সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং [illegible] সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৫০শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 20th April, 1962,
40 Naya Paise.

সম্প্রতি দিল্লিতে আকাশবাণীর উদ্যোগে সপ্তম বেতার-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। এই সম্মেলনে ভারতের তেরটি আঞ্চলিক ভাষার প্রতিনিধি হিসাবে ১২৪ জন সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। তথ্য ও বেতার দপ্তরের নবনিযুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন যে, সমগ্র দেশের মধ্যে জাতীয় এবং ভাবগত সংহতির জন্যে বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও এক নতুন ধরণের ঐক্যবোধ জাগ্রত করা উচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্যিকগণকে স্বকপোল-কল্পিত 'গজদন্ত মিনারে' বিচ্ছিন্ন না থেকে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতিকে ঐশ্বর্যশালী ক'রে জাতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অনুরোধ জানান।

এ ধরণের অনুরোধ আমরা আগেও শুনেছি; শ্রীরেড্ডী তাঁর নতুন সুযোগে যে সেই পুরনো কথাই নতুন করে বলবেন এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। এবং বক্তৃতার মধ্যে তিনি সাহিত্যিকদের যে 'গজদন্ত মিনার' ছেড়ে আসার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন তার মধ্যেও নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই।

কিন্তু 'গজদন্ত মিনার' কথাটির তাৎপর্য কী? শিল্পের জন্যেই শিল্প, কিংবা সমাজের জন্যে শিল্প, এ তর্ক বহুকালের। কিন্তু সাহিত্যিকরাও মানুষ, এবং ভক্তিভরে ডান হাতে হোক বা অনিচ্ছা-সত্ত্বে বাঁ হাতেই হোক তাঁরা সমাজের পায়েই পুজো দিয়ে থাকেন। তর্কটা নিতান্তই মানসিক প্রবণতার, এবং তর্ক ক'রে কারো মনের ঝোঁক বদলানো যায় কিনা তা খুবই সন্দেহের বিষয়।

তবু শ্রীরেড্ডী এবং তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের অসুবিধেটাও আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। তাঁরা শিল্প সাহিত্যের মধ্যে একটা অলৌকিক নেতৃত্ব আশা করেন। একথা অবশ্যই ঠিক যে মানুষের চিন্তা-ভাবনার উপর শিল্পসাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু শিল্পী কিংবা সাহিত্যিকগণ ইচ্ছা করলেই একটা সব পেয়েছির দেশ তৈরি করতে পারেন এ ধারণা অমূলক। আর যদি তা পারেনও তবে সেটাও কি এক ধরণের গজদন্ত মিনারেরই ব্যাপার হ'য়ে উঠবে না?

সাহিত্যিকদের যখন 'গজদন্ত মিনার ছাড়ার অনুরোধ জানানো হয় তখন নিশ্চয়ই বক্তাদের উদ্দেশ্য থাকে এই যে, সাহিত্যিকরা নিছক কল্পনাবিলাস ছেড়ে মাটির পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে নেমে আসবেন। এ প্রস্তাব যে অত্যন্তই যুক্তিসংগত সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই।

কিন্তু কথা হল এই যে, বাস্তবের মধ্যে যদি শ্রীরেড্ডীর আকাঙ্ক্ষিত সদ্‌গুণগুলির বিকাশের পথ ত্বরান্বিত না হয় তাহলে কেবল সাহিত্যের মধ্যে সেগুলির রূপায়ণ ঘটতে থাকলেও কি সেটা কল্পনাবিলাসের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে না?

আসলে, বিখ্যাত ইংরাজ কবি-সমালোচক এলিয়ট যে বলেছেন, প্রত্যেক যুগই তার প্রাপ্য সাহিত্য পায়, সেই কথাই সত্য। অর্থাৎ সাহিত্য ভুঁইফোড় জিনিস নয়, বাস্তবে যে অবস্থা থাকে, সাহিত্যেও ঘটে মোটামুটি তারই প্রতিফলন।

কাজেই জাতীয় সংহতি ইত্যাদির জন্যে সাহিত্যিকগণের কাছে আবেদন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবেও যাতে সে সংহতির বীজ অঙ্কুরিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। নয়তো বাস্তবে যেমন চলছে তা চলতে দিয়ে সাহিত্যিকদের কাছে একটা স্বপ্নময় সংহতির ভাবমণ্ডল প্রত্যাশা করলে সেটা হবে দুরাশারই নামান্তর।

শ্রীরেড্ডী অবশ্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে হিন্দি সাহিত্যিকদের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় দক্ষতা অর্জনের কথা বলেছেন। এবং অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা যেন হিন্দি সাহিত্যকে ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় এবং আঞ্চলিক সাহিত্য-গুলিকে হিন্দি ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ দায়িত্ব হিন্দি সাহিত্যিকরা একেবারে গ্রহণ করেননি এমন বলা যায় না। কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে অন্যত্র। হিন্দি সাহিত্যিকগণ যেহেতু ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দিকে একচ্ছত্র প্রভাবের অধিকারী বলে মনে করেন, সেইহেতু তাঁদের আচার আচরণের মধ্যে প্রকাশিত হয় এক ধরণের অধীরতা এবং অবজ্ঞা। আঞ্চলিক ভাষাগুলির কাছে এই মনোভাব যে বিরক্তি ও আতঙ্কের কারণ হ'য়ে ওঠে তা না বললেও চলে। এবং এইভাবেই তৈরি হয় পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষ, জাতীয় সংহতির পক্ষে যা সব থেকে বড় বাধা।

শ্রীরেড্ডী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যদি এদিকে বিশেষ মনোযোগী হন, এবং হিন্দির উদগ্র আধিপত্যাকাঙ্ক্ষা প্রশমিত করতে পারেন, তাহলে জাতীয় সংহতির অনুকূল একটা বাস্তব অবস্থা দেখা দিতে পারে। তখন আশাকরি সাহিত্যিকগণকে আর 'গজদন্ত মিনারে'র কথা শুনতে হবে না, এবং এমন সাহিত্যই সেদিন রচিত হবে যা আমাদের জাতীয় সংগীতে বর্ণিত ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের জনগণমনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।
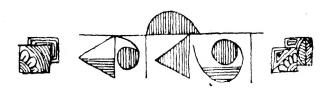
শান্তিনিকেতন ১৯৬৯

অসীম রায়

সন্ধ্যায় এমন এক ব্যাপ্তি আছে যা প্রায় সুদূর
রূপকথা ফুটপাথে দোকানের নিওন আলোতে,
এখানে তা এত সত্য এত মৃদু ধীর আলিঙ্গনে
অবলুপ্ত করে দেয় জল, জলে ছায়া, গাছ, গন্ধ,
দিনান্তের পাখী, ঘরে ফিরে চলা সাঁওতাল, মাঠ,
এত স্পর্শকাতর তুলিতে তোলে আলো শুধু রেখে দিয়ে যায়
একটু আকাশ যেন একটি প্রার্থনা
তা কি ঈশ্বর বা আমাদেরই অন্তরের সাধ
যেমন ঘনায়মান আঁধারে হৃদয় শুধু চায়
ফের যদি বাংলাদেশ বাংলাদেশ হয়।

একটি উজ্জ্বল মাছ

বিনয় মজুমদার

একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যতঃ সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেল—এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনার গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম হল ফল।

বিপন্ন মরাল ওড়ে, অবিরাম পলায়ন করে,
যেহেতু সকলে জানে তার সাদা পালকের নীচে
রয়েছে উদগ্র উষ্ণ মাংস আর মেদ;
স্বল্পায়ু বিশ্রাম নেয় পরিশ্রান্ত পাহাড়ে পাহাড়ে।
সমস্ত জলীয় গান বাষ্পীভূত হয়ে যায়, তবু,
এমন সময় তুমি, হে সমুদ্রমৎস্য, তুমি.....তুমি.....

কিম্বা দ্যাখ, ইতস্তত অসুস্থ বৃক্ষেরা
পৃথিবীর পল্লবিত ব্যাপ্ত বনস্থলী
দীর্ঘ দীর্ঘ ক্লান্তশ্বাসে আলোড়িত করে।
তবু, সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে দূরে
চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।

জানালা

অশোক চট্টোপাধ্যায়

সহসা দুচোখ তুলে জানালার পানে যদি চাই
স্তম্ভিত অরণ্যে বাজে অতিকায় পতনের ধ্বনি,
গিরিপথ সমাচ্ছন্ন, ঢেউ ওঠে প্রবল চূড়ায়,
শূন্যতা হারায় বর্ণ, তন্মুহূর্তে আমার নিধন।

এখনো অসংখ্য ভুল পড়ে আছে প্রহরীর মত
মৃত্যুর অমোঘ স্মৃতি দীর্ঘজীবী স্বপ্নে ও শরীরে,
পরিত্যক্ত প্রাসাদের অন্ধকার বিষণ্ণ গম্বুজে
দেখিনি কি কোনদিন ক্ষুদ্রতম পুষ্পের প্রয়াস।

প্রত্যাঘাতে রুক্ষতায় গড়েছি সহস্র প্রতিরোধ;
অভ্যাস দিয়েছে মুক্তি, অপমানে দলিত কুসুম
অভিশাপে বিদ্ধ করে—মনোরম চিত্রিত জানালা
লাবণ্যের মুখোমুখি আমি মৃত, আমি পরাভূত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্প আছে, নাম 'হতাশ প্রেমিক'। এবারের 'পূর্বপক্ষে' আমি সেই গল্পের লিখন-পদ্ধতি অনুসরণ করলাম। ডায়েরির আঙ্গিকে লেখা ঐ গল্পের প্রথম কয়েকটি লাইন এইরকম ঃ

৩১শে চৈত্র। রাত্রি ১০টা।

হে ১৩২৮ সাল! আজ কি সত্য সত্যই তুমি আমাদের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছ? আজ নিশা-শেষে, ঊষালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সত্যই কি অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইবে? তোমার পায়ে ধরি ২৮ সাল, এত শীঘ্র তুমি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাইও না, আরও কিছুদিন অবস্থিতি কর—তোমায় যে আমি বুক ভরিয়া ভোগ করিতে পাইলাম না। ভাই ২৮ সাল, তোমায় আমি বড় ভালবাসি, তাই তোমার আসন্ন বিরহে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে।......

প্রাণ জৈমিনিরও কেঁদে উঠেছিল। ২৮ নয়, ৬৮ সালের দুঃখে। তাই সে লিখেছে ঃ

ভাই ১৩৬৮ সাল!

তুমি আমাদের কাছে চিরবিদায় নিয়ে গেলে। কেন গেলে ভাই? তুমি কি মনে কর, সময় শুধু ঘড়ির কাঁটা ক্যালেণ্ডারের পাতা, বয়স মাপার নিরিখ? না তা তো নয়। সে যে শত-সহস্র মানব-মানবীর স্মরণের অম্লান কুসুম, তা কি তুমি জানো না?

কী জানি কেন ফুলের সঙ্গে সময়ের তুলনা দিলাম। হয়তো ফুলের মধ্যে মধু থাকে, সেই ছিল আমার আকর্ষণ। কিন্তু মধুর সঙ্গে মৌমাছি, এবং মৌমাছির সঙ্গে তার হুল যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তা কি আমি ভুলে গেলাম?

না, ভুলিনি। ভাই ১৩৬৮ সাল, তোমার মধু আর হুল, দুই-ই আমার অন্তরে চিরস্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেল।

আহা, কি সুন্দর ছিল এক বছর আগেকার সেই নতুন বছরের আরম্ভটা। সেদিনও এমনই নিদাঘ-তাপে আইঢাই করছিলাম বটে, কিন্তু সেদিন যে আমার এক বছর বয়স কম ছিল। এই কম থাকাটা যে কত বেশী থাকা, তা আমার মতো

বিগতযৌবন মানুষ মর্মে মর্মে অনুভব করে।

কিন্তু যৌবন নিয়ে শোচনা করিনে। কে না জানে, আয়ুর মতো যৌবনও পদ্মপত্রে নীর, যতোক্ষণ থাকে সেইটুকুর জন্যেই আমরা কৃতজ্ঞ। আরো বেশী থাকে না কেন, এ নিয়ে ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই। অতএব যৌবনের কথা থাক। কিন্তু যৌবন যেতে শুরু করলেই গায়ের চামড়া ঢিলে হয়, চুল পাকে, দাঁত পড়ে, এগুলো আমি ভুলে থাকতে পারিনে। কিংবা আমি ভুলতে চাইলেও লোকে ভুলতে দেয় না। আমার দুঃখ সেইখানেই। ভাই ৬৮ সাল, লোকের কাছে আমাকে হেয় করে তোমার কী লাভ হল?

জানি, আমার এই বিশেষ চেহারাটিরও কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধে তুমি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রেখেছ। আমি ইচ্ছে করলে এখন জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ দিতে পারব, আরো বেশি ক'রে সভা-সমিতির সভাপতি হ'তে পারব, এমন কি বিশেষজ্ঞ-রূপে দেশ-বিদেশেও আমন্ত্রণ পেতে পারি। তারপর ধীরে ধীরে আসবে সেইদিন যেদিন আমি নানা উপলক্ষে কাগজে বিবৃতি দেব। লোকে হাততালি দেবে. কিন্তু পড়বে না। আমি হাওড়া ব্রিজ, এসপ্ল্যানেড, কিংবা মেডিক্যাল কলেজের মতো একটা নিত্য-উচ্চারিত নামে পরিণত হব।......কিন্তু আমার যে কান্না পায়। ভাই ৬৮ সাল, তুমি আমাকে যাদুঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে গেলে!

কিন্তু তুমি চলে গেছ, এসব কথা বলে আর লাভ কি? বরং আমি সেইদিনের কথাই বলি যখন তুমি ছিলে। ভাই ৬৮ সাল, তুমি জানো না, তুমি কতো মহৎ। কালচক্রের অমোঘ নিয়মে যেদিন পাঁজিকায় ১২৬৮ সালের আবির্ভাব ঘটে সেইদিনই স্থির হ'য়ে গেছে তুমি চিরস্মরণীয় হবে। কারণ ঐ বছরেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১২৬৮ সালের একশ' বছর পরে যে তোমাকে আসতেই হবে এ তো সোজা অঙ্ক। তাই রাজার ছেলে রাজা হওয়ার মতো রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেছে, ১২৬৮ সালের মতো তোমারও কপালে পড়বে অক্ষয় কীর্তির চন্দন-তিলক।

সেই গৌরব তুমি কড়া-গণ্ডায় আদায় করে নিয়ে গেছ। বাঙালী যে এতো রসগ্রাহী জাত, এর আগে তা কে এমন মর্মে মর্মে টের পেয়েছে বল তো? আমরা দুর্বল, বিপর্যস্ত, অবহেলিত যাই হই না কেন, কলম ধরতে ভয় পাইনে। বরং কলম দেখলেই আমরা চঞ্চল হ'য়ে উঠি। ভাই ১৩৬৮ সাল, একবার চিন্তা করে দেখ, গত এক বছরে কতো প্রবন্ধ আমরা লিখেছি! সত্যি বলছি, একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, বাঙালীর ছেলে আর যাতেই ভয় পাক, প্রবন্ধ লিখতে ভয় পায় না। বিশেষ করে, বিষয়টা হয় যদি রবীন্দ্রনাথ। ভূমা, জীবনদেবতা, আপন মনের মাধুরী ইত্যাদি কথা এমন সহজে আমাদের কলমে আসে যে, নিজেরাই আমরা মুগ্ধ হ'য়ে যাই। বাস্তবিক, বীজগণিতের ফর্মুলার মতো একেও এক ধরণের রবীন্দ্র-বোধ ফর্মুলা বলা যেতে পারে। এই ফর্মুলা আমরা বাল্যকাল থেকে এমনভাবে রপ্ত করেছি যে অন্য কথা ভাববারই কোনো দরকার করে না। এবং ভাবিও না। তুমিই বল ৬৮ সাল, কষা অংক নতুন ফর্মুলায় কষতে গিয়ে একটা গোলমাল করে ফেলা কি খুব গৌরবের কথা হতো?

তাছাড়া, তুমি তো জানো, নতুন করে ভাবতে গেলে পড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে পড়া আমাদের অনেকেরই হ'য়ে ওঠেনি। আর তার সময়ই বা কোথায়? আমরা কেউ সাহিত্যিক, কেউ অধ্যাপক, কেউ বা রাজনীতিক। সারাদিনই আমাদের কাজ। এর মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথ পড়তে বসলেই হ'য়েছে আর কি! তাহলে আর বক্তৃতা দেব কখন? লিখব কখন? আমরা তাই কয়েকটা সরল রাস্তা বার করেছি। একটা তো আগেই বলেছি, ভূমা+জীবনদেবতা×আপন মনের মাধুরী=রবীন্দ্রনাথ। আরো কয়েকটা নিচে তুলে দিচ্ছি।
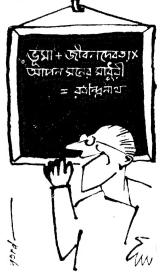
১। রামমোহন + দেবেন্দ্রনাথ + উপনিষদ + বৈষ্ণব কবিতা × ইংরাজি রোমান্টিক কবিতা-আধুনিক যন্ত্রণা= রবীন্দ্রনাথ।

২। রবীন্দ্রসংগীত = ধ্রুপদ + বাউল। = পাশ্চাত্য সঙ্গীত।

৩। রবীন্দ্রচিত্র = আধুনিক মন + কবিতার খসড়ায় কাটাকুটি × অবচেতন মনের অসুন্দর = অবদমন।

তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভাই ১৩৬৮, তুমি গেছ, কিন্তু যে সব অমূল্য শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছ সেজন্যে তুমি আমাদের ধন্যবাদ জেনো। একশ' বছর পর ১৪৬৮ সালে আবার লোকে তোমার কথা মনে করবে। এবং তোমার ৩৬৫ দিনের সামান্য আয়ুতে কী অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ত্রিরিশ হাজারটি প্রবন্ধের জন্মদান সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে ভেবে কূলকিনারা পাবে না। সেই জন্যেই আমি উপরে কয়েকটি : ফর্মুলা লিপিবদ্ধ করে রাখলাম। আশা করি, রবীন্দ্রজন্ম-দ্বিশত-বার্ষিকীর লোকেরা এ জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।

ভাই ১৩৬৮ সাল, আমার কামান নেই, তোমার সম্মানে আমি একুশবার নমস্কার জানাচ্ছি। বিদায়, চিরবিদায়!

॥ নববর্ষের সম্ভাষণ ॥

'অমৃতে'র অগণিত পাঠক-পাঠিকা, পৃষ্ঠপোষক এবং শুভানুধ্যায়ীগণ নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমাদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আপনাদের অকৃত্রিম সহযোগিতায় অল্পকালের মধ্যেই 'অমৃত' যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তাতে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করি। ভবিষ্যতেও যাতে 'অমৃতে'র প্রতি আপনাদের এই প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্যে আমরা সচেষ্ট থাকব।

ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩৬৯
সম্পাদক, অমৃত।

তলস্টয় সান্নিধ্যে

লিওনিড পাস্তেরনাক

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

লিওনিড পাস্তেরনাকের জন্ম-শত-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে বিগত ৪ঠা এপ্রিল। আজ তাঁর নাম পরিচয় জানবার সুযোগ এসেছে বলে পৃথিবীর অজস্র কলারসিক বিশেষ সুখী হয়েছেন। কারণ নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক বোরিস পাস্তেরনাকের পিতা শুধু নন, লিও-নিড নিজে ছিলেন একজন সার্থক স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী। শিল্পের সমস্ত মাধ্যমেই নিজের স্বকীয়তার পরিচয় এবং অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেলেও, প্রধানতঃ পোর্ট্রেট পেন্টিং-এই সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। তুলির আঁচড়ে তাঁর মডেলের দৈহিক প্রতিকৃতিই নয়, প্রকৃতি, চরিত্র আর ব্যক্তিত্বের আলেখ্যও ক্যানভাসের বুকে তিনি ফুটিয়ে তুলে ধরতে সক্ষম ছিলেন। বীটোভেন থেকে শুরু ক'রে তলস্টয়, আইনস্টাইন প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বহু ব্যক্তিরই প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন লিওনিড। সমসাময়িক শিল্প-জগতের গুরু ব'লেও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন লিওনিড পাস্তেরনাক।

শেষ-জীবনে, অক্সফোর্ডে বসে লিও-নিড রচনা ক'রে গিয়েছেন তাঁর স্মৃতি-কথা, ১৯৬০ সালে দেহত্যাগের আগে। এতদিন সেগুলো অপ্রকাশিতই ছিল। এই স্মৃতিকথায় তলস্টয়-পর্বটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের নতুন কয়েকটি দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন লিওনিড, তাঁর এই লেখনী-চিত্রে।

মাত্র তিরিশ বছর যখন লিওনিডের বয়স, সেই সময় একদিন সেণ্ট পিটার্স-বার্গ থেকে বহু-পঠিত এক পত্রিকার প্রতিনিধি এসে তাঁকে জানালেন যে, তলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' বইটি সচিত্র করবার জন্যে কয়েকজন সক্ষম চিত্র-শিল্পীর প্রয়োজন : রোপিন, কিভ্‌, শেভেকো এবং ভেরেশচাগিন সহযোগিতা করতে রাজি হ'য়েছেন। চতুর্থ শিল্পী-রূপে তাঁরা লিওনিডকে চান!

লিওনিড তো এই প্রস্তাব শুনে অবাক। কারণ উপরিউক্ত শিল্পী-তিনজন ইতিপূর্বেই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়েছেন চিত্র-জগতে: আর লিওনিডের নাম সবে অল্প অল্প ছড়াতে শুরু করেছে তখন! বরেণ্য শিল্পীত্রয়ের সঙ্গে এইভাবে কাজে নামা উচিত কিনা ভেবে শেষপর্যন্ত তিনি সম্মত হ'য়ে গেলেন।

উপন্যাসটির বিভিন্ন দৃশ্য বেছে নিয়ে প্রত্যেক শিল্পী স্বতন্ত্রভাবে কাজে হাত দিলেন। যে-যুগের বর্ণনা দিয়েছেন ঔপ-ন্যাসিক, সে-যুগের সংস্কার, চিহ্নমাত্র আর অবশিষ্ট ছিল না লিওনিডের যুগে। বহু বই-পত্র ঘেঁটে বহু গ্রন্থাগারে ধর্ণা দিয়েও সে-যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা ক'রে উঠতে পারলেন না। তবু আন্দাজে আন্দাজে তিনি কয়েকটি ছবি শেষ ক'রেই ফেললেন, যথাসম্ভব ইতিহাস-নিষ্ঠা এবং বাস্তবতা বজায় রেখে। মাঝে মাঝে লিওনিডের মনে হ'তে লাগল, খোদ ঔপন্যাসিক যখন মস্কোতেই আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে কিছু কিছু নির্দেশ নিয়ে এলে ক্ষতি কি? দালাক্রোয়া হেন মহারথী পর্যন্ত গোয়েটের ফাউস্ত সচিত্র করতে বসে প্রতিটি চিত্র মহাকবির কাছে পাঠাতেন তাঁর অনুমোদনের জন্যে —আর লিওনিড তো সামান্য উদীয়মান শিল্পী তখন। কিন্তু কোনমতেই সাহস করে তিনি তলস্টয়ের মতো বিরাট মহান ব্যক্তিত্বের কাছে যেতে পারলেন না।

এদিকে, ১৮৯৩ সালে, মস্কো আর্টস স্কুলে বড় ক'রে একটা চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন হ'ল। শোনা গেল উদ্বোধনের আগেই তলস্টয় আসবেন প্রদর্শনী দেখতে। লিওনিড পাস্তেরনাকের আঁকা বড় একটা ছবিও ছিল প্রদর্শনীতে। ঘটনাক্রমে, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতে থাকতেই একদিন চাঞ্চল্য জাগল, তলস্টয় এসেছেন প্রদর্শনী দেখতে! তলস্টয় যে আসবেন, লিওনিড জানতেন না।

তলস্টয় এসে পড়লেন। "অমায়িক, সরল, আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন প্রবীণ ভদ্রলোক যেন এত ভিড়ে একটু বিব্রতই বোধ করছেন। কী সহৃদয়, সৌজন্যভরা, আপন-করা ব্যবহারেই না তিনি অভিনন্দন জানালেন সমবেত শিল্পীদের।.......... পঁয়ষট্টি বছর বয়স হ'লেও প্রাণ-শক্তিতে ভরপুর, বলিষ্ঠ, মনে আর দেহে দারুণ সামর্থ্য রাখেন মনে হ'ল।'

ছবির পর ছবি দেখে চললেন তলস্টয়। পেছন পেছন চললেন প্রবীণ-

নবীন অগণিত শিল্পী। সবার পেছনে লিওনিড। হঠাৎ তাঁর কানে এল, প্রবীণ শিল্পী সাভিৎস্কি তলস্টয়কে বলছেন, "এই ছবিটি হচ্ছে প্রতিভাবান তরুণ শিল্পী পাস্তেরনাকের আঁকা।" সঙ্গে সঙ্গে তলস্টয় জবাব দিলেন, "বিলক্ষণ চিনি। পাস্তেরনাকের আঁকা ছবি গোড়া থেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।" সাভিৎস্কি বললেন, "যদি অনুমতি করেন তো শিল্পীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।" "ভারি সুখী হব", তলস্টয় বলা-মাত্র ভিড় ফাঁক করে সবাই পাস্তেরনাককে ঠেলে দিল সামনে। অল্প দু-চার কথা বলবার পর পাস্তেরনাক জানালেন "ওয়ার অ্যান্ড পীস" সচিত্র করবার কথা। ভারি উৎসাহিত হয়ে তলস্টয় বললেন, "দয়া করে, যে-কটা ছবি তৈরী আছে, নিয়ে আসুন না আমার ওখানে— আগামী শুক্রবার আমার ওখানে আপনার চায়ের নেমন্তন্ন রইল।"

নির্দিষ্ট দিনে লিওনিড উপস্থিত হলেন তলস্টয়ের বাড়িতে। তাঁকে দেখামাত্রই উৎফুল্ল তলস্টয় বললেন, "কই, ছবি এনেছেন? দেখি, কী এনেছেন!" সন্ধ্যা হয় হয়। তলস্টয় বাতিটার কাছে এগিয়ে গেলেন। লিওনিডের হাত থেকে প্রথম ছবিটা নিয়ে দেখতে লাগলেন। প্রথম বল-নাচের সন্ধ্যায় নাতাশা-র সঙ্গে প্রিন্স আঁদ্রে-র পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন পিয়ের বেসুখভ; পশ্চাৎপটে সম্রাট প্রথম আলেকজান্দার সপার্ষদ এসে ঘরে ঢুকছেন—এই দৃশ্যটি ছবিতে দেখেই তলস্টয় আনন্দে চেঁচিয়ে ডাকলেন তাঁর মেয়েকে: "তানিয়া, তানিয়া, দেখে যা, দেখে যা একবার কাণ্ডটা!" তারপর শিল্পীর দিকে ফিরে বললেন, "কী মজা! যখন এই দৃশ্যটির বর্ণনা আমি লিখছিলাম, ঠিক এমনি একটা ছবিই যে আমার মনের-চোখে ভাসছিল!" থেকে থেকে এ-কথাটাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উনি বলতে লাগলেন।

তলস্টয়-কন্যা তাতিয়ানা লভভনার সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় করিয়ে দিলেন সাহিত্য-সম্রাট। তাতিয়ানা নিজেও শিল্পী। পিতা আর কন্যার অকৃত্রিম প্রশংসায় লিওনিড যেমন আনন্দিত তেমনি বিব্রত হয়ে পড়লেন। পরবর্তী আর তিনটি ছবি হল "নেপোলিয়ন ও লাভরুস্কা", "আহত প্রিন্স আঁদ্রে ও নাতাশা", এবং "মস্কোতে ফরাসীরা"। চিন্তাকুল গম্ভীর নেপোলিয়নের পাশে মাতাল ফূর্তিবাজ লাভরুস্কাকে দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন তলস্টয় ছোট ছেলের মতো।

তলস্টয়ের উৎসাহ দেখে সাহস করে লিওনিড ধীরে ধীরে তাঁর প্রশ্নগুলি পাড়তে লাগলেন। কিন্তু লিওনিডের বিস্ময়ের অবধি রইল না, যখন দেখলেন যে স্বরচিত উপন্যাসের কোনও অংশই তলস্টয়ের মনে নেই, বেমালুম সব ভুলে বসে আছেন। অত বড় উপন্যাস "ওয়ার অ্যান্ড পীস" যেন আর-কারো লেখা এই রকম ভাব ওঁর!

একে একে তলস্টয় পরিবারের আর-সবাই, বন্ধু-বান্ধবও এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে লিওনিডের আলাপ হল। আলাপ হল তলস্টয়-পত্নী সোফিয়া আন্দ্রেভনার সঙ্গে। রাশান সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের যাতায়াত এই ড্রয়িং রুমটায়।

লিওনিডের স্ত্রী রোজা (কাউফম্যান, পরে পাস্তেরনাক) ছিলেন বিখ্যাত পিয়ানো-শিল্পী। তাঁর বাজনা শুনে তলস্টয়ের চোখে বইত আনন্দের অশ্রু। লিওনিদের বাড়িতে বসে তলস্টয় পিয়ানো শুনছেন—লিওনিডের আঁকা এই ছবিটা মস্কোর তলস্টয় মিউজিয়ামে আজো দেখা যায়। চাইকভস্কি-র বিশ্ববিশ্রুত Trio-টি তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে: রোজা পাস্তেরনাক পিয়ানো বাজাচ্ছেন, প্রফেসর গ্রজিমালি চেলো, আর প্রফেসর রাদুকেভ বাজাচ্ছেন ভিওলসেল!

রুমিয়ান্তসেভ মিউজিয়ামে র‍্যাম্ব্রান্টের আঁকা কটি ছবির পাশেই আছে লিওনিড পাস্তেরনাকের আঁকা তলস্টয়ের একটি ছবি, "পাণ্ডুলিপি শোনানো"। ছবিটি প্রসঙ্গে লিওনিড বলছেন:

"প্রসিদ্ধ শিল্পী-বন্ধু N. N. Gue-কে তলস্টয় তাঁর একটি রচনার খসড়া পড়ে শোনাচ্ছেন—এই দৃশ্যটি আমি এঁকেছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আসলে Gue-কে নয়, আমাকেই তলস্টয় যাটা পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তলস্টয়ের সঙ্গে নিজেকে এক-কানভাসে অমর করে রাখা আমার অভিসন্ধি ছিল না, অ স্বার্থপর হতে আমার বাধত তাই তলস্টয়ের প্রবীণ বন্ধুকে কল্পনা সাহায্যে শ্রোতার আসনে বসিয়ে দিলাম। তৃতীয় আর-একজনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন তলস্টয়ের জীবনীকার পল বিরুকভ। কিন্তু মেজাজের গভীর, নিবিড় একাগ্রতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁকেও আমি বাদ দিলাম।"

উক্ত ছবিটি আঁকবার মূলে যেটি, তার ইতিহাসও দিয়েছেন লিওনিড। ১৮৯৩ সালের জুন মাসে তলস্টয়ের আমন্ত্রণে লিওনিড যান তলস্টয়ের পল্লী-ভবনে। সেখানে, একদিন সকাল বেলা, তলস্টয় তাঁর লেখবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাতে কাস্তে। খানিকটা ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে, তলস্টয় যেতেন মাঠের কাজে। লিওনিড আর বিরুকভকে ডেকে তিনি মাঠে গিয়ে ঘাস কাটার কাজে (সেদিন ছিল আগাছা

লিওনিড পাস্তেরনাকের প্রথম যে চিত্রটিকে কেন্দ্র ক'রে মস্কো আর্টস স্কুলে তলস্টয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়

খোলা। মন দিলেন। কী যেন ভাবছিলেন তিনি সারাক্ষণ। কারো সংগে একটাও কথা বললেন না। কাজ-শেষে ক্লান্ত তলস্টয় ঘরে ফেরবার সময় হঠাৎ লিওনিডকে বললেন, "হাতে সময় আছে?" —"নিশ্চয়"। "তবে আসুন আমার সংগে!"

বিরুকভ ফিসফিস করে লিওনিডকে বললেন, "নিশ্চয়ই উনি নতুন কোনও রচনা শোনাবেন। সচরাচর উনি কাউকেই পান্ডুলিপি শোনাতে চান না। যান্!"—ঘরে ঢুকে, কাস্তেটা মেঝের এককোণে রেখে, ওভারকোট না খুলেই তলস্টয় সদ্য-রচিত এক বইয়ের একটা পরিচ্ছেদ পড়ে শোনালেন।

এর কিছুদিন বাদেই 'রিসারেকশান' বইটা চিত্রিত করবার ভার পেলেন লিওনিড। 'রিসারেকশান' তখনো একটা ছোটগল্পের আকারেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণতঃ তলস্টয় নিজের রচনা সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই করতে চাইতেন না। কিন্তু শিল্পীর হাতে 'রিসারেকশান'-এর খসড়া তুলে দেবার সময় তিনি বললেন, "এটিই আমার সেরা রচনা। মনে হয় আপনার ভালই লাগবে।"

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, তলস্টয় তাঁর গল্পটিকে ততই বিপুলতর ক'রে তুলতে লাগলেন : দৃশ্যের পর দৃশ্য বদলে দিলেন, কতক পরিচ্ছেদ বাদ দিলেন, নতুন আরো-কত পরিচ্ছেদ লিখলেন! সে এক এলাহি কান্ড! ওদিকে প্রথম পর্বটি তিনি প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন : একাদিক্রমে পিটার্স-বার্গ, পারী, লন্ডন, ন্যু ইয়র্ক প্রভৃতি বহু জায়গা থেকেই বইটা ছেপে বের হচ্ছে। শিল্পীর আঁকা ছবিগুলো দেখে শিশুসুলভ আনন্দে আটখানা হ'য়ে উঠতে লাগলেন তলস্টয়: কোনটা দেখে তিনি হো-হো ক'রে হেসে ওঠেন, কোনটা দেখে বলেন, "বাবাঃ, আপনি দেখছি আমার চেয়েও বেশি শ্লেষ ঢেলেছেন!" আর শিল্পীর আঁকা 'শাস্তির পরে' ছবিটা দেখে ওঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠল। বললেন, "খাসা! অতি সুন্দর! চমৎকার হয়েছে, ভায়া!" তারপর কপাল চাপড়ে বললেন, "ইস্! এত সুন্দর ছবিটা আমার বইয়ে যাবে না?" শিল্পী কিছু না বুঝতে পেরে ফ্যালফ্যাল ক'রে তলস্টয়ের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "ভায়া, আমি যে প্রকাশকের কাছে টেলিগ্রাম করেছি, এই পরিচ্ছেদটা বাদ দিতে!......না, না, তা' হয় না। এখুনি যাচ্ছি। টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি যে ও-পরিচ্ছেদটা বাদ দেওয়া অসম্ভব।......"

বইটা অবশেষে প্রকাশিত হ'ল। তার খ্যাতি সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সভ্য-জগতের সর্বত্র। সেইসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল লিওনিড পাস্তেরনাকেরও নাম।

লিওনিড পাস্তেরনাক তলস্টয়ের সুন্দর একটি উক্তি দিয়ে তাঁর তলস্টয় প্রসঙ্গ শেষ করেছেন। লিওনিডের আঁকা ছবিগুলি প্রথম যখন ছেপে এল, ছাপার খুঁত আর মামুলি ধরণের প্রয়াস দেখে তিনি বিশেষ মর্মাহত হয়েছিলেন। অথচ প্রকাশকেরা এইটুকুতেই সন্তুষ্ট, এতেই তাঁরা শিল্পীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শিল্পীর মনের ব্যথা বুঝে তলস্টয় তাঁকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন,

"এমন মর্মাহত হ'লে চলবে কেন? ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই প্রকাশ্য কোনও প্রদর্শনীতে আপনার মূল চিত্রগুলি আপনি দেখাবেন। তখনই তো লোকে বুঝতে পারবে তাদের সত্যকার মূল্য।"

তলস্টয় আরো বললেন, "মনে রাখবেন যে এই জগতের সবকিছুই লোপ পাবে : রাজ্য যাবে, সিংহাসন যাবে, ধন-রত্ন সবই লুপ্ত হ'য়ে যাবে, লোকে ভুলে যাবে আমাদের কথা, ভুলে যাবে আমাদের পুত্র-কন্যাদের রক্তমাংসের চেহারার কথা। কিন্তু, আমাদের কীর্তির কোথাও যদি তিলমাত্র সত্যকার শিল্প প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে তা' শাশ্বত, অমর হ'য়ে থাকবে চিরটা কাল।" লিওনিড পাস্তের-নাকের আঁকা ছবিতে কি তলস্টয় দেখেছিলেন সেই সত্যকার শিল্পের প্রকাশ?

মস্কো লেনিন স্টেট লাইব্রেরীতে রক্ষিত লিওনিড পাস্তেরনাক অংকিত তলস্টয়ের ছবি।

সাত পাঁচ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

॥ বিশেষ দ্রষ্টব্য ॥

সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়াটা আমাদের দৈনন্দিন রোজনামচায় খুব কমই ঘটে থাকে। ধর্মের বিভিন্নতার কথা না তুললেও, নিজেদের নশ্বর জীবনের দার্শনিক চিন্তায় মন ভারী করতে রাজী নই আমরা। শ্মশানে গিয়ে আমরা যেমন শ্মশান-বৈরাগী হয়ে পড়ি, তেমনি সমাধিক্ষেত্রে গেলে তার চেয়েও স্বাভাবিক কারণেই বেশী অস্বস্তিবোধ করি। কতকগুলো মানুষের সুখ-দুঃখ-ভরা জীবন এই মাটির নীচে স্তব্ধ হয়ে আছে, এই চিন্তাটা আমাদের মন ভারী করে তোলে। তাই কৌতূহলী ছাড়া এই নিষিদ্ধ এলাকায় পা বাড়াবার কথা ভাবতেই পারেন না কেউ।

হয়ত ইতিহাসের নায়কেরা কোন খ্যাত-অখ্যাত মানুষের শেষ সমাধি দেখার কৌতূহলটুকু আমরা বড় জোর দেখাতে পারি, কিন্তু যারা তাদের জীবনে চিরদিন লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে গেল, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি আমাদের কোন কৌতূহলই থাকে না।

তবু কবি মধুসূদনের 'দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি বঙ্গে তব, তিষ্ঠ ক্ষণকাল' তাঁরই সমাধিফলকে এই অমর অনুরোধের মত কেউ সমাধিক্ষেত্রে অকস্মাৎ যদি গিয়ে পড়েন, এমনি সারি সারি সমাধিফলকের লেখাগুলো মনে হবে মুখর হয়ে উঠেছে।

মানুষ জীবনে চিহ্ন রাখার জন্য চিরপ্রয়াসী। মরণের পরেও তাই পৃথিবীর বুকে চিহ্ন থেকে যায় পাষাণ-ফলকে কটি কথায়; গদ্যে, পদ্যে বা বিচিত্র ভাষায়। সমাধি-প্রস্তরের ওপর কিছু লিখে রাখার নিয়ম তাই অনেক যুগের প্রাচীন। যে প্রিয় মানুষেরা মাটির তলায় আশ্রয় নিয়েছে তার সম্বন্ধে সত্যি কথাটা ক্ষোদিত করে দেয় তার আত্মীয়রা। আর এই কটি কথা মৃত মানুষটির হয়েই যেন কথা বলতে চায়।

পৃথিবীর সেরা সেরা মানুষের সমাধি ফলকের লেখাগুলি পৃথিবীর মানুষের কাছে চির [illegible] শ্রদ্ধার বাণী। কিন্তু সাধারণ মানুষের সাধারণ সমাধিলিপিগুলির বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। মৃত মানুষের জন্যে জীবিত মানুষের শ্রদ্ধাভক্তির পরিমাণ এমনই কম, যে এই সংক্ষিপ্ত রচনা-গুলির কলেবর কোন দিন এমন হয় না যে দর্শকের ধৈর্যের ওপর অত্যাচার চলতে পারে। তাই হয়ত বিশ্বের সেরা সেরা মানুষেরা নিজেদের সমাধি বেদীর ফলকে কি লেখা হবে তারই মুসাবিদা করে গেছেন। শোনা যায়, কোলরিজ তাঁর নিজের জন্যে এমনি তিনটী লেখা রচনা করে গিয়েছিলেন অবশ্য তিনটীর একটিও তাঁর সমাধিফলকে শেষ পর্যন্ত উৎকীর্ণ হয়নি।

কোলরিজের এমনি একটি সুপরিচিত রচনা—

আমাকে দেওয়া হল মৃত্যু

আর তোমাকে জীবন

কিন্তু হায় এমন একটা মুহূর্তে এল

যখন দুজনেই আমরা সমান হয়ে গেলাম,

দেখ, ঈশ্বরের ইচ্ছার কোন পক্ষপাত নেই

অবশ্য সমাধিফলকে মৃতের আত্মীয়রা মৃতের কীর্তিগাথা-অকীর্তিগাথা [illegible] তাঁদের প্রীতি নিবেদন করতে পারেন, কিন্তু দর্শকদের মুগ্ধ করে সেই সমস্ত উৎকীর্ণ লিপি যার মধ্যে পাওয়া যায় রসবোধ, যার মধ্যে পাওয়া যায় দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা। যেমন একটি জায়গায় একটা রঙকর নকশীর সমাধি-ফলকে লেখা আছে (ইংরেজীতেই উল্লেখ করছি, বাংলা অনুবাদ সম্ভব নয় বলেই)।

HERE LIES JOHN HYDE
HE FIRST LIVED AND
THEN HE DIED;
HE DYED TO LIVE AND
LIVED TO DYE
AND HOPES TO LIVE
ETERNALLY

বা,

আজ যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ,

সেখানে আমি

একদিন দাঁড়িয়েছিলাম

আজ যেমন তুমি আমাকে দেখছ

তেমনি অন্য একজনকে

আমিও দেখেছিলাম।

একদিন তুমিও আমার মত নীচে,

নেমে আসবে

তখন অন্যরা তোমার সামনে দাঁড়াবে,

আর দেখবে তোমাকে।

বা,

রবীন্দ্রনাথের 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'র মত—

কি সুন্দর এই মৃত্যু

পৃথিবী ত শুধু দুঃখ আর

অহংয়ে ভরা।

পৃথিবীর সেই যন্ত্রণা কদিনের

তার পর ত এই সুখশয্যা।

ক্লান্ত পথিক বল তবে কোনটা ভাল

ক্লান্তিকর পথযাত্রা, না পথশেষের

এই বিশ্রাম!

ব্যঙ্গের ক্ষুরধার চমকও কখনও কখনও দেখা যায়, যেমন কোন রাজার সমাধি-ফলকে লেখা থাকে—

এখানে আমাদের মহারাজাধিরাজ

বিশ্রাম করছেন

যাঁর কথা কেউ কোনদিন বিশ্বাস

করেনি,

যিনি কোনদিন বোকার মত কথা

বলেননি

অথচ জ্ঞানীর মত একটাও কাজ

করেননি।

বা জনৈক অজ্ঞাত পরিচয়ের উদ্দেশ্যে—

ALIVE, HE LIED
IN ALL HE SAID
AND HAVING DIED
HE NOW LIES DEAD.

কখনও কখনও মৃত্যু-নিবন্ধনীর [illegible] পাই এই সব লেখার মধ্যে যেমন—

In memory of Captain underwood who was drowned.

Here lies free from blood and slaughter once underwood — now under water.

কিন্তু এত সব কিছু লেখার মধ্যে হঠাৎ যদি আমাদের চোখে পড়ে একটি-মাত্র কথা Silence তখন এক অন্তঃসারী মহা-মৌন আমাদের নিমেষে স্তব্ধ করে দেয়। মাথা কখন আপনা থেকেই মাটীর দিকে ঝোঁকে। মাটীর নীচে যে মানুষ তার কামনা-বাসনার অবসান করে দিয়ে শান্তির শয্যা পেতে রয়েছে, তাকে দেখা না গেলেও মনে হয় আমার সামান্য চঞ্চলতা তার শান্তিকে বিঘ্নিত করবে।

এই সমাধি-ফলকে কিছু লিখে রাখা কে প্রবর্তন করেছিল জানি না, কিন্তু কঠিন পাথরের বুকে এই লেখাগুলো জীবন আর মৃত্যুর শাশ্বত বাণীই ঘোষণা করে চলেছে মানুষকে তার ক্ষুদ্র গণ্ডির ঊর্ধ্বে ওঠবার জন্য আহ্বান জানিয়ে চলেছে। শত কাজের মধ্যেও তাই জীবনকে আরও সার্থক করে তুলতে সমাধি-ক্ষেত্রে বা শ্মশানে যাওয়াটা সময়ের অপব্যয় নয় নিশ্চয়ই। *

---

* উপকরণ বিদেশী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

প্রেম ও পাদুকা

জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)

(১)

বিকাশ মনে মনে বিবাহের স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে। সেকেলে রীতিতে পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের মনোনীত পাত্রী বিবাহ করিবে, এটা তার পছন্দ নয়। একটু আধুনিকভাবে দেখিয়া-শুনিয়া মিলিয়া-মিশিয়া তারপর যাহা হয় করিবে। সেকেলে দিন তো আর নেই। এখন ত পথে, ট্রামে, বাসে, পার্কে, মিটিং-এ, এক্জিবিশনে, সিনেমায়, থিয়েটারে কত বয়সের, কত বর্ণের, কত সাজের কত মেয়ে কিলবিল করিতেছে। ইহাদের মধ্য হইতে একটি বেশ মনোমত মেয়ে পছন্দ করিয়া আলাপ করিয়া তারপর—সেই ত ভাল।

একদিন বাসে উঠিতেই প্রায় সম্মুখেই তাহার বহুবাঞ্ছিত যুবতী যেন তাহারই জন্য বাসের একটি খালি সীটে আসিয়া বসিয়া পড়িল। আহা! যেমন রং, তেমনি মুখশ্রী, তেমনি গড়ন-পেটন। টিকিট কিনিবার সময়ে কন্ডাক্টরের সংগে কথা বলিবার সময়ে তাহার দাঁতের পাটি বিকাশ দেখিয়া ফেলিল—ঠিক যেন মুক্তার পাঁতি। বিকাশ মনে করিয়াছিল, আলাপ-টালাপ হইয়া যাইবার পর বুঝিয়া-সুঝিয়া ভালবাসার কথা বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে। কিন্তু কেমন যেন সব উল্টা হইয়া গেল। আলাপের আগেই কেমন যেন একটা, কি যেন একটা তাহার মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বসিবার সীট নিকটে খালি ছিল না। বিকাশ মাথার উপরের রড ধরিয়াই মেয়েটির দিকে একটু ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ড্যালহৌসি স্কোয়ারের কোথায় সে নামিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইল, মেয়েটি তাহারই পাশের অফিসের দরজার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

পরদিন। ঠিক সেই বাস-স্টপ, সেই রাস্তার মোড়, সেই সময়ে বিকাশের সম্মুখে বাস আসিয়া থামিল। জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল, লেডিজ সীটের কোথাও সে নাই। পর পর কয়েকখানি বাস এমনি করিয়া চলিয়া গেল। তারপর একখানি বাসের জানালার ফাঁকে তাহার বাঞ্ছিতার মুখখানি দেখিয়াই বাসে উঠিয়া পড়িল এবং যথাসম্ভব সেই মেয়েটির সীটের কাছেই গিয়া দাঁড়াইল। একটু লক্ষ্য করিয়া বিকাশ দেখিল, মেয়েটির হাতে একখানা চিঠির এনভেলপ, পোষ্ট-অফিসের সীল-দেওয়া। নাম পড়িয়া বুঝিতে পারিল, মেয়েটির নাম সুরমা—কি সুন্দর নাম! এমন সুন্দর নাম পৃথিবীতে বোধ হয় মাত্র একটিই আছে। দেখিতে দেখিতে এবং ভাবিতে ভাবিতে বিকাশ যথাস্থানে পৌছায়, আর তেমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বিদায় নেয়।

আবার একদিন। ঠিক তেমনি করিয়া সুরমা ও বিকাশ ঠিক সেই স্টপে ওঠে। সুরমার সীটের পাশে একখানা পোষ্ট-অফিসের সীল-দেওয়া পোষ্টকার্ড পড়িয়া যায়, বোধ হয় বিকাশই ফেলিয়া দেয়। সুরমা চাহিয়া দেখে তাহাতে বিকাশের নাম। মনে ভাবে, তাহলে ও'রই নাম বিকাশ। মনে মনে বলে, বিকাশ! কি মিষ্টি নাম। যাক গে, কোথাকার কে, ও-সব ভাবতে নেই। সুরমা ব্যাগ খুলিয়া ছোট আয়নার দিকে চাহিয়া মুখে একটু পাউডার বুলাইয়া নেয়। ও কি! আয়নার মধ্যে তাহার কাঁধের পিছনে কার মুখ! ওই তো বিকাশ—না, কে যেন, হ্যাঁ বিকাশই তো। যাক গে, কোথাকার কে, তার ঠিক নেই। সুরমা ব্যাগ বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিল। তারপর? তারপর আর কি। ড্যালহৌসি স্কোয়ারের সেই পাশাপাশি দুই অফিসের দুই দরজায় তারা নামিয়া যায়।

আরো কয়েকদিন পরে। একদিন বৈকালে অফিসের ছুটি হইবার একটু আগেই বিকাশ তাহার উপরিতন কর্মচারীকে বলিয়া মাথা ধরার অজুহাতে অফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং সুরমার অফিসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক জনস্রোত দেখিতে লাগিল। সুরমা তাহার অফিস হইতে বাহির হইয়া যখন বাসে উঠিল, ঠিক সেই সময়ে বিকাশও সেই বাসে উঠিল। কন্ডাক্টর টিকিট চাহিলে বিকাশ সেই বাস লাইনের শেষ স্টপের টিকিট কিনিয়া সাগ্রহে লক্ষ্য করিতে লাগিল, সুরমা কোথায় নামে। বিকাশের নিজের নামিবার স্থানে আসিয়াও সে নামিল না দেখিয়া সুরমা একটু যেন চিন্তিত হইয়া পড়িল। ব্যাপার কি? উনিও কি আমারই সংগে নামিয়া পড়িবেন না

কি! সুরমার মুখের ভাব ক্রমশই কঠিন হইতে লাগিল।

সত্যই তো। সুরমা নামিতেই বিকাশও নামিয়া পড়িল এবং একটু দূরে থাকিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিল। সুরমা একবার পিছনের দিকে একটু চাহিয়াই ব্যাপারটা বেশ বুঝিয়া ভাবিতে লাগিল, কি করা যায়! কত বইতে, কত পত্র-পত্রিকায় কত প্রেমকাহিনী পড়িয়াছে, কিন্তু ঠিক এই সিচুয়েশনে কি করা যায়, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার সমস্ত বুদ্ধিটাই যেন ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে। একে সকাল বিকালের এই বাসের ধাক্কা আর ঝাঁকানি, তারপর সমস্ত দিন আফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, তারপর আবার এসব উৎপাত কাঁহাতক সহ্য করা যায়! সুরমা যতই বাড়ীর নিকটে আসিতে লাগিল, ততই কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। যদি সটান বাড়ী পর্যন্ত এমনি করিয়া চলিতে থাকে, যদি তার মা—বাবা অবশ্য নেই—জানিতে পারেন। ছিঃ। আমি কি এমনই একটা অপদার্থ মেয়ে যে পথের একটা অচেনা লোক আমার পিছনে পিছনে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠবে। আচ্ছা, আসুন না আমার সঙ্গে, ঢুকুন না আমাদের বাড়ীতে, দেখিয়ে দেব না মজা। উঃ, কি আপদ! কি জ্বালা! অফিসের পরে বাস-ট্রাম ঠেঙিয়ে বাড়ীতে এসে হাত-পা ছড়িয়ে একটু গড়িয়ে পড়ব, তা তো নয়, যত-সব কলা-কাকির পাল্লা। উঃ, কি যে করি! সুরমার চোখে-মুখে আর মনে দুঃখের কান্না আর রাগের জ্বালা একত্র মিলিয়া উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলিল।

সুরমা বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়িতেই সুরমার মাতাঠাকুরাণী দরজার ছিটকিনি খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সুরমা দরজা ফাঁক করিয়া স্যাণ্ডাল-জোড়া খুলিয়া একটু ঝাড়িয়া লইয়া আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকিল। কি আশ্চর্য, দরজা বন্ধ করিতে যাইবে, এমন সময়ে সুরমা দেখিল, বিকাশ একেবারে দরজার চৌকাঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সুরমা একটু পিছাইয়া গেল। বিকাশ ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মাত্র মুহূর্তের জন্য। ক্রুদ্ধ এবং বিমুখ সুরমা তাহার পা হইতে একখানি স্যাণ্ডাল খুলিয়া লইয়া বিকাশের গালের উপর—ছিঃ ছিঃ ছিঃ। স্যাণ্ডালের তলায় একটা ছোট সরু পেরেক একটু বাহির হইয়াছিল, সেটা বিকাশের গালে ফুটিয়া রক্ত বাহির

বিকাশের গালের উপর—ছিঃ ছিঃ ছিঃ

হইয়া গেল। বিকাশ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কি যে করিবে ভাবিয়া পায় না। বিকাশের গালে রক্ত দেখিয়া সুরমা দৌড়িয়া ভিতরে গিয়া তাহার মাকে ডাকিয়া আনিয়া বিকাশের গালের দিকে চাহিয়া বলিল, শিগ্‌গির একটু ডেটল আর তুলো এনে দাও তো। সুরমার মাতাঠাকুরাণী—সুনয়নী-দেবী—তাড়াতাড়ি একটু ডেটল-মাখা তুলো আনিয়া বিকাশের গালের রক্তটা মুছিয়া সেখানে আস্তে আস্তে লাগাইয়া দিলেন। তারপর সুরমার দিকে চাহিয়া সুনয়নী বলিলেন, ব্যাপার কি বল তো। ইনি কে? ঝগড়াই বা কিসের?

বিকাশ আর কোন কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল। বাড়ীতে আসিয়া মুখ গোঁজ করিয়া চুপ করিয়া রহিল। বিকাশের বৌদি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুরপো, তোমার গালে কি হলো?

বিকাশ কোন মতে ঢোক গিলিয়া বলিল, মানে, পড়ে যা ছিড়ে! একটা বেটে ছাতার শিকের ডগা খোঁচা করে—।

তা, ডেটল, তুলো কোথায় পেলে? —বউদি বলিলেন।

বিকাশ বলিল, একটা ডিসপেন্সারিতে ঢুকে—!

বউদি বলিলেন, আহা, তবু চোখটা যে বেঁচে গেছে।

বিকাশের কাছু করার ইচ্ছা শেষ হইয়া গিয়াছে। সে যে এত আনাড়ী, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক, এই শেষ।

বিকাশ বেশ শান্ত হইয়া গিয়াছে। নিয়মিত অফিস যায়। যখন সুরমা যায় সে সময়ের বাসে আর ওঠে না। বাড়ীতে কেহ কোন বিবাহের সম্বন্ধ আনিলে বা মেয়ে দেখার প্রস্তাব করিলে, বিকাশ ঠিক যে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করে, তা নয়, তবে বলে, যাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। যা ইচ্ছে করগে তোমরা।

বৌদি বলেন, আজকাল সবাই তো দেখে-শুনে আলাপ-টালাপ করে মেয়ে পছন্দ করে।

তা করুক। মেয়েছেলেগুলো সব সমান, সব সমান।

তা কি হয়? কালো, ফর্সা, বেঁটে, লম্বা, শান্ত, চঞ্চল, কত রকম আছে! তোমার যাকে মনে ধরে—একটু দেখে-শুনে—

না, না। আমার দেখা শোনার কোন দরকার নেই। তোমরা যা খুশি করগে।

(২)

বিকাশের বৌদি এবং অপর সকলেই যা খুশি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া

লাগিলেন। এক একটা খবর আসে আর বৌদি সাজিয়া গুজিয়া গোল ব্যাগ ঝুলাইয়া, কি কি দেখিবেন, কি কি জিজ্ঞাসা করিবেন, খাবার খাইবেন কিংবা শুধু চাখিবেন, প্রভৃতি মুখস্থ করিতে করিতে কনের বাড়ীতে যান, সংগে হয়তো আরো দু'একজন পুরুষ মানুষ বা মহিলা আত্মীয়।

শেষ পর্যন্ত বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বৌদি বিকাশকে একান্তে লইয়া গিয়া বিশেষ করিয়া বলিলেন, একবার নিজের চোখে দেখলে পারতে ঠাকুরপো। শেষে আমাদের সবায়ের উপর চিরদিন চটে থাকবে।

বিকাশ জোর করিয়াই বলে, না, না, আমি কিছু করব না। লক্ষ্মী ছেলের মত গিয়ে বিয়ে করে আসব। একটা বউ হলেই হল। ওরা সব সমান, সব সমান।

বিকাশকে বাদ দিয়াই সব ঠিক হইয়া গেল। কনের বাড়ীতে যায়গা নাকি অত্যন্ত কম। সেইজন্য বিবাহের ব্যবস্থা হইয়াছে কনে'র এক আত্মীয়ের বাড়ীতে।

বিবাহের দিন সন্ধ্যায় বিকাশ সাজিয়া গুজিয়া অন্যান্য বরযাত্রীদের সংগে যাত্রা করিল। মুখে বা মনে কোন ব্যগ্রতা নাই, কোন উৎসাহ নাই। যেমন মন লইয়া অফিসে যায়, প্রায় সেই মন লইয়াই জাঁতি হাতে করিয়া ফুলে দিয়া সাজানো মোটর-গাড়ীতে উঠিল।

কনের বাড়ীতে পৌঁছিবার পর কোন নূতন ব্যাপার কিছুই ঘটিল না। যেমন সব বিবাহেই হইয়া থাকে, তেমনি আদর আপ্যায়ন, ইত্যাদি চলিল।

পিঁড়িতে বসিয়া সাতপাক ঘুরিয়া যখন শুভদৃষ্টি হইল, তখন—এ কি! বর আর কনে দুজনেই কেমন যেন ভয়ে, দুশ্চিন্তায় অস্বাভাবিকভাবে গম্ভীর হইয়া গেল। চারিপাশে ছেলে মেয়ের দল অবাক্। সবাই বুঝিল উহাদের পরস্পরকে পছন্দ হয় নাই। বৌদি ছিলেন বরযাত্রীদের মধ্যে। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন ছড়াইয়া পড়িল। ওদের নাকি পছন্দ হয়নি! বন্ধুরা বলিলেন, দু'দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ছোকরারা বলিল, বাপু, একবারে না দেখে শুনে মত দেওয়া কেন? আর একজন বলিয়া উঠিল, এমন মেয়ে অপছন্দ? ও যাক না চলে, ওর জায়গায় বাসরঘরে আমিই গিয়ে বসছি। এরপর অবশ্য, আর কোন কথা বা গোলমাল কিছুই হইল না। উৎসবের কোন অংগই বাকি রহিল না। বরকনে বাসরঘরে গিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। হাসি, ঠাট্টা, ইত্যাদির পালা শেষ হইলে প্রায় সকলেই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কয়েকটি ঠাট্টাস্থানীয়া তরুণী রহিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে কনে সংগিনীদিগকে বলিল, ভাই, ওঁকে তোরা আর জ্বালাস নে। শরীরটা ভাল নেই—আমাকে এক ফাঁকে একবার বলেছিলেন।

'ও বাবা! দেখিস! এর মধ্যেই এতখানি, শেষ পর্যন্ত সইলে হয়, বলিয়া সঙ্গিনী মেয়েটি ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। সংগের আর দুইটি মেয়েও উঠিয়া গেল।

কনে ভাবিতেছে, গালের সেই স্যাণ্ডেলের পেরেকের দাগটা এখনও রয়েছে। জানি না, কি আছে অদৃষ্টে।

বর ভাবিতেছে, স্যাণ্ডেল-পেটা করে যে তাড়িয়ে দিল, শেষে কি না তারই সংগে—। জানি না, কি আছে অদৃষ্টে।

কিছুক্ষণ পরে সুরমা ধীরে ধীরে বলিল, শুনছ?

কি বলছ, সুরমা?

আমার কিছুই বলবার নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না?

আমি জানি, তুমি আমাকে ভালবাসো। কাজেই অন্য সব কথা অবান্তর।

"আমার কিছুই বলবার নেই"

আর একটা কথা তুমি জানো না। কন্যাপক্ষের ঘটকী আমি নিজেই। আমাদের বাসার ঠিকানা শুনলে তুমি বেঁকে বসতে পার, তাই ভেবে আমি এই বাড়ীতেই সব ব্যবস্থা করেছি।

বেশ করেছ। এখন আর একটু কাছে এসো।

বর্ত্তমানকালে বাঙলা দেশে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রভাব যেমন সর্বব্যাপী, পাশ্চাত্যে জ্যাজ সংগীতের জনপ্রিয়তাও তেমনি অবিসংবাদী।

কিন্তু জ্যাজ সংগীতের সংজ্ঞা কি? —বিখ্যাত আমেরিকান নিগ্রো জ্যাজ শিল্পী লুই আর্মষ্ট্রং তার উত্তরে বলেছেন, 'এই প্রশ্ন করলে আপনি তার কোন সঠিক উত্তর পাবেন না।'

সত্যিই 'প্রচলিত সংগীত' ও জ্যাজের সীমারেখা অস্পষ্ট। তবে জ্যাজের প্রাণ-স্পন্দন হচ্ছে ছন্দ, লয় ও তাল। তাল, লয় ও ছন্দের এই গুরুত্বেই তার স্বাতন্ত্র্য।

সেই ছন্দ-লয় ও তালের দ্যোতনাই জ্যাজ গায়কদের মাতিয়ে তোলে, তাদের রক্তে নৃত্যের দোলা জাগায়। সেই ছন্দিত নৃত্যের তাল কখনো ধীর মন্থরতায় এলিয়ে-পড়ে, কখনো আচম্বিতে দ্রুত ও দ্রুততর হয়ে যেন মহারণ্যে ঝড়ের উন্মাদনায় তুফান জাগায়। জ্যাজের এই ছন্দ ও তাল-লয়কে তীব্রতর করার জন্যে ব্যবহৃত হয় ডবল বেস, ড্রাম, গীটার ও পিয়ানো। ডবল বেসের তারে জাগে ক্রমায়ত তাল ও মাত্রা, ড্রাম তাকে দেয় ঘনত্ব ও পারিপাট্য, গিটার কিম্বা ব্যাঞ্জো ও পিয়ানো আনে গভীরতা।

জ্যাজের অন্যান্য সংগত হচ্ছে বহুধা ও বিচিত্র। তার মধ্যে আছে নানা আকৃতি ও প্রকৃতির সেক্সোফোন, ব্যান্ড পাইপ, ক্লারিওনেট, ফ্লুট, হার্প, জলতরঙ্গ, বঙ্গ, পশ্চিম আফ্রিকার ড্রাম প্রভৃতি। পণ্ডিত চতুরলাল তো আমেরিকার জ্যাজ আসরে গিয়ে তবলাও বাজিয়ে এসেছেন।

জ্যাজের ইতিকথা

পশ্চিম আফ্রিকান ও ইউরোপীয়ান সংগীত-ঐতিহ্যের এক মিশ্রিত বিবর্তনে জ্যাজের উৎপত্তি। আফ্রিকার নিগ্রো ক্রীতদাসেরা যুক্তরাষ্ট্রের দাক্ষিণাত্যে নিয়ে আসে তাদের পালা-পার্বণের ছন্দময় সংগীত ও নৃত্য। তার সংগে ক্রমে যুক্ত হলো সামরিক ও সাধারণ ব্যান্ড, কেটল ড্রাম, খৃষ্টীয় উপাসনার হিমস্, সামস্ এবং বিচিত্র সব গাথা, লোকসংগীত, লোকনৃত্য ও বাজনা।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিউ অর্লেতে সেই বিচিত্র, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বরলিপিহীন সংকর সংগীত প্রথম নাম পেল জ্যাস (Jass)। তারপর একটি যুগ তা রইলো নিম্ন শ্রেণীর পানশালার আড্ডায় ও গণিকাপল্লীর হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে।

১৯১৫ সালে টম ব্রাউনের ডিক্সিল্যান্ড (স্বরলিপিহীন ও স্বতঃস্ফূর্ত) জ্যাস দল যখন শিকাগোয় কয়েকটি সংগীতানুষ্ঠানের জন্যে এলো তখন স্থানীয় সংগীতশিল্পী সংঘ তাঁদের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুললেন। কারণ, 'জ্যাস' কথাটার চলতি অর্থ তখনো যৌন সংযোগ। অতএব জ্যাসের নাম পাল্টে করা হলো জ্যাজ (Jazz)।

১৯১৭ সালে সর্বপ্রথম পাঁচজন শ্বেতাঙ্গের একটি দল জ্যাজ রেকর্ড করান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যেই কিন্তু জ্যাজ নাইট ক্লাব, কাফে ও ক্যাবারেতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। রচিত হতে লাগলো জ্যাজ-স্বরলিপি। এলো সর্বপ্লাবী জ্যাজের যুগ।

আজ জ্যাজের অন্তত নটি ধারা :

(১) **ডিক্সিল্যান্ড**—আগেই বলা হয়েছে এ হচ্ছে স্বরলিপিহীন ও স্বতঃস্ফূর্ত। ১৯১৫ থেকে '২০ ও '৩০ দশকের গোড়ার দিকে এর ছিল বহুল প্রচলন।

(২) **সুইং**—ত্রিশ দশকে এই মার্জিত ও অর্কেষ্ট্রাকৃত জ্যাজের বিকাশ হয়।

বিবপ্ (বা বপ্)—'৪০ দশকের নিউইয়র্কের মিনটন ক্লাবে প্রগতিশীল ও শক্তিমান জ্যাজ শিল্পীরা মিলিত হয়ে 'সুইং রীতির' পুরোনো অতিবিস্তৃত ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন।

জ্যাজের ইতিহাসে '৪০ দশকটা হচ্ছে পুরোনো ও নতুন রীতির মধ্যে সংঘাত ও বিবর্তনের কাল। সুইং রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নব্যপন্থীরা যে বিবপ্ রীতির প্রবর্তন করলেন তার বৈশিষ্ট্য হলো বহুস্পন্দন বা ছন্দের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ।

ফলে তীব্রতর সংঘাত সৃষ্টি করে তার দ্বারা সম-সাময়িক আবেগকে আরো মূর্ত করে তোলা সহজতর হলো।

যান্ত্রিক আঙ্গিকে এর মোদ্দা তফাৎ হলো,—বেস ড্রামে সুইং শিল্পীরা যেখানে চতুর্মাত্রিক ছন্দ ব্যবহার করতেন বিবপ্‌পন্থীরা সেখানে সিম্বল যন্ত্রের প্রাধান্য আনলেন। পুরোনো শিল্পীরা সিম্বলের ত্বরিৎ আওয়াজে একটা অংশের সমাপ্তি বোঝাতেন। বিবপ্ ড্রামবাদকেরা এই তালকে আরো ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করে ধ্বনিকে আরো দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করলেন।

ট্রাড—প্রথম দিককার বা জ্যাজ ঐতিহ্যের প্রায় সব বৈচিত্র্যকে বোঝানোর জন্যেই এই সংজ্ঞাটি ব্যবহৃত হয়।

মেনষ্ট্রিম—এর দ্বারা বোঝায় যা পুরাতনও নয়, নতুনও নয়।

হার্ড বপ্—কয়েকটি ছোট ছোট আধুনিক দলের ছাঁটা আঙ্গিক।

প্রগতিশীল জ্যাজ—ষ্ট্যান কেনটন কর্তৃক ব্যবহৃত বড় বড় দলের উচ্চাঙ্গ সংগীত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

থার্ড ষ্ট্রিম্—প্রগতিশীলদের চেয়ে ছোট ছোট দলে প্রায়-ধ্রুপদী সংগীতের চর্চা।

বুগি-উগি—এ একটি বিশেষ পিয়ানো আঙ্গিক, সংগে বাঁ হাতের ঢেউ-তোলা-তালকে ডান হাতের স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গীর দ্বারা কেটে-কেটে দেওয়া ও পারিপাট্য আনা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থাৎ জ্যাসের আবির্ভাবকালে সাধারণত
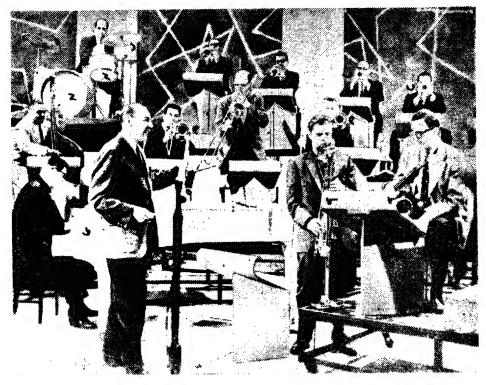
জ্যাজ আসরের সংগত: ১—সিম্বল ২—ড্রাম (Percussion-বা কাঠির আঘাতে বাজে) ৩। ট্রাম্পেট (ব্রাস বা ধাতব), ৪—বেস (তার বাদ্য), ৫—ট্রম্বন (ব্রাস বা ধাতব) ৬—পিয়ানো, ৭—ক্লারিওনেট (কনডাকটারের হস্তধৃত। কাষ্ঠনির্মিত তাই আরেক নাম 'উড উইণ্ড') ৮—স্যাক্সোফোন (বাড়তি ধাতব বা কুস)।

স্বরলিপি অনুসরণ করে এক ধরণে পিয়ানো-প্রধান সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় তার নাম রাগটাইম। মতান্তরে তা হচ্ছে জ্যাজের আদি সংস্করণ।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, বর্তমানে প্রধানত যন্ত্রসংগীত হলেও তার আরম্ভ হয় কণ্ঠসঙ্গীত হিসাবে। যদিও তারপর থেকে জ্যাজের এই বিভাগটির উন্নতি হয়েছে সামান্য এবং বিকৃতি হয়েছে বহুৎ, তবুও কণ্ঠসঙ্গীতকে এখনো তার একটি প্রামাণিক উপাদান বলা চলে।

পরিশেষে সর্বকালের, সর্বরীতির সংগীত সম্বন্ধে নিউ টেস্টমেন্টের 'ইউনিভার্সিটি সার্মনে' যে কথাটি আছে জ্যাজ সঙ্গীত সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য, "স্বরগ্রামে সাতটি সুর আছে,—তাকে চৌদ্দটিতে পরিণত করো। তবু এক বিশাল আয়োজনে সে কতটুকু সরঞ্জাম? কী অকিঞ্চিৎকর উপাদান থেকেই না এই শিল্পের মহানায়কেরা এক অভিনব জগৎ সৃষ্টি করেন।..........."

জ্যাজের জয়যাত্রা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে জ্যাজের জন্মভূমি ও পীঠস্থান। আজকের আমেরিকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর জ্যাজের প্রভাব আলোচনা করতে হলে একটি স্বতন্ত্র বই লেখা প্রয়োজন।

কিন্তু জ্যাজ আমেরিকাকে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বর্ধনে কতখানি সহায়তা করেছে এবং আমেরিকার জ্যাজ শিল্পীরা পৃথিবীর দেশে-দেশে কতখানি জনপ্রিয় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বোধহয় অপরিহার্য।

১৯৫৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর জন (ডিজি) গিলেস্পির নেতৃত্বে একটি জ্যাজ দলকে নিকট প্রাচ্য সফরে পাঠিয়ে এমনি সাড়া পায় যে, তারপর থেকে হামেশাই বিভিন্ন জ্যাজ দলকে বারবার পুরো কিম্বা আংশিক অর্থ-সাহায্য দিয়ে নানা দেশে পাঠিয়েছে। ঐ বছরই গিলেস্পির দল লাতিন আমেরিকা সফর করেন।

'৫৬—'৫৭ সালে বেনি গুডম্যানের দল দূর প্রাচ্য সফর করে দিগ্বিজয়ী সেনানীর মত জয়ধ্বজা উড়িয়ে ফিরে আসেন। '৫৭ সালেই উইলবার দি প্যারিসের নেতৃত্বে একটি দল ঘানার স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করেন। তারপর তাঁরা নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, বেলজিয়ান কঙ্গো, নিরক্ষীয় ফরাসী আফ্রিকা, টাঙ্গানিকা, উগান্ডা, ইথিওপিয়া, লিবিয়া, টিউনিসিয়া, আলজেরিয়া এবং মরক্কো পরিভ্রমণ করেন। '৫৮ সালের শেষের দিকে উডি হার্মানের নেতৃত্বে একটি দল আড়াই মাসের জন্যে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি সফরে যান।

উপরোক্ত সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়া বে-সরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেক আমেরিকান জ্যাজ শিল্পী বহির্বিশ্বে আনন্দ ও প্রীতির জোয়ার বইয়েছেন। কয়েক বছর আগে আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি যখন কারাকাস ও ভেনেজুয়েলায় গিয়ে ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক ইট-পাটকেল ও পচা ডিমের দ্বারা অভ্যর্থিত হন তখন

কয়েকদিন পরেই শ্রী ও শ্রীযুক্তা লুই আর্মস্ট্রং কারাকাস ও লাতিন আমেরিকার অন্যান্য স্থানে তাঁদের জ্যাজ দল নিয়ে সফরে যান। সেখানে তাঁদের অভ্যর্থনা কেমন হয়? —এর উত্তরে লুই আর্মস্ট্রং বলেন যে জনতা এমন উদ্দীপনার সঙ্গে তাঁদের সর্বদাই ঘিরে থাকতো যে তাঁদের স্নেহাতিশয্যে তাঁদের ব্যবসাটাই পণ্ড হবার দাখিল হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের পরই শ্রেষ্ঠতম জ্যাজ দলের দর্শন পাওয়া যায় যুক্তরাজ্যে। বর্তমানে বৃটেনে অন্তত পাঁচ লক্ষ জ্যাজ অনুরাগীর ৫০০০ জ্যাজ ক্লাব আছে।

জ্যাজকে কেবল মাত্র একটি নতুন হুজুগ বলে মনে না করে তাকে একটি বিশিষ্ট শিল্পের মর্যাদা দেয় সর্বপ্রথম ফ্রান্স। ১৯২৮ সালে জাঁ কাকতোর নেতৃত্বে প্যারিসিয়ান বুদ্ধিজীবীরা সিনেমা ও আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে জ্যাজকেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মর্যাদার আসন দেবার দাবী করেন।

অবশ্য আমেরিকার বাইরে জ্যাজের সবচেয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা হচ্ছে সুইডেনে। এই ছোট্ট দেশটিতে জ্যাজ সংগীতের রেকর্ড বিক্রীর সংখ্যা শুনলে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। সুইডেনে জ্যাজের প্রভাব লক্ষ্য করে আমেরিকান ভ্রমণকারীরা তার নাম দিয়েছে 'দোদুল্যমান দেশ'।

১৯৫৭—৫৮ সালে আমেরিকান জ্যাজ শিল্পী জন লুইস জার্মাণী ভ্রমণ করে বলেন যে, 'জ্যাজ সত্যিই যা— একটি শিল্প, জার্মাণরা তা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি করে অনুভব করে এবং সেইভাবে তাকে গ্রহণ করে।'

জার্মাণদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হলো সব কিছুকেই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা। তাই জার্মাণীতে জ্যাজের রেকর্ড বিক্রী হয় ইউরোপের অন্যান্য দেশের গড়পড়তা হারে, কিম্বা তার চেয়েও কম। কিন্তু জ্যাজের ওপর আলোচনার বই প্রকাশ ও বিক্রয় হয় সবচেয়ে বেশি।

শুধু পশ্চিম ইউরোপ কিম্বা আমেরিকাতেই নয়, রাশিয়া ও রুশ প্রভাবিত পূর্ব ইউরোপেও জ্যাজের জনপ্রিয়তা বর্ধিষ্ণু। তবে ঐ দেশগুলিতে জ্যাজকে সরকারীভাবে উৎসাহ দেওয়া হয় না।

পাশ্চাত্য রেডিও টেলিভিশনে বর্তমানে জ্যাজের প্রাধান্য প্রায় অপ্রতিহত। [illegible] চলচ্চিত্রে জ্যাজের আবির্ভাব হতে কিছু দেরী হয়। কারণ হলিউড কিম্বা বৃটিশ চলচ্চিত্রে নিগ্রোদের বাঁধা স্থান ছিল নস্কর-নফর কিম্বা ভাঁড়ের ভূমিকায়। তাই নিগ্রোপ্রধান জ্যাজের তাতে স্থান করে নিতে কিছুটা সময় লাগে। তবে আজ তার স্থান চলচ্চিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সাহিত্যে অর্থাৎ আধুনিক কাব্য-কবিতায় জ্যাজের প্রভাব নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা হয় '৬১ সালের সেপ্টেম্বরে বেলজিয়ামের ক্নক্‌লো-জুতে (Knokke-le-Zoute) আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলনে। আলোচনাকারীরা আধুনিক পাশ্চাত্য কবিদের ওপর জ্যাজের তাল-লয়-ছন্দের প্রভাবের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে দেখান যে একটু রদবদল করে নিলেই তা জ্যাজ সংগীতে উপযোগী হয়ে যায়।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ দুই ॥

সমস্ত গলিটা পচা আবর্জনার গন্ধে ভরাট হয়ে আছে। রবিবারে কর্পোরেশনের ধাঙড়েরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, তার ফলে সারা দিনের সঞ্চিত ময়লার স্তূপে এই চার হাত গলিটা এখন নরক। বৈশাখের বীভৎস গরমে সে ময়লা আরও বিকটভাবে ফেঁপে উঠেছে। সামান্য বাতাস হয়তো আছে, কিন্তু এই গলিতে আপাতত তার আনাগোনা নেই। বিন-বিন করে মশা উড়ছে, গলির মোড়ে দুজন হিন্দুস্থানী অশ্লীলতম ভাষায় ঝগড়া করছে আর কোন একটা বাড়ী থেকে একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে চিৎকার করে হার্মোনিয়ামের সঙ্গে গলা সাধছে।

আড়াই হাত বারান্দায় একটা জল-চৌকিতে বসে বিড়ি খাচ্ছিলেন গৌরাঙ্গবাবু। শেষ টান দিয়ে বিড়িটাকে ছুড়ে দিলেন সামনের আবর্জনার ওপরে। তারপরে দাঁতে দাঁতে ঘষে বললেন, এর চাইতে রাস্তার কুকুর হওয়া ভালো ছিল।

বারো বছর আগে পাকিস্তান ছেড়ে যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখনো সব এমন করে বিষিয়ে যায়নি। গায়ে জোর আছে, খেটে খাব; মনে শক্তি আছে —আবার উঠে দাঁড়াব। দেশের ভিটে-মাটি গেছে যাক—নতুন করে সব গড়ে নেব আবার।

তেরো আর ছ বছরের দুটি ছেলে, আট আর চার বছরের দুটি মেয়ে, স্ত্রী। এই পাঁচটি পোষ্যকে নিয়ে উদ্বাস্তুদের দলে ভিড়ে গৌরাঙ্গবাবু কলকাতায় এসে পা দিয়েছিলেন। বয়েস তখন বেয়াল্লিশ হলেও বাইশ বছরের মতো খাটতে পারেন। ম্যাট্রিক ফেল গৌরাঙ্গবাবু চাকরির মিথ্যে আশায় ঘুরলেন না। সীজন্ টাইমে শুরু করলেন বইয়ের ক্যান্ভাসিং— অন্য সময়ে দালালী। অভাবের মধ্যেও ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করালেন, নারকেলডাঙার এই গলিতে ছোট বাসাটা ভাড়া করলেন ত্রিশ টাকায়। ভাবলেন, কয়েক বছর চালিয়ে যাই—তারপর ছেলেদুটো দাঁড়িয়ে গেলে আমার আর কিসের ভাবনা!

কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গেল।

আজ চার বছর ধরে বাত। অল্পে অল্পে শুরু হয়েছিল, এখন সারা শরীরে যন্ত্রণার নাগপাশ জড়িয়েছে। ছ' মাস বিছানাতেই পড়ে থাকতে হয়—শরীরের প্রত্যেকটা সন্ধিতে যেন করাত চলে, হাত-পায়ের আঙুলগুলো বঁড়শীর মতো বেঁকে যেতে চায়। তখন পৃথিবীশুদ্ধ সকলকে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না। এক গ্লাস জলের জন্যে পর্যন্ত অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। যে গৌরাঙ্গ দে বেলা আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বালি থেকে ব্যারাকপুর চষে বেড়িয়েছে, সে নারকেলডাঙার গলির অন্ধকার ঘরে যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে টেনে ছিঁড়তে চায় মাথার চুল।

যে ছ' মাস শরীর ভালো থাকে, তখনো সামান্য চলাফেরা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। বায়ান্ন বছর বয়সেই পৃথিবীর কাছে গৌরাঙ্গবাবু সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছেন। এখন তিল-তিল করে মৃত্যুর অপেক্ষা। কিন্তু সে মৃত্যু কবে আসবে গৌরাঙ্গবাবুর জানা নেই। এর চাইতে যক্ষ্মাও ছিল ভালো, বোঝা যেত মৃত্যুটা দিনের পর দিন কাছে আসছে। সে ভরসাও তাঁর নেই। এই অকাল-পঙ্গুত্বের বোঝা নিয়ে হয়তো আরো দশ—আরো কুড়ি বছর বেঁচে থাকবেন, গৌরাঙ্গবাবু। এই দুর্গন্ধ গলির অন্ধকার ঘরে কানের কাছে মশার গুঞ্জন শুনতে শুনতে মনে হবে, নরক কি এর চাইতেও ভয়ংকর?

তবু আজ তিন বছর ধরে সংসার চলছে। কী ভাবে চলছে?

এই কথাটাই ভাবতে চান না গৌরাঙ্গবাবু। এক-চক্ষু হরিণের মতো সেদিকের দৃষ্টি সম্পূর্ণ বন্ধ করে রেখেছেন।

বড়ো ছেলে অভয় তিনবারে স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করতে পারেনি। এখন কোন একটা কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিস্ খাটছে। সামান্য হাত-খরচা পায়—কোনো মাসে দশ, কোনো মাসে পনেরো টাকা এনে দেয় সংসারে। ছোট মেয়ে তৃপ্তি ক্লাস সেভেন পর্যন্ত উঠে পড়া ছেড়েছে—পড়বার আর উপায় ছিল না। ছোট ছেলে অমিয় এইট পর্যন্ত উঠে স্কুলের মায়া কাটিয়েছে—এখন শিস দিয়ে সিনেমার গান গায়—পাড়ার রকবাজ ছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা মারে—ফুটবল খেলার নাম করে তিন-চার দিনের জন্যে কোথায় উধাও হয়ে যায়।

সংসার চালায় বড়ো মেয়ে দীপ্তি।

থার্ড ডিভিশনে [illegible] স্কুল-

ফাইন্যাল পাশ করেছিল। তারপর কোথায় যেন একটা চাকরি জুটিয়েছে। কী চাকরি গৌরাঙ্গবাবু জানেন না। সকাল ন'টায় বেরোয়,—চারটেয় আসে; আবার বেরিয়ে রাত এগারোটা-বারোটায় ফেরে। বলে, ওভার টাইম ডিউটি দিতে হয়।

কী চাকরি করে দীপ্তি?

কখনো একশো কখনো দুশো টাকা এনে দেয় বাপকে। শুধু তাই নয়। বিকেলে প্রত্যেকদিন শাড়ী বদলায়, প্রসাধন করে, চকচকে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায়। এইখানেই খটকা লাগে গৌরাঙ্গবাবুর। স্কুল-ফাইন্যাল পাশকরা দীপ্তি কী এমন চাকরি পেয়েছে যে সংসারে দুশো টাকা দিয়েও নতুন শাড়ী কেনবার পয়সা উদ্বৃত্ত থাকে তার হাতে? অনেকদিন বেশি রাত হলে সে ট্যাক্সি করে বাড়ী ফেরে—এত টাকা তাকে কে জোগায়?

গৌরাঙ্গবাবুর মনের ওপর ছায়া নড়ে বেড়ায়। দুর্বোধ্য আতঙ্কের একটা কালো হাত যেন নেমে আসতে চায় গলার ওপর। দীপ্তির প্রসাধন-করা মুখ, পেন্‌সিলটানা ভুরু, তার উচ্ছল চলার ভঙ্গির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন গৌরাঙ্গবাবু। কিছু একটা বুঝতে চান, কী যেন দেখা যায় আবছা-আবছা, তারপরেই চোখ বন্ধ করে ফেলেন। যা হওয়ার হোক—তিনি কিছু জানতে চান না। সংসার চলছে—চলুক। শরীরের প্রত্যেকটি সন্ধিতে সন্ধিতে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে তিনি শুধু মৃত্যুর জন্যেই অপেক্ষা করবেন।

পাঁচ বছর—দশ বছর—পনেরো বছর। কতদিন, গৌরাঙ্গবাবু তা জানেন না।

আবর্জনার দুর্গন্ধভরা গলিতে অন্ধকার নামছে। গৌরাঙ্গবাবু ডান হাত তুলে পায়ের ওপর মশা মারতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ওপর যন্ত্রণা টনটন করে উঠল।

—কুকুর! কুকুরেরও অধম আমি!—আর একবার অক্ষম ক্রোধে আত্মসমালোচনা করলেন গৌরাঙ্গবাবু। তারপর গলা চড়িয়ে ডাকলেন :

তৃপ্তি!

—আসছি বাবা।

কিশোরী মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—কী করছিলি?

—মশলা বাটছিলুম।

—রাতের বেলায় আবার মশলা কেন?

—দিদি বিকেলে কোত্থেকে ভেড়ার মাংস নিয়ে এসেছে—তাই—

ভেড়ার মাংস—মাটন! এই নারকেল-ডাঙার অসহ্য দুর্গন্ধে ভরা গলিতে—

—দিদি বিকেলে কোত্থেকে ভেড়ার মাংস নিয়ে এসেছে—তাই—

এই লোনাধরা একতলা স্যাঁত-সেঁতে বাড়ীতে মাটন! সব মিলিয়ে একটা বিকট প্রহসনের মতো মনে হল। গৌরাঙ্গবাবু মুখ বিকৃত করলেন। আবার সেই অস্পষ্ট ছায়াটা এগিয়ে আসছে সামনে—একটা ঠাণ্ডা হাতের ছায়া পড়ছে হৃৎপিণ্ডে।

—কোথায় পেল মাটন?

—বললে, মার্কেট থেকে এনেছে।

—মার্কেট! ও!

গৌরাঙ্গবাবু আর একটা বিড়ি ধরালেন। ছোট ছেলেটা কোন্ দোকানের বিড়ি এনেছে কে জানে! অসম্ভব তেতো।

সামনের বড়ো রাস্তায় আবার এক রাশ অশ্লীল গালাগালির ঢেউ উঠল। ওগুলোর অর্থ বোঝবার মতো তৃপ্তির হয়েছে। গৌরাঙ্গবাবু মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারলেন না। শুধু বিড়ির গোড়াটা চিবিয়ে চললেন কিছুক্ষণ

তারপর :

—তোর দিদি অনেক টাকা মাইনে পায়—না রে?

—জানি না বাবা

—হুঁ। একটা এম-এ পাশকেও বোধ

হয় এত টাকা দেয় না। সবই আমার বরাতের জোর।

ভাগ্যকে আশীর্বাদ করা নয়—শেষ কথাটায় সাপের ফণা হিস-হিস করে উঠল। কিন্তু ছোবলটা পড়ল নিজেরই বুকের ওপর। তৃপ্তি মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ গৌরাঙ্গবাবুর মনে হল, হয়তো অনেক কথাই তৃপ্তি জানে। কিন্তু সাহস করে দীপ্তিকে কখনো জিজ্ঞেস করতে পারেননি, তৃপ্তিকেও পারলেন না। চলুক—যেমন চলছে চলুক। তিনি অক্ষম, পঙ্গু। কিছু করবার শক্তি নেই—বাধা দেবার শক্তিও কি আছে?

—যাব বাবা?—তৃপ্তি আস্তে আস্তে জানতে চাইল।

—যা। পারিস তো আমাকে একটু চা—

—এনে দিচ্ছি।

তৃপ্তি চলে গেল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন গৌরাঙ্গবাবু। দীপ্তি দেখতে খারাপ নয়, কিন্তু তাঁর এই মেয়েটি সত্যিকারের সুন্দরী। যদি গরীবের ঘরে না জন্মাত, যদি আদর-যত্নে থাকত, তা হলে সারা শরীরে রূপ ঝলমল করে উঠত। লেখাপড়াতেও মন ছিল মেয়েটার

—কিন্তু পড়ানো গেল না।

একবার বলবেন দীপ্তিকে? বলবেন, তোর বোনটাকে আবার স্কুলে ভর্তি করে দে? গরীবের ঘরে মার্কেটের মাটন না হলেও কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু মেয়েটা যদি একটু লেখাপড়া শিখত—

কিন্তু দীপ্তিকে কোনো কথা তাঁর বলতে সাহস হয় না। মেয়ের দিকে তাকিয়ে গৌরাঙ্গবাবু বুঝতে পারেন, সে যেন অনেক দূরে সরে গেছে। তার চেহারায়, তার চলায়, তার কথার ভঙ্গিতে মনে হয় সে একটা আলাদা জগতে বাস করছে এখন। সংসারের সঙ্গে যোগ তার আছে বটে, কিন্তু বোঁটাটা আলগা। যে-কোনো সময় তার সিফনের শাড়ীর আঁচল দুলিয়ে সে প্রজাপতির মতো উড়ে যেতে পারে। তখন বাড়ীর এতগুলো মানুষ চক্ষের পলকে শূন্যের ভেতর দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে সোজা পাতালে গিয়ে নামবে! সে দুঃস্বপ্ন কল্পনাও করা যায় না।

গৌরাঙ্গবাবু দীপ্তিকে ভয় করেন আজকাল। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস নেই তাঁর; তাই একচক্ষু হরিণের মতো কেবল একদিকে তাকিয়ে থাকা। বাঁচতে হবে। সেই বাঁচবার উপকরণ কোথা থেকে আসে, সে-কথা জানতে না চাওয়াই সব চাইতে নিরাপদ।

তৃপ্তিটাকে যদি একটু লেখাপড়া শেখানো যেত!

সামনের বাড়ীর ছাতে একটা সিগারেটের আগুন দেখা যাচ্ছে। পাড়ার মধ্যে এরাই একটু অবস্থাপন্ন—বাড়ীটা নিজের, বেলেঘাটায় ভদ্রলোকের জামা-কাপড়ের দোকান আছে। তাঁরই ছেলে। লেখাপড়া বিশেষ করেনি—বাপের দোকানে কখনো কখনো যাওয়া-আসা করে; বাকী সময়টা আড্ডা দিয়ে বেড়ায় আর প্রতিমা-বিসর্জনের সময় ব্যান্ড্ পার্টিতে তাকে দেখা যায় সকলের আগে, হাতে দস্তানা পরে নানা ভঙ্গিতে ড্রাম বাজায়। তাঁর ছোট ছেলের সঙ্গে খাতির আছে—নাম অমল।

ছাতের রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহ চমকে উঠল মনে। তৃপ্তিকেই দেখছিল বোধ হয় এতক্ষণ। বোধ হয় নয়—নিশ্চয়ই। গৌরাঙ্গবাবুর মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ ছুটল। ওই ছেলেটার চোখের দৃষ্টি, শিস টানার ভঙ্গি, বাড়ীর সামনে একটা বিশেষ ধরনে চলাফেরা করাও তাঁর নজর এড়ায়নি।

ইচ্ছে করল, ছুটে গিয়ে ছোকরার শার্টের কলার টেনে ধরেন, ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় বসিয়ে দেন গালে। কিন্তু সারা শরীরে যন্ত্রণার নাগপাশ নিয়ে তিন পা-ও হাঁটবার উপায় নেই তাঁর—অনেক কষ্টে দেওয়াল ধরে ধরে এই বারান্দায় এসে বসতে হয়েছে তাঁকে। আর জোর করে কীই বা বলতে পারেন? কর্পোরেশনের রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার অধিকার সকলেরই আছে, নিজের বাড়ীর ছাতে দাঁড়িয়ে যে কেউ ইচ্ছেমতো সিগারেট খেতে পারে। তিনি কে তাকে শাসন করবার?

শুধু তৃপ্তিকে ভালো করে বলে দিতে

হবে। যেন সহজে বাইরে না আসে—যেন ওই ছেলেটার সামনে না দাঁড়ায়। কিন্তু তা-ও কি বলা উচিত ? এই নোনাধরা, দম-চাপা বাড়ীর বাইরের বারান্দাটুকুতেই যা কিছু খোলা হাওয়া—যা কিছু মুক্তির আকাশ। কোন্ লজ্জায় মেয়েটার কাছ থেকে সেটুকুও কেড়ে নেবেন তিনি?

—বাবা, চা—

তৃপ্তি চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলে। চা-টা হাতে নিয়েই গৌরাঙ্গবাবু আবার সামনের ছাতের দিকে তাকালেন। সেই ছেলেটা রেলিঙের ওপর থেকে গলা বাড়িয়েছে উটের মতো। আবছা আলোতেও যেন এতদূরে থেকে তিনি তার লুব্ধ চোখ দুটোকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন!

কিন্তু কিছুই বলবার জো নেই।

নিরুপায় হয়ে একটা ধমক লাগালেন মেয়েকেই।

—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন এখানে? ভেতরে যা।

তৃপ্তি ভয় পেয়ে চলে গেল ভেতরে। হুংকারটা সামনের বাড়ীর ছাদ পর্যন্তও পৌঁছেছিল নিশ্চয়ই। উটের মতো গলাটা সরে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

—নরক! নরকে বাস করছি!

চায়ে অনেকখানি একসঙ্গে চুমুক দিয়ে বসলেন গৌরাঙ্গবাবু—সমস্ত মুখ জ্বলে উঠল। ঠক করে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'হারামজাদী! আমাকে পুড়িয়ে মারতে চায়!

এতক্ষণে একরাশ গরম হাওয়া ছুটল গলির ভেতর, কতগুলো বিড়ির পাতা আর ছেঁড়া কাগজ আবর্জনার স্তূপ থেকে উঠে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। খানিকটা পচা আঁশের গন্ধ যেন গৌরাঙ্গবাবুর মুখে এসে ঘা মারল।

এর চাইতে পাকিস্তানে পড়ে থাকলেও কি খারাপ হত? এর চেয়েও বেশি দুর্ভোগ হত সেখানে?

—ডম্ ডম্ ডিগা - ডিগা—

চলতি কোনো হিন্দি গানের সুর ভেসে এল। গৌরাঙ্গবাবু উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। গানের আকর্ষণে নয়; গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল তাঁর ছোট ছেলে অমিয় আসছে। পরশু সকালে কোথায় খেলতে গিয়েছিল, এখন বাড়ী ফিরছে।

—ডম্ ডম্ ডিগা-ডিগা—

সামনের গ্যাসের আলোয় দেখা দিল অমিয়। বেশ তন্ময় হয়ে গাইতে গাইতে আসছে। এক হাতে একটি কিট্‌ব্যাগ আর এক হাতে একজোড়া ফুটবল বুট ঝুলছে। বাড়ীর বারান্দায় বাপকে বসে থাকতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কঠোর চোখে গৌরাঙ্গবাবু একবার তাকালেন ছেলের দিকে।

পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল অমিয়, গৌরাঙ্গবাবু বললেন, এই শুয়োর!

অমিয়র সারা মুখে বিদ্রোহ দেখা দিলে।

—বাড়ী ঢুকতেই গালাগালি দিচ্ছ যে বড়ো?

—না —আনন্দে নাচতে থাকব। কোথায় গিয়েছিলে লক্ষ্মীছাড়া বয়াটে ছেলে?

—বাঃ, খেলতে গিয়েছিলুম না সিউড়ীতে? বলেই তো গেছি তোমাকে।

—উদ্ধার করেছ—উল্লুক কোথাকার। —এতক্ষণের সমস্ত জ্বালা ফেটে পড়ল অমিয়র ওপর : আঠারো বছর বয়েস হল, এক পয়সা রোজগারের নাম নেই—ফুটবল খেলেই কাটাবে সারা জীবন?

অমিয় ভেতর দিকে পা বাড়িয়েছে ততক্ষণে।

—জবাব দিলি না?

—কী আবার জবাব দেব? কাজ-কর্ম পেলেই করব এখন। আমিও কি বসে থাকতে চাই নাকি? —উদ্ধত উত্তর এল অমিয়র।

কাজকর্ম কি গাছের ফল যে আকাশ থেকে তোমার মুখে টুপ করে এসে পড়বে? চেষ্টা করতে হবে না?

—চেষ্টা করছি না কে বললে তোমায়? মিথ্যে বকাবকি কোরো না। এই নেমে আসছি ট্রেণ থেকে—মেজাজ খারাপ করে দিয়ো না এখন।

—মেজাজ খারাপ করে দিলে কী করবি? —আগুন করা গলায় জানতে চাইলেন গৌরাঙ্গবাবু : মারবি নাকি আমাকে?

—তোমার মাথায়ই গোলমাল হয়েছে। —সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে মিটিয়ে দিলে অমিয়, কিটব্যাগ আর বুটজোড়া দোলাতে দোলাতে ঢুকে গেল বাড়ীর মধ্যে। একটু পরেই তার খুশী গলার চিৎকার শোনা গেল : মাংস হচ্ছে নাকি? বাঃ - বাঃ— চমৎকার! ঢুকতেই গন্ধ পেয়েছি।

চমৎকার! গৌরাঙ্গবাবুও স্বগতোক্তি করলেন। চারদিকে সব কিছুই চমৎকার চলছে। অভয় অ্যাপ্রেন্টিস খাটছে—কালি ঝুলি মেখে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে সেই যে লম্বা হয়ে শুয়েছে—আর উঠবে খাওয়ার সময়। মেজাজ তার সপ্তমে চড়া। —পনেরোটি টাকা মা-র হাতে দিয়ে সে যেন উদ্ধার করছে সবাইকে। অমিয় এই মাত্র ফুটবল খেলে ফিরল—সে সংসারের সব কিছুর ঊর্দ্ধে। দীপ্তি তার 'ওভার টাইম' খেটে যখন খুশি বাড়ী আসবে, একশো-দুশো টাকা ছুড়ে দেবে, মাটন আনবে—শাড়ী কিনবে—তাকে একটা কথা পর্যন্ত গৌরাঙ্গবাবু জিজ্ঞেস করতে পারেন না। আর সামনের বাড়ীর ওই ছোকরাটা নেকড়ের মতো দু চোখ দিয়ে তৃপ্তিকে গিলে খেতে চাইছে—কিন্তু এতটুকু প্রতিবাদ করা যাবে না, হয়তো যা তা বলে বসবে মুখের ওপর।

চমৎকার!

সামনে দিয়ে কুঁজো চেহারার এক ভদ্রলোক চলেছেন লাঠি ঠুকতে ঠুকতে। দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—কেমন আছেন গৌরাঙ্গবাবু?

—আর থাকা! মানুষের বাইরে চলে গেছি বলতে গেলে। —গৌরাঙ্গ-বাবুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

—বাতের মতো পাজী জিনিস আর ভূ-ভারতে নেই, ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন : আমিও তো ভুক্তভোগী। তবে আপনার মতো—একটু থেমে বললেন, ডাক্তারী কবরেজীতে ওর কিছু করতে পারে না। মাদুলী নিয়ে দেখবেন নাকি?

—গোটা দশেক নিয়ে দেখেছি—তিক্ত জবাব দিলেন গৌরাঙ্গবাবু।

—জানবাজার থেকে একটা আনিয়ে দেখুন না। অনেকেই তো ফল পায় শুনেছি।

—দেখব।

—দৈবের কথা তো কিছু বলা যায় না! কী থেকে যে কী হয় কেউ বলতে পারে না সে-কথা।

—হুঁ।

ভদ্রলোক লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে চললেন। পুরো নামটা গৌরাঙ্গবাবু জানেন না—পাড়ায় মুখুজ্জেমশাই বলেই পরিচিত। আজ পনেরো বছর ধরে সরকারী পেনশন পাচ্ছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, এখন বুড়ো বুড়ীর নিশ্চিন্তে দিন কাটে। গলির মোড়েই যে হোমিওপ্যাথির দোকানটা আছে—সেখানে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসবেন এখন। রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত কাটিয়ে আসবেন সেখানে। বেশ আছেন।

শুধু গৌরাঙ্গবাবুই—

রাত বাড়তে লাগল গলির ওপর। এক-একটা হাওয়ার গরম ঝলকে বিড়ি-পাতার টুকরো আর ময়লা কাগজ ছড়িয়ে যেতে লাগল চারদিকে। গৌরাঙ্গবাবুকে ঘিরে ঘিরে মশার গুঞ্জন উঠতে লাগল।

প্রায় এক ঘণ্টা আগে চা দিয়ে গিয়েছিল তৃপ্তি, সে-কথা এতক্ষণে গৌরাঙ্গবাবুর মনে পড়ল। এক চুমুক গরম চা খেয়ে বিরক্তিভরে নামিয়ে রেখেছিলেন, তারপর ভুলেই গিয়েছিলেন সে-কথা। এক ঘণ্টা পরে চা-টা নিশ্চয় ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্তু তা খাওয়া চলে না।

সামনে একটা দীর্ঘ ছায়া পড়ল। জুতোর শব্দ উঠল তার সঙ্গে। গৌরাঙ্গবাবু চেয়ে দেখলেন সেদিকে, মনটায় এতক্ষণে একটু প্রসন্নতার আলো পড়ল। এই ছেলেটির ওপর তাঁর একটু মমতা আছে।

—প্রভাত এলে নাকি?

—হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।

—আজ যে এত তাড়াতাড়ি ছুটি পেলে?

—গাড়ীটার একটু গোলমাল হয়েছে, সার্ভিসে গেছে।

—ভালোই হয়েছে। যাও—ভেতরে যাও।

প্রভাত সরকার তখনই ভেতরে গেল না, মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। যেন কী একটা তার বলবার আছে, কিন্তু বলাটা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছে না।

—জ্যাঠামশাই, দীপ্তি এখনো ফেরেনি—না?

এক মুহূর্তে গৌরাঙ্গবাবুর সমস্ত স্নায়ুগুলো সজাগ হয়ে উঠল। মনের সামনে সেই অস্পষ্ট ছায়াটা যেন কতগুলো ধারালো দাঁত নখ নিয়ে উদ্যত হল তাঁর দিকে।

অবরুদ্ধ গলায় গৌরাঙ্গবাবু বললেন, কেন-কেন? কী হয়েছে দীপ্তির?—শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, সন্ধিতে সন্ধিতে যন্ত্রণার বিদ্যুৎ চমকে গেল তাঁর।

আর সেইদিকে তাকিয়ে প্রভাত সরকার থমকে গেল। যে-কথাটা বলতে চেয়েছিল, বলতে পারল না।

—না, কিছু নয়। এমনিই জিজ্ঞেস করছিলুম।

দরজা ঠেলে বাড়ীর ভেতরে অদৃশ্য হল সে। আর গৌরাঙ্গবাবু শারীরিক যন্ত্রণা আর পচা দুর্গন্ধের সেই নরকের ভেতরে বসে বসে ভাবতে লাগলেন, কী বলতে চায় প্রভাত? কী বলতে চায় দীপ্তির সম্পর্কে?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার সাহস তাঁর নেই। যে-কালো পর্দাটা সামনে দুলছে—তার ওপারে কী আছে তা তিনি কল্পনাও করতে চান না।

প্রভাত সরকার আজ এক বছর ধরে এই দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ীতে পেয়িং গেস্ট।

(ক্রমশঃ)

॥ 'প্রেক্ষাগৃহ' এবং ভারতীয়ত্ব প্রসঙ্গে ॥

সম্পাদক সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃতে'র ৯ই মার্চের ৪৪শ সংখ্যায় 'প্রেক্ষাগৃহ' শীর্ষক নিয়মিত চলচ্চিত্র বিভাগে বর্তমানের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে নান্দীক'র মহাশয়ের আলোচনা পড়ে অবাক হয়ে গেছি। উনি মন্তব্য করেছেন, "সত্যিকারের 'ভারতীয়ত্ব' বলতে আজকের দিনে কোন্ বিশেষ জীবনধারাকে বোঝায়, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।" 'সরি ম্যাডামের' মতন কুরুচিপূর্ণ বাংলা ছবির প্রশংসা করার পর তাঁর চিন্তাধারা কোন্ স্রোতে বইছে' তা বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হয় না। কিন্তু নিজের বিচার-বুদ্ধিকে আর দশজনের বিচারবুদ্ধি বলে চালানোয় আমাদের আপত্তি আছে।

ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে সামাজিক কাঠামোর যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে তা কেউই অস্বীকার করবে না, বরং স্বাগত জানাবে এবং সহজভাবে মেনে নিতেও দ্বিধা করবে না, কারণ পরিবর্তনই সুস্থ জীবনের লক্ষণ, সে সমাজ-জীবনেরই হোক বা ব্যক্তিজীবনেরই হোক। আচারে ব্যবহারে, পোশাকে, সংস্কৃতিতে যুগোপযোগী আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতবর্ষ বিংশ শতাব্দীতে অনেক এগিয়ে এসেছে। আসাই

স্বাভাবিক। কিন্তু পরিবর্তন মানেই উৎকট আধুনিকতা নয়, প্রগতি মানেই নয় পুরনো ধ্যানধারণার সমূলে বিসর্জন।

কোনো দেশের চলচ্চিত্র সেই দেশের জীবনধারাকে রূপায়িত ও প্রতিফলিত করবে এটাই স্বাভাবিক, আর স্বাভাবিক বলেই কাম্য। কিন্তু তাই বলে শহরে পূজার নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় আমাদের যুবকেরা যে কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল রক্-এন-রোল, রুম্বা সম্বা নাচ দেখায় সেটাকে বাংলা ছায়াছবিতে দেখতে পেলে আমাদের কি খুব খুশী ও গর্বিত হবার সঙ্গত কারণ আছে? 'অমৃতে'র মতন বিখ্যাত বাংলা পত্রিকার চলচ্চিত্র সম্পাদকের কাছ থেকে আমরা আরও সুচিন্তিত, যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য আশা করেছিলাম, কারণ চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, চলচ্চিত্রে সঙ্গীতে, সাহিত্যে,জীবনের সকল ক্ষেত্রেই জনসাধারণের মত ও রুচিকে সত্য, শিব ও সুন্দরের পথে চালিত করার দায়িত্ব পত্র-পত্রিকার, তারাই জনসাধারণের বিচার ও রুচির জাগ্রত প্রহরী। "একালের বাঙালী দেহজীবনে ও মনোজীবনে দুই-ই অতিশয় শক্তিহীন হইয়াছে, তাই সুপথ্য যেমন অরুচিকর, কুপথ্যও তেমনি রুচিকর হইয়াছে।" (মোহিতলাল মজুমদার—"বাংলা ও বাঙালী") কুপথ্য ও সুপথ্যের মধ্যে যাতে সুপথ্য আমরা চিনে নিতে পারি তার জন্য সাময়িক পত্র-পত্রিকার দায় ও প্রভাব অনেক—সে দায়িত্ববোধকে সংকীর্ণ, ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপরে রেখে যথাযথোভাবে পালন করার মধ্যেই পত্র-পত্রিকার সার্থকতা। আমাদের প্রিয় 'অমৃত'কে সেই ভূমিকায় দেখতে পেলে আমরা আনন্দিত হ'বো।

নান্দীকর মহাশয় তাঁর আলোচনার উপসংহার টেনেছেন এই বলে, "আজ কি সাহিত্যে, কি সঙ্গীতে, কি চিত্রকলায়, কি চলচ্চিত্রে—কোনটা ভারতীয় এবং কোনটা ভারতীয় নয়, এ-কথা সঠিকভাবে বলা শুধু যে অত্যন্ত দুরূহ, তাই নয়; এ-কথা বলবার চেষ্টা করা মূঢ়তার নামান্তর মাত্র।" বলা দূরের কথা, বলার চেষ্টা করাই মূঢ়তার নামান্তর মাত্র?

'অমৃতে'র ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন বাংলা দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পটিকে যেন তিনি সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেন। বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পকে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক বলতে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন?

২রা ফেব্রুয়ারীর ৩৯শ সংখ্যায় নান্দীকর মহাশয় স্টেট্‌সম্যানের লেখিকা শ্রীমতী অমিতা মালিকের ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধটির সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "ভারত সম্বন্ধে আগ্রহ আজ পৃথিবীর সর্বত্রই। সকল দেশের লোকই ভারতবাসীর চিন্তাধারা, দৈনন্দিন রীতিনীতি, কার্যকলাপ—প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে চায়।...... ভারত কেমন, সেখানকার লোকজনসমেত সমস্ত দেশটাকেই ঐসব দেশের লোকেরা জানতে চায়। এবং এ-পরিচিতি ভারতীয় চলচ্চিত্র যে-রকম প্রত্যক্ষভাবে দিতে পারবে, সে-রকমটি আর কোনো কিছুর মাধ্যমেই সম্ভব নয়।" অতি খাঁটি কথা। ২রা মার্চের ৪৩শ সংখ্যায় তিনি এই কথারই পুনরুক্তি করে বলেছেন, "আমাদের চিত্রপ্রযোজকদের যেমন উচিত ছবির মধ্যে খাঁটি ভারতের আকৃতি-প্রকৃতি ও মানসকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা, তেমনি আমাদের সরকারের উচিত, প্রকৃত ভারতীয় ছবিগুলিকে বিদেশে বহুল প্রচার ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।" —এতো কথা লেখবার পর নান্দীকর মহাশয় নিজেই আবার সত্যিকারের 'ভারতীয়ত্ব' কি তা বুঝতে পারছেন না!

দেশাচার, লোকাচার, ধর্ম, ভৌগলিক পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রভৃতি একটা দেশকে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেয়, যা অপর কোন দেশের সঙ্গে হুবহু মিলে যেতে পারে না। বাংলা তথা ভারতের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে, রকেট্ বা অ্যাটম্ বোমার যুগেও

আছে। কোন্‌টা ভারতীয়, কোন্‌টা ভারতীয় নয় সে-কথা বলা অত্যন্ত দুরূহ স্বীকার করেও নান্দীকর মহাশয় কি করে আবার বলেন সেটা বলার চেষ্টা করাই মূঢ়তার নামান্তর মাত্র? দেখা যাচ্ছে, তিনি নিজেই শুধু চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হননি, বলেছেনও কিছু!

বিদেশে 'পথের পাঁচালী' বা 'অপুর সংসার' প্রকৃত ভারতীয় চিত্র বলেই বিশেষ সমাদর ও পুরস্কার পেয়েছে; হলিউড-মার্কা হাল্কা ভারতীয় ছবি না এদেশে, না বিদেশে, প্রকৃত গুণগ্রাহী রসিকজনের অকুণ্ঠিত প্রশংসা লাভ করতে পারে। সাধারণ মেহনতী কর্মক্লান্ত অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মজদুর শ্রেণীর অবসর বিনোদনের ছবি আর বুদ্ধিজীবি শিক্ষিত ও মার্জিতরুচিসম্পন্ন দর্শক-সমাজের ছবি এক নয়। মানুষের মনো-বৃত্তির বা হৃদয়াবেগের কয়েকটি সাধারণ দিক আছে। দেশজাতিধর্মভাষা-নির্বিশেষে যার আবেদন সার্বজনীন। কিন্তু তবুও কই 'অভিমানে'র তো ঠিক ইংরাজী প্রতিশব্দ এক কথায় পাই না। সর্বদেশে সর্বযুগে মায়ের রূপ যদি একই হয় তবে মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাসাগরের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে একথা বলেন কি করে, "Vidyasagar—the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengalee mother." The heart of a mother নয় Bengalee mother? তা এ বাঙ্গালী মায়ের হৃদয় কি অন্যদেশের অন্যজাতের মায়ের হৃদয়ের থেকে ভিন্ন? রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রও বাঙালী মেয়ের চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা বারবার স্বীকার করে গেছেন ('সাধারণ মেয়ে', 'শ্রীকান্ত')। এই বাঙালী মেয়ের জীবনকে উপজীব্য করে রচিত যে মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টি রূপোলী পর্দায় আমরা দেখবো, তার ভেতর "ভারতীয়ত্ব" বলে কিছু খুঁজে পাওয়া দুরূহ? 'অপুর সংসারে' নায়ক নায়িকার যে সংযত, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন প্রেমের অভিব্যক্তি ঘটেছে, এমনটি আর কোথায় দেখা যায়! প্রত্যেক মহৎ ও সার্থক শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই একটা সমগ্র দেশ, একটা সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে তাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করে তোলে। যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয়, নিজের বৈশিষ্ট্য হারায়, সে ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত দাঁড়কাকের মতই নিন্দা, ঘৃণা ও কৃপার পাত্র।

আমাদের 'ভারতীয়ত্ব' আমাদের দেহে মনে, আকাশে-বাতাসে, মাটিতে, চিন্তায় ধ্যানে, আমাদের সাধনা-আরাধনা সঙ্কল্পে, শৌর্যে, বীর্যে অশ্রুজলে, আমাদের সাহিত্য ও ধর্মে, এতো ওতঃপ্রোতভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে যে এর প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে টেস্ট-টিউবে ঢেলে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা যায় না, যেমন যায় না, ধ্বংস না করে, কুঁড়ি থেকে ফুলকে আলাদা করা, দেহ থেকে প্রাণকে। জলচর জীব জলে বাস করলেও জলের অস্তিত্ব অনুক্ষণ অনুভব করতে পারে না, যেমন মানুষ তার চারদিকেই সব সময়ে বাতাসের বিরাট চাপ থাকা সত্ত্বেও তা অনুভব করে না, কিন্তু তাই বলে জল বা বাতাস নেই একথা কেউ বলে না। Nation or Nationalism (Indian nation তে বটেই) একটা concept, একে একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে এককথায় বলা যায় না। Dr. Johnson একবার Boswell'র কাছে কবিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,

"What is poetry? Why, Sir, we all know what light is, but it is not easy to say what it is......It is much easier to say what it is not." তাই ভারতীয়ত্ব কি কি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত তা, বলার চেয়ে কোন জিনিসে ভারতীয়ত্ব নেই তা, বলা মনে হয় সহজতর।

'ভারতীয়ত্ব' কি, তা না বুঝতে পারি, কিন্তু 'ভারতীয়ত্ব'র— একটা অস্তিত্ব যে আছে এটা বেশ বুঝতে পারি যখন শুনি, "It is God's will that we should be ourselves and not Europe.... Our business is to realise ourselves first and to mould everything to the law of India's eternal life and nature." (Sri Aurobindo—"The Ideal of the Karmoyogin."). "India could not have been what she undoubtedly was and could not have continued a cultural existence for thousands of years, if she had not possessed something very vital and enduring, something that was worth while." (Nehru—"The Discovery of India.")

—এ চিঠি খুবই দীর্ঘ হয়েছে, সম্পাদক মহাশয় ছাপাবেন কিনা জানি না, তবে নান্দীকার মহাশয় এমন কয়েকটা বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যার সব উত্তর এর চেয়ে দীর্ঘতর হলেও অনেক কথা না-বলা থেকে যেতো।

নান্দীকর মহাশয় ছায়াছবির আলোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতীয়ত্ব' সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত 'শেষ কথা' বলা থেকে বিরত থাকলে প্রজ্ঞা ও পরিণামদর্শিতারই পরিচয় দিতেন এবং আমরাও তার জন্য আমাদের 'ভারতীয়ত্ব' সম্বন্ধে হঠাৎ সন্দিহান (?) না হয়ে তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকতাম।

নমস্কারান্তে
বিনীত
শ্রীসুভাষচন্দ্র পা[illegible]
কলিকাতা : ৯

অয়স্কান্ত

॥ কয়েকটি ঘরোয়া যন্ত্র ॥
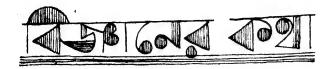
ঘরোয়া যন্ত্র মানে ঘরে ব্যবহার করা হয় এমন যন্ত্র। যেমন, সেলাইয়ের কল বা ঘড়ি ইত্যাদি। আমরা আজকাল অনেক সময়ে বড়ো বড়ো বিষয়ে খুঁটিয়ে খবর রাখি কিন্তু অনেক ছোট বিষয়ে প্রায় কিছুই জানি না। যেমন, যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আইসোটোপ কাকে বলে, তাহলে একেবারে মুখ বুজে ঢোক গেলার মতো অবস্থা আমাদের হয়তো কারও হবে না, কারণ এই পারমাণবিক যুগে খবরের কাগজের পাঠককেও আইসোটোপ সম্পর্কে কিছু না কিছু জানতেই হয়। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ঘড়ি চলবার সময়ে টিক-টিক শব্দ হয় কেন—তাহলে আমরা সবাই যে খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে জবাব দিতে পারব সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি আরো একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, পৃথিবী থেকে চন্দ্রে বা মঙ্গলগ্রহে বা শুক্রগ্রহে পাড়ি দিতে হলে কী কী আয়োজন ও প্রস্তুতি চাই তাহলে আমি খুঁটিয়ে জবাব দিতে পারি। কিন্তু আমার ভাইঝি আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—জোয়ার-ভাটা হয় কেন? জবাব দিতে গিয়ে টের পেলাম বিষয়টি সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই ভাসা-ভাসা। প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাশের একজন ভূগোলের ছাত্রী বিষয়টি যতোটা খুঁটিয়ে জানতে চায় তা আমার অনায়ত্ত। তারপরে আরো আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলাম যে, ভূগোলের চলতি টেক্সট-বইগুলোতে এ-প্রশ্নের জবাব যে-ভাবে দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে এই সামান্য প্রশ্নের জবাব জানবার জন্যে বড়ো একটি লাইব্রেরিতে গিয়ে বসতে হয়েছিল। এই দৃষ্টান্ত শুনে অনেকে হয়তো হাসছেন। কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের সকলকেই এমনি ধরনের পরিস্থিতে কোনো না কোনো সময়ে পড়তে হয়েছে। একবার একটি সাত বছরের মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—রাত্রিবেলা মাঝে মাঝে ট্রামের তারে সবুজ আলো জ্বলে ওঠে কেন? আমরা বলব, ও কিছু না, বৈদ্যুতিক স্পার্ক। মেয়েটি জিজ্ঞেস করবে, সব সময়ে হচ্ছে না কেন? জবাব দিতে গিয়ে আমাদের অনেককেই টের পেতে হবে যে, একটি সামান্য প্রশ্নের জবাব সাত বছরের মেয়েকে বুঝিয়ে বলার মতো জ্ঞান আমাদের নেই।

যাই হোক, আমাদের আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

॥ সেলাইয়ের কল ॥

বাইরে থেকে যেটুকু বোঝা যায়, একদিকে হাত বা পায়ের সাহায্যে একটি চাকা ঘোরানো হচ্ছে আর অন্যদিকে একটি সুঁচ অনবরত ওঠা-নামা করছে। আর যাঁরা ভেতরের দিকেও একটু নজর দিয়েছেন তাঁরা জানেন যে, এই সুঁচের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি মাকুও অনবরত সামনে-পেছনে ছুটোছুটি করে। সেলাইয়ের কলের যান্ত্রিক আয়োজন প্রধানত এই সুঁচ আর মাকুর যথাযথ সঞ্চলনের জন্যে।

হাতে-সেলাইয়ের সঙ্গে কলে-সেলাইয়ের একটি প্রক্রিয়াগত তফাৎ আছে। কলে-সেলাইয়ে দুটি সুতোর প্রয়োজন—একটি সুঁচের সঙ্গে, অন্যটি মাকুর সঙ্গে। মাকুর সুতোটি থাকে মাকুর ভেতরে একটি ববিনের মধ্যে। মাকুর সুতো না থাকলে শুধু সুঁচের সুতোয় কলে সেলাই পড়ে না—এ অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সকলের আছে।

আসলে ব্যাপারটা কী ঘটে? বাইরের সুঁচটি কাপড়কে একটা ফোঁড় দিয়ে ওপরে উঠে আসে। কিন্তু সুঁচের সঙ্গে সঙ্গে সুতোটিও কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারে না। তা আটকা পড়ে যায়। এখানেই মাকুর কৃতিত্ব।

বাইরের সুঁচটি যে-মুহূর্তে ফোঁড় দেওয়া শেষ করে ওপরে উঠে আসছে, তখন সুঁচের সঙ্গে সুতোটি হয়ে ওঠে একটি ফাঁসের মতো। আর সুতো সমেত মাকুটি সেই ফাঁসের মধ্যে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ে। তারপরে বাইরের সুঁচ বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সঙ্গের সুতোকে যতোই টানাটানি করে ততোই মাকুর সুতোর সঙ্গে সুঁচের সুতোর গিঁট শক্ত হয়। বাইরের সুঁচ আবার একটি ফোঁড় দেবার জন্যে নামতে শুরু করে। ততোক্ষণে কাপড় খানিকটা সামনের দিকে সরে গিয়েছে। অর্থাৎ এই ফোঁড়টি পড়ে নতুন জায়গায়। তারপরে একই প্রক্রিয়ায় বাইরের সুতোর সঙ্গে মাকুর সুতোর নতুন আরেকটি গিঁট। এমনিভাবে কাপড় সেলাই হয়ে চলে।

প্রক্রিয়ায় কোনো জটিলতা নেই। যান্ত্রিক আয়োজনেও নয়। কিন্তু মনে পড়ে, ছেলেবেলায় বাড়িতে যখন প্রথম সেলাইয়ের কল এসেছিল, আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। মা সেলাই করতেন আর মাঝে মাঝে যখন একটানা লম্বা সেলাই দেবার প্রয়োজন হত তখন শুধু চাকাটি ঘুরোবার সুযোগ পেলেই কী খুশী হতাম আমরা! আজকালকার মায়েদের অবশ্য বাড়িতে সেলাই করার অবসর খুবই কম। তার ওপরে শোনা যাচ্ছে, আর কিছুদিন পরে নাকি জামা তৈরি হবে বিশেষ ধরনের আঠার সাহায্যে কাপড়ের সঙ্গে কাপড় জোড়া লাগিয়ে, সেলাই দেবার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তবুও এই পুরনো যুগের সেলাইয়ের কল যতোদিন টিকে আছে, ততোদিন বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা সেলাইয়ের কল দেখে অবাক হবেই, কখনো কখনো সেলাইয়ের কলের আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে, আর সেলাইয়ের কলের চাকাটি ঘুরোবার সুযোগ পেলে ধন্য মনে করবে নিজেদের।

॥ ঘড়ির টিক-টিক ॥

ঘড়ি বলেই চলেছে টিক-টিক টিক-টিক। কান পেতে থাকলে এই শব্দের মধ্যেই অনেক কিছু ঘোষণা শোনা যেতে পারে। কবিরা শুনেছেন এবং কবিতাও লিখেছেন। আমরা আলোচনা করব, ঘড়ি কেন টিক-টিক করে।

প্রথমে পেন্ডুলাম-ঘড়ির দিকে তাকানো যাক। এই ঘড়িতে সপ্তাহে একবার দম দিতে হয়। পুরো দম খাওয়া স্প্রিংটি সাতদিন ধরে আস্তে আস্তে পাক খুলে দম শেষ করে। তাহলে বুঝতে হবে ঘড়ির স্প্রিং-এর দম ধরে রাখবার একটি ব্যবস্থা আছে। সেটি কি?

ঘড়ির ভেতরে যাঁরা তাকিয়ে দেখেছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, ঘড়ির ভেতরে রয়েছে অনেকগুলো ছোট-বড়ো দাঁতওলা চাকা। দাঁতের সঙ্গে দাঁত এমনভাবে লাগানো থাকে যে, একটি চাকা ঘুরতে শুরু করলেই সবকটি চাকাকে ঘুরতে হয়। বিশেষ যে চাকাটির সাহায্যে সবকটি চাকার ঘূর্ণগতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তার নাম এস্‌কেপ-হুইল। এই এস্‌কেপ-হুইলের সঙ্গেই মেইন স্প্রিং-এর কগ্‌-হুইলের যোগ। এই এস্‌কেপ-হুইলের পাক-খাওয়াকে বিশেষ একটি প্রক্রিয়ায় বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে।

ঘড়ির পেন্ডুলামটি দোলে তা আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি। এই পেন্ডুলামের দন্ডটির সঙ্গে ভেতরের দিকে এমন একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে যার ফলে

পেন্ডুলামের দোলন নোঙরের মতো দেখতে একটি ধাতুর পাতকে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঠেলা দিতে থাকে। নোঙরটি যখন ডানদিকে ঠেলা খায় তখন তার ডানবাহুটি ঢুকে পড়ে এস্‌কেপ-হুইলের দাঁতের মধ্যে আর এস্‌কেপ-হুইলের পাক-খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পর মুহূর্তেই নোঙরটি ঠেলা খায় বাঁদিকে। এস্‌কেপ-হুইলের দাঁত থেকে ডানবাহু বেরিয়ে আসে, এস্‌কেপ-হুইল পাক খেতে শুরু করে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নোঙরের বামবাহু গিয়ে ঢোকে এস্‌কেপ-হুইলের দাঁতে। এস্‌কেপ-হুইলের পাক-খাওয়া আবার বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে এস্‌কেপ-হুইলের পাক-খাওয়াটা চলে অনবরত থামতে থামতে। ফলে ঘড়ির স্প্রিংকেও বাধ্য হয়ে অতি ধীরে ধীরে পাক খুলতে হয়। আর তারপরে চাকার সঙ্গে চাকার যোগাযোগে এমন একটা মাপ বজায় রাখা হয় যার ফলে ঘড়ির ছোট কাঁটাটি চব্বিশ ঘন্টায় পুরো একটা পাক খেতে পারে, বড়ো কাঁটাটি প্রতি ঘন্টায় একবার।

নোঙরের ডানবাহু যখন এস্‌কেপ-হুইলের দাঁতে গিয়ে লাগে তখন একটি শব্দ হয়—টিক। পরক্ষণেই নোঙরের বামবাহু গিয়ে লাগে এস্‌কেপ-হুইলের দাঁতে। আবার শব্দ হয়—টিক। এমনি-ভাবে ঘড়ি চলার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ওঠে—টিক-টিক, টিক-টিক।

রিস্ট-ওয়াচে বা টাইমপীসে পেন্ডুলাম থাকে না। তার বদলে থাকে একটি হেয়ার-স্প্রিং। এই হেয়ার-স্প্রিং একটি ব্যালান্স-হুইলকে একবার সামনে আর একবার পেছনে পাক খাওয়াতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নোঙরটি একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঠেলা খায়।

ঘড়ির যান্ত্রিক আয়োজনও খুব জটিল নয়। কিন্তু লিখে হয়তো ঠিক বোঝানো গেল না। একটি টাইমপীসের পেছনের ডালাটি খুলে একবার তাকিয়ে দেখবেন। সামান্য কয়েকটি চাকা—আর তাই দিয়েই কিনা প্রবহমান সময়কে একটা মাপের মধ্যে বন্দী করা হয়েছে! তবে একটি বিষয়ে সাবধান করার আছে। অনভিজ্ঞ হাতে কখনো রিস্ট-ওয়াচ খুলতে চেষ্টা করবেন না।

॥ আবিষ্কারের ইতিহাস ॥

যতোদূর জানা গিয়েছে, সত্যিকারের একটি সেলাইয়ের কল প্রথম তৈরি হয়েছিল ফ্রান্সে। আবিষ্কারক একজন গরীব দরজী। তাঁর নাম বার্থেলেমি থিমোনিয়ে। ১৮৩০ সালে তিনি ফ্রান্সে এই সেলাইয়ের কলের পেটেন্ট নিয়েছিলেন। যন্ত্রটি অবশ্য ছিল খুবই জবড়জঙ ধরনের, প্রায় সবটাই কাঠে তৈরী—তবুও এই যন্ত্রটির সাহায্যে সত্যি সত্যিই সেলাই করা যেত। তবে যন্ত্রটি খুব যে জনপ্রিয় হয়েছিল তা বলা চলে না। প্রায় একযুগ পরে ১৮৪১ সালে এসে দেখা যাচ্ছে, সারা প্যারিসে মাত্র আশিটি সেলাইয়ের কল কাজ করছে। তাও শুধু সৈনিকদের পোশাক তৈরির জন্যে। ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সে রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এমনি এক আন্দোলনের সময়ে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা সবকটি সেলাইয়ের কলকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু থিমোনিয়ে তাতে দমেননি। ১৮৪৫ সালে তিনি আরো উন্নত ধরনের একটি সেলাইয়ের কল তৈরি করেন। তারপরে তিন বছর না যেতেই তিনি যে যন্ত্রটি তৈরি করেন তা খুবই উন্নত ও পুরোপুরি ধাতুতে তৈরি। কিন্তু রাজনৈতিক আলোড়নে বিক্ষুব্ধ প্যারিস এই আবিষ্কারকে কোনোই মূল্য দেয়নি। ১৮৫৭ সালে নির্বান্ধব ও নিঃসম্বল অবস্থায় থিমোনিয়ের মৃত্যু হয়।

তবে, সত্যিকারের অর্থে, আধুনিক সেলাইয়ের কল আবিষ্কার করেছেন নিউ-ইয়র্কের উইলিয়াম হাণ্ট নামে একজন ভদ্রলোক। ১৮৩২-৩৪ সালে তিনি যে যন্ত্রটি নির্মাণ করেন তার মধ্যে আধুনিক সেলাই-কলের সবকটি বৈশিষ্ট্যই ছিল। মাথার দিকে ফুটোওলা সূঁচ ও ববিন-সমেত মাকুর সার্থক প্রয়োগ তাঁরই কৃতিত্ব।

ইংলণ্ডেও ১৮৪৩ সালের পর থেকে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা চলেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৫১ সালে আইজাক মেরিট সিঙ্গার (১৮১১-৭৫) নামে এক ভদ্রলোক সেলাইয়ের কল উৎপাদনের পেটেন্ট সংগ্রহ করেন এবং সেলাইয়ের কল ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

ঘড়ি আবিষ্কারের ইতিহাস অল্প দু-এক কথায় বলার উপায় নেই। এই ইতিহাসের সঙ্গে মানব-সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা—বিজ্ঞানের এই দুটি বিশেষ শাখার অবদান ঘড়ি-নির্মাণের ক্ষেত্রে খুবই বেশি। এই আলোচনা ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল।

ইউরোপের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, ইউরোপে ঘড়ির ব্যবহার শুরু হয়েছে ত্রয়োদশ শতকে। তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে জানা যায় যে ঘড়ির আবিষ্কার আরো কয়েক-শো বছর আগেই। খুব সম্ভবত দ্বিতীয় পোপ সিল্‌ভেস্টার ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে যান্ত্রিক ঘড়ি আবিষ্কার করেছিলেন। তবে গোড়ার দিকে এই যান্ত্রিক ঘড়িকেও সূর্য-ঘড়ির সাহায্যে বারে বারে মিলিয়ে নিতে হত।

ইংলণ্ডের ওয়েস্টমিনিস্টার টাওয়ারে প্রথম ঘড়ি বসানো হয় ১২৮৮ সালে। ক্যান্টারবেরি গির্জায় ১২৯২ সালে।

* * *

কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স সম্পর্কে বিজ্ঞানের কথায় অনেক আলোচনা হয়েছে। ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি কি-ভাবে এক ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে কণ্ডিশনড স্টিমুলাস হয়ে উঠেছিল সেই গল্প বলে আজকের আলোচনা শেষ করছি।

এক জমিদার ভদ্রলোক দুপুরবেলা খেয়ে উঠতেন আর ঘড়িতে টং টং করে বারোটা বাজত। এক-দুই-তিন করে গুনতে শুনতে বারোটি ঘন্টা তিনি শুনতেন আর তারপরে প্রচন্ড শব্দ করে মস্ত এক ঢেকুর তুলতেন। ভদ্রলোক নিজেও জানতেন না যে ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি তাঁর ক্ষেত্রে কণ্ডিশনড্ স্টিমুলাস হয়ে উঠেছে। একদিন কি কারণে যেন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক যথারীতি দুপুরের খাওয়া শেষ করে বিছানায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সেই ঢেকুরটি আর কিছুতেই ওঠে না। ভদ্রলোক হাঁসফাঁস করতে থাকেন আর শেষকালে দম বন্ধ হয়ে মারা যান আর কি! ভদ্রলোকের কপাল ভালো যে তাঁর দরওয়ান অনেক দিন থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে সে তাড়াতাড়ি ঘড়িটা চালিয়ে দেয়। টং টং করে বারোটা বাজে। আর বারোটি ঘন্টা বেজে উঠতেই ভদ্রলোকের গলায় আটকে থাকা ঢেকুরটি সশব্দে বেরিয়ে আসে। ভদ্রলোক প্রাণে বেঁচে যান।

সতর্কভাবে অনুসন্ধান করলে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনেও কোনো কোনো ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ঘড়ির এমনিধারা সম্পর্ক খুঁজে পেতে পারি।

।। লুপ্ত বাক্‌শক্তির পুনরুদ্ধার ।।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বহু সৈনিক গলার কাছে আঘাত পাওয়ার ফলে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে। অনেক সময়ে আবার কঠিন কোনো অস্ত্রোপচারের ফলে কিংবা স্বরযন্ত্রে আঘাত পেয়ে কিংবা অন্য কোনো গলদেশীয় রোগে আক্রান্ত হয়ে কেউ কেউ কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এরা যাতে স্বাভাবিক কথা বলতে পারে, তার জন্যে কাজাকস্তানের চিমকেন্ত শহরের 'ইলেকত্রো-আপ্যারাৎ' কারখানার গবেষকরা একরকম যন্ত্র তৈরি করেছেন।

বিদ্যুৎচালিত এই যন্ত্র লুপ্ত স্বরদণ্ডের কাজ করে থাকে এবং এই সম্ভ্রব্যবস্থায় স্বরকক্ষের (ভোক্যাল বক্স) কাজও স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। ঠোঁট, জিহ্বা ইত্যাদির স্বাভাবিক সক্রিয়তার সহযোগে এই "বাচনযন্ত্র" বক্তার মূল কণ্ঠস্বরকে হুবহু রূপ দেয় এবং তার প্রত্যেকটি কথাকে যথাযথ স্পষ্টতার সঙ্গে ব্যক্ত করে। যন্ত্রটির ওজন মাত্র পঞ্চাশ গ্রাম এবং আকার একটি সাধারণ সিগারেট বাক্সের মতো। এই বাক্সের মধ্যে রাখা একটি ক্ষুদে ট্রানসিস্টার জেনারেটর-এর সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম তারের সাহায্যে সংযুক্ত বোতামের আকারের একটি ভাইব্রেটর বক্তার মুখের ভেতরে আটকানো থাকে।

।। স্বয়ংক্রিয় স্কুটার ।।

ব্রিটেনের ট্রায়াম্ফ ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিমিটেড সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা একটি স্বয়ংক্রিয় স্কুটার নির্মাণ করছেন।

এই ১০০ সি. সি. হাল্কা যানটির নাম হল 'টিনা'। ক্লাচ ও গীয়ার ব্যবহারের প্রয়োজন না থাকায় এর চালক রাস্তার অবস্থার প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি রাখতে পারবেন। থ্রট্‌ল এবং ব্রেক মাত্র এই দুটি কন্ট্রোল ব্যবস্থা এর রয়েছে। ইঞ্জিন চালু হয়ে গেলে অটোমেটিক ট্রানসমিশন ব্যবস্থাধীন যানটি দ্রুতগতিতে চলতে থাকবে। ট্রানসমিশন ইউনিট রাস্তার অবস্থা বুঝে আপনা-আপনি কাজ করবে।

দুইজন বয়স্ক ব্যক্তিকে বহন করে 'টিনা' ঘণ্টায় ৪০ মাইল পর্যন্ত বেগে চলতে পারবে। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ইন্ধন ব্যয় হবে প্রায় ১০০ মাইলে এক গ্যালন।

।। অভিনব বৈদ্যুতিক বাল্‌ব ।।

আমেরিকার নিউজার্সির নর্থবার্গেন ফ্লুরোটেস্ট কর্পোরেশন নামে একটি
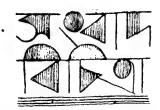
প্রতিষ্ঠান 'ফ্লেমসেন্ট' নামে একপ্রকার অভিনব বৈদ্যুতিক বাল্‌ব উদ্‌ভাবন করেছেন। এইটি বাজারে যে সকল বাল্‌ব আছে তাদের তুলনায় অনেক বেশী আলো দেয়, তিনগুণ বেশী টিকে এবং শক্ত জমিতে পড়ে গেলেও ভাঙে না। ফাইবার গ্লাস তন্তু, গ্লাস বা কাঁচ এবং রবারযুক্ত সিলিকোন দ্বারা এই বাল্‌ব নির্মিত হয়েছে।

॥ বৃহদায়তনের দাড়ি ॥

সম্প্রতি বিশ্বের সর্ববৃহৎ দাড়িওয়ালা লোক আমাদের ভারতেই পাওয়া গেছে। ফিরোজপুরের ঘোড়া গ্রামের সর্দার ফারা সিংয়ের বর্তমান বয়স ৫০। তাঁর পাঁচ ফুট লম্বা দাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকাকালে মাটি স্পর্শ করে। ১৬ বৎসর ধরে দাড়ির ওপর বিশেষ যত্ন নিয়েছেন ফারা সিং। সিং তাঁর দাড়ির জন্য কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সরিষার তেল ব্যবহার করেছেন। সম্ভবতঃ এইটিই বিশ্বের সর্ববৃহৎ আকৃতিসম্পন্ন দাড়ি।

।। সাংশ্লেষিক রক্ত ।।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আহত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে দুর্বল সৈনিকদের বাঁচিয়ে তোলার জন্য তাদের দেহে রক্ত প্রবেশ করানোর দরকার পড়ত খুব ঘন ঘন। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে রক্ত পাওয়া যেত না বলেই নানা দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও জৈব-রসায়নবিদরা গবেষণাগারে সাংশ্লেষিক রক্ত বা সিন্থেটিক ব্লাড তৈরি করার দিকে তখন মনোযোগ দেন এবং একাজে সফলও হন।

তারপর থেকে এক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে। এই সাংশ্লেষিক রক্তের গুণ ও ব্যাপক হারে উৎপাদন-ব্যবস্থার বিপুল উন্নতি ইদানিং ঘটানো হয়েছে। সম্প্রতি লেনিনগ্রাদের হাই-মোলিকিউলার কম্পাউন্ডস্ ইন্‌স্টিটিউট-এর অধ্যাপক বোগোমোলোভা পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করেছেন যে, জীবদেহের দুই-তৃতীয়াংশ স্বাভাবিক রক্তের অভাব এই সাংশ্লেষিক রক্ত দিয়ে অনায়াসেই পূরণ করা চলে। তার ফলে জীবদেহের প্রত্যেকটি ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই হবে। বোগোমোলোভা এক্ষেত্রে কুকুর নিয়ে এই পরীক্ষা চালান। এর ফলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাংশ্লেষিক পদ্ধতিতে তৈরি কৃত্রিম রক্তের কতোটা উন্নতিসাধন করা গেছে।

যে কুকুরগুলি নিয়ে তিনি পরীক্ষা চালান, তাদের প্রত্যেকের দেহ থেকে ক্রমে ক্রমে তিন ভাগের দুই ভাগ রক্ত বের করে নেওয়া হয়। এর ফলে তাদের ধমনী-চাপ (আর্টেরিয়াল প্রেসার) হঠাৎ অনেকখানি কমে যায় এবং হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তাদের দেহে সাংশ্লেষিক রক্ত ঢুকিয়ে দেওয়া হতে থাকে এবং খুব দ্রুত ধমনী ও হৃদপিণ্ডের কাজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

॥ কলের দিদিমা ॥

কিছুদিন হল পশ্চিম জার্মাণীর কলোন সহরে তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিশু-সামগ্রী প্রদর্শনী খোলা হয়। এই যুগের শিশুরা যেসব জিনিস পেলে খুশি হয় সেই সব জিনিসের মেলা সাজিয়ে বসে য়ুরোপের দশটি দেশের ৩০৫জন প্রদর্শক। এই মেলায় এসে জিনিসপত্র দেখে শিশুরা আনন্দে বিস্ময়ে কৌতূহলে উদ্দাম হয়ে ওঠে।

শিশুদের জন্মহারের সঙ্গে তাল রেখে বাজারে নতুন নতুন জিনিস বেরুচ্ছে। সেসব যেমনি রকমারি তেমনি মজাদার। এসব দেখলে শুধু শিশু কেন, শিশুদের মা-বাবারা পর্যন্ত অবাক হয়ে যান। ছেলে-মেয়ে এবং তাদের মায়েদের জন্য যত কিছু আধুনিক সম্ভব অসম্ভব হতে পারে সবই এখানে তাদের জন্য জড় করা হয়েছে।

বাস্তব সুবিধা বিচার করে শিশুদের জিনিসপত্র তৈরী করা হয়েছে। বড় বড় চাকার ঠেলাগাড়ী, রং-বেরং-এর সুন্দর ফিনিশ করা নানারকমের আসবাব। এর কোনটা এসেছে ইংল্যাণ্ড থেকে, কোনটা বা স্ক্যান্ডিনেভিয়া দেশ থেকে। শিশুদের সাজ-পোষাকের বাহার অবশ্য প্যারিস টেক্কা মেরেছে। অবশ্য শিশুদের মুস্কিল হয়েছে এইজন্য যে, এইসব জামা-কাপড় এত বেশী দামী ও বাহারী যে একটু নষ্ট হলেই মায়েদের চড়-চাপড় খেতে হবে।

অনেক প্রতিষ্ঠান মায়েদের কষ্টের বোঝা লাঘব করার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। কেউ বা তৈরী করেছেন শিশুদের স্নানের জন্য নতুন ধরণের টব, কেউ বা তৈরী করেছেন প্ল্যাস্টিকের জাফরি কাটা 'শিশু-সিন্দুক' যেখানে শিশুদের একলা কিছুক্ষণ রাখা যায়। এক জায়গায় রয়েছে "বৈদ্যুতিক দিদিমা"। এটি হচ্ছে শিশুদের ঘুম-পাড়ানি কলের দোলনা। প্রস্তুতকারীর মতে এই কলের দিদিমা শিগ্‌গিরই আসল দিদিমার স্থান গ্রহণ করবে।

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ একুশ ॥

আজ অধিবাস, গায়ে-হলুদ,—আগামীকাল বিবাহ! এখানে সভামন্ডপ, ওখানে বরযাত্রী ও নিমন্ত্রিতের আসর, এবং চতুর্দিকে বিয়েবাড়ির সাজসজ্জা, আনাগোনা আর আয়োজনের ধুম। সানাইয়ের মিষ্ট সুরে পাওয়া যাচ্ছে, দরবারী! 'সন্ধ্যায়' নান্দীপাঠ!

আজ মস্কোর 'অধিবাস'। আগামীকাল ৭ই নভেম্বর, সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্বব্যাপী বিপ্লবপূজো! নান্দীপাঠ করবেন প্রধান পুরোহিত মিঃ নিকিতা সেগেইভিচ খ্রুশ্চেভ। তিনি আপন দেশে তাঁর স্বভাবনম্রতা, সততা, বিচক্ষণতা এবং স্নেহশীলতার জন্য বিশেষ জনপ্রিয়। তিনি যখন যেখানে খুশি আনাগোনা করেন। তাঁর জন্য কোথাও সারবন্দী পাহারাওলা দাঁড়ায় না। যে কোনও দোকানে তিনি ঢোকেন। যে কোনও ব্যক্তি বিনা ছাড়পত্রে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারেন। পরদেশীর সঙ্গে মন খুলে তিনি কথা বলেন। ষ্টালিন আমলের সমস্ত পুরাতন রীতিকে ভাঙবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। তাঁর ধারণা, লৌহযবনিকার অন্তরালে সোভিয়েট ইউনিয়নে দুষ্ট দুর্গন্ধ জমেছিল অনেক। এবার বাইরে থেকে আসুক স্বাস্থ্যকর বাতাস। তিনি গোপনতার ঢাকা খুলেছেন অনেকটা। 'অগপু' এবং 'এন-কে-ভি-ডির' উগ্রতা কমিয়েছেন, মিথ্যা-অভিযোগে-আটক রাজবন্দীদেরকে ফিরিয়ে এনে সম্মান দিয়েছেন, দেশের উৎপাদনশক্তি বাড়িয়েছেন, বার বার বিদেশ ভ্রমণ ক'রে রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন এবং পৃথিবীর সকল দেশের পর্যটককে আমন্ত্রণ জানিয়ে 'ইনটুরিষ্ট' হোটেলের ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয়, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ভারত, জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন ক'রে সকলের সহিত সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সাধারণ গৃহস্থ। তাঁর স্ত্রীর নাম নিনা পেত্রভনা। তাঁর এখন একটিমাত্র পুত্র, নাম সের্গেই, একজন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর তিন কন্যা জুলিয়া, রাদা এবং লেনা। তাঁর অপর পুত্র লিওনিদ ছিলেন সামরিক বিমানচালক। বিগত বিশ্বযুদ্ধে একবার সেই যুবক গুরুতরভাবে আহত হন। সেরে উঠে আবার যান রণাঙ্গনে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে লিওনিদ যখন যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন, স্নেহময় পিতা তখন সেই রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে! মিঃ খ্রুশ্চেভ ঘৃণা করেন যুদ্ধকে! সেই ঘৃণা মৌখিক নয়। মিঃ খ্রুশ্চেভের প্রিয় বস্তু হল সাহিত্য এবং প্রিয় নেশা শিকার-অন্বেষণে যাওয়া! তিনি ষ্টালিনগ্রাড যুদ্ধের একজন অসমসাহসিক সেনানায়ক ছিলেন। তিনি গরীব গৃহস্থঘরের ছেলে। 'ডনেৎস বেসিন' ওরফে 'ডনবাস' কয়লাখনিতে তিনি একজন মজুর ছিলেন। তাঁর ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী—সকলেই উপার্জন করেন।

প্রতি বছরে ৬ই নভেম্বর সন্ধ্যায় মস্কোর নবনির্মিত স্পোর্টস-ষ্টাডিয়ম ওরফে লেনিন ষ্টাডিয়মে একটি রাষ্ট্রীয় অধিবেশন আহবান করা হয়, এবং জনসাধারণের সম্মুখে যে কোনও একজন মন্ত্রী এসে দাঁড়িয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা এবং তাঁদের পররাষ্ট্রনীতির মূলে বক্তব্যগুলি বুঝিয়ে বলেন। এবারে বলবেন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী মিঃ মিকোয়ান। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ভরশিলভ এবং মিঃ খ্রুশ্চেভ প্রমুখ সকল মন্ত্রীরাই সেখানে উপস্থিত। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক একদল সশস্ত্র দেহরক্ষী বদল হচ্ছিল, এটি বিশেষ ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলুম!

স্পোর্টস ষ্টাডিয়মটি গোলাকার। দিল্লীর পার্লামেণ্ট ভবনের মতো। আগাগোড়া ইন্দিছিন্দ বন্ধ। মাথার দিকে ছাদ সম্পূর্ণ ঢাকা,—সেটি দেখে বিস্ময় লাগে এই কারণে যে, ভিতরে কোনও স্তম্ভের দ্বারা সেই অতি বৃহৎ ছাদকে ধ'রে রাখা হয়নি। এই বিরাট ষ্টাডিয়মে ১৫ হাজার দর্শকের আসন আছে এবং বিদ্যুতের সাহায্যে ভিতরে উত্তাপসৃষ্টির ব্যবস্থা রয়েছে। লেনিন পাহাড়ের উপরে দাঁড়ালে দূরের থেকে এই ষ্টাডিয়মটিকে মনে হয় একটি গোলাকার 'তাতার ক্যাপ' উপর দিকে একটি মুণ্ডি বসানো। লেনিন-জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাতার পরিবারে। এই ষ্টাডিয়মে সর্বপ্রকার খেলাধূলা হয়ে থাকে। এটির নির্মাণ-কৌশল এবং ভিতরের অলংকরণ লক্ষ্য করলে রাক্ষসরাজ রাবণের স্বর্ণলংকার কল্পিত ছবিটি মনে আসে!

পৃথিবীর বহুদেশের এবং ভারতের রাষ্ট্রদূত সেদিন উপস্থিত ছিলেন। বহু পরদেশীকে এই উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ করা হয়েছে।

মিঃ মিকোয়ান তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধপাঠকালে ১৫ হাজার দর্শকের সঙ্গে নিজেও হাততালি দিচ্ছিলেন নিজের রচনার দক্ষতার উপর! মিঃ খ্রুশ্চেভকে দেখে সবাই যখন হাততালি দিচ্ছে মিঃ খ্রুশ্চেভও হাততালি দিচ্ছেন! দু' তিনটি কথা বলেই বক্তা নিজের কথার উপর নিজেই হাততালি দিতে থাকেন, এটি আমার অভিনব অভিজ্ঞতা!

সমস্তটার দিকে যখন মুগ্ধ ও অভিভূত চক্ষে চেয়ে রয়েছি সেই সময় জনৈক ভারতীয় মহিলা পিছনের সীট থেকে হঠাৎ সম্ভাষণ করলেন। এঁর নাম উর্মিলা দেবী। পিতা পাটনার এড্‌ভোকেট শ্রীবজরং সহায় এবং স্বামী শ্রীযুক্ত ওঙ্কারনাথ পাণ্ডালা। এঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এখানে অনুবাদের কাজ করেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর মহিলাটি আমাকে একসেট চকোলেট উপহার দিলেন, এবং আমি আমার পার্শ্ববর্তিনী শ্রীমতী লিডিয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলুম।

অতঃপর সভামণ্ডের উপরে যখন একটি মনোরম নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হল, তখন রাষ্ট্রনায়কগণ মঞ্চ ছেড়ে গিয়ে অপরদিকে গ্যালারিতে আসন নিলেন। নাচে, গানে এবং অভিনয়ে মঞ্চ মুখর হয়ে উঠল।

ফিরবার পথে সেদিন রাত্রে তুষার-পাত হচ্ছিল।

পরদিন ৭ই নভেম্বর বিপ্লব দিবস। মেঘময় আকাশ ইস্পাতবর্ণ। তুষারপাত নেই, কিন্তু তুহিন হাওয়ায় মস্কো ঠকঠক করে কাঁপছে। নগরের সমস্ত দোকানপাট, কাজকারবার—আগাগোড়া বন্ধ। এ যেন কলকাতার সাধারণ ধর্মঘট। মস্কো নগরী যেন তুহিনের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে!

শ্রীমতী নাটাশা বিশেষ কর্মতৎপরতার সঙ্গে আমাদের মোট ছয়জন ভারতীয়কে নিয়ে চললেন রেড স্কোয়ারের দিকে। তাঁরা হলেন জহীর, তাবান, শেখোন, যশপাল, বেদী এবং আমি। পথে পথে প্রতি অট্টালিকা সুন্দরভাবে সুসজ্জিত। দুই ব্যক্তির ছবিতে সমগ্র নগরী সজ্জিত। একজন কার্ল মার্ক্স, অন্যজন লেনিন। একজন 'থিয়োরী', অন্যজন 'প্রাকটিস'। একজন মন্ত্রদাতা, অন্যজন মন্ত্রসিদ্ধ। নগরের সর্বত্র বড় বড় অক্ষরে লেখা—'মীরদ্রুশবা'। শান্তি ও বন্ধুত্ব! কেবলমাত্র শান্তি প্রচার ও বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র কোটি কোটি টাকা খরচ করে। যুদ্ধের পক্ষে কোনও কথা উচ্চারণ,—ওখানে অপরাধ বলে গণ্য, এবং তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে! লাল চীনের কর্তারা যখন যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতার বক্তৃতা করেন, সেগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও কাগজে ছাপা হয় না! সোভিয়েট ইউনিয়নে পাশ্চাত্য দেশগুলির কঠোর সমালোচনা আছে, আত্মরক্ষার কথা নিয়ে সতর্কীকরণ আছে, কিন্তু আক্রমণের হুমকি নেই, অকারণ আস্ফালন নেই! সোভিয়েট ইউনিয়নে সর্বাপেক্ষা বেশি-সংখ্যক পর্যটক হল আমেরিকান। ওখানে রুবল যেমনই সস্তা, ডলার তেমনি দুষ্প্রাপ্য। এখন প্রতি ১৫ রুবলে ৫ ডলার হয়। এই হারে সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন অনায়াসে লক্ষ লক্ষ ডলার বাইরে থেকে উপার্জন করছেন। মজুত পরিমাণ স্বর্ণভাণ্ডারের মূল্যসমতুল 'নোট' ওদেশে বোধহয় ছাপা হয় না। ওরা উৎপাদনের হারে নোটের টাকা বাজারে ছাড়ে! সম্ভবত এই কারণে পাশ্চাত্য দেশের নিকট ওরা অবিশ্বাসের পাত্র! কিন্তু আমি অর্থনীতির ছাত্র নই, —এগুলি খুঁটিয়ে বলতে পারব না। শুধু এটি দেখেছি, আমেরিকান পর্যটক মাত্রই সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশেষ সমাদৃত।

'বিপ্লব দিবসে' রেড স্কোয়ারের পাথুরে ময়দানে প্রবেশ করতে গেলে পাস, আমন্ত্রণপত্র এবং পরদেশীর পক্ষে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণপত্রসহ 'পাসপোর্ট' দরকার হয়। জহীর এবং আমি পাসপোর্ট আনতে ভুলেছি। বলা বাহুল্য, নাটাশা কপালে করাঘাত করলেন! ফিরে গিয়ে আনবার তখন সময়ও হাতে নেই। পুলিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রত্যেকের পাসপোর্টসংলগ্ন ফটোটির সঙ্গে আমাদের পোড়ারমুখগুলি মিলিয়ে দেখে তবে একে একে ছাড়বেন! আমার অবারণ কৌতূহল আমাকে স্থির থাকতে দিল না। বন্ধুরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি নাটাশার পিছনে পিছনে 'শ্বেতভল্লুকদলের' গুহার মধ্যে প্রবেশ করলুম!

আমি নিরীহ এবং অমায়িক ভারতবাসী। গয়ার বুদ্ধমন্দিরের মূর্তিটির মতো আমার মুখে-চোখে একটি নির্বিকার করুণা জড়িত। ওই প্রকার দৃষ্টি নিয়ে যাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালুম তারা সেই বলশেভিক রাশিয়ার ঐতিহ্যবাহী এক একজন দানবাকার ব্যক্তি। প্রত্যেকের পোষাক কৃষ্ণনীল। প্রত্যেকের পোষাকের ওপর ওভারকোট চাপানো। আমার ধারণা, সাধারণ রুশ উচ্চতায় ৫॥ ফুটের বেশি হয় না। এখানে ৬ ফুটের কম কেউ নেই! সবাই কর্মতৎপর। কিন্তু কঠিন ঠাণ্ডার জন্য কেউ খাচ্ছে 'ভোদ্কা', কেউবা এক-আধটা সিগারেট। এ বাড়িটি 'এন-কে-ভি ডি'র একটি প্রধান কেন্দ্র।

মিনিট পাঁচেক পরে আবার বেরিয়ে এলুম। শুনলুম, আমরা ভারতীয়, এই আমাদের শ্রেষ্ঠ ছাড়পত্র! আমাদের পরিচয় ওইটিই যথেষ্ট।

রেড স্কোয়ারের চারিদিক জনারণ্যে ভরে গেছে। আমাদের জন্য 'লেনিন-ষ্টালিন মসোলিয়মের' পাশে সিঁড়ি বাঁধানো গ্যালারিতে স্থান নির্দিষ্ট ছিল। আমাদের পিছনে ক্রেমলিনের বৃহৎ প্রাকার। সেখানে শোভা পাচ্ছে সুপ্রীম সোভিয়েটের কেন্দ্রীয় প্রাসাদে প্রকাণ্ড রক্ত-পতাকায় সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতীক-চিহ্ন পাঁচফলাযুক্ত একটি তারকা। তারকার ঠিক নীচে 'কাস্তে আর হাতুড়ি'র ছবি।

আজকের 'বিপ্লব দিবস' উপলক্ষ্যে আমার রচিত দুটি প্রবন্ধের একটি আজ 'মস্কো নিউজ' নামক বাই-উইকলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং অন্যটি বাংলায় টেপ-রেকর্ড করা, সেটি আজ সন্ধ্যায় মস্কো বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হবে। দুটি প্রবন্ধেরই মূল বক্তব্য এক। গান্ধীজির সমকালীন, লেনিনের সম্পর্কে তুলনামূলক রচনা। গান্ধীজির অহিংস বিপ্লববাদে সসাগরা ধরিত্রীব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষয়রোগ ধরেছিল। লেনিনের আগ্নেয় বিপ্লবে রুশ সাম্রাজ্য চুরমার হয়েছিল! গান্ধীজির সংগ্রাম সকল প্রকার রাজনৈতিক বন্ধনের বিরুদ্ধে, লেনিনের সংগ্রাম মানবজাতির সর্বপ্রকার ঐহিক দুর্গতির বিরুদ্ধে। বিংশ শতাব্দীর এই দুই বিরাট পুরুষের একই দীক্ষামন্ত্র গঙ্গায় ও ভল্গায় প্রবাহিত হয়েছিল। বাংলা প্রবন্ধটি রুশ এবং ইংরেজিতে ছাপা হয়।

আমাদের পরণে প্রচুর পরিমাণ গরম পোষাক থাকা সত্ত্বেও ঠাণ্ডায় আমরা কষ্ট পাচ্ছিলুম। বেলা এখন দশটা। মেঘের আড়ালে সূর্য দেখা যাচ্ছে, কিন্তু জিরো ডিগ্রির নীচে ঠাণ্ডা। অদূরে বন্দরের টুপিপরা কৃষ্ণকায় এক ভারতীয় ভদ্রলোক এসেছেন। ওঁকে তাসকন্দে দেখেছিলুম। একদিন রাত্রে উনি আমার সঙ্গে আলাপ করেন। উনি হলেন জনৈক কেন্দ্রীয় উপ-মন্ত্রী শ্রীমতী ভায়লেট আলভার স্বামী শ্রীজোয়াচিন আলভা। আমাদের আশে-পাশে একটি মেয়ে ফ্লাস্কে কফি বিক্রি করছিল এবং তার সঙ্গে মাংসের বড়া। বলা বাহুল্য, বড় দুঃসময়ে কাজ দিল!

মসোলিয়মের ছাদের উপর একে একে এসে দাঁড়ালেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ভরোশিলভ, মিঃ খুশ্চেভ, মিঃ মিকোয়ান এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা। তাঁদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য কর্ণধারগণ। তাঁরা জনসাধারণের উদ্দেশে অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর কুচকাওয়াজ আরম্ভ। তৎকালীন সর্বোচ্চ সেনাধিনায়ক মার্শাল জুকভ তাঁর বাহিনীসহ পেরিয়ে যাবার সময় অভিবাদন জানিয়ে গেলেন। প্যারেড করে চলেছেন সেনাপতির দল। অগণিত সাঁজোয়া গাড়ি চলল সারবন্দী হয়ে। একে একে সোভিয়েট সামরিক শক্তির প্রবলতা প্রকাশ করা চলছে! বেলুন উড়ে চলেছে শূন্যে। বিরাট এক কৃত্রিম 'স্পুটনিক' দূর আকাশে উধাও হয়ে উড়ে গেল! এখানে বলে রাখা চলে, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে যে আণবিক 'বেবি মুনটি' উপরদিকে ৫৬৫ মাইল ঊর্ধ্ব শূন্যলোকে পাঠানো হয় সেটি ভারত, আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য

ইত্যাদি ভূভাগ প্রদক্ষিণ করে এবং “পিপ-পিপ”—এইরূপ সংকেত পাঠাতে থাকে! পরবর্তীকালে এই বোবা মনুটিকেই বলা হয় 'স্পুটনিক'। বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সাফল্যে পৃথিবীবাসী চমৎকৃত হয়।

আমাদের সামনে দিয়ে ছোট ছোট খেলাঘরের বিমান উড়ে চলে যেতে থাকে। অন্যদিকে কামান গর্জন করে ওঠে। একের পর এক বিভিন্ন 'বর্ণের' সেনাদল কুচকাওয়াজসহ এগোতে থাকে। তারপর আবার সাঁজোয়া বাহিনী, তার পিছনে আসে কামানের গাড়ি, বিভিন্ন অস্ত্রাদির খেলা, ট্যাঙ্কের দল। স্থল, জল ও বিমান বাহিনীর সৈন্যদল। আসে নীল, পীত, গোলাপী, রক্তিম,—নানা বর্ণের বিচিত্র বাহিনী। তারপর আসে নারী সৈন্যদল। এই প্রথম দেখলুম তন্বী সুন্দরী বেশ মেয়ে! মুখে-চোখে যেন কঠিন পরীক্ষার মৃদু হাসি! সর্বাঙ্গে তাদের মোলায়েম নীলাভ ঘাগরায় লাবণ্য ও তারুণ্য ফেটে পড়ছে। কোনও দলের বর্ণ রক্তিম পীত, কেউ গোলাপী, কেউ পেলব শুভ্র। তাদের এক হাতে অস্ত্র, অন্য হাতে পুষ্পগুচ্ছ। এতক্ষণ পরে রেড স্কোয়ারকে মনে হল, অপ্সরালোক!

আমাদের এদিকটা নিমন্ত্রিতের আসর। পৃথিবীর সকল জাতির প্রতিনিধি ও সাংবাদিকরা এখানে উপস্থিত। ক্যামেরায় ছবি তোলা হচ্ছে শত সহস্র। আজকাল ক্রেমলিনের ভিতরেও অবাধে ছবি তোলা যায়। আমাদের আশে-পাশে অগণিত বিদেশীরা এসে দাঁড়িয়েছেন। পতাকা হাতে নিয়ে বাদ্যসহকারে চলেছে সবাই। চারিদিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিরাটকার কার্ল মার্ক্স ও লেনিনের চিত্র। সামনে দিয়ে ছবি চলে যাচ্ছে ভরশিলভ ও ক্রুশ্চভ প্রমুখ নেতাগণের। হাততালি দিচ্ছে সবাই।

দেড় ঘণ্টা ধ'রে শোভাযাত্রা চলল। ভিড় যখন ভাঙলো এবং যখন আমরা জনতার সঙ্গে মিলিয়ে রেড স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, সেই সময় কয়েকজন লোক একটি দর্মার উপরে ষ্টালিনের একখানা ছবি সেঁটে নিয়ে কোথা থেকে যেন ভিড়ের মধ্যে ঢুকল। কিন্তু বিশেষ কেউ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। সে-ছবি এমন অনাদৃত, উপেক্ষিত এবং অসম্মানিত চেহারা নিল, যেটি অনেকের পক্ষেই বিস্ময়ের মতো ঠেকল! সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ষ্টালিন মুছে যেতে বসেছেন!

উক্রাইনা হোটেলের একটি ঘরে 'বিপ্লব দিবস' উপলক্ষে মধ্যাহ্নকালে একটি আনন্দ আসর বসেছে। কয়েকজন ভারতীয়সহ পাকিস্তানের কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ এবং ভারতীয় দূতাবাসের জনৈক বন্ধু সেখানে উপস্থিত। আমাকে নিয়ে জনৈক বাঙালীও সেখানে আছেন। শ্রীমতী নাটাশা হলেন মধ্যমণি। খবর পেয়ে শ্রীমতী লিডিয়াও এলেন। বলা বাহুল্য, এটি বন্ধনহীন এবং কতকটা শৃঙ্খলাবিহীন আমোদের আসর—সাধারণত যেটি রাত্রের দিকেই জমে বেশি। শ্রীমতী নাটাশার নৃত্যভঙ্গীটি অতি সুঠাম এবং মদের পাত্র হাতে থাকলে সুন্দরী রমণীর সেই লাস্যভঙ্গী পুরুষের চোখে মোহমদির হয়ে ওঠে। শ্রীমতী নাটাশা প্রাণোচ্ছলা এবং রসোচ্ছলীও বটে। আজও তিনি আনন্দে, হাস্যে, উচ্ছ্বাসে এবং পরিহাসে মুখরা। সম্মিলিত কর-তালির সঙ্গে তিনি ঘরময় বিভিন্ন ভঙ্গীতে নাচছিলেন।

আমি বোধ করি ঈষৎ বেমানান ব'লে নিজেকে ঠাওরাচ্ছিলুম। কিন্তু সেটি যে শ্রীমতী লিডিয়া পর্যবেক্ষণ করে থাকবেন, সেটি ভাবিনি। আমার স্নানাদির প্রয়োজন ছিল। সেই কারণে এক সময় সকলের অলক্ষ্যে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলুম নিজের ঘরে।

বোধ হয় আমার এবম্প্রকার আচরণে কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছিল! দিনতিনেক পরে সেদিন সকালের দিকে ঘরের দরজায় ঠকঠক শব্দ শুনে দরজা খুলেই দেখি, শ্রীমতী নাটাশা! তিনি হাসিমুখে ঢুকলেন। বললেন, আপনার সঙ্গে নিরি-

বিলিতে একটু কথা বলব, তা'র সময়ই পাইনে। কী এমন লেখাপড়া করছেন সারাদিন বলুন ত? আপনি বড্ড গম্ভীর মানুষ!

আমি খুব হাসছিলুম। নাটাশা পুনরায় বললেন, নাচগান কি আপনার ভাল লাগে না?

লাগে বৈকি।

তবে সেদিন হঠাৎ ঘর ছেড়ে চলে এলেন কেন?

বললুম, সত্যি বলছি, লেখাপড়ার অনেক কাজ জমে গিয়েছিল!

নাটাশা হাসলেন। বললেন, না, সত্যি আপনি বলছেন না! আমি জানি, আমার নাচগান আপনার ভাল লাগে না! ঠিক বলুন ত?

এবার আমি সচেতন হয়ে উঠলুম। বললুম, ম্যাডাম, আমি ভারতীয়। একটা খট্‌কা আছে আমার মনে।

কি বলুন? আমি শুনতে এসেছি। অসঙ্কোচে বলুন।

অসঙ্কোচে বলা চলে না! কিন্তু ভারতীয় কোনও স্ত্রী এবং সন্তানের জননী স্বামীর চোখের আড়ালে দিনে বা রাত্রে পুরুষের মদ্যপানের আসরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে নাচে গায়—এটি আমার দেখা অভ্যাস নেই!

শ্রীমতী নাটাশা বললেন, আপনি কি এটা অন্যায় মনে করেন?

আমি বললুম, এ কথাই ওঠে না! আমি অনভ্যস্ত, তাই বলছি! আমাদের দেশে আমরা অতিশয় কঠোরতার মধ্যে মানুষ। আমাদের দেশের স্বামীরা স্ত্রীর এই আচরণ বরদাস্ত করে না, সেটি স্বীকার করছি!

হাসিমুখে নাটাশা বললেন, তাঁরা হয়তো অসহিষ্ণু!

সম্ভব! তবে ভারতীয় মেয়েও অত্যন্ত সংরক্ষণশীল,—কঠোর সংযম তাদের।

আপনি নিজে কি একজন নীতি-বিদ্?

এবার আমিও হাসলুম! বললুম, আমি কি তা আমিও জানিনে। আমি শুধু অনভ্যস্ত! এসব আমার দেখা অভ্যাস নেই বলেই আমি আড়ষ্ট হই। ক্ষমা করবেন।

শ্রীমতী নাটাশা এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনাকে কষ্ট দিলুম, কিছু মনে করবেন না। বেশ, খাবার টেবলে আবার দেখা হবে। এখানে আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না ত?

বিন্দুমাত্রও না!

নাটাশা বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে এই আমার শেষ আলাপ। কেননা এই দিনটির প্রায় ৯ মাস পরে যেদিন রাত ২টার সময় আবার এসে মস্কো বিমানঘাটিতে নামলুম সেদিন শ্রীমতী মেরিয়ম, মালৎজেভ এবং লিডিয়ার কাছে একে একে সকলের খবর নিতে গিয়ে হঠাৎ সচকিত হয়ে শুনলুম, প্রায় মাস-চারেক আগে শ্রীমতী নাটাশা মারা গেছেন!

সংবাদটি আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল বলেই আমি ওটি সহজে ভুলতে পারিনি। কথায় কথায় আরেকদিন নাটাশার উল্লেখ করতেই শ্রীমতী ওকসানার কাছে শুনলুম, নাটাশার স্বামী অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে নাটাশাকে বুঝি গলা টিপে হত্যা করেছেন!

সোভিয়েট ইউনিয়নে এইরূপ নির্দয় ও নিষ্ঠুর হত্যার শাস্তি হল, আসামীকে পিছন থেকে গুলী ক'রে মারা। সে যাই হোক, অত্যন্ত বিষাদ এবং বেদনার মধ্যে সেদিন এই কথাই মনে হয়েছিল, নাটাশার এই অপমৃত্যুর জন্য পৃথিবীর সমস্ত পুরুষসমাজ দায়ী!

ভারতীয়রা সকলে এবার বিদায় নিলেন। সাজ্জাদ জহীর যাচ্ছেন লণ্ডনে। লণ্ডন শহরে জহীররা একটি মস্ত সম্পত্তির মালিক। শ্রীমান্ সুভাষ মুখোপাধ্যায় এতদিন ছিলেন তাঁর বাঙ্গালী বন্ধুদের বাড়ি। এবার তিনিও বিদায় নিলেন। কিন্তু তাঁর যাবার দিন রাত্রে সামান্য যানবাহনের ব্যাপারে তাঁর বন্ধু-কমিউনিস্ট কেরালার প্রফেসর দামোদরন যে ইতর আত্মপরতার পরিচয়টি দিলেন, সেটি লক্ষ্য ক'রে উক্রাইনা হোটেলের সোভিয়েট বন্ধুরা স্তম্ভিত হয়েছিলেন। সুভাষের মতো ভদ্র ও মিষ্টভাষী বন্ধু আমাদের মধ্যে কমই। দামোদরন তাঁকে মধ্যরাত্রে পথে ভাসিয়ে একা বিমানঘাঁটির দিকে চ'লে যাবার চেষ্টা পেয়েছিলেন! এ নিয়ে একটি বিরক্তিপূর্ণ গুঞ্জনও আমার কানে উঠেছিল। ভারতীয় একজন কমিউনিস্টের এবম্বিধ আচরণ সেদিন উক্ত হোটেলে যথেষ্ট গৌরব রেখে আসেনি! অতঃপর একই গাড়িতে দামোদরন সুভাষকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন!

এখন থেকে আমি রইলুম সম্পূর্ণ একা। আমার অদূরে ভবিষ্যৎ আমি জানিনে। এখানে আর আমার কোনও পরিচয় নেই, আমি এখন আর ভারতের প্রতিনিধিও নই! আমার না আছে রাজ-নীতি, না দল, না বা উদ্দেশ্য। আমি কবে ফিরব জানিনে, কেন পিছিয়ে রইলুম তাও অজ্ঞাত! আমি কে, কি এবং কেন,—আমার জাতি গণ গোত্র শ্রেণী গোষ্ঠী—সমস্তই অন্ধকারে! আমি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত এবং প্রক্ষিপ্তও বটে। আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ এবং নিরুদ্দিষ্ট। এবার থেকে আমি রইলুম, আর আমার সামনে রইল এক অজানা, 'অনামা', অনাবিষ্কৃত, আদিঅন্তচিহ্নহীন বিরাট 'মহাদেশ'—বিগত ৪৫ বৎসর কালের মধ্যে যার কোনও নির্দিষ্ট নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি, অর্থাৎ 'সোভিয়েট ইউনিয়ন'!

জগৎপ্রসিদ্ধ রুশ অভিনেতা 'কাচালভের' নামাঙ্কিত যে রাস্তাটিতে ট্রলিবাস আনাগোনা করে, সেই প্রশস্ত পথটির ৬নং গেটটির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে যখন ঢুকলুম, তখনও বাঙ্গালী ঘরের তুলসীমঞ্চে কোনও গৃহাঙ্গনা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালেনি! ফটক একটিই, কিন্তু ভিতরে এলেই চোখে পড়ে একটি পল্লী, এবং আশেপাশে বহু গৃহস্থের বাস। চারিদিক শান্ত—কোথাও কোনও উচ্চকণ্ঠের সাড়া নেই। এটি শহরের মধ্যস্থল, কিন্তু সাবেক আমলের পাড়া-পল্লী।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমতী লিডিয়া উন্মুক্ত একটি দরজায় ঢুকে পুনরায় একটি বড় দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পক্ষেও এ বাড়িতে এই প্রথম। তিনিও এখানে অপরিচিত। আমরা সামনে এসে দাঁড়াতেই যে ঈষৎ খর্বকায়া বৃদ্ধা শান্তমধুর হাস্যে ওদিক থেকে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন, তিনি ভারতীয় হলে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিতুম এবং আমার আরেকটু কম বয়স হলে তাঁকে অনায়াসে বলতে পারতুম 'দিদিমা'! কিন্তু আনন্দে ও রোমাঞ্চ পুলকে আমার সর্বশরীর একটু থরথর করছিল! কেননা ইনি জগৎ-প্রসিদ্ধ সাহিত্যপ্রতিভা এবং রুশ-বিপ্লবের অন্যতম মন্ত্রগুরু ম্যাক্সিম গোর্কির সহধর্মিণী! আমি সবিনয়ে

ভারতীয় রীতি অনুযায়ী নত নমস্কার জানালুম। সেই অশীতিপর বৃদ্ধা আনন্দিত মুখে আমার হাতখানা ধ'রে হঠাৎ সহাস্যে রুশ ভাষায় বললেন, ওমা, ছেলেমানুষ! আমি মনে করি কে এক হোমরাচোমরা! এসো বাবা, এসো,—বাড়ি চিনতে অসুবিধে হয়নি ত? সেই আমি কখন্ থেকে অপেক্ষা করছি! না না, কিচ্ছু সংকোচ ক'র না,—ভেতরে চ'লে এসো—

ভিতরের মস্ত ডাইনিং হল-এ এনে আমাকে বসিয়ে বৃদ্ধা ডাকলেন, বলি, কোথা গেলে, অ বৌমা? এই দেখে যাও 'ইন্দে'-র মানুষ! সেই যে তুমি বলছিলে না সেবার—?

একজন প্রৌঢ়া মহিলা ছুটে এলেন ভিতর থেকে বেরিয়ে, এবং যেভাবে করমর্দন ও অভ্যর্থনা জানালেন, তাতে আমি ভুলে গেলুম প্রবাসে এসেছি! আজ প্রথম প্রকৃতই আমার মন হায় হায় ক'রে উঠল যে, আমি রুশভাষা শিখিনি! ইনি হলেন গোর্কির পুত্রবধূ, এঁর নাম নাদেজদা পেশকভা। গোর্কি মারা যাবার এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে গোর্কির একমাত্র সন্তান এই পুত্র নিউমোনিয়ায় মারা যান। ইনি তাঁর স্ত্রী। সাত বছর এবং নয় বছরের দুটি কন্যাকে নিয়ে অল্প বয়সে ইনি বিধবা হন। বাড়িতে অপর কোনও পুরুষ দেখছিনে।

দেখতে দেখতে আর দুটি তরুণী এবং বছর ছয়েকের একটি বালিকা এসে ঘরে ঢুকল। তরুণীদুটির একজন হল চিত্রশিল্পী শ্রীমতী মার্ফা, এবং অন্যজন অভিনেত্রী, শ্রীমতী দারিয়া। ভারতীয় অতিথির সঙ্গে আলাপ করার জন্য অভিনেত্রীটি এসেছে তার বালিকা কন্যাটিকে সঙ্গে নিয়ে। সে থাকে শ্বশুরবাড়িতে। চিত্রশিল্পীটি গ্রাজুয়েট কোর্সে ইকনমিকস পড়ে এবং সে ইংরেজি জানে। শ্রীমতী লিডিয়া ও মার্ফা প্রতিটি শব্দ ও বাক্য আমাকে বুঝিয়ে যেতে লাগলেন।

এক সময় বৃদ্ধা বললেন, আমাকে ম্যাডাম গোর্কি বলো না বাবা, গোর্কি মানে যে 'তেতো'! তোমার সঙ্গে এমন মিষ্টি ক'রে কথা বলছি, তবু বলবে, 'তেতো'?

ঘরের মধ্যে হাসির ঝড় ব'য়ে গেল। বৃদ্ধা আবার বললেন, ও'র আসল নাম ছিল আলেক্সি ম্যাক্সিমভিচ পেসকভ, ও-নামটি উনি আমার ছেলের জন্যে রেখে যান। আর আমার নাম? আমার আসল নাম, একাটারিনা পাভলোভনা পেসকভা। পেসকভের গৃহিতে এসে পড়েছিলুম যে! হাড়মাংস আমার কালি হয়েছে, বাবা। যাক্ সে সব কথা।

আপনাদের বিয়ের গল্প বলুন।

শ্রীযুক্তা নাদেজদা ওদিকে হেসেই খুন। তরুণী মেয়ে দুটি এবার খিলখিলিয়ে উঠল। ওদের একজন বুঝি হেসে বলল, ঠাকুমা, সব সত্যি বলবে কিন্তু!

আ কপাল!—বৃদ্ধা বললেন, সে সব কি আর মনে আছে বাছা? প'য়ষট্টি বছর হতে চলল। আমরা ছিলুম 'নভগোরদের' একই গাঁয়ের ছেলেমেয়ে! আমাদের কারো অবস্থা ভাল ছিল না। উনি একটু জেদী মানুষ ছিলেন, আবার ওরই মধ্যে একটু খামখেয়ালী, উড়োউড়ো মন! আমি বাছা লেখাপড়া তেমন কিছু শিখিনি! তবে পাঠশালায় একটু-আধটু যা রগড়েছিলুম! বিয়ের গল্প? সে আবার কি? ছেলেমানুষ দু'জনের মধ্যে ভাব ছিল, এই যা। পেসকভ একদিন যেন কোথা থেকে ঘুরে এসে আমাকে ডাকল। বলল, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক। আমি ভেবেচিন্তে বললুম, তা হোক! উনি বললেন, 'গির্জে-ফির্জে' বুঝিনে। খাতাপত্র আনতে বল, সই করে দিচ্ছি! তারপর চল বেরিয়ে পড়ি।'—ও'র আবার ঘরকন্নায় তেমন মন বসত না! সেই পুরনো অভ্যেস বুড়ো বয়সেও যায়নি!

নাদেজদা এবং তাঁর কন্যা আমাদের জলযোগের আয়োজন করছিলেন। আঙুর, আপেল, রোজবেরি, চাটনি, ক্রীমবিস্কুট, বাদাম, চকোলেট, ওয়াইন এবং কফি। রুশ-গৃহস্থ অপরিচয়কে স্বীকার করে না, নতুন বন্ধুত্বের স্বাভাবিক আড়ষ্টতাকে গ্রাহ্যও করে না।

এই বাড়িতে গোর্কি বাস করেছিলেন তাঁর শেষজীবনে। এখানে তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও আসবাব সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী, তাঁর ব্যবহৃত টেবিল-চেয়ার, লেখাপড়ার সরঞ্জাম, অসংখ্য টুকিটাকি সামগ্রী, এমন কি পেন্সিলকাটা ছুরি, কাঁচি, আলপিন, নিব, ছুঁচসুতো, দোয়াত-কলম এবং বইয়ের প্যাকেট বাঁধবার জন্য যে শনদড়িগুলি তিনি সযত্নে রাখতেন—তাও। একটি ঘরের চারিদিকে অগণিত উপহারসামগ্রী, টলস্টয় প্রমুখ সাহিত্যরথীরা কে কবে গোর্কিকে বই দিয়েছেন, কোন্ শিল্পী কোন্ ছবিটি উপহার পাঠিয়েছেন, তাঁর চিঠিপত্র, লেখার টুকরো, পাণ্ডুলিপি, তাঁর মনিব্যাগ, হাতবাক্স, পৃথিবীর অসংখ্য ভাষায় অনুবাদ-করা

তাঁর বই—কোনটা বাদ যায়নি। আমি ঘুরে ঘুরে আগাগোড়া সব দেখছিলুম। এ বাড়ি এবং এর সমস্ত আসবাবসজ্জা এখন সরকারের তত্ত্বাবধানে। আমি যেন তীর্থমন্দিরে প্রবেশ করেছিলুম!

বৃদ্ধা বললেন, এখনও কি তোমার সব 'তেতো' মনে হচ্ছে, বাবা?

আমরা সবাই উচ্চরোলে হেসে উঠলুম। এবার আমি বললুম, আমাদের দেশে ভোজনে বসে প্রথম 'তেতো' দিয়ে আরম্ভ করতে হয়। শরীর সুস্থ রাখে 'তেতো'।

আমাদেরও তাই, বাছা।—বৃদ্ধা বললেন, বল ত' লিডিয়া? অ বৌমা, ওই শোনো! আমরাও যে 'তেতোজাম' চিবোই খাবার আগে! তবে বাছা তোমরা-আমরা তফাৎ কিসের?

আমি হাসলুম। বললুম, আমারও তরুণ বয়সের প্রথম সাহিত্যের আস্বাদ এই 'তেতো'! এটি আমার গুরুবাড়ি! এখানে আমি প্রণাম রেখে যাব। গোর্কির 'মাদার' প'ড়ে প্রথম চোখ খুলেছিল। তাঁর গল্প, নাটক, রেখাচিত্র, তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তা, তাঁর চরিত্রচিত্রণ, তাঁর রচনাশিল্প,—আমার মতন অনেক লেখকের জীবনে কাজ করেছে! তাঁর নারীচরিত্র বর্ণনা প'ড়ে অবাক হতুম—

বলছ বটে—গোর্কির স্ত্রী আমাকে একটু থমকিয়ে দিলেন। পরে নিজের মনেই বললেন, তাঁর সব কথা বোধ হয় নির্ভুল ছিল না! ভুল করেছেন অনেক-বার।

আমি ফিরে তাকালুম তাঁর দিকে। বৃদ্ধা একাটারিনা পেসকভা পুনরায় বললেন, মেয়েদের চরিত্র তিনি সঠিক জানতেন, আমার মনে হয় না!

কথাটা আমার কানে বেজেছিল বহু দিন ধরে। আমি জানতুম ম্যাক্সিম গোর্কির 'দুই' স্ত্রী বর্তমান। কিন্তু মস্কোর অপর একটি রাজপথে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় যেদিন সুবৃহৎ গোর্কি মিউজিয়মটি দেখতে যাই, এবং আগাগোড়া গোর্কির জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী ও সর্বপ্রকার তথ্যাদির দলিল-চিত্রগুলি দেখে অভিভূত হই, সেইদিন একটি ছবিতে প্রথম দেখলুম, গোর্কির দ্বিতীয় স্ত্রীকে! ইনি একজন আমেরিকান মহিলা। যতদূর বুঝতে পারা যায়, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পুলিশের চোখ এড়িয়ে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত গোর্কি আমেরিকায় পলায়ন করেন। কিন্তু আমেরিকার কোথাও তিনি স্থায়ী আশ্রয় পাননি। আশ্রয় পেয়েছিলেন একজন আমেরিকান মহিলার হৃদয়ে। সেই মহিলা গোর্কিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতেন। অতঃপর গোর্কি ইতালীর এক স্বাস্থ্যাবাসে গিয়ে বোধ করি বছর দেড়েক বাস করেন। এই মহিলা সেই সময় গোর্কির সহিত বিশেষভাবে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন্। গোর্কি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসেন মস্কোতে, এবং সম্ভবত বৃদ্ধ টলষ্টয়ের নির্দেশক্রমেই "কনসর্ট" রূপে গোর্কির তত্ত্বাবধানে তিনি একটি পৃথক বাড়িতে বাস করতে থাকেন। এই মহিলাটি ছিলেন বিশেষ বিদুষী এবং সাহিত্যপ্রিয়। তিনি নিজেও একজন লেখিকা বটে। এই আমেরিকান মহিলার প্রতি গোর্কি নিজেও যেমন আন্তরিকভাবে অনুগত ছিলেন, তেমনি এই নারীর সহায়তায় তাঁর নানা গ্রন্থেরও অনুবাদ হয়। সে যাই হোক, দুইবার বিবাহ রুশদেশে আইন-বিরোধী বলেই উভয়ের মধ্যে সামাজিক বিবাহ ঘটেনি! বিগত ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে এই আমেরিকান মহিলা মস্কোতেই মারা যান্। তাঁর কোনও সন্তানাদি হয়নি। তাঁর একখানি ছবি আমাকে উপহার দেবার আগে গোর্কি-মিউজিয়মের মহিলা-ডাইরেক্টর একটু কুণ্ঠিত হয়েছিলেন! তাঁদের ধারণা, চন্দ্রের এইটুকুই কলঙ্ক!

বৃদ্ধা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত নীচের তলাটায় ঘুরছিলেন দেখে এক-সময় আমি বললুম, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি,—আমি খুব দুঃখিত।

কষ্ট?—বৃদ্ধা হেসে বললেন, আমার বয়স কত ঠাওরে বলো দেখি?

বললুম, পঁচাত্তর হয়েছে কি?

কপালখানা! তোমার চেয়ে বয়স আমার অনেক কম, তা জানো? সবে আমি আশি পেরিয়েছি!

তুমুল হাস্যরোলে সবাই ফেটে পড়ল। বৃদ্ধা পুনরপি বললেন, ও, বিশ্বাস হল না বুঝি? বেশ, তাহলে এখনই দেখাতে পারি কার গায়ের জোর বেশি!

হাসতে হাসতে মহিলারা একশেষ। আমার নিজেরও সমস্ত আড়ষ্টতা ঘুচে গিয়েছিল। বৃদ্ধা বললেন, আমার ফ্ল্যাট এই কাছাকাছি। লিডিয়া, বল দেখি, ছেলেটাকে আমার ওখানে কবে আনছ? একসঙ্গে ব'সে খেতে হবে কিন্তু। আমি রান্না করব।

আচ্ছা বেশ, তারিখ ঠিক ক'রে আমাকে ফোন ক'রো। চলো বাবা, তোমাকে আমি থিয়েটারে পৌঁছে দিয়ে আসি। বৌমাও যাবেন সঙ্গে। চলো, লিডিয়া—

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার আগে ম্যাডাম গোর্কি দুটি স্নেহোপহার আমার হাতে দিলেন। প্রথমটি একটি রঙ্গীন পুতুল—এটি ঘাস-মাটির তৈরি। এগুলি তাঁদের 'গোর্কি' শহরের কুমোরেরা ঘরে তৈরি করে। অন্যটি ধাতব-নির্মিত একটি দেশালাই বাক্সের খোল। এটি বহুকাল ধরে ম্যাক্সিম গোর্কি ব্যবহার করেছিলেন।

তরুণ বয়সে একদা প্রথম গোর্কির রচনা প'ড়ে একটা আশ্চর্য বাস্তব জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলুম, সে অনেক-কাল হয়ে গেল। কিন্তু এমন অবাস্তব দিবাস্বপ্ন সেদিন দেখিনি যে, ম্যাক্সিম গোর্কির বৃদ্ধা স্ত্রী আমার জীবনের কোনও এককালে তাঁর নিজের গাড়িতে ক'রে তাঁরই স্বামীর নামাঙ্কিত থিয়েটারে আমাকে পৌঁছিয়ে দেবেন, এবং এক পাশে থাকবেন তিনি, অন্য পাশে গোর্কির পুত্রবধূ! কিন্তু বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি এখনও—এই গাড়ির মধ্যেই ব'সে—যখন আমার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে!

মস্কো আর্ট থিয়েটার ওরফে গোর্কি থিয়েটারের সামনে আমাদের তিনজনকে নামিয়ে দিয়ে মাদাম গোর্কি বিদায় নিয়ে গেলেন। অভিনয় তখনও আরম্ভ হয়নি। ডাইরেক্টর মহাশয় বিশেষ যত্নে ভিতরে আমাদের জায়গা ক'রে দিলেন।

সেদিন ছিল রুশভাষায় 'উইন্টার্স টেলস্'! আজ আমার সহদর্শিনী হলেন গোর্কির পুত্রবধূ মিষ্টভাষিণী মার্ফা পেসকভা! মোট চার ঘণ্টার অভিনয়। শেষ সাড়ে এগারোটায় আন্দাজ। শ্রীমতী লিডিয়া বসলেন এপাশে।—

এইদিন আমি সোভিয়েট সংস্কৃতি-মন্ত্রী মিঃ মিখাইলভের সঙ্গে একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়েছিলুম। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক আদর্শ এবং জনসাধারণের জন্য আনন্দ-অনুষ্ঠান-গুলিকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করার জন্য স্টেট কি-কি নীতি অবলম্বন করেছেন, এই নিয়ে এই শান্ত ও মৃদু-ভাষী ভদ্রলোক দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। অতঃপর রাত্রি বারোটায় শ্রীযুক্তা পেসকভাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আমরা যখন হোটেলে ফিরে আহারাদি শেষ করলুম রাত তখন ১টা। ওভারকোটটি

গায়ে চাড়িয়ে শ্রীমতী লিডিয়া শুভরাত্রি জানালেন।

এককালে গোঁড়া খৃষ্টধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি রাশিয়ায় ছিল প্রচুর। সনাতন খৃষ্টধর্ম দেশের রাজনীতিক, সামাজিক এবং নাগরিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। সেই সনাতন খৃষ্টধর্ম এবং ধর্মমন্দির অব্যাহতভাবে আজও আছে রাশিয়ায়, কিন্তু তারা দেশবাসীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার হারিয়েছে! কলকাতার কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর বা ভাটপাড়া যদি দুর্নীতি-গ্রস্ত হয়ে এই সিদ্ধান্ত করত যে, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বাঙালী জাতির সামাজিক বা রাজনীতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে, তাহলে তাদের ঠাঁই হ'ত ওই আদি-গংগা বা ভাগীরথীর জলে! বলা বাহুল্য, ৪৫ বছর আগেও বাঙালী বা ভারত-বাসী রাজনীতিক ও সামাজিক চিন্তায় রাশিয়া অপেক্ষা অনেক বেশি অগ্রসর ছিল! চিন্তাধারার দিক থেকে বাঙালী বা ভারতীয় রাশিয়ার থেকে আজও পিছিয়ে পড়েনি। কেননা রাশিয়া আজ যেমন 'গোঁড়া', তেমনই 'রক্ষণশীল'! বৈপ্লবিক চিন্তাধারা যে অগ্রসরবাদকে আশ্রয় ক'রে থাকে সেটি তাঁরা ভুলতে বসেছেন! রাশিয়ায় বিপ্লববাদের পুজো নেই, আছে বিপ্লবের পুজো! অগ্রসরবাদ অপেক্ষা উন্নতিবাদ এখন তাঁদের কাছে বড়। এইটিই গোঁড়ামি! কিন্তু ভারতবর্ষ দেখেছে অনেক, প্রচুর তার অভিজ্ঞতা। কোনও গোঁড়ামিকে সে আঁকড়ে ধরেনি, কেননা প্রতি যুগে সে 'সীনথেসিস' খুঁজেছে! আজ কমিউনিজমের জগৎ-জোড়া বিতর্কের মধ্যে বসে ভারতবর্ষ নিঃশব্দে তার মূলে শাঁসটুকু বের-ক'রে বা'র ক'রে নিচ্ছে! ভারতবর্ষে ভাকাট কমিউনিজম কোনও কালে জায়গা পাবে না, কেননা গোঁড়ামি তার প্রকৃতি-বিরোধী। বলা বাহুল্য, কমিউনিজমের প্রখরতা বা উগ্রতা, নিরীশ্বরবাদ বা বিবেকসত্তার বলি—এগুলি ভারতের দু'চোখের বিষ। হিউম্যানিজমকে জায়গা দিয়ে কমিউনিজমকে সে সরিয়ে রাখতে চায়!

মস্কোতে 'গোঁড়া' খৃষ্টধর্ম আজও সগৌরবে বিরাজমান। রাজধানীতে এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে অগণিত গির্জা এবং সেখানে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার নরনারীর উপাসনা ও মাথা ঠোকাঠুকি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে! বিস্ময়ের কথা এই, রাষ্ট্র এগুলিকে সেই লেনিনের আমল থেকেই রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে আসছে। ফুল বেলপাতা, পুজো-আর্চা, পান্ডা-পুরুতের দক্ষিণা, প্রণামী, গুরুঠাকুরের উপার্জন, খৃষ্টধর্ম প্রচার,—সমস্ত রয়েছে অব্যাহত! নেই শুধু বাধ্য-বাধকতা, নেই তার রক্তচক্ষু, এবং নেই তার শাসন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ষ্টালিনের আমলে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের প্রথম 'কনষ্টিটিউশন' প্রবর্তিত হয়। সেটির ১২৪ ধারা হল এই :

In order to ensure to citizens freedom of conscience, the church in the U.S.S.R. is seperated from the state, and the school from the church. Freedom of religious worship and freedom of anti-religious propaganda is recognised for all citizens".

এই ধারাটিরই পরিপূরক হিসাবে ১২৫নং ধারায় এটি স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে,

"In conformity with the interests of the working people, and in order to strengthen the socialist system, the citizens of the U.S.S.R. are guaranteed by law :

a) freedom of speech;
b) freedom of the press;
c) freedom of assembly, including the holding of mass meetings;
d) freedom of street processions and demonstrations

These civil rights are ensured by placing at the disposal of the working people and their organizations printing presses, stocks of paper, public buildings, the streets, communications' facilities and other material requisites for the exercise of these rights"

সোভিয়েট শাসনতন্ত্রে নাগরিক-গণের বিশুদ্ধ মৌল অধিকাররক্ষার ধারাগুলি যুক্তিহীন নয়। কিন্তু এমন কয়েকটি ধারা রয়েছে যার ছিদ্রপথ দিয়ে নাগরিকদের মৌল অধিকার অতি অনা-য়াসেই অপহরণ করা যায়। এই ছিদ্রপথ-গুলির সাহায্যেই ষ্টালিনের স্বৈরাচারী একনায়কত্ব সম্ভব হয়েছিল, এবং লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী সেই উৎপীড়নের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল।

বিগত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে 'সোভিয়েট কনষ্টিটিউশন' গ্রন্থখানি নূতন ক'রে প্রকাশ করা হয়,—কিন্তু এটি পাস হয়েছিল প্রথম ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দেই। এই শাসনতন্ত্রের ১০ম ধারায় যে আইনটি সুস্পষ্টভাবে বলবৎ আছে সেটি আমাদের দেশে অনেকেরই জানা নেই। সেটি হল :

"The personal property right of citizens in their incomes and savings from work, in their dwelling-houses and subsidiary husbandries, in articles of domestic economy and use and articles of personal use and convenience, as well as the right of citizens to inherit personal property, is protected by law."

এই ধারাটির মধ্যে 'property' এবং 'right'—এই শব্দগুলি একবচনে আছে, বহুবচনে নেই! অর্থাৎ একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবারের একখানি নিজস্ব বাড়ি থাকতে পারে, কিন্তু দুই-খানি নয়! সেই বাড়িখানি তাঁরা বংশ-পরম্পরায় ভোগ-দখল করতে পারেন, কিন্তু সেই বাড়িখানি যে-জমিটুকুর ওপর দাঁড়িয়ে, সেটুকু শাসনতন্ত্রের ৬ষ্ঠ ধারানুযায়ী "belong(s) to the whole people." এখানে 'পীপল মানে 'ষ্টেট'। বলা বাহুল্য এই সব ধারাগুলির মধ্যে একটি অলিখিত শাসন উহ্য থেকে গেছে! তুমি যদি এই সোসালিষ্ট রাষ্ট্রের বাধ্য, অনুগত এবং বশীভূত না থাকো, তাহলে তোমার জীবনযাত্রা ও ধনসম্পত্তি নিরাপদ নয়!

আমার ভ্রমণকালে একটিমাত্র সোভিয়েট নাগরিককেও আমি অবাধ্য হতে দেখিনি! কিন্তু আমার বিশ্বাস, আধুনিক পৃথিবীর মধ্যে 'উদারতম' শাসনতন্ত্র একমাত্র ভারতেরই আছে! কেননা আমাদের ঘরের শত্রুরা এই শাসনতন্ত্রের গুণে অহেতুক প্রশ্রয় পায়, এবং বাইরের শত্রুরা অবাধে আশ্রয় পায়!

মস্কো ছাড়িয়ে অনেক দূর যাচ্ছিলুম—প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। আমাদের সঙ্গে একজন নূতন অতিথি ছিলেন। তিনি এসেছেন অষ্ট্রেলিয়া থেকে। ভদ্রলোকের বয়স বছর পঞ্চাশ, মাথায় বহু পরিমাণ টাক এবং তিনি আপন দেশে একজন বিশিষ্ট ইতিহাসের অধ্যাপক। তাঁর নাম মিঃ কার্ক। তাঁরা চারজন অষ্ট্রেলিয়ান মিলে একটি পৃথক প্রতিনিধিমণ্ডলী। কিন্তু এই ভদ্রলোকের মিষ্টহাসি ও সৌজন্য আমি দূরের থেকে লক্ষ্য করতুম! এঁরা চারজন ছিলেন শ্রীমতী অকসানার তত্ত্বাবধানে। একদিন অকসানা আমাকে বললেন, মিঃ,

ক্লার্ক আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

মিঃ ক্লার্কের সঙ্গে সেদিন থেকেই বন্ধুত্ব। তিনি যে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের অতিথি এ সম্বন্ধে তিনি সচেতন এবং সতর্ক। তিনি মুখ বুজে হাসিমুখে এবং নিরীহ চেহারা নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন দেখে যেতে চান। প্রশ্ন, বিতর্ক, সমালোচনা বা বিশ্লেষণ,—এগুলি তাঁর মনে মনেই থেকে যায়। সম্ভবত আমি ভারতীয় বলেই তাঁর কিছু ঔৎসুক্য ছিল, এবং আমাদের গাড়িতে তিনি বেশ খুশী হয়েই চললেন। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ভারতের 'শান্তি কমিটির' নিরামিষভোজী ও নিরীহ ভারত পার্লামেন্টের সদস্য এবং বৃদ্ধ সর্দার গুর্বোক সিং, শান্তশীলা 'দিদি' শ্রীযুক্তা আশাদেবী আর্যনায়কম ও তাঁর স্বামী এবং অবশ্যম্ভাবিনী শ্রীমতী লিডিয়া! আমরা যাচ্ছিলুম সনাতন খৃষ্টধর্মের প্রধান কেন্দ্র তীর্থশ্রেষ্ঠ 'জেগোরস্ক'এ। এক কথায়, 'কাশী' যাচ্ছিলুম! চলো, তীর্থ কাশী!

দুধারে পাইন এবং বার্চের অরণ্যশ্রী। মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত ও মসৃণ রাজপথ। মাঝে মাঝে দিগন্তপ্রসার প্রান্তর, শ্যামশ্রী পরিপূর্ণ সমতল। দেখতে দেখতে পথ পেরিয়ে এলুম অনেক দূর, এবং একটি পল্লীজনপদের ধারে এসে পথের পাশে একটি মন্দিরসদৃশ গির্জার কাছে গাড়ি থামল। আমরা গিয়ে ঢুকলাম সেই মন্দিরে। এটি বহু প্রাচীন, এবং ভিতরটি ছমছমে। স্থানীয় বহু প্রবীণ নরনারী পূজাপাঠে ব্যস্ত। অনেকে হাঁটু মুড়ে পাথরের মেঝের উপর বসে স্তবপাঠ করছে, কেউ বিচিত্র ভঙ্গীতে কান মলছে, কেউ বা 'হৃদয়ে-স্কন্ধে-ললাটে, অক্ষে ও কণ্ঠে' করস্পর্শ করে 'আচমন' করছে। অনেকে মাথা ছুঁইয়ে খৃষ্টের ছবিতে প্রণাম জানাচ্ছে। এই মন্দিরের কর্মীদের ব্যয়ভার বহন করেন রাষ্ট্র, এবং প্রণামী বা পূজার দরুণ যা পাওয়া যায় তাতেই মন্দিরের খরচ চলে।

আমরা আবার এসে গাড়িতে উঠলুম।

সোভিয়েট ইউনিয়নে এখন মোটামুটি চারটি ধর্ম বর্তমান। সেগুলি হল খৃষ্ট, ইহুদী, ইসলাম এবং বৌদ্ধ। নিখিল সোভিয়েট বৌদ্ধ কাউন্সিলের যিনি সর্বপ্রধান লামা, তাঁর নাম 'গাবজি ধর্মায়েভ লবসানিমা', এবং যিনি 'চিতা' অঞ্চলস্থিত 'আগা' মঠের প্রধান পুরোহিত, তাঁর নাম 'গাবিৎ জিগ্‌জিতভ শম্ভু'। ইসলাম ধর্মগুরু যাঁরা তাঁদের মধ্যে মহম্মদ গাজি কুর্বানভ, শামসুদ্দিন আবদুল্লায়েভ, আলীজাদা আখুন্দ আগা, ইব্রাহিম আবদুল করিম, অলী আব্বাস কাজী,—প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ইহুদীদের মধ্যে দুইজন প্রধান ধর্মযাজক রয়েছেন। একজন হলেন 'সলোমন শিলফার', অন্যজন 'ইৎস্কো শেখৎমান'। বিগত ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে শান্তিপ্রচার কামনায় সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের এই চারিটি ধর্মের প্রধান পুরোহিতগণের যে মস্ত সম্মেলন হয়, পূর্বোক্ত ধর্মাচার্যগণ সেই সম্মেলনে যোগদান করেন। সেই বৃহৎ সম্মেলনের ক্ষেত্র ছিল 'জেগোরস্ক' (Zagorsk)।

সোভিয়েট ইউনিয়ন গোঁড়া বা সনাতন খৃষ্টধর্মের দেশ। এদেরই অধীনে আছে মোট ১৬টি তীর্থস্থান, সেগুলি পুণ্যক্ষেত্র! সেখানে স্নান দান পূজা দীক্ষা ত্রিরাত্রিবাস, ধর্মালোচনা, আরতি,—আগাগোড়া সমস্তই সনাতনী হিন্দুদের মতো! সেই ১৬টি পুণ্যক্ষেত্রের মধ্যে যেটি সর্বপ্রধান, সেই 'জেগোরস্ক'-এ আমরা এসে পৌঁছলুম। আমি অতিশয় কৌতুক বোধ করছিলুম এইটি দেখে যে, আমি গয়া-কাশী-প্রয়াগ-বৃন্দাবন-হরিদ্বারের বিশেষ বিশেষ মন্দিরের পাড়ায় এসে পড়েছি! সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা এই, যে ধরণের গির্জা আমাদের দেখা অভ্যাস, এখানে তার কোনও ডিজাইন নেই! রোমান ক্যাথলিকদের গির্জা, প্রটেস্টান্টদের গির্জা, ইহুদী সিনাগগ, গোঁড়া খৃষ্টানদের গির্জা,—এগুলির নির্মাণ-কৌশল প্রত্যেকেরই পৃথক। কলকাতার সেন্ট পলস, বা দার্জিলিং, কালিম্পঙ, শিমলা, মুসৌরি, বোম্বাই বা দিল্লীতে যে বড় গির্জাগুলি আমরা দেখি,—তাদের অধিকাংশ ইংরেজ স্থাপত্যকলা অনুসারে নির্মিত। কিন্তু রাশিয়ার প্রত্যেকটি গির্জার ডিজাইন ভিন্ন। হঠাৎ দেখে মনে হতে পারে, এ যেন হিন্দু মন্দিরের সগোত্রীয়! তার খিলান, তার গম্বুজ, তার স্বর্ণালি মুণ্ডি, এমন কি ভিতর ও বাহিরের নির্মাণকলার মধ্যে হিন্দু স্থাপত্যের ছায়াটি থেকে গেছে! 'টেম্পল' এবং 'চার্চ'—এই দুটি শব্দের ব্যবহারে একটি জটিলতা আছে। খৃষ্ট-জন্মের পরেও গ্রীস, ইতালী, পূর্ব ইউরোপ, রুশ সাম্রাজ্য—সর্বত্রই উপাসনা গৃহকে 'টেম্পল' বলা হত। শ্রেষ্ঠত্বের সকল কেন্দ্রই 'টেম্পল'। আমরা 'জেগোরস্কে' এসে চারিদিকে দেখছি বৃহদাকার এক একটি মন্দির! ক্রেমলিনের ভিতরে অত বড় যে 'উস্পেনস্কি ক্যাথিড্রল', সেও ত টেম্পল!

উক্রাইনের রাজধানী কিয়েভে থাকতে যে "পেচারাস্কি লাবরা" দেখে এসেছি, এটি তারই সগোত্রীয়। তবে সেটি 'তারকেশ্বর', এটি 'বারাণসী'! এখানে চারিদিকে মস্ত শহর, কিন্তু তীর্থ-কেন্দ্রিক। কালীঘাটে অত ভিড় শুধু কালীমন্দিরের জন্য। গদাধরের মন্দিরের জন্যই পুরনো গয়া! রাজস্থানে নাথজীর মন্দিরটি আছে বলেই নাথদ্বার শহর। এখানে এই বৃহৎ ও ব্যাপক 'ট্রিয়েৎস্কি-সের্গিয়েভা বিহার' আছে বলেই 'জেগোরস্ক' শহর! এই শহরে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বপ্রধান খৃষ্টধর্মগুরু 'হিজ হোলিনেস আলেক্সিস, পেট্রিয়ার্ক অফ মস্কোর' স্থায়ী বাসস্থান। এখান থেকে তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থার সাহায্যে তিনি ১৫টি সোভিয়েট রিপাবলিকের গোঁড়া খৃষ্টান সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এই প্রশাসন ব্যবস্থার উচ্চতম অধিকারের নাম হল, 'হোলি সাইনদ'। এককালে এখান থেকেই মহামতি টলস্টয়কে ধর্মচ্যুত করা হয়েছিল! এখানকার অধ্যাত্ম বিদ্যালয়, ব্রহ্মচর্য আশ্রম, মঠ, টোল ও গুরুগৃহ, এখানকার পাঠ্যক্রম, বসবাস ব্যবস্থা—সমস্তই ধর্মগুরুর নির্দেশে চলে! একজন ধর্মযাজক সগৌরবে আমাদের বললেন, আমরা এখানে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কোনও প্রকার অর্থসাহায্য (subsidy) গ্রহণ করিনে! আমাদের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব।

ধর্মযাজকটি বয়সে কিছু তরুণ, চেহারাটি অতি সুদর্শন, মুখশ্রীটি দীপ্ত ও কমনীয়, গুম্ফশ্মশ্রুযুক্ত। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা দেখে ঈষৎ বিস্ময় বোধ করেছিলুম। আজ বোধকরি কোনও এক পর্ব দিন। চারিদিকে সকল বয়সের হাজার হাজার নরনারীর জনতা। যে-বৃহৎ 'মন্দিরের' মধ্যে ঘণ্টা ও বাদ্য-সহকারে আরতি-অর্চনা চলছিল, আমরা সেইখানকার ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে চারিদিকের মণিমাণিক্যের শোভা-সম্পদের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়েছিলুম এবং যে কোনও হিন্দু মন্দিরের দেবদেবীর আরতির সঙ্গে এখানকার কিছুমাত্র প্রভেদ নেই, এইটি ভাবছিলুম! তেমনি ধূপ-ধুনো-প্রদীপ, তেমনি হাতজোড় এবং চোখ

খোঁজা। তেমনি দেওয়ালে মাথা ঠোকা। এক সময়ে আমাদের পাশ থেকে শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, এখানে বহু দেশ থেকে মেয়ে-পুরুষেরা মানৎ করতে আসে!

সোভিয়েট ইউনিয়নে বর্তমানে ৬৯টি মঠ বা খৃষ্টবিহার আছে। এই বিহারগুলি স্থানীয় ধর্মগুরু বা মোহন্তর অধীনে। যারা শাস্ত্র-চর্চা করবে, বা আধ্যাত্ম জীবন যাপন করবে,—তারা এখানে আশ্রয় পাবে। এই সব মঠ থেকে 'সন্ন্যাস' দেওয়া হয়। এই মঠগুলির মধ্যে যেগুলি অতি প্রসিদ্ধ, তাদের ভিতরে 'ত্রয়িৎসে-সেরগিয়েভা, কিয়েভো পেচোরস্কায়া, পোচায়েভস্কায়া, পেচোরস্কিকলারা, পুখ-তিৎসা' ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল মঠ বা খৃষ্টবিহার ছাড়া গির্জার সংখ্যা শত সহস্র। একমাত্র মস্কো এবং তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে ৫০টিরও বেশি গির্জা ধর্মোপাসকদের জন্য সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিন খোলা থাকে!

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান লেখক কেনেডি (ইনি প্রেসিডেণ্ট কেনেডি কিনা জানিনে) এই খৃষ্টবিহারে এসে চারদিক দেখেশুনে এখানকার 'ভিজিটার্স বুকে' যে কয়েকটি কথা লিখে গেছেন, সেগুলি এখানে তুলে দিচ্ছি :

"Coming from the United States of America, where it is frequently asserted by the press that freedom of religion does not prevail in the Soviet Union, it has been most gratifying to see with my own eyes the free exercise of religious conception here today. At the same time, it has been inspiring to see the Church fulfilling the function of service to the people." (August 8, 1954).

আমরা বিভিন্ন বৃহৎ অট্টালিকার আশেপাশে শত শত নরনারীর ভিড়ের ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। এই তীর্থস্থানের যিনি প্রথম পত্তন করেন তাঁর নাম 'সন্ত সেরগিউস'। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর একজন খৃষ্টান সাধু। তাঁর দেহাবশেষ আজও এখানকার একটি রৌপ্যময় স্তম্ভের নীচে একটি রৌপ্যাধারে সংরক্ষিত আছে। এখানে বর্তমানে ১০০ সাধু এবং ব্রহ্মচারীর বাস। তাঁরা জপ-তপ, পড়াশুনা এবং শাস্ত্রচর্চা নিয়ে থাকেন। এখানকার সর্বপ্রধান ধর্মগুরুর সহকারী হিসাবে যিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অধ্যক্ষ, তিনি হলেন মেট্রোপলিটান নিকোলাস রেভারেণ্ড ফাদার ক্রুটিৎজি। তাঁর বয়স প্রায় ৭৫। তিনি বছর দুই আগে দিল্লীর ধর্মসভার অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন।

মোট ৬টি বিভিন্ন বিভাগের সাহায্যে এই বিরাট খৃষ্টবিহার তার সকল কাজ সম্পন্ন করে। এখানকার আইন-কানুন, বিলি-ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন নির্দেশনামা 'হোলি সাইনদ' প্রচার করেন। এঁদের উপদেষ্টা কমিটির হাতে রয়েছে ধর্ম-শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থার মোট ১০টি শিক্ষায়তন এখানে বর্তমান। প্রচার ব্যবস্থার মধ্যে আছে মাসিকপত্রাদি, বাইবেল এবং ধর্মশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক, গুরুকথিত সমাচার এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থাদি। এখানে আছে পেন্সন ব্যবস্থা। অশক্ত, বৃদ্ধ বা অকর্মণ্য-প্রায় সাধুসন্ত, বার্ধক্যজীর্ণ ধর্মযাজক বা তাঁদের নিরুপায় পরিবার, শিক্ষক বা গির্জার কর্মী,—এঁরা যে অর্থসাহায্য বা পেন্সন পান, সেই সকল অর্থসংগ্রহের জন্য নানা অঞ্চলের গ্রামীয় ধর্মকেন্দ্রাদির নিকট আবেদন জানানো হয়। অর্থাৎ চাঁদার টাকায় এই দেশজোড়া ধর্মপ্রতিষ্ঠান চলে। এ ছাড়া এঁদের অধীনে কয়েকটি উৎপাদন কেন্দ্রও আছে। গৃহাদি নির্মাণের মালমসলা, মোমবাতি, আসবাবসজ্জা, তৈজস, গির্জার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী, কাঠের জিনিস, বাসনপত্রাদি ও পাখানা, কাগজ কল,—প্রভৃতি নানা প্রকার বস্তু প্রস্তুত হয়। কিন্তু সেগুলি কেবলমাত্র এখানকার জন্য। এখানকার কোনও কর্ম-ব্যবস্থায় সোভিয়েট ইউ-নিয়নের নির্দেশ গ্রহণ করা হয় না।

আমরা একেকটি পবিত্র বেদীমূলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলুম। একেকটি কক্ষ আগাগোড়া স্বর্ণখচিত। সম্পদ ও বৈভবে পরিপূর্ণ প্রত্যেকটি উপাসনাস্থল। খৃষ্টের ও মাতা মেরীর বর্ণাঢ্য চিত্রপটগুলির যে অনৈসর্গিক আবেদন, সেগুলি শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণের প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে। জড়োয়া, জহরৎ, মণিমাণিক্য চারিদিকে দ্যুতিমান। তার অলঙ্করণ, ঐশ্বর্য, কারুকলা, বৈচিত্র্য, শিল্পকর্মাদি আমাকে যেন বিভিন্ন বৌদ্ধ গুম্ফাগুলির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

পূর্বোক্ত ৬৯টি খৃষ্টবিহার বা মঠের তত্ত্বাবধানে সমগ্র রাশিয়ায়, সাইবেরিয়ায়, ট্রান্স-ককেশিয়ায়, এসটোনিয়া-লিথুয়ানিয়া-লাটভিয়ায় এবং উক্রাইনে শত শত খৃষ্ট-মন্দির এবং অধ্যাত্ম সাধনার যে ছোট-বড় কেন্দ্রগুলি অদ্যাবধি সগৌরবে বর্তমান, তারা প্রধানতই 'জেগোরস্কের' নির্দেশানুসারে চলে। তাদের পরে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের একমাত্র শাসন হল এই, দেশবাসীর রাজনীতিক, সামাজিক এবং অর্থনীতিক জীবনের ওপর তারা প্রভুত্ব করবে না! পার্লিটিক্সের মধ্যে ধর্ম বা সম্প্রদায়ের জিগির তোলা চলবে না। আগে মানুষ, পরে ধর্ম। ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রগত নয়। গির্জা, গুম্ফা, মন্দির, মসজিদ, সিনাগগ—এদের চৌহদ্দির মধ্যে ধর্ম যদি থাকে, তার বাইরে সে 'ধর্ম' যেন দেশের বৃহত্তর জীবনকে শাসন না করে, চোখ না রাঙায়, জাত মারবার ভয় না দেখায়! এই সেদিন অবধি ওদের আঁতুড়ঘরের ষেটেরা পুজোয় ঢুকতো 'বামুন', ব্যাপটিজম বা খৃষ্টানিং কর্মে 'বামুন', বিবাহে 'বামুন', মৃত্যুকালে 'বৈতরণী'র রেভারেণ্ড বা 'বামুন'। আজ সেই প্রথা বা শাসনের চিহ্ন কোথাও নেই। 'হোলি সাইনদ' আজ আর রাজনীতি নিয়ে বা ধর্মদ্রোহিতা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এখন প্রত্যেক ধর্মমন্দিরের পাঠ্যক্রম হল, সোভিয়েট কনস্টিটিউশন। আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন সেদিনকার মধ্যযুগীয় 'বামুনাই' ঘুচিয়েছে বলেই পাশ্চাত্ত্যবাসী এত কোলাহল! আমাদের সঙ্গী অস্ট্রেলিয়ান প্রফেসর মিঃ ক্লার্কের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। গত কয়েকদিন থেকেই তিনি বলছিলেন, সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে নতুন ঠেকছে! আমাদের সমস্ত চিন্তার ধারাটাই বিষাক্ত হয়ে রয়েছে ৪০।৫০ বছর ধরে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করি, লেখক হিসাবে আমার একটু আধটু খ্যাতিও আছে। কিন্তু এদের দেশে এসে নিজেকে যেন পদে পদে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ এবং অনেকটা অশিক্ষিত মনে হচ্ছে!—"I feel myself ignorant, inexperienced and foolish in every step".

আড়ালে দাঁড়িয়ে দুজনে খুব হাসছিলুম। ক্লার্ক বললেন,—"bel-lieve me, I've to unlearn many things which I learned already in my country" অর্থাৎ যা শিখে এসেছি এতকাল, তার অনেক কিছু ভুলতে হবে!

মিঃ ক্লার্কের কিছু ভাবান্তর ঘটেছিল। এই সৌম্যদর্শন অধ্যাপক এক সময় গল্পচ্ছলে আমাকে বলেছিলেন,—"I've been let down by our own people, and am going to expose them!"

আমাদের জন্য কিছু জলযোগের আয়োজন করা হয়েছিল এবং তিনি এখানকার পরম ভাগবত, সেই প্রভুপাদ 'মেট্রোপলিটান নিকলাস রেভারেণ্ড অফ ক্রুটিৎজি এণ্ড কলোমনা' আমাদেরকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁর সামনে বসালেন। বৃদ্ধের চেহারাটি অতি সৌম্য, পরিচ্ছন্ন এবং প্রসন্ন। শ্বেতশ্মশ্রুযুক্ত এই দশাসই বৃদ্ধকে দেখলে মনে একটি শ্রদ্ধা এসে পৌঁছয়। ইনি সাধারণত ভিনদেশীয় অভ্যাগতগণকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীমতী লিডিয়া দোভাষীর কাজ করছিলেন।

জলযোগের মধ্যে ছিল তিন চার রকমের মাংস, এবং সেগুলি হিন্দু-মুসলমান কারও পক্ষেই ভোজ্য নয়! আঙ্গুর-আপেল-পীয়ার-বেরি প্রভৃতি ছিল। পানীয়ের মধ্যে জল ভিন্ন আর সব রকমের তরল পদার্থের প্রাচুর্য রয়েছে! আলু, টমাটো, মাছ, শাক, শশা, টোস্ট,—কোনটার অভাব নেই। পুরোহিত মহাশয় নিজেও সকলের সঙ্গে আহারে বসে গেলেন। ভোজ্যবস্তু সম্বন্ধে এখানকার

পুরোহিত বা ছাত্রমহলে কোনও নিষেধ নেই। এটি ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির উপর নির্ভর করে। একমাত্র ভারতবর্ষ—যেখানে হিন্দু জাতির অধ্যাত্ম জীবনের বিশুদ্ধতা ও শুচিতার সঙ্গে জীবজন্তুর প্রাণনাশ জড়িত নয়। ভগবৎ আরাধনার সঙ্গে জীবহত্যা ও হিংসা শৈবভারতে মেলেনি।

খোঁজ-খবর নেবার মাঝখানে আমি অর্বাচীনের মতো একটি প্রশ্ন করে বসলুম যেটি শুনে আশা দেবী ও গুর্বাক সিং ঈষৎ ক্ষুব্ধ হলেন। প্রশ্নটি অপ্রিয়, কিন্তু প্রয়োজনীয়। আমার প্রশ্ন ছিল এই প্রকার ঃ 'বলশেভিক বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত হবার পর সম্রাট আমলের পুরোহিত সমাজ—যাঁরা লেনিন গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তাঁদের পরিণাম কি দাঁড়াল, সেইটি আমি জানতে উৎসুক।

গুর্বাক সিং বললেন, but these are embarassing questions!

বোধ হয় মিঃ ক্লার্কই বললেন, not irrelevant. I suppose!

শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, এসব প্রশ্ন যদি কারও মনে আজ আসে, তার জবাব পাওয়া উচিত বৈকি।—এই ব'লে তিনি বৃদ্ধ রেভারেণ্ডকে আমার প্রশ্নটি বুঝিয়ে বললেন।

মেট্রপলিটান নিকলাস ঈষৎ হাসলেন। বললেন, প্রশ্নটি পুরনো, কিন্তু কৌতূহলটি আজও রয়ে গেছে পৃথিবীতে। আসল কথাটি না জেনে লোকে গালমন্দ করেছে! শত শত বছরের অভ্যাস কি মানুষ সহজে ছাড়তে পারে? কেউ কি জানত, জার কোনও দিন সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন, না রুশ সাম্রাজ্য ভেঙে চুরমার হবে? আমি নিজে সেদিন দুঃখের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখেছি, পুরনো অভ্যাস রাতারাতি বদলানো কত শক্ত! কিন্তু রাজনীতি আমরা নাই বা করলুম, নাই বা জনজীবনের ওপর আধিপত্য করলুম! গভর্ণমেণ্ট ভাল কি মন্দ, সেটা বোঝেনগে গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ—আমরা ধর্মমন্দিরের বাইরে গিয়ে ওদের মধ্যে মাথা নাই গলালুম! অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এক শ্রেণীর ধর্মযাজক, তাঁদের শিষ্যমণ্ডলী এবং অনুগতের দল এই অভিমতটি মেনে নিতে পারেননি! তাঁরা দুঃখ বহন করেছেন, এবং বহু ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়নি! বহু পুরোহিত শাস্তিলাভ করেছেন।

এই অবস্থাটা কতদিন ছিল?

ধরুন মোটামুটি পাঁচ বছর! ১৯১৭ থেকে ১৯২১!—আচার্য বলতে লাগলেন, উপাসনার ক্ষেত্রগুলি যে রাজনীতিক ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র নয়, এটি সেদিন অনেকেই বুঝতে পারেননি। তাঁরা, প্রাচীন ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীর নানা দেশে ধুয়ো উঠেছিল, সোভিয়েট ইউনিয়নে খৃষ্টানধর্ম বিপন্ন! প্রকৃতপক্ষে কোনও ধর্মই বিপন্ন হয়নি! কিন্তু যে সকল ধর্মযাজক জারের আমলকে নানা কৌশলে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, তাঁরা কেউ রক্ষা পাননি!

আহারাদির পর আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলুম। এই তীর্থ-নগরীর সর্বত্র স্থাপত্যকলার মনোরম সমাবেশ দেখলে মন অভিভূত হয়। বড় বড় গির্জা, স্মৃতিসৌধ, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, টোল, নাটমন্দির বাসগৃহ, পরিভ্রমণের জন্য এক একটি পার্ক, প্রাচীন কলাশালা, প্রতি মঠের ভিতরে প্রতি দেওয়ালের ফ্রেস্কো চিত্রাদি,—আগাগোড়া সমস্ত বহু শত বৎসরের সংগ্রহ। একজন 'ফাদার' আমাদের হাসিমুখে বললেন, পৃথিবীর সব দেশে যেমন, এখানেও তাই। আজকাল মানুষের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য

বেড়ে গেছে, তাদের আকর্ষণ সেইদিকেই বেশি। ওরা ধর্মকথা বা তত্ত্বকথা এখন আর তেমন শুনতে চায় না। অল্প বয়সের মেয়ে-পুরুষেরা ধর্মতত্ত্বে এখন রস (interest) পায় কম। বয়স্ক লোকরাই বেশি আনাগোনা করে, যাদের প্রবীণ মনে প্রশ্ন ওঠে নানাবিধ!

আপনাদের খরচপত্র কি রীতিতে চলে?

আচার্য মিষ্ট হাস্যে বললেন, উপার্জন আমাদের প্রচুর! দান এবং প্রণামীর হাত লোকের কমেনি!People pay the church still lavishly!

মিঃ ক্লার্কের মুখে চোখে সেদিন বিস্ময় ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়েছিল।

মস্কোর 'জিপসী থিয়েটারে' বসে 'সোহনী ও মহীওয়াল' নামক একটি অপেরা নাট্যের মহড়া দেখেছিলুম। এটি কোনও এক পাঞ্জাবী লেখকের রচিত। এটি একটি দরিদ্র কুমোর-পরিবারের কাহিনী, এবং এর রস ও অভিনয়কলা অতিশয় অতীন্দ্রিয়! কেবলমাত্র গতি-ভঙ্গীতে এবং বাদ্যসঙ্গীতে এটিকে প্রকাশ করা হচ্ছে। এর সঙ্গীতের অংশটি যোজনা করেছেন মস্কোবাসী কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত বিনয় রায়। কিন্তু নাটক বা অভিনয়াংশটি যথেষ্ট মনোজ্ঞ হয়নি। আমি এর সুখ্যাতিপত্রে চক্ষুলজ্জার দায়ে সই করে দিলুম বটে, কিন্তু ডাইরেক্টর সাহেবের কাছে আমার প্রকৃত মনোভাবটি প্রকাশ ক'রে বললুম। নাটকের প্রধানা পাত্রীটি কে জানিনে, কিন্তু পরম্পরায় শুনলুম শ্রীমতী ভ্যালেনটিনা ভির্সানিয়াকোভা নামক একটি বিশিষ্ট অভিনেত্রী নাকি যোগ্যতর পাত্রী ছিল! রঙ্গমঞ্চের যবনিকার অন্তরালবর্তী যে-জগৎ, সেখানকার 'রাজনীতি' পরদেশীর নিকট দুর্বোধ্য। সেখানকার রহস্যময় পক্ষপাতিত্ব, সংগোপন কানাকানি, প্রচ্ছন্ন মান-অভিমান, অসন্তোষের বিস্ফোরণ,— এগুলির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। প্রকাশ্য মঞ্চের উপর এই পাঞ্জাবী অপেরা সেদিন যথেষ্ট আনন্দদায়ক হয়নি। ভাবতে এই আজগুবী বস্তুর ঠাঁই হত না।

কিন্তু ভাল লেগেছিল মস্কোর 'পাপেট থিয়েটার'। আমাদের দেশে এককালে 'পুতুলনাচ' ছিল অতি প্রসিদ্ধ। কলকাতার 'পুতুলনাচ' সমগ্র ভারতের পক্ষে গৌরবের বস্তু ছিল। সেদিন তারা 'কথা' বলত না বটে কিন্তু 'কায়িক-ভঙ্গীর' দ্বারা বিষয়টিকে প্রকাশ করত! আজ সেই 'জেলেপাড়ার সঙের' মিছিল কোথায় যেন হারিয়ে গেল! সে যাই হোক আজকের 'পাপেট থিয়েটার' বিস্ময় আনে না, আনে কৌতুকবোধ। মস্কোর এই 'পাপেট' থিয়েটারের পুতুল-নাচটি হল বিজ্ঞানকলার একটি অনন্য সৃজন। বিষয়টির মূলে উদ্দেশ্য রাজনীতিক, কিন্তু হাস্যকৌতুক রসে এটি পরিপূর্ণ। একটি আমেরিকান ফিল্‌ম্‌ কোম্পানীর নবতম প্রযোজনাকে নিয়ে তামাশা ও পরিহাস চলছে! প্রডিউসার, ডাইরেক্টর, অভিনেতা ও অভিনেত্রী, কুকুর, ষাঁড়, গরু, প্রত্যেকটি দৃশ্যপটের শুটিং, আউট-ডোর নিয়ে হৈচৈ,— সমস্তগুলি কলের পুতুলের দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে! ওরই মধ্যে নৈরাশ্য, ব্যস্ততা, ব্যর্থতা, হাসি-অশ্রু, সঙ্গীত ও অভিনয়, আয়োজন এবং বিড়ম্বনা! বাস্তবিক, পুতুলকে আর কোনদিন এমন জীবন্ত মনে হয়নি, এবং তাদের কণ্ঠে এমন করে মানুষের কলকণ্ঠও শুনিনি। সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টাব্যাপী যে অনর্গল হাস্যরস এবং 'অনাবিল' আনন্দ পেয়েছিলুম, তার জন্য শ্রীমতী লিডিয়াকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলুম!

মস্কোর অন্যতম আকর্ষণ হল, 'চিলড্রেন্স থিয়েটার'। ৬ বছর থেকে ১৭ বছর বয়স অবধি ছেলেমেয়েরা এখানে নাটকের অভিনয় দেখতে আসে। উপদেশ বা নৈতিক বক্তৃতা ছেলেমেয়েদের দু'চোখের বিষ! তাদের 'ভাল' হতে বললেই তারা 'মন্দ' হয়ে দাঁড়ায়। নীতি-উপদেশ দিলেই তারা বিগড়াতে থাকে, এবং শাসন করলেই বেঁকে বসে। প্রবীণ বয়স্ক মা-বাপের কাছে ছেলেমেয়েরা আনন্দ পায় না, ভয় দেখালে তারা নষ্ট হয়, সব সময় চোখে-চোখে রাখলে তা'রা চুরি করতে শেখে, ধমক শুনতে থাকলে তা'রা মিথ্যাবাদী হয়! ছোট ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা ও ভালবাসা এবং আনন্দ পেলে তবে উপযুক্তভাবে মানুষ হয়! সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এসম্বন্ধে খুবই সচেতন।

আমরা দুটি স্বচ্ছন্দচারী শিশু-বালকের একটি রূপককাহিনী নাট্যাকারে দেখেছিলুম। আজ আমার পাশে ছিলেন শ্রীমতী অকসানা, একজন তরুণ বয়স্ক স্কচ নাট্যকার ও কবি মিঃ রীড এবং এই থিয়েটারের ডাইরেক্টর সুন্দর সুপুরুষ শ্রীযুক্ত গোলুবভস্কি। পরম স্নেহশীলা একটি জননী তার দুটি শিশুসন্তানকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে অতি আনন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছিল। শিশুবালক দুটি অতি মিষ্টপ্রকৃতির। কিন্তু শিশু ব'লেই বোধ হয় একটু ভুল করল। তারা তাদের স্বাভাবিক কৌতূহলবশতঃ স্বাধীনতার সীমানার বাইরে গেল এবং এক ডাইনীর দ্বারা অপহৃত হয়ে কোনও এক অরণ্যলোকে একটি আপেলগাছের কোটরে লুক্কায়িত থাকতে বাধ্য হল। অবশেষে একটি সুন্দর নাটকীয় সংঘাতের ভিতর দিয়ে মাতাপুত্রের মিলন এবং প্রেক্ষাগৃহের বালক-বালিকা দর্শকদলের সঙ্গে নাটকের 'পাত্র পাত্রীর' উত্তর-প্রত্যুত্তরের কৌতুকজনক যোগাযোগ' এই নাটকটি দেখে বড় আনন্দ পেয়েছিলুম।

মিঃ গোলুবভস্কির বাড়িতে অর্থাৎ ফ্ল্যাটে আমাদের নৈশভোজের আমন্ত্রণ ছিল। তরুণ স্কচ কবি ও নাট্যকার শ্রীমান্‌ রীড মদ এবং আমোদ—এ দুটির বিশেষ অনুরাগী। তিনি বললেন, আমি স্কচ বলেই স্কচ হুইস্কিতে মানুষ! আমাদের দেশের স্বনামধন্য পাদরীদের জ্ঞানোন্মেষ হয় স্কচ হুইস্কির গুণে।

কথাটি হয়ত সত্য নয় হয়ত বা ওর মধ্যে বক্রোক্তি আছে। কিন্তু রীড সেদিন নৈশভোজের আসরটিকে রাত ১টা পর্যন্ত তাতিয়ে রেখেছিলেন।

ঘরে মিঃ গোলুবভস্কির প্রাচীনা জননী এবং বছর চৌদ্দ বয়সের একটি কন্যা বর্তমান। এ'রা বোধ হয় ইহুদী এবং এককালের বিশিষ্ট অভিজাত। বৃদ্ধার বয়স অন্তত ৬৫ বছর, কিন্তু এমন পরিচ্ছন্ন সুশ্বেতা ও সুন্দরী বৃদ্ধা এর আগে আমার চোখে পড়েনি। বালিকা মেয়েটিও যেমন সুশ্রী তেমনি শান্ত ও নম্রভাষিণী। বৃদ্ধা আমাদের সকলকে সাদরে বসালেন। নূতন ফ্ল্যাটটি নূতন আসবাবপত্রে ঝলমল করছিল। অনেকগুলি আলমারি বই ঠাসা। সর্বত্র পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় রয়েছে! গোলুবভস্কির বয়স হয়ত চল্লিশের কিছু বেশি। কিন্তু এমন রূপবান পুরুষ এদেশে আমার কমই চোখে পড়েছে। ভোজের আসরে এসে পৌঁছলেন তাঁর স্ত্রী এবং তিনি আমাকে দেখেই সবিস্ময়ে হেসে উঠলেন। গত বছর মস্কোতে এঁ'র সঙ্গে আলাপ হয়, এবং এই অতি সুশ্রী মহিলাটির নামও শ্রীমতী মীরা। ইনিও সুপটু দোভাষিণী, এবং বয়স আন্দাজ বছর পঁয়ত্রিশ। তিনি জানতেন না, আমি পুনরায় মস্কোতে এসেছি এবং গোলুবভস্কির সে-'ইন্ডিয়ান'কে আজ নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেছেন সে-ব্যক্তি যে আমি, এটি মীরার কাছে চেপে রাখা হয়েছিল!

বৃদ্ধার চেহারাটির মধ্যে [illegible] আমলের [illegible] পরিবারের যে আভিজাত্যের কথা শুনে এসেছি, তার একটি সুস্পষ্ট ছাপ দেখে আমি আনমনা হয়েছিলাম সন্দেহ নেই। তিনি যখন কাছে ব'সে সযত্নে আমার প্লেটটি [illegible] ভরিয়ে দিচ্ছিলেন, আমি তখন তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করছিলুম। বহু পরিবারের মধ্যেই আমি এতদিন ধরে ঘোরাফেরা করেছি, কিন্তু এমন একটি শোভন, সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন পরিবার নূতন [illegible] দেখতে আমার বাকি ছিল। শ্রীমতী মীরার সৌজন্য, গোলুবভস্কির [illegible] [illegible] শ্রীমতী অকসানার পরি-[illegible] শ্রীমান রীডের [illegible] [illegible]—সেই সন্ধির [illegible] কালব্যাপী নৈশভোজের [illegible] প্রোজ্জ্বল ক'রে তুলেছিল। [illegible] ফিরলুম তখন রাত দেড়টা! (ক্রমশঃ)

উপন্যাসোপম গল্প প্রসঙ্গে

প্রভাতকুমার দত্ত

বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক একনিষ্ঠ পাঠকই উপন্যাসোপম গল্প কথাটির সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত। সম্প্রতি 'বড়-গল্প' কথার বিকল্পে উপন্যাসোপম গল্প কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় আজকাল প্রায়ই ঘোষণা লক্ষ্য করা যায় যে অমুক অমুক রচনার সঙ্গে একটি কি দুটি উপন্যাসোপম গল্প প্রকাশ করা হবে। ভাবখানা যেন এই যে সম্পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাই উপন্যাসোপম গল্প দিয়ে উপন্যাসের স্বাদ মেটানো। উপন্যাসোপম গল্প কথাটা আমাদের শুনতে কেমন যেন লাগে। উপন্যাস ও গল্প এ দুটো তো আলাদা জিনিস। এ দুয়ের ধর্ম তো সম্পূর্ণ পৃথক। এদের ধর্ম পৃথক না হলে সাহিত্যের এই দুই প্রকাশ-মাধ্যম সৃষ্টি হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য বলা হতে পারে উপন্যাসোপম গল্প সেই জিনিস যেখানে গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে উপন্যাসের খানিকটা স্বাদ দেওয়া হয়। ব্যাপারটা আমরা বুঝলাম, কিন্তু প্রশ্ন এই যে সৃষ্টিতে দুই সাহিত্যরসেরই সন্ধান মেলে তার সার্থকতা কতটুকু? বাংলাদেশে যে উপন্যাসোপম গল্প সম্প্রতি রচিত হচ্ছে সেগুলির সাহিত্য-মূল্য কি ধরণের?

পাশ্চাত্ত্য দেশের সাহিত্যে 'নভেল' আর 'নভেলেট' উপন্যাসের এই দুটি রূপ প্রচলিত আছে। নভেলে কাহিনীর ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ বিস্তার আর নভেলেটে বক্তব্য পরিমিত। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই মূল কাঠামো হচ্ছে নভেলের। এমন অনেক কাহিনী আছে যা ঔপন্যাসিক নভেলের স্বাভাবিক পরিসরে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। তখন তাকে 'নভেলেট' ফর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। বাংলাদেশে নভেল আর নভেলেট দুইই লেখা হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত দিয়ে জিনিসটা বোঝানো যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' আর 'মালঞ্চ' দুখানি গ্রন্থ তুলনা করলেই আমরা নভেল আর নভেলেটের পার্থক্য বুঝতে পারব। প্রথম গ্রন্থটি হচ্ছে নভেল আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নভেলেট। 'গোরা'র কাহিনীর বিরাট ব্যাপ্তি ও মৌলিকতা এমনই যে তা নভেলের আঙ্গিকে প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু 'মালঞ্চের' কাহিনীর ধাঁচ এমন যে তা দিয়ে পূর্ণ অর্থে নভেল রচিত হতে পারে না। তাই এটিকে আমরা নভেলেট বলি। মালঞ্চ গদ্যে রচিত হলেও তার আবেদন কাব্যময় কারুণ্যে ভরা। বক্তব্যের সঙ্গে কাব্যভাব মিশ্রিত হলে তা দিয়ে তো আর নভেলের ঘটনা সংঘাতময় কাহিনীর মৌলিক বিস্তার সম্ভব নয়। তাই 'মালঞ্চ' নভেল হতে পারেনি। কিন্তু নভেল না হলেও কাহিনীর কাঠামো নভেলের আঙ্গিকেই রচিত। এই হোল 'নভেল' আর 'নভেলেটের' মধ্যে পার্থক্য। আমাদের এই ব্যাখ্যা থেকে সহজভাবেই বোঝা যায় যে সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে নভেলের উদ্ভব আগে তার থেকে এসেছে নভেলেট। একটির থেকে আর একটির উৎপত্তি বলে দুয়ের মধ্যে সম্পর্কও ওতপ্রোত। নভেল সৃষ্টির সুদীর্ঘ ট্র্যাডিশন থাকলেই নভেলেট সৃষ্টি হবার পরিবেশ রচিত হয়।

বাংলাদেশে 'উপন্যাসোপম গল্প' বলে যে জিনিসটা সম্প্রতি চলছে তাকে নভেলেট বললে বোধহয় ভুল হবে। কারণ আসলে যে জিনিসটা বড়গল্প তাকেই আমরা নামফের করে বলছি 'উপন্যাসোপম গল্প'। কিন্তু নামেই তো একটা জিনিস পরিবর্তিত হয়ে যায় না! গল্পের বিস্তৃত সংজ্ঞা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যায় যে গল্পে আমরা পাই বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ। গল্পে সাধারণতঃ একটা 'মুডকে' নিয়ে রস সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। চরিত্রের বিভিন্নমুখী রূপকে, তার গড়ে ওঠা এবং পরিণতিকে গল্পে ফুটিয়ে তোলা একেবারে সম্ভব নয়। কারণ সে পরিসর গল্পের আঙ্গিকে পাওয়া সম্ভব নয়। এক কথায় উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণের স্থান গল্পে নেই। অন্ধকারে দেশলাই কাঠি জ্বেলে এক পলকে মুখ দেখে নেওয়ার মত গল্পে আমরা চরিত্রকে এক পলকের পরিচয় পাই। গল্পের ধর্ম যদি বজায় রাখতে হয় তাহলে তাতে কি করে উপন্যাসের ছাপ পড়তে পারে? সে কারণে উপন্যাসোপম গল্প কথাটি আমাদের কাছে খানিকটা বিসদৃশ মনে হয়।

আসলে উপন্যাসোপম গল্পের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত আছে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের একটা গভীর সংকটের দিক। বর্তমানে যে উপন্যাসোপম গল্প রচিত হচ্ছে তার কারণ অনেকটা এই সংকটকে আড়ালি দেওয়া। বাংলাদেশে ছোটগল্প বিস্ময়কর উৎকর্ষতা অর্জন করেছে। বাঙ্গালী প্রতিভা ছোটগল্প সৃষ্টিতে অনবদ্য ও অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আর রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যুগান্তকারী সাহিত্য কর্ম ও বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। ছোটগল্পে প্রভাতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত উচ্চ মান সাম্প্রতিককালেও মোটামুটি বজায় আছে। এখনও বাংলাদেশে যে ছোটগল্প সৃষ্টি হচ্ছে তা নিয়ে খানিকটা অন্তত গর্ব বোধ করা যায় বৈকি। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ছোটগল্পের ফর্মের ক্ষেত্রে আমাদের সৃষ্টিধর্মী মানস যে রকম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তা অন্যত্র তেমন নয়। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এলে আমরা ঠিক উল্টো অবস্থা লক্ষ্য করি। একথা খুবই ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে সর্বপ্রথম প্রকৃত উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সাহিত্য সৃষ্টির ফর্ম হিসাবে উপন্যাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর রচনায় উপস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত উপন্যাসের মান পরবর্তীকালে কোন ঔপন্যাসিক বোধহয় ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। এরপর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস—চোখের বালি, গোরা ইত্যাদি বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু একেবারে সাম্প্রতিককালে এলে বর্তমান উপন্যাসলেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত উপন্যাসের টেকনিকগত সেই উচ্চ মান আর লক্ষ্য করি না। অবশ্য এর মধ্যে আমরা তারাশংকর-বনফুলের উপন্যাসকে বাদ দিচ্ছি কারণ সাহিত্যের ফর্ম হিসাবে উপন্যাসের মৌলিক গুণ তাঁদের সৃষ্টিতে বর্তমান। কিন্তু সাধারণ অর্থে বাংলা উপন্যাসের জগত আজ অত্যন্ত ম্রিয়মান। অভিনব প্রচ্ছদপটে পিচ-বোর্ড বাঁধাই করা আড়াই-শো তিন-শো পৃষ্ঠার উপন্যাস নামধেয় ভূরিভূরি রচনা আজকাল প্রকাশিত হচ্ছে। সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশে উপন্যাসের কোন দৈন্য

নেই। তবে মানুষ পেটে না খেয়ে যদি বাইরের পোশাকের চাকচিক্য বজায় রাখে তাহলে কি বলব তার ভাল অবস্থা? চরিত্রবিশ্লেষণ মৌলিকত্ব, জীবনদর্শনের গভীরতায়, আঙ্গিকগত সৌকর্যে বাংলা উপন্যাসের দুর্বলতা আজ অতিমাত্রায় প্রকট। আড়াই-তিনশো পৃষ্ঠার পরিসরে যে কোন কাহিনী নিয়ে কথার পর কথা গেঁথে দিলেই হোল। কয়েক ঘণ্টা অবসর সময় কাটাবার মত মনোহরণকারী কাহিনী একটা চাই। তাতেই সাধারণ পাঠকের পরিতৃপ্তি। আর বিষয়, আঙ্গিক এবং ভাষার চটকদারী মারপ্যাঁচে তেমন তেমন কাহিনী দিতে পারলে তো আর কথাই নেই। কিন্তু এ করলে তো আর উপন্যাসের প্রকৃত চরিত্র বজায় থাকে না।

অনেকে হয়ত বলবেন যে বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং ভাষায় বাংলা উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের যুগ থেকে বহুদূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। আজকাল বাংলা উপন্যাসের পটভূমি শুধু বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত নয়। আন্দামান, নাগা-পাহাড়, দক্ষিণ ভারতের উপকূল, লন্ডন শহর ইত্যাদি সবই এখন বাংলা নভেলের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য কি সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসকে এক নব-সার্থকতায় মণ্ডিত করেনি? এরপর ভাষার কথা। কাব্যের এলায়িত ও পল্লবিত ভাষা উপন্যাস সৃষ্টির মোটেই উপযোগী নয়। একথা বলা হতে পারে যে বাংলা ভাষা এখন যে ঋজুতা অর্জন করেছে তা কি মহৎস্বাস্থ্য উপন্যাস সৃষ্টিতে সহায়তা করছে না। এখানে প্রশ্ন হোল বিষয়বৈচিত্র্য ও ঋজু ভাষা উপন্যাস রচনার দুটি অঙ্গমাত্র। কেবলমাত্র এ দুটি জিনিস দিয়েই মহৎ উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারে না। আসল কথা হোল ঔপন্যাসিকের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বোধশক্তির গভীরতা এবং চরিত্র ও ঘটনা বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। ঔপন্যাসিকের যদি এই ক্ষমতাগুলি না থাকে তবে শুধু বিষয়ের বৈচিত্র্য আর ভাষা দিয়ে কি হবে? বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বর্তমানে সবচেয়ে বড় অভাব হচ্ছে ঐ বোধশক্তির গভীরতার আর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির। এরই জন্য মহৎ বাংলা উপন্যাস হচ্ছে না। উপন্যাসের নামে আড়াইশো-তিনশো পৃষ্ঠার মধ্যে যে কথার মালা গাঁথা হচ্ছে তা না উপন্যাস না গল্প। শুধু গল্প লিখলে আর্থিক সাফল্য অর্জন করা যায় না। কারণ নিছক গল্পগ্রন্থের চেয়ে তথাকথিত উপন্যাসের ক্রেতা ও পাঠক অনেক বেশি। প্রকৃত উপন্যাসিকের সেই পরিপূর্ণ দক্ষতা নেই অথচ সামনের লক্ষ্য আর্থিক সাফল্য। এ অবস্থায় কি ধরণের উপন্যাস সৃষ্টি হবে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। প্রকৃত উপন্যাস না লিখতে পারলে উপন্যাসোপম গল্প লেখা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। এই হচ্ছে অধুনা উপন্যাসোপম গল্প রচনার মূল কারণ। প্রকৃত উপন্যাস লিখতে অক্ষম তাই উপন্যাসোপম গল্প দিয়ে উপন্যাসের স্বাদ মেটাবার অস্বাভাবিক চেষ্টা।

সম্প্রতি বাংলা পত্র-পত্রিকায় উপন্যাস প্রকাশের একটা নতুন রীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগে ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হোত। কিন্তু এখন রেওয়াজ হয়েছে মাসিক পত্রিকাগুলিতে বিশেষ করে সিনেমা পত্রিকাগুলিতে প্রতি মাসে একটি করে এবং সম্ভব হলে দুটি কি তিনটি উপন্যাস প্রকাশের। তাই লেখকদের এখন পাণ্ডুলিপি তৈরীর তাড়া আগের চেয়ে অনেক বেশী। তাঁদের যদি বাজার রাখতে হয় তবে দ্রুত উপন্যাসের কপি তৈরী করতে হবে। এই অসম্ভব তাড়াহুড়োর মধ্যে মোটামুটি চলনসই একটা বিস্তৃত কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করা যেতে পারে কি? আজকাল শারদীয় সংখ্যায় (সিনেমা পত্রিকার) পাঁচ-ছশো পৃষ্ঠার মধ্যে অন্যান্য যাবতীয় রচনার সঙ্গে তিনখানি করে উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ভাবুন তো এই উপন্যাসগুলো কি জাতের হতে পারে? উপন্যাসের যথার্থ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই সমস্ত রচনায় কি রক্ষিত হওয়া সম্ভব মনে করেন। আমার তো মনে হয় সম্ভব নয়। যে কাহিনী কেবলমাত্র গল্পেরই উপযোগী তাকেই খানিকটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উপন্যাসোপম গল্প বা উপন্যাস বলা হচ্ছে। একটা সংখ্যায় উপন্যাসের পুরোকপি ছাপতে হলে এছাড়া আর উপায়ই বা কি?

পাশ্চাত্যের 'নভেলেট'কে যদি আমরা উপন্যাসোপম গল্পের সমগোত্রীয় মনে করি তবে বিশেষ ভুল করা হবে। কারণ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। নভেল থেকে নভেলেটের সৃষ্টি। পাশ্চাত্যে নভেলের ঋজু কঠিন বনিয়াদ ছিল বলেই নভেলেট রচিত হয়েছে। ছোট গল্পের প্রসিদ্ধি বাংলা দেশে। আমরা শুরু করেছি উলটো দিক থেকে। গল্পকে আমরা উপন্যাসোপম করে তুলতে চাইছি। কিন্তু তা কি সম্ভব? গল্প গল্পই এবং উপন্যাস উপন্যাসই। সার্থক উপন্যাসোপম রচনার অক্ষমতাকে ঢাকার জন্য দুয়ের মাঝামাঝি কিছু সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই। বাংলা দেশে শুধু গল্প হয় উপন্যাস হয় না একথা আমরা বলছি না। বাংলা দেশে উপন্যাস হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু মহৎ ও সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি ও পরিশ্রম স্বীকারের প্রয়োজন তাতে কার্পণ্য করলে বাংলা সাহিত্যই ফাঁকিতে পড়বে। মহাকাব্য ও উপন্যাসকে এক পর্যায়ে ফেলা যায় কি না সেটা অন্য কথা। তবে মহাকাব্য রচনার মত যথার্থ মহৎ উপন্যাস সৃষ্টিতেও অনন্যসাধারণ ক্ষমতার দরকার হয়। উপন্যাসের নামে গল্পকে কৃত্রিমভাবে ফোলানো ফাঁপানোয় বোধ হয় বাংলা সাহিত্য ও তার পাঠকের কারুরই কোন লাভ নেই। প্রকৃত অর্থে যাতে উপন্যাস সৃষ্টির উপযোগী প্রতিভার স্ফুরণ হয় সেদিকেই আগে নজর দেওয়া উচিত। নয় কি?

মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
SADHANA AUSADHALAYA
Dacca (Bengal)
Maha Bhringaraj
Taila
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮
SA-2/60

বিদেশী গল্প

ব্রিয়র্নস্টার্ন ব্রিয়র্নসন

যে লোকটি নিয়ে আমি এই গল্প লিখছি তার অঢেল বিষয় সম্পত্তি। গ্রামের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। লোক-টার নাম থোর্ড ওভারএস। বেশ বলিষ্ঠ তার চেহারা। একদিন গ্রামের পাদ্রীর ঘরে ঢুকে সে বললে, "আমার ছেলে হয়েছে। আপনি তাকে দয়া করে প্রথম দীক্ষা দিন।"

"কি নাম রাখবে ছেলের?"

"ফিন:—আমার বাপের নামে নাম রাখবো ছেলের।"

"কারা কারা ছেলের ধর্ম-বাবা ধর্ম-মা হবে? সে সব কিছু ঠিক করেছো থোর্ড।"

থোর্ড কয়েকটা নাম করলে। পাদ্রী দেখল লোক হিসাবে তারা বেশ সম্ভ্রান্ত। থোর্ডের সঙ্গে সম্পর্কও আছে তাদের।

থোর্ডের দিকে তাকিয়ে পাদ্রী বললে, "আর কিছু বলবে?"

কৃষকটি একটু সংকুচিত হল।

শেষকালে বললে, "আমি চাই......"

"যে কোন দিন হতে পারে।" উত্তর দিল পাদ্রী।

"তাহলে আগামী শনিবারের দিন বেলা বারোটার সময় হোক।"

"এ ছাড়া আর কিছু বলবে?"

"না, আর কিছু না", এই বলে টুপি তুলে থোর্ড যাবার জন্য তৈরী হল।

পাদ্রী বললে, "আরো কিছু আছে।" থোর্ডের কাছে গিয়ে তার দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে গভীর ভাবে তাকিয়ে পাদ্রী বললে, "ঈশ্বর করুন, এই সন্তান তোমার কল্যাণ আনুক।"

ষোলো বছর পরে থোর্ড আবার পাদ্রীর দরজার সামনে দাঁড়াল।

পাদ্রী বললে, "তোমার বয়স হয়েছে বলে বোঝাই যাচ্ছে না।" পাদ্রী থোর্ডের চেহারার ভেতর কোন পরিবর্তন খুঁজে পেল না।

থোর্ড উত্তর দিল, "আমার দুর্ভাবনা নেই, তাই আমি বুড়িয়ে যাইনি।"

এ কথার কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে সে বললে, "এই ভর-সন্ধ্যায় কি মনে করে?"

"ভর-সন্ধ্যায় আসার কারণ আছে। আমার ছেলেকে কাল পূর্ণ দীক্ষা দিতে হবে।"

"ছেলের কল্যাণ হোক।"

"কিন্তু চার্চে কালকে যখন গিয়ে দাঁড়াবে তখন তার কত নম্বর হবে। এ কথা না জেনে আমি কিছুতেই পুরুত-বিদায় দিতে পারবো না বলে দিলাম।"

"তার এক নম্বর হবে।"

"আমি তাই ভেবেছি। যাক দশ ডলার দেবো।"

"আর কিছু বলবে?" পাদ্রী থোর্ডের দিকে স্থির ভাবে তাকাল।

"না, কিছু না।"

থোর্ড চলে এল।

তার আট বছর পরে আবার পাদ্রীর ঘরের সামনে কলরব শোনা গেল। একদল

লোক আসছে। থোর্ড সেই দলের নেতা। সে-ই প্রথমে ঘরে এল।

একবার দেখেই পাদ্রী থোর্ডকে চিনতে পারল।

"দলবল সঙ্গে নিয়ে এসেছ যে। কি ব্যাপার?"

"আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে এসেছি। আমার ছেলে গুডমুন্ডের মেয়ে কারান স্টোরলিডেনকে বিয়ে করতে চায়। এই যে গুডমুন্ড, আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। বিয়ে হচ্ছে এই বলে যদি দয়া করে চার্চ থেকে একটু ঘোষণা করে দেন।"

"এ ত খুব সুখবর হে! অত বড় লোকের মেয়ে!"

পিছনের দিকের চুলগুলো ঠিক করতে করতে থোর্ড বললে, "লোকে ত ওদের বড়লোক বলেই জানে।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে গভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করল পাদ্রী। তারপর কোন কথা না বলে খাতায় নামটা টুকে নিল। দলের লোকজন তারপর খাতায় সই করে দিল। থোর্ড টেবিলের ওপর তিন ডলার রাখল।

পাদ্রী বললে, "এক ডলার আমার প্রাপ্য।"

"তা আমি জানি। কিন্তু ওই আমার একমাত্র ছেলে। আমি তাই আপনার সেবায় কিছু না হয় দিলাম।"

পাদ্রী টাকাগুলো তুলে রাখল।

"এই নিয়ে তিনবার তুমি ছেলের জন্যে আমার কাছে এলে থোর্ড।"

"ওকে নিয়ে আমি জব্দে পড়ে গেলাম।" কথাগুলো বলে থোর্ড পকেট-বইটা ঠিক করে পকেটে রেখে যাওয়ার জন্য তৈরী হল।

দলবল থোর্ডের পিছনে পিছনে হাঁটতে থাকলো।

দিন পনেরো পরে হ্রদে নৌকা করে বাপ আর ছেলে যাচ্ছিল স্টোরলিডেনের বাড়ী বিয়ের কথা পাকা করতে। হ্রদটা তখন শান্ত নিথর।

ছেলেটা বললে, "দাঁড় বাওয়ার জায়গাটা কেমন টলমল করছে। ঠিক বসতে পারছি না।" ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে জায়গাটা ঠিকঠাক করতে লাগলো।

আর উঠতে না উঠতে পা পিছলে জলে পড়ে গেল ছেলেটা। হাত দুটো উঁচু করে একবার চিৎকার করে উঠল সে।

হাল বাড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল বাপ। চিৎকার করে বললে, "হালটা আঁকড়ে ধর।"

কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেল ছেলের।

বাপ চিৎকার করে বললে, "একটু জলের ওপর জেগে থাক রে! এই তুললাম বলে।" বাবা ছেলেটার দিকে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে নিল। ছেলে ততক্ষণে জলের তলার দিকে যাচ্ছে। বাবার দিকে দীর্ঘ দৃষ্টি রেখে টুপ করে ডুবে গেল ছেলেটি।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না থোর্ড। নৌকোটাকে দাঁড় করিয়ে ছেলে যেখানে ডুবে গেছে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। ও ভাবছিল ছেলেটা এখুনি যেন জল থেকে আবার উঠবে। ছেলে উঠল না। জলের ওপর কয়েকটা বুড়বুড়ি কাটছে। তারপর আরও কতকগুলি; তারপর বড় একটা বুড়বুড়ি জলের ওপর উঠে শব্দ করে ফেটে গেল। তারপর হ্রদটা স্থির হয়ে গেল। একটু পরে আয়নার মত ঝকঝকে হয়ে উঠল।

গ্রামের লোকেরা দেখল যে ছেলে যে জায়গায় ডুবে গেছে সেখানে বাবা তিনদিন তিন রাত্রি ধরে কেবল নৌকো বাইছে। তিনদিন রাত্রি বাবা দাঁত দিয়ে একটা দানাও কাটেনি, তিন দিন রাত্রি বাবা চোখের পলক ফেলেনি একটিবারও। শেষে বাবা ছেলের লাশ খুঁজে পেল। টেনে তুললো নৌকোয়। ছেলেকে বুকের ভিতরে নিয়ে বাবা চলে গেল পাহাড়ের ওপর তার খামারে।

সে দিনের পর আরও একটা বছর কেটে গেল। পাদ্রী তার ঘরে বসে আছে। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্রি হয়েছে। হঠাৎ খেয়াল হল পাদ্রীর কে যেন বাইরের দরজায় খিল খোলার চেষ্টা করছে। উঠে নিজেই দরজা খুলে দিল পাদ্রী। লম্বা রোগাটে একটা লোক নমস্কার করে পাদ্রীর সামনে দাঁড়াল। তার চুলগুলো সব পেকে গেছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর পাদ্রী তাকে চিনতে পারলে। এই-ই থোর্ড।

তার সামনে দাঁড়িয়ে পাদ্রী জিজ্ঞাসা করল, "এত রাতে কি মনে করে?"

চেয়ারে বসতে বসতে থোর্ড উত্তর দিল, "রাত্তির হয়ে গেছে? খেয়াল করিনি।"

বসে পড়ল পাদ্রী। থোর্ড কি বলে শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। দুজনের কেউ-ই কোন কথা বললে না। চুপচাপ থাকল বহুক্ষণ। শেষে থোর্ড বললে;

"গ্রামের গরীবদের দেবার জন্য আমি কিছু টাকাকড়ি এনেছি। আমার ইচ্ছা আমার ছেলের নামে এই টাকার সদ্ব্যবহার হোক।"

থোর্ড উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর টাকা রেখে আবার বসে পড়ল চেয়ারে। পাদ্রী টাকা গুণতে লাগলো।

"এ যে অনেক টাকা, পাদ্রী বললে।

"আজকেই আমি আমার জমিজমা বিক্রি করেছি। যা দাম পেয়েছি তার অর্ধেকটা এনেছি।"

চুপ করে বসে থাকল পাদ্রী। শেষে খুব ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন করে ব্যয় করলে তুমি খুশী হও থোর্ড।"

"সে আর আমি কি বলব। আপনি যা ভাল বোঝেন তাই হবে।"

তারপর ওরা দুজন বহুক্ষণ বসে থাকল; থোর্ড চোখ নামিয়ে আর পাদ্রী থাকল থোর্ডের দিকে চেয়ে। ধীরে ধীরে পাদ্রী বললে, "তোমার ছেলেই তোমার মুক্তি আনল থোর্ড।"

"আমারও তাই মনে হয়", উত্তর দিল থোর্ড। দু'চোখ দিয়ে তার টপ টপ করে জল ঝরছে।

অনুবাদক : রাম বসু

নরওয়ের সাহিত্যে ইবসেনের মত সম্মানের অধিকারী বিয়র্নসেন। ১৮৩২ সালে এঁর জন্ম হয়। কিছুদিন ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার পর ইনি নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করেন। ১৯০৩ সালে এঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এই গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। ১৯১০ সালে প্যারিসে এঁর মৃত্যু হয়।

—সার্থবাহ—

॥ জার্মান চিন্তালোক ॥

॥ অহমিকা ও বিশ্বভোগ ॥

'ভেল্ট' ('বিশ্ব' 'জীবন') শব্দটি জার্মান ভাষায় যতগুলি সমস্ত পদের সৃষ্টি করেছে তাদের সংখ্যা ও চরিত্র লক্ষ্য করলে অবাক হ'তে হয় এই ভেবে যে জার্মান চিন্তা-প্রকৃতি কতো হরেক উপলক্ষ্যে স্বদেশের সীমানা পার হয়ে বিশ্ব-বাসে সম্মত হয়েছে! 'বিশ্বজনীন' বা 'বিশ্বপ্রেম' এর মতো কয়েকটিই যেখানে বিস্তৃতির এমতো দৌড়ে বাঙ্গালা ভাষাকে প্রায় সর্বস্বান্ত করে, (ইংরেজী ও অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষাতেও অনুরূপ অশক্তি) সেখানে জার্মান অভিধানে ইতিমধ্যে-প্রবিষ্ট 'বিশ্ব'-আকৃষ্ট শব্দের সংখ্যা কয়েক কুড়ি। আধুনিক ইংরেজী সমালোচনায় আকছার ব্যবহৃত জার্মান 'ভেল্তআনশায়ুঙ' (ইংরেজীতে শব্দটির প্রচলন সম্ভবতঃ টি, ই, হিউমের প্রাথমিক উদ্যমের কাছে ঋণী), 'বিশ্ব-বীক্ষা'-রূপে যার চলনসই বাঙ্গালা প্রতিশব্দের সঙ্গে আমরা এখন পরিচিত, বা 'ভেল্তগেশিখতে' (বিশ্ব-ইতিহাস), কিম্বা 'ভেল্তশ্মেরৎস' (বিশ্ব-বিষাদ) থেকে জার্মান ভাষায় 'বিশ্ব-চিত্ত' (ভেল্তসেলে), 'বিশ্ব-লয়' (ভেল্ত-উন্তেরগাঙ) এমনকি 'বিশ্ব-ভীতি' (অসভালত্ স্পেঙলরের প্রয়োগে) পর্যন্ত সহজলভ্য শব্দ সত্য। 'বিশ্ব-পত্রিকা' (ভেল্তব্লাত)-র কথা জার্মান সম্পাদনায়ই সম্ভাব্য! আর 'বিশ্ব-শক্তি'র নামোচ্চারণ কেবল হিতলরীয় প্রগলভতারই স্মারক!

বিশ্ব-শক্তি—ভেল্তমাখত! রাইখস্তাগে মন্ত্রাবিষ্ট শ্রোতৃবর্গের সামনে মাইক্রো-ফোন-লাগোয়া, তাঁর, দুর্বিনীত একটি মুখ, আদলফ হিতলরের মুখ, ভেসে ওঠে। মুখ নয় মুখ-ব্যাদান। বক্তা মানুষ নয়, অবতার; শ্রোতারা সাধারণ সামাজিক জীব নয় এক দঙ্গল সাচ্চা আর্য, কুলীন নর্ডিক জাতির সন্তান। নির্মম ভাষণে এক অজর পরন্তপের সকল রোমহর্ষের রূপরেখা ফুটে উঠছে : খোদ নর্ডিক জাতির সন্তান, মৌলিক জার্মানগণ! আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি পৃথিবীর সবটুকু তোমরা তোমাদের ভোগার্থে পাবে—তোমাদের আশীর্পূত জিজীবিষার পুরস্কার এই নব জার্মান অভ্যুত্থান, যা কোনও একটি ভুখণ্ডের আধিপত্য নয়, আহরণ করবে সারা বিশ্ব দখলের ও ভোগের নিয়তি-সমর্থিত মহাশক্তি। বিশ্ব-শক্তি!
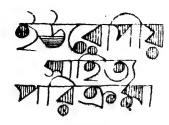
সারা বিশ্বে একাধিপত্যের এই মন্ত্র ও তা'র সাধনে একটি সমগ্র জার্মান শরীরের যে-পাতন, তা'র জন্য কেবল একজন দুর্মেধা নায়কের ব্যক্তিগত অনাচারই দায়ী ছিল না। আর এই অনাচারের মূলসূত্রে উদ্দিষ্ট হিসাবে যা ছিল, তাতেও আভাসিত চিন্তাপ্রণালীর কোনও জাতীয় বৈশিষ্ট্য। নিছক সাম্রাজ্য-বিস্তারের প্রায়-ন্যায্য উৎকণ্ঠার সঙ্গে গুণিতক হিসাবে কোনও ভৌগলিক স্বস্তিবোধের উপস্থিতি এই হিতলরীয় বিশ্বশক্তির মূর্তি গড়েনি। হিতলরের যে-অভিলাষ বাস-করা পৃথিবীর সমগ্রে জার্মান শাসন (টয়নবীর সংজ্ঞায় 'পাক্স-ঐকুমেনিকা') পরিকল্পিত করেছিল, তার পশ্চাতে ছিল জার্মান চিন্তা-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সেই সর্বস্বাত্মক ক্ষেপ যাতে ভাবনার প্রসর ও তীক্ষ্ণতা সৃষ্ট জীবনের আদ্যন্ত কবলিত করত, প্রদেশ-মহাদেশ টপকে বিশ্বকে তা'র লালস আয়োজনের মধ্যে আটক করত। জার্মান চিন্তার এই প্রকৃতি নানাভাবে অনুভূত হয় আধুনিক জার্মানীর মনোরাজ্যের বেশ ক'জন প্রতিনিধির রচনায়।

অবশ্য হিতলরীয় রাজ্যাদর্শ, যা'র পরিচিত নাম নাৎসীবাদ, এই চিন্তা-নায়কদের রচনা থেকে সরাসরি উদ্ভূত, এমতো ধারণা জন্মান কিম্বা এঁদের কারুকে নাৎসীবাদের সমর্থক প্রতিপন্ন করা, বর্তমান প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য নয়। কারণ, সাহিত্য, দর্শন বা ইতিহাস রাষ্ট্র-চিন্তাকে যে-ভাবে প্রভাবিত করে তাকে প্রত্যক্ষ বললে রাজনীতির ভোগসত্ত্বেই প্রথমতঃ অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, জার্মান চিন্তালোকের আলোচ্য প্রতিভূদের কাউকে সন্দেহাতীত নাৎসীরূপে আমরা এখনো জানিনি। দার্শনিক মার্তিন হাইদেগরের মতো কাউকে নাৎসী-বাৎলানোর স্বপক্ষে ব্যবহারিক যুক্তি স্বল্পই থাকে যখন তাঁর দর্শনে অস্তিত্ব ও সত্ত্বের দুরূহ মীমাংসায় তিনি এমনই জবরদস্তভাবে মগ্ন যে উপলব্ধির একটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া, প্রচার কিম্বা ভোগের চত্বরে নামমাত্র বিপথগমনের তোড়জোড়ও তাঁর পক্ষে অসম্ভব থেকেছে আগাগোড়া। কিম্বা, কবি স্তেফান গেয়র্গে, যাঁর চিন্ময় কল্পলোক হয়ত সত্যই রাজনীতির ছায়াপাতে কথঞ্চিত বিবর্ণ যেহেতু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তরুণ জার্মান কবি, হফ-মানস্তাল কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েও যুদ্ধ-বিরোধী ঘোষণায় স্বাক্ষর দিতে গর-রাজী হয়েছিলেন,—বলেই নাৎসী প্রমা-ণিত হ'ন না।

যে জার্মান চিন্তালোকে নাৎসী-বাদকে আমরা নেহাত আকস্মিক ও নিরাশ্রিত ব'লে ভাবতে অপারগ, এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে হিতলরীয় জার্মানীর সময় পর্যন্ত অর্ধ-শতাব্দীকালে যার ঐতিহাসিক পরিসর বিন্যস্ত, তার একটি প্রধান চরিত্র যদি হয় সর্বস্বাত্মকতা, তবে, এও স্বীকার করতে হয় যে তার স্বভাব গঠিত হয়ে-ছিল চিত্তময়তার উপাদানে। অন্তর্মুখী বোধ, মনস্তত্ত্বের খনিতে মানসিকতার চাইতে গভীর এক চিত্ত-জ্ঞান যা'র উৎস, এবং সেই বোধের এক আশ্চর্য সাহসিক উৎক্রান্তি, জার্মান চিন্তাকে যেন এক নতুন ডাইমেনসন এনে দিয়েছিল। হয়ত এই অন্তর্মুখিতার আদত সঞ্চার লক্ষ্য করতেই হয় অষ্টাদশশতকী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ত্-এ এবং তারই দুর্মর স্রোতের বিবিধ চলাফেরা পরখ করা সম্ভব পরবর্তী শতাব্দীতে শোপেন-হাউয়রের সদুয় নৈরাশ্যবাদে, বিলাসী ভাগনরের সংগীতে পলিফনির নান্দনিক জটিলতায় ও স্বাদেশিকতার স্বাদে, ঐতিহাসিক বুর্কহার্তের আত্মান্বেষী ইতিহাস-প্রজ্ঞায়, হাইনের যন্ত্রণাবোধে ও উৎপ্রাসে। এইভাবে জার্মান চিন্তার সংগঠনে ক্রমশঃ যে-একটি প্রকরণের ভাগ অব্যর্থভাবে বেশী হয়ে উঠেছিল তার নাম এক-কথায় প্রকাশ্য শুধু জার্মান 'গাইস্ত' শব্দটির দ্বারাই, এবং বোধহয় ফরাসী 'এস্প্রি'-তে ছাড়া এই 'গাইস্ত' অন্য কোনও আধুনিক ভাষার আয়ত্তাধীন শব্দে সম্পূর্ণ উপভুক্ত নয়। (বাঙ্গালার 'চিত্তময়তা', বলা বাহুল্য, ঐ 'গাইস্তে'র এক দুর্বল অনুবাদ মাত্র।)

যে-অর্থে আধুনিক জার্মান চিন্তা-নায়কদের চারিত্র্য তাঁদের চিত্তময় বা 'গাইস্তিক' সপ্রমাণ করে সে অর্থে আধুনিক ইংরাজ বা এমনকি, ফরাসী চিন্তাশীলতা বহুলাংশে বুদ্ধিজীবী।

আর • চিন্তার আঙ্গিক হিসাবে এই জার্মান চিত্তময়তা পশ্চিম য়ুরোপে এ যুগে খুব মানানসইও ঠেকেনি অনেকের কাছে। প্রসঙ্গতঃ, দার্শনিক অয়কেন-বিষয়ে টি. এস. এলিয়টের এই উন্নাসিক কথিকাটি ঃ 'ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেনি এমন কেউ কল্পনা করতে পারত না অধ্যাপক অয়কেনের স্বরে সেই নিশ্চিত যখন তিনি টেবিল থাপড়াতেন আর চেঁচাতেন ঃ ভাস্ ইস্ত্ গাইস্ত? গাইস্ত ইস্ত...।' এই রুদলফ খ্রিস্তফ অয়কেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত, হেগেলপন্থী দার্শনিক, যিনি প্রকৃতি ও বুদ্ধি এ দু'য়ের কোনও একটিতে আস্থা না-রেখে দু'য়ের মিলন-বিন্দুরূপে মানুষকে দেখেছিলেন, অবশ্যই সঙ্গত উৎকণ্ঠা ভোগ করতেন তাঁর 'গাইস্ত' নিয়ে। কারণ য়েনা বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে অয়কেন ছিলেন সেই বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে, যার ঐতিহ্যে বাখোফেন ও বুর্কহার্তের নামের সঙ্গে স্মর্তব্য অধ্যাপক ফ্রীদরিখ নীতশের নামও। আর, চিত্তময়তার প্রাবল্য এ যুগে নীতশের মতো আর কেউ সহ্য করেননি।

নীতশের নঙর্থক চিন্তার প্রভাব অয়কেনের গঠনমূলক ও মানবিক বিশ্ববীক্ষাকে অবশ্যই মন্দভাগ্য নেতিবাদ শেখাতে পারেনি। হেগেলীয় প্রণোদনার বাহুল্য সত্ত্বেও অয়কেন গের্মনীয় চিন্তার সেই অপর স্বভাবও প্রতিফলিত করেন যার উপাদান পরিমিতিবোধ, সমন্বয় ও সৃষ্টিশীলতা এবং যা'র আস্বাদ আমরা অনেক বিংশশতকী জার্মান লেখকের—নামতঃ, এরিখ হেলর, কার্ল মানহাইম, এর্নস্ত রোবের্ত কুর্তিয়ুস ও এর্নস্ত কাসিররের রচনায় পাই। কিন্তু চিত্তময় নীতশে তাঁর মানসিকতায় নিরঙ্কুশ এক অশান্তি আদৃত ক'রে সমাধানের কাঠগড়ায় বিশৃঙ্খলভাবে হাজির করেছিলেন ঐতিহ্যাশ্রিত সত্য ও মূল্যাদের, যদিও বিচারকের নৈতিক ও মানবিক স্বধর্ম পর্যন্ত তাঁর মধ্যে আর টিকে ছিল না। কতকগুলি অশান্ত অনুভবের আকাশে নিরালম্ব নীতশে, কবি ও দার্শনিক, সৃষ্ট, সভ্য জীবনের হিতাহিতে, ন্যায়ান্যায়ে, পতন-অভ্যুদয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে অস্তিত্বের অন্বয়ে ব্যক্তির,—প্রাঞ্জলতম ব্যক্তির, 'অহম্'-এর স্বরূপ আঁকতে এমন কয়েকটি অপরিচিত, ঘোর রঙ ব্যবহার করলেন, যা' অন্ততঃ সাধারণ চোখে ধাঁধা লাগাল জোরালভাবে; পরিচিত সুখাসুখের বিশ্বকে লোপাট করল অনাত্তর, জাঁকাল লাল-কালোর ঘূর্ণির মধ্যে। জীবনবোধের সর্বস্ব আক্রান্ত হ'ল নীতশীয় দর্শনের দুষ্ক্রিয়ায়। একাধারে নিরীশ্বর ও অযান্ত্রিক, নীতশে এক প্রলাপী চৈতন্যের নির্দেশে যে-উদ্ভট, টিউটনিক সোহংবাদ উত্থিত করলেন, তা'তে উদ্ভাবনের চমক যেমন নিঃসন্দেহে থাকল, তেমনি থাকল না সমন্বয়ের শান্তি।

কোটি কোটি মানুষের এই বসুন্ধরা ছেড়ে চিত্তময়তার অভ্যস্ত তপস্যা করতে তাই নীতশের স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি-আদর্শ, ৎসরাতুস্ত্রা, স্বার্থের কোনও ভয়ানক নৈমিষারণ্যে ঘুরে বেড়ায়। সেখানে আলাপ নেই। যূথচারিতায় নিস্পৃহ, গার্হস্থ্যে বীতরাগী, প্রেম-নিবেদন-গ্রহণে অসমর্থ তথা নিরুৎসাহী, এক অতিআত্মসচেতন শ্রমণ যেন গোপন ঈর্ষার অজুহাতে বক্তৃতায়, স্বগতোক্তিতে আর রূপক-বিলাসে জগৎ-সংসারের সব কিছু নস্যাৎ ক'রে আপন বুদ্ধি ও হার্দ্যকে বার বার অভিনন্দিত করে। আলাপ নেই, কারণ এ এক অপর বিশ্ব। এখানে সবজান্তা বক্তা সকল মানুষিক শ্রোতাকে বিদায় দিয়েছে।—

"আর ৎসরাতুস্ত্রা এইমতো বললেন লোকদের ঃ

'আমি তোমাদের উপর-মানুষ * সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছি। মানুষ হচ্ছে এমন কিছু যা উত্তীর্ণ হওয়া উচিত। কী করেছ তোমরা তা' উত্তীর্ণ হবার জন্য?

এতাবৎ সকল সত্তা সৃষ্টি করেছে এমন কিছু যা তাদের চাইতে বেশী, আর তোমরা চেয়েছ এই মহাতরঙ্গের ভাঁটা হ'তে এবং মানুষকে উত্তীর্ণ হবার চাইতে শ্রেয় মনে করেছো পশুতে প্রত্যাবর্তন।

মানুষের কাছে বাঁদর কী? একটি উপহসনীয় বস্তু, কিম্বা, এক সকরুণ লজ্জা। এই রকমটা হচ্ছে, মানুষ উপর-মানুষের চোখে ঃ একটি উপহসনীয় বস্তু, কিম্বা, এক সকরুণ লজ্জা।.........উপর-মানুষ হ'ল ধরণীর চৈতন্য। তোমাদের এষণা বলে ঃ হোক উপর-মানুষ ধরণীর চৈতন্য।" * *

সাধারণ মানুষ মর্কটের মতোই তুচ্ছ! শুধু তুচ্ছ নয়, (এবং এখানেই নীতশের অমানবিক বিদ্রূপ-প্রবণতা সক্রিয়) উপহাস্যও। 'উপর-মানুষে'র প্রস্তাবক নীতশে, যিনি আত্মপরিচয়ের উদার এক সংজ্ঞায় 'সত্যের নওজোয়ান' ('আইন য়ুঙেরদের ভাহরহাইত') ব'লে নিজেকে জাহির করেন, এইভাবে বিদ্বেষময় নৈরাজ্যে অধিষ্ঠানের ব্যবস্থা পাকা করেছিলেন। সংশয়ধর্মে প্রাথমিকভাবে দীক্ষিত নীতশে ভেবেছিলেন যে তথা-কথিত সকল সত্য ও বিশ্বাস পুনর্বিচারে স্বাধীনতাই তাঁর শক্তি প্রতীত এবং তদনুগ সার্বিক ঝোঁক নিয়েই জীবন-দর্শনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু এই সুবৃত্ত পুরুষটির ব্যক্তি-চরিত্রে কোনও বিশেষ গলদ—সেক্সপীয়র-কথিত সেই 'ওয়ন ডিফেক্ট',—তাঁকে শুরু থেকেই শিখিয়েছিল বাহিরকে অবিশ্বাস করতে। বাহির অর্থে জীবন; নারী, পুরুষ ও কর্মের জীবন, সকলের এবং সে-সঙ্গে নীতশেরও জীবন। সেই জীবনের প্রতি অবিশ্বাস ও তৎপ্রসূত অসূয়া নীতশেকে ক্রমশঃ ঠেলে দিয়েছিল এক মারাত্মক উন্মার্গে, সেখানে 'উপর-মানুষের' তামস যজ্ঞে আহুতি হ'তে হ'ল জীবৎ মনুষ্য-কুলের ধর্ম ও অস্তিত্বের সমগ্রকে। বাস্তব থেকে সরে, একক চিন্তাকারীর শূন্য গম্বুজ থেকে নীতশে দেখলেন নীচের অমহান্, উপহাস্য সাধারণকে এবং বিকৃত রূপকের সঙ্গে নিরুদ্দেশ চিত্ত-ময়তার যোগসাজশে গঠন করলেন নানান অসম্পূর্ণ জীবন-চিত্র। ৎসরাতুস্ত্রা যে-তিনটি রূপান্তরে মনুষ্যজীবন বৃত্তাবদ্ধ দেখেন তাতে তাই বুদ্ধি নিরর্থক ঃ ঊষর মরুভূমিতে চাপিয়ে-দেওয়া ভার বইতে সম্মত উট যেন মানুষিক চিত্তের প্রথম পর্যায়; তারপর, মরুভূমির নির্জনতম অঞ্চলে ঘটে তা'র দ্বিতীয় রূপান্তর—'কর্তব্যের' ড্রাগনের সঙ্গে লড়তে গিয়ে উৎপত্তি হয় 'ইচ্ছারূপী

---

* জার্মান Ubermensch ঃ প্রচলিত ইংরেজী ও বাঙলা প্রতিশব্দ যথাক্রমে 'Superman' ও 'অতিমানুষ'। কিন্তু নীতশীয় 'উ্যবেরমেনশ'-এর অনুবাদে 'সুপারম্যান' বা 'অতিমানুষ' বোধহয় অযথার্থ। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, ভালটার কাউফ্‌মান 'Overman' শব্দটি ব্যবহার করেন। জার্মান 'য়্যুবের', গ্রীক 'উপের' ও বাঙলা (সংস্কৃত) 'উপরি' একই অব্যক্ত এই অভিধায় 'উপর-মানুষকে' নিকটতর মনে করা হয়েছে।

** Also Sprach Zarathustra: Friedrich Nietzche Wilhelm Goldmann Verlag. Ungekurzte Ausgabe. 1957. পৃ—১১।

সিংহের। চিরাচরিতের প্রতিরোধ ও বিরুদ্ধতা, ও নূতনের অভিলাষ নিয়ে প্রলয়ংকর এই সিংহ 'নেতি-নেতি' ব'লে হুংকার দিলেও, তা'র পরিণতি তৃতীয় রূপান্তর 'শিশু'তে। কারণ "শিশু, পবিত্রতা ও বিস্মরণ"—নীতশের এই 'শিশু' আশ্চর্যভাবে ওঅর্ডসথীয়—'হাঁ'-বলতে জানে, সে 'ইতি-জ্ঞানী' (য়া-জ্যাগেনস)। ('ৎসরাতুস্ত্রা', পৃঃ ২১-২২)

"সৃষ্টির এই লীলাখেলায়", নীতশে বোঝেন বটে যে "প্রয়োজন আছে একটি পবিত্র 'হাঁ'-বলতে পারার"; কিন্তু সেই সম্মতির জন্য নীতশেকে ভাবতে হয় অপরিণত 'শিশু'র কথা। যেন পরিণত-চিত্ত প্রমাণ মানুষ কেবল 'না'-ই বলতে জানে! অবশ্য এই 'না'-বলার পর্যায়ে অভিসন্ধিই আমৃত্যু নীতশেকে চিন্তায় সজীব রেখেছিল। বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক নীতশের বুর্কহার্তীয় চিরন্তনতার কাব্য ও মানবিকতায় অন্বয়িত বোধ-করার চপল উদ্দাম সেই নঙর্থক শুরু নিঃশঙ্ক বুদ্ধিতে এক করাল অন্তিমে পৌঁছেছিল। বীর্য, শুদ্ধতা, শান্তি ও সুন্দরের দ্যোতনা যে-আপল্লোনীয় বিশ্ব-চিত্র, তা'র প্রতিপক্ষরূপে নীতশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সুরাসক্ত কাপুরুষ, বিলোল, দিওনাসসের অরাজক প্যানেৎসবকে। তাঁর 'উপর-মানুষ' ত্যাগ ও যন্ত্রণাভোগের প্রতীক, যিশুখৃষ্টকে সহ্য করেনি; নীতশে খাড়া করেছিলেন তাঁর প্রতিযোগী খৃষ্ট-বিরোধী পুরুষ, 'দের আন্তিখৃস্ত'কে। আর, সমগ্র মানুষিক অস্তিত্বের একমাত্র ধ্রুব প্রার্থিত বলে নীতশেকে ধার্য করতে হয়েছিল সেই দুঃশীল পরাক্রম-বাসনা—'দের ভিলে ৎস্যুর মাখ্‌ত'কে।

এই পরাক্রম-বাসনা মুসোলিনির ফ্যাশিবাদে সকর্মক হওয়ার দৃষ্টান্ত কেবল ত্বরান্বিত করেছিল হিণ্ডেনবুর্কী জার্মানীর অবসান ও 'তৃতীয় রাইখে'র সৃষ্টি। জনগণের প্রতিনিধিত্বে নয়, তাদের সমবায় বাসনার একচ্ছত্র নিয়ন্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজ্যচালক, 'রাইখসফ্যুহরর' হিতলর, একজন নিঃসংশয় 'উপর-মানুষ'। এই পরাক্রম-বাসনার ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল নাৎসী দার্শনিক আলফ্রেদ রোসেনবর্কের '২০শ শতাব্দীর রূপকথা (মিথুস)', যা'তে এক গগনচুম্বী বিকার নিয়ে গ্রন্থকার 'জ্ঞান'কে বেপাত্তা করে বলেছিলেন 'ঘোষিত সত্যাই (বেরেক্লেন্তনিস) সব; আর ইতিহাসের সামগ্রিক পুনর্লিখন দাবী করেছিলেন সেই মহাপ্রমাদের আরজি পেশ ক'রে—যে আর্য ও আর্যেতর জাতিদের দ্বন্দ্বই মানবেতিহাসের একমাত্র সত্ত্ব। সংগ্রাম ও ইতিহাসের এই ভাষ্যে, উপর-মানুষ—জাতির চালক, নর্ডিকদের পরমপুরুষ, নব-বিধাতা, বীর হিতলরে জার্মান জীবনের সমস্ত ভার, রাজনৈতিক ও সে-সঙ্গে আত্মিকও, অর্পিত হয়েছিল।

জার্মান ভূমিতে উপর-মানুষের নির্মম মহত্ত্বে পরিবৃত ছিলেন বীর; আর, বীরপূজার সঠিক মন্ত্র ও পুরোহিত সে-দেশে কখনই বিরল ছিল না। রিখার্ট ভাগনরের সংগীত-ধর্মের জাতীয়তাবাদ তাঁর অপেরাগুলিতে জিগফ্রিদ, ত্রিস্তান, পারসিফাল-এর মতো বীরদের জন্ম দিয়েছিল। 'বীর' ছিল কবি স্তেফান গেয়র্গের অশান্ত আধ্যাত্মে বৈদ্যুৎ অক্ষরে লিখিত এক শান্তির বিজ্ঞাপন। প্রায় জ্যোতির্গণনার স্বচ্ছতায় 'আকস্মিক অভ্যুত্থান' ও 'জয়ের তোরণাভিমুখে যাত্রা'র সামরিক স্বপ্ন গেয়র্গেতে অনায়াসলব্ধ ছিল। যে-'চিন্ময় রাষ্ট্র' (দাস গাইসতিগে রাইখ)-এর প্রস্তাবনা গেয়র্গে করেছিলেন, তা' কোনও এক বাঙালী কবির আকাঙ্ক্ষিত 'নির্বিকার স্বপ্নের নিভৃতে' পাতা 'যৌবরাজ্য' থেকে অনেক ভিন্নরূপ ছিল, তা'র জন্য গেয়র্গে সচেতনভাবে বীরদের—এবং মৌলিক জার্মান ঢঙে 'বিশ্ব'-বিশেষিত সেই নৃসিংহদের—নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপালনে! গেয়র্গের সেই 'বিশ্ব-প্রভুদের' (হেরন দের ভেল্ত) একজনই ছিলেন কি-না আদল্‌ফ হিতলর এ প্রশ্নও নেহাত অবান্তর নয়।

জার্মান চিন্তায় সর্বস্বাত্মকতার দৌরাত্ম্য নেতি-ইতির উভয়েই দারুণ হয়ে ওঠে। শোপেনহাওয়ার-আদিষ্ট 'এষণা ও ধারণার' বিশ্ব যদি বা ঝাপসা নীতশেতে তার পরিণাহ 'পরাক্রম-বাসনায়' স্পষ্টতর। ভাগনরের বীরগণ, কিম্বা, গেয়র্গের আধ্যাত্মিক-অধিরাজরা মানুষিক অস্তিত্বের এক সার্বিক সংজ্ঞার চক্রান্ত মেনে নেয়, যেমন নেয় রোসেনবর্কের বিংশশতকী 'মিথুস'-এর প্রাণঘাতী রূপকথা। উপর-মানুষ, বীর, বলৈষণা, ঘোষিতসত্য ইত্যাদি মূল্যের যদি কোনও নৈরাজ্যের উদ্ভাবৃত 'ধারণা'ই হয়ে থাকে, তবে হিতলরের 'ঝটিকা-বাহিনী', আউশভিৎস ও বুখেনভাল্দের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি, 'বিশ্ব-শান্তি' ও 'নর্ডিক জাতি' নিশ্চয়ই তাদের ইতিপ্রধান অনুবাদ। আর এমন কোনও তাজ্জব সোনায় গঠিত হয়েছিল সেই 'ইতি' যা'তে ন্যায়ান্যায়ের প্রশ্ন সামান্য কালিমাও মাখাত না। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নরক তার প্রবেশ-দ্বারে খোদাই ক'রে রেখেছিল: 'ন্যায় অথবা অন্যায়। আমার পিতৃভূমি!' *

দর্শন ও বিশ্ববীক্ষার মধ্যে টি. ই. হিউম-নির্দেশিত তফাতটির কথা মনে রেখে, আধুনিক জার্মান চিন্তানায়কদের প্রায় সকলেই অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ সেই 'বিশ্ববীক্ষা'রই রচয়িতা, যা'তে জ্ঞানের সঙ্গে ব্যক্তিত্বও অভিব্যক্ত। দর্শন-রচনার চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ও মারাত্মক এক বিশ্ববীক্ষা-প্রণয়নে ক্রিয়াশীল তাঁদের চিত্তের সার্বিক ক্ষুৎপিপাসা। সিস্টেমের ঋজুতায় অসহিষ্ণু না হয়ে উপায় থাকে না এ-ধরণের সর্বস্বাত্মক

* Buchenwald. Docteur George Roos. Editions Medicis, Paris. 1945.

বিশ্ববীক্ষা-প্রণেতাদের। যেন কোনও অপ্রত্যাশিত ও প্রলয়ংকর সংবাদের পরিবেশক হয়েই এ'রা বোধের জগতকে নাড়া দিতে চা'ন। মনে পড়ে জিগমুন্ত ফ্রয়দের একটি গ্রন্থে ব্যবহৃত সেই লাতিন শীর্ষ-ফলকের খবরদারি ঃ 'যদি দেবতাদের ওপর প্রভাব খাটাতে অশক্ত হই, তবে জাগাব পাতাল।' প্রসঙ্গতঃ ফ্রয়দের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তায়ও কি বিশ্ববীক্ষার চমক, প্রচণ্ডতা ও ব্যাপ্তি বিবৃত নয়? ফ্রয়দীয় চিন্তার কোনও রাজনৈতিক যোগসূত্র আবিষ্কার করা যদি বা পণ্ডশ্রম, তবু এটুকু মানতেই হয় যে প্রাণশক্তির উৎসরূপে অবচেতন 'ইদ'-এর প্রাথমিক স্বৈরাচারকে স্বীকার ক'রে ফ্রয়দ তথাকথিত মনুষ্যত্বের পবিত্র দাঢ্যকে বেকসুর নস্যাৎ করেছিলেন। মানুষের স্বভাবে মৌলিক ও অনার্য উপাদান হিসাবে নির্বিরোধ ষড় রিপুদেরই উপস্থিত দেখে ফ্রয়দ সৃষ্টিকার্যে ঐশ্বরিক সহৃদয়তাকেও প্রশ্নাধীন, ক্ষেমংকরী প্রকৃতির আচরণকেও অবিশ্বস্ত বাৎলেছিলেন। 'মারমুখী ও আক্রমণশীল' মানুষ তা'র স্বাভাবিক প্রচণ্ডতায় হেয় কি প্রেয়, সে-মীমাংসার সদিচ্ছা ফ্রয়দে কতোখানি ছিল বা না-ছিল এ প্রশ্ন উপেক্ষণীয়, কারণ ঐ দুরাচারী অবচেতনের সত্তোদ্ঘাটনের কর্তব্যেই ফ্রয়দীয় শাস্ত্রের মৌল প্রতিজ্ঞা নির্ণীত।

ফ্রয়দীয় মনোবিদ্যার 'ইদ্'-ভাবনা জার্মান চিন্তার সর্বস্বার্থক শক্তি অবশ্যই বহন করে। বসন, আভরণ, রং ও মাটির পরিণত ইন্দ্রজাল ছিঁড়ে কাঠামোর তুচ্ছ তবু বিপজ্জনক খড়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে প্রতিমা-দর্শনকারীর যে-অপকার করা হয়, ফ্রয়দ কতকটা সেই রকম করেছিলেন বিশশতকী জীবন-বোধের ক্ষেত্রে। অন্তরালে খড়ের শ্রীহীনতা, দহন, দাহন, ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত যেমন দর্শককে কেবল নান্দনিক অর্থেই বঞ্চিত করে না, নন্দনের পর্বেই তাকে সন্দিগ্ধ বানিয়ে বাড়তি এক বিবমিষায় ভোগায় পূজো-পার্বনের অঙ্গনে অঙ্গনে, তেমনি জীবনোপভোগের মহাক্ষেত্রে ফ্রয়দীয় 'ইদ্'-এর প্রজ্ঞা অবশ্যই কিছু পরিমাণে অনিষ্টকারীও। কিন্তু ফ্রয়দীয় বিশ্ববীক্ষার পরোক্ষ লাভ-লোকসানের তত্ত্ব খতিয়ে-দেখার যাথার্থ্য স্পষ্টই মনে হয় যখন এ-যুগের আরেক জার্মান মনীষী, অসওয়াল্ড স্পেঙলরের মৌলিক বিশ্বসমীক্ষার উপসংহার প্রচলিত, ঐতিহাসিক জীবনোপভোগের স্রোতকে আটক ক'রে তা'র কালান্তক উপপাদ্যগুলি শোনায় তীব্রতর, যদ্যপি ভিন্নমুখী, এক প্রত্যয় নিয়ে।

গের্মানীয় চিন্তনের সর্বস্বাত্মক প্রকৃতি স্পেঙলর-বিবৃত য়ুরোপীয় অবক্ষয়ের বৃত্তান্তে ঐতিহাসিকতার বর্ণে নগ্ন ও জোরাল। যদিও স্পেঙলর তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রতীচীর অধঃপতন' ('দের উন্টের-গাঙ দেস আবেন্দলান্দেস' ঃ ইঃ 'দ্য ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট')-এ তাঁর ঐতিহাসিক দৌড়ের সীমা-রক্ষায় গোড়া থেকেই সজাগ (য়ুরোপ মহাদেশ পেরিয়ে বিশ্বগ্রাসী হবে না স্পেঙলরের ইতিহাস-চেতনা), তবু স্পেঙলরের অনুসন্ধানে, পর্যালোচনায় ও সিদ্ধান্তে অন্তর্নিহিত এমন এক নিশ্চিতির প্রতিধ্বনি, যা অবধারণের পটভূমি হিসাবে নিয়েছে কোনও মানুষিক সর্বস্ব! বস্তু-সত্তা ('দিঙানসিখ-কাইত') স্পেঙলরকে আকৃষ্ট করে যদি বা, তাঁর ঐতিহাসিকতায় এক গুরুতর ভাববাদী একদেশদর্শিতা তাঁকে ঢালোয়া ধ্বংস ও রক্ষার ইতিতে উল্লসিত করে। অসাধারণ পাণ্ডিত্যে চমকপ্রদভাবে প্রাঞ্জল, স্পেঙলর গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকদের কূপমণ্ডূকতা ও সে-সঙ্গে ক্লাসিকল কৃষ্টির ফাঁকি, কিম্বা আধুনিক গণিতশাস্ত্রের কক্ষচ্যুত জটিলতা উপলব্ধি করেন। কিন্তু দুর্মিত ও আপাতসম্পন্ন এক বস্তুবাদের দিশায় তিনি ইতিহাস অর্থেই পড়েন 'সংগ্রাম'। স্পেঙলরের ভাষ্যে চলন্ত ইতিহাস কেবলমাত্র যুযুধানই, আর তা'র সেই সত্ত্বের বিনাশ, যা কোনও অপাপবিদ্ধ সত্তার 'অস্তিত্বের' জন্ম সম্ভব করে, ইতিহাসকেও নিঃশেষ ক'রে দেয়। গঠিত রাষ্ট্রের শান্তি ইতিহাসের জীবনাবসান। স্পেঙলর বলেন, কৃষ্টি তা'র আধ্যাত্মিক রসদের অভাবে সঙ্কুচিত হয়ে যখন হিমাঙ্ক স্পর্শ করে, তখন প্রসারের তাগিদ: একমাত্র প্রসারেই তখন তা'র প্রাণশক্তির দুর্গতি হদিশ। ইতিহাসের নামে স্পেঙলর এই বিপন্ন বিস্তৃতিকে সঙ্গত বিবেচনা করেন রাষ্ট্রের পক্ষে। ভৌগোলিক—রাজনৈতিক প্রসারে, অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহে, ইতিহাস তথা সভ্যতার মানরক্ষা তখন মানুষের নৈতিক স্বাধিকার। ইতিহাস রোমক কাইজারগণের জয়লিপ্সায় রক্তাক্ত, শান্তিহীন যেন সর্বকালেই। বিরল সেই শান্তির অধ্যায়গুলি যখন ইতিহাস-সত্ত্ব নিঃশেষিত হয়েছে আহবাগ্নি নির্বাপিত হওয়ার পরই; রাষ্ট্রের গঠনকার্যে নেই পরিবর্তন, পরিবর্ধনের অবসর আর মানুষ 'দ্বিতীয় ধার্মিকতায়' বিশ্বশান্তির অনুশাসন মেনে নিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে কীর্তিমান্ সেসিল রোডস্‌কে অভিনন্দিত করতে স্পেঙলর পঞ্চমুখ, কারণ আধুনিক য়ুরোপ তা'র মুমূর্ষু কৃষ্টির বিকীরণে দেশান্তর খুঁজবে, রাজ্যবিস্তার অনিবার্য করবে স্পেঙলরীয় ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই। নাৎসীবাদ থেকে অনেক দূরে, এক বিপন্ন ঐতিহাসিকের সঙ্গতি নিয়ে সত্যদ্রষ্টার ভূমিকায়ই দাঁড়িয়ে ছিলেন স্পেঙলর, কিন্তু একথাও বোধহয় অস্বীকার্য যে ঐ দুরন্ত রক্ষা-করার দায়িত্ব একদল অর্ধোন্মাদ, রাজনৈতিক দুষ্কৃতকারীদের ছিল না।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আশুবাবুর উঠবার তাড়া ছিল না। এতক্ষণ এক কোণে বসে সব নিঃশব্দে লক্ষ্য করছিলেন এবং গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন তাঁদের কথাবার্তা। এবার এগিয়ে এসে কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, আমাকে কী কাজ দিচ্ছেন?

পরিচয়াদি আগেই হয়েছিল। মৈত্র লঘু সুরে বললেন, 'আপনি যা করছেন মশাই তার চেয়ে শক্ত কাজ আর কী আছে? একপাল গেছো বাঁদর ধরে রেখেছে গবর্মেণ্ট্‌। আপনারা তাদের ল্যাজ খসিয়ে মানুষ বানাবার চেষ্টা করছেন।' বলে উচ্চ-রোলে হেসে উঠলেন। তারপর মিনিট-খানেক কী ভেবে নিয়ে একেবারে অন্য সুরে বললেন, কিন্তু মানুষ হচ্ছে কি?

—জানি না। আমরা শুধু চাকরি করে যাচ্ছি, এই পর্যন্ত।

—তাছাড়া আর কীই বা করতে পারেন আপনারা?' তার পরের ভাবনা যাদের, তারা ভাবে না। সরকারী দপ্তরে ঐ জিনিসটার বড় অভাব। সব আছে, নেই শুধু 'ইমেজিনেশন'। আমি নিজেই তার সাক্ষী।

বর্স্টালের নীতি, পদ্ধতি এবং দৈন-ন্দিন কর্মসূচী নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হল আশুতোষকে। তাঁর নিজের মনে যে-সব কথা বহুদিন থেকে আনাগোনা করছিল, সাহেবের সঙ্গে মাঝে মাঝে যে-সব আলোচনা হয়ে থাকে, তারও কিছু কিছু তিনি এই প্রসঙ্গে খুলে বললেন। শুনে-বার পর মৈত্র বললেন, ছেলেগুলোর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। সময় পেলে মাঝে মাঝে আসবেন। আরো শুনবো।

সেই থেকে শুরু। তারপর সুযোগ পেলেই একদিনের ছুটি নিয়ে এখানটা একবার ঘুরে যেতেন আশুবাবু। মৈত্র-মশায়ের এই প্রাণখোলা লোকটিকে ভাল লেগেছিল। অন্য অনেকের মত আশু-বাবুও ওঁকে মনে মনে 'গুরুদেব' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর ফরমাস মত দু-একটা ছোট-খাট কাজ করে দিয়ে তৃপ্তি পেতেন। কিন্তু বেশী বা ভারী কাজের ভার মৈত্র ওকে দিতেন না। বলতেন, 'তোমার তো দশটা পাঁচটার কলমপেষা নয়, তুমি চব্বিশ ঘন্টার চাকর। করবে কখন?' কিন্তু কিছু একটা না দিতে পারলে আশুবাবুর মনে স্বস্তি ছিল না। তাই কাজ বা 'সার্ভিস্'এর বদলে দিতেন অর্থ। সামান্য উপার্জনের একটা মোটা অংশ চলে যেত গুরুদেবের আশ্রমে। প্রথম দিকে তিনি মাঝে মাঝে আপত্তি জানাতেন, কিন্তু আশুবাবু দুঃখ পান বলে ইদানিং হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, তুমি এখন যা করছ, কর। সরকার যেদিন ছুটি দেবেন, ততদিন যদি বেঁচে থাকি, এসো। ভেবে দেখা যাবে, কী করা যায়। আর একটা কাজ করতে পারবে? তোমাদের ওখান থেকে যে ছেলেগুলো বেরিয়ে যায়, যতটা পার, তাদের সঙ্গে যোগ রাখবার চেষ্টা ক'রো।

আশুবাবু আশ্রমে যতবার এসেছেন খালি হাতে। বেশ কিছুদিন থেকে আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠা ছেড়ে দিয়ে-ছিলেন। সোজা এখানেই উঠতেন। সকালে এসে সন্ধ্যার দিকে চলে যেতেন, জিনিসপত্রের দরকার হত না। আজ তাঁর সঙ্গে একটা ছোট্ট তোরঙ্গ আর সতরঞ্চি জড়ানো হালকা বিছানা দেখে মৈত্রমশায় বলে উঠলেন, কী ব্যাপার? জেল থেকে খালাস পেলে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ, বলে আশুবাবু গুরু-দেবের পায়ের ধুলো নিলেন।

—বাঁচালে বাপু। এখানকার রান্না-ডিপার্টমেন্ট নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছি। মধু অবিশ্যি আছে, কিন্তু একজন পাকাপোক্ত ম্যানেজার দরকার। প্রায়ই লোকজন থাকে। তা, তোমাকে পেয়ে বর্তে গেলাম। হাজার হলেও সমঝদার লোক।...বলে হেসে উঠলেন।

আশুতোষের ভোজনানুরাগ এখানেও রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। তারই প্রতি গুরুর এই সস্নেহ ইঙ্গিতে তিনি সলজ্জ মুখে বললেন, রান্নাঘরের আসল জিনিসের ওপর আমার আকর্ষণ আছে, কিন্তু তার খবরদারির বিদ্যেটা তো শিখিনি।

—এবার বাধ্য হয়ে শিখবে। তা না হলে নিজেরাই ঠকবে। আমারও কিঞ্চিৎ স্বার্থ আছে। বুড়ো বয়সে একটু ভাল-মন্দের লোভ কার না হয়?

আশুতোষ জানেন, এটা গুরুর অতিভাষণ। আহার সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সংযমী এবং সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। এদিকে যে আয়োজনই হোক, অনেকদিনের পুরনো বন্ধু সনাতন ইক-মিক-কুকারটি ছাড়া অন্য কারো রান্না তাঁর রোচে না। সে ব্যবস্থাটুকুও তিনি নিজের হাতে করে নেন, মধুকে বা অন্য কাউকে হাত লাগাতে দেন না। ছোঁয়া-লেপার বাধা কিছু নেই। এইটাই তাঁর নীতি ও অভ্যাস। অবশ্য এ নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে ছাড়েন না। ইকমিকের নামমাত্র উপকরণ দিয়ে নিজের সামান্য প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে মাঝে মাঝে রান্না-ঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি দেন। ছুটির দিনের দুপুর বেলা কজন 'শিষ্য' মিলে

সেদিন হয়তো একটু বিশেষ আয়োজন করেছেন। গরেন ছদ্ম বিস্ময়ের সুরে বলে ওঠেন, ঈস, করেছ কি! এ যে রীতিমত 'ফিস্টি'। তা, আমাকে তো একবার ডাকলে না, বাপু।

ওদের ভিতর থেকে কেউ পাল্টা পরিহাস করেন, আপনাকে ডেকে কী লাভ হত? অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্।

"এ যে রীতিমত 'ফিস্টি'।"

—আহা! একবার পরখ করেও তো দেখতে পারতে সত্যিই অরসিক কিনা। থাক, তোমরা খাও, আমি আর নজর দিতে চাই না...বলে হাসতে হাসতে নিজের ঘরে চলে যান। কখনো বা দরজার সামনে বসে ওদের খাওয়া দেখেন এবং এর ওর সম্বন্ধে নানারকম সরস মন্তব্য করে ভোজনের আসর জমিয়ে তোলেন।

মৈত্রমশাই মুখে যাই বলুন, তাঁর রন্ধন-ডিপার্টমেন্টের ভার নেবার জন্যে আশুবাবুকে যে আসতে বলেননি, সেটা কদিন পরেই বোঝা গেল। সন্ধ্যার পর বর্স্টাল সম্বন্ধে কথা পাড়লেন এবং সেই প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন, ওখান থেকে বেরোবার পর ছেলেগুলো সব যায় কোথায়?

আশুবাবু বললেন, কেউ কেউ বাড়ি ফিরে যায়।

—সে আর কজন? বেশীর ভাগই তো বাপ-তাড়ানো মা-খেদানো। অনেকের দেশ হয় যে সব বালাই জন্মাবার পরেই চুকিয়ে ফেলেছে। তাদের নিয়ে তোমরা কী কর?

—তাদের জন্যে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। নামমাত্র একটা 'আফ্টার-কেয়ার'এর আস্তানা আছে। সেখানে কিছুদিন থাকতে পায়।

—তারপর?

—তারপর আর কী? যেখানে খুশি চলে যায়। অবিশ্যি ওঁরা কিছুটা চেষ্টা করেন, যদি কোনো কাজ-কর্ম জুটিয়ে দেওয়া যায়।

—কাজ-কর্ম শেখবার বহর যা শুনলাম তোমার কাছে, বিশেষ কিছু জোটে বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া, ঐ বয়সের একটা ছেলে কি কাজই বা করতে পারে যদি না তাকে আরো খানিকটা এগিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকে? সে রকম কিছু আছে কি? ইংরেজিতে যাকে বলে ফলো-আপ্ কোর্স।

—আজ্ঞে না, সে সব কোনো ব্যবস্থা নেই।

—তার মানে সোজা কথায়—যাও বাবা, চরে খাওগে।

আশুবাবু জবাব দিলেন না, দেবার মত কিছু পেলেন না। এ দিকটা তিনিও ভেবেছেন। সরকারী ভাষা অনুসারে যারা কৈশোরেই অ্যান্টি-সোস্যাল-এর দলে চলে গেছে, কটা বছর আটকে রেখে একটু ড্রিল, দু পাতা 'অজ-আম', আর তার সঙ্গে গোটা কয়েক পেরেক ঠোকা কিংবা বার দুই মাকু চালানোর মহড়া দিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিলেই কি তাদের সমাজ-বিরোধী প্রবৃত্তির পুরো চিকিৎসা হয়ে গেল? ঐখানেই সরকারের সব দায়িত্ব শেষ? বর্স্টাল স্কুলস্ অ্যাক্টে যাদের সংজ্ঞা, অর্থাৎ কুড়ি একুশ বছরে যারা বেরিয়ে যায়, তাদের তবু ডান হাত বাঁ হাত জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু ঐ ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রুপের ছেলেগুলো? ষোল বছর হতেই এক একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়, সে যেন বিশ্বাস করতেই চায় না, আজ থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে, থালা সাজিয়ে কেউ তাকে খেতে ডাকবে না, গায়ের জামা, পরনের প্যান্ট ছিঁড়ে গেলে ধমক দিয়ে বলবে না, গুদামে গিয়ে বদলে নিয়ে আয়। দোতলার হলঘরে তার ছোট্ট বিছানাটি, যার প্রতিটি বস্তু সে এতগুলো বছর নিজের বলে জেনে এসেছে, কম্বল দুখানা কত যত্নে পাট করে, তার উপরে নিজের হাতে কাচা ধবধবে ওয়াড় পরানো বালিসটি সাজিয়ে রেখেছে, সব ঐ পড়ে রইল। 'আমাদের স্কুল', 'আমাদের গ্রীণ হাউস' বলে যাকে জানত, এই মুহূর্তে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ

হয়ে গেল! এবার কোথায় যাবে সে, কে দুটো খেতে দেবে, রাত্রির অন্ধকারে কোনখানে জুটবে একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই?

খালাসের দিন ছ আনা পয়সা মাত্র সম্বল করে সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে, বর্স্টালের খাকী পোষাকে নয়, দীর্ঘ দিন আগে নিয়ে আসা নিজের সেই জীর্ণ মলিন জামাকাপড়টুকু কোনো রকমে জড়িয়ে এই সব ছেলে যখন ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকাতে তাকাতে গেট পেরিয়ে অজানা পথে পা দিয়েছে, তাদের মুখের উপর এই প্রশ্নগুলো স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন আশুবাবু। নিঃশব্দে সরে গেছেন সেখান থেকে। যদি কেউ মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে বসে, কী উত্তর দেবেন তিনি? এর কোনো সমাধান তাঁর জানা নেই।

আজ সেই বর্স্টাল ছেড়ে দূরে চলে এসেও সেই মুখগুলো চোখের উপর ভেসে উঠছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। গুরুর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ চমক ভাঙল। মৈত্রমশাই বলছিলেন, তোমার কথায় যদ্দুর বুঝলাম, ওখানে যে-সব কাজ তোমরা শেখাতে, তার মধ্যে প্রেস্ আর বুক বাইন্ডিং—ভদ্রঘরের ছেলেদের পক্ষে এই দুটোই যাহোক একটু কাজে লাগবার মত। তাছাড়া এগুলো মোটামুটি শিখতে খুব বেশী সময় লাগে না। শিখতে পারলে মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থাও হয়। কী বল?

আশুবাবু সায় দিলেন এবং বললেন, বর্স্টাল থেকে বেরিয়ে যাবার পর অনেক ছেলে আমাকে চিঠিপত্তর লেখে। আপনি বলবার পর আমিও যতদূর পারি তাদের সঙ্গে যোগ রেখেছি। তার থেকে দেখেছি, ঐ দুটো সেকশনে যারা ছিল, তাদের মধ্যে দু'একজন ছোটখাটো প্রেস-এ ঢুকতে পেরেছে। বাকী 'কামান'এর ছেলেগুলো কোথাও পাত্তা পাচ্ছে না।

—কেমন করে পাবে? সেখান থেকে যে বিদ্যে তারা নিয়ে গেছে, তা দিয়ে কিছুই হয় না। যাক্, তুমি এক কাজ কর। কোলকাতায় গিয়ে ছোটখাটো রাস্তায় অল্প ভাড়ায় একটা বাড়ি ঠিক করে একটি ছোট্ট প্রেস্ খুলে দাও। তার সঙ্গে বই বাঁধাই। দু'একজন ট্রেন্ড লোক রাখো, আর তোমার পুরনো মক্কেল যতগুলো জোটাতে পার, নিয়ে এসো। বাঁদরগুলোর একটা হিল্লে হোক।

আশুবাবু নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। বর্স্টাল প্রসঙ্গে গুরুর সঙ্গে কদিন থেকেই তার নানা আলোচনা চলছিল। কিন্তু এরকম একটা পরিকল্পনা তিনি মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন, অনুমান পর্যন্ত করতে পারেননি। শিষ্যের অভিভূত দৃষ্টির দিকে চেয়ে মৈত্র বললেন, কী ভাবছ? পারবে না?

—আজ্ঞে, আপনার আশীর্বাদ থাকলে কেন পারবো না? ভাবছিলাম—

—টাকা পয়সা কোত্থেকে আসবে! সেজন্যে আটকাবে না। আজ পর্যন্ত তুমিও তো কম টাকা দাওনি।

আশুবাবু প্রতিবাদস্বরূপ সবিনয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় জেলেপাড়া থেকে কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের কজন মেম্বর সোরগোল করতে করতে এসে পড়ল। মৈত্র বললেন, এখন আর কথা হবে না। এ সম্বন্ধে যতখানি খোঁজ খবর নেওয়া দরকার, আগেই সেরে রেখেছি। খরচপত্রের খসড়াও মোটামুটি তৈরী। তোমার সঙ্গে বসে ফিনিসিং টাচটুকু দিতে শুধু বাকী। তার আগে বাড়িটা ঠিক করা দরকার। তুমি বরং কাল সকালেই চলে যাও। আমার কাছেও খান দুই বাড়ির খবর আছে। ঠিকানা দিয়ে দেবো।

বাড়ি পেতে দেরি হল না। শুধু বাড়ি নয়, তার সঙ্গে একটি ছোট প্রেস্। মালিক হঠাৎ মারা যেতে তার ছেলেরা তার চালাতে চাইল না। একেবারে তৈরী জিনিস; সুবিধা দরেই পাওয়া গেল। নীচেটায় যন্ত্রপাতি, আফিস, পেছন দিকে রান্না-খাওয়া স্নানাদির ব্যবস্থাও আছে। উপরে খান তিনেক ঘর। তার মধ্যে সব চেয়ে ছোট কামরাটি নিলেন আশুবাবু, বাকী দুটোতে তার পুরনো ছাত্রদের আস্তানা। একটি একটি করে সাত আট-জন এসে জুটল, কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে যারা বেরিয়ে গেছে বর্স্টালের প্রেস্ এবং বুক বাইন্ডিং সেকশন থেকে। সবাই বেকার নয়, কেউ অন্য ছাপাখানায় কাজ করছিল, কেউ ঢুকেছিল মুদী দোকানে এবং পাইস হোটেলের 'বয়'এর কাজে। ছেড়ে দিয়ে চলে এল সেকেন্ড স্যারের প্রেস-এ। কথাটা কানে যেতেই আশুবাবু কষে বকুনি দিলেন, দূর হতভাগা, সেকেন্ড স্যারের প্রেস কি রে! তোদের প্রেস; তোরাই এর মালিক, আমি তোদের ম্যানেজার। ওরা তো অবাক! 'বা-রে, আমরা আবার মালিক হলাম কেমন করে? মিছিমিছি মালিক বুঝি?' —বলে উঠল একজন। সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল।

—'মোটেই মিছেমিছি নয়,' মাথা নেড়ে বললেন আশুবাবু। 'সব টাকাটা তোদের ধার দিয়েছেন গুরুদেব। আস্তে আস্তে শোধ দিতে হবে।'

ছেলেদের মুখ শুকিয়ে গেল। এত টাকা তারা শোধ দেবে কেমন করে! আশুবাবু বললেন, 'গতর খেটে। মাইনে পাবি তো? তারই খানিকটা দিয়ে মাসে মাসে শেয়ার কেনা হবে প্রত্যেকের নামে নামে। লাভ যেটা হবে, তার থেকে ধারের কিস্তি মিটিয়ে বাকীটা তোদের নামে জমা হতে থাকবে। সমস্ত পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন গুরুদেব।

ছেলেগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এসব শক্ত শক্ত কথা তারা জীবনে কোনোদিন শোনেনি। বুঝতেও পারল না একবিন্দু। তার জন্যে কোনো দুশ্চিন্তাও দেখা গেল না। 'সেকেন্ড স্যার' যখন আছেন এর মধ্যে, তখন এসব তাদের না বুঝলেও চলবে। কলরব করতে করতে বেরিয়ে গেল। একজন বলল, আপনার গুরুদেব কোথায় থাকেন স্যার?

—গঙ্গার ওপারে তাঁর আশ্রম। একদিন তোদের নিয়ে যাবো। প্রণাম করে আসবি।

(ক্রমশঃ)

এটিকেট

সমরজিৎ কর

এটিকেট! দেখুন, এই শব্দটি বিদেশী হলেও আমাদের ভাষা থেকে শুরু করে অঙ্গ-ভঙ্গীর বিভিন্ন সজ্জায় এটি এত সূক্ষ্মভাবে জড়িয়ে আছে যে, একে ব্যাখ্যা করার জন্য আর নতুন কোন ভাষ্যের প্রয়োজন হয় না। আসলে এ বস্তু যে কি তা যেমন আমরা জানি, আবার সরল উপেক্ষা করে এক গাল হেসে একে এড়িয়ে যেতেও আমরা কম সচেষ্ট নই। আমার এক বন্ধু, যিনি সম্প্রতি ইংলন্ড থেকে ফিরে এসেছেন, এই শব্দটির বর্তমান সভ্যজগতে প্রকট-রূপে আবির্ভাবের ব্যাপারে একটি মজার 'থিসিস' শোনালেন। তাঁর মতে 'এটিকেট' কথাটা তেমন উপেক্ষার বস্তু নয়। বরং সামাজিক স্বচ্ছতাই ধরুন আর সভ্যতার বিকাশই বলুন, এটিই নাকি তার একচুয়াল ম্যানোমিটার।

আমি বললাম, ভাই এটা আবার কি রকম হোল? ওসব স্বচ্ছ-টচ্ছ আর বিকাশ—আমার কাছে চিরদিনই নিতান্ত 'ভেগ' (Vague) বলেই মনে হয়েছে। সেদিন আমাদের লোক-সভায় কি কাণ্ড হয়ে গেল তোমার মনে নেই? লোক-সভায় প্রবেশ করার পর তার স্পিকার মশায়কে মাথা নত করে সম্মান দেখানোই নাকি 'এটিকেট'। কিন্তু জনৈক সভ্য তা মানতে রাজী নন। প্রথা অনুযায়ী একমাত্র 'আল্লা'র কাছেই তিনি ঐভাবে তছলিম পেশ করতে পারেন। কারণ আল্লা হো আকবর।

বন্ধুটি আমার কথায় যেন ক্ষেপে উঠলেন। আমি জানি, চিরদিনই সে ধোপদোরস্ত। অবশ্য সরল বাংলা ভাষায় যাকে বাবুগিরি বলে, তা অবশ্য তিনি করেন না। বেশভূষা সম্বন্ধে তিনি স্বাবলম্বী এই যা। লণ্ড্রী বা ধোপার অপেক্ষায় তিনি বসে থাকেন না। জুতোয় পালিশ চালানো থেকে শুরু করে প্রতি রবিবারে ছোট্ট লনের মরশুমী ফুলের তদারক করা, এমন কি গাড়ী ধোয়া, সব তিনি করেন। আমরা মাঝে মাঝে মন্তব্য করেছি এর মধ্যে কিন্তু একটু অর্থনৈতিক ব্যাপারের গন্ধ পাচ্ছি? তিনি এক গাল হেসে উত্তর দেন, ব্যাপারটা তা নয়। আসলে আত্মনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হয় পরনিষ্ঠা, পরের প্রতি সৌজন্যবোধ। সোজা বাংলায় যাকে বলে ভদ্রতা। এটিকেট।

আমি বললাম, ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে।

বন্ধুটি এবারে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। হাতের অসম্পূর্ণ চা'র কাপটি টেবিলের ওপর রেখে ড্রয়ার খুলে একটি কাগজের প্যাকেট বের করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তা খুলে ফেলে আমার সম্মুখে মেলে ধরলেন। দেখলাম, একটি ট্রাউজার, একটি সার্ট এবং একটি টাই। বিচিত্র বর্ণে প্রত্যেকেই রঞ্জিত। তবে মোট কম্বিনেশনটাকে যে কি বলব জানি না। তবে চিনি।

বিস্ময়ে বন্ধুর দিকে চাইলাম। রেগে উত্তর দিলেন, তোমাদের কলকাতা! বললাম, তা তোমার এগুলির এ দূরবস্থা হোল কি করে? কিন্তু তার উত্তর যা হোল, তা একান্ত মামুলী। কলকাতায় ওসব ব্যাপার হামেশায় চলে। বিশেষ করে বর্ষায় কলকাতা। তাতে আবার এটিকেটের কি হোল?

ব্যাপারটা তাহলে খুলে বলি। সেদিন বন্ধুটি আমাদের কলকাতা সহরেরই কোন রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ আগে বেশ এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সকলেই জানেন, বৃষ্টির পর শহর কলকাতার রাজপথগুলির কি অবস্থা হয়। রাস্তার আনাচে কানাচের ক্ষুদ্র-বৃহৎ হ্রদ, লেগুন থেকে শুরু করে কোন চৌমাথা, তেমাথায় উপ এবং মহাসাগর সৃষ্টি হয়। আবার দেখবেন, বড় বড় বাড়ীর কার্নিশ বা ঝোলানো বারান্দার ফাঁকে যে পাইপ ড্রেনগুলি থাকে তা সাময়িক অবিরাম প্রস্রবণে রূপান্তরিত হয়েছে। আর মহানগরীর হতভাগ্য পথিকরা এদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে লিভিংস্টোন, তেনজিং প্রভৃতির মত চেষ্টা করছে। আসল কথা, আফ্রিকার জঙ্গলের হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে বরং রক্ষা পাওয়া যায় এবং মাউণ্ট এভারেস্টে আরোহণ করাও হয়ত সোজা, কিন্তু এক একটি মোটর বাস বা কারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যে চেষ্টা করবেন, অতটা সোজা নয়। বন্ধুটি বোধ হয় একটি লেগুনের পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন। সবে লন্ডনের সভ্য সমাজ থেকে ফিরে এসেছেন, বোধ হয় সেখানকার ছবি-টবি ফিকে ফিকে তখনও মনে গাঁথা। কলকাতারই রাজপথকে হয়ত ভাবছেন পিকাডলি সারকাস। কিন্তু হঠাৎ গণিতের ভাষায় যাকে বলে 'ইনফাই-নাইটিসিমেল' ব্যাপার। তিনি অনুভব করলেন তাঁর সাদা জামা, প্যান্ট, টাই থেকে শুরু করে মায় ক্যাপটি পর্যন্ত করপোরেশনের বিবর্ণ তেল-জলে অভিসিঞ্চিত হয়েছে। আর এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটির জন্যে দায়ী অবশ্য কৃষ্ণ-মহাদেশের সিংহ নয়। একটি নিতান্ত পার্থিব, বাস্তব এবং একান্ত অনুগত সামগ্রী,—একটি হিন্দুস্তান ল্যাণ্ড-মাস্টার।

দেখুন, আমাদের অবচেতন ইন্দ্রিয়ের এইটে একটা বড় বৈশিষ্ট্য যে, সচেতন ইন্দ্রিয়ের কোন স্পন্দন হওয়ার আগেই কোন গোপন বন্ধুর মত সে আগে থেকেই কাজটি সেরে ফেলে। তাই দেখবেন, চোখের পাতায় কয়লার টুকরো পড়ার মুহূর্তগত পূর্বেই আমাদের পাতা বুজে আসে। একটি আঘাতের সম্ভাবনা কত মুহূর্তগতভাবে আমরা সামলিয়ে নিই। আমার বন্ধুর মধ্যেও যে এমন একটি চেতনা কাজ চালিয়ে যায়নি, তা অবশ্য বলব না। ধাবমান 'সম্ভাবনাটির' আবির্ভাব এবং তার পরিণতি কি হতে পারে তা তিনি জেনেও ছিলেন। তাই কাছের কোন ফুটপাথ বরাবর একটি উঁচু সিঁড়িতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু আগেই বলেছি, এভারেস্টে ওঠা হয়ত সোজা, এ ব্যাপারটি অত সহজ নয়।

বন্ধুটির তৎক্ষণে বাকরোধ হয়েছে। কারণ সহস্রপদের চরণামৃত তাঁর ওষ্ঠে শুধু নয়, মুখ-গহ্বরেও। ধাবমান গাড়ীর নম্বর টোকার চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি। টোকা যায়ও না। তবে তিনি আশা করেছিলেন, অন্ততঃ চালক একটু

থেমে তাঁর এই দুষ্কর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবেন।

বন্ধুটি বললেন, উঃ! ল্যাক অব এটিকেট!

আমি বললাম, ভাই, ব্যাপারটা এতই গোলমেলে, আসলে ও জিনিসটির অস্তিত্ব আমাদের দেশে নেই। কারণ এটিকেট দেখাতে যাওয়াকে হয়ত তুমি সামাজিক স্বচ্ছতা বা ভদ্রতা বলে মনে করতে পার। কিন্তু তাতেও বিপদ আছে। হয়ত এমন একটা কিছু আশংকা করেই লোকটি আর দাঁড়াতে সাহস করেনি।

বন্ধু আমার ওপর অপ্রসন্ন হলেন। বললেন, কি আনসিভিলাইজডের মত কথা বলছ।

আমি বললাম, তবে শোন। ব্যাপারটা গল্পের মত শোনালেও, সত্যি! : সেদিন বোধ হয় মাঘ মাস হবে। গ্যালিফ স্ট্রীটের লাস্ট ট্রামে বাড়ী ফিরছি। কয়েকদিন হোল খুবেই শীত পড়েছিল। প্রথম শ্রেণীর কক্ষে মাত্র জন-তিনেক যাত্রী। দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা। মহিলার বয়েস বছর ত্রিশেক হবে। সংগে কয়েকটি কাসকেড, বই এবং আরও কি যেন।

আমি সায়েন্স কলেজের সামনে নেমে পড়লাম এবং বাড়ীর পথে পা বাড়ালাম। সহর কলকাতার প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডে তখন নেমে এসেছে ঘন কুয়াশা এবং ধোঁয়া। তুমি নিশ্চয় জান, বিকালটায় সমস্ত কলকাতা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়। শুনেছি নাকি, তোমাদের ইংলণ্ডে লিভারপুলে অমনটি হয়। রাস্তার সমস্ত আলো নিভ-নিভ। এক পা এগোতেই মহিলা কণ্ঠে কে আমাকে ডেকে উঠল।

আমি থামলাম এবং পেছনে চাইলাম। দেখি সেই ভদ্রমহিলা। যাঁকে ট্রামে দেখেছি।

একটু বিচলিত হওয়ারই কথা। একে গভীর রাত, পথ জনশূন্য তায় অপরিচিতার আহ্বান।

বললাম, মাফ করবেন, আমায় ডাকছেন?

আজ্ঞা হ্যাঁ। দেখুন এই পথটি বড় খারাপ। সংগে দামী জিনিসপত্র আছে। জন্মদিনের উপহার। বললাম—!

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপারে মেয়েরা একটু বেশী কথাই বলে। হয়ত এক্ষুণি মস্ত এক লিস্টি মেলে ধরবেন, এই ভয়ে মাঝ পথেই প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কি, বলুন। মেয়েটি বলল, মানে, অমুক গলিতে আমার বাসা। যদি দয়া করে একটু এগিয়ে দিতেন—সর্বনাশ! সে যে আমার পাশের বাড়ী। গিন্নী অবশ্যই এখনও আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। রাত করে বাড়ী ফিরলে শত কৈফিয়ৎ দিতে হয়। তাঁর মতে, কলকাতা সহরটা নাকি উচ্ছন্ন যাওয়ার একমাত্র জায়গা। চাকরীর দোহাই দিলেও তিনি শুনতে চান না। তাঁকে একথা বোঝাতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছি যে, বর্তমান কালে পুরুষদের বাজার বড় মন্দা। কিন্তু তিনি তা শুনতে রাজী নন। তারপর যদি দেখেন, এই রাতে একজন সুন্দরী মহিলা আমার পার্শ্বচর, তাহলে তো কথাই নেই।

কিন্তু বিধি বাম। সংগে নিতে হোল। শুধু তাই নয়। ঐ যে, যাকে তুমি বলছিলে 'এটিকেট', শুধু সেটিকে পালন করার দায়ে, মায় তার ভারী ভারী উপহারগুলিও বয়ে নিয়ে চলতে হোল।

এদিকে তার বাসায় এসে বাধল গোলমাল। উপহারগুলি ফেরৎ দিতে গিয়ে দেখা গেল 'ফেক্সের' জুতো-জোড়ার বাক্সটি পাওয়া যাচ্ছে না।...আর যায় কোথায়! খোঁজ খোঁজ!

আমি বললাম, বন্ধুর বাড়ীতে ভুল হয়নি তো? অথবা ট্রাম থেকে নামার সময়? মেয়েটি যেন ক্ষেপে উঠল, বলেন কি মশায়? আমি ম্যাথেমেটিক্সের স্টুডেন্ট। আমার অত সহজে ভুল হয় না। ওঠা আপনার হাতেই আমি তুলে দিয়েছি।

আমার বন্ধুটি মন্তব্য করলেন, ব্রুট! তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, শোন একবার ব্যাপারটা! আমার অবস্থাটা একবার অনুমান কর। ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর ক্রমেই মধুর ছাড়িয়ে কর্কশ হতে লাগল। অংকের ছাত্রী কিনা। একে-বারে একটি এসেন্ডিং অরডারের সিরিজ তৈরী হতে লাগল। নেহাৎ রাতের কলকাতা। কেউ কারুর খোঁজ রাখে না। আর আমার তখন অত শীতেও পুরু কোটের ভেতর থেকে বাষ্প বের হতে লাগল। মায় গেঞ্জীশুদ্ধ লিকুইড হয়ে গেছে।

কিন্তু তবু বলব ভাগ্য সুপ্রসন্ন। প্রথম কারণ, এর মধ্যে মেয়েটির একটি ছোট ভাই বাড়ী থেকে বের হয়ে এল। যেন লেট দেয়ার বি লাইট, এণ্ড দেয়ার ওয়াজ লাইটে'র মত। আমাকে দেখেই একটু চমকে উঠল। বলল, প্রসূনদা' আপনি? তারপরেই সে তার দিদির

পায়ের দিকে চেয়ে বলল, আরে দিদি! মারভেলাস্‌, যা মানিয়েছে তোর পা! চকিতে তার পদযুগলের দিকে চাইলাম। নতুন ফ্রেঞ্চ সত্যিই খুব শোভা বর্ধন করেছিল।

মেয়েটির অবস্থা অবশ্য অনুমান করতে পারছ। কিন্তু আমার আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার অবস্থা নেই। কারণ, গিন্নী হয়ত এখনও ব্যাপারটা অনুভব করতে পারেননি। তাঁকে সামলানো আমার প্রথম কাজ। তরুণ অধ্যাপকদের ও'রা বিশ্বাস করেন না। ও'র কাছে যে, অন্ততঃ আমার 'এটিকেট'কে পুরো-মাত্রায়, যাকে বলে সেন্ট-পারসেন্ট অটুট, তা প্রমাণ না করতে পারলে নিস্তার নেই। বন্ধুটি কিন্তু থামল না। বলল, তর্ক করাটা আজকাল শিক্ষিত সমাজের যেন একটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, বলতে পার, জীবনের কোন জটিল সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত মানুষ তর্কের দ্বারা সংগ্রহ করতে পেরেছে? আসলে জীবনটা একটি অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকে বুঝতে পারবে, ব্যক্ত করতে পারবে না। তোমাকে আমার ভাল লাগছে, আর কেন ভাল লাগছে, তা বোঝানো শক্ত। মানুষের শিক্ষা বল, দীক্ষা বল সমস্ত কিছুর মধ্যেই আছে একটা মার্জিত রুচি, আচরণ এবং অভিব্যক্তি আহরণ করার চেষ্টা। ভবিষ্যতে জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়টি সার্টিফিকেট তুমি পেয়েছ, একথা তোমারও হয়ত মনে থাকবে না। কিন্তু যা মানুষকে মুগ্ধ করবে, দেবে সামাজিক খ্যাতি তা হোল তোমার ঐ শিষ্টাচার। আজ এর অভাবে মানুষ যে কত কি লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়, তা আমার তিনটি উদাহরণ থেকে বুঝতে পারবে।

প্রথমটি ঘটে মাদ্রাজ মেলের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। স্লিপার কোচে ভ্রমণ করছিলেন জনৈক মিঃ রাও এবং মিস সুলতা। ও'রা কেউ কারুরই পরিচিত ছিলেন না। মিঃ রাও বছর ত্রিশের যুবক এবং ইঞ্জিনিয়ার। মিস সুলতা বছর পঁচিশের তরুণী। অধ্যাপিকা। ও'রা পরস্পর সামনা সামনি নীচের বার্থে শুয়েছিলেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হোল। বৃষ্টি নামল হঠাৎ। ঘুম ভেঙে গেল মিঃ রাও-এর। দেখলেন তাঁর বিছানা ভিজে গেছে। তাড়াতাড়ি জানলার কাঁচ নামিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর নজরে পড়ল, মিস সুলতার গায়ে বৃষ্টির ছাট এসে পড়াতেও তাঁর ঘুম ভাঙছে না। একটু ইতস্ততঃ করে তিনি মিস সুলতার জানলার কাঁচও নামিয়ে দিলেন।

ভোর সাতটায় কোন এক স্টেশনে ট্রেন থামলে মিঃ রাও-এর ঘুম ভাঙল। তিনি দেখলেন, মিস সুলতা অতিরিক্ত এক কাপ কফি নিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। এ ব্যাপারে মিঃ রাও প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে যান। কিন্তু পরে উভয়ের মধ্যে আলাপটা জমে ওঠে। কথা প্রসঙ্গে মিস সুলতা জানান, এই-টুকু আন্তরিকতাও জীবনে তিনি কারও কাছ থেকে পাননি। অর্থাৎ বর্ষায় তিনি ভিজে যাচ্ছেন দেখে, কেউ যে তাঁর জানলা বন্ধ করতে পারে, এ তাঁর ধারণার বাইরে। ঘুমটা তাঁর গাঢ়। টের পাননি, গায়ে জল পড়ছিল।

একটু কৌতুকের সঙ্গে বললাম, তারপর?

বন্ধুটি আমাকে চমকে দিয়ে বলল, ও'রা পরস্পরে বিয়ে করেছেন। এ্যান্ড ইট ইজ ফর ইওর এটিকেট! এবং তার-পর বন্ধুটি আরম্ভ করল আমেরিকার সান লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির জৈনক ডিরেক্টারের জীবনী। ভদ্রলোকের নাম মিঃ এডগার জোন্স। কুড়ি বৎসর বয়সে ইনি হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে বেকার অবস্থায় নিউ-ইয়র্কের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ছিল উচ্চাশা। তাই ছোট-খাট ব্যাপার নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। অবশেষে বহু সাধ্যসাধনা করে ইনস্যুরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হওয়ার আবেদন করলেন একজন ঝানু এবং অত্যন্ত রাশভারি ম্যানেজারের কাছে। অনুমতি মিলল। কিন্তু সময় মাত্র তিন মিনিট। দেখাও করলেন। ব্যর্থমনোরথ হতে হোল। কঠিন কাজ। অত ছেলে-মানুষ এবং একেবারে আনাড়ী দিয়ে হবে না।

মিঃ জোন্সের মুখে কিন্তু কোন ব্যর্থতার রেখা ফুটে উঠল না। তিনি মৃদু হেসে অভিবাদন করলেন এবং আস্তে করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার অসংলগ্ন পর্দাটি ঠিক করে দিয়ে মৃদু পদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে লাগলেন। কিন্তু চমকে উঠতে হোল। মাত্র এক মিনিট পর। সবে মিঃ জোন্স রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন। বেয়ারা এসে তাঁর হাতে একটি খাম তুলে দিলে। একেবারে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। তাঁকে কোম্পানি জুনিয়ার এজেন্টের পদে বহাল করেছেন। পরে ইনি একজন ডিরেক্টারও হন।

প্রশ্ন করলাম, কারণ?

বন্ধুটি বলল, এটিকেট। মাত্র ঐ পর্দা সরানো, যা ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল ম্যানেজারকে। এপয়েন্টমেন্ট লেটার প্রস্তুতই ছিল। সই করে পাঠানো মাত্র।

বন্ধুটিকে বললাম, এবার বল তোমার শেষেরটা!

বন্ধু বলতে লাগল : এটা ঘটে আমাদের ভারতেরই কোন অফিসে কতকগুলি উচ্চ-পর্যায়ের কেরাণী বহাল করার সময়। অফিসে লোক নেয়ার কথা ছিল পনের জন। দরখাস্তকারীদের মধ্যে থেকে ইন্টার-ভিউ-এ ডাকা হয়েছিল চল্লিশ জনকে। যে ঘরে এদের বসার কথা ছিল সেখানে প্রতি প্রার্থীর নাম বসিয়ে একটি করে চেয়ার, একটি টেবিল এবং প্রতি টেবিলে এক প্যাকেট ক্যাপসটেন সিগারেট রাখা হয়েছিল। আর ছিল একটি করে এ্যাস-ট্রে এবং দুই-একটি করে ম্যাগাজিন প্রতি টেবিলেই। ঘরের কোণে একটি নোটিশ-বোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা ছিল : আপনাদের ইন্টার-ভিউ নিতে হয়ত আমাদের একটু বিলম্ব হবে। অনুগ্রহ করে বিচলিত না হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

কিন্তু তা তো হোল। মিনিটের পর ঘন্টা। তারপর আর এক ঘন্টা। কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা চলে? ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। শুরু হোল গুঞ্জন। পাক্কা আড়াই ঘন্টা যখন কাটল হঠাৎ একজন দাঁড়িয়ে উঠে হলঘরের এক কোণে গেলেন এবং বেশ সুর করে বলতে লাগলেন, মিঃ বোস, মিঃ কার্লেকার...... আপনারা অনুগ্রহ করে চলে যেতে পারেন। আমাদের প্রাথমিক ইন্টারভিউ পর্বে আপনারা নির্বাচিত হননি।

কি রকম? কে একজন বেশ ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করল।

যে ভদ্রলোকটি কথা বলছিলেন তিনি একজন অফিসার। চাকুরী-প্রার্থীর ছদ্মবেশে সকলকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বললেন, আপনারা নির্বাচিত হননি। কারণ আপনারা ডিসিপ্লিন ব্রেক করেছেন। আপনারা স্ব স্ব স্থানের যথাযথ ব্যবহার করেননি। এ্যাস-ট্রে থাকা সত্ত্বেও সিগারেটের টুকরো বা ছাই যত্রতত্র ছড়িয়ে রেখেছেন। ম্যাগাজিনগুলি এলোপাথারি পড়ে। এবং এক টেবিলেরটা অন্য টেবিলে যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমরা আপনাদের একটা গ্রুপ টেস্ট নিলাম।

বন্ধুটি বলল, একটু ভদ্রতা, সামান্য শিষ্টাচারের অভাব, দেখ, কেমন নিশ্চিত সম্ভাবনা থেকেও মানুষকে বঞ্চিত করতে পারে।

এবার আমাকে চুপ করে থাকতে হোল।

চোখের সামনে মোমের ফোঁটার মত ঝরে ঝরে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে এল। দৃশ্যমান অগণন বাড়ি, মানুষ, কোলাহল সব একাকার হয়ে গেল। কোথাও কোথাও থেকে উঠে শাঁখের শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে গেল। একাকী অন্ধকার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মত ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। শরীরে কুয়াশার আস্তরণ। দূরে চাঁদ উঠলে রূপোর টাকার মত চকচক করতে লাগলো।

অমল চেয়ারে চিবুকে হাত দিয়ে এই দৃশ্য রচিত হতে দেখল। এবং প্রতিদিনের মত আজও মনে মনে শূন্যে প্রজাপতির মত এক সুখী চিত্র রচনা করল। পুরীর সমুদ্রের ধারে একতলা বাড়ি তুলেছে। সেখানে থাকবে সে আর মীরা। প্রতিদিন সে কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরবে। মীরা দরজার পাল্লা বুকে চেপে দাঁড়িয়ে থাকবে, অপেক্ষা করবে। আর গভীর রাত্রে যখন ঘরের মধ্যে হু হু করে বাতাস আসবে, জানালার পাল্লাগুলো দেওয়ালে ঠোকাঠুকি করবে, তখন মীরাকে শরীরের নিকটতম প্রান্তে নিয়ে এসে বলবে, মীরা আমরা সুখী। মানুষ যা চিরকাল কামনা করে, আমরা তা পেয়ে গেছি। আমাদের মত ভাগ্যবান পৃথিবীতে আর কেউ নেই। মীরা হয়ত কিছুই বলবে না। তখন, অমল ভাবল, তার চিবুক আমার বক্ষদেশ স্পর্শ করবে।

ঠিক এই সময় তীক্ষ্ণ কাতর 'আঃ আঃ' শব্দপ্রবাহ ভেসে এল। অমল এই ধ্বনিতে মুমূর্ষুর আর্তি অনুভব করল। আর সেই সঙ্গে কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। কেননা, স্বরচিত সুখী চিত্র রচনার আমেজ ছিন্ন হয়ে যায়।

পুনরায়, অমল পূর্বের চিত্র রচনায় আত্মমগ্ন হল। কেননা, কেবলমাত্র এই চিত্রের দিকে তাকিয়ে সে প্রতিদিনের ধূসর ইতিহাস অনায়াসে ভুলে যেতে পারে। বাবার মুখ তখন মনে পড়ে না। আর, বাবার মুখ মনে পড়লেই সে কেমন অসুস্থ হয়ে পড়ে। কতবার সে মনে মনে বাবার মূর্তি তৈরী করেই পরমুহূর্তে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছে। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই অতল অন্ধকার থেকে সেই মুখ জেগে উঠেছে। পিছন থেকে ঘাতকের মত উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে এমনভাবে তাকিয়ে থেকেছে, যেন ঘাড় ফেরালেই তাকে দেখতে পাবে। ভয়ে আঁৎকে উঠে করতলে মুখ ঢেকেছে। কিন্তু তাতেও সে মুক্তি পায়নি। ঘাড়ের ওপর অনুভব করেছে হিম নিঃশ্বাসের স্পর্শ। তার শরীর কেঁপে উঠেছে। কিন্তু, কোথাও ছুটে যেতে পারেনি। স্থির হয়ে বসে থেকেছে।

প্রতিদিন অন্ধকারে ক্লান্ত, ক্লান্ত হয়ে ভেবেছে, এই দুঃসহ বোঝা আর কতদিন সে বহন করবে? রোগ-যন্ত্রণার অসহ্যতার চেয়ে বরং বাবার মৃত্যু হোক, এ নিষ্ঠুর গোপন সত্য হয়ত সে কোথাও কোনদিন উচ্চারণ করেনি, কিন্তু জানে, মৃত্যু হলে সে অন্ততঃ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। আবার সে ভাল করে বাইরের আকাশটাকে দেখতে পাবে। যেমন দেখতে পেত কৈশোরে, মাঠের মাঝে একা একা দাঁড়িয়ে।

এ সময় অমল গোপন তীব্র তৃষ্ণা অনুভব করল। এবং পরমুহূর্তে করতল দেখার মত নিজের প্রতিদিনের বৃত্তান্ত চোখের সামনে মেলে ধরতেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। কি ম্লান আর কি করুণ তার প্রতিদিনের ইতিহাস। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠে। নিয়মিত খবরের কাগজ পাঠ করে। তারপর স্নান করে খেয়ে নেয়। অফিসে যায়। বিকেলে ফিরে আসে। বাবার জন্য কিনে আনে বেদানা, ন্যাসপাতি, কমলালেবু। মীরার হাতে সেগুলো তুলে দিয়ে চুপচাপ

এই চেয়ারে বসে থাকে। সন্ধ্যা হয়। স্বপ্ন দেখে। রাত্রি বাড়ে। তারপর খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আর, মীরা প্রতি-দিন রান্না করে। বাসন মাজে। এবং বাকি সময় বাবার মাথার পাশে বসে থাকে। ওষুধ খাওয়ায়। থার্মমিটার দিয়ে শরীরের তাপ নেয়। চার্ট টুকে রাখে। আর আজকাল অসুখ একটু বাড়াবাড়ি হওয়ায় বাবার পাশেই সারা রাত শুয়ে থাকে। বাবাকে একলা রেখে কদাচিৎ এ ঘরে শুতে আসে।

অমল কপালে করাঘাত করে। তার শরীর ক্রমাগত ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে। চিবুক ঝুলে পড়ছে। আর মীরার চোখের কোলে কালি পড়ছে। মুখের চামড়া কুচকে যাচ্ছে। অথচ, মনে পড়ে অমলের, মীরাকে বিয়ে করার সময়ে অনেক উজ্জ্বল চিত্র রচনা করেছিল। বাবার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও মীরাকে বিয়ে করেছিল। তখন নিজেকে মনে হত সম্রাটের মত। পৃথিবীর যাবতীয় উজ্জ্বল আহ্লাদ যেন তার জন্য অপেক্ষা করছে, এ রকম মনে হত। মীরাকে এখানে আনার পর বাবার সঙ্গে শুধু কথা নয় প্রায় মুখদেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। এগুলো সে নির্মমভাবে অগ্রাহ্য করেছে। কেননা, তখনো তার কাছে জীবনের অন্যতর মানে ছিল। কিন্তু তারপর বাবা যেদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, সেদিন সে অকারণে চমকে উঠেছিল। ভয় পেয়েছিল।

বাবা শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রইলেন। দেখতে পেল, বাবার শরীর ক্রমশঃ বিবর্ণ হয়ে আসছে। কিন্তু, আশ্চর্য! বাবা তাঁর অসুস্থতাকে টিঁকিয়ে রাখলেন মাসের পর মাস। ওঠা-বসার ক্ষমতা লোপ পেলেও ঘাতকের মত নির্মম দৃষ্টি মেলে জেগে রইলেন। গোটা বাড়িটা নির্জন প্রাসাদের মত ভয়ংকর হয়ে উঠল। কোথাও দ্রুত পদ-পাত নেই। কোলাহল নেই। ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে বাবার তীক্ষ্ম যন্ত্রণার ধ্বনি ও কাদের মৃদু ফিসফাস কথাবার্তায় পুকুরে ঢিল ফেলার মত ঘরের স্তব্ধ হাওয়ায় অদৃশ্য তরঙ্গ উঠেই মিলিয়ে যেত। এ রকম শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় তারা অশরীরী আত্মার মত বেঁচে রইল। আর মাঝে মাঝে সেই সব অস্থির স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা দেশলাইয়ের কাঠির মত অকারণে জ্বলে উঠত, এবং সে আলোয় ক্ষণিকের জন্য দেখতে পেত, বিশাল শকুনের মত ডানা মেলে কি ভয়ংকর অন্ধকার এখানে নিপাতিত। মুহূর্তে কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে যেত।

হঠাৎ এ সময় অমল হু হু করে ছুটে আসা উত্তরে হাওয়ার নির্মম প্রহারে চমকে উঠল। চাদরটাকে আরো আপন করে জড়িয়ে নিল নিজের গায়। চেয়ে দেখলো, রাত্রি হয়েছে। অন্ধকার চাপ বেঁধে আসছে। চাঁদ দূরে অশ্বত্থ গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। আর সমস্ত আকাশ ভরে অন্তহীন নক্ষত্রপুঞ্জ।

অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে পদপাতের ক্ষীণ শব্দে অমল মুখ ফিরে তাকাল। মীরা। অন্ধকারে ওর গোটা শরীর পোড়া কাঠের মত মনে হল। মীরা দ্রুত এগিয়ে এসে বলল, বাবা কিরকম হয়ে যাচ্ছে। অবস্থা বোধ হয় খুব খারাপ। তাড়াতাড়ি এস।

অমল সব শুনল। কিছু বলল না। চুপচাপ বসে রইল। যেন এরকম অবস্থায় তার পক্ষে শুধুমাত্র বসে থাকা ছাড়া আর কোনরকম কাজ সে করতে পারে না। মীরা, অমল আসছে, এই ভেবে এগিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর, অমল সেই রকম ভাবেই চেয়ারে বসে রয়েছে, উঠে আসছে না, এরকম মনে করে পুনরায় মুখ ফিরিয়ে বলল, কই ওঠ।

অমল তবুও বসে রইল।

মীরা এবার ফিরে এসে তার হাত ধরে টান দিল। বলল, ওঠ।

অমল বলল, আমি কি করতে পারি বল? মীরা তার কথা শুনে অন্ধকারে তার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে বলল, ডাক্তার ডেকে আনতে হবে।

মীরা যেভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, তাতে সে অন্যরকম কথা আশা করেছিল। একটু অবাক হল। তাকিয়ে রইল মীরার বিবর্ণ চোখের দিকে। এবার মীরার কণ্ঠস্বর রূঢ় হয় উঠল, কই, ওঠ।

অমল এরকম কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। কেননা, এই প্রথম, এতদিন পর মীরার কণ্ঠস্বরে রূঢ়তা লক্ষ্য করল।

অমল বালকের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মীরাকে অনুসরণ করে পাশের ঘরে বাবার মৃতপ্রায় শরীরের পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর বাবার চোখ দুটো বোঁজান দেখে আশ্বস্ত হল। কেননা, ঘাতকের মত নির্মম দৃষ্টির প্রহার থেকে সে বেঁচে গেছে।

অমল এবার অনায়াসে বাবার শরীরের ওপর হাত রাখতে পারল। আশ্চর্য! একটুও জ্বর নেই। আর কেমন যেন ঠান্ডা। কিছু বুঝে উঠতে পারল না।

মীরা এবার বলল, দেখেছ, শরীরটা কিরকম ঠান্ডা হয়ে আসছে।

অমল বলল, কি করা যায় বলত?

—শীগ্‌গির ডাক্তার ডেকে আন।

—কি বলব?

—যা দেখলে তাই বলবে। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না? আশ্চর্য!

অমল মীরার মুখের দিকে একবার তাকাল। অকারণ আত্মঘাতী প্রহারে গোটা মুখ ভেঙে পড়েছে। বেশীক্ষণ তাকানো যায় না।

অমল চোখ দুটো ফিরিয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে এল। মীরা বাবাকে কোলে নিয়ে বসে রইল।

রাস্তায় নামতেই অমলের গোটা শরীর অস্থির মাতালের মত টলে উঠল। আর একটু হলেই পড়ে যেত। টাল খেয়ে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল। ধনুকের ছিলার মত নিজের শরীরটাকে টানটান করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করল। পারল না। পাতার মত থর থর করে কাঁপতে লাগল। আর সেই সময় তার মনে হল, সে বুঝি মারা যাবে। গোটা শরীর হিম হলে এল।

তারপর পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে আপ্রাণ টানল। খক খক করে কাশল। মাটিতে থু-থু ফেলল। চেয়ে দেখল একবার। এবং পুনরায় শূন্যে মুখ তুলে ধোঁয়া ছাড়ল। শরীর-টাকে গরম করার চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণ পর নিজেকে সুস্থ মনে হলে দ্রুত পায় এগিয়ে গিয়ে সামনের এক রেস্তরাঁয় ঢুকে পড়ল। চেয়ারে বসে ভাবতে শুরু করল, আশ্চর্য! আমি এমন টলে পড়লাম কেন? শারীরিক অসুস্থতা? হয়ত তাই। শূন্যে নিজের প্রতিকৃতি রচনা করল। তাকিয়ে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর নীরবে উচ্চারণ করল, আমার বয়স বাড়ছে। প্রতিদিন তিল তিল করে আমার শরীরের অস্থি মেদ মজ্জা শিথিল হয়ে

আসছে। আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। মারা যাব, হয়ত আজ কিংবা কাল।

এসময় একজন বেয়ারা এসে অমলের মুখের সামনে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, কি দেব?

অমল কথাটা যেন শুনতে পেল না। অপলক তাকিয়ে রইলো বেয়ারার টানটান শরীরের দিকে। ও কি করে এভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভেবে অবাক হল। যে কোন মুহূর্তে তার মত ওর শরীর ভেঙে পড়ে যেতে পারে, অথচ কি কঠিন মেরুদণ্ডে ভর করে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে!

বেয়ারা জবাব না পেয়ে পুনরায় প্রশ্ন করল, কি দেব? প্রশ্নটা এবার কানে যেতেই চমকে উঠে দ্রুত জবাব দিল, চা।

উত্তর শুনেই বেয়ারা গর্বিত শরীর নিয়ে চলে গেল। পিছন থেকে বিস্ময়ে অমল কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে, ফিরে তাকাল প্রতিটি টেবিল ঘিরে বসা বিভিন্ন মানুষের দিকে, যাদের মুখগুলি রেস্তরাঁয় ক্ষণিক উজ্জ্বলতা পেয়ে শ্রীময় হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ মৃদুস্বরে গোপন আলাপ করছে। কেউ বা তারস্বরে বোঝাচ্ছে রাজনীতি, দর্শন কিংবা কবিতায় গোপন শরীর। আবার দু'একজন যাবতীয় উপদ্রব থেকে নিজেকে মুক্ত করে, স্থির হয়ে দ্বিধাহীনভাবে চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

অমল এদের দিকে তাকিয়ে ভাবল, যেন স্রোতমুখে উন্মূলিত ভাসমান তৃণদল অকস্মাৎ স্থল খুঁজে পেয়ে স্থির হয়ে নিজেদের ফিরে পাওয়া অস্তিত্ব যাচাই করে নিচ্ছে। অথচ এরা জানে না সেই গোপনতম সংবাদ যে, হয়ত এই মুহূর্তেই অদৃশ্য মৃত্যুর নিপুণ প্রহারে এদের সমগ্র অস্তিত্বের সমূহ বিনাশ ঘটে যেতে পারে। আর হয়ত জানে না বলেই এরা ক্ষণেকের জন্যেও উজ্জ্বল হতে জানে।

এসময় বেয়ারাটি অমলের সামনে চায়ের পেয়ালা রেখে দ্রুত চলে গেল।

অমল চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে টেনে নিয়ে কয়েকবার চুমুক দিল। তারপর ভাবল, আমিও আসলে ওদের মত ক্ষণিকের জন্যও শ্রীময় হয়ে উঠতে চাইছি। অনুভব করতে চাইছি নিজের অস্তিত্বকে। যদিও জানি, আমার অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মৃত্যু। এবং মৃত্যু অদৃশ্য শরীর নিয়ে সেই
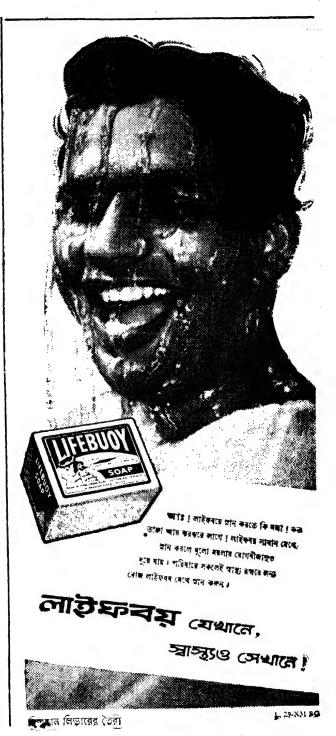
অন্তিম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষমাণ, যখন আমাকে অসহায় বালকের মত তার কাছে সমর্পিত হতে হবে। কিন্তু জানি না, জীবনে কখন আসবে সেই অন্তিম মুহূর্ত। এবং হয়ত একারণেই মানুষ ক্ষণিক উজ্জ্বলতা ভালবাসে।

অমল চা শেষ করে পেয়ালাটা ঠেলে সরিয়ে রাখল। বেয়ারা এলে তার হাতে চায়ের দাম তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর রাস্তায় পা দিয়েই বিব্রত বোধ করল। মনে পড়ল, বাবার শরীর ক্রমশ শীতল হয়ে আসছে। মীরা তাকে ডাক্তার ডেকে আনতে বলেছে। অথচ সে এতক্ষণ রেস্তোরাঁয় অনায়াস ভঙ্গীতে বসে রইল! সামান্য তাপের জন্য চায়ে চুমুক দিল। অমল বিস্মিত হল। বাবার কথা, কি করে এত সহজে সে ভুলে গেল, ভেবে পেল না।

আলোকিত রাস্তায় অমলের মুখ বিবর্ণ হয়ে এল। তারপর অস্থির ভঙ্গীতে হাঁটতে হাঁটতে এক পরিচিত ডাক্তারখানার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল।

অমলকে দেখেই ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর?

অমল দাঁড়িয়ে রইল। কিভাবে খবরটা দেবে, তা ঠিক করে উঠতে পারল না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তার অমলকে নীরব দেখে কপাল কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন, আপনার বাবার শরীর ভাল ত?

অমল এবার জবাব দিল, অবস্থা খুব খারাপ।

—কি হয়েছে?

—গা হাত পা কিরকম ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। শীগ্‌গির চলুন।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। ডাক্তারী ব্যাগের মধ্যে দরকারী ওষুধপত্র পুরে নিয়ে রাস্তায় নেমেই বললেন, চলুন।

অমল ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে জোরে হাঁটবার আপ্রাণ চেষ্টা করল।

তারপর বাড়ির কাছে এসেই অনুভব করল, বাবা হয়ত এতক্ষণে মারা গেছেন। আর সেই মুহূর্তে তার গোটা শরীর সংকুচিত হয়ে এলো। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল। সারাজীবনে সে এই ঘটনাটি কখনোই বিস্মৃত হবে না যে, বাবার শরীর যখন শীতল হয়ে আসছে, কিছুক্ষণ পরেই মারা যাবেন, সে তখন মীরার অনুরোধে ডাক্তার ডাকতে গিয়ে অনায়াসে রেস্তোরাঁয় ঢুকে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়েছে। মীরার কাছে না হলেও নিজের কাছে চিরকাল অপরাধী থেকে যাবে। অমল এই কারণে এই মুহূর্তেই কেবলমাত্র একবারের জন্যও বাবার জীবন কামনা করল।

ঠিক পরমুহূর্তে যখন বাড়ির নীল দরজার মুখোমুখি হয়েছে, অমল কেঁপে উঠল। কাছেই, চেয়ে দেখল, একজন পুলিশ ঘোরাফেরা করছে। পরণে কালো কোট। মাথায় লাল টুপি। লাল এবং কালোর তীব্র বিরোধিতা অমলের মধ্যে ত্রাশ সঞ্চার করল।

কোনমতে বাড়ির ভিতরে ঢুকে কয়েকবার শ্বাস ফেলল জোরে জোরে। শান্ত হতে চাইল।

তারপর ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে চাইল খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গীতে পা ফেলে ফেলে। ঠোঁট কামড়ে যাবতীয় ভয় ও উত্তেজনা থেকে নিজেকে সামলে নিতে চাইল। বাবা জীবিত আছেন, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পা ফেললো। আর ফেলেই সে আশ্চর্য হলো, কেননা বাবা তখনো জীবিত আছেন। এতে সে আনন্দিত না দুঃখিত তা বুঝে উঠতে পারল না।

ডাক্তার চেয়ারে ব্যাগ রেখে দিয়ে রুগীর হাত ধরে নাড়ী পরীক্ষা করলেন। তারপর হাত ছেড়ে দ্রুত ব্যাগ খুলে সিরিঞ্জে কোরামাইন ঢেলে বাবার উরুতে বড় সূচ গেঁথে দিলেন।

মীরা সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। অমলও তাই দেখছিল, হয়ত অন্য কিছু এখন দেখা উচিত নয় বা দেখা সম্ভব নয় বলে। মীরাকে উত্তেজিত মনে হল। ডাক্তারবাবুকে কম উত্তেজিত দেখাল। যদিও যাবতীয় কাজগুলি তিনি উদ্বেগ নিয়ে করে গেলেন। কিন্তু ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরমুহূর্তে তাঁকে কেমন শান্ত দেখাল। নিরুদ্বেগ মনে হল। আর আশঙ্কা নেই, এ রকম ভাব তাঁর চোখে-মুখে দীপ্ত হয়ে উঠল।

ব্যাগ গোছাতে গোছাতে অমলকে সঙ্গে যেতে বললেন। ওষুধ দেবেন। তারপর দ্রুত রাস্তায় নেমে বললেন, আর পাঁচ মিনিট হলেই রুগী মারা যেত।

অমল চুপ করে শুনল। ডাক্তারবাবুও আর কিছু বললেন না।

ডিসপেন্সারীতে এসে তিনি এক প্রেশক্রিপসন লিখে দিলেন। এবং সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন বারবার, কখন কোনটা খাওয়াতে হবে।

কাছের এক দোকান থেকে দ্রুত ওষুধ কিনে অমল হন হন করে বাড়ি ফিরে এল। মীরার হাতে সেগুলো তুলে দিলো। বুঝিয়ে দিলো ডাক্তারের নির্দেশ। তারপর চলতে চলতে নিজের ঘরে এসে চেয়ারে গোটা শরীর মেলে দিল। চতুর্দিকের নিরবয়ব অন্ধকারে চোখ দুটো বোজাল। তারপর ভাবল, আজ ঘটনাটা অন্য রকম ঘটল না কেন? আর, মাত্র পাঁচ মিনিট বেশী সে রেস্তোরাঁয় বসে থাকতে পারল না? কেন তার বিস্মৃতি আর কিছুক্ষণ স্থায়ী হল না? হলে, ক্রমশ এভাবে নিজেকে নিভে যেতে দিত না। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকম ঘটে গেল। অনায়াসে ঘটে যেতে দিল। আগামীকাল পুনরায় আজকেরই মলিন পুনরাবৃত্তি ঘটবে। নতুন কিছু আর ঘটবে না।

এ সময় অমল অনুভব করল, মীরার হাত তার শরীর স্পর্শ করেছে।

অমল চোখ মেলে মীরার দিকে তাকাল। অন্ধকারে মীরার শরীর ছায়ার মত মাংস-মেদ-মজ্জাহীন বলে মনে হল। মীরা মৃদুস্বরে বলল, চল, খাবে চল।

অমল চুপ করে বসে রইল। যেন কথাটা শুনতে পেল না।

মীরা পুনরায় বলল, কই চল।

অমল এবার ফিসফিস করে বলল, আমি আজ মারা যেতাম মীরা।

মীরা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছিল?

—তখন রাস্তায় বেরিয়েই শরীরটা কেমন নড়ে উঠল। আর একটু হলেই পড়ে যেতাম। খুব বেঁচে গেছি।

মীরা অমলের কপালে কিছুক্ষণ হাত রেখে বলল, শরীর খারাপ হয়েছে দেখছি।

অমল এ সময় চকিতে চেয়ার ছেড়ে মীরার শরীরের নিকটতম প্রান্তে এসে বলল, মীরা সময় হয়ে আসছে। খুব বেশী দিন আর বাঁচব না।

মীরা চমকে আহত গলায় বলল, কি যা তা বলছ?

অমল মীরার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। যেন স্বগতোক্তি করছে এ রকম স্বরে পুনরায় বলল, তবে, শুধু আমার নয়, তোমারও সময় হয়ে আসছে। তুমি দেখতে পাও না। আয়নার ভাল করে নিজের মুখ যদি কোন দিন দেখ, তাহলে বুঝতে পারবে।

অমলের কথা শুনে মীরা যেন এই প্রথম দেখতে পেল তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তার সমস্ত অস্তিত্ব কেঁপে উঠল। টলে উঠল তার শরীর। অমল মীরাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল।

তারপর তারা নিরবয়ব নির্মল অন্ধকারে প্রাচীন ভগ্ন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। যেন, অন্তিম ধ্বংসের অপেক্ষা করছে।
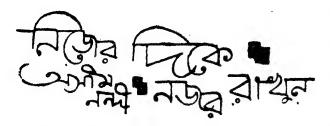
মানুষের মনের অস্বাভাবিকতা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়। মনোবিকলন এই গবেষণা নিয়ে মশগুল। তারা মানুষের মন, ব্যবহার, হাব-ভাব নিয়ে চুলচেরা বিচার করে। রায় দেয়—এই এই ব্যবহার স্বাভাবিক। আর তার থেকে এক পা এধার ওধার হলে রক্ষে নেই। বললে, বিকৃতি এল। স্বাভাবিকতা আর রইল না। অস্বাভাবিকতা এল। মোদ্দা কথায় স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক মানুষের তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু মোটা তফাতের বাইরে গেলে, খুব বিপদে পড়তে হয়। মনোবিকলন তাই বলে সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় সব মানুষের মধ্যেই অল্প-বিস্তর অস্বাভাবিকতা লুকিয়ে আছে। যেমন ধরা যাক গর্ব বা দম্ভ প্রকাশ করা। আমরা হামেশাই করে থাকি। অনেক সময় সচেতন ভাবে, কখনও বা অচেতন ভাবে। কিন্তু আমরা কোনদিন তলিয়ে বিচার করে দেখি না যে, ক্রমাগত দম্ভ প্রকাশ চরিত্রের অস্বাভাবিক রীতিকে জাহির করে। খেয়াল হয় বেশ কিছু পরে। তখন বন্ধু-বান্ধব ক্রমাগত আত্মম্ভরিতা সইতে না পেরে সরে যায়। আত্মীয়-স্বজন মুখ ফিরিয়ে নেয়। গর্বের জন্য খর্ব হই লোক-সমাজে। খেয়াল হয় তখন।

প্রত্যেক মানুষের বিকাশের বিশেষ ধারা আছে। সামাজিক মানসিক পোষণ পদার্থ তার দরকার। তা ভিন্ন বিকাশ অসম্ভব। যেমন প্রত্যেক মানুষ চায় নিজেকে প্রকাশ করতে। তার চিন্তা-ভাবনার যে বিশেষ মূল্য আছে এ কথা সে যেমন নিজে বুঝতে চায়, তেমনি বোঝাতে চায় অন্য লোককেও। সে চায় স্বীকৃতি। মানুষের বিকাশের জন্যে এই স্বীকৃতি বিশেষ প্রয়োজন। তা ভিন্ন নিজের প্রতি বিশ্বাস আসে না। যে মানুষ নিজেকে নিতান্ত মূল্যহীন বলে ভাবতে সুরু করলো সে জীবনের কাছ থেকে কি স্বীকৃতি আশা করতে পারে? কিছুই না। তাই গোটা জীবনটাই অর্থহীন হয়ে ওঠে।

এই স্বীকৃতি চায় এমন কি শিশুরা। তারা চায় বাড়ীর অন্য সব লোক তাকে আদর যত্ন করুক, তার কদর বুঝুক। তাই তাকে বাহবা দিতেই হবে। এই স্বীকৃতি না পেলে তার বিকাশ রুদ্ধ হতে পারে। সে নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে বিমর্ষ হয়ে একা একা থাকতে পারে। পরবর্তীকালে এই আঘাত তার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে জখম করতে পারে। হয় সে হতাশ বিফল মানুষ হিসাবে বড় হয়ে উঠবে অথবা তার মধ্যে জাগবে স্বীকৃতি, অশোভন ও উদগ্র কামনা। বলা বাহুল্য, বিকাশের এই দুই ধারা সমানভাবে অস্বাস্থ্যকর।

গর্ব বা দম্ভ প্রকাশ কখন করি? যখন দেখি যে, জীবন বা সমাজের কাছে আমার ধারণা অনুযায়ী যতখানি প্রাপ্য ছিল, ঠিক ততখানি পাচ্ছি না, তখনই আমরা গর্বের আশ্রয় নেই। কেন না আমরা মনে করি যে নীরব অবহেলা আমরা সহ্য করছি তা ভেঙে যাবে যদি আমি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি। তাই গর্ব বা দম্ভ প্রকাশের মূলে নেই অহংকার কিম্বা আত্মসম্মান বোধ। বরং ঠিক তার উল্টোটাই আছে। তা হল কাঙালপনা এবং আত্ম-অবমাননা। বাচ্চাদের উদাহরণ দিয়ে বড়দের কথা ভাল বোঝান যাবে। বাচ্চারা মায়ের আদর পাবার জন্য অকারণ কাঁদে। সে মনে করে মায়ের কাছ থেকে যতখানি স্নেহ ও যত্ন তার পাওয়া উচিত ছিল ঠিক ততখানি সে পাচ্ছে না। তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে। রাতদিন ঘ্যান ঘ্যান সহ্য না করতে পেরে চড়-চাপড়ের সংগে একটু বেশী স্নেহও পেয়ে থাকে। বড়দের অহংকার বা গর্বপ্রকাশ মনোগত অভিলাষের দিক থেকে ঘ্যান-ঘ্যানে বাচ্চাদের সমতুল্য। কাঁদতে তারা চায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। চায় লোকে তাকে দেখুক, প্রশংসা করুক।

অবশ্য আকাঙ্ক্ষা হিসাবে নিন্দার কিছু নেই। কারণ অজ্ঞাত হয়ে, অবহেলিত হয়ে থাকতে চায় না। জন সমাজে প্রতিষ্ঠা চায় সবাই। সবাই চায় আত্মপ্রকাশ করতে, বিকশিত হতে। এ নিতান্তই মানবিক প্রবৃত্তি। তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা চলবে না। সেজন্য গর্ব বা অহংকার প্রকাশ করা যদি কারো কাছে আত্মপ্রকাশের গ্রহণীয় পথ হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে কিছু বলার নেই। অবশ্য যদি সেই গর্ব বা অহংকার প্রকাশ সভ্যতা-ভব্যতার গণ্ডী না ছাড়িয়ে যায়। ছাড়িয়ে গেলেই বিপদ।

আমাদের আশে পাশে এমন কত লোক আছে। আপনার অফিসেই দেখতে পাবেন এই ধরণের লোক। অফিসের কাজে খুব সুবিধা করতে পারছেন না। বড়-বাবুরা খুব পছন্দ করেন না। আপনি নিজেও দেখেছেন ভদ্রলোক খুব চল-সই নয়। কিন্তু তার মুখের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য। নিজের ঢাক পেটাবার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। বাড়ীতে সেই ভদ্রলোকের হম্বি-তম্বিতে স্ত্রী পুত্র শঙ্কিত। কিন্তু এই অশোভন আত্মপ্রচারে তার কি কোন সুবিধে হয়? হয় না। ভদ্রলোক যদি একটু চিন্তা করেন তবে তিনি নিজেও বুঝবেন যে এতে হিতে বিপরীত হচ্ছে। সহকর্মীরা তাকে করুণা করতে সুরু করেছেন। অফিসারেরা নির্বিকার। পাড়া-পড়শী একঘেঁয়ে ঘ্যানঘ্যানানিতে বিরত। স্ত্রী পুত্র অস্থির। অন্তত অশোভনভাবে

অহংকার প্রকাশ করার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়।

বন্ধুবান্ধব বিরত হলেও কিন্তু ভদ্রলোক এক ধরণের তৃপ্তি পান। সে তৃপ্তি কল্পনায়। তিনি মনে করেন যে, যে অবিচার তার ওপর করা হচ্ছে তিনি তার প্রতিবাদ করতে পেরেছেন। যেমন ভাবে তাকে চিত্রিত করা হয়েছিল, তিনি ভাল-ভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই কাল্পনিক আনন্দে তার মানসিক শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু এও সত্য নয়। এ যে দিবাস্বপ্ন। এ ভেঙ্গে যেতে কতক্ষণ। সামান্য আঘাতেই ভাঙে। কারণ তিনি ত বাস্তব জীবনে তার মূল্য ও অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাই সাময়িক দিবাস্বপ্নের আনন্দ পরবর্তীকালে গভীর ক্ষোভের কারণ হয়ে ওঠে। পৃথিবী তার প্রতিপক্ষ। প্রতি পদে নিজের অসহায়তা বোধ করতে থাকেন।

আর তাই অহংকার প্রকাশ করার ভঙ্গী তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। তার থেকে আসে মানসিক ব্যাধি—যার নাম আত্মরতি, সানরিসিজম। নার্সিসাস নিজের প্রেমে পড়েছিল। জলার ধারে নিজের মুখ দেখতে দেখতে শুকিয়ে গেল সে। এ গ্রীক পুরাণের কথা। অতিরিক্ত অহংকারের অনিবার্য ফল নার্সিসিজম। বিশ্বভুবনের দর্পণে নিজের মুখ ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না। এই আত্ম-মগ্নতায় কি পাওয়া যাবে? কবি সাহিত্যিকরা এই কথা শুনে মারমুখী হবেন। কারো কারো মতে একেবারে নিজের গভীরে যেতে না পারলে বিশুদ্ধ কবিতা নাকি লেখা যায় না। কিন্তু কবিতা সাহিত্যের কথা থাক্। আমরা সাধারণ মানুষ। খাটি, খাই। সমাজ সংসারের সংগে আমাদের বনিবনা করে থাকতে হয়। আত্মীয়-পরিজনের মন যুগিয়ে চলতে হয়। অফিসে বড়বাবুদের কটু কথা শুনেও হজম করতে হয়। মুখের ওপর ফাইল ছুঁড়ে ফেলার সাহস নেই।

সংক্ষেপে এই যাদের অবস্থা তাদের কাছে নার্সিসিজম কিন্তু ঘোড়া-রোগ। অসাধারণ লোকদের পক্ষে যা প্রতিভার অঙ্গ সাধারণ লোকদের কাছে তা বিষ।

অহংকার প্রকাশের রীতি ভিন্ন। এই প্রকাশ কখন সোচ্চার। এখন সোচ্চার প্রকাশকে সহজে বুঝতে পারি। এই আত্ম-শ্লাঘা কখন গায়ে মাখি কখন মাখি না। কখন মানি কখন মানি না। কখন শুনি কখন শুনি না। কারণ এই প্রকাশের মধ্যে কোন গোপনীয়তা নেই, বুদ্ধির বালাই নেই।

কিন্তু যাঁরা নীরবে অহংকার প্রকাশ করে থাকেন তাঁরা আরও মারাত্মক। কারণ এ প্রকাশ শুধুমাত্র রসনায় নয়, সর্বাঙ্গে। হাবেভাবে, চালচলনে, কথায় বার্তায়, আকারে ইংগিতে, এক কথায় লোকটির ব্যক্তিত্বের প্রতি পরতে পরতে এই নীরব অহংকার মুখর হয়ে বাজে। কারণ যদি খুঁজতে চান, তবে ঠিক একই জায়গায় আসবেন। দেখবেন ভদ্রলোকটি এ কথা বুঝেছেন যে সাধারণ সমাজ তার মূল্য বোঝেনি, তার প্রাপ্য তাকে দেয়নি। তাই তিনি নিজের ঢাক পিটিয়ে কাঙালপনা প্রকাশ করতে চান না। বরং তিনি সমাজকেই করুণা করে যাবেন।

অতি-বিনয় আর এক ধরণের অহংকার। বিনয় জিনিসটা ভাল। কিন্তু অতি-বিনয় হলে খারাপ। অতি-বিনয়ের মধ্যে থাকে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। মানসিকতার দিক থেকে অতি-বিনয় আরো নিন্দনীয়। কারণ অহংকার করে সোচ্চার আত্ম-প্রকাশের মধ্যে যে অহং-বোধ কাজ করে তা বরং মানুষের ব্যক্তিত্বকে নাড়া দেয়, কিন্তু অতি-বিনয়ী ভদ্রলোকদের অহং-এর সেই জোরটুকু অবধি নেই। মেরুদণ্ডহীন এই অস্তিত্ব একান্ত করুণার।

গর্ব প্রকাশ করা মানুষে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে যদি ঠিক পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে আটকে না রাখা যায় তবে তা চরিত্রকেই ধ্বংস করে। তাই সময়ে নিজের দিকে নজর রাখুন।

জনৈক আমেরিকান লেখক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—'মাঝে মাঝে বাবা ঠিক করতেন, তাঁর অফিস আমাদের তিন ভাইয়ের স্কুল, মা-র ওপর বড্ড চাপ দেওয়া হচ্ছে। তিনি আমাদের শহরের বাইরে নিয়ে যেতেন। নদীর ধারে একটা পুরনো ধরনের বাংলো ভাড়া করা হতো।

সেখানে আমাদের শহরের বাড়ীর মতো আধুনিক বিলিব্যবস্থা ছিল না। বাবা বলতেন, এবার তোমার মা একটু বিশ্রাম করতে পারবেন।

সকালে উঠে মা কেরোসিনের সেকেলে স্টোভ জেলে আমাদের ব্রেকফাস্ট তৈরী করতেন। তারপর তিন মাইল দূরে বাজার করতে যেতেন। লাঞ্চ বানাতে, কাপড় কাচতে, ইস্ত্রী করতে তাঁর তিনটে বেজে যেত। চারটের সময় আমাদের নিয়ে বাবা নদীতে নৌকো চড়তেন। মা বারান্দায় টেবিলে খাবার সাজিয়ে বসে সন্ধ্যা হবার আগে ছেঁড়া মেরামত মোজা সেলাই এবং রিপু করতেন।

তাই দেখে বাবা বলতেন—'আঃ, তোমার মা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আলসেমি করতে পারছেন, দেখে আমার যা আনন্দ হচ্ছে!'

• যাঁরা কেরিআর করেননি তাঁরা গল্পটি উপভোগ করবেন।

পঞ্চাশ বছর আগে, গৃহিণীরা গৃহ নিয়ে থাকতেন। তাঁদের কর্তব্যও ছিল মাপাজোকা। সেলাই ফোঁড়াই, ছেলেদের পড়ানো, স্বামীর কর্মচিন্তার ভার নেওয়া, দোকান-বাজার করা, এ তাঁরা ভাবতে পারতেন না। মধ্যবিত্ত সংসারের অবস্থা একটু স্বচ্ছল হলেই ঝি-চাকর থাকত। রান্নার দিকটা দেখা ছাড়া গৃহিণীরা খুব বেশী কিছু করতেন না। যাঁরা বই পড়তেন, কাগজ পড়তেন, তাঁদের খুব নাম হ'তো। আজকাল গৃহিণীদের নাম হওয়া ভার।

অথচ কেরিআরটা বাইরে থেকে যাঁরা ঘরে এনেছেন, অর্থাৎ যাঁরা শুধু ঘর-সংসার করছেন, তাঁদের দায়িত্ব আজকাল অনেক বেড়ে গিয়েছে।

যাঁরা বাইরে কাজ করেন, স্বামী-সন্তান ও সংসারের কাছে তাঁদের অনেক রেহাই মেলে। বাইরেই যার আট ঘণ্টা কাটে, সে কেমন করে এ সব করবে, এ কথা সকলেই বলেন।

যাঁরা কাজ করেন না, তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা, চিঠি লিখে তাঁর অবস্থা জানিয়েছেন।

তিনি বলছেন—'আমি আই-এ পাশ। আমার স্বামীর আয় মাসে চারশো টাকা। আমার সন্তান দুটি। একটি মেয়ে, একটি ছেলে। দুটিই স্কুলে পড়ে। আমার বয়স আটাশ। সাত বছর হলো বিয়ে হয়েছে।

দিনদিন, আমি অনুভব করছি, জীবনের গতিবেগ বেড়ে চলেছে অসম্ভব দ্রুত লয়ে। এবং হঠাৎ আমি আবিষ্কার করছি, আমাকে একলা একসঙ্গে অনেকগুলো ভূমিকায় অভিনয় করতে হচ্ছে। তাই এই অদ্ভুত অনুভূতিটা হচ্ছে। সময়টা যেন আমি হারিয়ে হারিয়ে ফেলছি। সকাল ছ-টায় উঠতে না উঠতে দেখি দশটা বেজেছে। আবার ভাত খেয়ে উঠতে না উঠতে দেখি বিকেল চারটে বাজল।

আমার কার্যসূচীটি শুনুন। তাহলেই আমার কথাটা বুঝবেন।

কাগজে মেয়েদের পাতা খুলে দেখেছি, যাঁরা ঘরে থাকেন, তাঁদের জন্যে হাজারটা নির্দেশ। আমাদের জন্যে যে কতগুলো ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার হিসেব নেই।

এতদিন আমি মা এবং স্ত্রী, এই দ্বৈত ভূমিকায় নামছিলাম। কিন্তু যুগটাই হচ্ছে স্পেশলাইজেসনের। তাই এই সব ভূমিকার মধ্যে নানারকম নতুন ব্যাখ্যা আমদানী করা হয়েছে।

সংসারের তত্ত্বাবধায়িকা হিসেবে আমি কি কি কাজ করি দেখুন। আমি দুধের বাহক। কেননা ভোর ছটায় উঠে হরিণ-ঘাটার সেণ্টারে লাইনে দাঁড়াই। ফিরতি-পথে টাটকা ডিম-রুটি এবং দরজার গোড়া থেকে খবরের কাগজ আনা আমার কাজ।

স্টোভ ধরিয়ে দুধ বসাই। ডিম সেদ্ধ করি। ওদিকে মেয়েকে ঘুম থেকে ওঠার জন্যে ডাকি। আমার স্বামী আমাকে শিশুদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে শিখিয়েছেন। তাই, মনে ঘা লাগবে বলে আমি জোরে ডাকি না। মিষ্টি করে ডেকে তুলি।

তাকে তৈরী করে স্কুলে পাঠাতে না পাঠাতে আমার ঝি আসে। তাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আমি স্বামী এবং ছেলেকে তুলি।

'আপনার কাজের মধ্যে অনাবশ্যক ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়োর ভাবটি যেন না বোঝা যায়। আপনার স্বামীর সামনে সারাদিনের ব্যস্ততা। ট্রাম-বাস ধরবার তাড়া, অফিসে কাজের তাড়া—বাইরে যারা কাজ করে, অসুস্থ একটা দ্রুতগামিতা তাদের ব্যস্ত করে রাখে। মনে রাখবেন, আপনিই হচ্ছেন আপনার সংসারের প্রেরণার উৎস।'

সে কথা মনে রাখি। তাই, স্বামী এবং ছেলেকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট শুরু করবার সময়ে ঘড়ির দিকে না তাকাবার চেষ্টা করি। খবরের কাগজ থেকে স্বামী কি যেন খবর শোনান, আমার কানে অর্ধেক যায়, অর্ধেক যায় না। আমি কোনমতে চা-এর পেয়ালা নামিয়ে রেখে বাজারে ছুটি।

বাজারে জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। আমি তারই মধ্যে গুছিয়ে বাজার করে কোনমতে সামনের বাসটা ধরে ফেলি। স্বামী বলেন—এক স্টপ আসতে বাস দরকার হয়? বাঙালীর মেয়েরা—!

জবাব দিই না। কেননা তখন রান্নার ব্যবস্থা কুলিয়ে দেওয়া, স্বামীর দাড়ি কামাবার গরম জল, অফিসের জামা-কাপড়, শার্টটা একটু ইস্ত্রী করে দাওনা লক্ষ্মীটি, মা আমার বাস আসবে এক্ষুণি, ছেলের জামাকাপড়, ভূগোল

খাতা হারিয়ে গেছে, টিফিনে আজ-ও কমলালেবু? দিদিমণি, মাছের ঝোল পুড়ে গেল, আমার অফিসের ফাইলটা কোথায়?—সব একটার ওপর একটা হুড়-মুড় করে এসে পড়ে।

ন-টা বাজে। এখন বাড়ীতে শুধু আমি এবং আমার ঝি। ঘরদোর দেখলে কান্না পায়। ঘর-দোর পরিষ্কার করি। সাবান দিয়ে জামাকাপড় ভেজাই। কেননা, সিনেমাতে অতি সহজে জামাকাপড় কাচবার নিয়ম দেখে দেখে আমি এবং আমার স্বামী দুজনেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছি ধোপার খরচটা নেহাত বাড়তি। আমিই এখন ধোপা। এই ভূমিকাটা আমাকে কম সময় আটকে রাখে না। তারপর রান্নার বাকি পর্ব সেরে আমি কোনমতে বিকেলের খাবারটা গোছাই। স্নান করে উঠতে না উঠতে দেখি ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজল।

ছুটি মেয়ের ইস্কুলে। সেখানে যে-সব মা-দের দেখি, তাঁদের কি সুখী, শান্ত, গোছালো ভাব। আমি বুঝতে পারি আমার মুখে পাউডারের ছোপ। আমার হাতে হলুদের দাগ।

বাড়ী ফিরে খেয়ে নিতে না নিতে ইস্ত্রী করতে শুরু করি।

তারপর আবার ঝি আসে। স্কুল থেকে ছেলে। মেয়ের সি-এল-টি। ছেলের ফুটবল ক্লাব। স্বামী আসবার আগে গা ধুয়ে সুখী সুখী চেহারা করে বসে থাকি। কেননা 'মনে রাখবেন, আপনার স্বামী সারাদিন পর আপনার গোমড়া মুখ দেখতে চান না।'

তারপর 'যখন স্বামীর সঙ্গে বেড়াবেন, সঙ্গিনী বা বান্ধবীর মতো তাঁকে বন্ধুত্বের আনন্দ পেতে দেবেন'—তা-ও চেষ্টা করি।

'স্বামীকে নতুন নতুন কাজে প্রেরণা দেবেন। হয়তো আপনার স্বামী একটা নতুন কাজের ঝুঁকি নিতে চান। নতুন চাকরি, নতুন ব্যবসা, তাতে আপনি আমার কি হবে, এই বলে বাধা দেবেন না, বরঞ্চ উৎসাহ দেবেন।'

তা-ও করি। স্বামী যখন রেডিও খুলে বসে ঝিমোন, আমি বলে দেখেছি—কেন এক কাজ নিয়ে পড়ে আছ? নতুন কিছু কর। পুরুষমানুষের সাহসী হতে হয়।—দেখেছি তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না। বিরক্ত হন।

আমাকে সংসারের অফিস এ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করতে হয়। পোস্টাফিসে ছোটা, চিঠিপত্র লেখা, ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেওয়া, জন্মদিন, বিয়ে, অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ, হাজারটা অনুষ্ঠানের খোঁজ-খবর রাখা সে-ও আমার-ই কাজ।

আজকাল কেউ গরম-জামা কিনে পরে না। তাই শীতকালে আমার হাতে উলকাটা, গরম কালে ছুঁচ-সুতো। কেননা বোতাম লাগানো, ছেঁড়া মেরামত করা, রিপু করা এসব-ও আমার-ই কাজ।

আশ্চর্য কি, যে এর-ও পরে আমি ইলেকট্রিক বিল, হরিণঘাটার দুধের টাকা, ছেলেমেয়ের ইস্কুল, ক্লাব, সি-এল-টি'র টাকা সময়মতো দিতে ভুলে যাই?

আশ্চর্য কি, যে হঠাৎ যখন স্বামীর বন্ধুপত্নী বেড়াতে এসে কিউবার রাজনীতি, লুমুম্বা হত্যার অবিচার বা গাগারিণকে নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য করতে থাকেন, তখন আমি বোকার মতো চেয়ে থাকি? সত্যি বলতে কি কাগজ পড়বার সময়ই পাই না। ছেলের কাছ থেকে টুকরো-টাকরা খবর জেনে নিই। সে শুধু খেলার খবর শোনায়। রাজনীতির চেয়ে খেলার খবরটা তবু আমি মনে রাখতে পারি।

কি কি পারি না—মহিলা সমিতির সংগঠনের কাজ করতে পারি না। কোন চ্যারিটির টিকিট বিক্রি করতে পারি না। পাড়ার লাইব্রেরীর জন্যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী করতে পারি না। এবং শুনতে হয়—কি করেন? সারাদিন ত' ঘরেই থাকেন!

ঘরে যারা থাকার, তারা যে এক হাজার এক রকম ভূমিকায় কাজ করে চলবে এ ধারণা জন্মিয়েছেন বিলেত ও আমেরিকার মেয়েরা। বিলিতী ম্যাগাজিনের কল্যাণে তাঁদের কথা সবাই জানে, আর মনে মনে আশাও বাড়তে থাকে। আমাদের সম্পর্কে।

এদেশেও কেউ কেউ আছেন। পাশের ফ্ল্যাটের মহিলারা যদি চারটি ছেলেমেয়ে সামলে টবের বাগান, দেয়ালে ফ্রেস্কো করবার সময় পান, স্বামীকে দরকারী ইনজেকশান দিতে শেখেন, তাতে-ও আমাদের অনিষ্ট হয়।

ছেলেমেয়েদের কাছেও কথা শুনতে হয়। দীপান্বিতার মা রেডিওতে গান করে। সত্যব্রত-র মা ওয়েলফেয়ার অফিসার। বিশ্বপ্রিয়-র মা লেডি ডাক্তার, নিজে গাড়ী চালিয়ে আসেন।

ভাবছি এবার একটা চাকরি নেব। কেরিআর করিনি বলে এত কথা আর শোনা যায় না।

॥ জাতীয় অধ্যাপক ॥

রেডিও-ফিজিক্সের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক-বিজ্ঞানী অধ্যাপক এস. কে. মিত্র পদার্থ-বিদ্যার জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রক এই জাতীয় অধ্যাপক পদের স্রষ্টা। ১৯৪৯ সালে ডঃ সি. ভি. রমণ সর্বপ্রথম জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার পর এ পর্যন্ত অধ্যাপক মিত্রকে নিয়ে মোট ছয়জন বিজ্ঞানীকে জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হল। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা যাতে তাঁদের সমস্ত সময়টুকু গবেষণার কাজে দিতে পারেন এবং প্রয়োজনমত ভারতের যে-কোন গবেষণাগারে গিয়ে গবেষণা করতে পারেন তারই জন্যে এই জাতীয় অধ্যাপক পদের সৃষ্টি করা হয়। জাতীয় অধ্যাপকরা ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক, একারণে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্রেরাও প্রয়োজনমত তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবেন।

অধ্যাপক মিত্রের এই স্বীকৃতি ও সম্মানে বাঙালী মাত্রেই গর্বিত।

॥ বিনা টিকিটের যাত্রী ॥

সংবাদে প্রকাশ, উত্তর রেলপথের কর্তৃপক্ষ বিনা টিকিটের যাত্রী ধরার উদ্দেশ্যে একদিন ট্রেনের বিভিন্ন শ্রেণীর কামরায় অতর্কিত হামলা চালিয়ে যাদের গ্রেপ্তার করেন, দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে বিনা টিকিটে ভ্রমণরত একজন ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে শিক্ষক, ছাত্র, রেল কর্মচারী, পুলিশের লোক প্রভৃতি সব ধরনের লোকই আছেন।

লক্ষ্ণৌর সাংবাদিকদের কাছে ঘটনাটি বর্ণনাকালে ডিভিশনাল কমার্শিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেন, রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আজ এইটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা যে, সমাজের ওপরতলার লোকেরাই এখন বেশী করে বিনা টিকিটে ট্রেনে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন। তাঁদের তুলনায় গ্রামের লোকেরা এখন অনেক বেশী সৎ।

বিনা টিকিটের যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া ও ফাইন আদায় করে উত্তর রেলপথের কর্তৃপক্ষ গত মাসে ৬৭ হাজার টাকা আদায় করেছেন।

॥ শ্রেষ্ঠ দান ॥

মধ্যপ্রদেশের দুর্গ জেলার মানিয়ারি গ্রামের এক দরিদ্র অধিবাসী ছিন্দ্রম
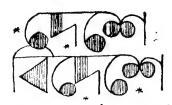
হাজার খানেক টাকা ব্যয়ে সদ্যনির্মিত তাঁর কুটিরখানি গ্রামের পাঠশালাকে দান করে দিয়েছেন। গ্রামের শিশুদের একমাত্র শিক্ষালয়টি এতদিন একটি আস্তাবলে ছিল, ছিন্দ্রমের মহানুভবতায় এবার তার কুটিরে স্থানলাভ হল। কিন্তু নিরাশ্রয়ী হতে হল ছিন্দ্রমকে।

॥ দণ্ডদান ॥

টেমস নদীর তীরে অবস্থিত বৃটেনের ঐতিহাসিক দুর্গ টাওয়ার অব লণ্ডন। বিজয়ী উইলিয়ম দশম শতাব্দীতে নির্মাণ করেন এই বিশাল দুর্গ এবং সেই থেকে প্রথম জেমসের শাসনকাল পর্যন্ত টাওয়ার অফ লণ্ডনই ছিল ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদ। এখনও ইংলণ্ডের রাজশাসনের সঙ্গে টাওয়ার অফ লণ্ডনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

শোনা যায়, টাওয়ার অফ লণ্ডনের নির্মাণের দিন থেকেই সেখানে বংশ-পরম্পরায় বাস করছে কয়েকটি অদ্ভুত-দর্শন বৃহদাকৃতি দাঁড়কাক। একদিন বিশেষ উদ্দেশ্যেই ওদের টাওয়ারে স্থান দেওয়া হয়েছিল। সে উদ্দেশ্যটি হ'ল খাদ্য পরীক্ষা। কোন ষড়যন্ত্রকারী রাজার খাদ্যের সঙ্গে কোন কৌশলে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে কিনা তা দেখার জন্য রাজাকে পরিবেশনের প্রাক-মুহূর্তে যাবতীয় খাদ্য ঐ দাঁড়কাকগুলিকে খাইয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া হ'ত। একারণে এখনও ঐ দাঁড়কাকদের প্রধান খাদ্য মাংস। সহস্রাব্দব্যাপী দুর্গাশ্রয়ী ঐ দাঁড়কাকগুলিকে নিয়ে বহু কিংবদন্তী ও কুসংস্কার গড়ে উঠেছে ইংলণ্ডে। তার মধ্যে একটি হল যে, ইংলণ্ডের রাজমুকুটের অভিভাবক ওরা, ওরা উড়ে গেলে রাজমুকুটও ভূলুণ্ঠিত হবে। একারণে সরকার থেকেই বিশেষ পরিচর্যার ব্যবস্থা আছে ঐ দাঁড়কাকদের। কিন্তু সম্প্রতি অসদাচরণের জন্য কর্তৃপক্ষ ওদের দণ্ড দিতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমানে টাওয়ারবাসী সাতটি দাঁড়কাককে চোদ্দ দিন খাঁচাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারা টাওয়ারের প্রাঙ্গণে কিছুতেই নতুন ঘাস গজাতে দিচ্ছিল না। নতুন করে ঘাসের বীজ বপন করলেই ওরা মাটির তলা থেকে তুলে সেগুলি খেয়ে ফেলছিল। কর্তৃপক্ষের আশা, রাজমুকুটের অভিভাবকদের খাঁচার মধ্যে চোদ্দ দিন আটকে রাখতে পারলে সেই অবসরে ঘাসগুলো বেড়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। তবে অভিভাবকদের পরিচর্যার কোন ত্রুটি হবে না, বন্দী অবস্থাতেও তাদের মাংস সরবরাহ করা হবে।

॥ দণ্ডভোগ ॥

অগ্র-পশ্চাত বিবেচনা না করে সর্বত্র নাক গলাতে যাওয়া যে নিরাপদ নয়, এবং আপাতদৃষ্টিতে উচিত কাজ বলে বিবেচিত হলেও তা করার আগে যে অন্ততঃ দুবার ভাবা দরকার তা গাঁটের পয়সা গুনোগার দিয়ে বুঝতে পেরেছে লণ্ডনের দুই পরোপকারী। রাস্তায় হঠাৎ একটি দুর্বল লোকের ওপর এক সবলকায় ব্যক্তিকে হামলা করতে দেখে তারা ছুটে গিয়ে তাদের ছাড়িয়ে দেয়, আর সেই ফাঁকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। কিন্তু তারপরে তারা জানতে পারে যে, সবল লোকটি একজন সাদা পোশাকের পুলিশ এবং আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ ঐ ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি একটি পাকা শয়তান।

পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অপরাধে দুজনকেই পাঁচ পাউণ্ড করে জরিমানা করা হয়েছে।

॥ রাজা মহেন্দ্র ॥

অবশেষে নেপালরাজের দিল্লীতে আসা পাকাপাকিভাবে স্থির হয়েছে। ১৮ই এপ্রিল আসছেন তিনি ভারতের রাজধানীতে।

নেপালের গণতন্ত্রবিমুখ বর্তমান শাসকবর্গের এটা বোঝার সময় এসেছে যে, শুধু অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দেশের মানুষকে চিরদিন দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। দেশের মানুষকে বিক্ষুব্ধ রেখে কোন শাসনই স্থায়ী হতে পারে না, যতদিন থাকে ততদিনও প্রতি মুহূর্তে শাসকদের শঙ্কিত থাকতে হয় অতর্কিত বিপর্যয়ের আশঙ্কায়। ইতস্ততঃ অভ্যুত্থান লেগেই আছে নেপালে। সম্প্রতি খবর এসেছে, সিকিম-নেপাল সীমান্তে নেপালের বিস্তৃত অঞ্চল এখন দেশভক্ত বিদ্রোহীদের কবলে এবং গত দু' মাসের চেষ্টাতেও নেপালের রাজকীয় বাহিনীর

পক্ষে সে অঞ্চল পুনর্দখল করা সম্ভব হয়নি। নেপাল-রাজ ও তাঁর পারিষদদের অবশ্য এখনও ধারণা যে, বিদ্রোহীদের শক্তির মূল উৎস হ'ল ভারত এবং একারণে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে তাঁদের বিরাম নেই। সম্প্রতি দুজন ভারতীয় সাংবাদিককে নেপাল থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে "নেপাল-ভারত সম্পর্ক ক্ষুণ্ণকারী" সংবাদ প্রচারের অভিযোগে। এ অবস্থায় রাজা মহেন্দ্র যে দিল্লীতে আসছেন সেটা অবশ্যই আশার কথা। চীনের বর্তমান অযৌক্তিক মনোভাব ও আচরণের ফলে ভারতের উত্তর সীমান্ত এখন যেভাবে বিপন্ন তাতে নেপালে শান্তি বজায় থাকা ভারতের স্বার্থেই বিশেষভাবে প্রয়োজন। নেপালে গণ-অসন্তোষের ফলে রাজ-শাসন যতই অপ্রিয় ও দুর্বল হবে ততই চীনের পক্ষে নেপালে অনুপ্রবেশ সহজতর হবে। ভারতের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে এ অবস্থা দেখা কোনমতেই সম্ভব নয়। একারণে নেপালে স্থায়ী ও জনপ্রিয় শাসন কায়েম হওয়ার ব্যাপারে ভারত বিশেষভাবে, এবং খুব সঙ্গত-ভাবেই আগ্রহী। এ অবস্থায় রাজা মহেন্দ্র যদি নেপালের গণতান্ত্রিক শক্তিকে দমনের অসম্ভব চিন্তা ত্যাগ করে ভারত সরকারের ইচ্ছামত তাঁদের সঙ্গে আপোষে আসেন এবং আবার নেপালে গণ-শাসন কায়েম করেন তবে সেটা নেপাল ও ভারত উভয়ের পক্ষেই বিশেষ কল্যাণকর হবে।

॥ আট মাসের নোটিশ ॥

ইন্দোনেশিয়ার বিমানবাহিনীর এক কুচকাওয়াজে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ বলেছেন, আট মাসের মধ্যে যদি ওলন্দাজরা পশ্চিম ইরিয়ান ত্যাগ না করে, তবে ১৯৬৩ সালের জানুয়ারীতে জোরকরে পশ্চিম ইরিয়ানকে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তবে শান্তিপূর্ণ-উপায়ে পঃ ইরিয়ানের মুক্তি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা ইতিমধ্যে যদি হল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তবে তা কার্যকরী করার জন্যে যতদিন দরকার ইন্দোনেশিয়া ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে। প্রসঙ্গক্রমে ডঃ সুকর্ণ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত "বাঙ্কার পরিকল্পনা" গ্রহণে ইন্দোনেশিয়া সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ঐ পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, ওলন্দাজদের হাত থেকে পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে দুবছর তাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে রাখা হবে, এবং ওরই মধ্যে তার প্রশাসনিক দায়িত্ব ইন্দোনেশিয়ার সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রস্তাব ওলন্দাজ সরকারের মনোমত হয়নি বলে জানা গেছে। এ সম্পর্কে তাদের প্রধান অভিযোগ নাকি এই যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার শুধু ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করেই এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন এবং তারপর তা জানিয়েছেন তাদের। কিন্তু ওলন্দাজ সরকারের মনোভাব যাই হোক না কেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাঙ্কার পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ যদি আন্তরিক হয়, তবে হল্যান্ডকে শেষ পর্যন্ত তা মেনে নিতেই হবে। এবং বিনা রক্তপাতেই সম্ভব হবে পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তি।

॥ সিরিয়া ॥

সিরিয়ার রাজনৈতিক নাটকের ওলটপালট এখনও শেষ হয়নি। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, নাসেরপন্থী ও নাসের-বিরোধী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিরোধের মীমাংসা এখনও হয়নি এবং এই মীমাংসার অভাবেতেই উভয়পক্ষ নাকি সিরিয়ায় আবার অসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল আবদেল করিম জাহেরোদ্দিন গত ১০ই এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তিন দিনের মধ্যেই সিরিয়ায় অসামরিক নাগরিকদের নিয়ে একটি সরকার গঠিত হবে। সুতরাং, অমৃতের এই সংখ্যা যখন প্রকাশিত হবে তখন হয়ত দেখা যাবে, সিরিয়ার শাসন-দায়িত্ব আবার এক অসামরিক সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে সেই অসামরিক সরকারের সদস্য কারা হবেন তার মীমাংসা বরং বোধ হয় খুব সহজে সম্ভব হবে না। কারণ, প্রধান সেনাপতি তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে পদচ্যুত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডঃ নাজেম কুদসি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করে বলেছেন, তাঁকে আটক রাখা হয়েছে। অথচ বেরুত থেকে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে, সিরিয়ার প্রস্তাবিত অসামরিক সরকারের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা ডঃ কুদসিরই সবচেয়ে বেশী। তবে তিনি নাকি পার্লামেন্টবিহীন মন্ত্রিসভার দায়িত্ব গ্রহণে রাজী নন। সুতরাং সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীর বিবদমান দুই পক্ষ অসামরিক সরকারের হাতে আবার সিরিয়ার শাসন-দায়িত্ব তুলে দিতে সম্মত হলেও সরকারের সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে একমত হওয়া তাঁদের পক্ষে বোধহয় খুব সহজে সম্ভব হবে না।

॥ ফ্রান্সে গণভোট ॥

আলজিরিয়ার প্রশ্নে গণভোট হয়ে গেল ফ্রান্সে, এবং সেই সুযোগে মস্ত একটা অপবাদ থেকে মুক্তি পেল ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা মন্ত্রের উদ্গাতা ফ্রান্স, একদিন সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে সে। কিন্তু মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদীর নির্লজ্জ লোভের ফলে ফ্রান্স তার সুনাম হারাতে বসেছিল। গণভোটের ফলাফলে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের প্রকৃত মনোভাব আর একবার সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হ'ল। জানিয়ে দিল ফ্রান্সের শতকরা নব্বুইজন মানুষ যে আলজিরিয়াকে তারা শৃংখলিত রাখতে চায় না।

গণভোটের নির্দেশমত নয়জন মুশ্লিম ও তিনজন শ্বেতাঙ্গ নিয়ে গঠিত আলজিরিয়ার অস্থায়ী শাসন-পরিষদের হাতে গত ১০ই এপ্রিল আলজিরিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসনদায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নে আলজিরিয়ায় গণভোট গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা থাকবে, তারপর গণভোটের সিদ্ধান্ত অনুকূলে হলে স্বাধীন সার্বভৌম আলজিরিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে আর কোন বাধা থাকবে না।

আলজিরিয়া স্বাধীনতা অর্জন করার পর আফ্রিকায় ফ্রেঞ্চ সোমালিল্যান্ড ছাড়া আর কোন উপনিবেশই ফরাসীদের হাতে থাকবে না।

আফ্রিকার বাইরে ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বা ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে কয়েকটি দ্বীপ-উপদ্বীপ ও দ্বীপাংশের ওপর ফরাসী কর্তৃত্ব অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু তবুও ফ্রান্স বৃহৎ শক্তি বলেই বিবেচিত হবে, আর তা হবে তার পারমাণবিক শক্তির জোরে নয়। ১০৪ সদস্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের একুশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা যখন ফরাসী কায়দায় দাঁড়িয়ে ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে অকুতোভয়ে জানাবেন নিজেদের অভিযোগ ও আহ্বান, তখনই বার বার করে প্রমাণ হবে বিশ্বের ইতিহাস, রাজনীতি ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে মহান ফ্রান্সের অনন্য ভূমিকা।

॥ ঘরে ॥

৫ই এপ্রিল—২২শে চৈত্র ঃ প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পরিকল্পনা পর্ষৎ গঠনের প্রস্তাব—রাজ্য সরকারগুলির নিকট কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ।

রাষ্ট্রপতির নিকট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর পদত্যাগপত্র পেশ—পত্র-প্রাপ্তির পরই শ্রীনেহরুকে প্রধানমন্ত্রী পদে পুনর্নিয়োগ।

৬ই এপ্রিল—২৩শে চৈত্র ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্যম—কর্মসূচী সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আবেদন।

কলিকাতার সন্নিহিত কয়েকটি স্থানে '[illegible] দুগ্ধ কলোনী' স্থাপনের পরিকল্পনা—নগরীর নিত্য দুগ্ধ চাহিদা মিটাইবার জন্য সরকারী প্রয়াস।

৭ই এপ্রিল—২৪শে চৈত্র ঃ কলেজের অধ্যাপকদের নির্দিষ্ট বেতনের হার চালু রাখার অনুরোধ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পত্র।

'ভারতীয় বাহিনীর কার্যকলাপ বিশ্বে ভারতের মর্যাদা বাড়াইয়াছে'—কঙ্গো প্রত্যাগত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সম্বর্ধনায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের মন্তব্য।

৮ই এপ্রিল—২৫শে চৈত্র ঃ পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি—গত বৎসর অনাবৃষ্টিজনিত ব্যাপক শস্যহানির জের—টেস্ট রিলিফ ও সাহায্যের ব্যবস্থা। (সংবাদ)

'নিরস্ত্রীকরণই আমাদের স্বপ্নের পৃথিবী রচনায় একমাত্র পথ'—বোম্বাই-এর সভায় শ্রীমেননের (প্রতিরক্ষামন্ত্রী) ঘোষণা।

অবিলম্বে আন্তর্জাতিক অস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধের দাবী—জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের উদ্দেশে নিখিল ভারত শান্তি সম্মেলনের (নয়াদিল্লী) প্রস্তাব।

৯ই এপ্রিল—২৬শে চৈত্র ঃ সতেরজন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী লইয়া শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠিত—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মন্ত্রীদের নাম ও দপ্তর ঘোষণা।

'গ্রামাঞ্চলের লোকদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির প্রশ্ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ'—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের মন্তব্য।

১০ই এপ্রিল—২৭শে চৈত্র ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুসমেত নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত পার্লামেন্টের প্রাক্তন সদস্য শ্রীকংসারি হালদারের মুক্তিলাভ—কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক আপীলের আবেদন মঞ্জুর।

১২ই এপ্রিল—২৯শে চৈত্র ঃ 'মনোহর কাহানিয়া' নামক হিন্দী পুস্তককে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় একদল মুসলমানের উচ্ছৃঙ্খলতা—রাজপথে যথেচ্ছভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হামলা—১৫০ জন গ্রেপ্তার।

মালদহে হিন্দুদের গৃহে দুর্বৃত্তদলের অগ্নিসংযোগ—৫ ব্যক্তি নিহত—সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অনুবৃত্তি বলিয়া ধারণা।

॥ বাইরে ॥

৫ই এপ্রিল—২২শে চৈত্র ঃ 'ভারত পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ না করার প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত'—রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্টের সার্কুলারের উত্তরে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীসি এস ঝা'র লিপি।

'পৃথিবীর এক কোটি অন্ধের মধ্যে অর্ধেকের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব'—বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থার পত্র।

৬ই এপ্রিল—২৩শে চৈত্র ঃ লণ্ডন বৈঠকের পর কেনিয়ার শাসনতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরিত—স্বায়ত্তশাসন কাঠামোর মধ্যে নূতন আফ্রিকান কোয়ালিশন সরকারের গঠনের প্রস্তাব।

মধ্য ভিয়েৎনামে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান।

৭ই এপ্রিল—২৪শে চৈত্র ঃ আলজেরিয়ায় অস্থায়ী শাসন পরিষদের কার্যভার গ্রহণ—নয়জন মুসলমান ও তিনজন ইউরোপীয় লইয়া পরিষদ গঠিত।

'স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গে রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করিলে প্রশ্নটি সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করা হইবে'—সাংবাদিকদের নিকট পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুবের উক্তি।

৮ই এপ্রিল—২৫শে চৈত্র ঃ 'নেপাল-সিকিম সীমান্তে দুইটি অঞ্চল (থিয়াংচুপ ও মিমিং) নেপালী বিদ্রোহীদের দখলে—মধ্যে মধ্যে সামরিক ও পুলিশ ফাঁড়িসমূহে বিদ্রোহীদের হানা'—নেপাল সরকারের ইস্তাহার।

৯ই এপ্রিল—২৬শে চৈত্র ঃ 'শান্তির পথে না হইলে পশ্চিম ইরিয়ান উদ্ধারে ইন্দোনেশীয়া যুদ্ধে নামিবে'—ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণের সতর্কবাণী—পঃ ইরিয়ান ত্যাগে ওলন্দাজদের আট মাসের মেয়াদ দান।

প্রেসিডেন্ট দ্য গলের আলজিরীয় শান্তিচুক্তির পক্ষে বিপুল সমর্থন—ফ্রান্সে গণভোটের ফলাফল ঘোষণা।

রাষ্ট্রসংঘে এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।

১০ই এপ্রিল—২৭শে চৈত্র ঃ ক্রুশ্চেভের (সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) নিকট বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান ও মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডির যুক্ত বার্তা—আণবিক অস্ত্র পরীক্ষার আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মনোভাব পরিবর্তনের অনুরোধ।

'রুশ-ভারত মৈত্রীতে বিশ্বশান্তি আসিবে ও উপনিবেশবাদ অবসান হইবে'—নূতন মন্ত্রিসভা গঠন উপলক্ষে শ্রীনেহরুর নিকট ক্রুশ্চেভের লিপি।

১১ই এপ্রিল—২৮শে চৈত্র ঃ 'ইঙ্গ-মার্কিণ যৌথ নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব প্রচার-কৌশল মাত্র'—সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী 'টাস'-এর মন্তব্য।

'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সহিত মিলন সম্পর্কে গণভোট গ্রহণের পরে বিবেচনা করা হইবে'—সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি মেজর জেঃ করিমের বিবৃতি।

অভয়ংকর

॥ শতাব্দীর স্বপ্ন ॥

ভারতের ইতিহাসে পাঞ্জাব চিরদিনই এক গৌরবের আসন লাভ করেছে, তার বিশিষ্ট ভূমিকা। বার বার অভিযান হয়েছে, শত্রুসৈন্যের অশ্ব, হস্তী ইত্যাদির পদধ্বনিতে অরণ্য-প্রান্তর মুখরিত হয়েছে, রাজা পাল্টিয়েছে, রাজ্য পরিবর্তিত হয়েছে, ধর্মীয় মতবাদের রূপান্তর ঘটেছে সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ঘটেছে প্রচুর। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাঞ্জাবের সঙ্গে সম্মানের সমান আসন দাবী করতে পারে বঙ্গদেশ। দুটি প্রদেশের কোষ্ঠীও যেন একই রকমের। তাই শেষ পর্যন্ত দুজনেরই অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে।

আর্য, গ্রীক, হূন, মোগল-পাঠান এবং সর্বশেষ শিখ সম্প্রদায়, সকলেই পাঞ্জাবে নায়কত্ব করেছেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক বছর আগে পাঞ্জাব রঙ্গমঞ্চে ইংরাজের পদধ্বনি শোনা গেল। পাঞ্জাবের অদৃষ্টে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বটা কান-ঘেঁষে গেছে, যাই হোক ইংরাজ-আগমনের পর থেকে অন্ততঃ কিছুকাল শান্তি ও প্রগতির মধ্যে পাঞ্জাব কাটিয়েছে।

প্রথম কমিশনার লরেন্স অমায়িক বদমাশ। কয়েকটি সংস্কার তিনি করেছেন, একটা প্রশাসনচক্র, নতুন আদালত, এবং পুলিশ বিভাগ স্থাপন করেছেন। ভূমিরাজস্ব এবং ভূমিসংক্রান্ত নথিপত্র সংগৃহীত রাখার ব্যবস্থা করেছেন, শিক্ষাবিস্তার, চাষবাসের উপযোগী খাল কাটানোর ফলে অনেক মরু-প্রান্তর শস্যশ্যামলা হয়ে উঠেছে। এই সব কারণে পাঞ্জাবের সমাজ-জীবনে এসেছে এক প্রচণ্ড পরিবর্তন। প্রাচীন রীতির রূপান্তর ঘটেছে নিঃশব্দ বিপ্লবের মাধ্যমে।

পাঞ্জাবীর অদৃষ্টে কিন্তু শান্তি সয় না। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে এল দেশবিভাগ, যার ফলে এই পরিবর্তনশীল, শান্ত, সমৃদ্ধ অঞ্চলে নেমে এলো এক দুঃসহ দুঃখের অশুভ মুহূর্ত। সামাজিক জীবনের অগ্রগতির পথে আকস্মিক সমাপ্তি ঘটল, শান্তি বিঘ্নিত হল।

প্রকাশ টানডনের আত্মজীবনীমূলক রচনা Punjabi Century নামক সদ্য প্রকাশিত, বহুল প্রশংসিত এবং আলোচিত গ্রন্থটিতে আছে পাঞ্জাবী সমাজ-জীবনের শতাব্দীব্যাপী ধারাবাহিক বিবর্তনের কথা, ব্রিটিশ পতাকার নীচে যে উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের 'মনমাতো পুষ্পেভরা' সমাজ গড়ে উঠেছিল তার কাহিনী। লেখকের খুল্লপিতামহ ঠাকুরদাসের জীবন এবং সমসাময়িক কাল থেকে এই কাহিনীর সূচনা। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরদাসের জন্ম, কাহিনী শেষ হয়েছে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখকের পিতা রামদাসের মৃত্যুতে।

মরিস জিন্‌কিন এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—
"nothing is more important to the illumination of history than good autobiography" —তবু এ কথা স্বীকার করা উচিত যে আত্মজীবনীর পরিধি সীমিত এবং শিল্পকর্ম হিসাবে তা দুরূহ। প্রকাশ টানডনের এই গ্রন্থটি কি সুন্দর আত্মজীবনীর এক উৎকৃষ্ট নমুনা, বিগত শতকের উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এক নিখুঁত চিত্ররূপ এই "Punjabi Century"। প্রথম দর্শনেই পাঞ্জাবের সঙ্গে ইংরাজের প্রেম ঘটেনি, কিন্তু অতিদ্রুত ইংরাজ আর পাঞ্জাবীর মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। লেখক বলেছেন—

"Our society was extrovert and adaptable. It had while retaining its internal structure, adapted itself to each change until, like the exposed cross section of an archeological excavation, it showed layers of characteristics piled one upon the other from each external impact. And this the British impact, was comparatively so gentle and pursuasive that the Punjabi for once enjoyed the process of change and adaptation".

টানডন পরিবারে লালা ঠাকুরদাস সর্বপ্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করলেন, বছর খানেক আইন শিক্ষা করার পর একেবারে পাকা উকিল হয়ে পসার জমালেন। তাঁর স্বগ্রাম গুজরাটে একটি বিরাট প্রাসাদ বানালেন। সম্মান, সমৃদ্ধি ইত্যাদি আহরণ করে, দীর্ঘজীবন সুখে ও স্বচ্ছন্দে ভোগ করলেন। উত্তম আহার্য এবং মনোরম আলাপাচার তাঁর প্রিয় ছিল। যা কিছু নতুন ও উত্তেজক, তাই তাঁর ভালো লাগত।

লেখকের পিতৃদেব রামদাস ক্ষুদে ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে জীবনযাত্রা শুরু করেন, এবং উত্তরকালে Imperial Engineering Service এর অন্তর্ভুক্ত হন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে খাল এবং বাঁধ রচনা করেছেন, এর ফলে পাঞ্জাবী কিষাণের দুঃখ, দুর্দশা দূরীভূত হয়েছে। যে যুগের মানুষের জীবনের ব্রত ছিল শিক্ষা আর সেবা, তিনি সেই যুগের মানুষ। কংকরকঠিন পথের বাধা অতিক্রম করে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। প্রাচীন পাঞ্জাবী চরিত্রে রামদাস কিছু নতুন মূল্য আরোপ করেছিলেন— "There was no contradiction or ambivalence in his make up, he was all of a piece and lived up to what he preached".

দুই পুরুষের এই সমাজ অত্যন্ত স্নেহময় এবং মমতাময়। যেখানে প্রচুর অবসর, অভাব ও অনটনহীন পরিবেশ, জীবন সেখানে মন্দাক্রান্তা তালে প্রবাহিত হত। প্রতিবেশী, আত্মীয় প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। "শোকযাত্রা, পারিবারিক অসুখ-বিসুখ, বিবাহ-উৎসব, প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের কাছ থেকে সাহায্য-প্রার্থনা প্রভৃতির দাবী সর্বাগ্রে মানতে হবে, হাতের কাজ ফেলে রেখেও বন্ধুদের হাত প্রসারিত করো। হাতের কাজ ক'দিন না হয় থেমে

থাক। এই হল কর্তব্যকর্ম, কোনো প্রশ্ন নয়, কোনো দ্বিধা নয়, সর্বাগ্রে তা পালন কর।"—সকল শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই নীতি মেনে চলত। ব্রিটিশের চাকরিতে কিন্তু অন্য জাতের নিয়মানুবর্তিতা, তাই এই প্রাচীন রীতি ধ্বংস হয়ে গেল। জীবনের কাজকর্ম, ঘন্টা, মিনিটের রুটিনে বাঁধা পড়ল।

লেখক পাঞ্জাবের মানুষের জীবন, সামাজিক আচার-ব্যবহার, খাদ্যরীতি, পোষাক, বিবাহবিধি, শোকযাত্রা, শোক-প্রকাশ প্রভৃতি সম্পর্কে নিখুঁত ছবি এঁকেছেন। গ্রীষ্মকালে ছাতের ওপর খাটিয়া উঠে যায়, সেই উন্মুক্ত আকাশের নীচে জীবন এক বিচিত্র মায়াময় রূপ গ্রহণ করে—

"On moonlit nights the country became etheral and unreal. Sometimes you would wake with a large bright white moon staring down in your face. The full moon will stare at couples sleeping on roof terraces. It would make the shy bride feel guilty in her husband's embrace as the intruder looked shamelessly on her body which she was just discovering for herself". চাঁদের এমন দুর্নাম আর শোনা যায়নি। এই গ্রন্থে এই জাতীয় অসংখ্য সুন্দর অংশ আছে। কাব্যধর্মী এই সমস্ত অংশাবলীতে লেখকের কবি-মানসের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন পাঞ্জাবী সমাজে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ছিল অবহেলিত। ব্রাহ্মণরা লেখাপড়া তেমন জানতেন না, তাই তাঁদের সম্মান ছিল না। নাপিতের কিন্তু প্রচণ্ড মর্যাদা ছিল। নাপিতের ভূমিকা ছিল ঘটকের, বিবাহাদি সেই ঠিক করত, সামাজিক অনেক কর্মে সে উপদেষ্টা। 'বিরাদারি' ব্যবস্থা তখনও অক্ষুণ্ণ, তাকে সংরক্ষণ করতে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা। এঁদের সামাজিক শাস্তিদানের ক্ষমতা ছিল, একঘরে করে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া হত।

কয়েকটি বিচিত্র সামাজিক বিধিও ছিল, যেমন জননী কখনও কন্যাগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করবেন না, যদিও করেন তাহলে আহার ও বাসস্থানের জন্য মূল্য দিতে হবে। পেশাদারী শোকপ্রকাশ আর এক বিচিত্র সামাজিক রীতি, ভাড়াটে লোক ধরে এনে কাঁদানো। এর চেয়ে বীভৎস 'সিপয়া' বিধি। পঁচিশ বা ততোধিক স্ত্রীলোকের এক দল এসে 'Would bare their breasts and grid up their garments to bare their thighs, and at a word from their leader, begin to beat their breasts, their cheeks, their foreheads and thighs rhythmically in that order, keeping time with the mourning song, sung in a quick tempo".

নতুন শিক্ষাবিস্তারের ফলে এ সবের পরিবর্তন ঘটলেও, সব কিছুর হয়নি এবং প্রাচীন মূল্যবোধের অবসান ঘটেনি। এই সামাজিক পরিবর্তনের মুখে পুরুষরা যেমন দ্রুতগতিতে এগিয়েছেন, মেয়েরা তেমন সমান তালে পা ফেলতে পারেননি। লেখক বলেছেন—"Our father changed rapidly and mother slowly and between them my generation managed to learn the new without entirely forgetting the old"

পশ্চিম পাঞ্জাবের এই শান্ত এবং ঢিমে-তেতালার জীবন আর্য সমাজী আন্দোলন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডেও তেমন বিচলিত হয়নি। শিক্ষিত পাঞ্জাবীরা এ সব ঘটনার সাময়িক আলোচনা করেই আবার বিস্মৃত হয়েছেন। কয়েকটি হরতাল, পিকেটিং ইত্যাদি ছাড়া অসহযোগ আন্দোলন তেমন জমেনি। এমন কি দেশবিভাগের চরমতম মুহূর্তেও টানডন পরিবার এবং আরো অনেকেই ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত তাঁদের পৈতৃক ভূমিতেই থাকতে দেওয়া হবে। তাই যখন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মুখ থেকে বিদায়-বাণী শুনতে হয়েছে এবং সে আবার চির-বিদায়ের-বাণী তখন তাঁরা অতিশয় আহত হয়েছেন।

লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে টানডন পরিবারকে তাঁদের স্বগ্রাম 'গুজরাট' ছাড়তে হয়েছে। লেখক বিষাদ-ভরে লিখেছেন—'আজ গুজরাটে আর কেউ নেই। আমাদের সব হিন্দু সম্প্রদায় সেখান থেকে চলে এসেছেন। রবি এবং চেনাবের মধ্যবর্তী সকল জমি, চেনাব থেকে ঝেলাম, ঝেলাম থেকে সিন্ধু, পাঞ্জাবের পর্বতশীর্ষে এবং সমতটে, যেখানে এই পঞ্চনদী অবশেষে এসে মিলেছে, সে অঞ্চল আমাদের 'বিরাদারি'র সপ্তপুরুষের বাসস্থান ইতিহাসের সূচনাকাল থেকে, সেই পিতৃভূমিতে আজ আর একটিও প্রাণী নেই।'

শ্রীপ্রকাশ টানডনের Punjabi Century—১৯৬১-তে প্রকাশিত—ভারতীয় লেখকের ইংরাজী গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। শ্রীপ্রকাশ টানডন শুনেছি ব্যক্তিগত জীবনে 'লিভার ব্রাদার্সে'র জনসংযোগ অধিকর্তা, লেখক হিসাবে তাঁর এই প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু এমন সুন্দর আত্ম-জীবনী ইদানীং কালে আর চোখে পড়েনি।

* PUNJABI CENTURY (1857-1947) — Prakash Tandon - Chatto & Windus — (London) 20 shillings.

রূপং দেহি ধনং দেহি—(উপন্যাস)
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ গ্রন্থ-প্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম : তিন টাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

"কে এই নবাগত? মাটীর উপরকার শোভনশ্যামল আস্তরণ ছেড়ে একেবারে তার নিচে অন্ধকার গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করেছে? সেখান থেকে কয়লার বদলে তুলে আনছে হীরামণি?" এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর অচিন্ত্যকুমার পেয়েছিলেন "নবাগতের" নিজের মুখ থেকেই :

"আমার আসল নাম কি জানো? আসল নাম শ্যামলানন্দ। ডাক নাম শৈল। ইস্কুলে সবাই ডাকত শৈল বলে। সেই থেকে কি করে যে শৈলজা হয়ে গেলাম—।...বাবা ধরণীধর মুখোপাধ্যায়। সাপ ধরেন। ম্যাজিক দেখান—' তাকালাম শৈলজার হাতের দিকে। তাইতেই তার হাতের এই ওস্তাদি। এই ইন্দ্রজাল।"

অচিন্ত্যকুমারের ঐন্দ্রজালিক উক্তিটি যে অতিকথন না, শৈলজানন্দ তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করলেন তাঁর নবতম উপন্যাসটিতে। কয়লাকুঠির গল্পের পর মহাযুদ্ধের ইতিহাস লিখে সাড়া ফেলেছিলেন শৈলজানন্দ এবং আজো তাঁর গ্রাম-গল্পের আকর্ষণ এতটুকু কম না। আলোচ্য উপন্যাসটির পটভূমি যদিচ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন একটি কয়লাখনি অঞ্চলের গ্রাম কিন্তু উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে কয়েকটি গ্রামীণ চরিত্রকেই কেন্দ্র করে। দুলালী গ্রামের মেয়ে কাঞ্চন। রূপের জোনাকি হয়ে সে ঘুরে বেড়ায় গ্রামে। বিয়ে হয় না পয়সার অভাবে। পাড়ার লোকেরা নিন্দে রটায়, দুর্ব্যবহার করে। এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সে মহানন্দপুরে আসে দাদাকে নিয়ে। সেখানে আশ্রয় পায় জমিদার রামকানাই মুখোপাধ্যায়ের 'অতিথি ভবনে'। আলসাঘন রামকানাই-এর আশ্রয়ে গভীরতরো এক অন্ধকারকে দেখতে পায় কাঞ্চন। বিচিত্র মানুষ শিবচৈতন্য সেই অন্ধকারের একটি মাত্র প্রদীপ। শৈলজানন্দ এই আপনভোলা আসক্তিহীন চরিত্রটিকে প্রথম উপস্থিতি-তেই পাঠকমনের সিংহাসনে বসিয়ে দিতে পেরেছেন এবং এ কুশলতা তাঁর

অভাবজ। গ্রামের দারোগার চরিত্রটিকেও যেন কোথায় দেখেছি এমনি জীবন্ত মনে হয়।

তবে আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর নিরলংকার ভাষার প্রসাদ-গুণ। নির্ভার ভাষাপ্রয়োগে শৈলজানন্দের একমাত্র পূর্বসূরী সম্ভবতঃ শরৎচন্দ্রই! এবং হয়ত তাই পাঠককে কাহিনীমুগ্ধ করার শারদীয় ক্ষমতাটিও তাঁর একান্ত আয়ত্তে।

যেদিন ফুটলো কমল— (উপন্যাস)
বুদ্ধদেব বসু : এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা —১২। দাম : চার টাকা।

উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল ১৯৩৩ সালে। আজ ১৯৬২ সাল। মাঝখানে দীর্ঘ ২৯ বছরের ব্যবধান। সেদিন বুদ্ধদেব বসু ছিলেন বিদ্রোহী তরুণ। বাংলা সাহিত্যের নিস্তরঙ্গ ধারায় তুলতে চাইছিলেন প্রবল প্লাবন। আজ বুদ্ধদেব বসু স্থিতধী প্রবীণ। বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত আসনে সমাসীন। আর এই দীর্ঘ উনত্রিশ বছরে পাঠক-সমাজের বোধ ও চৈতন্যের ক্ষেত্রে এসেছে বিপুল পরিবর্তন। পুরাতনকে দাঁড়াতে হয়েছে নূতন মূল্যায়নের কাঠগড়ায়। অতীতকে জবাবদিহি করতে হয়েছে বর্তমানের সঙ্গে। প্রত্যেক সং সাহিত্যিক এই বিচারকে বরণ করে নেয়। কারণ তাঁরা জবাবদিহি করেন সময়ের সঙ্গে।

আবার নূতন করে 'যে দিন ফুটলো কমল' পড়তে পড়তে বারবারই এই কথা আসে। মনে হয় এই উপন্যাসের পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল খুব বেশি। কারণ এটি একটি প্রেমের মিষ্টি উপন্যাস মাত্র নয়। ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে শুধুমাত্র দুটি চরিত্রের কাছাকাছি আসার, ভালবাসার নিটোল কাহিনী মাত্র নয়। এই দৃষ্টিতে উপন্যাসকে বিচার করলে সমূহ ভুল বোঝার আশংকা থাকে। কারণ, শ্রীলতা আর পার্থপ্রতিম এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানের পর কলেজীয় প্রেমের সীমাবদ্ধ গণ্ডি পার হয়ে নূতন উজ্জ্বলতা পেয়েছে। বোঝাই যায় যে এ একজন প্রতিভাবান কবির উপন্যাস। তাই রোমহর্ষক ঘটনা, কিংবা আশা-নিরাশার রহস্য তৈরি করে নায়ক-নায়িকার প্রতি পাঠকের অভিনিবেশ বজায় রাখতে হয় না। পাঠক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে শব্দের জাদুতে, ভাষার প্রাণবান ঐশ্বর্যে। পাঠক তখন রচয়িতার সঙ্গে পরম নির্ভয়ে যেতে পারে দুটি প্রাক-পরিণত যুবক-যুবতীর অনুভূতির সূক্ষ্ম ও নিবিড় স্বপ্নময় অদৃশ্য জগতে, যেখানে সামান্য অসতর্ক পদপাত, একটু অনামনস্ক শব্দ-প্রয়োগ বিকট আর্তনাদ তুলে উষ্ণ ও নরম নিসর্গকে কলুষিত করে দিতে পারে। যখন পড়ি, "অন্ধকারকে হতে দাও তোমার মধ্যে", তখন মনে হয় এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা কাহিনীর পরিধি পার হয়ে অন্য ব্যক্তে স্থিত। তাই তথাকথিত উপন্যাসের গঠন-রীতি স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করা হয়েছে। আবার সমগ্র উপন্যাস এমন একটি তীব্র ও কম্পিত আবেগে বিধৃত যা একমাত্র লিরিক কবিতায় সম্ভব এবং উপন্যাসটি পায় কবিতার মর্যাদা। এই বহু প্রশংসিত উপন্যাসের পরিমার্জিত সংস্করণ অভিনন্দনযোগ্য।

আমেরিকায় শিশিরকুমার— (রোজ-নামচা) ও মার্কিনী মার (নাটক)॥ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। দাম পাঁচ টাকা।

আচার্য শিশিরকুমারের নাটজীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা অভিনয় প্রদর্শনের জন্য নাট্য-সম্প্রদায় নিয়ে আমেরিকা যাত্রা। তাঁর আগে বা পরে কোনো বাঙালী নাট্যশিল্পী এইভাবে বিদেশ যাত্রা করেননি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিশিরকুমার আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ভ্যাণ্ডারবিল্ট থিয়েটারে 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। প্রখ্যাত নাট্যকার ও 'সীতা' নাটকের রচয়িতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সেই যাত্রায় শিশিরকুমারের সহযাত্রী ছিলেন। "জাহাজে করিয়া কলিকাতা হইতে নিউইয়র্ক যাত্রা সহজ কথা নয়। কি করিয়া সময় কাটানো যায়? তাই, সেই সময় কিছু দিনের জন্য ডায়েরী লিখিয়াছিলাম।" এই রোজনামচা ভাগ্যক্রমে একটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, এবং এত দিনে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। আমাদের দেশে উৎসাহী প্রকাশকের সংখ্যা কম, নতুবা এই গ্রন্থ অনেক আগেই প্রকাশিত হত। শিশিরকুমারের মত এক অসামান্য প্রতিভাধারী নটকে আমেরিকায় কি সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল তার অপরূপ বিবরণ যোগেশচন্দ্র দিয়ে গেছেন। এই সঙ্গে সংযুক্ত 'মার্কিনী মার' নামক নাটকটিও মার্কিনী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত প্রহসন। ডকুমেণ্টারী গ্রন্থ হিসাবে 'আমেরিকায় শিশিরকুমার' শুধু মাত্র ছাত্র, গবেষক প্রভৃতির কাছে যে মূল্যবান সম্পদ তা নয়, নাট্যরসিক ব্যক্তি মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। শিশিরকুমারের পূর্ণাঙ্গ জীবনী একদিন রচিত হবে, সেদিন 'আমেরিকায় শিশিরকুমার' তার একটি বৃহৎ পরিচ্ছেদ হবে। গ্রন্থটি উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। সুমুদ্রিত এবং সুন্দর প্রচ্ছদ শোভিত।

পদাবলী সাহিত্য— (সমালোচনা)— কালিদাস রায়। প্রকাশক : এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম সাত টাকা।

গ্রন্থপরিচিতিতে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "কবি কালিদাস রায় জীবনের পঞ্চাশৎ বৎসর পর্যন্ত প্রধানতঃ কাব্যরসেই বিভোর ও কবি আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। পঞ্চাশোর্দ্ধে তাঁহার কবিমন কাব্যরস-বিশ্লেষণের বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছে। এ যেন কাব্যরচনার প্রত্যক্ষ রাজৈশ্বর্যভোগ পরিত্যাগের পর তাহার পরোক্ষ রহস্য অনুধ্যানের প্রজ্ঞা কবি-জীবনে আবির্ভূত হইয়াছে।" কথাটি ঠিক, কবি কালিদাস রায় বর্তমানে কাব্য-রস বিশ্লেষণের বানপ্রস্থে আত্মনিয়োগ

করেছেন। কবিতা অপেক্ষা গদ্যসাহিত্যেই ইদানীং তাঁর সর্বাধিক আগ্রহ লক্ষিত হয়। "পদাবলী সাহিত্যে" তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্ববিচার ও রসবিশ্লেষণ করেছেন। কবি কালিদাস রায়ের কবিতা বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ী, সেই কারণে পদাবলীর মর্মোদ্ধারে তাঁর অধিকার অনস্বীকার্য। তিনি এই আলোচনায় পদাবলী সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা অতি সংক্ষেপে সুললিত ভঙ্গীতে বিবৃত করেছেন। সাধারণ পাঠক ও ছাত্রদের পক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর রসাস্বাদনে গ্রন্থটি সাহায্য করবে সন্দেহ নেই।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

চতুরঙ্গ— হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈ-মাসিক পত্রিকা। রবীন্দ্র-সংখ্যা, কার্তিক—পৌষ ১৩৬৮। দাম ঃ ১·২০ নঃ পঃ। ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।

শ্রীহুমায়ুন কবির সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা গত তেইশ বছর ধরে বাংলা-দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন এক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে যার তুলনা বর্তমানকালে বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুনির্বাচিত প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা এবং সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র ও চিত্রকলার বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তির আলোচনায় সমৃদ্ধ হ'য়ে এই পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল পত্রিকাটি বাংলাদেশের শিক্ষা-জগতে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। বর্তমান রবীন্দ্র-সংখ্যাটি সে গৌরব আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

আলোচ্য সংখ্যার লেখকসূচীতে আছেন—ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (এঁর স্মৃতিকথা অনুবাদ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র), সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, আইজায়া বার্লিন, লর্ড হেলসাম, আঁদ্রে-অস্টারলিং; এবং রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন ইংরাজি ও বাংলা সংকলন ও আলোচনা গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন—হিরণকুমার সান্যাল, অমলেন্দু বসু, নীহাররঞ্জন রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, হ্যালডর ল্যাক্সনেস, হরপ্রসাদ মিত্র, ভবতোষ দত্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপদ ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রনাথ রায়, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত এবং সুধাংশু ঘোষ।

এই সুদীর্ঘ তালিকা, বিশেষ করে বিভিন্ন অভারতীয় লেখকের নাম থেকে স্পষ্টই বোঝায় সম্পাদক তাঁর দায়িত্বের বিষয়ে কত তীব্রভাবে সচেতন ছিলেন এবং পত্রিকাখানি পাঠ করে একথা অকুণ্ঠভাবেই বলা যায় যে তাঁর পরিশ্রম আমাদের পক্ষে সুফলপ্রসূ হ'য়েছে।

উত্তরসূরী—সম্পাদক ঃ অরুণ ভট্টাচার্য। ৯বি।৮, কালিচরণ ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৫০ থেকে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

কবিতা, সংগীত, শিল্পচর্চা ও সমালোচনার ত্রৈমাসিক মুখপত্র হিসাবে 'উত্তরসূরী' ইতিমধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার মধ্যে। বর্তমান সংখ্যাটি নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। মূল্যবান প্রবন্ধ, বিবিধ আলোচনা, অনুবাদ কবিতা, এবং সুপাঠ্য কবিতাবলী নিয়ে প্রকাশিত এ সংখ্যাটি পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির উন্নত মানকে রক্ষা করেছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'একালের লেখা' নামক মূল্যবান রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এ সংখ্যায়। অরুণ ভট্টাচার্য ও শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে অমিয় চক্রবর্তী ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অমিয় চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য তরুণতর কবিদের কবিতা আছে। শেক্সপীয়রের পাঁচটি সনেটের মণীন্দ্র রায়-কৃত অনুবাদ নিপুণ এবং অনবদ্য। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় লের্মনতফ, তলস্তয় ও ব্রিউসয়োর কবিতা অনুবাদ করেছেন। তাছাড়া আরও কয়েকটি কবিতার অনুবাদ আছে।

তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন—কমলকান্তি ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য, অমিত সেন, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বিমল কর, মিহিরকুমার গুপ্ত প্রভৃতি।

নান্দীকর

আজকের কথা

বাঙলা থিয়েটারের নব বিবরণ :

অ্যাডেল্‌ফি থিয়েটারের নাম শুনেছেন? কল্‌কাতার অ্যাডেল্‌ফি থিয়েটার? এই শহর কল্‌কাতার অ্যাডেল্‌ফি থিয়েটার?—না, আপনাদের মত আমিও শুনিনি। তবে পড়েছি। ১৯৫৬ সালে টমাস নেলসন অ্যান্ড সন্স্ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ফবিয়ন বাওয়ার্স নামক জনৈক মার্কিণ ভদ্রলোক দ্বারা লিখিত "থিয়েটার ইন দি ইস্ট" (Theatre In The East) নামে একখানি ৩৭৪ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থে পড়লুম, "অহীন চৌধ্রি (?) সাধারণতঃ প্রাচীন এবং সুখ্যাত অ্যাডেলফি থিয়েটারে অবতীর্ণ হয়ে প্রচুর ভক্ত দর্শকবৃন্দকে আকর্ষণ করেন।" শুধু তাই নয়, তিনি প্রধানতঃ যে-নাটকে অভিনয় ক'রে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, সেখানির নাম হচ্ছে "[illegible]" (কুমারী নয়?) বা "ডটার অব ইজিপ্ট"। যেখানে তিনি ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে আবন রূপে বর্ণবিদ্বেষের ওপর লম্বা বক্তৃতা দেন, সেখানে মুগ্ধ দর্শকরা যে প্রায়ই "আস্তে", 'আস্তে' বলে চীৎকার করে, এ-ও গ্রন্থকার স্বকর্ণে শুনেছেন। কিন্তু এই "আস্তে" "আস্তে" বলার যে অর্থ এবং কারণ তিনি নির্ণয় করেছেন, তা শোনালে আপনারা হাসি চাপতে পারবেন না। গ্রন্থকার "আস্তে" কথার আভিধানিক অর্থ করেছেন "ধীরে" (slowly) এবং কারণ হিসেবে বলেছেন, সত্য বাক্ করবার আগে অভিনেতা যেন দর্শকমনের ঔৎসুক্যকে যতদূর সম্ভব টেনে বাড়াবার জন্যে তাঁর বক্তব্যকে অনেকখানি সময় নিয়ে বলেন। গুণগ্রাহী দর্শক অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়ের মধ্যেই অনেক সময় তারিফসূচক মন্তব্য শুরু ক'রে দিত বলে কোনো কোনো দর্শক তাঁর উপভোগ্য বাচনকে স্পষ্টভাবে শোনবার জন্যে অপর দর্শকদের গোলমাল করতে বারণ করে 'আস্তে' 'আস্তে'—এই কথা যে বলত, এটুকুও বুঝিয়ে দেবার মত লোককে তাঁর সংগী-দোভাষী হিসেবে পাননি ব'লে আমরা গ্রন্থকারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি। এবং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, গ্রন্থকার বর্ণিত অ্যাডেলফি থিয়েটার আমাদের মিনার্ভা থিয়েটার ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ইংরেজী প্রভাবেই বাঙলা রঙ্গালয়ের জন্ম, এই কথা বলে গ্রন্থকারপ্রবর তাঁর পাঠকদের জানিয়েছেন, বাঙালীরা তাদের সাধারণ রঙ্গালয় চালাবার জন্যে ইংরেজী নাটক অনুবাদ করেছে, ইংরেজী কাহিনী বা প্লট ধার করেছে। সে-যুগে গিরিশচন্দ্র 'ম্যাকবেথ'-এর অনুবাদ বাঙলা রঙ্গমঞ্চে চালাবার চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য হয়েছিলেন এবং আধুনিককালের নাটকে কিছু কিছু বিদেশী প্লট আমদানী হলেও বাঙলা নাটক 'পৌরাণিক' 'ঐতিহাসিক' বা 'সামাজিক'—প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে ভারতীয় কাহিনীকে আশ্রয় ক'রেই যে গড়ে উঠেছে, এ-কথা অনস্বীকার্য।

গ্রন্থকার আরও যে-সব 'ঐতিহাসিক' সংবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হ'ল, গিরিশচন্দ্র বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙলা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। আমরা সকলেই জানি ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের কোঠা থেকে তিনি নিয়মিতভাবে সাধারণ নাট্যশালায় অভিনয় ক'রে গেছেন। দ্বিতীয় সংবাদ, ভাদুড়ী মশাই ১৯৫৫ সালের কলকাতার কোনো একটি ছোট থিয়েটারে (?) প্রতি রবিবার বৈকালে অভিনয় করতেন। এবং স্টারের "শ্যামলী" নাটকের প্রধান ভূমিকায় যে-অভিনেত্রী অবতীর্ণা হয়েছিলেন, তাঁর নাম সুচিত্রা চট্টোপাধ্যায়। আর একটি সংবাদ হচ্ছে, ঐ ১৯৫৫ সালেই, 'ভক্ত রামপ্রসাদ'-এর জীবনী অবলম্বনে রচিত নাটক বাঙলা রঙ্গমঞ্চে ৪০০ রাত্রি অভিনীত হয়েছিল। আমাদের মনে হয়, এম্‌-জি-এন্টারপ্রাইজ'এর রামকৃষ্ণ মার্কিণ লেখকের কৃপায় রামপ্রসাদ-এ পরিণত হয়েছে, যেমন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় পরিণত হয়েছেন সুচিত্রা চট্টোপাধ্যায়ে।

আমাদের মনে হয়, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এমন কিছু নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন আছে,

তপন সিংহ পরিচালিত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' চিত্রে রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

যা একটি দেশের সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে অপর দেশে এই ধরণের ভ্রমপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনকে বন্ধ করতে সাহায্য করবে। শুনেছি, থিয়েটার ইন দি ইস্ট বইখানি ইউনাইটেড স্টেটস্ অব আমেরিকাতে একটি প্রামাণ্য বই হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সেই বইয়েরই মাত্র তিনটি পৃষ্ঠার মধ্যে যদি এতগুলি ত্রুটিপূর্ণ বিবরণ পেশ করা হয়ে থাকে, তাহলে সমস্ত বইখানিতে এ-রকম আরও কত ভ্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে, সে-কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

চিত্র সমালোচনা

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ঃ জালান প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ১১,০০০ ফুট দীর্ঘ ও ১১ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী ও গীতরচনা ঃ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ তপন সিংহ; সংগীত-পরিচালনা ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ ঃ বিমল মুখোপাধ্যায়; শব্দধারণ ঃ অতুল চট্টোপাধ্যায় (অন্তর্দৃশ্য); দেবেশ ঘোষ, নৃপেন্দ্র গুহঠাকুরতা, শচীন চক্রবর্তী (বহির্দৃশ্য); সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজনা ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ; নৃত্য-পরিকল্পনা ঃ শম্ভু নাগ; শিল্প নির্দেশনা ঃ সুনীতি মিত্র; সম্পাদনা ঃ সুবোধ রায়; রূপায়ণে ঃ কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রবি ঘোষ, প্রশান্তকুমার, দেবী নিয়োগী, চন্দনা রায়, বীরেশ্বর সেন, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন দাস, কেষ্ট দাস, নিভাননী, অনুভা, রঞ্জনা, লিলি প্রভৃতি। জালান ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় গেল ১লা বৈশাখ, ১৩৬৯, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬২ থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী—দুয়োরাণী, আর সুয়োরাণী—" কিংবা "এক ছিল বেঙ্গমা, আর এক ছিল বেঙ্গমী—", এই ছিল আগেকার কালের উপকথা বা রূপকথার আরম্ভ। উপকথার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে—আখ্যায়িকা-সদৃশ (যে কথা), কল্পিত গল্প, উপাখ্যান বা পুরাবৃত্ত কথন। এখন যুগ বদলেছে; সঙ্গে সঙ্গে উপকথারও রূপ বদলেছে। তাই কোপাই নদীর মাঝ বরাবর হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদি গ্রামের ঘরাতিরিশেক কাহারের আদিম, সরল জীবনযাত্রার কাহিনী—না, ঠিক সরল জীবনযাত্রার কাহিনী নয়, সেই সরল জীবনযাত্রার মধ্যে অকল্পিত বিপর্যয় ঘটে যাবার কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে বর্তমান বাঙলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"। এই যে কাহার বা বাউরীকুল—এরা রাঢ় বাঙলার অন্যতম আদিবাসী। বেহারা-কাহারই হোক আর আটপৌরে কাহারই হোক, যেমন বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এদের ছিল বাস, তেমনি বিচিত্র ছিল এদের জীবনযাত্রা—এদের সংস্কার, এদের অন্ধ বিশ্বাস, রীতিনীতি, করণ-কারণ, ধরণ-ধারণ, বেশভূষা, আহার-উৎসব। আজ আর এদের হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরে স্বাধীন ভারতের দ্রুত শিল্পায়ন এদের বাসভূমির সঙ্গে এদেরও গ্রাস করেছে; আজ এরা 'শ্রেণীহীন' সমাজে ছন্নছাড়া কলমজুর হয়ে নিজেদের হয়ত ভুলতেই বসেছে কিংবা ইতিমধ্যেই ভুলে গিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির দুলাল, এই কাহারদের রূপকথা তারাশংকর চিরকালের জন্যে ধ'রে রেখে দিয়েছেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'তে। বেহারা-কাহারদের মাতব্বর বনোয়ারী আর কালা সুচাঁদ বুড়ী এই আদিম সমাজের জীবন্ত প্রতীক। ওদের সমাজে ছেলেমেয়েতে ভালোবাসা জন্মালে বলত—'রঙ'-এর খেলা। বিবাহিতারও বারণ ছিল না এই রঙের খেলা করতে। স্বামীর কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে সে 'সাঙা' বসত মনের মানুষের সঙ্গে। তাই মাতব্বর বনোয়ারীরও মনে রঙ ধরায় আটপৌরে পাড়ার মাতব্বর পরমের স্ত্রী কালোশশী বা কালো-বৌ। কাহারদের সমাজে এটা তেমন কোনো দোষের জিনিস নয়। কিন্তু এই আদিম সমাজে প্রথম বিদ্রোহের সুর এনেছে করালী; সে কুলকর্ম না ক'রে হয়েছে রেলের কুলীগ্যাংয়ের একজন। বেলদাতিতলার 'কর্তাবাবার বাহন বিরাট

সাপকে পুড়িয়ে মেরে সে বাহাদুরি নেয়; হেঁপোরুগী নয়ানের যুবতী-বৌ পাখীকে নিয়ে সে কাহারপাড়া ছেড়ে চন্দনপুর রেলস্টেশনের কাছে বাসা বাঁধে। ঝড়ে খড়ের চাল উড়ে গেলে সে পাকা দালান গাঁথতে শুরু করে সকলের কথা অগ্রাহ্য ক'রে। মাতব্বর তো মাতব্বর, তার মুনিব ঘোষমশাইকেই সে কেয়ার করে না; মাতব্বরের সঙ্গে সে তো একদিন শক্তি-পরীক্ষা ক'রে জিতেই যায়। করালী যে-বিদ্রোহের সূচনা করে, তাই অনুকূল বাতাস পেয়ে পল্লবিত হয়ে ওঠে; যখন দ্বিতীয় মহাসমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়। করালীর পরণে তখন 'স্যাপার্স অ্যান্ড মাইনার্স'-এর পোশাক—যুদ্ধের সাজ। কাহারেরা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে দেখে আবার আকাশে উড়োজাহাজ দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। যুদ্ধশেষে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কাহার-সম্প্রদায়ের ভাঙন সম্পূর্ণ হয়। কেবল মাতব্বর বনোয়ারী তার সনাতন আদর্শে অটুট থেকে শেষ-নিশ্বাস ফেলে হাঁসুলী বাঁকের মধ্য-সীমায়।

চলচ্চিত্রে এই আদিম সমাজ-জীবনের ভাঙনের কাহিনীকে রূপান্তরিত করতে গিয়ে চিত্রনাট্যকার রূপে তপন সিংহ প্রথমেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তারাশংকর বর্ণিত সমগ্র 'কাহার-সমাজ-জীবন'কে পর্দায় উপস্থাপিত করা একেবারেই দুঃসাধ্য এবং তার প্রয়োজনও নেই। তাই 'হাঁসুলী বাঁকে'র প্রকৃতির সঙ্গে কাহার-সমাজের অংগাংগী সম্পর্ক এবং তাদের স্বাভাবিক অন্ধ বিশ্বাসপূর্ণ জীবনযাত্রার একটি সামগ্রিক রূপ ও তারই সংগে নব-জীবনবোধের অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষকে চিত্র, চরিত্র, সংলাপ ও সংগীতের মাধ্যমে সুপরিস্ফুট ক'রে তোলার মধ্যেই তাঁর কাজকে তিনি সীমিত রেখেছেন। এই কারণেই বনওয়ারীর স্ত্রী গোপালীবালা চিত্রে অনুপস্থিত; আটপৌরে পাড়ার রমণের শ্যালিকাপুত্রী বিধবা সুবাসীর সংগে বনওয়ারির 'সাঙা' বসার কাহিনী উহ্য; কাহার-জীবনের একটি বড় উৎসব—গাজন—চিত্রিত হবার অবকাশ পায়নি; বনোয়ারীর পেশা—গুড় তৈরি করা এবং তার কর্মস্থলে বর্ষার জল নিবারণের জন্যে করালীর 'তেরপল' আনা; এমনকি করালীর নিজের চন্দনপুরের জীবন—সবই ছবিতে অনুক্ত থাকতে বাধ্য হয়েছে। পুরুষ হয়েও মেয়েদের মত আবভাব ও কাপড়-পরা নসুবালার যে-ছবি তারাশঙ্কর এ'কেছেন, ছবির খাতিরে সেই নসুবালা সত্যিই মেয়েতে পরিণত হয়ে দর্শকদের হৃদয় জয় করেছে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-কে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যে চিত্রনাট্যকার তপন সিংহ এর নাট্যাংশের সঙ্গে সঙ্গীতাংশকেও যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন এবং স্বীকার করতে বাধা নেই, তাঁর অভীষ্ট সর্বাংশে সিদ্ধ হয়েছে। পুস্তকাকারে 'হাঁসুলী বাঁক' যেমন সাগা (Saga)-ধর্মী, চলচ্চিত্রাকারেও এটি ঠিক তেমনই সাগাধর্মী—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, দৃশ্যের পর দৃশ্যে, চিত্রের পর চিত্রে চরিত্রের পর চরিত্রে, গানের পর গানে, কথার পর কথায়, আলোকে-অন্ধকারে, রেলের বাঁশীতে, খুশীর হাসিতে, আবহসঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়—আমাদের চোখে ছবিটি একটি বিরাট 'সাগা'রূপে প্রতিভাত হয়েছে। চিত্রনাট্যকার তপন সিংহ এবং পরিচালক তপন সিংহ এক হয়ে মিশে গেছেন এই নব-সৃষ্টির উন্মাদনায়। ঝড় এবং বন্যার বিরাট রূপকে যদি এই ছবির মধ্যে আরও বৃহৎ ক'রে ধরা সম্ভব হ'ত, তাহ'লে এই 'সাগা'-রূপটিও অসামান্য পরিপূর্ণতা লাভ করত।

তপন সিংহের পরেই এই ছবিতে যাঁর কৃতিত্ব সমধিক প্রকাশিত, তিনি হচ্ছেন সুরকার ও গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর রচিত গান-গুলিতেই তিনি যে সার্থক সুরযোজনা করেছেন এবং সেগুলিকে সুগীত হওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন, শুধু তাই নয়, ঘটনা ও দৃশ্য অনুযায়ী আবহ-সঙ্গীত রচনায় তিনি অসামান্য দক্ষতা প্রকাশ করেছেন বাদ্যযন্ত্রের নির্বাচন ও উপযুক্ত সঙ্গীতসৃষ্টি ক'রে। নয়ানের মৃত্যু-দৃশ্যে 'ভাইরে, আলোর তরে ভাবনা কেন হায়রে' যেমন একটি নিঃশব্দ উদাস আবহ রচনা করে, ঠিক তেমনই বর ও বধূবেশী করালী ও পাখীর দলের মিলন-সংগীত 'বর আসিল বর আসিল ও বউ তুমি অংগ তোলো' প্রচণ্ড মাতনের সৃষ্টি করে। পাল্কীবহার দৃশ্যে 'প্লোহী' প্লোহী'' গানও অপূর্ব।

ছবিতে দিন অপেক্ষা রাতের দৃশ্য যেমন অত্যধিক, আবার স্টুডিও-অভ্যন্তর অপেক্ষা বহির্দৃশ্যও ঠিক সমভাবেই অসংখ্য। কাজেই চিত্রশিল্পী বিমল মুখোপাধ্যায়কে গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এই অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কাজকে একটি উচ্চপর্যায়ে পৌঁছুতে পেরেছেন। বিরাট পটভূমিকাকে বজায় রেখে এবং এক-কেন্দ্রীক গল্পের অভাবকে স্বীকার ক'রেও—বনোয়ারী-করালীর আদর্শগত বিরোধ, করালী-পাখীর সোচ্চার প্রেম এবং বনোয়ারী-কালোশশীর গোপন প্রেম, এই তিনটি কাহিনী একস্থানে কেন্দ্রীভূত হবার অবকাশ পায়নি—সুবোধ রায়ের চিত্র-সম্পাদনা ছবিকে স্থানে স্থানে কিছুটা মন্থর ক'রে তুললেও ছবির 'সাগা'-রূপটি প্রকাশে যথেষ্টই সাহায্য করেছে।

এ ধরণের ছবিতে স্বভাবতঃই অভিনেতা-অভিনেত্রীর অংশ গৌণ। তবুও ওরই মধ্যে পুরুষ-ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (বনোয়ারী), দিলীপ রায় (করালী), রবি ঘোষ (পানু), দেবী নিয়োগী (পরম), কেষ্ট দাস (নয়ান), পাগল (প্রশান্তকুমার) এবং মেয়েদের মধ্যে লিলি চক্রবর্তী (নসু), রঞ্জনা (পাখী), নিভাননী (সুচাঁদ বুড়ী) ও অনুভা (কালোশশী) চরিত্রোপযোগী অভিনয় ক'রে আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তারাশংকরের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' যেমন একটি নূতন ধরণের সাহিত্যকীর্তি, তপন সিংহ পরিচালিত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' চিত্রটিও তেমনই বাঙলা চলচ্চিত্র জগতে একটি নবতম শিল্পসৃষ্টিরূপে ঘোষিত হবে।

বিবিধ সংবাদ

'চেনা-অচেনা'র ভীমপলশ্রী':

'ভীমপলশ্রী' কাহিনীটি একটি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত হ'লেও 'বনফুল'-এর সরস কৌতূহলোদ্দীপক ভঙ্গী বইখানিকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দান ক'রে বাঙ্গালী পাঠকের অত্যন্ত প্রিয় ক'রে তুলেছে। সেই 'ভীমপলশ্রী'র একটি সার্থক নাট্যরূপের অভিনয় দেখলুম গেল ১৩ই এপ্রিল রঙমহল রঙ্গমঞ্চে। প্রতি অঙ্কে পাঁচটি ক'রে দৃশ্য রেখে মাত্র দুটি অঙ্কের মধ্যে সমগ্র কাহিনীকে যেভাবে নাট্য-কৌতূহল (Suspense) বজায় রেখে তিনি শেষ করেছেন, তার জন্যে নাট্যরূপদাতা সুনীল

ঘোষের ভূয়সী প্রশংসা না ক'রে পারি না। বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণে একটি সুষ্ঠু মান বজায় রেখে সমগ্র নাটকটি অভিনীত হয়েছে এবং ওরই মধ্যে অসামান্য নাট-নিপুণতা দেখিয়ে আমাদের রীতিমত অবাক করে দিলেন অজিত মুখোপাধ্যায় 'সদারঙ্গ বিহারীলাল'-এর ভূমিকায়। তাঁকে একজন ঝানো অভিনেতা বলতে আমরা আদৌ কুণ্ঠিত হব না। অপরাপর ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য সুঅভিনয় করেছেন অমর মুখোপাধ্যায় (হরিহর), জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুশোভন), দেবু বসু (ব্রজেশ্বর), অমরেন্দু মল্লিক (দিগ্বিজয়), নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জীতুবাবু), শমিতা বিশ্বাস (সান্ত্বনা), নমিতা দত্ত (স্বয়ংপ্রভা), পারুল দত্ত (সুরেশ্বরী) প্রভৃতি।

"গ্রুপ থিয়েটার"-এর "নয়ছয়" :

গেল শনিবার, বাঙলা নববর্ষের সন্ধ্যায় "গ্রুপ থিয়েটার" শ্রী-শিক্ষায়তন মঞ্চে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত একাঙ্ক প্রহসন "নয়ছয়" অভিনয় করেছেন। এই অভিনয় মারফত আমরা একজন প্রকৃত শক্তিশালিনী নাট্য-রচয়িত্রী ও অভিনেত্রীর সন্ধান লাভ করলুম; তিনি হচ্ছেন—গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিসেস চৌধুরীর চরিত্রে তাঁর অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক অভিনয় প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ যাঁদের হয়েছে, তাঁরা আমাদের সঙ্গে একবাক্যে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, মঞ্চ বা পর্দায় এ-ধরনের নাট্যনিপুণতার পরিচয় আমরা অতি অল্প অভিনেত্রীর কাছ থেকেই পেয়েছি। কন্যাদায়গ্রস্ত উকীল-পিতার জিদে এক অবাঞ্ছিত পাত্রের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দিনে পাত্রী 'উমা'কে এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারী একটি ছোট দলভুক্ত 'সজল'-এর সঙ্গে আকস্মিক পরিণয় ঘটিয়ে তিনি যে-ভাবে নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন, তাতে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মাত্র পাড়ার 'রকবাজ'দের দিয়ে ঘৃণ্য অঙ্গভঙ্গী-সহকারে তথাকথিত সনৃত্য গানের অবতারণা না করলেই তিনি সুরুচির পরিচয় দিতেন। জীবনে যা-কিছু ঘটে তাই আর্ট বা সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে না, এই সনাতন তত্ত্বটি তাঁর নিশ্চয়ই অজ্ঞাত নেই। তাঁর পরেই সুখ্যাতির সঙ্গে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে যতীন দাস (দুখিয়া ঝাড়ুদার), রেণু ঘোষ (তমালিনী), অপর্ণা চক্রবর্তী (মানসী), সলিল গাঙ্গুলী (সজল), সলিল দাস (পবিত্রবাবু), তপেন চট্টোপাধ্যায় (বিমল), মহম্মদ রেজওয়ান (দারোগাবাবু), বেলা মৌলিক (উমা), অবনী মুখোপাধ্যায় (গজেন), সুনীল দত্ত (রহিম) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। খালেদ চৌধুরী অল্প পরিবেশের মধ্যে একটি সুন্দর দৃশ্যরচনা করেছিলেন। 'Beware of dogs' পরিবর্তিত হয়ে 'Beware of Gods'-এ রূপান্তরিত হওয়া আজকের দিনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সেতুর ৬০০-তম স্মারক উৎসব

গেল রবিবার, ১৫ই এপ্রিল সন্ধ্যায় ৬০৫-তম অভিনয়ের প্রাক্কালে বিশ্বরূপার বিজয়বৈজয়ন্তী "সেতু" নাটকের ৬০০-তম স্মারক উৎসব সম্পন্ন হ'ল। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন স্থানীয় বার্ড কোম্পানীর অন্যতম মালিক মিঃ বেন্থল এবং নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে রাসবিহারী সরকার বলেন, রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে ইংরাজ জাতির প্রতি সাংস্কৃতিক ঋণ-স্বীকারের নিদর্শনস্বরূপ তাঁরা মিঃ বেন্থলকে ঐ উৎসবে সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ করেছেন। ভারতের রঙ্গমঞ্চে একাদিক্রমে চলার অভাবনীয় রেকর্ড সম্পর্কে প্রধান অতিথিরূপে অহীন্দ্র চৌধুরী বলেন, 'সেতু' নাটক কেন এই জনপ্রিয়তালাভ করেছে, তা সম্ভবতঃ কেউই বিশ্লেষণ ক'রে বলতে পারবেন না। কারণ, জনপ্রিয়তালাভের ফরমূলা যদি জানা থাকত, তাহ'লে পৃথিবীর সব নাট্যাভিনয়ই জনপ্রিয় হ'ত—কোনো বিশেষ একটি নাটক হঠাৎ জনপ্রিয় হ'ত না। তিনি এই সম্পর্কে আগাথা ক্রিস্টির "মাউস ট্র্যাপ" বা বার্নার্ড শ'য়ের 'পিগম্যালিয়ন' ভেঙে 'মাইফেয়ার লেডি'র অসাধারণ জনপ্রিয়তার উল্লেখ ক'রে বলেন, 'সেতু' নাটককে যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা তার এই রেকর্ড-সৃষ্টিকারী চলার পথে যথেষ্টই পাথেয় যোগাচ্ছে।

চতুর্থ বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন (১৯৬২)

বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার, ১৯-এ এপ্রিল থেকে রবিবার, ২২-এ এপ্রিল পর্যন্ত চারটি অধিবেশনে সম্পূর্ণ চতুর্থ বঙ্গনাট্যসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম তিন দিন সন্ধ্যা ৬টায় এবং শেষ দিন সন্ধ্যা ৫৷৷টায় অধিবেশনগুলি আরম্ভ হয়ে প্রতিদিনই প্রায় চার ঘণ্টা ধ'রে চলবে। সকল নাট্যামোদীকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

রূপান্তরী'র দুটি একাঙ্কিকা :

মৌলিক যুগোপযোগী নাটক প্রযোজনায় "রূপান্তরী"র বৈশিষ্ট্য সুবিদিত। গেল জানুয়ারী মাসে তাঁরা দুটি মৌলিক একাঙ্ক নাটক প্রযোজনা করে আরেকটি নতুন পথে পা বাড়িয়েছেন। আসছে ২৩এ এপ্রিল সন্ধ্যে সাতটায় তাঁরা আবার দুটি একাঙ্ক নাটক থিয়েটার সেণ্টার হলে মঞ্চস্থ করবেন। এর মধ্যে "রূপান্তরী"র সদস্য জগদীশ চক্রবর্তী রচিত 'ডাঃ হালদার' একাঙ্কিকাটি আজকের হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার উপর ব্যঙ্গ-নাটিকা। দ্বিতীয়টির নাম 'পঙ্গপাল'। প্রখ্যাত নাট্যকার জোছন দস্তিদার তাঁর এই সর্বাধুনিক একাঙ্ক নাটকটি রচনা করেছেন অট্টালিকা-নির্মাণে নিযুক্ত একদল রাজমিস্ত্রী, কুলি ও মজুরদের নিয়ে। দুটি নাটকেই
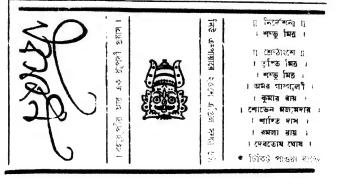
রূপান্তরীর ভাবাদর্শ ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে।

হাওড়ায় নিয়মিত অভিনয়

গেল ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল হাওড়া টাউন হলে ঋত্বিক ও নট-নাট্যম নাট্য-গোষ্ঠীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় হাওড়ায় নিয়মিত অভিনয় করার প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে দু'খানি একাঙ্ক নাটক—ঋত্বিক প্রযোজিত পরিমল দত্তর 'ব্যাণ্ডমাষ্টার' ও প্রেমেন্দ্র মিত্র 'সংসার সীমান্তে'র নাট্যরূপ অভিনীত হয়েছিল। শেষেরটির রূপদাতা ও দুটি নাটকেরই পরিচালক শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়। নট-নাট্যম নাট্যসংস্থা অভিনয় করেছিলেন 'করুণা করো না' ও 'ভরা কাজ করে'। এ দুটির রচনা ও প্রথমটির পরিচালনা করেছেন শ্রীজগমোহন মজুমদার ও শেষেরটির পরিচালনা করেছেন শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়মিত অভিনয়ের এই রজনীদ্বয়কে স্মরণীয় করে তোলার জন্য শিল্পী শ্রীরবীন মন্ডলের সম্পাদনায় একটি 'স্মরণী' প্রকাশিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন বিধানসভার সদস্য ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়।

।। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ।।

মণিপুরী নৃত্যকলা মন্দিরের প্রযোজনায় গত পয়লা বৈশাখ ক্যালকাটা ইনফরমেশান সেন্টার হলে মণিপুরী নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত বসন্ত সিংহের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "বসন্ত" নৃত্যনাটিকার এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি, উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত পি কে খান্না, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায় এবং শ্রীযুক্ত সুনীল-রঞ্জন সেনগুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত বাসন্তী বাগচী।

হিন্দী ছবি 'হাফ টিকিট'এ একটি দৃশ্যে কিশোরকুমার ও মধুবালা

সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে সূত্রধরের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে সর্বশ্রী কবি প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী গুহ, মিনাতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা নাহা, বাসন্তী বাগচী, গীতা বোস, ছায়া পাল, স্মৃতিরেখা দেব, মীরা দেব, জ্যোতিপ্রকাশ বসু, কিশোরকান্ত বাগচী, তপতী নন্দী, বীণা সেনগুপ্ত, খগেন্দ্র মুখার্জি, অজয় রায়চৌধুরী, সৌরেন নাগ, গৌর দে, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, অজিতকুমার নন্দী, চন্দন দাস প্রভৃতি। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী রূপা রাহা, মালা দে, শিপ্রা লাহিড়ী, শিখা দত্তরায়, অনিমা সিকদার, প্রতিমা দত্ত, অঞ্জলি সিকদার, নন্দনা রায়, ইন্দ্রাণী রায়, মধুছন্দা দাস, শীলা সেন, লিলি পাল, সুজাতা লাহিড়ী, প্রজ্ঞাপারমিতা রায় প্রভৃতি।

রাজার ভূমিকায় প্রমোদ মুখোপাধ্যায় এবং রাজকবির ভূমিকায় মৃণাল মুখোপাধ্যায়ের দরাজ কণ্ঠে অভিনয় খুবই শ্রুতিমধুর। সঙ্গীতাংশে সুমিত্রা নাহার কণ্ঠে একক সঙ্গীত সত্যই উচ্চ-প্রশংসিত। নৃত্যাংশে ঋতুরাজ ও মালতীর নৃত্যও সুন্দর। সবদিক দিয়েই নৃত্যনাটটি সুন্দর প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী সকলেই চমৎকৃত হন।

তিন দেশী ছবি

বাইশ বছর পর আবার একজন বিদেশিনী হলিউডের পুরস্কার দাক্ষিণ্যে অভিষিক্তা হলেন। ১৯৩৯ সালে "গন উইথ দি উইন্ড" ছবিতে অভিনয় করে এ্যাকাডেমি এ্যাওয়ার্ড পান ইংরেজ অভিনেত্রী ভিভিয়ান লে, তারপর থেকে ঘরের পুরস্কার ঘরেই থেকে যাচ্ছিল। অবশেষে ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার হেমকান্তি অস্কার মূর্তিটি ইটালির পথে যাত্রা করল, কারণ ১৯৬১ সালের জন্যে পুরস্কৃত হয়েছেন ইটালির সোফিয়া লোরেন, "দি টু উইমেন্স" ছবির অভিনয়ের জন্যে।

শরীরিণী সোফিয়ার খ্যাতি কিন্তু রূপনির্ভর না। স্বনামধন্যা অভিনেত্রী আনা ম্যাগনানির মতে সোফিয়া একটি "Neopolitan giraffe" মাত্র। বাস্তবিক ইউরোপীয় সমকালীন তারকাদের পাশে সোফিয়াকে রূপবতী বলা

'অস্কার'-বিজয়িনী সোফিয়া লোরেন

প্রায় কঠিন। লম্বা নাক, দুর্বল চিবুক-কোনো তাঁকে ক্যামেরা-সুন্দর করে না, কিন্তু উদ্ভুতে আঙ্গিকের নিরলস, নিরাবেগ ব্যবহারে লোরেন একটি বিরল দর্শক-চক্ষুজয়ী প্রতিভা।

সোফিয়া লোরেনের সাতাশ বসন্তের সমস্তটা জীবনই অধিকার অর্জনের যুদ্ধ-কাহিনী। এমনকি তাঁর বর্তমান পদবীটাও আদালত মারফৎ অর্জিত। মিলানের আদালতে সোফিয়ার বিমাতা এক অভিযোগ আনেন এই বলে যে, সোফিয়া এবং তার বোন মারিয়া "লোরেন" পদবীর অধিকারিণী হতে পারে না কারণ তাদের গর্ভধারিণী তাদের পিতার বিবাহিতা স্ত্রী নন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুই বোন মামলাটি জিতেছিলেন এবং এই মিলান আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দী থেকেই সোফিয়ার দরিদ্র-পীড়িত জীবনের অনেক কথা সাংবাদিকরা জেনেছেন।

নেপলস-এর উত্তরে পজুলি সোফিয়ার জন্মস্থান। সোফিয়ার বাল্যকাল শুধু ক্ষিদের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য :—

There was no meat to be had nor fish—only maize. The only feeling I had was hunger. I know what it is to have nothing and to be nothing. পজুলিতে মার সঙ্গে ঠাকুমার বাড়িতে থাকতেন সোফিয়া এবং তাঁর বোন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স মাত্র ছয়। এই সময় একবার বিমান আক্রমণে মুখে আঘাত পান তিনি। মা দুই মেয়েকে নিয়ে চলে আসেন নেপলসে বোনের বাড়িতে। বাড়িতে মারিয়াকে রেখে মা আর মেয়ে কতদিন যে রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছেন তার স্মৃতি আজো অম্লান সোফিয়ার কাছে। মা সিসিলেন ছিলেন অসাধারণ পিয়ানো বাজিয়ে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মত মেয়েও সঙ্গীতে স্বনামধন্যা হোক। পিয়ানো শিখতে আরম্ভ করলেন সোফিয়া। ইতিমধ্যে একটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় নেমে দ্বিতীয়া হয়ে কিঞ্চিৎ লক্ষ্যগোচর হলেন। নেপলস থেকে আবার সিসিলেন তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে রোমে এলেন। রোমে কয়েকটি পত্রিকা-প্রচ্ছদে প্রকাশিত সোফিয়ার ছবিতে আকৃষ্ট হয়ে কয়েকজন প্রযোজক তাঁকে সিনেমায় অভিনয়ের জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। প্রথম দু বছরে ছোটখাট ভূমিকায় প্রায় তেরোটা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সোফিয়া। প্রথম নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন Aida নামক চিত্রে।

আমেরিকায় সোফিয়ার প্রথম ছবি "ডিজায়ার আন্ডার দি এলমস"। সোফিয়ার আন্তর্জাতিক খ্যাতি বর্ধিত হয়েছে, কিন্তু "দি প্রাইড এ্যান্ড দি প্যাশন", "দি বয় এ্যান্ড দি ডলফিন", "হাউজ বোট" প্রভৃতি ছবিতে নায়িকা-চরিত্রে অনন্য অভিনয়ের জন্যে।

১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে 'অস্কার' পুরস্কার প্রাপ্ত সঙ্গীতমুখর "ওয়েস্ট সাইড ষ্টোরি"র একটি দৃশ্য

খেলাধূলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
পঞ্চম টেস্ট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৫৩ রান (গারফিল্ড সোবার্স ১০৪, রোহন কানহাই ৪৪, ইষ্টন ম্যাকমরিস ৩৭। রঞ্জনে ৭২ রানে ৪, নাদকার্ণী ৫০ রানে ৩, দুরাণী ৫৬ রানে ২ এবং বোরদে ৩৩ রানে ১ উইকেট)

ও ২৮৩ রান (ওরেল নট আউট ৯৮, সোবার্স ৫০, ম্যাকমরিস ৪২, কানহাই ৪১। সুর্তি ৫৬ রানে ৩, দুরাণী ৪৮ ৩, রঞ্জনে ৮১ রানে ২, নাদকার্ণী ১৩ রানে ১ এবং বোরদে ৬৫ রানে ১ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ১৭৮ রান (বাপু নাদকার্ণী ৬১, রুসি সুর্তি ৪১ এবং পলি উমরিগড় ৩২। লেস্টার কিং ৪৬ রানে ৫, লান্স গিবস ৩৮ রানে ৩ হল ২৬ রানে ১ এবং আলফ ভ্যালেন্টাইন ৩২ রানে ১ উইকেট)।

ও ৩৭ রান (২ উইকেটে)—দ্বিতীয় ইনিংস অসমাপ্ত।

প্রথম দিন (১৩ই এপ্রিল) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ২৫৩ রানে সমাপ্ত। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৩ রান (৫ উইকেটে)। পতৌদির নবাব ৮ এবং নাদকার্ণী ০ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (১৪ই এপ্রিল) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৭৮ রানে সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস—১৩৮ রান (৬ উইকেটে)। ওরেল ৩২ এবং কিং শূন্য রান ক'রে নট আউট থাকেন।

৩য় দিন (১৬ই এপ্রিল) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৮৩ রানে

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

সমাপ্ত। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস—৩৭ (২ উইকেটে)। মেহেরা (১৫) এবং বোরদে (৮) নট আউট আছেন।

সেলিম দুরাণী

নাদকার্ণী

চতুর্থ ও পঞ্চম দিনের খেলা এখনও বাকি।

পোর্ট-অব-স্পেনের চতুর্থ টেস্ট খেলায় বিজয়ী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের থেকে পঞ্চম টেস্ট খেলায় এই চারজন বাদ পড়েন—উইকেট কীপার মেনডোনকা, ফাস্ট বোলার স্টেয়ার্স, লেগ-স্পিন বোলার রডরিগস এবং ব্যাটসম্যান নার্স। এই চারজনের শূন্যস্থানে দলভুক্ত হ'ন মিডিয়াম ফাস্ট বোলার লেস্টার কিং, লেফট-আর্ম-স্পিন বোলার আলফ্রেড ভ্যালেন্টাইন, উইকেট-কীপার ডেভিড এ্যালেন এবং ব্যাটসম্যান জো সলোমন।

গারফিল্ড সোবার্স

এই চারজনের মধ্যে লেস্টার কিং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট দলে নবাগত খেলোয়াড়। এইভাবে খেলোয়াড় পরিবর্তন ক'রে দল গঠনের উদ্দেশ্য নতুন খেলোয়াড়ের সন্ধান করা যাতে ক'রে আগামী বছর ইংল্যাণ্ড সফরে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল গঠন করা যায়। পঞ্চম টেস্টে ভারতীয় দলে বসন্ত রঞ্জনে বাদে সকলেই ছিলেন চতুর্থ টেস্টের খেলোয়াড়। চতুর্থ টেস্টের খেলোয়াড় সারদেশাইয়ের স্থানে রঞ্জনেকে দলভুক্ত করা হয়। সারদেশাই অসুস্থ ছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে রঞ্জনের এই প্রথম টেস্ট খেলা। লেস্টার কিং টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন খুব ভাল ভাবেই—প্রথম দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলায় লেস্টার কিং ৬ ওভার বল ক'রে ১টা মেডেন পান এবং মাত্র ২০ রান দিয়ে ৫টা উইকেট পান।

পঞ্চম টেস্ট খেলাতেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল টসে জয়লাভ করেন—উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট খেলায় ভাগ্যের খেলাতে ওরেলের

...লাভ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা ভাল হয়নি, খেলায় মাত্র ২ রানের মাথায় হান্ট এক রান ক'রে নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় ...মের বলে উইকেট-কীপার কুন্দরামের হাতে ধরা পড়েন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ম্যাকমরিস এবং কানহাই ৬০ মিনিটের খেলায় ৬২ রাণ তুলে দেন। দলের ৬৪ রানের মাথায় দুরাণীর বলে ম্যাকমরিস (৩৭ রান) এবং সলোমন (০) আউট হন। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের রান দাঁড়ায় ১২৭, ৪ উইকেট পড়ে। উইকেটে নট আউট ছিলেন ওরেল (২৪ রান) এবং সোবার্স (৩৭ রান)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ২৫৩ রানে শেষ হয়। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১০৪ রান করেন গারফিল্ড সোবার্স। সোবার্স চতুর্থ উইকেটে যখন কানহাইয়ের সংগে খেলতে নামেন তখন দলের ৩ উইকেট পড়ে মাত্র ৬৪। সোবার্স দলের ২৫৩ রানের মাথায় নিজস্ব ১০৫ ক'রে আউট হ'লে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলাও শেষ হয়ে যায়। সোবার্স পঞ্চম উইকেটে ওরেলের সহযোগিতায় ৪৭ রান, ষষ্ঠ উইকেটে হলের সহযোগিতায় ৩০ মিনিটে ৩৪ রান এবং দশম উইকেটে ভ্যালেনটাইনের সহযোগিতায় দলের ৩৫ রান তুলে দেন। সোবার্স এই ১০৪ রান তুলতে ২০০ মিনিট সময় নেন। বাউন্ডারী করেন ১২টা এবং ওভার-বাউন্ডারী ২টো। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সোবার্সের এই সেঞ্চুরী ১৩শ সেঞ্চুরী এবং আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের বিপক্ষে দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। ভারতবর্ষের ফিল্ডিং এবং বোলিং খুবই ভাল হয়। রঞ্জনে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন—৭২ রানে ৪টে উইকেট পান। রঞ্জনের বলে হান্ট, কানহাই, ওরেল এবং সোবার্স এই চারজন নামকরা ব্যাটসম্যান আউট হ'ন। উমরিগড় পীঠের বেদনায় এবং সুর্তি আঙ্গুলে আঘাত পেয়ে এইদিন মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ভারতবর্ষ এইদিন ৬৫ মিনিটের মত খেলার সময় পায় এবং এই সময়ে ৫টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩৩ রাণ তুলে দিয়ে ২২০ রাণের পিছনে পড়ে থাকে। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি পতৌদি (৮ রাণ) এবং নাদকার্ণী (০) এইদিনের মত নট আউট থাকেন। ভারতবর্ষের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব ...তে খেলোয়াড় লেস্টার কিংয়ের। ...মাত্র ২০ রান দিয়ে ভারতবর্ষের ৫টা উইকেট পান। এই খেলা থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় বিগত চারটি টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের বিপর্যয় কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় দলের ৪০ রাণের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট (পতৌদির নবাব—৭ রাণ) পড়ে যায়। ৭ম উইকেটে নাদকার্ণীর সংগে সুর্তি জুটি বেঁধে দলের ভাঙ্গন রোধ করেন—৭ম উইকেটের জুটিতে ৭০ মিনিটের খেলায় ৭২ রাণ ওঠে। সুর্তি ৭০ মিনিট খেলে নিজস্ব ৪১ রান ক'রে ১১২ রানের মাথায় আউট হ'ন। বাউন্ডারী ৩টি এবং ১টা ওভার-বাউন্ডারী মারেন। ৮ম উইকেটে নাদকার্ণীর সংগে জুটি বাঁধেন অসুস্থ উমরিগড়। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের স্কোর দাঁড়ায় ১৩৫, ৭ উইকেটে। উইকেটে তখন নাদকার্ণী ৪৫ রান এবং উমরিগড় ৭ রাণ করে নট আউট। দলের ১৭১ রাণের মাথায় নাদকার্ণী ৬১ রান করে আউট হন। নাদকার্ণী ৫টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার বাউন্ডারী মেরেছিলেন। ৮ম উইকেটের জুটিতে ৬৩ মিনিটের খেলায় দলের ৫৯ রান ওঠে। দলের ১৭৮ রানের মাথায় ৯ম উইকেট (কুন্দরাম) এবং ১০ম উইকেট (উমরিগড়) পড়ে যায়। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৭৮ রানে শেষ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭৫ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনাও প্রথম ইনিংসের মতোই শোচনীয় হয়। দলের মাত্র এক রানের মাথায় দুটো উইকেট (হান্ট ০ এবং সলোমন ০) পড়ে যায়। সলোমনের ভাগ্যে উভয় ইনিংসেই শূন্য রান জুটে। ক্রিকেট খেলায় উভয় ইনিংসেই শূন্য রান ব্যাটসম্যানের পক্ষে খুবই ব্যর্থতার পরিচয়। রঙীন চশমা পরে লজ্জা ঢাকার মতই অবস্থা। শেষ পর্যন্ত ৩য় উইকেটের জুটি ম্যাকমরিস এবং সোবার্স দলের রান অনেকটা স্বচ্ছন্দ করেন। সোবার্স তাঁর খেলায় প্রাণ-প্রাচুর্যের যথেষ্ট পরিচয় দেন। বিবিধ মারে তিনি ভারতীয় খেলোয়াড়দের মাঠে ছত্রভঙ্গ করে দেন। সোবার্স ৬৩ মিনিটে ৫০ রান করে আউট হন, দলের ৭৫ রানের মাথায়। ৩য় উইকেটে দলের ৭৪ রান উঠে যায়। ম্যাকমরিসের সংগে ৪র্থ উইকেটে খেলতে নামেন দলপতি ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। দলের ১১৮ রানের মাথায় ম্যাকমরিস ৪২ রান করে আউট হ'ন। ম্যাকমরিস যেন বেরালের প্রাণ নিয়ে আজ খেলতে নামেন। কয়েকবার আউট হ'তে হ'তে বেঁচে যান। দলের রান যখন মাত্র ৭ এবং তাঁর রাণ ৫ তখন সুর্তির বলে নাদকার্ণী তাঁকে আউট করতে পারেননি। বল হাত-ছাড়া হয়ে যায়। উইকেট-কীপার কুন্দরাম তাঁকে দু'বার ছেড়ে দেন—দলের ২২ রানের মাথায় যখন তাঁর রান ১০ এবং দলের ৮২ রানের মাথায় যখন ম্যাকমরিসের রান ৩০। শেষ পর্যন্ত ম্যাকমরিস বোরদের বল মারতে গিয়ে নিজেই নিজের উইকেট ভেঙ্গে ফেলে খেলা থেকে বিদায় নেন। এইদিনের খেলা ভাঙ্গতে যখন মাত্র ২০ মিনিট বাকি এমন সময় অঘটন ঘটে গেল—বোরদের বলে ম্যাকমরিস, দলের ১৩৮ রানের মাথায় দুরাণীর বলে এ্যালান এবং গিবস খেলা থেকে বিদায় নিলেন। এ্যালান ২ রান এবং গিবস কোন রান না করেই খেলা থেকে বিদায় নেন। ৭ম উইকেটের জুটি ওরেল (৩২ রান) এবং কিং (০ রান) এইদিনের মত নট আউট থাকেন। এইদিনের খেলায় ভারতীয় দলের ফিল্ডিংয়ে যথেষ্ট গলতি ধরা পড়ে। ঠিকমত ফিল্ডিং হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের আরও বেশী উইকেট পড়তো এবং রানও কম হ'ত। প্রথম দু'দিনের খেলায় ২৬টা উইকেট পড়ে ৫৬৯ রান ওঠে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২১৩ রানে অগ্রগামী থাকে।

খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান দাঁড়ায় ১৩৮, ৬ উইকেট পড়ে।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় শেষ ওভারের শেষ দুটো বলে দুরাণী ২টো উইকেট নিয়েছিলেন। তৃতীয় দিনের খেলার সূচনায় দুরাণীর প্রথম বলে চার মারলেন লেস্টার কিং, দুরাণীর 'হ্যাট-ট্রিক' সম্মান পাওয়া আর হ'ল না। দলের ১৫৪ রানের মাথায় কিং নিজস্ব ১৩ রান ক'রে আবিশ্য দুরাণীর বলেই নাদকার্ণীর হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন। তাঁর শূন্য উইকেটে খেলতে নামেন কানহাই। অসুস্থ থাকায় কানহাই শনিবারের খেলায় যথাসময়ে নামতে পারেননি। লাঞ্চের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খেলা গড়ায়নি। বৃষ্টি নামায় ২৩ মিনিট আগেই খেলা বন্ধ হয়। এই সময়ে দলের রান ছিল ২২১, ৭টা উইকেট পড়ে। উইকেটে নট আউট ছিলেন ওরেল (৬৪ রান) এবং কানহাই (৩৩ রান)। লাঞ্চের পরবর্তী খেলায় দলের ২৩২ রানের মাথায় কানহাই নিজস্ব ৪১ রান ক'রে রঞ্জনের বলে বোল্ড আউট হ'ন। তাঁর ৪১ রানে ছিল ৭টা বাউন্ডারী। ৮ম উইকেটের জুটিতে কানহাই এবং ওরেল ৯০ মিনিটের খেলায় দলের মূল্যবান ৭৮ রান তুলে দেন। এরপর ৯ম উইকেটে ওরেলের সংগে খেলতে নামেন ওয়েসলে হল। হল দলের ২৪৮ রানের মাথায় ১০ রান ক'রে রঞ্জনের বলে এল-বি- ডব্লিউ হয়ে আউট হ'ন। লাঞ্চের পর যখন পঞ্চাশ মিনিট খেলা হয়েছে তখন পুনরায় বৃষ্টি নামার জন্যে খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হয়। এই সময়ে ওরেল ৮৯ এবং ভ্যালেন্টাইন ৬ রানে নট-আউট ছিলেন। দলের ২৮৩ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ উইকেট (ভ্যালেন্টাইন) পড়ে যায়। ওরেল আর মাত্র ২ রানের জন্যে তাঁর শতরান পূর্ণ করতে পারলেন না জুটির অভাবে, ৯৮ রান ক'রে নট-আউট রইলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম

ইনিংসের ২৫৩ রানের থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০ রান বেশী করে। ভারতবর্ষ ৩৫৮ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় প্রথম ইনিংসের মতই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নবাগত খেলোয়াড় লেস্টার কিং ভারতীয় দলের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ান। কিংয়ের বলে দলের ১৫ রানের মাথায় জয়সীমা ৬ রান ক'রে এবং দলের ২৫ রানের মাথায় দুরাণী মাত্র ৪ রান করে আউট হন। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ৩৭, দুটো উইকেট পড়ে। মেহেরা (১৫) এবং বোরদে (৮ রান) নট আউট থাকেন। ভারতবর্ষ এখনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজদলের থেকে ৩২১ রানের পিছনে পড়ে আছে। হাতে এখনো পুরো দুদিন খেলার সময় বাকি এবং উইকেট জমা আছে ৮টা। সময়ের দিক থেকে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩২২ রান তুলে দেওয়া মোটেই শক্ত কাজ নয়, তবে ভারতবর্ষের কথা আলাদা।

॥ টেস্ট ক্রিকেটে দুর্লভ সম্মান ॥

ক্রিকেট খেলায় যত রকমের দুর্লভ সম্মান আছে তার মধ্যে পাঁচটি টেস্ট খেলা সমন্বিত টেস্ট সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই জয়লাভ করার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে দুর্লভ সম্মানের পর্যায়ে পড়ে। এ পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে মাত্র দুটি দেশ অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড এই সম্মান লাভ করেছে। ১৯২০-২১ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ইংল্যান্ড দলের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলায় জয়লাভ ক'রে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে প্রথম এই সম্মান লাভের গৌরব লাভ করে। এই টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ছিলেন ওয়ারিক আর্মস্ট্রং এবং ইংল্যান্ড দলের জে. ডবলউ. এইচ. টি ডগলাস। এই টেস্ট সিরিজে সিডনির প্রথম টেস্টে ৩৭৭ রানে, মেলবোর্ণের দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংস এবং ৯১ রানে, এডলেডের তৃতীয় টেস্টে ১১৯ রানে, মেলবোর্ণের চতুর্থ টেস্টে ৮ উইকেটে এবং সিডনির পঞ্চম টেস্টে ৯ উইকেটে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ ক'রে 'রাবার' জয় করে। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে পাঁচটি টেস্ট খেলার টেস্ট সিরিজ প্রথম আরম্ভ হয় অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১৮৮৪-৮৫ সালে—এই দুই দেশের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট খেলা সূচনার অনেক বছর পরে। দুটো টেস্ট খেলার টেস্ট সিরিজ নিয়ে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হয় ১৮৭৬-৭৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে।

এরপর টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলাতেই অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভ—অস্ট্রেলিয়া সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ১৯৩১-৩২ সালে। এই 'রাবার' বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়কত্ব করেছিলেন বিল উডফুল। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অধিনায়ক ছিলেন এইচ বি ক্যামেরন।

সুদীর্ঘকালের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলাতেই একদল জয়লাভ করেছে এমন ঘটনা ঘটেনি। ১৯৫৯ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ড ৫—০ খেলায় ইংল্যান্ড সফরকারী ভারতীয় দলকে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয় দল হিসাবে প্রথম এই সম্মান লাভ করে। তবে ইংল্যান্ডের একজনের অধিনায়কত্বে এই সম্মান আসেনি—পিটার মে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্ট খেলায় অধিনায়ক ছিলেন এবং কলিন কাউড্রে ছিলেন শেষের দুটি টেস্টে—চতুর্থ এবং পঞ্চম।

সুতরাং অধিনায়কের সাফল্যের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ারিক আর্মস্ট্রং এবং বিল উডফুলের মর্যাদা ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৫৯ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলায় বিজয়ী ইংল্যান্ড দলের যুগ্ম অধিনায়ক পিটার মে এবং কলিন কাউড্রের থেকে অনেক বেশী।

॥ ক্যালকাটা হকি লীগ ॥

১৯৬২ সালের ক্যালকাটা হকি লীগ প্রতিযোগিতার সকল বিভাগের খেলা শেষ হয়েছে। প্রথম বিভাগের 'এ' গ্রুপে মোহনবাগান ক্লাব ১৮টা খেলায় ৩৪ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছে। লীগের শেষ খেলায় এরিয়ান্স দলের কাছে ১—৩ গোলে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতায় অপরাজেয় সম্মান লাভ থেকে মোহনবাগান বঞ্চিত হয়েছে। এই খেলাটির উপর মোহনবাগান দলের বিশেষ কিছু গুরুত্ব ছিল না— একমাত্র অপরাজেয় রেকর্ড করা ভিন্ন। কারণ এই খেলার আগেই তারা নিজ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে যায়। মোহনবাগান দলের নামকরা খেলোয়াড়রা বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত গোল্ড কাপ হকি টুর্ণামেণ্টে দলের পক্ষে যোগদান করায় এরিয়ান্সের বিপক্ষে মোহনবাগান এক দুর্বল দল গঠন করতে বাধ্য হয়। মোহনবাগানের বিপক্ষে এরিয়ান্স ২ পয়েণ্ট পাওয়াতে দ্বিতীয় বিভাগে নামা থেকে এরিয়ান্সের ফাঁড়া কেটে গেল। 'এ' গ্রুপে রাণার্স-আপ হয়েছে গত বছরের যুগ্ম লীগ চ্যাম্পিয়ান কাস্টমস, ১৮টা খেলায় তাদের ২৭ পয়েণ্ট উঠেছে। প্রথম বিভাগের 'বি' গ্রুপে প্রথম স্থান লাভ করেছে গত বছরের যুগ্ম-লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল এবং রাণার্স-আপ হয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অপরাজেয় অবস্থায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—১৮টা খেলায় ৩৫ পয়েণ্ট—একটা খেলা ড্র।

দ্বিতীয় বিভাগে বি এন আর (১৫টা খেলায় ৩০ পয়েণ্ট) এবং ক্যালকাটা এফ সি (১৫টা খেলায় ২৭ পয়েণ্ট) যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ান এবং রাণার্স-আপ খেতাব পেয়েছে।

॥ বাইটন কাপ ॥

ভারতীয় হকি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা বলতে বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা। বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। ক্যালকাটা কাস্টমস ১১ বার বাইটন কাপ পেয়ে সর্বাপেক্ষা বেশীবার বাইটন কাপ জয়লাভের রেকর্ড করেছে। তাছাড়া ক্যালকাটা কাস্টমস একই বছরে ৮ বার হকি লীগ এবং বাইটন কাপ পেয়ে রেকর্ড করেছে।

১৯৬২ সালের বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় খেলবার উদ্দেশ্যে ৩০টি দল নাম দিয়েছে—বাইরের দল ৮টি এবং স্থানীয় দল ২২টি। সরাসরি তৃতীয় রাউণ্ড থেকে খেলবার সুযোগ পেয়েছে এই ৬টি দল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, ইস্টার্ণ কোচ ফ্যাক্টরী, টাটা স্পোর্টস, ইণ্ডিয়ান নেভী এবং ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব।

চতুর্থ রাউণ্ডে সরাসরি খেলবে ২টি দল—বোম্বাইয়ের সেণ্ট্রাল রেল এবং মাদ্রাজের ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ।

ডেভিস কাপ পূর্বাঞ্চল

আন্তর্জাতিক লন টেনিস ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলায় ভারতবর্ষ প্রথম রাউণ্ডে ৫-০ খেলায় পাকিস্তানকে পরাজিত করে এবং পরবর্তী সেমি-ফাইনালের খেলায় ৪—০ খেলায় ইরাণকে পরাজিত ক'রে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে উঠেছে। ইরাণ প্রথম রাউণ্ডে ৩-২ খেলায় মালয়কে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে খেলেছিল।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের অপরদিকের সেমি-ফাইনালে ফিলিপাইন ৩-২ খেলায় জাপানকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছে। ভারতবর্ষ বনাম ফিলিপাইনের পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলাটি আগামী ২৮শে এপ্রিল দিল্লীতে সুরু হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

উপন্যাস : প্রেমেন্দ্র মিত্রের **মৌসুমী** ৩·০০ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **হিয়ে হিয়ে রাখনু** ৩·০০ ॥ সরোজকুমার রায়-চৌধুরীর **অনুষ্টুপ ছন্দ** ৪·০০ ॥ ভবানী মুখোপাধ্যায়ের **কান্নাহাসির দোলা** ৩·৭৫ ॥ বিমল মিত্রের **নিশিপালন** ৪·৭৫ ॥ অজিতকৃষ্ণ বসুর **সানাই** ২·৫০ ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষের **গান্ধর্ব** ৩·৫০ ॥ আশাপূর্ণা দেবীর **মেঘপাহাড়** ৩·০০।

গল্পগ্রন্থ : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **কায়কল্প** ৩·৫০ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **রূপহলুদ** ২·৫০ ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **জাতিস্মর** ২·৫০ ॥ নবেন্দু ঘোষের **পঞ্চম রাগ** ৩·২৫ ॥ জ্যোতির্ময় ঘোষের ('ভাস্কর') **ফাংশন** ৩·০০।

কবিতা : প্রেমেন্দ্র মিত্রের **প্রথমা** ২·৫০ : **সম্রাট** ২·০০ ॥ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের **কবি-চিত্ত** ৫·০০ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের **স্বনির্বাচিত কবিতা** ৪·০০ ॥ দেবেশ দাশের **সুদূর বাঁশরী** ২·৫০।

বিবিধ : দিলীপকুমার রায়ের **স্মৃতিচারণ** ১২·০০ ॥ যাদু-গোপাল মুখোপাধ্যায়ের **বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি** ১২·০০ ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর **পুরাতনী** ৫·০০ ॥ নলিনীকান্ত সরকারের **শ্রদ্ধাস্পদেষু** ২·৫০ ॥ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের **অবনীন্দ্র-চরিতম্** ৫·০০।

গ্রন্থতিথি

সদ্য প্রকাশিত

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
এমন দিনে (গল্পগ্রন্থ) ৩·৭৫

সম্প্রতি প্রকাশিত

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
রবি-কথা ৩·৫০

বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কবি-প্রণাম ৫·০০
[কবিগুরুকে নিবেদিত বাংলার কবিদের কাব্য-সংকলন]

নলিনীকুমার ভদ্রের
বিচিত্র মণিপুর ৩·০০
[চিত্রসহ মণিপুরের সর্বাঙ্গীণ পরিচিতি]

অঘটন আজো
ঘটে (নাটক) ২·২৫
কাহিনী : দিলীপকুমার রায়
নাট্যরূপ : ধনঞ্জয় বৈরাগী

১৯৬১-৬২ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

'বনফুল'-এর নবতম উপন্যাস

হাটে বাজারে ৩·৫০

আমাদের প্রকাশিত বনফুলের অন্যান্য বই

ভীমপলশ্রী (উপন্যাস—৫ম মুদ্রণ)	৫·০০	**ওরা সব পারে** (উপন্যাস)	২·৫০
দুই পথিক (উপন্যাস)	২·৫০	**স্থাবর** (উপন্যাস- নূঃ ১ম সং)	৮·০০
নূতন বাঁকে (কবিতা গ্রন্থ)	২·৫০	**শিক্ষার ভিত্তি** (প্রবন্ধ, ২য় মুদ্রণ)	২·৭৫
কাঞ্চ (নাটক)	১·২৫	**মধ্যবিত্ত** (নাটক)	২·০০

ছোটদের বই

রঙ্গনা (সচিত্র গল্পগ্রন্থ)	২·৫০
করবী (সচিত্র গল্পগ্রন্থ)	১·৭৫

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন ৩৪-২৬৪১ গ্রাম: 'কালচার'

সূচীপত্র

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৫১শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 27th April, 1962.
40 Naya Paise.

সাধারণ নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে নতুন কতকগুলি করবৃদ্ধির প্রস্তাব আছে। ভারতের জনসাধারণ দরিদ্র এবং পর্যাক্রমিক মূল্যবৃদ্ধির চাপে পর্যুদস্ত। কাজেই কর-ধার্যের কথা উঠলে যে এখানে বিষণ্ণতার আবহাওয়া নেমে আসবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। চারিদিকেই সেজন্যে সমালোচনার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু ভারতবর্ষ একটি গঠনশীল দেশ। তৃতীয় পরিকল্পনার জন্যে অর্থ সংস্থান করতে হলে করবৃদ্ধি না করে উপায়ই বা কি ছিল সেটাও বিবেচ্য।

এক নজরে যা অনুমান করা যায়, সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে করবৃদ্ধির আওতায় এসেছে—তামাক, সিগারেট ও মিহি কাপড়। তাছাড়া রপ্তানী-কর কমানোর জন্যে চায়ের রপ্তানী বেড়ে যাবে ব'লে চায়েরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। কিন্তু একমাত্র কাপড়ের দৃষ্টান্তটি বাদ দিলে এগুলির জন্যে কারোই ঠিক জীবনযাত্রা অচল হওয়ার কথা নয়। কাজেই এনিয়ে সোরগোল তোলা কতখানি যুক্তি-সংগত তা চিন্তার বিষয়।

বরং অশান্তির মেঘ ঘনীভূত হ'য়ে আসছে অন্যদিক থেকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বিগত এক বছরে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে ব'লে গত শুক্রবারের 'যুগান্তর' পত্রিকায় যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাই থেকেই বোঝা যায় সাধারণ মানুষ এখন কী দুর্দশায় জীবনযাপন করছে। চাল, মাছ, শাকসব্জী ইত্যাদির প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন আশ্চর্যরকম মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে যে সকলেরই মনে যেন মনস্তত্ত্বের এক নতুন ব্যাধির মতো 'বাজারাতঙ্ক' দেখা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু এগুলির জন্যে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোনো রকম বাজেট-প্রস্তাব বা নতুন কর দায়ী তা বলা যায় না!

প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্যা এখন অনেক গভীর। অতিমুনাফার লোভ এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের মনে এমন গভীরভাবে শিকড় বিস্তার করে আছে যে, সুযোগ পেলেই তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আসল বিপদ রয়েছে সেইখানে। কারণ, মূল্যবৃদ্ধি এবং বেতনবৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত দেশের অর্থনীতিকে মুদ্রা-স্ফীতির দিকে নিয়ে যায়, এবং পরিণামে বৃহত্তর জটিলতার উদ্ভব ঘটে।

সেই জন্যে মূল্য বৃদ্ধির গতিরোধ করা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। এতে মানবিক প্রশ্ন তো আছেই, কিন্তু সেকথা বাদ দিলেও দেশের গঠনকর্মকে অব্যাহত রাখার জন্যেও এ ব্যবস্থা আশু-আচরণীয়।

এবং সেই সঙ্গেই দরকার নতুন কর্মসংস্থানের উপায় আবিষ্কার করা। বেকার-সমস্যা ক্রমেই এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে যে, কিছুতেই একে আর ভবিষ্যতের জন্যে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত এই উভয় শ্রেণীর বেকার যে কেবল উপার্জনশীল ব্যক্তিদের উপর বিরাট ভারস্বরূপ তাই নয়, অব্যবহৃত মনুষ্যশক্তি হিসাবেও তা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এক অপচয়ের ক্ষত-মুখ। দেশগঠনের জন্যে এই অপচিত মনুষ্য-সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার হওয়া উচিত। না হলে পরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের অত্যন্ত দেরি হয়ে যাবে।

বাস্তবিক, প্রত্যেক ভারতবাসীরই চোখের সম্মুখে আজ শুধু একটি মাত্র আশার বর্তিকা—সে হল, পরিকল্পনা। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর বিদায়-ভাষণে লোকসভাতে যে সমাজতান্ত্রিক সুখী ভবিষ্যতের কথা বলেছেন সেই নতুন যুগের উদ্বোধনের জন্যেই পরিকল্পনা। এই পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনাগুলিকে যদি সত্যিই আমরা ভবিষ্যৎ উন্নতির সিঁড়ি বলে গ্রহণ করি তাহলে আমাদের যাত্রা-পথের দুঃখ হয়তো এত অসহ্য মনে হবে না। বিশেষ করে, দেশগঠনের জন্যে আমরা যখন বিদেশের সাহায্য ও ঋণের মুখাপেক্ষী, তখন অল্পস্বল্প বর্ধিত কর যে আমাদেরও দেওয়া উচিত এটা বোধহয় মেনে নেওয়াই যুক্তিসংগত।

'অমৃতে'র দ্বিতীয় জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ১১ই মে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে সুপরিকল্পিত আলোচনা এবং নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে সজ্জিত এই সংখ্যাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক—'অমৃত'

বসন্তে

গোবিন্দ চক্রবর্তী
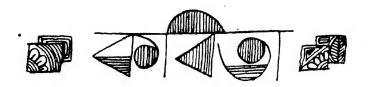
যেখানে আকাশ জ্বলে দাউদাউ পলাশে ও কৃষ্ণচূড়ায় :
হরিণ ও চিতা চরে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি পাহাড়ের গায়।
এলোমেলো তাঁবু যেন ফেলা,
দূরে-দূরে বসতির মেলা,
ঘাসের আঁচল পেতে এক পাশে আড়াআড়ি পৃথিবী ঘুমায়—
চল না বেড়াতে যাই সেখানে দু'দিন
সুদূর একান্ত নিরালায়।

তেমন একটি বাড়ী অবিকল টকটকে প্রবালের রঙ—
না মেলে—পেতে ত' পারি একটু বাগানঘেরা ডেরাই বরং।
[illegible] উদাসী দুপুর,
[illegible] একটানা সুর,
ধবধবে শাদা দিন, তারার ফিনিকফোটা ঝিকিমিকি রাত—
যা-ই মেলে টুকিটাকি পাখি কি, জোনাকি
—তা'তেই সাজাব সওগাত।

আসবে ময়ূরগুলি পুরোপুরি পোষমানা পাখির মতন—
কখনো নাচবে ছাদে, কিছু বা নাচেরি ছাঁদে ভরাবে উঠোন।
পেতে দু'টি বেতের চেয়ার
বস যদি মুখোমুখি—আর
একটি জংলী হাওয়া এক মুঠো ঝরাপাতা তখনি ওড়ায় :
ঝড় নয়—মনে হবে শ্বাস যেন কার
পাক দেয় বুকের গোড়ায়।

কী খোঁজ যে দিশেহারা ইটপাথরের এই নিরেট নগরে :
ছায়া এরা, কায়া নয়—পুতুলের মত যারা ঘোরাফেরা করে।
তুমি ঘুরে যতদূর যাও
যার পানে যতই তাকাও
কেউ সুধাবে না নাম ভুল করে কোনোদিন ভুলেও বারেক।
একটু বেড়াতে চল তারচে' দু'দিন,
একটুই কখনো অনেক।

নৌকো

আলোক সরকার

দুঃখ এই কোনোদিন দুঃখ পাওনি তুমি। ভালোবাসা,
একদিন খুব বড়ো দুঃখ জেনো।
দাঁড়িয়ো নির্মোহ একা অন্ধকারে, বাগানের সঘন কুয়াশা
তার মাঝে দুইটি ফুলের স্থির আঁনকেত নিস্পৃহ বিষাদ—
নির্নিমেষ সেই ছবি চিনো।

সারাদিন বিকেলবেলার হাওয়া, পাতা ঝরে রিক্ত অবসাদ।।
আমাদের রৌদ্র দিনগুলি
এখন মাঠের শেষে সাদা আলো, শব্দহীন নির্জন বিশ্রামে
জেগে ওঠে সুদূর গ্রামের নদী, অনুচ্ছ্বাস প্রণত অঙ্গুলি
ভাসায় ধূসর নৌকো নিরুদ্দেশে—তার ধ্বনি কোনোদিন শোনো?

ভালোবাসা, একদিন দুপুরবেলার গাঢ় জাগরণে দেখো
মাকড়শার জাল ফাটা দেয়ালের স্ফুরিত তমসা
জানালার পাশের নিভৃতে—দুই হাতে নত মুখ ঢেকো :
নৌকো চলেছে দূরে তেপান্তরে, জলধ্বনি বিস্তীর্ণ বিরাম।
দু-হাতে দরজা খুলে বিদ্যুতি আকাশে দেখো আলুলিত শ্রাবণ সহসা।
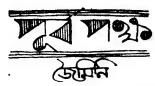
স্বর্গরাজ্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন অবিচ্ছেদ্য, আমাদের মর্ত্যভূমিতে, বিশেষ করে এই বাংলাদেশে, ইস্কুলীশিক্ষার অনিবার্য সঙ্গী তেমনি প্রাইভেট টিউটার। ইস্কুলগুলিতে পড়াশোনা কতদূর কি হয় সে বিষয়ে আমি আপাততঃ কোনো মন্তব্য করতে চাইনে, কিন্তু পাঠ্য বিষয়ের এমন ব্যাপ্তি ঘটেছে এবং হোমটাস্কের বহর এতোই বেশি যে, সরলমতি বালক-বালিকার পক্ষে সেগুলি সামলে ওঠা একরকম অসম্ভব। কাজেই, হয় অভিভাবক নিজে পড়াবেন অথবা একজন প্রাইভেট টিউটার রাখবেন, এছাড়া কোনো দ্বিতীয় রাস্তা নেই। এবং যেহেতু আজকাল অভিভাবকদের প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত অতএব প্রাইভেট টিউটারই যে এক ও অদ্বিতীয় কাণ্ডারী, এটুকু বুঝতে ন্যায়-শাস্ত্রের শরণ নিতে হয় না।

কাজেই ইনি আছেন। কলকাতা শহরে উনুন ধরানো ধোঁয়ার মত ইনিও কিছুক্ষণ বাড়ির আবহাওয়া রুদ্ধশ্বাস ক'রে রাখেন। এই নিত্য প্রয়োজনীয় ক্ষণিকের অতিথির জন্যে অভিভাবক বা ছাত্র কারোই খুব বেশি ভালোবাসা নেই। যে অসহায়তায় মানুষ দাঁতে দাঁত চেপে ইনজেকশান দেওয়ার সময়টুকু পার হ'য়ে যায়, সেইভাবেই সকলে পার হন মাস্টার আসা এবং মাস্টার থাকার সময়টুকু। মাস্টার চলে গেলে সকলেই যেন হাঁপ ফেলে বাঁচেন।

অথচ না হলেও চলে না।

এবং কেবল আজ নয়, বোধকরি চিরকালই। সুদূর অতীতে মহাভারতের কালেও দেখি আচার্য কৃপ এবং দ্রোণ কৌরব ও পাণ্ডবদের প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত হ'য়েছেন। আধুনিক যুগে আজ থেকে প্রায় নব্বুই বছর আগে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালেও দেখি একই ইতিহাস। তাঁর সেজদাদার কড়া শাসনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাধিক গৃহশিক্ষকের পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বাবধানে কেটে যেত কবির সারাটা দিন। নিশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। এবং সব থেকে আশ্চর্য, যে ইংরাজি ভাষায় তিনি পরবর্তীকালে ইংরাজ সাহিত্যিকের মতোই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, ছেলেবেলায় সেই ইংরাজি শিক্ষার নামেই হত তাঁর সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক। 'জীবনস্মৃতি'তে দেখা যায়, তাঁর ইংরাজি ভাষার টিউটার ছিলেন মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র, অঘোরবাবু। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র মহাশয়ের স্বাস্থ্য এমন অত্যন্ত আশ্চর্য-

রূপে ভালো ছিল যে, তাঁহার তিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনা সত্ত্বেও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই। কেবল একবার যখন মেডিকেল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙ্গালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল, সেই সময় শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙ্গিয়াছিল। ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে সময়টাতে মাস্টার মহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি নাই এবং তাঁহার আরোগ্য লাভকে অনাবশ্যক দ্রুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।"

তাছাড়া অঘোরবাবুর আসার সময়ও ছিল একেবারে অনিবার্য রকম নির্ভুল। একদিন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় রাস্তায় একহাঁটু জল জমে গেল। এমন দিনে মাস্টারমশায় কিছুতেই আসতে পারবেন না ভেবে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অন্য দুজন সহপাঠীর মনের ভিতরটা [illegible]লের মতো রোমাঞ্চিত' হ'য়ে [illegible] এদিকে ঘড়ির কাঁটাও দু-চার [illegible]নিট অতিক্রম ক'রে গেল। মনে খুব ভরসা, অথচ 'এখনো বলা যায় না' ধরনের ভাব। অবস্থাটির বর্ণনা দিয়ে কবি লিখেছেন—

"......রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। 'পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপথানং' যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা-হতোস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈব-দুর্যোগে অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে অপর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টার মহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর কাহারও অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।"

যাই হোক, এবার হাল আমলের কথায় আসি। প্রাইভেট টিউটার এখন যেহেতু 'নেসেসারী ঈভল্' সেইহেতু অনেক বাড়িতেই দেখেছি তাঁদের অভ্যর্থনা দায়সারা গোছের। শিক্ষকের চোখের সামনে না হলেও বেশ শ্রুতিগম্য-ভাবেই অনেক গৃহিণীকে ব্যাজার কণ্ঠে হাঁক দিতে শোনা যায়—'ওরে, খোকনের মাস্টার এসেছে, এক কাপ চায়ের জল বসিয়ে দে!' কিংবা মাস্টারমশাইকেই সম্বোধন করে বলতে শোনা যায়, 'কাল খোকনের জন্মদিন। বিকেলে ও পড়তে পারবে না, আপনি বরং তিনটের সময় আসবেন!' এছাড়া, 'আপনি তো কলেজ স্ট্রীটে যান. দেখবেন তো এই বইখানা পাওয়া যায় কিনা,' অথবা 'খোকনের আজ জ্বর হ'য়েছে, আপনি বরং বাবলুকেই গোটাকত অঙ্ক কষিয়ে যান,' এ ধরনের অনুরোধও একেবারে দুর্লভ নয়।

তবে মাস্টারমশাইরাও যে খুব নিরীহ জীব এমন বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। পরীক্ষার আগের কয়েক মাস কোনো কোনো কৃতবিদ্য শিক্ষক সরস্বতী পুজোর পুরুতঠাকুরের মতো তিন-চার বাড়িতেও বিদ্যাদান করে থাকেন। ইস্কুলের মাস্টার হলে এমনিতেই বাজারদর বেশি হ'য়ে যায়, তার উপর কারো কারো আবার ছাত্র পাশ করানোর ব্যাপারে এমন হাতযশ থাকে যে তাঁরা 'সীজন টাইমে' নাওয়া-খাওয়ার সময় পান না। এই রকম একজন অঘটন-ঘটন-পটু শিক্ষকের কাছে জনৈক ফেল-করা ছাত্রের অভিভাবক পরীক্ষার ঠিক আগের মাসটাতে এমন নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছিলেন যে বাধ্য হয়ে তাঁকে এক অশ্রুতপূর্ব শর্তে রফা করতে হয়েছিল। স্থির হয়েছিল এই যে, সকালে বিকেলে বা সন্ধ্যায় মাস্টারমশাই পড়াতে পারবেন না, তিনি পড়াবেন দুপুরে তাঁর 'অফ পিরিয়ডে'র সময়ে। অবশ্য সে সময়ে ছাত্রকে হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সে থাকবে ইস্কুলে। তা না পাওয়া যাক, তার টাস্কের খাতাটা পেলেই চলবে। সেটা যেন সে তার বাড়িতে রেখে যায়। বাড়িতে মানে, বাড়ির জানলায়। মাস্টারমশাই অবিবেচক নন, দুপুরে এসে বাড়ির লোকের শান্তিভঙ্গ করবেন না। বাড়ির জানলায় সুতো দিয়ে বাঁধা খাতাখানি নিয়ে তিনি ঐখানেই দাঁড়িয়ে টাস্কগুলি সংশোধন করে নতুন টাস্ক দিয়ে যাবেন। এবং গুরু-শিষ্যে সাক্ষাৎ না হলেও এইভাবে চলবে নিরুপদ্রব পঠন-পাঠন।

শুনেছি, এভাবে পড়েও ছাত্রটি সেবার পরীক্ষার্ণব পার হ'তে পেরেছিল।

আরেকজন কলেজের অধ্যাপক জনৈক দ'য়ে-মজা ছাত্রের অনুরোধে শুধু এইটুকু সময় দিতে পেরেছিলেন যে, তিনি যখন ভোরবেলার ফাঁকা ট্রামে বড়-বাজারের এক ধনী ছাত্রকে পড়াতে যান সেই সময়টুকু ছাত্রটি তাঁর সঙ্গে একই সীটে বসে জ্ঞানসঞ্চয় করে নিতে পারে। অবশ্য প্রণামীর অঙ্ক যে তাই বলে কিছু কম ধার্য করা হয়েছিল তা নয়। এবং সবটাই ছিল আগাম।

ইনি অবশ্য পরবর্তীকালে এ'র এক নবীন সহকর্মীকে আগাম নেওয়ার কারণটা সবিস্তারেই বলেছিলেন। তাঁর ধারণা, আগাম না নিলে, (১) ছাত্রের দিক থেকে সীরিয়াসনেস আসে না, (২) পরীক্ষার মাসের মাইনে পাওয়ার নিরাপত্তা থাকে না, এবং (৩) ছাত্র যদি ফেল করে, কিংবা ঈশ্বর না করুন, মারা যায়, শিক্ষকের পরিশ্রমটাও সেই সঙ্গে মাঠে মারা যায়।

সুখের বিষয়, হাজারকরা একজন গৃহশিক্ষকও হয়তো এই ব্যক্তির মতো দূরদর্শী নন। এবং সেইজন্যেই এখনো বনে না গিয়ে মানুষ সংসারেই বাস করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে অবস্থা এখন চলছে তাকেও ঠিক মনুষ্যোচিত বলা যায় না। গৃহশিক্ষক এবং অভিভাবক এই দুপক্ষই যদি একটু সংযত না হন তবে এই হৃদয়হীন পরিবেশের ভিতর দিয়ে যে সব ছাত্রেরা 'মানুষ' হ'য়ে উঠছে তারা হয়তো সংসারে বাস করেই হ'য়ে উঠবে এক-একটি বনমানুষ।

চাল্লিশ বছরের জীবনটা আনন্দ্য-সুন্দরের কাছে এমন বিস্বাদ হয়ে উঠবে তিনি নিজেও ভাবেননি। এই দীর্ঘ বছরগুলি ব্যর্থ নয়—বৃহৎ কর্মকাণ্ডে মহীরূহ হয়ে উঠেছে। খ্যাতি যশ অর্থ

তাঁর মুকুটে এসে শোভা বর্ধন করেছে। বিরূপ সমালোচকেরাও সবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন অনিন্দ্যসুন্দর আধুনিক যুগমানসের সার্থক ভাষ্যকার। তাঁর লেখায় বর্তমান আছে কিন্তু ব্যঞ্জনায় তা কালোত্তীর্ণ ধ্রুপদের মহিমা বিকীর্ণ করছে। রচনার এই প্রৌঢ়িগুণেই তিনি তরুণ চিত্তকে জয় করতে পারেননি। তরুণেরা তাঁর লেখা বোঝে না। তাই প্রবীণ বিদগ্ধদের দরবারে তাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। এই কয়েক বছরে ক্লান্তিহীন অজস্র ছোটগল্প লিখেছেন অনিন্দ্যসুন্দর, সেগুলি সম্পদ হয়ে আছে। আর মাত্র গুটিকয়েক উপন্যাস জীবনদর্শনের কীর্তনে সোচ্চার। নামের পায়ে পায়ে সম্মান এসেছে, অর্থ। পৈতৃক বাড়িটি সারিয়েছেন তিনি, সংসারে কল্যাণী স্ত্রী, দুটি প্রজাপতির মতো ছেলেমেয়ে। এই পরিবারের তিনি কর্তা, দায়িত্বশীল পিতা, প্রেমময় পতি। সমস্ত সংসারে স্নিগ্ধ পবিত্রতার প্রলেপ।

মাত্র চাল্লিশ বছর বয়েসে জমেওঠা খ্যাতি যশ অর্থ পারিবারিক মায়া সমস্ত কিছু হঠাৎ এক সকালে অনিন্দ্যসুন্দরের কাছে এমন বিরক্তিকর ঠেকবে তিনি নিজেও কল্পনা করেননি। নিত্যকার মতো আয়নার সামনে দাড়ি কামাতে বসেছিলেন, গরম জল রাখা ছিল টেবিলে, সরঞ্জামগুলি প্রস্তুত। হঠাৎ আয়নায় প্রতিফলিত নিজের চেহারার দিকে চেয়ে কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়ার ফলে চোখের মণি ঘোলাটে। অনিন্দ্যসুন্দর দেখলেন। দেখলেন সকালের এলো-মেলো বাসী চুলে বেরিয়ে-পড়া সাদা চুলগুলি, পিনের মাথার মতো গালময় সাদা সাদা দাগগুলি। কপাল কুঁচকোলেন। কপালে স্পষ্ট কয়েকটি ভাঁজ। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তারপর অস্ফুটে বললেন : 'এগুলির কি অর্থ।' তারপর চুপ করে গেলেন। কথা বলতে চাইলেন, পারলেন না। অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। পিছন ফিরে একবার বুক-শেলফ-এ চোখ রাখলেন। তাঁর নিজেরই বই, অজস্র পত্রিকা। লেখার টেবিলে গত রাত্রের অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসের অংশ, পত্রিকায় পাঠাতে হবে।

কেমন ধূসর চোখে অনিন্দ্যসুন্দর তাকালেন তাঁর কীর্তিস্তম্ভের দিকে। এই চারদেয়ালের ঘেরাটোপে আটকে-থাকা তাঁর অস্তিত্বের কল্পনা করলেন তিনি। এই ঘর আমার। এই কীর্তিও। এখানে কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে পারবে না, পারবে না কেউ স্পর্শ করতেও। কিন্তু কী এর অর্থ। খ্যাতি যশ অর্থ। নাকি এক বিরাট তামাশা। ঠাণ্ডা নিরুত্তেজ দৃষ্টিতে ঘরময় চোখ দিয়ে আঁচড়ালেন তিনি। এক বিরাট তামাশা। আবার ভাবলেন অনিন্দ্যসুন্দর। এগুলি তাঁর কীর্তি নয়, জনসাধারণের তুমুল হাততালিকে নির্ভর করে তিনি কসরত দেখিয়ে চলেছেন। ছি ছি। একি লজ্জা, এ কি গ্লানি। গড়পড়তা সাধারণ মানুষের মতো তার চলাফেরা নয়, তিনি কিম্ভূতকিমাকার এক ক্লাউনে পরিণত হয়েছেন। নিছক তামাশা। এই যশ অর্থ প্রতিপত্তি একটা ব্যঙ্গের নিশান তুলে তাঁর চোখের সামনে দুলছে।

[illegible]! আমার নিজের বলে কি আছে[illegible] আমি নিজেকে বুঝতে চাই, নিজেকে [illegible] আবার ভাবলেন অনিন্দ্যসুন্দর। [illegible]ক লোভনীয় স্রোতের টানে [illegible] নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন, দুতীরে অগণ্য মানুষ বাহবা দিচ্ছে। আমি ভেসে চলেছি, কখনো ডুব-সাঁতারে, কখনো চিত-সাঁতারে,... আশ্চর্য, তিনি এভাবে কতদিন ভেসে চলেছিলেন। নিজেকে একবারও ভাবেননি, নিজের জন্যে কোনো সময়ও তাঁর ছিল না। এবার তাঁকে তীরে উঠতে হবে। না, আর ভেসে-চলা নয়। যশ প্রতিপত্তি অর্থ। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল অনিন্দ্যসুন্দরের। ওগুলির তলায় তিনি তলিয়ে গেছেন। তাঁর চল্লিশপূর্ণ জীবনটা, চল্লিশ বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্পন্দন রক্ত-মাংস। আজ হঠাৎ মনে হল এই দীর্ঘ বয়েসে জীবনকে যথার্থরূপে তিনি দেখেননি। তাঁর দৃষ্টি জীবন-দেখা ভঙ্গিতে পরিণত হয়েছে। আয়নায় প্রতিবিম্বিত শরীরের দিকে আবার তাকালেন অনিন্দ্যসুন্দর। কাঁচা-পাকা চুল—এই বয়েসেই, দাড়ি বিন্দু বিন্দু সাদায় ভরে গেছে, কপালে বলী, চোখের তারা ঘোলাটে। ওই সুন্দর মলাটে বাঁধানো কেতাবগুলি তাঁর শরীরে অত্যাচারের নখ-দাঁত বসিয়ে দিয়েছে, ওগুলি তাঁর রক্ত, যৌবনকে হরণ করেছে। পরিবর্তে আমি কি পেয়েছি। যশ প্রতিপত্তি অর্থ। আমার রক্তের বদলে, যৌবন উৎসর্গ করে। বুক ঠেলে কী-একটা উঠতে চাইল। মাথাটা ঘুরল কি? চোখে ঝাপসা দেখছেন বোধহয়। টেবিলে মাথা রেখে কেমন ঘুম এল অনিন্দ্যসুন্দরের। আর ঘুম-ঘুম চোখের পরদায় একরাশ ঢেউ এসে আছাড় খেল। গানের মতো মূর্চ্ছনা। হঠাৎ, হঠাৎই ঠোঁটদুটো ভাঙা খেল তাঁর : কেমন এক আনন্দের, পিপাসার। স্বপ্ন না সত্যি। সুন্দর এক যৌবনের ছবি, বঙ্কিম সুঠাম সুচারু, যেন তাঁর সারা-জীবনের আদর্শ, প্রতীক। যশ প্রতিপত্তি অর্থের ইমারত চোখের সামনে ভেঙে যেতে দেখলেন তিনি, সেই ধ্বংস-স্তূপের ওপর নতুন একটি অবয়ব,

নির্দোষ নিখুঁত এক যৌবনের প্রাণবন্ত প্রতীক।

'একি। 'এখনো দাড়ি কামাওনি।' চায়ের বাটি হাতে নন্দিতা ঘরে ঢুকল।

কে? নিমীলিত চোখে তাকালেন অনিন্দ্যসুন্দর। বত্রিশ বছরের একটি শ্রীশরীর। তাঁর স্ত্রী, সন্তানের জননী।

'অমন করে তাকিয়ে আছ কেন। আমাকে চিনতে পারছ না।' নন্দিতা হাসল।

নন্দিতা সুন্দরী। হাসলে এখনো চোখের তারা অদ্ভুত চকচক করে ওর। চব্বিশ বছরের কৈশোরকাল পেরিয়ে এল নন্দিতা এল গৃহিণী হয়ে। ওর সৌন্দর্য অনেক শীত-বসন্ত-গ্রীষ্মের স্বভাব জড়ানো। অনিন্দ্যসুন্দরের প্রয়োজনের আগুনে গলা সোনার মতো বিভিন্ন অলংকারে রূপান্তরিত হয়েছে নন্দিতা। এতদিনের অভ্যাসে জড়ানো আটপৌরে।

'চা রাখো।' অনিন্দ্যসুন্দর বললেন।

প্রতিভাবান স্বামীর দিকে চোখ রেখে কোনো ভরসা না-পেয়ে কিছুক্ষণ কিছু বলল না নন্দিতা। তারপর একটু হেসে: সকাল থেকেই এমন মেজাজ। কিছু লিখতে পারোনি বুঝি?'

অনিন্দ্যসুন্দর সে কথার উত্তর দিলেন না।

গৃহিণীমানুষ, সকালে সময় থাকে না। জলদ পায়ে বেরিয়ে গেল নন্দিতা।

অনিন্দ্যসুন্দর আপনমনে হেসে উঠলেন। চল্লিশ বছরের জীবনটাকে যেন ব্যঙ্গ করলেন। আমি এই সংসারের প্রভু —বললেন তিনি। আমার সংসার। ঘোরতর সংসারী আমি। আমার স্ত্রী আমার সন্তান আমার যশ প্রতিপত্তি অর্থ।

চেয়ার ছেড়ে পদচারণা শুরু করলেন অনিন্দ্যসুন্দর। আয়নায় পিছলে যাচ্ছে তাঁর প্রতিবিম্ব। স্বপ্ন ঘনিয়ে এল দুচোখে: আছড়ে পড়ছে ঢেউ অশ্রান্ত গর্জন। একটি নিভাঁজ অটুট যৌবন, তাঁর স্বপ্ন, প্রতীক, আদর্শ। আশ্চর্য, এতদিন কি হাস্যকর জীবন কাটিয়েছেন তিনি। ভাঙাচোরা পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর দর্শনও বেঁকে-চুরে গেছে। কদর্য কুৎসিত গ্লানির চিত্র এঁকেছেন তিনি। একটি নিটুট যৌবনকে বৈজয়ন্তীর মতো তুলে ধরতে পারেননি।

আমি মাস্তুলভাঙা হালছেঁড়া একটি জাহাজ—আবার বললেন তিনি। আমি এ যুগের মতোই প্রত্যয়হীন আদর্শহীন প্রচণ্ড তামাশা। আমার স্বপ্ন নেই, বিশ্বাস নেই, নেই কোনো প্রতীক। একটি সুন্দর যৌবনের বিজয়-স্তম্ভ।

'বাবা, আমরা ইস্কুলে যাচ্ছি।' কনক আর বকুল।

'এস।'

তাঁর ছেলেমেয়ে, সুন্দর প্রজাপতির মতো। তাঁর ভাবীকাল। অনিন্দ্যসুন্দর বাৎসল্য অনুভব করলেন। কিন্তু...এই মুহূর্তে চিন্তিত হয়ে ভাবলেন তিনি: এদের পৃথিবীতে আনবার জন্যে একটুও সজাগ ছিলেন না তিনি, তাঁর হাজারো কর্মব্যস্ততার পরে কোনো শ্রান্ত উত্তেজিত মুহূর্তে এরা এসে গেছে, অন্যমনস্কতায় মাঝখানে। অনিন্দ্যসুন্দর বিমূঢ় হলেন। এই সংসারে তাঁর অস্তিত্ব আলগা-আলগা, আনুষ্ঠানিক। তাঁর সমগ্র চৈতন্যের সঙ্গে এই সংসারের সম্মিলন ঘটেনি। ঘটেনি—বললেন অনিন্দ্যসুন্দর।

একটা বিষণ্ণ বেদনায় ছেয়ে গেল অনিন্দ্যসুন্দরের মন। খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে দূরের দিগন্তের দিকে চাইলে যে বেদনা। যেন অকস্মাৎ হারিয়ে গেছেন তিনি: একটা নাম-না-জানা হিমেল ভয় তাঁকে পাকে-পাকে বেষ্টন করে ধরছে। আমার চল্লিশ বছরের জীবনটা—কান্নার মতো গলায় বললেন তিনি: আমার স্বপ্ন, আমার আদর্শ......এতদিন তিনি ঘোর-ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে ছিলেন, তাঁর অন্দরমহল কোনোদিন জাগেনি, ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন বুঝি। আজ হঠাৎ তীব্র তীক্ষ্ণ মদিরাময় রৌদ্র সকচিত্ত করে তুলল তাঁর অন্তর্লোককে। সে-আলোকে কেঁপে উঠলেন পাহাড়ের মতো থরথর করে। এবং দেখলেন নিজেকে।

সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন অনিন্দ্যসুন্দর। সমস্ত সাহস জড়ো করে ডাকলেন স্ত্রীকে। 'আমি এখুনি বেরোব। সুটকেসে কিছু জামা-কাপড় পুরে দাও।'

নন্দিতা অবাক। 'এখন কোথায় বেরোবে।'

আলমারি খুলে টাকা বের করেছেন অনিন্দ্যসুন্দর। বললেন, 'জানি না।'

নন্দিতা গজ-গজ করে বললে, 'জানো না মানে। কি পাগলের মতো কথা বলছ। দাড়ি কামালে না, খেলে না......'

অনিন্দ্যসুন্দর জামার বোতাম লাগিয়েছেন। টাকাগুলো পকেটে রাখলেন। উসকো চুলগুলোয় আলতো চিরুনি বুলোলেন। আয়নায় মুখটা পরীক্ষা করলেন একবার।

নন্দিতা আবার বললে, 'এইভাবে কি যাওয়া হয়। বলা নেই কওয়া নেই।'

দরজায় পা দিয়েছেন অনিন্দ্যসুন্দর। জুতোয় পা গলিয়েছেন। এখুনি নেমে যাবেন বুঝি।

সুটকেস তাড়াতাড়ি গুছিয়ে দিল নন্দিতা। মুখ অপ্রসন্ন বিহ্বল।

'তোমার কাণ্ডকারখানা......'

অনিন্দ্যসুন্দর সুটকেস হাতে বেরিয়ে গেলেন। একবারও পিছন ফিরে তাকালেন না।

রাস্তায় নেমে সকালের একরাশ আলোয় কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে রইলেন অনিন্দ্যসুন্দর। কিছু দেখতে পারলেন না চোখে। মনে হল অন্ধ হয়ে গেছেন। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে দ্রুত পায়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন। কখন হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছলেন। টিকিটের জানালায় দাঁড়িয়ে কি-একটা টিকিটও সংগ্রহ করে এক্সপ্রেসে উঠে পড়লেন। জানালার ধারের সিটে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। আঃ মুক্তি। স্বগত বললেন অনিন্দ্যসুন্দর।

গাড়ি ছাড়বে কয়েক মিনিট বাদে। গাড়ির ভেতরে ইতস্তত দৃষ্টি ছুঁড়লেন তিনি। বিষাদ গম্ভীরতায় ভরে উঠল মন। প্রত্যহের দেখা অভ্যস্ত কতকগুলি মুখ। নরনারী শিশু। ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত পালিশ-করা মেরামত-করা, কোথাও চড়া রঙ উদগ্র সুবাস। মনে হল বাসী গন্ধটাকে ঢাকবার জন্যে তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এই মানুষ—মানুষের হাস্যকর অবশেষ। শুধু কাঠামো নিয়ে হাজির হয়েছে। অনিন্দ্যসুন্দরের চোখে স্বপ্ন ঘনাল: একটি নিটুট সুস্থ যৌবনের প্রতীক, তাঁর আদর্শ। নাঃ প্রাণধারণে শ্রান্ত মানুষের মিছিল নয়। তাঁর স্বপ্নকে শরীর দিতে চান অনিন্দ্যসুন্দর। প্রয়োজন হলে বিশ্বের থেকে উপকরণ এনে এই যৌবনকে সমৃদ্ধ করবেন তিনি। খণ্ডখণ্ড কতকগুলি ছবি ভেসে উঠছে তাঁর চোখে। তরঙ্গের শীর্ষে আলো কাঁপছে, এক-জোড়া চোখ, দীর্ঘ নয় গভীর, শীতের দিনের রোদ্দুরের খুশি। টিকলো নাকের নীচে চোখের আলোকে সঙ্গত জানাচ্ছে গোলাপী পাতলা ঠোঁট, একটু ভিজে-

ভিজে, রক্তের আভাস। ক্ষীণ কটিকে ছাপিয়ে ঊর্ধ্বে আঁচলে-ঢাকা একজোড়া ডানাফোলানো পাখি, বাহুদুটো রাজহংসের গ্রীবার মতো বঙ্কিম সুঠাম। কঠিন নিতম্ব ছাপিয়ে এক রাশ কালো চুলের অরণ্য, ঠাণ্ডা, উদ্ভিদের গন্ধ জড়ানো। গাড়ির দোলায় দুলছে অনিন্দ্যসুন্দরের মাথা, স্বপ্নে-পাওয়া অংশগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমার স্বপ্ন, আমার প্রতীক—বললেন অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁর আবিষ্ট চোখের সামনে দিয়ে অনেকে স্টেশন অনেক মানুষ এল গেল। তাদের দেখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। কারুর মুখ আছে, কারুর চোখ, কারুর কটিদেশ—কিন্তু সবগুলি লক্ষণ নিয়ে কেউ সম্পূর্ণ নয়। ক্লান্ততনুমন মানুষ। কোথাও যৌবন তার বৈজয়ন্তী মেলে ধরেনি। একটি আস্ত দিন সন্ধ্যার চিতায় জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেল। রাত্রির খনি খুঁড়ে কোথাও হীরকখণ্ড দ্যুতি নিয়ে উঠবে না—জানেন অনিন্দ্যসুন্দর।

শেষরাত্রির দিকে কোনো এক স্টেশনে গাড়ি থামতে ত্বরিত উঠে দাঁড়ালেন অনিন্দ্যসুন্দর। ভাবলেন না কোন্ স্টেশন, দেখলেন না টিকিটের দৌড় ফুরিয়েছে কি না, সুটকেস হাতে করে নেমে গেলেন প্ল্যাটফরমে। ফিকে অন্ধকারে হাঁটু-মুড়ে ঝিমোচ্ছে স্টেশন, বাতিগুলি ঘোলাটে চোখে পিঁচুটিভরা দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মাথার ওপরে শুকতারাটা দপ্ দপ্ করছে। ট্রেনটা বিদায় নিতে ভালো করে স্টেশনটির দিকে চোখ রাখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। কী আশ্চর্য, স্টেশনটা তাঁর চেনা। চব্বিশ বছর বয়েসে একবার এসেছিলেন সেজকাকার সঙ্গে। ছোটো অরণ্য আছে একটা, কাকা ছিলেন তার চার্জে। স্টেশন ছাড়িয়ে মাইল দুয়েক, টাঙ্গায় যেতে হয়। কোয়ার্টার আছে। ডাকবাঙলো আছে। আর আছে ছোটো ছোটো পাহাড় চড়াই-উৎরাই, ছোট্ট একটা নদী, ঝরনা। চারদিকে তাকিয়ে চব্বিশ বছরের জীবনের নিবিড় টান বোধ করলেন অনিন্দ্যসুন্দর। খুশী হলেন। এখনো ফরসা হতে বাকি, চারদিকটা জলো কালির মতো ঝাপ্সা। সুটকেস রেখে কিছুক্ষণ প্ল্যাটফরমে পায়চারী করলেন তিনি। ধূমপানের ইচ্ছে প্রবল হল। সিগারেট বার করলেন পকেট থেকে। আঃ ধোঁয়া ছাড়লেন অনিন্দ্যসুন্দর। যশ খ্যাতি অর্থ—মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মনে মনে বললেন তিনি। এখানে কেউ তাঁকে চেনে না—যশ খ্যাতি পিছনে তাড়া করবে না। নিজেকে হাল্কা বোধ করলেন তিনি। জীবনটা যে এত সহজ হতে পারে এবং এমন অনায়াসে তাকে বহন করতে পারা যায়, এর আগে টের পাননি। একবার শিস্ দিতে ইচ্ছে করল তাঁর। কিন্তু পারলেন না। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন স্টেশনে কেউ তাঁকে লক্ষ্য করেনি, ভাবতে ভালো লাগল তাঁর।

'বাবুজি টাঙ্গা চাহিয়ে—' সম্ভাব্য খদ্দেরের প্রত্যাশায় বৃদ্ধ দাড়িঅলা লোকটি এগিয়ে এল।

অকারণেই ভালো লাগল বৃদ্ধকে। আজকের প্রত্যাসন্ন নবীন উষায় হৃৎপিণ্ড জুড়ে ভালো লাগার সুর বাজছে। সামনের রেল লাইন ছাড়িয়ে নিচু দিগন্ত ডিমের মতো ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। এখুনি ডিম ভেঙে লাল কুসুম ছড়িয়ে পড়বে দিগন্তে। অনিন্দ্যসুন্দর এই লগ্ন শুভ মনে করলেন। টাঙ্গা ছুটে চলল। সরু পিচঢালা রাস্তা, দুধারে ছেঁড়া ছেঁড়া বসতি, গাছপালার জটলা। চষা ক্ষেত। তারপর রাস্তা নির্জন হয়ে এল। শাল-সেগুন ইউক্যালিপটাসের সারি দিয়ে গাড়ি ছুটে চলল। চব্বিশ বছরের চোখ দিয়ে রাস্তাটা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন অনিন্দ্যসুন্দর। কাঁটা-ঝোপ, অনেক আগাছায় স্মৃতির সড়ক ঢেকে গেছে। গাছপালার মাথা থেকে উঁচু, ওটা কি গির্জে, সেদিনও কি ছিল! বাঁক ঘুরল টাঙ্গা। এবার জঙ্গল পরিষ্কার। এপাশে ওপাশে মেটো ঘর। তারপর একটি কুয়োতলা। ঘোড়া কয়েক পা এগিয়ে গেল। টালির ছাদ-অলা ডাকবাংলো পরিষ্কার চোখে পড়ল। ডাক-বাংলোর দক্ষিণ দিকে আরণ্যক সাহেবদের কোয়ার্টার্স। এখন আবছা মনে পড়ল। গাড়ি থেকে নেমে সরেজমিনে তদন্ত করতে লাগলেন অনিন্দ্যসুন্দর। যদি চব্বিশ বছরের কোনো স্মৃতি হঠাৎ তুমুল গন্ধে ঢেকে ফেলে সমগ্র চৈতন্যকে।

টাঙ্গাঅলাই খুঁজে নিয়ে এল বাংলোর ভৃত্যকে। ছোকরা। চালাক-চতুর বলে মনে হল। কিছুক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সাহেবের দিকে। না, কোনো সরকারী হুজুর নন। আশ্বস্ত হল সে।

সুটকেশ হাতে নিয়ে সে-ই অভ্যর্থনা জানাল। ভাড়া নিয়ে সেলাম করে টাঙ্গাঅলা বিদায় হল।

বিরাট হল ঘর। তার দুধারে ছোটো ছোটো শয়নকক্ষ।

একটি ঘর অনিন্দ্যসুন্দরের জন্যে নির্দিষ্ট হল। ভৃত্যের যাদুস্পর্শে পরিচ্ছ

ঘরটা ঝেড়েপুছে বাসযোগ্য হয়ে উঠল। আরামকেদারায় গা ঢেলে দিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর উচ্চারণ করলেন, আঃ। তারপর পকেট থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট ভৃত্যের হাতে ছুড়ে দিয়ে জানালেন তিনি এখানে কিছুদিন থাকবেন। আহারাদির যাবতীয় ব্যবস্থা ওকেই করতে হবে।

ভৃত্য সেলাম করে বিদায় নিল।

সকালের রোদ কমলারাঙা হতেই অনিন্দ্যসুন্দর বাংলো ছেড়ে বের হলেন। ইতিমধ্যে দাড়ি কামানো হয়েছে, স্নানও করেছেন। দেহে মনে পরিচ্ছন্ন স্নিগ্ধ লাগছে নিজেকে।

এই রাস্তা আমি চিনি—সকালের রোদে আর হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর। বুনো ঘাস আর উদ্ভিদের গন্ধ সুরার মতো উদগ্রীব করে তুলছে ইন্দ্রিয়গুলিকে। ডানদিকে একফালি পায়ে হাঁটা রাস্তা। অনেক চেনা মনে হল। যেন কোন্ কুমারীর সিঁথি দেখছেন তিনি। যৌবনের স্বপ্নটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে চোখের পাতায়। শুধু সিঁথি নয়, দুপাশে উপছানো চুলের তরঙ্গ পানের মতো মুখ, ঘসা কাচের মতো গায়ের রঙ আর, অলোর প্রপাত সৃষ্টিকরা গভীর একজোড়া চোখ। অনিন্দ্যসুন্দর হাসলেন। আমি আসছি—আবার বললেন তিনি : অনেক পথ হেঁটে, অনেক বিফল সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের পর। হঠাৎ গাছপালা ঠেলে বেলোয়ারি চুড়ির মিষ্টি আওয়াজ স্তব্ধ সমাহিত করে তুলল তাঁকে। অজস্র অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে তাকালেন তিনি : যেন কোন্ দামাল শিশু রাগ করে ভেঙে ফেলেছে ড্রেসিং টেবিলের বিরাট কাচটা, আর ভাঙা টুকরোগুলির পর আছড়ে পড়েছে আকাশের আস্ত সূর্যটা, ঝলসে উঠল অনিন্দ্যসুন্দরের চোখ। মুগ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। মস্ত একটা আলোর সাপ হয়ে কিলবিল করছে ঝরনার জল। তিরতির করে পাথরের ওপর দিয়ে জলের ধারা বইছে। নীল জল, শেওলা আর ছোটো ছোটো কাঁকড়া অদ্ভুত পায়ে হেঁটে চলেছে। জুতো খুলে কাপড় গুছিয়ে নেমে পড়লেন অনিন্দ্যসুন্দর ঝরনার মধ্যে। ছড়ানো পাথরের ওপর দিয়ে টপকে টপকে চললেন। পায়ের পাতা ভিজছে, ভিজুক। সামনে পাহাড়টা গম্ভীর গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অজস্র রঙ-বেরঙের ফুল আর প্রজাপতি।

এতদিন বুকের মধ্যে এই ঝরনা ওই পাহাড় কি করে ঘুমিয়ে ছিল। বুক থেকে কী একটা ঠেলে উঠতে চাইল তাঁর। কেমন অদ্ভুত খারাপ-লাগার বিষাদে ভরে উঠল মন। মনে হল রক্তের ভেতরে একটা কাঁপুনি অনুভব করছেন তিনি, মেরুদণ্ড বেয়ে কেমন এক শীতল ধারা। নিজেকে ভয়ংকর নিঃসঙ্গ নির্জন বোধ হল।

উঠে পড়লেন ঝরনা থেকে। ধীর পদক্ষেপে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললেন। ফুলগুলিকে স্পর্শ করলেন। ঘ্রাণ নিলেন নাসারন্ধ্র ভরে। স্পর্শ-গন্ধের বিপুল একটা জগৎ দুলে উঠল অনিন্দ্যসুন্দরের চোখে। পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আকাশকে আহ্বান জানালেন একবার, শঙ্খতরঙ্গ ডানা ছড়ানো পাখির মতো হা-হা করে ছড়িয়ে পড়ল দিক-বিদিকে। ওধারে ঘন জঙ্গল, মাঝখানে পাহাড়টা ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেছে। ওই জঙ্গলে যাওয়া যায় না। নীচে ঝরনার দিকে তাকালেন তিনি। এখান থেকে লাফিয়ে পড়লে ঝরনা কী বুকে টেনে নেবে। একটা পাথরের ওপর বসে নিশ্বাস নিলেন অনিন্দ্যসুন্দর। আঃ মুক্তি। তাঁর চব্বিশ বছরের জীবনের জানালায় এই পাহাড়ও ছিল ঝরনাও ছিল। কিন্তু আজকের মতো তাঁর সত্তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেনি। এই পাহাড় আর ঝরনাকেই এতদিন বুকের পাষাণে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন তিনি। তারা প্রতিশোধ নিয়েছে, কুরে কুরে খেয়েছে তাঁর সমগ্র অস্তিত্বকে।

সকালের রোদ এবার তীব্র হয়ে উঠেছে। ঘাম নয়, ভেতরে জ্বালা অনুভব করলেন। সিগারেট ধরিয়ে নিচে নেমে এলেন অনিন্দ্যসুন্দর। ফেরার পথে মন সুখে ভরে উঠল তাঁর। যেন বহুদিনের হারানো কোনো সম্পদকে ফিরে পেয়েছেন তিনি, যাকে উপভোগ করা যায়, যা প্রাণময় আলোময় অনন্ত যৌবনের জীবন্ত প্রতীক। সেই যৌবনের চেহারাটা আবার স্পর্শ-গন্ধের চেতনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারছেন তিনি। একটি নিটুট পরিপূর্ণ যৌবন। রক্ত রস স্পন্দন উত্তেজনা। একটা বিশুদ্ধ বেদনায় টলমল করে উঠল অনিন্দ্যসুন্দরের হৃদয়। এবং সেই বেদনাবোধ যে এমন সুখকর হতে পারে, জানা ছিল না তাঁর।

বিকেলের আলো মুছে যাবার আগেই অনিন্দ্যসুন্দর বেরোলেন। এলোমেলো হাওয়া বইছে। গাছের পাতায় পাতায় খুশী। মুখে চোখে চুল উড়ে পড়ছে, ধুতির প্রান্ত উড়ছে। দূর থেকে পাহাড় দেখলেন অনিন্দ্যসুন্দর, গোধূলি সূর্যের লাল ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের চূড়োয়। ঝরনার জল কাকচক্ষু। যেন আসন্ন সন্ধ্যাকে হাতছানি দিচ্ছে।

হঠাৎ সবিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। স্বপ্ন না সত্যি। অসহ্য উত্তেজনায় এখুনি যেন মস্তিষ্কে বিস্ফোরণ হবে। চোখ ঘসলেন তিনি। সত্যিই কি শুয়ে-থাকা ঝরনা এই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়েছে। নাকি কোনো স্ট্যাচু। কাছে যেতে সাহস হয় না যদি এই দেখাটুকু মিথ্যে হয়। তবু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। এই দেখবার জন্যে যে এই দীর্ঘ জীবন অন্বেষণ করেছেন তিনি। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর প্রতীক। পরিপূর্ণ যৌবন।

ওই আলোভরা চোখ, ওই গ্রীবা, রক্ত-উচ্ছ্বসিত পাতলা অধর, আঁচলে বন্দী একজোড়া পাখি, বঙ্কিম বাহুলতা, গুরু নিতম্ব ছাপিয়ে একরাশ কালো চুলের অন্ধকার। আমার যৌবন, আমার প্রতীক, আদর্শ—মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর। এতদিন একেই আমি খুঁজেছিলাম, আমার রক্তে এরই আকর্ষণ।

নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি।

'আমি আপনাকে চিনি......' সে বললে।

অনিন্দ্যসুন্দরের মুখ কিশোর-বেলার লজ্জায় ছেয়ে গেল। আশ্চর্য। আমি তোমাকে চিনিনি। চিনতে পারিনি। স্বগত বললেন তিনি।

'......আজ সকালেই তো ডাক-বাঙলোয় এসেছেন।' সে শেষ করল।

'আশ্চর্য।' অনিন্দ্যসুন্দর বললেন : 'তুমি এখানে কি করে এলে?'

"কেন পায়ে হেঁটে। আপনি যেমন করে এসেছেন।'

সেই মুখ, সেই চোখ। কী আশ্চর্য, স্বপ্ন যেন অবয়ব পেয়েছে।

'কী নাম তোমার?'

'সানু।'

'সানু!' তাই বুঝি তোমার সানু-দেশে অনেক আশ্রয়। অনেক গাছ, অনেক ফুল, প্রজাপতি।

'রোজ আসো এখানে?' অনিন্দ্যসুন্দর জিগ্যেস করলেন।

'প্রায় আসি।' সানু বললে।

'কাল আসবে?'

কেন?'

'আসবে?'

'চেষ্টা করব।'

অনিন্দ্যসুন্দর পরিপূর্ণ করে তাকালেন ওর দিকে। পাহাড়ের ছায়া পড়েছে নিচে। ঝরনার জল কালো শেলেটের মতো। পাহাড়ের মাথায় আকাশটা এখনো পিঙ্গল। মালার মতো একঝাঁক পাখি গান গাইতে গাইতে আকাশ-পরিক্রমা করে গেল।

সানু বললে, "আমি যাচ্ছি।'

অনিন্দ্যসুন্দর জিগ্যেস করলেন, 'কোথায় থাকো তুমি।'

সানু বললে, 'বাবার কাছে। আমার বাবা ফরেস্ট আপিসের কেরানী।'

'মা?'

'নেই।' সানু মলিন হাসল।

ওর চোখের আলোর দিকে অনিমিষে তাকিয়ে রইলেন অনিন্দ্যসুন্দর। ওই চোখের আলো এখন সন্ধ্যার ছায়ায় মেদুর। আর সন্ধ্যাকাশে দুটি তারার মতো চকচক করছে। ইচ্ছে হল ওই শীতল অন্ধকারের ওপর হাত রাখেন। কিন্তু, পারলেন না। আকাশে একটি দুটি করে তারা ফুটেছে। পাহাড়টা অন্ধকারে এখন আরক্ত ধূসর। গাছগুলি কালি-লেপা। ঝরনা এখন শব্দ, শব্দের জলতরঙ্গ। এই সেই যৌবন। অফুরন্ত আলো ঢেলে তার হৃদয়ের গুহাকে ভাস্বর করে গেছে। সেই আলোতে কাঁপছেন অনিন্দ্যসুন্দর, তারপর আলোটা যেন ফুলঝুরি হয়ে ঘিরে ধরল তাঁকে, সেই আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে একজোড়া চোখ, অধর, বাহু। ধপ করে বসে পড়লেন অনিন্দ্যসুন্দর। সানু, সানু, সানু—সুন্দর গানের কলির মতো বারবার উচ্চারণ করলেন তিনি। চব্বিশ বছরের মনের সুর লাগল কণ্ঠে। কেমন এক কাপুরুষতা ভয় দাসত্ব হতাশা শক্তিহীনতা পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল তাঁকে। তবু ভালো লাগল। যেন একটা অসহ্য শক্তির জোয়ার তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। থরথরিয়ে উঠল হৃৎপিন্ড। খোলা প্রান্তরের একক নিঃসঙ্গ পাখির গলায় চিৎকার করতে চাইলেন তিনি। আকাশটা কাঁপছে, সমস্ত প্রকৃতিতে নাচের মাতন। অনিন্দ্যসুন্দর স্থির স্তব্ধ।

পরের দিন সানু এল না। পাহাড়টা একটা বিরাট আলোর ভালুক হয়ে গম্ভীর হয়ে রইল। আর, ওই ঝরনা যেন বোবা হয়ে গেছে। অনিন্দ্যসুন্দর অকস্মাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। মনে হল এই নির্জন পরিবেশ থেকে উদ্যত অশরীরী ভয় তাঁকে গ্রাস করতে আসছে। আরো মনে হল তিনি হেরে গেছেন, ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছেন। কালকের পাওয়া শক্তিটা বেমালুম আজ এখন চুরি হয়ে গেছে। একি হল, একি হল আমার—বিড় বিড় করে বললেন তিনি। এই মুহূর্তে চোখের সামনে সমস্ত রঙ-গন্ধ মুছে গিয়ে কালোর বন্যায় একাকার হয়ে গেছে। অনুভূতিগুলি খরতর হয়ে ওঠে, প্রতীক্ষা কাঁটার মতো খচ খচ করতে থাকে। বারবার একটি লঘু পদশব্দের জন্যে কান পেতে থাকেন। তারপর অদ্ভুত বিমর্ষে চুমরে ওঠে ভেতরটা। সারা চোখমুখে প্রদাহ। জিভে কান্নার মতো লোনা স্বাদ। সে এল না। এল না। কথাগুলি যেন হাওয়ায় ভাসা পাতার মতো চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইলেন অনিন্দ্যসুন্দর। আধো অন্ধকারে হঠাৎ তাঁর স্ত্রী ছেলে-মেয়ের জন্যে একটা দুঃখ অনুভব করলেন তিনি। তীব্র আসক্তি। কিন্তু—অনিন্দ্যসুন্দর ভাবলেন : ওগুলি দুঃখ, দুঃখের অনুভূতি।

দুপুরের ঝামা রোদ্রে সানু এল ডাকবাংলোয়। একটু হাঁপাচ্ছে, ঠোঁটের প্রান্তে ঘাম।

'রাগ করেছেন?'

অনিন্দ্যসুন্দর স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

'বলুন না রাগ করেছেন আমার ওপর?' সানু জিগ্যেস করল ফের।

'কাল আসোনি কেন?'

'এম্নি। আসতে ইচ্ছে করেনি।' সানু বললে : 'আজ তো এসেছি।'

'জানো আমি কষ্ট পাই...' অনিন্দ্যসুন্দর মৃদু গলায় বললেন।

সানু একদৃষ্টে তাকাল অনিন্দ্যসুন্দরের দিকে। কি দেখল কি খুঁজল। তারপর মুখ নিচু করে বললে, 'আমি জানতাম না।'

অনিন্দ্যসুন্দর এবার স্পষ্ট করে তাকালেন ওর দিকে। সেই চোখ সেই মুখ। বললেন, 'আমি তোমাকে স্পর্শ করব।'

'করুন

সানুর করতল ভিজে, ঠান্ডা। অনেকক্ষণ নিজের মুঠোয় ওর করতল নিয়ে বসে রইলেন অনিন্দ্যসুন্দর। 'এতদিন তোমাকেই খুঁজছিলাম...'

সানু হাসল। 'আপনি এমনভাবে কথা বলেন যেন সত্যি।'

ওর ভিজে চুলে মুখ রেখে অনিন্দ্যসুন্দর ঘ্রাণ নিতে নিতে বললেন, 'এতদিন তোমারই আকর্ষণ আমি অনুভব করেছিলাম রক্তে...'

সানু ছিটকে সরে গেল। মুখ কালো করে বললে, 'এখানে যাঁরা আসেন তাঁরাই আমার আকর্ষণ বোধ করেন। আমার সতেরো বছরের শরীরটা...'

আহত বেদনায় মূক হয়ে গেলেন অনিন্দ্যসুন্দর। কোনো দিকে তাকাতে পারলেন না। শুধু কোনো রকমে বললেন : 'তুমি যাও। আর এস না।'

সানু অবাক হয়ে চলে গেল।

অনিন্দ্যসুন্দর পাথর হয়ে বসে রইলেন। কিছু ভাবতে চান, পারেন না।

তাঁর মস্তিষ্ক কে যেন থে'তলে দিয়েছে। এই সেই অটুট নিভাজ যৌবন, দীর্ঘকাল যাকে অন্বেষণ করেছেন, যার আকর্ষণ তাঁর রক্তে। না, তিনি লোভী নন। স্থূল রক্ত মাংসের কামনা তাঁর ভেতরে নেই। তাঁর আকর্ষণ কামনার নয়, ভালোবাসার রঙে তিনি রাঙাতে চান। একটি অফুরন্ত নির্দোষ যৌবন তার স্বাদে গন্ধে তাঁর সমস্ত চিত্তলোককে গন্ধময় করে তুলুক। তিনি পূর্ণ হতে চান, পরিপূর্ণ মানুষ। ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত পৃথিবীতে যৌবন তার কেতন উড়িয়ে তুলুক। তাঁর আদর্শ, প্রতীক। ও কি করে ভাবল এমন কথা। আকর্ষণ মানে কামনা! আরো দশজনের সঙ্গে তাঁকে এক করে দিল। তবে কি তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন তা স্বপ্নই, একটা লালিত সাধ। কোনোদিন সেই যৌবন তার ঐশ্বর্য নিয়ে তাঁর সামনে উন্মোচিত হবে না। হবে না! তবে এই জীবন কেন, কেন জীবন ধারণ। কেন? হঠাৎ এই ক্লান্ত দুপুরে অনিন্দ্যসুন্দরের মার কথা মনে পড়ল। 'মা আমি তোমাকে ভালোবাসি।' যেন মায়ের কোল আঁকড়ে ধরে শুয়ে আছেন তিনি। মার দীর্ঘ আঙ্গুলগুলি তাঁর চুলে, কপালে।

তিনটি দিন ডাকবাঙলোর সীমার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। ভাবলেন। মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করলেন। যতবার ভাবতে চান তাঁর স্বপ্নে পাওয়া যৌবনের কল্পনার সঙ্গে সানুর চেহারাটা মিলে যায়। ঐ পুঞ্জীভূত চুল, আলোপাগল চোখ, গ্রীবা, সব মিলিয়ে যৌবন তার আদল পায়। কোনোটিকে বাদ দেয়া যায় না। যেন কোন্ প্রতিমাকে নিরীক্ষণ করছেন তিনি। শিল্পীর হাতের স্পর্শে যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সূক্ষ্ম, সুঠাম। যৌবন একটা নিশানা নয়। শরীর, আর শরীর তার অঙ্গশোভা করবে। এই যৌবনকে তিনি স্পর্শ করতে পারেন, ঘ্রাণ নিতে পারেন। কেমন স্নিগ্ধ পবিত্রতায় ভরে ওঠে তাঁর মনোলোক। তাঁর মন অবগাহন করে রূপের, গন্ধের।

সেদিন আবার বেরোলেন অনিন্দ্যসুন্দর। ঝরনার ধারে গেলেন না, সোজা পাহাড়ের দিকে হাঁটতে লাগলেন। বুনো ফুলগুলি হাওয়ায় কাঁপছে, প্রজাপতিগুলি ঘুরে ঘুরে উড়ছে। অনিন্দ্যসুন্দর আজ যেন নিজেই পাহাড় হয়ে গেছেন। তেমনি বিমর্ষ গম্ভীর উদাস। তার মনের ছন্দের সঙ্গে আজকের বিকেলের আকাশটাও যেন সম্মতি দিয়েছে। তেমনি গুমোট বিষণ্ণ। কোথাও কোনো শব্দ নেই। অটুট নৈশব্দ ঘিরে ধরেছে পরিবেশকে।

বাঁক নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন অনিন্দ্যসুন্দর।

একটা পাথরের ওপর ঘাড় গুঁজে বসে সানু। আনমনে ঘাসের গায়ে হাত বুলোচ্ছে। কি করবেন বুঝতে পারলেন না অনিন্দ্যসুন্দর। হয়তো তাঁকে দেখেছে সে। কিংবা দেখেনি। নিঃশব্দে ফিরে যাবেন অথবা এগিয়ে। কিন্তু কিছুই করলেন না তিনি। তারপর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডাকলেন: 'সানু—'

সানু মাথা তুলল না কথা বললে না। কেবল ওর ঘনঘন বিক্ষুব্ধ দেহ-মুলকে দেখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তারপর ওর দু বাহু ধরে টেনে তুললেন তিনি, কানের পাশে চুলে হাত রেখে মুখ তুলে ধরলেন, দেখলেন ওর চোখ দুটো, প্রচণ্ড এক আলোকপ্রপাত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, কাঁপছে অধর। 'কেন, কেন আমাকে এত বড় শাস্তি আপনি দেবেন...' অশ্রুতে জড়িয়ে গেল স্বর।

অনিন্দ্যসুন্দর কিছু বলতে পারলেন না। কেবল দেহ দিয়ে তাকে আচ্ছাদিত করে দিলেন। নিজের হৃদয়ে ঝরনার স্পন্দন অনুভব করলেন তিনি। সুখকর আলোয় ছেয়ে গেল চেতনার আকাশ। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি বললেন। সানু হাসল। মাথা নাড়ল। 'আর কোনোদিন ভুল করব না।' বললে সে। অনিন্দ্যসুন্দর নিশ্চুপ। স্পর্শগন্ধের রাজ্যে তাঁর চেতনা মন্থর হয়ে গেছে। এই সেই যৌবন যাকে আমি স্পর্শ করেছি, ঘ্রাণ নিয়েছি—বললেন তিনি। এর আস্বাদ আলাদা, নতুন এক অবগাহন।

'সানু আমি তোমাকে ভালোবাসি...'

'কেন আমাকে ভালোবাসলেন? আপনি কি জানেন আমার, আমি—'

'সারা জীবন আমি তোমাকেই খুঁজেছিলাম, আমার ভালোবাসাকে।'

'কিন্তু আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়ে। ওদের আপনি ভালোবাসেন না?'

বাঁক নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন অনিন্দ্যসুন্দর

'হ্যাঁ। ওরা আমার প্রতিদিনের সঙ্গে প্রয়োজনের হিসেবে জড়ানো। আর তুমি,. তুমি আমার নিত্যকালের আমার অপ্রয়োজনের, আমার মনের যে অংশ নির্জন নিঃসঙ্গ সেখানে তোমার আসন।'

'কিন্তু সে কি সত্যিই আমি? না আপনার কল্পনা?' সানু বললে, 'আমার সবটাই হয়তো আপনার বানানো।'

অনিন্দ্যসুন্দর বললেন, 'কিন্তু তোমার স্পর্শ গন্ধ সেগুলো তো বানানো নয়! আমি যে .তা উপভোগ করতে পারি।

সানু চুপ করল। হাত ধরাধরি করে ওরা নিচে নেমে গেল।

'কাল আসছ?'

'জানি না।'

'আসছ না?'

'অমন করে ডাকলে আমি না এসে পারিনে।' সানু হাসল।

অনিন্দ্যসুন্দর বললেন, 'ডাকি বলেই আসো। নিজের থেকে আসতে ইচ্ছে করে না?'

সানু বললে, 'করে। আপনি আমার সব হিসেব গোলমাল করে দিয়েছেন।'

ঝরনার বুক থেকে অনেক জল ঝরে গেল। পাহাড়ের বুকে অনেক সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত। দীর্ঘদিন পর নিজের সত্তাকে ফিরে পেয়েছেন অনিন্দ্যসুন্দর। জীবন-ধারণের আনন্দ। আমি এমন করে নিজেকে কোনোদিন পাইনি—বললেন তিনি : বেঁচে-থাকার সুমহান অর্থ। আমার যৌবন-প্রত্যয়, আমার আদর্শ, প্রতীক। স্থূলে জীবনের গ্লানি কদর্যের পঙ্ক থেকে ঊর্ধ্বে এক পরিপূর্ণ শতদল। জীবন সহস্র পাপড়ি মেলে ধরেছে, রূপে রসে গন্ধে। তোমার ওই চুলের উদ্ভিদ-গন্ধ, তোমার পাতলা রক্ত ছড়ানো ঠোঁট নরম শীতল বাহু, কঠিন উষ্ণ বক্ষদেশ—আমার অস্তিত্বে ডুব দিয়েছে, তারা মন থেকে আলাদা নয়, তারা কথা বলে, কোলাহল করে, স্পন্দিত হয়। শুধু শরীর-ধর্ম নয়, আগল ভেঙে দেহমনের সম্পূর্ণ সন্ধি হয়ে গেছে। মন্দির আর বিগ্রহ একাকার।

সানু বলে, 'আমার ভয় করে। যদি মরে যাই—'

অনিন্দ্যসুন্দর বলেন, 'মৃত্যুরও মরণের ভয় আছে। জীবনকে সেও ভয় করে।'

সানু বলে, 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারিনে।'

'বলছি মৃত্যু জীবনের শেষ কথা নয়। একদিন আমরা থাকব না। তুমিও না আমিও না। থাকবে ওই আলোর ঝরনা, গম্ভীর পাহাড়, আমাদের অনুভবের প্রত্যয়ের নিত্যকার হাওয়া বইবে এই ধূলিতে। আমাদেরই ছন্দে নরনারী যৌবনকে খুঁজে পাবে, তার স্বপ্ন আদর্শ প্রতীককে চিনে নেবে।'

সানু মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অনিন্দ্যসুন্দর আবার বললেন, 'সেদিনকার মানুষ আবিষ্কার করবে এক মস্ত বড় ধর্ম। যৌবনের ধর্ম। শরীর আর মনকে একসূত্রে গেঁথে যৌবনকে মন্দিরে বসাবে। যৌবনকে সে ভয় করবে না, লোভ করবে না, কোনো কদর্যতা-কলুষতা নয়, তার উত্তাপ স্পর্শ গন্ধকে সে ফুলের রেণুর মতো গায়ে মেখে নেবে, নেবে তার আনন্দকে নিংড়িয়ে।'

সানু আজকাল কথা বলে না, চুপ করে শোনে। আর চিন্তা করে। অনিন্দ্য-সুন্দর নিজের চিন্তা দিয়ে তাঁকে সব সময় বুঝতে পারেন না। জিগ্যেস করলে তেমন উত্তর পান না। ও যেন কোথায় আটকে গেছে এবং চক্র দিয়ে ঘুরছে একটি আবর্তের মধ্যে। অনেক গোধূলি আলো ছড়িয়ে বিষণ্ণ সন্ধ্যাকে ডেকে আনল। সন্ধ্যা অনেক রাত্রিকে।

কদিন থেকে একটা চাপা গুমোট। হাওয়া নেই। থমথমে চারদিক। বোধ হয় বৃষ্টি নামবে কিছু দিনের মধ্যে। সেদিন বিকেলে ঝড় উঠল, আকাশ ঘোলাটে, গাছপালার মধ্যে দুরন্ত খেপামি। সানু সে-বিকেলে আসেনি। অনিন্দ্যসুন্দর ডাকবাঙলোয় চুপ করে বসে ছিলেন। সন্ধ্যা নামতে রাতের খাওয়া চুকিয়ে ঘরে পা দিতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুৎ। অনিন্দ্যসুন্দর শুয়ে শুয়ে সিগারেট খেতে লাগলেন। তারপর কখন গায়ের ওপর চাদর টেনে ঘুমিয়ে পড়েছেন, খেয়াল নেই।

অনেক রাত্রে একটা চিৎকার নাকি কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল অনিন্দ্যসুন্দরের। বাইরে সমানে মেঘের গর্জন বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো আলো। পায়ের দিকে জানালাটা খুলে গেছে।

ঝড়ের গর্জন ঠেলে একটা আর্তনাদ। একটা শ্বাপদ দুর্যোগের রাত্রে চিৎকার জুড়েছে বুঝি। জানালার কাছে উঠে এলেন তিনি। জানালা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন অনিন্দ্যসুন্দর। ঠিক জানালার নিচে একটা বেড়াল নখ দিয়ে দেয়াল আঁচড়াচ্ছে, জ্বলছে ওর চোখ দুটো ফসফরাসের মতো। একটা আতঙ্কের স্রোত নামল সারা গা বেয়ে। গলা শুকিয়ে এল অনিন্দ্যসুন্দরের। এমন ভয়ংকর বিভীষিকা তিনি জীবনে দেখেননি।

'দরজা খুলুন—দরজা খুলুন—'

জানালার গরাদে মুখ রেখে স্তব্ধ হয়ে গেছেন অনিন্দ্যসুন্দর। বিদ্যুতের প্রভায় ওর সিক্ত শরীর অদ্ভুত এক হিংস্র পাশবিক দেখাচ্ছে। মুখের ওপর লেপটে-পরা চুল, শাড়ি কোমর থেকে লুটোচ্ছে মাটিতে, সিক্ত হ্রস্ব ঊর্ধ্ববাসে এক জোড়া নিষ্ঠুর হিংসা প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে।

'দরজা খুলুন।' সানু হাঁপাচ্ছে, দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে : 'আমি ভুল বুঝেছিলাম, সব ভুল। আমার লোভ আছে, আমার কামনা আছে...' হিহি করে কাঁপছে সানু, দৃঢ় মুষ্টিতে দেয়াল আঁকড়ে ধরেছে।

নিশ্চল নিষ্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলেন অনিন্দ্যসুন্দর। আমার যৌবন, আমার স্বপ্ন, প্রতীক। ওই মুখ, গ্রীবা, বাহু, অধর প্রতিটি অংশ যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে তাঁর চোখের সামনে। ওগুলি সম্পূর্ণ হয়ে উঠে শরীর গড়ে তুলছে না কোনো প্রতিমার মতো, কেবল কতগুলি নিষ্ঠুর হিংসা লালসার চিহ্ন হয়ে ফুটে উঠছে চোখের সামনে। অনিন্দ্যসুন্দর হিমশীতল হয়ে গেলেন। বাইরে অঝোর-ধারে বর্ষণ চলেছে। পাহাড় ডুবল ঝরনা ভেসে গেল, সমস্ত পৃথিবীটা বোধহয় নিঃস্ব হয়ে গেল তাঁর চোখের সামনে।

পরদিন অনেক সকালে অনিন্দ্য-সুন্দর কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন।

॥ প্রেক্ষাগৃহ ও ভারতীয়ত্ব ॥

(উত্তর)

গেল হপ্তার "অমৃত"-এ মতামত স্তম্ভে প্রকাশিত, শ্রীসুভাষচন্দ্র পালিত লিখিত "প্রেক্ষাগৃহ এবং ভারতীয়ত্ব" শীর্ষক দীর্ঘ পত্রখানির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

প্রথমেই পত্রলেখককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তিনি আমার লেখার সমালোচনা করেছেন ব'লে। এবং দ্বিগুণ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তিনি আমার লেখার, তথা "অমৃত"-র নিয়মিত পাঠক ব'লে।

কিন্তু আমার মনে হয়, চুয়াল্লিশ সংখ্যক 'অমৃত'-এ "বর্তমানের ভারতীয় চলচ্চিত্র" সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'ভারতীয়ত্ব' নিয়ে আমি যে-কথা বলেছিলুম, সেকথা, হয় আমারই লেখার দোষে, নয় পত্রলেখকের পড়ার দোষে, তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। আমি কোনো কিছুরই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা বলিনি; আজকের ভারতের বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে যে-সব আচার-আচরণ লক্ষ্য করেছি, তারই কয়েকটি উল্লেখ ক'রে জিজ্ঞাসা করেছি, এদের মধ্যে কোন কোন্ জিনিসকে ভারতীয় বলা যেতে পারে বা পারে না। মনে রাখতে হবে, আজকের ভারত is a nation in the making স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ এখনও তার নিজের রূপকে খুঁজে পায়নি, আজ তার সাহিত্য, সমাজ, অর্থনীতি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—কোনোটাই স্থিতিশীল নয়, দ্রুত পরিবর্তনশীল। আজকের ভারতে নেহরুর 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া'ও একটি অতীতের বস্তু। এবং যতই ভাবপ্রবণ হয়ে 'আমাদের দেহে-মনে, আকাশে-বাতাসে, মাটিতে, চিন্তায়-ধ্যানে, আমাদের সাধনা-আরাধনা-সংকল্পে, শৌর্যে বীর্যে, অশ্রুজলে, আমাদের সাহিত্য ও ধর্মে' আমাদের 'ভারতীয়ত্ব' ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ব'লে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি না কেন, বর্তমান ভারতের 'ভারতীয়ত্ব'-কে অন্বেষণ করবার জন্যে জাগ্রত মনবিশিষ্ট কোনোও ব্যক্তিই 'পুরাতত্ত্বশালা'র স্বারস্থ হবেন না। ভারতীয় ঐতিহ্যকে সসম্মানে স্বীকার ক'রে নেবার পরেও এই হচ্ছে আমার সুচিন্তিত অভিমত। তাই দেখি, আজ পন্ডিত নেহেরু নব-ভারতের তীর্থক্ষেত্র বলতে বোঝেন, ভাখরা-নাঙ্গাল, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি বিরাট প্রযোজনাগুলিকে। পরাধীনতার শৃংখলমুক্ত ভারতে আজ 'পোহায় রজনী, জাগিছে জননী'—'ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়ে রূপান্তর চলেছে, কিন্তু রূপের পরিণতিতে আজও এসে পৌঁছোয়নি।'

সব শেষে বলি, লেখক আমার প্রতি সামান্য একটু অবিচার করেছেন। আমি সজ্ঞানে বলতে পারি, আমি কোনো দলের লোক নই এবং 'সংকীর্ণ, ব্যক্তিগত স্বার্থ' কোনোদিনই আমার চিন্তাকে কলুষিত করেনি। আমি যখন লিখি, তখন আমার সীমিত জ্ঞানবুদ্ধি বিদ্যায় সাহায্যেই নিজের অভিমত ব্যক্ত করি এবং সে-অভিমত পৃথিবীর আর একটি লোকের অভিমতের সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে, এমন অন্যায় আশা আমি কখনই মনের মধ্যে পোষণ করি না।

ইতি—নান্দীকার।

২২-৪-৬২

॥ মাতৃভাষা বনাম ইংরাজি ॥

সম্পাদক সমীপেষু,

মাননীয় মহাশয়,

ইংরাজি অথবা বাংলা শিক্ষার মাধ্যম কী হবে এ বিষয়ে শ্রীবসুর পরামর্শ, শ্রীমতী পন্ডিতের এবং উপাচার্য শ্রীলাহিড়ীর অভিমত এবং 'অমৃতের' সম্পাদকীয় আলোচনা অনেকের সঙ্গে আমিও মনোযোগ দিয়েই পড়েছি।

প্রতিবাদ যাঁরা করেছেন তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ক্ষেত্রে 'কেউকেটা' হলেও শিক্ষার বিষয়ে স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক এবং জ্ঞানবৃদ্ধ শিক্ষাবিদ শ্রীবসুর অভিমত খন্ডন করার যোগ্যতা তাঁদের আছে কি না তা প্রশ্নাতীত নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের কষ্টার্জিত অধিকার লাভ করার পর যে বিষয় এবং দপ্তরটির সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করা উচিত ছিল অথচ যার ভাগ্যে জুটেছে সর্বাধিক অবহেলা এবং অমনোযোগ সেই হতভাগ্য বঞ্চিতের নাম "শিক্ষা"। ইংরাজ আমলে ইংরাজি শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন মাত্র গুটিকয়েক (ভারতের লোকসংখ্যার অনুপাতে) সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র (তাঁরাই আজ আমাদের দেশের এবং সমাজের কর্তা-ব্যক্তি। ইংলন্ড, আমেরিকা, রাশিয়ার সঙ্গে তাঁরা নাড়ীর যোগ অনুভব করেন, আমাদের ভারতের দুঃখ তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য অথবা বোধের অযোগ্য)। প্রকৃত দেশ বলতে যা বোঝায় তা সেদিনও ছিল ও আজও আছে এবং বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আরও অনেকদিন থাকবে অজ্ঞানতা, কুশিক্ষা এবং মারাত্মক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। শিক্ষার দীপশিখা দেশের প্রত্যেকটি কোণে ছড়িয়ে দিতে না পারলে ভারতবর্ষ তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে না। আর আত্মবিশ্বাস ফিরে না পেলে হাজার পঞ্চ-বর্ষীয় যোজনাও গড়ে তুলতে পারবে না আমাদের জাতীয় চরিত্র, নৈতিক দৃঢ়তা, টিকে থাকবে না, সফল হবে না গণতন্ত্র। মাতৃভাষাই সেই 'Conductor' যা বহন করে নিয়ে যাবে শিক্ষার আলোকশিখাকে প্রত্যেক দেশবাসীর অন্তরে, অন্দরে।

প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যেই যদি সেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে জাতীয় সংহতি ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে উপাচার্য শ্রীলাহিড়ী এই মত পোষণ করেন। কিন্তু, প্রকৃত শিক্ষার সর্বব্যাপী বিস্তার (যা মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতীত সম্ভব নয়) ঘটলে ওরকম অবস্থা কখনোই সম্ভব নয়। জাতীয় সংহতি বিপর্যস্ত হবে তখনই যখন তার রক্ষার ভার থাকবে মাত্র গুটিকয়েক শীর্ষস্থানপ্রাপ্তদের হাতে আর দেশের অগণিত জনসাধারণ থাকবে এখনকারই মত অন্তর্দৃষ্টিহীন। আজ যখন পৃথিবীর এক দেশ সহস্র মাইল দূরবর্তী আরেক দেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে, বিনিময় করছে পরস্পরের সংস্কৃতি, তখন দেশের আভ্যন্তরীণ সংহতির বিপর্যয়ের আশঙ্কা কষ্টকল্পনা। আসল কথা "ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে সমাজের এক স্তরের মানুষ এমন একটি নতুন কৌলিন্যের আস্বাদ পেয়েছেন যা তাঁরা দেশের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে প্রস্তুত নন। সম্ভবতঃ সেইজন্যেই এত গেল গেল রব।" অমৃতের এই সম্পাদকীয় মন্তব্য ভারতবর্ষের প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির মনের কথা। সম্পাদক মহাশয়ের এই নির্ভীক মতপ্রকাশকে আমার অভিনন্দন জানাই। রাজনীতির মহিমায় অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়ে বিশেষ করে শিক্ষার কি অবস্থা কোন সচেতন ব্যক্তিকে তা বুঝিয়ে বলার দরকার নাই। যোগ্যের সমালোচনায় অযোগ্য আজ মুখর, যোগ্যকে কোণঠাসা করার নিরন্তর প্রয়াসে অযোগ্য ক্লান্তিহীন। তাই অনুরোধ, এই জাতীয় প্রশ্নের ব্যাপক আলোচনা আপনারা উৎসাহিত করুন যাতে দেশের প্রকৃত শিক্ষাবিদরা নির্ভয়ে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দিতে পারেন এবং দেশের সচেতন ব্যক্তি-মানস সেই পরামর্শ কার্যকরী করার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।

নমস্কারান্তে ইতি—

শ্রীতুলসীদাস বাগচী,

লালপুর, রাঁচি।

১৩-৪-৬২

নাটক অভিনয় আংগিক

রবীন মজুমদার

বাংলা নাট্যজগতে আঙ্গিকের আধিপত্য নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়েছে কিছুদিন যাবৎ। আঙ্গিকের বিরুদ্ধ-পন্থীদের অভিযোগ,— মঞ্চকৌশলের বাড়াবাড়িতে নাটক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে,— অভিনয়ের আবেদন ছাপিয়ে আঙ্গিকের কলাকৌশল দর্শককে বিভ্রান্ত করছে। নব্যপন্থীরা থিয়েটারে অভিনয়কে প্রাধান্য দিতেই রাজী নন। তাঁদের মতে নাটকের মধ্যে অভিনয়ের স্থান গৌণ। আঙ্গিক যথোচিত উৎকর্ষতালাভ করেনি বলেই অভিনেতারা এতদিন রঙ্গজগতে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পেয়েছেন এবং পরিচালকরাও উপায়বিহীন হয়ে তাঁদের স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন।

অভিনেতার পদচ্যুতির স্বপক্ষে তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন যে, নাটক হ'লো শিল্প, আর শিল্প হচ্ছে এক সৃষ্টি যা অচল, অনড়। অথচ এই শিল্পস্রষ্টা অভিনেতা হলেন সচল, সজীব, আবেগাশ্রিত। সৃষ্টির মুহূর্তে আবেগের প্রয়োজন, সুতরাং স্রষ্টা হিসাবে অভিনেতা আবেগাশ্রিত হ'লে অসুবিধা নেই। কিন্তু তিনিই আবার সৃষ্টির উপাদান। তাই সজীব হওয়ায় তিনি শিল্প-সৃষ্টির পরিপন্থী। কারণ প্রতিদিন একই জিনিস সৃষ্টি তিনি করতে পারেন না,— margin of human error থাকবেই। তাই তিনি শিল্পী নন এবং তাঁর আবেগ-ভিত্তিক অভিনয়ও শিল্প নয়। যথার্থ শিল্পী হ'তে হ'লে অভিনেতাকে সাধ্যমত প্রাণহীন, যান্ত্রিক হ'তে হবে। অন্যান্য আঙ্গিকের প্রয়োজনানুযায়ী যন্ত্রবৎ অভিনয়ের সেই শিক্ষা দেবেন নতুন যুগের পরিচালক। তাই আজকের যুগে নাটকের মুখ্য অঙ্গ অভিনেতা নয়, পরিচালক। এই প্রসঙ্গে নটগুরু স্তানিস্লাভস্কির the magic "If" theory ও তাঁরা নস্যাৎ করতে চেয়েছেন এই বলে যে যদি চাঁদ হলো সত্যের ভাণ আর ভাণ কখনো শিল্প হতে পারে না।

অভিনেতার বিরুদ্ধে নব্যপন্থীদের এই বিদ্রোহী মনোভাবের মূলে রয়েছে শিল্প সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। শিল্পের সংজ্ঞা কি? শিল্প বলতে আমরা কি বুঝি? যে প্রক্রিয়ায় অসম্পূর্ণ জিনিস সম্পূর্ণতা লাভ করে তাই শিল্প। এক টুকরো কাঠ শিল্প নয়, শিল্পের উপাদান মাত্র। সেই কাঠ থেকে তৈরী চেয়ারও শিল্প নয়, শিল্পজাত দ্রব্য। যে গতিশীল প্রক্রিয়ায় শিল্প উপাদান কাঠ শিল্পজাত দ্রব্য চেয়ার হিসাবে সম্পূর্ণতা লাভ করে পরিবর্তনশীল সেই প্রক্রিয়াই শিল্প। তাই শিল্পজাত দ্রব্য অচল, অনড় হ'তে পারে কিন্তু শিল্পী এবং শিল্প গতিশীল, সজীব না হ'লে চলে না।

অভিনেতা শিল্প নন, অভিনয়ই শিল্প। যে ক্রমিক অভিব্যক্তি অভিনেতাকে কোন এক বিশেষ চরিত্রের সূচনা থেকে নিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে নিয়ে যায় তাই শিল্প। সুতরাং নাটককে শিল্প ব'লে স্বীকার করলে অভিনয়ই প্রাধান্য পেতে পারে এবং অন্যান্য আঙ্গিক এই অভিনয়-শিল্পের পরিপূরক মাত্র।

এবার দেখা যাক আবেগের বিরুদ্ধে নব্যপন্থীদের যুক্তি কতদূর গ্রহণযোগ্য। The magic "If" theory-র বিরোধীতা করতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন যে যদি চাঁদ হলো সত্যের ভাণ এবং ভাণ কখনো শিল্প হতে পারে না। কিন্তু নাটকাভিনয়ের সবটাই কি ভাণ নয়? বাস্তবে আমি যা নই, মঞ্চে তার ভাণ করাই তো অভিনয়। দর্শকও জানে মঞ্চের 'সাজাহান' কিছু সত্যিকার সাজাহান নয়। তবু তারা অভিনয় দেখে আনন্দ পায়, তাদের রসাস্বাদনের ব্যাঘাত হয় না কারণ সাময়িকভাবে তারা এই 'ভাণ' সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। তাই এই 'ভাণ'টুকুকে যতদূর সম্ভব সত্যের মতো প্রতিভাত করতে পারলেই অভিনয় হয় সাফল্যমণ্ডিত। সুতরাং the magic "If" theory-র সাহায্যে অভিনেতা যদি এই ভাণটুকুকে সুন্দর করতে পারে তাহলে তার শিল্পসত্তাকে অস্বীকার করবো কেন?—আর তাছাড়া যন্ত্রবৎ অভিনয়ের স্বপক্ষে যাঁরা ওকালতী করছেন তাঁরা একথা ভুললে চলবে কেন যে যান্ত্রিক হ'লেও সে অভিনয়, অর্থাৎ ভাণমাত্র—সজীব হয়েও প্রাণহীন ভাণ।

সুতরাং তাও যদি শিল্প না হয় তাহ'লে তাঁদের যান্ত্রিক অভিনয়ের যুক্তি দাঁড়ায় কোথায়?

আসল কথা নাটকের প্রাণ অভিনয়, আর অভিনয়ের মূলমন্ত্র আবেগ—এই প্রতিষ্ঠিত সত্যকে নস্যাৎ করার দুর্বার ইচ্ছায় নব্যপন্থীরা দিশাহারার মতো যুক্তিবিহীন পথে অগ্রসর হয়েছেন। নতুন কিছু করার প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ, কিন্তু পুরানোকে তার যথোচিত মূল্যদানের ঔদার্য আমাদের থাকবে না কেন? সৃষ্টির মুহূর্তে আবেগের আবশ্যকতা স্বীকার করলে অভিনয়ের সাফল্যের জন্য আবেগের প্রয়োজনকে অস্বীকার করবো কোন যুক্তিতে, কারণ আগেই বলেছি, অভিনয়ই শিল্প এবং অভিনয়ের প্রতিটি মুহূর্তই সৃষ্টির মুহূর্ত।—তাছাড়া নাটক হচ্ছে দৃশ্যকাব্য আর কাব্যের পক্ষে আবেগ অপরিহার্য। কারণ তার আবেদন হৃদয়ের কাছে। নাটকের সংলাপের সাহায্যে দর্শকহৃদয় সংবেদনশীল করে তুলতে হলে চাই প্রাণ, চাই আবেগ। এবং সংলাপকে এই কর্তব্য পালন করতেই হবে, কারণ দর্শকই নাটকের সাফল্যের মূল্যায়নকর্তা,—প্রত্যক্ষ না হ'লেও পরোক্ষে দর্শকও নাট্যকলার অন্যতম অঙ্গ। অথচ অভিনয় দেখতে দর্শক শুধু চোখ আর কান নিয়েই যায় না, অভিনয় বিচারে তার মন তার হৃদয়ও অংশ গ্রহণ করে। সংলাপের মাধ্যমে সেই দর্শক-হৃদয়ের কাছে নাটকের আবেদন পৌঁছে দেওয়াই আবেগের কাজ, অভিনেতার মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তিতে সাহায্য করাই তার দায়িত্ব। "কোথায় যাচ্ছ" এই একটিমাত্র সংলাপকে আশ্রয় করে অভিনেতা কখনো প্রকাশ করেন তাঁর নিস্পৃহতা, কখনো বা মিনতি, বিরক্তি, রাগ। অভিনেতার এই বিভিন্ন মুডকে প্রকাশ করতে deliveryর যে modulation তার সার্থকতার মূলে রয়েছে আবেগ। সুতরাং নাটকে যতদিন সংলাপ থাকবে ততদিন আবেগকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেরও পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে আবেগের চাহিদা দেখা যায় কখনো বেশী কখনো বা কম। আজকের মানুষ মননশীল, তাই হৃদয়ের থেকে মনের প্রাধান্য বেশী। থিয়েটারে আবেগের আতিশয্য দেখলে তার 'যাত্রাগান' বলে মনে হয়। সুতরাং আবেগের অনুপান কমাতে হবে কিন্তু তাকে বিসর্জন দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, আগেই বলেছি, সংলাপ আর দর্শকের হৃদয় যতদিন আছে আবেগের আসন ততদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

অভিনয় ছাড়া নাট্যকলার অন্যান্য অঙ্গ হচ্ছে—নাট্যকার, নাটক, অভিনেতা, মঞ্চদৃশ্য ও রূপসজ্জা, আবহসংগীত, আলোকসম্পাত এবং পরিচালক। আঙ্গিকের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বহুলবিস্তৃত এবং উপরোক্ত সব অঙ্গই তার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আঙ্গিক সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে প্রত্যেকেরই উল্লেখ প্রয়োজন।

নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকার সম্বন্ধে আলোচনায় অবকাশ অল্পই আছে, কারণ বিগত যুগে "নাট্যকারের থিয়েটার" না "থিয়েটারের নাট্যকার" এই নিয়ে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হয়ে গেছে এবং জয়লক্ষ্মী "থিয়েটারের নাট্যকার"কেই বরণ করে নিয়েছেন। অর্থাৎ নাট্যকারের লেখনী অনুযায়ী থিয়েটার চলার যুগ শেষ হয়ে থিয়েটারের প্রয়োজনে নাট্যকারের লেখনী চালনার যুগ এসেছে। তবু আজকের ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আর আলোর কেরামতি নাট্য-প্রকরণে যে আমূল পরিবর্তন এনেছে তারই পটভূমিকায় একটা জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের অভিলাষে আজকের দিনের নাট্যকাররা এক একটি অঙ্কে দৃশ্য-সমাবেশ বাড়িয়ে দিয়েছেন অস্বাভাবিকভাবে। কিন্তু কোলকাতার গুটিকয়েক মঞ্চ বাদ দিলে সারা বাংলাদেশে আর কোন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আছে বলে আমার জানা নেই, আর থাকলেও অন্যান্য রংগমঞ্চের তুলনায় তারা অনুল্লেখ্য। সেক্ষেত্রে বর্তমান নাট্যকাররা যদি ঘূর্ণায়মান রংগমঞ্চের আকর্ষণ উপেক্ষা করতে না পারেন তাহ'লে সামগ্রিকভাবে নাট্যজগতের অপকারই করা হবে, কারণ নাটক নিয়ে পরীক্ষা, নিরীক্ষা সখের মঞ্চেই চিরকাল হয়ে এসেছে, পেশাদার মঞ্চে নয়। আর একটি জিনিস লক্ষণীয়। নাটকীয় সংঘাতের তুংগ মুহূর্তগুলি আলোর সাহায্যে চমকপ্রদ এবং appealing করা যায় কিয়ৎপরিমাণে। নাট্যকারের দৃষ্টি আজ সেই দিকেই নিবদ্ধ। ফলে, সংলাপের দিকে সজাগ দৃষ্টি না থাকায়, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সংলাপের আবেদন কমে আসছে। অথচ নাটক হচ্ছে ভাষা-শিল্প। গতিশীল জীবনের প্রত্যক্ষকল্প রসরূপ সৃষ্টিতে ভাষাই নাটকের অন্যতম প্রধান সহায়। আধুনিক নাট্যকারদের এ বিষয়ে সচেতন হবার সময় এসেছে, কারণ কোন এক অঙ্গের উৎকর্ষ যদি অন্য অঙ্গের অপকর্ষের সহায়ক হয় তাহ'লে তাকে উন্নতির পথে পদক্ষেপ বলে গ্রহণ করা চলে না কোনমতেই।

আবহসংগীত সম্পর্কে নব্যপন্থীদের বক্তব্য কথঞ্চিৎ যুক্তিযুক্ত। প্রাচীনকালে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। সাম্প্রতিককালেই এই আঙ্গিকের জন্ম এবং এখনো এর শৈশবাবস্থাই চলেছে। বর্তমানে হার্মোনিয়াম, গীটার, বেহালা, বাঁশী, সেতার ইত্যাদির সংমিশ্রিত ঐকতান বা যে কোন একটির এককতানকেই আবহসংগীত সৃষ্টির কাজে লাগানো হয়। এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। সংগীত, আবহসংগীত এবং শব্দের মধ্যে সংযোগ নেই কোন। নাটকের নিজস্ব প্রয়োজনে সংগীতের স্থান তার অন্দরমহলে। বিগতযুগে সংগীতবিহীন নাটক ছিল অকল্পনীয়। বর্তমান নাটকে সংগীতের স্থান গৌণ, এমনকি প্রয়োজন না থাকলে সংগীত অনুপস্থিত অনেক নাটকে। ঢাক বা ঝাজ ইত্যাদি সহযোগে যে শব্দ বা ধ্বনি সৃষ্টি তার ব্যবহারও প্রয়োজনানুযায়ী পরিমিত। কিন্তু যদিও প্রত্যক্ষ অঙ্গ নয়, তবু আবহসংগীত ছাড়া বর্তমান নাটক প্রায় অচল। নাটকীয় সংঘাত বা স্বগতের মুহূর্তে অথবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় দর্শকের মনকে সংবেদনশীল করে তুলতে সাহায্য করে আবহসংগীত। কিন্তু সে একান্তভাবেই নাটকের অধীন, নাটকের নিজস্ব সৃষ্টি। সমস্ত নাটকের মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে বিলীন করে ঘটনার মূর্ছনাকে রূপ দেওয়াতেই তার সার্থকতা। এর যথোচিত ব্যবহার শুধু পরিবেশ সৃষ্টি করে দর্শকহৃদয়কে সংবেদনশীল করেই তোলে না, অভিনেতাকেও আবেগ আনতে এবং এক নির্দিষ্ট পর্দায় ডেলিভারী দিতে সাহায্য করে। কিন্তু বিশুদ্ধ রাগ বা মার্গ সংগীতের ব্যবহার আবহসংগীতে সম্ভব নয় একথা স্বীকার করা যায় না। একটা সম্পূর্ণ রাগ বা রাগিণীকে আবহসংগীত সৃষ্টির কাজে কখনই নিয়োগ করা হয় না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাগ-রাগিণীর ছোঁয়ায় আবহসংগীত মাঝে মাঝে ক্ল্যাসিক পর্যায় ওঠে। একথা অনস্বীকার্য যে, সব রঙ্গমঞ্চেও এর সুষ্ঠু ব্যবহার হয় না কিন্তু তাই বলে গীটার আর বাঁশী থেকে শেয়ালের ডাক তোলার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা নব্যপন্থীদের

উন্নাসিকতার নিদর্শন। বাংলার নাট্য-জগতে আবহসংগীতের এখনো শৈশবাবস্থা. এই কথাটি স্বীকার করে নিয়ে যথোচিত কালচার-এর দ্বারা এর উন্নতি-বিধানে সচেষ্ট হওয়াই যুক্তিযুক্ত. অনর্থক বিষোদ্গারে লাভ নেই কোন।

এবার আলোক-সম্পাতের কথায় আসা যাক। এর বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীদের অভিযোগ হচ্ছে 'তাপস-সেনী' আলো বেশী সচেতন, সোচ্চার, স্থূল। নাটকের পরিবেশ অতিক্রম করে সে নাটককে লঙ্ঘন করে, তার বক্তব্য চেপে দেয়।

গানের আসরে যদি গানের ওপর দিয়ে তবলার চাটি শোনা যায় তা'হলে সে তবলা গানের পরিপূরক না হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে একথা স্বীকার করতেই হ'বে। অভিনয়ে আলোক-সম্পাতের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। একথা ভুললে চলবে না যে, অভিনয়ের সহায়করূপে আলোর প্রয়োজন। আলোক-সম্পাতের সার্থকতা অভিনয়কে দর্শকের সামনে তুলে ধরায়, অভিনয়োপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে। তাপস-সেনী আলো সেই বিচারে কি সার্থক? এখানে 'অঙ্গার' দেখে আসা এক দর্শকের মন্তব্য তুলে ধরছি—"পৃথিবীর ওপরকার মানুষের কাছে খনির নীচেকার মানুষের যে আর্ত এপিল তাকে 'হল' থেকে বাইরে আনার অবকাশ পেলাম না। এক তৌল্কের বন্যায় তার অপমৃত্যু ঘটল।"—অনেকেই 'সেতু' দেখতে যায় কারণ 'তার রেলগাড়ীর দৃশ্যটা বড় চমৎকার হয়েছে। অর্থাৎ নাটকের আবেদন ছাপিয়ে উঠেছে রেলগাড়ীর কৌশল, জল আর আগুনের কেরামতি।—কিন্তু কেবলমাত্র এই কারণেই এ যুগের আলোক-সম্পাতকে সোচ্চার বলে অভিহিত করা সংগত নয়। রঙ্গমঞ্চে আলোর এ জাতীয় খেলা দেখতে অভ্যস্ত নয় সাধারণ দর্শক। তাই, অদৃষ্টপূর্ব বলেই এর আকর্ষণ দর্শক-মনকে চঞ্চল করেছে। বিবেচক দর্শককে একথাও বলতে শুনেছি যে, রেলগাড়ীর দৃশ্যে নায়িকার আত্মহত্যার প্রচেষ্টা যে করুণরস সৃষ্টি করেছিল আলোর খেলায় তার আবেদন বিশেষ ব্যাহত হয়নি। আসল কথা এই জাতীয় আলো দেখে দেখে দর্শকের চোখ যখন অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, নতুনত্বের চটকে যখন আর চমক জাগবে না, তখন দেখা যবে নাটকের রসসৃষ্টির সহায়করূপেই এই আলো কাজ করছে। সুতরাং হঠাৎ আলোর জলকানি লাগা দর্শকের মোহমুগ্ধ চোখ দেখেই এই আলো সোচ্চার বা বেশী সচেতন বলে রায় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হ'বে না। পরন্তু এ কথা স্বীকার করাই সঙ্গত যে, আঙ্গিকের সাহায্যে যে সমস্ত পরিবেশ সৃষ্টি এক সময় অসম্ভব ব'লে বিবেচিত হ'তো তাপস-সেনী আলো সেই সমস্ত পরিবেশের বাস্তবরূপায়নের দ্বারা নাট্য-জগতে যুগান্তর এনেছে। এর আগে দেখেছি নাটকের প্রয়োজনে রঙ্গমঞ্চে স্থান পেলেও বাতি বা হ্যারিকেন-লণ্ঠন অনাদর আর উপেক্ষার মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে ইলেক্‌ট্রিক আলোর উপহাস সহ্য করছে। এ দৃশ্য দৃষ্টিকটু ঠেকেছে, কিন্তু সহ্য করেছি উপায়বিহীন হয়ে। এই সমস্ত অভাব, অসম্পূর্ণতা দূর করেছে তাপস-সেনী আলো, পরিবেশকে করে তুলেছে স্বাভাবিক। সুতরাং, গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে তাকে দূরে সরিয়ে না রেখে সানন্দে বরণ করে নেওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

এবার রূপ, দৃশ্য আর মঞ্চসজ্জার প্রসঙ্গে আসা যাক। রূপসজ্জার সরঞ্জাম আবরণ আর আভরণ। অভিনেতার স্বভাবিক রংকে মঞ্চোপযোগী করতে প্রয়োজন রংএর আবরণ এবং বয়স মেক্-আপ্ করতে পরচুলা ও তুলির আঁচড়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অধিকাংশ সখের থিয়েটারে খড়ি গোলা রংএর আধিক্য চক্ষুপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য রংএর সুষ্ঠু ব্যাবহার যে স্থান-বিশেষে হয় না তা নয়, কিন্তু নাটকের সব আঙ্গিকই যখন স্বাভাবিক ও বাস্তব হয়ে উঠছে তখন অভিনেতাদের রং মাখিয়ে সং সাজাবার প্রয়োজন কি? নাটকের প্রয়োজনে ব্যক্তিবিশেষকে রং মাখাতে হ'লে সেই রংকে কি আরো স্বাভাবিক করে তোলা যায় না? তা'হলে সামঞ্জস্য রাখার জন্য নাটকের সব পাত্র-পাত্রীকে রং মাখাতে হ'বে না, রূপসজ্জা আরো স্বাভাবিক হবে। আমার মনে হয় এই বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা দেবার জন্য রীতিমত শিক্ষালয় চালু করা উচিৎ। আভরণ সম্বন্ধে বলার কিছু নেই, কারণ কয়েকটি শখের থিয়েটারে পরিচালকের অজ্ঞতায় পোষাক-পরিচ্ছদ হাসির খোরাক হওয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা নেই বর্তমানে।

দৃশ্য আর মঞ্চসজ্জা নাটকের গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, নাটকের গতির সঙ্গে আজ সে সমতালে পা ফেলে চলতে পারছে না। পটে আঁকা মন্দির যদি হাওয়ায় দুলতে থাকে তবে তা চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক। তাছাড়া যাবতীয় দৃশ্য একমাত্র পটভূমিকায় ভীড় করে সময় সময় অত্যন্ত হাস্যকর হয়ে ওঠে। পটে আঁকা রাস্তা হয়তো পড়ে থাকে সুদূরবিস্তৃত হয়ে অথচ সেই রাস্তা দিয়ে যাবার কথা যে অভিনেতার তিনি প্রচ্ছন্ন হন উইংসের পাশে। এই সমস্ত অসংগতি মেনে নিতে হয়েছে কারণ না মেনে উপায় নেই। নব্যপন্থীরা বর্তমানে এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বলছেন যে, উইংস, বর্ডার, পট-ভূমিকা সব হঠাও। হঠাতে পারলে তো ভালই হ'তো কারণ অভিনেতা যেখানে ত্রিমাত্রিক সেখানে দ্বি-মাত্রিক আঙ্গিক সামঞ্জস্য আনতে পারে না। এর ওপর, অধ্যাপক সাধন ভট্টাচার্যের কথায়, নাটক যদি রবীন্দ্র-নাটকের ধারা বেয়ে চতু-র্মাত্রিক হ'তে শুরু ক'রে, তবে তো হালে পানি না পেয়ে হালই ছেড়ে দিতে হয়। এই উভয়বিধ সমস্যার কথা চিন্তা করেই কবিগুরু মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জাকে প্রতীকী করে কাল-পর্দার পটভূমিকা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এবং শুধু নির্দেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, বহু অভিনয়ের মাধ্যমে এর সুষ্ঠু ও সংযত ব্যবহারের শিক্ষা দিয়ে গেছেন হাতে-কলমে। কিন্তু নব্যপন্থীদের এতেও আপত্তি। তাঁরা বলেন, একরঙা পর্দার সামনে অভিনয় করলে অভিনয় আর আবৃত্তিতে তফাৎ রইল কি?—কথাটা অতিরঞ্জিত। অভিনয়ের দক্ষতা থাকলে মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জার আঙ্গিক যখন অভিনয়কে স্বাভাবিক করতে সাহায্য করতে পারে তখন তাকে বাদ দেবার চিন্তা করব কেন? তাছাড়া প্রতীকী মঞ্চসজ্জাও সর্বশ্রেণীর নাটকের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এতে দ্বিমাত্রিকতার ত্রুটি তো দূর হয়ই না, মনও যেন ভরে ওঠে না। সুতরাং নাটকের ক্ষেত্রে প্রতীকী দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জার কল্পনায় অভিনবত্ব থাকতে পারে, নতুনত্বের আস্বাদ তাতে পাওয়া যায়, কিন্তু বহুল ব্যবহৃত দ্বিমাত্রিক মঞ্চসজ্জার Substitute হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। নব্যপন্থীরা এর বিকল্প হিসবে কি দিতে চান, দেখা যাক—"থিয়েটার এবং দর্শক পেলেই আমি যবনিকা বাদ দেবো। তারপর বাদ দেবো উইংস, বর্ডার প্রভৃতি। তারপর হটাবো সীন জাতীয় যত জিনিস। মেঝেটাকে নানা আকারের বেদী দিয়ে ভরে দেবো। এলোমেলো এদিক-ওদিক সিঁড়ি সাজাবো। অভিনেতা চলতে গেলেই যাতে সিঁড়ি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।......ঝড় বোঝাতে ব্যবহার করবো ফ্রেগ্-এর আঁকা রেখা-কাটা একটা কালো পর্দা বা ব্রেশট্ বর্ণিত বিদ্যুৎ আঁকা ধূসর পর্দা। জল বোঝাতে নীল পোষাক-পরা জনকুড়ি নর্তকী। আগুন বোঝাতে হয়তো উদয়শংকর বর্ণিত লাল

রিবন নাড়বো। বৃষ্টি বোঝাতে গন্ডা-দশেক ছাতা খুলে ধরব। যুদ্ধক্ষেত্র বোঝাতে পর্দা আর বেদীগুলো নাড়বো ভীমবেগে। যাক্, করব আমি অনেক কিছুই। কিন্তু যা করব থিয়েটারী ঢং-এই করব। চিত্রপটের খোকাসুলভ বাস্তবতা আমদানী করব না।"—

যবনিকা নাটকের টেম্পো নষ্ট করে অনেক ক্ষেত্রে। সুতরাং তার ব্যবহার কমানোর চেষ্টা যুক্তিযুক্ত কিন্তু তাকে পুরোপুরি বাদ দিলে কি ভাল হ'বে? নাটকের মাঝে এমন অনেক দৃশ্য থাকে যার শেষভাগে কোন নাটকীয় সংঘাত তুঙ্গে ওঠে। তারপরই আরম্ভ হয় নতুন দৃশ্যের স্বাভাবিক গতি। এর মাঝখানে যতির প্রয়োজন। দর্শককে নতুন দৃশ্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার সুযোগ দেয় এই যতি। এই যতির কাজ করে যবনিকা। যবনিকা বিসর্জন দিলে এই যতির জন্য যবনিকার বিকল্পে অন্য কিছু ব্যবহার করতে হ'বে। তাতে লাভ কি? তাছাড়া এক অঙ্কের শেষে এবং অন্য অঙ্কের শুরুতে একই অভিনেতার প্রবেশ থাকলে পোষাক-পরিবর্তনের জন্যও বিরাম অপরিহার্য হয়ে ওঠে সময় সময়। সেক্ষেত্রেও যবনিকার প্রয়োজন। অন্যান্য ক্ষেত্রে যবনিকাকে বাদ দেওয়া যায় এবং বর্তমান ঘূর্ণায়মান রংগমঞ্চ অপ্রয়োজনে যবনিকার ব্যবহার সীমিত করে এনেছে। বর্ডার, উইংস্, সীন ইত্যাদি মাত্রা-বৈষম্যের জন্য অভিনয়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না একথা আগেই বলেছি। কিন্তু তাদের কোন বিকল্প ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। নব্যপন্থীরা আরো কি কি করার ইচ্ছা পোষণ করেন জানি না, কিন্তু যতটুকু তাঁরা জানিয়েছেন তাতে হামবড়া ভাব এবং বাগাড়ম্বর ছাড়া ভরসা করার মতো কিছুই তো পেলাম না। সিঁড়ি আর বেদী তাঁরা কি কি শ্রেণীর দৃশ্যে ব্যবহার করবেন জানাননি, তবে কথার ধরন দেখে মনে হয় মঞ্চসজ্জাকে ত্রিমাত্রিক করতে ঐ দুটোই তাঁদের প্রধান অস্ত্র। তা'হলে মঞ্চসজ্জাটা কেমন হ'বে একটু কল্পনা করার চেষ্টা করা যাক।

শয়নঘরে ড্রেসিং টেবিল আর খাটের মাঝখানে অথবা বনের পথে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত সিঁড়ি আর বেদী।—ত্রিমাত্রিক মঞ্চসজ্জার এই যদি নমুনা হয় তা'হলে তাকে নমস্কার জানিয়ে বলব দ্বিমাত্রিক নিয়ে তবু স্বস্তিতে আছি, ত্রিমাত্রিকের সুখে আমাদের প্রয়োজন নেই। আর প্রতীকী যে সমস্ত জিনিস তাঁরা আমদানী করতে চেয়েছেন মঞ্চে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক আগেই হয়ে গেছে। নাটকের পরিবেশ-সৃষ্টির যথার্থ সহায়ক হ'লে মঞ্চে এদের ব্যবহার সীমিত হয়ে থাকত না। আর তাছাড়া প্রতীকী মঞ্চসজ্জাকেই যদি গ্রহণ করবো তা'হলে বেচারা রবীন্দ্রনাথ দোষ করলেন কি? অর্থাৎ এককথায় নব্যপন্থীদের দ্বিমাত্রিক মঞ্চসজ্জা বিসর্জনের প্রস্তাবে সায় দিলেও তাদের বিকল্প সজ্জার পরিকল্পনা গ্রহণীয় নয়। আমার তো মনে হয় এই দ্বিমাত্রিক এবং ত্রিমাত্রিকের বিরোধ অদূর ভবিষ্যতে ঘোচবার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করার সাধু সংকল্প থাকলেও বর্তমানে বর্ডার, উইংসকে সহ্য করে আর আঁকা সীন পেছনে ঝুলিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হ'বে। তবে মঞ্চের সীন আঁকার কাজে যথার্থ শিল্পীরা যাতে হাত লাগান তারই জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে আমাদের। শিল্পীদের কাছে বর্তমানে এ'কাজ হীন, ঠিক যেমন কিছুদিন আগে অভিনয়ও হীন ছিল সামাজিক মানুষের কাছে। সে যুগের পরিবর্তন হয়েছে, বর্তমান যুগেরও পরিবর্তন ঘটবে একদিন, তখন আর এই কাজকে হীন বলে মনে করবেন না যথার্থ শিল্পীরা। আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিৎ সেই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা।

কিন্তু নব্যপন্থীরা অভিনেতার সমালোচনায় সবচেয়ে নির্মম। থিয়েটারে অভিনেতার মুখ্য আসন তাঁরা কেড়ে নিতে চেয়েছেন, তাকে আবেগহীন, যান্ত্রিক করে পরিচালকের দাস করতে চেয়েছেন। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে অভিনেতাদের জন্য তাঁরা General qualification নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুগঠিত দেহ তো তাঁদের অবশ্য প্রয়োজনীয়, উপরন্তু, তাঁরা এ্যাক্রোব্যাট্ জানলে ভাল হয়। তাছাড়া ক্রিকেট থেকে দাবা পর্যন্ত যাবতীয় খেলা তাঁদের জানা প্রয়োজন। এ্যাকাডেমিক না হ'লেও যথেষ্ট পড়াশুনার চর্চা থাকা দরকার তাঁদের সর্ববিষয়ে। রাজনীতিকেও বাদ দিলে চলবে না, মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে বিতর্ক করবার মতো যথেষ্ট জ্ঞান তাঁদের রাখতে হবে। তদুপরি কাব্যের রসাস্বাদনে তাঁরা হবেন পারঙ্গম। সাহিত্যের সর্বঘাটে জল খেতে হবে তাঁদের। চিত্র এবং কলা-রসিকও হ'তে হবে। অর্থাৎ এক কথায় তাঁদের হ'তে হ'বে এক একটি জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। যাঁর কাছ থেকে আমরা শুধু চাই পরিচালকের নির্দেশমতো যান্ত্রিক অভিনয়, সেই আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজ রাখার প্রয়োজন কি বুঝতে পারলাম না। রাখতে পারলে অবশ্য ভাল, কিন্তু অভিনেতা মাত্রেরই এগুলি essential qualification ব'লে নির্দিষ্ট করলে তলোয়ার দিয়ে দাড়ি কাটার ব্যবস্থা করা হয় না কি? আমাদের দেশে এমন চৌত্রিশ লোক কটি আছে হাতে গোণা যায়, যে ক'টি আছে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরো সম্মানজনক কর্মক্ষেত্র। সুতরাং অভিনেতার পক্ষে এগুলি essential qualification ব'লে নির্দিষ্ট করলে রঙ্গালয়ের দরজা আমাদের বন্ধ করে রাখতে হ'বে আরো বেশ কয়েক যুগ।

সবশেষে পরিচালক সম্বন্ধে দু'চার-কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নব্যপন্থীরা অভিনেতাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে পরিচালককে বসাতে চান সেখানে। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, একমাত্র পরিচালকই নাটককে ঐক্যবদ্ধ ক'রে শিল্পরূপ দিতে পারেন।—নাট্যাভিনয়ে পরিচালকের role অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ একথা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু অভিনেতার চেয়ে তাঁকে প্রাধান্য দেবার প্রস্তাব বাড়াবাড়ির পর্যায়ভুক্ত। কারণ, আগেই বলেছি, অভিনয় হচ্ছে শিল্প এবং সেই শিল্পের স্রষ্টা অভিনেতা, শিল্পের উপাদান অভিনেতা, এমন কি সৃষ্টিও অভিনেতা। এই শিল্পকর্মকে সার্থক করে তোলার জন্য পরিপূরক হিসাবে যে সমস্ত আঙ্গিক ব্যবহৃত তাদের সামঞ্জস্য-বিধান এবং সুষ্ঠু প্রয়োগের দায়িত্বমাত্র পরিচালকের। নাট্য-কলার অঙ্গ অভিনেতা; সুতরাং তাঁর ওপর ছড়ি ঘোরাবার অধিকারও আছে পরিচালকের। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রাজাকে শাসন করার অধিকার আছে বলেই রাজগুরুকে সিংহাসনে বসাবার পরিকল্পনা সমর্থনযোগ্য নয়।

এক কথায়, এতক্ষণের আলোচনায় আমরা দেখলাম যে বিদ্রোহের মনোভাব নিয়েই নব্যপন্থীরা আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন,—ভাল-মন্দ বিচারের অপেক্ষা রাখেননি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এই আন্দোলন যে সর্বতোভাবে অসার্থক এমন কথা বলা যায় না—বরং দেখছি আলোকের ক্ষেত্রে তাঁরা অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটি তাঁরা ধরতে পেরেছেন কিন্তু সংশোধনের পথ হয় দেখতে পাননি না হয় ভুল পথ দেখিয়েছেন। তবু, এই আন্দোলনকে অভিনন্দন জানাতে হয় কারণ পুরানোর বিরুদ্ধে নতুনের বিদ্রোহই জন্ম দেয় নতুনতর জীবনের, উন্মুক্ত ক'রে নব নব বৈচিত্র্যের নিত্য-নতুন দুয়ার, ত্বরান্বিত করে উজ্জ্বল নব-প্রভাত।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ তিন ॥

পাশের তক্তপোশে অভয়ের নাক ডাকছে। গুমোট গরমে ছট্‌ফট্ করতে করতে ঘুমটা ফিকে হয়ে এসেছিল প্রভাতের। মশারির বাইরে অশ্রান্ত ক্রুদ্ধ গুঞ্জন। রাত শেষ হয়ে এল অথচ এখনো ভেতরে ঢোকবার পথ পাওয়া যাচ্ছে না দেখে মশারা সমস্বরে প্রতিবাদ তুলেছে। প্রভাত করুণা অনুভব করল। মশারির একটা কোনা একটুখানি তুলে ধরলে মন্দ হয় না—বুভুক্ষু প্রাণীগুলো কিছুক্ষণ অন্তত খেয়ে বাঁচতে পারে।

বাইরের মশার কলরবের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অভয়ের নাকের ডাক যেন ঐকতান সৃষ্টি করছিল। প্রভাত সরকারের মনে আবার একটা তত্ত্বচিন্তা জেগে উঠল। নাক কখনো ডাকে না—ওটা নিতান্ত গুজবমাত্র। আওয়াজটা যদি মুখ থেকেই আসে—তাহলে মিছিমিছি নাকের এই অপযশ কেন? কিংবা এমনও হতে পারে যে, মুখ সব সময়ে মুখর বলে তার সবচাইতে নিকট প্রতিবেশী নাককে একেবারে বঞ্চিত করতে ভালো লাগে না, ইচ্ছে করেই তাকে খানিকটা গৌরব দেওয়া হয়ে থাকে।

নিজের গবেষণাতে প্রভাত বেশ কৌতুক বোধ করল। ঘাড়ের নীচে তেল-চিট্‌চিটে বালিশটা ঘামে ভিজে গেছে, একটা বিশ্রী গন্ধ উঠছিল। কোন এক শ্মশানে কবে দেখা একটা আবছা ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। বিবর্ণ ময়লা একটা বালিশ পড়ে আছে কুশ-বনের ভেতর, শীর্ণ কালো মৃতদেহের মতো পোড়া বাঁশটা রয়েছে তার পাশেই আর ঝোড়ো দক্ষিণা হাওয়ায় ফাটা বালিশটা থেকে রাশি রাশি তুলো উড়ে যাচ্ছে মজা নদীটার শ্যাওলাভরা কালো জলের দিকে। সামনের শিমুল গাছটায় দুটো শকুন শব্দ করে ডানা ঝাপ্‌টালো —মৃত্যু!

মৃত্যু! সেই রাত। বৃষ্টির ধারায় তিন-চার হাতের বেশি নজরে আসে না। অন্ধের মতো এগিয়ে চলেছে গাড়ীটা। তারপর—প্রভাতের চমক লাগল। মশার গুঞ্জরণ, অভয়ের নাকের ডাক—সব ছাপিয়ে ঝম্‌ঝম্ শব্দ উঠেছে বাইরে। বৃষ্টি নামল। প্রভাত চোখদুটোকে সম্পূর্ণ মেলে ধরল। ঘরটা অন্ধকার, তবু নিজের শরীরটাকে স্পষ্ট রেখায় দেখা যায়, শাদা মশারিটা তাকে খানিকটা মেঘের মতো ঘিরে আছে বলে মনে হয়। মৃত্যুর আগে যখন নিজের চেতনা এমনিভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আসবে, যন্ত্রণার শেষ গোধূলির পরে যখন শান্ত রাত্রির অবসান ধীরে ধীরে কালো থেকে আরো কালোর ভেতরে তলিয়ে নেবে তাকে, তখন নিজের দেহের রেখাটা একবার এমনি করেই ভেসে উঠবে তার আবছা চোখের সামনে। তারপরে আর কিছু নেই।

বৃষ্টি পড়ছে। সেই রাতটাকেই বার বার মনের কাছে জাগিয়ে তুলতে চায়। প্রভাত জোর করে অন্য কোনো বৃষ্টি—আরো অনেক বৃষ্টিকে ভাবতে চাইল। মাঠের ওপরে ঘন কালো মেঘে বিদ্যুৎ হেনে বৃষ্টি আসছে—বজ্রের আতঙ্কে জৈমিনি মন্ত্র জপ করছে দীর্ঘ তাল-গাছের সারি। পাড়াগাঁয়ে কোথায় অজস্র বর্ষণে পুকুর ভেসে গেছে—গেরস্ত-বাড়ীর উঠোন দিয়ে ঘোলা জলের সঙ্গে চলেছে মাছের ঝাঁক। কোথায় পথের ধারে মস্ত একটা গাছের নীচে কবে যেন বৃষ্টিতে আশ্রয় নিয়েছিল—দেখছিল খানিক দূরে টোকা মাথায় লাঙল দিচ্ছে চাষীরা—লাঙলের ফলায় মাটি আর কাদাজল বৃষ্টিতে যেন টগবগ করে ফুটছে আর গাছটা তুলসীর ঝারির মতো পাতায় পাতায় জলের বিন্দু উপহার দিচ্ছে ওদের : টপ-টপ-টপ—

—দূর শালা!

অভয়ের বিরক্ত গলার আওয়াজে গাছের পাতার বৃষ্টি মিলিয়ে গেল। প্রভাত মাথা ঘোরালো অভয়ের বিছানার দিকে। ঝাপসা অন্ধকারে দেখা গেল, অভয় নেমে পড়েছে বিছানা থেকে, হড়-হড় করে টানতে শুরু করেছে তক্তপোশ।

—কী হল অভয়?

—কী আর হবে? ছাত চুঁইয়ে জল পড়ছে। ব্যাটা বাড়ীওলা ভাড়া নেবার সময় ঠিক দোসরা তারিখে এসে হাজির, অথচ একটুখানি সারিয়ে দেবার বেলায় কোথাও নেই। বলে, অসুবিধে হলে ছেড়ে দাও। জোচ্চোর!

তৎক্ষণে টপ করে প্রভাতের মশারির চালেও একটা ফোঁটা পড়ল।

—আমার এখানেও পড়ছে।

—পড়বেই। কোথাও বাদ যাবে না। ঘর তো নয়, যেন ঝাঁঝরি।

প্রভাতের মশারির ওপর পর পর তিনটে ফোঁটা পড়ল এবারে। জলের ছিটে লাগল মুখে।

অভয় বললে, তক্তপোশ সরাও প্রভাতদা। এই কোনার দিকে নিয়ে এসো। এদিকে একটু কম পড়ে।

অগত্যা নামতে হল প্রভাতকেও। ঘড়ঘড়িয়ে খানিকটা সরাতে হল বিছানা। মেজেটা ভিজে উঠেছে এর মধ্যেই। টিপয়ের ওপর একটা কাচের প্লাশ ছিল, টুং টুং করে জলতরঙ্গ বাজতে শুরু হয়েছে তার ভেতরে।

অভয় রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দিলে। পশ্চিমমুখো জানলায় দক্ষিণমুখো বৃষ্টির ছাট আসছে না। বাইরে কালির শিশিধোয়া জলের মতো ভোর। থেকে থেকে বৃষ্টি ঝিকিয়ে উঠছে তার ভেতর।

—ওঃ, কী মশা! হুস-হুস! যা—বাইরে যা—দু হাত দিয়ে এক ঝাঁক মশাকে জানলার বাইরে চালান করবার একটা অকারণ চেষ্টা করল অভয়। মশারিটা তুলে ফেলে পা গুটিয়ে বসল বিছানার ওপর। কাচের প্লাশটায় জলতরঙ্গ বাজতে লাগল, ঘরের এখানে-ওখানে জল পড়বার নানা রকম ঐকতান উঠতে লাগল, ভেজা আবর্জনার গন্ধ আসতে লাগল খোলা জানলা দিয়ে।

—বিড়ি আছে প্রভাতদা?

প্রভাত আবার শুয়ে পড়েছিল, অভয়ের ডাকে উঠে পড়তে হল। বালিশের পাশ থেকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিলে অভয়কে।

—ম্যাচিস?

দেশলাইটাও দিতে হল।

অভয় দেশলাই জ্বালল। পনেরো-কুড়ি সেকেণ্ডের জন্যে খানিকটা লালচে আলোয় ভরে উঠল ঘর। চোখে পড়ল, মেজে দিয়ে দু-তিনটে জলের স্রোত গড়িয়ে চলেছে।

শোঁ শোঁ করে বিড়িতে গোটা দুই টান দিলে অভয়। তারপর :

—আচ্ছা প্রভাতদা!

—হুঁ।

—এ-বাড়ী যা হয়েছে, কোনো ভদ্দরলোক থাকতে পারে না। তুমি কোন্ দুঃখে পড়ে আছো এখানে?

প্রভাত হাসল : আমি ভদ্রলোক নই বলে।

—ঠাট্টা নয়। আমারই খুন চেপে যায় মধ্যে মধ্যে। বাবা রাতদিন খিট্‌খিট করছে। অমিয়টা বয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে—এর পরে ছোরা হাতে নিয়ে মানুষ খুন করতে বেরুবে। আর বড়দি—হঠাৎ থেমে গেল অভয়।

ভোরের ফ্যাকাশে আলোয় চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে প্রভাত অভয়ের দিকে তাকালো। বড়দি—অর্থাৎ দীপ্তি।

সন্দেহজনকভাবে যে চাকরি করে—সংসারের এই মুখ-থুবড়ে-পড়া বোঝাই গাড়ীটাকে যে দীপ্তিই কোনোমতে টেনে নিয়ে চলেছে। অভয় কী বলতে যাচ্ছিল প্রভাত জানে না, কিন্তু কাল নিজের চোখেই—

কথাটাকে অভয় ঘুরিয়ে নিলে।

—মাসে মাসে বাবাকে তুমি কত দাও প্রভাতদা?

—পঞ্চাশ, ষাট।

—ভস্মে ঘী ঢালছ। ওই টাকা দিয়ে কোনো একটা মেসে রাজার হালে থাকতে পারতে তুমি।

প্রভাত হাসল।

—এখানেও তো খুব খারাপ আছি বলে মনে হচ্ছে না।

—কী ভালো আছো?—বিড়িতে একটা কড়া টান দিয়ে মুখ বাঁকালো অভয় : এই তো ঘর—কুকুর থাকতে পারে না এর ভেতরে। কোন্ দিন ছাতের টালী ভেঙে পড়ে মাথা গুঁড়িয়ে দেবে ঠিক নেই। ছ্যাঁচড়া আর খেঁশারির ডাল খেতে খেতে পেটে চড়া পড়ে যাচ্ছে। পয়সা দিয়ে কেন এত কষ্ট পাও প্রভাতদা?

—কষ্ট কোথায়? কাল রাতেও তো চমৎকার মাটন খাওয়া গেল।

—হুঁ, মাটন—দিদির আনা মাটন! —অভয় বিড়িটাকে ছুড়ে ফেলে দিলে বাইরে : গলায় আঙুল দিয়ে বমি করতে ইচ্ছে করে আমার। আমরা কুলি-মজুরদের সঙ্গে খেটে মরি, একেবারে ছোটলোক হয়ে গেছি। রুটি আর ডাল খেতেও কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু দিদির পয়সায় রাজভোগ খাওয়াও—

আবার থেমে গেল অভয়। দূরে কোথায় ঠং ঠং করে পাঁচটা বাজল।

—নাঃ, উঠতে হল। একটু আরাম করবারও জো আছে নাকি কপালে!

মশারি তুলে ফেলেছিল, এবার বিছানাটা গুটিয়ে ফেলল অভয়। তারপর বেরিয়ে গেল বাইরে। আটটায় ওর হাজিরা দিতে হয় মেটেবুরুজে। বেরিয়ে যায় পোনে সাতটা সাতটার ভেতরেই।

বাইরে বৃষ্টি থেমে এসেছে, ঘোলাটে সকালের আলো উঁকি দিয়েছে ঘরে। কাচের প্লাশটাকে দেখা যাচ্ছে, কানায় কানায় ভরা। মেজে দিয়ে এখনো স্রোত চলছে, বাইরের বর্ষা থেমে এলেও, তেঁতুল পাতার বৃষ্টি চলছে ঘরে।

এইবার প্রভাত একটা বিড়ি ধরালো। একটা গর্তের ভেতরে যেখানে অনেকখানি জল জমে রয়েছে, কাঠিটা ছুড়ে দিলে তার ভেতর।

অভয় যে একেবারে মিথ্যে কথা বলেছে তা নয়। পঞ্চাশ-ষাট টাকার বিনিময়ে এর চাইতে অনেক বেশি আরামে থাকা যেত। মা আর বেঁচে নেই, এখন সে একেবারেই একা। একটা ধুঁকতে-থাকা লক্ষ্মীছাড়া সংসারের এক কোনায় মুখ বুজে পড়ে থাকার চাইতে স্বাধীন নির্ভাবনায় দিন কাটানো অনেক ভালো হত তার পক্ষে। কিন্তু কলকাতায় আসবার পর সেই যে এই বাড়ীতে এসে জুটল, তারপর থেকে সে রয়ে গেল এইখানেই। নিজের কথা কোনোদিন ভাবে না বলেই এখানকার সুবিধে-অসুবিধেগুলোকেও কোনোদিন খুঁতিয়ে দেখেনি প্রভাত। থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে। আত্মীয়তার একটা আলগা সম্পর্ক—অনেক খুঁজেপেতে সেটাকে বার করে আনতে হয়। এই সংসারে তার বাঁধন নেই বলেই এখানকার ভালোমন্দ বিশেষ কিছু তাকে স্পর্শ করে না। ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারে বলে যাওয়ার কথাটাও মনে আসে না কোনোদিন।

ড্রাইভারের চাকরি। সাড়ে সাতটায় তাকেও বেরুতে হয়। দুপুরের খাওয়াটা প্রায়ই মনিব-বাড়ীতে। কর্তা বড়ো একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চাকুরে, অফিসের টেবিলে তাঁর যা কাজ, তার চাইতেও ঢের বেশি ঘোরাঘুরি। কখনো চিৎপুর ইয়ার্ডে কখনো খিদিরপুরের ডকে, কখনো বা ধুলো, ধোঁয়া আর পাটের ফেঁসোতে বিষাক্ত দম-আটকানো জগদ্দলে। কর্তার কাছ থেকে ছুটি মেলে পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায়, তারপর গিন্নী আর দিদিমণি। মার্কেটে যাওয়া, বেড়ানো, নিমন্ত্রণ রক্ষা, আরো দশটা

খুঁটিনাটি। নারকেলডাঙায় আসতে রাত এগারোটা। কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে না পড়তেই পৃথিবীর সমস্ত আলো-মানুষ-শব্দ একসঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায়।

এই বাড়ীটাকে নিয়ে ভাববে কখন প্রভাত? সময় কই তার? এক অভয় ছাড়া—একঘরেই শোয় বলে—আর কারো সঙ্গে পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি তার দেখাই হয় কিনা সন্দেহ।

এই ভাবেই চলছিল। কিন্তু আজ দিন চারেক হল দীপ্তি তাকে ভাবিয়েছে।

কর্তা সপরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলেন গঙ্গার ধারে। প্রিন্সেপ ঘাট থেকে দক্ষিণে একটু এগিয়ে যেখানে গম্বুজতোলা দোতলা বসবার জায়গাটি রয়েছে, সেইখানে গাড়ীটা রেখে বেড়াতে চলে গিয়েছিলেন ও'রা। আর প্রভাত সরকার চুপ করে বসে দেখছিল গঙ্গার কালো বুকে দুটো বড়ো বড়ো জাহাজ স্তব্ধ হয়ে আছে, মিটমিটে লণ্ঠনের আলো জেলে ছোট নৌকাগুলো আসা-যাওয়া করছে—সার্চ লাইটের আলো ফেলে লঞ্চ আর স্টিমার চলেছে।

চোখে পড়ল সেই সময়।

স্যুটপরা একটি পুরুষ মানুষ—তাকে ভালো করে দেখা গেল না। কিন্তু দীপ্তিকে চিনতে ভুল হল না। পুরুষটির একখানা হাত দীপ্তির কোমরে জড়ানো। দুজনে রেললাইন পার হয়ে চলেছে।

দীপ্তির গলা পরিষ্কার কানে এল: এখন ছেড়ে দাও, বাড়ী ফিরব!

—আরে ধেৎ!

পুরুষটি আর কী বলল শোনা গেল না, কিন্তু দীপ্তিকে প্রায় জোর করে নিয়েই গম্বুজওলা ঘরটার ভেতরে সে অদৃশ্য হল। চোখের দৃষ্টি যথাসাধ্য তীক্ষ্ন করে চেয়ে রইল প্রভাত, কিন্তু দোতলায় দুটো ছায়ার অস্পষ্ট খানিকটা সান্নিধ্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না।

আর প্রভাত সরকারের খারাপ লাগল। যতটুকু দেখা গেল, তাকে ঘিরে ঘিরে না-দেখা অংশটা কুৎসিত কল্পনার জাল তৈরী করে চলল।

অথচ, বলতে গেলে সে এই পরিবারের কেউ নয়। আত্মীয়তার সূত্রটুকু প্রায় গবেষণা করে আবিষ্কার করতে হয়। সোজাসুজি এখানে সে পেয়িং গেস্ট্। দীপ্তির সে অভিভাবক নয়, আর বাইশ বছরের দীপ্তি নিজের ভালোমন্দ নিজেই বুঝতে পারে। তার মাথা ঘামানোর কিছু নেই। যার যা খুশি করুক, যা হওয়ার তাই হোক।

সহজ করেই নিতে চেয়েছিল প্রভাত, কিন্তু কিছুতেই সহজ হওয়া যাচ্ছে না। দীপ্তির টাকা-পয়সা, কখনো কখনো মার্কেট থেকে মাটনের দাক্ষিণ্য—সব কিছুর সঙ্গে প্রিন্সেপ ঘাটের ওই আশাহীন, ভবিষ্যৎহীন কতকগুলো মানুষ সেই পাঁকের ভেতর বুদ্বুদ তুলছে। দীপ্তির মতো অসংখ্য মেয়ে আজ—

কী করতে পারে প্রভাত? কিছুই করতে পারে না। সেই দুর্ঘটনার রাতটার স্মৃতি বয়ে সেও তো একটা প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। তারও কোনো আশা নেই, স্বপ্ন নেই, ভবিষ্যৎ নেই। বুকের

এখন ছেড়ে দাও, বাড়ী ফিরব!

ছবিটা জড়িয়ে যাচ্ছে। আর শুধু সে একাই নয়। একটু আগেই অভয় কী যেন বলতে গিয়েও থমকে গেছে। কিন্তু যেটুকু বলেছে—তারপর আর বলবার দরকার ছিল না।

প্রভাত জানে—প্রভাত দেখেছে। যুদ্ধ আর পার্টিশনের পর এই বীভৎস কলকাতা। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, আলাদা করে তৈরী হয়েছে দুই দেশের ভূগোল। সেই সব দুঃস্বপ্নের দিনগুলো এখন বিবর্ণ স্মৃতি হয়ে আসছে। কিন্তু এই কলকাতায় নয়। যেন যুদ্ধ আর দাঙ্গার রক্ত-ধোয়া যত পাঁক এসে জমেছে এই শহরের কুণ্ডের ভেতর, যত পচা শব যেন স্তূপ করে ফেলে দেওয়া হয়েছে এখানে। পাঁজরায় ফিক ব্যথা ওঠবার মতো রাণীর কথা কখনো কখনো মনে পড়ে—তারপরেই কলকাতার ট্রাফিক সিগন্যালের মধ্যে মুহূর্তে মুছে যায় সেটা। নিজের ভার বয়েই সে ক্লান্ত, অন্যের কথা ভাববার মতো সময় তার নেই।

তা হলে দীপ্তির কথা সে কেন ভাবছে? কেন জোর করে সরিয়ে দিতে পারছে না মন থেকে? কেন একটা অস্বস্তির কাঁটা হয়ে বিঁধছে বার বার?

—প্রভাতদা, চা।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢুকল তৃপ্তি। ছোটখাটো এই মিষ্টি মেয়েটিকে দেখলে মন খুশি হয়ে ওঠে। সংসারের

অর্ধেক দায়িত্ব এই মেয়েটির কাঁধের ওপর—ভোর থেকে একটানা খেটেই চলেছে। নিরাসক্ত প্রভাতেরও কখনো কখনো মনে হয়েছে, এই বাড়ীতে মেয়েটি যেন প্রক্ষিপ্ত—এখানে ওকে কোনোমতেই মানায় না। একটা সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে জায়গা পেলে তৃপ্তি ফুলে ফলে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারত।

—ইস, একেবারে ভেসে গেছে ঘরটা! —চায়ের পেয়ালা রাখবার জন্যে টিপয়টা টেনে আনতে গিয়ে স্বগতোক্তি করল তৃপ্তি। তারপর প্লাশের ময়লা জলটা ঢেলে দিলে মেজের ওপর : বাড়ীওলাকে বাবা এত করে বলেন, তবু সারিয়ে দেয় না? চা-টা সামনে রেখে বললে, তোমার এখানে খুব কষ্ট হয়, না প্রভাতদা?

ঠিক এই কথাই অভয় বলছিল। কিন্তু তৃপ্তির সুরটা সম্পূর্ণ আলাদা। প্রভাতের মনে হল, তৃপ্তির মুখ থেকে এই কথাটুকু শোনবার জন্যে এর চাইতে অনেক বেশি কষ্ট করা যেতে পারে।

প্রভাত হাসল : সব ঘরেই তো জল পড়ে।

—তা পড়ে। মার-র বাক্স-টাঙ্ক সব ভিজে গেছে কালকে। আমরা তো বসেই কাটিয়েছি শেষ রাতটুকু। এই সবে শুরু। এর পরে বর্ষা এলে কী যে হবে!

—একটুখানি সারিয়ে নিতে হবে নিজেদেরই, কী আর করা।

—বাবা বলছিলেন প্রায় একশো টাকা লাগবে।

—দেখা যাক!

তৃপ্তি বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনি মনে পড়ল প্রভাতের। আর সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাতেই প্রশ্নটা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে: শোনো, দীপ্তি কাল কখন ফিরেছিল?

তৃপ্তি থমকে দাঁড়ালো। প্রভাতের এই আচমকা কৌতূহলে যেমন আশ্চর্য হল, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে চোখে-মুখে ঘনিয়ে এল ভয়ের ছায়া। ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল একবার।

তৃপ্তি কাছে এগিয়ে এল। শুকনো ফিসফিসে গলায় বলল, তুমি জানো তা হলে? আমি তো ভেবেছিলুম, আমি একাই বুঝি জেগেছিলুম বাড়ীতে।

—না, আমিও ঘুমুচ্ছিলুম। এমনিই কথাটা জিজ্ঞেস করছিলুম তোমাকে।

—ওঃ, এমনিই।—একবারের জন্যে তৃপ্তির মুখ থেকে ভয়ের ছায়াটা সরে গিয়েই দ্বিগুণ বেগে ঘনিয়ে এল আবার।

জলে-ভেজা মেজেটার দিকে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—কী একটা যেন বলতে গিয়েও বলতে পারছে না।

প্রভাত চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে একটা নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে রইল।

তারপর তৃপ্তি মুখ তুলল। আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেছে।—

—কাউকে বলবে না প্রভাতদা? বাবা-মা-দাদা কাউকে নয়?

—না।

ফিস ফিস করে তৃপ্তি বললে, দিদি ফিরেছে প্রায় দুটোয়। একটা ট্যাক্সি থেকে টলতে টলতে নামল। জানো প্রভাতদা, দিদি মদ খেয়ে এসেছিল। কী বিশ্রী গন্ধ সমস্ত মুখে!

প্রভাতের পেয়ালা থেকে খানিকটা চা ছলকে পড়ল। অসম্ভব নয়—তার সমস্ত মন এমনি কিছু একটা শোনবার জন্যেই যেন তৈরী হচ্ছিল। তবু সহ্য করা গেল না। বুকের মধ্যে যেটা কাঁটা হয়ে বিঁধছিল, সেটা ছুরির ফলা হয়ে আঘাত করল।

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল তৃপ্তি।

—কী হবে প্রভাতদা? দিদির যে সর্বনাশ হয়ে গেল। কী হবে আমাদের?

কী হবে দীপ্তির? প্রভাত সরকার তার উত্তর জানে না। বাঁচবার পথ খুঁজতে গিয়ে দীপ্তির মতো অনেক মেয়েই আজ সোজা পা বাড়িয়েছে পাতালের পিছল সিঁড়িতে। কী হবে প্রভাত তা জানে না। কেউই কি জানে?

—তৃপ্তি—তৃপ্তি—

গৌরাঙ্গবাবু ডাকছেন। চোখের জল সেলাইকরা শাড়ীর আঁচলে মুছে নিয়ে তৃপ্তি প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। প্রভাত হাতের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। চা খাওয়ার প্রবৃত্তি আর নেই, এই মুহূর্তে জীবনের সব স্বাদ তার মুখে সম্পূর্ণ বিস্বাদ হয়ে গেল।

দীপ্তি এই সংসারটাকে চালায়। কিন্তু কী অন্ন—কিসের অন্ন সে তুলে দিচ্ছে সংসারের মুখে? আর সেই অন্নের বিনিময়ে কী ভয়ংকর দাম তাকে দিতে হচ্ছে দিনের পর দিন!

অভয়ই ঠিক বলেছিল। এই বাড়ী থেকে তার ছুটে পালিয়ে যাওয়া উচিত। এখুনি—এই মুহূর্তেই। কিন্তু এখান থেকেই বা সে পালাবে কোথায়? কোন্ কলকাতায়? যুদ্ধ-দাঙ্গা-পার্টিশনের যত রক্ত, যত ক্লেদ, যত পাপ সব এসে জমেছে এই কলকাতার পঙ্ক কুণ্ডে। কোথায় যাবে সে— কোথায় তার নিস্তার মিলবে? এই কলকাতার অক্ষম, নিরুপায় মনুষ্যত্বের প্রতীক গৌরাঙ্গবাবু—বাতের যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গ যার পঙ্গু। সব দেখতে পাচ্ছি—সব বুঝতে পারছি, ক্লীব যন্ত্রণায় তিলে তিলে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছি—অথচ প্রতীকার নেই। আকণ্ঠ রক্তপঙ্কের মধ্যে ডুবিয়ে অপেক্ষা করে আছি অনিবার্য একটা ভয়ংকর পরিণামের জন্যে।

আর তখন প্রভাত সরকারের মনে হল, এখান থেকে পালিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই তার। তৃপ্তির সঙ্গে কোথায় যেন রাণীর মুখের আদল আছে একটা। ঝড়ের কালো মেঘ হয়ে কী যেন ঘনিয়ে আসছে সামনেই, আর চরম একটা দুর্যোগের রাতে বাড়ীটাকে ভাঙ্গা মোটরের মতো চালিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষ দুর্ঘটনাটা না ঘটানো পর্যন্ত কিছুতেই তার ছুটি মিলবে না!

(ক্রমশঃ)

॥ বৈশাখী সাহিত্য সম্মেলন ॥

সাহিত্যের সঙ্গে আড্ডা বা মজলিসের যোগ চিরকালের। নানারকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈঠকের ভিতর থেকেই শ্রেষ্ঠ শিল্পী-কলাকুশলীর উদ্ভব ঘটেছে এককালে। একালে কর্মব্যস্ততার মাঝখানে ওধরনের বৈঠকী আবহাওয়া সৃষ্টির সুযোগ কম। কিন্তু প্রতি বছরে অনুষ্ঠিত বৈশাখী সাহিত্য সম্মেলনের আসরে গিয়ে পুরনো দিনের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে আমাদের পূর্বসূরীদের আর তাঁদের ঐতিহ্যপূর্ণ সেই সমস্ত আসরকে।

এবারের সম্মেলনে সাহিত্যালোচনা ও আলাপ-পরিচয়ের জন্যে আহ্বান এসেছিল শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারের যুগ্ম-স্বাক্ষরে। এই আসরেই উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টির স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদির ১৯৬১ সালের সাহিত্য পুরস্কার বিতরণ করা হয় সাতজন সাহিত্য-সেবীর মধ্যে।

সভাপতির ভাষণে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সাহিত্য-পুরস্কারগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সেকালের রাজাও নেই—রাজ-কবিও নেই ঠিকই। কিন্তু রাষ্ট্র এখন রাজার স্থান নিয়ে যোগ্য শিল্পীদের পুরস্কৃত করছেন। এ ব্যাপারে নানাপ্রকার মত প্রকাশের অবকাশ থাকলেও এই পুরস্কারগুলির উদ্দেশ্য খুবই মহৎ বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, সংবাদপত্রে জনগণের অভিমতই প্রতিধ্বনিত হয়। সংবাদপত্র জনগণের প্রতিনিধি। সুতরাং এই পুরস্কারগুলিকে জনসাধারণের পুরস্কার বলে মনে করা যেতে পারে। সাহিত্যিকদের সমাবেশ বা মজলিসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন যে, এই ধরনের

নরেন্দ্র মিত্র বিমল মিত্র

পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ মেলামেশা সত্যিই প্রয়োজনীয় এবং অনুকরণীয়।

আমাদের মধ্যে যাঁরা বয়স্ক তাঁদের মধ্যে অনেকেই একদিন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায় ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছিলেন। সেই 'মজলিসী' আড্ডার কোন বিরাম ছিল না। সে সময়ে রাজপক্ষ থেকে যেমন তেমনি অন্য কোন পক্ষ থেকে কোন পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা ছিল না। এই বৈঠকী-আড্ডাই আমাদের সামাজিক

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল নিঃসন্দেহে। আজ সে আড্ডা, সে মজলিস স্মৃতি। 'সাহিত্যের হাটে' ও ধরনের আড্ডার প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই—এই ধরনের আসরের মধ্য দিয়ে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি সেই অতীতের আড্ডাধারী মেজাজকে।

হরপ্রসাদ মিত্র কুমুদরঞ্জন মল্লিক

এ কথাগুলি অত্যন্ত দরদ ও জোর দিয়ে বলেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সরকারী পুরস্কারসমূহ বিতরণের মধ্যে রাজনৈতিক মতকে কোন কোন সময়ে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

এই আসরে পূর্ব ঘোষিত অমৃতবাজার, যুগান্তর, আনন্দবাজার, দেশ, মৌচাক, উল্টোরথ প্রভৃতি পত্রিকাগুলির পক্ষ থেকে একটি বিশেষ পুরস্কার বিতরণ করা হয়। 'শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এবং 'মতিলাল স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছেন ঔপন্যাসিক শ্রীবিমল মিত্র। 'প্রফুল্ল স্মৃতি পুরস্কার' এবং 'সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন যথাক্রমে শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ও শ্রীনরেন্দ্র মিত্র। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত 'সরলা স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। 'মৌচাক' পত্রিকা প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেছেন শিশু-সাহিত্যিক শ্রীসুখলতা রাও। 'উল্টোরথ' পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র।

সভায় সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীসুমিত্রা সেন। বহু সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-অধ্যাপক আসরে উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

॥ রবীন্দ্র পুরস্কার ॥

সাহিত্য জগতে ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় 'বনফুল' নামে পরিচিত। বহুদিন ধরে এই নিষ্ঠাবান কথাশিল্পী বাংলা সাহিত্যের সেবা করে আসছেন। এই প্রবীণ সাহিত্যিক রচিত 'হাটেবাজারে' গ্রন্থখানি মৌলিক সাহিত্যকর্মের জন্য ১৩৬৮ সালের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেছে। শ্রদ্ধেয় এই সাহিত্যিকের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করার জন্য আমরা তাঁকে অকৃত্রিম অভিনন্দন জানাই ও তাঁর দীর্ঘ সৃষ্টিশীল জীবন কামনা করি।

তাছাড়া শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ পঞ্চোপাসনা রচনার জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন।

পুলিনবিহারী সেন বিমানবিহারী মজুমদার

বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার দান করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এঁরা প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে পুরস্কার বাবদ পাবেন।

ভবঘুরের খাতা

অয়স্কান্ত

॥ কেকা ও কুহু ॥

কেকার সঙ্গে কুহুর চিরকালের বিবাদ। কেকা মুখর হলে কুহুকে নীরব হতে হয়। একটি পরিচিত গানের লাইনেও এই কথাটি বলা হয়েছে। এই গানে পাওয়া যায় একদিকে কেকার জন্যে আনন্দ, অন্যদিকে কুহুর জন্যে আক্ষেপ। কিন্তু কবি যদি কোনোদিন ঘরমুখো ডেলি-প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে বহির্গামী কোনো একটি ট্রেনে চেপে বসতেন তাহলে তাঁর এই আক্ষেপের কোনো কারণ থাকত না।

না, সারাদিনের আপিসের পরে ক্লান্তক্লান্ত মানুষগুলো কলকাতার অনিশ্চিত পরিবহণ-ব্যবস্থার ওপরে নির্ভর করা সত্ত্বেও আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে ট্রেন ছাড়বার এক-মিনিট কি দু-মিনিট আগে স্টেশনে পৌঁছে যখন কোনো রকমে কোনো একটি কামরার একটুখানি জায়গা করে নিয়ে বসতে বা দাঁড়াতে পারে তখন কুহু বা কেকার চিন্তা তাদের মনে ঠাঁই পায় না। বিশেষ কোনো চিন্তাই নয়। তাদের ফাঁকা মনের ওপরে বাইরের পৃথিবীটা কচুপাতার ওপরে বৃষ্টির জলের ফোঁটার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। মনে হয় জীবনের সমস্ত চাওয়াও এক পিচ্ছিল সিলভারের ওপর থেকে খসে খসে পড়ছে। আর ঠিক এমনি সময়ে শোনা যায় সেই কুহু আর কেকা। প্রায় একই সময়ে। একটির সুরে মিলিয়ে যেতে না যেতেই আরেকটি। ভিড়ে-ঠাসা কামরার বাতাসে দুই প্রান্তের দুই ঋতুর ছোঁয়া আনন্দের কাঁপন জাগিয়ে তোলে।

আর তারপরে একটু কান পাতলেই শোনা যায়, শুধু কুহু আর কেকা নয়, জীবজগতের সমস্ত পরিচিত ডাক যেন ঐকতানের মতো বেজে উঠছে। কারও অনাদর নেই। যে-সব জীব সর্ব ঋতুতেই মুখর তারাও অনুপস্থিত নয়।

তখন ঘরমুখো ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা নড়েচড়ে বসে, মুখ ফিরিয়ে তাকায়, আর নিস্তেজ মন থেকে ভাবনাগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলে নেয়। কী যে সেই ভাবনা তা তারা নিজেরাও ভালো করে জানে না। হয়তো বৌ-ছেলে-মেয়ের ভাবনা। হয়তো ফাইল-লেজার-বড়োবাবু-বড়োসাহেবের ভাবনা। হয়তো সভাসমিতি - ইউনিয়ন - আন্দোলনের ভাবনা। হয়তো বাজারের মাছ, ঘরের কোণের ছোট্ট বাগানের মরশুমী ফুল আর তারে শুকোতে দেওয়া ফ্যাকাশে একটি শাড়ির ভাবনা। কিংবা হয়তো কিছুই নয়। কোনো ভাবনাকেই ঠিক যেন মুঠোর মধ্যে ধরতে পারা যায় না।

আর তখন শোনা যায় দশ বছরের একটি কিশোরের স্বরযন্ত্রকে আশ্রয় করে আশ্চর্য সেই ডাক : কু-উ-উ-উ! কু-উ-উ-উ!

নানা সুরে আর নানা ভঙ্গিতে এই একই ডাক কামরার বাতাসে অনেকগুলো ঢেউ জাগিয়ে তোলে যেন। আপিস-ফেরত ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা এই ঢেউয়ের ধাক্কায় চমকে ওঠে দু-হাত দিয়ে ঠেলে ভাবনাগুলোকে সামনে থেকে সরিয়ে দেয় আর তন্ময় হয়ে শোনে।

আগেই বলেছি, বসন্তের ঘোষণা দশ বছরের একটি কিশোরের স্বরযন্ত্রকে আশ্রয় করেছিল। বাইরে থেকে তাকিয়ে দেখলে অসাধারণ কিছু নয়। কিন্তু হয়তো এইটুকুই অসাধারণ যে রাস্তাঘাটে দেখতে পাওয়া আর দশটা কিশোরের মতো রোগা ও ফ্যাকাশে নয়। উজ্জ্বল স্বাস্থ্য আর কালো রঙে পাথরে কুঁদে তোলা মূর্তির মতো। ছিটের হাফপ্যান্ট ও হাফশার্ট এখনো জীর্ণ হয়নি আর অপরিষ্কার কিনা বোঝা যায় না। কাজেই সব মিলিয়ে এই কিশোর-মূর্তিটি মনের ভেতর থেকে কি করে যেন ভালো-লাগাটাকেই সবচেয়ে আগে জাগিয়ে তোলে।

ট্রেন চলতে শুরু করার পরে দশ বছরের এই ছেলেটি অনায়াস পটুত্বে চলন্ত ট্রেনের কামরায় লাফিয়ে উঠে পড়ে। ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা এ-দৃশ্য দেখে দেখে অভ্যস্ত। কেউ আঁতকে ওঠে না বা আশঙ্কিত উদ্বেগে ধমক দেবারও চেষ্টা করে না। সকলেরই দেখা ও জানা ঘটনা।

প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, সুবিধেমতো একটি জায়গা বেছে নেয়, একবার কি দুবার ছোট্ট করে কাশে। এই হচ্ছে প্রস্তুতি-পর্ব।

তবে সব সময়েই এত অনায়াসে নয়। কেনো কোনো দিন কামরার ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতেই হয়তো কেউ একজন খেঁকিয়ে ওঠে, এখানে কেন, আরেকটু এগিয়ে যাও না বাবা!

দশ বছরের কিশোর তার চেয়ে তিন-চারগুণ বয়সে বড়ো গুরুজনতুল্য মানুষটিকে অনায়াসে ক্ষমা করতে পারে। একটু হাসে, হয়তো একটু এগিয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত প্রায় সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।

প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দরজা বড়ো একটা বন্ধ হয় না। আর ঠিক দরজার সামনেটিতে হাতল ধরে বা না-ধরে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ বাইরের দিকে হেলিয়ে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকার মতো যাত্রীরও অভাব হয় না কখনো। এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তারা বিড়ি বা সিগারেট টানে, আর এমন উদাস দৃষ্টিতে বাইরের মাঠ, গাছপালা, ডোবাপুকুর আর ঘরবাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে যে দেখে মনে হতে পারে দুনিয়ার সমস্ত দার্শনিক চিন্তা তাদের মাথায় ভর করেছে। আসলে তারা কিছুই ভাবছে না। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা নিতান্তই একটা অভ্যেস। ভেতরে বসবার

জায়গা থাকলেও, এরা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু এই লোকগুলোকেও ফিরে তাকাতে হয়। সিগারেটে একটা টান দিয়ে একজন মন্তব্য করে, বাঃ, বেশ শিখেছে তো ছোকরা!

ছোকরা মানে আমাদের সেই দশ বছরের কিশোরটি। ততোক্ষণে সে মুখের মধ্যে আঙুল পুরে মাথা একপাশে হেলিয়ে চোখ বুজে গলার স্বরযন্ত্রকে কাঁপিয়ে তুলেছে। কোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছে: কুহু, কুহু, কু-উ-উ-উ!

বেশ শিখেছে তো ছোকরা।

একটু আগে যে ধমক দিয়ে উঠেছিল সেও ফিরে তাকিয়েছে। চোখের দৃষ্টি দিয়ে সেও যেন একই কথা বলতে চাইছে।

প্ল্যাটফর্মের উলটোদিকের দরজার কাছে একটি নির্ঝঞ্ঝাট কোণে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে যে ভদ্রলোকটি এতক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন তিনিও একবার মুখ তুলে তাকান। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিল ও দুরূহ আবর্ত সামান্য একটা কোকিলের ডাকেই মুহূর্তের জন্যে খবরের কাগজের পৃষ্ঠার ওপরে অর্থহীন কালো আঁচড়ে পর্যবসিত হয়ে যায়। চোখ থেকে চশমাটা খুলে তিনি আরো একবার তাকিয়ে দেখেন। এতক্ষণে হয়তো বুঝতে পারেন যে চশমার কাচদুটো ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। তখন পকেট থেকে রুমাল বার করে কাচদুটো মুছতে শুরু করেন।

কামরার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দু-জোড়া মানুষ মুখোমুখি বসে কোলের ওপরে খবরের কাগজ বিছিয়ে তাস নিয়ে মেতে উঠেছিল। তাদের মধ্যে থেকে হঠাৎ একজন মন্তব্য করে ওঠে, বা ভাই! মন্তব্যটি ভালো তাস পাওয়ার জন্যে কিনা তা অবশ্য ঠিক বোঝা যায় না।

আর চারদিকে ছড়ানো ছিটানো এমন আরো অজস্র মানুষ ছিল এরা এইটুকু সময়ের মধ্যেই আশেপাশের সকল যাত্রীর সেইদিনকার দাওয়া সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া শেষ করেছে, জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা সম্পর্কে পরম বিজ্ঞজনোচিত মন্তব্য ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করার গুরুদায়িত্ব পালন করতে পেরেছে এবং পকেট থেকে ছোট্ট একটা খাতা বের করে তারই ফাঁকে ফাঁকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের হিসেব মেলাবার অসম্ভব প্রচেষ্টায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে পেরেছে। এরা সাধারণত নিজস্ব ধারণা ও মতামত দিয়ে গড়া এমন একটি জগতে বাস করে যা বাইরের শব্দে ও আলোড়নে বিচলিত হয় না। সত্যিকারের কোকিলের ডাক হয়তো এদের কানে নিতান্তই একটা মামুলি কোলাহল হয়ে বাজত। কিন্তু হুটেন্ত ট্রেনের কামরার এই কৃত্রিম কোকিলের ডাক এদের অভ্যস্ত জগতটাকে একটু যেন নাড়া দিয়ে গেল।

ফলে, দশ বা পনেরো বা কুড়ি বছরের ডেলি-প্যাসেঞ্জারকেও হিসেবের খাতা থেকে মুখ তুলে সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করতে হয়, কোন্ স্টেশন গেল এটা?

ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের ট্রেনের কামরা এক আশ্চর্য জগত। কান পাতলে এখানে দুনিয়ার তাবৎ বিষয়ের আলোচনা শোনা যাবে। চোখ মেললে দেখা যাবে অতি অদ্ভুত এক মানুষের মেলা। আর যদি কান ও চোখ বন্ধ করে শুধু হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করার চেষ্টা করা যায় তাহলে অনুভব করা যাবে মানবিক বিকাশের অনিবার্য ধারায় রূপায়িত এক মহত্তম জীবনবৃত্ত। দশ বছরের একটি কিশোর কোকিলের ডাক ডাকতে ডাকতে অনায়াসেই নিজেকে এই আশ্চর্য জগতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছে। কেকার সমারোহের মধ্যে থেকে যে-কবি কুহুর জন্যে আক্ষেপ করতে পেরেছিলেন তিনি এই কিশোরটিকে দেখলে নিশ্চয়ই নতুন একটি গান রচনা করে যেতেন।

সেই গানটি আমরা পাইনি। আর কিছুদিন পরে এই কিশোরটিকেও হয়তো আমাদের হারাতে হবে। তাই সময় থাকতে আরো খুঁটিয়ে ওর দিকে একবার তাকানো যাক।

—নাম কি?

—বিশু।

—পুরো নাম কি?

—শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ।

—বাবা আছে?

—হ্যাঁ

—বাবা কী করেন?

—কেত্তন গান।

—কী?

—কেত্তনের দল আছে না। সেই দলের গাইয়ে।

—মা আছে?

—হ্যাঁ

—আর কে আছে?

—দুটি ছোট ভাই আর একটি ছোট বোন।

এমনি প্রশ্ন আর জবাবের মধ্যে দিয়ে পুরো ছবিটি বেরিয়ে আসে। সমর্থ বাপ আর কিছু করার না পেয়ে কীর্তন গেয়ে বেড়াচ্ছেন। আর দশ বছরের কিশোর জ্যেষ্ঠ সন্তানের দায়িত্ববোধে পুরো সংসারের বোঝাটি তুলে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বাপের কাছ থেকে ছেলে সত্যিকারের কীর্তনগান শিখতে পেরেছে কিনা তা জানার উপায় আপাতত নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় অন্য এক ধরনের কীর্তন গাইতে শিখেছে বইকি।

লেখাপড়া? না, সে পাট এখনো চুকে যায়নি। ক্লাশ ফোরে পড়ে। এখনো পর্যন্ত দুপুরবেলাটা কাটায় স্কুলের চৌহদ্দিতে সমবয়সী পড়ুয়াদের সঙ্গে। কিন্তু বিকেলবেলার খেলার মাঠ অনেকদিন আগেই স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গিয়েছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত—আর এই ঘণ্টা-চারেক সময় একটা যন্ত্রের মতো আবর্ত তোলে।

কবে কি-ভাবে এই আবর্তের শুরু তা এখন আর স্পষ্ট মনে করতে পারে না। হয়তো নেহাতই একটা ঘটনার যোগাযোগ, হয়তো কোনো হৃদয়বান ব্যক্তির অযাচিত দাক্ষিণ্য, হয়তো কোনো একটি প্রয়োজনের দুর্নিবার দৃষ্টান্ত—বাকিটা সম্পূর্ণ করেছে নিদারুণ দারিদ্র্যজনিত অবস্থার চাপ। হয়তো বা অক্ষম বাপের শাসানি, হয়তো বা মায়ের চোখের জল, হয়তো বা নির্বোধ ও নিরবলম্ব একটি উচ্চাশা।

শুরু হয়েছিল কোকিলের ডাক দিয়ে। তারপরে আস্তে আস্তে দৈনন্দিন জীবনের শব্দময় পরিবেশটি দশ বছরের একটি কিশোরের স্বরযন্ত্রে অবিকৃত স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে। এখন আর শুধু কোকিলের ডাক নয়, কুকুর-বেড়াল, হাতি-ঘোড়া, শালিক-চড়ুই, পরিচিত জীবজগতের প্রত্যেকটি শব্দকে পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে।

হ্যাঁ, কিছু মূল্যও পাচ্ছে বইকি। ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের জগত এখনো এতটা নির্মম হয়নি যে এই আশ্চর্য অনুশীলনের দৃষ্টান্ত দেখেও কিছুমাত্র বিচলিত হবে না। জিজ্ঞেস করলে পরম পরিতৃপ্তির জবাব শোনা যাবে যে চারঘণ্টার অবিশ্রান্ত স্বরবিক্ষেপের পুরস্কার হিসেবে দু-টাকা থেকে তিন টাকা পর্যন্ত কাঞ্চনমূল্য পাওয়া যাচ্ছে। একটি পরিবারের বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে নিতান্তই সামান্য নয়।

জিজ্ঞেস করলে হয়তো আরো অনেক কিছু জানা যাবে। কিন্তু এই কিশোরটির কাছে বিকেল ও সন্ধের প্রত্যেকটি মুহূর্ত এতই মূল্যবান যে কিছু ব্যক্তিগত খবর সংগ্রহ করার জন্য ওকে আটকানো চলে না। তবে কিছু জিজ্ঞেস না করেও শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যক্তিগত খবরটির রেখাপাত লক্ষ্য করা যেতে পারে। পাথর কুঁদে গড়ে তোলা কিশোর-মূর্তিটির ওপরে ইতিমধ্যেই ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। এই ক্লান্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষয়ের রূপ নেবে। ভবিষ্যতের ইতিহাস হয়তো একটি রোগজীর্ণ ম্লান শরীরের সাক্ষ্য বহন করবে মাত্র।

আর তারপরেও যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে একজন ডেলি-প্যাসেঞ্জারের অন্ধকার চোখে কুহু ও কেকার নিষ্ফল একটি স্বপ্ন। সেদিনও ঠিক এমনিভাবেই বাইরের জগতটা পিছিয়ে একটি বিস্তারের ওপর দিয়ে কচুপাতার ওপরে বৃষ্টির জলের ফোঁটার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়বে।

একজন সাধারণ মিউজিয়াম প্রেমিকের চোখে যুক্তরাষ্ট্রের আর্ট মিউজিয়াম কেমন লাগল দু-চার কথা লিখব বলে বসেছিলাম। এমন সময় আমার এক কলা-সমঝদার বন্ধু এসে সব গোলমাল করে দিলেন। তাঁর মতে বর্তমান কলা-জগতের হালচাল সম্পর্কে আমি নাকি মোটেই ওয়াকিবহাল নই। আর্ট মিউজিয়ামের সমগ্র আইডিয়াটাই বুঝি এখন ব্যাকডেটেড্ বলে গণ্য হচ্ছে। নির্দিষ্ট স্থান, কাল, পরিবেশ থেকে চ্যুত করে শিল্পসামগ্রী মিউজিয়ামে এনে সাজিয়ে রাখার সার্থকতা কোথায়? এতে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য অনেকটাই ব্যাহত হয় না কি? প্রশ্নটা উঠেছে আঁদ্রে মালরোর কোন এক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে।

শুনে ভাবনায় পড়তে হল। সত্যিই তো, যে ম্যাডোনার মূর্তি হয়ত কোন গির্জার একটি নির্দিষ্ট জায়গা অলংকরণের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল যেখান থেকে সরিয়ে তাকে হঠাৎ মিউজিয়ামের পরিবেশে দেখলে খাপছাড়া মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। শিল্পী তো মিউজিয়ামের এই বিশেষ ঘরটির কথা ভেবে শিল্প-রচনা করেননি।

পোর্ট্রেট বা প্রতিকৃতির কথাই ধরা যাক। পোর্ট্রেট-আঁকিয়ের দক্ষতার মান প্রধানতঃ বিচার করা হয় একজনের চেহারার সাদৃশ্য ও ব্যক্তিত্ব কতখানি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তাই দিয়ে। আর বেশীর ভাগ ব্যক্তিগত পোর্ট্রেট আঁকা হয় ব্যক্তি বিশেষের আপনজনেদের জন্য। কিন্তু মিউজিয়ামের দেওয়ালে সার বেঁধে টাঙিয়ে রাখা সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি দেখে দেখে আমরা যখন তার ভাল-মন্দ নিরিখ করতে বসি তখন শিল্পীর প্রতি অবিচার হবার আশংকা অমূলক নয়।

কিন্তু তাই বলে আর্ট মিউজিয়ামের কার্যকারিতার দিকটাই কি উপেক্ষা করা যাবে? মিউজিয়ামে বিভিন্ন দেশকাল থেকে আহরণ করে আনা কলাসামগ্রী একসঙ্গে দেখার সুযোগ হয়। পরস্পরের তুলনা করা চলে। শিল্পকলার ইতিহাস, বিভিন্ন আঙ্গিকের আবির্ভাব ও ক্রম-বিকাশ এক জায়গায় ব'স গবেষণা করারও সুবিধে হয়। আধুনিক কলা-সমঝদারদের মনে যত সংশয়ই দেখা দিক না কেন চারুকলার ইতিহাসে আর্ট মিউজিয়ামের স্থান নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

যুক্তরাষ্ট্রের আর্ট মিউজিয়ামগুলোর অপর ঐশ্বর্য দেখে দেখে মুগ্ধ হতে হয়। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান আর্ট মিউজিয়াম, বস্টনের মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস, ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল গ্যালারি অফ আর্টস—এক-একটা যেন কুবেরের ভাণ্ডার বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে দেখে তৃপ্তি হয় না, তৃষ্ণা আরো বেড়ে যায়।

আর্ট সংগ্রহের সমৃদ্ধি, রক্ষণা-বেক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছাড়াও অন্য আর একটি জিনিস বিশেষভাবে চোখে পড়ত। তা হল মিউজিয়ামগুলো জনপ্রিয় করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা। শুধু এক-বাড়ী ছবি নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। চাই জনসাধারণকে মিউজিয়াম-সচেতন করে তোলা, চাই সাধারণ দর্শকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা-অসুবিধার দিকে প্রখর দৃষ্টি। এ সবদিকে আমেরিকান মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ সদাতৎপর।

সেবার এপ্রিল মাসে চেরী ফুলের উৎসবের সময় ওয়াশিংটন গিয়েছিলাম। চেরীফুলের রঙীন সৌন্দর্য ও ইতিহাস-ময় ওয়াশিংটনের নানান ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য দেখা হয়ে যাবার পরও সব কিছু

ছাপিয়ে মনে ভাসছে ন্যাশনেল আর্ট গ্যালারির স্মৃতি।

কনস্টিটিউশন, এভেনিউ-এ ন্যাশনেল গ্যালারির দরজায় আমাদের মহিলা ট্যাক্সি ড্রাইভার যখন গাড়ী থামাল হঠাৎ একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। চেয়ে দেখি আমার ভ্রমণ-সঙ্গী শিশুপুত্র গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছে। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে কি করব ভাবছি এমন সময় চোখে পড়ল ন্যাশনেল গ্যালারির এক গার্ড ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এগিয়ে আসছে, আর ঠেলে আনছে ছোট একটা স্ট্রোলার বা বেবী-ক্যারেজ। চকিতে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ধন্যবাদের উত্তরে হেসে আমেরিকান প্রথামত 'ইয়ু আর ওয়েলকাম' বলে চলে গেল গার্ড।

প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গেলেও পরে জেনেছিলাম আমেরিকান মায়েদের জন্য মিউজিয়ামে এ ব্যবস্থা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কাউণ্টারে ওভার কোট আর গ্লাভস রাখতে রাখতে নজরে এল এক-পাশে সারি সারি বেশ কয়েকটা স্ট্রোলার সাজানো রয়েছে।

স্ট্রোলার ঠেলে নিয়ে এলিভেটারের দরজার কাছে দাঁড়ালাম। মিউজিয়ামের দোতলাতেই বেশীর ভাগ এগজিবিশন গ্যালারি। বোতাম টিপতে বেশ বড়সড় এলিভেটর ধীরে ধীরে নেমে এল। দরজা খুলতেই দেখি চাকাওয়ালা চেয়ার ঠেলে এক নার্স বেরিয়ে আসছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে এক শীর্ণ চেহারা রোগিণী। কোলের উপর খোলা আছে ন্যাশনেল গ্যালারির গাইড বুক। শুধু শিশুর জন্য ক্যারেজ নয়, অশক্তের জন্য হুইলড চেয়ারের ব্যবস্থাও রয়েছে। এই বিচিত্র চিত্রসম্ভারের আয়োজন থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়।

দোতলায় একশটি ঘর জুড়ে ছবি সাজানো। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম বা বস্টনের ফাইন আর্টস মিউজিয়ামে গেলে বিশাল কলাসংগ্রহের মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছি মনে হয়। কিন্তু ন্যাশনেল গ্যালারিতে মোটের উপর শিল্পকলার ইতিহাসের এক-একটা অধ্যায় ধরে ক্রমানুসারে সাজানো তাই এক থেকে একশ নম্বর ঘর পর্যন্ত ঘুরে এলে শিল্পকলার ইতিহাসে বেশ একটা রিফ্রেসার কোর্স নেওয়া হয়ে যায়।

প্রথম কয়েকটি ঘরে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয় চিত্রকলা। ধর্মই বেশীর ভাগ ছবির উপজীব্য। চক-চকে সোনালী পশ্চাৎপটের ওপর উজ্জ্বল রঙে আঁকা আড়ষ্ট মূর্তি শিশুকোলে ম্যাডোনা। তারপর ধীরে ধীরে বাইজেন-টাইন আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে চিত্রকলা স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। প্রতিকৃতি, দৃশ্য চিত্র, 'জেনর' চিত্র ইত্যাদি কিছু কিছু ধর্ম সম্পর্কহীন ছবিও দেখা দিতে শুরু করেছে। আঙ্গিকের দিকেও কাঠের প্যানেলের ওপর টেম্পেরার কাজ ছাড়াও ক্যানভাসের ওপর তেল রঙের কাজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ফ্লেমিশ ও জার্মান চিত্রকরদের মধ্যে ইয়ান ভ্যান আইক, রুবেনস, ভ্যান ডাইক, গ্রুনেওয়ালড হলবাইন, ডুয়েরার, বশ সকলেই রয়েছেন। পাঁচটি ঘর জুড়ে আছেন ডাচ চিত্রকরেরা। দুখানা ঘর তো সম্পূর্ণ রেমব্রাণ্টেরই দখলে। দৈনন্দিন জীবনের ছবিতে ভেরমিয়ার, প্রতিকৃতিতে ফ্রান্স হলস, 'জেনর' চিত্রে ইয়ান ষ্টিন—ন্যাশনেল গ্যালারির ডাচ পেইন্টিং-এর দিকটা ভালই বলতে হবে।

গোটা পঞ্চাশ ঘর দেখার পর বিশ্রাম না নিলে অসম্ভব। বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থার অভাব নেই কোন। দোতলার দুটি গার্ডেন কোর্টে ফোয়ারায়, ফুলে পাতায় স্নিগ্ধ পরিবেশ। আরো সুন্দর গাঢ় সবুজ মার্বেলের থামে সুশোভিত মাঝের গোল হল বা রোটাণ্ডা।

আমরা অবশ্য মিউজিয়ামের একতলায় রেস্তোরাঁয় নেমে এলাম। রেস্তোরাঁর সামনে করিডর-এ লম্বা কিউ। কিউ ধরে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত কাউণ্টারে পৌঁছানো গেল। সেল্ফ সার্ভিস রেস্তোরাঁ। ট্রেতে স্টেক তুলে নিয়ে ট্রে হাতে এসে টেবিলে বসে পড়লাম।

লাঞ্চের পর ব্রিটিশ চিত্রকলার বিভাগটি দেখছিলাম। কনস্টেবল, টার্ণার, রেনোল্ডস—। গ্যানসবারার একটি ছবির সামনে দেখি জনৈক দর্শক অনেকটা ধ্যানমগ্নের মত দাঁড়িয়ে আছেন। ভাল করে চেয়ে দেখি তাঁর কানে ইয়ার ফোন, হাতে ছোট একটি রিসিভিং সেট। ন্যাশনেল গ্যালারির বিভিন্ন ঘরে সাজিয়ে রাখা শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনা টেপ রেকর্ড করা আছে। আর্টের ইতিহাসে উৎসাহী অনেক দর্শক এই রেডিও লেকচারের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী চিত্র-কলার ঘরে দেখলাম নবীন চিত্রশিল্পীদের অনেকে ইজেলে ক্যানভাস চড়িয়ে বসে গেছেন, মন দিয়ে কপি করে চলেছেন বিশেষ কোন মাস্টারপিস।

হোমার, ইয়াকিনস, রাইডার প্রমুখ আমেরিকান চিত্রকলার দিকপালদের দিয়ে সেদিনকার মত মিউজিয়াম পরিক্রমা শেষ করে বেরিয়ে পড়ছিলাম। বার হবার মুখে ইনফরমেশন রুমে আটকে পড়তে হল। মিউজিয়ামের ভাল ভাল ছবির নিখুঁত রিপ্রোডাকশন, চমৎকার রঙীন স্লাইড সেলস ডেস্কে সাজানো রয়েছে। কিছু ডলার দণ্ড না দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি সাধ্য কি! গিলবার্ট স্টুয়ার্টের আঁকা 'দি ভগ্যান পোর্ট্রেট' নামে পরিচিত জর্জ ওয়াশিংটনের একটি পোর্ট্রেট সংগ্রহ করলাম। ন্যাশনেল আর্ট গ্যালারির একটি সামান্য স্মৃতিচিহ্ন রইল আমার সঙ্গে।

থ্যাংকস গিভিং-এর দিনকতক আগে নভেম্বর মাসে কার্যোপলক্ষে নিউইয়র্ক এলাম। একদিন ইউনাইটেড নেশনস-এ গিয়েছি, একজন ভারতীয় সাংবাদিক বন্ধু ওঁদের ডেলিগেটস ডাইনিং রুমে লাঞ্চ খেতে নেমন্তন্ন করলেন। খাবার টেবিলে নানারকম আলোচনা হচ্ছিল—আমাদের পররাষ্ট্র নীতি, কৃষ্ণমেনন, আমেরিকান এইড...এমন সময় আমাদের টেবিল-সঙ্গী ইউ এন এর জনৈক কর্মচারী হঠাৎ বললেন, আর যাই করুন গুগেনহাইম মিউজিয়াম না দেখে নিউইয়র্ক থেকে চলে যাবেন না যেন।

দেখতে দেখতে গুগেনহাইম মিউ-জিয়াম নিয়ে টেবিলে বেশ তর্কের ঝড় উঠে পড়ল। সে সময় মাত্র অল্পদিন হল এপ্রিল মাসে মারা গিয়েছেন স্বনামধন্য স্থপতি নব্বুই বছরের বৃদ্ধ ফ্র্যাংক লয়েড রাইট। গুগেনহাইম মিউজিয়ামের অট্টালিকা এঁর শেষ কীর্তি। অক্টোবর মাসে পুরোন বাড়ী ছেড়ে গুগেনহাইম মিউজিয়াম ফিফথ এভেনিউর ওপর এই নব-নির্মিত ভবনে উঠে এসেছে। এই নতুন ভবনের স্থাপত্যকলা নিয়ে তর্ক চলছে নিউইয়র্কের সর্বত্র। আমার ইউ এন এর বন্ধুটি নিউইয়র্কের কোন এক কলাসমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বললেন,—বাড়ীটা দেখতে হয়েছে ঠিক যেন একটা 'ক্লজেট (closet) টার্ণড আপসাইড ডাউন।'

কৌতূহল জেগে উঠল, পরদিনই চলে গেলাম। ফ্র্যাংক লয়েড রাইট তাঁর শেষের দিকের কাজে 'রেক্টাংগল' সযত্নে পরিহার করে চলতেন। তাঁর তৈরী প্রাসাদ, ভবন, গির্জা হয়ে পড়ত গোলা-কার নয়ত ত্রিকোণ, নয়ত এমন কি ছয়টি দেওয়ালযুক্ত। গুগেনহাইম মিউজিয়াম

প্রধানতঃ গোল। কিন্তু এর ভিতরে না ঢুকলে এর অদ্ভুত আকৃতির তাৎপর্য বুঝতে পারা যায় না।

ভেতরে বিরাট গোল হল-এ দেয়ালের পাশ দিয়ে চওড়া পথ ঘুরে অতি ধীরে ওপরে উঠে গেছে। ঘোরানো সিঁড়ি নয়, ঘোরানো ঢালু পথ—আর তার ঢাল এত ধীর উঠতে গিয়ে কোন পরিশ্রমই হয় না। পাশের দেয়ালে একটু দূরে দূরে ছবি সাজানো। একদিকে ছবি তাই এদিক-ওদিক চাইতে হয় না, চোখের পরিশ্রম কম। ঘুরে ঘুরে একেবারে উপরে উঠে যাওয়ার পর নীচে চেয়ে থাকে থাকে সাজানো ছবি অপূর্ব মনে হল। প্রত্যেকটি ছবি সামনে থেকে, ওপর থেকে নীচ থেকে বিভিন্ন কোণ থেকে স্টাডি করা যায়। অনেকক্ষণ ধরে সেদিন ছবি দেখেছিলাম। এত অ্যাবস্ট্রাকট আর্ট একসঙ্গে দেখেও চোখের বা মনের ক্লান্তি হয়নি। কোন নতুন ভবনের রূপ কল্পনা করার সময় ফ্রাংক লয়েড রাইট সৌন্দর্যের চাইতেও কার্যকারিতার দিকে বেশী নজর দিতেন। সেদিক থেকে গুগেনহাইম মিউজিয়াম অফ নন-অবজেকটিভ পেইন্টিং-এর এই নব-নির্মিত বাড়ী চিত্রসংগ্রহশালা হিসেবে লয়েড রাইটের এক সার্থক সৃষ্টি বলা যেতে পারে।

একাধিকবার ওপর নীচ করেও গুগেনহাইম-এ এতটুকু ক্লান্তি বোধ করিনি। কিন্তু এর বিপরীত অভিজ্ঞতা হয়েছিল নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ণ আর্টস-এ। ছোট ছোট ঘরে দেওয়াল-ঠাসা ছবি। একে তো মডার্ণ আর্ট সাধারণ দর্শকের সহজবোধগম্য নয় তার উপর যেন এতখানি মডার্ণ আর্ট একসঙ্গে গহণ করতে বলা চোখ এবং মন উভয়ের উপর জুলুম। একদিন সারাদিন মিউজিয়াম অফ মডার্ণ আর্টস-এ কাটিয়ে বিকেলে এমন বিধ্বস্ত চেহারায় বাড়ী ফিরলাম যে, আমার গৃহস্বামিণী তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে এক পেয়ালা চা ও দুটি অ্যাসপিরিনের ট্যাবলেট সামনে বসিয়ে দিলেন।

অবশ্য চোখের ক্লান্তি যতই হোক না কেন এ কথা মানতেই হবে যে আমেরিকার জনচিত্তে আধুনিক আর্টের ভাবধারার প্রচারে মিউজিয়াম অফ মডার্ণ আর্টস-এর ভূমিকা নিতান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মিউজিয়ামের বিরাট ও বিচিত্র সংগ্রহশালায় অনেক ভাল ছবি মন্দ ছবি পা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে। তেমনি হয়ত রয়েছে অনেক দর্শককে হতবুদ্ধি করে দেওয়া অতি আধুনিকতার উৎকট নিদর্শন। কিন্তু এখানকার চিত্রশালাতেই আমেরিকার জনসাধারণ পৃথিবীর অনেক খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা আধুনিক শিল্পীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছেন। ১৯২৯ সালে এই মিউজিয়াম স্থাপিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই পর পর কতকগুলো প্রদর্শনী এখানে আয়োজিত হয়। সেজান, ভ্যানগগ গ্যগাঁর চিত্রকলা, প্যারিসের ফরাসী চিত্রকলা, আধুনিক জার্মান চিত্রকলা ও ভাস্কর্য এবং তারপর ১৯৩২-এ আমেরিকান লোকশিল্প প্রদর্শনী—আমেরিকার চিত্রজগতে এই প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

সেন্ট্রাল পার্কে মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম। মেট্রোপলিটান সমুদ্রবিশেষ—তার বর্ণনা দেবার চেষ্টা বৃথা। ঘরের পর ঘর পার হয়ে চলেছি তো চলেছিই—ইজিপশিয়ান, য়ুরোপীয়, আমেরিকান চিত্রকলা ও ভাস্কর্য। কোথায়ও রয়েছে ঘর জুড়ে পারস্যের গালিচা, নয়ত হলঘর ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র বর্ম ঝকঝক করছে, নয়ত আছে বহুকালের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র।

রেস্তোরাঁ ও সেলস ডেসক ছাড়া কোন আমেরিকান আর্ট মিউজিয়ামই যেন সম্পূর্ণ হয় না। মেট্রোপলিটানের রেস্তোরাঁটি খুব জমকালো। মস্ত হলের মাঝখানে আভ্যন্তরিক সরোবরের চারধারে সাজানো চেয়ার-টেবিল। সরোবরের জলে ব্রোঞ্জের মূর্তিশোভিত ফোয়ারা। সেলস ডেস্কে ভিড় লেগেই আছে। এখানকার ছবির রিপ্রোডাকশন দেওয়া কার্ড পাঠানো খুব ফ্যাসান। থ্যাংকস গিভিং আসতে না আসতে ক্রিসমাসের কার্ড নিঃশেষ।

আমেরিকান শিল্পকলায় যাদের অগ্রহ আছে তাদের পক্ষে নিউইয়র্কের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে হুইটনি মিউজিয়াম অফ আমেরিকান আর্ট। মিসেস গার্টুড হুইটনির নেতৃত্বে পরিচালিত হুইটনি স্টুডিও ক্লাব আমেরিকান চিত্রজগতে সুপরিচিত। অনেক তরুণ আমেরিকান চিত্রকরের আনাগোনা ছিল এই আড্ডায়। ১৯৩১ সালে এই ক্লাব পরিণত হয় হুইটনি মিউজিয়াম অফ আমেরিকান আর্ট-এ। অনেকে নিউইয়র্কে এসে মেট্রোপলিটান দেখেন, মডার্ণ আর্ট মিউজিয়ামও দেখেন কিন্তু আমেরিকান আর্টের এই সুন্দর সংগ্রহশালাটি তাদের তালিকা

ফ্র্যাংক লয়েড রাইটের সার্থক সৃষ্টি গুগেনহাইম মিউজিয়াম

থেকে বাদ পড়ে যায়। মডার্ণ আর্ট মিউজিয়ামের গায়ে-লাগাও এই মিউজিয়ামটি কিন্তু নিঃসন্দেহে নিউইয়র্কের অন্যতম "মাস্ট"।

বস্টনের ফেনওয়ে অঞ্চলে দুচারদিন হাঁটাহাঁটি করলে একটি সুউচ্চ ভিনিশিয়ান প্রাসাদ নজরে পড়বে। সকলেরই পড়ে। গার্ডনার মিউজিয়াম বস্টনের একটি অতি পরিচিত ল্যান্ডমার্ক। ইসাবেলা স্টুয়ার্ট গার্ডনার নামে বস্টন সোসাইটির এক ধনী, অভিজাত মহিলা এর প্রতিষ্ঠাত্রী। ১৯০২ সালে ফেনওয়ে কোর্টের এই বিরাট প্রাসাদটি প্রাচীন ভেনিসের স্থাপত্যকলার অনুকরণে তিনি তৈরী করেন। মৃত্যু পর্যন্ত এই বাড়ীতেই তাঁর জীবন কেটেছে।

একমাত্র সন্তান শিশুকালে মারা যাবার পর শিল্পকলা সংগ্রহ হয়ে দাঁড়ায়

এই মহিলার জীবনের সাধনা। বহুবার য়ুরোপে আনাগোনা করার সময় বহু বিখ্যাত শিল্পনিদর্শনে তাঁর সংগ্রহশালা ভরে ওঠে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উইল অনুসারে এই প্রাসাদ মিউজিয়মরূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। এ জন্য যে প্রভূত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার ব্যবস্থাও তিনিই রেখে যান।

ইসাবেলা গার্ডনারের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ এবং খানিকটা চমকপ্রদও বটে। বস্টনের পিউরিটান সমাজ থেকে থেকে তাঁর কার্যকলাপে শকড্ হয়ে যেত—তা সে প্রকাশ্যে বিয়ার ড্রিংক করাই হোক কি মাথার পিছনে ম্যাডোনার মত 'হ্যালো' (halo) দিয়ে নিজের প্রতিকৃতি আঁকানোই হোক। মিসেস গার্ডনারের ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে এই মিউজিয়ামে। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল শিল্পকলা উপভোগ করতে হলে তার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা চাই।

মাঝখানে ঢাকা দেওয়া আঙিনা ঘিরে এই বিরাট চারতলা অট্টালিকা উঠে গেছে। আঙিনার এই ঢাকা দেওয়া বাগানে বছরের সব ঋতুতেই ফুলের সমারোহ। পিছন দিককার খোলা বাগানেও রকমারি ফুলের বাহার। মিউজিয়ামের নিজস্ব বাগানবাড়ী থেকে সব ফুলের চারা আসে। আর আছে সংগীতের ব্যবস্থা। মিউজিয়ামের ট্যাপেস্ট্রি রুমে প্রতি রবিবার হয় কনসার্টের আয়োজন। অন্য দিনেও আছে আধ ঘণ্টা করে সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা।

মিউজিয়ামের ইতালীয় চিত্রকলা সংগ্রহটি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া অবশ্য ডাচ্, জার্মান, ফরাসী সব রকমই কিছু কিছু মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ হিসেবে এর বিরাটত্ব আশ্চর্য, তেমনি ব্যক্তিগত সংগ্রহ বলেই হয়ত সংগৃহীত শিল্পকলার মান সর্বত্র সমান নয়। গার্ডনার মিউজিয়ামের বৈশিষ্ট্য হল এর সবকিছু মিলিয়ে—ভিনিশিয়ান প্রাসাদ, ফুলের বাগান, সঙ্গীতময় পরিবেশ, বিচিত্র কলা-সংগ্রহ।

গার্ডনার মিউজিয়াম থেকে পূবদিকে মিনিট দশেক হেঁটে গেলেই চোখে পড়বে বস্টন মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস। বস্টন মিউজিয়ামকে আমি দেখেছি নানা রূপে নানা ঋতুতে। যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা দেবার অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম একদিন বস্টন মিউজিয়ামে যাই। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটি ঘরে ঢুকে চারদিকের দেওয়ালে মুঘল ও রাজপুত পেইন্টিং-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে "হোম সিক" বোধ করেছিলাম। কাঁচের শো-কেসে সাজানো আছে নানা রকম ভারতীয় অলংকার।

বস্টনের মিউজিয়ামে এশিয়াটিক আর্ট সংগ্রহের দিকটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমেরিকান আর্ট মিউজিয়ামের নানা গুণের মধ্যে একটি হল প্রাচ্য আর্ট সম্পর্কে চেতনা। সচরাচর পাশ্চাত্য আর্ট গ্যালারিতে এমনটি নজরে পড়ে না। বস্টন মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস-এ প্রাচ্য শিল্পকলার যথাযোগ্য স্থান পাবার অবশ্য একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। বিশিষ্ট ভারতীয় কলা সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামী এই মিউজিয়ামের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত ছিলেন।

বস্টন মিউজিয়ামও বিরাট সমুদ্র-বিশেষ। দু-একজন আমেরিকান চিত্রকরের কথা শুধু উল্লেখ করব। অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা চিত্রকর কোপলে (Copley) ছিলেন বস্টনেরই বাসিন্দা। তাঁর "মেরী এ্যান্ড এলিজাবেথ রয়েল" এখানে রয়েছে। সার্জেন্ট (Sargent) যদিও য়ুরোপে প্রবাসজীবন কাটিয়েছেন বস্টনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল গভীর। বহুবার আসা-যাওয়া করেছেন তিনি বস্টনে। বস্টনের পাবলিক লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম দুটির ডেকোরেশনেই তাঁর হাত ছিল। "এডওয়ার্ড ডার্লি বোয়াটের চারকন্যা" সার্জেন্টের তুলিতে চারটি ছোট ছোট মেয়ের একটি কম্পোজিশন্। আর একজন প্রবাসী আমেরিকান শিল্পী হুইসলার চিত্রজগতে সুবিখ্যাত। তাঁর "দি লাস্ট অফ ওয়েস্টমিনস্টার" এখানে রয়েছে। আর একটি ছবির সামনে বেশ খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়াতে হয়। গিলবার্ট স্টুয়ার্টের "ওয়াশিংটন এ্যাট ডরচেস্টার হাইটস্"—ঘোড়ার পাশে দাঁড়ানো জর্জ ওয়াশিংটনের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। দৃপ্ত, বীরত্বপূর্ণ চেহারা।

মিউজিয়ামের করিডর, বারান্দায় এদিক ওদিক দেখা যাবে হয়ত "মেম্বারশিপ ড্রাইভ" লেখা আবেদনপত্র। "দিস্ ইজ্ ইয়োর মিউজিয়াম"—এ মিউজিয়াম আপনারই। এর সভ্য হয়ে একে বড় করে তুলতে সাহায্য করুন। আমেরিকায় দেখেছি মিউজিয়ামে-মিউজিয়ামে তীব্র প্রতিযোগিতা, সকলেই তাই যার যার মিউজিয়াম উন্নত করে তুলতে সচেষ্ট। বস্টন মিউজিয়ামের স্থান নাকি দ্বিতীয়। হঠাৎ কিছুদিন একটা সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কি ব্যাপার! না ওয়াশিংটন ও ফিলাডেলফিয়ার মিউজিয়াম দুটি বস্টনকে প্রায় ধরব-ধরব করছে। আমেরিকার অনেক বড় বড় মিউজিয়ামই জনসাধারণের নিজস্ব চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। বড় বড় কতকগুলো দান, এনডাওমেন্ট ও সভ্যদের দেয় চাঁদার ওপর এগুলোর নির্ভর। এ ধরনের বেসরকারী প্রচেষ্টার বিরাট সাফল্য দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

আর্ট মিউজিয়ামের পেছনে আমেরিকানদের অকাতর অর্থব্যয় অন্যান্য দেশের মিউজিয়াম-কর্মীদের ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু অর্থই সব নয়। আমেরিকান আর্ট মিউজিয়ামের সাফল্যের পিছনে রয়েছে মানুষের জীবনে আর্টের মূল্য যে অনেক তারই উপলব্ধি। আবার এই উপলব্ধি আসবে শুধু তখনই যখন জনসাধারণের মন হয়ে উঠবে শুদ্ধ কলাসচেতন।

ভারতবর্ষে আমরা এখন সবে আর্ট মিউজিয়াম গড়ে তোলায় হাত দিয়েছি। গুটিকতক ছোট ছোট আর্ট গ্যালারি ও একটি দুটি বড় মিউজিয়ামে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা এখনো সীমাবদ্ধ। তাই মনে হয় আমেরিকান আর্ট মিউজিয়ামগুলোর সাফল্য থেকে আমাদের অনেক শেখবার আছে। আগেই বলেছি মিউজিয়ামগুলোকে আকর্ষণীয় করে তুলতে কি আপ্রাণ প্রয়াস আমেরিকানদের। প্রতি সপ্তাহে হয়ত টেলিভিশনে থাকবে মিউজিয়ামের একটি বিশেষ ঘর নিয়ে আলোচনা। মিউজিয়ামেও বক্তৃতামালার ব্যবস্থা থাকে। হয়ত তার নাম "দিস্ উইকস্ পিকচার", এক একটি বিশেষ চিত্র নিয়ে আলোচনা প্রতি সপ্তাহে। কর্মব্যস্ত মানুষের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করে কোন কোন মিউজিয়াম সপ্তাহে একদিন রাত্রি দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে। জনসাধারণকে মিউজিয়ামে উৎসাহী করে তুলতে এরা বদ্ধপরিকর।

আমাদের দেশে কোথায় সেই মিউজিয়াম-সচেতন জনসাধারণ? অথচ সার্থক আর্ট মিউজিয়ামের ভিত্তি রচনা করবে তো তারাই। দিল্লীর ন্যাশনেল গ্যালারি অফ মডার্ণ আর্টের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট একটি বন্ধু সেদিন গল্প করছিলেন কত মজার অভিজ্ঞতা হয় তাদের। দিল্লীর চারপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে রাজধানী দেখতে আসে সরল, কৌতূহলী গ্রামবাসী। এসে ঢুকে পড়ে মিউজিয়ামে। বিস্ফারিত নেত্রে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হঠাৎ একদল একসঙ্গে সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ এই অকস্মাৎ পতনের কারণ অনুসন্ধানে। হয়নি কিছু। সামনে রয়েছে এক জেলে রমণীর প্রতিকৃতি। এ কোন দেবী হ্যায়, বলছে তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের আর্ট মিউজিয়াম দেখতে দেখতে তাই মনে হত সফল আর্ট মিউজিয়াম সৃষ্টির পথে এখনো অনেক দূর যেতে হবে আমাদের।

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥বাইশ॥
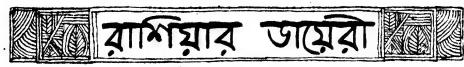
মস্কোর যে কোনও একটি জনবহুল বাজার আমার পক্ষে আকর্ষণের বস্তু। সেদিন যেখানে গেলুম সেটি পুরনো অঞ্চল। আমাদের দেশের মতো ভোজ্য বৈচিত্র্য ওদের বাজারে নেই। সব্জি ও আনাজ-তরকারির মধ্যে ওরা বোঝে আলু ও বাঁধাকপি। পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো প্রচুর। ভিনিগরে পচানো শশা ওদের প্রিয়। ফলের মধ্যে আপেল প্রধান। আঙ্গুর একটু বড়মানুষি। ওদিকে মাছ সহজলভ্য নয়। মাংস নানাবিধ। মুরগী, হাঁস অন্যান্য পাখী,—এরা বাজারে ঝোলে সিদ্ধ অবস্থায়! শুকরের মাংস প্রচুর। শুকরের বড়াগুলি মোড়কের মধ্যে পাওয়া যায় যেখানে-সেখানে। সেগুলির নাম 'সোসিসকি'। মধ্য-এশিয়ার মুসলমান-জগতে শুকরের সমাদর নেই। সেই-জন্য সেখানকার বাজার-ছাওয়া হল, 'সাসলিক্'—অর্থাৎ মাটন শিক-কাবাব!

বাজার করে অধিকাংশ মেয়েছেলে আর নয়ত পেন্সন্‌ভোগী বৃদ্ধ। প্রায় প্রত্যেকের হাতে একটি ক'রে জালি-থলে। প্রধানতঃ কেনে আলু, পেঁয়াজ, টমাটো, মাংস আর আপেল। ওর সঙ্গে এক শিশি জেলি, হয়ত বা আর এক শিশি 'ভোদ্‌কা' মদ। ওটা হজমের ওষুধ মাত্র। বাজারের মধ্যে ওজনে ঠকাবার উপায় নেই, কেননা মেসিনে ওজন! দরদস্তুর কেউ করে না। দাগী বা পচা জিনিস কেউ বেচে না। প্রতি বাজারে একটি করে ইনসপেক্টরের আপিস। প্রতি বিক্রেতার পোষাক ঔষধ-শোধিত। অধিকাংশ বস্তু কাঁচের বাক্সের মধ্যে—পাছে মাছি বসে! কিন্তু মাছির দেশ হল মধ্য-এশিয়া, মস্কো নয়। বাজারে তিন দলের লোক মাল বেচে। ষ্টেট ফার্ম, কলেকটিভ ফার্ম এবং ব্যক্তিগত। চাষীরা যখন তখন এসে নিজেদের গৃহজাত সামগ্রী বেচে কিছু রোজগার ক'রে চলে যায়। তারা আনে শশা, পেঁয়াজ, হয়ত বা চারটি আলু, অথবা নিজের গাছের আপেল কিংবা বেরি। ফলের মধ্যে আঙ্গুর এবং মাংসের মধ্যে মুরগী,—এদের দাম বেশি! ছাগল অথবা তার মাংস আমার চোখে পড়েনি!

তরুণী দোভাষিণী শ্রীমতী মেরিয়ম আমার সঙ্গে ছিলেন। বাজার থেকে বেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ একটি জীর্ণ-সজ্জাগ্রস্ত বৃদ্ধ আমার কাছে ছুটকিয়ে এসে দাঁড়াল। লোকটা হাত পেতে ভিক্ষা চাইল! যে দেশে টাকা-পয়সার অতি-প্রাচুর্য দেখে কতবার বিস্মিত হয়েছি, সে দেশে ভিখারী যদি সেলাম ঠুকে অতি বিনীতভাবে ভিক্ষা চায়, তখন একটু চমক লাগে বইকি। সামনে 'চৌরঙ্গীর' মতো রাজপথ, চারিদিকে জনতা, সকলের চোখের উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি এক বিদেশী, এবং এ-দেশে ভিক্ষা বে-আইনী,—এসব সত্ত্বেও পরদেশীর কাছে নির্ভয়ে যখন ভিক্ষা চায়,—অভাব তখন কোথাও আছে বইকি! একে একে অনেকগুলি ভিখারী দেখলুম।

ভিক্ষা দেবার অভ্যাস আমার কম। কিন্তু তখনই পকেট থেকে একটি রুবল বার ক'রে দিলুম। শ্রীমতী মেরিয়ম যে মন্তব্যটি করলেন, আমাদের দেশেও সেটি সর্বত্র শুনি : "কাজ দিলে করবে না, ভিক্ষে পেলে খুব খুশী!"

লোকটা ভিড়ের মধ্যে তখনই মিলিয়ে গেল! আমার সোভিয়েট ভ্রমণকালে এই নিয়ে বোধ করি প্রায় কুড়িজন মেয়ে-পুরুষ ভিখারীর মুখোমুখি এলুম! মস্কোয় ঘুরে বেড়ালে প্রায়ই ভিখারীর দেখা মেলে!

শ্রীমতী মেরিয়মের স্বামী জর্জ ভলংচেক আমার পুরনো বন্ধু। একদিন এই জর্জ আমাদের নিয়ে গিয়েছিল জর্জিয়ায়। সে একজন শিক্ষক। যেমন শান্ত, তেমনি নিরীহ। তার চোখে এক-জোড়া মোটা চশমা। কাজকর্মের ফাঁকে সময় পেলে মাঝে মাঝে সে স্ত্রীর ফাই-ফরমাসটা খেটে দেয়। জর্জ সেদিন আমাকে নিয়ে চলল 'সকল্‌নিকি' পার্কে। ওখানে আমেরিকান একজিবিশন চলছে আজ বুঝি মাস দেড়েক।

মস্কোর যেটা শহরতলী, তার চতুর্দিকেই বড় বড় পার্ক। এক একটি পার্ক এত বড় যে, একদিনে তার আগাগোড়া দেখা যায় না। পার্ক মানেই তার এক-একটি স্থলে একজিবিশন, রেস্তোরাঁ, খেলাধুলো, কিছু একটা ক্লাব, এবং নানাবিধ আকর্ষণ। যেমন গোর্কি পার্ক, 'নেসকুচনি' পার্ক, 'গ্রীণবেল্ট', 'ষ্টালিন' পার্ক, 'দিজেরজিন্‌স্কি' পার্ক, 'সোভিয়েট আর্মি পার্ক', 'অষ্টানকিনো গার্ডেনস' ইত্যাদি। এদের মধ্যে 'সকল্‌নিকি পার্ক' হল অনেক দিনের পুরনো। আগে যেগুলি ছিল জমিদারী এস্টেটের অনধ্যুষিত এলাকা বা ময়দান, আজ সেগুলি পার্ক নামে পরিচিত হচ্ছে। কলকাতার দক্ষিণে বছর ত্রিশেক আগে রেলপথের ধারে যে অঞ্চল ছিল জলাবিল এবং ম্যালেরিয়ার ডিপো, এখন তার একটা অংশের নাম হয়েছে 'ঢাকুরিয়া লেক' বা 'রবীন্দ্র সরোবর'। এই ধরণেরই একটা বনময় জলাবিলযুক্ত ময়দান, যেটি এককালে অপরিচিত ছিল, একালে সেই-টিই একজন দেশপ্রেমিকের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'সকল্‌নিকি পার্ক' নামে পরিচিত হয়েছে। মধ্য কলকাতায় যেমন এক-কালের 'হেদুয়া', অন্যকালের 'আজাদ হিন্দ-বাগ'। এই পার্কের ঝোপ-জঙ্গল একদা বিপ্লববাদীদের গোপন পরামর্শ-সভার কাজে লাগত। এটির আয়তন প্রায় পাঁচ হাজার বর্গবিঘা, এবং এখানে প্রায় এক লক্ষ বড় বড় গাছ বর্তমান। প্রতি বছরে এই পার্কে কমবেশি দশ লক্ষ ফুলগাছ বসানো হয়!

এই পার্কেরই সামনের অংশটায় বসেছে আমেরিকান একজিবিশন। মিঃ খ্রুশ্চভ স্বয়ং আমেরিকানদের সঙ্গে মিলে এর প্রতিষ্ঠার আয়োজন ক'রে দিয়েছেন। দূরের থেকে যে সুবৃহৎ গোলাকার অ্যালুমিনিয়ামের গম্বুজটি দেখা যায়, সেটি বৃষ্টির পর রৌদ্রালোকে ঝলমল করছিল। জর্জ আমাকে সঙ্গে করে ভিতরে ঢুকল।

প্রদর্শনীর যে খ্যাতিটি বাইরে থেকে শুনেছিলুম, ভিতরে তা'র জৌলস কম।

এটিকে ফটো-প্রদর্শনী বললে মানিয়ে যেত। যাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাদের সামনে আপন দেশের বৈজ্ঞানিক কীর্তিকলাপ এবং কল-কব্জার বিভিন্ন কারিগরির প্রকাশ করতে আমেরিকার কর্তৃপক্ষ যেন কিছু কুণ্ঠাবোধ করেছেন! ফলে, এই সর্বখ্যাত প্রদর্শনীটি কোথাও হয়ে উঠেছে জুতোর দোকান, কোথাও বা মনোহারী বিপণি-বেসাতি। একটি সাধারণ আমেরিকান শোবার ঘরের আসবাবপত্র এবং রান্না-ঘরের ও বাথরুমের সাজ-সজ্জা দেখানো হয়েছে। কিছু মেয়েদের পোষাকপত্র, কিছু বা বিলাসী জীবনের উপকরণ। সর্বসমেত ঘণ্টাখানেক কাটানো যায় এই প্রদর্শনীতে, এবং তারপরেই মনে হতে থাকে, দিল্লী-কলকাতার ভারতীয় এক্জিবিশন এর চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণীয়। আমি ঈষৎ নৈরাশ্য নিয়েই ফিরেছিলুম।

বরং সেদিন আনন্দ পেয়েছিলুম 'অস্টান্কিনো' বাগানের প্রান্তবর্তী একটি মস্ত রাজবাড়িতে গিয়ে। 'অস্টান্-কিনো' নামটি একটি জনপদের সঙ্গে মেলানো। প্রাসাদটি পুরনো কালের। সামনের অংশে রাজপথ, পথের ওপারে মস্ত এক জলাশয়। এটি প্রাচীনকালের এক এস্টেট। এই এস্টেটের সীমানা কতদূর জানিনে, কিন্তু এর বন-বাগানের সামনে সুদীর্ঘলম্বিত একটি প্রশস্ত দীঘি, এবং চারিদিকে নিঃঝুম নিকুঞ্জ কাননলোক। যেন পূর্ববঙ্গের কোনও এক বিজনবাহিনী নদীতট! রাজপথের ধারেই মস্ত এক গির্জা।

'অস্টান্কিনো' রাজপ্রাসাদের মধ্যে যে একটি কৌতুকজনক কাহিনী লুকিয়ে রয়েছে সেটি শ্রীমতী লিডিয়া ভিতরে প্রবেশ করার পর থেকে সবিস্তারে বলতে লাগলেন। বস্তুতঃ, রাজকুমার 'ত্রেতিয়াকভ' প্রতিষ্ঠিত আর্ট গ্যালারির পর এই প্রথম অপর এক রাজকুমারের বাসস্থানের মধ্যে প্রবেশ করেছি! এখানে বিধি-নিষেধ কিছু আছে। পায়ের জুতোর ঘর্ষণ মেঝের উপর না লাগে এজন্য ক্যাম্বিসের একজোড়া কৃত্রিম জুতো পায়ের তলায় প'রে নিতে হয়। এককালে যিনি এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন তাঁর নাম 'প্রিন্স শেরেমেতিয়েভ'। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্ত এবং ঊনিশ শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক। বলা বাহুল্য, রাজবংশের এক শাখায় তাঁর জন্ম, জার গোষ্ঠীরই এক সন্তান এবং তিনি বিপুল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী। এই বিশাল প্রাসাদের প্রতি কক্ষটি যে বিলাস এবং বৈভব-সজ্জায় পরিপূর্ণ, সেটি পর্যবেক্ষণ করলে চমৎকৃত হতে হয়। তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা অগণিত তৈল-চিত্রের সঙ্গে প্রতি দেওয়ালে ও শিলিংয়ে যে চিত্রাঙ্কন, সেগুলি দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করে। কোনটা শিষমহল—চারিদিকের স্ফটিকসম্ভার থেকে বিদ্যুৎ-ঝলক বিচ্ছুরিত হচ্ছে; কোনটা মোতি-মহল,—বিবিধ কোমল বর্ণাঢ্য প্রস্তরমণি সেখানে যেন ইন্দ্রলোকের দ্বার খুলে দিয়েছে; কোনটা জহরৎমহল,—সেখানে চক্ষুতারকা নানা জায়গায় ঘা খেয়ে যেন ঠিকরে আসে! কারুকার্য ও বিবিধবর্ণ মখমলের কাজ প্রতিটি আসনকে যেন সিংহাসনে পরিণত করেছে! কোনটা প্রমোদ-কক্ষ, কোনটা শয়নকক্ষ, কোনটা বিশ্রম্ভালাপের, কোনটা পানাহারের। গ্রীক এবং ইতালিয় ভাস্কর্য এক একটি মর্মর মূর্তিকে পরম রমণীয় করে তুলেছে। কোথাও সোনালি সাচ্চা জরির রাজ-পোষাক, কোথাও স্বর্ণ ও রৌপ্যময় তৈজসপত্রাদি, কোথাও ঝলমলে পালিশের মেহগনি ও আখরোটের আসবাবপত্র,—কোথাও বা রক্তনীল মখমলের সঙ্গে স্বর্ণালির সংমিশ্রণ। আমার থেই-হারানো মুগ্ধ দৃষ্টি একটার থেকে অন্যটায় ঘুরে বেড়াতে লাগল কিছুক্ষণ।

রাজকুমার শেরেমেতিয়েভের একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তদানীন্তন রাশিয়ার সম্রাট জার। সেণ্ট পিটার্সবার্গ

থেকে সম্রাট যখন আসতেন মস্কোতে, তখন তাঁর আমোদ-প্রমোদের অন্যতম কেন্দ্র হত এই প্রাসাদ। সম্রাটকে অভ্যর্থনা করার জন্য যে সমস্ত রাজকীয় বা রাজসিক উপকরণের প্রয়োজন, সেগুলি এখানে ষোড়শ উপচারে বর্তমান! কনসার্ট হলটি বৃহৎ, তার দারুময় মেঝের উপর মনোরম চিত্রাঙ্কন, আনন্দা সুন্দরী রমণীগণের নৃত্যগীতের আসর, তাদের যৌবনশ্রীকে বর্ণাঢ্য করার জন্য বিশেষ কক্ষে স্ফটিকচ্ছুরিত আলোক-ব্যবস্থা, এই বৃহৎ প্রাসাদকে তুষারপাতকালে উত্তপ্ত রাখার জন্য সুকৌশল উত্তাপ-সৃষ্টির আয়োজন, শিলিংয়ে স্বর্ণময় ঝাড়লণ্ঠনের শিল্পশোভা, এবং সম্রাটের অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ বিশেষ কক্ষ,—এগুলি যে কোনও দর্শককে সম্মোহিত করবে! শুনলুম, সম্রাট যখন এই প্রাসাদে আসবার জন্য সংবাদ পাঠাতেন, তখন এই জনপদের সমস্ত অঞ্চলগুলি থেকে জনসাধারণকে অপসারিত করা হ'ত।

রাজকুমার শেরেমেতিয়েভ তাঁর বিলাসপ্রিয়তা এবং অতিশয় ব্যয়-বাহুল্যের জন্য সমগ্র রাশিয়ায় সুবিদিত ছিলেন। আরেকটি কারণে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। দেশের ভূমিদাস সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী, কর্মী, কারুকলাবিদ্‌, ভাস্কর, গায়ক, নর্তক ও নর্তকী, সঙ্গীতবিদ্‌, কবি ও চিত্রকর—ইত্যাদি প্রতিভাবান ব্যক্তিকে নির্বাচন ক'রে আনতেন এবং তাদেরকে প্রতিপালন করতেন। তাঁর নিজস্ব ভূমিদাস বা দাসানুদাসের (Serf) মোট সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১০ হাজার ৪৪৭ জন। তাঁর এই বিশাল প্রাসাদ এবং এর যা কিছু বৈভবসজ্জা—সমস্তই সেই ভূমিদাস দলের সৃষ্টি। সুতরাং তিন ঘণ্টাকাল ধরে এতক্ষণ যা কিছু চর্মচক্ষে অবলোকন করলুম, তার আনুপূর্বিক কাহিনী দাসানুদাসদের সঙ্গে জড়িয়ে! কিন্তু শেষকালের কাহিনীটি ছিল কিছু মনোজ্ঞ।

এদেরই একজন নির্মাণশিল্পীর একটি কন্যার নাম ছিল শ্রীমতী প্রাসকোভিয়া কোভালেভা। উক্ত ভূমিদাস দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যে সম্প্রদায়টি ছিল, এ মেয়েটি তাদেরই একজনের কন্যা। মেয়েটি ছিল অসামান্য সুন্দরী এবং তার তনুলতার যৌবনশ্রী ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর পক্ষে দিবাস্বপ্নের মতো! কিন্তু রাজকুমার শেরেমেতিয়েভ কেবলমাত্র নারীদেহ-কেন্দ্রিক রিরংসার বিলুব্ধ পতঙ্গ ছিলেন না, বরং ছিলেন কিছু বিপরীত। তাঁর সমস্ত ভোগবিলাসের অন্তরালে একটি সূক্ষ্ম ঔদাসীন্যের 'সন্ন্যাস' তাঁকে অনেক সময় পেয়ে থাকত। সেই অবকাশের মুহূর্তগুলির মধ্যে অনেক সময় তিনি লক্ষ্য করতেন, তাঁর নাচের দরবারে একটি সুন্দরী নর্তকীর নির্লোভ এবং নিরাসক্ত সংযম! মাঝে মাঝে আবিষ্কার করতেন, এ নর্তকী ছবি আঁকে, এবং কবিতা লেখে! সে কবিতা বিরহগুঞ্জন গানের মধুর লিরিক নয়,—সে যেন অধ্যাত্মবাদী এক বিদগ্ধ আত্মার অবিনশ্বর পিপাসা!

রাজকুমার আপন জীবনের দিকে তাকিয়ে থমকিয়ে গেলেন! তিনি অবিবাহিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ভাবান্তর নানাদেশে ও নানাস্থানে প্রচারিত হতে লাগল। একদিন তিনি প্রাসাদকাননের নিভৃত নিকুঞ্জে পুষ্পমালা হাতে নিয়ে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে রইলেন। মেয়েটি এই পথ ধরেই তার ঘরের দিকে যায়!

'প্রাসকোভিয়া' সামনে এসে থমকিয়ে দাঁড়াল। শেরেমেতিয়েভ তাঁর প্রস্তাব জানিয়ে বললেন, আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই, প্রাসকোভিয়া!

আমাকে?—মেয়েটি বলল, সে যে আপনার মস্ত অপমান! তাছাড়া আমরা সবাই আপনার হুকুমের দাসী! ফুলের মালা হাতে নিয়ে মন জানাজানির অবসর কোথায় আপনার? একবার হুকুম হলেই ত আপনার পায়ের তলায় পড়ে আমরা যে কেউ দেহদান করতে বাধ্য! মালা ফেলে দিন, রাজকুমার, দাসীকে হুকুম করুন! আমরা শুধু ভোগের উপকরণই থাকতে চাই, মালা চাইনে!

রাজকুমার অপমানিত মুখে ফিরে গেলেন! কিন্তু গোপনে যে-ঘটনাটি ঘটেছিল, গোপনেই সেটি রয়ে গেল। তবুও প্রাসকোভিয়া এবং তার পিতার সম্বন্ধে শেরেমেতিয়েভের পক্ষপাতিত্বের কথা দেখতে দেখতে এখানে ওখানে কানাকানি হতে লাগল। জনশ্রুতি, নিন্দা, বিদ্রূপ, কানাকানি,—এরা ফণা উঁচিয়ে চারিদিকে দাঁড়িয়ে উঠল। রাজকুমার শান্ত, সংযত, ও সহাস্যভাবে একদিকে অবিবাহিত রয়ে গেলেন, এবং অন্যদিকে সেই সভানর্তকী বাহিরের সর্বপ্রকার বিলাস আড়ম্বরের অন্তরালে চারিদিকের 'সর্পদংশনে' ক্ষতবিক্ষত ও বিষজর্জর হতে লাগল। বছরের পর বছর কাটল!

অবশেষে যৌবনের প্রান্তে এসে রাজকুমার একদা তাঁর সংযমের কঠোর বাঁধন বিদীর্ণ ক'রে এই 'ভূমিদাসীর' পদতলে নতজানু হয়ে সাশ্রুনেত্রে ভিক্ষা চাইলেন! প্রাসকোভিয়াও রাজকুমারের ললাটের উপর মাথা রেখে অশ্রু বিসর্জন করলেন। অতঃপর সর্বপ্রকার অখ্যাতি, নিন্দা, বিদ্রূপ এবং দেশজোড়া অপমানের বোঝা মাথায় তুলে প্রিন্স শেরেমেতিয়েভ সেদিনকার সেই ভূমিদাসী প্রাসকোভিয়া কোভালেভাকে সগৌরব সমারোহের সঙ্গে বিবাহ করেন, এবং সম্রাট জারের পরিবার কর্তৃক সমাজচ্যুত হন। কিন্তু এই বিদগ্ধা নারীর সৌভাগ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি! যে-আগুনে বছরের পর

বছর সে দগ্ধ হয়েছিল, সেই আগুনই তার চিতায় জ্বলে উঠল বিবাহের দুই বছর পরে! প্রাসকোভিয়া যক্ষ্মারোগে মারা যায় ৩৫ বছর বয়সে!

সেদিনকার সেই রাজকুমারের শয়ন-কক্ষের দ্বারপ্রান্তে সালঙ্কারা সুন্দরী প্রাসকোভিয়ার একখানি মনোরম তৈল-চিত্রপট স্বর্ণমণ্ডিত ফ্রেমের মধ্যে আজও শোভা পাচ্ছে!

ওই ছবিখানার তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম। 'অস্টান্‌কিনোর' বাগানের ধারে রাজকুমার শেরে-মেতিয়েভের প্রতিষ্ঠিত প্রকাণ্ড গির্জায় সুদূর মধুর ঘণ্টা ডিং-ডং ডিং-ডং শব্দটা জানিয়ে দিল, এটি রবিবারের অপরাহ্ন, এখনই উপাসনা আরম্ভ হবে! শ্রীমতী লিডিয়া ডাক দিয়ে বললেন, আসুন, এবার বাগান দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে চলে যাই—

বাগানে এসে পৌঁছতেই সপসপিয়ে বৃষ্টি নামল। সুবিধা ছিল এই, প্রতি বাগানের ধারেই দু একটি খাবার হোটেল খোলা। এসব হোটেলে কফি, চা, মদ, আপেল, মাংসের খাবার ইত্যাদি পাওয়া যায়। দেখতে দেখতে বনবাগানে সন্ধ্যা নেমে এল।

'ফরেন্ লিটারেচার পাবলিশিং হাউস' বা বিদেশী সাহিত্য প্রকাশনের মস্ত আপিসটি মস্কোর সাবেক শহরের এক স্থলে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর হলেন ঈষৎ খর্বকায় বলিষ্ঠ ও সৌজন্যশীল ব্যক্তি মিঃ পাভেল চুভিকভ। এ'র কাছে আমাকে কয়েকবারই আসতে যেতে হয়েছে। এ'দের বর্তমান আপিসটি মস্ত বড় এক অট্টালিকা। এটি সাবেক-কালের, এবং জার আমলে এটি ধর্মযাজক এবং সাধুসন্তের বাসস্থান ছিল। রুশ-বিপ্লবের পর বিশেষ এক সরকারি ডিক্রির বলে যখন হাজার-হাজার অট্টালিকা অধিকার করা হয়, তখন এটিও তাদের সঙ্গে গভর্ণমেন্টের হাতে আসে। তারপর যে যেমন পারে, দখল ক'রে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু সেই সব 'সাধুসন্ত বাবাজিরা' কোথায় গেলেন কেউ জানে না! তাঁদের জন্য অবশ্য তুষারাকীর্ণ 'কোমি' উপত্যকা, সাইবেরিয়া, কাজাখস্তান, শাখালিন, অথবা 'লেবার ক্যাম্প' খোলা ছিল। তাঁদের একটা দল নাম ও পোষাক বদলে এবং জপতপের মালা ছিঁড়ে গার্হস্থ্যাশ্রমে ফিরে গেছে! কেউ কেউ এদেশ ছেড়ে ভিনদেশে পালিয়ে গাল-মন্দ করেছে অনেককাল। কেউ না খেয়ে মরেছে, কেউ ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে, কেউ বা বশম্বদ হয়ে আত্মরক্ষা করেছে।

মিঃ চুভিকভের আপিসে একটি যন্ত্রচালিতবৎ অভ্যর্থনা জুটে গেল। কিন্তু এ'রা ঠিক আমাদের দেশের মতো প্রকাশক নন যে, বেড়াতে বেরিয়ে দু ঘণ্টা গল্পগুজবের লোভে তাঁদের দোকানে ঢুকে জমিয়ে বসলুম।! ওদের দেশে প্রকাশকের কাছে যাওয়া আর আমাদের দেশের কোনও মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢোকা প্রায় একই কথা! আগে থেকে ইচ্ছা প্রকাশ করা, ইচ্ছার কারণ বলা, আসল উদ্দেশ্য জানানো, এবং ঘণ্টা ও মিনিট ধ'রে পৌঁছনো! যথাস্থানে গিয়ে নাম বললে একজন বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করবেন এবং এমন একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাবেন যেখানে টেবল-চেয়ার সবই শূন্য,—দ্রষ্টব্য বস্তু সে ঘরে কোথাও কিছু নেই। শুধু ঝুলছে লেনিনের ছবি!

শ্রীমতী লিডিয়া বোধকরি বুঝে-ছিলেন আমার গলা শুকোচ্ছে! তাই এক সময় বললেন, মনে রাখবেন, এ'রা আপনার প্রতি বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন!

কুণ্ঠার সঙ্গে বললুম, কিন্তু না এলেই হ'ত!

মানে?—লিডিয়া চোখ পাকিয়ে বললেন, ah, poor 'second brahmin!'

আমি চুপ ক'রে গেলুম। কিন্তু ওই 'second brahmin' কথাটার কিছু তাৎপর্য ছিল! গল্পটি তিনি আমার কাছে একদিন শুনেছিলেন।—একদা চৈত্রের রৌদ্রে মনের দুঃখে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর ব্রাহ্মণীর দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে কিছু সাহায্যলাভের আশায় মাঠ-ময়দান পেরিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর এক যজমানের বাড়ি। এমন সময় আকাশপথ অতি-ক্রম করছিলেন হরপার্বতী। দয়াবতী পার্বতী বললেন, হে দেবাদিদেব, সংসারে এত দুঃখ কেন? এই উপবাসী ব্রাহ্মণের দুর্ভাগ্যের কি কোনও প্রতিকার নেই? দয়ার্দ্র দেবাদিদেব স্নেহের হাসি হেসে একটি লাল কাপড়ের টুকরোয় একরাশি মোহরের পুঁটলি বেঁধে সেই ব্রাহ্মণের যাবার পথের উপর ঝুপ ক'রে ফেলে দিলেন! ব্রাহ্মণ সেই পথ পেরোবার সময় হঠাৎ সেই পুঁটলিটা দেখে নাকে কাপড় দিয়ে মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, কোন্ আবাগী সর্বনাশীর কাণ্ড র‍্যা? উচ্ছন্নে যা,—নরকে যা—!

ব্রাহ্মণ ঘৃণাভরে পাশ কাটিয়ে হন হন ক'রে চলে গেলেন! বুদ্ধিহীন দৃষ্টি-হীন মানুষের এই অজ্ঞান দেখে আকাশপথে হরপার্বতী আবার স্নেহের হাসি হাসলেন!

লিডিয়ার ধারণা, আমি 'দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ'!

মিঃ পাভেল চুভিকভ এলেন এঘরে তাঁর দলবলসহ। সোভিয়েট ইউনিয়নে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি একা কারো সঙ্গে দেখা করেন না, অথবা তাঁর নিজের আপিসঘরের মধ্যে কখনও কারোকে ডাকেন না! আপিস মানেই গোপনীয়! সাক্ষী না রেখে কখনও কারো সঙ্গে তিনি আলাপ করেন না! সেই কারণে তাঁর সঙ্গে পাঁচ ছয় জন ভদ্রলোক এসে পাশাপাশি বসে গেলেন, এবং আমার নানাবিধ প্রশ্ন এবং ঔৎসুক্যের জবাব দিতে লাগলেন। এই প্রতিষ্ঠানে পৃথিবীর বহু ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ ছাপা হয়। সেই সব গ্রন্থ নির্বাচন করেন বিভিন্ন কমিটি। এ'দের অধীনে যে সকল উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা আছেন, তাঁরা প্রত্যেকে এক একটি ভাষায় পারদর্শী। সংখ্যাতীত অনুবাদক এ'দের প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। প্রথম সংস্করণের দরুণ ৫০ হাজারের কম কোনও বই ছাপা হয় না! এর মধ্যে ৫ হাজার বই গভর্ণমেন্টকে দিতে হয় বিভিন্ন পাঠাগারের জন্য। ১৫০ থেকে ২০০ পৃষ্ঠার একখানি অনুবাদ-গ্রন্থের জন্য এ'রা প্রথম কমবেশি ১৫ হাজার রুবল রয়েলটি দেন, যেটি ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হারে এখন দাঁড়ায় ১৮ হাজার টাকা! কিন্তু এই রয়েলটির 'টাকা' বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া তাঁরা সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে যেতে দেন না। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর যে কোনও ভাষায় লিখিত যে কোনও গ্রন্থ তাঁরা গ্রন্থকারের অনুমতির অপেক্ষা না রেখে এবং তাঁদেরকে 'কলা' দেখিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে কোনও ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন। কেননা, 'World Copyright' আলোচনায় জেনেভা কনভেনশনে তাঁরা স্বাক্ষরকারী ছিলেন না। অবশ্য এর বিনিময়ে পৃথিবীর যে কোনও দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের যে কোনও গ্রন্থই ছাপতে পারেন। কিন্তু আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্য তাঁদের দেশের বাইরে যে যথেষ্ট সমাদৃত নয়,—

এটি বোধ কার তাঁদের কতকটা জানাও আছে।

রুশবিপ্লবের ফলে পৃথিবীর সব দেশের নিরীহ লেখকরা তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবেন—এ কেমন কথা? যে-দেশে 'exploitation' ব্যবস্থা চিরকালের জন্য নির্মূল হয়ে গেছে, সেই দেশ আজ পৃথিবীর সব লেখককে ভাঙিয়ে খাবে—এ কেমন যুক্তি?

আপনারাও আমাদেরকে 'expolit' করুন?

আমরা বারোজন মিলে একজনের খাদ্য খাবো, আর বারোজনের খাদ্য আপনারা একজনে খাবেন,—পেটটা কার ভরছে বেশি?

একথা নিয়ে হাসি পরিহাস চলে! কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে এর জবাব নেই! ফিরবার পথে সেদিন শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিলেন, ah, once again a poor 'second brahmin' .... incorrigible!

এইদিনটির দেড় বছর পরে "বিদেশী সাহিত্য প্রকাশন" আমার একখানি বই প্রকাশ করেন। কিন্তু আমার প্রাপ্য থেকে আমি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইনি!

পথে পথে ঘুরে বেড়ানো আমার দরকার ছিল। প্রয়োজন ছিল জনতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া, হোটেলে বা রেস্তরাঁয় শিঙাড়া ওরফে 'সাম্‌সা' এবং আর্মেনিয় হোটেলে 'পরোটা' খেয়ে বেড়ানো! বোধ হয় আর্মেনিয় হোটেলের রান্না এবং ভোজ্য দিল্লী-পাঞ্জাবের অতি কাছাকাছি! রান্না বলতে যা বুঝি তা রাশিয়ায় নেই! রাশিয়ানরা রাঁধে না, খাদ্য-সম্ভার 'প্রস্তুত' করে মাত্র! সিদ্ধ করাটা রান্না করা নয়! ওরা বাঁধাকপির যে 'ঘাঁট' রান্না করে, সেটিতে তেল বা ঘি, নুন, ঝাল—কোনটাই নেই! সেটি 'গোবরের' সমতুল্য! ভাল রান্না খেতে গেলে দক্ষিণে নেমে আসতে হবে আড়াই হাজার মাইল! অর্থাৎ মধ্য-এশিয়ায়! কেবলমাত্র মুসলমান মধ্য-এশিয়াই এটি জানে, "বাসনার সেরা বাসা রসনায়!" আমার আর্মেনিয় দোভাষিণী শ্রীমতী অকসানাকে একদা টাউ টাউ ক'রে তাসকন্দের 'পিলাও' গিলতে দেখেছিলুম।

একটি গোল-গোম্বাজের মধ্যে 'সিনেরামা'র ঘরজোড়া বৃহৎ ছবির মধ্যে সমগ্র লেনিনগ্রাড ও মস্কো অঞ্চল এমনভাবে দেখানো হল, যেন আমরা ওই দুটি শহরের রাজপথে এবং বিভিন্ন 'লোকেশনে' দাঁড়িয়ে একইকালে দেখছি নগরের নানাবিধ দৃশ্য। চোখের সামনে একটি বিস্ময়কর মায়াজাল রচনা করে এই সিনেরামা! এর আগে 'সকলানিক' পার্কে দেখে এসেছিলুম আমেরিকান 'সার্কারামা'! সোভিয়েট ইউনিয়নে সিনেরামা, থার্ড-ডাইমেনসনের ছবি এবং টেলিভিশন—এই তিনটি খুবই জনপ্রিয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র উজবেকিস্তানের জনসাধারণ ৬০ হাজারেরও বেশি টেলিভিশন সেট্ কিনেছে!

মস্কো থেকে একটি পথ চলে গেছে দেশগাঁয়ের দিকে। আমরা যাচ্ছিলুম 'লেনিনস্কি-গোর্কি' নামক একটি গ্রামে। শ্রীমতী অকসানা এনেছিলেন লেখক সঙ্ঘের একখানা গাড়ি এবং সেই গাড়িতে আমরা উঠলুম মোট ছয়জন! সস্ত্রীক মিঃ মালৎজেভ, একজন শিল্পী, শ্রীমতী অকসানা ও লিডিয়া। শহরতলী ছাড়িয়ে মাঠময়দান, ক্ষেতখামার, চাষীগ্রাম এবং পাইনের জঙ্গল পেরিয়ে বোধ হয় যেন মাইল তিরিশেক পথ। পথ ছিল মসৃণ এবং আকাশ ছিল রৌদ্র-ঝলমল। একদিকে দূরে দেখা যাচ্ছিল এক একটি গির্জা। ক্রেমলিন ছাড়া মস্কো অঞ্চলের প্রত্যেক গির্জায় নিয়মিত উপাসনা চলে! বিস্ময়ের কথা, স্টালিন আমলেও এর ব্যতিক্রম হয়নি!

আমরা যে এস্টেটে এসে পৌঁছলুম এইটিতেই লেনিন তাঁর জীবনের শেষ দু'বছর অতিবাহিত করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে এই বৃহৎ অট্টালিকায় সস্ত্রীক তিনি এসে জায়গা নেন, এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। শেষজীবনে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধি এবং পক্ষাঘাতে একপ্রকার অকর্মণ্য হয়েছিলেন, সেজন্য তাঁকে একটি তিন-চাকার গাড়িতে বসিয়ে এই এস্টেটেরই বনবাগানে বা এঘর থেকে ওঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ত। এবাড়িতে বসেই তিনি রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন, এবং মৃত্যুকাল অবধি তিনিই ছিলেন প্রধানমন্ত্রী! তাঁর ব্যবহৃত প্রাচীন মডেলের একখানা মোটরগাড়ি প্রদর্শনী হিসাবে রাখা হয়েছে। এই অট্টালিকার প্রত্যেক সুপ্রশস্ত কক্ষে মূল্যবান আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সম্পদ-সামগ্রী অবিকল অবস্থায় রয়েছে। এই এস্টেটের যিনি মালিক তিনি ছিলেন মস্ত জমিদার। রুশবিপ্লবের ঠিক পরে তিনি সপরিবারে প্রাণভয়ে রাতারাতি কোথায় যে পালিয়ে যান, আজও তার সন্ধান মেলেনি! সে যাই হোক, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট এই অট্টালিকা এবং এস্টেট অধিকার করেন এবং এটি লেনিনকে দান করা হয়। এই বৃহৎ এস্টেটের সীমানা কোথায় এবং কতদূরে সেটি ঠাহর করা যায় না। হঠাৎ মনে হয় এটি পার্বত্য উপত্যকা। আশে-পাশে ও নীচের দিকে সুবিস্তৃত বন-বাগান, এবং অদূরে একটি মস্ত জলাশয়। এরই মালিক ছিলেন সেই 'নোবল'। লেনিনের ব্যবহৃত প্রত্যেকটি সামগ্রী, এমন কি যে বেঞ্চখানিতে মাঝে মাঝে তিনি বসতেন সেখানিও, সযত্নরক্ষিত।

বাগানের পথে সর্বাপেক্ষা যেটি দর্শককে আকর্ষণ করে সেটি হল, একটি প্রস্তরমূর্তি। এটি লেনিনের 'শবযাত্রা'! লেনিনের মৃত্যুর পর যাঁরা তাঁর শবদেহ কাঁধে তুলে সেই জানুয়ারী মাসের কঠিন তুষারাকীর্ণ পথ দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন রেলষ্টেশনের দিকে, সেই শবদেহযুক্ত শোকার্ত বাহকদলের সম্মিলিত মূর্তি! পৃথিবীর কোনও দেশে এই প্রকার দলবদ্ধ শ্বেতমর্মর মূর্তি আছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু আমাদের দেশে বিহারে এমনি একটি 'সম্মিলিত' প্রস্তরমূর্তি আছে—যেটিতে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের শহীদদের আত্মত্যাগের মহিমাকে প্রকাশ করা হয়েছে। যাই হোক, ভাস্কর্যের এত বড় সাফল্যও বোধ হয় দুর্লভ। এগুলি ঠিক পুতুল নয়, সর্বহারা, শোকসন্তপ্ত, বেদনাদীর্ণ এবং অশ্রুকরুণ কয়েকটি শববাহক! এই বাহকদল আমাদের কাছে অপরিচিত নন্। কেননা এঁদের মধ্যে ছিলেন কালিনিন, ট্রটস্কী, স্টালিন, ভরশিলভ, মলোটভ, কামেনেভ, জিনোবিভ, বুখারিন, কাগানভিচ, বুলগানিন এবং আরও দু' কজন!

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তারিখে লেনিন এইখানে মারা যান, এবং ২৩শে জানুয়ারী তাঁর শবদেহ ট্রেনযোগে মস্কো নগরীতে পৌঁছয়! কঠিন বরফের নীচে সেদিন মস্কো নগরী নিমজ্জিত ছিল, এবং প্রচণ্ড তুষারঝটিকায় সেদিন রাজধানী ক্ষণে ক্ষণে বেত্রাহতবৎ কেঁপে উঠছিল! সেদিনকার সেই ভয়াবহ দুর্যোগ সত্ত্বেও লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আড়াই লক্ষ নরনারী রেল-ষ্টেশনের দিকে ছুটে এসেছিল! ষ্টেশন থেকে লেনিনের দেহ কাঁধে ক'রে এনে মস্কোর একটি প্রসিদ্ধ অট্টালিকায় রাখা

হয়। সেটির নাম 'হল্ অফ কলম্স্'। অতঃপর কি প্রকার কৌশল এবং প্রক্রিয়ার সাহায্যে লেনিনের শবদেহকে অবশ্যম্ভাবী ক্ষয় ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করা হয় এবং কোন্ বিশেষ ঔষধি প্রয়োগের দ্বারা তাঁকে 'সজীব বা জীবন্তসদৃশ' ক'রে রাখা হয়,—আজও পৃথিবীর পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্র থেকে সে-রহস্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি!

এই অট্টালিকার বিবিধ সম্পদের সঙ্গে লেনিনের যোগ ছিল কম। কেননা তাঁর বসবাসের অংশটি শাদামাটা স্বল্পবিত্ত পরিবারের মতো নিতান্ত সাধারণ। তাঁর ঘরকন্নায় ছিলেন তাঁরা মাত্র তিনজন, —তাঁর স্ত্রী ক্রুপস্কায়া, তাঁর ভগ্নি মেরিয়া ও তিনি নিজে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শয়নকক্ষে নানাবিধ কাগজপত্রের মধ্যে একটি দলিল পাওয়া যায়, সেটিতে চীন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর স্বহস্তলিখিত বাণী ছিল। এই বাণীতে তিনি বলেছিলেন, সমগ্র প্রাচ্যে উৎপীড়িত জাতিগণের মধ্যে ধূমায়িত অসন্তোষ একটি বৈপ্লবিক পরিণতি লাভ করতে চলেছে! চীন এবং ভারতে বিরাট এক মুক্তিসংগ্রাম আসন্ন! এই দুই জাতি সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে, সেদিনের বিলম্ব নেই!

কিন্তু বিলম্ব কিছু হয়েছিল, কারণ গান্ধীজি রক্তপাত, হিংসা, অরাজকতা এবং বলশেভিকবাদের পথ ধরেননি!

মিঃ খ্রুশ্চভ প্রমুখ সুপ্রীম সোভিয়েটের মন্ত্রীরা কে কোথায় থাকেন, এটি জানা সম্ভব নয়, এবং আমার প্রয়োজনও নেই! একবার শুনেছিলুম মিঃ খ্রুশ্চভ ক্রেমলিনের বাইরে সাধারণ নাগরিকের মতো থাকেন, এবং কাজকর্মের জন্য ক্রেমলিনে যান। এটি শুনে আমার ভাল লেগেছিল।

অত্যন্ত প্রয়োজন এবং জরুরী কাজকর্ম ছাড়া কোনও মন্ত্রীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা সহজসাধ্য নয়। আমি কেবলমাত্র সংস্কৃতি মন্ত্রী মিঃ মিখাইলভের সঙ্গে একদিন আর্ট থিয়েটারে ব'সে কিছুক্ষণ আলাপ করেছিলুম! সেদিন শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চললেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দপ্তরে। তাঁর ইচ্ছা, আমি সকল শ্রেণীর লোকজনদের সঙ্গে অল্পবিস্তর আলাপ ক'রে যাই। বস্তুতঃ, তাঁরই অক্লান্ত অধ্যবসায়ের গুণে আমি এই বিরাট দেশের বৃহত্তর জনতার মধ্যে অনেকবার মিলিয়ে যেতে পেরেছিলুম। অনেক সময় তিনি পাঁচ, সাত বা দশ মাইল দূরে কোনও এক রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করতেন, এবং আমি বিশেষ নির্দেশক্রমে বার দুই মোটরবাস বদল ক'রে কিংবা ট্যাক্সি নিয়ে তাঁর কাছে পথ চিনে যেতে পারতুম! এমনি করে পথঘাট চিনেছিলুম অনেকগুলি, এবং একা ঘুরে বেড়াতে আর ভয় পেতুম না! সর্বাপেক্ষা ভয় পথ হারাবার,—কেননা লক্ষ লক্ষ নরনারীর মধ্যে ইংরেজি জানা কেউ আছে কিনা, এই সন্দেহের জন্যই সবসময় আড়ষ্ট বোধ করতুম।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সুবৃহৎ অট্টালিকা বহু সরকারি দপ্তরে পরিপূর্ণ। এটি ১০নং কুইবিশেভা ষ্ট্রীটে অবস্থিত। প্রবেশপথে ডবল দরজা। বাইরে শীত, ভিতরে উষ্ণ। প্রত্যেক দপ্তরের মতো এখানেও কড়াকড়ি। সশস্ত্র পাহারা প্রথমে পরীক্ষা করবে অনুমতিপত্র! অতঃপর অপর একজন টেলিফোন করবে। তৃতীয় ব্যক্তি দোতলার পথনির্দেশ করবে, এবং দোতলার চতুর্থ ব্যক্তি সঙ্গে করে নিয়ে কোনও একটি অভ্যর্থনাকক্ষে বসাবে! আমার মনে পড়ছিল ইংরেজ আমলের কলকাতার 'রাইটার্স বিল্ডিং'! আমার ধারণা, ১৯৩০-এর আমলে বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী মিঃ প্রেনটিস এবং ১৯৪০-এর আমলে মিঃ পোর্টারের সঙ্গে দেখা করা বরং সহজ ছিল! আমার বিশ্বাস, অতিশয় কড়াকড়ির মধ্যে জনগণ সম্বন্ধে ভয় ও শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ পায়!

অথচ যে দুজন ব্যক্তি একসময় বেরিয়ে এলেন তাঁরা অতিশয় অমায়িক এবং সৌজন্যশীল। এ'দের একজন হলেন ভাইস-মিনিষ্টার অফ কালচার, মিঃ পাখোমভ, এবং অন্যজন সম্ভবত এ'র সহকারী,—ইংরেজিজানা! ভাইস মিনিষ্টার আমার সঙ্গে যে আলোচনা করবেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি সেগুলি টুকে নেবেন! সম্প্রতি নবপ্রতিষ্ঠিত জিপসি থিয়েটারে 'সোহনী এবং মহিওয়াল' নামক যে পাঞ্জাবী নাটকটি হচ্ছে, সেটির অপ্রাকৃত মিসটিক্ চেহারাটা যে অর্থহীন, এটি আমাকে বলতে হল! ভারতবর্ষের জীবন অবাস্তব অতীন্দ্রিয়তায় ভরা নয়! আজগুবী কোনও 'ইলুশন্' সৃষ্টি করে ভারতকে চেনাবার চেষ্টা হাস্যকর। সুতরাং মূলরস যেখানে বিকৃত, সেখানে নাটকের সাফল্য এবং দর্শকের হাততালি দুটোই অর্থহীন! ভারতবর্ষকে সোভিয়েট ইউনিয়নে পরিচিত করতে হলে সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নেওয়া উচিত। তাসকন্দে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসটি "Daughter of the Ganges" নামক নাট্যাকারে অভিনীত হচ্ছে, এবং এটিতে প্রকৃত ভারতীয় সমাজের একটি অংশকে ব্যক্ত করা হয়েছে।—মিঃ পাখোমভের সহকারী আমার কথাগুলি টুকে নিচ্ছিলেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নে ভারতবর্ষ অতিশয় অপরিচিত, কিন্তু অতিশয় প্রিয়! 'ভিলাই ইস্পাত কারখানার' কথা জানে বহুলোক, কিন্তু 'ভাকড়া-নাঙ্গাল' জানে কম! 'দুর্গাপুরে' শোনেনি,—'সুরাটগড়' অনেকে জানে! ভারতবর্ষের উন্নতি হচ্ছে কিনা, এটি শোনবার জন্য বহুলোক ব্যগ্র, কিন্তু ভারতবর্ষ বহু বিষয়ে যে কতখানি উন্নত—এটি তাদের জানতে বাকি আছে! ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন অর্থনীতিক অগ্রগতি আজ একান্ত প্রয়োজন এবং বহু শতাব্দীর অসাড়তার উপর দিয়ে ভারতের জনজীবনে প্রাণপ্রবাহের তরঙ্গ উঠেছে! কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবাদ যদি ভারতের চিরকালীন সংস্কৃতিকে শ্বাসরুদ্ধ করার চেষ্টা পায়, তবে ভারত সেটি সইবে না! কেননা আপন স্বভাবধর্ম এবং মানবতাবাদের প্রতি এতবড় আত্মপ্রত্যয় ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে ইদানীং আর দেখা যাচ্ছে না! মারণাস্ত্রের ঝনৎকার, সৌরবিশ্বের দিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, সম্পদসজ্জার বিরাট আয়োজন, ধনৈশ্বর্যের বাহবাস্ফোট,—এগুলি কিছুকালের জন্য ভারতকে সচকিত করে বটে, কিন্তু এনিয়ে সে ঈর্ষাকাতর হয় না, বা প্রতিযোগিতার পাঞ্জা পাঠিয়ে কোথাও সে আস্ফালন করে না,—সে কেবল শান্তভাবে শক্তিশালীকে স্বীকার করে নেয় মাত্র! কিন্তু পৃথিবীর কোনও দেশে কোথাও যদি নতুন মানবতার পুণ্যধ্বনি বেজে ওঠে, কেউ যদি কোথাও নিপীড়িত মানবাত্মার বেদনায় কেঁদে ওঠে, কেউ যদি কোথাও মানুষের ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা আনে, জীবনের কোনও নতুন ভাষ্যকার কোথাও যদি জন্মগ্রহণ করে, সাধু এবং মহতের প্রতি যদি কোথাও অবিচার ঘটে, যদি কোথাও অন্যায়ের দম্ভ মাথা তোলে, —ভারতবর্ষ তখনই চঞ্চল হয়ে ওঠে!

মিঃ বেসিলি পাখোমভ রবীন্দ্রনাথের কথা তুললেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ প্রিয়। তিনি কেবল ভারতের নয়, তিনি সকল দেশের এবং মহাপ্রাচ্যের ভাবনায়ক। তাঁর কাব্য, সঙ্গীত, নাটক, উপন্যাস, তাঁর বিবিধ চিন্তাসমন্বিত সাহিত্য,—এগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নে পরিচিত হচ্ছে। আগামী রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রত্যেক রিপাবলিকে তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হবে। তাঁর রচনাবলী সোভিয়েট নাগরিকের ঘরে ঘরে পেঁছবে। মিঃ পাখোমভ জানতে চাইলেন, কবির কোন্ কোন্ নাটক এবং নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্য,—সোভিয়েট রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়া উচিত। আমি এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলি নাম ক'রে গেলুম এবং বিশেষ ক'রে 'তপতী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, শ্যামা' প্রভৃতি কয়েকটির উপর জোর দিলুম। সহকারী সেগুলি টুকে নিলেন। মিঃ পাখোমভ আমাকে আমন্ত্রণ করলেন, আমি যেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের জন্য একখানি 'আধুনিক' নাটক অবিলম্বে লিখে দিই। তাঁকে আমি জানালুম, চলিত অর্থে আমি ঠিক নাট্যকার নই! তবে মনে রইল।

এই দিনটির প্রায় মাস পাঁচেক পরে মিঃ পাখোমভ কলকাতায় আমার নিকট বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে একখানি পত্র লিখে আমার রচিত একখানি নাটক চেয়ে পাঠান্। কিন্তু সে-নাটক আজও লেখা হয়নি! তাঁর দ্বিতীয় অনুরোধ ছিল, রবীন্দ্রনাথের গীতি ও নৃত্যনাট্যের প্রয়োজনা সম্পর্কে। এই সময়ে ভারতের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী প্রফেসর হুমায়ুন কবির যাচ্ছিলেন মস্কো। আমি পাখোমভকে লিখি, কবির সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য, এবং মিঃ কবিরের কাছে তার নকল পাঠিয়ে দিই।

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়নে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহাকবির 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য সর্বব্যাপী সমাদর লাভ করেছিল!

সাতটি অসমতল উপত্যকা মিলিয়ে মস্কো শহর। তা'র মধ্যে যে উপত্যকা-পথটি 'লেনিন পাহাড়' নামে খ্যাত, সেটি কলকাতার 'রাইটার্স বিল্ডিং' অপেক্ষা উচ্চস্তরের কিনা, সেটি চিন্তার বিষয়। কিন্তু এই লেনিন পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতা, গঠনকৌশল, এবং বিশালতা দেখে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান বিস্ময়ে-বিমূঢ় ও হতবুদ্ধি হন্। এই বিরাট বিশ্ববিদ্যামন্দিরটি ঠিক এই স্থলটিতে স্থাপন করার মূলে কর্তৃপক্ষের কোনও রাজনীতিক উদ্দেশ্য ছিল কিনা

আমি জানিনে। কিন্তু পৃথিবীর যে-কোনও দেশের লোক যদি মস্কো বিমান-বন্দরে এসে অবতীর্ণ হন, তবে মস্কো নগরীর প্রবেশপথে পৃথিবীর প্রথম সোস্যালিস্ট দেশের এই বিরাট কীর্তি তাঁর পক্ষে না দেখে উপায় নেই! মস্কো থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে যে কোনও অঞ্চলে গেলেও এই গগনস্পর্শী বিশাল অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হয়।

বিগত বিশ্বসংগ্রামের পর ডিক্টেটর ষ্টালিন আপন দেশে অতিশয় অপ্রিয় হন। তার প্রথম কারণ, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হিটলারের সঙ্গে তাঁর কুখ্যাত 'অনাক্রমণ চুক্তি', এবং দ্বিতীয় কারণ, হিটলারকে বিশ্বাস করে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নিরুদ্যম ক'রে রাখা! এর ফলে দেশব্যাপী যে সর্বনাশ ঘটে, তার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে গভীর অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। সম্ভবতঃ সেই কারণে, এবং আপন লুপ্ত 'গৌরব' ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ষ্টালিনশাসিত তদানীন্তন পার্টির কর্মীরা এই 'মস্কো ষ্টেট ইউনিভার-সিটির' নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন, এবং ষ্টালিনের মৃত্যু বৎসর ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে সেই কাজ শেষ হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টালিন আমলের সর্বশেষ কীর্তি!

সোভিয়েট ইউনিয়ন সংখ্যাগণনার উপর জোর দেন্ সর্বাপেক্ষা বেশি। সেই কারণে বিদেশী পর্যটকমাত্রই অঙ্কের উপরে ভেসে বেড়াতে বাধ্য হন্। ওদেশে মানুষের জীবন মস্ত এক অঙ্কের ফিরিস্তি। কমিউনিজম হল বিরাট এক অঙ্কের প্রকাশ। 'মস্কো ষ্টেট ইউনিভার-সিটি' দাঁড়িয়ে উঠেছে সেই একই অঙ্কের উপর। শুনলুম এইটি নির্মাণ করার জন্য দেশের ৫০০ বিভিন্ন শিল্পসংস্থা এক-যোগে কাজ করেছিলেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর অবধি এখানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪০০০, এবং বিদেশী ছাত্রসংখ্যা হয় ১৬০০। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২০০০ ক্লাসরুম ও গবেষণাগার চালু করা হয়েছে! ছাত্রদের থাকার ঘর, লাউঞ্জ, কমনরুম, ক্যানটিন, ব্যায়ামাগার, সন্তরণাগার, লাইব্রেরী, অধ্যাপকদের ঘর, রান্নাভাঁড়ার, ঝি চাকর, রাঁধুনি, ঝাড়ুদার, মেথর, মুচি, দর্জি, ধোপা, নাপিত, মালী, থানা-পুলিশ, কাছারি, ইত্যাদি সব মিলিয়ে মোট ৪৫,০০০ ঘর ও কক্ষাদি। এই অট্টালিকা হল ৩২ তলা, এবং মোট ১৮টি শাখায় বিভক্ত। কতখানি পরিমাণ অঞ্চল জুড়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত, তার হিসাব আমি করিনি, তবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার-দের ভাষায় যেটিকে বলা হয় 'ফ্লোর-স্পেস' সেটি প্রায় ১২৫ একর পরিমাণ জমি! এই 'দানবীয়' অট্টালিকার ভিতরে সর্বত্র যদি কেউ দেখেশুনে বেড়াতে চায় তবে তাকে মোট ১৪৫ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ৯০ মাইল পথ হাঁটতে হবে! এ ছাড়া এই অট্টালিকার সংলগ্ন যে বটানিকাল্ গার্ডেনটি রয়েছে, তার ভূ-পরিমাণ হল প্রায় ৩৫০ বিঘার একটি কুঞ্জকানন। সেখানকার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাড়িগুলি পৃথকভাবে নির্মিত।

শ্রীমতী লিডিয়া যখন আমাকে সেই লেনিন পাহাড়বর্তী যক্ষপুরীর দ্বার-প্রান্তে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন, বেলা তখন দুটো। জনৈক তরুণ রুশ অধ্যাপক আমাদের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভিতরে ঢুকলুম।

সোভিয়েট ইউনিয়নে শিক্ষা হ'ল আবশ্যিক, এবং সর্বপ্রকার শিক্ষা বিনা-মূল্যে। কিন্তু পৃথিবীর কোনও দেশে যে-ব্যবস্থাটি আজও নেই, এখানে সেটি বিদ্যমান! এখানে এবং সোভিয়েট ইউ-নিয়নের সকল রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্র ও ছাত্রী মাসিক বেতন বা 'ষ্টাইপেণ্ড' পায়। এখানে যে ছাত্র প্রথম প্রবেশ করে, তার প্রথম মাইনে হয় ৯০০ রুবল অর্থাৎ ১০৮০ টাকা! আমার কবি-বন্ধু ও সাংবাদিক শ্রীমান সমর সেন বাস করেন মস্কোতে। তাঁর ফ্ল্যাটে একদিন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারি ছাত্রর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এই যুবকের নাম শ্রীমান্ আদিত্য-প্রসাদ সিংহ, এবং এর বাড়ি হ'ল দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুরে। শ্রীমান্ আদিত্য ১৫০০ রুবল মাইনে পায় এবং সে যদি 'বড়মানুষি চালে' থাকে তবে তার খাই খরচ এবং সর্বপ্রকার হাত খরচসমেত—সিনেমা, থিয়েটার, যানবাহন মিলিয়ে—মাসিক ১০০০ রুবলের বেশি খরচ হয় না! বাকি টাকা সে ব্যাঙ্কে জমায়। বছরে একবার রিটার্ণ টিকিট কেটে যদি বিমানযোগে কলকাতায় যাতায়াত করতে হয় তবে ৪ থেকে ৫ হাজার রুবলের মতো খরচ পড়ে। আদিত্য আমাকে বলেছিল, এখানে প্রত্যেক ছাত্রের অবস্থাই সচ্ছল!

তরুণ অধ্যাপক আমাদের দুজনকে নিয়ে লিফ্‌টের সাহায্যে উপরে গেলেন। এটি এই অট্টালিকার একাংশ মাত্র। কিন্তু কতগুলি মহল কতদিকে বিভক্ত হয়ে চলে গেছে সেটি ঠাহর করে বেশিদূর এগোবার চেষ্টা করিনি। খুঁটিয়ে কিছু দেখার সময় নেই এবং আমি এঁদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শন করতেও আসিনি। এখানে দেখতে পাওয়া যায় একটি ভৌগোলিক যাদুঘর, সেখানে বিচিত্র প্রাকৃতিক সামগ্রী সংরক্ষিত। অতঃপর এদিক ওদিক ঘুরে আবাসিক ছাত্রদের ঘরে ঢুকলুম। প্রায় প্রতি ঘরেই রেডিয়ো, টেলিভিশন, টেলিফোন, গরম ও ঠাণ্ডা জলের কল, সুন্দর বিছানা, টেবল চেয়ারের সঙ্গে প্রতি ছাত্রের জন্য টেবল্ ল্যাম্প, কাপড়চোপড় রাখার ব্যবস্থা, একটি আলমারি, জুতো রাখার জায়গা ইত্যাদি। প্রতি ঘরে দুটি ক'রে ছাত্র। এই প্রকার বহু শত সংখ্যক ঘর এক একটি তলায় রয়েছে। যারা বিদেশা-গত ছাত্র তাদের পক্ষে আবশ্যিক নিয়ম হল, প্রথম বছরে এখানকার ব্যবস্থা-নুযায়ী রুশ ভাষা শিক্ষা করা। এখানে সমস্ত প্রকার শিক্ষার মাধ্যম হল রুশ ভাষা। এরপর ঘুরতে ঘুরতে আমরা এলুম, ছাত্র এবং ছাত্রীরা যেখানে জলাশয়ে সাঁতার শিখছে! বুঝতে পারা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সমস্ত দেশে যখন তুষারপাত হচ্ছে, ভিতর দিক তখন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে উষ্ণ রাখা হয়েছে! সাঁতার দেবার জল, পারি-পার্শ্বিক বাতাস—সমস্তই মধুর উষ্ণতায় ভরা,—যেন চৈত্র সংক্রান্তির দিনে দশাশ্বমেধ ঘাটে ডুব দিচ্ছি!

বয়স্ক তরুণ তরুণীরা একই সঙ্গে সাঁতার শিখছে এটি সর্বত্রই দেখেছি। ঠাণ্ডা দেশে কুমারী মেয়ের মনে লজ্জা এসে পৌঁছতে কিছু সময় লাগে! ওদের 'শীতল' তারুণ্যে শিথিল হ'তে কিছু দেরি হয়। কারণ শীতপ্রধান দেশে যৌন-চেতনা খুব সহজে আতপ্ত হয় না! বাঙ্গলাদেশে গোলাপ যেদিন ফোটে, পরদিন তার পাপড়ি ঝরে। ওদেশের গোলাপ দশ বারো দিন ধ'রে কঠিন বোঁটায় নিজেকে ধরে রাখে। কিন্তু ক্ষোভের কারণ এই, রুশ-মেয়েরা অধিকাংশই কুড়ি বছর বয়সের আগে থেকেই চর্বিপ্রধান হতে থাকে, এবং তারই তলায় তাদের যৌবনশ্রী চাপা পড়ে।

ঘুরে বেড়ালুম নানা দিকে। এটি যেন মস্ত এক শহর, এবং সমস্তই এই অট্টালিকার অভ্যন্তরে। এখানে-ওখানে-সেখানে ছাত্র-ছাত্রীর এক একটা জনতা

যেন একটা তরঙ্গ তুলে আবার যে-যার পথে চলে যাচ্ছে! এটি বিচিত্র শহর!

বিদায় নেবার আগে রেক্টর সাহেবের কাছে গিয়ে বসলুম। এ'র নাম আইভান পেট্রভস্কি। সামনে লেনিনের মস্ত ছবি। বস্তুত, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্রই লেনিনের বিভিন্ন প্রস্তরমূর্তি ও তৈল-চিত্র বর্তমান। তাঁকে বাদ দিয়ে কিছু নেই! মিঃ পেট্রভস্কি আলাপ করছিলেন মাতৃভাষায় এবং আমি তাঁর বক্তব্য শুনছিলুম লিডিয়ার অনুবাদে। ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, এবং তিনিই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা। এখানকার ফ্যাকালটির সংখ্যা এবং বিভিন্ন 'চেয়ারের' আলোচনা চলছিল। ছোট ছেলে-মেয়েরাও এখানে আসে এবং তাদেরকে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সকল প্রকার ব্যবস্থা এখানে আছে। ভারতীয় ছাত্র এখানে অনেক আছে। সম্প্রতি আফ্রিকার 'ঘানা' থেকে আসছে অনেক ছাত্র। ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান, যুগোশ্লাভ, হাঙ্গেরিয়ান, পোল,—সব দেশেরই ছাত্র এখানে। প্রতি বছরেই সংখ্যা বাড়ছে। চীন, মঙ্গোলিয়ান, কোরিয়ান, জাপানী, ইন্দোনেশিয়ান, বর্মী,—এদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এখানে সিংহলী এবং আফগান-ইরান ছাত্রও অনেকগুলি। প্রথম সর্ত এই, প্রত্যেককে রাশিয়ান শিখতেই হবে! ছাত্ররা এখানে চার বার পেট ভরে খায়, এবং একবার জলখাবার অর্থাৎ টিফিন। সকালবেলা রুটি, মাখন, ডিম, চীজ, কফি, দই, কড়াইশুঁটি সালাড, চপ, বিস্কুট এবং ফল। অনেকে দুধও খায়। আহার্যের উপরে শাসন নেই। যার যেমন এবং যত ইচ্ছে! দুপুরবেলা এগুলোর সঙ্গে যোগ হয় মাংস এবং সুপ। অপরাহ্নে ফলের পরিমাণ কিছু বাড়ে, হয়ত বা কিছু ভাজাভুজি। এবার আমি বললুম, দেখুন, শীতপ্রধান দেশে নৈশভোজনের চেহারা আমি দেখেছি। ওটা আর না শুনলেও চলবে।

মিঃ পেট্রভস্কি খুব হাসলেন। তারপর বললেন, আপনার ছেলে দুটিকে দিন না পাঠিয়ে এখানে, বেশ ভালই থাকবে। আপনাকে তাদের বিষয় আর কিছু ভাবতেই হবে না!

বললুম, তারা আপনাদের দেশের জল-হাওয়ায় বেশ সুস্থ থাকবে মনে করেন?

ভদ্রলোক অতি ভদ্র এবং সরল প্রকৃতির। কিন্তু আমার মুখের ওই 'সুস্থ' শব্দটির উচ্চারণ শুনে শ্রীমতী লিডিয়া একবার বক্র ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তিনি জানতেন, প্রশ্নটি কোন্ দিক ঘেঁষা! তিনি তাড়াতাড়ি হাসিমুখে বললেন, আপনার এই আশঙ্কা নিরর্থক! মস্কোর জলহাওয়া কি অস্বাস্থ্যকর মনে হচ্ছে? যদি তাদের স্বাস্থ্য না টেঁকে এখানে, তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন!

ঘণ্টাখানেক আলাপের পর মিঃ পেট্রভস্কির কাছে বিদায় নিয়ে এবং সেই অধ্যাপকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলুম।

পথে নেমে এসে শ্রীমতী লিডিয়া ফেটে উঠলেন, You're a very dangerous person, sir! I know what was your drive!

আমি বললুম, বাঃ, যদি তাদের জল-হাওয়া সহ্য না হয়? যদি কোনও স্থায়ী অসুখ নিয়ে তারা ফেরে?

স্থায়ী অসুখ? মানে? আমি কি জানিনে আপনার মনোভাব? This is the psychology of a man belonging to capitalist country! Don't you think so?

আমি বললুম, তার চেয়ে আপনার ছেলেটিকেই আমি সঙ্গে নিয়ে যাই! সে ছাত্র হয়ে চলুক, ক্যাপিটালিস্ট হয়ে ফিরবে!

এবার শ্রীমতী লিডিয়া উচ্চ-কণ্ঠে হেসে উঠলেন,—now I find the cat is out of the bag! ইস, কি ভাগ্যি ওই সরল ভদ্রলোকটি আপনার বক্রোক্তি ধরতে পারেননি! আশ্চর্য, আজও আপনার সংশয় ঘুচল না!

লেখক সঙ্ঘের অন্যতম কর্ত্রী শ্রীমতী হেলেন রমানভা আমার জন্য একটি নূতন ভ্রমণ ব্যবস্থা করতে পারেন এটি শুনেছিলুম। কিন্তু দেশ থেকে চিঠি আসতে দেরি হচ্ছিল ব'লে মনে কিছু উদ্বেগ ছিল। ও'রা আমার এই নূতন ভ্রমণের জন্য অপর একটি দোভাষিণী নিযুক্ত করতে চান। মেয়েটির বয়স কিছু অল্প, নাম শ্রীমতী মায়া। ইনি ইতিহাসের ছাত্রী ছিলেন। বর্তমানে লেখক সঙ্ঘে কাজ করেন। আমার সঙ্গে শ্রীমতী মায়ার পরিচয় ছিল না। কিন্তু কথায়-কথায় দোভাষী বদলানো কিছু ক্লান্তিকর এবং কিছুটা বিরক্তিকরও বটে। নতুন মেয়ে মানেই আবার নতুন ক'রে আমার মেজাজ-মর্জির সঙ্গে তাকে মিলিয়ে গ'ড়ে-পিটে নেওয়া! সেখানে ধৈর্যের প্রশ্ন আসে। আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি চারজনের মধ্যে। প্রথম, শ্রীমতী অকসানা, তিনি অতিশয় ভদ্র, বিচক্ষণ এবং বিদুষী। শ্রীমতী নাটাশা, বর্ণাঢ্য এবং বুদ্ধিমতী। শ্রীমতী মেরিয়ম কর্তব্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমী এবং অতি সৎপ্রকৃতি। শ্রীমতী লিডিয়া তেজস্বিনী, উদামশীলা এবং জাত-কমিউনিষ্ট। তাঁর অন্ধ দেশানুরাগ আমার পক্ষে কৌতুকের বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি লেখক সঙ্ঘের কর্মী নন্।

সেদিন উক্রাইন হোটেলের নীচের তলাকার লবিতে যিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁর নাম মিঃ কন্‌সটান্‌টিন চুগোনভ। ইনি লেখক সঙ্ঘের সহকারী সেক্রেটারী, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। এ'র কাজ হল বিদেশাগত অতিথিগণের আদর অভ্যর্থনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। ইনি মিষ্টভাষী, শান্ত এবং অতি ভদ্র। এ'র সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ তাসকন্দে। এই সৌম্যদর্শন ব্যক্তির বড় বড় চোখের অতি অমায়িক ও নিরীহ চাহনি লক্ষ্য ক'রে মাঝে মাঝে তাসকন্দে কেন জানিনে আমার গা ছমছম করত! দুমাস পরে আমাকে বিদায় দেবার দিনে এই ব্যক্তি যখন হাসিমুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সকলের কথাই বললেন, কিন্তু আমাকে কেমন লাগল, কই বললেন না ত?—আমি সেদিন বলে-ছিলুম, আপনার সৌজন্য, শালীনতা, সংযম ও মিষ্টতা দেখে বার বার আমার মনে হয়েছে আপনি বোধ হয় পুলিশের লোক!—মিঃ চুগোনভ তৎক্ষণাৎ বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন! আমার ডিস্ট্রিক্টের পুলিশ-ইউনিয়ন থেকে আমরা মিলিচ-মেন্ সাপ্লাই করি!

পরের বছরে সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়ন বোর্ডের তরফ থেকে মিঃ চুগোনভই আমার নিকট টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানান। ইনি আমার বিশেষ প্রিয় ছিলেন এই কারণে যে, ইনি কোথাও নিজেকে অস্পষ্ট রাখেননি।

নাটাশা আমার ঘরে বসে সেই সময় আলাপ করছিলেন। মিঃ চুগোনভের টেলিফোন পেয়ে নাটাশাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নীচে নেমে এলুম।—চুগোনভ বললেন, বাঃ এ কেমন কথা! ১৪ই তারিখে কেমন ক'রে যাবেন? আপনার জন্য নতুন জায়গা ঠিক হয়েছে যে?

কোথায়?

টান্স-ককেশিয়ার 'শোচি' শহরে।

আপনি বললে সীট বুক্ করি! পরশু যাবেন। লিডিয়া যাবেন আপনার সঙ্গে!

আমার তৃতীয়বার দিল্লী যাওয়া স্থগিত হল! মিঃ চুগোনভকে এবং তাঁর মারফৎ ম্যাডাম রমানভাকে ধন্যবাদ জানালুম। রাত্রে শ্রীমতী লিডিয়া ফোনে জানালেন, বেলা ৯টায় প্লেন,—আপনাকে সকাল সাড়ে ৭টায় বেরোতে হবে!

ট্রান্স-ককেশিয়ায় যেতে গেলে মস্কো থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে নেমে আসতে হয়। রেলগাড়িতে চ'ড়ে একটু দেখে-শুনে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ করতে গেলে দশ বছরের বেশি আর কতদিন সময় লাগে সেটি হিসেব করতে হয়। তাছাড়া তিন-চতুর্থাংশ রাষ্ট্রে রেলপথই নেই। মোটরপথ বহু আছে, কিন্তু পথের অনধিগম্যতা অনেক বেশি। সোভিয়েট ইউনিয়নের দু-তৃতীয়াংশ এখনও দুস্তর বলেই বিমান চলাচল ওখানে 'ডেলি প্যাসেঞ্জারের' মতো! ওদের দেশে জেট বিমানই 'ডেলি প্যাসেঞ্জার'। তার ভাড়া প্রথম শ্রেণীর ট্রেনভাড়া অপেক্ষা অনেক কম। আমরা দুজন একটি জেট বিমানে যাচ্ছিলুম। যাত্রীসংখ্যা মাত্র ৬ জন, তার মধ্যে ৪ জন ঘুমোচ্ছে!

বিমানপথে আমরা যে-অঞ্চলটি অতিক্রম ক'রে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলুম, সেটি হল রাশিয়ার সুপরিচিত "কালিমাটি"র দেশ, যাকে বলা হয় "Black Earth Region"। এই সমস্ত ভূভাগ—যেটি সম্মিলিতভাবে আমাদের উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যভারতের সমান,—এটি চিরকাল একটি সমস্যার মতো দাঁড়িয়ে ছিল। এটি নাবালভূমি, কৃষ্ণবর্ণ, জলা-জঙ্গল-বিল ও কতকটা অস্বাস্থ্যকর, নাতিশীতোষ্ণ, এবং স্যাঁত-সেঁতে। দক্ষিণের এই পথ দিয়ে বিভিন্ন যাযাবর সম্প্রদায়, তাতার আক্রমণকারী, কসাক দস্যু, কালমুখ, ইত্যাদি বর্বর ও অসভ্য জাতিরা মস্কো জয় করতে যেত, এবং পথে পথে রক্তপাত, আগুন, ও লুটতরাজের কাহিনী লেখা হত! পুরো ইতিহাসে এই "কালামাটি" ছিল জনবিরল। তারপর ধীরে ধীরে মস্কো শক্তি সংগ্রহ করে, এবং এই ভূভাগে তারা এক শ্রেণীর "সামরিক গোষ্ঠী" এবং তাদের সঙ্গে সংখ্যাতীত 'ভূমিদাস বা Serf' সম্প্রদায়কে এনে বসায়। কিন্তু এর দ্বারা রাশিয়ার অপর একটি কলঙ্কের ইতিহাস নতুন ক'রে আরম্ভ হল! কেননা সামরিক গোষ্ঠী হয়ে উঠল মধ্যযুগীয় সশস্ত্র জমিদার গোষ্ঠী,—ছোট ছোট একেকটি রাজা,—এবং তাদের উৎপীড়নের সামগ্রী হল লক্ষ লক্ষ ভূমিদাস, যাদেরকে এর আগে আমি দাসানুদাস আখ্যা দিয়ে এসেছি! অথচ অন্যদিকে এই 'কালামাটি' ভূভাগ হল রুশ জাতির অন্নসংস্থানের ক্ষেত্র। অপরিসীম এর উর্বরতা এবং ফসলোৎপাদন শক্তি। মারামারি ও বিরোধ সেইখানে। বিপ্লবের বীজ ওখানেই অঙ্কুরিত হয়। কেননা অর্থনীতিই জীবননীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে! যারা মনে করে, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের "ডিসেম্‌ব্রিষ্ট" বিপ্লব, এবং ১৯০৫ ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব,—এইমাত্র তিনটি বিপ্লবই সংঘটিত হয়েছে, তারা ভ্রান্ত! রুশ সাম্রাজ্যে ২৫০ বছরের মধ্যে কম-বেশি ৫৭০টি 'জনবিপ্লব' সংঘটিত হয়েছে। এই সাম্রাজ্যের প্রতিটি রক্তবিন্দুর মধ্যে ছিল হিংসা, ঘৃণা, বর্বরতা, নীচতা, ক্রূরতা, শয়তানি এবং সর্বব্যাপী অসত্যতা। এই বিরাট ভূভাগের ঐতিহ্যে পাওয়া যায় নৈরাজ্যবাদ, ঈশ্বরবিদ্বেষ, নির্দয়তা, ধর্মান্ধতা, নীতিজ্ঞানহীনতা,—এবং মানবতাবিরোধী সর্বপ্রকার আত্ম-অপমান! দাঙ্গা, অরাজকতা, দারিদ্র্য, শোষণ, প্রবঞ্চনা, চুরি, ডাকাতি, এগুলি ছিল নিত্যকর্ম। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরেও সুদীর্ঘকাল ধরে জনঅভ্যুত্থান ঘটেছে, কেননা লেনিনের 'মাষ্টার প্ল্যান' হজম করতে সোভিয়েট ইউনিয়নের সময় লেগেছিল অনেক! বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে হিটলারের সৈন্যবাহিনী যখন উক্রাইনের ভিতর দিয়ে দৃঢ়পদক্ষেপে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন বহু অঞ্চলে সোভিয়েটবিরোধী জনঅভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু এর ইতিহাস বাইরে প্রকাশ করা হয়নি।

এই সুবিশাল 'কালামাটি' অঞ্চল এখন ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, 'ওরেল, কারস্ক, বেলগোরদ, ভরনেজ, লিপেটস্ক, তামবভ এবং বালাশভ' অঞ্চল। 'কালামাটির' ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে ওকা, সীম ও ডন প্রভৃতি নদ-নদী। এই ভূভাগে এখন খাদ্য, জুতো, তুলাজাত সামগ্রী, খড়িপাথর, রাসায়নিক পদার্থ এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি হয়! 'বেলগোরদ' নামটির শব্দার্থ হল, 'শ্বেতবর্ণ শহর'। ভরনেজ শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে, তখন তাতার তুর্কি ও যাযাবর দস্যুর হাত থেকে দেশরক্ষার জন্য এখানে একটি বৃহৎ দুর্গ নির্মাণ করা হয়। এই শহর এখন সমস্ত সংস্কৃতির কেন্দ্র। এটি 'ভরনেজ' নামক নদীর উপরে দাঁড়িয়ে। সম্রাট পীটার-দি-গ্রেট এখান থেকে দক্ষিণাপথে শত্রু প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতেন!

আমাদের বিমা[illegible] গতি যথেষ্ট দ্রুত নয় এবং [illegible]ঠিন। কিন্তু যত দক্ষিণ, ততই উ[illegible]র স্পর্শ! রৌদ্র এবার কিছু উজ্জ্বল, মেঘের সঞ্চার কিছু কম। এদিকে তন্দ্রা এসেছিল শ্রীমতী লিডিয়ার চোখে। কিন্তু 'কমিউনিষ্ট কর্তব্যনিষ্ঠার' প্রখর উদাহরণ তিনি! হোষ্টেস চা ইত্যাদি আনতেই তাঁর তন্দ্রা ছুটল, এবং তিনি তাঁর তহবিল থেকে ৫।৭টি আপেল, আঙ্গুর এবং মাংসের খাবার বার করলেন।

এই দুগ্ধরক্তিমবর্ণা জাত-রুশ নারীর মুখে চোখে আনন্দশ্রী দেখে একসময় ভারতীয় কৌতূহল জাগল। প্রশ্ন করলুম, আপনার চোখে অমন নীলাভা কেন?

আমি উত্তরের মেয়ে! ঠাণ্ডার দিকে আমাদের চোখ থাকে—তাই!

একটু সাহস পেয়ে আবার প্রশ্ন করলুম, এ যাত্রা কেমন লাগছে আপনার?

শ্রীমতীর মনে বোধ করি ঈষৎ উচ্ছ্বাস ছিল। তিনি হাসিমুখে একটু কাব্য করে বললেন, "as happy as a swan floating into the unknown blues"!

ঈষৎ বিস্ময়ে বললুম, কিন্তু এভাষা ত' কমিউনিষ্টের নয়!

লিডিয়া বললেন, but 'am a human being!

জলযোগাদির পর ওঁর চোখ আবার তন্দ্রায় জড়িয়ে এল। ভোর বেলায় উনি বলেছিলেন, আপনার যাবার আয়োজন করতে গিয়ে দু'রাত আমি চোখ বুজিনি! উনি নাকি প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টার বেশি ঘুমোন না!

আমরা ভল্‌গা এবং ওকা—এই দুই নদের অববাহিকার উপর দিয়ে ভাসছিলুম। এ অঞ্চলে রুশরা আসে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে! অতঃপর ষোড়শ শতাব্দীতে 'আইভান গ্রজনির' আমলে যখন কাজান ও অস্ত্রাখান অঞ্চল অধিকার করা হয়, তখন রুশরা এই ভূভাগে আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একদা এই ভল্‌গা নদ ছিল দুই বিরোধী পক্ষের মাঝখানকার ব্যবধান সীমানা। এপারে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত রুশ ওপারে সশস্ত্র তাতার এবং বিভিন্ন উপজাতির দল। এই বিশাল ভল্‌গা নদীর অপর নাম, "গ্রেট রাশিয়ান রিভার", এবং এর দুই পারে দাঁড়িয়ে রাশিয়ার অনেক ইতিহাস এবং অনেককালের ভাগ্য বারবার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে! একশ' বছর আগে ভল্‌গার পূর্বপার থেকে সাইবেরিয়া আরম্ভ হত। ওপারে তখনও জমিদার গোষ্ঠীর রাজত্ব তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করেনি, সেই কারণে এপার থেকে ভূমিদাসের দল ওপারে পালিয়ে বাঁচত! এই ভূমিদাসপ্রথার অবসান ঘটে ১৮৬১ সালে। আমাদের পদতলবর্তী ভল্‌গা নদ হল রাশিয়ার অর্থনীতিক প্রাণসূত্র। এই নদ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে কাস্পিয় সাগরে মিলেছে। এর দুই পারে যে বৃহৎ কয়েকটি নগর গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে কস্ত্রোমা, গোর্কি, কাজান, উলিয়ানভস্ক, কুইবিশেভ,সারাটভ, কামিশিন, ষ্টালিনগ্রাড, ও অস্ত্রাখান অতি প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণসাগরের অডেসা ও কাস্পিয় সাগরের অস্ত্রাখান—এই দুই বৃহৎ বন্দর-শহর সোভিয়েট অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের মস্ত ঘাঁটি। ভল্‌গার জলের সরবরাহ হয় প্রধানত উত্তরের তুষারলোকের বিগলন এবং শরৎকালের বর্ষাধারা থেকে। এ নদের দৈর্ঘ্য হাজার মাইলের মতো। এই

নদের দুই পারে এখন শতকরা ৯০ জন রাশিয়ান, কিন্তু আরও যে সব জাতি বাস করে তাদের মধ্যে 'মারি' হ'ল প্রধান,—তাদের নিজ রাষ্ট্র হল, মারি অটোনমাস রিপাবলিক। এরা ছাড়াও আছে তাতার, চুভাষ, উদমর্ত্, মর্দোভিয়ান ইত্যাদি। ভলগার বহু অঞ্চল পার্বত্য, অরণ্যময় এবং অনধ্যুষিত। এই ভলগারই মধ্য অঞ্চলে 'সিমবিরস্ক' নামক নগরীতে 'ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ' অর্থাৎ লেনিন একটি তাতার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এখন সেই নগরীর নাম, 'উলিয়ানভস্ক'।

রাশিয়ায় এককালে 'জার্মানদের' সমাদর এবং আধিপত্য ছিল প্রচুর। দু'শো বছর আগে সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের রাজত্বকালে 'ফর্মানজারির' দ্বারা আমন্ত্রণ জানিয়ে বলা হয় বিদেশীরা এসে যদি রাশিয়ায় তাঁদের এক একটি উপনিবেশ গড়ে তোলেন, তাহলে সম্রাজ্ঞী সুখী হন্। তাঁর এই আহ্বানে অনেকেই সাড়া দেয়, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসে! কিন্তু জার্মানরা আসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায়। তারা নিজেদের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে দক্ষিণ ভলগায় এক বিরাট উপনিবেশ গড়ে তোলে, এবং অনেকগুলি অঞ্চল তাদের হাতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে! শিল্পে, বাণিজ্যে, বিদ্যায়, নির্মাণকলায় তারা সর্বত্র উন্নতি করে। কালক্রমে এরাই 'ভলগা জার্মান' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অতঃপর রাশিয়ার সর্বত্রই এই 'ভলগা জার্মানরা' ছড়িয়ে পড়ে। এদের এক একটি বৃহৎ ভূভাগ দান করা হয়েছিল। এরা অর্থসাহায্য পেত। রাজস্ব দেবার হাত থেকে এরা অব্যাহতি লাভ করত, এবং সামরিক কাজের বাধ্যবাধকতা থেকে এরা মুক্ত ছিল! এদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতাও স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছিল। এইভাবে 'ভলগা জার্মানরা' একটি উন্নতিশীল, পরিশ্রমী এবং ধনবান জাতিতে পরিণত হয়ে ওঠে এবং বংশ পরম্পরায় এরা একটি জাতীয়তাবাদী 'জার্মান সম্প্রদায়' হিসাবেই রাশিয়ার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এরা কেবল ভলগায় নয়, বেসারাবিয়া, ককেসাস, উক্রাইন, অডেসা প্রভৃতি বহু অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে। এদের নিয়ে লেনিনের আমলে একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, এবং তার নাম দেওয়া হয়, 'ভলগা জার্মান অটোনমাস রিপাবলিক'। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের কালে এই প্রথম জাতীয়তাবাদী জার্মান সম্প্রদায়কে সাইবেরিয়ায় পাঠাবার কথা উঠেছিল, কিন্তু সেটি আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে নাৎসীবাহিনী সোভিয়েট ইউনিয়নকে যখন আক্রমণ করে, তখন রাতারাতি এই "জার্মান রিপাবলিকটি" ভেঙে দেওয়া হয়, এবং ৪ লক্ষ জার্মানকে নির্বাসনে পাঠানো হয়! মোট কত লক্ষ জার্মান সোভিয়েট ইউনিয়নে ছিল জানিনে, কিন্তু চারিদিকের লক্ষ লক্ষ জার্মান যারা সোভিয়েট নাগরিক এবং যারা বংশ পরম্পরায় স্ত্রী পুত্র পরিবারসহ সোভিয়েট ইউনিয়নকেই আপন মাতৃভূমি মনে করে, তারা কেউ দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা পায়নি। আজও সোভিয়েট নাগরিক হিসাবে প্রচুর সংখ্যক জার্মান আছে মস্কো, লেনিনগ্রাড, আর্কটিক, সাইবেরিয়া এবং মধ্য এশিয়ার বহু অঞ্চলে।

বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে জানা যায়, উক্রাইন ও অন্যান্য স্থলের 'জার্মানরা' নাৎসী সৈন্যদলের নানাকাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল এবং আরও যে কয়টি খণ্ডজাতি বা ককেশিয় উপজাতি ষ্টালিন-বিরোধী ছিল তাদেরকেও একপ্রকার সাংঘাতিক নির্দয়তার সঙ্গে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে নির্বাসিত করা হয়! এইসব খণ্ডজাতির কারও নাম "কালমুখ", কারও নাম "ক্রাইমিয়ান তাতার", কারও নাম "চেচেন-ইনগুশ", কারও নাম বা "কারাচে"। এরা ছিল চিরকালের দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতি, এবং অধিকাংশই গোঁড়া ও ধর্মান্ধ মুসলমান। কোনওকালে এরা বশ্যতা স্বীকার করেনি এবং এরা অতিশয় গর্বিত এবং স্বাধীনচেতা ছিল। এদের নিজেদের রাজা ও রাজ্যপাট ছিল, এবং এরা এককালে রাণী ক্যাথারিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল! এরা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধেও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ করে এবং তুড়ি মেরে 'কলেকটিভ ফার্মের' ব্যবস্থা উড়িয়ে দেয়! এদের নিজস্ব রাষ্ট্রের নাম ছিল, "চেচেন-ইনগুশ অটোনমাস রিপাবলিক"। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টালিন ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই রিপাবলিক এবং এর ৫ লক্ষ অধিবাসীকে একটি ফুৎকারে উড়িয়ে দেন্। শোনা যায়, "চেচেনরা" জার্মান আক্রমণকালে ১৯৪১-৪২ সালে জনৈক নব্য কবি হাসান ইসরাইলের নেতৃত্বে সর্বশেষবারের মতো ষ্টালিনের অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মিঃ খ্রুশ্চভ সেইসব বিস্মৃতপ্রায় এবং বিক্ষিপ্ত উপজাতির নিরপরাধ নরনারীকে চারিদিক থেকে ডাক দিয়ে তাদের যথাস্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন!

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারীর রাত্রে মিঃ খ্রুশ্চভ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি অধিবেশন উপলক্ষ্যে যে-গোপন ভাষণটি দেন্, সেইটির একস্থলে তিনি বলেন,

"(Stalin) practised brutal violence not only towards everything which opposed him, but also towards that which seemed, to his capricious and despotic character, contrary to his concepts. Stalin acted not through persuation, explanation and patient cooperation with people.... Whoever opposed ......was doomed to removal ......and subsequent moral and physical annihilation...."

"কালমুখ" নামক একটি খণ্ডজাতি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দক্ষিণ ভলগা ও কাস্পিয়ান সাগরের মাঝামাঝি অঞ্চলে যাযাবরদের মতো বাস করত। তারা জাতিতে ছিল বৌদ্ধ এবং মঙ্গোল বংশসম্ভূত। লেনিন তাদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। 'কালমুখ অটোনমাস রিপাবলিক' নামক একটি রাষ্ট্র তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং তাদের রাজধানী ছিল, 'এলিস্তা'। এদের একটি দল যোগদান করেছিল লাল ফৌজে, কিন্তু আরেকটি দল নাৎসীবাহিনীর সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন ছেড়ে পালিয়ে যায়! সম্ভবতঃ এই কারণেই ষ্টালিন উক্ত 'কালমুখ রিপাবলিক' এবং 'কালমুখ' সম্প্রদায়কে সোভিয়েট মানচিত্র এবং সোভিয়েট অভিধান থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেন! "ক্রাইমিয়ান তাতার" বলে যারা পরিচিত ছিল, তারা নাৎসীবাহিনীর চর বলে সিদ্ধান্ত হওয়ায় তাদেরকেও সম্পূর্ণ ধ্বংস ক'রে 'ক্রাইমিয়ান রিপাবলিক' নষ্ট করা হয়। ক্রাইমিয়া এখন উক্রাইনে।

আমাদের বিমান এবার ধীরে ধীরে নেমে এল 'ষ্টালিনো' নামক একটি কয়লা-কেন্দ্রিক নগরে। এখানে আধঘন্টার জন্য আমাদের ছুটি। শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, চলুন, একটু বাইরে ঘুরে আসি।

বাইরে রৌদ্রতপ্ত মাঠে এসে আমরা নামলুম। বাতাস তপ্ত এবং রুক্ষ। দূরে দূরে বন্য ঝাউ, চারিদিকের বর্ণ যেন ধূসর সবুজ। আমি আবার সেই উক্রাইনে প্রবেশ করেছি! এই শুষ্ক গরম বাতাস ও রৌদ্রে দাক্ষিণ্য বড় কম।

এই অঞ্চল খনিজসম্পদ প্রধান, এবং এটি 'ডনেৎস বেসিন'-এর অন্তর্গত। 'ডনেৎস বেসিন'কেই ছোট ক'রে বলা হয়, 'ডনবাস'! ষ্টালিনো শহরের কিছু দক্ষিণে মৎস্যপ্রধান সমুদ্র 'আজভ' সাগর। এই সাগর অতিক্রম ক'রে আমাদের বিমান প্রবেশ করবে উত্তর ককেসাস অঞ্চলে। এখানে অপর প্রধান নগরটির নাম হল, 'ভরশিলভগ্রাড'। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান অংশ হল কসাক জাতি। এই জাতির প্রধান কর্মকেন্দ্র 'রস্তভ-অন্-ডন' নামক বৃহৎ নগর।

উত্তর ককেশাসের একদিকে 'ডনবাস' খনি অঞ্চল, অন্যদিকে লেনিন ভলগা-ডন ক্যানাল। এই দুই বৃহৎ নদীর জল একত্র ক'রে যে 'ডাম' বা কৃত্রিম জলাশয় প্রস্তুত করা হয়েছে, তার আয়তন হল ৬০০০ বর্গমাইল। এই ভলগা-ডন ক্যানালের পূর্বপ্রান্তে 'বীরনগরী' ষ্টালিনগ্রাড বা 'ভলগোগ্রাদ' নগরী দণ্ডায়মান!

বিমান এবার ছাড়ল এবং আমরা প্যাঁটিল খুলে মধ্যাহ্ন ভোজনে ব'সে গেলুম। (ক্রমশঃ)

সত্যকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়—জ্ঞানের সত্য ও ভাবের সত্য। রিচার্ডস্ ভাষার আবেগময় প্রয়োগ ও জ্ঞানময় প্রয়োগের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করেছেন। তিনি কবিতার ক্ষেত্রে জ্ঞানের সত্যকে নিশ্চিতভাবে অনুসরণ করেন নি। তাঁর মতে, শিল্পকৃতিতে প্রযুক্ত সত্যের একমাত্র অর্থ হচ্ছে শিল্পকৃতির অন্তর্নির্বন্ধ বা যাথার্থ্য, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সত্য যেখানে বাস্তবতার প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলিত, সেখানে শৈল্পিক সত্য আন্তর-সংসক্তির বিষয়। আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের জীবনের প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে 'রবিনসন ক্রুসো'র বর্ণিত বিবরণের ঐক্যসন্ধানের মাঝে নয়, তার ঘটনাবলীর প্রতি আমাদের মনের উদগ্র কৌতূহলের মাঝে বিচিত্র বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতাই এই রোমাঞ্চময় কাহিনীর সত্য। প্রাগুপসংহার পর্যন্ত 'ডন কুইকসোট' অথবা 'কিং লীয়র' যাদের মনে গভীরভাবে সাড়া জাগিয়েছে ঐ রচনা দুটির পরিসমাপ্তির অপ্রকৃতত্ব তাদের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এ দিক থেকে সত্য অন্তর্নির্বন্ধ বা যাথার্থ্যের সমমূল্য এবং তা অভিজ্ঞতার অনুরূপ অথবা তার পূর্ণতাসাধনে তৎপর।

'রবিনসন ক্রুসো' বা 'কিং লীয়রে'র সত্য বস্তুধর্মী সত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বর্ণিত বিবরণের গ্রহণযোগ্যতার নির্ধারণকারী কাহিনীর সকল ক্রিয়া হচ্ছে মনোবৈজ্ঞানিক ক্রিয়া। 'কিং লীয়রে'র পরিণতি ভ্রান্তিপূর্ণ, কারণ তা নাটকের অবশিষ্ট অংশের বিরোধী। প্রকৃত মনোবৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার উন্নয়নের জন্যে অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন মানসাবস্থার মধ্যে এবং সেই মানসাবস্থা ও বিশ্বজগতের মধ্যে শৃংখলাস্থাপনের জন্যে সমগ্রভাবে নাটকটি অকৃত্রিম। তাই রিচার্ডস্ বলেছেন, 'কিং লীয়র' পড়বার সময় আমাদের কোনো প্রত্যয়ের প্রয়োজন নেই, কারণ প্রত্যয় বস্তুধর্মী সত্যের দাবীতে আমাদের সংসক্তি ও অন্তর্নির্বন্ধকে বাধা দেয় যাকে তিনি নাটকের ক্ষেত্রে একমাত্র সত্য ব'লে অনুমোদন করেছেন। এভাবে তিনি বিজ্ঞান ও কবিতার সংঘাতের মীমাংসা করেছেন, এটি যেমন তীব্র তেমনি নিপুণ। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, বিজ্ঞান ও কবিতার মিলনের কোনো সাধারণ ক্ষেত্র নেই, ফলে সংঘাত হ'তেই পারে না। এরা ভাষার মৌলিক বিভিন্ন কলাকে ব্যবহারোপযোগী করে।

'রবিনসন ক্রুসো'তে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা সে করতে পারে না, কারণ কাহিনীর গোড়ার দিকে তার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা গ'ড়ে উঠেছে তা এদের দ্বারা লঙ্ঘিত হয়। 'কিং লীয়রে'র পরিসমাপ্তিও নাটকের পূর্বতন অংশের সঙ্গে সুসমঞ্জস নয়। তবু একটি বিশেষ উপন্যাস বা নাটকের পূর্বগামী অধ্যায়ে বা দৃশ্যে বিধৃত বিষয়ের তুলনায় অধিকতর বিষয় আমাদের প্রত্যাখ্যানের মনোভাব গঠনে কার্যকর বলে মনে হয়; আমাদের প্রবণতা মানবজীবনের সঙ্গে সমগ্র পূর্ব-পরিচয়ের অভিমুখে এবং এর দ্বারাই আমরা প্রভাবিত হই। যখন আমরা এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ক্রুসো এ কাজ করতে পারে না তখন একান্তভাবে নির্ভর করি মানবিক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ধারণার ওপর। এ সব ধারণা সম্ভবত খুবই সাধারণ, তবে তারা নির্দেশ করে শিল্পকৃতির ব্যবহারিক সীমার বহির্ভূত জগতের প্রতি। এমন কি ঈশপের উপকথা, বা কাল্পনিক রূপকথা কিংবা বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের জগৎ আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে সকল সংযোগ ছিন্ন করে না।

রিচার্ডস্ জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে সৃজনী সাহিত্যকে পৃথক করেছেন। এখন, এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যদি বলা যায় যে, 'ম্যাকবেথ' স্কটল্যাণ্ডের অপদার্থ ইতিহাস সম্বন্ধে শেক্‌সপীয়রের পাঠকের উদ্বিগ্ন হবার কোনো প্রয়োজন নেই অথবা চাঁদের অধোপ্রান্তে তারার স্থাপনের মতো বিজ্ঞানের দিক থেকে অসম্ভব বিবরণ দ্বারা কোলরিজের পাঠকের বিশৃংখলিত হবার কোনো কারণ নেই, তবে সামান্য তর্কের অবকাশ থাকে। এই পর্যায়ে সাহিত্য ও ইতিহাস এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রভেদ নির্ণীত হয়েছিল গ্রীক ও রোমানদের দ্বারা। রিচার্ডস্ তাঁর মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত যুক্তির দ্বারা অধিকতর প্রগতিপূর্ণভাবে বলেছেন, কবিতা হচ্ছে সাহিত্যগত প্রলাপ, তবে তা বিশেষ মূল্যবান ও গৌরবময়। অ্যালেন টেট্ ও জন র‍্যানসম্ কিন্তু শিল্পের সত্যকে পরম ব'লে স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে, জ্ঞানের সত্যই যথার্থ সত্যের মর্যাদায় ভূষিত। তাই রিচার্ডস্ যখন শিল্পের ক্ষেত্র থেকে জ্ঞানের সত্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন তখন টেট্ ও র‍্যানসমের মতো সমালোচকের পক্ষে এর প্রকৃত কারণ নির্দেশ করা দুঃসাধ্য।

শিক্ষাদানের রীতি যে প্রকাশমান কবিতার অন্তরঙ্গ অর্থাৎ কবিতা যে এক ধরনের বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত—এই ধারণাকে এলিয়টের চেয়ে অধিকতর পূর্ণভাবে ব্যক্ত করেছেন অ্যালেন টেট্। কোনো কিছুর বিবরণই হচ্ছে কবিতা—উইন্টারের এই মতকে প্রত্যাখ্যান ক'রে টেট্ কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন, কবিতা হচ্ছে আপন সমগ্রতায় সম্পন্ন একটি ক্রিয়া। এই ক্রিয়া বিজ্ঞানের মতো পদ্ধতির কিংবা ধর্মের মতো পরিণামের চিরব্যবহারসিদ্ধ নয়। কারণ এখানে পাঠকের নিজস্ব সিদ্ধান্তের গুরুত্বও স্বীকৃত। তা'হলে একথা মানতেই হয়, নীতিবাদী কবি, আলংকারিক কবি প্রভৃতির ক্ষেত্রে সত্যের বিভিন্নতা রয়েছে। আপন বক্তব্যকে যথার্থভাবে উপস্থাপিত করাই সত্য। কিন্তু যদিও কবিতা একটি প্রমাণাতীত বিবরণী তবু টেট্ তাকে কল্পনাপ্রসূত মনোধর্মী উদ্ভাবন ব'লে স্বীকার করেন নি। তিনি বস্তুর ওপর আরোপিত রূপক-উপমা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, কারণ তারা বস্তু থেকেই উৎসৃষ্ট। কবি কোনো পূর্বনির্ধারিত রীতিতে তাঁর কথাকে সজ্জিত করেন না। তিনি তাঁর রীতিকে অভিজ্ঞতার ওপর স্থাপন না ক'রে অভিজ্ঞতায় অন্তর্নিরূঢ় প্রকরণকে উদ্ঘাটিত করেন। 'বস্তু থেকে উৎসৃষ্ট' এবং 'সমগ্র অভিজ্ঞতায় স্বয়ংসিদ্ধ' এই অলংকারসমৃদ্ধ বাক্যাংশ

দৃটির প্রকৃত অর্থ নিরূপণে সচেতন হওয়া উচিত। তবে প্রকল্পনা যে শুধু খেয়ালের সামগ্রী এই দৃষ্টিকে তারা নিশ্চিন্তভাবে অগ্রাহ্য করে; তাদের নিগূঢ় অর্থ হচ্ছে, প্রকল্পনা মানবিক মনে জটিল বিধির অনুসারী এবং সকল মানবিক অভিজ্ঞতাই চূড়ান্তভাবে একক।

টেট্ এ সব ধারণাকে এত বিস্তৃতভাবে বলেন নি। অনেকের মতে, মানবিক মনের চরম একত্ব যে বিশেষ বিশেষ কবিতার ভালো-মন্দের নির্ণায়ক বিধির মাঝে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হ'তে পারে এই দৃষ্টিকে তিনি প্রতিহত করেছেন। কিন্তু অবস্থায়ী মানবের মৌলিক একত্ব অতিক্রম ক'রে চলে অসংখ্য প্রভেদকে যা প্রাতিস্বিক মানবের মধ্যে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় ও সংস্কৃতিগত মানবের মধ্যে অনৈক্যের সীমারেখাটি অংকিত করে। এরকম একটি প্রতীতি বর্তমানে জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। সম্ভবত একে উজ্জ্বল বোধের আলোকে বিশ্লেষণ করা উচিত। কারণ যদি আমরা মোটের ওপর কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলতে প্রবৃত্ত হই তবে এটি প্রয়োজনীয় প্রতীতি হ'তে পারে। যদি আমরা একে গ্রহণ না করি তবে নানা প্রকারের সামাজিক ও ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার সরণীকরণের নামে আমরা অবশ্যম্ভাবীরূপে পরিত্যাগ করি কবিতার নন্দনতত্ত্বের প্রত্যয়কে।

এই নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে অথবা সজীব শিল্পকৃতির দিক থেকে বলা যায়, বিষয় ও ভঙ্গি পরস্পর পৃথক ও বিশ্লেষণীয়। শিল্পদৃষ্টি নিঃশেষে এত বেশি ঐন্দ্রিয়িক যে, নৈর্ব্যক্তিক শিল্পরূপে সূচিত হয়; অর্থাৎ রচনা তার আপন আন্তর-তত্ত্বের অনুসারে মূর্তি লাভ করে এবং তা লেখকের অহং-এর সৃষ্ট পদার্থমাত্র নয়, তাঁর অনুভূতির দ্যোতনা অথবা তাঁর মতের নিশ্চিত প্রকাশ। লেখক সকলের জীবনকে স্বকীয় সৃষ্টির মাঝে বিধৃত করতে চান; কিন্তু তাঁর শিল্পী-বিবেক তাঁকে প্রতিহত করে এবং তখন সামান্যের মাঝে যা অলোকসামান্য তাকে তিনি উজ্জ্বল ক'রে তোলেন নিগূঢ় নিরীক্ষায়। লেখক এই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে, তিনি মানুষের আশা নৈরাশ্য ভীতি পরিসমাপ্তি দ্বারা আন্দোলিত হবার চেতনা নন; তিনি এমন একটি সংবেদনশীল যন্ত্র যা অন্তরলোকের পরিসরে লিপিবদ্ধ করে সত্যকে।

যেহেতু অনুভূতির জীবন মানসাবস্থা ও এষণার প্রবাহ এবং যেহেতু জীবনসম্বন্ধীয় সকল মানসাবস্থার প্রকরণ হচ্ছে ঐন্দ্রিয়িক প্রকরণ, সেজন্যে যে-কোনো শিল্পকৃতিই মূলত ঐন্দ্রিয়িক। [illegible] অনু[illegible] জীবনের অধ্যায়কে যেন আমরা [illegible]ভূতির প্রত্যক্ষ অনুকরণের মতো একটি স্থূল রুচির সঙ্গে মিলিয়ে না ফেলি সেদিকে সচেতন থাকতে হবে। যেহেতু শিল্পী কোনো প্রত্যক্ষ অনুকরণকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেন না তাই তাঁর রচনায় যে-সব অনুভূতি দ্যোতিত হয় তাঁর বাস্তব জীবনে অভিজ্ঞতা দ্বারা তাদের লাভ করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি রচনার পর্বে পর্বে অনুভূতির নোতুন সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করতে পারেন। কারণ শিল্পকৃতি যদিও মনোধর্মিতার বৈশিষ্ট্যকে প্রকটিত করে তবু তা আত্মগতভাবে বস্তুধর্মী, এবং অনুভূতির জীবনকে প্রত্যক্ষিত করাই এর উদ্দেশ্য। কবিতা তখনই যথার্থ মূল্যবান যখন তা সম্পূর্ণরূপে দ্যোতক। কবিতার দ্যোতনার বিষয় হচ্ছে একটি মহৎ ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতা, ভাবের উদ্দীপনা, কবির স্বকীয় অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা ও ব্যাপকতা। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, মহত্ত্বে কি আসে যায়, পাঠকের কাছে ভাবটি যদি তুচ্ছ ব'লে প্রতিভাত হয় তবে কি একটা প্রকৃত প্রভেদের সূচনা হবে না? এর উত্তরে বলা যায়, ভাবের মহত্ত্বের জন্যে দুটি ক্রিয়ার প্রয়োজন; প্রথমত, ভাবটি কবির কাছে মহৎরূপে আবির্ভূত হবে; দ্বিতীয়ত, কবি তাকে আমাদের কাছে মহৎরূপে প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ কোনো ভাবকে যথার্থভাবে দ্যোতিত করতে না পারাই কবির অসফলতা। তবে পাঠকের কাছে ভাবকে মহৎ ব'লে প্রতীত করতে গেলে তাকে প্রকাশ করতে হবে জ্ঞানের প্রাসঙ্গিক আদর্শে।

এলিয়ট যাকে খাঁটি কবিতা বলেছেন তাতে ব্যবহৃত সাহিত্যগত রীতিকে, বিশেষ ক'রে সাহিত্যগত অধ্যাসকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর কবিতার ভাব সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না উঠলেও তাঁর সাহিত্যগত আঙ্গিক কবিচেতনার কাছে হয়তো সত্য, কিন্তু পাঠকের কাছে তা সত্য ব'লে প্রতিভাত নাও হ'তে পারে। তাছাড়া তাঁর কবিতা স্থানে স্থানে এত স্পষ্ট যে, দ্যোতনার কোনো পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না। কবিতার উপাদানের কোনো ভালো-মন্দ নেই, প্রাণময়তা বা নিষ্প্রাণতা নেই, বিষয়ের দিক থেকে উৎকর্ষ-অপকর্ষের প্রভেদ করা যায় না। কবি তাকে উদ্দীপনাপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ ক'রে তোলেন। কবির সত্যদৃষ্টির এখানে প্রাধান্য। এ কথা ঠিক, কোনো মহৎ শিল্পকৃতিই স্পষ্ট নয়, তাকে পূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত করা যায় না, এবং তা কখনোই পরম ও চিরকালীন সত্যকে নিশ্চয়তার সঙ্গে নির্দেশ করতে পারে না। একই রচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সত্যকে আবিষ্কার করা সম্ভব। যা শিল্পকৃতির মনোবৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা থেকে আমাদের স্থানান্তরিত ক'রে কবির স্বকীয় মানসিক প্রবণতার সম্মুখে উপস্থাপিত করে তাকেই বলতে পারি সত্য।

দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে শিল্পকৃতির ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। এ কথা নিশ্চিত যে, সত্য বা অসত্য নির্ধারিত হ'তে পারে একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ের দ্বারা, জ্ঞানময় বিবরণের দ্বারা। শিল্পকৃতি প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপস্থাপনের সঙ্গে সংসৃষ্ট নয়, জ্ঞান ছাড়া ভাষার অন্য ক্রিয়া রয়েছে। শিল্পকৃতি আবেগ অথবা মানসাবস্থাকে উদ্দীপিত করে। এদের সত্য নেই, তবে মূল্য আছে। তাছাড়া যখন বস্তু নান্দনিকভাবে বিধৃত হয় তখন তার সত্য বা অসত্যের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। রচনার সকল দিক আপন অন্তর-মাধুরীতে আমাদের অনুরাগকে কেন্দ্রায়িত করবার জন্যে মিলিত হয়। যদি রচনার শিল্পকলাগত সামঞ্জস্যের দিক থেকে আমাদের উপভোগ-নৈপুণ্যের পরিবর্তে প্রজ্ঞা অনুশীলিত হয় তবে দুটি যথার্থ প্রান্ত হচ্ছে গুরুত্ব ও তুচ্ছতা; সত্য এবং অসত্যের প্রসঙ্গ এখানে সম্পূর্ণ পরিবেশানুচিত। এই প্রভেদ নান্দনিকভাবে সংগত। এর আলোকে প্রতিটি ব্যক্তি অকিঞ্চিৎকর হাসির কবিতা থেকে শুরু ক'রে সফোক্লিস ও শেক্‌স্‌পীয়র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত রচনাধারা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব একটি মান গড়ে তোলেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, একটি রচনার গুরুত্বের অবস্থান কোথায়। মূল্যবোধের সমস্যা সত্যের সমস্যার মতোই জটিল। তবু আকৃতিগত, শিল্পকলাগত ও গঠনগত মূল্যে একটি লঘু ভাবের রচনাও একটি গভীর ভাববিষয়ক রচনার মতো সমৃদ্ধ হ'তে পারে। প্রকৃত তুচ্ছ রচনা প্রায়ই মহৎ সৃজন-নৈপুণ্য প্রকাশ করে। রচনার মূল্য তার উপস্থাপিত জীবনের সঙ্গে সংসৃষ্ট মূল্যের মাঝে নিহিত। যখন কয়েকজন লেখক সচেতনভাবে একই পথ অনুসন্ধান করেন তখন তা নান্দনিক

বিবেচনার দিক থেকে অপ্রাসঙ্গিক হ'তে পারে। রচনার ভাবধারায় প্রতীতি নিশ্চিতভাবে এর ক্রিয়াকে ক্রমবর্ধিত করে। কিন্তু সত্যের বিধি দ্বারা আমরা আবার ভাব থেকে শব্দে চ'লে আসি।

তিনটি প্রধান বোধের বিবেচনায় সত্য শিল্পকৃতির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। কারও প্রত্যয়ের সঙ্গে ঐক্যবিশিষ্ট সত্য শিথিলভাবে প্রায়ই স্বীকৃত হয়। ব্যাপকভাবে সংগৃহীত ও কদাচিৎ পরীক্ষিত অনুভূতি ও ভাবধারা রূপ লাভ করেছে সাধারণ বোধ থেকে সমাজ-সংহিতা পর্যন্ত বিভিন্ন শব্দে। এদের দ্বারাই বিশ্বজগৎকে দেখা যায়। এই শ্রেণীর অদ্যোতিত মতের সঙ্গে রচনা সুসঙ্গত হ'তে পারে; যেমন, এটি দ্যোতিত করে আবেগোৎপন্ন চিন্তাকে যা প্রতিটি হৃদয়ে সাড়া জাগায়। জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত সত্য প্রাচীনকাল থেকে সুপ্রচলিত অনুকৃতিবাদের ভিত্তিভূমি। সার্থক অনুকরণ থেকে স্বাভাবিক জীবন-চেতনার মধ্যে দিয়ে, প্রকৃতির সামনে বিধৃত মুকুরের মধ্যে দিয়ে যথার্থ প্রতীকের সংশ্রব পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। সাহিত্যের সত্য স্বয়ংসিদ্ধ, কারণ শিল্পকৃতি হচ্ছে সৃষ্টি, তা দলিল নয়। বিচ্ছিন্ন অংশকে একীভূত ক'রে, সকল মূল্যকে সংসক্তি ও সামঞ্জস্যের মাঝে বিন্যস্ত ক'রে সত্য গ'ড়ে তোলে একক শিল্পকে।

শিল্পকৃতি হচ্ছে মানবিক আত্মার কেতনস্তম্ভ। তা মানবের উচ্চাভিলাষ ও আদর্শের পথনির্দেশ করে। সুতরাং আমরা যদি শিল্পকৃতিকে দলিল ব'লে বিবেচনা করি তবে জীবনের ক্ষেত্রে সংঘটিত তথ্যের দিক থেকে কিংবা জীবনের প্রকৃত অনুকরণের স্বাভাবিকতার দিক থেকে নয়, মানবিকতার ক্রমোন্নতির মতো আদর্শের দিক থেকে তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার মর্যাদানুভব করব। তা'হলে শিল্পকৃতি জীবনসত্যের যথার্থতার মানদণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। বরং তা এমন মান প্রতিষ্ঠা করবে যার দ্বারা মানুষের ক্রিয়ার বিচার করা যায়। ফলে এই চিন্তাই দৃঢ়মূল হবে যে, শিল্পকেই জীবনের অনুকরণ করা উচিত। জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে ঐক্যসাধনের মাধ্যমে অথবা তার অনুকৃতির মাধ্যমে সাহিত্যের সত্য গ'ড়ে ওঠে। বাস্তবানুগ অনুকরণেই সত্যের জন্ম, কিন্তু বাস্তবের অনুকরণ শৈল্পিক সত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গত। প্রতিদিনের জগতে যা আমরা বিশ্বাস করি তা আমাদের কাছে অতি পরিচিত, সাহিত্যের জগতে যাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় তা আমাদের পরিবেশন করে নন্দনরস। প্রকৃতকে আমরা গ্রহণ করি যুক্তিকে পরিহার ক'রে। ভাবকে আমরা স্বীকার করি জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। এখানেই নিহিত রয়েছে সাহিত্যের সত্য।

কলারসিক

॥ তিনটি চিত্র প্রদর্শনী ॥

মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রায় একসঙ্গে কলকাতায় তিনটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি একক এবং একটি সম্মিলিত প্রদর্শনী। দুটি প্রদর্শনী চলছে ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে, অন্যটি চলছে পার্ক ম্যানসন্সের আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে।

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে প্রখ্যাত শিল্পী গোপাল ঘোষ দীর্ঘদিন পরে তাঁর সৃষ্টি-কর্মের চমৎকার নিদর্শন উপস্থিত করেছেন, এটাই এই তিনটি প্রদর্শনীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অ্যাকাডেমী ভবনের অন্য অংশে চলছে স্টুডিও সভ্যদের 'স্কেচ ক্লাবের' পঞ্চম বার্ষিকী সম্মিলিত প্রদর্শনী। আর আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারী আয়োজিত প্রদর্শনীর শিল্পী হলেন শ্রীসলিল ভট্টাচার্য।

॥ শিল্পী গোপাল ঘোষের প্রদর্শনী ॥

কলকাতার মানুষ যখন প্রায় একঘেয়ে ক্লান্তিকর, ইওরোপীয় চিত্ররীতির ভঙ্গী-সর্বস্ব প্রদর্শনী দেখতে দেখতে কিঞ্চিৎ বিরক্তিবোধ করছিলেন, তখন উল্লেখযোগ্য দু'একটি ব্যতিক্রমের সঙ্গে প্রখ্যাত শিল্পী গোপাল ঘোষ এসে তাদের সেই ক্লান্তি আর বিরক্তির হাত থেকে মুক্ত করলেন। শিল্পী গোপাল ঘোষের প্রদর্শনীর এই হলো ফলশ্রুতি।

প্রকৃতপক্ষে, শিল্পী গোপাল ঘোষ যে পঞ্চাশখানি প্যাস্টেলে অঙ্কিত চিত্র এবং চৌদ্দখানি স্কেচ এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করেছেন তার প্রত্যেকখানির সম্মুখে দাঁড়ালে একটি জিনিস সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সে জিনিস, শিল্পীর স্বধর্মনিষ্ঠা আর স্বদেশের জল-মাটি, আলো-হাওয়ায় বর্ধিত এক অনন্য শিল্পীমনের সজাগ উপস্থিতি।

গোপালবাবু এই প্রদর্শনীতে জলরঙ কিংবা তেল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত কোনো চিত্র এবার উপস্থিত করেননি। প্যাস্টেল, অয়েল প্যাস্টেলই ছিল এবার তাঁর চিত্রাঙ্কনের একমাত্র মাধ্যম। এটা খুব লক্ষ্যণীয় ঘটনা। আর একটি লক্ষ্যণীয় ঘটনা : তাঁর প্রতিটি চিত্রে বাঙলা দেশের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ যেমন করে খুঁজে পাওয়া গেল, এ-বছর কলকাতার অন্য কোনো প্রদর্শনীতেই তার সন্ধান আমরা পাইনি। তাহলে গোপালবাবু কি আধুনিক নন, সেকেলে শিল্পী? আমার কিন্তু এ-প্রশ্ন একবারও মনে হয়নি। বরং তাঁর ছবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে বারবার মনে হচ্ছিল, তথাকথিত আধুনিক শিল্পীরা একবার যেন দেখে যান গোপালবাবুর সৃষ্টিকর্ম। দেখলে বুঝতে পারবেন, ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভুলানো যায়, মন রাঙানো যায় না কোনদিন। অথচ, গোপালবাবু আমাদের চোখ ভুলিয়েছেন, মনও রাঙিয়েছেন। এই 'কম্যুনিকেশন'—এর অভাবই তো আধুনিক প্রতিটি শিল্পকর্মের সঙ্গে আমাদের মানসলোকের সেতুপথ রচনার সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গোপালবাবু যেগুণে সাফল্য অর্জন করেছেন সেই গুণগুলির প্রতি যদি অতঃপর আধুনিক বাঙালী শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তাহলে আমরাই খুশি হবো সকলের আগে।

আলোচ্য প্রদর্শনীর পঞ্চাশখানি চিত্রের মধ্যে তেত্রিশখানি ছিল নিঃসর্গ চিত্র। এর কোনখানিতে বাংলার গাছ-গাছালি, খেত-খামার, নীল আর ধূসর আকাশ আবার কোনখানিতে পল্লীর শান্ত-শ্রী, নদীর তীর, জলাশয়, ঘন জঙ্গল আর জীর্ণ বাড়ি আশ্চর্য বর্ণ-সুষমায় রূপায়িত হয়েছে। প্রত্যেকটি চিত্রের সংস্থাপন এবং রঙ প্রয়োগ এত নিখুঁত যে মনকে অভিভূত করে। বাংলা দেশকে যেন এই চিত্রমালার মধ্য দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন শ্রীযুক্ত ঘোষ। আর কী আশ্চর্য, কোনো চিত্রেই তথাকথিত 'অ্যাকাডেমিক' গন্ধ নেই একেবারে।

অন্য কতকগুলি চিত্র ছিল ফুল আর পাখি নিয়ে। কয়েকখানি ছিল নারীর বিভিন্ন ভঙ্গীর সুন্দর চিত্র। শ্রীঘোষের এই নারীরাও আধুনিকা নন। কোনটায় গ্রাম্য আবার কোনটায় অন্ত্যজ নারীর অন্তরঙ্গ রূপে ফুটে উঠেছে। কালি-কলমে আঁকা স্কেচগুলির মধ্যেও দক্ষ শিল্পীর নিপুণতার চিহ্ন বিদ্যমান। সব মিলে শিল্পী গোপাল ঘোষের এই প্রদর্শনী আমাদের মন যেমন জয় করেছে, তেমনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দানে এবং মৌলিকতায় তাঁকে বাংলার শিল্প-জগতেও দিয়েছে স্থায়ী আসন। প্রদর্শনীটির আয়োজন করায় আমরা ইয়ং আর্টিস্ট সোসাইটিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শিল্পী—গোপাল ঘোষ

॥ স্কেচ ক্লাবের প্রদর্শনী ॥

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর স্টুডিও গ্রুপের সদস্যরা মিলে যে, 'স্কেচ ক্লাব' গঠন করেছেন তার পঞ্চম বার্ষিক প্রদর্শনীতে ২৩ জন শিল্পীর ৬৫টি শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। তেল-রঙ, জল-রঙ, প্যাস্টেল আর কালি-কলমের মাধ্যমে অঙ্কিত হয়েছে চিত্রগুলি। অধিকাংশই স্কেচধর্মী চিত্র। স্কেচগুলির মধ্যে শিল্পী যোগেন চৌধুরী, মিলু ব্যানার্জি, প্রিয়গোপাল ভট্টাচার্য, অরুণ মুখার্জি, সেলিম মুন্সী, সজল রায়, সুচন্দ্রা রায়-ভাদুড়ানী নিঃসন্দেহে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তেল-রঙে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে গোপাল বসাকের 'হেডস্টাডি' (৩), তারাদাস চ্যাটার্জির স্কেচ (১০), টুটু লাহিড়ীর প্রতিকৃতি-চিত্র 'বুলু' (৩০), সজল রায়চৌধুরীর 'ফ্লুট-প্লেয়ার' (৫৫) ও সুবীর সেনের 'স্টাডি' (৬১, ৬৪) মোটামুটি মন্দ নয়।

জল-রঙের কাজ এই প্রদর্শনীতে বিশেষ কিছু নেই। একমাত্র সজল রায় ও কুমকুম মুন্সীর কয়েকখানি চিত্র দর্শক-মনকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। আমরা আশা করবো, 'স্কেচ ক্লাবের' সদস্যেরা তাঁদের শিল্প-চর্চায় বাংলার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবেন।
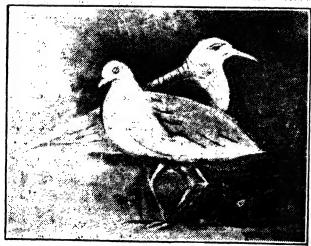
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(নয়)

'শ্রেণী' বা 'মিডল ক্লাস' বলতে যাদের বোঝায়, (বিত্তের দিক দিয়ে আজ যাঁরা 'মধ্য' থেকে 'নিম্ন'পানে দ্রুত ধাবমান), চাকরি নামক পরম বস্তুটি তাদের কাছে চিরদিনই দুর্লভ। সে-বাজারে বিদ্যাবুদ্ধির জোর যতই থাক বা না থাক, আসল মূলধন 'মামার জোর'। বিশেষ করে ইংরেজ আমলে সওদাগরী অফিসে সেটা ছিল অপরিহার্য। বিজন ব্যানার্জির ঐ সম্বলটি গোড়া থেকেই মজুত ছিল। বাপ ঢুকেছিলেন রেল কোম্পানীর ক্লেমস অফিসে এবং মুরুব্বীর খুঁটো ধরে বেশ খানেকটা উঁচুতেও উঠেছিলেন। তিরিশ বছর পরে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর হাতে প্রভিডেন্ড ফান্ডের মোটা টাকার চেয়েও বড় সঞ্চয় কয়েকটি শাঁসালো উপরওয়ালার নেকনজর। সেই জোরে বড় মেজো দুটি ছেলের পাকা ব্যবস্থা নিজের জীবদ্দশাতেই করে ফেলেছিলেন এবং তৃতীয় অর্থাৎ বিজনের বার্থটিও রিজার্ভ করে রেখে গেলেন। অপেক্ষা শুধু তার বি-এ ডিগ্রির। যথাসময়ে সেটি লাভ করবার পর মা এবং দাদাদের তরফ থেকে যখন তাগিদ এল, বিজন বলে বসল, 'এম-এ পড়বো'। দাদারা বোঝালেন, তাতে লাভ কিছু নেই। শুধু দুটি বছর এবং সেই সঙ্গে দুটি ইনক্রিমেণ্ট নষ্ট করা। কেননা, রেলের সাহেবরা 'ব্যাচেলর' এবং 'মাস্টার'-এর তফাৎটা ঠিক বুঝতে পারেন না। তা সত্ত্বেও বিজন নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইল।

এম-এ পাশ-এর ফল বেরোতেই আবার যখন তাকে সেই পুরনো কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, বিজন তখন 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন দেখে দেখে চোস্ত ইংরেজিতে দরখাস্তের মুসাবিদা করতে ব্যস্ত। মাথা না তুলেই সোজা জানিয়ে দিল, 'রেলে চাকরি করবো না।' সমস্ত পরিবারের মুখে শুধু বিস্ময় নয়, সেই সঙ্গে খানিকটা শোকের ছায়া নেমে এল। সবাই একবাক্যে রায় দিলেন, এ ছেলের কপালে দুঃখ আছে। তা নৈলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কেউ আলেয়ার পেছনে ছোটে? এ বাজারে এম-এ পাশের দাম কী? একটা পঞ্চাশ টাকার মাস্টারিও জোটে না। কথাটা মিথ্যা নয়। তবু বিজন পাল্টা প্রশ্ন তুলল, রেলের কেরানীর মাইনেও তো তিরিশ টাকা।

—আহা, মাইনেটাই তো সব নয়, বলে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করলেন বড়দাদা। প্রকাশ্যে বললেন, তাছাড়া ফিউচার প্রস্পেক্ট দেখতে হবে না?

—'ও চাকরি আমার ভালো লাগে না'। তর্কের পথে আর বেশী না এগিয়ে ঐখানেই দৃঢ় হাতে ছেদ টেনে দিল বিজন।

বছর খানেক ধরে দিস্তা কয়েক দরখাস্ত ছাড়বার পর সাড়া পাওয়া গেল সি পি অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের এক অখ্যাত শহর থেকে। নতুন কলেজ খোলা হচ্ছে; একজন লজিকের অধ্যাপক চাই। ফিলজফিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম নাম ছিল বিজন ব্যানার্জির। একশ টাকা তলবে ওকেই তাঁরা নির্বাচিত করেছেন। বাড়ি থেকে এল সমবেত বাধা। মা বললেন, রেলের চাকরি না করতে চাস, না করলি। তাই বলে, অত দূরে যেতে হবে কেন?

—কাছাকাছি তো কিছু জুটছে না।

—আজ না জোটে কাল জুটবে। জলে তো আর পড়নি।

বিজন সে অনিশ্চয়ের অপেক্ষায় বসে থাকা সমীচীন বলে মনে করল না। নাই বা থাকল সচ্ছলতার অভাব। তবু বেকার জীবনের মধ্যে কেমন একটা অমর্যাদা আছে, যার সূক্ষ্ম ধারগুলো উঠতে বসতে লাগে, বিশেষ করে যে পরিবারে আর দুজন কর্মক্ষম পুরুষ বসে নেই। তার চেয়েও একটা বড় কারণ ছিল, যা কাউকে বলা যায় না।

নির্মলা তার জীবনে বিগত হয়েও শেষ হয়ে গেল কই! চোখ বুজলেই দেখা যায় আজও সে বিক্ষত অন্তরের গভীর স্তর জুড়ে আছে। আনন্দের রঙে রঙীন, বেদনার রঙে রঞ্জিত। যে স্বপ্নের মায়ামাধুরী নিয়ে সে এসেছিল, যে বাস্তবের রূঢ় আঘাত দিয়ে সে চলে গেছে, কোনোটাই মুছে যায়নি। একদিকে দুটি প্রসন্ন নয়নের স্নিগ্ধ আলো, আরেকদিকে রুষ্ট চক্ষুর বিষাক্ত বহ্নি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তার চোখের উপর। কোনোটাকেই ভোলা যায় না, ভুলতে ইচ্ছা করে না। তবু ভুলতে তো হবেই। যে দ্বার চিরদিনের তরে বন্ধ হয়ে গেছে, বার বার তার উপরে করাঘাত করে কী লাভ? যে তার ছিঁড়ে গেছে, কোনোদিন জোড়া লাগবে না, তার একটা ক্ষীণ সূত্রকে জীইয়ে রাখা শুধু বিড়ম্বনা। কিন্তু লোভী অন্তরটার উপরে তার বিশ্বাস নেই। নিজেকে তাই অনেক দূরে এমন জায়গায় নিয়ে ফেলতে হবে যেখান থেকে ইচ্ছা করলেই ছুটে আসা যায় না। সান্নিধ্যে যে উজ্জ্বল, অম্লান, দূরত্বের দিগন্ত রেখায় সে

একদিন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাক, এই তার একমাত্র কামনা।

সন্ধ্যার পরে ট্রেন। বিকালের দিকে বিমলা দেওরের ঘরে এসে ব্যাগে নিয়ে যাবার জিনিসপত্রগুলো স্যুটকেসে গুছিয়ে দিচ্ছিল। খানিকটা দূরে বসে বিজন কোন এক বন্ধুকে চিঠি লিখছিল। বিমলা কণ্ঠে খানিকটা রাগত ভাব এনে বলল, একশবার করে বললাম, এর ওপরের সাইজটা নাও। না এতেই হবে। হলতো? গরিবের কথা বাসী হলে ফলে। এখন কী উপায় করি বল?

বিজন মুখ না তুলেই বিজ্ঞের মত গম্ভীরভাবে বলল, উপায় অত্যন্ত সহজ।

—যথা? কৌতুকের সুরে জানতে চাইল বিমলা।

—যেগুলো ঢুকছে না, স্রেফ বাদ দিয়ে দাও।

—বা, বা, বা! এই বুদ্ধি না হলে আর সংসার করবে কি করে?

—সংসার করতে যাচ্ছি নাকি? মৃদু হেসে বলল বিজন।

—তা ছাড়া আর কি? মা, ভাই, কাজ—এদের নিয়ে আর কদিন চলে মানুষের? চাকরি মানেই নতুন সংসারের পত্তন, নতুন মানুষের—কি বলবো?—আহ্বান।

—অন্যের বেলায় হয়তো তাই, কিন্তু আমার? আমার কথা আর কেউ না জানুক, তুমি তো জানো।

বিজন হয়তো চায়নি, তবু একটা উদাস সুরের করুণ রেশ নিয়ে বেরিয়ে এল কথাগুলো।

বিমলা হঠাৎ চকিত দৃষ্টি তুলে তাকাল দেওরের দিকে। মুখের উপর ফুটে উঠল গাম্ভীর্যের ছায়া, কণ্ঠের সে তরলভাবটিও রইল না। উঠে এসে ওর চেয়ারের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, জানি বলেই একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, ঠাকুরপো। তুমিই একদিন কোন প্রসঙ্গে ঠাট্টা করে বলেছিলে, প্রকৃতি শূন্য সইতে পারে না। কথাটা সত্যি। আমার মনে হয় মানুষের জীবনে আরো বেশী সত্যি। শূন্য নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। যা হল না, হতে পারে না, তাকে আঁকড়ে ধরে কে কবে সুখী হতে পেরেছে?

—সুখী হওয়া হয়তো সকলের ভাগ্যে নেই।

—ওটা মেয়েলী অভিমানের কথা। মেয়েরা ঐ বলে নিজেদের মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। তুমি পুরুষমানুষ, তোমার মুখে ওটা সাজে না।

বিজন চুপ করে রইল। বিমলা তিক্ত কণ্ঠে বলল, একজনাকে চেয়েছিলাম; পেলাম না। তাই বলে সারাজীবনটা হা-হুতাশ করে কাটিয়ে দিতে হবে! জীবনের চেয়ে বড় হল একটা মেয়ে!

'মেজো বৌমা!'—দরজার বাইরে থেকে শাশুড়ীর ডাক কানে যেতেই বিমলা সাড়া দিল, যাই মা। মাথার উপর থেকে আঁচলটা পড়ে গিয়েছিল, সেটাও তুলে দিল। তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, বিজুর খাবারটা তুমি নিজে হাতে গুছিয়ে দিও। টিফিনক্যারিয়ারের কোন বাটিতে কি থাকবে, ঠাকুর ওগুলো ঠিক পেরে উঠবে না।

—না মা; ওসব আমি ঠিক করে দেবো। এখনো দেরি আছে।

—ও, তুমি বুঝি বাক্স গোছাচ্ছিলে? সব দেখে শুনে দিয়েছ তো? স্যুটকেসটা বোধ হয় ছোট হয়েছে, বৌমা। ওতে কি সব ধরবে?

—না: এটাতে কুলোচ্ছে না। ওঁর স্যুটকেসটা এনে দিচ্ছি।

—তাই দাও। কাছের পথ নয়, যে কোনো কিছুর দরকার পড়লে কেউ গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বিজন ক্ষীণ-কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল, কী যে হবে এত সব লাটবহর টেনে নিয়ে? আমি বলছিলাম—

—তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। তুমি ওর কথা শুনো না বৌমা। যা যা দরকার সব দিয়ে দাও।

বিমলা ঘাড় নেড়ে সায় দিল এবং শাশুড়ীর অলক্ষ্যে দেওরের দিকে চেয়ে ভ্রূভঙ্গি দিয়ে জানিয়ে দিল—কেমন জব্দ! তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি স্যুটকেসটা নিয়ে আসি।

মা ছেলের কাছে সরে এলেন। সর্বাঙ্গে সস্নেহ দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, ওখানকার মত ওদেশে গরমের ছুটি আছে তো?

—তা বোধ হয় আছে। ওখানে তো আরো বেশী গরম।

ছুটি হলেই চলে আসবি। জ্যৈষ্ঠ মাসের সতরই একটা দিন আছে। আপাততঃ ঐটাই স্থির রইল।

বিজন বুঝতে পারলেও জিজ্ঞাসা করল, কিসের দিন?

মা সে প্রশ্নের জবাব দিলেন না, নিজের সঙ্গেই যেন আলোচনা করছেন, এমনিভাবে বললেন, এরপর ছুটি হতে হতে সেই পুজো। আশ্বিন মাস। তারপর বড়দিন, সেও পৌষ মাস। তারপর—না, অতদিন দেরি করা যায়

না। যত শীগ্গির হোক শুভ কাজ মিটিয়ে ফেলা দরকার।

বিজন এতক্ষণে কথা বলল, জ্যৈষ্ঠ্যি মাসে হবে না।

—কেন? মায়ের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

—ও সম্বন্ধে আমি এখনো মনস্থির করিনি।

—কেন, সম্বন্ধটা কেমনা হল কোনদিক দিয়ে? অমন চমৎকার মেয়ে, অত ভাল ঘর, দেখে শোনেও ভাল। সব দিক ভেবেচিন্তে কর্তা নিজে মুখে কথা দিয়ে গেছেন।

—জানি। সম্বন্ধ ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে আমি কিছু বলছি না। আমার আপত্তি বিয়ে নিয়ে। বিয়ে আমাকে করতে বলো না। আমি পারবো না।

মায়ের মুখে সহসা কোনো কথা যোগাল না। 'কেন'— এ প্রশ্নটাও জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না। বিস্ময়ে, ক্ষোভে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মিনিটখানেক পরে সুটকেস হাতে করে বিমলা ঘরে ঢুকতেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, শুনলে বৌমা? শুনলে কি বললে বিজু? আমার মুখের ওপর শুনিয়ে দিল, বিয়ে করবো না!

বিমলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ডান হাতে শ্বশ্রূকে জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে আকর্ষণ করে বলল, আপনি ওঘরে চলুন মা। অত উতলা হবেন না। ছেলেরা ঐ রকম বলে থাকে। আমি শুনছি কী বলতে চায় ও।

মায়ের দুচোখের কোল বেয়ে তখন অশ্রুধারা নেমে এসেছে। বললেন, আর কী শুনবে তুমি। ও আমাদের কিছুই চায় না, অত করে কাজ ঠিক করে গেলেন, নিলে না; মেয়ের বাপকে কথা দিয়ে গেলেন, তাও মানবে না! এই-জনাই কি এত কষ্ট করে, এত লেখাপড়া শিখিয়ে এতবড়টা করলাম!........বলতে বলতে দুচোখে আঁচল চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিন ঐ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা হয়নি। কিন্তু যাত্রার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সকলের মুখে যে গম্ভীর, থমথমে ভাবটা দেখা দিয়েছিল, সেটা শুধু বিচ্ছেদের বেদনা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষোভ ও হতাশা। অনুক্ত হলেও বিজনের কাছে তা অস্পষ্ট ছিল না। গার্ডসাহেব গাড়ি ছাড়বার বাঁশী বাজাতেই জানালায় মুখ বাড়িয়ে বিমলা ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল, চিঠিতে সব জানাবো। মাস-খানেক যাক, একটু গুছিয়ে বস। তার-পর।

পর পর কয়েকখানা দীর্ঘ চিঠিতে অনেক কিছু জানিয়েছিল বিমলা। তার জানি না। তোমরা যা ভাল বোঝ, কর— এই জাতীয় বিস্তৃত বর্ণনা। শুধু বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হবে, বৌদি তেমন পাত্র নয়। এই সব কিছুর মূলাধার যে তুমি-ই, এবং প্রতিকারের চাবিকাঠিও তোমার হাতে, বিমলা তার নিজস্ব ভঙ্গিতে এই অনুক্ত সত্য কথাটাও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করত। বিজনের অস্বীকার করবার উপায় ছিল

.....ভেবেচিন্তে কর্তা নিজে মুখে কথা দিয়ে গেছেন।

মধ্যে সবচেয়ে বেশী জায়গা জুড়ে থাকতেন মা। দিনদিন তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছে, যে সংসার ছিল তাঁর প্রাণ, তার থেকে একেবারে সরে দাঁড়িয়েছেন, সারা-দিন নিজের ঘরটিতে চুপ করে বসে থাকেন, লোকজন দেখলে বিরক্ত হন, কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেন, আমি কিছু না। মাকে সে জানত। বিজু তাঁর শেষ বয়সের সন্তান। স্বামী, তাকে মানুষ করে যেতে পারেননি; কিন্তু তার পথগুলো তৈরী করে রেখে গেছেন। ছেলেকে তারই উপর পা দিয়ে দিয়ে ছক-কাটা রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে হবে, এই-টুকুই তিনি জানেন। সেখানে এতটুকু হেরফের বরদাস্ত করতে পারেন নি তবু

ছেলের মুখ চেয়ে, ছকের বাইরে তার অনেকগুলো পদক্ষেপ তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তাকে এম-এ পাশ করতে দিয়েছেন, রেলের রাস্তা না ধরে কলেজের চাকরিতে ঢুকতে দিয়েছেন, বাড়ি-ঘর ফেলে, নিতান্ত বিনাকারণে একা একা দূর দেশে পাড়ি দেবার যে দুর্বুদ্ধি, তাতেও শেষ পর্যন্ত বাধা দেননি। কিন্তু স্বর্গত স্বামীর শেষ ইচ্ছা ও আদেশ এবং তার নিজের একান্ত মনের শেষ কামনাটুকু জেনে-শুনেও যখন সে পায়ে ঠেলে চলে গেল, পরলোকগত পিতার প্রতিশ্রুতির মর্যাদা পর্যন্ত রাখতে চাইল না, তখন সেই চরম আঘাত বুকে পেতে নেওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। এতদিন কোনরকমে দাঁড়িয়ে থেকে এবারে তিনি ভেঙে পড়লেন। তাঁর এই পরিণতি বিজনের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। শিশু বয়স থেকে সে অতিমাত্রায় মাতৃ-নির্ভর। সুতরাং দূরে থেকেও উদাসীন থাকতে পারল না. মায়ের কথা ভেবে ভেবে প্রবাসের দিনগুলো দুঃসহ হয়ে উঠল।

বৌদি জানিয়েছে, প্রতিকার তার হাতের মধ্যে। সেও জানে। শুধু একটা মুখের কথা—'আমি রাজী আছি'। বাপ-মায়ের মনোনীত এবং সমস্ত পরিবারের মনোমত পাত্রীটিকে গ্রহণ করলেই সব সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু গ্রহণ কি শুধু পাণিগ্রহণ? বহু আড়ম্বর-মুখরিত উৎসব সন্ধ্যায় বরাসনে বসে দেবভাষায় 'গৃহ্ণামি' 'গৃহ্ণামি' বলে পুরোহিতের প্রতিধ্বনি করলেই কি বলা হল—তোমাকে নিলাম? নিজের অন্তর সে জানে। সেখানে তো কোন আয়োজন নেই, উৎসব নেই, ঐ কথাটি মনে-প্রাণে বলবার জন্যে কেউ বসে নেই। একটি নির্দোষ, সরল, নিঃসন্দিগ্ধ মেয়ের সঙ্গে প্রতারণা করবার কী অধিকার আছে তার?

এই কথাটাই সে বিমলাকে লিখে জানিয়েছিল। উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গে। লিখল,—"ঠাকুরপো, তুমি অনেক লেখা-পড়া শিখেছ। তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। আমার বিদ্যের দৌড় তো জান। পাড়ার লাইব্রেরীর খানকয়েক বাংলা নাটক-নভেল পর্যন্ত। মনে পড়ে, তারই কোনো একটাতে পড়েছিলাম—মানুষের মন যেন নদীস্রোত। জীবনের ছোট-বড় সুখ-দুঃখ নৌকোর মত তার উপর দিয়ে ভেসে চলে যায়। কোনোটা দ্রুতগতি কোনোটা মন্থর। তারই মধ্যে দু'-একখানা হয়তো কদিনের জন্যে নোঙর ফেলে। কিন্তু থাকে না কেউ। পুরনো যায়, নতুন আসে। স্রোত কাউকে ধরে রাখে না। তোমার মনের যে নোঙর ফেলে বসে আছে, মনে হচ্ছে আর উঠবে না, সেও দুদিন পরে ভেসে চলে যাবে। যে আসছে, তাকে জায়গা দিতে হবে তো। এই নিয়ম। আমি তোমার চেয়ে অনেক বিষয়ে ছোট হলেও, বয়সে বড়, অভিজ্ঞতায় বড়। এটা আমার শুধু নভেল-পড়া বিদ্যা নয়, নিজের চোখে দেখেছি। আমার এই কথাটা তুমি মেনে নিও, ভাই।"

"সুরমার জন্যেও তোমার কোনো ভাবনা নেই। সে এসে তার পাওনা ঠিক বুঝে নেবে। তার জন্যে যদি দুদিন অপেক্ষা করতে হয়, করবে। মেয়েরা সব কিছুর জন্যেই তৈরী হয়ে আসে। তোমার মন এখনো 'বিমুখ' বলে তুমি ভয় পাচ্ছ। বিমুখকে উন্মুখ করবার চেষ্টাই তো মেয়েদের সাধনা। উদাসীনকে উৎসুক করে তোলাই তাদের ব্রত। উমার কথা পড়নি? দেবাদিদেবের মত শ্মশান-চারী বৈরাগীও তার কাছে হার মেনেছিলেন। তুমি কি শিবের চেয়েও অসাধ্য? মনে রেখো, সব মেয়ের মধ্যেই উমা আছে। সুরমাও একদিন জয়ী হবে।"

সকলের শেষে ছিল সব চেয়ে যেটা দরকারী কথা। "মার অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে চলেছে। আর দেরি করলে হয়তো তাঁকে আমাদের হারাতে হবে। সে দুঃখ কি সইতে পারবে? মাঘের গোড়াতেই দিন আছে, তোমার চিঠির অপেক্ষায় আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে দিন গুনবো।"

এর পর সেই সমবেত উৎকণ্ঠার নিরসন ছাড়া বিজনের সামনে আর কোনো পথ ছিল না। মাঘের প্রথমেই যে দিন ছিল, তারই এক শুভলগ্নে সকলের ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে সুরমাকে সে গ্রহণ করেছিল। মা যেন আবার নতুন জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। বহু ঘটা করে, সকলের সব সাধ মিটিয়ে প্রায় নিঃসম্বল হয়ে ছোট ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। সবাইকে একে একে ডেকে বলেছিলেন.
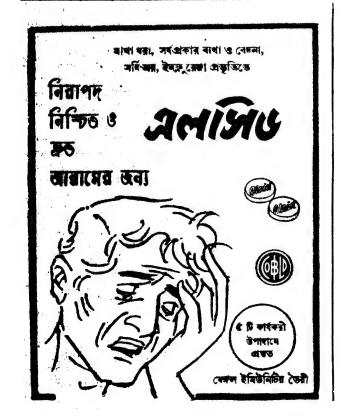
'এই আমার শেষ কাজ; বল তোমাদের কার কী ইচ্ছে।' কেউ চেয়েছিল গড়ের বাদ্য, কেউ জমকালো প্রসেশন, কারো ফরমাস ছিল বাঈজী নাচ। কোনোটাই তিনি অপূর্ণ রাখেননি।

লগ্ন শুভ হলেই কি তার ফল শুভ হয়? সব সময়ে হয় না। মঙ্গলানুষ্ঠানের সমাপ্তি-পর্বে মঙ্গলের আবির্ভাব ঘটবেই—একথাও জোর করে বলা যায় না। বিজনের জীবনে ঘটেনি। বাসর-সজ্জার মঙ্গল-দীপ নিবতে না নিবতেই তার লক্ষণ দেখা দিল।

ফুলশয্যার দুদিন পরে। এ পর্যন্ত সুরমার সঙ্গে তার একটি কথাও হয়নি। শুভরাত্রির নিভৃত শয্যায় সুযোগ আসেনি তা নয়, কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ এসে যেন তার মুখ চেপে ধরেছিল। হয়তো শুধু সঙ্কোচ নয়, তার সঙ্গে কিছুটা অপরাধবোধ—'জায়গা নেই জেনেও কেন একে ডেকে নিয়ে এলাম।' তার পরের রাত্রিতে আবার যখন দেখা হল, তখনো ঐ একই চিন্তার রেশ তার মন জুড়ে আছে—এই ফুলের মত মেয়ে; অন্য কারো হাতে পড়লে সুখী হতে পারত। আমি কেন সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালাম? নিজেকে বড় ছোট বলে হল, বড় স্বার্থপর। প্রাণপণে চেষ্টা করল, সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সহজভাবে দুটো কথা বলতে। প্রতিবারেই ব্যর্থ হল। প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল। বিস্তীর্ণ শয্যার আরেক প্রান্তে জড়সড় হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইল তার সুন্দরী শোভন-সজ্জিতা নবোঢ়া স্ত্রী। একটিবার তার ভীরু কোমল হাতখানি স্পর্শ করা হল না, কাছে ডেকে বলা হল না, শোনো। তারপর কখন গভীর অবসাদে জুড়ে এল চোখের পাতা। সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথম চোখ মেলে দেখল, শূন্য শয্যা খাঁ খাঁ করছে। কোথায় গেল সুরমা! ঘরের ও পাশটায় কার্পেটের ওপর কম্বল ঢাকা দিয়ে পড়ে আছে একটি কাপড়-চোপড়ের কুণ্ডলী। বিজন বিছানার উপর উঠে বসতেই, সেও ধড়মড় করে উঠে পড়ল এবং কোনো দিকে না তাকিয়ে শশব্যস্তে বেরিয়ে চলে গেল।

সে রাতটা ছিল শ্বশুরবাড়িতে জোড়ে আসবার পর দ্বিতীয় দিন। বিজন স্থির করে রেখেছিল, আজ যেমন করে হোক সব দৌর্বল্যকে কাটিয়ে উঠতে হবে। যা ঘটে গেছে, স্বেচ্ছায় হোক, বাধ্য হয়ে হোক যে সত্যকে মেনে নিতে হয়েছে, তার মুখোমুখী দাঁড়াবার মত সৎসাহস
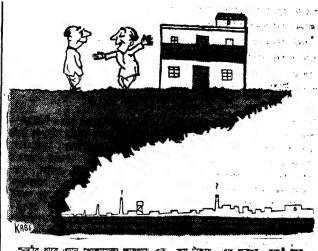
"নদীর ধারে এমন খোলামেলা জায়গায় এত কম টাকায় এত সুন্দর বাড়ী আর পাবেন না স্যার।"

তাকে অর্জন করতেই হবে। স্ত্রী বলে যাকে গ্রহণ করেছি, তার যোগ্য আসন যদি তাকে না দিতে পারি, সে অপরাধও কম নয়। বৌদি বলেছিল, মেয়েরা সব কিছুর জন্যে তৈরী হয়েই আসে। হয়তো তাই। তবু পুরুষকেই অগ্রণী হয়ে আহ্বান জানাতে হয়।'—এই সঙ্কল্প নিয়েই সে শয়নঘরে এসে ঢুকেছিল। কিছুক্ষণ পরেই সুরমা এল এবং স্বামী কিছু বলবার আগেই নিঃসঙ্কোচ পদ-ক্ষেপে এগিয়ে এসে নিজের মাথার বালিশটা টেনে নিয়ে সহজ ভাবে বলল, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি নীচে শুচ্ছি।

বিজন বিস্ময়ে মুখ তুলল, কেন?

সুরমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। কয়েক মুহূর্ত মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল, আপনার অসুবিধা হবে, তাই।

—অসুবিধা হবে! কে বললে?

—আমি জানি। এ বিয়েতে আপনার মত ছিল না। আপনার বাবা আমার বাবাকে যে কথা দিয়েছিলেন, সেইটে রাখবার জন্যেই বাধ্য হয়ে রাজী হয়েছেন।

বিজন স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবু বিয়ের উৎসব শেষ না হতেই সদ্য-পরিণীতা স্ত্রীর মুখ থেকে একথা শুনতে হবে, এটা তার কল্পনার বাইরে। সুরমা এক পলক ওর দিকে তাকিয়ে আবার বলল, আপনার মা এবং দাদা-বৌদিরা অনেক করে আপনাকে রাজী করিয়েছেন, তা-ও আমি জানি।

কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কী নির্মম বিরোধ! কী প্রত্যাশা নিয়ে সে আজ ঘরে এসেছিল, আর কী তাকে শুনতে হল! এই নিদারুণ আশাভঙ্গের আঘাতেই বিজনের মনটা বিবাক্ত হয়ে উঠল। সুরমার দিকটা ভেবে দেখল না। তিক্তকণ্ঠে বলল, তাই যদি জানতে, তুমি কেন রাজী হলে? বললেই পারতে এ বিয়ে আমি করবো না?

—'আমি!' দুটি বিস্ফারিত দীপ্ত চক্ষু স্বামীর চোখের উপর তুলে ধরল সুরমা, 'আপনি পুরুষমানুষ, হয়ে যা পারলেন না, আমি মেয়ে হয়ে তাই বলবো! কে শুনত আমার কথা?

ঠিকই বলেছিল সুরমা। কেউ শুনত না। তাকেই বরং শুনতে হত অনেক কথা। সবাই ছিঃ ছিঃ করত, নির্লজ্জ বেহায়া বলে তিরস্কার করতেন অভিভাবকেরা। 'এসব নাটক নভেল পড়বার ফল'— বলে, ব্যঙ্গোক্তি করতেন প্রতিবেশিনী প্রবীণার দল। তরুণীরা মুখ টিপে হাসত। যে পরিবারে তার জন্ম, যে সমাজে, যে সব আত্মীয়স্বজনের বেষ্টনীর মধ্যে সে বড় হয়েছে, সেখানে একটি অনূঢ়া মেয়ের মুখ থেকে এত বড় স্পর্ধার কথা শুনবার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। মেয়ে আবার বিয়ে করবে কি! তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। সে শুধু দত্তা, তৃতীয় পক্ষ মাত্র।

(ক্রমশঃ)

সেকালের কাঁসারীপাড়ার সং

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান কলকাতা আর সেকালের কলকাতায় অনেক প্রভেদ। কলকাতা শহর নানাভাবে বদলে গেছে। চারিদিকে প্রাসাদের পর প্রাসাদ নির্মিত হয়ে এক মহান প্রাসাদ-নগরী গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের পিছনে আছে অনেক ইতিহাস। পরিবর্তন খুব দ্রুতই হয়েছে, অবশ্য সে পরিবর্তন অনেক রূপে নিয়ে বদলে গেছে পথ-ঘাট। বদলে গেছে মানুষের রুচি। বদলে গেছে আমোদ-প্রমোদের বিষয়বস্তু। বদলে গেছে অনেক কিছু। সেকালে সিনেমা ছিল না। বর্তমানের মত এত রঙ্গশালা ছিল না। তাছাড়া সেকালে মাঠে মাচা বেঁধে মঞ্চ করে অভিনয়াদি এত হতো না। সেকালের মানুষ যাত্রা, পাঁচালী, কবির লড়াই, পুতুল নাচ আর সংয়ের মিছিল দেখে আমোদ-আহ্লাদ করতো। কলকাতার বিভিন্ন পল্লী থেকে সং-এর মিছিল বার হতো। উত্তর কলকাতার বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট থেকে যে সং বার হ'তো তাকে বলা হতো "কাঁসারীপাড়ার সং"। কাঁসারীপাড়ার পল্লীবাসীর উদ্যোগে ও বহু ব্যয়ে প্রতি বছর সং বার হতো। সেই সাথে পরিহাসাত্মক ও নানা রসোদ্দীপক ছোট ছোট নাটিকা অভিনয় করা হতো। তা' ছাড়া থাকতো গান ও ছড়া। উক্ত পল্লীর ৯০ বছর আগেকার সংয়ের মিছিলের সংবাদ যা ১৫ই এপ্রিল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের "হিন্দু পেট্রিয়ট" (The Hindoo Patriot) সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে তাই থেকে কতকাংশ মর্মানুবাদ লিপিবদ্ধ হলো।

"বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটের কাঁসারীগণ প্রতি বছর চড়ক পূজায় উৎসব করেন এবং শহরের জনবহুল দেশীয় মহল্লাগুলি দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে যান। শোভাযাত্রায় গায়ক, বাদক, ভাঁড় ও সং থাকতো। প্রায় দশ ঘন্টা ধরে এই শোভাযাত্রা দুই মাইল পথ প্রদক্ষিণ করতো। এবং এই তামাশা দেখতে বহু জনসমাগত হতো। এই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য ছাদে ও বারান্দায় লোকেরা ভীড় করতো। এই দৃশ্য দেখতে কোন মূল্যে লাগতো না। এবং আমরা আনন্দিত যে, চড়ক উৎসব সংক্রান্ত বর্বর প্রথাগুলির বিলোপসাধন করা হয়েছে। কিন্তু লোকরঞ্জক অনুষ্ঠানগুলি অব্যাহত আছে। এই বছরের আয়োজনটি সর্বোত্তম হয়েছিল।"

উক্ত সংবাদে আরও উল্লেখ ছিল যে—"কৌতুক ও শ্লেষ অবশ্য সর্বিশেষ ছিল কিন্তু তা'তে অশ্লীলতা কিছু ছিল না। অভূতপূর্ব রকমারি সংয়ের সমাবেশ ছিল। যথা—একদল যন্ত্রপাতি সমেত কূপখননকারী, জাঁকজমক পোষাকপরিহিত পারস্য দেশের আতর বিক্রেতা, একদল বস্তা সেলাই-ওয়ালা, একদল বিলাতী গোরাপল্টনদের

১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দের 'বসন্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যঙ্গ চিত্র।

ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রসহ বাদকের দল, দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের একটি দল, কাপড় কাচতে কাচতে চললো একটি ধোপা, তেল নিষ্কাষণে ব্যাপৃত কলু, প্রেমিকার সাথে আলাপরত একটি ধীবর, মস্করারত জেলে-জেলেনী, মোসাহেব পরিবৃত জনৈক লম্পটবাবু। সকলেরই মুখে যথোপযুক্ত গান ও ছড়া। এবং ঐ ছড়া ও গানগুলি নীতিগর্ভ ছিল। পৌরাণিক ঘটনাগুলিও বাদ যায়নি। যথা গোপিনীদের সাথে ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণ, গয়ায় পিণ্ডদান, কার্তিকের অর্চনা। কিন্তু প্রতি দৃশ্যই কৌতুকবিশেষ ছিল। আমাদের সমাজ-জীবনের কয়েকটি দিকও ব্যঙ্গের সাথে পরিস্ফুট করা হয়েছিল।

কুলীনের বিবাহদৃশ্যটি যথার্থ অপূর্ব হয়েছিল। ষ্টিফেন সাহেবের আইন অনুযায়ী বিবাহেরও একটি চমৎকার ব্যঙ্গচিত্ররূপের সং বার হয়েছিল। তাতে বর পাতলুন ও চাপকান পরিহিত। কনে পায়ে বুট জুতো ও নর্তকীর পোষাক পরিহিতা এবং বিবাহের পুরোহিত তিনি নিজেকে জগৎগুরু অথবা গুরুর গুরু আখ্যায় অভিহিত করেন। তিনি খড়ের শিরস্ত্রাণ (হেলমেট) পরিহিত ছিলেন। আমরা এই হেতু তাঁতে "কুশপুত্তল" (The man of straw) আখ্যায় অভিহিত করি। বিবাহ অনুষ্ঠানটি খুব সাধাসিধা ও কালোপযোগী ছিল। বর উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন যে তিনি হিন্দু নন, মুসলমান নন, খৃষ্টান নন, জৈন নন, বৌদ্ধ নন। এবং কনেও উক্ত প্রকার

ঘোষণা লাজসহকারে করেন। তারপরে তাঁরা পুরোহিতকে বলেন যে পরস্পরের পাণিগ্রহণ করতে প্রস্তুত। পুরোহিত যখন বললেন 'আমিন' (Amin) তখন বর-কনে করমর্দন করলেন।"......

কাঁসারীপাড়ার সং বার হতো উক্ত পল্লীর মহান পুরুষ তারকনাথ প্রামাণিকের উৎসাহে। আর একজনের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি হলেন তৎকালীন হিন্দু সমাজের মুখপত্র হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল। তিনিও কাঁসারীপাড়ার সং বার হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। . এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে কৃষ্ণদাস পাল লাট কাউন্সেলের সদস্যপদে নিযুক্ত থেকে স্বদেশবাসীর যথেষ্ট হিতসাধন করে গিয়েছেন। তাঁহার এক শ্বেত-প্রস্তরময় মূর্তি এখন মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড) ও কলেজ ষ্ট্রীটের সংগম স্থলে প্রতিষ্ঠিত আছে।

কাঁসারীপাড়ার সং প্রসঙ্গে শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ লিখিত "প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

"সং যাত্রা দেখিবার নিমিত্ত সাধারণের এরূপ আগ্রহ ছিল যে, সং বাহির হইবার বহু পূর্ব হইতেই রাজপথের সম্মুখস্থ বারান্দাগুলি দর্শনার্থি জনসংঘ কর্তৃক অধিকৃত হইয়া যাইত; ঐ সকল ভাড়া দিয়া গৃহের মালিকগণ প্রচুর অর্থ লাভ করিতেন। জনসমুদ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থান করিত।"

উক্ত গ্রন্থে সং প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করেছেন যে,—"প্রাচীন বঙ্গীয় প্রথার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক হিসাবেই তারকনাথ এই অনুষ্ঠানের পরিচালকপদ গ্রহণ করেন এবং ইহাকে লোকপ্রিয় করিবার নিমিত্ত আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন।"

কাঁসারীপাড়ার সংয়ের সাথে সেকালে বিশেষভাবে নির্মিত ঘোড়ার গাড়ী করে সংয়ের দল ও অভিনেতারা বিভিন্ন পথে ঘুরতো। সেকালে এই গাড়ীকে বলা হতো "কাটরা গাড়ী"। অর্থাৎ অশ্ববাহিত সুসজ্জিত কাটরা করে সং ঘুরতো। উত্তম বসন ভূষণে বিভূষিত অভিনেতারা যে সব অভিনয় দেখাতেন ও গান গাইতেন তা' রসাত্মক ও শিক্ষাপ্রদ সুন্দর দৃশ্য বলে গৃহীত হতো। ছোট ছোট নাটিকা ঘোড়ার গাড়ীতে অভিনয় হতো। যেমন শকুন্তলার নাটিকাবলম্বনে রচিত একটি পালা সেকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। উক্ত নাটিকার দুষ্মন্তের প্রতি শার্ঙ্গরবের উক্তি কিয়দংশ উল্লেখ করলাম—

"জয় জয় মহারাজ দুষ্মন্ত ভূপতি!
যশঃকীর্তি, আয়ুবৃদ্ধি,
ধর্মে থাক মতি!
ধর্মারণ্য-বাসী, পুণ্যরাশি, তপোধন—
মহর্ষি কণ্বের শিষ্য আমরা দুজন॥
অবধান, মহারাজ! তাঁহার আরতি—
শকুন্তলা কন্যা ধন্যা—রূপগুণবতী—
তাঁরে না জানায়ে তোমা ক'রেছে বরণ।
তথাপি হ'য়েছে তাঁর প্রীতির কারণ॥
—ইত্যাদি

উক্ত পালায় শকুন্তলার উক্তিঃ—

"হা বিধাতঃ! এই ছিল ললাট লিখন!
সরলা সরল মন, ভাবিয়া সরল জন,
সঁপিলাম প্রাণ-মন,
কে জানে যে সুধার্ণবে বিষের সৃজন!
অরণ্যের পূর্বরাগ, অনুরাগ এত!
ভাঙ্গিল স্বপন-ভুর, সব আশা হ'লো দূর,
আপন অদৃষ্ট ক্রূর,
সাধিয়া কাঁদিয়া হব মিছা মানহত!"
—ইত্যাদি

কাঁসারীপাড়ার সংয়ের আর একটি বিখ্যাত ছড়া হ'লো কৃষ্ণ-কালী বিষয়ে ছড়াঃ—

"শুনিয়ে মুরলি-ধ্বনি,
গৃহে হ'য়ে উদাসিনী,
বনে এলেন কমলিনী রাই।
কুটিলা তো দেখতে পেয়ে
কুটিল ভাবে অমনি ধেয়ে,
জানায় গিয়ে আয়ান ঘোষের ঠাঁই—
শুন বলি ওগো দাদা!—
তোমায় তো বানিয়েছে গাধা—
হারামজাদা বৌ এমন দেখিনে,
তোমার মাথায় ঘোল ঢালি,
বনে নিয়ে বনমালী,
রসের খেলা খেলছে সে নির্জনে।"
—ইত্যাদি

১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দের 'বসন্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যঙ্গ চিত্র।

উক্ত পালায় কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তিঃ—

"চেয়ে দেখ, বনমালি, হ'লো বিষম দায়—
আয়ান ঘোষের হাতে আজ
প্রাণটা বুঝি যায়—
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিবাদী ননদী মোর বাঘিনী,
ভাইকে নিয়ে আসছে ধেয়ে,
উপায় কি শ্যাম গুণমণি?"
—ইত্যাদি

অক্রূরের প্রতি কৃষ্ণের উক্তিঃ—

"শুন রাধে বিনোদিনি,
চিন্তা কেন কর ধনি,
উপায় করব আমি, হ'য়ো না উতলা।
ব্রজে তুমি রাইকিশোরী,
ছলেতে আয়ানের নারী,
গোলোকে গোলোকেশ্বরী, আপনি কমলা।
তুমি প্রিয়ে আদ্যাশক্তি,
ভব-ভয়ে কর মুক্তি,
আয়ানের কি আছে শক্তি,
তোমায় ভয় দেখাতে?
ত্যেজে রূপ-বনমালী,
আমি হই কৃষ্ণকালী,
তুমি দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি, বৈসহ পূজিতে।"
—ইত্যাদি

সেকালে কাঁসারীপাড়ার সংয়ের মুখ থেকে মুগ্ধ হয়ে পল্লীবাসীরা শুনতেন—দুজ'য় আনে কৃষ্ণের সন্ন্যাস গ্রহণ ভাবের ছড়া—সখীর উক্তিঃ—

"দেখ দেখ কমলিনি! কুঞ্জদ্বারে আসি,
দাঁড়ায়ে র'য়েছে এক নবীন সন্ন্যাসী;—
ত্রিশূল-ডম্বুর-ধরা; পরা বাঘ-ছাল,
ববম্ ববম্ ঘন বাজাইছে গাল;
ভাং ধুতুরায় ঘোরে আঁখি ঢুল ঢুল;
সর্বাঙ্গে বিভূতি, কর্ণে ধুতুরার ফুল!
"ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি"
ধীরে ধীরে বলে—
আহা! কথাগুলির ছলে যেন
সুধারাশি গলে!"
—ইত্যাদি

কাঁসারীপাড়ার সংয়ের প্রায় নব্বই বছর পূর্বেকার একটি গানের কিয়দংশ উল্লেখ করলামঃ—

"আজব সহর কলকেতা।
হেতা ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে,
বলিহারি সভ্যতা।।

হেরে এক নূতন হুজুগ
উঠেছে রে ভাই,
অশ্লীলতা শব্দ মোরা
আগে শুনি নাই;
এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা,
বঙ্গদর্শন এর নেতা।"
—ইত্যাদি

উক্ত গানের মধ্যে আরও উল্লেখ আছে—

"বৎসরান্তে একটি দিন
কাঁসারীরা যত,
নেচে কুঁদে বেড়ায় সুখে
দেখে লোক কত,
এতে গরীব লোকের আমোদ বড়,
সভ্যতার মাথা ব্যথা।।"
—ইত্যাদি

সং প্রসঙ্গে সেকালের পত্রিকা—"নব্যভারত" ১৩১০ সালের মাঘ মাসের সংখ্যায় উল্লেখ আছে যে—"প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে যদিও তখন বাণ-ফোঁড়া প্রচলিত ছিল না, তত্রাচ কাঁসারী-পাড়ার বাবু তারকনাথ প্রামাণিকের উৎসাহে কাঁসারীরা মহা উৎসাহে সঙের মিছিল বাহির করিত। সেই সময় মহাত্মা বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে কলিকাতার অনেকগুলি কৃতবিদ্য লোক ও খৃষ্টান পাদরী একটি অশ্লীলতা নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন; এই সভার অনুরোধে গভর্ণমেন্ট প্রকাশ্য পথে অশ্লীল সঙ্গীতাদি নিবারণোদ্দেশে দণ্ডবিধির প্রচার করায় ঐ মিছিল বন্ধ হইয়া যায়।"

উক্ত "নব্যভারত" পত্রিকায় আরও উল্লেখ আছে যে—"অমৃতবাজার পত্রিকার ন্যায় সংবাদপত্র এই সভাকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই।"

সেকালে সং-এর গানে অশ্লীলতা দোষ দেখিয়ে সং-এর মিছিল বন্ধ করার যে চেষ্টা হয়েছিল তা'র উল্লেখ আমরা পাই ১৩১০ সালের "নব্যভারত" পত্রিকায়। একদল যেমন অশ্লীলতা খুঁজে বেড়াতেন ঠিক তেমনি আর এক-দল সং-এর মিছিলে কোনরূপ অশ্লীলতা নেই তা' দেখানোর চেষ্টা করতেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে সেকালের মাসিক "বসন্তক" পত্রিকায় (১৮৭২—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের সংখ্যায়) যা' লেখা হয়েছিল। কিয়দংশ উল্লেখ করলামঃ—

"এক্ষণে সামান্য লোকের আমোদ-আহ্লাদ ও উৎসব তো সকলি একে একে শেষ হইতেছে। এক্ষণে যাত্রা নাই, পাঁচালী নাই, কবির তো কথাই নাই। সামান্য লোকেরা কি লইয়া থাকিবেন। কেবল ধান্যেশ্বরী। আর ছোবড়া টেনে কি দিনপাত হয়? সামান্য লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে এ সভ্যতা দেখান কেন?"

উক্ত পত্রিকায় আরও উল্লেখ আছে—

"কাঁসারীপাড়া দিয়া তো কাঁসারীদের সং বাহির হয়, সেখানে তো বাবু কৃষ্ণ-দাস পাল থাকেন, তিনি কি অসভ্য আর অশ্লীল?"

সেকালের কাঁসারীপাড়ার সং বারা-ণসী ঘোষের ষ্ট্রীট থেকে বার হয়ে বিভিন্ন পথে ঘুরতো। রাস্তা লোকে লোকারণ্য হতো বিশেষ করে চিৎপুর রোড ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

কাঁসারীপাড়ার সং প্রসঙ্গে যা সংগ্রহ করা হয়েছে তা' এখানে লিপিবদ্ধ হলো। এবার কাঁসারীপাড়ার পথ প্রসঙ্গে দু-চারটি কথা—

বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ইহা জোড়া-সাঁকো হতে আরম্ভ হয়েছে। এই পথের উপর এক প্রাসাদতুল্য ভবনে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বাস করতেন। মহা-ভারতের অনুবাদ করে সিংহ মহোদয় অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক "হুতোম পেঁচার নক্সা"। নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করে লং সাহেবের যখন জেল ও জরিমানা হয়, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ই তাঁহার জরিমানার টাকা প্রদান করেন। বারাণসী ঘোষ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের জামাতা। দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ। বারাণসী ঘোষ—কলকাতার তদানীন্তন কালেক্টার, আইন-ই-আকবরির অনু-বাদক গ্লাডউইন সাহেবের অধীনে দেওয়ানী করতেন। বারাণসী ঘোষের নাম হতেই পথটির নামকরণ হয়।

সেকালের কলকাতার ম্যাপে দেখা যায় যে, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট বেরিয়েছে চিৎপুর রোড থেকে। উক্ত পথটি এঁকে বেঁকে হ্যালিডে ষ্ট্রীট যা এখন সেন্ট্রাল (পরে চিত্তরঞ্জন) অ্যাভিনিউ অংশে পরিণত হয়েছে। উক্ত পথ পার হয়ে এসে পড়েছে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে। বর্তমানে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের দিকের অংশটি অর্থাৎ শ্রীমাণি বাজারের পাশ দিয়ে যে পথটি গিয়েছে সেই পথটির বর্তমান নাম তারক প্রামাণিক রোড। অর্থাৎ সেকালের কাঁসারীপাড়ার রাস্তা। এই রাস্তার প্রায় পূর্বপ্রান্তে তারকনাথ প্রামাণিকের ভবনটি অবস্থিত। কল-কাতার একটি ঐতিহাসিক ভবন। দরজা দিয়ে ঢুকে সামনে চোখে পড়ে প্রকাণ্ড উঠান আর ঠাকুরদালান। অতীতের বহু উৎসব ও পল্লীবাসীর বহু আনন্দ-উজ্জ্বল দিনগুলির স্মৃতি-চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

খোলা চিঠি

সুলেখা সান্যাল

কেমন করে মুখোমুখি হবো ভাবছিলাম। কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবো সেই মহিলাটির সামনে যিনি আজ ত্রিশ বছর ধরে তপতী নামে একটা মেয়েকে লালনপালন করেছেন। শোকদগ্ধ সেই প্রাণের সামনে কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবো এই কথাটাই যেন তপতীর চলে যাওয়ার শোকের চেয়েও বেশি করে আমাকে বিঁধছিল কাল থেকে কিন্তু আজ মুখোমুখি হ'তে গিয়ে অবাক হ'য়ে গেলাম। যা ভেবেছিলাম তাতো নয়— ভেঙ্গে পড়েননি তো। তেমনি আগের ভঙ্গীতে ঘর-সংসারের কাজ করে যাচ্ছিলেন। শোকটা ছিল, অভাবটা ছিল কিন্তু তাকে কোথাও জোর করে টেনে আনার চেষ্টা ছিল না।

তপতীর বাবা দুপুরবেলা খেয়ে বিশ্রাম করছিলেন, দরজা খুলে দিয়ে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কেমন নির্বাক বিস্ময়ে, তারপর স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'যাও, ও ঘরে তোমার মাসিমা আছেন।'

তপতীর মা তখন স্নান করে এসেছেন, গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বললেন, 'আয় জয়ন্তী, বোস।'

কেঁদে ভেঙ্গে পড়বেন ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম কেমন করে সহ্য করবো— কিছু করলেন না। শান্ত গলায় বললেন, 'ভাত খাবি?'

—'না মাসিমা, আমি যে এইমাত্র খেয়েছি। আপনি খান—আমি কাছে বসি।'

—'তবে আয়।' রান্নাঘরের শিকল খুলে একটা পিঁড়ি পেতে আমাকে বসতে দিলেন। নিজে একটা আসন পেতে থালায় ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসলেন স্বাভাবিক মানুষের মত।

আমার বুকের ভেতরটা এই নিঃসঙ্গতার প্রতিমূর্তিকে দেখে পুড়তে লাগলো, যখন নিস্তব্ধ দুপুরে এক শোকদগ্ধ মায়ের অসংখ্য স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত মুহূর্তগুলোর কথা ভাবতে গেলাম। পুড়তে লাগলো যখন আমার জানা আছে যে, মাসিমা কত একা, পুড়তে লাগলো যখন দেখলাম মাসিমা বাইরে স্থির কিন্তু ভাত তাঁর গলা দিয়ে নামছে না—থর থর করে কাঁপা হাতের ফাঁক দিয়ে সব ভাত ঝরে ঝরে যেতে লাগলো। কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেলেন। কত শক্ত আছেন তার অভিনয় করতে গিয়ে মাসিমা যেন হঠাৎ পার্ট ভুলে-যাওয়া নায়িকার মত হতাশ হ'য়ে থালার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর গেলাসের সব জলখানি পাতে ঢেলে দিয়ে বললেন, 'আজও পারলাম না—থাকগে।'

তপতীর পরে আরও দুটি ভাই-বোন আছে—একজন কলেজে পড়ে, একজন চাকরী করে। তপতীর বাবা ব্লাড-প্রেসারের রোগী। এদের সবারের পরিচর্যা শেষে ওর মায়ের নিস্তব্ধ দুপুরগুলো আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। বুঝলাম এমনি করে রোজ জল ঢেলে উঠে পড়েন, এমনি করে চুপ ক'রে থেকে থেকে একটা পোড়া তালগাছের মত হয়ে গেছেন। তপতীর ওপর এতক্ষণে রাগে-ক্ষোভে আমার সারা শরীর রি রি করে উঠলো, 'ছি ছি, যে মাকে তুই এত ভালোবাসতিস, যে মাকে তুই দেবীর মত ভক্তি করতিস, সে মায়ের কথা তোর মুখে ফুরোতে চাইত

মা—সে মাকে আজ কি করে রেখে গেলি তুই? কী সান্ত্বনা সঞ্চিত রেখে গেছিস?'

কাঁদছিলাম—মাসিমাই হাত ধরে আমাকে ঘরে নিয়ে এলেন। তপতীর একখানা নিজস্ব ঘর ছিল সেই ঘরই কিন্তু তপতীর কোনো চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে নেই। বিছানার চাদর থেকে শুরু করে টেবিলের বই কোথাও তার চিহ্ন নেই, দেওয়ালে তার যে ছবিখানা ঝুলতো—একটা সুন্দর ফুলের গোছার ক্যালেণ্ডার ঝুলছে সেখানে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনের কথাগুলো কেমন সহজে বুঝে নিলেন মাসীমা—, 'ভাবছিস, তপুকে এমন করে নিশ্চিহ্ন করেছি কেন—মা হয়ে?''

আমার চোখ দিয়ে আবার জল গড়াতে লাগলো। কিন্তু মাসিমা কাঁদলেন না। আমার মুখের দিকে ফ্যাকাসে ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে তাকিয়ে রইলেন একটু।' তারপর প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'তপুর কোনো স্মৃতিকেই আমি সইতে পারি না রে জয়ন্তী। ভয় হয় ওই স্মৃতি ধরে ও যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়—যদি আমার দিন-রাতের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আসে—যদি.........।"

মাসিমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে না তো? কেমন ভয় করতে লাগলো আমার—ভয়ে আর কষ্টে কান্না দ্বিগুণ হয়ে উঠলো।

মাসিমা আবার মুখের দিকে তাকালেন, কথা বললেন, মনে হ'ল কত কালের ক্লান্তি জড়ানো সে স্বরে। আর সে কথায়—সে জিজ্ঞাসায় আমার চোখের জল বন্ধ হ'য়ে বিস্ময় ফুটে উঠলো দু'চোখে।

"জয়ন্তী—বলতে পারিস তপতী মেয়েটা আসলে কেমন ছিল।" এ কি প্রশ্ন? আমার আর কোনো সন্দেহই রইল না যে মাসিমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঐ বাড়িতে কেউ তা লক্ষ্য করে না। জানি মৃতকে সবাই ভুলে যেতে চায়—ভুলে যায়, পারে না কেবল সেই একটা মানুষ—মা। তপতী যে মৃত তাই না কে বলেছে—কিন্তু এখনি তাকে এমনি করে ভুলে যেতে হবে! কেউ কি মাসিমাকে কাছে বসে একটু সান্ত্বনার কথাও শোনায় না নাকি মাসিমারই শোক প্রকাশের অবসর নেই তাই নিজের মধ্যে গুমরে গুমরে মাসিমা পাগল হ'য়ে যাচ্ছেন। দু'হাতে আমি মাসিমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম, বললাম, 'মাসিমা, তপুর কথা বলে আপনি একটু কাঁদুন—আমার সঙ্গে কাঁদুন—বুকটা হাল্কা হবে আপনার। এমন ক'রে চেপে থাকলে আপনার যে ক্ষতি হবে মাসিমা।"

তবু কাঁদলেন না, তেমনি জেদী গলায় বললেন, 'আগে বল্ তুই, তপতী কেমন মেয়ে ছিল?"

"আপনার চেয়ে আমি তাকে বেশি চিনি? সে যে আপনার নিজের জিনিস।"

—"না রে, নিজের জিনিস হলেই বা? বাবা-মা'ই বোধহয় ছেলেমেয়েদের চেনে সবচেয়ে কম—নইলে.........।"

—"তপু আপনাকে যে কত ভালো-বাসতো সে বোধহয় আপনিও জানেন না—আপনাকে ও দেবীর মত ভক্তি করত।"

—'কেন রে'?—মাসিমা কেমন অবাক হ'য়ে গেলেন যেন।

"তাতো জানিনে, কেবলই বলতো আমার মা আমার জীবনের পথ দেখিয়ে-ছেন অমন মা কারো হয় না।"
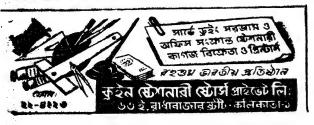
মাসিমা যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে কোন্ এক জগতে চলে গেলেন—আপন মনে বলতে লাগলেন, "বলেছে? বল্‌তো বুঝি এ-সব কথা তোদের কাছে? জয়ন্তী, তপু এ্যাডভেঞ্চার খুব ভালোবাসতো নাকি রে?"

"এ্যাডভেঞ্চার! তপুর মত শান্ত আর সহিষ্ণু মেয়ে—মাসিমা! এত তো আমার বন্ধু-বান্ধব আছে, অমন ক'রে সহ্য করতে, অমন ক'রে যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে মরেও সাহসের সঙ্গে নিজের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখতে আর কাউকে দেখিনি।"

হঠাৎ এতক্ষণ পরে কেঁদে-ভেঙ্গে পড়লেন মাসিমা, 'শান্ত, সহিষ্ণু! মিথ্যে কথা রে—মিথ্যে কথা। ওর মতো নিষ্ঠুর, ওর মতো অত্যাচার আর কোনো মেয়ে মায়ের ওপর করেছে কিনা জানি না। জানিস, ও কি করেছে? তোর বন্ধু তপু সমস্ত টাকা-পয়সা আমাকে উইল করে দিয়ে গিয়েছে। জানিস ত্রিশ-বছরের নিজের জীবনের সবখানি জ্বালা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সে চলে গেছে—নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাকে যে আমি শেষবারের মতও একবার দেখতে পাইনি।"

তপতীর পুরানো সব স্মৃতি আমার মনে ভিড় করে আসছিল, বললাম, "মাসিমা, মহীতোষ ওর জীবনটা যদি এমন ক'রে নষ্ট না করে দিত—ও জীবনের মানে হয়তো এমন ক'রে হারিয়ে ফেলতো না।"

কানে হাত চাপা দিয়ে মাসিমা বললেন "বলিস্‌নে, বলিস্‌নে,—ও নাম উচ্চারণ করিসনে। উঃ আমি যে মা—মা হ'লে.....।" হঠাৎ স্থির হ'য়ে চোখের জল মুছে ফেলে মাসিমা বললেন, "জয়ন্তী, তোকে একটা জিনিস দেখাই—তুই পড়ে বল আমাকে, বুঝিয়ে দে। আমি খুলে পড়তে পারিনি—ভয় হ'য়েছে আমার—কি ভয়ঙ্কর কথা ওখানে লিখে রেখে গেছে ও কে জানে—আমি সইতে পারবো না হয়তো। আজই দুপুরে খুঁজে পেলাম ওখানে......।"

বড় বড় ফুলস্কেপ কাগজের কয়েকটা পাতা ভাঁজ করা একটা খামের মধ্যে—কার্বণ কপি করা। মনে হয় আসল কপিটাকে কোনো কাজে লাগিয়ে কার্বণ কপিটাকে রেখে দেওয়া হয়েছিল—তপতীরই হাতের সেই বাঁকা বাঁকা লেখা—

মহীতোষ,

যেদিন তুমি বিদেশ যাবার ছাড়পত্র পেলে আমি তোমার বুকে মুখ রেখে কাঁদছিলাম—কাঁদছিলাম সুখে, গর্বে।

আমার একেবারে ঠিক হয়ে যাওয়া বিয়েটা কেমন তছ্‌নছ্ ক'রে দিয়েছিলে

তুমি সেকথা সেদিন আমার আবার মনে পড়েছিল। অথচ তুমি আমাকে চাও একথা আগে নাকি কখনই তোমার মনে হয়নি। দুজনে পাশাপাশি কাজ করলাম, চলাফেরা করলাম, হৈ চৈ করলাম, জলসা করলাম। অফিসের উৎসবে দিনের পর দিন নাটকের মহড়া দিলাম, দুজনে প্রধান নায়ক-নায়িকা হ'লাম তখনও তোমার কিছু হ'ল না—আমার যদিওবা কিছু হ'য়েছিল কিন্তু তোমার কাছ থেকে সায় না পেয়ে তাকে আমিও আমল দিলাম না। কারণ তোমার যদি কখনও একথা মনে না হয় যে এ মেয়েটা ছাড়া আমার চলবে না, আমারই বা কেন একথা মনে হবে যে তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না—আর তাই নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না তাও আমার ধাতে নেই। তাই বাবা যখন তাঁর পিতৃত্বের অধিকারে আমাকে সংপাত্রস্থ করতে গেলেন আর ছেলেটাকে দেখে যখন আমার খারাপ লাগলো না আমি কেনই বা বিয়েতে অমত করবো? আমি খুশী হয়ে বৈঠকে এসে বিয়ের খবর দিলাম, মেয়েরা আমাকে ঘিরে ধরলো নানা প্রশ্নে, ছেলেরা অভিনন্দন জানালো—তুমি উঠলে সবায়ের ওপরে, চেঁচামিচি করে এক হুলুস্থুল কাণ্ড বাধালে। আমার টাকায় সন্দেশ এলো, চা এলো। হঠাৎ কি হ'ল একটা সন্দেশ আধখানামাত্র খেয়ে তুমি প্লেট সরিয়ে দিলে—আমি দেখলাম কেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগলে বারে বারে।

বৈঠক হ'য়ে গেলে রাস্তায় নেমে আমার সংগে সংগে এলে, বললে "তপতী, শুনুন।

আমি বললাম, কি বলুন?

"চলুন, ঐ চায়ের দোকানটায় গিয়ে বসি।"

"চা যে খেলেন এইমাত্র।"

"চলুন না—কথা আছে।"

কেবিনের পর্দা টেনে দিয়ে প্রথম কথা তুমি বললে, "আপনার যার সংগে বিয়ে হ'চ্ছে সে বেশ ভালো ছেলে না?"

"হ্যাঁ, মোটা মাইনে পায়, গান গাইতে পারে শুনেছি।"

"দেখতে বেশ সুন্দর না?"

"মন্দ না—আপনার কিম্বা আমার চেয়ে সুন্দর।"

"আপনার এ বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে কেন?"

"বারে! ইচ্ছে না হবারই বা কি আছে? বিয়ে তো একদিন করতেই হবে—তাছাড়া বাবা-মা সবাই এতে খুশী হবেন। বিয়ে করবো না এমন প্রতিজ্ঞা তো আমার নেই।"

"না, শুনুন," হঠাৎ আমার হাতের ওপর হাত রেখেই আবার সরিয়ে নিলে সে হাত, "এমন করে সাধারণের মত কেন হবেন আপনি? এ বিয়েটা ভেঙে দিতে পারেন না?"—কাঁপা কাঁপা হাতে তুমি একটা সিগারেট ধরালে—তোমার গলার স্বরও কাঁপছিল, তবু আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ভেঙে দিয়ে তারপর?"

"তারপর"—তোমার মত ছেলেও আর চোখ তুলে তাকালে না আমার দিকে "তারপর লড়াই—বাড়ির সংগে, জীবনের সংগে। সেখানেই তো জীবন—আমি আছি আপনার পাশে।"

আমি অবাক চোখে তাকালাম—বুঝতে চেষ্টা করছিলাম তোমাকে, তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলে—"বুঝতে পেরেছেন? নতুন করে কাছে যাবেন? কে আপনাকে বাধবে? তাছাড়া আমি—আমি পারবো না—আগে বুঝিনি—এখন বুঝতে পারছি"—বলে অপরাধীর মত ম্লান হাসি হাসলে।

সে হাসিতে কী ছিল জানি না—আমার সব অন্যরকম হ'য়ে গেল। তারপর কত কথা হয়তো আমরা বলেছিলাম কিম্বা কিছুই বলিনি, কিন্তু একটা জিনিস মনের মধ্যে গাঁথা হ'য়ে গেল—তোমার হাসিটা! আমার আগেকার মত প্রকৃতি আর মেনে নেওয়াকে আমি অপরাধীর মত যেন বিসর্জন না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি পেলাম না। একটা এ্যাড-ভেঞ্চারের লোভ যেন আমাকেও পেয়ে বসলো। আমি বাড়ি এসে বিয়ে ভেঙে দিতে বললাম। যত সহজে কথাটা বলতে পারছি ব্যাপারটা কিন্তু তত সহজে হয়নি। একটা প্রচণ্ড চীৎকারের মত, একটা উৎপাতের মত আমার সমস্ত কথাগুলো যেন সংসারের ওপর ভেঙে পড়লো। সেদিন আমার মায়ের চোখের জল পড়েছিল, বাবার ব্লাডপ্রেসার কতটা বেড়েছিল তার খোঁজ আমি রাখিনি, কারণ আমি চাকুরে মেয়ে। বাবা-মার মধ্যে হয়তো একটা গোপন সন্ধি হয়েছিল—আমাকে এজন্যে একটা কড়া কথাও তাঁরা বলেননি। কখন একসময় নিঃশব্দে বিয়েটা তাঁরা ভেঙে দিয়েছিলেন—কখন একসময় নিঃশব্দে সমস্ত ব্যাপারটার ওপর যেন যবনিকা প'ড়ে গিয়েছিল তার খোঁজও আমি রাখিনি। এ বাড়িতে বিয়ের সম্বন্ধে আর কোন কথাই উঠলো না—বাবা আমাকে ডেকে একটা কথাও বললেন না কিন্তু তাঁর ব্যবহারে একটা জিনিস তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন—তোমাকে তিনি পছন্দ করেন না। পুরুষের ইনটুইশান দিয়ে হয়তো কিছু বুঝেছিলেন তিনি—কে জানে! বাবা না করুন কিন্তু মা তো আছেন। তোমার কথা আমিই তাঁকে ব'লে ব'লে তাঁর মনের মাটিটাকে ভিজিয়ে তুলেছিলাম। তুমি দেখতে সুন্দর নও কিন্তু তোমার অন্তরের রূপের তুলনা নেই—তোমার আত্মীয়-স্বজন চাল-চুলো নেই, কিন্তু তুমি অমিত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মেছো—এসব কথা ব'লে ব'লে আমি মায়ের মনের জমিটিতে বীজ বুনেছিলাম আর তারই ফাঁকে ফাঁকে নিজেরই কল্পনার জালে নিজেকে জড়াচ্ছিলাম, তোমার সব কিছুকে ভালোবাসতে শুরু ক'রেছিলাম। ক্রমে মায়ের সেই মনের ভিজে জমিতে তোমার পদক্ষেপ সহজ হ'য়ে উঠতে লাগলো—তোমার সংগে আমার সম্পর্কটা আর আমার বোঝানোর অপেক্ষায় রইল না। এমনকি বাবা পর্যন্ত সহজ হয়ে উঠলেন যখন, এমনি একদিনে তুমি আমাকে একটা কথা বলেছিলে—বলে খুব হেসেছিলে। মজা লেগেছিল আমারও, আমিও হেসেছিলাম, তারপর

দু'জনেই হৈ হৈ ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ে সব কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

তুমি বলেছিলে, "আসলে কি জানো? একটা মজা করা গেল আর কি। তুমি যদি সেদিন অমন হঠাৎ বুকে ফুলিয়ে, খুশী হয়ে বিয়ে করার কথাটা না বলতে তাহ'লে হয়তো আমার কিছুই হ'ত না। কিন্তু যেই দেখলাম এ বিয়েতে তোমার বেশ মত আছে—তুমি খুশী, ছেলেটা বেশ ভালো, ওমনি আমার মাথায় ভূত চাপলো। তোমাকে অন্য লোকে পাবে এ আমার সহ্য হ'ল না—ক'রে ফেললাম একটা এ্যাডভেঞ্চার।"

"এ্যাডভেঞ্চার। যদি আমি রাজী না হ'তাম তোমার কথায়?"

"আরে এ্যাডভেঞ্চারের তো তাই নিয়ম—মোটামুটি একটা পথ ভেবে নিয়ে তো ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়—সফল না হলেই বা! ওটাই তো মজা।"

তোমার এ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ আমাকেও পেয়ে বসেছিল। কিন্তু সেই এ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে যখন মাঝে মাঝে মদ খাওয়াটাকেও তুমি যোগ করে বসতে আমার বাঙালী মেয়ের মন একেবারে বেঁকে বসতো, আর তুমি কেবলই বলতে, "ধোৎ, তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না। এই সামান্য ব্যাপারে এত কাণ্ড করতে পারো তোমরা। কতটুকু খেতে পাই আমরা বল—কি মাইনে পাই—কতটুকু আমাদের প্রাণ? ভয়ে ভয়ে বারে ঢুকবো —মেপে এতটুকু খাবো, ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে আসবো তাও বাধা দেবে?"

আমি ভারী বিস্মিত হ'য়ে বলতাম, "তোমাদেরই বা কি সুখ হয় বল? ওটা তো আমাদের না হ'লে চলে না এমন নয়—। শীতের দেশের লোকেরা খায়—সে আলাদা কথা। সেখানে গিয়ে খাও প্রয়োজনে—কিছু বলবে না কেউ।"

"আঃ," তুমি চমকে উঠতে, "আঃ, কোনোদিন যদি যেতে পারতাম সেখানে—আমার জীবনের সব আকাঙ্ক্ষাগুলো পূর্ণ করে নিতাম। জানো কি করতাম?"

আমি মাথা নেড়ে বলতাম, "না, শুনতে চাই না—যে ভাবনায় আমি নেই সে ভাবনা আমি শুনবো না।"

তুমি জোর করে আমার হাত চেপে ধরে সামনে বসিয়ে বলতে, "শোনো, শুনতেই হবে তোমাকে। আচ্ছা তৃপতী? তুমি একটুও এ্যাডভেনচারিস্ট নও কেন? ভাবো তো—বাইরে বরফ পড়ছে—আমি ওভার কোটে সর্বাঙ্গ ঢেকে মোটা জুতোয় বরফ মাড়িয়ে মাড়িয়ে রাস্তা চলেছি। বাইরেটা অসহ্য ঠাণ্ডা, বাসায় ফিরে কোট থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে বরফ ফেলছি—টুপি থেকে ফেলছি, তারপর মদ খেয়ে সমস্ত শরীরটাকে চাঙ্গা ক'রে......আঃ, ভাবতে যা ভালো লাগে।"

খুব রেগে গিয়ে আমি বলতাম, "শুধু মদ—আনুসঙ্গিক আর কিছু নয়? সুরার সঙ্গে নারী? লাগবে না তোমার?"

তুমি যেন আরও উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে, "আঃ, মেয়ে যদি হয় তো ইরাণী তো ঘর বাঁধে না—লাল আগুনের মত চুলের বিনুনি, কালো চোখ আর খাপ খোলা তলোয়ারের মত দেহ—মেয়ে যদি হয় সে রকম তবে জীবনের একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়—একটা এ্যাডভেঞ্চার হয়।"

সেদিন আমার খুব রাগ হ'য়েছিল, দুঃখে আমার দু'চোখ ভ'রে জল এসেছিল—আমি রাগ ক'রে উঠে যাচ্ছিলাম। তুমি সেটা বুঝতে পেরে হো হো ক'রে হেসে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলে, "ওমনি রাগ হ'ল তো? আচ্ছা তুমি এত সাধারণ কেন বলতো? আমার কোনো কল্পনাকেই তুমি সহ্য করতে পারো না। জানো না আমার মধ্যে একটা বর্বর পুরুষমানুষ বাস করে—সে তো এসব ভাববেই। তাই কি সত্যি হচ্ছে নাকি? আসল সত্যিটা তো তুমি—এই আমার মেয়ে। শুনেছি ওসব দেশে কিছু পাওয়া যায়। শুনেছি এমন ঈর্ষা ওদের তার নাকি কোনো হিসেব-পত্তর নেই, যাকে ভালোবাসলো তাকে ভীষণ ভালোবাসলো আর রাগ হ'ল তো দিল খুন ক'রে। ওরা

"ওমনি রাগ হ'ল তো?"

বাঙলা দেশের মাটির প্রদীপ—নাই বা হ'ল আমার এ্যাডভেঞ্চার—তুমি তো আছো"।

তুমি যে ভালো ছবি আঁকতে পারো এটা আমি কখনও জানতাম না। হঠাৎ আমাকে বসিয়ে বসিয়ে আমার একটা ছবি তুমি আঁকতে শুরু ক'রে দিলে। শেষ হ'লে তোমার ঘরে রেখে তোমার বন্ধুবান্ধবদের দেখালে—সবাই খুব প্রশংসা কোরলো ছবিটার। আমি যে খুশীতে কি করবো ভেবে পেলাম না। একটা মানুষ যাকে আমি অনবরত পাশা-পাশি দেখে দেখে সাধারণের দলে ফেলে দিয়েছিলাম সে যেন আমার চোখে নতুন নতুন মূর্তিতে আবিষ্কৃত হ'তে লাগলো। তোমার একটা ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় তুমি কৃতিত্বের সঙ্গে লিফ্‌ট পেয়ে গেলে আর তারই সঙ্গে গুজব উঠলো আমাদের অফিস থেকে নাকি জনকয়েককে ইউ-রোপে ট্রেনিঙে পাঠানো হবে—তার মধ্যে তোমার নামটাও আছে।

জয়ন্তী দৌড়ে এলো সেদিন আমার কাছে, বললে, "কি করছিসরে তুই? মহীতোষ চললো সে খবর রাখিস। বিয়ে না ক'রে ঝোলাচ্ছে কেন তোকে? বিয়ে করে ফেল তাড়াতাড়ি।"

"কেন রে?"

"কেন রে!"—জয়ন্তী আমাকে যেন ব্যঙ্গ করে উঠলো। "তিন বছরের ট্রেনিঙ তা জানিস? কোনো ছুটি থাকবে না—যদি অন্য রকম হয়ে যায় সব কিছু? যা এ্যাডভেনচারিষ্ট ছেলে মহীতোষ। আর আমাদের ছেলেদের বিদেশে গিয়ে পাখা গজায় জানিসনে—সাদা চামড়ার মেয়েদের দেখে তারা মূর্চ্ছা যায়।"

আমি জানি তোমার পছন্দ—আমি তোমার ইচ্ছেগুলো জানতাম। আমারও কেমন ভয় করতে লাগলো। গেলাম তোমার কাছে, বিয়ের কথা বলেছিলাম তোমাকে—বলিনি কেবল আশঙ্কার কথাটা, কেমন লজ্জা করেছিল।

তুমি বললে, "দাঁড়াও, যাওয়াটা সত্যি কিনা আমি এখনও জানি না—যদি সত্যি হয়, তাহ'লে তিন বছরের ব্যাপার তো, মাঝখানে একবার এসে তোমাকে নিয়ে ছুট লাগাবো।"

'বিয়ে করে তো?'

"পারলে বিয়ে না করে—সেটাই তো মজা। পারবে না থাকতে?"

তোমার মধ্যে অদ্ভুত একটা শক্তি ছিল মহীতোষ—আমাকে তুমি যা বলতে আমি তাই করতাম। ঠিক করেছিলাম নিজেকে কখনও ছোটো কোরবো না তোমার কাছে। আঁকড়ে রেখে—জোড় ক'রে কাউকে পাওয়া যায় না—আমি সাবধান ছিলাম আমার ভারে যেন তুমি ভারাক্রান্ত না হও।

তাছাড়া এই বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারটায় তুমি আমাদের বাড়িতে কেমন শ্রদ্ধার আসন পেয়েছো, একটা ছোটো-খাটো মধ্যবিত্ত সংসারের গতানুগতিক অভ্যস্ত জীবনের ছককাটা গণ্ডী থেকে কেমন করে তুমি নিজেকে অসাধারণের

দলে নিয়ে গেলে, তোমারই অনেক সহ-কর্মীর ঈর্ষার দৃষ্টি তোমাকে কেমন বিঁধছে, আমার অনেক সহকর্মিণীর ঈর্ষা আমাকে কেমন দিনরাত পোড়াচ্ছে আর এ সবের মূলেই যে আছে তোমার সেই এ্যাডভেনচারিস্ট মনটা—যার জোরে তোমার এ অদ্ভুত উত্তরণ সে কথা ভেবে তোমার পাশে আমার এ সাধারণ মনটাকে নিয়ে নিজেকে ভারী দীন লাগতো।

মহীশূরে অফিসের হেডকোয়ার্টারে তোমার শেষ ইনটারভিউ দিয়ে ফিরে এলে তুমি। ওরা তোমাকে চূড়ান্ত-ভাবে নির্বাচিত করেছে। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার স্মার্টনেস ওদের খুশী করেছে, যার দীপ্তিতে আমি এতদিন অভিভূত ছিলাম তা যে সবাইকেই আকর্ষণ করে এ কথাটা তুমি যাবার আগে প্রমাণ করে দিলে।

তুমি খুশী—একটা অসম্ভব প্রত্যাশা পূর্ণ হ'লে যেমন খুশী হয় মানুষ! সেই খুশী মাখানো মুখেই তুমি বললে, "দেখেছো, ভাগ্যি বিয়েটা করে ফেলিনি। ইনটারভ্যুতে যে তিনজন চান্স পেল—তিনজনই আনম্যারেড। কী ওদের লাভ বাবা ওরাই জানে......।"

আমার চোখে জল ভরে আসছিল,—তুমি হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "কি ভাবছো তপতী?"

চোখের জল মুছে ফেলে বললাম, "কই, কিছু না তো।" তুমি সেদিন দু' হাতে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলে, "মাত্র তো তিনটে বছর। এর মধ্যে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো—যাবোই। তাছাড়া কি ভাবছি জানো—?"

আমি তোমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলাম, বললে, "অফিস আমাকে কতকগুলো সর্ত দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিল—সে সর্তগুলো মেনে নিলে আর্থিক দিক দিয়ে লাভ হোত আমারই কিন্তু আমি তা নিইনি। সেজন্যে আমাকে খানিকটা কষ্ট পেতে হবে ঠিকই কিন্তু লাভ হবে আমার। পারলে আমি অন্য কিছু শিখবো, ইউ-রোপের জীবনটা দেখবো একবার ভালো ক'রে, আমার সারা জীবনের স্বপ্ন। তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখবে তো—আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে তো?"

কেঁদে ফেলেছিলাম আমি, "আমি আর নতুন ক'রে কি করবো তোমার প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া। আমি তো এ্যাডভানচারিস্ট নই।"

তুমি শুনে হো হো করে হেসেছিলে, "বাবা! কী অভিমান মেয়ের। সত্যি তপতী, তুমি নিজে ভেবে দ্যাখো তো আমাদের জীবনগুলো কী ঘোলো, জীবনে কোথাও বৈচিত্র্য নেই। ইউরোপে দেখ ওদের জীবনের ওপর দিয়ে যুদ্ধ, খুনোখুনি—ওদের ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকের জীবন যেন পাগলা ঘোড়ার সওয়ার—আর আমাদের! দাঁড়াও—সেই জীবনের স্বাদ তোমাকে আমি এনে দেবো...তখন।"

তারপর তুমি চলে গিয়েছিলে খুশী মুখে। পরের দিনগুলো সব আমার একার। আমার সমস্ত সত্তা তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হ'য়ে থাকতো—কী সুন্দর চিঠিই যে তুমি লিখতে পারতে। কয়েকটা মাস তুমি সুন্দর চিঠি লিখেছো আমাকে—সাহিত্যের মত। তারপর ক্রমে কমে গেল চিঠির সংখ্যা—ক্রমে বিরল হ'য়ে এলো। অনুযোগ জানালে তুমি জানাতে বড্ড ব্যস্ত তুমি। যে এ্যাডভেঞ্চারের নেশা এখানে তোমাকে উন্মনা করে দিত ওখানে গিয়ে তুমি তা কতখানি পাচ্ছো জানতে চাইলে কোনো উত্তর পেতাম না। মাঝে মাঝে অফিসে নানা গুজব শুনতাম, শুনতাম হেড অফিস থেকে নাকি কড়া চিঠি গেছে তোমার নামে—কখনও শুনতাম তুমি নাকি এ অফিসের সঙ্গে সংযুক্ত নও আর—তোমাকে নাকি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। লোকেরা এ সব জানতো এবং বিশ্বাস করতো—আমি শুনতাম কিন্তু বিশ্বাস করতাম না কারণ তোমাকে বিশ্বাস করবো এ প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম।

এমনি করে বোধহয় বছর দুয়েক কেটে গিয়েছিল—ঠিক জানি না। একটা সময় আসে যখন সময়টা তার কাজ করে যায় কিন্তু তার কোনো অস্তিত্ব থাকে না—আমার হ'য়েছিল তাই। শেষের দিকে কদাচিৎ একটা চিঠি পেতাম তোমার—কেবল মামুলি কুশল প্রশ্ন তাতে—তারপর সেই শীর্ণ পরিচয়ের সুতোটাও কবে যেন ছিঁড়ে গেল।

যারা আমাকে প্রথমে হিংসে করে-ছিল তারা এখন আমার দিকে অনু-কম্পার দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। এরমধ্যে গোটাকয়েক বিয়ে ঘটে গেল অফিসের ছেলে-মেয়েদের মধ্য। আমার বন্ধু জয়ন্তী বিয়ে করলো সদ্য বিদেশ-ফেরতা ভালো একটি চাকুরে ছেলেকে। আর জয়ন্তীই একদিন বাড়ি বয়ে এসে বলে গেল অনেক কথা, "জানিস তুই, মহীতোষ গোল্লায় গেছে? জানিস ওর কাণ্ডকারখানা?"

আমি গম্ভীর হইনি—হাসিমুখে বললাম, "মদ খাচ্ছে তো? তা খাক্ না,
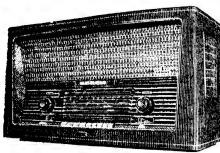
মদ খাবার এ্যাডভেঞ্চারটা পূর্ণ করে আসুক ওখান থেকে।"

"শুধু মদ!"—মুখ বাঁকালো জয়ন্তী।

"কি? মেয়েদের সঙ্গে মিশছে তো? ইরাণী মেয়ে নিশ্চয়ই? জানিসনে তো ওরা কি ধাতের—ঘর বাঁধে না ওরা—মানুষ খুন করতে পারে।"

এবার ক্ষেপে উঠলো জয়ন্তী, "ছাই জানিস তুই। এক আর্মেনী মেয়ে নিয়ে দিব্যি ঘর বেঁধেছে দুজনে—শুনলাম সে মেয়ের প্রণয়ীর সঙ্গে মারামারি করে মহীতোষ কিছু-দিন হাসপাতালে পর্যন্ত ছিল! ছি ছি—মাসিমা-মেশোমশাই-এর মুখের দিকে তুই তাকাস কেমন করে? ওঁরা তোর জন্যে কেমন সুন্দর পাত্র পেয়েছিলেন—ওই মহীতোষটা তোকে কি বোঝালো কে জানে! আমরা তো কেউ ওকে দেখতে পারতাম না।"

আমার মধ্যে কান্নার সমুদ্র উথলে উঠেছিল, তবু ব্যঙ্গের হাসিতে মুখ ভরিয়ে আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "আঙুর ফল বড় টক না রে? মহীতোষকে ভালো লাগবার মত ক্ষমতা তোদের কারো ছিল—ওকে পেতে হলে মূল্য দিতে হয় জানিস?"

জয়ন্তী আমার ছোটবেলার বন্ধু—কথাগুলো ওকে বিঁধলো, কেঁদে উঠে গেল, বললো, "ভারী তো মূল্য—তুই একটা বোকা তাই। অফিস থেকে যে ওর চাকরি গেছে তাও জানিস কি?"

জানলাম সব—যা জানতাম না তাও, যা বুঝেছিলাম সব। এতদিন পরে, দীর্ঘ-দিনের এই স্বাবলম্বী মেয়ের অহংকারে যেন একটু ঘা পড়লো—অনেকদিন পরে হঠাৎ আমার মায়ের কথা মনে পড়লো।

মা শান্ত চোখ তুলে তোমার সব কথা শুনলেন, একটুও কাঁদলেন না, কাঁপলেন না, পুরানো কথা তুলে আমাকে মৃদু তিরস্কার পর্যন্ত করলেন না, কেবল বললেন, "তুমি নিজে তাকে চিঠি লিখে জানো তপু—লোকের কথায় কান দিয়ো না। অযথা ভুল বোঝাবুঝির জন্যে ভবিষ্যতে যেন অনুতপ্ত হতে না হয়।" আঃ এই আমাদের মা, আমরা তাঁদের চিনি না, বুঝি না।

তোমাকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম—দীর্ঘ চিঠি। তার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমার জীবনেও এ্যাড-ভেঞ্চার এসে গেল। আমাদের অফিসে এলো একটি নতুন ছেলে—নির্মল তার নাম। তার সঙ্গে কেমন করে কি সূত্রে আমার যেন আলাপ হ'য়ে গেল—আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। বয়সে সে হয়তো আমার ছোটই হবে কিন্তু অভিজ্ঞতা তার কারো চেয়ে কম নয়। অনেক দেখেছে সে ছেলে, জীবনের অনেক পথ, অনেক মোহানা পেরিয়ে সে হঠাৎ এই অফিসে এসে উঠেছিল। সাধারণ চেহারা কিন্তু ভারি শান্ত তার চোখ দুটো। মেয়েরা তাকে টানছে নানা দিকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি মিশতাম নিঃসঙ্কোচে। তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি বসে বসে, কখন এক সময় নিজের সব কথাও বলেছি তাকে, আমার সমস্যার কথা, প্রতীক্ষার কথা—বলেছি তোমার এ্যাডভেঞ্চারের কথা।

নির্মল প্রথম প্রথম হাসতো সব শুনে, বলতো, "দেখুন, ইউরোপ না গেলেও কাশ্মীর-কার্সিয়াঙ এ সমস্ত জায়গায় আমি দীর্ঘদিন বন্ধনহীন জীবন যাপন করেছি। যাকে মহীতোষবাবু এ্যাডভেঞ্চার বলে মনে করেন ওরকম এ্যাডভেঞ্চার আমার জীবনেও হয়নি যে তা নয়, কিন্তু ওগুলো আসলে কি জানেন? জীবনের পাঁককে একটু ঘুলিয়ে তুলে দেখতে চাওয়া। ওতে আনন্দ নেই, তৃপ্তি নেই।"

আমি বলেছিলাম, "তৃপ্তি তবে আছে কোথায়? এই জোলো জীবনে?"

আবার হাসলো নির্মল, "না, তৃপ্তি হয়তো সেখানেও নেই, কিন্তু উনি দেখছি আপনার মাথায় জোলো জীবন-টীবন এ সব কথাগুলো বেশ করে ঢুকিয়ে গেছেন।"

আমি উত্তেজিত হ'য়ে বলতে চাইলাম, "কেন নয়? দেখুন—ইউরোপের জীবন—ওদের চলা-ফেরা, প্রেম-ভালোবাসা সব কিছু ওদের রক্তে, ক্লেদে, ঘামে, মৃত্যুতে আর বাঁচার নেশায় এমন ক'রে মেশামেশি যে সার্থক সাহিত্য ওরাই সৃষ্টি করতে পেরেছে। আর আমাদের? একটা রক্তাক্ত যুদ্ধ পর্যন্ত আমাদের ওপর দিয়ে যায়নি—বড় জোর একটা দাঙ্গা না হয় জমির লড়াই। কোনোমতে বেঁচে আছি—কোনোমতে ধুঁকে ধুঁকে প্রাণশক্তিটাকে টিঁকিয়ে রেখেছি। ওদের সাহিত্যের মধ্যে, জীবনের মধ্যে প্রাণ আর আমাদের সেই বস্তা পচা মামুলি কাঁদুনি।"

নির্মল তবু শান্ত মুখে হেসেছিল, "এভাবে ভাবতে ভালো লাগে বৈকি কিন্তু যাদের জীবন যেমন। কেবল যুদ্ধের ঝনঝনাতেই জীবনের স্বরূপ—স্বামী-স্ত্রীর সুখী সংসারটা তুচ্ছ—এ কথা কে বললো? অবাধে মিশতে পারা যায় বলে সে দেশের মেয়েদের কেবল লালসার চোখ দিয়ে দেখা এগুলোর জন্যে বর্বরতাই যথেষ্ট। কিন্তু ওদেরও দেশে ঘরে ঘরে কত পবিত্র প্রেম, সুকুমার চিন্তা আর সৌন্দর্য লুকোনো আছে তাকে শ্রদ্ধা করাটাই তো আসল কথা। এ্যাডভেঞ্চার কি কেবল সৃষ্টিছাড়া অসামাজিক কাজের মধ্যেই? দুঃখের মধ্যেও অপেক্ষা করে থাকা, যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করা—নিজের মনটাকে শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও অন্যের জন্যে উন্মুখ করে রাখা এগুলোও কি কম বড় শক্তি?"

বাড়ি এসে নির্মলের কথাগুলো সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ভেবেছিলাম আমি। দেখলাম তিন বছরের মধ্যে তোমার কাছ থেকে পাওয়া মোট চিঠির সংখ্যা হচ্ছে আমার সাত-আটখানা আর তোমার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলে দেখি কিছুতেই ঠিক ঠিক মেলাতে পারছিনে। এতদিন তুমি আমাকে যা বলতে, যা যা বোঝাতে, যতবার তা ভাবতে যাই ততবার নির্মলের বলা কথাগুলো এসে কান আর মন জুড়ে বসে। তোমার চেহারা ভাবতে গেলে নির্মলের চেহারাটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

অফিসের রমলা নির্মলের পাশের চেয়ারে কাজ করে। শুনেলাম বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে সে তার সঙ্গে নির্মলের ঘনিষ্ঠতার কথা নিয়ে। কিছু তার বানানো, কিছু সত্যি। একদিন-দুইদিন-তিনদিন— অনেকদিন আমার কানে এলো সে কথা। নিজেকে কেমন নির্বোধ মনে হ'ল হঠাৎ। আমার বন্ধু জয়ন্তী চাকরী ছেড়ে দিয়েছে, এখন যারা আছে তারা অনেকে নতুন। পুরানো যারা আছে তারা সবাই সংসারী—অন্য আর এক ধরণের জীবনযুদ্ধে তারা ব্যস্ত, তারা কেউ আমার মত নয়। যারা এখন আছে তারা নবীন—বয়সে—আচরণেও। আমার থেকে তারা স্বতন্ত্র। তাদের দেখে প্রতি মুহূর্তে আমার মনে পড়ে আমাকে সাতাশ বছরে তুমি রেখে গিয়েছিলে—আজ আমি একত্রিশ পেরিয়ে যাচ্ছি। ওদের যৌবনের অহংকারকে তাই আমি ভয় করতে শুরু করেছিলাম আর নির্মলের সঙ্গে মেশামেশিটাও একেবারে কমিয়ে দিয়েছিলাম— সেও একটা আতঙ্কে। শুনলাম ওরা আমার আর নির্মলের মেলামেশা আর বয়স নিয়ে হাসতে শুরু করেছে—অনুকম্পার হাসি। বিদ্রূপের স্পষ্ট ঝিলিক দেখতে পেলাম ওদের বাইশ-তেইশ আর পঁচিশের ঠোঁটে। আমি তাই নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিলাম ওদের বিদ্রূপের আওতা থেকে। কিন্তু নির্মল তা হ'তে দিল না। সে আমাকে টেনে আনলো সবায়ের মাঝ-খানে। আমাকে সে নতুন করে ভাবতে শেখালো, বয়সটাকে সে হেসেই উড়িয়ে দিল, বললো, "বয়স মানুষের শরীরে নয়—মনে।" এ্যাডভেঞ্চারে জিতে গেলাম আমিও—বাইশ, তেইশ, পঁচিশদের হারিয়ে দিয়ে।

অনেকদিন আগে সব জানতে চেয়ে চোখের জলে ভেজা যে চিঠি দিয়েছিলাম—তুমি তার কোনো উত্তর দাওনি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলে গিয়েছিলে, আমি বিশ্বাস করেছিলাম। তুমি অপেক্ষা করতে বলেছিলে—অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু সে বিশ্বাসের মূল্য দিয়েছো তুমি বিশ্বাসহীনতা দিয়ে, অপেক্ষার মূল্য দিয়েছো নিস্তব্ধতা দিয়ে—আমাকে

অনেক বিনিদ্র রাতের চোখের জলে ভাসিয়ে, লজ্জা-দুঃখ-অপমানের তুষের আগুনে পুড়িয়ে মেরে!

তবু আমার নিষ্ঠা আমাকে ছেড়ে যায়নি। আবার চিঠি দিয়েছিলাম আর একখানা—তাতে ছিল নির্মলের কথা—তাতে তোমার কাছে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম আমি। ভাবিনি যে সে চিঠিও ভেসে যাবে তোমার নীরবতার হাওয়ায়। কারণ তুমি তো সেই লোক, যারা নিজে প্রথমে মূল্য দিতে পারে না কিন্তু যখন দেখে যে যে ধন সে ফেলে দিয়েছে তাকে অন্য কেউ কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখনই লোভীর মত হাত বাড়ায়।

তাই নির্মলের কথা শুনেও তুমি যখন সাড়া দিলে না, বুঝলাম তুমি একটা উল্কার মত জ্বলে নিভে গেছো—কোথায় তোমার এ্যাডভেঞ্চার!

তোমার চেহারাটা আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম চোখের সামনে একটা চল্লিশ বছরের প্রৌঢ় চেহারা ভেসে ওঠে—। আমি নিজে নিজে কল্পনা করে দেখেছি ইউরোপের সেই প্রাণচঞ্চল জীবনকে দেখার নেশায় তুমি কেবল নিজেকে ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত করেছো—তোমার আর্মেনী মেয়ে তোমাকে ছেড়ে গেছে, ইরাণী মেয়ের খোঁজ আজও মেলেনি—আর যে সব মেয়ের খোঁজ মিলেছে তারাও বাঙলা দেশের তপতী মেয়েটারই মত সাধারণ—তারাও ঘর চায়, সংসার চায়—সেই একই জোলো জীবন ইউরোপেও।

তোমাকে আর আমি পুরানো আসনে বসাতে পারলাম না মনের মধ্যে, উল্টে নির্মলের সেই দীর্ঘ ঋজু চেহারা, তার সেই বয়সের তুলনায় একটু গম্ভীর মুখ, তার থেমে থেমে বলা কথাগুলো এখন আমার দিনরাতের সহচর হয়ে উঠেছে। দেখলাম আমি কেমন লোভীর মত হ'য়ে উঠেছি। একদিকে বয়সের একটা ব্যবধান আমাকে পিছু টানছে—মন বলছে, তোমার-যে যৌবন যেতে বসেছে। আর কেন? মনের মুখে হাত চাপা দিয়ে আমি বলি—চুপ করো, চুপ করো—শুনতে চাইনে।

ভেতর থেকে কে যেন বলে মহীতোষ যদি কোনোদিন ফেরে? মন বলে, যে মহীতোষকে আমি চিনতাম তাকে তো আমি কোনোদিন ফিরে পাবো না। ভাঙা যন্ত্রে নতুন সুর বাজবে না—বাজাতে হয়তো নতুন যন্ত্রেই বাজাবো।

তোমার আর নির্মলের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে একটা ক্ষয়িত যৌবন আর একটা যৌবনের সমারোহ। আমি কাকে গ্রহণ করি, যে তুমি আমার যৌবনকে প্রতীক্ষা আর চোখের জলে ক্ষইয়ে ক্ষইয়ে আজ প্রৌঢ়ত্বের দরজায় পৌঁছে দিয়েছো তাকে? না যে আমার ক্ষয়িত যৌবনকে নিজের যৌবনের দীপ্তিতে ভ'রে দেবার আশ্বাস দিয়েছে—তাকে? যে বলেছে, "এ্যাডভেঞ্চার তো কতরকমের আছে। সারা ভারতবর্ষটা একবার ঘুরে দেখতে পারি আমরা। ছোটো খাটো সুখ-দুঃখ বিরক্তি আর শূন্যতার মধ্যও বাঁচবার চেষ্টা করবো। সৌন্দর্য কি শুধু লুকানো আছে পপলার আর পাইনের বনে, শুধু বরফের স্তূপে?"—জানি এরপর ও রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করবে, জানি হয়তো তার অনেকখানি উচ্ছ্বাস, তবু আমি তাতে ভুলেছি। এ আমার প্রায় শেষ হ'য়ে আসা যৌবনের শেষ লোভ কিনা জানি না—জানি না কি আছে আমার ভাগ্যে কিন্তু আমি তো তোমারই মন্ত্রশিষ্যা——নেমে পড়লাম এ্যাডভেঞ্চারে।

মাত্র গতকালের একটা ঘটনা বলি। সকালের রেডিওতে কার যেন বাজানো সারেঙ্গীর সুর বাজছিলো—কী অদ্ভুত করুণ সুর! তার মূর্ছনায়—ছড়ের টানে আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ মুচড়ে মুচড়ে, গুমরে গুমরে কান্নার তুফান তুলে ফেটে যেতে চাইলো। মনে হোল জগত-সংসারে আমার মত নিঃস্ব, নির্জন, একা কেউ কি কোথাও আছে? মনে হ'ল সমস্ত বিশ্বসংসারের প্রাণের মধ্যে একটিই সুর বাঁধা—তা বিষাদ। তোমার কথা মনে পড়লো—তোমার প্রথম দিকের পাঠানো ইউরোপের বরফ ঢাকা ল্যান্ড-স্কেপ একখানা যত্ন ক'রে বাঁধানো ছিল দেওয়ালে, হঠাৎ বহুদিন পরে সেখানার দিকে চোখ পড়লো—সাদা গভীর বরফের ওপর পাতাছাড়া ন্যাড়া ন্যাড়া কয়েকটা গাছ। হঠাৎ মনে হ'ল তোমাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—সেই বরফের স্তূপের ওপর দিয়ে, বাঙলা দেশের ছেলে তুমি—বিলিতি বুট প'রে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছো—হেঁটে হেঁটে যাচ্ছো নারী, সুরা, মেদ-মাংস আর রক্তের মধ্যে মাখামাখি হবার জন্যে। যাকে তোমরা বল প্যাসান—সেই প্যাসানের লোভে সেই পা ডোবা বরফের মধ্যে ভূতের মত এগিয়ে যাচ্ছো। তারপর মনে হ'ল না তুমি নও—কেউ নয়—ঐ ন্যাড়াগাছগুলোই বুঝি এগুচ্ছে।

সারেঙ্গীর সুর হঠাৎ আমাকে যেন চমকে দিল। জানলার ফাঁকে একটুকরো রোদ এসে লালচে করে তুলেছিল ল্যান্ড-স্কেপটাকে—হঠাৎ মনে হ'ল ছবির মধ্যের ঐ সাদা বরফের স্তূপে লাল হ'য়ে উঠেছে আমার বুকের রক্ত!—তোমার বুটের তলায় ছিল সে রক্ত! কেমন বিবমিষা হ'ল আমার—হঠাৎ মনে হ'ল কে তুমি! তোমাকে তো আমি চিনি না—অনেক দূরের একটা বিশাল বীভৎস কালো ছায়ার মত একটা মূর্তি যেন তুমি—তার বেশি কিছু নও।

তাই নির্মলকে আমি ভাবতে চাইলাম। ওর মধ্যে আমি বাঙলা দেশের ছলছল চোখ দুটিকে দেখতে পেয়েছি—ওর সঙ্গে কোলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কাশ্মীর থেকে কার্শিয়াঙ কিম্বা সিকিম-ভুটানের কোনো একটা জায়গায় ও নতুন একটা কাজ নিয়ে চলে গেছে কয়েকদিন আগে। ওর কাছ থেকে চিঠি পেয়ে আমিও যাবো আগামী সপ্তাহে। না কাউকে নয়—এমনকি যে মাকে এত ভালোবাসতাম সেই মাকেও আমি জানাতে পারলাম না—একটা অদ্ভুতভাবে উধাও হওয়ার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে।

তুমি যদি কোনোদিন ফেরো কি করবে তুমিই জানো। হয়তো কোনো আমেজনী কিম্বা ইরাণী মেয়েকে নিয়ে ফিরবে। তারপর ভারতের জলমাটি যদি তাদের সহ্য না হয় তারা ফিরে গেলে, বাঙলা দেশের সেই সুবোধ শান্ত ছেলের মত—বাঙলা দেশেরই কোনো কালো মেয়েকে বিয়ে করবে হয়তো। তারপর কোনোদিন বাজার থেকে ব্যাগে করে পুঁই ডাটা কিনে নিয়ে যাবে কিম্বা কালো ছেলের হাত ধরে কালো স্ত্রীকে পাশে নিয়ে সামাজিকতা রাখতে বেরোবে.....। হয়তো জীবনের নির্মম হাতের ধাক্কায় আমিই আবার কোথায় পৌঁছাবো জানি না—তবু আপাতত এই পর্যন্ত।

জীবনের ঘাটে ঘাটে নোঙর করা প্রাণগুলো—তোমার মত, আমার মত, একদিন কবে যেন পাশাপাশি এসে মিশেছিল—আবার এমনি করেই আলাদা হ'য়ে গেল। এও এক অদ্ভুত এ্যাডভেঞ্চার! জীবন-বিধাতার এ্যাডভেঞ্চার! দেখি আমার জন্যে তাঁর ভান্ডারে আর কি সঞ্চিত আছে! তপতী।

চিঠি শেষ করে আমি মাসিমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে

উঠলাম, "মাসিমা, তপু যে বেঁচে আছে। এ চিঠি এতদিন পড়েননি কেন?"

মাসিমা পাংশুমুখে একবারমাত্র আমার মুখের দিকে তাকালেন তারপর হঠাৎ জ্ঞান হারালেন। আমার চীৎকারে তপতীর বাবা উঠে এসেছিলেন।

আমি হাসি-কান্না মেশানো অদ্ভুত মুখে সে খবর দিলাম তাঁকে, দেখলাম মেশোমশাই-এর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। মাসিমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগলেন, "কণা ওঠো—উঠে বোসো। তপতী যে আমাদের রক্তের জিনিস—ঠিকই করেছে। নিজের জীবনে যা হ'তে পারে মেয়ের জীবনে হ'লে কষ্ট পেলে চলবে কেন?" তারপর হেসে আমার মুখের দিকে তাকালেন—"তা এমন ক'রে ভাবিয়ে—কাঁদিয়ে। অবশ্য আমার যেন কেমন একটা সন্দেহ ছিল—গাড়ির খালি কামরায় তার ব্যাগ পাওয়া গেল আর ডেড বডি নেই? পুলিশ বলছে যখন একটা ব্রীজের ওপর দিয়ে পাস করছিল গাড়িটা তখন নাকি নিচের খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে রাত্তিরে—আমি তবু বিশ্বাস করিনি।"

মাসিমা দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে আমাকে ভর ক'রে উঠে বসলেন, তারপর কেমন খুশীতে আর আনন্দে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। তপতীর বাবা আমার সামনেই তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, "কেঁদো না কণা, ও যেদিন বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল সেদিনই বুঝেছিলাম আমার রক্তের ডাক ওতে আছে। তুমি কি নিজের জীবনকে আড়াল ক'রে সন্তানকে ভাবতে চাও? তা হয় না—জয়ন্তী, তোমাকে একটা কথা বলি," মেশোমশাই আমার মুখের দিকে করুণা-প্রার্থীর মত তাকালেন, "তোমার কাছে বলা দরকার নইলে আমার কথার অর্থ তুমি বুঝবে না। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে তোমার এই মাসিমাকে বিয়ের চেলী পরা অবস্থায় নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম অন্য লোকের সঙ্গে ওর বিয়ে হচ্ছিল বলে। তারপর জীবনের অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা পার হ'য়ে কেবল যখন একটু পা রেখেছিলাম মাটিতে তখনই এসেছিল তপতী—ওর রক্তেও তাই এ্যাডভেঞ্চারের নেশা আছে।"

মাসিমার দিকে তাকিয়ে পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার সেই মেয়েটাকে কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম আমি। দেখি মাসিমা লজ্জিত হ'য়ে থামাতে চেষ্টা করছেন মেশোমশাইকে. "আঃ থামো না, ও না তোমার মেয়ের মত।"

"না, জানা ওর দরকার। জানা দরকার যে একালের ছেলে-মেয়েরা নতুন কিছু করবার নামে মাঝখান থেকে খানিকটা সময়ের অপচয় করে ফেলছে কেবল—এর বেশি কিছু নয়।"

মাসিমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো, "যেখানেই থাক, ও যেন সুখী হয়। তপু—আমার তপু। কি যে হ'য়ে গেল মেয়েটার জীবনটা। নির্মলও যদি ওকে অসুখী করে?—" অসহায়ের মত নিজের মনের কাছেই যেন প্রশ্ন করলেন মাসিমা। এ প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না—উত্তর হয় না।

একটা মৃত্যুকরুণ সুর থেমে গিয়ে হঠাৎ জীবনের সুর বেজে উঠেছিল সারা সংসারটায়—আমি প্রাণভরে তাই উপভোগ করছিলাম—আর তপতীর অদ্ভুত খেয়াল, ওর খাপছাড়া জীবন—এমনি ক'রে উধাও হ'য়ে যাওয়া সব মিলিয়ে যত মেলাতে যাই, আমার বাঁধা সুরের সঙ্গে কিছুতেই সে সুর মেলে না—তবু কিন্তু আমার একটুও দুঃখ হ'ল না।

কখন যেন বেলা শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। তপতীর লেখা কাগজগুলো তখনও আমার হাতের মুঠোয় ধরা ছিল। মাসিমা, মেশোমশাই তখন বসে বসে হয়তো পুরানো কথা ভাবছিলেন।

তপতীর বোন ফিরলো অফিস থেকে, ভাই ফিরলো কলেজ থেকে। ওদের চোখে-মুখে একটা রুক্ষতার আর ক্লিষ্টতার ছাপ পড়েছিল। তপতীর আকস্মিক অন্তর্ধানকে মৃত্যু বলে স্পষ্ট না বুঝে অথচ মৃত্যু আশঙ্কায় ফ্যাকাসে আর ম্লান হ'য়ে গিয়েছিল। মাসিমা ওদের দুজনকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে বললেন তপতীর খবর। শুনে বোন ভারতী ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত মার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো, ওর মুখে বিরক্তির একটা স্পষ্ট ছায়া পড়লো, বোললো, "বুড়ো বয়সেও দিদির এ্যাডভেঞ্চার। এত কান্ড-বান্ড—অফিসে আমি মুখ দেখাতে পারিনে, সবাই আমাকে সহানুভূতি দেখাতে আসে। সমস্ত পরিবারের মুখ এমন করে না হাসালেই কি চলতো না? একবার মহীতোষবাবু, একবার নির্মল—তাও আবার বয়সে ছোট! এ্যাডভেঞ্চারের কী মোহ মানুষের!"

আমি জানি ভারতী খুব হিসেবী মেয়ে। ও যে ছেলেটাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক ক'রে রেখেছে সে ওকে কোন উন্নতির পর, কতদিনের মাথায়—ক'টা ঘরওয়ালা ফ্ল্যাটে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে, কেমন ক'রে ঘর সাজাবে—সব কিছু ঠিক করা আছে। খুব হিসেবী মেয়ে ভারতী, তাই ওর কথায় আমি রাগ করতে পারলাম না, কারণ আমি স্পষ্ট দেখলাম ওর চোখে ঈর্ষার ছায়া।

আমার ওঠবার সময় হ'য়েছিল—উঠে আসছিলাম। দরজার কাছে দেখি ভারতীর ভাবী স্বামী সমরেশ। ঠিক হিসেব কষে এসেছে। এখন ওরা দুজনে বেড়াতে যাবে—কোনো এক বিশেষ দিনে কেমন ক'রে ওদের বিয়ে হবে—কেমন ক'রে ওরা ঘর সাজাবে সেই হিসাব কষবে ওরা। তপতী আর ভারতী! এক রক্তের দুই প্রতিক্রিয়া।

কেবল শুনতে পেলাম সুদর্শনের চেঁচামেচি—'সমরেশদা, জানেন দিদি বেঁচে আছে—চলে গেছে নির্মলদার সঙ্গে। খবর একটা দেবেই—হয় কাশ্মীর না হয় গ্যাঙটক কোথাও না কোথাও থেকে। তরপর ব্যাস—দেখুন না, এবার আমিও পালাবো শিগ্গির। একবার বেরিয়ে পড়তে পারলেই ব্যাস।'"

আমার রিক্সাটা অনেক দূরে চলে এসেছিল। এতক্ষণে আমি মহীতোষের কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম। তপতীর লেখা চিঠিখানা শেষ পর্যন্ত পেয়েছে তো মহীতোষ!

॥ কর্মযোগীর লোকান্তর ॥
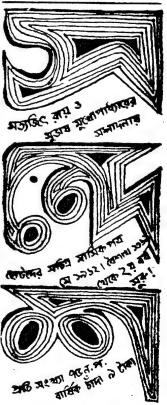
মহান কর্মযোগী ডঃ এম বিশ্বেশ্বরায়ার শতবর্ষব্যাপী কর্মময় জীবনের অবসান হ'ল। একটিমাত্র মানুষের কর্মসাধনায় একটি জাতির বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে কি বৈপ্লবিক রূপান্তর সম্ভব হ'তে পারে ডঃ বিশ্বেশ্বরায়া তা প্রমাণ করেছেন তাঁর সমগ্র কর্মজীবনের সাধনা ও সিদ্ধি দিয়ে। শতাব্দীকাল পূর্বে মহীশূরের এক অজ্ঞাত গ্রামের অখ্যাত পরিবারে তাঁর জন্ম এবং কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে অতিক্রান্ত হয় তাঁর শৈশব। কিন্তু অনন্য প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের জোরে তিনি শুধু নিজের জীবনকেই দারিদ্র্যের অভিশাপমুক্ত করেননি, তাঁর অগণ্য স্বদেশবাসীর জীবনেও বহন করে এনেছেন আধুনিক সভ্যতার বিবিধ আশীর্বাদ। এই হতভাগ্য দেশের সকল মানুষকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অনগ্রসরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর দীর্ঘ জীবনের একমাত্র সাধনা। এবং ভাগ্যবান তিনি যে, জীবদ্দশাতেই দেখে যেতে পেরেছেন, তাঁর সে সাধনা ব্যর্থ হয়নি। তাঁর প্রতিভা ও মহত্ত্ব শুধু এদেশেই দলমতনির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেনি, ইংলণ্ড আমেরিকার মত দেশগুলিতেও শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন তিনি বিজ্ঞজনের মাঝে। পঞ্চাশ বছর আগে মহীশূরে কৃষ্ণরাজসাগরে তিনি যে বাঁধ বেঁধেছিলেন শুধু ইঁট ও মাটি দিয়ে পরবর্তীকালে তাই আমেরিকাবাসীদের বুদ্ধি যুগিয়েছে টেনেসি পরিকল্পনায়। কৃষ্ণরাজসাগরে বাঁধ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে মহাত্মাজী একবার বলেছিলেন, শুধুমাত্র ঐ বাঁধটির জন্যেই বিশ্বেশ্বরায়া চিরজীবী হয়ে থাকবেন। পরবর্তীকালে মহীশূররাজের উদ্যোগে সারা রাজ্যজুড়ে যে উন্নয়ন যজ্ঞ শুরু হয় তার প্রধান হোতাই ছিলেন মহীশূর রাজের দেওয়ান বিশ্বেশ্বরায়া। রেলপথ প্রসার, রাস্তাঘাট তৈরী, শিক্ষাবিস্তার, কৃষিব্যবস্থার উন্নতি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পপ্রসার
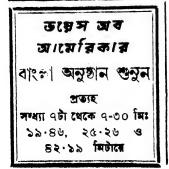
প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েই তিনি দৃষ্টি দেন এবং সেই মহান কর্মসাধকের সুনিপুণ পরিচালনা ও অনুপ্রেরণাতেই গড়ে উঠেছে আজকের মহীশূর। সমগ্র ভারতের বৈষয়িক উন্নতিতেও ছিল তাঁর সীমাহীন আগ্রহ এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে তিনি রচনা করেন "ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা" নামে অতি মূল্যবান ও চিন্তাসমৃদ্ধ এক গ্রন্থ। সারা ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতির আদর্শে নিবেদিত এমনই একটি প্রাণ শতাব্দীকাল পরে স্পন্দনহীন হ'ল। দেশের এ-ক্ষতি অপূরণীয়।

॥ রাজা মহেন্দ্র ॥

নেপালরাজ মহেন্দ্র এসেছেন ভারতে, রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে। এদেশে এই তাঁর প্রথম আসা নয়, কিন্তু তবুও এ আগমন বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং একারণে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নেপালের সঙ্গে ভারতের বর্তমান সম্পর্ক নানা কারণে ভাল নয়। নেপালের জনসাধারণের দীর্ঘ সংগ্রাম ও পরলোকগত নেপালরাজ ত্রিভুবনের সক্রিয় সহযোগিতায় নেপালে যে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হয়েছিল, রাজা মহেন্দ্র তার অবসান ঘটিয়েছেন। ফলে সারা নেপাল জুড়ে এখন স্বৈরতন্ত্রী রাজশাসনের বিরুদ্ধে চলেছে প্রজাসাধারণের প্রবল বিক্ষোভ। নেপালের জননেতাদের বেশীরভাগকেই মহেন্দ্র কারাগারে বন্দী করে রেখেছেন, কয়েকজন গ্রেপ্তারী এড়িয়ে পালিয়ে এসেছেন ভারতে। ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী নেপালী জননেতাদেরও গ্রেপ্তার করতে চান রাজা মহেন্দ্র, এবং একারণে নেপাল সরকারের পক্ষ হতে বহুবার ভারত সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়েছে তাঁদের গ্রেপ্তার করে নেপাল সরকারের হাতে সমর্পণ করার জন্যে। কিন্তু সে অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবীতে ভারত সরকার কর্ণপাত করেননি বলে নেপাল সরকারের বিভিন্ন মুখপাত্র বারবার ভারতের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেছেন এবং নেপালের বর্তমান গণবিক্ষোভকে প্ররোচিত করার অভিযোগও এনেছেন ভারতের বিরুদ্ধে। ওদিকে নেপালের সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান সখ্যও ভারতের পক্ষে বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ অবস্থায় রাজা মহেন্দ্রের ভারতে আসার সিদ্ধান্ত অবশ্যই আশার কথা। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে যদি নেপালের বর্তমান আভ্যন্তরীণ সংকটের একটা সমাধান হয় এবং আবার যদি ভারত ও নেপাল পরস্পরের বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হয় তবে সেটা ভারত ও নেপাল উভয়ের পক্ষেই বিশেষ কল্যাণকর হবে।

কিন্তু মহেন্দ্রের দিল্লী আগমনের প্রাক-মুহূর্তে নেপালের জাতীয় পরিচালনা দপ্তরের প্রচার ও বেতার বিভাগ ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দলিল প্রকাশ করে ভারতের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে শ্রীনেহরুর বিরুদ্ধে যেভাবে বিষোদ্গার করেছেন তাতে রাজা মহেন্দ্রের ভারত আগমনের যে সুফল আশা করা গিয়েছিল তা প্রায় সম্পূর্ণই নির্মূল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। শ্রীনেহরু যে নেপালকে ভারতের অনুরূপ গণতন্ত্র গ্রহণের সুপারিশ করেছেন এটা নাকি কোন বিবেকসম্পন্ন নেপালীর পক্ষেই বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নেপালের বিদ্রোহীদের প্রশ্রয় দিয়ে ভারত সরকার পরোক্ষে নেপালের সার্বভৌমত্বের উপরেই আঘাত হানতে উদ্যোগী হয়েছেন এমন অভিযোগও ভারতের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে। এ অবস্থায় নেপালরাজের ভারত সফর সম্পূর্ণ অর্থহীন বলেই মনে হয়, যদি না অন্যকোন কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে তিনি ভারতে এসে থাকেন।

॥ পূর্ব পাকিস্তান ॥

ভয় বা প্রলোভন কোন কিছুতেই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজকে দমন করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকদের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে দাবী জানিয়েছিলেন, অনতিবিলম্বে পাকিস্তানের সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে হবে, সারা দেশজুড়ে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করতে হবে ও পূর্ণ বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকার করতে হবে; অন্যথায় ১৮ই এপ্রিল থেকে আবার তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্যে ধর্মঘট শুরু করবেন। কর্তৃপক্ষ তাঁদের সে দাবীর কোন উত্তর দেননি, পরন্তু এই বলে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, ধর্মঘটে যেসব ছেলে যোগ দেবে তাদের বৃত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় সুযোগ কেড়ে নেওয়া হবে। কিন্তু সে ধমকে কোন কাজ হয়নি। ঢাকার ছাত্ররা সব বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট দিনেই ধর্মঘট আরম্ভ করেছিলেন। ফলে ক্রুদ্ধ কর্তৃপক্ষ ৩১শে মে পর্যন্ত যাবতীয় স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

॥ ঘরে ॥

১২ই এপ্রিল—২৯শে চৈত্র : তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপ্রচেষ্টা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার আশংকা—রাজ্য সরকারের উচ্চ মহলে বিশেষ উদ্বেগ সঞ্চার।

১৩ই এপ্রিল—৩০শে চৈত্র : হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপলক্ষে ২০ লক্ষাধিক নর-নারীর পুণ্যস্নান।

'সমাজ-জীবনের উৎকর্ষ সাধনে যুব সমাজের গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে'—পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের বার্ষিক যুব-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের বক্তৃতা।

১৪ই এপ্রিল—১লা বৈশাখ, ১৩৬৯ : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আরও চারজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও এগারজন উপমন্ত্রী নিযুক্ত—রাষ্ট্রপতি ভবন হইতে ঘোষণা : এপর্যন্ত মন্ত্রিসভায় মোট সদস্য-সংখ্যা ৩৮।

বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার ও দেশসেবক 'ভারতরত্ন' ডাঃ এম বিশ্বেশ্বরায়ার (১০১) বাঙ্গালোরে জীবন-দীপ নির্বাণ।

সাধারণ নির্বাচনে বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে শৃংখলাভঙ্গের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত ব্যবস্থা—দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে একটি কমিটি নিয়োগ।

১৫ই এপ্রিল—২রা বৈশাখ : এলাহাবাদে অশান্ত জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—প্রহারের ফলে নিহত বলিয়া কথিত ব্যক্তির মৃতদেহের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জের—উপদ্রুত অঞ্চলে ১৪৪ ধারা ও কার্ফ্যু জারী।

শ্রীএ কে গোপালন লোকসভায় (তৃতীয়) কম্যুনিষ্ট দলের নেতা নির্বাচিত।

১৬ই এপ্রিল—৩রা বৈশাখ : মন্ত্রিবর্গসহ লোকসভায় নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন।

কলিকাতার সন্নিহিত দক্ষিণদাঁড়িতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কর্তৃক লবণ হ্রদ সংস্কার পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

'এলাহাবাদে পুলিশের গুলী বর্ষণের ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাই'—পার্লামেন্টের বিরোধীপক্ষীয় ৮ জন সদস্যের সম্মিলিত দাবী।

১৭ই এপ্রিল—৪ঠা বৈশাখ : সর্দার হুকুম সিং সর্বসম্মতিক্রমে লোকসভার স্পীকার নির্বাচিত।

ইতস্ততঃ দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিণতিতে মালদহ শহরে সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারা জারী।

১৮ই এপ্রিল—৫ই বৈশাখ : 'গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ভারতের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ'—পার্লামেন্টের যুগ্ম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতিরূপে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের শেষ ভাষণ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার (কংগ্রেস) পুনরায় কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত।

নেপালের রাজা মহেন্দ্রের দিল্লী উপস্থিতি ও যথোচিত সম্বর্ধনা।

॥ বাইরে ॥

১২ই এপ্রিল—২৯শে চৈত্র : পশ্চিমী শক্তিবর্গ প্রতিশ্রুতি দিলে রাশিয়া জেনেভা আলোচনাকালে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করিতে প্রস্তুত—সপ্তদশ রাষ্ট্র সম্মেলনে সোভিয়েট প্রতিনিধি মিঃ জোরিনের ঘোষণা।

১৩ই এপ্রিল—৩০শে চৈত্র : পূর্ব পাকিস্থান সরকার কর্তৃক ছাত্রদের সতর্কীকরণ—'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বে-আইনী ক্রিয়াকলাপের ঘাঁটি করা চলিবে না'।

ভারত সরকারের নিকট চীনের নূতন লিপি প্রেরণ—সীমানা বিরোধ প্রসঙ্গে ভারতের মনোভাব মীমাংসার অনুকূল নয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ।

আলজিরিয়ার গুপ্ত সামরিক সংস্থার (ও-এ-এস) নেতা ভূতপূর্ব জেনারেল এডমন্ড উহাউং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত—প্রতিমাসে আলজিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইউরোপীয়দের ধর্মঘট।

আলোচনাকালে আণবিক পরীক্ষা বন্ধ রাখার জন্য ভারতের উত্থাপিত প্রস্তাব গ্রহণে সোভিয়েট সরকারের সম্মতি।

১৪ই এপ্রিল—১লা বৈশাখ, ১৩৬৯ : আন্তর্জাতিক পরিদর্শনাধীনে পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব ক্রুশ্চেভ (সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক পুনরায় প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় পশ্চিমী মহলে নৈরাশ্য।

১৫ই এপ্রিল—২রা বৈশাখ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবিলম্বে শৃংখলাভঙ্গকারী ছাত্রদের শায়েস্তা করিবার জন্য সরকার নির্দেশিত ব্যবস্থা কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত।

১৬ই এপ্রিল—৩রা বৈশাখ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পুনরায় ধর্মঘট—গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য তিনদিবসব্যাপী প্রতীক ধর্মঘটের সূচনা।

জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের নূতন উদ্যোগ—নিরপেক্ষ দেশগুলির বৈজ্ঞানিকদের লইয়া আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের প্রস্তাব।

১৭ই এপ্রিল—৪ঠা বৈশাখ : সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির খসড়া মুখবন্ধ অনুমোদিত—জেনেভা সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ দলিল সম্পর্কে মতৈক্য।

ভারতের বিরুদ্ধে নেপালের আবার বিষোদ্গার।—রাজা মহেন্দ্রের দিল্লী সফরের প্রাক্কালে ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল প্রকাশ।

৩১শে মে পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাশ বন্ধ—শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের জের।

১৮ই এপ্রিল—৫ই বৈশাখ : জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে আমেরিকার তিনটা অধ্যায় সম্বলিত প্রস্তাব পেশ—প্রস্তাবে নূতন কিছু নাই বলিয়া সোভিয়েট জোটের মন্তব্য।

'রাশিয়া চুক্তি (নিরস্ত্রীকরণ) সম্পাদনে রাজী না হইলে বায়ুমণ্ডলে আণবিক পরীক্ষা চালানো হইবে'—মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ঘোষণা।

অভয়ঙ্কর

ব্যক্তিত্ব— (সংকলন-গ্রন্থ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুবাদ— সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। দাম : আড়াই টাকা।

নাম জানিনে, অথচ লেখকের জায়গায় মুদ্রিত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এমন বই এখন চোখে পড়লে বিস্মিত হ'তে হয়। এই সঙ্গে ছাপা কভারটি দেখে সেই বিস্ময়ই জেগেছিল আমাদের মনে। পরে বোঝা গেল ঘটনা অন্যরকম।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রে যান তখন বিভিন্ন স্থানে যে সব বক্তৃতা দেন সেগুলি ১৯১৭ সালে Personality নামে একটি বইয়ে সংকলিত হয়। দীর্ঘকাল বইটির বাংলায় অনুবাদ হয়নি, এতদিন পরে রবীন্দ্রশতবর্ষ উপলক্ষে এর বাংলা অনুবাদ বিশ্বভারতী থেকে ছাপা হল। বইটিতে সর্বসমেত ছটি প্রবন্ধ আছে : 'আর্ট কি?', 'ব্যক্তিত্বের জগৎ', 'দ্বিতীয় জন্ম', 'আমার বিদ্যালয়', 'ধ্যান' এবং 'নারী' প্রত্যেকটিই মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন ঠিকানা সম্বন্ধে। প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর্ট সম্বন্ধে প্রায় ছে-চল্লিশ বছর আগে যে সব ধারণার অবতারণা করেছেন সেগুলি আজকের বাংলা দেশের শিল্প-সমালোচকদের পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। তখন পাশ্চাত্য জগতে শিল্পবিচার আধুনিক যুগের ধাক্কায় পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে। শিল্পের, উপলব্ধি এবং শিল্পকর্মের সমালোচনার জন্য যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন তার হদিস এই প্রবন্ধে মিলবে। 'ব্যক্তিত্বের জগৎ' প্রবন্ধে তিনি মানুষের অস্তিত্বের এক রহস্যের মর্মকে আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। 'দ্বিতীয় জন্ম' মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ নিয়ে লেখা। মানুষ কেমন করে প্রকৃতির কোলে জন্ম নিয়ে প্রকৃতির জগতের বাইরে নিজস্ব এক জগৎ সৃষ্টি করে তাই এর বক্তব্য। 'আমার বিদ্যালয়' প্রবন্ধে তিনি জাতির শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত বরাবরই অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এই প্রবন্ধেও তার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। "ধ্যান" প্রবন্ধ তাঁর সত্যোপলব্ধি সম্বন্ধে।

এতে বহির্জগত থেকে আহরিত উপকরণ অন্তরে সঞ্চয় করার সঙ্গে সত্যকে উপলব্ধি করার পার্থক্য বোঝান হয়েছে। 'নারী' প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন নারীর মুক্তি নিয়ে। পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র সীমানা থেকে তিনি নারীর মুক্তি চেয়েছেন, যাতে তারা তাদের সহজাত এবং স্বভাবসিদ্ধ ভালবাসা দিয়ে মানব জগৎকে গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য নারীচিত্তে পুরুষের অনুকরণে যে নৈর্ব্যক্তিক সংগঠনসর্বস্ব সামাজিক আদর্শের প্রতি আকর্ষণ দেখা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন। অনুবাদক তাঁর দুরূহ কর্ম অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। ইদানীং এত সুন্দর অনুবাদ চোখে পড়েনি। রবীন্দ্রশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বইটি উপস্থিত করার জন্যে প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

ভবিতব্য— (অনুবাদ গল্প-সংগ্রহ) ॥ উইলা ক্যাথার। অনুবাদ—রাখাল ভট্টাচার্য। প্রকাশক—এম. সি. সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ॥ দাম—আড়াই টাকা ॥

১৮৭৫-এর ডিসেম্বর মাসে এক অ্যাংলো-আইরিশ পরিবারে উনচেস্টার

পল্লীর কাছে শ্রীমতী উইলা সিবার্ট ক্যাথারের জন্ম হয়। সংগীতের প্রতি অতিশয় আগ্রহ থাকায় পিটসবার্গে আসেন ১৮৯৫-এ স্নাতক হওয়ার পর। এইখানে সাংবাদিকতায় হাতে-খড়ি। কিন্তু তেমন ভালো না লাগায় শেষ পর্যন্ত এলেঘানি হাই-স্কুলের শিক্ষিকার কর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই প্রথমে কাব্য রচনার সূত্রপাত, তারপর প্রকাশিত হয় ১৯০৫-এ প্রথম গল্প-সংগ্রহ। য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রচুর পর্যটন করেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে April Twilights, O Pioneers, The song of the Lark প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, Youth and the bright Medusa, One of Ours, A lost Lady, My Mortal Enemy, Obscure Destinies, এবং উপন্যাস Death comes to Archbishop-সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন। One of Ours গ্রন্থটি ১৯২২-এ পুলিটজার পুরস্কার লাভ করেছে। শ্রীমতী ক্যাথারের গ্রন্থাবলী আমেরিকার সাহিত্যে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর রচিত গল্পাবলীর এক চমৎকার নমুনা। হ্যারিস বুড়ি, দুই বন্ধু ও প্রতিবেশী এই তিনটি গল্প এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। হ্যারিস বুড়ি গল্পে কলরাডো অঞ্চলের এক বালিয়াড়ি শহরের বৃদ্ধা মিসেস হ্যারিস। বয়সের শেষ সীমায় পৌঁছে অবাঞ্ছিত, যারা যৌবনের উন্দামতায় উন্মত্ত তারা ভাবে না যে তাদের একদিন ঐ অবস্থায় পৌঁছাতে হবে। সকল দেশের এক চিরন্তন সমস্যা old age problem — সহানুভূতি ও সমবেদনায় মন ভরে ওঠে। দুই বন্ধু গল্পে আছে রাজনৈতিক বাতুলতার অন্ধ আবেগ, যে তীব্র নেশায় মানুষ বন্ধুকেও শত্রু করে তোলে। প্রতিবেশী রোসেকি গল্পে এক দেশ-বিবাগী ভ্রাম্যমাণের জীবনী, লণ্ডন ও নিউইয়র্কে দিন কাটিয়ে, তবু ভরিল না চিত্ত। তাই সে অবশেষে প্রেইরী অঞ্চলে এসে তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার বলে আসে, জীবনকে সে নিবিড়ভাবে দেখেছে, তাই সে সংবেদনশীল মন নিয়ে সব বুঝতে পারে অতি সহজেই। উইলা ক্যাথারের রচনার সঙ্গে বাঙলার সমাজ-জীবনের অনেক মিল। এ তাবৎ তাঁর সাহিত্য এদেশে অচেনা ছিল। এখন কিছু কিছু অনুবাদ হচ্ছে। রাখাল ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে দু' একখানি গ্রন্থ অনুবাদে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'ভবিতব্যে'র সাবলীল অনুবাদে তাঁর পূর্বগৌরব অম্লান রইল। ঝরঝরে সরল ভাষায় তিনি গল্পগুলি বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে ভাষান্তর করেছেন। ছাপা ও বাঁধাই মনোহর। প্রচ্ছদটি সুন্দর।

যে কমনওয়েলথে আমরা বাস করি—(প্রবন্ধ) ভারতস্থিত ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত।

এই ৭২ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটির চাকচিক্য আপাত-দৃষ্টিতেই চমক লাগায়। তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে সুদৃশ্য চিত্রাবলীর মাধ্যমে কমনওয়েলথের জন্ম, তার ক্রমবিকাশ, কার্যাবলী, আদর্শ, বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি বর্তমান বিশ্বের কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির জটিল সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে এর ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ প্রচেষ্টা নিখুঁত ও সহজবোধ্য হয়েছে। ক্রমবিবর্তনের পদক্ষেপে আজকের কমনওয়েলথ বিশ্বশান্তির অগ্রদূত। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত এই

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সার্থক করার কাজে যুব-সম্প্রদায়ের অসীম ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা স্মরণ করা হয়েছে এই পুস্তকে। জাগতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিশেষত শিক্ষাপ্রসার, ক্রীড়ানুষ্ঠান, শিল্পকলার বহুমুখীন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে মৈত্রী-বন্ধন হবে সুদৃঢ়; এবং সেই সঙ্গে হবে ভ্রান্ত ধারণার অবসান। আজকের ১ কোটি ৪৫ লক্ষ বর্গমাইল এলাকার প্রায় ৬৭ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ কমনওয়েলথ সীমানায় সীমিত। এই কমনওয়েলথের লক্ষ্য ত্রিমুখী—শান্তিরক্ষা, সম্পদবৃদ্ধি এবং নিজস্ব সভ্যতার বিকাশ। তবে মহাকালের দরবারেই বিচার হবে এই মহাশক্তিমান সভ্যতা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, সমৃদ্ধিশালী ও শ্রেষ্ঠ কিনা। রঙীন প্রচ্ছদপট এবং মূল্যবান আর্ট পেপারে পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ প্রশংসনীয়। এর "গাম-পেন্টিং" বাঁধাইও নূতনত্বের দাবী রাখে।

নীল সাগরের নাবিক— ভিক্টর হুগো। অনুবাদ : স্বপনকুমার। পরিচয় পাবলিশার্স, ২১, হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯। দাম—এক টাকা।

ভিক্টর হুগোর "টয়লার্স অফ দি সী" বিশ্বসাহিত্যের একটি অনন্য গ্রন্থ। রোমাঞ্চকর নাবিক-জীবনের কাহিনী অতি সহজেই পাঠক-মনকে আবিষ্ট করে—হুগোর গ্রন্থটিও তার ব্যতিক্রম নয়। 'নীল সাগরের নাবিক' হুগোর 'টয়লার্স অফ দি সী'র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। সুলভ মূল্যে বিশ্বসাহিত্য পরিচয়ের একটি প্রচেষ্টার জন্যে প্রকাশক ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন। আঙ্গিক কিন্তু মনোরঞ্জক না। অনুবাদ মোটামুটি। ভূমিকায় অনুবাদকের গ্রন্থকারের ভূমিকা গ্রহণ অতীব দৃষ্টিকটু। আশা করি আগামী সংস্করণে এ ত্রুটি সংশোধিত হবে।

বৈদিকী— (কাব্যগ্রন্থ) অনুবাদক : অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : বাণীতীর্থ, ২৬-২বি, বেনিয়াটোলা লেন। কলিকাতা—৯। মূল্য : দুই টাকা।

কবি অরীন্দ্রজিতের এইটিই চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। বর্তমান গ্রন্থে অরীন্দ্রজিৎবাবু ঋগ-বেদের ৩৪টি সূক্তের অনুবাদ করেছেন। প্রাচীন আর্য-সংস্কৃতির বাহক হিসাবে ঋগবেদের মূল্য অনস্বীকার্য। সে-যুগের মানুষের ধর্ম, কর্ম আর চিন্তার প্রতিফলন এই সূক্তে। সেই জন্য ঋগবেদের ওপর আমাদের কৌতূহল সহজাত। অরীন্দ্রজিৎবাবু আমাদের সেই কৌতূহল কিছুটা মিটিয়েছেন।

কাব্যগ্রন্থটির ভূমিকা হিসাবে ডঃ সুকুমার সেনের ঋগবেদ সংহিতার ওপর সাধারণ আলোচনাটি মনোজ্ঞ; কবির নিজস্ব কথা কয়টিও উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদপটটি রুচিসম্মত।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা
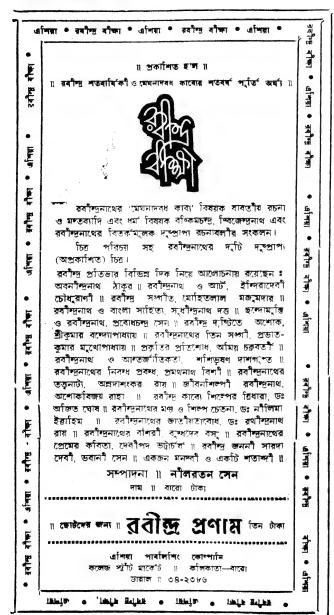
কান্না ঃ ডিল্যুক্স-এর নিবেদন; ১১,৫৩১ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ অগ্রগামী; সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ সুধীন দাশগুপ্ত; চিত্রগ্রহণ ঃ রামানন্দ সেনগুপ্ত; শব্দধারণ ঃ দেবেশ ঘোষ ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; গীত-রচনা ঃ শৈলেন রায় ও গোপীনাথ সেন; সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশ ঃ সুধীর সেন; সম্পাদনা ঃ কালী রাহা; রূপায়ণ ঃ উত্তমকুমার, রাধামোহন ভট্টাচার্য, শ্যামল ঘোষাল, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, প্রীতি মজুমদার, সলিল দত্ত, ধীরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ভট্টাচার্য, নন্দিতা বসু, সুলতা চৌধুরী, শোভা সেন, রেণুকা লাহিড়ী, জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা সিন্‌হা, ঊষা প্রভৃতি। ডিল্যুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ১২ই এপ্রিল থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

ভারতীয় খ্রীষ্টান ন্যাথানিয়েল রমেশ বিশ্বাস আসলে মানবধর্মে দীক্ষিত লোক। তাই তিনি কন্যাকুমারীকা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন এক পঙ্গু নাম-না-জানা শিশুকন্যাকে এবং সার্কুলার রোডের গোরস্থানের কাছ থেকে সাংঘাতিকভাবে আহত বছর এগারো-বারো বয়েসের বস্তির ছেলে বাচ্চিকে। পিতার সমস্ত স্নেহ ঢেলে দিয়ে এই দুই ছেলেমেয়েকে তিনি এমনভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করতে পারে। সারাক্ষণ সদুপদেশ, নৈতিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় সঙ্গীতের সাহায্যে তিনি এদের মনকে প্রভাবান্বিত করতে চেয়েছিলেন। অবশেষে তাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ক'রে তিনি এদের নাম দিয়েছিলেন লনা ও জন। লনা তার শুধু সংযত আচারে-ব্যবহারে একটি অনাবিল পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হয়ে তাঁর যীশুখ্রীষ্টকে সিদ্ধ করেছিল; কিন্তু জন?— সে ফাদার বিশ্বাসের কাছ থেকে দশ বছর ধ'রে নীতিশিক্ষালাভের পরও তার অতীতকে ভুলতে পারেনি—শত চেষ্টা সত্ত্বেও। সেই যে বস্তিজীবনে সে একদিন রোশনি ব'লে একটি নৃত্যগীতপটীয়সী কিশোরীর মাদকতাময় যৌন আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, দীর্ঘ দশ বারো বছরেও তার সঙ্গসুখকে সে ভুলতে পারেনি এবং লাস্যময়ী নারীর আহ্বান তার কাছে অমোঘ। সে জানে, লনা তাকে ভালোবাসে; কিন্তু সে ভালোবাসায় কোনো মাদকতা নেই—'কামগন্ধ নাহি তায়'। লনার মধ্যে কোনো উত্তেজনা নেই সে হিমশীতল। কাজেই ফাদারের শিক্ষা ব্যর্থ ক'রে জন নেমে গেল পাঁকের মধ্যে; দীর্ঘদিনের পর নর্তকী রোশনীকে নতুন ক'রে পেয়ে সে ডুবে গেল যৌনউপভোগের অতল তলে—ফাদারের পবিত্র আহ্বান এবং লনার পবিত্র প্রেম তাকে ফেরাতে পারল না। সে মাত্র তখনই আত্মস্থ হ'ল, যখন তাকে রক্ষা করবার জন্যে ফাদার হারালেন তাঁর প্রাণ এবং সে নিজে হারাল তার চোখের আলো।

'হার্ফাটাকিটে' মধুবালা

সাহিত্যের কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করতে গেলে স্বভাবতঃই বহু পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মূল কাহিনীর ন্যাথানিয়েল রমেশ বিশ্বাস ছবিতে হয়েছেন সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। জনের বন্ধু ডেভিড হয়েছে স্টীফেন। কাহিনীকে সরল এবং নাটকীয় করবার জন্যে থিয়েটারের সুমি সেন ও পুতুলকে সরিয়ে দিয়ে আনা হয়েছে বস্তীর রোশনীকে নর্তকীরূপে। এর ওপর কাহিনীতে ফাদার এবং বাচ্চি—দুজনেই কণ্ঠসঙ্গীতে অসামান্য; তার ওপর তারা বহু বাদ্যযন্ত্রবিশারদ। কিন্তু ছবিতে দেখি, বাচ্চি বস্তী-জীবনে বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে এবং জন-রূপে সে ফাদারের কাছ থেকে শিখেছে বেহালা। ফাদার নিজে বলছেন বটে, তিনি জনকে পাকা বেহালাবাজিয়ে ক'রে তুলবেন; কিন্তু নিজে বেহালা না ছুঁয়ে বাজিয়েছেন পিয়ানো। এসব পরি-

বর্তনের হয়ত প্রয়োজন ছিল কিংবা হয়ত, সবগুলির ছিলও না। কিন্তু বাচ্চি বা জনের জীবনের যে দ্বন্দ্ব নিয়ে নাটক, তা সম্যক পরিস্ফুট করবার জন্যে আহত অবস্থায় বাচ্চিকে তুলে আনবার পর যখন সে ফাদারের সেবাযত্নে সুস্থ হয়ে উঠল, তখন তার পবিত্র সুস্থ জীবনের চেয়ে বস্তী-জীবনে ফিরে যাবার আগ্রহকে বিস্তারিতভাবে দেখাবার প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া তার যে সংগীতের প্রতি একটি সহজাত অনুরাগ আছে, তারও কিছু নিদর্শন দেওয়ার দরকার ছিল, যার ফলে পরবর্তী জীবনে ফাদার বলতে পারেন, "জনের জীবনেও আসবে সত্যের নতুন আলো—কারণ সে সুর ভালোবাসে, সংগীত তারই কাজ—তারই প্রার্থনা।"

পবিত্র ভাবে দিনযাপনের শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলে জন যখন থিয়েটারে বেহালা বাজানোর চাকরী নিল এবং রোশনী দ্বারা ধীরে ধীরে প্রলুব্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত কামের কুটীল আবর্তে গা ভাসিয়ে দিল, তখন আবহ সৃষ্টির তাগিদে যে কুশ্রীতার অবতারণা করা হয়েছে, তার খুব বেশী প্রয়োজন ছিল ব'লে বোধ হয় না। এ ক্ষেত্রে সেন্সরের কাঁচি আরো নির্মমভাবে ব্যবহৃত হওয়ার অবকাশ ছিল। এ ছাড়া চিত্রনাট্য মোটের উপর সুন্দরভাবে গ্রথিত হয়েছে। ফাদারের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, লনার নিরুচ্চার প্রেম দৃশ্যের পর দৃশ্যে যে চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং ছবির শেষভাগে অনুতাপ-দগ্ধ অন্ধ 'জন'কে যেভাবে চিত্তশুদ্ধির তপস্যার দ্বারা সার্থকতার পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা সমূহ প্রশংসা পাবার যোগ্য।

পরিচালনায় অগ্রগামী গোষ্ঠী অত্যন্ত নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন 'কান্না' ছবিখানিতে। বহু রকমের চরিত্রের ভীড়েও ছবিখানির ছন্দপতন ঘটেনি কোথাও। আলো-ছায়ার সংমিশ্রণে 'মুড'-অনুযায়ী চিত্রগ্রহণে রামানন্দ সেনগুপ্ত অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির গোড়ার দিকে সম্ভবতঃ শব্দ-পুনর্যোজনার ত্রুটির জন্যেই পাত্র-পাত্রীর সংলাপ শুনতে অসুবিধা বোধ করেছি। সুরকার হিসেবে সুধীন দাসগুপ্তের কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়; বিশেষ ক'রে আবহ-সংগীত কয়েক জায়গায় এমন বিচিত্রভাবে দৃশ্য-সংস্থাপনায় সাহায্য করেছে, যাকে অভূতপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হবে না।

অভিনয়ে নবাগতা নন্দিতা বসু সংযত, ধীর, শান্ত অভিনয়ে লনার পবিত্র চরিত্রকে মূর্ত ক'রে তুলেছিলেন। রূপ-বিলাসিনী রোশনীর ভূমিকায় সুলতা চৌধুরী ছলনাময়ী রূপে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখালেও কোনো মাদকতাময়ী অভিনেত্রীকে এই ভূমিকায় দেখব ব'লে আশা করেছিলুম। রাধামোহন ভট্টাচার্যের ফাদার সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় একটি শুচিরত, মানবধর্মী, ভারতীয় খৃষ্টানকে আমাদের চোখের সামনে মূর্ত করে তুলেছিল। তাঁর রূপসজ্জাও চরিত্রের অনুরূপ। নায়ক 'জন'-এর ভূমিকায় উত্তমকুমার গৃহীত চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বটিকে অবলীলাক্রমে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বলিষ্ঠ অভিনয় দ্বারা। ছোট বাচ্চি ও রোশনীর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্যামল ভট্টাচার্য ও জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় নৃত্যে, বংশীবাদনে ও অভিনয়ে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পল্টনের ভূমিকার অভিনেতাটিকে জীবন্ত শয়তান বললেও অত্যুক্তি হবে না, এমনই স্বাভাবিক হয়েছে তাঁর রূপসজ্জা ও অভিনয়। 'জন'-এর গুণগ্রাহী বন্ধু স্টীফেনের ভূমিকায় শ্যামল ঘোষাল স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন শোভা সেন (চাচি), রেণুকা লাহিড়ী (মাদার সুপিরিয়র), ঊষা (নানি) এবং অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় (থিয়েটার মালিক)।

"অগ্রগামী"-গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য অধুনা পরলোকগত পার্বতীচরণ দে'র নামে উৎসর্গীকৃত "কান্না" ছবিখানি মানুষের জীবনপরীক্ষার একটি মর্মন্তুদ চিত্র।

বিবিধ সংবাদ

।। বাঙালী সুরকারের সম্মান ।।

সম্প্রতি নিখিল সোভিয়েট সুরকার সঙ্ঘের আমন্ত্রণে দিল্লী-প্রবাসী বাঙালী সুরকার শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে উক্ত সঙ্ঘের তৃতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়েছিলেন, এ সংবাদে সকলেই আনন্দিত হবেন। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু গত কয়েক বৎসর ধ'রে কেন্দ্রীয় সংগীত নাটক আকাদমীর অধীনস্থ

সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

একটি প্রতিষ্ঠানে সুরকার এবং অধ্যাপক হিসাবে কাজ করছেন। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং স্বরবিন্যাসের কাঠামোকে মোটামুটি অক্ষত রেখে তিনি আধুনিক মন ও কানের পক্ষে তৃপ্তিকর সৃজনধর্মী আবহসংগীত রচনায় সুদক্ষ।

এইসব গুণাবলীর জন্যেই তিনি বিদেশে আমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন এবং এবার মস্কোতে গিয়ে তিনি সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সুরকারদের একযোগে কাজ করার জন্যে আহ্বান জানান। তাঁর এই প্রস্তাব সেখানে সাদরে গৃহীত হ'য়েছে। দেশে ফিরে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সুরকারদের নিয়ে অদূরভবিষ্যতেই একটি আলোচনা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার বিষয় চিন্তা করছেন।

বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্য সম্মেলন :

গেল বৃহস্পতিবার, ১৯-এ এপ্রিল থেকে চারদিন ধ'রে বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেল। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসু। মূল সভাপতি ও প্রধানঅতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং যুগান্তর-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

আর ডি বনসালের নবতম চিত্র 'এক টুকরো আগুন'-এর একটি বিশিষ্ট চরিত্রে নবাগতা সুচরিতা দাশগুপ্ত

উদ্বোধন বক্তৃতা প্রসঙ্গে মনোজ বসু বলেন, "আমাদের জাতীয় সরকার আজকাল দুঃস্থ সাহিত্যিকদের মাসিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেছেন। যাঁরা একদিন রঙ্গমঞ্চ থেকে জনসাধারণের আনন্দবিধান করেছিলেন, তাঁরা অক্ষম হয়ে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হ'লে তাঁদেরও জন্যে সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত।" প্রধান অতিথিরূপে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যে-ভাষণ দেন, তার এক স্থানে তিনি বলেন, "আমরা নতুন জীবন ও যুগের সিংহদ্বার এবং ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেচি। এই জীবন তীব্র ও তীক্ষ্ম—এর সংঘাত অত্যন্ত গভীর। আজ দেশের নতুন পটভূমিকায় জনসাধারণের জীবনযুদ্ধ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব, চিন্তায় ও চেতনায় নতুন ভাব ও আদর্শের জাগরণ—এই সকলকে কেন্দ্র ক'রে সাহিত্য, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, শিল্পকলা—এক কথায় সমগ্র সংস্কৃতিকে নতুন বাস্তববাদে গড়ে তুলতে হবে।" এর পর ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য গেল বছরকে 'রবীন্দ্র"-নাটকের বছর ব'লে অভিহিত ক'রে বলেন, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প এবং উপন্যাসগুলিতে এত যে নাট্যবস্তু ছিল, তা রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব না হলে আমাদের কাছে ধরা পড়ত না। এ-ছাড়া তাঁর কাহিনীগুলির নাট্যরূপ কিন্তু বিভিন্ন সাধারণগ্রাহ্য প্রয়োগরীতি মারফতই জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়েছে, প্রযোজনা ব্যাপারে তাঁর অনুসৃত মঞ্চরীতি কচিৎ অনুসৃত হয়েছে। সুধীপ্রধান "সাধারণ নাট্যশালায় এক বছর" সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করবার পর বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। সবশেষে মূল সভাপতি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন, "আজকাল নাট্যরচনায় হৃদয়কে অস্বীকার ক'রে মস্তিষ্কের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। মস্তিষ্কধর্মী নাট্যকারেরা তাঁদের রচিত নাট্যবস্তু থেকে হৃদয়ধর্মকে সমূলে বিদায় করার পক্ষপাতী। কিন্তু নাট্য-সাহিত্যে শুধু 'হৃদয়হীন মস্তিষ্ক' বিরাজ করলে সমস্ত দেশ একটা নীরস জড়পদার্থে পরিণত হতে দেরী হবে না।"

কলকাতা মেট্রো সিনেমার কর্মাধ্যক্ষ :

কলকাতা মেট্রো সিনেমার সুদক্ষ কর্মাধ্যক্ষ জনাব আই, এ, হাফেসজী চিকিৎসার জন্যে সুইজারল্যান্ড যাত্রা করেছেন গেল ১৭ই এপ্রিল। কলকাতা ত্যাগের আগে ঐ দিন সকালে তিনি স্থানীয় চিত্র-সমালোচকদের একটি ঘরোয়া চা-পানে আপ্যায়িত করেছিলেন। আমরা কামনা করি তিনি যেন চিকিৎসান্তে যত শিগ্গির সম্ভব নিরাময় হয়ে এবং হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ক'রে দেশে ফিরে আসেন।

এস, সি, প্রোডাকসন্স-এর "শুভদৃষ্টি" :

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের বহুপঠিত উপন্যাস 'কাঁটা ও কেয়া' অবলম্বনে এস, সি, প্রোডাকসন্স চিত্ত বসুর পরিচালনায় যে-ছবিখানি তুলছেন, তার নব-নামকরণ হয়েছে 'শুভদৃষ্টি'। স্টুডিওর আভ্যন্তরীণ দৃশ্য শেষ ক'রে শ্রীবসু এবার বন্যা-দৃশ্য তোলার জন্যে খুব শিগ্গিরই মসেঞ্জোর যাত্রা করবেন। ছবিখানির নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন

ভি এ পি প্রোডাকসনের 'কাজল' চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও অসীমকুমার

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র শিল্পী অরুণ মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় এবং অপরাপর ভূমিকায় আছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোলী, অনুপকুমার, গীতা দে, নিভাননী প্রভৃতি। ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন মণি বর্মা এবং এতে সুরারোপ করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জনতা পিকচার্স অ্যান্ড থিয়েটার্স লিমিটেডের পরিবেশনায় ছবিখানি জুলাই মাসের গোড়ার দিকে মুক্তি পাবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে।

সূর্যশিখা :

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠান তাঁদের প্রথম ছবি 'সূর্যশিখা'র শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন করেছেন গেল ১লা বৈশাখ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও-তে। ছবিখানি পরিচালনা করবেন 'অগ্রদূত'-গোষ্ঠীর সহকারী সলিল দত্ত। বিনয় চট্টোপাধ্যায় এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণে আছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সুলতা চৌধুরী, রেণুকা রায়, শোভা সেন, শিখা বাগ প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ ছবিখানির পরিবেশনা করবেন।

সাক্ষী :

একখানি অভিনব অপরাধমূলক চিত্র হবে এম্-কে-জি প্রোডাকসন্স-এর আগামী চিত্রনিবেদন 'সাক্ষী'। ছবিখানির চিত্রনাট্যরচনা, পরিচালনা এবং সুরযোজনায় যথাক্রমে আছেন প্রণব রায়, পিনাকী মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত, দীপক মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, বীরেশ্বর সেন, জীবেন বসু, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, রেণুকা রায় এবং ন'বছর বয়সের শিশু-অভিনেতা বাসুদেব। কালিকা ফিল্মস্ ছবিখানির পরিবেশক।

মায়ার সংসার :

শিবানী ফিল্মসের সংগীতবহুল চিত্র "মায়ার সংসার"-এর কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও-তে কনক মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। ছবিখানির গীত রচনা করেছেন প্রণব রায় এবং সুরকার হচ্ছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। এর বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন বিশ্বজিৎ, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, সুলতা চৌধুরী, দীপ্তি রায় প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ চিত্রখানির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির :

১২ই মে, সন্ধ্যা ৬টায় মহাজাতি সদনে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'শ্রীমতী' নৃত্যনাট্য (শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার জীবনালেখ্য) নৃত্য-বিচিত্রা প্রদর্শিত হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র মহাশয়। সংগীত ও সহকারী নৃত্যে যথাক্রমে অংশ গ্রহণ করবেন সময় মিত্র, অরবিন্দ মিত্র, স্বপ্না সেনগুপ্তা, অরুণকুমার ও অনুপশংকর।

'পূর্বাপর' অভিনয়

গত ১১ই এপ্রিল '৬২ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় 'রূপদর্শী' সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শ্রীহরিপদ বসু রচিত 'পূর্বাপর' নাটকখানি রঙমহলে অভিনয় করলেন। পরিচালনা করলেন শ্রীরমেশ চট্টোপাধ্যায়।

আলোচ্য নাটকখানিতে নাট্যকার সামাজিক অব্যবস্থা ও দেশের বর্তমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছেন এবং সেদিক দিকে নাটকখানি রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

অভিনয়াংশে সেদিন যাঁরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন তাঁদের মধ্যে সুপ্রিয়, বাবুলাল, মিঃ লাহিড়ী, মৃত্যুঞ্জয়, গোসাই, বিমান, প্রজাপতি, অবিলাস, পিয়াসা, পুতুল ও বিরজা চরিত্রে যথাক্রমে : প্রভাত বসু, বিশ্বনাথ গরাই, গোপাল দত্ত, ভাস্কর চ্যাটার্জি, নির্মলেন্দু বিশ্বাস, রথীন সিকদার, বিকাশ দত্ত, বাদল মুখার্জি, সিপ্রা সাহা, দত্তা মুখার্জি ও মেনকা দেবীর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাট্য পরিচালনা এক কথায় সুন্দর।

হাওড়ায় নিয়মিত অভিনয় :

ঋত্বিক ও নট-নাট্যম্-এর যুগ্ম প্রযোজনায় হাওড়ায় নিয়মিত অভিনয়ের প্রথম পর্যায়ের অভিনয় গেল ১৪ই ও

'উত্তরায়ণ' চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও উত্তমকুমার

১৫ এপ্রিল হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনে চারটি একাঙ্কিকার অভিনয় হয়। পরিমল দত্তের 'ম্যান্ড-মাষ্টার', প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প অবলম্বনে অরুণ মুখোপাধ্যায় কৃত নাট্যরূপ 'সংসার সীমান্তে', জগমোহন মজুমদারের 'করুণা কোরো না' এবং জো কুরীর 'হিউয়ার্স অব কোল' অবলম্বনে জগমোহন মজুমদার কৃত নাট্যরূপ 'ওরা কাজ করে'।

প্রথম দুটির পরিচালনা করেন অরুণ মুখোপাধ্যায় এবং শেষের দুটির পরিচালনার দায়িত্ব নেন যথাক্রমে জগমোহন মজুমদার ও শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম পর্যায়ের অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ঋত্বিক ও নট-নাট্যম্ আগামী মে মাসে দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিনয় শুরু করবেন।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

পঞ্চম টেস্ট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৫৩ রান (গ্যারিফিল্ড সোবার্স ১০৪, রোহন কানহাই ৪৪, ইস্টন ম্যাকমরিস ৩৭, রঞ্জনে ৭২ রানে ৪, নাদকার্ণী ৫০ রানে ৩, দুরাণী ৫৬ রানে ২ এবং বোরদে ৩৩ রানে ১ উইকেট)।

ও ২৮৩ রান (ওরেল নট আউট ৯৮, সোবার্স ৫০, ম্যাকমরিস ৪২, কানহাই ৪১। সুর্তি ৫৬ রানে ৩, দুরাণী ৪৮ রানে ৩, রঞ্জনে ৮১ রানে ২, নাদকার্ণী ১৩ রানে ১ এবং বোরদে ৬৫ রানে ১ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ১৭৮ রান (বাপু নাদকার্ণী ৬১, রুসি সুর্তি ৪১ এবং পলি উমরিগড় ৩২। লেস্টার কিং ৪৬ রানে ৫, লান্স গিবস ৩৮ রানে ৩, হল ২৬ রানে ১ এবং আলফ ভ্যালেন্টাইন ৩২ রানে ১ উইকেট)।

ও ২৩৫ রান (উমরিগড় ৬০, সুর্তি ৪২, মঞ্জরেকার ৪০, মেহেরা ৩৯। সোবার্স ৬৩ রানে ৫, হল ৪৭ রানে ৩, কিং ১৮ রানে ২ উইকেট)

প্রথম দিন (১৩ই এপ্রিল) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ২৫৩ রানে সমাপ্ত। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৩ রান (৫ উইকেটে)। পতৌদির নবাব ৮ এবং নাদকার্ণী ০ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (১৪ই এপ্রিল) : ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৭৮ রানে সমাপ্ত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস—১৩৮ রান (৬ উইকেটে)। ওরেল ৩২ এবং কিং শূন্য রান করে নট আউট থাকেন।

৩য় দিন (১৬ই এপ্রিল) : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৮৩ রানে সমাপ্ত। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস—৩৭ (২ উইকেটে)। মেহেরা (১৫) এবং বোরদে (৮) নট আউট থাকেন।

৪র্থ দিন (১৭ই এপ্রিল) : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩১ রান (৫ উইকেটে)। মঞ্জরেকার ৩৬ রান এবং উমরিগড় ১১ রান করে নট আউট থাকেন।

লাঞ্চের পর ২০ মিনিট খেলা হয়ে বৃষ্টির জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। এই দিন আর খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি।

৫ম দিন (১৮ই এপ্রিল) : ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২৩৫ রানে সমাপ্ত।

খেলার ফলাফল : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১২৩ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

কিংস্টনের পঞ্চম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১২৩ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করায় পাঁচটি খেলা সমন্বিত টেস্ট সিরিজের প্রত্যেকটি খেলায় জয়লাভের সংকল্প রক্ষা করতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সক্ষম হয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট ক্রিকেট জীবনে এই ধরনের সাফল্য প্রথম; এবং আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তৃতীয় দল হিসাবে এই সম্মান লাভ করলো। টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে যোগদানকারী সাতটি দেশের মধ্যে মাত্র তিনটি দেশ—অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই দুর্লভ সম্মান পেয়েছে। ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়া ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে সফররত ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে এবং ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়া সফররত দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এবং ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড দল টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাতেই জয়লাভের কৃতিত্ব লাভ করে। অস্ট্রেলিয়ার কৃতিত্বই বেশী, তারা দু'বার এই সাফল্য লাভ করেছে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করার আছে, কোন দেশই ভিন্ন দেশের মাটিতে এই সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়নি। ভারতবর্ষ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই পরাজয় স্বীকার করলো—কোন দেশেরই টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ ধরনের অকৃতকার্যতার দৃষ্টান্ত নেই। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সদ্য 'রাবার' বিজয়ী ভারতবর্ষের এই চরম ব্যর্থতায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে ভারতবর্ষের সুনাম অনেকটা নষ্ট হয়েছে এবং ক্রিকেট অনুরাগী মাত্রেই বিস্মিত হয়েছেন ভারতবর্ষের এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ খেলাতে।

গত সংখ্যায় (৫০শ সংখ্যা, শুক্রবার ৭ই বৈশাখ) পঞ্চম টেস্টের তৃতীয় দিন পর্যন্ত খেলার বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৮৩ রানে শেষ হলে ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভ করতে ৩৫৯ রানের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষ ৭৪৫ মিনিট খেলার সময় পায়। ভারতবর্ষ মাত্র ১৫ মিনিটের খেলায় ১৫ রান করে জয়সীমার উইকেট হারায়। দলের ২১ রানের মাথায় দুরাণী ৪ রান করে কিংয়ের বলে আউট হন। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনায় কিংয়ের এই সাফল্য ভারতীয় দলের সমর্থকদের মহা-দুশ্চিন্তায় ফেলে। যাই হোক এইদিন আর কোন অঘটন ঘটেনি—নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগে খেলার উপযুক্ত আলোর অভাবে খেলা ভেঙ্গে যায়। রান দাঁড়ায় ৩৭, ২ উইকেটে। উইকেটে অপরাজেয় ছিলেন মেহেরা (১৫) এবং বোরদে (৮)।

এই দিন বৃষ্টির জন্যে ১০৮ মিনিটের মত খেলার সময় নষ্ট হয়।

চতুর্থ দিনের খেলায় ভারতবর্ষ তৃতীয় দিনের ৩৭ রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে ৯৪ রান যোগ করে আরও ৩ উইকেট খুইয়ে। চতুর্থ দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি, ১৪০ মিনিট খেলা হয়। লাঞ্চের পর ২০ মিনিট পর্যন্ত খেলা চলে এবং বৃষ্টির দরুণ সেই যে খেলা বন্ধ হয় এইদিনে আর খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। চতুর্থ দিনে লাঞ্চের আগেই ভারতবর্ষের ৩ জন খেলোয়াড়—মেহেরা, বোরদে এবং অধিনায়ক পতৌদির নবাব আউট হয়ে যান, এদিকে পূর্ব দিনের ৩৭ রানের সঙ্গে ৮১ রান যোগ হয়ে মোট রান দাঁড়ায় ১১৮, ৫টা উইকেট পড়ে। চতুর্থ দিনে প্রথম ৭৭ মিনিটের খেলায় দলের রান পাঁচের কোঠায় পৌঁছায়। এবং ৮১ মিনিটের খেলায় তৃতীয় উইকেটের

জুটিতে ৫০ রান পূর্ণ হয়। দলের ৭৭ রানের মাথায় সোবার্সের বলে খোঁচা দিয়ে মেহেরা উইকেট-কীপার এ্যালানের হাতে ধরা পড়েন। এর ৬ মিনিট পর দলের ৮০ রানের মাথায় সোবার্সের বলেই বোরদে বোল্ড আউট হয়ে খেলা থেকে বিদায় নেন। ১৫ মিনিট পর সোবার্স দলের ৮৫ রানের মাথায় ভারতবর্ষের অধিনায়ক পতৌদিকে বোল্ড আউট করেন। ৬ষ্ঠ উইকেটে মঞ্জরেকারের সঙ্গে খেলতে নামেন উমরিগড়। লাঞ্চের সময়ে স্কোর ছিল ১১৮, ৫ উইকেট পড়ে। চতুর্থ দিনে বৃষ্টির দরুণ লাঞ্চের পর যখন মাত্র ২০ মিনিট খেলা হয়েছে তখন বৃষ্টির জন্যে খেলা বন্ধ রাখতে হয়। ভারতবর্ষের তখন রান ১৩১ (৫ উইকেটে)। উইকেটে আছেন মঞ্জরেকার (৩৬) এবং উমরিগড় (১১ রান)। এই দিনের মত এইখানেই খেলা শেষ। খেলার এই অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভে ২২৮ রানের প্রয়োজন হয়। হাতে খেলার সময় ৩৩০ মিনিট এবং হাতে জমা আছেন মঞ্জরেকার, উমরিগড়, সুর্তি, নাদকার্ণী, কুন্দরাম এবং রঞ্জনে—৫টা উইকেট পড়তে বাকি।

খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে যখন ভারতবর্ষ খেলা আরম্ভ করে তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের থেকে ভারতবর্ষ ২২৭ রানের পিছনে আছে। এই দিনের খেলার সূচনায় মঞ্জরেকার সোবার্সের বলে বার বার পরাস্ত হন। তিনি যে আর বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারবেন না তা এই থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। কলকাতায় খেলা হলে বার বার ঠাকুরের কাছে তাঁর জন্যে মানত করা হ'ত। এই দিনের বার মিনিটের খেলার সময়ে এবং দলের ১৩৫ রানের মাথায় মঞ্জরেকার নিজস্ব ৪০ রান ক'রে সোবার্সের বলে এল-বি-ডবলিউ হয়ে বিদায় নেন। ৬ষ্ঠ উইকেটে মঞ্জরেকার এবং উমরিগড় দলের ৪৯ রান যোগ করেন। চতুর্থ দিনে মঞ্জরেকার তাঁর ১৩ রানের মাথায় হলের বলে একটা খুব সোজা ক্যাচ তুলে দেন। সলোমন এই বলটা ফেলে দিলে মঞ্জরেকার অপয়া ১৩ রানের মাথায় খুব জোর আউট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যান। ৭ম উইকেটে উমরিগড়ের সঙ্গে খেলতে নামেন সুর্তি। এই জুটি খুব তাড়াতাড়ি দলের রান তুলে দেন। দলের ২১৮ রানের মাথায় সুর্তি ৪২ রান ক'রে আউট হন। তখন লাঞ্চের জন্যে খেলা ভাঙতে ২০ মিনিট বাকি—সোবার্সের বল মারতে সুর্তি লাফ দিয়ে এগিয়ে যান, কিন্তু ব্যাটে বলে এক করতে পারলেন না; উইকেট-কীপার এ্যালান তাঁকে স্টাম্পড আউট করেন। সুর্তি এবং উমরিগড়ের ৭ম উইকেটের জুটিতে দলের ৮৩ রান উঠে যায় ৮০ মিনিটের খেলায়। সুর্তি ধীর-স্থিরভাবে খেলেননি। গোড়া থেকেই তাঁর খেলায় অস্থিরতা প্রকাশ পায়। তাঁর এই দুর্বলতার প্রতি সোবার্স লক্ষ্য রেখেছিলেন এবং বেশ বুঝে কোপ মারেন। সুর্তি একটু ধীর-স্থিরভাবে খেলেলে এইভাবে আউট হতেন না। এবং ওরেলকে এই পঞ্চম টেস্ট খেলায় জয়লাভের জন্যে যথেষ্ট মাথা ঘামাতে হত। সুর্তি যখন আউট হন তখনও ভারতবর্ষ ১৪০ রানের পিছনে পড়ে রয়েছে। এর পর নাদকার্ণী খেলতে নামেন; কিন্তু বেশীক্ষণ উইকেটে ছিলেন না। দলের মাত্র এক রান যোগ হয়ে ২১৯ রান দাঁড়াল এবং নাদকার্ণী কোন রান না করেই হলের বলে বিদায় নেন। তাঁর শূন্যস্থানে খেলতে নামেন কুন্দরাম। কুন্দরাম হলের বল খেলতে খুবই অসুবিধায় পড়েন। হলের পর পর পাঁচটা বল খেলতে গিয়ে তিনি কোন রকম আউট থেকে বেঁচে যান। লাঞ্চের জন্যে খেলা ভাঙলে কুন্দরাম হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন আর কি! লাঞ্চের সময় স্কোর ছিল ২২৪ রান ৮ উইকেটে; উইকেটে তখন আছেন উমরিগড় (৫৪ রান) এবং কুন্দরাম। কুন্দরাম তখনও রানের মুখ দেখেননি। লাঞ্চের পরের বার মিনিটের খেলার সময়ে কুন্দরাম বোল্ড আউট হলেন হলের বলে। কুন্দরাম ১ রান করে পিতৃরক্ষা করেন। দলের রান তখন ২৩০ অর্থাৎ লাঞ্চের পর দলের মাত্র ৬ রান যোগ হয়েছে। রঞ্জনে শেষ উইকেটে খেলতে নামেন উমরিগড়ের সঙ্গে। উমরিগড় সোবার্সের বলে বাউণ্ডারী এবং হলের বলে ১ রান মোট ৫ রান করেন। দলের রান দাঁড়ায় ২৩৫। এই ২৩৫ রানের মাথায় হলের শেষ বলে উমরিগড় বোল্ড আউট হন। ফলে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২৩৫ রানে শেষ হয় এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১২৩ রানে জয়লাভ করে। উমরিগড় ২১০ মিনিট খেলে নিজস্ব ৬০ রান করেন এবং বাউণ্ডারী করেন ২টো।

পাঁঠের ব্যথার জন্যে উমরীগড় পঞ্চম টেস্ট খেলায় বল করেননি। সোবার্স ৬৩ রানে ৫টা উইকেট পান। শেষ দিনে ওস্তাদের মার দেন কিন্তু হল। ১৩ ওভার বল ক'রেও হলের থলে শূন্য—এমন অবস্থায় হল পুরনো বল নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের শেষের দিকে বল করতে নামেন এবং ৭·৫ ওভার বলে ৩টে উইকেট পান; তাঁর থলে পূর্ণ করেন নাদকার্নী, কুন্দরাম এবং উমরীগড়। এই ৩টে উইকেটের বিনিময়ে হল মাত্র ৭ রান দেন। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, উইকেট পাওয়ার উপযুক্ত পাঁচ পেয়েও গিবস ২৫ ওভার বল ক'রে একটা উইকেটও পাননি, অথচ রান দিয়েছিলেন ৬৬টা। আর এই গিবসই কিনা ভেল্কির খেলা দেখিয়েছিলেন তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৬ রানে ভারতবর্ষের ৮টা উইকেট নিয়ে; এবং তাঁর সেই খেলার জন্যেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়।

॥ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট ॥

(বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলা এবং টেস্ট সিরিজের সংক্ষিপ্ত ফলাফল)

	মোট	জয়	হার	ড্র
টেস্ট খেলা	৯৪	৩১	৩২	৩১*
টেস্ট সিরিজ	২২	১০	১০	২

*টেস্ট খেলার ইতিহাসে প্রথম 'টাই ম্যাচ' (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট) নিয়ে ৩১টি

॥ ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট ॥

	মোট	জয়	হার	ড্র
টেস্ট খেলা	৮২	৮	৩৪	৪০
টেস্ট সিরিজ	১৯	৩	১৩	৩

॥ ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ॥

প্রথম টেস্ট ১৯৪৮-৪৯ এবং শেষ টেস্ট১৯শে এপ্রিল, ১৯৬২

স্থান	সাল	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের হার	খেলা ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	১৯৪৮-৪৯	০	১	৪	৫
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৫৩	০	১	৪	৫
ভারতবর্ষ	১৯৫৮-৫৯	০	৩	২	৫
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৬২	০	৫	০	৫
মোট		০	১০	১০	২০

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে পাঁচটা টেস্ট খেলার ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়-পড়তা তালিকায় প্রবীণ খেলোয়াড় পলি উমরীগড় ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথম স্থান লাভ করেছেন। ব্যাটিংয়ে তাঁর খেলার হিসাব দাঁড়িয়েছে : খেলা ৫, ইনিংস ১০, নট-আউট ১ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭২ নট-আউট, মোট রান ৪৪৫ এবং গড়পড়তা ৪৯·৪৪। বোলিংয়ের হিসাব : ওভার ১৫৬, মেডেন ৬৭, ২৪৯ রানে ৯ উইকেট এবং গড়পড়তা ২৭·৬৬। মোট টেস্ট খেলায় তিনিই উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান (১৭২ নট-আউট) এবং নিজ দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান (৪৪৫) করেছেন। চতুর্থ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসে উমরীগড়ের ১০৭ রানে ৫ উইকেট, প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৫৬ ও ১৭২ নট-আউট রান করার কৃতিত্ব—টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই রকমের সাফল্য খুব কমই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পক্ষে এবার উমরীগড়ই এক ইনিংসের খেলায় ৫টা উইকেট পেয়েছেন। টেস্ট খেলা ছাড়াও এইবারের সফরের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর খেলার ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন উমরীগড়ই। সফরের খেলায় আহত এবং পীঠের পুরনো ব্যথায় অসুস্থ না হলে তিনি আরও উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারতেন। বর্তমানে উমরীগড়ের টেস্ট ক্রিকেট খেলার হিসাব দাঁড়িয়েছে : মোট খেলা ৫৯, মোট রান ৩৬৩১, সেঞ্চুরী সংখ্যা ১২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২৩ (নিউ-জিল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৫-৫৬), অর্ধ-সেঞ্চুরী ১৪ এবং ১৪৭৫ রানে ৩৫ উইকেট। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র উমরীগড়ই তিন হাজার রান ক'রেছেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ১৯৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় উমরীগড়ের পর যথাক্রমে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান পেয়েছেন—নাদকার্নী ২৩৬ রান (৩৩·৭১), দুরানী ২৫৯ (২৮·৭৭), সুর্তি ২৪৬ রান (২৪·৬০) এবং বোরদে ২৪৪ (২৪·৪০)। বোলিং-য়ের গড়পড়তা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন নাদকার্ণী, ৩১৬ রানে ৯ উইকেট (৩৫·১১)। দুরানী ৬০০ রানে ১৭টা উইকেট নিয়ে তৃতীয় স্থান (গড়-পড়তা ৩৫·২৯) পেলেও দলের পক্ষে তিনিই সর্বাধিক ১৭টা উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল—খেলা ৫, ইনিংস ৬, নট আউট ২ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৯৬ নট আউট, মোট রান ৩৩২ (৮৩·০০)। উভ[illegible] [illegible]র পক্ষে সর্বাধিক মোট রান [illegible] পেয়েছেন রোহন কানহাই; [illegible]তাঁর স্থান দ্বিতীয়—খেলা ৫, ই[illegible] [illegible], এক ইনিংসে সর্বোচ্চ [illegible]ন ১৩[illegible] [illegible]রান ৪৯৫ (৭০·৭১)। ৩য় স্থানে [illegible]স—খেলা ৫, ইনিংস ৭, নট আ[illegible] [illegible], এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৫৩, মোট [illegible]ন ৪২৪ (৭০·৬৬), ৪র্থ স্থানে ম্যা[illegible] [illegible]রস—খেলা ৪, ইনিংস ৬, নট আউট [illegible], এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২৫, [illegible] রান ৩৪৯ (৮৫·১৬)। উভয় দ[illegible] [illegible]লোয়াড় নিয়ে ব্যাটিংয়ের গড়পড়[illegible] [illegible]লিকা তৈরী করলে উমরিগ[illegible] [illegible]ন পঞ্চম স্থান। প্রথম [illegible] [illegible]নেই পাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ[illegible] [illegible]দের পক্ষে বোলিংয়ের গড়পড়তা [illegible] প্রথম স্থান পেয়েছেন ওয়েসলে হল—ওভার ১৬৭·৪, মেডেন ৩৭, ৪২৫ রানে ২৭ উইকেট (গড়পড়তা ১৫·৭৪)। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেটও (২৭) পেয়েছেন ওয়েসলে হল। গিবস পেয়েছেন ৪৯০ রানে ২৪টা (২০·৪১), সোবার্স ৪৭৩ রানে ২৩টা (২০·৫৬), স্টেয়ার্স ৩৬৪ রানে ৯টা (৪০·৪৪) এবং কিং ৬৪ রানে ৭টা।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ৫টা করে উইকেট পেয়েছেন চারজন বোলার : ওয়েসলে হল ৪৯ রানে ৬ (২য় টেস্ট ২য় ইনিংস) এবং ২০ রানে ৫ (৪র্থ টেস্ট ১ম ইনিংস), ল্যান্স গিবস ৩৮ রানে ৮ (৩য় টেস্ট ২য় ইনিংস), লেস্টার কিং ৪৬ রানে ৫ (৫ম টেস্ট ১ম ইনিংস) এবং গারফিল্ড সোবার্স ৬৩ রানে ৫ (৫ম টেস্ট ২য় ইনিংস)।

পাঁচটি টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ মোট রান করেছে ২০৯১ (১০০ উইকেটে) এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২[illegible] (৬০ উইকেটে)। ভারতবর্ষের ২০৯১ রানের মধ্যে অতিরিক্ত রান ১৩০ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২৫৬৬ রানের মধ্যে অতিরিক্ত ৮৫ রান। টেস্ট সিরিজে মোট ৭টা সেঞ্চুরী হয়েছে—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ৫ এবং ভারতবর্ষের পক্ষে ২। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সেঞ্চুরী করেছেন কিংস্টনের দ্বিতীয় টেস্টে সোবার্স ১৫৩, কানহাই ১৩৮ এবং ম্যাকমরিস ১২৫; পোর্ট অব স্পেনের চতুর্থ টেস্টে কানহাই ১৩৯ এবং কিংস্টনের পঞ্চম টেস্টে সোবার্স ১০৪। ভারতবর্ষের পক্ষে টেস্ট সেঞ্চুরী করেছেন পোর্ট অব স্পেনের চতুর্থ টেস্টে দুরানী ১০৪ এবং উমরিগড় নট আউট ১৭২।

ভারতবর্ষের ব্যর্থতার কারণ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষ শুধু টেস্ট খেলায় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়নি; এবারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের ফলাফল ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই লজ্জার কারণ। এই ব্যর্থতার কারণ হিসাবে বলা যায়, বিদেশের অনভ্যস্ত জলবায়ুতে কয়েক-জন নামকরা খেলোয়াড়ের অসুস্থতা, খেলায় কয়েকজনের শারীরিক আঘাত, টেস্ট খেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তে দলের ক্ষতি, দল পরিচালনায় যোগ্যতার একান্ত অভাব, ব্যাটিং বিপর্যয়, ত্রুটিপূর্ণ ফিল্ডিং, খেলোয়াড়দের মানসিক দুর্বলতা এবং ওয়েসলে হলের ফাস্ট বল সম্পর্কে খেলোয়াড়দের নিদারুণ আশংকা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধি-নায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল পাঁচটা টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের শোচনীয় পরাজয়ের অন্য-তম কারণ হিসাবে হলের বলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের দারুণ ভয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। ওরেলের মতে, ভার-তীয় দল দুর্বল নয়, মূলতঃ ভালই। তিনি বলেছেন, যে সময়ে হল সম্পর্কে ভারতীয় দলের ভ্রান্ত ধারণা অনেকটা কেটে যায়, তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তিনটে টেস্ট খেলা জিতে নিয়েছে। দল পরি-চালনায় ত্রুটি সম্পর্কে তিনি খোলা-খুলিভাবে অভিমত প্রকাশ করেননি; ভদ্রতার খাতিরে বেখে-ঢেকে ইঙ্গিত করেছেন মাত্র। একথা ঠিকই যোগ্য অধিনায়কের হাতে পড়লে ভারতীয় দলের এরকম 'হাঁড়ির হাল' হ'ত না। ভারতীয় দলের কন্ট্রাক্টর এবং পাতৌদির নবাব কি খেলায় এবং কি দল পরিচালনায় মোটেই যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে যেখানে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল অধিনায়ক সেখানে ভারতীয় দল পরিচালনার ভার কার উপর দিলে শোভন এবং কাজের হ'ত প্রবীণ টেস্ট খেলোয়াড় পলি উমরিগড় এই সফরের খেলায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। খবরে প্রকাশ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চারজন ফাস্ট বোলারকে ভারতবর্ষের খেলোয়াড়দের মন থেকে ফাস্ট বলের 'জুজুর ভয়' দূর করার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিগত টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের ১০০টা উইকেটের মধ্যে ফাস্ট বোলাররা পেয়েছেন ৪৩টা উইকেট; বাকি বেশীর ভাগ উই-কেট পেয়েছেন স্লো বোলাররা। ভার-তীয় ক্রিকেট দলের আজ প্রধান সমস্যা যোগ্য অধিনায়কের। ঝক্‌ঝকে দামি গাড়ি অক্ষম চালকের হাতে পড়লে গাড়ির যে দুর্গতি হয় ভারতবর্ষেরও তাই হয়েছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচী পত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১০৪৭	সম্পাদকীয়		
১০৪৮	স্বগত	(কবিতা)	—শ্রীমৃগাঙ্ক রায়
১০৪৮	রৌদ্রে খুঁজি সেই মুখ	(কবিতা)	—শ্রীকৃষ্ণ ধর
১০৪৮	বাসাবাড়ী	(কবিতা)	—শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
১০৪৯	পূর্বপক্ষ		—শ্রীজৈমিনি
১০৫১	রবীন্দ্রচিত্রের রূপ		—শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০৫৬	মতামত		—শ্রীবাণী দত্ত ও —শ্যামসুন্দর মাইতি
১০৫৭	ত্রিপদী	(গল্প)	—শ্রীআরতি দাস
১০৭০	সাহিত্য সমাচার		
১০৭১	মেঘের উপর প্রাসাদ	(উপন্যাস)	—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
১০৭৬	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
১০৭৯	দীঘা		—শ্রীশংকরনারায়ণ সেন

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৫২শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২১শে বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 4th May 1962.
40 Naya Paise

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সম্প্রতি কংগ্রেসের সংসদীয় দলের এক সভায় গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে, পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানুষের পক্ষে অত্যন্তই ক্ষতিকর, এবং সেইজন্যেই যাঁরা শান্তি-পূর্ণ পৃথিবী চান তাঁদের এই পরীক্ষা বন্ধের জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

সকলেরই একথা জানা আছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে খৃস্টমাস দ্বীপে নব-পর্যায়ে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা শুরু হওয়ার ফলে জেনেভায় অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন প্রায় ব্যর্থ হ'য়ে উঠেছে। এবং উক্ত সম্মেলন শুরু হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক ঘনঘটার মধ্যে সামান্য যে একটু আশার আলো দেখা দিয়েছিল, তাও এখন বিলীয়মান।

কিন্তু আরম্ভেরও একটা আরম্ভ আছে। সেই হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সাম্প্রতিক পারমাণবিক বিস্ফোরণের কারণ হিসাবে দেখাতে পারে গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত রুশ পারমাণবিক বিস্ফোরণের নজির। প্রকৃত প্রস্তাবে সে সময়ে রাশিয়ার পঞ্চাশ মেগাটন বোমার বিস্ফোরণ যে-পরিমাণ প্রতিবাদের ধূলিঝড় উৎক্ষিপ্ত করে তুলেছিল তাও প্রায় অভূতপূর্ব। তবে প্রতিবাদের ফলে রাশিয়া যেমন তখন তার বিপজ্জনক পরীক্ষা বন্ধ করেনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তেমনি বর্তমানে অবিচলিতভাবেই তার পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এবং এইভাবে পুরোদস্তুর একটা মহা-যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার আগেই নিছক পারমাণবিক বিস্ফোরণ-জাত তেজস্ক্রিয় ভস্মপতনের ফলেই সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষ 'সবংশে নিধন' হওয়ার বিভীষিকায় নিমজ্জিত হ'চ্ছে।

প্রত্যক্ষ মৃত্যুর চেয়ে এই সর্বগ্রাসী আতঙ্কই যেন এ যুগের উৎকটতম অভিশাপ!

এ আতঙ্কের বজ্রমুষ্টিতে কেবল আমরা অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরাই যে প্রাণান্তকর দুঃস্বপ্নের মধ্যে কালাতিপাত করছি তা নয়, বর্তমান পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীরও সেই একই দুরবস্থা। বাস্তবিক শ্রীনেহরু তাঁর পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতায় ঠিকই বলেছেন যে, দুই বৃহৎ শক্তির পারস্পরিক অবিশ্বাসই নিরস্ত্রী-করণ চুক্তির পথে সব থেকে বড় বাধা। এবং এই অবিশ্বাসের ফলেই উভয় দেশে পর্যায়ক্রমে পারমাণবিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'য়ে চলেছে।

অবশ্য যদি ধ'রে নেওয় যায় যে, আমরা এক সর্ব-ব্যাপী যুদ্ধের মুখোমুখী বাস করছি তবে পরীক্ষা-মূলক পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণের জন্যে কোনো পক্ষকেই হয়ত দোষী করা যায় না। কারণ পারমাণবিক অস্ত্রই যখন সম্ভাবিত সে যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের নিয়ন্তা তখন যে-পক্ষ ভীষণতম অস্ত্রের অধিকারী হবে, জয়লক্ষ্মী তাদেরই কণ্ঠে বরমাল্য দান করবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কাজেই রাশিয়া পঞ্চাশ মেগাটন বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষাকার্য চালালে মার্কিন রাষ্ট্রকেও উন্নত-তর বোমা ফাটাতে অগ্রণী হ'তে হয়। এবং মার্কিন দেশের পর রাশিয়া যদি নতুন পর্যায়ে আবার পার-মাণবিক বিস্ফোরণ আবশ্যক মনে করে তাতেও বিস্ময়ের অবকাশ থাকবে না। এই দুষ্টচক্র যেন কালচক্রের মতোই অমোঘ: ন্যায়শাস্ত্রের বিধান মতো এ থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ অত্যন্তই ক্ষীণ।

কিন্তু ন্যায়ের বিধান বা নিয়তি মনে ক'রে মানুষ কোনো বিপদকেই নির্বিচারে মেনে নেয় না। মানুষের মনুষ্যত্ব এবং পুরুষকার অজস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মানবিক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে তৎপর। সভ্যতার বিস্তৃত ইতিহাস আসলে এই ধরনের অভাবনীয় বাধা এবং তাকে সাহস ও বুদ্ধির দ্বারা অতিক্রম করারই ইতিহাস। কাজেই বর্তমান বিপদকেও সর্বশক্তিমান মনে করলে সে হবে মানুষের যুগ-যুগ-অর্জিত মনুষ্যত্বের প্রতিই নিদারুণ অবিশ্বাস।

প্রকৃত প্রস্তাবে, ইতিমধ্যেই অন্য একটি সম্ভাবনার পথরেখা স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। মার্কিন দেশের পক্ষ থেকে বর্তমানে খৃষ্টমাস দ্বীপে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হ'চ্ছে এ যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও অত্যন্ত সত্য যে ইস্টার দিবসের পূর্বে রাত্রে নিউইয়র্ক শহরের টাইম স্কোয়ারে প্রায় সাড়ে তিন হাজার নরনারীর প্রতিবাদ ঘোষিত হ'য়েছে। এবং এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, ২৩শে এপ্রিল নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি থেকে ১২৫ জন অধ্যাপক ও গবেষক একটি প্রতিবাদ পত্র ছেপে জানিয়েছেন, যাঁরা ঐ প্রতিবাদের পক্ষে একমত তাঁরা যেন তার নিচে তাঁদের নাম স্বাক্ষর করে সেটি প্রেসিডেন্ট শ্রীকেনেডির কাছে পাঠিয়ে দেন। এ ছাড়া ঐ দিন গ্রেট বৃটেনে ১৫ হাজার, পশ্চিম জার্মানীতে ১০ হাজার এবং কোপেনহেগেনে ৩০ হাজার প্রতিবাদকারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন, এ সংবাদও নিউইয়র্ক টাইমস থেকেই জানা যায়। ইতিপূর্বে রাশিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষার সময়েও এইভাবে দেশে দেশে প্রতিবাদ-ধ্বনি উত্থিত হ'য়েছিল। আমাদের মনে হয়, বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীদের এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদই পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়।

অত্যন্ত সুখের বিষয়, কেবল আমাদের প্রধানমন্ত্রীই নয়, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষও এই শান্তিপূর্ণ নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্যে বারেবারেই তাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে; এবং আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, যতোদিন প্রয়োজন ঘটে ততোদিনই তাদের এই মুক্তকণ্ঠ প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।

স্বগত
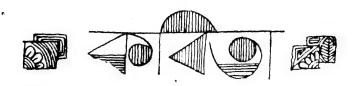
মৃগাঙ্ক রায়

ট্রাম টকি ট্রেন, সংসার শহর,
প্রাচীন প্রত্যহের পরিচর্যা,
মাছি মাংস বাজার, অবিমিশ্র রৌদ্রের
রক্তহীনতা, তিন ডাইনির কড়ায়ের নিচে
আগুন আগুন আগুন।

তবু লেখো, প্রতিদিন কবিতা লেখো
যদিও সাধারণ, অতীব সাধারণই থাকবে,
শ্রুতকীর্তি সম্রাট হবে না, যদিও তুমি
দুসারি দাঁতের অন্তরালের অন্ধকারে
জীবনের নিত্যকার ক্ষুধার আহার্য।

তবু লেখো, অর্পিত হও কবিতায়
কেননা, জীবন যথেষ্ট যন্ত্রণা নয়॥

রৌদ্রে খুঁজি সেই মুখ

কৃষ্ণ ধর

আমি খুঁজি এই রৌদ্রে তোমার সে ঝলসানো মুখ
দগ্ধদীর্ণ এ প্রান্তরে, তোমাকেই খুঁজে দেখি আমি
লাল পাহাড়ের নিচে, উজ্জ্বল নদীর জলে নামি
খুঁজে দেখি সেই মুখ, অন্বেষণে অপরিমেয় সুখ।

তৃপ্তি দেবে বলেছিলে, গভীর যন্ত্রণা দেবে মুছে
জীবনের পাত্র থেকে, কিছু আর রাখিনি যে নিজে
সবই তোমাকে দিয়ে শুচিস্মান নায়কের সাজে,
শিশুর খেলনার মতো রৌদ্র নাচে মহুয়ার নিচে।

আমাকে ডাকবে বলে পৃথিবী এমন রৌদ্রমতী
জ্যোৎস্নার মতো শাদা বুকের ভিতর ভালবাসা
পুষে রাখে অবিরত, পূর্ণতর প্রেমিকের আশা
রেখেছি তোমার জন্য, হে নায়িকা তোমার সম্মতি

কখন মিলবে বলো, রৌদ্রে খুঁজি ঝলসানো মুখ
লাল পাহাড়ের নিচে, অন্বেষণে অপরিমেয় সুখ॥

বাসা বাড়ী

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

কাল রাত্রে ওরা সব চলে গেছে বাসাটাকে ছেড়ে।
এই বাসাবাড়ী থেকে অন্য কোন নতুন বাসায়।
দুয়ার জানালা খোলা, এদিকে সেদিকে ইতস্ততঃ
ছেঁড়া কাগজের টুকরো, ভাঙা কলসী মাটির গেলাস।

কী নির্মম শূন্যতায় ভরে আছে, দেখ চতুর্দিক।
দেওয়ালে কালির দাগ, কে একটা ছবি এঁকে গেছে।
ছেঁড়া পাতা ক্যালেণ্ডার হাওয়ায় আপন মনে ওড়ে।
শূন্য ঘর একা সাক্ষী শুধু এ নীরব শূন্যতার।

কয়েকটা পুরানো চিঠি, খালি টিন, শিশি ও বোতল
এ ঘরের কুলুঙ্গিতে প্রদীপের কালোভুসো দাগ।
খোলা দরজা রান্নাঘর, ভাত ফেলা এখানে সেখানে,
অত্যন্ত স্বাধীন কটা কাক সে রাজত্বে সমাসীন।

কজন মানুষ এসে এখানে কদিন বাস ক'রে,
অভিনয় ক'রে গেছে চিরন্তন হাসি ও কান্নার,
সুখদুঃখ ভালবাসা, জন্মমৃত্যু, বিরহ প্রণয়।
মূক মৌন বাসাবাড়ী, সে শুধু নীরব সাক্ষী তার॥

একটি প্রতিষ্ঠান আছে এই শহরেরই পূর্বাঞ্চলে, তার নাম লুম্বিনী হাসপাতাল। মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করা হয় সেখানে। শোনা যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটি নাকি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হ'য়েছে। অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছি আমি এ সংবাদে।

কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করার আগে পাগল, আধা-পাগল এবং হবু-পাগলদের আশ্বাস দিয়ে জানাচ্ছি, সরকারী যে আইনের প্যাঁচে পড়ে লুম্বিনী হাসপাতালের দুর্দশা ঘটেছে, অচিরেই হয়তো তার সংশোধন ঘটবে এবং প্রতিষ্ঠানটি যেমন আছে তেমনি টিঁকে যাবে। যাঁরা আরো বেশি নিশ্চয়তা দাবী করেন তাঁরা খবরের কাগজের পাতার দিকে নজর রাখতে পারেন।

একটা ব্যাপার ভাবতে ভারি আশ্চর্য লাগে, পাগলের বিষয়ে আমাদের এত কৌতূহল কেন! আমাদের বলতে আমি শুধু বয়স্কদেরই বোঝাচ্ছি নে, শিশুরাও পড়ে সেই দলে। এবং সত্যি বলতে কি, শিশুদের কৌতূহল এ ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরতারই নামান্তর হ'য়ে দাঁড়ায়!

কারণটা অনেক সময়েই হয়তো মজা দেখা, কিন্তু পাগলকে বিরক্ত ক'রে মজা লাগারই বা কারণ কি?

আমার মনে হয়, পূর্ণকায় পরিণত মানুষের সব কিছু দৈহিক লক্ষণই অটুট আছে অথচ আচার-আচরণের মধ্যে কোনো যুক্তি-শৃঙ্খলা নেই, পাগলদের মধ্যে এই ঘাটতিটাই বালক-বালিকাদের কাছে আশ্চর্য লাগে। এবং হয়তো তারা এই ভেবে কিছুটা আত্মপ্রসাদও লাভ করে যে, অতো বড় একজন সাবালক মানুষের চেয়ে তাদের বুদ্ধিসুদ্ধিও বেশি! কিংবা, এসব কিছুই নয়, ছোটোদের আমোদ লাগে স্রেফ আছাড়-খাওয়া দেখলে যেমন হাসি পায় সেই-রকম। জীবনের পথে চলতে চলতে পাগল মানুষটি যে পিছলে পড়ল, সেই পতনটাই হ'ল মজার ব্যাপার।

কিন্তু বয়স্ক মানুষদের কাছে তা নয়। তাঁরাও মাঝে মাঝে খুশি হন পাগল দেখলে, কারণ তাঁদেরও মনের মধ্যে শিশু বাস করে। তবে বেশির ভাগ সময়েই তাঁদের মনে জাগে করুণা এবং তারই সঙ্গে মিশে থাকে একটি আতঙ্ক। না, পাগল এসে তাঁদের আক্রমণ করবে সে আশঙ্কা নয়, বরং সময়ের ধাক্কায়

নিজেরাই পাছে তাঁরা পিছলে চলে যান পাগলের দলে, সেই আতঙ্ক।

বাস্তবিক, আমরা যাঁরা 'ভারতীয় উন্মাদ আইন ১৯১২'র চাহিদা মতো পাগল হিসেবে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের সার্টিফিকেট পাইনি এবং পাইনি ব'লে কোনো মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে রোগী হিসেবে ঢুকতে পারব না, তারাও যে খুব একটা সুস্থ মনে বাস করছি এমন কথা তামা-তুলসী হাতে নিয়ে বলা যায় না। তাছাড়া অল্পস্বল্প পাগলামি না থাকলে সমাজেও তো তেমন পাত্তা পাওয়া যায় না। ভাবুক-প্রকৃতির শিল্পী-সাহিত্যিক কিংবা 'কাজের মানুষ' ব্যবসায়ী কি চাকুরে যাই হন আপনি, আপনার নিজের পেশার চূড়োয় যদি উঠে থাকেন তো দেখবেন বেশ খানিকটা পাগলামিও আপনার মজ্জাগত হয়ে গেছে। অবশ্য কোনো কোনো মনীষীর জীবনে আপাত-দৃষ্টিতে কোনো অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে, পাগলামিকে ঠেকিয়ে রাখাই তাঁদের পাগলামি। কিংবা বলা যায়, তাঁরা হলেন অস্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক। ঠিক যেমন হয়েছিল বার্ণার্ড শ'র দৃষ্টিশক্তির বেলায়। তাঁর চক্ষু-চিকিৎসক বন্ধু ডাঃ ওয়াইল্ড শ'য়ের চোখ দেখে বলেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি নর্ম্যাল। তখন শ' জানতে চান, চোখে দেখতে পাওয়ার বেলায় নর্ম্যাল কথাটার মানে কি? ডাঃ ওয়াইল্ড এতে স্বীকার করতে বাধ্য হন, বেশির ভাগ মানুষেরই দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক নয়, কিন্তু শ'য়ের চোখ সত্যিই স্বাভাবিক—কাজেই বেশির ভাগ মানুষের তুলনায় তাঁর চোখের দৃষ্টিকে বলা যায়, অ্যাবনর্ম্যালি নর্ম্যাল!

কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের অবস্থাই এর বিপরীত। অর্থাৎ নর্ম্যালি অ্যাবনর্ম্যাল!

এবং এই 'স্বভাবতই অস্বাভাবিক' মানুষের দলেই আমরাও। অবশ্য এসব অস্বাভাবিকতাকে আমরা ঠিক পাগলামি বলে সনাক্ত করিনে, বাতিক বলে একটা ডাকনাম বার করেছি, সেই নামে ডাকি। এমন আটপৌরে পোষা বাতিক আমাদের অজস্র। খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ, চলা-ফেরা থেকে শুরু ক'রে মানব জীবনের গোপনতম অনুভূতি পর্যন্ত অনেকের বাতিকের শিকড় ছড়ানো। প্রত্যেকটি খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন খোঁজা কিংবা ভর গ্রীষ্মেও আকাশের কোণে মেঘ দেখা দিলে গায়ে সোয়েটার চাপানো, অথবা যে-কোন মিটিংয়ের ডাক এলেই খবরের কাগজে নাম উঠবে মনে ক'রে বাঁচি-মরি করে সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া, এগুলো বাতিকের পর্যায়েই পড়ে।

খুব বেশি কিছু থাকে এমন নয়। কিন্তু চোরের ভয় তাঁর এমনই মজ্জাগত যে রাতে ঠিক ঘরের মাঝ-বরাবর খাট টেনে এনে শোন তিনি; এবং হঠাৎ যদি উঠতে হয় তো পাশে রাখা হারিকেন লণ্ঠনটি আগে খাটের এপাশে দুলিয়ে খাটের তলায় লুক্কায়িত কোনো ব্যক্তির ছায়া খাটের ওপাশের দেয়ালে পড়ে কিনা দেখে নিয়ে তারপর তিনি মাটিতে পা নামান।

আরেকজনকে জানি, রাতে শোবার আগে দরজাটা ভালো করে বন্ধ হয়েছে কিনা সেটা টেনেটুনে দেখা ছিল তাঁর পাগলামো। এভাবেই এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তাঁদের অনভ্যস্ত দরজায় একটু বেশি জোরে টান দিয়ে ইনি কাঠের খিলের ইস্কুপ উপড়ে ফেলেছিলেন। শোনা যায়, তারপর তাঁকে সমস্ত রাতই দরজায় পিঠ লাগিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল।

এছাড়া ভূতের ভয় তো লোকে হাসিমুখেই ব্যক্ত করেন। যাঁরা শোনেন তাঁরাও হাসিমুখে শোনেন—যেন এ ব্যাপারে কারোই কিছু করার নেই।

আর চোরের ভয়, তা যাঁর নেই তিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। বাক্স-প্যাটরা কা কথা, ঘরের দেয়ালও তাঁর কাছে বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা বেশির ভাগ মানুষই ঘরের ভিতরে থাকতে ভালোবাসি, এবং বাক্স-তোরঙ্গও আমাদের বিলক্ষণ আছে। আর সেগুলির লোভে পাছে চোর এসে ঘরে ঢোকে এ ভয়ও আমাদের যৎপরনাস্তি।

কিন্তু কারো কারো আবার এই চোরের ভয়টা প্রায় বাতিকের পর্যায়ে চলে যায়। যেমন ধরুন আমাদের ব-বাবুর ব্যাপার। কার্যব্যপদেশে তাঁকে প্রায়ই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে হয়, আশ্রয় তখন ডাক-বাংলো। সঙ্গে জিনিসপত্রও যে

যাই হোক, দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। মানসিক হাসপাতালের দরজা যখন নিঃশর্তভাবে খোলা ছিল, আমরা তখন আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের অল্পস্বল্প পাগলামির মজাটা মুখ বুজে উপভোগ করলেও বেকায়দা দেখলে তাদের নিয়ে গিয়ে বিশেষজ্ঞের হেপাজতে রাখাই নিরাপদ মনে করতাম। কিন্তু এখন ম্যাজিস্ট্রেটের সার্টিফিকেট ছাড়া পাগল বলে কাউকে ভর্তি করা বেআইনী কাজ হওয়ার ফলে হাসপাতালে রোগী কমলেও গোটা সংসারটাই হয়ে উঠবে বোধ হয় বিরাট একটি পাগলা-গারদ। হায়, শিক্ষা-প্রসারের নামে সরকারী শিক্ষা-সংকোচনের নীতির মতো এই পাগলাত্মক নীতিও যে অচিরাৎ কী মারাত্মক বুমেরাঙের মতো ফিরে আসবে আমাদের উপর, তা ভেবে শিহরিত হচ্ছি!

।এক।

'আমার মধ্যে সৃষ্টিমুখী যতগুলো উদ্যম আছে, তার প্রত্যেকটাকেই স্বীকার করতে আমি বাধ্য।'

প্রবীণ, প্রতিষ্ঠিত কবি জীবনের শেষ অধ্যায়ে হঠাৎ ছবির রাজ্যে প্রবেশ করতে এলেন কেন, এই কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর কবির উপরিউদ্ধৃত উক্তিটির মধ্যে নিঃশেষে পাওয়া যাবে।

ছবিকে কবি বলেছেন তাঁর 'শেষ জীবনের প্রিয়া', যে তাঁকে 'নেশার মতো পেয়ে বসেছে'। কাব্য বা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি তিনি জীবন-দেবতার নির্দেশকেই মুখ্য ভূমিকা দিয়ে আপন ইচ্ছার গৌণতার উল্লেখ করেছেন। প্রতিমা দেবীকে লেখা একটি পত্রে পাই—

'ছবি কোনোদিন আঁকি নি। আঁকব বলে স্বপ্নেও বিশ্বাস করি নি.... জীবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল, তখন অভূতপূর্ব উপায়ে আমার জীবন-দেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন।'

কিন্তু এই পরিশিষ্টটি যে একেবারেই ভূমিকাবিহীন, এমন নয়। শৈশবের কোনো পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন চিত্রবিদ্যায় বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ প্রকাশ করেছেন কিনা তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে জীবন-স্মৃতির 'নানা বিদ্যার আয়োজনে' এ বিদ্যাটির উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থেই যৌবনের চিত্রচর্চার একটি সুন্দর বর্ণনা পাই।—

'মনে পড়ে দুপুরবেলা জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি।'

কিন্তু কবির ভাষাতেই 'সে চিত্রকরের কঠোর সাধনা নয়'। সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে' নিয়ে 'আপন মনে খেলা করা'।

তারপর দীর্ঘদিনের ব্যবধানে প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভেই চিত্রলক্ষ্মী তাঁর মন টেনেছেন। কিন্তু সে শেষবয়সের ব্যাপক চিত্রসৃষ্টির বহু আগে। সকলেই জানেন, লেখার কাটাকুটি দিয়ে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলি বিচিত্ররূপে ভরিয়ে তোলা কবির খেয়ালে এবং ক্রমশ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আর এই প্রবণতা তাঁর পরবর্তী চিত্র-সাধনার প্রেরণা ও পাথেয় হয়েছে। 'পূরবী' রচনাকাল থেকে অর্থাৎ ১৯২৪ থেকে এ অভ্যাসের শুরু। কিন্তু এই সময়ের বহু পূর্বে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় নয়, একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবি আঁকার চেষ্টা কবি করেন শান্তিনিকেতন-পর্বেরও আগে, শিলাইদহে বাসকালে। বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে একটি পত্রে লিখছেন—

'শুনে আশ্চর্য হবেন, একখানা স্কেচ্-বুক নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকছি।...... কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে, তেমনি যে বিদ্যাটা ভালো আসে না, সেইটার উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করলুম, এবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো, তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে।' (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০; চিঠিপত্র ৬, পৃঃ ৫)

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চল্লিশের এপারে। এর পরের অধ্যায় শান্তি-নিকেতনে।

আশ্রমে প্রথম যে ছবি আঁকার চেষ্টা কবি করেন, সে ছবি মানুষের মুখের অনুরূপ; কিন্তু মুখ নয়, মুখোশ। পেন্সিল-ড্রইং, কলাভবনে অথবা রবীন্দ্র-সদনে তা হয়তো রক্ষিত আছে। এরকম মুখোশ আঁকেন তিনখানা। শান্তি-নিকেতনের কলাভবন তখন অজ্ঞাত।

এরপর সম্ভবত ১৯১৯ সালে 'আনন্দ-মেলার' জন্যে একটি ছবি আঁকা হয়। ছবিটি কাঁটা গাছ বা ক্যাকটাসের। সেখানি কলাভবনে থাকতে পারে। ১৯২০ কিংবা ২১ সালে শান্তিনিকেতনে কোনো পত্রিকার প্রচ্ছদের এক কৌতুক-কর চিত্র প্রতিযোগিতায় কবি স্বয়ং ছিলেন অন্যতম প্রতিযোগী। অন্যেরা ছিলেন মাষ্টারমশাই (নন্দলাল বসু), শ্রীসুরেন কর এবং সি এফ এন্ড্রুজ।
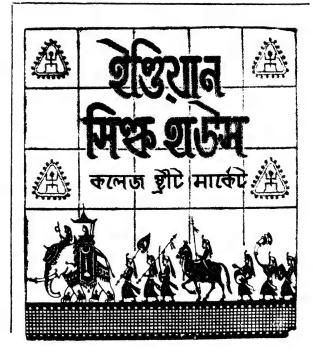
বিষয় ছিল মুখাকৃতি দিয়ে আলপনায় ডিজাইন।

এই হ'ল রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক চিত্র-সৃষ্টির প্রাক্-ইতিহাস। কালের দিক থেকে এগুলি বিচ্ছিন্ন চেষ্টা। কবির অন্তরের কথা জানি না, কিন্তু বাইরে পরবর্তী শিল্প-সাধনার সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতার যোগ নেই। এর পরের সব চেষ্টাই পূরবী-পরবর্তী।

শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান অঙ্গরূপে 'কলাভবন' ক্রমে গড়ে উঠল আচার্য নন্দলালের অধ্যক্ষ-তায়। সেখানে বহু শিল্পীর শিল্প-সাধনা চলছিল দিনের পর দিন। রবীন্দ্রনাথও তারই পাশে, অথচ স্বতন্ত্র-ভাবে আপন একক শিল্প-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর রং ও রেখাভঙ্গি ঐতিহ্যবিহীন; নিজস্ব। কিন্তু একবার তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল, তিনি ড্রইং শেখেন, বস্তুর রীতিমতো এনাটমি শিখে হাতটাকে পাকিয়ে তোলেন। নন্দলালকে তিনি সে ইচ্ছার কথা জানিয়েওছিলেন। কিন্তু শিল্পাচার্য সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে-ছিলেন, 'দরকার নেই'। এতে কবি নিরস্ত হন। বস্তুত শিল্পাচার্য ভিন্নমত প্রকাশ করলেও কবি তাঁর ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা হয়তো করতেন না। দীর্ঘদিন ধরে ড্রইং শেখার ধৈর্য তাঁর ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। ড্রইং-শিক্ষা দূরের কথা, বসে-বসে ছবি আঁকার ধৈর্যও তাঁর স্বল্প ছিল, একথা অনেকেই জানেন, যে কারণে, পাতলা রং যা শুকোতে সময় লাগে, তা তিনি অপছন্দ করতেন, ব্যবহার করতেন মোটা রং যা সহজে শুকোয়।১ কবির প্রায় সব ছবির মধ্যেই ধৈর্যবিহীন অতিদ্রুততার ছাপ সুপ্রত্যক্ষ।

'পূরবী' রচনাকাল থেকে কলমের খোঁচায় পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠদেশ কলঙ্কিত করে তোলা নেশার মতো কবিকে পেয়ে বসল। চোখে দেখলে বোঝা যায়, কী বিপুল সময় এর জন্য ব্যয়িত হয়েছে। আসলে কিন্তু সময়টা খরচ হয়েছে নিছক আঁচড় কাটতে নয়। এর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবেই সাহিত্যচিন্তার স্রোত চলেছে। কাজেই আনমনা কবির আঁচড়ের রেখা-গুলি অনেক ক্ষেত্রে নিরুদ্দেশ। শুধু সেই হিজিবিজি রেখাজালের মধ্যে অতর্কিতে এক একটা অপ্রত্যাশিত রূপ ধরা পড়ে কবিকে মুগ্ধ করেছে। কোনো স্পষ্ট উদ্দেশ্য কলমকে ঠেলে নিয়ে যায়নি, তাকে টেনেছে 'অকস্মাতের আশা'। বারে বারেই অভাবিতের দর্শন মিলেছে এই পথেই। তারপর অবশ্য এই রীতির পালাবদল হয়েছে। কিংবা বলা যায়, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ শিল্পচর্চায় নিজের একটা পথ পেয়ে গেছেন। তখন রেখাগুলি শুধুমাত্র পাণ্ডু-লিপির উপজাত অংশ না হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'স্বে মহিম্নি'। অভীপ্সিত রূপ-সৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়েছে বিরাট শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে।

। দুই ।

রবীন্দ্রনাথের ছবি এ দেশের শিল্প-ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগহীন, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দেশীয় শিল্প-সাধনার রীতিভঙ্গের প্রথম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ নন। ঠাকুরবাড়ীতে এ চেষ্টা আগেই হয়েছে। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় রীতিকেই অর্থাৎ অজন্তা, রাজগুহা, রাজপুত, মোগল-ধারাকেই বিশুদ্ধভাবে মেনেছেন, এমন নয়। বরং বলা যায়, তাঁর রং ও রেখার প্রথম প্রয়োগ আদৌ ভারতীয় নয়। ক্রমে দেশীয় ধারার সঙ্গে য়ুরোপের মতো চৈনিক, জাপানী শিল্প-কৌশলের সংমিশ্রণ ঘটেছে অতি সূক্ষ্মভাবে। এক কথায় অবনীন্দ্রনাথ কোনো ট্র্যাডিশন-বিশেষকে অনুসরণ করেননি। নানা ধারার মিশ্রণে এক অভিনব শিল্প-রীতির উদ্ভব ঘটিয়েছেন, যার মধ্যে তাঁর আপন স্রষ্টারূপের ছাপটি সুপ্রত্যক্ষ।

সব মেনে নিয়েও অনেকে বলবেন, তবু অবনীন্দ্র-প্রতিভা মূলত ভারতীয় ধারার অনুবর্তন করেছে। বিমিশ্র ও নূতন হলেও প্রাক্-আধুনিক ধারার সঙ্গে তার যোগটা দুর্লক্ষ্য নয়। একথা মানি।

কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ? জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর এই প্রতিভাধর স্রষ্টা এ দেশের শিল্পী ও রসিক সমাজে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কিন্তু এঁর রচনায় বিশুদ্ধ ভারতীয় রীতির অনু-বর্তন নেই। বরং স্পষ্টত বিচ্যুতি আছে। গগনবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ স্বতন্ত্র। ইয়োরোপে কিউবিজ্‌ম-এর আন্দোলন তখন শেষ পর্যায়ে এসে অবসিতপ্রায়। নূতন জয়যাত্রা শুরু হয়েছে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর। সেই সময় গগনেন্দ্রনাথ ভারতে প্রথম কিউবিস্ট আর্টের সাধনা শুরু করলেন। বলা বাহুল্য তাঁর শিল্পসৃষ্টি ইউরোপীয় শিল্পের অন্ধ অনুকরণ নয়। তেমন হলে রূপের রাজ্যে তার দাম সস্তা হ'ত এবং সে-শিল্প স্থায়ী সৃষ্টির আসন লাভের অযোগ্য হয়ে উঠত। পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করলেও গগনেন্দ্রনাথ তাকে নিজস্ব করেছেন এবং সেই স্বীকরণের মধ্যে দিয়েই ভারতীয় সম্পদ করে তুলেছেন। এই কারণে তাঁর শিল্প ভারতীয় ধারানুসারী শিল্প না হলেও ভারতীয় শিল্পজগতে এক নূতন সংযোজন।

রবীন্দ্রনাথও ছবি-সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্য না-মানার দলে। এবং এই হিসাবে তিনি গগনেন্দ্রনাথের সম-ধর্মা। কিন্তু এক জায়গায় তিনি একান্ত পৃথক। গগনেন্দ্রনাথ পুরোদস্তুর শিল্পী, অর্থাৎ শিল্পসাধনার নির্দিষ্ট ক্রমের পথে তিনি এগিয়েছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই শিক্ষা ও অধ্যবসায়ের পথে অগ্রসর নন। সাহিত্যের ভাষায় যেমন, চিত্রের ভাষায় কিন্তু তেমনি দীর্ঘদিন-অর্জিত সাধনার সঞ্চয় তাঁর ছিল না। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

'আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তবে একথা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে, তার প্রতি আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি; কিন্তু পাবার আশা নেই। সাধনা করার বয়স চলে গেছে।'

সাধনার বয়স চলে গেলেও সৃজনের সাধ দুর্নিবার। শিল্পরাজ্যে তাঁর পদক্ষেপ হঠাৎ খুশির ফল। এ ক্ষেত্রে তাই তিনি একেবারে সহজপন্থী। বাউল-ভাষায় 'আপনা-পথের পথিক'। তাঁর রেখা ও বর্ণিকাভঙ্গ স্ব-আবিষ্কৃত, ভাষান্তরে তিনি একে বলেছেন 'অশিক্ষিত পটুত্ব'।২

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেননি, তার কারণ এ নয় যে, ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্য তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণে অসমর্থ। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের প্রতি যেমন, সম-কালীন অবনীন্দ্র-নন্দলাল প্রভৃতির শিল্প-সাধনার প্রতিও তেমনি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠক-দের অবিদিত নয়। রবীন্দ্র-রচনা ও বিশ্ব-ভারতীর জীবনযাত্রায় সে অনুরাগের অজস্র পরিচয় আছে। বস্তুত পূর্বশিক্ষা

১। "একটু মোটা রং গুলে দাও। আমার কি অত ধৈর্য আছে যে একবার রং দিয়ে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকব, যে কতক্ষণে শুকোবে।" —মংপুতে রবীন্দ্র-নাথ : মৈত্রেয়ী দেবী।

২। "আমার হ'ল অশিক্ষিত পটুত্ব"—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ী দেবী।

বা প্রস্তুতিবিহীন দুর্বার আত্মপ্রকাশ-বাসনার বেগ তাঁকে আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভবের বা বিবেচনার তিলমাত্র অবকাশ না দিয়ে নিজের পথ নিজেই খনন করার ত্বরিত সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে এবং বিকল্পহীন সেই খাতেই সৃষ্টিধারাকে প্রবাহিত করে দিয়েছে।

অনেকে অনুমান করেন, পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে এবং ইয়োরোপীয় শিল্পরীতির আশ্রয়েই তিনি নিজের সৃষ্টি-ইচ্ছাকে বিকশিত করতে চেয়েছেন। এই অনুমানের পশ্চাতে যুক্তি কি আছে, আমাদের জানা নেই। প্রথমত ইয়োরোপীয় চিত্রকলার প্রধান মাধ্যম তেল-রং এবং তার বিশিষ্ট রীতি রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া পরিহার করে এসেছেন। অয়েল কালারে তিনি কখনও ছবি আঁকেননি। উপকরণ হিসাবে তিনি ব্যবহার করেছেন পেলিক্যানের রং, দ্রুত শুকিয়ে যাবার গুণ যার আছে। এই নির্বাচন ব্যবহারিক সুবিধার্থে। ঘন জল-রং রবীন্দ্রনাথের প্রিয়। কিন্তু যেমন রেখায়, তেমনি রঙে প্রয়োগ-ভঙ্গিটা তাঁর নিজস্ব। প্রয়োগের বাহ্যিক কৌশলটাও তাঁর। তুলির বিপরীত প্রান্ত দিয়ে, আঙুল দিয়ে, প্রয়োজন হলে কল্কি বা তামু দিয়ে বর্ণপ্রলেপন তাঁর স্ব-আবিষ্কৃত বিচিত্র পদ্ধতি।

বস্তুত ইয়োরোপীয় শিল্পকে শ্রদ্ধা করলেও ভারতীয় শিল্পীর ইয়োরোপীয় চিত্ররীতির অনুকরণ করাটা রবীন্দ্রনাথের চোখে কখনও ভালো ঠেকেনি। আমাদের দেশের কলাবিদ্যালয়ের অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা তাঁকে দীর্ঘদিন পীড়াই দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে এক জায়গায় যে মন্তব্য করেছেন, এখানে তা স্মরণ করা যেতে পারে। কবি লিখেছেন—

'কিন্তু শিল্পবিদ্যালয়ে আমাদিগকে অগত্যা ইয়োরোপীয় চিত্রাদির অনুকরণ করিয়া আঁকিতে শিখিতে হয়। তাহাতে হাত এবং মন বিলিতি ছবির ছাঁচে প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহার আর কোনো উপায় থাকে না। সেই অভ্যস্ত পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেশী চক্ষু দিয়া দেশী চিত্র-বিষয়কে দেখা আমাদের পক্ষে কঠিন।' (প্রাচীন সাহিত্য, র, ব, ৫)

এখানে রবীন্দ্রমনের অনুকরণ-বিরূপতা কত তীব্র ও দৃঢ়মূল, তা সহজেই অনুভব করা যায়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের ছবির দৃষ্টি এবং সৃষ্টি-কৌশল তাঁর একান্ত নিজস্ব।

। তিন ।

সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ যত ছবি এঁকেছেন, সেগুলি গভীর অভিনিবেশ নিয়ে দেখলে তার মধ্যে দুটি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। এদের মৌলিক ভাবগত প্রভেদটা বাইরের রূপগত ভিন্নতার সৃষ্টি করেছে। যেন দুই মানসিকতা থেকে উদ্ভূত সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই জাত। এ দুয়ের মাঝে তবু যদি কোনো মিল থাকে, শিল্পীমনের দুর্জ্ঞেয় অন্ধকারের মধ্যে তার রহস্যের সন্ধান করতে হয়। অর্থাৎ দুই ধারার সমান্তরাল রেখাগুলো স্রষ্টামনের অসীমে মিলতে পারে।

প্রথম দল কালের দিক থেকে প্রথম দেখা দিয়েছে। এগুলির আকৃতি ও প্রকৃতির বিশেষত্বকে একটি নাম দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। এগুলি ছবি-রাজ্যের 'ছড়া'। বাণীশিল্পে যেমন 'ছড়ার ছবি', চিত্রশিল্পে তেমনি 'ছবির ছড়া'। কলমের আঁচড়ে বা তুলির রেখায় বিচিত্রদর্শন মুখ, অতিকায় জীবজন্তু, অদ্ভুত চেহারার পাখী, গাছ, ফুল এই গোত্রের অন্তর্গত। ছবিগুলিতে প্রকৃতিকে অনুকরণের চেষ্টা এমন কি ইচ্ছাও নেই। বাহ্য সাদৃশ্য রাখার উদ্যম নেই। এগুলো স্বাধীন সৃষ্টির আনন্দে আঁকা, যদিও কর্ম্-এর মধ্যে মানুষ, পশু, গাছ-পালার মৌলিক চেহারা নিগূঢ়ভাবে পাওয়া যায়। এগুলি দর্শকচিত্তে কৌতুকের সৃষ্টি করে। আসলে স্রষ্টা-চিত্তে যে কৌতুকবোধ সৃষ্টিকালে কাজ করেছে, দর্শকচিত্তে তাই সঞ্চারিত হয়ে যায়। এই ছবির রস আলংকারিক অন্য কোনো রস নয়, বিশুদ্ধ কৌতুকরস। সৃষ্টিগুলি চিন্তা বা ভাবনার ফল নয়। এমন কি কোনো গভীর ভাবের বা ইমোশানের প্রকাশ নয়। এগুলি ভাবনা ও ভাবের ভারমুক্ত হাল্কা মনের নিছক খুশির খেয়ালে রচিত অদ্ভুত, উদ্ভটের জগৎ। তাই এর মধ্যে অর্থের সন্ধান করা অন্ধকারেতে বেগুনে খোঁজার মতো। অর্থলোভী সমালোচকের একথা স্মরণ রাখা ভালো। কবির কথাই তুলে দিই—

'যখন আর কিছু ভালো লাগে না, তখন ছবি আঁকি। কিন্তু আমার ছবি রেখার ছবি রঙের ছবি; ভাবের ছবি নয়। ভাবের ছবির জন্য কথা, সে-ছবি অনেক এঁকেছি। সম্প্রতি কথার চেয়ে রেখার পরে মনের টান হয়েছে বেশি। রেখা চোখের ভিতর দিয়ে মরমে পশে, কানের ভিতর দিয়ে নয়। কথাকে অর্থ

দিতে হয়, রেখাকে দিতে হয় রূপ। রূপ বিনা-অর্থে ভোলায়। দৃশ্যমান হয়ে ওঠা ছাড়া ওর আর কোনো দায়িত্ব নেই।' (রাণী মহলানবীশকে লিখিত পত্র)।

এই ছবিগুলির উপাদান বিশ্লেষণ করলে দুটি জিনিস পাওয়া যায়। এক, প্রাকৃতিক বস্তু-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র রূপ-ময়তা, দুই, সেই রূপসৃষ্টির পিছনে কৌতুকের দৃষ্টি। কিম্বা হয়তো বলা উচিত, কৌতুকী দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক বস্তুরূপের অতিরেক। অর্থাৎ মানুষ বা মনুষ্যেতর জীবের আকৃতিগত গঠন-ভঙ্গিমায় প্রত্যাশিত রেখাভঙ্গিকে বিপর্যস্ত করে, অপ্রত্যাশিতের ধাক্কায় দর্শক-মনে কৌতুকের উচ্ছ্বাসকে উদ্রিক্ত করা। মানুষের মুখে নাকটাকে বা কান-দুটোকে দীর্ঘ ক'রে, পশুর গলাকে অযথা লম্বা করে দিয়ে, পাখীর ঠোঁট-টাকে বিচিত্র ভঙ্গিতে বাড়িয়ে তুলে এই রসসৃষ্টির চেষ্টা আছে। ছবিতে জীব-জন্তুর ছড়াছড়ি এই কারণে। নিছক নিসর্গচিত্রে কৌতুকের অবকাশ কম। কেননা, পূর্বেই বলেছি, প্রত্যাশাকে আঘাতের দ্বারা চমক সৃষ্টি শিল্পীর উদ্দেশ্য। গাছপালা, লতাপাতা, নদী-পর্বতের রেখার বিকৃতিতে সে চমক সৃষ্টি অসম্ভব, কারণ সেখানে আমাদের কোনো বিশেষ প্রত্যাশাই থাকে না। কিন্তু প্রাণীজগতে আকারের রেখা-ভঙ্গি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা প্রত্যাশা থাকে। তাই বিকার সেখানে মনকে ধাক্কা না দিয়ে পারে না।

এ কৌতুকরস ব্যঙ্গরস নয়, নিছক অসঙ্গতির লঘু ও নির্দোষ আনন্দ। ইংরেজিতে বলা যায় 'হিউমারাস'। ভাবনার ভারে ভারাক্রান্ত নয়, ভাবের ঘন বাষ্পে আচ্ছন্ন নয়, এ যেন সহজ মনের একটা মুক্তির জগৎ। ভাব-ভাবনার ভারাকর্ষণটা এখানে লুপ্ত হয়ে গিয়ে এর পরিমণ্ডলকে এমন লঘু করে দিয়েছে যে, দুদণ্ড দায়হীন ভাস্কা জীবন যাপন করা যায়। মন অর্থছুট জগতে এসে দুর্লভ ছুটি উপভোগ করে।

মজা এই যে, বাইরে কাজের ভাবনার দাবী যখন সবচেয়ে ভয়ংকর কবি তখনই এই সব ছবি এঁকেছেন সবচেয়ে বেশি। চিন্তার শাসন যখন জবরদস্ত চিন্তাশাসনমুক্ত এই ছড়া রাজ্যে তখনি তিনি প্রবেশ করেছেন বার বার। বস্তুত এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ভাবনাহীন এই ছবির জগতে কবি অত্যধিক ব্যস্ত-তার দিনে সাময়িকভাবে মনকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। এক একটি ছবি-সৃষ্টির পর্ব কবির কাছে অতিসংহত মুক্তিপর্ব। কাজের 'ঠাস দাসত্বের' দিনে স্বরচিত 'নিবিড় ছুটি'।

যৌবনে অবশ্য মনের আনন্দে প্রথম ছবি আঁকার যে প্রয়াস, তা দেখা দিয়ে-ছিল অখণ্ড অবকাশের মধ্যেই, 'জাজিম বিছানো কোণের ঘরে শরৎকালের দুপুরবেলায়।' সে শরৎ কবির ভাষায় 'আমার গান-পাকানো শরৎ, আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা বোঝাই করা শরৎ, আমার বন্ধন-হীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি-আঁকানো, গল্প-বানানো শরৎ' (জীবন-স্মৃতি)।

অর্থাৎ যৌবনে ছবি এসেছিল ছুটির সহচর হয়ে। কিন্তু বার্ধক্যে যে-ছবি এল, ছুটি হল তার সহচর। এবার ছুটি ছবি নিয়ে আসেনি, ছবি নিয়ে এল ছুটিকে বুকের মধ্যে বহন করে।

। চার ।

কবি ছবিরাজ্যের না হলেও সাহিত্যরাজ্যের ছড়াগুলিকে মুক্তির জগৎ বলে অভিহিত করেছেন।—

'লঘুকায়, বন্ধনহীন মেঘ ছড়াগুলি ভারবিহীন, অর্থবন্ধশূন্য।' (লোক-সাহিত্য, ছেলেভুলানো ছড়া, র র ৬)।

ছড়াগুলিকে তুলনা করেছেন ভার-মুক্ত শরৎ মেঘের সঙ্গে।—

'কতকগুলি অসংলগ্ন ছবি সামান্য প্রসঙ্গসূত্রে অবলম্বন করিয়া উপস্থিত। কোনো বাছবিচার নাই, বালকের কল্পনা ঐতিহাসিক ঐক্যরচনার জন্য উৎসুক নহে, তাহার নিকট সমস্তই বর্তমান এবং বর্তমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে, সেই ছবিকে ভাবের অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা করিতে চাহে না।' (লোকসাহিত্য, ছেলেভুলানো ছড়া র র ৬)

রবীন্দ্র-চিত্র রচনার সঙ্গে বাংলা-দেশের এই ছড়া-রাজ্যের যে শুধু সাদৃশ্যই আছে, তা নয়। এর দানও আছে। কবি ছবি সৃষ্টিকালে এই ছড়া-জগৎকে স্মরণে রেখেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু সৃষ্টি-নিরত মনের অব-চেতনায় এগুলি যে অবশ্যই কাজ করেছে একথা জোর করেই বলতে পারি এই জন্য যে, একদা তিনি ভাষা-রাজ্যের এই আশ্চর্য জগৎটাকে চিত্রের রূপরাজ্যে রূপান্তর-দানের ইচ্ছা অনুভব করে-ছিলেন, সেকথা নিজেই বলেছেন। সে উক্তিটুকু রবীন্দ্র-চিত্রের রসোপভোগ এবং রসবিচার-কালে বিশেষভাবে স্মরণ ও প্রণিধানযোগ্য। কবি বলেছেন—

'এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘ-রাজ্যের লীলা। সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার নির্ণয় নাই। ছড়ার অযত্ন-রচিত চিত্রগুলির অনেক স্থানে রেখার এমন সুস্পষ্টতা আছে যে, তাহারা আমাদের সংশয়ী চক্ষেও অতিসংক্ষেপ বর্ণনায় ত্বরিত চিত্র আনিয়া উপস্থিত করে। ছবি যদি কিছু অদ্ভুত গোছের হয়, তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, বরঞ্চ ভালোই। কারণ নূতনত্বে চিত্তে আরও অধিক আঘাত করে।...ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছুই নাই। এক মুণ্ডওয়ালা মানুষের মতো দুই মুণ্ডওয়ালা, এমন কি স্কন্ধকাটাও সম্ভব।

যেমন মিষ্ট ছন্দ শুনিলে তাহাকে গানে বাঁধিয়া গাহিতে ইচ্ছা করে, তেমনি এই সকল ভাষার চিত্র দেখিলেই ইহা-দিগকে রেখার চিত্রে অনুবাদ করিয়া আঁকিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে।'

শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করেই কবি ক্ষান্ত হননি। তার ঠিক পরেই আরও একটু মন্তব্য আছে। এবং সেটুকু আমাদের মতে বিশেষ মূল্যবান।—

'কিন্তু হায়, এ সকল চিত্রের রস নষ্ট না করিয়া, ইহাদের বাল্যসরলতা, উজ্জ্বল নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ সম্ভাব্যতা রক্ষা করিয়া আঁকিতে পারে, এমন চিত্রকর আমাদের দেশে কোথায়? এবং বোধ করি সর্বত্র দুর্লভ। এই সমস্ত চিত্র সুনিপুণ, সহৃদয় চিত্রকরের প্রত্যাশায় বহুকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে।' (ছেলে-ভুলানো ছড়া—লোকসাহিত্য: প্রথম প্রকাশ ১৩০১ বা ১৮৯৪)।

প্রতীক্ষা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে কিনা কে জানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। সুনিপুণ না হলেও তিনি সহৃদয় চিত্রকর। ছড়া-রাজ্যের অন্দরমহলে তাঁর মতো সংবেদন-শীল মন নিয়ে এমন করে পৌঁছতে পেরেছে কে? আর এখানে নৈপুণ্য তো প্রচলিত রূপদক্ষতা নয়। ছড়ার রূপের যে-কটি মৌলিক গুণের তালিকা রবীন্দ্র-নাথ দিয়েছেন,—'বাল্যসরলতা, উজ্জ্বল নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ সম্ভাব্যতা', যদি তার প্রত্যেকটির নিঃসংশয় উপস্থিতি রবীন্দ্রচিত্রে দেখা যায়, তবে একথা বললে বাড়াবাড়ি হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ 'ছড়ার ছবিকে' 'ছবির

ছড়ায়' অনুবাদের কাজে সম্পূর্ণ অধিকারী। আর সেইজন্যও শিল্পজগতে তাঁর তুলি অজন্তা, বাগ, রাজপুত, মোগল, অবনীন্দ্র, নন্দলালের পথে চলেনি, সে 'আপনা পথের পথিক'। বাংলার শিল্পজগৎ তাকে পথ দেখায়নি, বাংলার গ্রাম্য সাহিত্য তাকে পথের ইঙ্গিত দিয়েছে।

এবার এই ছড়াগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রচিত্রের ভাব ও রূপগত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যগুলি লক্ষ্য করে আমাদের বক্তব্যের সীমা টানব। ছড়ার জগৎকে এক হিসাবে বলা যায়, 'অ্যাবস্ট্রাক্ট'। কথার ফ্রেমে বাঁধলেও তার অনেকখানি কথার বাইরে। কতকগুলি প্রত্যক্ষ ছবি থাকলেও অনেকটা ঝাপসা। আসলে যা অমূর্ত, তাকে মূর্তি দানের চেষ্টায় খানিকটা বাষ্পীয়। কঠিন জমাট বেঁধে কিছু অংশ স্পষ্ট দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও বাকিটা নীহারিকার জগৎ। রবীন্দ্রচিত্রেও তাই। রেখাভঙ্গি কোথাও প্রত্যক্ষ বস্তুর আকৃতির আভাস দিয়ে আবার অনির্দিষ্টতার মধ্যে বিলীন।

ছড়ার একটা প্রধান বিশেষত্ব তার রূপের চলমানতা, বিবর্তনময়তা। সে স্থির নয়, মেঘের মতো অস্থির, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। ছড়ার ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'সহজ অবস্থায় আমাদের মানস আকাশে স্বপ্নের মতো যে সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন্ অলক্ষ্য বায়ুপ্রভাবে দৈব-চালিত হইয়া কখনও সংলগ্ন, কখনও বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র বর্ণ ও আকার পরিবর্তনপূর্বক ক্রমাগত মেঘ রচনা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা যদি কোনো অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিচ্ছবি চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত, তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়া মাত্র, তরল, স্বচ্ছ সরোবরের উপর নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো।.. কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া সেখানে খোকাকে অনায়াসে পক্ষী জাতের সামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোনো প্রাণীবিজ্ঞানবিদ্ তাহাতে আপত্তি করিতে আসেন না।'

রবীন্দ্রচিত্রেও তাই। আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চল রেখায় স্থির মনে হলেও এ ছবির মধ্যে রূপের পরিবর্তনশীলতা দুর্লক্ষ্য নয়। ছড়াকারের মতো চিত্রী রবীন্দ্রনাথও পাখীকে মানুষের মুখে, গাছকে জন্তুর আকারে পরিণত করেছেন অনায়াসে। এ ছবিগুলি স্থির নয়। আন্দোলিত সরল ও বক্ররেখার বাঁকে বাঁকে ছন্দের স্বতশ্চাঞ্চল্য তো আছেই, আর আছে রূপান্তর লাভের চাঞ্চল্য, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, এক আকার থেকে অন্য আকারে।

রবীন্দ্রনাথের মতে ছড়ার মুখ্য বা একমাত্র রস হ'ল কৌতুকরস। লিখেছেন—

'শুধুমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।'

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রনাথের ছড়াগুলিতেও ঐ রসই মুখ্য। যে রসের আকর্ষণ তাঁকে ছড়া-সংগ্রহে প্রবৃত্ত করেছে, সেই রসের প্রেরণায় তাঁর তুলিতে বিচিত্র রূপের জন্ম।

বাংলা লোকসাহিত্যের এই শাখাটির সঙ্গে রবীন্দ্রচিত্রের যোগটা যে নিছক আনুমানিক নয়, তার আর একটি প্রমাণ কবি শেষবয়সে এই ছবি-রচনাকালেই ছড়ার অনুসরণে ভাষা-সাহিত্যেও অজস্র ছড়া-রচনায় হাত দেন। 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি', 'ছড়া' প্রভৃতি গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত। এগুলি ছবির মতোই ভাষারাজ্যের অর্থছুট্ সৃষ্টি। একটু নমুনা তুলে দিই—

ঝিনেদার জ্ঞানদার ছেলেটার জন্যে।
ছিচিনাপল্লী গিয়ে খুঁজে পেল কন্যে॥

কিংবা

দাড়ীশ্বরকে মানত ক'রে
গোঁপগাঁ গেল হাবল।
স্বপ্নে শেয়ালকাঁটা পাখি
গালে মারল খাবল॥

অথবা

নাম তার ভেলুরাম ধুনিচাঁদ শিরথ।
ফাটা এক তম্বুরা কিনেছে সে নিরর্থ॥

কলম আর তুলির ভাষার বাইরের তফাৎটাকে বাদ দিলে আসলে এরা জাতে এক। এই ঐক্য নিঃসংশয়রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানে, যেখানে ছড়াগুলিকে কবি সচিত্র রূপ দিয়েছেন। ঐ ধুনিচাঁদ শিরথকে খাপছাড়ার পাতায় মূর্ত হতে দেখি কলমের আঁচড়ে। ছড়া আর ছবির যমজ রূপটা আমাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। আর সমর্থন করেন স্রষ্টা স্বয়ং। লিখেছেন—

'যেমন তেমন বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে, কিছু তুলি দিয়ে আঁকা
দিলেম উজাড় ক'রে ঝুলি।'

(উৎসর্গপত্র : 'সে')

ভাষায় ও তুলিতে এই যেমন তেমন ছবি অর্থহীন, কিন্তু রূপবান। তাই দৃষ্টিমান এর প্রেমে না পড়ে পারে না। অর্থগন্ধলুব্ধ অরসিকের কটাক্ষ ও কটূক্তির বিরুদ্ধে তার যে একটিমাত্র বক্তব্য, তার ভাবখানা হ'ল—

শিমুল রাঙা রঙে চোখেরে দিল ভ'রে
নাকটা হেসে বলে হায় রে যাই মরে।
নাকের মতে গুণ কেবলি আছে ঘ্রাণে
রূপ যে রঙ্ খোঁজে নাকটা তা কি জানে।

(খাপছাড়া)

তবুও নিরস্ত না হয়ে অরসিক যদি প্রশ্ন করে,—রবীন্দ্রনাথের মতো ঋষিকবির জীবন ও শিল্পসাধনার অন্তিমপর্বে অর্থগৌরবযুক্ত মহত্তম সৃষ্টির মাঝখানে হঠাৎ এই অর্থহীন অনাসৃষ্টির জন্ম দিলেন, এ বড় আশ্চর্য নয় কি? তবে এ প্রশ্নের আগাম উত্তর কবির মুখেই শুনতে পাব। তিনি বলবেন—

যদি দেখ খোলশটা খসিয়াছে বৃদ্ধের
যদি দেখ চপলতা, প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে সিদ্ধের
যদি ধরা পড়ে সে যে নয় ঐকান্তিক
ঘোর বেদান্তিক,
দেখ গম্ভীরতায় নয় অতলান্তিক
যদি দেখ কথা তার কোনো মানে মোদ্দার
হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক,
মনখানা পৌঁছয় খাপামির প্রান্তিকে,
তবে তার শিক্ষার দাও যদি ধিক্কার
সুধাব বিধির মুখ চারিটা কী কারণে।
একটাতে দর্শন করে বাণী বর্ষণ
একটা ধ্বনিত হয় বেদ উচ্চারণে
একটাতে কবিতা রসে হয় দ্রাবিতা,
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে।
নিশ্চিত জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে ওঠে উচ্ছ্বাসিয়া।
তাই তারি ধাক্কায় বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।
চতুর্মুখের চেলা কবিটিরে বলিলে
তোমরা যতই হাস, রবে সেটা দলিলে।
দেখানে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা
অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোঁকটাও অল্প না॥

(খাপছাড়া)

পাগলামির এই অনাসৃষ্টিগুলি হ'ল রবীন্দ্রচিত্রের একটি রূপ। আর একটি রূপ আছে, যা ভাবে ও অভিব্যক্তিতে ভিন্ন জগতের বস্তু। তার ধাতটা সম্পূর্ণ পৃথক। মনে হবে তুলিটাই যে আলাদা, তা নয়, মানুষটিও যেন এক নয়।

ইতিমধ্যে যদি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়ে থাকি, তবে বারান্তরে সে প্রসঙ্গে আসার ইচ্ছা রইল।

॥ উপন্যাসোপম গল্প প্রসঙ্গে ॥

সবিনয় নিবেদন,

৭ই বৈশাখের 'অমৃত' পত্রিকায় 'উপন্যাসোপম গল্প প্রসঙ্গে' রসিক পাঠকের মনের কথাটি ব্যক্ত করার জন্য শ্রীপ্রভাতকুমার দত্তকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আধুনিক বাংলাদেশে মহৎ উপন্যাস সৃষ্টির উপাদানের অভাব নেই, অভাব বস্তুগত গভীরতা ও রূপগত নিষ্ঠার। মহৎ ভাব থাকলেই উপন্যাস মহৎ হয়ে ওঠে না—এই কথাটি প্রবীণ লেখকদের স্মরণ রাখা উচিত।

উপন্যাসোপম গল্প নামক নিরবয়ব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত মহাশয় শারদীয় সংখ্যা ও সিনেমা-পত্রিকাগুলিকে দায়ী করলেও পাঠকেরা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। শিল্পের ক্ষেত্রে আজকাল quality-র চেয়ে quantity-রই চাহিদা বেশী দেখা যায়। সাধারণের রুচিগঠনের দায়িত্ব শিল্পীরই। কিন্তু কখনও কখনও সাধারণের রুচিবিকৃতি শিল্পীকে বিভ্রান্ত করে। এইজন্যই প্রয়োজন পাঠক-গোষ্ঠীর (Readers' Society) যাদের কাজ হবে পাঠকদের সৎ-সাহিত্যের রসাস্বাদন করানো তথা মহৎ সৃষ্টিতে শিল্পীকে উৎসাহিত করা। ইতি—

বাণী দত্ত,

আসানসোল

॥ ইংরাজের মত ইংরাজী ॥

'অভয়ঙ্কর' লিখিত 'বাঙালী ভদ্রলোক ও ইংরাজের মত ইংরাজী' আলোচনাটি পড়লাম। আলোচনাটি পড়ে আমার মনে যে দুটি চিন্তার উদয় হয়েছে, তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম।

প্রথম, শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত খুসোবন্ত সিং-এর মন্তব্যটি খুব নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। বিশেষ করে তাঁর মন্তব্যের শেষাংশটি, যথা—

As a matter of fact there are few English writers who have the same mastery over their mother-tongue shown by the "Bengali Bhadralog" in the two books he has written" যেন অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। বেশ কয় শতাব্দীর ঐতিহ্য-পুষ্ট ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বাগ্মিকদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে একাসনে বসাবার অভিপ্রায় ইংরেজী সাহিত্যিক-সমাজ মেনে নেবেন বলে মনে হয় না। সুতরাং কোন ইংরেজী রচনা কতটা 'ইংরেজের মত ইংরেজী' হতে পারল, সে বিচার কোন এক অ-ইংরেজের পক্ষে সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে। তা যদি সম্ভব হোত, তাহলে কোন ইংরেজী বা ইয়োরোপীয় রচনা ইয়োরোপে সর্বজনস্বীকৃতিজনক সমাদর পাওয়ার পূর্বে এদেশে কিছুটা অন্তত পরিচিত হতে পারত। দেখা গেছে, যখনি কোন ইয়োরোপীয় সাহিত্য নোবেল পুরস্কার বা ঐরূপ কোন স্বীকৃতি লাভ করেছে, তখনি ঐ সাহিত্য এদেশে পরিচিত হতে পেরেছে। তার পূর্বে আমরা ঐ সাহিত্য সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবরই রাখিনি। হয়ত ঐ সাহিত্য আমরা পড়েছি, কিন্তু তা যে অত উচ্চাঙ্গের হতে পারে, পাশ্চাত্য বিদগ্ধ সমাজ সে সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করার পূর্বে স্বাধীনভাবে আমরা আমাদের অভিমত প্রকাশ করতে পারিনি। উদাহরণস্বরূপ প্যাস্টারনাকের কথা বলা যেতে পারে। নোবেল পুরস্কার না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই ছিলেন।

দ্বিতীয়, 'ইংরেজের মত ইংরেজী' লিখবার পক্ষে শ্রীযুক্ত চৌধুরী যে ব্যবস্থা-পত্র দিয়েছেন, যথা 'roast beef ও Yorkshire pudding ভক্ষণ' সব সময় তা যে ঈপ্সিত ফললাভে সহায়তা করে না এবং চৌধুরীমশায়ের অপর উক্তি বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় রেখেও 'ইংরেজের মত ইংরেজী' লেখা সম্ভব, এটিও যে সর্বজনগ্রাহ্য নয়, তা জনৈক হিন্দু বাঙালীর ইংরেজী রচনা সম্বন্ধে প্রখ্যাত ইংরেজ সমালোচক জন মিডলটন মারীর উক্তি থেকে বোঝা যায়। উক্তিটি একটু দীর্ঘ। আশা করি পাঠক ধৈর্য হারাবেন না। শ্রীযুক্ত মারী বলছেন—

"I lately read a volume of English poems by a Hindu, who was sent to this country at the age of seven, and educated at St Paul's and Christ Church. Not till he was twenty-five did he return to his own country and then it was to serve as a Professor of English literature in an Indian university. At such a task he died

The poems perplexed me. Their author's command of the English language was notable, his emotional sincerity obvious; yet never for one moment could I be lulled into the—belief that they were good poems. Something was lacking. What was it? Though I thought over the question for long I could find no pat and positive answer but I came to certain conclusions about the poems.

What troubled me, I concluded, was a constant hiatus that I felt between the language and the thought, between the expression and the experience. The poet was using English words to convey what English words never could convey. It was not that other English words than those he used would have done the work better: on the contrary, his diction was surprisingly felicitous. The truth was that no English words could possibly convey what he wanted them to convey, and no doubt supposed that they did convey

It might be asked: How did I know what he wanted to convey, seeing that I had only his words to inform me? A fair logical objection, but fortunately (for otherwise literature would be unnecessary) logic is not sovereign in literature. It is true, that if I took an isolated verse, or an isolated sequence of verses, I could not pronounce positively that he meant something other than he said: I could merely register an indefinable dissatisfaction. But the cumulative effect of many pages was not to be mistaken. A thousand approximate expressions of a thought will make a thought distinct even though no individual expression be exact. So with the Indian poet: though no once of his poems really expressed his thought or his feeling, and therefore no one of them was a true poem yet all together conveyed to me a fairly distinct impression of his habit of thought and feeling. And I am confident that such a habit of thought and feeling can not be expressed in the English language'. (J. M. Murry: Things to Come).

সাত বছর বয়সে বিলেতে গিয়ে দীর্ঘ আঠার বৎসর সেখানে থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ 'roast beef এবং Yorkshire pudding' গলাধঃকরণ করেও একটা 'good poem' লেখা যদি সম্ভব না হয় তাহলে এদেশে বাস করে এদেশের জীর্ণ-শীর্ণ গোদেহের 'roast beef এবং Yorkshire pudding' বেশী কাজ দেবে কী? প্রচুর পরিমাণে 'roast beef এবং Yorkshire pudding'-ভক্ষণও যে বাঞ্ছিত ফললাভ করতে সাহায্য করল না, তার কারণ মারী সাহেবের মতে সাত বছর বয়সে বিলেত গিয়ে এবং সেখানে দীর্ঘ আঠার বৎসর থেকেও ভদ্রলোকের 'habit of thought and feeling' এতটা ভারতীয় রয়ে গিয়েছে যে, তাকে আর ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হোল না। আর যদি হয়, তাহলে চৌধুরী-মশায় যে উপদেশ দিয়েছেন, ভারতীয় লেখকেরা তাঁদের বিষয়বস্তুটা যেন খাঁটি ভারতীয় রেখে ইংরেজীর চর্চা করেন, তাঁর এই উপদেশ প্রার্থিত ফললাভে সাহায্য করবে বলে কি করে আশা করি?

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর মাইতি

হাওড়া

দ্বিপদী

আরতি দাস

(১)

কুড়িয়ে পেয়েছে বলে অমার নাম হল কুড়োরাম। সবাই ডাকে কুড়ো। আর ওই ছেলেটিকে সবাই বলে খোকাবাবু। খোকাদাবাবু আমার মালিক, আমি ওর বন্ধু। আমার ওজর-আপত্তি, মনের সুখ-দুঃখ আনন্দ আহ্লাদ সবই বুঝতে পারে খোকাদা। এ বাড়ীতে দিদিমাও একটু সুনজরে দেখেন আমাকে। বলেন, আহা, অবোলা জীব, অমন সারাক্ষণ বেঁধে রাখিসনে, বাগানে ছেড়ে দে খোকা। আহা, ওর খিদে পেয়েছে রে। কিন্তু রাঙাঠাকুমার এসব কথা দূরে থেকেই। কাছে গেলে ছুঁলে ছুঁলে গেল গেল চেঁচানি। ওইরে, ঘরের মধ্যে গেল বুঝি। ওই আমার শুধু কষ্টরখানা দিল একাক্কার করে। সত্যি বলতে ওঁর এই ব্যবহার আমার সহ্য হয় না। কিন্তু তা বললে শুনছে কে? যার যা স্বভাব। উনিও চেঁচাবেন। আমিও ছুঁয়ে দেব।

খিদিরপুরের বাড়ীতে আমার আসবার মাস কয়েক পরেই কর্তাবাবু মারা যান। কর্তাবাবু মানে খোকাবাবুর মামা। কর্তাবাবুকে আমি মাত্র একদিনই দেখেছি। সকালবেলা ছাড়া পেয়ে ঘুর ঘুর করছি দোতলায়। একটা খোলা ঘর পেয়ে ঢুকে গেলুম। পুব-দিকের জানালার কাছে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন কর্তাবাবু। আমার ঘরে আসা টের পাননি। এমন সময় খোকাবাবু আমার খোঁজে এসে হাজির। ভাগ্নের সাড়া পেয়ে মুখ ফিরিয়েই দেখতে পেলেন আমাকে। আরে এটাকে কোত্থেকে পেলি খোকা? এযে দেখছি খাঁটি পিকিনিজ, আমার বকলশের সঙ্গে শেকল জুড়ে দিয়ে কর্তাবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল খোকাদা। আমি করবার মত কিছু না পেয়ে বার-দুই ওর পা চেটে দিলুম। ভীষণ চটে গেল খোকাদা। বলল, তোর এই স্বভাবটা আর গেল না কুড়ো।

কর্তাবাবু হেসে উঠলেন। ভারি অদ্ভুত ধরনের সেই হাসি। কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, এখন থেকে ওকে সেই কথাটাই শিখিয়ে দে খোকা, ভালবাসলেই পা চাটতে নেই। কথাটা শেষ করেও কেমন টেনে টেনে বিশ্রীভাবে হাসতেই থাকলেন। কর্তাবাবু দেখতে সুন্দর কিন্তু ওঁর এই হাসিটা আমার ভাল লাগেনি।

এর মাসখানেক পরেই একদিন রাত্রে হঠাৎ শুনতে পেলুম, কর্তাবাবু মারা গেছেন। কর্তাবাবুর বালিশে মুখ চেপে খোকাদাবাবু খুব কাঁদছিল। তখন অনেক রাত। বাইরের বাগানে ধবধবে জোৎস্না। সবাই মিলে ধরাধরি করে কর্তাবাবুকে নীচে নামাল। চাকর রসিকলালের পায়ের ধাক্কায় একটা কাঠের তেপায়া গড়িয়ে পড়ল নীচে। সে রাত্রের কথা আর কিছুই মনে নেই আমার।

(২)

এ বাড়ীটা গোল ধরনের। আগা-গোড়া শ্বেতপাথরে মোড়া। বাড়ীর চার-দিক ঘিরে বাগান। বাগানের উত্তরদিকে একটানা লম্বা ব্যারাকের মত একসারি ঘর। ওটা রান্নাবাড়ী। ওর বাকী ঘর-গুলোয় ভাগাভাগি করে ঠাকুর, চাকর, ড্রাইভার, মালি, দরওয়ান সব থাকে। ওদিকটা আমার বেশ লাগে। হৈ-চৈ গোলমাল হাসি কথায় সরগরম। ওখানে মানুষের হাট। আর এই মার্বেল পাথরে মোড়া গোলবাড়ীটা দিনের-বেলায়ও এমন নিশ্চুপ নিঝ্ঝুম যে চলতে-ফিরতে গা ছম্ছম্ করে।

একতলায় দু-তিনটে ঘর নিয়ে থাকেন দিদিমা, দোতলার দক্ষিণ-দিকের সবটাই বৌরাণীর মহল। বৌ-রাণীকে দেখলে আমার ভয় ভয় লাগে। খুবই সুন্দর। কিন্তু যেন পাথরে গড়া একটি মূর্তি। ওঁর হাসি, কথা, হাঁটা, চলা সবই কেমন নিঃশব্দ, চাপা। তবু সেই কথার মধ্যে, হাসির মধ্যে কি যেন আছে, কাছে যেতে সাহস হয় না। এবাড়ীতে সবাই বৌরাণীকে ভয় করে। দিদিমাও। কর্তাবাবু মারা গেলে সকলেই কাঁদছিল। বৌরাণীর চোখে কিন্তু একবিন্দু জল দেখিনি। ঝি,

চাকররা এ নিয়ে কি সব বলাবলি করছিল আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

গোলবাড়ীর তিনতলার মস্ত বড় ছাত। ছাতের লাগোয়া দুখানি ঘর নিয়ে থাকে খোকাদা। একটায় পড়াশোনা করে। অন্যটাতে শোয়। মস্ত বাথটব্ ভর্তি করে খোকাদাবাবু আমায় যত্ন করে নাওয়ায়। তারপর মোড়া পেতে বসে আমার খাওয়ার তদারক করে। আমার সব ব্যবস্থা আলাদা। রান্নাবাড়ী থেকে আমার খাবার তৈরী করিয়ে নিয়ে আসে রসিক।

কিন্তু দুপুরবেলা হয় মুসকিল। খোকাদা সিঁড়ির দরজায় তালা দিয়ে কলেজে চলে যায় তখন।

এদিক থেকে কট্‌কটাস্ চাবী বন্ধ করার আওয়াজ পাই আমি। তার মানে থাকো এখন সমস্ত দিন বন্দী হয়ে। চেঁচাও, কাঁদো, কেউ শুনবে না। আমি আর কি করব? পড়ে পড়ে ঘুমোই। ঘুম ভাঙলে দেখতে পাই চক্‌চকে নীল আকাশে সাদা মেঘের বল নিয়ে কারা যেন খেলা করে। ওই বলগুলো যখন গড়িয়ে গড়িয়ে আকাশের একটেরে চলে যায় আর তাদের মাথায় সোনারং লাগে তখন বুঝতে পারি খোকাদার আসবার সময় হল। ঘরে ঢুকেই ও আমার শেকল খুলে দেবে আর আমি ছুটব নীচে। তিনতলা থেকে দোতলা, তারপর একতলায়। ছুটে ছুটে পৌঁছব রান্নাবাড়ীতে। রসিক আমায় কলাই করা বাটিতে চা দেবে, মেঝেয় ছড়িয়ে দেবে বিস্‌কুট। চা খেতে আমার ভারি ভালো লাগে। খেয়ে-দেয়ে চাঙ্গা হয়ে ঘুর ঘুর করব রান্নাবাড়ীর উঠোনে। চেয়ে চেয়ে দেখব ঘি নিয়ে, ময়দা নিয়ে, বাজারের হিসেব নিয়ে ঝি চাকর ঠাকুর আর সরকার মশাইএর বাক্‌বিতণ্ডা। মতি ঝি যখন চেঁচায় মনে হবে রাস্তার খেঁকী কুকুরটা মার খেয়ে একটানা চীৎকার করছে।

আমি বরাবর দেখেছি খাবার জিনিস নিয়ে বেশীর ভাগ মানুষের লড়াই, চেঁচামেচি। শুধু বৌরাণী, রাঙা-ঠাকুমাদের মত লোকদের খিদের চাড় নেই। ওদের ঘরে খাবার নষ্ট হয়। ওরা বেড়াল কুকুরকে বিলিয়ে দেয় নয়ত ফেলে দেয় জঞ্জালের মত। আমি এসবের মানে বুঝিনে। একদিকে ফেলে ছড়িয়ে অপচয়, অন্যদিকে এক দানা খাবারের জন্য খেয়োখেয়ি। আমার মনে হয় মানুষ বড় বোকা।

শনিবার বিকেলটা আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। আড়াইটের আগেই এসে পড়ে খোকাদাবাবু। বিকেলের সোনালী রোদের মধ্যে বেরিয়ে পড়ি আমরা। ময়দানের সবুজ ঘাসে মুখে বল নিয়ে ছুটুতে থাকি আমি। খোকদাও এক এক সময় আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটে, হাততালি দেয়। অঢেল হাওয়ায় ছোটাছুটি করে শরীরটা তাজা হয়ে ওঠে। সন্ধ্যে ঘোর হয়ে এলে তখন বাড়ীর দিকে ফিরি। রবিবার বিকেলেও বেড়াতে যায় খোকাদা কিন্তু আমাকে রেখে যায় বাড়ীতে। সেদিন ওর সঙ্গে থাকে নীরা দিদিমণি, পাশের বাড়ীর কর্ণেল চ্যাটার্জির মেয়ে।

খোকাদাবাবু মুখে বলে, এ দুনিয়ায় আমিই ওর একমাত্র বন্ধু। কিন্তু এ আমি অনেকবার দেখেছি, নীরাদিকে কাছে পেলে আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। সেদিন বাগানের ঘাসে গড়াগড়ি দিতে গিয়ে বিষ পিঁপড়ের ঝাঁকের মধ্যে পড়ে আমার যা লাঞ্ছনা হল বলবার নয়। লোমের ভেতরে ঢুকে পিঁপড়েগুলোর যা কামড়! মনে হল আগুন জ্বলছে আমার সারা গায়ে। আমি চেঁচিয়ে কেঁদে একশা, দেখি খোকাদা নীরাদির সঙ্গে গল্পে মত্ত, একবার ফিরেও তাকাল না। হুঃ, এই নাকি বন্ধুত্ব। একজনকে পেলেই আর একজনকে দিব্যি ভুলে যায়।

দিদিমা শিউলি ফুল কুড়িয়ে রাধামাধবের জন্য মালা গাঁথেন আর আপনমনে অনেক কথা বকে যান। বলেন, কুড়োকে তোমরা কেউ কিছু বল না। কুড়ো এসে খোকার মুখে হাসি ফুটেছে। মামা গিয়ে অবধি ছেলেটা যেন অনাথ হয়ে গেছে।

আমি বুঝিনে কর্তাবাবু মারা যেতে অনাথ হবে কেন খোকাদা? বৌরাণী তো আছেন। মামী থাকলে আর ভাবনা কি! বরং খোকাদারই দোষ। বৌরাণীকে ও একেবারে সহ্য করতে পারে না। মুখো-মুখি হলেই খোকাদার শরীরটা কেমন শক্ত কঠিন হয়ে ওঠে। কথা বলতে মুখ লাল হয়ে যায়। উত্তেজনায় রাগে ভেতরে ভেতরে যেন কাঁপতে থাকে ও। কথার মাঝখানে বৌরাণীকে থামিয়ে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। কতদিন দেখেছি খোকাদা ঘর থেকে চলে গেলে বৌরাণী নিজের কান্নাভাসা মুখটা নীচু করে মেঝেয় গালচের নক্সার দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে। যত দিন যাচ্ছে সম্পর্ক বিষিয়ে যাচ্ছে ততই। এর কারণ বুঝতে আমার সময় লেগেছে। মানুষদের এসব মন কষাকষি বাজে ব্যাপার আমার আদৌ ভাল লাগে না। তার চেয়ে কাবুলি বেড়ালটাকে তাড়া করে গাছে তুলে দিতে ভালবাসি আমি। ওটা বৌরাণীর বেড়াল। গলায় লাল রেশমী ফিতে বাঁধা। চালচলনে খুব দেমাক। ভারী জব্দ হয়েছে এখন। আমায় দেখে সেই যে মোটা শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে গাছে তুলে বসে আছে তো আছেই। নামবে কি করে? আমি যে গাছের তলায়?

বৌরাণীর ঝি 'দ্রৌপদী' বেড়ালটার জন্য একবাটি দুধ নিয়ে ডাকছে ওকে। দ্রৌপদী বড় ভাল। ওকে আমার খুব ভাল লাগে। ছিপছিপে একহারা গড়ন। টিকলো নাক, টানা দুটি চোখ, ফুরফুরে পাতলা ঠোঁট। গায়ের রং কিন্তু কচকচে কালো। খুব সুন্দর ছবি এঁকে যদি কেউ তার ওপর এক দোয়াত কালি ঢেলে দেয় দেখতে ঠিক দ্রৌপদীর মত হবে।

এ বাড়ীতে খোকাদার বন্ধু আমি, বৌরাণীর বন্ধু দৌপদী। দিদিমা মুখে বলেন, কারুর সাতে পাঁচে নেই, কিন্তু খোকাদার ওপরেই ওঁর টান, বৌরাণীকে দেখেন বিষনজরে। এত বড় বাড়ীতে মোটে তিনজন মানুষ কিন্তু কি বিশ্রী আবহাওয়া করে রেখেছে এরা? ছি-ছি-ছি। আমরা জানোয়ার। ঝগড়া লড়াই খেয়োখেয়ি করি বটে তাবলে মানুষের মত এমন সারাক্ষণ মুখ বুজে মনের ছুরিতে শান দিইনে।

খোকাদাবাবুর রাগের কারণটাও আর আমার অজানা নেই। রাত আটটার সময় দরওয়ান রামভকত টেনে গেটটা সম্পূর্ণ খুলে দেয়। রুপালি রং-এর একখানা মোটরগাড়ী নিঃশব্দে চলে আসে ভেতরে। চাপা বাঁশীর সুরে হর্ণ বেজে ওঠে। ঠিক সেই মুহূর্তে দোতলার দক্ষিণ দিকের বৌরাণীর একটা ঘরের জানালা খুলে যায়। যতক্ষণ গাড়ীটা এবাড়ীতে থাকে ততক্ষণ খোকাদা ছটফট করে অস্বস্তিতে। জিনিসপত্র টেনে ছুঁড়ে ফেলে, মাথার চুল ধরে টানে নয়ত ছাতময় পায়চারী করে বেড়ায়। আমি এসবের মানে বুঝিনে। বাইরে কন্‌কনে শীত, ঘরের মধ্যে গোল হয়ে আরামে চোখ বুজে থাকি। একটু পরেই রসিক আমার জন্য গরম গরম মাংস আর ভাত আনবে।

(৩)

আগে ছোট ছিলুম, রাতদিনের পার্থক্য তত বুঝতুম না। এখন দেখছি

দিনের মানুষে আর রাতের মানুষে আকাশ পাতাল তফাত। দিনের বেলা যে যার খুশিমত এক একটা মুখোশ পরে নিয়ে হাঁটে, চলে, কথা বলে। রাতের বেলা সেই মুখোশটা খুলে যায় আমার বকলশে বাঁধা শেকলটার মত। তখন মানুষগুলো আসল চেহারা নিয়ে ইচ্ছেমত চলে। তখন সব নানা রকম মজার মজার ব্যাপার ঘটে। এই রাঙ্গাঠাকমা যিনি লাল টুকটুকে লোমবস্ত্র পরে পুজোর মন্ত্র বলেন তাঁকেই দেখি দুপুর রাতে আঙুল মটকে বৌরাণীকে শাপশাপান্ত করেন। বলেন, অলক্ষ্মীর মরণ হয় না, মলে হাড় জুড়োয়, আপদ মরেও না।

রাত বারোটায় যখন চারদিক নিষুতি, গোলবাড়ীর সব ঘরের আলো নেভানো, আকাশটার হাঁড়ি মুখ কালো অন্ধকার, তখন দেখতে পাই ঘোমটায় মুখ ঢেকে কে যেন ছায়ার মত রসিকলালের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। ঠুক ঠুক ঠুক তিনটে ঘা দেয় কবাটে আর সঙ্গে সঙ্গেই হাঁ হয়ে খুলে যায় দরজাটা। ঘরের আঁধার যেন গিলে ফেলে ছায়াটাকে। তারপর আবার সব সুনসান্ নিশ্চুপ।

আজ রাতে গোলবাড়ীর আলো নিভে যাবার পর রান্নাবাড়ীর রকে ঝি চাকরদের জটলা বসেছে। রসিক বলছে, রতন সিং ড্রাইভারের নাকি চাকরী থাকবে না।

বলে গাড়ীই বেচে দিচ্ছে তার আবার ড্রাইভার। মুখ ঘুরিয়ে ফোড়ন কাটল মতি ঝি।

ওই চাকলাদারসাহেব ইচ্ছে করলে বাড়ীশুদ্ধু সবাইকে পথে বসাতে পারে। বিড়িতে একটা সুখটান দিয়ে বলল রসিক।

কথাটা শুনে আমি চমকে গেলাম। অসাবধানে আমার মুখ থেকে ঘেউ করে একটা আওয়াজ বেরোতেই ওরা শিউরে উঠল সবাই। পেছন ফিরে আমাকে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্বস্ত হল বোধ হয়। মতি ঝি বলল, দূর হ মুখপোড়া, তুই কোত্থেকে এসে জুটলি।

এই যে লাটসাহেবের মত চারসন্ধ্যে ভাল মন্দ খাওয়া, গাড়ী চড়ে হাওয়া খাওয়া সব শিকেয় উঠবে। বাছাধন টের পাবে কত ধানে কত চাল। রসিক হেসে হেসে বলল আমার দিকে তাকিয়ে।

আমি জানি খোকাদা আমায় ভালবাসে, এত আদর-যত্নে রেখেছে বলে ওরা আমায় দুচোখে দেখতে পারে না। হিংসেয় জ্বলে মরে।

চাকলাদারসাহেব কত্তাবাবুর বন্ধু। হুট্ করে পথে বসাবেন না এদের, বলল রতন সিং।

কত্তাবাবুর বন্ধু এখন বন্ধ হয়েছেন গো। মতি ঝি কথাটা বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি! অন্য সকলেও হাসছিল। হঠাৎ দ্রৌপদীকে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখে চুপ হয়ে গেল সবাই। একখানা চিরকুট রসিকের হাতে ধরে দিয়ে দ্রৌপদী বলল, এই ওষুধটা এখখুনি এনে দিতে হবে। কথাটা বলে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। আমি জানি বৌরাণীর ঘুমের ওষুধ ওটা। ওষুধ না খেলে বৌরাণীর ঘুম হয় না রাত্রে।

দ্রৌপদীর পেছনে আমিও নেমে এলুম রান্নাবাড়ীর রক ছেড়ে। বাগানে নামতেই কনকনে হাওয়া শীত ধরিয়ে দিল। টুপটাপ শিউলি ফুল ঝরছিল ঘাসে। আমার থাবার নীচে ফুলগুলো পিষে যাচ্ছিল।

(৪)

কদিন থেকেই গোলবাড়ীর আবহাওয়া থমথমে, মেঘলা দিনের মত। রাঙ্গাঠাকমার মুখ গম্ভীর। খোকাদা বই খুলে গুম হয়ে বসে থাকে। বৌরাণীর অবশ্য কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। কুরুশ-কাটি দিয়ে লেস বুনছেন সোফায় বসে। পায়ের কাছে কাবলী বেড়ালটা লেজে-মুখে এক হয়ে ঘুমোচ্ছে। রসিক এসে খবর দিল চাকলাদারসাহেব আসছেন। বৌরাণী লেসটা চোখের সামনে ধরে পরখ করছিলেন, বললেন, ওপরে আসতে বল।

নীচের হলঘর সুন্দর করে সাজানো। অতিথি-অভ্যাগত এলে ওখানেই বসানো হয়। কিন্তু চাকলাদারের বেলায় দেখি অন্যরকম। সোজাই দোতলায় বৌরাণীর বসবার ঘরে চলে আসেন। দিদিমা চাকলাদারের এই ওপরে আসা-বসা একেবারে সহ্য করতে পারেন না। খোকাদাবাবুও না। অথচ মুখ ফুটে সেকথা ওরা কেউই বলবে না।

মানুষেদের হালচালই আলাদা। আমি যাকে পছন্দ করি না তাকে পিছুতাড়া করে একেবারে গেট-এর বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

টিয়ে পাখীর মত নাকটা উঁচু করে চাকলাদারসাহেব লম্বা লম্বা পা ফেলে ওপরে উঠে আসছেন। পরণে চোস্ত সাহেবী পোশাক, মুখে পাইপ, ডান হাতটা প্যাণ্টের পকেটে, বাঁহাতে আলতো করে পাইপটা ধরা। আমি পেছনে লাফাচ্ছি, ঘেউ ঘেউ করছি, ভ্রূক্ষেপই নেই ওঁর। রসিক দরজার ভারী পর্দাটা উঁচু করে তুলে ধরতে ভেতরে ঢুকলেন উনি। সোফার মাঝখানে পায়ের ওপর পা তুলে বসলেন চাকলাদার, যেন আগন্তুক কেউ নন, এ বাড়ীরই মালিক। খুট্ করে আওয়াজ হল একটা। ওপাশের দরজাটা খুলে গেছে, বৌরাণী দাঁড়িয়ে। চাকলাদার বৌরাণীর দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলেন। সাদা রেশমের থান কি এক অদ্ভুত কায়দায় পরেছেন বৌরাণী। দিদিমা বলেন বাইজীদের মত। সে যাই হোক্, বৌরাণী সুন্দর। এই হাতায় লেস্ দেওয়া গরদের জামা আর দুধরং রেশমের থানে ওঁকে দেখাচ্ছে সকালের সেটা সাদা পদ্মফুলটির মতন। একটু হাসির ছোঁয়াচ লেগে আছে ঠোঁটে, চোখে। চাকলাদার চেয়ে আছেন তো চেয়েই আছেন। চোখের পলক পড়ছে না। বৌরাণী এগিয়ে এসে সোফায় বসতে যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। সুপ্রভাত।

মিষ্টি আওয়াজ তুলে হেসে উঠলেন বৌরাণী। আমি ভাবলুম কাচের ঠুনকো একটা ডিশ্ কার হাত থেকে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল বা। অনেক কথা হল দুজনের। তা থেকে বুঝলুম ঝি চাকরদের কোন কথাই ঠিক নয়। এ বাড়ী-ঘর, মোটরগাড়ী, ড্রাইভার সব যেমন আছে তেমনই থাকবে। চাকলাদার বেঁচে থাকতে বৌরাণীর গায়ে আঁচড়ও লাগতে দেবেন না।

আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না। কথাটা বলতে বৌরাণীর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, চোখে জল আসবার মত হল। আর চাকলাদারের মনটা চিরে গেল তাতেই।

ছি, ছি, এ কী কথা? আপনি কি করে ভাবলেন আমি আপনার ক্ষতি করব।

আমার মনে হল যেন বৌরাণী নয় চাকলাদারই কেনা হয়ে আছেন এঁদের কাছে। বিচিত্র ঝংকার তুলে দেওয়াল ঘড়িতে দশটা বাজলো। বাইরে খর রোদ, ঘরের মধ্যে না রাত না দিনের আবছা অন্ধকার। গোলাপ ফুল, চন্দন ধূপের মিষ্টি সুবাস।

চিরকাল মন্দিরের চাতালেই দাঁড়িয়ে রইলুম। দরজায় আঘাত করব কি করব না ভেবেই সময় বয়ে গেল। ভেতরে যাবার অনুমতি পেলুম না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন চাকলাদার।

বৌরাণী একথার জবাব দিলেন না, নিরুত্তর হাসলেন একটু। তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির মতই শোনাল ওঁর কথাটা। খোকাটা এত ছেলেমানুষ, শুধু বয়সে নয় বুদ্ধিতেও। ও মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ালেই আমার ছুটি। একটা নিঃশ্বাস ফেলে শেষ করলেন কথাটা। তখন আর আমার পিছু ফিরে তাকাবার মত কিছুই রইল না এ বাড়ীতে।

যেন আশায় অধিক অনেক কিছু পেয়ে গেছেন এমনিভাবে জ্বলে উঠল চাকলাদারের মুখ। পাইপটা পকেটে পুরে দুহাতের চেটোয় মুখখানা রগড়ে নিলেন। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। ওর বয়স কত হল? এইবার বি, এস-সি ফাইনাল না?

হ্যাঁ, এই মাঘে আঠারো পূর্ণ হবে।

উঠে পড়লেন চাকলাদার। হাত বাড়িয়ে টুপিটা নিতে গিয়ে অসাবধানেই বৌরাণীকে ছুঁয়ে গেলেন একটু। অন্ততঃ আমার তাই মনে হল। তারপর

হাত বাড়িয়ে টুপি নিতে গিয়ে অসাবধানেই বৌরাণীকে ছুঁয়ে গেলেন একটু।

যেন জোর করে নিজেকে নিজেই ধাক্কা দিয়ে বার করলেন ঘরের থেকে।

দোতলায় এই ব্যাপার। তিনতলায় এসে দেখি খোকাদা দুহাত মুঠি করে মাথার চুল টানছে। রূপালি রং-এর গাড়ীটা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ গেট খোলা। এ বাড়ীতে চাকলাদারের আসা যাওয়া কর্তাবাবুর মতই। কর্তাবাবু মারা যেতে এদের এমন কি অসুবিধে হয়েছে ভেবে পাইনে।

(৫)

দেখতে দেখতে কর্তাবাবুর বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন এসে গেল। কুটুম্ব-স্বজন, গুরু-পুরোহিত লোকজনে গোলবাড়ী থৈ থৈ করছে। এ সময়টা চাকলাদারসাহেব আড়ালেই থেকে গেলেন। শুধু অনেক টাকার চেক সই করে পাঠাতে লাগলেন বৌরাণীর নামে। আমি দেখতুম খাম ছিঁড়ে চেক্ বার করবার সময়ে বৌরাণীর সাদা পদ্মকলির মত আঙুলগুলো কাঁপছে, মুখে খুশীভরা উত্তেজনার হাসি। এ কয়দিন খোকাদাবাবুর রাগটাও যেন পড়ে আসছে। নানা দরকারে বৌরাণীর ঘরে আসছে, ডেকে কথা বলছে। ওর মুখে মামী ডাক শুনে বৌরাণীর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে বার বার।

বাৎসরিক উপলক্ষে যে সব কুটুম্ব-স্বজন এসেছে তাদের চুপিচুপি কথা-বার্তা আলোচনা থেকে এ পরিবারের অনেক কিছুই জানতে পেরেছি আমি। কর্তাবাবুর পৈত্রিক জমিদারী ছিল। সেই আয়ের টাকা থেকে উনি অভ্র আর কয়লার খনি কিনেছিলেন। এ ব্যবসায়ের অন্য অংশীদার ছিলেন চাকলাদারসাহেব। বন্ধুকে খুবই বিশ্বাস করতেন কর্তাবাবু। শেষের দিকে চাকলাদারের হাতে সবই ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিজে ঘুরে বেড়াতেন দেশ বিদেশে। ওঁর নাকি ইচ্ছে ছিল সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে বই লিখবেন। এই ঘুরে বেড়ানো আর বই-এর নেশা যখন কাটল তখন প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন। ওদিকে চাকলাদার ফুলে-ফেঁপে চতুর্গুণ।

মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে হলে বন্ধুর দিকে হাত বাড়ানোই তো সুবিধের। খোকাদার পিসেমশাই বললেন।

যাই বল বাপু, এককালে যা খেয়েছে এখন সুদে আসলে তাই তো উগরে দিচ্ছে। হেসে হেসে একজন রোগাটে বুড়োমানুষ বলছিলেন।

ছাতময় পাতা পড়লো। কত মানুষ খেল, কত খাবার যে ফেলাছড়া গেল তার হিসেব নেই। রাত তখন এগারটা। আমি গেটের পাশে দাঁড়িয়ে। একদল লোক যেতে যেতে বলছিল, নটীর টাকায় নারায়ণের পুজো।

(৬)

বাৎসরিকের হট্টগোল থামল একদিন। ছাতের ওপরকার ম্যারাপ খুলে নিয়ে গেছে। দড়ি দড়া বাঁশ তারের চিহ্নমাত্রও নেই। একটা এলোমেলো হাওয়া বইছে ক'দিন থেকে। হঠাৎ আসছে, ঘরের কাগজপত্র, গাছের শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে আবার। পিছনের বাগানে ভারী অদ্ভুত এক ব্যাপার দেখছি। একটা নেড়া গাছ চারপাশে ডালপালা ছড়িয়ে হাহুতাশ করছে। একটিও পাতা নেই গাছে। অথচ অজস্র কালচে রং-এর কুঁড়ি ধরেছে গাছটায়। দুদিন বাদে আগুন ধরে যাবে ডালে ডালে, বলছিল খোকাদা। পলাশ ফুলের বড় বাহার, সরকারমশাইও মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন।

সেদিন বিকেলে গোলবাড়ীটা ফাঁকা। দিদিমা গেছেন বনহুগলী। খোকাদা বইখাতা হাতে কোথায় বেরিয়ে গেল পায়ে হেঁটেই। আজকাল গাড়ী চড়া ছেড়ে দিয়েছে ও। একা একা কি আর করি। ঘুরু ঘুরু করছি দোতলায়। বৌরাণীর হলঘরের দরজায় দেখি এক জোড়া হরিণ চামড়ার চটি। ঢুকে গেলুম ঘরের মধ্যে। বৌরাণী ঘর আলো করে বসে আছেন। কানের গয়না থেকে গলার হারের লকেট থেকে নীলচে আলো ঠিকরে পড়ছে। বৌরাণীর পায়ের দিকটায় একটা মোড়া পেতে বসেছেন চাকলাদার।

চাকলাদার যেন কি সব বলতেই খিল-খিল করে হেসে উঠে বৌরাণী ডাকলেন, দ্রৌপদী। সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে সরে এসে অন্য একটা সোফায় বসে পড়লেন চাকলাদার। দ্রৌপদী তো সামান্য ঝি। তাকে এত ভয়, সমীহ করেন কেন চাকলাদার! ভয় যদি করতেই হয় তো আমাকে। আমি খ্যাঁক করে কামড়ে দিতে পারি। চাকলাদারের মোজার মধ্যে দিয়ে একেবারে হাড় পর্যন্ত দাঁত ফুটিয়ে দিতে পারি। দ্রৌপদী রসিক রতন সিং ওদের সে মুরোদ আছে? চাকলাদার লোকটা দেখছি বেজায় বোকা!

নরম থাবা পেতে কোচের পেছনে বসে পড়লুম, ওরা বোধহয় জানতেই পেল না।

না না না, তা হয় না। আমায় ভাবতে দিন, সময় দিন। বৌরাণী যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠেছেন। গলার স্বর কাঁপছে, কালো চোখের তারা ঝকঝক্ করছে।

সুরমা, তুমি কি আমায় মেরে ফেলতে চাও? মরীয়া ঘোড়ার মত হাঁফাচ্ছেন চাকলাদার। আমার সব চাওয়া এমনি করে পায়ে পিষে—।

চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল দ্রৌপদী। ওঁরা দুজনেই চুপ। ঘড়িটা টিক্ টিক্

করে যাচ্ছে একমনে। ওটা যেন রাংগাঠাকুমার মতো। কেউ গ্রাহ্য করুক আর নাই করুক, বকে যাবে একটানা।

চাকলাদার বৌরাণীর কাছে কি চায়? কি নিয়ে দিনের পর দিন এই কথা কাটাকাটি? আমি বুঝিনে বৌরাণীই বা ওঁকে এত ঘোরাচ্ছেন কেন? যা দেবার দিয়ে ফেললেই তো চুকে যায়। তা নয়, রোজ এক কথা নিয়ে বাজে ঝামেলা।

নীচে গাড়ীবারান্দায় মোটরের হর্ণ বেজে উঠলো। ওঃ, গাড়ী এসে গেছে। চায়ের কাপ নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন চাকলাদার। সুরমা, তুমি আমায় প্রাণে মেরে ফেলবে। হাসতে হাসতে পাইপটা ঠোঁটে চেপে ধরে বেরিয়ে যাবেন, বৌরানী ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসতে লাগলেন। শুধুই প্রাণে? ধনে নয়?

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছো। ধনে-প্রাণেই গেলুম। বাই দা বাই, বুড়ীটা গেল কোথায়, দেখছিনে আজ।

আমি বুঝেছি দিদিমার কথা বলছে চাকলাদার। দিদিমাকে একেবারেই পছন্দ করেন না উনি। এক বৌরাণী ছাড়া আর কাকেই বা ভাল চোখে দেখেন! আমাদের মধ্যেও এ রকম আছে। চাকলাদার চান শুধু বৌরাণীকে আগলে থাকতে।

সে যাই হোক্ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন কি করে? ওঁর সেই হরিণ চামড়ার এক পাটি চটি খুঁজে পাচ্ছেন না যে! কি করে পাবেন? চটিটা দাঁত দিয়ে কামড়ে সোজা নিয়ে এসেছি তেতলায়। খুব খোঁজাখুঁজি করে শেষটায় নাকি কর্তাবাবুর এক জোড়া পাম্পশু পরে যেতে হয়েছে চাকলাদারকে। রাগে দেখলুম বৌরাণীর মুখটা লাল, থমথমে। চাকলাদারের চটির কথা নিয়ে রান্নাবাড়ীতে ভারী হাসির ধুম পড়ে গেল।

(৭)

লেজের ডগায় ছোট্ট একটু ঘা হয়েছে। একটা মাছি কখন থেকে উৎপাত শুরু করেছে। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজবো আর অমনি কুটুস্ করে এক কামড়। এই এক যন্ত্রণা। কতদিন হল আমার সাবান আনে না রসিক। কিন্তু কে আর দেখছে সে সব। খোকাদা আজকাল আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। বলতে গেলে বাড়ীই থাকে না। এই আসে তো এই বেরিয়ে যায়। কোথায় যায় কি করে তা ও-ই জানে। যখন বাড়ী থাকে মুখ গোঁজ করে গুম হয়ে বসে থাকে পড়ার টেবিলে। খোলা বই-এর পাতাটা উল্টায় না পর্যন্ত। রাতেও ভাল করে ঘুমোয় না। ছাতময় পায়চারী করে বেড়ায়।

বৌরাণী এখানে নেই। উনি তীর্থ করতে বেরিয়েছেন প্রায় মাসখানেক হল। উনি চলে গিয়ে মগের রাজত্ব শুরু হয়েছে এ বাড়ীতে। নিয়ম কানুন বলতে কিছু নেই। আমার জন্য সরকার মশাই-এর কাছ থেকে সাবানের পয়সা চেয়ে নেয় রসিক আর সেই পয়সা দিয়ে বিড়ি দেশলাই কেনে। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে করে এসব। আমাকে সংকোচ নেই ওর। থাকলে আমারই সাবানের পয়সা দিয়ে বিড়ি কিনে ফুঁকতে লজ্জা হত ওর।

দিদিমার ইচ্ছে ছিল বৌরাণীর সঙ্গে তীর্থ করতে যান। কিন্তু অত টাকা কোথায়! শুধু দ্রৌপদীকে নিয়ে গেছেন সঙ্গে। রাধামাধবের জন্য চন্দন ঘষতে বসে চোখের জল ফেলছিলেন দিদিমা। খোকাদা হাসছিল। ডিয়ার ওল্ড লেডি কান্না কেন? খোকাদা দিদিমার পিঠে হাত বুলিয়ে হেসে হেসে বলছিল। ডিয়ার ওল্ড লেডি, পকেটে পয়সা না থাকলে তুমি আমিও যা, ওই কুড়োরামও তাই। কোনো তফাত নেই। কথাটা বলেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল খোকাদা। দিদিমাকে ছুঁয়ে দিয়েছে বলে উনিও উঠে গেলেন কাপড় ছাড়তে, গঙ্গাস্পর্শ করতে। কিন্তু আমার ভারি রাগ হল খোকাদার কথায়।

পকেটে পয়সা না থাকলে কি মানুষদের আরও দুটো করে ঠ্যাং গজাবে আমাদের মত? নাকি পয়সা রোজগারের ফিকিরে আমি কুড়োরাম মোড়ের ভিখিরিটার পাশে বসব গিয়ে। মানুষদের সঙ্গে জন্তু জানোয়ারের তুলনা হয় নাকি? খোকাদার যত সব আজগুবী কথা।

আমার কানাকড়িও নেই একথা মানি। কিন্তু নেই কেন? সারারাত জেগে আমি বাড়ী পাহারা দিই আর ওই বুড়ো দরওয়ান রামভরত দিব্যি ঘুমোয় নাক ডাকিয়ে। ও পায় মাসে চল্লিশ টাকা আর আমার বেলা একটা আধলাও না। আসলে ওরা মানুষরা ঠিক এই রকম। বিনে পয়সায় যেখান থেকে যতটুকু সুবিধে আদায় করতে পারে করে নেয়। সে বেলায় ন্যায় অন্যায় ভাল মন্দর কোন কথাই ওঠে না। আমার চানের সাবান নেই, বিস্কুট মিয়ানো, মাংস আসে না প্রায় এক হপ্তা। অথচ রসিক এসবেরই হিসেব দেখিয়ে পয়সা নিচ্ছে রোজ। সেদিন সরকারমশাইকে চেঁচিয়ে বলতে গেলুম সেই কথাটা, উলটে আমাকেই তেড়ে এলেন। বললেন, বেরো বেরো হতচ্ছাড়া। রাস্তার কুকুরকে এনে রাজপাটে বসিয়েছে। এবাড়ীর ধরনই এই। যেমন মা তেমন ছা।

(৮)

হাম ভি দেখা। ড্রাইভার রতন সিং চওড়া বুকে হাত চাপড়ে বলল।

রসিকও নাকি দেখেছে। বৌরাণী যে ট্রেণে হাওড়া থেকে রওনা হয়ে গেছেন, সেই ট্রেণেরই অন্য কামরায় চাকলাদার-সাহেবকে উঠতে দেখেছে ওরা। যদিও হাওড়া ষ্টেশনের পিষে যাওয়া ভীড়, যদিও প্লাটফর্মের জমজমাট আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায় তবু রসিক, রতন সিং সেই ভীড়ের মধ্যে আবিষ্কার করেছে চাকলাদারসাহেবকে। চাকলাদার চোখে কাল চশমা ছিল। পরণে ঢোলা পায়জামা আর চুড়িদার পাঞ্জাবী। একেবারে ভোল পালটানো বেশবাস। তবু রতন সিংয়ের আঁখকে ধোঁকা দিতে পারেননি।

আরে ভাই মু বন্দ করকে তামাশা তো দেখো। বলেই রতন সিংএর সে কি হাসি। রান্নাবাড়ীর রকে সবাই অট্টহাসি জুড়ে দিয়েছে। উড়ে ঠাকুরটা শুদ্ধ পানঠাসা তোবড়ানো গালে মৌরীমাখা হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সকলের পেছনে। ভাল মওকা পাওয়া গেছে। আমি নিঃশব্দে পা টিপে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লুম। ভাজা মাছগুলোর অর্ধেকের বেশী যখন সাবাড় করে এনেছি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে রসিক দেখে ফেলল আমাকে। হাঁ হাঁ করে ছুটে এল সবাই। আমি ঠোঁট চাটতে চাটতে বেরিয়ে পড়েই টেনে দৌড় লাগালুম বাগানে। একজনের লাভ মানেই আর একজনের লোকসান। লোকসানটা বোধহয় রসিকেরই বেশী প্রাণে বেজেছিল। তা ছাড়া আমার ওপর রাগ আছে ওর। আমি বাগানের ঘাসের ওপর দিয়ে প্রাণপণ ছুটছি, একখানা ঢেলাকাট্ এসে লাগল গায়ে। তারস্বরে চেঁচাতে লাগলুম খোকাদার নাম ধরে। ছাত থেকে ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিল খোকাদা।

সন্ধ্যাবেলা শুনলুম রসিকের জবাব হয়ে গেছে। খোকাদাই ওকে বরখাস্ত করতে বলেছে। রান্নাবাড়ীর রকে বসে

চোখের জল প'ছতে প'ছতে পোঁটলাটা বাঁধছিল রসিক।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওকে আর যেতে হয়নি। সরকারমশাই মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। রসিককে সবার সামনে নাক কান মলে বলতে হল আর কখন আমার গায়ে হাত তুলবে না।

খুব জব্দ হয়েছে রসিক। ইদানীং বৌরাণী আর চাকলাদারকে নিয়ে বড় বেশী রংতামাশা জুড়েছিল ও।

(৯)

সকালবেলা। এরই মধ্যে রোদের আঁচ গণগণে হয়ে উঠেছে আকাশে। খোকাদা চা খেয়ে সবে কাপটা নামিয়ে রেখেছে, কর্ণেল সাহেবের বেয়ারা সেলাম জানিয়ে একটা খামে আঁটা চিঠি দিয়ে গেল ওর হাতে। খোকাদা রসিককে ইসারা করল কাপ-ডিসগুলো সরিয়ে নিতে। নিয়ে চলে গেল রসিক। ডান হাত দিয়ে চিঠিটা তুলে নিল খোকাদা।

এ কী? খোকাদা আচমকা চেঁচিয়ে উঠল। আমি চেয়ে দেখি চিঠি ধরা ওর হাতটা থরথর করে কাঁপছে। ও বিড়-বিড় করে ক্রমাগত আউড়ে চলেছে অশোক চাকলাদার অশোক চাকলাদার—চাকলাদার। মনে হল শেষের কথাটা দাঁতে পিষে ফেলতে চাইছে ও।

আমি হতভম্ব হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলুম। ও চিঠি তো নীরাদির। সেলিম বেয়ারা এরকম চিঠি অনেক এনেছে এর আগে, জবাবও নিয়ে গেছে খোকাদার কাছ থেকে। আজ অবশ্য জবাবের জন্য দাঁড়ায়নি। কিন্তু নীরাদির এ কি কান্ড! খোকাদার নামের সঙ্গে উলটো পদবী জুড়ে দিয়েছে কেন? খোকাদার নাম অশোক। কিন্তু চাকলাদার কেন? এ বাড়ীর সবাই তো রায়চৌধুরী। এমনকি বৃন্দাবন কাশী থেকে রাঙ্গাঠাকুমার নামে পান্ডাদের যে সব চিঠি আসে তাতেও লেখা থাকে রায়চৌধুরাণী। খোকাদা কেন চাকলাদার হবে? নীরাদির হঠাৎ এরকম লিখবার কি মানে? গুম হয়ে বসে আছে খোকাদা। ওর মুখটা কাগজের মত সাদা। যেন হঠাৎ একটা বিষাক্ত সাপ ছুবলে দিয়েছে ওকে। এ ভাল নয়। আমার মন বলছে এ কিছুতেই ভাল নয়।

আমি পিকিনিজ, নীরাদিদের বাড়ীতে আছে এ্যালসেশিয়ান জোনস সাহেবের আধ ডজন ডালকুত্তা আছে। জোর করে পিকিনিজকে আলসেশিয়ান বলা যায়? রায়চৌধুরী কখনো চাকলাদার হয়?

দুপুরের ডাকে হরিদ্বার থেকে বৌরাণীর চিঠি এল উনি এখন কিছু-দিন ওখানেই থাকবেন। জায়গাটা ভাল লেগেছে ও'র। রতন সিং-এর পাওনা গন্ডা চুকিয়ে জবাব দিতে লিখেছেন বৌরাণী। উনি ফিরে এসে মোটর গাড়ীটা বেচে দেবেন। গাড়ী বেচার কথাবার্তা প্রায় ঠিকই হয়ে আছে।

তলপী গুটিয়ে চলে গেল রতন সিং। এলোমেলো হাওয়ায় এখন কেবলই ধুলো ওড়ে। প্রায় একশ কাকের জটলা বসেছে পেছনের শিমুল গাছে। কোত্থেকে দুটো শকুন এসে বসেছে তাল গাছের মাথায়। সরকারমশাই বলছেন, এ ভিটেয় এখন শেয়াল শকুন চরবে।

কি হবে না-হবে কিছুই জানিনে। শুধু খোকাদার রকম সকম দেখে আমি স্তম্ভিত। নাওয়া খাওয়া ছেড়েছে। দিনরাত ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে। কাল দিদিমা কোমর বেঁকিয়ে অতি কষ্টে ওপরে উঠে এলেন ওকে বোঝাতে।

ও দিদিমাকে বলল, মাই ডিয়ার ওল্ড লেডী ডোণ্ট ডিসটার্ব মি। রাঙ্গাঠাকমা হার মেনে বেরিয়ে যেতে দরজাটা বন্ধ করে দিল। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হতে চলল দরজা খোলেনি ও।

হবিষ্যঘরের চাতালের নীচে চটি-জোড়া রেখে সরকারমশাই উঠে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। আমায় ডেকেছেন কর্তামা?

হ্যাঁ, বোসো ওখানে।

হবিষ্যঘরের সামনের বাতাবী-লেবুর গাছ বেয়ে একটা কাঠবেড়ালী ওঠানামা করছে। আমি ওটাকে তাক করে ওৎ পেতে বসে আছি। দিদিমা বললেন, কাশীর বাড়ীটা মেরামত করিয়ে একতলায় ভাড়াটে বসিয়ে দাও। দোতলায় আমি থাকব।

সরকারমশাই-এর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন, আপনিও আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।

কত্তামা হাসলেন। আমি তো গিয়েই আছি বিনোদ। গোনা কটা দিন। সরকারমশাই চুপ করে রইলেন। কাঠবেড়ালীটা সন্তর্পণে একটু একটু করে নেমে আসছে গাছের গা বেয়ে। শুনলুম সরকারমশাই মাথা নেড়ে নেড়ে বলছেন, সবই বুঝি কত্তামা। সকল গেল মরে, কত্তা হল হরে।

একদিন বিকেলের দিকে একটা ট্যাক্সি এসে থামল গাড়ীবারান্দার সামনে। ঠাকুর চাকর ঝিরা সবাই ছুটল ওইদিকে, সেই সঙ্গে আমিও। লম্বা ঘোমটা টেনে প্রথমেই নামল দ্রৌপদী। তাহলে বৌরাণী এসে গেছেন ? গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগলুম ব্যাপারটা। একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়ে ধরাধরি করে সবাই নামাচ্ছে বৌরাণীকে। চোখ বুজে মড়ার মত মাথা হেলিয়ে দিয়েছেন। এ যেন সেই বৌরাণীই নয়।

একটু পরেই চাকলাদার এলেন গাড়ী করে। তাঁর গাড়ীর পেছনে আরও দু-তিনখানা মোটরকার। ডাক্তার নার্স-এর ব্যস্ত চলাফেরায় বাড়ীটা যেন হাসপাতাল হয়ে উঠল।

আজ রাতে রসিক আমার জন্য স্রেফ ডাল ভাত দিয়ে গেছে। চারদিকের ব্যাপার সুবিধের নয়। সোনামুখ করে ঐ ডাল-ভাতই খেয়ে নিলুম।

পরদিন সকালে উঠে দেখি রাতারাতি বাড়ীর আবহাওয়া পাল্টে গেছে। খোকাদা কাকভোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে। রান্নাবাড়ীতে হুলস্থুল। এই জল গরম চাই, নার্সদের জলখাবার, সাতরকম ফরমাস নিয়ে দ্রৌপদী ক্রমাগত গোলবাড়ী থেকে আসছে। সরকারমশাই-এর মুহূর্তে ফুরসত নাই। রসিক এই নিয়ে বোধহয় দশবার ছুটল ওষুধ আনতে। ওদিকে মতি ঝিকে দিয়ে দিদিমা বারবার ডেকে পাঠাচ্ছেন সরকারমশাইকে।

একটু ফুরসত পেতেই লাল খেরো বাঁধানো খাতাটা বগলে চেপে সরকারমশাই হবিষ্যঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। টুকটুকে লাল ক্ষোমবস্ত্রে চমৎকার দেখাচ্ছে দিদিমাকে। কিন্তু ঠাহর করে দেখি। ও'র তোবড়ানো গাল কেমন শুকনো অথচ শুকোনো আঙ্গারের মত চোখ দুটি ছলছলে। গুণগুণ অস্পষ্ট গলায় উনি কি বললেন বোঝা গেল না। মতি ঝি জোরগলায় ও'র কথাগুলো শুনিয়ে দিল সরকারমশাইকে।

কাল থেকে জলটুকুও ছোননি কত্তামা। আজই কাশী চলে যেতে চান। চমকে উঠলেন সরকারমশাই। আজই ? কিন্তু বাড়ী মেরামত হয়নি, কোন ব্যবস্থাই নেই, ওখানে গিয়ে—

ওখানে ও'র ভাইপো আছেন! এখন ভাইপোর বাসায় উঠবেন গিয়ে তারপর—

কিন্তু গাড়ী ভাড়ার টাকাও তো—। সরকারমশাই থেমে গেলেন। দোরের আড়াল থেকে রুপোর একটা কৌটো ঝনাৎ করে এসে পড়ল বারান্দায়। কৌটোর মুখ খোলা। তার মধ্যে ঝলমলে সোনার সাতনরী হার। মতি ঝির গলা থনথন করে উঠল। এইটে বিক্কিরী করে যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দিন। নইলে কি উপুসী থেকে বুড়ো মানুষ আত্মঘাতী হবেন

রসিক ছুটতে ছুটতে এল। সরকারমশাই শীগ্‌গীর আসুন। তেনারা সব দাঁড়িয়ে আছেন আপনার জন্য। পড়ি কি মরি ছুটলেন সরকারমশাই, পেছনে রসিক।

সরকারমশাই চলে যেতে দিদিমা উঠে গেলেন। সুযোগ বুঝে আমিও এগিয়ে এসে উঁকি দিলুম হবিষ্যঘরের দরজায়। ঘরের মেঝেয় চাল ডাল মশলা ছড়ানো ছিটোনো, কিছু পেতলের, তামার বাসন। একটা শালিখ জানালায় বসে ঘাড় নেড়ে দেখছে এদিক ওদিক। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় কাগজের ঠোঙ্গাগুলো সর্‌সর্ থরথর এলোমেলো ছড়িয়ে গেল আর ভয় পেয়ে শালিখটাও উড়ে গেল কুড়ুপ একটা আওয়াজ তুলে।

(১০)

ওই শালিখ পাখীটার সঙ্গে সঙ্গেই যেন এ বাড়ীর এতদিনকার নিয়মকানুন আদব কায়দা আবরু পরদা সবই উড়ে উধাও হয়ে গেল। চাকলাদারসাহেবের গাড়ীটা প্রায় সারাক্ষণই এ বাড়ীতে। উনি কখন যান কখন আসেন এ নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। একটা মুসলমান বেয়ারা বহাল হয়েছে। চাকলাদার সাহেবের ফরমাস খাটে আর তিন ওকত নমাজ পড়ে।

দিদিমা সেইদিনই চলে গেছেন। যাবার সময় কর্তাবাবুর একটা অল্প

বয়সের ছবি দিলেন খোকাদাকে। এইটে তোর শোবার ঘরে টাঙিয়ে রাখিস খোকা। আর ভাল না লাগলে কাশী চলে যাস।

খোকাদা ইজিচেয়ারে শুয়ে পা দোলাচ্ছিল হেসে হেসে। বলল, কোথায় যাব এই স্বর্গো ছেড়ে? স্বর্গো, ইডেন, গার্ডেন অব ইডেন।

দিদিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলে কপালে হাত ঠেকিয়ে নেমে এলেন। আমি আসছিলুম ওঁর পেছনে। দেখতে পেয়ে বললেন, খোকা রইল, ওকে দেখিস্ কুড়ো। কত গালমন্দ দিইছি তোকে, মনে করিস্‌নে কিছু। ভাল থাকিস সব। দিদিমার তোবড়ানো গাল বেয়ে হুহু করে জল পড়ছিল।

(১১)

নিশুতি রাত। অন্ধকারের হাত-ছাড়ানো এককোণ খাওয়া চাঁদ উঠেছে, নারকেল গাছের ফাঁকে। হাওয়ার দোলায় বারবার গাছের আড়ালে চলে যাচ্ছে চাঁদটা মনে হচ্ছে এক খাবলা মাংস তুলে নেওয়া একটা মড়ার মাথা থেকে থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে এ বাড়ীটা।

বারবার তিনবার ডেকে উঠলুম আমি। সেই ডাকটা শুনে চমকে জেগে বিছানায় উঠে বসল খোকাদা। ও হাত বাড়িয়ে জানালাটা খুলে দিতেই চোখো-চোখি হল ঐ চাঁদটার সঙ্গে। আবছা আলোয় দেখলুম কেমন কেঁপে উঠল ওর শরীরটা, আর তখনই কি ভেবে যে ও খাট ছেড়ে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল আমি জানিনে।

ও পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, পেছনে আমি। একবার আমার একটা পা মাড়িয়ে দিল, খেয়ালই নেই ওর।

দোতলায় নেমে এলুম আমরা। বৌরাণীর ঘরে নীলচে মৃদু আলো। মেঝেয় শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে দ্রোপদী। জানালার কাচে নাক মুখ চেপে ঘরের মধ্যে তাকিয়ে আছে খোকাদা। আমিও দেখলুম। ধবধবে সাদা বিছানায় কুঁকড়ে যাওয়া শীর্ণ শরীর মেলে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছেন বৌরাণী। হয়তো বেঁচে নেই, নয়তো ঘুমিয়ে আছেন কে জানে! মাথার কাছে সাজানো নানারকম কাঁচের শিশির ওপর আলো পড়ে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। খোকাদার নজর সারা ঘর —— এসে দ্রোপদীর ওপরে আটকে গেল। দ্রোপদীর গায়ে জামা নেই। বুকের আধখানা খোলা। আমি স্পষ্ট দেখলুম সেদিকে চেয়ে চেয়ে খোকাদার চোখ দুটো হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল। টং করে একটা আওয়াজ হল দেওয়াল ঘড়িতে। ভীষণ চমকে গিয়ে খোকাদা পিছন ফিরে মরীয়ার মত উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। বারকয়েক হুঁচোট খেল বোধ হয়। ওর ভ্রূক্ষেপও নেই।

ওকে আর মানুষ বলে মনে হয় না। সারাক্ষণ ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হন্যে হয়ে ঘুরছে। সত্যিই ক্ষেপে গেছে ও, নইলে এই আবছায়া শেষ রাতের অন্ধকারে আধখাওয়া চাঁদটার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে অমন অদ্ভুত বিশ্রীভাবে হেসে উঠত কি? হো হো হো, হি হি হি সে কি হাসি খোকাদার! যেন চাঁদটার সঙ্গে ইয়ারকী জুড়ে দিয়েছে ও!

বেশ খানিকক্ষণ এমনি হেসে হেসে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। পরক্ষণেই দুহাতে মুখ চেপে ডাকল, মামা, মামাগো! যেন ডাক নয়, কান্না। আমার ভারী কষ্ট হতে লাগল শুনে। কর্তাবাবু না মরে গেলে এমন দশা হত না ওর।

ঘরে চল শোবে, ঘরে চল। ভেউ ভেউ করে আমার এই কান্নাটাও খোকাদা শুনতে পেল না, যেমন কর্তাবাবু পেলেন না ওরটা।

(১২)

না আর নয়। কাশীই চলে যাব আমরা। সরকারমশাই তারই উদ্যোগে উঠে-পড়ে লেগেছেন। খোকাদার ভাব-গতিক দেখে ভয় পেয়েছেন উনি। চোখ দুটো পাকা করমচার মত লাল। কালি-লেপা গর্তের মধ্যে ওর চোখের চাউনি দেখে আঁতকে উঠেছিলেন সরকারমশাই।

দাদাবাবু, কাশী চলে যান আপনি। সেই ভাল। কাশীতে কর্তামা আছেন, ভালই হবে। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।

কাশী? ফাদার বিশ্বনাথ? খোকাদা হো হো করে হাসতে লাগল। সরকার-মশাই-এর দিকে তর্জনীটা বাড়িয়ে দিয়ে টেনে টেনে বলতে লাগল, ইওর ফাদার; মাই ফাদার, মাই ফাদারস ফাদার, ও হো হো হি হি হি। সরকারমশাই আর দাঁড়ালেন না, সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি-লেন, খোকাদার হাঁক শুনে থমকে দাঁড়ালেন। হ্যালো জেন্টলম্যান, কুড়ো যাবে না আমার সঙ্গে? কুড়ো মাই ওয়ান এ্যান্ড ওনলি ফ্রেন্ড?

হ্যাঁ হাঁ, কুড়োও যাবে। ও আর এখানে থেকে কোন্ ঘোড়ার ঘাস

কাটবে! ও-ও যাক। নীচে চলে গেলেন সরকারমশাই।

আর আমাকে পায় কে? লাফিয়ে ছুটে চলে গেলুম নীচের বাগানে। কাশী। কাশী যাব আমরা। রেলগাড়ী চড়ে খোকাদার সঙ্গে। কোথায় বা বৌরাণী, আর কোথায়ই বা চাকলাদার-সাহেব।

বাতাবী লেবু গাছটার ঝরে-পড়া শুকনো পাতার ওপর আমার পায়ের আওয়াজ হচ্ছে খচ্‌মচ্‌ খচ্‌মচ্‌। খু-ব মজা লাগছে আমার।

খোকাদার নজর সারা ঘর ঘুরে এসে দ্রোপদীর ওপরে আটকে গেল।

মিয়াও! চমকে তাকিয়ে দেখি ছবিমন্থরের উনানের মধ্যে থেকে ছাই-কালি মেখে বেরিয়ে এল বৌরাণীর বেড়ালটা। এইটেই তাহলে আজকাল ওর আস্তানা হয়েছে। ওপারে কে আর ওকে পাত্তা দিচ্ছে এখন? ওর ছাইমাথা হাঁড়ী-খেকো চেহারাটা দেখে আমার কেবলই হাসি পাচ্ছিল। কষ্টে হাসি চেপে বললুম, আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে। আমি আর খোকাদা। কাশী যাব। সে কি এখেনে? অনেক অনে-ক দূর। তুই পড়ে থাকবি এই উনানের পাশ-গাদায় আর এঁটোকাঁটা কুড়োবি। ছোঃ।

ওপর থেকে রসিকের গলার আওয়াজ পাচ্ছি। আয় আয় কুড়ো, চা খেয়ে যা। আয় আয় কুড়ো।

বৌরাণীর বেড়ালটা করুণ সুরে আর একবার ডাকল। মিয়াও। আমি ফিরেও তাকাইনি। বয়েই গেছে আমার ওর কথা শুনতে।

(১৩)

পরশু দুপুরে আমাদের ট্রেন। মাঝে আর একটা দিন। আনন্দে উত্তেজনায় ঘুম আসছে না আমার। বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ঘরের মধ্যে দম আটকানো গরম। খোকাদাও আজকাল হয়েছে তেমনি ভুলো। পাখাটা খুলতেও মনে নেই ওর। বন্ধ ঘরের মধ্যে সেদ্ধ হচ্ছি গরমে। কাশীতেও কি এমনি গরম? সেখানে দিদিমা সব ঘরে ঢুকতে দেবে ত? এমনি সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। খট্‌ করে ঘরের আলোটা জ্বলে উঠতে ঘুমের চট্‌কা ভেঙে গেল আমার।

চোখ চেয়ে দেখি খোকাদা একটা ছোট টর্চ এক বাণ্ডিল দড়ি নিয়ে পকেটে পুরছে। চেয়ারের পিট থেকে একটা তোয়ালে তুলে নিয়ে আলো নিভিয়ে দিল আবার।

ওকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে আমিও পেছু নিলুম। কি ব্যাপার? এসব দড়াদড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? অস্পষ্ট গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলতেই চাপা শিষ দিয়ে থামিয়ে দিল ও। খু-ব নীচু-গলায় বলল, কুড়ো, একদম চুপ।

খোকাদা অন্ধকারে হাতড়ে নেমে এল দোতলায়। গোলবাড়ীর বারান্দা সম্পূর্ণ ঘুরে পেছনের দিকে চলে এলুম আমরা। এদিকটায় বৌরাণীর গোসল-খানা। গোসল-ঘরের বাইরের দিকের দরজাটা বন্ধই থাকে। কিন্তু আজ দেখলুম খোকাদা একটু ঠেলতেই ভেজানো দরজাটা খুলে গেল। খোকাদা ঢুকেই ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। টর্চ জ্বেলে বাথটব ধরে ধরে এগিয়ে চলল ও। দরজা পর্যন্ত পৌঁছেই আলো নিভিয়ে দিল আবার। আমি হোঁচট খেলুম একটা বালতির গায়ে।

গোসল-খানার পরেই আর একটা ছোট ঘর। সবাই বলে বক্স রুম। এ ঘর ভর্তি তোরঙ্গ, স্যুটকেশ আর আলমারী। বৌরাণীর শোবার ঘর থেকে তেরছাভাবে আলো এসে পড়েছে এ ঘরে। সেই আলোয় দেখলুম মেঝের ওপর কাত হয়ে পড়ে রয়েছে একটা ফুলদানী। খানিকটা জল আর একগুচ্ছ লাল গোলাপ গড়িয়ে পড়েছে মেঝেয়। ও'রা দুজনেই ফুল ভালবাসেন। বৌরাণী আর চাকলাদার। খোকাদা বক্সরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখছিল বৌরাণীর ঘরটা। দ্রৌপদী ঘরের এক কোণে স্পিরিট স্টোভ জ্বেলে কি যেন করছে। চট্‌ করে সরে এল খোকাদা। খু-ব সন্তর্পণে টিপে টিপে আবার বেরিয়ে এলুম আমরা। তেতলার ঘরে ফিরে এসে ইজিচেয়ারটায় গুম হয়ে বসে রইল খোকাদা। আমি হতভম্ব হয়ে ওর পায়ের কাছে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বসে আছি। নানা দুর্ভাবনায় ক্লান্ত হয়ে শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পোড়া গন্ধে ঘুম ভাঙ্গল ভোরবেলা। পূবের আকাশটা টকটকে লাল। কিন্তু ওরকম আগুন-রাঙা আকাশ তো প্রায় রোজই দেখি। তা থেকে পোড়া গন্ধ পাইনে তো কখনো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

দেখি ছাতের মাঝখানে বই-খাতা,

কাগজপত্র ডাঁই করে তাতে আগুন জেবলে দিয়েছে খোকাদা। একবার ঘরে ছুটে এসে আলমারী থেকে কি যেন বার করে নিয়ে গিয়ে সেই দাউ দাউ আগুনে ফেলে দিল। চেয়ে দেখি এক বাণ্ডিল চিঠি আর নীরাদির ছবি।

আমার আর কিছুই বলবার নেই। প্রথম প্রথম ওর এই সব ক্ষ্যাপাটে কাণ্ড-কারখানা দেখে চেঁচিয়ে কেঁদে বকে, একসা করেছি। এখন কিছুই বলিনে। শুধু চুপ করে দেখি আর শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ি।

বেলা আটটার সময় খোকাদা হন্তদন্ত হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। বোশেখ মাসের চড়া রোদ গায়ে জনালা ধরিয়ে দেয়। আর এই রোদেও কর্তাবাবুর পুরোনো শাল দিব্যি করে গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

(১৪)

খোকাদার কাশী যাবার কথায় বৌরাণী চিঁ-চিঁ করে কি যে বললেন সরকারমহাশয়কে বোঝা গেল না, চেহারার সঙ্গে গলার আওয়াজটা শুদ্ধ পালটে গেছে ও'র। আজকাল এক-আধটু উঠে বসেন বিছানায়, পরক্ষণেই শুয়ে পড়ে হাঁফাতে থাকেন। চুলোয় যাক বৌরাণীর কথা। দুপুর গাড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। এখনও খোকাদার পাত্তা নেই। কাল আমরা রওনা হব, জিনিসপত্র গোছানো সব পড়ে আছে। কখন কি হবে?

রাত নটা নাগাদ ফিরে এল খোকাদা। এসেই ধপ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। নিশ্চিন্ত হয়ে আমিও চোখ বুজলুম। যাক ফিরেছে তাহলে। কাল দুপুরেই মানে মানে বিদেয় হব এ বাড়ী থেকে। কাশী গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। খোকাদা আগের মত হবে, তোফা মজায় থাকবো দুজনে।

মাঝ রাত্রে আচমকা ঘুম ভেঙেগ গেল। অন্ধকারে ঠাহর করে দেখি খাটের বিছানায় খোকাদা নেই। পালাল নাকি? তড়াক করে লাফ দিয়ে বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। গন্ধ শুঁকে বুঝছি ও গোসলখানার দিকেই গিয়েছে। হাঁফাতে হাঁফাতে চলে এলুম ওদিকে। মাথা দিয়ে ঠেলতেই বুঝলুম দরজা বন্ধ। মানে ওদিক থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে দিয়েছে খোকাদা। আর আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না ও।

আমি আর দাঁড়ালুম না। বাগানের দিকে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি আছে। ঐ সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলে বৌরাণীর শোবার ঘরের একটা জানালা চোখে পড়ে। ওদিক থেকে যদি দেখতে পাই এই ভেবে তর-তর করে নীচে নেমে ছুটলুম বাগানে।

লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ছোট্ট চাতালটায় দাঁড়াতেই থ হয়ে গেলুম আমি। জানালা খোলা। পরিষ্কার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘরের ভেতরটা।

মেঝেয় তাকিয়েই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। গালচের ওপরে চিৎ হয়ে পড়ে দ্রৌপদী। তোয়ালে দিয়ে শক্ত করে মুখ বাঁধা। হাত-পাগুলোও পাকিয়ে পাকিয়ে রশি দিয়ে বেঁধেছে। দ্রৌপদীর চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন।

বৌরাণী কিন্তু কিছুই জানছে না এ সবের। অকাতরে ঘুমোচ্ছেন খাটে শুয়ে।

দ্রৌপদীকে বাঁধা শেষ করে এগিয়ে এল খোকাদা। হাতের টর্চটা দিয়ে বৌরাণীর গায়ে একটা ঠেলা দিল ও। চমকে জেগে গেলেন বৌরাণী। পরক্ষণেই ও খোকা। বলে পাশ ফিরে শুতে যাবেন আবার একটা টর্চের গুঁতো।

দেখবে না? দ্যাখো। বিশ্রী একটা হাসি ফুটে উঠল খোকাদার ঠোঁটে। কি কি দেখব? কি বলছিস তুই? ধড়ফড় করে উঠে বসতে চাইলেন বৌরাণী আর ওইটুকু পরিশ্রমেই হাঁফাতে হাঁফাতে শুয়ে পড়লেন আবার।

উঁহু। শুয়ে পড়লে চলবে না। ওঠো দ্যাখো। এক হেঁচকা টানে বৌরাণীকে তুলে বসিয়ে দিল খোকাদা। নিজের হাতটার দিকে চেয়ে নাক কোঁচকাল। যেন বৌরাণী নয়, বিশ্রী নোংরা একটা জিনিষ ছুঁয়েছে ও।

এতক্ষণে বৌরাণীর ঘুম পুরোপুরি ছুটে গেছে। মেঝের ওপর আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা দ্রৌপদীকে দেখতে পেয়েছেন উনি থর-থর করে সমস্ত শরীর কাঁপছে ও'র

সর্বনাশ খোকাদা দ্রৌপদীর গলা টিপে ধরেছে, এ কি কাণ্ড? দ্রৌপদী যে খুন হয়ে যাবে এখনই! আমি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চীৎকার করে ডাকতে লাগলুম রামভকত। রসিক!

অনেক রাতে বাগানের একটা ছুঁচো কি ইঁদুর দেখেও ওরকম চেঁচিয়েছি আমি। তাই ভেবেই বোধ হয় ওরা কেউ এল না। না রামভকত, না রসিক।

চেঁচানি বন্ধ করে তাকিয়ে দেখি বৌরাণী ঢলে পড়েছেন বিছানার ওপর। একেবারেই ঘুমিয়ে গেছেন উনি।

(১৫)

সে রাতের কথা, খোকাদার কথা কাউকেই কিন্তু বলেনি দ্রৌপদী। খোলা দরজা দিয়ে সকালবেলা যখন রসিক ঝাড়পোঁছ করতে এল শুধু আঙ্গুলে তুলে রসিককে দেখিয়ে দিয়েছিল বৌরাণীর দিকে।

সারা বাড়ীতে তোলপাড় ঢেউ উঠলো। ডাক্তার এল একটু পরেই। দুর্বল শরীরে হার্টফেল করে মারা গেছেন বৌরাণী।

ডাক্তার কাগজে সেই কথা লিখে দিয়ে চলে গেলেন। আর বৌরাণীকে নিয়ে শ্মশানে ওরা রওনা হয়ে যাবার পর দ্রৌপদীকে কেউ খুঁজে পায়নি এ বাড়ীতে। ওর সেই গোলাপ ফুলে আঁকা টিনের স্যুটকেশ নিয়ে ও যে কোন অচেনা অজানা রাজ্যে হারিয়ে গেল সে খবর আমরা কেউই জানতে পাইনি।

বৌরাণীকে যখন সবাই ধরাধরি করে খাটে তুলছে, সরকারমশাই খোকাদাকে ডাকতে এলেন। খোকাদা তখন তেতলার ঘরে বসে গোঁফ-দাড়ি কামাতে লেগেছে।

মারা গেছে? পাগল হয়েছেন? খোকাদা সরকারমশাইকে যেন ধমকাতে লাগল। ওসব স্রেফ ন্যাকামো। ছোঃ। একরাশ থুতু ছিটিয়ে দিল সরকার-মশাই-এর মুখে। বুড়ো সরকার কোঁচার খুঁটে চোখের জল আর থুতু পুঁছতে পুঁছতে নেমে গেলেন নীচে।

আমি বসে বসে খোকাদার মুখটা দেখতে লাগলুম। অনেকদিন পর ওকে বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছে আজ।

(১৬)

চাকলাদারসাহেব সরকারমশাইকে ডেকে বললেন, আমার তো একটা কর্তব্য আছে। সরকারমশাই মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, সে তো ঠিকই।

গাড়ীতে উঠে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিলেন চাকলাদার। একটু চেঁচিয়ে বললেন, আপনি সব রেডী করে রেখে দেবেন, আমি সকাল আটটার সময় আসব।

পরদিন ভোর থেকেই সে কী বৃষ্টি! জলে জলে সমস্ত পথ-ঘাট থৈ থৈ। দোকান-পাট সব বন্ধ। একটা কুকুর বেড়ালও বেরয়নি রাস্তায়। চাকলাদারের রুপোলী রং গাড়ীটা যেন জলে ভেসেই এসে দাঁড়াল গাড়ী-বারান্দায়।

খবর পেয়ে ভিজতে ভিজতে সরকার-মশাইও এলেন রান্নাবাড়ীর দিক থেকে। বর্ষাতি গায়ে খোকাদা উঠে বসল গাড়ীতে। স্যুটকেশ হোল্ডঅল টিফিন ক্যারিয়ার একে একে তুলে দিল রসিক। আমিও উঠব বলে আগাগোড়াই দু পা তুলে দিয়েছি, চাকলাদারসাহেব রসিককে বললেন, ওটাকে সরিয়ে নাও। এতক্ষণে চমকে তাকাল খোকাদা। বলল কোথায় যাবে না? কি রকম একটা হাসি খেলে গেল চাকলাদারের ঠোঁটে। ও নো, নো, নো।

খোকাদা দাঁত দিয়ে নীচেকার ঠোঁট কামড়ে ধরল। রসিক আমাকে সরিয়ে নিতেই চাকলাদার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন।

খোকাদা চলে যাচ্ছে। চাকলাদার ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আমি চেঁচিয়ে লাফিয়ে পড়লুম গাড়ীর জানালায়, পর-ক্ষণেই ছিটকে পড়লুম নীচে। তাকিয়ে দেখি খোকাদাকে নিয়ে গাড়ীটা তীরের মত বেরিয়ে যাচ্ছে গেট দিয়ে। আমি গাড়ীর পেছনে ছুটতে যাব অমনই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম।

ততক্ষণে সরকারমশাই হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছেন, গেছে গেছে একেবারে গেছে।

সামনের দুটো পাই চাকার তলায় পিষে গেছে। রসিক, রামভকত, মতি ঝি গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাকে।

মাথায়, যন্ত্রনায় আর খোকাদার জন্য কষ্টে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছি আমি।

ঝি-চাকরদের কথা থেকে বুঝলুম খোকাদাকে রাঁচী পাঠানো হল। রাঁচী কেন? আমরা যে কাশী যাব। কাশীতে দিদিমার কাছে—।

কিন্তু আমার কান্নাকাটির জবাব পাবার আগেই সরকারমশাই-এর টেলি-ফোন পেয়ে পশু হাসপাতালের গাড়ী এসে গেল। আমাকে সেই গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে গেল কয়েকজন লোক। আমি তাদের কাউকেই চিনিনে।

(১৭)

আমি কুডোরাম। সবাই ডাকত কুড়ো। কিন্তু ও নামে এখন আর আমাকে কেউই ডাকে না। আমার চারটে পাও নেই আর। সামনের পা দুটো হাসপাতালে কেটে রেখে দিয়েছে, আর ফেরত পাইনি। সেদিক থেকে আমি মানুষ হয়ে গেছি বলা যায়। দু পায়ে হাঁটলেই মানুষ হয় কিনা জানিনে তবে মানুষের মতই আমার খিদে তেষ্টা ভালবাসা কষ্ট সুখ-দুঃখের বোধ আছে। মানুষেরা কি মনে রাখে আর কোন কথা জানে যায় ... পারে। আমি কিন্তু আজকালো কিছুই ভুলিনি। সব যদি ভুলেও যাই খোকাদাকে কোনদিন ভুলব না।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গেলুম একদিন। খোঁড়া পা হেঁচড়ে টেনে কোন-মতে এক সকালবেলা গোলবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালুম। গেট বন্ধ। তালা দেওয়া। কেউ নেই কোথাও।

গেটের লোহার শিকগুলোর মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে ডাকলুম, সরকারমশাই, রসিক। শন্-শন্ করে গাছপালার মধ্যে দিয়ে হাওয়া বয়ে গেল। দোতলার একটা জানালার কপাট বন্ধ হয়ে খুলে গেল আবার। ওটা বৌরাণীর ঘর। আমার মনে হল চাকলাদারের অপেক্ষায় নয়, খোকাদার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বৌরাণী। আর তাই আমাকে দেখতে পেয়ে খুশী হয়ে ডাকছেন।

আমি কুঁই কুঁই করে লেজ নাড়লুম, জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিলুম কবার। ভেতরে যাবার পথ নেই, কি করব!

রোদ বাড়ল, হাওয়ায় শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে এল। যখন চন্‌চনে খিদে পেটে জ্বালা ধরিয়ে দিল আস্তে আস্তে হাঁটা দিলুম বাজারের দিকে।

পেছনের দুটো পায়ে ভর দিয়ে কোন-মতে হেঁচড়ে পথ চলি। গাছতলায়, মিঠাই-এর দোকানের উনানের ছাই-গাদায়, নরত কারুর বাড়ীর রকে ঘুমিয়ে থাকি।

একদিন কতগুলো ভিখিরী ছোঁড়া এসে আমার গলার বকলশটা খুলে নিয়ে গেল। ছোঁড়াগুলো আমাকে ভারী জ্বালায়। কখনও ঢিল ছুঁড়ে মারে, কখনো রাস্তার গঙ্গাজলের ফোয়ারায় পা চেপে আমার সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দেয়। এই শীতে, অবেলায় নেয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকি।

আমি এখন বুঝতে পারি যাকে ভালবাসার কেউ নেই তার কষ্ট ঠিক আমার মতই।

খোকাদা এখন কোথায় কার কাছে আছে কে জানে? রাঁচী কতদূর? যাবার সময় ও যদি বুদ্ধি করে রুটি কি বিস্কুটের টুকরো রাস্তায় ফেলে ফেলে যেত তাহলে আমি ঠিক পৌঁছে যেতুম ওর কাছে। কিন্তু কোন নিশানাই রেখে যায়নি ও।

কদিন থেকে একটা অশত্থগাছের তলায় থাকি। কাল রাতে ভীষণ ঝড়ে মড়মড় করে ভেঙে গেছে গাছটা। আজ আবার কোথায় থাকব কে জানে!

সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার আগে টমাস মানকে সর্বপ্রথম কর্মক্ষেত্রে 'সিমপ্লিজিসিমাস' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। ১৯০১ সালে প্রকাশিত 'বাডেনব্রুকস' উপন্যাসে একটি পতনশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'হিজ রয়েল হাইনেস'-এ অর্থ, মহত্ব, মান-মর্যাদা ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের সাহায্যে সুন্দর-ভাবে অঙ্কিত। মানের 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন' বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর নিন্দা ও প্রশংসার ঝড় বয়ে যায়। তবু ১৯২৯ সালে মান নোবেল পুরস্কার পান উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টির জন্য। মান সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ মোক্ষম কথা বলেছেন, '...তিনটি ছোট গল্প পড়লাম। অপূর্ব। অর্থাৎ ও-দেশেও অপূর্ব। ম্যান পড়তে আমার কষ্ট হয়, বিশেষত শেষ বয়েসের নভেলগুলি। অত্যন্ত ক্লান্তিকর। চিন্তার জটিলতা এত বেশি যে, গল্পের গতি সময় সময় থেমে যায়। আর সবচেয়ে খারাপ লাগে রোগ আর পাপবোধের ব্যাখ্যান। 'টিপিকাল' জার্মান সভ্যতার প্রতীক। জার্মানীতে থাকতে পারলেন না, আমেরিকা গেলেন, সেখানেও থাকতে পারলেন না, পালিয়ে এলেন সুইজারল্যাণ্ডে। এই ধরনের পলাতক প্রবাসী জীবন সত্যই ভয়াবহ। ভদ্রলোকের কোনো রচনায় রসিকতার চিহ্ন মাত্র নেই। তবু মহান ভিন্ন জগতেরই স্রষ্টা; অথচ এই জগতেরই আভ্যন্তরীণ সমস্যার প্রতীক।'

আনুমানিক ১৯০০ সাল সময়কার মানের চিত্র।

সম্প্রতি ড্রামসডাটে মানের জীবন ও রচনাবলীর ওপর এক আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেছে। এমন কতকগুলি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল যা একেবারেই নবাবিষ্কৃত। নানান ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়া জুরিখের একটি বিদ্যালয় থেকে অনেক কিছু পাওয়া গেছে। যা প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ নিবন্ধের এই বিচিত্র সমাবেশ থেকে টমাস মানের প্রতিভার বহুমুখীনতার সমাবেশ ও সমন্বয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়, যা উপস্থিত বিদগ্ধমণ্ডলীকে মান সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

টমাস মান অল্প বয়সে, জুলিয়া, কার্লা ও হাইরিখের (দুই বোন ও ভাই) সঙ্গে মান।

• • •

বিদেশে বিশ্রীভাবে বাঁধানো হলদে কাগজের ওপর ছোট ছোট হরফে ছাপা বই এখন ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বই-এর রূপ দ্রুত পাল্টাচ্ছে। সুন্দর ছাপা, বাঁধাই, রঙচঙে মলাটের বইগুলি দেখলেই কিনতে ইচ্ছা করে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও আধুনিক উপন্যাস ও কবিতার বইগুলি জাতির বৈদগ্ধ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের বহুমুখিনতার নিদর্শন।

জার্মান প্রকাশনালয় মরিংস ডিস্টের-ভেক 'আমাদের যুগ সম্বন্ধে জ্ঞান' নামে একটি নতুন রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই রচনাবলী ১৯টি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা। আধুনিক গদ্য ও পদ্যের ধারা ছাড়াও শিল্পবিজ্ঞানের উপর সেকাল ও একালের প্রভাব সম্বন্ধে লিখিত আঁদ্রে জিদের 'ইডিপাস ইন্টার-প্রিটেশান' কিংবা অ্যালবার্ট কামুর 'সিসিফাস প্যারাবল' এতে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত বই প্রকাশিত হয়েছে তাদের মূল্য অপরিসীম।

অন্যান্য প্রকাশকরা শিশু মনের উপযোগী অসংখ্য বই প্রকাশ করেছে। পুরোনোদিনের বড় বড় লেখকের গল্প ছাড়াও আধুনিক লেখকদের সঙ্গেও শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমন সব গল্পও লেখা হচ্ছে যা নিয়ে তারা স্কুলে সাহিত্য সম্বন্ধে বিতর্কে যোগ দিতে পারে। আমাদের দেশের সাহিত্যের বাজারে শুধু নয়—শিক্ষা-জগতে ঘটনাটি একান্তই বিস্ময়কর।

শিশু ও ছাত্ররাও যে সাহিত্যের সমঝদার এই কথাটা প্রকাশকরা আজকাল ভাল করে বুঝেছেন। অন্তত পকেট বুকের ক্ষেত্রে তো বটেই। পশ্চিম জার্মানীতে এখন কম করে ৪১টি প্রকাশনালয় এই ব্যবসায়ে ব্রত রয়েছে। রোভল্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠান ১৯৫০ সালে প্রথম পকেট বুক প্রকাশ করেন। বর্তমানে প্রকাশিত হয় ৫২টি সিরিজ। পশ্চিম জার্মানীর সর্ব বৃহৎ পকেট বুক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান রোভল্ট ও ফিশার ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ৭০ মিলিয়ন কপি পকেট বুক ছেপেছেন। এবং এটি সম্ভব হয়েছে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে এই যুগের তরুণদের বিপুল জ্ঞান পিপাসার জন্য।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। চার ।।

ব্রেকে গোলমাল ছিল। অথচ কর্তার গাড়ীর তাড়া। নটা থেকে সার্ভিস স্টেশনে বসে থেকে প্রায় বারোটায় গাড়ীর ডেলিভারী পাওয়া গেল। প্রভাত গাড়ীটা নিয়ে তখনি বেরিয়ে পড়ল ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে।

জ্বলন্ত কলকাতার পথে পীচ গলছে। 'মেঘবিহীন খর বৈশাখ'—কোথায় যেন এমনি একটা গান শুনেছিল। কিন্তু ভুল হল—সম্পূর্ণ মেঘবিহীন নয়। কাল রাতেও বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু আপাতত সে বৃষ্টির চিহ্নমাত্র কোথাও নেই একটা মুমূর্ষু মহিষের প্রসারিত শুকনো কালো জিভের মতো ছড়িয়ে আছে পথটা—একটু একটু কাঁপছে যেন। দক্ষিণ থেকে ঝোড়ো হাওয়ার ঝলক আসছে, কিন্তু তাতে সমুদ্রের ছোঁয়া নেই। কোথায় একটা আকাশ-ছোঁয়া অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে—বাতাসে তারি হল্কা আসছে থেকে থেকে।

ট্রাফিকের লাল আলো রোদে আগুনের গোলক হয়ে জ্বলছে। নন-দিবেদ্র স্ক্রীনটা তুলে নিল প্রভাত।

এই রোদে পূর্ব বাংলার বর্ষাকে মনে পড়ে। কালোর কালো মেঘে বিদ্যুৎ জ্বলছে। ঠাণ্ডা হাওয়া এল নারকেল-সুপারীর বন কাঁপিয়ে। তারপর মেঘনার কালো জলের ওপর বৃষ্টির সে কী মাতামাতি। পৃথিবী-আকাশ—সব জুড়িয়ে গেল, উঠতে লাগল জল, ভিজে মাটি, যুঁই আর কদমের গন্ধ।

কিন্তু না! বৃষ্টিকে ভয় করে প্রভাত। সেই রাত্রিটা বুকের ভেতর থেকে বিভীষিকা হয়ে দেখা দেয়। আরো মনে পড়ে, বৃষ্টি নামলেই গৌরাঙ্গবাবুর ফাটা ছাতের ভেতর দিয়ে বসুধারা নেমে আসে।

বৃষ্টি নেই—বৃষ্টি আসবে না কলকাতায়। ফুটপাথ জুড়ে উদ্বাস্তু-[illegible]দের স্টল। খরিদ্দার নেই, টিনের ছাউনির তলায় কতকগুলো কাতর ঘর্মাক্ত মানুষ, রং-বেরঙের সস্তার পোষাক আর ছিট কাপড়গুলো ঝোড়ো হাওয়ায় পতাকার মতো দুলছে। টিনের কৌটো আর কলাইকরা ভাঙা থালা হাতে, তিন-চারটি কালো কালো কঙ্কালসার শিশু নিয়ে অর্ধ-উলঙ্গ রুক্ষকেশ মায়ের দল দরজায় দরজায় ফিরছে ভাতের ভিক্ষেয়। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার একটি মানুষ, বাস-স্টপের সামনে দাঁড়ানো কয়েকটি বিরক্ত মানুষের কাছে কি যেন বলছে হাতজোড় করে—মাথা নেড়ে নেড়ে সরে যাচ্ছে সবাই। ওদিকে এই প্রখর রোদের ভেতরেও কে যেন উবুড় হয়ে পড়ে আছে ফুটপাথে, দুটো কালো কালো লম্বা পা পথের অনেকখানি পর্যন্ত নেমে এসেছে। একটি শীর্ণদেহ অল্প বয়েসী মেয়ে ছেঁড়া জুতো টানতে টানতে এগিয়ে চলেছে—নিশ্চয় চাকরির খোঁজে বেরিয়েছে, নিশ্চয় ট্রামে ওঠবার পয়সা নেই। আর দীপ্তির মতো মেয়েদের সবে হয়তো নেশার ঘোর কেটেছে, হয়তো গ্লানিতে, লজ্জায় কেঁদে উঠেছে একবার, হয়তো একবারের জন্যে ভেবেছে, এভাবে বেঁচে থাকার চাইতে আত্মহত্যা করাও অনেক ভালো।

বৃষ্টি নেই কলকাতায়। অন্তরে-বাইরে সে জ্বলছে। যে বৃষ্টিতে পোড়া মাটি জুড়িয়ে যায়, নতুন অঙ্কুর মাথা তোলে, ঘন সবুজ কচি পাতা খুশিতে দোল খেয়ে ওঠে—সে বৃষ্টি এখানে কখনো নামবে না। শুধু নরকের যন্ত্রণাকে সম্পূর্ণ করে একটা পচা ডোবার পাঁক এই অগ্নিবৃষ্টিতে টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

একটা লরী এসে মাঝরাস্তায় বিকল হয়ে পড়েছিল, সেটাকে ঠেলে সরিয়ে পথটাকে পরিষ্কার করতে প্রায় সাত-আট মিনিট সময় লাগল। আবার গাড়ী নিয়ে এগিয়ে চলল প্রভাত। সেই মেয়েটি জ্বলন্ত রোদের ভেতর দিয়ে তেমনি করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে, ট্রাম-বাসের ভাড়া যার জোটে না, ছাতা তার থাকবার কথাও নয়। একবারের জন্যে মনে হল, এই মেয়েটিকে একটা লিফ্‌ট দিয়ে তার যাবার জায়গায় পৌঁছে দিলে কেমন হয়?

কিন্তু প্রভাত জানে, মেয়েটি তাকে বিশ্বাস করবে না। একটা বিশ্রী সন্দেহে ভরে উঠবে তার মন, হয়তো চিৎকার করে লোক ডাকবে, বলবে, এই লোকটা আমাকে কিড্‌ন্যাপ করতে চাইছিল। এই কলকাতায় কেউ কাউকে

বিশ্বাস করতে পারে না, নিজেকেই কি বিশ্বাস করতে পারে কেউ?

সামনে গাড়ীর একটা দীর্ঘ সারি পড়েছে. প্রভাত আস্তে আস্তে চলছিল। হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে ডাকল : প্রভাতদা!

প্রভাত দেখল, অমিয়। পরনে পা-জামা, বুকখোলা বুশশার্ট হাওয়ায় উড়ছে।

—একটু লিফ্‌ট দাও প্রভাতদা—ফুটপাথ থেকে নেমে পড়ল অমিয়।

গাড়ীটা একটু সরিয়ে এনে দাঁড় করালো প্রভাত। বললে, চটপট। দাঁড়ানোর উপায় নেই এখানে।

বলবার দরকার ছিল না। অমিয় তার আগেই প্রভাতের পাশে এসে বসে পড়েছে। রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বললে, যা রোদ্দুর!

প্রভাত একবার বিতৃষ্ণ চোখে চেয়ে দেখল অমিয়র দিকে। সবে সিগারেট টেনে এসেছে, মুখে এখনো পোড়া তামাকের গন্ধ। চুলের কায়দাটা লক্ষ্য করবার মতো। যে রুমালটা দিয়ে মুখ মুছল, এসেন্সের একটা মৃদু গন্ধ বেরুচ্ছিল তা থেকে।

প্রভাত আবার পথের দিকে মনো-নিবেশ করল।

—গাড়ীটা হিলম্যান—না প্রভাতদা?

—হুঁ।

—বেশ গাড়ীটা কিন্তু।

—হুঁ।

অমিয় সুগন্ধি রুমালটা নিয়ে নিজের আঙুলে জড়াতে লাগল।

—জানো প্রভাতদা, আমিও গাড়ী চালাতে পারি অল্প অল্প।

—তাই নাকি? কোথায় শিখলে?

—চন্দন সিংয়ের কাছ থেকে।

—কে চন্দন সিং?

—আমার এক পাঞ্জাবী ফ্রেন্ড। ভবানীপুরে থাকে। অনেকগুলো ট্যাক্সির মালিক।

প্রভাত ভুরু কোঁচকালো। অনেক উন্নতি হয়েছে অমিয়র। নারকেলডাঙার সেই জীর্ণ বাড়ী আর ভাঙা সংসারের সঙ্গে কোথাও তার কোনো মিল নেই। বুশশার্টের বুক পকেটে আমেরিকান সিগারেটের একটা মোটা প্যাকেটের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে, রুমালটি সুরভিত, অনেকগুলো ট্যাক্সির মালিক চন্দন সিং তার ফ্রেন্ড। অর্থাৎ অনেক ঊর্ধ্বলোকে বাস করছে অমিয়। দু-একটা ছোটখাটো ক্লাবে ফুটবল খেলেই কি এমন অসাধারণ উন্নতি হয়েছে তার?

—লেখাপড়া কি ছেড়েই দিলে অমিয়?

—কী হবে ও-সব করে? —পকেটের সিগারেটের প্যাকেটটায় এক-বার হাত ছুঁইয়েই অমিয় সামলে নিলে : কত বি-এ এম-এ পাশ এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে লাইন দিচ্ছে, দেখে এসো একবার।

—কী করবে তা হলে?

—বিজ্‌নেস। বিজ্‌নেস্‌ই হল সব।

—তা বেশ। —প্রভাতের মুখে বাঁকা হাসি ফুটল একটুখানি : কিসের বিজ্‌নেস্‌?

—ঠাট্টা নয় প্রভাতদা। দেখো।

—ঠাট্টা করছি না, কৌতূহল হচ্ছে। কিসের ব্যাবসা?

—চন্দন সিং বলছিল ওর ট্যাক্সির বিজ্‌নেসে আমাকে নিয়ে নেবে। —অমিয় উৎসাহিত হল : চমৎকার লোক প্রভাতদা। ওর সঙ্গে আলাপ হলে তোমার খুব ভালো লাগবে।

যাক, অমিয়র জন্যে তবে ভাবনা নেই—প্রভাতের মনে হল। বড়ো গাছে নৌকো বেঁধেছে। গৌরাঙ্গবাবুর সংসারের দুজন অন্তত সত্যিকারের

কলকাতাকে চিনে নিয়েছে, খ্‌ঁজে পেয়েছে উন্নতির পথ। একজন দীপ্তি, আর একজন অমিয়। কিন্তু—

অমিয় গুন গুন করে সুর ভাঁজছিল। অ্যাম্‌প্লিফায়ারের কল্যাণে গানটা প্রভাতের চেনা। 'ছলিয়া মেরা নাম'। ছলিয়া কথার মানে কী? অমিয়কে জিজ্ঞাসা করলে হয়।

কিন্তু নামটার অর্থ জিজ্ঞাসা করল না প্রভাত। জানতে চাইল : এই দুপুর রোদে কোথায় বেরিয়েছিল অমিয়?

—টালীগঞ্জ। একটা ক্লাবের হয়ে বসিরহাটে খেলতে যেতে হবে, তারাই ডেকে পাঠিয়েছিল।

—তা বেশ। কিন্তু মোহনবাগান কিংবা ইস্টবেঙ্গলে চান্স পাচ্ছ কবে?

অমিয় জবাব দিল না। তার বদলে বলে উঠল : একটু—একটু রাখো প্রভাতদা। এইখানেই আমি নামব।

গাড়ীটা ভালো করে দাঁড়ানোরও তর সইল না। তার আগেই টক করে নেমে পড়ল অমিয়। একটা লরী প্রায় পায়ের ওপর এসে পড়েছিল। সেটাকে বাঁচিয়ে দু লাফে উঠে গেল ফুটপাথে। একবার ঘাড় ফিরিয়ে প্রভাত দেখতে পেলো, রাস্তার ধারের পান-বিড়ির দোকানের দড়ি থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিচ্ছে অমিয়।

গৌরাঙ্গবাবুর সংসারে দুজন সুখে আছে। একজন অমিয়, আর একজন দীপ্তি।

কর্তার নাম কাঞ্জিলাল-সাহেব। আধা-বিলাতী আধা-মাড়োয়ারী কোম্পানির একজন বড় কর্তা। বয়েস ষাটের দিকে, কিন্তু এখনো চল্লিশ-প'য়তাল্লিশের মতো শক্ত-সমর্থ চেহারা। পোশাকে এবং চাল-চলনে অসম্ভব স্মার্ট। তিন-চারতলা পর্যন্ত লিফট ব্যবহার করেন না, দুটো সিঁড়ি লাফিয়ে ওঠেন এখনো। মধ্যে মধ্যে টেনিস খেলেন। গর্ব করে বলেন, আমার ব্লাড-প্রেশার নেই, সুগার নেই, রিউম্যাটিজম্‌ নেই, অম্বল নেই। অ্যাভেরেজ বাবু-মার্কা বাঙালী ইয়ংম্যানের চাইতে থ্রি-টাইম্‌স্‌ বেশি আমি খাটতে পারি।

অতিশয়োক্তি হয়তো একটু আছে, কিন্তু সত্যি সত্যিই কাজের লোক কাঞ্জিলাল-সাহেব। কোনো কোনো দিন ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পর্যন্ত গাড়ী নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন। সন্ধ্যেয় ফেরবার পথে পার্ক স্ট্রীটের একটা বারের সামনে ঘণ্টাখানেক দাঁড়াতে হয়, তারপর থেকেই হেল্‌ অ্যান্ড্‌ হার্টি—একেবারে রাত এগারোটা পর্যন্ত।

এ সবে প্রভাতের আপত্তি নেই। কিন্তু বার থেকে বেরিয়ে কোনো কোনো-দিন যখন এক-আধটু মুড আসে, তখন গাড়ীটাকে আস্তে আস্তে চালাবার অনুমতি দেয় কাঞ্জিলাল-সাহেব। এসে বসেন প্রভাতের পাশে।

—আমরা কোয়েকাররা কী চাই? পীস অ্যান্ড প্রোগ্রেস। সত্য আর শান্তির জন্যে প্রাণ দিতে পারি। তাই অল্‌ ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড—আমরা এক-সূত্রে গাঁথা—এ হ্যাপি ফ্যামিলি। একবার ল্যান্ডানে এক বাঙালী ডাক্তার বন্ধু আমায় নিমন্ত্রণ করলে, বললে ইন্ডিয়ান ডিস খাওয়াব। চার বছর ধরে একটানা সেদ্ধ খাচ্ছি—ন্যাচারালি ভারী লোভ হল। গেলুম ব্র্যাডফোর্ডে তার বাসায়। গলদা চিংড়ির কারী খাওয়ালে—যেমন

এই দুপুরে রোদে কোথায় বেরিয়েছিলে অমিয়?

স্পাইসেস, তেমনি পেপার—সেই টিপিক্যাল আন্‌-হাইজেনিক বেঙ্গলী কুকিং! বাড়ী ফিরে পেটে যন্ত্রণা—এক্সকুশিয়েটিং! ডক্টর নিকলসকে কল দিলুম! আলাপ হতে হতে যেই শুনল, আই অ্যাম এ কোয়েকার—অমনি দু হাতে জড়িয়ে ধরলে আমায়। বললে, য়্যু আর মাই ব্রাদার। ব্যাস—নিয়ে গেল পার্সোন্যাল নার্সিং হোমে। কী অ্যাটেন্ডান্স! ল্যান্ডান ছেড়ে আসবার সময় হি অ্যাকচুয়্যালি ওয়েপট!

রূপকথার গল্পের মতো শুনতে থাকে প্রভাত সরকার, একবার আড় চোখে দেখে নেয় তখন দেশের কথা, বিশ্বমানবতার কথা ভেবে তাঁর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে যায়। প্রভাতের সঙ্গেই তিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আলাপ শুরু করে দেন। 'বস' হয়েও যে তাঁর কোনো ভ্যানিটি নেই, তিনি যে সত্যি সত্যিই মেন্টালি ডি-ক্লাসড্‌—এইটেই প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করেন।

—ডু য়্যু নো—আমি একজন কোয়েকার?

কোয়েকার কথার অর্থ প্রভাত সরকার জানে না। শুনতে থাকে কান পেতে।

চোখে তাকিয়ে দেখে কর্তার দিকে। ফিকে নীল লেনসের নীচে কাঞ্জিলাল-সাহেবের চোখেও ভাবের অশ্রু দেখা দিয়েছে বলে সন্দেহ হয় তার।

—ট্রাই টু লাভ ম্যান—মানুষকে ভালোবাসতে শেখো। কেন পলিটিক্স—কেন লেবার আনরেস্ট—কেন এ সব ঝান্ডা প্রোসেশন? স্ট্রাগল—বিটারনেস—আনরেস্ট। কোথাও শান্তি আছে পৃথিবীতে? ক্যাপিটালিস্ট দেশে, কম্যুনিস্ট কান্ট্রিতে? পীসফুল কো-এক্জিস্টেন্স? অল রাইট—খুব ভালো কথা। কিন্তু নিউক্লিয়ার ব্যানিং নিয়ে একটার পর একটা সামিট টক শেষ পর্যন্ত ফিয়াস্কো—ডেমোক্রেসের সোর্ডের মতো থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার পৃথিবীর মাথার ওপর ঝুলছে। কী করছ তোমরা সবাই মিলে—সায়েন্টিস্‌ট্‌স— পোলিটিশ্যানস—থিংকারস? আই ডিম্যান্ড অ্যান আনসার!

'আনসার'টা সারা পৃথিবীর কাছেই দাবী করেন, কিন্তু নীলচে চশমার মধ্য দিয়ে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে থাকেন প্রভাতের দিকেই। বলা বাহুল্য, প্রভাত জবাব দিতে পারে না; নিজেকেই অপরাধী ঠিক করে নিয়ে নীরবে গাড়ী চালাতে থাকে।

—আসল কথা কী জানো? লোভ—যাকে বলে গ্রীড। ক্যাপিটালিস্ট ভাবে লেবারকে কত ঠকাতে পারি, লেবার ভাবে—কত কম সার্ভিস দিয়ে কত আদায় করে নিতে পারি। ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি চায় কলোনিয়াল মার্কেটে বেপরোয়া লুটতরাজ, কম্যুনিস্ট জায়েন্টরা চায় সোস্যালিস্ট ইম্পিরিয়্যালিজম—লুক অ্যাট চায়না!

চীনের দিকে কাঞ্জিলাল-সাহেব প্রভাতকে তাকাতে বলেন। প্রভাত সেটাকে চোখের সামনে দেখতে পায় না—গাড়ী থামিয়ে ট্রাফিকের সংকেত লক্ষ্য করে।

চোখটা বোধ হয় ভিজেই গেছে, চশমা খুলে কাঞ্জিলাল-সাহেব চোখ মোছেন। একবার খাঁকারি দিয়ে গলাটাকে পরিষ্কার করে নেন একটুখানি। তারপর সোজাসুজি প্রশ্ন করেন প্রভাতকে।

—এ সম্পর্কে কী আইডীয়া তোমার?

প্রভাত বিব্রত হয়। নীল আলোর নিশানায় গাড়ীটাকে এগিয়ে দিয়ে বলে, আজ্ঞে কিছু ভেবে দেখিনি।

—ভাবো—ভাবো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমাকে একটা কংক্রীট উদাহরণ দিই।—কাঞ্জিলাল-সাহেব চুরুট ধরান : কলকাতায় ভিড় কি রকম দেখেছ? রাস্তা দিয়ে চলা পর্যন্ত যায় না—বাতাস আনব্রেদেবল। ফ্যাক্ট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পার্টিশনের ফলে অনেক লোক এসে পড়েছে, তাই—

—দেয়ার—দেয়ার—

কাঞ্জিলাল-সাহেব প্রভাতকে থামিয়ে দেন : সেই কথাই বলছি। পার্টিশনের ফলে অনেক লোক এসে পড়েছে কলকাতায়। কিন্তু কলকাতায় কেন? ধুলো-ধোঁয়া-ভিড়। একটু খোলা জায়গা নেই—একটুকু আকাশ নেই—নট এ প্যাচ অফ গ্রীন। এর মধ্যে পিগারির শুয়োরদের মতো গুঁতোগুঁতি করে মরা কেন? অথচ কলকাতার আশে-পাশে খোলা জায়গা রয়েছে—সুবার্বে না হোক—আর একটু দূরে গিয়ে সেটল করো। ফ্রেশ এয়ার, ফ্রেশ ভেজিটেব্‌ল। তা নয়—কলকাতায় এসেই ভিড় করা চাই। কেন? সেই গ্রীড! কলকাতায় কুকুরের মতো মাটি কামড়ে থাকলেও পয়সা আসবে—এই স্বপ্ন!

—থাকে অনেকেই তো কলোনীতে—

—ইয়েস—ইয়েস, আই নো। কিন্তু কলোনী করলেই তো হয় না। দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলাতে হবে আগাগোড়া। চাষবাস করো, বন্ধ্যা মাটিতে ফসল ফলাও—সোনার বাংলা তৈরী করো। যাই হোক—উদ্বাস্তুদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, অনেক প্রবলেম আছে তাদের। কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট ইয়োর মিডল ক্লাস? কলকাতার গলির একতলাতে দুটো ড্যাম্প ঘর ভাড়া নিয়ে পনেরোজন লোক এক সঙ্গে থাকা—ডার্ট অ্যান্ড ডিজীজ। অথচ একটু দূরে গিয়ে—ন্যাচারাল সারাউন্ডিংয়ে বাস করলে—

এর মধ্যে গাড়ীটা বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছোয়, বাধ্য হয়ে সারগর্ভ আলোচনাটা বন্ধ করতে হয় কাঞ্জিলাল-সাহেবকে। কিন্তু প্রভাত বুঝতে পেরেছে, আপাতদৃষ্টিতে কড়া, এফিশিয়েন্ট, চাকরীগত প্রাণ কাঞ্জিলাল-সাহেব আসলে দেশপ্রেমিক এবং বিশ্বপ্রেমিক। মানুষের হিতের জন্যে সময় পেলেই তিনি চিন্তা করেন। 'কিন্তু যদ্ নো'—এক সময় নিজেই দুঃখ করে বলেছেন, 'লীডার্স যদি ঘুমিয়ে থাকেন—য়্যাম এ স্মল ম্যান—আমি কী করতে পারি।' প্রভাত মধ্যে মধ্যে ভাবে, চাকরী-বাকরী ছেড়ে দিয়ে কেন ইলেকশনে দাঁড়ান না কাঞ্জিলাল-সাহেব?

আজও তিনি কম্যুনিটি প্রোজেক্ট-এর ব্যর্থতা সম্পর্কে কী সব মৌলিক আলোচনা করছিলেন, কিন্তু একটা কথাও কানে যাচ্ছিল না প্রভাতের। চিন্তাটা ঘুরছিল দীপ্তি আর অমিয়কে ঘিরে ঘিরে। দীপ্তি ওভার-টাইম খেটে সংসারে অল্প-বিস্তর স্বাচ্ছন্দ্য আনে—অমিয় চন্দন সিংয়ের ট্যাক্সির ব্যবসায় ঢুকে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু আলো আর আলেয়া পাশাপাশি জ্বলছে এই কলকাতায়। একবার ভুল করলে কী নিদারুণভাবে তার দাম চুকিয়ে দিতে হয়—প্রাইভেট ড্রাইভার প্রভাত সরকার তা যে একেবারেই জানে না, তা নয়।

কাঞ্জিলাল-সাহেব ভেতরে উঠে যাবার পর, স্টিয়ারিঙে মাথা রেখে প্রভাত চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। বাড়ীর সামনে খানিকটা অংশ সাদা পাথরের কাঁকর ছড়ানো, তারপর দুধার দিয়ে বাগান। কতগুলো ফুলের ঝাড়, ক্রোটন, পাম আর ঝাউ গাছ। দুটো গাছে ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুটে রয়েছে কিছু কিছু—দক্ষিণের হাওয়ায় তার গন্ধ আসছে। ভোর রাতের সেই বৃষ্টিটার পর আজকের বাতাস যেন একটু ঠান্ডা—অন্তত গুরুসদয় রোডের এই বাড়ীতে বৈশাখী সন্ধ্যা বসন্তের ছোঁয়া মেখেছে।

প্রভাতের ঝিমুনি আসছিল। এমনি ঝাউয়ের শব্দ, এমনি ছায়া—এই রকম ঘুমে জড়ানো ঠান্ডা হাওয়ায় ম্যাগ্‌নোলিয়ার গন্ধ। কত শান্তি, কত বিশ্রাম, কী স্নিগ্ধতা! কিন্তু নারকেলডাঙার গলিতে এ ছায়া কোথাও নেই—এ বিশ্রাম সেখানে কোনোদিন পাওয়া যাবে না। এখানে বসে বিশ্বপ্রেমের কথা ভাবতে ভালো লাগে, বসন্তের বাতাসে গা এলিয়ে দিয়ে দেশের জন্যে চোখের জল ফেলা যায়, কিন্তু—

খোয়ার ওপর দিয়ে জুতোর আওয়াজ। প্রভাত চোখ মেলল। কাঞ্জিলালের মেয়ে রিনি—যার ভালো নাম অরুণা। মনে পড়ল, কোথায় কোন বান্ধবীর জন্মদিনে যাওয়ার কথা আছে ওর।

প্রভাত বেরিয়ে এসে গাড়ীর দরজা খুলে ধরল। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিরক্তিভরে গাড়ীতে ঢুকল রিনি। ভুরু কুঁচকে বললে, ইস, সাড়ে সাতটা বেজে গেল।

—আজ্ঞে পার্ক স্ট্রীটে ঘন্টাখানেক দেরী হল বলেই—

বিরক্তিতে সুন্দর মুখখানা বিকৃত

করল রিনি : বাপির ওই এক রোগ! মালহোত্রার 'বারের' সামনে এলে আর মাথা ঠিক থাকে না। অথচ, আমি বলে দিয়েছি, পার্জিটিভলি সাতটার মধ্যে গাড়ীটা আমার চাই। হোপলেস!

প্রভাত জবাব দিল না। এ-সব পারিবারিক আলোচনায় তার কোনো ভূমিকা নেই।

গাড়ীটাকে ব্যাক করিয়ে রাস্তায় এনে নামালো সে। জিজ্ঞেস করল, কোথায় যেতে হবে?

—নিউ আলিপুর।

এতক্ষণে প্রভাত অনুমান করল কোথায় যেতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল একটা। আজকে বাড়ী ফিরতে রাত এগারোটার আগে নয়।

(ক্রমশঃ)

অয়স্কান্ত

॥ প্লাস্টিকের যুগ ॥
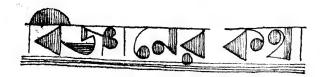
এক প্রাচীনা ভদ্রমহিলাকে প্লাস্টিকের একটি গয়না উপহার দেওয়া হয়েছিল। সোনার গহনায় অভ্যস্তা ভদ্রমহিলাটি প্লাস্টিকের গয়নাটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন, 'এই প্লাস্টিক জিনিসটা তৈরি না হলেই ভালো হত। প্লাস্টিকের জিনিস আমার ছুঁতেও ঘেন্না করে।'

ভদ্রমহিলা অবশ্য বলেই খালাস। সোনার গয়নার বদলে প্লাস্টিকের গয়না উপহার পেলে যে-কোনো ভদ্রমহিলাই হয়তো এমনি ধরণের মন্তব্য করবেন। কিন্তু এই ভদ্রমহিলাদের মনোবাসনা পূর্ণ করে আচমকা যদি সমস্ত প্লাস্টিক উধাও হয়ে যেত তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াত দেখা যাক।

প্রথমেই সবচেয়ে ভয়াবহ যে ব্যাপারটি ঘটত তা হচ্ছে এই যে নাইলন-পরিহিতা তাঁর দুই আধুনিক কন্যাকে তিনি সর্বসমক্ষে বিবস্ত্রা হতে দেখতেন। এমন কি পায়ের শৌখিন চটিজোড়া পর্যন্ত অদৃশ্য হত। প্লাস্টিকের কাঁটার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে খোঁপার বাহার মিলিয়ে যেত নিমেষের মধ্যে। অন্য দিকে তিনি শুনতে পেতেন অনেকগুলো কাঁচের গ্লাস ঝন ঝন শব্দে ভেঙে পড়ছে। তাঁরই নির্দেশে বাড়ির পরিচারিকা প্লাস্টিকের ট্রে-তে বসিয়ে কাঁচের গ্লাসে সরবৎ নিয়ে আসছিল। প্লাস্টিকের ট্রে অদৃশ্য হবার ফলে যা হবার তাই হয়েছে। তারপরে রেডিওর দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠতেন তিনি। রেডিওর অমন সুন্দর প্লাস্টিকের ক্যাবিনেটটি আর নেই—তিনি শুধু দেখতে পাচ্ছেন চেসিসে আঁটা কয়েকটি ভাল্‌ভ। টেলিফোনেরও একই দশা। ঘরের জানলা থেকে নাইলনের পর্দা উবে গিয়েছে। ইলেকট্রিক সুইচের জায়গায় খাড়া হয়ে রয়েছে কয়েকটি ধাতুর পাত। আর গোটা বাড়িটা অন্ধকার, কারণ ইলেকট্রিক তারের প্লাস্টিক ইনসুলেশন আর নেই, তারে তারে ছোঁয়া লেগে শর্ট-সার্কিট হয়েছে। ইলেকট্রিক বাল্‌ব ও ফ্লুয়োরেসেন্ট টিউবের চিহ্নমাত্র নেই; প্লাস্টিকের হোল্ডার অদৃশ্য হতেই সেগুলোর গতি হয়েছে কাঁচের গ্লাসের মতোই। ওদিকে বাড়ির বাচ্চারা তারস্বরে কান্না জুড়ে দিয়েছে কারণ তাদের খেলনাগুলোকে (প্রায় সবই প্লাস্টিকে তৈরি) তারা আর খুঁজে পাচ্ছে না। আর খুব সম্ভবত ইলেকট্রিক ওয়্যারিং-এ শর্ট-সার্কিট হবার ফলে সারা বাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছে। প্রাচীনা ভদ্রমহিলাটি নিজেও জানতেন না যে, তাঁর অনুমতি না নিয়েই তাঁর সাজানো-গোছানো সংসারে এমনভাবে প্লাস্টিকের অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছিল।

একটু ভেবে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব যে, আমাদের আধুনিক জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, আমরা অনেক সময় সে বিষয়ে সচেতন হবার অবসরটুকু পর্যন্ত পাই না। আমরা ধরেই নিই যে, এমনটিই হওয়া উচিত।

প্লাস্টিক অবশ্য নিতান্তই হালের আবিষ্কার। কিন্তু প্লাস্টিকের আগের যুগেও সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি অবহিত ছিলাম না, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও।

রবার—একটি অপরিহার্য উপকরণ

যেমন ধরা যাক, আজকের দিনে আমাদের কাছে অতি মামুলী একটি জিনিস—রবার। আমি যদি বলি, রবার না থাকলে এমন কি এই প্লাস্টিকের যুগের পৃথিবীও অচল হয়ে যাবে তাহলে কথাটা মিথ্যে হবে না। কিন্তু আমরা যখন সাইকেলে চাপি বা মোটরে-ট্রেনে-জাহাজে-এরোপ্লেনে দূরদেশে যাত্রা করি বা কোমরের যন্ত্রণায় হট-ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে বিছানায় শুই তখন একবারও ভাবি না যে এ ধরনের প্রত্যেকটি কাজে রবার আমাদের কতখানি সাহায্য করছে। পেনসিলের দাগ ওঠানো থেকে শুরু করে সুইচ টিপে ইলেকট্রিক বাতি জ্বালানো পর্যন্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক কর্মকাণ্ডেরই অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে রবার। আধুনিক যুগ রবারের চাকার ভর দিয়ে চলছে—এমন কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

রবারের আবিষ্কার ও একটি আশ্চর্য জীবন

রবারের আবিষ্কার আসলে ঠিক আবিষ্কার নয় (যে-অর্থে প্লাস্টিকের আবিষ্কার একটি আবিষ্কার)—একটি সন্ধান-লাভ। ইউরোপের মানুষ প্রথম রবারের সন্ধান পায় ১৭৩৬ সালে। শার্ল মারি দ্য লা কোঁদামিন নামে একজন ফরাসী ভৌগোলিক হাজির হয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে। তিনিই প্রথম জানতে পারলেন যে, ব্রেজিলের আদিবাসীরা একধরনের গাছের নাম দিয়েছে 'কাঁদুনে গাছ'। এই গাছের কাণ্ডে কুড়ুলের ঘা মারলে সাদা দুধের মতো রস বেরিয়ে আসে। এই রস অল্প তাপে জমিয়ে নিতে পারলেই তৈরি হয় এঁটেল মাটির মতো নরম একটা পদার্থ। এই পদার্থ দিয়ে বাটি তৈরি হতে পারে, বা নানা ধরনের পাত্র, বা এমন কি পায়ের জুতো।

ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কানে এই খবর পৌঁছবার পরে অনেকেই এই বিশেষ পদার্থটি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই যে ফললাভ হল তা নয়। শুধু জানা গেল, কাগজের ওপর থেকে কালো লেড-পেনসিলের দাগ মুছে ফেলতে হলে এই পদার্থটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। সেই থেকে পদার্থটির নামও হল 'রাবার'। ইংরেজি 'রাব' শব্দের অর্থ ঘষা আর ঘর্ষণকারী অর্থে 'রাবার'। এই ইংরেজি শব্দটিকেই বাঙালী ধাঁচে আমরা অকারান্ত করে নিয়েছি।

যাই হোক, এই প্রথম সোরগোল কেটে যাবার অনেক বছর পরে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রবারের জগতে একজন উদ্যোগী পুরুষের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেল। তিনি হচ্ছেন চার্লস ম্যাকিনটোশ—গ্লাসগোর একজন তরুণ রসায়নবিদ। তাঁর ছিল রঙ-তৈরির কারখানা। এই রঙ তৈরি করার সময়ে আনুষঙ্গিক একটি তেলও পাওয়া যেত, যাকে বলা হত 'ন্যাপথা'। ম্যাকিনটোশ

করলেন কি এই ন্যাপ্থার সঙ্গে কাঁচা রবার মিশিয়ে তাকে শুষিয়ে শুষিয়ে ঘন করে তুললেন। তারপরে তাঁর কি খেয়াল হল, দু টুকরো কাপড়ে এই ঘন পদার্থটি লেপ্টে মাখিয়ে মুখে মুখে জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এভাবে নিতান্তই ঘটনাচক্রে তৈরি হয়ে গেল এমন একখণ্ড বস্ত্র যা জলপ্রবেশরোধক বা ওয়াটার-প্রুফ। ১৮২৩ সালে তিনি এই প্রক্রিয়াটির পেটেন্ট নিলেন এবং ম্যাকিন-টোশ কোট তৈরি করার কারবার খুলে বসলেন। ইংরেজি ভাষায় নতুন একটি শব্দ চালু হয়ে গেল। ম্যাকিনটোশ বা জলপ্রবেশরোধক উপরের জামা।

ইতিমধ্যে আমেরিকাতেও রবারের প্রচলন শুরু হয়েছে। প্রথমে একটি এবং তার দেখাদেখি আরো কয়েকটি কারখানার পত্তন হল রবারের জিনিসপত্র তৈরি করার জন্যে। গোড়ার দিকে অবস্থা দেখে মনে হতে লাগল, রবারের কারবার ভালোই মুনোফা তৈরি করবে।

কিন্তু বিপর্যয় দেখা দিল কয়েক বছরের মধ্যেই। আচমকা একটি উষ্ণ-প্রবাহ আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলল আর দেখা গেল যে রবারের তৈরি জিনিসগুলো কাদার মতো চটচটে হয়ে গিয়েছে। আবার আবহাওয়া যদি খুব বেশি ঠান্ডা হয় তাহলে রবারের তৈরি জিনিসগুলো খুব বেশি শক্ত হয়ে যায় আর অনায়াসেই তাতে ফাটল ধরে। রবার-শিল্প একটা ভরাডুবির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

রবার-শিল্পের এই প্রাথমিক বিপর্যয়ের পটভূমিতে একজন আশ্চর্য মানুষের জীবন-কাহিনীও কান্নার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে।

মানুষটির নাম চার্লস গুডইয়ার। একটি সুপরিচিত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের দৌলতে এই নামটি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু এই মানুষটি কোনো সময়েই ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তাঁর জীবন কেটেছিল চরম দারিদ্র্য এবং অবহেলা ও উপেক্ষার মধ্যে। কিন্তু অন্যদিকে অপরাজেয় অধ্যবসায়ে ও তন্নিষ্ঠ সাধনায় তিনি একটি অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত।

১৮০০ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবার ছিল হরেক রকম টুকিটাকি জিনিস তৈরির ছোট একটি কারখানা। ১৮১৬ থেকে ১৮২৬ পর্যন্ত তিনি বাবার এই কারখানাতেই কাজ করে-ছিলেন। তাঁর জীবনের এই পর্বে উল্লেখ করার মতো ঘটনা কিছু নেই। তারপরে তিনি বাবার কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেই একটি লোহালক্কড়ের দোকান খুলে বসলেন। শুরু হল স্বাধীন জীবিকার্জনের প্রচেষ্টা এবং প্রায় একই সঙ্গে ব্যর্থতার পরে ব্যর্থতা।

স্বাধীন ব্যবসা চার বছরও টিকিয়ে রাখা গেল না। ধারে-দেনায় এমনভাবে ডুবলেন যে, বৌ ও পাঁচটি ছেলেমেয়েকে ভাগ্যের হাতে সঁপে কয়েক সপ্তাহের জন্যে কারাবাসে যেতে হল। পরের চার বছরেও এই একই ইতিহাস। নানা শহরে

চার্লস গুডইয়ার

নানাভাবে ব্যবসা করার চেষ্টা ও শেষ পর্যন্ত কারাবাস। এমনি এক কারাবাসের পরে বোস্টনের রাস্তায় ঘুরে বেড়া-চ্ছিলেন, হঠাৎ নজরে পড়ল একটি দোকানের জানলায় রবারের প্রলেপ দেওয়া ক্যানভাসের জ্যাকেট সাজানো রয়েছে। জিনিসটিকে দেখে তাঁর মনে হল, চেষ্টা করলে তিনি আরো ভালো জিনিস তৈরি করতে পারেন। হলও তাই। সেই কোম্পানীর কাছেই তিনি আরো ভালো জিনিসের নমুনা হাজির করলেন। তারপরে নিজের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি এই রবারের জিনিস নিয়েই মেতে উঠলেন।

কিন্তু এই সাফল্য খুবই ক্ষণস্থায়ী। ১৮৩৪ সালের যে উষ্ণপ্রবাহের কথা বলেছি, সেই উষ্ণপ্রবাহ এবারে তাঁর জীবনে দুর্ভাগ্যের রূপ নিয়ে দেখা দিল। ফলে আরো একবার (এবার নিয়ে ছ' বার) কারাবাস।

কিন্তু এবারকার কারাবাসের সময়ে তিনি অদ্ভুত একটি কাণ্ড করে বসলেন। কারা-কক্ষে একটি গবেষণাগার স্থাপনের অনুমতি চেয়ে বসলেন কারা-কর্তৃপক্ষের কাছে। আবেদন মঞ্জুর হল এবং তিনি তাঁর গবেষণাগারটি সাজিয়ে বসলেন। আর গবেষণাগারটিও দেখবার মতো। একটা মার্বেলের পাটাতন, একটা রোলিং-পিন, খানিকটা রবার ও কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ—এই ছিল তাঁর গবেষণাগারের মোট উপকরণ। এবং এই অপরূপ গবেষণাগারেই একটি গুরুত্ব-পূর্ণ আবিষ্কার হল। সেটি এই যে রবারের সঙ্গে ম্যাগ্নেসিয়াম মেশালে রবারের উপরিভাগের চটচটে ভাবটা দূর করা যায়। তারপরে জেল থেকে ছাড়া

পাবার পরেই তিনি নিজস্ব 'কারখানা' খুলে বসলেন। অবশ্য কারখানাটি বসল বাড়ির রান্নাঘরেই আর বৌ-ছেলে-মেয়েরাই হল কারখানার কর্মী। মহা উৎসাহে এই কারখানায় ম্যাগনেসিয়াম মেশানো রবারের জুতো তৈরি হতে লাগল। কিন্তু এবারেও তিনি দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। এবার-কার দুর্ভাগ্য এল প্রতিবেশীদের প্রতি-বাদের রূপ নিয়ে। রবার জ্বাল দেবার গন্ধে প্রতিবেশীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে-ছিলেন।

কিন্তু এই মানুষটি এত সহজে দমবার পাত্র নন। বৌ-ছেলেমেয়েদের একটি বোর্ডিং-হাউসে রেখে তিনি গিয়ে হাজির হলেন নিউইয়র্কে। আর সেখানে লোকালয় থেকে অনেক দূরে আবার খুলে বসলেন তাঁর কারখানা। এখানেই তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি দেখলেন, রবারের সঙ্গে যদি নাইট্রিক অ্যাসিড মেশানো যায় তাহলে অনেকখানি উত্তাপেও রবার চটচটে হয় না। তখন এই নতুন প্রক্রিয়ায় তৈরি হতে লাগল রবারের জুতো ও আরো নানা জিনিস। নিজের সাফল্য সম্পর্কে তিনি এতই নিশ্চিত হলেন যে, বৌ-ছেলেমেয়েদের চিঠি লিখলেন চলে আসবার জন্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হাজির হল আর্থিক মন্দার রূপ নিয়ে। আরেক-বার তিনি একেবারে নিঃসম্বল হলেন।

পরের জীবন বোস্টনে। এখানেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। সাময়িক সাফল্য, তারপরেই বিপর্যয়। এই সময়ে তিনি নতুন আরেকটি পদ্ধতির সন্ধান পেলেন। রবারের সঙ্গে গন্ধক বা সালফার মিশিয়ে রোদে শুকিয়ে নিলে রবারের উত্তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা খুবই বেড়ে যায়। গুড-ইয়ার জানতেন না যে, রবারের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে তিনি যে সুফল পেয়েছিলেন তাও একই কারণে। বাজারের নাইট্রিক অ্যাসিডে কিছু পরিমাণে সালফার থাকেই। আর এই সালফার থাকার জন্যেই তাঁর আগের-বারের সাফল্য।

ইতিমধ্যে পারিবারিক অশান্তি চরমে উঠেছে। স্ত্রী ক্যারিসা স্বামীর এই সমস্ত পাগলামি আর কিছুতেই সহ্য করতে রাজি নন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনবরত এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি। এমনি পরিস্থিতিতে একদিন গুডইয়ার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে রবারের সঙ্গে সালফার মিশিয়ে পরখ করে দেখছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ স্ত্রীর ফিরে আসার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। গুডইয়ার করলেন কি, আর কোনো জায়গা না পেয়ে রবার ও সালফারের পিন্ডটিকে গুঁজে দিলেন উনুনের মধ্যে। স্ত্রী হয়তো ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন কিন্তু মুখে কিছু বলেননি। তারপরে স্ত্রী আবার বেরিয়ে যেতেই গুডইয়ার উনুনের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অস্তিত্বকে নাড়া দিয়ে প্রচন্ড একটি উল্লাসের ধ্বনি বেরিয়ে এল। উনুনের জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে রয়েছে ঝলসে যাওয়া এক টুকরো রবার—শক্ত, নীরেট। যে উষ্ণপ্রবাহ রবারের এত বড়ো শত্রু সেই শত্রুই কিনা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল আরো বেশি উত্তাপের কাছে। অবশ্যই শুধু উত্তাপ নয়, সালফার বা গন্ধকের উপস্থিতি টুকুও চাই।

এতদিনে পথের শেষ চোখের সামনে ভেসে উঠল যেন। শুরু হল উন্মত্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অন্য কোনো দিকে আর তাঁর হুঁশ রইল না। সবাই মনে করতে লাগল যে তিনি পুরোপুরি পাগল হয়েছেন।

এদিকে পরিবারের অবস্থা প্রায় রাস্তার ভিখিরির মতো। বিক্রি করার মতো আসবাবও আর কিছু নেই।

কিন্তু গুডইয়ার তাঁর লক্ষ্যে অবিচল। নিজের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে তিনি আবারও এলেন বোস্টনে ভাগ্যপরীক্ষা করতে। কিন্তু হোটেলের বিল শোধ করতে না পারার জন্যে আবার তাঁকে জেলে যেতে হল। ছাড়া পেয়ে তিনি পায়ে হেঁটে বাড়িতে ফিরে এলেন। দুর্ভাগ্য এল তাঁর পেছনে পেছনে। বাড়িতে পৌঁছে তিনি দেখলেন তাঁর ছোট ছেলেটি মারা গেছে।

তারপরেও এই আশ্চর্য মানুষটি ভেঙে পড়েনি। লন্ডনে ও ফ্রান্সে গিয়ে-ছিলেন পেটেন্ট সংগ্রহ করতে। ফ্রান্সে প্রদর্শনী করতে গিয়ে প্রদর্শনীর জায়গার ভাড়া দিতে না পারার জন্যে আরো একবার তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভেঙে পড়েননি।

১৮৬০ সালের ৩০শে জুন তারিখে তিনি ছিলেন নিউইয়র্কে। খবর এল তাঁর মেয়েটি মারা গেছে। এই খবরটি পাবার পরে তিনি আর মাত্র একদিন বেঁচে-ছিলেন। অবজ্ঞা ও উপেক্ষার মধ্যে তাঁর অখ্যাত মৃত্যু।

তাঁর মৃত্যুর আঠাশ বছর পরে একটি টায়ার ও রবার কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—যার নামের সঙ্গে তাঁরই নাম যুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীঘা সমুদ্র-সৈকতের উন্নয়ন ও বসতি লইয়া বহু জল্পনা-কল্পনা কিছুকাল ধরিয়া করিতেছেন। যাতায়াতের অসুবিধাই হইল প্রধান অন্তরায়, অন্ততঃ সাধারণ লোক তাহাই বুঝিতেছে। ট্রেনে খড়্গপুর পর্যন্ত গিয়া তারপর বাস ধরিতে হয়। সুতরাং যাঁহারা শিশুদের লইয়া যাইবার কথা চিন্তা করেন তাঁহাদের হৃৎকম্প হওয়া শুধু আশ্চর্য নয়, স্বাভাবিক। মালপত্র লইয়া বাসে যাওয়া এবং অনেকে বসিয়া যাওয়া এদেশে বর্তমানে চিন্তাও করা যায় না। আমিও মানা করিব। কিন্তু মোটরে যাওয়ার কোনও বাধা নাই এবং রাস্তা মোটামুটি ভালই। অবস্থা-সম্পন্ন ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ মোটরে সমুদ্রস্নান ও আনন্দ করিতে সমুদ্র-সৈকতে গিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের পিছন পিছন ধীরে ধীরে সাধারণ ব্যক্তিরাও যাইতে শুরু করেন। এইরূপ করিয়াই সমুদ্রসৈকতে শহর গড়িয়া উঠে। সুতরাং মোটরে যাইতে বাধা কি?

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া দুর্গাপুরের ব্যারাজ পার হইয়া বাঁকুড়া যাওয়া অতি সহজ। দূরত্ব ১৯১ মাইল এবং চারি ঘণ্টার বেশী লাগে না। দুর্গাপুরের পর হইতে রাস্তা দীঘা পর্যন্ত বেশ ফাঁকা থাকে এবং জোরে চালাইতে অসুবিধা কিছু নাই। ট্রাকের উৎপাৎ নাই বিশেষ। বাঁকুড়া হইতে খড়্গপুর ৫ মাইল, মেদিনীপুরকে দক্ষিণে রাখিয়া বাহিরের রাস্তা ধরিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। খড়্গপুর হইতে বেলদা ২০ মাইল এবং চমৎকার রাস্তা। সেখান হইতে কাঁথি পার হইয়া দীঘা ৫৫ মাইল এবং রাস্তা ভালই। এ রাস্তা আগে খারাপ হইয়া গিয়াছিল। বর্তমানে সম্পূর্ণ মেরামত হইয়া গিয়াছে। মোট হইল ২৮১ মাইল।

এই ২৮১ মাইল যাইতে বিশেষ দেরী হয় না। কারণ দুর্গাপুরের পর হইতে, আগেই বলিয়াছি, রাস্তায় বিশেষ ভিড় নাই। সকাল ৭টায় ছাড়িলে, পথে গাছতলায় খাওয়া-দাওয়া করিয়া, পরমানন্দে সন্ধ্যা ৫।৬টায় দীঘা পৌঁছানো চলে, কলিকাতা হইতে। পথে পশ্চিমবঙ্গের ছোট ছোট প্রাচীন শহরগুলি পড়ে যেমন, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, গড়বেতা, শালবনী, দাঁতন, জলেশ্বর, কাঁথি ইত্যাদি। অনেকের ইহাও ভাল লাগিবে। রাস্তার বহু জায়গা ও দৃশ্য অতিশয় মনোরম।

দীঘায় বাড়ীঘর বিশেষ নাই। কয়েকজন মাত্র লোকের নিজস্ব বাড়ী আছে তাহা তাঁহারা নিজেরাই ভোগ করেন। সুতরাং বাড়ী ভাড়া করিয়া দীঘায় থাকার কোনও প্রশ্নই উঠে না। সরকারের সড়ক বিভাগ এক উঁচু আধুনিক বাংলো করিয়াছেন এবং যাহা খরচ করিয়াছেন তাহাতে অন্ততঃ [illegible] ছয়খানা বাড়ী ঐ খরচে করা যাইত। যাঁহারা সরকারের পদস্থ কর্মচারী নহেন এবং যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েটের মাতব্বরদিগকে ধরাধরি করার কৌশল জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে ঐ বাংলোয় থাকিবার চেষ্টা করা বা বাসনা রাখা বাতুলতা মাত্র। সর্বদাই কোনও পদস্থ অফিসার বা মাতব্বর ব্যক্তি মধ্যে [illegible] করিবার জন্য একেবারেই সমগ্র বাংলো লইয়া এখানে থাকেন। আর একটি সেচ বিভাগের বাংলো আছে। উহার চমক নাই কিন্তু তাহাও দুষ্প্রাপ্য।

সাধারণ লোকদের থাকিবার জন্য মেসের মত একটি হোটেল আছে তাহার নাম "ক্যাফেটেরিয়া"। এইখানে তক্তাপোশ ও দুই-একখানা ভাঙা চেয়ার দেওয়া হয়। মেসের ভাত, ডাল ইত্যাদি অতিসাধারণ ভোজ্য বিক্রয় করা হয়। রান্না অতিশয় কদর্য ও নোংরা, লাললঙ্কা ভিন্ন কোনও আর আস্বাদ থাকে না। ১৫০্ হইতে ২০০্ টাকার মাসিক রোজগার যাঁহাদের তাঁহারা এখানে থাকিতে পারেন। আর একটি নামমাত্র হোটেল আছে এক টিনের চালায়। উহাও সমশ্রেণীর। "ক্যাফেটেরিয়ার" মেইন বাড়ীর দোতলায় পশ্চিমবঙ্গ কোঅপারেটিভের দুইখানি ঘর আছে, তাহা ভাড়া পাওয়া যায়। প্রতি ঘরের ভাড়া দৈনিক বারো টাকা। অতিশয় জরাজীর্ণ অবস্থা। কিছু নড়বড়ে ভাঙ্গা-চোরা আসবাব আছে। একমাত্র আধুনিকত্ব আছে সংলগ্ন বাথরুমে। খাদ্য নীচের ক্যাফেটেরিয়া পাঠাইয়া দেয়। উপরোক্ত এই জায়গাগুলির কোথাও যাঁহারা মোটর লইয়া যাইবেন তাঁহারা একদিনের বেশী থাকিতে পারিবেন না। আমি প্রত্যেককে মানা করিব যেন তাঁহারা সে চেষ্টা না করেন এবং যদি একান্তই যান সঙ্গে শিশুদের যেন কখনও না লইয়া যান। এ অখাদ্য তাহাদের একবেলাও সহ্য হইবে না।

ইহা ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গ সরকার "সেটেলমেন্ট" নাম দিয়া এককামরা-বিশিষ্ট চারখানি ও দুকামরাবিশিষ্ট পাঁচখানি দেশলাইয়ের বাক্সর মত একতলা বাড়ী করিয়াছেন। একদম নূতন, আসবাবপত্র আছে, রান্না করিবার বাসনপত্র আছে খাইবার পাত্রও সব আছে। পাঁচ ছয় টাকা দৈনিক ভাড়া হিসাবে

পুরীর সমুদ্র

এগুলি সুন্দর স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু কয়টাই বা লোক সেখানে থাকিতে পারিবে? গরমের সময় সর্বদাই ভর্তি থাকে এইসব বাড়ী এবং এক একজন বহুদিন থাকেন। এখানে রান্নাবাড়া নিজেদের করিতে হয়। ইহা ভিন্ন দীঘায় থাকিবার কোনও জায়গা নাই। খানচারেক দৃষ্টিকটু একতলা দোকান ঘরের মত ঘর করা হইয়াছে তাহাতে নাকি অসুস্থ শ্রমিকও কেরানীরা থাকিবে না। যে স্থানে করা হইয়াছে, তাহা দীঘার শ্রেষ্ঠাংশের লাইনে। ইহা সমীচীন হয় নাই।

দীঘার কথা বলিতে গেলে খুবেই স্বাভাবিক পুরীর কথা মনে পড়িবে। সাধারণ ব্যক্তিরা যাঁহারা দীঘা যান নাই তাঁহারা প্রশ্ন করিবেন কোনটি ভাল? তুলনামূলক প্রশ্ন পুরীর সহিত দীঘার হইতে পারে না। পুরী বিশাল শহর—দীঘা একটি গন্ডগ্রাম। হাতে গুণিতে পারা যায় দীঘার কয়খানি বাড়ী আছে। হঠাৎ অসুখ বিসুখ হইলে দীঘায় ভগবান ভরসা ভিন্ন কিছুই করিবার নাই। দীঘায় একখানি রিক্সা পর্যন্ত নাই। সমুদ্রের তুলনা করিলে বলিব পুরীর সমুদ্র দুর্দান্ত ও উচ্ছল, দীঘার সমুদ্রও চক্রবালে মিলিয়া যায় কিন্তু শান্ত ও দুর্বল। পুরীতে জলে নামিলেই ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করিতে হয়। দীঘায় আধ মাইল ভিতরে হাঁটিয়া গেলে বুক পর্যন্ত জল পাওয়া যায়। ঢেউ অতিশয় সামান্য এবং টান বিশেষ কিছু নাই। সামুদ্রিক জীব দীঘাতে পাড়ের কাছে পুরী হইতে অনেক বেশী বিশেষ করিয়া সংকর মৎস্য। ইহাতে একটু নজর রাখিয়া স্নান করা কর্তব্য। দীঘার জল কিঞ্চিৎ ক্লেদাক্ত, পুরীর মত নীল নয়।

কিন্তু দীঘায় একটি জিনিস আছে তাহা ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। ইহা দীঘার সমুদ্রসৈকত বা তট, অর্থাৎ "বীচ"। এই অপরূপ বীচ ভোগ করিবার লোক নাই, ইহা পরম দুঃখের কথা। সমুদ্রসৈকতের জল গড়াইয়া আসিয়া মোটরের চাকায় লাগিতে থাকে আর গাড়ী ৬০ মাইল ঘণ্টায় মহানন্দে চালানো যায়। এমনকি দশ হাত জলের ভিতর গিয়াও গাড়ী কিনারা ধরিয়া চালানো যায়। চাকা কখনও বসিয়া যায় না। এইরূপ কঠিন বালুকাময় অথচ মসৃণ "বীচ" আমি য়ুরোপ ও আমেরিকায়ও কখনও দেখি নাই। শুনিয়াছি দক্ষিণ আমেরিকায় আছে। ইহার কারণ দীঘার বালুকাতে মাটির মিশ্রণ আছে যথেষ্ট। এই সমুদ্রতটে ফুটবল হকি ইত্যাদি মহোল্লাসে খেলা যায়। পরম আনন্দে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া বেড়ানো যায়। পুরীর মত দুঃসাধ্য বালুকার ভিতর হাঁটা নয় এবং খালিপায়ে হাঁটিতে হয় না। যাঁহারা পায়েহাঁটার ভক্ত দীঘাতে প্রাতঃ ও সান্ধ্য-ভ্রমণ তাঁহাদের অতি আনন্দদায়ক হইবে।

একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। দীঘার সৈকত অশ্বারোহণ আনন্দের জন্যই যেন ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন। "রাইডিং" সভ্য সমাজের এক বিশিষ্ট ক্রীড়া ও ব্যায়াম এবং কলিকাতায় ইহা প্রায় অসম্ভব। মুষ্টিমেয় কয়েকজন রেসকোর্স ও ময়দানে বন্দোবস্ত করিয়া এ আনন্দ প্রাতঃকালে উপভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাহা যৎসামান্য আনন্দ। দীঘায় এ আনন্দের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ পড়িয়া আছে। মাইলের পর মাইল ভেলভেটের ন্যায় মসৃণ ও নরম বালুরেতটে মনের আনন্দে "রাইডিং" করা চলে। শিক্ষার্থীরা পড়িয়া গেলে হাত পা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তট ঘোড়ার পা বসিয়া যাইবার মত নরম নয় অথচ হাত পা ভাঙ্গিবার মত কঠিনও নয়। এ এক আশ্চর্য সমুদ্রসৈকত। আমি আশা করি অদূরে ভবিষ্যতে দীঘায় "রাইডিং ক্লাব" অথবা "স্কুল" কোনও চিন্তাশীল উদ্যোগী ব্যক্তি বা সরকার খুলিতে দ্বিধা করিবেন না। বড় হোটেল যদি কেহ করেন, তিনি যেন "রাইডিং"কে বাদ না দেন।

কলিকাতার "টার্ফ ক্লাব", যাঁহারা রেস পরিচালনা করেন তাঁহাদের, গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্য ঘোড়ার আস্তাবল রাঁচীর পাহাড়ে আছে। এ স্থান গরমে এমন কিছু ঠান্ডাও নহে এবং ঘোড়ার ব্যায়ামের জন্য জায়গাও বিশেষ নাই। ফলে দামী এবং ভাল ঘোড়ারা যায়

ব্যাঙ্গালোরে গ্রীষ্ম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য। তাহার খরচ নিতান্ত সামান্য নহে এবং দূরত্ব যথেষ্ট। এই গ্রীষ্মাবকাশের আস্তাবল যদি দীঘায় করা যায়, তাহা হইলে বহু কারণে ইহা জনপ্রিয় হইবে। ঘোর গরমেও দীঘা ৯০° ডিগ্রি ফাঃ হাঃ'র বেশী হয় না এবং আস্তাবল যদি ঝাউয়ের শান্তশীতল ছায়ায় করা যায়, যেখানে রৌদ্র পর্যন্ত ঢোকে না, আস্তাবলের উষ্ণতা ৭৫।৮০ ফাঃ হাঃ'র বেশী কখনও হইবে না। কারণ, রৌদ্র নাই অথচ শীতল সমুদ্রের হাওয়া সর্বক্ষণ থাকিবে। ঘোড়ার ব্যায়ামের জন্য ট্রাকের দরকার নাই, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ট্রাক অযত্নে পড়িয়া আছে। যে সব রেসো ঘোড়া পায়ের ব্যায়রামে অকেজো হইয়া যায় ও তাহাদের গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হয়, তাহারা দীঘার শান্ত সমুদ্রের জলে ছোটাছুটি করিয়া নবযৌবন লাভ করিবে। আমি অনেক ঘোড়ার ট্রেণারের মুখে দুঃখের সহিত শুনিয়াছি যে "যদি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের নোনা জলে এক সপ্তাহ ছোটাইতে পারিতাম, তাহা হইলে উহাকে আজ গুলী করিয়া মারিতে হইত না।" আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও রয়েল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের কর্তৃপক্ষদের এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ঘোড়া দু ঘণ্টায় খড়গপুরে পৌঁছাইবে ট্রেণে সেখান হইতে "হর্সমোটর ভ্যানে" তিন ঘণ্টার ভিতর দীঘায় পৌঁছাইয়া যাইবে। চারিখানি "হর্সমোটর ভ্যান" সময়কালে খড়গপুরে মোতায়েন রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

দীঘার সমুদ্র

দীঘাকে যদি সত্যই শহর বানাইতে হয় সম্পন্ন ও অর্থশালী ব্যক্তিদের আগে আনাইতে হইবে। তাঁহারাই হইবেন শহর গড়িবার পথপ্রদর্শক। দীঘার নিকটবর্তী বড় সহর খড়গপুর ও মেদিনীপুর। সেখান হইতে মালমশলা, ঠিকাদার, মিস্ত্রি ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া ও আনাইয়া দীঘায় বাড়ী করিবার সময়, উৎসাহ ও বন্দোবস্ত খুব কম লোকেরই থাকিবে। অথচ যদি দশ পনেরো কুড়ি হাজারের ভিতর তৈয়ারী বাড়ী পাওয়া যায়, আমার বিশ্বাস, কয়েক হাজার বাড়ী এখনই বিক্রয় হইয়া যাইবে। "কল্যাণীর" মত পরিকল্পনা করিয়া জমি বিক্রয় ও বাড়ী বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত সরকারের অবিলম্বে করা উচিত। ইহা করিলে পাঁচ বৎসরের ভিতর দীঘা স্বাস্থ্যান্বেষীদের ও সমুদ্রস্নানার্থীদের কাশীবাস হইয়া উঠিবে। বাড়ী করা দূরে থাকুক, কি করিয়া জমি কেনা যায়, তাহাও দীঘাতে কেহ বুঝিতে পারেন না।

সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে, একেবারে সমুদ্রসৈকতে যেখানে একটি বিশাল হোটেল করা উচিত ছিল, সেখানে সরকার করিয়াছেন এক বাজার। ইহা যে কি দুঃখের বিষয় তাহা আর বলা যায় না। তবে এখনও সময় আছে। এ বাজারের উপর দুতলা, তিনতলা তুলিয়া অন্ততঃ দুইশত মধ্যবিত্ত লোকদের থাকিবার জন্য হোটেল করা যায়। ভাল হোটেল থাকিলে দীঘায় যাত্রীর অভাব কখনও হইবে না। দীঘাকে প্ল্যান করিয়া আধুনিক মনোরম সমুদ্রোপকূল স্বাস্থ্যাবাস করা দরকার এবং ইহা করিতে গেলে সমাজের বিদগ্ধ ও প্রথম শ্রেণীর লোকরাই অগ্রে আসিবেন। দার্জিলিং চিন্তা করিয়া দীঘার প্ল্যান করিতে হইবে এবং ঐরূপ সমুদ্রকূলে আর একটি শহর হইলে পশ্চিমবঙ্গের বহু দিনের এক বড় অভাব ঘুচিবে।

আধুনিক বাংলো

মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮
SADHANA AUSADHALAYA
Maha Bhringaraj
Taila

রাশিয়ার ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল
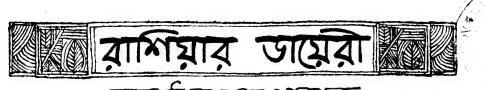
(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

।। তেইশ ।।

ট্রান্সককেশিয়ার উপর দিয়ে আমাদের বিমানটি ধীরে ধীরে যাচ্ছিল পূর্ব-দক্ষিণে। কসাক নগরী 'রসটভ-অন-ডন' পেরিয়ে গেলুম। দক্ষিণ-পশ্চিমে পড়ে রইল 'আজব' সমুদ্র। ককেসাস পর্বতমালা দূরের থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। রসটভের ধারে দিয়ে যাচ্ছি 'অনপা' উপত্যকার দিকে। 'কিউবান' নদী ও তার উপত্যকা চোখে পড়ছে। পাশেই মস্ত শহর 'ক্রাসনোদর'। এই শহর থেকে রেলপথ চলে গিয়েছে পাহাড়তলীর জটিল পথ ধরে। ভিতরে ভিতরে অগণিত চা-বাগান, বিশাল অরণ্যানী, এবং শত শত বর্গমাইলব্যাপী আঙ্গুরের ক্ষেত। এই ককেসাসের আশেপাশে ফেডারেটেড রাশিয়ার অধীনে কয়েকটি অটোনমাস বা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল আছে। যেমন রসটভ, ক্রাসনোদর, স্টাভরোপল, গ্রজনি, দাঘেস্তান প্রভৃতি। এই বৃহৎ পার্বত্যভূভাগে সংখ্যাতীত আরণ্যক নদী, উপনদী ও শাখানদী পূর্বে অথবা পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে গেছে।

আমাদের বিমান এবার ধীরে ধীরে ভেসে চলল কৃষ্ণসাগরের পূর্বসীমানা ঘেঁষে। দূর তীরভূমিতে এক একটি শহর গ'ড়ে উঠেছে। কোনটি স্বাস্থ্য-শহর, কোনটি বা খনিজসামগ্রীপ্রধান শহর। যেমন 'অনপা, নভরসিস্ক, গেলেন্-দিজিক, তুয়াপ্সে, শোচি, আদলার' প্রভৃতি। আমরা দেখতে দেখতে পৌঁছলুম ফেডারেটেড রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমপ্রান্তে। আমদের বিমান নেমে এল 'শোচি' নামক একটি পার্বত্য শহরের বিমানঘাটিতে। প্লেন থেকে নেমে এসে দেখলুম, চারিদিকে পর্বতের দেওয়াল, মাঝখানে একটি নাতিবৃহৎ প্রান্তর।

জনৈক খর্বকায় ব্যক্তি আমাদের দিকে এগিয়ে এল। হাতে তার এক মস্ত ফুলের তোড়া। বলা বাহুল্য, এটি লৌকিক সৌজন্য—ইংরেজিতে যাকে বলে, মেকানিকাল্। কিন্তু বেঁটে লোকটির একগাল হাসিতে আমি আকৃষ্ট হলুম। উনি এসেছেন স্থানীয় 'লেখক সংঘের' প্রতিনিধিস্বরূপ. ও'র সঙ্গে রয়েছে একখানা কালো রংয়ের মস্ত মোটরগাড়ি। ভদ্রলোকটি নিরীহ এবং অকিঞ্চন, কিছু লাজুক এবং অনেকটাই স্বল্পভাষী। নাম মিঃ আইভান জাইৎ-জেভ। উনি একজন লেখক। পরে উনি ও'র একখানি সচিত্র চটি বই আমাকে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক শিল্পীও বটে। গাছের ডাল ভেঙে তার খোসা ছাড়িয়ে উনি ছুরির সাহায্যে অতি সুন্দর ডালের পুতুল 'কুঁদে' বার করেন। পরবর্তীকালে এই ব্যক্তি আমার অতিশয় প্রিয় হয়ে ওঠেন!

পাহাড়ের ধার দিয়ে একটি ঘন বনময় পথ ছায়াবীথির ভিতর দিয়ে চলে গেছে শহরের দিকে। কম-বেশি কুড়ি মাইল অরণ্যপথ। কিন্তু এই পথ সুন্দর হয়েছে কয়েকটি কারণে। ককেসাসের পার্বত্য অঞ্চলে পৃথিবীর প্রাচীনতম বৃক্ষ ও বনস্পতি দেখতে পাওয়া যায় কেন, তার ভূতাত্ত্বিক কারণ আমার জানা নেই! যে-পথটি দিয়ে আমি চলেছি, তার পাশে পাশে চলে গেছে রেলপথ, এবং রেলপথের পাড়ের ঠিক নিচে কৃষ্ণ-সাগরের ঢেউ এসে আঘাত করছে! বনের ধারে সমুদ্র আমাদের দেশের বহু স্থলেই আছে। কিন্তু যে-অঞ্চলটির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, সেখানকার পশ্চিমে সমুদ্র এবং পূর্বদিকে 'এলব্রুজ' পর্বতচূড়া তুষারাবৃত,—এটি আমাদের দেশে কোথাও নেই। পূর্ববঙ্গের পার্বত্য চট্টগ্রামে, মাদ্রাজের দিকে 'পূর্বঘাটে', বোম্বাইয়ের 'পশ্চিমঘাটের' কোন কোনও স্থলে,—সমুদ্র ও পাহাড় মেশানো আছে। কিন্তু সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে পর্বতের তুষারচূড়া দেখতে পাওয়াটা নতুন। সে যাই হোক, এই রেলপথটি তুরস্কের সীমানা-শহর 'বাটুমী' থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের তীরে তীরে সোজা উত্তরে চলে গেছে বোধ করি 'আজব' সাগরের প্রান্ত পর্যন্ত। এই রেলপথ যেমন প্রত্যেকটি জনপদে রসদ সরবরাহের কাজে লাগে, তেমনি এটি সোভিয়েট-তুরস্ক সীমানাও রক্ষা করে। দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর সীমানা-বর্তী 'বাটুমী' নগরটি হ'ল সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি মস্ত ঘাঁটি!

আঁকাবাঁকা বনময় পথ ধ'রে আমরা 'শোচি' শহরে এসে প্রবেশ করলুম, তখন কৃষ্ণসাগরের দিগন্তে সূর্য নেমে যাচ্ছে। এটি ককেসাসের অধিত্যকা শহর,—সমুদ্রের উপরেই। আমরা যে বৃহৎ নব-নির্মিত অট্টালিকায় এসে উঠলুম, সেটি 'ইনটুরিস্টেরই' পরিচালিত হোটেল 'প্রিমর্স্কি'। এটি এই পার্বত্য 'পুষ্প-নগরীর' সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হোটেল। এখানে উল্লেখযোগ্য এই, প্রধানমন্ত্রী মিঃ খ্রুশ্চভ তাঁর অবকাশযাপনের জন্য 'শোচি' শহরটি বিশেষভাবে পছন্দ করেন। মিঃ জাইৎজেভ কথায় কথায় আমাকে বললেন, 'শোচি' শহরে আপনিই প্রথম ভারতীয় এলেন!

সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত এক রাজপথের চৌমাথায় এই হোটেলটির তিনদিকে ডালিয়া, সূর্যমুখী, গোলাপ এবং কাশ্মীরি ফুলের অজস্র সমারোহ। বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই, এ-নগরের জনবিরলতা। একটি শহর তার সমস্ত সৌধশ্রেণী, পথঘাট, যানবাহন,—আগাগোড়া সব নিয়ে নবনির্মিত, এটি একটু অভিনব। জারের আমলে 'শোচির' এক প্রান্তে বুঝি ছিল সৈন্যদলের উপনিবেশ। কিন্তু সোভিয়েট আমলে এটিকে স্বাস্থ্যাবাসে পরিণত করা হয়। বিগত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই নগরটিকে নির্মাণ করার জন্য ১৪০ কোটি রুবল অর্থাৎ ভারতীয় টাকার পরিমাণ ১৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর ফলে এই শহরের সর্বত্র 'ষ্টালিন' বিরাজ করছেন! সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথ, স্বাস্থ্যাবাস, বিদ্যা-মন্দির, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বন্দর, হাসপাতাল,—সবই তাঁর কীর্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁর বিরাট মর্মরমূর্তি সর্বত্র, তাঁর বৃহদাকার তৈলচিত্র প্রতি প্রতি-ষ্ঠানের দেওয়ালে,—তাঁকে বাদ দিয়ে 'শোচি' শহরের কোনও অস্তিত্বই নেই। আজ তাঁর মৃত্যুর পর নানাজনে উচ্চকণ্ঠে নানান প্রতিবাদধ্বনি তুলছে বটে, কিন্তু

একজন মাত্র ব্যক্তি আপন শক্তিবলে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল ধ'রে কুড়ি কোটি লোককে স্তব্ধ ক'রে রেখেছিল,— এ কৌতুক কোনও কালের ইতিহাসেও নেই! ইউরোপের সর্বশেষ দানব হিটলারের বিরুদ্ধে নাৎসী জার্মানিতে প্রকাশ্য বিরোধিতা ছিল, কিন্তু স্টালিনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দও কোথাও শোনা যায়নি! প্রসংগত বলা চলে, সোভিয়েট ইউনিয়নের তিনজন প্রধান ব্যক্তির নামই তিনটি ছদ্মনাম! উলিয়ানভ হয়েছেন 'লেনিন', ব্রণস্টিন হয়েছেন 'ট্রটস্কী', এবং 'দিযুগাসভিলি' হয়েছেন 'স্টালিন'।

'প্রিমর্স্কি' হোটেলের দোতলায় একটি 'ডবল-ঘর' আমাকে দেওয়া হল। তার একটিতে শয়ন, অন্যটি বৈঠকখানা। গরম জলের সুব্যবস্থার অভাবে এই ঘরের সংলগ্ন স্নানাগারটি অনেক সময় আমার পক্ষে অস্বস্তির ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে এমনটি সচরাচর ঘটে! ওদের 'প্রাচ্যদেশীয়' প্রকৃতির ভিতরে একটি 'তালকানা' ভাব অতি প্রকট। এতগুলি শহর ও গ্রাম এবং জনপদ ভ্রমণ করলুম, কিন্তু নিখুঁৎ স্নানাগার সচরাচর চোখে পড়ে না! চারিদিকে বিলাস এবং সুখের এত আয়োজন, মানুষের সুযোগসুবিধাসৃষ্টির এমন সর্বব্যাপী অধ্যবসায়, কিন্তু ছোট ছোট স্বাচ্ছন্দ্যদানের বিবেচনা অনেক ক্ষেত্রে এত কৃপণ যে, বিরক্তিতে মন ভরে ওঠে! লেনিনগ্রাড বা মস্কো থেকে তাসকন্দ, এবং সাইবেরিয়া থেকে ক্রাইমিয়া, কর্কেশিয়া বা জর্জিয়া— এই বৃহৎ ভূভাগে স্নানাগার বা শৌচাগার সৃষ্টির ব্যাপারে যে অক্ষমতা, অবিবেচনা ও মূঢ়তার চেহারা চোখে পড়ে, সেটি ওদের পক্ষে যথেষ্ট গৌরবের নয়! এসব ব্যাপারে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ আরেকটু সুরুচিসম্পন্ন হলে ভাল হত!

শহর মাত্রই অট্টালিকাবহুল, সেখানে বিস্ময় নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি বাড়ি যদি বাগানবাড়ি হয়, তবেই সেগুলি নগরের সম্পদ। নিউদিল্লীর বড় বড় রাজকর্মচারী বা লোকসভার সভ্যদের বাংলোগুলি যে কারণে সুশ্রী, শোচি শহরেও তেমনি। এটি পার্বত্য শহর, প্রত্যেকটি গৃহস্থই সংস্থানসম্পন্ন, কিন্তু এর জনবিরলতা ও প্রসন্ন শান্তি যে কোনও ব্যক্তিকে মুগ্ধ করে। কৃষ্ণসাগরের উত্তর এবং পূর্বপার হল সোভিয়েট ইউনিয়নের অধীনে। পশ্চিমে বুলগারিয়া এবং রুমানিয়া, দক্ষিণে তুরস্ক। পূর্বপারে যেখানে শোচি শহর, পশ্চিম পারে ঠিক সেইখানে রয়েছে একটি বন্দর। বন্দরটির নাম হল 'স্টালিন', কিন্তু সেটি বুলগারিয়ার মধ্যে পড়ে!

সন্ধ্যার পরে শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে নিয়ে এলেন শোচি থিয়েটারের প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। বাস্তবিক আধুনিক সোভিয়েট থিয়েটারে ঢোকবার আগে ভাবতে হয় রাজবাড়িতে ঢুকছি কিনা। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে একমাত্র মস্কো আর্ট থিয়েটার বা গোর্কি থিয়েটার—যার বাড়িটি হল সাবেক কালের, যেটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং যেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলি অভিনীত হয়! কিন্তু মস্কোর 'মালি' থিয়েটার হল রাশিয়ার প্রাচীনতম থিয়েটার। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা ছিলেন। তাঁর নাম মচালভ। তিনি তৎকালীন বিদ্বজ্জন সমাজে অতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আজও 'মালি' থিয়েটার আপন আভিজাত্যের গৌরবে গর্বিত। বলা বাহুল্য, রুশ জাতির অভিনয় ও মঞ্চঐতিহ্য চিরদিন গৌরবোজ্জ্বল!

শোচি থিয়েটারের ভিতর দিকটি ঝটখটে নতুন এবং প্রচুর সম্পদশালী। যদিও এটি নির্মাণ করা হয় ১৯৩৭ সালে, তবুও এটিকে নূতনের মতো করে রাখা। ওরা পুরনো চায় না, শুধু চায় নতুন! বাপের নাম জানতে চায় না, ছেলের কথা শুনতে চায়! শোচি থিয়েটারটির কোল ঘেঁষে যে প্রাঙ্গণ-পথ, তার নিচেই সমুদ্র! ফলে, বনবাগান লতাপাতার সঙ্গে মিলিয়ে শান্ত গম্ভীর সমুদ্র কেমন যেন মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আমি মুগ্ধচক্ষে চেয়েছিলুম।

সোভিয়েট ইউনিয়নে নগর নির্মাণবিধি একটু কৌতুকজনক। বহু দুস্তর ভূভাগে ওরা যখন রাতারাতি নগর বসাতে থাকে, তখন বসবাস ব্যবস্থা বা অন্নজলের উপযুক্ত আয়োজন করার আগেই ওরা বানিয়ে তোলে রঙ্গমঞ্চ! নগরের প্রথম দিনের নির্মাণকার্যের তালিকায় আগে বসবে একটি থিয়েটার, তারপর আসবে সিনেমা! অভিনেতা এবং অভিনেত্রী ওদের দেশে পরম সম্মানিত এবং যত্নের সামগ্রী। ওরা বার্ধক্যের কালে শুধু যে পেনসন পায় তাই নয়, ওদের অবশিষ্ট জীবনে যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য এবং শান্তি থাকে, সেদিকে কর্তৃপক্ষ প্রখর দৃষ্টি রাখেন। অবসর-প্রাপ্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিলাসপূর্ণ বসবাসের জন্য লেনিনগ্রাডে যে বৃহৎ ও মনোরম অট্টালিকাটি দেখেছিলুম সেটি ভুলিনি!

শোচি থিয়েটারের মঞ্চের উপরে জনৈকা উক্রাইনীয় গায়িকা আপন কণ্ঠের কসরৎ দেখাচ্ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ গায়িকা, শুনলুম। তাঁর কণ্ঠস্বরের কেরামতির ভিতরে বিভিন্ন পক্ষীর উচ্চগ্রামের কাকলী শুনেছিলুম। এই সূত্রে জনৈক রুশলেখক ভিক্টর ভিট্‌কোভিচ তাঁর একখানি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করেছেন :

"When Rabindranath Tagore, the famous Indian author, heard European singing for the first time, it sounded to him like a strange immitation of the singing of birds."

এই গায়িকার কণ্ঠস্বরে আমিও সেই 'strange immitation' শুনে অবাক হচ্ছিলুম! কিন্তু মানুষের কণ্ঠে পাখির কাকলীর অবিকল অনুকরণ হল একপ্রকার ম্যাজিকের কসরৎ,—এটা 'মিমিক্রি'! আমি এসেছিলুম গান শুনতে!

শ্রীমতী লিডিয়া আড়ষ্ট হয়ে পাশ থেকে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। এক সময় বললেন, চলুন, আর আপনার শুনে কাজ নেই!

আমি তৎক্ষণাৎ উঠে পালিয়ে বাঁচলুম!

সন্ধ্যার পরে এই পুষ্পনগরীর উপরে যেন স্বপ্নাচ্ছন্নতার ছায়া নেমে আসে। আমাদের প্রিমর্স্কি হোটেলের ব্যবস্থা খাস ইউরোপীয়। এ হোটেলের ম্যানেজার একজন দীর্ঘকায় প্রসন্নমুখ ব্যক্তি। সুবিধা ছিল এই, তিনি ইংরেজি জানেন এবং করিৎকর্মা ব্যক্তি। তাঁর আপ্যায়নের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। আমার ঘরটিতে আসবাবসজ্জা এবং আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে বৈকি! ঘরের সামনের দিকে ছোট ছোট দুটি বারান্দা, সেখানে দাঁড়ালে এপাশে ওপাশে পুষ্পোদ্যান এবং সামনে সমুদ্র! কিন্তু এই হোটেলের বাইরের চেহারাটা যেমন প্রোজ্জ্বল, এবং প্রবেশপথটি তার সমস্ত বৈভবসজ্জাসহ যেমন চাকচিক্যময়,—ভিতর মহলে ঠিক ততখানি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য আছে কিনা এটি বার বার ভাবতে হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণকালে এটি প্রায়ই চোখে পড়ত, অভ্যাগত বা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্য যে পরিমাণ আতিথেয়তার আয়োজন,

তাঁদের 'ঘরের' লোকদের জন্য সে-পরিমাণ নেই! শ্রীমতী অকসানা আমার সঙ্গে তাঁদের দেশে ভ্রমণ করেছেন প্রচুর, কিন্তু তাঁর জন্য প্রায় প্রতি হোটেলে যে-প্রকার অস্বস্তিকর বসবাসের ব্যবস্থা হত,—সেটিতে আমি নিজেই পীড়া বোধ করেছি! সভ্যতার ইতিহাসে যে-দেশে সাধারণ মানুষের 'ডিগনিটি' প্রথম প্রধান স্থান পেয়ে বাঁচল, সে-দেশে 'ঘরের লোকের' প্রতি এই অসংগত তাচ্ছল্য এবং তারতম্য আমার ভাল লাগেনি। ভোজনের আসরে পাশাপাশি বসে একজনের পাতে চারখানা দাগা মাছ এবং অন্যজনের পাতে মাছের টুকরো পড়াটা যেমন দৃষ্টিকটু, এও অনেকটা তাই! শ্রীমতী অকসানা যে-সকল ব্যবহারিক অসুবিধাগুলি মিষ্ট হাসি-মুখে সহ্য ক'রে নিতেন, এই হোটেলের কোনও একটি দরিদ্র ঘরে জায়গা পেয়ে শ্রীমতী লিডিয়াও সেই অসুবিধাগুলির মুখোমুখি হয়েছেন, এটি আমার দৃষ্টি এড়ায়নি! কিন্তু 'সোভিয়েট নাগরিকের' শিক্ষা বড় কঠিন। তারা বরং ভাঙে, কিন্তু মচকায় না! দোভাষিণীর পক্ষে যে স্নায়ুর সুব্যবস্থার প্রয়োজন, এটির সম্বন্ধে ইন্টারপ্রিটেরের ঔদাসীন্য লক্ষ্য ক'রে বিরক্তিবোধ করতুম।

আমাদের বারানসী শহর উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি ক্ষুদ্র নদীর দ্বারা সীমায়িত। তার উত্তরে হল বরুণা নদী, এবং দক্ষিণে অসি। এখানে পার্বত্য অধিত্যকা নগরী শোচিও তাই—দুটি নদীর দ্বারা এর সীমানা নির্দিষ্ট। একটির নাম 'মাৎসেস্তা', অন্যটি 'কুদে-পস্তা'। এ দুটি ককেসাসের বরফগলা জলের নালীপথ মাত্র। কিন্তু এ দুটির চারিপাশে অরণ্যশ্রীর চেহারা মনোরম। শোচির আরণ্যক বনভূমির ইতিহাস সত্যই মনোজ্ঞ। এ অরণ্য নাকি প্রাগৈতি-হাসিক যুগের। এখানকার শীতাতপের ভিতরে নাকি এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যেটি প্রকৃতির সম্পদকে বহুকাল অবধি অক্ষুণ্ণ ও অজর করে রাখে। এখানে এমন হাজার হাজার গাছ এবং বনস্পতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল যাদের আয়ু ৫০০ বছর থেকে প্রায় ২৫০০ পর্যন্ত, এবং প্রতি গাছে তার এক একটি ইতিহাস খোদিত!

এখানে আমার আরও দুজন নিত্য-সঙ্গী জুটেছিল। পূর্বোক্ত আইভান জাইংজেভ এবং এখানকার প্রসিদ্ধ নাট্যকার মিঃ নিকলাই ভিনিকভ। প্রথম ব্যক্তি অতি নিরীহ এবং মিষ্টভাষী, দ্বিতীয় ব্যক্তি আমোদপ্রিয় ও প্রাণচঞ্চল। এ'রা দুজনেই রাইটার্স ইউনিয়নের লোক। কিন্তু এর মধ্যে জাইংজেভ হলেন দারুশিল্পী এবং ছুতোর। কাঠের উপরে তাঁর খোদাইশিল্পের কাজগুলি বড় সুদৃশ্য। এমন গাছের ডালের ভিতর থেকে তিনি এমন সব অদ্ভুত ধরণের অষ্টাবক্র পুতুল কুঁদে বার করেন, যেগুলি বিস্ময় ও প্রশংসার উদ্রেক করে। এদিকে কৃষ্ণসাগরকে কেন্দ্র ক'রে তিনি দুখানি বইও লিখেছেন। ঘরে তাঁর স্ত্রী আছেন,—অতি ভদ্রা এবং সরলা। তাঁর বিশ্বাস, আমি একজন ভারতীয় ভবিষ্যদ্-বক্তা এবং গণৎকার! তিনি একদিন 'হাত দেখাতে' এসে যখন শুনলেন, তাঁর স্বামী শীঘ্রই সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করবেন, তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মস্ত বিতর্ক বেধে গেল, এবং স্ত্রী শাসন ক'রে বললেন, আমারও তাই সন্দেহ! বেশ, আজ থেকে তোমাকে ঘরে তালাচাবি দিয়ে রাখব! দেখি কেমন তোমার স্বাধীনতা—!

স্ত্রী বোধ হয় স্বামী অপেক্ষা দু'-এক বছরের বড়ই হবেন। শ্রীমতী লিডিয়া রাগ করে বললেন, আপনি বুঝি ওদের ঘর ভাঙতে চান? দেখতে পাচ্ছেন না, মেয়েটি এসব বিশ্বাস করে?

মস্কো থেকে আসবার সময় একটি কাগজ এনেছিলুম সঙ্গে। প্রাচ্য-ভাষা প্রকাশন বিভাগ থেকে "Palace and Prison" নামক একখানি বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করা হচ্ছিল। সেটি আমি একটু 'দেখেশুনে' দিচ্ছিলুম। সুতরাং এখানকার অনাহত বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে ওই কাজটি আমার হাতে ছিল।

স্থানীয় রাইটার্স ইউনিয়নের কর্তৃ-পক্ষ আমাদের জন্য একখানি বড় গাড়ি বরাদ্দ করেছিলেন। নাট্যকার ভিনিকভ সেই গাড়িতে আমাদের নিয়ে চললেন ককেসাস পাহাড়ের দিকে। পথ মাত্র ১১ মাইল, কিন্তু সেই সুন্দর চিক্কণ পথ আমাদের আনন্দ-কলরবে মুখর ছিল। ভিনিকভের বয়স এখনও পঞ্চাশ হয়নি। ইংরেজি তিনি জানেন না, কিন্তু বিদেশী বন্ধুকে কেমন উল্লাস সহকারে কথায়-কথায় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করতে হয়, এটি তিনি জানেন। তাঁর সাবলীল প্রাণোচ্ছলতা অনেক সময় আমারও প্রাচীন বেপরোয়া প্রকৃতিকে খুঁচিয়ে বার করত! ভিনিকভের বাড়িতে আমার 'দাবা খেলার' আড্ডা জমতো। মাঝে মাঝে তাঁর মুখে ভারতীয় কি একখানা ছবির নোংরা সুরভাঁজা শুনতুম! সেটি তাঁর বাড়ির গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া ইতর একটি সুর। তার দু'-চারটি শব্দ এই প্রকার,—"ইচেক দানা ইচেক দানা...... জুতি মেরা জাপানী......মেরা পাংলুন হিন্দুস্তানী—"

এই গান এবং এর সংলগ্ন ছবিটি সোভিয়েট ইউনিয়নে তৎকালে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে, এবং এর থেকে আমি সেদিন সোভিয়েট নাগরিকদের রুচিবিকারের পরিচয় পাই!

জলে, স্থলে, অনিলে, আকাশে অন্ধ-কারে যেমন শ্রীরাধা একদা শ্রীকৃষ্ণেরই ছায়া দেখতে পেতেন, আমিও তেমনি প্রতি দেশের প্রতি পর্বতের কোলে হিমালয়কেই আবিষ্কার করি! কিন্তু ককেশাস গিরিমালার মধ্যে এমন একটি রহস্যজনক প্রেতচ্ছায়া চোখে পড়ে যেটি হিমালয়ে নেই! সেখানে নগাধিরাজের স্তবকে স্তবকে দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শন মেলে, কিন্তু ককেশাসের গুহা-গহ্বরে যাদেরকে দেখি, তারা মহাদেবেরই

সঙ্গী, ভূত-প্রেত-পিশাচ-নন্দী-ভৃঙ্গী। এর কারণ আছে। পাহাড়ের ভিতর যত গহনলোকে যাচ্ছি ততই দেখতে পাওয়া যায় ঘনকালো কৃষ্ণচ্ছায়া! বড় বড় বনস্পতি এবং বড় বড় গগনচুম্বী বৃক্ষ কালো বর্ণ! শুধু তাই নয়, চারিদিকে কেমন যেন ভৌতিক মানবাকৃতি, সংখ্যাতীত অষ্টাবক্রের দল! ঠাহর ক'রে দেখলে ওদের চোখ-কান-নাক-হাত-পা,— সমস্ত এ'কে নেওয়া যায়! চারিদিকে বৃক্ষ-বনস্পতির জটলার মধ্যে ছায়ারা দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন ক্রোধোন্মত্ত, বিকলাঙ্গ, পাগল, রক্তচক্ষু, রুক্ষমূর্তি, জীর্ণবাসা,— একদল শুষ্কপ্রকৃতি ও ভয়ভীষণ কাল-প্রহরীর দল! এই আদিম এবং প্রাগৈতিহাসিক বনভূমির মধ্যে একা অগ্রসর হতে গেলে গা ছমছম করে।

সেই অরণ্যালোকের গহন জটিল কন্দরে গিয়ে নাট্যকার নিকলাই ভিনিকভ প্রত্যেকটি গাছের ইতিহাস বলছিলেন এবং হাজার দু'হাজার তিনহাজার বছরের সেই অরণ্যকাহিনী শুনছিলুম! এই পাহাড়গুলির নানা নিভৃত স্থলে অনেকে বাগানবাড়ি বানিয়েছে, কোথাও বা কোন কোন বিষয়ের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলি একে একে অতিক্রম ক'রে অবশেষে আমরা তিনজন পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এবং ছবি তুলতে তুলতে গভীর বনভূমির মধ্যে যেন তলিয়ে গেলুম!

ককেশাসের একটি চূড়ার নাম, "আথুন বা আহুন"। কিন্তু সেখানকার প্রাকৃতিক শোভাসম্পদ দেখার জন্য একটি চতুষ্কোণ পাথরের টাওয়ার নির্মাণ করে তার নাম দেওয়া হয়েছে, 'আথুন টাওয়ার'। এটি ১০০ ফুট উঁচু, এবং সিঁড়ি দিয়ে এর চূড়ার বারান্দায় উঠে দাঁড়ালে অদূরে পশ্চিমে দিকচিহ্নহীন কৃষ্ণসাগর এবং পূর্বদিকে নয়নাভিরাম ও তুষারকিরীট 'এলব্রুজ পর্বতের' চূড়া দেখা যায়। এই পর্বতরাজির আশে-পাশে এখনও নানা বন্যজাতি ও সম্প্রদায় বাস করে—যারা এখনও আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলেছে।

শোচি শহরের অন্যতম আকর্ষণ হল কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ। এই জলধারাগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যশোধনী ধাতব পদার্থ থাকার জন্য প্রতি বছরে প্রায় ৩ লক্ষ নরনারী এখানে 'স্নান' করতে আসে। একটি সুবৃহৎ অর্ধচন্দ্রাকার এবং পুষ্পোদ্যান সম্বলিত অট্টালিকার নাম দেওয়া হয়েছে 'মাৎসেস্তা'। এটিকে ও'রা বলেন, 'বাথ প্যাভিলিয়ন,' অর্থাৎ স্নানচত্বর। ধাতব পদার্থমিশ্রিত উষ্ণজলের দ্বারা বহু-প্রকার ব্যাধি এখানে নিরাময় করা হয়। এখানকার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়ে রোগীর স্বাস্থ্যকে নূতন ক'রে নির্মাণের যে আয়োজন আছে সেগুলি দেখে আমি বিশেষভাবে তারিফ করেছিলুম। কিন্তু এগুলি আমার কাছে নতুন নয়। যাঁরা বিহারের অন্তর্গত রাজগৃহে, পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাংড়ায়, কুমায়ুনের অন্তর্গত গৌরীকুণ্ডে, বীরভূম জেলার অন্তর্গত তারাপীঠে বা বক্রেশ্বরে গেছেন, তাঁদের কাছে এগুলি অপরিচিত নয়! যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা জানেন, এবম্প্রকার 'স্নান-চত্বর' ভারতে আছে শত শত, তবে সেসব স্থলে অবশ্য এমন সুন্দর প্রাসাদ বা স্বাস্থ্যগবেষণার বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নেই। আমাকে অভিভূত করেছিল এখানকার মানবহিতৈষণার মন্ত্র, এবং জনকল্যাণকর্মের অপরিসীম অধ্যবসায়। একটি সাধারণ কয়লাখনির মজুর, রেল আপিসের কনিষ্ঠ কেরানী, মুদির দোকানের একটি চাকর, সামান্য একজন ঝাড়ুদার—এরা এখানে এসে যে রাজবেশ পরে, সেটি দ্রষ্টব্য। এর জন্য তদ্বির-তদারক, লেখালেখি, উমেদারি--এসবের গন্ধমাত্র নেই, কারণ এগুলি তাদের পাওনা। এককালে এখানকার জনপদে বহু অর্থশালী লোকের বাগানবাড়ি এবং ব্যবসায়ীদের বোর্ডিং হাউস ছিল। সোভিয়েট আমলে সেগুলিকে 'লিকুই-ডেট' করা হয়েছে এবং ২৫।৩০ বছরের মধ্যে একমাত্র 'শোচি-মাৎসেস্তা' অঞ্চলে ৫০টিরও বেশি অতি বৃহৎ 'স্যানা-টোরিয়ম' অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন এবং পুরনো মিলিয়ে বা পুনর্নির্মাণ একত্র ক'রে এই পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় ৯০টি স্বাস্থ্যাবাস গড়ে উঠেছে। সমগ্র কৃষ্ণসাগরের উত্তর ও পূর্ব তীর ধরলে শোচির মতো অন্তত কুড়িটি শহর আঙুলে গোণা যায়, এবং প্রতি শহরে এই প্রকার সংখ্যাতীত স্বাস্থ্যাবাস সৃষ্টি করা হয়েছে!

এখানে গন্ধকজল সহ 'অম্লজান' স্নানের ব্যবস্থা দেখলুম। শ্বাস-প্রশ্বাস শোধনের জন্য 'মেন্থল' গ্যাসের চিকিৎসা আছে। চর্মরোগ, হৃদ্‌রোগ, পক্ষাঘাত, রক্তদুষ্টি, শিরঃপীড়া, অন্ত্রব্যাধি, কেশ-বিরলতা প্রভৃতি ব্যাধির বিবিধ নিরাময়-ব্যবস্থা এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। কোন কোনও নিরাময় কক্ষে গিয়ে লক্ষ্য করলুম, বিভিন্ন ও বিচিত্র ধাতব জলের সাহায্যে আনন্দ পুরুষ এবং নারীকে নানাবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা চিকিৎসা করা হচ্ছে!

'মাৎসেস্তা' থেকে বেরিয়ে আমরা যে প্রাসাদোপম একটি অট্টালিকায় এসে প্রবেশ করলুম, সেটি মস্ত এক হাসপাতাল। এখানে আগাগোড়া সব বিনামূল্যে। হাসপাতাল বলতে বুঝি, আহার, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং ঔষধপত্র! এখানে একটু অন্যরকম। এখানে সর্ব-প্রকার আমোদ-আহ্লাদ, থিয়েটার-সিনেমা, খেলাধুলো, লাইব্রেরী, সন্তরণ ক্ষেত্র, ব্যায়ামাগার, এবং বিস্তৃত লাউঞ্জ ও কমন্-রুম। প্রতিদিন পাঁচটি পরিপূর্ণ ভোজের আয়োজন। সোভিয়েট ইউনিয়নের হাসপাতাল কেবল চিকিৎসা-কেন্দ্র নয়, স্বাস্থ্যোদ্ধারের কেন্দ্রও বটে। একজন মহিলা ডাক্তার সর্বত্র ঘুরে ঘুরে যখন আমাকে দেখাতে লাগলেন, তখন এইটিই শুধু ভাবছিলুম, দীর্ঘকাল অসুস্থ অবস্থায় সোভিয়েট ইউনিয়নের হাসপাতালে থাকার মতো সৌভাগ্য আর কিছু নেই! মাঝে মাঝে এক-আধজন ভারতীয় কমিউনিষ্ট কর্মী 'স্বাস্থ্য-লাভের' কামনায় ছিটকে চ'লে যান সোভিয়েট ইউনিয়নে, এটি সংবাদে দেখতে পাই। বলা বাহুল্য, তাঁদের সেবা-যত্নাদি ভালই হয়! কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের একজন কমিউনিষ্ট তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে নিরাময় হতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ব্যাধি তাঁর সারেনি, এবং ম্লানমুখ নিয়েই তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল! আমার বিশ্বাস, এখানকার অসুখ ওখানে গেলে সারে না, এবং ওখানকার চিকিৎসা এখানে মেলে না!

সোভিয়েট ইউনিয়নে মেয়েদের প্রত্যেক কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে একেকটি ছোট বা বড় হাসপাতাল এবং প্রসূতি-সদন সংযুক্ত থাকে। অন্তঃস্বত্ত্বা নারীর স্বাস্থ্য-রক্ষা, জীবনরক্ষা এবং ভ্রূণ বা সন্তান-রক্ষার সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব তার শ্বশুরবাড়ি বা বাপের বাড়ির মাথাব্যথা নয়,— সে-দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সন্তানসম্ভবা মেয়ের 'চতুর্থ' মাস থেকে তাকে অতিশয় হাল্কা কাজ দেওয়া হয়। সে থাকবে পর্য-বেক্ষণে, এবং সতত তত্ত্বাবধানের মধ্যে। তার আহার, বাসস্থান, চলাফেরা, ঔষধ-পত্রাদি, নিয়মিত স্বাস্থ্য ও দেহপরীক্ষা, —এগুলি বিশেষ যত্নের সঙ্গে করা হবে। এখানে রাষ্ট্রের স্বার্থ অনেক বেশি বলেই নারীর প্রতি এত যত্ন! রাষ্ট্র কেবলই চাইছে সুস্থ সন্তান! লোকসংখ্যার অভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন কাঁদতে

বসেছে! বিগত বিশ্বযুদ্ধে সে হারিয়েছে দেড় কোটি পুরুষ! এখন সে প্রতি মেয়ের কাছে চাইছে ৪।৫টি সন্তান—ছেলে বা মেয়ে যাই হোক। সেইজন্য সর্বাপেক্ষা সমাদৃত জাতি হল, শিশু-জাতি!

জারের আমল পর্যন্ত রাশিয়ায় ছিল সন্তান প্রসব করানোর জন্য বুড়ি-দাই! আঁতুড়ঘরের জন্য ঝোপড়া বানিয়ে ভিতরে ঘাস বিছিয়ে দেওয়া হত! ঘুঁটে বা কাঠ-কুটোর আগুনে সেঁক; ভোঁতা বা মরচে-ধরা ছুরিতে নাড়ি কাটা; শিশুকে স্নান করাবার ব্যবস্থা হত না; অশিক্ষিত দাইরা, তুকতাকের ব্যবস্থা করত। এর ওপর ছিল ভূত, প্রেত, ডাইনী বা 'পেঁচোয়' পাবার ভয়! এর ফলে রুশসাম্রাজ্যে প্রসূতি ও শিশুর যে-পরিণাম ঘটত, সেই সম্বন্ধে এক ইংরেজ চিকিৎসক সম্পাদিত এক রুশীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে:

"Two million martyred mothers shed bitter tears every year on Russian soil, burying in early graves with their work-worn hands the needlessly lost innocent victims of a monstrous state system." ("Health Protection in the Soviet Union").

আমাদের খাবার টেবলের সামনে এসে বসতেন স্থানীয় জনৈকা প্রসিদ্ধ মহিলা-ডাক্তার 'মিসেস ব্রাকো'। আমি তাঁকে বলেছিলুম, আমার আহারাদি পর্যবেক্ষণ ক'রে আমাকে বলে দিন্ আমার শরীরে কোনও রোগ আছে কিনা!

বলা বাহুল্য, আমি সর্বপ্রকার সামগ্রীই খেতুম। মিসেস ব্রাকো প্রতিদিন তিনবার এসে আমার খাবার সামনে ব'সে গল্পগুজব করার অবসরে আমার আহার্য তালিকা ও ভোজনভঙ্গী লক্ষ্য করতেন! চতুর্থ দিনে বিদায় নেবার কালে তিনি বললেন, দু'তিনটি সামগ্রীর প্রতি আপনার অনেককালের ঝোঁক মনে হচ্ছে! ডিম এবং কার্বো-হাইড্রেট আপনি কমিয়ে দিন। চল্লিশের পর কোন কোনও খাদ্যের প্রতি ঝোঁক কমানো ভাল!

তাঁর উপদেশটি গ্রহণ ক'রে উপকৃত হয়েছিলুম। শ্রীমতী লিডিয়া সেদিন থেকে আমার প্রতিবাদসত্ত্বেও পাতের ধার থেকে দু'একখানি প্লেট সরিয়ে নিতেন!

এমনি সময় একদিন আইভান জাইৎজেভ আমাদেরকে নিয়ে এলেন মাইল তিনেক দূরবর্তী একটি পাহাড়তলীর ধারের ফল-ফুলের বাগানে। এই বাগানের পরিচালক হলেন 'মিঃ ফিয়েডোর জোরিন'। তাঁর বয়স প্রায় ৫৫। তিনি ভারতের কথা বহু শুনেছেন, কিন্তু একজন ভারতীয়কে দেখলেন এই প্রথম! এখানে করমর্দনের সাধারণ সৌজন্যের অবকাশ না দিয়ে তিনি সোজা এসে আমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন! এই সুবৃহৎ পুষ্পকাননের সঙ্গে তাঁর জীবন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এবং লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, তিনি যে কেবল প্রত্যেকটি ফুলফলের গাছের আনুপূর্বিক ইতিহাস জানেন তাই নয়, তিনি নিজের মনে এদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন! তাঁর চারিদিকে সমস্ত বাগান-ভরা বড় বড় গোলাপ্, ডালিয়া, সূর্য-মুখী, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতির বিপুল সমারোহ এবং চতুর্দিকব্যাপী আপেল ও রোজবেরির অজস্র ফলন। একটি অতি বিচিত্র লেবুগাছের কাছে তিনি নিয়ে গেলেন। গাছটির বয়স তখন ১৮ বছর, মোট ১৮ রকমের কমলালেবু ও অন্যান্য লেবু এতে ফলে, এবং মাত্র ১৮ দিন আগে আমেরিকার প্রসিদ্ধ নিগ্রো গায়ক 'পল রবসন' এই বাগানটি দেখে গিয়েছেন! এই গাছটির নাম রাখা হয়েছে, 'আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব বৃক্ষ'। এই গাছটি প্রকৃতির খেয়াল অনুসারে চলে, এবং এর উচ্চতা আন্দাজ ২০ ফুট। উপর থেকে নিচে পর্যন্ত কয়েকটি ছোট বড় নানা ধরণের রক্তিম লেবু ঝুলছে! সমস্ত গাছটির প্রায় প্রত্যেক ডালে ছোট ছোট প্লাসটিকের টিকিটে জগতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যক্তির নাম লটকানো,—ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ, চীন, জাপান—কেউ বাদ নেই। তাঁরা প্রত্যেকে এসে এই গাছের একেকটি ডালে অপর একটি গাছের কাঁচ ডাল দিয়ে 'সূত্রবন্ধ' ক'রে গেছেন। আমিও সেই প্রকার একটি 'গ্রাফটিং' ক'রে দিলুম! একটির নির্যাস অন্যটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কালক্রমে ফল ধরবে! ধ'রেও ছিল তাই। বছর দেড়েক পরে মিঃ জোরিন আমাকে পত্র লিখে জানান, আপনার 'গ্রাফটিংয়ের' ডালে একটি বৃন্তাশাখা এসেছে, যথাসময়ে ফল আসবে! কিছুকাল পরে এই স্বভাবসরল ব্যক্তি আমার নামাঙ্কিত 'গ্রাফটিং'-এর ডালের ফলসহ একটি ফটো আমার নিকট পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি ঐ ডালের চারটি লেবু একটি কাঠের বাক্সে পার্সেল ক'রে কলকাতায় আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন্! যাঁর মারফৎ পাঠানো হয় তিনি তাঁর পত্রে আমাকে লেখেন, 'We have great pleasure to send you the oranges from the branch grafted by you on the "Friendship Tree" in the garden of Sochi experimental station of subtropical and southern fruits during your stay in our town. Let Friendship between the peoples of the Soviet Union and India grow and flourish just as the "Friendship Tree" is developing. Yours sincerely, Efremov."

"অগনিয়োক" নামক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে আমার 'গ্রাফটিং' করার ছবিটি ছাপা হয়েছিল।

মিঃ জোরিনের এইটিই পেশা। ফুল ফোটানো, বাগান সৃষ্টিকরা, উদ্ভিদের নানাবিধ পর্যালোচনা,—এই নিয়েই তিনি থাকেন। লুসিয়া নামক একটি মেয়ে তাঁর এই সকল কাজে সহায়তা করে। তাঁর নূতন ফ্ল্যাট, আর্থিক সাচ্ছল্য এবং তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে আমি সচকিত হয়েছিলুম। তাঁর বাগানে কয়েকটি ভারতীয় 'কলাগাছ' তিনি সযত্নে লালন করেন। সে-গাছে 'কাঁদি' আসে না কোনদিন!

সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণকালে যাঁদের সান্নিধ্যে এসেছিলুম, তাঁদের প্রায় সকলেরই পারিবারিক ও ব্যক্তিগত
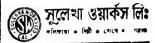
জীবনের খোঁজ-খবর নেওয়া আমার পক্ষে একটি প্রধান কাজ ছিল। আমার এই কৌতূহল অনেকটা অসামাজিক এবং এই অহেতুক ঔৎসুক্যের জন্য অনেক সময় লজ্জা পেতুম! রুশভাষা না জানার জন্য আমার বহু কৌতূহল অতৃপ্ত থেকে গেছে, এবং সেই কারণে বহু জীবনের মধ্যে প্রবেশলাভ ঘটেনি। তবু এটি দেখতে পেয়েছি, আমার পথ ছিল অবারিত, এবং যে সকল পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়—তাঁরা অকৃপণভাবে আমাকে তাঁদের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন।

যাঁর সঙ্গে শোচি শহরে এসেছি তিনি খুব নরম মেয়ে নন্। কিন্তু আমার রাশিয়া ভ্রমণকালে বোধ করি তাঁর সহায়তা পেয়েছি সর্বাপেক্ষা বেশি। আমার রুচি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কৌতূহল, প্রয়োজন,—এগুলি ছিল তাঁর নখ-দর্পণে। তাঁর বিশেষ আগ্রহের জন্যই আমি সকল স্তরের নরনারীর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলুম। মাদাম চেকভ, মাদাম গোর্কি, গোর্কি পরিবারের অন্যান্যরা,—এ'দের সঙ্গে তিনিই আমার সংযোগ ঘটান্। এ ছাড়া শিল্পী, কবি, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক, প্রকাশক, মন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর, থিয়েটার ও সিনেমার ডাইরেক্টর, বিভিন্ন যাদুঘর ও প্রদর্শনী, খৃষ্টানতীর্থ জের্গোস্ক ও তার ধর্মযাজক, মস্কোর বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাইটার্স ইউনিয়নের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ,—এ সমস্তই শ্রীমতী লিডিয়ার সহায়তায় ঘটে। কিন্তু অন্যান্য দোভাষী এবং দোভাষিণীরা যেমন আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক জীবনের দ্বারোদ্ঘাটন করতেন, ইনি তাঁদের বিপরীত! এ'কে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভাবাপ্লুত হয়ে চোখের জল মুছতে দেখেছি কয়েকবার। কিন্তু নিজের চারিদিকে ইনি এমন একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা ক'রে রাখতেন, যার জানালা বা দরজার সন্ধান আমি কোন-মতেই পেতুম না! শুধু এইটুকু জানতম, ও'র বছর আঠারো বয়সের একটি ছেলে আছে, এবং সে ছাত্র।

সেদিন মেঘলা ও বৃষ্টির দিন। কৃষ্ণসাগরের উপর ঘন কালো মেঘ দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টি ও বাতাসে বাইরে বেরোবার জো ছিল না। সমুদ্রের ধারের বেঞ্চগুলি শূন্য। আমি সকালের দিকে প্রাতরাশ শেষ ক'রে ঘরে এসে ব'সে 'Palace and Prison' বইটির বাংলা পান্ডুলিপিটি পরীক্ষা করছিলুম। এমন সময় শ্রীমতী লিডিয়া একখানি চিঠি হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। চেয়ে দেখলুম, তাঁর মুখখানা গম্ভীর। চোখে তাঁর 'শর্ট-সাইটের' চশমা, মাথার চুলগুলি তাম্র-স্বর্ণাভ, এবং তাঁর মুখখানি সুশ্রী।
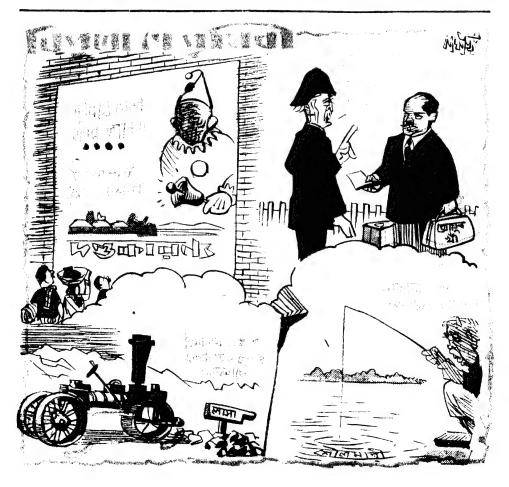
মুখের দুটি দাঁত সোনা-বাঁধানো—যেমন এদেশে বহু মেয়েপুরুষের হয়। অনেকের মুখে 'ষ্টেইনলেস্ ষ্টীলের দাঁতও দেখতে পাওয়া যায়। চিঠিখানা আমার সামনে রেখে তিনি পিছন দিকের কুশনে চুপ ক'রে বসে রইলেন। চেয়ে দেখছিলুম, সুদীর্ঘ চিঠি।

গতরাত্রে একটি অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। সেটি এখানে বলি। এই হোটেলেরই কোন্ একটি ঘরে জনৈক সিকাগোবাসী আমেরিকান আইনজীবী এসে উঠেছেন, এবং হোটেলের বাসিন্দাদের তালিকায় একজন ভারতীয়ের নাম দেখে তিনি আমাকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করেন, আমার ঘরে তিনি এখনই একবার আসতে পারেন কিনা। আমি তখনই তাঁকে আমন্ত্রণ করি, এবং লিডিয়াকেও ডেকে পাঠাই। মিঃ লিউইস বোধ করি 'একাই' আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে যেতে চেয়েছিলেন! কিন্তু আমি সেটি পছন্দ করিনি। সুতরাং তাঁকে বললুম, আমি যে দেশের অতিথি এবং যাঁর হেপাজতে আছি, তাঁকে বাদ দিয়ে অপর একজন বিদেশীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা একটু যেন অসুবিধাজনক বোধ করি! ইতিমধ্যে শ্রীমতী লিডিয়া এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। লিডিয়াকে হঠাৎ দেখে ভদ্রলোক একটু যেন থতিয়ে যান, এবং অপ্রস্তুত ভাবে বলেন, দিল্লী থেকে আগ্রা ঠিক কতটা দূরে, এইটি জানতে এসেছিলুম!

আমি তাঁর অবস্থা দেখে হাসি চাপতে পারলুম না। বললুম, আসুন, বসুন। বেশ ত, দিল্লী-আগ্রা নিয়েই তিনজনে মিলে গল্প করা যাক্।

ভদ্রলোকটি খর্বকায়, ধারালো এবং তাঁর বয়স আন্দাজ ষাট। তিনি হাসিমুখে আমার ইঙ্গিতটা গ্রহণ করলে আমি সুখী হতুম! কিন্তু তিনি একটু ভুল ক'রে বসলেন। বললেন, ভেবেছিলুম ঘরে আপনি একাই থাকবেন!

হঠাৎ রুষ্ট হয়ে উঠলেন লিডিয়া। বললেন, ক্ষমা করবেন। উনি একা থাকলে আপনার পক্ষে কি প্রকার সুবিধা হত?

ভদ্রলোক কৌতুক ক'রে বললেন, সুবিধা ছিল এই, আমরা দুজনে একই ভাষায় গল্প করতে পারতুম, দোভাষীর দরকার হ'ত না।

ফস্ ক'রে শ্রীমতী বললেন, Do you mean my presence here is unwanted and undesirable?

না, না—মিঃ লিউইস বললেন, এ কি কথা! আপনিও থাকুন! আমি একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কাছে কিছু কিছু গল্প শুনেছি, সেইগুলি ও'কে বলবার জন্য এসেছিলুম!

আর যায় কোথা! দুগ্ধধবলিম সুন্দর মুখখানিতে প্রাচীন বলশেভিক বিপ্লবের আগুন ধকধক ক'রে উঠল,—Do you ask me to believe that you tried to bribe a Soviet driver?

এবার লিউইসের পালা! তিনি হাসিমুখে বললেন,—

no, he was very eager to get inside my flat in Moscow and narrate your miserable plights!

ক্রুদ্ধ হাসি হাসলেন শ্রীমতী লিডিয়া। বললেন, And are you going to give out the story in your democratic Press?

It is not a story, dear madam!

এবার আমাকে মাঝখানে দাঁড়াতেই হল। হাসিমুখে বললুম, এই ঘরটির থেকে যদি রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা হয় তবে ইতিহাসে আমার নামটি থেকে যেতে পারে।

বচসাটা আরম্ভ হয়েছিল মাত্র। কোথায় গিয়ে দাঁড়াত জানিনে।—

অতঃপর দুই পক্ষে একটি রফা হল এবং হাসি-তামাশার মধ্যে দুইজনই যখন বিদায় গ্রহণ করলেন, তখন আন্দাজ ক'রে নিলুম, উভয়পক্ষই 'জয়লাভ' করেছেন! কিন্তু লিডিয়ার বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে রইল, এই আইনজীবী ব্যক্তিটি যথেষ্ট সরল নয়!

আজ সকালে বৃষ্টি-বাদলার দিনে যিনি এসে ঘরে ঢুকলেন তিনি গতরাত্রির 'ঝড়ঝঞ্ঝা' নন্, তিনি অন্য মেয়ে! চিঠিখানা নাড়াচাড়া ক'রে বললুম, এ ত' রুশ ভাষা, আমি নিয়ে কি করব? কা'র চিঠি?

শান্ত এবং কোমলকণ্ঠে লিডিয়া বললেন, এ চিঠি এল একটু আগে মস্কোর ঠিকানা কেটে! যাঁদের কখনো দেখিনি এ চিঠি তাঁরা লিখেছেন।

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি পুনরায় মৃদুকণ্ঠে বললেন, একঘণ্টা আগেও জানতুম না আমার মা ছাড়া আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আর কেউ বেঁচে আছে! আজ প্রথম জানলুম, আমি আর একা নই। আমার কাকার ছেলেমেয়েরা জীবিত রয়েছে! জীবনে এমন সুন্দর চিঠি আর কোনদিন পাইনি! সমস্ত চিঠিতে আমার দাদার কণ্ঠস্বর যেন কান্নায় কাঁপছে!

শ্রীমতী লিডিয়ার চোখে জল এল। আমি সাগ্রহে তাঁর পারিবারিক পরিচয় শুনতে চাইলুম!

মস্কো থেকে বহু দূরে উত্তর-পশ্চিমে বালটিক্ ইউনিয়ন রাষ্ট্রের সীমানার বিরাট একটি নগরের নাম 'পেশকভ'।
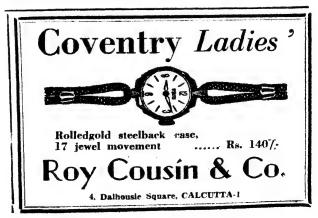
এই নগরীর নিকটবর্তী 'পেচাস্কি' অঞ্চলের অন্তর্গত 'বগোমলোভো' নামক গ্রামে এক দরিদ্র চাষী পরিবারের কর্তা ছিলেন 'পাভেল লুকিন'। লুকিনের পাঁচটি ছেলেমেয়ে ছিল, এবং সকলের ভরণপোষণের জন্য সেই লোকটাকে নানা মাঠে গিয়ে ক্ষেত-মজুরি করতে হত। পাঁচটি সন্তানের মধ্যে চারটি ছিল ছেলে, মেয়ে একটি। লুকিনের যে ছেলেটি বড়, তার নাম নিকলাই। সে ১২ বছর বয়স থেকেই ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়! সুবিধা পেলে জুতো পালিশ ক'রে দেয়,—তার থেকে পয়সা জমিয়ে নদীর ধারে মাছ কিনে বাজারে বেচে আসে। ১৪ বছর বয়সে কারখানায় কিংবা এখানে ওখানে মজুরি ক'রে পয়সা আনে। কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে সে লেখাপড়া শেখে। মাথাটা তার পরিষ্কার, এবং লেখাপড়াটা সে ভালই শিখল। অতঃপর সে একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে হিসেবনবীশের কাজ পেল। এইখানে একটি মেয়ের সংগে তার ভাব হয়। মেয়েটি ওইখানেই কাজ করত, নাম 'আলেকজান্দ্রা'! নিকলাইয়ের সংগে যখন বিয়ে হল, আলেকজান্দ্রার বয়স তখন ১৬। সেই বিবাহ ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে। কিন্তু সেই যুদ্ধের দশ বছর আগে অত্যন্ত বালক বয়সে অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নিকলাই 'গুপ্ত বিপ্লবী দলে' যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধের সময় আলেকজান্দ্রা কাজ নিল ফ্রণ্টে, এবং নিকলাই 'সাব-লেফটেনান্ট' পদে বহাল হল। কিন্তু সেই যুদ্ধ থামবার আগেই রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল, এবং বিপ্লবী নিকলাই আপন মেধা ও যোগ্যতার বলে হয়ে উঠল পেশকভ অঞ্চলের 'পার্টিজান্ কমাণ্ডার'। নিকলাই তার অধীনে ক্রমশ একটি সশস্ত্র বিশাল বাহিনী গ'ড়ে তোলে এবং তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭,০০০! এই যুবক অসীম বীরত্বের সঙ্গে একদিকে জমিদার-গোষ্ঠীর বিপক্ষে এবং অন্যদিকে দেশব্যাপী শত্রুদল 'হোয়াইট গার্ডসদের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তিনি 'পেনেভস্কিকভলস্তি' অঞ্চলের বিপ্লবী সংস্থার সভাপতি ছিলেন, এবং পরে তাঁকে 'পীপল্‌স কমিসার' অর্থাৎ মন্ত্রীর পদে উন্নীত করা হয়। ওদিকে জারতন্ত্রী 'হোয়াইট গার্ডস'-এর কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, যদি কোনও ব্যক্তি নিকলাইকে হত্যা করে অথবা তার মুণ্ডটি কেটে আনতে পারে তবে তাকে ৫,০০০ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পেশকভ শহরে দাঁড়িয়ে একদা জারসম্রাট দ্বিতীয় নিকলাস ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কেরেনস্কিপেরিত এক দলিলে সই ক'রে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

রাশিয়ার ঘরোয়া সংগ্রাম চলেছিল অনেকদিন। কিন্ত লেনিনের প্রিয়পাত্র এই ব্যক্তি মন্ত্রীপদে আসীন থাকাকালেও সেই ঘরোয়া-যুদ্ধ অনেকদিন অবাধ থামেনি। এই সময় নিকলাইয়ের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সেই সুদীর্ঘকালব্যাপী অরাজকতার কালে বছর দুইয়েকের মধ্যে আলেকজান্দ্রা পুনরায় যখন আসন্নপ্রসবা হয়—সেই সময় নিকলাই স্থির করে, আলেকজান্দ্রাকে পেশকভের বাড়িতে রেখে আসা দরকার! কিন্তু নিকলাই তখন চারিদিক থেকে সশস্ত্র শত্রুবেষ্টিত। অতএব সে স্থির করল, রাত্রির ঘন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে সে একটি ঘোড়াটানা ঘাসপাতার গাড়িতে তার অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রীকে কোনমতে বসিয়ে নিয়ে গা-ঢাকা দেবে! সঙ্গে সঙ্গে হে'টে যাবে ওই দুই বছরের ফুটফুটে মেয়েটা,—যার নাম রাখা হয়েছে 'লিডিয়া নিকলায়েভনা'! সে কতক যাবে হে'টে, কতক যাবে বাপের কাঁধে। তবে হ্যাঁ, গুলীভরা রাইফেলটাও কাঁধে নিতে হবে বৈকি!

নিঃসাড় রাত্রে ছোট্ট একটি খোলা ঘোড়াটানা গাড়িতে অসুস্থ আলেকজান্দ্রাকে শুইয়ে মেয়েটাকে চুপি চুপি কাঁধে নিয়ে নিকলাই মাঠের ধার দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেইদিকে, যেদিকটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। জনচারেক সশস্ত্র দেহরক্ষী বহুদূর পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে নিকলাইকে সেই তল্লাটের বাইরে পার ক'রে দিয়ে এল। ঘোড়ার মুখের রাশটি ধ'রে নিকলাই হাঁটিতে হাঁটিতে চলল। মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে!

ঊষার প্রাক্কালে একটি নালা ও খাদের কাছে এসে যখন গাড়ির পথ আটকে গেল, সেই সময় মেয়েটাকে কোল থেকে নামিয়ে নিকলাই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিল, এমন সময় সেই অতর্কিত মুহূর্তে নিকটবর্তী ঝোপজঙ্গলের ভিতর থেকে সহসা শত্রুপক্ষের রাইফেলের গুলী ছুটে এসে নিকলাইয়ের শরীরে বিদ্ধ হয়, এবং সেই গণ্ডগোলের মধ্যে দুই বছরের মেয়েটা খাদের মধ্যে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায়! এর পর আসন্নপ্রসবা আলেকজান্দ্রা, জ্ঞানহারা শিশুকন্যা লিডিয়া, এবং নিকলাইয়ের রক্তাক্ত শবদেহ শত্রুদের হাতে পড়ে। বলা বাহুল্য, শ্বশুরবাড়ির আর কোনও খবর আলেকজান্দ্রা পাননি!

এর পর 'হোয়াইট গার্ডসের' সৈন্যরা নিকলাইয়ের দুই সহোদর ইভান এবং মিখাইলকে বহুবিধ শারীরিক উৎপীড়ন করার পর গুলী ক'রে মারে। অন্য দুটি ভাই—তার মধ্যে একটি [illegible]—তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে এস্টোনিয়াতে আশ্রয় নেয়। তাদের আর কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায় না।

আলেকজান্দ্রার আর একটি কন্যা জন্মায় কিন্ত দু'বছর বয়সে সে মারা যায়! জননীর কাছে 'লিডিয়া' লেখাপড়া শেখেন, এবং টীচার্স ইন্‌স্টিটিউট থেকে তিনি গ্রাজুয়েট হন্। এখন তিনি শিক্ষকতা করেন। তাঁর দুই কাকা নাৎসী বাহিনীর অবরোধ কালে এসটোনিয়া থেকে গ্রেপ্তার হয়ে 'গ্যাস চেম্বারে' প্রেরিত হন্, এবং সেখানেই তাঁদেরকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে হত্যা করা হয়। কিন্তু তাঁদের ছেলে-মেয়েরা পেশকভের বাড়িতে কোনওমতে বেঁচে যায়! এতকাল পরে কোনও এক সূত্রে আলেকজান্দ্রা তাঁর শ্বশুর পরিবারের খবর পান্, এবং সেই সূত্র ধ'রেই যে ভাইটি লিডিয়াকে চিঠি দিয়েছেন তিনি লিডিয়ার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। লিডিয়াকে সকল সংবাদ জানিয়ে আমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়ে অবিলম্বে তিনি পেশকভে যেতে লিখেছেন! চিঠির মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হৃদয়াবেগ ও ভালবাসার মাধুর্যটি উপলব্ধি ক'রে শ্রীমতী লিডিয়া ঝরঝরিয়ে কাঁদছিলেন!

এই দিনটির প্রায় আট মাস পরে বালটিক প্রান্তবর্তী 'পেচরি' নামক একটি গ্রাম থেকে শ্রীমতী লিডিয়া আমাকে কয়েকখানি পত্র লেখেন। তার মধ্যে একখানিতে এই কয়েকটি ছত্র ছিল ঃ

"In the "Pskov Pravda" of the city of Pskov on 31. 12. 58 an article dedicated to my father was published I quote here a few lines from the article for you. (Forgive my poor English) My family members visited the graveside of my father along with me and they all wept." At the very fence of the cemetry which is situated a kilometre away from a village of the Latvian Republic, there is seen a small hill under a curly thick birch tree. It is the grave of the "Military Commissar of Pankovsky District, Nikolay Pavlovich Lookin,who stubbornly fought for the strengthening of the Soviet power, was killed in the fight against White Guards".

আরেকখানি পত্রে তিনি লেখেন, তাঁর পিতার নামে এখানে একটি মিউজিয়াম ও স্মৃতিসৌধ রয়েছে এবং এখানকার গ্রামে প্রতি বছর তাঁর স্মৃতি উপলক্ষে একটি মেলা হয়,—এগুলি এতকাল ধ'রে তিনি জানতেন না।

"I became all of a sudden a "hero" when I reached my village, as I am the only living child of my father."

নিকলাই লুকিনের ঘটনাবহুল জীবনী পূর্বোক্ত মিউজিয়মে সুরক্ষিত আছে!

'পেচরি' গ্রাম থেকে শ্রীমতী লিডিয়া যে প্রথম পত্র আমাকে লেখেন, সেখানি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এখানে তার অনুবাদটি তুলে দিই ঃ

"শিশু অবস্থার পরে জীবনে এই প্রথম পিতৃভূমিতে পদার্পণ করলুম। মনে করুন, সেই আমরা যাচ্ছিলুম মস্কো থেকে লেনিনগ্রাডের দিকে। মাঝপথে সেই স্টেশনে নামলুম যেখানে 'আনা কারেনিনা' প্রথম দেখেছিল 'ভ্রন্‌স্কিকে'। তারপর উত্তর পশ্চিমে গাড়ি চলল বালটিক রিপাবলিকের দিকে। রাত

১২টায় নামলুম 'পেচরি' ষ্টেশনে। দাদা, বৌদি এবং তাঁদের বড় মেয়ে ষ্টেশনে এসেছিলেন। এই ষ্টেশনের কাছেই রয়েছে ষোড়শ শতাব্দিতে নির্মিত খৃষ্টানদের প্রাচীন মঠ (Church monastery), আমি তখনই সেটি দর্শন করতে গেলুম! সেটি দেখে আনন্দ পেলুম। সেখানে এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা. তিনি আমার বাবাকে চিনতেন। পরদিন গেলুম এসটনিয়ায় মাইল আষ্টেক দূরে। সেই গ্রামে একটি 'গানের জলসা' ছিল—সেটি বহু সম্প্রদায়ের আসর। আমাদের গ্রাম পেশকভ প্রদেশের অন্তর্গত। এই গ্রাম এককালে সবচেয়ে দরিদ্র ছিল। এই অঞ্চল একদা ঘরোয়া যুদ্ধে সামাজিক অনাচারে, বুর্জোয়ারাজের উৎপীড়নে এবং পরিশেষে ফাসিস্তদের সর্বনাশা অধিকারে গিয়ে এর দুর্গতির অন্ত থাকে না। সেই সব সাংঘাতিক কাহিনী আমাকে শুনতে হল।

"শুনে অবাক হবেন যদি বলি, আজ একটিও দরিদ্র পরিবার এখানে নেই! কাল সেই 'জলসায়' গিয়ে দেখি, আমি ছাড়া আর সকলের পরণে রেশমী পোষাক! কী সুন্দর সকলের স্বাস্থ্য!... আমার বাবা এক বুড়িকে দুবছর ধ'রে 'ওরেরি' যুগিয়ে তবে একটি সুতী-শার্ট পেতেন তাঁর ছোটবেলায়। সেই বুড়ির বাড়ি দেখলুম। একজোড়া জুতোর জন্য এককালে একটি গরু দিয়ে দিতে হত! একখানি বাইসাইকেল কিনতে গেলে ৪টি গরু বেচতে হ'ত। এখন একটি গরু বেচলে ৪ খানারও বেশি সাইকেল কেনা যায়! বিপ্লবের আগে এ অঞ্চলের লোক চাউলের দানা বা চায়ের পাতা কেমন, চোখেও দেখেনি! 'চিনিও' দেখেছিল কিনা সন্দেহ! এখন এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না!

"আমি যে বাড়িতে জন্মেছিলুম, সেই বাড়ি ফাসিস্তরা ভস্মীভূত করে! যুদ্ধের পর গভর্ণমেণ্ট নতুন বাড়ি পরিচ্ছন্নভাবে বানিয়ে দেন। আমার কাকাদেরকে হত্যা করার পর আমার খুড়তুতো ভাই-বোনরা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেনি এবং উৎপীড়নের ভয়ে তাদেরকে পিতৃ-পরিচয় গোপন ক'রে বাঁচতে হয়েছিল সুদীর্ঘকাল! তাদের জীবনের কাহিনী শুনতে শুনতে চোখের জল সামলানো যায় না.........

"এখানে নদী নেই, আছে একটি শীর্ণ স্রোতস্বিনী। সেখানে স্নান করা যায় সাঁতার কাটা যায় না। প্রাকৃতিক শোভা সুন্দর, কিন্ত বড্ড ঝোপজঙ্গল তাছাড়া ভয়ানক সাপের ভয়..... জাম কুড়োতে যেতে সাহস হয় না... ......চেষ্টা করেও এগোতে পারিনে! কাল গিয়েছিলুম 'জলসায়' নিজেই ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে। গাড়ি আমি ভালই চালাতে পারি। এখানে এখন রাতে অন্ধকার নেই! রাত ১১টার পরে আলো না জেনলেও বেশ লেখাপড়া করা চলে। এটি আমার কাছে একটু আশ্চর্য লাগে। মস্কোয় এখন রাত আটটায় আলো জ্বালতে হয়! এখানে এখন সম্পূর্ণ 'অন্ধকারই' নেই, এবং আর মাসখানেক এই রকম থাকবে। তারপর ধীরে ধীরে আসবে রাত্রি, সেই রাত্রি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকবে.........

"আজ আমার ভাইঝির সঙ্গে গরু ও ভেড়া চরাতে গিয়েছিলুম। এ কাজও ভাল পারি। কিন্তু মাঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম! ভাইঝির কাছে আমার 'চাকরিটা' গেল! ...আজ আপনার জন্মদিন আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আশা করি আমার টেলিগ্রামটি পেয়েছেন! এই চিঠি আসছে কাল ডাকে দেবো। ইতি—"

চিঠিখানা হৃদয়াবেগের সঙ্গে জড়িত ছিল। সুতরাং প'ড়ে শেষ করতে কিছু সময় লাগল। অতঃপর শ্রীমতী লিডিয়া মুখ-চোখ মুছে যখন একটু সুস্থির হয়ে বসলেন আমি তাঁর দিকে তাকালুম। প্রথম দিন থেকে লক্ষ্য করেছি, এই মহিলার সর্বপ্রকার মিষ্টমধুর আচরণ এবং অপরিসীম সেবা-যত্নের অন্তরালে একটি পৃথক ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে থাকে। তাঁর সুন্দর মুখশ্রী, পোষাক-পরিচ্ছদের শোভনতা, ব্যবহারিক সংযম এবং স্বভাব কোমলতার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে ঈষৎ উগ্রমতি একজন নির্জলা কমিউনিষ্ট। সেখানে তিনি অনমনীয় এবং আপোষবিহীন। অকসানা, নাটাশা, মেরিয়ম, নীনা,—এদের সকলকে যে কোনও দেশের সমাজে মানিয়ে যাবে। শ্রীমতী অলেসিয়া বা সোয়েৎলানা—সব দেশেই প্রিয় হবে। কিন্তু শ্রীমতী লিডিয়া কেবলমাত্র রাশিয়াতেই সম্ভব! তাঁর বিশ্বাস মানব জাতির 'ভূ-স্বর্গ' একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও নেই!

আজ দেখি অন্য মেয়ে! এ মেয়ে 'মানবী'। দুঃখে-বেদনায় এবং মমতায় এই মহিলার চেহারাটি আমার সামনে যেভাবে প্রতিভাত হচ্ছে, সেটির সঙ্গে গতরাত্রির 'রুশ-আমেরিকান' সংগ্রাম ঘোষণা'র কোথাও মিল নেই! সেটি খোলস এমন কথা বলিনে কিন্ত আজ যেটি অশ্রুর আবেগের ভিতর দিয়ে দেখছি, সেটি খোলস নয়। আজ মনে হচ্ছে, জীবনের যে অনন্ত বৈচিত্র্য সেটি সর্বত্রই এক! সেখানে ভারতবর্ষের কোনও দুর্গম গ্রামের অশিক্ষিত মেয়ে নিউ-ইয়র্ক-লণ্ডন, প্যারিস-রোমের লিপষ্টিক ঘষা মেয়ে অথবা রাশিয়ার প্রসাধন-বিলাসবিহীন মেয়ে, এদের মধ্যে তফাৎ কম!

আমি চুপ ক'রে গিয়েছিলুম। এবার মুখ খুললুম। বললুম, আপনার পারিবারিক জীবন খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত জীবন আমি জানিনে। আপনার একটি ছেলে আছে, এ ছাড়া কিছু শুনিনি!

আপনি শুনতে চান?

শুনতে চাওয়াটা শোভন নয়!

লিডিয়া নিজেই বললেন আমার ছেলেটির বয়স ১৮। সে একজন ছাত্র—থাকে তার দিদিমার কাছে। ছেলের বাবা ছেলেকে খুব ভালবাসেন। দরকার হলে ছেলের খরচপত্র দেন। তিনি বিশেষ স্নেহশীল এবং হৃদয়বান। তিনি থাকেন অন্যত্র। তাঁর অবস্থা বেশ ভাল।

বললুম, কিন্তু আরেকটা কথা যে উহ্য থেকে যাচ্ছে, ম্যাডাম?

শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, ছেলের বাবার সঙ্গে ছেলের মায়ের কিছুমাত্র বিরোধ নেই! টাকাকড়ি বা অন্যান্য সাহায্যের দরকার হলে ছেলের মা যান ছেলের বাবার কাছে! তিনি বিশেষ বিবেচক মানুষ অতিশয় ভদ্র!

কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ সবাই জানে, ছেলেদের মায়েরা আর বাপেরা একত্র বসবাস করে। অভিধানে বলে, তা'রা নাকি স্বামী এবং স্ত্রী!

সোভিয়েট ইউনিয়নেও তাই বলে!—তবে এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে উভয়ে একত্র বসবাস করেন না! সোভিয়েট আদালতের রেকর্ডে এটি পাওয়া যাবে তাঁদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে গেছে বছর দশেক আগে!

এবার সাহস ক'রে বললুম, এই বিচ্ছেদের পর উভয় পক্ষের কে ক'বার পুনরায় বিবাহ করেছেন, জানতে পারি কি?

কেউ একবারও করেননি!—শ্রীমতী বললেন, ছেলের বাবা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এসব ব্যাপারে তাঁর ভ্রূক্ষেপও নেই। পড়াশোনা নিয়ে তিনি একা থাকেন। বিচ্ছেদ ঘটলেও তিনি তাঁর স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে চান!

আমি পুনরায় তাঁর দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের দেশে এটি ঘটে,—বোধ হয় অনেক দেশেই ঘটে। বার বার স্বামী অথবা স্ত্রী বদল করার পর অনেকেই ফিরে আসে প্রথম বিবাহের সম্পর্কে! জানিনে তা'রা কেমন!

একটু অবাক হয়েছিলুম সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব ব্যক্তিগত আলোচনা বেশি দূর চলে আমার ইচ্ছা নয়। মানুষের জীবনে অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্নটাও অনেক সময় জটিল হয়ে থাকে। প্রণয়ী এবং প্রণয়িনীর সম্পর্ক চিরদিনই সহজবোধ্য। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভিতরকার প্রকৃত সম্পর্ক চিরকাল জটিল দুর্বোধ্য, অপ্রকাশ্য এবং বিশ্লেষণের অতীত। এ ব্যাপারটি নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে কারও মাথা ঘামাবার সময় নেই, এ

নিয়ে মামলাও চলে না কোথাও দীর্ঘকাল! সেই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা শেষ হয় মাত্র দশ মিনিটে!

শ্রীমতী লিডিয়া এবার উঠে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার স্বামী অত্যন্ত ভদ্র এবং সুশিক্ষিত। তিনি আমার দূর-সম্পর্কের কুটুম্বও বটে! তাঁর ছাত্রাবস্থায় আমি উপার্জন ক'রে তাঁকে সাহায্য করতুম! আমাদের বিবাহ ছিল বিশেষ আনন্দের! উভয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্রও বিতর্ক ছিল না। তবু আট বছরের মধ্যে সেই বিবাহ-বন্ধন ঘুচে গেল!

এ নিয়ে আর কোনদিন কথা ওঠেনি।—

পরদিন আমরা গিয়েছিলুম একটি স্যানাটোরিয়মের কনসার্ট হল-এ। সেখানে সঙ্গীতানুষ্ঠানের পরে একটি কনসার্ট-নাটক 'স্বামী-স্ত্রী' অভিনীত হল। এটি যেন অনেকটা কৌতুকনাট্য। স্ত্রীর জন্ম-দিনে স্বামী একটি উপহার দিচ্ছেন, সেটি স্ত্রীর পছন্দ নয়! এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে মস্ত বচসা এবং বিতর্ক। উভয় পক্ষেরই বক্তব্য ছিল বেশ চড়া সুরে। নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হল, যা পেয়েছ তাই নিয়ে যদি সুখী না হও, তাহলে মনে মর্মেই দুঃখ পাবে,—কিন্তু অবস্থার প্রতিকার হবে না। শেষ পর্যন্ত এইটি দাঁড়াল, স্বামীর অকৃত্রিম এবং আন্তরিক ভালবাসাই হল নারীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপহার! এই মিলনান্তক এবং কৌতুক-নাট্যটি যন্ত্রসঙ্গীতের দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছিল। এটি সকলেই উপভোগ করে-ছিলেন। এই নাটকটি দেখার পর অভিনেতা এবং অভিনেত্রীটির সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ ঘটল, তখন জানলুম, বাস্তব জীবনেও তাঁরা স্বামী-স্ত্রী।

মিঃ নিকলাই ভিনিকভ আমাদের নিয়ে গেলেন কৃষ্ণসাগরের উপরে 'মোটর-বোট বিহারে'। আমি সাঁতার জানিনে। অজানা কালো সমুদ্র,—এবং তার বিদেশী কালো জলের করাল রূপে আমার মনে নিয়ে এল ত্রাস! তরঙ্গের উপর দিয়ে মোটরবোটের দুরন্ত দ্রুতগতির চেহারাটা খুব উৎসাহজনক মনে হচ্ছে না। আমার কাছাকাছি ব'সে লিডিয়া যখন বললেন ভয় পাবেন না, আমি ভালই সাঁতার জানি!—তখন আমাকে বলতেই হল, ডুবে মরার আগে লোকে খড়কুটো আঁকড়ে ধ'রেই ডোবে! সুতরাং আমাদের দুটি 'মৃতদেহ' যখন একই সঙ্গে তোলা হবে,—সেটি এদেশে-ওদেশে কোথাও আনন্দ-দায়ক হবে না!—আমার কথা শুনে ও'রা দুজন হেসেই লুটোপুটি!

সেদিন অপরাহ্ণে ভিনিকভের ওখানে 'মধ্যাহ্নভোজের' আমন্ত্রণ ছিল। সেই মধ্যাহ্নভোজ রুশীয় সামাজিকতা অনু-সারে মধ্যরাত্রির কাছাকাছি অবধি চলল। কিন্তু সেদিন বিদেশী অতিথি প্রথম থেকেই এই নাট্যকার পরিবারের রান্না-ভাঁড়ার, শোবার ঘর, বারান্দা, বৈঠকখানায় এমনিই অবাধ অধিকার পেয়েছিল যেটি উল্লেখযোগ্য। ভিনিকভের অতি ভদ্রা স্ত্রীর সকল প্রকার পরিচর্যায় ওই ৭।৮ ঘণ্টা কালের মধ্যে একবারও মনে হয়নি, আমি আমার সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের বাইরে এসেছি! সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কথাই যদি ধরি, তাহলে আমার বিশ্বাস, সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের সঙ্গে ভারত-প্রকৃতির এত নৈকট্য নেই! সেদিন-কার আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে রুশ ভাষা কোথাও অবরোধ সৃষ্টি করেনি!

নিকলাই অস্ত্রভস্কি নামক একজন নব্যকালের প্রসিদ্ধ লেখকের স্মৃতি-মন্দির ও যাদুঘর 'শোচি' শহরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এঁর একখানি উপন্যাস "How The Steel Was Tempered" সোভিয়েট ইউনিয়নে ১ কোটি ২০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়। এই লেখক ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে একটি গ্রামীণ চাষী-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-লাভের পর তিনি লেনিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বলশেভিক বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েন! তিনি যখন লালফৌজে যোগদান করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫। ঘরোয়া যুদ্ধের কালে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়। অতঃপর নানাবিধ ব্যাধির আক্রমণে তাঁর স্বাস্থ্যও ভাঙ্গতে থাকে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি চিরদিনের মতো শয্যাগত হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ এবং তাঁর দুখানা হাত ছাড়া সমগ্র দেহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়। এই সময় তিনি তাঁর স্ত্রী, ভগ্নী এবং বন্ধুদের কায়িক সাহায্যে পূর্বোক্ত রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই বইখানি তাঁকে যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে সেটি যে কোনও লেখকের পক্ষেই দুর্লভ সৌভাগ্য। এই তরুণ লেখকের তেজস্বিতা, আদর্শ-নিষ্ঠা, জীবন-পর্যালোচনা এবং অপরি-সীম দরদ তাঁকে সোভিয়েট ইউনিয়নে বহুজনশ্রদ্ধেয় ক'রে রেখেছে। বিগত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মস্কো নগরীতে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে এই অনন্যসাধারণ লেখকের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর আগে বহু বছর তিনি 'শোচিতে' বাস করেছিলেন।

অস্ত্রভস্কির প্রবীণা ভগ্নি শ্রীমতী অস্ত্রভস্কায়া এবং এই যাদুঘরেরই অপর একজন প্রবীণা কর্মী শ্রীমতী লাজারেভা সমস্ত বাড়িটিতে অস্ত্রভস্কির সকল চিহ্নগুলি আমাকে সযত্নে ঘুরিয়ে দেখালেন। ভিজিটার্স বুক-এ আমি লেখকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানালুম।

এখানকার বটানিক্যাল গার্ডেনে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ থেকে মোট ৮০০ রকমের গাছ এনে বসানো হয়েছে। তার মধ্যে ভারতীয়, আম, নিম, কলা ও নারকেলকে চিনতে দেরি হয় না। এখান-কার সাব-ট্রপিক্যাল আবহাওয়া সত্ত্বেও ওদের না আছে বৃদ্ধি, না আছে ফুল-ফল, না বা মৃত্যু! ওরা তামাশার মতো শুধু দাঁড়িয়েই রয়েছে।

কিন্তু শোচির মস্ত বাজার এবং হাটতলা ছাড়িয়ে পাহাড় অলিগলি পেরিয়ে একটি সিনেমাহলে গিয়ে যেদিন মিখাইল সলোকভের, "Quiet flows the dawn" বইটির সুদীর্ঘ ছবিটি দেখলুম, সেদিন সোভিয়েট ইউ-নিয়নের সিনেমা-শিল্পটি আমার নিকট অতিশয় শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিল। এ ছবি এত জীবন্ত এবং এমন বাস্তব চেহারা নিতে পারে, এটি অবিশ্বাস্য। "আউট-ডোরের" সঙ্গে "ইনডোরের" যে মনোজ্ঞ সংমিশ্রণ লক্ষ্য করেছিলুম, সেটি আমার পক্ষে স্মরণীয়। এমন চিত্রনাট্য রচনা, প্রয়োগশিল্প এবং প্রাণবন্ত অভিনয় আমি অল্পই দেখেছি।

শোচি শহরে আমি হঠাৎ খ্যাতিমান হয়ে উঠলুম, যেদিন ট্রান্স-ককেশিয় ভাষার একখানি দ্বি-সাপ্তাহিক 'রেড ব্যানার নামক কাগজে আমার একটি ছোটখাটো জীবনী ও একটি ছোট প্রবন্ধের অনুবাদ ছাপা হল। হঠাৎ-খ্যাতি বোধহয় রামধনুর মতো এক সময় মিলিয়ে যাবার ভয় থাকে! সেইজন্য স্থানীয় লেখকসঙ্ঘের কর্তারা সেদিন নিয়ে গেলেন তাঁদের আয়োজিত একটি সভায়। সভাটি খুব ছোট নয়। সেখানে চেনবার জো নেই, কা'রা কোন্ সম্প্র-দায়ের লোক। বস্তুত, মধ্য-এশিয়ায় অথবা মঙ্গোলয়েড রক্তের কাছাকাছি না এলে জাতি-বৈশিষ্ট্য আর কোথাও চেনা যায় না। যাই হোক, সভাস্থ নরনারীরা এর আগে অবশ্য লেখক বস্তু কেমন, অবশ্যই দেখেছেন,—কিন্তু একজন ভারতীয়কে তাঁরা দেখলেন এই প্রথম! যেখানে শোনার আগ্রহ অপেক্ষা দেখার আগ্রহ বেশি,—সেখানে একটু ভিড় হয় বৈকি! শ্রদ্ধা অথবা বিরক্তি আসে পরে, কৌতূহল আসে সকলের আগে! ওদের কাছে আমি প্রধান নয়, 'ভারত' প্রধান! অভ্যর্থনা জানাচ্ছে ভারতকে আমাকে সামনে রেখে। আমি নমস্কার জানালুম হাতযোড় ক'রে,—কিন্তু সে-নমস্কার 'ভারতের'! ভারত প্রসন্ন কিনা, সেটি প্রকাশিত আমার অভিব্যক্তিতে! আমি কথা বলছি ভারতের মুখে! অহমিকা, আত্মশ্লাঘা, মাৎসর্য, আত্মা-ভিমান, অনমনীয় কঠোর মতবাদ—এরা ভারতের নয়! আমরা পরস্পর অপরি-চিত! কেউ কারো ভাষা জানিনে, উভয়ের সমাজব্যবস্থায় মিল নেই, জীবনাদর্শ পৃথক, কেউ কারও কুটুম্ব নয়, বিরাট এক অপরিচয়ের ব্যবধান দুইয়ের মাঝখানে! কিন্তু ভালবাসা ও বন্ধুত্বের ভাষা হল তার নিজস্ব! সেখানে সামান্য সুন্দর হাসি, ঈষৎ

একটি মধুর স্পর্শ—তারই মধ্যে আস্বাদ পাওয়া যায় অমৃতের! মানুষের পরমাশ্চর্য সত্তা তারই স্পর্শে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেখানে কৃষ্ণসাগরের নাবিকের সঙ্গে গঙ্গাসাগরের নৌকার মাঝির চিরকালীন সম্পর্কটি অচ্ছেদ্য প্রাণসূত্রে বাঁধা! এই ককেসাস অঞ্চলের প্রতি ব্যক্তির মর্মস্থলে অবাধে পৌঁছতে পারি সামান্য একটি ছাড়পত্র নিয়ে,—যদি হাসিমুখে তার হাত ধরতে পারি! ভারতবর্ষ এমনি করে হাত ধরতে চেয়েছে চিরদিন! স্বার্থসিদ্ধি, মতবাদ-প্রচার, রাষ্ট্রসীমানা, শক্তি ও শৌর্যের আস্ফালন,—এর জন্য ভারত ছোটেনি কখনও দিগ্বিদিকে। কিন্তু সে ভীরু একটি প্রদীপ হাতে নিয়ে ভিক্ষুর বেশে গিয়েছে দেশ-দেশান্তরে। সে-প্রদীপ জ্ঞান-পিপাসার, বিদ্যার্জনের, অধ্যাত্ম আনন্দের! ভারতে সেই প্রদীপ আজও জ্বলছে!

ভারতীয় সাহিত্য সেই কারণে কেবলমাত্র বুদ্ধিপ্রতীক জড়বাদী হয়ে ওঠেনি! সাহিত্যে সে সুখসমৃদ্ধির কথা ভাবেনি, সে আনন্দের অনুসন্ধান করেছে! তা'র সাহিত্যচিত্তের গঠন হয়েছে জ্ঞানপ্রতীক। দেবাসুরের সংগ্রামে সে সমুদ্র-পরিমাণ গরল পান করেছে অমৃতের সন্ধানে! ভারতের চিরায়ত সাহিত্য সেই অন্তহীন জ্ঞান-সাধনার একটি মহৎ আসন! সেই জ্ঞান-সাধনার ধারা চলে এসেছে কাল থেকে কালান্তরে,—তার ইতিহাস বাল্মীকি-বেদব্যাস-কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথে এসে পৌঁছেও শেষ হয়নি! ভারতের সাহিত্যে চিরকালের পরমায়ু লুকানো আছে বলেই চিরকাল সে নতুন!

আধুনিক সোভিয়েট লেখকের তুলনায় ভারতের লেখকরা বড় দরিদ্র! কিন্তু সেটি তাদের অঙ্গের ভূষণ। রাষ্ট্রের সহায়তা তাদের কাম্য নয়, সেইটি তাদের গৌরব। সেখানে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম আছে আছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা, আছে নির্দয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আছে সামাজিক জীবনের নানাবিধ গ্লানি। কিন্তু সেই কঠোর পরীক্ষার মধ্যেই ত' শক্তিমানের পরিচয়! সমস্ত দুর্যোগ, বিরোধ, দুর্ভাগ্য এবং বিরূপতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে যে সাহিত্য-সাধক,—তাকেই ত' বলি প্রতিভা! সে অপরাজেয় বলেই ত' বরেণ্য! ভারতের প্রত্যেকটি লেখক হ'ল যোদ্ধা,—জীবন-যাত্রার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে প্রাণপণ সংগ্রাম করে বলেই সে স্বাধীনচিত্ত! অনায়াসলভ্য সৌভাগ্য তা'র চোখে সম্মানজনক নয় বলেই সে [illegible] বিরূপ! ভারতীয় [illegible] কবি শিল্পী [illegible] মনীষী—এঁরা [illegible] এঁরা [illegible] এঁদের [illegible] নেই এঁদের [illegible], অভিরুচি, অভিমত,—সমস্তই নিজস্ব। এঁরা মন্ত্র দান করেন আপন প্রতিভার শক্তিতে, কিন্তু মন্ত্র গ্রহণ করেন না! পৃথিবীর আর কোনও আকাশে এমন স্বচ্ছন্দবিহারী বিহঙ্গের দল আছে কিনা আমার জানা নেই!

নমস্তে!

এটি পুরী কিংবা দ্বারকার সমুদ্র নয় যে, ক্রমনিম্নমান ঢালু ধীরে ধীরে গভীরে চলে যাচ্ছে! কৃষ্ণসাগর হল একটা বিরাট গহ্বর, যার ধারে পা পিছলে প'ড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ৬৫৬ ফুট নীচে তলিয়ে যেতে হয়। এ যেন এক অতিকায় জলপাত্র, এবং এর গর্তটা লম্বায় ৭১৬ মাইল এবং চওড়ায় ৩৭৮ মাইল। এই গহ্বরের গভীরতা ৭৩৫৭ ফুট। এর আশেপাশে আগ্নেয়গিরির নানাবিধ উৎপাত আছে। এর জল অতি বিকৃত-স্বাদ, একপ্রকার ক্ষার ও গন্ধকমিশ্রিত পোড়া গন্ধ—যেন ঢালাই-লোহার কড়াইয়ে সিদ্ধ করা জল! এই সাগরের পূর্বদিকে ককেসাস পর্বতমালার ফাটল থেকে অবিশ্রান্ত উত্তপ্ত ধাতব জলধারা যেমন নামছে, যেমন নামছে তুষারবিগলিত 'রাইওনি, ইংগুরি' প্রভৃতি উপরিভাগের নদী,—তেমনি কৃষ্ণসাগরের উত্তর লোক থেকে নেমে এসেছে ইউরোপের চারটি বৃহৎ নদী,—'দানিউব, নীষ্টার, বাগ ও নীপার'। এই সমস্ত জল পশ্চিমে এশিয়া মাইনর বা তুরস্কের গা বেয়ে 'বসফোরাস' প্রণালীর ভিতর দিয়ে 'ইজিয়ান, মর্মর ও ভূমধ্যসাগরের' দিকে চলেছে! ভূতত্ত্ববিদরা বলেন,

"In remote geological times what are now the Black, Azov and Caspian seas was a gulf of the ancient Mediterranean which extended from the Atlantic far to the East—to the Arctic and Indian oceans—and covered the territory of Southern Europe North Africa and Central Asia In the tertiary period when the great tectonic upheavals gave rise to the Himalayas, Alps and Caucasian mountain ranges and the deep valleys intersecting them, the ancient sea retreated and formed seperate basins."

খৃষ্টপূর্ব বহু শতাব্দীর আগে ফিনিসিয়ানরা (Phoenicians) এবং গ্রীকরা এসে কৃষ্ণসাগরের তীরে-তীরে উপনিবেশ গড়ে। পরবর্তীকালে যাযাবরের দল এসে গ্রীক উপনিবেশ ধ্বংস করে। তারপর আসে রোমানরা। তারাও পরে পালায় যাযাবরদের জন্য। অবশেষে এসে পৌঁছয় বাইজানটাইনরা। তারা আবার গ্রীক উপনিবেশ গড়ে তোলে। এমনি ক'রে বহু শতাব্দী চলে যায়। তারপর দশম শতাব্দিতে স্লাভরা আসে। তাতার ও মঙ্গোলরা এসে দাঁড়ায় ১৩শ শতাব্দীতে। তারা মারধর করে সবাইকে এবং রাশিয়ানরা পালায়। অতঃপর তুর্কীরা মাথা তোলে, এবং তারা ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই সাগরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। কিন্তু কালের গতি স্তব্ধ হয়ে থাকে না। ১৮শ শতাব্দী থেকে রাশিয়ানরা তুর্কীদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে আবার ফিরে আসে কৃষ্ণসাগরে। তারা সমগ্র উত্তর ভাগ দখল করে। অতঃপর বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯২০ সালে এই সাগরের সমগ্র পূর্বসীমানা বহুবিধ সংঘর্ষ এবং অরাজকতার পর সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পূর্ণ দখলে আসে। আজ কৃষ্ণসাগরের সর্বত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রচণ্ড শক্তিশালী নৌবাহিনীর সর্বময় প্রভুত্ব! এদেরই একটি মনোরম 'নেভি কনসার্ট' সেদিন বসে বসে দেখছিলুম।

আমাদের সুন্দরবনের নিভৃত নদীর চড়ায় শীতের দিনে যেমন বড় বড় মোটাসোটা কুমীরগুলি রোদ্রের মধ্যে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে; তেমনি কৃষ্ণসাগরের ধারে ধারে প্রায়নগ্ন নরনারীরা ছড়িয়ে থাকে গা ঢেলে দিয়ে। ওদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি, কেননা সাধারণতঃ জনতার মধ্যে ওরা বিবস্ত্রা হবার সুবিধা পায় না! যাদের বয়স কিছু বেশি, তারা বেশি স্থূল, এবং ঈষৎ চক্ষুলজ্জা থাকার জন্য কেউ কেউ রঙ্গীন ছাতার সাহায্যে সূর্যালোক এবং নিরীহ পথিকের দৃষ্টি থেকে 'মুখরক্ষা' করে! ভারতে এরূপ দৃশ্য দেখার অভ্যাস নেই বলেই নিজের চক্ষুকে অনেক সময় বিশ্বাস করতে পারিনি! কিন্তু কুমীরের প্রয়োজন আছে সূর্যসম্ভোগের, আমি তার ত্রিসীমানায় নাই বা এলুম!

শোচিত্যাগের পূর্বরাত্রে ফিয়োডোর জোরিন একটি ভূরিভোজের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী রান্না করেছেন নিজে। তাঁর বালকপুত্র অতি উৎসাহী। এই ভোজে উপস্থিত ছিলেন জনৈক তরুণ ফটোগ্রাফার, 'অগনিয়োক' কাগজের একজন প্রতিনিধি এবং পররাষ্ট্র বিভাগের একজন কর্মচারী। এই সুন্দর চন্দ্রহাসিত পুষ্পনগরী পর্যটন ক'রে প্রথম একজন ভারতীয় আগামী কাল বিদায় নিচ্ছে, এজন্য সকলের ভাবাবেগ ছিল! পরম স্নেহশীল জোরিন আপন স্বভাবগুণে চোখ মুছেছিলেন কয়েকবার। এখানেও জর্জিয়ার রীতি অনুযায়ী অতিথির সঙ্গে চুম্বন-বিনিময়ের ব্যাপার ছিল। ফলে, আমার মুখের দিকে চেয়ে শ্রীমতী ক্লাডিয়া ঈষৎ বিব্রত বোধ করেছিলেন! অতঃপর হোটেলে ফিরে বিদায় নেবার কালে তিনি ব'লে গেলেন, সাবান দিয়ে মুখখানা ধুয়ে তবে বিছানায় উঠবেন!

(ক্রমশঃ)

কলারসিক

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতার বিভিন্ন প্রদর্শনী ভবনে অনেকগুলি চিত্র ও কারুশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে পার্ক ম্যানসনের আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে শিল্পী নিখিল বিশ্বাস ও ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে শিল্পী সান্ত্বনা গোস্বামীর চিত্র-প্রদর্শনী আমরা দেখে এসেছি। কারুশিল্পের প্রদর্শনীটি চলছে পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে এবং বাঙলার লোকশিল্পের প্রদর্শনীটি শুরু হয়েছে ৪, এলগিন রোডের 'রচনা' নামক প্রদর্শনী কক্ষে।

॥ শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের প্রদর্শনী ॥

শিল্পী নিখিল বিশ্বাস তরুণ শিল্পী। দু'একটি প্রদর্শনীতে ইতঃপূর্বে তাঁর ছবি দেখেছি কিন্তু তাঁর কোনো একক প্রদর্শনী দেখার সুযোগ এতকাল পাইনি। আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীর কর্তৃপক্ষ সেই সুযোগ করে দেওয়ায় আমরা আনন্দিত।

এই প্রদর্শনীতে শ্রীবিশ্বাস চৌদ্দখানি চিত্র-কর্মের নিদর্শন উপস্থিত করেছিলেন। এর মধ্যে আটখানা চিত্রের মাধ্যম ছিল টেম্পেরা ও চারখানা তেল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত। এই সঙ্গে চীনা কালিতে অঙ্কিত দু'খানি স্কেচও স্থান পেয়েছিল।

শ্রীবিশ্বাসের এই সব চিত্র-কর্মের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটি কথা আমার বারংবার মনে পড়েছে। শিল্পীর যদি কোনো জীবন-দর্শন না থাকে এবং সেই জীবন-দর্শন রূপায়ণের আঙ্গিক সম্পর্কে মনে যদি থাকে দ্বিধার ভাব, তবে সেই শিল্পীর নিকট থেকে কোনো ভাল শিল্প-কর্ম বোধহয় প্রত্যাশা করা যায় না। এবং 'কম্পোজিশান' এই চিত্র-নামের আড়ালে লুকিয়েও সেই দুর্বলতা ঢাকা যায় না। শ্রীবিশ্বাসও পারেননি। এবং ফলে, তাঁর চিত্র-কর্ম-দর্শনের পর কোনো ফলশ্রুতি, কোনো প্রাপ্তির আনন্দ নিয়েও আমরা ফিরতে পারিনি।

এমনটা কেন হয়? আসলে, বোধহয় সমস্ত তরুণ শিল্পীরাই এক বিশ্বাসের সংকটে ভুগছেন। তাঁদের চিত্র-কর্মে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এত কম থাকে যে, তার মধ্য দিয়ে প্রতিভাদীপ্ত কোনো ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে আমরা স্বাগত জানাতেও পারি না। নিখিলবাবুর মনেও দৃঢ় কোনো শিল্প-বিশ্বাস বাসা বাঁধতে পারেনি। প্রতিটি চিত্রেই এর সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। তিনি বাস্তব ও বিমূর্ত শিল্পকে মিলাতে গিয়েছেন, কোথাও শুধুমাত্র ব্যঞ্জনার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সীমিত কল্পনা-প্রতিভার জন্য কোনো শিল্প-বক্তব্য তেমন করে অন্ততঃ আমার মনকে নাড়া দিতে পারেনি।

অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে। এবং নিখিলবাবুর ড্রয়িং সম্বন্ধে চেতনাও অনেক তরুণ শিল্পীর চেয়ে প্রখর। বিশেষ করে যেখানে জন্তুর কোনো চিত্ররূপ তিনি অঙ্কন করতে চেয়েছেন সেখানে তিনি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর টেম্পেরায় অঙ্কিত ঘোড়া (৪), কিংবা 'পশুবধ' (৫) এই গতিশীল জন্তুর ছন্দিত রেখা ও বর্ণে বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর 'চন্দ্রালোক' (৯), গির্জা (১০) কিংবা 'কম্পোজিশান' নামধারী চিত্রগুলি মনে বিশেষ কোনো দাগই কাটেনি।

নিখিলবাবুকে এ-সব সত্ত্বেও আমি অভিনন্দন জানাই। তাঁর 'বাইসন' (৮) নামক স্কেচখানিতে তিনি যে অপূর্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা এই প্রদর্শনীর সম্পদ। পশুর এত ভাল জান্তব রূপ শুধু রেখায় তুলে ধরতে পারেন যে শিল্পী তাঁর ভবিষ্যৎ চিত্র-কর্ম দেখার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করবো। এই অবকাশে নিখিলবাবু তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি-মুক্ত হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

॥ শিল্পী সান্ত্বনা গোস্বামীর প্রদর্শনী ॥

ছাত্র-শিল্পী সান্ত্বনা গোস্বামীর প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছেন 'মহেঞ্জোদারো' নামক একটি পত্রিকার পরিচালকমন্ডলী। ক্যাথেড্রাল রোডের প্রদর্শনী কক্ষে ১৭ খানি চিত্রকলা ও ১৪ খানি খোদাই কর্মের প্রতিলিপি স্থান পেয়েছে। বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক থেকে শিল্পী বেছে নিয়েছেন পশু ও পক্ষীর নানা ভঙ্গী। তাঁর এই স্টাডির মধ্যে শিক্ষানবিশীর চিহ্ন থাকলেও রচনা-গুলির মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষরও আছে। মাটির সঙ্গে গাছের পাতা ও ফলের নির্যাস মিশিয়ে ইনি অনেকগুলি চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই খাঁটি দেশী পদ্ধতি মন্দ এফেক্ট সৃষ্টি করেনি। কয়েকখানি চিত্রে বিমূর্ত শিল্প-চেতনা প্রত্যক্ষ করা গেল। শিল্পী গোস্বামীর টান বোধহয় এই বিমূর্ত শিল্পকলার দিকে। অন্ততঃ তাঁর ভাস্কর্যশিল্পের প্রতিলিপিতে এই রূপ সুস্পষ্ট। শিক্ষানবীশ থাকা-কালে এই মানসিক চেতনা বোধহয় খুব ভাল ফল প্রসব করে না। বরং ভবিষ্যৎ শিল্পী-জীবন এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ, যার ফর্মের চেতনা দৃঢ়-ভিত্তির উপর গড়ে ওঠার অবকাশ পেল না, সে যদি ফর্ম-ভাঙ্গার নেশায় মেতে ওঠে তবে কি বাস্তব, কি বিমূর্ত কোনো শিল্পধারাতেই তার শিল্পকর্ম স্থান পাবে না। আশা করি শ্রীগোস্বামী এদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।

এই প্রদর্শনীর 'রোদ পোয়ানো' (২৫), 'ঝোপের উপর পাখি' (৬), 'মাতঙ্গ' (২৩) ও 'মোহাবেশ' প্রভৃতি চিত্রগুলি আমাদের মন্দ লাগেনি। আমরা এই ছাত্র-শিল্পীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

বাইসন —নিখিল বিশ্বাস

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিজনও সেই সমাজে সেই পরিবেশে মানুষ। সুতরাং তার প্রশ্নটা যে নিতান্তই অর্থহীন, সহজেই বুঝতে পেরেছিল, এবং উত্তরের মধ্যে যে বিস্ময় ছিল, তাতেও কিছুমাত্র বিস্মিত হয়নি। শুধু বিস্ময় নয়, তার সংগে জড়ানো একটা প্রচ্ছন্ন তিরস্কার তীক্ষ্ণ শরের মত তার বুকে এসে লাগল। বলবার মত আর কোনো কথা খুঁজে পেল না। সুরমা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। হাতের বালিশটার দিকে চেয়ে, যেন অন্য কারো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে, যার সংগে সে জড়িত নয়, এমনি নির্লিপ্ত সুরে বলল, যে কারণে আপনি বিয়ে করতে চাননি, তাও আমি জানি। সবই শুনেছি।

—কী জানো? কী শুনেছ তুমি? তড়িৎ স্পর্শে মানুষ যেমন চমকে কেঁপে ওঠে, তেমনি একটা ত্রস্ত স্বর বেরিয়ে এল বিজনের গলা থেকে।

—থাক; সে কথা আপনার ভালো লাগবে না।.. শান্তকণ্ঠে এই দুটি কথা বলেই সুরমা বালিশ আর কম্বলটা টেনে নিয়ে ওদিকের দেয়ালের পাশে মেঝের উপর গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। হয়তো এক সময়ে ঘুমিয়েও পড়েছিল। কিন্তু বিজন একটিবারও দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। অনেকবার মনে হয়েছে এখনই নেমে গিয়ে ওকে ডেকে তুলবে, হাত ধরে নিজের পাশটিতে বসিয়ে বলবে, তোমার সব অভিযোগ আমি অকপটে মেনে নিচ্ছি সুরমা। কিন্তু তোমার আমার মধ্যে যে বাধা দাঁড়িয়ে আছে সেটা অলঙ্ঘ্য নয়। তাকে আমি জয় করবো। তার জন্যে শুধু কটাদিন সময় চাইছি তোমার কাছে।

এই কথাগুলো যদি সেদিন মুখফুটে বলতে পারত, সুরমা হয়তো মুখ ফিরিয়ে থাকত না। কৈশোরে পা দিয়েই সে শুনে আসছে, বিজনের কাছে সে বাগদত্তা। দূর থেকে তাকে দেখেওছে অনেকবার। এই প্রিয়দর্শন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কৃতী ছেলেটির পাশে নিজেকে বসিয়ে বছরের পর বছর মনে মনে কত মধুর স্বপ্ন রচনা করেছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে উপভোগ করেছে সেই কল্পিত স্পর্শের শিহরণ। তারপর নানা কানাঘুষার মধ্য দিয়ে কোত্থেকে একখানা কালো মেঘ ভেসে এসে সেই নিত্যপ্রতীক্ষিত মিলনাকাশের একটা কোণ জুড়ে বসল। মা থেকে আরম্ভ করে বহুকালের পুরোনো ঝি সারদার মুখেও তার ছায়া। শঙ্কায়, বেদনায় তার সংগে কী এক অর্থহীন অভিমানে সুরমার ভীরু হৃদয় ভরে উঠল। বিজন যে তাকে চায় না, অন্য কারো কাছে তার মন বাঁধা পড়ে আছে— এই কথাগুলো নানাসূত্রে পল্লবিত হয়ে তার কানে আসতে লাগলো। তার মধ্যে একদিকে ব্যর্থতার বেদনা, আরেকদিকে প্রত্যাখ্যানের লজ্জা। সকলের চোখের আড়ালে নিজের ঘরের নিরালা কোণটি ছাড়া তার আর কোনো আশ্রয় রইল না।

তারপর একদিন তাদের ঝিমিয়েপড়া বাড়িটা হঠাৎ যেন কোন যাদুমন্ত্রে জেগে উঠল। বোন ভাজ এবং সখীরা মিলে তাকে সেই কোণ থেকে টেনে এনে হাসি-পরিহাস ঠাট্টা তামাশায় অতিষ্ঠ করে তুলল। সকলরবে শুরু হল আসন্ন উৎসবের আয়োজন। মেঘ কেটে গেছে। সকলের সঙ্গে সুরমার মনেও সেই আশ্বাসের আনন্দ। শোভাযাত্রা করে ব্যান্ড বাজিয়ে বরের গাড়ি যখন তাদের বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছিল, সুরমার সাজানো পর্ব তখনো মাঝপথে। চিরুনি, চন্দন মালা কাজল ফেলে এক ঝাঁক উড়ন্ত পায়রার মত মেয়েরা চোখের নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেল। সুরমারও কি ইচ্ছা হয়নি তাদের মত একটা কোন জানালার আড়াল থেকে কতবার দেখা চেনা মুখখানা আজ আবার নতুন চোখ দিয়ে দেখে আসে। কিন্তু লজ্জা এসে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিল। মেয়েরা ফিরে এসে বলাবলি করেছিল—কেমন যেন গোমড়ামুখো বর! চমকে উঠেছিল সুরমা। সে কি! সে যাকে দেখেছে তার মুখখানা যে সদাহাস্যোজ্জ্বল। তারপর নিজেকেই আবার বুঝিয়েছিল, মেয়েগুলো যেন কী! বিয়ে করতে এসে কেউ হাসতে হাসতে নামে নাকি বরের গাড়ি থেকে? চারদিকে সব গুরুজন রয়েছে না? কিন্তু যেখানে গুরুজন নেই কেউ নেই, শুধু দুজনে একা, সেখানে যখন দেখা হল, দামী বেনারসীর আধঘোমটার অন্তরাল থেকে ভীরু চোখ দুটি যখন অলক্ষ্যে তুলে ধরল স্বামীর মুখের পানে, তখন আর কোনো কৈফিয়ৎ বা সান্ত্বনা দিয়ে নিজেকে বোঝাতে পারেনি। তারপরেও রাতের পর রাত ব্যর্থ অপেক্ষায় কাটিয়ে নিঃসন্দেহে বুঝেছিল সুরমা, না, মেঘ কাটেনি। শুধু কাটেনি নয়, তার নবারব্ধ যাত্রাপথের যতখানি চোখে পড়ে সবটাই বোধহয় মেঘেঢাকা।

পরের ইতিহাস দীর্ঘ হলেও ঘটনা-বহুল নয়। ছুটি ফুরিয়ে যাবার ওজুহাত দেখিয়ে বিজন হয়তো তখনকার মত একটা আশু সংকটের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছিল। ভেবেছিল, আপাততঃ পালিয়ে গিয়ে ভারাক্রান্ত মনটাকে একটু হালকা হবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সুরমার সেই হীন নিরুত্তাপ চোখ দুটো সে যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। তার চেয়ে সে যদি তীব্র ভাষায় নালিশ জানাত, রসনায় কিংবা

চোখের তারায় বিষের জ্বালা ছড়িয়ে আক্রমণ করত তাকে, বিজনের পক্ষে সেটাই ছিল অনেক বেশী সহজ ও সুসহ। সেই প্রত্যাশাই সে করেছিল। কিন্তু সুরমা সে পথে যায়নি। বোধহয় ভেবেছিল, পাওনা যেখানে শূন্য, সেখানে পেলাম না বলে অভিমান জানাতে যাওয়া হাস্যকর। না-পাওয়ার মধ্যে বেদনা আছে; সেটা সয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের মধ্যে আছে অপমান। সাধ করে হাত বাড়িয়ে সেটা মাথায় তুলতে কে চায়?

বিমলা হয়তো ঠিকই বলেছিল। মেয়েরা যখন স্বামীর সংসারে আসে, অনেক কিছুর জন্যে তৈরী হয়ে আসে। তেমনি একথাও সত্য, প্রথম পাওনা দিয়েই তারা আগামী দিনের পাওয়া ও না-পাওয়ার হিসাব কষে। ঐদিনের রূপটি ওদের জীবনে অক্ষয়। পুরুষ যাকে পেল, তাকে সে সারাজীবন ধরে একটু একটু করে চেনে, কিন্তু নারী যার হাতে প্রথম হাত রাখল, তাকে সে চেনে ঐ একটি মাত্র স্পর্শ দিয়ে। শুভ-দৃষ্টির আড়ালে কিংবা বাসরের কোলা-হলে একটি মাত্র দৃষ্টি দিয়ে। ভুল যে করে না, তা নয়। কিন্তু সে ভুল সহজে ভাঙে না। অনেক সময় তার মাশুল গুনতে হয় সারাজীবন।

সুরমা তার স্বামীর সম্পর্কে ভুল করেনি। সব জেনেই, অন্তরে না হোক, বাইরের দিক থেকে ঘটনাপ্রবাহকে স্বীকার করে নিল। নিজেকে বোঝাল, মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে সবই কি তার মনোমত? বেশীর ভাগই নয়। অনেক ঘটনাই দুর্ঘটনা। তবু সে সত্য। 'মানি না' বললেই মিথ্যা হয়ে যায় না। অস্বীকার করলেও তার হাত থেকে মুক্তি নেই। সুতরাং যা ঘটেছে তারই স্রোতে নিজেকে ছেড়ে দাও। যে পরিবারে যে পরিবেশে সে মানুষ, যেখানে এসে সে দাঁড়াল সেখানে একটি সামান্য লেখাপড়া-জানা সাধারণ মেয়ের সামনে তা ছাড়া আর পথ কী? মন? তার দিকে কেউ তাকায় না। সংসার বড় নির্মম। সে নিজের মনে নিজের পথে এগিয়ে যায়। কারো মন-রাখা তার কাজ নয়। ঐ অলক্ষ্য বস্তুটি কোথায় কোন চাকার তলায় থেঁতলে, গুঁড়িয়ে গেল, সেসব দেখলে তার চলে না।

বিয়ের মাস দুয়েক পরেই শাশুড়ী একদিন বললেন, বৌমা, আসছে রবিবারে বিমান তোমাকে বিজুর কাছে রেখে আসবে। ওকেই আসতে লিখেছিলাম। বলছে, ছুটি পাবে না।

সুরমা চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, যেমন থাকতে হয়, নব-বিবাহিতা বধূ শ্বশ্রূর মুখে এ জাতীয় প্রস্তাব শুনে যেমন থাকে। শাশুড়ী ভাবতে লাগলেন তাঁদের কালে তাঁরা কী করতেন। লজ্জায় জড়সড় হয়ে মাটিতে মিশে যেতেন নয়তো ছুটে পালিয়ে যেতেন। কিন্তু যুগ বদলে গেছে। এরা এতে লজ্জা পায় না। যাবার জন্যেই দুপা বাড়িয়ে আছে। 'ফচ্‌কা' বেহায়া মেয়ে; বিয়ের রাত থেকে বরটিকে চিনতে শেখে। তাঁর কালের কনে-বৌ ত নয়। তবু বলা কর্তব্য বলেই বললেন, এই সবে এলে। মনে করেছিলাম, দুটোদিন তোমাকে নিয়ে আমোদ-আলহাদ করবো। সকলেরই তাই ইচ্ছে। সববার ছোট তুমি। কিন্তু ওদিকে বিজু একলা। খোট্টার দেশে একটা পছন্দমত রান্নার লোক পর্যন্ত পাওয়া যায় না। পেলেও কে তাকে চালায়? তুমি না গেলে ওর কষ্ট হবে।

একটু থেমে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, নিজের ঘরসংসার বুঝে নাও। তোমরা সুখী হও, এই আমার সবচেয়ে বড় সাধ।

শাশুড়ীর এবং সেই সঙ্গে শ্বশুর ও পিতৃকুলের সমবেত সাধ মেটাবার জন্যেই যেন সুরমা শুভদিনে যাত্রা করে মেজো ভাসুরের সঙ্গে স্বামীর কর্মস্থলে গিয়ে পৌছল। নিজের মনের দিকে তাকাল না। সেখানে কোনো সাড়া জাগল কিনা, কোনো উৎসাহের জোয়ার কিংবা আগ্রহের জাগরণ, সে প্রশ্ন একান্ত অবান্তর বলে এক কোণে ঠেলে রেখে দিল। যেতে হবে, তাই যাওয়া, ঘটনার গতির সঙ্গে পা ফেলে চলা। এর বেশী আর কিছু ভাবনার নেই, করবার নেই।

শুরু হল দুজনের সংসার। বিজনের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই বয়সে বড়। সব বাড়িতেই দুটি-চারটি ছেলেমেয়ে এবং আনুষঙ্গিক ঝঞ্ঝাট ও বিশৃঙ্খলা। তাঁরা বেড়াতে আসেন, কখনো একা, কখনো জোড়ে। সুরমা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে, ঋতু ও সময় ভেদে চা, ফল, সরবৎ, নিজের হাতে তৈরী দুটি-একটি মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করে অতিথিদের, হাসি-পরিহাসে যোগ দেয়। ছোট্ট বাসাটুকর প্রতিটি কোণ তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। সব পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি। প্রতিটি জিনিসে সাজানো-গোছানোর বিশেষ ভঙ্গিতে গৃহকর্তীর সযত্ন নিপুণ হাতের স্পর্শ। সকলের মুখেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। "ঠিক যেন দুটি কপোত-কপোতী" "What a loving pair!" "আপনাদের দেখলে হিংসে হয়" ইত্যাদি। ওরাও বেড়াতে যায় এবাড়ি ওবাড়ি। একটা সাধারণ শাড়ি পরেই হয়তো তৈরী হয়েছিল সুরমা। বিজনের চোখে পড়তে বলল, ওটা কেন, আর একটু ভালো কিছু পরে নাওনা? সুরমা বিরক্তি না করে তখনই কাপড় পালটে আসে। 'এই তো বেশ' বলে ঔদাসীন্যের ভাবও নেই, স্বামীর ইচ্ছায় নতুন সাজে সেজে আসবার আগ্রহও নেই।

দিনগুলো কেটে যায় কাজকর্মের ভিড়ে এবং লোকজন বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্যে। রাত আসছে ভাবতেই এক অবর্ণনীয় শঙ্কায় বিজনের বুক ভরে ওঠে। সেখানে দুজনের মাঝখানে কোনো অন্তরাল নেই। সুরমার সেই নিস্পৃহ, নির্বিকার রূপটি সেখানে বড় বেশী প্রকাশিত। অত্যন্ত কাছে থেকেও সে যে কত দূরে রাত্রির নির্জনতায় এই কঠোর সত্যটাই নির্মমভাবে ধরা পড়ে। তারা এক টেবিলে, একসঙ্গে বসে খায় (এবিষয়ে নিজের মত যা-ই থাক স্বামীর ইচ্ছাকেই মেনে নিয়েছে সুরমা), খাবার পর বারান্দায় পাশাপাশি বসে গল্প করে, সাধারণ সাংসারিক গল্প, যার মধ্যে সুরমার স্থান প্রধানতঃ শ্রোতার, তারপর রাত বাড়লে উঠে গিয়ে একই শয্যায় পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তবু বিজনের মনে হয়, তার একান্ত সান্নিধ্যে যে মেয়েটি শুয়ে আছে, তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়, তার উপরে স্বামিত্বের সব ইচ্ছা ও অধিকার অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু তার নাগাল পাওয়া যায় না। মাঝখানের এই ব্যবধানটুকু সামান্য হলেও অনতিক্রম্য।

অথচ অভিযোগ করবার মত কোথাও কিছু নেই। সুরমা আদর্শ গৃহিণী। প্রতিটি দিকে তার প্রখর দৃষ্টি। রান্না-বান্না, গৃহসজ্জা, যত্ন-পরিচর্যা, সব ত্রুটিহীন। যেটি যখন দরকার, হাতের কাছে উপস্থিত। ওটা নিয়ে এস, সেটা কোথায় গেল—বলবার অবকাশ নেই। সব প্রয়োজন নিরলসভাবে যুগিয়ে চলেছে প্রতিদিন। ক্লান্তি নেই বিরক্তি নেই, মাথাধরা বলেও দুমিনিট বিশ্রাম নেই। বিজন যদি কখনো বলে, 'এত খাটবার কী দরকার? ঝি রয়েছে চাকর রয়েছে,' সুরমা হয় কোনো জবাব দেয় না,

যা করছিল করে যায়, নয়তো সংক্ষেপে জানিয়ে দেয়. তারা অন্য কাজ করছে। সংসারের এই যান্ত্রিক শৃঙ্খলা, গৃহ-কর্ত্রীর এই ত্রুটিহীন নৈপুণ্যে উঠতে বসতে বিজনকে পীড়া দেয়। সুরমার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সে যেন একটি সচল পুতুল, ভিতরে কোনো প্রাণ নেই, আছে একটা দম-দেওয়া স্প্রিং। তারই জোরে চলছে ফিরছে। আর মনে হয়, সতত স্বাচ্ছন্দ্যে, পরম আরামে যেখানে তার দিন কাটছে, সেটা তার গৃহ নয়, একটি সুষ্ঠু-পরিচালিত হোটেল, আর ঐ মহিলাটি, যাকে সে তার স্ত্রী বলে জানে সেখানকার সদা-বশংবদ সুদক্ষ ম্যানেজার। তার বেশী আর কিছু নয়।

তার বেশী আর কিছু যে সে আশা করতে পারে না, সেকথা বিজনের চেয়ে কে বেশী জানে? জানে, কিন্তু কোথায় তার প্রতিকার তা জানে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এভাবে আর চলে না, একটা খোলাখুলি বোঝাপড়া দরকার। তার ফলে যদি আলাদা হয়ে বাস করতে হয়, সেই পথই বেছে নিতে হবে। সুরমাকে বুঝিয়ে বলবে, তোমাকে আমি সুখী করতে পারিনি, সেটা আমার পরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু তোমার সব ইচ্ছা আমি প্রাণপণে মেনে চলবো। তোমার যেখানে থাকতে মন যায়, আমার মায়ের কাছে, কিংবা তোমার মায়ের কাছে, সেখানে গিয়ে থাকো। কারো উপরে নির্ভর করতে হবে না। তোমার সব ভার, সব দায়িত্ব আমারই রইল।

মনে মনে এই সংকল্প নিয়ে কত-দিন কলেজ থেকে ফিরেছে, কিন্তু সুরমার সেই নিস্তরঙ্গ চোখদুটোর সামনে দাঁড়িয়ে কিছুই বলতে পারেনি। বাড়ি আসা মাত্র ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সুরমা। তারপর যন্ত্রের মত একটির পর একটি করে গেছে তার নিত্য-নির্ধারিত কাজ-গুলো। কেমন একটা মায়া হয়েছে বিজনের। যেকথা বলবে বলে ভাবতে ভাবতে এসেছিল, তার বদলে বলেছে, বেড়াতে যাবে সুরমা?

—'আমার যে এখনো কাজ সারা হয়নি,' দীপ্তিহীন ক্লান্ত চোখদুটি স্বামীর মুখের উপর তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছে সুরমা।

—কাজ পরে হবে। চল একটু ঘুরে আসি।

সুরমা আর কিছু বলেনি। নিঃশব্দে ধীর পায়ে ঘরে গিয়ে পরনের কাপড়খানা বদলে যাহোক একটা কিছু পরে তখনই ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে সেইখানে। রাস্তায় বেরিয়ে বিজন জানতে চেয়েছে, কোন দিকে যেতে চাও?

সেই নিস্পৃহ উত্তর—যেদিকে হোক, চল।

—আচ্ছা, চল ঐ পাহাড়টায় চড়া যাক। পারবে তো?

তেমনি বিনাবাক্যে অনুসরণ করেছে সুরমা। বলেনি, এখনো অনেক বেলা আছে, পাহাড় থেকে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসা যাবে। কিংবা যে জামা-কাপড় পরে বেরিয়েছে, সেটা যে বন্ধুদের বাড়ি যাবার যোগ্য নয়, তার জন্যে তৈরী হয়েও আসেনি, একথাও তোলেনি।

বেড়াতে যাবে সুরমা?

সুরমা মাথা নুইয়ে জানিয়েছে, পারবে।

খানিকক্ষণ নীরবে পথ চলবার পর মত বদলেছে বিজন, 'নাঃ, পাহাড়ে উঠতে গেলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। তার চেয়ে চল, প্রফেসর সুকুলের বাড়ি যাওয়া যাক। ওরা দুদিন এসে গেছে, আমাদের একবারও যাওয়া হয়নি।'

কিছুক্ষণ পরে বিজনের নিজেরই খেয়াল হয়েছে, 'এভাবে সেখানে যাওয়া যায় না। চল ফিরি। কী বল?'

সুরমা এবারেও ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে মাত্র।

একদিন কী কারণে সকাল সকাল কলেজ ছুটি হয়ে গেল। বিজন স্থির করে ফেলল, এতদিন অনেকবার যা

বলতে গিয়েও পারেনি, আজই তার সুযোগ। এখন সুরমার অবসর। হয় শুয়ে আছে, নয়তো বই কিংবা সেলাই নিয়ে বসেছে। কী ভাবে পাড়বে কথাগুলো; কেমন করে বললে রূঢ় শোনাবে না, সুরমার মনে হবে না, এ শুধু তাকে সরিয়ে দেবার ছল; উত্তরে কী বলবে সে, যদি বলে 'আমি কোথাও যাবো না', তারপর তার কী করবার আছে—ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে সমস্ত ব্যাপারটাকে নানা ভাবে ওজন করে, বক্তব্য কথাগুলো মনে মনে সাজিয়ে নিয়ে বাড়ির কাছে এসে পৌঁছল। সদর দরজা খোলা রেখে চাকরটা কী করছিল। কড়া নাড়া বা ডাকাডাকির প্রয়োজন হল না। বসবার ঘর পার হয়ে দক্ষিণের বারান্দায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল বিজন। ঠিক সামনে কয়েক ফুট মাত্র দূরে সুরমা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে দূরে ঐ শালবনের দিকে। এ ধার থেকে তার সমস্ত মুখখানা দেখা যায় না, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবার বিশেষ ভঙ্গিটি চোখে পড়ে। সেদিকে একটি বার তাকিয়েই বিজনের মনে হল 'বিষাদ প্রতিমা' বলে যে কথাটি সে কাব্যে-উপন্যাসে পড়েছে, কখনো উপলব্ধি করেনি, এই হচ্ছে তার জীবন্ত রূপ। বেদনার অবয়ব আছে, একটি নারীদেহের প্রতি অঙ্গে সে সমূর্ত হয়ে উঠতে পারে—এই পরম সত্যটি সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল।

কতক্ষণ স্থাণুর মত সেই একই জায়গায় নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে ছিল, বিজনের মনে নেই। হয়তো ঐ ধ্যান-মৌন মূর্তির দিকে চেয়ে অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করে থাকত। হঠাৎ কী কারণে এদিকে ফিরে তাকাল সুরমা। শ্রান্ত, বিষণ্ণ, জ্যোতিহীন দুটি চোখ। কোলে যেন কালি ঢেকে দিয়েছে। তার উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলধারা। স্বামীকে দেখেই যেন ব্যাধভীতা ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। বিজন ফিরে এসে গা এলিয়ে দিল বসবার ঘরে সোফার উপর। সেই মুহূর্তে একটি কথাই শুধু মনে হল—নিজের শয়নকক্ষেও তার প্রবেশের অধিকার নেই। সেখানকার নিভৃত শয্যায় ঝরে পড়ছে যে গোপন সঞ্চিত অশ্রুধারা, তার অমর্যাদা হবে।

সুরমারও মনে হল, স্বামীর কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। অন্তরের যে গুপ্ত কক্ষটি সে সযত্নে বন্ধ করে রেখেছিল, একটা অসতর্ক দুর্বল মুহূর্তে সহসা তার দ্বার খুলে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে বেদনা-মলিন দীনরূপ। ছিঃ ছিঃ, এর পর সে মুখ দেখাবে কেমন করে? এরপর একে অন্যের সান্নিধ্যটুকু যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা ছাড়া দুজনের আর পথ রইল না। তাই বা কেমন করে সম্ভব? তিনখানা ঘরের এই ছোট্ট বাসায় সর্বক্ষণ একই সঙ্গে থাকা; মাঝখানে একটু অন্তরাল সৃষ্টি করার মত আর কোনো পরিজন নেই! এই সমস্যা যখন দুজনের কাছেই দুরূহ হয়ে উঠেছে, একদিন আকস্মিকভাবে তার অনেকখানি সমাধান হয়ে গেল। কোনো খবর বার্তা না দিয়ে সকালের গাড়িতে সুরমার ছোট ভাই মোহন এসে উপস্থিত। বিজন ছিল বাইরের ঘরে। বিস্ময়ে আনন্দে কলরব করে উঠল—তুমি! কী আশ্চর্য! একটা খবর দিয়ে এলে তো স্টেশনে যেতে পারতাম।

ফার্স্ট ইয়ারের ছেলের পৌরুষে আঘাত লাগল। বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, কেন, আমি বুঝি আর চিনে আসতে পারি না?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই; তার প্রমাণ তো হাতে-হাতেই পাওয়া গেল। কিন্তু গাড়ি আসে ভোর পাঁচটায়, এখন বেজেছে সাড়ে ছটা। মাইল দুয়েক পথ, রিকসাতে বড় জোর আধ ঘণ্টা লাগবার কথা। কী ব্যাপার বল দিকিন?

—তা কী করবো? যে-দেশে আছেন, রিকসওয়ালাগুলো একটা কথাও বোঝে না, খালি হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—'তাই বলো!' বলে, বিজন হো হো করে হেসে উঠল, আচ্ছা এবার সোজা ভিতরে চলে যাও। জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধোও।

দিদির সঙ্গে দেখা হতেই মোহন চমকে উঠল, এ কি! তোকে যে চেনা যায় না। কী হয়েছিল?

—কী আবার হবে? নে, ঐ ঘাম-জবজবে জামাটা ছেড়ে হাওয়ার মুখে এসে বস। ছেলে একেবারে লায়েক হয়ে উঠেছেন। কেন, একটা খবর দিয়ে এলে কী দোষ হত?...... না বলে কয়ে পালিয়ে আসিসনি তো?

মোহনের কানে বোধহয় এর কোনো কথাই ঢুকল না। দিদির কাছে এগিয়ে গিয়ে অনেকখানি উঁচু হয়ে-ওঠা কণ্ঠার হাড়ে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বলল, সত্যি দিদি, তুই বড্ড রোগা হয়ে গেছিস। নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেছিল। কই আমাদের তো একবারও জানাসনি?

—কী মুশকিল! অসুখ করলে তো জানাবো?

—করলেই বা জানাবি কেন? এখন তো আমরা কেউ নই। সবচেয়ে যিনি আপন, তিনি—

কথাটা শেষ করবার আগেই সুরমা সস্নেহে ভাইয়ের গালটা টেনে ধরে বলল, খুব ফাজলামো শিখেছিস, দেখছি। কলেজে ঢুকে বুঝি এই উন্নতি হয়েছে?

ঐ দিনই বিকেলের দিকে জানা গেল, মোহনের এতখানি পথ ঠেলে মধ্যপ্রদেশে আসবার আসল উদ্দেশ্য বেড়ানো নয়, দাদার বিয়েতে দিদি ও জামাইবাবুকে নিয়ে যাওয়া। বিয়ের এখনো মাসখানেক দেরি। মাঝখানে কয়েকটা দিন একটু ঘুরে-ফিরে দেশ দেখবে। তাই কলেজ বন্ধ হতে অনেক বলে-কয়ে মা ও দাদাদের মত করিয়ে চলে এসেছে। কবে কোন্ গাড়িতে রওনা হচ্ছে, কখন পৌঁছবে, ইত্যাদি বিবরণ দিয়ে বড়দা বিজনকে যে-চিঠিটা লিখেছিলেন, সেটা ডাকে দেবার ভার ছিল ওরই উপর। সে কাজটি ইচ্ছা করেই সে করেনি। মনে মনে মতলব ছিল—হঠাৎ এসে দিদি ও ভগ্নীপতিকে চমকে দেওয়া। ওখান থেকে ওঁরা ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেন, মাঝখানে গাড়ি-বদলের হাঙ্গামা নেই। এখানকার স্টেশন থেকে রিকশ করে বাসায় আসা। সে আর এমন কি কঠিন! তখন কে ভেবেছিল তার এত কষ্টের শুদ্ধ হিন্দী এই লোকগুলোর মাথায় ঢুকবে না, আর এদের দেহাতী বুলিও তার কাছে 'বিশুদ্ধ গ্রীক' হয়ে দাঁড়াবে?
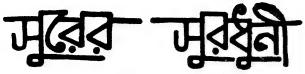
(ক্রমশঃ)

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

।। পাঁচ ।।

কোলকাতায় বাল্যশিক্ষাকালে যখন স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ শান্তপ্রায় তখন আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে সংস্কৃতিক ও গঠনমূলক নানা ব্যাপারের পরিচয় আমরা সর্বদাই পেতাম। বাবা স্বয়ং ব্রাহ্মণপন্ডিতের ঘর হ'তেই গৌরীপুর জমিদারবাড়ীতে দত্তকপুত্র-রূপে এসেছিলেন, তাই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি এই কারণেই তাঁর অনুরাগ বর্ধিত হয়। যদিও ঠাকুর-পরিবার ও চৌধুরীপরিবারের সংস্কৃতির উদারনৈতিক রূপ বিশেষ ভাবেই পরি-স্ফুট ছিল, তথাপি শাস্ত্রীয় সংগীত-বিষয়ে বাবার সহিত চৌধুরীপরিবার ও ঠাকুরপরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ সহ-যোগিতা ছিল। স্বর্গীয় জাস্টিস আশুতোষ চৌধুরী সম্পর্কে আমার মামা হ'তেন এবং দেশের কাজে বাবা সর্বদাই তাঁর বহুমূল্য উপদেশ গ্রহণ ক'রতেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি ও অবশেষে সংগীত সংঘে স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরীর সহিত বাবার পূর্ণ সহযোগিতার নিদর্শন আমরা দেখেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলি-কাতার কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে যখন রাঁচীতে শান্তিপূর্ণ সাধন-জীবন অবলম্বন ক'রলেন, তখন "সংগীত প্রকাশিকা" পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংগীত সমাজেরও অগ্রগতি স্তিমিত হ'য়ে গেল। ১৯১১ সালে জাষ্টিস আশুতোষ চৌধুরীর সুযোগ্যা সহধর্মিণী প্রতিভা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহেই "সংগীত সংঘ" নামক একটি উন্নত সংগীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ রাঁচী থেকেও এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বহুমূল্য নির্দেশ-উপদেশ সর্বদাই দিতেন। রাজা সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন সংগীত সংঘের প্রথম সভাপতি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সহ-সভাপতি। বর্ধমানের মহারাজা, নাটোরাধিপতি মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ও কলিকাতার অন্যান্য গণ্যমান্য অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিগণ ইহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য বাবার সহিতও সংগীত সংঘের বিশেষ যোগাযোগ ছিল এবং তিনি সংগীত সংঘের নানা অনু-ষ্ঠানে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। সংগীত সংঘের প্রতিষ্ঠার দুই বৎসরের মধ্যেই লেডী প্রতিভা চৌধুরী ও তাঁর কনিষ্ঠা ও বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক জগতে তাঁরই পরবর্তী নেতৃস্থানীয়া স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সহ-সম্পাদকতায় "আনন্দ সংগীত পত্রিকা" নামে একটি অতি উন্নত শ্রেণীর সংগীত মাসিক প্রকাশ ক'রতে থাকেন। আনন্দ সংগীত পত্রিকা সংগীত সংঘেরই মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় লেডী চৌধুরী সম্পাদকীয় যে নিবন্ধ লেখেন, তা পাঠ ক'রলেই আমরা "সংগীত সংঘ" ও আনন্দ সংগীত পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারবো। তিনি লিখেছেন :—

(আনন্দ সংগীত পত্রিকা : প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা—শ্রাবণ ১৩২০ সন)

"আমাদের দেশ হইতে বিশুদ্ধ আর্য-সংগীতের চর্চা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। যদিও সংগীতের উন্নতিকল্পে দুই-একটি সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু সেগুলির দ্বারা সংগীতের শিক্ষার জন্য বিশেষ-ভাবে কোনও উদ্যোগ হয় নাই। আমরা দেশ হইতে সেই অভাব মোচন করিবার জন্য "সংগীত সংঘ" নামে একটি সংগীত শিক্ষাগার স্থাপন করিয়াছি। যাহাতে সংগীতে ও যন্ত্রাদি বাদনে বালক-বালিকাগণকে যথারীতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুণী সংগীতজ্ঞদিগের একত্র সমাবেশ করিয়া আর্য-সংগীতের শিক্ষা-প্রণালী যাহাতে যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের সংগীতের অনেক তত্ত্ব ও অনেক যন্ত্রাদি লোপ পাইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। এমন সময়-কাল পড়িতেছে যে মনে হয় বুঝি বা অর্ধশতাব্দী মধ্যে আর্য-সংগীত ও আর্য-যন্ত্রাদি লোপ পাইবে ও তাহার আসন বিদেশী সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রাদি অধিকার করিয়া বসিবে। বালক-বালিকাগণই আমাদের ভবিষ্যতে আশার স্থল। যাহাতে সংগীতবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া দেশ-বিদেশে উহার পথ প্রসারিত করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই সংঘ স্থাপিত হইয়াছে।

এই কার্যে সকল গুণী, গায়ক ও যন্ত্র-বাদকগণের একযোগ আবশ্যক। যাঁহারা গান-বাজনার সমাদর করেন বা যাঁহাদের গান-বাজনায় রুচি বা আসক্তি আছে, তাঁহারাও সকলেই ইঁহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। সময়ে সময়ে ইঁহার অধিবেশনে সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী ভাল ভাল গুণী গায়ক ও যন্ত্রবাদকগণের সমাগম হয়। সেই শুভ অবসরে শিক্ষা-প্রাপ্ত বালক-বালিকাদিগের concert (ঐকবাদন)) ও গীতিবাদ্যের নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়। যখন সুশিক্ষিত শত শত বালক-বালিকাগণের কণ্ঠে ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি সুমিষ্ট সংগীত কিংবা যখন বালক-বালিকাগণের কোমল অঙ্গুলীস্পর্শে সরস্বতীর বীণার ন্যায় বীণা-তন্ত্রীতে নানা স্বরসংযোগে মধুর ঝংকার শুনিতে পাওয়া যাইবে তখন আমাদের উদ্যোগের ফল বুঝিতে পারিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সংকল্প পূর্ণ করুন এই প্রার্থনা। সহজে গান শিক্ষা হইবার অভিপ্রায়ে একটি সংগীত পত্রিকা বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। ইহার নাম "আনন্দ সংগীত পত্রিকা" রাখা হইল। এই পত্রিকা বাহির করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য এই স্বরলিপি শিক্ষা করিয়া গান-গুলিকে সহজে নিজের আয়ত্তে আনা। এখন অনেকে নানা প্রণালীতে নিজের সুবিধামতো স্বরলিপি বাহির করিয়া গানগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছেন। আমাদের দেশের গানগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, তাহার রক্ষার নিমিত্ত এবং যাহাতে এগুলি স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে সকলে চেষ্টা করিতেছেন ইহা খুব সুখের বিষয়। খালি তো গানের শব্দ-প্রয়োগে গান গাইতে পারা যায় না। সুর-তাল-লয়ে শব্দগুলি যুক্ত হইয়া কণ্ঠস্বরে বাহির হওয়া চাই। একটি কথা আমি বলিতে চাই। নানা প্রণালীতে সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার উপায় বাহির না করিয়া সহজ সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারা সহজে লোকের যাহাতে বোধগম্য হয়, এমন উপায় এবং যেটি বহু বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতি আমাদের মতে অবলম্বন করা উচিত। "সংগীত-প্রকাশিকা" নামে একটি সংগীত পত্রিকা অনেক বৎসর হইতে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহাতে নানা দেশের গান পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্ভাবিত আকার-মাত্রিক স্বরলিপি

"আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—আমি একটু বেশী সিগারেট খাই কিনা তাই........"
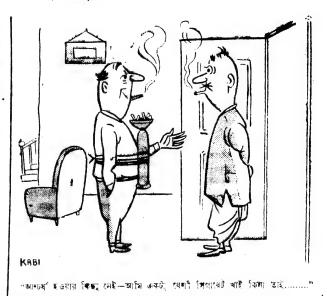
পদ্ধতি অনুসারে এতদিন লিপিবদ্ধ হইয়া চলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয় কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাঁচী বাস করায় এবং আরও অন্যান্য কারণে ইহা বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। বড় দুঃখের বিষয় যে, এতবড় কাজের জন্য কেহ সহানুভূতি দেখান নাই, কত উদার স্বভাবাপন্ন মহানুভব কত ঐশ্বর্যশালী মহাত্মারা আছেন তাঁহারা অনায়াসে অর্থের সাহায্য করিয়া এটি রক্ষা করিতে পারিতেন। তাঁহাদের কত সময়ে কত কাজে বৃথা অর্থব্যয় হয়। এইরূপ একটি কাগজের আজকাল যে কত দরকার হইয়াছে ইহা অবশ্য সকলের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। এইজন্য ইহা সর্বসাধারণের নিকট এত আদরের বস্তু হয় নাই। যাঁহারা সংগীতপ্রিয়, তাঁহাদের কাছে আমার এই নিবেদন, নিজেরা অনুগ্রহ-পূর্বক গ্রাহক হইয়া এবং অনেক গ্রাহক করাইয়া ইহার সাহায্য করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহা লিখিয়াই যেন ইহার শেষ না হয় এবং বৃথা বাক্যব্যয় না হয় এই আমাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এবং সকলের কাছে আমাদের অনুনয়। আমি এবং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এই পত্রিকার সম্পাদিকার ভার লইয়া যদি কিছু করিতে পারি সে চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছি। সকলে অনুগ্রহ করিয়া ইহা চেষ্টা করিয়া শিক্ষা করিয়া দেখিবেন কত সহজ উপায়ে এই স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে গান শিক্ষা করা যায়। সংগীত সংঘে যত গান হিন্দুস্থানী এবং ব্রহ্ম-সংগীত ইত্যাদি ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে এবং অন্যান্য সংগীতও প্রকাশিত হইবে। শুনিয়া সকলে সুখী হইবেন যে অনেক শিক্ষক এবং জনসাধারণ হইতে গান প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে এই পত্রিকা পরিপুষ্ট হইবার অনেক উপায় হইবে আশা হয়।"

আনন্দ সংগীত পত্রিকার প্রথম প্রকাশকালে লেডী চৌধুরী মহোদয়ার এই বিবৃতিটি পাঠ করলে "সংগীত সংঘ" প্রতিষ্ঠানের মহৎ উদ্দেশ্য আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো। বর্তমানে স্বাধীন ভারত সরকার উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রতিষ্ঠানের সহায়ে সংগীত প্রচারে অগ্রসর হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যাঁরা এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের আদর্শ বর্তমান সময়ে আমরা যদি জীবন্ত ক'রে তুলতে পারি, তবেই স্বাধীন ভারতের সংগীত-প্রগতি সার্থক হয়ে উঠবে। সংগীত সংঘের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সংঘের ১৯১৪ সালের বার্ষিক বিবরণীতে যে বর্ণনা আছে, তা পাঠে আমরা জানতে পাই যে, জাস্টিস চৌধুরী পার্ক স্ট্রীটে হিন্দু সংগীতের যে সংস্থার প্রতিষ্ঠা বহু পূর্বেই ক'রে-ছিলেন, সেখানেই সংগীত সংঘের প্রথম উদ্বোধন ঘটে। পরে পার্ক স্ট্রীট হ'তে ল্যান্সডাউন রোডে সংগীত সংঘ স্থানান্তরিত হয়। ঐ সময় থেকেই দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সংগীত সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রতী হন।

আর এক মৃত্যু

রতন সান্ন্যাল

একটি মৃত্যু দিয়ে একটি জীবনকে ঘিরে রাখা যায় না। সুখেন ভাবল, মানুষের মৃত্যুকে কেন অনুসরণ করা যায় না! মৃত্যুকে অনুসরণ করে কোথায় গিয়ে পৌঁছন যায়! যাকে ভালবাসা যায় তার শরীরের অনুপস্থিতি কেন এমন নাড়া দিয়ে যায়! ভালবাসার মৃত্যু নেই। কিন্তু একটি শরীরের মৃত্যুতে সব কিছু শেষ হয়ে যায়! মনে হয়, আর কোন আর কারো স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই। একটি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, নিঃশেষ হয়, মুছে যায়। ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট ছায়ার মত। স্মৃতি-সাগর মন্থন করেও ঠিক তার অনুরূপ প্রতিচ্ছবি, মুখের দেহের শরীরের প্রতিটি খাঁজের রেখা মিলিয়ে আগেকার মানুষটিকে চোখের সামনে তুলে ধরা যায় না। এই মুহূর্তে সুলতার সম্পূর্ণ মানস-চিত্রটি স্মরণ করতে, ঠিক তার হুবহু চেহারাটা মনে করতে পারল না সুখেন। অথচ চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি সুলতার অস্তিত্ব এ-ঘর থেকে মুছে গেছে। অস্তিত্ব মুছে গেছে কি? সুখেন ভাবল। ঘরের চারদিকে আঁতিপাতি করে খুঁজতে লাগল। টেবিলের কাছে এসে তার দৃষ্টি ঠিকরে পড়ল। আটকে গেল। ঝুলে রইল দাঁড় করানো একটা ফটোর গায়। বিয়ের পর ওরা এক সঙ্গে ফটো তুলেছিল। একটা স্টুডিয়োয় গিয়ে অনেক কসরং করে ফটোগ্রাফার ওদের যুগল ছবি তুলেছিল। ছবিটা কোনদিনই ভাল লাগেনি সুখেনের। তার নিজের চেহারার অবিকল প্রতিচ্ছবি। সুলতার জন্যই নিয়ে আসতে হয়েছিল। ফটোগ্রাফার ছোকরা মুখ টিপে বলেছিল, খুব ভাল হয়েছে আপনাদের ফটোটা। দুটো স্ন্যাপ নিয়েছিলাম। দরকার ছিল না। প্রথমবারেই ভাল উঠেছিল। সুলতা বলেছিল, বাঃ বেশ উঠেছে তো! তোমার ছবি এত সুন্দর ওঠে! সুখেন ভেবেছিল, সুলতা তার নিজের ছবিটার জন্যই বলছে। আসলে ওর নিজের চেহারাটারই প্রেমে পড়েছিল। বাঁধিয়ে এনে টেবিলের উপর রেখেছিল। অনেক দিন ঝাড়পোঁছ করা হয়নি। অনেক ধুলো জমে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বোঝা যায়, ওটা সুলতারই ফটো। সুলতার কি? না সুলতা কখনো এমন ছিল না। ফটোগ্রাফার ছোকরার কারসাজি। ওর মনের মত করে সুলতাকে এঁকেছিল, ফটোর গায় তুলি বুলিয়ে ওর অসুন্দর চেহারাটাকে মনোরম করে তুলেছিল; যাতে সুলতা বাহবা দেয়। সুখেন জানতো, ফটোগ্রাফাররা অনেক কারসাজি করতে পারে মানুষের চেহারাকে ফটোতে সুন্দর করে তুলতে। খরিদ্দারের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার কায়দা ও রপ্ত করে নিয়েছে। আসলে ওটা সুলতার ছবি নয়। প্রতিচ্ছবি মাত্র। প্রতিচ্ছবি কি আসল ছবি হয়? না—ওর চেহারার সঙ্গে কোন মিল নেই। সুখেন বাঁধানো ফটোর ছবি থেকে আসল সুলতায় কোন আঁচ করতে পারল না। বরং তার মনের ছবিটাই কেমন হিজিবিজি হয়ে গেল। অস্পষ্ট কতগুলো আঁচড়-কাটা। আশ্চর্য, তার অস্তিত্ব এখনো অনুভব করতে পারে সুখেন। না, সুলতা মরে যায়নি। পাশের ঘরে তার চুড়ির শব্দ শোনা যায়—হাত নাড়াচাড়ার, ছোটখাট গৃহস্থালি কাজে ব্যাপৃত থাকার শব্দ। সুলতার অস্তিত্ব ভোলা যায় না।

দেয়ালের কোণের খাটটাতে সুলতা শুতো। সে খাটটা কাত করে একদিকে ঠেলে রাখা হয়েছে। বেশ খানিকটা জায়গা বেড়েছে ঘরখানার। উঃ, কতটা জায়গা দখল করে থাকত খাটখানা। আকারে এমন কিছু বড় নয়, অথচ ঘরের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকত। এখন বেশ পায়চারি করা যায়। ওই খাটখানার মত সুলতাও তার জীবনের অনেকখানি জুড়ে ছিল। খুশিমত এমন অনায়াসে পায়চারি করা চলত না। না বলে ফিরতে দেরি হলে, কাজে বা যান-বাহন বিভ্রাটে বা বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে দেরি হয়ে গেলে, কত কৈফিয়তই না দিতে হতো। আজ সে সব থেকে একেবারে মুক্তি দিয়ে গেছে সুলতা। এমন মুক্তি জীবনে অনেকদিন পায়নি সুখেন। কারো কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। কেউ কোন খোঁজ নেবে না। আশ্চর্য, মুক্তি পেয়েও, অনায়াস জীবনের স্বাধীনতা লাভ করেও, বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না তার। এই অন্ধকার

ঘরের দমবন্ধ ভেপসা নির্জীব পরিবেশ ছেড়ে কোথাও যেতে তার মন টানল না ; যেন মুক্তির স্বাদ ভুলে গেছে সুখেন। মুক্তির ইচ্ছাটাও মরে গিয়েছে। এতদিনের অভ্যস্ত জীবনে মুক্তি ছিল না বলে বন্ধন-মুক্তির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। পোষা পাখি খাঁচা খুলে দিলেও যায় না। খাঁচার জীবনে অভ্যস্ত পাখি বাইরের মুক্তি উপেক্ষা করে। সুখেনও কি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল? সুলতার উপস্থিতি, তার সাহচর্য, দেহের একান্ত শারীর আসঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সুখেন? সুলতা কি অভ্যস্ত হয়নি? শরীরের একটা দাবির কাছে শুধু কি অসহায় হয়ে পড়ত সুলতা, নিরুপায়ের মত নতি স্বীকার করতো? সুখেনের অস্তিত্ব কি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারতো না সে? সামুদ্রিক জীবের মতো জড়িয়ে জড়িয়ে নিজের অস্তিত্বই ভুলে থাকতে চাইত সুলতা, সঙ্গে সঙ্গে অন্যের অস্তিত্বও। উপেক্ষা আর অভ্যস্ততার হাত থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল সুলতা। সে নিজে কি মুক্তি পায়নি? মুক্তি দেবার আর মুক্তি পাবার আর কোন সহজ পথ কি খুঁজে পায়নি সে? সুখেন তো অনায়াসেই তাকে মুক্তি দিতে পারতো। বললেই সুখেন রাজি হয়ে যেতো। আমাদের মন যখন চাইছে না তখন দেহের অধীনতাকে নাই বা স্বীকার করলে। তার জন্য আত্ম-নাশের কী প্রয়োজন হল। আত্মহত্যা করার কোন দরকারই ছিল না।

সুলতার বিকৃত শরীরটার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। নীলাভ ফ্যাকাশে রক্তহীন বীভৎস একটা মানুষের অবয়ব। হাঁ, মানুষেরই। সুলতার। এক টুকরো কাগজে স্পষ্ট করে লিখে রেখেছিল : 'আমি তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলাম।...' লিখতে গিয়ে ওর হাত কেঁপেছিল। কাঁপা কাঁপা ছাড়া ছাড়া অক্ষরের কতগুলো কথা। করোনারও সে কথার মানে ধরতে পারেননি। অবশ্য এ নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাননি তাঁরা। কেন না, এমন ঘটনা ও'দের কাছে অনেক আসে। একটা সিদ্ধান্তকে যেন আগে থেকেই খসড়া করে রেখে দেয়। জুরিদের মত নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা রায়ও লিখে ফেলে। যেন অনিবার্যভাবে করে ফেলতে হবে, নিয়ম মাফিক। অবশ্য সে সব মুহূর্তগুলো সুখেনকে একা থাকতে হয়নি। খবর পেয়ে অনেকেই এসেছিলেন। বিশেষ সুলতার আত্মীয়েরা। অনেক সাহায্য করেছিলেন তাঁরা। সুখেন যন্ত্রের মত একটার পর একটা প্রতিটি কর্তব্য-কর্ম করে গেছে, মন্ত্রের মত অনুসরণ করেছে, অনুগমন করেছে। সব কাজ শেষ হয়ে গেলে ফিরে এসেছে। আর কিছু করার নেই। আর কোন কর্তব্যবোধ ঘোড়ার পিঠে সহিসের চাবুকের মত তাড়া করে আসেনি। সব কাজ সব দায়িত্ব যেন শেষ হয়ে গেছে।

সুখেন ভেবেছিল এবার তার মুক্তি। আর কোন বন্ধন নেই। সুলতা নিজেই বন্ধন ছিন্ন করেছে, তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। তবে কেন সে এখানে একা নিঃসঙ্গ কাটিয়ে দিল। একটানা চব্বিশ ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্ত সময়ের প্রতিটি স্পন্দন ঘড়ির পেন্ডুলামের প্রতি সেকেন্ডের গতিকে নিজের মধ্যে স্তব্ধ করে রেখেছে। ভূমিকম্পে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। সুখেনের প্রতিদিনের চলার, প্রতিটি পদক্ষেপের গতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওর মনের সিসমোগ্রাফে এ-স্পন্দন অনুভব করা যায়। দারুণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে ওর মনে—যেন ওর অনুভূতিগুলো সব ভোঁতা হয়ে গেছে। কঠিন কিছুতে আঘাত করলে ধারাল কাটারির ধার ক্ষয়ে যায়, ভোঁতা হয়ে যায়। জীবনের কঠিন পাথরে আঘাত করেছে সুলতা, তাই এমন ভোঁতা হয়ে গেছে সুখেনের অস্তিত্ব, ওর বেঁচে থাকা। মৃত্যুকে অনুসরণ করার দারুণ কৌতূহল পেয়ে বসেছে যেন। নিঃসঙ্গ হাঁপিয়ে উঠেছে, জীবনের একাকীত্বে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তবে কেন সে একা থাকতে চাইল?

আমাকে একা থাকতে দাও।

একা আপনি ওই বাসায় ফিরে যাবেন! ললিতা বলেছিল, ওখানে গেলে দিদির কথা মনে করে মন খারাপ করবেন।

মারা যাবার পরও কি আমি তার কথা মনে করবো না? তোমার দিদির তো ধারণা ছিল তার কথা আমার কখনো মনে হয় না। মারা যাবার পর সে জানুক আমি তাকে ভালবাসতাম।

তা জানি। দিদি না জানুক। আমি তা জানতাম।

তুমি জানতে!

হাঁ। ললিতা মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুখেন ওর মুখ দেখতে পেলে দেখতে পেত দিদির জন্য গভীর মমতা ঝরে পড়ছে ললিতার। চোখ ছলছল হয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুখেন। শেষে ললিতাই এগিয়ে দিতে এল। সুখেনের একতলার ফ্ল্যাটের কাছে এসে দু'জনের চোখাচোখি হল। ট্যাক্সি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। সারাদিনে অনেক ধকল গেছে। একটানা অনেক কর্মব্যস্ততা—একটি জীবনের সম্পত্তির ব্যবস্থায় সকলকেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। সব চুকে গেলে ট্যাক্সির নরম গদির সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়েছে। ফুটবল খেলার বিরতির সময় যেমন খেলোয়াড়রা বুক ভরে বাতাস নেয়, শুয়ে বসে নিঃশ্বাস টানে। সুখেনের মনে হয়েছিল তার দম আটকে এসেছে। অনেক ছোটাছুটি করে হাঁপিয়ে পড়েছে। গড়ের মাঠের শির শির হিমের স্পর্শে স্তিমিত হয়ে এসেছিল তার উত্তেজনা, বুঝি নিজের মধ্যে গতির ছন্দ অনুভব করছিল, অজানা একটা খুশীর অনুভূতি তাকে কেমন আনমনা করে ফেলেছিল। গলির মুখে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেল। তন্দ্রায় ঝুলে পড়েছিল সুখেন। ললিতা তাকে ডেকে তোলে। ভাড়া মিটিয়ে পাশাপাশি হেঁটে এসেছে। সুখেন বলেছিল, ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলে? ললিতা বলেছিল, আরেকটা ডেকে নেবো'খন। আপনাকে পৌঁছে দিই।

কোন দরকার ছিল না। সুখেন বলেছিল।

তা জানি। আপনার কিছুতেই দরকার নেই। সারাদিন কিছু মুখে দেবারও প্রয়োজন হল না। দিদির জন্য এমনি উপোস করে থাকবেন নাকি? ললিতা বলেছিল।

একরাশ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়েছিল সুখেন। সারাদিনের পরিশ্রমে, রোদে ছোটাছুটিতে ললিতাকে শুকনো দেখাচ্ছিল। বিশেষ, কোন প্রসাধনের, সাজসজ্জার বালাই ছিল না। এমন সাধারণ কোনদিন দেখেনি ললিতাকে। সুলতা এই নিয়ে কত কথা বলতো। সুখেনের সাক্ষাতেই কত ইঙ্গিত করতো আর সে সময় সুলতার চোখদুটো জ্বলে উঠতো। একটা ঈর্ষায় যেন জ্বলত সুলতা। সেই সুলতার মৃত্যুর দিন কেমন সাধারণ আটপৌরে হয়ে গেছে ললিতা। দিদি বেঁচে থাকতে যদি দেখতো ললিতাকে, তাহলে এমন ঈর্ষায় জ্বলত না সে। হয়তো মরতে ইচ্ছে হতো না তার। সুখেন চোখ ভরে নতুন করে দেখল ললিতাকে। অনেকক্ষণ। ওর চোখের ভাষা বুঝে নিয়ে বলেছিল, দেখ

উপোস করে থেকে যদি প্রায়শ্চিত্ত করা যায়। তোমার দিদির আত্মা হয়তো তাহলে তৃপ্তি পাবে।

দিদিকে তৃপ্তি দিতেই আপনি উপোস করে থাকবেন! তাহলে দিদির কাছে পৌঁছতে আর দেরি নেই। ললিতা বলেছিল।

আমাকে তোমার দিদির কাছে পৌঁছে দিতে পারো ললিতা? তোমার দিদি যেখানে আছে।

সুখেনের গলার স্বরে চমকে উঠেছিল ললিতা। পরিহাসের স্বর এ নয়। ললিতা জানে। তবে কি সত্যি পাগল হয়ে গেল। দিদির জন্য পাগল হয়ে গেল দাদাবাবু? আরো কাছে সরে এসে তার হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ললিতা বলেছিল, কী বলছেন! দিদির কাছে আপনি যেতে চাইবেন কেন? আপনার কি মাথা খারাপ হল?

সুলতার তো মাথা খারাপ ছিল না ললিতা।

না, দিদির মাথা ঠিকই ছিল।

তবে কেন সে আত্মহত্যা করল?

আমি কেমন করে জানবো? অসহায়ের মত সুখেনের হাতটা আরো জোরে আরো গভীরভাবে চেপে ধরেছিল ললিতা। —আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

আমিও পাচ্ছি না ললিতা। করোনারের কথা আমি বিশ্বাস করি না। হার্ট দুর্বল ছিল। এনিমিয়ায় ভুগছিল সুলতা—একথা সত্যি। কিন্তু আত্মহত্যার কথা কেমন করে ওরা মেনে নিল। আসলে রোগের লক্ষণ ছিল ওর মনে। আমার মনে হতো এমন একটা কাণ্ড ও করবেই। কথাগুলো বলে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল সুখেন। শারীরিক অস্থিরতা ওকে আরো বেশি উত্তেজিত করে তুলেছিল।

ও কথা যাক। আপনি আর বেশি ভাববেন না।

কিন্তু মন থেকে সরিয়ে দিতে পারি না ললিতা। আমি ওকে ক্ষমা করতে পারি না। সুলতার মৃত্যুকে আমি মেনে নিতে পারি না। আমি পাগল হয়ে যাবো ললিতা।

না-না! কী বলছেন! দুদিনেই আপনি দিদির কথা ভুলে যাবেন। আপনাকে ভুলতে হবে। বেঁচে থাকবার জন্য আপনাকে ভুলতে হবে।

বেঁচে থাকবার জন্য! সুখেন হেসে বলেছিল, বেঁচেই তো আছি। হাঁ বেঁচে থাকবো ললিতা। আমি অনেকদিন বেঁচে থাকবো। আমি বাঁচতে চাই। মৃত্যুকে আমি ভয় করি। আমি কোনদিন মৃত মানুষ দেখিনি। মানুষ মরে গেলে কেমন দেখায় এ-অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। আমি বড় ভীরু। ছেলেবেলায় হরিধ্বনি শুনলে কান চেপে রাখতাম, মাকে জড়িয়ে ধরতাম ভয়ে। কেউ মারা গেলে আমি পালিয়ে যেতাম, পাছে সেই মৃতের মুখোমুখি হতে হয়। বড় হয়েও আমার ভয় যায়নি। সুলতাই আমাকে সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে গেল। আমি মৃত্যুকে দেখলাম। চোখের সামনে দেখলাম মানুষের দেহকে নিস্পন্দ হয়ে থাকতে, বিকৃত হয়ে যেতে, আগুনে পুড়ে ছাই হতে। মানুষের মৃত্যুর চেহারা এমন বীভৎস করুণ—কল্পনাও করতে পারিনি। কেমন নিরুত্তাপ গলায় সুখেন কথাগুলো বলেছিল। না, ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না তার। স্বাভাবিক মনকেও হারিয়ে ফেলেছিল। একটি মানুষের মৃত্যু কেমন আবিষ্ট করে ফেলেছিল—তার চিন্তা বুদ্ধি বিবেক সবকিছুর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আবেগের আকুলতা রুদ্ধ কান্নার ভাষায় আকুলি বিকুলি করেছিল। রুদ্ধ আবেগ ভাষা পেতে চেয়েছিল তার মনে।

স্মরণ করতে পারে সুখেন কালকের প্রতিটি ঘটনার খুঁটিনাটি, প্রতিটি কথার ধ্বনি। কালকের ঘটনা কি? সুখেনের মনে হল অনেক অনেকদিন আগেকার। আদৌ এমন কিছু ঘটেছিল কিনা, তাও বলতে পারে না। না, আজ তার অফিসে যাওয়া উচিত ছিল। অফিসে একটা খবর দেওয়া, নয়তো সীক্ লীভের দরখাস্ত। অফিসের নিয়মে তার অনুপস্থিতি কেউ ক্ষমা করবে না। অবশ্য সে যদি বলেই ফেলে। সবাই তাকে সমবেদনা জানাবে। তার অসহ্য লাগবে। আড়ালে সহকর্মীরা মুখ টেপাটেপি করবে, তাও সে সহ্য করতে পারবে। আড়মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল সুখেন। ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। অনেকটা জায়গা বেড়েছে ঘরখানার। পায়চারি করা যায়। জানলা গলিয়ে কিছুটা আলো ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়েছে। পথের লাইটপোস্টের আলো চুরি করে ঘরে ঢুকেছে। অন্ধকারকে আরো যেন উজ্জ্বল করে তুলেছে। সুলতা থাকলে এই আলোটুকু নিয়ে কত কবিতা করতো। উপভোগ করতো আলোর এই অভিসার, চুপিসারে ঘরে ঢোকা। জোরে সুইচ টিপে আলো জেলে দিল সুখেন। অন্ধকার অসহ্য হয়ে উঠেছে। অন্ধকার সে সহ্য করতে পারতো না। তাকে ঘিরে ধরতো, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতো। সেজন্য সে বেশি পাওয়ারের আলো জ্বালতো ঘরে, সারা রাত একটা সবুজ আলো জেলে রাখতো। এই নিয়ে সুলতার সঙ্গে কত কথা কাটাকাটি হয়েছে, কত বাদানুবাদ। সুলতা আলো সহ্য করতে পারতো না। অন্ধকারকে সে ভালবাসতো। বলতো, আমি যা পছন্দ করি না তাই তুমি করবে। আমার যা অসহ্য তাই তোমার কাছে ভাল। আশ্চর্য মানুষ তুমি। সুখেন বলেছে, তোমার পছন্দের কথা আর বলো না। কিসে যে তোমার অসহ্য নয় বুঝি না। সুলতা বলতো, বুঝবে। আমি মরে গেলে তুমি বুঝবে। তখন সব বুঝবে। সুখেন বুঝতে পারে না আলো মানুষের অসহ্য হয় কেন? কিন্তু চড়া রঙ তো ওর অসহ্য ছিল না। ডিপ্ রঙের শাড়ি পরতো সুলতা। লাল কিংবা বেগুনি। বলতো, চড়া রঙেই নাকি ভালো দেখায়। সুলতাকে হালকা রঙ পরলেই মানাতো। কেননা, ওর রঙটা উজ্জ্বল ছিল না। ললিতার মত ছিল না ওর গায়ের রঙ। সুখেন বলেই ফেলেছিল, ওই রঙের শাড়ি তোমার বোনকে পরলে মানায়। সুলতা বলেছিল, আমার বোনকে কী পরলে মানায় তাই তো তোমার দেখার। তাকে কেমন করে হাটলে ভাল দেখায়, কেমন সাজ পোশাক

করলে, রাতদিন তুমি তারই ধ্যান কর— তা কি আমি বুঝতে পারি না ভাবো?

কী বলছো সুলতা! ভাগ্যিস ললিতা এখানে নেই।

আপসোস থাকে কেন। আনিয়ে দিচ্ছি তাকে। কথার সঙ্গে সঙ্গে সুলতার চোখ জ্বলে উঠতো। কী কথা থেকে কী কথা এসে পড়তো। সুখেন প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাইতো। আলো নিভিয়ে সুলতার তীব্র দৃষ্টি থেকে যেন আড়াল করতে চাইতো নিজেকে।

আজ আর আড়াল করতে চাইল না। আলনায় ঝোলান এলোমেলো শাড়ি ব্লাউজ সায়া বডিজ। চুলের ফিতে কাঁটা প্রসাধন সামগ্রী আয়নার সামনে জড়ো করা। যেন এইমাত্র সুলতা খুলে রেখেছে। এখনো মাথার তেলের দাগ, রান্নার হলুদ মশলার ছোপ কাপড়ে। কাপড়গুলো লণ্ড্রিতে পাঠাতে হবে। সেই সঙ্গে পাঞ্জাবিটাও। মনে করে কেমন আশ্বস্ত হল সুখেন। ধীরে ধীরে তার দৃষ্টিটা দেয়াল বেয়ে জানলার বাতা ছাড়িয়ে লোহার জাফরি ভেন্টিলেটর ডিঙিয়ে শির শির করে উপরে উঠতে লাগল। ছাদের কোণে মাকড়সার জাল অন্ধকার করে রেখেছে, ধুলো জমে ঝুলে রয়েছে। দৃষ্টি বুলিয়ে ছাদের কড়ি বরগা লেপে লেপে এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল। নিশ্চল, নিষ্পলক। ফ্যানের একটা হুক ঝুলে আছে। একটা ফ্যান পয়েণ্ট। অসহ্য গরমে ওই সিলিং-এর সঙ্গে একটা ফ্যান ঝোলাতে কতদিন বলেছে সুলতা। —পয়েণ্ট যখন আছে ইনস্টলমেণ্টে একটা ফ্যানও তো কিনতে পারো, নয়তো ভাড়াও করা যায়। সারাদিন আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। সারাটা দুপুর কেমন করে কাটে তা তুমি কি করে বুঝবে। সুখেন বলেছে, তা নয় সুলতা। ফ্যান কেনার কথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু একসঙ্গে যে অনেকগুলো টাকার দরকার। দেখি যদি পারা যায়। সুলতা বলেছে, আর দেখেছো। তোমাকে তো বাড়িতে থাকতে হয় না। অফিসে ফ্যানের নিচে বসে থাকো—। সুখেন হেসে বলেছে, তাই তোমার ঈর্ষা হয়। তুমিও তো ইচ্ছে হলে অফিসে ফ্যানের নিচে বসতে পারো।

না, আমি চাকরি করতে ছুটতে পারবো না। একটু ফ্যানের হাওয়ার জন্য আমাকে দিয়ে গোলামি করিয়ো না।

চাকরি করলেই গোলামি হয় না। তাছাড়া গোলামি কে না করছে। আজকাল মেয়েরা তো চাকরি করছে।

করুকগে। তাবলে আমাকেও করতে হবে। তোমার মত লোকের হাতে পড়েছি বলেই না আমার এমন হাল হয়েছে। রাগে সুলতা স্বামীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে দ্বিধা করতো না।

সুখেনকেই বলতে হতো শেষে, আচ্ছা। আচ্ছা। তোমাকে আর চাকরি করতে হবে না। ফ্যানও দেখি আনতে পারি কিনা। সুলতা গুম হয়ে বসে থাকতো। অনেকক্ষণ অপ্রিয় কথা বলে ও যখন হাঁপিয়ে উঠতো তখন হঠাৎ কথা বন্ধ করে গুম হয়ে থাকতো। ডাকলেও সাড়া দিতো না। মেজাজটা ওর কিছুদিন হল এমন হয়ে উঠেছিল। সামান্য কিছুতেই রেগে উঠতো, কথার সূত্র পেলেই কথা শোনাতো।

সেই ফ্যান আর এবারের মেজনে কেনা হয়নি। আগামী বছরের জন্য মুলতুবি রয়েছে। অথচ ফ্যানটা কেনা হলে এমন হতো না। জংধরা লোহার ওই নিঃসঙ্গ হুকটাই কাল হয়েছে। সিলিং-এর গায় আটকানো লোহার হুকটা একটা আকর্ষণের মত টানতে লাগল। মাধ্যাকর্ষণের চেয়েও এর শক্তি বেশি, এর আকর্ষণ কাটানো যায় না। স্থির একটা বিন্দুতে নিজেকে সংহত করে রাখে, দৃষ্টির বিভ্রম ঘটায় না। নিচের খাটটা অনেকখানি দূরত্ব ঘুচিয়ে দেয়। ধীরেধীরে সিলিংটা এগিয়ে আসতে লাগল, আরো কাছে, হাতের নাগালের মধ্যে। যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়, স্পর্শ করা যায়। কি ঠাণ্ডা, মৃত্যুর মত শীতল বরফের মত নিরুত্তাপ। নিশ্চিত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারা যায়। একটা পরিণতির দিকে টানতে লাগল, হাতছানি দিল, কাছে টানল, জড়িয়ে ধরল। আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিতে ইচ্ছে হল। হাঁ সুলতাই তো। ওর লাল শাড়ির একটা তীব্র আকর্ষণ। হাতছানি, ইশারা। তাকে ডাকছে, কাছে ডাকছে। ওই সিলিংটার সঙ্গে ঝোলান ওর শরীরটা তো নিস্পন্দ নয়। এই তো ছুঁয়ে দেখল সুখেন। কেমন জীবন্ত, স্পন্দিত, উত্তপ্ত ওর শরীরের স্পর্শ।

আমাকে ডাকছো সুলতা?

হাঁ, কাছে এসো। ভয় পাচ্ছো কেন? এগিয়ে এসো। আমাকে ছুঁয়ে দেখ আমি বেঁচে আছি। তুমি না ছেলেবেলায় ভয় পেতে।

ও তো ছেলেবেলার কথা। এখন অনেক বড় হয়ে গেছি। ভয়-টয় আমার নেই।

খিল-খিল করে হেসে উঠল সুলতা। তাই বলো! তোমাকে দেখে আমি কী ভয় পেয়েছিলাম। যাক বাঁচা গেল। তুমি ভয় পাওনি! এবার শোন আমার কথা। কোনদিন তো আমার কথা শোননি।

এবার শুনবো। তোমার সব কথা শুনবো আমি।

অনেক অন্ধকার সাঁতরে অতলে ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠে চোখ মেলে তাকাল সুখেন। স্বপ্নের মত সব জড়িয়ে গেছে। হিজিবিজি কাটাকুটি। অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া একটা স্মৃতি ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। ললিতাকে সামনে দেখে উঠে বসার চেষ্টা করল সুখেন।— কখন এলে? একি আমার চুলগুলো সব ভিজে গেছে।

ললিতা তখনো বিশ্বাস করতে পারছে না। এতক্ষণের সযত্ন শুশ্রূষা বিকারের ঘোর থেকে জাগিয়ে তুলবে সুখেনকে। মাথায় জল ঢেলে, ব্লটিং পেপার পুড়িয়ে নাকের কাছে ধরে অনেক চেষ্টা করেছে। তার জানা যা কিছু বিদ্যা ছিল সবই পরীক্ষা করে দেখেছে। শেষে ডাক্তার ডাকবে ঠিক করতেই সুখেনের জ্ঞান ফিরে এল। খাটের একপাশে তার শরীরটা ঝুলে ছিল—কেমন অপ্রকৃতিস্থ, অসম্বৃত, বিকারগ্রস্ত।

কেমন লাগছে এখন?

কেন? আমার কি হয়েছিল? তারপর চোখ বুজে স্মরণ করার চেষ্টা করল সুখেন। কী একটা মনে করে বলল, জানো ললিতা, আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।

ভাগ্যিস আমি এসে পড়েছিলাম। না হলে আর এক কাণ্ড বাধিয়ে বসতেন। এবার চলুন দেখি। উঠুন।

সুখেন ম্লান হাসল। বলল, আমাকে নিয়ে যেতে এসেছো? কোথায় নিয়ে যাবে? আমি তোমার দিদিকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারি না ললিতা। সুলতা আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল। কেমন অপ্রকৃতিস্থের মত ললিতার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল সুখেন।

ললিতা ওর কথায় চমকে উঠল। যেন সেও আর নিজেকে সামলাতে পারছে না। ললিতা বলল, আমি নিয়ে যেতে দেবো না!

সত্যি তুমি আমাকে আটকে রাখতে পারবে? সত্যি পারবে? আমার কেমন ভয় হচ্ছে। তুমি আমাকে ফেলে যেও না ললিতা। তুমি এখানে থাকো। দিদির পাশে। দিদিকে আড়াল করে থাকবে তুমি।

আলোটা নিভিয়ে দেবো? তোমার আলো অসহ্য লাগে না?

না। আলোটা জ্বালা থাক।

আমি অন্ধকার সইতে পারি না। আমার মনে হয় অন্ধকার মানে মৃত্যু। আর এক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আর এক জীবনকে পেতে চাই। তুমি দিতে পারবে ললিতা?

॥ শের-ই—বাঙগাল ॥

বঙ্গ রাজনীতির প্রায় অর্ধ শতাব্দীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক, শত সংঘর্ষের বীর যোদ্ধা, শের-ই-বাঙগাল ফজলুল হক পরিণত বয়সে ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের যাঁরা প্রথম দিনের সঙ্গী সেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ আবদুল্লা সোহরাবর্দী প্রভৃতি সকলেরই স্থান আজ ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের যুগের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা জনাব হক প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও ছিলেন বাঙলাদেশের মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। ওপরতলার রাজনীতির কূটবুদ্ধির খেলায় বহুবার পরাজিত হয়েছেন তিনি, কিন্তু সে পরাজয় তাঁকে গ্রাম-বাঙলার কোটি কোটি মানুষের

অন্তরের আসন থেকে কখনও অপসারিত করেনি। তাই মুকাবিলার সুযোগ এলেই 'শের-ই-বাঙগাল' বুঝিয়ে দিয়েছেন, ড্রয়িং রুমের কূটবুদ্ধি রাজনীতিকদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ কোথায়।

বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সাহসে, কর্মক্ষমতায় হক সাহেব ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ১৮৯৪ সালে যুগপৎ গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর সম্মানসহ তিনি বি-এ পাশ করেন, এবং পরে গণিতে এম-এ ও ল' পাশ করে ১৮৯৮ সালে স্যার আশুতোষের জুনিয়ররূপে কলিকাতা হাইকোর্টে শুরু করেন আইন ব্যবসায়। অনতিবিলম্বেই আইন ব্যবসায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেন কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারেন না তাঁর দেশের কোটি কোটি মানুষকে যাদের দুর্দশা শৈশবে অতি কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি। ১৯১২ সালে তিনি যোগ দেন জাতীয় কংগ্রেসে, ১৯১৫ সালে শুরু করেন প্রজা-

আন্দোলন। ১৯১৮ সালে তিনি হন জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেসের সমর্থনে হন কলিকাতা পৌরসভার মেয়র। ১৯৩৭ সালে জনাব হক শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন বাঙলা মুশ্লিম লীগের নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনকে বিধানসভার নির্বাচনে। কিন্তু তারপর কংগ্রেসের অবহেলাতেই ফজলুল হককে সাময়িকভাবে হারায় বাঙলার জাতীয়তাবাদী শক্তি, যার ফলে এদেশে গড়ে ওঠার সুযোগ পায় মুশ্লিম সাম্প্রদায়িকতা।
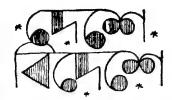
দেশ বিভাগের পর হক সাহেব ঢাকায় যান এবং মুশ্লিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। সে সুযোগ আসে ১৯৫৪ সালে, পূর্ব-বঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে। মুশ্লিম লীগের বিরুদ্ধে সংযুক্ত ফ্রণ্টের নেতারূপে তিনি নির্বাচনে নামেন এবং সে নির্বাচনে অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের। কিন্তু হক সাহেবের পক্ষে সে গণনেতৃত্ব বেশীদিন অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়নি। অনতিবিলম্বে সারা পাকিস্থানে কায়েম হয় আয়ুব খাঁর সৈন্যশাসন আর সে শাসনের পীড়নে কয়েক কোটি পাকিস্থানবাসীর সঙ্গে ফজলুল হকের কণ্ঠও চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়। কিন্তু তবুও এই সাধারণ মানুষটির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্থানের প্রাণের সংযোগ যে কখনও ছিন্ন হয়নি তা প্রমাণিত হয়েছে তাঁর শবানুগমনে লক্ষ মানুষের সমাগমে। রণক্লান্ত যোদ্ধা পরলোকে চিরশান্তি লাভ করুন, সারা বাঙলার সকল মানুষের সঙ্গে আজ এই আমাদের কামনা।

॥ তুচ্ছের বিড়ম্বনা ॥

অতি তুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র এক নয়া পয়সা সরকারী টাঁকশালে নাকি এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। বিদেশ থেকে তামা আমদানির খরচ সমেত তার বর্তমানে যা উৎপাদন ব্যয় তাতে তার মুদ্রা-মূল্যের অর্ধেকও নাকি উশুল করা সম্ভব হচ্ছে না। দু' নয়া পয়সারও বেশী খরচ করে সরকারকে প্রতিটি নয়া পয়সা ছাড়তে হচ্ছে বাজারে। কিন্তু তার চেয়েও দুশ্চিন্তার কারণ হল এই সামান্য মুদ্রাটির অসামান্য বাজার চাহিদা। কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি টাঁকশালের এক-তৃতীয়াংশ সময় ব্যয় হয়ে যায় শুধু এক নয়া পয়সার উৎপাদনে, তবুও তাতে ক্রয়ক্ষমতাশূন্য ঐ ক্ষুদ্র মুদ্রাটির বাজার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। মুদ্রাটি বর্তমানে ধাতব প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে, সরকারের মনে এমন আশঙ্কাও নাকি দেখা দিয়েছে। তাই রেলভাড়া, বাসভাড়া, রাজস্ব শুল্ক, খাম পোস্টকার্ডের দাম প্রভৃতি যাবতীয় সরকারী হিসাবব্যবস্থায় বেজোড় সংখ্যার বদলে শূন্য বা পাঁচ-বিভাজ্য সংখ্যায় মূল্যমান স্থিরীকরণের কথা চিন্তা করছেন সরকার। তাতে নয়া পয়সার চাহিদা হয়ত কমবে, কিন্তু এই অজুহাতে যাবতীয় বস্তুর আরও একবার দাম বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ মিলবে সব সরকারী ও বেসরকারী মুনাফা-শিকারীদের।

॥ সরকারের ভেল্কি ॥

'আচ্ছা ভেল্কি দেখালে বটে সরকার'—কথাটা বলছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের জনৈক কর্মচারী। দশ টাকা মাগ্গীভাতা বাড়ার কথাটা শোনামাত্রই তাঁর নাকি সন্দেহ হয়েছিল, ওটা আর এক হাত দিয়ে পনর টাকা বার করে নেওয়ার প্রারম্ভিক প্রস্তুতি। বাজেটের দণ্ডাঘাত মাথায় পড়ার পর তাঁর সে সন্দেহের নিরসন হল। তিনি হিসেব করে দেখিয়ে দিলেন, শুল্ক বাড়ানোর জন্যে কাপড়, সুতো, তামাক, দেশলাই, চা প্রভৃতির যে হারে দাম বাড়লো, বাড়তি দশ টাকা মাগ্গী ভাতা দিয়ে তার বারো আনা মাত্র পূরণ হবে মাত্র। তবুও তিনি জানালেন যে, এই বাজারে অন্ততঃ দশটা টাকা মাইনে বেড়েছে তাঁর। যারা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী নয় সেই কোটি কোটি মানুষের মাথায় যে বিরাট বোঝা ইতিমধ্যেই চেপে আছে তাদের কোন

সরকারী কৃপায় সাম্প্রতিক ব্যয়বৃদ্ধিটি সম্পূর্ণই নূতন সংযোজন। এর ওপরেও আছে রেলের যাত্রীভাড়া ও মালভাড়া বৃদ্ধি।

একচেটিয়া কারবারেও কতকগুলি বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। সৃষ্টিছাড়া যে কোন দাম চেয়ে বসা যায় না যে কোন পণ্য বা কাজের জন্যে, তা সে পণ্য বা সে কাজ যতই মানুষের প্রয়োজনে লাগুক না কেন। একচেটিয়া কারবারের জবরদস্তির সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক হল বিকল্প পণ্য বা সেবা, যা অর্থনীতির প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদেরও জানা আছে। সুতরাং ভারত সরকারের ওকথা অজানা থাকার কথা নয়। তবুও তাঁরা কোন বিবেচনায় যে রেলের যাত্রীভাড়া ও মালভাড়া বাড়িয়ে দিলেন, তা বোধহয় শুধু তাঁরাই জানেন। রেলের উভয় পর্যায়ে এইভাবে ভাড়া বৃদ্ধিকে সবচেয়ে বেশী সাদর অভিনন্দন জানাবে বাস ও ট্রাকের মালিকরা যারা আজ ভারতের সর্বত্র রেলের বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থা হিসাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এমনিতেই সাধারণ মানুষের কাছে আজ মালবহনের ব্যাপারে ট্রেনের চাইতে ট্রাক অনেক নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, এরপর যখন ট্রেনের মালবহনের মাশুল দ্বিগুণ হবে, তখন ট্রাকের চাহিদাও দ্বিগুণতর হবে। যাত্রীবাহী বাসের উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধিও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ অবস্থায় সরকারের রেলের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবকে সুবিবেচনাপ্রসূত বলে ভাবা খুবই কষ্টসাধ্য। তৃতীয় শ্রেণী নামক চলমান অন্ধকূপগুলি মুমূর্ষু যাত্রীগুলির সামান্যতম নিশ্বাস ফেলার সুযোগটুকুও না করে দিয়ে তাদের কাছ থেকে আরও বেশী ভাড়া চাওয়ার নৈতিক অধিকারের প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে না হয় না-ই তোলা গেল।

॥ কর্ণফুলি ॥

পাক প্রেসিডেণ্ট জনাব আয়ুব খাঁ গত ৩১শে মার্চ কর্ণফুলি বাঁধের উদ্বোধন করেছেন। ঐ বাঁধ নির্মিত হলে চট্টগ্রাম বিভাগের কি কি মহান উপকার সাধিত হবে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন জনাব আয়ুব, শুধু বলেননি, ঐ বাঁধের ফলে কি সমূহ ক্ষতি হবে ভারতের অন্তর্গত আসামের লুসাই পাহাড় এলাকার। বাঁধ বাঁধার যখন প্রস্তাব ওঠে ১৯৫০ সালে তখনই ভারত পাকিস্থানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল ঐ বাঁধের ফলে লুসাই পাহাড়ের বহু ভূমি নিমজ্জিত হবে। কিন্তু ভারতের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে পাকিস্থান কর্ণফুলিতে বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনার কাজ শেষ করেছে এবং তার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ আসামের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। ভারত সরকারের সেচমন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম লোকসভায় বলেছেন, পাকিস্থানের এই অন্যায় ও আন্তর্জাতিক আইন-বিরোধী কার্যকলাপ দমনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার অবিলম্বে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন তবে সে ব্যবস্থা কি ধরণের হবে, জনস্বার্থের খাতিরে সেচমন্ত্রী এখনই তা প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করেননি।
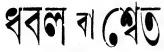
॥ সোনার খাট ॥

সোনার খাটে গা, রূপোর খাটে পা রাখত রূপকথার রাজকন্যারা। তাতে এ মর্তজগতের অধিবাসীদের কোন আপত্তি ছিল না, কারণ তাদের পয়সায় ঐ রাজকন্যাদের বিলাসবাসন চলত না, মন্ত্রেই হত ওসব। কিন্তু লোকের রক্ত জল করা টাকায় রূপকথার রাজকন্যা হওয়ার সখ হয়েছিল ঘানার শিল্পমন্ত্রীর শ্বেতাঙ্গিনী সহধর্মিণীর। সুতরাং গোড়াতেই সাংঘাতিক ভুল হয়েছিল তাঁর, আর আজ সে ভুলের মাশুল দিতে তিনি স্বামী-পুত্রে সর্বহারা।

আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন দেশ ঘানা এগিয়ে চলেছে সমাজতন্ত্রের পথে, ডঃ এনক্রুমা পরিচালিত ঘানার শাসকদলের অন্তত ওই দাবী। কিন্তু ক'দিন আগে হঠাৎ লণ্ডনের এক সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়, ঘানার শিল্পমন্ত্রী ক্রোবো এডুসেইর সহধর্মিণী মেরী লণ্ডনের এক সৌখিন আসবাবের দোকান থেকে কিনেছেন, সোনার পাতে মোড়া এক পালঙ্ক, যার দাম চল্লিশ হাজার টাকা! সঙ্গে সঙ্গে দাবানলের মত সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে ঘানায়, এবং এনক্রুমার সহকর্মীদের পক্ষ থেকেই দাবী ওঠে শিল্পমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের। নিরুপায় শিল্পমন্ত্রী ছুটলেন লণ্ডনে প্রতিকারের আশায়। কিন্ত প্রতিকার কিছু হল না, পরন্ত ফিরে এসে দেখলেন, ঘানার রাজধানী আক্রার উপকণ্ঠে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে স্বপ্নপ্রাসাদ তিনি নির্মাণ করেছিলেন তাও গেছে হাতছাড়া হয়ে। ঘানার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ডঃ এনক্রুমার অন্যতম বিশ্বস্ত সহকর্মী ক্রোবো এডুসেই বোধহয় সংগ্রামের পুরস্কার মনে করেই যে প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন তার মধ্যে আছে সাঁতারের পুকুর, বিরাট মর্মরনির্মিত অতিথি অভ্যর্থনা ভবন, চোখ ঝলসানো আলোকস্তম্ভ। সরকারী নির্দেশে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ক্রোবোর স্বপ্নপুরী।

॥ আবার পরীক্ষা ॥

সকলের সব অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্র আবার শুরু করল বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক পরীক্ষা। এই ভয়ংকর পরীক্ষার পরিণতি কি ভয়াবহ যুক্তরাষ্ট্রের তা অজানা নেই, তবুও তাকে বিশ্বের শান্তিকামী কোটি কোটি মানুষের সকাতর অনুরোধ নিবৃত্ত করতে পারল না। এমন কি নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা চলাকালে পরীক্ষা বন্ধ রাখার জন্য যে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাও যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য হল যে, পর্যবেক্ষণাধীন নিয়ন্ত্রণ ছাড়া নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে আর কোন প্রস্তাবেই তার পক্ষে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়। আর সে প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পরীক্ষা বন্ধ রাখাও সম্ভব নয়। পারমাণবিক শক্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের অগ্রগতি যুক্তরাষ্ট্র নীরব নিশ্চেষ্ট হয়ে দেখে যেতে পারে না।

এক পক্ষের এই যুক্তি ও মনোভাবের অনিবার্য পরিণতি সকলেরই জানা আছে। এর পর সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হতেও অনুরূপভাবে পারমাণবিক পরীক্ষা শুরু হবে, আর তা সে শুরু করলে তার প্রতি কোন রকম দোষারোপই করা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সোভিয়েট ইউনিয়ন এ পর্যন্ত ত অনেক কম পরীক্ষা করেছেই, সমগ্র পশ্চিমী শক্তিজোটের পরীক্ষার সামগ্রিক হিসাবের সঙ্গে তুলনা করলে সোভিয়েট ইউনিয়নের পরীক্ষার স্বল্পতা আরও স্পষ্ট হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হতে এ পর্যন্ত পারমাণবিক পরীক্ষা হয়েছে ১০৫টি, সে জায়গায় যুক্তরাষ্ট্র পরীক্ষা করেছে ১৮১টি, বৃটেন ২২টি ও ফ্রান্স চারটি। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়নও অবশ্যই আর চুপ করে থাকবে না। আর তার ফলে সারা পৃথিবীর আকাশ আবার সর্বনাশা বিশ্বযুদ্ধের অশুভ আশঙ্কার মেঘে কালো হয়ে উঠবে।

॥ ঘরে ॥

১৯শে এপ্রিল—৬ই বৈশাখঃ ১লা জুলাই (১৯৬২) হইতে রেলের মাশুল ও যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব—রেলওয়ে মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং কর্তৃক লোকসভায় নূতন রেল বাজেট পেশ।

লাদাক অঞ্চলে চীনাদের আর এক দফা অনুপ্রবেশ ও ঘাঁটি স্থাপন—চীন সরকারের নিকট ভারতের তীব্র প্রতিবাদ—লোকসভায় পররাষ্ট্র বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননের বিবৃতি।

ভারত-নেপাল সম্পর্ক বিষয়ে দিল্লীতে নেপালের রাজা মহেন্দ্র ও প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরুর মধ্যে পুনরায় গোপন বৈঠক।

২০শে এপ্রিল—৭ই বৈশাখঃ ভারতস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ গলব্রেথ কর্তৃক ব্যাণ্ডেলে দেশের বৃহত্তম তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন—অর্থ সাহায্যের জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (মুখ্যমন্ত্রী) কর্তৃক অনুষ্ঠানে মার্কিণ সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

কলিকাতা ও উপকণ্ঠে বৎসরের প্রথম কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব—প্রচণ্ড ঝড় ও জলে রেল, বিমান, ট্রাম, বাস চলাচল ব্যাহত।

পুরুলিয়ায় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ৩৭তম বার্ষিক সম্মেলন সুরু; সভাপতি অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী।

২১শে এপ্রিল—৮ই বৈশাখঃ এক তরফা কর্ণফুলী বাঁধ নির্মাণ সম্পর্কে ভারতের আর এক দফা প্রতিবাদ—প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া পাকিস্থানকে সতর্কীকরণ।

নয়াদিল্লীতে রাজা মহেন্দ্র (নেপালা-ধীশ) ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মধ্যে দুই দফা আলোচনা।

পুরুলিয়া সম্মেলনে দীর্ঘ আলো-চনার পর মাধ্যমিক শিক্ষকদের (পশ্চিম-বঙ্গ) প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত।

২২শে এপ্রিল—৯ই বৈশাখঃ দিল্লী আলোচনা ফলপ্রসূ হইয়াছে রাজা মহেন্দ্রের (নেপাল) মন্তব্য।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র চাউল ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি—সাধারণ মানুষের চরম দুর্দশা।

২৩শে এপ্রিল—১০ই বৈশাখঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৬২—৬৩ সালের বাজেটে ১৫০ কোটি টাকা ঘাটতি—পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কর্তৃক নূতন বাজেট পেশ—কাপড়, সূতা, তামাক, দিয়াশলাই, চা, চট ও বস্তার উপর শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব।

ভারত-নেপাল সম্পর্কের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা—রাজা মহেন্দ্র-নেহরু যৌথ ইস্তাহার প্রকাশ—বিভিন্ন বিষয়ে উভয় নেতার ঐক্যমত।

পূর্ব পাকিস্থান হইতে এখনও শত শত উদ্বাস্তুর পশ্চিমবঙ্গে আগমন।

চীনের সহিত বাণিজ্য আলোচনায় ভারত অসম্মত—অধিকৃত এলাকা না ছাড়িলে কিছুই করা হইবে না বলিয়া সাফ জবাব।

২৪শে এপ্রিল—১১ই বৈশাখঃ পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ রাখার জন্য আণবিক শক্তিগুলির নিকট শ্রীনেহরুর আবেদন।

'প্রয়োজনবোধে পূর্ব পাক সীমান্তে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হইবে'— লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) আশ্বাস।

২৫শে এপ্রিল—১২ই বৈশাখঃ 'কাশ্মীরে পাকিস্থানই রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দেশ অমান্য করিয়াছে'—পাক অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের নতুন পুস্তিকা প্রকাশ।

'শৌলমারী আশ্রমের সাধু নেতাজী সুভাষচন্দ্র নহেন'—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আশ্রম সম্পাদক শ্রীরমণীরঞ্জন দাসের পত্র।

॥ বাইরে ॥

১৯শে এপ্রিল—৬ই বৈশাখঃ বৃটেনে প্রবেশ সম্পর্কিত কমনওয়েলথ বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ আইন—১লা জুলাই (১৯৬২) হইতে বলবৎ হইবে বলিয়া বৃটিশ সরকারের প্রেস নোটে ঘোষণা।

দক্ষিণ নেপালে সশস্ত্র ও সুসংগঠিত বিদ্রোহী দলের অভিযান—নেপালী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি।

২০শে এপ্রিল—৭ই বৈশাখঃ পাক সরকারের নিকট বিনা বিচারে আটক সকল ছাত্র, সাংবাদিক ও জননেতার মুক্তি দাবী—ময়মনসিংহ ও রাজসাহী বার এসোসিয়েশনের সভায় প্রস্তাব গৃহীত।

আমেরিকা আণবিক পরীক্ষা চালাইলে রাশিয়া ত্রিশক্তি পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ কমিটি বর্জন করিবে—জেনেভায় সাংবাদিক বৈঠকে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ জোরিনের হুমকী।

২১শে এপ্রিল—৮ই বৈশাখঃ প্যারিসের জেলে দাঙ্গা ও অগ্নি-সংযোগ—১৫ জন বন্দী ও পাঁচজন পুলিশ আহত।

প্রশান্ত মহাসাগরে খৃষ্টমাস দ্বীপে আমেরিকার প্রস্তাবিত পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষায় বাধা প্রদানের আহ্বান—নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির (ভারত সমেত) নিকট দার্শনিক রাসেলের (৮৯) আবেদন।

মার্কিণ সরকারের বায়ুমণ্ডলে আণবিক পরীক্ষা পুনরারম্ভের বিরুদ্ধে আমেরিকার সর্বত্র বিক্ষোভকারীদের মিছিল।

২২শে এপ্রিল—৯ই বৈশাখঃ 'সমগ্র বিশ্বে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির সদস্য সংখ্যা প্রায় চার কোটি তন্মধ্যে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহেই প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ সদস্য'—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বিশ্লেষণে তথ্য প্রকাশ।

২৩শে এপ্রিল—১০ই বৈশাখঃ মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কেনেডি কর্তৃক পারমাণবিক অস্ত্র-সজ্জিত পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা প্রস্তাব অনুমোদন।

আমেরিকার পারমাণবিক পরীক্ষা পুনরারম্ভের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লণ্ডনে ১০ হাজার বিক্ষোভকারীর নীরব প্রতিবাদ।

২৪শে এপ্রিল—১১ই বৈশাখঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ ও লিওনিদ ব্রেজনেভ পুনরায় রাশিয়ার যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।

আর্জেণ্টিনায় সমস্ত নির্বাচনের (মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত) ফলাফল বাতিল—প্রেসিডেন্ট গোসে গুইডো কর্তৃক সকল প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ।

রাশিয়া কর্তৃক 'কসমস-৩' নামক কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন।

২৫শে এপ্রিল—১২ই বৈশাখঃ আমেরিকা কর্তৃক শীঘ্রই প্রশান্ত মহা-সাগর অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা আরম্ভ—প্রেসিডেন্ট কেনেডির চূড়ান্ত নির্দেশ।

রাশিয়ার নূতন সরকার মোটামুটি অপরিবর্তিত— ক্রুশ্চেভ (প্রধানমন্ত্রী) অন্তরঙ্গগণ স্ব স্ব পদে বহাল—ষ্ট্যালিনী শাসনতন্ত্র পাল্টাইবার উদ্যোগ।

অভয়ঙ্কর

॥ আরো বই পড়ুন ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একজন ফরাসী রসিক সমসাময়িক গ্রন্থ সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ মন্তব্য করেছিলেন; তাঁর মতে সমকালীন গ্রন্থাদি যেন একদিনেই লিখিত, পড়ে মনে হয় পূর্বদিনে পঠিত গ্রন্থপাঠের প্রত্যক্ষ ফসল নতুন বই। ভারতবর্ষের যে স্বল্পসংখ্যক পাঠক আছেন, যাঁরা আজো বই কিনে পাঠ করে থাকেন, তাঁদের অনুভূতি কতকটা এই জাতীয়। ভারত সরকারের বিদায়ী তথ্য ও বেতারমন্ত্রী কেশকার আগস্ট ১৯৬১-তে প্রকাশকদের এক সম্মেলনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থাদি যে বিক্রী হয় না, বেশী লোকে কেনে না, কিনে পড়ার আগ্রহ নেই, তার কারণ সে সব বই কেনবার উপযুক্ত নয়। তিনি আরো বলেছিলেন যে প্রকাশকদের সমস্যাটা কেমন করে বই বিক্রী হবে তা নয়, কাকে বিক্রী করা যাবে এই হল আসল সমস্যা। প্রকাশকরা স্বচ্ছন্দে তাঁদের ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেন, যদি তাঁরা বৈদগ্ধ-কৌতূহল পাঠকমনে জাগ্রত করতে পারেন।

মন্ত্রী মহোদয়ের এই উপদেশ নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণে যে শক্তিমান যন্ত্র আছে, জন-সংযোগ রক্ষা করা এবং জনসমাজে পৌঁছে দেওয়ার যে পদ্ধতি আছে তার সাহায্যে প্রকাশকদের কি সাহায্য হতে পারে সে কথা তিনি সেদিন বলেননি। কিভাবে প্রকাশকরা শ্রীযুক্ত কেশকারের এই উপদেশ পালন করতে পারেন, তার নির্দেশ তিনি দেননি।

বেতারযন্ত্রের দ্বারা প্রচারিত সঙ্গীত, তথ্য, সাহিত্য, সংবাদ-সমীক্ষা ইত্যাদিতে কি জনসাধারণের যথেষ্ট কৌতূহল জাগানো গেছে? সরকারী নির্দেশে এবং তত্ত্বাবধানে প্রযোজিত নাটকের মাধ্যমে জনসাধারণকে কতদূর শিক্ষিত করা গেছে, কতটা সমাজসচেতন করা সম্ভব হয়েছে! সরকারী দৃশ্য-শ্রাব্য (audio-visual) প্রচারপ্রচেষ্টা কতখানি সাফল্য লাভ করেছে? এই প্রশ্নাবলীর উত্তর কোথায় পাওয়া যাবে? প্রকাশকরা তাঁদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যথাসম্ভব কৌতূহলোদ্দীপক, চিন্তা-কর্ষক, মনোহর, সুলিখিত গ্রন্থ প্রচ্ছদ-ভূষণে সজ্জিত করে প্রকাশ করছেন, নতুন বইটির প্রকাশ-সংবাদ যথোচিত কৌশলসহকারে বিজ্ঞাপিত করছেন। গ্রন্থাদির ভালো, মন্দ কিংবা উদাসীন জাতীয় সমালোচনাও বহুল এবং স্বল্প প্রচারিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু যে বিপুলসংখ্যক পাঠক বই কিনবো না, দেখবো না এবং পড়বো না পণ করেছেন, তাঁদের আগ্রহ কিভাবে বাড়ান যাবে?

দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত কোনও প্রকারের সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা দ্বারা পঠিতব্য বিষয়াদির (গ্রন্থ, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতি) কি কারণে পাঠকমহলে তেমন চাহিদা নেই, আগ্রহ নেই এই গবেষণা করানো হয়নি। অথচ বিগত দুই দশকে দেশে শিক্ষার হার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে গিয়েছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গের সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের পরিচালিত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের সংখ্যা নাকি ১·৪ মিলিয়নের মত। ৫০০০ হাজার পরীক্ষক এই ১·৪ মিলিয়ন খাতা দেখতে দেখতে এই গরমে হিমসিম খাচ্ছেন। অনেকে সব-কনট্রাক্ট দিয়ে আত্মীয়কুটুম্বমহলে খাতা বিতরণ করছেন। এই বাংলাদেশে আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও গ্রন্থপাঠের আগ্রহ ছিল, যাঁরা তেমন লেখাপড়া জানতেন না তাঁরা অপরের মুখ থেকে শুনতেন প্রতি সন্ধ্যায় ইনস্টলমেণ্ট পদ্ধতিতে। রাজশেখর অগ্রজ রসিকপ্রবর শশিশেখর বসু মহাশয়ের 'যা দেখেছি যা শুনেছি' নামক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ উধৃত করছি একথার প্রমাণস্বরূপ—

"তারপর? মামী জিজ্ঞাসা করলেন। ভাগনে উপেন্দ্র প্রদীপের শলতে উসকে দিয়ে 'তটিনী তরঙ্গ' উপন্যাসের খোলা পাতায় আবার চোখ বুলুতে লাগল। বলতে লাগল ব্যাখ্যা করে:—

—হ্যাঁ, তারপর তটিনী একটু রাগ দেখিয়ে ওঘরে চলে গেল। যাবার সময় তপনকে বলে গেল, সকলের সামনে তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকো কেন? ইত্যাদি।

এ-বাড়ির ও-বাড়ির ঝি, রাঁধুনিও গল্প শুনছিল, গ্রাম সম্পর্কে এক মাসীমাও ছিলেন; সেকালে নিরক্ষরার দল প্রেমের গল্প শুনতো এই রকম করে।" —(যা দেখেছি যা শুনেছি: পৃ ৩১)।

এই জিনিষ বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের ঘরে ঘরে একদা প্রচলিত ছিল। যা একদা অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত বর্তমান সভ্যতার স্পর্শ লাভ করে তা কি বে-মালুম সূক্ষ্ম বাতাসে মিলিয়ে গেল? এ অবস্থা শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতেই নাকি আজ উপর এবং মাঝের তলার সমাজে এই অবস্থা। অথচ স্ট্যাটিসটিক্স দেখে গড়পড়তা শিক্ষার হার কিভাবে কয়েক বছরে বেড়েছে তা জানা যায়, অথচ সাময়িক বা সংবাদপত্রের কিংবা মুদ্রিত পুস্তকের প্রচারসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেলেও আশানুরূপ বাড়েনি। গ্রন্থ-প্রকাশের সংখ্যা বা তার প্রচার-সংখ্যার কোনও গ্রহণযোগ্য সর্বভারতীয় স্ট্যাটিস-টিক্স পাওয়া যায় না, অথচ বই-এর বাজারে দুর্ভিক্ষ ঘটেনি, প্রতি সপ্তাহেই হাজার হাজার বই সারা ভারতে প্রকাশিত হচ্ছে, তার মধ্যে সরকারী, আধা-সরকারী, বিদেশী রাষ্ট্রের আনুকূল্যে প্রকাশিত গ্রন্থাদির সংখ্যা কম নয়।

বাংলাদেশে 'বেস্ট সেলার' মানে তিন মাসে এক হাজার খণ্ড গ্রন্থবিক্রয়। যে হিন্দী ভাষা ভারতের ভাষা, যার প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা খয়রাত করছেন তার সর্বাধিক চাহিদাসম্পন্ন গ্রন্থ বড়জোর ৫০০০ কপি বিক্রী হয়, অথচ হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চল এবং হিন্দী পাঠকের সংখ্যা কম নয়, একটি প্রদেশেই সীমা-বদ্ধ নয়।

দেখা গেছে ধর্মীয়গ্রন্থ বা ধর্ম-গুরুর জীবনীর একটা চাহিদা আছে বছরের সব সময়ে, কিন্তু উপন্যাস, গল্প, বিজ্ঞানালোচনা, বা সাময়িক প্রসঙ্গ খুব বেশী বিক্রী হলে বড়জোর তিন-চার হাজারের বেশী নয়, অর্থাৎ তিন কিংবা চার সংস্করণেই তার বাজার পড়ে যায়। এর কারণ কি? আমাদের পাঠকরা কি সত্যই উদাসীন? না আমাদের লেখকরা পাঠকদের রুচিমাফিক গ্রন্থ লিখতে পারছেন না, বা যে সমস্যায় 'সাধারণের

আগ্রহ সর্বাধিক সেই সমস্যায় নাগাল পাচ্ছেন না? সংস্কারক, গোঁড়া মতাবলম্বী একদল মানুষ চিরদিন সজাগ হয়ে বসে আছেন গ্রন্থকে নিষিদ্ধ করানোর তালে, আরেক দল আছেন প্রকাশিত গ্রন্থ মাত্রেই অপাঠ্য এই কথা চড়া গলায় জাহির করতে, নবীন লেখককে আবিষ্কার করা, বা প্রতিষ্ঠিত করার দিকে না পাঠক না সমালোচক, না প্রকাশক কারো আগ্রহ নেই। গ্রন্থকে সর্বসাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টাই নেই, গ্রন্থপাঠের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য কোনও প্রচেষ্টাই নেই, ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে যে-কটি পাঠক মান্ধাতার আমলে ছিল আজো সেই নির্দিষ্টসংখ্যক পাঠকই রয়েছেন। বেতার, সিনেমা প্রভৃতির প্রতিযোগিতাও উপেক্ষণীয় নয়। অনেক পাঠকই গ্রন্থবিমুখ হয়ে বসে আছেন। মোটা অঙ্কের সরকারী পুরস্কার প্রভৃতির উৎসাহ সাহিত্যিককে সাময়িক সান্ত্বনা দিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিকদের গ্রন্থাদির প্রচুর প্রচারের জন্য সরকারের কি কোনও দায়িত্ব নেই। ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাসমূহের শ্রেষ্ঠ ও পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থাবলী সরকারী খরচে সুমুদ্রিত করে সুলভে বাজারে ছাড়া উচিত। চতুর্দিকে প্রচার করা উচিত এমন কি বেতার মাধ্যমেও—আরো বই পড়ুন। শুধু লেখক, প্রকাশক ও পাঠককে নিন্দা করলে এতটুকু লাভ হবে না, পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি করানোটাই আজ সর্বসাধারণের এবং জাতীয় সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। জাতীয় গ্রন্থাগারগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, পাঠকসাধারণের আগ্রহের অভাব নেই। অনুকূল পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য অধ্যবসায়ী পাঠক জাতীয় গ্রন্থাগারে নিয়ম করে যেতে পারেন।

বর্তমান কালে অতিরিক্ত পরিমাণে সাংস্কৃতিক আসরের অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেখানে সংস্কৃতি মানে শুধু নাচ, গান আর হল্লা। ফলে গুরু বিষয়ে মন দেওয়ার মত ইচ্ছা বা শক্তি কোনোটাই সাধারণ মানুষের নেই। যা চটুল, সহজবোধ্য এবং সরস তার প্রতি মানুষ সহজে আকৃষ্ট হয়। আরো বেশী দেরী হওয়ার পূর্বেই সেই বিপুলসংখ্যক পাঠকের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে তাঁদের বলাতে হবে আরো বই কিনুন। আর আরো বই পড়ুন।

নতুন বই

সাংস্কৃতিকী—(প্রথম খণ্ড) শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য ৫-৫০ নঃ পঃ।

বাংলাদেশে এখন স্বল্প-সংখ্যক যে কয়জন বিশ্ববিশ্রুত মনীষী বর্তমান আছেন আচার্য সুনীতিকুমার তাঁদেরই অগ্রগণ্য একজন। ভাষাতত্ত্বের মৌলিক গবেষণার জন্যে যে সম্মান তিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে অর্জন করেন,

নিরন্তর অনুশীলনের দ্বারা তাঁর সেই পূর্বগৌরবকে অতিক্রম ক'রে আজ তিনি বিশ্ব-সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে দেশে-বিদেশে সুপরিচিত। তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়, তেমনি তাঁর মানব-হিতৈষণাও অপরিসীম। এই দুটি বিরল গুণের অধিকারী হওয়ার ফলে তাঁর মুখে নানা পরিচিত উক্তিও নতুন চারিত্র্য পায়। যেমন—

'আমাদের আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্ব-সংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় ক'রে বহুরূপ হ'য়ে যা বিরাজ ক'রবে আর পৃথিবীর তাবৎ মানব-জাতির বা মানব-সমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত করে এক করে তুলবে।'

এই সিদ্ধান্ত জানার আগে যখন আমরা দেখি যে প্রাজ্ঞ লেখক 'সংস্কৃতি' কথাটির সঠিক সংজ্ঞা এবং 'সভ্যতা' শব্দের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও পার্থক্যের বিষয়ে আলোচনা ক'রে ভারতীয় সংস্কৃতির আদি যুগের তত্ত্বানুসন্ধিৎসামূলক গায়ত্রী মন্ত্র, মধ্যযুগের আধ্যাত্মিক অনুভূতি-সম্পন্ন সুফী দৃষ্টিকোণ, এবং আধুনিক যুগের ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবধারার অভিসংঘাতের উপরে আলোকপাত করেছেন, তখন তাঁর বক্তব্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতে হয় বৈকি!

তাছাড়া, আচার্য সুনীতিকুমার এই গ্রন্থে কেবল ভারতে বিকশিত ভারতীয় সংস্কৃতির বিষয়েই আলোচনা করেন নি, ঐ সংস্কৃতির যে নতুন রূপ দ্বীপময় ভারতে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে বিষয়ে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচীন যুগের চীন ও মধ্য-যুগের নিকট-প্রাচ্যের দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়েও তুলনামূলক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে সমগ্র আলোচনাই এমন একটি বহু-ব্যাপ্ত পরিপ্রেক্ষিত পেয়েছে যে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পাঠকেরও মানস-দিগন্ত প্রসারিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে।

এই পুস্তকের সূচীপত্রে আছে : সংস্কৃতি, যবদ্বীপের মহাভারত, রামায়ণ, কুরল, কোল-জাতির সংস্কৃতি তাও, সুফী অনুভূতি ও দর্শন, অল বীরুনী ও সংস্কৃত, দরাপ খাঁ গাজী, মণিপুর-পুরাণ, শিল্প কলা, এবং রবীন্দ্রনাথের "জীবন দেবতা"। ভূমিকায় জানা গেল, "বিভিন্ন সময়ে রচিত ও নানা পত্র-পত্রিকায় কিংবা পুস্তকের ভূমিকারূপে প্রকাশিত" প্রবন্ধের সংকলন এই "সাংস্কৃতিকী"। এবং এর দ্বিতীয় খণ্ডও হয়তো অচিরেই প্রকাশিত হবে। প্রকাশকবর্গ এ জন্যে সংস্কৃতি-অনুরাগী পাঠক-সাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

বইখানির প্রচ্ছদ ও ছাপা-বাঁধাই খুবই সুরুচিসম্পন্ন।

নয়নী ও রাজনীতি—জল্লাদ খাঁ বিরচিত। প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। দাম পাঁচ টাকা।

ছদ্মনামের আড়ালে যিনি এই বইটি লিখেছেন তাঁর কলমটি খুবই জোরালো। এবং তিনি মনেপ্রাণে বাঙালি। আধুনিক কালটিকে তিনি একজন স্বাতন্ত্র্যগর্বী বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মহাভারতের উপাখ্যান বিবৃত করার ভঙ্গিতে উপস্থিত করেছেন। লেখকের দৃষ্টি বিশেষ করে দেশভাগজনিত রক্তক্ষরণের দিকে, যার মূলো আজকের দিনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতাদের কাছে অনেকখানি অস্বীকৃত। আর এই রক্তক্ষরণের যে নির্মম চিত্র লেখক উপস্থিত করেছেন তা দেখিয়ে তাঁর সমালোচনায় কঠোর ও উদ্বাস্তু জীবনের প্রতি মমতায় আকীর্ণ।

বইয়ের শুরুতে প্রকাশক জানিয়েছেন, এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি তিনি পেয়েছেন বেলুড়বাড়িকে শেষ দেখা দেখে ফিরবার পথে শাকতীর জঙ্গলের এক কুটিরের মধ্যে। "কুটিরের দেয়ালে দুটি পট রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণের পটের নিচে

লেখা 'ডাইনামো' আর বিবেকানন্দের পটের নিচে লেখা 'বালব,' চতুর্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পত্র-পত্রিকা। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক।" এ থেকে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বাঙালিয়ানা যতোখানি, হিন্দুত্ব তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

লেখকের মতামতের সঙ্গে হয়তো সব পাঠক সর্বত্র সায় জানাতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের ঘটনাবলীর যে সামগ্রিক বিশ্লেষণ এই বইয়ে পাওয়া যায় তা যে-কোনো বাঙালী পাঠককে উদ্বেলিত করবে। পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের নিয়ে আমাদের দেশের রাজনীতি যে কি-পরিমাণ ঘোলাটে হয়েছে তার ইতিবৃত্ত হয়তো টুকরো-টুকরো ভাবে আমরা জানি, ইতিমধ্যে হয়তো অনেকখানি ভুলতেও বসেছি, কিন্তু এই টুকরো-টুকরো ইতিবৃত্তের বিচ্ছিন্ন রেখাগুলোকে দেশ ও কালের সামগ্রিক পটভূমিতে ঠিকভাবে বিন্যস্ত করলে যে-ভয়ংকর ছবিটি ফুটে ওঠে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুবই কম। এই ছবিটি আমাদের জানা দরকার—নইলে আমাদের জীবন-প্রয়াস খণ্ডিত থাকবার সম্ভাবনা। তাছাড়া, অন্য এক-দিক থেকেও এই বইটি অভিনন্দনীয়। এই বইয়ে এমন কিছু কিছু বিবরণ আছে যা খবরের কাগজ পুরনো হবার সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসেই আমাদের বিস্মৃতির মধ্যে লোপ পেত। জহলাল খাঁর এই বইটি এই বিবরণগুলোকে আরো কিছুকালের জন্যে আমাদের স্মৃতির জগতে উদ্যত করে রাখল।

মহাশূন্যের রহস্য—মনোজ দত্ত। প্রকাশক : এস ব্যানার্জী অ্যান্ড কোং, ৯, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম : এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বইয়ের নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে বইটি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত। ছোটদের জন্যে লেখা এই বইটি সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র বসু লিখেছেন, "গ্রন্থকারের এই বই জনপ্রিয় হবে আশা করছি।"

অধ্যাপক সত্যেন্দ্র বসুর অভিমত সংযোজিত এই বইটিকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে পারলে আমরা খুশি হতাম। অধ্যাপক বসু বলেছেন, "আজকের দিনে তাই সকলকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল-কথাগুলো জানতে হয়।" কিন্তু বইটি পড়ার পরে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ হয়েছে, বিশেষ করে এই বইটি পাঠককে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনো মূলকথা শেখাতে পারবে কি না! একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

"শুধু বাতাস কেন, শুক্রগ্রহে পাহাড় আছে। আছে বরফের স্তূপ। আর আছে সমুদ্র। সেই সমুদ্রের জল সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে মেঘ তৈরী করে। নিশ্চয়ই সেই মেঘ থেকে আবার বৃষ্টি হয়। নইলে সাগর শুকিয়ে যেতো কোনদিন। বৃষ্টি হওয়ার কথা যদি সত্যি হয়, তবে নদী-নালাই-বা থাকবে না কেন? আর যদি নদী-নালাই থাকে তবে জীবই বা বাস করবে না কেন? জীব বেঁচে থাকার জন্য জল এবং বাতাস দুই-ই আছে সেখানে।" (পৃঃ ১০)

এমনি ধরনের মনগড়া তথ্য পরিবেশনের দৃষ্টান্ত একাধিক। তাছাড়া, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় কনফিউজড্ থিংকিং, এই বইটি তারও একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বইটি পড়ার পরে বহু সরল বিষয়কে জটিল বলে মনে হবে। স্থানাভাবে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল না।

শিশু মঙ্গল— আবুল হাসানাৎ। প্রকাশক : স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম চার টাকা।

'যৌনবিজ্ঞান'-এর লেখক আবুল হাসানাৎ নিজস্ব ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। এটি তাঁর সর্বশেষ বই। বইটি পিতামাতা ও অভিভাবকদের জন্যে। এই বইয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে জন্ম থেকে যৌবনের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত সন্তানকে কি-ভাবে মানুষ করতে হবে। বইটি সচিত্র এবং জ্ঞাতব্য তত্ত্বে ও তথ্যে সমৃদ্ধ। বিশেষ করে প্রসূতি ও জননীরা এই বইটি পড়লে অবশ্যই উপকৃত হবেন। মানবশিশুর জন্ম-প্রকরণ ও সন্তান-পরিকল্পনা সম্পর্কে দুটি সুলিখিত অধ্যায় বইটিকে মূল্যবান করে তুলেছে। আমরা এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

চাঁদের দেশ— দেবদাস দাশগুপ্ত। প্রকাশক : কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম এক টাকা।

এই বইতে গল্প-বলার মতো ভঙ্গিতে চন্দ্র-অভিযানের বিবরণ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু খুবই দুঃখের কথা, বইয়ে এমন কিছু কিছু বিবরণ আছে যা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে যথাযথ নয় বা ভ্রান্ত। বিজ্ঞানের বইয়ের লেখকের কাছ থেকে আমরা আরো বেশি দায়িত্বজ্ঞান আশা করি।

॥ সংকলন ও পত্রপত্রিকা ॥

মানবমন—সম্পাদক : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৬২। ১৩২।১এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

'মানবমন' নামক এই সুসম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইতিপূর্বে বিশেষ পাভলভ সংখ্যা এবং একটি সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংখ্যাটিও পূর্ববর্তী সংখ্যা দুটির ন্যায় মূল্যবান রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংখ্যায় আছে পাভলভ-পরিচিতি (ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়), শেরিংটনের ভাববাদী চিন্তা সম্পর্কে (আই পি পাভলভ), জীবনদর্শন ও চিকিৎসাবিজ্ঞান (ইউ আখুসেরভ), জাতির মানসিকতার রূপায়ণে ইতিহাসের ভূমিকা (মোহম্মদ আবদুল করিম), মানসিক ক্রমবিকাশ (দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়), পাভলভ ও বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ। তাছাড়া আরও অনেকগুলি মূল্যবান রচনা আছে। মনোবিজ্ঞান - জীববিজ্ঞান-সমাজবিজ্ঞানের এই পত্রিকাটির উপযুক্ত সমাদৃতি ও বহুলপ্রচার কামনা করি। কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ চোখে পড়ল।

মহেঞ্জোদাড়ো—সম্পাদক : সমীর রায়। ৫৫।৪, নটবর পাল রোড, হাওড়া থেকে প্রকাশিত। প্রথম বর্ষ প্রথম সংকলন। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পত্রিকাটি মাসিক, ত্রৈমাসিক কি ষাণ্মাসিক তার কোন উল্লেখ পেলাম না। এমন কি পত্রিকার উদ্দেশ্য কোথাও বলা হয়নি। মোটামুটিভাবে বলা যায় সাহিত্য ও শিল্পসংক্রান্ত পত্রিকা। নন্দলাল বসু ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্কেচ আছে। প্রবন্ধ লিখেছেন উমাশঙ্কর ঘোষ (উপলব্ধি প্রসঙ্গে) ও শঙ্কর মিত্র (যামিনী রায় ও তাঁর শিল্পধর্ম)' দিনেশ দাস

প্রভৃতি কয়েকজনের কবিতা আছে। মুদ্রণ-প্রমাদ খুবেই বেশী।

চিত্রাংগদা—অজিতমোহন গুপ্ত। ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-১২ হতে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত চিত্র-শোভিত চলচ্চিত্র-বিষয়ক এই পত্রিকাটি হাতে পেয়ে যথেষ্ট আনন্দিত হবার কারণ আছে। অধিকাংশ রচনাকারের নাম আমাদের কানে নতুন শোনালেও রচনাগুলির কোনটিই কাঁচা হাতের লেখা বলে মনে হবে না। দিলীপ দাশগুপ্ত, গোরা ঘোষ, অমরেন্দ্রকুমার ঘোষের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আরও অনেকগুলি ছোট ছোট রচনা স্থান পেয়েছে। ঈশিতা মুখোপাধ্যায়ের "খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে' উপন্যাসটি অনেকেরই ভাল লাগবে।

।। সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য ।।

সম্প্রতি রেনেশাঁস ক্লাব হলে 'সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই আলোচনা-সভার প্রথম দিনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কবিগুরুর জন্ম-শতবার্ষিকী বৎসরে, সাধারণভাবে আলোচনা করেন ডাঃ অমলেন্দু বসু। বর্তমান পৃথিবীতে সমস্যাবিজড়িত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় ও আপাতমূল্যহীনতার যুগে রবীন্দ্রনাথের শাশ্বত বাণী কতটা কার্যকরী এ সম্পর্কে তিনি কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সাময়িক-পত্রের আদিযুগ ও আধুনিক যুগ সম্পর্কে আলোচনা করেন যথাক্রমে বিনয় ঘোষ ও নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। নানাবিধ তথ্যে উদ্ঘাটিত আলোচনা দুটি খুবেই মূল্যবান ছিল এবং সাময়িকপত্র যে সৃষ্টিশীল সাহিত্যকে কতখানি অগ্রসর করে দিতে পারে তারই উদাহরণস্বরূপ বক্তাগণ কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রিকার উল্লেখ করেন। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত 'বঙ্কিম-চন্দ্র ও বঙ্গদর্শন' বিষয়ে চিন্তাপূর্ণ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ছিল সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য-রচনার মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর সম্পাদনাকার্যে একটি স্থির আদর্শ ও নিষ্ঠার পরিচয় সর্বদাই পাওয়া যেত বলে শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও ডাঃ রথীন্দ্রনাথ রায় 'প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র' পর্যায়ে আলোচনা করেন। প্রমথ চৌধুরীই সর্ব-প্রথম 'সবুজপত্রে'র মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত করেন বলে উভয় বক্তাই উল্লেখ করেন। সুধীন্দ্র-নাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন সুজয় ভট্টাচার্য ও অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়। 'পরিচয়'এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে মননশীলতা দেখা দেয় ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

সভায় ঘোষণা করা হয় যে বর্তমান বৎসর থেকে 'এম-এন-রায়—এলেন রায় বক্তৃতামালা'র ব্যবস্থা হবে ও কোন বিশিষ্ট চিন্তাশীল মনীষীকে আমন্ত্রণ জানান হবে। এবং 'সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য' বিষয়ক বক্তৃতাগুলি পরে গ্রথিত হয়ে "উত্তরসূরী" পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

নান্দীকর

আজকের কথা

বর্তমানের বাংলা নাটক ঃ

বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন"-এর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন দিবসে পরিষদের সম্পাদকীয় বিবরণী থেকে জানা গেল যে, গেল চার বছরের মধ্যে একাংক এবং পূর্ণাঙ্গ নাটকের অন্ততঃ এক হাজারটি পাণ্ডুলিপি তাঁদের হস্তগত হয়েছে। অনুমান করা কঠিন নয় যে, ঐ সময়ের মধ্যে আরও অন্ততঃ এক হাজারটি পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছে, যা তাঁদের হস্তগত হয়নি। অর্থাৎ এই বাঙলাদেশে বাঙলা ভাষায় বছরে গড়ে পাঁচশোটি ক'রে গেল চার বছরে প্রায় দু'হাজারখানি পূর্ণাঙ্গ ও একাংক নাটক রচিত হয়েছে। উক্ত উন্নয়ন পরিষদের আর একজন সদস্য অবশ্য জানালেন যে, ঐ এক হাজারটি নাটকের মধ্যে বেশীরভাগই অপাঠ্য এবং নাটক নামের অনুপযুক্ত। তাঁর কথা অনুযায়ী যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে, শতকরা নব্বইখানিই নাট্যপদবাচ্য নয়, তবুও ঐ দু'হাজারের মধ্যে যদি দু'শোখানিও যথার্থ নাটকের মর্যাদা পাবার যোগ্য হয়, তাহ'লেও বছরে পঞ্চাশখানি অর্থাৎ প্রতি হপ্তায় গড়ে একখানি ক'রেও সার্থক নাটক রচিত হওয়া নিশ্চয়ই একটি অসাধারণ এবং অভূতপূর্ব ঘটনা।

নাট্যরসিক মাত্রই ইচ্ছা করবেন, সার্থক নাটকগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'তে। নাটকগুলি পড়তে পারলে জানতে পেতুম, ওদের বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী, বক্তব্য প্রভৃতি কি। এবং ওগুলির অভিনয় প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেলে আরও বেশী ক'রে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতুম ওদের রসমূর্তি। বহু বিদগ্ধজনের মত আমারও আক্ষেপ আছে, এদেশে নাটক-পাঠকের আজও সৃষ্টি হয়নি। যে আগ্রহ নিয়ে জনসাধারণ উপন্যাস ভক্ষণ করেন, তার অর্ধেক আগ্রহও যদি তাঁরা প্রকাশ করতেন ভালো নাটক পাঠ করবার জন্যে, তাহ'লে অনভিনীত বহু নাটকই আজ মুদ্রিতরূপে লোকচক্ষুর সামনে এসে উপস্থিত হতে পারত। মানি, নাটক দৃশ্যকাব্য এবং নাটকের সার্থকতা অভিনয়ে; তবুও মুদ্রিত নাটক পাঠ ক'রে কি আমরা অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করি না? কালিদাস এবং ভবভূতির নাটকাবলী, সেক্সপীয়র, ইবসেন, সেকভ প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ রচনাবলী পাঠ ক'রে আমরা কি মানস-চক্ষে তাদের অভিনয় দেখতে পাই না?

হিন্দী "মায়াজাল" চিত্রে চিত্রা ও মমতাজ বেগম

সাধারণতঃ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে-সব নাটকের অভিনয় হ'য়ে থাকে, তাদের মুদ্রিত রূপে পাঠকের চাহিদার সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ের মুখাপেক্ষী না হয়েও কিছু কিছু বাঙলা নাটক ছাপা যে হয়নি, তা নয়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্র-নাথের নাটকগুলি। অবশ্য তিনিও তাঁর অধিকাংশ নাটকই শান্তিনিকেতনে অভিনয় করিয়ে বা অভিনীত হওয়া সাপেক্ষে প্রকাশ করেছিলেন।

বর্তমানে নাটক নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তবুও আজকের বাঙলা নাটক বলতে আমরা যা দেখতে পাই, তার বেশীর ভাগই হচ্ছে সমস্যাজর্জর সমাজের চিত্র। আজ আর পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না আদপেই। এমনকি, গার্হস্থ্য প্রেম বা প্রতিহিংসা কিংবা বাদ-বিসংবাদের ঘটনা নিয়ে লেখা নাটকও খুব কমই চোখে পড়ে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক বা গার্হস্থ্য হিসেবে শ্রেণীবিভাগ না করে ট্রাজিডি, কমেডি, ফার্সিক্যাল, মিউজিক্যাল, ফ্যাণ্ট্যাসি, মিস্টিক প্রভৃতি গোছের শ্রেণীবিভাগ ক'রেও আমরা

'ও ক্যু অক্সিজেন' চিত্রের একটি দৃশ্য
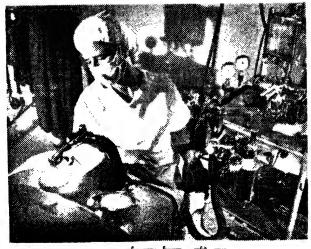
আজকের দিনে মাত্র একটি টাইপেরই সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই এবং সেটি হচ্ছে ট্র্যাজিডি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনসমস্যা যতই জটিল হচ্ছে, আমাদের নাটকও ততই সমস্যা-সংকুল হয়ে পড়ছে। বাঙলাদেশ একসময়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে মেতে উঠেছিল। বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের হাত থেকে পরাধীন ভারতভূমিকে উদ্ধারের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিল। আমাদের নাট্যশালাগুলি সেই সংগ্রামকে সার্থক ক'রে তোলবার জন্যে দেশের সঙ্গে সোৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন। সেযুগে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে দর্শকদের প্রাণে স্বাধীনতার বাসনা জাগিয়ে তোলবার জন্যে তাঁদের অকুণ্ঠ প্রয়াস ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

আজ জাতির সম্মুখে নতুন জীবন-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়েছে। কিসে জাতির উন্নত হবে, কোন পথে চললে দেশ সমৃদ্ধ ও সুখসম্পদের আকর হবে, কিভাবে জনগণ দেশকে সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে পারবে, এই সব প্রশ্ন আজ জাতির সামনে এসে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। আজকের নাটক এই প্রশ্নের জবাব দেবে, এই আশাই আমরা করব। এবং এও আশা করব, আমাদের চোখের সামনে মাত্র ব্যর্থজীবনের ছবি উপস্থিত না ক'রে ভবিষ্যতের সৃষ্টিমূলক সম্ভাবনার চিত্র থাকবে তাদের মধ্যে। আরও আশা করব, মাত্র সমাজ-সমস্যা-মূলক নাটক রচিত না হয়ে হাস্যরসপ্রধান, সংগীতমুখর এবং কল্পনামূলক নাটকও আমরা দেখতে পাব।

'শেষাগ্নি' নাটকে আশীষকুমার ও বাসবী নন্দী

মঞ্চাভিনয় ঃ

স্টারে "শেষাগ্নি" ঃ

কলকাতার একমাত্র শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রঙ্গমঞ্চ "স্টার"-এ শক্তিপদ রাজগুরুর "শেষনাগ" উপন্যাস অবলম্বনে দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত "শেষাগ্নি" নাটকটি পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হচ্ছে।

নাটকের ঘটনাকাল বাঙলাদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপের কিছু আগে থেকে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের ব্যারাজ তৈরী কাজের শেষ পর্যন্ত। ঘটনার স্থান আসানসোলের নিকটবর্তী দামোদর নদপ্লাবিত অঞ্চলের কাল্পনিক গ্রাম কালীপুর এবং ভুবনপুর। নাটকের নায়ক কন্দর্পনারায়ণ পিতা ভুবননারায়ণের অন্ধত্বের জন্যে অল্পবয়সেই জমিদারীর পরিচালনাভার পাওয়ায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন ক্রূর, নৃশংস, দুর্ধর্ষ। লুঠতরাজ, খুন, জখম—কিছুই তাঁর বাধে না। শ্বশুরবংশের সঙ্গে চরের জমির দখল নিয়ে তাঁর নিত্য বিরোধ। অন্ধ পিতা বৃথাই তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত হতে অনুরোধ করেন; কিন্তু কন্দর্পের একমাত্র পুত্র মানব কলকাতায় বড়মামার বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করে বি, ই পরীক্ষা দিয়েছে। সে গ্রামে ফিরে পিতার নৃশংস কান্ডকারখানা দেখে মর্মাহত হয়; প্রতিবাদও করতে চায়—কিন্তু উদ্ধত পিতার 'মাটি বাপের নয়, দাপের'—এই সদম্ভ উক্তির কাছে তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। রেল-ওয়াগন লুঠের অপরাধ চাপা দিতে তার পিতা যে-অন্যায় মিথ্যার আশ্রয় নেন, তা দেখে সে বিরক্ত হয়ে পিতাকে না জানিয়ে পারে না যে, আসল অপরাধী কে, তা সে জানে; কিন্তু মত ও পথ পৃথক হওয়া সত্ত্বেও পিতার প্রতি স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্যে সে একমাত্র সন্তান হয়ে পিতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে পারে না, তার অনিষ্টাশঙ্কায়। মায়ের মর্মপীড়া, পিতামহের অসহায়তা তাকে বিচলিত করে। এরই মধ্যে তার বাগ্‌দত্তা দীপা তার মর্মমূলে কঠিন আঘাত করে, প্রত্যক্ষভাবে তার পিতার ক্রূর প্রকৃতি লক্ষ্য করবার পর তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে। কিন্তু তার প্রকৃত শিক্ষিত মন এত আঘাতেও ভেঙে পড়ে না। নিজের ভবিষ্যতকে সে নিজেই গড়বে, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ে—নিজের গ্রামের সন্নিকটে যে-কালীপুর ব্যারেজ তৈরী হবে, তারই অন্যতম ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে সরকারী চাকরী নিয়ে সে তার গ্রামেরই কাছের

কর্মক্ষেত্রে এসে পেঁছায় এবং নিতান্ত দৈববশে ডিনামাইটের সাহায্যে শুধু যে নিজেদের বাসভূমি 'আচার্য-প্যালেস'কেই ধূলিসাৎ করে, তাই নয়; সঙ্গে সঙ্গে জমিদারীর শেষ অগ্নিশিখা 'কন্দর্প-নারায়ণ'-এরও মৃত্যুর কারণ হয়ে পড়ে।

আদর্শের সংঘাতকে অবলম্বন ক'রে একখানি সাবলীল নাটক গ'ড়ে ওঠা সম্ভব ছিল কিনা, সে-প্রশ্নকে স্থগিত রেখে বলতে পারি যে, "শেষাগ্নি" নাটকের chief protagonist দুর্বার কন্দর্পনারায়ণের দ্বন্দ্ব আসলে অমোঘ নিয়তির সঙ্গে। দুরন্ত কন্দর্প ওয়াগন লুট, নীলুর খুন হওয়া প্রভৃতি বহু জিনিসের নিমিত্ত হয়েও ধরা পড়ে গেলেন মুকুন্দ সাঁপুইয়ের হত্যার ব্যাপারে; কালের অমোঘ চক্রে ঠিক যেদিন তিনি তাঁর আহারের জন্যে কালীপুরের কাছারীবাড়ীতে না গিয়ে ভুবনপুরের 'আচার্য-প্যালেসে' রইলেন, সেই দিনই তাঁর অবস্থানের কথা না জেনে তাঁরই একমাত্র সন্তান ডিনামাইটের সাহায্যে নিজেদের বাড়ীকে ভূমিসাৎ করতে গিয়ে তাঁর জীবনান্ত ঘটাল। প্রমাণিত হ'ল, মানুষ যতই দুরন্ত, দুর্দম হোক না কেন, নিয়তি তার থেকেও কঠোর, কঠিন ও দুর্বার।

হিন্দী চিত্র "জিন্দগী ঔর খোয়াব"এ মীনাকুমারী ও রাজেন্দ্রকুমার

তিনটি অঙ্কে এবং একুশটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ "শেষাগ্নি" নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে টগর ডুমনীর সামান্য অবস্থা থেকে হোটেল-পরিচালিকা হওয়ার কাহিনীটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত না হ'লেও দর্শকমনে কিছু কৌতুকের সঞ্চার ক'রে বৈচিত্র্যের স্বাদ আনতে সাহায্য করে। যারা চিরদিন ধ'রে বঞ্চিত জীবন যাপন ক'রে, সামান্য সুখের লোভে তারা নিজেদের ইজ্জত বিকিয়ে দিতেও কসুর করে না, এই মর্মান্তিক সত্যটি টগরের জীবনে প্রকট হয়ে উঠেছে। আবার বিপরীত দিকে মানবের বড়মামার পুত্রবধূ টুনু-বৌদিদির চরিত্রে স্বামীসোহাগে বঞ্চিতা নারীর যে-আদর্শ উদ্ঘাটিত করা হয়েছে, তার সুষমা হৃদয়কে দ্রবীভূত করে। "শেষাগ্নি" নাটকে অল্প পরিসরে অঙ্কিত এমন বহু চরিত্র আছে, যারা জীবনেরই প্রতীক।

অভিনয়ে অন্ধ ভুবননারায়ণের ভূমিকায় কমল মিত্র অনায়াসেই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন; তাঁর রূপসজ্জা এবং অন্ধত্বের অভিনয় অতুলনীয় হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। শক্তিমদে মাতাল, বিচিত্র জীবনা-দর্শের অনুগামী, সমাজবিরোধী কর্মে উৎসাহী, কঠোর হৃদয় জমিদার কন্দর্প-নারায়ণের কঠিন ভূমিকায় আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় করেছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে'—এই সত্যকে অনুধাবন করবার পরে, খুনের মামলায় জামীনমুক্ত কন্দর্প-বেশে তাঁর অভিনয় অবশ্যই স্মরণীয়। শিক্ষিত যুবক মানব রূপে আশীষকুমার অত্যন্ত দরদ দিয়ে অভিনয় করেছেন। মুকুন্দ সাঁপুইয়ের বিচিত্র ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিকে হাস্যরসের নির্ঝর এবং শেষের দিকে অসহায়ভাবে করুণার পাত্র। অনুপকুমার চিত্রিত পরমা ডোমের টগর-প্রীতি অত্যন্ত উপভোগ্য। চোরাকারবারী কৃপাল সিং-এর ভূমিকায় চন্দ্রশেখরের অনবদ্য অভিনয় ভূমিকাটিকে জীবন্ত ক'রে তোলে। অপরাপর পুরুষ-চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন বীরেশ্বর সেন (বসন্ত), শিবেন বন্দ্যো-পাধ্যায় (নিবারণ), প্রীতি মজুমদার (রোহিনী), পঞ্চানন ভট্টাচার্য (অভা ডোম), প্রেমাংশু বসু (পাঁচু), শ্যাম লাহা (তরফদার), সুখেন দাস (শান্তনু) ও শৈলেন মুখোপাধ্যায় (মিঃ রয়)।

স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কন্দর্পগৃহিণী বাসন্তীর ভূমিকায় অপর্ণা দেবীর। কোমলহৃদয়া, স্বামীর অন্যায়ের জন্য ম্রিয়মাণা, কর্তব্য-পরায়ণা রূপটিকেও তিনি যেমন অনায়াসে ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনই নাটকের শেষের দিকে ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় সদাই উদ্বিগ্নভাব এবং সহ্যসীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় ব্যথাতুর হৃদয়ের প্রকাশে তিনি সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সাধনা রায়চৌধুরীর টুনু-বৌদি একটি মিষ্টি চরিত্রচিত্রণ। দীপার চরিত্রের আধুনিক উল্লাসিক ভাব এবং শেষের দৃশ্যে সত্যসচেতনতা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বাসবী নন্দী। কিন্তু তাঁর প্রথম গানখানি সুর এবং গাওয়া—উভয় দিক থেকেই ব্যর্থ। প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি, সাম্প্রতিককালে আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে গাইয়ে অভিনেত্রীর একান্তই অভাব অনুভব করছি। লিলি চক্রবর্তীর মাধুরী সত্যিই মাধুরী-মন্ডিত; শেষের দিকে তার অন্তর্বেদনার

রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে অগ্রগামীর 'নিশীথে' চিত্রে উত্তমকুমার ও নন্দিতা বসু

প্রকাশ নাটকের জন্যেই কিছুটা আকস্মিক ব'লে মনে হয়। যৌবন-পীড়িতা, অর্থলোভী টগরের লাস্যময়ী রূপকে কিছুটা উগ্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন গীতা দে। কামনা-বাসনা যাকে প্রতি মুহূর্তেই ধাক্কা দেয়, সে বোধ করি এমনই উগ্রই হয়। আশা দেবী চিত্রিত 'নীলের মা' একটি জীবন্ত চরিত্র। মিসেস ব্যানার্জি ও মীরার ভূমিকায় যথাক্রমে প্রিয়া চট্টোপাধ্যায় ও শীলা পাল চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন।

ডোম-ডুমনীদের 'দামোদর পুজো'র নৃত্যগীত উপভোগ্য।

"শেষাগ্নি"র প্রযোজনায় স্টারের কর্তৃপক্ষ অনুমাত্রও ত্রুটি থাকতে দেননি। উপযোগী দৃশ্যপট, সাজসজ্জা এবং সুষ্ঠু আ লো ক নি য় ন্ত্র ণে নাট্যোপস্থাপনার আঙ্গিক অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের। স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টার থেকে নৈশট্রেন চ'লে যাওয়ার দৃশ্য অভিনব কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

সুপ্রযোজিত "শেষাগ্নি" নাট্যরসিক দর্শক মনোরঞ্জনে সক্ষম হবে ব'লেই আশা করি।

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন :

আসছে ১৩ই মে, রবিবার সকালে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ বাঙলা ও হিন্দী চিত্রের প্রযোজক, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, চিত্রশিল্পী, শব্দযন্ত্রী, অভিনেতা, অভিনেত্রী প্রভৃতি এই সভায় যথাযোগ্য প্রশংসাপত্র দ্বারা ভূষিত হবেন। সভায় সভাপতিত্ব করবেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তুষারকান্তি ঘোষ এবং প্রশংসাপত্র বিতরণ করবেন লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়।

রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পারিতোষিক বিতরণ :

গেল শনিবার, ২১-এ এপ্রিল, নতুন দিল্লীর বিজ্ঞান-ভবনে ১৯৬১ সালের জন্য সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ ব'লে নির্বাচিত ছবিগুলিকে এবং তাদের পরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। এই উৎসবে পুরস্কার বিতরণের পরে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন চলচ্চিত্রনির্মাতাদের উদ্দেশ করে বলেন, তাঁরা যেন তাঁদের কাজকে একটি পবিত্র মিশনরূপে গ্রহণ করেন। বর্তমানে জাতীয় জীবনে উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের যে অভাব নিত্য অনুভূত হচ্ছে, ছবির মাধ্যমে সেই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্যে তিনি চিত্রনির্মাতাদের আহ্বান জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, চিত্রজগতের লোকেরা দেশের মন্ত্রীদের চেয়েও জনপ্রিয়। কাজেই সাধারণের সঙ্গে তাঁদের একটা সহানুভূতির বন্ধন অতি সহজেই গ'ড়ে ওঠা সম্ভব। নবনির্বাচিত বেতার ও তথ্যমন্ত্রী গোপাল রেড্ডি বলেন, "চলচ্চিত্র মাত্র মানুষের আনন্দের উপাদান নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষার বাহনও বটে।"

ব্রিটিশ অক্সিজেন কোম্পানীর প্রামাণিক চিত্র :

৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ব্রিটিশ অক্সিজেন কোম্পানী "ও ফর অক্সিজেন" নামে যে-প্রামাণিক চিত্রখানি তৈরী করিয়েছেন, তারই একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল সেদিন লাইটহাউস মিনিয়েচার থিয়েটারে। ইন্ডিয়ান অক্সিজেন কোম্পানীর চেয়ারম্যান সার জন ব্রাউন তাঁর

অরবিন্দ মুখার্জি পরিচালিত 'কাঞ্চি' চিত্রে জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, অজিত চ্যাটার্জি, অনিল চ্যাটার্জি ও আশাদেবী

উদ্বোধনী ভাষণে জানান, এই ছবিখানি টিউরিন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ১৮টি দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। তার পর কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এ. কে. সেন বলেন যে, ছবিখানির ভারতীয় অংশের কৃতিত্ব বলু দাসগুপ্তের, যিনি রঘুনাথ গোস্বামীর সহযোগিতায় "হট্টগোল বিজয়" নামে পাপেট ফিল্ম পরিচালনা ক'রে শিশুচিত্র হিসেবে ছবিখানিকে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক লাভ করিয়েছেন। এরপর ছবিখানি দেখানো হয়। এই কুড়ি মিনিট স্থায়ী, প্রায় দু'রীল দীর্ঘ ছবিখানিতে ১৭৭৮ সালে বৈজ্ঞানিক প্রিসলে দ্বারা অক্সিজেন আবিষ্কার থেকে শুরু ক'রে বর্তমান জগতে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে অক্সিজেনের প্রয়োগকে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখানো হয়েছে। সাধারণ বায়ুর বিভিন্ন উপাদানকে বৈজ্ঞানিকরা পরস্পর থেকে পৃথক ক'রে নিয়ে কি কি কাজে লাগাচ্ছেন, তাও প্রসঙ্গক্রমে ছবিখানিতে দেখানো হয়েছে। ছবিটির পরিচালক ও প্রযোজক হচ্ছেন যথাক্রমে জন আর্মস্ট্রং এবং যুগ্মভাবে জেমস্ কার ও রেমণ্ড স্পটিশউড।

লোকতীর্থের "দীপা-কেবিন" ও সুমেরু-কুমেরু

গেল ২৭এ এপ্রিল, শুক্রবার থিয়েটার সেণ্টারে লোকতীর্থ-সম্প্রদায় তাঁদের দু'টি মৌলিক প্রয়াস—'দীপা-কেবিন' ও 'সুমেরু-কুমেরু' নামে দু'খানি নাটক মঞ্চস্থ করেন। পুরুষ বা মেয়ে, কারুরই পক্ষে সৎভাবে উপার্জনের চেষ্টা নিন্দনীয় নয় এবং কোনো কাজকে ছোট জ্ঞান না ক'রে শ্রমের মর্যাদা দেওয়া উচিত—এই কথাকেই প্রতিপাদ্য করে 'দীপা-কেবিন'-এর সৃষ্টি। কোনো ভদ্র মেয়ে চায়ের কেবিনে কাজ করার জন্যে কেন সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হবে, এই প্রশ্ন নাট্যকার তুলে ধরেছেন বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে। আর 'সুমেরু-কুমেরু' হচ্ছে একটি সাসপেন্সধর্মী নাটক, যে-সাসপেন্সের অবসান হয় মাত্র তখনই, যখন জানতে পারা যায়, নাটকের মধ্যে যাদের অ্যাবনর্মাল চরিত্র ব'লে মনে করা হচ্ছে, বা যাদের সন্দেহভাজন চরিত্র ব'লে মনে করা হচ্ছে, তারা আসলে একটি চলচ্চিত্রের স্যুটিং পার্টির অন্তর্ভুক্ত। দু'টি নাটকের অভিনয়ই সাধারণ শ্রেণীর।

শিশু রংমহল (সি-এল-টি) :

শিশু রংমহলের একাদশ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আসছে ৬ই ও ১৩ই মে নিউ এম্পায়ারে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থাপিত করবেন 'ছন্দগাথা'—সাতটি বিভিন্ন ছন্দের সমবেত প্রদর্শনী। প্রকাশ, এই দৃশ্যের স্কেচগুলি এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যন্ত্রসংগীতের সংগে বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ নৃত্যের প্রাথমিক ছন্দের সংগে পরিচিত হতে পারে। এই বিশেষ যন্ত্রসংগীতটি যদি রেকর্ড ক'রে নেওয়া হয়, তা'হলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই সংগীত তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্যে ব্যবহার করতে পারবেন—এই কথা স্মরণ রেখে শিশু রংমহলের কর্তৃপক্ষ কলকাতা ও মফঃস্বলের দু'শো জন প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাকে আমন্ত্রণ জানাবেন। এই আমন্ত্রণ-পত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকেন্দ্র ২নং তিলক রোড থেকে পাওয়া যাবে।

৬ই মে 'ছন্দগাথা'র সংগে কৃষ্ণলীলা 'সাধু' মঞ্চস্থ করা হবে। এবং ১৩ই মে থাকবে 'ঝগড়াটে পড়ুয়া' ও 'সাত ভাই চম্পা'।

সি-এল-টির নতুন নাটিকা 'আসছে বুড়োর' কাজ পুরোদমে এগুচ্ছে। এতে সুরযোজনা ও নৃত্য-পরিচালনা করছেন যথাক্রমে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও ভানু দে।

একাদশ প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপনের পর শিশু রংমহলের শিল্পীরা শিলং যাচ্ছেন তাঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করবার জন্যে।

দাক্ষিণীর রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসব :

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও দাক্ষিণীর চতুর্দশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠান-সূচী নির্ধারিত হয়েছে :—

(ক) ৮ই মে, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭টায় দাক্ষিণী-ভবনে শিক্ষার্থী, সদস্য ও অভিভাবকদের প্রীতি-সম্মেলন ও বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠান।

(খ) ১৩ই মে, রবিবার, সন্ধ্যা ৭টায় আশুতোষ কলেজ হলে শুভ গুহঠাকুরতার পরিচালনায় রবীন্দ্র-সংগীতের বিশেষ অনুষ্ঠান।

পাভলভ ইনস্টিটিউটের অভিনয় :

আসছে ৯ই মে, বুধবার সন্ধ্যে ৬৷৷টায় মিনার্ভা থিয়েটারে পাভলভ ইনস্টিটিউটের নাট্যবিভাগ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'সম্রাট' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। প্রযোজনা, পরিচালনা ও আলোক-সম্পাতে উপদেশ দিয়েছেন যথাক্রমে সুধী প্রধান, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও তাপস সেন। অভিনয়ের উদ্বোধন করবেন গোপাল হালদার।

বক্স অফিসের সন্ধানে হলিউড

বক্স অফিসের সন্ধানে হলিউডের যাত্রার গতি ক্রমশঃই বৃদ্ধির দিকে। জনতোষণায় হলিউড আজকে তার সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করেছে, ফলে 'কোয়ালিটি' চিত্রের নির্মাণ সংখ্যা বছরে বছরে কমে যাচ্ছে আমেরিকায়। এমন কি যাঁরা ইতিপূর্বে বাণিজ্যিক মূল্যায়ক্ত ছবি নির্মাণে তেমন আগ্রহী ছিলেন না তাঁরাও আজকে বক্স অফিসের জালে জড়িয়ে পড়ছেন।

চিত্রের জন্যে কাহিনী নির্বাচন-পর্ব থেকেই হলিউডের প্রযোজকবৃন্দ গণতোষণায় আত্মনিয়োগ করেন। মৌলিক গল্পের দিকে তাঁদের কোনো ঝোঁক নেই। ব্রডওয়ে-সার্থক নাটক অথবা সংস্করণধন্য উপন্যাসের জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে প্রযোজকদের মধ্যে। ফলে কাহিনীর জন্যে মূল্যও দিতে হচ্ছে অস্বাভাবিক অঙ্কের। ওয়ারনার ব্রাদার্সকে "মাই ফেয়ার লেডি" মঞ্চধন্য নাটকটির গল্প স্বত্বের জন্যে দিতে হয়েছে পঞ্চান্ন লক্ষ ডলার (প্রায় তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা!)। এবং এছাড়াও লভ্যাংশের অংশও দিতে হবে কাহিনীমূল্য বাবদ! প্রযোজকরা মঞ্চসফল নাটক অথবা 'বেস্ট সেলার'-এর দিকে আরো একটি কারণে আগ্রহী। যদি দৈবাৎ চলচ্চিত্রায়িত হবার পর ছবিটি সফল না হয় তিনি অন্যের ঘাড়ে দোষ ফেলে নিজে দায়মুক্ত হতে পারবেন। সেক্ষেত্রে পরিচালক বেচারীর কপাল পোড়ে। কাহিনী নির্বাচনের পরের অধ্যায় হল তারকা নির্বাচন। 'স্টার সিস্টেম'-এর ব্যাধিতে হলিউড অনেকদিন যাবৎই ভুগছে, ইদানীং কাহিনীর পেছনে প্রচুর টাকার লগ্নী হওয়াতে কোনো ঝুঁকি স্বভাবতঃই তাঁরা নিতে চান না। ফলে তারকা নির্বাচনও হয় বিপুল অঙ্কের। শ্রেষ্ঠ তারকারা অচেনা কাহিনী (তা সে যতই উৎকৃষ্ট হোক) অপেক্ষা ইতিপূর্বে বহু বিজ্ঞাপিত কাহিনীতে অভিনয় করতে পছন্দ করেন। অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যে নেই তা না। বিলি ওয়াইলডার অথবা আই. এ. এল ডায়মণ্ডের মৌলিক কাহিনীর জন্যে শ্রেষ্ঠ তারকার অভাব হয় না কখনো। কিন্তু ব্যতিক্রমটি নিয়মকেই বার-বার সত্য প্রমাণিত করে। তারকা নির্বাচনের পর আসে স্টুডিওর খরচ। যেখানে কাহিনীতে, তারকায় ইতিমধ্যে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে সেখানে উৎপাদন মূল্যের দিকে তাকানোর ইচ্ছে থাকে না প্রযোজক পক্ষে। ফলে জাঁকজমকে উচ্চকিত চিত্র নির্মিত হয়। কিন্তু বক্স অফিস আরাধনার এই প্রাণান্ত চেষ্টা যে সব সময়ে সফল হয় তা নয়, কিন্তু তথাপি খরচের গোলকধাঁধা থেকে হলিউডের প্রযোজকদের নিস্তার নেই সম্ভবতঃ আজকে।

শুধুমাত্র জাঁকজমকের ওপরেই হলিউডে কম চিত্র নির্মিত হচ্ছে না। 'বেন-হার' ছবিটিই এর উজ্জ্বল নিদর্শন। তবু বেন-হারে তৎকালীন বিপুল অঙ্কের কোনো তারকা ছিলেন না। বেন-হারের অসামান্য সাফল্যের পরে প্রযোজকরা ভাবলেন শ্রেষ্ঠ তারকাহীন হয়েই বেন-হার যদি স্বর্ণপ্রসবিনী হয়, শ্রেষ্ঠ তারকাসমৃদ্ধ হলে হয়ত এল ডোরেডোর সমস্ত কুবেরধন ভাণ্ডারই ব্যাঙ্কে এসে সঞ্চিত হবে। ফলে শ্রেষ্ঠ তারকাজ্যোতিতে উজ্জ্বল করে তোলা হল 'স্পার্টাকাস'! স্পার্টাকাসের পরে আসছে 'মিউটিনি অন দি বাউন্টি'র নবসংস্করণ এবং 'ক্লিয়োপেট্রা'। দুটি ছবিতে আছেন যথাক্রমে মার্লোন ব্রাণ্ডো এবং এলিজাবেথ টেইলার। উপরোক্ত তিনটি ছবির একটা বিশেষ সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতিটি চিত্রই নির্মাণের প্রাথমিক হিসেবকে অতিক্রম করে গেছে। 'স্পার্টাকাস' নির্মাণের ব্যয় হয়েছে এক কোটি কুড়ি লক্ষ ডলার। 'মিউটিনি অন দি বাউন্টি'—এক কোটি সত্তর লক্ষ ডলার, এবং 'ক্লিয়োপেট্রা'—দু কোটি ডলার ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু ছবি এখনো শেষ হয়নি। ইতিমধ্যেই উপরোক্ত অঙ্ক খরচ হয়ে গেছে। অথচ একটি সাধারণ ভালো ছবি কুড়ি থেকে ত্রিশ লক্ষ ডলারের মধ্যেই নির্মিত হতে পারে হলিউডে। কিন্তু সেদিকে যাওয়ার সৎ সাহস হলিউডের নেই। কারণ 'কোয়ালিটি' চিত্র বাড়ি বদল করে আমেরিকা থেকে ইয়োরোপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাই বিভিন্ন চিত্র-উৎসবে ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশের ছবিগুলিরই জয়ধ্বনি শোনা যায়।

—চিত্রদূত

॥ প্রথম বিভাগের হকি লীগ ॥

১৯৬২ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান দল চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। এই চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্ধারণের জন্যে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, কাস্টমস এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের মধ্যে শেষ পর্যায়ের খেলা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের এ গ্রুপে মোহনবাগান প্রথম স্থান এবং কাস্টমস দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। বি গ্রুপে প্রথম স্থান পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল এবং দ্বিতীয় স্থান মহমেডান স্পোর্টিং দল। চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্ধারণের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় মোহনবাগান মোট ৩টি খেলার মধ্যে জয়লাভ করে ২টি খেলা এবং ড্র করে একটা। মোহনবাগান ৪—০ গোলে কাস্টমসকে এবং ২—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে। ইস্টবেঙ্গল দলের বিপক্ষে তৃতীয় খেলাটি তারা ড্র করে। প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়েছে ইস্টবেঙ্গল দল, ৩টে খেলায় ৪ পয়েন্ট, মোহনবাগানের থেকে ১ পয়েন্ট কম। ইস্টবেঙ্গলের জয় ১, মহমেডান দলের বিপক্ষে ১—০ গোলে। তারা কাস্টমস এবং মোহনবাগান দলের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে মূল্যবান ২টো পয়েন্ট নষ্ট করে।

এই নিয়ে মোহনবাগান দল আটবার প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল। তারা লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৩৫, ১৯৫১-৫২, ১৯৫৫-৫৮ (উপর্যুপরি ৪ বার) এবং ১৯৬২।

লীগ খেলার চূড়ান্ত তালিকা

	খেঃ	জঃ	হাঃ	ড্র	পঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	৩	২	০	১	৬	০	৫
ইস্টবেঙ্গল	৩	১	০	২	১	০	৪
মহঃ স্পোর্টিং	৩	১	২	০	০	৩	২
কাস্টমস	৩	০	২	১	০	৪	১

কাস্টমস অনুপস্থিত থাকায় মহমেডান স্পোর্টিং বনাম কাস্টমস দলের খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে মহমেডান স্পোর্টিং দল দু' পয়েণ্ট লাভ করে।

লীগ জয়ের পথে মোহনবাগান

পোর্ট কমিশনারের বিপক্ষে ৮—০ ও ৩—০; জাভেরিয়ান্সের বিপক্ষে ৭—০ ও ৮—০; আর্মেনিয়ান্সের বিপক্ষে ১৩—০ ও ওয়াকওভার; পাঞ্জাব স্পোর্টসের বিপক্ষে ৪—০ ও ৫—০; রেঞ্জার্সের বিপক্ষে ৪—০ ও ১—০; ইস্টার্ণ রেলের বিপক্ষে ১—০ ও ২—০; এরিয়ান্সের বিপক্ষে ২—০ ও ১—৩; পুলিশের বিপক্ষে ৪—০ ও ৩—০; কাস্টমসের বিপক্ষে ৩—১, ৩—০ ও ৪—০; মহমেডানের বিপক্ষে ২—০ এবং ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে ০—০।

পূর্ব বিজয়ী দল

এ পর্যন্ত ১৪টি দল প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। সব থেকে বেশী বার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ক্যালকাটা কাস্টমস, ১৭ বার। তারপরই রেঞ্জার্স এবং মোহনবাগান দলের স্থান। প্রত্যেকে পেয়েছে ৮ বার ক'রে।

পাঁচবার অথবা তার বেশী জয়

ক্যালকাটা কাস্টমস (১৭ বার) : ১৯০৯-১০, ১৯১২-১৩, ১৯২১-২২, ১৯২৬-২৭, ১৯৩১-৩৩, ১৯৩৬-৩৯, ১৯৫০ ও ১৯৬১ (যুগ্ম বিজয়ী)

রেঞ্জার্স (৮ বার) : ১৯১৪-১৭; ১৯২৮-২৯, ১৯৩৪ ও ১৯৪৩

মোহনবাগান (৮ বার) : ১৯৩৫, ১৯৫১-৫২, ১৯৫৫-৫৮ ও ১৯৬২

বি ই কলেজ (৫ বার) : ১৯০৫-০৬, ১৯০৮, ১৯১১ ও ১৯২০

পোর্ট কমিশনার্স (৫ বার) : ১৯৪২, ১৯৪৪, ১৯৪৬, ১৯৪৮-৪৯

প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের চূড়ান্ত পর্যায়ে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের গোলরক্ষক কাপুর মোহনবাগান দলের গুরুদেয়ের গোল দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ করেছেন।

দু' বার জয়

গ্রীয়ার : ১৯১৯ ও ১৯২৩; **জ্যাভেরিয়ান্স** ১৯২৪-২৫; **ভবানীপুর** ১৯৫৩-৫৪; মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৪৫ ও ১৯৫৯; **ইস্টবেংগল** ১৯৬০ ও ১৯৬১

একবার জয়

ক্যালকাটা ১৯০৭; **মিলিটারী মেডিক্যাল** ১৯১৮; **বি জি প্রেস** ১৯৪০; **পুলিস** ১৯৪১

॥ আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতা ॥

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মারহাট্টা লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি দল (বেলগাঁও) ১—০ গোলে বোম্বাইয়ের শক্তিশালী টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতায় যোগদানের প্রথম বছরেই আগা খাঁ কাপ জয়লাভ করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে অলিম্পিক খেলোয়াড় শান্তারাম খেলার শেষ সময়ে পেনাল্টি কর্ণার কিক থেকে জয়সূচক গোলটি করেন। প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৬৬ বছরের ইতিহাসে মাত্র এই তিনটি দল উপর্যুপরি তিনবার স্বর্ণ-নির্মিত সুদৃশ্য আগা খাঁ কাপ পেয়েছে (১) চেশায়ার রেজিমেন্ট, (২) বোম্বাই কাস্টমস (১৯৩৪-৩৬) এবং (৩) টাটা স্পোর্টস ক্লাব (১৯৫০-৫২)। এই নিয়ে টাটা স্পোর্টস ক্লাব তিনবার রানার্স-আপ হ'ল। ১৯৫৫ সালের ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিশ এবং ১৯৫৭ সালের ফাইনালে বাংগালোরের মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ দলের কাছে টাটা স্পোর্টস ক্লাব পরাজিত হয়।

আলোচ্য বছরে একদিকের সেমি-ফাইনাল খেলার দ্বিতীয় দিনে টাটা স্পোর্টস ক্লাব ২—০ গোলে ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। প্রথম দিন খেলাটি গোলশূন্যভাবে অমীমাংসিত থেকে যায়। অপর দিকের সেমি-ফাইনাল খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হ'তে দুদিন লাগে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় মারহাট্টা লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি দল ২—১ গোলে বাংগালোরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যায়। প্রথম দিনের খেলা ১—১ গোলে ড্র যায়।

এ বছরের আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা চতুর্থ রাউণ্ডের খেলায় টাটা স্পোর্টস ক্লাবের কাছে এ বছরের সদ্য গোল্ড কাপ বিজয়ী সেণ্ট্রাল রেলওয়ে দলের ০—২ গোলে এবং মহারাষ্ট্র লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি দলের কাছে এ বছরেরই গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতার রানার্স-আপ পাঞ্জাব পুলিস দলের ০—১ গোলে পরাজয়।

এবারের ফাইনাল খেলার ধারা দর্শকদের মনে উত্তেজনা আনতে পারেনি —খেলা দেখে দর্শকেরা হতাশ হয়েছেন।

ফাইনালে দুই দলের রক্ষণভাগের খেলাই প্রাধান্য লাভ করে; কিন্তু সেই খেলার মধ্যে দর্শনীয় কিছু ছিল না, যে কোন রকমে গোল রক্ষার চেষ্টা। টাটা স্পোর্টস ক্লাব একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট করে—তাদের দুর্বলতা ছিল মধ্য-ভাগের খেলায়। মারহাট্টা লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি দলের পক্ষে এবারের আগা খাঁ কাপ জয়লাভ 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া' হয়নি। বোম্বাইয়ের লুসিটেনিয়ান্স, এ বছরের জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাব পুলিস, বাংগালোরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ এবং ফাইনালে টাটা স্পোর্টস ক্লাব—এতগুলি শক্তিশালী দলকে পরাজিত ক'রে তবে এই কাপ পেতে হয়েছে।

॥ গোল্ড কাপ হকি ॥

বোম্বাইয়ের গোল্ড কাপ হকি টুর্ণামেন্টের ফাইনালে সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ৩—১ গোলে পাঞ্জাব পুলিসকে পরাজিত করে। সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ১৯৬১ সালের বেটন কাপ ফাইনালেও পাঞ্জাব পুলিশকে পরাজিত করেছিল। সুতরাং শক্তিশালী পুলিস দলের বিপক্ষে রেলওয়ে দলের উপর্যুপরি দ্বিতীয় সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এশিয়ান ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

এশিয়ান ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে মালয় ৫—০ খেলায় বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় 'টমাস কাপ' বিজয়ী ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে। সেমি-ফাইনাল খেলাতেও মালয় ৫—০ খেলায় পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়লাভ করেছিল। ইন্দোনেশিয়া অপর দিকের সেমি-ফাইনালে থাইল্যান্ডকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল ৩-২ খেলায়।

এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা

ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়ান যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে থাইল্যান্ড ২—১ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করেছে। প্রতিযোগিতায় এই দশটি দল যোগদান করে : 'এ' গ্রুপে—মালয়, থাইল্যান্ড, ভিয়েৎনাম, জাপান এবং ব্রহ্মদেশ; 'বি' গ্রুপে—কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, হংকং এবং সিংগাপুর। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দশটি দেশকে সমান দুটি বিভাগে ফেলে লীগ প্রথায় খেলানো হয়। এবং প্রতি বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশগুলি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ভারতবর্ষ প্রতিযোগিতায় যোগদান থেকে বিরত থাকায় ভারতীয় যুব সমাজ নিজেদের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর

ভারতবর্ষ : ২১৮ রাণ (ইঞ্জিনিয়ার ৬২ এবং সুর্তি ৪১ (আহত হয়ে খেলা থেকে অবসর); ম্যাসন ৩২ রাণে ৫ এবং গ্রানাম ৪৭ রাণে ৩ উইকেট) ও ২০২ রাণ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড'। জয়সীমা ৪৪ এবং সুর্তি ৩৫; ম্যাসন ৩৩ রাণে ৩ এবং গ্রানাম ৩২ রাণে ২ উইকেট)

উইণ্ডওয়ার্ড—লীওয়ার্ড আইল্যাণ্ড একাদশ : ১৩২ রাণ (গ্রেসাম ৪২; প্রসন্ন ৫৩ রাণে ৫, রঞ্জনে ৩০ রাণে ৩ এবং দুরাণী ১৬ রাণে ২ উইকেট) ও ১৫১ রাণ (এডওয়ার্ডস ৫২ ও গ্রেসাম ৩০; প্রসন্ন ৫০ রাণে ৪, দুরাণী ৩ রাণে ২ এবং সুর্তি ২৬ রাণে ২ উইকেট)

ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের শেষ খেলায় উইণ্ডওয়ার্ড এ্যাণ্ড লীওয়ার্ড আইল্যাণ্ড একাদশ দলের বিপক্ষে ১৩৭ রাণে জয়লাভ করে। এবারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের শ্রেণীর খেলায় ভারতীয় দলের ৩ প্র জয়। মোট ৯টি প্রথম শ্রেণীর খেলা মধ্যে ভারতবর্ষের জয় ১, ড্র ২ এবং হার ৬ (পাঁচটি টেস্ট খেলা সহ)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের তালিকায় উইণ্ডওয়ার্ড এ্যাণ্ড লীওয়ার্ড আইল্যাণ্ড একাদশ দল ছিল সব থেকে দুর্বল—যদিও সাতটি দ্বীপের খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী।

ভারতীয় দল টসে জয়লাভ ক'রে প্রথমেই ব্যাট করার সুযোগ নেয়। কিন্তু প্রথম ইনিংসের গোড়াপত্তন মোটেই সুবিধার হয়নি। দলের ৩১ রাণের মধ্যে ৩টে উইকেট পড়ে যায়—জয়সীমা, দুরাণী এবং মেহেরা। ৪র্থ উইকেটে সারদেশাইয়ের সঙ্গে খেলতে নামেন অধিনায়ক পতৌদির নবাব। দলের পতন রোধ করার সমস্ত আশা ভেঙ্গে গেল যখন পতৌদির নবাব কোন রাণ না করেই দলের ৩৭ রাণের মাথায় বিদায় নিলেন। লাঞ্চের সময় উইকেটে অপরাজেয় ছিলেন সারদেশাই (১৮) এবং কুন্দরাম (১৯); এই দু'জনের ২৫ মিনিটের খেলায় ৩১ রাণ উঠে। চা-পানের বিরতির সময় দলের রাণ দাঁড়ায় ১৯৭, ৭ উইকেট পড়ে। উইকেটে তখন খেলছিলেন সুর্তি ৪১ রাণ) এবং ইঞ্জিনীয়ার (৬২ রাণ)। সুর্তি এবং ইঞ্জিনীয়ারের ৮ম উইকেটের জুটি দলের ৭৩ রাণ তুলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুখ রাখেন। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ২১৮ রাণে শেষ হয়। সুর্তি তাঁর ৪১ রাণের মাথায় ফাস্ট বোলার ম্যাসনের গোউন্সার বল খেলতে গিয়ে চিবুকে আঘাত পান এবং খেলা থেকে শেষ পর্যন্ত অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। হাসপাতাল পর্যন্ত তাঁকে দৌড়তে হয়েছিল চিকিৎসার জন্যে। প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দলের বিপক্ষে বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন ফাস্ট বোলার ম্যাসন এবং গ্রাণাম। ওয়ার্ণার পার্কের ঘাসের পিচে বল বোলারদের সহায়ক ছিল। এই দিনের বাকি খেলায় উইণ্ডওয়ার্ড-লীওয়ার্ড আইল্যাণ্ড দল ২টো উইকেট নষ্ট করে ৭০ রাণ করে।

খেলার দ্বিতীয় দিনে উইণ্ডওয়ার্ড-লীওয়ার্ড আইল্যাণ্ড দলের প্রথম ইনিংস ১৩২ রাণে শেষ হলে ভারতীয় দল ৮৬ রাণে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দ্বিতীয় দিনে আইল্যাণ্ড একাদশ দল বাকি ৮টা উইকেটে মাত্র ৬২ রাণ করে। লাঞ্চের পরই তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ভারতীয় দলের পক্ষে বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন প্রসন্ন, ৫৩ রাণে ৫টা উইকেট। ভারতীয় দল দ্বিতীয় দিনের খেলায় ২০২ রাণ ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। আইল্যাণ্ড একাদশ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে কিন্তু দলের কোন রাণ হওয়ার আগেই আলোর অভাব ঘটায় খেলা বন্ধ রাখা হয়। ভারতবর্ষ ২৮৮ রাণে অগ্রগামী থাকে। ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যাটিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন জয়সীমা ৮৪ রাণ করে। তাঁর এই রাণে ছিল ১৪টা বাউণ্ডারী; এবারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে তাঁর সর্বোচ্চ রাণ।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পর ৮০ মিনিট পর্যন্ত খেলা হয়। আইল্যাণ্ড একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫১ রাণে শেষ হলে ভারতীয় দল ১৩৭ রাণে জয়লাভ করে। আইল্যাণ্ড দলের পক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫২ রাণ করেন এডওয়ার্ডস। দ্বিতীয় ইনিংসেও বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন প্রসন্ন, ৫০ রাণে ৪টে উইকেট। দুটো ইনিংস নিয়ে প্রসন্ন পান ৯টা উইকেট ১০৩ রাণে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে
এক ইনিংসে ৬০০ রান
ও
তিনটি ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী

টেস্ট সিরিজ : ১৯৪৮-৪৯

৬৩১ ১ম টেস্ট, নিউ দিল্লী (ওয়ালকট ১৫২, গোমেজ ১০১, উইকস ১২৮ ও ক্রিশ্চিয়ানী ১০৭)।

৬২৯ (৬ উইকেটে ডিক্লেঃ) ২য় টেস্ট, বোম্বাই

টেস্ট সিরিজ : ১৯৫৮-৫৯

৬১৪ (৫ উইঃ ডিক্লেঃ), ৩য় টেস্ট, ক'লকাতা (কানহাই ২৫৬, বুচার ১০৩ ও সোবার্স নট আউট ১০৬)।

৬৪৪ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), ৫ম টেস্ট, নিউ দিল্লী (হোল্ট ১২৩, স্মিথ ১০০, সলোমন নট-আউট ১০০)।

টেস্ট সিরিজ : ১৯৬২

৬৩১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ২য় টেস্ট, কিংস্টন (কানহাই ১৩৮, ম্যাকমরিস ১২৫ ও সোবার্স ১৫৩)। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের খেলায় ৬০০ রান করেছে।

টেস্ট সিরিজ : ১৯৫২-৫৩

৫৭৬ ৫ম টেস্ট, কিংস্টন (ওরেল ২৩৭, উইকস ১০৯ ও ওয়ালকট ১১৮) *

* ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত তিনটি সেঞ্চুরীর প্রথম টেস্ট রেকর্ড।

বছরের সেরা ক্রিকেট খেলোয়াড়

ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পক্ষে বড় সম্মান ক্রিকেট খেলার বিখ্যাত 'উইসডেন' বর্ষপঞ্জীতে প্রকাশিত 'বছরের পাঁচজন খেলোয়াড় (five cricketers of the year)' এই বিশেষ অধ্যায়ে খেলোয়াড়দের নামের তালিকায় স্থান পাওয়া। এই সম্মান লাভের জন্যে বিশ্বের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা কি গভীর আগ্রহে না অপেক্ষা ক'রে থাকেন। অথচ প্রতি বছরের নির্বাচিত পাঁচজন খেলোয়াড় এই সম্মান লাভের জন্যে কোন পদক, সার্টিফিকেট বা আর্থিক পুরস্কার লাভ করেন না। ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছে খেলোয়াড়-জীবনের পরম বাসনা এই সম্মান লাভ। 'উইসডেন' (প্রতিষ্ঠাকাল ৯৮ বছর আগে) ক্রিকেট খেলার শুধুমাত্র প্রামাণ্য বর্ষপঞ্জী নয়; এই বর্ষপঞ্জী সম্পর্কে প্রবাদ দাঁড়িয়েছে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের 'বাইবেল'।

উইসডেন বর্ষপঞ্জীর ১৯৬১ সালের সংস্করণে বছরের সেরা ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে যে পাঁচজনকে নির্বাচিত করা হয়েছে তাঁরা সকলেই অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন ১৯৬১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের চারজন—অধিনায়ক রিচি বেনো, নর্মান ও'নীল, এলান ডেভিডসন, বিল লরী এবং ইংল্যাণ্ডের সামারসেট ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় বিল এ্যালে। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬১ সালের টেস্ট সিরিজে দল পরিচালনায় রিচি বেনো, বোলিং এবং ব্যাটিংয়ে এ্যালান ডেভিডসন, ব্যাটিংয়ে নর্মান ও'নীল এবং বিল লরী কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিল এ্যালে ইংল্যাণ্ডের গত ক্রিকেট মরশুমে ৩,০১৯ রাণ ক'রে এবং ৬২টা উইকেট পেয়ে চৌকস খেলোয়াড়ের পরিচয় দেন।

এপর্যন্ত ৬ জন ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় বিভিন্ন সময়ে 'বছরের পাঁচজন খেলোয়াড়' এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছেন। তাঁদের নাম কে এস রঞ্জিৎ সিংজী (১৮৯৭), কে এস দলীপ সিংজী (১৯৩০) পতৌদির নবাব (১৯৩২), সি কে নাইডু (১৯৩৩), ভি এম মার্চেন্ট (১৯৩৭) এবং ভিনু মানকাদ (১৯৪৭)। রঞ্জিৎ সিংজী, দলীপ সিংজী এবং পতৌদির নবাব ইংল্যাণ্ডের টেস্ট দ'লে এবং ইংল্যাণ্ডের কাউন্টি দলে খেলে এই সম্মান লাভ করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বাড়ী থেকে
মাল আনা, আবার
পৌঁছে দেওয়া
আপনি জানেন কি, যে কলকাতায় দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের পক্ষ থেকে, বাড়ী থেকে মালপত্র সংগ্রহ করা এবং বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু রয়েছে।
প্রচলিত ভাড়ার ওপরে সামান্য কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিলেই আপনিও এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।
এই রেলপথের অনুমোদিত প্রতিনিধি—শ্রীবাচরাজ আগরওয়ালা, ১৭, কাশীনাথ মল্লিক লেন, রুম নং ২২, কলকাতা-৭ এই ঠিকানায় (ফোন নং ৩৪-৭১০৩) ২৪ ঘণ্টা আগে একটু লিখে জানালেই সমস্ত ব্যবস্থার সুবিধা আপনার জন্যে তৈরী থাকবে।
বিশদ বিবরণের জন্যে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :
১। চীফ পার্সেলস এণ্ড লাগেজ ইন্সপেক্টর (পার্সেলস ট্রাফিক), হাওড়া (ফোন ৬৬-৩৪১১, এক্সটেনশন-৯)
২। স্টেশন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (গুডস ট্রাফিক), শালিমার (ফোন নং ৬৭-২৮০৬)
৩। চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অফিস, রোড ট্রান্সপোর্ট সেক্সন, রঞ্জি ষ্টেডিয়াম, ইডেন গার্ডেনস, কলিকাতা-২১ (ফোন ২৩-২৯৩৩)
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা . বিষয় . লেখক

সূচীপত্র

মে সংখ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস

'ঝাউ বাংলোর রহস্য'

সত্যজিৎ রায়ের রোমহর্ষক গল্প :

'সেপ্টোপাসের ক্ষিদে'

তা ছাড়া হাতের কাজ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, ম্যাজিক, হাত পাকাবার আসর।

১৭২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা—১৩
(নিউ সিনেমার পাশে)

মিত্রালয়ের বই

: গল্প ও উপন্যাস :

অনুরূপা দেবী	: মা	৬·০০
	: মহানিশা	৬·০০
	: রাঙ্গাশাঁখা	২·৫০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের	: অহিংসা	৬·০০
	: জননী	৪·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	: অপরাজিত	৮·০০
	: ইছামতী	৬·০০
	: দৃষ্টিপ্রদীপ	৫·৫০
	: মৌরীফুল	৩·০০
মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	: তীর্থ নয় কাণাগলি	৫·৫০
দক্ষিণারঞ্জন বসু	: পরম্পরা	৪·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	: গল্প সঞ্চয়ন	৪·০০
	: পঞ্চগ্রাম	৭·৫০
	: পাষাণপুরী	২·৭৫
	: মন্বন্তর	৭·০০
সুশীল ঘোষ	: মৌন নূপুর	৪·৫০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	: লঘুপাক	৩·০০
	: পরিচয়	৪·০০
অবধূত	: শুভায় ভবতু	৫·০০
	: দুরি বৌদি	৪·০০
গৌরকিশোর ঘোষ (রূপদর্শী)	: নাচের পুতুল	২·৫০
	: এই দাহ	৩·৫০
বাণী রায়	: পুনরাবৃত্তি	২·৫০
সুভাষ মজুমদার	: আবার জীবন	৩·৫০
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	: সমুদ্রমানুষ	৫·০০
নিরুপমা দেবী	: আমার ডায়েরী	২·৫০
	: দেবত্র	৪·৫০
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	: হরি যাকে রাখেন	৩·০০
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	: মুমূর্ষু পৃথিবী	৪·৫০
প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়	: রং তুলি	৩·৫০
	: আসর বাসর	২·৫০
নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত	: বিদেশিনী	৪·৫০
ধীরেন্দ্রনাথ রায়	: হে মহাজীবন	৩·০০
গজেন্দ্রকুমার মিত্র	: রাত্রির তপস্যা	৫·০০
	: রজনীগন্ধা	২·৫০
	: পুরুষ ও রমণী	২·২৫
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	: অ্যালবার্ট হল	৪·৫০
	: প্রিয়তমের চিঠি	৩·০০
	: মহালগ্ন	৪·০০
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	: চর্যাপদের হরিণী	৩·০০
	: তৃতীয় ভুবন	৪·৫০
	: কাছের যারা	২·৫০
বিমল কর	: নিশিগন্ধ	৩·৫০
বিনোদচন্দ্র সেন	: আইনের দুনিয়া	৪·৫০
রণজিৎকুমার সেন	: রাধা	২·৫০
প্রফুল্ল রায়	: তাসের মিনার	৩·০০
সন্তোষকুমার ঘোষ	: চীনে মাটি	৩·০০
সুব্রতেশ ঘোষ	: কয়েকটি রঙ	২·০০
অনুসূয়া দেবী	: সহমরণ	২·৭৫
সাবিত্রী রায়	: পাকা ধানের গান	

১ম খণ্ড : ৩·৫০ ২য় খণ্ড : ৪·০০ ৩য় খণ্ড : ৫.০০

১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট : কলিকাতা—১২

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮৩	**হত্যার পরের ঘটনা**	(গল্প)	—শ্রীবিমল মিত্র
৮৯	**মেঘের উপর প্রাসাদ**	(উপন্যাস)	—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৯৫	**রাশিয়ার ডায়েরী**	(ভ্রমণ-কাহিনী)	—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল
১০১	**মসিরেখা**	(উপন্যাস)	—শ্রীজরাসন্ধ
১০৫	**দেশেবিদেশে**		
১০৬	**প্রেক্ষাগৃহ**		—শ্রীনান্দীকর
১১২	**খেলাধুলো**		—শ্রীদর্শক

অমৃত ।। অমৃত ।।

অমৃত

।। অমৃত ।। অমৃত

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা—মূল্যে ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৮শে বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 11th May, 1962.
40 Naya Paise.

এক বৎসর পূর্বে, এইদিনে, আমাদের "অমৃত" পত্রিকা, বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সংবাদজগতে আত্মপ্রকাশ করে। সেদিন ছিল মহাকবির জন্মশত-বার্ষিকী-উৎসবের আনন্দ-মুখরিত দিবস। সেই বৎসর-ব্যাপী শুভ অনুষ্ঠানের অন্তে আমরা আজ জগতের সকল সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমিকজনের সঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করি সেই অমরলোকবাসী মহামানবের উদ্দেশ্যে।

যে পথে "অমৃত" সেদিন যাত্রারম্ভ করে সে পথে নূতন পথিকের আসা-যাওয়া কিছু নূতন কথা নয়। কিন্তু যে প্রেরণার বশে এই নূতন পত্রিকার আবির্ভাব হয়, তাহার মধ্যে নূতন সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের গতানুগতিক চেষ্টা ছাড়াও অন্য চিন্তা অন্য প্রয়াস ও অনেক কিছু ছিল—এবং এখনও আছে। আমরা এই নবপ্রকাশনের প্রথম সংখ্যায়, সম্পাদকীয় নিবেদনে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাতে ঐ প্রেরণার উৎস কোথায় তাহার কিছু নির্দেশ ছিল। সেই নির্দেশগুলি এইরূপ :—

"আমরা জানি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল হইতে, কিম্বা বলা যাইতে পারে যে মোটামুটিভাবে ১৯৫০ সাল হইতে যেন একটি নূতন যুগের শুরু হইয়াছে। সারা এশিয়া মহাদেশে জাতীয় মুক্তির নতুন প্লাবন আসিয়াছে এবং সেই প্লাবন আজ অন্ধকার আফ্রিকার অরণ্যে অরণ্যে নব জীবন-বসন্তের বার্তা আনিয়াছে। ইউরোপে এবং দূরবর্তী আমেরিকায় নতুন চিন্তা আসিয়াছে বিশ্বৎ জন-সমাজে ও বুদ্ধিজীবী মহলে—..."

"সাহিত্যিককে এই নতুন যুগের সারথি হইতে হইবে এবং পৃথিবীতে এখনও যারা মূক আছে, সেই "মূক মুখে ভাষা' দিতে হইবে। সাহিত্য কেবল বিশ্রাম-ভোজীদের সেবাদাসী হইবে না, কেবল লোকরঞ্জন এবং মনোরঞ্জনই তার উদ্দেশ্য নয়—তার উদ্দেশ্য আরও মহৎ এবং সেই উদ্দেশ্য হইতেছে জীবন গঠন; মানবাত্মার অপরিমিত সৌন্দর্যের প্রকাশ যে মহৎ সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির মধ্যে, সেই দিকে যেন আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়।"...

সারা পৃথিবীতে যেখানে যেখানে জীবন্ত সাহিত্যের ধমনীতে এই যুগপরিবর্তনের স্পন্দন সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতেছে সেখানেই শোনা যায় সাহিত্যিকের লেখনী এই সন্ধিকালের ঘোষণা উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিতেছে। আমরাও সেই স্পন্দনের অনুভূতির বশে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নূতন উদ্যম নবীন প্রেরণার প্রয়োজন উপলব্ধি করি এবং সেই অনুভূতির ফলেই "অমৃত" জন্মলাভ করে। আমরা অনুভব করিয়াছিলাম যে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির জীবনধারা যেন গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, যেন তাহা যুগপরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না, তাহার জীবনস্রোত স্তিমিত হইয়া ঘূর্ণির জলের মত একই স্থানে ঘুরিতেছে।

অথচ আজ বাংলায় সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্মীর অভাব নাই এবং তাঁহাদের লেখনীও সক্ষম, নিপুণ ও সজীব। অন্যদিকে সাহিত্যরসপিপাসুজনের সংখ্যাও ক্রমে বাড়িয়াই চলিতেছে। তবে কেন বাংলা-সাহিত্যে এই নবচেতনার অভাব?

আমাদের ধারণা হয় যে সাহিত্যের,—বিশেষ সাময়িক সাহিত্যের—ক্ষেত্র প্রসারিত হইলেই, অর্থাৎ স্রোতের মুখ কাটিয়া পঙ্কোদ্ধার করিয়া প্রশস্ত করিলেই বাংলা-সাহিত্যের স্রোতে নূতন প্রবাহের সৃষ্টি হইবে এবং স্রোতমুখ খুলিয়া গেলে যেমন সমস্ত নদীবক্ষ সজীব ও সচঞ্চল হইয়া উঠে তেমনই সমস্ত সাহিত্য পত্রিকার বিশাল ক্ষেত্রে এক নূতন সজাগভাব দেখা যাইবে।

আমাদের সেই ধারণা যে যথার্থ ছিল তাহার প্রমাণ আজ বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। "অমৃত" প্রকাশের প্রথম বৎসর শেষ হইয়াছে। এই বৎসরের মধ্যে সাময়িক পত্রিকার পথে আমাদের অগ্রগামী যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যেও চাঞ্চল্য ও নূতন উদ্যোগের পরিচয় সাহিত্যরসিক মাত্রেই পাইয়াছেন। সাহিত্যিকদের মধ্যেও নূতন সাড়া পড়িয়াছে, ইহাও আজ পাঠকসমাজ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিতেছেন।

আমরা যে পথ লইয়াছি, যে প্রেরণায় চলিতেছি, তাহাতে আমরা কতদূর অগ্রসর হইতে পারিতেছি সে কথার বিচার করিবেন সুধীজন ও রসিকজন। আমরা জানি যে পথ দুর্গম এবং লক্ষ্যস্থলও দূরে, তবে তাহাতে আমাদের উদ্যমে কোনও শ্রান্তি বা অবসাদ আনিতে পারে নাই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রিকার জীবন যাঁহাদের সহযোগিতা ও সমর্থনের উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ সাহিত্যকর্মী, সাহিত্যিকগোষ্ঠী ও পাঠকসমাজ—আমরা তাঁহাদের কাছে আশাতীতভাবে সহায়তা পাইয়াছি এই প্রথম বৎসরেই। আমাদের সম্মুখে দীর্ঘ পথ। আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়া,—ভাবীকালের জন্যও সেই আশা রাখিয়া, দৃঢ় সংকল্প ও অদম্য উৎসাহ লইয়া পথ চলিব।

যাত্রারম্ভে আমাদের ভরসা ছিল যাঁহাদের উপর, সেই লেখক ও পাঠক, প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক ও শিল্পী, তাঁহাদের প্রীতি ও সহযোগিতা এবং পূর্বগামী ও পথিকৃৎদিগের আশীর্বাদ পুনর্বার প্রার্থনা করিয়া আমরা নূতন বৎসরের আবাহন করি।

জৈমিনি

আজ আমার বিষয়বস্তু হল, নতুন রীতির ছোটগল্প বা হাল আমলের বাংলা কবিতা। পাঠক! শিরদাঁড়া সোজা করে বসুন।

প্রথমেই অবশ্য আপত্তি উঠবে, গল্প আর কবিতাকে এভাবে গুলিয়ে ফেলার কারণ কী? মাফ করবেন, আমি গোলাইনি। বরং ঐ দুটির শিল্পরীতিই আমাকে গুলিয়ে তুলেছে। একটা লেখা পড়তে বসে সেটা কবিতা না গল্প তা ঠিক ঠাহর করতে পারিনে। কবিতা বলে আরম্ভ করে শেষপর্যন্ত দেখেছি সেটি একটি গল্প, এবং গল্প ভেবে পড়তে শুরু করে অচিরাৎ হৃদয়ঙ্গম করেছি, তার ধরনধারণ মোটামুটি প্রায় কবিতার মতো। আবার একই রচনার মধ্যে কিছুটা গল্প আর কিছুটা কবিতা, এও একেবারে দুর্লভ নয়। এবং সবচেয়ে যা মজার ব্যাপার, দু'রাজ্যের বর্ডার লাইনটা ঠিক কোথায় তাও যেন হদিস করা যায় না।

আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কবি আছেন, নতুন রীতির গল্প-লেখকও আছেন। তাঁদের কাছে আমি আমার অসুবিধের কথা নিবেদন করেছি। তাঁরা ছাড়া-ছাড়াভাবে যে দু'একটা জবাব আমাকে দিয়েছেন, তা থেকে আমি ব্যাপারটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু খুব যে কিছু একটা বুঝতে পেরেছি তা বলতে পারব না।

কবিতার কথা আগে বলি। কবিরা বলেন, কবিতার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ চিরকালই ছিল। যেমন গীতি-কবিতা, বর্ণনাত্মক কবিতা, কাহিনী-কবিতা ইত্যাদি। এই ভাগগুলো এখন সব সময় ইঞ্চি মেপে মানা হয় না। সেইজন্যেই কখনো কখনো কবিতার মধ্যে গল্পের আঁচ পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আসল অসুবিধে ঘটে অন্য ব্যাপারে। একটি সমকালীন কবিতা তার পাঠকদের কাছ থেকে যে পরিমাণ একাগ্রতা দাবি করে, বেশির ভাগ পাঠকই তাতে সাড়া দিতে পারেন না। তাছাড়া তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষাও তার পরিপন্থী। পাঠ্যজীবনে তাঁদের মনে এমন কোনো সংস্কারই দানা বাঁধতে পারে না যাতে তাঁরা আধুনিক কবিতার রস গ্রহণ করতে পারেন। তার জন্যে কেবল রবীন্দ্রোত্তর কবিতার পঠনপাঠনই নয়, বর্তমান জগতের বহু বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতা ও জটিলতার বিষয়েও মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার। বলা বাহুল্য এমন পাঠক লাখে মেলে এক।

কিন্তু আমরা পাঠকরাও এর উত্তরে অনেক কিছু বলতে পারি। প্রথম কথা, যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের অনেককেই আমরা ভালো করেই চিনি। তাঁদের অধীত বিদ্যা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ইত্যাদি এমন নয় যে আমরা বিশ্বাস করতে পারি 'বর্তমান জগতের বহু বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতা ও জটিলতার বিষয়ে' তাঁরা নিজেরাই খুব একটা খোঁজখবর রাখেন। কাজেই, এ থেকে দ্বিতীয় বক্তব্য এই ওঠে যে, হয় তাঁরা স্বয়ম্ভু জীনিয়াস, নয়তো বুজরুক। কিংবা এ দুটো দলে যদি তাঁদের ফেলা নাও যায় তো নকলনবীশ তাঁরা অবশ্যই। অর্থাৎ, হাল-আমলে-আমদানী-হওয়া পঞ্চাশ বছর আগেকার ইউরোপীয় আধুনিকতার কার্বন কপি। তবে হাঁ, পার্থক্য একটা আছে বটেক। আসলে আর নকলে তফাৎ কিছু থাকবেই। তাছাড়া ভাষা-ব্যবহারের সীমাবদ্ধতাও তুচ্ছ করার মতো নয়। ফলে খুঁড়িয়ে চলার ছাপটা এর সর্বত্র। শব্দচয়ন, বাক্যগঠন ইত্যাদি থেকে শুরু করে কমা-সেমিকোলনের প্রয়োগে পর্যন্ত অপটুতা প্রায় একচ্ছত্র। তাই বাংলা কবিতাকে মনে হয় যেন হিব্রু পড়ছি।

তাছাড়া ভাবের দীনতা, আবেগের তুচ্ছতা কিংবা পৌনঃপুনিক কনসীটের ব্যবহার, এসব তো প্রায় এপিডেমিকের মতো কর্মাবিস্তার-প্রয়াসী। দৃশ্য, জল, নারক, ঈশ্বর, রক্ত, যন্ত্রণা, বাগান ইত্যাদির সংযোগে এমন কতকগুলো 'ক্লিশে' তৈরি হয়েছে আজকাল যা দেখলেই গা-কেমন ক'রে ওঠে।

মোটকথা, একালের কবিতা বোবার সংগীতের মতোই অর্থহীন এবং করুণ।

জানিনে এর উত্তরে কবিরা কী বলবেন।

এই অবসরে আমরা গল্পের প্রসঙ্গে আসি। দেখা যাক, গল্প-লেখকেরা আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারেন কিনা।

না, পারেন না। বলা বাহুল্য আমি নতুন রীতির গল্প-লেখকদের কথাই বলছি। এই তরুণ লেখকেরা যেন আমাদের প্রতি কবিদের চেয়েও অকরুণ। কারণ কবিরা যা লেখেন তা বলে-কয়েই লেখেন। কিন্তু এ'রা, এই নতুন গল্প-লেখকেরা ফাঁকি দিয়ে শর্করা খাওয়ানোর মতো গল্পের নাম ক'রে কবিতা পড়ান, আর সেটা হয় আরো মারাত্মক। বলা যায়, এটা এক রকম প্রবঞ্চনাই। দুঃখের বিষয়, পাঠকের প্রতি এই প্রবঞ্চনায় শেষ পর্যন্ত প্রবঞ্চিত হন কিন্তু গল্প-লেখকেরা নিজেরাই।

অবশ্য এজাতের গল্পে নামকরণের মধ্যেই একটা নিষেধের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন ধরুন—'অপর্ণার মন, ভাঙা কাচ আর শংখচিল,' কিংবা 'অমাবস্যার ভ্রমর, আর আকাশের দরজা' অথবা 'মৃত্যুর পাপড়িতে'। কিন্তু হাজার হোক, গল্প তো। তাই নামের বাধাটা পাশ কাটিয়ে রচনার ভিতরে ঢুকতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। আর সেখানেই শুরু হয় বিপত্তি। গল্পগুলোর কয়েকটা মুদ্রাদোষ অবশ্য গোড়াতেই মেনে নিতে বাধ্য হই আমরা। যেমন সিনট্যাক্সের অভাব, যুক্তির অসংলগ্নতা, উপমা দিয়ে কথা বলার ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। কিন্তু সব থেকে বিমূঢ় করে, গল্পের নামে লেখকের 'আত্মজৈবনিক নিম' (সুধীন্দ্র দত্ত থেকে উদ্ধৃত) খাওয়ানো। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো গল্পই থাকে না এসব গল্পে। কিংবা যা থাকে তা অত্যন্তই মামুলী। যেমন, একটি ছোট ছেলে (ডাকঘর নাটক থেকে আমদানী করা?), দিদি বা ঐ বয়সের কোনো মেয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, দুপুরের নিঃশব্দতা ও নিঃসঙ্গতা, উঠোনের চড়ুই আর একফালি আকাশের হাতছানি, কিংবা সর্বক্ষণ দাগী আসামীর মতো ধরা পড়ে যাওয়ার আতংক, এইসব। গল্পটা চলে ডুবসাঁতার দিয়ে, মাঝে মাঝে শুশুকের মতো ভেসে উঠে শ্বাস ছাড়ে—সেইটুকুই যা জীবনের চিহ্ন। নয়তো মনে হতো, অনন্তকাল ধরে কে যেন শ্মশানের কাছে একঘেয়ে সুরে মাথুর গেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে আর কতোটুকু শান্তি!

জামাই-ঠকানো ছড়া শোনার মতো অপ্রস্তুত ভাবটা তবু থেকেই যায়।

তাছাড়া, এজাতের গল্পে আরো একটা প্রধান গুণ (?) হল এর ঋজুভাষণ। যেখানে আপনি জানতে চান সেখানে লেখকরা মৌন থাকলেও যেটা আপনি জ্ঞাতব্য মনে করেন না, তা জানাতে এ'দের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। মানুষের দৈহিক ক্রিয়াগুলোর বর্ণনা এ'রা বেশ নিপুণতার সঙ্গেই অঙ্কিত করেন; ঘাম, রক্ত, বমি থেকে শুরু করে ঘেয়ো কুকুর, মাছি, মলমূত্র ইত্যাদি সমস্তই এ'দের কৃপায় সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু তাই বলে এ'দের আপনি একচোখো মনে করবেন না। এ'রা কুৎসিতের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরের বিষয়েও সচেতন। দুটোকে এ'রা একসঙ্গে 'পাঞ্চ' করে দেন—যাতে হরিষে-বিষাদের মতো একটা মিশ্র অনুভূতি আপনাকে ব্যাকুল করে তোলে। একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, (কিন্তু সবটাই মনগড়া নয়!) যেমন ধরুন—

হাবুল বেওয়ারিশ কুকুরের মতো রাস্তায় ভাসল। ধুলো। ড্রেন। দোকানীটা আচ্ছা পাজি, চিল্লাচ্ছে কেমন ষাঁড়ের মতো। ষাঁড় অবশ্য খুব কম চিল্লোয়। বড়দার মতো রাশভারী। বড়দা কি টের পেয়েছে তার পকেট থেকে পয়সা মেরেছি? দোকানীটা ধার দিল না, কী করব! হাবুল দাঁড়াল। ড্রেনের পাশে বসে '—' করল। (লেখক কিন্তু আসল কথাটাই লিখবেন ঐ কোটেশান মার্কা জায়গায়।—জৈমিনি।) তারপর হাই তুলে একটা গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে নাক খুটতে লাগল। সিকনি। সামনের আকাশটায় রোদ্দুরে ডানা মেলে দিয়েছে কয়েকটা শংখচিল। নীল। কী নীল! হাবুল ওখানে কোনোদিনও যাবে না। কোনোদিনও পাবে না শংখচিলের বুকের ইচ্ছে।......

এরপর যদি আপনার মনে হয়, গল্পলেখক রাঁচির একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বাসিন্দা এবং কলকাতায় তাঁর থাকাটা মোটামুটি একটা স্থান-বিভ্রাট মাত্র, তাহলে দোষ দেওয়া যাবে না। কিন্তু ঘটনা যদি তা না হয়, এবং ঘটনা যদি এই হয় যে, লেখকরাই মনে করছেন তাঁরা যথাস্থানে আছেন, অর্থাৎ এই কলকাতা শহরটাই আসলে রাঁচির ঐ বিশেষ প্রতিষ্ঠানটির দোসর, তাহলে অবশ্য বিলক্ষণ দুশ্চিন্তার ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই।

পরশুরামের অনুকরণে আমরা 'আম্মা কালী যীশু'র নামে দিব্যি দিয়ে বলছি, এমন মিটমিটে পাগল-অধ্যুষিত কলকাতায় থাকার চেয়ে আমরা বরং ডালপিটে পাগলের আশ্রয় কোনো উন্মাদনিকেতনে থাকাও বেশি শ্রেয় জ্ঞান করি।

নতুন রীতির গল্প-লেখকরা কী বলেন?

রাজশেখর বসু—সংকলিত
বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধান

চলন্তিকা

দাম—৮·৫০

বিমল মিত্রের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৃহৎ উপন্যাস

অন্যরূপ

বহুদিন দুষ্প্রাপ্য থাকার পর নতুন সংস্করণ
প্রকাশিত হ'ল। দাম—৫·৫০

সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন—সংকলিত

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড—প্রথম ভাগ; দাম—৭·০০
প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় ভাগ; দাম—৮·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-প্রণীত

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

স্বামীজীর জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উৎসবে উজ্জ্বলতম অর্ঘ্য

প্রথম খণ্ড—৫·০০
দ্বিতীয় খণ্ড—৫·০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

দত্তা ৩·৫০
শেষের পরিচয় ৫·৫০

জওহরলাল নেহরুর

পত্রগুচ্ছ ১০·০০

পরশুরাম বিরচিত

পরশুরামের কবিতা ২·০০
চমৎকুমারী ৩·০০
নীল তারা ৩·০০
আনন্দীবাঈ ৩·০০
গল্পকল্প ২·৫০
হনুমানের স্বপ্ন ২·৫০
ধুস্তুরীমায়া ৩·০০
গড্ডলিকা ৩·০০
কৃষ্ণকলি ২·৫০

তারকচন্দ্র রায় রচিত

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য ৪·০০

অমল হোম প্রণীত

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ (৩য় সং) ৩·০০

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

প্রাচীন ইরাক ৬·০০
মহাচীনের ইতিকথা ৭·০০
প্রাচীন মিশর ৫·৫০

বুদ্ধদেব বসুর
নতুন বই

জাপানি জর্নাল

প্রকাশ আসন্ন

অন্নদাশংকর রায়ের

জাপানে ৬·৫০ অপ্রমাদ ৩·০০
দেখা ৩·০০ পথে প্রবাসে ৪·০০
রূপের দায় ৩·৫০
অসমাপিকা ৩·০০
কামিনীকাঞ্চন ৩·০০

বুদ্ধদেব বসুর

যে-আঁধার আলোর অধিক ২·৫০
কালিদাসের মেঘদূত ৬·০০
আধুনিক বাংলা কবিতা ৬·০০
যেদিন ফুটলো কমল (৩য় সং) ৪·০০
শোণপাংশু (উপন্যাস) ৪·০০
শেষ পাণ্ডুলিপি (") ৩·২৫
একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু ৩·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের

মনে রেখ (উপন্যাস) ৬·৫০

প্রাণতোষ ঘটকের

রাজায় রাজায় (উপন্যাস) ৯·০০

শ্রীমতী সুষমা দেবীর

স্বাহা (উপন্যাস) ৫·০০

দীপক চৌধুরীর উপন্যাস

মালদা থেকে মালাবার ৩·০০
ঝড় এলো ৫·০০
শঙ্খবিষ ৫·৫০
রোয়াক ৩·৫০
পাতালে এক ঋতু (১ম) ৬·০০
এই গ্রহের ক্রন্দন ৬·০০

প্রতিভা বসুর উপন্যাস

অতল জলের আহ্বান ৩·৫০
মধ্যরাতের তারা ৩·২৫

বিশু মুখোপাধ্যায় রচিত

বিখ্যাত বিচার কাহিনী ৩·০০

সুশীল রায়ের নতুন উপন্যাস

ত্রিনয়না ৫·০০

সুলেখা সরকারের

রান্নার বই ৫·০০

উইলা ক্যাথারের

আর্চবিশপের মৃত্যু ৪·০০
ভবিতব্য ২·৫০

অপূর্বরতন ভাদুড়ীর

মন্দিরময় ভারত (১ম খণ্ড) ৫·০০
মন্দিরময় ভারত (২য় খণ্ড) ৬·০০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

প্রেমতারা (উপন্যাস) ৪·০০

রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব
সম্পাদিত

কাব্যদীপালি ৭·০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট; কলিকাতা—১২

গল্পের ইতিহাস সুদীর্ঘ। মানুষের সেই আদিম যুগে চেতনার প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সে ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-বেদনা, ঘৃণা-হিংসা, আসক্তির আবেগ মানুষের সীমিত বাস্তব-বোধকে কল্পনার মুক্তি দিয়েছে।

মূলতঃ আত্ম-তোষণ ও ইচ্ছা-পূরণের সে গল্প নানা জটিল বিচিত্র ধারায় বইতে বইতে শেষ পর্যন্ত নিজেকে চিনতে পেরে অনেকখানি মোহমুক্ত যে হতে পেরেছে গত একশ বছরে বিদেশে এদেশে তার অজস্র প্রমাণ মিলবে।

কিন্তু মনের সস্তা ফরমাশ খাটার দায় অগ্রাহ্য করেও গল্প আর নিজের ভূমিকায় সন্তুষ্ট নয় দেখা যাচ্ছে।

ইওরোপে আমেরিকায় গল্পের কলম বেঁকে দাঁড়িয়েছে। ছোঁয়াচ লেগে আমাদের এখানেও কিছু কিছু।

না, তোমাদের ও গৎ-বাঁধা গল্প ত বলবই না, কোনো গল্পই বা বলতে যাবো কেন?

জীবনটা তোমাদের কাছে ছিল দাবার ছকের মত। সে ছকের ঘুঁটির নাম-ধাম তোমরা সময় সুবিধে বুঝে পাল্টেছ। কখনো রাজা কখনো মন্ত্রী, কখনো ঘোড়া কখনো পিল কি নৌকো কি বড়েকেও দিয়েছ প্রাধান্য, নিয়ম-কানুনও পেঁচিয়ে তুলেছ দরকার মত, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ছক ছাড়া কিছু নয়। ঘরগুলো কি বল বিশেষের চাল তোমাদের মন-গড়া, মাৎ বা মোক্ষ যা বলো সেও তাই। আমরা দুনিয়া আর জীবনকে তোমাদের কোন ছকেই মেলাতে পারিনি মুক্ত মন নিয়ে, কোন খুঁটিই পাইনি এমন ধ্রুব যা ধরে থাকতে পারি নিশ্চিন্ত হয়ে। সুতরাং তোমরা যাকে গল্প বলে বোঝো সে আমাদের কলমে বেরুবে না,—এই হল এ যুগের গল্পরাজ্যের বিদ্রোহীদের বক্তব্য।

সে বক্তব্য সম্পূর্ণ বুঝি না বুঝি, প্রশ্ন করতে পারি যে কি গল্প তাহলে তোমরা বলতে চাও?

যে গল্প তোমাদের শাস্ত্র মানে না। তার শুরুও নেই, শেষও নয়।

জবাবে বলা যায়, শুরু ও সীমা বলতে গেলে কোন গল্পেরই নেই, শেষও না। শুধু তাকে এক জায়গায় ধরতে হয় একটি ইঙ্গিতের কিংবা বলা যেতে পারে একটা ঝিলিকের জন্যে, যে ঝিলিক ক্ষণিক একটু চমকের মধ্যে অনাদ্যন্ত জীবন-রহস্যের চাবিকাঠির যেন আভাস দেয়।

এ জবাব দেবার সঙ্গেই কিন্তু পাল্টা উত্তরটা অনুমান করতে পারি।

ওই জীবন-রহস্য আর ইঙ্গিতময়তা, ও সব ধোঁয়াটে ধাপ্পা আমাদের জন্যে নয়। জীবন যদি রহস্যই হয় ত তার কুঞ্চিকা কোথাও মেলবার নয়। আমাদের গল্পের শুরু, কি শেষ না থাকা গূঢ় গোপন কোন ইঙ্গিতময়তা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবার নয় মানে না।

এবার হয়ত বলে ফেলি,—তবু খেয়াল-খুশি মত শুরু ও শেষ করলেও সবটুকু কলমের কালিতে ফুটিয়ে তুলি তার একটা সংলগ্নতা ত থাকবে, স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন উদ্দেশ্যের বাহন না হলেও যে সংলগ্নতা সমগ্র প্রকাশটিকে একটি সার্থকতার বৃন্তে ধরে রাখে।

একটু বিস্তারিতভাবে তারপর বোঝাবার চেষ্টা করি,—সামনের এই চশমার খাপটা নিয়েও গল্প শুরু করতে পারা যায় নিশ্চয়। কালো খাপটা পড়ে আছে টেবিলের শাদা ঢাকনার ওপর। টেবিল ল্যাম্পের আলো খোলা খাপটার ওপরের ডালার দিকে একটু ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে। অ্যাসট্রেটা অবধি। একটা কি ছোট্ট পোকা টেবিলের ঢাকনার সেই ছায়া-প্রান্তরের ওপর দিয়ে বোঝাই যায় না এমন ধীর গতিতে চলেছে যেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়। এই গল্প চশমার খাপে শুরু করে যেখানেই গিয়ে শেষ করি না কেন, শুরু ও শেষ যত সূক্ষ্ম বা ক্ষীণ সম্বন্ধেই হোক, জড়িত না হলে এ গল্প বলতে বসাই বা কেন? যে দিকে চোখ ফেরাই একটা না একটা কিছু ছবি আছেই। সে ছবি বস্তুর দর্পণ-ছায়া হবারও কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু একটি ফ্রেমের মধ্যে যখন রং কি রেখার অর্থহীন উচ্ছ্বাসকেও ধরি, তখন ছবির
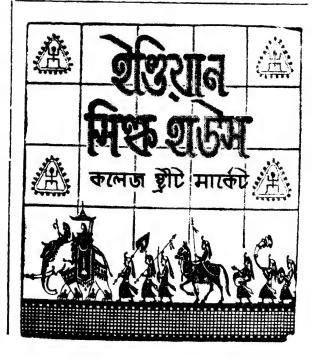
ফ্রেমই একটা গড়ে বিন্যাস তার মধ্যে দাবী করে, সে বিন্যাস বিশৃঙ্খলতম সঙ্গীতের শব্দসমাবেশের মত আমাদের স্থূলে ইন্দ্রিয়ানুভূতি কি মামুলি আবেগে অনুবাদের অতীত হলেও।

এই পর্যন্ত বলেই মনে হয়, এ যুগের বিদ্রোহের কাছে যা হাস্যাস্পদ, সেই যুক্তিই অভ্যাস-দোষে দিয়ে ফেলেছি। ওদেশের সবচেয়ে বেপরোয়া বিদ্রোহীদের কাছে ছবির ফ্রেম একটা অর্থহীন কুসংস্কার, সঙ্গীতের শব্দ-সমাবেশে বিন্যাসের আভাস লজ্জাকর। গল্পে কি কবিতায় সংলগ্নতা একটা ভ্রান্তি।

এ সব কথা বুঝেও অবজ্ঞা কি উপহাস করবার প্রবৃত্তি সত্যিই হয় না। শুধু ছোটগল্পে নয়, শিল্পের সমস্ত ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিস্তৃত নৈরাজ্যপ্রবণতার একটা কিছু অর্থ নিশ্চয় আছে। সেই অর্থ ও হেতুমূল বোঝবার চেষ্টা না করলে নয়।

এ বিদ্রোহের সূচনা অনেক আগেই অবশ্য হয়েছে।

১৯১৩-তে প্রকাশিত George Santayanaর Winds of Doctrine-এ পাড়ি —'Immediate feeling pure experience, is the only reality, the only fact.'

D. H. Lawrence তাঁর কবিতার বই-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'We do not speak of things crystallized and set apart. We speak of the instant, the immediate self, the very plasma of the self'.

সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ আমদানির জন্যে যিনি কতকটা দায়ী সেই William James বলেছেন,—'Consciousness then, does not appear to itself chopped up in bits ......It is nothing jointed; it flows. A 'river' or 'stream' are the metaphors by which it is most naturally described'.

'চেতনাপ্রবাহ' প্রবর্তনের মূলে Bergson-এর সমর্থনও অনেকখানি কাজ করেছে। ভাষায় শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি তখনই বলেছেন, — 'The truth is that the writer's art consists above all in making us forget that he uses words. The harmony he seeks is a certain correspondence between the movements of his mind and the phrasing of his speech, a correspondence so perfect that the undulations of his thought born of the sentence, stir us sympathetically; consequently the words taken individually no longer count.'

কিন্তু আধুনিক যুগের বিদ্রোহ 'চেতনাপ্রবাহ'-এর তটভূমিও ছাড়িয়ে চলে গেছে। কোথায় তা চলেছে তা না জানলেও তার বেগের উৎস কতকটা অনুমান করতে পারি। কোন একজন যুগ-সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, — 'In a world of increasing socialization, standardization and uniformity the aim was to stress uniqueness, the purely personal in experience; in one of 'mechanical' rationality, to assert other modes through which human beings can express themselves, to see life as a series of emotional intensities involving a logic different from that of the rational world; and capturable only in dissociated images or stream of consciousness musings.'

এই সিদ্ধান্ত যদি মেনে নিতে হয়, তা হলে বলতে হবে সাহিত্য-শিল্পের এই দিশাবিমুখ স্বাতন্ত্র্যসন্ধানের মূলে আছে সমষ্টিগত মানবজীবনে আধুনিক যুগের এক যান্ত্রিক অস্বাভাবিকতার প্রতিক্রিয়া। প্রকাশ সুস্থ কি অসুস্থ সে বিচার ছেড়ে দিয়েই বলা যায়, মানবমনের রুগ্নতাতেই এ বিদ্রোহের সূত্রপাত। ফলে বিকারের বাতুলতা থাক বা না থাক মূলেই তার রোগ।

কিন্তু নিদান শুধুই কি তাই?

আর কিছু না হোক, ভাসমান চেতনাকেই সার করার প্রেরণা নির্লিপ্ত বিজ্ঞান থেকেই কি সাহিত্য অনেকখানি পায়নি?

যা প্রতীয়মান তাই বাস্তব এই প্রতীতি ভিন্নভাবে আধুনিক লেখক ও বৈজ্ঞানিক উভয়কেই চালিত করছে।

এখনও পর্যন্ত সাহিত্য-শিল্পের অধিকাংশ নব আন্দোলনের যা জন্মভূমি সেই ফ্রান্সের তরুণ লেখকসমাজ গল্প ও উপন্যাসকে তৎক্ষণিকের প্রতিফলিত চেতনাতেই ভাসমান রাখার বেশী আর কিছু করতে নারাজ। Claude Mauriac, Nathalie Sarraute, Claude Simon, Michel Butor প্রভৃতি যে নবীন লেখকগোষ্ঠীর নাম অল্প-বিস্তর কানে আসে নব বাস্তববাদী ওরফে বিপক্ষ-ঔপন্যাসিক বলে তাঁরা পরিচিত। উপন্যাসের গঠনে ত বটেই, উদ্দেশ্যে ও প্রকাশভঙ্গিতে গতানুগতিক সব ছক তাঁরা বাতিল করে দিয়েছেন। গল্প-উপন্যাস মানে মেলে রাখা একটা চেতনার ক্যামেরা যার লেন্স ইচ্ছামত ইতস্ততঃ দূরে-কাছের ছবি ধরলেও সব সময়ে স্বচ্ছ থাকার ধার ধারে না এবং যার পেছনে কোনো ইঙ্গিত কি অর্থ-সঙ্গতি খোঁজার দায় নেবার মত প্রজ্ঞা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বলেই মনে হয়। রচনাকে কাহিনীর ক্লেদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করাই এই লেখকগোষ্ঠীর পরম আদর্শ বলে শুনি।

প্রশ্ন আসে ততঃ কিম।

ছিয়াত্তর বছর বয়সে সাতাশটি উপন্যাসে নিজের জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা উপলব্ধি ঢেলে দেবার পর ফরাসী সাহিত্যেরই অন্যতম দিক্‌পাল Jules Romains এ প্রশ্ন যেভাবে তুলেছেন ও যে উত্তর খুঁজেছেন তা একটু শোনা যেতে পারে। তাঁর মতে অনবদ্যতাই এযাবৎ মানুষের সমস্ত কীর্তির অভিশাপ। তিলোত্তমার আদর্শই আত্মপ্রকাশের জগতে তার অপঘাত এনেছে। শিল্পে সঙ্গীতে সাহিত্যে স্থাপত্যে নিখুঁত হবার আগ্রহে যে-সব উপাদান বর্জিত হয়েছিল আজ তাই ফিরিয়ে আনবার জোয়ার বইছে। শিল্পী অনবদ্যতা থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা তবু থেকে যায়, কোন দিকে? শুধু আরেক অখণ্ড বাস্তবতার দিকে কি? না, বাহ্যিক সমস্ত আস্ফালনের অন্তরালে নিছক জৈব আবেগের আবর্ত-ফেনিল কাহিনী এড়িয়ে নির্মল গভীর কোনো জীবন-বীক্ষার অভিমুখে?

তা না হ'লে চেস্টারটনের বহু আগের একটি উক্তিকেই একটু ঘুরিয়ে বলতে হবে,—শুধু ভাঙ্গা-মকের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরার খামখেয়াল যদি সাহিত্য হয়, তাহলে খানায় শুয়ে থাকাও স্থাপত্য।

আজকালকার এই সমালোচনার যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সব চাইতে বড় ব্যর্থতার কারণ হোল যাঁরা সাহিত্যের ভালোমন্দ বিচার করেন তাঁদের অধিকাংশেরই খুব বেশী রসবোধের বালাই নেই। প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, যে পি-ই-এনকে লোকে আন্তর্জাতিক সাহিত্য-চর্চার প্রধান সহায় বলে উল্লেখ করে থাকেন,—অন্য দেশের বিষয় সঠিক কিছু বলা না গেলেও, অন্ততঃ আমাদের দেশে—তাঁরা কোনো শিশুসাহিত্যিককে সহজে, তাঁদের সভ্য-তালিকাভুক্ত করে নিতে চান না, যদি না তিনি সেই সঙ্গে বড়দের জন্যেও লিখে থাকেন।

আরো প্রমাণ আছে। একখানি ৬০০ পাতার বই-এর কথা শুনেছি, যার বিষয়-বস্তুই হোল বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস, তার মধ্যে শিশুসাহিত্যের নামগন্ধ নেই, এমন কি সুকুমার রায়েরও নামোল্লেখ নেই। অথচ সত্যি কথা বলতে গেলে বুড়োরা যদি মন দিয়ে ঐ রচনাগুলি পড়তেন, আজ আমার কোনো আক্ষেপেরই কারণ থাকত না।

আরো বলা যায় যে, যখনই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করা হয়, শিশুসাহিত্যকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বলা হয়। পন্ডিতরাও তাকে সাহিত্য বলে স্বীকার করেন না। সাধারণ সাহিত্য-প্রতিযোগিতাতেও শিশুসাহিত্য ঠাঁই পায় না।

এই উপেক্ষার একটা প্রধান কারণ হোল যাঁরা সমালোচনা করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই কলেজের মাষ্টারমশাই, এবং তাঁদের বেশীর ভাগই কোনোদিনও ছোটদের জন্য লেখা বই পড়েন না। শুধু 'পড়েন না' নয়, তাঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, যাঁরা শুধু অপোগন্ড শিশুদের জন্য বই লেখেন, তাঁদের মধ্যে খানিকটা নাবালকত্ব থেকে গেছে, পরিণত-বুদ্ধি হোলে তাঁরা নিশ্চয়ই ছোটদের জন্য লিখে সময় নষ্ট করতেন না।

এ যেন মৌরাণীকে বাদ দিয়ে মৌচাক গড়ার চেষ্টা। সাহিত্যের মূল ও শেষ যে রসসৃষ্টি সে কথা এ'রা সকলেই মানেন; যে রসের কোনও সংজ্ঞা হয় না, তার এ'রা চুলচেরা বিচার করে থাকেন; কিন্তু অনাবিল রসের যেখানে উৎস, সেই পর্যন্ত তাঁদের নাগাল পেঁ'ছয় না।

ঐ নাবালকত্বের কথাটা কিন্তু ভুল। যাঁরা ছোটদের জন্য সার্থক রচনা লিখেছেন, তাঁদের সকলের বুদ্ধি অতিশয় পাকা। কাঁচা হাতে ছোটদের জন্য লেখা বেরোয় না। এই কারণেই কিশোর বয়সে যারা কলম ধরে, তাদের প্রায় সব লেখাই হয় বুড়োমিতে ঠাসা। ছোটরা বড় হবার জন্য এমনই অধীর আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে, যে ইচ্ছে করে ছেলেমানুষি করাতে তাদের ধৈর্য থাকে না। ছোটরা যখন ছেলেমানুষি করে নিজেদের অজ্ঞাতসারে করে, কিন্তু বড়রা যদি ছেলেমানুষি করে সে হওয়া চাই ওস্তাদের সেরা কারিগরি, নইলে সাহিত্য হোয়ে না উঠে, সে হোয়ে দাঁড়ায় ন্যাকামি।

শিশুসাহিত্য রচনা করতে হোলে যে রকম তারুণ্যের দরকার হয়, সেটা বুদ্ধির নয়, মনের। তার অনেকখানিই লেখকের নিজের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো থাকে। ছোটরা নিজেদের মনের কথা খুলে বলতে পারে না, কিন্তু আজকের ছোটকাল যখন বুড়ো হয়, তখনও যদি তার ছোটবেলাকার শুধু ঘটনা নয়, ভাবনাচিন্তাগুলোকে সুদ্ধ মনে থাকে, তা হোলে তার পক্ষে ছোটদের মনের কথা লেখা সহজ হোয়ে যায়। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করার কলমটি হওয়া চাই পাকা।

অনেকের ধারণা যে, ছোটদের জন্য লিখে লিখে হাতটা যখন কায়দাদুরস্ত হোয়ে উঠবে, তখন বড়দের আসরে নেমে পড়া যাবে। ছোটদের তেমন বিচার-বুদ্ধিও নেই, ওদিকে আকাট মুখ্যও আছে, যা হয় একটা খাড়া করে ওদের কাছে চালিয়ে দেওয়া খুব শক্ত হবে না।

এই সব ব্যর্থ সাহিত্যিকদের ভিড়ে শিশুসাহিত্যের হাটে বড় ঠেলাঠেলি। তার মধ্যে সত্যিকার শিল্পী যাঁরা আছেন তাঁদের খুঁজে বের করা বিষম দায় হোয়ে উঠেছে। এ দিকে ছোটদের রুচির পরিণতি হয়নি আর তারা স্বাভাবিকই মুখ্যু, সেইজন্য তাদের কাছে তৃতীয় শ্রেণীর জিনিস চালাবার চেষ্টা হোল, দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা। বড়দের ভালোমন্দ জ্ঞান একটা যা হয় তৈরী হোয়ে গেছে

বলে তাদের মনে আঁচড় কাটা বড় শক্ত। শিশুরে বেলা ঠিক তার উল্টোটি: তারা বর্জন করতে জানে না, রসের তৃষ্ণা তাদের থাকে পুরোমাত্রায়, অথচ তাকে যোগ্যভাবে চরিতার্থ করবার বিচার-বুদ্ধি থাকে না। চিনি মুড়ে বিষ দিলেও পরম আনন্দে চেটে খাবে। সেইজন্যই অতি বড় গুণী না হোলে ছোটদের জন্য লেখার কাজে হাত না দেওয়াই ভালো।

এদেশে শিশুসাহিত্য রচনায় নিজেকে উৎসর্গ করার কতকগুলো অসুবিধা আছে। তার মধ্যে প্রধান হোল এতে খ্যাতি যেটুকু পাওয়া যায় সেও হয় খানিকটা সস্তা দরের আর পয়সাকড়ির কোঠায় তো প্রায় শূন্য। অথচ চারি-দিকের অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, সাহিত্যকে ক্রমশঃ একটা জীবিকার উপায় হোয়ে উঠতে হোচ্ছে। শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার ভরসা বড় কম। ছোটদের জন্য লেখায় কড়ির আশা অল্প। প্রকাশক-মশায়রা বড়দের বই-এর জন্য রয়েলটি দিয়ে থাকেন শতকরা ২০ ভাগ, কিন্তু ছোটদের বই-এর জন্য শতকরা ১৫ ভাগ, তার কারণ হোল ছোটদের বই-এ ছবি দিতে হয়, তার খরচ অনেক। উভয় পক্ষেরই লাভের অঙ্ক কমে যায়।

ওদিকে ছোটদের ভালো পত্রিকার বড়ই দরকার, সেখানেও ঐ একই সমস্যা। একখানি বড়দের পত্রিকা এক টাকা দিয়ে কিনতে কারও কিছু মনে হয় না, অথচ ছবি দিয়ে সাজানো ছোটদের মাসিক পত্রিকার দাম দু সিকে থেকে তিন সিকে করলেই আপত্তি ওঠে। এর জন্য লেখক কি প্রকাশক কাকেও দোষ দেওয়া চলে না, সম্পূর্ণ দায় যাঁরা বই কেনেন, তাঁদের।

এই সমস্ত কারণে এতাবৎকাল ছোট-দের জন্য যত ভালো বই লেখা হয়েছে, উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা বেরিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুরুতেই লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেগুলি নিতান্ত ব্যক্তিগত সখের জন্যই হোয়েছে। এমন কি পত্রিকার বেলায় লাভ তো দূরের কথা, বরং পকেট থেকে প্রতি মাসে গুণগার দিতে হোয়েছে। কাজেই লেখার উপর যাঁদের নির্ভর করতে হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরাই এ কাজ হাতে নিতেন।

তাঁদের সংখ্যা ক্রমে বিরল হয়ে আসছে। অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জন, আর অবসর সময়ে সাহিত্যসাধনা, অর্থ ও অবকাশের অভাবে আজকাল আর তেমন হয়ে ওঠে না। এই হোল শিশুসাহিত্যের প্রধান সমস্যা। যে সব প্রতিভাসম্পন্ন

লেখক আছেন যাঁদের দিয়ে এ কাজ হোতে পারত, তাঁরাও পেরে উঠছেন না, কাজেই লোকে এ কথা বলবার সুযোগ পাচ্ছে যে, শিশুদের জন্য সে রকম প্রতিভাশালী লেখক আজকাল জন্মাচ্ছেন না।

বাস্তবিক উপেন্দ্রকিশোর, অবনীন্দ্র-নাথ, দক্ষিণারঞ্জন, সুকুমার ইত্যাদির মতো গুণী, শুধু আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর কোনো দেশেই খুব বেশী দেখা যায় না। কিন্তু প্রতিভার যে আজকাল অভাব এ কথা আমার মনে হয় না। বরং নাটক ছাড়া, সাহিত্যের আর সব ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল প্রতিভার সন্ধান পাই, যদিও সমালোচকদের সমর্থন সব সময় পাওয়া যায় না।

অবিশ্যি পথিকৃৎদের সর্বদাই এই অবস্থা হোয়ে থাকে। তরুণ রবীন্দ্রনাথও বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের হাত থেকে নিস্তার পান নি। পুরোনো মানদন্ড দিয়ে নতুনকে মাপা যায় না। তাছাড়া শিশুসাহিত্য বলতে আমাদের দেশে আগে আলাদা কিছু ছিল বলে মনে হয় না। লোক-সাহিত্য বলে যে সব কাহিনী চলে আসছে, দিদিমা-ঠাকুমারা সেই সব গল্প বলেই রাত্রে নাতি-নাতনীদের ঘুম পাড়াতেন। তাঁদের বিষয়বস্তু যে ছোট-দের উপযুক্ত না-ও হোতে পারে এ কথা বক্তা বা শ্রোতা কারো মনে হোত না।

কি ছিল সেই সব বিষয়বস্তু? না, যে সব রাগানুরাগ, ভয়, লোভ, হিংসা, দ্বেষ, খুন, অভিশাপ, প্রতিশোধ, বড়দের জীবনকে রোমাঞ্চময় করে থাকে সে সমস্তই। বিষয়বস্তুর অনুপযুক্ততা রস

জমানোর পথে, কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। করেও না। ছোটদের বুদ্ধি যাকে হৃদয়ংগম করতে পারে, সে সমস্তই শিশুসাহিত্যের বিষয় হোতে পারে। ওস্তাদি থাকে বলার ধরণে। সমস্ত জগৎকে অপূর্ব সম্ভাবনাময় করে তুলতে যে-ই পারবে, তার গল্প উৎরে যাবে।

আজকাল ছোটদের গল্পের বিষয়-বস্তু নিয়ে বড় একটা বিতর্ক চলেছে। ভূতের গল্প বললেই ওরা ভীতু হোয়ে যাবে, চোরের গল্প বললেই ওদের চুরি করতে ইচ্ছা করবে, এই ধরণের কথা প্রায়ই শোনা যায়। বলেছি তো আসল রহস্য হোল বলার ধরণে, ভূত-পেত্নীর দেশ কিম্বা কংকাবতীর সাহেব ভূত ইত্যাদি কিম্বা রাক্ষস-খোক্কসের অমানুষগুলোর কথা পড়ে কেউ কখনও ভীতু হোয়ে যায় না। কজন আইনভংগকারী রবিন হুডের গল্প পড়ে ডাকাতিতে নেমেছে?

আসল কথা রসের ক্ষেত্রে কোনো সীমারেখা টানা যায় না: সে উত্তাল সাগরের মতো, সুগভীর, উচ্ছ্বসিত, ফেনায়িত; কেউ তার তল পায় না; জল কখনও নীল, কখনও সবুজ; কোটি কোটি অজানা প্রাণীর বাস; সেখানে যখন বান ডাকে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শেখানো-পড়ানো শিখিয়েদের সেখানে আসন পড়ে না, নিয়ম-কানুন চলে না সেখানে। একটি মাত্র নিয়ম ছাড়া, এতটুকু খাদ মেশাতে পারে না কেউ রসের ভাগে।

পরিষদ গড়ে, মিটিং করে শিশু-সাহিত্যের কতখানি উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। শিল্পের রাজ্যের হাওয়াটাই অন্য রকম, সেখানে হুকুম আসে হৃদয় থেকে, তাগাদা দেয় নিজের মন। সেখানে উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যসিদ্ধি হয় না। সেখানে খাতার পাতায় লাইন টেনে ফলাফলের সেকশন আলাদা করা হয় না। সেখানে একবার কাজ শুরু হোয়ে গেলে মানুষের মনুষ্যত্বের মূলে গিয়ে নাড়া দেয়, তার অবচেতন মনের সত্য-সন্ধানী দৃষ্টি খুলে দেয়। শিশুরা চোখ খুলে তাকায় তখন, সুন্দরকে সুন্দর বলে চেনে, ভালোকে ভালো বলে জানে। এর চাইতে বড় শিক্ষা আর কি হোতে পারে?

আজকাল সাহিত্যরচনার কারখানা তৈরী হচ্ছে, সেখানে একেকজন মোটা-মুটি-শিক্ষিত লোককে ট্রেনিং দিয়ে, সাহিত্যিক বানিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। সুখের বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই যাঁরা নতুন অক্ষর শিখেছেন, এই সব তৈরী-করা সাহিত্যিকরা তাঁদেরই জন্য লেখেন। সহজ, পরিপাটি ভাষায় সংক্ষিপ্ত তথ্য-পূর্ণ উৎকৃষ্ট সব জ্ঞানের বই।

মুস্কিল হোয়েছে এই যে, সহজ ভাষা দেখে অনেকেই এ ধরণের বইকে শিশুপাঠ্যের তালিকাভুক্ত করে নেন। শুধু এ সব বইকে বাদ দিলেই যথেষ্ট হোল না, ছোটদের জন্য যা কিছু লেখা হয়, তার সবটাকেও শিশুসাহিত্য বলা চলে না। সাহিত্য হবে মাষ্টারমশাইদের অনুপ্রেরণা ও অবলম্বন, তাঁদের এসিস্টেন্ট নয়। এ সব বইএ সাহিত্যের প্রাণটুকুই বাদ পড়ে যায়।

কিন্তু ঐ প্রাণটুকুই হোল আসল; ওরই জন্য বিজ্ঞানের বই, ইতিহাসের বই, ভূগোলের বই, জীবনচরিত সবই সাহিত্যের কোঠায় উঠে বসতে পারে। বহুবার বলা পুরোনো গল্প হোয়ে ওঠে নতুন, বিদেশী গল্প হোয়ে যায় একান্ত আপনার, জানা কথা হয় অভিনব। এই ধরণের কথার যেন শিকড় থাকে, তার থেকে নতুন নতুন গাছ জন্মায়, পড়া হোয়ে গেলেই শেষ হোয়ে যায় না, মনের আকাশে কেবলই নতুন নতুন তারা দেখায়।

ছোটদের মন নিয়ত যেন জাল পেতে রাখে, প্রতিটি সূক্ষ্মতম অনুভূতিকে ফাঁদে ধরবে বলে। তাদের কল্পনা পাখা মেলে উড়ে যাবার জন্য সর্বদা ডানা ঝাপটায়। তাদের হাতে স্থূল ও কর্কশ, নকল ও মেকি জিনিস তুলে দেওয়া যায় না। এত কথা মনে রেখে তবে ছোটদের জন্য লেখা বইএর সমালোচনা করতে হয়। তার উপরে যেখানেই তথ্যের পরিবেশন থাকে, সে তথ্য হওয়া চাই নির্ভুল। কল্পনা তার নিজের ঘোড়ায় চেপে ছুটুক, সত্যের ঘাড়ে পা রেখে যেন বিপথগামী না হয়, তাও মনে রাখা চাই।

এবারে কোনো সাহসী সমালোচক এগিয়ে আসুন শিশুসাহিত্যের একটা হিসাব কষে, এ যুগের সেরা বইএর তালিকা তৈরী করে দিন। ছোটদের বাবা-মারা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ হোয়ে থাকবেন।
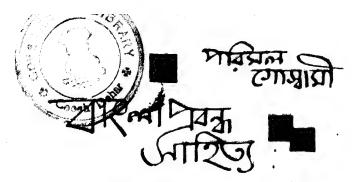
বাংলা গদ্যের আরম্ভ ও অগ্রগতির একটা ইতিহাস আছে, ভাষার ইতিহাসবিদেরা তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে তার অগ্রগতিকে অনুসরণ করেছেন।

আমি সে রকম কিছু করতে নামিনি। আমি প্রথমত এর বিশেষ বিশেষ যুগকে বুঝতে চেষ্টা করেছি, দ্বিতীয়ত আমার আলোচনাকে আমি প্রবন্ধ সাহিত্যের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছি। আর তা করতে গিয়ে বাংলা গদ্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সমাজ-ইতিহাসকেও একটুখানি স্মরণ করার চেষ্টা করেছি।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস গত ১০০ থেকে ১৫০ বছরের ইতিহাস। বাংলা গদ্যে এই সময়ের মধ্যে বহু প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, এবং প্রবন্ধ পুস্তকের সংখ্যাও বর্তমানে দ্রুত বৃদ্ধির মুখে।

কিন্তু প্রবন্ধ সাহিত্য বলতে শুধু একটি আধারকে বোঝায়, প্রবন্ধগুলি কোন্ বিষয়ের তা জানতে পারলে তবে তার সম্পূর্ণ অর্থটা বোঝা যায়। অর্থাৎ আধারের সঙ্গে আধেয়কে জানা। আধেয় হচ্ছে বাইরে থেকে আহৃত জ্ঞানবিজ্ঞান অথবা সমাজ-চিন্তার ধারা, অথবা তত্ত্বচিন্তা।

নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও জানবার ইচ্ছা মানুষের সহজাত। এই জ্ঞানান্বেষী মানুষকে নানাবিষয়ের জ্ঞানের কথা পরিবেশন ক'রে তার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করে সাহিত্য। —বিশেষ ক'রে প্রবন্ধ সাহিত্য। যে সমাজে জানবার আগ্রহ যত বেশি, সে সমাজের লিখিত ভাষা জ্ঞাতব্য তথ্যের নতুন নতুন সম্ভারে তত ঐশ্বর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। অবশ্য এর বিপরীতটাও সত্য। অর্থাৎ তথ্য পরিবেশনের পরিমাণ বাড়তে থাকলে পাঠকের জানবার আগ্রহ আরও বাড়তে থাকে।

ভারতবর্ষে এককালে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার উৎকর্ষ চরমে উঠেছিল, কিন্তু তার কোনো বিভাগেরই ধারাবাহিকতা বজায় নেই। বহির্মুখী গবেষণামূলক বহু বিষয়ের কিছু কিছু চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে এখন। রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতিশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ প্রভৃতির কাজ যে যুগে আরম্ভ, মনে হয় সেই যুগেই যেন শেষ হয়ে গিয়েছিল। দার্শনিক তত্ত্ব মীমাংসাদিরও পরিণতি একই। এ-সব বিদ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই এগিয়েছিল, কিন্তু প্রয়োগবিদ্যা একমাত্র আয়ুর্বেদ এবং স্থপতি ভিন্ন বিশেষ কিছু দেখা যায় না। যন্ত্রবিদ্যা তো আরম্ভ এবং শেষ প্রায় ছোটখাটো দু একটা জিনিসে। চরকা, তাঁত, লাঙ্গল, ঢেঁকি, ঘানি, চাকা, আর তেলের প্রদীপ — আমাদের হাতে হাজার হাজার বছরেও কোনো পরিবর্তনের মুখ দেখেনি। তবু বাংলাদেশের এর কতখানি নিজস্ব ছিল তা ঠিকভাবে জানা যায় না। একমাত্র নৌ-শিল্পের উন্নতি ঘটেছিল বাংলাদেশে, কিন্তু তাও এক সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বয়নবিদ্যার যে উন্নতি হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য অবশ্য এখনও কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে।

কিন্তু আধুনিক জ্ঞান বলতে যে সংখ্যাহীন বিষয়বস্তুর প্রায় সীমাহীন বিভাগ-উপবিভাগ বোঝায়, এবং তার উপর ভিত্তি ক'রে যে উদ্ভাবন বৈচিত্র্য প্রতিমুহূর্তে আমাদের মনে নতুন নতুন বিস্ময় জাগিয়ে চলেছে তার জনক আমরা নই, পাশ্চাত্যদেশ। আমাদের কোনো দান তার মধ্যে নেই। এ-সবের পরিচয় আমাদের কাছে আসছে প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষা অথবা তার অনুবাদের মাধ্যমে। অবশ্য অনুবাদ অতি সামান্যই হওয়া সম্ভব। মন স্বাধীন চিন্তার শক্তি হারিয়েছে, তাই অন্যের দেওয়া বিবরণ পড়ে আমরা প্রায় বিস্ময়ে অভিভূত। এত রকমের বিষয়বস্তুর অনুবাদ বাংলা ভাষায় হওয়া অসম্ভব, ভাষার সে প্রসার আসতে দেরি আছে। কিন্তু তবু বাংলা ভাষা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের মোটামুটি একটা স্থূল পরিচয় বহন করতে পারে এবং এটিও এই অল্পবয়স্ক ভাষার পক্ষে কম গৌরবের নয়।

গত একশ' দেড়শ' বছর ধ'রে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের যে উন্নতি ঘটেছে তা
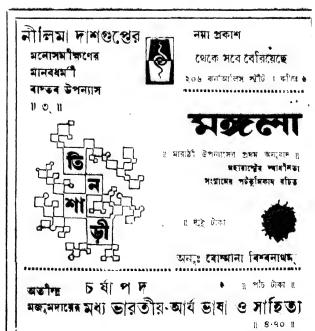
মূলে এই সব বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা জানবার আগ্রহ। এবিষয়ে প্রাথমিক কাজ করেছেন বিদেশীরা। তার পরেই স্মরণ করতে হয় স্বাধীন চিন্তাসম্পন্ন কয়েকজন মনীষীর, যাঁরা আপন গরজে দেশে জ্ঞান-বিস্তারের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

বাংলাদেশে স্বাধীন চিন্তার প্রথম উদ্বোধক রাজা রামমোহন রায়। আধুনিক বাংলা গদ্যের মধ্যে তিনিই প্রথম প্রাণ-সঞ্চার করেন। তিনি বাংলা ভাষায় নানা বিষয়ে বর্ণনামূলক বই লিখেছেন, কিন্তু সেটি তাঁর বড় কৃতিত্ব নয়। তিনি বাঙালীর মনে বিচারবুদ্ধি জাগাবার যে চেষ্টা করেছেন, সেটাই তাঁর বড় কৃতিত্ব। এতবড় প্রতিভা সে যুগে এক পরম বিস্ময়।

কিন্তু তবু তা আরম্ভ মাত্র। এবং যে ভাষা তিনি তাঁর চিন্তার বাহন করেছিলেন তা তখনও খুব সরল হতে পারেনি। ভাষা তাঁর কাছ থেকে প্রথম চমৎকার প্রেরণা পেয়েছিল। সেই প্রেরণা থেকেই তা আজ এতটা এগিয়ে এসেছে, নইলে, এবং তাঁর অব্যবহিত পরবর্তীরা তার ধারাবাহিকতা রক্ষা না করলে বাংলাভাষা জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারে এতটা প্রসারলাভ করতে পারত কিনা সন্দেহ। ভাষার এই চরিত্রের সঙ্গে হাওয়ার একটি বিশেষ চরিত্রের তুলনা চলে। আমরা জানি হাওয়ার আর্দ্রতা বেশি থাকলে তা বেশি জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারে না, কিন্তু আর্দ্রতা যত কমে, তত তার সংপৃক্তি-সীমা বা স্যাচুরেশন পয়েন্ট-এর স্ফীতি ঘটে, তত সে আরও বেশি বেশি জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারে। আজকের বাংলাভাষার সংপৃক্তি-সীমা এতটা স্ফীত হয়েছে যে, এখন তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিভাগের বাষ্প মোটামুটি শোষণ করতে সক্ষম, যদিও ইংরেজীর তুলনায় তা কিছুই নয়। কারণ লক্ষ লক্ষ কৃত্রিম পরিভাষা সৃষ্টি ক'রে তা জোর ক'রে কোনো ভাষার অঙ্গীভূত করা যায় না। সুতরাং একথা আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, কোনো একটা আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাংলাদেশের আবহাওয়া না বদলালে এবং বাঙালীর চরিত্র অন্তত আবিষ্কার-এবং উদ্ভাবন-প্রবণতায় ইউরোপের সমকক্ষ না হলে বাংলাভাষা ইংরেজীর সমান ঐশ্বর্যশালী কখনও হবে না।

অতএব বাংলাভাষা বা ভাষাভঙ্গি বা রচনাশক্তির যে উন্নতির জন্য আমরা আজ বহু জ্ঞানতপস্বী ও মনীষীর কাছে ঋণী, সে উন্নতি বাংলাভাষার ইতিহাসেরই বিস্ময়, ইংরেজী ভাষার সঙ্গে তার কোনো তুলনা এখানে চলে না।

আগের যুগে যাঁরা বাংলাভাষাকে জ্ঞানবিজ্ঞানের অথবা নিজ নিজ মত-প্রচারের বাহন ক'রে ভাষাকে এতটা এগিয়ে আনতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের প্রধানদের কয়েকটি নাম যখন যেটি মনে আসছে দিচ্ছি। এই তালিকায় তাঁদের বয়সের পারম্পর্য রক্ষা করা হয়নি, সেটি মনে রাখলে ভাল হয়। আধুনিকদের নামও কিছু যোগ করা হল এর সঙ্গে। আমি যাঁদের কথা বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করি রাজা রামমোহনের পর তাঁদের নাম হচ্ছে এই—অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত, অজিত চক্রবর্তী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুন্দরীমোহন দাস, রাধাগোবিন্দ কর, জগদীশচন্দ্র বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শিশিরকুমার ঘোষ, বিনয় সরকার, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, জলধর সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, চুনিলাল বসু, জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র রায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যদুনাথ সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্র, সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত, গিরিন্দ্রশেখর বসু, অমৃতলাল বসু থেকে আরম্ভ করে সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, সুশীলকুমার দে, কালিদাস রায়, কালিদাস নাগ, অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, অমূল্যচন্দ্র সেন, রেজাউল করিম, নীহাররঞ্জন রায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, অমিয়নাথ সান্যাল, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিশিরকুমার মিত্র, প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, নির্মলকুমার বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, হুমায়ুন কবির, পশুপতি ভট্টাচার্য, সরোজ আচার্য, যোগেশচন্দ্র বাগল, গোপাল হালদার, সৈয়দ মুজতবা আলি, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, পুলিনবিহারী সেন, প্রমথনাথ বিশী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র সিংহ, হিরণকুমার সান্যাল, বিনয় ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্যাল, মৈত্রেয়ী দেবী, ঋষি দাস, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, সুবোধ ঘোষ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, কাজি আবদুল ওদুদ ইত্যাদি দীর্ঘ তালিকা। বিজ্ঞানে, জীবনচরিতে, সাহিত্য-আলোচনায়, সংগীত বিষয়ে

রচনায়, এঁদের কৃতি উল্লেখযোগ্য। আমি আগেই বলেছি এ তালিকা অসম্পূর্ণ, তবু বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে এঁদের সবারই উল্লেখযোগ্য দান স্বীকৃত।

প্রথম যুগে রামমোহন রায়ের পরেই বাঙালীর চিত্ত-উদ্বোধকের কাজ করেছেন যুক্তিবাদী ঈশ্বরচন্দ্র। তিনিও অন্যান্য শিক্ষাবিদের মতো বিবরণমূলক বহু রচনা লিখলেও সমাজ বিষয়ে তাঁর নিজের একটি বিশিষ্ট মত ছিল। তিনি চোখ বুজে সব মানবার লোক ছিলেন না। তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিককে নিজের মনের মতো পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। আর তার জন্য তাঁকে তাঁর বিপক্ষের পন্ডিতদের সঙ্গে অবিরাম তর্ক করতে হয়েছিল। এবং এই উপলক্ষে তাঁর বহু রচনা লেখার প্রয়োজন ঘটে, এবং তার জন্য ভাষাকে আরও কিছু কসরৎ করাতে হয়। নিজের মনের কথার বাহনরূপে ভাষাকে ব্যবহার করতে গেলেই ভাষার নমনীয়তা কিছু বাড়েই।

অনেকটা এপিক ও লিরিক কাব্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে। বাংলা গদ্যের প্রথম দিকে বর্ণনামূলক রচনাই ছিল প্রায় সম্বল। তাকে বলা চলে এপিক। রামমোহন রায় প্রথম আপন মনের কথা প্রকাশ করলেন যুক্তির ভিত্তিতে। তখন তা হল লিরিকের মতো। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও তাই। অবশ্য এটি নিতান্তই স্থূল তুলনা। কিন্তু এর ইঙ্গিত হচ্ছে—ভাষা যতটা আপন মনের কথার বাহন হয়েছে, ততটাই সরল হয়েছে। তার বড় প্রমাণ মিলবে তার পরবর্তী লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়। তিনি তাঁর নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়ে তাদেরই মনের কথা বলিয়েছেন, এবং তা নিতান্তই সাধারণ সুখ-দুঃখের কথা, তাই সেখানে ভাষা সরল এবং মধুর। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবশ্য আছে এর মূলে। তার আগে নাটকের ভিতর দিয়ে চলছিল এই সাধনা। কালীপ্রসন্ন সিংহ গদ্যকে আরও কিছু তরল করেছিলেন হুতোমী ব্যঙ্গের ঢঙে।

প্রবন্ধ রচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা গদ্য নতুন শক্তি লাভ করেছিল। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা ও যুক্তি-ভিত্তিক কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা—সবই গদ্যের অগ্রগতির বিশেষ দৃষ্টান্ত। বাংলা রচনা লেখার ভাষা যে কতদূর সরল হতে পারে তার আদি দৃষ্টান্ত মিলবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। এই পত্রিকার মাধ্যমে যিনি অক্লান্তভাবে দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁর নাম অক্ষয়কুমার দত্ত। ইনিও যুক্তিবাদী, রামমোহনের সমধর্মী, এবং মনেপ্রাণে প্রচলিত সমাজ-চিন্তার বিরোধী। ইনিই প্রথম ঈশ্বরের মহিমা শাস্ত্রের মধ্যে না খুঁজে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে খুঁজতে বলেছিলেন।

এই ভাবে প্রবন্ধ সাহিত্য এগিয়ে চলল নানা দিকে ডালপালা বিস্তার করতে করতে। কিন্তু তথাপি একটি কথা মনে রাখা দরকার এই যে, ভাষায় কোনো বিষয় প্রকাশ করার ক্ষমতা, অথবা সরলভাবে প্রকাশ করার বিদ্যায় সাফল্য-লাভ করলেই সব হল না। কারণ আগেই বলেছি আমাদের দেশে স্বাধীন চিন্তার অভ্যাস বহু যুগ ধ'রে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এবং নিজের চিন্তায় এবং পরিকল্পনায় সমাজ-জীবনে কোনো পরিবর্তন ঘটানোর দায় কারোই ছিল না। কর্তার ইচ্ছায় কর্মই ছিল নীতি। তারপর একটু একটু করে যখন সবার মনের উপর দিয়ে স্বাধীন চিন্তার হাওয়া বইতে লাগল, তখনই সমাজ-জীবনে আলোড়ন শুরু হল, এবং কথা শোনাবার লোক যেমন দেখা দিল, তেমনি কথা শোনবার লোকেরও সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে লাগল।

এমনি অবস্থায় শুধু রচনা লিখলেই কর্তব্য শেষ হয়নি, কারণ শুধু তাইতে পাঠকমনে প্রভাব বিস্তার করা যায় না। অন্তত ব্যাপকভাবে যায় না। কারণ সে সব রচনার সঙ্গে পাঠক-মনের সহজ যোগ স্থাপন হয়নি, তার হৃদয়ের যোগ

স্থাপন হয়নি। সে যোগ আরম্ভ হ'ল যখন আন্দোলনের বিষয়গুলি তাদের নিজস্ব জীবনের বিষয় হ'য়ে উঠল। গদ্যের দ্রুত পুষ্টির এটাই হচ্ছে একটা বড় শর্ত।

বাংলাদেশে এ সময় একটা নতুন সভ্যতারই জন্ম হচ্ছিল। পুরনো জিনিসের নব সংস্কৃত রূপ এবং তার সঙ্গে ইউরোপের সংস্কৃতির মিশ্রণে পরিবর্তিত সময়ের উপযোগী এই সভ্যতার ক্রমবিকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এ সময় বাংলার মানুষ নিজ নিজ মনের কথার প্রতিধ্বনি খুঁজতে চেষ্টা করেছে সাহিত্যের মধ্যে। অবশ্য বই পড়বার মতো লোকের সংখ্যা সে যুগে খুব কমই ছিল, কিন্তু তবু আপন গরজে দেশে শিক্ষাবিস্তারের কাজও দ্রুত এগিয়ে চলছিল। সাহিত্যও তাই ধীরে ধীরে জনসাহিত্যের দিকে ঝুঁকছিল। কারণ সমাজের ভিতরের স্তরেও একটা বিরাট পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছিল। সমাজ-জীবনের এটি শান্তিভঙ্গের যুগ।

এই সময়ে একদল লোক বললেন যা ছিল তাই ভাল এবং তারই গুণগানে প্রবৃত্ত হলেন, আর একদল বললেন যা আছে তার সংস্কার দরকার, আর একদল বললেন নতুন নামে নতুন সমাজ গড়তে হবে, আর একদল বললেন এ সমাজের কিছুই ভাল না, ভাল হবেও না, অতএব পরিত্যাজ্য।

যা আছে তার ভিতরে থেকেই তার সংস্কার চাই বললেন বিদ্যাসাগর এবং বিবেকানন্দ। অন্য সবাই নতুন ক'রে নতুন সমাজ গড়তে লাগলেন। আর এই উপলক্ষে বাংলা গদ্য দ্রুত প্রচারধর্মী হয়ে ক্রমে সাধারণ লোকের গ্রহণীয় হতে লাগল।

এই সময়ে সম্পূর্ণ নতুন এক প্রতিভা নিয়ে দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি শত শত রচনার ভিতর দিয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষাব্রত গ্রহণ করলেন—দেশের লোকের মন জাগানোর ব্রত। তার আগে ছিল কেবলমাত্র বুদ্ধি জাগাবার পালা এবং তার মধ্যে নতুনত্ব বেশি ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সব সুন্দর, তাঁর ভাষা, তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর সত্যদৃষ্টি, তাঁর অন্যের মনে প্রবেশের ক্ষমতা, অন্যের মনকে পূর্ণ সত্যে জাগিয়ে দেবার ক্ষমতা—সব সুন্দর, সব চমকপ্রদ। বাংলার সমস্ত নব-জাগরণ যেন তাঁর ভিতর দিয়ে আরও বেশি লোভনীয় রূপে ফুটে উঠল। সকল দিকে তিনি মানুষকে ডাকলেন। আর সে আহ্বানের কি অদ্ভুত সুন্দর ভাষা। প্রাচীন কথকেরা যেমন নানা গল্পের ভিতর দিয়ে, সহজবোধ্য উপমার ভিতর দিয়ে, আপন বক্তব্যকে শ্রোতার মনে সহজে সঞ্চারিত করতেন, (তাঁদের শেষ সুমার্জিত দৃষ্টান্ত ক্ষিতিমোহন সেন), রবীন্দ্রনাথও অনেকটা সেই ভঙ্গিতে তাঁর অনন্যসাধারণ কল্পনা, দেশের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ কামনা, উদার শিক্ষা এবং সংস্কার-প্রবণতাকে একত্র মিলিয়ে মধুর ভাষায়, অজস্র চমক-প্রদ সহজ উপমার সাহায্যে সবার মনে সঞ্চার করতে লাগলেন। সমাজের, শিক্ষার, সাহিত্যের, এমন কি ভাষারও, সকল দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন, সবই তাঁর কল্পনার জাদুস্পর্শে নতুন রূপে, নতুন স্বাদে, লোভনীয় রূপে ফুটে উঠতে লাগল। তিনি পাঠক-হৃদয়ের সকল তন্ত্রী একসঙ্গে বাজিয়ে তুললেন, তিনি পাঠক-মনের সকল স্নায়ুতে প্রবেশ করলেন।

তাঁর এই কল্পনার নতুন নতুন বিস্তারের সঙ্গে বাংলা ভাষা আপনা থেকেই নব নব দিগন্তে আপনাকে প্রসারিত করতে লাগল। তিনি পল্লী-জীবন, পল্লী-সাহিত্য বা লোকসাহিত্যকে যে সম্মান দিলেন তা তাঁর আগে কেউ কল্পনা করতে পারেননি।

আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে (বৈশাখ ১৩০০) রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বত্রিশ বছর, তখন তিনি লিখছেন, "......যখন ভাবিয়া দেখি এমন অসংখ্য

লোক আছে যাহাদের দুঃখকষ্ট যাহাদের মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে যেন অনাবিষ্কৃত, যাহাদিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে লাগাই এবং বেতন দিই, স্নেহ দিই না, সান্ত্বনা দিই না, শ্রদ্ধা দিই না—তখন বাস্তবিকই মনে হয় পৃথিবীর অনেকখানি যেন নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচরে। কিন্তু সেই অজ্ঞাতনামা দীপ্তিহীন দেশের লোকেরাও ভালোবাসে এবং ভালোবাসার যোগ্য। আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালোরূপে ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন কি, নিজেকেও ভালোরূপে চেনে না, মূকমুগ্ধভাবে সুখ-দুঃখ-বেদনা সহ্য করে, তাহাদের মানবরূপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের পর কাব্যের আলো নিক্ষেপ করা আমাদের এখনকার কবিদের কর্তব্য।" ('মনুষ্য')

আজ থেকে সত্তর বছর আগে যুবক রবীন্দ্রনাথের মুখে এই কথা। এই একটি মাত্র উদ্ধৃতি থেকেই তাঁর একটি দিকের প্রায় সব পরিচয় প্রকাশিত। ভাষার পরিচয় তো আছেই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন ১৭ বছরের বালক।

প্রমথ চৌধুরী বাংলা প্রবন্ধের ভাষা করলেন চলতি ভাষা, এবং তাতে ক্ষুরের ধার যোগ করলেন। চলতি ভাষায় লেখা তার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য, ছিন্নপত্র নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্রে সেই ভাষা নতুন ক'রে প্রচলিত করলেন এবং রবীন্দ্রনাথকেও তাতে পুনরায় দীক্ষিত করলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আর এক মনীষী যিনি বাংলা ভাষায় কঠিন কঠিন বিজ্ঞানের বিষয় (অবশ্য কৃত্রিম পরিভাষা ব্যবহার না ক'রে) আলোচনা করলেন, এবং নিজের উপলব্ধ সত্য সুন্দর যুক্তি-পূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করলেন। ভাষাকে যতদূর সম্ভব সরল করা যায় এ সব বিষয় আলোচনায় তা তাঁর হাতে হয়েছিল। আমার প্রথম কলেজ-জীবনে ভারতবর্ষ কাগজে যখন তাঁর দর্শন-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত, তখন তা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। শুধু বিষয় ব্যঞ্জনা নয়, তার ধ্বনি নিজের আনন্দও যেন প্রকাশিত হত।

এই ভাবেই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভাষা ও ভাগীরথী নদীর মতো এগিয়ে যেতে যেতে দুই কূলের বহু পাড় ভেঙে আত্মসাৎ করতে করতে নিজেকে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বাংলা মাসিকপত্র প্রবাসীতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজের যুক্তিপূর্ণ সরল অথচ অতি প্রবল সমালোচনার ধারা প্রবর্তন করলেন যা তার আগে এদেশে ছিল না। তাঁর সমস্ত সমালোচনাই ছিল বাস্তব তথ্যের উপর নির্ভরশীল। ফাঁকা কথা তিনি বলতেন না।

ক্ষেত্র প্রস্তুত। এমন সময় এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। সর্বধ্বংসী যুদ্ধ। এই সময় এক আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেল। বাংলাদেশে তখন জাপানীদের আক্রমণ আসন্ন। একদল মানুষ দিশাহারা হয়ে ঘরবাড়ি ফেলে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, আর একদল মানুষ ভাগ্য-নির্ভর ভাবে শহরেই বাস করছে বা করতে বাধ্য হচ্ছে। এদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিল যাদের মনে কোনো দিন বস্তু-জিজ্ঞাসা বা আত্ম-জিজ্ঞাসা জেগে তাদের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করেনি, সেই তারা হঠাৎ মাথার উপর শত্রু-বিমান দেখে হাজার হাজার প্রশ্ন নিয়ে ইতস্ততঃ চাইতে লাগল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। কাগজে যুদ্ধের বিবরণ পড়ছে, রেডিওতে শুনছে, গুজব শুনছে, আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন যুদ্ধের কৌশল কি, অস্ত্রাদির পরিচয় কি, রাজনীতি কি, অর্থনীতি কি, এ সব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। আমি অন্যত্র বলেছি মাথার উপর রাত্রে ভারী বোমা পড়বে এটা নিশ্চিত বিশ্বাস করেও ভারী বোমা জিনিসটা কি কি উপাদানে তৈরি, তা দিনের আলো থাকতে থাকতে জেনে নেবার ইচ্ছা জেগেছিল তখনকার শহরবাসীদের মনে।

আর ঠিক এই কারণে তখন যুদ্ধ বিষয়ে যেখানে যে বই পেয়েছে তাই উন্মাদের মতো পড়েছে। এ সময় যুদ্ধ ও যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা বইও যথেষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। এবং সে আগ্রহ যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণ স্তিমিত হয়ে পড়লেও পাঠপিপাসা তখন থেকেই যে হঠাৎ খুব ব্যাপক হয়ে পড়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই যে এতটা বেশি বেশি প্রকাশ হবে তা যুদ্ধের আগে কল্পনা করা যায় নি।

যাই হোক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের এবং ভাষার যে এমন উন্নতি সম্ভব

হয়েছে তার পটভূমিতে যে সব কারণ আছে মোটামুটিভাবে তার কিছু বিবৃত করা গেল। এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী সমস্ত উন্নতির আরও পিছনের কারণ যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, এবং এ বিষয়ে তাঁর দান যে কত বড় সে কথা ইতিহাসে লেখা হয়ে গেছে। তাঁর রচিত নতুন নতুন শব্দচিত্র এবং সেই সংগে বহু নতুন শব্দের ব্যবহার এক বিস্ময়কর ঘটনা। সব দিকেই তাঁর উদাম এবং উৎসাহ কাজ করেছে। দীনেশচন্দ্র সেনকে তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় প্রেরণা দিয়েছেন, এবং যিনি যে বিষয়ে প্রথম গবেষণা করেছেন তাঁরই সংগে তাঁর ছিল উৎসাহপূর্ণ আন্তরিক যোগ। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা কাজে সাহায্য হবে বলে তিনি ভিক্ষা করতেও কুণ্ঠিত হননি। তাঁর শুভ কামনা সকল কল্যাণকর কাজের পিছনে। তিনি স্বয়ং বাংলা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন, প্রাচীন লোকসংগীতের পুনরুদ্ধার কাজ তিনিই প্রথম আরম্ভ করেন। তিনিই প্রথম ছাত্রদেরও নিজ নিজ পল্লী অঞ্চল থেকে নিজের দেখা নানা তথ্য সংগ্রহে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা তখন বিশেষ কার্যকর হয়নি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাসের একটা বাঁধা ছক আছে, তার বাইরে যাবার মতো উৎসাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তখন খুব পাওয়া যায়নি। তখন যে সামান্য কজন গবেষণার কাজ করেছেন, তাঁরা তা প্রায় নিজের গরজেই করেছেন। এবং সম্ভবত এখনও তাই করছেন। তবে এখন গবেষণা কাজে বৃত্তির ব্যবস্থাও হয়েছে প্রচুর। সরকার থেকেও কিছু হয়েছে। তাই এখন বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণামূলক অনেক বই বাংলায় লেখা হচ্ছে, যদিও তার প্রচার এবং পাঠক অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

বাংলাদেশে মাত্র একজনের নাম করা যেতে পারে যিনি কলেজে বিজ্ঞান না শিখেও শুধু নিজের আগ্রহে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এবং আপন হাতে পরীক্ষা ও গবেষণা ক'রে বিজ্ঞানী হয়েছেন। তাঁর ইংরেজী প্রবন্ধ আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞান পত্রিকায় সসম্মানে গৃহীত হয়। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের কথা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ক'রে লিখতে পারেন। এই বিজ্ঞানীর নাম গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। এককালে প্রবাসীতে এঁর প্রবন্ধ পড়ে জগদীশচন্দ্র বসু এঁকে ডেকে এনে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে বসিয়ে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের প্রায় সকল দিক নিয়েই ইনি বাংলায় প্রবন্ধ লেখেন, এবং এত সরল নির্ভরযোগ্য লেখা আমি আর বাংলা ভাষায় দেখিনি। তাঁর বাল্যকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা পড়েই জগদীশচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন।

আর এক জাতীয় গবেষণা হচ্ছে অতীতকে খোঁড়া। এর ক্ষেত্র বহু ব্যাপক। এ খোঁড়া মাটির নিচেও হতে পারে, মাটির উপরেও হতে পারে, অথবা গ্রন্থাগারে ব'সেও হতে পারে। এই তিন জাতীয় কাজ থেকেই বাংলা ভাষায় অনেক ভাল ভাল বই বেরিয়েছে। পাষাণের কথা, অর্থাৎ পাষাণের আত্মকথার ভঙ্গিতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্বের প্রথম বই লেখেন নিজে প্রত্নতাত্ত্বিক হয়ে। ইতিহাসে প্রথম গবেষণামূলক বই যদুনাথ সরকার লেখেন। ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্বের পথে কিছু পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি-প্রেম থেকে যে সব বই লিখেছেন তা বাংলা ভাষায় আর কারো দ্বারা লেখা সম্ভব ছিল না।

যে প্রাচীনের সংগে আমরা সম্পর্কচ্যুত হয়েছি সেই প্রাচীনকে আবিষ্কার করে বর্তমানের সংগে তার সম্পর্ক স্থাপন করাই হচ্ছে ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক অথবা পুরাতাত্ত্বিকদের কাজ।

এই ইতিহাস সংগ্রহের কাজে আমাদের যে উৎসাহ জেগেছিল তা আজ থেকে প্রায় ২৭ বছর আগে (১৯৩৫) যদুনাথ সরকার তাঁর "আধুনিক ভারতে ইতিহাসের বিকাশ" নামক একটি প্রবন্ধে অতি চমৎকার ভাষায় বলেছেন।

"সব দেশেই দেখা গিয়াছে যে যখন হৃদয়ে মাতৃভূমির বোধ প্রথম উন্মেষিত হয়, জাতীয় জীবনের সেই অতি প্রত্যূষে, দেশের লুপ্ত কাহিনী জানিবার জন্য, অতীত-গৌরব কাহিনী বাণী প্রচার করিবার জন্য, জনসেবকদের মনে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে।...... তাই দেখিতে পাই যে বঙ্কিম—বঙ্কিম কেন, তাঁহার একপুরুষ আগের বিদ্যাসাগর পর্যন্ত—বঙ্গের, ভারতের, প্রকৃত ইতিহাস জানিবার জন্য এত লালায়িত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতে অগাধ পণ্ডিত, বাংলা গদ্য তাঁহারই হাতে গড়িয়া তোলা, কিন্তু তাঁহার 'পরাণপ্রিয়' সাহিত্য ছিল ভারত-ইতিহাস। সেই বিভাগের অতি দুষ্প্রাপ্য পুরাতন বইগুলি তিনি অজস্র অর্থ ব্যয়ে কিনিতেন, নবাবের উপযোগী মূল্যবান কাপড় চামড়া ও সোনার জল দিয়া বাঁধাইতেন, আর নিজের হাতে ঝাড়িয়া-পুঁছিয়া রাখিতেন। অথচ তিনি নিজে অতি সামান্য কাপড় পরিতেন, যাহা দেখিয়া ধনী ঘরের দাসীরা তাঁহাকে উড়ে বেহারা ভাবিত। বঙ্কিমের ইতিহাস-পিপাসা তাঁহার অনেক উপন্যাসে এবং ভূমিকায়ই প্রকাশ পাইয়াছে।"

"......রামদাস সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, ফরাসী পণ্ডিতদের বৌদ্ধ গবেষণার ফল বঙ্গীয় পাঠকদের নিকট পরিচিত করাইয়া দিলেন। শত শত রাজকার্যের মধ্যে মগ্ন রমেশচন্দ্র দত্ত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, নব্যভারতীয় অর্থনীতিতে নানা ভাণ্ডার হইতে সংকলন করিয়া, অন্যের অর্জিত তথ্য সরল ভাষায় সাধারণের মধ্যে প্রচারিত করিলেন।......"

"...আমাদের প্রায় সব বিদ্যায়তনেই গবেষণার ফলে সর্বোচ্চ উপাধি পিএইচ-

ডি, ডি-লিট, দিবার নিয়ম জারি হইবার ফলে মৌলিক জ্ঞানান্বেষণ ও গ্রন্থ রচনার প্রবাহ এই যুগের একটি নবীন দৃশ্য। ভারতীয়দের রচিত এরূপ গ্রন্থ (এখানের ও বিলাতের লইয়া) বৎসরে আর্টস বিভাগেই চল্লিশ-পঞ্চাশখানি প্রকাশিত হইতেছে। আজ কোন প্রকৃত মেধাবী ছাত্রই পুঁথিগত বিদ্যার জোরে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষান্ত হয় না, স্বাধীন জ্ঞানচর্চার এবং মৌলিক রচনার পথে এই পিএইচ-ডি, ডি-লিট-এর প্রবল বন্যা তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। ইহার ফলে এ পর্যন্ত আমাদের বিশ-পঁচিশখানি স্থায়ী সদ্‌গ্রন্থ বাহির হইয়াছে।"

সাতাশ বছর আগের কথা এটি। এখন কোনো ঐতিহাসিক পিএইচ-ডি, ডি-লিটের টানে অদ্যাবধি কখানা স্থায়ী সদ্‌গ্রন্থ বেরিয়েছে তার হিসাব প্রকাশ করেননি। কিন্তু ভাল ছাত্রদের মন যে আরও বেশি গবেষণামুখী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এখন অনেকেই নিজ নিজ বিষয়ের প্রেরণা ও প্রবণতা অনুযায়ী অতীত খোঁড়ার কাজে লেগেছেন। এবং তার ফলে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য বিচিত্র বিষয়কে নিজের অঙ্গীভূত করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনাদি সম্পাদনায় পুলিনবিহারী সেন যে নজির স্থাপন করেছেন তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় এবং অনুকরণযোগ্য। অবশ্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহর্ষির আত্মজীবনী সম্পাদনার কৃতিত্বও স্মরণীয় এই প্রসঙ্গে। কিন্তু বাংলা গ্রন্থের সম্পাদনায় পুলিনবিহারীর দৃষ্টান্ত বাংলার সম্পাদনা-ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। আমি প্রথম তাঁর সম্পাদিত 'চিঠিপত্র' (৬ষ্ঠ খণ্ড, জগদীশ-রবীন্দ্র-অবলা বসু) দেখে বিস্মিত হই। দুই বন্ধুর মধ্যে ও বন্ধুপত্নীর সঙ্গে যে সব চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছিল, এবং তার সঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্ত ও ভগিনী নিবেদিতার চিঠি ও প্রসঙ্গত অন্যান্যকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিই শুধু সংগৃহীত হয়নি—এঁদের সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ চিঠি ও টুকরো খবর এবং জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এতে দুঃসাধ্য চেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছে। মোট ২৬২ পৃষ্ঠার বইতে আনুষঙ্গিক অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্য সংকলিত হয়েছে ১২৯ পৃষ্ঠা।

বাংলা গ্রন্থের সম্পাদনা ক্ষেত্রে ঠিক এমন আর হয়নি। আমার

দেখা দুখানা ইংরেজী ভাষায় লেখা বইয়ের কথা মনে আসে। একখানির নাম লাইফ ইন শেক্স্পীয়ারস্ ইংল্যান্ড (লেখক জন ডোভার উইলসন, পেলিক্যান বুক), অন্য খানির (একখানি নয়, ৫ খণ্ড, ম্যাকগ্র-হিল) নাম ইলাসট্রেটেড ওয়ার্লড অফ দি বাইবল লাইব্রেরি। প্রথমখানায় শেক্স্পীয়ারের নাটকগুলিতে যেখানে যেখানে সমসাময়িক কালের কথা আছে সেই স্থানগুলি উদ্ধৃত ক'রে সেই সময়ে অন্যান্য লেখকের লেখা তথ্য বা সংবাদ বা প্রাসঙ্গিক যত রকম তথ্য সম্ভব তা সেই সব উদ্ধৃতির পটভূমি রূপে দেওয়া হয়েছে। তা ভিন্ন ছবি যে কত আছে তার সংখ্যা নেই। সবই সেই সময়ের বা কাছাকাছি সময়ের আঁকা ছবি ও কিছু পরবর্তী কালে তোলা ফোটোগ্রাফ।

বাইবল লাইব্রেরি এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। সে না দেখলে বর্ণনার সাহায্যে কাউকে বোঝাবার উপায় নেই। বাইবলের এক একটি কথা—এবং সেই সঙ্গে সেই কাল ও স্থানের যাবতীয় ছবি (সবই রঙীন) একত্র সংগ্রহ ক'রে বিরাট আকারে আর্টপেপারে ছাপা। আমি নিজে বহু রকম বিদেশী বই বা এনসাইক্লোপীডিয়া দেখেছি, কিন্তু এ বস্তু আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

...অনেক পার্থক্য থাকলেও তিনখানি বইয়ের মূলে পরিকল্পনা প্রায় এক। পুলিনবিহারী সেন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা এবং সেই সঙ্গে আমার উল্লেখ করা এই বইগুলি দেখলে বাংলা নতুন নতুন বই তৈরি করার অথবা সম্পাদনা করার কাজে নতুন একটা দিক উদ্ঘাটিত হবে। বাংলা গ্রন্থের সম্পাদনা প্রসঙ্গে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "জীবনস্মৃতি" এবং কানাই সামন্তের সম্পাদনায় "গীতবিতান" তৃতীয় খণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সম্পাদনা কাজে ঐ একই নিষ্ঠার, এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আর এক জাতীয় সম্পাদনা, যেখানে মূল গ্রন্থের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য এবং তার ঐতিহাসিক পরিবেশ বিবৃত ক'রে ভূমিকা সংযোজন দরকার, এমন স্থলে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অনেকগুলি বইতে ভূমিকার এই কৃতিত্ব প্রকাশিত। তার পরেই আমি নাম করব প্রমথনাথ বিশীর। তাঁর সম্পাদনায় কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার ভূমিকা মূল্যে অসামান্য। প্রমথনাথ বিশীর প্রবন্ধ-রচনা শক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ভাষা সরল, মনোহর এবং বুদ্ধিদীপ্ত। কাব্য নাটক বা কথাসাহিত্য সবারই অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য তাঁর চোখে সহজে ধরা পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সন্ধানে অপেক্ষাকৃত তরুণ গবেষক বিনয় ঘোষ আর এক নজির দেখিয়েছেন। নির্মলকুমার বসু যেমন সমস্ত ভারতবর্ষকে তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র করেছিলেন, বিনয় ঘোষও গোটা পশ্চিমবঙ্গকে ঠিক সেই-ভাবে ব্যবহার ক'রে, অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে, যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা ঘরে ব'সে কখনও সম্ভব হত না। ফলে বাংলা ভাষার সুবৃহৎ একখানি বই পাওয়া গেল। গবেষণার এটিও একটি নতুন দিক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র রায় প্রভৃতি এ পথের প্রথম যাত্রী। নৃতত্ত্বের বহু বিভাগ, অতএব ভবিষ্যতে বহু গ্রন্থ পাওয়া যাবে বাংলা ভাষায়। নৃতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব বা পুরাতত্ত্ব ভালভাবে জানা না থাকলে অতীত খোঁড়ার কাজ কখনই হবে নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। সে হিসাবে নৃতত্ত্বের ছাত্র বিনয় ঘোষ অতীতের বহু বিভাগে যে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং চমৎকার সব গ্রন্থ প্রকাশ করছেন, নিঃসন্দেহে তার মূল্য বেশি।

আমি এ প্রবন্ধে অতি সামান্য তথ্যই দিতে পারলাম। অনেক নাম অনেক বইএর কথা বাধ্য হয়ে বাদ দিতে হ'ল। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য কি ভাবে বিচিত্র রূপ পাচ্ছে তার ইঙ্গিত দেওয়াই আমার লক্ষ্য।

বিচিত্র রূপ পাচ্ছে, কিন্তু এর একটা সীমা থাকবেই। ইংরেজীর মতো বিরাট হবার সম্ভাবনা তার আপাতত নেই, এবং তার অনেক কারণ আছে, সে কারণ এখানে আমি আলোচনা করব না। গত প্রায় দেড়শ বছরে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য যে পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী হয়েছে এটি তার সামান্য একটুখানি আশাপূর্ণ ইঙ্গিত দেওয়া গেল। কিন্তু তবু যখন দেখি গত ১৫০ বছরের মধ্যে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য পরিমাণে এমন বেশি কিছু বাড়েনি, তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠবার মতো কিছু আছে ব'লে মনে হয় না। বিশ্বভারতী থেকে 'বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ' বা 'লোকশিক্ষা' পর্যায়ের যে সব বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার সবগুলি নির্ভরযোগ্য নয়। যে সব বিজ্ঞান-লেখক পরমাণু ও অণুর পার্থক্য বোঝেন না, তাঁরাও অনেক সময় অনধিকার চর্চা করেন। এটি দুঃখের বিষয়।

যাই হোক যখন দেখি ১৮২০ সালে বাংলা ভাষায় মাত্র ৩০ খানা বই বেরিয়েছিল, এবং বর্তমানে বাংলা বই বছরে ১৫০০-এর বেশি ছাপা হয় না, তখন পার্থক্যটা খুব বেশি, অন্তত আশানুরূপ বেশি, বলে বোধ হয় না।

১৯৫৯-এর হিসাব

মোট বাংলা বইয়ের সংখ্যা	১৩৯০
দর্শন বিষয়ক	৩৪
ধর্ম বিষয়ক	১১০
সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক	১৬৮
ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক	২৫
বিজ্ঞান বিষয়ক	৮১
প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক	২৭
ললিতকলা বিষয়ক	২৪
সাহিত্য বিষয়ক	৭৮৪
ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক	১১৭
বিবিধ বিষয়ক	২০

পাঠ্যপুস্তকও এর মধ্যে ধরা হয়েছে। এই সংখ্যা আমি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গ্রন্থাগার' (মাঘ ১৩৬৮) পত্রিকায় মুদ্রিত "বাংলা বই : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ" নামক রচনা থেকে নিয়েছি।

১৪২ বছর ধ'রে এই উন্নতি। তার কারণ বিজ্ঞানের শত শত উপবিভাগ বাংলা ভাষার পক্ষে দুর্গম হয়ে আছে, কৃত্রিম পরিভাষা রচনা ক'রে সে দুর্গম পথকে সুগম করা অসম্ভব। এমন শুধু উপন্যাসের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকবে। অন্য বিভাগের বই একটা সীমা পর্যন্ত এসে থেমে যাবে। বিশেষ ক'রে বিজ্ঞান।

অতএব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ সাহিত্য আজ পর্যন্ত যে উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও কিছু করবে আশা করা যায়, তা বাংলা ভাষার পক্ষে অবশ্য গর্বের এবং গৌরবের এ কথা নিরপেক্ষ বিচারে স্বীকার্য। এবং ভারতের অন্য রাজ্যের ভাষার কথা জানি না তবে অনুমান করি বাংলা ভাষার কাছে সে সব নিষ্প্রভ। তবে বাংলা ভাষার দুর্গতি ঘনিয়ে আসবে যদি ইংরেজী হটাও আন্দোলনের মধ্যে আমরাও গিয়ে পড়ি।

মন্মথ রায়

বাংলা একাংক নাটক প্রসঙ্গে

আধুনিককালে বাংলা একাঙ্ক নাটক বিদগ্ধজন ও নাট্যরসিকদের সানুরাগ মনোযোগ আকর্ষণ ক'রেছে। নব নাট্য আঙ্গিকের এই ক্রম-প্রসারতা সম্পর্কে আলোচনা ক'রতে হ'লে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ব'লতে হয়—আরম্ভেরও একটা আরম্ভ আছে। সন্ধ্যেবেলায় দীপ জ্বালাবার আগে সকালবেলার স'লতে পাকানোর মত। তেমনি বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রসঙ্গে আলোচনার আগে একাঙ্ক নাটকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আঙ্গিক সম্পর্কে কিছু আলোচনা আরম্ভের অবকাশ থেকে যায়।

আধুনিক কাল যন্ত্রশাসিত ব্যস্ততার কাল। একাঙ্ক নাটক সেই ব্যস্ততার, সেই দ্রুতির ও সেই সময় সংক্ষিপ্ততার ফলশ্রুতি। অত্যন্ত স্বল্প পরিধিতে, স্বল্প কাল-সীমায় ও নির্দিষ্ট সংখ্যক চরিত্রের সাহায্যে এক অঙ্কে লিখিত নাটক আধুনিক কালের ব্যস্তবাগীশ কর্মী মানুষদের খুব সহজেই আনন্দ দিতে পারে ও জীবন-সত্যের মুখোমুখি করাতে পারে। পূর্ণাংগ নাটক যেমন যথেষ্ঠ সুযোগ ও সময় নিয়ে রসাস্বাদন করাতে পারে, একাঙ্ক নাটক ঠিক তেমনি বিপরীতভাবে অল্প সুযোগ ও অল্প সময়েই দর্শক ও পাঠক শ্রেণীকে তৃপ্তি দিতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ নাটক ও একাঙ্ক নাটক উভয়ের মধ্যে শুধু বহিরঙ্গমূলক পার্থক্যই সূচীত করে না, উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতার দিক থেকেও পার্থক্য দুস্তর। পূর্ণাঙ্গ নাটকের কাহিনী একের অধিক হ'তে পারে। এর কাহিনী অসংখ্য চরিত্রের সাহায্যে নানা ঘাত-সংঘাতের মাধ্যমে জটিলতার সৃষ্টি ক'রে পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ পরিক্রমা ক'রে এক পরম পরিণতিতে পৌঁছয়। কাহিনীর এই চলার গতিকে ত্বরিততর করবার জন্যই পূর্ণাংগ নাটকে অঙ্ক-বিভাগের প্রয়োজন দেখা দেয়। আমাদের সংস্কৃত নাটকে এই অঙ্কবিভাগ ছিল। পাশ্চাত্যের রোমীয় নাটকেই প্রথম অঙ্ক-বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। তারপর সেক্সপীয়ারে এর পূর্ণ পরিণতি দেখা গেল পঞ্চমাঙ্কে। ইবসেন থেকে আবার এই Covention বা পঞ্চমাঙ্কের প্রচলিত রীতি ভেঙে তিন অঙ্কের, দুই অঙ্কের নাটক রচিত হ'তে লাগল।

একাঙ্ক নাটকের নামাকরণের মধ্যেই এর প্রথম বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর প্রয়োজন, এর ইতিহাস সমস্ত কিছুই অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যাবে পূর্ণাঙ্গ নাটকের সঙ্গে এর পার্থক্য কতখানি! একাঙ্ক নাটক কখনোই বিভিন্ন ঘটনা বা শাখা-কাহিনী নিয়ে গঠিত হ'তে পারে না। একটি মাত্র নাটকীয় ঘটনা ও তার সংস্থানকেই একাঙ্কিকা গুরুত্ব দেয়। ছোটগল্পকে যেমন চোরা লণ্ঠনের আলোর সঙ্গে উপমিত করা হ'য়ে থাকে, একাঙ্কিকা নাটককেও তেমনি 'চোরা লণ্ঠনের আলো' বলে অভিহিত করা যায়। স্বল্প পরিসরে স্বল্প চরিত্রের মাধ্যমে তীব্রগতি হ'য়ে ওঠে একাঙ্ক নাটক।

আসল কথা, একাঙ্কিকার বৈশিষ্ট্য হ'ল তার Compactness-এ বা সংহতিতে। শুধু মাত্র অতি প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নিয়ে তা' অনিবার্য গতিতে পরিণামমুখী হয়ে উঠবে। একটি অখণ্ড ঐক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এর Climax বা চূড়ান্ত স্তরটি সৃষ্টি ক'রতে হবে। কিন্তু শুধু বহিরঙ্গ বিচারে একটি মাত্র অংক সম্বলিত নাটকই 'একাঙ্ক নাটক' রূপে অভিহিত করা চলে না। পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি একাঙ্ক নাটকে অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। একটিমাত্র অঙ্কে যদি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতই বিচিত্র ঘটনার বিস্তার থাকে, বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটে অথবা ভাবগত ঐক্যের অভাব থাকে—তাহলে তাকে 'একাঙ্ক নাটক' শিরোনামায় অভিহিত করা অসম্ভব ও অযৌক্তিক। পাশ্চাত্য সমালোচক একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা নির্ণয় ক'রতে বলেছেন, "organic whole, with a begining middie and end."

পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংগে একাঙ্ক নাটকের এই begining, middle ও end-এর যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। পূর্ণাঙ্গ নাটকে এই সমস্ত পর্যায়গুলি বিস্তৃত-রূপে চিহ্নিত করবার অবকাশ থাকে কিন্তু একাঙ্ক নাটকে তা নেই। পূর্ণাঙ্গ নাটকে যেমন Exposition, Progression ও Continity-কে পৃথক পৃথকভাবে চিহ্নিত ক'রে নেওয়া যায়, একাঙ্ক নাটকে প্রায় সীমিত.. রেখার মধ্যে, স্বল্প সময়েই, স্বল্প চরিত্রের ও পরিমিত সংলাপের মধ্যেই এদের প্রায় একই সংগে সুষ্ঠু সমন্বয় ক'রে নিতে হয়।

এই একাঙ্ক নাটকের মূল অনু-সন্ধান ক'রলে পাশ্চাত্যের Mistry play-গুলি স্মরণে আসে। কিন্তু এই

Mistry play 'বিদগ্ধ জনের তথা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অনুগ্রহ লাভ করতে পারল না ব'লেই তা' অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় নক্সায় বন্দী হ'য়ে রইল। এর পরের Curtain raiserও বিশেষ সমর্থন পেল না বলেই অন্তর্ধান করল। তবে এ কথা নিশ্চিত-রূপেই বলা যায় যে, Mistry play বা অষ্টাদশ শতাব্দীর কৌতুক নাটক কিম্বা Curtain raiser প্রভৃতিগুলির সঙ্গে আধুনিক একাঙ্ক নাটকের আত্মীয়তা অত্যন্ত ক্ষীণ। এইসব নাটক মূল নাটকের পূর্বে অথবা পরে অভিনীত হ'ত দর্শকদের কিঞ্চিৎ লঘু আনন্দ পরিবেশন করবার উদ্দেশ্যে। আধুনিক কালের একাঙ্ক নাটকের বক্তব্যের গভীরতা বা আঙ্গিকের সচেতনতাও তার মধ্যে পাওয়া যেত না। য়ুরোপে ও আমেরিকায় বিভিন্ন স্বাধীনচেতা নাট্য-গোষ্ঠী গড়ে উঠল ও একাঙ্কিকার প্রসারতা দেখা গেল। প্যারিসের Theatre Libre —১৮৮৭, বার্লিনের Freie Buhne —১৮৮৯, লণ্ডনে Independent Theatre —১৮৮৯ শিকাগোর New Theatre ইত্যাদি নাট্যগোষ্ঠীর পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলেই একাঙ্ক নাটক স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারল। এ ছাড়াও 'ব্রিটিশ ড্রামা লীগ', 'স্কটিশ কম্যুনিটি ড্রামা এসোসিয়েশন' প্রভৃতিও একাঙ্ক নাটকের উন্নতি ও প্রসারের জন্য যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে 'রিপার্টারি থিয়েটার' নবনাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। 'আইরিশ লিটল থিয়েটার' এমন অনেক নাট্যকারদের পদ্মর যার ফলে তারা নবনাট্য আন্দোলনে বিশেষ স্বাক্ষর রাখতে পারে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইয়েটস লেডি গ্রেগরি, সীঙ্গে প্রমুখ নাট্যকার। এই 'রিপার্টারি থিয়েটার' যত প্রসারতা লাভ করে—একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রও তত প্রশস্ত হয়।

সুতরাং আধুনিক একাঙ্ক নাটকের জন্মস্থান পাশ্চাত্যভূমি এবং তার জন্ম-লগ্ন উনিশ শতকরূপে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ এই সময় থেকেই একাঙ্ক নাটক স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ ক'রল। কর্মব্যস্ত জীবনের যে প্রয়োজনের তাগিদে ছোটগল্প আত্মপ্রকাশ করেছিল, একাঙ্ক নাটকও সেই প্রয়োজনের তাগিদে জন্মগ্রহণ করল। ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটক বহিরঙ্গে পৃথক হয়েও অন্তরঙ্গের দিক থেকে মৌলিক ভাব ও উদ্দেশ্যে একই হ'ল। ফলে প্রতিভাবান গাল্পিকরা যেমন, অস্কার ওয়াইল্ড, শেখভ, গলস্‌ওয়ার্দি অনেকেই এই দুই ক্ষেত্রেই আসর জমিয়ে বসলেন। তবে এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্মর্তব্য যে, উনিশ শতকে একাঙ্ক নাটকের অভিযান শুরু হলেও তার বৈচিত্র্যময় ও সম্ভাবনাপূর্ণ পরিণতি ঘটল বিশ শতকেই। সমগ্র ইয়োরোপে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন নাট্যকার একাঙ্ক নাটক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে চলেছেন। objective বিষয়বস্তু ছাড়াও subjective বিষয়বস্তু নিয়ে আজ একাঙ্ক নাটক রচিত হচ্ছে। শুধু ঘটনা-প্রধান বিষয়বস্তু যেমন ছোটগল্প, উপন্যাস থেকে বিদায় নিচ্ছে তেমনি একাঙ্ক নাটকও মনস্তত্বমূলক বিষয়-বৈচিত্র্যে প্রতিষ্ঠাভূমির সন্ধান ক'রে ফিরছে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যেও একাঙ্ক নাট্য-শাখা সংযোজিত হলো বিশ শতকের শেষের দিকে। বাংলা দেশের বিদগ্ধ সাহিত্য-ঐতিহাসিকদের মতে বাংলা নাট্যসাহিত্যে বর্তমান নিবন্ধের লেখকই এই বিশেষ নাট্যাঙ্গিকের প্রবর্তন করেন। অবশ্য তাঁর পূর্বে যে একাঙ্ক নাটকের অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি তা নয়। গিরিশচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের, অমৃত-লালের, স্বর্ণকুমারী দেবীর নাটক রচনার মধ্যে একাঙ্ক নাটকের পূর্বাভাস রয়েছে। কিন্তু সেগুলি আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে পুরোপুরিভাবে একাঙ্ক নাটক হ'য়ে উঠতে পারেনি। এই নাটকগুলির স্বতন্ত্র আবেদন ও অনুপম মূল্য স্বীকার করেই বলা যায় যে, একাঙ্ক নাটকের যে বিশেষ শিল্প-রূপ ও ভাবরূপ থাকা প্রয়োজন এগুলির মধ্যে তার অভাব রয়েছে। এইজাতীয় অধিকাংশ নাটকগুলিতেই পূর্ণাঙ্গ নাটকের দৃশ্যবিভাগ রয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গ নাটকের বিষয়বস্তুও এগুলিতে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। একাঙ্ক নাটক এই শিল্পরীতিকে সমর্থন করে না।

বর্তমান লেখকের প্রথম একাঙ্কিকা 'মুক্তির ডাক' যখন ১৯২৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে মুক্তি-লাভ করে, তখন প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখে-ছিলেন—"'মুক্তির ডাক' আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনার নাটকখানির মহাগুণ এই যে, এখানি যথার্থই এক-অঙ্ক ড্রামা। বাংলা সাহিত্যে নাটক একরকম নেই বললেই হয়। আশা করি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন। (১৩-৭-১৯২৪)"। লেখক পরম শ্রদ্ধেয় বীরবলের সে মনস্কামনা পূর্ণ করতে পেরেছিল কিনা সে বিচারের দায়িত্ব সমালোচক ঐতিহাসিক-দের, তবে এটুকু সবিনয়েই বলা যায় যে, একাঙ্ক নাটক রচনায় আজ পর্যন্ত লেখক কখনও উৎসাহের অভাব বোধ করেননি। 'মুক্তির ডাক' রচনার পর থেকেই দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর ধরে তিনি বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে ও বিচিত্র আঙ্গিকে বহু একাঙ্কিকা রচনা করেছেন।

তারপর থেকেই একাংক নাটকের ক্ষেত্রে বহু প্রতিভাশালী নাটক রচয়িতার আবির্ভাব হ'ল। শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, বনফুল, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সলিল সেন, ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রমুখ নাট্যকার অসংখ্য সার্থক একাংক নাটক রচনা করেছেন। এ'দের
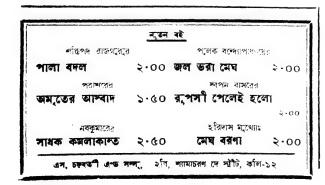
চিন্তাধারা, এঁদের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং এঁদের উপস্থাপনার মুন্সিয়ানা বাংলা একাঙ্ক নাটকের ইতিহাসকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। এঁদের চিহ্নিত পথ ধরে সাম্প্রতিক কালের তরুণতম নাট্যকারগোষ্ঠী নব নব পথ্যাবিষ্কারে উদ্যোগী হয়ে দিগ্বিজয়ী হ'তে চলেছেন। এঁদের মধ্যে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশংকর, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, কিরণ মৈত্র, সুনীল দত্ত, মনোজ মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও আরও অনেক প্রতিভাবান নাট্যকার একাঙ্ক নাটকের আসরে রয়েছেন যাঁদের স্মরণযোগ্য বহু নামই উল্লিখিত হল না, তাতে তাঁদের অমর্যাদা হ'ল না, আমারই সীমিত জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পেল।

সাম্প্রতিক কালের বাংলা একাঙ্ক নাটকের প্রসারতার মূলে শুধু নাট্যকারদের অবদানই শেষ কথা নয়। এর মূলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, পেশাদারী-অপেশাদারী নাট্যগোষ্ঠী, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। যদিও পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ কর্তৃক নিয়মিতভাবে একাঙ্ক নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়নি, তথাপি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের পরিচালকেরা এর প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য নানা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাছাড়াও বহু অপেশাদারী নাট্যসংস্থাও এগিয়ে এসেছেন একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের অনুষ্ঠানের মধ্যে একাঙ্ক নাটকের অনুষ্ঠানটি নির্দিষ্ট করে রাখেন। কিছু কিছু সাময়িক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকাও একাঙ্ক নাটক প্রকাশ করে লেখকদের ও পাঠকদের যথাক্রমে একাঙ্ক নাটক রচনা ও পাঠে উৎসাহী করে তুলেছেন।

নাট্যসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় একদিন এইসব নাট্যগোষ্ঠী, পত্র-পত্রিকার নাম একাঙ্ক নাটক রচয়িতাদের নামের সঙ্গে সঙ্গে সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লিখিত হবে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের সেই গৌরবময় দিনের আর দেরী আছে বলে আমার মনে হয় না। বাংলা একাঙ্ক নাটকের জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় যে, একদিন একাঙ্ক নাটক পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যেও নিজের আসর করে নিতে পারবে। অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে, সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে একাঙ্ক নাটকের অভিনয়ে যে রসাস্বাদন লাভ হয়, তা অফুরন্ত ও অসীম: তা' আনন্দলোকেরই স্বাদের তুল্য-মূল্য।

সাম্প্রতিক বাংলা একাঙ্ক নাটকের সাফল্য সম্পর্কে আমি আশাবাদী। আমি বিশ্বাস রাখি বাংলা সাহিত্যের সিন্ধুর স্বাদ বাংলা একাঙ্ক নাটকের বিন্দুতেই মিলবে। বাংলা একাঙ্ক নাটক নিশ্চিতরূপেই উত্তরপুরুষের গর্বের বস্তু হয়ে উঠবে—এ ভবিষ্যৎবাণী আমি দ্বিধাহীন কণ্ঠেই ঘোষণা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য শিক্ষার বিস্তার এবং বই অপরিহার্য। কারণ, শিক্ষিত, দায়িত্বশীল, রুচিবান ও সচেতন নাগরিক গণতন্ত্রের সম্পদ। তাই নাগরিকদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য।

কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা কয়েক বছরের সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট। শুধু স্কুল-কলেজে পড়বার সুযোগ পাওয়া তাই যথেষ্ট নয়। ছাত্রজীবন শেষ হবার পর যদি পড়াশুনোর সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে যায় তাহলে আবার অজ্ঞানতার অন্ধকারে ফিরে যাবার আশংকা থাকে। অথচ স্বল্প-শিক্ষিত নর-নারীও চর্চা বজায় রাখলে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যেতে পারে, এর প্রমাণ আছে।

বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সীমা পার হবার পর যদি বই পড়বার সুযোগ না থাকে তাহলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য নিত্য-নতুন আবিষ্কৃত হচ্ছে পুঁথি-পত্রের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে পরিচয় না রাখলে পিছিয়ে পড়তে হয়। ব্যক্তি পিছিয়ে পড়লে ক্ষতি রাষ্ট্রের। বই পড়বার অবাধ সুযোগের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগার। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে গ্রন্থাগার হল জন-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নিঃশুল্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়। এখানে এসে যে-কেউ আজীবন বইয়ের সাহচর্য লাভ করতে পারে।

পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে শিক্ষা, পুস্তকপ্রকাশ ও গ্রন্থাগারের সুব্যবস্থা আছে। এই তিনটি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত; কোনো একটিকে বাদ দিয়ে মূল উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। বর্তমান কালকে যন্ত্রযুগ বলা হয়; একাল তেমনি বইয়েরও যুগ। বর্তমানে বইয়ের সহায়তা ছাড়া যন্ত্রের আবিষ্কার ও যন্ত্র-চালনা সম্ভব নয়।

প্রগতিশীল রাষ্ট্রে তাই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য নিরন্তর চেষ্টা চলছে। বছরের পর বছর পুঁথিপত্র অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। বই পড়বার আরো বেশী সুযোগ করে দেবার জন্য গ্রন্থাগার-ব্যবস্থায় নানা উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টার বিরাম নেই।

বিগত কয়েক দশকের মধ্যে শিক্ষা ও পুস্তক-প্রকাশনের ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে তার মধ্যে রাশিয়ার শক্তির উৎস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। রাশিয়ার জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জন-সংখ্যার আনুমানিক ৭ ভাগ; কিন্তু পৃথিবীতে যত বই বের হয় তার প্রায় কুড়ি ভাগ পাওয়া যায় রাশিয়া থেকে। রাশিয়ায় এখন সবচেয়ে বেশী বই প্রকাশিত হয়। এটা সম্ভব হয়েছে পরি-কল্পনা অনুযায়ী প্রকাশন-শিল্পের বিস্তার দ্বারা। সোভিয়েট রাশিয়া গোড়া থেকেই বুঝেছিল যে, গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় করবার জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল বই। সেইজন্য রাশিয়ার পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় পুস্তক প্রকাশনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর ফলে ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় যে পরিমাণ পুস্তক প্রকাশিত হত সেই তুলনায় বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রথম দশকের শেষে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩৭ গুণ; দ্বিতীয় দশকের শেষে বৃদ্ধি পায় ৫৪৪ গুণ। ১৯১৩ সালে গড়ে একটি বই ৩,০০০ কপি ছাপা হত; এখন এই গড়-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় পঁচিশ হাজার।

১৯৬১-'৬২ সালে জাতীয় গ্রন্থা-গারে ২১,০৭৬টি বই ভারতীয় প্রকাশন আইন অনুসারে এসেছে। বিষয়মূল্যহীন বই এবং সাময়িকপত্র এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাওয়া গেছে ৩০২১টি বই ; বাংলা বই ২০৪৩, বাকী অন্যান্য ভাষার। চল্লিশ কোটি লোকের জন্য একুশ হাজার বই অকিঞ্চিৎকর। অপেক্ষাকৃত ছোট দেশের সঙ্গে তুলনা করলেও দেখা যাবে আমরা কত পিছিয়ে আছি। বেলজিয়ামের জনসংখ্যা ৮৮ লক্ষ; সেখানে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৩,৬৪৫; চেকোশ্লোভাকিয়ার জনসংখ্যা সওয়া কোটি; ১৯৬০ সালে বই বেরিয়েছে ৭৯৩০; ফ্রান্স ও জাপানের জনসংখ্যা যথাক্রমে চার কোটি আটাশ লক্ষ ও প্রায় আট কোটি; ১৯৬০ সালে বই ঐ দুই দেশে বেরিয়েছে যথাক্রমে ১১,৮৭২ ও ২৩,৬৮২ খানা। তুলনা করবার সুবিধার জন্য বলা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি।

শুধু পুস্তক-প্রকাশের দিক থেকে নয়, গ্রন্থাগার-ব্যবস্থায়ও আমরা পিছিয়ে

আছি। বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ডেনমার্কে জাতীয় গ্রন্থাগার আছে দুটি করে; ইতালী ও যুগোশ্লাভিয়ায় সাতটি করে এবং রুমানিয়ায় আছে ছ'টি জাতীয় গ্রন্থাগার। রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও বুলগেরিয়ায় পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যা যথাক্রমে ১৪,৫০১, ১৪,৪৩১ ও ৪৩২১টি। ভারতে ১৯৫৪ সালে ৩২,০০০ লাইব্রেরি ছিল; এদের অধিকাংশ অল্পসংখ্যক পুস্তকের সংগ্রহ, নামেই লাইব্রেরি; পাশ্চাত্তের পাবলিক লাইব্রেরির সঙ্গে তুলনা হতে পারে না। এ সব লাইব্রেরির মোট পুস্তক-সংখ্যা ছিল ৭১ লক্ষ; আর শুধু চেকোশ্লোভাকিয়ার পাবলিক লাইব্রেরিগুলির মিলিত পুস্তক-সংখ্যা প্রায় এক কোটি তিরানব্বই লক্ষ। এদেশের পঞ্চাশ জন পাঠকের জন্য একটি করে বই আছে লাইব্রেরিতে; আমেরিকায় মাথাপিছু বই লাইব্রেরিতে আছে ১·২৪টি; বৃটেনে ১·১৫টি। বৃটেনে লাইব্রেরির জন্য মাথাপিছু প্রতি বছর ব্যয় করা হয় তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। আমাদের পক্ষে এক-মাত্র গ্রন্থাগারের জন্য প্রতি বৎসর একশ' চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় করবার কল্পনা করাও বাতুলতা।

টাকা থাকলেই তো চলবে না। গ্রন্থাগার আন্দোলন সফল করবার জন্য পাঠক ও উপযুক্ত সংখ্যক বই চাই। ভারতীয় ভাষার বই। এখন যে পরিমাণ বই প্রকাশিত হয় তা জাতিগঠনের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। জাতির প্রয়োজন ভারতীয় ভাষায় বই দিয়ে মেটাতে হলে সকল ভাষায় দশ বারো লক্ষ টাইটেলের প্রয়োজন। ইংল্যান্ডে আমেরিকায় বাজারে সব সময় প্রায় এক লক্ষ বই পাওয়া যায়।

বাংলা বইয়ের কথা ধরা যাক। বর্তমানে যে হারে বাংলা বই বের হয় সেই হিসাবে এক লক্ষ বাংলা বই পেতে লাগবে একশ' বছর। তখন আবার অনেক বই দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাবে। সুতরাং এক লক্ষ বই একসঙ্গে এক সময় বাজারে পাওয়া যাবার মতো সুযোগ যে কখনো আসবে বর্তমান অবস্থায় তা কল্পনা করা যায় না। এক লক্ষ বই কিন্তু বেশি নয়। আমরা যদি শুধু বাংলা বই-এর সহায়তায় জাতীয় জীবনের প্রয়োজন মেটাতে চাই তাহলে সকল বিষয়ে বিভিন্ন মানের বই দরকার হবে। এখন সাহিত্য-গ্রন্থের প্রাধান্য। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই চাই। আবার সব বিষয়ের বই বিভিন্ন মানের হওয়া দরকার। শিক্ষার্থী, বিশেষজ্ঞ ছাত্র নব-সাক্ষর প্রভৃতির জন্য আলাদা করে বই লিখতে হবে। বাংলা ও ভারত সম্পর্কে ইংরেজীতে যে-সব মূল্যবান বই আছে তাদের অনুবাদ না করলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে একালের পাঠকের সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে না।

বাংলা বইয়ের বর্তমান অবস্থায় কেউ কেউ গৌরব বোধ করেন। তাঁরা মনে করেন এখন নানা বিষয়ে অনেক বাংলা বই বের হয়; [illegible] বই উজ্জ্বল

কয়েকটি দেশের গ্রন্থাগার তালিকা : ১৯৬০ *

	জাতীয় গ্রন্থাগার	বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার	স্কুল গ্রন্থাগার	বিশেষ গ্রন্থাগার	সাধারণ গ্রন্থাগার
আমেরিকা	১	১৯৬০	৪১৪৬৩	৫০০০	৭৮০০
কানাডা	১	৩৩৯	১০২৬	৩৭২	১১৩৮
জাপান	১	৭৪২	৩৬৬৬৯	...	৭৬০
থাইল্যান্ড	১	৭	২৩৩	৯০	৩০২
ইন্দোনেশিয়া	...	৫৭	...	৯০	১৬০৮
ইজিপ্ট	১	৭৮	৯২৬	৮৬	৪৭
ঘানা	২	২	২৭	২৭	২৯
কোরিয়া সাধারণতন্ত্র	১	৭০	২১২	৪৫	১৭
অস্ট্রিয়া	১	১২	৫৫০	৮৩৫	২৬০৯
বুলগেরিয়া	১	১৭	২০৯৩	৪৯৭	৪৫২৩
ডেনমার্ক	২	১১৪	...	১৪৬	১৩০১
হাঙ্গারী	১	১৬	৬৫৬১	১৭৮১	৯৭৭০
আয়ারল্যান্ড	১	৩	...	২	২৮১০
নেদারল্যান্ড	১	১১	...	...	...
পোলান্ড	১	৫৫	২১৯৭৭	২০৭	৭০৫৩

* যে সমস্ত দেশের ১৯৬০ সালের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে কেবল সেই সব দেশেরই গ্রন্থাগার তালিকা প্রদত্ত হল।
সংকেত ঃ ..... = হিসেব পাওয়া যায়নি — = নেই।

সম্ভাবনার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এ ধারণা তথ্য দ্বারা সমর্থন করা যায় না। বাংলা বইয়ের সংখ্যাবিচার করলেই তা ধরা পড়বে।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় ত্রিশখানি বই (টাইটেল) বেরিয়েছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল ৩২২। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের সংখ্যা ছিল ৮৯৪; ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বেরিয়েছিল ১,৩১৪টি বাংলা বই। এর পরে বাংলা বইয়ের হিসাব পৃথকভাবে পাওয়া যায় না। বাংলা দেশে প্রকাশিত ভারতীয় ভাষায় বইয়ের হিসাব আছে। তবে এর মধ্যে অল্প কয়েকটি বাদে সবই বাংলা বই :

১৯০২-'০৩ — ২,৪৪৮

১৯৩০-'৩১ — ৩,০২৫

১৯৪০-'৪১ — ৩,১৯৩

১৯৬১-'৬২ সালে বাংলা বই পাওয়া গেছে ২০৪৩টি। তাহ'লে প্রকাশন-শিল্পে আমাদের অগ্রগতির প্রমাণ কোথায়? বিশ বছর পূর্বে যত বাংলা বই বের হত এখন তার চেয়ে এক হাজার কম টাইটেল পাওয়া যায়। অবশ্য বলা হবে যে, এর পরে বাংলা ভাগ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, সাক্ষরের হার বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে; পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত বাসিন্দারা পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন। তা ছাড়া পূর্বেও যেমন, এখনও তেমনি কলকাতাই প্রধান প্রকাশন-কেন্দ্র; —একমাত্র বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ভারতীয় ভাষায় বই প্রকাশিত হয়েছিল ৯৬৮টি, এবং কপি ছাপা হয়েছিল প্রায় কুড়ি লক্ষ। অন্যান্য স্থানে প্রকাশিত ভারতীয় ভাষার বইয়ের হিসাব এইরূপ :

স্থান	টাইটেল	কপি
বর্ধমান	৫৬	৫৩,২৫০
চট্টগ্রাম	২৩	২১,২০০
ঢাকা	১৮৭	২১১,৫৭৬
রাজসাহী	২৭	২০,১০০
চব্বিশ পরগণা	৮৬	১৪৫,৭০০

(কলকাতা ছাড়া)

১৮২০ সালের তুলনায় ১৮৫৭ সালে প্রায় এগারো গুণ বেশী বই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলা বই প্রকাশনের এই ক্রমবর্ধমান হার রক্ষিত হয়নি। হলে অবস্থা অন্য রকম দাঁড়াত। বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখবার ফলে ইংরেজী শিক্ষার ও কর্মজীবনের ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়। পরিণামে বাংলা বই প্রকাশনের পেছনে প্রয়োজনের প্রেরণা ছিল না। বাংলা বই খেয়াল-খুশি অনুযায়ী লেখা এবং প্রকাশিত হয়েছে। গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা অবশ্য রচিত হয়েছে লেখকের আত্ম-প্রকাশের তাগিদে। কিন্তু কোনো সাহিত্যের সামগ্রিক বিকাশের জন্য তা যথেষ্ট নয়। যে বই জীবিকার্জনে সহায়তা করে না, শিক্ষিত লোকের পক্ষে যে ভাষার বই অত্যাবশ্যক নয়, সে বইয়ের মর্যাদার আসন লাভ করা সম্ভব নয়। মর্যাদা দিয়েছি আমরা ইংরেজী ভাষার বইকে। এখনো আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনে ইংরেজীর আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বিদেশী লেখকরা বই লেখেন, বিদেশে বই ছাপা হয়, আমরা শুধু বাজার থেকে কিনে পড়ি। এতে আমাদের মানসিক আলস্য প্রশ্রয় পেয়েছে, সাংস্কৃতিক পরাধীনতা সুদৃঢ় হয়েছে এবং বাংলা প্রকাশন-শিল্পের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি বাধা পেয়েছে।

আর দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে বাংলা দেশের মন। একদল যারা ইংরেজী জানে; আর একদল যারা ইংরেজী জানে না। চণ্ডীদাস কিংবা চণ্ডীমঙ্গলের যুগে এমন ভাগ ছিল না। এখন ইংরেজী জানা এবং ইংরেজী না-জানাদের গোত্র আলাদা। তাই সেই সুদৃঢ় একানুভূতির

হাজারের হিসেবে গ্রন্থসংখ্যা

	জাতীয়	বিশ্ববিদ্যালয়	স্কুল	বিশেষ	সাধারণ
আমেরিকা	১২০৭৫	১৭৬০০০	১২৩২৩১	...	২০০০০০
কানাডা	২৫০	৬৫৪১	২৭৫১	৪৩০০	১২৪৬৮
জাপান	৫২৫৬	৩৪৮০৫	৭৫০০০	...	১৬১৮০
থাইল্যান্ড	১০৪	২০৭	১০৩	৪৫৩	২৬৮
ইন্দোনেশিয়া	---	২৩২	...	১০০০	১১৫০
ইজিপ্ট	৪৫০	৮১০	৩৮৮২	৪৫০	৪০৮
ঘানা	৪৪০	১৬১	২৪	৫০	৩২৩
কোরিয়া সাধারণতন্ত্র	৩৪২	২৫৫৮	১০১	৫০১	২০৬
অস্ট্রিয়া	১৭০২	৩৪৬২	২৫০	১০০০০	২৪৯৫
বুলগেরিয়া	৭৪৬	১২৯১	৪০৬৫	২৪৮০	১৩১৫৪
ডেনমার্ক	১৮৬০	১৭৫৪	...	১৪৩০	৭০৮৩
হাঙ্গেরী	১৪৬২	৪৬৬১	৪৭১১	৬৫৭৬	১১১১৫
আয়ারল্যান্ড	৫০০	১৭২১	...	১৮৪	২৩৪৭
নেদারল্যান্ড	৮০৬	৫৯০০	...	...	...
পোলান্ড	৮৭২	১০১২২	৪৯২৪৫	৪৬৫৭	৩১১৪৫

অভাব,—যা জাতীয়তাবোধের প্রথম শর্ত। ইংরেজী যারা জানে জাতীয় জীবনে তাদেরই একাধিপত্য। বাংলা বইও লেখা হয় ইংরেজী-জানা পাঠকদের কথা ভেবে। ভারতের সকল আঞ্চলিক সাহিত্য সম্বন্ধেই এ কথা সত্য।

মাতৃভাষায় বইয়ের দুর্ভিক্ষ যে কি বিপর্যয় আনে তার উদাহরণ এশিয়ার কতকগুলি রাষ্ট্র। পাশ্চাত্য শক্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও অনেকগুলি রাষ্ট্রেই গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে; অন্তত গণতন্ত্রের নীতি সুদৃঢ় হতে পারেনি। এর প্রধান কারণ জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের নিরক্ষরতা; এবং সাক্ষরদের জন্যও বইয়ের অভাব। ভারতের কথা আলাদা। ভারতে কয়েকজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী নেতার প্রভাবে গণতন্ত্রের কাঠামো অক্ষুণ্ণ আছে। তাছাড়া এ ব্যাপারে কংগ্রেসের দীর্ঘকালের ঐতিহ্যও কম সহায়তা করেনি। এশিয়ার অন্য কোনো দেশে কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠান নেই। তথাপি এই প্রভাব যতদিন আছে তার মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করবার এবং চাহিদা মেটাবার মতো উপযুক্ত সংখ্যক বই মাতৃভাষায় প্রকাশ করবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা দরকার।

বই পাঠকের মন সচল রাখে, চিন্তা-বৃত্তিকে সচেতন করে এবং বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করে। আদর্শ নাগরিকের পক্ষে এগুলি অত্যাবশ্যক গুণ। এই জন্যই গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য মাতৃভাষায় লেখা বই অপরিহার্য।

বইয়ের অভাবে মন যদি নিষ্ক্রিয় থাকে তাহলে জনসাধারণকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সহজ হয়ে পড়ে। জনসংযোগের নতুন পন্থাগুলি রাষ্ট্রনায়কের হাতে বিপজ্জনক হয়ে ওঠবার আশঙ্কা আছে। ঊনবিংশ শতকে জনসংযোগের প্রধান উপায় ছিল বই। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশান ম্যাস কম্যুনিকেশানের ক্ষেত্রে বইয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিয়েছে। টেলিভিশান এশিয়ায় এখনো খুব কমই এসেছে। কিন্তু সিনেমা ও রেডিও জনসংযোগের আদর্শ পন্থা। একসঙ্গে এক ধরনের সংবাদ, মতামত বা আনন্দ বহু লোকের নিকট পৌঁছে দেওয়া যায়। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা দল একটি কেন্দ্র থেকে জনসাধারণকে স্বমতে আনবার জন্য কত সহজে প্রচার করতে পারে! সিনেমা ও রেডিওর দান গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। বই পড়বার জন্য প্রস্তুতি দরকার। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সাধনার ফল এশিয়ার নিরক্ষর ব্যক্তিরাও অনায়াসে গ্রহণ করছে; কিন্তু য়ুরোপ-আমেরিকার বইয়ের দান গ্রহণ করবার শক্তি ক'জনেরই বা আছে? নিজেদের ভাষার বই সাক্ষররাও পায় না। সুতরাং পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশানের ক্ষতিকর প্রভাব বইয়ের প্রাচুর্যের দ্বারা হ্রাস করবার যে সুযোগ আছে এশিয়ার বহু দেশেই সে সুযোগ নেই। এইজন্যই আমাদের বিপদের আশংকা বেশী।

গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বইয়ের সহায়তা যে অপরিহার্য এ বিষয়ে আমরা এখনো সচেতন হইনি। তাই ভারতীয় ভাষায় পুস্তক-প্রকাশের জন্য কোনো সর্বাত্মক পরিকল্পনা রচিত হয়নি। উপযুক্ত লেখক, প্রয়োজনীয় অর্থ এবং মুদ্রণের ব্যবস্থা করবার জন্য অনেক প্রস্তুতি এবং দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

নিষ্ক্রিয়ভাবে কিছু কিছু কাজ অবশ্য আরম্ভ হয়েছে। সাহিত্য আকাদেমি, পাবলিকেশানস্ ডিভিশান, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ভারতীয় ভাষায় পুস্তক-প্রকাশনের কাজ শুরু করেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় বই প্রকাশের জন্য একটি ট্রাস্ট উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। মাদ্রাজ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের সরকার আঞ্চলিক ভাষায় বই-প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি পৃথক প্রকাশন-দপ্তর খুলেছেন। ইতিমধ্যে এ সব দপ্তরের উদ্যোগে অভিধান, কোষগ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা বই প্রকাশের জন্য অনুরূপ উদ্যোগ এখনো দেখা যায় না।

কয়েকটি পশ্চিমী দেশের বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত পুস্তকের পরিসংখ্যান : ১৯৬০

আমেরিকা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
যুক্তরাষ্ট্র	২৮২	৪৮০	১১০৪	১৯৯৬	২২৮	১০৮৯	১৮৭৬	৮৩৪	৩৩৯৩	২২১০	—	=	১৩০২২
ইংল্যান্ড	৮৩	৪৩৭	১৩১৪	৩৪০০	৭৩৪	১৮৭৯	৩৮৮২	১১৭৩	৮৩১৬	২৩৫৩	—	=	২১৭৮২
সোভিয়েট দেশ	২২৪২	৬১২	৮০৩	১৪৪০৩	২০২৬	৫০৬১	৩৩৯৩১	২৮৭২	১২০৩	২২৬১	—	=	৭৬০৩১
ফ্রান্স	১২৯	৫২৯	৯৩৩	১২২২	২২৪	৭৫৯	৬৯৬	১৭২১	৮২১১	১৪৪০	—	=	১১৮৭২
পঃ জার্মানী	৩৪১	৪৬২	১৫১০	৫০৮২	৭০১	১১৮৮	২৭৮১	১১৫৭	৫৯৩১	১৭৯১	৫৯	=	২২১০৩
অস্ট্রিয়া	৭৯	৭৯	১৭৩	১১১৭	৮০	২৩৪	৪৪৯	৩১৯	৬০০	৩০৯	—	=	৩৪৩৯
বুলগেরিয়া	৩৬	৪৭	২	৬৮১	১৫৩	৫১	৬১৭	৩৫	১০২	৮৬	৭৫১	=	৩৩৬৪
পোল্যান্ড	২৩০	৬৯	৯৩	১৩৭৩	২১৩	৮০২	২২৫০	২৭৯	১৬১৫	৩৮১	—	=	৭৫০৩
ডেনমার্ক	১৭৫	৪৩	১১৬	৩০০	৩১০	৩৮১	৫০৩	১৮৬	১০২০	৬৮৯	—	=	৩৩৩১
হাংগারী	৬৭	২৪	৩৯	৫৭১	৫৬	১১১	২২২৪	২৬৬	৯১৩	১৭৬	৭২৮	=	৫২০৩
নেদারল্যান্ডস	১৭৪	১৪৪	৩২২	১০১৮	১৩৮৬	১১৮১	৭৮৬	৩৯৬	১১৩৩	১৪৫	১১৯০	=	৭৮৯৩
অস্ট্রেলিয়া	৩১	১১	৫২	২৮৬	২১	৯০	১৬২	৬০	১১৯	১২৭	—	=	৯৩৪
কানাডা	১০৮	৩৫	১৭২	৬৭৪	৮৯	১৭৩	৫৩৫	১৬৮	৪৯১	২১৬	—	=	২৭৯৩
স্পেন	৩১৮	১৩৫	৬৫৪	৭৮৭	১৮	২৯৯	৫৯৪	২৬১	২০৬২	৫৩৭	—	=	৬০৮৫
মেক্সিকো	৯৫	৯০	৮২	২৭৬	৭১	৮১	২৭১	৬০	৬১৪	৩৩০	—	=	১৯৬৪
নরওয়ে	১১০	৪৪	১৬১	৫১৭	১৮৬	২৮৭	৪৫২	১৩০	৯৭৮	৩৬৪	—	=	৩২৫৬
রুমানিয়া	১৮০	২৬	২৯	১৮৯৮	১৯	২১৩	১৬৯৭	৭২৩	৭৭১	১২৭	—	=	৫৬৭৩
পর্তুগাল	১১৭	৬৩	১১৯	১২৮০	১৯২	৩৩৮	১৪০৫	১১৫৭	১২৯১	৩৬৪	—	=	৬৬৪৬
সুইজারল্যান্ড	৭৭	১৪৬	৪৮৯	৭২০	১৬৩	১৫২	৫৩৪	৮৮৫	১০৩০	৪৪৭	২৩৬	=	৪৮৯৯
সুইডেন	১৮৯	৪৫	৩১৭	৪৭৬	৪২৬	৫৩৮	১০৪২	২৭৯	১৭৯৮	৭১৬	—	=	৫৮২০
যুগোশ্লাভিয়া	১২১	৬৪	৫৬	১১৪৩	১৩৪	৩৪৪	৯৩২	৩৭৯	১৩০৩	২৪২	১১৭	—	৫৩৩৫

প্রাচীনকালের কথা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, রাজা-মহারাজারা সব-সময়ে সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ'দের রাজসভায় কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। কেবল আর্থিক সাহায্য নয়, এই 'সভাপণ্ডিত' বা 'রাজ-কবি'রা নানা-রকম রাজ-সাহায্যে পরিপুষ্ট হতেন। বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্নে'র কথা তো আমাদের সকলেরই জানা আছে। বাংলাদেশেও এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কৃত্তিবাস তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের 'সভাকবি' ছিলেন, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রের রাজসভায় থাকতেন। এই রকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে।

স্বাধীনতা লাভের পর কয়েক বৎসর হোল আমাদের দেশে সাহিত্যিকদের সম্মান ও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই সম্মান বা পুরস্কার দুই প্রকারের, যেমন পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ইত্যাদি সম্মান দান; আর প্রতি বৎসর যোগ্য সাহিত্যিকদের অর্থ পুরস্কার দান।

এই পুরস্কার দান নিয়ে কিছুদিন থেকে সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এ'দের যুক্তি সাধারণতঃ এই রকম—(১) পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় সাহিত্যিকদের লেখার মান অনেক সময় নিম্নগামী হয়। নিজের স্বাধীনমত বিসর্জন দিয়ে পুরস্কারের লোভে এ'রা অন্য ধরনের লেখার পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। এতে সাহিত্যিক-মন বাধাগ্রস্থ ও পঙ্গু হয়ে পড়ে এবং সাহিত্যের সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। (২) নির্বাচক বা সমালোচকমণ্ডলী যাঁরা পুরস্কার নির্বাচন করেন, তাঁরা সবক্ষেত্রে নানা কারণে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। (৩) পুরস্কারের নিয়ম কানুন সব-সময়ে ঠিকভাবে প্রতিপালিত হয় না। (৪) নির্দিষ্ট কালের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তককে পুরস্কৃত করা হবে নিয়ম থাকার জন্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সেই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত কোন নিকৃষ্ট বইকেই পুরস্কৃত করা হয়। সেইজন্য ঠিক বোঝা যায় না শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক না তাঁর নিকৃষ্ট পুস্তককে পুরস্কৃত করা হলো এবং (৫) সাহিত্যিকদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা।

উপরোক্ত অভিযোগের মধ্যে কিছুটা যে সত্যতা আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে স্বীকার করতে হবে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের উৎসাহ ও সম্মান দিতে হলে এই আর্থিক পুরস্কার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। এর ভার নিরপেক্ষ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা সরকারী প্রতিষ্ঠানকেই নিতে হবে।

দেশের সাহিত্য-পুরস্কার বা সম্মানদানের বিষয়ে এবারে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করি। যতদূর জানা যায় ব্রিটিশ আমল থেকে এই সাহিত্য পুরস্কার বা সম্মানের সূচনা হয়—যদিও এলোমেলো ও অসংলগ্নভাবে। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের এবিষয়ে কোন বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না: নিতান্ত দায়ে পড়ে অনুরোধে বা অন্য কোন কারণে তাঁরা এই রকম দুই একটা পুরস্কার এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র রায়বাহাদুর ও সি আই ই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সি আই ই, দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর, হারাণচন্দ্র রক্ষিত রায় সাহেব, অক্ষয়কুমার মৈত্র, রায় বাহাদুর ও সি আই ই সাহিত্যের জন্যই পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন, কিন্তু জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর এই উপাধি পরিত্যাগ করেন। আরও কয়েকজন উপাধি পেয়েছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের জন্য নয় – যেমন, রমেশ দত্ত, সি আই ই, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায় বাহাদুর, কালি-প্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাদুর। শোনা যায়, দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের জন্য ৫০্ টাকা মাসিক বৃত্তি পেয়েছিলেন।

সাহিত্যের জন্য সরকারী সম্মান ও পুরস্কার আরম্ভ হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পরে। কেবল কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট নয়, বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টও প্রাদেশিক সাহিত্যের জন্য প্রতি বৎসর পুরস্কার দিয়ে আসছেন। এইখানে আমরা অবশ্য

কেবল কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট ও বাংলা-দেশের প্রচেষ্টার কথাই উল্লেখ করবো।

উপাধি বা সম্মানের কথা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, কেন্দ্রীয় সরকার এপর্যন্ত রাজশেখর বসুকে পদ্ম-ভূষণ, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে পদ্মভূষণ, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রকে পদ্মশ্রীতে সম্মানিত করেছেন। তুলনামূলকভাবে দেখলে, আমাদের মনে হবে, বাংলাদেশের প্রতি সরকার বরাবর কার্পণ্য দেখিয়েই আস-ছেন। ১৯৬২ সালের কথাই ধরা যায়; এই বৎসরে প্রজাতন্ত্র দিবসে একজন মারহাট্টি ঔপন্যাসিক, একজন উর্দুকবি এবং একজন হিন্দী লেখক 'পদ্মভূষণ' সম্মান পেয়েছেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যের তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বনিম্ন সম্মান 'পদ্মশ্রী' সম্মান পেয়েছেন।

দিল্লীতে সাহিত্য আকাদমী স্থাপনের পর সর্বভারতীয় ভাবে দেশে সাহিত্য পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়। ভারতীয় সংবিধানে যে ১৪টি ভাষার উল্লেখ আছে, সেই ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকার মধ্যে প্রতি বৎসর পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা হয়। প্রতি বৎসর প্রত্যেক ভাষার জন্য এই আর্থিক পুরস্কারের পরিমাণ ৫০০০৲ টাকা। ইংরাজী ভাষার উল্লেখ না থাকলেও গত বৎসর একটি ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তককে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের শিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Education) ১৯৫৪-৫৫ থেকে প্রতি বৎসর কয়েকটি সাহিত্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। প্রতি বৎসর শিশু-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের বাৎসরিক দুইটি করে পুরস্কার এই মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম পুরস্কার ৫০০৲ টাকা। এছাড়া পুরস্কৃত পুস্তকের ২০০০ কপিও এই সঙ্গে কিনে নেওয়া হয়।

এছাড়া এই মন্ত্রণালয় প্রতি বৎসর সদ্য সাক্ষর অর্থাৎ Neo-literates-দের জন্য বিভিন্ন ভাষার প্রতি বৎসর ৪০টি প্রাইজ দিয়ে থাকেন। এই পুরস্কারের পরিমাণ ১০০০৲ টাকা থেকে ৫০০৲ টাকা পর্যন্ত এবং কয়েক শত সংখ্যক পুরস্কৃত বইও কিনে নেওয়া হয়।

বাংলাদেশে এই ধরণের সাহিত্য পুরস্কারের প্রাচীন দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে। এই সাহিত্য পুরস্কারের মাধ্যমে আমরা দুইখানা বিখ্যাত বই পেয়ে-ছিলাম। যেমন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে লিখিত Bengal Peasant Life এবং বিখ্যাত 'নাটকে' রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখিত 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নামে কুলীন প্রথার বিরুদ্ধে বিখ্যাত নাটক। এই দুইটি পুস্তকই পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে আমরা পেয়েছিলাম। রামনারায়ণ তর্করত্ন পুরস্কার পান ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে।

বাংলাদেশের এখন বিখ্যাত পুরস্কার হচ্ছে 'রবীন্দ্র প্রাইজ' যা পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট কয়েক বৎসর হোল প্রবর্তিত করেছেন। উপযুক্ত বিবেচিত হলে বিভিন্ন বিষয়ের তিনটি পুরস্কার পর্যন্ত প্রতি বৎসর দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতি পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ৫০০০৲ টাকা এবং এই পুরস্কার অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৪৯—৫০ সাল থেকে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতি বৎসর বাংলা সাহিত্যের জন্য কয়েকটি পুরস্কার দিয়ে আসছেন—যেমন জগৎ-তারিণী পুরস্কার, লীলা পুরস্কার, শরৎচন্দ্র পুরস্কার ইত্যাদি।

তিন বৎসর অন্তর রবীন্দ্রভারতীও ৩০০০৲ টাকার একটি সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে থাকেন। প্রথমবারে এই পুরস্কার পেয়েছেন স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

এবারে অন্য কয়েকটি সাহিত্য পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা যাক। কয়েক বৎসর আগে একটি বাৎসরিক নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠানে শ্রীঅন্নদা-শংকর রায় মহাশয় দুঃখ প্রকাশ
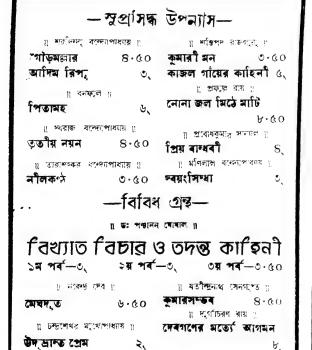
করে বলেছিলেন—দেশের দুর্ভাগ্য, কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এপর্যন্ত সাহিত্যিকদের উৎসাহিত ও সম্মানিত করবার জন্য পুরস্কার নিয়ে এগিয়ে আসেননি। তাঁর এই মন্তব্যের পরেই কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিবিধ বাৎসরিক সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা করেন; যেমন অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তরের 'শিশিরকুমার' ও 'মতিলাল' পুরস্কার, প্রকাশক এম-সি সরকার অ্যান্ড সন্সের পক্ষ থেকে শিশুসাহিত্যের জন্য 'মৌচাক' পুরস্কার, আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশের 'প্রফুল্লকুমার' ও 'সুরেশচন্দ্র' পুরস্কার এবং উল্টোরথের পক্ষ থেকে কবিতার জন্য পুরস্কার। এই ছয়টি পুরস্কার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে।

বাংলা সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য বাৎসরিক এক হাজার টাকার পুরস্কার হচ্ছে বিখ্যাত ব্যবসায়ী নরসিংদাস আগরওয়ালা প্রদত্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংদাস পুরস্কার।

আমাদের সাহিত্য পুরস্কারের বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি এখানে দুই একটি বিদেশী পুরস্কারের কথা উল্লেখ না করি। ভারতবাসীরা এই দুই একটি বিদেশী পুরস্কার পেয়েছেন বলে এখানে উল্লেখ করার সার্থকতা আছে। প্রথমটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত 'নোবেল' প্রাইজ, দ্বিতীয়টি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রাপ্ত শিশু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই বলে আমেরিকার বিখ্যাত বাৎসরিক Newbury পুরস্কার লাভ, যা ১৯২৪ সালে এঁকে দেওয়া হয়।

এইসব সাহিত্য পুরস্কারের কথা আলোচনা করলে দেখা যাবে, পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ বেশী হলেই যে পুরস্কার প্রাপ্তির সম্মান বেড়ে যাবে তা স্বীকার্য নয়। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে ফ্রান্সের বিখ্যাত Prix Goncourt। এই পুরস্কারের বাৎসরিক মূল্য ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক। কিন্তু এই পুরস্কারের খ্যাতি ও সম্মান পৃথিবী জোড়া। যে বৎসর যে বই এই পুরস্কার পায়, তার বিক্রয় সংখ্যা সাধারণতঃ দুই লক্ষের কাছাকাছি হয়। তা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব শ্রেষ্ঠ ভাষায় এই বই অনূদিত হয়।

ছোটদের বই: সেকাল ও একাল

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের শৈশবে বাংলা সাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। সেদিন ছোটদের আর বড়দের বইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় কোন পার্থক্য ছিল না। 'ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম; যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুই-ই, আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত' (জীবনস্মৃতি)। এরপরেই তিনি বলেছেন, 'সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার যতটুকু তাহারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহা-ও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।' 'জীবনস্মৃতি'র সমসাময়িক ছোটদের বই সম্পর্কে তাঁর উক্তি প্রণিধানযোগ্য 'এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে-সকল ছেলেভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না।'

তাঁর ছোটবেলায় তিনি কি কি বই পড়েছিলেন আমাদের জানতে ইচ্ছে করে। অনেক ছলনা করে একজন আত্মীয়াকে ভুলিয়ে তিনি দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই-বারিক' পড়েন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' মাসিকপত্র থেকে সেদিনের বালক 'নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ' এবং 'কৃষ্ণকুমারী' উপন্যাস পড়তে পেত, তারপর বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা এবং বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' বড়দের হাতঘুরে তাঁর হাতে আসতো এবং অনেক আয়াসলব্ধ সেই 'বিষবৃক্ষ', সেই 'চন্দ্রশেখর' অনেকদিন ধরে একটু একটু পড়ে তিনি তৃপ্তি পেতেন এর বেশী তিনি বলেননি।

বুদ্ধদেব বসু অনেক পরের মানুষ। তিনি বলছেন, 'আমরা ছোটো ছিলুম বাংলা শিশু-সাহিত্যের সোনালি যুগে। দুই অর্থেই সোনালি সেই যুগ। প্রথমত, সে-ই আরম্ভ, সূত্রপাত—বলতে গেলে শিশু-সাহিত্যই শিশু তখনো; আমরা এখন যারা সসম্মানে কিংবা যে কোনো প্রকারে মধ্যবয়সে অবস্থান করছি, বাংলা-ভাষার লক্ষণযুক্ত শিশু-সাহিত্য আমাদেরই ঠিক সমসাময়িক! দ্বিতীয়ত, গুণের বিচারেও সোনালি: শুদ্ধ, সরল, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ—এই অর্থেও সোনালি। এই সমাবেশ সুলভ নয়' (বাংলা শিশু-সাহিত্য ঃ সাহিত্য চর্চা ঃ বুদ্ধদেব বসু)। এই প্রবন্ধের সমসাময়িক শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তাতে এই মনে হবে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যরসে প্রভূত জলের মিশোল দেখে দুঃখিত হয়েছিলেন, দুই পুরুষ বাদে সে জল জলজ-উদ্ভিদ এবং জীবজগতের অবাঞ্ছিত সমাগমে ঘোলা হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ পড়ে যে সব বইয়ের সাক্ষাৎ পেলাম, আমাদের শৈশবে শিশু-সাহিত্যে দেখছি তারাই ছিল রাজা-উজীর। উপরন্তু আরো কেউ কেউ এসেছিলেন, তালিকাটি দীর্ঘ হয়েছিল আরো। এখন মনে হচ্ছে তাঁর শৈশবে হয়তো সোনালি যুগের আরম্ভ। কিন্তু শেষ সোনালি ফসল আমরাই কুড়িয়েছি। তারপর গত পঁচিশ ছাব্বিশ বছরে অনেক বই লেখা হয়েছে। ছোটদের বই, ছোটদের কাগজ শুধু নয়, দৈনিক পত্রেও শিশু-বিভাগ। প্রতি শরতে রংচঙে মলাটে পরিবেষিত হয় শারদীয় সাহিত্য-সম্ভার। যেখানে এত প্রাচুর্য এত ঐশ্বর্য সেখানে গুণগত উৎকর্ষতা অগত্যা মুখ লুকোতে বাধ্য। খুব ভাল-র দিন হয়তো ফুরিয়েছে তাই মাঝারি ভাল-র এত ছড়াছড়ি। শুধু মাঝারি ভাল হলেই বলবার কিছু ছিল না, সেইসঙ্গে এখন এমন সব বই, এবং এমন সব বিষয়বস্তু ছোটদের সাহিত্যের ছাড়পত্র পেয়ে অবাধে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে দেখলে রীতিমতো চিন্তিত হতে হয়। সুলভ মূল্যে গোয়েন্দা সিরিজের পর সিরিজ বেরুচ্ছে। শুধু গোয়েন্দা হলেই চলবে না, নারী-গোয়েন্দা হলেই ভাল হয়। বাংলা ভাষায় কিশোরদের জন্য সত্যিকারের গোয়েন্দা-গল্প সত্যিই লেখা হলো না। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের হুকো-কাশি এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বিমল-কুমার-রামহরি বাঘা (পরে জয়ন্ত মাণিকের কিছু কিছু আডভেঞ্চার) কখনোই দলে ভারী হলো না। তারপর এলো আডভেঞ্চার ও গোয়েন্দা-গল্পের জগতে রীতিমতো স্বৈরাচার। বিলিতী গোয়েন্দা-গল্প-ই এখন বাংলায় ছোটদের জন্যে পোশাক বদলে দরবারে হাজির। বলা বাহুল্য যাঁরা এইসব তথাকথিত 'সিরিজ' লেখেন, তাঁরা

আগাথা ক্রিস্টি, ডরোথী সেয়ার্স, যা নিকোলাস ব্লেকের মর্যাট খোলেন না। তাঁদের আনাগোনা আরো সস্তা লেখক-দের দরবারে। গোয়েন্দা-কাহিনী না হয়ে-ও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী হতে পারতো। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বিমল-কুমার 'যখের ধন'এ অ্যাডভেঞ্চারের লোভে-ই বেরিয়েছিল। যদিও পরে তারা শখের গোয়েন্দা হলো। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চাঁদের পাহাড়ে' শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের-ও অনাবিষ্কৃত, অজানা-কে জয় করবার নেশায় দক্ষিণ রোডেশিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। তবে জানার চেয়ে অজানা, দেখার চেয়ে না-দেখা শিশু চিত্তকে আকর্ষণ করে বেশী তা তিনি জানতেন। তাই চাঁদের পাহাড়ের সবটুকু রোমাঞ্চ তিনি মুছে নিলেন না। সেই দুর্ধর্ষ পাহাড়, সেই বুনিপ এবং সেই হীরক-ভাণ্ডার যেমন ছিল তেমনিই রইল। শঙ্কর যে আবার কোনদিন ফিরে সেখানে যেতে পারে এর আভাসমাত্র দিয়েই লেখক ক্ষান্ত হলেন।

রবীন্দ্রনাথ 'নদী' কবিতায় লিখে-ছিলেন নদী অনেকদিন সাদা বরফের রাজত্বে ঘুমিয়েছিল। যেদিন তার মুখে রোদ লাগল, সে জাগল, সেদিন সে আপনি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোল 'মনে ভাবিল যা আছে ভবে সবই দেখিয়া লইতে হবে।' আমরা ছোটবেলায় যাঁদের লেখা পড়তাম তাঁরা সেই কাজটি করতেন। সুগভীর দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য-নিষ্ঠার সঙ্গে শিশুচিত্তকে জাগিয়ে তুলতেন। পড়বার নেশা জাগাতেন, সাহিত্যের জগৎ, যে জগতে প্রবেশ করলে আবিষ্কারের নেশাতেই ছোটরা একটির পর একটি বন্ধ দরজা খুলতে চায় সেই জগতের চাবিটি হাতে দিয়ে দিতেন। তাঁরা যে যার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই 'রাজকাহিনী', 'ভূতপত্রী', 'ক্ষীরের পুতুল, 'বুড়ো আংলা', 'ঠাকুর-মা-র ঝুলি', 'বনেজঙ্গলে', 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী' এসব চিরদিনের সাহিত্য হয়ে উঠল। অনুবাদসাহিত্যে কুলদারঞ্জন রায়ের 'বাস্কারভিল কুকুর', 'আশ্চর্য দ্বীপ', 'রবিনসন ক্রুশো' এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। সে অনুবাদের ভাষাকে তরল করবার প্রয়াস ছিল না। মূল কাহিনীর গল্পাংশটুকু রেখে কোনমতে গল্প বলে যাবার তাড়াহুড়ো ছিল না। এই প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আরব্য উপন্যাস' বইটি মনে পড়বে। ঘননীল মলাটে বাঁধাই উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ভারী বই, তার চেহারার আভিজাত্য প্রথমেই সম্ভ্রম জাগায়। মনীষী দে-র জাদুকরী তুলিতে আঁকা অজস্র ছবি, এবং তার ভাষায় রীতিমতো বাদশাহী গাম্ভীর্য। সর্বজনপরিচিত গল্পগুলি ব্যতীত-ও তাতে অনেক গল্প ছিল। রীতিমতো সাধুভাষায় লেখা। অবশ্য সাধুভাষায় লেখা গল্পই আমরা অনেক পড়তাম। সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর 'নিরেট গুরুর কাহিনী' 'হিন্দুস্থানী উপকথা'র সব ভাষা-ও সাধুভাষা-ই ছিল। তাতে রস গ্রহণে ব্যাঘাত হতো না। তারপরে অবশ্য ভাষায় অনেক রূপান্তর ঘটলো। লীলা মজুমদার দুষ্টুছেলেদের চলতি ভাষাকে রীতিমতো নতুন করে সৃষ্টি করলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় বিনুর গল্পে এবং যখ হওয়া ছোট ছেলেটি যে তাস খেলতে ভালবাসতো তার গল্পে আবার অবনীন্দ্র-নাথের আমেজ আনলেন। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রথম পাওয়া পদ্মফুল' আর 'বোর্ডিং ইস্কুল'এ ঘরোয়া মিষ্টি কথায় নতুন নতুন ছবি আঁকলেন। তবে পূর্বসূরীদের কথা স্মরণ করলে মনে হয় সাধুভাষাকে বাধা মনে করবার অভ্যাস তাঁরা প্রথমেই অপসারিত করতেন। ভাষা ও শব্দের সৌন্দর্য সম্পর্কে মনে আগ্রহ জাগাতেন। শব্দ ও ধ্বনির রূপময় আনন্দলোকে যিনি ছোটদের প্রথম ছাড়পত্র দিলেন সেই অবনীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা ভাষার পাঠকদের অনেক ঋণ চিরদিনই থেকে যাবে। আরাবল্লী পর্বতে মেঘমন্দ্র বেণী এলায়িত বর্ষার বর্ণনায়, সূর্য মন্দিরের দরজায় অপেক্ষমান সুভগার বর্ণনায়, পুষ্পবতীর সোনার সূঁচের ফোঁড় তুলবার চিত্রে বর্ণনায় তিনি শিশুমনে অবর্ণনীয়

সৌন্দর্যের পিপাসাকে উন্মুক্ত করেন। তারপর মন অজানতে-ই ভাষার সৌন্দর্য খোঁজে। পরে 'রাজর্ষি'র শিবচতুর্দশীর রাতে গোমতী তীরে একা জয়সিংহ ছুরির শাণ দেবার দৃশ্য পড়তে পড়তে রোমাঞ্চ ও অনির্বচনীয়ের আস্বাদ পায়। এমনি করেই অবনীন্দ্রনাথ অভিভূত করেন এবং সেইসব আচার্যরা, অবনীন্দ্রনাথ যাঁদের প্রমুখ, তাঁরা ছোটদের মনে উন্নত রুচি এবং সৎসাহিত্যে অনুরাগ সৃষ্টি করেন। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুমন্ত মনকে জাগান। তারপর ধীরে ধীরে বিকাশমান মন সাহিত্যে পাঠ নেবার উপযোগিতা পায়।

বাংলাদেশের শিশু-সাহিত্যের ক্রমানুবর্তী আলোচনা করবার জন্য এ-প্রসঙ্গের অবতারণা নয়। তবে শিশু-সাহিত্যের সেই প্রথম সোনালি যুগ থেকে মধ্যযুগ, অর্থাৎ আমাদের শৈশবকাল অবধি পর্যালোচনায় এই মনে হয়, পূর্বসূরীরা এবং তাঁদের উত্তর-সাধকরা স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। নিছক গল্প বলে আসর জমাতে তাঁরা আসেননি। তাঁরা শিশুদের সস্তা এবং মনভোলানো সাহিত্যের বিকল্প পরিবেষণে বিশ্বাস করতেন না। রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য যখন ভেবেছেন তখন আমরা 'সহজপাঠ' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, 'শিশু' পেয়েছি। 'ইচ্ছাপূরণ' গল্প, 'গল্পসঞ্চয়' সংকলনে আমরা প্রথম পড়েছিলাম। কিন্তু তাঁর 'সে', 'গল্পসল্প', 'খাপছাড়া', 'ডাকঘর', 'শারোদোৎসব', 'শিশু ভোলানাথ' ছোটদের পক্ষে সম্পূর্ণ বোধ্য কিনা সে বিষয়ে সংশয় হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করাও সম্ভব নয়। তাঁর সেই উদার ও প্রসন্ন দাক্ষিণ্য নিয়ে তিনি যা-ই লিখলেন তাই সাহিত্য হলো। তাঁর 'সহজপাঠ'-এর প্রথমভাগে 'কাল ছিল ডাল খালি আজ ফুলে যায় ভরে'-র আবেদন চিরদিনের চিরশিশুর কাছে। যে শিশুরা কখনো জগৎ পারাবারের তীরে খেলা করে, যে শিশুর 'জননীর মুখ-তাকানো হাসি'-র সুর তিনি নিজের অন্তরেই শুনতে ও শোনাতে চান। ছোটদের নিয়ে তাঁর যে সব লেখা তা ছোটরা এবং বড়রা পড়তে পারেন। ছোটরা ছোটদের মতো ক'রে তাঁকে বোঝে। বড়রা আরো গভীরে যেতে পারেন। তাঁর আসন তাঁর-ই থাকবে। সসঙ্কোচে, তিনি ব্যতিরেকে ছোটদের যে সাহিত্য তার সম্পর্কে আলোচনাই যুক্তিযুক্ত।

দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্য পালনের কথা। আমাদের অগ্রজদের শৈশবের সেই প্রথম সোনালি যুগের ঐশ্বর্য থেকে ত' আমরাও রস আহরণ করেছি। তারপর আমাদের শৈশবে ছোটদের সাহিত্য আরো বিস্তৃত হলো। আমরা একসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, সুখলতা রাও, সুকুমার রায়, এ'দের পেলাম। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দিলেন 'আরব্যোপন্যাস'। সীতা দেবী, শান্তা দেবীর বই-এর নাম আগেই বলেছি। হেমেন্দ্রকুমার রায় 'যখের ধন' লিখে চিত্তজয় করলেন। লীলা মজুমদার-এর 'দিনে দুপুরে', অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'ডাকাতের হাতে', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'পদ্মরাগ বুদ্ধ', 'ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি', পড়ে অনাবিল কৌতুক, অবিমিশ্র রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নীল পাখী' কিছু জানা কিছু না জানার আশ্চর্য আনন্দ আনে। 'বিচিত্র জগৎ'-এ বিভূতিভূষণ নতুন পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করান। রহস্য ও অলৌকিক, রাতে যাদের নাম করতে নেই, তারা বোধ হয় এই সময়েই ছোটদের সাহিত্যে প্রথম প্রবেশ করে। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় অন্তত ছটি অবিস্মরণীয় গল্প লেখেন। নিশিতে ডেকে যে ছেলেটাকে তার বন্ধু সুরো-র কাছে নিয়ে যায় সেই বিনুর কথা, আর যখে পাওয়া এক অবোধ বালকের আত্মা, যে শুধু পৃথিবীর শিশুদের সঙ্গ চায় তার গল্প। হেমেন্দ্রকুমার এই অলৌকিকের রাজ্যে অনেকদিন পর্যন্ত রাজত্ব করে গেছেন। 'যখের ধনে' সেই ঈশানের গল্প পড়ে কার বুক কাঁপেনি, 'কঙ্কাল সারথি', 'মানুষ পিশাচ' এবং রাঘবের মৃত্যুর গল্প পড়ে কোন বালকবালিকা না ভয় পেয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'ল্যাজকাটা টিকটিকির গল্পে আর এক জাতের রহস্যময় পরিবেশ আনলেন। শৈলজানন্দ কয়লাখনির প্রতিবেশে রহস্যকে প্রতিপালন করলেন। হাস্যকৌতুকের অনাবিল স্ফূর্তি আনলেন শিবরাম চক্রবর্তী। তাঁর অশ্বিনী ডাক্তারের পটলতোলার কাহিনী, পঞ্চাননের সেই একক ও অনন্য ঘোড়া-র গল্প পড়ে চেঁচিয়ে হাসা গেল। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বিভিন্ন ও বিমিশ্র রসের গল্প পরিবেষণ করলেন। অনন্য দুই বই, প্রিয়ম্বদা দেবীর 'অনাথ' এবং তেজেশ সেনের 'কুড়োন ছেলে' সেইদিনের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীতে অনেক উদ্যমে আবিষ্কার করেছিলাম। এই বই দুটি এখন পাওয়া যায় কিনা জানি না। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'শিশু ভারতী' এবং বাংলাদেশের রাজা-

রাজাড়া, বারভূঁইয়া, হার্মাদ ও দস্যুদের গল্প-কাহিনীও সমসাময়িক।

যেসব বই কখনোই ছোটদের জন্য লেখা নয়, অথচ যার মধ্যে শিশুদের আনন্দ সংগ্রহের অনেক সঞ্চয় লুকিয়ে আছে, সেইসব বইয়ের কথা মনে করতে গেলে সবচেয়ে আগে 'পথের পাঁচালী'র কথা মনে হয়। বিভূতিভূষণের সৃষ্ট সেই চিরশিশু-র যুবাজগৎ ছোটদের হৃদয়ে বহু অনুভূতির দ্বার একসঙ্গে খুলে দিতে পারে বলে-ই আমি বিশ্বাস করি। তারপরেই মনে পড়ে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীচরিত্র', 'পল্লী-বৈচিত্র্য'। বাংলাদেশের পালাপার্বণ উৎসবের কথা তিনি নিরলংকার ভাষায় সহজ ক'রে বলতে জানতেন। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী', আত্তাধারী মশায়ের গল্প, যিনি ভূমিকম্প করান তাঁর গল্প, 'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি' এসব গল্প পড়েও আমরা প্রচুর আনন্দ পেতাম। 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' এসব বই ত' আমরা মূলসংস্করণই পড়েছি। তখনও সবকিছুর সুলভ শিশু-সংস্করণ করবার হিড়িক পড়েনি। ছোটদের জন্য সবকিছুই সহজপাঠ্য ক'রে উপস্থাপিত করবার পক্ষে হয়ত অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু যারা সেই সহজ ও সরলীকৃত সংস্করণ পড়ে তারা পরে মূল বই পড়তে চায় না। অতিসরল অতিপ্রাঞ্জল ভাষা পড়তে পড়তে মূল বই-এর ভাষা সম্পর্কে ভয় জন্মায়। কোন মতে গল্পাংশটুকুই জানতে পারে তারা, মূল বইয়ের ভাষা ও লেখনভঙ্গীর বিশিষ্টতা, যে বিশিষ্টতা সেই বই-এর লেখকের একক চরিত্রকে প্রকাশ করে তার সঙ্গে তাদের পরিচয়ই হয় না। এসব বই ছোটদের নয়। এই যুক্তির বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ-ই শেষকথা বলে গেছেন, যা তাদের পাবার সেটুকুই ছোটদের চিত্ত আহরণ করে, বাকিটুকু তারা ফেলে যায়।

আমাদের অগ্রজদের অনেকেই এখনো লিখছেন।

এ যুগের ছোটরা অন্নদাশঙ্করের অনন্য ছড়াগুলি পেয়েছে, লীলা মজুমদারের কলম এখনো সজীব ও প্রাণবন্ত, সায়েন্স ফিকশান-এ তারা প্রেমেন্দ্র মিত্রের অদ্বিতীয় ঘনাদা-কে পেয়েছে। কিন্তু আরো কতিপয় নাম ব্যতিরেকে সর্বত্র সুলভ কমিক, সস্তা অ্যাডভেঞ্চার, এবং রুচিবিকৃতির ছড়াছড়ি। এ যুগের শিশুদের কাছে পৃথিবীর ভূগোল সংকুচিত। কাছের এভারেষ্ট এবং দূরের চাঁদ-ও মানুষের অদম্য উদ্যমের কাছে পরাজিত। অনাবিষ্কৃত জগতে আর রোমান্স থাকছে না। আজ বাংলা সাহিত্য ক্রমেই ঐশ্বর্যশালী হচ্ছে। কিন্তু ছোটদের সম্পর্কে আজকের লেখকরা কি সেই দায়িত্ব অনুভব করেন? ছোটদের বই খুলে যখন দেখি সুন্দরবনে ভয়ংকর নরখাদক জাতির সঙ্গে হীরক-সন্ধানীরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করছেন, অথবা রহস্যময় হত্যাকাণ্ড ভেদ করতে গোয়েন্দা ও তৎপ্রণয়িনী যুক্ত অভিযানে চলেছেন তখন দুঃখ বোধ করি। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'বাংলা শিশু-সাহিত্য' (সাহিত্য-চর্চা) প্রবন্ধে যদিও বলেছেন, এই রুচিবিকৃতি এ যুগের লক্ষণ এবং বাংলার শিশু-সাহিত্য আবার একদিন পূর্বজদের সৃষ্ট ঐতিহ্যের যোগ্য হতে পারবে, তবু মনে হয় তাঁর সে প্রবন্ধের পরও ত দশ বছর কাটলো। পাঠোদ্ধারের সময়েই যাদের রুচি গঠিত হতে পারল না তারাই ত' উত্তরকালের পাঠকসমাজ। পাঠকদের বহুলাংশের রুচির মান অধোগামী এবং সেই সঙ্গে বয়স্ক পাঠ্য সাহিত্যে গল্প উপন্যাসের মান ও নামছে। ঐ ধরনের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়।

সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, পাঠকদের নিয়ে আলোচনা হয় না। ভালো লেখার পাঠক নিশ্চয় বেড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আপাত উপভোগ্য বইয়ের পাঠক-সংখ্যাই বেশী। এ সমস্যা আজ পশ্চিমেও। সেখানে ও কমিক অপ্রতিরোধ্য ভাবে হানা দিচ্ছে। হ্যান্স অ্যান্ডার্সন, লুইস ক্যারোল, এডওয়ার্ড লীয়র এবং গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের বদলে, দুষ্টু ছেলে পেনরড ও উইলিয়মের দেশে, রোমাঞ্চকামী গালিভার, রবিনহুড ও রবিনসন ক্রুশোর দেশেও আজ সহজপাঠ্য কমিক শিশু-সাহিত্যের ওপর একাধিপত্য করতে পারছে।

আমাদের দেশে-ও তার ধাক্কা লেগেছে। রুচির গোড়াপত্তন শৈশবে। আজকের শিশু সাহিত্যের পাঠক-ই উত্তরকালের পাঠক-সমাজ। সাহিত্যে বহুলাংশে অধোগামিতা সত্ত্বেও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে সুধীসমালোচক শংকিত হন। তাঁরা বয়স্ক পাঠকের কথাই ভাবেন, অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের কথা ভাবেন না। পাঠকসমাজ আজ-ও নাবালক এ ধরনের আক্ষেপও মাঝে মাঝে শোনা যায়। সাহিত্য নিয়ে যখনই সমালোচনা হয় তখনই নাম অনুক্ত থাকলেও পাঠক সে আলোচনার অংশভাক হন। কেননা সাহিত্য পাঠককে নিয়ে পাঠকেরই জন্য। শিশু ও বালক-পাঠ্য সাহিত্যের সংক্রামক ও ব্যাপক অধোগামিতা নিয়ে আলোচনা হবার প্রয়োজন। অন্ততঃ পাঠকের রুচি সম্পর্কে, তা বাদ দিয়ে আলোচনা করা সঙ্গত নয়। বাংলা-সাহিত্যে বহু গুরুত্বের ও মূল্যবান পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও অধিকাংশ পাঠক কেন শুধুই গল্প-সন্ধানে তৃপ্তি খোঁজেন তার উত্তর বহুলাংশে গত দশ-পনেরো বছরের ছোটদের সাহিত্যে খাতখানে নিহিত আছে।

॥ জাপান ॥

জাপান সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, জাপান ভাষা-বিকাশের দেশ। জাপানে লেখন-ভাষার অস্তিত্ব যে বহু শতাব্দী থেকেই ছিল তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি জাপানে শুরু হয়েছে মেইজী যুগ (১৮৬৮—১৯১২) থেকে। আধুনিক সোয়া যুগের শুরু ১৯২৬ থেকে। পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে জাপান অন্যতম, মাত্র ৩৫২,৫০৮ বর্গ কিলোমিটারে প্রায় দশ কোটির মত লোক বাস করে। প্রগতির দিক দিয়েও বিচার করলে দেশটি এশিয়ার মধ্যে সব চেয়ে সমৃদ্ধিশালী। জাপানীদের জীবন-যাত্রার মানও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬০ সাল এই এক বছরে জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় শতকরা ২৯ ভাগ। জাপানের বর্তমান ক্রমপরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে পুস্তক-প্রকাশন ব্যবস্থাও বদলে যাচ্ছে তাড়িৎ গতিতে। জাপানে প্রকাশিত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকার সংখ্যা যে অবিশ্বাস্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে নীচের পরিসংখ্যান থেকেই তার কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে :

১৯৫৩ সালে মোট ৭৭,২৯০,০০০ ইয়েনের বই বিক্রী হয়েছে। ১৯৬০ সালে মোট বিক্রীত পুস্তকের মূল্য দাঁড়ায় ১৮৪,০১৪,০০০,০০০ ইয়েন। অর্থাৎ সাত বছরে দু গুণেরও বেশী মূল্যের বই বিক্রী হয়েছে সমগ্র জাপানে। বিদেশ থেকেও জাপানে প্রচুর বই আমদানী হয়। জাপানী পুস্তক আমদানী সমিতি মারফত সমস্ত বই আমদানী হয় দেশে। আমদানীকৃত বই-গুলির মধ্যে বেশীর ভাগই বিজ্ঞান-গ্রন্থ। আমেরিকা থেকেই বেশীর ভাগ বই আমদানী হয়। কয়েকটি আমেরি-কান প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ইংরেজী বইয়ের জাপানী সংস্করণও প্রকাশিত হচ্ছে ইদানীং। এবং এই 'জাপানী'-আমেরিকান বইগুলো দামে মূল গ্রন্থের অর্ধেক। খুব সস্তা হবার ফলে দক্ষিন-পূর্ব এশীয় দেশগুলিতেও জাপানী সংস্করণের মার্কিনী বইগুলি জাপান থেকে রপ্তানী হয়। জাপানী প্রকাশকদের নিজস্ব ইংরেজী প্রকাশনাও আছে, তবে প্রকাশিত বইগুলি সবই জাপানী বিষয়ের ওপর, যেমন জাপানের চা-উৎসব, জাপানী ফুল-সজ্জা প্রভৃতি।

	বই	পত্র-পত্রিকা
১৯৫০ ...	১২০,০০০,০০০	২৯০,০০০,০০০
১৯৬০ ...	২১১,০০০,০০০	১,০৮৮.৪৮০,০০০
শতকরা বৃদ্ধি ...	১৭৫·৮%	৩৭৫·৩%

পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় জানা গেছে সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকার জন্ম-হার ১৯৫৮ সালে হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছিল, ১৯৫৮-৫৯ সালের সমগ্র প্রকাশনার শতকরা ৬০ ভাগ ছিল এই সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রকাশনা-জগতের আর্থিক দিকটার দিকে তাকালে দেখা যাবে

বিদেশী পত্র-পত্রিকাও জাপানে প্রচুর আমদানী হয়। প্রায় পাঁচশটি পত্র-পত্রিকা বিদেশ থেকে আসে জাপানে। এদের মধ্যে আমেরিকান ম্যাগাজিনের প্রতি-পত্তিই সবচেয়ে বেশী। জাপান থেকেও ইংরেজীতে দশটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

জাপানে গ্রন্থ-বিক্রয়ের প্রথাটা একটু অন্য রকম। প্রকাশকরা তাঁদের প্রকাশিত বইগুলি সরাসরি দোকানে পাঠান না। বিভিন্ন দোকানে বইগুলি যায় ডিস্ট্রি-বিউটার মারফত অনেকটা আমাদের দেশের চলচ্চিত্র ব্যবসার মত। বর্তমানে জাপানে প্রায় একশটি মধ্যবর্তী পুস্তক-বিতরণকারী সংস্থা আছে, এঁরা প্রায় জাপানের ২৩০০ প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাদি বিভিন্ন বইয়ের দোকান মারফত বিক্রয় করেন।

॥ ইরান ॥

ইরানের মোট জনসংখ্যা এক কোটি নব্বই লক্ষের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক কৃষিজীবী। তাদের জীবনযাত্রার মানও নীচু বলে নিরক্ষর-তার হারও ইরানে খুব বেশী। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাও তেমন উন্নত না। যদিও প্রাথমিক শিক্ষা আইন করে বাধ্যতা-মূলক করা হয়েছে তথাপি উপযুক্ত স্কুলের অভাবে চল্লিশ লক্ষ স্কুলে-পড়ার-বয়সী ছেলেদের মধ্যে মাত্র দু লক্ষ শিশু স্কুলে পড়তে পারে। বলা বাহুল্য এই অবস্থার মধ্যে কোনো দেশেরই গ্রন্থ-প্রকাশনী উন্নত স্তরের হতে পারে না। ইরানের পুস্তক-ব্যবসাও ব্যবসার দিক দিয়ে লাভজনক ত নয়ই, সম্মানের সারিতেও পুস্তক-ব্যবসাকে বসায় না কেউ। এবং ইরানে যারা পুস্তক-ব্যবসায় নিযুক্ত তাদের মধ্যেও শিক্ষিত লোকের অভাব ইরানের গ্রন্থ-জগতকে সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে ফেলেছে। যে বই প্রকাশ করলে অশু অর্থযোগ হবে না তেমন

বই সাধারণতঃ ইরানের প্রকাশকরা প্রকাশ করতে চায় না। ফলে সদ্‌গ্রন্থের বদলে সস্তা বই প্রকাশের দিকেই তাঁদের বেশী ঝোঁক। এবং প্রকাশকরা সংগঠিত না হবার ফলে একটা প্রগতিমূলক গ্রন্থ-প্রকাশ নীতিও গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ইরানে বাইরে থেকে অবশ্য বেশ কিছু বই আমদানী হয়। কিন্তু তার কোনো প্রভাব প্রাদেশিক বা জাতীয় ভাষা বা সাহিত্যে পড়ে না। ইংরেজী, ফরাসী এবং জার্মান ভাষার বই, পত্র-পত্রিকা, খবরের কাগজ আসে ইরানের বইয়ের বাজারে। কিন্তু এই সব বই মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের দ্বারাই ব্যবহৃত হয় শুধু. দেশের সাধারণ মানুষ বিদেশী ভাষা-রসে বঞ্চিত হওয়ার ফলে তাদের পুস্তকেচ্ছা স্বভাবতঃই আমদানী-কৃত বইয়ে মেটে না। তবে বিদেশী বইয়ের আমদানীর ফলে ইরানের অনুবাদ সাহিত্য কিছুটা উন্নত হয়েছে। যে সব শহরে বা গ্রামে শিক্ষিতের হার অপেক্ষাকৃত বেশী সেখানে এই অনুবাদ-গ্রন্থগুলি মোটামুটি বিক্রী হয়। ইরানে পাঠ্য পুস্তক বাদ দিলে বছরে ৮০০টি নতুন বই প্রকাশিত হয়. এই বইগুলির অধিকাংশই অনুবাদ-গ্রন্থ। এক একটি অনুবাদ-গ্রন্থ দু থেকে তিন হাজার কপি বিক্রী হয় যদিও এতে সময় লাগে দু বছরের বেশী। বিভিন্ন বিষয়ের অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করে ইরানের প্রকাশকরা আর্থিক দিকে অপেক্ষাকৃত লাভবান হতে পারেন তাই ইরানে আজ-কাল অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ইরানের গ্রন্থ-জগৎ অনুন্নত হলেও মুদ্রণবিভাগে ইরান সুদক্ষ। যে কোনো ধরনের বই-ই ইরানে স্বচ্ছন্দে মুদ্রিত হতে পারে। অবশ্য বছরের অধিকাংশ সময়েই ছাপাখানা-গুলোকে বসে থাকতে হয় বইয়ের অভাবে।

সমগ্র দেশে পুস্তক-বিক্রেতা আছে মাত্র ৩০০টি। এদের মধ্যে দশজন ব্যবসায়ী পাইকারী হারে বইয়ের কেনা-বেচা করে। ইরানে পুস্তক বিক্রয়-প্রণালী একেবারেই অনাধুনিক। গ্রামা-ঞ্চলে বই বিক্রী করার লোক নেই, যে সব বইয়ের চাহিদা খুব বেশী সে সমস্ত বই লোকে গ্রামের মুদীর দোকান থেকে কেনে। সরকার পক্ষের সঙ্গে ইরানের প্রকাশক-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ নানা কারণেই তিক্ত। সরকার পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করাতে প্রকাশকরা স্বভবতঃই ক্ষুব্ধ, কারণ এক-মাত্র পাঠ্য পুস্তক দ্বারাই সেখানকার প্রকাশকরা লাভবান হতে পারেন। ইরানের একটি চরম সরকারী ঔদাসীন্য হল কপি-রাইট আইনের ব্যাপারে। ওদেশে কপি-রাইট আইন কঠোরভাবে পালিত হয় না। ফলে প্রকাশক এবং লেখকরা তাঁদের প্রকাশিত এবং লিখিত রচনার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাঁদের সর্বদাই কুম্ভীলক ভয়ে ভীত থাকতে হয়। একটি বিষয়ে শুধু ইরান সরকার পুস্তক ব্যবসার প্রতি সদয়। বই পাঠানোর ডাকখরচ অন্যান্য ডাক-বাহিত সামগ্রীর অর্ধেক। ইরানে খুব কম খরচে ডাকে বই পাঠানো যায়, সম্ভবতঃ এদিক দিয়ে ইরান পৃথিবীর অনেক দেশের পথপ্রদর্শক হতে পারে।

॥ পাকিস্থান ॥

উনিশশো পঞ্চাশ থেকে উনিশশো ষাট এই দশ বছরে পাকিস্থানের জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার হল ২৩·৭%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেমন বেড়েছে জীবনযাত্রার মানও তেমনি কমেছে পাকিস্থানে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনার পর্যায়ে পাকিস্থানের জীবন-যাত্রার মান জনপ্রতি ২·৩% হারে কমেছে। নিরক্ষরতার হার পাকিস্থানে আজো শোচনীয়। পূর্ব পাকিস্থানে শতকরা ১৭·৬ জন লোক অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন, পশ্চিম পাকিস্থানে এই হার আরো কম শতকরা ১১·৭ জন মাত্র। এমন কি করাচীর মতন শহরেও অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্নের হার শতকরা ৩১·৩ জনের বেশী নয়। একদিকে নিরক্ষরতা, অপর দিকে অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রা, এই দুই বন্ধনীর মধ্যে পাকিস্থানের পুস্তক-প্রকাশন ব্যবসা আবদ্ধ। একটি

১৯৫৪ সালের বুক ডেলিভারী অ্যাক্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রকাশিত সমস্ত বইয়ের তিন কপি ভারতবর্ষের তিন জায়গায় পাঠাতে হয়—কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বম্বে। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে উক্ত আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত পুস্তক সংখ্যা থেকে ভারতবর্ষের পুস্তক প্রকাশনার একটা মোটামুটি ছবি পাওয়া যায়। প্রাপ্ত পুস্তক অনুসারে জানা গেছে দিল্লী থেকে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ভাষা হিসেবে ইংরেজীর স্থান প্রথম, হিন্দী দ্বিতীয় এবং বাংলা তৃতীয়।

	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত বই	২৪৮৫৬	১৮৮২৭	২১০৭৩
দিল্লী থেকে প্রকাশিত বই	৬৭৫৫	৪১৯১	৩৮২৪
ইংরেজী বই	১০৫৮৫	৮৯২৪	৯৩৬১
হিন্দী বই	৩৭৫১	২৬০০	২৮০৫
বাংলা বই	১৭৫০	১৩২২	২০৪৩

সাম্প্রতিক হিসেব থেকে দেখা গেছে যে পুস্তকপাঠে সক্ষম পাকিস্থানীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোকেরই পুস্তক ক্রয়-ক্ষমতা নেই। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৪৫ থেকে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী বই কিনে পড়তে পারেন না। গ্রন্থাগারের ওপরেই তাঁদের মুখাপেক্ষী নির্ভর করতে হয়।

পাকিস্থানে পুস্তক-প্রকাশন ব্যবসার প্রধান অন্তরায় কাগজ উৎপাদনের স্বল্পতা। বাইরে থেকে কাগজ আমদানী পাকিস্থানে নিষিদ্ধ। দেশীয় মিলে উৎপন্ন কাগজের দাম বিদেশী কাগজের তুলনায় দু-তিনগুণ এবং গুণগত দিক দিয়েও পাকিস্থানে উৎপন্ন কাগজ সর্বাংশে নিকৃষ্ট। সুতরাং পাকিস্থানী প্রকাশকরা প্রায়শঃই মুদ্রণযোগ্য কাগজের দুর্মূল্যতার দরুন পুস্তকপ্রকাশে উৎসাহী হতে পারেন না। পাকিস্থানকে তাই একান্ত বাধ্য হয়েই স্কুল-কলেজ পাঠ্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা-গ্রন্থ আমদানী করতে হয়। বিদেশী পুস্তকের প্রায় ৭৫% বিজ্ঞান এবং কারিগরী গ্রন্থ। পাকিস্থানে বছরে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার বই বিদেশ থেকে আসে, কিন্তু দেশের প্রয়োজন বছরে এক কোটি টাকার বই। সাধারণ পাঠকদের জন্য কিছু কিছু বইও আসে বিদেশ থেকে, যেমন ১৯৬০ সালে পাকিস্থানে সাধারণ পাঠকদের জন্যে একুশ লক্ষ টাকার বই আমদানী হয়েছে।

পাকিস্থানে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলিত না হওয়া পর্যন্ত সঠিক হিসেব পাওয়া যাবে না। তবে আনুপাতিক হিসেবে দেখা যায় গত দশ বছরে পাকিস্থানে প্রায় দু হাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থগুলির এক-তৃতীয়াংশ হল উপন্যাস এবং ধর্ম-গ্রন্থ। গড়পড়তা প্রতিটি বইয়ের কাটতি হয় এক হাজার থেকে দু হাজার কপি।

পাকিস্থান সরকার দেশের পুস্তক-প্রকাশন ব্যবসার উন্নতিকল্পে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সরকারের পৃষ্ঠপোষণায় পাকিস্থান প্রকাশক এবং পুস্তকবিক্রেতা সমিতি গঠিত হয়েছে। সমিতিটি তিনটি আঞ্চলিক শাখায় বিভক্ত, ঢাকা, লাহোর এবং করাচী। পাকিস্থানের সমস্ত প্রকাশক এবং পুস্তকবিক্রেতারা এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত। এই সমিতি সম্প্রতি গ্রন্থমূল্য, রয়েলটির হার, কমিশন ইত্যাদির একটি সর্বজনগ্রাহ্য নীতি স্থির করেছেন। পাকিস্থানের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মুদ্রণ-শিল্প এবং গ্রন্থ-প্রকাশনাকে বিশেষ স্থান দেয়া হয়েছে। কিন্তু একটি সরকারী নীতি দেশের পুস্তকপ্রচারের অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বছর ১-১-৬১ থেকে পাকিস্থানের বুক-পোস্টের ডাকমাশুল বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রতি বইয়ের ডাকখরচা শতকরা পঞ্চাশ টাকা বেড়ে গেছে। এতে দেশের মধ্যে পুস্তক-চলাচলও ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে।

॥ সিংহল ॥

সিংহলের বই-পড়ুয়া-সমাজের বয়েস খুব বেশী না। সিংহলের জাতীয় ঐতিহ্যে শ্রুতিনির্ভর পাণ্ডিত্য, অধীত বিদ্যার চেয়েও সম্মানিত, ফলে পঠন-পাঠনের পশ্চিমী অভ্যাসে সিংহলীরা আজো তেমন রপ্ত হইতে পারেনি। দ্বীপটিতে নিরক্ষতার হার অত্যধিক বেশী এবং পাঠ্যবস্তুর সংখ্যাও সেই অনুপাতেই কম। ১ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ত্রিশ লক্ষ দ্বীপবাসী অক্ষর চেনে। কিন্তু এই ত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র দশ লক্ষ সক্রিয় পাঠকও পাওয়া যাবে না। এই জন্যে শিক্ষাব্যবস্থার দৌর্বল্যও অনেকাংশে দায়ী। সরকারী চাকরিকে কেন্দ্র করেই সিংহলের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো রচিত। ফলে সিংহলের শিক্ষাজগৎ পাঠ্য পুস্তকের প্রাচীরের মধ্যে আজো অন্তরীণ। এমনকি সাহিত্যও শুধুমাত্র একটি পাঠ্যভুক্ত বিষয় হিসেবে চর্চিত, সাহিত্যের অন্য কোনো বাস্তব সিংহল দ্বীপে নেই। সম্প্রতি সরকার পক্ষ থেকে দ্বীপবাসীদের সাহিত্য-সচেতন করবার প্রচেষ্টা চলছে। সরকার কর্তৃক আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী "সাহিত্যদিবস" পালনের আয়োজন উক্ত প্রচেষ্টার একটি প্রশংসনীয় প্রমাণ।

তিনটি ভাষার অস্তিত্ব সিংহলের পুস্তক-ব্যবসাকে গভীর জটিলতার মধ্যে ফেলেছে। এতদিন যাবৎ এবং এখনো ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই স্কুল-কলেজের শিক্ষানুশীলন চলছে। কিন্তু ইদানীং তামিল এবং সিংহলী ভাষা শিক্ষা-বিস্তারের অন্যতম ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। দেশের প্রশাসনিক কাজ আরম্ভ হয়েছে ইংরেজীর পরিবর্তে সিংহলী

কয়েকটি দেশের অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশনী : ১৯৫৯

বিশ্বের কয়েকটি প্রধান প্রধান দেশের অনুবাদ-গ্রন্থের সংখ্যা বিষয়ানুযায়ী নিম্নে প্রদত্ত হল।

বিষয়	* ভারতবর্ষ	জাপান	ইংল্যাণ্ড	আমেরিকা	সোভিয়েট দেশ	ফ্রান্স	পশ্চিম জার্মানী
সাধারণ	২	৪	২	৪	১৬	৫	৪
দর্শন, মনস্তত্ত্ব	১১	৩২	১৬০	৫১	২০	৮৬	৮১
ধর্ম, ঈশ্বরতত্ত্ব	১৯	৩৯	১২৮	২০৭	৩৪	১৪০	১৪০
আইন, সমাজ-বিজ্ঞান, শিক্ষা	৩০	১৭৯	৩৫	৭৫	৮৭৮	৫৭	১১৩
ভাষাতত্ত্ব	৫	১৬	২	৪	২	...	৩
প্রকৃতি বিজ্ঞান	২৪	৭২	৫২	৮৩	৩১৮	৭৫	৮৯
ফলিত বিজ্ঞান	২৮	৮৩	৪৬	৬৭	৭২১	৯১	৭৪
শিল্প, খেলাধূলা	৪	৭৩	৭৫	৮৩	৭৯	৪৮	৮৭
সাহিত্য	৩৩৮	৩৬০	২৭৬	৩৮৬	২২৬৩	৮০৬	১২৮০
ইতিহাস, ভূগোল ও জীবনী	২০৯	৬৫	১২২	১৮৬	৩২৮	১৫২	১৭৭
	৬৮৩	১১০৩	৭৩৪	১১১০	৫২৩৪	১৪৬০	২০৬৮

* ভারতবর্ষে ১৯৫৯ সালে মোট প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ১১৯৭৯। বাংলা ভাষায় ১৯৫৯ সালে ৭৪টি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, মারাঠি ভাষায় হয়েছিল ৩১টি এবং হিন্দীতে ৪৯টি।

ভাষায়। ফলে পুস্তক-প্রকাশকদেরও একাধিক ভাষায় একই বই প্রকাশের কথা ভাবতে হচ্ছে। ইংরেজীর ক্ষেত্রে অবশ্য সমস্যাটি অত জটিল না, কারণ আমদানি করেই ইংরেজী বইয়ের চাহিদা মেটানো সম্ভব। আসল অসুবিধা দেখা দিয়েছে স্থানীয় ভাষা দুটি নিয়ে। আগে যেখানে একটা ভাষাতেই বই প্রকাশ করা চলত, এখন তার পরিবর্তে দুটি ভাষায় গ্রন্থ-বেশী না। লেখকরা সাধারণত পত্র-পত্রিকার দরজা দিয়েই সাহিত্যের আসরে ঢোকেন, কিন্তু সিংহলে সত্যিকারের সাহিত্য পত্রিকা বলতে গেলে একটিও নেই।

এতদিন পর্যন্ত সিংহলে মুদ্রাকর এবং প্রকাশকগোষ্ঠীর কোনো আলাদা অস্তিত্ব ছিল না। কিছু কিছু প্রেস-মালিক প্রেসের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ-সিংহল সরকার প্রণয়ন করতে পারেননি। সরকার রেলমাশুল এবং ডাক-মাশুল না কমিয়েও পুস্তক-ব্যবসার সমূহ সর্বনাশ ডেকে এনেছেন।

অবশ্য গ্রন্থ-জগতের প্রসারের জন্যে সিংহলে কিছু কিছু সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হয়েছে। সম্প্রতি ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ সোসাইটি গ্রন্থ-প্রকাশনার মানবৃদ্ধির জন্যে অক্লান্ত কাজ করছেন। গ্রন্থ-

এশিয়ার কয়েকটি দেশের পুস্তক প্রকাশনী *

	সাধারণ	দর্শন	ধর্ম	সমাজ-বিজ্ঞান	ভাষাতত্ত্ব	বিজ্ঞান	ফলিত বিজ্ঞান	শিল্পকলা	সাহিত্য	ইতিহাস-ভূগোল	বিবিধ		মোট গ্রন্থসংখ্যা
ভারতবর্ষ—	২১৭	১৩৫	১০৩৪	৩৩১০	২৬৯	৫৮২	৩৬০	১৭৭	৩৯৭১	৬৮৬	—	=	১০৭৪১
জাপান—	৩৮৬	৬৩৬	৪৭০	৪০৬২	৮৫১	৮২৩	২৯৬৯	১১৪১	৫৭০৫	১১৫৫	৫৪৮৪	=	২৩৬৮২
সিংহল—	৫	৪০	২৬৯	৭০৮	৪৯	৩৫	১১৩	৭৮	৩৭৩	৯৭	—	=	১৭৬৭
ইন্দোনেশিয়া—	১০	৪৬	৮৬	২৫৬	১১০	১৪৮	১৫৬	৪০	৯১	১৭১	—	=	১১১৪
কোরিয়া সাধারণতন্ত্র—	১৭১	৩৮	৮৫	৩৬০	৮৬	৬৬	৭৩	৭৫	৫০৪	১৬০	—	=	১৬১৮
ইজরাইল—	২৭	২৫	২৪৪	২০৭	৫৬	৪৫	১৮১	৫৫	৪০৩	২৬৪	—	=	১৫৬৭
থাইল্যান্ড—	৯১	৬০	২২০	২৯৫	৯৫	৩৯	৪৪	৫৯	৪৪৬	১২৩	—	=	১৪৭২
ভিয়েৎনাম—	১০	১৪	১০০	৬৪	৮১	১৫২	৬০	১৭১	২০২	৭৮	৪১	=	৯৭৮

* যে সব দেশের ১৯৬০ সালের প্রকাশিত বইয়ের হিসেব পাওয়া গেছে তাদের তালিকাই শুধু প্রদত্ত হল।

প্রকাশ করতে হচ্ছে। তামিল বা সিংহলী যে কোনো একটি ভাষার বইয়ের পাঠক-সংখ্যা সীমিত হওয়ার ফলে বিশেষ কোনো ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ লক্ষ্মী-লাভের সহায়ক হয় না। প্রকাশকরা আবার ইচ্ছে করলেই যে কোনো ভাষায় বইয়ের অনুবাদ করাতে পারেন না, কারণ উপযুক্ত অনুবাদকের সংখ্যাও সিংহলে মুষ্টিমেয়। লেখকের সংখ্যাও তেমন প্রকাশনার ব্যবসাও চালান। কেবলমাত্র পুস্তক-প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করেছেন এরকম প্রকাশকের সংখ্যা সিংহলে বিরল। দেশে বিধিসম্মত গ্রন্থসত্ব আইন না থাকার ফলে গ্রন্থ প্রকাশের উৎসাহ অনেক সময় হতাশার নষ্ট হয়। একটি জনপ্রিয় বই যদি কেউ বিনানুমতিতে ছেপে বার করে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে আদালতের সামনে হাজির করার আইন আজো জগতের উন্নতিকল্পে সরকার ১৯৫ সালে একটি সাহিত্য মণ্ডল স্থা করেছেন। পাঠ্য পুস্তক প্রকাশকের জ 'স্বভাষা' দপ্তর খোলা হয়েছে। ই নেস্কোর তত্ত্বাবধানে সিংহলে "ন্যাশ বুক ট্রাস্ট" স্থাপিত হয়েছে। ন্যাশ বুক ট্রাস্ট বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত এক কমিটি দ্বারা এক ব্যাপক পুস্তক-প্রক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

একালে সকল ভাষার উপন্যাসের রাশিচক্রে একটা দুঃসময় চলেছে। সমালোচকরা ক্রমাগত উঁচুগলায় ঘোষণা করছেন উপন্যাসের ক্রমাবনতি ঘটছে, তার প্রয়োজন শেষ হয়েছে, শিল্প হিসাবে এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে, চিত্ত-বিনোদনের মাধ্যম হিসাবেও তেমন জমছে না। তা ছাড়া উপন্যাস পাঠ করে 'আহার এবং ঔষধ' এই দ্বিবিধ ফললাভ হচ্ছে না, অর্থাৎ নৈতিক জ্ঞান, আত্মিক শিক্ষা বা চিন্তার খোরাক মিলছে না। সমাজ-জীবন গঠনে উপন্যাসের ভূমিকা আজ অকিঞ্চিৎকর ইত্যাদি।

এ যুগের সাহিত্যিকের নাকি ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই, তাঁরা 'মনিব্যাগের' অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ, লেনিন বলেছেন :

"Are you free of your bourgeois publisher, Mister Writer? Of your bourgeois public which demands of you pornography in Novels and Pictures, prostitution in the form of a Suppliment to the holy scenic arts? The Freedom of the bourgeois writer, artist, actress is only a masked (or hypocritically masked) dependence on the money bag, on being bought and maintained."

বুর্জোয়া লেখকদের, বুর্জোয়া প্রকাশকদের, বুর্জোয়া পাঠকদের এই জাতীয় মতিগতির প্রতি লেনিন যে ইঙ্গিত করেছেন, তা যে নিছক কল্পনা তা নয়, কিন্তু যে দেশের লেখকরা লিখে খান এবং খেয়ে লেখেন তাঁদের পক্ষে অন্য কি পথ আছে? অর্থের জন্য লিখতেই হবে, আর সেই অর্থ যাতে বেশী পরিমাণে আসে তার চেষ্টা করতে হবে লেখককে। জর্জ বার্নাড শ এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন অথচ তিনি আ-মৃত্যু মার্কসবাদী ছিলেন। সুতরাং লেখক, শিল্পী ইত্যাদির পক্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতার দুর্গপ্রাকারে আপনাকে আবদ্ধ করে রাখার কাল এ নয়, কিছু পরিমাণে 'মনিব্যাগের অধীনতা সকলকেই মেনে নিতে হবে।

উপন্যাসের প্রয়োজন এ দেশে এখনও শেষ হয়নি, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে ক্রমাবনতি ঘটছে একথা বলার কোনো যুক্তি নেই, উপন্যাস-লেখক ও পাঠক-সম্প্রদায় ক্রমশই বাড়ছে, বিভিন্ন মাসিকপত্রে সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রেওয়াজ হয়েছে, প্রকাশক-সংখ্যাও প্রতিদিন বাড়ছে। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করলে এই উক্তির সমর্থন মিলবে। হেতু যাই হোক, যার প্রয়োজনেই হোক, সৎ, মহৎ এবং বৃহৎ উপন্যাস অনেকগুলি বিগত ১৩৬৮ সনে লিখিত, প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছে, এবং এই কারণে বাঙালী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক মাত্রেরই গর্ববোধের অধিকার আছে।

সাহিত্যকর্মে অবিচল নিষ্ঠা, সদা-জাগ্রত বৈদগ্ধ্য এবং শিল্পজ্ঞানের ফলেই বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস-লেখকগণের পক্ষে এই মর্যাদামণ্ডিত আসন লাভ করা সম্ভব হয়েছে। সব কিছুর মধ্যে ভালো, মন্দ এবং উদাসীন প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, অসংখ্য সৎ উপন্যাসের মধ্যে অনেক সস্তা প্যাঁচের নিকৃষ্ট উপন্যাসও যে প্রকাশিত হয়নি তা নয়, কিন্তু তা অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়।

ইদানীন্তনের উপন্যাস-লেখকের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে সুসংবদ্ধ, সংহত গল্পের দিকে, যেখানে গল্পের স্রোত ক্ষীণ সেখানে আছে গল্পের নির্যাস, সেই নির্যাস সমগ্র উপন্যাসকে একটা সূক্ষ্ম সৌরভে ভরে রাখে। বাংলা উপন্যাসে characterisation এবং over dramatisation-এর একটা পরিহরণীয় প্রবণতা আছে, এটা ট্রাডিশনগত দুর্বলতা, চরিত্রকে সবগুণান্বিত করতে গিয়ে আর্টকে কণ্ঠরোধ করার অনিচ্ছাকৃত অপরাধও দেখা যায়, তবু সামগ্রিকভাবে সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে জীবনের একটা স্থায়ী সত্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টা দেখা যায়। গভীর গতিবেগের সঙ্গে আবার জীবন সম্পর্কে, প্রেম সম্পর্কে বিকৃত রুচির পরিচয়ও পাওয়া গেছে। শূন্যতার আর পূর্ণতার সীমা নির্ধারণ করা যেখানে সহজসাধ্য

নয় সেখানে লেখক শোচনীয়ভাবে বিবর-বিহীন।

এ-যুগের বাংলা উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব-সমাধানের প্রচেষ্টা, সংশয় থেকে নিঃসংশয়তার মাঝে গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা। বর্তমানকালের বাঙালীর জীবনে যে সামন্ত-তান্ত্রিক, ধনিক-তান্ত্রিক ও সমাজতন্ত্র-অভিমুখী চিন্তার তরঙ্গ প্রবহমান সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে তার প্রতিফলন অস্পষ্ট নয়। নিছক কল্পনাবিলাসের মর্বিড মনোবৃত্তি নয়, গভীর মানবিকতাবাদ এবং নয়া-মূল্যবোধের সুকঠিন চিন্তনের সুস্পষ্ট ছাপ সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে পাওয়া যায়। প্রতিভার উজ্জ্বলতম আবির্ভাবে সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত এই সংবাদ বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। দেশের চিত্তভূমিই বাঙালী উপন্যাসকারের আশ্রয়। সমাজ-সচেতন, ইতিহাস-সচেতন বাঙালী উপন্যাস লেখকরা তাই অভিনন্দনযোগ্য।

সৃষ্টিসমুদ্রে অসংখ্য তরঙ্গ, সেই মহাসাগরে অবগাহন করে বাঙালী লেখকরা এক নিরাসক্ত নিস্পৃহতার দীক্ষালাভ করেছেন, তাই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের স্বধর্ম বস্তুনিষ্ঠা, তার মূলরস সহজরস, উদ্ভট বা বীভৎস রসে বাঙালী লেখকের অভিরুচি নেই।

পিকারেস্ক এবং এপিক উপন্যাস রচনার দিকে একটা সাম্প্রতিক ঝোঁক এসেছে। পিকারেস্ক উপন্যাসের কাহিনীভাগ শিথিল অথচ তার ঘটনা হবে চটকদার। পিকারেস্ক উপন্যাস ইদানীং কালে রচনা করেছেন টমাস মান, তাঁর Confessions of Felix Knell উপন্যাসটি আধুনিক পিকারেস্ক উপন্যাসের নমুনা। নায়কের জীবনের প্রথম বিশ বছরের কাহিনী লেখক প্রথম খণ্ডে লিখেছেন, পরবর্তী খণ্ডগুলি আর লেখা হয়নি। পিকারেস্ক উপন্যাসই উপন্যাসে বাস্তবতা এনেছে। সামাজিক জীবনের চিত্র এই জাতীয় উপন্যাস পাঠকের সামনে ধরে দেয়। পিকারেস্ক উপন্যাসের আমদানি হয়ত লেখকের অজ্ঞাতসারেই সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঘটেছে, এ এক শুভ লক্ষণ।

লঘুভাবে আমরা সব রকমের উপন্যাসকেই এপিক বলে বিজ্ঞাপিত করি এবং কিঞ্চিৎ উচ্চাঙ্গের কাহিনী হলে বলি 'ধ্রুপদী' সাহিত্য, অর্থাৎ classic, ক্লাসিকের মর্যাদা দান করাটাও যথেচ্ছভাবে হচ্ছে। একদা স্বর্ণকুমারী দেবীকে প্রকাশক 'বাংলা সাহিত্যের কুইন ভিক্টোরিয়া' বলে বিজ্ঞাপিত করতেন। এই জাতীয় প্রচার নিরর্থক। এতে উপন্যাসের চরিত্রগত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। মহৎ উপন্যাস যদি এপিক বা ক্লাসিক না হয় তাহলে কি তার মর্যাদাহানি হয়? এই প্রসঙ্গে টিলিয়ার্ডের উক্তি স্মরণীয় ঃ

"In the easy and fluid medium of prose-fiction it is a lack of intensity that so often presents itself as the reason why a work admirable in other ways cannot be considered as an epic."

বৈচিত্র্য ও দুঃসাহসে সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস যে এক প্রশংসনীয় শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে একথা বলার দিন নিঃসন্দেহে সমাগত। নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নে বাংলা উপন্যাস যে আজ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত এ কথা স্বীকার করতেই হবে নিরপেক্ষ সমালোচককে। এ যুগের কান্নাকে বর্তমানের উপন্যাসে যে বাঙালী লেখকরা ধরে রাখতে পেরেছেন, সেখানেই তাঁদের কৃতিত্ব।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে প্রবীণ লেখকরা তাঁদের পরিণত মানসের পরিচয় দিয়েছেন, মধ্যবয়সী জনপ্রিয় লেখকরা শক্তিমত্তার ও নূতন চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের রচনায়, আর অপেক্ষাকৃত যাঁরা নবীন তাঁদের সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাসে শিল্প-মহিমা ও নিরলস নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের সমগ্রতাকে রূপায়িত করার চেষ্টা তাঁরা করেছেন।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস তাই সাহিত্য-পাঠকের কাছে আশা ও আনন্দের কারণ হয়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রাঢ় অঞ্চলের মানুষ। আঞ্চলিকতাধর্মী কাহিনী পরিবেশনে এ কালের তিনি অগ্রণী লেখক। গ্রামীণ মানুষের দুর্জয় প্রাণশক্তি, গভীর হৃদয়াবেগ এবং স্বাভাবিক প্রেম-পিপাসা তাঁর গল্প-উপন্যাসে রূপায়িত। ১৩৬৮তে তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন। লেখকের সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের পটভূমিতে রচিত 'সারারাত' উপন্যাসটিতে শঙ্কর চরিত্রটি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। সে নির্ভীক, দুঃসাহসী, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী যুব-বাংলার প্রতীক। তাঁর আর একটি উপন্যাস 'রূপং দেহি ধনং দেহি', সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী আমল এবং তার পরবর্তী অবক্ষয়ের চিত্র এই উপন্যাসে রূপায়িত। জমিদার টেটরামের দ্বিতীয়পক্ষের সন্তান রামকানাই চরিত্রটি অনেকের কাছেই পরিচিত মনে হবে।

'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথার' লেখক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক রচনার সমালোচনা প্রসঙ্গে জনৈক লেখক বলেছেন যে, তাঁর হাল আমলের যে কোনও উপন্যাস পড়লেই ব্রাউনিং-এর 'লস্ট লীডার' কবিতাটি মনে আসে' ইত্যাদি। তারাশংকরের নাগরিক জীবনভিত্তিক আধুনিক রচনা 'উত্তরায়ণ', 'যোগভ্রষ্ট' এবং 'বিপাশা'র মধ্যে তিনি 'শিল্প প্রবঞ্চনা' লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য এ সব বক্তব্য নিছক 'ম্যাটার অব অপিনিয়ন'। তারাশংকর অনেক ছবি এঁকেছেন, নানা রঙে এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে, তাঁকে চিরকালই এক ছবি একই ছকে আঁকতে হবে এমন কোনও কথা নেই, শিল্পে পুনরাবৃত্তির আধিক্য ঘটলে সেটা ত্রুটি বলে বিবেচিত হবে। পিকাসোর ছবি যেমন বিভিন্ন 'পিরিয়ডে'র মেজাজে বিভক্ত, তারাশংকরের রচনার হাল আমলের মেজাজ একটি পিরিয়ডের

লক্ষণ। এই উপন্যাসগুলিতে তাঁর নিত্য-পরিবর্তনশীল শিল্পী-মানসের ছাপ রয়েছে। তারাশংকর দীর্ঘাকৃতি উপন্যাস বেশী লিখেছেন, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসের আয়তন ক্ষুদ্র, অল্প কথায়, হ্রস্ব ক্যানভাসে তিনি তাঁর পরিণত জীবনের অভিজ্ঞতার ইতিহাস লিখেছেন। এমনই আর একখানি উপন্যাস 'নিশিপদ্ম'—কীর্তনওয়ালী কাঞ্চনমালার জীবনের ট্রাজেডি, তার তরুণী কন্যা মুক্তামালার জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্যে শক্তিমান লেখক এক চমকপ্রদ ইঙ্গিত রেখেছেন। তারাশংকরের লেখনী আজো অক্লান্ত, তাঁর বিপুলায়তন উপন্যাসের চেয়ে ক্ষুদ্র উপন্যাসে সংগীতের সংহত স্বচ্ছতা পাওয়া যায়। শারদীয়ায় লিখিত তাঁর 'শুক-সারী' উপন্যাস (সম্ভবতঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি) আমার উক্তি সপ্রমাণ করবে।

অনেকদিন পরে করুণ ও মধুর রচনার যাদুকর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "রূপ হোল অভিশাপ" সুবৃহৎ উপন্যাস। গ্রন্থটি তাঁর 'নীলাঙ্গুরীয়'র সমগোত্রীয়।

কবি এবং ছোটগল্পের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র দীর্ঘদিন পরে লিখেছেন নতুন উপন্যাস 'প্রতিধ্বনি ফেরে'। প্রেমেন্দ্র মিত্র আরেকজন লেখক যিনি নিয়ত পরিবর্তনশীল। রূপকল্পে, আঙ্গিক এবং মানসিকতায় তাঁর যে স্বতোৎসারিত স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যায় তার দৃষ্টান্ত বিরল। 'প্রতিধ্বনি ফেরে' উপন্যাসের উমাপতি চরিত্র এক রহস্যময় দুরূহ ব্যক্তিত্বের রূপায়ণ। নায়ক বাংলার এক দুঃস্বপ্নের যুগের প্রতিনিধি, নিজের আন্দামান তৈরী করে তিনি আপনাকে নির্বাসিত করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর 'প্রতিধ্বনি ফেরে'। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যজীবনের এক গৌরবময় পরিচ্ছেদ 'প্রতিধ্বনি ফেরে' উপন্যাসটি। কিসের আশায় আত্মবলিদান করেছেন উমাপতি, সে কি দেশ, না জয়া, না নীরজা। বিপিন ঘোষ, নিশীথ পাত্র ও রামবাবু সবই কি আমাদের অপরিচিত? যে-সূর্যকণা হারায় না, থেকে থেকে জ্বলে ওঠে—'প্রতিধ্বনি ফেরে' তারই অভিব্যক্তি।

আর এক লেখক অন্নদাশংকর রায়। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'সুখ' যেন এক অপরূপ রূপকথা। রাজকন্যা এখানে মালা, দেবপ্রিয় যেন রাজকুমার। এই রূপকথার সংগে রাজনৈতিক পরিবেশের আভাষ দিয়েছেন লেখক, স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে নামিয়ে এনেছেন পাঠককে। বুদ্ধিগ্রাহ্য রচনায় লেখক সংগ্রাম ও সাধনার এক মহৎ সূচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুখ কিন্তু সুখপাঠ্য সহজগ্রাহ্য উপন্যাস নয়।

অচিন্ত্যকুমার এখন আবার লিখছেন প্রচুর। গল্প, উপন্যাস, দিব্যজীবন কথা সর্বত্রই সমান স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাস 'প্রথম কদম ফুলে'র মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম প্রেমের অক্ষয় সংযোগ তিনি বিধৃত করেছিলেন অপরূপ কৌশলে। সেই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে ১৩৬৭-এর শেষের দিকে। 'হিয়ে হিয়ে রাখনু' হয়ত আরও আগে লেখা তবে প্রকাশিত হয়েছে পরে। এক বিয়োগান্তিক প্রেমের কাহিনী 'হিয়ে হিয়ে রাখনু'। আনন্দ তার প্রেমের পাত্রীকে জয় করতে না পেরে মৃত্যুর অন্ধকারে মিশিয়ে যায়। এই উপন্যাসেও অচিন্ত্যকুমারের শাণিত সংলাপ অত্যন্ত উপভোগ্য। অচিন্ত্যকুমারের ভাষাপ্রকরণ বিভিন্ন ধরনের, উপমা, যমক এবং তীক্ষ্ণ বক্তব্যে উপন্যাসটি উপভোগ্য।

ভ্রাম্যমাণ উপন্যাস-লেখক প্রবোধকুমার উপন্যাসের পটভূমি খুঁজতে কিন্তু দূরে যান না। আমাদের আশেপাশে, ঘরের কোণে, পাশের বাড়ি যারা থাকে তাদের কথাই তিনি বার বার লিখেছেন। সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, রোমান্টিক তীক্ষ্ণমধুর প্রেম-কাহিনী পরিবেশনে তাঁর জুড়ি নেই। এই বছর তাঁর দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। একটি 'বিবাগী ভ্রমর' অমৃত-পাঠকদের পরিচিত, অপরটি 'লগ্ন শুভ'। দাম্পত্য-জীবনের বিরোধের ফলে সন্তান সোমেন্দ্র এমন ভাবে গড়ে উঠেছিল যে, জননী তার নাগাল পান না। সরমা দেবীর কৌশল ব্যর্থ হয়েছিল তাঁর স্বামীর বুদ্ধির কাছে, তাই পুত্রবধূ চারুলতাকে অবশেষে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এই 'লগ্ন শুভ' উপন্যাসের মধ্যে যেমন এক-

দিকে আছে মানবিক জীবন-সংঘর্ষ তেমনই অপরদিকে আছে নিরাসক্ত বৈরাগীর সুবর্ণ গৈরিকের আত্মত্যাগী প্রতীক। প্রবোধকুমার রচিত এই উপন্যাসে বৈচিত্র্য আছে, সাময়িক সমস্যাও আছে।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী কম লেখেন। এই বছর তাঁর দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে 'বসন্ত রজনী' ও 'নাগরী'। নাগরী উপন্যাসে অপর্ণার সুমিত্রায় রূপান্তর এবং সুমিত্রার অপূর্বকে সেবা করার জন্য নাগরী জীবনে ইস্তফা দানে ফুটে উঠেছে এক সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। 'বসন্ত রজনীতে' আছে মৃত্যুপথযাত্রী অজয়, বৈষ্ণবী রাধা, স্বামী-পরিত্যক্তা টুলু, আর যে মৃণালের কাছে টুলু আর রাধা আশ্রয় নিয়েছিল সে। প্রতিকূল অবস্থার চাপে মানব-জীবনের কি প্রতিক্রিয়া ঘটে তারই প্রতিফলন আছে এই উপন্যাসে।

মনোজ বসুর সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য রোমাণ্টিক আমেজের সঙ্গে রিয়ালিজমের সংমিশ্রণ। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস, এবং বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট উপন্যাস 'বন কেটে বসত' এই ধারার ব্যতিক্রম নয়। এর আগে 'জল-জঙ্গল-এর' মধ্যে তাঁর যে বৈশিষ্ট্যের ছাপ লক্ষিত হয়েছিল 'বন কেটে বসত' উপন্যাসে তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গগন দাস জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে মাছের ভেড়ীর মালিক হতে হয়েছে, অথচ সে জাতে জেলে নয়। তার সঙ্গে একপাল মানুষ, স্ত্রী বিধবা বোন চারু প্রভৃতি। এই উপন্যাসে মেছো, মেছো-ভেড়ীর দালাল, আড়তদার, হোটেলওয়ালা প্রভৃতি অপূর্ব ফুটেছে। অদ্বৈত মল্ল বর্মন, সমরেশ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকগণের জলযাত্রার কাহিনীর সমগোত্র মনোজ বসুর এই কালজয়ী বিচিত্র উপন্যাস।

এ বছর রবীন্দ্র-পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বনফুলের উপন্যাসকে, নাম 'হাটে বাজারে'। এই উপন্যাস ১৩৬৭-তে প্রকাশিত। 'দুই পথিক' তাঁর আর এক উপন্যাস। ঝড়-জলের রাত্রে দুটি বিচিত্র মানুষের আকস্মিক দেখা ও জীবনানুসন্ধানের বিচিত্র কাহিনী।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রহস্য-কাহিনী রচয়িতা হিসাবে এক ব্যতিক্রম। তাঁর রহস্য উপন্যাসেও থাকে সুস্নিগ্ধ সাহিত্যরস। 'কহেন কবি কালিদাস' এমনই এক সার্থক রচনা। 'অমৃত' পাঠকের কাছে গ্রন্থটি অপরিচিত নয়। তাঁর 'রাজদ্রোহী' চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে লিখিত কাহিনী।

'জরাসন্ধ' আর এক সার্থক লেখক। 'ন্যায়দণ্ডের পর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'পাড়ি' ও 'আশ্রয়'। পাড়ি উপন্যাসের তারা এক বিচিত্র চরিত্র। ধনীর ঘরের সন্তান অদৃষ্টচক্রে তাকে বংশগত ঐতিহ্য ভুলে নতুন জীবনযাপন করতে বাধ্য হতে হয়, বলিষ্ঠ পৌরুষ ও জীবনের কাছে একদিন সে আত্মসমর্পণ করে এবং পরিতৃপ্তি লাভ করে। 'আশ্রয়' উপন্যাসে মানবমনের বেদনা নিবিড় আকুলতার এক অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন লেখক। শুভেন্দুর জীবনের চরম ট্রাজেডি তাই সহজেই মানবমনকে ব্যথিত করে।

প্রবীণ লেখকদের পর্যায়ে আজ সুবোধ ঘোষও উপনীত। সম্ভবতঃ তিনি পঞ্চাশোর্ধ্বে পৌঁছেছেন। তাঁর উপন্যাসাবলীর মধ্যে চিরদিনই একটা নূতন এবং চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এই বছর তাঁর উপন্যাস খুব বেশী প্রকাশিত হয়নি, তিনি লিখেছেন কম। তাঁর 'মুক্তি প্রিয়া' উপন্যাসটির মধ্যে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে। তাঁর প্রেমের উপাখ্যানে আছে লিরিকের মাধুর্য। সুচরিত আর সামন্ত সাহেবের মেয়ে অর্চনাকে নিয়ে এই কাহিনী। কাহিনী-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় আছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'উপনগর' এই বছরে প্রকাশিত হয়েছে। শক্তিমান লেখকের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বিধৃত বিচিত্র কাহিনী এই বৃহৎ উপন্যাস।

বিমল মিত্র 'সাহেব বিবি গোলামে'র বিস্ময়কর সাফল্যের পর আজো তাঁর অসামান্য শক্তির পরিচয় দান করছেন। বিমল মিত্রের জনপ্রিয়তার সিক্রেট তাঁর গল্পকথনের ভঙ্গী। তার মধ্যে এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যা সহজেই পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে। তাঁর উপন্যাস 'নিশিপালন' তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। জয়ন্তী, সবিতা ও বনলতা। চরিত্রগুলি যেন তিনি পাথর কেটে খোদাই করেছেন। এরা তিনজনই সংসার করতে চেয়েছিল, স্বামীও লাভ করেছিল, কিন্তু সুখ তাদের কপালে নেই। প্রতিটি চরিত্রের পরিণতিতে একটা অপ্রত্যাশিত চমক আছে। কিন্তু বিমল মিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম উপন্যাস তাঁর 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', এই উপন্যাসের দীপঙ্কর, সতী, লক্ষ্মী, ঘোষাল সাহেব এবং সতীর স্বামীর তুলনা বোধকরি বাংলা সাহিত্যে আর নেই। চরিত্রচিত্রণে এবং এই বিরাট ক্যানভাসে সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখার কৃতিত্ব লেখকের আছে। এক হিসাবে বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'কে পিকারেস্ক উপন্যাস বলা যায়।

দীপক চৌধুরীর জনপ্রিয়তা অসীম। 'শঙ্খবিষে' তাঁর যে শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে, বিশেষতঃ 'ফারিয়াদে' তিনি তার পরিপূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। এই বছর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'কীর্তিনাশা' এবং 'এক যে ছিল রাজা' এই দুটি উপন্যাস। সাধারণ স্কুলমাষ্টারের ছেলে শশাঙ্ক আর একদা রাজা মৃত্যুঞ্জয়ের নাতনী করবীর প্রেমোপাখ্যান 'কীর্তিনাশা'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। উনবিংশ শতকের পতন ও নবীন যুগের অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত আছে এই উপন্যাসে। 'এক যে ছিল রাজা' শ্লেষাত্মক রচনা। আন্দামানে নির্বাসিত গজাননের স্বদেশে ফিরে রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে সংঘর্ষ-কথা। টাইপ চরিত্রগুলি চমৎকার ফুটেছে।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'কলিকাতার কাছেই'-এর পরবর্তী অংশ 'উপকণ্ঠ' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

সুমথনাথ ঘোষের 'নীলাঞ্জনা' উপন্যাসে প্রণবেশ ও অনুশীলার চরিত্রের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব সার্থকতার সঙ্গে রূপায়িত।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে বৈদেশিক পরিবেশ যেসব উপন্যাস-লেখক এনেছেন তাঁদের অন্যতম। আয়ারল্যাণ্ডের উপকূলের তুফানের ঝাপটাখাওয়া জেলে--ডিঙ্গির মানুষগুলির দূরপ্রাচ্যে এসে উত্তরণ-- এই বিস্তৃত পটভূমির উপন্যাস 'মেঘলোকে'। তরুণী ছাত্রী রিটা কেন তার পিতার সমবয়সী বন্ধুকে আপনজন বলে ভাবছে তা 'মেঘলোকে' পাঠে জানা যায়। অপরিচিত জগৎ অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি রূপায়িত করেছেন। কল্পনার বলশালীতায় 'মেঘলোকে' এক বিচিত্র উপন্যাস।

নরেন্দ্র ঘোষ বোম্বাই শহরে সিনেমার কাজে ব্যস্ত, তারই ফাঁকে কিছু লেখেন। তাঁর 'প্রথম বসন্তে' উপন্যাসটি একটি কিশোরীর জীবনে প্রেমের পদক্ষেপ-কাহিনী, সেই প্রেমের পরিণতি পরিণয়ে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ যুগের এক বিশিষ্ট লেখক। তাঁর বৈশিষ্ট্য অতিমাত্রিক উৎপাদনে নয়, স্বল্প অথচ সুন্দর শিল্পকর্মে। উজ্জ্বল জীবনের স্বাদ তাঁর কাহিনীতে পাওয়া যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'তিন প্রহর' উপন্যাসের নায়ক নির্মল চৌধুরী ধনী জমিদারের অকৃতদার এবং অসার্থক সন্তান। তার শেষ বয়সে শূন্য প্রাসাদে বসে আত্মচিন্তনের মধ্যে সমগ্র কাহিনীটি বিধৃত। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি লেখকের অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতার পরিচায়ক।

গত এক বছরে সমরেশ বসুর কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হ'য়েছে ব'লে চোখে পড়েনি, যদিও 'জোয়ার ভাঁটা' নামে তাঁর একখানি গল্প-সংকলন বেরিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীরও কোনো উপন্যাস সম্ভবতঃ এই বছর প্রকাশিত হয়নি।

মানবধর্মী লেখক বিমল কর রচিত 'নির্বাসন' উপন্যাসে আছে ললিত আর বিভার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা। একজনের পক্ষাঘাতে বাকরুদ্ধ আর অপর ব্যক্তি ললিত স্ত্রী এবং পরিচিতদের চোখে অপরাধী। সন্দেহের অবকাশে সে হত্যাপরাধে মুক্ত। অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে 'নির্বাসন' চিন্তাশীল পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে। তাঁর অপর উপন্যাস 'খোয়াই' প্রতীকধর্মী উপন্যাস। এই উপন্যাসটি তাঁর 'ফানুষের আয়ু'কে স্মরণ করিয়ে দেয়। বুদ্ধিগ্রাহ্য কাহিনী বিন্যাসে তাঁর উপন্যাস দুটি সার্থক হয়েছে।

আরেকজন শক্তিমান লেখক গৌরকিশোর ঘোষ। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসের মধ্যে অপূর্ব মননশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' তাঁর দেশ মাটি ও মানুষ নামক সংকল্পিত এপিকের একটা খণ্ড। দেশকে লেখক নিবিড় মানবিকতার স্পর্শে যেন নতুন করে আবিষ্কার করছেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুহীন জীবনের মধ্যে যে সংকেত রয়েছে তা অপূর্ব। গৌরকিশোরের আর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে 'এই দাহ', আপাতদৃষ্টিতে অশ্লীল মনে হলেও উপন্যাসটির মধ্যে যক্ষ্মাব্যাধিতে জর্জর দুটি বিচিত্র নর-নারীর জীবন-দ্বন্দ্বের বিচিত্র আভাস পাওয়া যায়।

অশোক গুহ এবং দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণতঃ উপন্যাস লেখেন না। এই বছর দুজনেই দুখানি চমকপ্রদ উপন্যাস রচনা করেছেন। অশোক গুহ লিখেছেন 'গোরাকালার হাট' এবং দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'মাটি ও মানুষ'। 'গোরাকালার হাট' ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস, সমসাময়িক কালের চরিত্রচিত্রণে ও পরিবেশ-সৃষ্টিতে লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। 'মাটি ও মানুষ' উপন্যাসে লেখক এ'কেছেন উদ্বাস্তু-জীবনের বিষাদাত্মক করুণ চিত্র। সংলাপাংশ অতিশয় বাস্তবানুগ এবং মধুর। 'রাতের ঢেউ' উপন্যাসে লেখক সত্যপ্রিয় ঘোষ প্রভাতকে এ'কেছেন নাটকীয় কল্পনায়। কাহিনীটি সুসংবদ্ধ এবং পরিচ্ছন্ন।

সুশীল রায় লিখেছেন 'ত্রিনয়নী'। হারাধনবাবুর স্ত্রী ভদ্রকালী দেবী ছিলেন তাঁদের অঞ্চলের গৌরবের বস্তু, তিনি একদিন দৃষ্টিহীন হয়ে পড়লেন। কন্যা ত্রিনয়নী মিস পার্বতী হয়ে অভিনয়ে নাম করলেন, ছোটবোন নয়নতারাও সিদিকে ধরে এই অভিনেত্রী-জীবনই গ্রহণ করেছিল। দুই বোনের জীবনের এক বিচিত্র ট্র্যাজেডি। 'ত্রিনয়নী' এ যুগের অভিশাপের কাহিনীও বলা যায়।

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আজ রাজা কাল ফকির' ও 'কত রঙ কত আলো' লিখেছেন। দুটি উপন্যাসেই কাহিনীতে বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম উপন্যাসের নায়ক রজা অতুল ঐশ্বর্য উড়িয়ে দিয়ে ফকির হয়ে দেখল পয়সা না থাকলে কিছুই হয় না। বিদেশিনী আরিয়েৎ চরিত্রটি মনোরম। 'কত রঙ কত আলো'র এক চিত্রশিল্পীর জীবন ও জীবন-দর্শন রূপায়িত। আনন্দ আর উমা চরিত্রটি অনুপম। আধুনিক কালের উদ্‌ভ্রান্ত জীবনকথা। তাঁর আর একটি

উপন্যাস 'বৈশালীর দিন', রূপকধর্মী কাহিনী।

শক্তিমান লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক উপন্যাস 'অগ্নিমিতা'। কিংবদন্তীমূলক কাহিনীর মাধ্যমে সতীনাশার থান এবং স্বাহার বিষাদান্তিক জীবনকাহিনী লিখেছেন কুশলী লেখক।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইদানীং কম লেখেন, তাঁর উপন্যাস 'শ্রীমতী' এক অভিজাত পরিবারের মুক্তিকামী মেয়ে। তার জননীর উগ্র আধুনিকতার সঙ্গে সে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। 'শ্রীমতী' তার জীবনের সহচর করেছে এক দরিদ্র মানুষকে যে হৃদয়ের ঐশ্বর্যে গরীয়ান।

সুবোধ চক্রবর্তী নূতন ধরণের গল্প লেখার জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। 'আরও আলো' নামক উপন্যাসে সিমলা পাহাড়ের পটভূমিকায় বাঙালী আর অবাঙালী পরিবারের কাহিনী এঁকেছেন। বাস্তবানুগ চরিত্র-চিত্রণে লেখকের কৃতিত্ব আছে। তাঁর রচনারীতি পরিচ্ছন্ন এবং রসোত্তীর্ণ।

বারীন দাস লিখেছেন 'চন্দ্র চকোর'। এ কাহিনীর নায়ক একজন চিত্রাভিনেতা, এক সাধারণ মেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতাকে ভালোবেসেছিল। কাহিনীর পরিণতি বিয়োগান্ত। বারীন দাসের এই রচনার মধ্যে একটা করুণ মধুর জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর আর একটি সুন্দর উপন্যাস 'দুলারীবাই'।

সদাপরলোকগত জ্যোতির্ময় রায়ের একটি উত্তর-মৃত্যু উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তার নাম 'ভেঙেছে দুয়ার'। অনাথ আশ্রমে পালিতা মাধুরী জমিদার-গৃহে কাজ নিয়ে এক রহস্যপুরীর মধ্যে এসে পড়ে, তারপর সবশেষে রহস্যের জাল খুলে যায়। নতুন ধরনের রহস্য-কাহিনী।

'আকাশ পাতাল' ও 'রাজায় রাজায়' প্রণেতা প্রাণতোষ ঘটক রচিত একটি মাত্র উপন্যাস এ বছর প্রকাশিত হয়েছে 'রোজালিন্ডের প্রেম'। ফ্যাসন-দুরস্ত কৃত্রিম ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ছবি। রোজালিন্ড, সুললিতা আর নীলকান্ত চরিত্রটি অপূর্ব কাব্য-ধর্মী ভাষায় বিধৃত। এ এক অনাবিষ্কৃত জগতের কাহিনী।

প্রতিভা বসু, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে দু'চারজন মহিলা লেখিকা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তাঁদের একজন। 'অতল জলের আহ্বান' উপন্যাসে জয়ন্ত ও লোটি এবং জয়ন্তর আশ্রিতা সাবিত্রীকে ঘিরে কাহিনী গড়ে উঠেছে। তাঁর 'বনে যদি ফুটলো কুসুম' আরেক রসমধুর প্রণয় কাহিনী। আরেকজন প্রখ্যাত মহিলা লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর নতুন উপন্যাস চোখে পড়েনি।

যোসেফ কোনরাডের মত শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রফুল্ল রায় নতুন দিগন্তের আবিষ্কারে ব্যস্ত। শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শান্তির স্বাক্ষর' ও প্রফুল্ল রায়ের 'মাটি আর নেই' উল্লেখ-যোগ্য রচনা।

মিহির আচার্য রচিত উপন্যাস 'এক নদী বহু তরঙ্গ' অস্থির সমাজ-ব্যবস্থার পটভূমিতে রচিত দুঃসাহসিক চিত্র। এক কিশোরীমনের নিঃসঙ্গ সংগ্রাম কাহিনী। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এসো নীপবনে' সমাজ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ। বর্তমান যুগে প্রেমের কি বিচিত্র পরিণতি ঘটেছে, হৃদয়হীন দেহচর্চা সমাজকে কোথায় নিয়ে চলেছে তার ইঙ্গিত। খগেন্দ্র দত্তের 'স্বপনদীপ' শংকর ও অনুরাধার জীবন-সংগ্রামের বিষাদ-মলিন কাহিনী। তাঁর অপর উপন্যাস 'চেনা মুখে' এই মধ্যবিত্ত জীবনের আরেকটি রূপ ফুটে উঠেছে। সেখানে আছে দুঃসহ দুঃখের মাঝে স্নিগ্ধ আশাবাদ। 'জলকিব' চিত্ত সিংহের উপন্যাস। অবিবাহিত তরুণ আর এক বিবাহিতা তরুণীর কাহিনী। নায়ক শুভ চরিত্রটি সুন্দর ফুটেছে, চরিত্রটি তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট। দিব্যেন্দু পালিত আরেকজন প্রতিশ্রুতিময় লেখক। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'সেদিন চৈত্র মাস' উপন্যাসটিতে ঘটনার প্রতি বা চরিত্রের প্রতি তেমন মনোযোগ নেই, ঘটনার অংশ ক্ষীণ, কিন্তু সেই ক্ষীণ ধারার নির্যাস সমগ্র উপন্যাসটিকে একটি স্নিগ্ধ মধুর সৌরভে ভরে তুলেছে। সুরজিৎ দাশগুপ্তের 'দিন-রাত্রি'ও উল্লেখযোগ্য রচনা।

১৩৬৮-র উপন্যাসের একটা মোটা-মুটি পরিচয় দেওয়া গেল। এই স্বল্প পরিসরে প্রবীণ, পরিণত এবং নবীন সকলের কথাই উল্লেখ করা গেল, এবং যার উল্লেখ নেই তা নিছক অনবধানতা-বশতঃ, অবহেলাবশতঃ নয় একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। আমার বিশ্বাস সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের অতুলনীয় সম্পদ যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের জয় নিশ্চিত।

॥ এক ॥
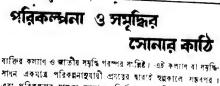
একান্নবর্তী বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার তার শেষ আলোক-রশ্মি ছড়ালো বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে। এবং আশ্চর্য এই গল্পগুলি লেখা হয়েছে সেই তখন, যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘোর ঘনঘটা আকাশে মাটিতে, যখন বাংলা-দেশের আকাশেও কোকিলের থেকে বমার-ফাইটারের স্কোয়াড্রনগুলোর ডাক বেশি শোনা যাচ্ছে—ঠিক তখন, যখন বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার মুহুর্মুহুঃ অনুভব করতে পারছে আসন্ন ভাঙনকে। যখন জ্বলে যেতে বসেছে পুরনো মূল্য-বোধ, ইতস্তত লভ্য শুধু ভস্মাবশেষ অংগার (প্রবোধ সান্যাল), এ্যাম্পুলে যখন ওষুধের বদলে জল, আকাশের দিকে তাকিয়ে বোবা কান্না (তারাশঙ্কর) যখন বুকের কাছে ঠেলে ঠেলে উঠছে, তখন তারই পাশাপাশি বিভূতিবাবু বাঙালীর পারিবারিক মাধুর্যের শেষ গল্প আমাদের শুনিয়েছেন। আজো অতীত-বিধুরতার বেদনার্ত মুহূর্তে এই গল্পগুলিই আমাদের আশ্রয়। এই কারণেই রাণুর প্রথম ভাগের লেখককে আমরা ভালবেসেছি যে যা আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম, তিনি মনো-লোকে তা আগলে নিয়ে বসেছিলেন।

কিন্তু ভেঙে যা যাচ্ছিল, তা যাচ্ছিলই। নিষ্ঠুর কাল তার নিষ্ঠুরতম নখরে উপড়ে উপড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেল-ছিল সমস্ত রঙীন পালক, আর উড়াল দেবার ডানা। সে মেলে ধরছিল শেষ পর্যন্ত আমাদের অসহায় রক্ত-মাংসের নগ্নতাকে, আমাদের কঙ্কালকে। যুদ্ধ-চোরাকারবার-দুর্ভিক্ষ-ক্রমবর্ধমান গণিকা-পল্লীর মাঝখানে নিবু নিবু মূল্যবোধের সমগ্র নিষ্প্রদীপ ঘটল কলকাতায়। সে সময়ের বাংলা কথা-সাহিত্যে স্বভাবতই এর ছায়া পড়েছে নিবিড়-ভাবে। প্রবীণতম তারাশঙ্কর থেকে সে সময়ের নবীন লেখক নারায়ণ গঙ্গো-পাধ্যায় একটা প্রয়াস করেছিলেন সন্দেহা-তীত ভাবে যে, সার্বিক মৃত্যুকে জোর-কলমে এঁকে মৃত্যুর বিরুদ্ধে নিয়ে আসতে হবে মানুষকে। কিন্তু দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে মানুষ যে তৈরি করে নিয়েছে অনেকগুলো জিজ্ঞাসার দর্পণ। সেই সব দর্পণে মানুষ যত নিজেকে দেখেছে তত তার সংশয় বেড়েছে, অবিশ্বাস বেড়েছে। বিশ্বাস-লোকে এই ভাঙন, চেতনার জগতে নানা টানা-পোড়েন সৃজন করেছে দুই মহা-যুদ্ধের মধ্যে। তাই গ্রাম-বাংলার বিগত-মহিমা সামন্ততন্ত্রের অস্তগৌরবকে দেখতে দেখতে তারাশঙ্কর যখন তন্ময়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সামান্য মানুষের মধ্যে খুঁজছেন মুহূর্তের অসামান্যতাকে মাণিকবাবু তখনই মানুষের আচার-আচরণের চাওয়া ও পাওয়ার একটা নতুন পরিমাপক দন্ড হাতে পেয়েছেন। বাংলা কবিতায় আত্মদর্শনেচ্ছু বাঙালী কবিরা তখনই প্রসঙ্গে প্রকরণে নতুন পথ খুঁজছেন। এর আগেই একুশ আর বত্রিশের গণ-আন্দোলনের ব্যর্থতা, শ্রমিক ধর্মঘটের বিস্তার, তিরিশের আর্থিক সংকটের ঢেউ এবং বেকার সমস্যার তীব্রতায়, প্রাক্-প্রথম মহাযুদ্ধ বাঙালী মধ্যবিত্তের নিশ্চিন্ত স্বর্ণযুগের অবসান ঘটেছে। বিশ্বাস তখন ভাঙতে শুরু করেছে। আমরা আশা করেছিলাম—কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের বিনিময়মূল্য কিছু হাতে এল না, আমরা আশা করেছিলাম—কিন্তু গণ-আন্দোলন বালুচরে ঠেক খেতে খেতে কখন শুকিয়ে গেল। অথচ বহি-র্বিশ্বের সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি তখন স্পর্শ করছে আমাদের চেতনাকে। কল্লোল জাগুক এ আকাংক্ষা ছিল তীব্র। এমন কি বুদ্ধদেবকেও কল্লোল ভাবতে আমাদের দ্বিধা ছিল না। এইভাবে দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে আমরা আশাকে খুঁজে বেড়িয়েছি চারিদিকে বিশ্বাসের ভগ্নাবশেষ পরিকীর্ণ জিজ্ঞাসাকন্টকিত এক ধূসর প্রান্তরে। কারো কাছে ছিল কিছুটা মার্কসবাদ, কারো কাছে ছিল কিছুটা ফ্রয়েড। অর্ধেক সত্য সকলের কাছেই ছিল—সেই অর্ধেকই পূর্ণ বলে ঘোষণা করা ছাড়া, আর কী তখন আমরা করতে পারতাম! তাই দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী বাংলা ছোট গল্পের দর্পণে পরিবর্তমান চেতনার নানা ছায়ার মাঝ-খানেই সাম্প্রতিক বাংলা ছোট গল্পের পূর্বাধ্যায়কে খুঁজতে হবে।

॥ দুই ॥

দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে যত বাংলা ছোট গল্প লেখা হয়েছে একদিক থেকে

তারা তৎকালীন উপন্যাস-সাহিত্য অপেক্ষা জীবনের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করেছে অধিক পরিমাণে। করেছে বলেই প্রকরণ-সিদ্ধির দিক থেকে ছোট গল্প দুই মহাযুদ্ধের মাঝে উপন্যাস অপেক্ষা অনেক বেশি তৎপরতা দেখিয়েছে। হয়তো ছোট গল্পের পরিমিত পট এ ব্যাপারে লেখকদের অধিকতর সাহায্য করেছে। উপন্যাসের রস-সিদ্ধি তখনই লেখকদের করতলগত হয়েছে, যখন তাঁরা সমকালীন মধ্যবিত্ত তথা নাগরিক জীবনের সর্বৈব অসংগতি, টান ও পিছু-টানকে পরিহার করেছেন। পথের পাঁচালি, আরণ্যক, কবি, পদ্মানদীর মাঝি প্রমুখ উপন্যাসগুলির বিষয়-বৈভব এবং তার বৈশিষ্ট্য এই তাৎপর্যে বিচার্য। যে সমকালীন মধ্যবিত্ত নায়কটি নানা আশাভঙ্গে পারিপার্শ্বিকের ভগ্নস্তূপের মাঝখানে শেষকালে পথ খোঁজাই ছেড়ে দিলে সেই শশী ('পুতুলনাচের ইতিকথা') মহৎ উপন্যাসের বলিষ্ঠ নায়ক নয়। উপন্যাসের ফ্রেমে সেই প্রথম অনায়ক নায়ক—এই তার নিজস্ব পরিচয়। নতুবা তারাশংকরের সামাজিক উপন্যাসের নায়কগুলির আদর্শপ্রাণতায় সাধুবাদ নিশ্চয় প্রাপ্য, কিন্তু এ কথা কখনোই বলা চলে না যে, তারাশংকরের উপন্যাসের মধ্যবিত্ত নায়কেরা প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাঙালী মধ্যবিত্তের বাস্তব সংকটের প্রতিভূ। বনফুলের নায়কেরা অসংগতিকে দেখেছিল। কিন্তু সে নায়ককুলের চিন্তায় বনফুল এত বেশি নিজেকে আরোপ করতেন যে, শেষ পর্যন্ত নৈতিভিত্তিক সেই সব নায়কেরা নেতি নেতি করতে গিয়ে জীবনের অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে। যে সর্বতোমুখী সচেতনতা ব্যতীত ঔপন্যাসিক সার্থকতা দুর্লভ তা খুব কম ক্ষেত্রেই লেখকদের আয়ত্তগত ছিল। শশী তখন আমরা সকলে। আমরা চেয়েছিলাম জীবনকে নানা রকম করে, জীবন নিষ্ঠুর নিয়তির মত আমাদের সব চাওয়াকে দলিত করেছে। আমাদের স্বপ্নের কলকাতা ও বাস্তবের গাওদিয়ার মধ্যে অমোচ্য ব্যবধান চিরদিনই নিষ্ঠুর হয়ে বিরাজ করবে—আমরা বৃটিশ কলোনির ব্যর্থ-ব্যক্তিত্ব শশীবাবুরা যেন তার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিলাম। তা বলে আমরা কেউ শশীকে গোরার মত ভালবাসতে পারি না। শশীরও চারপাশে ব্যর্থতার ভগ্নস্তূপ, গোরারও চতুর্দিকে অকৃতার্থতার আস্ফালন। কিন্তু শশী তো গোরা নয়। তাই গোরা যেমন করে সেই চতুর্দিকবর্তী অন্ধ যবনিকাকে ছিঁড়ে ফেলে উদ্ভাসিত নায়ক, শশী তা কেমন করে হবে? গোরা থেকে শশী বাঙালী মধ্যবিত্ত চেতনারও এক রূপান্তর, বাংলা উপন্যাসের নায়ক-প্রকরণেরও এক বিবর্তন। অবশ্য গোরাকেই আমরা ভালবাসি। ভালবাসি সেই যন্ত্রণার অগ্নিদাহকে। সেই অপ্রতিহত শত-তরংগকে। কিন্তু গোরাকে তো শশীর মত বন্ধ্যাত্বের ফলভোগ করতে হয়নি। শশী যে শুধু নিজেই ব্যর্থ নয়, যারা যারা তার সংগে সম্পর্ক-সূত্রে জড়িত হল তারা যে সকলেই ব্যর্থ। বাংলা উপন্যাসে শশী নায়ক হল, এই একটি ব্যাপারে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্ত সংকটের অনেকখানিই ধৃত।

কিন্তু আমরা বলেছি দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী নাগরিক মধ্যবিত্তের সংকটের চেহারা আঁকার ব্যাপারে বাংলা উপন্যাসের ভূমিকা ছিল অস্পষ্ট। বরঞ্চ ছোট গল্প সে তুলনায় ছিল অনেক মুখর। যদিও সে মুখরতার সবটুকুই সত্য ভাষণে নিয়োজিত ছিল এমন কথা বলা চলে না। তথাপি প্রেমেন্দ্র মিত্রের ধূসর-বিষণ্ণ গল্পগুলিতে, মাণিকবাবুর কঠিন-গম্ভীর গল্পগুলিতে, ল্যানসেটের মত কার্যক্ষম বনফুলের ক্ষুদ্র গল্পিকায় সমকালীন মানসের নানা চাপ, প্রতিক্রিয়া, বিকার, ব্যর্থতার ছায়া পড়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামান্য মানুষ এবং অসামান্য মুহূর্তের রবীন্দ্র-কিরণ এবং তারাশংকরের চরিত্র-বৈচিত্র্যের বিস্ময়রস এবং সুবোধ ঘোষের রচনায় তার উজ্জ্বল অনুসরণ এক হিসাবে রবীন্দ্র-মানববাদের উত্তরাধিকারের স্বাধীন ব্যবহার। এদিকে নতুন উত্তরাধিকার সৃজিত হচ্ছিল প্রেমেন্দ্র-মাণিকের হাতে। সেই ধূসর বিষণ্ণতার জগতে, কঠিন গাম্ভীর্যের মাঝখানে বনফুলের নির্মম ছুরি মাঝে মাঝে জানিয়ে দিচ্ছিল—যা তোমার বুকের মধ্যে ধুক ধুক করছে তা হৃদয় নয়, হৃৎপিণ্ড।

॥ তিন ॥

সেই তিনজন নর-নারীর ন্যায় অনেকেই প্রাণপণে চেষ্টা করছিল যে পুরোনো বিমলিন স্টোভটা (প্রেমেন্দ্র মিত্র) যেন কিছুতেই না ফাটে যে জানালা দিয়ে দেখা যায় দিগন্ত-লগ্ন পাহাড়কে, অনেকেই তার দিকে পিছু ফিরে তখন ভস্মশেষ জীবনটাকে নাড়াচাড়া করছিল। হলুদ পোড়ার গন্ধাবকাশে তবু এরই মধ্যে অন্তর্লোকের গহন আঁধার উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। মানুষ নিজের দিকে তাকিয়ে, ক্লান্ত হয়ে শুনেছে উড়োজাহাজের গান—যে উড়োজাহাজ সুন্দরবনের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়, বাঘের ও যেখানে স্বরূপে সত্তা। প্রেমেন্দ্র মিত্র আর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্পেই ক্লান্ত মন্থর জীবনের জটিল ছায়া পড়েছে নিবিড়ভাবে। আর যে আশ্চর্য সংযম থাকলে গ্রহণ বর্জনের ভিতর দিয়ে ছোট গল্পের সিদ্ধিতে পৌঁছানো যায়—দুজনেরই বক্তব্যগত সম্পদের জন্যই তা ছিল অনায়াসে করতলগত। এর পাশাপাশি তারাশংকরের অতিকথনকে রাখলেই বোঝা যায় যে বক্তব্যের স্বাতন্ত্র্য কেমন করে গল্পের প্রকরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। চরিত্র এবং ঘটনার চাপবহুল তারাশংকরের গল্পে সংক্ষিপ্ত আকস্মিকতার জননী হয়ে উঠবে এ আশংকা ছিলই। তাই তারাশংকরকে পট-পরিবেশ নির্মাণে লম্বা করে বলতে হয়েছে। তাঁর কোনো গল্পই এক কথায় সারা যায় না। কিন্তু প্রেমেন্দ্র-মাণিকের গল্পের প্রসংগ-প্রকরণের তাৎপর্য তারাশংকরের সংগে প্রতিতুলনায় হৃদয়ংগম হয়। এঁদের গল্পের মূল আকর্ষণ গল্পের প্রত্যক্ষ ঘটনায় নেই। গল্পের অন্তর্গত একটা চাপ এঁরা তীব্র করে তোলেন বাইরের

ঘটনার সাহায্য না নিয়ে, অথবা খুব কম নিয়ে। মাণিকবাবু মন নিয়ে গল্প লিখেছেন, অথবা প্রেমেনবাবু নগরকে করেছেন গল্পের বিষয়—এ উক্তি অবশ্যই সত্য। কিন্তু দুজনের আঙ্গিক-রীতির ও প্রসঙ্গের সাধ্য-সাধনায় মানুষের অন্তর্লোকই হয়ে উঠেছে মুখ্য। একজন বললেন মানুষের নৈঃসঙ্গ্যের কথা, আর একজন বললেন মানুষের জটিলতার কথা। দুজনেই ঘটনার ওপর জোর কমিয়ে এনেছেন নিজেদের বক্তব্যকে নির্মাণ করার তাগিদে। তাই এদের গল্পের কোনো সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করা যায় না।

এ'দের গল্পের সংক্ষেপিত রূপে, চেকভেরই মত, গল্পের কিছুই বোঝা যাবে না। একটি বিষণ্ণ কাহিনীর এই বীজ-স্বরূপ চেকভের নোট বইয়ে লেখা ছিল—"একজন অধ্যাপক জেনেছেন যে তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি, এ অবস্থায় শেষ কটাদিনের একটা দিন-পঞ্জী তিনি লিখে রাখছেন।" এ থেকে গল্পের কিছুই ধরা যাবে না। প্রথানুগত ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনীয় নয় অথচ অন্তর্গম্ভীর এই গল্পের সঙ্গে পরিচয়-লাভ মানুষকেই নিবিড় করে দেখা। সেই দেখাই চেকভের দেখা। 'তিনি কিছু আবিষ্কার করেন না'—চেকভ সম্বন্ধে তাঁর স্বদেশীয় গুণগ্রাহীদের এই ছিল অভিমত। আবিষ্কার করার দরকারও কিছু নেই। যা প্রতিদিন ছড়ানো রয়েছে তাতেই আছে শাশ্বতের বিস্ময়। বাস্তবতার দুমহল। তার বাইরের মহলে নানা লোকের ভিড়, অনেকজনের আনাগোনা সেখানে নানা চমক, নানা ঘটনা। কিন্তু আরো একটা বাস্তবতা আছে, সে থাকে অন্দরে। সাধারণ দৃষ্টির অন্তরালে। সে অবগুণ্ঠিত। তাকে জানলে তবে জানা যায় সেই অন্তরঙ্গ জীবনকে, সেই বাস্তবের সারাৎসারকে তরঙ্গের অন্তর্লীন গভীরতাকে। দেশে বিদেশে ছোট গল্পের শিল্পীরা এই পন্থানুসারী হয়েছেন, অনেক আগেই। আজকের বাংলা ছোট গল্প নিশ্চয় ঋণ স্বীকার করবে এই ঐতিহ্যের কাছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র আর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প তা বলে চেকভীয় পন্থানুগামী নয়। কেননা ধর্মের অমিল। সরলতাই চেকভের মূল ধর্ম। যদিও মাণিকবাবু চেকভেরই মত রাসায়নিক-সুলভ নিরাসক্ত শীতলতার আসনে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত লেখ্য বিষয় হাতে করতেন না, তথাপি, সরলতাই
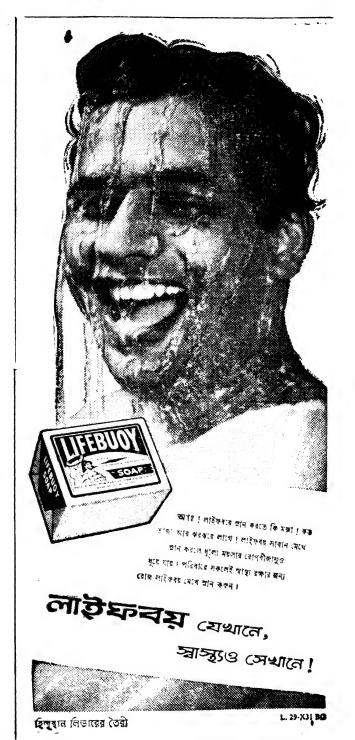
ছিল চেকভের সাধ্য-সাধন; মাণিকবাবুর তা নয়। আপাত-সারল্য থেকে চেকভ পৌছতেন গভীরতায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সারল্য অন্ত-র্জটিলতার বহিরাবরণ। যদিও এঁদের উভয়ের মধ্যে আবার পার্থক্য সুপ্রচুর।

এবং এইভাবেই বাংলা গল্প দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালবর্তী হল। রসনার পরিচ্ছন্ন পটে বুদ্ধদেবের আত্মলীন নায়কদের স্বগত জগৎ এরই মধ্যে ছায়া ফেলেছে। জ্বর গল্পের অর্ধমনস্ক তন্দ্রালু জগতে ইসারা পাওয়া গেছে নতুন ভাষার। গোপাল হালদার লিখলেন প্রচলিত কথাসাহিত্যের ব্যতিক্রম—একদা। এরই মধ্যে সেই ভদ্রলোক, খগেনবাবু যার নাম, নিজের স্ত্রীর শবদাহ করতে গিয়ে চিতাকাষ্ঠের সামনে দাঁড়িয়ে খুঁজে পেয়েছেন অন্তঃশীলা চেতনাকে। এতদিন যা হতে পারত বাংলা গল্পের উপসংহার তাই হল উপক্রমণিকা। ততদিনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়ে উঠেছে ঘনঘোর। মধ্যবিত্ত-স্বপ্নের এবং উচ্চাশার যে গাণ্ডীবকে আমরা তখনও শিথিল হাতে ধরে রাখার চেষ্টা করছিলাম, গর্জমান সময়-সমুদ্রের জলে তাকে ভাসিয়ে দেবার নির্দেশ তখন কুটিল কিন্তু অমোঘ। পিছনে বাজছে পদধ্বনি, কালবৈগুণ্যের দস্যু তখন হরণ করছে সর্বস্ব। ব্যর্থ ধনঞ্জয়, ব্যর্থ তার গাণ্ডীব টঙ্কার—এ আমরা দেখলাম।

।। চার ।।

চেকভের অকালমৃত্যু না ঘটলে চেকভ কী করতেন আমরা জানি না। কিন্তু যিনি অনেক কিছুর মত গল্পে চেকভের পাশে গিয়েও দাঁড়াতে পারেন সেই রবীন্দ্রনাথ জীবৎকালেই আর রবীন্দ্রনাথের মত গল্প লিখছিলেন না। প্রসঙ্গ প্রকরণ পরিবর্তনের অমোঘ নির্দেশ অনুভব না করে তিনি শুধু উজ্জ্বলতা-বিলাসী হবার জন্য স্বধর্ম পরিহার করেছিলেন, এমনটা ভাবলে রবীন্দ্র-স্বভাবকেই সন্দেহ করা হয়। আমাদের জীবনের আধারে যখন মুহুর্মুহুঃ নানা কিছুর মিশেল চলেছে তখন তার তিক্ত কষায় স্বাদকে ফেলে দেবে কোন্ প্রেরণায়—রবীন্দ্রনাথের শেষতম গল্প-প্রয়াসে এই বক্তব্যই প্রধান ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এবং তার অব্যবহিত পরবর্তী দিনগুলিতে আমাদের গল্প-সাহিত্যে তিক্তের স্বাদ অনুভূত হল আরো তিক্ত হয়ে, কষায় আরো কটু হয়ে উঠল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, সমরেশ বসু যুদ্ধ পরবর্তী দশকে প্রধান শক্তিশালী লেখক হিসাবে দেখা দিলেন। এই শক্তিমান লেখকবৃন্দের ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে তিলমাত্র গৌণ না করেও বোধ হয় বলা চলে এঁদের ভিতর দিয়ে প্রধানতঃ যুদ্ধপূর্ব দশকের তিনজন প্রতিভাধর গল্প লেখকের ধারা নব রূপায়ণে ধন্য হল। সেই লেখক তিনজন হলেন, প্রেমেন্দ্র, তারাশঙ্কর এবং মাণিক। কোনো একজনের প্রভাব কোনো একজনকেই যে স্পর্শ করেছে এমনটা সব সময়ে সত্য নয়। হয়তো একজনের ওপর আংশিকভাবে দুজনের প্রভাবই পড়েছে, কিন্তু মোটামুটি চারিত্র্য ছিল এই। গল্পে উপন্যাসে তখন একটা আশ্চর্য ব্যবধান লক্ষিত হচ্ছে, যেটা যুদ্ধপূর্ব দিনগুলিতে ছিল না। উপন্যাসে তখন কলকাতাকে এবং সমকালকে এড়াবার প্রচেষ্টা প্রকট হয়ে উঠছে। কখনও ফেলে আসা অতীতের কথা শুনিয়ে, কখনো অপরিজ্ঞাত আঞ্চলিক আবরণে মন ভোলাবার আয়োজন তখন প্রবল। কিন্তু ছোট গল্পে শেষোক্ত প্রয়াস মাঝে মাঝে দেখা দিলেও সমকালবর্তী জীবনের সঙ্কটকে ও সংগ্রামকে ছোটগল্প লেখকেরাই ধরবার চেষ্টা করলেন আন্তরিকতার সঙ্গে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সমরেশ বসুর গল্প

যেমন মানুষের বেদনা ও সংগ্রামকে ধরার চেষ্টা করেছে, বাকিদের গল্পে তেমনি সর্বতোমুখী অবক্ষয়কে, অপচয়কে ধরার চেষ্টা হয়েছে। এঁদের হাতেই বারোঘর এক উঠান, চেনামহল, মোমের পুতুলের মত উপন্যাস সৃজিত হয়েছে, বাস্তবের মুখোমুখি হবার সাহসে যেগুলি বিশিষ্ট।

তবু এরই মধ্যে অভিজ্ঞতার মূল্য নিয়ে যে চুলচেরা বিচার শুরু হবে এ ইঙ্গিতও স্পষ্ট। যুদ্ধের দশকে নানা প্রাণান্ত এবং মর্মান্ত মোচড় খেয়েছে আমাদের অনুভূতি— নানা অভিজ্ঞতার টানে। যে সব বিশ্বাস ধারণা এবং বোধগুলিকে আমরা অন্ততঃ মনের উপরিতলে ভাসিয়ে রেখেছিলাম সেগুলি দেখতে দেখতে অন্ধকারে মিশে গেল। আমাদের মূল্যবোধ দারুণ বিপর্যস্ত হল ঐ দশকে। বিশ্বাসের উপজীব্য কিছু আর তখন আমাদের সামনে ছিল না। যদিও জড়োয়া গয়না গায়ে ভ্রান্তির গণিকা তখনও আমাদের রঙিন গলির মোড়ে হাতছানি দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের তখন ভ্রান্তিবিলাসের মোহটুকুও টলমল করছে। তাই একদিকে যদিও সুবোধ ঘোষের নিঠাঁশিশ্য মনে হচ্ছে কৃত্রিম, বিমল মিত্রের গল্পে মোপাসাঁর মতো জীবনের ক্ষণসত্যের লীলা, অন্যদিকে গল্পজগতে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। সে প্রতিক্রিয়া নিজেদেরই সীমাবদ্ধতার প্রতিক্রিয়া। কারো কারো মধ্যে, বিশেষ করে নবাগতদের মধ্যে এই প্রশ্নটাই জাগ্রত হল যা বলার কথা তা কি সব বলা হচ্ছে? এবং বলা মানেই কি ঠিকভাবে বলা নয়?

।। পাঁচ ।।

বহু মৃত্যুকে দেখলাম আমরা যুদ্ধ থেকে দেশ ভাগ পর্যন্ত। যারা বলেন যে, আমাদের চেতনায় এমন কোন অভিজ্ঞতার ধাক্কা এসে লাগল যার ফলে লেখকেরা নূতন প্রকরণের কথা চিন্তা করেছেন, তাঁরা এই সংখ্যাহীন মৃত্যুর, এই আত্যন্তিক বিনাশের গুরুত্বকে ভুলে যান। ভুলে যান মানুষের এবং মনুষ্যত্বের মৃত্যুর মুহূর্তে মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্বন্ধে অনেকেই শীতল-নিঃসন্দিগ্ধতা অর্জন করেছিলেন। আর তা স্বাভাবিক। এই আমাদের অভিজ্ঞতার নতুন অধ্যায়। যিনি পিতার কাছে নাস্ত দেখেছেন বঙ্কিমের যুক্তিবাদী ধর্মকে আর নিজে প্রশান্ত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সত্য সুন্দরের স্বর্গলোকে, তাঁরই সন্ততিদের চতুষ্পার্শ্বে যখন পরিকীর্ণ হল এত মৃত্যু, এত মূল্যের, এত মানুষের, এত মনুষ্যত্বের—তখন যে-সাহিত্যের প্রসঙ্গ-প্রকরণ-চিন্তায় ধাক্কা লাগে না সে-সাহিত্যে কোথাও বহতা প্রাণস্রোত নেই এ কথাই বুঝতে হবে। ইউরোপের ক্যাথলিক-লিবারেল-মার্কসবাদীদের ত্রিধারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কোন্ বাস্তব তাড়নার সম্মুখীন হল ঠিক তারই আক্ষরিক অনুবাদ এদেশের মাটিতে খোঁজা স্বভাবতঃই নিরর্থক। এখানে যে মূল্যমানগুলি গত দেড়শ

বছরে গড়ে উঠেছে, যুদ্ধে তাই ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছে। যুদ্ধোত্তর দশকের বাঙালী গল্পলেখক বুঝলেন যে সর্বতোমুখী সচেতনতা ছাড়া এই ভাঙনের পটভূমিতে ধৃত মানুষের মনকে ধারণ করা যাবে না। এই কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা এত তীব্র যে গজ ফুট ইঞ্চি দিয়ে তাকে মাপা যাবে না। দিন গণনায় তার কালের হিসেব নেই। একমাত্র সেই মনকে যদি সঞ্চারিত করা যায়, সংক্রমিত করা যায়—যে-মন বহন করেছে সমস্ত সময়ের স্বাক্ষরকে তাহলেই সেই সমগ্রের আভাস রচনা করা যাবে। কোনো এক বিশেষ ঘটনায়, কোনো এক বিশেষ চরিত্রের উত্থান পতনে সেই দিন-দিনান্তর-বিস্তৃত ব্যাপকতম বাস্তবতার নাগাল পাওয়া যায় না।

প্রতি যুগেই মানুষ সেই যুগের দৃষ্টিতে দেখতে চায় সভ্যতাকে, তার আবহমানের সঞ্চয়কে। মৃত্যু পরিকীর্ণ, বিনষ্টিতে ধূসর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যে বাঙালী গল্পলেখক প্রসঙ্গ-প্রকরণের কথা চিন্তা করেছেন। তা করতে গিয়ে মানুষের যে চৈতন্য এঁদের বিষয়বস্তু সেই চৈতন্যের মুকুরে এঁরাও প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন সভ্যতার আবহমানের অনুভূতিকে। চৈতন্যকে কাল খণ্ডে বাঁধা যায় না বলে চৈতন্যই সকল বিপরীতকে ধারণ করতে পারে। যা কিছুর সমন্বয়ে সে গঠিত, এবং যা কিছুর প্রতিমুখে সে স্থাপিত সব কিছুকেই অভিব্যক্তি দেওয়া যাবে, যদি তাকেই অভিব্যক্তি দেওয়া সম্ভব হয়। এবং এই যদি হয় প্রসঙ্গ, তাহলে প্রকরণের চেনা-আদর্শও যে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ কী? গল্প কাহিনীর ভার কমিয়ে আনার যে প্রয়াস তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বিশিষ্ট হয়ে উঠছিল তা চূড়ান্ত পরিণামে পৌঁছল পাঁচের দশকের শেষার্ধে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায় প্রমুখ কয়েকজন নবীন লেখক এবং বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন ইতোপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত লেখক বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের চেনা আদর্শ গড়ে তোলার জন্য উদামশীল প্রয়াস শুরু করেছেন।

এখানে বর্তমান আলোচনার লেখক হিসাবে একটা কথা বলে রাখি। আমরা সাম্প্রতিক ছোট গল্পলেখকদের নিঃশেষিত তালিকা প্রণয়ন করতে বসিনি। সাম্প্রতিক বাংলা ছোট গল্পের প্রধান ধারাগুলির স্বরূপ নির্ণয়ই বর্তমান লেখকের কাম্য।

।। ছয় ।।

তা বলে একথা ভাবার কোনো হেতু নেই যে পাঁচের দশকে প্রচলিত প্রকরণে কোনো ভাল গল্পই লেখা হয়নি। নারায়ণ নাথ মিত্রের একাধিক ছোট গল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন এই পাঁচের দশকেই পাওয়া যাবে। সমরেশ বসুর পাড়ি এবং সাম্প্রতিক গল্প 'লড়াই' বা নারায়ণবাবুর লেখা 'বাইশে শ্রাবণ' নামক অবিস্মরণীয় গল্প কোনোমতেই চেনা-প্রকরণকে ভাঙেনি। কিন্তু নিঃসন্দেহে ভাল গল্প। তবে একটা ব্যাপারের দিকে বোধ হয় রসিকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। নতুন আবির্ভাবেরা প্রায় সকলেই গল্পের নতুন প্রসঙ্গ প্রকরণকেই যেন আঁকড়ে ধরছেন। নতুনেরা কেউই গতানুগতিক কাহিনী-প্রাণ গল্প লিখতে চাইছেন না এটা বোধহয় স্বীকৃত সত্য। তা বলে এও ঠিক যে সকলে একই ধরণের গল্প লিখছেন না। বিস্তর ব্যবধান আছে পরস্পরের মধ্যে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মর্মভেদী-বস্তব দৃষ্টি, সন্তোষকুমার ঘোষের চিন্তাবৃত্ত, বিমল করের গহন চৈতন্য, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিমুহূর্তচারী সংবেদনশীলতা, দেবেশ রায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খতায় অবশ্যই গড়ে পার্থক্য। সর্বতো-সচেতনতার ব্যাপারে সকলে সমান আগ্রহান্বিত নন। মুদ্রাদোষগুলিও এক একজনের এক এক রকম। একথাও ঠিক নয় চৈতন্য-স্রোতের প্রকরণসাধনাই সাম্প্রতিক বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তেমনি অস্তিত্ববাদীদের ছায়া হয়তো কোথাও কোথাও একটু ঘন হয়ে রয়েছে কিন্তু তা বলে গোটা বাংলা ছোট গল্প-প্রচেষ্টা একই স্লোগানের বশবর্তী হয়ে চলেছে না। তবুও একটা অতি সামান্য সম্পর্ক-সূত্র বোধ করি কল্পনা করা চলে। গল্পে নায়কের স্মৃতিলোকের সামগ্রিক ব্যবহার বোধহয় সাম্প্রতিক সব গল্পলেখকেরই একটা প্রসঙ্গ-লগ্ন বৈশিষ্ট্য।

এই স্মৃতিই কাহিনীসূত্র পরিহারের যে প্রতিক্রিয়া তার প্রধান সন্তান। কাহিনীর পরিণাম নিয়ে মিটতাসর্বস্ব লেখকেরা ছাড়া সকলেই এখন ভাবিত। কাহিনী যে বিপন্ন এ বোধও কমবেশী করে সচেতন লেখকের মধ্যে বিদ্যমান। কাহিনীর টানকে বাঁচাতে গিয়ে সমরেশ বসুর মত দক্ষ গল্প লেখককেও পাপ-পাপচেতনা বা অপরাধীভীতিক গল্পবস্তুর সন্ধান করতে হচ্ছে। যুদ্ধোত্তর মানুষের অবক্ষয়কে চিত্রিত করা এ গল্পগুলির লক্ষ্য হলেও—কাহিনী যেন স্বাভাবিক-তার মধ্যে দুর্লভ এমন ইঙ্গিত এই বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। ফসিলের কাহিনী-প্রাণ গল্প-লেখক কাহিনীর বৃত্তবন্ধন রচনা করতে করতে নাটকীয় রোমান্টিকতাকেই শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরেছেন। কাহিনীর এই অনভিপ্রেত হস্তাবলেপকে এড়াবেন বলেই অতি কঠিন আঙ্গিকরীতির দুরূহ নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন কমল

বিন্যাসের তাৎপর্যে একটা ব্যাপার স্পষ্ট ভাবে বোঝা গেল। বিষয়বস্তুর মধ্যে আধুনিকতা আঁচল ভদ্রাসন রচনা করে বসে নেই। কমলবাবুর 'অন্তর্জলী যাত্রা'র কাহিনীর বিষয় গত শতাব্দীর প্রত্যুষের পটে স্থাপিত। ছাতাপরবের গল্পটিকে আঞ্চলিক গল্পও বলা যেতে পারত। কিন্তু কমলবাবু প্রচলিত সংজ্ঞায় দুটি গল্পকেই বাঁধেননি। বস্তুত যাকে আমরা আধুনিকতা বলি সে থাকে বক্তব্যের প্রাণে, বাচনের মর্মে তার নিধান। বিষয়-বস্তু কোনোকালে বা কোনো অঞ্চলে স্থাপিত তার মধ্যে আধুনিকতার খবর মেলে না। মানুষের চিন্তার সঙ্গে মানুষের ভাষার যোগ নিবিড়। তার ভাষায় শুধু তার টাইপ-রূপই আভাসিত নয়। বর্তমান গল্পলেখকেরা বলছেন যে একটি ব্যক্তির চিন্তার ভাষায় রয়েছে তার আবহমান কাল, সভ্যতার সমকালীন চেহারা, স্বকালীন পুরুষার্থ সবই। চিন্তার ভাষার একটি অংশকেও যদি ঠিকভাবে উদ্ভাসিত করা যায় তাহলে সভ্যতার মর্মশায়ী রূপের অনেকটাই উদ্ভাসিত করা সম্ভব। ভিন্ন প্রসঙ্গে পকরণে কমলবাবু সাম্প্রতিক গল্প-লেখকদের দূর-আত্মীয়। সভ্যতা ও ব্যক্তির ম্যাক্রোকজম-মাইক্রোকজম্ সম্পর্ককে বাঙ্ময় করতে হলে চিন্তা-স্রোতের ভাষাকে অনুসন্ধান করাই বর্তমানে মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কেননা সভ্যতা আজ নানা নৈতিতে লাঞ্ছিত। নানা প্রশ্ন চিহ্নে জর্জরিত। ব্যক্তির মুকুরে সভ্যতার বাধিমূলই সন্ধেয়। তাই অগাধ সময়ের ব্যঞ্জনাকে লেখকেরা ধারণ করতে চান স্বল্প সময়ের পরিমিত আধারে। স্মৃতি-সূত্র ছাড়া, চিন্তা এবং চৈতন্যের ব্যাপকতায় ছাড়া সেই অগাধ সময়ের ব্যঞ্জনাকে বিম্বিত করা যায় না।

তাই দেখা যায় 'দুপুর', 'অশ্বমেধের ঘোড়া', 'জটায়ু', 'তোপ' প্রমুখ গল্প এবং 'মুখের রেখা' প্রমুখ উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি স্থাপিত হয়েছে প্রধানত একটি পরিমিত কালখণ্ডের উপর। কয়েক ঘণ্টার ব্যাপারকে গল্পে বলা হয়েছে। কিন্তু অতীতকে সমূলে এবং স-পরিবেশে পুনর্জাগ্রত করার বিষয়টি লেখকদের অনুধ্যেয় ছিল বলেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কয়েক বছরের ব্যঞ্জনা আনা হয়েছে। দ্বিবিধ উদ্দেশ্য এর সাহায্যে সাধিত হয়েছে। প্রথমতঃ বর্তমানের বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতাকে রূপময় করে তোলার ব্যাপারে অতীতের সাহায্য পাওয়া গেছে—সে কখনো বৈপরীত্য সঞ্চার করছে, কখনো প্রেরণা। দ্বিতীয়ত চরিত্রটির অতীত ইতিহাস আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। যার কথা পড়ছি তার বাইরের এবং অন্তরের

ইতিহাসকে লাভ করছি আমরা এই স্মৃতিসূত্রের মাধ্যমে। লেখকেরা রীতিমত সতর্কতার সঙ্গে অতীত ও বর্তমানের এই দ্বন্দ্ব এবং সাযুজ্যের বিষয়টি ব্যবহার করতে চান। এই প্রয়োগ-সতর্কতা অবলম্বন না করলে এ জাতীয় গল্প হাস্যকর বিড়ম্বনায় পর্যবসিত হবার সম্ভাবনাই সমধিক। গল্পে ঘটনার প্রত্যক্ষ চাপ বাড়াতে গেলেই গল্প অতীত-বর্তমানের নিটোল বৃত্ত হারিয়ে ফেলবে। হয় অতীত, নয় বর্তমান, তখন প্রাধান্য বিস্তার করবে গল্পে। সে ক্ষেত্রে বাস্তবের যে আন্তর-রূপকে লেখক খুঁজেছেন তাকে পাওয়া যাবে না। সন্তোষবাবুর 'মুখের রেখা' উপন্যাসটি এই ত্রুটির জন্যই ব্যর্থ হয়েছে। আবার বিমল করের 'উপাখ্যান' গল্প এই সাযুজ্যকে মেনেই সার্থকতা লাভ করেছে। বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দিব্যেন্দু পালিত, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী প্রমুখ সাম্প্রতিক বাংলা ছোট গল্প লেখকদের সকলেরই গল্পের বিষয় হল সময়। এই বহমান সময়কে কে কেমনভাবে দেখেছেন বা দেখছেন সেটা নির্ভর করে রয়েছে লেখকদের নিজ নিজ জীবনদৃষ্টির ওপরে। শেষ পরিণতি নির্মিত হবে এখান থেকেই।

॥ সাত ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে মানুষের নিঃসঙ্গতার কথা বলা হয়েছে। মানিকবাবুর গল্পে বলা হয়েছে মানুষের জটিলতার কথা। একথা আমরা বলেছি যে উভয়েরই গল্প কাহিনী-নির্ভর নয়। সুতরাং এ প্রশ্নটার মীমাংসা হওয়া দরকার যে প্রেমেন্দ্র মাণিকের গল্পে দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী আধুনিকের যে যন্ত্রণা প্রতিফলিত হয়েছে, সাম্প্রতিক ছোট গল্পলেখকেরা তা থেকে কোন্ ধর্মে, কোন্ বক্তব্যে পার্থক্য অর্জন করেছেন? মানুষের নিঃসঙ্গতা ও মানুষের জটিলতা সাম্প্রতিক গল্পলেখকদেরও অনেকেরই অন্যতম বিষয়। কিন্তু প্রকরণের দিক থেকে এঁরা ব্যক্তিকে তার সমগ্র চেতনায় ধারণ করতে চান বলে, মানুষের নানা ভগ্নাংশ—যা তার দুপাশে এবং পিছনে ছড়ানো, আপাত-অসংলগ্ন, তাকে ব্যবহার করেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র সব গল্পেই উপসংহারের আলোকে সমগ্রকে দেখান। সমগ্রের ব্যভিচার ঘটেছে কেন একথা বলতে গিয়ে তিনি যেন একটা কোনো অংশকেই সংকেতায়িত করেন। মাণিকবাবু নিজেই অনেক সময় জটিলতাকে বর্ণনা করতেন। তাঁর নায়ক-নায়িকারা নিজেরা তাঁর মত জটিলতা-সচেতন নয়। সাম্প্রতিক গল্পলেখক নিরপেক্ষভাবে নায়ককে বিবরণ করেন, উপস্থাপিত করেন। যা কিছু
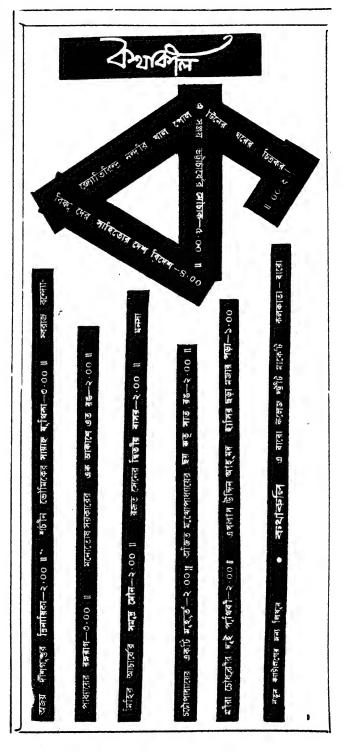
আছে চারিপাশে—আসবাবপত্র, গাড়ি-ঘোড়া, মানুষের মুখ, গানের লাইন, খবরের কাগজ, কবিতা অথবা ছবি—নানা রেখা, নানা সুর, কথা অথবা কলরব, সবই লেখকের বক্তব্যের ভাষা। সবই প্রতীক না হয়েও প্রতীকী ব্যবহারের মান পেতে পারে। শব্দে গন্ধে স্পর্শে বর্ণে সেই মনোময় সত্তার বাস্তবায়ন। তাই কখনো রঙ, কখনো স্বর, কখনো ঘ্রাণ,—ঘুরে ঘুরে আসে। তাই ব্রহ্মান্ড একটা নয়। প্রতিটি ব্যক্তির অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাই এক একটি ব্রহ্মান্ড।

তাই সাম্প্রতিক বাংলা গল্পে কখনও দুআনার ব্যাঙ বেহালার বাঁশীতে ধ্বনিত একটি দুপুরের মুকুরে একটি সংসারের অভিজ্ঞতায় গোটা সময়ের ক্লান্তিই আভাষিত হয়। যে নায়ক-নায়িকা দুটি সারা কোলকাতায় একটু কান্নার নিভৃতিও খুঁজে পায় না তাদের কিছু সময়ের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ীর মধ্যে রেখে লেখক ইতিহাস চেতনাকে প্রয়োগ করেছেন। এমন কি বিমূঢ় নায়িকা যখন নায়কের গলার তিলটিকে প্রথম লক্ষ্য করে তখনও আমাদের বিশ্বাসবোধ ব্যাহত হয় না। কেন না আমাদের বিশ্বাসবোধ নিয়ে লেখক গল্প লিখছেন না। আমাদের সময় আমাদের কোন পরিমন্ডল দেয় না—যকে আমরা বলতে পারি নিজের। এই সময়ই এই গল্পের প্রকৃত নায়ক। মানুষের ভেতর যে সত্তার দ্বিরাচরণ আছে তার প্রতি-মুহূর্তের বিনাশ এবং অবিনাশকে অবলম্বন করে যখন গল্প লেখা হয়, তখনও সে গল্পের বিষয় সময়। হার-জিতের প্রশ্ন পরে, আমরা সকলেই সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছি এবং সময় তার চিহ্ন ধীরে ধীরে আমাদের ওপর এঁকে দিচ্ছে এই কথাটিকেই সাম্প্রতিক গল্পলেখকেরা বলতে চান। তাই প্রচলিত গল্পপাঠের পদ্ধতিতে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা এই প্রতিমুহূর্ত-সচেতনায় পূর্ণ গল্পগুলিকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু সে প্রশ্ন বর্তমান আলোচকের সীমার মধ্যে পড়ে না।

।। আট ।।

তথাপি একটা প্রশ্ন থাকেই। সে প্রশ্নটা এই, যে সামাজিক ব্যক্তির ভূমিকা এই গল্পগুলির মধ্যমে ধরা যাবে কিনা। মানুষ ইতিহাস রচয়িতা, ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়েই এই দ্বান্দ্বিক বিশিষ্টতা বর্তমান। বর্তমান গল্পগুলির প্রসঙ্গ-প্রকরণে সেই দ্বান্দ্বিক বিশিষ্টতাকে স্বীকার করবার অবকাশ কতখানি সে কথা গল্পলেখকদেরই অনুধাবন করতে হবে। বিশেষ আশঙ্কার কথা এই যে জগৎ সংসারের অলীকতা বোধ ও মৃত্যুর

চূড়ান্ত বলে মানে না। এবং প্রতি-মুহূর্তকেও অলীক বলে গণনা করে না। এই ঐতিহ্য আরো দৃঢ়তা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। এবং ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ এখনো মূলতঃ অব্যবহৃত। এই বোধ-সংকটের ফলেই গল্পের বিষয়-নির্বাচনে যেমন কৃত্রিমতা দেখা দিচ্ছে, প্রকরণেও তার নিশানা হয়ে উঠছে প্রকট। বাংলা কবিতায় বাখরুমের বাড়াবাড়ি ঠিক সেখানেই দেখা দিল, মিষ্টাতিশয্য যেখানে এতদিন অকারণ হয়ে বিরাজ করছিল। বাংলা ছোট গল্পেও দাঁতের ময়লা ও চোখের পিচুটির পৌনঃপুনিকতা ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে। আমি অবশ্যই বর্তমান আলোচনায় সাম্প্রতিকদের সার্থক গল্প গুলির কথা স্মরণে রেখেই কথা বলেছি। তথাপি বহু উচ্চারিত অভিযোগগুলির গুরুত্বের কথা অবশ্যই অবধান করা প্রয়োজন। রীতি বাস্তবকে ব্যাখ্যা করার জন্যই। চেকভের লেখায় আমরা পরনা-রীতির সাক্ষাৎ পাই বটে, কিন্তু তিনি সূক্ষ্মতাবিলাসী নন। পরিপূর্ণ নৈতিক সচেতনতা ছিল বলেই তাঁর হাতে রীতি পরমা হয়ে উঠতে পেরেছে। মিহির গুপ্তের লেখা 'অনাম্য' এবং 'নাসত্য' বলে দুটি গল্পকে দুর্বোধ্যতা সাধনার চূড়া বলে আখ্যাত করা যায়। এগুলো কৃত্রিমতা। দুঃখের বিষয় এই কৃত্রিমতার ঝোঁক অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা দিচ্ছে। এইটাই—এই কৃত্রিমতাই—বিপদের কথা।

আমি বাংলা ছোট গল্পের ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। এবং বিশ্বাস করি না যে সে ভবিষ্যৎ একটি এবং একটি মাত্র পথেই অনুসন্ধেয়। এ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক গল্প লেখকদের অন্যতম একজনের একটি কথা উদ্ধৃত করছি : 'একমাত্র শ্মশানেই সকলকে যেতে হয়। জীবনে যে যার তার পথে চলে। শ্মশানে সবাই সমান, জীবনে অসমান। সাহিত্য নিশ্চয় শ্মশান নয়।' বাংলা ছোট গল্প জীবনের হাত ধরেই চলবে। এ পথে তার অন্য কোনো অভিভাবক নেই। তাই যদি সে জীবনের দিকেই ঠিকভাবে তাকায় তাহলে একটা প্রশ্ন সে নিজেকে করবেই —গত চার পাঁচ বছরে বাস্তবতার বোধের কোনো গুণগত পরিবর্তন দেখা দেওয়া কি অসম্ভব ছিল? অর্জুনের তীরের মত একটা প্রকরণ বা বিদেশাগত দার্শনিক ছায়াকে লক্ষ্য করে অবিচল থাকা অস্ত্রসাধনার গোড়ার কথা হতে পারে, কিন্তু শিল্পসাধনারও কি?

অবশ্যই সাম্প্রতিক লেখকেরা বলতে পারেন যে, এ প্রকরণের একটা সুফল ইতোমধ্যেই লাভ করা গেছে। তিরিশের দশক থেকে আধুনিক কবিগোষ্ঠীর হাতে ভাষার যে নবশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে, বাঙালী চিত্রশিল্পীরাও যে বাঙালী

আরম্ভ করছেন বাংলা গল্পে তার নিদর্শন ছিল দুর্লক্ষ্য। চোখ-কান-মন মিলিয়ে যে আধুনিক বাঙালী তাকে প্রতিবিম্বিত করার জন্য কবিতার প্রতীক ইমেজকে কবিতাতেই বন্দী রেখে দিলে যে আধুনিক অভিজ্ঞতার ভাষানির্মাণই ব্যাহত হয় এই সত্য সাম্প্রতিকদের কাছেই মর্যাদা পেয়েছে। যদিও প্রকৃতি নির্বাসিত, হিউমার অপসারিত এবং ঐতিহ্যকে মাত্র প্রতীক নির্মাণেই ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে, তথাপি আধুনিক অভিজ্ঞতার ভাষা নির্মাণে এঁদের প্রয়াসের কথা স্মরণীয়। গল্পের প্রয়োগ-পরিণতি ও বাচ্যের দ্বন্দ্ব এ পথে এখনো এঁদের বাধা। সে বাধা কখনো কখনো গল্পের ফ্রেমকে নষ্ট করে যেমন 'চর্যা-পদের হরিণী'। এই দ্বন্দ্বের পরিণতি কি হবে সেটাই সাম্প্রতিক গল্প-লেখকদের পরীক্ষার বিষয়।

মানুষ তার পরিবেশ নিয়ে অসুখী বা নিজেকে সে অসহায় মনে করছে, কিম্বা সে আশ্রয়হারা, তাই হতাশা তার পক্ষে স্বাভাবিক, স্বাভাবিক নাস্তিক্য, এ কথাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিলে মানুষ সত্যের মুখোমুখি হয় না, নিজেকে পৃথিবীর কাছে একটা উপরন্তু বলে মনে করতে শেখে গল্পলেখকরা তার দার্শনিক মীমাংসাও করবেন বৈকি। না করলে, 'দুঃস্বপ্ন' গল্পের নায়কের, পরিবেশ-অসুখী ভীরু সত্তা শেষ পর্যন্ত যে অলীক অলৌকিক স্বপ্নে মুক্তি খোঁজে। 'বিজনের রক্ত মাংস' গল্পের অসুস্থমনা নায়ক এক ভয়াবহ অবক্ষয়ের প্রতিনিধি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যা কিছু সুস্থতা, তা সবই যেন তার কাছে রহস্য। 'দুঃস্বপ্ন' নামকরণে যদি বা জ্যোতিরিন্দ্রবাবু পরিমলের স্বপ্নভঙ্গের একটা সৎ ইঙ্গিত দিয়েছেন, 'বিজনের রক্ত মাংস' গল্পের নামকরণে বোঝা যায় যে নাস্তিক্যকে প্রখর করে তোলার জন্যই লেখক ব্যস্ত। এ এক ধরণের বিদেশিয়ানা। বরঞ্চ 'জটায়ু' গল্পের নায়ক-নায়িকা এ প্রসঙ্গে অনেক সুস্থ-মনস্কতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের মধ্যেও ধ্বংস-সচেতনতা, কিন্তু তারা নির্বিকার আত্মসমর্পণকারী নয়।

বাংলা ছোট গল্পের সামনে যত প্রলোভন তত সংকট। কেমন করে সে বিপদকে সে উত্তীর্ণ হবে, প্রলোভনকে এড়াবে, সেটা লেখকদের সাধ্যসাধনের বিষয়। লেখকরা পুঁথির জালে অন্ধ হয়ে সমালোচক নামের জন্য ব্যস্ত নন। কাজেই পুঁথির ভেতরে নয়—জীবনের অভিজ্ঞতার ভেতরেই পাবেন তাঁদের অন্বিষ্ট।

---

* লেখকের মতামত তাঁর নিজস্ব, এবং বলা বাহুল্য তা সম্পাদকীয় অভিমত নয়। এবিষয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা সাদরে গৃহীত
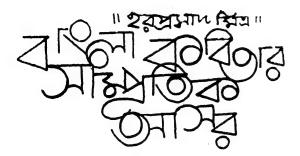
রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে, ছন্দের মন্দিরে বসে, রেখা-জাদুকর কাল কী যেন গড়ে তুলছেন ইঙ্গিতের অনুপ্রাসে ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বের গভীর সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। শেষ পর্বের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই অনুভূতি প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর তিরোধান থেকে ধরলে, ইতিমধ্যে বিশ বছর অতিবাহিত হোলো। বছর পাঁচেক আগেকার একটি প্রবন্ধে অধুনা স্বর্গত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন অন্য কথা। আজ, সদ্য-অতিক্রান্ত বছর-খানেকের বাংলা কবিতার কথা ভাবতে বসে, এঁদের দুজনের দুটি কথা একসঙ্গে মনে এলো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় মননজাত উপলব্ধির উল্লেখ করে গেছেন তাঁর 'নবজাতক'-এর ভূমিকায়। কবিতায় যুক্তিতর্কের সিঁড়ি ধরে কবির মন যে প্রস্তাবনা থেকে সিদ্ধান্তের দিকে না এগুতে পারে, তা নয়। বুদ্ধি, বিশ্লেষণ, যুক্তিতর্কের কাজ অগ্রাহ্য নয়। তারা থাকতে পারে,—থাকেও। তবু 'ইঙ্গিতের অনুপ্রাস' মন্তব্যটি রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব। শেষ পর্বের আর একটি কবিতায় তিনি বলেছিলেন যে, হৃদয় উতলা হলে কল্পনা-ভাণ্ডার থেকে অলংকার আপনিই দেখা দিয়ে থাকে। হৃদয়ের সেই উতলা ভাবটিই কবিতার উৎস। সুধীন্দ্রনাথ যখন জানিয়েছিলেন যে কবি আর নৈয়ায়িকের পংক্তিভোজন কখনোই স্বভাববিরুদ্ধ নয়, তখন তাঁরও মনে এই প্রেরণার আবশ্যিকতাবোধ জেগেছিল। তবে, তিনি এই বিশেষ অভিযোগ পেশ করেছিলেন যে, বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে "লেখা-পড়ার অসামঞ্জস্য বিস্ময়কর"; এবং এই অসামঞ্জস্যের ফলে—'বাংলা প্রবন্ধই বিপদগ্রস্ত নয়, বাংলা কাব্যও অসংলগ্ন ভাবোচ্ছ্বাসের অনিকাম সংঘট্ট'।

শক্ত শব্দ ব্যবহার করা সুধীন্দ্রনাথের স্বভাব ছিল। তাঁর গদ্যও তাই, কবিতাও অনেকটা তাই। তিনি নিজে বলে গেছেন যে, তথাকথিত স্বভাবকবিদের তিনি ভক্ত ছিলেন না। নিজের অন্তরের কাব্যাদর্শের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি ম্যালার্মে আর রিলকের নাম করেছিলেন। কিঞ্চিৎ দুরূহ গদ্যভঙ্গিতে আশ্রিত হলেও তাঁর সেই বিনয়-বচনের অর্থবোধ দুরধিগম্য নয়। মনে পড়ছে সেই কথা—'রিলকের মনে মাধুর্য ও তাৎপর্যের ধ্যান নিরাসক্তিঘটিত যে বিস্মৃতির অপেক্ষা রাখে, তার প্রয়োজন আমি এখনও হৃদয়ংগম করেছি কি না সন্দেহ।'

সুধীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের তারিখ ১০ই মার্চ ১৯৫৭। তার কয়েক বছর আগেই এখনকার নবীনতর এবং তখনকার তরুণতম কবিদের মুখপত্র 'কৃত্তিবাস' বেরিয়েছে। 'কৃত্তিবাসে'র প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩৬০) তাঁদের অগ্রজ কবি সমর সেন লিখেছিলেন যে, তখন থেকে দশ-বারো বছরের মধ্যে বাংলা কবিতার ভাষা অনেক সহজ হয়েছে—বার বার 'চলন্তিকা' দেখতে হয় না;—'ইংরাজি কবিতার প্রতিধ্বনি অথবা গূঢ় উল্লেখ আছে কিনা ভেবে মাথা চুলকোতে হয় না।'

আভিধানিক শব্দ,— ইংরেজি-ফরাসী বিদেশী রীতির অথবা বিদেশী প্রয়োগের ব্যাপক অনুকরণ এবং সেই ১৩৬০ সালের আগেকার আমলের অন্যান্য কোনো কোনো লক্ষণও ইতিমধ্যে বদলে গেছে। স্বভাব-কবিত্বই হোক্ আর কবিমনের নিত্যসজাগ মননস্বভাবই হোক্—এ দুয়ের যে-কোনো উৎস বা ভিত্তি মেনে নিয়ে বাংলা কবিতার ধারা কিন্তু অব্যাহত আছে। আজ জীবনানন্দ নেই, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নেই, সুধীন্দ্রনাথ নেই। করুণানিধান নেই, মোহিতলাল মজুমদারও নেই। প্রবীণদের মধ্যে প্রাচীনপন্থী কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়ই হোন—আর, নব্যপন্থী প্রবীণ-অপ্রবীণ অন্যান্য যে-কোনো কবির কথাই ধরা যাক্—এক কবির সঙ্গে অন্য কবির পুরোপুরি মিলের কথা ভাবা যায় না। প্রত্যেকেই নিজের স্বভাবে একক। এই অনন্যতার কথা মনে আসছে বটে, তবু

১৩৫৫ সালের একটি প্রবন্ধে কবি মণীন্দ্র রায় যা বলেছিলেন, সে-মন্তব্যও আজকের কথাসূত্রে অবান্তর নয়। অতএব সে-কথাও নিবেদন করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন,—'গত এক বছরের অনেকগুলো পত্রিকা ও শারদীয় সংখ্যা নাড়াচাড়া করে',—প্রায় শ'দুয়েক কবিতা পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল যেন—"জন তিরিশেক ভদ্রলোক একটি আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন—আর একই কবিতা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং উচ্চারণের সামান্য পার্থক্যের ঢঙে পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন।' তাঁর এই উক্তিতে পাঠকের মনে বিমুখ ধারণা জাগতে পারে অনুমান করে তিনি বলেছিলেন—'আমার এ সব আপ্তবাক্যকে যাঁরা নেহাৎ কালাপাহাড়ী মনে করে হাসছেন তাঁরা যে কোনো কাব্যরসিক বন্ধুর কাছে এইসব বিভিন্ন লেখকের কয়েকটি কবিতার রচয়িতার নাম বাদ দিয়ে একজনেরই লেখা বলে চালাবার চেষ্টা করবেন, দেখবেন কোনো প্রতিবাদ ওঠে কি না।' তাঁর বিশ্লেষণে বাংলা কবিতার তৎকালীন 'আধুনিকতা'র এই দুটি লক্ষণ বিশেষভাবে ধরা পড়েছিল যে তাতে প্রতীক-চর্চা ক্রমশঃ ব্যক্তিগত প্রতীক নির্বাচনের দিকে ঝুঁকেছিল, এবং দ্বিতীয়তঃ যথার্থ বোধ-নিরপেক্ষ শব্দ পরম্পরামাত্র সাজিয়ে তোলার দিকেই কবিরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সেই সময়েই বিষ্ণু দে তাঁর 'টি এস এলিয়ট' প্রবন্ধে বলেছিলেন যে এলিয়টের কাছ থেকেই বাংলার আধুনিক কবিগোষ্ঠী আত্মসচেতনতার প্রেরণা পেয়েছিলেন। যথার্থ 'আধুনিক' হতে গেলে কবিদের যথার্থ আত্মসচেতন হওয়া দরকার। এই বিশেষ দিকটি দেখিয়ে দিয়ে সেই প্রবন্ধেই তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, অ্যারাগ'র দেশে সত্তর বছরেরও বেশি—সুদীর্ঘ সময় বিস্তারে আধুনিক কাব্যের পরীক্ষা চলছিল!

এদিকে খৃষ্টাব্দের হিসেবে—চল্লিশের দশকের যুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ এবং স্বাধীনতালাভের উত্তেজনা পার হয়ে, পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতা পূর্বাভাস্ত বিষয়, ভঙ্গি, অসন্তোষ, অতৃপ্তির কথাই বার বার ধ্বনিত হতে দিয়েছে। অনুবাদ-চর্চা বোধ হয় আগেকার তুলনায় বেড়েছে। চিত্রকল্প বা ইমেজ সৃষ্টির দিকে লেখকদের ঝোঁক দেখা দিয়েছে অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে। সেই সঙ্গে আভিধানিক বা অল্প পরিচিত শব্দের দিকে আগ্রহ ব্যাপক ক্ষেত্রে কখনোও কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে উৎসাহিত হতে দেখা গেছে। প্রবীণদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ইত্যাদি সুপ্রতিষ্ঠিত যাঁরা, তাঁদের কলম থেমে যায়নি,—তাঁদের তুলনায় অনুবর্তী প্রতিষ্ঠিত যাঁরা তাঁদেরও চর্চা অব্যাহত আছে। দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সুশীল রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, উমা দেবী, গোপাল ভৌমিক, অরবিন্দ গুহ প্রত্যেকেই লিখছেন। অরুণ মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ, সুনীলচন্দ্র সরকার, অশোকবিজয় রাহা, অবন্তী সান্যাল, সুভাষ মুখোপাধ্যায় আজকাল খুবই কম লেখেন। অন্যান্য সুপরিচিতদের মধ্যে অলোক সরকার, কৃষ্ণ ধর, অরুণকুমার সরকার, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, আনন্দ বাগচী, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদকুমার মুখোপাধ্যায় দুর্গাদাস সরকার, রাজলক্ষ্মী দেবী, আরতি দাস, তরুণ সান্যাল, তারাপদ রায়, রঞ্জিত সিংহ, দেবতোষ বসু, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, মৃগাঙ্ক রায় ইত্যাদি অনেকের নাম স্মরণীয়। কিন্তু এক নিঃশ্বাসে নামের তালিকা সাজিয়ে দেওয়া নিরর্থক। অলোকরঞ্জনের পরীক্ষা এক জাতের, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্য ধরণের। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ কবি বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় যে মেজাজের মানুষ, তরুণতর

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সে মেজাজ নয়। দশ বছর আগে পূর্ণেন্দুশেখর পত্রীর 'এক মুঠো রোদ' বেরিয়েছিল। সেই পুস্তিকার 'সমাজ-জীবনের কাছে বাঁচার উদ্দীপনাকে প্রাণবন্ত করে' তুলতে চেয়েছিলেন লেখক। একেবারে হাল আমলের কবিতায় সে-ধরণের ঘোষণা বা উদ্দীপনা প্রায় অনুপস্থিত। দিলীপ রায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—দুজনেরই ছন্দের কান সজাগ, দেখবার সামর্থ্য সন্দেহাতীত। রাম বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় পূর্বোক্ত দুজনের সঙ্গে একই পাঠকরুচির সমাদরণীয় কবি। বীরেন্দ্র মল্লিক, রমেন্দ্র মল্লিক, সুনীল বসু, সুনীলকুমার নন্দী, সুনীল চট্টোপাধ্যায় এবং এ'দেরই মতন আরো অনেকে প্রকৃতিপ্রেমে, স্বপ্নমাধুরীতে, ভাবাবেগে আগ্রহী। ষাটের দশকে যাঁরা বাংলা কবিতার বিষয়ে-আঙ্গিকে নিজেদের পরীক্ষার চিহ্ন রেখে যাবেন, তাঁদের নামের তালিকা হ্রস্বায়তন নয়। তরুণতম কবিরা এখন আঙ্গিকের ভাবনা বোধ হয় একটু বেশিই ভাবছেন। কবিতার পাশাপাশি কাব্য-নাটিকার চর্চাও বাড়ছে। কিন্তু কবিতার আঙ্গিক আর অনুভূতি,—রীতি আর বিষয় তো আলাদা করে দেখবার জিনিস নয়! কবিতার অনুভূতি যে কী জিনিস, সে কি প্রবন্ধ লিখে এক মন থেকে অন্য মনে সঞ্চারিত হতে দেওয়া যায়? তেরশ আটষট্টির কবিতা পড়তে পড়তে বিষ্ণু দে'র লাইন চোখে পড়লো—'কি বা আসে যায় কিছু ভাবে যদি তোমার পাঠকে'। বন্যা যদি সত্যিই আসে, বন্ধ্যার হৃদয় তো তাতে ভেসে যাবেই! সেই বন্যার প্রতীক্ষাই আসল প্রতীক্ষা। এবং সকলেই জানেন যে কেবলমাত্র দু'পাঁচ-জনের বা বিশ-পঁচিশজনের আঙ্গিক-বদলের ঐকান্তিক অঙ্গীকারেও দেশে সত্যিকার ভাবের বন্যা আসা সম্ভব নয়।

তবু সহিষ্ণুতার অভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কোনো এক সুপ্রতিষ্ঠিত কবির কবিতায় একদা 'যৌবনের শারীরিক উপস্থিতি' প্রখর হয়ে উঠেছিল,—বোধ হয় এই ধরণের একটি উক্তি থেকেই উৎসাহিত হয়ে হাল আমলের তরুণ কবিদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা কবিতায় বিকৃত দেহরাগ প্রকাশের চেষ্টা করছেন। অবিশ্যি এও ঠিক গত এক বছরের খবর নয়। যতোদূর মনে পড়ে, ১৩৬০ সালেই দস্তুর মতন ঘোষণা করে, এ-চর্চা শুরু হয়েছিল। এবং আজও এ-অনুশীলন অব্যাহত! সেটাই আশঙ্কার কথা। শব্দ কবিতার উপাদান বটে, চিত্রকল্পও সমাদরণীয়—কিন্তু যথার্থ আত্মানুসন্ধান ও আত্মদান ব্যতিরেকে—এবং আধুনিক জীবনের যোগ্য উপলব্ধি ব্যতিরেকে যথার্থ আধুনিক কবিতার জন্ম কি সম্ভব হবে? শব্দের সঞ্চয়, ছন্দের কান, চিত্রকল্প সৃষ্টির আগ্রহ—আমাদের নবীন কবি-সমাজের এ-সবই আজ অল্প-বিস্তর অধিকারভুক্ত। এখন একটু শুভ-বুদ্ধির হাওয়া লাগুক,—এই মাত্র কামনা। বাংলা কবিতার পাঠকের তরফ থেকে এইটুকুই সবিনয় নিবেদন। কারণ, যথার্থ সমাজ-সচেতনতা ব্যতিরেকে মহৎ কিছু সৃষ্টি করা সত্যিই সম্ভব নয়। এ-কথা কবিদের উদ্দেশে পরামর্শ নয়, একান্তই নিবেদন।

তরুণেরা নিজেদের নাম রাখতে চান। সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সৃষ্টির গভীর উৎসে যে শান্ত প্রত্যয় থাকা দরকার—অথবা যে সৃজনী আবেগটুকু আবশ্যিক, সে শর্ত তাঁরা অন্তরে স্বীকার করুন। পশ্চিম ভূখণ্ডে 'ক্রুদ্ধ যুবজন' দেখা দিয়েছেন,—অতএব এদেশের কবিতার আসরেও তাই হোক, এ-কথাটা ঠিক নয়। রাজনীতির দলাদলি, প্রেমের ভাবোচ্ছ্বাস—তথাকথিত অকুণ্ঠতার নামে খিস্তি-খেউড়—কিংবা স্বাতন্ত্র্য দেখাবার জন্যে বা মনন প্রকাশের নামে দুর্বোধ্যতায় ঝাঁপ দেওয়া—এদের একটিও সত্যিকার কবিধর্ম নয়। কবি-মন আর কবিকর্ম দুটি একই অবিচ্ছেদ্য বিষয়। গত বছরখানেকের বাংলা কবিতায়,—নবীনদের রচনায় এই দুটির সমন্বয়দৃশ্য কেমন যেন বিরল মনে হয়েছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ দরদী কবিকেও বলতে শোনা গেছে যে একেবারে সাম্প্রতিকতম কোনো কোনো কবির লেখা পড়ে তাঁদের মনে হয়েছে যে তাঁরা এই নবীন দলের সঙ্গে নিজেদের সত্যিই যেন যোগ খুঁজে পাচ্ছেন না। পাঠকের তরফ থেকে এ-মন্তব্যও এই সূত্রে জানিয়ে রাখা দরকার।

বিজ্ঞাপন কি পড়ে থাকেন?

সন্তোষকুমার দে

"বাঃ, ঠিক যেন ফোটা ফুলের গন্ধ!"

প্রায় চাল্লিশ বছর আগে প্রকাশিত কেশতৈলের একটি পূর্ণপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ছে। বিজ্ঞাপনটিতে কোন ছবি ছিল না, ছাপাখানার হরফ সাজিয়ে একটি জনপ্রিয় কেশতৈলের চমৎকার গন্ধ এবং উপকারিতার কথা বর্ণনা করা ছিল। আমার মত অনেকেরই হয়ত এমন অনেক বিজ্ঞাপনের কথা মনে আছে। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নানাভাবে বিজ্ঞাপন আমাদের নজরে পড়ে এবং তার কিছু কিছু আমাদের মনেও থাকে। "আপনি কি হারাইতেছেন তাহা আপনি জানেন না,"—Don't spoil it. Hoyl it. Born in 1870 still going strong. "His Master's Voice", প্রভৃতি কথা বিজ্ঞাপন হতে আমাদের প্রাত্যহিক কথাবার্তায় আমাদের নিজেদের অজ্ঞাতেও ব্যবহার করি। তাই মনে হয় বিজ্ঞাপন দেখেন না, পড়েন না এবং অল্পবিস্তর মনে রাখেন না এমন লোক নিতান্ত বিরল।

ব্যাপক বিজ্ঞাপন যন্ত্রসভ্যতার দান। যান্ত্রিক উপায়ে কলকারখানায় অল্প সময়ে বিস্তর পণ্যবস্তু তৈরী হওয়ার ফলেই ব্যাপক বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। নতুবা যখন তাঁতি তাঁতে কাপড়-গামছা বুনতো, কামার দা-কুড়ুল বানাতো, কুমোর হাঁড়ি-কলসী গড়তো, তখন তাদের উৎপন্ন পণ্যসম্ভার গাঁয়ের মানুষের চাহিদা মিটিয়ে নিকটের গঞ্জে-হাটে-বাজারে পাঠালেই বিকিয়ে যেত, তার জন্য লিখিত বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হত না। বিদেশী পণ্যের সঙ্গে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন বিদেশ হতে আমদানি হয়েছে। কোম্পানীর আমলে যখন বিদেশ হতে বণিকেরা নানা বাণিজ্যসম্ভার এদেশে আনতে শুরু করলেন তখন সে সব জিনিসের বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তা বাদে রাজ্য পরিচালনায় সরকারি ইস্তাহার প্রচারেরও প্রয়োজন ছিল। তাই সে যুগে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে কেবল যে প্রথম থেকেই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে তাই নয়,

পত্রিকার নামকরণেও সে উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করা হত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র হিকির গেজেটের কথা বলা চলে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ২৯ জানুয়ারী Bengal Gazette or Calcutta General Advertiser জেমস্ অগাস্টিন হিকি প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে প্রথম অংশটিতেই ছিল একটি বিজ্ঞাপন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে Calcutta, Gazette and Oriental Advertiser প্রকাশিত হয়। এটিরও নামেই প্রকাশ পাচ্ছে যে পত্রিকাটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞাপন প্রচার করা। এটিতেও প্রথম সংখ্যা হতেই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। শেষোক্ত পত্রিকাটি বর্তমানে ক্যালকাটা গেজেট নামে নিয়মিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

সে যুগের বিজ্ঞাপনের ধরন-ধারণ লক্ষ্য করবার বিষয়। কোন কোন বিজ্ঞাপনের উপর সেটি যে বিজ্ঞাপন তাও লিখে দেওয়া হত। সব বিজ্ঞাপনই তখন ছাপাখানার হরফ সাজিয়ে তৈরী হত এবং লেখার মধ্যে কখনও কখনও বাক্‌পটুতার নিদর্শন মিললেও অহেতুক বাগাড়ম্বরেই অধিকাংশ বিজ্ঞাপন বিড়ম্বিত হত। চার লাইনে প্রকাশযোগ্য বিষয়কে চৌদ্দ লাইনে বললে স্বভাবতই ক্ষুদে ক্ষুদে হরফে তা ছাপতে হত এবং তখন যতটুকু স্থানের মধ্যে বিজ্ঞাপনটি দেওয়া হত তার সবটুকুই লেখা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়ার একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তখন নানা আকারের ও নানা প্রকারের ছাপার হরফ আবিষ্কৃত হয়নি, তাই অধিকাংশ বিজ্ঞাপনই সাধারণ সংবাদের সঙ্গে সহজেই মিশে যেত এবং বোধ হয় সেই জন্যই কেউ কেউ নিজেদের বিজ্ঞাপনের উপরে সেটি যে বিজ্ঞাপন তাও লিখে দিতেন।

সে যুগের বিজ্ঞাপনের নমুনা হিসাবে একশত বৎসর পূর্বে যেদিন রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৮ই-মে তারিখের ইংলিসম্যান পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার একাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। তখনকার দিনে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাটি বিজ্ঞাপন দিয়ে ভরা থাকত। এই সেদিন পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই চালু ছিল। যুদ্ধের সময়ে নিউজ-প্রিন্টের অভাবে যখন সংবাদপত্রে স্থানাভাব হয় তখন প্রথম পৃষ্ঠা হতে বিজ্ঞাপন সরিয়ে নিয়ে সেখানেই প্রধান সংবাদগুলি পরিবেশিত হতে থাকে। এই ব্যবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় এখনও সেই ব্যবস্থাই চালু আছে।

ইংলিসম্যানে প্রকাশিত শতবৎসর পূর্বের এই কয়েকটি বিজ্ঞাপন লক্ষ্য

করলে অনেক বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। খাকি কাপড়ের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন গিলমোর ম্যাককিলিগিন কোম্পানী। তাদের কোন ঠিকানা দেওয়া নেই। মনে হয় এই প্রতিষ্ঠানটি র‍্যানাকিন কিম্বা হোয়াইটওয়ে লেইডল'-র মত সুপরিচিত ছিল, তাই তাদের ঠিকানা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। নীলামকারী হাণ্টার কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের বিষয়েও সেই কথাই প্রযোজ্য। পি. সাণ্ডার্স-এর দেওয়া চায়ের বিজ্ঞাপনেও ঠিকানা দিতে হয়নি। কুক এণ্ড কেলভির বিজ্ঞাপনে ঠিকানা আছে, কিন্তু শহরের নাম নেই। দি পোর্টল্যাণ্ড কোম্পানী 'লিমিটেড' নামটির লিমিটেড কথাটির নূতন প্রয়োগ লক্ষণীয়। তাঁদের ভারতীয় দালাল মেসার্স অ্যালান এণ্ড হেস্-এর ঠিকানাতেও ১০, গভর্ণমেণ্ট প্লেস বলেই তাঁরা খুশী। নীল চাষের দুটি বিজ্ঞাপন লক্ষণীয়। ৫০০০ রায়তির একটি লোভনীয় নীল চাষের কারবার বিক্রয় করতে চাইছেন জে. জি. বাগবান, ৯১ ও, সি, বাজার। এটি ওল্ড চীনা-বাজার হওয়াই সম্ভব। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট প্লেস বা ওল্ড্ চীনাবাজার যে কলকাতায় অবস্থিত তা বলবার দরকার হয়নি। মনে হয়, ইংলিসম্যান কলকাতায় কাগজ এবং মুখ্যত তার প্রচার কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল—এজন্যই বিজ্ঞাপনদাতারা বাহুল্যবোধে কলকাতা কথাটি উল্লেখ করেননি।

এই বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে "কুক এণ্ড কেলভি" এবং গিলাণ্ডার্স আর-

পঞ্জিকায় প্রকাশিত পুরাতন বিজ্ঞাপনের নমুনা—স্বয়ং শিব দশাননকে মোদক দান করছেন।

বুথনট এণ্ড কোং এখনও কলকাতায় ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

এই সব ইংরাজি পত্রিকায় দেশীয় বিজ্ঞাপন বিরল। দেশীয় সংবাদপত্র বেরুলে তাতে দেশীয় বিজ্ঞাপন ছিল। তবে পুরানো পঞ্জিকায় দেশীয় বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখা যায়। আর সে সব বিজ্ঞাপনে দেদার ছবির ব্যবহার লক্ষ্য করবার বিষয়। কাঠের ব্লক করে বড় টাইপ এবং ছবি দিয়ে তখন বিজ্ঞাপন সাজানো হত। বাংলাদেশ কেশতৈলের রাজ্য, এত কেশতৈল যেমন ভারতের আর কোন একটি রাজ্যে তৈরী হয়নি, তেমনি হয়নি বিজ্ঞাপনের এত বিচিত্র ব্যবহার। এই সব কেশতৈল

পঞ্জিকায় প্রকাশিত আর একটি বিজ্ঞাপনের নমুনা—একটি সালসা সেবনে কাঁধে হাতী তোলা এবং পদতলে সিংহ দমনের শক্তিলাভ।

কবিরাজি মতে তৈরী, প্রস্তুতকারক প্রায় সকলেই কবিরাজি ওষুধের ব্যবসায়ী ছিলেন। তাদের কবিরাজি ওষুধের বিজ্ঞাপনেই না কত বাহার ছিল। একখানি পঞ্জিকার তিন ভাগের দুভাগ থাকত এই সব বিচিত্র বিজ্ঞাপনে বোঝাই। মোদকের বিজ্ঞাপনে দেখা যেত স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব দশানন রাবণকে সেই মহাশক্তি ওষুধটি দান করছেন, আর দশানন নতজানু হয়ে তা গ্রহণ করছেন। কোন সালসা খেয়ে হাতী দুহাতে মাথার উপরে তোলার দৃশ্য দেখানো, কোথাও বা শুধু হাতে সিংহের সঙ্গে লড়াই। আকাশ হতে পরীরা ফুলেল তেলের শিশি কেশবতী কন্যাদের দিয়ে যাচ্ছে—এ দৃশ্যও তেলের বিজ্ঞাপনে এও দেখা গেছে। পঞ্জিকার আর একটি সর্বজনপ্রিয় বিজ্ঞাপন বিভাগ ছিল—সব্জী ও ফলের বীজের বিজ্ঞাপন। বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলো, বরবটি প্রভৃতি তরকারির মনোহর পাতাজোড়া ছবি পঞ্জিকার শোভা বর্ধন করত। এখানে মোদক ও সালসার বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত চিত্রের নমুনা দেখান হল। সালসার বিজ্ঞাপনটিতে হাতী এবং সিংহ একই সঙ্গে পরাভূত করতে দেখা যাচ্ছে।

পঞ্চাশ বছর আগে প্রকাশিত 'সাহিত্য' মাসিক পত্রে প্রকাশিত দু-একটি বিজ্ঞাপন এখানে তুলে দিচ্ছি। 'সাহিত্য' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৬ সালে, এখন থেকে ৭৩ বছর আগে। তখনও বাংলা সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপন-

রবীন্দ্রনাথ যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সেই ৭ই মে ১৮৬১ তারিখের ইংলিশম্যান পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার কিয়দংশে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের নকল।

('Advertlink' পত্রিকার সৌজন্যে।)

দাতারা কেমন সাগ্রহে বিজ্ঞাপন দিতেন তা ভাবলেও আনন্দ হয়।

১৩১৯ সালে প্রকাশিত 'সাহিত্য' মাসিক পত্রের প্রচ্ছদের উপরে ও নীচে প্রতি মাসেই এই দুটি বিজ্ঞাপন ছিল: প্রথমটি হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর, দ্বিতীয়টি শ্রীঘৃতের।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই বিজ্ঞাপন দুটি কোন প্রকার সজ্জনী দিয়ে সাজানো নয়, টানা লেখা।

হিন্দুস্থান সমবায় বিমা মণ্ডলী—যাঁহারা এই সুবৃহৎ স্বদেশী অনুষ্ঠানের আশ্চর্য্য সাফল্য, অপ্রতিহত ক্রমোন্নতি ও ব্যাপক বিস্তার সম্বন্ধে অবগত হইয়া ইহার সহিত অংশী, বিমাকারী বা সংগ্রাহকরূপে যোগদান করিয়া লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

৩০নং ডালহাউসী স্কোয়ার,
কলিকাতা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রধান সম্পাদক।

এ বিজ্ঞাপনটির ভাব, ভাষা ও লে-আউট হুবহু শতবৎসর পূর্বে প্রায় ঐ ইংলিসম্যানে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের অনুরূপ। পি. সণ্ডার্স কর্তৃক চা বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনটির সঙ্গে এটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি থাকত প্রচ্ছদের নিচের দিকে। প্রচ্ছদের মধ্যস্থলে প্রথমে লেখকদের নাম একত্রে দেওয়া হত, তার নীচে সূচী। সূচীতে রচনাগুলির নাম ও পৃষ্ঠাসংখ্যা। তার নীচে পত্রিকার কার্যালয়ের ঠিকানা। তার নীচে শ্রীঘৃতের বিজ্ঞাপনটি। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

উৎসব ও পার্ব্বণে নিমন্ত্রিতদের তৃপ্তি-
সাধন করিতে হইলে
একমাত্র 'শ্রী' মার্কা ঘৃত
আপনাকে ব্যবহার করিতে হইবে—
কেন না ইহা বিশুদ্ধ!!!
ম্যানুফ্যাকচারার— শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত।
১৫৩।১ কটন স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সময়ে প্রকাশিত জবাকুসুম তৈলের বিজ্ঞাপনে কাঠের ব্লকে ভারতের

রঞ্জনাবর্গের ছবির ব্যবহার স্মরণযোগ্য। বেঙ্গল কেমিক্যালের 'অশ্বান' এবং 'ম্যালেরিল' ট্যাবলেটের বিজ্ঞাপনও লক্ষণীয়। একটি বোতলের পশ্চাতপটের উপর বড় বড় হরফে 'অশ্বান' লেখা—এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পরবর্তী কালে যতীন সেনের অঙ্কিত জীবন্ত রেখায় বলবান অশ্বারোহীর চিত্র ও মনোরম হরফে 'অশ্বান' লেখা বিজ্ঞাপনের তুলনা করলে বিজ্ঞাপনের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। প্রসঙ্গক্রমে বাংলা বিজ্ঞাপনে পরিশীলিত ভাষা প্রয়োগ এবং লাবণ্যময় চিত্রপ্রয়োগে রাজশেখর বসু ও যতীন্দ্রকুমার সেন যে যুগান্তর এনেছিলেন সে কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। রাজশেখর বিজ্ঞাপন রচনাকে সাহিত্যের পরিধির মধ্যে গণ্য করতেন। তিনি বলেছেন—

"সাহিত্যের আধুনিক অর্থ অতি ব্যাপক। কাব্যসাহিত্য, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, রবীন্দ্রসাহিত্য তো আছেই, তা ছাড়া দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনী সমালোচনা, বিজ্ঞাপন, স্কুলপাঠ্য সাহিত্য প্রভৃতি।"

—সাহিত্যের পরিধি, চলচ্চিন্তা. (পৃঃ ৪৩)

রাজশেখর স্বয়ং যে অতুলনীয় বিজ্ঞাপন-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁর রসরচনা, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও অভিধানের উত্তুঙ্গ মহিমার ছায়ায় তার প্রকৃত পরিচয় প্রচ্ছন্ন আছে। বিজ্ঞাপন-সাহিত্যে রাজশেখরের দান বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য, সুতরাং এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখমাত্র করে ক্ষান্ত হচ্ছি।

বিজ্ঞাপন রচনায় অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সির একটি মহৎ ভূমিকা আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই আমাদের দেশে কয়েকটি বিদেশী অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাতে যে সব ভারতীয় প্রচার কাজে দক্ষতা অর্জন করেন তার মধ্যে বাঙালী ও মাদ্রাজীর সংখ্যাই বেশী। এখনও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালী কমার্সিয়াল আর্টিস্ট, কপিরাইটার, একাউন্ট একসিকিউটিভ, অ্যাডভারটাইজিং ম্যানেজার প্রভৃতি সগৌরবে অধিষ্ঠিত আছেন। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত বিষয় জন-সংযোগ (Public Relation); এ ক্ষেত্রেও বাঙালী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অগ্রণী স্থান অধিকার করে আছেন।

আধুনিক বিজ্ঞাপন রচনায় শিক্ষিত রুচিশীল সুদক্ষ ব্যক্তিদের সমবেত

একটি অত্যাধুনিক বিজ্ঞাপনের নমুনা—তুলি ও ক্যামেরার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই স্বল্পবাক সুশোভন বিজ্ঞাপনটি। আজকাল বিজ্ঞাপনে ফটোগ্রাফের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে।

প্রচেষ্টা প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় বিজ্ঞাপনশিল্পে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। ফলিত কলা (Applied Art) এখন একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। এ দেশে বিজ্ঞাপন বিষয়ে শিক্ষা এবং গবেষণার বিবিধ প্রচেষ্টা চলেছে। বিজ্ঞাপন বিষয়ে এদেশেও বই লেখা হচ্ছে, এমনকি বাংলা ভাষাতেও বিজ্ঞাপন বিষয়ে বই বেরিয়েছে। বিজ্ঞাপন বিষয়ে কলকাতা হতে 'Advertlink' এবং বোম্বাই হতে 'Admars' নামে দুখানি ইংরাজি মাসিকপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। প্রচার ব্যবস্থায় সর্বাধুনিক উপকরণসমূহ আমাদের দেশেও ব্যবহৃত হচ্ছে। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে সাধারণ ছাপাখানার হরফ হতে শুরু হয়ে বিবিধ প্রকার চিত্রসংযোগ এবং এখন অধিক পরিমাণে আলোকচিত্র ব্যবহারেও আমাদের প্রগতি সূচিত হচ্ছে। এদেশে ফটোগ্রাফের জিনিসপত্রও তৈরী শুরু হয়েছে. আশা করা যায়, ক্রমেই বিজ্ঞাপনের লে-আউটে আরো বেশি পরিমাণে ফটোগ্রাফির সাহায্য নেওয়া হবে। তবে তাতে কমার্শিয়াল আর্টিস্টের প্রয়োজন কখনই কমবে না, কারণ গোটা বিজ্ঞাপনটা তো আসলে তাঁর হাতেই সৃষ্টি হয়, আর্টিস্টই তাঁর প্রয়োজনমত ছবি তুলিয়ে নিয়ে নিজের কাজ ত্বরান্বিত করেন বা আর্টওয়ার্কে বৈচিত্র্য আনেন।

এ কথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনের মান যথেষ্ট উন্নত হয়েছে এবং প্রতি বৎসরই এমন বহু বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় যা পৃথিবীর যে কোন দেশে প্রস্তুত উন্নতমানের বিজ্ঞাপনের সমকক্ষ বলে বিবেচিত হবে। তাই তো বছরের পর বছর বিদেশের বিজ্ঞাপন-সংকলন-গ্রন্থসমূহে এদেশের তৈরী বিজ্ঞাপনও স্থান পাচ্ছে।

১৩৬৮ সালের বাংলা ছবি

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

বছর শুরু হয়েছিল অগ্রদূত পরিচালিত "অগ্নিসংস্কার" ছবি দিয়ে এবং শেষ হয়েছে অগ্রগামী পরিচালিত "কান্না" ছবির মুক্তি দেখে। "অগ্নিসংস্কার" মুক্তি পায় ১৩৬৮ সালের ১লা বৈশাখ এবং "কান্না" মুক্তিলাভ করে ২১-এ চৈত্র অর্থাৎ বছরের শেষ সংক্রান্তির একদিন আগে। এই দুখানি ছবিকে ধ'রে গেল বাংলা বছরে মোট ৩৬খানি কাহিনী-চিত্র সাধারণ্যে প্রদর্শিত হয়েছে। এবং এ ছাড়াও আরও দুখানি বিশেষ চিত্র দেখানো হয়েছে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে: প্রথমখানি ভারত সরকারের হয়ে নির্মিত সত্যজিৎ রায়ের স্মরণীয় দলিল-চিত্র "রবীন্দ্রনাথ" এবং দ্বিতীয়খানি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্যে রবীন্দ্রনাথের চারটি কাহিনী-কবিতা অবলম্বনে দেবকীকুমার বসু কর্তৃক রচিত "অর্ঘ" চিত্র। ছ'রীলে সম্পূর্ণ, প্রায় পাঁচ হাজার ফুট দীর্ঘ প্রামাণ্য দলিল-চিত্র "রবীন্দ্রনাথ" সত্যজিৎ রায়ের সৃজনী-প্রতিভার এক নতুন দিগন্ত আমাদের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করেছিল এবং সম্প্রতি ছবিখানি ভারত সরকার দ্বারা শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে পুরস্কৃত হয়ে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক লাভ করেছে। "পূজারিণী", "অভিসার", "পুরাতন ভৃত্য" ও "দুই বিঘা জমি"—রবীন্দ্রনাথের এই চারটি সুখ্যাত কাহিনী-কবিতার প্রতিটির দুরীলে সম্পূর্ণ চিত্ররূপ দিয়ে বিগত যুগের শ্রেষ্ঠ পরিচালক দেবকীকুমার বসু কিছু অভিনব চিত্ররীতির (film-technique-এর) পরিচয় দিলেও একটা সার্বিক সাফল্য-লাভে সক্ষম হননি।

এই দুখানি বিশেষ ছবি ব্যতীত যে-ছত্রিশখানি কাহিনী-চিত্র গেল বাংলা সাল ১৩৬৮তে মুক্তিলাভ করেছে, তাদের মধ্যে অগ্নিসংস্কার, স্বরলিপি ও মধ্যরাতের তারা—"অমৃত"-পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হবার আগেই মুক্তিপ্রাপ্ত। এই তিনখানি বাদে বাকী সব কখানিরই সমালোচনা যথারীতি অমৃত-এর প্রেক্ষাগৃহ-স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছে। হিসাব ক'রে দেখা যাচ্ছে, ৩৬খানি ছবির মধ্যে ১৪খানি এমন সব পূর্ব-প্রকাশিত উপন্যাস বা গল্প অবলম্বনে গ'ড়ে উঠেছে, যেগুলি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হবার জন্যেই বিশেষভাবে লেখা হয়নি। আবার চলচ্চিত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখেই লেখা, অথচ আগেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, এমন অন্ততঃ পাঁচটি কাহিনী যে চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে, তাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর ১৭টি চিত্র নির্মিত হয়েছে, তাদের জন্যে বিশেষভাবে রচিত মূল পাণ্ডুলিপি থেকে। নীচে ছবিগুলিকে যেভাবে ছকের মধ্যে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতেই পাঠকরা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, কোন্ ছবি কোন্ শ্রেণীভুক্ত।

কাহিনী-চিত্র কখানির দিকে একটু নজর দিলেই দেখতে পাওয়া যাবে, এ-বছর একখানিও পৌরাণিক বা ধর্মমূলক চিত্র নির্মিত হয়নি। এমন কি, রূপকথা বা ফ্যান্টাসি জাতীয় চিত্রও প্রযোজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। নৃত্যগীতবহুল চিত্র-প্রযোজনার দিকেও কারুর ঝোঁক নেই। সকলেই তৈরী করেছেন সামাজিক চিত্র; অবশ্য এদের মধ্যে বেশীর ভাগই সামাজিক পরিবেশে কাহিনী-চিত্র এবং কিছু সামাজিক সমস্যামূলক ছবি। ৩৬খানি ছবির মধ্যে 'দিল্লী থেকে কলকাতা', 'কাঞ্চনমূল্য', 'কঠিনমায়া', 'কানামাছি' এবং 'সরি ম্যাডাম'—এই পাঁচখানি মূলতঃ হাসির ছবি। 'ডাকাতের হাতে' হচ্ছে একমাত্র শিশুচিত্র, যা পশ্চিমবঙ্গ শিশুচিত্র পরিষদের উদ্যোগে 'লিটল সিনেমা' সংস্থার দ্বারা নির্মিত হয়েছে। জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট পটভূমিকায় একখানি মাত্র রম্যচিত্র তৈরী হয়েছে—'ঝিন্দের বন্দী'। 'মেঘ' হচ্ছে একমাত্র মনস্তত্ত্বমূলক রহস্য-চিত্র। বছরের একমাত্র জীবনী-চিত্র 'ভগিনী নিবেদিতা' সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ চিত্র বিবেচিত হয়ে রাষ্ট্রপতি-সুবর্ণপদক লাভ ক'রে বাঙলার চলচ্চিত্র-শিল্পের গৌরব বর্ধন করেছে। তারু মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত ও পরিচালিত "ইংগিত" ছবিখানি পরীক্ষামূলকভাবে 'সবাক যুগে নির্বাক' আকারে প্রস্তুত হয়ে অসাফল্যই বরণ করেছে। সত্যজিৎ রায়ের "তিনকন্যা" যে রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প অবলম্বনে প্রস্তুত হয়েছে, এ-কথা পাঠকমাত্রই জানেন। "শশ্রুকাতিলক" ছবিখানিকে সামাজিক অপরাধমূলক ছবিরূপে চিহ্নিত করা

১৩৬৮ সালের বাংলা ছবি

পূর্বপ্রকাশিত উপন্যাস বা গল্প অবলম্বনে	চলচ্চিত্রকে লক্ষ্য রেখে প্রকাশিত গল্প অবলম্বনে	চিত্রের জন্য বিশেষভাবে লিখিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে
১। তিন কন্যা (মণিহারা, পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি)	১। মধ্যরাতের তারা	১। অগ্নিসংস্কার
২। স্বয়ংবরা	২। কঠিন মায়া	২। স্বরলিপি
৩। ঝিন্দের বন্দী	৩। ডাইনী	৩। মেঘ
৪। কাঞ্চনমূল্য	৪। কানামাছি	৪। শশ্রুকাতিলক
৫। মধ্যরেণ	৫। বিপাশা	৫। দিল্লী থেকে কলকাতা
৬। সপ্তপদী		৬। নেকলেস
৭। আহ্বান		৭। আজ-কাল-পরশু
৮। সন্ধ্যারাগ (কঙ্কাল)		৮। আশায় বাঁধিনু ঘর
৯। মা		৯। মিথুন লগ্ন
১০। ডাকাতের হাতে		১০। পুনশ্চ
১১। সঞ্চারিণী		১১। ইংগিত
১২। শাস্তি (ভুবন ডাক্তার)		১২। দুই ভাই
১৩। শিউলিবাড়ি (নাগলতা)		১৩। সরি ম্যাডাম
১৪। কান্না		১৪। মন দিল না বঁধু
		১৫। কাঁচের স্বর্গ
		১৬। ভগিনী নিবেদিতা
		১৭। সূর্যস্নান

মোট—১৪ + ৫ + ১৭ = ৩৬খানি ছবি

'ভগিনী নিবেদিতা' চিত্রের একটি দৃশ্য

কাল-পরশু", 'পুনশ্চ', 'আহ্বান', 'কাঁচের স্বর্গ', 'সূর্যস্নান' ও 'শাস্তি'। অবশ্য এদের মধ্যে একমাত্র 'আজ-কাল-পরশু'-কেই সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী আখ্যা দেওয়া যায়; বাকী পাঁচখানিতে বাস্তবধর্মিতা থাকলেও কিছু কিছু রোমান্টিক ভাবালুতাও স্থান পেয়েছে। পাঁচখানি হাসির ছবি, একখানি শিশুচিত্র, একখানি রম্যচিত্র, একখানি রহস্যচিত্র, একখানি জীবনী-চিত্র, একখানি নির্বাক চিত্র, তিনটি ছোটগল্প অবলম্বনে রচিত চিত্রমালা 'তিন কন্যা', একটি অপরাধমূলক চিত্র, একটি বিগত যুগের সামাজিক অন্যায়ের চিত্র, একটি সন্তান-বাৎসল্যের উপর রচিত চিত্র, এবং ছ'খানি প্রধানতঃ বাস্তবধর্মী চিত্র বাদে বাকী ষোলখানি ছবির কাহিনীর প্রধান উপজীব্য হচ্ছে— প্রেম। আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা, বিরহ-মিলন, সুখদুঃখ, হাসিকান্নার চুনিপান্নায় রচিত সেই শাশ্বত প্রেমের কাহিনী, যা যতদিন পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকবে, ততদিনই মানুষকে দুর্নিবারভাবে আকৃষ্ট করবে। কাহিনীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাগ করে আর একটি ছক নীচে দেওয়া হ'ল।

যায়। বিগত যুগের সামাজিক একদেশদর্শিতার একটি নিদর্শন বলা যেতে পারে "ডাইনী" ছবিখানিকে। এ-ছাড়া সকলেই জানেন যে, অনুরূপা দেবীর "মা" সন্তানবাৎসল্যের উপর রচিত কাহিনী।

সামাজিক বাস্তবধর্মী চিত্র যে-কখানি তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে আছে—"আজ-

১৩৬৮ সালের বাংলা ছবি

ক। প্রেমের কাহিনীমূলক চিত্র	১। অগ্নিসংস্কার ২। স্বরলিপি ৩। মধ্যরাতের তারা ৪। স্বয়ংবরা ৫। নেকলেস ৬। আশায় বাঁধিনু ঘর ৭। মধুরেণ ৮। মিথুন লগ্ন ৯। দুই ভাই ১০। সপ্তপদী ১১। সন্ধ্যারাগ ১২ মন দিল না বঁধু ১৩। বিপাশা ১৪। সঞ্চারিণী ১৫। শিউলিবাড়ি ১৬। কান্না
খ। সামাজিক বাস্তবধর্মী চিত্র	১।আজ-কাল-পরশু ২। পুনশ্চ ৩। আহ্বান ৪। কাঁচের স্বর্গ ৫। সূর্যস্নান ৬। শাস্তি। (অবশ্য 'আহ্বান' ছবিটিকে সন্তান-বাৎসল্যের উপর রচিত চিত্রও অনায়াসেই বলা যেতে পারে।)
গ। হাসির ছবি	১। দিল্লী থেকে কলকাতা ২। কাঞ্চনমূল্য ৩। কঠিন মায়া ৪। কানামাছি ৫। সরি ম্যাডাম
ঘ। শিশুচিত্র	১। ডাকাতের হাতে
ঙ। রম্যচিত্র	১। ঝিন্দের বন্দী
চ। মনস্তত্ত্বমূলক রহস্য-চিত্র	১। মেঘ
ছ। জীবনী-চিত্র	১। ভগিনী নিবেদিতা
জ। নির্বাক চিত্র	১। ইংগিত (এটিরও প্রধান উপজীব্য হচ্ছে প্রেম)
ঝ। চিত্রমালা	১। তিন কন্যা
ঞ। অপরাধমূলক চিত্র	১। পংকতিলক
ট। বিগত যুগের সামাজিক অন্যায়ের চিত্র	১। ডাইনী
ঠ। সন্তানবাৎসল্যের চিত্র	১। মা

গেল সালে আমরা কম ক'রে চোদ্দজন নতুন পরিচালকের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে ইতিমধ্যেই যশস্বী হয়ে উঠেছেন। প্রথমেই আমরা রাষ্ট্রপতির পুরস্কার-বিজয়ী "ভাগিনী নিবেদিতা"-চিত্রের তরুণ পরিচালক বিজয় বসুর নাম করতে পারি। এ'র পরে নাম করব বিখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার ও মঞ্চ-পরিচালক উৎপল দত্তের, যিনি তাঁর "মেঘ" ছবিতে চিত্র-পরিচালক হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই দু'জনের পর যাঁরা পরিচালকরূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন- নির্মল সর্বজ্ঞ (আজ-কাল-পরশু), কনক মুখোপাধ্যায় (আশায় বাঁধিনু ঘর), দয়াভাই (শাস্তি), পীযূষ বসু (শিউলিবাড়ি), অজয়কুমার (সূর্যস্নান), দিলীপ বসু (সরি ম্যাডাম), শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী

তারাশংকরের কাহিনীর চিত্ররূপ 'সপ্তপদী'তে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

মৃণাল সেন প্রোডাকসন্সের 'পুনশ্চ' চিত্রে একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার

(ডাকাতের হাতে), দিলীপ নাগ (নেকলেস), ভবেন দাস পরিচালিত টাস-ইউনিট (কানামাছি), শান্তি মুখোপাধ্যায় (মধুরেণ), সন্তোষ মুখোপাধ্যায় (মন দিল না বঁধু) এবং তরু মুখোপাধ্যায় (ইংগিত)।

ঠিক সমানভাবেই আমরা পরিচিত হয়েছি কয়েকজন শক্তিশালী অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে। প্রথমেই সত্যজিৎ রায়কে ধন্যবাদ দিতে হয়, তিনি তাঁর "তিন কন্যা" মারফৎ তিনজন নতুন অভিনেত্রী আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন : কণিকা মজুমদার (মণিহারা), অপর্ণা দাসগুপ্ত (সমাপ্তি) এবং চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় (পোস্টমাস্টার)। এ'দের মধ্যে কণিকা মজুমদারই ইতিমধ্যে বহু ছবিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। বাকী দু'জন আর কোনো ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন ব'লে শোনা যায়নি। "মেঘ" ছবিতে আমরা দেখতে পেয়েছি মালবিকা গুপ্ত এবং রবি ঘোষকে। এ'রা দু'জনেই আরও কয়েকখানি ছবিতে নিজেদের গুণপনা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। "নেকলেস" ছবির নায়িকা অবাঙালী অভিনেত্রী সুনীতারও ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ ব'লেই আমাদের ধারণা। "সন্ধ্যারাগ"-এর কল্যাণী ঘোষ চিত্রোপযোগী চেহারার অধিকারি; কিন্তু অভিনেত্রী হিসেবে তিনি কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হবেন, তা' এখনই বলা যাচ্ছে না। "ডাকাতের হাতে"র ডাকাত রূপে চিত্রাবতরণ করেছেন মঞ্চাভিনেতা শেখর চট্টোপাধ্যায়। "কান্না"-র নায়িকা নন্দিতা বসু সংযত অভিনয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১৩৬৮ সালে আমরা যে-চারজন সঙ্গীত-পরিচালকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাঁদের মধ্যে দু'জন হচ্ছেন নারী —এক সঙ্গায়িকা বাঁশরী লাহিড়ী (দিল্লী থেকে কলকাতা); দুই, প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় (শিউলিবাড়ি)। তৃতীয়জন হচ্ছেন—সত্যজিৎ রায় (তিন কন্যা) এবং চতুর্থজন হচ্ছেন বোম্বাইয়ের ভেদ পাল (সরি ম্যাডাম)।

এই ৩৬খানি কাহিনী-চিত্রের প্রযোজক হিসেবে যাঁদের নাম পাচ্ছি, তার মধ্যে পুরোনো নাম হচ্ছে বারোটি, বাকী সবাই নতুন। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি যে, বাঙলা ছবির প্রযোজনা করতে গিয়ে সাধারণতঃ

"সূর্যস্নান" চিত্রে তৃপ্তি মিত্র, আরতি মৈত্র ও বেচু সিংহ

প্রযোজকরা আর্থিক দিক দিয়ে এমনই ক্ষতিগ্রস্ত হন যে, একটি মাত্র চিত্র-নির্মাণের পরই তাঁরা চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। অসামান্যভাবে সাফল্যমণ্ডিত না হ'লে বাঙলা ছবি থেকে লাভ করবার আশা নিতান্তই আকাশ-কুসুম হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রতি বছরই দেখা যায়, পুরাতন বিদায় গ্রহণ করেছে, পরিবর্তে নতুনের ভিড়। কিন্তু এই নতুনদের মধ্যে সত্যিসত্যিই ক'জন আর্থিক দিক দিয়ে বলবান, সেটা গবেষণার বস্তু। যতদিন না বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতের আর্থিক কাঠামোকে সরকারের সাহায্যে শক্ত বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে, ততদিন 'চোরের রাত্রিবাসই লাভ'-গোছের অবস্থাই চলতে থাকবে বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতে।

গত সালের ছবিগুলি দেখে মোটামুটি দু'টি কথা আমাদের মনে হয়েছে। এক, দর্শক স্টুডিওর অভ্যন্তরে কৃত্রিম সেটে তোলা দৃশ্য থেকে বহিপ্রকৃতির মধ্যে গৃহীত দৃশ্যগুলিকে বেশী পছন্দ করছে। দুই, মাত্র ভাবসমৃদ্ধ কাহিনীই তার মনে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে পারছে না; সে বর্তমান জীবনের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হ'তে চায়। বাস্তব জগৎ থেকে পলায়নপর মনোবৃত্তি নিয়ে সে কোমল-পেলব প্রেমের সপ্তম স্বর্গে

বিশ্বের চিত্রগৃহ সংখ্যা

দেশ ও মহাদেশ	চিত্রগৃহ সংখ্যা	আসন সংখ্যা দশ লক্ষের হিসেব	আসন সংখ্যা প্রতি হাজার জনের জন।
এশিয়া (সোভিয়েট দেশ বাদে)	১৭০০০	১০	৬
ইয়োরোপ („)	৬০০০০	২৩	৫৫
উত্তর আমেরিকা	২২০০০	১৩·৫	৫২
দঃ আমেরিকা	৯০০০	৫	৩৭
ওসিয়ানিয়া	২৬০০০	১·৫	৯৩
সোভিয়েট দেশ	৫৯০০০	৮·৮	৪২
আফ্রিকা	২৬০০	১·৩	৬
মোট	১৭২১০০	৬৩·১	গড়ে ২২টি আসন

উন্নীত হ'তে চায় না, সে চায় জীবনের বহু সংঘাত ও আবর্তবহুল পরিবেশের মধ্যেই ইস্পাতের মত প্রেমকে প্রত্যক্ষ করতে। তাই 'স্বয়ংবরা', 'নেকলেস', 'দুই ভাই', 'সপ্তপদী', 'বিপাশা' বা 'শিউলিবাড়ি' মূলতঃ প্রেমের ছবি হয়েও নিরঙ্কুশ প্রেমের চিত্র নয়—এর প্রায় প্রতিটি ছবিতেই কঠিন বাস্তবের আঘাতে প্রেমকে বাজিয়ে যাচাই ক'রে নেওয়া হয়েছে। এবং এরই ফলে আগেকার তুলনায় বর্তমানের ছবিগুলি অত্যন্ত গতিশীল; সব সময়েই ঘটনাবলী দ্রুত লয়ে পরিণতির দিকে ধাবমান।

আঙ্গিকের দিক থেকেও বলতে পারা যায়, গেল বছরের ছবিগুলিতে প্রায়ই অত্যন্ত উন্নত চিত্রগ্রহণ ও শিল্প-নির্দেশের কাজ লক্ষ্য করা গেছে। ক্যামেরায় দীনেন গুপ্ত, বিমল মুখোপাধ্যায়, অনিল গুপ্ত, অজয় কর প্রভৃতি কৃতী চিত্রশিল্পীরা অসামান্য উৎকর্ষ দেখিয়েছেন এবং শিল্পনির্দেশনায় সতোন রায়চোধুরী, সুনীতি মিত্র, সুবোধ দাস প্রভৃতি যে-বাস্তবধর্মী অথচ চিত্রগ্রহণের পক্ষে আশ্চর্য রকম সহায়ক দৃশ্যাদি প্রস্তুত করছেন, তা অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য।

গেল সালের ছবিগুলির মধ্যে মাত্র দু'খানি ছবি বিদেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানের জন্যে মনোনীত হয়েছে। এক, সত্যজিৎ রায়ের 'তিন কন্যা'র অন্তর্ভুক্ত 'সমাপ্তি' ছবিখানি ভেনিস ও কান উৎসবের জন্য; এবং দুই, জীবন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত "সন্ধ্যা-রাগ" ছবিটি কায়রো চলচ্চিত্র-উৎসবের জন্যে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, বাঙলা ছবি নানা রকম অসুবিধা সত্ত্বেও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে নিজের শিল্প-মানকে যথাসম্ভব উন্নত করতে বদ্ধ-পরিকর এবং তার চলার পথের সামনের আর্থিক বাধাকে যদি কোনো জাদু-মন্ত্রবলে অপসারিত করা সম্ভব হয়, তাহ'লে তার ভাস্বর জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে প্রাতিনিয়তই।
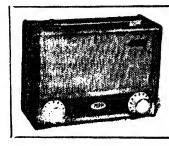
১৩৬৮ সালের খেলাধূলার সালতামামী

ক্ষেত্রনাথ রায়

॥ আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

ক্রিকেট : গত বছর ভারতবর্ষ যে সব আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট ক্লাব 'এম সি সি' ভারত সফরে আসে এবং ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে যায়। দীর্ঘ দশ বছর পর টেড ডেক্সটারের নেতৃত্বে মেরিলিবন ক্রিকেট ক্লাব (এম সি সি) ভারত সফরে আসে ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে। এই সফর ছিল তাদের চতুর্থবারের সফর। ইতি-পূর্বে এম সি সি ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলে যায় ১৯২৬—২৭, ১৯৩৩—৩৪ এবং ১৯৫১—৫২ সালে। এম সি সি-র ১৯৬১—৬২ সালের ভারত সফরের প্রথম খেলা আরম্ভ ২৯শে অক্টোবর এবং সফর শেষ করে ১৯৬২ সালের ১৫ই জানুয়ারী। আড়াই মাসের এই সফর তালিকায় পাঁচটি টেস্ট খেলা নিয়ে মোট ১৫টি খেলা ছিল। এম সি সি দলের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়ায় জয় ৪, ড্র ৯ এবং হার ২ (৪র্থ ও ৫ম টেস্ট)। এম সি সি দল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির একাদশ দলের বিপক্ষে ৪ উইকেটে, উত্তরাঞ্চল দলের বিপক্ষে ৯ উইকেটে, সার্ভিসেস দলের বিপক্ষে এক ইনিংস ও ৩৭ রানে এবং দক্ষিণাঞ্চল দলের বিপক্ষে ৩৭ রানে জয়লাভ করে। এম সি সি দল ইংল্যাণ্ডের প্রতিভূ হিসাবে ভারতবর্ষের সংগে পাঁচটি সরকারী টেস্ট খেলায় যোগদান ক'রে উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট খেলা ড্র করে। চতুর্থ এবং পঞ্চম টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ যথাক্রমে ১৮৭ রানে এবং ১২৮ রানে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে টেস্ট সিরিজের অধিক খেলায় (২—০) জয়লাভের দরুণ 'রাবার' লাভ করে। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সরকারী টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের এই প্রথম 'রাবার' লাভ। ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের মধ্যে এ পর্যন্ত মোট টেস্ট খেলা হয়েছে ২৯টা। টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষের জয় ৩, হার ১৫ এবং খেলা ড্র ১১। টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে ৮টা। টেস্ট সিরিজের ফলাফল : ভারতবর্ষের জয় ১, হার ৬ এবং টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত ১ (১৯৫১—৫২)।

কেন ব্যারিংটন

ডেভিড এ্যালেন

সেলিম দুরানী

ভি এল মঞ্জরেকার

১৯৬১-৬২ সালের ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের টেস্ট সিরিজে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ভারত-বর্ষের পক্ষে ব্যাটিংয়ে প্রথম স্থান লাভ করেন ভি এল মঞ্জরেকার—খেলা ৫, ইনিংস ৮, নট আউট ১বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৮৯ নট আউট, মোট রান ৫৮৬ (গড় ৮৩·৭১)। মঞ্জরেকার টেস্ট সিরিজে মোট রান (৫৮৬) করার দিক থেকেও নিজ দলের পক্ষে শীর্ষস্থান লাভ করেন এবং উভয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় স্থান—প্রথম স্থান অধিকারী ইংল্যাণ্ডের কেন ব্যারিংটনের ৫৯৪ রানের থেকে ৮ রান কম পান। তবে তিনি উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান (১৮৯ নট আউট) করার গৌরব লাভ করেন। ভারতবর্ষের পক্ষে বোলিংয়ে প্রথম স্থান লাভ করেন সেলিম দুরানী—ওভার ২৪৯·০, মেডেন ৬৫ এবং ৬২২ রানে ২৩ উইকেট (গড় ২৭·০৪)।

দুয়ানী দুই দলের পক্ষে গড়পড়তায় এবং অধিক সংখ্যক উইকেট পাওয়ার দিক থেকেও প্রথম স্থান পান।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়-পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেন সারে কাউন্টি ক্রিকেট দলের কেন ব্যারিংটন—খেলা ৫, ইনিংস ৯, নট আউট ৩বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭২ এবং মোট রান ৫৯৪ (গড় ৯৯·০০)। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে বোলিংয়ে প্রথম স্থান পান অফ্-স্পিনার ডেভিড এ্যালেন—ওভার ৩০১·৫, মেডেন ১২১ এবং ৫৮৩ রানে ২১ উইকেট (গড় ২৭·৭৬)।

টেড ডেক্সটারের এই এম সি সি দলের শক্তি বিচার করে কোন কোন মহল অভিমত দিয়েছিলেন দলটি প্রথম শ্রেণীর নয়—দ্বিতীয় শ্রেণীর। এই রকম ধারণার কারণ, ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় যাঁরা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬১ সালের টেস্ট সিরিজে খেলেছিলেন তাঁরা এই দলে যোগদান করেননি। এম সি সি-র সভাপতি স্যার উইলিয়াম ওর্সলে মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্ট খেলায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি এই দলটিকে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর দল বলে স্বীকার করতে মোটেই রাজী হননি। বরং তিনি এই দলকেই তাঁদের ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে মর্যাদা দিয়েছিলেন। ট্রুম্যান এবং ষ্ট্যাথামের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন তাঁরা খুবই পরিশ্রান্ত এবং তাঁদের যোগদানে দলের বর্তমান শক্তির কোন বিশেষ পরিবর্তন হত না। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের 'রাবার' জয়লাভের ঘটনাকে তিনি সহজভাবেই স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের এই 'রাবার' সম্মান লাভ ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি গৌরবান্বিত অধ্যায়। এই সম্মান পেতে ভারতবর্ষকে সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে এই সাফল্য-লাভের অব্যবহিত পর ভারতবর্ষ ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে যায় এবং এই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। বর্তমান সময়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দল। ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে যে সম্মানজনক আসন লাভ করেছে তার স্থান অস্ট্রেলিয়ার পরই। কিন্তু ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের শক্তির তুলনায় ভারতীয় দল খুব বেশী দুর্বল ছিল না।

শক্তিশালী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত সম্পদ ভারতবর্ষের যথেষ্টই ছিল। কিন্তু নানা পারিপার্শ্বিক কারণে ভারতবর্ষ তার প্রকৃত শক্তির পরিচয় দিতে পারেনি। খেলোয়াড়দের অসুস্থতা, খেলায় দুর্ঘটনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আম্পায়ারের ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষকে খুবই অসুবিধায় ফেলে। এর উপর ছিল খেলায় ত্রুটি। ভারতবর্ষ ব্যাটিং এবং ফিল্ডিংয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ব্যাটিং বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ছিল হলের ফাস্ট বল। হলের ফাস্ট বলের মধ্যে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যে 'জুজুর ভয়' দেখেছিলেন তার জের যখন কেটে গেল তখন টেস্ট সিরিজ হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। ভারতবর্ষকে শেষ পর্যন্ত পাঁচটা টেস্ট খেলাতেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এই রকমই ঘটেছিল ইংল্যাণ্ডের কাছে ১৯৫৯ সালের

ইংল্যান্ড সফরে। এবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর অথবা তাঁর বদলী পতৌদির

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

নবাব দক্ষতার সঙ্গে দল পরিচালনা করতে পারেননি। নবং প্রবীণ এবং দক্ষ খেলোয়াড় পলি উমরীগড় তাঁর খেলার মধ্যে দিয়েই প্রমাণ করেছেন দলের সহ-অধিনায়ক পদের থেকে অধিনায়ক পদ-লাভের যোগ্যতা তাঁর কত বেশী। পলি উমরীগড় ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভারত-

পলি উমরীগড়

বর্ষের ব্যাটিং এবং বোলিং গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেন।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এবারের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেন পলি উমরীগড়। ব্যাটিংয়ের তালিকায় তাঁর খেলার হিসাব : খেলা ৫, ইনিংস ১০, নট আউট ১ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭২ (নট আউট) এবং মোট রান ৪৪৫ (গড় ৪৯·৪৪)। তিনিই উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান (১৭২ নট আউট) করেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পক্ষে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেছেন গারফিল্ড সোবার্স (১৫৩ রান)। উমরীগড়ের বোলিংয়ের হিসাব—১৫৬ ওভার, ৬৭ মেডেন, ২৪৯ রানে ৯টা উইকেট (২৭·৬৬)। ভারতীয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন সেলিম দুরানী—১৭টা (গড় ৩৫·২৯)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ব্যাটিংয়ের তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন দলেরই অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল—খেলা ৫, ইনিংস ৬, নট আউট ২বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৯৮ (নট আউট) এবং মোট রান ৩৩২ (গড় ৮৩·০০)। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করেছেন রোহন কানহাই—৪৯৫ রান (গড় ৭০·৭১)। উভয় দলের পক্ষে বোলিংয়ে শীর্ষ স্থান পেয়েছেন ওয়েসলে হল—১৬৭·৪ ওভার, ৩৭ মেডেন এবং ৪২৫ রানে ২৭ উইকেট (গড় ১৫·৭৪)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দলের বোলিংয়ের তালিকায় লান্স গিবসের ৪৯০ রানে ২৪ উইকেট (গড় ২০·৪১) এবং গারফিল্ড সোবার্সের ৪৭৩ রানে ২৩ উইকেট (গড় ২০·৫৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৬২ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতবর্ষের খেলার ফলাফল

দাঁড়ায় : মোট খেলা ১২, হার ৬ (৫টা টেস্ট খেলা এবং একটা প্রথম শ্রেণীর খেলা), জয় ২ (১টা প্রথম শ্রেণীর খেলা) এবং খেলা ড্র ৪।

১৯৬২ সালে ১৮ই এপ্রিল ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পঞ্চম টেস্ট খেলা শেষ হওয়ার পর উভয় দলের টেস্ট খেলা এবং টেস্ট সিরিজের ফলাফল দাঁড়িয়েছে : টেস্ট খেলা ২০, ভারতবর্ষের জয় ০, হার ১০, খেলা ড্র ১০। টেস্ট সিরিজ ৪, ভারতবর্ষের জয় ০, হার ৪। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৪৮-৪৯ সালে ১—০, ১৯৫৩ সালে ১—০, ১৯৫৮-৫৯ সালে ৩—০ এবং ১৯৬২ সালে ৫—০ খেলায় জয়লাভ ক'রে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 'রাবার' লাভ করে।

উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা : ১৯৬১ সালের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইংল্যাণ্ডের বাৎসরিক উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ থেকে রমানাথন কৃষ্ণান, প্রেমজিৎলাল, জয়দীপ মুখার্জি, আখতার আলি এবং নরেশকুমার যোগদান করেছিলেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের গুণানুসারে যে বাছাই তালিকা প্রস্তুত করা হয় ভারতীয় এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান সেই তালিকায় ৭ম স্থান লাভ করেন। উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের নামের বাছাই তালিকায় এই রকম সম্মানজনক উচ্চ স্থান পাওয়া ভারতবর্ষের পক্ষে এই প্রথম। কোয়ার্টার ফাইনালে কৃষ্ণান

রমানাথন কৃষ্ণান

স্ট্রেট সেটে ৪নং বাছাই খেলোয়াড় রয় এমার্সনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বছর সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেন। সেমি-ফাইনালে ১৯৬১ সালের সিঙ্গলস বিজয়ী রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬—২, ৮—৬, ৬—২ গেমে কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণান পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার সেমি-ফাইনাল এবং পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিলেন। বাকি ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে কোন খেলোয়াড়ই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউণ্ডের বেশী যেতে পারেননি।

ডেভিস কাপ : ডেভিস কাপ জয়লাভের গৌরব লন টেনিস খেলার দলগত বিভাগে বিশ্বখেতাব লাভের সমান। ১৯৬১ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলায় ভারতবর্ষ ইন্দোনেশিয়াকে ৪—১ খেলায়, থাইল্যাণ্ডকে ৫—০ খেলায় এবং পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে জাপানকে ৪—১ খেলায় পরাজিত ক'রে মূল প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে আমেরিকার সঙ্গে মিলিত হয়। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এই ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলায় আমেরিকা ৩—২ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের ভারত সফর : অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রিচি বেনোর নেতৃত্বে কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত চারদিনের এক প্রদর্শনী খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাবের সভাপতির একাদশ দলের সঙ্গে মিলিত হয়। সভাপতি একাদশ দল পরিচালনা করেন প্রাক্তন ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জি এস রামচাঁদ। কমনওয়েলথ দলের এগারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে মাত্র দু'জন টেস্ট খেলোয়াড় ছিলেন না। ৯ জন টেস্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে ছিলেন ইংল্যাণ্ডের কাউড্রে, গ্রেভনী, সুব্বা রাও এবং সিম্পসন; অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো (অধিনায়ক), ক্রেগ এবং মেকিফ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এভার্টন উইকস এবং রামাধীন। সভাপতি একাদশ দলে একমাত্র টেস্ট খেলোয়াড় ছিলেন রামচাঁদ। এই চারদিনের প্রদর্শনী খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়।

আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা : রাশিয়ার তাসখণ্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় রাশিয়া, ভারতবর্ষ, মঙ্গোলিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং আফগানিস্থান—এই পাঁচটি দেশ যোগদান করে। রাশিয়া প্রথম, ভারতবর্ষ দ্বিতীয় এবং মঙ্গোলিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করে।

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা : মালয়ের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কুয়ালামপুরে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বার্ষিক মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষসহ মোট ৯টি দেশ যোগদান করে।

'এ' গ্রুপের লীগ খেলায় ভারতবর্ষ সর্বনিম্ন স্থান পাওয়াতে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। মোট তিনটি খেলার মধ্যে ভারতবর্ষের খেলার ফলাফল দাঁড়ায় জয় ১ এবং হার ২। জাপান ৩—১ গোলে এবং ভিয়েৎনাম ২—১ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষ ২—১ গোলে 'এ' গ্রুপের শীর্ষস্থান অধিকারী এবং গত তিন বছরের চ্যাম্পিয়ান মালয়কে পরাজিত করে দু'পয়েন্ট পায়। মালয় চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় ইন্দোনেশিয়ার কাছে ১—২ গোলে পরাজিত হয়।

বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতা : জাপানের টোকিও সহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি উদয়চাঁদ তৃতীয় স্থান লাভ করে ব্রোঞ্জ পদক পান।

নিউজিল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় হকি দল : অলিম্পিক হকি খেলোয়াড় উধম সিংয়ের অধিনায়কত্বে ইণ্ডিয়ান ওয়াণ্ডার্স হকি দল ১৯৬১ সালের মে মাসে নিউজিল্যাণ্ড সফরে যায় এবং অপরাজেয় সম্মান নিয়ে ফিরে আসে। দলে ছিলেন ১৬ জন খেলোয়াড়। খেলার ফলাফল : মোট খেলা ২৫, জয় ২২ এবং ড্র ৩। টেস্ট খেলা ৩, জয় ২ ও ড্র ১।

আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা : আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক হকি লীগ প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট ১০টি দেশ যোগদান করে। ভারতবর্ষ ৯টি খেলায় ১৮ পয়েন্ট লাভ ক'রে চ্যাম্পিয়ান খেতাব পায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষ ৫১টা গোল দেয় কিন্তু ভারতবর্ষের বিপক্ষে কোন দলই গোল দিতে পারেনি। এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে জার্মানী (৯টা খেলায় ১৪ পয়েন্ট) এবং তৃতীয় স্থান অস্ট্রেলিয়া (৯টা খেলায় ১৩ পয়েন্ট)। ভারতবর্ষ ১১—০ গোলে জাপানকে, ১১—০ গোলে ইন্দোনেশিয়াকে, ৩—০ গোলে মালয়কে, ৯—০ গোলে হল্যাণ্ডকে, ৪—০ গোলে নিউজিল্যাণ্ডকে, ৫—০ গোলে ইউনাইটেড আরবকে, ৩—০ গোলে অস্ট্রেলিয়াকে, ৪—০ গোলে বেলজিয়ামকে এবং ১—০ গোলে জার্মানীকে পরাজিত করে অপরাজেয় অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়।

॥ ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট ॥

১৯৬২ সালের ১৯শে এপ্রিল ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট সিরিজ শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে ভারতবর্ষের টেস্ট খেলা এবং টেস্ট সিরিজের সংক্ষিপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ দাঁড়িয়েছে :

॥ টেস্ট খেলার ফলাফল ॥

ভারতবর্ষ	মোট খেলা	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের হার	খেলা ড্র
,, ব ইংল্যাণ্ড	২৯	৩	১৫	১১
,, ব অস্ট্রেলিয়া	১৩	১	৮	৪
,, ব ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২০	০	১০	১০
,, ব নিউজিল্যাণ্ড	৫	২	০	৩
,, ব পাকিস্তান	১৫	২	১	১২
মোট :	৮২	৮	৩৪	৪০

॥ টেস্ট সিরিজের ফলাফল ॥

ভারতবর্ষ	মোট সিরিজ	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের হার	সিরিজ ড্র
,, ব ইংল্যাণ্ড	৮	১	৬	১
,, ব অস্ট্রেলিয়া	৩	০	৩	০
,, ব ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৪	০	৪	০
,, ব নিউজিল্যাণ্ড	১	১	০	০
,, ব পাকিস্তান	৩	১	০	২
মোট :	১৯	৩	১৩	৩

সিংহল সফরে ভারতীয় মহিলা হকি দল : সফরে ভারতীয় মহিলা হকি দল অপরাজেয় সম্মান লাভ করে। সফরের সাতটি খেলায় কোন গোল না খেয়ে ৫৯টি গোল দেয়। ১ম টেস্টে ২—০ গোলে, ২য় টেস্টে ৩—০ গোলে এবং ৩য় টেস্টে ৫—০ গোলে ভারতবর্ষ জয়লাভ করে।

এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতা : এই প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয় ১৯৪৯ সালে কলকাতার সাউথ ক্লাবের লনে। সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া সরকারীভাবে যোগদান করায় প্রতিযোগিতার গুরুত্ব এবং মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ের টেনিস খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে নিঃসন্দেহে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান বলা যায়। ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার মহিলা খেলোয়াড় মিস্ লেসলি টার্ণার তিনটি অনুষ্ঠানে (সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস) জয়লাভ ক'রে 'ত্রিমুকুট' সম্মানলাভ করেন। অস্ট্রেলিয়ার রয় এমারসন দু'টি অনুষ্ঠানে (সিঙ্গলস ও ডাবলস) জয়লাভ ক'রে 'দ্বিমুকুট' খেতাব পান। ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে এবং পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে রমানাথন কৃষ্ণান ও নরেশকুমারের জুটি অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের কাছে পরাজিত হ'ন।

রাশিয়ান সার্ভিসেস ফুটবল দলের ভারত সফর : দিল্লীতে অনুষ্ঠিত খেলায় ডুরান্ড কাপ বিজয়ী অন্ধ্র পুলিস দলকে ৫—০ গোলে এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর একাদশ দলকে ৬—০ গোলে, বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত খেলায় বোম্বাইয়ের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে ১১—১ গোলে এবং সার্ভিসেস দলকে ৩—০ গোলে এবং পাটনায় অনুষ্ঠিত খেলায় কলকাতার মোহনবাগান দলকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে।

ভারতবর্ষ ও রাশিয়ার জিমন্যাস্টিক্স ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রাশিয়ান জিমন্যাস্টরা ভারত সফরে এসে তিনটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে তিনটি অনুষ্ঠানেই ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। পাতিয়ালার প্রথম অনুষ্ঠানে জয়লাভের পর দিল্লীর দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে ২১৯·৪—১৯৮·১ পয়েন্টে এবং কলকাতার তৃতীয় অনুষ্ঠানে ২৭৮—২৫২·৪ পয়েন্টে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। ব্যক্তিগত বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন : পাতিয়ালার প্রথম অনুষ্ঠানে আজারিয়ান, দিল্লীর দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে আজনাওরিয়ান (৩৮·১ পয়েন্ট) এবং কলকাতার তৃতীয় অনুষ্ঠানে আজনাওরিয়ান (৫৬·৮ পয়েন্ট)। ১৯৫৬ এবং ১৯৬০ সালের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান আজারিয়ান দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় স্থান পান।

॥ জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (রঞ্জি ট্রফি) : ১৯৬১-৬২ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই দল এক ইনিংস ও ২৮৭ রানে গত বছরের রানার্স-আপ রাজস্থানকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি ৪বার (১৯৫৯-৬২) এবং মোট ১৩বার রঞ্জি ট্রফি জয়লাভের গৌরব লাভ করে। প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ২৮ বছরের ইতিহাসে বোম্বাই দলের এই বিরাট সাফল্য জাতীয় রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়েছে।

জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা : অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত খেলোয়াড় রয় এমারসন ফাইনালের দুটি বিষয়ে (পুরুষদের সিঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলস) জয়লাভ করেন। রয় এমারসন ফাইনালে ভারতীয় এক নম্বর খেলোয়াড় এবং গত বছরের বিজয়ী রমানাথন কৃষ্ণানকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত ক'রে উইম্বলেডন লন টেনিস খেলার কোয়ার্টার ফাইনালে কৃষ্ণানের কাছে পরাজয়ের পাল্টা জবাব দেন। প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া তিনটি অনুষ্ঠানে (পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস) জয়লাভ ক'রে প্রাধান্যলাভ করে। ভারতবর্ষ পুরুষদের ডাবলস খেতাব পায়।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা : দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় গত দু'বছরের পুরুষ বিভাগের চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দল পুরুষ বিভাগের মোট ১৫টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ১৩টি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক লাভ করে। প্রতিযোগিতায় ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান পায় যথাক্রমে রেলওয়ে, পশ্চিম বাংলা এবং কেরালা। মহিলা এবং জুনিয়ার বিভাগে চ্যাম্পিয়ান খেতাব লাভ করে পশ্চিম বাংলা। পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধি কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র তিনটি অনুষ্ঠানে (১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক) স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাছাড়া তিনি ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে বিজয়ী বাংলা দলের পক্ষেও যোগদান করেছিলেন। এইবারের প্রতিযোগিতায় তিনি ছাড়া আর কোন সাঁতারু ব্যক্তিগতভাবে তিনটি বিভাগে প্রথম স্থান পাননি।

সন্ধ্যা চন্দ্র

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান : জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত বিংশতম জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে সার্ভিসেস দল অধিক সংখ্যক পদক লাভ ক'রে পুরুষ এবং বালক বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে। পুরুষ বিভাগের মোট ২৩টি অনুষ্ঠানে সার্ভিসেস দল ১৬টি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক পায়। পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস দলের মোট পদক

সংখ্যা ৩৭ (স্বর্ণ ১৬, রৌপ্য ১৩ ও ব্রোঞ্জ ৮)। বালক বিভাগে সার্ভিসেস দলের মোট পদক সংখ্যা ১১ (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৫)। বালক বিভাগে ২য় স্থান অধিকারী বাংলা দলের মোট পদক সংখ্যা ১০ (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ৫ ও ব্রোঞ্জ ৩)। মহিলা এবং বালিকাদের বিভাগে সর্বাধিক স্বর্ণ পদক পায় মহারাষ্ট্র--মহিলা বিভাগে ৪ এবং বালিকা বিভাগে ৬। মহিলা বিভাগে পদকের হিসাবঃ বাংলা ৭ (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ৩ ও ব্রোঞ্জ ৩), মহীশূরে ৭ (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ৪) এবং মহারাষ্ট্র ৬ (স্বর্ণ ৪ ও ব্রোঞ্জ ২)। বালিকা বিভাগে সর্বাধিক পদক লাভ করে মহারাষ্ট্র ৯ (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ১)। প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দেয় বালিকা বিভাগে ক্রিস্টিন ফোরেজ (মহারাষ্ট্র) এবং বালক বিভাগে কৃষ্ণপ্রতাপ সিং লাম্বা (মহীশূর)। ক্রিস্টিন ফোরেজ ১০টি অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে প্রথম স্থান লাভ করে ৫টিতে, দ্বিতীয় স্থান ২টিতে এবং ৩য় স্থান ১টি অনুষ্ঠানে। তাছাড়া তাঁর সহযোগিতায় মহারাষ্ট্র ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে প্রথম স্থান লাভ করে। এ প্রসঙ্গে সটপুট অনুষ্ঠানে ফোরেজের জাতীয় রেকর্ডও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বালক বিভাগে মহীশূরের প্রতিনিধি কৃষ্ণপ্রতাপ সিং লাম্বা হাইজাম্প, লংজাম্প এবং হপ-স্টেপ-জাম্প অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ ক'রে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে।

॥ পুরস্কার ও মর্যাদা লাভ ॥

রমানাথন কৃষ্ণানের সম্মান লাভ : আমেরিকার বহুল প্রচারিত প্রতিষ্ঠাবান 'ওয়ার্ল্ড টেনিস ম্যাগাজিন'-এ বিশ্বের টেনিস খেলোয়াড়দের যোগ্যতা বিচার করে বিশ্বের খেলোয়াড়দের নামের যে ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান সেই তালিকায় ৮ম স্থান লাভ করেন।

খেলোয়াড়দের রাষ্ট্রীয় খেতাব লাভ : ভারতবর্ষের এয়োদশ সাধারণতন্ত্র দিবসে এই চারজন খেলোয়াড় 'পদ্মশ্রী' খেতাব লাভ করেনঃ ফুটবল খেলোয়াড়

গোষ্ঠ পাল

গোষ্ঠ পাল, টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উমরীগড় এবং নরী কন্ট্রাক্টর এবং ভারতবর্ষের এক নম্বর লন টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান।

অর্জুন পুরস্কার : কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত 'অর্জুন পুরস্কার' প্রদানের প্রথম বছরে খেলাধুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের কৃতী খেলোয়াড় হিসাবে এই ২০ জন ক্রীড়াবিদ 'অর্জুন পুরস্কার' লাভ করেছেন :

ফুটবল : প্রদীপ ব্যানার্জি; **ক্রিকেট :** সেলিম দুরাণী; **হকি**—পৃথিপাল সিং; **লন টেনিস**—রমানাথন কৃষ্ণান; **টেবল টেনিস**—জয়ন্ত ভোরা; **এ্যাথলেটিক্স**—গুরবচন সিং; **ব্যাডমিন্টন**—নান্দু নাটেকার; **বাস্কেটবল**— সরাবজিৎ সিং; **মহিলা হকি**—এ্যান লামসডেন; **জিমন্যাস্টিক**—শ্যামলাল; **মুষ্টিযুদ্ধ**—এল 'বাড়ি' ডি'সুজা; **ভারোত্তোলন**—এ এন ঘোষ; **সন্তরণ**—জেম বজরঙ্গী প্রসাদ; **রাইফেল সুটিং**— মহারাজা কারণী সিংজী; **কুস্তি**—হাবিলদার উদয়চাঁদ; **ভলিবল**—এ পালানিচামী; **পোলো**—

প্রদীপ ব্যানার্জি

মহারাজ প্রেম সিং; **স্কোয়াস**—ক্যাপ্টেন কে এস জৈন; **গলফ**—ক্যাপ্টেন পি জি শেঠী; **দাবা**—ম্যানুয়েল এ্যারন।

এ্যান লামসডেন

'লিউটি' কাপ পুরস্কার : ১৯৬২ সালের শ্রেষ্ঠ হকি দল হিসাবে ভারতবর্ষ বিখ্যাত 'লিউটি কাপ' পুরস্কার লাভ করে। ইন্টার ন্যাশনাল হকি ফেডারেশনের প্রথম সভাপতির স্মৃতিরক্ষার্থে এই পুরস্কার প্রতি বছরের শ্রেষ্ঠ হকি দলকে দেওয়া হয়। ইটালী ১৯৬০ সালে এবং স্পেন ১৯৬১ সালে এই পুরস্কার পায়। আহমেদাবাদে প্রথম আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং সেই প্রতিযোগিতায় অপরাজেয় অবস্থায় চ্যাম্পিয়নসীপ লাভ করায় ভারতবর্ষ এই পুরস্কার পায়।

মা-জননীরা, আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। গল্প লেখা আমার নেশা। আবার পেশাও বটে। কিন্তু তা বলে আমি আপনাদের কখনও গল্প শোনানোর নাম করে মিথ্যে কথা শোনাতে পারিনি। সে-কাজ আমার দ্বারা হয় না। প্রতিদিন লেখবার আগে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র তেত্রিশ কোটি দেবতা আর মা-বসুমতীকে সাক্ষী রেখে আমি লিখতে শুরু করি, যাঁরা শোনেন তাঁরা কেউ ভালো বলেন প্রশংসা করেন, আবার কেউ নিন্দে করেন। তা নিন্দে করুনগে তাতে আমার কোনও ক্ষতি নেই। আমি আপনাদের গল্প শুনিয়ে খালাস! নিজের বিবেকের কাছে আমি খাঁটি, এই আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। এর চেয়ে বেশি সুখ আমি চাই না। আপনারা বিশ্বাস করুন আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি, আপনাদের আমি ভক্তি করি। মায়ের জাতির ওপর আমার বিশ্বাসের অন্ত নেই।

এই গৌরচন্দ্রিকাটুকু এ-গল্পের পক্ষে অপরিহার্য। এ-টুকু না বললে আপনারা আমাকে ভুল বুঝতে পারেন, তাই বলছি। এবার আপনারা গল্পটা শুনুন।

ছোটগল্পের আগে নায়ক-নায়িকার বা পাত্রপাত্রীর নাম বলা দরকার। কিন্তু এ-গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম আমি প্রথমে জানতাম না। শুধু আমি নয়, আমার সঙ্গে যত লোক সেদিন ভবানীপুর থানায় ছিলো কেউই জানতো না।

ভবানীপুর থানার দারোগাও বার বার মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করেছিল—আপনার নাম কী?

মহিলাটি কিছুই উত্তর দেননি। চুপ করে ছিলেন শুধু।

—বলুন আপনার নাম কী?

—আপনি কোথায় থাকেন?

—আপনার স্বামীর নাম কী?

কোনও কথারই উত্তর সেদিন দেননি মহিলাটি।

ভবানীপুর থানা তখন মানুষের ভিড়ে ভেঙে পড়ছে। দু'নম্বর বাসে যত লোক ছিল প্রায় সবাই তখন এসে থানার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। যারা ভেতরে ঢুকতে পারেনি তারা বাইরে থেকে উঁকি মারবার চেষ্টা। পুলিশ কনস্টেবলরা অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছে না আর।

—এখানে কী হয়েছে মশাই?

রাস্তায় বেকার লোকের অভাব নেই কলকাতা শহরে। উত্তেজনার খোরাক চাই সকলের। রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে কোথাও কিছু মানুষের ভিড় দেখলেই উঁকি মেরে দেখি। কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে খুশী হই।

—কী হয়েছে মশাই এখানে? ভিড় কীসের?

—কে জানে মশাই, আমিও

আপনার মত, কিছুই বুঝতে পারছি না।

পাশ থেকে একজন বললে—চোর ধরেছে বাসে—

—চোর?

—হ্যাঁ মশাই, শুনছি নাকি মেয়েমানুষ চোর।

মেয়েমানুষ চোর কথাটা বারুদের মত হঠাৎ যেন বাতাসকে বিষাক্ত করে দিলে। যারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের কানে কথাটা যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের দেখাদেখি আরো কয়েকজন। যারা জরুরী কাজে বেরিয়েছিল তারা কাজ পণ্ড করে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করলে।

কয়েকটা কনস্টেবল তখন একেবারে থানার সামনে রুল উঁচিয়ে হেঁকে এল—ভাগো, ভিড় হটাও—ভিড় হটাও—

কিন্তু কে আর তখন শুনছে তাদের কথা। যারা ভেতরে ঢুকেছে, একেবারে মহিলাটির কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, তাদেরই বেশি সুবিধে। তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মহিলাটিকে। অনেকক্ষণ থেকেই দেখে আসছে। সেই যখন বৌবাজারে দু'নম্বর বাসে উঠেছিল। উঠে লেডিজ-সীটে বসেছিল। অবশ্য তখন এমন করে তার দিকে নজর করবার সুযোগ আসেনি। অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও কোনও মহিলার মুখের দিকে ক্যাট্-ক্যাট্ করে চেয়ে থাকা যায় না। চাওয়া উচিতও নয়। অমন কত মেয়ে বাসে উঠছে, বাস থেকে নামছে, কে আর তার হিসেব রাখছে।

—আপনি কোথা থেকে বাসে উঠেছিলেন?

ডবল্-ডেকার বাসের একতলায় ঢুকেই দু'পাশে লম্বা লেডীজ-সীট। একজন লেডী ওঠে তো আর একজন নামে। কখনও বাসে চাপাচাপি ভিড়। পুরুষেরা প্যাসেজের ওপর, পাদানিতে সিঁড়ির ধাপে-ধাপে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে দোল খাচ্ছে, ধাক্কা খাচ্ছে, ঝুলছে। তখন হয়ত লেডীজ-সীটের ওপর একটি মেয়ে সব জায়গাটা জুড়ে বসে আছে। সবাই পকেট সামলাচ্ছে, জামা-কাপড় জুতো বাঁচাচ্ছে। তার ওপর অফিসের ছুটির সময়। সে-সময়ে কারো জ্ঞান ছিল না কোনও দিকে। এক-একটা স্টপেজ্ এসেছে আর যেন মল্ল-যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কারো হাতে ছাতা, কারো পুঁটলি, কারো ফাইল। জামা ছিঁড়ে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। সে-সময় লেডীজ-সীটের দিকে নজর দেবার সময় ছিল না।

—আপনি ঠিক জানেন এটা আপনার এটাচি কেস্?

মনে আছে এক ভদ্রলোক উঠেছিলেন ঠিক বোধহয় মেডিক্যাল কলেজের সামনের স্টপেজ থেকে। ট্রাউজার-ওপন-ব্রেস্ট কোট পরা ছিল। খুব জরুরী কাজেই বোধহয় যাচ্ছিলেন। হাতে ছিল একটা এটাচি কেস। বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে বললেন—মশাই একটু ভেতরে সরে যাবেন,—

কে আর সরে যাবে! কে আর অন্য লোকের দুঃখ বোঝে। কার এত মাথাব্যথা!

কিন্তু তারই মধ্যে ভদ্রলোক এক হাতে এটাচি কেস আর এক হাতে হ্যাণ্ডেলটা ধরে একটা পা পাদানিতে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন কোনও মতে। তারপর ঝুলতে ঝুলতে চলতে গিয়ে হাতটা একটু ব্যথা হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। তাড়া কার নেই? সকলেরই তো জরুরী কাজ। সকলেই তো কাজ করতে ছুটেছে। কেউ বাড়ি যাবে, কেউ আত্মীয়ের সংগে দেখা করতে যাবে, কেউ হাসপাতালে যাবে। নানান্ ঝঞ্ঝাটে সবাই জ্বলছে। কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।

তবু মনে আছে, ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত পাদানি পেরিয়ে প্যাসেজ, প্যাসেজ থেকে একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন। তারপর একটা লেডীজ-সীট খালি দেখে হাতের বোঝাটা খালি করবার জন্যে এটাচি কেসটা সেখানে এককোণে রেখে দিয়েছিলেন।

এ-ঘটনা কেউ দেখেছে, অনেকে দেখেও নি।

আজকের দিনে কারোর এমন সময় নেই যে সব দিকে চোখ মেলে সব কিছু দেখবে। আর তা ছাড়া বাসের মধ্যে কেউ কারোকে চেনে না। কে কার পাশে বসলো তা দেখবারও সময় নেই। শুধু কোথায় কোন্ সীট্টা খালি হলো কিম্বা খালি হতে পারে, সেই দিকেই নজর। একটা সীট খালি হবার সূচনা হলেই দশজনে হাঁ হাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কে আগে বসতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলে। সেই পাইকপাড়া থেকে বালিগঞ্জ ষ্টেশন পর্যন্ত এই-ই হচ্ছে প্রতিটি বাসের ভেতরের ইতিহাস। ভেতরের প্রাত্যহিক মর্মান্তিক ইতিহাস।

ইন্স্পেকটর বললেন—তারপর?

যে-ভদ্রলোক গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করে এসেছেন তিনি বললেন—তারপর এলগিন রোডের কাছে আসতেই এক ভদ্রলোক তাড়াহুড়ো করে সকলকে ঠেলেঠুলে চিৎকার করে উঠলেন—বাঁধকে, বাঁধকে—
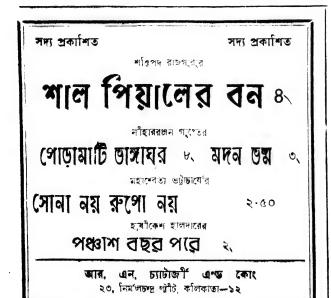
বাস তখন ভালো করে বাঁধেও নি। ভদ্রলোক বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। আর ভালো করে থামবার আগেই কণ্ডাক্টর আবার বেল্ বাজিয়ে দিয়েছে, আর সামনে ট্র্যাফিক সিগন্যাল-

ল্যাম্প গ্রীণ ছিল, ড্রাইভারও স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে।

—তারপর ?

— তখন আমার খেয়াল হলো ভদ্রলোক তো এটাচি কেসটা ফেলে গেলেন। এই ট্রাউজার আর ওপন-ব্রেস্ট কোট পরা ভদ্রলোকই তো মেডিকেল কলেজের সামনে থেকে এটাচি কেসটা নিয়ে উঠেছিলেন। অতি কষ্টে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে-ঝুলতে শেষকালে ভেতরে ঢুকে ওই খালি লেডীজ-সীটটার ওপর এটাচি কেসটা রেখেছিলেন।

কথাটা কণ্ডাকটরকে বলতেই সেও ঘণ্টা দিলে।

সবাই মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলুম— ও-মশাই, আপনার এটাচি কেস ফেলে গেলেন, ও-মশাই, শুনেছেন— ?

ভদ্রলোক তখন কোথায় রাস্তায় নেমে কোন দিকে গেছেন তার আর পাত্তা নেই। আর বাসটাও তখন পুরো স্পীডে এগিয়ে চলেছে। সবাই মিলে আলোচনা করা হলো ওটাকে বাসের ডিপোতে গিয়ে জমা দেওয়া ভালো। যদি বাড়ি গিয়ে মনে পড়ে, তাহলেও একবার খবর নিতে পারেন বাস-অফিসে।

—কণ্ডাকটর, ওটা ডিপোতে জমা দিয়ে দেবেন! আহা, দামী জিনিষ হয়ত ভদ্রলোক ফেলে গেছেন!

কিন্তু এটাচি কেসটা নিতে যেতেই মহিলাটি কেমন বিরক্ত হলো।

বললে—এটা তো আমার—

—আপনার ?

মহিলাটি বললে—হ্যাঁ আমার, এটা আমার জিনিষ—

কণ্ডাকটর প্রথমে একটু কিন্তু-কিন্তু করেছিল। বেশ ধোপ-দুরস্ত মহিলা। গলায় সোনার সরু চেন-হার রয়েছে। হাতে সোনার বালা রয়েছে। ছাপা সাড়ি, সং-শিলভ ব্লাউজ, ডোনাট-খোপা। যেমন অন্য মেয়েদের থাকে, সেই রকমই। কোনও তফাৎ নেই। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মহিলা। বেশ ছিম্-ছাম গড়ন। বয়েস ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হবে। কেমন যেন বেশ একটা মিষ্টি মাধুর্য মুখের আদলে।

কণ্ডাকটর হাত বাড়িয়েও হাতটা গুটিয়ে নিলে। মহিলা ততক্ষণ এটাচি কেসটা নিজের কোলে তুলে নিয়েছে।

কিন্তু বাসের মধ্যে দু'একজন জাঁদরেল প্যাসেঞ্জারও থাকে। তারা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। তারা সব সময় দুর্বলের পক্ষে। তারা ত্রাণকর্তা। পতিত-পাবন।

—আপনার কী-রকম ? ওটা তো ওই ভদ্রলোক ফেলে গেলেন। আমি তো নিজের চোখে দেখেছি।

বাসসুদ্ধ লোক এতক্ষণ সচেতন হয়ে উঠেছে। সবাই চেয়ে দেখলে মহিলাটির দিকে। সকলের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে উঠেছে মহিলাটি।

—আপনি দেখেছেন ?

— হ্যাঁ মশাই, আমি নিজের চোখে দেখেছি। মেডিকাল কলেজের সামনে ভদ্রলোক উঠলেন হাতে এটাচি কেসটা নিয়ে, শেষকালে কোথাও রাখবার জায়গা না পেয়ে ওই খালি জায়গাটায় রেখে দিলেন।

আর একজন পাশ থেকে বললেন— না না মশাই, আমিও দেখেছি, ভদ্রলোকের হাতে এটাচি কেসটা ছিল!

—আহা, এতক্ষণ বোধহয় সে-ভদ্রলোক বাড়িতে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন।

—মশাই, বাসে এ-রকম কত লোক কত কী ফেলে যান!

উপদেশ দেবার লোকেরও অভাব হয় না। কণ্ডাকটরকে একজন বললে—
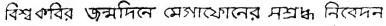
আপনি কারো কথা শুনবেন না মশাই, আপনি ডিপোতে গিয়ে ওটা জমা দেবেন—

কন্ডাকটর মহিলাটির দিকে আবার হাত বাড়িয়ে দিলে—দিন, এটাচি কেস্‌টা দিন!

—এটা আমার!

—আমার মানে ?

—আমার মানে আমার!

এতক্ষণ যারা কোনও-কিছুতেই মাথা ঘামায় না, সেই শান্ত-শিষ্ট-শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকের দলও মুখ ফেরান এবার।

—আপনার জিনিষ বললেই হলো! আমরা দেখলুম অন্য এক ভদ্রলোক এটাচি কেস্‌ নিয়ে ওখানে রেখে দিলেন, আর আপনি বলছেন আপনার? আপনার বললেই আমরা ছেড়ে দেব?

বেশ গরম হয়ে উঠলো ভেতরে। ড্রাইভার তখন ফুল-ফোর্সে গাড়ি চালিয়েছে। কন্ডাকটরের টিকিট কাটা ঘুচে গেল।

—আপনি জিনিষটা দেবেন কি না বলুন?

মহিলাটি গম্ভীর গলায় বললে—আপনাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।

—কথা বলতে আপনাকে কে বলছে? জিনিষটা দিয়ে চুপ করে থাকুন।

অন্য লেডীজ-সীটে যে-সব মহিলারা বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও ব্যাপারটা সংক্রামিত হয়ে গেছে ততক্ষণে। একজন বুড়ী মতন মহিলা বললেন—কেন বাবা, তোমরা অমন করে বলছো? কেউ কি কারো জিনিষ এমন করে নিতে পারে?

—নিতে পারে কি না সে আমরা জানি। যা জানেন না, তা নিয়ে আপনি কথা বলতে আসবেন না।

আর একজন মাঝ-বয়েসী মহিলা ওপাশে বসেছিলেন। তিনি বললেন—আপনারা কেন ওঁকে অমন করে বলছেন? মেয়েদের সম্মান রেখে কথা বলতে পারেন না?

—আপনি আর এর মধ্যে কথা বলতে আসবেন না মা, আমরা যথেষ্ট সম্মান রেখে কথা বলছি।

এটাচি কেসটা হাতে নিয়ে ভদ্রমহিলা এবার উঠলো। স্টপেজ এসেছে একটা। একেবারে নেমে চলে যাবার চেষ্টা।

—কন্ডাকটার, যেতে দেবেন না ওঁকে।

—কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

মহিলাটি বললে—আমি নামবো এখানে, সরুন!

—নেমে যাবেন মানে? এটাচি কেস্‌টা দিয়ে নেমে যান!

ভদ্রমহিলা তবু নামবার উদ্যোগ করছে। কয়েকজন সামনে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল। বললে—জিনিষ চুরি করে নেমে যেতে পারবেন না।

ভদ্রমহিলা বললে—জানেন, আপনাদের পুলিশ ডেকে অ্যারেস্ট করাতে পারি!

ওপাশ থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললে—আঃ, আপনারা যেতে দিন না ওঁকে, কেন রাস্তা আটকাচ্ছেন?

সে কথায় কান দিলে না কেউ। বললে—পুলিশের ভয় দেখাবেন না, তাতে আপনিই বিপদে পড়বেন—

একজন বললে—চলুন, ওঁকে ধরে নিয়ে থানায় চলুন, সব হিস্তে হয়ে যাবে—

কথাটা তুলতেই হৈ হৈ করে উঠলো সবাই। বাস ছেড়ে দিচ্ছিল। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে! সবাই নামলো। ভদ্রমহিলা নামলো। বাসসুদ্ধ লোকই নামলো। কিছু বাইরের লোকও জুটলো। সামনেই ভবানীপুর থানা। ভবানীপুর থানাতেই নিয়ে চলুন মশাই। মুখো-মুখি ফয়শালা হয়ে যাক্‌।

—তারপর?

ইন্‌স্পেকটর এতক্ষণ কোনও কথারই সঠিক জবাব পাননি। আবার বললেন—এঁরা সবাই দেখেছেন এক ভদ্রলোক এটাচি কেস নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে উঠেছেন, আর আপনি বলছেন এটা আপনার?

চারদিকের ভিড়ের মধ্যে তখন তুমুল হৈ চৈ চলছে।

কনস্টেবল কয়েকজন ভিড় সরিয়ে ঘর খালি করার চেষ্টা করলে। কিন্তু কে বাইরে যাবে? এমন মুখরোচক দৃশ্য দেখতে পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নাকি? তারা রুল উঁচিয়ে এগিয়ে এল। হাটো, বাহার যাও সব—হাট্‌ যাও—

—কথার জবাব দিন? চুপ করে আছেন কেন?

ভদ্রমহিলা বললে—আপনি বিশ্বাস করুন, এ এটাচি কেস্‌ আমার—

—আপনি কোথা থেকে উঠেছিলেন?

—বৌবাজার থেকে।

—যে ভদ্রলোক হাতে এটাচি কেস্‌টা

নিয়ে উঠেছিলেন, তিনি কি আপনার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন এটা?

মহিলাটি বললে—তিনি রাখতে দেবেন কেন? তাঁর জিনিষ হলে তিনি তো যাবার সময় এটা নিয়ে নেমে যেতেন! এটা তো আমার।

—আপনার বাড়ি কোথায়?

—ভবানীপুরে রামময় রোডে!

—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ভদ্রমহিলা বললে—বৌবাজারে আমার বোনের বাড়ি, আমি সেখান থেকেই আসছি।

—এ এটাচি কেসের মধ্যে কী জিনিষ আছে?

ভদ্রমহিলা বললে—আমার শাড়ি একটা আর টাকা কিছু আছে।

—কত টাকা আছে?

ভদ্রমহিলা বললে—তা মনে নেই—

—মনে করার চেষ্টা করুন না। নিজের টাকা রেখে দিয়েছেন আর কত টাকা আছে মনে করতে পারছেন না?

ভদ্রমহিলা বললে—না—

—চাবি? এর চাবি আছে আপনার কাছে?
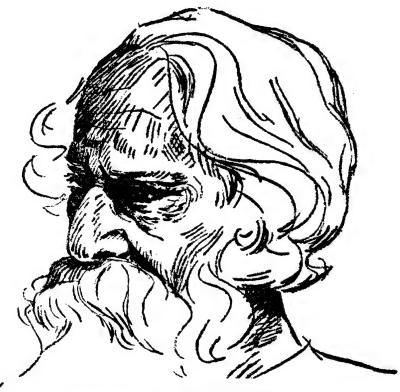
ভদ্রমহিলা বললে—না।

—সে কী? নিজের এটাচি কেস্, আর নিজের কাছে এর চাবি নেই?

ভদ্রমহিলা বললে—আমার বোনের বাড়িতে ভুলে চাবিটা ফেলে এসেছি।

—আপনার বোনের বাড়িতে টেলিফোন আছে?

ভদ্রমহিলা বললে—না—

ইন্‌স্পেক্‌টর হুঁশিয়ার লোক। বললেন—তাতে ক্ষতি নেই, আমার কাছে মাস্টার-কী আছে, তা দিয়ে সব খোলা যাবে।

বলে তিনি একজন কনস্টেবলকে মাস্টার-কী'র গোছাটা আনতে বললেন। এক মিনিটের ধৈর্য পরীক্ষা। কিন্তু সকলের মনে হলো সেই এক মিনিটই যেন কল্পকালে রূপান্তরিত হয়ে গেল সেদিন সেই ভবানীপুর পুলিশ স্টেশনের ভেতরে। আর এটাচি কেস্‌টা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সমস্ত পাপ, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত কলঙ্ক যেন এক চাবির মোচড়ে হাঁ করে উঠলো।

আশে-পাশের ভিড়ের মানুষ তখন উল্লাসে উন্দাম হয়ে উঠেছে।

ভদ্রমহিলা আর থাকতে পারলে না। যেন ভেঙে পড়লো। বললে—এ এটাচি কেস আমার নয়, আমি মিথ্যে কথা বলেছিলুম, বিশ্বাস করুন, এ আমার নয়, আমি এর বিন্দু-বিসর্গও জানি না।

বলতে বলতে ভদ্রমহিলা সেই অবস্থাতেই চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

—তারপর?

মা-জননীরা, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সত্য বই মিথ্যে জানি না। আমি প্রতিদিন লেখবার আগে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র তেত্রিশ-কোটি দেবতা, মাতা-বসুমতীকে সাক্ষী রেখে কলম ধরি। লেখা আমার নেশা, আবার পেশাও বটে। কিন্তু তা'বলে গল্প শোনানোর নাম করে কখনও আমি আপনাদের মিথ্যে কথা বলতে পারিনি। আপনারা আমার শ্রদ্ধার পাত্রী, আপনারা আমার ভক্তির পাত্রী। আপনাদের মর্যাদাহানি আমার কল্পনার বাইরে। আমি আপনাদের আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান জানাই।

"এ আমার নয়, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না।"

যারা শুনছিল এতক্ষণ তারা অধৈর্য হয়ে উঠলো।

বললে—ও-সব কথা থাক, তারপর কী হলো বলুন? এটাচি কেসের ভেতর কী ছিল?

—সেই কথাই তো বলছি। যুগ যুগ ধরে সাহিত্য মানুষের কল্যাণ-বোধকেই জাগ্রত করেছে, সাহিত্য জাতির মনের মুকুর......

—ও-সব কথা থাক, এটাচি কেসের মধ্যে কী পাওয়া গেল বলুন শিগ্‌গির?

—একটা ছোট একদিনের মরা ছেলে!

সমস্ত লোক স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

—কিন্তু সেদিন যারা সেই থানার মধ্যে ছিল তখন তাদের সকলেরই মনে হয়েছিল ও যেন মরা ছেলে নয়, মানুষের ধর্ম মানুষের কীর্তিকে কেউ খুন করে রেখে গেছে যেন এটাচি কেসের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আত্মার গলা টিপে কেউ যেন ওখানে হত্যা করে ওই রকম করে সংকার করতে চেয়েছে।

মেঘের উপর প্রাসাদ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ পাঁচ ॥

কলকাতা এক—কলকাতা অনেক। একের মধ্যে তার বিশ্বরূপ।

সে খবর দীপি জানত না, যখন ময়লা ফ্রক পরে, বাবার কায়ক্লেশের ফলে জোগাড় করা সাম্পল্ কপি বই নিয়ে স্কুলে পড়তে যেত। ফ্রক পরার বয়েস পেরিয়েও টাকার অভাবে বাবা যখন তাকে শাড়ী কিনে দিতে পারেনি—যখন তার সেই করুণ-কৈশোরের ওপর এক-আধটা কুৎসিত মন্তব্য এসে কাদার ছিটে দিয়েছে, তখনো তাদের কোনো স্পষ্ট অর্থ ধরা পড়েনি তার কাছে। তখনো দীপি বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে হাওড়া ব্রীজ দেখে খুশি হত, চৌরঙ্গীর নিয়ন আলোর চাতুর্য দেখে তার বিস্ময়ের সীমা থাকত না, বছরে একদিন চিড়িয়াখানায় যাওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করলে কী অসম্ভব ভালো লাগত কলকাতাকে!

সেই সময় তাদের ক্লাস-টীচার তনুদি—তনুশ্রী সেন একটা গল্প বলেছিলেন।

তনুদির বয়েস কুড়ি-বাইশের বেশি ছিল না, রোগা আর ছোট বলে পনেরো ষোলো বছরের মেয়ের মতো মনে হত। রং কালো হলেও ভারী মিষ্টি ছিল মুখখানা, ইতিহাস পড়াতে পড়াতে ডাগর ডাগর চোখ দুটো যেন মুখের মধ্যে তলিয়ে যেত। একদিন বোধ হয় তাড়াতাড়িতে এলো খোঁপা বেঁধে এসেছিলেন। একবারের জন্যে খুলে গিয়েছিল চুলের রাশ, ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে অবাক হয়ে দেখেছিল ওইটুকু মানুষের চুলগুলো গোছায় গোছায় কোমর ছাপিয়ে নেমে পড়েছে।

এমনিতে খুব গম্ভীর ছিলেন তনুদি। ক্লাসের বাইরে প্রায় কথাই বলতেন না। মেয়েরা তাঁকে ভালোবাসত, ভয়ও করত। তারপর একদিন স্কুলে নানা রকম গোলযোগ শোনা গেল। তনুদির সঙ্গে নাকি হেড মিস্ট্রেস আর সেক্রেটারীর কী নিয়ে খুব ঝগড়া হয়েছে, স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তিনি।

তনুদি ক্লাসে এলেন, নাম ডাকলেন, কিছুক্ষণ ইতিহাস পড়ালেন, তারপর হঠাৎ বন্ধ করলেন বইটা। মেয়েদের মাথার ওপর দিয়ে কয়েক মিনিট চেয়ে রইলেন পেছনের দেওয়ালটার দিকে। বললেন, তোমাদের একটা গল্প বলি, শোনো।

মেয়েরা খুশি হল, আশ্চর্যও হল সেই সঙ্গে। তনুদির মতো রাশভারী মানুষ আচমকা পড়ানো ছেড়ে দিয়ে গল্প বলতে আরম্ভ করবেন—মেয়েরা যেন পুরোপুরি সেটা বিশ্বাস করতে পারল না।

তেমনি দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে তনুদি বলেছিলেন, গল্পটা হ্যানস্ অ্যান্ডারসনের লেখা। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে চমৎকার গল্প লিখতেন তিনি।

ক্লাসের সবচেয়ে ভালো মেয়ে ব্রততী বলেছিল, জানি দিদিমণি, আগলি ডাকলিংয়ের গল্প পড়েছি।

জবাব না দিয়ে তনুদি বলেছিলেন, তাঁর একটা ছোট্ট গল্প বলছি। একজন বুড়ো মানুষ ছিল, তার নাম ক্রিবল-ক্র্যাবল্। সে চাইত সব জিনিসকে সুন্দর আর ভালো করে দেখতে। নানা রকম জাদুবিদ্যা তার জানা ছিল, সেই জাদু দিয়ে সব নোংরা আর বিশ্রী জিনিসকে সে সুন্দর করে তুলত।

একদিন সে পচা নর্দমা থেকে এক ফোঁটা জল নিয়ে রাখল মাইক্রোস্কোপের নীচে। মাইক্রোস্কোপ জানো তো? যে-সব ছোট ছোট জীবাণু এমনিতে কেউ চোখে দেখে না, তার ভেতর দিয়ে সেগুলো খুব বড়ো আর স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়। ক্রিবল-ক্র্যাবল মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখল, নর্দমার পচা জলে কী অসংখ্য সব কদাকার পোকা! আর পোকারা কী করছে? এ ওকে মারছে—সে তাকে খাচ্ছে—সে এক বীভৎস ব্যাপার!

ক্রিবল-ক্র্যাবল সে দৃশ্য সইতে পারল না। ওই পোকাগুলোকে সুন্দর করবার জন্যে জলের বিন্দুর সঙ্গে এক-ফোঁটা ডাইনির রক্ত মিশিয়ে দিলে। তাতে করে জলটা লালচে হয়ে গেল। পোকাগুলোর রঙ হল মানুষের মতো—এমনকি তাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ বলে মনে হতে লাগল। আর সেই পোকা-মানুষেরা কী করলে? তারা একে মারতে লাগল, তাকে ধরে খেতে লাগল।

ক্রিবল-ক্র্যাবল দেখলে, একটি মেয়ে চুপ করে বসে আছে। সে ওসব খেয়োখেয়ির মধ্যে নেই। সেই মেয়েটি ভাবছে, সে জীবনে সৎ হবে, সুন্দর হবে। অমনি অন্য পোকা-মানুষগুলো তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল, তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলল।

তখন আর এক বুড়ো জাদুকরকে সে বললে, দ্যাখো তো আমার মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে। কী দেখছ বলো আমাকে।

সেই বুড়ো দেখে-শুনে বললে, আরে এতো একটা শহর দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমাদের কোপেনহাগেন। অন্য কোনো শহরও হতে পারে—কারণ যে-কোনো বড়ো শহরের চেহারাই এক

রকম। তবে এটা যে কোনো শহর, তাতে আমার একবিন্দু সন্দেহ নেই।

ক্লিবুল-ক্যাবুল বললে, দুত্তোর! এ তো নর্দমার পচা জল!

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গিয়েছিলেন তনুদি। মেয়েরা অবাক হয়ে দেখেছিল, তনুদির ডাগর ডাগর চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে আর সেই সঙ্গে অদ্ভুতভাবে দপ দপ করে জ্বলছে।

তখনো ঘণ্টা পড়েনি। তনুদি বই-খাতা তুলে নিলেন। বললেন, আমি এই স্কুল থেকে চলে যাচ্ছি। কাল থেকে আর আসব না। তোমাদের কাছে অনেক অন্যায় করেছি হয়তো, অকারণে বকেছি, শাস্তি দিয়েছি। পারো তো সেজন্যে আমায় ক্ষমা কোরো।

তারপরেই বেরিয়ে গেলেন ক্লাস থেকে। মেয়েরা দেখল, দরজার বাইরে পা দিতেই তাঁর হাতের রুমাল চোখে উঠল।

সে আজ অনেক বছরের কথা। দীপ্তি ভালো ছাত্রী ছিল না—কিন্তু তনুদির সেই আশ্চর্য গল্পটা—যার একটি বর্ণও তখন তারা কেউ বুঝতে পারেনি—সেই গল্পের সবটা তার মনে আছে। এমনকি হ্যান্স্ অ্যান্ডারসন আর সেই বিদঘুটে নাম ক্লিবুল-ক্যাবুল—কিছুই সে ভুলে যায়নি।

আজকে দীপ্তি জানে, ওই গল্পের অর্থ কী। অনেক দাম দিয়ে ওই গল্পটা তাকে বুঝতে হয়েছে।

সব সময় চেতনাটা স্পষ্ট থাকে না। কিন্তু এক একদিন সকালে অতৃপ্ত—বিশ্রামহীন ঘুম থেকে জেগে উঠলে, মাথার শিরাগুলোতে থেকে থেকে যন্ত্রণার বিদ্যুৎ বয়ে গেলে, জিভে আর মুখের ভেতর তিক্ততার একটা মোটা প্রলেপ জড়িয়ে রয়েছে এই রকম মনে হলে আর নিজের উদামহীন শরীরটাকে ডাস্টবিনের নোংরা ন্যাকড়ার চাইতেও কদর্য বলে বোধ হতে থাকলে, তখন এই গল্পটা কোথা থেকে সামনে এসে দেখা দেয়।

তখন সারা কলকাতায় নানা রঙের পোকারা এ ওকে ছিঁড়ে খাচ্ছে, এ ছবিটা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। দীপ্তি এক-বারের জন্যে ঝুলে-পড়া ছাতের কড়ি-কাঠের দিকে তাকায়। কিন্তু অতই কি সহজ? চার বছর আগে যা পারেনি, আজ তা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে তার পক্ষে।

অথচ, এভাবে কিছুই আরম্ভ হয়নি।

অভাবের সংসার নিজের মতো করে চলছিল। কষ্ট ছিল, সুখও ছিল তার ভেতরে। দীপ্তি ভাবছিল, স্কুলের পড়া শেষ করে যদি অন্তত আই-এটাও পাশ করতে পারে, তা হলে একটা মাস্টারি জুটবে, বাবার একলার ওপরে যে চাপটা পড়ছে, তার খানিকটাও সে ভাগ করে নিতে পারবে। কিন্তু মাঝপথে থমকে গেল সে-সব। গৌরাঙ্গবাবুকে বাতে ধরল।

অথর্ব বুড়ো হয়ে নয়, বিকলাঙ্গ হয়েও নয়। বেঁচে থেকেও যে কী নিদারুণ মৃত্যুর ভেতরে মানুষের দিন কাটতে পারে, গৌরাঙ্গবাবুই তার নমুনো। বাবার যন্ত্রণা দেখে করাতকলের কথা মনে আসে দীপ্তির। সেই উজ্জ্বল ধারালো অদ্ভুত অসংখ্য তীক্ষ্ণধার দাঁত দিয়ে সমানে কাঠ চিরে চলেছে—যেন হাড়-মাংস চিবুচ্ছে এমনি কর্কশ আওয়াজ উঠছে একটানা। শিউরে উঠে দীপ্তি ছোটবেলায় ভেবেছে, তার মাথার ভেতর দিয়ে কেউ যদি অমনি একটা করাতকল চালিয়ে দেয়—তা হলে কি রকম হবে তার যন্ত্রণা!

সেই যন্ত্রণা সে দেখতে পেলো গৌরাঙ্গবাবুর শরীরে। আর তাঁর শরীর থেকে সেটা বেরিয়ে এল ক্ষুধা হয়ে—সমস্ত সংসারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। রাউজের ভেতর বইয়ের পাতা লুকিয়ে নিয়ে, নকল করে থার্ড ডিভিশনে পাশ করল দীপ্তি। তারপরে চাকরির খোঁজ।

কিছুদিন সকালে সরকারী দুধের বোতল বিলি করল, কিন্তু হিসেব

মেলাতে গোলমাল হয়ে যায়, লাইন বাঁধা বিরক্ত মানুষগুলির সঙ্গে খিটিমিটি বাধতে থাকে তুচ্ছ কারণে। যৎসামান্য মাইনের জন্যে এত ঝঞ্ঝাট তার অসহ্য ঠেকল। আবার পথে বেরুল দীপ্তি।

দেড়শো-দুশো মেয়ের সঙ্গে দু-দুবার নার্সিংয়ে ইণ্টারভিউ দিল, পেলো না। স্কুলের চাকরির স্বপ্ন—বি-এ এম-এ পাশ করা বেকার মেয়েরা সেখানে মাথা ঠুকে মরছে। একটা আধা-সরকারী নারী-কল্যাণ আশ্রমে কাজ শিখতে গিয়েছিল, সামান্য ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি হওয়াতে সোজা বের করে দিলে সেখান থেকে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের তালিকায় নাম লেখানো ছিল, কিন্তু সেখান থেকেও তার ডাক এল না।

শেষ পর্যন্ত চাকরি জুটল শহরতলীর এক কেমিক্যালস্-এর কারখানায়। কিছু কেরানীগিরি, বাকীটা প্যাকিংয়ের কাজ। বাসে করে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হয়, হাঁটতে হয় আরো প্রায় আধ মাইল। সকালে বেরিয়ে ফিরতে সন্ধ্যা বাজে।

সেই শহরতলীর কারখানাতেই এক কলকাতার মধ্যে দেখল আর এক কলকাতাকে। মাইক্রোসকোপ দিয়ে যাকে দেখতে হয়।

বিকেলে বেরুবার একটু আগেই অগ্নিকোণে ঘন ঘন আগুনের খেলা দেখিয়ে ঝড় এল। গাছ পড়ল, পোস্ট ভাঙল, ওদের কারখানারই একটা টিনের চালা উড়িয়ে নিলে। তারপর আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী অন্ধকার।

কারখানায় যারা কাজ করে, তারা অধিকাংশ কাছাকাছির মানুষ—ঝড় থামলে বেরিয়ে চলে গেল। দীপ্তিও বেরুতে যাচ্ছিল, বাধা দিলে গয়াপ্রসাদ। বুড়ো মালিক চন্দ্রিকাপ্রসাদের বড়ো ছেলে—আসলে সেই দেখাশুনো করে। মোটা মোটা কালো আঙুলে গোটা আষ্টেক আংটি পরে, অনর্গল পান খায়, গলায় সোনার হার, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবির নীচে চিকচিক করে জ্বলে। বয়েস চল্লিশ ধরো-ধরো।

গয়াপ্রসাদ বললে, আরে, তুমি কোথায় যাবে? তার ছিঁড়েছে, গাছ ভেঙে পড়েছে। বাস বন্ধ। আমার গাড়ীতে পৌঁছে দেব।

দীপ্তিকে গাড়ীতে তুলে নিয়েছিল গয়াপ্রসাদ।

কিন্তু গাড়ী সোজা কলকাতায় আসেনি। প্রথমে চলে গিয়েছিল ছ মাইল দূরের এক বাগানবাড়ীতে। তার উঁচু প্রাচীর-দেওয়া বাগানঘেরা নির্জনতায়, সেই ঝড়-থামা অন্ধকারের ভেতরে, সেদিন ভগবানেরও আসবার পথ ছিল না।

সেদিন পান-জর্দার গন্ধে ভরা গয়াপ্রসাদের ভারী কালোমুখটা—একটা নয়, এক লক্ষ বিকট পোকার মুখ হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেদিন তনুদির সেই গল্পটা চোখের সামনে একবার ভেসে উঠেই আবার হারিয়ে গিয়েছিল ভয় আর যন্ত্রণার ঘূর্ণির ভেতরে।

দীপ্তি শেষবার আশ্রয় চেয়েছিল ভগবানের কাছে। কিন্তু তিনি তখন চন্দ্রিকাপ্রসাদের তৈরী নতুন শ্বেত-পাথরের মন্দিরে, রূপোর সিংহাসনে, ভেলভেটের গদীতে লুচি-ক্ষীর-লাড্ডুর গুরুভোজনের পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কলকাতা থেকে এত দূরে এই পাঁচীল-ঘেরা বাগানবাড়ীতে এসে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে।

ফেরবার পথে, সেই পান-জর্দার গন্ধ ভরা মুখখানা একেবারে কানের কাছে এনে—ড্রাইভারে যাতে শুনতে না পায় এইভাবে (অবশ্য তার কোনো দরকার ছিল না, কারণ গয়াপ্রসাদের ড্রাইভার এ সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে গেছে অনেক আগেই), গয়াপ্রসাদ বলেছিল, আরে কাঁদছ কেন খোকার মতো? কোনো ইনটেলিজেণ্ট্ গেরল্ এ সব নিয়ে এখন মাথা ঘামায় না। পুরোনো আইডিয়া নিয়ে জীবনে 'সাইন' করতে পারে না কেউ—এখন নয়া জমানা। তোমার বেতন বাড়িয়ে দিব, আর এই পচ্চিশ রুপেয়া দিচ্ছি।

টাকাটা দীপ্তিকে হাত পেতে নিতে হয়নি। গয়াপ্রসাদই গুঁজে দিয়েছিল তার ব্যাগের মধ্যে।

সেই দিন রাত্রে, বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, একা রান্নাঘরে গিয়ে কেরোসিনের বোতলটা নিয়ে অনেকক্ষণ ঠায় বসে ছিল দীপ্তি। কিছুই করতে পারেনি। আকাশ ফিকে হয়ে এলে, কাকের ডাক শোনা গেলে, নিজের জর্জরিত দেহমন নিয়ে আবার শোবার ঘরে ফিরে এসেছিল।

গয়াপ্রসাদের পরে এল রামবিলাস দত্ত।

—গয়াটা ওই রকমই মিস দে। মেয়ে দেখলেই তার মাথা ঠিক থাকে না।

আপনি আসুন আমার অফিসে। সত্যিকারের জীবন তো সামনে পড়ে আছে।

লম্বা ফর্সা চেহারার রামবিলাস, ভালো স্যুট পরে, শ্যাময় লেদারের পাউচ থেকে তামাক বের করে মেশিনে সিগারেট পাকায়। ব্যবসা শেখবার জন্যে নাকি সে দেড় বছর ইউ-কে কাটিয়ে এসেছে। মাপা হাসি, মাপা কথা। চায়ের টেবিলে বসেই মনোহরণ করতে পারে।

কিন্তু পোশাকের চেহারা যেমনই হোক—সব হায়নাই সমান। সব মানুষ-খেকো পোকাগুলোর চরিত্রই এক রকম। গয়াপ্রসাদ ছিল রক্ষণশীল—একচ্ছত্র হয়েই থাকত। কিন্তু রামবিলাস আধুনিক এবং ডেমোক্র্যাটিক। সে পুরোনো মতে বাগান বাড়ীতে নিয়ে গেল না—দীপ্তিকে এনে হাজির করল এক হোটেলে। চৌরঙ্গীর নিয়নের আলো দেখে ছেলেবেলায় খুশি হত দীপ্তি—এবার দেখল তার নেপথ্যকে। যেখানে পৃথিবীর সব রকম পাপের বিষ-বুদ্বুদ ফুটে উঠছে নিশিপদ্ম হয়ে—যেখানে পোকাগুলো মিরাধরণ নন্দনতায় পরস্পরকে গ্রাস করবার প্রতিযোগিতা করে। সেখানে একা রামবিলাস নয়—দীপ্তিকে ঘিরে এক পাল শকুন এসে জড়ো হল। তারা নানা ধরনের—নানা ভাষায় কথা বলে।

সেইখানেই দীপ্তির আলাপ হল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে রোজমেরীর সংগে।

রোজমেরী বললে, নাউ ইউ নো এভ্‌রিথিং। তাড়াও ওই ভ্যাম্পায়ারগুলোকে। বী ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট। আমার সংগে চলো—স্বাধীন ভাবে কি করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয় সে আমি তোমায় শিখিয়ে দেব।

তারপর থেকে দীপ্তির আর বাধা রইল না—বাঁধনও নয়।

গয়াপ্রসাদের দেওয়া পঁচিশটা টাকাকে সে কুচি-কুচি করে উনুনে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু সে সুযোগও ঘটেনি। পরের দিনই তাই দিয়ে এক মণ চাল আনতে হল। সেই ভাত সেদিন কাঁকরের পিণ্ড হয়ে বিঁধেছিল নিজের গলায়, তারো চাইতেও অসহ্য মনে হয়েছিল, বাড়ীশুদ্ধ ক্ষুধার্ত মানুষকে সে ভাত খেতে দেখে।

তারপর দীপ্তির চোখ খুলল। দেখল, শাদা ভাতের গায়ে কোনো কলঙ্কের চিহ্ন থাকে না। দেখল, সেই ভাত খেয়ে বিষে মানুষের শরীর নীল হয়ে যায় না। আরো দেখল, ভাত না হলে মানুষে বাঁচতে পারে না।

ভাত থেকে মাটন এল, এমন কি মুর্গী এল পর্যন্ত। এল শাড়ী, এল সোনার গয়না।

দীপ্তি জানে, বাবা সব বুঝতে পারেন। সে বোঝে বাড়ীর সবাই সন্দেহ করে তাকে। বাবার দু চোখ ঘৃণায় ভরে থাকে, থমথম করে মায়ের মুখ, অভয় তার সংগে কথা বলে না, একটা চাপা হাসি চমকায় অমিয়র চোখে। কিন্তু এ-কথাও তার জানতে বাকী নেই, সবাই নিঃশব্দে তাকে মেনে নিয়েছে। তাকে অভিশাপ দিতে দিতে তারই দেওয়া অন্ন তারা লোলুপ গ্রাসে মুখে তুলবে, পাতে একটি কণাও কারো পড়ে থাকবে না।

এ-ই জীবন। এ-ই কলকাতা।

দীপ্তি কোথাও চাকরী করে না। চাকরীর তার দরকার নেই। বাঁধা মনিবের দাসত্ব আজ তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তবু চাকরীর একটা আবরণ রাখতে হয়। বাইরে থেকে সেটা ভালো দেখায়, বাড়ীর লোকে স্বচ্ছন্দে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারে। একটা মান্থলি করে নিয়েছে ট্রামের। সেইটে নিয়ে সাড়ে দশটা এগারোটায় বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। নিউ মার্কেটের দোকানগুলোর সামনে দিয়ে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করা যায়, এক টুকরো সস্তার ব্লাউজ-পীস্ বাছাই করতে কাটিয়ে দেওয়া যায় এক ঘণ্টা। সেখান থেকে যাওয়া যায় আলিপুরের চিড়িয়াখানায়। টালীগঞ্জের ট্রাম ডিপোয় নেমে রিক্‌শ করে অনেক দূরে অকারণে যাওয়া চলে। বোটানিক্সে

গেলে সারাদিনের জন্যে কোনো ভাবনা থাকে না। দুপুরে চৌরঙ্গির চায়ের দোকানে সময় কাটানো যায়—চা খাওয়ানো সংগীও জুটে যায় মাঝে মাঝে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলে ক্ষতি কী—কী হয় কিছুক্ষণের জন্যে মিউজিয়ামে ঢুকলে কিংবা ইডেন গার্ডেনে গিয়ে নোংরা ঝিলটার সামনে কোনো গাছের ছায়ায় আরো খানিকটা বসে থাকলে?

আসল কথা, সারাটা দুপুরে কলকাতায় বেকার কাটানোর মতো সুযোগের কোনো অভাব নেই। মুখ বদলাবার ইচ্ছে থাকলে ঘুরে আসা যায় ক্যানিং কিংবা ডায়মণ্ডহারবার, শীতের দিনে সহজেই চলে যাওয়া যায় ব্যাণ্ডেল চার্চে—ইলেকট্রিক ট্রেনের কল্যাণে আজকাল আর কতক্ষণই বা সময় লাগে? তা ছাড়া কলকাতাতেই বা বৈচিত্র্যের অভাব কোথায়? একজিবিশন থাকলে ঢুকে পড়া যায় তার ভেতর—সে ছবিরই হোক আর যন্ত্রপাতিরই হোক।

ভয় নেই? সাধারণ মেয়ের আছে। কিন্তু দীপ্তি সে দিক থেকে নিশ্চিন্ত। বরং এক আধটি ভালো খরিদ্দারও জুটে যায় কখনো কখনো।

চারটে-পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায় একবার "অফিস" থেকে বাড়ী ফিরলেই চলে। হাড় ভাঙা খাটুনির পরে খুব ক্লান্ত হয়েই ফিরতে হয় তাকে। সব মিলে জিনিসটা চমৎকার দেখায়।

তারপর সন্ধ্যা। আসল চাকরী শুরু হয় সেই সময়।

হোটেলটা চৌরঙ্গীর নেপথ্য মঞ্চে। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার জো নেই। মোটামুটি সম্ভ্রান্ত চেহারা, নীচের তলায় 'বার' আছে সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত গাড়ী থামে, লোক আসা-যাওয়া করে।

ওপরে সারি সারি ঘর। কেউ বা ঘণ্টাকয়েকের জন্যে ভাড়া নেয়, কেউ সারা রাতের জন্যে। কয়েকটা টাকার বিনিময়ে প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতা সভ্যতাকে বীভৎসতম ব্যঙ্গ করে। মানুষ পোকারা এ ওকে ধরে খায়—ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে।

ঈশ্বর সেখানে নিগ্রো, চীনা কিংবা আর্মেনিয়ানের ভূমিকায় নেচে নেচে অ্যাকর্ডিয়ান বাজান—অতিথিদের পরিতৃপ্তির জন্যে; কখনো হোটেলের মালিক হয়ে কর্কশ শক্ত আঙুলে নোট গুণতে থাকেন। নইলে ময়লা শার্ট পা-জামা পরে, নারী মাংসের দালাল হয়ে, চোখের অশ্লীল ভঙ্গি করে—একটা সোনা বাঁধানো দাঁতের ঝিলিক দেখিয়ে ফিসফিসে গলায় বলতে থাকেন: ফ্রেশ এ্যাণ্ড ইয়ং স্যার—কলেজ গার্ল স্যার—বেঙ্গলী-

পা ঞ্জা বী-মাদ্রাজি-হিন্দুস্থানী-মা রো-য়ারী-ইউরোপীয়ান—

কলকাতা দাঁত বের করে, বিকট হাঁ মেলে রাখে। গীতার বিশ্বরূপের মতো। চোয়ালের দু-পাশ দিয়ে, রক্ত গড়ায়। বিলিতী বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রেডিয়ো থেকে রামপ্রসাদী গান ভেসে আসে। কখনো বা রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনা যায় : 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা—'

কিন্তু নেপথ্য-চৌরঙ্গীর অজস্র আলোর অসীম অন্ধকারে সে ধ্রুব-তারাটিকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

আর সে ধ্রুবতারায় দীপ্তিরও কোনো দরকার ছিল না। সে এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল তার আজকের অতিথিটিকে।

বিরাট লম্বা চওড়া পুরুষ—কোনো বিদেশী কনসুলেট কিংবা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লোক। ভাঙ ভাঙা ইংরেজি বলে, হিন্দীও সেইরকম। মাথায় মাঝারি ধরণের গোলাপী টাক, থুতনির নীচে শৌখিন তামাটে দাড়ি।

আকণ্ঠ মদ গিলেছে। দীপ্তিকেও খাওয়াতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কালকে নেশা হয়ে যাওয়াতে আজকে সামলে নিয়েছে সে। দীপ্তির মক্কেলটি টলতে টলতে এগিয়েছিল ঘরের কোণের ওয়াশ-বেসিনের দিকে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি। হিমালয় পাহাড়ের মতো কাত হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর, বমি করে ভাসিয়ে দিয়েছে সব। উদগীর্ণ মদ মাংস আর রুটির টুকরোর বিকট গন্ধে ঘরটা আবিল হয়ে রয়েছে—দীপ্তির নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত পাক দিয়ে উঠছিল।

কী কদাকার— রাক্ষসের মতো দেখতে লোকটা! নগ্ন বুক আর রোমশ বাহু দেখা যাচ্ছে—গলা আর মুখ বাদ দিয়ে সর্বাঙ্গে উল্কি। নানা ধরণের ফুল—নারীমূর্তি—বাহুতে কী একটা নাম লেখা রয়েছে—এতদূরে থেকে খাটের কোণা ধরে দাঁড়িয়ে দীপ্তি সেটা পড়তে পারছে না। কিন্তু বুকের ওপর যে তীর-বেঁধা হরতনের টেক্কা আঁকা রয়েছে—ওর অর্থ দীপ্তি জানে। কোনোদিন প্রেমের তীর বিঁধেছিল ওর হৃৎপিণ্ডে, ওটা তারই চিহ্ন।

একটা বাঁকা নিষ্ঠুর হাসি দেখা দিল দীপ্তির ঠোঁটে। এই সমস্ত লোকেরও হৃৎপিণ্ডের বালাই আছে! এদের জীবনেও ভালোবাসা আসে!

হয়তো আসে। মদের নেশায় তাকে জড়িয়ে ধরে অনেকেই তো কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, 'বিলিভ মি—তুমিই কি আমার সেই? তোমাকে দেখে আমার যে তারই কথা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে।'

দেশী-বিদেশী কয়েকটি মেয়ের নাম।

শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' পড়েছে দীপ্তি, একটা হিন্দী ফিল্মও দেখেছে। এরা সবাই কি সেই দেবদাসের দল? এই যে মেজেতে পড়ে আছে বিকট বিদেশী লোকটা।—এও?

কিন্তু দীপ্তি চন্দ্রমুখী নয়। কখনো কখনো মনে হয়, হাতে একখানা ছোরা থাকলে এই লোকগুলোকে সে খুন করত; তারপর একটা লোহার হাতুড়ি এনে একঘায়ে নিজের মাথাটাকেই সে চুরমার করে দিত।

টুক্-টুক্-টুক্—

দরজায় টোকা পড়ল আস্তে আস্তে।

নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দিয়ে, জুতো হাতে নিয়ে ছুটে গেল পেছনের বারান্দায়। সেখানে সুইপার আসবার একটা স্পাই-রাল সিঁড়ি, সেটা ঘুরে ঘুরে একটা নিরাপদ অন্ধকার গলিতে গিয়ে নেমেছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দ্রুতবেগে দীপ্তি নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। কিসের একটা খোঁচা লেগে শাড়ীর আঁচলের খানিকটা ফরফর করে ছিঁড়ে গেল তার —নতুন দামী কাপড়টা! কিন্তু পুলিশের

কাত হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর

লোকটার নাক আর গলা দিয়ে ঘড় ঘড় করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরুচ্ছে, পৃথিবী তার কাছে লুপ্ত। কিন্তু আওয়াজটায় চমকে উঠল দীপ্তি। এই শব্দের অনেক রকম অর্থ আছে।

এক মিনিটের মধ্যে নিজেকে গুছিয়ে নিলে সে। তারপর সন্তর্পণে ফাঁক করল দরজাটা। একজন বেয়ারার সন্ত্রস্ত সতর্ক মুখ দেখা গেল দরজার বাইরে। ফিস ফিস করে লোকটা বললে, পুলিশ!

পুলিশ রেইড। এই অবস্থায় ধরতে পারলে কাল—

দীপ্তি আর এক সেকেন্ডও দাঁড়ালো না। তার মাননীয় অতিথিটিকে

ভয়ে সেদিকে ফিরে তাকানোরও তার সময় ছিল না।

গলির ভেতর দিয়ে খানিকটা ছুটে সে থমকে দাঁড়ালো। বুকের ভেতরে তুফানের ওঠা-পড়া চলছে—এখনো যেন সে ভালো করে দম নিতে পারছে না। নীচু হয়ে জুতোটা পরে নিলে, একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতে চাইল।

সেই সময় নির্জন গলির ভেতর দিয়ে ছায়ার মতো কে এগিয়ে এল। আর বজ্র-মুঠিতে একখানা হাত চেপে ধরল দীপ্তির।

(ক্রমশঃ)

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ চব্বিশ ॥
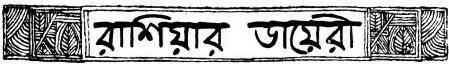
ট্রান্সককেশিয়া ছাড়িয়ে কোনও একদিন আবার সেই মধ্যএশিয়ার দিকে রওনা হয়েছিলুম। কিন্তু পথ এবার ভিন্নতর।

কাস্যপ সমুদ্রের পশ্চিমপারে ট্রান্স-ককেশিয়া তার পর্বত, অরণ্য নদী, কান্তার হরিৎ নীলাভ সৌন্দর্য নিয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু এই সমুদ্রের পূর্বপার এর ঠিক বিপরীত। সেখানে অন্তহীন মরুলোক কাজাখস্তানসহ মধ্যএশিয়ার পাঁচটি 'স্বাধীন' রিপাবলিক সূর্যের জ্বলজ্বালায় দাউ দাউ করে জ্বলছে। কাস্যপ সমুদ্রের উত্তর-পূর্ব অংশ হল কাজাখস্তান, এবং দক্ষিণ-পূর্ব তুর্ক-মেনিয়া। কাজাখস্তান ভারতবর্ষ অপেক্ষা দেড়গুণ বড়, কিন্তু এই বৃহৎ ভূভাগের জনসংখ্যা ১ কোটিরও অনেক কম। কাজাখরা অধিকাংশ মঙ্গোলিয়, অনেকাংশ তাতার, কতকাংশ রুশ,—তাছাড়া আছে উজবেক এবং তুর্ক। মধ্যএশিয়ার অপর চারটি রাষ্ট্রের মতো কাজাখস্তানও মুসলমান-প্রধান। উত্তর ভূভাগে রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সামাজিক ও রাজনীতিক যোগ থাকার জন্য কাজাখস্তানের শিক্ষা, স্বাতন্ত্র্য, পোষাক, ভাষা ও সামাজিক চেহারা বদলে গেছে অনেক। উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজের প্রভাবে যেমন বাঙ্গালীর ধরণধারণ বদলে গিয়েছিল! এখন কাজাখরা রুশভাষায় কথা কয়, তাদের ভাষায় এখন রুশলিপি, অগণিত ক্ষেত্রে রুশদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক,—জীবনযাত্রার মধ্যে রুশীয় প্রভাব প্রচুর। আগামী ৫০ বছর পরে সোভিয়েট ইউনিয়নে কা'র কতটুকু জাতি-বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত থাকবে, এখনই অনুমান করা কঠিন। কেননা এই বৈশিষ্ট্যের প্রধান লক্ষণ হল পাঁচটি, যথা—ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সামাজিক রীতি-প্রথা এবং আত্ম-ইতিহাস। কিন্তু দরিদ্র হতভাগ্য এবং সভ্যতালেশবর্জিত জাতি যখন সৌভাগ্যের আস্বাদ পায়, এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য স্বাস্থ্য ও সম্পদ লাভ করতে থাকে তখন সে পুরনো ইতিহাসের সঙ্গে পুরনো ধর্মকেও ভোলে। মধ্য-এশিয়ার প্রত্যেকটি জাতি এখন আর তাদের প্রাচীন ইতিহাসের কথা তোলে না। ওরা জানে, ওটা ওদের লজ্জা এবং অগৌরব।

কাজাখস্তান মূলত মরুলোক, এখনও অর্ধেকেরও বেশি মরুভূমি। কিন্তু বাকি অংশের "virgin soil upturned". এখন বালু সরিয়ে মাটি বা'র করা হচ্ছে, কাটা খাল দিয়ে আসছে নদীর জল, অরণ্যের সৃষ্টি করা চলছে, নগরের পর নগর বসে যাচ্ছে, প্রতি বছরে দেড় কোটি থেকে দুই কোটি টন খাদ্য-শস্য তোলা হচ্ছে, মাটির তলা থেকে উঠছে অফুরন্ত কয়লা আর তেল,—এবং গৃহপালিত পশুর সংখ্যা কাজাখস্তানে আজ সর্বাপেক্ষা বেশি। যে-মরুভূমিতে একদা মরুচারী ক্যারাভানের সমাধি-ক্ষেত্র রচিত হত, আজ ঠিক সেই স্থলগুলিতে বয়ে যাচ্ছে স্রোতস্বিনীরা, যাদের দুই পারে হরিৎ শ্যামলের প্রাকৃতিক শোভা। মানব ইতিহাসের কোনও পর্বে এত অল্পকালের মধ্যে কোনও ভূভাগ চিরান্ধ-কারসমাচ্ছন্ন মধ্য-এশিয়ার মতো এমন সম্পদশালী হয়ে ওঠেনি। সমগ্র বৃহৎ প্রাচ্যে একমাত্র মধ্যএশিয়ার ২ কোটি মুসলমান আজ সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং ঐশ্বর্যবান। কাজাখস্তানের রাজধানী 'আলমা-আতার' কথা ছেড়ে দিই, কিন্তু এর বহু মরুভূভাগ আজ শস্যে সম্পদে অরণ্যে ফুলে ফলে পরিপূর্ণ। এ রাষ্ট্রে যুগান্তর ঘটেছে।

কাজাখস্তান, কিরগিজিয়া এবং তাজিকিস্তানের পূর্বদিকে চীনের সীমানা। চীন সাম্রাজ্যের এই অঞ্চল অতি বৃহৎ,—এবং নাম সিংকিয়াং। চীন থেকে সিংকিয়াং অবধি আসবার পথ চিরদিনই দুস্তর ও দুর্গম। সিংকিয়াংএরই ভিন্ন নাম তাকলা মাকান। এই লক্ষ লক্ষ বর্গ-মাইলব্যাপী মরুলোক চিরকাল বালু পাথর বরফ ও পশুকঙ্কালে আকীর্ণ। এরই মধ্যে বিভিন্ন উপজাতি বা তাদের দলপতিরা মাথা তোলে, পরস্পরের মধ্যে লড়াই চলে, বালু আর পাথরের উপরে

রক্ত গড়ায়,—আবার ঠান্ডা হয়ে থাকে কিছুকাল। কিন্তু এককালে এই পথ দিয়েই আসত চীন দেশ থেকে রেশম,—সেজন্য এই পথের একদা নাম ছিল 'সিল্ক রুট'। কাশগড় থেকে এই পথ সাধারণত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটি চ'লে যেত পামীর হয়ে মধ্যএশিয়ায় এবং অন্যটি কারাকোরমের তলায় তলায় এসে পেঁছত আকসাই-চিন ও লাদাখ হয়ে কাশ্মীরে। পামীর থেকে কাশ্যপ সমুদ্র অবধি যে পাঁচটি সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ইদানীং মধ্যএশিয়া বলা হয়, এটির পূর্ব নাম ছিল তুর্কীস্তান। এই তুর্কীস্তানের ওপর চীনাদের আক্রমণ হয়েছে একাধিকবার। অধিকার এবং আধিপত্য বিস্তার করেছে তা'রা বারম্বার; তাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যুগে যুগে, সামাজিক সম্পর্ক ঘটেছে অনেক; এবং মঙ্গোলীয় রক্তের ধারা চীনে যতটা, সোভিয়েট ইউনিয়নে তার চেয়ে কম নয়।

এই একই রক্তের ধারা বয়ে এসেছে কিরগিজিয়ায়! এই রাষ্ট্রটি পামীর এবং কাজাখস্তানের মাঝামাঝি। কিন্তু তিয়েনসানের সুউচ্চ পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত এই রাষ্ট্র প্রকৃতির দাক্ষিণ্যলাভ করেছে প্রচুর। এই রাষ্ট্র বোধ করি মধ্যএশিয়ার মধ্যে প্রাকৃতিক শোভাসম্পদে সর্বাপেক্ষা মনোরম। এটির আয়তন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা প্রায় আড়াই গুণ বেশি,—এবং এর অরণ্য, নদী, শস্যক্ষেত্র, মৃৎপ্রকৃতি অতি প্রসিদ্ধ। কিরগিজিয়ার উত্তর-পূর্বে যে বৃহৎ হ্রদটি এই অঞ্চলকে সমৃদ্ধ ক'রে রেখেছে, সেটির নাম 'ইসিকুল'। এই রাষ্ট্রের রাজধানীর নাম 'ফ্রুনজ'। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, এত বড় ভূভাগের জনসংখ্যা মাত্র ১৯ লক্ষ, এবং রাজধানীতে যারা বাস করে তাদের সংখ্যা ২ লক্ষর বেশি নয়। বিগত বিশ্বযুদ্ধের কালে নতুন কয়েকটি সম্প্রদায়কে এনে এখানে বসানো হয়েছে। এ কাজটি করেছেন ষ্টালিন। এর পিছনে একটি কথা ছিল। রুশবিপ্লবের পর লেনিন যখন ক্ষমতা লাভ করেন, তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অন্যান্য ১২টি বিভাগে ১২ জন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তৎকালীন সোভিয়েট মন্ত্রীসভার এই ১৩ জন মন্ত্রী পাশ্চাত্য দেশে "আনহোলি থার্টিন" ব'লে নিন্দিত ছিলেন। লেনিন ছাড়া বাকি ১২ জনের মধ্যে আবার ২ জন ছিলেন প্রধান। এই ২ জন হলেন 'ব্রনষ্টিন এবং দিজুগাসভিলি,' অর্থাৎ ট্রটস্কী ও ষ্টালিন। ট্রটস্কী পররাষ্ট্র বিভাগ নিলেন, এবং ষ্টালিন নিলেন স্ব-জাতিদলের উপর দখল। তৎকালে মন্ত্রীর নাম ছিল 'পীপল্'স কমিসার'। সুতরাং ষ্টালিনকে বলা হত, "People's Commissar of Nationality Affairs". 'পীপল্'স কমিসার'—এই সংজ্ঞাটি উদ্ভাবন করেন ট্রটস্কী। সোভিয়েট ইউনিয়নে উপজাতি এবং অ-সভ্য সম্প্রদায় অগণিত ছিল, কিন্তু তাদের কতগুলি পূর্বাবস্থায় আছে, অথবা আছে কিনা—অতটা খবর পাইনি। বর্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়নে মোট ৩৪টি বিশিষ্ট জাতি বাস করে। গত বিশ্বযুদ্ধের পর ষ্টালিন কয়েকটি উপজাতিকে এনে কিরগিজিয়াতে বসিয়ে দেন। তাদের মধ্যে আছে ক্রাইমিয় তাতার, প্রাচীন রাশিয়াবাসী বৃহৎ এক জার্মান সম্প্রদায় এবং ট্রান্স-ককেশিয়ার কয়েকটি বিভিন্ন উপজাতি। এই উপজাতিগুলিকে রাতারাতি এই রাষ্ট্রে সরিয়ে আনার ফলে এরা নানা উৎপীড়ন এবং দুঃখদুর্দশা সহ্য করে। অতঃপর ১৫ বৎসর কাল জীবন-সংগ্রামের পর এদের অবস্থা এখন কিছু ফিরেছে। এখন কিরগিজিয়ায় নানা জাতির সংমিশ্রণ ঘটতে আরম্ভ করেছে। তাতার, মঙ্গোল, জার্মান, ইগুশ, চীনা, তুর্ক, চেচেন—এরা সবাই মিলছে একে একে। এরা সাধারণভাবে রুশভাষা নিয়েছে, এবং তাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে না! এখানে যুদ্ধের বন্দী, পঙ্গু নরনারী, আগেকার কালের জাত-ভিখারী গোষ্ঠী, দুর্ধর্ষ নানা সম্প্রদায়, বহু কয়েদী, জন্মান্ধ, আতুর, ইত্যাদি জায়গা পেয়েছে।

সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়নের নিকট আমি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর নরনারীর খবর ও তালিকা চেয়েছিলুম। যেমন, পাগল, বেশ্যা, স্বভাবদুর্বৃত্ত, জুয়াড়ী, দেশ ও জাতিদ্রোহী, সোভিয়েট ব্যবস্থাবিরোধী, চোর, লম্পট, ডাকাত,—প্রভৃতি। কিন্তু সেগুলি আমি পাইনি। এদের সংবাদ কোনও কাগজে ছাপা হয় না। এগুলি পুলিশ রেকর্ডে থাকে। গোপনে।

পামীরের প্রাচীন অধিবাসীদের নাম ছিল তাজিক। সেইজন্য পামীর রাষ্ট্রের নতুন নামকরণ হয়েছে, তাজিকিস্তান। মধ্যএশিয়া বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হবার পর সমগ্র পামীর উপত্যকার বর্তমান আয়তন দাঁড়িয়েছে ৫৫ হাজার বর্গমাইল। এটি সম্পূর্ণ পার্বত্য অঞ্চল; এবং পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম মালভূমি। এক এক অঞ্চলের এখানে একেকটি পরিচয়। যেমন গ্রেট পামীর, লিট্‌ল পামীর, সেন্ট্রাল পামীর প্রভৃতি। এই বৃহৎ মালভূমির উচ্চতা সাধারণভাবে ১২ হাজার ফুট থেকে ২২ হাজার ফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। চাকার গাড়ি কোনও যুগে এখান দিয়ে চলেনি। কিন্তু সোভিয়েট যুগে নানা স্থলে এটি সম্ভব হয়েছে। এই মালভূমি বৎসরের অধিকাংশ কাল তুষার ও বরফে আচ্ছন্ন থাকে। এই তাজিকিস্তানের সীমানায় এসে মিলেছে হিন্দুকুশ, কারাকোরম এবং তিয়েনসান। এখানকার বিশাল পর্বতশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে বহু দূরবর্তী কৈলাস গিরিশ্রেণী, হিমালয়ের পশ্চাতবর্তী গিরিদল এবং হিন্দুরাজ পর্বতমালা দৃষ্টিগোচর হয়।

এই পামীরের মধ্যে যেটি উচ্চতম শিখর, সেটির নাম 'ষ্টালিন-শৃঙ্গ', সেটির উচ্চতা ২৪,০০০ ফুট। কিন্তু এই শৃঙ্গটি কিরগিজিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে পড়ে। বর্তমান ষ্টালিনোচ্ছেদের যুগে এই শৃঙ্গের সঙ্গে লেনিনের নামটি যুক্ত হবে।

বৃহৎ ও প্রশস্ত নদী বয়ে চলেছে পামীরে। যে-সব নদী কারাকোরাম, তিয়েনসান, হিন্দুকুশ, আলতাই প্রভৃতি গিরিশ্রেণী থেকে নেমে গিয়েছে—তার মধ্যে প্রধান হল আমুদরিয়া। এখানে আফগানিস্তান রাষ্ট্রের একটি বৃহৎ 'খণ্ড' গিয়ে প্রবেশ করেছে পামীরের মধ্যে। কিন্তু আমুদরিয়ার দক্ষিণে আফগানিস্তান এবং উত্তরে সোভিয়েট ইউনিয়ন। এদিকে কারাকোরামের উত্তরে চীনের এলাকা অর্থাৎ সিনকিয়াং, এবং দক্ষিণে কাশ্মীর। বর্তমানে পামীরের দক্ষিণ সীমানায় এসে মিলেছে পাঁচটি রাষ্ট্র,—আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন। বিগত ৫০ বছর আগেও এই পামীরে প্রত্যেকের রাষ্ট্রসীমানা একপ্রকার 'অনির্ণীত' ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল অবধি পামীরের মালভূমি অনধিগম্য বলেই ওখানে আধুনিক সভ্যতার আলো জ্বলেনি! আজ কিন্তু এর চেহারা কিছু অন্যরকম। এই রাষ্ট্রের বর্তমান জনসংখ্যা হল ১৮ লক্ষেরও কিছু বেশি। পুরাকালে এই পামীরে সম্রাট আলেকজান্দার এসে উপস্থিত হন, এবং নিজ নামে এখানে একটি জনপদ সৃষ্টি করেন। সেই খৃষ্টপূর্ব কাল থেকে খৃষ্টপরবর্তী কালে এসে পাওয়া যায় অপর দুটি জনপদ,—তাদের একটির নাম হল 'খোদ্জেন্ত', যেটি বর্তমানে নাম পেয়েছে 'লেনিনাবাদ'। অন্যটির নাম ছিল 'দুষাম্বে',— সেইটিই তাজিকিস্তানের বর্তমান রাজধানী,—কিন্তু এই রাজধানীর নাম, 'ষ্টালিনাবাদ'! বলা বাহুল্য, ষ্টালিনের জীবিতকালে তাঁর নামে ৫০।৬০টি নগর, জনপদ, এলাকা, গ্রাম, কলেকটিভ ফার্ম, ফ্যাক্টরী ইত্যাদি নামাঙ্কিত হয়। এ ছাড়া সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে কমবেশি ৫ হাজার প্রতিষ্ঠান ষ্টালিনের নামাঙ্কিত। আমি নিজে গুণিনি, কিন্তু ষ্টালিনের অন্তত দশ হাজার প্রস্তরমূর্তি সোভিয়েট ইউনিয়নে ছড়ানো, এবং অন্তত ৫ লক্ষ তৈলচিত্র তার কাছে-কাছে! মধ্যএশিয়া, ট্রান্সককেশিয়া, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, আজারবাইজান—এসব অঞ্চলে ষ্টালিনের আধিপত্য ছিল অসপত্ন! লেনিন ছিলেন মুখরক্ষা হিসাবে। কিন্তু তবু একথা অনস্বীকার্য, পৃথিবীর এই অনধিগম্য ভূভাগ ষ্টালিনের প্রভুত্বকালেই ধনে, ঐশ্বর্যে ও সম্পদে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে ওঠে। তাঁর চারিত্রের ভীষণতর দিক ছেড়ে দিই, কিন্তু তাঁর কর্মজীবনের দ্যোতনায় মধ্যএশিয়া উদ্ভাসিত! বর্তমান 'ষ্টালিনোচ্ছেদের' যুগে একথাটি সকলেই বিচার করবে।

ষ্টালিনের মৃত্যুর পর তাজিকিস্তানের দরজা খুলেছে। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে পর্যটকরা আসছেন পামীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে। ভারতীয় লেখকদেরও একটি অংশ গিয়েছিল তাজিকিস্তানে। রাজধানী ষ্টালিনাবাদ এখন আধুনিক নগর। এখানকার বিজ্ঞান একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। কথিত আছে, পারস্যের অমর কবি 'ওমর খৈয়াম' পামীরের কোলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন! তিনি আসলে একজন তাজিক! এই আকাডেমি থেকে সম্প্রতি ওমর খৈয়ামের একটি সসম্পূর্ণ কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। বাঙলায় বোধ করি প্রথম স্বর্গত কান্তিচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'রুবাই'-য়াৎ-ই—ওমর খৈয়াম' নামক একটি ক্ষুদ্রাকার কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন। এই সূত্রে সেই স্বর্গত কবিবন্ধুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ষ্টালিন আমলে ভারতীয় কোনও সাংস্কৃতিক দলকে সোভিয়েট ইউনিয়নে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এর রাজনীতিক কারণটি সঠিক আমার জানা নেই। ভারতীয় কংগ্রেস, নেহরু গভর্ণমেণ্ট, গান্ধীজীর আদর্শ,—এদের সম্বন্ধে তাঁর প্রীতির পরিচয় বিন্দুমাত্র ছিল কিনা—এ আমার অজ্ঞাত। কিন্তু ষ্টালিন সম্পূর্ণ পরিহার করেছিলেন পাশ্চাত্য দেশকে,—পাশ্চাত্যের কোনও পর্যটকদল তাঁর আমলে সোভিয়েট ইউনিয়নে আসেনি। তাঁর নির্দেশ ছিল এই প্রকার : "The wall between the Soviet system and the West could never be broken down until the Soviet standard of life could bear comparison with the living standard elsewhere".

আজ পাশ্চাত্যের তুলনায় সোভিয়েট জীবনের মানোন্নয়ন কতখানি ঘটেছে, সে-আলোচনা করবে বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু ভারতীয়রা যে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভালমন্দ সব দেখেই আনন্দ পেতে পারে, ষ্টালিন বোধ করি এটি অনুমান করেননি! পাশ্চাত্য জগতের ধনী-সমাজের টুরিস্ট, এবং আমার মতো ভারতীয় একজন সাধারণ পর্যটক,—এ দুইয়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু তফাৎ আছে বৈকি। ষ্টালিনের 'ভঙ্গী' ছিল, কিন্তু 'দৃষ্টি' ছিল কিনা জানিনে!

কাজাখস্তানকে যদি বাদ দিয়ে ধরি, তবে মধ্যএশিয়ার সর্বাপেক্ষা কঠিন মরুলোক হল, 'তুর্কমেনিস্তান'। এই 'আদি-অন্তহীন' মরুরাষ্ট্রের আয়তন হল ১ লক্ষ ৮৭ হাজার বর্গমাইল, এবং এই রাষ্ট্রে মোট ১৪ লক্ষ নরনারীর বাস। অধিকাংশ মরুভূমি হল কোনও এককালের সমুদ্র-লোক! মধ্যএশিয়া, তাক্লা মাকান, তিব্বত, গোবি, মঙ্গোলিয়া,—এরা সেই অর্থে এককালের সমুদ্র! এই সকল ভূভাগের কোটি কোটি বর্গমাইল মিলিয়ে যে সব সামগ্রী বালুর উপরেই পাওয়া যায় তা হল লবণ, সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল, শামুক-ঝিনুক, খড়িমাটি, বালুর তলাকার তেল, এবং এই ধরণের নানা বস্তু। তুর্কমেনিস্তানেও এই সব সামগ্রী সহজলভ্য। শুধু তাই নয়, আণবিক শক্তি উদ্ভাবন করতে গেলে যে ধরণের 'মনাজাইট' বালুর প্রয়োজন এবং যে-প্রকার জনশূন্যতা দরকার,—সেটি এই তুর্ক-মুসলমান রাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ ও ভীষণ মরুলোক 'কারাকুম' অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। 'কারা-কুম, কিজিল-কুম, উস্তু-উর্ৎ, কারা-কল্পক' প্রভৃতি বিস্তীর্ণ মরু-

ভূমিতে বিভিন্ন আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষাকার্য চলে, এটি কানেই শুনেছি, এর সত্য-মিথ্যা জানিনে!
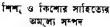
তুর্কমেনিস্তানের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্ত পর্বতরাজি দ্বারা পারস্য এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে বিভক্ত। এই পর্বতশ্রেণী হল হিন্দুকুশ এবং তার শাখাপ্রশাখা। এই শাখাদলের দুটির নাম 'কোপেৎ-দাগ' এবং 'নেবিৎ-দাগ', অর্থাৎ এই দুটি গিরিশ্রেণী তুর্কমেনিয়ার সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশকে ঘিরে রয়েছে। এই দুই গিরিশ্রেণী থেকে কয়েকটি নদী নেমে গিয়েছে হিন্দুকুশের অপরপারে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। তার মধ্যে 'মুর্ঘাব' নদ প্রধান। এ ছাড়া তিয়েনসান ও পামীরের ভিতর দিয়ে 'তারমেজ' নামক উজবেক নগরের দক্ষিণ-সীমানা দিয়ে বয়ে চলে এসেছে আমুদরিয়া,—এ নদী পূর্ব-তুর্কমেনিস্তানের ভিতর দিয়ে 'কারাকুম' মরুলোক পেরিয়ে 'আরল হ্রদের' দিকে উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে। তুর্কমেনিস্তানের দুটি প্রবেশপথ। একটি হল পূর্বদিকের রেলপথ—যেটি মস্কো, কুইবিশেভ, তাসকন্দ, সমরকন্দ ও কাগান হয়ে তুর্কমেনিয়ার প্রথম ষ্টেশন 'ফারাব' এসে পৌঁছেছে। অন্যপথটি হল সম্পূর্ণ পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী বন্দরনগর 'ক্রাসনভদস্ক'-এর ভিতর দিয়ে। বহিঃ-পৃথিবীর কোনও ভূভাগ থেকে এই 'পশ্চিম তুর্কিস্তানে' প্রবেশ করার পথ ছিল না কোনও দিন। এই 'পান্ডববর্জিত' ভূভাগের অন্তহীন মরুলোকে ঢোকবার একমাত্র উপায় ছিল পারস্যের উত্তরভাগে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে 'বন্দরশেখ' নামক একটি জনপদে। কিন্তু বালুর ঝাপটে দুঃসাহসীর দৃষ্টি সেদিন অন্ধ হয়ে যেত। উনিশ শতাব্দীর শেষদিকে রাশিয়ার জারের আমলে তুর্কমেনিয়ার রেলপথটি নির্মিত হয়, কিন্তু আজও বৎসরের অধিকাংশ কাল এই রেলপথ প্রবল বালুতাড়না বরদাস্ত করে। পূর্বে ও পশ্চিমে এই মরুরাষ্ট্রের বিস্তার হল ৭০০ মাইল। এই রাষ্ট্রের রাজধানী 'আস্কাবাদ' বর্তমানে সম্পূর্ণ আধুনিক শহর। এটি দক্ষিণ প্রান্তের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত, এবং এর পূর্ব নাম ছিল 'পলটোরাটস্ক'। আফগানিস্তানের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী যে দক্ষিণ-নগর, তার নাম 'কুশকা'। এটি তুর্ক-আফগান ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি অতি প্রাচীন ঘাঁটি। তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী ছাড়া যে কয়টি নগর কিছু প্রসিদ্ধ তাদের মধ্যে 'চার্দজু' এবং 'মেরি' হল প্রধান। এ ছাড়া আছে আরও দুটি জনবহুল নগর, সে দুটি উত্তরলোকে আমুদরিয়ার তীরে অবস্থিত। একটির নাম 'তাসহজ', অন্যটি 'উরগেঞ্চ'। বলা বাহুল্য, এই নগরগুলি একেকটি 'ওয়েসিস' বা মরু-উদ্যান মাত্র। এই রাষ্ট্রের জনসংখ্যার প্রায় সবটাই হল তুর্ক-মুসলমান, এবং বিভিন্ন যাযাবর সম্প্রদায়—যারা আজকে নতুন ব্যবস্থাপনার মধ্যে এসে লাভবান হয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যার পরিমাণ আজও হিসাব করলে দেখা যায়, প্রতি ১০০ বর্গমাইলে মাত্র ১ জন মানুষ বাস করে!

তুর্কমেনিয়ার বর্তমান জনসংখ্যার ২০ ভাগ হল রুশ, উজবেক, কাজাখ, তাতার, আর্মেনিয়, আজারবাইজানি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়। এ রাষ্ট্রে জলের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম বলেই কাটা খালের কাজ সবচেয়ে বেশি। রাজধানী আস্কাবাদ অঞ্চল পার্বত্য বলেই বছরে মাত্র ৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, এবং সারা বছরের আট মাসকালের মধ্যে কাংস্যবর্ণ তুর্কমেনের আকাশে কেউ ছোট একটি টুকরো মেঘেরও সন্ধান পায় না! এর ফলে সূর্যের জ্বলজ্বলায় 'কারাকুমের' সর্বাপেক্ষা ভয়ভীষণ মরুভূমির বর্ণ হল কৃষ্ণাভ,—আমাদের দেশের মুড়িভাজা কড়াইয়ের বালুর যে বর্ণ হয়—সেই প্রকার! কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্র এই ভীষণতায় ভয় পায়নি। তারা এই মরুলোকের বিভিন্ন অঞ্চলে খুঁজে পেয়েছে নানাবিধ খনিজ পদার্থ, এবং জলের চিহ্ন কোথাও খুঁজে না পাওয়া সত্ত্বেও তারা একটির পর একটি জনপদ বসিয়ে বিমানপথে আনছে পানীয় জল, অথবা বরফগলা জল মোটরট্রাকের সাহায্যে। পানীয় জল বহন করার জন্য বিশেষ ধরণের বিমান ও ট্রাক তারা বানিয়ে তুলেছে অসংখ্য। সোভিয়েট ইউনিয়নের জীবনের ক্ষেত্রে এমন বহু সমস্যা আছে, যেগুলি পৃথিবীর অন্য কোথাও চোখে পড়ে না। ওরা শুধু ভয় পায় মরুলোকের ক্রিমে বালু-পাহাড়গুলির দিকে তাকিয়ে। এগুলির নাম 'বড়খান'। এদের ডগায় ডগায় উড়তে থাকে ঘূর্ণিবলুর ধোঁয়া। এ ধোঁয়া হল কুলক্ষণ। কারণ, দেখতে দেখতে মরুলোকের ভিতর থেকে উঠে আসে ঝড়, এবং সেই ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হতে থাকে অগণ্য বালুপাহাড় একটির পর একটি! সেই ঝাপটের তাড়নায় দিগ-দিগন্তব্যাপী উড্ডীন বালু আবার কোথায় 'পাহাড়' বানিয়ে তুলবে আপন খেয়ালে, এইটি হল উদ্বেগ!

কিন্তু তুর্কমেনিস্তানের মরুলোকের ইতিহাস চিরকাল এরূপ ছিল না। পুরাকালে এখানে 'পার্থিয়া'-দের সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এই কৃষ্ণবর্ণ কারাকুমের বালুর নীচে থেকে পাওয়া গেছে সেই 'পার্থিয়া'-দের রাজধানী 'নিশা' নগরীর

ধ্বংসাবশেষ। আড়াই হাজার বছর আগে পারশ্যের রাজা সাইরাস এই মরুলোকে তাঁর 'আচিমেনিদ' সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু তুর্কি'রা তাঁকে 'মেরি বা মারি' নামক অঞ্চলের রণক্ষেত্রে হত্যা করেছিল। মধ্যএশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও জল নিয়ে এবং জলের উপর আধিপত্য নিয়ে লড়াই চলে এসেছে চিরকাল। সেই জল মানুষের টুঁটির রক্তে রঙগীন হয়েছে যুগ থেকে যুগান্তরে। এই 'মেরি' নগরটি ষষ্ঠ শতাব্দীতে যারা নির্মাণ করে তাদের নাম ছিল 'নেষ্টোরিয়ান' খৃষ্টান সম্প্রদায়। পরবর্তী কালে মেরি নগরের নাম হয়, 'মার্ভ'। বিগত উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন রুশরা মধ্যএশিয়ার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, সেই সময়ে ভারত-শাসক ইংরেজরা ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাশিয়ানদের বিপক্ষে প্রস্তুত হতে থাকেন। এই যুদ্ধযাত্রার পথ ছিল তখন আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে—ষে-অঞ্চলে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার-লাভ করেছিল। সে যাই হোক, সেই যুদ্ধ বাধেনি কোনদিন। কিন্তু তখন ইংরেজের মানসিক উদ্বেগ এবং আশঙ্কাকে তৎ-কালে ইংরেজরাই ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, 'মার্ভাসনেস্'! কথিত আছে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মঙ্গোলিয় সম্রাট-দস্যু জেঙ্গিস খান্ এই মেরি নগরের উপান্তে দশ লক্ষ নরনারীকে হত্যার হুকুম দিয়েছিলেন! কিন্তু এরও বহু শতাব্দী আগে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মাসিডোনিয়ার সম্রাট আলেক-জান্দার সৈন্যদল নিয়ে হাজির হয়ে-ছিলেন 'কোপেৎ-দাগ' পার্বত্য অঞ্চলে, এবং 'মার্গিয়ানা' নামক প্রদেশে তিনি নিজ নামে 'আলেকজান্দ্রিয়া' নামক যে নগর স্থাপন করেন, পরবর্তীকালে সেই-টিরই নাম হয় 'মেরি'। সোভিয়েট আমলে এই নামটিই চালু আছে। সপ্তম শতাব্দীতে এখানে আরবরা এসে আক্রমণ করে; একদিন তাদেরও চলে যেতে হয়। প্রাচীন মধ্যএশিয়ার শক্তিশালী রাজ্য ছিল তুর্কমেনিস্তানের উত্তর মরু-অঞ্চলে,—তার নাম ছিল 'খোরেজিম'। এই রাজ্যে 'বীজগণিতের' স্রষ্টা 'আল্-খোরেজমি' নামক প্রসিদ্ধ এক বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জাতিতে ছিলেন আরব। পরবর্তীকালে চতুর্দশ শতাব্দীতে সম্রাট-যোদ্ধা তৈমুরলঙ্গ তাঁর পশ্চিম বিজয়যাত্রাকালে এই 'মারি' এবং 'উর্গেঞ্চ' অঞ্চল ছারখার করেন, এবং তাঁর সর্বাত্মক নিষ্ঠুরতা জেঙ্গিস খান অপেক্ষা কম ছিল না! এর পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে পারশ্য-সম্রাট নাদির শাহ—যাঁর জন্ম ছিল তুর্করক্তে,—তিনি আক্রমণ করেছিলেন 'খোরেজিম ও বুখারা'। তাঁর অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়নের কাহিনী আজও ছড়িয়ে রয়েছে তুর্ক-মেনিস্তানের সাহিত্যে, কাব্যে এবং উপ-কথায়। 'খোরেজম এবং বুখারা' এই দুটি অঞ্চল এখন এসেছে উজবেকিস্তানের মধ্যে।

সমস্ত পথ পেরিয়ে মধ্যএশিয়ার হৃৎকেন্দ্র তাসকন্দে এসে নামলুম। সেই তাসকন্দ, পুরনো বন্ধুর মতো যেন চারিদিক থেকে তাকাল। আমার সঙ্গে ছিলেন অকসানা। আমরা সমরকন্দের দিকে রওনা হয়েছিলুম।

রৌদ্র ধু ধু করছিল। রাইটার্স ইউ-নিয়নের সেক্রেটারি সুদর্শন ও তরুণ মিঃ হামিদ গোলাম এবং শিশুসাহিত্য-লেখক অতি সজ্জন বন্ধু এহসান রহিমভ আমাদের জন্য 'শার্ক' হোটেলে দুটি ঘর রেখেছিলেন। এই হোটেলটির সামনে বসেছে উজবেকদের একটি মেলা, এবং মেলায় গিয়ে আমরা 'পিলাও' খাবার জন্য চেয়ার নিয়ে বসে গেলুম। মেলা থেকে এগিয়ে কয়েক পা গেলেই সেই আমাদের পরিচিত নাভয় অপেরা হাউস, আর সামনে সেই মস্ত বাগান, বাগানের প্রান্তে রাজপথের ধারে তাসকন্দ হোটেলের সেই বিশাল অট্টালিকা। প্রায় এক বছর পরে আবার এসে হাজির হলুম। এখনও ঠান্ডা পড়েনি।

সময় ছিল কম, তবু তাসকন্দের একটি স্কুল দেখতে বেরিয়েছিলুম। পুরনো 'তুর্কিস্তানে' সেদিন আর নেই। এখন শুধু উজবেকিস্থানেই ১৩ লক্ষ বালক-বালিকা স্কুলে পড়ে। মোট ৩৫টি বড় কলেজ ছাত্র-ছাত্রীতে ভরা। ৩০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান পড়ে। পৃথিবীর বৃহত্তম সুতোর কল এখন এই রাষ্ট্রে। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী মিঃ আরিপভ এখানকার লোক। বিজ্ঞান আকাডেমির প্রেসিডেন্ট হলেন মিঃ হবিব আবদুল্লা-য়েভ। উজবেক সুপ্রীম সোভিয়েটের বর্তমান যিনি সভাপতি তিনি একজন বিদুষী উজবেক মহিলা। নাম শ্রীমতী ইয়াদগার নাসিরুদ্দিনোভা।

স্কুলের হেডমাস্টার অতি অমায়িক ব্যক্তি। নাম করিম রসুলভ। এই স্কুলে এখন ১৩০০ ছাত্র, ৭০ জন শিক্ষক, তার মধ্যে চারজন হলেন হিন্দি শিক্ষক। হিন্দি শিক্ষকদের মধ্যে যিনি মহিলা, তাঁর নাম 'সুদামিলা শেষকো'। তাঁর ক্লাসে গিয়ে দাঁড়াতেই ছেলেমেয়েরা দুটি গান শোনালো,—কিন্তু তার একটি হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'। মহিলা আমার সঙ্গে হিন্দিতে আলাপ করলেন। এই স্কুলে দুটি বিদেশী ভাষা পড়ানো হয়,—হিন্দি অথবা ইংরেজি। প্রত্যেক শিক্ষকের বিদ্যা এবং অভিজ্ঞতা অনুসারে তিনি ৭০০ থেকে ১১০০ রুবল বেতন পান, এবং তাঁদেরকে প্রতি মাসে মোট ৭২ ঘন্টা পড়াতে হয়। এখানে শিক্ষাদান পদ্ধতির যে বৈজ্ঞানিক রীতি এবং সহজ-বোধ্য কৌশলগুলি লক্ষ্য করেছিলুম, সেগুলি আমার পক্ষে স্মরণীয়। প্রাকৃতিক ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষার সক্রিয় পদ্ধতি আমাকে অভিভূত করেছিল। এই স্কুলটি যে পল্লীতে অবস্থিত, সেটি প্রাচীন। আশেপাশে গরীব গৃহস্থের বস্তি, গলি-ঘুঁজি, মাটির চালাঘর, কাঁকর-পাথর ধুলোবালিভরা পথ, এবং সেখানে পুরনো কালের বাসিন্দাদের আনাগোনা। তবু ভাল লাগল, কেননা চারিদিকে অতি পরিচিতের ছায়া দেখতে পাচ্ছিলুম।

স্টেট পাবলিশিং হাউসের ডাইরেক্টর মিঃ নাসের আখুনডির সঙ্গে আলাপ হল। এখান থেকে প্রতি বছরে ভারতীয় সাহিত্যের ১০ খানা বই ছাপা হয়। উজ-বেকিস্তানের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঔপ-ন্যাসিক হলেন আইবেক, এবং কবি হলেন গফুর গোলাম। নাট্যকার হলেন হামিদ গোলাম এবং কামিল ইয়াসিন। সাম্প্রতিক উজবেক-জীবন নিয়ে বর্তমানে ৮১ জন লেখক-লেখিকা সাহিত্য রচনা করতে বসেছেন। সকলেই মাঠ ময়দান, কল কারখানা এবং নানাবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আপন আপন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। মিঃ আখুনডির আপিসে একজন তরুণী উজবেক কবি, লেখক শার্দুল আইয়েড এবং প্রাচ্যসাহিত্য বিভাগের সহ-পরিচালক মিঃ শামুখ-মেডভ-এর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। এখানকার মিষ্ট আলাপের সঙ্গে সুভোজ্য সামগ্রী মিলিয়ে একটা মস্ত আতি-থেয়তার চেহারা দেখেছিলুম!

নূতন তাসকন্দের অন্তর্গত 'টেলি-ভিশন ষ্টুডিয়োর' ভিতরে নিয়ে গেলেন এর ডাইরেক্টর মিঃ মীর আকজানভ। এটি বিচিত্র এক যন্ত্ররাজ্য,—যেটি আমার কাছে নতুন। কেমন ক'রে বেতারের ছবি জন্ম-গ্রহণ করছে, অভিনয়টিকে কেমন ক'রে যন্ত্রের মধ্যে ধ'রে নেওয়া হচ্ছে, শব্দ কেমন ক'রে মিলছে ছবি ও ব্যক্তির সঙ্গে, —এগুলি ভাল ক'রে বুঝতে গিয়ে এক জটিলতার থেকে অন্য জটিলতায় জড়িয়ে গেলুম। এইটুকু কেবল কানে রইল, শুধু উজবেকিস্তানেই ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ৬০ হাজার সংখ্যক টেলিভিশনের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। লাইসেন্স ফি প্রতি বছরে ১২০ রুবল। এই টেলিভিশন হাউসের মাধ্যেই উজবেকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি রঙীন ফিলম-এর সাহায্যে কর্মীদেরকে দেখানো হচ্ছিল। তার মধ্যে বাবরের জন্মভূমি 'ফারগানা' অঞ্চলের সজল প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম।

উজবেকিস্তান রাষ্ট্র মোটামুটি ছয়-ভাগে বিভক্ত। তাসকন্দ ওয়েসিস, ফার-গানা, জারফশান, খোরেজম বা খাওয়ারিজম, কারাকল্পক এবং দক্ষিণ সীমান্ত। তাসকন্দ থেকে ফারগানা উপত্যকার সুশ্যামল ও সুন্দর অঞ্চলে পৌঁছতে গেলে পামীরে প্রবেশ করতে হয়। এখানে সোভিয়েট আমলে কোকন্দ নামক প্রাচীন জনপদকে একটি আধুনিক নবনগরে পরিণত করা হয়েছে। বাস্তবিক, এই নবসভ্যতার জন্মভূমিতে কোথায় যেন রয়েছে একটি যাদুমন্ত্র লুক্কায়িত, যেটির স্পর্শে ধুলো হচ্ছে সোনা, মরুবালু হয়ে উঠছে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা! মানুষ এখানে কেবলমাত্র কর্ম-যন্ত্র কিনা, মানুষের বিবেকসত্তা কমিউনিজমের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার ফলে বন্ধনজর্জর হয়েছে কিনা, এসব কথা পরে চিন্তা করব। কিন্তু মানুষের বৃহত্তর ও সুন্দরতর কল্যাণকর্মে মানুষের এই অক্লান্ত অধ্যবসায়, জীবনকে ঐশ্বর্যময় এবং ফলবান ক'রে তোলার এই অশ্রান্ত উদ্দীপনা,—এটি পৃথিবীর যে কোনও দেশেই দুর্লভ। সে যাই হোক, কোকন্দ, মার্গেলান, শাহিমর্দান, আন্দিজান—এগুলি হাল আমলে একেকটি স্বপ্ন-পুরীর মতো গ'ড়ে উঠেছে। চতুর্দিক-ব্যাপী বিশাল মরুপ্রান্তরলোকের মাঝ-খানে ফারগানা উপত্যকা ফলে ফলে শস্যে ও সৌন্দর্যে অমরাবতীর আকার নিয়েছে।

আমুদরিয়া নদীর সুপ্রাচীন প্রবাহ-পথের পাশে কোনও এককালে যে-সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল সেটির নাম 'খাওয়া-রিজম'। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খৃষ্টপরবর্তী পঞ্চম শতাব্দী অবধি এই সভ্যতার আয়ুষ্কাল ছিল। তৎকালীন অগ্নিউপাসক 'মাজদাইস্টদের' ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ্ আবেস্তা' নাকি এই সভ্যতার কালেই লিখিত হয়েছিল। বর্তমানে সোভিয়েট স্থাপত্যবিদ্‌গণ সেই ২৫০০ বছর আগেকার খাওয়ারিজমের প্রাচীন সভ্যতার নানাবিধ সামগ্রী বালুর নীচে থেকে আবিষ্কার করেছেন। একটি সম্পূর্ণ নগর আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখান-কার একটি প্রাসাদে মোট ৩০০ সংখ্যক কক্ষ দেখা যাচ্ছে। এগুলি সবই খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর আমলের। এই কক্ষ-গুলি বহুবর্ণে চিত্রিত করা। সম্ভবতঃ শীঘ্রই মধ্যএশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের ইতি-হাস আবার নতুন ক'রে লেখা হবে।

লেনিনের 'মাস্টার প্ল্যানের' চেহারা এ নয় যে, এক পক্ষ দয়াপরবশ এবং অন্য পক্ষ অনুগৃহীত! রাতারাতি যারা গ'ড়ে তুলছে সুখের সংসার, তারা নিজের জন্যই গড়ছে। মধ্যএশিয়ায় সমস্ত উপ-করণই ছিল, কিন্তু প্রাণ ছিল না। সেই প্রাণ এসেছে এ যুগে। সুদূরে দক্ষিণে 'কাসকা দরিয়া' ছিল তুষার নদী, এবং 'শারিসব্জ-কিতাব' ছিল মাত্র ওয়েসিস। এই তুষার নদীর দুই পারে আধুনিক-কাল কোনদিন এসে পৌঁছবে, জন্ম-জন্মান্তরে কেউ ভাবেনি! এখন এই নির্জন, পার্বত্য ও অনধ্যুষিত 'কিতাবে' এসে বসেছে আকাশতত্ত্বের যন্ত্রপাতি। এটি এখন বিজ্ঞানীদের কেন্দ্র। 'কিতাব ল্যাটিচিউড স্টেশন' এখন জগৎপ্রসিদ্ধ। পশুপালন, সূচীশিল্প, আঙ্গুরের বন, মদ্যপ্রস্তুতের আধুনিক কারখানা—এগুলির জন্য 'কিতাব' এখন বিখ্যাত। এই অঞ্চলের আশেপাশে 'বায়সুন গিরি-শ্রেণীর' উপত্যকায় এক জাতীয় বিশিষ্ট ভেড়া জন্মায় যার নাম 'হিস্সার'। এদের লোম এবং চর্বি অতি প্রসিদ্ধ। ৬ মাসের একটি ভেড়ার ওজন দাঁড়ায় প্রায় ১ মণ ১০ সের। সুপরিণত একটি ভেড়া ৪ মণেরও বেশী। 'বায়সুন' গিরি উপত্যকা অনেকস্থলে সমুদ্রসমতা থেকে ১০ হাজার ফুটেরও বেশী উঁচু, কিন্তু এই উপত্যকায় যে ছোট ছোট নগর একালে নির্মিত হয়েছে তাদের মধ্যে 'শিরাবাদ, গুজার, মিরাকিন এবং মাদানিয়াৎ' নামক শহর ও একটি বৃহৎ কলেকটিভ ফার্ম প্রসিদ্ধ। যে-ভূভাগের অধিবাসীরা বংশ-পরম্পরায় চারিদিকের অবরোধের মাঝ-খানে চাকার গাড়ি কখনও দেখেনি, এবং গাধার ক্যারাভানের কাছে খাদ্য ও কম্বল মাত্র নিয়ে যারা হাজার হাজার বছর ধরে প্রাণধারণ করেছে, তারা এখন মোটরে বিহার করছে মসৃণ পার্বত্য পথে! আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় তাদের ছেলেমেয়েরা এখন শিক্ষিত। সোভিয়েট ইউনিয়নের যে কোনও উন্নত অঞ্চলের সঙ্গে ওরা পাল্লা দেয়। লেনিনাবাদ, তাজিকস্তান, ফারগানা, জারফশান—এদের থেকে ওরা কেউ পিছিয়ে নেই'

(ক্রমশঃ)

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কদিনের মধ্যে মায়ের চিঠিও পেয়ে গেল সুরমা। বিয়ের খবর বিস্তৃতভাবে জানিয়ে কন্যা-জামাতাকে তিনি বেশ কিছুদিন আগেই গিয়ে পৌঁছবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। পাঁচজনকে নিয়েই তো যা-কিছু আমোদ-আহ্লাদ। বিজন-সুরমা না গেলে কাজকর্মই বা করবে কে? চিঠি পড়ে বিজন বলল সে তো অবশ্যই। কিন্তু আমার কলেজ বন্ধ হতে যে এখনো কদিন দেরি আছে।

তার আগে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে নিন না? প্রস্তাব করল মোহন।

—তা হয় না। তার চেয়ে এক কাজ কর। তুমি এসেছ, দু'চার দিন থাক, তারপর তোমার দিদিকে নিয়ে চলে যাও। জামা-বিভ্রাটের ভয় নেই। আমি গিয়ে তোমাদের গাড়িতে তুলে দেবো।

সুরমার কোনো ব্যাপারেই কিছু বলবার নেই। সুতরাং সেই ব্যবস্থাই হল। কয়েকদিনের মধ্যেই সুরমা চলে গেল মোহনের সঙ্গে। কথা রইল, বিজনও ঠিক সময়ে গিয়ে উৎসবে যোগ দেবে। কিন্তু সে কথা সে রাখেনি, কিংবা হয়তো রাখতে পারেনি।

বিয়ের উৎসব মিটে যাবার পর বিমলা লিখেছিল, তুমি আসনি বলে ও'রা দুঃখ করলেন। এবাড়ি-ওবাড়ির প্রত্যেকেরই আশা ছিল, তুমি আসবে। আমি কিন্তু জানতাম, না। সুরমাকে দেখেই বুঝেছিলাম। আশ্চর্য মেয়ে! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যত রকম করে যত প্রশ্ন করলাম। কিন্তু আসল কথাটা জানা গেল না। মুখ ফুটে কিছু না বললেও, বুঝতে কি আর পারিনি? তুমিই বলেছিলে, মেয়েদের একটা তৃতীয় নয়ন আছে, তার কাছে সব ধরা পড়ে যায়। তাই তো ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, সব জেনে-শুনেও এ কী করলে তুমি! তুমি এত দুর্বল, এত অবুঝ হলে, যদি জানতাম, এত বড় ভুল আমি করতাম না। এই মেয়েটার কাছে মনে মনে কী কৈফিয়ৎ দেবো আমি?'

বিজন এ প্রসঙ্গের কোনো উত্তর দেয়নি। দেবার মত কিছু ছিল না। অন্য দু'চারটা বাজে কথা দিয়ে এই সমাধান-হীন তীক্ষ্ণ প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেয়েছিল। সেটা বুঝতে পেরেই বোধহয় বিমলা সেই ঢাকাটা আর সরাতে চায়নি। ঘটনার গতি তখন অন্য পথ ধরেছে। তার মধ্যে শুভ-সমাধানের ইঙ্গিত পেয়ে নতুন আশা জেগেছিল তার প্রাণে। লিখেছিল, "একটা মস্ত বড় সুখবর আছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো। তবু না জানিয়ে থাকতে পারছি না। আমি জ্যাঠাইমা হতে চলেছি। এখনো অবিশ্যি মাস সাতেক দেরি। তবু দুবাড়িতে উৎসব লেগে গেছে। কিন্তু তুমি না থাকাতে পুরোপুরি জমছে না। তোমার কাছে আমাদের অনেক সন্দেশ পাওনা হল। কবে পাঠাচ্ছ জানাও। হাতে হাতে না দিলে নিচ্ছি না কিন্তু।"

শেষের দিকে ছিল—"সুরমার শরীরের কথা ভেবে ওর মায়ের ইচ্ছা এ কটা মাস ওকে নিজের কাছে রেখে দেওয়া। আমাদের মাও মত দিয়েছেন। তার মানে বেশ কিছুদিন শূন্য শয্যায়

হা-হুতাশ, আর তার সঙ্গে এ-পাশ ও-পাশ। কেমন জব্দ! রাগ করে আর কী করবে বল? বাপ হতে চলেছ তার দাম দেবে না? এক দিক দিয়ে ভালই হল। দীর্ঘ বিরহের পরেই মিলনটা জমে বেশী।"

এই সব ব্যাপারে বধূঠাকুরাণীরা ঠাট্টা-পরিহাস করেন, দেবরেরা হাসিমুখে উপভোগ করে। এইটাই সাধারণ রীতি। কিন্তু বিজন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল। লিখেছিল, তোমার 'সুখবর' পেয়ে আমি শুধু খুশী নয়, নিশ্চিন্ত হলাম। তুমি যা লিখেছ বা ভাবছ, সে সব কারণে নয়, অন্য কারণে। ধরা-ছোঁয়া যায়, নিঃসন্দেহে নিজের বলে ভাবা যায়, এমন একটা অবলম্বন যে মানুষের, বিশেষ করে মেয়েমানুষের কতখানি প্রয়োজন, গত ছমাসে যেমন করে বুঝেছি, তেমন আর কোনোদিন অনুভব করিনি, তারই সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে সত্যিই আমি বাঁচলাম!

" শুধু বিজন নয়, সুরমাও ঐ পথ দিয়েই বাঁচতে চেয়েছিল। আলো যেদিন তার কোলে এল, মনে হল, এতদিন তার আকাশে ছিল শুধু অন্ধকার, আজ তারই কোন্ নতুন দিগন্তের দ্বার ভেঙে একটি ক্ষীণ রশ্মি এসে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। মেয়ের নামটাও সেই দিয়েছিল। ভেবে-চিন্তে নয়, হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে। কোনো কোনো অভিভাবিকা তাই শুনে মুখ টিপে হেসেছিলেন। হয়েছে তো একটা মেয়ে, পেট থেকে পড়তে না পড়তেই তার আবার নামকরণ! নাম যদি দিতেই হয়, তার দিদিমা, ঠাকুমা মামা জ্যাঠারা রয়েছে। তা নিয়ে প্রথম পোয়াতীর এই 'আদিখ্যেতা' কে কোথায় শুনেছে। খবরটা এ বাড়িতে যখন পৌঁছল, এঁরাও কেউ প্রসন্ন মনে নিতে পারেননি। শুধু বিমলা বুঝেছিল, নাম সুরমা দেয়নি, তার অন্তরের মধ্যে বসে দিয়েছে তার বিধাতা-পুরুষ। নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বলেছিল, 'নামটা যেন সার্থক হয়। আহা, বেঁচে থাক; ঐটুকুই তো সম্বল!' দূরে বসে আর একজনও বোধহয় ঐ কামনাই করেছিল।

কিন্তু শুধু সন্তান নিয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে কোন্ নারী? তার আকাঙ্ক্ষা যে অতলস্পর্শী। স্বামীর প্রেমে যে গরবিনী, সেও মাতৃত্বের কামনায় জর্জর, সন্তান-সৌভাগ্যে যে অনন্যা, বিমুখ ও বিগত স্বামীর জন্যে তারও হাহাকারের অন্ত নেই। ('বিগতের' মধ্যে তবু একটা সান্ত্বনা আছে, সে শোক সয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু 'বিমুখের' বেলায় শুধু বঞ্চনা। তার যন্ত্রণা দুঃসহ।) এইখানেই শেষ নয়। পত্নী ও মাতার যুগপৎ আসনে বসেও তার তৃপ্তি নেই। তখন সে চায় স্বামীর আত্মীয়-পরিজনের স্বীকৃতি, বধূর সম্মান ও গৃহিণীর শাসন-দন্ড। সব কিছু অজস্রভাবে লাভ করেও স্বামীর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অন্যান্য অধিকার পায়নি বলে নিজের ও অপরের জীবন বিষময় করে তুলেছে, এ হেন রমণীরও অভাব নেই সংসারে। নারী যখন দেয়, নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে যেমন সে থামে না; তেমনি যেখানে সে চায়, আকণ্ঠ পান করেও তার তৃষ্ণার নিবৃত্তি নেই।

সুরমা সব কিছুই পেয়েছিল। তবু একটা না-পাওয়াকে ঘিরে যে-বঞ্চনা, তারই অন্তর্জ্বালা তাকে তার অজ্ঞাতসারেই ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে দিচ্ছিল। আলো সে পথ রোধ করতে পারেনি। একটা সাময়িক প্রলেপ মাত্র দিয়েছিল সেই পুরনো ক্ষতের মুখে। কিন্তু সামান্য একখানা শিশু-হস্তের সাধ্য আর কতটুকু! আগুন নেভেনি। ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে গোপন বিষক্রিয়া অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল।

মেয়ে হবার পর একবারটি এসে দেখে যাবার জন্যে দুবাড়ি থেকেই অনেক তাগিদ গিয়েছিল বিজনের কাছে। নানা অজুহাত দেখিয়ে আসাটা সে ইচ্ছা করেই পিছিয়ে দিয়েছে। দিনের পর দিন মনে মনে একটি আশাই শুধু গড়ে তুলেছে—সুরমা সেরে উঠেছে, তার মুখের সেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লাবণ্য ফিরে এসেছে, আরো মধুর হয়েছে মাতৃত্বের আভায়। তার কাছে যা পায়নি সেই অভাব পূর্ণ করেছে তার আত্মজা। 'আলো' নামের মধ্যেই রয়েছে সেই আশ্বাস। তারও খুব পছন্দ ঐ নামটি।

আলোর বয়স যখন চার মাস, তখন সে দেখতে এল মেয়েকে। ঠিকই লিখেছিল বৌদি। আলো সত্যিই এক ঝলক ভোরের আলো। এক সাজি সদ্য কুড়িয়ে আনা শিউলি ফুল। দোলার উপর ঘুমন্ত মেয়েকে এক পলক দেখেই বিজনের সমস্ত বুকখানা ভরে উঠল। পরক্ষণেই শিউরে উঠে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। এ কে এসে দাঁড়াল দোলনার পাশে! সুরমা, না তার প্রেত! কোথায় গেল সে রঙ, সে স্বাস্থ্য, সেই মেঘের মত চুল! সুরমা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল তার পায়ের কাছে। নিষ্প্রভ চোখ দুটি তুলে ক্ষীণ কন্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানকার খবর সব ভালো তো?' বিজন সে কথার উত্তর দিল না। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, কী হয়েছে তোমার!

—কিছু না, মাথা নেড়ে মাটির দিকে চেয়ে জানাল সুরমা। তারপর নিঃশব্দে চলে গেল পাশের ঘরে।

বিমলার সঙ্গে দেখা হতেই, বেরিয়ে এল অনুযোগের সুর, সুরমার অসুখের কথা তো আমাকে কিছু লেখোনি?

—কী লিখবো? রোগ ব্যাধি ওর তেমন কিছু নেই। সামান্য হজমের গোলমাল। বাচ্চা হবার পর একটু-আধটু সকলেরই হয়ে থাকে। তাছাড়া—

বিজন চোখ তুলতেই যোগ করল বিমলা, ও কিছুই লিখতে দেয়নি। মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করেছিল। মার জবানীতে যে লিখবো, তাও একশবার নিষেধ করেছে।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। তারপর বিমলা বলল, ওকে তুমি নিয়ে যাও,

ঠাকুরপো। এখানে থাকলে এ অসুখ সারবে না।

—ওখানে গেলেই কি সারবে?

কঠিন প্রশ্ন। বিমলার মুখে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর যোগায়নি। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলেছিল, সেটা অনেকখানি নির্ভর করছে তোমার উপর। ভালো করে ভেবে দেখ।

শুধু ভালো করে নয়, আকাশ-পাতাল ভেবে দেখেছিল অধ্যাপক বিজন অনেক মেঘ জমেছে, যাকে উড়িয়ে দেবার মন্ত্র তার জানা নেই। সেই ক্ষীণ মুঠি দুটি বন্ধ হয়ে গেছে, রুদ্ধ হয়ে গেছে দ্বার; খুলবার যন্ত্রটি তার হাতে নেই। আজ শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে ব্যর্থ করাঘাত।

শেষ পর্যন্ত মা-ই আপত্তি করলেন। 'শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বৌমার। একটু যত্ন-আত্তি দরকার। বিজু একা পেরে উঠবে কেন? ওকে কে দেখে তার ঠিক

আরো মধুর হয়েছে মাতৃত্বের আভায়

ব্যানার্জি। কিন্তু কূল-কিনারা পায়নি। একদিন হয়তো পারত। কুমারী মনের স্বচ্ছতা এবং সামান্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রথম এসে যখন দাঁড়িয়েছিল সুরমা, অনায়াসে সেদিন ভরে দিতে পারত তার দুটি সুকুমার শূন্য মুঠি। তারপর অনেক সুসময় বয়ে গেছে। সেই নির্মল আকাশে নেই। তার উপরে কচি ছেলের ঝক্কি। যাক আগে দু'চার মাস। তারপর যাবে।' অতিশয় ন্যায্য কথা। এর পরে আর কার কী বলবার থাকতে পারে? বিজন একাই ফিরে গেল তার শূন্য গৃহে।

মাস দুই পরে বিমানের বদলি হল কানপুর। সম্ভবতঃ 'উপরি'-সংক্রান্ত

কোনো ব্যাপার, যার ফলে উপর-ওয়ালারা রুষ্ট হয়েছিলেন। ধরপাকড় করে সুবিধা হল না। ভোজনবিলাসী সুখী মানুষ। কোন্ অজানা খোট্টা মহারাজের 'পুরি-সবজির' উপর নির্ভর করে তার একদিনও থাকা চলে না। সুতরাং বিমলাকে সংগী হতে হল। সেই বা একা থাকে কেমন করে? চারদিকে তো শুধু 'যাতা হ্যায়, খাতা হ্যায়'। প্রাণ-খুলে দুটো কথা বলবে কার সংগে? সারাদিন করবেই বা কী। কোলে কাঁখে তো কিছু দেননি ভগবান, যে তাই নাড়াচাড়া করে সময় কাটবে। এখানে সে অভাব মিটিয়েছিল আলো। এ বাড়িতে আসবার পর মেয়ের ভার আপনা থেকেই চলে গিয়েছিল 'মেজ-বৌ'এর হাতে। ঝাড়া হাত-পা মানুষ; তার মত আর পারবেই বা কে? সে প্রয়োজন আরো বড় হয়ে দেখা দেবে দিন দিন। মেয়ে বড় হচ্ছে। তার চেয়েও বড় কথা। এ বাড়িতে সুরমাকে বোঝে শুধু ঐ একজন। তাকে ফেলে যাবে কার কাছে? মেজদি চলে যাচ্ছে শুনে সেও খুব মুষড়ে পড়েছিল। নিয়ে যাবার প্রস্তাব হতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সব দিক বিবেচনা করে মা-ও মত দিলেন। বিজনের মতামতের জন্যে অপেক্ষা করা অনাবশ্যক। সে দায়িত্ব বিমলার। সে যে এই ব্যবস্থাতেই নিশ্চিন্ত হবে, বিমলার চেয়ে কে বেশী জানে? কানপুরে পেঁছে খবরটা জানিয়ে দিলেই হবে। তাই দিয়েছিল। বিজন লিখেছিল, 'এ আর নতুন খবর কী? মেজদার কানপুর বদলির খবর যেদিন পেলাম, সেই দিনই এটা জানতাম। তোমার ঐ নতুন পুষ্যি দুটিকে ফেলে পালাবে কোথায়? পালাতে যদি পারতে, সেইটাই বরং জবর খবর হত।'

বিমলা লিখেছিল, 'লোটা-কম্বল নিয়ে তুমিও চলে এসো না? আমার আর একটি পুষ্যি বাড়ুক। ভয় নেই। বাসাটা বেশ বড়। কূজন-গুঞ্জনের অসুবিধা হবে না। সে সময়টা আলোকে আমি সামলাবো।'

এ প্রসংগে আর কোনো জবাব আসেনি।

কানপুরে এসে একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছিল সুরমা, এবং তাকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করবার চেষ্টা করেছিল। বিয়ের পরে এই প্রথম যেন একটু উচ্ছলতা দেখা গেল তার কথাবার্তায় চলাফেরায়। সদা-বিষণ্ন মুখের উপর কারণে-অকারণে এক ঝলক হাসি, মেজদির সংগে ছোটখাট খুনসুড়ি, মেয়েকে নিয়ে খেলা, গল্প, ছুটোছুটি। ভাসুরের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে দূরত্ব রক্ষা করাই ছিল তখনকার দিনের প্রচলিত রীতি। যে-সব পরিবারে সেটা ভাঙতে শুরু করেছিল, ওরা তখনো সে স্তরে গিয়ে পেঁছিতে পারেনি। সুরমা সেদিক দিয়েও খানিকটা এগিয়ে গেল। এ বাড়িতে সে-ই প্রথম 'দাদা' বলে ডাকল ভাসুরকে, মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার আবদার নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার কাছে। ছোটখাট ফাই-ফরমাস, আগে যেটা চলত শুধু মেজদির উপর, এখন তার কিছু কিছু 'দাদা' পর্যন্ত পেঁছিতে লাগল। বিমান খুশী হল। এই বধূটি যে তাদের সংসারে এসে সুখী হয়নি, তা সে জানত। অথচ করবার কিছু নেই জেনে ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি ছিল। এই পরিবর্তনটুকু তার মনের সব ভার তুলে নিল। সবচেয়ে খুশী হল বিমলা। আশা হল, মেঘ কেটে যাচ্ছে, এ তারই পূর্বাভাস। অনুকূল হাওয়া বইতে শুরু করেছে, কানপুর ছাড়িয়ে একদিন সেটা মধ্যপ্রদেশে গিয়ে পেঁছবে। সেই শুভদিন আসন্ন।

(ক্রমশঃ)

॥ পরলোকে ডঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ৪ঠা মে পরলোকগমন করেছেন—এ সংবাদে সকলেই দুঃখিত হবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যার কৃতি ছাত্র ডঃ মিত্র জার্মানীর লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। স্যার আশুতোষের আমন্ত্রণক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় যোগদান করেন। ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষার প্রসারকল্পে তাঁর অবদান কম নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের ফেলো ডক্টর মিত্র বহু মনোসমীক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

॥ সমাজতন্ত্রের পথে ॥

বর্মার জঙ্গী শাসক জেনারেল নে উইন সৈন্য, নৌ ও বিমানবাহিনীর কমান্ডিং অফিসারদের এক সম্মেলনে বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বর্মাকে পুনর্গঠিত করাই তাঁর শাসনব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য। কারণ, তিনি বলেছেন, একমাত্র সমাজতন্ত্রী বর্মাতেই সাধারণ মানুষের দুঃখের অবসান হতে পারে। যতদিন পর্যন্ত নানা দোষে দুষ্ট বর্তমান আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তন না করা হবে এবং অন্যের শ্রমলব্ধ ধন অনায়াসে শোষণ করে মুষ্টিমেয় ধনী তাদের সম্পদবৃদ্ধির সুযোগ পাবে ততদিন বর্মার সাধারণ মানুষের কোন উন্নতি সম্ভব হতে পারে বলে বর্মার বিপ্লবী পরিষদ বিশ্বাস করে না। নে উইন দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, বর্মা চৌদ্দ বছর পরীক্ষা করে দেখেছে যে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। এই কারণেই শেষ পর্যন্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ ত্যাগ করা হয়েছে। যুগের ও পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন অনুসারে বর্মার বর্তমান শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন করা হবে, কিন্তু সকল অবস্থায় বর্মার শাসনযন্ত্রের রক্ষক হবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ বর্মার জাতীয় বাহিনী।

॥ দ্বিতীয় ফ্রন্ট ॥

ঠিক যে সময় পাকিস্থান রাষ্ট্রসংঘে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এবং সেই সঙ্গে গোয়ার ব্যাপারটিকে লেজুড় হিসাবে জুড়ে দিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রগুলির সমর্থনকে ভারতের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে ব্যস্ত সেই সময়েই আফগানিস্থান এক অতর্কিত "আক্রমণ" চালিয়ে "দ্বিতীয় ফ্রন্ট" খুলেছে তার বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের কাছে এক মুদ্রিত প্রচারপত্র বিলি করে আফগানিস্থান জানিয়েছে, পাকিস্থানের বেপরোয়া আক্রমণে পাখতুনিস্থানের অধিবাসীদের জীবন আজ দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। পাখতুনিস্থানের অধিকাংশ নেতা আজ কারাগারে বন্দী। তাদের সভা শোভাযাত্রার অধিকার আজ অপহৃত। সম্প্রতি পাখতুনিস্থানের অন্তর্গত স্পিনওয়াম, শিল্গারগুল, নোমান্ড, লোয়ারগাই, য়ুয়োকশাই প্রভৃতি খণ্ডজাতিসমূহের নেতারা কয়েকটি সভায় সমবেত হয়ে পাকিস্থানের নির্যাতন ও পাখতুন জাতীয়তাবাদীদের উপর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। যেসব পাখতুন জাতীয়তাবাদী নেতাদের বর্তমানে পাকিস্থানের জেলে আটক করে রাখা হয়েছে তাঁদের নাম ও পরিচয়ও উক্ত প্রচারপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

নান্দীকর

রবীন্দ্রনাথের একশত এক জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হ'ল গেল ২৫-এ বৈশাখ। ঐ পুণ্য দিনটিকে স্মরণ করে আমরা নত মস্তকে বলছি—'তোমারে করি নমস্কার'। দেখতে দেখতে আমাদের 'অমৃত'-ও একটি বছর শেষ ক'রে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে পৃথিবীর সকলজনকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভমঙ্গলকামনা জানাচ্ছি।
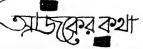
ভারতীয় চলচ্চিত্রের সরকারী পদোন্নতিঃ

ভারত সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুসারে এখন থেকে তথ্য ও বেতার দপ্তর ক্যাবিনেট পর্যায়ে উন্নত হ'ল। এর ফলে তথ্য ও বেতার দপ্তরের অধীন ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্যাগুলি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রধানতমদের প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হওয়ার সুযোগ পাবে। মাত্র চলচ্চিত্রশিল্পের জন্যে একজন বিশেষ মন্ত্রী নিয়োগের আবেদন ভারত সরকার যখন কিছুতেই কর্ণপাত করছেন না, তখন তথ্য ও বেতার দপ্তরের ক্যাবিনেট পর্যায়ে উন্নত হওয়ার ফলে চলচ্চিত্র-শিল্প যেটুকু বেশী সুযোগ লাভ করবে, তাকেই সানন্দে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী এস, কে, পাতিলের নেতৃত্বে যে-চলচ্চিত্র অনুসন্ধান কমিটি সৃষ্ট হয়েছিল, তার বহু সুপারিশের মধ্যে প্রধানতমটি ছিল—সরকার, চলচ্চিত্রশিল্প, শিল্পকশ্রেণী এবং অপরাপর স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'ফিল্ম কাউন্সিল' গঠন। এই 'ফিল্ম কাউন্সিল' সমগ্র চলচ্চিত্রশিল্পের নিয়ামক এবং তত্ত্বাবধায়ক হবে। সরকার কিন্তু এই সুপারিশটিকে আজও পর্যন্ত কার্যকরী করতে চাইছেন না এই অজুহাতে যে, চলচ্চিত্রশিল্পটি এখনও তেমন পাকা হয়ে ওঠেনি অর্থাৎ আজও সে শিশুই আছে। কিন্তু সরকার জানেন যে, ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প আজ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। সরকার এই শিল্প থেকে মাত্র প্রমোদকর বাবদ বছরে বারো কোটি টাকারও বেশী সংগ্রহ করেন; এ-ছাড়া আয়কর, মুদ্রিত ফিল্ম প্রদর্শনী কর প্রভৃতি বহু রকম তো আছেই। এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছেন অন্ততঃ এক লক্ষ লোক এবং হিসেব ক'রে দেখা গেছে, অপর ১৭২টি শিল্প এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। সমগ্র ভারতে বছরে অন্ততঃ ৭০ কোটি লোক সিনেমা দেখে থাকেন। সবচেয়ে সস্তা প্রমোদোপকরণ হিসেবে সিনেমার জুড়ি নেই এবং আনন্দ-বিতরণের সঙ্গে শিক্ষার বাহনরূপে সিনেমার প্রভাব জনমানসের ওপর সবচেয়ে বেশী।

প্রচণ্ড স্বার্থবুদ্ধি সিনেমাশিল্পের কর্ণধারদের বহুধা বিভক্ত ক'রে রেখেছে, এ-তথ্যও সরকারের অজানা নেই। অনুসন্ধান কমিটি তাঁদের সুপারিশ করতে গিয়ে স্বার্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন, "শিল্পটির মধ্যে অন্যায় এমন গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে যে, তার নিজের পক্ষে আত্মসংশোধন করা অসম্ভব।" (Evils in the industry having crept far too deep into the system, it would be unable to reform itself).

কাজেই এ অবস্থায় কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়তে পারে। ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করে

সত্যজিৎ রায়ের "কাঞ্চনজঙ্ঘা" চিত্রে অনুভা গুপ্তা ও সুব্রত সেনশর্মা

সরকারের উচিত, কালবিলম্ব না ক'রে ফিল্ম কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার কাজটিকে ত্বরান্বিত করা।

চিত্র সমালোচনা

হট্টগোল-বিজয় (বাঙলা) : হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রোডাকসান: ১৮১৮ ফুট দীর্ঘ ও ২ রীলে সম্পূর্ণ ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত পুতুল-চিত্র: পরিচালনাঃ রঘুনাথ গোস্বামী ও বুলু দাশগুপ্ত: চিত্রগ্রহণ ঃ বুলু দাশগুপ্ত; কর্মিসংঘ ঃ দিলীপ ভৌমিক, মাণিক মুখোপাধ্যায়, বীরেন মজুমদার, পতিতপাবন সাহা বিশ্বাস, শিবপদ কর, হেনা দাশগুপ্ত, কোটি শকলাত, মঞ্জু ঘোষ, উমা দাশগুপ্ত, রত্না ঘোষ, কালীশঙ্কর চক্রবর্তী, বরদা গুহ, কৃষ্ণকুমার রায়চৌধুরী।

হিন্দী সংলাপ সমন্বিত "হট্টগোল-বিজয়" ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র বিবেচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর সুবর্ণপদক লাভ করেছে, এ-খবর পাঠকমাত্রেরই জানা আছে। "দি পাপেটস্" নামে যে-বিশিষ্ট দলটি পুতুলনাচের মাধ্যমে "হট্টগোল-বিজয়" পালাটি ১৯৫৯-৬০ সালে অনুষ্ঠিত শিশু রংমহল উৎসবে শিশুদের চমৎকৃত করেছিলেন, তাঁদেরই সাহায্যে হরিসাধন দাশগুপ্ত এই শিশু-চিত্রটি প্রযোজনা করেছেন।

ছোট্ট রূপকথা গোছের গল্প। এক ছিল রাজা; তার ছিল দুই বিদূষক—কেনারাম, আর বেচারাম। রাজা শুনলেন, রূপকুমারী নামে এক রাজকন্যেকে হট্টগোল নামে এক দৈত্য আটক ক'রে রেখেছে। পাঁজিপুঁথি দেখে রাজা তাঁর বিদূষক দুটিকে নিয়ে রাজকুমারীর মুক্তি-অভিযানে যাত্রা করলেন। পথে গভীর বনে নানা আশংকা দুশ্চিন্তার মধ্যে রাত কাটিয়ে রাজা রূপকুমারীর দুর্গে পৌছলেন। বাক্সে আবদ্ধ দৈত্যকে হত্যা করবার জন্যে রাজা যখন সরোবরের মন্ত্রপূত জলে তাঁর তলোয়ারটিকে ডুবিয়ে আনতে গেলেন, তখন অদম্য কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বেচা-কেনা বাক্সর ঢাকাটি খুলে ফেলল। প্রকাণ্ড দৈত্য বেরিয়ে এসে যখন তাদের আক্রমণ করতে যাবে, ঠিক তখনই রাজা এসে তার সম্মুখীন হলেন এবং ঘোরতর যুদ্ধ ক'রে তাকে হত্যা করলেন। এরপর রাজা রাজ-কুমারীকে নিয়ে বয়স্যদের সঙ্গে দেশে ফিরলেন বিজয়গর্বে গর্বিত হয়ে।

পুতুলগুলি জীবন্ত নয় অর্থাৎ সোবিয়েত রাশিয়া বা চেকোশ্লোভেকিয়ার মত animated puppet নয়। তাদের চোখ বা ঠোঁট—কিছুই নড়ে না। মাত্র হাত, পা এবং মুখমণ্ডল নড়াচড়া করে। কিন্তু এই নড়াচড়ার সাহায্যেই সংলাপের সঙ্গে একাত্ম হওয়ায় এদের একটুও বাধেনি—কথা বা ছড়ার সঙ্গে ঠিক তাল রেখে এরা হাত এবং মাথা

ঘুরিয়েছে, পা ফেলেছে, পাশ ফিরেছে। হিন্দী সংলাপ কি রকম সুন্দর হয়েছে, তা জানি না; কিন্তু বিভিন্ন চরিত্রের হয়ে বিভিন্ন ধরণে যে চটকদার ও মজাদার কথা—গদ্যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে, ছড়ায় শুনলুম, তা কান ও মনকে খুশী করে। সংগে সংগে আবহসংগীতের মনোহারিত্বও উপভোগ্য।

পুতুলের সাহায্যে শিশুচিত্র নির্মাণের পথে "হট্টগোল-বিজয়" একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। ছবিটি "ইণ্ডিয়া টিউব কোম্পানী"র বিজ্ঞাপনচিত্র হিসেবে নির্মিত।

"বাইশে শ্রাবণ" টেলিভিশানে আমন্ত্রিত:
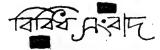
মৃণাল সেন পরিচালিত "বাইশে শ্রাবণ" ছবিখানি ডেনমার্ক সরকার কর্তৃক ওখানে টেলিভিশান মারফত প্রদর্শিত হবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছে। সুইডিশ টেলিভিশানেও ছবিখানি প্রদর্শিত হবার সম্ভাবনা আছে বলে ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী ছবিখানির পরিবেশক প্রতিষ্ঠান "চিত্রলোক"কে জানিয়েছেন।

'হট্টগোল বিজয়ে'র একটি চরিত্র

॥ শোক সংবাদ ॥

১৯৬১ সালে ভারতীয় শিশু-চিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করা সদা প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত "হট্টগোল বিজয়ী"-এর চিত্রশিল্পী ও অন্যতম পরিচালক বলু দাসগুপ্ত অত্যন্ত অকালে আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেছেন। সংবাদে প্রকাশ, গেল বৃহস্পতিবার, ৩রা মে তারিখে "ভারতের ঋতু" ছবির একটি স্যুটিং শেষ করে তিনি যখন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের নিকটবর্তী পাঁচথুপি গ্রাম থেকে নিজ বাসস্থানে সদলবলে ফিরে আসছিলেন, তখন পথের মধ্যে তিনটি তালগাছের তলায় তিনি অকস্মাৎ বজ্রাহত হয়ে সংগে সংগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল বত্রিশ। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প একটি প্রতিভাকে হারাল।

ভগবান তাঁর আত্মার শান্তিবিধান করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এই নিদারুণ আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা দিন।

ছবিটির একটি প্রিন্ট শিগ্‌গিরই স্টক্‌হলমে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

"শৌভনিক"-এর জন্মদিন:

১লা মে হচ্ছে "শৌভনিক" সম্প্রদায়ের জন্মদিন। আমরা তার সুদীর্ঘ দীর্ঘায়ু কামনা করি।

"রূপান্তরী"র শিশু-চলচ্চিত্র:

"রূপান্তরী" নাট্যগোষ্ঠী আট মিলিমিটার কোডাক্রোম রঙীন ফিল্মে

একটি শিশু-চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। মাত্র পরিস্ফুটন ছাড়া চিত্র-গঠনের আর সকল পর্যায়ের কাজই রূপান্তরীর সদস্যরা সম্পূর্ণ অপেশাদার-ভাবে সম্পন্ন করছেন। শিশুদের দ্বারা অভিনীত এই ছবিটি ২৫-এ মার্চ তারিখে শুরু হয়ে মে মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হবে, এই আশাই করছেন কর্তৃপক্ষ।

রবীন্দ্রভারতীর উদ্যোগে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব :

গেল ৩০এ এপ্রিল থেকে ৬ই মে পর্যন্ত সাতদিন ধ'রে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬॥টা থেকে শুরু ক'রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় গান, নৃত্যনাট্য, নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে রবীন্দ্রভারতীর কর্তৃপক্ষ কবির ১০১-তম জন্মোৎসব পালন করছেন।

কল্পরূপের নাট্যানুষ্ঠান :

গেল বাইশে এপ্রিল হাওড়া ই. আর. গোলমোহর রঙ্গমঞ্চে কল্পরূপের প্রযোজনায় দুটি নাটকের অভিনয় হয়। নাট্যানুষ্ঠানের প্রারম্ভে সভাপতির অভিভাষণ দেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ও প্রধান অতিথির ভাষণ দেন শ্রীদিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীবিজন ভট্টাচার্যের 'ছায়াপথ' নাটকটি এ'রা সাফল্যজনকভাবে অভিনয় করেন। এ'দের অনুষ্ঠান দেখে মনে হল এ'রা নিছক সখ ও খেয়াল মেটানোর জন্য নাটকের দল গড়েননি। বহু অভিনীত নাটক 'ছায়াপথ' অভিনয়ের গুণে দর্শকের মন কাড়তে পেরেছে। চাষধর ভূমিকায় বলিষ্ঠ অভিনয় করে আমাদের মুগ্ধ করেছেন শ্রীভূমেন্দু চট্টোপাধ্যায়। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের পরেই নাম করতে হয় 'প্রিয়ার' ভূমিকায় শ্রীমতী গায়ত্রী চক্রবর্তীর। চাষী বউয়ের রূপায়ণে শ্রীমতী আশা বেরার অভিনয় প্রশংসাযোগ্য। এ রকম টুকরো টুকরো অভিনয়াংশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই সুন্দর অভিনয় করেছেন। শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এমনও দিন আসতে পারে' আমাদের ভালো লাগেনি। নাটকের মধ্যে যেটুকু শ্লেষ ছিল অভিনয় গুণে (?) তা 'কমিকে' পরিণত হয়েছে। নাটক দুটির নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীঅনিল মিত্র ও শ্রীসত্য দেব। সুর-সংযোজনা করেন শ্রীঅমৃতলাল রায়। শ্রীআশুতোষ বড়ুয়ার আলোক-সম্পাত চলনসই।

'মৌলিক'-এর 'এক অধ্যায়' :

'মৌলিক'-গোষ্ঠী গেল ৯ই মে '৬২ সন্ধ্যে ৭টায় অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এক অধ্যায়' নাটকটি 'থিয়েটার সেণ্টার' গৃহে মঞ্চস্থ করেছিলেন। নাটকটি পরিচালনা করেছেন তড়িৎ চৌধুরী।

অভিনয়ের প্রারম্ভে 'গীতাঞ্জলি' সম্প্রদায় প্রগতিশীল সংগীত পরিবেশন করেছিলেন।

... নাটক "আদর্শ হিন্দু হোটেল"-এর একটি দৃশ্যে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিপ্রা মিত্র

টমাস মানের উপন্যাসের চিত্ররূপ

ইতিপূর্বে টমাস মানের দুটী উপন্যাস "বাডেন ব্রুকস" এবং "ফেলিক্স ক্রুল" চলচ্চিত্রায়িত হয়ে চিত্ররসিক সমাজে অভূতপূর্ব সাড়া এনেছিল। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল মানের চার খণ্ডের আরেকটি উপন্যাস "য়োসেফ এণ্ড হিজ ব্রাদার্স"এর চিত্ররূপ দেবেন পরিচালক গটফ্রেড রেইনহার্ট। রেইনহার্ট প্রখ্যাত মঞ্চ পরিচালক মাক্স রেইনহার্টের পুত্র। রেইনহার্টের ছবিটি বিশাল দৈর্ঘ্যের ছবি হবে বলে স্থির হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে তোলা হলিউডের দীর্ঘ ছবি, যথাঃ টেন কমাণ্ডমেণ্ডস, বেনহার, স্পার্টাকাস প্রভৃতির ব্যবসায়িক সাফল্য ইয়োরোপের অনেক দেশের চিত্র-প্রযোজকদের বিরাট ছবি প্রস্তুতে উৎসাহিত করছে ইদানীং। এমনকি গত বছর রাশিয়ার দুটী চিত্র-প্রতিষ্ঠানও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি বিরাট ছবি নির্মাণ করেছেন। পশ্চিম জার্মানীর চলচ্চিত্র জগত ও হলিউডি ধরনের বৃহদায়তন ছবি তৈরীর দিকে ঝুঁকেছিল। তবে প্রযোজকরা বড় ছবি নির্মাণের ঝুঁকি নেবার পক্ষপাতী নন। তাঁদের মতে একটা প্রকাণ্ড ছবি নির্মাণের চাইতে দু তিন খণ্ডে ছবি নির্মাণই শ্রেয়। কিন্তু রেইনহার্ট প্রযোজকদের মতামতের অপেক্ষা না রেখেই মানের চার খণ্ডের উপন্যাসটিকে একটি বৃহদায়তনের চিত্রে রূপান্তরিত করতে মনস্থ করেছেন।

"য়োসেফ এণ্ড হিজ ব্রাদার্স", বাইবেল এবং ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী। চার খণ্ডের শেষ খণ্ড "য়োসেফ দি প্রভাইডার" লেখা হয়েছিল ১৯৪৩ সালে যখন মান উদ্বাস্তু হয়েছিলেন তাঁর দেশ থেকে। রেইনহার্ট তাঁর ছবির কাজ আরম্ভ করবেন বর্তমান মাস থেকে। ছবির প্রধান প্রধান চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন অভিনেতাবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে আছেন উইলিয়াম হোল্ডেন, টনি কার্টিস, হেইনৎস রুমান। এই ছবিটি তোলার ব্যাপারে রেইনহার্টকে কয়েকজন টমাস মান ভক্ত বুদ্ধিজীবীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য হল মানের উপন্যাসকে হলিউডি ধরনের চিত্ররূপ দিলে জনতোষনাই হবে, মানের সম্মান রক্ষিত হবে না। রেইনহার্ট কিন্তু সমস্ত সমালোচনা হাওয়ায় উড়িয়েছেন। তিনি স্থির করেছেন মানের উপন্যাসটিকে যথাসম্ভব না বদলেই তুলবেন। মানের সংলাপগুলিই হুবহু ... চেষ্টা করবেন. তিনি এবং এ... ...কে সাহায্য করবেন টমাস মা... এরিকা। —চিত্রকূট

॥ বেটন কাপ ফাইনাল ॥

১৯৬২ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে এ বছরের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতার রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১—০ গোলে গত বছরের বেটন কাপ এবং এ বছরের বোম্বাইয়ের গোল্ড কাপ বিজয়ী সেন্ট্রাল রেলওয়ে দলকে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয়বার বেটন কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। নির্দিষ্ট সময়ের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে ইস্টবেঙ্গল দলের সেন্টার হাফব্যাক কুশলকুমার পেনাল্টি কর্ণার থেকে জয়সূচক গোলটি দেন। রেলওয়ে দলের গোলরক্ষক কায়ুমের এক ক্ষণিকের মারাত্মক ভুলে রেল দলকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়। একটি বহির্গামী বলকে ছেড়ে না দিয়ে শেষ সময়ে কিক ক'রে তিনিই দলের বিপদ ডেকে আনেন। কায়ুমের এই ফিরিয়ে দেওয়া বলটি আয়ত্বে আনতে গিয়ে রেল দলের গোলের সামনে খেলোয়াড়দের এক জটলা সৃষ্টি হয় এবং রেল দলের প্যারেলাল এই সময়ে বলটি পা দিয়ে খেলে আইন ভঙ্গ করেন। ফলে আম্পায়ার পেনাল্টি কর্ণারের নির্দেশ দেন। এই দিনের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে ইস্টবেঙ্গল দলের পুরোভাগের অলিম্পিক প্রখ্যাত খেলোয়াড় যোগীন্দর সিং 'প্রতীপ স্মৃতি ট্রফি' লাভ করেন। এই সঙ্গে এইদিনের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের গোলরক্ষক পি কাপুরের অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইস্টবেঙ্গল দল এ পর্যন্ত দু'বার বেটন কাপের ফাইনালে খেলেছে এবং দু'বারই বেটন কাপ জয়লাভ করেছে :

প্রথম রাউণ্ড

কাস্টমস ২ : পুলিস ১
ডবলিউ বি পুলিস ০, ১ :
পোর্ট কমিশনার্স ০, ০
ইস্টার্ণ রেলওয়ে ১ : রাজস্থান ০
এরিয়ান্স ২ : আর্মেনিয়ান্স ০
উয়াড়ী ০, ০, ০, ১ :
গ্রীয়ার ০, ০, ০, ০
খালসা বুজ ১ : রেঞ্জার্স ০
আদিবাসী ১ : মহঃ স্পোর্টিং ০
পাঞ্জাব স্পোর্টস ২ : ভবানীপুর ০
বি এন আর (ওয়াকওভার) :
ভিলাই স্টীল
বি ই কলেজ (ওয়াকওভার) :
বার্ণপুর ইউনাইটেড

দ্বিতীয় রাউণ্ড

কাস্টমস ৪ : ডবলিউ বি পুলিস ০
ইস্টার্ণ রেলওয়ে ২ : এরিয়ান্স ০
খালসা বুজ ০, ২ : উয়াড়ী ০, ০
দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টস ২ :
নাগপুর এ সি ০
পাঞ্জাব স্পোর্টস ১ : আদিবাসী ০
বি এন আর ১৩ : বি ই কলেজ ০

তৃতীয় রাউণ্ড

কাস্টমস (ওয়াক-ওভার) :
ইণ্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী
টাটা স্পোর্টস ০, ২ :
ইস্টার্ণ রেলওয়ে ০, ০
মোহনবাগান ৩ : খালসা বুজ ০
ইস্টবেঙ্গল ৩ : দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টস ০
ইণ্ডিয়ান নেভী ৩ :
পাঞ্জাব স্পোর্টস ০
বি এন আর ১ :
ইউনাইটেড স্পোর্টস ০

চতুর্থ রাউণ্ড

সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ১, ২ : কাস্টমস ১, ০
টাটা স্পোর্টস ২ : মোহনবাগান ০
ইস্টবেঙ্গল ২ : ইণ্ডিয়ান নেভী ১
মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ ১ :
বি এন আর ০

সেমি-ফাইনাল

ইস্টবেঙ্গল ২ : মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং ১
সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ১, ১ :
টাটা স্পোর্টস ১, ০

ডেভিস কাপ পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল

ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষ ৫—০ খেলায় ফিলিপাইনের বিপক্ষে জয়লাভ ক'রে উপর্যুপরি দু' বছর মূলে প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। গত বছর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১৯৬১ সালের ডেভিস কাপের ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলায় ভারতবর্ষ ২—৩ খেলায় শক্তিশালী আমেরিকার কাছে পরাজিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ বনাম ফিলিপাইনের খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

প্রথম সিংগলস : জয়দীপ মুখার্জি ৯-১১, ৭-৫, ৬-০ ও ৬-৪ সেটে জুয়ান মা জোসকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় সিংগলস : রমানাথন কৃষ্ণান ৬—১, ৮-৬ ও ৬-১ সেটে ফেলিসিমো অ্যাম্পনকে পরাজিত করেন।

ডাবলস : প্রেমজিৎ লাল এবং জয়দীপ মুখার্জি ৬-৩, ৩-৬, ৯-৭ ও ৬-১ সেটে রেমণ্ড ডেইরো এবং জুয়ান মা জোসকে পরাজিত করেন।

তৃতীয় সিংগলস : প্রেমজিৎ লাল ৬-৩, ৬-১ ও ৬-০ সেটে জুয়ান মা জোসকে পরাজিত করেন।

চতুর্থ সিংগলস : জয়দীপ মুখার্জি ৬-১, ৬-৩, ৩-৬ ও ৬-১ সেটে ফেলিসিমো অ্যাম্পনকে পরাজিত করেন।

সি এ বি'র পুরস্কার বিতরণী সভা

ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত সি এ বি'র পুরস্কার বিতরণী সভায় বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত বিভিন্ন ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিজয়ী দলগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সি এ বি'র সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিম বাংলার কারা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উপমন্ত্রী বর্ধমানের মহারাণী অধিরাণী পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিভিন্ন ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফলাফল :

সি এ বি ক্রিকেট লীগ : প্রথম বিভাগের চ্যাম্পিয়ান (আর সি সেন কাপ)—কালীঘাট ক্লাব; রাণার্স-আপ (ডি সি ঘোষ কাপ)—এলবার্ট স্পোর্টিং ক্লাব। দ্বিতীয় বিভাগের চ্যাম্পিয়ান (কুঞ্জবিহারী কাপ)—বালীগঞ্জ ইউনাইটেড; রানার্স-আপ (সি এ বি কাপ)—বাটা স্পোর্টস ক্লাব।

সি এ বি নকআউট টুর্ণামেন্ট : বিজয়ী (মেহরা কাপ)—স্পোর্টিং ইউনিয়ন; রানার্স-আপ (রবিন কাপ)—মোহনবাগান। সেমি-ফাইনালে পরাজিত দুই দলের মধ্যে বিজয়ী দল (ফণীন্দ্র ট্রফি)—মহমেডান স্পোর্টিং।

অমৃত পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক [illegible]কা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটা[illegible] লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক

অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত ।।

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 18th May, 1962.
40 Naya Paise

কলিকাতা বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজ-চলাচলের পথ দীর্ঘদিন যাবৎ সংকীর্ণ ও জটিল হইয়া আছে। গংগা নিজে যে পলিমাটি ও বালি বহন করিয়া আনেন তাহা তো আছেই, উপরন্তু দামোদর, রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখা, আরও অনেক বালি-কাঁকর ও পলিমাটি লইয়া আসে এবং এ সবই নদীগর্ভে পড়িয়া যেখানে-সেখানে চরের সৃষ্টি করে। সেই চরে জাহাজ ঠেকিলেই বিপদ। সুতরাং সেই সব এড়াইয়া তাহাদের পাশে যে গভীর জলের খাড়িপথ আছে সেই সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথে জাহাজ চালাইয়া যাওয়া-আসার ব্যবস্থা আছে। গংগাগর্ভে চর পড়ারও কোন স্থিরতা নাই, আজ যেখানে জল, কাল বা পরশু সেখানে চর আগাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং বন্দরে যে সব জাহাজ আসে-যায় তাহাদের নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে জাহাজের পাইলট, অর্থাৎ বন্দরের পথ-প্রদর্শকের সুদক্ষ ও সতর্ক-সজাগ নির্দেশের উপর।

বন্দরে জাহাজ চলাচল আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে দীর্ঘদিনের অবহেলার ফলে। কলিকাতার গংগার জলপ্রবাহ ও স্রোতের জোর দুই-ই ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ। ব্রিটিশ সরকার বাংলা ও বাংগালীকে কি নজরে দেখিতেন, সে কথা এখানে বলার প্রয়োজন নাই। এবং সেই বক্রদৃষ্টি যে কিছুটা ফলিত হইয়াছিল এই বন্দরের প্রতি অবহেলায়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রতিকারের যে সকল পথ বিশেষজ্ঞরা দেখাইয়াছিলেন, তাহার কোনটার উপরই তদানীন্তন নয়াদিল্লীর সরকার সময় থাকিতে বিশেষ ঝোঁক দেন নাই। ব্রিটিশ-রাজ যখন বিদায় গ্রহণ করেন তখন এই কলিকাতা বন্দরে বড় জাহাজ, অর্থাৎ ৮।১০ হাজার টন মালবাহী আসা বন্ধ এবং মাঝারি জাহাজের পক্ষেও ইহা সহজ নয়।

তারপর আসিল স্বাধীনতা। এবং স্বাধীনতার সংগে সংগে নয়াদিল্লীতে দেশশাসন ও পরিচালনের রাজদণ্ড পড়িল ভারতীয় অধিকারিবর্গের হাতে। খণ্ডিত বাংলার পশ্চিম অংশে যাঁহারা শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা সংগে সংগেই কলিকাতা বন্দরের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত হইতে বলেন এবং অবস্থা যে দ্রুত জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে সে কথাও ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণগোচর করেন। প্রতিকার কিভাবে করা প্রয়োজন সে কথাও তখনকার পশ্চিম বাংলার সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে স্মরণ করাইয়া দেন।

আরও কিছুদিন পরে আসিল প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা। পশ্চিম বাংলার লোকে দেখিল যে, কলিকাতা বন্দরের কথা তাহাতে বিশেষ কিছু নাই, যাহা আছে তাহাতে প্রতিকার বা উপকার কোনটাই স্থায়ীভাবে কিছু হইবে না, অন্যদিকে নদীপথের অবনতি সমানেই চলিবে। শোনা গেল যে, টাকা যাহা আছে বা যাহা ধার বা দান হিসাবে পাওয়া যাইবে তাহা অন্য এবং অত্যন্ত জরুরী কাজের জনাই যথেষ্ট নয়, সুতরাং পশ্চিম বাংলার এই সমস্যার সমাধান আরও কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকিবে।

প্রথম পাঁচসালার পর আসিল দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা। পশ্চিম বাংলার বাংগালী অবাক হইয়া দেখিল যে, উহাতেও কলিকাতা বন্দর উপেক্ষিত। অথচ এই কলিকাতা বন্দর ও কলিকাতার গংগা শুধু পশ্চিম বাংলার প্রাণরুধিরবাহ প্রধান ধমনী নয়, ইহা বৈদেশিক মুদ্রা—যাহা সকল পরিকল্পনার সারবস্তু—অর্জনের সর্বপ্রধান পথ, কেননা এই পথে সেই অর্থাগমকারী রপ্তানির শতকরা ৪৬।৪৮ ভাগ বিদেশে যায়।

বাংগালীর মনে সন্দেহ জাগিতে লাগিল যে, নয়াদিল্লীতে বিদেশী সরকারের বদলে বিমাতা-সরকার বসিয়াছে। কিছু আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং তাহার উপশম কিছুমাত্রায় হইয়াছিল তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই বন্দর ও কলিকাতার গংগার পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা থাকায়—যদিও কাজের গতি এখন যাহা দেখা যায় তাহাতে বিশেষ আশান্বিত হওয়ার কারণ কম।

কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতা বন্দরের ৪৬ জন পাইলটের মধ্যে ৪০ জন পদত্যাগ করায় যে ঘোরালো অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে আমাদের মনে সেই সন্দেহ দেখা দিয়াছে। এই অবস্থার জন্য দায়ী কে সে কথা বিচারের অধিকার আমাদের নাই। তবে যেভাবে ইহার সমাধান নয়াদিল্লীর কর্তৃপক্ষ করিতেছেন তাহার সমালোচনা করিবার পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে। যদি বোম্বাই বন্দরে কোন কারণে এইরূপ জটিল অবস্থা আসিত, তবে কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এভাবে গদীতে বসিয়া দিল্লী হইতে বিবৃতি ও ফতোয়াজারী করিতেন? মনে হয়, না।

নয়াদিল্লীর বিবৃতি ও পাইলট এসোসিয়েসনের বিবৃতির মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে। এবং কোনটা সঠিক তাহার উপর নির্ভর করিতেছে দিল্লীর নির্দেশের যাথার্থ্য। যদি সেই যথার্থ্য ন্যায়সংগতভাবে না প্রমাণ করা হয় তবে পশ্চিম বাংলা বুঝিবে ইহাও সেই বিমাতার দৃষ্টিজনিত। পাইলট এসোসিয়েসনের বিরুদ্ধে সরকার হটকারিতার অভিযোগ আনিয়াছেন। উহা প্রমাণসাপেক্ষ বলিয়া আমরা মনে করি।

দুইকে এক

বিষ্ণু দে

যায় সে, যাওয়া নয়, চৈত্ররাতে
যেন বা হাওয়া দেয় অধরা হাওয়া.
অদূরে সাগরের সজল মাধুরীতে
যখন মেশে সারা দিনের উষ্ণতা।

চলা তো চলা নয়, পয়লা আষাঢ়ের
ধারার পরে যেন স্বচ্ছ হাওয়া,
হাওয়ায় ভাসে যেন গানের অশরীরী
পিলু বা খাম্বাজে বিধুর হাওয়া।

সে আজ পেয়েছে কি অঙ্গীকার কারো,
মুখের অথবা কি মৃদু হাতের?
পুলকে নীল জল তার হৃদয় তাই,
আকাশে ওড়ে লঘু সারা শরীর?

একাই চলে বটে, সঙ্গে তবু তার
হাওয়ার সঙ্গীকে রাত্রে আনে
এককে দুই করে প্রতিটি শ্বাসে
দুইকে এক প্রতি পদক্ষেপে॥

হাসিঅশ্রু

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

হাসিঅশ্রু স্বভাবেই রূপ পায় সিন্ধুর সম্মানে।
যেজন ঘুমায়ে আছে হাহাকারে আপন গৌরবে,
কোন অর্থে পটভূমি, স্বর্ণ কালগ্রাহ্য সে কি জানে!
শব্দের গর্জনে নাকি অর্থহীন, বধির রৌরবে!

হাসিঅশ্রু দুই আছে, প্রবাহিত নিজ প্রয়োজনে।
চৈতন্যের নবাঙ্কুর, উঁকি দেয় বোধের আলোক;
ডাক দেয় জন্ম আনে বৃদ্ধি পায় সংখ্যায় স্বজনে।
হাসিঅশ্রু ছুঁয়ে গেলে ভরে তোলে সে-ই, অর্থলোক।

ঋতুর অশেষ পথে কোটি বর্ষ অন্তর্হিত।
জন্মমৃত্যু বধিরতা পৃথিবীর মেঘবৃষ্টিঝড়।
শব্দের স্পর্শেই বোঝ শব্দপ্রাণ অর্থের সহিত;
হাসিঅশ্রু তবে বুঝি স্বাভাবিক সময় নির্ভর।

হাসিঅশ্রু স্বভাবেই বহে যায় সিন্ধুর সম্মানে;
শব্দার্থে ঘুমায়ে আছে সে নিজেই, হাসিঅশ্রু জানে।

ঘোড়া

দিলীপ রায়

ঘোড়াগুলো ক্ষিপ্র, লাগাম মানে না, রাশ ছিঁড়ে ছোটে
বরফের মধ্যে,
চূর্ণ তুষারের ভিতর চতুর ওরা সতর্ক ধীর পদে যাচ্ছে।
ভীষণ ওদের রূপ, দৈত্য যেন এত প্রকাণ্ড, দেখে ভয় করে,
কিন্তু শান্ত, আর সংহত শক্তি অনেক রয়েছে তাই গর্ব
এমন ভঙ্গী, ঘাড় নাড়ে;
গলায় ঘণ্টা মৃদু সংকেত শুনে ওরা অধীর উৎসাহে ব্যস্ত।

বিলম্বিত গান গির্জা থেকে আসে, সে গান শুনে যেন মুগ্ধ
বরফ বিচূর্ণ, হিম শীতল স্তব্ধ তুলো তুষার পাহাড় মহামৌন;
ঝঞ্ঝা যদি উঠে দারুণ আঘাত আনে, তখন অশ্ব হ্রেষা রবে
আক্রমণের দেয় জবাব, আহ্বান জানায় ঘোর যুদ্ধে।

মাংসপেশীতে দেহে শক্তি পরিস্ফুট, কেশর ফুলানো যেন সিংহ
এমন বিক্রম আর এমন বন্য তেজ, নিশ্চয় ওরা কিছু হিংস্র ॥

জৈমিনি

সভাপতি হ'তে কার না ইচ্ছে হয়। আদর-আপ্যায়ন, মালা, জলযোগ এবং সেই সঙ্গে দু'চারটে জ্ঞানের কথা বিতরণ করা—এতে সন্ধ্যেটা ভালোই কাটে বলতে হবে। তাছাড়া এত লোকের লক্ষ্যস্থল হ'য়ে আসর জাঁকিয়ে বসা, সেও কম আকর্ষণের ব্যাপার নয়। জীবনে একমাত্র বিয়ের সময়েই লোকে এমন একচ্ছত্র মনোযোগের অধিকারী হ'তে পারে এবং বিয়ে যেহেতু ঘন ঘন করা যায় না, সেজন্যে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো সভাপতি হওয়াই সর্বলোকের লক্ষ্যস্থল হওয়ার অদ্বিতীয় পথ।

কিন্তু, দোহাই আপনাদের, আমাকে আপনারা কেউ সভাপতি হ'তে বলবেন না। সভাপতি হওয়ার সাধ আমার জন্মের মতো মিটে গেছে।

আমি জানি, আপনারা আমার কথা একটুও বিশ্বাস করছেন না। ভাবছেন, এ আমার আদর-কাড়ার নবতম উপায়—'আরেকবার সাধিলেই খাইব' ধরনের ব্যাপার। কিন্তু আমি সত্যিই বলছি, তেমন কোনো গোপন অভিসন্ধি নেই আমার। নিছক সেই ধরনের জৈববৃত্তি পণ্ডিতেরা যার নাম দিয়েছেন ইন্স্টিংক্ট্ অব সেল্ফ্ প্রিজারভেশান তারই তাগিদে সভাপতি হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

অবশ্য এ লাইনে আমি নতুন লোক নই। অল্প-স্বল্প দুর্ঘটনার ব্যাপার আমার আগেই জানা ছিল। যেমন ধরুন, আমার নাম যদি হয় পরমেশ গুপ্ত, তাহলে অনিবার্যভাবেই সভাস্থলে ঘোষণা করা হবে—আজকের সভার সভাপতিত্ব করবেন পরেশ গুপ্ত কিংবা রমেশ গুপ্ত, কখনোই আমার নিজের নাম নয়। তাছাড়া, কর্মকর্তাদের তরফ থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে যিনি আমাকে সম্বর্ধনার জন্য নির্দিষ্ট হবেন, তিনি প্রথমে আমাকে প্রমথেশ গুপ্তের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন, তারপর নিজের ত্রুটির বিষয়ে সচেতন হ'য়ে জানতে চাইবেন আমি কোন কোন

বইয়ের লেখক এবং আমার লিখিত বইয়ের নাম শুনে তিনি শুধু সহাস্য-বদনে বলবেন—বেশ, বেশ, বেশ!

কিংবা এসব কিছু যদি নাও ঘটে তো, ধার করে চেয়ে আনা যে গাড়িতে আমাকে প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি, কণ্ঠ-সংগীত-পরিবেশিকা, তাঁর বাদ্যযন্ত্র এবং তাঁর অভিভাবকের সংগে প্রায় গুড়ের নাগরির মতো বোঝাই ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে, ফেরৎ দেওয়ার সময়ে সে গাড়ি পেতে যে রাত দশটা বেজে যাবে, এ তো একরকম স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

তারপর রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধাক্কা। আপনারা যাঁরা সভাপতি হ'য়েছেন, তাঁরা জানেন সভাপতির মতো অসহায় জীব ভু-ভারতে নেই। কলকাতার বাইরে গেলে দেখা যাবে সভাস্থলের বারো-আনা শ্রোতাই বালক-বালিকা। তারা সাগ্রহে অপেক্ষা করে নাচ-গানের জন্যে এবং নাচগান আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ঠেলাঠেলির ফলে যে পরিমাণ কলরব উত্থিত হয় তাতে সযত্নে সাজানো বক্তৃতারও থেই হারিয়ে যায় মাঝে মাঝে।

তবু তাদের সভাপতি চাই। সভাপতি না পাওয়া পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তার আর অবধি থাকে না। প্যাণ্ডেল, মাইক, গায়ক-গায়িকা—সব কিছু ঠিক হওয়ার পরও পছন্দসই একজন সভাপতি খুঁজে না পেলে সমস্ত অনুষ্ঠানটারই যেন মাথাকাটা যায়; কর্মকর্তারা একেবারে মরীয়া হ'য়ে ওঠে।

আমার বন্ধু স-বাবুর কাছে শুনেছি, একবার তিনি শহরতলী থেকে একটা টেলিফোন পেয়েছিলেন। তাতে ছিল সভাপতি হওয়ার জন্যে ব্যাকুল অনুরোধ। স-বাবু অনেকগুলি উপন্যাসের লেখক, কিন্তু সভার মধ্যে মুখ খুলতে পারেন না। সভার নামে তাঁর বুক ধড়ফড় করে। শরীর ভালো নয় বলে তিনি টেলিফোন-কারীকে নিরস্ত করলেন। কিন্তু অন্য প্রান্ত থেকে শোনা গেল হতাশায় ভেঙে-পরা মন্তব্য (সম্ভবত পাশের কোনো সহকর্মীকে বলা), 'এক ব্যাটাকেও তো সভাপতি করা যাচ্ছে না!'...ও'রা টেলিফোনে হাত চাপা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন, কাজেই স-বাবুকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখতে হল নিজের রিসিভারটা!

এইরকমই এক উদভ্রান্ত আবেদনে সেদিন আমাকে যেতে হ'য়েছিল কলকাতার কাছাকাছি নৈহাটি লাইনের কোনো এক জায়গায়। গিয়ে আমার আচ্ছা আক্কেল-সেলামী হ'য়েছে। আমি তাই স্থির করেছি, জীবনে আর কখনো কারো নারী-কান্নায় ভুলব না।

ব্যাপারটা খুলে বলি। রাত দশটায় ফাংশন শেষ হবার পর, ওরা আমাকে নিয়ে গেল এক বাড়িতে জলযোগ করাতে। সেখানে চা-খেয়ে এবং জলযোগ না ক'রে (কারণ ওলাওঠা অতি ভয়ানক ব্যাধি, এবং শুনেছি ব্যাসিখাবার তার উত্তম বাসস্থান!) অনেক কষ্টে তো আধঘন্টার মধ্যে অব্যাহতি পাওয়া গেল। কিন্তু গাড়ি আর কিছুতেই আসে না। আরো প্রায় আধ ঘণ্টা পরে জানা গেল গাড়িটার টায়ার ফেঁসে গেছে। তাহলে উপায়? আছে বৈকি, বাসে ফিরতে হবে। একটি ছেলের সংগে সাইকেল-রিক্সা করে আমাকে রওনা ক'রে দেওয়া হল বাস-রাস্তার দিকে। কিন্তু তার কাছাকাছি এসেই দেখা গেল কলকাতামুখী বাস সগর্জনে হাতছাড়া হ'য়ে গেল। সংগী বলল, এবার স্টেশনে যেতে হবে, কারণ এটা লাস্ট বাস; লাস্ট ট্রেন আসতে আরো মিনিট দশেক দেরি আছে।

সাইকেল-রিক্সা চলতে লাগল। হঠাৎ পিছনে শুনি বাসের হর্ণ। কী, না কলকাতা থেকে শেষ-বাস আসছে। সংগীটি তৎক্ষণাৎ ছট্‌ফট্‌ ক'রে নেমে পড়ল এবং ঝাঁপিয়ে উঠে পড়ল সেই প্রায় চলন্ত বাসে, বলল—আপনি স্টেশনে যান।

কিন্তু যান বললেই তো যাওয়া যায় না। রিক্সাচালক বলল, সে আর এগোবে না। কারণ ফিরতি পথে একা-একা এলে ছিনতাইয়ের ভয় আছে। ওই তো সামনে স্টেশান, রেল-ইয়ার্ডের ভিতর দিয়ে গেলে পোয়াটাক পথও নয়, ট্রেন ধরতে অসুবিধে হবে না।

অগত্যা নামতে হল, ভাড়া দিতে হল এবং ইয়ার্ডের ওপর দিয়ে আধা-অন্ধকারে ছুটতে হল। হোঁচট খেলাম চারবার, চশমাটা ছিটকে পড়ল, একপাটি জুতোও কোথায় গেল খুঁজে পেলাম না। কিন্তু ট্রেন পেলাম এবং বাড়ি এলাম। রাত তখন ১টা। পরদিন একশ চার জ্বর!...

সেই থেকে ঠিক করেছি, আর আমি সভাপতি হব না।

রবীন্দ্রনাথ : সংগীতের মুক্তি

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যরচনার আদিযুগে রবীন্দ্রনাথ সংগীত ও কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি, তখন তাহাকে শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টিরূপে দেখি না—কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়স্বরূপ। আমরা সংগীতকেও সেইরূপ দেখিতে চাই। সংগীত সুরের রাগরাগিণী নহে, সঙ্গীত ভাবের রাগরাগিণী। ...আমাদের ভাব প্রকাশ করার দুটি উপকরণ আছে—কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে সুরও ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। ....সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই ও সঙ্গীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই।' (সঙ্গীত ও কবিতা : রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড)।

কবিতায় কথার ভাষার প্রাধান্যের ফলে কাব্যের আবৃত্তি আমাদের মনে যে ছবির সৃষ্টি করে তার মধ্যে জটিলতা কম। কিন্তু গানের সুর আমাদের মনে যে অনুভূতি আনে এবং যে সব ছবির সৃষ্টি করে তার বিবরণ দেওয়া বড় কঠিন। তবে রাগরাগিণীর ঐতিহ্যসূত্রে তাদের একেকটা রূপ আমাদের মনে ফুটে ওঠে। সুরের সেই বিকাশ আমাদের মনকে বিশ্বের অনির্বচনীয় ভাবরূপের সঙ্গে যুক্ত করে সন্দেহ নেই। কিন্তু হৃদয়াবেগ যখন সুরের সহায়তায় ভাষা বিস্তার করে তখন তা বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে এমন সব সুর খোঁজে যার মধ্যে রাগরাগিণী অপেক্ষা হৃদয়জাত আবেগের প্রকাশই প্রধান হয়ে ওঠে। কথা ও সুরের পারস্পারিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ এই ভাবেই এসে পড়ে।

পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের এই বিশেষত্ব সম্পর্কে যে কথা বলেছেন এই সূত্রে সেটির উল্লেখও প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখছেন, 'গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহন মাত্র। ...... বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে।' (গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ : জীবনস্মৃতি)।

কথার অতীত কিছু প্রকাশ করা সঙ্গীতের ধর্ম হলেও বাংলা গান কথাকে ভিত্তি করেই সুর বিস্তার করে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য তার কথা ও সুরের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ওজনবোধে। গানের কাব্যাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যদি সুরের বিচার করি তবে পাই শুধু স্বরসমষ্টি, আর সুর থেকে কাব্যকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে থাকে শুধু বাক্‌সমষ্টি। প্রথমটিতে সুরের অনির্বচনীয় খেলা, দ্বিতীয়টিতে কথার অর্থবান ধ্বনিতরঙ্গ। কবিতার গানের ছন্দ এবং আবৃত্তির ভঙ্গি সুরেলা না হলে সে কবিতা ভাবকে ঠিকমত রূপায়িত করে না, আর গানের মধ্যে যদি সুর না লাগে তবে তা কবিতার পর্যায়ে নেমে আসে। কবিতা একটু বেশি কথা খরচ করে চিত্তপটে ছবি ফুটিয়ে তোলে, কিন্তু গানের মধ্যে সুর থাকে বলে চিত্রযোজনায় কথার মেহনৎ কম। কেননা বাক্যের অতীত কিছু প্রকাশ করাই সুরের ধর্ম। কবিতার চেয়ে গানের কথায় একটু বেশি ফাঁক দরকার হয়, সেই ফাঁক দিয়ে সুরের আলো ছড়িয়ে পড়ে ভাবের অঙ্গনে। কবিতার চেয়ে গান তাই একটু বেশি ভাবঘন হয়ে ওঠে। অনুভূতি ও আবেগের তীব্রতায় কথার অর্থবান অংশ কমে গিয়ে সুরের অংশ স্বভাবতই বৃদ্ধি পায় এবং হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে অনির্বচনীয় রস।

নমুনা স্বরূপ একটি কবিতার কাব্য-রূপে এবং গীতরূপে দেখুন। কাব্যরূপে ছিল এইরকম—

"মোর গান এরা সব শৈবালের দল
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে
করেনি অচল।
মূল নাই, ফুল আছে,
শুধু পাতা আছে—
আলোর আনন্দ নিয়ে
জলের তরঙ্গে এরা নাচে।
বাসা নাই, নাইকো সঞ্চয়,
অজানা অতিথি এরা
কবে আসে নাইকো নিশ্চয়।
যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে
দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে,
আমার শৈবালদল
উদ্দাম চঞ্চল,
বন্যার ধারায়
পথ যে হারায়,
দেশে দেশে—
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।"

এই কাব্যের 'কথার ভাষাকে' 'সুরের ভাষায়' নিয়ে যাবার জন্য কিছু বাক্যের অদলবদল করতে হল, বাক্যের ঘন রূপ কিছু তরল করতে হল, দানাবাঁধা কবিতার রূপকে একটু আলগা করে যেমন ছেড়ে দিতে হল তেমনি আবার নিয়ে আসতে হল সুঠাম ছন্দ, কাঠামো-টায় করতে হল একটু ওলটপালট, আর ভাবের রাগিণী প্রকাশের খাতিরে কিছু অংশের হল পুনরাবৃত্তি। যে রূপটা খাড়া হল সেটা কাব্যরূপের তুলনায় যতিবদ্ধ ছন্দোময় হয়ে একটু ঘনও হয়ে উঠল। দাঁড়ালো এইরকম :—

"গানগুলি মোর শৈবালেরই দল—
ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল।
ওরা কেনই আসে যায় বা চলে,
অকারণের হাওয়ায় দোলে—
চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে
পায় না কোনো ফল।
ওদের সাধন তো নাই
কোনো সাধন তো নাই,
ওদের বাঁধন তো নাই
কোনো বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে
গৃহহারা পথের স্বরে
ভুলে যাওয়া স্রোতের 'পরে করে টলমল।"

কাব্যরূপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী বাঁধন থাকার ফলে রবীন্দ্রসংগীতে সুররূপের চেয়ে চিত্ররূপ প্রধান। অর্থাৎ সুর আমাদের মনে যে ছবি ফুটিয়ে তোলে কথা সেই প্রতিফলনেরই রূপ দেয়, কিম্বা কথার অংশে যে ছবি থাকে সুর সেই ছবিকেই ফুটিয়ে তোলে। কথা এ ক্ষেত্রে সুরকে ছাড়িয়ে যায় না এবং সুরও কথার সঙ্গে মানিয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, গানের সুর তিনি বসিয়ে যান কথা বার করবার জন্য, সুর বার করবার জন্য কথার ব্যবহার নয়। তাই একটা পরিমিতির মধ্যে সংগীতের বিকাশ। কাব্যানুশ্রয়ী সুরের মধ্যে যে চিত্ররূপ থাকে তাকে গানের ছাঁচে এনে ফেললে সুর সেই চিত্ররূপেরই হয় প্রতিরূপ। তাই রাগরাগিণীর আইনকানুনগুলো পুরোপুরি না মেনে চললেও ক্ষতি হয় না। যেমন ধরুন, দরবারী কানাড়ার ছাঁদে রচিত 'বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে' গানটি, কিম্বা ভৈরবী ঠাটের 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী' কাব্য-গীতি, ইমন সুরে 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে' অথবা মেঘরাগের আধারে রচিত 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু' প্রভৃতি গানে ভাষায়, কাব্যছন্দে, শব্দপ্রয়োগে, সুরমাধুর্যে যে ছবি ফুটে উঠেছে তা কথায় সুরে ভাবে ভঙ্গিতে মিলেমিশে একটা সামগ্রিক রূপেরই চিত্র। অর্থাৎ এখানে সমগ্র গীতি-কবিতাটি সুরের মধ্য দিয়ে এমন একটি একক রূপ ফুটিয়ে তুলছে যেটি শুধু কাব্যাংশে অথবা শুধু সুরাংশে পূর্ণতা পেত না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের উক্তি 'সুরের ভাষা আর কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিলে ভাবের ভাষা নির্মাণ করে', এবং পরবর্তী জীবনের মন্তব্য 'গানের কথার উচিত হয় না গানকে ছাড়িয়ে যাওয়া,'—এ দুই উক্তিই পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে। এবং গীতরূপের এই সামগ্রিকতা বজায় রাখবার জন্যই রবীন্দ্রসংগীতের সুর নিয়ে খেলানো বা কথা নিয়ে ফেনানো সম্পর্কে বিবেচনা করে চলতে হয়। কথার অংশের ভাব সুরের মধ্যে ছাড়া পায় বলেই সুরের কাঠামোতেও নড়চড় করা যায় না; তা হলে গানের কথা গানকে ছাড়িয়ে যেতে চাইবে। সুরের একটা নিজস্ব কথানিরপেক্ষ রূপ থাকা সত্ত্বেও 'ভাবের ভাষার' নোঙরে গান রয়েছে বাঁধা।

কিন্তু গান মাত্রেই সংগীত-শাস্ত্রের কতকগুলি নিয়মে বাঁধা। সেটা মুখ্যত রাগরাগিণীর নিয়ম, তাল-মাত্রার বাঁধা-বাঁধি। বাণীভিত্তিক গানের পক্ষে এই সব বাঁধাবাঁধি অনেক সময়ে ভাবের ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে। সেই ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নানাবিধ বৈচিত্র্যের আমদানি করলেন। 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন কেমন করে কবিতার ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাল ও লয়ের বিচিত্র ব্যবহার করেছেন তাঁর 'কাঁপিছে দেহলতা থরথর', 'বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে', 'যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে' প্রভৃতি গানে। কবিতার ছন্দ গানের ছন্দে রূপায়িত হয়ে উঠেছে এগুলিতে। রবীন্দ্র-সংগীতের প্রধান মুক্তি তার কাব্যসম্পদের অন্তর্মুখীনতায়, যেখানে সুরের সাহায্যে কথার ভাবরূপে মনের মধ্যে গিয়ে বিস্তার লাভ করে। এই ভাব-বিস্তৃতি সংগীতকে ক্রমে সূক্ষ্ম রহস্য-রসে আবৃত করেছে। তার ফলে রবীন্দ্র-নাথের প্রথম দিকের সহজ কাব্যময় রাগ-ভিত্তিক গানগুলির বদলে ক্রমে আমরা পেয়েছি ভাবভিত্তিক মিশ্র গান। অর্থাৎ সংগীত ক্রমে মুক্তি পেয়েছে ভাবের দিকে। মনের ভাবকে কথায় সাজিয়ে সুরের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে গিয়ে রাগরূপ আর কাব্যরূপ মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে।

ভারতীয় রাগরাগিণী বিশেষ বিশেষ স্বরের ব্যবহারে আমাদের বিশেষ বিশেষ অনুভূতিকে রূপ দেয়। একেকটা রাগ-রাগিণীর জন্য দিনের একেকটা সময় নির্ধারিত, এবং সেই সঙ্গে নির্ধারিত হয়ে আছে আমাদের মনের কোমল কঠোর নানাবিধ আবেগ। প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে মানুষের মনের সেই সব আবেগ বা অনুভূতির রূপ পাই গানে। রবীন্দ্র-নাথের মুখ থেকে সংগীতের এই প্রভাবের কথা শোনা যাক। তিনি বলছেন, "সংগীতের মতো এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজাল বিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই—এ এক নূতন সৃষ্টিকর্তা। আমি তো ভেবে পাইনে, সংগীত একটা নূতন মায়া-জগৎ সৃষ্টি করে না এই পুরাতন জগতের অন্তরতম অপরূপ নিত্যরাজ্য উদ্ঘাটিত করে দেয়। গান প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস আছে যা মানুষকে এই কথা বলে যে, 'তোমরা জগতের সকল জিনিষকে যতই পরিষ্কার বুদ্ধিগম্য করতে চেষ্টা করো না কেন এর আসল জিনিষটাই অনির্বচনীয় এবং তারই সঙ্গে আমাদের মর্মের মর্মান্তিক যোগ—তারই জন্যে আমাদের এত দুঃখ, এত সুখ, এত ব্যাকুলতা'।" (ছিন্নপত্রাবলী, ২২৯)

আরো শুনুন, "প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু

না—আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি তাহলে এই রৌদ্র-রঞ্জিত সুদূরে বিস্তৃত শ্যামল-নীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপরে বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘ-মল্লারে একটা নূতন বর্ষার গান রচনা করি, কিন্তু ক্ষমতা কৈ? এবং শ্রোতাদের সম্মুখে তো এই বর্ষার নিত্য মোহ নেই, তাদের কাছে এক ঘেয়ে ঠেকবে। কারণ কথা তো ঐ একই—বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্য-নূতন আবেগ, অনাদি-অনন্ত বিরহ-বেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।" (ছিন্নপত্রাবলী, ২০২)

সুরের এই ইন্দ্রজালবিদ্যার ফলে এবং তার সঙ্গে প্রকৃতির অনির্বচনীয় রূপ-রসের আত্মীয়তায় আমাদের মন বস্তুর আওতায় থেকেও বস্তুর অতীত একটা জগতের ধরাছোঁয়ার স্তরে এসে যায়। তাই কথা যতই পুরানো হোক বা ছবি যতই একঘেয়ে হোক তার মধ্যেকার আবেগ বা অনির্বচনীয়তারই প্রকাশ গানের সুরে। গানের সুরেই চিরপুরাতন দেখা দেয় চিরনূতন হয়ে। ভাবের সর্ববিধ প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রসংগীতে শুধু রাগমিশ্রণ, তানবর্জন, তালের বৈচিত্র্য বা বিলোপ ইত্যাদি ব্যাপারই দ্রষ্টব্য নয়, সমগ্র গানের মধ্যে কথায় সুরে চিত্রকল্পে ভাবরূপের প্রকাশটুকু লক্ষণীয়। ভাবের এই ছবি আঁকবার জন্যই মল্লার না হয়েও রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসংগীত, ভৈরবী বা রামকেলি না হয়েও গড়ে ওঠে সকালবেলাকার গান। অর্থাৎ বর্ষার বা সকালের নানাবিধ রূপ-সমারোহ এবং মনের আনন্দ-বেদনা উচ্ছলতা-গভীরতা প্রভৃতি ভাবের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে সুরের ভাষা আর কথার ভাষা। এবং অন্তর্নিহিত এই সব ভাবরূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে' গানটির সুর হয় ইমনকল্যাণ, কানাড়া সুরে পাই 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে'; আবার হাম্বীর রাগে রচিত হয় বর্ষার গান 'আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে', কেদারা রাগে 'কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে'।

• কিন্তু সুরারোপের আরেকটা দিকও আছে রবীন্দ্রসংগীতে। কাব্যগীতি—অর্থাৎ নিছক কবিতা হ'তে বাধা নেই এমন সব পদ্যে সুর বসানো। যেমন, 'কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া এসেছি ভুলে', 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে', 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে', 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি', 'এই তো ভাল লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়' ইত্যাদি। এই ধরণের কবিতায় সুর দিতে গিয়ে একই গানের মধ্যে নানাবিধ বৈচিত্র্য আনতে হয়েছে,—কখনো তালের বৈচিত্র্য, কখনো সুরের বৈচিত্র্য, লয়ের রকমফের, বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি, এমন কি মাঝে মধ্যে কীর্তন বা কথকতার চাল। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে একটা বিষয় কিন্তু পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, সুরও রইল, কবিতাও রইল, গানও হল,—কিন্তু চলতি নিয়মের ব্যতিক্রমেও রসহানি হল না। তাঁর পরবর্তী জীবনের রচনায়,—এমন কি আদিযুগের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যের গানেও একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার যে, কবিতা অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্যছন্দ থেকে এবং গান নিয়মিত তাল-বন্ধ থেকে মুক্তি পেয়েছে সুর-লোকে। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন পদ্যছন্দের আওতায় অনেক কথাই বলা যায় না। বলবার কথাকে সরলতর করতে ক্রমে ক্রমে গদ্যকে নিয়ে এসেছেন কাব্যের ক্ষেত্রে। তিনি বিশ্বাস করেছেন 'অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া যায়'। এবং নবসৃষ্ট এই গদ্যকাব্যে সুরারোপ করে তিনি মানুষের সাধারণ সুখ-দুঃখকেও গানের আওতায় নিয়ে এসেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন অসাধারণতার।

এই গদ্য গীতভঙ্গি নানারকমভাবে নানান গানে আগেও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন 'এ শুধু অলস মায়া' কিম্বা 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল' গানের মধ্যে সাংগীতিক সংযম রক্ষিত হলেও পুনরাবৃত্তির বেলায় নিয়ম ছাড়া; 'ওগো স্বপনস্বরূপিনী' অথবা 'মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন' গান দুটি অসম অনিয়মিত মিলের পংক্তি সত্ত্বেও পুরোপুরি গীতিনিয়মানুগ; 'নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে' কিম্বা 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' গানে অন্ত্য মিলের বালাই নেই কিন্তু ছন্দে তালে গরমিল হয়নি। 'আমার গান আমার অগোচরে আমার আপন মন হরণ করে', 'হে বিরহী হায় চঞ্চল হিয়া তব' 'নীলাঞ্জন ছায়া' প্রভৃতি গানের গদ্যভঙ্গিও এই সূত্রে লক্ষণীয়। গীতরূপের এই সব ছোটখাট কাব্যিক অসংগতি গানের বেলায় একেবারেই ধরা পড়ে না। এর পরের পর্বেই দেখতে পাই সাধারণ কথাকে আর সাজিয়ে গুছিয়ে বলবার প্রয়োজনও রইল না—সোজাসুজি চালান হয়ে গেল কবিতার মহলে,—গানের আসরে। আমরা একে একে পেলাম তালছাড়া গদ্য গান, এবং—এমন কি—তালযুক্ত গদ্য। এই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল বিশেষ করে গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য রচনার সূত্রে। নৃত্যনাট্যের গানে তালের অংশে নাচের ছন্দেরও জুড়ি থাকে, আর সেই সঙ্গে কথার ভাষায় ভার লাঘব হয়ে ভাবের ভাষারও কিছুটা প্রকাশিত হয় অভিনয়ে ও নৃত্যভঙ্গিতে। তাই সেখানে কবিতার কাজটা তেমন অপরিহার্য নয়। অনেকেই রবীন্দ্রনাথের 'আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে ঝুলন খেলা' কিম্বা 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে' প্রভৃতি কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যপরিবেষণ দেখেছেন। 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার আবৃত্তি অংশের সঙ্গে নাচের দৃশ্য রয়েছে। 'শাপমোচন' নৃত্য-নাট্যে পেয়েছি কিছু নিছক গদ্যাংশ,—'অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান.........' ইত্যাদি,—যার আবৃত্তি কবিতার সুরে নয়, গানের সুরে। এই ভাবে সুর ক্রমে তাল মাত্রার বন্ধনকে এক পাশে রেখে ভাবের রসে—রবীন্দ্রনাথের কথায় 'ভাবছন্দে' মুক্তি পেয়েছে। তারপরে একেবারে সাধারণ কথায় হৃদয়ের সাধারণ ভাবগুলির 'সুরের ভাষায়' প্রকাশ দেখি চণ্ডালিকা নৃত্য-নাট্যে। এই প্রকাশের ভঙ্গি আমরা অনেক আগে দেখতে পেয়েছিলাম 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যে। কিন্তু তার মধ্যেকার গানগুলির ভঙ্গি গদ্যের হলেও এবং নাটকীয়তা গদ্যানুগ হলেও কিছু পরিমাণে তা ছিল কাব্যিক,—একটা [illegible] ছিল না ভাষার ব্যবহার। তবে সেই অঙ্কুর থেকেই ছড়িয়েছে ডালপালা। কাব্য হয়ে উঠেছে গদ্যময়, আর গদ্য গীতিময়। সুরের ভাষা আর কথার ভাষা মিলে এমনি করে নির্মাণ করেছে ভাবের ভাষা; রাগরাগিণীর নানারকমের মিশ্রণে এবং তালের বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুবর্তনে [illegible] তোলা হয়েছে তার রস।

নৃত্যনাট্যের গানই শুধু নয়, যেসব মুক্তক ছন্দের কবিতার গান আমরা 'গীতবিতান' গ্রন্থে পাই,—যেমন, 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে', 'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়' ইত্যাদি, এবং যেসব কাব্যছন্দোবদ্ধ মুক্ততালের গান, যেমন 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে', 'রূপে তোমায় ভোলাব না', ইত্যাদি—তার মধ্যেও ভাবরূপের প্রকাশই প্রধান। ভাবের চিত্ররূপ খাড়া করতে গিয়ে কখনো কবিতার বাঁধন আলগা হয়েছে, কখনো সুর হয়েছে ছন্দছাড়া। ভাবের এই রাগিণীর মধ্যেই মুক্তি পেল সংগীত [illegible] বেষ্টন থেকে। কাব্যগীতির সুরমূর্ছনা এবং [illegible] মিলিয়ে মিশিয়ে সংগীতের অনির্বচনীয় ভাবরূপ গঠনই রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য,—যে বৈশিষ্ট্যের [illegible] থেকে [illegible] ব্যক্তিহৃদয় থেকে বিশ্ব-হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত।

॥ সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গে ॥

অমৃত বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প' শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমার কয়েকটি বিনীত নিবেদন আছে। লেখক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতীব নিষ্ঠায় আধুনিক ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আধুনিক ছোটগল্পের বিবর্তনটিকেও কুশলতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। সরোজবাবু সাম্প্রতিক গল্পের পূর্বসূচী হিসেবে মূলতঃ যুদ্ধপূর্ব দশকের তিনজনকে চিহ্নিত করেছেন : প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশংকর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য হল :

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, সমরেশ বসু যুদ্ধপরবর্তী দশকে প্রধান শক্তিশালী লেখক হিসেবে দেখা দিলেন। এই শক্তিমান লেখকবৃন্দের ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে তিলমাত্র গৌণ না করেও বোধ হয় বলা চলে এঁদের ভিতর দিয়ে প্রধানতঃ যুদ্ধপূর্ব দশকের তিনজন প্রতিভাধর গল্প-লেখকের ধারা নবরূপায়ণে ধন্য হল।

উপরোক্ত একদেশদর্শি উক্তিটি সম্ভবতঃ প্রবন্ধ লেখকের অমনোযোগিতারই ফসল, নতুবা এই প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার, অন্নদাশঙ্কর এবং বুদ্ধদেব বসুর নাম বাদ পড়ে কোন্ যুক্তিতে? সরোজবাবু যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকাল সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন : উপন্যাসে তখন কলকাতাকে এবং সমকালকে এড়াবার প্রচেষ্টা প্রকট হয়ে উঠছে। অথচ অচিন্ত্যকুমারের 'যে যাই বলুক' এবং 'যায় যদি যাক' উপন্যাস দুটি যুদ্ধকালীন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। শুধু উপন্যাসেই নয় সমসাময়িক সময়কে ছোটগল্প মারফতও অচিন্ত্যকুমার কাঠ-খড়-কেরোসিন, হাঁড়ি মুচি ডোম প্রভৃতির গল্পে সার্থক করে তুলে ধরেছিলেন। (এই প্রসঙ্গে সরোজ রায়চৌধুরীর 'কালো ঘোড়া' উপন্যাসটিও স্মর্তব্য।) শুধু জীবন-মূল্যায়নেই না, আঙ্গিক প্রকরণেও অচিন্ত্যকুমারের প্রভাব পরবর্তী যুগে কম অনুভূত হয়নি। একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনীর ভাষার ছায়া পরবর্তী অনেক লেখকদের মধ্যেই সুলভ ছিল। এবং বুদ্ধদেব বসুর নাম এই প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই আসে। সরোজবাবু যাঁদের যুদ্ধপরবর্তী শক্তিমান লেখক হিসেবে নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ দুজনের ওপর বুদ্ধদেব বসুর গদ্যরীতির প্রভাব একদা প্রবল ছিল এবং আজো আছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং বিমল কর। বিমল কর অবশ্য যতটা বুদ্ধাশ্রয়ী ততটাই জ্যোতিরিন্দ্রীয়। শুধু যুদ্ধ-পরবর্তীই বা কেন হাল আমলের তরুণ গল্পকাররাই ("নতুন রীতির" লেখকদের ধরেই বলছি) কি আজো অনেকে তিথিডোরে আবদ্ধ নন? অনুল্লিখিত অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গটি না হয় আর নাই বাড়ালাম, যে ত্রয়ীর নাম উল্লেখ করেছেন সরোজবাবু তাঁদের প্রতিই কি সুবিচার করেছেন তিনি? এই ত্রয়ী সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন সরোজবাবু :

"এঁদের গল্পের মূলে আকর্ষণ গল্পের প্রত্যক্ষ ঘটনায় নেই। গল্পের অন্তর্গত একটা চাপ এঁরা তীব্র করে তোলেন বাইরের ঘটনার সাহায্য না নিয়ে অথবা খুব কম নিয়ে।"

এবং আরেক জায়গায় আছে :

"গল্পে-কাহিনীর ভার কমিয়ে আনার যে প্রয়াস তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল তা চূড়ান্ত পরিণামে পৌঁছল পাঁচের দশকের শেষার্ধে।" তাই যদি হয় তাহলে কি করে অন্ততঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র এবং রমাপদ চৌধুরীর "ভিতর দিয়ে প্রধানতঃ যুদ্ধপূর্ব দশকের তিনজন প্রতিভাধর গল্প-লেখকের ধারা নব-রূপায়ণে ধন্য হল"? উল্লিখিত তিনজন লেখকই প্রধানতঃ অন্তিম চমকের তাড়িতে গল্পের আলো জ্বালান এবং এঁদের গল্প কখনই "গল্পচ্ছুট" (শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রেমেন্দ্র মিত্র, ক্ষমা করবেন!) নয়। একমাত্র সমরেশের মধ্যেই তারাশংকরের সাক্ষাৎ উত্তরসূরীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। প্রেমেন্দ্র-মানিক আজো নতুন রীতির লেখক, এঁদের অনুকরণ হয়ত হয়েছে অনুসরণ চোখে পড়েনি। তবে হাল-আমলের তরুণ লেখক মতি নন্দীর মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আভাস হঠাৎ হঠাৎ কোথাও ঝলকে ওঠে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনা পোতা আবিস্কার', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'স্টোভ', 'পঞ্চশর' ভাবীকালের খোঁজ করে।

কে সরকার
লালকুঠি
বজবজ।

॥ পূর্বপক্ষ প্রসঙ্গে ॥

সম্পাদক সমীপেষু,
মহাশয়,

সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪২শ সংখ্যা, শুক্রবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী, '৬২) বিভাগীয় স্তম্ভে 'পূর্বপক্ষে' জৈমিনি শহর কলকাতার বিশেষ এক সমাজের সংস্কৃতি অনুরাগের যে চেহারা প্রত্যক্ষ করেছেন তা আশা করি উৎসাহী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। 'জৈমিনি' শহর কলকাতার উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংকর-সংস্কৃতির যে চিত্র উক্ত স্তম্ভে তার বক্তব্যে এবং তৎসহ কথঞ্চিৎ আভাসে বলবার চেষ্টা করেছেন তা অত্যন্ত সময়োপযোগী, এবং আমার মনে হয় তথাকথিত সংস্কৃতির নামে ইঙ্গবঙ্গ কালচার এবং সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের আত্মপ্রসাদ বঙ্গ সংস্কৃতি চর্চার স্নিগ্ধতাকে জটিল এবং শ্রীহীন করে তুলবে। শহর কলকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের সংস্কৃতিবিলাস এর স্বপক্ষে রায় দেবে। বিশেষ করে বৈঠকখানা, বহির্কক্ষের সজ্জার ব্যাপারে বিচিত্রিত পরস্পরবিরোধী উপকরণ ইত্যাদির আশ্চর্য সহাবস্থান হয়তো অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। জৈমিনির বক্তব্যের একটি অংশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : ...'বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণে এমন সব জিনিস বৈঠকখানায় জড়ো করছেন তাঁরা যার মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া কঠিন।'

'রুচি' কথাটির অর্থ প্রকৃতই বিস্তৃততর এবং পাশাপাশি বলাও যায় যায় যে 'রুচি' বস্তুটিও আশ্চর্য অদ্ভুত। রুচি যাঁর আছে তাঁরই আছে; এবং প্রকৃত প্রস্তাবে রুচিবান বা সংস্কৃতি-প্রেমী মানুষের শিক্ষাদীক্ষা বা পরিবেশ-ঐতিহ্যের মধ্যেই নির্ভেজাল সংস্কৃতির উৎসধারা নিহিত। জোর করে সংস্কৃতির অধিকার অর্জন করা যায় না এবং তা সম্ভবও নয়। লোকদেখানো সংস্কৃতির ধ্বজাধারীরা তাই সহজেই ময়ূরপুচ্ছ সহযোগে দাঁড়কাকের চরিত্রে ধরা পড়ে যান। এবং ফলত প্রকৃতই 'নকল ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের নকলস্য নকল উপকরণের যত্রতত্র ব্যবহারে কেবল রুচিদৈন্যই প্রকটিত হয়, পরিবারের বিষয়ে কোনো সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান তাতে মেলে না।'

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সময়োপযোগী একটি প্রশ্ন উত্থাপনে 'জৈমিনি' অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হবেন। বিনীত—

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত,
জলপাইগুড়ি।
২৭-২-৬২

একান্ত

আশাপূর্ণা দেবী

না, হাসি কোনদিন বাড়ীর ভাড়া দেয়নি। হাসির বাবা সুকুমারবাবু মারা যাওয়া অবধি এই তিন তিনটে বছর বাড়ীর সংলগ্ন ওই ছোট্ট বাড়ীখানা থেকে এক পয়সাও আয় হয়নি সরোজদের। অথচ বাড়ী বাবদ ব্যয়টা হয়ে চলেছে ঠিকই।

নতুন সাবালক হয়ে ওঠা সরোজের হঠাৎ এই ভয়ঙ্কর অপচয়ের দিকে দৃষ্টি পড়েছে, আর সে দৃষ্টি তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। কিছুতেই আর এই অবস্থাটা চলতে দিতে রাজী হচ্ছে না সে। তাই অনবরত বাপকে উত্যক্ত করছে এর একটা বিহিত করতে। সত্যি, তার মা বাপের ভালমানুষীর সুযোগে, সুযোগের অপব্যবহার করে যে, চিরকাল একজন তাদের ভাঙিয়ে খাবে, এ কী কম অসহ্য!

হ'তে পারে সুহাসিনী বা হাসি পিসিমাকে সে আজন্ম দেখছে, আর হতে পারে সুকুমারবাবুর সঙ্গে তাদের পারিবারিক বন্ধুত্বটা ছিল নিকট আত্মীয়ের পর্যায়ে, তবু টাকা হচ্ছে টাকা।

সেই কথাই বলে সরোজ, 'টাকা হচ্ছে টাকা! অত সেণ্টিমেণ্টাল হলে—'

সরোজের মা নিরুপমা কিন্তু ছেলের এই দিব্যবুদ্ধির পরিচয়ে উল্লসিত না হয়ে আহতই হন। ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে বলে ওঠেন, 'তা বলে হাসি ঠাকুরঝিকে উচ্ছেদের নোটিশ দিতে হবে? তুই বলিস কি সরোজ? 'টাকা' খুব মস্ত জিনিস বুঝলাম, তাই বলে মানুষের চোখের চামড়া থাকবে না?'

'চোখের চামড়া!' সরোজ ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে 'সেটা তো উভয়পক্ষেরই থাকা উচিত। হাসি পিসিমা তো দিব্যি সেটা বাদ দিয়েই চালিয়ে যাচ্ছেন। মল্লিক দাদু যে অমনি থাকতেন না, বাড়ীর ভাড়া দিতেন, এ উনি জানতেন না? অথচ এমন নিশ্চিন্তভাবে কাটিয়ে দিচ্ছেন যেন জানেন না পরের বাড়ীতে থাকলে বাড়ীর ভাড়া দিতে হয়।'

নিরুপমা বিরক্ত স্বরে বলেন, 'ও আমাদের পর ভাবে না তাই নিশ্চিন্দি আছে। ভাড়ার কথা যে বলছিস, ভাড়া ও কোথা থেকে দেবে শুনি? ওর কি কোন আয় আছে? সুকুমার কাকার লাইফ ইনসিওরের সেই টাকা কটাইতো মাত্র সম্বল। সেই কটা টাকার সুদে যে হাসি নিজের খরচা চালিয়ে নিচ্ছে, এতেই বাহাদুরি দেওয়া উচিত।'

'বাহাদুরি!' সরোজ অদমিত ব্যঙ্গে বলে, 'আমি আবার ওঁর অন্য ব্যাপারেও বাহাদুরি দিতে পারি। এই যে ভাড়া দিচ্ছেন না, তার জন্যে তো একদিন একটু অপ্রতিভ দেখলাম না।'

'হচ্ছে কি না হচ্ছে, তোকে শোনাতে আসবে? না কি পাড়ায় বলে বেড়াবে?' নিরুপমা গভীর বিরক্তিতে বলেন, 'এই বয়সে তুই এত পয়সা পিশাচ হয়ে উঠলি কি করে বলতো? অথচ ছেলে-

বেলায় বলতে গেলে ওর কাছেই মানুষ হয়েছিস।'

সরোজও বিরক্তি দেখাতে কম যায় না।

সমান বিরক্তি আর অবজ্ঞায় বলে, 'মা বেঁচে-থাকা ছেলের যদি পাড়ার লোকের কাছে মানুষ হতে হয়, সেটা নেহাৎ-ই দুর্ভাগ্যের কথা মা, গৌরব করে বলে বেড়াবার কথা নয়। কিন্তু খানিকটা ভাবের ফেনা নিয়ে প্রকৃত অবস্থাকে অস্বীকার করা, অথবা মহত্ত্ব দেখিয়ে বাইরের লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে অন্যদিকের কর্তব্যের ত্রুটি করা সুস্থ বুদ্ধির লক্ষণ নয়।'

নিরুপমা অবাক হয়ে বলেন, 'মহত্ত্ব দেখিয়ে প্রশংসা কুড়োতেই বা কে যাচ্ছে, আর কর্তব্যের ত্রুটিই বা কোথায় কি হচ্ছে, আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে রে সরোজ! এত কথা তুই শিখছিসই বা কোনখান থেকে?'

'কথা শেখবার জন্যে কোন পাঠশালায় যেতে হয় না মা, চোখ কান খোলা থাকলেই শেখা যায়। কর্তব্যের ত্রুটি শুনে অবাক হচ্ছ? যদি বলি ত্রুটি আমার ওপরেই হচ্ছে। অনেক দিকেই বঞ্চিত হচ্ছি আমি।'

এবার নিরুপমা গম্ভীর হ'লেন। গম্ভীর হয়েই বললেন, 'অনেক দিকেই যখন বঞ্চিত হচ্ছিস তখন আর ওই দেড়খানা ঘরের ভাড়াটুকু দিয়ে তার কী সমাধান হবে? আটাশ টাকা আবার টাকা!'

এতক্ষণে সরোজ প্রকৃত কথায় আসে, 'আটাশ টাকা ছিল আটাশ বচ্ছর আগে, মা, এ যুগে নয়। এখন ওই দেড়খানা ঘরের বাড়ীই মাসে একশো আটাশ টাকা ঘরে এনে দিতে পারে।'

নিরুপমা অগ্রাহ্য ভরে বলেন, 'পারে! দেবে লোকে! টাকা রাস্তার ধুলো যে!'

'রাস্তার ধুলো তোমাদের কাছেই। বল না কত ভাড়াটে চাও? যারা ওই বাড়ীর জন্যেই শুধুই একশো দেড়শো টাকা ভাড়াই নয়, হাজার টাকা সেলামি দিতে প্রস্তুত। হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যত ছোটই হোক সেপারেট একখানা বাড়ী তো? এইতো, আমার এক বন্ধুর বাবা দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটের জন্যে দুশো টাকা পর্যন্ত।—'

সরোজের কথায় বাধা পড়ল।

ঘরে যে তৃতীয় ব্যক্তিটি এতক্ষণ বোবা এবং কালার ভূমিকা নিয়ে একখানা খবরের কাগজে মুখ আড়াল করে বসেছিলেন, তিনি কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে বললেন, 'প্রকৃত কথা তা'হলে তোমার বন্ধু? সে বোধকরি তোমায় প্ররোচিত করছে?'

'আমায় কেউ প্ররোচিত করেনি।' সরোজ বাপের এই ব্যঙ্গোক্তিতে আহত হয়ে বলে, 'শুধু একটা বাস্তব বুদ্ধির কথা বলছিলাম। থাক্, আর বলবো না। তবে তোমাদের এই সেন্টিমেন্টকে সমর্থনও করবো না।'

অরবিন্দ কথা বলার আগেই নিরুপমা ক্ষুব্ধ স্বরে বলে ওঠেন, 'সেন্টিমেন্ট আমাদের নয় সরোজ, সেন্টিমেন্ট বলতে পারিস বাড়ী যিনি করেছিলেন তাঁর। দেখেছি তো তোর দাদুরে, সুকুমার কাকার কাছ থেকে ভাড়া নিতে কী আপত্তি! ইনিও নেবেন না, উনিও ছাড়বেন না। ছেলেমানুষের মতন ঝগড়া! আমি তখন নতুন বৌ, দুই বন্ধু ঝগড়া করে সালিশ মানতে আসতেন আমার কাছে। আমিও দুষ্টুমী করে বলতাম, 'তার থেকে টাকাগুলো আমায় দিয়ে দিন, মাঝে মাঝে আপনাদের ভোজ খাওয়াই।' তারপর যখন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতন বিয়ের বছর না ঘুরতেই হাসি ঠাকুরঝি বিধবা হ'ল, দুটো সংসারেই শোকের ঝড় বইল। সুকুমার কাকা তোর ঠাকুমার কাছে কেঁদে পড়লেন, 'বৌদি ওর যে মা নেই, ও কার কাছে দাঁড়াবে?' তোর ঠাকুমা বললেন, 'ভাবছ কেন ঠাকুরপো, ওর মা নেই, জেঠি তো আছে?' এই রকম সম্পর্ক ওদের সঙ্গে আমাদের। আজ কি না আমরা যাব হাসিকে পেয়াদা দিয়ে উচ্ছেদ করতে?'

দীর্ঘ এই বিবৃতিটি দিয়ে আত্মপ্রসাদমুগ্ধ নিরুপমা ভাবেন, ছেলের মনের গলদ দূর করতে সমর্থ হয়েছেন তিনি, এইবার ছেলে অনুতপ্ত অপ্রতিভ হবে। কিন্তু ভুল ভাঙল। আশা নির্মূল হ'ল।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সরোজ বলে উঠল 'যাঁদের মধ্যে এত ভালবাসার ঘটা ছিল, তাঁরা তো আজ সকলেই পৃথিবীর ওপারে। তবে সেই ভালবাসার জের যদি পুরুষানুক্রমে চালিয়ে যাওয়াই চলতে থাকে, বলবার কিছু নেই। আমার বন্ধুকে বলে দেব আশা ছাড়তে। আর আমিও—'

কথা শেষ না করেই চুপ করে যায় সে।

বাস্তবিকই বড়ই আশাভঙ্গ হল বেচারা। আটাশের বদলে একশো আটাশের রোমাঞ্চময় সম্ভাবনাতেও যে মা বাপকে টলানো যাবে না, এতটা সে ধারণাই করতে পারেনি। মস্ত আকর্ষণ ছিল বন্ধুর বাবার স্বেচ্ছা প্রস্তাবিত হাজার টাকা সেলামী! কতদিন থেকে বাসনা একটা হারমোনিয়মের, আর একটা সাইকেলের, যেটা প্রায় প্রত্যেক ছেলেরই আছে, থাকে, অথচ তার নেই। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হ'বার কোন আশাই আর দেখছে না সে।

ওর চুপ করে যাওয়ার পর কিন্তু একমিনিটও যায় না, অরবিন্দ আবার মুখের সামনে কাগজখানা বিছিয়ে ধরে দুজনকে অবাক করে দিয়ে বলেন, না, আশা ছাড়বার কথা তাড়াতাড়ি কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। নোটিস তো দিতেই হবে।'

নোটিস দিতেই হবে!

নিরুপমা আকাশ থেকে পড়েন!

'দিতেই হবে?'

অরবিন্দ তেমনিভাবে বলেন, 'তা' সত্যিই তো চিরদিন এভাবে চলতে পারে না? কিছুদিন থেকেই ভাবছি আমি এটা—'

নিরুপমা অবাক হয়ে যান।

কিছুদিন থেকেই ভাবছেন এটা অরবিন্দ? অথচ নিরুপমা তার ছন্দাংশও জানেন না! হাসিকে উচ্ছেদ করবার চিন্তাটা অরবিন্দের মাথাতেই আগে এল!

অবাক নিরুপমা বলেন, 'কিছুদিন থেকেই ভাবছ?'

'হ্যাঁ—' কাগজখানা উল্টে নিয়ে অন্য পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উত্তর দেন অরবিন্দ, 'তবে ঝপ্ করে নোটিস ফোটিস না দিয়ে একবার মুখের কথায়—'

'মুখের কথায়?' 'জো' পায় সরোজ। ব্যঙ্গের সেই হাসিটি সশব্দে প্রকাশ করে বলে, 'তা' হলেই তো অগাধ সমুদ্রে! যদি কেঁদে কেটে বলেন, 'এইতো অবস্থা, কোথায় যাব—' তখন আর কিছু বলতে পারবে? তোমরা অন্ততঃ পারবে না।'

'তা সত্যিই তো—' নিরুপমা স্বামী পুত্র উভয়ের ব্যবহারেই বিরক্ত

হয়ে বলেন, 'যাবে কোথায়? তিনকুলে ওর আছে কে?'

'কে আছে নেই, সে দেখতে গেলে আমাদের চলবে কেন?' অরবিন্দ কাগজখানা হাত থেকে নামিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে আলস্যের একটা ভঙ্গী করে বলেন, 'ওর শ্বশুরবাড়ীর দিকে সত্যিই কি আর কেউ নেই? সেখানে যেতে ভালবাসে না তাই। তবে যদি এই তিন বচ্ছরের টাকাটা মিটিয়ে দিতে পারে, আর নিয়মিত ভাড়া দিয়ে চলার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে—'

সরোজ অসহিষ্ণু স্বরে বলে ওঠে, 'তবে তো সবই হল! ওঁর নিয়মিত তো সেই আটাশ টাকা—'

অরবিন্দ কি বলতে যাচ্ছিলেন কে জানে। নিরুপমাও দাঁড়িয়ে উঠে ঠিকরে বলেন, 'তুমি হঠাৎ এত ন্যাকা সাজছ কেন বল তো? হাসি এই তিন বচ্ছরের ভাড়া মিটিয়ে দেবে, এইটা তুমি আশা করছ? কোথা থেকে করবে?'

অরবিন্দও বোধকরি ছেলের মতই লোভে অন্ধ হয়ে উঠেছেন, তাই ছেলের মতই অবুঝ ভঙ্গীতে বলেন, 'তা' ওর কি আর কোনও গয়না-টয়না নেই? বিয়ের সময় তো কিছুও দিয়েছিলেন সুকুমার কাকা!'

এবারে নিরুপমার নিতান্তই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। 'বেশ তাই নিও। সহায়-সম্বলহীন বিধবার কোথায় দু' একরো সোনা আছে, তাই কেড়ে বাকড়ে বেচে পাওনা বুঝে নিও। ছিঃ! সত্যিই দেখছি টাকার লোভ, বড় লোভ। মানুষ মনুষ্যত্ব নিংড়ে খায়।'

অরবিন্দ কিন্তু এতবড় ধিক্কারেও বিচলিত হন না। জানলার বাইরে আকাশে উড়ন্ত একটা চিলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

আর সরোজ দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ভাবতে থাকে, বাবার যদি বা মতি ফিরেছে, ওই ভালমানুষী করে জিগ্যেস করাটা কি করে বন্ধ করা যায়! জিগ্যেস করলে কি আর হাসি পিসিমা এত সুখের আর এত সুবিধের আস্তানাটি ছেড়ে যেতে রাজী হবেন? নিশ্চয় সময় নিতে চাইবেন। আর শেষ পর্যন্ত সবই ভেস্তে যাবে।

তারপর মনে মনে হেসে ভাবে—টাকার লোভ বড় লোভ বৈকি! নইলে বাবা গোড়ায় কী রকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব
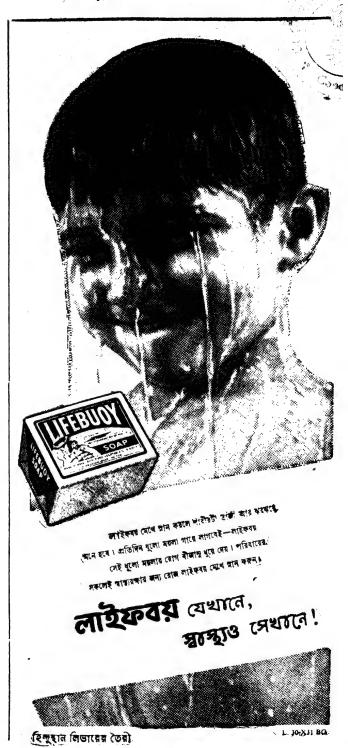
দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু ওই একশোর বেশী ভাড়া আর হাজার টাকা সেলামিটি শুনেই—'

আচ্ছা সরোজই তো হাসি পিসিমার সঙ্গে কথার ছলে, ওর বন্ধুর বাবার এই ঘোষণাটি শুনিয়ে দিয়ে, ইসারায় একটু বুঝিয়ে দিয়ে আসতে পারে? ও'র কি আর তাতে চৈতন্য হবে না?

আগে অবশ্য হাসি পিসিমাকে সে বেশ মহিমময়ীই ভাবত, কিন্তু বড় হয়ে-ইস্তক ও'র ওই বাড়ীর ভাড়া না দিয়েও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা দেখে চিত্ত চটে গেছে সরোজের।

যাকে নিয়ে এত আলোচনা, সে কি সত্যিই নির্বিকার? এই তার প্রকৃতি? না, তার প্রকৃতি বোঝা যায় না। তবে দুঃখে বিগলিত মরমে মরে থাকা বিধবা সে নয়।

বরং নামে আর স্বভাবে এমন সার্থকতা কমই দেখা যায়। হেসেই আছে সুহাসিনী! বিধবা হবার পর নতুন নতুন কি হয়েছিল কে জানে, তবে সুকুমারবাবুর মৃত্যুর পর কিছু দিন যা বড় বেশী বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বভাব যায় না ম'লে। ক্রমশঃই সেই বিষণ্ণতার খোলস ঝরে গিয়ে স্বভাব প্রকাশিত হতে থাকে।

দু'-চার দিন যদি সরোজ ও-বাড়ী না যায়, উঠোনের পেয়ারাতলা থেকে ডাক দেয়, 'এই ছেলেটা, মায়ের আঁচল-ধরা হয়ে গেলি না কি? পিসিদের একেবারে বিস্মরণ!' নয় তো নিরুপমা-কেই ডাকে, 'বৌদি! বৌদি! আমার দাদাটিকে তো পুরোপুরি দখল করে ফেলেছ, ভাইপোটার কিছু অংশ ছাড়ো?'

উঠোনের এই পেয়ারাতলাটা একে-বারে নিরুপমার রান্নাঘরের লাগোয়া, তাই সারা দিনই কথা চলে এখান থেকে। আসলে ওই ছোট্ট বাড়ীটুকু এই ভেবে করেছিলেন অরবিন্দের বাবা গোবিন্দবাবু, ভবিষ্যৎ কালে ছেলে বৌকে ভাল বাড়ীখানায় প্রতিষ্ঠিত করে, নিজেরা কর্তা-গিন্নী ওই অংশে থাকবেন পুজোপাঠ শান্তি সরলতা নিয়ে। তাই ওই দেড়খানা ঘরের বাড়ীতেও একটু মেটে উঠোন রেখেছিলেন, লাগিয়ে ছিলেন একটু ফল-ফুলের গাছ।

কিন্তু যতদিন না সেই ভবিষ্যতের স্বপ্নময় বার্ধক্য আসে, পরম আদরের প্রিয় বন্ধুটিকে থাকতে দিলে মন্দ কি? বন্ধু একটি মাত্র শিশুকন্যা আর ছেলেমানুষ বৌটিকে নিয়ে কলকাতায় বাসা বাঁধতে চায় ডেলি প্যাসেঞ্জারীর যন্ত্রণা জুড়োতে। তার চাহিদা মিটিয়ে ছিলেন গোবিন্দবাবু।

এবাড়ীতে সুকুমারবাবুর আগমন সেই সুদূর অতীতে।

কিন্তু যে যার স্বপ্ন আর সুখ-দুঃখের ভার নামিয়ে রেখে স্বর্গলোকে ঠাঁই খুঁজতে গেল, ছোট্ট ওই বাড়ীখানায় টি'কে রইল শুধু একা সুহাসিনী।

একদা সে ওই পেয়ারাতলায় শুধু জাঙিয়া পরে ধুলো-মাটি মেখে খেলেছে, খেলেছে রঙিন ছিটের ফ্রক উড়িয়ে, ডুরে শাড়ীর আঁচলে গাছ-কোমর বেঁধে পেয়ারা গাছে উঠে রসাতল করেছে। আবার সদ্য-বিবাহিতার লাবণ্য মুখে মেখে বসে থেকেছে এমনি চুপ করে। তারপর? তারপর তো আরোই হল। কয়েক হাত এই জমিটুকুর মধ্যেই জীবনের সব ফসল বুনল সুহাসিনী।

ছেলেমানুষ বিধবার প্রাপ্য পাওনা স্বল্প একটু স্বর্ণাভরণ, আর দু' ইঞ্চি পাড়ের শাড়ী পরে ঘুরে বেড়ালো, বাপের সেবা করল, তাঁকে মালা চন্দনে সাজিয়ে এই উঠোনটুকু থেকে এগিয়ে পার করে দিল, আর তার-পর নির্মল শুচিতার শুভ্রতা গায়ে জড়িয়ে পেয়ারাতলায় তুলসী গাছ পুঁতল।

অথচ এরই মাঝখানে দুপুরের কাজ সেরে পাশের দোতলায় এসে হানা দেয়, 'তাস পাড়ো বৌদি, তাস পাড়ো! চটপট! বেলা গড়িয়ে খেলতে বসলে, নসেই উঠি উঠি করবে তুমি।'

নিরুপমা তাস পাড়তে পাড়তে বলেন, 'বাবাঃ হাসি ঠাকুরঝি, তোমার যা তাসের নেশা, মদের নেশার বেশী।'

হাসি অপ্রতিভ হয় না, তাস ভাঁজাতে ভাঁজাতে হেসে উঠে বলে, 'তা একটা কিছু নেশা তো থাকবে মানুষের। এটাই বরং কম অনিষ্টকারী।'

আবার সন্ধ্যার দিকে নিরুপমার হাতের কাজ সারা হলে, রান্নাঘরের ভিতর থেকে ছোট দরজাটা টুক করে খুলে পেয়ারাতলায় নামেন, বলেন 'ঠাকুরঝি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

হাসি হাতের বইখানা মুড়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বাইরে আসতে আসতে বলে, 'হ্যাঁ ঘুমিয়ে কাদা! স্বপ্ন দেখছিলাম!'

তা' নিরুপমারও তো কম পরিবর্তন হ'ল না। ডুরে শাড়ী থেকে হাতী-পাড়, রং বদলে তসর মটকা, কিন্তু সখীত্বের সেই ধারাটি অপরিবর্তিতই আছে।

সরোজেরও তো আগে ওই পেয়ারা-তলাই ছিল আস্তানা। কিন্তু ক্রমশঃ বাইরে বহু রকমের বন্ধু জুটেছে তার, মনের আনাচে কানাচে বান্ধবীরও আনাগোনা চলছে, হাসি পিসি তার পেয়ারাতলার আকর্ষণ সমেত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেই আলোড়নে।

আর অরবিন্দ?

তিনি ও-বাড়ীতে দৈবাৎই গিয়ে-ছেন, কারণ সুকুমারবাবুই বরাবর এ-বাড়ীতে এসে হাজির হতেন। কার কাছে আর যাবেন তবে অরবিন্দ?

সুকুমার মারা যাবার পর তো এক-দিনও না। কদাচ কখনো মিস্ত্রী-মিস্ত্রী লাগাবার দরকার হলে ছেলেকে ডেকে বলেন, 'এই ও-বাড়ীতে গিয়ে একটু দাঁড়াস তো, তোর হাসি পিসির কলের ট্যাপটা খারাপ হয়ে গেছে না কি, মিস্ত্রীকে বলে রেখেছি—'

হঠাৎ সেদিন এই রকম কি একটা হুকুমে সরোজ বিরক্ত হয় বলে উঠেছিল, 'কল ভেঙে গেছে, তোমার কানে কে তুলতে এল?'

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন অরবিন্দ।

এক মিনিট চুপ করে থেকে বলে-ছিলেন, 'যে চিরকাল তুলে এসেছে, সেই-ই তুলেছে। কেন, তুই কি তোর মার স্বভাব জানিস না?'

'জানব না কেন! আজন্ম দেখছি। আমার সময় হবে না।' বলেছিল সরোজ।

অরবিন্দ আরও অবাক হয়েছিলেন, কিন্তু ছেলেকে তিরস্কার করেননি। জোরও ফলাননি।

কিন্তু রাগ করে নিজেই কি গিয়ে-ছিলেন?

না, তা অবশ্য যান নি। এত রাগ তাঁর শরীরে নেই। নির্দেশ দিয়েছিলেন নিরুপমাকেই।

যতই ছোট বোনের মত ভাবুন, আর যতই হাসি এ-বাড়ীতে এসে 'দাদা

দাদা' করে কথার স্রোত বহাক, তবু একেবারে একলা একটা বাড়ীতে—

অস্বস্তি না এসে পারে না।

কিন্তু আজ একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলেন অরবিন্দ।

শুধু ও-বাড়ী নয়, এ-বাড়ীটাও যখন নির্জন, তখন আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালেন পেয়ারাতলার ছায়ায়।

ওরা মা ছেলে বাড়ী নেই।

মাসীর মেয়ের পাত্র-দেখায় গেছে। আর আজই অরবিন্দর দরকার পড়ল প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা করবার? আশ্চর্য বটে!

নাকি এমনি একটা সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলেন তিনি এতদিন?

হাসি ঘর থেকে দেখতে পেল উঠোনের দেয়ালে দীর্ঘ একটা ছায়া! চমকে উঠল। নিরুপমার অনুপস্থিতির খবর জানে সে, কে তবে ওখানে এসে ছায়া ফেলে?

বাইরে বেরিয়ে এসে আরও চমকাল, কিন্তু গলার স্বরকে আয়ত্তে আনল। সহজ সুরে বলল, 'ওমা, অরুদা নাকি! কী ভাগ্যি! বোসো বোসো।'

ঘরে বসতে ডাকল না, বাইরে টেনে আনল একটা আধভাঙা জলচৌকী।

'থাক থাক ব্যস্ত হসনি, অরবিন্দ বোধ করি কথা খুঁজে পাওয়ার অভাবেই অপ্রতিভভাবে বলেন, 'কি করছিলি?'

'আর কি!' হেসে ওঠে হাসি, 'চর্বিতচর্বণ! সেই শরৎ গ্রন্থাবলীর পাতা ওল্টাচ্ছি।'

'দু' একটা কথা ছিল! সময় হবে?'

চৌকীটার ওপর বসলেন অরবিন্দ।

'শোনো কথা! আমার আবার সময় হওয়া! অরুদা, হঠাৎ আমাকে খুব একটা কাজের লোক ঠাওরালে নাকি? বল কি বলবে?'

তবু অরবিন্দ ইতস্ততঃ করেন, 'না মানে আর কি, বিশেষ কিছু না। তোর বৌদিকে দিয়েই বলা যেত। তা তুই তো আবার মস্ত রাগী, হয়তো কী বলতে কী বলবি, ননদভাজে ঝগড়াই হয়ে যাবে।'

হাসি কৌতুকের স্বরে বলে, 'কেন আমরা বুঝি কুঁদুলী?'

'না না, সে কি! তা' বলছি না। মানে ঠাট্টা করছি।' অরবিন্দ বলেন, 'তোদের দুজনের গলায় গলায় ভাব দেখি না আমি? আর সেই জন্যেই তো--' এতক্ষণে যেন খেই খুঁজে পান, অরবিন্দ, আর কথার রেলগাড়ী চালিয়ে যান, 'দুটোতে এত ভাব, ছাড়াছাড়ি হলে কি আর বাঁচবি? তোর বৌদি হয়তো ননদের শোকে—এদিকে ছেলে-বেটা মহা মাতব্বর হয়ে—মানে ব্যাপারটা হচ্ছে বন্ধুপ্রীতি আর কি! বাবুর কোন বন্ধু বুঝি 'বাড়ী বাড়ী' করে মরছে। আরে বাবা মরছে তো অনেকেই, তা বলে তুই শুধু নিজের বন্ধুর কথাটাই ভাববি? মায়ের দিকটা দেখবি না? শুনলে আশ্চর্য্যি হবি হাসি, বেটা বলে কি না—'

কি বলে সেটা গুছিয়ে পেশ করতেই বোধ করি সময় নেন অরবিন্দ, আর সেই অবসরে হাসি হেসে উঠে বলে ফেলে, 'তা' ছেলেটাকে অত দুষছো কেন বলতো অরুদা? খুব অন্যায় সে বলেনি। সত্যিই তো এই বাজারে—'

অরবিন্দ মুহূর্তে একেবারে মরা-মাছের মত ফ্যাকাসে হয়ে যান। ক্ষীণ স্বরে বলেন, 'ওঃ, বলে যাওয়া হয়েছে?'

'বলাবলি আবার কি,' একেবারে সহজভাবে বলে হাসি, 'বন্ধুর বাড়ীর গল্প করছিল সেই সূত্রে—শুনে মূর্চ্ছা যাই আর কি! কী বাজারই হল! বলে নাকি ঘরপিছু একশো টাকা করে ভাড়া! গেরস্থ লোকে যে কি করে—' রেলগাড়ী চালিয়ে যায় হাসিও, 'আমি তো অরুদা আমার সেই শ্বশুরবাড়ীকে কবর খুঁড়ে তুলে ভাসুরপোকে একটা চিঠিই লিখে ফেললাম!'

'চিঠি লিখে ফেললি—'

অরবিন্দ সহসা উদ্দীপ্ত স্বরে বলে ওঠেন, 'তার মানে সেই জন্ম-অচেনা হাড়চামারদের বাড়ীতে গিয়ে উঠবি! না না, ওসব চলবে না। মরতে হবে না কি?'

হাসি কিন্তু এবার আর হাসে না। শান্ত স্বরে বলে, 'আহা মরতেই বা হবে কেন? ওরা তো রয়েছে। বেঁচেই রয়েছে।'

'তোকে বলেছে, বেঁচে রয়েছে।' অরবিন্দ প্রায় ধমক দেন, 'সে বেঁচে থাকা আমার জানা আছে। কোথায় তোর শ্বশুরবাড়ী? মেদিনীপুরের কোন অগা পাড়াগাঁয়ে না? দুর্মতি ছাড় হাসি, বলি শোন—' অরবিন্দ গলার স্বর খাটো করেন, 'সেই জন্যেই চুপিচুপি আসা আমার। নবাব পুত্তুরের কানে না যায়! বেটার আস্ফালন তো 'ভাড়া ভাড়া' করে? দে তুই ওর নাকের ওপর তিনটি বছরের পুরো ভাড়াটি ধরে। তারপর ব্যাটা কি করে দেখি। দেখি কত নাক নাড়ে।'

হাসি অবাকের অবাক হয়ে বলে, 'তুমি কি পাগল হলে অরুদা? ওসব আমি পাবো কোথায়?'

অরবিন্দ এবার মৃদু হাসেন।

স্নিগ্ধ আত্মপ্রসাদের হাসি।

'আরে বাবা, সে ব্যবস্থা কি আমি না করে এসেছি? এই রাখ।'

জামার পকেট থেকে মোটা একখানা খাম বার করে বাড়িয়ে ধরেন অরবিন্দ।

বুঝতে ভুল হয় না হাসির, খামটার অন্তঃপুরে কি আছে।

মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে যায় হাসি।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। আর সেই অবকাশে খামখানা তার পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে অপরাধী অপরাধী মুখে বলেন অরবিন্দ, 'আমি যাই! ওরা

আবার কখন হট্‌করে এসে পড়বে, কড়া নাড়লে শুনতে পাব না।'

'ওটা তুলে নিয়ে যাও অরুদা!'

'তুলে নিয়ে যাবো!'

'যাবে বৈকি! তুমি পাগল বলে তো আমি পাগল হইনি? তোমার টাকায় তোমার বাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে দেবার মত থিয়েটার করা আমার পোষাবে না। তা' ছাড়া রাস্তায় ছড়িয়ে দেবার মত এত টাকা তুমি পাচ্ছই বা কোথায়?'

অরবিন্দ রুদ্ধস্বরে বলেন, 'কোথায় পাচ্ছি সে কথা তোর জানবার দরকার কি? সবদিক বিবেচনা করে যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি। তুই আর বাগড়া দিসনে।'

'কিন্তু যা হয় না, হতে পারে না, হওয়া অসম্ভব, তা কি করে হবে অরুদা?' হাসিও রুদ্ধ গাঢ় স্বরে বলে, 'তোমার এই স্নেহ, এই দয়ার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। নিতে পারলাম না বলে রাগ কোর না।'

অরবিন্দ বুজে আসা গলা ঝেড়ে নিয়ে বলেন, 'দয়া! দয়ার কথা হচ্ছে? খুব যে বড়বড় কথা শিখেছিস! হুকুম হয়ে গেল! রাগ কারুর কেনা চাকর নয় হাসি!'

'তবে রাগ করে চারটি ভাত বেশী খাওগে!'

হঠাৎ নিজস্ব স্বভাবে হেসে ওঠে হাসি।

অরবিন্দ অবশ্য এ হাসিতে যোগ দেন না, বিরক্ত স্বরে বলেন, 'সব কথায় হাসিসনে হাসি! টাকা কটা নিয়ে আমায় কেতাথ কর। নে, তোল'।

হাসি অবশ্য হুকুম পালন করে না।

শুধু তরল কন্ঠে বলে, 'আর ওরা মায়ে বেটায় যদি আমায় জিগ্যেস করে, 'রাতারাতি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ পেলে নাকি গো?' নইলে—'

'তুই বলবি, তোর গহনা বেচার টাকা!' অরবিন্দ জোরের সঙ্গে বলেন, 'বিয়ের সময় তোর গহনা হয়নি? দেনার দায়ে তাই বেচেছিস তুই।'

'পাগলের কথা সহজ লোকে বিশ্বাস করে না অরুদা। যাও পালাও। টাকা নিয়ে চটপট পালাও।'

'কী আশ্চর্য' গো তোর হাসি! টাকা নিবি নে—পাড়াগাঁয়ে চলে যাবি—ছেলের ওপর অভিমান করে— তোর বৌদির কথা একবার ভাববি না—'

হাসি আস্তে বলে, 'অভিমান আমি কারুর ওপর করি না অরুদা! ভাগ্যের ওপরও না। বৌদির কথা আমি বুঝবো। ও নিয়ে তুমি আর মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে—'

কথা শেষ করতে পারে না হাসি।

হঠাৎ এই প্রৌঢ় মানুষটা একটা বেখাপ্পা কান্ড করে বসে।

হাত বাড়িয়ে সম্মুখবর্তিণীর একখানা হাত ধরে ফেলে গভীর গাঢ় স্বরে করে, মুহূর্তকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে নীচু হয়ে নোটের তাড়াভরা খামটা তুলতে তুলতে বলেন, 'কিছু মনে করিসনে হাসি, আমি তোর বড় ভাইয়ের মত, সেই ভরসাতেই—' চোখ দিয়ে যে দুফোটা জল উপছে পড়ল সেটা কি দেখতে পায় না হাসি? নিজে তাই হেসে ওঠে? কিন্তু এখনো সে এত রং বদলাবার ক্ষমতা ধরে? চুলে পাক ধরা বিজ্ঞ একটা লোককে 'থ' করে দেবার মত অদ্ভুত বদল!

ওর নিজেরও তো চুলে পাক ধরে এল।

"আর আমার যদি কোন কথা থাকে?"

বলে, 'আর আমার যদি কোন কথা থাকে? বুঝবি? আমি যদি বলি, ওপরের ওই জানলাটা থেকে এই পেয়ারাতলায় তোকে ঘুরতে না দেখলে মেজাজ ফেজাজ খারাপ হয়ে যাবে আমার, বাড়ীতে টিঁকতে পারবো না। বুঝতে পারবি সে কথা?'

হাতটা আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে হাসি বলে, 'তুমি বাড়ী যাও অরুদা!'

ততক্ষণে অবশ্য নিজেই মরমে মরে গেছেন এই সহসা উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাওয়া মানুষটা। লজ্জিত কুণ্ঠিত মুখটা নীচু

সত্যিই ওই মস্ত লোকটা 'থ' হয়ে তাকিয়ে দেখে, ঝরঝরিয়ে হেসে উঠে, সেই ছাড়িয়ে নেওয়া হাতখানাই আবার জড়িয়ে ধরে পেতে বলছে হাসি, 'ওকী অরুদা, দিয়ে আবার নিয়ে যাচ্ছ যে? দিয়ে, নিলে কি হয় জানো না? না বাপু তোমাকে ওইসব কালীঘাটের 'ইয়ে টিয়ে' হতে দেব না। দাও দাও, যা দিয়েছিলে দিয়ে, পালাও শীগগির। কে বলতে পারে পরের মেয়ের চোখে পড়লে, তার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে উঠবে কি না।'

গৌড়ে কিছুক্ষণ

শোভন আচার্য

ইতিহাস? এ রাজ্যের ইতিহাস আর কেউ বলবে না আপনাকে। এখন নিছক কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। পন্ডিতরা গবেষণা করে ঘোষণা করেছেন গুড় থেকে গৌড়ের নাম এসেছে। গৌড়ের ইতিহাস এখন ওই আবিষ্কারের মধ্যে অবগুন্ঠিত রয়েছে। অথচ এই গৌড়ের মাটিতে সভ্যতার কোন্ ঊষাকাল থেকে আর্য-শক্তির পদার্পণ ঘটেছে। এসেছেন বৌদ্ধ নরপতিরা, তারপরে ব্রাহ্মণ্য-শক্তি আদি মধ্যযুগ পর্যন্ত তাঁদের কীর্তির ধ্বজা উড়িয়ে গেছেন। সবশেষে এসেছেন ইসলাম-শক্তি, পাঁচ শতক ধরে এই মাটিতেই তাঁদের শৌর্য প্রকাশ করে গেছেন।

গৌড়ের ইতিহাস সতেরো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। এবং কী আশ্চর্য এই শতকের শেষে মারাত্মক মহামারীতে গৌড় পান্ডববর্জিত শ্মশান হয়ে গেল। প্রাণভয়ে ভীত মানুষ পালাল ভিটেমাটি ছেড়ে, কাঁধে করে নিয়ে গেল ইতিহাসকেও। গৌড় হারিয়ে সুলতান টাঁড়ায় রাজধানী স্থাপন করলেন, শেষে রাজমহলে। কিন্তু তবু ইতিহাসের রথকে আটকানো গেল না, চাকার তলায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল সুলতানী আমল। নতুন শক্তির উদ্ভব হল—বণিক-শক্তি। গৌড়ের ইট ভেঙে গড়ে উঠল পুরাতন মালদহ, ইংরেজবাজার, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের কুঠি তৈরি হল সুলতানী ইট থেকে। এই ঘটনাও সতেরো-আঠারো শতকের।

তবু সুদূর রাজধানী থেকে সাহিত্য-সভা করতে যখন আপনি কষ্ট করে হাজির হয়েছেন উত্তর বাঙলার এই ছোট্ট শহরটিতে তখন সভাশেষে আপনার অপর্যাপ্ত সময়কে কাজে লাগাতে একবার আপনার পায়ের ধুলো গৌড়ের ধ্বংস-স্তূপে পড়বেই। গৌড় নামটিতেই জাদু আছে, আপনি আকৃষ্ট হবেন। মাত্র চৌদ্দ মাইল দূরে মালদা শহর থেকে, আপনার আধুনিক রথ ক্ষিপ্র গতিতে আপনাকে নিয়ে হাজির করবে যথাস্থানে।

গাইড নেই, আছে এনামেল-করা সরকারি নির্দেশিকা। আর মাথার ওপরে প্রচন্ড তপনতাপন। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক থেকে আপনার চোখে পড়বে মসজিদটি। বারোদুয়ারী বা সোনা মসজিদ। সুলতান নসরত সাহের আনুকূল্যে ১৫২৬ সালে এই মসজিদ গড়ে ওঠে। সর্বসাকুল্যে বারোটি দরজা, তার থেকে নাম বারোদুয়ারী। বারোটি দরজা আজ আর নেই, গুণে দেখলে এগারোটি পাবেন। চারিধারে বারান্দাগুলি খিলান-মন্ডিত। মধ্যেকার গম্বুজটি সোনালী সূক্ষ্ম কারুকার্যযুক্ত। আর তিনটি তোরণ-দ্বারের মধ্যে কেবল পূর্বদিকেরটি কারুকার্যময়।

এরপর আপনি যাবেন দাখীল বা সেলামী দরওয়াজায়। এর নির্মাতা বারবক সাহ। নির্মাণকাল ১৪২৫। এটি গৌড়দুর্গের উত্তরদিকের প্রবেশপথ। গোলাবর্ষণ দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করা হত বলে নামকরণ হয়েছে সেলামী দরওয়াজা।

এবার আসুন একটি মিনার দেখতে। কুতুব মিনারের মতো উঁচু না হলেও ফিরোজ মিনারের উচ্চতা ৮৪ ফিট। ৭৩টি ধাপের ঘোরানো সিঁড়ি আছে। সর্বসমেত পাঁচতলা। কথিত আছে আবিসিনিয়া দেশীয় সেনাপতি মালিক আন্ডিলের তৈরি। তিনি ক্রীতদাস বারবাক সাহকে হত্যা করে সৈফুদ্দিন ফিরোজ সাহ নামে গৌড়ে রাজত্ব করেছিলেন।

আপনি ফিরোজ মিনার থেকে নেমে একটু বিশ্রাম করছেন এমন সময় রুগ্ন শীর্ণ প্রবীণ মুসলমান এসে দাঁড়াল আপনার কাছে: 'সাহেব, কদম রসুলে যাবেন না?'

'আপনি?'

'আমি কদম রসুলের খাদেম। আসুন—'

খাদেমের সঙ্গে এলেন কদম রসুলে। চতুষ্কোণ, এক গম্বুজবিশিষ্ট এই গৃহটি নির্মাণ করেছেন নসরত সাহ। সেই ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে। খাদেমই আপনাকে জুতো খুলে ভেতরে আহ্বান জানাবে; দেখাবে প্রস্তরের উপর হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন। বহুৎ তকলিফ্ করে মক্কা থেকে রসুলের কদম, পায়ের চিহ্ন আনা হয়েছে। আপনার প্রণামী খাদেমকে বেশি মাত্রায় উৎসাহিত করবে। সে দেখাবে বিরামশালার ধ্বংসাবশেষ। দেখাবে ফতে খাঁর সমাধি। ফতে খাঁ কে ছিল? আওরঙ্গজীবের সেনাপতি দিলওয়ার খাঁর পুত্র। খাদেমই জানাবে আপনাকে খাঁ সাহেবের গভীর ট্রাজেডি। সুলতান সুজাকে বিদ্রোহের পরামর্শদানের অভিযোগে পীর শাহ নিয়মাতুল্লাকে হত্যা

ফিরোজ মিনার

করার জন্যে সম্রাট পাঠালেন খাঁ সাহেবকে। এবং দেখো আল্লার কেরামতি এখানে রক্তবমি করে মারা গেল ফতে খাঁ।

সূর্য এবার পশ্চিমে হেলে পড়েছে। রোদের তেজ মন্দা।

এবার আপনি যেখানে পৌঁছবেন সেটাকে মসজিদ বললেও আসলে সমাধিস্থল। কোনো সময়ে এখানে প্রচুর চামচিকা বাস করত। তার থেকে নাম হয়েছে চিকা বা চামকান মসজিদ। সুলতান হুসেন শাহ এটাকে কারাগার-রূপে ব্যবহার করতেন। হিন্দু মন্দির থেকে আনা পাথর ও মীনে-করা ইট এখানে লাগানো হয়েছে। গৌড়ের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ওই মীনেকরা ইটগালি—তার পালিশ এখনো কালের অত্যাচার সহ্য করে অম্লান রয়েছে। আধুনিক স্থপতিরা এখনো আবিষ্কার করতে পারেননি কি করে ইটের গায়ে এমন ধরনের মীনে করা হত। ১৪৫০ সালে এটি নির্মিত হয়।

আপনি সাহিত্যের ছাত্র, তাই হুসেন সাহের নাম আপনার স্মৃতিকে পুনর্বার আন্দোলিত করে তুলবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। বৈষ্ণব সাহিত্যে এ'র নাম অমর হয়ে আছে। এই গৌড়নিবাসী দুজন হিন্দু যুবক সুলতানের দুই সেনাপতি ছিলেন। রূপ সনাতন। দুই ভাই। পূর্ববাংলা যাবার পথে চৈতন্যদেব গৌড়-অন্তর্গত রামকেলী নামক স্থানে থামলেন। এবং এখানেই রূপ সনাতনের সংগে চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটল এক কদম গাছের তলায়। সে আজ

বারোদুয়ারী

১৫১৫ সালের কথা। চৈতন্যচরিতামৃতে এই মহাসম্মিলন শ্লোকাবদ্ধ হয়ে আছে। গৌড়ে আসার পথে রামকেলীতে কদম গাছের তলায় প্রস্তরে রক্ষিত মহাপ্রভুর পদচিহ্ন অবশ্যই আপনি দেখে থাকবেন।

দেখে থাকবেন সনাতন প্রতিষ্ঠিত মদন-মোহন জীউ মন্দির এবং রূপে নির্মিত বিরাট পুষ্করিণীটি, যার নাম রূপ-সাগর।

আপনার দেখার জিনিস ফুরিয়ে এসেছে। আপনি লুকোচুরি দরওয়াজা দেখলেন। শাহ সুজা নির্মিত এই দ্বিতল গৃহটি গৌড়ের পূর্বদিকের প্রবেশপথ। এটি নহবৎ রূপে ব্যবহৃত হত। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে তৈরি।

এরও পর রয়েছে ঘুমটি ঘর, যা এখন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। আছে চামকাটি মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ, লোটন মসজিদ।

দেহজোড়া ক্লান্তি নিয়ে কতদূর এগিয়ে গেছেন আপনি।

'হল্ট!'

রূঢ় বাস্তবের সংঘাতে আপনি সম্বিত ফিরে পেলেন।

'আর এগোবেন না। ওপারে পাকিস্তান।' সীমান্ত ফৌজ ঘোষণা করল।

আপনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন। গৌড়ের খানিকটা অংশ পাকিস্তানে পড়েছে। সেখানে আপনি বিদেশী, আপনার প্রবেশপত্র নেই।

আশ্চর্য বেদনার সঙ্গে আপনি ভাববেন : আর্য-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ-ইসলাম শক্তির গৌড়ভূমি, সেই সুমহান ইতিহাস, সেই বিভিন্ন ভাবের সম্মিলন স্থল, আজ রাজনীতির ছুরিকাঘাত ঐতিহাসিক গৌড়কে দ্বিখণ্ডিত করেছে।

তাই বলছিলাম গৌড়ের আজ আর ইতিহাস নেই, সে নিহত পংগু কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ছয় ।।

প্রভাত ভেবেছিল, টী-পার্টি থেকে বেরিয়ে আসতে রিনির দশটা-সাড়ে দশটা বাজবে। তারপর তাকে বাড়ী পেঁছে দিয়ে, গ্যারাজে গাড়ী তুলে ধরতে হবে নারকেলডাঙার শেষ বাস। তাই আপাতত অন্তত ঘন্টা আড়াই তার কিছুই করবার নেই।

রাস্তায় আরো দশ-বারোখানা গাড়ীর ভেতরে নিজের অস্তিত্বটাকে লোপ করে নিয়ে, প্রভাত নিশ্চিন্তে ঘুমুতে চেষ্টা করল। অন্তত কয়েক দিন আগেও এ ব্যাপারে একটা স্বাভাবিক শক্তি তার ছিল, যে কোনো জায়গায়—যে কোনো অবস্থাতে সে নির্বিকারভাবে ঘুমিয়ে পড়তে পারত। কিন্তু মাসখানেক ধরে কোথায় কী একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে। সারাটা দিনের ক্লান্তির বোঝা বয়ে রাত সাড়ে বারোটায় বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েও ঘুম আসে না। একটু হাওয়ার আওয়াজে, ইঁদুরের চলাফেরায়, দূর থেকে একটা কুকুরের চিৎকারে কিংবা অভয়ের একটুখানি নাকের ডাকে তন্দ্রার ছোঁয়া-লাগা চোখের পাতাদুটো চাপ-সরে-যাওয়া স্প্রীঙের মতো খুলে যায়। ঘুম আসে, কিন্তু ঘুমের ভেতরে বিশ্রাম থাকে না। সকালে উঠে মনে হয় মাথাটা ধরা ধরা, কপালের দু-ধারে একটা মৃদু যন্ত্রণা থমকে আছে, জর-জর শরীরটার কোথাও এক বিন্দু উৎসাহের অস্তিত্ব নেই।

খুব সম্ভব চোখে গোলমাল হয়েছে কিছু। একবার ডাক্তার দেখালে হয়।

কিংবা—

দীপ্তি? গৌরাঙ্গবাবুর সংসারকে যে চালিয়ে নিয়ে চলেছে, অথচ যার উপজীবিকা সম্পর্কে কোনো অনুমান করতেও সাহস হয় না।

না—দীপ্তিও নয়। হঠাৎ তৃপ্তির কথা মনে এল প্রভাতের। কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিয়েছে কেবল। মেয়েটি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী—এই পরিবারের জীর্ণ অপরিচ্ছন্নতার ভেতরে এক টুকরো সোনার মতো জ্বলছে। আশ্চর্য চোখদুটি—কালো জলের ওপর মেঘে-ঢাকা বিকেল ঘনিয়ে আসার মতো একটা ভয়ের ছায়া ছড়িয়ে আছে সব সময়ে। ওই চোখ আর একজনকে মনে পড়িয়ে দেয়।

রাণী!

সঙ্গে সঙ্গেই প্রভাত চমকে উঠল। কর্কশ শব্দে একটা লরী কিংবা বাস কোথায় যেন ব্রেক কষল। অ্যাক্সিডেন্ট্ হতে যাচ্ছিল একটা? চাপা পড়তে যাচ্ছিল কেউ? প্রভাতের সমস্ত শিরা-গুলোতে ঝাঁকানি লাগল—হৃৎপিন্ডটা ফুলে উঠতে চাইল বেলুনের মতো।

মাথার যন্ত্রণা—অনিদ্রা—এ-সব কিছুই নয়। এইখানেই তার আসল ব্যাধি। রাণীর নামটাকে মনের একটা অন্ধকার গুহায় সে প্রাণপণে লুকিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু থেকে থেকে এক-একটা অচেতন মুহূর্তে সেটা আলোড়ন তুলে বেরিয়ে আসে। তখন হাওয়ায় পাতা নড়লে তার আওয়াজ লক্ষ বেড়ে গিয়ে মস্তিষ্কের কোষে গর্জন করতে থাকে—যেন ঝড় অ খোলা কল থেকে জল পড়বার শুনলে বোধ হয় আকাশ ভেঙে প্রলয়ের শেষ বৃষ্টি যেন নেমে কোনোখানে একটুখানি যান্ত্রিক কানে এলে মনে হয় অন্ধগতি মোটরগাড়ী কিসের সঙ্গে যেন খেয়ে ডিমের খোলার মতো চুরমা গেল। তখন প্রভাতের চোখের থেকে নানা আলো আর নানান এই কলকাতা বিশ্রুনো মিলিয়ে অসংখ্য হিজিবিজি ফাটল-ধরা অভ্রের পর্দা যেন কাঁপতে থাকে—আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসবার করে গলা দিয়ে।

অবস্থাটা হয়তো কয়েক জন্যেই আসে, কিন্তু প্রভাত পারে এ সাংঘাতিক। এই ক শহরে ত্রিশ মাইল বেগে গাড়ী চালাতে এক মুহূর্তের অন্যমন সেই রকম—কিংবা তারো সাংঘাতিক—যে-কোনো দুর্ঘটনা পারে যে-কোনো সময়ে। আরো ব হত্যাকান্ড ঘটতে পারে তার হাতে এবারে সে নিজেও হয়তো পড়বে না।

নিজের জন্যে দুঃখ নেই। কি ক'টি মানুষ একান্ত সরল তার হাতে নিজেদের সঁপে তাদের জীবন নিয়ে সে

াছে কোন অধিকারে? প্রভাত নিজের টো দাঁত দিয়ে চেপে ধরল এবার। —এ কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। তার র গাড়ী চালানো উচিত নয়, এই নার্ভ য় কতকগুলো মানুষের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে না। সে এ কাজ ড় দেবে। কী করবে তারপর? সে- আগে থেকেই ভেবে কোনো লাভ । এই কলকাতা শহরে যে কোনো ম পরিশ্রম করে যে বাঁচতে চায়, তার টা ব্যবস্থা হয়েই যায় কোথাও। পাথে ঝাঁকা রেখে যে মুটে রাত্রি ন করে—সেও তো বেঁচে আছে!

মনের এই বিকারটা কিছু কিছু াই, খবরের কাগজের পাতায় কখনো নো দুর্ঘটনার বিবরণ পড়ে মাথার রে বিদ্যুৎ খেলত তা-ও ঠিক, কিন্তু াতি সেটা যেন অদ্ভুতভাবে বেড়ে ছে। শেষ পর্যন্ত সে পাগল হয়ে নাকি? তারপর একদিন—

রিনির গলার আওয়াজ পাওয়া ল। প্রভাত দেখল গেট দিয়ে রিনি রয়ে আসছে—সঙ্গে তার বান্ধবী ীনা। এই মেয়েটির জন্মদিনের সবেই রিনি এসেছে।

—না ভাই, শরীরটা আজ ভালো ছে না। একটু তাড়াতাড়িই ফিরব।

প্রভাত নেমে পড়ল। খুলে ধরল ীর দরজা।

—শরীর খারাপ লাগলে কী আর ব, বল্।—নিলীনাকে একটু ক্ষুণ্ণ হল: কাল বিকেলে যাব তোদের নে।

—আচ্ছা, আসিস।

প্রভাত এঞ্জিনে স্টার্ট দিলে।

—মেনি হ্যাপি রিটার্ণস্।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

গাড়ী চলল। দু পাশে মর্মরিত র সার। বৈশাখী সন্ধ্যায় বসন্তের মোতি।

মিনিট তিনেক পরে রিনি কথা : না, বাড়ীতে নয়।

একবারের জন্যে প্রভাত মাথা ালো। নিঃশব্দ জিজ্ঞাসায় জানতে , কোথায় যেতে হবে।

হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল : মোটে ন'টা। গড়ের মাঠে নিয়ে ন গাড়ীটা। একটু বেড়িয়ে ফিরব।

প্রভাত বাঁয়ে গাড়ীটা ঘোরালো। ালো সার্কুলার রোড দিয়ে।

ময়দানে ঢুকে চার দিকে একবার চক্কর দিলে প্রভাত, স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে ঘুরে এসে গবর্ণর হাউসের সামনে দিয়ে আবার মাঠে ঢুকল। আরো খানিকটা এগিয়ে আসতে রিনি বললে, থামুন—এইখানে রাখুন গাড়ীটা।

বৈশাখ মাসের রাত ন'টায় সারা কলকাতা জেগে আছে—দূরের চৌরঙ্গী মধুভরা একটা জ্যোতির্ময় মৌচাকের মতো গুঞ্জন করছে. সিনেমায় সবে নাইট-শো শুরু হয়েছে। রেস্তোঁরা বার এখন জমাট, ঝলমল করছে বইয়ের স্টল আর সিগারেটের দোকান, পথে বেলফুল বিক্রি হচ্ছে। ময়দানের সামনের দিকটায়—মনুমেণ্ট ছাড়িয়ে আরো অনেকখানি পর্যন্ত—দল বেঁধে, জোড়ায় জোড়ায়, নিঃসঙ্গ হয়ে, বসে আছে মানুষ, আড্ডা দিচ্ছে, চীনে-বাদাম আইসক্রীম খাচ্ছে, মালিশওলা কাউকে পরিচর্যা করছে প্রাণপণে। এই দিকটা নির্জন। পথ দিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ীগুলো বেরিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু দুধারে রোদে-পোড়া ঘাস আবছা অন্ধকারে জীর্ণ কার্পেটের মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে, কোথাও গাছের ছায়ায় অন্ধকারের দ্বীপ, রেসকোর্সের রেলিংগুলোকে সার বাঁধা কঙ্কালের মতো দেখাচ্ছে।

গাড়ী থেকে নেমে ঘাসের ভেতরে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেল রিনি। তারপর ডাকল: প্রভাতবাবু!

—কিছু বলছেন আমায়?

—আসুন এদিকে।

প্রভাত নেমে গেল সেদিকে।

রিনি বসে পড়ল। বললে, আপনিও বসুন।

—আজ্ঞে?—বোকার মতো জিজ্ঞাসা করল প্রভাত। কথাটা ঠিক শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না।

রিনি আবার বললে, এখানে বসুন। একা একা কী করবেন গাড়ীতে?

—আমাকে বসতে বলছেন?

—কানে কম শোনেন নাকি?—রিনি ভ্রূকুটি করল: বসে পড়ুন। গল্প করব আপনার সঙ্গে।

ভীত এবং বিব্রত হয়ে প্রভাত বসে পড়ল। হাওয়ার অভাব ছিল না, কিন্তু অস্বস্তিতে তার কপালে ঘাম জমে উঠল। বেশ কিছুদিন ধরে সে কাঞ্জিলাল-সাহেবের গাড়ী চালাচ্ছে, কিন্তু রিনি যে তাকে গল্প করার মতো উঁচুদরের জীব বলে ভাবে, এ কথা এর আগে তার কখনো মনে হয়নি।

—অত দূরে সরে বসলেন কেন?—রিনি তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠল হঠাৎ: ভয় করে নাকি?

প্রভাত চমকে উঠল। রিনির হাসি আর গলার স্বর দুই-ই অচেনা আর অস্বাভাবিক ঠেকল তার কানে।

—কী, ভয় পাচ্ছেন?—আবার একটা খরধার প্রশ্ন এগিয়ে এল তার দিকে। একরাশ হু হু করা হাওয়া রিনির স্বরটাকে ভেঙে ভেঙে কেড়ে নিয়ে গেল, প্রভাতের মনে হল যেন অনেক দূর থেকে রিনি কথা কইছে।

একটা জবাব দেওয়া দরকার। প্রভাত আস্তে আস্তে বললে, আপনারা মনিব, একটু সাবধান হয়েই তো চলা উচিত আমাদের।

—মনিব!—রিনি আবার হেসে উঠল: ডোন্ট্ ইউ নো—আমার বাবা একজন বিশ্বপ্রেমিক? তিনি রবীন্দ্রনাথকে রবি ঠাকুর বলেন, আরো বলেন, ঠাকুরের বিশ্বপ্রেম খুব সুপারফিশ্যাল—তিনি নাকি ওর ডেপ্থে যেতে পারেন নি। আপনি শোনেননি এ-সব?

সামান্য মোটর-ড্রাইভার প্রভাত সরকার আরো বিব্রত বোধ করল।

—আমাকে মাপ করবেন—আমি এ-সব কিছু বুঝতে পারি না।

—কেন পারেন না?—রিনির তিক্ততা আরো উচ্ছল হয়ে উঠল: তাঁর থিয়োরী অনুসারে পৃথিবীর সব মানুষে সমান—সবাইকে ভালোবাসবার জন্যে তিনি দু-হাত বাড়িয়ে রেখেছেন। এই ফাঁকা মাঠের ভেতর—এই রাতের বেলা এখন আমি যদি আপনার গলা জড়িয়ে ধরি আর বাবা সেটা দেখতে পান, তা হলেও থিয়োরিটিক্যালি তাঁর আপত্তি হওয়ার কথা নয়।

রিনির কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রভাত দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রিনি খপ করে তার হাত চেপে ধরল। আতঙ্কে একটা আর্তনাদ করতে গিয়েই প্রভাত সামলে নিলে সেটাকে।

তীরের মতো তীক্ষ্ণ আওয়াজে রিনি বললে, ভয় নেই, বসুন। ওটা শুধু কথার কথা বলছিলুম। আপনার হার্টফেল ঘটিয়ে আমার কোনো লাভ

নেই। ও-রকম মারাত্মক ঠাট্টা আপনার সঙ্গে করব না—গ্যারান্টি দিচ্ছি।

প্রভাত বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলল।

—আমি বরং গাড়ীতে গিয়েই বসছি।

—অবলাকে এই রাতের বেলা ফাঁকা মাঠে রেখে যাবেন? গাড়ীটা তো প্রায় চল্লিশ গজ দূরে। পেছনের ওই গাছ-

"ডোন্ট ইউ নো—আমার বাবা একজন বিশ্বপ্রেমিক?"

গুলোর ভেতর থেকে যদি গোটা তিনেক গুণ্ডা এসে আমায় আক্রমণ করে—

—কিছু হবে না। আশেপাশে লোক আছে, গাড়ী যাচ্ছে, পুলিশ পেট্রল ঘুরছে। আমি—

আর একবার ওঠবার চেষ্টা করল প্রভাত। রিনি এবার আর তার হাত ধরল না, তার বদলে তীব্র গলায় বললে, বসে থাকুন এখানেই। আমি আপনাকে বসতে বলেছি।

মনিবের হুকুম কানে এল। ভয় পাওয়া জন্তুর মতো নিজের শরীরটাকে যথাসাধ্য গুটিয়ে নিয়ে শক্ত হয়ে বসে রইল প্রভাত।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কাটল। মাঠের গাছপালায় বাতাস দুরন্তপনা করছে—যে ক'টা শুকনো পাতা ছিল একটাও আর বাকী রইল না। পায়ের নীচে শুকনো ঘাসগুলো পর্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে শির শির করছে, যেন তারাও এই বাতাসে ডানা মেলে দিতে চায়। হাওয়ার নেশায় পাগল হয়ে গাড়ী-গুলো পর্যন্ত ঝড়ের বেগে উত্তরে দক্ষিণে ছুটেছে আর রিনির উড়ন্ত শাড়ীর আঁচল আর ফাঁপানো ছাঁটা চুল থেকে একটা মিশ্র সুগন্ধের উচ্ছ্বাস এসে আছড়ে পড়ছে প্রভাতের চোখে-মুখে।

প্রভাত তাকিয়ে দেখছিল একটু দূরে একটা মুমূর্ষু গাছ কী অদ্ভুত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। মাটির তলার রস শুকিয়ে গেছে কিম্বা মর্মে মর্মে কোথাও মৃত্যু ব্যাধি বাসা বেঁধেছে ওর। একটি পাতা নেই, একটা নতুন কিশলয় দেখা দেয়নি। কালো কালো শূন্য ডাল-গুলো কোনো শতবাহু প্রেতের কঙ্কাল আঙুল দিয়ে আকাশ আঁ ধরতে চাইছে—যেন দমকা হা মাটিতে আছড়ে পড়বার আগে ওই অন্তিম চেষ্টা।

একটা স্মৃতি আসছিল প্রভাতে তার ছেলেবেলার স্মৃতি। বড়ো জংলা খেজুর গাছের কাঁটায় কাঁটায় খর করে আওয়াজ উঠছে, কাদম মেঠো পথের দুধারে শন শন করে চা হানছে বেতবন। বাবা লণ্ঠন আগে আগে চলছেন, আলোটা দপ করছে থেকে থেকে। হঠাৎ দাঁ প্রভাতকে একেবারে বুকের কাছে আনলেন।

'এই দাঁড়া। বাঘ আছে কাছাকা গন্ধ পাচ্ছি তার।'

সেই পচা বিকট গন্ধটা? সৌরভের উচ্ছ্বাস আসছে রি শরীর থেকে, শাড়ী থেকে, ফাঁ চুলের রাশি থেকে।

রিনি আবার কথা কইল। অনেকখানি মগ্ন আর আত্মস্থ মনে তাকে।

—আমার কথাবার্তা শুনে ভয় পাচ্ছেন প্রভাতবাবু। তাই না?

শুকনো ঠোঁট দুটো একবার নিলে প্রভাত। এতক্ষণে মনে পিপাসায় গলাটা শুকিয়ে গেছে

—না, ভয় নয়। আমি ভাবা আপনার শরীর আজকে ভালো নে

নিলীনাকে তাই বলেছিলুম নইলে ওরা এত তাড়াতাড়ি ছাড়ত না—এক মুঠো শুকনো ছিঁড়ে নিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে রিনি : কিন্তু কিছুই হয়নি এত ভালো আমি অনেক দিন থ তার চাইতেও বড়ো কথা কী মনের মধ্যে খানিকটা পাঁক বছর তিনেক ধরে—আজ ধুয়ে প হয়ে গেল।

প্রভাত কথা বলল না—তার বলবার কথা নেই, কোনো কো নয়।

রিনি আবার কতগুলো ঘাস কিন্তু হাওয়ায় উড়িয়ে দিল না, ধরে রাখল মুঠোর ভেতর। আপনি শোভন ব্যানার্জির নাম ছেন প্রভাতবাবু?

—না।

—ঠিক জানবার কথাও হাসতে চেষ্টা করেও হাসতে পা

টা পেশা পেটে পড়লে বাবার ম জেগে ওঠে বটে, কিন্তু তাঁর র কাছে অত নীচে তিনি নামতে বেন না। শোভন ব্যানার্জি এখন কায়। এঞ্জিনিয়ারিঙের ওপর বড়ো বড়ো ডিগ্রি এর মধ্যেই সে।

।

সব খবরে আপনার কোনো নেই—না?—জিজ্ঞাসা করে রিনি জবাব দিলে : তাই স্বাভাবিক। আদার ব্যাপারী—জাহাজের আপনার কিছু যায় আসে না। একটু দরকার আমার ছিল। কায় যাওয়ার আগে পুরোনো রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গানের খাতায় সে লিখে :

আমার বেলা নাহি আর,
একাকী বিরহের ভার—
ধনু যে রাখী পরাণে তোমার
সে রাখী খুলো না—খুলো না!

কালির ফাউন্টেন পেন দিয়ে , বোধ হয় বলেছিল, বুকের যাচ্ছি। তারপরে কী হয়েছে আজকে রিনির জন্মদিনে ওর কাছে খবর পেলুম ওখানে কার মেয়েকে বিয়ে করেছে সে।

মুহূর্তে সব স্পষ্ট হয়ে গেল। চমকে উঠে প্রভাত রিনির দিকে ।

ন বললে, ওর বোন অর্চিতা রেছিল আমার মুখ সঙ্গে সঙ্গে মতো হয়ে যাবে—আমি ফেন্ট ব, কিংবা রুমালে মুখ গুঁজে রে কেঁদে উঠব। আর লোকে সার্কাসের ক্লাউনকে দেখে থাকে, বে ও দৃশ্যটা এনজয় করবে। অন্য মেয়ে সম্পর্কে যে কত হতে পারে আপনার তা ধারণাও তবাবু।

ন আবার হেসে উঠল, কিন্তু রো ভাবটা এবারে আর কান না প্রভাতের।

কন্তু আই অ্যাম সরি, অর্চিতাকে নীয় আনন্দের সুযোগ আমি রিনি। হেসে বললুম, তাই হোয়াট্ এ হ্যাপি নিউজ! তোর তো এখানে পাচ্ছি না, তার হয়ে বরং আমায় ফিরপো কিংবা খাইয়ে দে। বিশ্বাস করবেন, প্রায় কেঁদে ফেলেছিল?

াত নিশ্চুপ হয়ে সেই কঙ্কাল দিকেই তাকিয়ে রইল একভাবে। াঙুলে দিয়ে প্রাণপণে তারাভরা কে আঁকড়ে ধরতে চাইছে সেটা। ভালোবাসা— প্রেম— ইমোশান— জন্যে আমি সুইসাইড করতে পারি!—রিনি বিকৃত মুখে বললে : এক রাশ পাঁক। ন্যাকামির খানিকটা কদর্য মিউকাস্ যেন জড়িয়ে আছে শরীরে! এক মুহূর্তে আমার মুক্তিস্নান হয়ে গেল আজকে। তবু এখনো অনেক বাকী। সাজানো কথা—সাজানো জীবন—দিনের পর দিন রুচিহীন ড্রয়িংরুমের ফুলদানিতে কাগজের ফুল হয়ে টিঁকে থাকা। খালি একজন লোক এই জুয়াচুরিটা পরিষ্কার ধরতে পেরেছিল—ডি-এইচ লরেন্স। আপনি তার লেখা পড়েননি।

—না। বেশি লেখাপড়া শিখিনি আমি।

—রেসেড্। আপনি কোথায় থাকেন আমি জানি না। নিশ্চয় কোনো বাজে জায়গায়—বস্তি-টস্তি কিছু হবে, নইলে কোনো ভাঙাচুরো ড্যাম্প-লাগা অন্ধকার ঘরে। আপনার জীবনে কোনো হায়ার থট্ নেই—বিশ্বপ্রেমের কথা ভাববার কোনো সুযোগ আপনি পান না, আপনি এক্জিস্টেন্সিয়ালিজ্‌ম্ বোঝেন না, গার্সিয়া লোর্কাকে নিয়ে তর্ক করতে পারেন না। কোনো মতে টিঁকে থাকতে পারলেই খুশি হন আপনি। প্রিমিটিভ্ মানুষের যা প্রব্লেম তার বেশি কিছুই আপনার নেই।

রিনি স্বগতোক্তি করছে—আবছা আলোতেও প্রভাত ওর তন্ময় চোখ দুটো দেখতে পেলো। এই দুর্বোধ্য আলোচনায় তার কোনো ভূমিকা নেই। সেই মরা গাছটা যেন থর থর কেঁপে উঠছে হাওয়ায়—হঠাৎ এক সময় মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়বে বলে মনে হয়। এই রাত—রিনির এই নিজের সঙ্গে কথা বলা—ওই গাছটা—সব মিলে কী যেন একটা অর্থ আছে কোথাও। প্রভাত সেই অর্থটা বোঝবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

"I was so weary of the world,
I was so sick of it,
Everything was tainted with
myself
Skies, trees, flowers, birds
water—"

রিনি ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করছে। মিষ্টি, সুরেলা গলা—বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে কথাগুলো। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

"Absolutely to nothing
nothing
nothing —"

রিনি থামল। আবার সেই একটানা হাওয়ার সমুদ্র। রিনির চুল আর শাড়ীর গন্ধ। কোথায় যেন ব্যান্ড বাজছে, মেঘের ডাকের মতো তার গুরু গুরু আওয়াজ।

প্রভাত উসখুস করে উঠল। আর ভালো লাগছে না। মাথায় সেই যন্ত্রণা—সারা শরীর ছেয়ে আবার সেই ক্লান্তি নেমে আসছে। পিপাসায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে তার।

—বাড়ী ফিরবেন না?

বেগে উঠে দাঁড়ালো রিনি। চোখ-দুটোয় এবার বিদ্যুৎ ঝলকালো তার।

—আপনাকে বেশি সম্মান দিয়ে-ছিলুম। আপনি প্রিমিটিভ নন—ফসিল।

তার পরে দ্রুত এগিয়ে গেল গাড়ীর দিকে। মরা ঘাসের ভেতরে একটা ঘুমন্ত গঙ্গাফড়িং থেঁতলে গেল তার জুতোর তলায়।

দীপ্তি ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্তে মনে হল পুলিশ। এর পরে থানা, আদালত, আর—

কিন্তু পুলিশ নয়। লোকটার ডান হাতে একটা ধারালো ছোরা। সাপের মতো হিস হিস করে বললে, চুপ—ব্যাগ দে দো। আউর জেবর। চিল্লানে সে অভি খতম হো জায়গী।

গুণ্ডা!

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ব্যাগটা দিতে যাচ্ছিল দীপ্তি, তখন আর একটা প্রকাণ্ড ছায়া আবির্ভূত হল লোকটার পাশে। তার কাঁধে হাত রেখে বললে, এই!

চমকে ফিরে তাকালো গুণ্ডাটা।

—কেয়া?

—ছোড় দো বেচারীকো। ম্যায় পহ্‌চান লিয়া। কস্‌বী। আও—

তারপরেই ছায়াদুটো মিলিয়ে গেল দু দিকে। যেন এই ফাঁকা গলিটা থেকে হাওয়া হয়ে শূন্যে মিলালো, নইলে চক্ষের পলকে তলিয়ে গেল পাতালে।

দীপ্তি আবার দেওয়ালে হেলান দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করতে লাগল। এতক্ষণ হৃৎপিণ্ডে ঝড়ের দোলা চলছিল, এইবারে সেটা স্তব্ধ নিঃসাড় হয়ে গেল। গলিটা যেন চোরা-বালির রূপ নিয়ে নীচের দিকে টানতে লাগল তাকে।

কস্‌বী!

শব্দটার মানে সে জানে। ওই ছোরা হাতে গুণ্ডাটার সে আপনজন। তাই তাকে ওরা অমন করে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। কাকের মাংস কাকে খায় না! এত দিন পরে নিজের সত্যিকারের জায়গাটা দেখতে পেয়েছে দীপ্তি।

পুলিশে ধরলে কি খারাপ হত এর চেয়ে? এর চাইতে বেশি অপমান হত আদালতে গিয়ে দাঁড়ালে?

হাত থেকে ব্যাগটা খসে পড়ল, দীপ্তি টেরও পেল না। বার বার করে চোখের জল গড়াতে লাগল আর তারই দুটো একটা বিন্দু ঠোঁটের কোণায় এসে তিক্ত লবণাক্ত স্বাদে ভরে দিতে লাগল মুখটা। (ক্রমশঃ)

অয়স্কান্ত

॥ ফুটপাথের শিল্পী ॥

লালদীঘির পাড়ে এক অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেদিন দুপুরের সূর্য যদিও তখন বিকেলের দিকে হেলেছে, কিন্তু প্রায়-ছায়াহীন লালদীঘির পাড় গরম হাওয়ায় আর রোদে ঝলসে পুড়ে যাচ্ছিল যেন। এমন কি মানুষগুলোও যেন ঠিক পুরো-পুরি মানুষ ছিল না। একরাশ ঘাম আর ক্লান্তি নানা ছাঁদের সাজপোশাক পরে ধুঁকছিল।

এরই মধ্যে টেলিফোন ভবনের পেছন দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিবিড় একখণ্ড ছায়া। খানিকটা দূরে লালদীঘির দক্ষিণপাড় ঘেঁষে সারি সারি নলের মুখ থেকে ফোয়ারার মতো জল পড়ছে। দৃশ্যটি এতই মনোরম যে গরম হাওয়ার ঝাপ্টায় সঙ্গে খানিকটা স্নিগ্ধতার প্রলেপকেও অনায়াসেই অনুমান করে নেওয়া চলে। তখন আর জি-পি-ওর ঘড়ির দিকে তাকিয়েও অতিমাত্রার ব্যস্ততার তাড়নায় পদক্ষেপকে দ্রুত করা চলে না। একটুখানি দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। কিংবা অল্প-ঢেউ-ওঠা লালদীঘির জলের দিকে তাকিয়ে একটুখানি বসতে। আর সেই অবস্থায় জল থেকে মুখ তুলে সামনের দিকে তাকালে রাইটার্স বিল্ডিং-এর লাল ভ্রূকুটির চেয়েও আকাশটাকে অনেক বড়ো বলে মনে হয়। যদিও আকাশের নীল রঙ পুড়ে একটু যেন তামাটে।

আমিও দাঁড়িয়েছিলাম। লালদীঘির অন্য তিনটি পাড়কেই ট্রামের লাইন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। এই একটি পাড়ে এখনো মুক্তির নিশ্বাস। এই একটি পাড়ে এখনো নিবিড় একখণ্ড ছায়া।

আর, আশ্চর্য, ব্যস্ত ত্রস্ত লালদীঘির এই পাড়েই যেন যতো রাজ্যের কুঁড়ে ও নিষ্কর্মাদের ভিড়। অনেকগুলো তাসের আসর বসেছে। প্রত্যেক আসরে চারজন নির্বিকার খেলোয়াড়কে ঘিরে জনা বারো উৎসুক দর্শক। এমন একটা তন্ময়তার আবহাওয়া যে একবার তাকিয়েই মনে হবে, পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন বাহান্নটি তাসের ফুৎকারে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু, খেলোয়াড় ও দর্শকদের মধ্যে অনেকেরই গায়ে যদি তকমা-আঁটা সাজপোশাক চাপানো না থাকত তাহলে এই অনুমান কোথাও এতটুকু চিড় খেত না।

কিংবা, তকমাধারীদের দিকে তাকিয়ে মনে হতে পারে—প্রাণধারণের যে কৃপণ

আয়োজনে এই মানুষগুলোকে অতি-মাত্রায় ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় তার বিরুদ্ধে একটা অক্ষম বিদ্রোহ তারা যেন এইভাবে প্রকাশ করতে চাইছে। দ্যাখো, আমরা কতখানি স্বাধীন আর কতখানি বেপরোয়া। আমাদের হাতের পিয়নবই এই মুহূর্তে লালদীঘির ধুলোয় গড়া-গড়ি দিচ্ছে। বগলের ফাইল ও চিঠি রাস্তার ভিখিরির মতো অপেক্ষা করছে কতক্ষণে তাদের দিকে একটু কৃপাদৃষ্টি দেবার অবসর আমাদের হবে। জীবন আমাদের যতোভাবেই বঞ্চিত করে থাকুক, এই মুহূর্তে আমরা স্বরাট।

অন্যদিকে, তকমাহীনরা অনেক বেশি নিঃসাড় ও নির্জীব। কেউ শুয়ে, কেউ বসে। সময়কে ফাঁকি দেবার সেরা উপায় হচ্ছে ঘুম—তা এদের দিকে তাকিয়ে টের পাওয়া যায়। জীবন সম্পর্কে ক নিস্পৃহতা থেকে এই নিশ্চিন্ত ঘুম তা হয়তো সব সময়ে কল্পনা করা সম্ভব নয়। আমরা বড়ো জোর খানিকটা হিংসে বা খানিকটা তাচ্ছিল্য দিয়ে এই কল্পনার ফাঁকগুলোকে ভরাট করতে পারি।

আরো একটু এগিয়ে গেলে একেবারে অন্য ধরনের একটি দৃশ্য। একদল তদগা মানুষ চোখ বুজে ঘাড় কাত করে তুলসী দাসের রামায়ণ শুনছে। ফোঁটাতিলক কা কথকঠাকুরটি উচ্চাসনে আসীন। এ বেঞ্চিটি হয়তো আশেপাশের কোন আপিসের। কিন্তু এখন আর তা সামা একটা কাঠের বেঞ্চি নয়—রীতিমত বেদি। বিচিত্র সব ঠাকুরদেবতার ফ ঝুলছে দু-পাশ থেকে। এমনিতে হয় যে-সব দেবতার পরস্পরের সঙ্গে মু দেখাদেখি নেই—তাঁরাও এই বিচিত্র প বেশের গুণে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আর এই কাঠের বেঞ্চির বে ওপরে কথকঠাকুর জোড়াসন হয়ে ব হাতের ও মুখের অপরূপ ভঙ্গিমা পাঠ ও ব্যাখ্যায় এতটুকু ক্লান্তি নে একটু পেছনের দিকে কোমরে তলো ঝোলানো যে উদ্ধত পাথরের মূর্তি লালদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটি সবসময়ে সচকিত করে রাখে, তিনিও এখন অনেকটা ম্লান।

আর এই পরিবেশেই আমি এক অদ্ভুত মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

মানুষটির গায়ের রঙ কালো, খ কালো। কিন্তু নিষ্প্রভ বা ফ্যাকাশে। সমস্ত কালো রঙের ভেতর শরীরের ভেতরকার একটা আলো

ফুটে বেরোচ্ছে। এমন উজ্জ্বল কালো রঙ সচরাচর দেখা যায় না।

আর গায়ের কালো রঙের সঙ্গে মিল রেখে মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়া চুল। চুলে তেল পড়ে না বোঝা যায়, কিন্তু তাতেই যেন চুলের বাহার আরো খুলেছে।

আর চারদিকে কালোর এমন মেলা জমেছে বলেই হয়তো চোখের সাদা অংশকে আরো সাদা দেখায়। সাদা দাঁত-গুলোও যেন অসম্ভব রকমের সাদা।

লোকটির পরনে একটি খাকী হাফ-প্যান্ট। পেছনের দিকে মস্ত একটি তালি, যার রঙ এককালে সাদা ছিল বোঝা যায় কিন্তু এখন ধুলোয় আর ময়লায় গাঢ় খাকী।

লোকটি উবু হয়ে বসেছিল আর তার পিঠের ওপরে কয়েক বিন্দু ঘাম গড়াতে গড়াতে জলের একটা রেখা ফুটিয়ে তুলেছিল। লালদীঘির সবুজ জল দেখতে দেখতে আমি এই জলের রেখার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। চারদিকে একখণ্ড ছায়া ঘিরেছিল। কাজেই এই জলের রেখা থেকে আলো ঠিকরে আসেনি।

তখন আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম, লোকটি একটি কাঠকয়লা দিয়ে লালদীঘির দক্ষিণ পাড়ের শান-বাঁধানো অংশে একমনে ছবি এঁকে চলেছে। একখণ্ড নিবিড় ছায়া দিয়ে ঘেরা অলস অপরাহ্ণটি এই তন্ময় কর্মব্যস্ততায় বেসুরো হয়ে বেজে উঠল।

শুধু তাই নয়। ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গেও আজকের দিনের এই লালদীঘির কোনো মিল আছে কিনা তা একনজরে উপলব্ধি করা যায় না। তবুও আমার মনে হতে লাগল, ছবিগুলো যেন কিছু বলতে চাইছে।

প্রথম ছবিটি শুধু একটি মানুষের মুখ। অল্প কয়েকটি রেখায় একটি সুপুষ্ট ও ভরাট গালের আভাস, একটি গভীর ভুরু, একটি তীব্র চোখ, একটি খাড়া নাক, একজোড়া চিকন ঠোঁট ও একটি ধারালো চিবুক। মুখটির দিকে তাকিয়েই বোঝা যায়, এ-মুখ কোনো ভারতীয়ের নয়, বাঙালীর তো নয়-ই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই মানুষটি কে?

দু-বার একই প্রশ্ন করার পরে অতি সংক্ষিপ্ত জবাব পাওয়া গেল : সাহেব।

তাই বটে। সাহেবদের এই মূর্তির সঙ্গে তো আমাদের আজন্ম পরিচয়। চিনতে না পারার কোনো কারণ ছিল না। কলকাতার রাস্তা থেকে কয়েকটি মূর্তি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেই কি সাহেবদের আমরা ভুলে গেলাম!

দ্বিতীয় ছবিটি আরো স্পষ্ট। এবারে আর শুধু মুখ নয়, একজন মিলিটারি সাহেবের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। নির্ভুল ভঙ্গিতে বন্দুক উঁচিয়ে তিনি কোনো কিছুর দিকে তাক করছেন। কিসের দিকে তা বোঝার উপায় নেই। কারণ বন্দুকের নাগালের মধ্যে যতো-খানি জায়গা আসা সম্ভব সবটাই ফাঁকা রাখা হয়েছে। এই শূন্যতায় বন্দুকের লক্ষ্যবস্তুর নির্দিষ্টতা লোপ পেয়েছে বটে কিন্তু কল্পনা অবাধ হতে কোনো বাধা নেই। নাকি লালদীঘির লোহার শেকল পরানো পাড়ের দিকেই এই বন্দুকের লক্ষ্য?

তৃতীয় ছবিতে একজন নয়, দুজন সাহেব। এবারে আর মিলিটারি চেহারা নয়, হাফপ্যান্ট পরা আদুড় গা। হাতে গ্লভস্ এঁটে দুই সাহেব মুষ্টিযুদ্ধে নেমেছেন।

লালদীঘির শানবাঁধানো পাড়ে এই তিনটি ছবি পুরনো একটি যুগকে চোখের সামনে এনে হাজির করল যেন।

লোকটিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ছবি তোমাকে কে আঁকতে শিখিয়েছে?

দু-বার একই প্রশ্ন করার পরে জবাব পাওয়া গেল : আমি নিজেই শিখেছি।

আমি নিজেই শিখেছি। নিবিড় ছায়াঘেরা অলস অপরাহ্ণে কথাগুলোকে শোনাল বিদ্রূপের মতো। আমি আরো একবার তাকিয়ে দেখলাম। মানুষগুলো যেন মানুষ নয়। একরাশ ঘাম আর ক্লান্তি নানা ছাঁদের সাজপোশাক পরে ধুঁকছে। অথচ লালদীঘির দক্ষিণ পাড়ে নিবিড় ছায়ায় পৃথিবীর আহ্নিক-আবর্তন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে যেন।

একটি একটি করে প্রশ্ন আর তার অতি সংক্ষিপ্ত ও অনিচ্ছুক জবাবের মধ্যে দিয়ে কুড়ি বছরের বিচিত্র জীবন-সংগ্রামের খানিকটা আভাস পাওয়া গেল মাত্র। পূর্ববাংলায় বাড়ি। কৈশোরে পা দিতেই এক বন্ধুর পরামর্শে ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত আসামের জঙ্গলে এক মিলিটারি সাহেবের কোয়ার্টারে একটা কাজ পেয়ে যায়। পাংখাওলার কাজ। সারাদিন বসে বসে দড়ি টেনে টেনে পাখা চালানো। কাজটা এমন রপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত আর হাত লাগাতে হত না, পায়ে দড়ি বেঁধে পায়ের কসরতেই কাজ সারতে পারত। হাতদুটো নিয়ে কি করে, তখন সাহেবের ফেলে দেওয়া ছবির পত্রিকার পৃষ্ঠা ওলটাত আর একটা কাঠকয়লা দিয়ে মেঝের ওপর ছবি আঁকত। যুদ্ধের পরে সাহেব দেশে ফিরে গিয়েছে কিন্তু ও আর তারপরে কোনো কাজ জোটাতে পারেনি। পাংখাওলার কাজের অভিজ্ঞতা কোনো কাজেই লাগেনি শেষ পর্যন্ত। অন্যদিকে চেহারাটা এমন জোয়ান ও তাজা যে ভিক্ষে চাইলে কটূক্তি শুনতে হয়। একদিন আপন মনে বসে ফুটপাথে ছবি আঁকছিল হঠাৎ খেয়াল হয় যে পথ-চারীরা কেউ কেউ পয়সা ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। সেই থেকেই উপার্জনের এই বিশেষ পন্থা।

মামুলি গদ্যে আমি বললাম, কাজ করো না কেন?

একই প্রশ্ন দু-বার করার পরে ও বলল, কাজ পেলেই করি।

বাড়ির চাকরের কাজ করবে?

স্পষ্ট জবাব শোনা গেল : না।

পরে জানা গেল, দু-ধরনের কাজ করতে রাজি আছে ও। পাংখাওলার কাজ কিংবা ছবি আঁকার কাজ। দুটি কাজই ও শিখেছে। শেখা কাজেই থাকতে চায় ও।

আমি ওকে আর বোঝাতে চেষ্টা করিনি যে এই ইলেকট্রিকের যুগে কলকাতা শহরে পাংখাওলার কাজ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। আর এই শহরে কলেজে পাশ-করা আর্টিস্টের সংখ্যা এত বেশি যে ওর মতো ফুটপাথের শিল্পীকে দিয়ে কাজ করাবার প্রয়োজন কারোরই কোনো কালে হবে না।

ততোক্ষণে ও তৃতীয় ছবিতে হাত দিয়েছে। এবারে আর সাহেব নয়, ফ্রক পরা একটি শিশু। শিশুটি দু-হাত বাড়িয়ে কি যেন চাইছে। যদি বলা হয় শিশুটি ভারতীয়—তবে তাই। যদি বলা হয় শিশুটি ভারতীয় নয়—তবে তাই। আমি ওকে দেবার জন্যে একটি দশ-নয়াপয়সা ফেললাম। টুং করে একটা শব্দ হল মাত্র। কথকঠাকুর বেঞ্চির তলায় ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখলেন। ও আরো ঝুঁকে পড়ে শিশুটির ফ্রকে একটি ফুল ফুটিয়ে তুলতে লাগল।

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২৫ ।।
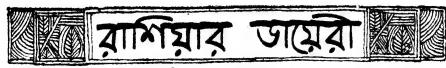
প্রভাতকালে বিমানপথে তাসকন্দ থেকে সমরকন্দ যাত্রা করেছিলুম। সঙ্গে একদল সাহিত্যকর্মী ও কবি যাচ্ছিলেন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। শ্রীমতী অকসানা তাঁদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁদের মধ্যে প্রবীন লেখক মিঃ সেরগিয়েভ বরোদিনের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তিনি বিশেষ কৃতী লেখক। যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্যে খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁদের মধ্যে কবি মিখাইল সোয়েৎলভ, ইরাসলভ স্মাইলাকভ, ইউজিন যেভতুসেনকা— এঁরা বিশিষ্ট। দলপতি হলেন গদ্যলেখক পাটার সার্দাজন। আরেকজন আছেন নাট্যকার লিওনিদ লেন্চ্। এঁরা কেউ ইংরেজি জানেন না। ফরাসী বা জার্মান জানেন কিনা, সেটির খোঁজ পাইনি। এঁদের সকলের অবস্থাই সচ্ছল।

বিস্ময়ের কথা এই, রুশ সাহিত্যের পুরনো আমলে এবং বর্তমান সোভিয়েট সাহিত্যে একজনও যথার্থ প্রতিভাশালিনী মেয়ে-লেখক, মেয়ে-কবি বা মেয়ে ঔপন্যাসিক জন্মগ্রহণ করেনি! অনুবাদিকা আছে, সাংবাদিক বা রিপোর্টার আছে প্রচুর অধ্যাপিকা-শিক্ষিকা-বিজ্ঞানী সংখ্যাতীত, চিত্রশিল্পীও অগুণতি। কিন্তু রসসাহিত্যস্রষ্টা মেয়ে-লেখিকা কোনওকালেই প্রসিদ্ধিলাভ করেনি। এখানে-ওখানে-সেখানে দু'একজন যে ছড়িয়ে থাকে না তা নয়,—কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্ব বড়ই কম। রুশ সমাজ বা সোভিয়েট সমাজে কোথাও যেন একটা গলদ আছে, কোথাও একটা অভাব আছে চিন্তা-স্বাচ্ছন্দ্যের—যার চাপে মেয়ের সাহিত্য-সৃষ্টিপ্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত হয়নি! গায়িকা, নর্তকী, অভিনেত্রী, চারুশিল্পী,—এরা বেরিয়ে এসেছে দলে দলে। কিন্তু একজনও উল্লেখযোগ্য মেয়ে-প্রতিভা রুশ বা সোভিয়েট সাহিত্যে একটি বড় আসন লাভ করেনি—এটি বিস্ময়ের কথা! উজবেকিস্তানের কবি শ্রীমতী জুলফিয়ার কথা এবং শ্রীমতী অলেসিয়া ক্রাভেজকে মনে রেখেই এগুলি বলছি।

আমি যাচ্ছি যে-দলটির সঙ্গে, তাদের মধ্যে মেয়ে নেই। এঁরা অল্পবিস্তর সকলেই প্রভাতকালে 'ভোদ্‌কা' পান করেছেন। শরীরে উত্তাপ এবং মনে 'মুখরতা' আনতে গেলে মাদকবস্তুর প্রয়োজন,—একথা সোভিয়েট দেশে স্বীকৃত। এখানে নিষেধ নেই, কিন্তু অতিশয়তার নিন্দা আছে। মদ্যপরা এদেশে যথেষ্ট শাস্তি পায়। এক সময় আমি তামাশা ক'রে দলপতিকে বললুম, চলুন না, এই বিমানেরই নাকটি ঘুরিয়ে সোজা দিল্লীর দিকে! ভারতে আপনাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি ঘটবে না!

বোধ হয় যেন নেশাটা কাটল! মুখ ফিরিয়ে ঈষৎ গম্ভীর মুখে তিনি বললেন, রাজি আছি! কিন্তু আগে কথা দিন, আমাদের অবর্তমানে আপনি আমাদের স্ত্রীপুত্রপরিবারবর্গকে চিরকাল প্রতিপালন করবেন?

কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য আমি আজও ভেবে পাইনি! অথচ এটি জানি, পরিবার-প্রতিপালনের দায়িত্ব এঁদের কম। স্ত্রীমাত্রই উপার্জন করে, শিক্ষার খরচ নেই, অসুস্থ হবামাত্র হাসপাতাল, ফ্ল্যাটভাড়া নামমাত্র, কন্যাদায় নেই, পুত্রাদির ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত। সুতরাং লেখকদের পক্ষে 'দিলদরিয়া' হবার বাধা নেই! এই যে এঁরা ভ্রমণে বেরিয়েছেন,—এর সমস্ত খরচ 'লেখক সঙ্ঘের'। পনেরোটি রাষ্ট্র থেকে একটির পর একটি লেখকের দল প্রতি রাষ্ট্রে অশ্রান্তভাবে ভ্রমণ ক'রে ফিরছে। এঁদের জন্য শ্রেষ্ঠ হোটেল, শ্রেষ্ঠ সানাটোরিয়ম, শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও পানীয়, শ্রেষ্ঠ যানবাহন,—সর্বত্র সকল সময় প্রস্তুত। এঁরা 'সুখী সম্প্রদায়'। এঁদের এই অনাহত সুখের মধ্যে কোন্ কোন্ 'কাঁটা' ফুটে আছে, সেটি উত্তমরূপে জানতে গেলে আমাকে রুশভাষা শিখতে হত!

জেটবিমানের জানলা দিয়ে নীচের দিকে চেয়েছিলুম। আমার পায়ের নীচে দিগন্তজোড়া 'হাংরি স্টেপ্‌স্'। অনুর্বর পাথর-কাঁকর আর বালু,—তার বর্ণ একপ্রকার হালকা গৈরিক। আমরা ৬ থেকে ৭ হাজার ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি হাজার হাজার বর্গমাইলব্যাপী কর্কশ, অনুর্বর, শ্রীহীন ও ধূসর এক প্রকার পৃথিবী, যেটি কচ্ছপের পিঠের মতো। মাঝে মাঝে আছে ঝোপ, মাঝে মাঝে হঠাৎ চোখে পড়ে রৌপ্যসূত্রের মতো জলধারা, মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ওটা বুঝি লোকবসতির চিহ্ন! একটি রেলপথ চলে এসেছে মরুভূমির ভিতর দিয়ে—সেটি তাসখন্দ-সমরখন্দ-বুখারা হয়ে প্রবেশ করেছে তুর্কমেনিস্তানে। কিন্তু এবারেও রেলপথে ভ্রমণ কপালক্রমে সম্ভব হল না। আমি যেন বার বার ফুলের তোড়াই দেখতে পাচ্ছিলুম! কিন্তু এবারে দেখতে চেয়েছিলুম ফুলগাছকে, যার শিকড় রয়েছে মাটির তলায়। আমি বার বার দেখতে চাই সেই দুর্গত, অখ্যাত, নগণ্য অগণ্যকে। পল্লীগ্রামের রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফরমে দেখেছি ছাদ ঢাকা নেই,—জীর্ণ ছিন্ন পোষাকে যেখানে মেয়েপুরুষের দল গুড়ের কলসীর মতো বসে রয়েছে, কিংবা যারা ভিড় করেছে যাত্রীশালায়, ময়লা চেহারায় ময়লা পোষাকে ময়লা রুটি বা'র ক'রে যারা কামড় দিচ্ছে! মেয়ের পিছনে ঝুলছে রুক্ষ্ম বেণী, ময়লা ওড়না মাথায় বাঁধা, দু'একটি পুঁটুলী যাদের সম্বল, যারা দল বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে যায় তৃষ্ণাদগ্ধ পাথরের প্রান্তরের দূরদূরান্তরে,—তাদেরকে আমার বড় আপন মনে হয়েছে! পুরুষদের মাথা অনেক সময় নেড়া, গোঁফদাড়ি কামানো নেই, ছিন্নভিন্ন সজ্জা, পায়ে পুরনো জুতো, মাথায় চাঁদি তুর্ক টুপি, নয়ত তাতার ক্যাপ, নয়ত বা চৌকোনা উজবেক টুপি। হয়ত ওরা আজও কমিউনিজম বোঝেনি! ওরা জানে আপন মাঠ, আপন চাষ, আপন জীবনের সংগ্রাম। ওরা মাটি কাটছে যুগযুগান্তের, পাথর ভাঙছে, নদী বাঁধছে, নগর গড়ছে, কারখানা বানাচ্ছে, চাষ করছে! ওরা ভারতে, ইউরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে, আমেরিকায় সর্বত্র এক! ওরা চিরকাল নিরীহ, এবং নির্বাক। ওরা কমিউনিজম, সোসালিজম, ডিমক্রাসী, 'ফ্রি-ওয়ার্লড',—এদের

তত্ত্ব বোঝে না! ওরা শুধু মুখ বুজে কাজ ক'রে যায় সব দেশে, অন্ন খুঁটে খায় সব যুগে, অন্নের অভাব ঘটলে কেঁদে ওঠে সব কালে, এবং আপন নিরাপত্তার জন্য যে কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে! ওরা সেই চিরদিনের আদিম জনসাধারণেরই আধুনিক ধারাবাহিকতা।

এই 'ক্ষুধার্ত' উপত্যকা' এক সময়ে হঠাৎ ভিন্ন চেহারা নিল—যখন এসে নামলুম সমরকন্দের ছোট্ট 'কাঁচা' বিমানঘাঁটির মাঠে। আশ্চর্য, বদলে গেল পৃথিবী,—হারিয়ে গেল 'হাংরি স্টেপ্‌স'। আমি যেন এসে পৌঁছলুম বর্ধমানের এক গ্রামপ্রান্তে,—যেখানকার কোমল দূর্বাদল এবং ঘনশ্যাম বনশোভার দিকে চেয়ে চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল! চারিদিকের দুস্তর মরুলোকের মাঝখানে হঠাৎ একেকটি ওয়েসিস যেন করুণ স্নেহমমতার মতো! সমরকন্দ এলাকা তেমনি একটি ওয়েসিস বা মরুদ্যান! চোখ ফেরালেই দেখা যায়, এই শহর যেমন নরম, তেমনি কোমল। এখন সকাল নটা। বনবাগানে এখনও পাখীর কাকলী শেষ হয়নি। মাঠের ফসল উঠেছে। অরণ্যের ছায়া পড়েছে বাগানের আশেপাশে। এখানে ওখানে মাটির দেওয়াল, মাটির পাহাড়-স্তূপ পথের দুই পাশে। সমরকন্দ শহর হল 'জারফশান' উপত্যকার অন্তর্গত। বিমানঘাঁটির বৃক্ষবহুল বাগান পেরিয়ে সুন্দর চিক্কণ পথ চলে গেছে অদূরবর্তী শহরের দিকে। পেলব মৃন্ময় স্তূপগুলির মাঝখান দিয়ে পথ। মাঝে মাঝে প্রান্তর, দূরে দূরে পাহাড়। পথটি ভাল, কিন্তু মাটির ধুলো আর বালু প্রচুর ওড়ে।

'সমরকন্দ' শহরটির বাঙলা অর্থ, 'পুষ্প' শহর। 'সমর' শব্দটির অপর অর্থ, সৌন্দর্য'! সমরকন্দের আরও একটি নাম, 'গ্রীন সিটি' বা হরিৎ নগর। এই সুন্দর নগরটি চিরদিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাদেশে অন্তহীন ঔৎসুক্যের বস্তু ছিল। এই বুলবুলিডাকা পুষ্পকুঞ্জকাননশোভিত এবং শ্বেতজ্যোৎস্নাপুলকিত স্বপ্নপুরীতে বসে কবেকার কোন্ তন্দ্রাচ্ছন্না 'শাহারজাদী' এক-হাজার-এক-রাত্রি ধ'রে কা'র কানে কানে যেন অবিশ্রান্ত মধুর রূপকথা শুনিয়েছিলেন! এখানকার কোন্ আমীর যেন কবেকার কোন্ প্রিয়ার কপোলের একটি তিলের বিনিময়ে 'সমরকন্দ ও বুখারা' দান করতে চেয়েছিলেন! তা হবে। আমাদের প্রাক্তন সঙ্গী ডাঃ মুল্‌করাজ আনন্দ একদিন মস্কোর একটি চলন্ত বাসের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, কেউ যদি এখনি তাঁর সঙ্গে একটি চুম্বন বিনিময় করে, তবে তিনি এই মুহূর্তে তাকে 'সমরকন্দ ও বুখারা' দান করতে প্রস্তুত! একটি রুশ মেয়ে এই 'পুরস্কার' পাবার লোভে মুল্‌করাজের দিকে হাসিমুখে এগিয়ে গেল, এবং তারপর আর কিছু আমি দেখিনি, শুধু উচ্চহাসির আওয়াজ শুনেছিলুম।

একটি 'চায়খানায়' এসে বসলুম। এখানে ভাত, মাংস, চা, কফি মদ, ফল,—সবই বিক্রি হয়। এটি মস্কো নয়, মধ্যএশিয়া! রোদ, মাছি, আঁস্তাকুড়, বস্তি, জঙ্গাল, নালা-নহর,—কোনটা বাদ নেই। আজ হাটের বার, বহু নরনারী যাচ্ছে হাটতলার দিকে। এদিকটা পুরনো শহর, দূরে দূরে নবনির্মাণের কাজ চলছে। কোথাও উপত্যকা, কোথাও বা নাবালভূমি। পশ্চিমের দিকে অনুচ্চ যে পাহাড় দেখি, ওটির নাম 'আলেকজান্দার' পাহাড়! পথ দিয়ে যারা যাচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক পক্বশ্মশ্রুযুক্ত বলবান বৃদ্ধ,—মাথায় শাদা কাপড়ের মস্ত মস্ত পাগড়ি। এরা আমার অতি পরিচিত। দিল্লী, অমৃতশহর, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান, মিয়ানওয়ালি, কোহাট, বান্নু, চাকলালা,—এরা সবাই সেখানে ছড়িয়ে আছে। কলকাতায় এদেরকে পাওয়া যায় মুর্গিহাটায়, টেরেটি বাজারে, তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে এবং কাবুলিবস্তিতে। ক্বচিৎ এক একটি মেয়ে যাচ্ছে যারা বোরখা পরেনি, কিন্তু ঘোড়ার ল্যাজের ঝাপটা ঝুলিয়েছে সামনের দিকে মস্ত ঘোমটার মতো! সে এক অদ্ভুত চেহারা! মেয়েদের পিঠের দিককার রাশিকৃত কেশসম্ভার যদি উলটিয়ে মুখের সামনে ঝালরের মতো নামানো যায়, এও ঠিক তেমনি। ওদের গলা থেকে নীচে পর্যন্ত আর্মেনিয় ঘাগরা, পায়ে সরু কালো জুতো। সুন্দর আঙুলে মেহেদির রং। তুর্ক, উজবেক, মঙ্গোল, তাতার—সব মিলে এখানে একাকার। সামনে দিয়ে মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে মোটরবাস এবং প্রাইভেট কার। 'চায়খানার' সেই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে বসে আমার মনে হচ্ছিল, শ্রীমতী অকস্মাৎই যেন এখানে পরদেশী, এবং আমি যেন এদেরই লোক! মধ্যএশিয়ার সর্বত্রই এই মনোভাবটি পেয়ে থাকে।

সমরকন্দ নগরী সেকাল থেকে একালে একটু নড়ে বসেছে! কাছাকাছি যে গিরিশ্রেণী চোখে পড়ছে, এদেরই একটি উপত্যকায় সুপ্রাচীন সমরকন্দ অবস্থিত ছিল। সেই অঞ্চলটির নাম হল 'আফ্রোসিয়াব'। এই নগরীর উপান্তে যে স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে প্রবল সফেন ভঙ্গীতে, সেটির নাম 'সিয়াব-আরিক'। সমরকন্দকে প্রসিদ্ধ ক'রে তুলেছে তার তুষারবিগলিত স্বচ্ছ জল, তার মৃত্তিকার কোমলতা, বনবাগান ও পুষ্পকাননের শোভা এবং তার অতি বিস্তৃত বিবিধ ফলফলাদির বাগান। এখানে ফলের রস নিয়ে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা হয়েছে, তার নাম 'পমোলজিক্যাল গ্যার্ডেন'। উৎকৃষ্ট 'পীয়ার-ফলের' নাম এখানে বলা হয়, 'দিল আফরুজ' অর্থাৎ 'হৃদয়ানন্দ'। সুপক্ক রক্তমুখী একজোড়া আপেলকে বলা হয়, 'শিরী-ফরহাদ' আর নয়ত, 'লায়লা-মজনু'। সমরকন্দের 'পীয়ার' হাতে পেলে এককালে সাহেবরা লুফে নিয়ে বলত, 'জোসেফাইন'। মিষ্টরসের সঙ্গে মিষ্ট নাম মিলে যেত! সমরকন্দিরা তাদের প্রাতরাশের সঙ্গে এক একজন সেরখানেক ওজনের এক একটি আঙুরের 'থোলো' নিয়ে বসে। নধর পেলব ভেড়ার মাংস এবং সুপুষ্ট মোরগ মাখনে ডুবিয়ে সিদ্ধ ক'রে তারা মধ্যাহ্নভোজনে বসে। এখানে ভাত এবং রুটি দুই চলে। সমরকন্দে এক প্রকার 'তন্দুরী' রুটি তৈরি হয়, তার ওজন অনেক সময় এক সের ছাড়িয়ে যায়। এই রুটির উপর আরবি বা রুশ অক্ষরে সমরকন্দের নাম ও পরিচয় ছাঁচে তোলা হয়। এক বছরেরও বেশী এই বৃহৎ এক একখানা 'কানা-উঁচু থালার' মতো রুটি তাজা থাকে! আমি একখানা রুটি কিনলুম ৭ রুবলে, অর্থাৎ প্রায় ৮॥ টাকায়! শুনলুম ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এই 'সমরকন্দ-মার্কা' একখানা রুটি কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন! সমরকন্দের মহাজনী বাজার এবং তা'র চা'ল-ডাল, মসলাপাতি, তার ফড়ে আর দোকানি, তা'র খুচরো এবং পাইকারি দর,—এর আগাগোড়া দিল্লীর চাঁদনী চৌক বা কাশীর মহাজনটোলার মতো! বাজারের মধ্যেই উবু হয়ে গামছা বিছিয়ে কোন কোনও স্থলে খেতে বসে গেছে মেয়ে-পুরুষ! শশা, টমাটো, আলুসিদ্ধ, মাংস, রুটি, কেউ বা ফুলুরি বা ডিমের বড়া, কিংবা গরম শিঙাড়া! চট ক'রে সুশ্রী মেয়ের দিকে তাকালে কাশ্মীরকে মনে পড়ে! সেই হরিণ-নয়না, সেই বাঁকা কটাক্ষ, আর কালো চোখের পক্ষরেখায় কাজলের

আভা, মাথার সি'থির দুপাশে পাটি করা কালো কেশ, বেণী ঝুলছে পিছনে। ওদের দেখে যেন বুঝতে পারা যায়, দেড় লক্ষ ভারতীয় নরনারীকে একদা তৈমুরলংগ ধ'রে এনেছিলেন এই সমরকন্দে! বাজারে চাটাই বিছিয়ে ফড়েরা চাউল, গম, ডাল ও সব্জি বিক্রি করতে বসেছে!

'চায়খানা' ছেড়ে যে রুক্ষ কাঁকর-পাথর ডেলা-ডুমরি ছাওয়া পাহাড়ি পথের দিকে অগ্রসর হলুম, এই পথেই এসেছিল জন্তুর ছালজড়ানো, বল্লম-বর্শা-তরবারি ঘুরিয়ে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দার তাঁর সৈন্যদল নিয়ে,—তার চিহ্ন নাকি আজও রয়েছে অদূরবর্তী পাহাড়ে! তিনি মধ্যএশিয়ার পূর্বপ্রান্ত অবধি অগ্রসর হবার কালে একটির পর একটি উপনিবেশ বা জনপদ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তারমেজ থেকে আমুদরিয়া অতিক্রম ক'রে আফগানিস্তান ও ভারতের দিকে অগ্রসর হন কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু মধ্যএশিয়ার ইতিহাস পরবর্তী দেড় হাজার বছর ধ'রে বসে থাকেনি—বিশেষজ্ঞরা সেটি জানেন। তারপর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইতিহাস আবার নতুন পাতা ওলটাতে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চেঙ্গিস খাঁর বিজয়যাত্রাপথে মধ্যএশিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মাটিতে লুটোয়, বালু ও পাথর রক্তরঞ্জিত হয়, আমুদরিয়ার জল লাল হয়ে ওঠে! সেই হত্যা এবং সর্বব্যাপী ধ্বংসের শ্মশানকে বুকে নিয়ে উপুড় হয়ে কাঁদে মঙ্গোলিয়া, তাকলা মাকান, পামীর, তুর্কিস্তান এবং কাশ্যপের পশ্চিম পার। চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আবার একজন মেষপালক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বালকদলের মধ্যে তরবারির খেলায় এবং ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস নিয়ে সে বড় হয়। পারশ্য ধনিকদের রেশম ব্যবসায়ের দিকে সে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, এবং আশেপাশে নানা জায়গায় যুদ্ধ-বিগ্রহ, লুণ্ঠন ও ডাকাতির গল্প শোনে! এই গল্পের কথক যারা ছিল, তারা ভদ্রচেতা ও নিরীহ 'হিন্দু'—তারা পাঠান দস্যুদের কাহিনী বলত! ওদের সংগে থাকত আরব ও ইহুদী ব্যবসায়ীরা। এই ছেলেটি মাঝে মাঝে বন্ধুমহলকে নিয়ে কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া দিত, এবং তাতে প্রমাণিত হত, ওদের ভিতরে তা'র মতো অশ্বারোহী আর কেউ নেই! অতঃপর সন্ধ্যাবেলায় একা ফিরত সে ঘরে, ভবিষ্যৎ কালের স্বপ্নজাল বুনত মনে মনে! তার সংগী ছিল একটি ঘোড়া, কয়েকটি বাজপাখী এবং কুকুর। সামান্য মাটির ঘরে সে থাকে, তার চেয়েও সামান্য তার জীবনযাত্রা। ছেলেটির মা নেই আবাল্য, এবং সে বাপের ধমক খেয়ে এটা ওটা কাজ ক'রে দিত। জাতিতে তারা সম্ভবত তাতার ও তুর্ক মিশ্রিত ছিল। ছেলেটির নাম ছিল 'গুরাগন'। এই সমরকন্দেরই চতুর্দিক-ব্যাপী দারিদ্র্যের ছায়ায় ওই মাটির বস্তির একটি সামান্য ঘরে 'গুরাগনের' জন্ম হয়। সেই বালক-বয়সে বয়স্ক ব্যক্তিদের ফাই-ফরমাস খেটে দেবার সময় মাঝে মাঝে একটি কথা তা'র কানে আসত, "এরেইন মোর নিগেন বুই." অর্থাৎ পুরুষের বা মানুষের সামনে আছে একটি মাত্র পন্থা,—অন্য পথ নেই!

ক্যারাভান্-সরাইয়ের আশে পাশে গ্রুরাগান এক অস্থির বালকের মতো ঘুরে বেড়ায়। গোধূলিকালে সমরকন্দের মসজিদের থেকে আজানের মধুর শীর্ণ ডাক এসে পৌঁছত তার কানে, চারিদিক থেকে জন্তুর চামড়ার পোড়া গন্ধ আসত তার নাকে তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে মিলিয়ে, তারই মধ্যে মৌলবীরা খুঁজে বেড়াত তাদের শিষ্যসেবককে, ভিখারীরা ঝুলি নিয়ে ফিরত এখানে ওখানে, ব্যবসায়ীরা টাকার লেন-দেন করত, পারশ্যের বোরখা-পরা রমণীরা আপন জড়োয়া-জরি-রেশমের পোষাক প'রে নন্দনকাননে পরিণত করত এই সমরকন্দের রক্তমুখী গোলাপের বাগান। কিন্তু তাদেরই ভিতরে এই সঙ্গীহীন বালক আপন মনে মাঝে মাঝে বয়স্ক ব্যক্তিদের কোষবদ্ধ তরবারিগুলির দিকে চেয়ে বিড় বিড় করত ঃ "পুরুষের একটিমাত্র পথ"।

এই বালকেরই ভবিষ্যৎ কালের নাম হল, 'আমীর তৈমুর গুরাগান্।' পৃথিবীবাসী তাকে জানে, 'ট্যামারলেন', অর্থাৎ 'খঞ্জপদ লৌহমানব'! ভারতবাসী তাকে জানে, তৈমুরলঙ্গ! এই অশ্বারোহী এবং অসিধর্মী তাতার তার প্রত্যেকটি যুদ্ধ-যাত্রায় পরাজয় কাকে বলে জানত না। জয়ধর্ম ছাড়া অন্যধর্ম সে স্বীকার করেনি। তার একমাত্র স্বপ্ন ছিল, সে পৃথিবীর অধীশ্বর হবে! কিন্তু সেটি তার বয়সে কুলোয়নি, এই দুঃখ সে রেখে গেছে! তৈমুর আপন হাতে নিজের জন্য একটি সিংহাসন রচনা করে, আপন হাতে একটি বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করে, এবং আপন হাতে একটি নিজস্ব সভ্যতা সৃষ্টি করে! মৃত্যুকাল অবধি একটি মাত্র মন্ত্র তা'র কানে ছিল, "পুরুষের একটিমাত্র পথ,—অন্য পথ নেই!"

পাঁচশো বছর পরে আরেকজন তাতার আবার ওই মন্ত্রটি লাভ করেছিল। সেও ওই ত্রিশূলী-মন্ত্র! "পুরুষের একটিমাত্র পথ"—সিংহাসন রচনা, সাম্রাজ্য গঠন এবং আপন সভ্যতা সৃজন!

'সম্রাট' লেনিনের অবিসম্বাদী সিংহাসন আজ ২১ কোটি নরনারী হৃদয়ের উপরে ধারণ ক'রে রয়েছে! তাঁর 'শরীর-পতনের' আগে তিনি মন্ত্রের সাধন ক'রে গেছেন বৈকি। বিজয়ী যোদ্ধার তরবারি অপেক্ষা লেনিনের তরবারি অনেক পরিমাণ বেশী ধারালো ছিল,—সেটি তাঁর কলম! সেটি তাঁর ধারালো জিহবা!

এই সমরকন্দ নগরী এখন দুই ভাগে বিভক্ত। যেটি প্রাচীন সেটি তৈমুরলঙ্গের,—সেটিতে তাঁর বহু কীর্তি এবং স্মৃতি-সৌধ বর্তমান। যে-শহরটি নবীন, —সেটি লেনিনের। রুশবিপ্লবের পর কিছুকালের মধ্যেই সমরকন্দে আধুনিক-কালের বৈজ্ঞানিক ধরণের নানাবিধ নির্মাণকার্য চলতে থাকে। নূতন সমরকন্দের মনোরম ছায়াবীথির তলায় তলায় পথ হাঁটতে বেশ লাগে।

তৈমুরলঙ্গের যে পরিচয়টি রয়ে গেছে সোভিয়েট ইউনিয়নে অথবা ভারতবর্ষে, সেটি শ্রুতিমধুর নয়। সে দস্যু, হত্যাকারী, লুটেরা, পররাজ্যগ্রাসী ইত্যাদি। কিন্তু খোদ সমরকন্দে তার পরিচয় খুব অগৌরবের নয়। তৈমুরলঙ্গ ছিলেন অন্ধ দেশপ্রাণ ব্যক্তি, এবং সমরকন্দকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে রাখার জন্য যে কোনও প্রকারের নিষ্ঠুরতায় তিনি কাতর হতেন না! আপন সিংহাসন সৃষ্টি ক'রে তিনি সম্রাট হয়েছিলেন, কিন্তু সেই 'সিংহের' প্রকৃত আসন ছিল ঘোড়ার পিঠে! এই যুদ্ধপ্রিয় দিগ্বিজয়ী সম্রাটের জীবনের অধিকাংশ কাল কাটে অশ্বারোহণে। হ্যারল্ড ল্যাম্ব তাঁর গ্রন্থে বলেছেন ঃ "One after the other, he overcame the armies of more than half the world. He tore down cities, and rebuilt them in the way he wished. Over his roads the caravan trade of two continents passed. Under his hands he gathered the wealth of empires, and spent it as he fancied. Out of mountain summits he made pleasure palaces — in a month".

তৈমুরলঙ্গ তাঁর রাজধানী নির্মাণকালে যে নূতন ধরণের স্থাপত্যকলার সৃষ্টি করেন, সেটি তাঁর নিজস্ব। কিন্তু যখন দামাস্কস নগরীটিকে অগ্নি-সংযোগের দ্বারা ধূলিসাৎ ও সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করেন, তখন সেখানকার একটি গম্বুজ তিনি দেখে রেখেছিলেন।। এই গম্বুজটির একটি পরিমার্জিত চেহারা তিনি সমরকন্দে ফিরে এসে নির্মাণ করেন। তৈমুরলঙ্গের সেই স্থাপত্যকলার অনুকরণে পরবর্তীকালে রাশিয়ার প্রায় সবগুলি ধর্মমন্দির নির্মিত হয়—যার অনেকগুলি আজও সগৌরবে 'তৈমুর-স্থাপত্যের' সাক্ষ্য দিচ্ছে। আগ্রার তাজমহল তৈমুর-স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত,—সেইজন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের বহু ধর্মমন্দিরের সঙ্গে তাজমহলের মিল দেখতে পাওয়া যায়!

এই সমরকন্দকে নিয়ে পৃথিবীর বহু কবি বহু শতাব্দী ধ'রে কবিতা ও রূপকের স্বপ্নজাল বুনেছেন। তৎকালীন ইউরোপের পূর্বাংশ তৈমুরলঙ্গের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এ বর্বর বহুরূপী ছিল, এবং এর অসাধ্য কিছু ছিল না। অন্ধ কবি মিল্টন তাঁর "Paradise Lost" রচনাকালে "Satan" নামক চরিত্রটি নাকি তৈমুরলঙ্গকে স্মরণ করে লিখেছিলেন! ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্র প্রাচ্যের এই দানবের কীর্তিকাহিনী শুনে ভয়ে ভয়ে রাজদূত মারফৎ অভিনন্দনবার্তা পাঠাতেন তৈমুরের রাজদরবারে। এঁদের মধ্যে ইংলণ্ডের ৪র্থ হেনরী, ফ্রান্সের ৬ষ্ঠ চার্লস, গ্রীক সম্রাট ম্যানুয়েল, ক্যাস-টিলের রাজা লর্ড ডন হেনরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ডন হেনরীর প্রতিনিধি 'গনজালেস ক্লাভিয়ো' যখন কুর্নিশ করতে করতে নতমস্তকে তৈমুরলঙ্গের সামনে এসে দাঁড়ান তখন সমরকন্দ নগরী লুণ্ঠিত হীরামুক্তামণিমাণিক্য-চ্ছটায় ঝলমল করছিল। সেই সময় ক্লাভিয়ো রাজসভায় দেখতে পান, সম্রাট তৈমুরের সভাকক্ষে 'অধিকাংশ পৃথিবীর রাজবংশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণীরা' হাসিমুখে দণ্ডায়মান, এবং 'মিসর ও চীনের রাজদূতগণ' আপন আপন আসনে উপবিষ্ট। তারই একপাশে ক্লাভিয়োকে একটি আসন দেওয়া হ'ল। কেননা 'বৃহৎ সমুদ্রে ক্ষুদ্রতম মৎস্যটিরও স্থান আছে বৈকি।'

অতঃপর ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে ক্লাভিয়ো যে রিপোর্ট দাখিল করেন সেটি এই ঃ Tamerlane, Lord of Samarkand, having conquered all the land of the Mongols, and India; also having conquered the Land of the Sun, which is a great lordship; also having conquered and reduced to obedience the land of Kharesm; also having reduced all Persia and Media, with the empire of Tabriz and the city of the Sultan; also having conquered the land of Silk, with the land of the Gates; and also having conquered Armenia the Less, and Erzerum, and the land of the Kurds — having conquered in battle the lord of India and taken a great part of his territory; also having destroyed the city of Damascus, and reduced the cities of Aleppo, of Babylon and Bagdad; and having overrun many other lands and lordships and won many battles, and achieved many conquests, he came against the Turk Bayazid (who is one of the

greatest lords of the world) and gave him battle, conquering him and taking him prisoner".

কিন্তু ক্লাভিযোর রিপোর্ট অসমাপ্ত ছিল এই কারণে যে, তৈমুরলঙ্গ তখনও ট্রান্স-ককেশিয়া, দক্ষিণ রাশিয়া, আংশিক দক্ষিণ-পশ্চিম সাইবেরিয়া,—এগুলি জয় করেননি। তিনি চেঙ্গিস খানের আমলের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'গোল্ডেন হোর্ড'-এর বিরাট সৈন্যবাহিনীকে প্রায় দুই হাজার মাইল উত্তরে অতিক্রম ক'রে গিয়ে পরাস্ত করেছিলেন, এবং তাঁর ভয়ে চেঙ্গিসের বংশখ্যাত 'আমীর তোক্তা-মিশ' আপন সৈন্যব্যূহ ভেদ ক'রে নিরুদ্দেশে পালিয়ে যান্। উরল এবং ভল্গা নদীর আশেপাশে তোকতামিশের 'গোল্ডেন্ হোর্ডের' কে লক্ষ মঙ্গোল এবং মিশ্রিত সৈন্যকে যখন হত্যা করা হচ্ছে, তখন এদিকে মঙ্গোলদের পরিত্যক্ত রণাঙ্গনে 'স্বর্ণময়' তাঁবুর মধ্যে আমীর-ওমারহ্‌পরিবৃত তৈমুরলঙ্গ মধু-যামিনী পালন করছেন! কিন্তু এর আগে একটি কথা বলা দরকার। 'গোল্ডেন হোর্ড' কথাটির তাৎপর্য, 'কিপচাক' নামক একটি সংমিশ্রিত উপজাতি ও মঙ্গোলিয় যাযাবর সম্প্রদায়,—এরা তুর্ক-মঙ্গোল মিশ্রিত একপ্রকার অতি হিংস্র ও বর্বর জাতি। কিন্তু এদের বসবাসব্যবস্থা, ঘরকন্নার সামগ্রী, বিলাসবস্তু ও আসবাবপত্র ছিল প্রায় সবই স্বর্ণমণ্ডিত। এরা যাযাবর এবং শিকড়বিহীন, এবং এরা হীরা, জড়োয়া, জহরৎ, মণিরত্ন-সম্ভারসহ মধ্যএশিয়ায়, মঙ্গোলিয়ায়, পামীরে, ককেসাসে, সাইবেরিয়ায় এবং বহু অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। অরাজকতা সৃষ্টি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, লুটপাট, রাহাজানি, দস্যুতা ইত্যাদি এদের পেশা ছিল। এরা স্বর্ণপাত্র, স্বর্ণময় সজ্জা ও শয্যা, স্বর্ণ-সূত্রে প্রস্তুত তাঁবু ও পর্দা, স্বর্ণমণ্ডিত তরবারি ও বল্লম-বর্শা, স্বর্ণরচিত পাদুকা প্রভৃতি ব্যবহার করত এবং এদের যাবতীয় ব্যবহার্য সামগ্রী স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত হত! এদের মেয়েদের শরীরের কোন কোনও অংশ স্বর্ণঝালরের দ্বারা ঈষৎ অন্তরালে রাখা হ'ত! তোকতামিশের পলায়নের পর যখন স্বর্ণমণ্ডিত তাঁবুগুলি তৈমুরলঙ্গ দখল করলেন, তখন বিজয়ী সেনাপতিগণের জন্য এল স্বর্ণপাত্রে সুগন্ধী জলমিশ্রিত তাজা মধু এবং উৎকৃষ্ট মদ। যাঁরা আনলেন তাঁরা সুন্দরী এবং তন্বী বন্দী-রমণীর দল। সংখ্যায় তাঁরা শত শত। কিন্তু তৎকালীন রীতি অনুযায়ী তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা! কেবল তাঁদের পিছনের কেশরাশি কাঁধের উপর দিয়ে সামনের দিকে ঝোলানো! মদ্য ও মধু বিতরণের পর সেই বিবস্ত্রা রমণীর দলকে নৃত্যসহ প্রণয়-সঙ্গীত গাইতে বলা হল, এবং গানের পর "the Tatar lords took them off and violated them".

তৎকালে মস্কো নগরী ছিল একটি সাধারণ ছোট শহর— "a roadside town" মাত্র, এবং তার জনসংখ্যা হাজার পঞ্চাশেকের বেশী নয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র শহরটিও মাত্র ৫।৭ বছর আগে তোকতামিশের মঙ্গোল সৈন্যরা ভস্মীভূত করেছিল। ঐতিহাসিকরা বলেন, তৈমুরলঙ্গ মস্কো নগরীতে ঢুকে আগাগোড়া লুটতরাজ করেছিলেন, কিন্তু রুশেরা সেকথা অস্বীকার করে। সে যাই হোক, তৈমুরের ভয়ে মস্কোর অধিবাসীরা সেদিন ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, এবং যে-রাজকুমার সেদিন সৈন্যদলসহ যুদ্ধ-সীমান্তে বিষণ্ণ মুখে অগ্রসর হলেন, তিনিও ভয়ে কাঁপছিলেন! কিন্তু যুদ্ধের চেয়েও সেদিন মস্কোতে ছিল "গ্রহশান্তি, পূজাপাঠ এবং ঠাকুর-দেবতার দোরে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি"। যাদের অবস্থা ওরই মধ্যে একটু সচ্ছল, তারা ছুটল মস্কো থেকে দূরে কোনও এক 'কালীঘাট' থেকে মাতা 'মেরীর' পুরনো পুতুল জোগাড় করতে। তখন মস্কোতে 'স্লে' গাড়ি প্রচলিত,—যার একটিও চাকা নেই! সেই গাড়ি ঘর্ষাড়িয়ে-ঘর্ষাড়িয়ে ছুটল জমাট বরফের উপর দিয়ে! অতঃপর সেই 'ভার্জিনের' মূর্তি নিয়ে যখন সবাই ফিরছে, তখন দুইধারে কাতারে-কাতারে রুশ জনসাধারণ সেই বরফেরই উপর নতজানু হয়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে,—"হে মা জননী, বিপদতারিণী দুর্গতিনাশিনী,—তুমি রক্ষে কর মা,—তুমি ছাড়া কেউ নেই ...ওগো, মাগো—"

রুশ জাতির একান্ত বিশ্বাস, সেদিন 'দুর্গতিনাশিনীর' কানে এই কাতর প্রার্থনা পৌঁছেছিল। কেননা ডন্ নদীর তীরভূমি থেকে তৈমুর নাকি লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখে ফিরে গিয়েছিলেন। মস্কো নাকি বড় দরিদ্র!

চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অবশেষে তৈমুরের হাতে ধ্বংস হয়েছিল, এবং তোকতামিশকে পরাস্ত করার ফলে রুশ জাতি বহুকাল পরে মঙ্গোল সৈন্য তথা 'গোল্ডেন হোর্ডের' হাত থেকে চির-কালের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করল। সেই অর্থে, তৈমুরলঙ্গের কাছে রুশ জাতি কৃতজ্ঞ!

অসুস্থ দেহে বৃদ্ধ বয়সে তৈমুরলঙ্গ গোবি মরুভূমির পথে 'কাথে' নামক এক রাষ্ট্রবিজয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর সেই শেষ শক্তিমান রাষ্ট্রকে পদানত করার আগেই পথিমধ্যে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হন। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৭০। অবশেষে 'অৎরার' নামক একটি জনপদের ধারে বন্য ও তুষারাছন্ন নদীর প্রান্তে পার্বত্যালোকে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সেটি ১৪০৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস।

সমরকন্দের যে অংশটা অনুর্বর এবং পার্বত্য, তারই একস্থলে একটি অতি প্রাচীন 'মানমন্দিরের' (Observatory),

সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। রৌদ্র তখন ধূ ধূ করছে। এই মানমন্দির মাটির গভীর নিচের থেকে উপর দিকে উঠে এসেছে। এটি একটি বিস্তৃত এবং কতকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর। নিচের থেকে আঙ্কিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী বড় বড় পাথরের দেওয়াল দাঁড়িয়ে উঠেছে বৃহৎ এক একটি ত্রিকোণ ফলার মতো। এটি পঞ্চদশ শতাব্দীর নির্মাণ, এবং এটির সঙ্গে তৈমুরলঙ্গের পৌত্র 'উলুগবেগ'-এর নামটি জড়িত। ভারতবর্ষে এই প্রকার চারটি মানমন্দির আমার দেখা ছিল,—জয়পুরে, দিল্লীতে, উজ্জয়িনীতে, এবং বারানসীতে। এগুলি বোধ করি অষ্টাদশ শতাব্দীর মহারাজা জয়সিং কর্তৃক নির্মিত। ভারতবর্ষের মানমন্দিরগুলি অনেক বেশি উন্নত এবং তাদের তিথি, বার, সময় ও রৌদ্র-গণনা অনেক বেশি নির্ভুল। কিন্তু আমার ধারণা, এই মানমন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা ও কৌশল মহারাজা খুঁজে পেয়েছিলেন উলুগবেগের প্রতিভা ও নির্মাণকলা থেকে। তখনকার দিনে ইরান-তুর্কিস্তান-আফগানিস্তানের সঙ্গে দিল্লী-জয়পুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

উলুগবেগ সম্বন্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন শ্রদ্ধাশীল। তৈমুরলঙ্গের চার পাঁচটি ছেলের তেমন কোনও কীর্তি নেই, বরং কুকীর্তিই কিছু ছিল। তাদেরই একজনের ছেলে শ্রীমান্ উলুগবেগ মাত্র ১৫ বছর বয়সে সমরকন্দের সিংহাসনে বসেন, এবং কালক্রমে সেই বালক, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শিল্পানুরাগী, বিজ্ঞানান্বেষী এবং মানবতাবাদী হয়ে ওঠে। তাঁর প্রতিভা, কর্মনিষ্ঠা এবং সংগঠনশক্তির কথা তুর্কিস্তানের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বহুকাল পরে দৈত্যকুলে যেন এক প্রহ্লাদের জন্ম হল, এবং তাঁর বিরুদ্ধে যথারীতি গোঁড়া মুসলমান সমাজে একটি ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই উলুগবেগ তাঁর পিতামহের আমলের অসমাপ্ত স্থাপত্যসৌধগুলির নির্মাণকার্য শেষ করেন। কালক্রমে আমীর উলুগবেগ সমরকন্দের সর্বত্র মাদ্রাসা-বিদ্যালয়, অসংখ্য সাধারণ স্নানাগার, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, এবং জনকল্যাণমূলক নানাবিধ কীর্তি রচনা করেন। উলুগবেগের বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা এমন প্রসিদ্ধিলাভ করে যে, পাশ্চাত্য দেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের দল তাঁর রাজসভায় এসে উপস্থিত হন্। কথিত আছে, তাঁর জ্যোতির্বিদ্যার গণনাশক্তি এত নির্ভুল এবং সঠিকভাবে অঙ্কিত হত যে, পরবর্তী ১০০ বছরের মধ্যেও ইউরোপে তার জুড়ি মেলেনি! উলুগবেগ বলতেন, "ধর্ম ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যায়, কালক্রমে সাম্রাজ্যও যায় রসাতলে, কিন্তু বিজ্ঞানের কীর্তির মৃত্যু নেই!"

কিন্তু সেদিনের হিংসাবাদী এবং ধর্মান্ধ মুসলমান জাতির পক্ষে এই প্রগতিশীল মতবাদ বরদাস্ত করা সম্ভব হয়নি। তারা গোপনে তাতিয়ে তুলল উলুগবেগের পুত্র আবদুল লতিফকে। তার কানে কানে বলা হল, মুসলমান জাতি এবং ইসলাম বিপন্ন! তুমি যদি এই দুর্দিনে সমরকন্দের সিংহাসনে বসতে পার, তবে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষা হয়! তৈমুরলঙ্গের বংশধর আবদুল লতিফের তরুণ রক্ত টগবগ ক'রে উঠল, এবং মোগল পাঠান যুগে ভারতে যা ঘটত,—ঠিক সেই উপায়েই আবদুল লতিফের নিয়োজিত গুপ্ত ঘাতকের দল একদা অন্ধকার রাত্রে উলুগবেগের শিরশ্ছেদন করল!

আজও সেই প্রাচীনের ছায়াচ্ছন্নতা দেখছিলুম এই ভূগর্ভের নিচে অন্ধকারের মধ্যে। ওখানে যে অশরীরী প্রেতচ্ছায়াদলের নিঃশ্বাস উঠছে গুমরিয়ে, তাদের আমি চিনিনে। আমি পরদেশী, আমার সঙ্গে সমরকন্দের নাড়ির যোগ নেই। তুর্কিস্তানের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আমার কানে কানে কাঁদে না! শুধু এইটি জানি, সমরকন্দের যে রৌদ্র-রুক্ষ পাহাড়টির উপরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, সেইটির উপর দিয়ে চলে গেছে পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বপ্রধান তিনজন দিগ্বিজয়ী সম্রাটের উন্মত্ত সেনাদল! তাঁরা হলেন আলেকজান্দার,—যাঁর স্থানীয় নাম 'ইস্কান্দার', সম্রাট-দস্যু চেঙ্গিস খাঁ এবং ভারত-বিভীষিকা তৈমুরলঙ্গ!

সম্ভবত এঁদেরই কথা স্মরণ ক'রে বিংশ শতাব্দীর মহাকবি বলেছিলেন :

"রাজছত্র ভেঙে পড়ে;
রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে;
রক্তমাখা অস্ত্রহাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।"

উলুগবেগ ছিলেন স্বভাব-বিজ্ঞানী এবং সংস্কারক,—সেই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে,—ইসলাম তাঁর হাতে বিপন্ন! তিনি ধর্মনিরপেক্ষ অগণিত বিদ্যালয় সৃষ্টি করেছিলেন,—সুতরাং তিনি ধর্মান্ধ সম্প্রদায়ের শত্রু হয়ে ওঠেন! তিনি এই কথাটি প্রচার করেছিলেন, "প্রতি মুসলিম নরনারীর কর্তব্য আপন আপন চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করা।"

কিন্তু সেদিনের মৌলবীগোষ্ঠী এই 'দেশশত্রুকে' হত্যা করেই কেবল ক্ষান্ত থাকেনি। উলুগবেগের সমস্ত কীর্তিকে তারা নিশ্চিহ্ন করে এবং অবশেষে তাঁর সেই মানমন্দিরের ভূগর্ভে মাটি ভরে দিয়ে সেটিকেও সম্পূর্ণ 'অদৃশ্য' ক'রে দেয়। অবশেষে প্রায় পাঁচশ' বছর পরে জনৈক রুশবিপ্লবী নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মধ্যএশিয়ায় আসে। সেই যুবক ছিল একজন অধ্যাপক, এবং ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ববিদ্। সে এসে একদা সমরকন্দের প্রান্তরের মৃৎস্তূপ সরিয়ে এই মানমন্দিরটি আবিষ্কার করে। বিগত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এই অধ্যাপকের মৃত্যু ঘটে।

রৌদ্র প্রখর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দূরদূরান্তব্যাপী কোমল মৃন্ময়তা ও সুশ্যাম হরিৎশোভা দেখতে পাচ্ছিলুম। দূরে দূরে এই 'জারফশান' অঞ্চলের অনুচ্চ পাহাড়, কিন্তু তাদেরই মধ্যে একটি হল হিমবাহ,—সেখান থেকে নেমে আসছে 'সিয়াব নালার' দুরন্ত তুহিন জলধারা,—সে আপন সফেন উন্মাদনার আঘাতে সৃষ্টি করছে সমরকন্দের উপান্তে এক বিশাল জলাশয়! এই প্রাণবন্যায় আজও সমরকন্দ জীবন্ত। মুগ্ধ চক্ষে দেখছিলুম রক্তনীলাভ শস্যপ্রান্তরের সজীবতা।

এক সময় অকসানা বললেন, আসুন, এবার শহরের দিকে যাই।

সমরকন্দের ইতিহাস গৌরবে উজ্জ্বল এবং কলঙ্কে মসীলিপ্ত। এই সমরকন্দ পরগণার চতুর্দিকব্যাপী মরুভূমি বহু উন্নতি সত্ত্বেও আজও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু সমরকন্দ আজও দপ দপ ক'রে জ্বলছে যেন তার মধ্যমণি! মধ্যএশিয়ায় ইসলাম চর্চার সর্বপ্রধান কেন্দ্র হল দুটি—সমরকন্দ ও বুখারা। এই দুই পরগণা শত সহস্র বছর ধ'রে তুর্ক ও তাতার জগতে যুগিয়ে এসেছে কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, জাতীয়তাবাদ, ইসলাম সভ্যতার নীতি ও আদর্শ। কিন্তু অন্যদিকে এই সমরকন্দ ছিল লুণ্ঠিত ধনভাণ্ডারে পরিপূর্ণ! তৎকালীন 'পৃথিবীর' শ্রেষ্ঠ সম্পদ—হীরা মুক্তা মানিক্য জড়োয়া সোনা রূপা, সকল দেশের রাজঐশ্বর্য—তৈমুরলঙ্গ একে একে এখানে এনে জড়ো করেছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণীদের ধ'রে

আনা হয়েছিল এই সমরকন্দে। শ্রেষ্ঠ নির্মাণশিল্পী, শ্রেষ্ঠ চিত্রকর, গায়ক, কবি, কারিগর, শাস্ত্রজ্ঞ,—এবং সভ্যতা-পত্তনের জন্য যা কিছু শ্রেষ্ঠের প্রয়োজন,—তৈমুরলঙ্গ তার কিছু বাদ রাখেননি। সমরকন্দের পথে পা বাড়ালে যে জনতাটাকে আজ চোখে পড়ে তাদের মধ্যে আফগানি, ইরানী, তুরানী, ভারতীয় বা কাশ্মীরি—এদেরকে চিনে বা'র করতে দেরি হয় না। তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ ত্যাগের কালে নাকি দেড় লক্ষ ভারতবাসীকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন,—তাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল সমধিক। তৈমুর অর্থে 'লোহা', এবং তাঁর পায়ে একটি শরাঘাত লাগার ফলে তিনি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন ব'লেই তাঁকে 'লঙ্গ' বলা হত। তাঁর সঙ্গে চেঙ্গিস খান বংশের একটি পারিবারিক কুটুম্বিতা বর্তমান ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই,—চেঙ্গিস প্রধানত ছিলেন ধ্বংসাত্মক, তৈমুরলঙ্গ ছিলেন সংগঠনশীল। মধ্য-এশিয়ায়, মঙ্গোলিয়ায়, পূর্ব-দক্ষিণ ইউরোপে,—কোথাও আজ চেঙ্গিসের কোনও কীর্তির স্বাক্ষর নেই। কিন্তু প্রায় ছয়শ' বছর হতে চলল,—আজও তৈমুরলঙ্গের বহু কীর্তি সমরকন্দের পথে পথে জাজ্বল্যমান। মধ্যএশিয়ায় গিয়ে না দাঁড়ালে তৈমুরের প্রকৃত পরিচয় জানা যায় না। এ এক ধরণের উন্মত্ত অন্ধ দেশপ্রেম, যার ভিত্তি হল ক্ষমতা-প্রিয়তা, পরস্বাপহরণ, হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও পররাজ্যগ্রাস। তৈমুরের ভয় ছিল, পাছে তাঁর জীবনকালে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে—পাঁচ হাজার মাইলের মধ্যে আর কোনও নরপতি মাথা তোলে! ডমস্কস ও আলেপ্পো নগর ধ্বংসকালে তিনি মানুষের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে একটির পর একটি পাহাড় বানিয়েছিলেন! এই 'লৌহ-মানবের' অপর একটি নাম ছিল, "Pole of the World and Faith", who razed hundreds of flourishing towns in Georgia, Armenia, Seistan, Southern Russia, India and Asia Minor, strove to turn Samarkand, the capital of his empire, into the 'centre of the universe". His empire, whose shaky economy was based on the plundering of the conquered countries, fell apart shortly after his death."

সমরকন্দের পথে ঘাটে পা বাড়ালে আজও একটি জনশ্রুতি কানে ওঠে, "সমরকন্দ সয়কাল-ই-রুইয়ে জমিন অস্ত্।" সমরকন্দ পৃথিবীর সৌন্দর্য!

সমরকন্দের পূর্বদিকে কোহিস্তান পর্বতমালা। এই পর্বতের একটি অংশে যে বিরাট এক 'গ্লেসিয়ার' দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারই বিগলিত ধারা নেমে এসেছে শতধারায় যে উপত্যকাপথে,—তার নাম 'জারফশান'। সমরকন্দ পরগণা জারফশানের অন্তর্গত, এবং এইটিই তাকে সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা ক'রে রেখেছে। জারফশানের এই জল এখন মধ্যএশিয়ার সম্পদ,—এই জল সঞ্চয় করার জন্য দুই বিশাল হ্রদ নির্মাণ করা হয়েছে; তার একটি হল 'কাটা কুর্গন' এবং অন্যটি প্রাচীন 'কারাকুল'। কাটা কুর্গন নামক যে কৃত্রিম বিশাল জলাশয়টি আজ সর্বত্র পানীয় জল পরিবেশন করছে, সেটির সঙ্গে এক মুসলমান 'রাজ্মাশের' নাম জড়িত। এই শ্রমিক দলপতির নাম হল, 'মৌলানা গফর' এবং ইনি 'মওলান পালোয়ান' নামে আজ সুবিদিত। সমরকন্দে জল এখন প্রচুর, এবং এই 'গ্রীন সিটি' ধীরে ধীরে আপন চতুঃসীমায় হরিতের শোভা প্রসারিত করছে। 'কাটা কুর্গনকে' এখন বলা হয় 'উজবেক সমুদ্র'।

সমরকন্দ কোনও এককালে একটি ক্ষুদ্র প্রাচীরবেষ্টিত জনপদ ছিল, এবং এর বয়স বোধকরি আড়াই হাজার বছরের কাছাকাছি। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে এই জনপদ আরবদের দখলে আসে, এবং আরব রাজকন্যা শাহারজাদী তাঁর সেই স্বপ্নময় 'এক হাজার এক রাত্রি' এখানেই যাপন করেছিলেন—সাহিত্য-জগতে যেগুলি "Arabian Nights" বলে পরিচিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চেঙ্গিস খান এখানে তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অতঃপর চতুর্দশ শতাব্দীতে তৈমুর এর অধিপতি হন। সমরকন্দের অধিবাসীদের তৎকালীন নাম ছিল 'সংদ'! বলশেভিক বিপ্লবের পর সমর-কন্দকে উজবেকিস্তানের রাজধানীতে পরিণত করা হয়েছিল। কিন্তু যোগাযোগ-রক্ষার সুবিধার জন্য তাসকন্দ নগরীর প্রাধান্যকে স্বীকার করা হয়। অনেকে বলে, সমরকন্দের মুসলীম জাতীয়তাবাদ ষ্টালিনের পক্ষে আতঙ্কের বিষয় ছিল, সেই কারণেই রাজধানীকে সরিয়ে আনা হয়।

প্রাচীন সমরকন্দ পাঁচটি প্রধান দ্রষ্টব্য সামগ্রীর জন্য প্রসিদ্ধ। প্রথম, মির্জা উলুগবেগ নির্মিত 'মানমন্দির'। দ্বিতীয়, 'গুর আমীর'। তৃতীয়, 'বিবি খানিম বা দেবী হানুম'। চতুর্থ, 'রেগিস্তান'। পঞ্চম, 'শাহি জিন্দা'।

আমাদের গাড়ি এসে থামল এক সংকীর্ণ গলিপথে,—যার আশেপাশে বনবাগান এবং প্রাচীন বস্তির জীর্ণা-বশেষ। এটি পুরনো শহরের একাংশ। সেই গলি থেকে একটি প্রস্তরময় সোপান-শ্রেণী পুরনো খিড়কির ভিতর দিয়ে সোজা এক-এক স্তরে উপরে উঠে গেছে। এটির নাম 'শাহি জিন্দা'। অর্থাৎ 'সম্রাট এখানে জীবিত'। কিন্তু কিছু নেই, কেউ নেই, —আছে শুধু গোটা কয়েক পায়রা, আর

আছে কয়েকটা গম্বুজ উপরে-উপরে, এবং ভিতরে ভিতরে জরাজীর্ণ ছোট ছোট মসজিদ। পাথরের নানা ফাটলে শুধু রয়েছে ধূলিধূসর গুল্মের চারা আর কাঁটালতা। এটি কবরভূমি, এবং এখানে তৈমুরের পিতৃপুরুষের প্রায় সকলেই সমাধিস্থ রয়েছে। তৈমুর নিজে এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই সমাধিক্ষেত্র তৈমুরেরও বহু আগে থেকে রয়েছে এবং এর অনেকগুলি অষ্টম শতাব্দীর। এখানে প্রফেট মহম্মদের আত্মীয় হোসেনের দেহাবশেষ রক্ষিত রয়েছে, এবং যে-বর্ণটির প্রতি তৈমুরের একটি স্বাভাবিক আসক্তি ছিল, সেই নীলাভ বর্ণের গম্বুজসহ একটি স্ফটিক ও এনামেল কাঁচ-নির্মিত মসজিদ এটির পাশে জরাজীর্ণ অবস্থায় আজও দাঁড়িয়ে। এই সমাধিভূমিতে মির্জা উলুগবেগ, তাঁর পত্নী ও পুত্রগণ এবং তাঁর আবাল্যের যিনি গুরু,—তাঁদের সকলের দেহ সুরক্ষিত রয়েছে। আমরা এখানে-ওখানে ঘুরে সেগুলি দেখছিলুম।

তৈমুরলঙ্গের প্রধানা মহিষী ছিলেন সম্ভবত একজন চীনা নারী। এই নারীর মৃত্যু তৈমুরের পক্ষে বিশেষ বেদনাদায়ক হয়েছিল। তাঁরই স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তৈমুর যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন, তারই নাম দেওয়া হয়েছে 'বিবি খানিম' বা 'দেবী হানুম'। এখানকার স্ফটিকপাথরের টালিগুলি অতি সুদৃশ্য। এদের ঔজ্জ্বল্য আজও ম্লান হয়নি। এর গঠন, নির্মাণকলা, অলঙ্করণ, এর খিলান এবং তোরণদ্বার—ভারতীয় মোগল স্থাপত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মনোরম শিল্পকর্মের দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল, দস্যুরাজ তৈমুরলঙ্গের মধ্যে একজন প্রকৃত শিল্পীর বাসা ছিল!

সমরকন্দ থেকে বছর পাঁচেকের জন্য ছুটি নিয়ে তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন। যাবার আগে তিনি 'রেগিস্তান' নামক একটি অঞ্চল নির্মাণ করার জন্য তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীকে নির্দেশ দিয়ে যান। এই কথা বলে যান, পাঁচ বছরের মধ্যে যদি সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ সুসম্পন্ন করা না হয়, তাহলে সবাইকে ধ'রে কোতল করা হবে! ভারতবর্ষের অপরিমেয় ধনদৌলতের কাহিনী অনেক দিন ধ'রে তাঁকে লুব্ধ ক'রে তুলেছিল, এবং তাঁর ভারত বিজয়যাত্রার কাহিনী নতুন ক'রে না বললেও চলবে। তৈমুরের ভারত আক্রমণ, দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যে তাঁর রাজধানী পরিবর্তন, তাঁর ভয়াবহ বর্বরতা— এগুলি ভারত-ইতিহাসে দুঃস্বপ্ন স্বরূপ! কিন্তু একক ব্যক্তির জীবনে তৈমুরলঙ্গ যে বিজয়যাত্রার ইতিহাস রেখে যান, সেটি একদিক থেকে আলেকজান্দার, চেঙ্গিস খান, নেপোলিয়ন ও একালের হিটলারও কল্পনা করেননি!

পাঁচ বছর পরে সমরকন্দে যখন তৈমুর ফিরলেন, তখন তাঁর প্রিয় 'রেগিস্তানের' কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তৈমুরের কালে এই রেগিস্তান ছিল সমরকন্দের শ্রেষ্ঠ অঞ্চল। সামনে এক বিরাট তোরণ, এবং তার সেই সুউচ্চ দৃশ্য মনে একটি সম্ভ্রম আনে। এর প্রত্যেকটি খিলান মোগল স্থাপত্যের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, এবং সেই মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলির আশেপাশে যখন ঘুরছিলুম, তখন দিল্লীর হুমায়ুন ও আকবরের কালের স্থাপত্যগুলির কথা মনে পড়ছিল। একথাটি স্পষ্ট, সমরকন্দ ও বুখারা চোখের সামনে না থাকলে দিল্লী বা উত্তর ভারতের মোগল স্থাপত্য এমন ক'রে দাঁড়িয়ে উঠত না!

'মাদ্রাসা' বিদ্যালয়গুলি আজও ইসলাম শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র এবং আরবি লিপি ও ভাষা এখানে বিশেষভাবে প্রচলিত। নগরের এই অংশে এলে মনে হয় না, কেউ সোভিয়েট যুগে বাস করছে! সমরকন্দ যে ইসলাম সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র,—এটি রেগিস্তানে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট অনুভব করা যায়। কামউনিজমের আওতা সত্ত্বেও মুশলিম জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রত্যয় এবং দৃঢ়তা সমরকন্দে বিশেষভাবেই প্রকট। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা এই, তৈমুর ধর্মান্ধ ছিলেন না, তিনি কোনও মসজিদে ঢুকতেন না, এবং মুসলমান ধর্মের পরোয়া করতেন না। তিনি তাঁর নিজের এবং সন্তান-সন্ততির নামের সঙ্গে কোনও প্রকার মুসলমান নাম বা পদবী সংযুক্ত করেননি।

রেগিস্তানের প্রাচীন স্থাপত্যের চারিপাশে চারটি সুনীল ও স্ফটিক নির্মিত মিনার আজও দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি ঈষৎ হেলানো। অতি দ্রুতভাবে নির্মাণকার্য সম্পন্ন করতে গিয়ে বনিয়াদের তলায় কিছু ফাঁক থেকে গিয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি পাছে ভেঙ্গে পড়ে এজন্য লৌহশৃঙ্খলের দ্বারা এটিকে 'ভারা'-র সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে! রেগিস্তানের প্রান্তর নানাবিধ রঙ্গীন স্ফটিক ও পাথরের টুকরোয় আকীর্ণ। রাজমিস্ত্রিরা কাজ করছে ওখানে বছরের পর বছর। ঐতিহাসিক স্থাপত্যশিল্প-রক্ষার একটি মস্ত আয়োজন চলছে সর্বত্র। ভারতের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড কার্জন বিগত ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দে গিয়ে এই রেগিস্তানের স্থাপত্যকলার অশেষ সুখ্যাতি করেছিলেন, এবং পরবর্তীকালে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে যে স্থাপত্যকীর্তি-রক্ষার জন্য একটি আইন বলবৎ করেন, সেটির জন্য, বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের অধিকাংশ বৌদ্ধ, হিন্দু, পাঠান ও মোগল স্থাপত্য বেঁচে যায়! ক্ষয় এবং লয়ের হাত থেকে কোনও সামগ্রীর নিস্তার নেই, সবাই জানে। কিন্তু অজ্ঞান ও অশিক্ষার জন্য পুরাকীর্তিকে নষ্ট করবার একটি বদ অভ্যাস অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। কাশীর এক শ্রেণীর সনাতনপন্থী হিন্দু এককালে সারনাথের বৌদ্ধ স্থাপত্যকীর্তির পাথরগুলি খুলে এনে কাশীর বহু ঘাটের নির্মাণকর্মে কিভাবে লাগিয়েছে তার চিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যায় গঙ্গার ধারে ধারে! লর্ড কার্জন ভারতীয় স্থাপত্যকে চরম দুর্গতির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন!

আধুনিক সোভিয়েট সমরকন্দের একান্ত পেরিয়ে যেখানে এসে পৌঁছলুম, সে-অঞ্চল কাশীর গৌরীগঞ্জ বা লাক্সা-র রামকুণ্ডের আশপাশের ধূলি-ধূসর বন-বাগানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেটি সেপ্টেম্বরের শেষ। রৌদ্রতপ্ত ধূসর মৃন্ময় প্রান্তর। কোথাও শিসম ও আখরোটের জটলা, কোথাও বা পরিচিত বটের ঝুরি নেমেছে। এক আধজন তরুণ তুর্কি বা পাঠান চলেছে এখানে ওখানে। এখানে এলে উত্তর প্রদেশের জন্য মনকেমন ক'রে ওঠে!

সামনেই 'গুর-এমীরের' বিশাল তোরণদ্বার। 'গুর-এমীরের' অর্থ সম্রাটের গোরস্থান! সম্রাট বলতে 'আমীর তৈমুর গুরোগণ' ছাড়া পৃথিবীর অপর কোনও সম্রাটকে বোঝায় না! শ্রীমতী অকসানার সঙ্গে এই বিশাল সমাধিসৌধের সুবৃহৎ প্রস্তরপ্রাঙ্গণে যখন এসে প্রবেশ করলুম, তখন দিল্লীর হুমায়ুনের কবর-প্রাসাদের কথাই মনে হতে লাগল। এই সমাধিক্ষেত্রে তৈমুরলঙ্গের দেহ সুরক্ষিত রয়েছে।

এই সুবৃহৎ সমাধিসৌধের চূড়াটির আকার তাজমহলের মতো। কিন্তু এর ঘননীল ও দ্যুতিমান স্ফটিকের ঔজ্জ্বল্য

চারিদিকের বিশাল শূন্যতাকে যেন অপূর্ব শোভায় সমৃদ্ধ ক'রে রেখেছে। এটি তুর্কিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়া! ভিতরে এই জনশূন্য, অলঙ্কারশূন্য এবং সর্বশূন্য অট্টালিকা দ্বিতল। যেমন ভারতের তাজমহল। উপর দিকে কৃত্রিম সমাধি, কিন্তু নীচেকার গর্ভে প্রস্তর-শিলার তলায় তৈমুরের মৃতদেহ রক্ষিত! শুধু তৈমুর নন্,—তাঁর পুত্র, পৌত্র এবং তাঁর জীবনের প্রধান গুরু ও শিক্ষকের। সম্রাটের দেহটি উজ্জ্বল কালো পাথরে ঢাকা! তৈমুরলঙ্গের মৃত্যু ঘটে ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৭০ বছর বয়সে,—যখন তিনি 'কাথে' নামক এক মঙ্গোলিয় রাজ্য-বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। যক্ষ্মারোগে তাঁর ধীরে ধীরে মৃত্যু ঘটে। তৈমুরের পাথরের উপরে লেখা, "আজ আমি বেঁচে থাকলে মানবজাতি ভয়ে কাঁপতো।" কথাটি শুনে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সেদিন হাসল!

প্রাসাদগর্ভের ছায়ান্ধকারে তৈমুরের মূল সমাধিকে কোলের কাছে নিয়ে একা বসে রইলুম কতক্ষণ! ওরা বাইরে গিয়ে আলাপ করছিল। প্রবেশপথের ফাঁকে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে,—বাতাসটি স্নিগ্ধ। একখানি মাত্র উজ্জ্বল কালো পাথরের তলায় যে-ব্যক্তি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, সেই ব্যক্তির একদা মৃত্যু ঘটেছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে। 'অৎরার' নামক এক পার্বত্য জনপদে কাঠের একটি বাড়িতে তিনি যখন মারা যান, তখন তাঁর প্রধানা মহিষী 'বিবি শিরাই মুলখ্ খানুমে' উপস্থিত ছিলেন,—এবং বাইরের প্রবল তুষারপাতের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন কয়েকজন ইমাম,—তাঁরা পবিত্র কোরাণের অংশবিশেষ পাঠ করছিলেন। মৃত্যুর ঠিক আগেও মৃদুকণ্ঠে সম্রাট তৈমুর বলছিলেন, "কঠিন হাতে তরবারী ধ'রে রেখো। ঘরোয়া বিবাদ বাধিয়ে সর্বনাশ ডেকে এনো না। 'কাথে' আক্রমণে পরাঙ্মুখ হয়ো না! ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।"

তৈমুরের সমাধির ঠিক পাশে রয়েছে শ্বেতপাথরের নীচে তাঁর বন্ধু ও গুরু 'মীর সৈয়দের' সমাধি। যে-কালো পাথরটির দ্বারা তৈমুরের দেহ আচ্ছাদিত, সেটি উপহার পাঠিয়েছিলেন জনৈক মঙ্গোল রাজকন্যা। এটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'নেফ্রাইট' পাথর। এই পাথরের ঠিক নীচে একটি দারুনির্মিত বাক্সের মধ্যে সাজ্জাজরি ও ব্রোকেডে সুসজ্জিত তৈমুরলঙ্গ শয়ান রয়েছেন। এককালে তৈমুরের মৃতদেহ নিরুদ্দেশ হয়, এমনি একটি সংবাদ রটে। অনেকে বলে, শত শত বছর পরে মরুভূমির এক জনশূন্য অঞ্চলে তৈমুরলঙ্গের সমাধি খুঁজে পাওয়া গেছে! এ সকল সংবাদ সত্য নয়। সম্ভবত সোভিয়েট আমলের প্রথম পত্তন-কালে গোঁড়া মুসলমানদের সঙ্গে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ বাধে। তখন এই মৃতদেহ আক্রান্ত হবার একটি আশঙ্কা দেখা দেয়, এবং এটিকে এখানে ওখানে নানা জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিগত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের কালে এই 'কফিনকে' একবার নিরুদ্দেশ করা হয়েছিল। অতঃপর রুশেরা একবার এই বাক্সটি খোলে এবং তৈমুরের কঙ্কালটি বার ক'রে তা'র মুণ্ডের এবং দেহের একটি 'ছাঁচ' তুলে নেয়! বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর পুনরায় যথাস্থানে সম্রাট তৈমুরের মৃতদেহ অবিকলভাবে পুনঃস্থাপনা করা হয়। সমরকন্দের প্রাচীন ব্যক্তিদের চোখে তৈমুরলঙ্গ আজও মহাপুরুষ!

তৈমুরের জন্মকাল ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দ। সেই যুগটি তৎকালীন 'গোল্ডেন হোডে'র' পক্ষে গৌরবোজ্জ্বল যুগ। কিন্তু এই 'গোল্ডেন হোর্ড'-কে ধ্বংস করে রুশ জাতির নিকট তৈমুর ত্রাণকর্তা হিসাবে পরিগণিত হন। কিন্তু তার জন্য কৃতজ্ঞতা আধুনিক সোভিয়েট আমলে কোথাও স্বীকৃত হয়নি! তাঁরা বলেন, ক্ষমতার লোভে দুই দল পশু হানাহানি ক'রে মরেছে মাত্র! উভয়েই পরস্বাপহারী, পররাজ্যলোভী। উভয়েই মানবজাতির শত্রু! কিন্তু তৈমুরের সাম্রাজ্যের আয়তন এবং বর্তমান কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত আয়তন,—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নয়।

তৈমুরলঙ্গের সমাধি-সৌধের দ্বারে পাথরের দেওয়ালে এই কয়টি কথা আরবী লিপিতে উৎকীর্ণ করা আছে,

"This is the resting place of the illustrious and merciful monarch, the most great Amir, the most mighty warrior, Lord Timur, conquerer of the Earth."

এরই পাশে অন্য দেওয়াল এবং খিলানগুলির ভগ্নাবশেষের গায়ে রুশীয় রাইফেলের গুলীর চিহ্ন প্রকট হয়ে রয়েছে। চিরযুদ্ধপ্রিয় সম্রাট তৈমুরলঙ্গের মৃতদেহের উপরেও যুদ্ধ ঘটে গেছে! বিগত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কবরের ভিতর থেকে তৈমুরের কঙ্কালটি যখন বার করা হয়, তখন তার একটি চলচ্চিত্র গ্রহণ করা হয়েছিল। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার সঙ্গে তৈমুরলঙ্গের সেই কঙ্কালটি দেখে সে-রাত্রে বিনিদ্র ছিলুম।

আধুনিক সমরকন্দ সম্পদে ও প্রাচুর্যে সমুজ্জ্বল। এক একটি বৃহৎ অট্টালিকা, মসৃণ সুন্দর রাজপথ, অগণিত পুষ্পোদ্যান, অনায়াসলভ্য আহার্য-সম্ভার, পণ্যবিপণির সচ্ছল সমারোহ, সুবেশা নরনারী,—এখানে প্রাচীন সমরকন্দ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে! এককালে এই সমরকন্দেরই উৎপন্ন 'ভুরা তামাক' আর 'চরস' ছিল অতি প্রসিদ্ধ, এবং সেই চরসের অতিমাদকতার প্রভাবে মস্তিষ্কের বিকার নিয়ে এই শহরেই পাগলের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক! তুর্কী ও পাঠানদের সাহায্যে এক শ্রেণীর ভারতীয় সমরকন্দের অত্যুগ্র সেই চরস এই সেদিনও ভারতে আমদানি করত। ভারতীয় অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীমহলে সমরকন্দের 'চরস' বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। সে যাই হোক, আধুনিক সমরকন্দের চেহারা অনেকটা নূতন তাসকন্দেরই মতো, তবে আকারে কিছু ছোট। এখন এখানে ৩ লক্ষ নরনারীর বাস। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসংখ্যা ১২ হাজার এবং এটি তুর্কিস্তানের প্রাতঃস্মরণীয় পাঠান কবি নাজামুদ্দিন

আলিশেরের নামাঙ্কিত। মেডিক্যাল কলেজে ২ হাজার ছাত্রছাত্রী। উচ্চ বিদ্যালয় এখানে ৪৪টি, কৃষি কলেজে ২ হাজারের বেশী ছেলেমেয়ে। এখানে গুটিপোকার চাষ এক বৃহৎ কর্মকেন্দ্র, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক রেশম এখানে উৎপন্ন হয়। এখানে কারিগরি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯টি। দুটি জাতীয় বৃহৎ রঙ্গমঞ্চ এখানে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সিনেমা হাউস ১৫টি। সমগ্র সমরকন্দ এখন ট্রেড ইউনিয়নে পরিপূর্ণ। এই পরগণায় এখন মোট ১৬১টি কলেকটিভ ফার্ম এবং ৫৫টি ষ্টেট ফার্ম একযোগে কাজ করছে। যেমন তাসকন্দে, তেমনি এখানেও—সারবন্দী সর্ববৃহৎ অট্টালিকাগুলির মধ্যে একটি হ'ল কমিউনিষ্ট পার্টির আপিস। সমরকন্দের প্রধান শস্য হ'ল চাউল, গম, ভুট্টা, এবং বহুবিধ শাকসব্জি। তুলার চাষ, ফলের উৎপাদন এবং গরু ও ভেড়া প্রতিপালন,—এদের প্রধান পেশা।

সমরকন্দ থেকে বিদায় নেবার কালে একথা মনে হয়েছিল, যতদিন এ নগরী বহির্জগতের নিকট অবরুদ্ধ ও দুস্তর ছিল, ততদিনই লোকমনে এটি ছিল একটি অবাস্তব স্বপ্নপুরীর মতো! আজ সমরকন্দের সঙ্গে কোনও রসকল্পনা জড়িয়ে নেই। চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ ছিল বলেই পৃথিবীবাসীর নিকট রহস্যময় ছিল! সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রকৃতির মধ্যেও এটি দেখা গেছে! ১৯৫৩ পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের চারিদিকে একটি দুর্ভেদ্য লৌহযবনিকা ফেলে রেখেছিলেন বলেই পৃথিবীতে এত ভয়, সংশয়, অবিশ্বাস এবং ঔৎসুক্যের উৎপত্তি ঘটেছিল! কিন্তু এর পরিণাম ভাল হয়নি! বৃহৎ পৃথিবীর মনে যে অবিশ্বাস ও আশঙ্কা তাঁরা বদ্ধমূল ক'রে রেখেছেন, সেটি অপসারণ করতে সময় লাগবে। আজ যখন তাঁরা সর্বত্র হাত প্রসারিত করছেন, তখন অনেকেই সেই হাতের সঙ্গে হাত মিলাতে কুণ্ঠিত হচ্ছে! এই গোপনীয়তার নীতি লেনিনের ছিল না!

আমুদরিয়ার পশ্চিমপার কারাকুম মরুভূমি, তথা তুর্কমেনিস্তান। পূর্বপার হল উজবেকিস্তানের অন্তর্গত কিজিলকুম মরুলোক, এবং বুখারা অঞ্চল। সমরকন্দ থেকে রেলপথ চলে এসেছে পশ্চিমে বুখারায়। বুখারা অতি প্রাচীন এবং দু'হাজার বছরেরও বেশি তার বয়স। বুখারা ইসলাম সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ এবং তীর্থস্থান। বুখারা চিরদিন সামন্ত নরপতির হাতে ছিল। এখানে

"ওঃ ব্যাটা যেন মহা শূন্যের স্পুৎনিক!!!"
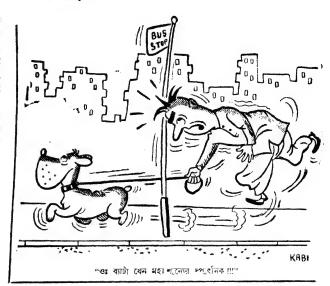
পরবর্তীকালে সনাতনী মুসলমানদের প্রভুত্ব ছিল প্রবল এবং ধর্মের গোঁড়ামির জন্য বুখারা ছিল প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন তীর্থনগরী যেমন হয় এটিও তেমনি। একদিকে ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্যের আড়ম্বর, অন্যদিকে দেশজোড়া ভিখারীর দল। একদিকে ধূপ দীপ চন্দন পুষ্প আতর গোলাপের ছড়াছড়ি, অন্যদিকে ইতর অসভ্য নোংরা ও পঙ্কিল জীবনযাত্রা, এবং সর্বপ্রকার দুষ্ট ব্যাধি ও বিকারের আড়ৎ! একদিকে ষড়ৈশ্বর্যশালিনী পরমাসুন্দরী বেগমের দল গোলাপগন্ধী জলাধারে স্নানরতা, অন্যদিকে অবমানিত ক্রীতদাসী সম্প্রদায়ের অর্ধাসনে দিনযাপন! বুখরা নগরী নানা বিষয়ে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তার মধ্যে প্রধান হল এর স্থাপত্যকলা। এর মিনার, গম্বুজ, মসজিদ, এবং বিবিধ প্রাচীন শিল্পকলা, সূচীশিল্প, কারুকলা, চিত্রসম্পদ, অঙ্কনবিদ্যা, অলঙ্করণ,—মুশলিম শিল্প ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে।

ভারতের প্রাক্তন বড়লাটগণের অধীনে যেমন এককালে হায়দরাবাদের নিজাম বা ভূপালের নবাব ছিলেন, তেমনি রুশ সম্রাটগণের প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারলের অধীনে থাকতেন "হিজ হাইনেস আমীর অফ বুখারা" বা "হিজ এক্সল্টেড্ হাইনেস খান অফ খিবা"। এই বুখারা ও খিবার শাসনকর্তারা ১৯১৭-১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে একদা ভারত-শাসক ইংরেজের সাহায্য পেয়ে জাতীয়তাবাদী দলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিল! ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি ম্যালিসন ২০ হাজার পাঠান সৈন্যসহ বুখারার আমীরকে সশস্ত্র 'সহায়তা' করতে যান্। কিন্তু তৎকালে লেনিনের নির্দেশক্রমে মিখাইল ফ্রুনজ্, ভ্যালেরিয়ান কুইবিশেভ এবং কগানভিচ,—এঁরা আপন আপন সৈন্যদলসহ ইংরেজ সেনাদলের পরাজয় ঘটান। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বুখারা, খিবা, সমরকন্দ, ফারগানা—প্রভৃতি ওয়েসিস পরগণার খাঁন ও আমীরগণের প্রভুত্বকালের অবসান ঘটে। অবশেষে মিঃ কালিনিন এসে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে উজবেকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম পত্তন করেন। চারটি 'স্বাধীন' রাষ্ট্রে সমগ্র তুর্কিস্তানকে ভাগ করে দেওয়া হয়।

প্রাচীন বুখারা ও খিবা আজও প্রাচীন, কিন্তু একালে আর স্বেচ্ছাচার নেই। সেই মিনার-মসজিদ-গম্বুজ, সেই ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজও অব্যাহত রয়েছে,—কিন্তু সেই উগ্রতা এবং কদাচার নেই! সমাজজীবনে মূঢ়তা এখন কম। শিক্ষা হয়ে উঠছে আধুনিক। এককালে চর্বির বাতি এবং ভিস্তির সরবরাহ-করা পানীয় জলে বুখারার জীবন চলত, যেমন চলত এককালের কলকাতায়,—আজ জারফশানের প্রচুর জলে এবং ইলেকট্রিকের আলোয় বুখারা প্লাবিত! এই সুপবিত্র নগরীর আধুনিক প্রশস্ত রাজপথে একে একে উঠে দাঁড়িয়েছে অট্টালিকাশ্রেণী। আগেকারকালে গোরস্থান, ধর্মীয় মাদ্রাসা বিদ্যালয়,

আমীরদের বিভিন্ন প্রাসাদ ও জমিদারী, বাজার হাট,—এদের পেরিয়ে জনসাধারণের বাস ছিল মাটির ঘরে, ঝোপড়ায়, বস্তির দুর্গন্ধের আশেপাশে,—আজ সেই চেহারা বদলিয়ে গিয়েছে! বুখারায় প্রাচীন ও নবীন যুগ এখন একত্র মিলেছে। এই নগরের রাস্তাঘাটে 'চায়খানা' আজ কথায় কথায়। এককালে সমগ্র শহরে পানীয় জল সংরক্ষণের জন্য মোট ৮৫টি প্রস্তর জলাধার বা 'হজ' নির্মাণ করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি রোগের বীজানু ছড়িয়ে দিত। এদিকে যেমন সমরখন্দ সমুদ্র-সমতা থেকে দুই হাজার ফুট উঁচু, বুখারার উচ্চতা তেমন ৪৫ ফুটের বেশি নয়।—ফলে এই হজ্-গুলিতে যে-জল জমত, সে-জল দুষ্ট দুর্গন্ধে ভরে থাকত। বুখারায় আজ সেই সমস্যা নেই। এখানকার রেগিস্তানও মনোরম এবং বনবাগানভরা। বৃহৎ ওয়াটার-টাওয়ার, ফলবান বৃক্ষরাজি, স্বচ্ছসলিল হ্রদ, পরিভ্রমণের জন্য উদ্যান,—এগুলি মরুলোকের মাঝখানে পরম স্নেহচ্ছায়ার মতো পাওয়া যায় বলেই এগুলি পরম মূল্যবান।

'সামানিদ ইসমাইলের' সমাধি-সৌধ বুখারার প্রধান আকর্ষণ,—যেমন আকর্ষণ বুখারার কার্পেট এবং মীনাকরা বাসন-পত্রের! দশম শতাব্দীর সামানিদ বংশের সমাদর ছিল প্রচুর। এঁদের একটি পুরাতন পুঁথি সংরক্ষণের পাঠাগার এখনও পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। এই পাঠাগারে তৎকালে দুজন কবি ও মনীষী কাজ ক'রে গেছেন। একজন তাজিক কবি রুদাগি, এবং অন্যজন আবু আলি ইবন-সিনা,—যিনি এককালে সমগ্র ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে 'অভিসেন' নামে পরিচিত হন। বিগত ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রেডেরিক জোলিয়ট কুরী একটি আবেদন প্রচার ক'রে পৃথিবীর সকল দেশকে 'অভিসেনের' এক হাজার বছরের জন্মবার্ষিকী পালন করতে বলেন! 'অভিসেনের' নামে একটি বৃহৎ পাঠাগার ও মাদ্রাসা বুখারার অপর একটি আকর্ষণ। এই পাঠাগারের বর্তমান নাম, 'আবু আলি ইবন-সিনা লাইব্রেরী'। এখানে মহাপ্রাচ্যের বহু দেশের শত শত বছরের পুরাতন পুঁথি, কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে। এই বুখারার একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সঙ্গীত-রচয়িতা 'সখতার আশ্রফির' সঙ্গে আমার বিশেষভাবে আলাপ হয়। এব্যক্তি সমগ্র উজবেকিস্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার বলে পরিচিত। ইনি একটি 'হেরোয়িক সিমফনির' স্রষ্টা, এবং সেজন্য এককালে সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন!

মধ্যএশিয়ার বিশাল মরুলোকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানা শ্রেণীর জন্তু জানোয়ারের বংশপরম্পরা আজও চোখে পড়ে। একপ্রকার অতিকায় গিরগিটি শত্রু দেখলে চিৎকার করতে থাকে। আরেক রকম আছে যাদের শ্বেতবর্ণ দেহ ঘননীল হয়ে ওঠে ক্রোধপ্রকাশের কালে। তাদের সমগ্র দেহ শত্রুদর্শনে ঠকঠক ক'রে কাঁপে। এক সময় তা'রা বালুর তলায় অদৃশ্য হয়। ছোট এক প্রকার চতুষ্পদ জন্তু হঠাৎ মুখ তুলে যখন তাকায়, তখন তাকে চামড়ার চশমাপরা মানুষের মুখের মতো দেখতে হয়! একপ্রকার তাড়কা-পক্ষী বীভৎস দেহ নিয়ে ডানা খুলে দৌড়তে থাকে,—তারা কিন্তু উটপাখী নয়! পীত-রক্তিমবর্ণ একপ্রকার হরিণ ভূতের মতো সামনে ছুটে পালায়। এসব জানোয়ার আজও কোনও দেশের চিড়িয়াখানায় জায়গা পায়নি!

দশম শতাব্দীতে বুখারা বারম্বার বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। মধ্য-এশিয়ার সর্বপ্রধান শাস্ত্রচর্চার এই কেন্দ্রটি চেঙ্গিস খাঁন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধ্বংশ করেন এবং অধিকাংশ আরব অধিবাসী তাঁর হাতে নিহত হয়। এই বুখারাতেই খৃষ্টপূর্বকালে দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজান্দার একটি সিংহের সহিত মল্লযুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই বুখারার বাজারে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ অবধি মেয়ে এবং পুরুষ ক্রীতদাস সস্তাদরে বিক্রি হত! একটি মেয়ের দাম একটি মেয়ে-ঘোড়ার দামের অর্ধেক ছিল। আমীরের আমলে এখানে অপরাধীর শাস্তি ছিল, অনেক উঁচু থেকে তাকে একটি বিষাক্ত কীটময় গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া। অতঃপর সেই সংখ্যাতীত কীটের দল অল্পে-অল্পে তিলে-তিলে অপরাধীকে খেয়ে ফেলতো! বুখারার সর্বশেষ আমীরের হারেমে ৪ শত সংখ্যক সুশ্রী যুবতী ও কিশোর বালককে পাওয়া গিয়েছিল! কিন্ত এই আমীরের শাস্তি কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষের হাতে কি প্রকার হয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও তা'র খবর পাইনি!

বুখারার ভগবৎ বিদ্যালয় এবং ফাঁসির চূড়া প্রায় একইকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফাঁসির চূড়াটি বানানো হয় পরে—দ্বাদশ শতাব্দীতে। এটির নাম, 'মানারি-কাল্ভিয়ান', অর্থাৎ মৃত্যুশিখর, 'টাওয়ার অফ ডেথ্'। এই আকাশচুম্বী মিনারের শিখর থেকে অপরাধীকে টুসকি দিয়ে নীচেকার পাথরের উপরে ছুড়ে ফেলা হত! এইটি ছিল বুখারানদের 'গৌরবের' বস্তু! এ সকল বর্বরতার আজ অবসান ঘটেছে। যারা এককালে ধর্ম ও সমাজের নামে নিরুপায় নরনারীকে এইভাবে শাস্তি দিত, তাদের বিচার যথাসময়ে হয়ে গেছে। আজ বুখারা তার প্রাচীনকালের সমস্ত গৌরব ও সম্পদসহ তার মণিরত্ন-খচিত মসজিদগুলি নিয়ে মধ্যএশিয়ার মধ্যমণির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, কিন্ত সেই মসজিদে ঢুকে যারা নমাজ পড়বে তাদের সংখ্যা ও সময় একালে কম। দু'হাজার বছরের প্রার্থনা বোধ হয় মিথ্যে হয়নি! মধ্যএশিয়া ওদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে! দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নিরুপায় দারিদ্র্য, ধর্মান্ধতা ও বর্বরতা,—এরা পাশাপাশি বাস করে!

ফিরে এলুম আবার তাসকন্দে। এখানে আসামাত্রই আমাদের প্রিয় লেখক বন্ধু এহসান নিয়ে গেলেন 'বাপান' সিনেমায় জাতীয় 'কবি ফুর্কাতের' ছবিটি দেখার জন্য। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের বৈশিষ্ট্য এই, প্রাচীন ইতিহাসের গৌরবগুলিকে তাঁরা সকল সময়ে জনসমক্ষে তুলে ধরতে চান। ভয়, বীভৎসতা, গোয়েন্দার চাতুরি, যৌন আবেদন, সামাজিক নোংরামি, অহেতুক উৎপীড়নের দ্বারা মেয়েদেরকে কাঁদানো,—এগুলি তাঁদের ছবির বিষয় নয়। কবি ফুর্কাত ১৯ শতাব্দীতে আপন দেশপ্রেমের জন্য জারের প্রতিনিধিগণের দ্বারা অতিশয় উৎপীড়িত হয়েছিলেন। তাঁর প্রিয়তমা ছিল একটি উজবেক মেয়ে। কিন্তু তাঁর প্রকৃতির সরলতা ও মাধুর্যের গুণে জনৈক রুশ নারীও তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। কবি ছিলেন আদর্শবাদী এবং সমাজসেবক। অধোগত সমাজ ও দারিদ্র্য-দৈন্য-পীড়িত জীবনের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করতে গিয়েছিলেন। রুশ-নারীটি তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কবি ফুর্কাত উজবেক মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্য মরুভূমির ভিতর দিয়ে যখন দেশত্যাগ করছিলেন, তখন মেয়েটির মৃত্যু ঘটে! ফুর্কাত তাঁর ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় ভারতে আসেন। অবশেষে চীন দেশে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এ ছবিটির মূল প্রকৃতির মধ্যে 'প্রচারকার্য' থাকলেও এটি দেখে আনন্দ পাওয়া যায়।

শ্রীমতী অকসানা আমার 'কন্যা ও জামাতা' শ্রীমতী সোয়েৎলানা ও ভাদিন কুর্বানিকভের নিকট খবর পাঠিয়েছিলেন। সকালের দিকে আমি 'শার্ক' হোটেলের নীচে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলুম। এক বছর পরে লানাকে আর ভাদিনকে দেখলুম। লানা দূর থেকে আমাকে দেখে ছুটতে ছুটতে আসছিল, কিন্ত হাত দশেক দূরে থেকে একেবারে ঝাঁপিয়ে এল আমার দুই হাতের মধ্যে! আমি পরদেশী এবং ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার লোক, কিন্তু আমি 'পিতা'! লানা যখন গলগলিয়ে কথা বলতে লাগল, শ্রীমতী অকসানা বললেন, আপনার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলেছে! আমি আর কোনওদিন এমন মুগ্ধ হইনি!—ভাদিনকে আমি আলিঙ্গন করলুম।

তোমার বাচ্চা কই, লানা?

লানা খুশী হয়ে বলল, দুপুরবেলায় আপনার কাছে আনব।

কী আনন্দ এবং কী উচ্ছ্বাস লানার মুখে চোখে! একদা আমি তার শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলে গিয়েছিলুম, সেগুলি একে একে সে পুনরুক্তি করল।

দুপুরবেলায় আমি একটি রাঙ্গা ঝুমঝুমি এক রুবল দিয়ে কিনে রেখেছিলুম। কলকাতায় তার দাম দু'আনার বেশি নয়। লানা যখন তার শিশুপুত্রকে কাঁধে ক'রে নিয়ে এল, বেলা তখন তিনটে। রৌদ্র তখনও টা টা করছে। 'দৌহিত্রকে' আমি কোলে নিয়ে ঝুমঝুমি হাতে দিলুম। তারপর হোটেলের একান্তে বসে যখন কথাবার্তা আরম্ভ করলুম, তখন সেই আলাপে আর যাই থাক্, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ভারত বা সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ ছিল না! বাচ্চাটির যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমনি শ্রী। আমি তাকে কোলে নিয়ে বসলুম। ছেলেটির বয়স ৬ মাস উৎরে ৭ মাসে পড়েছে! লানা ঠিক যেন এসেছে বাপের বাড়ি, এবং সেখানে শ্বশুরবাড়ির গল্পই প্রধান। কিন্তু সেই গল্প আমার অতি পরিচিত। সেখানে রুশ এবং ভারতীয় সমাজের পার্থক্য কোনকালেই নেই। লানা মধ্যবিত্ত ঘরের বউ। সেখানে আনন্দ ও বিষাদ দুই বর্তমান। সেখানে যদি তার শাশুড়ীর পক্ষপাতিত্ব কোন-দিকে থাকে, দেবর যদি স্ত্রৈণ হয়, যদি খরচপত্র নিয়ে কথা ওঠে, সম্ভাব থাকতে থাকতে যদি কোনও পক্ষ আলাদা হয়ে যায়,--তবে এসব কাহিনীর মধ্যে আমি নিজের সমাজকেও দেখি! লানার অভি-যোগ, ভাদিন বড্ড উদাসীন, একটু বেশি ভদ্র। বাচ্চাটা হবার পর যে সমস্ত ছোট ছোট সমস্যার কথা ওঠে—সেদিকে ভাদিনের চোখ নেই! ছোট দেবরের বয়স মাত্র ১৯, কিন্তু সে বিয়ে ক'রে বসল ২৬।২৭ বছরের একটি মেয়েকে। তর্ক বাধে নতুন বউ আর শাশুড়ীর মধ্যে। তা ছাড়া ওবাড়িতে জায়গা একটু কম। আমরা দুজন ওবাড়ি থেকে চ'লে এসেছি। লানা আমাকে ঠিকানা দিয়ে বলল, আসুন একদিন আমাদের কাছে। আমি নিজে রাঁধব আপনার জন্য। না না, ভাববেন না, আমি একজন রাতদিনের ঝি রেখেছি, সে খাওয়া-পরা আর মাইনে পায়।

অনেকক্ষণ ছিল লানা। বাচ্চাটা আমার কোলের মধ্যে যেন তার পরি-চিতের আস্বাদ পাচ্ছিল। লানা বলল, ছেলেটা হবার পর খুব ভুগেছিলুম, আপনার সঙ্গে দেখা হবার আশা ছিল না। আবার যখন আসবেন, আমাদের কাছে থাকবেন কিন্তু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এখন আর 'কাজ' করিনে!

ঘণ্টাখানেক লানা ছিল। তারপর ছেলেটাকে কাঁধে নিয়ে আমিই তাকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিলুম। সেই নিরি-বিলি পথে একসময়ে বাচ্চা নিয়ে সে যখন দূরে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল, তখন চিরকালের পিতার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল! (ক্রমশঃ)

ডাকপিওনের কাজে ইলেকট্রনিক যন্ত্র

মানব সমাজ নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আজ আর আবদ্ধ নয়। পরিচিতের সংখ্যা দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে দিনের পর দিন। এই পরিচয়কে সজীব রাখবার উপায় হচ্ছে চিঠিপত্রের মাধ্যমে পারস্পরিক সংবাদ আদানপ্রদান। উন্নত দেশগুলিতে বিদেশী মানুষের ভীড় হচ্ছে অসম্ভবরকম। ফলে দেশী ও বিদেশী চিঠির চাপরে পড়ে পোস্টাফিসগুলি প্রতি মুহূর্তেই চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সময় কাটাচ্ছে। চিঠির বন্যার ঠেলায় পশ্চিম জার্মানীর ডাকবিভাগ ভেসে যাবার যোগাড় হয়েছে। রোজ কম করে ত্রিশ মিলিয়ন চিঠি ও পার্শেল বিলি করতে হয়। গত দশ বছরে চিঠির সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। এই পর্বতপ্রমাণ চিঠিপত্র লোক দিয়ে বাছাই করা দিন দিন মুশকিল হয়ে উঠছে বলে, রোবট দিয়ে কাজ করবার কথা হচ্ছে।

পশ্চিম জার্মাণীর বড় ডাকঘরে আজকাল বহু কাজ করা হয় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে। যেমন, দূরপাল্লার টেলিফোনে আপনা-আপনি ডায়লিং, টেলেক্স ব্যবস্থা অর্থাৎ বেসরকারী টেলি-টাইপিং যেটির চলন পশ্চিম জার্মাণীতে খুব বেশী। শীঘ্রই একটি ইলেকট্রনিক চিঠি বাছাই যন্ত্র চালু হবে। এই পরিবর্তন আনার জন্যে পশ্চিম জার্মাণীর ২৪,০০০ পোস্টাফিসগুলিকে বিশেষ পরিচায়ক সংখ্যায় চিহ্নিত করা হবে এবং ঐ চিহ্নিত সংখ্যার তালিকা রোবটের লেখা অভিনন্দন-পত্রের সঙ্গে পশ্চিম জার্মাণীর আঠারো মিলিয়ন বাড়ীতে জানানো হবে।

মিউনিখ ও ডার্মস্টাড শহরের পোস্টাপিসে দুটি ইলেকট্রনিক চিঠি বাছাই যন্ত্র ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে ও সে দুটিতে বেশ সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে। এর সমস্ত কৃতিত্বের মূলে রয়েছেন পোস্টাপিস ও টেলি কমিউনিকেশন বিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিঃ স্টুয়েকলেন। প্রথম পর্বে এই যন্ত্রের কাজ, বড় বড় ও মোটা মোটা চিঠিপত্রগুলিকে আলাদা করা। পরে মানুষের সাহায্যে সেগুলি যথাস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। রোবট মাত্র আধ ইঞ্চি পর্যন্ত মোটা চিঠি ঠিকমত বাছাই করতে পারে। ফলে এখন থেকে চিঠি লিখতে হবে নির্দিষ্ট মাপের খামে নির্দিষ্ট ওজনের কাগজে। পোস্টাপিসগুলিকে চিহ্নিত করার কারণও তাই কেননা রোবটের ইলেকট্রনিক মগজ নির্দিষ্ট কয়েকটি মাত্র সংখ্যা পড়তে পারে।

প্রাথমিক বাছাইয়ের পর, অন্য একটি যন্ত্রের সাহায্যে চিঠিগুলিকে এমনভাবে সাজান হবে যাতে সব চিঠির ঠিকানা লেখা পিঠ ওপর দিকে থাকে। এই কাজের সুবিধার জন্য এখন থেকে চিঠির ডাকটিকিট জ্বলজ্বলে কাগজে তৈরী হবে। এরপর একটি কনভেয়ার লাইনের ওপর দিয়ে চিঠিগুলি একজন কর্মচারীর কাছে পৌঁছাবে। তিনি সব চিঠির ওপর একটি অদৃশ্য চুম্বক চিহ্ন দিয়ে বিভিন্ন পোস্টাপিসের পরিচায়ক সংখ্যা দেবেন। এর পর শেষ বাছাই যন্ত্রই পরিচায়ক সংখ্যা অনুযায়ী চিঠিগুলিকে পৃথক করবে। বর্তমানে এই যন্ত্র ঘণ্টায় ২০,০০০ চিঠি বাছাই করতে পারে।

প্রত্যেক ব্যাপারে নতুনত্ব মানেই খরচ। আর ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মত জটিল ব্যবস্থা হলে তো কথাই নেই। এই ডাকের মাশুল বাড়াতে হয়েছে। আগামী দশ বছরে বড় বড় ৪৫টি পোস্টাপিসে মোট ২৫০টি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বসানো হবে। ভবিষ্যতে এক একটি যন্ত্রে একলাখ চিঠি দিনে বাছাই করা যাবে।

সবচেয়ে উঁচু অফিসবাড়ি

ওষুধ কেনার ব্যাপারে অনেকে নিশ্চয়ই বেয়ার কোম্পানীর নামের সঙ্গে পরিচিত। আসলে এই জার্মাণ প্রতিষ্ঠানের পুরো নাম ফারবেনফাব্রিকেন বেয়ার এজি। সম্প্রতি পশ্চিম জার্মাণীর লেফেরকুশেন শহরে এদের ৩৫ তলা প্রশাসনিক ইমারতের কাঠামো শেষ হয়েছে। নিউইয়র্কের স্কাই স্ক্রেপারের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলেও, এই অঞ্চলে গির্জার চূড়া বাদ দিলে এই বাড়ীটিই সবচেয়ে উঁচু।

এক বছরের মধ্যে কাঠামো শেষ করে, তাতে প্রিফেব্রিকেটেড কংক্রীটের ফলক লাগিয়ে চারদিক এলুমিনিয়ামের পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে মোট ৪৬০০ টন ইস্পাত লেগেছে। গোটা কাঠামোটি ২৪টি থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে থেকে দেখতে ভারি সুন্দর। বিশেষ ইস্পাতের কাঠামো তৈরী করায় এর দেওয়াল ও তলাগুলি খুব পুরু করতে হবে না। বাড়ীর দেওয়াল হবে অগ্নিনিরোধক ইঁট দিয়ে তৈরী এবং ভিতরের দেওয়াল, পার্টিশন ইত্যাদি নতুন হাল্কা মালমশলা দিয়ে তৈরী হবে যাতে কাজের সুবিধা অনুযায়ী সেগুলি দরকার মত অদলবদল করা চলে।

লোকের ওঠানামা, চিঠি, নথিপত্র ইত্যাদির আনাগোনা সব স্বয়ংক্রিয় লিফট্ মারফৎ সারা হবে। ভূগর্ভে কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে ইমারতের সঙ্গে পোস্টাফিসের যোগাযোগ থাকবে যাতে সরাসরি চিঠিপত্র বিলি করা চলে। তাছাড়া সুড়ঙ্গ পথে এই প্রশাসনিক ইমারতের সঙ্গে বেয়ার কোম্পানীর কাছাকাছি অন্যান্য অফিসেরও যোগাযোগ থাকবে। এই বাড়ীতে মোট যে ২৭৭২ জানালা থাকবে, সেগুলি আজকালকার কায়দায় তৈরী হবে, যাতে রোদ না ঢোকে অথচ আলো আসে। জানালার সার্সি আটকানোর জন্য রোলামের বদলে নতুন ধরণের কৃত্রিম রবারের মিশ্রণ লাগানো হবে। জানালা অবশ্য খুলতে হবে না। কেননা পুরো বাড়ীটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হবে। আলো, টেলিফোন ইত্যাদির সব তার অদৃশ্যভাবে লাগানো হবে। অথচ প্রত্যেক টেবিলের নীচে আলো ও টেলিফোনের সুইচ থাকবে। মজার ব্যাপার যে, কর্মচারীদের হাতমুখ ধোবার জন্য তরল সাবান সরবরাহ হবে সব ওপরতলার একটি ট্যাঙ্ক থেকে।

এই বছরের শরৎকালে বাড়ীটি সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে যাবে। তারপর বেয়ার কোম্পানীর ২২০০ জন কর্মচারী পশ্চিম জার্মাণীর সবচেয়ে উঁচু অফিসে বসে কাজ করবে। বেয়ার কোম্পানীর অগুন্তি কর্মচারীর মধ্যে এরাই ভাগ্যবান বলতে হবে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কয়েক মাস যেতেই বিমলা বুঝতে পারল, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তারা ভুল করেছে। বিমান পুরুষমানুষ; তার চোখে পড়বার কথা নয়, কিন্তু মেয়েমানুষের চোখ নিয়ে সেও তো ধরতে পারেনি। যে-গাছের মূলে কীট এসে বাসা বেঁধেছে, ফাগুনের সাড়া পেয়ে সেও নতুন পাতা মেলবার চেষ্টা করে। তারপর ধীরে ধীরে সে ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে যায়, শাখা-প্রশাখায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্ষয়ের চিহ্ন। যারা তার ক্ষণিক বিকাশের মধ্যে আনন্দের বার্তা খুঁজে পেয়েছিল তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। আরো বুঝতে পারে, ঐ পাতা মেলার মধ্যে একটা ব্যর্থ-প্রয়াসের করুণ ইতিহাস লুকিয়ে আছে। সে বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু পারছে না। মূলে বসে বিষ তার জীবন-রস শুষে শুষে নিচ্ছে।

সে লক্ষণ বিমানের চোখেও ধরা দিল। স্ত্রীকে বলল, সুরমার শরীরটা তো সারছে না। অসুখটা কী বল দিকিন?

বিমলা কী একটা করছিল। সেই দিকে চোখ রেখেই সংক্ষেপে জবাব দিল, সে তোমরা বুঝবে না।

বিমান সহজবুদ্ধি সরল মানুষ। এ ক্ষেত্রে সাধারণ সমাধান বলে যা তার মনে হল, তাই প্রকাশ করল, 'আলো তো এখন একটু বড় হয়েছে। ওদের এবার বিজুর কাছে পাঠিয়ে দাও। চিঠি লিখে দাও, দু'চারদিনের জন্যে এসে নিয়ে যাক।'

স্ত্রী সাড়া দিচ্ছে না দেখে যোগ করল, তুমিও না হয় ঘুরে এসো ঐ সঙ্গে। দরকার হলে কিছুদিন থেকে—

এবার বিমলা মুখ তুলল। স্বামীর বক্তব্য শেষ হবার আগেই গম্ভীর মুখে বলল, টেলিগ্রামের কাগজ আছে তো?

—টেলিগ্রাম কী হবে? চিঠি লিখে দাও না? দুদিনে পেয়ে যাবে।

—না, না; সেজন্যে নয়, তোমার জন্যে বলছি।

—আমার জন্যে!

—আমাকে যেতে বলছ কিনা। পৌঁছনো পর্যন্ত তর সইবে তো? না, তার আগেই—"কণ্ডিশন হোপলেস্; কাম্ অ্যাট্ ওয়ান্স্"?

বিমান হেসে উঠল। তারপর বলল, তা, আমি কী করবো? আঁচলের তলায় রেখে রেখে অবস্থাটা যে সত্যিই হোপ্‌লেস্ করে তুলেছ।

স্বামী যে প্রস্তাব করলেন, সে কথাটা বিমলাও কিছুদিন থেকে মনে মনে ভেবে দেখছিল। এবার সরাসরি প্রকাশ করল সুরমার কাছে। সে প্রথমটা চমকে উঠল। জা-এর মুখের দিকে চেয়ে বোধহয় বুঝতে চাইল তার মনের কথা। তারপর ম্লান হেসে বলল, তাড়াতে চাইছ বুঝি?

—চাইছিই তো। আর কতদিন জ্বালাবি আমাকে? এবার যার বোঝা, তার ঘাড়ে গিয়ে চাপো।

সুরমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। বাইরে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। বারান্দার রেলিং ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। আরো কিছুক্ষণ সেইভাবে দূরে কোন অলক্ষ্য বস্তুর দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, যেদিন বুঝবো, সত্যিই জ্বালাচ্ছি তোমাকে আলো আর আমি সত্যিই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি তোমাদের কাছে, সেদিন নিজেই চলে যাবো, তোমাকে বলতে হবে না।

বলতে বলতে দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বিমলা সরে এসে আঁচলের কোণে মুছিয়ে দিয়ে বলল, ছিঃ ছিঃ ভর-সন্ধ্যেবেলা ঐ সব অলক্ষুণে কথা মুখে আনে কেউ?

একটা জিনিস স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করল বিমলা। বিয়ের পরে যে-সুরমা স্বামীর সঙ্গে প্রথম ঘর করতে গিয়েছিল, তার থেকে আজকের এই সুরমার অনেক তফাৎ। সেদিন তার মধ্যে অনীহা ছিল, আগ্রহের অভাব ছিল, কিন্তু অমত বা অনিচ্ছার তীব্রতা এমন প্রবল হ'য়ে ওঠেনি। সেদিন সেটা ছিল ঘটনা-প্রবাহের কাছে অনুৎসুক আত্মসমর্পণ, আজ তাকে রোধ করবার কঠিন সংকল্প।

এর পর কানপুর এবং মধ্যপ্রদেশের মধ্যে যে-সব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতে লাগল, তার ভিতরে উভয় পক্ষের মামুলী কুশল-প্রশ্নাদি ছাড়া সুরমার ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ রইল না। কিন্তু দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার ফলে বর্তমান ব্যবস্থাও দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না। মায়ের অসুখের খবর পেয়ে সুরমাকে যেতে হল বাপের বাড়ি, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর বিমলার মা এসে আশ্রয় নিলেন মেজোমেয়ের কাছে। সুরমা আর কানপুরে ফিরে এল না, বিমলাও তাকে আনবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল না। হয়তো তার মূলে তার মায়ের উপস্থিতির খানিকটা যোগ ছিল। কে জানে, সেটা শুধু এ তরফে নয়, ও তরফেও।

আলো চার বছরে পড়ল। এই দীর্ঘ সময়টা সুরমা বেশীর ভাগ মায়ের কাছেই কাটিয়েছে। মাঝে মাঝে দু'চারদিনের জন্যে শাশুড়ীর কাছেও থেকেছে। তাঁর শরীর ভাল নয়, বড়বৌ তার নিজের কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত। তাই ইচ্ছা থাকলেও ওদের বেশীদিন ধরে রাখতে পারেননি, কখনো দু'এক বেলা সঙ্গে নিজেই গরজ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নাৎনীটি দিদিমা-অন্ত প্রাণ। সেজন্যে তাঁর মনে একটু গোপন অভিমান ছিল। অথচ করবার কিছু নেই। পুত্র যেখানে থেকেও নেই, সেখানে পৌত্রীর উপর জোর খাটাবেন কার জোরে? বৌকেও তাই আপনার বলে কাছে টেনে নিতে পারলেন না। তার শীর্ণ-মলিন মুখখানার দিকে চেয়ে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হত। এই মেয়েটার চরম দুঃখের জন্যে তিনিই যেন দায়ী। ছেলের উপর দারুণ অভিমানে বুক ভরে উঠত। মুখ ফুটে বৌকেও কোনোদিন বলতে পারেননি চল বৌমা, তোমাকে বিজুর কাছে রেখে আসি; তাকেও একবার লিখতে পারেননি, ওদের এসে নিয়ে যা।

এই ক্ষোভ বুকে করেই একদিন তিনি চোখ বুজলেন। টেলিগ্রাম পেয়ে বিজন যখন এসে পৌঁছল, তখনো তাঁর স্পষ্ট জ্ঞান ছিল। ঘরে আর কেউ ছিল না। ছেলের দিকে বারবার ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলেন। কী একটা যেন বলবার আছে, কিন্তু বলতে পারছিলেন না।

বিজন বুঝতে পেরে মায়ের বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, আমায় কিছু বলবে, মা?

—বলবার যে আমার মুখ নেই, বাবা। দোষ তোদের নয়, আমার। আমি বুঝতে পারিনি।

—তুমি বিশ্বাস কর মা, ও যদি সুখী হত বুঝতাম, আমি ওকে নিজের কাছে নিয়েই রাখতাম। এখনো আমি তৈরী। কিন্তু—

মায়ের ঠোঁট নড়ে উঠতেই বিজন থেমে গেল। তিনি অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, দ্যাখ, ও আর বেশীদিন বাঁচবে না। আমি যে রেখে যেতে পারছি, এই আমার পরম ভাগ্যি। সে দুর্দিন যদি আসে, মেয়েটাকে তুই নিজের কাছে এনে রাখিস। বাড়ুয্যে-বংশের মেয়ে যেন পরের বাড়িতে মানুষ না হয়।

পরদিনই মা মারা যান। তাঁর শেষ সময়ে একঘর লোকের মধ্যে সুরমাও ছিল। তার দিকে হঠাৎ নজর পড়তেই চমকে উঠেছিল বিজন। বুঝেছিল, মায়ের আশঙ্কা হয়তো অমূলক নয়। তবু বছর না ঘুরতেই যে তাঁর শেষ আদেশ পালন করবার প্রয়োজন দেখা দেবে, এতটা সেদিন ভাবতে পারেনি। সুরমার সঙ্গে দুচারটি মামুলী কথা যা হয়েছিল, তার মধ্যেও এমন কোন আভাস পায়নি যে সে এত শীঘ্র চলে যাবে।

একবাড়ি লোকের ভিড়ে নিভৃতে দেখা হবার সুযোগ বড় কম। সে সুযোগ যে করে দিতে পারত সে আসতে পারেনি। তার আগে থেকেই কানপুরের বাসায় টাইফয়েড্-এ শয্যাশায়ী। শুধু বিমান এসেছিল শ্রাদ্ধের আগের দিন এবং ঐ দিনটা থেকেই চলে গিয়েছিল। বৌদির অভাব বিজন সেদিন যেমন তীব্রভাবে অনুভব করেছিল তেমন আর কখনো করেনি। নিজের চেষ্টাতেই স্ত্রীকে কিছুক্ষণের জন্যে একান্তে পেয়ে বলেছিল, আমার সঙ্গে যাবে সুরমা?

সুরমা চোখ তুলে চায়নি। মাটির দিকে চেয়ে আঁচলের একটা কোণ আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলেছিল, আলোটা বড় দুরন্ত হয়েছে। আমি ওকে মোটেই সামলাতে পারি না।

—ওর জন্যে আলাদা ঝি রেখে নিও।

—ঝি-এর কাছে থাকলে তো? 'দিদা' না হলে ওর এক মিনিট চলে না।

—বেশ তো। তাহলে ও দিদিমার কাছেই থাক না?

সুরমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়নি। কিছুক্ষণ পরে অস্ফুট মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, আমি কী নিয়ে থাকবো?

আমার সঙ্গে যাবে সুরমা?

গলাটা কি একটু ধরে এসেছিল? হয়তো এসেছিল, কিংবা ওটা বিজনের শুনবার ভুল। সে আর কোনো কথা বলেনি। অনেক দিন পরে মনে হয়েছে,

সুরমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করে সেদিন যদি সে দ্বিধাহীন সুরে শুধু বলত, 'তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি, সুরমা,' হয়তো তাদের জীবনের স্রোত অন্য পথ ধরত; ঘটনার ধারা বয়ে যেত অন্য খাতে। কিন্তু সুরমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একথা সেদিন সে বলতে পারেনি।

সুরমা যখন কানপুরে, বিমলা দেওরকে অনেকবার লিখেছে, 'ও চাকরি তুমি ছেড়ে দাও, ঠাকুরপো। কার জন্যে পড়ে আছ ঐ জঙ্গলে? কোলকাতা কিংবা তার কাছে ধারে কিছু একটা জুটিয়ে নাও। যতদিন না জোটে, বাড়িতে থাকতে বাধা কী?' আজ সেই প্রয়োজন অনিবার্য ভাবে দেখা দিল। মায়ের মৃত্যুশয্যার নির্দেশ তাকে মানতে হবে। কিন্তু ঐটুকু মেয়েকে তো এই নির্বান্ধব দূরদেশে এনে রাখা যায় না। কলকাতায় ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই। তার জন্যে প্রথমেই দরকার একটি চাকরি, এবং আলাদা বাসা। বড়বৌদির একদঙ্গল ছেলে-পিলের মধ্যে সুরমার শিশু অবহেলায় মানুষ হচ্ছে, এ কথা সে ভাবতে পারে না।

চাকরির দরখাস্তের সূত্র ধরেই বেলেঘাটায় পিসতুতো দিদির বাড়িতে তাকে যেতে হয়েছিল। প্রয়োজনটা ছিল ভগ্নীপতির কাছে। যে-কলেজে চাকরি উনি তার গভর্ণিং বডির প্রতিপত্তিশালী মেম্বর। যদি কোনো সুবিধা হয় এই আশায় তাঁর আফিসে গিয়ে দেখা করেছিল। দীর্ঘকাল পরে দেখা বিশিষ্ট কুটুম্বকে তিনি তখনই ছেড়ে দেননি। পরম সমাদরে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কে জানত, অতবড় নির্মম বিস্ময় সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

।। দশ ।।

'সেকেন্ড স্যরকে' যেদিন ঘটা করে সংবর্ধনা জানানো হল, বর্স্টাল স্কুলের ছেলেরা সেদিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে তার তিন মাসের মধ্যেই আবার তাদের কলাগাছ আর দেবদারু পাতার প্রয়োজন দেখা দেবে। এবারকার আয়োজন আরো ব্যাপক। মালাটা আরো বড় করে গাঁথতে হবে, গেটটা হবে আরো জমকালো। যে-সে ব্যক্তি নন, স্বয়ং সুপারসাহেবের বিদায়-অভিনন্দন।

ঘোষ নিজেও এই বদলির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, কর্তৃপক্ষের মতে এটা শুধু ট্রান্সফার নয়, প্রমোশন; বর্স্টাল স্কুলের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে সেন্ট্রাল জেলের বৃহৎ এলাকার খবরদারি। খুদে কয়েদীর ছোটখাট নালিশ-ফরিয়াদ-এর বদলে জাঁদরেল ক্রিমিনাল-এর জটিলতর সমস্যা ও ব্যাপকতর দায়িত্ব। খুশী হবার কথা। অন্য যে কেউ এই পরিবর্তনকে তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি বলে গ্রহণ করতেন, কৃতজ্ঞতা জানাতেন উপরওয়ালার দরবারে। কিন্তু লেফটেনান্ট ঘোষ চিরদিনই একটু বেয়াড়া ধরণের মানুষ। পদোন্নতির সুখবর পেয়ে মুখ ভার করে রইলেন। ক্লাব মহলে কেষ্ট-বিষ্টুদের একজন পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিলেন, ভাবছেন কী, মশাই? কপাল খুলে গেল। ছিলেন বৃন্দাবনের রাখাল-রাজা, এক কলমের খোঁচায় একেবারে মথুরেশ্বর।

ঘোষসাহেব মৃদু হেসে জবাব দিলেন, ভাবছি, সেই 'খোঁচাটা' কপালে সইলে হয়। সবাই তো আর কেষ্টঠাকুর নয়।

বলে, বাঁকা চোখে তাকালেন বক্তার মুখের দিকে। আশেপাশে যাঁরা ছিলেন সকলের মুখেই চাপা হাসি। ভদ্রলোক অস্বস্তি বোধ করলেন, কিছুদিন থেকে তিনি শহরের সান্ধ্য ক্লাবে নারী-মেম্বরদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে আন্দোলন করছিলেন। ঐ সম্পর্কে তাঁর যে একটু বিশেষ দুর্বলতা আছে, ক্লাবে এবং তার বাইরে সেটা সরস ও মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মুখে যাই বলুন, ঘোষসাহেবের মনের কথাটা তাঁর মনেই রইল। বর্স্টালের এই ছেলেগুলো, প্রতিকথায় যাদের তিনি 'হতভাগা' বলে উল্লেখ করতেন, এই দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরের কতখানি স্থান অধিকার করে বসেছিল, তিনি নিজেও বোধহয় জানতে পারেননি। ছেড়ে যেতে গিয়ে সেখানটায় টান পড়ল। সে বেদনাবোধ কাউকে জানতে দিলেন না। আশুবাবু থাকলে ও'র মুখের দিকে চেয়ে নিজেই বুঝতে পারতেন। আর একজনও বুঝল। সে দিলীপ। যে-বিশালকায় 'সাহেবের' বাইরেটা দেখে সে একদিন ভয় পেয়েছিল এবং সে ভয় অনেকদিন পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তাঁর অন্তরের মধ্যে যে তাদেরই মতো একটি শিশু বাস করে, বন্ধু বলে যার দিকে হাত বাড়ানো যায়, সঙ্গী বলে কাছে ডাকলে সাড়া মেলে, দিলীপের কাছে এই গোপন সত্যটি অজানা ছিল না। সাহেবের ঘরে সবসময়েই ভিড়। চলে যাবার মুখে সেটা আরো বেড়ে গেছে। তারই মধ্যে কখন এসে তাঁর কাছে দাঁড়াবে, যখন ভাবছে, এমন সময় তিনিই তাকে ডেকে পাঠালেন।

আশুবাবু চলে যাবার পর দিলীপের পড়াশুনা দুদিক থেকে বাধা পেয়েছিল। প্রথম—সেই অভাবটা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। তারপরে তাঁর কাছ থেকে যেটা নিয়মিত পেয়ে আসছিল সেই সাগ্রহ এবং সক্রিয় সাহায্য দেবার মত আর কেউ ছিল না। তাছাড়া, বাহাদুর চলে যাবার পর সেই শূন্য স্থানটা তাকেই পূরণ করতে হয়েছিল। প্রেস-এর কাজও খানিকটা বেড়ে গিয়েছিল। সমস্ত দিনে আসন্ন পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি দূরে থাক, সে কথা ভাববার অবসরও থাকত না। প্রেস্-মাস্টার ওকে ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, 'এটা এখন রেখে দাও। খানিকটা নিজের কাজ কর। পরীক্ষা তো এসে গেল।' আবার মিনিট কয়েক পরেই হয়তো ডেকে পাঠাতেন,—'এই দ্যাখ, দিনাজপুর জেল আবার তাগিদ দিয়েছে। ফর্মগুলো কালকের মধ্যেই ছেপে ফেলতে হবে। ডেপুটিবাবু রাগারাগি করছিলেন, এত দেরি হয় কেন?' দিলীপকে তখন এ্যালজেব্রা ফেলে 'কম্পোজ'এ বসতে হত।

রাত্রে ব্যারাকে পড়াশুনা অসম্ভব। এক দঙ্গল ছেলে গোলমাল করছে। 'সেল্'-অঞ্চলটা এমন নির্জন যে দিলীপ কেন কোনো বয়স্ক লোকও সেখানে একা থাকতে সাহস করবে না। তার উপরে সেই ঘরগুলোও শাস্তি দেবার জন্যে, বাস করবার জন্যে নয়। তাই তার থাকবার ব্যবস্থা ছিল হাসপাতালে। অতবড় হল-ঘর; তিন চারটির বেশী রোগী বড় একটা থাকে না। অনেক জায়গা পড়ে আছে। এককোণে বসে পড়াশুনার কোনো ব্যাঘাত নেই। সাহেবের নির্দেশেই ডেপুটিবাবু বন্দোবস্তটা করে দিয়েছিলেন, যদিও মনে মনে খুশী ছিলেন না। কিন্তু কম্পাউন্ডার খুব খুশী। একগাদা খাতাপত্র দিলীপের ঘাড়ে চাপিয়ে প্রায় পেন্‌সন উপভোগ করছিলেন। রাত জেগে জেগে সেইগুলো ওকে লিখে রাখতে হত। কোনো কিছু বাদ পড়লে তিনি রুষ্ট হতেন। সুতরাং দিলীপের পরীক্ষার পড়া শিকেয় উঠেছিল। সুপার এসব জানতেন না, ডেপুটি জেনেও নির্বিকার, (সরকার-নির্দিষ্ট 'শেডিউল্‌ড্ টাস্‌ক্' না করে কোনো ইন্‌মেট্ শুধু পরীক্ষার পড়া

নিয়ে থাকবে এটাই বরং তাঁর মনঃপূত হয়নি) হেড্‌মাস্টার এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, অন্য কারও এটা এলাকার বাইরে। যিনি বলতে পারতেন, প্রয়োজন মত সাহেবের নজরে এসে সবকিছুর প্রতিকার করতে পারতেন, সেই আশুবাবু নেই। অনেক রাত্রে হাসপাতালে হারিকেনের আলোয় বসে মর্ণিং স্টেট্‌মেন্ট্‌ কিংবা বেড্‌হেড্‌ টিকিট লিখতে লিখতে সেই পরম স্নেহপরায়ণ, একান্ত সুহৃৎ মাস্টারমশাই-এর কথা তার বারবার মনে পড়ত। চোখ দুটো জলে ভরে উঠত।

সুপারের আরদালী এসে যখন দিলীপকে তাঁর আফিসে ডেকে নিয়ে গেল, তিনি একা বসে কাজ করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলে বললেন, পড়াশুনো কেমন হচ্ছে?

দিলীপ মাথা নেড়ে জানাল, ভালো।

—ভালোভাবে পাশ করতে পারবে তো?

—চেষ্টা করবো।

—শোনো; তোমার খালাসের প্রায় বছর খানেক বাকী রয়েছে। এতদিন তুমি যেভাবে আছ, ক্লাস পরেই মানে টার্ম পুরো হবার আগেই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া যেত। আমি ইচ্ছে করেই সে চেষ্টা করিনি। যাবার আগে যাতে ম্যাট্রিকটা দিয়ে যেতে পার, সেইটাই চেয়েছিলাম। সে ব্যবস্থা হয়ে আছে। এখন তুমি তৈরী হলেই হল।

দিলীপ মাথা নত করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। সাহেব আবার বললেন, তোমার মায়ের কোনো চিঠিপত্তর তো পাওনি।

—'না'। বলেই সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে তাকাল। হঠাৎ সে কথা কেন জানতে চাইছেন সাহেব? তবে কি নতুন কোনো আশার সূত্র দেখা দিয়েছে কোনোখানে? সুপার বোধহয় পড়তে পারলেন ওর চোখের সেই উদ্বেগাকুল নীরব প্রশ্ন। তারই উত্তরে ধীরে ধীরে বললেন, আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমরা খোঁজ-খবর নিয়েছি। তবে তাকে ঠিক চেষ্টা করা বলে না। সেটা তুমি বেরিয়ে গিয়ে করবে, এবং আমার বিশ্বাস, তোমাকে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না। সেদিক দিয়ে আশুবাবু তোমাকে সাহায্য করবেন। উনি এখন কোলকাতাতেই আছেন। তাঁর চিঠি পাওনি?

—পেয়েছি, স্যার।

—খালাসের পর ও'র ওখানেই চলে যেও। ও'র তাই ইচ্ছে। আমাকে লিখেছেন তোমাকে বলবার জন্যে। আমিও একদিন যাবো ওঁর প্রেস দেখতে। হয়তো সেখানেই আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

ঘোষসাহেব এখানে একটু থামলেন, একবার তাকালেন ওর আনত মুখের পানে, তারপর বললেন, জেনেছ নিশ্চয়ই, আমি চলে যাচ্ছি।

'চলে যাচ্ছি' কথাটা হয়তো সহজ সুরেই বলেছিলেন ঘোষসাহেব। কিন্তু দিলীপের কানে সেটা অনেক গভীরতর আবেদন নিয়ে গিয়ে পৌঁছল। সাহেব যে চলে যাচ্ছেন সে কথা তার অজানা ছিল না। তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। মনে মনে ভেবে রেখেছিল, এর পরে আর হয়তো ও'র সঙ্গে এমন একান্তে দেখা হবে না, এখানেই সে সাহেবকে তার দীর্ঘ সঞ্চিত কৃতজ্ঞতাটুকু জানিয়ে যাবে। বলবে, 'আপনার স্নেহ আমি কোনোদিন ভুলবো না. যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা করবেন।' কিন্তু ও'র মুখ থেকে ঐ 'চলে যাচ্ছি' কথাটা উচ্চারিত হতেই তার সমস্ত বুকের ভিতরটা অব্যক্ত বেদনায় আলোড়িত হয়ে উঠল। কিছুই বলা হল না। শুধু এগিয়ে গিয়ে ওঁর পায়ের উপর একটি নিঃশব্দ প্রণাম রেখে মাথা নত করে বেরিয়ে গেল।

নতুন অধ্যক্ষের নিয়োগ সময়-সাপেক্ষ। যতদিন না আসেন, 'অ্যাকটিনি' করবার ভার পড়ল ডেপুটি সুপার সন্তোষ সেনের উপর। ক্ষমতা হাতে আসতেই তিনি, আক্ষরিক অর্থে যাকে বলে, 'রুল অব ল' প্রতিক্ষেত্রে তারই প্রয়োগ ঘোষণা করলেন। সহকর্মীদের ডেকে বললেন, 'রুলস্‌ আমরা তৈরী করিনি, তার ফলাফল চিন্তা করবার অধিকারও আমাদের দেওয়া হয়নি, আমাদের একমাত্র কাজ তাকে নির্বিচারে মেনে চলা। মনে রাখবেন, এই হচ্ছে আমাদের বেদ কোরাণ ও বাইবেল,—বলে, বহু-ব্যবহারে জীর্ণ জেলকোড্‌খানা তুলে ধরলেন সকলের চোখের উপর।

সেই সনাতন রুটিনের পুনঃপ্রবর্তন হ'ল—ড্রিল, ব্যাণ্ড, দুঘন্টা স্কুল, পাঁচ-ঘন্টা ওয়ার্কশপ, একঘন্টা খেলা। আট থেকে আঠারো—সব বয়সের একই নিয়ম। বর্স্টাল ও ইনডাস্ট্রিয়াল—দুদল তো একই আইনে বাঁধা। দিলীপকেও তার মধ্যে পড়তে হল। শেষের দিকে তার ড্রিল মাপ করে দিয়েছিলেন ঘোষসাহেব। সে 'অন্যায় প্রিভিলেজ' প্রত্যাহার করা হল। সুযোগ পেয়ে ড্রিল-মাস্টার তার পুরনো আক্রোশ মিটিয়ে নেবার আয়োজন করলেন। এতদিনের অনভ্যাসে যা অনিবার্য সেইসব ছোটখাটো ভুল-ত্রুটিও বড় হয়ে দেখা দিল। শাস্তিস্বরূপ ব্যবস্থা হল নিয়মিত এক্সট্রা ড্রিল। পড়ার সময় অন্য সকলের মত সেই দুঘন্টায় এসে দাঁড়াল। তার সঙ্গে পুরো পাঁচ ঘণ্টার প্রেস-খাটনি। একটা অনিয়ম শুধু বরদাস্ত করে গেলেন নতুন সুপার। হাসপাতাল থেকে সরিয়ে এনে ওকে ব্যারাকে পুরে দেওয়া হল না। পড়তে চাও তো পড়; পাশ যদি করতে পার মন্দ কী? স্কুলের নাম হবে। কিন্তু তার জন্যে আইনের পাশ কাটিয়ে কোনো বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে না। এই ব্যবস্থাটুকু নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই বজায় রাখলেন সন্তোষবাবু। সেইসঙ্গে কম্পাউন্ডার আরও একটু সদয় হলেন। কেরানীগিরির উপর খানিকটা নার্স-গিরিও চাপিয়ে দিলেন দিলীপের ঘাড়ে। সন্ধ্যার পর রোগীদের ওষুধ-পথ্য খাওয়ানো, তাপ পরীক্ষা করা, প্রয়োজন-মত মাথায় আইস-ব্যাগ চাপানো এবং এই জাতীয় ফাই-ফরমাস। ওকে বোঝালেন, "সেবার চেয়ে বড় ধর্ম আর কী আছে? তাছাড়া, রাত জেগে বই মুখস্ত করে হবেটা কী? তার চেয়ে এই কাজগুলো শিখে যাও। আখেরে কাজ দেবে।" সুতরাং পরীক্ষার পরিণাম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে দিলীপকে এবার এই নতুন আখেরে আত্মনিয়োগ করতে হল।
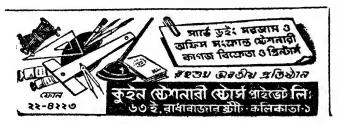
(ক্রমশঃ)

সুনয়নী দেবীর চিত্র প্রসঙ্গে

হিরন্ময় সেন

বাঙালী মহিলা চিত্রশিল্পী সুনয়নী দেবী কিছুদিন হল মারা গেছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর মেয়ে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা এই মহিলা শিল্পী সর্বসাধারণ্যে হয়তো খুব বেশী পরিচিত ছিলেন না। তবু তাঁর ছবির সমজদারের দল ছিল আলাদা, দর্শকমহলও ছিল ভিন্ন। চিত্রায়ণের এক ভিন্নতর জগৎ তাঁর সৃষ্টিকে করেছে পবিত্র, সকলের মাঝখানেও স্বতন্ত্র ভাবসুষমায় অভিব্যক্ত—যা সমকালীন ছবির জগতে একান্তই দুর্লভ। তাই ভারতীয় চিত্রকলার আলোচনা প্রসঙ্গে একজন শিল্পসমালোচককে বলতে শুনি, "নূতন পদ্ধতির ভারতীয় চিত্রকলার সাধনা কয়েকটি মহিলার কল্যাণস্পর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে সুনয়নী দেবীর চিত্রকলা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইঁহার চিত্রে বাংলাদেশের প্রাচীন নিগূঢ়তা ও রহস্যময় অলৌকিকতার দিব্য ছাপ আছে। বাংলার অন্তরের ভাবুকতা এমন সহজ সরল অথচ মৌলিক রীতিতে আর কোন শিল্পীই আধুনিক যুগে প্রকাশ করতে পারেন নাই।"—এখানেই তাঁর ছবির অসামান্যতা ও অনন্যতা।

সুনয়নী দেবী একনিষ্ঠভাবে কোন গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করতে পারেননি। শিক্ষায় গুরুর প্রয়োজন। কোন প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকার দরকার। কিন্তু অনেক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় যাদের কোন গুরুর প্রয়োজন হয়নি। স্বভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটেছে অবধারিতভাবে। দেখা ও বোঝার আন্তরিক প্রচেষ্টা তাদের এই শিল্পমনকে গড়ে তুলেছে। শিল্পসমালোচকদের ভাষায় এই-ই হচ্ছে অশিক্ষিত সহজপটুত্ব। কথাটি হয়ত শ্রুতিমধুর নয় কিন্তু যথেষ্ট অর্থবহ।

সুনয়নী দেবীর প্রতিভাও সহজপটুত্বের সার্থক নিদর্শন। মন চাইল ছবি আঁকতে। রঙ তুলি পেন্সিল নিয়ে বসলেন একান্ত নিভৃতে। শুরু হল মনের চাওয়াটাকে পাওয়ার মধ্যে আবদ্ধ করবার প্রয়াস, একদিকে রয়েছে পারিবারিক ঐতিহ্য, অপরদিকে আন্তরিক প্রচেষ্টা। অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথের দুর্লভ উপদেশ পেয়েছিলেন একালে। এ উপদেশের প্রয়োজন ছিল নিঃসন্দেহে। পরিবেশ যদি অনুকূল না হয়, পারিপার্শ্বিকে যদি গুণগ্রাহিতা না থাকে তাহলে কোন প্রতিভারই সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব নয়। সুনয়নী দেবী উভয়েরই আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বরাবর তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন। সমরেন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ উৎসাহিত করেছেন। পরিশেষে অন্তরের প্রকাশধর্মী চিরন্তন জিজ্ঞাসা শিল্পরূপের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

পরবর্তীকালে সেই শিল্পরূপকে দেশবিদেশের মানুষের সামনে উপস্থিত করেন অবনীন্দ্রনাথ। কেউ যদি মনে করেন সুনয়নী দেবী অবনীন্দ্রনাথের চিত্ররীতির দ্বারা প্রভাবিত তাহলে ভুল করবেন। প্রভাব ছবির মধ্যে ধরা পড়েনি, অবনীন্দ্রনাথ শুধু মানুষকে শিল্পী হতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন মাত্র। এ প্রসঙ্গে সুনয়নী দেবীর উক্তি যথেষ্ট মূল্যবান—"ছোড়দা (অবনীন্দ্রনাথ) একবার আঁকবার সময় মুখের কাঁধের মাপগুলো আমায় বলে দিয়েছিলেন কোনটা কতখানি হবে। তাঁরা বাইরে বসে আঁকতেন আমি বাড়ীর ভেতরে থাকতুম। আমার ছবিতে ও'নাদের প্রভাব তো নেই। আমার ছবি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের।"

সম্প্রতি 'আকাদমি অব ফাইন

আর্টসে' সুনয়নী দেবীর কতকগুলি ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। ছবি দেখে বর্তমানকালের একজন শিল্পসমালোচক বলেছেন, "Shrimati Sunayani Devi's work commemorates a world that is no more but its remoteness from our times does not rob it of its value. For modes of living may be out of fashion for a while, but if they are true modes, they will always mean something for us. In exalting womanhood in certain of its normal manifestations, she has built for us a representing vision with a power to cheer us up while we drift along the stream of change often without a sense of direction".

তাছাড়া সুনয়নী দেবীর ছবিতে কোন আপাত জটিলতা নেই। তাঁর ছবিতে একটি প্রশান্ত সুস্নিগ্ধ ভাবতরঙ্গের প্রকাশ ঘটেছে। সেখানে মানবজীবনের বিবিধ জটিল পরিবেশের প্রকাশ ঘটেনি। প্রাত্যহিক জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেদনা ব্যর্থতার ঊর্ধ্বে স্থিত শান্ত রূপটি ফুটে ওঠে ব্যঞ্জনা ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে। সহজ সরল শিল্পধৃত রূপটি কখনো কখনো বিস্ময়ের উদ্রেক করে। চোখ দিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বোঝার কাজ হয় অনেকটা। সৌন্দর্যের আনন্দময় রূপটি ধরা পড়েছে স্বাভাবিকভাবে স্বচ্ছন্দে। ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন হয় না। অতিরিক্ত রঙের ব্যবহার তাঁর ছবিতে অনুপস্থিত। মোটামুটিভাবে শান্তস্নিগ্ধ নিরাভরণ রূপকে চিত্রায়িত করাই যেন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সহজ সরল অলংকৃত সুন্দরের এই অপূর্ব নির্মিতির শৈল্পিক মহিমা অনন্য। একালের লোক হলেও সাম্প্রতিককালের শিল্পীদের অনেকেরই থেকে তাঁর ছবির বিষয়বস্তুই কেবলমাত্র নয় অঙ্কন পদ্ধতিও ভিন্ন। ছবির বিষয়বস্তুতে ভাবই মুখ্য। দীঘল নয়না নারীর চোখ অধিকাংশ চিত্রেই একটি বিচিত্র আবেশের সৃষ্টি করে। এখানেও রয়েছে সুনয়নী দেবীর শিল্পস্বাতন্ত্র্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। বাঙলার পটশিল্পকে শিল্পরীতির আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করাতেই এ স্বাতন্ত্র্য এসেছে। ভাবই যেখানে মুখ্য আর ভাবের উত্থান যেখানে আবেগের মধ্যে বিধৃত সেখানে দীর্ঘায়তন চোখই শিল্প রূপকে সার্থকতা দানের উৎকৃষ্টতম পন্থা। মহাদেব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মা যশোদা, ছেলে, বাঙলার ঠাকুর দেবতা, গৃহস্থঘরের বউ, রাধাকৃষ্ণ এ সবই নানাভাবে তাঁর ছবির বিষয়। অথচ একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে দুটি নির্মিতির কত না পার্থক্য। তুলির টানে রঙের রেখার ভাষায় তাঁর ছবি কথা বলে। তাঁর ছবি দেখে কখনো কখনো জাপানী শিল্পরীতিও মনে পড়ে।

সুনয়নী দেবীর চিত্র প্রসঙ্গে স্টেলা ক্রামরিশ বলেছেন, 'সুনয়নী দেবীর আর্টের মূল তত্ত্বই হচ্ছে জীবনের ভিতরকার এই দ্বৈত (চঞ্চলতা ও চিরন্তন স্থিতি), যা একইকালে অনিত্য ও ধ্রুব। এইতো সেই ভারতীয় প্রকৃতির প্রকাশ, যার গুণে ইনি অজন্তার অখণ্ড প্রবাহিত কালরীতিকে এমন অনায়াসে

জাপানী মেয়ে

গ্রহণ করতে পেরেছেন। মোগল চিত্রকলা ভারতীয় আর্টকে আয়তনে প্রাণশক্তিতে এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় যে খর্ব করে ফেলেছিল, এই ছবিতে সেই ত্রুটি বিস্মৃত এবং মার্জনাপ্রাপ্ত হয়েছে। রচয়িত্রীর অজ্ঞাতসারে অথচ নিশ্চিত নৈপুণ্যে এই ছবিতে বিশুদ্ধ ভারতীয় রেখার আকুঞ্চন ভঙ্গি (curvature) আপনার শান্ত সকরুণ সুরকে প্রকাশ করেছে।' পিসিমার ঘরের পটচিত্র তাঁর শিল্পচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল একদিন। ঐ পটচিত্রের মধ্যেই শিল্পজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। 'বাংলার পটচিত্র ইম্প্রেসিয়নভিত্তিক। ইম্প্রেসনবাদের মুখ্য বক্তব্য হল শিল্পীর সৃষ্টির কেন্দ্রটিকে রঙে ও রেখায় মূর্ত করে তোলা। ইম্প্রেসনবাদের অন্য নাম হল চাইল্ড আর্ট। সুনয়নী দেবী বাংলার চাইল্ড আর্টের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। সনাতন ঐতিহ্যের পুজারীর চিত্রায়িত রৈখিক ব্যঞ্জনাময় রূপটি অব্যক্ত সৌন্দর্যের যে প্রকাশ করেছে, তা চিরকালের রসিক মানুষের কাছে জীবন্ত হয়ে থাকবে।

ক্রামরিশের ভাষায় একথাও বলা যায় 'সুনয়নী দেবী আর্টিস্ট পরিবারের মেয়ে। তাঁর কোনো ভাই বহুকাল পূর্বে অজন্তার গুহায় ছবি এঁকেছিলেন, আবার তাঁর কোনো কোনো ভাই আর কিছুকাল পরে ইটালিতে জন্মেছেন, যেমন মার্গারিটোনে ডারেজ্জো এবং গুইডাডো সিয়েনা। এইসব ভাইদের মধ্যে কেউ কারও অনুকরণ করেননি। এমনকি পরস্পরের অস্তিত্ব তাঁদের জানাই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির এমনই আশ্চর্য নিয়ম যে, মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা যখন একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবলম্বন করে চলে তখন দেশকাল নির্বিশেষে তা একই রূপ ধারণ করে। এইজন্যেই তো সকলকালের সকল দেশের যোগীদের জীবন ও উক্তি সম্বন্ধে এমন সাদৃশ্য দেখা যায়।'

বধূ

সার্থবাহ

॥ পর্তুগীজ সাহিত্যের অ, আ, ক, খ ॥

(১)

সাহিত্যে, দর্শনে বা বিজ্ঞানে নামজাদা য়ুরোপীয় দেশগুলির মধ্যে পর্তুগাল যে একটি নয় এবং কখনই যে খুব স্পষ্টভাবে ছিল না, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির বৃত্তান্তে মোটামুটি অবহিতিও এই সত্যে সটান উপস্থিত হয়। অন্ততঃ আধুনিক য়ুরোপের চিন্তাভাবনার বা শিল্পকলার ইতিহাসে পর্তুগীজদের নামোল্লেখ নেহাতই কালেভদ্রে। খ্যাতনামাদের যদি বা এক দৃষ্টিকটু সংখ্যাধিক্য আজকের য়ুরোপে, তবু, পর্তুগালের দিকে যে খ্যাতির কৃপাদৃষ্টি আদপেই পড়েনি, এই নিরাপদ তথ্যে আস্থা বিশেষজ্ঞদের মতামতসাপেক্ষ নয়। নোবেল বা কোনও আন্তর্জাতিক পুরস্কারের একটিও পর্তুগাল লাভ করেনি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রচনার প্রামাণ্য সংকলনে পর্তুগীজ সাহিত্যের ছিটেফোঁটাও নেই দেখে অবাক না-হওয়াই ধাতস্থ ক'রে নিতে হয় আজকের পাঠককে। য়ুরোপীয় মধ্যযুগের কবিতা আলোচনায় পর্তুগীজ ত্রুবাদুরদের কথা কদাচই উত্থাপিত হয়, যেমন হয় 'এপিক' বা 'মহাকাব্যের' প্রসঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ কবি ক্যামোয়েশের 'উশ লুসিয়াদাশ'-এর। উদারনৈতিক 'অক্সফোর্ড'-সঞ্চয়ন যদি বা পর্তুগীজ কাব্যকে অবহেলা করে না, তবু পর্তুগীজ কবিতার অক্সফোর্ড পুস্তকখানি তার আপেক্ষিক কৃশতায় যেন কোনও দৈন্যের কথাই বলে। হালাম সাহেবের ঊনবিংশ শতকী য়ুরোপীয় সাহিত্য-পরিক্রমায় যদি বা পর্তুগীজ কবিতা বেপাত্তা হয়নি, তবু বর্তমান শতাব্দীতে পর্তুগীজ সাহিত্যে উৎসাহী সমালোচকদের করে গোণা যায়। আর, আধুনিক কবিদের মধ্যে দূরযানী এজ্রা পাউন্ড ছাড়া বোধ হয় আর কেউই পর্তুগালের দিকে চোখ ফেরাননি।

পর্তুগীজ সাহিত্যের প্রতি এই ঔদাসীন্য অবশ্যই সে-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে ন্যায়তঃ সন্দিহান করে জিজ্ঞাসুদের। এবং স্বীকার করতেই হয় যে ফ্রান্স বা ইতালী, কিম্বা লাগোয়া দেশ, স্পেনের সাহিত্যের সঙ্গে, তুলনামূলক প্রেক্ষণে, পর্তুগালের সাহিত্য হ্রস্বকায় ও ম্রিয়মাণ। এ ছাড়া, আরো একটি কারণেও পর্তুগীজ সাহিত্য তার স্বকীয়তা নিয়ে য়ুরোপীয় মানসে যথেষ্ট অনুভূত হতে পারেনি। সে কারণটি ভাষাগত। ইবেরিয় উপদ্বীপের একাংশরূপে স্পেনের সঙ্গে পর্তুগালের ভাষিক সাহচর্য এতো জোরাল যে প্রকৃতপক্ষে হিস্পানী ভাষার থেকে পৃথক হ'য়ে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে আত্মসচেতন হ'তে পর্তুগীজ ভাষার সময় লেগেছিল। রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত মাটি হিসাবে, পর্তুগালের উৎপত্তি যদি, প্রখ্যাত পর্তুগীজ ঐতিহাসিক আলমাইদা-র * মতে একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সম্ভব হয়ে থাকে, তবে ভাষিক মর্যাদায় জাগরূক হ'তে তার বোধ হয় আরো এক শতাব্দী লেগেছিল। স্বপ্রতিষ্ঠ যখন পর্তুগীজ ভাষা, তখনও—এবং পরবর্তী বেশ কয়েক শতাব্দী ধরেই, পর্তুগীজ সাহিত্যিকদের প্রলুব্ধ করেছে স্পেনের ভাষা। পঞ্চদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা পর্তুগীজ নাট্যকার জিল ভিসেংৎ হিস্পানী ভাষায় এগারখানি নাটক রচনা করেছিলেন এবং সেই ভাষায় কবিতা লিখেও তিনি দক্ষ প্রমাণিত হ'ন। স্বয়ং ক্যামোয়েশ, যিনি পর্তুগীজ ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের রচয়িতা এবং যাঁর স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্য ছিল নিঃসংশয়ে প্রখর, হিস্পানীতেও কবিতা লিখতেন মাঝে মাঝে। (এখানে মনে রাখা দরকার যে স্পেন ও পর্তুগালের ভাষা দু'টি মূলতঃ এক হিস্পানিক-লাতিনের বংশোদ্ভূত এবং এ দুই ভাষার মধ্যে মিল শব্দার্থে, ব্যাকরণে ও বাগ্‌ভঙ্গীতে এতো বিস্তর, যে একমাত্র যেন উচ্চারণগত পার্থক্যেই পর্তুগীজ হিস্পানী থেকে স্বতন্ত্র। ক্যামোয়েশের পক্ষে হিস্পানীতে কবিতা-লেখার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের ব্রজবুলি-ব্যবহার স্মরণ করায়।)
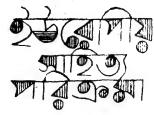
তাই একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যদিও আলমাইদা-কথিত 'পর্তুগীজ মাটি' ('তেরা পর্তুকালেনসে') স্বরূপ উদ্ধার করেছে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা সমেত পর্তুগাল মূর্ত হয় মাত্র কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস নিয়েই। কিন্তু তবু যে-পর্তুগাল এরকুলানু ও আলমাইদার মতো ঐতিহাসিক, ভিসেংৎ-এর মতো নাট্যকার, ক্যামোয়েশ, ইউজেনিয়ু দা কাস্ত্রু ও ফেরনাঁদু পেস্সোয়ার মতো কবিদের স্বদেশভূমি, সে পর্তুগাল অন্ততঃ কিছুটা মনোযোগ দাবী করতেই পারে। আর যে-পর্তুগাল আলবুকের্ক, গাসপার কুররেয়া, দুয়ার্ত বাররোসা ও আলভারেস কাব্রালের মতো বর্ণময় ব্যক্তিত্বগুলির জন্মদাত্রী সে দেশমাতৃকা গরিয়সী নিঃসন্দেহে। 'পর্তুগাল নাউ' এ উ' পাইস পেকেনো'—'তুচ্ছ দেশ নয়ক পর্তুগাল', পর্তুগীজদের এই দাবীতে হয়ত স্বাদেশিকতা উগ্রগন্ধী নয়, যদিও তামাসাপ্রিয় স্পেনীয়দের একটি প্রবাদ বলে যে 'মন্দ একটি হিস্পানী একজন ভালো পর্তুগীজ'।

পর্তুগীজ সংস্কৃতির বিলম্বিত অভ্যুত্থানের ইতিহাসে প্রথমেই স্মরণীয় চতুর্দশ শতকের পর্তুগীজ সম্রাট দিনিশ-এর নাম। রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন দিনিশ ইংলণ্ডের প্রথম এডয়ার্ডের সঙ্গে পত্রালাপ ক'রে এক উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতির পথ-প্রদর্শক, তেমনি সাহিত্য বিষয়েও দিনিশের লিপ্তি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আলমাইদা বলেন যে পর্তুগীজ ভাষাকে উন্নত ও দোষমুক্ত করার জন্য দিনিশ অন্যান্য ভাষার বিখ্যাত প্রতিটি বই পর্তুগীজে অনুবাদ করিয়েছিলেন। দিনিশ নিজে অসংখ্য কবিতা লিখেছিলেন এবং তাঁর সমকালীনদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান কবি ব'লে বিবেচিত হতেন। দিনিশের কবিতায় আভিজাত্যের সামান্য গন্ধও অবশ্য ছিল না, সর্বান্তঃকরণে গ্রাম্য ও গীতিধর্মী—তাঁর কাব্য প্রভাসাল কবিতা থেকে পরিপুষ্টি আহরণ করেছিল সরাসরি। প্রকৃতি ও প্রেম, এই দুই সহজ সত্যে আস্থা রেখে নৃপতি দিনিশ পর্তুগীজ কবিতাকে স্বচ্ছ ও গীতিময় ক'রে তুলেছিলেন যেমন, তেমন তা'তে যোগ করেছিলেন কিছুটা ভাববাদী সত্ত্ব, যা ত্রুবাদুরদের কবিতায় ছিল না। পর্তুগীজ ত্রুবাদুর কবি জোয়াউ সোয়ারেস দ পাইভার অবদানে পর্তুগীজ কবিতার যে প্রাথমিক অগ্রগতি সূচিত হয়েছিল, তা' দিনিশের সাহিত্য-সাধনায় নানাভাবে প্রসারিত হয়।

দ্বাদশ শতকের দ পাইভা ত্রুবাদুরদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন। গালিসা ও

* Historia de Portugal por Fortunato de Almeida, Tomo I, Coimbra, 1922.

প্রভাঁসের বিখ্যাত গায়েন কবিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, খাঁটি পর্তুগালের কবি দ পায়া দ্রুবাদুর-কাব্যে নিজস্বতা সপ্রমাণ করেন। দিনিশ, কতকটা রাষ্ট্রনৈতিক উৎসাহ সত্ত্বেও দ্রুবাদুর প্রেমের কবিতায় নিসর্গ-বোধ ও চিন্তাশীলতার উপকরণ যুক্ত ক'রে তাকে গায়েনদের কথ্য কবিতা থেকে লিখিত কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করেন। অবশ্য দিনিশ, কিম্বা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য পর্তুগীজ কবিরা, প্রধানতঃ গীতিকবিতাই রচনা করেছিলেন এবং তা-ই ছিল স্বাভাবিক, কারণ গানের সঙ্গে পর্তুগালের মানুষদের যোগাযোগ আগাগোড়াই নিবিড়। লোকসংগীতের ঐতিহ্যে মধ্যযুগীয় পর্তুগীজ গীতি-কাব্যের বৈচিত্র্য ধরা পড়ে পর্তুগীজ ছড়া ও গানের প্রাচুর্যে ও রকমারি বিন্যাসে। 'কান্তু দ লেদিনু', 'কান্তু দ আমিগু', 'শাকোনে', 'সেররানিল্লা' মধ্যযুগে পর্তুগীজ গীতি-কবিতার নানান ছন্দ ও রূপ ব্যক্ত করে।

অবশ্য দ পায়ার স্বাতন্ত্র্য ও দিনিশের সার্থকতা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে পর্তুগীজ সাহিত্যে আগাগোড়াই বিদেশী প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। যদিও এপিকের যে মৌলিক পর্তুগীজ রূপ মধ্যযুগীয় 'আরাভিয়া'য় নির্ধারিত, তা'রই উত্তরণ হিসাবে ক্যামোয়েঁশের মহাকাব্যকে আকস্মিকতার দায়মুক্ত করা যায়, তবু ভের্গিলিয়ুস, দান্তে ও প্রাচীন হিস্পানী মহাকাব্য, 'এল কান্তার দে মিয়ো থিদ'-এর কাছে ক্যামোয়েঁশের ঋণ ব্যাপক ও আন্তরিক। পঞ্চদশ শতাব্দীর পর্তুগীজ কবিতায় হিস্পানী কবি, হুয়ান দে মেনার প্রভাব সর্বথা স্বীকৃত। পরবর্তী শতাব্দীতে পর্তুগালে যে 'গোচারণ-কাব্য' সুফল-প্রসু হয়েছিল তার উৎস ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে লাতিন কবি ভের্গিলিয়ুস। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পর্তুগালে যে সাহিত্যিক নবজাগরণ 'রেনাসেনসা পুর্তুগেশা' নামে অভিহিত হয় ও যা'র নেতৃত্বে ছিলেন, লেউনার্দু ক'য়ব্রা, তা'র লেখকগোষ্ঠির মধ্যে এমন কাউকে পাবনি যিনি বিদেশী প্রভাব-বিবর্জিত অথচ সাহিত্য সৃষ্টিতে সার্থক। আধুনিক পর্তুগীজ সাহিত্যে যে দুইজন কবি সর্বাগ্রগণ্য, পেস্সোয়া ও কাস্ত্রু, তাঁরা উপযুক্ত দক্ষতা ও সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে কোন তীব্র স্বকীয়তার মিলন ঘটাতে সক্ষম হননি। সাম্প্রতিক পর্তুগীজ কবি, আলবের্তু দ লাসের্দা'র কবিতারও শক্তির সাক্ষাৎ যেমন প্রকট, তেমন তাঁর আধুনিক ফরাসী ও হিস্পানী কবিতায় অতি-পঠিত হওয়ার।

কিন্তু বিদেশী প্রভাবের কাছে তা'র ভাষা ও সাহিত্যের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে-থেকে বাঁধা পড়লেও পর্তুগীজ চিন্তা, অন্ততঃ একটি বিষয়ে, সুশোভন এক প্রেরণাকে মানানসই ক্ষমতা দ্বারা লালন করেছে। এক কথায় এই বিষয়টিকে বলা যায় 'ঐতিহাসিকতা'। আশ্চর্য লাগে যখন গানের দেশ পর্তুগালের এক বিশেষ প্রণোদনা হিসাবে লক্ষিত হয় তা'র ইতিহাস, পর্যটনকাহিনী ও সমালোচনার গদ্য। ক্যামোয়েঁশের কবিতার বিদগ্ধ এক মুখবন্ধ লিখেছিলেন তাঁর সমকালীন সুরুপিতা। ষোড়শ শতাব্দীর জোয়াউ দ বাররোস তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর উৎকর্ষ সপ্রমাণ করেন 'আসিয়া পুর্তুগেশা' ও 'আমেরিকা পুর্তুগেশা' নামক দুইটি গ্রন্থে। অষ্টাদশ শতকী পর্তুগীজ ঐতিহাসিক সুপণ্ডিত ফ্রানসিস্‌কু শাভিয়ের দ মেনেজেশ স্বনামধন্য। আলেশান্দ্র এরকুলানু ঊনবিংশ শতাব্দীতে পর্তুগালের প্রামাণ্য ইতিহাস-প্রণয়নের অনুপ্রেরণা নিয়ে তাঁর 'পর্তুগালিয়াই মনুমেন্তা হিস্তরিকা' গ্রন্থমালার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানকালে অলমাইদার চার খণ্ডে সমাপ্ত 'পর্তুগালের ইতিহাস' এরকুলানুর অপূর্ণ প্রতিশ্রুতিকে কার্যকরী করে। ঐতিহাসিক খাতেই যেন পর্তুগীজ জীবনচর্চার উর্বর গতি। ষোড়শ শতাব্দীতে, পর্তুগীজ সাহিত্যের স্বর্ণযুগে, গারসিয়া দ রেজে'দ-সম্পাদিত, তিনশত কবির রচনায় সমৃদ্ধ, সুবৃহৎ সংকলন গ্রন্থ, 'কানসিনেইরো জেরাল, ও 'উশ লুসিয়াদাশ' বাদ দিলে, পরবর্তী দুই শতাব্দীর পর্তুগীজ সাহিত্যে ইতিহাস ভিন্ন অন্য প্রকরণে পর্তুগীজ গ্রন্থকারদের আকর্ষণ স্বল্পই হয়েছে। অবশ্য, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক দ মেনেজেশ তাঁর 'এনুরিকেইদা' মহাকাব্য লিখেছিলেন ও 'ফিলিন্তু এলিসিয়ু' ছদ্মনামে আরেকজন কবি পর্তুগীজ ভাষায় 'সাহিত্যিক' জোয়ার আনার প্রচেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দ মেনেজেশ-এর পরিকল্পিত শিল্পী-সমিতি, 'আরকাদিয়া দ লিসবোয়া'র কার্যকলাপে, কিম্বা তাঁর ফরাসীপনায় পর্তুগীজ সাহিত্যিক জায়দাদ্‌ পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। 'ফিলিন্তু'-পন্থীদের উৎসাহও অল্পকালেই অবদমিত হয়।

ঊনবিংশ শতকে পর্তুগীজ সাহিত্যে রোমান্টিকতার যে যৎসামান্য আবেশ এসে পৌঁছেছিল, তা'র ফলে পর্তুগীজ উপন্যাস ও কবিতা যেন কিছুটা নবজীবন লাভ করে। এই রোমান্টিকতার সঙ্গে পর্তুগালের পরিচয় অবশ্যই আভ্যন্তরীণ হয়নি'ক। রাজনৈতিক কারণে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত এরকুলানু ও জোয়াউ বাপ্তিস্তা দ আলমাইদা গারেত তাঁদের নির্বাসনকালে য়ুরোপীয় রোমান্টিকতার খোলা বাতাসে থাকতে পেয়েছিলেন বলেই, তাঁদের প্রত্যাবর্তন পর্তুগীজ সাহিত্যে রোমান্টিকতার আমদানী সম্ভব করেছিল। ঐতিহাসিক হিসাবে এরকুলানুর সাড়ম্বর শুরুর মধ্যে রোমান্টিকতা ছিল কি-না তা' যদিও প্রশ্নাধীন, তবু গারেতের বিখ্যাত রচনা, 'ফল্লাস কাইদাস' ('ঝরা পাতা')-এ ও তাঁর নাটকগুলিতে রোমান্টিক উদ্বেগ সুপ্রকাশ। ঊনবিংশশতকী পর্তুগীজ, আন্তুনিয়ু ফেলিসিয়ানু দ কাস্তিল্লোর কাব্যগ্রন্থ, 'আ প্রিমাভেরা' ('বসন্ত') ও 'আমর এ মেলাংকুলিয়া' ('প্রেম ও বিষাদ')-ও রোমান্টিকতার ভাবগত পরিবেশ আশ্রিত। এই রোমান্টিকতার আতিশয্যেই 'শতাব্দী-শেষের' ব্যাধিতে আক্রান্ত, ইউজেনিয়ু দ কাস্ত্রুর নাটক 'বেলকিস' ও তাঁর 'সালোমে ও অন্যান্য কবিতা' রচনা সম্ভব হয়েছিল। আধুনিক কালে ফেরনাঁদু, পেস্সোয়া, জোসে রেজিয়ু ও মিগুয়েল তুর্গার কবিতায়ও রোমান্টিকতার আমেজ একেবারে বহিষ্কৃত হয়নি। আর, এই রোমান্টিসিজমের পরোক্ষ ফল প্রেক্ষিত হয় পর্তুগীজ উপন্যাসে। তা'র ঐতিহ্যাশ্রিত গ্রাম্যতা, অবাস্তবতা ও আঙ্গিকগত দৈন্য অতিক্রান্ত হয়ে ঊনবিংশ শতকেই আবির্ভাব ঘটল পর্যাপ্ত পর্তুগীজ ঔপন্যাসিকতার এসা দ কেইরোশ্‌-এর রচনায়।

অবশ্য উপন্যাস-রচনায় পর্তুগীজদের সাফল্য স্বল্প নিঃসন্দেহে। জনপ্রিয় য়ুরোপীয় উপন্যাসগুলির তালিকায় কোনও আধুনিক বা পুরাতন পর্তুগীজ উপন্যাস স্থান পায় না। আর, ইতিহাস-প্রণয়নে পর্তুগীজদের প্রত্যয় যদিও ভিয়েইরার এই সংজ্ঞায় সুস্পষ্ট যে ইতিহাস 'সত্যের মতো' (মাই দা ভেরদাদ), তবু মানতে হয় যে পর্তুগালের ইতিহাস যাঁরা সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা অসাধারণ ছিলেন না। একজন গিজো, মমসেন বা টয়নবির সহচারিত্বে অবশ্যই একজন এরকুলানু কু আল-

মাইদা সক্ষম নন। তাই আমাদের ফিরে যেতেই হয় পর্তুগীজ কাব্যে : উশ লুসিয়াদাসে', সা দ মিরাঁদার কবিতায়, দিনিশে, পেস্সোয়ায়। বিশেষতঃ 'উশ লুসিয়াদাশে'। কারণ ষোড়শ শতাব্দীর এই মহাকাব্য, যা'র পরতে পরতে যদি বা দেশপ্রেম ও জাত্যাভিমান, তা'র বৈষয়িক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও একটি এমতো নিঃসংশয়ে কাব্যিক মহত্ত্বের ধারক, যে তা'র অধ্যয়ন সর্বকালেই লাভজনক।

অবশ্য ক্যামোয়েঁশ শুধু মহাকাব্যেরই রচয়িতা ছিলেন না। ছোট কবিতায়ও তাঁর হাত ছিল পাকা। সামগ্রিকভাবে তাঁর কবিত্ব এপিক ও লিরিক দুয়েরই সংলগ্ন সাধনা। আর যেমন মহাকাব্যে তেমন গীতিকবিতায়ও ক্যামোয়েঁশ ভুঁইফোঁড় ছিলেন না গানের দেশ পর্তুগালে। সহজ, স্বাভাবিক সংবাদকে চমৎকার কাব্যিক সঙ্গীতি দেন মধ্যযুগোত্তর পর্তুগীজ কবি ভালবাসার জয় গেয়ে :

উঁ আমীগু কেঁউ আভীয়া
মানসানাস্ দোরু মে'-ভীয়া
গারুরিদু আমর।
দূর অতীতের কোন একজন বন্ধু
পাঠিয়ে দিয়েছে সোনার আপেলগুলি
জয়তু প্রেম!

পঞ্চদশ শতাব্দীর পর্তুগীজ কবিতায় ইতালীয় রেনেসাঁস ও হিস্পানী কাব্যের প্রভাবে রূপকধর্মী, বর্ণনামূলক পদ্যের ভিতর সঞ্চারিত হয়েছে লিরিক আবেগ। পরবর্তী শতাব্দীতে তাই সা দ মিরাঁদা তাঁর ধ্রুপদী মনোভাব সত্ত্বেও গীতিকবিতার ফাঁদে ধরা দিয়েছিলেন অনেকবারই। পর্যবেক্ষণ ও বোধ সা দ মিরাঁদায় যথেষ্ট পরিপক্কতা লাভ করেছিল, তবু তাঁর কবিতা চিত্রধর্মী ও ভাষার আশ্চর্য সুষমা। ধ্বনি ও অর্থের সাযুজ্যে শক্ত হয়ে ওঠে দা সা-র কবিতার আঁচড় :

উ সল্ এ গ্রাঁদ, কায়ে' কু আ
কাল্মা আশ্ আভেশ্
সূর্য ঝলে নিরবধি,
তাপে মূর্ছা যায় পক্ষিকুল!

আবার পঞ্চদশশতকী জিল ভিসেঁৎ-এর কবিতায় স্বচ্ছ, রেনেসাঁসী প্রশস্তিতে কুমারী প্রেয়সীর রূপের তুলনা নেই :

বল্ না নাবিক,
থেকেছিস ত' জাহাজে জাহাজে,—
জাহাজ, পাল বা রাতের তারা,
কেউ অতো সুন্দর? *

এইভাবে ক্যামোয়েঁশের কবিতার ভিত্তিভূমি নির্মিত হয়েছিল তাঁর কতিপয় পূর্বপুরুষদের দ্বারা। বলা বাহুল্য, ঐতিহ্যের অবদানের সঙ্গে ক্যামোয়েঁশ যোগ করেছিলেন তাঁর সন্দেহাতীত স্বকীয় প্রতিভার বৈচিত্র্য ও শক্তি। 'উশ লুসিয়াদাশ'-এর সংহতি ও সৌন্দর্যে পৌঁছানোর জন্য ছোট কবিতা মারফত ভাষা ও ভাবনাকে আলোড়িত করতে শিখেছিলেন ক্যামোয়েঁশ। প্রকৃতি, প্রেম ও ভগবদ্ বিশ্বাস সংক্রান্ত নানান অভিব্যক্তিতে ভরা ক্যামোয়েঁশের এই কবিতাগুলি যে-বাচনিক ঋজুতা ও চিত্তস্থৈর্যের নির্দেশ দেয়, তাতে তাঁর মহাকাব্যিক পরিণতি সূচিত।

কাঁতা আগরো, পাস্তর, কে উ গাদু পাসে
এন্‌ত্রে আশ উমিদাশ্ এরভাশ্ সসেগাদু
হে রাখাল, গান করো,
এখন তোমার গোকুল
শান্ত বিচরণ করে
জলসিক্ত তৃণের মাঝখানে

'গোচারণ-কাব্যের' এই নৈসর্গিক দূরবর্তিতা থেকে ইতালীয় রেনেসাঁসের বিদায় ও সে-সঙ্গে ঈশ্বরানুভূতির প্রশ্নে উপনীত হ'তে ক্যামোয়েঁশকে গলদঘর্ম হতে হয়নি। পেত্রার্কীয় সনেটের স্বরূপ চমৎকারভাবে ক্যামোয়েঁশের আয়ত্তে এসেছিল, তাঁর মেজাজেও সঞ্চারিত হয়েছিল কিছুটা শহুরে বৈদগ্ধ্য—রেনেসাঁসী শিল্পবোধ। কিন্তু সর্বময় ভাবনার প্রয়োগে ক্যামোয়েঁশ কী প্রশান্ত!

আধার

কেলাসে কেলাসে দ্যুতি পুষ্পপাত্রময় :
দেবসন্ততির-ধরা জল
হেথা স্বচ্ছ, সুবাসিত;
শ্বেত সিল্কের পরে
সোনালী আখরে চিত্রিত,
জোড়ের সর্বাঙ্গ ঘুরে হিরণ
ঘোড়ারা দৌড়ায়।
স্পষ্টই প্রতীয়মান দৈব বর প্রযুক্ত হেথায়।
এই শুক্লা কিন্নরীর কারু-কৃত
বাহুতে আহূত,
খাটে সে সমানে এবে
শিল্পের চিকীর্ষা-নন্দিত;
থাকুনা আকাশে প'ড়ে
শুকতারা শুভ্রের ছটায়!

তোমার স্বরূপখানি পুষ্পপাত্র
করেছে পূর্ণিত;
যতো তা'রে কেটে দিক
সুন্দর প্রত্যঙ্গের জালি,
আর জল, পুণ্য জল,
দেবাত্মা দেখায় বিম্বিত।
শুভ্রতা ত' ঐ সিল্কে মেখে আছে,
আর ঘোড়াগুলি
নিগড় বানিয়ে রাখে;
আমার আর্তিও প্রসাদিত
ওদেরই মতন ঐ জোড়ার
রাংঝালে উচ্ছলি'। *

(অনুবাদ : অমর ভট্টাচার্য)

* ভিসেঁৎ-এর উদ্ধৃত কবিতাংশটি ও ক্যামোয়েঁশের সনেটটি হিস্পানী ভাষায় রচিত।
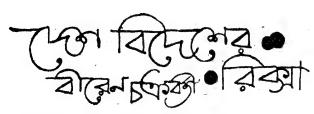
ভারত সরকার ঠিক করেছেন যে রিকসা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেবেন। অনেকেই সরকারী প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছেন। সত্যি ভেবে দেখতে গেলে ব্যাপারটা বড়ই বিশ্রী। একজন মানুষের পিঠে চড়ে অন্য মানুষ শহরের রাস্তা পার হচ্ছে। মানবতার দিক থেকে এই প্রথা নিশ্চয়ই প্রতিবাদযোগ্য। আর হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে যে, রিকসা-চালকদের জীবন বড়ই স্বল্পায়ু। পঞ্চাশ বছরের ওদিকে বড় একটা কেউ যায় না। পরিশ্রম হয় বেশী, পারিশ্রমিক বড়ই অল্প। এই সব কারণে রিকসার প্রতি বিরূপতা আছে অনেকের। এদের

গ্লানিকর জীবন নিয়ে উপন্যাস ও গান রচনা হয়েছে। তারাও বেশ জনপ্রিয়।

কিন্তু হলে কি হবে, এই প্রস্তাবে রিকসা-চালকেরাই প্রসন্ন নয়। এক পেশায় তারা হাত পাকিয়েছে, জাত-ব্যবসায় স্তরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ছেড়ে অন্য কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াতে তাদের বুক কাঁপে। ভারতবর্ষে সাইকেল-রিকসার প্রচলন ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। মোটর-রিকসাও চলছে কোথাও কোথাও। খবর নিলে দেখা যাবে যে এরা নোতুন লোক। পুরানো রিকসা ছেড়ে দিয়ে এই যান্ত্রিক রিকসার দিকে যায়নি কেউ। কারণ শুধুমাত্র আর্থ-নৈতিক নয়, চারিত্রিকও বটে। তারা নোতুন প্রথার সঙ্গে বনিবনা করতে পারছে না।

রিকসার চলন নেই ইয়োরোপে। এসিয়া ও আফ্রিকায় রিকসা চলে। প্রতি দেশে রিকসার রকমভেদ। তাদের দেখতে আলাদা।

চীনের রিকসার বড় জাঁক-জমক। সাংহাই, হংকং-এর রিকসা ছবির মতন। রিকসা-চালকদের বেশভূষার প্রচুর বাহার। মাথায় তাদের নানা রঙের টুপি। রিকসাও খুব হালকা। চলেও দ্রুত। সাংহাইতে রিকসা-চালকদের বড় দুর্নাম। জনবিরল পথে তারা নাকি যাত্রীদের সর্বস্ব লুট করে নেয়।

জাপানে এখনও কিছু সংখ্যক রিকসা আছে। রিকসাকে তারা এমন সুন্দর ও লঘুভাবে তৈরী করে যে চালাতে গেলে খুব কষ্ট হয় না। বিদেশী যাত্রীরা সাধারণতঃ এই ধরনের যান পছন্দ করে থাকেন। তাঁদের ধারণা এই রিকসায় চড়লে দেশের অনেক নিকটে যাওয়া যাবে। কিন্তু রিকসায় চড়েই তাঁরা বিরত হ'য়ে পড়েন। রিকসার দ্রুত তালের সঙ্গে যাত্রীরা বড় অসহায় বোধ করতে থাকেন।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত, বেঢপ বিকট দেখতে ভারতবর্ষের রিকসা। তেমনি রিকসা-চালক। নেই তাদের চেহারার কোন ঔজ্জ্বল্য, বেশ-ভূষার কোন পারিপাট্য। দারিদ্র্য তাদের চোখে-মুখে। ক্লান্তি তাদের সর্বাঙ্গে। তাই টিম-টিমে গতির সঙ্গে এই মৃত্যু-মুখী চালকরা বেমানান নয়। কিন্তু কোন গতি নেই। কোন জোর নেই। চলেছে ত চলেছেই। গরুর গাড়ীর মত। ধমক দিলে কিছুক্ষণ ছোটে। তারপর ঝিমিয়ে পড়ে। তাই বিদেশী যাত্রীরাও পারত-পক্ষে রিকসায় চড়তে চায় না।

কিন্তু ডারবান শহরের বৈশিষ্ট্য তার রিকসাচালক। পৃথিবীর সমস্ত রিকসাচালকদের মধ্যে ওরাই কুলীন। বলা যেতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকার গৌরব হল ডারবানের রিকসা-চালক।

জুলু যোদ্ধারা তাদের রঙ-চঙে পোষাক পরে রিকসার সামনে যখন দাঁড়ায়, তখন বিদেশীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মাথায় তাদের নানা ধরনের শিঙ আর নানান রকমের পালকের মুকুট। কাঁধে তাদের চামড়ার চাদর। নরম লোমগুলো বাতাসে দোলে। গায়ে গাঢ় রঙের পোষাক। পায়ের পাতা থেকে হাটু পর্যন্ত নানা অলংকারে মোড়া। যাত্রী আসা মাত্রই তারা নেচে গেয়ে তাদের রিকসার প্রশংসা করতে থাকবে। এই রিকসার গতিও দ্রুত। মাঝে মাঝে রিকসার রেসও হয়। বেশ কয়েক বছর আগে চুয়ান্ন মাইল রিকসা রেস হয়েছিল। দেশময় উত্তেজনা। এই রেসে জিতেছিল 'ওল্ড হুইস্কি'। কথা ছিল তখনকার প্রিন্স অফ ওয়েলস দক্ষিণ আফ্রিকায় এলে এই রিকসা করে তাঁকে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সম্মতি দিতে পারেননি। হতাশা এসেছিল প্রচুর।

ঝড়

অমরেশ দাস

রমেন, তুমি তো অনেক আগেই দেখেছো আকাশ কেমন লাল হয়ে উঠেছিল। আর একথাও তুমি জানো যে, আকাশ লাল হলে ঝড় আসে। তাহলে তখন থেকে কেন সাবধান হওনি; তখন কেন এ ঘরের সমস্ত জানালা কবাট বন্ধ করনি। এখন ঝড়ের দাপটে তোমার ঘরের সব-কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে; আসবাবপত্রে মেঝেতে ধুলো পড়েছে। শুধু কি তাই? একবার আয়নায় তোমার মুখটা দেখ তো। চুলগুলো চিরুনির শাসন উপেক্ষা করে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে; সারা মুখে হাওয়ার-চড় কেমন দাগ কেটে গেছে। আচ্ছা বলতে পারো, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে চেয়ারে বসে বসে ভাববার কি সার্থকতা!

দেখছো না আকাশটা কেমন কালো হয়ে এসেছে। অবশ্য লক্ষ্য করে থাকবে রূপনারায়ণের এ-তীরে অর্থাৎ তোমাদের বাড়ী যেদিকে সেদিকের আকাশটাই শুধু ভয়ংকর রকমের আঁধারের ফৌজ নিয়ে এসেছে। অথচ ওপারে কেমন আলো! দেখেছো, প্রতিমাদের বাড়ীটা কেমন আলোকিত। আর তোমাদের এদিককার সমস্ত বাড়ীগুলো দরজা-জানালা বন্ধ করে অন্ধকারে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। সেই সংগে লক্ষ্য করে থাকবে। তোমার ঘরটার মুখেও কেমন কালি পড়েছে।

না না, রমেন, এই অন্ধকার ঘরে তোমার এভাবে বসে থাকবার কোনো যৌক্তিকতা আমি দেখছি না। আলোটা জ্বালো। নইলে এই অন্ধকার যে তোমার দেহ ও মন গ্রাস করবে! এমনি করে নিজেকে কেন কালো কুমীরটার মুখে ঠেলে দিচ্ছ? তোমার তো অভিজ্ঞতা নেই; —এই কুমীরটা কী সাংঘাতিক জীব। দেখবে, সে তোমার গোটা দেহটাকে গিলে ফেলবে। আবার একটু পরেই মনটা হজম করে বাকিটা উগরে দেবে। তুমি হয়তো ভাবছো, তাহলে সে আর কী এমন সাংঘাতিক জীব। কিন্তু জানো না রমেন, ঐ জীবের ওটাই বৃত্তি। ও তোমায় প্রাণে মারবে না, মারবে মনে। আর তখন দেখবে, তুমি আর তুমি নেই! অথচ তোমার এই দেহ, এই মুখ—সবই আছে। খুব চমক লাগছে, না? দোহাই তোমার—এই চমকটাকেই সর্বস্ব বলে ধরো না।

সেই তখন থেকে এই চেয়ারে বসে বসে একমনে সিগারেট খাচ্ছো আর তাকিয়ে আছো প্রতিমাদের আলো-ভরা বাড়ীটার দিকে। রূপনারায়ণের একূলে বসে ওকূলের আলোর প্রতিফলন দেখছো নদীর জলে। ওদের বাড়ীটা একেবারে নদীর ধার ঘেঁষে। আচ্ছা রমেন, তুমি কি তোমার সমস্ত বোধগুলি ঐ জলে ভাসিয়ে দিয়েছো? তা নাহলে তুমি তোমার বাবার সামনে সিগারেট খাও! কই আগে তো কখনো তোমাকে বাবার সামনে সিগারেট খেতে দেখিনি। দু-দুবার তোমার বাবা ঐ দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন; তিনি হয়তো তোমায় কিছু বলতে এসেছিলেন। অথচ তুমি তাঁরই সামনে ঐ চেয়ারে বসে বসে জানালা দিয়ে প্রতিমাদের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে ছিলে, লক্ষ্যই করনি দরজার দিকে। এরই মধ্যে কয়েক প্যাকেট সিগারেট তুমি শেষ করেছো। প্যাকেটগুলো ঘরময় ছড়িয়ে, সিগারেটের ছাই যেখানে-সেখানে পড়ে।

আচ্ছা রমেন, এভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে কি লাভ? ডাক্তারবাবু তোমায় কতদিন বেশী সিগারেট খেতে বারণ করেছেন; কিন্তু তুমি তাঁর কথা মানছো না। আমি তোমায় কতবার বলেছি, "রমেন, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। তা নিয়ে মন খারাপ করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তাতে তোমার জীবনীশক্তি কমে আসবে, তুমি নিরুৎসাহী হবে, তোমার মন জীবন-বিমুখ হয়ে উঠবে।" কিন্তু আমার কথায় কান দাওনি। উলটে, জানালা দিয়ে দৃষ্টিকে মেলে দিয়েছো প্রতিমাদের বাড়ীতে। কান পেতে শুনেছো ওপার থেকে ভেসে-আসা নহবৎ। তুমি কি জানো, ঐ নহবৎ ওদের বাড়ীতে যে আশার বাণী ঘোষণা করছে, তা-ই আবার তোমার কাছে নৈরাশ্যের কুমন্ত্রণা।

এখন থেকে নিজেকে সংযত কর রমেন; দেখবে সব আবার ঠিক হয়ে গেছে। তুমি এবং তোমার জগৎ ঠিকই আছো। শুধু একটা সাময়িক ঝড়ে নিজেকে নিঃসহায় ভেবে সেই ঝড়টাকেই সর্বস্ব বলে জেনো না। প্রতি বছর চৈত্রের শালবনে এমনি কতো ঝড় ওঠে। তাই বলে কি শালবন মাথা নুইয়ে ঝড়ে আত্মবিস্মৃত হয়? তবে তুমি কেন আত্মবিস্মরণের পালায় মেতে উঠেছো? গোটা পৃথিবী যখন মাতাল হয়ে ক্ষণিকের জন্য কোনো কিছুকে আপন বলে চুম্বন করে, এবং পরক্ষণেই সেটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আর একটির দিক ছুটে যায়, তখন তুমি

সেই ক্ষণিককেই চিরকালীন বলে ভুল করবে? না, তা হয় না,—হতে দেওয়া উচিত নয়। কেননা তার মানেই তুমি জীবনযুদ্ধে হেরে গেলে। এই মুহূর্তে তুমি যে হৃদয়, অনুভূতি এবং স্মৃতিকে চূড়ান্ত বলে মনে করছো আসলে সেগুলি তা নয়। ভাবাবেগকে আদর করে প্রাতিস্বিকতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। কিন্তু তুমি তাই করছো বলে এখনো ঐ অন্ধকারে নিরালায় তন্ময় হয়ে বসে আছো। প্রতিমাদের বাড়ীর জানালার ঐ ছায়া দুটির দিকে অমন করে তাকিয়ো না রমেন। ওদুটি আসলে ছায়া নয়; অন্তত মানুষের ছায়া নয়! নদীর ওপারে এতদূরে থেকে তুমি ভুল দেখছো। তুমি নিশ্চিত ধরে নিয়েছো একটি প্রতিমা; আর একজনকে তুমি চেনো না। ওরা দুজনে পাশাপাশি ঘন হয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। ওদের চোখে তুমি যে উপহাসের দৃষ্টি দেখছো তা সম্পূর্ণ কল্পিত। হ্যাঁ কল্পিত;—তোমার মানসিক ভ্রম।

আঃ! স্মৃতির ডোবা অমন করে ঘেঁটো না। তোমাদের প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিকে স্মরণ করে মনকে শুধু পীড়া দিচ্ছো...। রূপনারায়ণের বাঁকটায় যেখানে তোমাদের খেলার মাঠ, সেখানে সেদিন তুমি অপরিমেয় প্রশংসা কুড়িয়েছিলে। আর সেই ভিড়ে তুমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলে প্রতিমার উল্লাস ও আনন্দ দেখে। ওদের গাঁয়ের দল খেলায় হেরে গিয়েছিল; অথচ তোমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ওর মুখ আশ্চর্য রকমের খুশীতে ভরে উঠেছিল। মনে পড়ছে, ভিড়ের মধ্যে ওর সঙ্গে তোমার দৃষ্টি-বিনিময়? তুমি নিজেই কি সেদিন বুঝেছিলে প্রতিমার সেই দৃষ্টির ভাষা? আজ মনে হচ্ছে, মায়ামৃগ তোমায় ছলনা করেছিল। তখন মনে করেছিলে ঐ দৃষ্টি নিবিড় হবার সংকেত। অ-ই হয় রমেন, মানুষ এমনি করেই ভুল করে। আর সেই জন্যেই তো তোমায় এতো করে বলছি ক্ষণিকের প্রত্যয়কেই সত্য বলে মনে করো না।

জানালা দিয়ে একবার চারপাশের আকাশটা দেখো রমেন; কেমন কালো হয়ে এসেছে। বুঝতে পারছো না ওটা ঝড়ো কি জলো মেঘ। বোঝা কি সব সময়ই যায়? ঐ অন্ধকারে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে বাইরের অন্ধকারে কেমন করে তাকিয়ে আছো? ভয় করে না তোমার? আমার তো ভীষণ ভয় করছে। আলো জ্বালো রমেন, জ্বালো, জ্বালো! বুঝতে পারছো তো আলো হাতে মাকে ফিরিয়ে দিয়ে কী ভুল করেছো!

আঃ! রমেন, নিজেকে অমন ক'রে ছিঁড়ো না। মানুষ-ছেঁড়া শল্য-বিদদেরই শোভা পায়, তোমায় না। তারা যখন মানুষের দেহটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখে তখন তারা হৃদয়কে বাক্স-বন্দী ক'রে রাখে। তোমার মতো হৃদয়-সর্বস্ব মানুষ যদি নিজের দেহটাকে ঐ অন্ধকারে বসে বসে ছেঁড়ে, তা'হলে সে পাগল হয়ে যাবে। শুধু কি তাই? তুমি যে তোমার মনটাকেও টুকরো টুকরো করছো। আচ্ছা রমেন, মানুষ যদি তার মনের এক্স-রে করতে পারতো, আর সেই এক্স-রের রিপোর্ট দেখে সে যদি মনের অবস্থা বুঝতে পারতো তা'হলে বেশ ভালো হতো, তাই না? তখন তুমি নিশ্চয় এভাবে একলা বসে নিজেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখতে না। অনায়াসেই মনের মতো কাজ করতে পারতে। আর,— মানুষ যদি তার মনটা দেখতে পেতো! ওকি!—তুমি যে সেই অষ্টমী রাত্রির কথা ভাবছো। কি সর্বনেশে রাত্রিরে বাবা! যাত্রা দেখতে তুমি প্রতিমাদের বাড়ীতে গেছলে। ওদের চণ্ডীমণ্ডপে মস্ত সামিয়ানা টাঙিয়ে, 'পলাশির পরে' যাত্রা হচ্ছিল। কী ভিড়! প্রতিমাদের বাড়ীর সকলে আসরের সামনে জাঁকিয়ে বসেছিল। তুমি সেখানে গেছলে যাত্রা দেখতে; অথচ সেই আসরে তুমি ছিলে না। তুমি আর প্রতিমা তখন ওদের বাড়ীর ছাদে। অন্ধকারে আঙ্গুল দিয়ে প্রতিমাকে তুমি তোমাদের বাড়ী দেখাচ্ছিলে। নামবার সময় অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি চলতে চলতে তোমাদের দুজনের দেহ এক হতে চাইছিল। আর তখনই তুমি আলতো করে চুম্বন করেছিলে প্রতিমাকে......।

দেখেছো, ডোবার জল কেমন ঘোলা হয়ে উঠেছে। আর সেই নোংরা জল তোমার ঘরে, কাপড়ে জামায় কী বিশ্রীভাবে লেগে গেছে। লাগবে না। ডোবা কি কেউ অমন করে ঘাঁটে?

তোমার খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে, না রমেন? প্রতিমাদের বাড়ীর সকলে জানতো তোমার সঙ্গে ওর একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একথা জেনেই তারা তোমাকে কোনোদিন কোনো কথা বলেনি। এমনকি প্রতিমার মা এবং ভায়েদের সঙ্গেও তুমি বেশ ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিলে। বিশেষ করে প্রতিমার মা তোমায় খুব ভালোবাসতেন। ওবাড়ীতে নির্বাধ চলনের ছাড়পত্রও ওরা তোমায় দিয়েছিল। কতোদিন প্রতিমা এবং তুমি ঘন্টার পর ঘন্টা একসঙ্গে একটি ঘরে গল্প করেছো। সে ঘরের দরজা কোনোদিন তোমরা বন্ধ করনি। সকলে দেখেছে, তোমরা হৈ-হুল্লোড় করেছো কখনো বা একজনের কাঁধে আর একজন হাত রেখে কথা বলেছো। কই, কখনো তো বাধা আসেনি? তোমাদের ঐ স্বচ্ছন্দ মিলন তোমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে তুলেছিল। কিন্তু আজ সমস্ত ইতিহাসকে বিদ্রূপ করে বর্তমান সেই বিশ্বাসের দেহটা টানতে টানতে রূপনারায়ণের জলে ফেলে দিয়ে এল। আশ্চর্য হবে বৈকি? আচ্ছা রমেন, তুমি কি জানো, অন্ধকারের ডুবুরীরাও মুক্তো হাতে করে ওপরে ওঠে? কই আমিতো কখনো শুনিনি। আমার কেবলই ভয় হয়—কেননা আমি জানি যারা অন্ধকারে ডুব দেয় তারা অধিকাংশই অন্ধকারে তলিয়ে যায়। অথচ সেই তখন থেকে তুমি এই অন্ধকারে ডুব মেরে বসে আছো।

সেই সুখের বিকেলের কথা মনে পড়ছে। তুমি আর প্রতিমা সেই বিকেলে বেড়াতে গিয়েছিলে। রূপনারায়ণের চরায়। বহুদিনের চর সেই শক্ত মাটিতে জেলেদের জালগুলি সারাদিন রোদ পোহায়। তোমরা দুজনে খুশী-ভরা মন নিয়ে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর প্রতিমার কোলে মাথা রেখে একটি জালের ওপর শুয়ে পড়েছিলে তুমি। প্রতিমা তোমার চুলে আঙ্গুলের চিরুনি দিয়ে আরাম দিতে দিতে বলেছিল, চরাটা বেশ।

তুমি বলেছিলে, তার ওপর আমরা দুজন! আরো ভালো, তাই না! উত্তর দেয়নি প্রতিমা। অনেকক্ষণ তোমরা দুজনে চুপ করে ছিলে। এব সময় প্রতিমার হাতের আঙ্গুলগুলো নিজের আঙ্গুলের মধ্যে নিয়ে তুমি বলেছিল, আচ্ছা, তোমার বাবা যদি মত না দেন? ও উত্তর দিয়েছিল

না মানে! যেমনি হোক আমি
মত আদায় করব।

সেদিন প্রতিমার কথার দৃঢ়তা
ক'রে তুমি বেশ খুশী হয়েছিলে।
া তোমার চোখে চোখ রেখে
ছল, জানো, বাবা আমায় কতো
বাসেন?

তুমি বলেছিলে, আমার চেয়েও

ও শুধু ছোট্ট 'যাঃ'! বলেই চোখ
য়ে নিয়েছিল।

রমেন, এখন তুমি মাঝনদীর
দায় তাকিয়ে আছো, সেখানেই
ন চরটা ছিল। আজ সেটা
তলায় তলিয়ে গেছে। আজ
রমেন, আস্তে আস্তে চরটা যে
দন কখন তলিয়ে গেছে তুমি
করনি। লক্ষ্য করার অবসরও
ল তোমার?

টেবিলের ওপর তোমার হাত দুটো
কাঁদো-কাঁদো ভাব করে
তারই তলায় তোমার নামের
অক্ষরটি লেখা। এই টেবিল
তোমার পকেটে যে রুমালটা
সেটা, তোমার বালিশের তোয়ালেটা
প্রতিমার কাজ। আচ্ছা রমেন,
দুবছর ধ'রে যে মনটা তুমি
বেড়িয়েছো সেটাও কি প্রতিমার
য়?

জ সারা রাত এভাবে বসে বসে
দিকে তাকিয়ে থেকেও তুমি
চরার সন্ধান পাবে না। এমন কি
র চোখ দুটি যদি ডুবরীও
পাবে না। পরে একদিন একসময়
সেটা মরে, পচে, ফুলে, ফেঁপে
উঠেছে।

প্রতিমাদের বাড়ীর যে জানালাটার
তুমি এখন তাকিয়ে আছো
এমনি করেই তাকিয়েছিল।
যেখানে আলো দেখছো, কাল
অন্ধকার ছিল। তুমি নদীর ধারে
ছলে রমেন। কথা ছিল প্রতিমা
। বাবার মত ও আদায় করতে
ন। তাই তোমরা সাহস করেছিলে
ও পালিয়ে যাবার। কথা ছিল ঐ
নদীর ধারে ও সময় মতো আসবে।
ওর অপেক্ষায় বসে বসে তুমি বিরক্ত হয়ে
উঠেছিলে। চুপ-চাপ তাকিয়েছিলে ঐ
জানালার দিকে। জানালায় প্রতিমা
দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকারে ওকে চিনতে
পারছিলে না তুমি। তবুও তোমার
স্থির বিশ্বাস ছিল, ওটা প্রতিমা।
তুমি ভেবেছিলে, ও দাঁড়িয়ে থেকে
জানাতে চাইছিল,—তুমি অপেক্ষা কর;
আমি আসছি। অপেক্ষা তুমি অনেকক্ষণ
করেছিলে। প্রতিমার আঁচলটা বাতাসে
জানালার শিকের ভেতর দিয়ে উড়ে উড়ে
বাইরে আসছিল; চুলগুলি এলোমেলো
হয়ে কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল। তুমি
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলে রমেন।
অনেকক্ষণ। তারপর একসময় ভীষণ
বিরক্ত হয়ে উঠেছিলে প্রতিমার ওপর।
সন্দেহের বিষাক্ত বাণ একে একে ছুঁড়ে
দিয়েছিলে ওকে লক্ষ্য করে ঐ জানালার
দিকে। তুমি যেখানটায় বসেছিলে তার
চারপাশের ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছিলে।
জায়গাটায় একটা ঘাসও অবশিষ্ট ছিল
না। দাঁত বার করে তোমার দিকে চেয়ে
মাটি হাসছিল। কিন্তু রমেন, তোমার
সন্দেহতো সত্য না-ও হতে পারে!
হয়তো ঐ ঘর থেকে বেরুবার কোনো
উপায় ছিল না প্রতিমার। তুমি যখন
সন্দেহের আগুনে পুড়িয়ে মারছিলে
ওকে, ও তখন রুদ্ধ কক্ষে চোখের পাতা
ভেজাচ্ছিল। অন্ধকারে ওর ভেজা চিবুক
হয়তো তুমি দেখতে পাওনি।

কিন্তু আজ, এখন ঐ জানালার দিকে
তাকিয়ে শত খুঁজলেও ওকে পাবে না।
ঐ ঘরে কতো মেয়ে ভিড় ক'রে; সকলের
খোঁপাতেইতো ফুলের মালা। তার মধ্যে
থেকে প্রতিমাকে তুমি কেমন করে খুঁজে
বার করবে? আর দেখছো একটিমাত্র
পুরুষ খাটের গায়ে হেলান দিয়ে পা-
দুটো জানালার দিকে মেলে দিয়েছে।
তাকে তুমি চেনো না রমেন।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তুমি কি
আলো জ্বালবে রমেন? না, বাইরে গিয়ে
ঝড়টা বুক পেতে নেবে? কই, তুমিতো
আলোও জ্বাললে না, বাইরেও গেলে না।
পরিবর্তে ঘরময় জোরে জোরে পায়চারি
করছো। মাঝে মাঝে আঙুলে দিয়ে চুল
নেড়ে অত কি ভাবছো রমেন? তুমি
জানো তোমাদের এ-বাড়ী বহু পুরনো।
দেয়ালগুলোর চোয়াল বেরিয়ে পড়েছে;
মেঝের হাড় জিড়-জিড়ে অবস্থা। তাতে
তুমি যদি অমন জোরে জোরে পা-ফেলে
ঘরময় ছুটে বেড়াও তাহলে নীচের তলায়
যারা এই গভীর রাতে শুয়ে, তাদের যে
অসুবিধে হবে!

রমেন, তুমি কি জানো তোমার বাবা
তোমারই মতো চোখ-চেয়ে সারারাত
বিছানায় পড়ে আছেন? ঘুমোবার চেষ্টা
করেও তিনি ঘুমোতে পারেননি। তার
ওপর তুমি যদি অমন শব্দ ক'রে হাঁটো
তাহলে তিনি তিষ্ঠোতে পারবেন না।
বাইরে বেরিয়ে আসবেন বা ওপরে তোমার
দরজার সামনে এসে আগের মতো দাঁড়া-
বেন। তুমি তাতে বিরক্তই হবে।

ওকি!—তুমি যে প্রতিমার দেওয়া
একগাদা চিঠি নিয়ে বসলে। এই নিখাদ
অন্ধকারে তুমিতো সেগুলি পড়তে
পারবে না। তবে ওগুলো সামনে রেখে
মিছি-মিছি কেন মাথা গরম করছো?
একবার বাইরে তাকিয়ে দেখো রমেন।
শুনেছো কি জোর আওয়াজ ভেসে
আসছে দূর থেকে। না, কোনো ট্রেন
রূপনারায়ণের পুলের ওপর দিয়ে যাচ্ছে
না। একটু পরেই ঐ শব্দ ঝড় সঙ্গে করে
তোমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। তার
আগে তুমি বরং জানালা-কবাটগুলো বন্ধ
ক'রে দাও রমেন। নইলে আবার তোমার
সমস্ত ঘর ধুলোয় ছেয়ে যাবে।

দেখছো, বলতে বলতে ঝড়ের বেগ
কতো তীব্র হয়ে উঠল। জানালার কবাট-
গুলো দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে কী বিশ্রী
আওয়াজ করছে। ওকি তুমি যে চিঠি-
গুলি ছিঁড়ে ফেললে! ছেঁড়া চিঠি মুঠো
ভর্তি ক'রে জানালার পাশে দাঁড়ালে
কেন? তুমি ভুল করছো রমেন, ঝড়ের
বেগ তোমার ঘরের দিকেই। কাজেই
চিঠিগুলি বাইরে উড়িয়ে দেবার বৃথাই
চেষ্টা করলে তুমি। দেখছো প্রায় সবকটা
টুকরোই আবার উড়ে এল।

এই ঝড়ে শত চেষ্টা করেও
ওগুলোকে তুমি ঘরের বার করতে
পারবে না। পারা কি যায়?

— কলারসিক

।। সুনয়নী দেবীর চিত্র ।।

মাত্র মাস তিনেক হল সুনয়নী দেবীর মৃত্যু হয়েছে (২৪শে ফেব্রুয়ারী)। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে বাঙলার এক বিশেষ শিল্প-শৈলীরও বোধহয় অন্তর্ধান ঘটলো। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের কন্যা, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী সুনয়নী দেবী বাঙলার পটচিত্রের শৈলী অবলম্বনে যে চিত্রকলার সৃষ্টি করেছিলেন সত্যি তার তুলনা হয় না। আর প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন এই ধারা-পুনরুজ্জীবনের শেষ পথিকৃৎ।

সুনয়নী দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর সেই চিত্রের এক মনোরম প্রদর্শনীর আয়োজন করে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনের কর্তৃপক্ষ আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। গত পক্ষকাল ধরে ক্যাথেড্রাল রোডের এই চিত্র-প্রদর্শনীতে কলকাতার অজস্র নর-নারী সুনয়নী দেবীর সৃষ্টি-কর্ম দেখে পরিতৃপ্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরেছেন।

সুনয়নী দেবী অল্প বয়স থেকেই তাঁর দাদা গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় চিত্র-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সহজাত শিল্পী-মন এমন এক মাধ্যম গ্রহণ করে যেখানে সহজ সরল লোকায়ত জীবনের প্রবেশ ছিল অবারিত। বাঙলার লোক-শিল্পের পট-চিত্রের মধ্যেই তাই সুনয়নী দেবী খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর শিল্পী-মনের আসল বক্তব্য। আর, সুদীর্ঘ ৮৭ বছরের জীবনে তিনি এই ধারার চর্চাতেই বাঙলার চিত্রকলার ইতিহাসে নিজেকে অমর করে রেখে গেলেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে সুনয়নী দেবীর যে ৪১ খানি চিত্র উপস্থিত করা হয়েছিল তা থেকে স্পষ্ট অনুভব করা যায় তাঁর শিল্পীসত্তাকে। এ-যেন রঙে আর রেখায়, সহজ পটুয়ে অংকিত বাঙলার সেই চিরপ্রশান্ত মানসলোক। তাঁর অধিকাংশ চিত্রেই আকৃতি আর প্রকৃতির ভিড়। এবং এগুলি ঘিরে রয়েছে প্রশান্ত গম্ভীরতায় পরিব্যাপ্ত অভিন্ন অথচ সুনিশ্চিত রেখা। কখনো গতিশীল, আবার কখনো মন্থর এই রেখায় তাঁর প্রতিকৃতি সেই চিরকালীন সৌন্দর্যকে পরিস্ফুট করেছে। তাই তাঁর চিত্রকে কেউ যদি খণ্ডকালের চঞ্চলতা আর অন্তরাত্মার চিরন্তন স্থিতির সমন্বয়রূপে অভিহিত করেন, তবে বোধহয় ভুল হবে না তাঁর।

সুনয়নী দেবীর বিষয়বস্তু আহরিত হয়েছে ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্য আর রূপকথার কাহিনীর রাজ্য থেকে। আমাদের লোক-জীবন, মানব-মানবীর শান্ত প্রতিকৃতিকেও তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই গ্রহণের মধ্যে কোনো স্বকল্প-সংঘাতকে তিনি স্থান দেননি। তাই তাঁর সমস্ত চিত্রের জগৎ জুড়ে রয়েছে স্নিগ্ধ প্রশান্তির দ্যুতি। একই বিষয়বস্তুকে বারংবার গ্রহণ করতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। কিন্তু প্রতিটি রচনার ভাব ছিল স্বতন্ত্র। তাই মনে হয়, বিষয়-বৈচিত্র্যের থেকে ভাব-ব্যঞ্জনা সৃষ্টির দিকেই ছিল তাঁর বেশি লক্ষ্য। বলাবাহুল্য এখানেও তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন অনায়াসে।

সুনয়নী দেবীর তুলির টান যেমন ছিল দ্বিধাহীন, তেমনি রঙ প্রয়োগেও তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। লাল আর সবুজ রঙের প্রাধান্য তাঁর চিত্রে। হয়তো এই বর্ণগুলি কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু বাঙলার মানসলোকে এর একটি সহজ আকর্ষণী শক্তিও আছে। তাই বৈচিত্র্যহীন হলেও চিত্রে গাম্ভীর্য আনয়নে এদুটি রঙ অপরিহার্য। ছবির ঘনত্ব আনয়নে তিনি সোনালী আর কালো রঙ প্রয়োগ করেছেন। মেয়েদের মুখ ব্যঞ্জনাময় করার জন্য কোমল ধূসরের সমতলে এনেছেন লাল আর সবুজ রঙের আভাস। সব মিলে তাঁর চিত্রে এমন এক নিবিড়তা, অন্তরঙ্গতা, স্বতঃস্ফূর্ততা প্রকাশিত—যা আর হয়তো কোনোদিনই কোনো শিল্পীর পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না।

জানিনে, তাঁর বধূ, দান, জাপানী মেয়ে, রাধাকৃষ্ণ, উমা-শিব প্রভৃতি চিত্র আর কতকাল পরে দেখবো। অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর কর্তৃপক্ষ যদি তাঁর সমস্ত ছবি সংগ্রহ করে ভবিষ্যতে আর একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন, তবে আমরা আরো খুশী হবো। আশা করি আমাদের অনুরোধ ব্যর্থ হবে না।

॥ কারুশিল্পের প্রদর্শনী ॥

পার্ক স্ট্রীটের আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান। এঁরা দীর্ঘকাল ধরে কারুশিল্পে এবং শ্রম-শিল্পে কিভাবে চারুময়তা প্রয়োগ করে তাকে মানুষের সৌন্দর্যপিপাসু মনের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সেই সাধনায় লিপ্ত। সারা ভারত থেকে এঁরা এই উদ্দেশ্যে এমন সব দুষ্প্রাপ্য কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন, যা বাংলা দেশের অন্যতম সম্পদরূপে এখন পরিগণিত। এই সব লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য এঁরা নিত্য-নতুন নক্সার দিকে শিল্প-দ্রব্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। প্রতি বছর এ উদ্দেশ্য নিয়েই এঁদের সংগৃহীত শিল্প দ্রব্যের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এবার সেই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আম আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি-র এই মহৎ প্রয়াস অভিনন্দিত করি।

এবারের প্রদর্শনীতে সব চেয়ে বে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ত্রিপুরা অঞ্চলে পার্বত্য উপজাতি ত্রিপুরী, রেঙ জোমাতিয়া, লুসাই ও চাকমাদের অনুপ সৌন্দর্যসৃষ্টির কয়েকটি নিদর্শন এদের অলংকারের গড়ন, বয়নকলার বর্ণ সৌন্দর্য কিংবা বাঁশ ও বেতে প্রস্তু কারুশিল্প সত্যি সুন্দর। নক্সাগুলি একটু অদল-বদল করে নিলে এ আধুনিক যুগের অনেক সৌন্দর্যপিপাসু মনকে পরিতৃপ্ত করা যাবে। কারুশিল্প বিভাগে নানাস্থান থেকে সংগৃহীত বয় শিল্প, হস্তীদন্তের প্রস্তুত দ্রব্য, শিং প্রস্তুত দ্রব্য, পোড়ামাটি ও চীনামাটি প্রস্তুত নানাবিধ শিল্পদ্রব্য স্থান পেয়েছে

এই প্রদর্শনীতে এবার গৃহ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে য গৃহস্থালীকে সৌন্দর্যময় করে সাজা উপকরণগুলি। একটি ঘরকে কিভা কত চমৎকার আসবাব দিয়ে রুচি-সম্ম করে সাজানো যায় তার দৃষ্টান্ত উপস্থি করেছিলেন কয়েকটি আসবাব-প্রস্তু সংস্থা। এ ছাড়া শিল্পজাত দ্রব্য কেমন সুন্দর করে উৎপাদন করা য তারও নিদর্শন ছিল এখানে। আর বাণিজ্যিক শিল্পকলার নানা নক্সা।

মোট কথা, এই চারটি বিভা সাহায্যে শিল্পে চারুময়তা প্রয়ো যে দৃষ্টান্ত আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি-র কর্তৃপ তুলে ধরেছেন তা' নিঃসন্দেহে অভিনন্দ যোগ্য। এঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থা আমরা এই কমানাই করি।

॥ লোক-শিল্পের প্রদর্শনী ॥

লোক-শিল্প বাঙলার অন্যতম সাংস্কৃতিক সম্পদ। আজ নানা কা লোক-শিল্পের সেই ধারা অবলু পথে। ঠিক এমনি সময়ে যদি লোক-শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন ক তবে তাঁকে যে-কোনো সুস্থ মা অভিনন্দনে অভিষিক্ত করবেন। ইন্ডি সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট কিছুকাল পরে এমনি একটি স্মর কাজ করলেন। এলগিন রোডের শ্রী

রের বাড়ীতে এই প্রদর্শনী উদ্বোধন ন সাংস্কৃতিক মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হুমায়ুন র।

এই প্রদর্শনীতে বাঙলার লোক-পের প্রায় সমস্ত ধারারই নিদর্শন স্থিত ছিল। আমরা প্রদর্শনীটি ভোগ করেছি। আশা করি ওরিয়েন্টাল সোসাইটি শুধুমাত্র নামে জীবিত থেকে এর প্রতিষ্ঠাতা শিল্পাচার্য নীন্দ্রনাথের স্বপ্ন-সাধকে সার্থক করে বেন। আমরা সেই শুভ প্রচেষ্টায় যোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

॥ মার্কিন-শিল্পী রবার্ট এফ, বাসাবাগার ॥

গত ২৯শে এপ্রিল, ৭৭, পার্ক টস্থ ইন্ডো-আমেরিকান সোসাইটির শনী কক্ষে মার্কিন শিল্পী শ্রী রবার্ট বাসাবাগার একটি মনোরম শিল্প-শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন ছে।

এই শিল্পী আমেরিকার মিশৌরী বিদ্যালয়ের কলা বিষয়ের সহকারী পক। ফুল ব্রাইট গবেষণা-বৃত্তি তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন কলা য়ে গবেষণার জন্য। গত সাত মাস ন এদেশের বিভিন্ন স্থানে পোড়ামাটি মৃৎশিল্পের যে ঐতিহ্যের সঙ্গে চিত হয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে ন নিজস্ব ভঙ্গীতে গড়ে তুলেছেন বে সব শিল্প-নিদর্শন। পশ্চিম-গর বাঁকুড়া উত্তর প্রদেশের গোরক্ষ-ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ড়া, হাঁড়িকুড়ি, থালার যে গঠন-এবং চিত্রায়ণ রীতি আমাদের চিত, এই বিদেশী শিল্পীর শিল্প-শনের মধ্যে সেগুলি অনায়াসে স্থান য়েছে। কিন্তু অনুকরণ নয়, শিল্পী বাগার আমাদের শিল্পরীতি সরণ করে নিজস্ব ভঙ্গীতেই তার দানে সক্ষম হয়েছেন। এখানেই তাঁর ত্ব।

শিল্পীর 'ব্লাক নাইট', 'হর্স এন্ড ডার', 'কিং এন্ড কুইন' এবং 'স্ট্যান্ডিং ট' নিঃসন্দেহে এই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ র্শন। বাঁকুড়ার পাঁচমোড়া অঞ্চলে বে 'ঘোড়া' ও 'মনসার মেড়' তৈরী ন মৃৎশিল্পীরা, এই অধ্যবসায়ী র্কন শিল্পীও অনুরূপ পদ্ধতিতে ট করেছেন তাঁর 'নাইট' মূর্তি-দ্বয়। গঠন প্রকৃতিতে স্থাপত্যশিল্পের তা ও ঋজু ভঙ্গী স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। য়বস্তুতে অবশ্য এসেছে ইউরোপীয় যুগের বীরত্বব্যঞ্জক ধারা। এই রেই 'হাউস অফ এ প্রিন্সেস' একটি র রচনা।

এই প্রদর্শনীর উজ্জ্বল মৃৎপাত্র এবং চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিও আমাদের খুব ভাল লেগেছে। শিল্পী যথার্থই নিষ্ঠাবান এবং শক্তির অধিকারী। ভারতবর্ষের লোক-শিল্পের এই বিশেষ ধারা যদি তাঁর হাতে নতুনরূপে, নবতর দেশে প্রতিষ্ঠা পায় তবে নিশ্চয়ই আমরা গর্ব অনুভব করবো। শিল্পী রবার্ট এফ. বাসাবাগারকে আমরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

মিঃ বাসাবাগারের নির্মিত পোড়ামাটির মূর্তি "ঘোড়া ও সওয়ার"

॥ শিল্পী সলিল ভট্টাচার্যের প্রদর্শনী ॥

আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে পর পর তিনটি প্রদর্শনীতে যে এক-ঘেয়েমি এসেছিল, শিল্পী সলিল ভট্টা-চার্যের প্রদর্শনী সেই একঘেয়েমি থেকে দর্শকদের কিছুটা উদ্ধার করেছে। শিল্পী শ্রীভট্টাচার্য প্রধানতঃ কিউবিষ্ট ধারার শিল্পী। জ্যামিতিক প্যাটার্ণও আমাদের কাছে এখন আর নতুন কোনো রসানুভূতি সৃষ্টি করতে পারছে না। কিন্তু শ্রীভট্টাচার্যের জ্যামিতিক প্যাটার্ণের মধ্যে একটু নতুনত্ব আছে। তার রেখার বিন্যাস ও বিষয়বস্তু নির্বা-চনের মধ্যে এমন এক স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেছি যা থেকে তাঁকে অন্য দশজন জ্যামিতিক প্যাটার্ণপন্থী শিল্পীর মত মনে হয়নি। তাঁর সরল এবং বৃত্তাকার রেখার ছন্দময় সমন্বয় এবং ঘন রঙ প্রয়োগ-পদ্ধতির মধ্যে কৃতিত্বের পরিচয় আছে।

শিল্পী ভট্টাচার্যের 'সূর্য', 'মেছুনী', 'আয় ঘুম আয়', 'আয়ুষ্মতী' প্রভৃতি চিত্র আমাদের বেশ ভালই লেগেছে। আশা করি শিল্পী জ্যামিতিক প্যাটার্ণের তথাকথিত বিমূর্ত চিত্র রচনার চেয়ে তাঁর বর্তমান প্রচেষ্টায় যে রেখার ছন্দ আবিষ্কার করেছেন তাই দিয়ে ভবিষ্যতে তিনি আমাদের আরও সুন্দর চিত্র উপহার দেবেন। আমরা শিল্পীর সৎ প্রচেষ্টাকে নিশ্চয় অভিনন্দিত করবো।

রক্তচাপ বৃদ্ধির সমস্যা

পশুপতি ভট্টাচার্য

দেহস্থ রক্তচাপের বৃদ্ধি আজকাল-কার সভ্য মানুষদের পক্ষে বিশেষ এক সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চল্লিশের পর থেকে প্রায়ই বুকের কষ্ট, মাথার যন্ত্রণা, দেহের নানা স্থানে বেদনা, পরিশ্রম করতে গেলে হাঁপ লাগা, প্রভৃতি এমন কতকগুলি অস্বস্তির লক্ষণ দেখা যায় যাতে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়, আর ডাক্তার তখন চাপমান যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখতে পান যে দেহের রক্তচাপ অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে গেছে। তখন সেই রক্তচাপ কমাবার জন্যে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। তাতে কারো কারো রক্তচাপ বেশ কমেই যায় এবং সতর্কভাবে থাকলে তা আর বাড়ে না। কিন্তু কারো কারো বেলাতে ওষুধে তেমন স্থায়ী ফল হয় না, অর্থাৎ যতদিন ওষুধ খাওয়া যায় ততদিনই কিছু কম থাকে, ওষুধ ছেড়ে দিলেই আবার বেড়ে যায়। তাদের সকলকে একটা দুশ্চিন্তা নিয়েই জীবন কাটাতে হয়। কারণ রক্তচাপের বৃদ্ধি ঐভাবে বরাবর স্থায়ী হলে তার থেকে অকস্মাৎ একটা অঘটনও ঘটে যেতে পারে, মস্তিষ্কের ভিতরকার সূক্ষ্ম রক্তশিরা ছিঁড়ে গিয়ে পক্ষাঘাতও আক্রমণ করতে পারে বা হঠাৎ মৃত্যুও ঘটতে পারে। বস্তুত আজকাল কত লোকই যে এইভাবে অকালে মারা যাচ্ছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

প্রকৃতপক্ষে এই রক্তচাপ-বৃদ্ধি জিনিসটা কি? রক্তের স্রোত আমাদের দেহের মধ্যে নিত্যই প্রবাহিত হচ্ছে। হার্ট যন্ত্রটি তাকে পাম্প করে ঠেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে আর্টারি বা ধমনীর ভিতর দিয়ে, আর সেই রক্তই আবার ভেন বা শিরার ভিতর দিয়ে ফিরে যাচ্ছে হার্টের মধ্যে। কিন্তু সে রক্ত ধমনী থেকে শিরাতে সরাসরি গিয়ে পেঁছিতে পারে না, কারণ দুই-এর মাঝে রয়েছে কৈশিকের জাল, সেই সরু সরু কৈশিকের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে রক্তকে ধমনী থেকে শিরায় পেঁছিতে হয়। কৈশিকের জাল আছে দুই প্রস্থ, এক প্রস্থ ধমনীর কৈশিক আর এক প্রস্থ শিরার কৈশিক। কৈশিক মানে কেশের মতো অতি সূক্ষ্ম রক্তবাহিকা নলী, সেই কারণেই ওর নাম ক্যাপিলারি বা কৈশিক। অতএব ধমনীর রক্ত প্রবাহিত হয়ে এসে প্রথমে বহুশাখাযুক্ত ধমনী কৈশিকের জালের মধ্যে প্রবেশ করে, সেখান থেকে যায় শিরা কৈশিকে, তার পরে যেতে পারে শিরাগুলির মধ্যে। এই-রূপে অপেক্ষাকৃত মোটা নল থেকে খুব সরু নলের মধ্যে ঢুকতে হয় বলেই রক্তের মধ্যে একটা চাপের সৃষ্টি হয়। কোনো এক নদীর জলকে যদি অন্য নদীর মধ্যে চালনা করা হয় অনেকগুলি সরু সরু নলের ভিতর দিয়ে, তাহলে পূর্বোক্ত নদীর জল একটা বাধা পেয়ে জলের চাপ যেমন বেড়ে যাবে, এখানেও সেইরূপ অবস্থা। কেবল রক্তবাহিকা নলগুলির দেয়াল অনেকটা রবারের মতো স্থিতি-স্থাপক বলে সেই চাপের মাত্রা অনেকটা পুষিয়ে গিয়ে চাপটা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকে। কিন্তু যদি কোনো কারণে

নলের সেই স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস প
তখন দেয়ালগুলি অপেক্ষাকৃত শক্ত এ
অনমনীয় হয়ে পড়াতে তখন ঐ চা
মাত্রা আর স্বাভাবিক থাকে না, তখন
ক্রমশ বাড়তে শুরু করে।

নানা প্রকার কারণে ঐরূপে অব
সৃষ্টি হয়ে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পা
যেখানে রক্তপ্রবাহ উপরোক্ত কৈশিকগু
মধ্যে যতই বেশী বাধা পাচ্ছে, সেখা
রক্তচাপও ততই বেশী বাড়ছে, অর্থ
কৈশিকগুলি সংকীর্ণ থেকে আরো কি
বেশী সংকীর্ণতর হচ্ছে বলেই ত
ঘটছে। এর বিভিন্ন প্রকার হেতু থাক
পারে। হয়তো ব্যক্তিবিশেষের অতি
স্নায়বিক অসামঞ্জস্যের ফলে এ
হয়েছে। কারো বা হয়তো আভ্যন্তর
গ্ল্যান্ডগুলির হর্মোনরসের ক্ষ
ইতরবিশেষ থেকে তাই হয়েছে। কা
বা কৈশিকের দেয়ালের গায়ে নুন জম
থাকায় দেয়ালগুলি পুরু হয়ে গেছে এ
নলগুলি অপেক্ষাকৃত বুজে গেছে, তা
ফলে ঐরূপ হয়েছে।

বস্তুতঃ অতিরিক্ত নুন জমতে থাক
যে রক্তচাপ বৃদ্ধির সবচেয়ে বেশী সম্ভ
কারণ, বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা সে
কথাই এখন বলছেন। পরীক্ষায় দে
গেছে, রক্তচাপ যাদের বেশী থাকে, তাদে
রক্তে প্রায়ই নুনের পরিমাণও বেশ
থাকে। আরো অন্যান্য নিম্নপ্রাণী
মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে
ইঁদুরদের পানীয় জলের মধ্যে যদি কি
নুন মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাদে
রক্তচাপের মাত্রা বেশ বেড়ে যায়, এমনি
তার ফলে কোনো কোনো ইঁদুর মারা
যায়। কিন্তু নুন দেওয়া বন্ধ করলে
তাদের রক্তচাপও তখন কমে যায়।

আরো লক্ষ্য করে দেখা গেছে
যে-সব দেশের লোকেরা নুন প্রায়ই খে
পায় না অথবা কম খায় তাদের ম
কারো রক্তচাপ বাড়তে দেখা যায় না
যেমন তিব্বতীরা, এস্কিমোরা, পানাম
অধিবাসীরা, অস্ট্রেলিয়ার আদিম জাতি
ইত্যাদি। আর যারা বেশী নুন খায়, প্র
তাদের মধ্যেই রক্তচাপ বৃদ্ধির প্রাচু
দেখা যায়।

নুনের আসল নাম হলো সোডি
ক্লোরাইড, অর্থাৎ সোডিয়মের লবণ। ও
সোডিয়ম জিনিসটাই অনিষ্টকারী। ন
তো রক্তের মধ্যে স্বভাবতই কি
পরিমাণে থাকে। সকল প্রকার জৈব ও
অজৈব খাদ্যের মধ্যেও কিছু কিছু থাকে
তথাপি খাদ্যের আস্বাদ বাড়াবার জ
আমরা সকল প্রকার খাদ্যের সঙ্গেই ন

মিশিয়ে রন্ধন করতে অভ্যস্ত হয়েছি, আলোনা কোনো জিনিস আমাদের মুখে রোচে না। শুধু তাই নয়, খাদ্যকে আরো বেশী লবণাক্ত করবার জন্যে আমরা খেতে বসি পাতে কিছু পরিমাণ নুন নিয়ে। তাতেই আমাদের সোডিয়ম গ্রহণের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। নুনের মাত্রা যথেষ্ট কমিয়ে দিতে পারলে সোডিয়মের মাত্রাও সেই অনুপাতে কমে যায়।

নুনের আধিক্যে কেবল যে রক্তচাপকেই বাড়িয়ে দেয় তাই নয়, অধিকন্তু দেহরক্তের মোট পরিমাণও ওতে বেড়ে যায়। সেইজন্য দেখা যায় যে, রক্তচাপবৃদ্ধিতে রক্তমোক্ষণ করলে বা শিরার ভিতর থেকে কতকটা রক্ত টেনে বের ক'রে দিলে চাপও কমে এবং সেই সঙ্গে রোগী সুস্থও বোধ করতে থাকে।

শুধু তাই নয়, বেশী নুন খাওয়াতে হার্টের অনিষ্ট হতে পারে এবং করোনারি রোগ বা থ্রম্বসিস রোগের সূত্রপাত হতে পারে। সুতরাং করোনারি রোগের সম্ভাবনা মাত্রেই আজকাল নুন খাওয়া বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়।

এ ছাড়া নুনের দ্বারা কিডনি যন্ত্রের অনিষ্ট তো হয়ই, সেই কারণে যাদের মূত্ররোগ থাকে এবং হাত পা ফোলে তাদের পক্ষে নুন খাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। আরো এক কথা, এও দেখা গেছে যে বেশী নুন খেলে মাথার চুল উঠে যায়। যাদের মাথা হতে প্রচুর চুল উঠে যাচ্ছে, তারা যদি নুন খাওয়া ত্যাগ করতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চুল ওঠাও নিবারিত হয়। যাদের মাথা থেকে প্রচুর চুল উঠে যাচ্ছে তারা নিজেরাই এটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারে।

রক্তচাপ বৃদ্ধি পাবার ধাত যাদের, তাদের পক্ষে নুন খাওয়ার মাত্রা যথাসাধ্য কমিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত। লোনা খাওয়া বা আলোনা খাওয়া নিতান্তই অভ্যাসের ব্যাপার। যাদের ডায়াবিটিস আছে তারা যেমন চিনি বর্জন করা অভ্যাস ক'রে নিতে পারে, যাদের রক্তচাপ বাড়ে তারাও তেমনি নুন বর্জন করা অভ্যাস ক'রে নিতে পারে। এ অভ্যাসটি ক'রে নিতে পনের দিনের বেশী সময় লাগে না, এবং তখন দেখা যায় যে নুনমিশ্রিত খাদ্য খেতে আর ভালোই লাগে না। এই অভ্যাসটি করতে পারলে হার্টও সবল হয় এবং পরমায়ু বাড়ে, অন্ততপক্ষে রক্তচাপ অধিক থাকলেও হঠাৎ হার্টফেল হয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না। কারণ এও লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে নুন খাওয়া যারা ছেড়েছে তাদের কারো ঐভাবে মৃত্যু হয়নি।

তবে অবশ্য রক্তচাপ-বৃদ্ধির আরো অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। অতএব সকল প্রকার কারণগুলির সম্বন্ধেই পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে, এবং যা কিছু কারণ লক্ষিত হবে সেগুলিকে দূর করতে হবে। যেমন, অতিরিক্ত ধূমপান এবং চা কফি প্রভৃতি পান করা অত্যধিক হলে তার ফলেও হতে পারে। যেখানে সেরূপ দেখা যাবে সেখানে তার সম্বন্ধে সমুচিত ব্যবস্থা করতে হবে। কোথাও বা অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনার ফলে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। যেখানে তাই ঘটছে সেখানে তা যথাসাধ্য নিবারণ করতে হবে। কোথাও বা নিত্য একস্থানে বসে থাকার দরুণ নড়াচড়া ও পরিশ্রমের অভাবে ধমনী ও কৈশিকগুলির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটছে। সেখানে রীতিমত চলাফেরা ও কিছু পরিশ্রমাদির ব্যবস্থা দিতে হবে। কোথাও বা আভ্যন্তরীণ গ্রন্থিরসের বিপর্যয়ে রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে। সেখানে উপযুক্ত গ্রন্থিরসাদির সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। আরো অন্যান্য কারণ থাকতে পারে।

তাহলে মোটের উপর রক্তচাপবৃদ্ধি নিবারণ করতে হলে সাধারণভাবে কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত?

রক্তচাপ কমিয়ে দেবার জন্য, অর্থাৎ কৈশিক নলীগুলিকে স্ফীত করে দিয়ে রক্তচাপের মাত্রা নামিয়ে দেবার জন্য আজকাল নানাপ্রকার ভালো ভালো ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেগুলির দ্বারা ভালো রকম ফলও পাওয়া যায়। কিন্তু সে ফল হয় সাময়িক। ওষুধ ব্যবহার করা ছেড়ে দিলেই আবার পূর্বাবস্থা ফিরে আসে। তদ্ভিন্ন ওষুধগুলি যদি বরাবরের জন্য ব্যবহার করতে থাকা যায় তাহলে ক্রমশ তা এমন অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় যে তখন তার দ্বারা আর আগেকার মতো সুফল পাওয়া যায় না। অতএব সেগুলিকে নিত্য ব্যবহার না ক'রে কেবল প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা উচিত।

ইতিমধ্যে রক্তচাপ যাতে না বাড়ে তার জন্য সাধারণ উপায়গুলি অবলম্বন করা উচিত। তন্মধ্যে নুন খাওয়া কমিয়ে দেওয়া এবং পারতপক্ষে বর্জন করাই হলো সর্বপ্রধান। তাতে কেবল রক্তচাপই হ্রাস পাবে না, অধিকন্তু হার্ট যন্ত্রটিও ভালো থাকবে এবং করোনারি রোগের আক্রমণেরও আশংকা থাকবে না।

দ্বিতীয় কথা, অস্বাস্থ্যকর সকল বস্তুই বর্জন করা উচিত। যেমন অতিরিক্ত ধূমপান করা, চা কফি এবং মদ্যপান করা প্রভৃতি এ-অবস্থায় পরিহার করতে হবে। যখন দেহের কল বিগড়েছে তখন একটু সতর্ক হয়ে থাকতেই হবে।

তৃতীয় কথা, দেহকে কিছু পরিশ্রম করাতে হবে আর মনকে যথাসম্ভব শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন রাখতে হবে। ব্যায়াম প্রভৃতি অন্যান্য কোনোরূপে পরিশ্রম করা সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু প্রত্যহ কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ানো নিশ্চয়ই সম্ভব। অন্ততপক্ষে ঘণ্টাখানেক প্রত্যহ পায়চারি ক'রে বেড়ানো দরকার। নতুবা রক্তবাহিকাগুলির স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে না।

চতুর্থ কথা, রসুন খাওয়া এ-অবস্থায় খুবই ভালো। অনেকেই খায়। মহাত্মা গান্ধীও প্রত্যহ কিছু রসুন চিবিয়ে খেতেন বলে শুনেছি। আর কিছু নয়, ভাত খেতে বসে প্রথম গ্রাসের সঙ্গে দুই চার কোয়া রসুন চিবিয়ে খেয়ে তারপর যথারীতি আহার করা। এতে যে রক্তচাপ কম থাকে এটা পরীক্ষিত সত্য। গন্ধের জন্য যাঁরা রসুন চিবিয়ে খেতে পারবেন না, তাঁরা রসুনের ক্যাপসুল খেতে পারেন।

॥ নূতন কর্ণধার ॥

ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও ডাঃ জাকির হোসেন যথাক্রমে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। মূলত শিক্ষাব্রতী ভারতের এই দুইজন বিশিষ্ট সন্তান প্রায় অবিসংবাদিতরূপেই উক্ত দুই সম্মানিত

রাধাকৃষ্ণন

পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কোন রাজনৈতিক দলই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রার্থী মনোনীত করেননি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থহীন বলেই যে অন্যান্য দলগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রেননি তা নয়, কমিউনিস্ট পার্টি, প্রজা-সমাজতন্ত্রী, জনসংঘ, স্বতন্ত্র প্রভৃতি সর্বভারতীয় দলগুলি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ও ডাঃ হোসেনকে তাঁদের প্রার্থিত পদে যোগ্যতম প্রার্থী বিবেচনা করেই তাঁদের প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন। উল্লেখযোগ্য দলগুলির মধ্যে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনি কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রী দল ও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম। সমাজতন্ত্রী দল তাঁদের সিদ্ধান্তের কারণস্বরূপ বলেন, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বা ডাঃ হোসেন কেউই কোনদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেননি, সুতরাং এই জাতিগঠনের সময় দুজন "অপরীক্ষিত সৈনিককে" তাঁরা দায়িত্বপূর্ণ দুটি পদে প্রতিষ্ঠিত করার "ঝুঁকি" নিতে পারেন না। আর দক্ষিণ ভারতীয় দল দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগামের আজ প্রধান ধ্বনিই হল ভারতের দ্বিখণ্ডীকরণ ও স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে দক্ষিণ ভারতের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং ভারতের ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে তাঁরা দলের আদর্শবিরোধী কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারেন

না। দুই দলেরই বক্তব্যে চমকলাগানো অভিনবত্ব আছে, কিন্তু বিশাল ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের এ বক্তব্যের গুরুত্ব নিতান্তই অনুল্লেখ্য।

সমগ্র ভারতের যাবতীয় আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সমস্যাগুলির কথা মনে রেখেই শাসকদল কংগ্রেস এবার সর্বভারতীয় পদগুলি পূরণ করেছেন বলে মনে হয়। দক্ষিণ ভারতের বহু অভিযোগ আছে উত্তর ভারতের বিরুদ্ধে, তাই তাদের সন্তুষ্ট করতে এবার রাষ্ট্রপতি হলেন দক্ষিণ ভারতীয়। উপ-রাষ্ট্রপতি হলেন সংখ্যালঘুর প্রতিনিধি। প্রধানমন্ত্রী হলেন উত্তর ভারতীয় ও লোকসভার অধ্যক্ষ শিখ। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের আঞ্চলিক ও আংশিক স্বার্থকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এগিয়ে চলা নানা কারণেই সম্ভব নয়, তবুও সবদিক বিবেচনা করে যাঁকে যে পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে তিনি নিঃসন্দেহে সে পদের যোগ্যতম প্রার্থী। তৃতীয় সাধারণ নির্বা-

জাকির হোসেন

চন-অন্তে নূতন পদপূরণ সম্পূর্ণ হল। এবার তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে ও দেশবাসীর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় আগামী পাঁচ বছরে দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হোক, সারা ভারতের এই আজ একান্ত কামনা।

॥ কাশ্মীর ॥

'মৃত' কাশ্মীর প্রসঙ্গকে আর একবার পুনরুজ্জীবিত করার পাকিস্থানী প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। শত দফার মামুলি আলোচনায় রাষ্ট্রসংঘে নতুন কোন রাষ্ট্রই পাকিস্থানের দাবীর সমর্থনে এগিয়ে আসেনি, পরন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের দাবীর সমর্থনে অতি জোরালো ভাষায় বলেছে যে, চোদ্দ বছর আগে যে অবস্থায় ভারত কাশ্মীরে গণভোটের প্রস্তাব করেছিল সে অবস্থার আজ আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, সুতরাং বর্তমান অবস্থায় চোদ্দ বছর আগের প্রস্তাব কার্যকরী করার দাবী অর্থহীন। কাশ্মীর এখন ভারতীয় ইউনিয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেই অবস্থা স্বীকার করে নিয়েই কাশ্মীর সমস্যা আলোচনা করতে হবে। চোদ্দ বছর আগের প্রস্তাব মত কাশ্মীরে যে গণভোট করা সম্ভব হয়নি তার জন্যেও সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্থানকেই দায়ী করেছে, কারণ, পাকিস্থান জোর করে কাশ্মীরের যে এলাকা দখল করেছে সে এলাকা সে আজও ছেড়ে যায়নি। স্বভাবতই সোভিয়েট ইউনিয়নের এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত হওয়ার পর রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদ বা সাধারণ পরিষদে কাশ্মীর নিয়ে আরও আলোচনা করার কোন অবকাশ থাকেনি। যুক্তরাষ্ট্রও কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্থানের পক্ষে কোন উৎসাহ দেখায়নি এবং জাফরুল্লা খাঁর দীর্ঘ বক্তৃতাবলীর সামান্যতম অংশও যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকাগুলিতে স্থান পায়নি।

কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন না পেলেও পাকিস্থানের বন্ধুর অভাব হয়নি। সে বন্ধুটি হল ভারতীয় ভূমির আর এক জবরদখলকারী, চীন। পাকিস্থান যেমন আজও কাশ্মীরের প্রায় ৩৭ হাজার বর্গমাইল স্থান জোর করে দখল করে বসে আছে, চীনও তেমনি দখল করেছে কাশ্মীরের লাডাক অঞ্চলের প্রায় ১২ হাজার বর্গমাইল ভূমি। স্বভাবতই দস্যুস্বার্থ আজ এই দুটি দেশকে ভারতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও চীন পাক-অধিকৃত কাশ্মীর এলাকাকে পাকিস্থানের অংশ বলে ধরে নিয়েছে, এবং লাডাকের অধিকৃত অঞ্চলটিকেও নিজ এলাকা বলে ধরে নিয়ে সে পাকিস্থানের সঙ্গে "সীমান্ত নির্ধারণে" উদ্যোগী হয়েছে।

চীন ও পাকিস্থানের এই হিটলারী মনোভাব ও আচরণের বিরুদ্ধে ভারতের

প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, চীন ও পাকিস্থানের সীমান্ত নির্ধারণের তথাকথিত সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে ভারতের সার্বভৌমত্বের উপরেই হস্তক্ষেপের সামিল এবং এই ধরণের জবরদস্তি ও বে-আইনী কার্যকলাপ ভারত কখনোই স্বীকার করে নেবে না। প্রতিরক্ষামন্ত্রীও অনুরূপে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রনায়কদের এই মনোভাব ও কার্যক্রমের মধ্যে কিভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায় সেইটাই আজ এ রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সমস্যা। প্রায় চল্লিশ হাজার বর্গমাইল ভারতীয় ভূমি এখন দুই বৈরী প্রতিবেশীর বে-আইনী দখলে এবং ভারত সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সেই অধিকারকেই তারা স্থায়ী অধিকারে পরিণত করতে উদ্যত। অথচ এর বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় ও কার্যকরী কর্মসূচী ভারত সরকারের পক্ষ হতে এখনও প্রস্তাবিত হয়নি।

॥ বৈরী নাগার অপপ্রয়াস ॥

বৈরী নাগা নেতা ফিজোর ইউরোপ সফর ব্যর্থ হয়েছে. শূন্য হাতেই আবার তিনি ফিরে আসছেন তাঁর ক্ষয়িষ্ণু অনুগামীদের মাঝে। কিন্তু একেবারে হতাশ হওয়ার কারণ ঘটেনি তাঁর. এবার নতুন বন্ধু পেয়েছেন তিনি। সে বন্ধু পাকিস্থান। ভারতের বিরক্তির কারণ ঘটার এমন সহজ সুযোগ বোধহয় পাকিস্থান হাতছাড়া করতে রাজী নয়. তাই "মানবিক" কারণে সে ফিজো ও তাঁর দলবলকে সর্ব উপায়ে সাহায্যে অগ্রণী হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, লণ্ডন থেকে বৈরী নাগা নেতা ফিজো যখন ঢাকায় এসে উপস্থিত হবেন তখন তাঁকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানানোর জন্যে এখন থেকেই উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়েছে। ঢাকার রাস্তায় ইতিমধ্যেই পোস্টার পড়েছে "স্বাগত ফিজো" বলে। তাছাড়া ফিজোকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে যে প্রায় তিনশত বৈরী নাগা শ্রীহট্ট দিয়ে পাকিস্থানে প্রবেশ করেছিল, একটি বিশেষ ট্রেনযোগে তাদের ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঢাকায় এসে তারা পূর্ব পাকিস্থানের গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে এবং পাকিস্থানী স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় একটি "স্বাধীন নাগা সরকার" গঠনের পরিকল্পনা নিয়েও নাকি তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। ফিজো কি ফিজোর প্রতিদ্বন্দ্বী কাইটো সেমার নেতৃত্বে ঐ তথাকথিত নাগা সরকার গঠিত হবে। তাও নাকি পাক সরকার ঐ বৈরী নাগাদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করে দেবেন। বলা বাহুল্য, "স্বাধীন নাগা সরকার" যদি পাকিস্থানের স্বীকৃতি লাভ করে তবে তার ফল হবে মারাত্মক। কারণ তখন প্রকাশ্যে এবং "আইনগত"ভাবে পাকিস্থান তাদের অস্ত্র সরবরাহ করতে পারবে এবং তার জোরে বৈরী নাগারা দ্বিগুণ উৎসাহে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধীতা শুরু করতে পারবে। পাকিস্থানের বর্তমান মনোভাব ও কার্যক্রম দেখে মনে হয়, ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করার কোন সুযোগই তারা ছাড়তে রাজী নয়। কিন্তু এভাবে যে পাকিস্থানের বিক্ষুব্ধ জনমতকে বিপথচালিত করা যাবে না, এটা পাকিস্থানের জনসমর্থনহীন জঙ্গী শাসকরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবেন ততই সেটা তাঁদের ও পাকিস্থানের সাধারণ মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর হবে।

॥ নির্বাচনের প্রহসন ॥

একটি নির্বাচনের প্রহসন শেষ হ'ল পাকিস্থানে। স্বাধীন হওয়ার পর এই পাকিস্থানের প্রথম "সাধারণ নির্বাচন", এবং এই নির্বাচনে পাকিস্থানের প্রায় দশ কোটি নাগরিকের মধ্যে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলেন মাত্র আশী হাজার নির্বাচক, যাদের পিঠে "মৌলিক গণতন্ত্রী"র ছাপ মেরে দিয়েছিলেন পাকিস্থানের জঙ্গী শাসকরা। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই নির্বাচকদের বাছাই করা হয়, তবুও সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। একারণে প্রত্যেক নির্বাচককেই একখানি করে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছিল, যা তাঁরা ভোট দিতে আসার সময় বিশেষ করে পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং তাছাড়াও তাদের দেহ তল্লাস করে দেখা হয় যে কোন জাল ভোটপত্র তাঁরা সঙ্গে করে এনেছেন কি না। এতখানি অসম্মাননার মধ্যে যাঁরা ভোট দিতে এসেছিলেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কর্তার ইচ্ছেয় কর্মই করতে এসেছিলেন। ফলে মাত্র দুশ' আড়াই শ' ভোট পেয়ে যাঁরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরূপে পাকিস্থানের সংসদে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে পাকিস্থানের সাধারণ মানুষের সম্পর্ক বহুদিন আগেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক জীবনে বারংবার ধিকৃত কতকগুলি মানুষকে নিয়ে এভাবে "গণতান্ত্রিক" সংসদ গঠনের প্রয়াস পাকিস্থানবাসীদের মনে স্বভাবতই কোন দাগ কাটতে পারেনি। কিন্তু সবচেয়ে লজ্জার যা তা হল এই যে তথাকথিত সংসদে পাকিস্থানের এক কোটি সংখ্যালঘু হিন্দুর একজনও প্রতিনিধি নেই। কিন্তু তার জন্যে কোনরকম সংকোচ বোধ করার কারণ খুঁজে পাননি পাকিস্থানের শাসকবর্গ। "জনগণ" যদি তাদের নির্বাচিত না করে তবে তাঁরা কি করতে পারেন, এই হ'ল তাঁদের কৈফিয়ত। অথচ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের জন্যে তাঁদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সংখ্যালঘুদের স্বার্থের প্রতি এই উপেক্ষা নিঃসন্দেহে মানবতা-বিরোধী আচরণ, এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুধু পাক সরকারের কাছে নয়, রাষ্ট্রসংঘের কাছেও জানানো উচিত।

॥ বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ॥

আশী বছর বয়সে অগ্নিযুগের অন্যতম বিপ্লবী নায়ক অবিনাশ ভট্টাচার্যের জীবনাবসান হল। মেট্রোপলিটান কলেজে পাঠরত অবস্থায় তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং পরে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ প্রখ্যাত বিপ্লবীদের সহকর্মীরূপে দেশের মুক্তি-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। যখন তিনি নবশক্তি পত্রিকার সম্পাদক সেই সময় শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মীরূপে আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামীরূপে গ্রেপ্তার হন এবং অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন। পরে স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় ১৯১৫ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পর অবিনাশচন্দ্র দেশবন্ধুর সহকর্মীরূপে "নারায়ণ" পত্রিকার পরিচালন দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সুভাষচন্দ্রের আমলে কর্পোরেশন গেজেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জাতির মুক্তির শপথ নিয়ে যে সকল বিপ্লবী দেশত্যাগ করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানারূপ বৈপ্লবিক কার্যকলাপে লিপ্ত হন তাঁদের সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত তথ্য পরবর্তীকালে অবিনাশচন্দ্র বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেন। সে সকল রচনার মূল্য সীমাহীন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিনাশচন্দ্র ছিলেন বিপ্লবী ও প্রগতিশীল চিন্তার ধারক। তাঁর মৃত্যুতে যেন একটি যুগের শেষ অঙ্কের উপর যবনিকাপাত হল।

॥ ঘরে ॥

২৬শে এপ্রিল—১৩ই বৈশাখঃ রিয়ার এডমিরাল শ্রীঅজিতেন্দু চক্রবর্তীর পদত্যাগপত্র পেশ—সিনিয়রিটির দাবী উপেক্ষা করিয়া চীফ অব্ ন্যাভাল ষ্টাফ পদে রিয়ার এডমিরাল সোমানের নিয়োগের জের।

২৭শে এপ্রিল—১৪ই বৈশাখঃ 'পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য দণ্ডকারণ্যের দ্বার অনির্দিষ্টকাল খোলা থাকিবে'—দণ্ডকারণ্যে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

২৮শে এপ্রিল—১৫ই বৈশাখঃ ভারতীয় সেনাবাহিনী অভিযাত্রী দল কর্তৃক ২৩ হাজার ফুট উঁচু কোক্‌টাং শৃঙ্গ বিজয়।

২৯শে এপ্রিল—১৬ই বৈশাখঃ 'পারমাণবিক পরীক্ষা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর'—দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ—জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন চলার সময় অস্ত্র পরীক্ষার নিন্দা।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সভাপতি ও সম্পাদক পদে যথাক্রমে শ্রীএস্, এ, ডাঙ্গে ও শ্রীই, এম, এস্, নাম্বুদ্রিপাদ নির্বাচিত।

৩০শে এপ্রিল—১৭ই বৈশাখঃ শালতোড়া (বাঁকুড়া) উপনির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী ডাঃ অনাথবন্ধু রায় (প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী) নির্বাচিত।

১লা মে—১৮ই বৈশাখঃ পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ বন্ধ করার চেষ্টা—কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তুতি।

২রা মে—১৯শে বৈশাখঃ দাবী পূরণ না হওয়ায় পোর্ট কমিশনার্সের (কলিকাতা) অধিকাংশ পাইলটের পদত্যাগ—কলিকাতা বন্দরে বিপর্যয়কর অবস্থা।

৩রা মে—২০শে বৈশাখ ঃ 'চীনা হুমকীর সম্মুখীন হইতে ভারত প্রস্তুত'—রাজ্যসভায় শ্রীনেহরুর দৃপ্ত ঘোষণা।

৪ঠা মে—২১শে বৈশাখ ঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তানী মুসলমানদের ভারতে অনুপ্রবেশ অব্যাহত—টাকার বিনিময়ে ভারত প্রবেশে ভারতীয় মুসলমানদের সহায়তা—এযাবৎ বহু পাকিস্তানী গ্রেপ্তার।

৫ই মে—২২শে বৈশাখ ঃ পাইলট ধর্মঘটের পরিণতিতে কলিকাতা বন্দরে ১৯খানি জাহাজ আটক—কাজে যোগ না দেওয়ায় ২৫ জন পাইলটের বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান।

৬ই মে—২৩শে বৈশাখ ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা (শ্রীনেহরুর নেতৃত্বাধীন) পুনরায় সম্প্রসারণ—আরও দুইজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১০ জন উপমন্ত্রী নিয়োগ (মন্ত্রিসভায় মোট সদস্য সংখ্যা ৫০)।

৭ই মে—২৪শে বৈশাখ ঃ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে (দ্বিতীয়) ডঃ জাকির হোসেন নির্বাচিত।

৮ই মে—২৫শে বৈশাখ ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে 'রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন—প্রথম উপাচার্য ঃ শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (আই-সি-এস)।

দেশের সর্বত্র সাড়ম্বরে রবীন্দ্রনাথের ১০১তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত।

৯ই মে—২৬শে বৈশাখ ঃ কলিকাতা বন্দরের ১১ জন শিক্ষানবিশ পাইলটেরও পদত্যাগ—পরিস্থিতির আরও অবনতি—বন্দরে ৭২ খানা ও মোহনায় ১০ খানা জাহাজ আটক।

॥ বাইরে ॥

২৬শে এপ্রিল—১৩ই বৈশাখঃ পারমাণবিক পরীক্ষা পুনরারম্ভে রাশিয়া কর্তৃক আমেরিকার কার্যের তীব্র নিন্দা।

২৭শে এপ্রিল—১৪ই বৈশাখঃ অবিভক্ত বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতা ও পূর্ব পাকিস্থানের প্রাক্তন গভর্ণর মিঃ এ. কে. ফজলুল হকের (৮৯) ঢাকার হাসপাতালে জীবনাবসান।

কাশ্মীর প্রশ্ন সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক পুনরারম্ভ—প্রশ্নের দ্রুত মীমাংসা না হইলে ব্যাপকতর যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া পাক্ প্রতিনিধির হুমকী।

২৮শে এপ্রিল—১৫ই বৈশাখঃ পাক্ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন প্রসঙ্গে সমগ্র পূর্ব পাকিস্থানে ভোটগ্রহণ।

২৯শে এপ্রিল—১৬ই বৈশাখঃ ঢাকা সহরে সাম্প্রদায়িক গোলযোগে তিন দিনে সংখ্যালঘু শ্রেণীর ৯ জন নিহত—চাঁদপুর (ত্রিপুরা) ও রাজশাহীতেও সংখ্যালঘুদের গৃহ লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের সংবাদ।

৩০শে এপ্রিল—১৭ই বৈশাখঃ ঘানার প্রেসিডেন্ট নক্রুমার লেনিন শান্তি পুরস্কার (১৯৬১) লাভ।

১লা মে—১৮ই বৈশাখ ঃ মে দিবসে মস্কোর রেড স্কোয়ারে ছাত্র শ্রমিক ও সৈন্যদের সমাবেশ—কয়েকঘণ্টা ধরিয়া কুচকাওয়াজ ও রকেট অস্ত্রের প্রদর্শনী—প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ কর্তৃক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন।

রাজশাহী জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তৃতি—পাক্ সরকার কর্তৃক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ।

২রা মে—১৯শে বৈশাখঃ রাজশাহী ও পাবনা শহরে ব্যাপক হাঙ্গামার সংবাদ—পাবনায় শতাধিক ব্যক্তি ছুরিকাহত।

ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহামকে পুনরায় কাশ্মীর বিরোধে সালিশ নিয়োগ করার জন্য পাকিস্তানী দাবী—রাষ্ট্রসংঘ স্বস্তি পরিষদে পাক্ প্রতিনিধি স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খানের ভাষণ।

৩রা মে—২০শে বৈশাখ ঃ চট্টগ্রাম ও যশোহরে চলন্ত ট্রেন আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ—সংখ্যালঘু যাত্রীদের উপর হামলা—পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে লুঠতরাজ অব্যাহত।

৪ঠা মে—২১শে বৈশাখ ঃ 'কাশ্মীর বরাবর ভারতের অঙ্গ ঃ কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের প্রশ্ন আদৌ উঠে না'—স্বস্তি পরিষদে পাক্ বক্তব্যের জবাবে শ্রীমেননের দৃঢ় উক্তি—রাশিয়া কর্তৃক ভারতকে সর্বতোভাবে সমর্থন।

৫ই মে—২২শে বৈশাখ ঃ পূর্ব পাকিস্তানের মৈমনসিংহ ও পাবনা জেলায় দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপকতা—রংপুর, কুমিল্লা ও বগুড়া জেলাতেও প্রবল সন্ত্রাস।

৬ই মে—২৩শে বৈশাখ ঃ অধুনালুপ্ত খাকসার আন্দোলনের নেতা আল্লামা মাসারিকি সদলবলে গ্রেপ্তার—রাষ্ট্রের (পাকিস্তান) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে লাহোরে আটক।

৭ই মে—২৪শে বৈশাখ ঃ পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রিত নাগা বিদ্রোহীদের অপচেষ্টা—তথাকথিত 'স্বাধীন নাগা সরকার' গঠনের তোড়জোর—উদ্যমে পাক্ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার সংবাদ।

৮ই মে—২৫শে বৈশাখ ঃ নেপালের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্যোগ—রাজা মাহেন্দ্র কর্তৃক খসড়া রচনা কমিটি নিয়োগ।

৯ই মে—২৬শে বৈশাখ ঃ নাগা বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী ৪ জন ভারতীয় বৈমানিকের মুক্তি—ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে বর্মী রক্ষীবাহিনীর হস্তে সমর্পণের সংবাদ।

অভয়ঙ্কর

॥ অণুচিন্তা ॥

গ্রন্থ-প্রকাশন সম্পর্কে সাধারণের জ্ঞান অতি সামান্য, গ্রন্থ-প্রকাশ ব্যাপারে যদি কোনো কিছু গুরুতর ঘটে তাহলে 'জুট প্রেস' নিয়ে যে হট্টগোল 'প্রিণ্টিং প্রেস' নিয়ে তার এক বিন্দুও সাড়া জাগবে না।

প্রকাশকদের নিঃসন্দেহে 'Brain-washer' বলা যায়, কোনও সংবাদপত্র সম্পাদকও এইভাবে ব্রেনওয়াসিং বা "মগজ ধোলাই"-এর ব্যবস্থা করতে পারবেন না। সমুন্নত দেশে এই "মগজ ধোলাই"-এর দায়িত্ব সরকারের, সেখানকার কলাকৌশল এমন বিচিত্র যে সলিল চৌধুরীর অনুকরণে বলা যায় যে, 'সেথায় রাজায় খেয়ে ঢেঁকুর তোলে প্রজায় বলে খেলাম'। মগজ ধোলাই এমনই বস্তু' সেখানকার ধোলাই ব্যবস্থা বিচিত্র, উন্নত ধরনের এবং প্রকরণ বিভিন্ন। অনগ্রসর এবং অনুন্নত দেশে বৈদেশিক 'মগজ ধোলাই'-এর দুর্ভোগ ভুগতে হয়, এর জন্য দায়ী খানিকটা স্বদেশীয় প্রকাশকরা, তাঁদের অক্ষমতার সুযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন বিদেশীরা; বর্তমান ভারতের সাহিত্য-জগতে এ এক সংকটময় অবস্থা।

ভারতীয় প্রকাশন সংস্থার সংখ্যা কম নয়, জানা গেছে সর্বভারতীয় প্রকাশনের বাৎসরিক হিসাবে দেখা যায় যে, বছরে প্রায় ২৮,০০০ থেকে ৩০,০০০ হাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এক বছরে প্রকাশিত গ্রন্থ-সংখ্যা এর অর্ধেক। সংখ্যা যাই হোক, উৎকর্ষে এবং খ্যাতিতে আমরা অনেকখানি পশ্চাদপদ, অথচ প্রকাশকের সব কিছু নির্ভর করে উৎকৃষ্ট প্রকাশনের ওপর। যেসব ভারতীয় লেখক ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেন তাঁরা সকলেই বিদেশী প্রকাশকের দিকেই লোলুপ দৃষ্টি মেলে রাখেন।

কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে সরকারের এই বিষয়ে প্রচণ্ড দায়িত্ব আছে। ভারতবর্ষ কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এমন সব আইন-কানুন করা হয়েছে যার ফলে ভারতীয় প্রকাশকদের হাত-পা বাঁধা, তাঁদের বাধা অনেক, ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, এবং সরকারী আইন মানতে গিয়ে তাঁরা হাঁফিয়ে উঠেছেন। এ ছাড়া স্বয়ং সরকারও প্রকাশকের ভূমিকা গ্রহণ করায় একটা সর্বনাশা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

ভারত সরকার দুটি 'বুক ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটির নাম 'দি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট', অপরটির নাম 'দি চিলড্রেনস বুক ট্রাস্ট'। যদিচ এই দুটি প্রতিষ্ঠান অনেকদিন ধরেই স্থাপিত হয়েছে এঁরা একরকম শূন্যগর্ভ। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের প্রথমতম গ্রন্থ প্রকাশ করতে সময় লেগেছে আড়াই বছর। এই প্রতিষ্ঠান যে কি জাতীয় শ্বেতহস্তী তা বোঝা যাবে সামান্য একটিমাত্র তথ্যে। ট্রাস্টিদের একটিমাত্র সভার খরচখরচা মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকা। ট্রাস্ট নিশ্চয়ই অনেক মোটা বেতন দিয়ে অফিসর, কেরানী, চাপরাশী, পেয়াদা রেখেছেন, অনেক লাল ফিতা বাঁধা ফাইল তৈরী হয়েছে, সুতরাং গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও মোটা টাকা খরচ করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। যে উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করা হয়েছিল তা হয়ত কর্তৃপক্ষ বিস্মৃত হয়েছেন। সরকারের যে সব গ্রন্থ প্রকাশ করার বাসনা তা যদি সম্ভ্রান্ত প্রকাশকদের প্রতি ভার দেওয়া হয় তাহলে কি অসুবিধা হয়? তাঁরা অভিজ্ঞ, এবং ব্যবসা জানা থাকায় সরকারী প্রচেষ্টা সফল করা তাঁদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে। করদাতাদের যে পরিমাণ অর্থ অপচয় হচ্ছে তা হয়ত কিঞ্চিৎ বেঁচে যাবে। সেই ব্যবস্থা কি আমাদের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রগঠনের উদ্দেশ্য ব্যাহত করবে? সমাজতন্ত্র মানে এ নয় যে জনসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধন করবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাঁরা আসীন তাঁরা অর্থ অপচয় করবেন।

আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতির এই দ্বিধাভরা পদক্ষেপের ফলে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে বৈদেশিক স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ হয়েছে, অতি অল্পমূল্যে চামড়ার বাঁধাই লেনিন, ষ্ট্যালিন বা এব্রাহাম লিংকনের জীবনী সব ঘরেই পাওয়া যাবে। পথের ধারে সামান্য কয়েক আনার বিনিময়ে এই গ্রন্থ পাওয়া যায়। অসংখ্য 'পেপার ব্যাক' চার আনা থেকে ছ' আনায় পাওয়া যায়। তাতে অবশ্য সুলভে গ্রন্থ পাওয়া যায়। পাঠকের সুবিধা নিশ্চয়ই, কিন্তু পাঠ্য-গ্রন্থের সঙ্গে দু'চারখানি অপাঠ্য কিতাবও ঘরে ঢুকে পড়ে, সেই সঙ্গে মগজে। অবশ্য যাঁরা নিছক শুচিবায়ুগ্রস্ত তাঁরাই মগজের শুচিতারক্ষার জন্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু মূর্খ, অল্প-শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিতদের কি উপায় হবে! কি অবস্থা হবে স্বদেশীয় লেখকবৃন্দের। কাঁচ যদি সস্তায় পাওয়া যায় কাঞ্চনের কে মূল্য দেবে? কলকাতা শহরের ফুটপাতে হাঁটলে খ্যাতনামা বিদেশী লেখকদের অসংখ্য গ্রন্থ নামমাত্র মূল্যে কিনতে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈনিকদের প্রয়োজনে যে সব সুলভ সংস্করণ গ্রন্থ এসেছিল তাও বাজারে ছড়ানো আছে। কোনো কোনো রাষ্ট্র যুদ্ধের সময় তাঁদের স্বদেশস্থ প্রকাশকদের কিছু পরিমাণ বৃত্তিদান করে অল্প দামে বা বিনামূল্যে গ্রন্থ বিতরণ করতেন, মহাযুদ্ধ শেষ হলেও শীতল সময়ের প্রয়োজনে তাঁদের দেশের প্রকাশকরা আজো সরকারী বৃত্তিলাভ করছেন। তাঁদের নিশ্চয়ই একটা লভ্য আছে। ঠকছেন কিন্তু এদেশী প্রকাশকরা। তাঁদের জন্য দেশীয় সরকার কোনও বৃত্তিদান করেন না। ফলে তাঁরা অসমান এবং অশোভন এক ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন।

স্বয়ং ভারত সরকার টেকস্ট বই-এর ব্যাপারে এই বৃত্তি গ্রহণ করে বৈদেশিক রাষ্ট্রের হাতের মুঠোয় পড়েছেন। P. L. 480 মূলধন থেকে নয়াদিল্লী টেকস্ট বই সরবরাহ সংক্রান্ত একটা চুক্তি করেছেন। য়ুনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশন এই ব্যবস্থার তদারক করবেন। ভারতীয় প্রকাশক যদি গ্রন্থটির তেমন চাহিদা না থাকে তাহলে অন্ততঃ ২৫০০ কপি ছাপতে বাধ্য থাকবেন। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি মন্দ নয়, কিন্তু বৈদেশিক রাষ্ট্র স্বয়ং টেকস্ট বই নির্বাচন করে দেবেন। এইসব গ্রন্থ

ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে তেমন প্রয়োজনীয় না হওয়ায় য়ুনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশনকেই বকেয়া গ্রন্থাদি কিনে নিয়ে বিতরণ করতে হয়।

ভারতবর্ষ অন্য দেশ থেকে সাহিত্য এনে তার ভাণ্ডার পূর্ণ করুক, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'দিবে আর নিবে', কিন্তু ভারতের গ্রন্থাদি অন্যত্র চালান হচ্ছে না কেন? হিন্দী-প্রেমিক কর্তৃপক্ষরা বিনামূল্যে হিন্দী কেতাব বিতরণ করছেন, অহিন্দী অঞ্চলকে তাঁরা হিন্দী-রসিক করুন আপত্তি নেই, কিন্তু বিদেশে যদি ভারতের প্রান্তীয় ভাষার গ্রন্থাদির চাহিদা হয় সেখানেও এই ধরনের হিন্দী গ্রন্থ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাতে হয়ত সেই দেশের মানুষের শ্রদ্ধা হ্রাস পায়। বিদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাসে যে সব সাংস্কৃতিক কর্মচারী থাকেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা বা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান কতটুকু। খুসাবন্ত সিং জাতীয় দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষকে আমরা আমাদের দেশের প্রতিনিধি হিসাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পাঠাই। বিদেশের গ্রন্থ এদেশে আসুক, সবরকমের গ্রন্থ আসুক আপত্তি নেই, কিন্তু স্বদেশের লেখক ও প্রকাশক যেন সেই চাপে পড়ে শুকিয়ে না মরে।

স্বদেশীয় প্রকাশকদের সরকারী আনুকূল্য বর্ধিত হোক, পরিকল্পনানুসারে তাঁদের সৎগ্রন্থ প্রচারে সহায়তা করা হোক, বিদেশে ভারতীয় গ্রন্থের (সকল ভাষার—শুধু হিন্দী নয়) অনুবাদ প্রচারিত হোক, তবেই ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের মহান উদ্দেশ্য সফল হবে, একতরফা আমদানী নীতি কোনো মতেই স্বাস্থ্যকর নয়, মগজের দিক দিয়েও অস্বাস্থ্যকর। স্বদেশীয় প্রকাশকদের সঙ্গে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের ঘনিষ্ঠ সংযোগ-রক্ষা করা প্রয়োজন।

ভারতীয় লেখক ও প্রকাশক আজ এক সংকটময় চৌমাথায় এসে পৌঁছেছেন। আমরা বাঙালী, অতি স্বাভাবিক এবং সঙ্গত কারণেই আমরা বাঙালী প্রকাশক এবং লেখকের বিপদ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হব।

আমাদের প্রকাশকগোষ্ঠী আজ কিঞ্চিৎ দলবদ্ধ হয়েছেন। ব্যবসায়িক সমস্যা-সমাধানে চাই সমবেত প্রচেষ্টা, তাই তাঁরা সমবেত হয়ে সংঘ গড়তে পেরেছেন। সাহিত্যিকরা কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ নন, বিদ্বেষ, পারস্পরিক ঈর্ষা এবং সংকীর্ণতার বন্ধন কাটিয়ে ওঠা তাঁদের পক্ষে কঠিন। এ ছাড়া নানাবিধ রাজ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (যাঁরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত এবং যাঁরা ক্ষমতালোভী) তাঁদের নাচিয়ে বেড়ান, ফলে বাংলা-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ফসল আজ মাঠে মারা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আমরা যত চেঁচাই না কেন, বাংলার বাইরে বা ভারতের বাইরে সে চীৎকার পৌঁছায় না। বাংলাদেশে ডবল কলম হেডলাইন দিয়ে যতই দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করি না কেন তা শুধু মালদা থেকে মহিষাদলেই সীমাবদ্ধ থাকে, বাইরে যায় না। আমাদের প্রকাশকরা অল্পে তুষ্ট, দু' হাজার, তিন হাজার খণ্ড গ্রন্থ বিক্রি হলেই তাঁরা খুশী।

এই আত্মতুষ্টির দিন অবসান হোক। বাঙালী লেখকরাও প্রকাশকদের মত সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করুন, তাঁদের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে বাহিরের জগৎকে অবহিত করার জন্য সচেষ্ট হোন, তবেই বাংলাসাহিত্যের মর্যাদা রক্ষিত হবে। আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত অখণ্ড প্রতিভার অধিকারী বঙ্গ সাহিত্যে কেউ নেই, একথা সত্য, কিন্তু খণ্ড প্রতিভার অধিকারী অনেক বাঙালী কবি, গল্পকার ও উপন্যাস-লেখক আছেন। নূতন মূল্যবোধের কঠিন চিন্তনে তাঁরা অনন্য-সাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মৌলবিরোধ থাকা সম্ভব, তবু সব বাঙালী সাহিত্যিকই পারস্পরিক আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ এই চিন্তা মনে জাগা উচিত। বাঙালী প্রকাশক অতীতে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, আজ যখন বাঙালীর সাহিত্য সামান্য একটা প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে, মগজ ধোলাই-এর আবর্তে যখন চিন্তা-ভাবনা আবিল হয়ে উঠেছে, তখন তাঁদেরই সর্বাগ্রে সচেতন হতে হবে। নইলে বাঙালী লেখক, প্রকাশক এবং সেই সঙ্গে সাধারণ পাঠক এক অভূতপূর্ব সংকটে তলিয়ে যাবেন। ভারত সরকার যদি অচেতন আত্মতুষ্টিতে মগ্ন থাকেন, থাকুন, বাংলাদেশ আর একবার নেতৃত্ব গ্রহণ করে জাতীয় সংস্কৃতিকে এই মহাসংকটে ত্রাণ করুক।
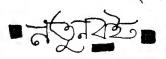
RABINDRANATH TAGORE — Bibliotheqve Nationale, Paris, 1961.

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে পারিতে ইউনেস্কোর উদ্যোগে এক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। এই বইটি তার স্মারক। প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা এবং ইউরোপীয় ভাষায় তার যে সব অনুবাদ আছে সেগুলি প্রদর্শিত হয়। চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ, রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি ইত্যাদি নিয়ে

BIBLIOTHEQVE NATIONALE

RABINDRANATH TAGORE

PARIS
1961

দেখা যাচ্ছে ৫১০টি দ্রষ্টব্য বস্তু প্রদর্শিত হয়। এই ১৪৯ পাতার ছোট বইটিতে এসবের ক্যাটালগ এবং বিদেশীর কাছে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেবার প্রশংসনীয় চেষ্টা করা হয়েছে। এর মুখবন্ধ লিখেছেন বিবলিওথেক নাসিওনালের প্রধান পরিচালক জুলিয় কেইন এবং রবীন্দ্র-পরিচয় লিখেছেন পণ্ডিচেরীর বিদ্যাভবনের পরিচালক বিখ্যাত পণ্ডিত জাঁ ফিলিওজা। ১৮৬১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী-পঞ্জী দেওয়া হয়েছে। তারপর তাঁর বংশপরিচয় এবং জোড়াসাঁকোর জীবনধারার বিবরণ রয়েছে। সেই সংক্রান্ত কিছু বইও প্রদর্শিত হয়েছে। দেখা গেল ভিক্তর কুজ্যাঁর "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল" বইটি মূল থেকে পড়বার জন্যে দেবেন্দ্র-

নাথ বৃদ্ধবয়সে ফরাসী-চর্চা শুরু করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতির পরিচয় এবং তাঁদের লেখা বই ও আঁকা ছবিও প্রদর্শিত হয়। তার পরের বিভাগে ছিন্নপত্র রচনা ও ইন্দিরা দেবী সম্পর্কে কয়েকখানি বই ও ছবি রাখা হয়। তারপর দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের বিকাশে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও মহাকাব্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ডক্টরেট পাওয়ার কাহিনীটিও বাদ যায়নি। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বিভিন্ন বিষয়-অনুযায়ী ভাগ করে সাজান রয়েছে। ধর্ম এবং দার্শনিক চিন্তা, সাহিত্যকর্ম, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, সংগীত, শিক্ষা ও গ্রামোন্নয়ন (শান্তি-নিকেতন ও শ্রীনিকেতন) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সাধন। (এই বিভাগে তাঁর প্রতিটি বিদেশযাত্রার কাল এবং সেই সময়ে দেওয়া বক্তৃতা এবং রচিত গ্রন্থাবলী প্রদর্শিত হয়)। ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলাদা একটি বিভাগ করা হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও রোলাঁ সম্পর্কে প্রচুর চিঠিপত্র এবং লেখা প্রদর্শিত হয়। তারপর আছে ভারতের মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী এবং সবশেষে কবির জীবিত-কালে এবং মৃত্যুর পর শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে যে বইগুলি প্রকাশিত হয় তার প্রদর্শনী। প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত এবং মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। উদ্যোক্তারা দুঃখ করেছেন যে, রবীন্দ্র-নাথের যথেষ্ট বই ফরাসীতে অনুবাদ হয়নি এবং যাও বা হয়েছে তার অধিকাংশই ইংরিজি থেকে। দেখা গেল প্রথম বাংলা থেকে ফরাসী অনুবাদ করেন কালিদাস নাগ ও পিয়ের জাঁ জুভ্ ১৯২৩ সালে বলাকার কয়েকটি কবিতা। তারপর ১৯৩৮ সালে পাঁচটি কবিতার অনুবাদ করেন সিলভাঁ লেভি। হালে ১৯৬১-তে গোরার যে অনুবাদটি বেরিয়েছে সেটি মার্গারিৎ গ্লোৎসের করা—ইংরিজি থেকে। কিন্তু পিয়ের ফালোঁ মূলে বাংলা থেকে সেটি আগা-গোড়া মিলিয়ে দিয়েছেন। জিদ্-এর গীতাঞ্জলির অনুবাদ সংক্রান্ত অনেক খবর বইটিতে রয়েছে। তাঁর "আমারে তুমি অশেষ করেছ" কবিতাটির অনুবাদের পাণ্ডুলিপি প্রদর্শিত হয়েছে দেখা গেল। ১৯১৩ সালে জিদের অনূদিত গীতাঞ্জলি মাত্র ৫০০ কপি ছাপা হয়। ১৯১৪ সালে যে সংস্করণ বেরোয় সেটির ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ১৩৬টি সংস্করণ হয়েছে দেখা গেল। ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় সম্পর্কে কিছু সংবাদ পাওয়া গেল। আমাদের খুব ভাল লাগল যে বইয়ের গোড়ায় বাংলা শব্দের একটি উচ্চারণ বিধি সংযোজিত করা হয়েছে দেখে।

বেদ মীমাংসা— (প্রবন্ধ) অনির্বাণ। প্রথম খণ্ড। কলকাতা সংস্কৃত কলেজ গবেষণা সিরিজ নম্বর তেরো। সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা। দাম—দশ টাকা।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, বেদ প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্তর-পরিচয়ের অনন্য প্রকাশ। বৈদিক যুগের ইতিহাসের উৎস-সন্ধানে গেলে বৈদিক সাহিত্য ছাড়া আর বিশেষ কোনো উপাদান পাওয়া যায় না। সাহিত্যচর্চার রসের দিকটা বাদ দিলেও বৈদিক সাহিত্য-চর্চার ঐতিহাসিক প্রয়োজনও আজকের নবসংস্কৃতি উন্মেষের যুগে কম নয়। বক্ষ্যমান গ্রন্থটি বৈদিক সাহিত্যচর্চার প্রসারে একটি অভিনন্দনযোগ্য গবেষণা-গ্রন্থ।

সংহিতার মন্ত্রব্যাখ্যা এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়, শুধু মাত্র বেদব্যাখ্যার পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি মূল্যবান আলো-চনা এবং 'বৈদিক সাহিত্য' পর্যায়ে সংহিতা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং বেদাঙ্গের সাবলীল এবং সুদক্ষ আলোচনা গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। সাধারণ্যে বেদমীমাংসার সমস্যাটি অতীব জটিল এবং সে কারণেই সাধারণ-শিক্ষিত পাঠকেরাও বেদচর্চায় অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। বেদের কোনো মীমাংসাই সমগ্র বেদাশ্রিত নয়। যদিচ ব্রাহ্মণ মন্ত্রসংহিতার টীকা, তবুও ব্রাহ্মণ মূলত কর্মমীমাংসা, মন্ত্রব্যাখ্যা মূল উপজীব্য নয়। ব্রাহ্মণের এই পূর্ব-মীমাংসা এবং উপনিষদের জ্ঞাননির্ভর উত্তরমীমাংসার সংঘাত দৃষ্টিবিভ্রমকারী আলোআঁধারির মধ্যে প্রায়শঃই নিয়ে যায়
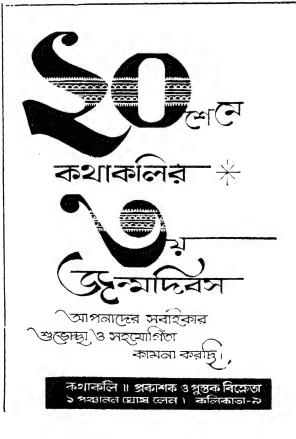
পাঠককে। কিন্তু লেখককে অশেষ ধন্যবাদ তিনি অতি সহজভাবে তাঁর প্রাক্-কথনে বেদব্যাখ্যার এই জটিল দিকটায় রশ্মি-পাত করেছেন। বৈদিক সাহিত্য পর্যায়ের আলোচনাগুলি সাহিত্য-পাঠক এবং প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্র উভয়েরই অবশ্য-পাঠ্য।

নীলকণ্ঠ—(১ম ও ২য় খণ্ড) শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ প্রণীত। সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ৬০, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের প্রিয়তম শিষ্য ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, তেমনই শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের উত্তরসূরী কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। তিনিই গোস্বামী মহারাজের জীবনী ও বাণী জাতির কাছে ব্যক্ত করেছেন, প্রকাশ করেছেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকে। গোস্বামী মহারাজের জীবন-দর্শনের সঙ্গে বাঙালী মাত্রেই পরিচিত। বাঙালীর জীবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা, সেই মহাপুরুষের জীবন-বেদের অনুসরণ করেছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত মহাসাধক। বিজয়কৃষ্ণের মানস সন্তান নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজী। তাঁর জীবন ভাবগম্ভীর এবং মাধুর্য-মণ্ডিত। অতিশয় কর্মবহুল জীবনের মধ্যে আছে শিক্ষাপ্রদ বহু ঘটনা। কুলদানন্দজী আত্মপ্রচারপ্রয়াসী ছিলেন না। তাঁর ন্যায় সাধননিষ্ঠ ও স্বানুভূতিসিদ্ধ বিরাট যোগীপুরুষের জীবন-রহস্য উপলব্ধি করাও সহজ নয়। কিভাবে বিজয়কৃষ্ণের প্রভাবে তাঁর জীবন সুষমামণ্ডিত হয়েছিল তা অতি বিস্ময়কর। কুলদানন্দের জীবনে গোঁসাইজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে। এই জীবনীলেখক ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ সুবৃহৎ গ্রন্থে তাঁর শ্রীগুরুর দেহাশ্রিত জীবনের যে কয়েক বছর তাঁর সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন তার মধ্যে গুরুদেবের স্বমুখে বহু ঘটনা জানার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সেই সব উপকরণ সহ এই গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে।

বাঙালী বুদ্ধিজীবির কাছে গোঁসাইজী ও তাঁর মহান শিষ্য কুলদানন্দের জীবনের দাম অনেক। ভক্তপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্র সেন ২য় খণ্ডের ভূমিকায় যথার্থই লিখেছেনঃ—"যুগাবতার স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব। নাম ভিন্ন কলি যুগে নাই আর ধর্ম। সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের সমর্থনে এবং সমাচার সূত্রে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজীকে স্বহস্তে নীলকণ্ঠ সাজাইয়া তিনি সদ্গুরুর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়া যান। ব্রহ্মচারিজী যুগ যুগান্তরের আবর্জিত ধর্মসংস্কারের অন্ধতা এবং অবিদ্যাজনিত হলাহল প্রসন্ন চিত্তে পান করিয়া নাম-প্রেমের সর্বজনীন আদর্শ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এই আদর্শেই ভারতের সনাতন ধর্মই মহাবিভীষিকায় পতিত বর্তমান আর্ত জগৎকে রক্ষা করিতে পারে। শ্রীমৎ গঙ্গানন্দজী ধন্য।"

আমরাও এই কথার প্রতিধ্বনি করি। শ্রীমৎ গঙ্গানন্দজী এক মহাকর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। নবগৌরাঙ্গ বিজয়কৃষ্ণের সার্থক শিষ্যের কথা দেশবাসী অবগত হওয়ার সুযোগলাভ করলেন এই দুই বিরাট খণ্ডে সমাপ্ত জীবনী মাধ্যমে।

ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

রবীন্দ্র-চর্চা— হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত। সুরভি প্রকাশনী। ১ কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে প্রকাশিত বিবিধ আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে জানবার পথ যেমন ক্রমশঃ পূর্ণায়ত হয়ে আসছে তেমনি বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যও সমৃদ্ধ হচ্ছে যথেষ্ট মাত্রায়। আলোচ্য সংকলনটি হাতে নিয়ে সেকথাই মনে হয়েছে। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত সমালোচকগণই সংকলনে স্থানলাভ করেননি, অন্যান্য যাঁরা লিখেছেন তাঁদের বক্তব্য কোন অংশেই দুর্বল নয়। রচনাগুলি যুক্তিতথ্যময়তায় সমৃদ্ধ। আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এক একটি রবীন্দ্র-ভাষ্য। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লিখিত 'জ্যোতির্বন্যা' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন (ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ), শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় (বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সৃষ্টি), শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত (রবীন্দ্রনাথ ও মুক্তি) শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ('লিপিকা'র ছোটগল্প), শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ (শিল্প ও জীবন : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প), শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য (লোকসাহিত্য : প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ), শ্রীঅশোক সেন (রবীন্দ্রনাট্যে ভক্তিবাদ), শ্রীভবতোষ দত্ত (রবীন্দ্রনাথ ও সাময়িকপত্র), শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (সবুজপত্র, কল্লোল : রবীন্দ্রনাথ), শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র (কবি রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্ব), শ্রীগীতা ঘোষ (রবীন্দ্রকাব্যের আদি পর্ব), শ্রীনমিতা সেন (নৌকাডুবি), শ্রীসুকুমার সেন (রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন), শ্রীপুলিনবিহারী দাস (হাস্যকৌতুকময় রবীন্দ্রনাট্য প্রদেশ), শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের দুটি প্রবন্ধ আছে। শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র লিখিত সম্পাদকীয় যথেষ্ট মূল্যবান।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

সমকালীন—সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হতে প্রকাশিত। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাঙলা ভাষার সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে সমকালীন যে একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে ইতিমধ্যে দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যার দ্বারা তা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। মূল্যবান সুনির্বাচিত প্রবন্ধ নিয়েই এর প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যায় শ্রীঅসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের 'বাংলা গদ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' এবং শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের 'জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা। এ দুটি প্রবন্ধ থেকে জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেই অনেক কিছু জানতে পারবেন। শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য লিখিত 'মাতৃভাষা বনাম আন্তর্জাতিক ভাষা' সমকালীন একটি জটিল সমস্যা প্রসঙ্গে মূল্যবান তথ্যসমন্বিত রচনা; যা ইংরিজি ও যে কোন দেশীয় ভাষা-প্রেমিককে নতুনভাবে চিন্তা করবার খোরাক যোগাবে। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। তা ছাড়া আছে সংস্কৃতি সংবাদ বিদেশী সাহিত্যালোচনা ও পুস্তক-সমালোচনা। শ্রীসত্যজিৎ

রায়ের আঁকা প্রচ্ছদটি এবারও মুদ্রিত হয়েছে।

স্বগত—সম্পাদক : অজিত মুখোপাধ্যায়। এফ/এল, ওয়ান/৬৭, ষ্টীল টাউন, দুর্গাপুর-৪ থেকে প্রকাশিত। দাম ষাট নয়া পয়সা।

আলোচ্য প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যার মূল্যবান রচনা শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ লিখিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা ও ব্যক্তিত্ব' নামক প্রবন্ধটি। গল্প লিখেছেন শ্রীবোম্বানা বিশ্বনাথম, শ্রীসত্যব্রত সেন, শ্রীরবীন রায়, শ্রীনির্মল সাধু ও শ্রীভক্তি ঠাকুর। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য নয়।

উত্তরকাল—সম্পাদক : সতীন্দ্রনাথ মৈত্র ও প্রসূন বসু। ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হতে প্রকাশিত। দাম পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকার আসরে উত্তরকাল নবাগত। একটি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা পত্রিকা প্রকাশ করছেন। আলোচ্য সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅসীম রায়, শ্রীরাম বসু, শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। এরিফ হার্টলের 'সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতা', শ্রীরবীন্দ্র মজুমদারের 'আফ্রিকা : সভ্যের বর্বর লোভ', শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নৈঃসঙ্গ্যের দীপ্তি' পত্রিকাটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ ধর, শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধনঞ্জয় দাস। শ্রীকৃষ্ণ ধরের এই আলোচনাটি বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করলেও এর যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। বক্তব্য আরও জোরালো হলে ভাল হত। দুটি গল্প লিখেছেন শ্রীমিহির সেন ও শ্রীকালিদাস দত্ত। যে চিঠিটি সম্পাদকমণ্ডলী মুদ্রণ করেছেন আলোচ্য সংখ্যার ওটিই অন্যতম আকর্ষণ। মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা অত্যন্ত সাধারণ। অপরিচ্ছন্ন মুদ্রণের জন্য একালের প্রখ্যাতনামা শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদটি নষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে এবং লেখা সম্পাদনায় যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ দৃষ্টিদানের প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন তা ব্যাহত হবে।

কবিপত্র—সম্পাদক : তুষার চট্টোপাধ্যায় ও পবিত্র মুখোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ১সি রাণী শঙ্করী লেন, কলিকাতা-২৬। দাম এক টাকা।

আধুনিক বাঙলা কবিতা সম্পর্কে পাঠক-সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে উদাসীন। যে কোনকালের আধুনিকদের সম্পর্কে একথা সত্য। এ অবস্থায় একমাত্র কবিতা পত্রিকা প্রকাশ করা যে কী কঠিন ও দুঃসাহসের কাজ তা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে কবিতার পত্রিকাগুলির ভাগ্য খুবই অনিশ্চিত ও যে কোন মুহূর্তেই পতনশীল। সে সময়ে কবিপত্রের এই চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংকলনটি হাতে নিয়ে যথেষ্ট আশান্বিত হবার কারণ দেখা দেয়।

যাঁরা প্রতিষ্ঠিত এবং যাঁরা বহুদিন ধরে লিখছেন তাঁদের মধ্যে এ সংখ্যায় লিখেছেন শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য, শ্রীসতীন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীসিদ্ধেশ্বর সেন, শ্রীতরুণ সান্যাল ও শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীআলোক সরকার, শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁরা যদি কেউ খারাপ লেখেন তবে সে সম্পর্কে কোন সম্পাদক দায়ী নন। রচনার উৎকর্ষহীনতার জন্য তাঁরা যে কোন মুহূর্তে সাহিত্য থেকে সরে যাবেন স্বাভাবিকভাবে। তাছাড়া এঁদের যে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছেন তা বোধহয় ভুলতে পারেননি। সে প্রসঙ্গে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে তরুণদের রচনা সম্পর্কে যথেষ্ট বক্তব্যের অবকাশ রয়েছে। ভবিষ্যতে যাঁরা ওঁদের আসন নেবেন তাঁদের যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। কারণ সমালোচিত না হলে ভবিষ্যতে তাঁরা দায়িত্ব সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন থাকবেন। এ ক্ষেত্রে যে কোন কালের সমালোচকের দায়িত্ব রয়েছে বলে মনে করি। আলোচ্য সংখ্যায় তরুণ কবিদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশে অক্ষম।

পুস্তকালোচনা পর্যায় নিতান্তই দুর্বল বক্তব্যের সমাবেশে পরিকীর্ণ।

আমেরিকার পুস্তক প্রকাশন

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রকাশনের ব্যবস্থা যে কত বৃহৎ তা দেখলে অবাক হতে হয়। সাধারণতঃ ৮০০ পুস্তক-প্রকাশক সমস্ত দেশের পুস্তক প্রকাশে লিপ্ত; এ ছাড়া ৪১৮টি পুস্তক-প্রকাশন সংস্থা আছে—যেমন বিভিন্ন বিদ্যালয়, বিবিধ ধর্ম প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ও কার্যকরী সমিতি বা সমবায় সমিতি যাঁরা লভ্যাংশ না নিয়ে নানারকম সংস্কৃতিমূলক পুস্তক প্রকাশ করে থাকেন।

আমেরিকার প্রকাশকরা গড়পড়তা বাজারে সব সময় ১৫০,০০০ সংখ্যক পুস্তক বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখেন। ১৯৫৯-এর হিসাবে দেখা যায় ৮০০ প্রকাশকের মধ্যে ৩৮২ জন ৫ খানা করে বই প্রকাশ করেছিলেন। মোট প্রকাশনের সংখ্যা ছিল ১৩,৪৬৬ নূতন বই। এর মধ্যে ছয়জন বৃহৎ প্রকাশক, প্রত্যেকে ২০০ কিম্বা কিছু বেশী বই প্রকাশ করে ছিলেন। ১৯৫৯ সালের প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে ৭৭৫ খানা ছিল অন্যান্য ভাষা হতে অনুদিত বই। এর মধ্যে ফরাসী ভাষা হতে অনুদিত বইয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী—২৪৯। ১৯৫৮ সালের সমগ্র বিক্রীত পুস্তকের দাম ছিল ১,০০৫,৬০৫,০০০ ডলার। এর মধ্যে স্কুল ও কলেজ পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩২·৬।

কোন কোন মুদ্রিত বইয়ের সংস্করণ ছিল ২৫,০০০ কপি থেকে ১,০০,০০০ কপি পর্যন্ত। উরিসের 'Exodus' উপন্যাসটি ১৯৫৯ সালে বিক্রি হয় ৬০,০০০ কপি। পরে এর বিক্রয়সংখ্যা উঠেছিল ৩৫২,০০০ কপি। কম মূল্যের সংস্করণে এই বই বিক্রি ছিল ২,০০০,০০০ কপি।

গ্রন্থকারদের 'রয়েলটি' দেওয়া হয় প্রতি বইয়ে সাধারণতঃ শতকরা ১০ হতে ১৫ পর্যন্ত।

১৯৪০ সাল থেকে কমমূল্যের paper back বই প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছে। এদের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা প্রতিবৎসর অসম্ভব রকম বেড়ে চলেছে। বড় বড় বাজারে, সিগারের দোকানে, ওষুধের দোকানে, রেলে, বাসে, এরোপ্লেন আপিসে, হোটেলে, খেলনার দোকানে, মণিহারী দোকানে ইত্যাদি সর্বত্রই এই ধরণের বই বিক্রি হয়। ১৯৫৯ সালে ১,৫৭৫ রকম Paper back বই প্রকাশিত হয়েছিল। এই ধরণের অধিকাংশ বই বড় বইয়ের পূর্ণ মুদ্রণ হলেও নূতন বইও অনেক প্রকাশিত হয়।

নান্দীকর
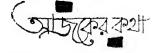
চলচ্চিত্র বিবাচক সংস্থা :

কোনও একটি চলচ্চিত্র—সেটি কাহিনী, দলিল বা তথ্য, সংবাদ, বিজ্ঞাপন কিংবা শিক্ষণ-চিত্র, যাই হোক না কেন—সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শিত হওয়ার যোগ্য কিনা, সেটি বিচার ক'রে "সাধারণ" বা মাত্র "প্রাপ্তবয়স্কের জন্য" শংসাপত্র প্রদানের ভার দেওয়া আছে ভারতীয় চলচ্চিত্র বিবাচক সংস্থা বা কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের ওপর। কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র বিবাচক সংস্থা ছাড়াও কয়েকটি আঞ্চলিক বিবাচক সংস্থা আছে এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে। প্রতিটি সংস্থাই সরকারী এবং বে-সরকারী—উভয়বিধ জনকয়েক সদস্য নিয়ে গঠিত এবং প্রত্যেক সংস্থার কার্য পরিচালনার জন্য একজন ক'রে বিবাচক আধিকারিক বা সেন্সর অফিসার সরকার থেকে নিযুক্ত আছেন। সরকারী সদস্যরা বিশেষ পদাধিকার বলে নির্বাচিত হন এবং বে-সরকারী সদস্যরা কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক (মন্ত্রণালয়) দ্বারা মনোনীত হন। স্পষ্টই বোঝা যায়, আঞ্চলিক বা কেন্দ্রীয় সংস্থাতে বে-সরকারী সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে কিছু সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

'এক টুকরো আগুন' চিত্রে কালী ব্যানার্জি ও অনুভা গুপ্তা

চলচ্চিত্র বিবাচক সংস্থার সদস্য মনোনয়ন সম্পর্কে ১৯৪৯ সালে গঠিত চলচ্চিত্র অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি, বর্তমানে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী এস কে পাতিল এক সময়ে একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন। সার ক্লিফোর্ড মনমোহন আগরওয়ালা যখন চলচ্চিত্র বিবাচক সংস্থার সভাপতি, তখন কলকাতায় অনুষ্ঠিত ঐ সংস্থার একটি বিশেষ অধিবেশনে শ্রীপাতিল বলেছিলেন, বিবাচক সংস্থার সদস্য মনোনয়নে প্রথম ও প্রধান দ্রষ্টব্য হওয়া উচিত, যাঁকে ঐ পদে মনোনীত করা হচ্ছে, তিনি চলচ্চিত্রের নিয়মিত দর্শক কিনা। আরো পরিষ্কার ক'রে তিনি বলেছিলেন, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, অধ্যাপক বা অন্য প্রকারে যে কোনো গুণিজনকে মনোনয়নের আগে বিশেষ ক'রে জানতে হবে, তিনি নিজের পকেটের পয়সা খরচ ক'রে টিকিট কিনে ভারতীয় অভারতীয় নির্বিশেষে হপ্তায় অন্ততঃ দুখানিও ছবি দেখে থাকেন কিনা। যদি জানা যায়, তিনি তা দেখেন না, তাহলে নিশ্চয় বুঝতে হবে, তিনি চলচ্চিত্রকে যদি ভালো না বাসেন, তাহলে তাঁর অন্য যে কোনো গুণই থাকুক না কেন, তিনি চলচ্চিত্র বিবাচক সংস্থা বা সেন্সর বোর্ডের সদস্য হবার যোগ্য নন। শ্রীপাতিলের এই মত সর্বাংশে সমর্থনীয়। বাস্তবিকই যদি কোনো ব্যক্তি চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাবান না হন, চলচ্চিত্রকে একটি বিশিষ্ট শিল্পকলা বলে স্বীকারই না করেন, দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্রগুলিকে প্রত্যক্ষ ক'রে তাদের মাধ্যমে পরিবেশিত রসাস্বাদনে আগ্রহান্বিতই না হন, তিনি মাত্র সাহিত্যিক বা সাংবাদিক কিংবা অধ্যাপক বলেই কোনও চলচ্চিত্রের ভালো-মন্দের বিচারকের পদে আসীন হন কি ক'রে? চলচ্চিত্র সম্পর্কে ভূয়সী জ্ঞানলাভ তখনই সম্ভব, যখন ভালো-মন্দ নির্বিশেষে বহু চলচ্চিত্র দেখা হয়ে গেছে। এখানে বহু বর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের পথকে প্রশস্ত করতে সাহায্য করে। এবং শ্রীপাতিলের ঐ সর্তটির কথাও ভুললে চলবে না। কেউ যে চলচ্চিত্রকে ভালোবাসেন, তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে, তিনি নিজের পকেটের পয়সা খরচ ক'রে ছবি দেখে থাকেন। প্রসংগক্রমে উল্লেখের লোভ সংবরণ করতে পারছি না, বিবাচক সংস্থার ঐ বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত সুধীবর্গকে শ্রীপাতিল জানিয়েছিলেন, তিনি নিজে সপ্তাহের প্রতিটি রাত্রির ,প্রদর্শনীতে কোনো না কোনো ছবি দেখে থাকেন এবং তা টিকেট কেটেই। কেন্দ্রীয়ই হোক আর আঞ্চলিকই হোক, চলচ্চিত্র বিবাচক

সংস্থার বে-সরকারী সদস্য মনোনয়নের সময় সুপারিশকারীরা শ্রীপাতিলের কথাগুলি মনে রাখলে চলচ্চিত্র শিল্প অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির কবল থেকে উদ্ধার পাবে।

এই প্রসঙ্গে সেদিন বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের বার্ষিক শংসাপত্র (Certificate of merit) বিতরণ উৎসবে সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ যে কথা বলেছিলেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীঘোষ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন, "চলচ্চিত্র সাংবাদিকরা আজও পর্যন্ত তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি লাভ করেন নি। চলচ্চিত্র বিবাচক সংস্থা বা চলচ্চিত্র পুরস্কার সুপারিশ সমিতিতে সদস্য হিসেবে তাঁদের গ্রহণ করা হয় না।' বহুদিন ধ'রে যোগ্যতার সঙ্গে চিত্র-সাংবাদিকতা ক'রে যাঁরা চলচ্চিত্র সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁদের বিচার-বুদ্ধির সুযোগ গ্রহণ না ক'রে সরকার নিজেই বঞ্চিত হচ্ছেন।

চিত্র সমালোচনা

কাঞ্চনজঙ্ঘা: এন সি এ প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ১০,১৮৪ ফুট দীর্ঘ ও ১১ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত-পরিচালনা ও পরিচালনা: সত্যজিৎ রায়; চিত্রগ্রহণ: সুব্রত মিত্র; শব্দধারণ: দুর্গাদাস মিত্র; সম্পাদনা: দুলাল দত্ত, রূপায়ণ: ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অনিল চট্টোপাধ্যায়, এন বিশ্বনাথন, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুব্রত সেন, হরিধন মুখোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, অলকানন্দা রায়, বিদ্যা সিংহ, ইন্দ্রাণী সিংহ প্রভৃতি। শ্রীজগন্নাথ পিকচার্স (প্রাঃ) লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ১১ই মে থেকে রূপবাণী, অরুণা ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

কিছু দিন আগে "বর্তমান ইয়োরোপে চলচ্চিত্রের ধারা" প্রসঙ্গে শ্রীসত্যজিৎ রায় আমাদের জানিয়েছিলেন, সেখানে 'একটি বিশেষ দিনের কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী একটি ছোট্ট ঘটনা—কতকগুলো mood বা কয়েকটা relationship—এই-ই একটা atmosphere-এর ওপর দিয়ে ছবির মাধ্যমে বলা হচ্ছে। এক-একটা ছবির গল্প এমনই যে, সাহিত্যের ভাষায় তাকে বলতে গেলে দেখা যাবে যে, হয়, বলাই যাচ্ছে না, আর নয়, দু লাইনেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ছবির গল্প বা film-story সম্বন্ধে conception—চিন্তার ধারাটাই বদলে যাচ্ছে। ওরা (ইয়োরোপীয় চলচ্চিত্র পরিচালকেরা) বলতে চায়, ফিল্মের জন্যে যে গল্প, সে গল্প শুধু ফিল্মের মারফতই বলা বা বোঝা যাবে, সাহিত্যের মাধ্যমে তাকে বলাও যাবে না, বোঝাও যাবে না।' ইত্যাদি—বর্তমান ইয়োরোপের চলচ্চিত্র পরিচালকদের চিন্তাধারা শ্রীরায়কে যে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করেছে, তাঁর নবতম চিত্র "কাঞ্চনজঙ্ঘা" তারই জাজ্বল্যমান নিদর্শন। এ ছবিতেও দেখি, একটি বিশেষ দিনের কয়েক ঘণ্টাস্থায়ী কিছু ঘটনা—কতকগুলো mood বা কয়েকটা relationship—যা দার্জিলিংয়ের মনোরম নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে ছবির মাধ্যমে বলা হয়েছে। একটি আস্ত গল্পকে এই "কাঞ্চনজঙ্ঘা" ছবির ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা সাধারণ বাঙালী দর্শক ছবির মাধ্যমে দেখতে চান। একটি বিশেষ পরিবার এবং তাদেরই পরিচিতদের মধ্যে ঘটনাগুলিকে সীমিত রাখলেও পরিবারভুক্ত দুই মেয়ে—বিবাহিতা অনিমা এবং অবিবাহিতা

দিলীপ মিত্র পরিচালিত ও রামচন্দ্র শর্মা প্রযোজিত 'হাই হিল' চিত্রের নায়ক অনিন্দ চ্যাটার্জি

মনীষার সমস্যা বাহ্যতঃ একীভূত হতে পায়নি এবং মনে হয়, কাহিনীকার পরিচালক শ্রীরায় সে চেষ্টাও করেননি। দিদি বিবাহিত জীবনে সুখী নয়, অতএব ছোট বোন নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনস্থির করতে পারছে না—এই যোগসূত্র চেষ্টা করলে আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। কিন্তু ছবির মধ্যে বর্ণিত দুটি প্রধান সমস্যা দুই ভিন্ন পথে চালিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত দুটি সমস্যারই আকাঙ্ক্ষিত সমাধান ঘটেছে। ছবির একেবারে সমাপ্তি মুখে ইন্দ্রনাথ অবশ্য আবিষ্কার করেন, তাঁর একরোখা বলিষ্ঠ কর্তৃত্বের অবসান ঘটেছে নিঃসন্দেহে; কিন্তু এই আবিষ্কার আমাদের মনকে অণুমাত্রও অভিভূত করে না। বরং চোখের সামনে দৃশ্যমান শৈলশ্রেণীর বর্ণাঢ্য নিসর্গশোভা মনকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব নিঃসঙ্গতায় আপ্লুত করে।

সত্যিই, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির মধ্যে হৃদয়কে নাড়া দেবার মত মুহূর্ত আছে অনেক—অনেকগুলি এবং সেগুলিকে যে আশ্চর্য পটভূমিকার মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়েছে, তা শ্রীরায়ের মত সচেতন শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। পথ চলতে চলতে মনীষা ও মিঃ প্রণব ব্যানার্জি একটি গেটের থামের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন—মনীষা সামনে মিঃ ব্যানার্জি পিছনে; মিঃ ব্যানার্জি মনীষার মনোভাব জানবার জন্যে ব্যগ্র, তিনি বারংবার ডাকছেন—মনীষাকে; ঠিক এই সময় পাহাড়ীরা পার্বত্য ঘোড়ার পিঠে ভার চাপিয়ে তাঁদের পাশ দিয়ে দলে দলে বিপরীত মুখে চলতে লাগল, ঘোড়ার গলার ঘন্টাধ্বনি মিঃ ব্যানার্জির আহবানকে বারে বারে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

এতে যে কি অপূর্ব atmosphere-সৃষ্ট হয়েছে, তা না দেখলে সম্যক অনুভূত হবার নয়। মনীষা মিঃ ব্যানার্জির সঙ্গ অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও এড়াতে চাইছে—এমন অবস্থায় তারা এসে পড়ল ব্যান্ড-বাজিয়েদের সামনে। অণিমা এবং শংকর নিজেদের অসুখী দাম্পত্যজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব পর্যন্ত ক'রে ফেলেছে; এমন সময়ে তাদেরই ছ' বছর বয়েসের মেয়ে টুকলু ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে যেতে দূর থেকে মিষ্টি ক'রে ডাকল—'মা', 'বাবা'—দুজনের মনের মেঘ থমকে দাঁড়াল। পাখী-পাগল জগদীশ বলছে—migratory brid-এর কথা; কি করে তারা অন্ততঃ দু'হাজার মাইল দূর থেকে প্রতি বছর ঠিক একই সময় একই জায়গায় এসে হাজির হয়; তারপর আজকের এই ধ্বংসোন্মত্ত পৃথিবীর আণবিক পরীক্ষার প্রকোপে পড়ে তারা হয়ত একদিন লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে, এই আশংকা তার মনে আসতে যেভাবে শব্দের সাহায্যে আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে তা অবিস্মরণীয়। এই রকম বহু নাটকীয় মুহূর্তে ছবিখানি সুসমৃদ্ধ। এবং ছবিখানি দেখতে দেখতে আমাদের ক্রমাগত মনে হয়েছে, সঙ্গীত এবং প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট শব্দের সাহায্যে যেভাবে শ্রীরায় আবহ সৃষ্টি করেছেন, তাতে পরিচালক শ্রীরায়কে যেন সঙ্গীত-পরিচালক শ্রীরায় বারে বারেই পরাজিত করেছেন। এটি শ্রীরায়ের একটি অনাবিষ্কৃত রূপ।

রাজেন তরফদার পরিচালিত শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের 'অগ্নিশিখা' চিত্রে কণিকা মজুমদার ও নবাগতা শর্মিষ্ঠা

সুপরিচিত ইতালীয় অভিনেতা ও প্রযোজক ভিত্তোরিও ডি সিকা। এঁর পরিচালিত 'টু ওমেন' চিত্রটি 'মেট্রো' সিনেমায় দেখান হচ্ছে।

ইস্টম্যান কালারে তোলা "কাঞ্চনজঙ্ঘা" দার্জিলিংয়ের পরিবেশের সঙ্গে একান্ত হয়ে গেছে। প্রায় প্রতিটি শট—এমন কি ঘরের ভিতরেরও শট এমন আশ্চর্য সুচিন্তিতভাবে নেওয়া হয়েছে যে, দার্জিলিংয়ের পরিবেশ তার মধ্যে আছেই আছে। এমন একটিও শটের কথা মনে করতে পারছি না, যার মধ্যে দার্জিলিংয়ের কোনো না কোনো অংশ ধরা পড়েনি। এবং বর্ণসমারোহই "কাঞ্চনজঙ্ঘা" ছবিকে একটি বিশেষ গৌরবের আসনে বসিয়েছে। নিঃসংশয়ে চিত্রশিল্পী সুব্রত মিত্রের ললাটে "কাঞ্চনজঙ্ঘা" একটি সুচিত্রিত জয়-তিলক।

"কাঞ্চনজঙ্ঘা"-তে সুপরিচিত এবং নবাগত অভিনেতা-অভিনেত্রীর একটি অদৃষ্টপূর্ব সম্মেলন ঘটেছে। একদিকে ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অনিল চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা প্রভৃতি জনপ্রিয় শিল্পী, অন্যদিকে অলকানন্দা রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুব্রত সেন, বিদ্যা সিংহ, ইন্দ্রাণী সিংহ, গুইয়ে প্রভৃতি নবাগতের সমাবেশ। ছবি বিশ্বাস তাঁর কথায়বার্তায় চাল-চলনে তাঁর গৃহীত চরিত্রে নিশ্চয়ই একটি ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন; তবু বলব, তাঁর মুখ দিয়ে অপ্রয়োজনে ইংরেজ-প্রশস্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর নিন্দাসূচক মন্তব্যগুলি আমাদের আদৌ খুশী করেনি। বিপত্নীক জগদীশের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল অতি সহজেই একটি আত্মভোলা ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। হরিধন মুখোপাধ্যায়ের শিবশঙ্কর তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়ে সমুজ্জ্বল। হাল্কা মনের প্রেমপাগল অনিলের চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় একটি নতুনরূপে দর্শকদের অভিবাদন করেছেন। তাঁকে সকলেরই ভালো লাগবে। দাম্পত্য জীবনে অসুখী অণিমার ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা অন্তর-স্পর্শী অভিনয় করেছেন। যেখানে স্বামীর কথায় অণিমা তার পূর্ব প্রণয়ীর চিঠি ছিঁড়ে ফেলছে, সেখানে তাঁর অভিব্যক্তি অসাধারণের পর্যায়ে পড়ে। তাঁর সঙ্গে প্রায় সমান তালেই অভিনয় করেছেন সুব্রত সেন। চিত্রাভিনেতারূপে সম্ভবতঃ এই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে অশোকের ভূমিকায় নবাগত অরুণ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুন্দর অভিনয় করেছেন। মনীষার সঙ্গে তাঁর শেষ দৃশ্যে তাঁর অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। বিলাত ফেরৎ, আপ-টু-ডেট মিঃ ব্যানার্জির ভূমিকায় এন বিশ্বনাথন চারিত্রিক বৈশিষ্ট রেখে অভিনয় করেছেন। মনীষার ভূমিকাটি ছবির মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে এবং এই প্রকাণ্ড ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন নবাগতা অলকানন্দা রায়। মনীষার ভূমিকায় তাঁকে মানিয়েছে চমৎকার; বিশেষ করে তাঁর ডাগর দুটি চোখ চলচ্চিত্রের পক্ষে খুবই উপযোগী। প্রথম অবতরণ হিসেবে তাঁর অভিনয় খুবই ভাল—আড়ষ্টতা তাঁর নেই বললেই হয়। তাঁর বাচনও শ্রুতিমধুর। ছোট্ট মেয়ে টুকলুর ভূমিকায় ইন্দ্রাণী সিংহে ভারী মিষ্টি। কিন্তু অতি আধুনিকা লিলির ভূমিকায় বিদ্যা সিংহ তাঁর আড়ষ্টতাকে আদৌ বর্জন করতে পারেননি। ছবিতে আর একটি চরিত্র—গুইয়ে। এই পাহাড়ী ছেলেটি প্রয়োজনানুসারে চলেছে, বসেছে, কথা বলেছে এবং গান গেয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। ছবিটিতে আরও অনেক আন্তর্জাতিক চরিত্রের ভিড় আছে। তারা ছবিতে স্বাভাবিকভাবে এসেছে, গেছে এবং দু-একটা কথাও বলেছে।

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের বর্ণাঢ্য 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে একটি নবতম দিগন্তের দ্যোতক।

মঞ্চাভিনয়

মিনার্ভায় "ভি আই পি" :

অনুষ্ঠান-সূচীতে "লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপ"-এর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, "এ নাটকে যদি একাধিক বিদেশী নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করেন তবে অবাক হবেন না।"—না, মাত্র প্রভাব লক্ষ্য করলে অবাক হবার কিছুই ছিল না। কারণ সেক্সপীয়ার থেকে শুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল সাহিত্যিকই অপরাপর রচনা দ্বারা কোন না কোন সময়ে প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু "ভি-আই-পি"-তে যা দেখলুম, তাকে মাত্র প্রভাব ব'লে লঘুভাবে উড়িয়ে দিতে পারছি না। "ভি-আই-পি"-কে জর্জ, এস কাউফ্‌ম্যান এবং মস্‌ হার্ট রচিত "দি ম্যান হু কেম টু ডিনার" (The Man who came to dinner by George S. Kaufman and Moss Hart) -এর সরল বঙ্গানুবাদ বললেই অনুভাষণের অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মূল বইয়ের টাইটেল পৃষ্ঠায়—'All rights including the rights of translation into foreign languages are controlled by the Estate of Sam H. Harris, 239 West 45th Street, New York City" — এই ধরণের একটি লেখা নজরে পড়ে। মাত্র ওহিয়োর একটি শহরের পরিবর্তে বর্ধমান এবং খ্রীস্টমাস দিনের বদলে স্বাধীনতা দিবস করলেই অনুবাদের দায় এড়ানো যায় কিনা জানি না।

'বোম্বে কা চোর' চিত্রে মালা সিন্‌হা

অনুবাদ সুন্দরই হয়েছে বলতে পারতুম। কেননা calf's-foot jelly বাঙলাতে সুন্দরভাবে 'মুড়িঘণ্ট' করা হয়েছে; কিন্তু নাট্যকার উৎপল দত্ত একটু যত্ন নিলেই যে বইটিকে অশ্লীলতা দোষ থেকে মুক্ত করতে পারতেন, তাকে তিনি সম্ভবতঃ দর্শকসাধারণের তুষ্টি-বিধানের জন্যে যৌনসম্পর্কিত কথা-বার্তায় পরিপূর্ণ করে রুচিবিকারেরই পরিচয় দিয়েছেন। "মিস পাল, আজ আপনাকে চমৎকার দেখাচ্ছে, আমার যৌবন থাকলে আমি আপনাকে—." "অরুন্ধতী মুখুজ্জের মত প্যানপেনে অভিসারিকা সাজবার শখ হয়েছে," "লিপিকা তার দেহকে বাঁধা দিয়েছেন," "ওয়াইফ টোয়াইফকে অন্ধকারে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ," "মেয়েটি একটি ক্ষুধিত পাষাণের চরিত্র," "যৌবনের চোঁয়া ঢেঁকুর", "স্বামীধরার যত রকম প্যাঁচ আছে," "উইপোকার যৌন অভিলাষ", "দেখ, দেখ, ছারপোকারা কেমন প্রেম করছে"—ইত্যাদি সাধু বচন নাটকখানির আষ্টেপৃষ্ঠে ছড়িয়ে আছে। এ ছাড়াও এমন সব অশালীন বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে, যা কোনো সুস্থ ব্যক্তি সজ্ঞানে সমর্থন করতে পারবেন না। "তোর ভাষা যে একেবারে মধুসংলাপী বিধায়কের মত" বা "এক গাছা রবি ঠাকুরের কাব্য" আমাদের আদৌ শ্রুতিসুখকর মনে হয়নি। "ভি-আই-পি"-কে একটি নির্দোষ হাস্যনাটিকা রূপে উপস্থাপিত করা কি এতই কঠিন ছিল?

অভিনয়ে অনায়াসেই মাত করেছেন ভি-আই-পি সুরেন্দ্রনাথ হুন্দাদারের ভূমিকায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একাই একশো এবং নাটকের সবখানিই জুড়ে আছেন তিনি। শ্লীল-অশ্লীল সব কথাই তিনি নাটকের খাতিরে যথাসম্ভব রসিয়ে বলেছেন। নাটকে আর যাঁরা আছেন, তাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছেন মাত্র। ওরই মধ্যে বিশেষ করে নাম করব নীলিমা দাস (লিপিকা রায়), মানসী সেন (সবিতা গড়গড়ি), সুলেখা ভট্টাচার্য (কাদম্বিনী), রেণু ঘোষ (মিস পাল), সুনীল রায় (অনাথ গড়গড়ি), বিধান মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার মল্লিক), সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (গজু), অরুণ রায় (চিন্ময় কাঞ্জিলাল), কমল মুখোপাধ্যায় (সুব্রত) এবং সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (দেবকুমার) প্রভৃতির।

দৃশ্যপট-পরিকল্পনা এবং মঞ্চো-পস্থাপনায় সলিল ভট্টাচার্য উল্লেখ্য নতুনত্ব আমদানী করেছেন। মঞ্চে বর্ধমান-ট্যাক্সির আবির্ভাব সুপরিকল্পিত। এ-নাটকে আলোকসম্পাতে বাহাদুরী দেখাবার কোনই সুযোগ নেই।

বিবিধ সংবাদ

শিশু-রংমহলের একাদশ প্রতিষ্ঠা উৎসব: গেল রবিবার, ৬ই মে সকাল দশটায় শিশু-রংমহল নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে তাঁদের একাদশ প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব পালন করলেন। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সমর চট্টোপাধ্যায়ের স্বাগত ভাষণের পর প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি এম এম ভোস এবং নিউ এম্পায়ারের অধ্যক্ষ এগারো বছর আগে প্রতিষ্ঠানটির ক্ষুদ্র রূপ থেকে আজকের বিরাট বিশালতায় আনন্দ জানিয়ে শিশু-রংমহলের নিজস্ব গৃহস্থাপনে সাহায্য করবার জন্য আবেদন জানান। এ'দের পরে সৌমেন ঠাকুর তাঁর সংক্ষিপ্ত বাঙলা বক্তৃতায় শিশু-রংমহলের জন্যে উপযোগী নাটক লেখবার জন্যে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সাহিত্যিকদের অন্তরঙ্গ হবার জন্যে আহ্বান জানান। ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের পর শুরু হয় অনুষ্ঠান। প্রথমেই হিন্দী হাই স্কুলের ছাত্ররা নেপথ্য-গীত ও বাদ্যের সঙ্গে সমবেত শিকারনৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দবর্ধন করেন। পরে সি-এল-টির শিশু-সভ্যারা চার বছর বয়েস থেকে শুরু করে দশ-এগারো বয়েস পর্যন্ত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে তারা কেমন ক'রে ছন্দ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে, তাই পর পর নাচের (রিথম্ ড্রিল) সাহায্যে ফুটিয়ে তোলে। দেশজ গণনৃত্য থেকে কথক, মণিপুরী, কথাকলি ও ভরতনাট্যম্-এর ক্লাসিক্যাল ভঙ্গী কত ছোট বয়সেই এরা সুন্দরভাবে আয়ত্ত করতে শিখছে, তা দেখলে বিস্মিত

শিশু রংমহলের একাদশ প্রতিষ্ঠা উৎসবে সি-এল-টির শিশুসভ্যারা ছন্দ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন কেমন ভাবে তা নাচের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছেন।

হতে হয়। অবশ্য মণিপুরী বলে যে-নাচ সাত-আট বছরের মেয়েদের শেখানো হয়েছে, তাকে খাঁটি মণিপুরী ব'লে মেনে নিতে পারা শক্ত। তবু খাঁটি ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সংগে ভারতীয় নৃত্যের সম্যক অনুশীলনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন ব'লে সি-এল-টির কর্তৃপক্ষকে আমরা অজস্র সাধুবাদ জানাচ্ছি।

পনেরো মিনিট বিরতির পর শিশু-রংমহলের 'সাত ভাই চম্পা' অভিনীত হয়।

বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন:

গেল শুক্রবার, ১১ই মে ফাইন আর্টস অ্যাকাডেমির প্রেক্ষাগৃহে বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক শংসা বিতরণ উৎসব হয়ে গেল। ১৯৬১ সালে কলকাতায় প্রদর্শিত যে সব দেশী এবং বিদেশী ছবি অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যদের মতে প্রথম দশটি স্থান অধিকার করেছে, তাদের প্রযোজক বা তাঁদের প্রতিভূদের হাতে যোগ্যতার শংসাপত্র প্রদান করলেন প্রবীণ পরিচালক দেবকীকুমার বসু। এ-ছাড়া বাংলা, হিন্দী এবং বিদেশী ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, সহ-অভিনেতা, সহ-অভিনেত্রী, আলোকচিত্র-শিল্পী, শব্দযন্ত্রী, সংগীত-পরিচালক সংগীত-রচয়িতা এবং সংলাপ লেখকদেরও ঐ সমানভাবেই সংবর্ধিত করা হয়। বাংলাদেশের প্রথিতযশা পরিচালক, কলাকুশলী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক, পরিবেশক এবং প্রদর্শকরা প্রায় সকলেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বোম্বাই থেকে সহ অভিনেত্রীর মানপত্র নিতে এসেছিলেন ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

"চক্র"-এর প্রযোজনায় 'রাম-শ্যাম-যদু':

গেল ১৪ই মে, সন্ধ্যা ৬-৩০টায় "চক্র"-নাট্য সংস্থার সভ্যরা রঙমহল রংগমঞ্চে বাদল সরকার রচিত "রাম-শ্যাম-যদু" নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন। তাঁরা আবার ২১এ মে নাটকটির পুনরভিনয় করবেন ঐ একই জায়গায়।

"সাত পাকে বাঁধা":

প্রযোজক আর ডি বনশালের পরবর্তী চিত্র "সাত পাকে বাঁধা"-র পরিচালনা করবেন অজয় কর। বইটির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে সুচিত্রা সেন চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এর সংগীত পরিচালনা করবেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখিত বইটির চিত্রনাট্য প্রস্তুতের পর আসচে মাসে চিত্র গ্রহণ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বংগীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র কলা-কুশলীদের সার্টিফিকেট প্রদান উৎসবে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

হাওড়ার শিল্পী মহলের আগামী নাটক "যুগকবি জয়দেব":

সৌখীন নাট্য প্রতিষ্ঠান শিল্পী মহলের আগামী নাটক হচ্ছে চিত্র সাংবাদিক ও সুপরিচালক রণজিৎ দত্ত বিরচিত "যুগকবি জয়দেব"। আসচে মাসের মাঝামাঝি নাট্যকারেরই পরিচালনায় নাটকখানি বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনীত হবে। গেল ৭ই মে সন্ধ্যায় নাটকখানির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা:

আসচে ২৩-এ মে ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টারে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে কানাডা এবং স্কাণ্ডিনেভিয়ার কতকগুলি স্বল্প দৈর্ঘের চিত্র দেখানো হবে।

পি এল ফিল্মস-এর "পসারিণী":

আজ শুক্রবার, ১৮ই মে ইউনিতা ফিল্মস পরিবেশিত, পি এল ফিল্মস প্রযোজিত এবং সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে গঠিত "পসারিণী" চিত্রটি উত্তরা, পূরবী ও উজ্জ্বলা চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অধুনা পরলোকগত জ্যোতির্ময় রায় এবং পরিচালনা করেছেন ফণী লাহিড়ী।

কবিপক্ষে শৌভনিকের নাট্যার্ঘ্য:

কবিগুরুর জন্মোৎসব উপলক্ষে কবিপক্ষে শৌভনিক-সম্প্রদায় প্রতি বৃহস্পতিবার "গোরা" ও প্রতি শনিরবিবার "তাসের দেশ" অভিনয় করবেন।

বিশ্বরূপার ঘোষণা:

বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করছেন যে অতঃপর প্রতি বৎসর পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকলা সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্যে তাঁরা ১,০০০ (এক হাজার টাকা) পুরস্কার দেবেন। বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের সুপারিশ-ক্রমে এই পুরস্কার বাঙলার নাট্যজগতের সংগে সংশ্লিষ্ট নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, নাট্যকলাকুশলী বা অভিনেতা-অভিনেত্রী-দের মধ্যে যে-কেউ এই পুরস্কার লাভের অধিকারী।

বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পে সরকারী সাহায্যের আবেদন :

গেল শনিবার, **৫ই মে,** কলেজ স্কোয়ারস্থ স্টুডেন্টস্ হলে বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পের কুশলী, কর্মী, শিল্পী, পরিচালক, প্রদর্শক ও পরিবেশকবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পে ঘনায়মান বিপদের জন্যে উৎকন্ঠা প্রকাশ করেন এবং সরকারকে অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন এই শিল্প থেকে কর হিসেবে সংগৃহীত চার কোটি টাকার কিছু অংশ এই বিপদ নিবারণের জন্যে ব্যয়িত করেন। প্রস্তাব করা হয়েছে যে, সিনেমাশিল্পে নিযুক্ত ১১,০০০ কর্মীকে মাসিক ১৫৲ টাকা হিসেবে সাহায্য দেওয়া হোক, সকল কর্মীকে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা আইনের আওতায় আনা হোক, সরকার কর্তৃক কয়েকটি ফিল্ম স্টুডিও চালু করা হোক এবং প্রগতিধর্মী ছোট প্রযোজকদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হোক।

টেনেসী উইলিয়ামের নতুন ছবি :

অনেকদিনের অনুপস্থিতির পর ভিভিয়েন লে আবার চিত্রজগতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি **'দি রোমান স্প্রিং অফ মিসেস ষ্টোন'** লণ্ডনে মুক্তি পেয়েছে সম্প্রতি। চিত্রের কাহিনীকার হলেন "এ ষ্ট্রিট কার নেমড ডিজায়ার", "রোজ টাটু"র লেখক টেনেসী উইলিয়ামস।

মিসেস ষ্টোন সেক্সপীরিয়ান রঙ্গমঞ্চের বিফল নায়িকা। বয়েসের হাতে যৌবনকে এবং আকস্মিক দুর্ঘটনায় কবরে স্বামীকে রেখে রোমকেই বার্ধক্যের বারানসী করেছেন তিনি। একদা একটি নাচের আসরে এক পেশাদার নাচিয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বসন্তের হাতে অসহায়ভাবে বন্দী হন মিসেস ষ্টোন। কিন্তু নাচিয়ে যুবকটি বেশীদিন তাঁকে সহ্য করল না। এক কমবয়েসী মেয়ের প্রেম তাকে মিসেস ষ্টোনের কাছ থেকে নিয়ে গেল। বর্ষীয়সী মিসেস ষ্টোন তাঁর অপসৃয়মান যৌবনের সান্ত্বনা খুঁজলেন রাস্তার একটা বাউন্ডুলে লোকের মধ্যে।
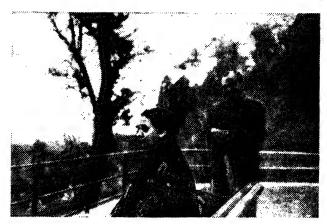
টেনেসী উইলিয়ামস-এর ক্রুর কলমের ফসল মিসেস ষ্টোন। ওপরতলার মহিলামহলের অন্যতম প্রতিনিধির অন্তঃসারহীন জীবনবোধের ওপর তীব্র আক্রমণ করেছেন টেনিসী উইলিয়ামস তাঁর এই কাহিনীতে। তবে চিত্রনাট্য যথারীতি চলচ্চিত্রানুযায়ী পরিবর্তিত। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন গ্যাভিন ল্যাম্বার্ট। ছবিটি তোলা হয়েছে লণ্ডনের এলষ্ট্রি ষ্টুডিওতে।

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যালকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চিত্রে দেখা যাবে

ভিভিয়েন লে ছাড়া, নাচিয়ে যুবকটির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আমেরিকান অভিনেতা ওয়ারেন বিটি। তবে এই ছবিতে মনে রাখবার মতন অভিনয় করেছেন লটে লেনিয়া।

"নায়ক জাহাজ"

আলেক গিনেস অভিনীত নবতম ছবির নায়ক **'এইচ এম এস ডিফায়েন্ট'** নামক একটি জাহাজ। জাহাজ মানে নেপোলিয়নের সময়কার একটি পালতোলা জাহাজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর নৌ-জীবনের কঠোরতা এবং গ্লানি ছিল অপরিসীম। নাবিকদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করা হত সেকালে। "ডিফায়েন্ট" এর নাবিকরা পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রতিবাদে বিদ্রোহ করে জাহাজে এবং তাদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সফল হয়। মোটামুটি এই কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে তোলা হয়েছে ছবিটি।

জাহাজটি যখন পোর্টসমাউথ থেকে ইটালীর দিকে যাত্রা করে নাবিকরা তখনই বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে দেয়। স্থির হয় কর্সিকার বন্দরে পৌছে ইংলণ্ডের অন্যান্য জাহাজের নাবিকদের নিয়ে একটি ব্যাপক বিদ্রোহ করা হবে। এরই মধ্যে জাহাজের ক্যাপটেন (আলেক গিনেস) এবং তাঁর সহকারীর (ডার্ক বোগার্ড) মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলতে থাকে। পথে ডিফায়েন্টের সঙ্গে একটি ফরাসী জাহাজের সংঘর্ষ হয়, এবং নেপোলিয়নের এক উপদেষ্টা বন্দী হন। এবং তারপরেই স্মরণীয় বিদ্রোহ।

পরিচালক লিউইস গিলবার্ট অসাধারণ গতিবেগসম্পন্ন এই নাটকটিকে অসামান্য দক্ষতায় চিত্রায়িত করেছেন। সিনেমাস্কোপে তোলা হয়েছে চিত্রটি। আলেক গিনেসের ক্যাপ্টেন চরিত্রটি দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। ডার্ক বোগার্ড অসহিষ্ণু লেফটেন্যান্ট-এর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন। বিদ্রোহী নাবিকদের নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন আনথনি কোরেল।

অসউইৎসের কাউন্ট :

ডার্ক বোগার্ড-এর আরেকটি নির্মিয়মান ছবি "দি পাসওয়ার্ড ইজ কারেজ"। এই ছবিতে বোগার্ড হচ্ছেন ফ্যাক্টরী ফোরম্যান। লোকে তাঁকে সাধারণতঃ 'অসউইৎসের কাউন্ট' নামে ডাকে। এবং এই ডাকের পেছনের ইতিহাসটিই ছবির মূল কাহিনী। ১৯৪০ সালে ফোরম্যানটি ছিলেন রয়েল আর্টিলারির সার্জেন্ট মেজর। কালেতে তিনি বন্দী হন এবং একটি যুদ্ধশিবির থেকে পালান। পালাবার সময় চারশজন ইহুদীকে গ্যাস-চেম্বার থেকে উদ্ধার করেন।

জন ক্যাসেলের জনপ্রিয় উপন্যাসটিকে অবলম্বন করে তোলা হচ্ছে ছবিটি।

—চিত্রকূট

॥ ফুটবল মরসুম ॥

ক'লকাতায় প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা গত ৭ই মে থেকে আরম্ভ হয়েছে। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এ পর্যন্ত (১৪।৫।৬২) ৩টে ম্যাচ খেলেছে। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে খিদিরপুরের বিপক্ষে ৩—০ গোল, জর্জ টেলিগ্রাফ দলের বিপক্ষে ১—০ গোল এবং উয়াড়ীর বিপক্ষে ১—০ গোল। গত বছরের রাণার্স-আপ বি এন আর দল দুটো ম্যাচ খেলে ২ পয়েন্ট পেয়েছে; উয়াড়ী এবং এরিয়ান্সের বিপক্ষে তারা দুটো খেলা ড্র করেছে। মোহনবাগান ৩টে ম্যাচ খেলেছে—বাটা স্পোর্টস দলের বিপক্ষে ৩—১ গোল, পুলিশের বিপক্ষে ০—০ গোল এবং বালী প্রতিভার বিপক্ষে ২—২ গোল। মহামেডান স্পোর্টিং দল ১টা ম্যাচ খেলে হাওড়া ইউনিয়নকে ২—১ গোলে পরাজিত করেছে।

॥ ইংলিশ এফ এ কাপ ॥

১৯৬২ সালের ইংল্যাণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন কাপের (এফ এ কাপ) ফাইনালে গত বছরের এফ এ কাপ এবং প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান টোটেনহ্যাম হটস্পার দল ৩—১ গোলে ল্যাঙ্কাসায়ারের বার্ণলে দলকে পরাজিত ক'রে পর পর দু'বার এফ এ কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। বিশ্রাম সময়ে বিজয়ী দল ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় বিজয়ী দল আরও দুটো গোল দেয়। খেলা ভাঙ্গার ৯ মিনিট আগে বিজয়ী দলের অধিনায়ক পেনাল্টি থেকে দলের তৃতীয় গোল দেন। গত বছরের ফাইনালে টোটেনহ্যাম হটস্পার দল ২—০ গোলে লিস্টার সিটি দলকে পরাজিত করেছিল। এই নিয়ে তারা চার বার এফ এ কাপ জয়লাভ করলো (১৯০১, ১৯২১, ১৯৬১ এবং ১৯৬২)।

এ বছরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান টোটেনহ্যাম হটস্পার দল তৃতীয় স্থান লাভ করায় উপর্যুপরি দু'বার একই বছরে ফুটবল লীগ কাপ এবং এফ এ কাপ জয়লাভের দুর্লভ সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়। এ পর্যন্ত মাত্র এই তিনটি দল একই বছরে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ কাপ এবং এফ এ কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে—১৮৮৯ সালে প্রেসটন নর্থ, ১৮৯৭ সালে অস্টন ভিলা এবং ১৯৬১ সালে টোটেনহ্যাম হটস্পার ক্লাব।

॥ ফ্র্যাংক ওরেল ॥

আগামী ৬ই আগষ্ট জামাইকা স্বাধীনতা লাভ করবে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

ফ্র্যাংক ওরেল

টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ফ্র্যাংক ওরেলকে স্বাধীন জামাইকা দেশের আইনসভার উচ্চ পরিষদের সদস্য পদে মনোনীত করা হয়েছে। তাছাড়া আগামী ১৯৬৩ সালে যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ড সফরে যাবে ফ্র্যাংক ওরেল সেই দলের নেতৃত্ব করবেন।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ইংল্যাণ্ড সফর

গত ২রা মে থেকে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ইংল্যাণ্ড সফরের খেলা সুরু হয়েছে। গতানুগতিকভাবে প্রথম খেলা পড়ে ওরষ্টারসায়ার দলের সঙ্গে। প্রত্যেকটি বহিরাগত ক্রিকেট দলেরই ইংল্যাণ্ড সফরের প্রথম খেলা পড়ে এই ওরষ্টারসায়ার দলের সঙ্গে। ইংল্যাণ্ডে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের এই দ্বিতীয় সফর। পাকিস্তান ক্রিকেট দল প্রথম ইংল্যাণ্ড সফরে যায় ১৯৫৪ সালে এবং ওভাল মাঠে ২৪ রাণে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে রাতারাতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে সাড়া এনে দেয়। পাকিস্তান ক্রিকেট দলের পূর্বে কোন বহিরাগত দল ইংল্যাণ্ডে প্রথম ক্রিকেট সফরে এসে টেস্ট খেলায় জয়লাভ করতে পারেনি। ইংল্যাণ্ডে অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট খেলে ১৮৮০ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯০৭ সালে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১৯২৮ সালে, নিউজিল্যাণ্ড ১৯৩১ সালে, ভারতবর্ষ ১৯৩২ সালে এবং পাকিস্তান ১৯৫৪ সালে। সেই ঐতিহাসিক ওভাল মাঠের টেস্ট খেলায় পাকিস্তান দলের প্রখ্যাত বোলার ফজল মামুদ ৯৯ রাণে ১২টা উইকেট নিয়ে পাকিস্তান দলকে জয়লাভে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। এই দ্বিতীয়বারের ইংল্যাণ্ড সফরে তিনি দলভুক্ত হননি। ইংল্যাণ্ড সফরকারী দ্বিতীয় পাকিস্তান দলে ১৮ জন খেলোয়াড় দলভুক্ত হয়েছেন। অধিনায়ক হয়েছেন জাভেদ বার্কি। এই দলটি ইংল্যাণ্ড সফরে পাঁচটি টেস্ট খেলা নিয়ে মোট ৩৩টি খেলায় যোগদান করবে। সফর আরম্ভ হয়েছে ২রা মে এবং শেষ হবে ৯ই সেপ্টেম্বর। টেস্ট খেলা সুরু হওয়ার তারিখ ঃ ১ম টেস্ট (এজবাস্টন), ৩১শে মে; ২য় টেস্ট (লর্ডস), ২১শে জুন; ৩য় টেস্ট (লিডস) ৫ই জুলাই; ৪র্থ টেস্ট (ট্রেণ্ট ব্রিজ) ২৬শে জুলাই এবং ৫ম টেস্ট (ওভাল), ১৬ই আগষ্ট।

পাকিস্তান এ পর্যন্ত পাঁচটি দেশের বিপক্ষে মোট ৩৭টি টেস্টম্যাচ খেলেছে। পাকিস্তানের পক্ষে টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ঃ পাকিস্থানের জয় ৮, হার ১০ এবং খেলা ড্র ১৯। ১৯৫৪ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে প্রথম গিয়ে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ ড্র করে। পাকিস্তান এ পর্যন্ত টেস্ট সিরিজে 'রাবার' লাভ করেছে দুটি দেশের বিপক্ষে—১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে তিনটি খেলার টেস্ট সিরিজে ২—০ খেলায় এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে তিনটি খেলার টেস্ট সিরিজে ২—১ খেলায় জয়লাভ ক'রে।

বিশ্ব ফুটবল কাপ চিলি

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার—'জুলে রিমে কাপ'। ইণ্টার ন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশন (সংক্ষিপ্ত নাম F. I. F. A) ফ্রান্সের মঁসিয়ে জুলে রিমে-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং দক্ষ পরিচালনায় এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। মঁসিয়ে রিমে সুদীর্ঘ ৩৫ বছর এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। তাঁরই নামে এই 'জুলে রিমে কাপ'। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে মঁসিয়ে রিমে তাঁর ৮০ বছর বয়সে এসোসিয়েশনের সভাপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালে জুলে রিমে কাপ প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন হয়। প্রতি চতুর্থ বৎসরে এই প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা; কিন্তু বিশ্ব মহাযুদ্ধের দরুণ ১৯৪২ এবং ১৯৪৬ সালে কোন প্রতিযোগিতা হয়নি। ইণ্টার ন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত সভ্যদেশগুলি এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের একমাত্র অধিকারী।

প্রতিযোগিতায় পেশাদার এবং অপেশাদার উভয় শ্রেণীর খেলোয়াড়ই যোগদান করতে পারেন। এ পর্যন্ত দু'বার ক'রে জুলে রিমে কাপ পেয়েছে মাত্র দু'টি দেশ—উরুগুয়ে (১৯৩০ ও ১৯৫০) এবং ইটালী (১৯৩৪ ও ১৯৩৮)।

॥ ১৯৬২ সালের বিশ্ব ফুটবল ॥

আগামী ৩০শে মে থেকে চিলির চারটি অঞ্চলে ১৯৬২ সালের সপ্তম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ের খেলা আরম্ভ হবে। এই শেষ পর্যায়ের খেলায় যে ১৬টি দেশ যোগদান করবে তাদের মধ্যে ১৪টি দেশকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন জোনের খেলায় শীর্ষস্থান লাভ ক'রে চিলির শেষ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে। কেবল ১৯৫৮ সালের জুলে রিমে কাপ বিজয়ী ব্রেজিল এবং এইবারের প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ চিলিকে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় ইউরোপীয় জোনের ১০টি গ্রুপেই শীর্ষস্থান লাভ করেছে ইউরোপীয় জোনেরই অন্তর্ভুক্ত দেশ। ইউরোপীয় জোনের ১০টি গ্রুপের মধ্যে তিনটি গ্রুপের—৭ম, ৯ম ও ১০ম গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশ ভিন্ন জোনের
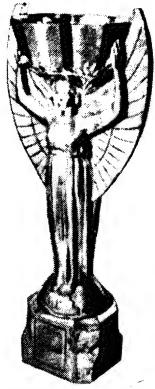
জুলে রিমে কাপঃ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার। কাপের উচ্চতা দুই ফিট তিন ইঞ্চি। ওজন ১২ পাউণ্ড ৩ আউন্স। এই রৌপ্য নির্মিত কাপের মূল্য ২,৫০০ পাউণ্ড।

চ্যাম্পিয়ান দেশের সঙ্গে খেলে নিজ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান খেতাব পায়। ৭ম গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান ইটালী 'নিয়ার ইস্ট জোন'-এর চ্যাম্পিয়ান ইসরাইলের সঙ্গে, ৯ম গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান স্পেন আফ্রিকান জোন চ্যাম্পিয়ান মরোক্কোর সঙ্গে এবং ১০ম গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান যুগোশ্লাভিয়া এশিয়ান জোন চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে খেলে নিজ নিজ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হয়। ইউরোপীয় জোনের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় অপ্রত্যাশিত ঘটনা—সুইডেন এবং ফ্রান্সের বিদায়।

১৯৫৮ সালের ৬ষ্ঠ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে সুইডেন ২—৫ গোলে ব্রেজিলের কাছে পরাজিত হয়ে রানার্স-আপ হয়েছিল এবং ফ্রান্স পেয়েছিল তৃতীয় স্থান। এবারের প্রতিযোগিতায় ২য় গ্রুপে ফ্রান্স এবং বুলগেরিয়া সমান ৬ পয়েন্ট পায়। গ্রুপচ্যাম্পিয়ান নির্ধারণের জন্যে তখন উভয় দলকে আর একবার খেলতে হয় এবং এই খেলায় বুলগেরিয়া ১—০ গোলে জয়লাভ করে। আগের দুটো খেলার ফলাফল ফ্রান্সের জয় ৩—০ গোলে এবং পরাজয় ০—১ গোলে। ১ম গ্রুপেও সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ড সমান ৬টা পয়েন্ট পেয়েছিলো; কিন্তু সুইডেনের গোল এভারেজ অনেক ভাল ছিল। তৃতীয় খেলায় সুইজারল্যাণ্ড ২—১ গোলে সুইডেনকে পরাজিত ক'রে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়। আগের দুটো খেলায় ফলাফল সুইডেনের জয় ৪—০ গোলে এবং হার ২—৩ গোলে।

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশগুলিকে এই ৬টি জোনে ভাগ ক'রে লীগ প্রথায় খেলানো হয়ঃ (১) ইউরোপীয় জোন (১০টি গ্রুপ), (২) এশিয়ান জোন, (৩) আফ্রিকান জোন (৩টি সেক্সন এবং ফাইনাল পুল), (৪) নিয়ার ইস্ট জোন, (৫) সাউথ আমেরিকান জোন (৪টি গ্রুপ) এবং (৬) নর্থ আমেরিকান এ্যাণ্ড সেন্ট্রাল জোন (৩টি সেক্সন এবং ফাইনাল পুল)। এই ৬টি জোনের মধ্যে একমাত্র ইউরোপীয় জোনের ১০টি, সাউথ আমেরিকান জোনের ৩টি এবং উত্তর ও মধ্য আমেরিকান জোনের ১টি—মোট ১৪টি দেশ শেষ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

চিলিতে ১৬টি দেশ চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে এবং পরবর্তী নক আউটের খেলায় যোগদান করবে প্রত্যেক গ্রুপের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ।

বিভিন্ন গ্রুপের খেলায় যোগদানকারী দেশঃ

প্রথম গ্রুপঃ উরুগুয়ে, কলোম্বিয়া, রাশিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া।

দ্বিতীয় গ্রুপঃ চিলি, সুইজারল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মাণী এবং ইটালী।

তৃতীয় গ্রুপঃ ব্রেজিল, মেক্সিকো, স্পেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়া।

চতুর্থ গ্রুপঃ আর্জেন্টিনা, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং ইংল্যাণ্ড।

॥ প্রাথমিক পর্যায়ের ফলাফল ॥

ইউরোপীয়ন জোন

গ্রুপ—১

ফাইনাল তালিকা : গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান সুইজারল্যান্ড

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
সুইডেন	৪	৩	০	১	১০	৩	৬
সুইজারল্যান্ড	৪	৩	০	১	৯	৯	৬
বেলজিয়াম	৪	০	০	৪	৩	১০	০

সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ড দুই দলই সমান ৬ পয়েণ্ট করে। সুইডেনের গোল এভারেজ খুব ভাল ছিল; কিন্তু প্রতিযোগিতায় গোল এভারেজকে খেলার ভাল-মন্দ বিচারের মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়নি। সুতরাং উভয় দলকেই তৃতীয়বার খেলতে হয় এবং সুইজারল্যান্ড ২-১ গোলে জয়লাভ করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

সুইজারল্যান্ড ৪-২ ও ২-১ গোলে বেলজিয়মকে এবং ০-৪, ৩-২ ও ২-১ গোলে সুইডেনকে পরাজিত করে।

গ্রুপ—২

ফাইনাল তালিকা : গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান বুলগেরিয়া

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ফ্রান্স	৪	৩	০	১	১০	৩	৬
বুলগেরিয়া	৪	৩	০	১	৬	৪	৬
ফিনল্যান্ড	৪	০	০	৪	৩	১২	০

বুলগেরিয়া তৃতীয়বারের খেলায় ১-০ গোলে ফ্রান্সকে পরাজিত ক'রে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

বুলগেরিয়া ২-০ ও ৩-১ গোলে ফিনল্যান্ড এবং ০-৩, ১-০ ও ১-০ গোলে ফ্রান্সকে পরাজিত করে।

গ্রুপ—৩

ফাইনাল তালিকা : গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মাণী

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পঃ জার্মাণী	৪	৪	০	০	১১	৫	৮
উঃ আয়ারল্যান্ড	৪	১	০	৩	৭	৮	২
গ্রীস	৪	১	০	৩	৩	৮	২

পশ্চিম জার্মাণী ৪-৩ ও ২-১ গোলে উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং ৩-০ ও ২-১ গোলে গ্রীসকে পরাজিত করে।

গ্রুপ—৪

ফাইনাল তালিকা : গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরী

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
হাঙ্গেরী	৪	৩	১	০	১১	৫	৭
হল্যান্ড	৩	০	২	১	৪	৭	২
পূঃ জার্মাণী	৩	০	১	২	৩	৬	১

হাঙ্গেরী ৩-০ ও ৩-৩ গোলে হল্যান্ডকে এবং ২-০ ও ৩-২ গোলে পূর্ব জার্মাণীকে পরাজিত করে। হল্যান্ড বনাম পূর্ব জার্মাণীর ফিরতি খেলা হয়নি।

গ্রুপ—৫

ফাইনাল তালিকা : গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান রাশিয়া

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
রাশিয়া	৪	৪	০	০	১১	৩	৮
তুরস্ক	৪	২	০	২	৪	৪	৪
নরওয়ে	৪	০	০	৪	৩	১১	০

রাশিয়া ১-০ ও ২-১ গোলে তুরস্ককে এবং ৫-২ ও ৩-০ গোলে নরওয়েকে পরাজিত করে।

গ্রুপ—৬

ফাইনাল তালিকা : গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান ইংল্যান্ড

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইংল্যান্ড	৪	৩	১	০	১৬	২	৭
পর্তুগাল	৪	১	১	২	৯	৭	৩
লাক্সেমবার্গ	৪	১	০	৩	৫	২১	২

ইংল্যান্ড ৯-০ ও ৪-১ গোলে লাক্সেমবার্গ এবং ১-১ ও ২-০ গোলে পর্তুগালকে পরাজিত করে। লাক্সেমবার্গের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ৯-০ গোলে জয়লাভ এ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক গোলের ব্যবধানে জয়লাভ হিসাবে রেকর্ড হয়েছে।

গ্রুপ—৭

ফাইনাল তালিকা : গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান ইটালী

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইটালী	২	২	০	০	১০	২	৪
ইসরাইল	২	০	০	২	২	১০	০

ইটালী এবং রুমানিয়াকে নিয়ে এই গ্রুপ তৈরী হয়েছিল এবং কথা ছিল এই দুজনের বিজয়ী দল খেলবে 'নিয়ার ইষ্ট জোন-এর বিজয়ী দলের সঙ্গে। কিন্তু রুমানিয়া প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় ইটালী সরাসরি 'নিয়ার ইষ্ট জোন'-এর বিজয়ী ইসরাইলের সঙ্গে খেলে জয়লাভ করে।

ইটালী ৬-০ ও ৪-২ গোলে ইসরাইলকে পরাজিত করে।

গ্রুপ—৮

ফাইনাল তালিকা : গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান চেকোশ্লোভাকিয়া

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
চেকোঃ	৪	৩	০	১	১৬	৫	৬
স্কটল্যান্ড	৪	৩	০	১	১০	৭	৬
রিপাঃ আয়ারল্যান্ড	৪	০	০	৪	৩	১৭	০

চেকোশ্লোভাকিয়া তৃতীয় বারের খেলায় ৪—২ গোলে স্কটল্যান্ডকে পরাজিত ক'রে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

চেকোশ্লাভাকিয়া ৩—১ ও ৭—১ গোলে রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডকে এবং ৪—০, ২—৩ ও ৪—২ গোলে স্কটল্যান্ডকে পরাজিত করে।

গ্রুপ—৯

ফাইনাল তালিকা : গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান স্পেন

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
স্পেন	২	১	১	০	৩	২	৩
ওয়েলস	২	০	১	১	২	৩	১

৯নং গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান স্পেনের সঙ্গে আফ্রিকান জোনের চ্যাম্পিয়ান মরোক্কোর খেলা পড়ে। এই খেলায় স্পেন ১—০ ও ৩—২ গোলে মরোক্কোকে পরাজিত ক'রে ৯নং গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান আখ্যালাভ করে।

স্পেন ২—১ ও ১—১ গোলে ওয়েলসকে এবং ১—০ ও ৩—২ গোলে মরোক্কোকে পরাজিত করে।

গ্রুপ—১০

ফাইনাল তালিকা

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান যুগোশ্লাভিয়া

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
যুগোশ্লাঃ	২	১	১	০	৩	২	৩
পোল্যান্ড	২	০	১	১	২	৩	১

১০নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে এশিয়ান জোন চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়ার খেলা পড়ে। এই খেলায় যুগোশ্লাভিয়া ৫—১ ও ৩—১ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত ক'রে ১০নং গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করে।

যুগোশ্লাভিয়া ২—১ ও ১—১ গোলে পোল্যান্ডকে এবং এশিয়ান জোন চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫—১ ও ৩—১ গোলে পরাজিত করে।

এশিয়ান জোন

এশিয়ান জোনে তিনটি দেশ—ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান নাম দেয়; কিন্তু ইন্দোনেশিয়া নাম প্রত্যাহার করে। দক্ষিণ কোরিয়া সহজেই জাপানকে পরাজিত ক'রে ইউরোপীয় জোনের ১০নং গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

আফ্রিকান জোন

গ্রুপ—১

এই বিভাগে সুদান এবং ঈজিপ্টের খেলা পড়ে; কিন্তু এই দুই দেশই প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় এই বিভাগটি বাতিল হিসাবে গণ্য হয়।

গ্রুপ—২

এই গ্রুপে মরোক্কো এবং টিউনিসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে সমান ৩ পয়েণ্ট লাভ করে—দুই দলেরই জয় ১, ড্র ১
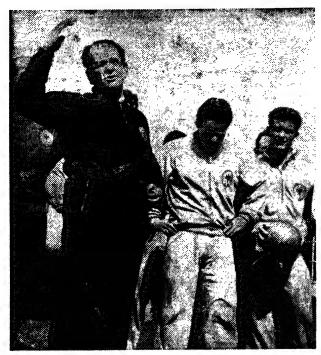
চিলির সপ্তম বিশ্বফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী পশ্চিম জার্মাণীর ফুটবল দলের কোচ সেপ হেরবের্গের (হাত তুলে আছেন) কয়েকজন ফুটবল খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলোচনা করছেন। হেরবের্গেরের বয়স ৬৫ বছর। তিনি সুদীর্ঘ ২৫ বছর ধরে পশ্চিম জার্মাণীর ফুটবল দলের ফুটবল খেলা-শিক্ষার ভার গ্রহণ করে সুদক্ষ কোচ হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁরই শিক্ষার গুণে ১৯৫৪ সালের পঞ্চম বিশ্বফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিম জার্মাণী ৩—২ গোলে শক্তিশালী হাঙ্গেরী দলকে পরাজিত করে।

এবং গোল এভারেজ সমান-সমান। তখন টস করা হয়। মরক্কো টসে জয়লাভ করে।

গ্রুপ—৩

এই গ্রুপে ঘানা একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নাইজেরিয়ার বিপক্ষে ৩ পয়েণ্ট লাভ ক'রে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

আফ্রিকান জোন ফাইনাল

মরোক্কো ০—০ ও ১—০ গোলে ঘানাকে পরাজিত ক'রে ইউরোপীয় জোনের ৯নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান স্পেনের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

নিয়ার ইস্ট জোন

জোন চ্যাম্পিয়ান : ইসরাইল

এই গ্রুপে ইসরাইল, সাইপ্রাস এবং ইথোপিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ইসরাইল শেষ পর্যন্ত এই জোনে চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ ক'রে ইউরোপীয় জোনের ৭নং গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ান ইটালীর সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

সাউথ আমেরিকান জোন

গ্রুপ—১

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : আর্জেণ্টিনা

আর্জেণ্টিনা সহজেই ৫—০ ও ৬—৩ গোলে ইকিউডরকে পরাজিত ক'রে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

গ্রুপ—২

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান উরুগুয়ে

উরুগুয়ে ১—১ ও ২—১ গোলে বোলিভিয়াকে পরাজিত ক'রে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

গ্রুপ—৩

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : কলম্বিয়া

কলম্বিয়া ১—০ ও ১—১ গোলে পেরুকে পরাজিত ক'রে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

গ্রুপ—৪

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : মেক্সিকো

এই গ্রুপে প্যারাগুয়ের সঙ্গে নর্থ আমেরিকান এবং সেণ্ট্রাল জোনের চ্যাম্পিয়ান মেক্সিকোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। মেক্সিকো ০—০ ও ১—০ গোলে প্যারাগুয়েকে পরাজিত ক'রে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

নর্থ আমেরিকান এ্যান্ড সেণ্ট্রাল জোন

গ্রুপ—১

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : মেক্সিকো

এই গ্রুপে মেক্সিকো, আমেরিকা এবং কানাডার খেলা পড়ে। কিন্তু কানাডা নাম প্রত্যাহার করে। মেক্সিকো ৩—৩ ও ৩—০ গোলে আমেরিকাকে পরাজিত ক'রে চ্যাম্পিয়ান হয়।

গ্রুপ—২

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : কোস্টা রিকা

এই গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোস্টা রিকা, গুটেমালা এবং হোন্ডুরাস। কোস্টা রিকা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

গ্রুপ—৩

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান এ্যান্টিলিজ

এই গ্রুপে এ্যান্টিলিজ সুরিনামকে পরাজিত ক'রে চ্যাম্পিয়ান হয়।

ফাইনাল পুল

ফাইনাল পুলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মেক্সিকো, কোস্টারিকা এবং এ্যান্টিলিজ। মেক্সিকো ০—১ ও ৪—১ গোলে কোস্টা রিকাকে এবং ৭—০ ও ০—০ গোলে এ্যান্টিলিজকে পরাজিত ক'রে সাউথ আমেরিকা জোনের ৪নং গ্রুপে প্যারাগুয়ের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

॥ খেলার তারিখ ও স্থান ॥

গ্রুপ ১ : খেলার স্থান—আরিকা

খেলার তারিখ : মে ৩০ উরুগুয়ে বনাম কলোম্বিয়া; মে ৩১ রাশিয়া বনাম যুগোশ্লাভিয়া; জুন ২ উরুগুয়ে বনাম যুগোশ্লাভিয়া; জুন ৩ কলোম্বিয়া বনাম রাশিয়া; জুন ৬ উরুগুয়ে বনাম রাশিয়া; জুন ৭ কলোম্বিয়া বনাম যুগোশ্লাভিয়া।

গ্রুপ ২ : খেলার স্থান—সান্তিয়াগো

খেলার তারিখ : মে ৩০ চিলি বনাম সুইজারল্যান্ড; মে ৩১ পশ্চিম জার্মানী বনাম ইটালী; জুন ২ চিলি বনাম ইটালী; জুন ৩ পশ্চিম জার্মানী বনাম সুইজারল্যান্ড; জুন ৬ চিলি বনাম পশ্চিম জার্মানী; জুন ৭ সুইজারল্যান্ড বনাম ইটালী।

গ্রুপ ৩ : খেলার স্থান—ভিনা ডেল মার

খেলার তারিখ : মে ৩০ ব্রেজিল বনাম মেক্সিকো; মে ৩১ স্পেন বনাম চেকোশ্লোভাকিয়া; জুন ২ ব্রেজিল বনাম চেকোশ্লোভাকিয়া; জুন ৩ মেক্সিকো বনাম স্পেন; জুন ৬ ব্রেজিল

বনাম স্পেন; জুন ৭ মেক্সিকো বনাম চেকোশ্লোভাকিয়া।

গ্রুপ ৪ : খেলার স্থান—রাংকাগুয়া

খেলার তারিখ : মে ৩০ আর্জেণ্টিনা বনাম বুলগেরিয়া; মে ৩১ হাঙ্গেরী বনাম ইংল্যান্ড; জুন ২ আর্জেণ্টিনা বনাম ইংল্যান্ড; জুন ৩ বুলগেরিয়া বনাম হাঙ্গেরী; জুন ৬ আর্জেণ্টিনা বনাম হাঙ্গেরী; জুন ৭ বুলগেরিয়া বনাম ইংল্যান্ড।

কোয়ার্টার-ফাইনাল

খেলার তারিখ ১০ই জুন, স্থান আরিকা

১নং গ্রুপের বিজয়ী বনাম ২নং গ্রুপের রাণার্স-আপ।

১০ই জুন, স্থান—শান্তিয়াগো

২নং গ্রুপের বিজয়ী বনাম ১নং গ্রুপের রাণার্স-আপ।

চিলির মানচিত্র। চিলির আরিকা, ভিনা ডেল মার, শান্তিয়াগো এবং রাংকাগুয়াতে সপ্তম বিশ্বফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ের খেলা আগামী ৩০শে মে থেকে আরম্ভ হবে।

১০ই জুন, স্থান—ভিনা ডেল মার

৩নং গ্রুপের বিজয়ী বনাম ৪নং গ্রুপের রাণার্স-আপ।

১০ই জুন, স্থান—রাংকাগুয়া

৪নং গ্রুপের বিজয়ী বনাম ৩নং গ্রুপের রাণার্স-আপ।

সেমি-ফাইনাল

আরিকার বিজয়ী দল বনাম ভিনা ডেল মারের বিজয়ী দল; রাংকাগুয়ার বিজয়ী দল বনাম শান্তিয়াগোর বিজয়ী দল।

ফাইনাল

তারিখ ১৭ই জুন, স্থান—শান্তিয়াগো

॥ পূর্ববর্তী খেলার ফলাফল ॥

॥ প্রথম বিশ্ব ফুটবল ॥

স্থান : উরুগুয়ে ।। জুলাই ১৯৩০
ফাইনাল : উরুগুয়ে ৪ : আর্জেণ্টিনা—২
সেমি-ফাইনাল : আর্জেণ্টিনা ৬ : আমেরিকা ১; উরুগুয়ে ৬; যুগোশ্লাভিয়া ১

যোগদানকারী দেশ (১৩) : উরুগুয়ে, আর্জেণ্টিনা, যুগোশ্লাভিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, মেক্সিকো, চিলি, ব্রেজিল, বোলিভিয়া, রুমানিয়া, পেরু, বেলজিয়াম এবং প্যারাগুয়ে।

॥ দ্বিতীয় বিশ্ব ফুটবল ॥

স্থান : ইটালী ।। মে-জুন, ১৯৩৪
ফাইনাল : ইটালী ২ : জার্মাণী ১
সেমি-ফাইনাল : ইটালী ১ : অস্ট্রিয়া ০; জার্মাণী ৩ : চেকোশ্লোভাকিয়া ১

যোগদানকারী দেশ (২৯) : ইটালী, জার্মাণী, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাইটি, কিউবা, মেক্সিকো, ব্রেজিল, আর্জেণ্টিনা, ঈজিপ্ট, প্যালেস্টাইন, সুইডেন, ইস্টোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, স্পেন, পর্তুগাল, গ্রীস, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, সুইজারল্যান্ড, রুমানিয়া, আয়ার, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ফ্রান্স এবং ইউ, এস, এ।

॥ তৃতীয় বিশ্ব ফুটবল ॥

স্থান : ফ্রান্স ।। জুন, ১৯৩৮
ফাইনাল : ইটালী ৪ : হাঙ্গেরী ২
সেমি-ফাইনাল : ইটালী ২ : ব্রেজিল ১; হাঙ্গেরী ৫ : সুইডেন ১

যোগদানকারী দেশ (২৬) : ইটালী, হাঙ্গেরী, ব্রেজিল, সুইডেন, জার্মাণী, ইস্টোনিয়া, ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, নরওয়ে, রুমানিয়া, সুইজারল্যান্ড, পর্তুগাল, প্যালেস্টাইন, গ্রীস, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, অষ্ট্রিয়া, লিথুয়ানিয়া, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, ইষ্টইন্ডিজ, আয়ার, যুগোশ্লাভিয়া এবং কিউবা।

॥ চতুর্থ বিশ্ব ফুটবল ॥

স্থান : ব্রেজিল ।। জুন-জুলাই, ১৯৫০

শেষ লীগ পর্যায়ের খেলার চূড়ান্ত তালিকা

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
উরুগুয়ে	৩	২	১	০	৭	৫	৫
ব্রেজিল	৩	২	০	১	১৪	৪	৪
সুইডেন	৩	১	০	২	৬	১১	২
স্পেন	৩	০	১	২	৪	১১	১

শেষ লীগ পর্যায়ের খেলায় উরুগুয়ে, ব্রেজিল, সুইডেন এবং স্পেন এই চারটি দেশ খেলবার যোগ্যতা লাভ করে এবং উরুগুয়ে সর্বাধিক পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয়বার 'জুল রিমে কাপ' জয়লাভ করে। উরুগুয়ে প্রথম 'জুল রিমে কাপ' পায় ১৯৩০ সালে, প্রতিযোগিতা আরম্ভের প্রথম বছর।

১৯৫০ সালের চতুর্থ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় (Preliminary Pool) মোট ১৬টি দেশ যোগদানের জন্যে নাম পাঠায়; কিন্তু তিনটি দেশ—ভারতবর্ষ (৩নং পুল), ফ্রান্স এবং আয়ার (৪নং পুল) প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি।

এই ১৩টি দেশের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা হয় :

১নং পুল : ব্রেজিল, যুগোশ্লাভিয়া, সুইজারল্যান্ড এবং মেক্সিকো
২নং পুল : স্পেন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং চিলি
৩নং পুল : সুইডেন, ইটালী এবং প্যারাগুয়ে
৪নং পুল : উরুগুয়ে এবং বলিভিয়া

উপরের ১৩টি দেশের মধ্যে লীগ প্রথায় খেলা হয়। প্রথম পুলে ব্রেজিল, দ্বিতীয় পুলে স্পেন, তৃতীয় পুলে সুইডেন এবং চতুর্থ পুলে উরুগুয়ে নিজ নিজ বিভাগে প্রথম স্থান লাভ ক'রে চূড়ান্ত পর্যায়ের লীগের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্যতা লাভ করে।

বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের দৃঢ় ধারণা ছিল, ১৯৫০ সালের প্রতিযোগিতায় ব্রেজিল 'জুল রিমে কাপ' জয়লাভ করবে; কিন্তু শেষ পর্যায়ের লীগের তিনটি খেলার মধ্যে ব্রেজিল দুটি খেলায় জয়লাভ করে এবং ১—২ গোলে উরুগুয়ের কাছে হার স্বীকার ক'রে শেষ পর্যন্ত রাণার্স-আপ হয়।

॥ পঞ্চম বিশ্ব ফুটবল ॥

স্থান : বার্ণে (সুইজারল্যান্ড) : জুন-জুলাই, ১৯৫৪

প্রাথমিক পর্যায়ের খেলার পর ১৬টি দেশ শেষ পর্যায়ের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা লাভ করে। এই ১৬টি দেশকে সমান চার ভাগে ভাগ ক'রে লীগ প্রথায় খেলানো হয়। ১ম গ্রুপ থেকে ব্রেজিল এবং যুগোশ্লাভিয়া, ২য় গ্রুপ থেকে হাঙ্গেরী এবং জার্মাণী, ৩য় গ্রুপ থেকে উরুগুয়ে এবং অষ্ট্রিয়া এবং ৪র্থ গ্রুপ থেকে ইংল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ড মূল প্রতিযোগিতার

কোয়ার্টার ফাইন্যালে ওঠে। ২য় গ্রুপে জার্মাণী এবং তুরস্কের সমান ২ পয়েন্ট হয়। ফলে তাদের তৃতীয়বার খেলতে হয়। এই খেলায় জার্মাণী ৭—২ খেলায় তুরস্ককে পরাজিত করে। ৪র্থ গ্রুপেও ইটালী এবং সুইজারল্যাণ্ডের সমান ২ পয়েন্ট হয়। সুইজারল্যাণ্ড ৩য় খেলায় ৪—১ গোলে ইটালীকে পরাজিত করে।

কোয়ার্টার ফাইনাল: উরুগুয়ে ৪ঃ ইংল্যাণ্ড ২; হাঙ্গেরী ৪ঃ ব্রেজিল ২; জার্মাণী ২ঃ যুগোশ্লাভিয়া ০; অস্ট্রিয়া ৭ঃ সুইজারল্যাণ্ড ৫।

সেমি-ফাইনাল: জার্মাণী ৬ঃ অস্ট্রিয়া ১; হাঙ্গেরী ৪ঃ উরুগুয়ে ২।

ফাইনাল: জার্মাণী ৩ঃ হাঙ্গেরী ২

৩য় স্থান: অস্ট্রিয়া ৩—১ গোলে উরুগুয়েকে পরাজিত ক'রে ৩য় স্থান লাভ করে।

॥ ষষ্ঠ বিশ্ব ফুটবল ॥

স্থান : সুইডেন ।। জুন-জুলাই ১৯৫৮

ফাইনাল : ব্রেজিল ৫ : সুইডেন ২

ফ্রান্স ৬—৩ গোলে পশ্চিম জার্মাণীকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

সেমি-ফাইনাল : ব্রেজিল ৫ ঃ ফ্রান্স ২; সুইডেন ৩ ঃ পশ্চিম জার্মাণী ১

কোয়ার্টার ফাইনাল : ব্রেজিল ১ঃ ওয়েলস ০; সুইডেন ২ ঃ রাশিয়া ০; ফ্রান্স ৪ ঃ নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ড ০ এবং পশ্চিম জার্মাণী ১ ঃ যুগোশ্লাভিয়া ০

পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ নিষিদ্ধ-করণের প্রস্তাব

বৃটেনের লর্ডস সভায় পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকেনি, ২৯—২২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। মুষ্টি যুদ্ধের ফলাফল ঘোষণার পরিভাষায় বলতে পারেন প্রস্তাবটি K. O অর্থাৎ নক আউট হয়েছে। পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ নিষিদ্ধ-

ফুটবলের যাদুসম্রাট 'পিলে'

আসল নাম এডসন আরান্টেস ডোনা-সিমেন্টো। বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতি-যোগিতায় ব্রেজিলের সব থেকে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। ইন সাইড খেলোয়াড় 'পিলে' বর্তমান সময়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে দেশ-বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছেন।

করণের এই প্রস্তাবটি তুলেছিলেন ব্যারনেস সামারস্কিল, যিনি এডিথ সামারস্কিল নামেই সমধিক সুপরিচিতা। তিনি একজন চিকিৎসক এবং কমন্স সভায় শ্রমিক দলের সভ্যা। মুষ্টিযুদ্ধের বিপক্ষে তাঁর এই মনোভাব নতুন নয়, বহুকালের। মুষ্টি যুদ্ধে বিপদ কোথায় সে সম্বন্ধে তাঁর অভিমত লর্ডস সভার সভ্যদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করলেও ভোটা-ভুটির মুষ্টি যুদ্ধে তাঁর প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। তাঁর উত্থাপিত বিলে এই রকম প্রস্তাব ছিল, মুনাফার উদ্দেশ্যে মুষ্টি যুদ্ধের আয়োজন বে-আইনী হবে এবং তার জন্যে শাস্তি—২০০ স্টার্লিং অর্থদণ্ড অথবা তিন মাসের শ্রীঘর বাস।

বিশ্ব-ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী পশ্চিম জার্মাণীর প্রখ্যাত গোল-রক্ষক হান্স তিলকোস্কি। সপ্তম বিশ্বফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় গ্রীসের স্পিকে তিনি তাঁর অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 25th May 1962.
40 Naya Paise

স্বাধীনতার পর আমাদের যে নেতৃবর্গ এদেশের রাষ্ট্রচালনার ভার লইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে শিক্ষাদীক্ষা বা ব্যবহারিক জ্ঞান বিশেষ কিছুই ছিল না। স্বাধীনতালাভের পরবর্তী পনেরো বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সে জ্ঞানটা কতটা অর্জিত হইয়াছে তারও কোন সঠিক পরিমাপ বা নির্দেশ পাওয়া কঠিন। অথচ এই রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে সজাগ অভিজ্ঞতা না থাকিলে রাষ্ট্ররক্ষা অসম্ভব বলিলেই চলে। পণ্ডিত-জনের মতে নবম শতাব্দীর পর ভারতে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির চর্চা ও শিক্ষা বন্ধ হওয়াই আমাদের স্বাধীনতা হারানোর প্রধান কারণ। বর্তমানে আমরা দেখিতেছি যে এই রাষ্ট্রনীতির জ্ঞান না থাকায় আমরা প্রতিনিয়তই বহিশত্রু এবং ঘরের দেশদ্রোহী শত্রুর কার্যকলাপে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। জানিনা কতদিনে এই অবস্থার নিরসন হইবে।

কাশ্মীরের ব্যাপারে তো আমাদের এখনও পণ্ডিত নেহরুর অবিমৃশ্যকারিতার ফলভোগ করিতে হইতেছে। চীনের সঙ্গে পঞ্চশীল অনুযায়ী সর্তে মিতালি করায় দেশ তো এখন বিপদগ্রস্ত, এবং সে বিপদের কতটা কোনদিক হইতে আসিতে পারে সে বিষয়েও কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা এখন অসম্ভব। সম্প্রতি এই দুই বহিশত্রু আমাদের পিতৃপুরুষের পুণ্য-ভূমি হিমালয়ের অংশ ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবার চুক্তি করিতেছে। এবং আর এক দেশের অধিকারী, নেপালরাজ মহেন্দ্র, চীনের সঙ্গে সখ্যতাস্থাপনে আগ্রহ দেখাইয়াছেন।

পাকিস্তানের সহায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ। ইঁহাদেরই সহায়তায় সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীরের ব্যাপারে প্রথম অভিযোগকারী ভারতকে আসামী দাঁড় করাইয়া অভিযুক্ত এবং বিচারে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত—পাকি-স্তানকেই ক্ষতিগ্রস্ত প্রমাণ করার অপরূপ বিচার-প্রহসন চলিতেছে। সেখানে ভারতের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে ও করিতেছে সোভিয়েট রাশিয়া। গোয়ার ব্যাপারেও পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ অতি অসংযতভাবে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়া ভারতকে বিশ্বাসহন্তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। অবশ্য বহু নির্লিপ্ত দেশ ভারতের পক্ষ লওয়ায় সে চেষ্টা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। এবং সে সময়েও ভারত সমর্থন পায় সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট।

চীনের সহায়ক এ জগতে একমাত্র ছিল সোভিয়েট রাশিয়া। কিন্তু চীনের বর্তমান সর্বগ্রাসী চেষ্টা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ে বিশ্বাসঘাতকতা যে সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট সমর্থন পাইতেছে তাহা মনে হয় না। এবং চীন ও ভারতের দ্বন্দ্বে রাশিয়া চীনের পক্ষ লইয়াছে, মনে হয় না। উত্তর কাশ্মীরের দুর্গম অঞ্চলে পথঘাট ও প্রতিরক্ষা কেন্দ্রাদি তৈয়ারী করার যন্ত্রপাতি ও ভারবাহী হেলি-কপ্টার ভারত সোভিয়েটের কাছেই কিনিতে পাইয়াছে। অন্যেরা নানা অজুহাতে দেন নাই।

ভারত সকলের কাছেই মৈত্রী ও সদ্ভাব চায়, কোনও শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় তাহার নৈতিক আপত্তি আছে। অন্যদিকে তাহার অহিংসনীতি তাহাকে যুদ্ধবিরোধী করিয়াছে। কিন্তু বহিশত্রুর তাড়নায় এত-দিনে ভারত-কর্তৃপক্ষের হুঁস হইয়াছে যে অস্ত্রবল ছাড়া দেশরক্ষার অন্য উপায় বর্তমান জগতে নাই। ভগবান বুদ্ধের পঞ্চশীল যে এই হিংসায় আপ্লুত জগতে শুধু শক্তিমান ও বীর্যবানই মানিয়া চলিতে পারে—এই চেতনা এতদিনে আমাদের আসিতেছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য আমাদের নেতৃকুল হয় জানেন না, নয় মানেন না। ইতিহাস দেখায় যে জগতের হিংস্রতম ও নৃশংসতম বিজেতা ছিল বুদ্ধের উপাসক জংগীস খাঁ। এবং ইহাও দেখায় যে তথাগতের শ্রেষ্ঠ উপাসক ও বাণীপ্রচারক অশোকের সাম্রাজ্য কিভাবে বিশ্বাসঘাতকের আঘাতে ধ্বংস হয়।

পাকিস্তান আক্রান্ত নয় এবং পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ জানেন—মুখে তাঁহারা যাহাই বলুন—যে ভারত আক্রান্ত না হইলে কোনমতেই পাকিস্তানের সঙ্গে লড়িবে না। ভারত শুধু আক্রান্তই নয়, তাহার উত্তর সীমান্তের হিমালয়-অঞ্চলের দশ হাজার বর্গমাইল ভূমি শত্রু-অধিকৃত। অথচ এই অবস্থায় মার্কিন সরকার "শুধু অকারণ পুলকে" গত বৎসরে দুই স্কোয়াড্রন (বোধহয় ৩২টা) অতি ক্ষিপ্রগতি সুপারসনিক যুদ্ধবিমান পাকি-স্তানকে উপহার—অর্থাৎ বিনামূল্যে দিয়াছেন। এখন ভারত-প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ঐরূপ গতিতেজসম্পন্ন ও যুদ্ধাস্ত্রযুক্ত বিমান ক্রয় অত্যাবশ্যক দাঁড়াইয়াছে। মার্কিন বিমানের দাম অসম্ভব কিন্তু রাশিয়া উহার সমকক্ষ যুদ্ধ-বিমান অনেক কম দামে দিতে প্রস্তুত। ভারত তাহা ক্রয় করার জন্য আলোচনা চালাইতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। আলোচনা এখনও চলিতেছে এবং তাহার ফলা-ফল অনিশ্চিত। আমাদের কর্তৃপক্ষ কি করেন তাহাই দ্রষ্টব্য, কেননা মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, রুশ-বিমান ক্রয়ের প্রতিক্রিয়ায় ভারতকে সাহায্যদান ব্যাপারে মার্কিন দেশে আপত্তি আসিবে।

কবিতা ॥ ॥ কবিতা

সাগ্নিক

গোপাল ভৌমিক

আমার দেহের বহু দুর্বলতা আছে,
হয়তো এ মনও তার কিছু অংশভাক্;
মনুর বংশের যারা সতীর্থ আমার
তারা কি সবাই মুক্ত? সংশয় অসার।

খাঁটি সোনা হলে আমি, হে পুষণ, তুমি
নিরর্থক হয়ে যেতে আমার জীবনে;
আমাকেই কেন্দ্র করে মানবক দল
হয়তো স্তুতির শিখা জ্বালাতো আকাশে।

এ দেহের ক্লেদ ক্লান্তি আছে বলে তাই
পাবক-শিখার ধ্যান রোজ রোজ করি;
পুষণের কৃপা পেলে দেবত্বের দাবী
না পেলেও হতে পারি স্থায়ী পোড়ামাটি।

হে পুষণ আদিপ্রাণ, আপাতত তুমি
এ স্বল্প-মেয়াদী প্রাণ দাবী কর, কর;
আশায় কম্পিত হয়ে যদি উঠি আমি
পোড়ামাটি হতে পারে নিখাদ ভাস্কর্য।

মৃত্যুর পূর্বরাত্রে

আনন্দ বাগচী

আর একটু বাকি আছে রাত্রিটুকু পার করে দিতে।
তারপর আমি যাবো, শব্দহীন শবযাত্রী গেছে
ভোরের আলোর মত খৈ ছড়িয়ে, প্রতিধ্বনিতে
নিদ্রায় নিহত রাজধানী চমকে দিয়ে,
আমি তার অনুগামী হব।
চারদেওয়ালে এসে গেছে নিশাচর
পাখিদের ছায়া—
সময় আগতপ্রায়, রুদ্রাক্ষের মত অন্ধকার
আমাকে হাতছানি দিয়ে
ক্রমাগত ডেকে যাচ্ছে দূরে—
ঘরে বসে সব দেখছি, পটে আঁকা নিদ্রিত মুখের
চতুর্দিকে ম্লান আলো, মেঘের সমুদ্রে খেলা করে
মীন জ্যোৎস্না; প্রেয়সীকে একাকী শয্যায় রেখে যেতে
আর একটু দেরী হবে, অন্যসব আয়োজন শেষ,
উঁচু চিমনি, হাসপাতাল, গ্যাসলাইট নির্বাপিত পথ
অবৈধ ছবির মত অন্তর্জলী, উলঙ্গ বৃক্ষের সম্ভাষণ
অর্ধ দগ্ধ উপন্যাস, বিকলাঙ্গ জটিল নাটক
সব শেষ হয়ে গেছে, সব এক সমুদ্র সৈকতে
বিষণ্ণ ঝিনুক, শ্বেতশঙ্খ, কড়ি, মৃতমুদ্রাবলি
এবং অস্পৃশ্য প্রেম, দেহাতুর জ্বালা।

চাবি

ভাস্কর দাশগুপ্ত

পথ খোলা আছে অধঃপাতের সিঁড়ি
সামনে তোমার, কেন যে তাকাও পিছে?
তীরে এসে বুঝি ডুববে এবার তরী,
উঁচু পানে আঁখি মন যেতে চায় নীচে।

দোষ কি তোমার? সমাজের বাঁধা বুলি
বেঁধেছে যারাই তারাই পাড়বে গাল।
ন্যায় অন্যায় প্রশ্নের চুলোচুলি—
তর্কের তোড়ে নিজেরাই নাজেহাল।

কেবা নয় ব'লো মাতাল স্বার্থলোভী?
মুখোশে কি ঢাকে মুখর মুখের ছবি
বাক্যের জালে বোঝা ভার কে যে বড়,
বয়সের সাথে ঢং পাল্টায় সবই।
প্রেমিক বিধাতা কপট প্রণয়ে দড়;
নির্বোধ যারা প্রতিপদে খায় খাবি—
মিছে দ্বিধা করো চোখ বুজে যাও নেমে,
এই সিঁড়ি জেনো স্বর্গে যাওয়ার চাবি।

জৈমিনি

সেদিন চা-পানের জন্যে এক রেস্তোরাঁয় ঢুকে সুশান্তের সংগে দেখা হয়ে গেল। সুশান্তকে আপনারা কেউ চেনেন না। আমিও তেমন কিছু চিনতাম না। একসংগে এম-এ ক্লাসে যাতায়াত করেছি, একটু মুখ চেনা ধরণের পরিচয় ছিল এই আর কি! কিন্তু বহুদিন পর ছাত্রজীবনের সামান্য পরিচয়ও নতুন আলাপের সূত্রপাত হ'য়ে উঠতে পারে। বিশেষত আপনার সহপাঠী যদি সামাজিক মনোভাবের মানুষ হয় তাহলে তো কথাই নেই।

তা সুশান্ত সত্যিই আলাপী মানুষ বটে। অনেক আশ্চর্য তথ্য জানতে পারলাম সুশান্তের ঐ আধ ঘন্টার কথা-বার্তায়। সেবারে সে এম-এ পরীক্ষা দিতে পারেনি, বাড়ির গোলমালে চাকরীতে ঢুকে পড়তে হ'য়েছিল। তারপর বিবাহ এবং পরিবার-বৃদ্ধি। ফলে শুরু হল ছাত্র পড়ানো। অবশেষে ছাত্রদের উৎসাহেই সে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে বসেছিল এবার। পাশও করেছে।

ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ছাত্রের তাগিদে টিউটর কেন পরীক্ষা দিতে যাবে?

সুশান্ত হেসে বলল, 'সত্যি ভাই এ এক তাজ্জব কাণ্ড। আমার ছাত্রেরা টপাটপ সব ডি-ফিল পেয়ে গেল দেখে মন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। শেষে ওদেরই একদল এসে আমাকে বলল, আপনার এত জ্ঞান, আপনি স্যার নির্ঘাৎ ডক্টরেট পেয়ে যাবেন, শুধু একবার এম-এ-টা পাশ করে নিন আগে। শুনে ভারি লোভ হল মনে। দিয়ে দিলুম পরীক্ষা। তা সেকেণ্ড ক্লাস একটা পেয়ে গেছি বরাত গুণে।'

'তাই নাকি?' খুশি হতেই হল আমাকে। প্রশ্ন করলাম, 'এবার থীসিসের কথা ভাবছ বুঝি?'

'ভাবনা তো কত রকমেরই মাথার মধ্যে আসছে, সিলেক্ট করিনি কিছু। তাছাড়া তিন বছরের আগে তো হবে না, দেখি আরো কিছুদিন ভেবে।' বলে সে সহসা একটু নড়ে-চড়ে বসে বলল, 'ভালো কথা, তোমাকেই জিগেস করি। তুমি তো সাহিত্যিক, বল তো কোন সাবজেক্টটা ঠিক জুৎসই হয়! একটা বিষয় আছে—যতীন সেনগুপ্তের উপর

বৌদ্ধপ্রভাব। আরেকটা হল— মনঃসমীক্ষকদের দৃষ্টিতে হাস্যরস। কিন্তু আমার মনে হয় এ দুটোর চেয়েও স্ট্রাইকিং হবে—বাংলা কাব্যে ভূমা বনাম ভূমি। কিছু কায়দা-চরণও আমি আঁচ করে ফেলেছি এর মধ্যে। উপনিষদে কোথায় কোথায় 'ভূমা' শব্দটির প্রয়োগ আছে তার একটি তালিকা তৈরি করে দিতে বলেছি আমার এক সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধুকে। সেইটে পেলে আমি দেখব ভূমার ধারণাটা ভক্তিবাদ না জ্ঞানবাদের ফসল। সেই সঙ্গেই আসবে বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত মতবাদের বিচার। তারপর সেই তথ্য এনে ফেলব রবীন্দ্র-কাব্যের উপর। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কোথায় কোথায় 'ভূমার' প্রয়োগ করেছেন তারও একটা ক্যাটালগ তৈরি করতে হবে এই সঙ্গে। অন্যদিকে হল 'ভূমি'। এই ইডিয়াটি আর্য কিংবা অনার্য তাই বিচার করে দেখব আগে। সেইসঙ্গে আসবে পশুচারণ আর কৃষির কথা। সঙ্গে সঙ্গে উঠবে 'তন্ত্র', অথর্ববেদ এবং আয়ুর্বেদের কথা। এর পর বৌদ্ধতন্ত্র এবং ...তন্ত্রের বিচার এবং সেই প্রসঙ্গে ...পদ এবং মঙ্গলকাব্য। বুঝতেই পারছ, তারপর লোক-সাহিত্য, ঈশ্বর ...গুপ্ত, ইত্যাদি হ'য়ে বাংলার রেনেসাঁস এবং ক্যালকাটা কালচার পর্যন্ত আসা খুবই সহজ ব্যাপার। আর এইভাবে ভূমা ও ভূমির দুই ঐতিহ্যকে আমি তুলনা ও প্রতিতুলনায় ফেলে বিচার করে দেখব রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ...তে।......কেমন মনে হচ্ছে তোমার?'

সত্যি বলতে কি, মাথা ধরে গিয়েছিল। কাজেই সংক্ষেপে বললাম, 'ভাল'।

সুশান্ত উৎসাহিত হ'য়ে বলল, 'মস্ত বড় কাজ হবে একটা বুঝলে। উপাদান যোগাড় করেছি অনেক। সাহিত্য থেকে স্থাপত্য, হিস্ট্রি থেকে কেমিস্ট্রি, কিছুই বাদ দিইনি। ওদিকে ব্রহ্মবাদ থেকে বস্তুবাদ, বাংলাদেশের সঙ্গে স্পেন ও পর্তুগালের বাণিজ্য সম্পর্ক, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত সাহিত্যে গাছগাছড়া ও পশুপাখির উল্লেখের তালিকা, ভারতের ...প্রকৃতি এবং খনিজদ্রব্য, কৃষির বিবর্তন এবং নানারকম আদিবাসীদের টটেম ও ...বৃ, বাঁশ কাঠ ও লোহার তুলনামূলক ...রুত্ব, বাংলাকাব্যে শব্দ-ব্যবহারের বিবর্তন এবং ছন্দোবৈচিত্র্য, ধ্বন্যালোক ও ক্রোচে, এমন কি ওরিজিন অব অ্যাবোরিজিন্যাল মিথ পর্যন্ত সব কিছুই থাকবে আমার থীসিসে। আর এছাড়া উপায়ও নেই। আমার ছাত্রদের চাইতে তো আমি পিছিয়ে থাকতে পারিনে! কি বল?'

'সে তো বটেই।' আমি খাবি খেতে খেতে বললাম।

সুশান্তের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। আমাকে একেবারে বন্ধু বানিয়ে দিয়েছে মনে করে বেশ একটা প্রসাদের ভাব দেখা দিল তার।

দেখে, একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায়, বললাম, 'দেখো ডক্টর রাহার মতো ফ্যাসাদে না পড় আবার!'

'কি রকম? ডক্টর রাহাই বা কে?'

'কেন, ডক্টর শুভাঙ্কুর রাহার নাম শোনোনি? এই তো বছর দুয়েক আগে বাংলা সাহিত্যে কান্নার ইতিহাসের উপর থীসিস লিখে ডি-ফিল পেয়েছেন ভদ্রলোক!'

সুশান্ত নিষ্প্রভভাবে হেসে বলল, 'কান্নার ইতিহাস? তা বেশ সাবজেক্ট তো! কি হ'য়েছিল তাঁর?'

'কান্না। মানে কাঁদতে হ'য়েছিল তাঁকে'। আমি বললাম, 'কেঁদে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল।'

'কেন, কেন?' সুশান্তের গলায় শুধু কৌতূহল নয়, ঈষৎ ভয়ের আভাস পাওয়া গেল।

খুশি হ'য়ে আমি বলতে লাগলাম, 'ডক্টর রাহা কিছুকাল আগে এক মফঃস্বল কলেজের লেকচারার হ'য়ে সপরিবারে কর্মস্থলে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন একেবারে পাণ্ডব বর্জিত জায়গা; তাঁর মতো শিক্ষিত মানুষের বাস নেই বললেই চলে। ফলে প্রায় কারো সঙ্গেই তাঁর আলাপ পরিচয় হল না। ফাঁকা জায়গায় একটা দোতলা বাড়ি পেয়ে তিনি কেতাদুরস্ত নেমপ্লেট লাগিয়ে নিজের মতো বাস করতে লাগলেন। তারপর মাস ছয়েক যেতে না যেতেই ঘটল সেই মারাত্মক ব্যাপারটা। একদিন গভীর রাতে সদর দরজায় শোনা গেল উপর্যুপরি করাঘাত। ঘুম ভাঙা চোখে ভীত ত্রস্তভাবে ডক্টর রাহা উপরের বারান্দায় বেরিয়ে দেখেন, চার-পাঁচজন গ্রাম্য মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কারো হাতে লাঠি, কারো বা লন্ঠন। ডাকাত নাকি? ডক্টর রাহা নীরবে ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাদের একজন ইতিমধ্যে তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যে ডাক্তারবাবু বেরিয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে সকলে উপরের দিকে তাকাল, এবং মিলিত কণ্ঠে ব্যাকুলভাবে তাঁকে নীচে নেমে আসতে বলল। ফলে ডক্টর রাহাকে নামতে হল। নেমে তিনি শুনলেন, মাইল দুয়েক দূরে এক গাঁয়ে কলেরা লেগেছে, তক্ষুনি তাঁকে একবার যেতে হবে। শুনে তো তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। কলেরা দুরস্থান, কারো পেটব্যথা শুনলেও তাঁর হাত-পা হিম হয়ে যায়। তিনি বললেন, তিনি তো ডাক্তার নন, একজন ডাক্তারকেই এখন নিয়ে যাওয়া দরকার। তারা বলল, ডাক্তার বলেই তো তাঁর কাছে আসা—দরজার পাশে লেখা আছে, তিনি ডাক্তার। তখন তাদের মধ্যে এই ধরণের কথাবার্তা হল—

ডক্টর রাহা। আমি তো সে ডাক্তার নই ভাই!

তাদের একজন। সে ডাক্তার নন মানে? এই তো দিব্যি লেখা রয়েছে। গেঁয়ো মানুষ পেয়ে বোকা বানাচ্ছেন, অ্যাঁ? নাকি ভিজিট দেব না?

ডঃ রাহা। না না, তা কেন? আমি চিকিৎসা করার ডাক্তার নই, বুঝলে ভাই।'

অন্য ব্যক্তি। বুঝেছি, ভিজিট বেশি চান, এই তো? তা দেব'খন বেশি।

ডঃ রাহা। কি মুস্কিল! আমি যে ডাক্তারই নই? দেখছ না, আমার ডাক্তারখানা নেই?

অন্য ব্যক্তি। ডাক্তারবাবু, না হয় মানলাম আপনি হোমোপ্যাথী করেন। তা সেই ওষুধই দেবেন চলুন না!

ডঃ রাহা। (রাগতভাবে) এ তো আচ্ছা মুস্কিল! বলছি আমি ডাক্তার নই—

তারা। (ততোধিক রাগতভাবে) আলবৎ ডাক্তার! ভালো চান তো চলুন।

ডঃ রাহা। তার মানে?

তারা। (হাত ধরে) মানে, যেতেই হবে!

তারপর টানাটানি, ধস্তাধস্তি। শোরগোল শুনে লোকজন এগিয়ে এল চারদিক থেকে। শেষে তাদের মধ্যস্থতায় রক্ষা পেলেন ডক্টর রাহা। পরদিন চাকরী ছেড়ে কলকাতায় পালায়ন।... বোঝ একবার ঠেলা!'

সুশান্ত বলল, 'বাঃ, সব তোমার বানানো।' কিন্তু মুখ থেকে তার চিন্তার ছাপ গেল না।

সেইটুকুই যা আমার ...শান্ত।

অনাস্বাদিত

বেহালা ও ছড় পড়ে রয়েছে এক-পাশে। ফুটো-চালা টিনের ঘর। সকাল থেকেই বৃষ্টি নেমেছে। চালার ফুটো দিয়ে বৃষ্টির জল অব্যাহত ধারায় প্রবেশ করছে ঘরে। মাটির মেঝে ভেসে যাচ্ছে তাতে। ভাঙা দরজা চেপে বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও বাইরের জোলো হাওয়া রোধ করা যাচ্ছে না। বৃষ্টির সঙ্গে খেয়ালী ঝড়ের মাতন রয়েছে। মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির ধারা। বড় বড় ফোঁটাগুলো যান্ত্রিক ফোয়ারার মতো এক এক ঝলক ধরে দিচ্ছে—ঝড়ের দাপট তখন বেশি। সেই সময় আশ্চর্য এক হিসহিসানি শোনা যায় ঝড়ের। যেন ক্ষুব্ধ আক্রোশে বিশ্বের ঝুঁটি ধরে প্রাণপণে নাড়া দিতে চায়। প্রলয়-শ্বাসে থমথম করে মর্ত। ঘরের ভেতরে তখন জল ঢুকে যায় হুড়হুড় করে। মাটির মেঝে ভাসিয়ে সেই প্রলয়-শ্বাস যেন তিনটি প্রাণীকেও আতঙ্কিত করে তোলে। জানলার আলগা ছিট-কিনিতে যেন প্রকৃতির করতাল বেজে ওঠে। ঠক ঠক ঠক ঠক আওয়াজ ওঠে ভাঙা জানলায়। ঝড়ের শনশন—বৃষ্টির ঝরঝর—একটানা চলেছে সকাল থেকে। আকাশে মেঘের মৃদঙ্গ। সবটা জড়িয়ে আতঙ্ক যেমন আনন্দও তেমনি। হঠাৎ মনে হয় বিশ্ব-প্রকৃতি যেন রাগ-সংগীতের মজলিশে নেমেছে আত্মহারা হয়ে। বিছানার ওপর স্থির হয়ে বসে সমীর এই রাগ-সংগীত শুনছিল চুপ করে। ওর কোলে মাথা রেখে সান্ত্বনা শুয়ে রয়েছে চোখ বুজে। মৃদু শ্বাসে ওঠানামা করছে ওর বুক। চূর্ণ কুন্তল ছড়িয়ে পড়েছে মুখের চারপাশে—বাতাস এসে এলোমেলো করে দিয়ে গেছে রুক্ষ চুলের রাশি। শীর্ণ মুখ, তবু যেন রাগ পঞ্চমের আখর-ঢালা। বিদ্যুতের চকিত আভাস এসে পড়ে সান্ত্বনার শায়িত অলস শরীরে, বিশীর্ণ হাত দুটি বুকের ওপর জড়ো করে রেখেছে সান্ত্বনা, ঈষৎ ভঙ্গ কোমরের নিচে পায়ের সঙ্গে পা জড়ানো। সমীর স্ত্রীর ক্লান্ত ভঙ্গির দিকে চেয়ে দেখল একবার, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে নিল। খুব ধীরে সান্ত্বনার মুখের ওপর থেকে চুলগুলো উপরে তুলে দিতে লাগল, নরম কেশগুচ্ছ খসখসে স্পর্শ ঠেকল হাতে। সান্ত্বনা আজ ক'দিন চুলে তেল মাখেনি। ওর মাথাটা আস্তে কোল থেকে নামিয়ে বিছানায় রাখতে চাইল সমীর, সান্ত্বনার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসতে চাইল সান্ত্বনা, সমীর বাধা দিল। 'উঁহু' উঠো না।'

সান্ত্বনা একটা বড়ো নিশ্বাস ফেলে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল করুণ চক্ষে। যেন বলতে চাইল, 'একটুখানি বসো।'

সমীর বলল, 'না, শুয়ে পড়ো। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

সান্ত্বনা অসহায়ভাবে শুয়ে পড়ল ফের ওর কোলে মাথা রেখে। অভিমান হয়েছে যেন। পাশ ফিরে শুল। হেসে, ওর মুখ ঘুরিয়ে সোজা হয়ে শয়নের ইংগিত করল সমীর। বলল, 'পিঠে লাগবে।' সোজা হয়েই শুল সান্ত্বনা। পাশ ফিরে শুলে সত্যি পাঁজরে লাগে। অভিনব শয্যা। টিনের চালা আর মাটির মেঝের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে

যেন এই শয্যা রচনা করেছে সমীর। চার কোণে চারটি শক্ত বাঁশের খোঁটা পুঁতে লম্বা লম্বা বাখারি এঁটে তৈরি করেছে সুখ-শয্যার পালঙক, অসমতল বাখারি-গুলো যাতে পিঠে না লাগে তার জন্যে গদির পরিবর্তে শুধু পুরু একখানি কাঁথা, কাঁথার ওপরে সুন্দর একখানি বেডকভার। হঠাৎ দেখলে মনে হয় চমৎকার ছিমছাম একটি শয্যা কিন্তু শয়ন-সুখ উপভোগ করতে গেলে তল-দেশ স্মরণ করিয়ে দেয় উঁচুনীচু শক্ত বাখারির উপস্থিতি। বেশিক্ষণ পাশ ফিরে শোওয়া যায় না, পাঁজরে লাগে।

'তোমার ওষুধ আনা হয়নি আজো।' সমীর ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মৃদু স্বরে ব্যক্ত করল।

'আমি ওষুধ খাব না।' সান্ত্বনা চোখ বুজে থেকেই বলল।

'সামান্য ওষুধও তোমায় এনে দিতে পারছি না।' সমীরের গলায় হতাশ্বাস বেজে উঠল : 'কতো সুখে যে তোমায় রেখেছি!'

'এর চেয়ে বেশি সুখ তোমার কাছ থেকে কে চেয়েছে?' সান্ত্বনা চোখ খুলল। হাত বাড়িয়ে সমীরের গলায় ফাঁস পরাল। 'তুমি বেহালা বাজাও আমি শুনি।'

'আজ আমি কিছু রান্না করতে পারিনি, তুমি কি খাবে?' সান্ত্বনার অসুস্থ কপালে গাল রাখল সমীর। 'ইস! জবর হয়েছে তোমার!' সমীর যেন চমকে গেল। 'একজন ডাক্তার ডেকে আনি।' ছটফট করে উঠল সে।

ওকে জড়িয়ে রইল সান্ত্বনা, বাধা দিল। বলল, 'পাগল! এই বৃষ্টিতে কোথায় যাবে ডাক্তার ডাকতে। ডাকলেও কি ডাক্তার আসবে এখন? তার চেয়ে আমি যা বলি শোনো, খানিক আগে তুমি যে সুর বাজাচ্ছিলে সেইটে আবার বাজাও। আমার ভারি সুন্দর লাগছিল।'

বাবুলের ঘুম ভেঙে যায়। ওদের দুজনের ঠিক পাশে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল বাবুল। ঘুমভাঙার পরই কান্না শুরু করল আবার, 'মা আমার খিদে পেয়েছে।'

সান্ত্বনা ওকে বুকে তুলে নিল। 'লক্ষ্মী সোনা, কাঁদতে নেই। চুপ করে শুয়ে থাকো আমার বুকে, শোনো তোমার বাবা কি সুন্দর বেহালা বাজাবে।'

বাবুল আবার বলল, 'মা, আমার খিদে পেয়েছে।' কাঁদতে লাগল।

সান্ত্বনা ওর পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, 'সোনা আমার, মানিক আমার, কাঁদে না। দ্যাখো না কী ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে, এখন বাপী কোথা থেকে খাবার আনবে বলো? লক্ষ্মী সোনা, তুমি ঘুমোও।'

'আমার খিদে পেয়েছে।' বাবুল যেন অবুঝ হয়ে উঠল, 'কাল কিছু খেতে দাওনি, আজ এতো বেলা হল, আমার খিদে পায় না বুঝি?'

সমীর বলল, 'ঘরে কিছু নেই সান্ত্বনা মুড়ি কিংবা—'

সান্ত্বনা বলল, 'তুমি কিছু ভেবো না। ওকে এখুনি আমি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।'

সমীরের ফের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তার মানে ঘরে আজ কিছুই নেই। বাইরে প্রবল বর্ষণ চলেছে, কখনও কমে কখনও বাড়ে। ভাঙা দরজার ফাটল দিয়ে বাতাসের জোলো হিসহিসানি ছুটে আসে প্রবল দাপটে। জানলার আলগা ছিটকিনিতে ঝড় মাথা কুটে মরছে। প্রকৃতির মজলিশে আর-একবার বেতালা তাল ঠুকে গেল মেঘের গর্জন। কড় কড় শব্দে বাজ পড়ল কোথায়। বাবুল ভয়ে আঁকড়ে ধরল মায়ের বুক। সান্ত্বনা ওকে বুকে চেপে হাত বুলোতে লাগল মাথায়।

সমীর বসে রয়েছে স্থির হয়ে। যেন নড়লেই প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটে যাবে ঘরের মধ্যে। ঘরের দেয়ালের বেআব্রু ফুটো দিয়ে জলের ছাট ঢুকছে ভেতরে, মেঝেতে পুকুর তৈরি হয়ে গেছে ছোটো একটা। মাথার ওপরের টিনের চালা দিয়েও বৃষ্টির জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। বিছানার অংশকে রক্ষা করা যায়নি কিছুতেই। পায়ের দিকের বেশ কিছুটা জায়গা ভিজে গেছে একেবারে—পা ছড়াতে পারছে না সান্ত্বনা। হাঁটু দুটো উঁচু করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে, বুকের ওপর বাবুলকে নিয়ে। সান্ত্বনার চুলভরা ছোট্ট মাথাটি সমীরের কোলে।

অনেকক্ষণ মাথাটা রয়েছে কোলের ওপর। উরু অসাড় হয়ে আসছে—কনকন করছে যেন। সান্ত্বনার মাথাটা যে এতো ভারি এর আগে কখনো মনে হয়নি সমীরের। ভারি—বেশ ভারি সান্ত্বনার মাথা। নামিয়ে রাখলে হয়। পা ছড়ানো যেত—আড়ষ্ট কাটত। আস্তে হাত দিল সান্ত্বনার মাথার নিচে, ঘাড়ে হাত ঠেকল। নরম সরু ঘাড়—খসখসে। অভ্যাস মতোই ঘাড়ে হাত রাখল কিছুক্ষণ। চমকে গেল। ঘাড়ের ওপর দিয়ে কণ্ঠার কাছে হাত আনল সন্তর্পণে—নিচু হয়ে ঝুঁকল। দেখল না নেই। সান্ত্বনার শেষ অলংকার, গলার হারটিও গ্রাস করে নিয়েছে নিষ্ঠুর সংসার। কবে ওটা বিক্রি করেছে সান্ত্বনা, সমীর জানে না।

গলায় হার নেই সান্ত্বনার—কানে কিংবা হাতে কোনো স্বর্ণালঙ্কার নেই। রিক্ত ধু ধু একখানি শরীর। অসুখে ম্লান, শীর্ণ। অথচ এমন হবার কথা ছিল না। অনায়াসেই সান্ত্বনা বিয়ে করতে পারত যে কোনো ধনীর সন্তানকে। আজন্ম ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত—রূপ যৌবন রুচি কোনো দিক দিয়েই সেদিন ছোটো ছিল না। কিন্তু কী যে হয়ে গেল। সামান্য একজন বেহালা-শিল্পীর সংগেই ঘর

ছাড়ল সান্ত্বনা। আজ ওর ফিরে যাবার কোনো পথই নেই।

'মা আমার খিদে পেয়েছে।' বজ্রের কড়কড় শব্দ মিলিয়ে যাবার পর বাবুল জেগে উঠেছে আবার। সমীরের মনে হল এইটাই সত্যিকারের বজ্র। সমস্ত অন্তঃকরণকে যেন ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইছে বাবুলের মুখের ওই সামান্য ক'টি কথা। আকাশকে ফালা ফালা করা বজ্রের মতোই বাবুলের কথা ক'টি অমিত শক্তিধর। ওর খিদে পেয়েছে। কাল রাত্রে কিছু খায়নি বাবুল, আজ সারাদিন ওর পেটে কিছু পড়েনি। খিদে পাওয়া অস্বাভাবিক নয় কিন্তু ওর ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটানো......

'বাবুল, কালকের সেই সুরের রাজার গল্প বলি শোনো।' সান্ত্বনা ওর মুখ বুকে গুঁজে শোনাতে লাগল সুরের রাজার গল্প। নিঃস্ব, রিক্ত এক সুরের রাজা। বাড়িঘর নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। শুধু আছেন রাজা নিজে আর তার সুর। বেহালা বাজিয়ে রাজা ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তর, যে তার বেহালা শোনে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়। বেহালায় যেন যাদু আছে, মানুষকে পাগল করে দেয়। কিন্তু সুরের রাজার তবু তৃপ্তি নেই। আপন খেয়ালে বেহালা বাজায় রাজা আর ঘুরে বেড়ায় নানান দেশ। কী যেন খোঁজে, কাকে যেন খোঁজে। পায় না। কতো মাঠ, কতো বন, কতো নদী পার হয়ে রাজা এগিয়ে যায় পায়ে পায়ে - কাঁধের ওপর বেহালা তাতে ছড়ের টান, মাথা হেলে আছে বেহালার দিকে, মুখে পড়েছে পড়ন্ত বিকেলের রোদ, ক্লান্ত হয়েছে পা দুটি, খিদে পেয়েছে খুব; তবু থামে না রাজা, চলে আর চলে। কতো লোক সেই বেহালা শুনে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, অবাক হয়ে শুনল সেই বেহালা, আদর করে তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল কেউ কেউ কিন্তু কারো বাড়িতেই বেশিদিন থাকল না রাজা। থাকবার যে উপায় নেই! যাকে সে খুঁজছে তার দেখা সে যে পায়নি! চলতে হবে চলতে হবে। চলতে চলতে হঠাৎ একদিন......

সমীরের গল্প বলে যাচ্ছে সান্ত্বনা। বাবুল শুনছে চুপ করে। সান্ত্বনা থামতেই বাবুল জিজ্ঞেস করল 'তারপর মা?'

'সে এক মস্ত রাজার প্রাসাদ। হাতীশালে হাতী ঘোড়াশালে ঘোড়া। দরজায় দরজায় দৈত্যের পাহারা। সুরের রাজা গিয়ে পৌঁছুল সেই ভয়ংকর রাজপুরীর সামনে। উস্কখুস্ক চুল, ছেঁড়া জামা, ধুলোভরা পা—মানুষটাকে দেখেই তো মারবার জন্যে ছুটে এলো দৈত্যের দল। হৈ হৈ করে ছুটে আসছে দৈত্যেরা, কিন্তু সুরের রাজার কোন হুঁস নেই। সে কাঁধের ওপর বেহালা রেখে চোখ বুজে বাজিয়ে যাচ্ছে এক আশ্চর্য সুর। দৈত্যদের সে সুর বোঝবার মত ক্ষমতা ছিল না কিন্তু একজনের ছিল। সোনার পালঙ্কে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে ছিল সে, সুরের রেশ তার কানে গিয়ে পৌঁছুতেই ধড়মড় করে পালঙ্কে উঠে বসল দৈত্যপুরের রাজকুমারী। তার বুকের ভেতর যেন কেমন করে উঠল। সহচরীদের কোনো কথা না শুনেই রাজকুমারী আলুথালু হয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো কক্ষ থেকে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ুল প্রাসাদের ফটকের দিকে। দৈত্যদের হাতের কৃপাণ তখন ঝলসে উঠছে সূর্যের আলোয়, কোপ পড়ল বলে, ঠিক সেই সময়......'

আশ্চর্য মিষ্টি সুরে গল্প বলতে পারে সান্ত্বনা। রূপকথা সৃষ্টি করল যেন নিজেকে নিয়েও। জীবনের গল্পে যাদু চালাতে জানে সান্ত্বনা। আতঙ্কে রহস্য-বিস্ময় মিশিয়ে তাকে অপরূপ করে তুলতে পারে। আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল সমীর। মনে হচ্ছিল বাবুলের মতো সান্ত্বনার বুকে শুয়ে অনন্তকাল এ গল্প শোনা যায়। এর স্বাদ আলাদা এর রূপ আলাদা। ঘরের মেঝেতে বৃষ্টির তোড় মিথ্যে—মাটির দেয়াল আর ফুটো-চালা টিনের আচ্ছাদন সত্য নয়। রূপকথা-মেশানো নিজের জীবনের গল্প বলে ক্ষুধার্ত বাবুলকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে সান্ত্বনা, এ যেন বিশ্বাসের অতীত, নতুন অভিজ্ঞতা। সমীরের বুকের ভেতর কী যেন গলে গলে যাচ্ছে, ঠেলে উঠছে অপার্থিব এক অনুভব। মনে হচ্ছে এই পরিবেশে সে বেহালা বাজাতে পারবে, সান্ত্বনার কল্পনা মিথ্যা নয়। সত্যি সে সুরের রাজা।

বাবুলকে আস্তে বুক থেকে নামিয়ে দিল সান্ত্বনা। ঘুমিয়ে পড়েছে বাবুল গল্প শুনতে শুনতে। বর্ষণ থেমে এসেছে বাইরে, শেষবিকেলের আলোর আভাস জেগেছে আকাশ জুড়ে। সমীরের কোল থেকে শ্রান্ত মাথা নামাল সান্ত্বনা। অনেকক্ষণ বকেছে। ক্লান্তি এসে গেছে। কিন্তু মধুর একটি সজীবতা তবু জেগে রয়েছে সান্ত্বনার রোগ-পাণ্ডুর বিশীর্ণ মুখে। ওরও ঘুমনো দরকার। সান্ত্বনাও কিছু খায়নি গতকাল থেকে।

সমীর বেহালা তুলে নিল। সান্ত্বনা চোখ বুজল।

জার্মান কবি শীলার

সত্যভূষণ সেন

স্বনামখ্যাত জার্মান কবি গ্যেটের সমকক্ষ না হলেও শীলারও একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বনামখ্যাতিতে দীপ্তিমান ছিলেন। যেমন ছিল তাঁর কবি-প্রতিভা তেমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব-গরিমা। স্বয়ং গ্যেটে তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন যে, জনতার যে কলরোল মানব-সংসারকে সর্বদা মুখরিত করে রাখে ও বিভ্রান্ত করে রাখে শীলার ছিলেন তার বহু ঊর্ধ্বে। শীলারের নিজের মতবাদ ছিল যে, শিল্পী এক হিসেবে তার যুগের সন্তান এ পর্যন্ত স্বীকার করা চলে, কিন্তু শিল্পীকে যুগের অনুগামী হলে চলবে না। একজন কবি-সমালোচক শীলারের চরিত্রচিত্রন করতে গিয়ে বলেছেন—আল্পস পর্বত থেকে উৎসারিত স্রোতধারার ন্যায় স্বাধীন, পর্বত শীর্ষস্থ তুষারের ন্যায় পবিত্র, পর্বতেরই ন্যায় স্থৈর্য এবং গরিমায় শোভমান। শীলারের কাব্যের আদর্শও ছিল তাঁর নিজজীবনাদর্শের সহিত সুসমঞ্জস, যেন তাঁর কবি-প্রতিভা ছিল তাঁর গরিমাময় ব্যক্তি-জীবনের সহজ পরিণত ফল। কেউ কেউ শীলারের সাহিত্য-কৃতিকে ইংরেজ কবি বায়রণের কবি-কৃতিত্বের সমপর্যায়ের বলে কল্পনা করেছেন। কিন্তু উচ্ছৃংখল প্রকৃতি, আদর্শহীন, সংসারে বীতশ্রদ্ধ বায়রণের সংগে শীলারের প্রকৃতিগত এবং আদর্শগত বিরোধ এতই প্রখর যে একজন সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন যে, বায়রণকে ভুলে যেতে পারলে ইংলণ্ডের পক্ষে কল্যাণকর হত, কিন্তু জার্মানীর পক্ষে শীলারকে ভুললে চলবে না।

শীলারের জন্ম হয় দক্ষিণ জার্মানীর উয়র্ভেমবার্গ অঞ্চলের মারবাকে ১৭৫৯ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে। সাধারণত সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব সামান্য নয়, কিন্তু শীলারের পক্ষে তাঁর মায়ের প্রভাব ছিল অসামান্য। আকৃতিতে তিনি ছিলেন ক্ষুদ্রকায়া, কিন্তু তাঁর চিত্তের উদারতা ছিল অসাধারণ; তিনি প্রকৃতিকে ভালবাসতেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তিনি সংগীতে অনুরাগিণী ছিলেন, কাব্য পাঠেও তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম; তাঁর চিত্তের ধর্মপ্রবণতা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক, জীবনাদর্শ ছিল অত্যন্ত সরল। তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে যখন তিনি ধর্মজীবনের কথা-কাহিনী নিয়ে আলোচনা করতেন তখন তাঁর অন্তরের অনুপ্রেরণায়ও তাঁর সকল

জার্মাণ কবি শীলার

কথা তাঁর ছেলেমেয়েদের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করত। শীলারের পিতা ছিলেন উয়র্ভেমবার্গের ডিউকের অধীনে সামরিক বিভাগের চিকিৎসক; তাঁরও সাহিত্যে অনুরাগ ছিল এবং তিনিও ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন। তাঁকে সময়ে সময়ে সৈন্যদলের আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে হত; বালক শীলারও এসব প্রার্থনায় যোগদান করতেন এবং এতে তিনি তৃপ্তিলাভও করতেন।

শীলার অত্যন্ত অল্পবয়সেই নানা-প্রকার নাট্য অভিনয় অনুষ্ঠানের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর তের বৎসর বয়সের সময় তাঁকে গ্রামের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয় এবং ডিউকের আদেশে তাঁকে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করতে হয়। এই সময়ে সামাজিক লোক হিসাবে শীলারের কোনও প্রকার প্রতিষ্ঠা ছিল না, তাঁর প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত, অসমঞ্জস, তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেন সকলেই সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ সেই তরুণ বালকের মধ্যেই দেখতে পেয়েছিলেন প্রতিভার আভাস যার দীপ্তিতে সকল ভুল-ভ্রান্তি, সকল দুঃখ-বিপদ যেন কোনও রসায়নযোগে সার্থকতায় রূপান্তরিত হয়।

যার অন্তরে থাকে প্রতিভার দীপ্তি তার চিত্তে অনুপ্রেরণা না এসে পারে না। এই সময়েই সাহিত্যের প্রতি শীলারের

অনুরাগ দেখা দিল। তিনি শেক্সপীয়র, রুশো, প্লুটার্ক এবং গোটের সাহিত্য অত্যন্ত আগ্রহের সংগে পড়তে লাগলেন। সাহিত্য অনুশীলনই হল তাঁর প্রধান ব্যসন, যেন তাঁর জীবনের গতিপথও নির্ধারিত হয়ে উঠতে লাগল। তিনি কবিতা রচনা করে স্থানীয় সাময়িক পত্রিকাদিতে পাঠাতে লাগলেন। তিনি এই সময়ে একখানা নাটক রচনায়ও হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ-রচনা হবে বুঝতে পেরে তিনি নিজেই সেটা নষ্ট করে ফেললেন। তার পরে তিনি আরম্ভ করলেন আর একখানা নাটক যেটা সার্থক নাটক হিসাবে গড়ে উঠল; তখনও তাঁর বয়স উনিশ বৎসর পূর্ণ হয়নি।

১৭৮০ সালে শীলারের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা সার্থকভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করে; অমনই উয়ার্ট্টেমবার্গের ডিউকের অধীনে সামরিক বিভাগে তাঁর নিয়োগ ঘটে বার্ষিক বিশ পাউন্ড বেতনে। ১৭৮১ সালে তাঁর পূর্বোক্ত নাটকের রচনা সমাপ্ত হয় এবং তিনি নিজ ব্যয়ে নাটকখানা প্রকাশিত করেন। নাটকখানা প্রকাশিত হবামাত্র জনগণের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। এই নাটকে প্রচলিত জীবন-ধারা এবং জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর এত স্পষ্ট এবং উদ্দাম-ভাবে প্রকাশ পায় যে ডিউক তা বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি আদেশ দিলেন যে, শীলার উয়ার্ট্টেমবার্গের সীমানার বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান ছাড়া তিনি আর কোনও বিষয়ে এক বর্ণও লিখতে পারবেন না।

উয়ার্ট্টেমবার্গের সীমানার বাইরে মান-হাইমে শহরে নাটকখানির অভিনয় আরম্ভ হয় ১৭৮২ সালের জানুয়ারী মাসে। কয়েক মাস পরে শীলার এই নাটক অভিনয় দেখবার জন্য একদিন গোপন অভিযানে মানহাইমে যান। ডিউক জানতে পেরে তাঁর আদেশ লঙ্ঘনের শাস্তিস্বরূপ শীলারকে দুসপ্তাহের জন্য আটক করে রাখেন।

শীলার এই অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে সামরিক বিভাগের চাকুরি ছেড়ে ডিউকের এলাকা অতিক্রম করে মানহাইমে পালিয়ে যান এবং সংকল্প গ্রহণ করেন যে, সাহিত্য অনুশীলনই হবে তাঁর জীবনের ব্রত। এই অনুভূতির তৃপ্তিতে তাঁর অন্তর ভরে গেল যে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, তাঁর সম্মুখে বিস্তৃত পৃথিবীর সীমাহীন বিস্তার—"পৃথিবীর জনগণই আমার সহচর, আমার প্রভু এবং আমার ধ্যানের বিষয়।" কিন্তু তাঁর জন্য খ্যাতির পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ, তাঁকে তার পথযাত্রায় ক্ষত-বিক্ষত হতে হল। তিনি আশা করে এসেছিলেন যে, মানহাইমে তিনি সকলের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করবেন এবং সেখানকার নাট্যজগতে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করতে পারবেন। কিন্তু তাঁর 'দি রবার্টস' নাটকে তিনি যে বাধাহীন উদ্দামতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে সেখানকার নাট্য-সংসদ প্রধানেরা তাঁর সম্পর্কে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

'দি রবার্টস' নাটকখানা সার্থক রচনা বলে গণ্য হলেও এটি তাঁর অপরিণত বয়সের রচনা, এতে যৌবনের প্রাণশক্তি, কল্পনা ও উৎসাহ উদ্দামের প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু মানবজীবন এবং মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা বোধ-শক্তি তখনও পরিণতি লাভ করেনি; সেজন্য তাঁর নাটকের উৎকর্ষও সেই অনুপাতে সীমাবদ্ধ ছিল। তবুও নাটকখানার মধ্যে নাট্যকারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রত্যাশার পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের নায়ক মূরে একজন দুর্ধর্ষ বীর, কিন্তু তার চিত্তেও কখন কখনও জেগে ওঠে তার বাল্যজীবনের স্মৃতি যখন দিবাবসানে প্রার্থনা করতে ভুলে গেলে রাত্রিতে তার ঘুম আসত না। যে নায়িকা এমন দুর্ধর্ষ চরিত্রের নায়কটিকে ভালবাসত সেই এমেলিয়ার চরিত্র এই নাটকে এক অপূর্ব সৃষ্টি, সমস্ত নাটকীয় ঘটনার উপরে যেন চন্দ্রকিরণ-রশ্মির স্নিগ্ধতার প্রলেপ। এমেলিয়া আপন মনে যে গান গেয়ে চলেছে তার মধ্যে শীলারের সংগীত-রচনা ক্ষমতারও পরিচয় পাওয়া যায়—এস্থলে তার ভাব সংকলন মাত্র সম্ভব—

> পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যরাশির মধ্যে তার মত সুন্দর কেউ নেই, দেবদূতের মত দীপ্তোজ্জ্বল মূর্তি, পবিত্রতার আধার, নীল সাগরবক্ষে আপাতত মৃদু সূর্য-কিরণ সম্পাতের মত নির্মল। আমাদের ঘিরে আছে রাত্রির পবিত্রতা। দুটি হৃদয় পরস্পরের হৃদয়তাপে উদ্দীপিত হয়ে প্রেমের গরিমাময় ঊর্ধ্বাকাশের অভিমুখে যাত্রী। দুটি অগ্নি একই শিখাতে সম্মিলিত, দুটি বীণাতন্ত্রী একই সুরে ঝংকৃত, দুটি আত্মা একই আলোকের পরিবেষ্টনে ঊর্ধ্বমুখী। পরস্পরের আত্মার আত্মীয়, একই তাদের গতি, একই সাধনা, আনন্দ-রসাস্বাদের পরিপূর্ণতায় তারা রোমাঞ্চিত: তাদের নিকট পৃথিবী তখনকার মত অবলুপ্ত। এই পৃথিবীতে এমন পরিপূর্ণ আনন্দ-রসানুভূতির জন্য সৃষ্টি হয়নি। সে চলে গেছে, সংগীত অবলুপ্ত, অগ্নি নির্বাপিত, সূর্যরশ্মি স্তিমিত। সে চলে গেছে, এখন জীবন তো তারই স্মৃতি বহনে ভারাক্রান্ত।

শীলার অশান্তচিত্তে মানহাইম থেকে গেলেন ফ্রাঙ্কফুর্টে। দারিদ্র্য পীড়নে সেখানেও স্থায়ীভাবে বাস করতে পারলেন না, দারিদ্র্যের পেষণে তাকে শীতার্ত এবং ক্ষুৎপীড়িত হয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। এই সময়ে তাঁর পূর্ব-পরিচিতা এক বিধবা রমণী তাঁর নিজের গ্রামের বাড়ীখানা শীলারের ব্যবহারের জন্য দিলেন এবং কিছু অর্থসাহায্যও করলেন।

থুরিংগিয়ান বনভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশে এই বাড়ীতে আট মাস কাল অবস্থিতিতে শীলার দুখানা নাটক রচনা করলেন। প্রথম নাটক 'ফিয়েস্কো' তাঁর সর্বপ্রথম নাটক অপেক্ষা পরিপক্ক রচনা বটে, কিন্তু অভিনয় হিসাবে সার্থক হল না। দ্বিতীয় নাটক 'প্লট এন্ড প্যাসন'-এ ছিল তৎকালীন অভিজাত জীবনের পাপ ও দুষ্প্রবৃত্তির কঠোর সমালোচনা; ঝড়-ঝঞ্ঝার উপরে বিদ্যুদ্দীপ্তির

নার মর্মন্তুদ জীবন ঘটনার অভিব্যক্তিতে কবির চিত্তের ভাবাবেগের দীপ্তি এই নাটকখানাকে সার্থক রসরচনা-রূপে উত্তীর্ণ করেছে।

১৭৮৩ সালে জুলাই মাসে শীলার মানহাইমে ফিরে এলেন। এবার নাট্য-সংসদ তাঁকে বার্ষিক পঞ্চাশ পাউন্ড বেতনে তাদের নাটক রচয়িতার পদে নিযুক্ত করলেন। এইখানে তাঁর 'প্লট এন্ড প্যাসন' নাটকখানা অভিনীত হল। অভিনয়ের শেষে সমগ্র দর্শকমণ্ডলী দণ্ডায়মান হয়ে সম্মিলিতভাবে কবিকে অভিনন্দন জানালেন; এই নাটকখানা প্রথম পরিবেশনেই জনগণের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৭৮৫ সালে তিনি মানহাইমে ছেড়ে গেলেন লাইপজিগে, সেখান থেকে গেলেন ড্রেসডেনে। এখানে এসে উপযুক্ত বন্ধু-গণের সাহচর্যে তাঁর জীবনের সমৃদ্ধিসাধন ঘটল; সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা, সতর্ক সমস্যা, অশান্তি, নৈরাশ্যের পরে তিনি যেন জীবনে প্রতিষ্ঠার সন্ধান পেলেন; তাঁর প্রতিভারও কতকটা পরিণতি লাভ ঘটেছে এই সময়ের মধ্যে।

এই সময়ের প্রসিদ্ধ রচনা 'ডন কার্লস' নামে নাটক। এই নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কবির দৃষ্টি-ভঙ্গিতেও এসেছে গাম্ভীর্যের পরিচয়। স্পেন দেশের ঘটনার ষোড়শ শতাব্দী—নিষ্ঠুর প্রকৃতির রাজা ফিলিপ, তার সিংহাসনের চার পাশে আছে নিষ্ঠুর পুরোহিতসম্প্রদায় এবং ধর্মবিচারকগণ, এদের সম্মিলিত শাসনে প্রজাগণের জীবন দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত। যুবরাজ ডন কার্লস সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক, প্রজাগণের দুঃখে তার অন্তর ব্যথিত। তার সংকল্প হল যে তিনি যখন দেশের রাজা হবেন তখন তিনি শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে প্রজা-দের জীবনে শান্তি বিধান করবেন। রাজা ফিলিপ যুবরাজের মতিগতির কথা জানতেন, তার চিত্ত ঈর্ষায় দগ্ধ হতে লাগল। তার ঈর্ষার আরও একটু গূঢ় কারণ ছিল। যিনি এখন রানী তার সঙ্গে যুবরাজেরই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল, পরে রাজা নিজে তাকে বিয়ে করেন। রাজার ধারণা রানী এখনও রাজপুত্রকেই ভালবাসেন। পুরোহিতগণ এবং ধর্মবিচারকগণও যুবরাজের প্রতি সন্দিগ্ধ, কারণ যুবরাজ রাজসিংহাসন লাভ করলে এদের সকলের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এই সকল পরিস্থিতির সমবায়ে চক্রান্তের ফলে যুবরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। অভি-যোগের বিচারে যুবরাজের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

এই নাটকের সংলাপ বড় সুন্দর : রানীর সহচরীকে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—যুবরাজ রানীর নিকটে গেলে কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ ঘটে।

সহচরী বললে—এই সকল রত্নালংকার তার নিকট তুচ্ছ বস্তু গণ্য, রাজমর্যাদাও তাকে কিছুমাত্র উদ্দীপিত করে না, জীবন যেন তার কাছে স্বাদ বিহীন, চিত্তের উদাসীনতার ফলে তার দেহভঙ্গিও যেন কতকটা শিথিল। কিন্তু যখন রাজপুত্র এসে দেখা দেন তখন যেন পাথরের মূর্তির মধ্যে প্রাণ স্ফুরণ হয়, কপোলে ফুটে ওঠে রক্তিমাভা, দৃষ্টিতে দীপ্তি, সমস্ত দেহ যেন সৌন্দর্যে এবং প্রাণ-শক্তিতে মঞ্জুরিত হয়ে ওঠে।

তখন রাজা জানতে চাইলেন—রানী যুবরাজকে কিভাবে সম্বর্ধনা করেন।

রানীর সহচরী বললে—তমসাবৃত ধরণীর উপরে যেন সূর্যের রশ্মিসম্পাত। যা কিছু অস্পষ্ট ছিল সকলই যেন নূতন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অন্য প্রসঙ্গে যুবরাজ সম্পর্কে রানীর মত জানতে চাইলে রানী বললেন—আপনার লক্ষ লক্ষ প্রজার মধ্যে যুবরাজের মত এমন কেউ নেই। ঈর্ষার ইন্ধন না হলে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে পারে না, পুণ্যের বিচারে যার মত সমর্থনও কেউ পাবে না।

শীলারের জীবনে অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভের ফলে তাঁর জীবনের আরও পরিণতি লাভ ঘটেছে। তিনি জেনা বিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেছেন; গ্যেটের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে অনেকটা অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। কান্টের দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে সৌন্দর্যের আদর্শের সঙ্গে সত্য এবং মঙ্গলের আদর্শ সংযোজিত থাকা প্রয়োজন; সকল ভাবাবেগ এবং কামনার উপরে কর্তব্যের দায়িত্ব, স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ধর্মনীতির ভিত্তির উপরে। ইতিমধ্যে তাঁর পিতা এবং ভগ্নী পরলোকে গমন করেছেন। সর্বোপরি তিনি পেয়েছেন তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে, যার প্রেম ও সাহচর্যে তিনি বিক্ষুব্ধ জগতে পেয়েছেন আলোকের দীপ্তি। এইরূপ সর্বপ্রকার জীবন-পরিণতির ফলে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা সৃষ্টি করলে কতকগুলি অনবদ্য খণ্ডকাব্য, গাথাকাব্য এবং কয়েকখানা উৎকৃষ্ট নাটক যাতে সংগঠিত হয়ে রয়েছে তাঁর জীবনের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয়।

বিখ্যাত গাথাকাব্য 'হীরো ও লিয়েণ্ডার'। হেলেসপণ্ট সাগর-প্রণালীর তীরে দাঁড়িয়ে লীয়েণ্ডার; তার প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাত্রা-পথে বিক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গের দুর্জয় বাধা। এশিয়া ও ইউরোপ এই দুই ভূখণ্ডের মাঝপথে এই হেলেসপণ্টই ব্যবধান সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু সাগরতরঙ্গ গর্জন প্রেমের আহ্বানের পথে বাধা বলে স্বীকৃত হল না—লীয়েণ্ডার সাগরবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রাকৃতিক শক্তির নিকট মানুষের দৈহিক শক্তি পরাভূত হল। সাগর-তরঙ্গ বাহিত হয়ে লীয়েণ্ডারের দেহ তার প্রণয়িনীর তটপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছল; নায়িকা হীরো সাগর বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুর রাজ্যে গিয়ে তার দয়িতের সঙ্গে মিলিত হলেন। একজন বিশিষ্ট শিল্পী কর্তৃক অংকিত লীয়েণ্ডারের জন্য প্রতীক্ষারত হীরোর চিত্র চিত্রজগতেরও এক সম্পদ হয়ে রয়েছে।*

আর একটি বিখ্যাত খণ্ডকাব্য "পৃথিবীর সম্পদ লাভ"। ভগবান পৃথিবীর সকল সম্পদ ভাগ ভাগ করে সকলকে দিয়ে দিলেন: মাঠ দিলেন চাষীকে, বন-ভূমি এবং শিকারস্থল দিলেন জমিদারকে, সাগর দিলেন নাবিককে এবং রাজার জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন সকল প্রকার জাতীয় রাজস্ব। কবি এসে দাঁড়ালেন এবং জানতে চাইলেন—যে তোমাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে তার জন্য কি বিধান হল?

*(এই চিত্রের প্রতিলিপি আমাদের দেশেও অনেকে দেখে থাকবেন।)

তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? দেবার জন্য অবশিষ্ট তো আর কিছুই নেই।

কবি বললেন—আমি তো বরাবরই তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম; তোমার সৃষ্টির ঐশ্চর্য দেখে, তোমার ধ্যানে এমনই তন্ময় ছিলাম যে আমার কিছু চাইবার মত তো অবসর ছিল না।

ভগবান তার কামনা অপূর্ণ রাখলেন না, বললেন, পৃথিবীর সব তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তোমাকে স্বর্গরাজ্যে স্থান দেওয়া হবে; তোমার যখন খুশি তখনই তুমি চলে এসো।

অন্যান্য বিখ্যাত কবিতার মধ্যে আছে (—"The Muncible Armada", "The Diver", "The Glove", "The Lay of the Bell")

কিন্তু তাঁর খণ্ড-কবিতার সমস্ত রসসম্পদ স্বীকার করে নিয়েও বলতে পারা যায় যে শীলারের সাহিত্য-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর নাটকে। তিনি মনে করতেন যে নাটকের মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনে ধর্ম এবং নীতিবোধ জাগিয়ে তুলে জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধিসাধন করা চলে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সেই হিসাবে সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই নাটক অভিনয়ের একটা প্রয়োজন এবং দায়িত্বও আছে। এইজন্যই যেন কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হয়েই শীলারের জীবন-সাধনা হল নাটক রচনা, ফলে এমন কয়েকখানা নাটকের রচনা হয়েছে, যতদিন জার্মান ভাষা জীবিত থাকবে ততদিন সেই সকল নাটকও সমাদৃত হবে।

এই নাটকসমূহের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখমাত্র করা চলে।

'মেরী ষ্টুয়ার্ট' একখানা শোকগাথা হিসাবে অনবদ্য সৃষ্টি। "মেসিনার কন্যা" একটি পরিপূর্ণ শিল্পসৃষ্টি। এই নাটকের ভাষার মোহও পাঠকের চিত্তকে মুগ্ধ করে রাখে। "অরলীন্সের কন্যা" কাহিনী হিসাবে এমন অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু কবি তাঁর উন্নত দৃষ্টি ও বলিষ্ঠ মনোবৃত্তির রসায়নের যোগে সমস্ত নাটকখানাকে অপূর্ব গরিমায় নিয়ে উন্নীত করেছেন।

"উইলিয়ম টেল" নাটকখানা সমধিক পরিচিত। নৃশংস অত্যাচারী শাসন-বিধানের বিরুদ্ধে জনগণের বিরোধ এই নাটকের আখ্যায়িকার ভিত্তি। একজন দেশপ্রেমিকের দাবী ঘোষণার মধ্য দিয়ে যেন সমগ্র জাতির মর্মবেদনা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং দেশাত্মবোধের নিষ্ঠাও প্রকাশ পেয়েছে।

"এ দেশ তো আমাদের; আমাদেরই সৃষ্টি এই দেশ। স্বাপদসঙ্কুল অরণ্য থেকে ভূভাগ উদ্ধার করে এনেছি, পর্বত বিদীর্ণ করেছি, সেতু বন্ধনে নদনদীকে [illegible] এনেছি ক্ষেত চাষ করে ধরণীকে শাস্যসম্পদে ভূষিত এবং সমৃদ্ধ করেছি, ঘরবাড়ী বানিয়েছি, নগর বসিয়েছি। সব করেছি আমরা, এখন একজন বিদেশী এসে আমাদের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করবে। আমরা সহ্য করব না। আমাদের স্বাধিকারের দাবী গ্রহনক্ষত্রের ন্যায়ই চিরন্তন। আমরা সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব; সকল প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হলে আমরা যুদ্ধ করতেও বিরত হব না।"

হয়ত নায়ক "উইলিয়ম টেল" এবং জেস্লার উভয়েই কল্পনার সৃষ্টি; কিন্তু নাটকের মূল্য তাতে ব্যাহত হয় না। উইলিয়ম টেল যেন সমগ্র জাতির প্রতিনিধিস্থানীয় এবং সমগ্র নাটকখানা যেন স্বাধীনতার মহাকাব্য।

শীলারের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক "ওয়ালেন-ষ্টাইন"। এই নাটকখানা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমগ্র ইউরোপে একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে খ্যাত হয়ে পড়লেন। কোনও কোনও সমালোচকের মতে শেক্সপীয়রের লেখনী স্তব্ধ হয়েছে পরে একমাত্র গোটের "ফাউষ্ট" ছাড়া পৃথিবীতে এমন শ্রেষ্ঠ নাটক আর রচিত হয়নি। নাটকখানা প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ সালে, কিন্তু নাট্যকার সাত বৎসর এই নাটকের ভাবনায় ব্যাপৃত ছিলেন। নাটকের পরিকল্পনা এত ব্যাপক যে নাটকখানাকে তিনখণ্ডে ভাগ করে নিতে হয়েছে, অভিনয়কালেও পর্যায়ক্রমে তিন রাত্রিতে অভিনয় সমাপ্ত হত।

নাটকের নায়ক ওয়ালেনষ্টাইন অসাধারণ বীর। তাঁর সৈন্যদলে ছিল বহু বিভিন্ন প্রকৃতির দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, কিন্তু তাঁর সম্মুখে এলে সকলেই যেন মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত। ওয়ালেনষ্টাইন ছিলেন উন্নতমনা সর্বগুণান্বিত একজন আদর্শ পুরুষ, সর্ব বিষয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ছিল তার ব্যসনস্বরূপ। তিনি বীর ছিলেন, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তার দুর্বলতাও ছিল, যেমন কুসংস্কার। এই সকল দুর্বলতাই শেষ পর্যন্ত তার পতনের এবং মৃত্যুর কারণ ঘটায়।

শীলারের সাহিত্য-প্রতিভা ছিল অত্যন্ত উন্নত স্তরের; তার সম্পর্কে সত্যই বলা চলে—তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ। কাব্য নাটক ছাড়াও শীলার নানা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন—বিশেষতঃ ধর্মতত্ত্ব এবং সাহিত্যের আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে; এই সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল মানবজীবনকে এবং মানব সমাজকে উন্নত করা। তাঁর এই উন্নত আদর্শ এবং মহৎ চেষ্টার জন্য গোটের মত বিরাট পুরুষও তার ঋণ স্বীকার করে গেছেন।

গোটের সঙ্গে শীলারের প্রথম সাক্ষাৎ বড় সার্থকতা লাভ করেনি, তাঁর নিজ জীবনের দুঃখ সঙ্কট শ্রান্তি ক্লান্তির পরিপ্রেক্ষিতে গোটের কাব্য-জীবনের সার্থকতা শীলারকে সাময়িক-ভাবে গোটের বিরুদ্ধে ঈর্ষাক্লিষ্ট করেছিল। কিন্তু পরে গোটের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পেয়ে তাঁর মতের পরিবর্তন হয়েছিল; তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, গোটের তুলনায় তাঁর নিজের প্রতিভা অতি তুচ্ছ।

১৭৯৪ সালে গোটের আমন্ত্রণে শীলার গোটের বাড়ীতে গিয়ে কিছুকাল অবস্থান করেন; এর ফলে তাঁদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এরূপ দুজন প্রতিভাবান পুরুষের আন্তরিক বন্ধুত্ব উভয়ের পক্ষেই ফল-প্রদ হয়; শীলারের চেয়ে হয়ত গোটেই বেশী প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। গোটে কিছুকাল সাহিত্য-সাধনা ছেড়ে বিজ্ঞান অনুশীলন আরম্ভ করেছিলেন। লোকের সহিত ব্যবহারেও যেন তিনি কঠোর, সহানুভূতিহীন হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু শীলারের প্রভাবে গোটের চিত্তে যেন নব বসন্তের স্পর্শ এসে লাগল; আবার তিনি কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন। গোটে কৃতজ্ঞচিত্তে এবং মুক্তকণ্ঠে তাঁর জীবনে শীলারের মঙ্গল স্পর্শের কথা স্বীকার করেছেন।

শীলার সাহিত্যসাধনা করে চলেছিলেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁর উপরে খড়্গ উদ্যত করেই ছিল। পনেরো বৎসর যাবৎ তিনি ফুসফুসের ক্ষয়রোগে ভুগে আসছিলেন। "উইলিয়ম টেল" নাটক প্রকাশিত হবার এক বৎসর পরে আবার রোগের আক্রমণ ঘটে ১৮০৫ সালে। এপ্রিল মাসের ২৮শে তারিখে যখন তিনি আর একখানা নাটক "ডেমেট্রিয়াস" রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময়েই তিনি আবার রোগে আক্রান্ত হলেন। মে মাসের ৬ই তারিখে তাঁর প্রলাপ অবস্থা দেখা দিল; ৭ই তারিখ রাত্রিতে সেবা-রত রোগ-সেবিকা শুনতে পেলেন কবি যে নাটক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তারই কিছু কিছু আবৃত্তি। পরদিন সন্ধ্যায় কবি বললেন, তিনি ক্রমশঃই ভাল বোধ করছেন। একটু পরে পর্দা খুলে দিতে বললেন। তারপরে আকুলভাবে চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে এবং শেষবারের মত সৌন্দর্য পরিপূর্ণ পৃথিবীকে দেখে নিলেন; স্ত্রীকে দু'একটি কথা বললেন। পরদিন ৯ই মে পৃথিবী ছেড়ে পরলোকে যাত্রা করলেন।

গোটে বন্ধুর মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। স্বাধীনতার কবির পরলোক গমনে সমগ্র জার্মানীতে শোকের ছায়া পড়ল। শীলার বলেছিলেন "যে মৃত্যু এমন সর্বব্যাপী তা কখনও অকল্যাণকর হতে পারে না"। যিনি সকলের জীবন-বিধাতা ও সকলের ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁর উপরে শীলারের নির্ভরতা ছিল অসীম। বিধাতার বিধান কখনও অকল্যাণকর হতে পারে না। শীলারের মৃত্যুও সেই বিধাতারই বিধান।

।।সোবিয়েত কথাসাহিত্য—১৯৬১।।

বর্তমানে নানাবিধ গ্রন্থ প্রকাশনায় সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে। দেশী-বিদেশী গ্রন্থের বিচিত্র প্রকাশন প্রতিটি মানুষের পক্ষেই আনন্দের সংবাদ। সাহিত্যামোদী পাঠকের কাছে বিশেষ সংবাদ হচ্ছে গত বৎসর সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় লিখিত ও বিদেশী ভাষায় অনূদিত উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ৭,৪৯৬টি। এই প্রায় সাড়ে সাত হাজার উপন্যাস গল্পগ্রন্থের মোট মুদ্রণ সংখ্যা হল ৩১ কোটি ৮৬ লক্ষ। ১৯৪০ সালের পরিসংখ্যানের চেয়ে সাত গুণ বেশি।

১৯৬১ সালে সোবিয়েত পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রকাশন নামক বিবরণী পুস্তিকা থেকে আরও জানা গেছে যে এই প্রায় সাড়ে সাত হাজার উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ৫৯টি বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় এবং ১৯টি বিদেশী ভাষায়। এগুলির মধ্যে ৬,৩০০টি গ্রন্থ গত বৎসরেই প্রথম মুদ্রিত হয়েছে। বাকি প্রায় ১,২০০ গ্রন্থ হল পুনর্মুদ্রিত। বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত সোবিয়েত কথাসাহিত্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে বাঙলা, হিন্দী প্রভৃতি কতকগুলি ভারতীয় ভাষা। আফ্রিকার কয়েকটি ভাষাতেও ১৯৬১ সালেই প্রথম সোবিয়েত গল্প গ্রন্থ ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

।।বেস্ট্‌সেলার গ্রন্থ।।

সম্প্রতি 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় 'বেস্ট সেলার' গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ছয়খানি উপন্যাস ও ছয়খানি অন্যান্য ধরণের গ্রন্থও আছে। উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে (১) ফ্রেনি অ্যান্ড জ্যোনি : লেখক—সেলিংগার; দি বুলে ফ্রম দি সি : লেখক—রেনাল্ট; দি ফক্স ইন দি এটিক : লেখক—হ্যাগেন; দি অ্যাগোনি অ্যান্ড দি একসটাসি : লেখক—স্টোন; সিপ অব ফুলস : লেখক—পোর্টার; ডেভিল ওয়াটার : লেখক—সিটন।

অন্যান্য বইয়ের তালিকায় রয়েছে ক্যালোরিজ ডোন্ট কাউন্ট : লেখক—টেলর; মাই লাইফ ইন কোর্ট : লেখক—নিজার; দি রোথসচাইল্ডস : লেখক—মর্টন; দি গানস অব অগাস্ট : লেখক—টাসম্যান; সিকস্ ক্রাইসেস : লেখক—নিক্সন; দি মেকিং অব দি প্রেসিডেন্ট—১৯৬০ : লেখক—হোয়াইট।

।।টলস্টয়ের উইল।।

বিশ্বসাহিত্যের অমর কথাশিল্পী টলস্টয় তাঁর রচনাবলীর স্বত্ব জনগণের নামে উৎসর্গ করে মানব প্রেমের সুমহান নিদর্শন রেখে গেছেন। সাহিত্য জগতের এই সংবাদ পুরানো হলেও সম্প্রতি সে সম্পর্কে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য খবর পাওয়া গেছে।

টলস্টয় স্মৃতিভবনের একাংশে যে টলস্টয়ের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিগুলি সংরক্ষিত আছে, সেখানে নতুন কতকগুলি পাণ্ডুলিপি ও দলিল সংযোজিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে: টলস্টয়ের 'হাজীমুরাদ' গল্পটির একটি বহু-সংশোধিত পাঠ; টলস্টয়ের নিজের লেখা 'রেজারেকশন' উপন্যাসের কতকাংশের প্রুফ; বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা তাঁর আটখানি চিঠির খসড়া এবং তাঁর স্বাক্ষরিত দুটি উইল বা ওয়াসিয়ৎনামা।

এ উইল দুটির একটি সম্পাদিত হয় ১৯১০ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে এবং অপরটি ২২শে জুলাই। টলস্টয় স্মৃতিভবনে অবশ্য এই উইল দুটিরই অনুলিপি রক্ষিত আছে দীর্ঘকাল যাবৎ। কিন্তু মূল উইল ছিল বিখ্যাত পিয়ানো বাদক এ-বি-সোলডেনভাইস-এর কাছে। যিনি ছিলেন এই ওয়াসিয়ৎনামার তিনজন সাক্ষীর একজন। সোলডেনভাইস-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী এই উইল দুটি সংগীতপ্রত্নশালাকে উপহার দেন। সেখান থেকে সম্প্রতি এই দলিল দুটি উপহার হিসেবে পাঠান হয়েছে টলস্টয় স্মৃতিভবনে।

দুটি উইল আসলে একই। টলস্টয় ১৭ই জুলাই (১৯১০) তারিখে প্রথম উইলটি রচনা করেন। কিন্তু সাক্ষীদের সই নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সেটাকে আইনসম্মত রূপ দেবার ব্যাপারে দিন কতক দেরি হওয়ার ফলে, আবার ২২শে জুলাই তারিখে টলস্টয়কে নতুন করে (সামান্য কয়েকটি শব্দগত অদল-বদল সহ) ওই উইল লিখতে হয় এবং শীলমোহর করাতে হয়।

সকলেই জানেন, টলস্টয় এই উইলে তাঁর সমস্ত রচনাবলীর পূর্ণস্বত্ব বা কপিরাইট সর্বসাধারণের জন্য দান করে যান। তাঁর প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশিত কোনো রচনার স্বত্বাধিকারী কোনো ব্যক্তি-বিশেষ হতে পারবে না, যে কোনো লোক তাঁর যে কোনো রচনা ছাপতে বা উদ্ধৃত করতে পারবে। এই মর্মে টলস্টয় উইল করে যান। এই বিখ্যাত উইলের কপি বা অনুলিপি টলস্টয় স্মৃতিভবনে গিয়ে অনেকেই দেখেছেন। এখন থেকে তাঁরা মূল উইল দেখতে পাবেন।

লিও টলস্টয়ের ছেলে আন্দ্রেই টলস্টয় তাঁর পিতার মৃত্যুর পর এই উইল নাকচ করার জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। আন্দ্রেই ছিলেন তাম্বোভ্ প্রদেশের শাসকের (গভর্ণর) কর্মচারী। এই গভর্ণর এ সম্বন্ধে তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে লিখেছিলেন : "এই উইল সম্পাদিত হওয়ার ফলে (কাউন্ট লিও টলস্টয়ের) বিধবা পত্নী ও তাঁর পরিবারের লোক লক্ষ লক্ষ টাকার এক বিপুল উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বড় কথা—আমি বলব, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার হল এই যে, এই উইল কাউন্ট টলস্টয়ের সমগ্র রচনাবলীকে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিয়েছে......"

উইলটি রচনা করেছিলেন টলস্টয়ের বন্ধু আইনজীবী ভি. জি. শেৎকফ। তিনি অন্যতম সাক্ষী হিসেবে এই উইলের সঙ্গে একটি নোট দিয়েছিলেন। তাতে এই কথা লেখা ছিল, "নিজের রচনাবলী সম্পর্কে লিও নিকোলায়েভিচের উইলের মর্ম হল : তাঁর যাবতীয় প্রকাশিত অপ্রকাশিত সাহিত্য-রচনাবলী ও অন্যান্য রচনাবলী কোনো একজন ব্যক্তির সম্পত্তি হতে পারবে না। যে কোনো ব্যক্তিই তাঁর যে কোনো রচনা ইচ্ছেমত মুদ্রিত বা পুনর্মুদ্রিত করতে পারবে...।"

শেৎকফের এই নোটের সঙ্গে, ৩১শে জুলাই ১৯১০ সালে টলস্টয় তাঁর নিজের এই মন্তব্য যোগ করেছেন : "আমার অনুরোধে রচিত ও আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করছে এই উইল, ও উপরোক্ত নোট, তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।— লিও টলস্টয়।"

এশিয়ার লোকনৃত্যের ভূমিকা

চিত্তরঞ্জন দেব

বলতে গেলে সর্বকালে সর্বদেশেই জীবনের গভীরতম অনুভূতি এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের কাছে নৃত্য-কলা এক গুরুত্বের স্থান দখল করেছে। এই নৃত্য-কলা কখনও দেখা গেছে ধ্রুপদী রীতি-নীতি এবং বাঁধা-ধরা নিয়মানুসারে কখনও বা প্রকাশ পেয়েছে নিরক্ষর সরল পল্লীজীবনের অনাড়ম্বর অভিব্যক্তির মাধ্যমে। সংগীতের মত নৃত্য-কলাও এশিয়াবাসীদের জীবনযাত্রাপ্রণালীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ প্রবন্ধে আমরা শুধুমাত্র এশিয়াবাসীদের লোক-নৃত্য সম্পর্কেই সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব।

সমগ্র এশিয়া মহাদেশের নৃত্য-কলা, বিশেষ করে লোক-নৃত্য বিষয়ে আলোচনা করতে বসলে প্রথমেই আমাদের নজরে আসে, এখানকার নৃত্য-শিল্প, বিশেষ করে লোক-নৃত্যের বিকাশ ঘটেছে মূলতঃ ধর্ম এবং লৌকিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই। এই মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যথা,—বিবাহ-উৎসব, শস্য-কর্তন, পাল-পার্বণকে উপলক্ষ্য করেই সরল পল্লীবাসীরা বিনা প্রস্তুতিতে মনের আনন্দে এই সব নৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে। অবশ্য নৃত্য-কলার ব্যাপারে এই মিলটুকু থাকলেও এর সঙ্গে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার অঞ্চল ভেদে ভিন্ন রূপ ধারণ না করে পারে না। এ সম্পর্কে পরে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

॥ ভারতবর্ষ ॥

বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ। এক কথায় বলা হয় উপ-মহাদেশ। এর এক এক অঞ্চলের জীবনযাপনপ্রণালী, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এক এক রকমের। এক বাংলা দেশেই হরেক রকমের লোক-নৃত্যের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। মালদার গম্ভীরা, বীরভূমের রাইবেঁশে, গাজন ও বাউল, পুরুলিয়ার করম ও ডাঁইরশাল বা দাঁড়পাচ, নাটুয়া ও ছো নাচ, শ্রীহট্টের ঘাটু, ধামাইল প্রভৃতি। বাংলার বাইরে গুজরাটে গর্বা, পাঞ্জাবের ভাংরা ও লুড্ডি নাচ, দণ্ড নাচ সমধিক প্রসিদ্ধ। তাছাড়া রাজস্থানের বিভিন্ন দেহাতী নাচ, উড়িষ্যার উল্টি ঘোড়া নাচ, আদি-বাসী সমাজের শিকার নৃত্যও বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। সেরাইকেল্লা ও ময়ূরভঞ্জের ছো আসামের বিহু পরবের নাচ, মানভূমের ঝুমুর, তাঞ্জোরের করবাঞ্জি, উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের খট্টক ও বাঙ্জি, নেফা ও তিব্বত অঞ্চলের ডেভিল ডান্স বা শয়তান নৃত্য বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য লোক-নৃত্য।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের লোক-নৃত্যের প্রচলন থাকলেও সমগ্র দেশের লোক-নৃত্যের মধ্যে একটা ঐক্যও রয়েছে। প্রায় সমস্ত লোক-নৃত্যই যৌথ বা সামূহিক। লোক-নৃত্যের এই সামূহিকতা তার সজীব প্রাণশক্তিরই একটা প্রধান উৎস।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভারতের লোক-নৃত্যগুলি বিকাশ লাভ করেছে প্রধানতঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই। তার ভিতর প্রায় সব অঞ্চলেই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কাহিনী-সম্পর্কিত নৃত্যের একটা ঐতিহ্য স্পষ্টতঃই প্রমাণ করে লোক-নৃত্যের অন্তর্নিহিত ঐক্যতা। বিশেষ করে গুজরাটের গর্বা, মালবার অঞ্চলের তিরুভা থিরাকলি, রাজপুতনার ঝুমুর ও হোলি, বাংলার কলার নাচন, শ্রীহট্টের ধামাইল, উত্তর-প্রদেশের কাজরী প্রভৃতি নাচের ভিতর রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলারই ছবি ফুটে উঠেছে।

॥ চীন প্রজাতন্ত্র ॥

চীনের নৃত্যসংস্কৃতি বহুদিনের। প্রায় চার হাজার বছর আগেকার ইতিহাসের ভিতরও চীনের নৃত্য-সংস্কৃতির খবর পাওয়া যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে গ্রীক এবং মিশর সভ্যতার থেকেও পুরাতন ঐতিহ্যের অধিকারী চীন। তবে চীনের সাম্প্রতিক লোক-নৃত্য কিন্তু তার পূর্ব ভাবধারা থেকে অনেকটা সরে এসেছে। পূর্বের লোক-নৃত্যের ভিতর যেমন ছিল 'হার ভেস্টিং ডান্স' বা ফসল-তোলা নাচ, 'ড্রাগন ডান্স' ইত্যাদি তখন গ্রাম্য জীবনের সময় কাটাবার অবলম্বন হিসেবে, আজ কিন্তু তার ভিতর যেন প্রচারের গন্ধ উঁকি দিচ্ছে। সন্দেহ নেই যে চীন তার নৃত্য-শিল্পের উন্নতির জন্য পল্লীবাসী তথা শ্রমজীবী মানুষের অবসরবিনোদনের জন্য গ্রামে-গ্রামে 'ওয়াকার্স' ডান্স এবং ড্রামাটিক গ্রুপের' প্রবর্তন করেছে, ফলে নিয়মিতভাবে একক ও সম্মিলিতভাবে লোক-নৃত্যের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তবু এর ভিতর প্রচারের ধারাটাই যেন সমধিক ব্যাপ্ত। নয়া চীনের অন্যতম 'শিখাং ডান্স ড্রামা 'রেড ক্লাউডস' বা লাল মেঘ এই জাতীয়।

॥ জাপান ॥

সৌন্দর্যের দেশ হল জাপান। তার নৃত্য-কলাও তাই ফুলের মতই সুন্দর। জাপানের লোকনৃত্যও পুরাতন ঐতিহ্য-বাহী। জাপানী লোকনৃত্যের ভিতর সেখানকার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন

গুজরাটের গরবা নৃত্য

জীবনযাত্রাপ্রণালী প্রতিফলিত হয়। জাপানের 'ড্রাগন' বা পোলো নাচ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নবান্ন বা নববর্ষকে উপলক্ষ করে জাপানে যে লোকনৃত্যের প্রচলন আছে তার ভিতর দিয়ে এর পুরাতন ঐশ্বর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বসন্ত সমাগমে বিমর্ষ মন প্রফুল্ল হয়ে উঠে। এই সময় দেখা যায় 'চেরী' নৃত্যের প্রাদুর্ভাব। এছাড়া 'ছত্রনৃত্য', 'নাগনৃত্য', 'অশ্বনৃত্য', মাছধরা নাচ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্য। জাপানের অন্যতম বিখ্যাত লোকনৃত্য হল 'বন' নৃত্য। শেষ গ্রীষ্মে দেশের সর্বত্রই প্রায় বিশেষ সমারোহের সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

॥ পাকিস্থান ॥

লোকনৃত্যের ব্যাপারে পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় পাকিস্থানই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু পাকিস্থানের দুই অঞ্চলের লোকনৃত্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। হয়ত জল-বায়ু এবং ভৌগোলিক পরিবেশের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্থানে, বিশেষ করে পশ্চিম পাঞ্জাবের সিন্ধু, করাচী, বেলুচিস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে ভাংরা, লুড্ডি, সমীর, কুড়ার, সম্মী, কীগল এবং কিক্কাই হল প্রধান লোকনৃত্য। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্থানে জারি, সারি, নৌল, গাজন, ধানকাটা, মাছধরা, সাপুড়ে, বাউল ও বৌ-নাচই হল প্রধান লোকনৃত্য।

যেহেতু ভাংরা হল কৃষিপ্রধান দেশের বহুল প্রচলিত নাচ, সেইহেতু এপ্রিল ও মে মাসে পাঞ্জাবের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে গুজরানওয়ালা, গুজরাট ও সারগোদা জেলায় এর চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্থানের ধানকাটা নাচের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

পশ্চিম পাকিস্থানের অন্যতম বিশিষ্ট নাচ হল লুড্ডি—বীররসের নাচ। মণ্টগোমারী, লয়ালপুর, সারগোদা, গুজরাট ও গুজরানওয়ালের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রচলিত।

পশ্চিম পাকিস্থানের মেয়েলী লোকনৃত্যের মধ্যে 'সাম্মী', 'কিক্কাই' এবং 'কীলীক' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্য।

সিংহল

সিংহলের উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্যের ভিতর 'শয়তান নৃত্য' (Devil Dance) এবং 'কান্ডী' নৃত্য। কান্দী হল এদেশের রাজধানী, সেই নাম অনুসারেই এ নৃত্যের নামকরণ হয় 'কান্ডী নাচ'। এখানেই এ নাচের প্রধান কেন্দ্রস্থল। যতদূর জানা যায় ষোড়শ শতাব্দীতে কান্দীর রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ নাচের প্রসার লাভ করে। এ হল ভারতের 'কথাকলি' নৃত্যেরই অনুরূপ।

সিংহলের আদিমতম নৃত্যের ভিতর 'শয়তান নৃত্য' (Devil Dance)-ই বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ লোকনৃত্য। যেমনি তাদের পোষাকবৈচিত্র্য তেমনি তাদের নৃত্যকুশলতা। বিপদাপন্ন এবং অসুস্থ মানুষের কল্যাণকামনায় এই শয়তান নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

'কান্দী নৃত্য' ও 'শয়তান নৃত্য' পুরুষোচিত নৃত্য। কিন্তু এ ছাড়া সিংহলে শুধুমাত্র নারীদের নৃত্যও আছে। তার মধ্যে একটি হল স্বাগত নৃত্য (Welcome Dance) —গৃহে কোন সম্মানিত অতিথি এলে তার সম্বর্ধনার জন্য এর আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। একে অনেকটা দক্ষিণ ভারতের দেবদাসী নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য মেয়েলী নৃত্য হল 'পাত্র নৃত্য' (Pot Dance)—মেয়েরা মাথায় ঘট বা কলসী নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন মুদ্রা সহযোগে তাদের নাচ দেখিয়ে বেড়ায়।

দক্ষিণ সিংহলে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর 'অসি নৃত্য' এবং 'লাঠি নৃত্য' নামক দুটি অনুল্লেখযোগ্য নৃত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

॥ ব্রহ্মদেশ ॥

ব্রহ্মদেশের নাচ বলতে গেলে ভারতীয় নৃত্যকলারই অন্যতম অঙ্গ। এখানকার নাচগুলির অধিকাংশই জাতকের কাহিনী বা বৌদ্ধ ধর্মের উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করেই রচিত। এখানকার নৃত্যের একটি বিশেষ রীতি হল নাচিয়েরা প্রথমটায় কোন একটি গানের কয়েক চরণ গেয়ে যায়, তারপর বাদকবৃন্দ তাদের বিভিন্ন যন্ত্রের ভিতর সেই গানের সুর তুলে ছড়িয়ে দেবার পর শুরু হয় তাদের নাচ।

এখানকার নাচের একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এখানকার নাচের ভিতর দুঃখদায়ক নাচ বিশেষ জমে না। এখানে পুতুলনাচ বা মুখোশ নৃত্যেরও বেশ প্রচলন দেখা যায়। উত্তর ব্রহ্মে জন্তু-জানোয়ার, যুদ্ধনৃত্য প্রভৃতি বেশ চালু আছে।

ব্রহ্মের সব চাইতে মনোরম হল এদের নৃত্যভঙ্গিমা। অপূর্ব দেহবল্লরী ছন্দের তালে তালে দোলায়িত হয়—দর্শকমনে সৃষ্টি করে অপূর্ব রোমাঞ্চ।

॥ শ্যাম ॥

শ্যাম দেশেও বার মাসে তের পার্বণ। এই সব লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গই হল নাচ। এখানকার নাচ সবই ভারতীয় নৃত্য এবং ভাবধারার উপর ভিত্তি করে রচিত। এখানকার নৃত্যের বিষয়বস্তু প্রায়ই রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী নিয়ে রচিত। ছায়া নৃত্যের খুবই প্রচলন এদেশে। এই ছায়া নৃত্য থেকেই মুখোশ নৃত্যের উৎপত্তি। এই মুখোশপরা নাচকে এদেশের ভাষায় বলে 'খোন'। এই খোন বা মুখোশ নানা রকমের এবং নানা রং-এর হয়ে থাকে এ কথা বলাই বাহুল্য। এর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কথাকলি নাচের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই নাচের সঙ্গে বাদকবৃন্দ সাধারণতঃ পাঁচ রকমের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ঐকতান সৃষ্টি করে থাকে। এর কতকগুলি খোন আছে যা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়, কতকগুলি হল বিশেষ জাঁক-জমকপূর্ণ—যাকে বলে রাজকীয় খোন—বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ নৃত্যকলা—ব্যয়সাপেক্ষ।

॥ ভিয়েৎনাম ॥

ভিয়েৎনামের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অনেক দিনের। ভারতবর্ষের মত ভিয়েৎনামও বহুদিন ফরাসীদের অধীন ছিল। অত্যাচারিত, নিপীড়িত, শোষিত এই ভিয়েৎনামবাসী কিন্তু তাদের দেশের অমূল্য সম্পদ নৃত্য-গীতকে-এর মধ্যেও ভোলেনি। এখানকার কৃষকশ্রেণীর লোকেরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছে তাদের লোকনৃত্যের মাধ্যমে। এখনকার বিখ্যাত এবং

চীনের লোকনৃত্য

জনপ্রিয় লোকনৃত্যগুলির মধ্যে প্রজাপতি নৃত্য, সাকী নৃত্য, পাখা নৃত্য প্রভৃতি। সুন্দরী তরুণীদের দেহভঙ্গিমায় অপূর্ব মনোরম কলা-কৌশলে পাখা নৃত্যটি বিশেষ উপভোগ্য অনুষ্ঠান। এছাড়া বীরত্বব্যঞ্জক 'লাঠি নৃত্য' বা 'তরবারি নৃত্য', শরৎ—বসন্তকালে 'সিংহ শোভাযাত্রা'র ভিতর দিয়ে আশার বাণী প্রচারিত হয়। তবে লোকনৃত্যের বহুল চর্চা কিন্তু এর পার্বত্য অঞ্চলেই বেশী। এই সব অঞ্চলে বানর নৃত্য, বর্শা নৃত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ মঙ্গোলিয়া সাধারণতন্ত্র ॥

মঙ্গোলিয়া সাধারণতন্ত্রের নাচ-গানের মূলে উৎস হল তাদের সহজাত ধর্মবোধ। লামাদের অত্যাচারে যখন নৃত্য-গীত রাজদরবার থেকে নির্বাসিত হল তখন মঙ্গোলিয়ার নৃত্য-গীত বেঁচে রইল সেখানকার লোক-শিল্পীদের কাছে। তারা খুর নামক এক প্রকারের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে নৃত্যসহযোগে জাতীয় গাথা গেয়ে বেড়াত। গ্রামের মেলায় এই সব চারণের দল মুখে মুখে জাতীয় গাথা রচনা করে জনসাধারণকে আনন্দ দিত।

মঙ্গোলিয়ার লোকনৃত্যের মধ্যে পাখী ও জীব জন্তু সম্পর্কিত কতকগুলি নাচ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল মোরগ নৃত্য, সারস নৃত্য, তিতির নৃত্য, হরিণ নৃত্য, কাক নৃত্য, পক্ষীরাজ নৃত্য, গরুড় নৃত্য প্রভৃতি। শোন নামক একটি নৃত্যে দেখা যায় যে একদল লাজুক ও ভীরু নারী ঘুঘু পাখীর ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তাদের ঘিরে নাচে বাজপাখীর ভূমিকায় একজন নর্তক। ভীরু ঘুঘু পাখীরা বাজপাখীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য উদ্বিগ্ন। দ্রুততালে

মালয়ের লোকনৃত্য

নিষ্পন্ন হরিণ নৃত্যটিও বেশ উপভোগ্য।

॥ ফিলিপাইন ॥

ফিলিপাইনের উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্য হল 'বিনুসান'—বাতি নাচ ও টিন কলিং নাচ। প্রথমটিতে নর্তক অথবা নর্তকী মাথায় জ্বলন্ত বাতি নিয়ে এমনভাবে করতালি ও গীটারের তালে তালে নাচতে থাকে যেন একটি বাতিও নেভে না বা পড়ে না যায়।

পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তারা বিবাহ, যুদ্ধযাত্রা, নরমুণ্ড শিকার, মৃত্যু, ফসল তোলা এবং বীজ বোনা উপলক্ষে নেচে থাকে।

অনেক সময় রোগ সারাবার জন্য ওষুধ হিসেবেও তারা নাচের ব্যবস্থা করে থাকে।

॥ ইন্দোনেশিয়া ॥

অদ্ভুত দেশ এই ইন্দোনেশিয়া। অধিবাসীদের অধিকাংশই হল মুসলমান ধর্মাবলম্বী কিন্তু এদের সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম-ঘেঁষা। তাই এদের নাচের বিষয়বস্তুও সংগৃহীত হয়

সিংহলের কাণ্ডী নৃত্য

সব প্রায় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে। এখানে নাচ জানে না এমন মেয়ের সন্ধান এক রকম পাওয়াই যায় না। নাচকে তাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের অঙ্গ হিসেবেই তারা গণ্য করে থাকে। ধ্রুপদী নৃত্যের মত লোকনৃত্যেও ইন্দোনেশিয়ায় একাধিক লোকনৃত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, বিশেষ করে সেলিবীস দ্বীপে Pojaja এবং Pakarena নামক নাচ দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বলীদ্বীপের নাচ পৃথিবীবিখ্যাত। এর সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। এখানকার প্রত্যেক গ্রামেই রয়েছে নৃত্য সংস্থা। এরা নতুনকে সাদরে আমন্ত্রণ জানায় সব সময়ই, কিন্তু তাই বলে নতুনত্বের মোহে তারা তাদের নিজেদের ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেয় না কখনও—এইটেই হল এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

॥ তিব্বত ॥

তিব্বতের লোকনৃত্য তিব্বতীদের নিজস্ব স্বতন্ত্রে বিভূষিত। 'হল মোরগ',

পূর্ব পাকিস্থানের লোকনৃত্য

'ইয়াক',—এই সব নাচ তিব্বতের সাধারণ মানুষের জীবন-ছন্দের দ্যোতনায় ছন্দিত। এ নাচে এখানকার মেয়েপুরুষ পাশাপাশিই নাচে। এ নাচ সরল, সহজ ও স্বাভাবিক। এই নাচ এদের হাটে, মাঠে, উৎসব অনুষ্ঠানে সর্বত্রই দেখা যায়। এমন কি বৌদ্ধ মঠের মধ্যেও এ নাচের প্রচলন যে একেবারে না দেখতে পাওয়া যায় এমন নয়।

॥ মালয় ॥

মালয়ের উচ্চাঙ্গের নৃত্যশিল্পের ভিতর নিজস্ব কিছু না থাকলেও, লোকনৃত্যে সে ঐশ্বর্যশালিনী এখনও। উত্তর মালয়ে এখনও মালয়ের নিজস্ব জিনিস কিছু কিছু বর্তমানে রয়েছে। এখানকার বিখ্যাত লোকনৃত্য হল Donang Sayan এবং Donak Donay।

Donak Donay নাচ হল যুদ্ধ নৃত্য। প্রথমটায় দেখলে মনে হবে বুঝি কতকগুলি যুবক হাতাহাতিতে মেতে উঠেছে, কিন্তু তা নয়, তাদের এ নাচের ঐ হল মুদ্রা। নাচ জমে উঠলে দর্শকবৃন্দ বেশ উল্লাসের সঙ্গেই উপভোগ করে থাকে।

॥ কাম্বোডিয়া ॥

অপরূপ নৃত্য-কুশলতার জন্য বিখ্যাত এই কাম্বোডিয়া। এর প্রাচীন মন্দির গাত্রে খোদিত নৃত্যরতা নর্তকীদের নৃত্যভঙ্গিমা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কত যুগ ধরে কাম্বোডিয়া তার নৃত্যশিল্পের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এর উচ্চাঙ্গের বা দরবারী নাচ ছাড়াও লোকনৃত্যেও সবিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন।

Lamthong ই বোধহয় এর সবচাইতে প্রাচীন লোকনৃত্য। এছাড়া পূজা-পার্বণ উপলক্ষে শিকার নৃত্যটিও সবিশেষ জনপ্রিয়।
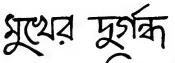
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ সাত ॥

অভয় বেরিয়ে গেছে কারখানায়, প্রভাত চলে গেছে নিজের ডিউটিতে। অমিয়কে একটু আগে গলির মাথায় দেখা যাচ্ছিল তিন-চারটি ছেলের ভেতর, গোষ্ঠ পাল-মেওয়ালাল-মুর্গেশ-প্রদীপ ব্যানার্জি এই সব নামগুলোর সঙ্গে প্রচণ্ড চীৎকার কানে আসছিল তার। আপাতত তাকে আর দেখা যাচ্ছে না, চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে এতক্ষণে হয় রাজাবাজার নইলে বেলেঘাটায় গিয়ে পৌঁছেছে।

বাড়ীর ভেতর থেকে স্ত্রীর গলা শুনতে পেলেন গৌরাঙ্গবাবু।

—দীপু, ওঠ মা। বেলা এগারোটা বাজল যে—উঠে এখন চোখে মুখে একটু জল দে।

গৌরাঙ্গবাবু ভ্রূকুটি করলেন। কাল রাত এগারোটায় ফিরে মেয়ে শয্যা নিয়েছেন—এখনো তিনি গা তোলেননি। আজ নাকি তার শরীর খারাপ, সে অফিসে বেরুবে না। কী তার হয়েছে, গৌরাঙ্গবাবু জানেন না। এই গরমের ভেতরেও একটা চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে সমানে। তৃপ্তি তিন-চারবার তুলতে গিয়েছিল, মুখ ঝামটা খেয়ে ফিরে এসেছে। এইবারে মা তুলতে চেষ্টা করছে মেয়েকে। হাঁটু থেকে তীব্র যন্ত্রণার চমক উঠে, কোমর বেয়ে দুটো বাহুতে করাত চালিয়ে হাতের দশটা বাঁকা আঙুলে এসে থামল, আঙুলের ডগায় ডগায় যেন আগুন জ্বলতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে বসে রইলেন। গৌরাঙ্গবাবু। যার কোনো প্রতিকার নেই, যে অসহ্য যন্ত্রণার কেউ ভাগ নিতে পারবে না, চেঁচিয়ে—আর্তনাদ করে দশজনকে সেটা জানান দিতে তাঁর খারাপ লাগে। জীবনে তিনি কারো করুণার পাত্র হতে চাননি—একান্ত দুঃখের দিনেও কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন—বাঁচবার জন্যে লড়েছেন সাধ্যমতো। তারপর যেদিন পঙ্গু হয়ে গেলেন, সেদিনও ঠিক করলেন রোগের কাছে হার মানবেন না, একা নিঃশব্দে তাকে সহ্য করে যাবেন।

কিন্তু সব কিছুর একটা সীমা আছে। দীপ্তি—অমিয়।

অমিয়কে বুঝতে পারেন। লেখা-পড়া ছেড়ে, ফুটবল খেলে আর আড্ডা দিয়ে আনন্দে দিন কাটাচ্ছে, এর পরে হয় রেস্তোরাঁয় বয়ের চাকরি নেবে নইলে গাঁটকাটা হয়ে জেল খাটবে। অমিয়কে অদৃষ্টের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন গৌরাঙ্গবাবু। এই কলকাতা শহরে কিছু পকেটমারও দরকার, আর অমিয়র মতো দু-চারটি ছেলে না হলে তারাই বা কোথা থেকে আসবে?

কিন্তু দীপ্তি।

গৌরাঙ্গবাবু আবার দাঁতে দাঁতে চেপে চোখ বুজলেন। এই মেয়েটিও এক সময় তৃপ্তির মতো শান্ত-শিষ্ট ছিল, গায়ের রঙ শ্যামল হলেও চোখে-মুখে লক্ষ্মীশ্রী ফুটে বেরুত তার। অনেক কষ্টে যখন স্কুল থেকে পাশ করল, তখন আশা দেখা দিয়েছিল মনে। ভেবে-ছিলেন—না, আর ভাবছেন না এখন। ভাববার আর কিছু নেই। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের মতো অন্ধ চোখ নিয়ে বসে আছেন। দেখতে চান না—জানতে চান না—বুঝতে চান না। যা হবার তাই হোক। জীবনে হার মানবেন না পণ করে-ছিলেন—কিন্তু বেঁচে থেকেও যে মরে আছে, তার হার-জিত সব সমান।

—বসে আছেন নাকি?

মুখুজ্জেমশাই। ওষুধের সেই দোকানটা থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরলেন।

একরাশ বিরক্তি ঠেলে উঠল গৌরাঙ্গ-বাবুর গলায়। বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই যে তাঁর করবার নেই, একথা মুখুজ্জেমশাই বেশ ভালো করেই জানেন, দু-বেলাই দেখতে পাচ্ছেন নিজের চোখে। তবু একটা অহেতুক আপ্যায়ন।

—কী আর করব বলুন।

মুখুজ্জেমশাই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—চিকিৎসা-পত্তর একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন?

—লাভ নেই কিছু।

মুখুজ্জে মাথা নাড়লেন। তিনিও একমত।

—তা বটে। এ রোগ ডাক্তার-কবরেজে সারাতে পারে না, খালি টাকা খাওয়ার যম। ভালো সাধু-সন্নিসির কাছ থেকে একটা কবচ-টবচ ধারণ করে দেখুন।

শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে আবার যন্ত্রণার সেই তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বয়ে [illegible]

আবার দাঁতে দাঁতে চেপে গৌরাঙ্গবাবু একটা আর্তনাদকে সামলে নিলেন। বিস্বাদ স্বরে বললেন, ভালো সাধু-সন্ন্যিসিই বা কোথায় পাচ্ছি বলুন।

—সে ঠিক—সব জোচ্চোর। আসল সাধুর দেখা পাওয়াও ভাগ্যির কথা মশাই। একবার একজন এসেছিল বটে—জনাইয়ে—আমার মামাবাড়ীতে। আমার এক মামাতো ভাইয়ের টাইফয়েড। একুশ দিন ভোগের পর শেষরাত্তিরে মারা গেল। ডাক্তার বিদায় নিয়ে গেল, বাড়ীতে কান্না উঠেছে—হঠাৎ দোরগোড়ায় কে যেন মোটা গলায় বললে, শিব-শিব! সবাই দেখলে, কাঁধে ঝোলা, সারা গায়ে ছাই, এক ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে।

গৌরাঙ্গবাবু বিস্মিষ্ট চোখে তাকিয়ে রইলেন মুখুজ্জের দিকে। ধারালো বৈশাখের রোদ পড়েছে গলিতে, বাতাসে আগুন ধরেছে। ডাস্টবিন তুলে-দেওয়া রাস্তা থেকে গতরাত্রের আবর্জনা-স্তূপের গন্ধ—এখনো সেগুলো পরিষ্কার করা হয়নি। অথচ একটা ছাতা মাথায় দিয়ে এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে কী অনাবশ্যক বাজে বকুনি শুরু করেছে লোকটা! ওষুধের দোকানটায় ঘণ্টা-তিনেক বকর বকর করে এখনো আশ মেটেনি!

বলতে ইচ্ছে করল, থামুন—নিজের কাজে যান—কিন্তু যা বলতে ইচ্ছে হয়, তা বলা যায় না। নারকেলডাঙার এই গলিতে, মুমূর্ষু ঘেয়ো কুকুরের মতো একটা অস্তিত্ব নিয়েও ভদ্রতার আইন-কানুন মেনে চলতে হয়। সুতরাং গৌরাঙ্গবাবুকে ছেলেবেলার রূপকথার মতো এই অলৌকিক কাহিনী শুনে যেতে হল। সন্ন্যাসীর হাতের এক মুঠো ধুলো মাথায় পড়তেই তাঁর মৃত মামাতো ভাই কেমন করে স্প্রীঙের পুতুলের মতো বিছানায় উঠে বসল, বললে, 'মা, আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, শিগ্‌গীর ভাত আর মাগুর মাছের ঝোল রান্না করে দাও।' গৌরাঙ্গবাবু আরো জানলেন, সেই ভাগ্যবান ভাইটি তারপর ত্রিশ বছর সরকারী চাকরী করে, সাত বছর পেন্‌শন ভোগ করে সজ্ঞানে গঙ্গা পেয়েছেন মাত্র এই কিছুদিন হল।

—তা দিন না সেই সাধুকে এনে।

মুখুজ্জে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে দেখলেন একবার। ঠাট্টা করছে নাকি লোকটা?

—তাকে আর আমি পাচ্ছি কোথায়? অনেক পুণ্যফল না থাকলে কি আর ও'দের দেখা মেলে? ভালো কথা—আপনার গুরু-টুরু নেই?

—ছিলেন, কুলগুরুর বংশধর এক-জন।—গৌরাঙ্গবাবু বিস্বাদ গলায় বলে চললেন, বছরে একবার করে খুলনা না পিরোজপুর কোত্থেকে এসে হাজির হতেন, তিন-চার দিন থাকতেন, ভালো-মন্দ খেতেন, তারপর টাকা-কাপড় যা পেতেন তাই নিয়ে বিদায় হতেন। গুজব শুনেছিলুম গুরু নাকি দাগী চোর—তখন বিশ্বাস হয়নি। শেষে একবার আমাদের বাড়ী থেকেই বাকস-প্যাটরা ভেঙে নগদ শ পাঁচেক টাকা আর হাজার দুই টাকার গয়না নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। সেই থেকেই গুরুর দর্শন আর ঘটেনি। আর না হয়ে ভালোই হয়েছে—অন্তত গুরুদেবের পক্ষে।

শুনে মুখুজ্জে হা-হা করে হাসলেন। কিন্তু হঠাৎ মাঝপথে হাসিটা বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। ঠোঁটের একটা কোণা একটু বাঁকিয়ে, চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি এনে গৌরাঙ্গবাবু তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে।

তা হলে ঠাট্টা করছে লোকটা!

গুরুকে নিয়ে ঠাট্টা—সাধু-সন্ন্যিসি নিয়ে মশ্‌করা! এই জন্যেই তোমার এত কষ্ট—তোমার গাঁটে গাঁটে বাত! স্বগতোক্তি করলেন মুখুজ্জেমশাই, তার-পর সংক্ষেপে বললেন, যাই, অনেক বেলা হল।

ছাতাটা নিয়ে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে।

কিন্তু মুখুজ্জের অনুমান মিথ্যে নয়, গল্পটা বানিয়েই বলেছেন গৌরাঙ্গ-বাবু। একটা রূপকথার উতোরে দিয়েছেন আর একটা গল্প শুনিয়ে। তাঁর বাবা প্রায় নাস্তিক ছিলেন, সেই তখনকার দিনেও মফঃস্বল শহরের বুকের ওপর দিয়ে হাতে মুরগী ঝুলিয়ে বাজার করে আসতেন। বাড়ীতে পুজো-আচ্চার পাট প্রায় ছিলই না। কুলগুরুর এক বংশধর খুঁজতে খুঁজতে একবার হাজির হয়ে-ছিল বটে, কিন্তু তাকে এমন হুড়ো লাগিয়ে ছিলেন যে সে আর কখনো ও-মুখো হয়নি। কুস্তিগড়া বিরাট শরীর ছিল, বলতেন, ঠাকুর-দেবতা বুঝিনে, নিজের পা আছে দাঁড়াব, দুটো হাত আছে খেটে খাব।

বাবার কথা মনে পড়তেই গৌরাঙ্গ-বাবু অনেক দূরে চলে গেলেন। বাবা খুন হয়েছিলেন তাঁদের দেশের বাড়ীতে—গ্রামে। তখন ষাটের ওপর বয়েস, তবু লোহার মতো স্বাস্থ্য। জমি-জমার ব্যাপার নিয়ে খুন করিয়েছিল জ্ঞাতি-শত্রুরা। ভুয়া ডাকাতের দল এসে মাঝ-রাত্তিরে চড়াও করেছিল বাড়ীতে, লাঠি হাতে দরজা জুড়ে বাবা দাঁড়িয়েছিলেন। বারোজন ডাকাতের কেউ সামনে এগোতে পারেনি, দূর থেকে বন্দুকের গুলি ছুঁড়েছিল তাঁর বুকে।

তেমনি করে মরবার শক্তি নেই গৌরাঙ্গবাবুর। তিলে তিলে একটা রাস্তায় কুকুরের মতো মরে যাচ্ছেন তিনি। তাঁকে ছেঁকে ধরেছে ডাঁশ আর মাছির দল, বিষাক্ত দংশনে সারা শরীর জর্জরিত করে তুলছে।

দূর থেকে মুখুজ্জের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আবার গল্প জুড়ে দিয়েছেন যেন কার সঙ্গে। মনে হল, একটা-দেড়টার আগে বাড়ী ফেরবার কোনো তাগিদ তাঁর নেই।

একমাত্র ছেলে ভালো চাকরি করলে আর মেয়েদের মনের মতো বিয়ে হয়ে গেলে, ঘরে ভাতের ভাবনা না থাকলে—এই বেতো শরীর নিয়েও অমনি করে গৌরাঙ্গবাবু গল্প করতে পারতেন। সাধু-সন্ন্যাসী-ভূতের গল্প, অকারণে লোকের কুশল জিজ্ঞেস করে বেড়ানো—কিছুতেই তাঁর আপত্তি থাকত না। কিন্তু সকলের ভাগ্য সমান হয় না।

পিয়ন এসে দুটো চিঠি ফেলে দিয়ে গেল। আড়ষ্ট ডান হাতটা একটু বাড়িয়ে গৌরাঙ্গবাবু সে দুটো তুলে নিলেন।

একখানা পোস্টকার্ডে লেখা অমিয়র নামে। শালকে থেকে কোন একটা ক্লাব অমিয়কে মনে করিয়ে দিয়েছে, আগামী শনিবার তাদের সেমি-ফাইন্যাল। অমিয় যেন ঠিক তিনটে নাগাদ গিয়ে হাজির হয়।

—লক্ষ্মীছাড়া!

পোস্টকার্ডটা নামিয়ে রেখে এবার খামটা তুলে নিলেন। উপরে নাম লেখা তৃপ্তি দে।

গৌরাঙ্গবাবু ভুরু কোঁচকালেন। তৃপ্তিকে আবার কে চিঠি লিখল? আলাদা করে খামে তৃপ্তিকে চিঠি লিখতে পারে এমন কারো কথা তাঁর মনে পড়ল না।

খাম ছিঁড়তেই এসেন্সের একটা হাল্‌কা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। আর

গৌরাঙ্গবাবুর স্নায়ুগুলো উগ্র হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে:

'প্রিয়া আমার—'

সম্ভাষণটার ওপর চোখ পড়তেই সর্বাঙ্গ পাথর হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে সামনে থেকে মিলিয়ে গেল এই গলি, এই রোদ—এই কলকাতা। মনে হল একটা অগ্নিকুণ্ডের ভেতরে আছেন তিনি—তাঁকে ঘিরে ঘিরে কতগুলো আগুনের শিখা খেলে বেড়াচ্ছে। আর তিনি একটা বিস্ফোরকে পরিণত হয়েছেন—এই মুহূর্তে ফেটে পড়বেন বজ্রের মতো।

কতক্ষণ এমনি করে বসে ছিলেন, গৌরাঙ্গবাবু জানেন না। চিঠিটা ছুড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন, তাও পারলেন না। যন্ত্রণায় বাঁকা বাঁকা আঙুলগুলোতে চিঠিটা এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গারের দাহ ছড়াচ্ছিল। তবু শেষ পর্যন্ত পড়তে চেষ্টা করলেন তিনি। চারের পৃষ্ঠাটার দিকে আর তাকানো গেল না—কদর্য অশ্লীলতার পাঁক পরম উল্লাসে বুদবুদ তুলেছে সেখানে।

কোনো ভদ্রলোকের ছেলে লিখতে পারে এই চিঠি!

অথচ, ভদ্রলোকের ছেলেই লিখেছে।

তৃপ্তির জন্যে নামহীন চিঠির লেখক পাগল। তৃপ্তি তার দিকে ফিরেও তাকায় না—তাইতে তার প্রাণ আরো ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সিনেমার গান উধৃত করে বোঝাতে চেষ্টা করেছে নিজের অবস্থাটা। আর তৃপ্তিকে যদি কখনো পায়—তার পরেই বিকৃত কল্প-কামনার কদর্য উচ্ছ্বাস।

অজস্র বানান ভুল, অশুদ্ধ ভাষা। কিন্তু বক্তব্যটা ঠিক পৌঁছে দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে মনের যে পরিচয় মেলে ধরেছে তা আদিম বর্বরকেও লজ্জা দেয়। এরাই দেশের ছেলে—দেশের ভবিষ্যৎ! এরাই প্রতি বছর প্যাণ্ডেল তৈরী করে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের আয়োজন করে—মাইকে গান শোনা যায়: 'ধর্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান, নীরব হয়ে, নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।' নেতাজীর জন্মদিনে এরাই বের করে প্রভাত ভেরী, ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যায়!

ঠিক সেই সময় এল তৃপ্তি।

—বাবা, ওঠো। চান করবে না?

যে বিস্ফোরক এতক্ষণ ধরে তৈরী হচ্ছিল, এইবার সেটা ফেটে পড়ল। যে তৃপ্তির কোনো দোষ নেই, চার পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠিতে যার অপরাধের এক বিন্দু প্রমাণ নেই—শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে তারই দিকে বিদ্যুৎ বেগে ফিরলেন গৌরাঙ্গবাবু। গলা থেকে বিকৃত একটা জান্তব স্বর বেরুল: হারামজাদী—এ কার চিঠি?

তৃপ্তি থ হয়ে গেল।

—আমি তো জানিনে বাবা।

—জানিসনে?— গৌরাঙ্গবাবু ভুলে গেলেন রাস্তার ধারের বারান্দায় বসে আছেন তিনি, লক্ষ্য করলেন না তাঁর গলার অদ্ভুত আওয়াজে একজন ফিরিওলা এর মধ্যেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পাগলের মতো চিৎকার করে বলে চললেন: চিঠি কে লিখেছে তা জানিসনে? রাস্তায় বার হতে জানিস? পাড়ার যত বদমাস ছেলের চোখের সামনে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াতে জানিস? নইলে কেন আসে এই সব যাচ্ছেতাই চিঠি—কোত্থেকে এরা সাহস পায়?

তৃপ্তির মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেছে তখন। বারান্দায় একটা কাঠের খুঁটি আঁকড়ে ধরেছে প্রাণপণে।

—তুমি যে কী বলছ বাবা—

—চুপ—একটা কথা নয়। খুন করব তোকে হারামজাদী—খুন করে ফেলব—

চীৎকারে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল দীপ্তি, দরজার আড়ালে সভয়ে মুখ বাড়িয়েছিলেন দীপ্তির মা। সেই সময় পা থেকে এক পাটি চটি খুলে নিয়ে গৌরাঙ্গবাবু ছুড়ে মারলেন তৃপ্তির দিকে। সেটা তৃপ্তির গায়ে লাগল না—দীপ্তির কপালে গিয়ে পড়ল। আর গৌরাঙ্গবাবু জলচৌকি থেকে উলটে পড়লেন বারান্দার উপর—মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ করে একটা আওয়াজ বেরুতে লাগল মৃগী রোগীর মতো।

"......................এ কার চিঠি?"

অমিয় তার মা-র সঙ্গে কথা বলছিল। আধবোজা চোখে বিছানায় পড়ে শুনতে পাচ্ছিলেন গৌরাঙ্গবাবু।

—আর বলতে হবে না মা। আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। এ ওই অমলের কাজ।

—কোন অমল? ওই হলদে বাড়ীটার ছেলে?

—আবার কে। তুমি জানো না মা,

কী ভয়ংকর চীজ ও। দাঙ্গার সময় বোমা ফাটিয়ে আর মানুষ মেরে হাত পাকিয়েছে। মস্ত দল আছে ওদের—এ তল্লাটে সবাই ওদের ভয় করে।

—পুলিশ কিছু বলে না?

—পুলিশ!—অমিয় হাসল : পুলিশ ওদের টিকি ছুঁতে পারে না।

—তাই বলে ওরা যা খুশি করবে? দেশ কি অরাজক?

আবার হাসির শব্দ শোনা গেল অমিয়র।

—জোর যার মুল্লুক তার মা। চেপে যাও। বাবাকে বলে দিয়ো এ নিয়ে যেন ঘাটাঘাটি করতে না যান। মুস্কিল হবে তা হলে।

বিছানাটা পিঠের তলায় পিনের মতো ফুটতে লাগল। গৌরাঙ্গবাবু বালিশে পিঠ দিয়ে উঠে বসলেন। ডাকলেন, অমিয়!

বাইরে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অমিয় ভেবেছিল বাবা ঘুমুচ্ছেন।

আবার ডাক এল : অমিয়!

গুটি গুটি পায়ে অমিয় ঘরে এল।

—অমলের কথা কী বলছিলি?

বাপের চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা নামালো।

—বলছিলুম তিপুকে তুমি মিথ্যেই বকছিলে বাবা। এ অমলের কাণ্ড। কিন্তু ওকে ঘাটালে ভালো হবে না—পেছনে গুণ্ডার দল আছে।

গৌরাঙ্গবাবুর সমস্ত মন ঘৃণায় কুঁকড়ে গেল। বারোজন ডাকাতের সামনে তাঁর বাবা লাঠি ধরে বাধা দিয়েছিলেন, একজনও সামনে এগোতে পারেনি, দূর থেকে বন্দুক ছুড়ে খুন করেছিল। এরা তাঁর বংশধর নয়। ভীরু, মেরুদণ্ডহীন। কেঁচোর চাইতেও কদর্য।

—অমলকে ডেকে আনতে পারিস একবার?

প্রায় লাফিয়ে উঠল অমিয়। যেন সাপের ছোবল পড়েছে গায়ে।

—ওকে কিছু বলতে যেয়ো না বাবা। বাড়ীতে বোমা ফাটিয়ে দেবে।

ছেলের মুখে থুথু ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করল গৌরাঙ্গবাবুর। একটা অমানুষিক চেষ্টায় আত্মদমন করলেন তিনি।

—ভয় নেই, তোর মাথায় কেউ বোমা ফাটাবে না। আর বোমা ফাটালেও কিছু হবে না তোর মাথার। তুই অমলকে ডেকে আন একবার। আমি মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বলব।

অমিয় তবু দাঁড়িয়ে রইল। সকালের ওই বীভৎস ব্যাপারটার পরে বাবা অমলের সঙ্গে এ নিয়ে খুব মধুর ভাষায় আলাপ করবেন, এ কথাটা সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না।

—কী, সাহস হচ্ছে না।

বাপের ঘৃণা ঠিকরে-পড়া মুখের দিকে তাকিয়ে অমিয় আবার মাথা নামালো। চোরের মতো বললে, যাচ্ছি। কিন্তু বাবা—

—বললুম তো, খুব খাতির করে কথা বলব ওর সঙ্গে। দরকার হলে চা আর জলখাবার খাওয়াব। তুই ডেকে আন একবার।

—আচ্ছা দেখছি—ফাঁসির আসামীর মতো বেরিয়ে গেল অমিয়।

স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। ভয়ে ছাইয়ের মতো মুখ।

—অমলকে ডেকে পাঠালে?

—হুঁ।

—কিন্তু অমিয় বলছিল—

—সামনে থেকে সরে যাও আমার—গৌরাঙ্গবাবু গর্জন করলেন।

দেশে মনুষ্যত্ব নেই, বিবেক নেই, আইন নেই, কিছুই নেই। শুধু এই নারকেলডাঙার গলিতে নয়—বড়ো বড়ো রাস্তা, রাশি রাশি মোটর আর চোখ-ধাঁধানো অতিকায় প্রাসাদের এই কলকাতায় মানুষ সুন্দরবনে বাস করছে। কিংবা এই শহর আর মাটিতে নেই—মেঘের ওপর ভর করে হাওয়ায় ভেসে চলেছে, তার চারদিকে চমকাচ্ছে সর্বনাশের বিদ্যুৎ। একদিন আকাশ ফাটিয়ে একটা গুরু গুরু আওয়াজ উঠবে, তারপর সব কিছু রেণু রেণু হয়ে বৃষ্টির কণার সঙ্গে দিকে দিকে ঝরে পড়বে।

দেওয়ালে আর ছাতের গায়ে বৃষ্টির যে সব এলোমেলো বাদামী রেখা পড়েছে, সেইগুলোর দিকে তাকিয়ে এই সব কথা ভাবছিলেন গৌরাঙ্গবাবু। প্রায় আধ ঘণ্টা হল বেরিয়ে গেছে অমিয়। বিকেল পার হয়ে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ঘরের ভেতরে ছায়া ছড়াচ্ছে—দেওয়ালের রেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে ক্রমশ। আর অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই ভবিষ্যৎটা।—যার ওপর আশ্রয় করে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন তিনি।

অভয় কখন বাড়ী ফিরেছে গৌরাঙ্গবাবু টের পাননি। তার উত্তেজিত পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন।

অভয় বললে, মা-র কাছে সব শুনলুম বাবা। এত বড় আস্পর্দা! ওই রাস্কেলটার কান দুটো যদি ছিঁড়ে না নিই তো—

আর তখন অমিয় এল।

—অমল আসতে চাইল না বাবা।

হিংস্র রুক্ষ স্বরে অভয় বললে, কী বলেছে?

—বলেছে অমল চৌধুরী কারুর বাড়ী যায় না। যার গরজ আছে, সে যেন তার বাড়ীতে আসে।

অভয় চিৎকার করে উঠল : ঘাড় ধরে টেনে আনতে পারলি না?

—ঘাড় ধরে!—পাংশু মুখে অমিয় বললে, তার ঘাড়ে হাত দেবে, এমন বুকের পাটা কার আছে! আরো বলেছে কী জানো? চিঠি যদি লিখেই থাকি, বেশ করেছি। দেখি কোন্—সামলে নিয়ে বললে, দেখি কে আমার কী করতে পারে?

গৌরাঙ্গবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই চেঁচিয়ে উঠল অভয়।

—গরীব বলে ইজ্জৎ নেই আমাদের? আচ্ছা, দেখে নিচ্ছি একবার। আমিও ইস্টবেঙ্গলের ছেলে—গুণ্ডাকে ঠাণ্ডা করতে জানি।

সদ্য ডিউটি থেকে ফেরা, ক্ষুধিত ক্রুদ্ধ অভয় একটা বাঘের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একটা কথা বললেন না গৌরাঙ্গবাবু—

অমিয় দাদার পিছে পিছে ছুটল তাকে ঠেকাতে। শুধু অসহায় গলায় ডাকতে লাগলেন গৌরাঙ্গবাবুর স্ত্রী : অভয়—অভয়—শোন—শুনে যা—

অভয় শুনল না। আর রাস্তায় বেরিয়েই দেখল অমলকে। ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত পুরে সিগারেট টানছে।

পথে ইলেকট্রিক আলোটা জ্বলে উঠল তখন। সেই আলোয় অভয় দেখল, চোখ দুটোকে বাঁকিয়ে একটা বিচিত্র উপেক্ষার ভঙ্গিতে অমল তাকিয়ে আছে তার দিকে।

—আমার বোনের নামে চিঠি লিখেছ তুমি?

—কোন্ শালা বলে?

অমিয় হাঁ-হাঁ করে ওঠবার আগেই হাতের মুঠোটাকে লোহার পিণ্ডের মতো পাকিয়ে সজোরে অমলের মুখে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলে অভয়। অমলের ঠোঁট থেকে তিন হাত দূরে ঠিকরে পড়ল সিগারেটটা। (ক্রমশ)

সাম্প্রতিক বাঙলা ছোট গল্প : ভিন্ন বিচার

'অমৃতের' বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্য ও রসবিচার প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ববিরোধ-পীড়িত বিশ্লেষণ সমালোচকের নিরাসক্ত দৃষ্টির পরিচয় বহন করে না। বাংলা গল্প-সাহিত্যের প্রসঙ্গ-প্রকরণ বৈপরীত্যে বিপর্যস্ত একটি নিষ্ফল ঋতুকে তত্ত্ববিলাস ও আবেগের মোহে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা মর্যাদা আরোপ করেছেন।

সামগ্রিক অসঙ্গতির মধ্যে উপসংহারের অংশটির সঙ্গে মূল বক্তব্যের যুক্তি-বিন্যাসের অন্তর্বিরোধটি প্রবল। সরোজবাবুর আলোচনায় গভীর বাস্তবতাবোধে উজ্জ্বল উপসংহারটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিস্ময়ের কথা, সাম্প্রতিক চেতনা-স্রোতাশ্রয়ী গল্পের রসবিচারপ্রসঙ্গে সরোজবাবু তাঁর এই সূক্ষ্ম বাস্তবতা-বোধের প্রয়োগে নিস্পৃহ। এই নিস্পৃহা নিঃসন্দেহে তত্ত্ববিলাসের আবেগপ্রবণতা-সঞ্জাত; একটি অলক্ষ্য অন্তর্বন্ধনের সূত্রে আজ বাংলা গল্পের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ-প্রসঙ্গে তাই "একদা" ও "অন্তঃশীলার" প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্ধারের প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে। সূক্ষ্ম ও গভীর বাস্তবতাবোধে সমৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় ধূর্জটি-প্রসাদ ও গোপাল হালদার কথাসাহিত্যের সাধনার ক্ষেত্র থেকে বাস্তবতাবোধ পরিচালিত হয়েই ভিন্নতর ক্ষেত্রে সাধনা করেছেন; সরোজবাবুর পরিণতিও মোটামুটি সেই খাতে প্রবাহিত। কেন এমন হল?—এ প্রশ্ন বর্তমান আলোচনায়ও সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। গভীর বাস্তবতাবোধে প্রসঙ্গের ইঙ্গিত তাঁরা পেয়েছিলেন কিন্তু উপযুক্ত প্রকরণটির সন্ধান পাননি কারণ মূলতঃ তাঁদের চিন্তাশীলতায় প্রকরণ-সাধনার ব্যাঘাত ঘটেছিল; প্রসঙ্গ-প্রকরণের অন্বিত মহিমাটি ব্যক্ত হয়নি; কথাসাহিত্যিকের মানস-ধর্ম তাঁদের ছিল না। বাংলা গল্প-সাহিত্যের ঐতিহ্যের ধারা অনুসন্ধানে তাই 'অন্তঃশীলা' ও 'একদা'র ব্যর্থ প্রকরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার উল্লেখ নিরাসক্ত দৃষ্টির পরিচয় বহন করে না।

সাম্প্রতিক চেতনাস্রোতআশ্রয়ী গল্পের রসবিচার প্রসঙ্গে সরোজবাবু "দিন-দিনান্তর বিস্তৃত ব্যাপকতম বাস্তবতার" কথা বলেছেন;—এই সমগ্র বাস্তবতা সাম্প্রতিক বাংলা গল্পলেখকদের শিল্পী-মানসে রূপপ্রার্থনা করায় তাঁরা নাকি বিচলিতবোধ করেছেন: 'সর্বতোমুখী সচেতনতার' বিস্তারে নূতন প্রকরণ-বন্ধনে তাঁরা এই ব্যাপকতা নিরবধি কাল বিস্তৃত বাস্তবতার প্রসঙ্গকে রূপদানের সাধনায় নিমগ্ন! এই বাস্তবতার বিশিষ্ট স্বরূপটিকেও বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ—"বাস্তবতার

দুই মহল। তার বাইরের মহলে নানা লোকের ভিড়, অনেক জনের আনাগোনা সেখানে নানা চমক, নানা ঘটনা। কিন্তু আরও একটা বাস্তবতা আছে, সে থাকে অন্দরে, সাধারণ দৃষ্টির অন্তরালে...... তাকে জানলে তবে জানা যায় সেই অন্তরঙ্গ জীবনকে, সেই বাস্তবের সারাৎসারকে, তরঙ্গের অন্তর্লীন গভীরতাকে।"—বিশ্লেষণে উচ্ছ্বাস আছে কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতাবোধ আছে কি?—যে বাস্তবতাবোধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসঞ্জাত? অন্দরমহলের অবগুণ্ঠিত বাস্তব কি ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্ক রসায়নসম্ভূত,—নিরবয়ব?—না বাইরের প্রত্যক্ষ বাস্তবের অভিঘাতে, অভিযোজনায়, সংযোগ-বিপ্রয়োগে সূক্ষ্ম, গভীর স্বরূপে নির্দিষ্ট? পরোক্ষ বাস্তবতার এই আন্তর রূপটি প্রত্যক্ষ বাস্তবতার সূক্ষ্ম অভিঘাতে সৃষ্ট মাত্র। বিচিত্র ও গভীর জীবন-পরিচয়ে প্রত্যক্ষ বাস্তবতাবোধের সমৃদ্ধি; অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে আন্তর বাস্তবতার ব্যঞ্জনাময় বিস্তার। ব্যক্তির স্মৃতি, চিন্তা, ধ্যানধারণা প্রত্যক্ষ বাস্তবতার অভিঘাতে নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যক্তিটি অবশ্যই স্বয়ম্ভূ চৈতন্যের জগতে মাত্র বিচরণ করেন না। সমষ্টি-নিরপেক্ষ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের প্রতিধ্বনি জানিয়ে সরোজবাবু উচ্চারণ করেছেন—"ব্যক্তির মুকুরে সভ্যতার ব্যাধিমূলই সন্ধেয়"। (!) ব্যাধি লক্ষণ হলে তবুও কথা ছিল। ব্যাধিমূলে সন্ধানের জন্য সরোজবাবু যে ব্যক্তিচৈতন্যের সন্ধান করছেন চেতনা-স্রোতাশ্রয়ী, প্রকরণবিলাসী সাম্প্রতিক বাংলা গল্পসাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি অবশ্যই তার সন্ধান পাবেন—এবং এটি আমারও বক্তব্য। নিরবধি কালের ব্যঞ্জনাকে চৈতন্যস্রোতের ধারায় এরা ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাই সাম্প্রতিক বাংলা ছোট-গল্প-লেখকদের অনেকেরই গল্পের বিষয় হ'ল "সময়"—যে মানুষ ইতিহাস রচনা করে সেই মানুষ নয়; তবুও সরোজবাবু এই গল্পগুলির মাধ্যমে সামাজিক ব্যক্তির ভূমিকা খুঁজতে চান—তাঁর বাস্তবতা-বোধের এখানেই ত্রুটি ঘটেছে বলে সন্দেহ হয়।

উপসংহারে সরোজবাবু একটি বিশেষ আশংকার কথা উল্লেখ করেছেন—"জগৎ সংসারের অলীকতাবোধ ও মৃত্যুর অনিবার্যতাবোধ যেন প্রসঙ্গ হিসাবে বেশী মর্যাদা পাচ্ছে।" এই বিশেষ আশংকাটি একটি অনিবার্য পরিণতি মাত্র। সচেতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আত্ম-কেন্দ্রিকতা ও অর্ধচেতন বাস্তবতাবোধ-হীন প্রকরণ-বিলাস এর বেশী আর কিছু দিতে পারে না। প্রকরণ-কৈবল্যের জন্ম-রহস্যের মূলেই এই অনিবার্য পরিণতিটির জন্মপরিচয় নিহিত। সংসারের অলীকতাবোধ ও মৃত্যুর অনিবার্যতাবোধ আত্মকেন্দ্রিকতার পরম উপলব্ধি। সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির সাযুজ্য-বৈষম্যে যে বাস্তবতাবোধ মর্যাদা পায়নি—সময়ের কাছে অবসন্ন আত্মসমর্পণে যে ব্যক্তিচৈতন্যের উদ্ভব—আঙ্গিকবিলাসে তার এই চরম পরিণতিই ত' রূপ পেতে পারে। বোধ-সঙ্কটের ফলে বিষয়-নির্বাচনে আজ যে কৃত্রিমতা দেখা দিয়েছে সেটা কোনো আকস্মিক ব্যতিক্রম নয়। উজ্জ্বলতাবিলাসী নবাগতের দল যে মরীচিকার মোহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল "চাঁদের মহলা" আর "চোখের পিচুটিতেই" তার অভিজ্ঞতার শেষ সম্বল!

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর মৃত্যুপরিকীর্ণ, বিপর্যস্ত মূল্যবোধ ও বিচলিত প্রত্যয়ের অস্থির ভূমিতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাদের চেতনাকে আলোড়িত করেছে সত্য;—কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের সংঘর্ষের সংকট মুহূর্তে পরিবেশের সঙ্গে মানস অভিযোজনীয় গভীর বাস্তবতাবোধ ও নবপ্রত্যয়সৃষ্টির সাধ্য-সাধনা সামান্য শিল্পীর ক্ষেত্রে দুর্লভ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, আত্মকেন্দ্রিক, সংশয়ী এই সামান্য শিল্পীরা স্বভাবতঃই নৈরাজ্যের দাস।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের গল্প-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। আত্মকেন্দ্রিকতার মোহাচ্ছন্ন, সংশয়ী, নৈরাজ্যবিলাসী, হতাশাবাদীদের মধ্যে বিমল কর, সন্তোষ ঘোষ প্রমুখ কতিপয় গল্পলেখক কাহিনীর ভারমুক্ত, চেতনাস্রোতাশ্রয়ী প্রসঙ্গ-প্রকরণের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবর্তনা করেন। প্রসঙ্গ-প্রকরণের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্বভাবতঃই গভীর বাস্তবতা-বোধসমৃদ্ধ ছিল না। সাগরপারের গল্প-সাহিত্যের ধারা-প্রকৃতির অনুকরণ অনেকাংশে এর প্রেরণা সঞ্চার করেছে: এদেশের মাটিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপের বাস্তবতার বিন্যাসবিভঙ্গের আক্ষরিক প্রতিরূপ স্বীকৃতি থেকেই এই ভ্রান্ত অনুকরণমোহের সৃষ্টি। এই প্রয়াস বাংলা গল্প-সাহিত্যের "বহতা প্রাণস্রোতের" পরিচয় আদৌ বহন করে না বরং একটি জটিল, অন্তর্মুখী আবর্তের সংবাদ জানায় মাত্র। পরম দুর্ভাগ্যের কথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তবতাসমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধারা থেকে এঁরাই সাম্প্রতিক বাংলা গল্পলেখকদের বিচ্যুত করেছেন এবং ভ্রান্তিবিলাসের মোহাচ্ছন্ন হাতছানিকে নবাগতের দল সুস্থ পথের ইঙ্গিত ভেবেছেন। সরোজবাবু সূক্ষ্ম বাস্তবতাবোধে সমৃদ্ধ সার্থক সমালোচ-

কের দায়িত্ব পালনে' এখানেই ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে হয়।

সুস্থ জীবনদৃষ্টি রচনায় সূক্ষ্ম ও গভীর বাস্তবতাবোধ অপরিহার্য; এটি একটি মৌলিক দার্শনিক প্রক্রিয়া। সুস্থ জীবনদৃষ্টি থেকে জন্ম নেয় পরিচ্ছন্ন বিন্যাসবোধ: অভিজ্ঞতার আপাত-নৈরাশ্যের জগতে সার্থক রসশিল্পীর কাছে এই বিন্যাসবোধ একটি বিস্ময়কর মূলমন্ত্র। মৃত্যুপরিকীর্ণ, বিচলিত প্রত্যয়ের পটভূমিতে এই বিন্যাসবোধের অভাব শিল্পীকে ভ্রান্তিবিলাসের হাতছানিতে নৈরাজ্যের দাসত্ববরণের প্রলোভন দেখায়। সময়-নায়কের কাছে অবসন্ন আত্মসমর্পণ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার স্বয়ম্ভূ, নিরপেক্ষ ব্রহ্মাণ্ড-নির্মাণ নৈরাজ্যের দাসত্ববরণের পরাজয়-লক্ষণ মাত্র। সরোজবাবু যাকে বাঙালী গল্পলেখকের "সর্বতোমুখী সচেতনতা" বলে গৌরবময় আখ্যা দিয়েছেন মূলতঃ তা নৈরাজ্যের দাসত্বে অবসন্ন, বিচূর্ণ চেতনা। ক্ষণপ্রশংসা-লোভে উজ্জ্বলতাবিলাসী জীবন-বিমুখ নবাগত লেখকের দল বিমল কর-সন্তোষ ঘোষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সহজলভ্য ফলশ্রুতিকেই পরমপ্রাপ্তি বলে কুড়িয়ে পেলেন। সুতরাং—"নতুন আবির্ভাবের প্রায় সকলেই গল্পের নতুন প্রসঙ্গ-প্রকরণকেই যেন আঁকড়ে ধরছেন। নতুনেরা কেউই গতানুগতিক কাহিনী-প্রাণ গল্প লিখতে চাইছেন না"—এ স্বীকৃত সত্য বেদনাদায়ক সংকটেরই ইঙ্গিত বহন করে মাত্র।

'কাহিনী-সূত্র পরিহারের প্রতিক্রিয়া' বলে নায়কের স্মৃতিলোকের যে সামগ্রিক ব্যবহারকে সরোজবাবু চিহ্নিত করেছেন সেটিই সম্ভবতঃ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকার এবং কাহিনী-সূত্র পরিহারের প্রতিক্রিয়া থেকে মোটেই তার জন্ম নয়, আর এ স্মৃতি আদৌ প্রত্যক্ষ বাস্তব-নিরপেক্ষ নয়।

সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের প্রধান ধারাগুলির স্বরূপ নির্ণয়ই সরোজবাবুর আলোচনার লক্ষ্য; এই প্রসঙ্গে "প্রচলিত গল্পপাঠের পদ্ধতিতে যাঁরা অভ্যস্ত প্রতিমুহূর্ত-সচেতনার পূর্ণ গল্পগুলোকে তাঁরা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না" বলে সরোজবাবু কিছু পাঠকের রসবোধের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সাহিত্য-বিচারকের নিরাসক্ত দৃষ্টি তাঁরও সর্বক্ষেত্রে পরিক্রমণ করেনি; না হলে বাংলা গল্প-সাহিত্যের বিকারগ্রস্ত, প্রতিক্রিয়াশীল অন্য একটি ধারার প্রতিও তিনি ইঙ্গিত করতেন, যদিও সে ধারাটি বর্তমান আলোচিত চেতনাস্রোতাশ্রয়ী ধারার মতই অপ্রধান। ছাঁৎমার্গলাঞ্ছিত সমালোচকের দৃষ্টি নিছক প্রসঙ্গ-সর্বস্বতায় পীড়িত গল্প-সাহিত্যের তৃতীয় ধারাটিকে চিহ্নিত করেনি;—যে গোপন ধারায় সাধু-সন্ত, অবধূতের অতীত, জীর্ণপ্রত্যয়ের বিকারাশ্রয়ী কাহিনী পরিবেশন প্রত্যয়ের সংকটকে গভীরতর করে তুলছেন। যোগভ্রষ্ট তারাশংকরের অতীত প্রত্যয়সঞ্জাত প্রসঙ্গ-সর্বস্বতার প্রশ্রয় সংগোপনে অবধূতের আবির্ভাবের পথরচনা করেছে। প্রসঙ্গ-সর্বস্বতার মেরু-মায়ার কোনো কোনো স্বনামধন্য লেখক কল্পলোকে পুরানো প্রত্যয়ের স্থিরভূমির মোহবন্ধনে ধর্মাশ্রয়ী, সংস্কারবাদী রোমান্টিক রোমন্থনে শ্রুতিমোহ সৃষ্টি করছেন। নব প্রত্যয়ের প্রস্তুতিসাধনক্ষেত্র ও প্রচলিত প্রত্যয়াশ্রয়ী জগতে আজও যাঁরা বিচারণ করে চলেছেন সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও নরেন্দ্র মিত্র তাঁদের মধ্যে প্রধান।

শম্ভু মুখোপাধ্যায়
কলকাতা।

॥ উপন্যাসোপম গল্প প্রসঙ্গে ॥

সম্পাদক সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,

'অমৃতের' ২০শে এপ্রিলের ৫০ সংখ্যায় শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত মহাশয়ের 'উপন্যাসোপম গল্প প্রসঙ্গে' শীর্ষক সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধটি পড়ে আনন্দ পেলাম। পাঠক ও লেখক উভয় মহলেই এ জাতীয় প্রবন্ধের উপযোগিতা ও চাহিদা আছে। যদিও প্রবন্ধটি আলোচনা সাপেক্ষ।

কতগুলি বিষয়ে শ্রীদত্তের সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। তাঁর প্রবন্ধের একটা ছোট উদ্ধৃতি দিই—

(১) 'কিন্তু একেবারে সাম্প্রতিক কালে এসে বর্তমান উপন্যাস লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত উপন্যাসের টেকনিকগত সেই উচ্চমান আর লক্ষ্য করি না। অবশ্য এর মধ্যে আমরা তারাশংকরের ও 'বনফুলের' উপন্যাসকে বাদ দিচ্ছি কারণ সাহিত্যের ফর্ম হিসাবে উপন্যাসের মৌলিক গুণ তাঁদের সৃষ্টিতে বর্তমান।'

আমার জিজ্ঞাস্য হ'ল, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী, শ্রীতারাশংকর ও 'বনফুল' ছাড়া বর্তমানে বাঙলার একজন ঔপন্যাসিকও কি একটি মৌলিক উপন্যাস লেখেননি? কিংবা রবীন্দ্র-বঙ্কিমের টেকনিকগত উচ্চাদর্শ 'বনফুল'-তারাশংকরের সৃষ্টির সীমারেখায় সীমিত হয়ে গেছে?

শ্রদ্ধেয় প্র-না-বি'র 'কেরী সাহেবের মুন্সী', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পদসঞ্চার' কিংবা বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' কি অতি-আধুনিক সমরেশ বসু, দীপক চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও শংকরের যথাক্রমে 'গঙ্গা', 'শঙ্খবিষ' 'বারোঘর এক উঠান' ও 'কত অজানারে'র মৌলিকতা সর্বজন স্বীকৃত।

এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ওঁদের (বনফুল-তারাশংকর) তুলনায় বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন। এঁদের সকলের সুখ্যাতির-সৌরভ এখনও হয়ত বহু-বিস্তৃত হয়নি। কিন্তু তাই বলে বনফুল-তারাশঙ্করের উল্লিখিত পরবর্তীরা অমৌলিক অপাংক্তেয়, অনাদর্শবাদী একথা স্বীকার করতে অন্ততঃ আমি রাজি নই। রবীন্দ্র-বঙ্কিমের উচ্চাদর্শ ও মৌলিকত্ব কেবল প্রবীণ লেখকদ্বয়ের একচেটিয়া সম্পদ, এমন সিদ্ধান্তই বা প্রভাতবাবু আবিষ্কার করলেন কোথা থেকে? অবশ্য একথা তিনি কোথাও জোর গলায় স্পষ্ট করে লেখেননি, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এই রকম একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল।

(২) প্রভাতবাবু বলেছেন 'কাব্যের এলায়িত ও পল্লবিত ভাষা উপন্যাস সৃষ্টির মোটেই উপযোগী নয়।'

আমার প্রশ্ন হ'ল রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমকে নিয়ে। এঁরা দুজনেই তো অতিমাত্রায় কাব্যিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' থেকে সুরু করে 'গোরা' পর্যন্ত আমরা একটা অবিচ্ছিন্ন কাব্যের সুর শুনতে পাই। বঙ্কিম সম্বন্ধেও ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। কিন্তু তাঁদের ভাষা অলংকার-বর্জিত, অনাবলীল একথা নিশ্চয় স্বয়ং প্রভাতবাবুও স্বীকার করতে নারাজ।

আমার মনে হয় ঔপন্যাসিকের পক্ষে ভাব ও ভাষা দুটিই সমান প্রয়োজনীয়। তবে একথা ঠিক, তাঁর লেখা যেন ভাব-সর্বস্ব না হয়ে ওঠে। ভাষা এলায়িত ও পল্লবিত হলে খুব ক্ষয়-ক্ষতি নেই। কারণ উপন্যাসের পরিসর বড়।

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বোধশক্তির গভীরতা, চরিত্র-চিত্রণ ও বিশ্লেষণে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির ঊর্ধ্বে আর একটা জিনিস আছে যার নাম অভিজ্ঞতা। শিল্পী-মন অভিজ্ঞতার আগুনে না পুড়লে সার্থক সৃজনশীল উপন্যাসের সৃষ্টি হতে পারে না। ক্লাস্কি বলেছেন, "Man is a prisoner of his own experience". মানুষ অভিজ্ঞতার কয়েদী। বলা নিষ্প্রয়োজন, ঔপন্যাসিক মানুষ সমাজেরই অন্তর্গত। কাজেই, তিনি অভিজ্ঞতার আলোয় যা মন-মন্থন করেন তার দাম নেহাত অল্প নয়।

নমস্কারান্তে ইতি—
বিনীত—প্রেমজ্ঞান বসু,
সরোজিনীনগর,
নতুনদিল্লী—৩।

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ছাব্বিশ ।।

এ যাত্রায় শেষবারের মতো মস্কো ফিরে যাচ্ছিলুম। আমার ভ্রমণকালের শেষপর্যায়ে এসে পৌঁছতে আর বিলম্ব নেই।

পূর্বে ও পশ্চিমে কাশ্যপ এবং কৃষ্ণসাগরকে পিছনে ফেলে সোজা উত্তরে বিমানটি উড়ে যাচ্ছিল দূরশূন্যে। পায়ের তলায় একে একে পেরিয়ে যাচ্ছিল রুস্তভ-অন্‌-ডন্‌, ভল্‌গোর মোহানা, সেই সুবিশাল 'কালামাটি' ভূভাগ। ট্রান্স-ককেশিয়া থেকে এবারের মতো বিদায় নিয়ে চললুম।

কিন্তু এই যাত্রায় যে-ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রহস্যপুরুষটি আমার মনকে পেয়ে বসেছিল, সে-ব্যক্তি লেনিন নয়,—রাসপুটিন! রমানভ রাজবংশের ইতিহাসে এত বড় প্রসিদ্ধিলাভ আর কেউ করেনি, এবং পৃথিবীর অপর কোনও রাজবংশের কাহিনী এমন করেও আর কোনওদিন কলঙ্কিত হয়নি। জারতন্ত্রের ফুটো নৌকা একদিন অবশ্যই ভরাডুবি হতো, কিন্তু এই ব্যক্তির মতো অপর কেউ সেই নৌকাকে অকূলে নিয়ে গিয়ে এর আগে খানখান করে দেয়নি!

এই ব্যক্তির জন্ম হয় সাইবেরিয়ার অন্তর্গত 'পেকভস্কি' নামক অঞ্চলে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, এবং এর পূর্বনাম ছিল 'গ্রেগরি নভিক'। এই বিশালকায় ও শক্তিমান ব্যক্তিটি এক ধরণের কাপালিক সন্ন্যাসী ছিল কিনা, এটি সুস্পষ্টভাবে কেউ বলে না। কেউ একে বলে, তাতার বংশীয় যাযাবর, কেউ বা বলে জিপসি সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ব্যক্তি এক ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ! পুরনো ইতিহাসে এ ব্যক্তির কাহিনী যাই থাক, সোভিয়েট ইতিহাসে এর সম্বন্ধে কোথাও তেমন কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। রুশজাতি অথবা সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্ব-কলঙ্কচিহ্নিত কোনও প্রকার কাহিনী বা ইতিবৃত্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রকাশিত হয় না। আপন কীর্তির ইতিহাস ভিন্ন অপর কোনও ইতিহাস সোভিয়েট ইউনিয়নে দুষ্প্রাপ্য। ওঁরা প্রায় প্রতি কথাতেই বলেন, গতস্য শোচনা নাস্তি! ওঁরা আপন পূর্বইতিহাস সম্পূর্ণ ভুলতে চান্‌।

রাসপুটিনের খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিলাভ করে পদে-পদে। তার পারিবারিক পরিচয় রহস্যাবৃত, এবং তার স্থায়ী আস্তানা কোথাও ছিল না। লোকটা ছিল গণৎকার এবং ভবিষ্যৎ-বেত্তা। তার পোশাক ছিল ধর্মযাজকের। তার ভঙ্গী, চালচলন, বাকপটুতা এবং চেহারা মিলিয়ে একটি অতি-মানবিক পরিবেশ সৃষ্টি হ'ত বলেই সে যুবা বয়সে একটি দুর্লভ জনপ্রিয়তা লাভ করে! যাদুবিদ্যায় রাসপুটিনের প্রসিদ্ধি ছিল, এবং সে ঝাড় ফুঁক, তুকতাক, টোটকা, মুষ্টিযোগ, বশীকরণ, মারণ-উচাটন, হঠযোগ—ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিল। ফলে, একটি বিরাট মূঢ় জনতা তাকে দেবতা জ্ঞান করত। ভাগ্য-বিড়ম্বিতা এবং অশিক্ষিতা গ্রামীন স্ত্রীলোকেরা তার সেই দশাসই চেহারা, বৈরাগীসুলভ আলখাল্লা, তার বড় বড় চোখ, উন্নত ললাট এবং সুগঠিত দেহশ্রীর দিকে মুগ্ধ চক্ষে চেয়ে থাকত! রাসপুটিন একদা মৎস্য-ব্যবসায়ী ছিল, এবং চুরির দায়ে একবার নাকি জেল খাটতেও হয়েছিল। মদ এবং মাদকের নেশায় সে ডুবে থাকত, এবং আপন ইচ্ছাক্রমে সে নিজের নাম নিয়েছিল 'রাসপুটিন',—যার অন্যতম শব্দার্থ, অসচ্চরিত্র! অনেকের ধারণা, সে মস্ত যোগী, এবং সে নাকি মৃতসঞ্জীবনীর সন্ধানও জানে! মানুষের ভাগ্যবিচারের ব্যাপারে সে 'বাকসিদ্ধ' পুরুষ,—এমন রটনাও ছিল।

তার ৩২ বৎসর বয়সকালে একদা সেণ্ট পিটার্সবার্গে সে যাযাবরদের এক তাঁবুতে বসে রাজধানীর মূঢ় নর-নারীর সামনে তার নানা ভেল্কি দেখাচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তার খ্যাতির সংবাদ গিয়ে পৌঁছয় রাজপ্রাসাদে—যেখানে সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দার শিশুপুত্র রিকেট, রক্তক্ষরণ ও আজন্ম দুষ্ট-ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত ছিল! সম্রাজ্ঞী এই দৈবজ্ঞের খবর পেয়ে একদিন এক অশ্বারোহী পাঠিয়ে রাজধানীর উপান্তবর্তী প্রান্তরের তাঁবু থেকে রাসপুটিনকে তুলে আনালেন রাজপ্রাসাদে! শালপ্রাংশুর মতো দীর্ঘ সুন্দর রূপবান এক সন্ন্যাসী এসে দাঁড়াল সম্রাজ্ঞীর সামনে! রাস-পুটিনের দৃষ্টিতে ছিল একপ্রকার আশ্চর্য বন্য সম্মোহন, আলেকজান্দ্রা সেই সম্মোহনী আকর্ষণ থেকে রক্ষা পেলেন না! পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে রাসপুটিন যখন সেই রাজকুমারকে নিরাময় করে তুললেন, তখন সম্রাট দ্বিতীয় নিকলাস এবং সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা সেই ব্যক্তির 'কেনা গোলাম' হয়ে গেলেন! রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এবং সম্রাজ্ঞীর হৃদয়ে রাসপুটিনের স্থায়ী আশ্রয় মিলে গেল!

সেটি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম রুশবিপ্লবের বৎসর,—সে-বৎসর শত শত নরনারী ও বালক বালিকা অন্নবস্ত্রলাভের জন্য একটি দরখাস্ত নিয়ে যায় রাজপ্রাসাদে, এবং সম্রাট সৈন্যের দ্বারা 'হৃদয়হীন' সাকোর নিকট আক্রান্ত হয়। এতে ৭০ জন নর-নারী মারা যায়, এবং শত শত ব্যক্তি গুলীবিদ্ধ হয়। "রুটির বদলে গুলী"—এই কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়ে রুদ্ধ আক্রোশ দাঁড়িয়ে ওঠে চতুর্দিকে। সেই কুখ্যাতকলঙ্কিত দিনটি ছিল ২২শে জানুয়ারী রবিবার। অতঃপর ওই দিনটির নাম দেওয়া হয়েছিল, "Bloody Sunday"।

দেশের ঘনায়মান দুঃসময়ে আলেকজান্দ্রা এই ভবিষ্যৎবেত্তা, সন্ন্যাসী, গুরুস্থানীয় এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন 'মহাপুরুষ' রাসপুটিনকে সম্রাটের প্রাসাদের সর্বপ্রকার বৈভবের মধ্যে রেখে দিলেন, এবং দ্বিতীয় নিকলাস তাঁর এই 'প্রতিভাময়ী' স্ত্রীর একপ্রকার ব্যবস্থা-পনায় গর্ববোধ করতে লাগলেন!

তৎকালীন সম্রাট পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য পলরডেঞ্জ বলেছিলেন :

"The Emperor lacks real education or experience in affairs of state and most particularly any strength of character".

ক্রমে ক্রমে এমন একটি অবস্থা দাঁড়াল যে, সম্রাট তাঁর মন্ত্রী ও পারিষদ্‌-

দলকে বিশ্বাস না ক'রে কেবলমাত্র নির্ভর করলেন দুইজনের উপর—তাঁর জার্মান পত্নী আলেকজান্দ্রা এবং রাসপুটিন! লেনিনের বহুকালের বন্ধু ও সুলেখক David Shub বলছেন, "Rasputin's hold over the Empress came not only from his hypnotic gifts, which enabled him to check the bleeding of the haemophilic heir to the throne, but from his alleged powers as a clairvoyant. He became intermediary between Alexandra and God and played the same role for Nicholas. Rasputin had no program but he was always consulted when political appointments were made. This was his favourite domain. Here he filled his pockets without rousing the Czar's suspicion."

রুশ ইতিহাস এই কথা বলে, সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা দ্বাদশ বৎসরকাল অবধি রাত্রিকালে সম্রাটের শয়নকক্ষে প্রবেশ করা অপেক্ষা রাসপুটিনের নিভৃতকক্ষে ঢুকে তার শয্যার সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ানো বেশি পছন্দ করতেন! রাসপুটিনের আকর্ষণ সম্রাজ্ঞীর পক্ষে অপ্রতিরোধ্য ছিল, এবং নিকলাসের মতো দুর্বল, স্ত্রৈণ ও মেরুদণ্ডহীন পুরুষ যদি সম্রাটও হয়, তবুও সে স্ত্রীলোকের চোখে প্রিয় হয় না, এটি সত্য হয়ে উঠেছিল। রাজপরিবারের অনেকের ধারণা ছিল, সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার কোন কোনও নাবালক সন্তানের জনক হলেন স্বয়ং রাসপুটিন!

রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন চরম দুর্গতিতে পরিণত হয়, তখন এই দেশের, সমাজের, রাষ্ট্রের এবং সম্রাট-পরিবারের পরম শত্রু সর্বশক্তিমান রাসপুটিনকে মন্ত্রীপরিষদের সভ্যরা এক নৈশভোজনে সুকৌশলে আমন্ত্রণ করেন। রাসপুটিনের পানপাত্রে সাংঘাতিক বিষ মিশ্রিত করা হয় এবং নির্বিবাদে সেই বিষ মদের সঙ্গে পান করেও তিনি অটল থাকেন। অতঃপর তাঁর টলটলে অবস্থায় তাঁকে কয়েকটি গুলীর দ্বারা বিদ্ধ করা হয়। শক্তিমান রাসপুটিন সেই অবস্থায় যখন পলায়ন করছিলেন তখন পুনরায় তাঁকে পিস্তল ও তরবারির দ্বারা আক্রমণ করা হয়! সেটি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বরের শেষরাত্রি! রাসপুটিনের অপমৃত্যুর সংবাদে আলেকজান্দ্রা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন, এবং সম্রাট দ্বিতীয় নিকলাস কেঁদে আকুল হন!

এই ঘটনার দুই মাস পরে রাশিয়ায় 'দ্বিতীয়' বিপ্লব উপস্থিত হয়, এবং তার পরিণামে কেরেনস্কি গভর্ণমেণ্টের নিকট শাসনভার ছেড়ে দিয়ে নিকলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় সমগ্র দেশে আনন্দ ও উৎসবের সাড়া পড়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী কেরেনস্কি সমগ্র দেশের অভিনন্দন লাভ করেন। লেনিন তখন ছিলেন রাশিয়ার বাইরে। তিনি এই সাফল্যমণ্ডিত 'বিপ্লবকে' অভিনন্দিত ক'রে ২০শে এপ্রিল, ১৯১৭ তারিখের 'প্রাবদায়' একটি ভাষণ প্রকাশ ক'রে রাশিয়া সম্বন্ধে বলেন, "the freest country in the world!" লেনিন তখন স্বদেশে ফিরতে চান।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের সারা বছরই হ'ল রুশবিপ্লবের কাল। একটির পর একটি বিপ্লবের ঢেউ ওঠে বসন্তে ও বর্ষায়। গাছের ফল একপ্রকার যখন পেকে উঠেছে তখন আসেন লেনিন! ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের মুখপাত্র কেরেনস্কি গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধন করাই ছিল বলশেভিক বিপ্লবের লক্ষ্য! কিন্তু সেইদিন থেকে প্রকৃত অরাজকতা আরম্ভ! রক্তহীন বিপ্লব ধীরে ধীরে রক্তময় হয়ে ওঠে।

সে যাই হোক, রাসপুটিন ছিলেন রমানভ রাজবংশের সর্বশেষ দুর্নীতি! কিন্তু সম্রাট-পরিবারের শেষ কাহিনীটুকুর জন্য ঈষৎ ঔৎসুক্য থেকে যায় বৈকি! ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে দেশব্যাপী অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কেরেনস্কি যে গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন, তাঁরই বিশেষ একটি সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে সম্রাটকে একা পেশকভ শহরে সরিয়ে দিয়ে অবশেষে তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। সেটি ছিল ১৫ই মার্চের মধ্যরাত্রি! রাজপরিষদের দুইজন সভ্য গুচকভ ও শুলগিন—এঁরা দুজনে একখানি দলিল সম্রাটের সামনে নিয়ে গিয়ে ধরেন, এবং নিকলাস তাতে সই ক'রে দেন। সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা পেট্রোগ্রাড থেকে বেরিয়ে স্বামীর কাছে পৌঁছাতে পারেননি। বিস্ময়ের কথা এই, জারের সিংহাসন ত্যাগ, 'সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী দলের' দেশব্যাপী জয়জয়কার, ক্ষমতা হস্তান্তর, সকল শ্রেণীর রাজবন্দীর মুক্তি, এবং স্বাধীনতালব্ধ দেশের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন, সমস্তগুলি যখন ঘটতে থাকে, তখনও লেনিন বা তাঁর দলবল এবং বলশেভিক পার্টির কেউ কোথাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু সেই ইতিহাস আমি বলতে বসিনি!

সিংহাসন-ত্যাগের পরেই সম্রাট নিকলাসকে সপরিবারে 'গ্রেপ্তার' করা হয় এবং পেট্রোগ্রাডের নিকটবর্তী "জারস্কয়ে সেলো" নামক একটি জনপদে তাঁদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। অতঃপর ১৯১৭-র জুলাই মাসে পুনরায় বলশেভিক আতঙ্ক প্রকট হবার কালে তাঁদেরকে সাইবেরিয়ার অন্তর্গত টোবলস্ক অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু লেনিনের ক্ষমতালাভের পর ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে উরল-সোভিয়েট প্রতিষ্ঠান দাবি করেন, সম্রাট পরিবারকে একাটেরিনবার্গের 'নিরাপদ' ব্যবস্থার মধ্যে পাঠানো হোক!

নিকলাস যখন আলেকজান্দ্রা ও পাঁচটি সন্তানসহ একাটেরিনবার্গে এসে পৌঁছলেন তখন থেকেই তাঁদেরকে হত্যা করার 'সুব্যবস্থা' চলতে থাকে। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী, চার কন্যা ও নাবালক পুত্র আলেক্সি, সম্রাটের পারিবারিক চিকিৎসক ও পাচক, পরিচারিকা এবং একটি ভৃত্য,—মোট ১১ জন! কিন্তু মস্কোর কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ লেনিনের সম্মতি ছাড়া এ কাজ কি করা উচিত হবে? অতএব স্থানীয় বলশেভিক নেতা গলস্চেকিনকে ডেকে তাঁর হাতেই রমানভ রাজগোষ্ঠীর 'দায়িত্ব' দেওয়া হল! প্রথমে স্থির হল, প্রকাশ্য বিচারে এর নিষ্পত্তি হোক। কিন্তু তখন বহিঃশত্রুরা একাটেরিনবার্গের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিল —অর্থাৎ তখন সামরিক দিক থেকে সংকটকাল উপস্থিত! সুতরাং এইটি স্থির হল, সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীকে হত্যা ক'রে তাঁদের দেহাস্থির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করা দরকার,—যাতে প্রতিবিপ্লবীরা ওদের হাড়ের টুকরো খুঁজে বার করে মূঢ় জনসাধারণের রাজভক্তির উপর সুড়সুড়ি দিতে আর না পারে! এই কর্তব্যটি যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য একটি কমিটি নিয়োজিত হল।

সেটি ১৬ই জুলাই, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ। একাটেরিনবার্গে 'ইপাতিয়েভ' নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে তখন রমানভ রাজপরিবার বসবাস করেন। সেদিন মধ্যরাত্রে তাঁরা ছিলেন নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বেগভাবে নিদ্রিত! সহসা কয়েক ব্যক্তি নিঃশব্দে সেই বাড়িতে ঢুকে নিকলাস পরিবারকে জাগিয়ে তোলে, এবং সকলকে পোশাক প'রে নিচের তলাকার গুপ্তকক্ষে গিয়ে আত্মগোপন করার জন্য নির্দেশ দেয়,—

কেননা 'সেই রাত্রেই এবাড়ী 'হোয়াইট গার্ডদের' দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সম্ভব।' সরল বিশ্বাসে রাজপরিবারের সকলে দ্রুতগতিতে গিয়ে সেই গুপ্তকক্ষে আশ্রয় নেন্। তাঁরা মোট ১১ জন। অতঃপর বাহির থেকে একজন এগিয়ে এসে সেই ১১ জনের মৃত্যুর পরোয়ানা সামনে দাঁড়িয়ে পাঠ করেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে একে-একে বিস্ময়বজ্রাহত নিকলাস, আলেকজান্দ্রা, রাজকুমার আলেক্সি, পর পর চারটি কন্যা, ডাক্তার, পাচক, ঝি এবং চাকর,—প্রত্যেককে গুলী ক'রে মারা হয়। রমানভ রাজবংশ ওখানেই শেষ! এই রাজবংশ ১১৭ বৎসর কাল অবধি রাশিয়ায় সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব করেছিল। প্রথম আলেকজান্দার (১৮০১—২৫), প্রথম নিকলাস (১৮২৫—৫৫), দ্বিতীয় আলেকজান্দার (১৮৫৫—৮১), তৃতীয় আলেকজান্ডার (১৮৮১—৯৪), তারপর এই দ্বিতীয় নিকলাস, পৃথিবীর প্রধানতম ও শ্রেষ্ঠতম ধনী, ইনি সিংহাসনে বসেন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে।

হত্যাকাণ্ডের রাত্রে ১১টি মৃতদেহকে কম্বলে জড়িয়ে একটি মোটর-ট্রাকে তুলে নিয়ে নগর ছাড়িয়ে কয়েক মাইল দূরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন প্রভাতকাল থেকে মৃতদেহগুলি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার কাজ চলতে থাকে। সর্বাগ্রে কুঠারের দ্বারা সেই শবদেহগুলি টুকরো টুকরো করা হয়, তারপর সেগুলির উপর ঢালা হয় বেন্‌জিন এবং সালফিউরিক য়্যাসিড, এবং তারপর অগ্নিসংযোগ করা হয়! এ সকল দায়িত্বপূর্ণ কর্মের ভার দেওয়া হয়েছিল সোভিয়েটের তদানীন্তন অধিনায়ক য়ুরভোস্কির উপর। অতঃপর অগ্নিদগ্ধ কয়েকটি ক্ষুদ্র 'কুন্ডলী' কিছু দূরে এক জলাভূমির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়! কিন্তু যেখানে শবদেহগুলি দগ্ধ করা হয়েছিল, সেখানকার মাটি ওলোটপালট ক'রে তার ওপর ঘাস লতা পাতা ইত্যাদি বসিয়ে বেমালুম করা হয়।

১৮ই জুলাই তারিখে লেনিনের তদানীন্তন দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মিঃ সোয়েদ্‌লভ এসে ক্রেমলিনের সভাকক্ষে ঘোষণা করেন, "নিকলাস পলায়ন করবার চেষ্টা করেছিলেন, সেজন্য তাঁকে গুলী করা হয়!"

সভাকক্ষে তখন জন-স্বাস্থ্যরক্ষার আইনটির আলোচনা চলছিল, এবং লেনিন সে-আলোচনার প্রধান বক্তা ছিলেন। ১৯শে জুলাই তারিখে মস্কোর সরকারি মুখপত্র 'ইজ্‌ভেস্তিয়ায়' এইটি ছাপা হয়, "নিকলাস স্ত্রী-পুত্রকে একটি নিরাপদ অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে!"

পরবর্তীকালে একাটারিনবার্গ নগরটির নতুন নামকরণ হয়, 'সোয়েদ্‌লভস্ক'! যেমন এককালে জারিৎসিন নগরের নাম বদল ক'রে রাখা হয় 'ষ্টালিনগ্রাড'!

মহাভারতের কথা ভুলিনি! লোককল্যাণের মহৎ আদর্শ, সাধুকে পরিত্রাণ, অসাধুকে বিনাশ, লোকধর্মের পুনঃস্থাপনা, খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একই সাংস্কৃতিক যোগসূত্রে গ্রথিত করার মূলে লক্ষ্য—এগুলি মনে আসছে! কংস বধ পুতনা বধ, জরাসন্ধ বধ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, শিখন্ডী,—একে একে মনে পড়ছে! বিরাট কুরুক্ষেত্র 'বিপ্লব' সাধনের আগে দরকার ছিল কিছু খলতা-কপটতা, কিছু ক্রুরতা-শঠতা-হিংস্রতা ও কূটনীতি! তারপর যখন সেই রক্তাক্ত বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেল, তখন মায়া-মোহ-দয়া-দাক্ষিণ্য, স্বজননিধনের আশঙ্কা, দুর্বল বৈরাগ্য,—এর পাপ, কুসংস্কার, অপৌরুষ,—এরা পরিত্যক্ত ছিল। সেই সর্বব্যাপী ধ্বংসের মধ্যে অনেক ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, কল্যাণ-অকল্যাণ—সবই দাউ দাউ ক'রে জ্বলে-পুড়ে গিয়েছিল। অন্যায় যারা করেছিল এবং অন্যায় যারা সয়েছিল,—উভয়পক্ষই শুষ্ক তৃণগুচ্ছের মতো দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়েছিল।

ভারত-বিপ্লবের আদিগুরু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এক গুপ্তঘাতকের শরাঘাতে দেহত্যাগ করেন! রুশ-বিপ্লবের 'কাপালিক' এক গুপ্তঘাতিকার গুলীতে আহত হন! গান্ধীজি শেষবারের মতো ইংরেজকে বলেছিলেন : 'For God's sake, leave us to chaos and anarchy". জাতির পক্ষে একটা সময় আসে যখন বিপ্লব ছাড়া গত্যন্তর থাকে না! গান্ধীজির অপমৃত্যু অপেক্ষা গান্ধীজিকে সেদিন বিপ্লবের অধিনায়কস্বরূপ দেখতে পেলে অবিভক্ত ভারতবর্ষ হয়ত খুশী হতো! কেননা, তিনি বলতেন সেখানে 'উপায়' হবে সৎ, সেখানে 'পরিণতি' সৎ হতে বাধ্য! লেনিনের সঙ্গে গান্ধীজীর গভীর পার্থক্য ওইখানে!

আরেকবার মস্কো এসে পৌঁছে।—

সেদিন সন্ধ্যায় মাদাম গোর্কির কাছে বিদায় নিতে গিয়েছিলুম। উনি বোধ হয় রাশিয়ার সর্বশেষ জগৎপ্রসিদ্ধ বন্ধু,—ও'র আগে একে একে সবাই চলে গেছেন! কিন্তু টলস্টয়ের কন্যা সোফিয়া আন্দ্রেইয়েভনা গেছেন বহুদিন আগে, লেনিনের স্ত্রী ক্রুপস্কায়া নেই

চেকভের স্ত্রী অল্গা কেনিপারের মৃত্যুর পাঁচ মাস আগে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল,—এবং সেই কারণে আমি যেন বৃদ্ধা মাদাম গোর্কির প্রত্যেকটি পরিহাস-সরস বাক্য চেখে-চেখে উপভোগ করছিলুম। আজ তাঁর পুত্রবধূ নাদেজদা আমাদের এই আনন্দের আসরে উপস্থিত ছিলেন না।

শ্রীমতী লিডিয়া তাঁর সুযোগ্য দোভাষণের সহায়তায় এই বৃদ্ধার সঙ্গে আমার একটি মধুর বাৎসল্যের সম্পর্ক গ'ড়ে তুলেছিলেন। গোর্কির গল্প ও রেখাচিত্রগুলি নিয়ে সেদিন আলাপ করছিলুম।

সেদিন শ্রীমতী লিডিয়া 'মাদার' নামক গোর্কির প্রসিদ্ধ উপন্যাসখানির চিত্ররূপে আমাকে দেখিয়েছিলেন। সেই চিত্রে 'জননীর' ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তাঁর চেহারার সঙ্গে মাদাম গোর্কির বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলুম। কিন্তু রেখাচিত্র রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর সাত বৎসরব্যাপী ইতালী প্রবাসকালে অপর একটি মাদারের যে রেখাচিত্র বর্ণনা করেছিলেন, সেটি ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও সাহিত্যের পক্ষে সেটি মূল্যবান।

মধ্যএশিয়ায় আরেকবার ফিরে গিয়ে দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গের রাজদরবারে প্রবেশ করি। গোর্কি বলছেন, তৈমুরলঙ্গ পঞ্চাশ বছর ধ'রে তাঁর লৌহ-পদাঘাতে পৃথিবীকে দলিত করেছিলেন, —হস্তী যেমন আপন পায়ের তলায় উই-ঢিবিকে নিষ্পেষণ করে! মৃত্যুর চেয়ে তিনি শক্তিমান হতে চেয়েছিলেন ব'লে মৃত্যুর স্বাভাবিক নিয়মকে তাচ্ছিল্য করে মানবসংসারকে নিজের হাতে তিনি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। সংসারে তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র ছিল জাহাঙ্গীর। সেই ছেলেটির অকালমৃত্যুর পর তৈমুর তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ত্রিশ বৎসরকাল হাসেননি। মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে তিনি মানবজাতির ভাগ্যবিধাতা হবার চেষ্টা পেয়েছিলেন! তাঁর আজীবন নিষ্ঠুরতা ও রক্তপাতের অন্তরালে বসে এক পুত্রশোকাতুর পিতা নীরবে নিভৃতে কেঁদে বেড়াতো!

ম্যাক্সিম গোর্কি সমরকন্দের রাজদরবারের এক বিজয়োৎসবের বর্ণনা করেছেন একটি বিশেষ 'জননীর' আবির্ভাবের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। সেদিন সমরকন্দ উপত্যকায় মোট ১৫ হাজার তাঁবু পড়েছিল, এবং সেই চক্রাকারে স্থাপিত তাঁবু-দলের ঠিক মধ্যস্থলে সম্রাটের তাঁবু নির্মিত হয়েছিল। সেই তাঁবুর মধ্যে একটি রত্নবেদীর উপরে একা বসেছিলেন অপরাজেয় সম্রাট-দস্যু তৈমুরলঙ্গ। তাঁর সেই আলুলিত রেশম-জোব্বার উপরে অন্তত পাঁচ হাজার মণি-মাণিক্য-মুক্তা ঝলমল করছিল। তাঁর দুই কানে দুটি রক্তমুখী সিংহলী কর্ণকুণ্ডল দোলায়মান। তাঁর চতুর্দিকে রাজন্য ও ও পারিষদবর্গ সমাসীন। সেখানে তিন শত স্বর্ণপাত্রে সুরা প্রস্তুত রয়েছে। সমগ্র শিবিরের চতুর্দিক রক্তবর্ণ রেশম ও স্বর্ণসজ্জায় ঝলমল করছিল। সভাগায়ক, সভাকবি, সেনানায়ক এবং স্বজনপরিজন পরিবৃত হয়ে সম্রাট সিংহাসনে আসীন!

সভাকবি 'কের্মানির' প্রতি সম্রাটের দৃষ্টিনিবদ্ধ হল। সম্রাট প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা কের্মানি, তুমি এখন আমাকে কতগুলি স্বর্ণমুদ্রায় কিনতে পার?

সুরাভিভূত কের্মানি জড়িতকণ্ঠে তখনই জবাব দিলেন, সত্য বলব, সম্রাট! পাঁচিশটি স্বর্ণমুদ্রায় আপনাকে কেনা চলতে পারে!

পাঁচিশটি!—সম্রাট সবিস্ময়ে বললেন, তুমি জান আমার এই কোমরবন্ধটির দাম হয়ত পাঁচিশ স্বর্ণমুদ্রা হবে?

আজ্ঞে, ওইটিরই ত দাম! নৈলে আপনার মূল্য কানাকড়িও নয়!

কবি কের্মানি সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

অতঃপর সেই বিজয়োৎসবকালে যখন বাদ্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ক্রীড়া, প্রমোদ, ব্যায়াম, পানাহার, তরবারি খেলা,—ইত্যাদি বিভিন্ন আনন্দ-অনুষ্ঠান ও কলরব-কোলাহল চলছে, সেই সময় তাঁবুর বাহিরে শোনা গেল ধারালো এক তরবারির মতোই কোনও এক নারীকণ্ঠের শীর্ণ তীব্র উন্মত্ত চিৎকার,—'যেন গুরু-গুরু মেঘমন্দ্রের ভিতর দিয়ে এক আকস্মিক বিদ্যুতের অগ্নিঝলক!' সেই চিৎকার দূরের থেকে যেন এসে বিঁধল তৈমুরের কানে, এবং সেই তীব্র ধারালো কণ্ঠের সঙ্গে যেন তাঁর নিজের পুত্র-বিয়োগাতুর আত্মার একটা ঐক্য অনুভব করা গেল। এই ধূলিধূসরা ছিন্নভিন্নবস্ত্রা যুবতী নারী সম্রাটের দর্শন দাবি করে! উন্মাদিনী এক নারী!

নগ্নপদ আলুলায়িতকেশা জীর্ণবাসা এক সুন্দরী যুবতী ঝড়ের বেগে এসে সম্রাট তৈমুরের সামনে দাঁড়াল! সর্বাঙ্গে লজ্জাবাসের পরিমাণ কম। কুঞ্চিত কেশ-জালে আনগ্ন দুই স্তনাগ্রচূড়া ঢাকা। অতঃপর কৃষ্ণবসনা সেই পাগলিনী কঠোর চক্ষে তার একখানা অকম্প হাত সম্রাটের দিকে প্রসারিত করে চেঁচিয়ে উঠল, সম্রাট, তুমি জগৎপ্রসিদ্ধ সুলতান বায়েজিদকে পরাজিত ও পদদলিত করেছ!

তৈমুর বললেন, হ্যাঁ, অনেককেই করেছি। এখনও ক্লান্ত হইনি। কিন্তু তোমার কি বলবার আছে, নারী?

শোন সম্রাট! —নারীটি গর্জে উঠল —যা কিছু তুমি করেছ, সেসব পুরুষের কাজ! কিন্তু আমি জননী, সম্রাট। তুমি মৃত্যুর সেবা করেছ,—আমি জীবনের! তুমি অপরাধ করেছ আমার বিরুদ্ধে। আমি আদেশ করছি, সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর। তোমার রাজ্যে একথা শুনি, সুবিচারের মধ্যে শক্তি নিহিত! বিশ্বাস করিনি আমি। কিন্তু আমি জননী, আমার প্রতি সুবিচার কর!

সম্রাটের নির্দেশে এই নারীকে একটি বসবার স্থান দেওয়া হল। অতঃপর এই 'লজ্জাহীনা' অগ্নিশিখাসমা নারী ভয়হীন কণ্ঠে বলতে লাগল, সম্রাট, আমি আসছি ইতালী থেকে! আমি জাতিতে মৎস্যজীবী, আমরা সুখী পরিবার ছিলুম! কিন্তু আমার নাবালক পুত্রসন্তান......।

ফুঁপিয়ে ককিয়ে উঠল সেই জননী, —এ পৃথিবীতে সেই আমার একমাত্র ভালবাসার বস্তু—আমার ছয় বছরের শিশুবালক!

মৃদুজড়িতস্বরে তৈমুরলঙ্গ উচ্চারণ করলেন, আমার জাহাঙ্গীরের মতন!

উন্মত্ত নারী আবার কেঁদে উঠল,—সম্রাট, সেই ছেলেকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে সরাসেন জলদস্যুরা! তারা খুন করেছে আমার বাবাকে আর স্বামীকে! আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার সন্তানকে চার বছর ধরে! সম্রাট, দাও ফিরিয়ে আমার সেই ছেলেকে! আমি জানি, সে আছে তোমার কাছে! একদিন সেই জলদস্যুরা বায়েজিদের দলের হাতে ধরা পড়ে, তারপর তোমার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় সদলবলে বায়েজিদ। তুমি জান আমার ছেলে কোথায়! দাও সম্রাট, ফিরিয়ে দাও তাকে!

সম্রাট স্তব্ধ। পারিষদবর্গ সন্দিহান। শুধু কবি কের্মানি বললেন, মেয়েটা পাগল! পৃথিবীর প্রত্যেক জননীর মতোই পাগল।

তৈমুরলঙ্গ এই নারীকে শান্তকণ্ঠে সম্ভাষণ ক'রে বললেন, তুমি সেই অজানা

দেশ থেকে কেমন ক'রে সমুদ্র, নদী, পর্বত, অরণ্য পেরিয়ে বন্য জন্তু এবং জন্তু অপেক্ষাও বর্বর মানুষকে এড়িয়ে এতদূরে এলে? নিরস্ত্র, নিঃসহায় তুমি এক অজ্ঞাত নারী,—বল ত' সত্যি ক'রে? আমি যে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

অশ্রুসজলা নারী জবাব দিল,—সম্রাট, আমি জননী, আমার ভয় নেই! প্রিয়তম সন্তানের সন্ধানে একদিন বেরিয়ে পড়েছিলুম! পাহাড় অতিক্রম করেছি, নৌকায় নদী পেরিয়েছি, কখনো সাঁতরেছি! বনশূকর, ভালুক, বনের বলদ,—এরা সামনে পড়েছে, কিন্তু কিছু বলেনি! দুবার পড়েছি বাঘের মুখে,—তোমারই মতন তাদের চোখ! কিন্তু মনে রেখ সম্রাট, প্রত্যেক জন্তুর হৃদয় আছে। তোমার মতন তাদের সঙ্গেও কথা বলেছি! তারা বিশ্বাস ক'রে গেছে,—আমি বৎসহারা জননী! তাদের চোখে আমি করুণার আভা দেখেছি! তাদেরও সন্তান আছে, বাৎসল্য আছে,—তারাও জানে জীবনের জন্য, স্বাধীনতার জন্য মানুষের মতন কেমন ক'রে লড়াই করতে হয়! মনে রেখ সম্রাট, পুরুষ চিরকাল তার জননীর কাছে শিশু, প্রতি পুরুষেরই আছে এক জননী! তুমি ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে পার, কিন্তু জননীকে অস্বীকার করতে পার না। ফিরে দাও, ফিরে দাও সম্রাট আমার হারানো সন্তানকে!

বৃদ্ধ 'ব্যাঘ্র' কতক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। পরে তৈমুরলঙ্গ বললেন, এমন ক'রে আর কেউ কোনদিন আমার প্রাণের এই জাগরণ ঘটায়নি! এ মেয়ে সত্যই আশ্চর্য। এ মেয়ে সমানে-সমানে কথা বলে, ভিক্ষে চায় না, শুধু দাবি জানায়! এ মেয়ে শক্তিরূপিনী,—সেই শক্তি বাৎসল্যের, ভালবাসার! পৃথিবীর সব নারী, সব মনীষী, সব যোদ্ধাই ত' এক-দিন অসহায় শিশু ছিল।!

সম্রাট তৈমুর গুরাগনের চক্ষু সেদিন আরেকবার তাঁর প্রিয়পুত্র জাহাঙ্গীরের জন্য বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। তিনি সেইখানে বসেই একটি কঠোর আদেশ-নামা জারি করলেন: এই মুহূর্তে তিন শত শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী আমার রাজ্যের চারদিকে ছুটে যাক্। এই নারীর নাবালক পুত্রকে যেখান থেকে হোক এবং যেমন ক'রে হোক, খুঁজে এনে আমাদের সামনে হাজির করা চাই! এই মেয়েটির সঙ্গে আমিও এখানে অপেক্ষা ক'রে রইলুম!

এই জননীর নিকট সেদিন তৈমুরের আনত অভিবাদনটি লক্ষ্য ক'রে কবি
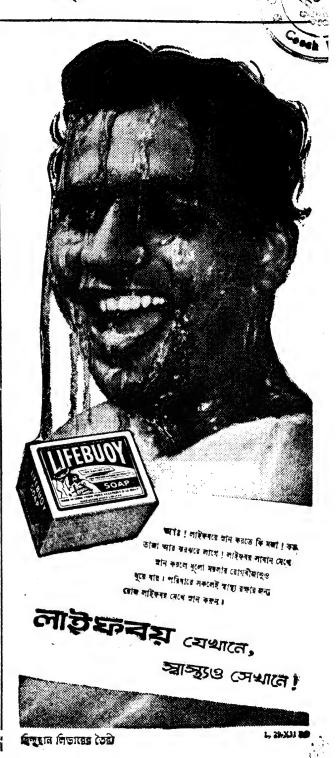
কেমার্নিন যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন, তার কয়েকটি সুন্দর পংক্তি এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিই :

"What is more beautiful than
the song of flowers and
stars?
The answer all men know:
'tis the song of Love!
....
But the eyes of beloved are
lovelier than all the
flowers,
And her smile is more gentle
than the sun's rays.
....
But the song most beautiful
of all is yet to be sung.
The song of the beginning of
all things on earth.
The song of the world's heart,
of the magic heart
Of her whom on earth we
call Mother!"

সম্রাট বললেন, কেমার্নিন, চমৎকার কবিতা তোমার। ঈশ্বর তাঁর বাণীকে প্রচার করার জন্য তোমার ওষ্ঠাধরটি দিয়েছিলেন। তিনি ভুল করেননি!

মদ্যজড়িত প্রলাপ-কণ্ঠে কেমার্নিন জবাব দিলেন, ঈশ্বর নিজে একজন মহাকবি, সম্রাট!

সভাস্থ রাজন্যবর্গ এবং সেনানায়কের দল সেই নবাগতা বিদেশিনী যুবতীর প্রসন্ন মুখখানির প্রতি সসম্ভ্রমে চেয়ে রইল! বলা বাহুল্য, সেই পাগলিনী জননী তৈমুরের অসীম কৃপায় তার সন্তানটিকে অক্ষত অবস্থায় দীর্ঘ চার বছর পরে ফিরে পায়।

রুশ-ইতিহাসের দুই বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে ম্যাক্সিম গোর্কি যে দুটি ছবি রেখে গেছেন, সেদিন সে দুটি খুঁজে পেয়েছিলুম। কিন্তু দুটি চিত্রই একটু ঘরোয়া, একটু ব্যক্তিগত। তাঁদের মধ্যে একজন লিয়ো টলস্টয়, অন্যজন লেনিন!

রুশভাষায় লিয়ো শব্দটির অর্থ, সিংহ। টলস্টয় শব্দটির অর্থ কায়িক শক্তিসম্পন্ন বলবান বা বিশাল! টলস্টয় ছিলেন বিশালকায় পুরুষসিংহ। গোর্কি বলছেন, তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের দিনটি মনে পড়ে। আমার দুটি গল্প নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ চলতে থাকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে তিনি অনর্গল 'অশ্লীল' কথা বলে যান। প্রতি বাক্যের শেষে যে শব্দটি তিনি উচ্চারণ করে বসেন, সেটি প্রাদেশিক একটি গালি! প্রথম দিন আমি কিছু বিস্মিত ও আহত হই। আমি যেন ওই প্রকার ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বুঝিনে, এটি হয়ত তিনি ধরে নিচ্ছেন! পরে জেনেছিলুম, এ আমার কতখানি নিবুদ্ধিতা!

ফরাসী ঔপন্যাসিকের মতো টলস্টয় স্ত্রীলোক সম্পর্কিত ব্যাপার নিয়ে গল্প-গুজব করতে ভালবাসতেন। সেদিন পাখী-সমাজের ঈর্ষাবিদ্বেষ নিয়ে কথা উঠেছিল। বাগানের গাছতলায় পাথরের বেঞ্চিতে আমরা বসেছিলুম। মাথার উপরে লতাপাতা ও ডালপালার আড়ালে পাখীরা কিচিরমিচির করছিল।

টলস্টয় বললেন, "মেয়েপাখীরা তাদের জীবনে শুধু একটি মাত্র গান জানে। সে হল বিদ্বেষপরায়ণতার গান! পুরুষের বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে শত শত সঙ্গীত! কিন্তু 'he is blamed for giving way to jealousy, is it fair?

"জীবনে এমন মুহূর্ত আসে পুরুষ যখন নিজের কোন কোনও গোপন তথ্য মেয়েমানুষের কাছে ফাঁস করে—যা মেয়ের পক্ষে জানাটা একটু অতিরিক্ত! তারপর পুরুষ সেটি যখন স্বভাবতই ভুলে যায়, মেয়ে সেটি মনে রাখে! সম্ভবতঃ ছোট হবার ভয় থেকেই বিদ্বেষের জন্ম হয়, মর্যাদাবিপন্ন হবার আশঙ্কা, নিজেকে বেয়াকুব মনে হবার দুর্ভাবনা!

"পুরুষ অতিক্রম ক'রে যায় ভূমিকম্প, মহামারী, ভয়াবহ রোগের আক্রমণ, এবং নানাবিধ আত্মিক যন্ত্রণা,—কিন্তু তা'র জীবনের সর্বাপেক্ষা উৎপীড়ন এবং বেদনাদায়ক যন্ত্রণা ও বিচ্ছেদ সে সহ্য করে শোবার ঘরে।"

টলস্টয় তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পঞ্চাশ বৎসরকাল ঘর করেছিলেন, কিন্তু এই বলবীর্যবান পুরুষসিংহের পারিবারিক জীবনে শান্তি ছিল না।

লেনিন সম্বন্ধে ম্যাক্সিম গোর্কির ধারণা বেশ কৌতুকজনক ছিল। গোর্কির নিষ্পৃহ চারিত্রিক রেও লেনিন বিস্ময়ের বস্তু ছিলেন। লেনিনের এক বিশ্বাস-হন্তা বন্ধু এবং বলশেভিকবাদের চিরশত্রু মার্টভ সম্বন্ধে লেনিনের একটি প্রচ্ছন্ন প্রীতি ছিল। মার্টভকে যখন তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হত্যা করা হচ্ছিল, লেনিন তখন গোর্কিকে বলেন, "মার্টভ আমাদের সঙ্গে নেই, এটি বেদনার কথা। কমরেড হিসাবে সে আশ্চর্য, তার জুড়ি নেই।"

মার্টভ সম্বন্ধে লেনিনের আন্তরিক অনুরাগ তাঁর অন্যান্য বিশ্বস্ত সহকর্মীগণের নিকট বিস্ময়ের কারণ ছিল। মার্টভ একবার মন্তব্য করেছিলেন, "সমগ্র রাশিয়ায় মাত্র দুজন 'প্রকৃত' কমিউনিস্ট বর্তমান! তার মধ্যে একজন, লেনিন, এবং অন্যজন হলেন মাদাম কলোনটাই!" লেনিন একথাটি শুনে উচ্চ হাস্য করে বলেছিলেন, "What a wise man Martov is!"

মাদাম কলোনটাই ছিলেন লেনিনের বহু সহকর্মীর একজন। বলশেভিক বিপ্লব-সাফল্যের পর লেনিন যখন ক্ষমতা লাভ করেন সেই সময় একদিন এই কমিউনিস্ট মহিলা লেনিনের নিকট একটি প্রস্তাব করেন যে, এমন একটি সামাজিক আইন প্রবর্তন করা হোক যার সাহায্যে যে কোনও নারী আপন ইচ্ছামতো যে কোনও পুরুষের সঙ্গে রতিসহবাস করার অবাধ অধিকার ও স্বাধীনতা পাবে।

লেনিন তাঁর এই প্রস্তাবটি সহাস্যে নাকচ ক'রে দেন। পরবর্তীকালে তাঁর নানা ভাষণে তিনি বলেন কমিউনিস্ট-সমাজের আদর্শ হল, চরিত্রের সংযম, শালীনতা, শ্রী এবং নৈতিক শুচিতা! বড় চরিত্র ছাড়া বড় কাজ সম্ভব নয়! চরিত্রের শৈথিল্য এবং অসংযম কমিউনিজমের শত্রু!

ম্যাক্সিম গোর্কি বলছেন, লেনিনের চরিত্রের একটা অংশ হল, জুয়াখেলার দিকে তাঁর প্রবল ঝোঁক! কিন্তু সে-জুয়া তাঁর আপন ভাগ্য-অন্বেষণের পথে নয়! পৃথিবীর চারিদিকের অরাজকতার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আপন ভূমিকাটির উপর তাঁর অখণ্ড বিশ্বাসের শক্তি! তাঁর সর্বদৃষ্টিমান চক্ষুর 'চতুরতা', এবং 'অশোভন' ভঙ্গী—অনেক সময় অদ্ভুত রকমে প্রকাশ পেতো! কখনও মাথা হেলাতেন পিছন দিকে, কখনও কাৎ হতেন, কখনও হাত দুটো নিয়ে বাহুমূলের গহ্বরে চেপে রাখতেন। এসব ভঙ্গীতে একটি কৌতুক প্রকাশ পেতো,—কেমন যেন একটা 'বিশ্রী' উল্লাস! কিন্তু এই মুহূর্তগুলিতে তিনি যেন আনন্দে দপদপ করতেন! "From his face of Mongolian cast gleamed and flashed the eyes of a tireless hunter of falsehood and of the woes of life—eyes that squinted, blinked, sparkled sardonically, or glowered with rage. The glare of those eyes rendered

his words more burning and more poignantly clear."

বৃদ্ধা মাদাম গোর্কির নিকট এ-যাত্রা বিদায় নিয়ে যখন পথে নেমে এলুম তখন সন্ধ্যা সাতটা। শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, আপনার ডায়েরীতে লিখতে পারেন, এটি স্মরণীয় গোর্কি-সন্ধ্যা! চলুন, আজ আর তাড়া নেই। হাঁটতে হাঁটতে কোথাও যাওয়া যাক।

ঠাণ্ডা পড়েছে প্রচুর। রাজপথে যে মস্ত জনতাটা গতিশীল এবং কর্মব্যস্ত, তাদের প্রায় সকলেই গায়ে তুলেছে ওভারকোট। মস্কোর ওভারকোট তিন প্রকার। গ্রীষ্ম, শরৎ এবং শীতকালের। বর্ষাকালে 'রেনকোটটিও' ওভারকোটের কাজ করে। আমি একটি ভাদ্র-আশ্বিনের উপযুক্ত ওভারকোট কিনেছিলুম ১১০০ রুবলে, অর্থাৎ ভারতীয় টাকার বিনিময়ে সেটি দাঁড়ায় ১৩২০ টাকা। সেটি গরম এবং সুশ্রী,—দিল্লীর ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে সেটি ভালই চলে। মস্কোর শীতকালীন ওভারকোট দেখলে স্বাস্থ্যবান ভল্লুককে মনে পড়ে!

অতিশয় ঠাণ্ডায় গরম চা, গরম কফি, গরম গরম এক বাটি মহাপ্রসাদের ঝোল, এবং যে সকল উপকরণের দ্বারা শরীরকে গরম রাখা যায়, সেগুলি সাধারণত প্রিয়! কিন্তু মস্কো অঞ্চলে তার বিপরীত। যত বেশি ঠাণ্ডা, তুষারপাত এবং তুহিন বৃষ্টিবর্ষণ,—ততবেশি রাজপথে বেরিয়ে আইসক্রীম খাবার ধুম! ওটির ওপর আকর্ষণ আবালবৃদ্ধবনিতার। পথ হাঁটতে-হাঁটতে এক একদিন যখন শীতে ঠকঠক করতুম, শ্রীমতী লিডিয়া পথের ধারের ছোট ছোট স্টল দেখিয়ে বলতেন, আসুন একটা আইসক্রীম খেয়ে নিন it will make you tight.

তাঁর এই প্রস্তাবের ফলে যে-ধরণের কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে যেত, বঙ্গভাষায় সেটিকে বলে, ঝগড়া! মস্কোর কোথাও ভদ্র চা নেই!

শ্রীমতী লিডিয়া সেদিন এনে হাজির করলেন, মস্কোর এক অতি-প্রশস্ত রাজপথের উপর অতি-বৃহৎ 'স্টেট লাইব্রেরীর' সামনে। এর দূরবিস্তৃত সোপানশ্রেণী এবং স্তম্ভগুলি কলকাতার অধুনালুপ্ত সেনেট হলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই স্টেট লাইব্রেরী এখন লেনিনের নামের সঙ্গে যুক্ত হলেও এর বিরাট প্রাসাদটি নির্মিত হয় ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে। এই প্রাসাদ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ দখল করেন রুশ-বিপ্লবের পর এবং এরই সংলগ্ন অপর দুটি অট্টালিকা নির্মিত হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। মস্কোয় বর্তমানে ১০০০ সরকারি লাইব্রেরী রয়েছে এবং তাদের মোট পুস্তক-সংখ্যা ৫ কোটির কিছু বেশি!

লেনিন লাইব্রেরীর প্রাসাদ এবং ভিতরকার প্রশস্ত শ্বেতমর্মর নির্মিত সোপানশ্রেণী বেয়ে ওঠবার কালে একথা মনে হয়, আমরা যেন এক সম্রাটের প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করেছি! মস্কো এবং লেনিনগ্রাডে এমন বহু প্রাসাদ বা অট্টালিকা আছে যাদের ভিতরে প্রবেশ করলে ভারতের তাজমহল প্রমুখ শ্বেতমর্মর সৌধকে নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং নগণ্য মনে হয়! কিন্তু সেগুলি প্রায় সমস্তই,—'মেট্রো টিউব' রেলপথ ছাড়া,—জার সম্রাটদের আমলের। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এগুলিকে বিশেষ আইনবলে দখল ক'রে নাম দিয়েছেন, 'পীপলস প্রপার্টি'!

এই প্রাসাদের জটিল অলিগলির মধ্যে পথ হারাবার ভয় থাকে। এখানে এক সপ্তাহকাল ধ'রে বিচরণ করলে তবেই আগাগোড়া সবটা পর্যবেক্ষণ করা যায়। কিন্তু আমাদের হাতে সময় মাত্র দুই ঘণ্টা। ডাইরেক্টর মহাশয় এই সময়টুকুর মধ্যে কতটুকু কি দেখাবেন, সেটি আমার পক্ষে কৌতুকের বিষয় ছিল। বলা বাহুল্য, আমি ঈষৎ হকচকিয়ে গিয়েছিলুম।

এই প্রাসাদটি দু-দিকের নবনির্মিত অট্টালিকাসহ মোট ১৮ তলা, এবং ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষ হিসাবে দেখা যায়, এর গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষের মতো। এই পাঠাগারের ভিতরে মোট ১৪টি অধ্যয়ন-কক্ষে দৈনিক ৫ থেকে ৭ হাজার নরনারী পড়াশুনো করে এবং প্রতি পাঠকের জন্য আরামদায়ক ব্যবস্থা, নোট নেবার কাগজপত্রাদি এবং নিজস্ব টেবল-ল্যাম্প বর্তমান। এখানে গ্রন্থাদি পরিবেশন করবার জন্য ইলেকট্রিক যন্ত্রগুলি দেখে আমি ঈষৎ হতবুদ্ধি হয়েছিলুম। যে কোনও বই যে কোনও সময় চাইলে টেলিফোন এবং যান্ত্রিক কৌশলে সেটি কোন এক রহস্যপুরী অতিক্রম ক'রে ৪।৫ মিনিটের মধ্যে পাঠকের হাতে আসে! এই পাঠাগারে পৃথিবীর ১৬০টি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ বর্তমান, তার মধ্যেকার ৮৫টি ভাষা হল একা সোভিয়েট ইউনিয়নের। বাঙলা ভাষাসহ ভারতের ১৪টি ভাষা ও সংস্কৃত গ্রন্থ এখানে সুরক্ষিত। মার্কসপন্থী দু'চারজন বাঙালী লেখকের বই ছাড়া পুরনো বাংলার সামাজিক বিষয়ের কয়েকখানা বই এখানে এসে দেখলুম। পৃথিবীর কোনও সাহিত্যের কোনও সোভিয়েট-ব্যবস্থাবিরোধী বই এ পাঠাগারে নেই! উৎকৃষ্ট এবং সুলিখিত গ্রন্থও যদি ক্যাপিটালিস্ট-সমাজের অনুপন্থী হয় অথবা সোভিয়েট-ব্যবস্থার সমালোচনাযুক্ত থাকে, তবে সে-বই এ পাঠাগারে পড়তে দেওয়া হয় না! উপন্যাস, গল্প, উপকথা, কাব্য,—যাই হোক না কেন, তাদের জাতি এবং মূলরস বিচার না ক'রে এখানে বই রাখা নিষিদ্ধ। সোভিয়েট-কর্তৃপক্ষ উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের রসবিচার অপেক্ষা তার লক্ষ্যবিচারের উপর বেশি জোর দেন। কমিউনিজম-বিরোধী কোনও সাহিত্য-গ্রন্থ উচ্চাঙ্গ এবং শ্রেষ্ঠ হতে পারে, এটি তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন না! আমিও বিশ্বাস করি, এই পাঠাগারের বাইরে পৃথিবীর অন্য কোথাও মহৎ সাহিত্য তার নির্মল ও গভীর আনন্দ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে কিনা, সেটি সোভিয়েট-পাঠকের নিকট অজ্ঞাত!

কিন্তু ক্লাসিক মহাকাব্য, নাটক ও গদ্য সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নয়। যা কিছু লোকপ্রিয়, এখানে তা বর্তমান। বেদব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, হোমর, শেক্সপীয়র, মিল্টন শেলী, বায়রণ, টেনিসনাদি এখানে আছে বৈকি। ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান ক্লাসিকস আছে। পৃথিবীর সকল দেশের বিপ্লবের ইতিহাস পাওয়া যাবে। এখানে মার্ক্স এবং এঙ্গেলের প্রথম সংস্করণ বই সুরক্ষিত আছে,—যখন তাঁরা দুজন জীবিত ছিলেন! সেই সব বই 'ফুল-বেলপাতা-ধূপধুনো-গঙ্গাজল' দিয়ে পূজো করা হয়! এ-পূজো অস্বাভাবিক নয়। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম মানেই ত বই-পূজো! বাইবেল, কোরান, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহেব, ভগবৎগীতা, রামায়ণ-মহাভারত—এরাও ত লোকের পূজ্য! সোভিয়েট ইউনিয়নে 'দাস ক্যাপিটল' বাইবেল অপেক্ষা অনেক বেশি পূজ্য এবং সম্মানিত! এটি নাকি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 'ধর্মগ্রন্থ', এবং সকল ধর্ম নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে এসে এই 'মহামানবের সাগরের' মধ্যে মিলিছে! তা হবে!

আমি মনোজ্ঞ এবং অলঙ্কারবহুল ও বিস্ময়জনক আখরোট কাঠের আগাগোড়া কারুশিল্প পর্যবেক্ষণ করছিলুম। কিন্তু এখনকার 'গ্রন্থ-জগতের' শেলফ-

গ্রলির অরণ্য-জটলার মধ্যে কিছ্দূর পর্যন্ত এগিয়ে অন্ধকার দেখে পালিয়ে এলুম। এগুলি দেখে বেড়াতে গেলে মোট ২০০ কিলোমিটার হাঁটতে হয়,—অর্থাৎ 'হাওড়া' স্টেশন থেকে 'ধানবাদ' স্টেশন অবধি! এই পাঠাগারে এখন প্রতিদিন ১৫০০ বই এবং ১৭০০ পত্র-পত্রিকাদি এসে পৌঁছয়। দৈনিক ২৪,০০০ বই পাঠকদের কাছে সরবরাহ করা হয়। ডাইরেক্টর মহাশয় আমাকে 'মাইক্রোফিল্মের' সাহায্যে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পুঁথির ও গ্রন্থের অবিকল ছবি দেখালেন, এবং তার মধ্যে মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলার' যে প্রথম রুশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের সময়—তার একটি ছবি! এই লাইব্রেরীতে ১৩শ শতাব্দীর বহু মূল্যবান রুশীয় পুঁথি ও পরবর্তীকালের মুদ্রিত বহু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দেখতে পাওয়া যায়। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে লাইব্রেরীর সংখ্যা হল মোট ৩,৬৮,০০০।

প্রাসাদের বাইরে এসে আরেকবার পিছন ফিরে তাকালুম। ওটি দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের মূল প্রবেশপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

লেনিন মিউজিয়মের মধ্যে লেনিনের জীবনের সমস্ত কাহিনীই খুঁজে পেয়েছিলুম, কিন্তু সামান্য একটি ঘটনার বিবরণ সেখানে পেয়েছিলুম কিনা, এখন আর মনে পড়ে না। সেটি একটি বিশেষ ধনবতী নারীঘটিত। এই মহিলাটি ইংরেজ, এবং এঁর নাম ছিল 'এলিজাবেথ ক্রে'। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে লেনিন যখন ছদ্মবেশে ইউরোপ থেকে পিটার্সবার্গে আসেন, তখন তিনি নিজের নাম গ্রহণ করেন, 'উইলিয়ম ফ্রে'। এ নামটি ছিল ইংরেজি। সে যাই হোক, তৎকালীন রাজনীতিক জটিলতা ও বৈপ্লবিক চেতনার মধ্যে 'উইলিয়ম ফ্রে' খুঁজছিলেন নিজের সাংঘাতিক পথ! তিনি রক্তপিচ্ছিল এবং সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী! তিনি দয়া-ক্ষমা-বিবেচনা-নীতিকথা বা হিতোপদেশে আস্থা রাখেন না! একদিকে তাঁর বলশেভিক সংবাদপত্র 'নভায়া জিজ্ন' এবং অন্যদিকে গুপ্তগৃহালোকে ব'সে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য গোপন নক্সা রচনা,—তাঁর এই মাত্র দুটি কাজ!

লেনিন তাঁর জাল-পাসপোর্ট নিয়ে যখন এইভাবে ঘুরছেন, এবং স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যখন একেবারেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না, সেই সময় একদিন সন্ধ্যায় রাজধানীর এক তাতার-হোটেলে তিনি সুন্দরী এলিজাবেথকে দেখে আকৃষ্ট হন। যুবতীটি একা একটি টেবলে বসেছিল। লেনিনের ইঙ্গিতে তাঁর অনুচর এগিয়ে গিয়ে আলাপ ক'রে মেয়েটিকে লেনিনের টেবলে ডেকে আনে। মেয়েটির চেহারা, চাহনি, স্বাস্থ্যশ্রী এবং মিষ্ট আলাপ—সমস্তই আকর্ষণের বস্তু ছিল, এবং প্রথম দিনেই উইলিয়ম ফ্রে'র সঙ্গে তার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে গেল!

স্ত্রীলোকের হ্লাদিনী শক্তি এক-দিকে, অন্যদিকে জীবনের কঠিন-তম লক্ষ্য। কিন্তু প্রাণসমুদ্রের এই তরঙ্গ-দোলায় লেনিন ওরফে উইলিয়ম ফ্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। এই নারীর কাছে আসল ব্যক্তি চাপা রইল, এবং লেনিন এই নারীর বাস-স্থানেই সপ্তাহে দু-দিন তাঁর গোপন সম্মেলনের আসর বসিয়ে যেতে লাগ-লেন। এই মমতাময়ী এবং একাকিনী নারী 'উইলিয়মে'র প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগবশত এই গোপন বৈঠকের বাইরে দাঁড়িয়ে সতর্ক প্রহরার কাজ করতেন। কিন্তু রাজনীতির সম্বন্ধে বা বিপ্লব সম্পর্কে এই নারীর ঔৎসুক্য ছিল কম। লেনিনের মিষ্ট ও মধুর এবং কৌতুকজনক ব্যবহারের গুণে এই নারীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত ছিল!

কিন্তু কালক্রমে এই আনন্দদায়িনীর প্রতি লেনিনও অনেক পরিমাণ আসক্ত

হন। লেনিন বহু সন্ধ্যায় একাকী এসেছেন সংগোপনে এই নারীর নিঃসঙ্গ বাসস্থানে। এলিজাবেথের সঙ্গে থেকে তিনি একত্র চা ও জলযোগ প্রস্তুত করেছেন, বিশ্রম্ভালাপে কাটিয়েছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই নারী লেনিনকে আনন্দ দেবার জন্য পিয়ানোয় বিঠোফেনের "য়্যাপ্যাসিওনাটা সনাটা"-র মধুর মূর্ছনাময় সুরটি যখন ধ্বনিত ক'রে তুলতেন, তখন লেনিন একটি বিশেষ মূর্ছনার বার বার পুনরাবৃত্তি চাইতেন। এই মধুর উদ্বেলতর সুরটি কানে আসামাত্র লেনিনের চোখে-মুখে এক প্রকার অদ্ভুত চাঞ্চল্য দেখা যেত! এলিজাবেথ কিছুকালের জন্য লেনিনের জীবনে মমতা ও মাধুর্য এনেছিলেন!

একদিন এলিজাবেথ প্রশ্ন করলেন, আমার বাজনার এই অংশটার কাছাকাছি এলে তুমি এত অধীর হও কেন বল ত'?

লেনিন শুধু হাসলেন। গানে, কাব্যে, সাহিত্যে, রস-কল্পনায় এলিজাবেথ লেনিনের জীবনকে মোহমদির ক'রে রাখতে চান। কিন্তু তিনি কেমন ক'রে জানবেন, লেনিনের প্রকৃত রসের আস্বাদন কোন্‌খানে! উইলিয়ম ক্রে শুধু বললেন, এই সুরটি আমাকে ইহুদী সোস্যালিস্টদের বিপ্লব-সঙ্গীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়!

চোখ পাকিয়ে রাগ ক'রে এলিজাবেথ বললেন, পোড়া কপাল! তুমি এতক্ষণ মার্ক্সিজম ভাবছিলে? ওই বুঝি তোমার ধ্যান আর জ্ঞান?

এলিজাবেথ সেবার কতকটা যেন আশাহত হয়ে পিটার্সবার্গ ছেড়ে চলে যান।

এর পর লেনিনের পলাতক অবস্থায় সুইডেনের রাজধানী স্টকহলমে উভয়ের দেখা হয়। রাশিয়ার বাইরে গিয়ে তখন সেখানে বলশেভিকদের পার্টি কংগ্রেস চলছে! তারই এক ফাঁকে এক ছুটির দিনে এলিজাবেথকে নিয়ে লেনিন চলে যান গ্রামের দিকে। একটি জনবিরল সরোবরে নেমে একখানি নৌকা নিয়ে দুজনে বহু দূরে চলে যান। এলিজাবেথের পক্ষে সেটি বড় আনন্দের দিন। তাঁর অনুরাগ ছিল অকৃত্রিম।

নৌকাচালনায় লেনিন ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সেই দিকে চেয়ে মধুরভাষিণী এলিজাবেথ হাসি মুখে বললেন, তুমি কিন্তু পেশাদার বিপ্লবী হয়ে জন্মাওনি, তা জান?

লেনিন হাসি মুখে তাকালেন। এলিজাবেথ পুনরায় বললেন, তোমার উচিত ছিল হয় চাষী, কি জেলে, কি খালাসী,—আর নয়ত টিনকাটা মিস্তিরি হওয়া! তুমি বিপ্লবী নও!

লেনিন প্রাণখুলে হেসেছিলেন। এলিজাবেথ বললেন, পৃথিবীর এই উত্তর মেরুলোকের শোভা কী আশ্চর্য সুন্দর বল ত'? 'নুট্ হামসুনের' বই পড়েছ?

পড়েছি বৈকি!—লেনিন বললেন, অতি শক্তিশালী লেখক তিনি। তাঁর 'হাংগার' হল মানুষের দেহের ও মনোলোকের পরম ক্ষুধার চিত্র! তাঁর নায়ক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার শহীদ!

এলিজাবেথ আনন্দ ও স্বপ্নলোকে ভাসমান ছিলেন! কিন্তু প্রেমবিদগ্ধা নারীর পক্ষে প্রণয়াশ্রয় পুরুষের ভিন্ন-আকর্ষণ অসহনীয়! লেনিনের এই 'রাজনীতিক' প্রণয় এবং ভালবাসার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি এই 'রাজনীতিক' অন্যমনস্কতা এলিজাবেথের ভাল লাগেনি! বিঠোফেনের সঙ্গীত তিনি আবার ধরেছিলেন, কিন্তু লেনিনের সমগ্র সত্তা ছিল অন্যদিকে। সেটি একান্তভাবেই বিপ্লবের পথ, একান্তভাবেই প্রেমের বিপরীত পথ! নাবিকের কম্পাসের কাঁটা যত আন্দোলিতই হোক, এক সময়ে সেটি উত্তর দিকেই নির্দেশ করে! তেমনি লেনিনের মনের নিকট অনুরাগের চঞ্চলতা অপেক্ষা বিপ্লবচিন্তার স্থিরতাই ছিল সত্য! অনুরাগিনীর দৃষ্টি স্বচ্ছ ছিল না!

এলিজাবেথ ব্যর্থমনে নিঃশব্দে চলে গেলেন স্টকহলম ছেড়ে!

এই ঘটনার দু' বছর পরে প্যারিসের এক বিরাট জনসভায় লেনিন বক্তৃতা ক'রে যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সেই সময় পিছনের একটি দরজা দিয়ে এলিজাবেথ সহসা এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। স্তাবক-পরিবৃত লেনিন বিস্ময়াহত চক্ষে এলিজাবেথের দিকে একবার তাকিয়ে নিজকেই সংযত করলেন। পরে শান্তভাবে বললেন, এখানে যে?

আপনার বক্তৃতা শুনতে!—এলিজাবেথ জবাব দিলেন,—তাছাড়া আরেকজনের একটা কাজ নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। এই নিন তার নাম আর ঠিকানা—।

বলা বাহুল্য, এটি অছিলামাত্র। এটি এলিজাবেথের নিজেরই প্রাণের গরজ! পরদিন সকালে অনুগত ভক্তের মতো লেনিন নিজেই গিয়ে হাজির হলেন এলিজাবেথের বাসস্থানে। উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটতেই লেনিন সাগ্রহে তাঁর হাত ধ'রে বললেন, কতদিন দেখিনি তোমাকে! ভাবছিলুম হয়ত তুমি বেঁচে নেই!

অশ্রু দুলে উঠল এলিজাবেথের দুই চোখে। কিন্তু লেনিন তাঁকে কোলে টেনে নিতে উদ্যত হবামাত্র অভিমানিনী ব'লে উঠল, থাক, ও আর নয়! ও তুমি ভুলে যাও!

লেনিন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, হাঁ, ঠিকই বলেছ! ভুলে যাওয়াই ভাল! কিন্তু তবু তুমি চিত্তবিজয়িনী! আমার শুধু দুঃখ এই, তুমি 'সোস্যাল ডিমক্রাট' নও!

এলিজাবেথ বললেন, তুমিও চিত্তবিজয়ী! আমারও দুঃখ এই, তুমিও সোস্যাল ডিমক্রাট ছাড়া আর কিছু নও!

দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়লেন। লেনিন সে-বেলাটা রয়ে গেলেন এলিজাবেথের ফ্ল্যাটে। স্টকহলমের সেই স্মরণীয় তরণীবিহারের কথা উঠল। লেনিন হাসিমুখে বললেন, সেই দিন আমি প্রথম জানলুম, 'হাংগার' ছাড়া হামসুনের সব বই তুমি পড়েছ!

আমিও সেদিন প্রথম জানলুম,—এলিজাবেথ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, এক 'হাংগার' ছাড়া হামসুনের আর কোনও বই তুমি পড়নি!

লেনিন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

সেদিন বড় আনন্দে সময়টি কেটেছিল দুজনের। বিদায় নেবার সময় লেনিন বলে গিয়েছিলেন, আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে সুইজারল্যাণ্ডে।

অতঃপর লেনিনের জীবনের অতিশয় দুঃসময় এবং নৈরাশ্যের কালে ১৯০৮ সালে জেনেভাতে এই নারীর সঙ্গে লেনিনের পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সম্ভবত সেইটিই শেষবার। সেটি লেনিনের দারিদ্র্য, অবসাদ, হতাশা এবং ব্যর্থতার যুগ। তখন তাঁর আর বাঁচবার সাধ নেই! এই সময়ই একদিন স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন: "I feel as if I have come here to be buried."

এলিজাবেথ সেই সময় লেনিনের জীবনে যেন নূতন প্রাণসঞ্চার ক'রেছিলেন। তিনি থাকতেন জেনেভা থেকে কিছু দূরে এক নিরিবিলি অঞ্চলে। লেনিন একখানা সাইকেলে চড়ে তাঁর কাছে যেতেন। তাঁর পকেটে থাকত দাবা-খেলার ছক আর ঘুঁটি। এলিজাবেথকে তিনি দাবা খেলা শেখাবার চেষ্টা পেতেন! কিন্তু সোদকে এলিজাবেথের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে লেনিন একদিন রাগ ক'রে বললেন, এমন মেয়ে জীবনে দেখলুম না, যে তিনটে জিনিস বোঝে!

এলিজাবেথ হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন, কি কি?

লেনিন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, মার্ক্স, দাবা, আর রেলওয়ে টাইম-টেবল!

এলিজাবেথ সেদিন হেসে ফেটে পড়েছিলেন।

লেনিন-মিউজিয়মের ভিতরকার বিশালতা, গাম্ভীর্য এবং একটি মহিমা দর্শকের মনকে কিছুকালের জন্য অভিভূত করে। এই বিরাট প্রাসাদের বাহিরের রূপ রক্তাভ, কিন্তু ভিতরের প্রবল ও কঠিন প্রস্তরজগতের মধ্যে দুটি বর্ণ প্রকট—শ্বেত ও কৃষ্ণ। শান্তি ও শোক! এই মহান জননেতার জীবনের সমস্ত চিহ্নগুলি যেন এখানে বাঙ্ময়! সেই প্রবলের ও প্রচণ্ডের মৃত্যুহীন প্রাণ প্রতি সামগ্রীকে যেন উজ্জীবিত করে রেখেছে।

কিন্তু ওখানে সুন্দরী ও মমতাময়ী এলিজাবেথের কোনো চিহ্ন নেই।

[আগামীবারে সমাপ্য]

নজরুল জীবনী

আবদুল আজিজ আল আমান

বৈচিত্র্যেভরা নজরুল-জীবনের দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে যেতে হয়। দারিদ্র্যে জর্জর নজরুলের বাল্যজীবন সম্পর্কে আজ পর্যন্ত তো কিছুই আলোচনা হয়নি, তাঁর 'লেটো' দলের অন্তর্ভুক্ত জীবন সম্পর্কে ভাসা ভাসা কিছু আলোচনা হলেও আরো বহুতর তথ্য আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে। নজরুলের ছাত্রজীবন তো আজ পর্যন্ত অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। বেকারী-বয় নজরুল, কি গার্ডসাহেবের বাবুর্চি নজরুল, বংশীবাদক নজরুল, মোল্লাজী নজরুল ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা ঃ সাধারণ পাঠকেরা আজ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই জানতে পারলুম না। কবির সেনাদলে যোগ দেবার কথা আমরা সবাই জানি, সে সময় তিনি যে সব সাহিত্য রচনা করেছেন সে সম্পর্কেও মোটামুটি আমরা কিছু জেনেছি। কিন্তু তাঁর সৈনিক-জীবন আমাদের কাছে চিরঅজ্ঞাত রয়ে গেল অথচ এ জীবন-পরিধি কম নয়—প্রায় তিন বছর। বাংলাদেশের অনেক কবি-সাহিত্যিক জেলে গেছেন কিন্তু সাহিত্য করে জেলে গেছেন একমাত্র নজরুল। দীর্ঘ দিন তাঁকে কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছে—অথচ নজরুল-জীবনীকারগণ ইসারা-ইংগিতে এ জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছেন।

নজরুলের প্রথম বিবাহ হয়েছিল দৌলতপুরে—অথচ সেই বিচিত্র ঘটনা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত আমরা সবাই নীরব। কুমিল্লার সেনগুপ্ত-পরিবারের সংগে তাঁর আলাপ ও দীর্ঘদিন অবস্থান সম্পর্কেও আমরা কিছু জানি না। কুমিল্লা থেকে ফেরার পর কবি বেশ কিছুদিনের জন্য ছিলেন দেওঘরে। রাঁচীতে তো মধ্যে-মাঝে প্রায়ই যেতেন তিনি। এ সব জীবনের সাক্ষী হয়ে হয়তো এখনো অনেকে বেঁচে আছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে কবির সেই দুর্লভ জীবন সম্পর্কে অনেক কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব। কবির প্রথমা প্রিয়া তো আজো বেঁচে আছেন। তাঁর কাছে গেলে হয়তো অনেক কিছু নতুন তথ্য জানা সম্ভব হবে। কুমিল্লা-জীবনের অনেক সৃষ্টির সাথে তাঁর 'চক্রবাক', 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট' প্রভৃতি গ্রন্থের যোগ রয়েছে— বিস্তারিত আলোচনা হলে সে সব আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব নয়। শ্রদ্ধেয়া প্রমীলা নজরুল ইসলামের ডাকনাম ছিল 'দুলি'—এই দুলি থেকেই 'দোলন চাঁপা' নামের উৎপত্তি। "চক্রবাকে"র বহু কবিতা তো তাঁর প্রথমা প্রিয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত।

Gramophone — Rehearsal Room, 106 Upper Chitpur Road, Calcutta থেকে ১-৭-৩৭ তারিখে তাঁর প্রথমা প্রিয়াকে লিখিত প্রথম এবং শেষ চিঠিতে (একমাত্র চিঠি) কবি বলেছেন..."আমার 'চক্রবাক' নামক কবিতা-পুস্তকের কবিতাগুলো পড়েছ? তোমায় বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে। তোমার কোনো পুস্তকে আমার সম্বন্ধে কটূক্তি ছিল।" কবির প্রথমা প্রিয়ার লেখা কোন বইতে কবি সম্পর্কে কি কটূক্তি ছিল সে সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। শুনেছি প্রমীলা নজরুল ইসলামের সংগে কবির বিবাহ যখন নিতান্ত অনিশ্চিত, হৃদয়ের সেই অস্থিরতার ভাবটি কবির অনেকগুলি কবিতায় ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। তারপর এই বিয়েটাই তো ছিল সে যুগের একটি মস্তবড় ব্যতিক্রম। কম বেশী সকল দৈনিকে এই বিয়ের বিরুদ্ধে তুমুল আলোড়ন উঠেছিল। মুষ্টিমেয় কয়েক-জনকে সম্বল করে কবি এই অসাধ্য কাজটি সাধ্য করেছিলেন। সে সময়কার বিস্তারিত তথ্য উদ্ঘাটিত হলে উদার মানুষ নজরুলকে চেনা আমাদের অনেক সহজ হবে। যাঁরা বলেছিলেন—এ বিয়ে টিকবে না—শেষকালে তাঁরাই দেখেছেন রুগ্ন পত্নীর সেবার জন্যে কবি তাঁর বালীগঞ্জের জমি, গাড়ী, কবিতাপুস্তক, গানের Royalty ইত্যাদি সবই বিক্রি করেছেন। এমন কি অনেকে অনুমান করেছেন পত্নীর রোগমুক্তির দারুণ দুশ্চিন্তাই কবির বর্তমান ব্যাধির একটি অন্যতম কারণ। জীবনীকারগণ যদি পরিশ্রম করে সঠিক তথ্য উদ্ঘাটিত করতে পারেন তা হলে মানুষ নজরুল আমাদের কাছে অনেক শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।

খেয়ালী কবি—সরাসরি নেমে পড়লেন রাজনীতিতে। কংগ্রেসের তরফ থেকে দাঁড়ালেন কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ফরিদপুর, ঢাকা, রাজশাহী কত না জায়গায় তিনি ছুটোছুটি করলেন। সে সময়ের বিচিত্র জীবন-কথা সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোকপাত করেছেন কবি জসীমউদ্দীন —তাঁর 'ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়' গ্রন্থে। কিন্তু এখনো বহু ঘটনা আবিষ্কারের প্রতীক্ষায়। নির্বাচন-প্রচারে গিয়ে মানুষকে ধরে ধরে শোনাচ্ছেন গান আর কবিতা। এ সব কি নজরুলের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের দিকে ইংগিত করে না?

কবির জীবনের একটা মূল্যবান অংশ কেটেছে ঢাকা আর চট্টগ্রামে। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ তাঁর "নজরুলকে যেমন দেখেছি" গ্রন্থে কবির চট্টগ্রাম-জীবন সম্পর্কে সামান্য আলোচনাও করেছেন কিন্তু কবির ঢাকা-জীবনটা সম্পূর্ণ আবৃতই রয়ে গেল। অথচ যতদূর জানি কবির ঢাকার জীবনটা দারুণ কোলাহল-কর্মে উত্তেজনাপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। এখানে একবার একদল খান-বাহাদুরেরা কবির সাথে দেখা করতে চান কিন্তু কবি অবহেলায় তাঁদের সে ইচ্ছাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "আমি জনগণের কবি। মানুষের কবি। আমি পথ দিয়ে যাব। খানবাহাদুরেরা পথের দু' পাশে দাঁড়িয়ে আমায় নমস্কার করবে, কুর্ণিশ জানাবে। এই হলে সত্য-

কার সম্পর্ক। তাদের সাথে আমি দেখা করতে যাব কি?" নিঃস্ব গুণীর, দরিদ্র শিল্পীর এমন অমিত মহিমাবোধ পৃথিবীতে ক'জনের আছে? ঢাকার জীবনে এমন ঘটনা বহুতর ঘটেছিল। সেগুলি আবিষ্কৃত হলে মানুষ নজরুলের পরিচয়-দিগন্ত অনেকদূর ছড়িয়ে যেত। ৮।১, পানবাগানের নজরুল, ৩৯, সীতানাথ রোডের নজরুল, হুগলীর নজরুল, চাঁদ সড়কের নজরুল সম্পর্কে নজরুল-জীবনীকারদের বহু কিছু জানতে হবে, সংগ্রহ করতে হবে। নজরুল-জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ অংশ এমন জায়গায় কেটেছে এবং সে জীবন ঘটনা-বহুল।

'সাংবাদিকতায় নজরুল' সম্পর্কে আজ পর্যন্ত (একমাত্র ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের আলোচনা ছাড়া) কোথাও কিছু আলোচনাই হল না। অথচ নজরুলের প্রথম সাহিত্যিক জীবন—যে জীবনে তিনি নিখিল বাংলায় আলোড়ন এনেছিলেন—কেটেছে সাংবাদিকতায়। ধূমকেতু, সেবক লাঙল, গণবাণী, নবযুগ ইত্যাদি সাপ্তাহিক, অর্ধসাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্রপত্রিকার সাথে তিনি কখনো সম্পাদক, কখনো পরিচালক হিসেবে যুক্ত। এ-জীবনের বহুতর ঘটনা আজ নেপথ্যে রয়ে গেছে। ধূমকেতুর সাথে যুক্ত হয়ে অগ্নিক্ষরা লেখার সাহায্যে তিনি তৎকালীন গতানুগতিক সাংবাদিকতায় দারুণ আলোড়ন এনেছিলেন। দৈনিক সেবকে কাজ করার সময় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন কিন্তু মুসলিম-সম্পাদিত পত্রিকায় ('সেবক' পত্রিকাটির পরিচালকবর্গ ছিলেন বর্তমানে ঢাকা হতে প্রকাশিত 'আজাদ'-এর পরিচালকবর্গ—জনাব মোলানা আক্রাম খাঁ ইত্যাদি) প্রকাশের সময় প্রবন্ধটি আমূল পরিবর্তিত হওয়ায় নজরুল সেবকের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। এ সব ঘটনা মানুষ নজরুলকে মহান করে দেখতে সাহায্য করবে।

নজরুল তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক-জীবনের একটি বড় অংশ কাটিয়েছেন সংগীত রচনায়। এই সংগীত রচনাকালে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন গোবরডাঙার ঘটক-পরিবারের সঙ্গে। এই ঘটক-পরিবার ও নজরুল বহুদিন পাশাপাশি বাস করেছেন। এই পরিবারের কর্তৃস্বরূপা শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবীকে কবি 'মা' ডাকায় এঁদের সাথে কবির সৌহার্দ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে সুনীতিবালা দেবীর পুত্র জগৎ ঘটক ও নিত্যানন্দ ঘটকের সঙ্গে কবির যে গভীর আন্তরিকতা গড়ে উঠেছিল তা থেকে বহুতর বিচিত্র ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাবে। নিত্যানন্দ ঘটক ও কবি উভয়ে এক সঙ্গে অভিনয় করেছেন, সংগীত পরিচালনা করেছেন, গান রেকর্ড করেছেন। সুতরাং এঁদের কাছে গেলে বহুতর ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাবে।• অথচ নজরুল জীবনীকারদের কেউ আজ পর্যন্ত এঁদের কাছে গেছেন বলে মনে হয় না। এঁদেরই হারমোনিয়াম ও অন্যান্য যন্ত্র নিয়ে কবি গভীর রাতে সংগীতসাধনায় মেতে উঠতেন। ৫নং ম্যাঙ্গো লেনে, দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার অফিসগৃহে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে জনসাহিত্য সংসদের শুভ উদ্বোধনে সভাপতির ভাষণে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সংগীত-সাধনা সম্পর্কে বলেন, "কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি, জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলেছি। আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সংগীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোনও আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু জানা নেই, তবে এইটুকু মনে আছে সংগীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।" অথচ কবির সেই সংগীত সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোথাও কোন আলোচনা হল না।

এই সংগীতের কথা নিয়েই অনিবার্য কারণে এসে পড়ে গ্রামোফোন কোং ও

নয়ন-ভরা জল গো তোমার,
আঁচল-ভরা ফুল।
ফুল নেব, না অশ্রু নেব
ভেবে হই আকুল॥
ফুল যদি নিই তোমার হাতে
জল রবে গো নয়ন-পাতে,
অশ্রু নিলে, ফুটবে না আর
প্রেমের মুকুল॥
মালা যখন গাঁথ, তখন
পাওয়ার সাধ জাগে।
মোর বিরহে কাঁদ যখন,
আরও ভালো লাগে।
পেয়ে তোমায় যদি হারাই
দূরে দূরে থাকি গো তাই,
ফুল ফুটিয়ে যাই গো চলে
চপল বুলবুল॥

নজরুলের হস্তাক্ষর

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কথা। সংগীত-রচয়িতা হিসেবে কবি দীর্ঘকাল এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ সময় বহু কুমার-কুমারী, তরুণ-তরুণী, গায়ক-গায়িকার সাথে কবির আলাপ হয়েছে—তাঁরাও কবির সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন—কবিও ঘনিষ্ঠ হয়েছেন তাঁদের সাথে। ফলে গড়ে উঠেছে অন্তরঙ্গতা। কবি বহু গায়ক-গায়িকাকে নিজে গান শিখিয়েছেন। নির্দিষ্ট সুর রপ্ত করার জন্যে অনেককেই বহুবার তাঁর সান্নিধ্যে আসতে হয়েছে। এঁদের বহুজনের কাছে কবির বহু চিঠি, জীবনের বিচিত্রতর উপকরণ ছড়িয়ে আছে। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে এঁদের অনেকেই এখনো জীবিত। জীবনীকারগণ একটু কষ্টসহিষ্ণু ও সতর্ক হলে বেতার ও সংগীত জগতের পুরনো তথ্যের সবটুকু উদ্ধার করা সম্ভব। "কলগীতি" নামে তিনি যে গ্রামোফোনের দোকানটি করেছিলেন সে সম্পর্কেও আজ পর্যন্ত বিশেষ কিছু জানা গেল না।

এছাড়াও আছে লোভনীয় অভিনয়-জগৎ। কবি বেশ কয়েকটি থিয়েটার ও ছায়াছবির প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নিজের লেখা দুটি কাহিনী 'বিদ্যাপতি' ও 'সাপুড়ে' ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। নাট্যনিকেতনে তাঁর 'আলেয়া' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে (৩রা পৌষ, ১৩৩৮) নজরুল স্বয়ং 'কবির' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যে ভীরুতার পরিচয় দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত কেউ সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করলেন না। তিনি বহু চিত্রের সংগীত-পরিচালক ছিলেন। 'ধ্রুব' চিত্রে তিনি নারদের ভূমিকায় অভিনয় করে তৎকালে ছায়াচিত্র জগতে যে বিপুল আলোড়ন এনেছিলেন সে সম্পর্কেও আমরা কিছু জানতে পারলুম না। মোট কথা, নজরুলের অভিনয়-জীবন সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোথাও কোন সত্যকারের আলোচনা হয়নি। নজরুল-জীবনের পূর্ণাঙ্গতার জন্যে এ অধ্যায়ের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় বিভিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংস্পর্শ কবির জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা তাও দেখতে হবে।

আর একটি জগৎ রয়েছে—চিঠিপত্রের জগৎ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণ মানুষ মিশেছেন অত্যন্ত সমীহ করে—ফলে দর্শক ও দর্শনীয় ব্যক্তিটির সঙ্গে হৃদ্য নৈকট্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি—একথা কবিগুরু নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু নজরুল? শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু ঠিক কথাই বলেছেন : শ্রীকৃষ্ণের মত তিনি যখন যেখানে তখন তাঁর। গুরুর আসন নয়—বন্ধুর আসনে বসে তিনি সবার কাজীদা, নুরুদা। নজরুলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কারো পক্ষে শ্রদ্ধার পর্দা টাঙিয়ে রাখার উপায় ছিল না। কাছে এলে তাকে অসীম সমুদ্রে হারিয়ে যেতে হয়েছে। দূরে গেলে এই যোগসূত্র রক্ষিত হয়েছে চিঠির মারফত। বহুজনকেই তিনি চিঠি লিখেছেন এবং চিঠিতে ব্যক্তি নজরুল, মানুষ নজরুল, আটপৌরে নজরুলকে পাওয়া অত্যন্ত সহজ। অথচ নজরুলের চিঠিপত্রগুলি সংগ্রহ করার চেষ্টা আজ পর্যন্ত কেউ করলেন কি? এ বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের "মাহেনও" সম্পাদক, নজরুল-গবেষক জনাব আবদুল কাদির কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। নজরুল জীবনীকারদের প্রথমেই লক্ষ্য দিতে হবে এই চিঠির জগতের দিকে। ২৩-৮-৩৩ তারিখে ৩৯, সীতানাথ রোড, কলকাতা থেকে নারায়ণগঞ্জ সংগীত-সংসদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিকে কবি একটি পত্র লিখেছেন :

"সবিনয় নিবেদন,

শ্রীমান আজিজুল হাকিমের মারফত আপনাদের প্রস্তাবমত নিম্নলিখিত সর্ত্তে আমরা ছয়জন আর্টিষ্ট নারায়ণগঞ্জ যাইতে রাজী হইয়াছি।

প্রথম সর্ত্ত : আপনি আমাদিগকে ১২০০৲ টাকা (বার শত টাকা) দিবেন। ঐ টাকায় আমরা নারায়ণগঞ্জে আগামী ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর দুই রাত্রি গান করিব।"

এরপর ৫টি সর্তের কথা বলার পর কবি লিখেছেন : "আমরা নিম্নলিখিত ছয়জন আর্টিষ্ট যাইব :—

১। অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, ২। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস, ৩। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, ৪। আব্বাসউদ্দিন আহমদ, ৫। শ্রীরাসবিহারী শীল (সঙ্গতিয়া), ৬। কাজী নজরুল ইস্‌লাম।"

এই চিঠিতে যাঁদের কথা উল্লেখিত হয়েছে একমাত্র আব্বাসউদ্দীন এবং ধীরেন্দ্রনাথ দাস ছাড়া আর সবাই জীবিত আছেন। এঁদের কাছ থেকে নজরুল-জীবনের বহু উপকরণ পাওয়া যেতে পারে।

প্রেমের ব্যাপারে নজরুল বোধ হয় কিছুটা দুর্বল ছিলেন। এ সম্পর্কে জনাব আবুল ফজল লিখেছেন : "তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন না, বরং পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দাস ছিলেন বলতে পারি। ভালবেসেছেন প্রাণ ঢেলে, ভালবাসা পেয়েছেনও অপর্যাপ্ত। প্রেমে পড়েছেন, প্রেমে না পড়েও প্রেম করেছেন। প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, প্রত্যাখ্যানও করেছেন। বিরহের অনলে নিজে পুড়েছেন, অন্যকেও পুড়িয়েছেন। এমনকি তাঁর জন্য আত্মহত্যা করেছেন নারী।" এই জগৎটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। এবিষয়ে 'চুপ চুপ' ভাবের কোনই প্রয়োজন নেই। শেলী, কিট্‌স, বায়রণ থেকে শুরু করে পৃথিবীর কম বেশী সকল কবিই একাধিকবার প্রেম-সাগরে হাবুডুবু খেয়েছেন। একথা আজ অস্বীকার করে কোনই লাভ নেই যে, আন্না তড়খড়ও রবীন্দ্রকাব্যে প্রেরণা দান করেছেন। সুতরাং রক্তমাংসের নজরুলকে জানতে হলে এই রংমহলের দ্বারোদ্ঘাটিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কবি-প্রিয়াদেরও এবিষয়ে লজ্জিত হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বরং তাঁরা গর্ববোধ করবেন। কেননা কবির সৃষ্টিতে প্রেরণা দিয়ে উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টির সহায়তা করেছেন তাঁরা। কবির আত্মীয়-স্বজনদেরও সংকুচিত হবার কোনই কারণ নেই—একজন রক্ত-মাংসের তাজা মানুষের পক্ষে এটি কোন অস্বাভাবিক কাজ নয়।

নজরুল শেষজীবনে অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণ করেছেন। প্রমীলা নজরুলের অসুস্থতার পর থেকেই কবি কালী-সাধনার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি রীতিমত গুরু ধরে কালী-সাধনা শুরু করেন। আর গুরুর নির্দেশ মত রাত্রের আহার ত্যাগ করেন, খাওয়ার পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়ে ফেলেন, কাঁচা লবণ খাওয়া ত্যাগ করেন এমনি আরো কত কি। কালী-সাধনা নিয়ে তিনি এমনই উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েন যে একদিন গভীর রাত্রে কাকেও কিছু না বলে তিনি সোজা চলে যান দক্ষিণেশ্বরে। এই জীবনে তিনি যে শ্যামাসংগীতগুলি রচনা করেছেন সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। নজরুলের শেষজীবন সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোথাও কোন আলোচনা হয়নি। *

---

* ঋণ-স্বীকার : আলোচ্য প্রবন্ধটিতে জনাব আবুল ফজল-এর কোনো প্রবন্ধের কিছু কিছু উপকরণ ব্যবহার করেছি।

গাড়ীর হর্ণ আর লাউডস্পীকারে স্বদেশী গানের আওয়াজে, পাশের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয় চেঁচিয়ে। দেশের দিকপাল নিশানাথ মজুমদারের জন্মতিথি। জাঁকিয়ে উৎসব পালন করছে দেশবাসী। দেশবাসী বলতে, সমাজের উচ্চতম শ্রেণীর সূত্র ধরে যে কয়েকটি ধাপ মাত্র পাংক্তেয় হতে পারে—তাদেরই সমাগমে বাড়ীর ভেতর দিকের বিরাট লনটি গমগম করছে। বহুবিধ খাদ্য ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বয়-বেয়ারার দল। যে যার রুচিমাফিক তুলে নিচ্ছে তা থেকে। টকটকে লাল রঙের ছুঁচলো নখে দুই আঙুলের টিপে কিছু একটা মুখের কাছে ধরে অনর্গল ইংরাজীতে আলাপ করে চলেছে কোনো উগ্র আধুনিক মহিলা।

একধারে মস্ত একটা কোচে বসে আছেন নিশানাথ মজুমদার। কপালে চন্দনের ফোঁটা—একটু আগে মহা সমারোহে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে অভ্যাগতাদেরই একজন যা সাড়ম্বরে চিহ্নিত করেছে। গলায় ফুলের মোটা মালা। সামনে নীচু টেবিলের ওপর রাখা সোনার একটি ট্রেতে মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একখানা বই। মলাটের ওপর স্বর্ণাক্ষরে লেখা নিশানাথ মজুমদারের নাম। আজকের দিনে দেশবাসীর কাছে পাওয়া উপহার, তাঁরই কর্মব্যস্ত জীবনীর একখন্ড। আশেপাশে ঘিরে রয়েছে শহরের ছাপমারা সব ধনী-মানীরা। সব মিলিয়ে সে এক এলাহী ব্যাপার। রাত সাড়ে নয়টা বাজলে অতিথিদের সামান্য দু'চার কথায় ধন্যবাদ-জ্ঞাপনপূর্বক নিশানাথ বিদায় নিয়ে প্রাইভেট সেক্রেটারী সমভিব্যাহারে উঠে গেলে, অতিথিরাও একে একে পূর্ণ স্থানটি শূন্য করতে উদ্যত হয়।

ফুলে পাতায় সাজান প্রকান্ড গেটটার সামনে গাড়ীর চঞ্চলতার মধ্যে হঠাৎ দেখা দেয় এক উপদ্রব। একটি শীর্ণকায়া স্ত্রীলোক ঢুকতে চাইলে স্বভাবতঃই প্রতিবাদ করতে হয় দারওয়ানকে। এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত দুটি পুলিশও এগিয়ে আসায় বেশ একটা ছোটখাটো গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়। স্ত্রীলোকটিকে পাগল মনে করে হাসাহাসির সঙ্গে কটূক্তি করতে থাকে তারা।

এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে যে অতিথিরা নিজের গাড়ী বা ট্যাক্সির খোঁজ করছে, এ ঘটনাকে তারা চোখে দেখলেও এতে খুব একটা লক্ষ্য করার মত কিছু পায় না।

সিগারেট মুখে সুবেশ একটি যুবক সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেটের বাইরে এসে গন্ডগোল দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। স্ত্রীলোকটিকে একটু লক্ষ্য কোরে পাগল বলে মনে হয় না তার। তা ছাড়া হাতে ওটা কি! খবরের কাগজে মলাট দেওয়া! একটা বই মনে হচ্ছে না? কৌতূহল বোধ ক'রে এগিয়ে যায় যুবকটি। কিন্তু ততক্ষণে জোর করে বাড়ীটার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় বাধা দিতে দারওয়ান গিয়ে স্ত্রীলোকটির হাত ধরে একটা ধাক্কা দিতেই রুগ্ন শরীরে টাল সামলাতে না পেরে সে টলে পড়ে যায় একেবারে রাস্তার ওপর। হাত থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে বইটা। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ে একখানা গাড়ী। আপ্রাণ চেষ্টায় ব্রেক কষতে কষতেও আঘাত থেকে বাঁচাতে পারে না স্ত্রীলোকটিকে। নেবে

আসে চালক, মালিক। ভিড় জমে ওঠার আগেই শীর্ণ দেহটি গাড়ীতে তুলে স্পীড নিয়ে বেরিয়ে যায় গাড়ীটা, কোনো হাসপাতালের উদ্দেশে।

ইতিমধ্যে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে বইখানা তুলে নিয়েছে যুবকটি। সামনের ল্যাম্পপোস্টের নীচে গিয়ে খুলে স্তম্ভিত হোয়ে যায় সে। নিশানাথ মজুমদারের জীবনীর একখন্ড। কোনো নামের সন্ধানে বইয়ের পাতাগুলো দ্রুত-হাতে উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে চরম বিস্ময়ে চোখ তার থেমে যায় একটা পাতায়। নীশানাথের সপ্ততিতম বৎসরের ইতিবৃত্ত যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক তার পাশেই বইয়ের মাপে সাদা একখন্ড কাগজ পরিচ্ছন্নভাবে সাঁটা। আর তাতে গোটা গোটা সুন্দর হস্তাক্ষরে কি সব লেখা। মুহূর্তে বইখানা বন্ধ করে কোটের নীচে লুকিয়ে ফেলে যুবকটি। তারপর ছোট টু-সীটার গাড়ীটায় স্টার্ট দিয়ে একেবারে থামে গিয়ে নিজের বাড়ীতে।

শোবার ঘরে ঢুকে প্রথমেই বন্ধ করে দেয় দরজা জানালা। ভেতরে একটা উত্তেজনা কেমন যেন অস্থির কোরে তোলে। বইখানা হাতে নিয়ে বসে পড়ে একটা চেয়ারে। কি এক গোপন তথ্য উদ্ঘাটনের আনন্দের সঙ্গে তীব্র একটা স্নায়বিক চঞ্চলতা নিয়ে পড়তে শুরু করে—

আমাকে বাদ দিয়ে তোমার জীবনী সম্পূর্ণ হয় না। আজ তুমি দেশের লোকের কাছে পূজ্য, মৃত্যুর পরে হবে মহান্। ইতিহাসে থাকবে তোমার নাম।

মনুষ্যত্বের না হলেও বাস্তব প্রতিষ্ঠার শিখরে দাঁড়িয়ে তুমি। যেখানে পৌঁছে, আমি বা আমার মত বহু মেয়ের স্মৃতিকে ঝুটো মহত্বের জাঁকে চাপা দেওয়াই তোমার আজকের প্রয়োজন। জীবন বাদ দিয়ে জীবনী তো জীবনীকারের চাতুকারিতা মাত্র। তাই সত্যের সামান্য একটুকরো জুড়ে দিয়ে সে অসম্পূর্ণতার তিলমাত্র ভরিয়ে তুলতে আমার এই দুর্বল প্রয়াস।

পঁচিশ বছর আগে যে শিশু-সন্তানটিকে পৃথিবীতে এনে তুমি সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে, কিন্তু বাধা দিয়েছিল তার মা—সেই সন্তান আজও জীবিত। তোমাদের চরম সুব্যবস্থায় বহু মায়ের সন্তানের মতো আর্থিক সংগ্রামে জর্জরিত হোয়ে মরছে সে এই কলকাতারই বুকের ওপর।

সন্তানের দাবীতে—বিরাট জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার এই ভুয়া সম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে মুহূর্তেও সময় লাগবে না তার। কিন্তু তা সে করবে না—তার কারণ তোমাকে তার পিতার স্বীকৃতি দিতেই সে ঘৃণা বোধ করে।

অনেক মহা প্রতারণা আর্থিক মূল্যে আড়াল করা যায়। কিন্তু পিতৃত্বের প্রতারণা কোনো মূল্যেই সন্তানের কাছে আড়াল করা যায় না। সেখানে এর কোনো মার্জনা নেই।

এরপর লেখা একটি নাম ও ঠিকানা।

বারবার পড়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না যুবকটি। ঠিক পড়েছে তো? বইখানা বন্ধ কোরে চায় সে মলাটটার দিকে। জ্বলজ্বল করতে থাকে স্বর্ণাক্ষরে নিশানাথ মজুমদারের নাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে যুবকটি।

পরদিন সকাল। নিশানাথ মজুমদারের প্রাইভেট চেম্বার। গদীমোড়া ভারী একটা কোচে গা ডুবিয়ে বসে আছেন নিশানাথ, সামনে দাঁড়ালো যুবকটি। কার্ডের পেছনে কি একটা নাম ঠিকানা লিখে নিশানাথের কাছে পাঠানোমাত্রই অনায়াসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেয়েছে সে।

গম্ভীর শব্দ বেরিয়ে আসে নিশানাথের কণ্ঠ থেকে, 'ঠিক আছে।'

'আচ্ছা স্যার'—সবিনয়ে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে আসে যুবকটি। খুশী-চঞ্চল পায়ে দ্রুত নেবে যায় সিঁড়ি দিয়ে। গেট পেরিয়ে শিস দিতে দিতে গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দেয়। এক মোচড়ে গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছোটে গ্রীন্ডলের দিকে। পকেটের মোটা অঙ্কের চেকটা ভাঙাতে হবে।

বঙ্কিম যুগের এক বিস্মৃত অধ্যায়: স্বর্ণলতা

দীপঙ্কর নন্দী

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ভাস্বরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁর অপূর্ব লিপি-কৌশল কবিত্বময়ী ভাষা, রোমান্টিক পরিবেশপূর্ণ প্রণয়-কাহিনী পাঠ করে বাঙ্গালী যেমন মুগ্ধ তেমনি তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করে গৌরবান্বিত। তাঁকে অনুসরণ করে বাঙ্গালী সাহিত্যসেবিগণ সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। সেদিন তাঁর অপ্রতিহত প্রভাবে বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্য আচ্ছন্ন ছিল।

ঠিক এই সময়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একজন প্রতিভাবান উপন্যাসকারের আবির্ভাব হয়, তিনি আর কেউ নন, "স্বর্ণলতা" প্রণেতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তারকনাথ তাঁর প্রথম উদ্যম 'স্বর্ণলতা' রচনা করে অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করেন। সে খ্যাতির প্রভাবে সে দিন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। এর নজির রয়েছে বাংলা সাহিত্যের পাতায়। সেই ঐতিহাসিক বিস্মৃত অধ্যায়টির আলোচনার জন্য বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। এখানে বলে রাখা ভাল, বঙ্কিমচন্দ্রের অপপ্রচার করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট; তাঁর সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না, তিনি অতুলনীয়।

স্বর্ণলতা' পল্লীবাংলার সাধারণ নর-নারীর সুখদুঃখের ঘর-সংসারের কথা, বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামের বাস্তব কাহিনী। স্বর্ণলতায় বাঙ্গালীর হৃদয়-সংঘাতের যে করুণ কাহিনী অঙ্কিত হয়েছে তা যেমন নিখুঁত তেমনি মর্মস্পর্শী। বাঙ্গালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের এমন হৃদয়গ্রাহী বাস্তব চিত্র এর আগে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়নি। শুধু তাই নয়, স্বর্ণলতায় তারকনাথ যে বাস্তব নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। প্রথম প্রকাশের সময়ই (১৮৭৪ এপ্রিল) তাঁর এই বাস্তবতার প্রতি অনুরাগ সুধী-জনের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

স্বর্ণলতায় বাঙ্গালী নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলের গোপন কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, অনুভব করলো নতুন করে। 'স্বর্ণলতা' মুকুরে নিজেদের স্বরূপ-চিত্র দেখে আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। স্বর্ণলতাকে বাঙ্গালী আপন করে নিলো। সেদিন সকলের মুখেই 'স্বর্ণলতার' জয়জয়কার। 'ক্যালকাটা রিভিউ' স্বর্ণলতা সমালোচনা করতে বসে আত্মহারা হয়ে লিখলেন, "স্বর্ণলতাই বাংলা ভাষার একমাত্র উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলি উপন্যাস নয়—কাব্য।"—সেই কৌতূহলোদ্দীপক সমালোচনাটি এইরূপ—

This is only true novel we have read in Bengali, Babu Bankim Chandra's works being poems, not novels, * * * In discribing Bengali domestic life, in delineating real character, in sketching ordinary scenes, the author of Swarnalata, Babu Taraknath Ganguli is without a rival among Bengali writers of fiction. He is a close observer of men and manners, and he has a faculty, which seems to be exclusively his, for working up—ordinary materials into a highly effective picture. As specimens of character-painting, his Promoda, his Sarala, his Gadadhar, his Nilkamal, his Syama, and his Sasankasekhara are the best of their kind in Bengali literature. Babu Taraknath seems also capable of highly-successful efforts at ideal representation. His Sarala is almost an ideal character, and his story of Gopal and Swarnalata possesses a strong ideal cast. As a painter of real ordinary life, both in its comic and in its serious and tragic side, Babu Taraknath is unrivalled among Bengali author's......(1) ...

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে স্বর্ণলতার তুলনামূলক সমালোচনা করে রামনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০) লিখেছেন,

"কোন কোন স্থানে তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) বর্ণনা সুসঙ্গত নহে, এবং কোন কোন স্থানে জাতীয় ভাবের অভাব আছে। অর্থাৎ যে বিদেশীয় ব্যক্তিগণ আমাদিগের হিন্দু জাতির রীতি নীতি অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা যদি তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা ঠিক অবগত হইতে চাহেন, তাহারা তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা ঠিক অবগত হইতে পারিবেন না।........ উপন্যাস রচয়িতা বলিয়া 'স্বর্ণলতা' প্রণেতা অল্পখ্যাতি লাভ করেন নাই। তাঁহার রচিত উপন্যাসের একটি প্রধান

গুণ এই যে, তাঁহার কোন স্থানে জাতীয় ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই।" (২)

ব্যঙ্গরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯১১) লিখেছেন, "নামের ভার নাই, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নাই, তবু 'স্বর্ণলতা' চতুর্থবার মুদ্রিত হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষায় এখনকার অবস্থায় ইহা সামান্য শ্লাঘার কথা নয়। তাহার উপর ইংরাজী ধরণের প্রণয় লীলা, চোর ডাকাইতের অদ্ভুত খেলা, আকস্মিক বিচ্ছেদ, অভাবনীয় মিলন—এই সকল প্রসঙ্গের ছায়াপথ বর্জিত হইয়াও যে গ্রন্থ এত আদরের সামগ্রী তাহার অসাধারণ কোন গুণ আছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে। বাস্তবিক 'স্বর্ণলতা' স্বর্ণলতাই বটে।" (৩)

সমসাময়িক লেখকদের এই সব উক্তি থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, স্বর্ণলতার খ্যাতির প্রভায় কিছুদিন বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। এহেন অবস্থায় বঙ্কিম অনুরাগী ভক্তগণের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক; হয়ে ছিলও ঠিক তাই। তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের বাস্তবচিত্র খুঁজতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কোথায় একটু সামাজিক জীবনের খণ্ড চিত্রের সন্ধান পেয়ে তাঁরা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেন। তাই দেখতে পাই বঙ্কিম অনুরাগী ভক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১২৬৮—১৩০৫) বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' সামাজিক চিত্রের একটু সন্ধান পেয়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে অভিমানের সুরে বলেছেন, "যাঁহারা সত্যমূলক (Real) উপন্যাস দেখিতে ভালবাসেন এবং বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে সেই সত্য (রিয়েলিটি) কম আছে বলিয়া যাঁহারা 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসকে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস হইতে উৎকৃষ্ট বলিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই উপন্যাস পাঠ করুন, দেখিবেন কি সুন্দর স্বাভাবিক চিত্র।" (৪)

স্বর্ণলতার প্রশংসা আর তারকনাথের খ্যাতিতে বঙ্কিম অনুরাগী শিষ্যগণই নয়, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বড় কম বিচলিত হননি। হয়তো সেই কারণেই তিনি স্বর্ণলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। "তাঁহার সমসাময়িক অনেকের প্রতিই তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) কিছু পরিমাণে প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করিতেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' বাঙ্গালা ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং বাঙ্গালায় প্রথম গৃহস্থ উপন্যাস। এই বইটির কোন সমালোচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় নাই × ×।" (৫)

বলা বাহুল্য সে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সমালোচনা করে 'বঙ্গদর্শন' মারফৎ লেখককে অভিনন্দন জানাতেন এবং সাহিত্য সাধনায় লেখককে উদ্বুদ্ধ করতেন।

তারকনাথই বঙ্কিম যুগের একমাত্র লেখক যিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারকনাথের 'স্বর্ণলতায়' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি এতটুকু। 'স্বর্ণলতা' বঙ্কিম উপন্যাসের প্রতিক্রিয়া। যে-যুগে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট, সেই যুগে তাঁর আকাশস্পর্শী প্রভাব অতিক্রম করে সার্থক বাস্তবধর্মী সামাজিক উপন্যাস রচনা করা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। অনেকের মতে স্বর্ণলতাই বাংলা সাহিত্যের বাস্তবধর্মী সর্বপ্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাস।

তারকনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল কিনা জানা যায় না। তবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একটুও প্রসন্ন ছিলেন না। কারণ তারকনাথের মতে বঙ্কিমচন্দ্র "Fiction to please should wear the face of truth". নীতি অনুসরণ করেননি। এজন্য তিনি স্বর্ণলতার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু কটাক্ষ করেছেন। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস সম্বন্ধেও তিনি বলতেন, দেবী চৌধুরাণী কর্তৃক ঘড়া ঘড়া মোহর বিতরণ প্রভৃতি বর্ণনা অস্বাভাবিক—অবাস্তব।

স্বর্গীয় উপন্যাসকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "বঙ্কিমের উপর তিনি (তারকনাথ) অত্যন্ত চটা ছিলেন। কেহ যদি বঙ্কিমের নিন্দা ও 'স্বর্ণলতা'র সুখ্যাতি করিলে তিনি মহাখুসী। তৎক্ষণাৎ নিমন্ত্রণ করিয়া পোলাও কালিয়ার বন্দোবস্ত করিতেন। তিনি বলতেন, বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি প্রায়ই ফেলিয়োর—অস্বাভাবিক। বঙ্কিমের মত লোকের দুইতিনখানির অধিক উপন্যাস লেখা উচিত ছিল না। কতকগুলি লিখিতে গিয়া অধিকাংশই রাবিশ হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে Filding-কে অনুসরণ করাই উচিত। Filding অধিক উপন্যাস লেখেন নাই; যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।" (৬)

---

(1) The Calcutta Review : 1882.

(২) রাজনারায়ণ বসু : বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, পৃঃ ৫৪।

(৩) 'স্বর্ণলতায়' মুদ্রিত স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র।

(৪) গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী : "বঙ্কিমচন্দ্র" (তৃতীয় ভাগ), পৃঃ ৫২।

(৫) ডক্টর সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃতীয় সংস্করণ), পৃঃ ৯২।

(৬) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : "তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়", ১০ আগষ্ট, ১৮৯৬।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লেফ্‌টেনান্ট ঘোষের রাজত্বে আর একটা মারাত্মক অনিয়ম চলে আসছিল। উনিই তার প্রবর্তক। এ প্রতিষ্ঠানের লিখিত আইনে 'স্টার' হবার অধিকার শুধু সেইসব ছেলেদের, 'বর্স্টাল স্কুলস্ অ্যাক্‌টে' যাদের সাজা, অর্থাৎ যাদের বয়স ষোল থেকে একুশ। 'ইনডাস্ট্রিয়াল বয়েজ', অর্থাৎ আট থেকে পনর যাদের বয়স, তারা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত। 'স্টার-বয়' কতগুলো বাড়তি সুবিধা ভোগ করে থাকে; তার মধ্যে প্রধান—সাধারণ খাদ্যতালিকার উপর কিঞ্চিৎ মাছ-মাংস-ডিম দুধের আলাদা বরাদ্দ। নেহাৎ 'কিঞ্চিৎ' নয়, দৈনিক আড়াই ছটাক মাছ বা মাংস, অথবা তার বদলে দুটো ডিম। নিরামিষওয়ালাদের বিকল্প ব্যবস্থা দুধ।

ঘোষসাহেব তখন নতুন এসেছেন। একদিন 'ফীডিং প্যারেড' তদারক করতে গিয়ে তার নজরে পড়ল কয়েকটি বড় ছেলের পাতে মাংসের কারী, আর তাদেরই পাশে বসে ছোটদের দল খাচ্ছে শুধু ডাল ভাত। কেউ কেউ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে ভাগ্যবান দাদাদের থালার দিকে আর প্রাণপণে পাত চাটছে।

'ওদের মাছ কৈ?' কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন চীফ্ অফিসারকে।

—আজ্ঞে, ওরা কাল পাবে। কাল 'জেনারেল ফাইল'।

—এরা যে আজ খাচ্ছে?

চীফ্ অফিসার হাসল। নতুন সাহেবের অজ্ঞতার উপর কিঞ্চিৎ করুণার হাসি। তারপর বলল, আজ্ঞে, হুজুর, এটা হচ্ছে • 'ইস্পিশাল'। ওরা 'স্টার' কিনা? ওদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা।

—খুব ভালো ব্যবস্থা তো। ধেড়ে-গুলো গিলবে আর বাচ্চাগুলো বসে হাত চাটবে!

তখনই আফিসে ফিরে ডেপুটি সুপারকে ডেকে দেখতে চাইলেন কি আছে "রুলস্"। তারপর, দেখা হয়ে গেলে মোটা বইখানা সশব্দে টেবিলের উপর আছড়ে ফেলে বেঁটে ছড়িখানা বগলদাবা করে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ হল না। দিনদুই পরে আবার ডেপুটির ডাক পড়ল। আসতেই, কোনোরকম ভূমিকা বা পরামর্শ না করে সরাসরি বললেন, আপনার 'স্টার' প্রভুরা আলাদা মাছ মাংস যেটা পায়, তার সঙ্গে সাধারণ ছেলেদের পাওনাটা যোগ করে এক জায়গায় রান্না করতে বলুন।

ডেপুটি নির্দেশটা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তখন বাকী অংশটা পূরণ করলেন সুপার, 'আর, বলে দিন সেটা যেন সক্‌কলকে সমান ভাগে দেওয়া হয়।'

—তা কেমন করে হবে, স্যর?' প্রতিবাদ জানালেন সন্তোষবাবু। 'স্টার' বয়দের এক্‌সট্রা অ্যালাউন্স আলাদা রান্না করেই দেবার কথা। গবর্মেন্ট স্যাংশান আছে।

—তা আছে, কিন্তু কান্ডজ্ঞানের স্যাংশান নেই। ওদের পাওনাটা ওরা সকলের সঙ্গে ভাগ করে থাক, এইটাই আমার ইচ্ছা।

ডেপুটি বলতে পারতেন, 'আপনার ইচ্ছায় তো আর আইন বদলায় না।' বললেন না। উপরওয়ালাকে সব কথা বলা যায় না। তবে, এই ব্যাপার নিয়ে 'স্টার' ছেলেরা গোলমাল করতে পারে, কর্তব্যের অনুরোধে একথা তিনি স্পষ্টাপষ্টি না জানিয়ে পারলেন না। ঘোষ তার উপরে বিশেষ কোনো গুরুত্ব দিলেন বলে মনে হল না। সংক্ষেপে বললেন, আচ্ছা, সে যখন করবে, তখন দেখা যাবে।

ডেপুটির অনুমান যে অমূলক নয়, প্রথমদিনেই দেখা গেল। স্টার-মহলে একটা চাপা অসন্তোষ দেখা দিল। কয়েকজন মাংস খেল না, একজন পুরো-পুরি অনশন অর্থাৎ গোটা একদিন হাঙ্গার স্ট্রাইক্ করে বসল। সাহেব ওদের সব কজনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'তোমাদের অনেকেরই বড় ভাই আছে। কী বল?' কেউ কেউ মাথা নাড়ল।

'আচ্ছা, ধর, একসঙ্গে খেতে বসেছ আর মা কী করলেন? মাছের কালিয়াটা সব তার পাতে ঢেলে দিলেন, আর তোমাকে দিলেন শুধু ডাল চচ্চড়ি। তোমার খুব ভালো লাগবে কি? আর তোমার দাদারও কি লজ্জা করবে না ছোট ভাই-এর সামনে বসে মাছের মুড়ো চিবোতে?

'স্টার'এর দল গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এসব 'ইস্কুল মাস্টারি' উপদেশ কারোই ভালো লাগল না। নীতিবচন শুনবার জন্যে তারা বর্স্টাল্ জেলে, আসেনি, সাহেব মনে মনে হাসলেন। ভাষাটা মোলায়েম হলেও বেশ দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন, তার কাছে ছোটবড় সব ছেলেই সমান। সুতরাং খাওয়া পরার ব্যাপারে কোনো ইতর-বিশেষ হতে দেবেন না।

ভিতরে ভিতরে আন্দোলন চলতে থাকল। কর্মীদের ভিতরেও দু'একজন তাতে গোপন ইন্ধন যোগাতে লাগল। স্বয়ং ডেপুটি সক্রিয়ভাবে সে দলে না থাকলেও, তাঁর মানসিক সমর্থন রইল এদের দিকেই। কিন্তু সাহেবকে কিছুমাত্র বিচলিত দেখা গেল না। পরে আবার

যেদিন মাছের পালা, গোটা বরাদ্দটা একসঙ্গে রাঁধিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সমানভাবে পরিবেশন করালেন। এদিন আর না-নেওয়ার দলে কেউ রইলো না, শুধু একজন ছাড়া। দিনেশ সরকার; বয়স একুশ ছাড়িয়ে গেছে, সাজাও বর্স্টাল-আইনে নয়। কোন একটা সেন্ট্রাল জেলে 'প্রতারণা' মামলায় জেল খাটছিল। সেখানকার সুপারিন্টেন্ডের সুপারিশে এবং ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের বিশেষ ক্ষমতা বলে জেলের কয়েদটা বর্স্টাল-মেয়াদে পরিণত করা হয়েছে। সেদিনও সে খেতে আসেনি, আজও তাকে খাবার-ফাইলে দেখা গেল না। খবর নিয়ে জানা গেল সে এবার রীতিমত নোটিশ দিয়ে হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছে এবং যতদিন এই বে-আইনী আদেশ বাতিল না হয়, অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাবে।

ঘোষসাহেবের মুখে তার সেই রহস্যময় বাঁকা হাসিটা আরেকবার দেখা দিল। চীফ অফিসারকে ডেকে বললেন, ওকে সেল-এ পাঠিয়ে দাও। সেখানে এক জল ছাড়া আর কিছু থাকবে না। যে-গার্ড থাকবে সে শুধু ওর ওপর নজর রাখবে কিন্তু কথাবার্তা বলবে না আর কাউকে ওর ত্রিসীমানায় যেতে দেবে না।

চব্বিশ ঘন্টা পেরিয়ে যেতেই সন্তোষ সেন একখানা নীল মলাটের পুস্তিকা হাতে করে বিমর্ষমুখে সাহেবের ঘরে দেখা দিলেন। শুষ্ক স্বরে বললেন, রিপোর্টটা এবার পাঠাতে হয়, স্যার, আর দেরি করা চলে না।

—কিসের রিপোর্ট? প্রশ্ন করলেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

—হাঙ্গার স্ট্রাইকের।

—ও-ও।

—এক কপি আই জি; এক কপি সরাসরি হোম্-সেক্রেটারী।

—হোম্-সেক্রেটারী!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই দেখুন না? রুল বলছে, টু বি অ্যাড্রেসড্ টু দি হোম্ সেক্রেটারী বাই নেম্। নামে পাঠাতে হবে।

—বেশ, দিন পাঠিয়ে। ঐ সঙ্গে জানিয়ে দেবেন আমার হোম্ আমিই সম্‌লাবো, হোম্ সেক্রেটারীর দরকার হবে না।

সন্তোষবাবুর শেষ কথাটায় কান দিলেন না। চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালেন, চিন্তান্বিত মুখে বললেন, 'হাঙ্গার-স্ট্রাইক কেন হল, ওর গ্রীভান্সটা কী তাও জানাতে হবে। এইখানে বলছে'—বলে নীল মলাটের বইটা খুলতে যাচ্ছিলেন। সাহেব তার জন্যে অপেক্ষা না করে বললেন, বেশ তো, সেটাও জানিয়ে দিন, স্টার-বয়দের ফালতু খাবারটা অন্য সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে বলে ও'র গোসা হয়েছে। সেইজন্যে খাচ্ছিল না।

—সেটা বলা কি ঠিক হবে?

—কেন হবে না? এমনি বললে তো, কর্তারা কান দেন না। হাঙ্গার স্ট্রাইক-এর গুঁতোয় যদি—

—আচ্ছা, আজ শুধু গেলন রিপোর্টটাই চলে যাক। যদি পারসিস্ট করে, পরে দেখা যাবে।

সন্তোষবাবু পীড়াপীড়ি করায় প্রাথমিক রিপোর্টে কারণের উল্লেখ রইল না। "ফারদার রিপোর্ট ফলোজ" বলে খবরটাই শুধু পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এদিকে দীনেশ যখন দেখল, দলপতি হয়ে সে যেখানে একটি দানা পর্যন্ত মুখে তুলছে না (এক্ষেত্রে তার উপায়ও ছিল না,) সেখানে তার অকৃতজ্ঞ অনুচরের দল তিন বেলা তিন-থালা ভাত্তিছল্যের অন্ন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, তখন সেই নির্লজ্জ, ভীরু, বেইমানগুলোর জন্যে জীবনদানের সার্থকতা কোথায়? একদিন পরেই তার মনে এই জাতীয় একটি দার্শনিক বিজ্ঞতার উদয় হল। উদয় যে হবে, ঘোষসাহেব সম্ভবতঃ তা জানতেন। তাই পরদিন দেখা গেল, দীনেশের সেল-এ শুধু জলই নয়, তার পাশে কিঞ্চিৎ ফল দুধ, মিষ্টিও এসে গেছে—একাদশীর পরে যেমন পারণ। সকলের অলক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে তার সদ্ব্যবহারও হয়ে গেল।

দ্বিতীয় রিপোর্ট গেল টেলিগ্রামে—'হাঙ্গার স্ট্রাইক কলড্ অফ্।' ডেপুটি সুপার নিশ্চিন্ত হলেন।

ঘোষসাহেব চলে যাবার পর অস্থায়ী 'রাজ্যভার' গ্রহণ করেই সন্তোষবাবু স্টার বালকদের প্রতি এই দীর্ঘস্থায়ী অবিচারের অবসান ঘটালেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! কৃতজ্ঞতা জানানো দূরে থাক, তারা বিশেষ খুশী হয়েছে বলেও মনে হল না। একদিন যারা ন্যায্য পাওনা পায়নি বলে আন্দোলন করেছিল, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ খালাস হয়ে গেছে, দু-তিনজন তখনো ছিল। আজ সেই হৃত অধিকার ফিরে পেয়ে তারাও ঠিক যেন উপভোগ করতে পারল না। ছোটদের মধ্যে বসে এই বাড়তি খাবারটা মুখে তুলতে চক্ষুলজ্জায় বাধল। বাকি স্টার যারা, তারা পরে এসেছে; সুতরাং এই ফালতু বরাদ্দের কথা জানত না। তারা আরো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কেউ কেউ ঐ বাড়তি খাবারটা পাতে নিতেই চাইল না, কেউ নিলেও সরিয়ে রেখে দিল। কজন, সবটা একা না খেয়ে পাশাপাশি অন্য ছেলে যারা বসেছে, তাদের থালায় খানিকটা তুলে দিয়ে ভাগাভাগি করে খেয়ে নিল।

নতুন সুপারের কানে যেতেই তিনি সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, তিন দলই বে-আইনী কাজ করছে। সরকারের বরাদ্দ করা খাদ্য পুরোপুরি না-নেওয়া বা না-খাওয়া যেমন অপরাধ, তার চেয়েও গুরুতর অপরাধ তার কোনো অংশ অন্যকে দান করা। কার কী প্রাপ্য, আইনই সেটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তার মধ্যে অনুমাত্র তারতম্য করবার অধিকার ইনমেটদের দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতে এই জাতীয় অবাধ্যতা দেখা গেলে অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

এর পরে প্রকাশ্য না-নেওয়াটা বন্ধ হল, কিন্তু পরস্পর আদান-প্রদান চলতে লাগল গোপন পথে। স্বয়ং চীফ্ অফিসার এবং তাঁর কর্মীরা দেখেও দেখলেন না। আইন যা-ই বলুক, ঘোষসাহেবের ব্যবস্থাটাই অনেকের মনোমত ছিল এবং ওতেই তারা অনেকদিন ধরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এতদিন পরে আবার একটা জটিলতা সৃষ্টি না করলেই তারা খুশী হত। প্রশাসন-যন্ত্রটা মসৃণগতিতে চলুক, তার ছোট-বড় সকল অঙ্গ সেই কামনাই করে। এখানে-ওখানে আটকে গেলেই বরং অসন্তোষের কারণ দেখা দেয়। যে-চালক সেই অবাধ চালনায় অক্ষম, বিশেষ করে নাটবল্টুরা তাদের প্রীতির চোখে দেখে না। চাপটা যে বেশীর ভাগ পড়ে গিয়ে তাদেরই ঘাড়ে।

সন্তোষ সেন নাটবল্টুগুলোকে আর একটু বেশী 'টাইট দিতে' গিয়ে বিপত্তির সৃষ্টি করলেন। একজন 'স্টার' একটি 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল' ছেলের পাতে একটুকরো মাছ চালান করেছিল কিন্তু পাহারায় নিযুক্ত 'পেটী অফিসার' দেখেও বাধা দেননি কিংবা চীফ্‌কে রিপোর্ট করেননি,

এই অপরাধে তিনি ঐ দুটি ছেলেকে যেমন শাস্তি দিলেন, সেই সঙ্গে সিপাইটাকেও জরিমানা করে বসলেন। তারপর কোথা দিয়ে কে কী করল, ঠিক বোঝা গেল না। দুদিন বাদে ছিল মাংসের 'ফাইল'; অর্থাৎ যেদিনে এক ফোঁটা ঝোল বা একটুকরো হাড়ের চেয়ে প্রাণের দাম অনেক কম, সেদিনে চোখ বুজে শুকনো হাড় চিবোবার দৃশ্য দেখে ঘোষসাহেব একবার আশুবাবুর কানে কানে বলেছিলেন, চেয়ে দেখুন, একদল মুনি ধ্যানে বসেছে। এই মুহূর্তে দুনিয়া উল্টে গেলেও ওরা জানতে পারবে না। সেই দিনে সেই পরম বস্তুর হাঁড়ির সামনে বসে স্টার বাদে বাকী সবাই অর্থাৎ কাঁচ ও কাঁচার দল গম্ভীর মুখে বলে বসল, 'মাংস খাবো না।' ছোটদের মনে ক্ষোভ দেখা দিলেই সেটা 'না-খাওয়ার' রূপ নেয়। বর্স্টালের কর্মীরা তা জানে। সেই সঙ্গে এও জানে, যে-অপগণ্ডের দল নিয়ে তাদের ঘর করতে হয়, তারাও সেই চিরন্তন শিশু ও কিশোর। চারদিকের এই উঁচু পাঁচিল এবং একরাশ আইনকানুনের দাঁড়িদড়ার মধ্যে বসেও এরা যা তাই। সুতরাং এই ধরণের 'না-খাওয়ার' হুমকি যখনই আসে, চীফ অফিসার এবং তাঁর অনুচরদের খানিকটা কাজ বাড়ে। সেটা তাদের সরকারী ডিউটি-রোস্টারে লেখা থাকে না। কাউকে একটু পিঠে হাত, কাউকে একটা ধমক, কাউকে দুটো মিষ্টি কথা—এইরকম ছোটখাট মুষ্টিযোগ দিয়েই তারা সব গোল মিটিয়ে ফেলে। কর্তৃপক্ষের দরবারে বড়-একটা ছুটতে হয় না। আজ কিন্তু তারা সে-পথে গেল না। 'মাংস খাবে না? বেশ।' ফীডিং-শেডে যার ডিউটি, তার কাজ চীফকে জানানো। চীফের কাজ সাহেবকে রিপোর্ট দেওয়া। সেইটুকু করেই তাদের কর্তব্য শেষ হল।

সাহেব এসে গোটা দলটাকে শাসালেন, কঠোর শাস্তির ভয় দেখালেন, এতদূর পর্যন্ত বললেন যে, আইনের চোখে এই জাতীয় 'মাস্ অ্যাক্শন' অর্থাৎ দলবদ্ধ অবাধ্যতার নাম 'মিউটিনি', যার দণ্ড অতি ভয়ানক। সকলে মাথা নীচু করে নিঃশব্দে শুনে গেল। তিন দিন পরে আবার মাছের পালা এলে দেখা গেল, ডাল আর তরকারী দিয়ে সব ভাত শেষ করে সবাই থালা নিয়ে উঠে যাচ্ছে, 'মাছ' বলে যে একটা পদার্থ রয়েছে তাদের খাদ্য-তালিকায়, সে-কথা যেন কারো জানা নেই।

সন্তোষবাবু বুঝলেন, রিংলীডার-দের আলাদা করতে হবে। চীফকে ডেকে হুকুম করলেন, পাণ্ডাগুলোকে সেল-এ পাঠিয়ে দাও। চীফ্ পকেট থেকে নোটবুক, আর পাগড়ির ভিতর থেকে পেন্সিল বের করে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, কাকে কাকে পাঠাবো, হুজুর?

—'কাকে কাকে, আমায় বলতে হবে?' খাঁঝিয়ে উঠলেন সুপার।

—আজ্ঞে, আমি তো জানি না, কে কে ওদের পাণ্ডা।

খাঁঝিয়ে উঠলেন সুপার

—বেশ, তাহলে আমিই বলবো।

স্টারদের মধ্যে দু-তিনজনকে গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগানো হল। তাদের যারা কোনো কারণে খুশী করতে পারেনি, এমনি কয়েকটা নাম তারা গোপনে এসে সাহেবকে জানিয়ে গেল।

তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের ডাকিয়ে এনে কড়া ধমক দিলেন এবং সেল-এ পুরবার ভয় দেখিয়ে আপাততঃ ছেড়ে দিলেন। দিলীপের নামটা কোনো সূত্রে না পেলেও, নিজে থেকেই তাকে ডেকে পাঠালেন। ধমকের সুরে বললেন, 'তুমিও বুঝি আছ এই আন্দোলনের পেছনে?'

সে যখন জানাল, কোনো আন্দো-লনের সঙ্গে তার যোগ নেই তখন আরো রুখে উঠলেন, তবে মাছ-মাংস খাচ্ছ না কেন?

—মাছ-মাংস আমি খাই না, স্যার।

—ওসব চালাকি আমি বুঝি।

দিলীপ আর কোনো কথা বলল না। এখানে আসবার পর সামান্য কিছু-দিন সে আমিষ খাবার খেয়েছিল, অনেকটা কেশব ও বাহাদুরের পীড়া-পীড়িতে। তারপর ছেড়ে দিয়েছে।

মাছ-এর খণ্ড পাতে পড়লেই তার মায়ের কথা মনে পড়ত। তাদের সেই ছোট্ট রান্নাঘরে 'আঁশ'-এর কারবার ছিল না। তবু উঠোনের কোণে তোলা উনুনে মা মাঝে মাঝে তার জন্যে দু-একটুকরো মাছ রেঁধে দিত। তাকে খাইয়ে আবার স্নান করে তবে হেঁসেল ঢুকত নিজের জন্যে দুটো ভাত ফুটিয়ে নিতে। জ্ঞান হবার পর থেকেই বিধবার ছেলে; মাছের উপর দিলীপের তেমন কোনো আকর্ষণ ছিল না। বলত, 'আমার জন্যে মাছ রেঁধো না মা। আমার ভাল লাগে না। এর চেয়ে তোমার পাতের ঐ মুগডাল আর ডাঁটাচচ্চড়ি অনেক ভালো।' মা শুনত না। বলত, মাছ না খেলে চোখের জ্যোতি কমে যায়। রোজ তো দিতে পারি না। দু-তিন দিন অন্তর দু-একটা টুকরো খেতে হবে বৈকি?

দিলীপ তর্ক করত, ওসব বাজে কথা। তুমি যে খাও না। তোমার বুঝি চোখ খারাপ হয় না?

মা জিভ কেটে বলত, ছিঃ, ছিঃ, ও-কথা বলতে আছে? আমি যে বিধবা।

বর্ষ্টালে যেদিন মাছ আসত, বিশেষ করে সেই দিনগুলোতে এই সব কথা তার মনে পড়ত। মা আজ কোথায় সে জানে না। যেখানেই থাক, 'খোকার জন্যে' মাছ রান্নার পাট তাঁর চুকে গেছে। সেই সঙ্গে তার খাবার পালাও ঘুচে গেছে। মায়ের হাতের স্পর্শই তো একদিন এই তুচ্ছ জিনিসটাকে পরম বস্তু করে তুলেছিল। আজ এর কোনো দাম, কোনো স্বাদ নেই তার কাছে। মুখে তুলতেও ইচ্ছা করে না। দু-চার মাস কোনো রকমে চালিয়ে সে মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়েছিল।

সন্তোষবাবু ওকে চুপ করে থাকতে দেখে সুর বদলালেন। বললেন, বেশ, তুমি না হয় আগে থেকেই নিরামিষ খাও, কিন্তু ঐ বাঁদরগুলো? ওরা খাচ্ছে না কেন? কাজটা কি খুব ভালো হচ্ছে মনে কর?

—ওদের কথা ওরাই ভালো বলতে পারবে, স্যার। দু-একজনকে ডেকে যদি জিজ্ঞেস করেন,—

—'আমার দায় পড়েছে জনে জনের কাছে গিয়ে হাত কচলাতে!' গর্জে উঠলেন সুপার, 'আমি আর একটা 'ফাইল' দেখবো, তারপর একে একে সক্কলের সব প্রিভিলেজ কাটতে শুরু করবো। চিঠিপত্তর, দেখাশুনো, খেলা-ধুলো......। দেখি, তোমরা কত বাড় বাড়তে পার।'

মিনিটখানেক নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে দিলীপ নমস্কার করে বলল, আমি যেতে পারি, স্যার?

সুপার কিছু একটা ভাবছিলেন। হঠাৎ মাথা তুলে বললেন, শোনো। তুমি লেখাপড়া শিখেছ। দুদিন পরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে। তুমি নিশ্চয়ই বোঝো, গভর্মেণ্ট যে ব্যবস্থা করেছেন তার বাইরে আমি যেতে পারি না।

আমার আগে যিনি ছিলেন, তিনি যদি গায়ের জোরে বে-আইনী হুকুম চালিয়ে গিয়ে থাকেন, আমাকেও কি তাই মানতে হবে?

দিলীপ, যেমন ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল. এ-প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। সুপার স্বর নামিয়ে বললেন, তুমি ঐ গাধাগুলোকে একটু বুঝিয়ে দাও না? তোমাকে ওরা সবাই মানে।

'আমি চেষ্টা করবো, স্যর' বলে দিলীপ আর একবার নমস্কার করে বেরিয়ে চলে গেল।

সেই রাত্রেই ঘটল এক অপ্রত্যাশিত বিচিত্র ঘটনা, যার ফলে 'বর্ষ্টালের' গোটা জীবনটাই হঠাৎ অন্য দিকে মোড় নিয়ে বসল।

মাসে অন্ততঃ একবার সুপারকে 'নাইট রাউণ্ডে' বেরোতে হয়। আগে থেকে না জানিয়ে গভীর রাতে ঘুরে ঘুরে ঘুরে দেখতে হয়, বিভিন্ন এলাকার সব 'পেটী অফিসার' ঠিকমত টহল দিচ্ছে, না, তৃণশয্যায় সটান হয়েই কাবার করছে তাদের দু' ঘণ্টার ডিউটি-মেয়াদ।

সেদিন সন্তোষবাবু যথারীতি নৈশ পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। গেট থেকেই তাঁর সঙ্গ নিয়েছে সহকারী চীফ্—পাহারারত পেটী অফিসারদের সেই সময়কার ভারপ্রাপ্ত সর্দার। ডানদিকের ওয়ার্ডগুলো ঘুরে দেখে, দেবদারু-বীথিকার পাশ দিয়ে, পশ্চিম সীমানার পাঁচিল-পাহারার রিপোর্ট নিয়ে ঢুকে পড়লেন হাসপাতালের হাতায়। ডিউটি-সিপাইকে দেখতে পেলেন না। চারদিকে টর্চ ফেললেন। চার ব্যাটারীর জোরালো আলোয় প্রতিটি কোণ ঝলমল করে উঠল, কিন্তু কোথাও কোনো মনুষ্য-কায়ার আভাস পাওয়া গেল না। সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে মোড় ফিরতেই চোখে পড়ল, জানালার শিকে পা এলিয়ে দিয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে পেটী অফিসার। এবার টর্চ গিয়ে থামল তার ব্যাদান-বিকশিত মুখের উপর। কিন্তু নাসিকা-গর্জন ছাড়া আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সুতরাং এ-পক্ষ থেকে পাল্টা গর্জনের প্রয়োজন। তারই ব্যবস্থা হল। গোটা হাসপাতালের ভিৎসুদ্ধ কাঁপিয়ে দিয়ে ফেটে পড়ল সহকারী চীফ্ বলবন্ত সিং-এর বাজখাঁই হুঙ্কার—'মর গিয়া'। সিপাইটি চমকে উঠে আরক্ত চক্ষু মেলে তাকাল. কিন্ত প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারল না। হয়তো মনে করে থাকবে ভূমিকম্প। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আসল ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেই লাফ দিয়ে উঠতে গেল। পারল না; সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়তে হল। দ্বিতীয় লাফ, আবার বসে পড়া। পর পর বারতিনেক নৃত্যের ভঙ্গীতে উত্থান-পতনের পর বলবন্ত সিং গর্জে উঠল, 'ঠ্যারো। বুরবক্ কাঁহাকা।' সিপাই তখনো বুঝতে পারেনি, গোলযোগটা ঘটেছে তার পশ্চাদ্দেশে। অর্থাৎ কোমরের বেল্ট বাঁধা পড়েছে জানলার গরাদের সঙ্গে। নিজে থেকে পড়েনি। তার গভীর নিদ্রার সুযোগ নিয়ে কোনো 'অদৃশ্য হস্ত ওয়ার্ডের ভিতর থেকে কখন তাকে বন্দী করে ফেলেছে। লোকটি কিঞ্চিৎ শীর্ণকায়। চামড়ার বেল্টটা পুরোপুরি এঁটে বসে না। বসলে বা শুয়ে পড়লে ফাঁকটা আরো বেড়ে যায়। তারই ভিতর দিয়ে একটুকরা শক্ত সুতো গলিয়ে বন্ধন কার্যটি সমাধা করতে কয়েক সেকেণ্ডের বেশী লাগেনি। জানালার ঠিক বাইরে ঐ চওড়া সিমেণ্ট-বাঁধানো জায়গাটি নিদ্রার পক্ষে মনোরম। সেখানে যে এত বড় বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে, সিপাই মহারাজ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

সহকারী চীফ্-এর সহায়তায় বন্ধনমুক্ত হবার পর সিপাই তার বেশ-বাস সামলে নিয়ে অন্নদাতা মনিবের সামনে দু কদম এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই একটি লম্বা সেলাম ঠুকল, তারপর হাতজোড় করে কাতরস্বরে বলল, 'কসুর হো গিয়া, হুজুর; মাপ্ কিজীয়ে। আপ মা-বাপ হ্যয়—।' আরো কি সব বলতে যাচ্ছিল, সুপার ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। তাঁর বর্তমান লক্ষ্য সিপাই-এর এই ঘুমিয়ে পড়ার 'কসুর' নয়, তার চেয়ে অনেক বড় 'কসুর', ঐ ভিতর থেকে কেউ বা কারা যেটা করেছে। কিন্তু সেখানে কোনো চাঞ্চল্য বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। পাশাপাশি খাটে সাত-আটটি মশারি টাঙানো। তার ভিতরে যারা আছে, তারা সজীব প্রাণী। কিন্তু হাতকয়েক মাত্র দূরে এত বড় যে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল, তাতে তাদের অণুমাত্র শান্তিভঙ্গ করেছে বলে মনে হল না।

পরদিন শুরু হতেই হল তদন্ত। সাহেব নিজেই তার ভার নিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শনের পালা শেষ করে, গত রাতে ঐ ওয়ার্ডে যারা ছিল, সবাইকে তাঁর অফিসে তলব করলেন। তার মধ্যে তিনজন শয্যাগত রোগী। তাদেরও স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হল। ঘটনাটা যে কত গুরুতর, একজন কর্তব্যরত সরকারী কর্মচারীকে বেঁধে রাখা যে কতখানি মারাত্মক অপরাধ, বিশেষ করে কোনো বন্দীনিবাসের বাসিন্দার পক্ষে, সে সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়ে তিনি সরাসরি প্রশ্ন করলেন, বল, এ-কাজ কে করেছ?

সকলেই নিরুত্তর।

—'বলবে না?'

এ-প্রশ্নেরও কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

সুপার ক্ষণকাল অপেক্ষা করে বললেন, বেশ, তাহলে আমিই তাকে খুঁজে বার করবো এবং আশা করি, তোমাদের মধ্যে যারা নির্দোষ, তারা আমাকে সাহায্য করবে।

এই বলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন এবং এক-একজনের কাছে গিয়ে নাকের উপর আঙুল উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'তুমি জানো, কে করেছে।' প্রত্যেকেই মাথা নেড়ে জানাল, সে জানে না। লাইনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল দিলীপ। ঐ ওয়ার্ডেই সে অনেকদিন থেকে আছে। ঐ রাত্রেও ছিল। সুপারের তর্জনী তার উপরে পড়তেই মাথা তুলে বলল, জানি।

—'জানো?' অনেকটা যেন আশ্বস্ত হলেন সন্তোষবাবু।

আগ্রহের সুরে বললেন, কে, বলতো?

—আমাকে মাপ করবেন, স্যর। আমি বলতে পারবো না।

—বলতে পারবে না! বাট্ ডু ইউ নো, অন্যায় করার চেয়ে তাকে সমর্থন করা আরো বড় অপরাধ?

—জানি।

—তবে?...কী জন্যে তাকে বাঁচাতে চাইছ? বন্ধু বলে?

—না।

—তাহলে তোমার স্বার্থটা কী?... বল।

দিলীপ অনুনয়ের সুরে বলল, এবারকার মতো তাকে মাপ করুন, স্যর। ব্যাপারটা যে কতখানি দোষের, ও ঠিক বুঝতে পারেনি। ঐ নিয়ে একটু মজা করবে বলে—

—'মজা!' গর্জে উঠলেন সুপার। তারপর চাপা গলায় কিন্তু দৃঢ়ভঙ্গিতে বললেন, 'আচ্ছা; মজা কাকে বলে তোমরাও টের পাবে।'

বিচার আপাততঃ মুলতুবী রইল। কিন্তু তার ফলটা যে রীতিমত কঠোর হয়ে দাঁড়াবে, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ রইল না। এখানে-সেখানে ছোট ছোট দলের মধ্যে চাপা সুরে সারাদিন সেই আলোচনাই চলল। শুধু ছেলেদের মহলে নয়, মাষ্টার ইনষ্ট্রাকটর কেরানী এবং সিপাই-মহলেও। দিলীপকে কেউ বাহবা দিল, সাবাস ছেলে। কী রকম মনের জোর! কেউ আবার মুখ বেঁকিয়ে মন্তব্য করল, ওসব বাহাদুরির কোনো মানে হয় না। বলে দিলেই তো চুকে যায় বাপু। কোনো কোনো শুভানুধ্যায়ী ওকে ডেকে নিয়ে সেই পরামর্শই দিলেন। সে শুধু শুনে গেল, আর কিছু বলল না।

(ক্রমশঃ)

অয়স্কান্ত

॥ রকেটের যুগে ॥

আকাশে এরোপ্লেন দেখলে আজকাল আর আমরা অবাক হই না। জেটপ্লেনও হামেশাই আমাদের চোখে পড়ে। তীব্র একটা শিসের মতো আওয়াজ তুলে মস্ত একটা ডানামেলা পাখি চোখের পলকে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে হাজির হচ্ছে—এ দৃশ্যও আমাদের কাছে মামুলি। এমন কি চলচ্চিত্রের কল্যাণে আকাশযাত্রার শেষতম বাহন রকেটের সঙ্গেও আমরা অনেকেই পরিচিত। এখন যদি শুনি যে কলকাতার ময়দান থেকে একটি রকেট আকাশে উঠবে তাহলে আমরা সবাই ভিড় করে দেখতে যাব নিশ্চয়ই—কিন্তু অবাক হয়তো হব না। এমন কি মহাকাশচারী গাগারিনকেও আমরা কলকাতায় সম্বর্ধনা জানিয়েছি আমাদেরই মতো রক্তমাংসের মানুষ হিসেবেই। গাগারিন ও তিতোভ যদি পৃথিবীতে নেমে আসার সময়ে সামান্য হিসেবের হেরফেরের দরুণ সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটিতে না নেমে কলকাতার মাটিতে নামতেন তাহলেও আমরা কক্ষনো মনে করতাম না যে, তাঁরা অ-মানুষ। এককথায় বর্তমান কালে পৃথিবীর একদেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্ক ও যোগাযোগ এতই ঘনিষ্ঠ যে, কোনো ঘটনাই কোনো একটি বিশেষ দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। এক দেশের অভিজ্ঞতা কিছুকালের মধ্যেই হয়ে ওঠে সারা পৃথিবীর।

তাই এই কলকাতা শহরেও আমরা একটুও অবাক না হয়ে অপেক্ষা করে আছি কবে আমরা খবর পাব যে, মানুষ চন্দ্রে গিয়ে পৌঁছেছে, মানুষের পক্ষে যে চন্দ্রে যাওয়া সম্ভব বা মঙ্গলগ্রহে বা শুক্রগ্রহে বা এমন কি নক্ষত্রলোকে—তা সাইকেলের যুগের (প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়) মানুষ আমরাও অনায়াসেই বিশ্বাস করে বসে আছি। এ যে কী আশ্চর্য পরিবর্তন তা উপলব্ধি করতে হলে খানিকটা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার।

আমি এখানে দুটি চিঠি উদ্ধৃত করছি। চিঠি দুটি নেওয়া হয়েছে 'এ ইয়ং ভিক্টোরিয়ান ইন ইণ্ডিয়া' নামে ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ডে প্রকাশিত একটি বই থেকে। বইটি কতকগুলো চিঠির সংকলন।। চিঠিগুলি লিখেছিলেন একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান ১৮৭৪ থেকে ১৮৮৯ সালের মধ্যে।
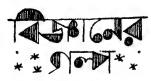
॥ প্রথম চিঠি ॥

"পোস্টমাস্টার জেনারেলের অফিস
কলকাতা
২৭শে মার্চ, ১৮৮৯

মিঃ স্পেনসার মঙ্গলবার বেলুনে চেপে আকাশে উঠলেন। তারপরে দুদিন ও তিন রাত্রি তাঁর কোনো খবর পাওয়া গেল না। ধরে নেওয়া হল যে: তিনি নিখোঁজ হয়েছেন। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র খুলে দেখা হল। তাঁর মৃত্যু ঘটলে কি-কি করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি কিছু লিখে রেখে গিয়েছিলেন—তাও পড়া হল। তাঁর পার্টনার ঘোষণা করলেন কি-ভাবে তাঁর শেষ ইচ্ছেগুলি পূরণ করা হবে। সে-সময়ে সারা কলকাতা শহরে দারুণ এক উত্তেজনা। খুব সম্ভবত সিপাহী বিদ্রোহের পরে শহরে এত বেশী উত্তেজনা আর কখনো হয়নি। যতোদূর ধারণা করা যায়, একলক্ষ লোক মিঃ স্পেনসারকে বেলুনে চেপে আকাশে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছিল। তারপরে যখন বোঝা গেল যে, মিঃ স্পেনসার নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছেন তখন প্রত্যেকেরই সে কী উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা। ...বৃহস্পতিবার রাত্রি প্রায় এগারোটার সময়ে খবর পাওয়া গেল যে, মিঃ স্পেনসার কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে একটি মহকুমা শহরে নিরাপদে রয়েছেন ও কলকাতার দিকে রওনা হয়েছেন। একটি সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে তাঁকে আনবার জন্যে একটি স্পেশাল ট্রেন এবং সেইসঙ্গে একজন বিশেষ প্রতিনিধি পাঠানো হল। ব্যাপার যা শোনা গেল তা এই যে, মিঃ স্পেনসার তাঁর বেলুন সমেত কলকাতা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা জলাভূমিতেই অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্যাপারটি ঘটেছে মঙ্গলবারেই কলকাতা থেকে শূন্যে পাড়ি দেবার ঘণ্টা দেড়েক পরে। এই ঘটনা থেকে ইংলণ্ডের লোকেরা ধারণা করতে পারবেন এমন কি এই ১৮৮৯ সালেও ভারতের অবস্থাটা কী। একবার ভাবো যে, কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে থেকেও একজন মানুষ পঞ্চাশ ঘণ্টার মধ্যেও তাঁর বন্ধুবান্ধবের কাছে কোনো খবর পাঠাতে পারেননি। আর সাধারণই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মিঃ স্পেনসার যেখানে নেমে এসেছিলেন সেখান থেকে আর কয়েক মাইল দূরে গিয়ে নামলেই তাঁকে আর কোনো গ্রামে বা কারও বাড়িতে পৌঁছতে হত না—তার আগেই তিনি বাঘের বা কুমিরের পেটে যেতেন। অবশ্য অন্য দিকেও ব্যাপারটা এই দাঁড়িয়েছিল যে, তাঁকে সবাই রাক্ষস বলে ধরে নিয়েছিল। নিজের গায়ের কোটটি আগে থেকেই বাড়ির আঙিনায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তবে তিনি বাড়িতে ঢুকতে পেরেছিলেন।"

॥ দ্বিতীয় চিঠি ॥

"কলকাতা
১০ই এপ্রিল, ১৮৮৯

বেলুনযাত্রী মিঃ স্পেনসার আরেকবার আকাশে উঠবেন এবং প্যারাস্যুটের সাহায্যে নেমে আসবেন। এ-ধরনের কোনো ব্যাপার ঘটলে নেটিভরা কি রকম অভিভূত হয় তা দেখলে অবাক হতে হবে। তারা ধারণা করে নেয় যে, এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার এবং মিঃ স্পেনসার একজন দেবতা। এবার যখন তিনি আকাশ থেকে নেমে এলেন তখন কয়েকজন উচ্চবর্ণের নেটিভ তাঁকে একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়েছিল, যদিও এই অন্দরমহলে কোনো পুরুষকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। মিঃ স্পেনসারকে তারা একবারে বাড়ির মেয়েদের সামনে হাজির করেছিল। ভাবখানা এই যে, যে-সব নিয়ম সাধারণ মানুষদের বেলায় খাটে তা মিঃ স্পেনসারের বেলায় খাটছে না, কারণ তিনি স্বর্গে ভ্রমণ করে এসেছেন।"

মাত্র তিয়াত্তর বছর আগে এই ছিল আমাদের কলকাতা। সামান্য একজন বেলুনযাত্রী সারা শহরের মানুষকে স্তম্ভিত করে দিতে পেরেছিল।

॥ প্রথম বেলুন ॥

তাই বলে কলকাতা শহরের লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই, একটু আগে-পরে হলেও একই ব্যাপার ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে আকাশে বেলুন ওঠানোর কিছু বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

বেলুন আবিষ্কারের কৃতিত্ব ফরাসী দেশের দুটি ভাইয়ের। একজনের নাম যোসেফ মোঁৎগোলফিয়ে, (১৭৪০-১৮১০), অপরজনের নাম এতিয়েন মোঁৎগোলফিয়ে (১৭৪৫-১৭৯৯)। দুজনেরই আগ্রহ

ছিল আবহাওয়া সম্পর্কে। প্রিস্টলের লেখা 'বিভিন্ন ধরনের বাতাসের পর্যবেক্ষণ ও সেই সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা' (১৭৭৪ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থটির ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ সালে। এই বইটি অবশ্যই তাঁরা পড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৎকালের অন্যান্য বিজ্ঞানের বইও। চুল্লীর ধারে বসে থাকতে থাকতে তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন যে চুল্লীর ওপরে পাতলা কাঠের টুকরো বা কাগজের টুকরো এসে পড়লে তারা যেন ঠেলা খেয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। এই পর্যবেক্ষণ থেকেই খুব সম্ভবত তাঁরা বেলুনের ধারণায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। তখনকার ভাষায় বলা হত যে, একটি থলের মধ্যে খানিকটা মেঘ পুরে ফেলতে হবে আর সেই মেঘ থলেকে ঠেলে তুলবে আকাশে।

যতোদূর অনুমান করা চলে, ১৭৮২ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে দুই ভাই ঘরের মধ্যে প্রথম বেলুন উড়িয়েছিলেন। বেলুনটি তৈরি হয়েছিল হাল্কা সিল্কের থলে দিয়ে—নিচের দিকটা খোলা ছিল। থলের নিচে আগুন জ্বালানো হয়েছিল আর তখন আস্তে আস্তে থলেটা গিয়ে ঠেকেছিল সিলিং-এ। তারপরেও নিশ্চয়ই এই ঘরের মধ্যেই তাঁরা নানাভাবে বেলুন ওড়ানোর পরীক্ষা করেছিল। প্রাথমিক সাফল্যের পরে দুই ভাই ঘোষণা করলেন যে, ১৭৮৩ সালের ৫ই জুন তারিখে তাঁরা প্রকাশ্যে বেলুন উড়িয়ে দেখাবেন।

মানুষের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় তারিখ। সারা শহরের উচ্চ-নীচ সমস্ত মানুষ এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত মানুষকে বিস্ময়ে নির্বাক করে দিয়ে আকাশে উঠে গিয়েছিল বেলুনটি। তারপরে প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার পর সমস্ত মানুষ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে উল্লসিত চিৎকার করে উঠেছিল। মানুষের তৈরী এই প্রথম বেলুনটির ধারণক্ষমতা ছিল ২৩৪৩০ ঘনফুট, ব্যাস ছিল ৩৮ ফুট। এটির বাইরের আবরণ ছিল লিনেনের—ভেতরের দিকে কাগজ লাগিয়ে বায়ু-রোধক করা হয়েছিল। বেলুনটি আকারে ছিল প্রায়-গোল। বেলুনের নিচের দিকটি খোলা ছিল। কাঠ আর খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন তৈরী করা হয়েছিল এই খোলা মুখের ঠিক নীচেই। ক্রমে বেলুনটি

প্রথম আকাশ যাত্রা: ১৭৮৩
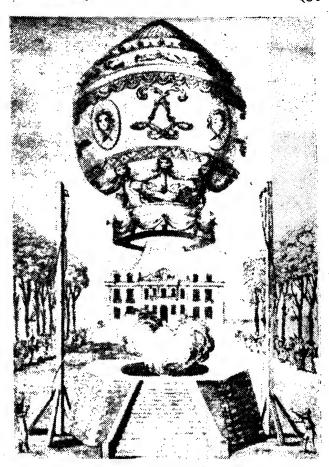
ফুলেফেঁপে ওঠে আর তারপরে আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠে যায়। এই বেলুনটি ৬০০০ ফুট ওপরে উঠেছিল আর মাটিতে নেমেছিল যাত্রা-শুরুর জায়গা থেকে ৭৬৬৮ ফুট দূরে।

॥ প্রথম হাইড্রোজেন বেলুন ॥

এই সাফল্যের খবর ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমির কাছে গিয়ে পৌঁছয়। এই বিষয়ে একটি পরীক্ষাকার্য চালাবার জন্যে আকাদেমির উদ্যোগে একটি ফান্ড তৈরি হয়। ইতিপূর্বে ১৭৬৬ সালে বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিশ হাইড্রোজেন গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন। আকাদেমির বেলুনকে আকাশে ওঠাবার জন্যে এই হাইড্রোজেন গ্যাসকেই ব্যবহার করা হয়েছিল। বেলুনটির ব্যাস ছিল ১৩ ফুট। ১৪৮৩ সালের ২৭শে আগস্ট তারিখে বিকেল পাঁচটার সময় তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বেলুনটিকে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাত্র দু-মিনিট বেলুনটিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, তারপরেই বেলুনটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল মেঘের আড়ালে। তখন দ্বিতীয় আরেকবার তোপধ্বনি করে এই স্মরণীয় উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন স্বনামখ্যাত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। একজন এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বেলুনের দরকারটা কী বলতে পারেন?' বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন জবাব দিয়েছিলেন, 'নবজাত শিশুরই বা দরকারটা কী?'

এই বেলুনটি মাটিতে নেমেছিল পনেরো মাইল দূরের ছোট্ট একটি গ্রামে। আচমকা দেখা গেল আকাশ ফুঁড়ে মস্ত একটা ফুটবল নিঃশব্দে মাটির দিকে নেমে আসছে। এই দৃশ্য দেখে গ্রামের লোকের অবস্থা কী হয়েছিল তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়: "প্রথম দর্শনে সবাই মনে

করেছিল অন্য কোনো জগৎ থেকে এটা এসেছে। অনেকে পালিয়ে যায়। যাদের বিবেচনাশক্তি একটু বেশি তারা ভাবে যে এটা হচ্ছে অতিকায় একটা পাখি। তারপরে জিনিসটা মাটিতে নামে। কিন্তু তখনো ভেতরকার অবশিষ্ট গ্যাসের ঠেলায় নড়েচড়ে বেড়ায়। দর্শকদের মধ্যে জনকয়েক সাহস সঞ্চয় করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। একঘণ্টা ধরে একটু একটু করে তারা এগোয় আর প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করতে থাকে যে দৈত্যটা আবার বোধ হয় উড়ে পালাবে। তারপরে, দলের মধ্যে যে সব চেয়ে সাহসী সে বন্দুক তুলে নেয়, তারপরে সতর্কভাবে লক্ষ্য স্থির করে গুলী চালায়। গুলী খেয়ে দৈত্যটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়। উল্লাসের ধ্বনি তুলে শাবল আর গাইতি নিয়ে সবাই ছুটে আসে। একজন অস্ত্র চালায় আর তখন যেটাকে সে মনে করেছিল দৈত্যের গায়ের চামড়া তা ছিঁড়ে যায়। একটা বিষাক্ত দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে। তখন আবার সবাই পালিয়ে যায়। তারপরে নিজেদের কাপুরুষতায় লজ্জা পেয়ে আবার ফিরে আসে আর সেই ভয়ের জিনিসটাকে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বাঁধে। ঘোড়া ছুটে চলে মাঠ-প্রান্তর ডিঙিয়ে আর সেই জিনিসটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।"

॥ জীবন্ত প্রাণীর আকাশযাত্রা ॥

সেই বছরেই ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদের মাঠ থেকে রাজা ও রানীর সামনে আরেকটি বেলুন আকাশে ওঠানো হয়। এই বেলুনের সঙ্গে একটি খাঁচা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল আর এই খাঁচার মধ্যে ছিল একটি ভেড়া, একটি মোরগ ও একটি হাঁস। আট মিনিট আকাশে ওড়ার পরে মাইল দেড়েক দূরে একটি জঙ্গলের মধ্যে বেলুনটি মাটিতে নেমে আসে। দেখা গেল যাত্রী তিনটিও অক্ষত ও সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছে।

মানুষের আকাশযাত্রা শুরু হয়েছিল ১৭৮৩ সালের ২১শে নভেম্বর তারিখে। কিন্তু সেই কাহিনী এতই বিচিত্র ও ঘটনাবহুল যে অল্প দু-এক কথায় বলা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের কোনো একটি সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে ফিরে আসার ইচ্ছে রইল।

অমলেন্দু ঘোষ

বারাসি বা বারোমাসি গান গ্রাম্য গীতিকবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। বারাসি বা বারোমাসি বলতে বারো মাসের সমষ্টিকেই বোঝায়। বারাসি বারোমাসি কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। বারোমাসি গান যশোহর-খুলনায় বারাসি গান নামে পরিচিত। এবং এই বারাসি গান যশোহরের মাদারিপুর অঞ্চলেই সহজপ্রাপ্য। (দ্রঃ যশোহর খুলনার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র, ২য় খণ্ড পরিশিষ্ট)।

বারাসি গান বাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলায় অল্প-বিস্তর প্রচলিত। বাংলার চাষী মজুর প্রভৃতি খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনে বারো মাসে—তেরো পার্বণের পরিবর্তে হাজারো রকমের অভাব অভিযোগ প্রকট হয়ে ওঠে। এই অভাব-অভিযোগের মধ্যে আর্থিক ও সাংসারিক বিষয়ের সঙ্গে আবার রয়েছে দৈহিক ও মানসিক বিষয়সমূহের কথা। এই উভয়-বিধ অভাব-অভিযোগের মধ্যে মানসিক অর্থাৎ নায়িকার বিরহের কথাই বারাসি গানের মূল উপাদান।

বারাসি গান সাধারণতঃ ফসল তোলার সময় কৃষকেরা গেয়ে থাকে, ফসল তোলা-কালীন পরিশ্রম লাঘবের আশায় আর মনের আনন্দে। তা' ছাড়া এমনিতেই চাষী যুবক বছরের প্রায় বারো মাসই এই গান গেয়ে থাকে—পথ চলতে এবং কাজের ফাঁকে।

এই গানের এমনই একটা সুর-বৈশিষ্ট্য আছে যা' সত্যিই মনোহারী। খানিকটা ভাটিয়ালী সুরের মিশ্রণে এই গান গাওয়া হয়। আড়-বাঁশী সহযোগে এই বারাসি গান যে-কোনো শিক্ষিত সঙ্গীত-রসিকের মন প্রাণ কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে এই বারাসি গান প্রায় অপাংক্তেয় হয়ে আছে। কেননা এই বারাসি গান প্রায়ই আদিরসাত্মক।

॥ ২ ॥

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বারোমাস্যা বা বারোমাসিতে যেমন বারোমাসের বা ছয় ঋতুর বিভিন্ন প্রাকৃতিক বর্ণনা পাওয়া যায়, এই পল্লীগীতির বারোমাসি ঠিক সেই জাতীয় নয়। পল্লীগীতির এই বারোমাসি গান অপেক্ষাধিক পরিমাণে আদিরসাত্মক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই উভয় প্রকার বারোমাসিতে বিরহি-নারীমনের অন্তর্বেদনা সমভাবে প্রকাশিত। এইখানেই এই উভয় প্রকার বারোমাসির সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বারোমাস্যা বা বারোমাসা বা বারোমাসি প্রায়ই সহজলভ্য। কিন্তু উৎকর্ষের বিচারে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের 'ফুল্লরার বারমাস্যা'ই সর্বাধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

পল্লী-অঞ্চলে বারোমাসি যে কতো জনপ্রিয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি গ্রাম্য ছেলে-ভুলানো ছড়ায়। ছড়াটি বারো মাসের বিভিন্ন সময়ে সহজপ্রাপ্য ও বাঙালীর অতিপ্রিয় বিবিধ আহার্য-বস্তুর তালিকায় পূর্ণ। ছড়াটি খুলনার গ্রামাঞ্চলে অতি পরিচিত।—

পৌষে চাপ, মাঘে বোল,
ফাল্গুনে গুটি, চৈতে ঝোল।
বোশেখে একটি দুটি,
জ্যৈষ্ঠে দুধের বাটি।
আষাঢ়ে চাটাচুটি,
শ্রাবণে পোড়ামাটি।
ভাদ্দরে তালপিঠে,
আশ্বিনে শশা মিঠে।
কার্তিকে খলসে মাছের ঝোল,
অঘ্রাণে বেটা কি বলবি বল ।।

ডাকের বচনেও ওই জাতীয় একটি বারোমাসিতে বাঙালীর প্রিয় আহার্য-বস্তুর তালিকা পাওয়া যায়।—

কার্তিকে ওল, মার্গে বেল,
পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল।
ফাগুনে আদা, চৈতে তিতা,
বৈশাখেতে নিম নালিতা।
জ্যৈষ্ঠে ঘোল, আষাঢ়ে দই,
শ্রাবণে চুড়ান্ত খই।
ভাদ্রে তাল, আশ্বিনে শশা,
ডাক বলে—এই বারোমাসা।।*

* দ্রষ্টব্য : ডঃ সুশীলকুমার দে সংকলিত বাংলা প্রবাদ (নং ৩০৭২)।

॥ ৩ ॥

প্রায়ই দেখা যায়, গ্রাম্য বারমাসি গানের নায়ক অর্থের সন্ধানে বিদেশে যায়। এবং স্বভাবতই কাজের গতিকে অনেক সময় স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব ঘটে। ইতিমধ্যে বসন্তের দূত কোকিল পঞ্চম স্বরে তান তোলে এবং নায়িকার মনে এক অপূর্ব শিহরণ জাগায়—নায়িকার ভাষায় : মনের আগুন উসকে দেয়। অভাব-অভিযোগে জর্জরিত, কর্মক্লান্ত মানুষ অসহায় কিন্তু অনিবার্যভাবে অনুভব করে বসন্তের পরশ। কৃষক-বধূর মন সাড়া দিতে চায় কোকিলের ডাকে। কিন্তু স্বামী তার বিদেশে অর্থের সন্ধানে ব্যাপৃত। কৃষক-বধূর এ দুঃখের বুঝি পার নেই। পদাবলীর ভাষায় নায়িকা যেন বলতে চায় : 'এ সখি হামারি দুখের নাহিক ওর'।—নায়িকার সাধ, স্বামী বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে কোকিলের ডাকে সে মনের আনন্দে সাড়া দিতে পারতো। তাই সে কোকিলের উদ্দেশে সখেদে তার আন্তরিক আবেদন জানায় :

শুধু ও পয়সার জন্য, প্রাণপতি মোর
গেছে বিদেশে।
ও প্রাণ-কোকিলে,
তুমি ডাকো কি বলে!

এ আবেদন বড়োই করুণ ও প্রাণ-বিদারী। আবার,—

শীত গেল বসন্ত এল
এল ফাল্গুন মাস।
সবে খেলে সুখের পাশা,
আমার পতি-পরবাস॥

এই অবস্থা, বিশেষত বছরের ফাল্গুন মাস, বিরহী-নায়িকার কাছে নিতান্তই অসহনীয়। তাই, নায়কের উদ্দেশে নায়িকার অভিযোগ দারুণ আক্ষেপের সুরে ধ্বনিত হয়। নায়িকা বলছে :

পরের নৌকায় ব্যাপার করো
বাঙ্গাল সদাগর—
নিজের নৌকা ঘাটে বাঁধা,
সোনায় জর-জর॥

এখানে শেষোক্ত 'নৌকা' শব্দটি দেহতত্ত্বের প্রচ্ছন্ন ভাষায় মানুষের দেহরূপ নৌকা অর্থে ব্যবহৃত। যে কোনো প্রকার পল্লীগীতিতে দেহতত্ত্বের সাধনভজন সংক্রান্ত রূপক শব্দের ব্যবহার প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। এর এক বিশেষ কারণ গ্রামের মানুষেরা সাধারণত সাধন-ভজনের গূঢ় কথা সহজ ভাষায় শুনতে চায়।—যাই হোক, এই লাইন দুটি থেকে আমরা একটি ঐতিহাসিক সত্যও জানতে পারি। সে সত্য : এককালে বহির্বাণিজ্যে বাঙ্গালীর আসক্তি।

॥ ৪ ॥

আগেই বলেছি, গ্রাম্য বারমাসি গানের নায়ক প্রায়ই বিদেশে অবস্থান করে অর্থের সন্ধানে। প্রেমাস্পদ বিদেশে অবস্থানকালে বিচ্ছেদ-হেতু নায়িকার অন্তরে যে জ্বালাময় অবস্থার উদ্ভব হয়, প্রধানত তাই বারোমাসি গানের মূল সুর বা প্রধান আবেদন। নায়কের প্রবাসজনিত-বিরহে নায়িকার মনের অবস্থাই ভাব ও রসের বিচারে 'প্রবাস' নামে অভিহিত হয়। প্রবাস-দশাগ্রস্ত নায়কের অবস্থা 'মেঘদূত' কাব্যে, এবং প্রবাস-দশাগ্রস্তা নায়িকার অবস্থা বৈষ্ণব পদাবলীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেমন, 'মেঘদূত' কাব্যে,—

"মাসের পরে মাস শৈল করে বাস,
প্রিয়ার বিরহে সে কান্তিহীন;
খসিয়া ভূমি পরে সোনার বালা পড়ে,—
নিটোল বাহু হ'ল এমনি ক্ষীণ।"
[মেঘদূত; পূর্বমেঘ, ২। প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ। ১৩৩৭]।

বিদ্যাপতির বিরহ-বিষয়ক পদাবলীতে—

"এ সখি হামারি দুখের নাহিক ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন
ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া॥"

সীতা-হরণে রামের বিলাপ, সীতার বনবাসে রামের শোক, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণে বিষ্ণুপ্রিয়ার ও রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণে অদুনা-পদুনার বিলাপ প্রবাস-জনিত বিরহ-দশার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই তুলনায় গ্রাম্য বারমাসি গীতগুলিও যে রীতিমতো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তার পরিচয় এই সংকলনের গীতিগুলিতেও মিলবে।

॥ ৫ ॥

গীতসংগ্রহ

এখানে সংকলিত গীতগুলি যশোহর-খুলনার গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত। প্রথম পাঁচটি নায়িকার বিরহ-গীত, এগুলিতে কোকিলের মারফত নায়কের উদ্দেশে নায়িকার মনের ভাব প্রকাশিত। তাই এই জাতীয় বারমাসি গানগুলি কোকিলার বারমাসি বা কোকিল-কন্যার বারমাসি নামে এই অঞ্চলের চাষীদের কাছে পরিচিত।—ষষ্ঠ ও সপ্তম গীতদুটি যথাক্রমে 'কৃষ্ণ বারমাসি' ও 'নিমাই বারমাসি' নামে পরিচিত।

(১)

শীত গেল বসন্ত এল
এল ফাল্গুন মাস।
সবে খেলে সুখের পাশা
আমার পতি পরবাস॥
ডালে বসে কালো কোকিল
করে মধুর গান।
আর ডাকিস না কালো কোকিল,
আমার উড়েছে পরাণ॥
পরের নৌকায় ব্যাপার করো
বাঙ্গাল সদাগর।
নিজের নৌকা ঘাটে বাঁধা
সোনায় জর জর॥

তুলনীয় :

বৈশাখে বিষম ঝড় এ হিয়া-আকাশে।
কে রাখে এ তরি
পতি-কাণ্ডারী বিদেশে॥
—লোচনদাস।

(২)

আর ডাকিস্‌নে কালো কোকিল
প্রভাতেরও কালে।
শুয়ে ছিলাম, ছিলাম নিরালে—
ও তুই ডাক দিয়ে কেন শোকের অনল
দিলি রে জেলে॥
একগুণ আগুন দ্বিগুণ জ্বলে
নির্বাণ হয় না জলে গেলে॥
প্রাণপতি মোর ছেড়ে গেছে
বসন্তেরও কালে—
আমি কোন দেশে যাই কোথা বা পাই
কোকিলরে, ও তুই দে আমায় বলে॥

(৩)

শুধু ও পয়সার জন্যে, প্রাণপতি মোর
গেছে বিদেশে।
ও প্রাণ কোকিলে, তুমি ডাকো কি বলে!
আর ডাকিস্‌নে কালো কোকিল,
আমার পতি নাই দেশে—
ও পতি নাই দেশে!
ও শুধু পয়সার জন্যে, প্রাণপতি মোর
গেছে বিদেশে॥

(৪)

ও বন্ধু আও রে—
তোমারে দেখিতে মনে লয়॥ — ধুয়া
শিশুকালে কইরা বিয়া,
রাইখা গেলে ঘরে
জনমদুখিনী বলে,
না পড়ে তোর মনে॥

ও বন্ধু আও রে—
তোমারে দেখিতে মনে লয়॥

তরল বাঁশের বাঁশী রে বন্ধু
কাঞ্চন বাঁশের আগা—
সেই বাঁশীতে লিখা আছে,
কলঙ্কিনী রাধা॥

ও বন্ধু আও রে—
তোমারে দেখিতে মনে লয়॥

সেই বাঁশী বাজাইয়া থুইছ
কদম গাছের ডালে—
নিরালা বাতাসে বাঁশী
রাধা রাধা বলে॥

ও বন্ধু আও রে—
তোমারে দেখিতে মনে লয়॥

রাধার একেত অলপ বয়েস
আরও যে অবলা—
সহে না শরীরে দুখ
বিরহিনীর জ্বালা॥

ও বন্ধু আও রে—
তোমারে দেখিতে মনে লয়॥

(৫)

যা রে কোকিলা তুই
আমার পতি গেছে যে দেশে;
অমন করে জবালাস নে আর নিত্তি এসে॥
শুনে তোর কুহুস্বর,
উসকে ওঠে পরাণ আমার;
প্রাণপতি মোর দেশান্তরে,
(তুই) ছাড়গে সেথায় তোর কুহুস্বর॥
কাঁচা বুকে লাগলে আঘাত,
পাইনে কোনো দিশে—
...যারে কোকিলা তুই,
আমার পতি গেছে যে দেশে॥

॥ ৬ ॥

এখানে এমন দুটি গান উদ্ধৃত করা হোল যার সঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত গানগুলির সাদৃশ্যের অভাব রয়েছে। এই গান দুটি গায়কের মুখ থেকে স্পষ্টতই 'কৃষ্ণ বারাসি' ও 'নিমাই বারাসি' হিসাবেই সংগৃহীত।—প্রথম গানটিতে : ননী চুরির দায়ে মাতা নন্দরাণী কর্তৃক কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা, কৃষ্ণের অপরাধ অস্বীকারের চেষ্টা, গোপীদের সাক্ষ্যে কৃষ্ণের অপরাধ প্রমাণিত। কিন্তু শাস্তি দেওয়াতে ফল না হওয়ায় এবং কৃষ্ণের অদর্শনে বাৎসল্যবশে নন্দরাণী কর্তৃক কৃষ্ণকে পুনরায় শাস্তি না দেবার আশ্বাস দান, বর্ণিত হয়েছে।—দ্বিতীয় গানটিতে : অতি দুঃখে ও বেদনায় অভিমানভরে মাতা কর্তৃক নিমাইকে সন্ন্যাস গ্রহণে নিষেধ, সন্ন্যাস গ্রহণে নিমাই-প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার ভবিষ্যৎ বর্ণনাতে পুনরায় নিমাইকে সন্ন্যাস গ্রহণে নিষেধকরণ, ইত্যাদি হৃদয়গ্রাহী ও মর্মান্তিক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। পল্লী-কবিদের রচিত পল্লী-গীতিতে এই যে সহজ সরল প্রকাশের মাধ্যমে ভাবের গভীরতায় ডুবে যাওয়া,—পল্লী-কবিদের এ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট লক্ষণ।

(৬)

কৃষ্ণ বারাসি

নন্দরাণী নন্দরাণী বড়ই ভাগ্যবান।
সেই ঘরেতে জন্ম নিলেন কৃষ্ণ বলরাম॥
রাত দুপুরে নন্দরাণী ঘাটে চলে যান।
শূন্য ঘর পেয়ে কৃষ্ণ সকল ননী খান॥

ননী খেলো কে রে গোপাল,
ননী খেলো কে—
আমি তো খাইনি ননী, বলাই খেয়েছে॥
এক গোপী উঠে বলে ওরে ননী চোর।

এই তো খালি ভাণ্ড ভেঙে,
হাতে মাখা তোর॥

বলাই তো খায়নি ননী,
কৃষ্ণ পোঁটলা বেঁধেছে।
তখন রাগে নন্দরাণী
ঝাঁপদে' ছিঁড়ে নিয়ে,
গাভী-ছাদন দড়ি দিয়ে,
বাঁধিলেন কৃষ্ণে গিয়ে॥

লাফ দিয়ে ধরলেন কৃষ্ণ
কদম গাছের ডাল।
গোপীগণ বলে কৃষ্ণ সামাল সামাল॥
আগায় পাতায় বেড়ান কৃষ্ণ,
ডালে না দেন পা—
নেমে আয় রে সোনার যাদু,
আর বাঁধবো না॥

(৭)

নিমাই বারাসি

কেমনে বাঁচিবে তোর মা—
আরে ও নিমাই সন্ন্যাসেতে যেও না॥
যখনে জন্মিলে নিমাই নিম তরুতলে।
আমি বাছিয়া রাখিলাম নাম
নিমাইচাঁদ তোমারে॥
সন্ন্যাসী না হইও নিমাই,
বৈরাগী না হইও।
ওরে, ঘরে বসে কৃষ্ণনাম
আমারে শুনাইও॥

সোনার নদীয়া ছেড়ে যাবে গোরা রায়।
ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়ার বল কি হবে উপায়॥
কাঁচা সোনার বরণ অঙ্গে
ছাই যে মাখিবে।
শচী মায়ের বুকে তাহা কেমনে সহিবে॥
...কেমনে বাঁচিবে তোর মা—
আরে ও নিমাই সন্ন্যাসেতে যেও না॥

[৫, ৬ ও ৭ সংখ্যক গীত তিনটি আমার বহু পূর্বে মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ও যশোহরের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেন, এবং তা বাংলা ১৩১১ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তবে ভট্টাচার্য মহাশয় সংগৃহীত গীত-গুলির সঙ্গে বর্তমান গীতগুলির পাঠান্তর লক্ষণীয়। আরও উল্লেখ-যোগ্য, ভট্টাচার্য মহাশয় বর্তমান সংকলনের ৭ সংখ্যক গীতটিকে 'সারী-গীত' হিসাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। কিন্তু আমি গায়কের মুখ থেকে এটিকে স্পষ্টতই 'নিমাই বারাসি' হিসাবে সংগ্রহ করেছি।]

কেমন যেন গাটা ঘুলিয়ে উঠলো কুন্তীর।

এক ঢলক বমিই বুঝি উঠে আসে। অতি কষ্টে নাকে রুমালটা চেপে সামলে নিলো।

প্লাষ্টিকের গন্ধ। বললো শ্যামল।

উঠোনের মাঝখানে চৌবাচ্চা। দড়ি বাঁধা বালতি করে জল তুলে চান করছিলো কে যেন। উবু হয়ে বসে সাবান মাখা কাপড়ে থুবি দিচ্ছিলো কে। আরও কারা কারা যেন ছিলো, এদিকে ওদিকে। সবারই জোড়া জোড়া চোখ পড়লো তার মুখের ওপর। কৌতূহলী চোখ নিশ্চয়ই। ড্রেনের মুখটা বোধ হয় আটকে গেছলো। উঠোনের এদিকটায় জল জমেচে উঁচু হয়ে। কুন্তী বাঁ হাত দিয়ে কাপড়টা সামলে নিলো। তারপর পা বাড়িয়ে পার হ'য়ে গেলো।

শ্যামলই কথাবার্তা বললো মালিকের সংগে।

এই ভদ্রমহিলা, মানে আমার বোন। যার কথা সেদিন বলছিলাম। কাজ করতে চায় আপনাদের এখানে।

কথাগুলি বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই বললো শ্যামল। প্রত্যুত্তরে মালিক ঘাড় নাড়লো। বোঝা গেল কাজ হবে।

কি দেবেন আপনারা ?

মালিক এবারে ভুরু দুটি কুঁচকে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ কানটি চেপে ধরে ডান কানটি এগিয়ে নিয়ে গেলো শ্যামলের কাছে। বোঝা গেল লোকটার শোনার পক্ষে যথেষ্ট জোরে বলা হয়নি এবারে। কুন্তী বুঝলো প্রথম বারে শ্যামলের অতো জোরে চেঁচিয়ে বলার কারণটা কি। শ্যামল আবার রিপিট করলো তার কথা।

প্রত্যুত্তরে ডান হাতটা উল্টে বললো মালিক। কেমন এক জড়ভরতের মত নিরুত্তাপ কণ্ঠে।

ওই যা আছে আমাদের রেট।

সেটা একবার বলুন না শুনি। আর একবার চেঁচালো শ্যামল।

আমরা শতকরা বারো আনা দিই। তা আপনি একহাজারও করতে পারেন, আবার বেশীও করতে পারেন।

সেদিন কুন্তী ভেবেছিলো এ আর এমন শক্ত কি। বসে বসে খালি রঙ দেওয়া তো ? তা সে অমন অনেক পারে। যাই হোক কাজটা হ'য়ে গেলো কুন্তীর। প্লাষ্টিকের জিনিসে রঙ দেওয়ার কাজ। বাঁধা চাকরি নয়। ঠিকা কাজ। যখন ইচ্ছা এসো, যাও। কাজ করলে দাম। না করলে নয়। গুণে তোমাকে মাল দেবে। গুণে তোমার কাছ থেকে মাল নেবে। কারখানার মালের স্টক তৈরী আছে তো কাজ আছে। না আছে তো ব'সে থাকতে হবে। তবু তো কুন্তীর অন্নসংস্থানের একটা উপায় হোল। মনে মনে ধন্যবাদ দেয় শ্যামলকে।

কিন্তু যতটা ভেবেছিলো কুন্তী ততটা নয়। একহাজার কেন, একশো করতেই তার দিন কাবার হ'য়ে যেতো। তবু ভালো লাগতো কুন্তীর। গালফোলা এই গোলাপী পুতুলগুলোর ঠোঁটে, হাতে রঙ লাগাতে লাগাতে তারও ফ্যাকাশে গালটা গোলাপী হ'য়ে উঠতো মাঝে মাঝে। তুলি বাগিয়ে এই সব প্লাস্টিক খোকাদের ভুরু আঁকতে আঁকতে কি এক অজ্ঞাত পুলকে মনটা তার ভরে উঠতো। আর চোখের সামনে তুলে ধ'রে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখতো কেমন ক'রে রাঙা রাঙা ঠোঁটে তারই হাতে আঁকা কাজল কালো টানা-ভুরুর নীচে প্লাস্টিক খোকাদের চোখগুলো চেয়ে থাকে।

তাড়াতাড়ি ফেলে দেয় হাতের পুতুলটা কুন্তী. আর একটা পুতুল নিয়ে বসে আবার। তুলিটা বাগিয়ে। কি এক লজ্জায় মবারুণের চাপা হাসি তার মুখে। হঠাৎ ফিরে পাওয়া আত্মসম্বিৎ-এর চমক।

প্রথম প্রথম যা কষ্ট হোত কুন্তীর। ঐ অতোখানি রাস্তা হেঁটে এসে বলাই সিংহি লেনের গলিটায় ঢোকার সংগে সংগে তার বমি পেয়ে যেতো। মুচিপাড়ার ঐ চামড়ার গন্ধটা তার বত্রিশ নাড়ীর পাকে পাকে সেঁধিয়ে গিয়ে চাপ দিতো। আর তখনই সে এসে ঢুকতো ফটি'নাইন বাই ওয়ান মধু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটের এই বাড়ীটায়। যার উপর তলায় একটা মেস আর নীচের তলায় পূর্ণিমা প্লাষ্টিক ওয়ার্কস।

উঠোনের এক কোণায় অনবরত একটা আঁচের উনুন জ্বলেই আছে। আর তারই পাশে বসে পদ্মর মা পুতুলগুলোর তলায় কেবলই এঁটে চলেচে টিপের বোতামগুলো। তবেই তো পুতুলগুলো বাজবে, টেপার সংগে সংগে।

চৌবাচ্চার পাশেই বসানো ইলেকট্রিক জেনারেটারটা একটানা চলেচে শব্দ ক'রে। আর ঘরের ভেতরে তিনখানা প্লাষ্টিক মেশিন অনবরত মাল তৈরী করতে ব্যস্ত। কখনো ছাঁচ বদল হচ্চে, কখনও রঙ। আবার শিফটে শিফটে মানুষও বদল হয়।

ছোট ছোট দলে ভাগ হ'য়ে রঙ লাগাচ্ছে মেয়েরা।

প্লাষ্টিকের গন্ধ সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে কুন্তীর। ওপরের মেস থেকে কখনও কখনও ভেসে আসে বাবুদের সংগে ঠাকুরের ঝগড়া। কিন্তু সবচেয়ে বিশ্রী লাগে কুন্তীর, বাড়ীওলা যখন তিনটে থেকে এসে বসে থাকে সামনের উঠোনটায় চেয়ার পেতে। কিছুই তো কাজ থাকে না লোকটার। তবু কেন যে আসে শুধু শুধু, রোজ রোজ। আর এসেই মণিকাকে অর্ডার ক'রে এক খিলি পানের। কালো কুচ্ছিত মেয়েটা। মুখে বসন্তের ছিট। কিন্তু বাড়ীওলা এলেই ওরই ভেতরে একটু ফিটফাট হয়ে নেয়। মুখে পাউডারের পাফটা বুলিয়ে লাল রঙের ব্লাউজটা সেঁটে নেয় গায়ের ওপর। কালো রঙের একটা ডুরে শাড়ী। কপালে সাদা রঙের বড় টিপ কেটে চার পাশে লালের ফুটকি। পানের খিলিটা যখন এসে দাঁড়ায় হাতে ক'রে, ব্লাউজের বাইরে যেন ফেটে পড়তে চায় দেহটা।

ওর যৌবন বোধ হয় অটুট থাকবে চিরদিনই। ভাবে কুন্তী। বেঁটে খাটো মেয়ে তো। কিন্তু ওই বাড়ীওলা?

নিজের কাজে হঠাৎ মনোযোগী হ'য়ে পড়ে কুন্তী।

বাড়ী পালিয়ে একবার ছবি দেখতে গেছলো অমলের সংগে। জলসাঘর। ঠিক সেই জলসাঘরের বুড়ো জমিদারটার মতই বাড়ীওয়ালা। জীবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে দাঁড়িয়েও পলিত কেশ গলিত দন্তঅদ্যপায়ী তার শেষ উপচার পেঁছে দিচ্চে যৌবনবতী মেয়েটার পায়ে! কত বয়েস হবে ওর? ঐ মণিকার? পনেরো-ষোল। উঁহু, আঠারো-উনিশই হবে। বেঁটে মেয়েদের আবার বয়েস বোঝাই দায়। মরুকগে। হাতের কাজটা শেষ ক'রে উঠে পড়লো কুন্তী।

ওমা একিগো! আজ এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে?

জিজ্ঞেস করলো পদ্মর মা।

হ্যাঁ দিদি, আজ শরীরটা তেমন ভালো নেই।

কেন গো, তোমাদের মত শক্তসোমত্ত মেয়ের আবশ্ব শরীর খারাপ কিসে?

একটু হেসে পা বাড়ালো কুন্তী।

পাশাপাশি বসে কাজ ক'রে ক'রে একটু ঘনিষ্টই হ'য়ে গেছলো পদ্মর মা। বিধবা পদ্মর মা আলাদাই বসতো এদিকটায়। মিশতো না বড় একটা কারো সঙ্গে। আর মিশবেই বা কি ক'রে? ওদের মতো যৌবনের জোয়ার তো আর নেই। তাই কত রঙ, ঢঙ। ইয়ার্কি-ফাজলামো। ফষ্টি-নষ্টি। হাসির হররা। একান্তই পেটের দায়ে কারখানায় কাজ। কিন্তু যৌবন যে এককালে ছিলো এবং অতি প্রখরভাবেই, বুঝতে পারে কুন্তী।

ভাই, সোয়ামী মরলো আশ্বিন মাসে। তিনমাস গেলো না দেওররা বের ক'রে দিলো। কোথায়ই বা যাই, কিই না করি! বিধবা মেয়েমানুষ, রাস্তায় দাঁড়ালাম এসে পদ্মর হাত ধরে।

এই পর্যন্ত বলে থামলো পদ্মর মা। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো। টিনের বোতামগুলো এঁটেই চললো একটার পর একটা। খানিকটা নৈঃশব্দ।

তারপর? জিজ্ঞেস করলো কুন্তী।

তারপর বলে কি আর কিছু আছে ভাই? তারপর থেকে এই কারখানায়। এই পর্যন্ত বলে থামলো পদ্মর মা। হয়তো তার অভিপ্রেত নয় জীবনের অন্ধকার অংশটুকুকে দিনের আলোয় টেনে আনা।

কুন্তী রঙ দেয়, আর চুপ করে ভাবে। তার হাতের প্লাষ্টিক খোকারা প্রাণের উত্তাপ অনুভব করে।

আর তো কটা মাস। কুন্তীরও কোল জুড়ে যে খোকন আসবে তারও কি গাল-গুলো হবে ঐ রকম টুসটুসে? চোখ-গুলো চেয়ে থাকবে ঐ রকম টানা টানা ভুরুর নীচে?

গাটা আবার কেমন ঘুলিয়ে উঠলো কুন্তীর। বমি হ'য়ে গেলো খানিকটা, পড়েই যেতো হয়তো। পদ্মর মা এসে ধ'রে ফেললো। আর আর মেয়েরাও উঠে এসেছিলো কাজ ফেলে। ওর সম্বন্ধে যারা কৌতূহলী নয়, তারাও। ওপরের মেস থেকে কয়েকজন দেখলো মুখ

ঝুঁকিয়ে। মেসিন ফেলে রেখে পুরুষগুলোও এসেছিলো বেরিয়ে।

হঠাৎ গাটা কেমন ঘুলিয়ে উঠলো। একটুখানি সামলে নিয়ে বললো কুন্তী। তখনও পদ্মর মা শক্ত ক'রে ধ'রে রেখেছে তাকে।

দিন দুই পরে।

ফিস ফিস ক'রে জিজ্ঞাসা করলো পদ্মর মা।

কমাস?

গলাটা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে উঠলো কুন্তীর। মুখ দিয়ে একটি কথাও সরলো না। অসহায় চোখ দুটো মেসে পরলো পদ্মর মার মুখের ওপর।

তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা নামিয়ে ফেললো। কোন রকমে একটা ঢোক গিলে বললো, সাতমাস।

তাই বলো। সেদিন তোমাকে ধরতে গিয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো আমার। মাথায় এয়োতির চিহ্ন নেই, সোমত্থ আইবুড়ো মেয়ে, পেটে ওটা এলো কি করে গো? তোমরা কি খেরেস্টান নাকি গো?

কুন্তী চুপ করেই রইলো।

সে জানে না তার ছেলে কি হবে। খেরেস্টান না মুসলমান। সে মরলে কোথায় যাবে—শ্মশান না গোরস্থান।

সে জানে তার শুধু ছেলে হবে। সে মা হবে। সেই ছেলেকে মানুষ ক'রে তুলবে। দশে-পাঁচের এক হবে। লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, অমুকের মা।

সোয়ামী কি করে?

স্বামী যে কি করে সে কথাটা এতদিন একবারও মনে হয়নি কুন্তীর। তাই আজ পদ্মর মার কথায় নতুন করে ভাবতে হচ্চে তাকে।

মেয়েমানুষ পোয়াতি হ'লেই তার একটা স্বামী থাকতে হবে। তাকে ঘরকন্না করতে হবে। নইলে সমাজ আছে, সংসার আছে। ঘর-কন্না তো সে করতেই চেয়েছিলো। কিন্তু অমল তাকে নিয়ে আর সংসার পাতলো কই? সে কি বলে দেবে তার স্বামী মরে গেছে? সেও পদ্মর মার মত পোড়া-কপালী?

ছিঃ ছিঃ। ষাট্ ষাট্। অতো ছোট সে হ'তে পারবে না। অমল তাকে নেয়নি ব'লে সে অমলের অকল্যাণ করতে পারবে না।

দাদা বউদি তো বলেইছিলো অনেক করে। প্রথম যেদিন ধরা পড়লো বউদির কাছে। তখন চারমাস। গালে হাত দিয়ে জিভ কাটলো বউদি। দাদা সব শুনে তখনকার মত গম্ভীর হ'লেও জানতে চাইলো ছেলেটার নাম। অভয় দিলো কুন্তীকে। যেমন ক'রেই হোক বিয়ে দেবেন তিনি। দরকার হ'লে জোর করে।

চোখ ফেটে কান্না এলো কুন্তীর। এ-বিয়ে যে হবার নয়। তাহ'লে কি আর এত ঢেকে চেপে বেড়াতে হয় কুন্তীকে। অমল তো তাকে সেই সাহসই দিয়েছিলো। কিন্তু সত্যিই যদি তাই হতো তাহ'লে কি আর ধপ্ ক'রে ফেলে দেয় তাকে। যাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছিলো কুন্তী, সে আসতো স্বাধিকারের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে। আজকে আর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী ক'রে জোর করে ধ'রে এনে জীবন-দেবতার উচ্চাসনে বসাতে পারবে না সে তাকে।

নাম বলেনি কুন্তী। নাম না বলার দুর্যোধনী প্রতিজ্ঞা তার ঠোঁটে।

শুধু একটা জবাব দিতেই হয় পদ্মর মাকে।

তাই সে অসংকোচে বলে ফেললো, কাজ করে।

হেসে ফেললো পদ্মর মা।

হাসলে যে? অপ্রতিভ চোখ দুটো তুলে জিগেস করলো কুন্তী।

ওমা, হাসবো না? আমি জিগেস করলাম কি করে, তুমি বললে কাজ করে। এটা কি একটা কথার জবাব হোল গা?

নিজের ভুলটা বুঝতে পারে কুন্তী। নেহাত দায় এড়াতে কথার জবাব দিয়েচে। কিন্তু পদ্মর মা'র প্রশ্নটা ছিলো আরও গভীরে। তাই সে বললো, আগে তো কারখানায় কাজ করতো এখন বুঝি দিন-রাত বিড়ি বাঁধে।

ছাঁটাই হয়েছেলো বুঝি?

হুঁ। খুব গম্ভীর হ'য়ে পড়ে কুন্তী। পদ্মর মাও চুপ করে যায়।

দিন পনেরো চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিলো দাদা। বৌদি তো কোনদিনই প্রসন্ন ছিলো না তার উপর। যেমন হ'য়ে থাকে সংসারে। ইদানীং অপ্রসন্নতাটা আরও বেড়ে গেছলো। কোথা থেকে এক আপদ জুটালো ননদ। অগত্যা দাদাই একদিন সোজাসুজি প্রস্তাব করলো বোনের কাছে।

তুই তাহলে তৈরী হ'য়ে নে কুন্তী। আর তো উপায় নেই। চার মাস যখন হয়েই গেছে। আজ-কাল তো হামেশাই হচ্চে। প্রতি ঘরে ঘরে। ও-তে কিছু দোষ নেই। আমার এক বন্ধু ডাক্তার। তাকে বলে রেখেছি। আসবে এখন সন্ধ্যা-বেলা, টুক ক'রে ইঞ্জেকসানটা দিয়েই চলে যাবে।

দাদা আপিস চলে গেলো। সারাটা দুপুর দাদার ঐ কথাগুলোই ঘুর-পাক খেলো কুন্তীর মনে। আর তো উপায় নেই। চার মাস হ'য়ে গেছে। কুন্তীও বুঝতে পারে। কিসের একটা সাড়া সে পায়, তার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে কথাগুলো।

দিনটা কখন শেষ হয়ে গেছে। পড়ার টেবিলে বসে বসে। ও-ঘরে দাদা বৌদির সঙ্গে কথা বলচে। ডাক্তারবাবু

বোধ হয় এলো। দাদা সঙ্গে ক'রে নিয়ে ঢুকলো ডাক্তারকে। বৌদিও।

একিরে, তুই এখনও আলো জ্বালাসনি?

সুইচটা টিপে দিলো দাদা, এক ঘর আলো। সিরিঞ্জে ওষুধটা ভরচে ডাক্তার, কুন্তী বসে রইলো, দাদা অন্যমনস্ক। কি যেন ভাবচে। বৌদি তার দিকে তাকিয়েই আছে। ডাক্তার উঠলো, স্পিরিটের ভেজা তুলোটা ঘষলো তার হাতে। সিরিঞ্জটা এগিয়ে নিয়ে এলো। ইঞ্জেকসনের ছুঁচটা বুঝি ত্বক স্পর্শ করলো কুন্তীর। এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে নিলো কুন্তী। হাঁ হাঁ করে উঠলো দাদা, চেপে ধরতে এলো বৌদি। কুন্তী হাঁপাচ্ছে। ডাক্তার বললো, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন মিস্ সেন? লাগবে না একটুও।

আমি আমার ছেলেকে নষ্ট করবো না ডাক্তারবাবু। হাঁপাতে হাঁপাতেই বললো কুন্তী।

ডাক্তার হতভম্ভ। দাদা-বৌদিও। কোথা দিয়ে যে কি হ'য়ে গেলো। কুন্তী যে আপত্তি করবে ভাবতে পারেনি কেউ। অন্ততঃ সকালবেলা এরকম কোনো ইঙ্গিত দেয়নি সে দাদাকে। ডাক্তারও তার জীবনে দেখেনি এরকম কোনো মেয়েকে রিফিউজ করতে। বরং অনেকেই বলেচে, যত তাড়াতাড়ি খালাস হ'য়ে যায় সেই ব্যবস্থাই করুন ডাক্তারবাবু।

তারপর তাকে অনেক বুঝিয়েচে সবাই মিলে। যে যার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক মত। যুক্তির থলি উজাড় করে। সবারই মূল কথাটা হচ্চে সমাজ, সংসার আর সংস্কার। কুমারী মেয়ের এ অবস্থা ঘটা অন্যায়, অসামাজিক। কুন্তী তো মুখ দেখাতেই পারবে না লজ্জায়। দাদাকেও সমাজ ছাড়তে হবে।

কুন্তী বুঝলো এই তিনজোড়া চোখের সবকটাই নিবদ্ধ দাদার প্রেস্টিজ আর পোজিসানের দিকে। কেউ তার কথাটা একবারও ভাবচে না। সে মা হ'য়ে কেমন ক'রে হত্যা করবে অন্ধকারের সেই শিশুকে যে আপন সরল বিশ্বাসে নয়, সে কারও নয়। সে দুই পৃথিবীর বুভুক্ষু মানব-মানবীর সুন্দর একটি মুহূর্তের অমৃতসিঞ্চিত মানবক।

সে খোকাকে মানুষ ক'রে তুলবে। সেই খোকা বড় হবে। জীবনের কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সে হবে মহারথী।

হাসলে যে! অপ্রতিভ চোখ দুটো তুলে জিগেস করলো কুন্তি

পলে পলে আবেদন জানাচ্ছে একটু আলোর মুখ দেখবার জন্যে। তার সমগ্র সত্তাকে যে মাতৃত্বের রসে অভিষিক্ত করেচে একবার তাকে গলাটিপে খুন করলেই কি আপন কুমারীত্বকে ফিরে পাওয়া যায় অক্ষত, অক্ষুণ্ণ?

বার বার সেই কথাটাই একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় উন্মাদ ক'রে তুললো তাকে।

কেন সে নষ্ট করবে তাকে? কি সে মহান মূল্য? অমল বিশ্বাসঘাতক। সে অপরাধী। কিন্তু যে শিশু তার সত্তাশ্রয়ী সে অমলের নয়। সে কুন্তীর

তোমার বুঝি খোকাই হবে গো। চোখ-মুখ যে রকম বসে গেছে, সেই রকমই মনে হচ্চে। অনেকক্ষণ পরে বললো পদ্মর মা।

কুন্তীর মুখখানি মধুর রসে অভিষিক্ত হ'য়ে উঠলো। তাহ'লে তার খোকাই হবে। পদ্মর মা বলেচে। ওরা তো সব জানে, বোঝে কিনা। হাজার হোক ছেলের মা তো। অভিজ্ঞতা আছে একটা।

কুন্তী তো তাই চেয়েছে। তার কামনার রঙে রঙীন একটি খোকা, এই প্লাস্টিক পুতুলগুলোর মত টুলটুলে গোলাপী গাল।

কুন্তী তুলি দিয়ে পুতুলের চোখ আঁকতে থাকে। যে-চোখ সে কখনো দেখেনি কিন্তু তারই দিকে চেয়ে আছে—সেই অন্ধকারের চোখ, আলো-দেখার চোখ!

॥ প্যারী-বনচক্র ॥

বৃটেন যে ইউরোপের খোলা বাজারে পূর্ণ সদস্যরূপে যোগদান করে এটা পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর আদেন্যুর বা ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল দ্য গল কারও অভিপ্রেত নয়। আর যদিও ইউরোপের খোলা বাজার একটি অর্থনৈতিক সংগঠন, ফ্রান্স বা পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান মনোভাবের পেছনে কোন অর্থনৈতিক কারণ নেই। তাদের আপত্তি সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক কারণপ্রসূত। কমিউনিষ্ট জোট-বহির্ভূত পশ্চিম ইউরোপ সম্পর্কে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী উভয়েরই দুটি পরিকল্পনা আছে এবং মুখ্যত সেই পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যেই তাদের পশ্চিম ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে এত আগ্রহ। ফ্রান্স আজ চায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবমুক্ত একটি সংঘবদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ পশ্চিম ইউরোপ, যা নিজের শক্তিতেই কমিউনিষ্ট শিবিরের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে বা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে কোন বিষয়ে আলোচনা চালাতে পারবে সমান মর্যাদার ভিত্তিতে। পশ্চিম ইউরোপের একটি স্বতন্ত্র সত্তা ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই আজ জেনারেল দ্য গলের নীতি এবং এ ব্যাপারে তিনি ডঃ আদেন্যুরকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ মিত্র ও সহায় বলে মনে করেন। কারণ ডঃ আদেন্যুরও আজ চান পশ্চিম ইউরোপকে একটি শক্তিশালী কমিউনিষ্ট বিরোধী শিবিররূপে গড়ে তুলতে যার সঙ্গে জার্মানীর সম্পর্ক হবে অবিচ্ছেদ্য। প্যারী ও বন উভয়েরই বর্তমানে ধারণা, তাদের মনোমত করে পশ্চিম ইউরোপকে গড়ে তুলতে হলে ঐ অঞ্চলকে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন উভয়েরই প্রভাবমুক্ত করে রাখতে হবে এবং এই কারণেই বৃটেন ইউরোপের খোলা বাজারে যোগ দিক এটা তাদের কাম্য নয়। তাদের উভয়েরই ধারণা বা ভয়, বৃটেন খোলা বাজারে যোগ দিলে পশ্চিম ইউরোপের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চরিত্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

বন বা প্যারীর এ ধারণা অবশ্যই অমূলক নয়, কারণ বরাবরই দেখা গেছে যে, বণিক স্বার্থই বৃটেনের কাছে চিরকাল সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট নীতির বালাই তার কোনদিনই নেই। সুতরাং ইউরোপের খোলা বাজারে যোগ দিতে বৃটেন নিশ্চয়ই কোন কমিউনিষ্ট বিরোধী শক্তি শিবিরের সংগ্রামী ভূমিকায় ঠিক সম্মত হবে না।

ইউরোপের খোলা বাজারের সবচেয়ে প্রভাবশালী দুই শক্তি ফ্রান্স ও জার্মানীর এই মনোভাব জানা সত্ত্বেও বৃটেনের পক্ষে খোলা বাজারে যোগ দেওয়া উচিত হবে কি না এটা বৃটেনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মহলের বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

॥ চীন অষ্ট্রেলিয়া বাণিজ্য ॥

অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী মিঃ ম্যাক ইভান সম্প্রতি মেলবোর্ণে বলেছেন, বৃটেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে তাঁদের সাবেকি বাজার যেভাবে ক্রমেই গুটিয়ে আসছে তাতে পণ্য বিক্রয়ের জন্যে কমিউনিষ্ট দুনিয়ার উপর নির্ভরশীল হওয়া ভিন্ন তাঁদের গত্যন্তর নেই। আর এই অর্থনৈতিক সম্পর্ক অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের রাজনৈতিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করবে। অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি যেসকল রাষ্ট্র এখনও চীনকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেয়নি, নিজ অর্থনীতির স্বার্থে তারা সকলেই তা দিতে বাধ্য হবে। কারণ তাদের সকলেরই স্বার্থ আজ এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সকল রাষ্ট্রগুলির বর্তমান মনোভাব দেখে মনে হয়, বৃটেন ইউরোপের খোলা বাজারে যোগ দিলেই উপরোক্ত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চীনের সম্পর্ক নিকটতর হবে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক উল সেক্রেটারিয়েট (অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দঃ আফ্রিকা যার সদস্য) চীনের সঙ্গে উল ব্যবসায় সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা স্থির করে ফেলেছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৭০ সালে চীনে ঐ দেশগুলির বিক্রিত উলের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার। অষ্ট্রেলিয়া এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আট মাসে চীনকে গম বেচেছে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের, যে জায়গায় গত বছর ঐ সময়ে অষ্ট্রেলিয়া চীনে এলুমিনিয়ম, অকলঙ্ক ইস্পাত, তামা, ম্যাগনেশিয়ম, কাঠের মণ্ড ইত্যাদি সরবরাহের কথা চিন্তা করছে।

॥ লাওস ॥

যুদ্ধবিরতি সীমারেখা করে কমিউনিষ্টপন্থী পাথেট লাও বাহিনী হঠাৎ দক্ষিণপন্থী সরকারের শাসনাধীন এলাকায় অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছে এবং এ ব্যাপারে উত্তর ভিয়েৎনাম ও কম্যুনিষ্ট চীন উভয়েই পাথেট লাও বাহিনীকে সমর্থন করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। যে চুক্তি বলে লাওসে যুদ্ধবিরতি হয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। শুধু উদ্যোক্তা বললেই যথেষ্ট বলা হবে না, কারণ যে আন্তর্জাতিক কমিশন আজ লাওসে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দায়ী, রাশিয়া তার যুগ্ম-সভাপতি। এ অবস্থায় হঠাৎ কম্যুনিষ্ট চীনের এই তৎপরতা তার পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয়। কোন কোন কূটনীতিক মহলের ধারণা, এটাও চীন-সোভিয়েট মনকষাকষির আর এক অভিব্যক্তি। যাই হোক, কমিউনিষ্ট পক্ষের এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গের ফল দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে খুবই মারাত্মক হবে। কারণ লাওসের সমগ্র উত্তর ভাগই এখন পাথেট লাও বাহিনীর অধিকারে। এ অবস্থায় চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের সহযোগিতায় আবার যদি তারা অগ্রসর হতে আরম্ভ করে স্বভাবতই অনতিবিলম্বে সমগ্র লাওস তাদের অধিকারে এসে যাবে। সুতরাং যুদ্ধবিরতি চুক্তি যদি পালিত না হয় তবে প্রিন্স বন উমের দক্ষিণপন্থী সরকারের সমর্থক যুক্তরাষ্ট্র হয়ত চুপ করে বসে থাকবে না। আর তার ফলে আবার লাওসকে কেন্দ্র করে যাতে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গ না হয় এবং যুদ্ধ অনিবার্য না হয়ে পড়ে সেটা দেখা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই বিশেষ কর্তব্য। পাথেট লাওর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তারা অস্ত্রসম্বরণে

প্রস্তুত কিন্তু তার আগে প্রস্তাবিত ত্রিদলীয় সরকার লাওসে গঠন করতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে এই প্রস্তাব আন্তর্জাতিক লাওস কমিশনের সম্মুখে রয়েছে এবং কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাবে বা নিরপেক্ষ প্রিন্স ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সুভানা ফুমার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাবেও তিনপক্ষ একমত। শুধু গোল বেঁধেছে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর হাতেই প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দিতে দক্ষিণপন্থী প্রিন্স বুন উমের রাজকীয় সরকার সম্মত নন এবং এই কারণেই কোয়ালিশন সরকার আজও গঠন করা সম্ভব হয়নি। বলা বাহুল্য, এই অচল অবস্থায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি খুব বেশী দিন যথাযথ পালিত হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে পাথেট লাও বাহিনীর সম্মুখে বর্তমানে যেসব সুযোগ-সুবিধা আছে তা খুব বেশীদিন নাও থাকতে পারে। এ অবস্থায় তাদের পক্ষেই প্রথম অধৈর্য হওয়া স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক কমিশনের, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের, আজ একথাটা জানা দরকার যে, সংযুক্ত সরকার গঠিত না হওয়া ভিন্ন লাওস সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব নয়। সামরিক শক্তির জোরে কোন অনিবার্য শক্তিকে যে প্রতিরোধ করা যায় না এটা চিয়াং কাইশেকের শোচনীয় পতন থেকে তাদের বহুদিন পূর্বেই উপলব্ধি করা উচিত ছিল।

॥ পশ্চিম ইরিয়ান ॥

পশ্চিম ইরিয়ানকে যুক্ত করতে ইন্দোনেশিয়াকে শেষ পর্যন্ত বোধহয় যুদ্ধের পথই বেছে নিতে হ'ল।' হল্যান্ডিয়া বন্দর থেকে ওলন্দাজ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান যে সংবাদ পাঠিয়েছে তাতে জানা যায়, ১৫ই মে ভোরে পশ্চিম ইরিয়ানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অন্তত চারটি ডেকোটা বিমান থেকে ইন্দোনেশিয় ছত্রীবাহিনী অবতরণ করেছে। দুটি মিচেল বোমারু বিমান ডকোটা বিমানগুলিকে প্রহরা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, ওলন্দাজ বিমানধ্বংসী কামানগুলি তাদের লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ করে। ছত্রী-বাহিনীর বিরুদ্ধেও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে বলে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের দিক থেকে দাবী জানানো হয়েছে। অপর এক সংবাদে প্রকাশ, দলে দলে ইন্দোনেশিয়ার স্থলবাহিনী বিভিন্ন পথ ধরে পশ্চিম ইরিয়ান অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। এ সম্বন্ধে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল আবদুল হ্যারিস নসুটিয়ন বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ার স্বেচ্ছাসেবকরা উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম দিক দিয়ে এবং হল্যান্ডিয়ার রাজধানীর মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইরিয়ান অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন। 'ন্যাটো' সমর্থিত ওলন্দাজ সামরিক শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য তাঁরা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছেন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে হল্যান্ড একদিন ইন্দোনেশিয়ার হাতে পশ্চিম ইরিয়ান ফিরিয়ে দেবে এ বিশ্বাস তাঁদের আর নেই। সুতরাং নিরুপায় হয়েই ইন্দোনেশিয়াকে যুদ্ধে নামতে হবে।

॥ ডঃ সুকর্ণের প্রাণরক্ষা ॥

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণের প্রাণনাশের প্রয়াস আরও একবার ব্যর্থ হল। এটি তাঁর প্রাণনাশের পঞ্চম প্রয়াস এবং এই বছরেই তার ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ। গত ৭ই জানুয়ারী যখন তিনি পশ্চিম ইরিয়ানে সশস্ত্র অভিযানের পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ সেলিবিসে উপস্থিত হন সেইসময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ করা হয় কিন্তু তা পূর্বের কয়েকবারের মতই ব্যর্থ হয়। এবার তাঁকে আক্রমণ করা হয় উপাসনা কালে। আক্রমণকারী উগ্র সাম্প্রদায়িক দল দার-উল-ইসলামের সদস্য, এবং ঘটনাস্থলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডাঃ সুকর্ণ সম্পূর্ণ রক্ষা পেলেও তাঁর পাঁচজন সঙ্গী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন, যার মধ্যে আছেন ইন্দোনেশিয়া সংসদের স্পীকারের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এই ঘটনার পরের দিন ডাঃ সুকর্ণ সাংবাদিকদের বলেছেন, ইন্দোনেশিয় বিপ্লবের যেমন শত্রু আছে তাঁরও তেমনি শত্রু আছে। সুতরাং মাঝে মাঝে এরকম আক্রমণ তাঁর উপর আসবেই।

॥ জিলাসের কারাদণ্ড ॥

যুগোশ্লাভিয়ার রাজনীতিক নেতা ও চিন্তাশীল লেখক মিলভান জিলাসকে আবার যুগোশ্লাভ সরকার প্রায় ন'বছরের জন্যে কারাদণ্ডিত করলেন। ইতিপূর্বে 'দি নিউ ক্লাস' পুস্তকটি লেখার জন্য তাঁকে চার বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। এবারও তাঁর দণ্ডভোগের প্রত্যক্ষ কারণ গ্রন্থরচনা। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাক্তন অধিনায়ক স্তালিনের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও পরবর্তীকালে তাঁর যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল তাই তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন 'স্তালিনের সহিত কথোপকথন' নামক গ্রন্থটিতে। ঐ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য উদ্যোগী হওয়ার অপরাধেই আবার তাঁকে ন'বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হ'ল। তাঁর বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভ সরকারের অভিযোগ, তিনি সরকারী গোপনীয়তা প্রকাশ করে আইন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়েছেন। তাছাড়া ক্ষতিকর রাজনীতিক কার্যকলাপে আর কোনদিন নিজেকে জড়িত করবেন না, এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৯৬১ সালে তিনি যে মুক্তিলাভ করেছিলেন সে প্রতিশ্রুতি তিনি রাখেননি।

গণতান্ত্রিক দেশগুলির সমরূপ ব্যক্তি-স্বাধীনতা যুগোশ্লাভিয়ায় কেউই প্রত্যাশা করে না। তবুও শুধুমাত্র একখানি গ্রন্থরচনার জন্য তাঁরা একজন প্রখ্যাত রাষ্ট্রনেতা ও চিন্তানায়ককে এভাবে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করবেন এটা কেউই আশা করতে পারেনি। স্বভাবতই যুগোশ্লাভ সরকারের এই কঠোর মনোভাব সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষের চেতনাকে গুরুতরভাবে আহত করেছে। সমালোচনাকে উপেক্ষা করার বা সহজভাবে নেওয়ার শক্তি যে সরকারের নেই সে সরকার কোনদিনই স্বাধীনচেতা মানুষের শ্রদ্ধা বা আস্থা অর্জন করতে পারে না।

॥ আইখম্যান ॥

সর্বোচ্চ আদালতেও যদি আইখম্যানের মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকে তবে ইস্রায়েল সরকার স্থির করেছেন সাগরতীরে তার দেহকে পুড়িয়ে ফেলে শূন্যে ভস্ম মিলিয়ে দেওয়া হবে। কারণ তাঁরা মনে করেন, ঐ জঘন্য হত্যাকারীকে ইস্রায়েলের কোথাও সমাধিস্থ করলে সারা ইস্রায়েলের মাটিকে অপবিত্র করা হবে। আর যদি তাকে জার্মানীতে সমাধিস্থ করা হয় তবে তা হয়ে উঠবে ইহুদী-বিদ্বেষী জার্মানদের আর এক তীর্থক্ষেত্র।

॥ ঘরে ॥

১০ই মে—২৭শে বৈশাখ : ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে সশ্রদ্ধ বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন—অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে দিল্লীর রামলীলা ময়দানে বিরাট জনসমাবেশ।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের (৮০) জীবনাবসান।

'বাজেটে প্রস্তাবিত কর সময়োপযোগী ও যুক্তিযুক্ত হইয়াছে'—লোকসভায় বাজেট বিতর্কের উত্তরে অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইর মন্তব্য।

১১ই মে—২৮শে বৈশাখ : ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বিপুল ভোটাধিক্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত—প্রতিদ্বন্দ্বী দুইজন প্রার্থীর পরাজয় বরণ।

'পূর্ব পাকিস্থানের সাতটি জেলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বহুলোক হতাহত—অনেক ক্ষেত্রে নারীহরণ, গৃহদাহ ও লুঠতরাজ'—রাজ্যসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

১২ই মে—২৯শে বৈশাখ : কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নেতাজীর অবমাননাসূচক প্রবন্ধের লেখিকা শ্রীমতী প্যাট শার্পের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ গঠন।

হুগলী নদীর পাইলটদের দাবী (বেতন সংক্রান্ত) সরকার মানিয়া লইতে পারেন না—লোকসভায় জাহাজী দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুরের ঘোষণা।

'ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ হইলে পাল্টা আঘাত হানিব'—শ্রীনগরে সাংবাদিক বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেননের সতর্কবাণী।

১৩ই মে—৩০শে বৈশাখ : শপথ গ্রহণান্তে নূতন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ কর্তৃক কার্যভার গ্রহণ—সংসদ ভবনে সাড়ম্বর অনুষ্ঠান—উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেনেরও শপথ গ্রহণ সম্পন্ন।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের পর ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের পাটনা যাত্রা—বিদায়ের প্রাক্কালে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ কর্তৃক বিদায়ী রাষ্ট্রপতি 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবিলম্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী—পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু নিধনের প্রতিবাদে কলিকাতায় বিরাট জনসভা।

১৪ই মে—৩১শে বৈশাখ : দিল্লী হইতে বিদায় লইয়া পাটনায় আসিলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন—ডাঃ প্রসাদ কর্তৃক জীবনের অবশিষ্ট কাল জাতির সেবায় উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা।

কলিকাতা বন্দরে প্রতিদিন সাড়ে পাঁচ লক্ষাধিক টাকা লোকসান—পাইলটদের কর্মবিরতিজনিত পরিস্থিতির জের।

মানচিত্র অনুযায়ী চীন ও ভারতের সৈন্যাপসারণ করিয়া বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আলোচনা চালাইতে শ্রীনেহরুর প্রস্তাব।

১৫ই মে—১লা জ্যৈষ্ঠ : প্রতিরক্ষা দপ্তরের (ভারত) বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা সরকারী অর্থের অপচয়ের অভিযোগ—অডিট রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ।

সুখীসমৃদ্ধ বিশ্বগঠনে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার আহ্বান—দিল্লীতে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের ভোজসভায় নূতন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের ভাষণ।

১৬ই মে—২রা জ্যৈষ্ঠ : পাইলটদের বেতনাদি বৃদ্ধির জন্য আলোচনা চালাইতে সরকারের অনিচ্ছা—অন্যান্য বৈধ অভিযোগ আলোচনায় সরকার প্রস্তুত—লোকসভায় জাহাজী মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুরের বিবৃতি।

কয়লা সংকট দূরীকরণের জন্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত—লোকসভায় খনি ও জ্বালানী মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্যের ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

১০ই মে—২৭শে বৈশাখ : পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সংখ্যালঘুদের ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া দিন যাপনের সংবাদ—বাস্তু ত্যাগ করিয়া অসংখ্য নরনারীর আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য ও উত্তরবঙ্গে প্রবেশের ব্যাকুল চেষ্টা—ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসে হাজার হাজার মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের দরখাস্ত পেশ।

পাকিস্তানে পুনরায় রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ—পাক্ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারী।

১১ই মে—২৮শে বৈশাখ : নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্পাদিত হইলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান সামরিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবে—জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ আর্থার ডীনের ঘোষণা।

১২ই মে—২৯শে বৈশাখ : সমগ্র লাওসে অবরোধ অবস্থা ঘোষিত—প্যাথেট লাও ফৌজের অগ্রগতিতে দক্ষিণপন্থী সরকারের কার্য ব্যবস্থা—লাওস প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনে জরুরী বৈঠক।

১৩ই মে—৩০শে বৈশাখ : লাওসে মার্কিণ সৈন্য নিয়োগে প্রেসিডেন্ট কেনেডির প্রস্তুতি—সপ্তম নৌবহরের প্রতি তৎপর হওয়ার নির্দেশ।

১৪ই মে—৩১শে বৈশাখ : ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুকর্ণের প্রাণনাশের চেষ্টা—গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় জীবন রক্ষা। নয়জন গ্রেপ্তার।

লাওসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুনরালোচনায় কম্যুনিষ্ট সমর্থক প্রিন্স সুভানুফং সম্মত—কোয়ালিশন সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার সংকল্প ঘোষণা।

১৫ই মে—১লা জ্যৈষ্ঠ : মার্কিণ সপ্তম নৌবহর হইতে থাইল্যাণ্ডে সৈন্যাবতরণের সংবাদ—লাওস সীমান্ত অভিমুখে আমেরিকার পদাতিক সৈন্য দলের অভিযাত্রা।

১৬ই মে—২রা জ্যৈষ্ঠ : পশ্চিম নিউগিনির উত্তর উপকূলে ইন্দোনেশীয় গেরিলা ফৌজ ও ওলন্দাজ নৌবাহিনীর মধ্যে লড়াই সুরু—কতিপয় ওলন্দাজ সৈন্য আহত হওয়ার সংবাদ—

সৈন্য বহনের জন্য ব্যাঙ্ককে মার্কিণ জেট জঙ্গী বিমানের উপস্থিতি—বৃটেন ও সিরিয়া কর্তৃক মার্কিণ কার্যের সমর্থন—রাষ্ট্রসংঘকে মার্কিণ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের কথা।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের দুর্গম অঞ্চলে ব্রহ্মের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বিদ্রোহী নাগা দল ঘেরাও।

অভয়ঙ্কর

॥ ধূলিতে ফুলকণা ॥

এখানে কোরকের অভাব, আছে শুধু ধূলিকণা। মূল বক্তব্য এই যে, ভারতীয় জনসমাজ নামক মানবজমীনে উপযুক্ত-ভাবে আবাদ করলে নিশ্চয়ই ফলতো সোনা, অর্থাৎ 'হিউম্যান এলিমেন্ট'কে যথোপযুক্ত কর্ষণ করলে ভারতীয় পরিকল্পনাসমূহ এই অঞ্চলের মানুষ-গুলিকে সুসংবদ্ধ ভঙ্গীতে উন্নততর জীবনযাত্রার পথে অগ্রগামী করতে পারত, সকল কুসুম মঞ্জরিত হতে পারতো। জীবন আরো মধুর এবং মনোহর হতে পারত।

পরিকল্পনার যাঁরা উদ্‌গাতা তাঁরা কিন্তু মানবিক পদার্থটুকুর প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দান করেননি, ফলে সম্ভাব্য কোরক আর প্রস্ফুটিত হতে পারেনি, একেবারে আঁতুড়েই বিনষ্ট, ফলে উন্নয়নের গুরুভার বুকে চাপিয়ে ধূলিতেই কবরস্থ হয়েছে, একেবারে মাটিতেই মিলিয়ে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন সামাজিক বিপ্লবের পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, জনগণের এই প্রচেষ্টায় নিঃসন্দেহে খুশী হওয়ার কথা। কিন্তু উত্তর প্রদেশে গিয়ে শ্রীমতী কুসুম নায়ার দেখেছেন যে, কিষাণরা জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির জন্য বিলাপ করছে, জমিদার ছিলেন তাদের পৃষ্ঠপোষক মুরুব্বিস্বরূপ, মূলধন কর্জ দিতেন, জমির প্রয়োজনীয় সার দান করতেন, বাঁধ ভেঙে গেলে তা মেরামত করিয়ে দিতেন, 'বেগার' দিতে হত বটে, তবু পুষিয়ে যেত, ক্ষতির চেয়ে লাভই হত। জমিদারের পীড়ন, অত্যাচার প্রভৃতি গা-সওয়া হয়ে গিছল। তার মধ্যে যেন খানিকটা পিতৃস্নেহ ও পৈতৃক শাসনের আমেজ ছিল। সরকারী ব্যবস্থার ফলে যে সব সরকারী কর্মচারী জমিদারদের শূন্যস্থান গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে যে নির্লজ্জ লোভ, অশোভন অসাধুতা ও ঘুষের জুলুম প্রভৃতির উৎপাত সহ্য করতে হচ্ছে জমিদারী জবরদস্তী তার চেয়ে অনেক উত্তম। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যে অবস্থা ছিল, উত্তর প্রদেশের কিষাণদের মতে বর্তমান অবস্থা তার চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ নিকৃষ্ট।

দুর্নীতির প্রতি জনগণের এই ক্রোধ বাড়লেও হয়ত তেমন ক্ষতি ছিল না, শ্রীমতী কুসুম নায়ার লক্ষ্য করেছেন যে, পরিকল্পনা সম্পর্কে জনসাধারণ শুধু যে উদাসীন তা নয়, তাদের সমগ্র মনো-ভঙ্গীটুকু নিন্দাজ্ঞাপক, পরিকল্পনা-মাফিক উন্নয়নব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বত্রই এই মনোভাব, যে কোনো পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে এই উদাসীনতা এক বিরাট বাধা। "Blossoms in the Dust" নামক বিগত বৎসরের একটি বেষ্ট সেলারের লেখিকা শ্রীমতী কুসুম নায়ার সরেজমিনে ব্যক্তিগতভাবে জনসাধারণের জীবনে বা গোষ্ঠী-জীবনে পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া কিভাবে ঘটেছে দেখার জন্য এই ভারততীর্থের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন, নানা পথ ধরে গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে গিয়েছেন। অতি সামান্য-তম মানুষের সঙ্গে তিনি মুখোমুখি হয়ে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরাও অকপটে তাঁদের মনের কথা বলেছেন। শ্রীমতী কুসুম নায়ারের বিচিত্র ভ্রমণ-কাহিনীই এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু। শ্রীমতী নায়ার বলেছেন—

"In planning for the farming community it is apparent that there can not be any economics in isolation from Sociology and social Psychology". এই মূল বক্তব্য-টুকু স্বাভাবিক কারণেই পাঠকচিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মনোবৃত্তি-অনুসারী মানুষদের সঙ্গে লেখিকার যে সব প্রাণখোলা সংলাপ এই গ্রন্থে ছড়ানো আছে তা পাঠ করলে বিস্মিত হতে হয়। এই সব সরলচিত্ত সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, সংস্কার, সন্দেহ, সংশয়, আশা, বিশ্বাস আছে, পরিকল্পনাকারীদের প্রভাব থেকে এ'রা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তাই এ'দের বক্তব্য উপেক্ষণীয় নয়।

আমরা সবাই শুনেছি সেই অতি-পরিচিত উক্তি— "You can take a horse to water, but you can not make it drink" কিন্তু সেচ-পরিকল্পনা সম্পর্কে যে এই প্রবাদ-বাক্য আক্ষরিক-ভাবে ফলে যাবে তা কে জানতো! কিষাণদের দোরগোড়ায় সেচ-ব্যবস্থার ফলে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তারা কিন্তু নিজেদের জমির উর্বরতা বৃদ্ধি-কল্পে জল ব্যবহারে একেবারেই নারাজ। অথচ এই জমি তাদের জীবনধারণের একমাত্র সহায় ও সম্পদ। তারা বরং অর্ধাশনে থাকবে, অলসভাবে দিন কাটাবে, তবু সক্রিয় হয়ে নিজেদের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে সচেষ্ট হবে না। এই ভাবেই রায়চুড়ের পল্লীর কিষাণ বীর-আপ্পার দোরগোড়া দিয়ে সেচ-বিভাগের জল প্রবাহিত, তবু সে তার দশ একর জমির জন্য এতটুকু জল গ্রহণ

করবে না। এর স্বপক্ষে তার যুক্তি— "after all we have been growing our crops like this with only rain water for thousands of years!"

লেখিকা দেখেছেন উত্তর প্রদেশের কিষাণ সম্প্রদায় অতিশয় দরিদ্র।

তিনি যে পঁচাশিটি কুটিরে গিয়েছেন তার একটিতেও 'চুলা' জ্বলতে দেখেননি, বা ছাই দেখতে পাননি। রিখি দেও নামক জনৈক আনন্দময় তরুণ তাঁকে বলেছে, "I do not get even two meals a day; what of gold?"—কতটা সোনা তার ঘরে মজুত আছে এই প্রশ্নের জবাবে রিখি দেও হেসেই উক্ত উক্তি করেছে। দুধ অতি অল্পই পাওয়া যায়, জনগণ তার কারণস্বরূপ বলেছে—"because after the abolition of Zemindary there are no longer any grazing ground". সম্পদ ও বিত্তশালী উঁচুতলার মানুষেরা সর্বত্রই এই ভূমি-সংস্কার এবং সামাজিক সংস্কার-ব্যবস্থা-বিরোধী। কোনো দেশেই ভূমি-সংস্কারপ্রথা ভূমি-বুভুক্ষু মানুষের ক্ষুধা মেটাতে পারেনি।

উত্তর প্রদেশে সরকার কর্তৃক জঞ্জাল-সারের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে খনিত কূপ অপূর্ণ রয়ে গেছে। তার কারণ ধাঙড়রা জঞ্জাল গ্রামের বাইরে নিয়ে যেতে নারাজ, তারা গ্রাম-সীমানার ধারে জঞ্জাল নিক্ষেপ করে প্রতিটি বাড়ির মাঝে একটা পাহাড় রচনা করে। উত্তর প্রদেশের ঘালোরী নামক স্থানের কিষাণরা উত্তম ধরণের জঞ্জাল-সার প্রস্তুত-প্রণালী জানে। সার হিসাবে এর মূল্য সম্পর্কে তারা অবহিত। দেওয়ালীর দিনে সব কিছু মূল্যবান সম্পদের তলদেশে তারা প্রদীপ রাখে, জঞ্জাল-সারের ঢিবির নীচেও প্রদীপ দেয়। লেখিকার কাছে কিষাণরা বলেছে—"because our lands are at some distance from the village and the 'Bhangin' will not carry the refuse so far, we can not make quality compost".

হতাশা, দারিদ্র্য, ক্রোধ, বুভুক্ষা, অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতির এই সুবিশাল মানচিত্রের মধ্যে উজ্জ্বল অংশও আছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের বাস্তুহারারা ভারতবর্ষীয় পাঞ্জাবে এসে অতিশয় সুদৃঢ়ভাবে পাঞ্জাবকে গড়ে তুলেছে, সর্দার প্যাটেলের গুজরাট সমবায় প্রচেষ্টার এক নবগঠিত স্বর্গ। NEFA-র উপজাতি অঞ্চলে শিক্ষা-প্রসারের প্রশংসনীয় অগ্রগতি আনন্দ-বর্ধন করে।

লেখিকা কিন্তু এই শিক্ষাবিস্তারের অগ্রগতির দ্বারা সামাজিক উন্নয়নের প্রসারে সুবিধা হবে এই কথা মানতে রাজী নন। তিনি বলেছেন—"Is it not a fact — that the educated son of peasant, though he may own sufficient land, seeks alternative avenues of work which he considers to be less difficult, more pleasant and more dignified, even though his income from that job may be lower than what he could earn if he worked on the land?"

তাঁর এই কাহিনীর মধ্যে এই জাতীয় অসংখ্য দৃষ্টান্ত লেখিকা দিয়েছেন।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিকল্পনা-ব্যবস্থায় মৌল সমস্যার সমাধান হয়নি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তনসাধন সম্ভবপর হয়নি। এর জন্য নতুনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন। সমগ্র পরিকল্পনা-প্রস্তাবটি সরকারের আবার পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন এই পরিপ্রেক্ষিতে। লেখিকার মতে—এই সমস্যা is a challenge to the Government, the politicians, the social scientists and the economists engaged in planning in India".

ভূমিকায় Gunnar Myrdal সতর্কবাণী দিয়েছেন যে "the processes of production are ultimate determinants of all that is culture" এই মার্কসীয় নীতিতে অধিক পরিমাণে আস্থা রাখা অকর্তব্য। এই সতর্কবাণী লেখিকার সমগ্র রচনাটির প্রতি প্রযোজ্য।

শ্রীমতী কুসুম নায়ার লিখিত Blossoms in the Dust সাহিত্য রস-সমৃদ্ধ ভ্রমণকথা, এবং নবভারতের এক তথ্যনিষ্ঠ মূল্যায়ন। গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা সম্পর্কে এই গ্রন্থ এক মূল্যবান সম্পদ, পরিসংখ্যান এবং শুষ্ক তথ্যের ভারে কুসুম নায়ারের গ্রন্থ অকারণ ভারাক্রান্ত নয়।

*BLOSSOMS IN THE DUST: By Kusum Nair: Publishers: Gerald Duckworth, London, W.C. 2: Price 21 Shillings.

সুতানুটি সমাচার (উইলিয়াম হিকি, এলিজা ফে, ফ্যানি পার্কস ও ভিক্টর জ্যাকমোঁর স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী অবলম্বনে রচিত)—বিনয় ঘোষ। বাক-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম—বারো টাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষক বিনয় ঘোষ ১৯৪৯-৫০ থেকে প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাস নিয়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। 'কালপেঁচার নকশা', 'কলকাতা কালচার', 'টাউন কলিকাতার কড়চা' প্রভৃতি সুবিখ্যাত গ্রন্থে তাঁর সদাজাগ্রত ইতিহাসবোধ ও তথ্যনিষ্ঠার পরিচয়দান করেছেন। শহর কলিকাতার সামাজিক ইতিহাস-সন্ধানে তিনি আগ্রহশীল ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসন্ধানকর্মে ব্যস্ত থাকার সময় এটর্ণি উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথা, এলিজা ফে'র চিঠিপত্র এবং ফ্যানি পার্কসের ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংগ্রহ করেছেন এবং হিকি, ফে, ফ্যানি কলিকাতা শহর এবং বঙ্গদর্শন সম্পর্কে যে সব বর্ণনা করেছেন বিনয় ঘোষ 'সুতানুটি সমাচার' নামক এই সুবৃহৎ

গ্রন্থে তা সঙ্কলিত করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাস হিকির ডায়েরীতে সুন্দরভাবে বর্ণিত, অতিশয় সুললিত ভঙ্গীতে বিনয় ঘোষ তার নির্বাচিত অংশ অনুবাদ করেছেন। Memories of William Hickey (1749-1809) চার খণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট গ্রন্থ। উইলিয়াম হিকি কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের অ্যাটর্ণী ছিলেন, তাছাড়া সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হিসাবে সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যথা, ওয়ারেণ হেসটিংস, ফিলিপ ফ্রান্সিস, কর্ণআলিস, ওয়েলেসলি, ইলিজা ইম্পে, জাস্টিস হাইড, উইলিয়াম জোনস্ প্রভৃতি ইংরাজগণ এবং খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবাড়ীর গোকুল ঘোষাল, মল্লিক-বংশের নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভ করায় তাঁর এই স্মৃতিকথায় স্বাভাবিক কারণেই তাদের সম্পর্কে অনেক অন্তরঙ্গ উক্তি স্থানলাভ করেছে। এলিজা ফে'র চিঠিপত্র ও ফ্যানি পার্কস-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথার সমতুল্য নয় বটে, তবে তার বৈশিষ্ট্যও কম নয়। বিনয় ঘোষ অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে প্রয়োজনীয় এবং আকর্ষণীয় অংশ 'সুতানুটি সমাচারে' পরিবেশন করেছেন। উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথায় হেসটিংস ও ফিলিপস ফ্রান্সিস, সুপ্রিম কোর্টের বার্ষিক উৎসব, ডিনারে হুঁকো খাওয়া প্রভৃতির অতি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে।

নন্দকুমারের ফাঁসি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে হিকি সমবেদনার পরিচয়

দান করেছেন, এবং নন্দকুমারের ফাঁসি তাঁর মতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ইতিহাসে একটা কলঙ্কের কথা হয়ে আছে।

মন্বন্তরের যে মর্মান্তিক চিত্র তিনি এঁকেছেন তার সঙ্গে ১৯৪৫-৪৬-এর মন্বন্তরের যেন অনেক মিলঃ—

"কলকাতা শহরের মধ্যে ও আশে-পাশে বুভুক্ষু জনতার আর্তনাদ বাড়তে লাগল, পথঘাট সব ভর্তি হয়ে গেল। ঘরের দরজা খুলে বাইরে পা বাড়ালেই তাদের ক্ষুধার আর্তনাদ ও মৃত্যুযন্ত্রণার কাতরানি শুনতে হত। কত মানুষ, শিশু ও নারী যে পথের উপর মরে পড়ে থাকত তার ঠিকানা নেই। মোটামুটি একটা হিসাব থেকে জানা যায় যে কয়েক সপ্তাহ ধরে গড়ে প্রতিদিন কমপক্ষে পঞ্চাশজন করে বুভুক্ষু মারা গেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল এই যে কলকাতার মতন শহরে পথের উপর ক্ষুধার যন্ত্রণায় তিলে তিলে এরা মৃত্যু-বরণ করেছে নিঃশব্দে মুখ বুজে, কোন অভিযোগ করেনি, দোকানপাট লুটপাট করেনি, বাড়িঘরে হানা দেয়নি, এমন কি দরজায় ঘুরে চেঁচিয়ে ভিক্ষে করেনি পর্যন্ত। এ বোধহয় ভারতবর্ষের মতন দেশেই সম্ভব।"

এরপরে আছে জমাদারনীর সঙ্গে হিকির সংসারযাত্রা যাপনের ইতিহাস। চার্ণক এদেশী রমণীর সঙ্গে সংসার করেছিলেন। হিকিও অনুরূপ কর্ম করেছিলেন, হয়ত বিবাহবন্ধনে এঁরা আবদ্ধ হননি, তবু কয়েকটি লাইনের মধ্যে পশ্চিমা তরুণী জমাদারনীর সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। তার মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও প্রীতির পরিচয় আছে।

ভৃত্য চাঁদের কীর্তিও কৌতূহলো-দ্দীপক। আর চমৎকার লাগে বাঙালী কেরানী রামরতন চক্রবর্তীর কথা, সে তার মনিবকে ইংরাজী কবিতায় চিঠি লিখে মনের কথা জানিয়েছিল। হিকি সেই কবিতা সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। কলিকাতার থিয়েটার-সংক্রান্ত ঘটনাটিও বিশেষ তথ্যপূর্ণ, রাণ্ডেল এবং পোলাই-এর কথা অন্যত্র বোধহয় পাওয়া যায় না।

শ্রীমতী ফের চিঠিপত্রে আছে কলকাতার অনুরূপ। সংসারযাত্রার সামাজিক ঘরোয়া কাহিনী। জিনিসপত্রের মূল্যাদিও কম লোভনীয় নয়। কলকাতার ইংরেজদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের চিত্রও আছে।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিকতর জ্যাকোমাঁর চিঠি ১৮২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার কথা আছে। আছে কর্মব্যস্ত সদাচঞ্চল কলকাতার কথা, যাকে ইদানীং মুমূর্ষু বলাটা ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে।

বিনয় ঘোষ, বাংলার বর্তমান সাহিত্য সমাজে এক অবিস্মরণীয় নাম, সেই নামের পিছনে আছে অবিচল নিষ্ঠা, যুক্তিবাদী মন আর ঐতিহাসিকের সত্যনিষ্ঠা। 'সুতানুটি সমাচার' তাঁর সেই খ্যাতি আরো বর্ধিত করবে।

ছাপা এবং প্রচ্ছদ আশ্চর্য সুন্দর।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

বৈতানিক—(সাহিত্য-সংকলন) ঃ সম্পাদক—ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সনস্ প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম এক টাকা।

বাঙলা ভাষার অসংখ্য পত্রপত্রিকার আসরে সাহিত্য-পত্রিকা হিসাবে বৈতানিক সম্পূর্ণ নবাগত, কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আলোচ্য প্রথম সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, গোবিন্দ চক্রবর্তী, তরুণ ভট্টাচার্য, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দিনেশ দাস, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, দুর্গাদাস সরকার প্রভৃতি। প্রবন্ধ লিখেছেন ভবতোষ দত্ত, অতীন্দ্র মজুমদার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিতাই মুখোপাধ্যায়, পবিত্র পাল, দুর্গাদাস সরকার ও হরেন ঘোষ। গল্প লিখেছেন মিহির আচার্য, খগেন্দ্র দত্ত, সত্যপ্রিয় ঘোষ, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, জয়দেব চট্টোপাধ্যায়। মুন্সী প্রেমচন্দের একটি গল্প অনুবাদ করেছেন মানবেন্দ্র বসু। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্নদাশঙ্কর রায় ও দক্ষিণারঞ্জন বসুর চিঠি সংকলিত হয়েছে। সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত এই সাহিত্য-পত্রিকাটি পাঠক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে আশা করি। শিল্পী বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত প্রচ্ছদটি মনোরম ও চিত্তগ্রাহী।

সপ্তর্ষি—সম্পাদক ঃ ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়। সহ-সম্পাদক ঃ খগেন দত্ত। ৩২ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। দাম দু টাকা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা 'সপ্তর্ষি'র এই সংখ্যাটি নববর্ষ সংখ্যারূপে বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য সংখ্যাটি সুসম্পাদিত এবং সুনির্বাচিত রচনা নিয়ে প্রকাশিত। মিহির আচার্যের সম্পূর্ণ উপন্যাস 'দ্বিরাগমন' একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণই নয়—লেখকের সার্থক জীবনায়ন ক্ষমতাগুণে উল্লেখ্য। কবিতা লিখেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, দীনেশ দাস, রাম বসু, গোপাল ভৌমিক, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র রক্ষিত। 'অতলান্তিক' ও 'কল্যাণী বৌদি' ও 'সিন্ধু নিকটে যদি' নামক তিনটি গল্প লিখেছেন যথাক্রমে ভবানী মুখোপাধ্যায়, খগেন দত্ত ও সুবোধ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সম্পর্কে স্মৃতিকথা লিখেছেন শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী। ধারাবাহিকভাবে 'বাংলা সাহিত্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়' ও 'আধুনিক বাংলা নাটকে'র ওপর আলোচনা করছেন যথাক্রমে শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীসুবন্ধু ভট্টাচার্য। পর্ণোগ্রাফি সম্পর্কে লিখেছেন শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পী শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি স্কেচ ও একটি উড্‌কাটের প্রতিচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলারসিক

।। স্থায়ী রবীন্দ্র-গ্যালারী ।।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রদর্শনী করে কলকাতার শিল্প রসিকদের অকুন্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এবার শতবার্ষিকী শেষে কবিগুরুর ১০১তম জন্মদিনে তাঁরা কবিগুরুর স্মৃতি-বিজড়িত অনেকগুলি নিদর্শন দিয়ে উদ্বোধন করেছেন স্থায়ী রবীন্দ্র-গ্যালারী। অ্যাকাডেমীর দ্বিতলে গত ৮ই মে এই গ্যালারীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। আমরা অ্যাকাডেমীর এই সৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করছি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা, পাণ্ডুলিপি কিংবা অন্য কোনো স্মৃতি-স্মারক দর্শন করতে হলে এতকাল রবীন্দ্র-ভক্তদের শান্তিনিকেতনে গমন করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। লেডি রাণু মুখার্জি তথা অ্যাকাডেমীর প্রচেষ্টায় কলকাতার মানুষ শান্তিনিকেতনে না গিয়েও এখন সেই সব দর্শনীয় সম্পদের অন্ততঃ কিছু অংশ ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এ গিয়ে দর্শন করে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করতে পারবেন।

এই স্থায়ী রবীন্দ্র-গ্যালারীতে ৩২ খানি চিত্র স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অঙ্কিত এই চিত্রগুলির মধ্যে চিত্রশিল্পীরূপে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় আজ বিশ্ব-বন্দিত তাও খুঁজে পাওয়া যাবে। এছাড়া আছে অনেকগুলি চিঠিপত্র। এগুলি লেডি রাণু মুখার্জি ও তাঁর পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। এই গ্যালারীর অন্যতম আকর্ষণ লেডি রাণু মুখার্জিকে উদ্দেশ্য করে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'ভানু সিংহের পত্রাবলী'র পাণ্ডুলিপি। রবীন্দ্রনাথের নাম স্বাক্ষরিত এক আলমারী গ্রন্থও সংরক্ষিত হয়েছে। এই গ্যালারীতে।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ একদা ব্যবহার করেছিলেন এমন কিছু নিদর্শন দেখেও দর্শকেরা পরিতৃপ্ত হবেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত একখানি কাঁথা, টেবিলের ঢাকনি, ধাতু নির্মিত একটি ফুলদানী, পেন্সিল দানী প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। লেডি মুখার্জির বিবাহ উপলক্ষে প্রীতি-উপহার স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যে কেশগুচ্ছ একটি স্বর্ণ-নির্মিত ক্যাস্কেটে করে পাঠিয়েছিলেন, তাও সংরক্ষিত হয়েছে এখানে। মোট কথা, এই গ্যালারীর সমস্ত সম্পদই লেডি মুখার্জি কর্তৃক সংগৃহীত। সেই একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ আজ জনসম্মুখে স্থায়ীভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করায় আমরা তাঁকেও আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি অ্যাকাডেমীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-বিজড়িত আরো নিদর্শন সংগ্রহ করে এই গ্যালারীকে সমৃদ্ধতর করতে তৎপর হয়ে উঠবেন। আমরা এই গ্যালারীটি দর্শনের জন্য কলকাতার শিল্প-রসিকদের অনুরোধ করছি।

॥ রাজস্থানী চিত্র-শিল্পীদের প্রদর্শনী ॥

সম্প্রতি সঙ্গীত কলা মন্দিরের উদ্যোগে পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে রাজস্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আটজন শিল্পীর এক চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই প্রদর্শনীর নাম দেওয়া হয়েছিল রাজস্থানী চিত্র-কলার প্রদর্শনী। কিন্তু নামের সঙ্গে প্রদর্শিত নিদর্শনের সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। কারণ, আটজন শিল্পীর অনেকেই রাজস্থানের অধিবাসী নন এবং অনেক শিল্পীর চিত্রধারায় রাজস্থানী শিল্পরীতিও অনুসৃত হয়নি। মোটামুটি বিড়লা ব্রাদার্সের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রই ছিল এই প্রদর্শনীর মূল বিষয়। মালিক কর্তৃক কর্মচারী শিল্পীদের চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমরা বিড়লা ব্রাদার্সের এই প্রচেষ্টাকে নিশ্চয়ই স্বাগত জানাই।

আটজন শিল্পীর মধ্যে ভুরসিং শেখাবত, কেশবদেও আগরওয়াল, প্রীতমলাল শর্মা ও জি পি শারদা রাজস্থানের অধিবাসী। শিল্পী গৌরাঙ্গচরণ ও বীণাপাণি দেবী উড়িষ্যার অধিবাসী। শিল্পী রিয়াজ আহম্মদ কাজি মহারাষ্ট্রের ও গোবিন্দস্বারকানাথ গনু রঙ্গগিরির অধিবাসী।

শৈলী ও প্রকরণে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথাগত ধারার অনুসারী আবার কেউ শান্তিনিকেতনী, বিশেষ করে নন্দলাল ও অবনীন্দ্রনাথের অনুসারী এবং একজন নিঃসন্দেহে আধুনিক বিমূর্ত চিত্র-শৈলীকে গ্রহণ করেছেন তাঁর বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম রূপে।

প্রথাগত ধারার শিল্পীরূপে ভুরসিং শেখাবত, কেশবদেও আগরওয়াল, প্রীতমলাল শর্মা (একখানি চিত্র বাদে) এবং বীণাপাণি দেবী উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী। রাজপুত গ্রাম্য জীবন এবং নর-নারী এঁদের চিত্রে রঙে আর রেখায় সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। গৌরাঙ্গচরণের আশ্চর্য সুন্দর রেখায়িত ছন্দ অনায়াসে মনকে মুগ্ধ করে। রিয়াজ-উদ্দিন আহম্মদ কাজির চিত্রগুলিও আমাদের ভাল লেগেছে। জি পি শারদা জ্যামিতিক প্যাটার্ণে মনোবিশ্লেষণ-ধর্মী যে চিত্রগুলি অঙ্কন করেছেন তার সংস্থাপন এবং বর্ণপ্রয়োগ নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। আমরা এই শিল্পীদের কাজ ভবিষ্যতে দেখার ইচ্ছা পোষণ করি। আশা করি উদ্যোক্তারা আমাদের এই বাসনা পূর্ণ করতে দ্বিধা করবেন না।

॥ শিল্পী চন্দন মালাকার ॥

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে তরুণ শিল্পী চন্দন মালাকারের চিত্র-প্রদর্শনী দেখে আমরা খুশি হয়েছি। স্কেচ, জল রঙ, প্যাস্টেল ও তৈল রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত প্রায় ৫২টি চিত্র ছিল এই প্রদর্শনীতে। কালি-কলমে অঙ্কিত পশু ও পাখির কয়েকটি স্কেচ সত্যি সুন্দর। তাছাড়া রঙ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে ইনি কয়েকখানি চিত্রকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলতেও সক্ষম হয়েছেন। অকারণ আধুনিকতা কিংবা প্রথাগত পদ্ধতি এর কোনো চিত্রেই প্রায় নেই। ফলে, তাঁর 'ব্যর্থ আমন্ত্রণ' 'আত্ম অস্তিত্বের সংগ্রাম' কিংবা 'অপরিসীম আনন্দ' প্রভৃতি চিত্র যে কোনো দর্শকের ভাল লেগেছে বলে আমার বিশ্বাস।

আমরা শিল্পী চন্দন মালাকারের ভবিষ্যৎ প্রদর্শনী দেখার প্রত্যাশায় রইলাম। আশা করি এই প্রদর্শনীর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করে তিনি আমাদের আরো সুন্দরতর চিত্র উপহার দিতে কুন্ঠিত হবেন না।

নান্দীকর
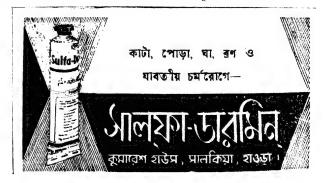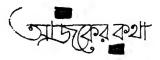
জাতীয় সম্পদের অবাঞ্ছিত অপব্যয় :

সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই কথাটার আলোচনা হওয়া দরকার; কিন্তু যেহেতু বোম্বাই এবং মাদ্রাজের চিত্রজগতের খুঁটিনাটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি-মাত্রায় সীমিত, তাই বাঙলাদেশের চলচ্চিত্র-প্রযোজনা নিয়েই কথাটা পাড়তে হচ্ছে। একদিন ছিল, যখন নিউ থিয়েটার্স, রাধা ফিল্মস্, কালী ফিল্মস্ (অধুনা টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও ব'লে পরিচিত), ভারতলক্ষ্মী, অরোরা, ইস্ট ইণ্ডিয়া, ইস্টার্ণ টকীজ, দেবদত্ত (অধুনা লুপ্ত) প্রভৃতি স্টুডিওর মালিকেরা নিজেরাই ছবির প্রযোজনা করতেন। এবং এ'দের ছবিগুলি ভালো, মন্দ বা মাঝারি ধরণের হ'লেও এ'রা প্রত্যেকেই নিজের নিজের একটা বিশিষ্ট মান ও ভঙ্গী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোনো বিশেষ স্টুডিওর ছবি কি ধরণের হবে, এ সম্পর্কে জনসাধারণের মনে বেশ একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই গোষ্ঠীর মধ্যে নিউ থিয়েটার্সের "নীল হাতী"-মার্কা ছবি ছিল অবিসংবাদীভাবে শ্রেষ্ঠ এবং এ'দের হিন্দী ছবি উত্তরে লাহোর থেকে দক্ষিণে বোম্বাই-মাদ্রাজ পর্যন্ত সারা ভারতের মনকে অধিকার করেছিল।

আজ কিন্তু আর সেদিন নেই। আজ একমাত্র অরোরা স্টুডিও ছাড়া আর কোনো স্টুডিওর মালিকই ছবির প্রযোজনা করেন না। যে-ক'টি স্টুডিও আজ চালু আছে—অবশ্য এদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে—সে-ক'টিই সম্পূর্ণ-রূপে স্বাধীন প্রযোজকদের ওপর নির্ভর-শীল। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি একটি ছবির প্রযোজনা করবার সংকল্প নিয়ে কোনো স্টুডিও-মালিকের কাছে যান এবং উভয় পক্ষে শর্তাদি সম্বন্ধে একমত হবার পর স্টুডিওকে ভাড়া নেন, তবেই সেই স্টুডিওর কর্মীরা কিছু দিনের জন্যে—যে-ক'দিন ছবিটির স্যুটিং হবে সেই ক'দিন কাজ করবার সুযোগ পাবেন স্টুডিও-কর্মীদের ভাষায় 'পার্টি' না থাকলে কাজও নেই; এই কর্মহীন অবস্থায় এ'দের নিত্যকারের কাজ হচ্ছে স্টুডিওতে হাজির দেওয়া, গল্পগুজোব করা, কখনও কখনও নিজেদের ব্যবহারের যন্ত্রগুলিকে পরিষ্কার করা এবং দিনের শেষে বাড়ী ফেরা। না, আরও একটি কাজ আছে; শিকারের জন্যে ওৎ পেতে ব'সে থাকা অর্থাৎ কোনো 'পার্টি' খোঁজ-খবরের জন্যে এলেই তাকে নিজেদের জালে আটকে ফেলা। আজ প্রতিটি স্টুডিওই 'পার্টি'র সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রাখবার জন্যে। এবং সত্যি কথা বলতে কি, এই 'পার্টি' অর্থাৎ চলচ্চিত্রের হবু-প্রযোজক এই বাঙলাদেশে তথা কলকাতায় ক্রমেই বিরল হয়ে পড়ছে। এবং আরও সত্যি কথা হচ্ছে এই যে,

হৃষিকেশ মুখার্জি পরিচালিত 'আশিক' চিত্রে রাজকাপুর ও পদ্মিনী

আজকের দিনে ছবির প্রযোজনার কাজে যে-ক'জন লোক ব্রতী হবার জন্যে এগিয়ে আসছেন, তাঁদের মধ্যে একটি বৃহত্তর অংশ আদৌ নিজের পয়সায় ছবি করেন না। প্রায়ই দেখা যায়, সবচেয়ে কম হাজার পাঁচেক, আর সবচেয়ে বেশী হাজার পঞ্চাশেক টাকা যোগাড় ক'রে এ'রা ছবির প্রযোজনার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ছবিটিকে শেষ করবার জন্যে পরিবেশকের স্বারস্থ হন। পরিবেশক প্রযোজকের আর্থিক দৌর্বল্য বুঝে তাঁদের পরিবেশনার শর্তকে এমন ক'রে নেন যে, প্রযোজক তাঁর ছবির মুক্তির পর তাঁর নিয়োজিত অর্থ ফেরত পাবার আশা অধিকাংশ সময়েই ত্যাগ করতে বাধ্য হন। দেখা যায় যে, যে-ছবি আশাতীত রকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে অর্থাৎ যে-ছবি চলতি ভাষায় 'হিট' করেছে, তারও প্রযোজক কোনোক্রমে তাঁর নিয়োজিত অর্থ ফেরত পাবার পর লাভের অঙ্কের মুখ দেখতে পান অতি সামান্যই। ছবি-নির্মাণের আসল খরচ, 'কপি'-মুদ্রণের খরচ এবং প্রচার (পাব্লিসিটি) খরচের অর্থ সমগ্রভাবে পরিবেশকের কৃপায় এমনই একটি স্ফীত রূপ ধারণ করে, যার বিবর ভর্তি হবার পর পরিবেশকের কমিশন বাদ দিয়ে লাভের অঙ্কের মুখ দেখতে পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

কিন্তু এটা তো হচ্ছে ছবির রাজ্যের উজ্জ্বল দৃশ্য। অপর দিকের কথা কইবার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এমন অনেক তথা-কথিত প্রযোজকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাঁরা পরিচিত-অপরিচিত লোকদের কথায়বার্তায় রীতিমত বিভ্রান্ত ক'রে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন এবং যেমন যেমন অর্থ সংকুলান করতে পারেন, তেমন তেমন ছবির স্যুটিংয়ের তারিখ নেন। যখন কোনো মতেই অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন না, তখন ছবির স্যুটিংও বন্ধ থাকে। ছবিটি আরম্ভ হবার পর ছবিটি যে কবে শেষ হবে, তার কোনই স্থিরতা থাকে না এবং কখনও কখনও আদৌ শেষ হবে কিনা, তাও সন্দেহের বিষয় হয়ে পড়ে। কারণ, অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কাজ করতে করতে ছবির শিল্পীরা তাঁদের গৃহীত চরিত্র সম্বন্ধে আন্তরিকতা হারিয়ে ফেলেন এবং অনেক সময় বীতশ্রদ্ধ হয়ে 'দায় সারা গোছ' ভাবে অভিনয় ক'রেই কর্তব্য শেষ করেন। এমনও হয়, বহু ছবি মাত্র আরম্ভই হয়—এক বা দু'দিন স্যুটিং হবার পরেই বন্ধ হয়ে যায়; আবার কোন ছবি আরও বেশী কিছুদিন, ধরুন দশ-বারো দিন, স্যুটিং হবার পর আর এগোয় না। আবার এমনও দেখা গেছে, আর দু' তিনদিন স্যুটিং হ'লে ছবিটি শেষ হয়, কিন্তু তার জন্যে যে-টাকা দরকার, তাও যোগাড় করা যাচ্ছে না। এবং এর পরেও চরম পরিতাপের বিষয় হয় তখন, যখন ছবিটি সমাপ্ত হবার পরেও এবং 'সেন্সর' হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও স্টুডিওর দেনা মেটাতে না পারার জন্যে মুক্তিলাভে বঞ্চিত হয়। এই যে পরিস্থিতিগুলির কথা বলা হ'ল, বেশ ভালো ক'রে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এগুলি মাত্র তখনই উদ্ভব হয়, যখন ছবির প্রযোজকের হয় নিজের অর্থের সামর্থ নেই, নয় তাঁর ওপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আস্থা নেই। সে যাই হোক, এই বিভিন্ন পরিস্থিতির ফলশ্রুতি হচ্ছে এই যে, অল্প বা বিস্তর জাতীয় সম্পদের অকারণ অপচয়। নগদ অর্থ থেকে শুরু ক'রে মানুষের পরিশ্রম, সময়, কাঁচামাল—সবই অপব্যয়িত হয়।

অথচ আজকের দিনে এই ধরণের অপচয় ঘটা কি উচিত? —আমরা এমন ছবিকেও মুক্তি পেতে দেখি, যে-ছবি কোনো দিনই নির্মিত হওয়া উচিত ছিল না। ছবির গল্প, চিত্রনাট্য, পরিচালনা, আলোকচিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ, অভিনয়—কিছুই দর্শককে খুশী করতে পারে না, এমন ছবি দেখবার দুর্ভাগ্য কখনও কখনও ঘটে। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত খারাপ ছবি এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের প্রশ্ন সেই ছবিগুলি সম্বন্ধে, যে-গুলি আরম্ভ হ'ল, অথচ শেষ হ'ল না কিংবা শেষ হয়েও মুক্তিলাভ করল না। বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতের ওপর অবিসংবাদী কর্তৃত্ব রয়েছে বেঙ্গল মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের। এবং আজ আর কেউই চলচ্চিত্র প্রযোজনার কাজে হাত দিতে পারেন না, যতক্ষণ না তিনি বি-এম-পি-এর সভ্য হচ্ছেন। সরকার কর্তৃক কাঁচা ফিল্ম নিয়ন্ত্রণের ফলে চলচ্চিত্র-প্রযোজককে কাঁচা ফিল্ম ক্রয় করবার অনুমতি লাভের জন্যে জয়েণ্ট চীফ কনট্রোলার অব ইমপোর্টস্-এর কাছে আবেদন করতে হয়। তিনি এই আবেদন মঞ্জুর করবার আগে বি-এম-পি-এ'র আওতায় প্রতিষ্ঠিত একটি উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিস গ্রহণ করেন। কোনোক্রমে শ'দেড়েক টাকা যোগাড় করতে পারলেই বি-এম-পি-এ'র সভ্য হওয়ার খরচটা সামলানো যায়। কিন্তু বি-এম-পি-এর সভ্য হওয়াই কি চলচ্চিত্র-প্রযোজক হবার যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি? পরামর্শ-সমিতির কি দেখা প্রয়োজন নয়, আবেদনকারীর এমন আর্থিক ব্যবস্থা আছে কিনা,—যার দ্বারা তিনি ছবিটির সম্ভাব্য ব্যয়ের সম্মুখীন হ'তে পারবেন?

কাঞ্চনজঙ্ঘায়

ছবি বিশ্বাস

অরুণ মুখোপাধ্যায়

অলকানন্দা রায়

এন বিশ্বনাথন

গল্প নির্বাচন ইত্যাদির যোগ্যতার কথা না হয় ব্যক্তিস্বাধীনতার অজুহাতে নাই তোলা হ'ল, কিন্তু আর্থিক যোগ্যতার প্রমাণ দেবার জন্যে প্রত্যেক হবু-প্রযোজককেই আহ্বান করা অত্যন্ত সংগতভাবেই প্রয়োজনীয়। চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে জাতীয় সম্পদের সমূহ অপব্যয় রোধ করতে হ'লে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

॥ কয়েকটি মঞ্চাভিনয় ॥

(১) মুখোশ-এর "অলীকবাবু" ঃ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অলীক-বাবু" একটি সুপ্রাচীন ও সুখ্যাত প্রহসন। নাট্যরসিকদের কাছে এর নতুন করে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। দক্ষিণ কলকাতার পেশাদার নাট্যকে দল "মুখোশ" সম্প্রতি এই প্রহসনটিকে নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ করছেন। সাজ-পোশাকে এবং অভিনয়রীতিতে এ'রা এই প্রহসনটির অভিনয়কালে এমন একটি পুরাতন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন, যা আধুনিক দর্শকের কাছে বৈচিত্র্য হিসেবে অবিশ্বাস্য রকম উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তরুণ মিত্রের পরিচালনায় এবং গৌরী-শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীলমাধব সেনের সাজসজ্জা ও মঞ্চোপস্থাপনায় "অলীকবাবু" কাহিনী অনুযায়ী রূপ-সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করেছে। অলীক-প্রকাশই কাহিনীটির নায়ক হ'লেও কায়ার চেয়ে ছায়া বড় হ'য়ে উঠেছে। কারণ, অলীকপ্রকাশের অলীকত্ব যার চেষ্টা ব্যতীত কিছুতেই ঢাকা পড়ত না, সেই গদাধরের চরিত্রে পিকু নিয়োগীর অদ্ভুত অভিনয় এই নাট্যাভিনয়ের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। তাঁর নাটুভাই, চীনে-ম্যান ও ভাগ্নে-জগদীশ সেজে এসে অলীকপ্রকাশের মিথ্যা ঢাকবার চেষ্টা এক কথায় অনবদ্য। ছায়ার পরেই আসে কায়ার কথা। তরুণ মিত্র অলীকপ্রকাশকে তাঁর বাচনে ও ভঙ্গীতে মঞ্চের উপর মূর্ত করে তুলেছেন। মাতাল গায়করূপে একটি দৃশ্যে স্নিগ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শক-দের চমৎকৃত করে যান। ঝি-প্রসন্ন এবং অবিবাহিতা নায়িকা হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করেছেন কৃষ্ণা রায় ও রুবী মিত্র। দুজনেই চরিত্র দুটিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছিলেন। অপরাপর ভূমিকার মধ্যে সত্যসিন্ধু ও জগদীশবাবু রূপে অমরেশ দাশগুপ্ত ও অজিত মিত্রের অভিনয় উল্লেখ্য। "অলীকবাবু" প্রহসনের সার্থক মঞ্চাভিনয় নাট্যরসিক দর্শকদের হাস্যোৎ-ফুল্ল ক'রে রাখে পুরো সওয়া দু' ঘণ্টা ধ'রে।

অগ্রগামীর নির্মীয়মাণ ছবি কবিগুরুর "নিশীথে"র একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও নন্দিতা বসু।

(২) শ্রীমঞ্চ-এর "শেষের কবিতা" ঃ

রবীন্দ্রভারতী অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের প্রথম দিন, ৩০এ এপ্রিল, শ্রীমঞ্চ-সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা"র নাট্যরূপ পরিবেশন করেছিলেন জোড়াসাঁকোস্থ রবীন্দ্রভারতী প্রাঙ্গণে।

"শেষের কবিতা"র মত একটি উচ্চাঙ্গের রসসিন্ধ রচনার সার্থক নাট্য-রূপদান এবং তার সার্থক অভিনয় নিশ্চয়ই একটি দুরূহ প্রয়াস। বলতে বাধা নেই, শ্রীমঞ্চ-সম্প্রদায় এই উভয় বিষয়েই আশাতিরিক্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে আমাদের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভে সমর্থ হয়েছেন। মমতা চট্টোপাধ্যায় কাহিনী-বর্ণিত ঘটনাগুলিকে যে-ভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মাধ্যমে সাজিয়ে চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত রূপকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, তাতে তাঁর অসামান্য নাট্যবোধের পরিচয় পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে পূর্ণ মর্যাদা দেবার জন্যে তিনি নাটকের শেষের দৃশ্যের অবতারণা করেছেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়, নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে তার আগের দৃশ্যেই।

মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জাকে অস্থায়ী মঞ্চের ওপর অকস্থাগাতিকে কত সরল ও সহজ ক'রেও নাট্যরসসৃষ্টিকে অব্যাহত রাখা যায়, তার একটি সুন্দর নিদর্শন তুলে ধরেছিলেন শ্রীমঞ্চের কলাকুশলীরা। অপরাপর নাট্য সম্প্রদায় এ'দের কাছ থেকে মঞ্চরীতির পাঠ নিলে উপকৃত হবেন।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় অমিত রায় এবং লাবণ্যের ভূমিকায় প্রেমাংশু বসু এবং গীতা দে'র অসাধারণ রসদীপ্ত ও নাট্যবিভূতিপূর্ণ অভিনয়ের। অমিত এবং লাবণ্যরূপে এ'দের দুজনেরই দর্শনডালি রবীন্দ্রবর্ণনার ধারেকাছে পৌঁছানো তো দূরের কথা, যোজন দূরে বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এ'দের যুগ্ম-অভিনয়ে যে-রসের প্লাবন বয়ে গেছে, আমরা তাতেই প্রাণ ভ'রে ডুব দিয়েছি; তাঁদের দৈহিক পারিপাট্যের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টি বিচ্যুত হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। কেটীরূপিণী মিতা চট্টোপাধ্যায়, লিসিরূপিণী হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, যোগমায়ারূপিণী কেতকী দত্ত, যতিরূপে সমর চট্টোপাধ্যায় এবং সুরমারূপে বেবী মুখোপাধ্যায়—এ'রা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহীত ভূমিকাকে মঞ্চের উপর জীবন্ত ক'রে তুলতে পেরে-ছিলেন অনায়াসেই। আশ্চর্যের কথা, এমন একটি চরিত্রাভিনয় দেখলুম না, যাকে খারাপ লেগেছে ব'লে ব্যতিক্রম করতে

'খনা' চিত্রের নায়িকার ভূমিকায়
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

র। শোভনলাল যথার্থই সুন্দর এবং নীশের অভিনয় যথার্থই হৃদয়গ্রাহী।

মনে হয় এমন নিখুঁত অভিনয় দিন দেখিনি।

) রঙ-বেরঙ-এর "তোতা কাহিনী" :

রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের তৃতীয় দিনে, মে তারিখে রঙ-বেরঙ সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের রূপক গল্প "তোতা কাহিনী"র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সাধারণ বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মাধ্যম এবং পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে বরাবরই একটি বিরূপ মনোভাব ছিল। মুখস্থের মাধ্যমে কতকগুলি বিষয় জোর করে মুখস্থ করিয়ে দিলেই ছেলেরা মানুষ হ'য়ে ওঠেনা না, বরং গুরুভার হওয়ার দরুণ তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা; এই কথাটিকেই তিনি রূপকের সাহায্যে "তোতা কাহিনী"তে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু মণীন্দ্র মজুমদার কৃত নাট্যরূপে এই বিষয়বস্তু ছাড়াও মানুষের সাধারণ অন্নবস্ত্রের সমস্যা প্রভৃতিকে আনা হ'লেও উপভোগ্যতা ও মননের দিক দিয়ে নাটকটি সার্থক হয়ে উঠেছে। এবং অভিনয়েও বিভিন্ন শিল্পী শ্রেষ্ঠ নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সমগ্র অভিনয়টিকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছিলেন।

৪) মৌলিক-এর "এক অধ্যায়" :

৯ই মে, থিয়েটার সেণ্টার গৃহে অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের একাঙ্ক নাটক "এক অধ্যায়"-কে মঞ্চস্থ করেছিলেন তড়িৎ চৌধুরীর পরিচালনায় মৌলিক-সম্প্রদায়। কয়লার খনিতে শ্রমিক-বিদ্রোহ নিয়ে লিখিত এই নাটকটিতে যাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মিঃ রায়ের ভূমিকার অভিনেতা সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়। অপরাপর ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (সহকারী ম্যানেজার), মানস ঠাকুর (কৈলাস), পবিত্র মুখোপাধ্যায় (হরেন), গোপাল বর্ধন (প্রশান্ত) ও ধীরেন মুখোপাধ্যায় (ঝণ্টু)।

(৫) "চক্র"-এর "রাম শ্যাম যদু" :

গেল ১৪ই মে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে "রাম শ্যাম যদু" নামে একটি অভিনব হাস্যোজ্জ্বল নাটককে মঞ্চস্থ করেন 'চক্র।' নাট্যকার বাদল সরকার নিজেই স্বীকার করেছেন, একটি বিদেশী ছবির ছায়া অবলম্বনে তিনি এটি রচনা করেছেন। তাঁর নিজেরই পরিচালনাগুণে এই নাটকের অভিনয়টি বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ ক'রে রাম শ্যাম যদু, এই তিন ৪২০—নরহন্তা এবং চোরের ভূমিকায় বিজন দাশগুপ্ত, মাণিক চৌধুরী ও সুফল পাল—এই ত্রয়ী নাটকটিকে কোনো সময়েই মিইয়ে যেতে দেননি।

(৬) "রঙ্গম"-সম্প্রদায়ের "রীতিমত নাটক :

১৬ই মে সন্ধ্যায় মিনার্ভা মঞ্চে রঙ্গম-সম্প্রদায় জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রসিদ্ধ নাটক "রীতিমত নাটক"টি পরিবেশন করেন। একদা এই নাটকখানি শিশিরকুমারের অভিনয়দীপ্ত হয়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং তারই দ্বারা চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়ে "টকী অব টকীজ" নামে জনসাধারণে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বলতে বাধা নেই, "রঙ্গম"-এর সভ্যবৃন্দ নাটকটির প্রতি সুবিচার করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষ ক'রে প্রফেসর দিগম্বরের ভূমিকায় সামু চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মনে সেই

বহু পূর্বে দেখা শিশিরকুমারের অভিনয় এবং বাচনভঙ্গীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। চমৎকার তাঁর কণ্ঠ এবং অসাধারণ তাঁর বাচনভঙ্গী। তিনি অতি সহজেই এই ভূমিকাটিতে একটি ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পেরেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সুন্দর সহযোগিতা করেছিলেন স্বাগতার ভূমিকায় মুকুলজ্যোতি। স্বাগতার অন্তর্বেদনা তাঁর অভিনয়ের মারফত মূর্ত হয়ে উঠেছিল। শান্তা বা বুলবুলের ভূমিকায় লতিকা দাশগুপ্ত নাটকের প্রথম দিকে তাঁর অনুচ্চ কণ্ঠস্বরের জন্যে আমাদের মনকে স্পর্শ করতে না পারলেও শেষের দিকে তাঁর আন্তরিক অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। বাড়ীওলা নবকৃষ্ণের ভূমিকায় শৈলেন সিমলাই অত্যন্ত সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। এছাড়া উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন সন্তোষ দত্ত (দিব্যেন্দু) সুধীর চট্টোপাধ্যায় (বসন্ত), শচীন মুখোপাধ্যায় (গণপতি), শিবপ্রসাদ দে (দীননাথ) এবং রাধারাণী মুখোপাধ্যায় (সান্ত্বনা)।

সামু চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় "রীতিমত নাটক"-এর অভিনয় মোটের উপর বেশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

আর, ডি, বনশালের "অতল জলের আহবান" :

আজ শুক্রবার, ২৫-এ মে আর, ডি, বনশালের নবতম চিত্রার্ঘ "অতল জলের আহবান" শ্রী, লোটাস, ইন্দিরা, আলো-ছায়া এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। প্রতিভা বসু রচিত কাহিনী অবলম্বনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কৃত চিত্রনাট্যটিকে পর্দায় রূপদান করেছেন পরিচালক অজয় কর। নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তন্দ্রা বর্মণ এবং এঁদের সঙ্গে আছেন ছবি বিশ্বাস, ছায়া দেবী, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিখানিকে সুরসমৃদ্ধ করেছেন।

আর ডি বনশাল প্রযোজিত ও অজয় কর পরিচালিত "অতল জলের আহবান" চিত্রে নায়িকারূপে তন্দ্রা বর্মণ।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও-তে নূতন ধ্বনি-নিকেতন :

সঙ্গীত-রেকর্ডিং কার্যের সৌকর্যার্থে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর কর্তৃপক্ষ যে-নতুন যন্ত্রপাতি সমন্বিত ধ্বনি-নিকেতন নির্মাণ করেছেন, তারই শুভ দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল গেল ২১এ মে, বৈকাল ৫টায়। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেছিলেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন মাননীয় সমবায় ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ। কলকাতা নগরীর পৌরপ্রধান রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উৎসব সমিতি :

গেল ২৩এ মে, বুধবার স্টার রঙ্গমঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উৎসব সমিতি বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রণীত প্রসিদ্ধ নাটক "ক্ষুধা" অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব :

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে গেল ১৯-এ মে থেকে শুরু ক'রে ন'দিনব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতি সন্ধ্যায় নৃত্য, গীত, অভিনয়, দৈহিক কসরৎ, বিভিন্ন দেশের ফিল্ম শো প্রভৃতির মাধ্যমে যে চিত্তহারী অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখা যাচ্ছে, তাতে উৎসব-প্রাঙ্গনের জনতা স্বতঃই উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন।

মাইকেলের "কৃষ্ণকুমারী" নাটক অভিনয় :

আসছে ২১-এ জুন, বৃহস্পতিবার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রেক্ষাগৃহে অচলায়তন-সম্প্রদায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত বিয়োগান্ত নাটক "কৃষ্ণকুমারী"কে দর্শকসকাশে উপস্থাপিত করবেন। বর্তমানের উপযোগী ক'রে নাটকখানির রূপদান করছেন সুধী প্রধান এবং পরিচালনা করছেন প্রখ্যাত অভিনেতা কালী সরকার।

ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স প্রযোজিত "পশ্চিমবঙ্গ—দৃশ্যাবলী" :

গেল শুক্রবার ১৮ই মে লাইটহাউস মিনিয়েচার থিয়েটারে ইন্ডিয়ান চেম্বার

সন্তোষ প্রোডাকসন্স-এর 'কিং কং' চিত্রে কুমকুম

অব কমার্স প্রযোজিত এবং হরিসাধন দাসগুপ্ত পরিচালিত ১৭১২ ফুট দীর্ঘ ও ২ রীলে সম্পূর্ণ "পশ্চিমবঙ্গ-দৃশ্যাবলী" নামে একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। ১৯৬০ সালে জব চার্ণক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুতানুটি নামক একটি ছোট্ট গ্রাম প্রায় আড়াইশো বছর ধ'রে ধীরে ধীরে কি ক'রে সমৃদ্ধিশালী শিল্পনগরী কলিকাতায় পরিণত হ'ল এবং এই শহর-কলকাতাকে ঘিরে কেমন ক'রে নানাবিধ দ্রব্যের কলকারখানা গ'ড়ে উঠেছে—কৃষিকর্মের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাঙলা কিভাবে শিল্পোন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ বন্যানিরোধের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচকর্মে কেমন করে সহায়তায় অগ্রসর হয়েছে, তারই একটি মনোরম চিত্র এই নাতিদীর্ঘ ছবিখানির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ছবিটির চিত্রগ্রহণ করেছেন অধুনা পরলোকগত বুদ্ধ দাসগুপ্ত এবং ইংরাজীতে নেপথ্য-ভাষ্য বলেছেন বাদল হালদার। বালসারাকৃত আবহসঙ্গীত কিন্তু বহুস্থানেই অপ্রযুক্ত হয়েছে এবং এইটিই ছবির একমাত্র ত্রুটি।

নান্দীকারের "বদনাম" :

রবীন্দ্রনাথের একাধিকশততমজন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'নান্দীকার' কবিগুরুর শেষজীবনে লেখা 'বদনাম'-এর নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করবার মনস্থ করেছেন। গল্পটির নাট্যরূপ দিয়ে পরিচালনা করবেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এতে অংশ গ্রহণ করবেন মহেশ সিংহ, দীপক নন্দী, বরুণ সেন, জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী, মায়া ঘোষ ও পরিচালক স্বয়ং।

ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর "মহানিশা" :

গত ১৮ই মে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেডের ক্যাশ বিভাগের প্রযোজনায় ও রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয় নট সুধীর মুস্তাফির পরিচালনায় অনুরূপা দেবীর "মহানিশা" নাটকটি সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়। এই নাটকটিতে প্রশংসনীয় অভিনয় করেন, প্রকৃতি ঘোষ (ব্রজরাজ) এবং রণেন্দ্রনারায়ণ বসু (রাধিকাপ্রসন্ন)। এ ছাড়া সুঅভিনয় করেছেন নীহার মুখোপাধ্যায় (নির্মল), পশুপতি সরকার (কেশব ডাক্তার), ব্রজগোপাল মিত্র (বিহারী), চিত্রিতা মণ্ডল (সৌদামিনী), শেফালী দে (ধীরা), বীণা চক্রবর্তী (অপর্ণা), প্রীতি পাল (ছোট খুড়ী)। নাটকটির সঙ্গীত পরিচালনা করেন, উমাপতি শীল।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির

১২ই মে, সন্ধ্যা ছয়টায় মহাজাতি সদনে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'শ্রীমতী' নৃত্যনাট্য (শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার জীবনালেখ্য) ও নৃত্যবিচিত্রা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা, বাটানগর, কাঁচরাপাড়া, বজবজ, হরিণঘাটা কলোনী প্রভৃতি শিক্ষা-কেন্দ্রের ছাত্রীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করে। ব্যবস্থাপনায়—সম্পাদক শ্রীঅসিত চক্রবর্তী। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন
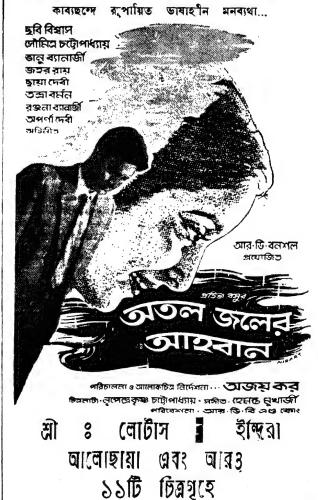
শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রযোজিত ও রাজেন তরফদার পরিচালিত 'আগ্নিশিখা' চিত্রের একটি প্রণয়মধুর দৃশ্যে বসন্ত চৌধুরী ও কণিকা মজুমদার

মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র মহাশয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বাটা সু-কোম্পানীর ওয়েলফেয়ার অফিসার শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় (বাটানগর)। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীবি ঘোষ। সঙ্গীত ও সহকারী নৃত্য-পরিচালকরূপে অংশ গ্রহণ করেন—সমর মিত্র, অরবিন্দ মিত্র, স্বপ্না সেনগুপ্তা, অরুণকুমার, অনুপশঙ্কর, অনিল ঘোষ, শঙ্কর পাল (ভারতী অর্কেস্ট্রা) প্রভৃতি।

রবীন্দ্রপাঠচক্রে রবীন্দ্র জয়ন্তী

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রপাঠ-চক্রের উদ্যোগে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমাপ্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে কলকাতার শেরিফ রাজা বি এন রায়-চৌধুরী এবং রাজ্য-বিধান-পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে রেঃ বিলাস মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রপাঠচক্রের সম্পাদক শুভেন্দু বসু, জে পি, অভ্যাগতদের স্বাগত জানান। প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিশ্বের তিনজন শ্রেষ্ঠ লেখক, রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে ও টলস্টয় যুগে যুগে জনচিত্ত উদ্বেলিত করিয়াছেন। সারা পৃথিবীতে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, কবির বাণী শাশ্বত।' সভাপতি শ্রী রায়চৌধুরী বলেন, 'মানুষের ঐক্য ও একত্বের বৈদান্তিক আদর্শের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিকতাবাদের বলিষ্ঠ উদ্গাতা ছিলেন।' অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তৃতা করেন। বর্ধমানের মহারাণী অধিরাণী শ্রীমতী রাধারাণী মহাতাব পুরস্কার বিতরণ করেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারীদের। অনুষ্ঠানে নৃত্য সংঘের 'স্বদেশ' নৃত্যনাট্য, ভি বালসারা সম্প্রদায়ের যন্ত্র সাহায্যে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও শ্রীকল্পনা দত্তের নৃত্য পরিবেশন উল্লেখ্য।

॥ প্রদর্শনী ফুটবল ॥

পশ্চিম জার্মাণীর ভি এফ বি স্টুটগার্ট ফুটবল দল কলকাতার প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় ৩—১ গোলে আই-এফ-এ একাদশ দলের বিপক্ষে জয়লাভ করে। দ্বিতীয়ার্ধের ১২ মিনিট পর্যন্ত আই-এফ-এ দল ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। পেনাল্টি কিক থেকে স্টুটগার্ট দল গোলটি পরিশোধ করে এবং দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় আরও দুটি গোল দেয়। পেনাল্টি থেকে গোল খাওয়ার পরই আই এফ এ দলের মনোবল ভেঙেগ যায় এবং খেলায় অবনতি ঘটে। রেফারীর পেনাল্টি কিকের নির্দেশ দর্শকমণ্ডলীকে হতবাক করে। বলটি অতর্কিতে চুণী গোস্বামীর হাতে লাগে, তখন তিনি নিজ গোলের দিকে মুখ ক'রে ছিলেন। তিনি বলটি হাত দিয়ে খেলেননি, বলটিই তাঁর হাতে এসে লাগে। ফুটবল খেলার আইনে ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দিয়ে বল খেলাই দণ্ডনীয়।

প্রথমার্ধের খেলায় আই এফ এ দল গোল দেওয়ার কয়েকটি সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় পেনাল্টি থেকে গোল শোধ করার পর চার মিনিটের মধ্যে জার্মাণ দল দ্বিতীয় গোল দিয়ে ২—১ গোলে অগ্রগামী হয় এবং খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করে। এই সময়েও আই এফ এ দল একবার গোল দেওয়ার একটা সহজ সুযোগ হাতছাড়া করে। খেলার একেবারে শেষ সময়ে জার্মাণ দলও চতুর্থ গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ নষ্ট করে। জার্মাণ ফুটবল দলের খেলার বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। দল হিসাবে তারা স্থানীয় দলের থেকে অনেক বিষয়ে উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। বল ধরা, বল নিজের আয়ত্বে রাখা, নিখুঁতভাবে দলের খেলোয়াড়দের বল পাশ করা, স্থান পরিবর্তন ক'রে খেলা, খেলার ধারা অনুযায়ী এগিয়ে-পিছিয়ে খেলা এবং আক্রমণাত্মক খেলা—ফুটবল খেলার এই সব বিশিষ্ট ভূমিকায় জার্মাণ দল যথেষ্ট কৌশল, সাধনা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

এইদিনের প্রদর্শনী খেলায় জার্মাণ দলের পক্ষে গোল দেন হোয়েলার, গাইগার এবং রাইনার। আই এফ এ দলের পক্ষে গোল দেন আপ্পালারাজু।

ভি এফ বি স্টুটগার্ট ফুটবল দল জার্মাণীর অতি প্রাচীন ক্লাবগুলির মধ্যে অন্যতম দল, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। গত দশ বছরের মধ্যে এই দলটি দুবার (১৯৫০ ও ১৯৫২) জার্মাণ চ্যাম্পিয়ানশিপ এবং ১৯৫৪ এবং ১৯৫৮ সালে জার্মাণ কাপ লাভ করেছে। এই সময়ের মধ্যে স্টুটগার্ট দল ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশ সফর ক'রে যথেষ্ট সাফল্য এবং খ্যাতি অর্জন করে। বর্তমানে দলটি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সফর করছে। ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর এবং জাকার্তায় অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় সাফল্য লাভ করেছে।

॥ ফুটবল লীগ ॥

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার তালিকায় গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৫টা খেলায় ৯ পয়েন্ট ক'রে বর্তমানে শীর্ষস্থান নিয়ে আছে। ইষ্টবেঙ্গল একটা পয়েন্ট নষ্ট করেছে গত বছরের রাণার্স-আপ বি এন আর দলের সঙ্গে গোলশূন্যভাবে খেলা ড্র ক'রে। ইষ্টবেঙ্গল এ পর্যন্ত কোন গোল খায়নি, গোল দিয়েছে ৬টা। উপস্থিত দ্বিতীয় স্থানে আছে মোহনবাগান ক্লাব—৫টা খেলায় তাদের ৮ পয়েন্ট উঠেছে। পুলিশের বিপক্ষে ০—০ গোলে এবং বালী প্রতিভা দলের বিপক্ষে ২—২ গোলে খেলা ড্র ক'রে তারা ২টো পয়েন্ট নষ্ট করেছে। গত বছরের রাণার্স-আপ বি এন আর দল এ পর্যন্ত ৪টে ম্যাচ খেলে ৪ পয়েন্ট নষ্ট করেছে, তাদের ৪টে খেলাই ড্র গেছে। জর্জ টেলিগ্রাফ এবং রাজস্থান ৩য় স্থানে আছে, দুই দলেরই ৪টে খেলায় ৫ পয়েন্ট।

॥ আঞ্চলিক হকি প্রতিযোগিতা ॥

মাদ্রাজের এমগোর ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত আঞ্চলিক হকি লীগ প্রতিযোগিতায় দক্ষিণাঞ্চল দল অপরাজেয় অবস্থায় চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। রাণার্স আপ আখ্যা লাভ

পশ্চিম জার্মাণীর ভি এফ বি স্টুটগার্ট (ফেরাইন ফাউর বেভেগুঙসস্পিলে—ক্লাব ফর্ এ্যাথলেটিক স্পোর্টস) ফুটবল দল কলকাতার প্রদর্শনী খেলায় আই-এফ-এ একাদশ দলকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে।

করেছে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতির একাদশ দল।

ফাইনাল তালিকা

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পঃ
দক্ষিণাঞ্চল	৪	২	২	০	৬
সভাঃ একাদশ	৪	২	১	১	৫
উত্তরাঞ্চল	৪	২	০	২	৪
পূর্বাঞ্চল	৪	১	২	১	৪
পশ্চিমাঞ্চল	৪	০	১	৩	১

ইতালীয়ান লন টেনিস

ইতালী প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় সম্প্রতি নিজের স্থান করে নিয়েছে। ইতালী উপর্যুপরি ২ বছর (১৯৬০ ও ১৯৬১) ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে যথাক্রমে ১-৪ ও ০-৫ খেলায় পরাজিত হয়ে রাণার্স আপ হয়েছে। যুদ্ধোত্তর কালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত, একটানা দীর্ঘ ১৪ বৎসর, মাত্র দুটি দেশ—অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই সময়ে অস্ট্রেলিয়া মোট ৮ বার (উপর্যুপরি ৪বার—১৯৫০-৫৩ এবং উপর্যুপরি ৩বার—১৯৫৫-৫৭) এবং আমেরিকা মোট ৬বার (উ প য্যু প রি ৪বার—১৯৪৬-৪৯) ডেভিস কাপ জয় করে। ১৯৬০-৬১ সালে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলেছে অস্ট্রেলিয়া এবং ইতালী। ফলে ইতালীয়ন জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা আজ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ১৯৬২ সালের ইতালীয়ন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল চিলি, ফিনল্যান্ড, সুইডেন এবং স্পেনের পুরো ডেভিস কাপের খেলোয়াড়রা যোগদান করেন। ভারতবর্ষের ১নং খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান ৩য় রাউন্ডে যুগোশ্লাভিয়ার নিকোলাস পিলিক-এর কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হন। পিলিক বাছাই খেলোয়াড়দের নামের তালিকায় কোন স্থান পাননি। বাছাই খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্যায় তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার ১ম স্থান এবং ইতালীর নিকোলা পিয়েত্রাঞ্জলী ২য় স্থান পেয়েছিলেন। রমানাথন কৃষ্ণান পেয়েছিলেন ৬ষ্ঠ স্থান। কৃষ্ণান এবং তাঁর জার্মান জুটি ইংগো বুডিং পুরুষদের ডাবলসে ৩য় রাউন্ড পর্যন্ত খেলেছিলেন।

প্রতিযোগিতায় অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন ইতালীর জুয়ান ম্যানুয়েল কাউডার। বাছাই খেলোয়াড়দের নামের তালিকায় তাঁর কোন নাম গন্ধ ছিল না। কাউডার প্রাক্তন উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়ার নীল ফ্রেজারকে পরাজিত করেন। নীল ফ্রেজারকে বাছাই তালিকায় ৭ম স্থান দেওয়া হয়েছিল। এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে কাউডার ২নং বাছাই খেলোয়াড় ইতালীর চ্যাম্পিয়ান নিকোলা পিয়েত্রাঞ্জলীকে পরাজিত করেন। সেমি-ফাইনালে তিনি ৩নং বাছাই খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার রয় এমারসনের কাছে পরাজিত হন।

মহিলাদের সিংগলস খেতাব পান প্রতিযোগিতার ১নং বাছাই খেলোয়াড় এবং অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ন মিস মার্গারেট স্মিথ। মিস স্মিথ ফাইনালে ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালের উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ান মারিয়া বুইনোকে (ব্রেজিল) পরাজিত করেন। বুইনো ১৯৬১ সালের উইম্বলডেন প্রতিযোগিতায় অসুস্থতার জন্যে যোগদান করেননি।

বুইনো ১৯৫৮ ও ১৯৬১ সালে ইতালীয়ন টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিংগলস খেতাব পেয়েছিলেন।

পুরুষদের ফাইনালে ১৯৬১ সালের উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ন রড লেভার তাঁরই স্বদেশবাসী রয় এমারসনকে পরাজিত করেন। লেভার ১৯৬১ সালের অস্ট্রেলিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে এমারসনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

পুরুষদের সিংগলস: উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ন এবং এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২, ১-৬, ৩-৬, ৬-৩ ও ৬-১ সেটে ৩নং বাছাই খেলোয়াড় রয় এমারসনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস: এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় এবং অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ান মিস মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) ৮-৬, ৫-৭ ও ৬-৪ সেটে ২নং বাছাই খেলোয়াড় মারিয়া বুইনোকে (ব্রেজিল) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ঃ রড লেভার এবং জন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) ১১-৯, ৬-২ ও ৬-৪ সেটে কেন ফ্লেচার এবং জন নিউকম্বকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ঃ মিস মারিয়া ইসথার বুইনো (ব্রেজিল) এবং মিস ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) ৬-৪ ও ৬-৪ সেটে লী পেরীকোলী এবং সিলভানা লাজারিনো-কে (ইতালী) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ঃ সেসলি টার্ণার এবং ফ্রেড স্টোলী (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪ ও ৬-১ সেটে ম্যাডোনা এবং ওয়েন ডেভিডসনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

আলোচ্য প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাই সাফল্য এবং প্রাধান্য লাভ করে। প্রতিযোগিতার পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল ছাড়া অস্ট্রেলিয়া বাকি চারটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং চারটিতেই জয়লাভ করে। পুরুষদের সিংগলস, পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে কেবল অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ব্রেজিল।

॥ সুইস লন টেনিস প্রতিযোগিতা ॥

সুইস লন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে ১৯৬১ সালের উইম্বলেডন সিংগলস চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার ৬-৪, ৬-২ সেটে ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন। সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণান ৮-৬, ৭-৫ সেটে রয় এমারসনকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠেন। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, রয় এমারসন গত এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশীপ এবং ভারতবর্ষের জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার সিংগলস ফাইনালে রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করেছিলেন।

সুইস লন টেনিস প্রতিযোগিতার অপর দিকের সেমি-ফাইনালে রড লেভার ৬-৪ ও ৬-৪ সেটে ম্যানুয়েল শান্তানাকে (স্পেন) পরাজিত ক'রে কৃষ্ণানের সংগে ফাইনালে মিলিত হ'ন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে মিস মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) ৬-১ ও ৬-২ সেটে মিস টার্ণারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পাকিস্থান ক্রিকেট দলের ইংল্যান্ড সফর

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

(১) ওরস্টারসায়ার দলের বিপক্ষে খেলা ড্র; (২) ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স একাদশ দলের বিপক্ষে পাকিস্থানের ৭ উইকেটে জয়; (৩) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে পাকিস্থানের এক ইনিংস এবং ১০৩ রাণে জয়; (৪) লিস্টারসায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলা ড্র; (৫) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে পাকিস্থান দলের ৮ উইকেটে জয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

।। ১ম বর্ষ ৪র্থ খণ্ড, ৩৯ সংখ্যা হতে ৫২ সংখ্যা ।।

১৯শে মাঘ ১৩৬৮—২১শে বৈশাখ ১৩৬৯ ॥ ২রা ফেব্রুয়ারী—৪ঠা মে ১৯৬২

অমৃত

অমৃত

৪

অমৃত

অমৃত

অমৃত

সূচী পত্র

সূচী পত্র

পেটের যাবতীয় বেদনায় সবার সেরা!
কাগমা
দি কাগমা ঔষধালয়

SINGAPURI
HAND WOVEN
G.G.LUNGI COY.
Ganamukala
No. A 1
গণমুকলা
গুড়িয়াখম গণমুকলা লুঙ্গি কোম্পানী
185/6, MAHATMA GANDHI ROAD, CALCUTTA-7
সকল সম্প্রদায়ের ব্যবহার উপযোগী প্লেন ও চেক ডিজাইনের
গণমুকলা লুঙ্গি
রং পাকা ও টেকসই
সকল লুঙ্গির দোকানেই পাইবেন

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 1st June, 1962.
40 Naya Paise

কয়দিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-বিক্ষোভজনিত যে সকল বিসদৃশ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে খবরের কাগজে অনেক কিছুই লিখিত হইয়াছে—অধিকাংশই সংবাদ হিসাবে এবং অল্প কিছু মন্তব্যের রূপে। ঘটনার সময় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের অনেকের সঙ্গে আলোচনার পরে কিছু অন্য তথ্যও আমাদের কর্ণগোচর হয়, কেননা যাঁহাদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা হয়, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বাহিরের ভদ্রলোক, যাঁহারা অনাকাজে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন, নির্লিপ্ত দর্শক ও ঐ মেডিক্যাল ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এরূপ কয়েকজন ছিলেন। ইঁহাদের সকলের দৃষ্টিকোণ এক ছিল না সুতরাং তাঁহাদের বিবরণেও কিছু পার্থক্য স্থানে স্থানে দেখা যায়। কিন্তু ঘটনার মধ্যে মূল কয়েকটি বিষয়ে সকলেই একইভাবে বিবৃতি দিয়াছিলেন এবং সংবাদপত্রের বিবরণেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

এই ঘটনার উৎপত্তি পরীক্ষার তারিখ পিছাইবার দাবী নামঞ্জুর হওয়ার দরুণ। এই দাবীর পিছনে যুক্তি দর্শান হইয়াছিল যে পরীক্ষার পড়ার কোর্স শেষ হয় নাই। কিন্তু সে যুক্তিকে মেডিক্যাল কলেজগুলির অধ্যক্ষেরা অসার প্রতিপন্ন করায় উহা গ্রাহ্য হয় নাই। এই আবেদনের পূর্বে বা তাহা প্রত্যাখ্যাত হইবার পরে, সমস্ত পরীক্ষার্থীদিগের মতামত জানিবার জন্য বা ঐ দাবীর ব্যাপকভাবে সমর্থনলাভের জন্য যে কোনও মিটিং ডাকা হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। বরঞ্চ যাহা জানা যায় তাহাতে মনে হয় ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারী কয়েকজন নিজেরাই অন্য বাহিরের লোকের সহিত পরামর্শ করিয়াই কার্যপন্থা স্থির করেন। এবং যাহা শোনা যায় তাহাতে মনে হয় যে ঐ বাহিরের পরামর্শদাতাদিগের মধ্যে ডাক্তার শ্রেণীর একাধিক ব্যক্তিও ছিলেন।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে প্রকৃত পরীক্ষার্থী—অর্থাৎ যাহাদের ২৯শে মে তারিখের পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার কথা সেইরূপ ছাত্রছাত্রী—শতকরা ৪০ জনও ছিল কিনা সন্দেহ। ঐ বিক্ষোভের কেন্দ্রে এরূপ একদল ছিল যাহারা হাঙ্গামা বাধাইতে প্রস্তুত ও বদ্ধপরিকর হইয়া গিয়াছিল। ইঁট-পাটকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে প্রচুর পড়িয়া আছে সুতরাং বিক্ষুব্ধ ছাত্রদলের পক্ষে তাহার ব্যবহার কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু টেলিফোনের তারকাটা যন্ত্র বা সোডা-ওয়াটারের বোতল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে কিছু ছড়াছড়ি যায় না। টেলিফোনের তারকাটা পেশাদার হাঙ্গামাকারীর নিশ্চিত নিদর্শন, এবং উপাচার্যের ঘরের কাঁচ ভাঙ্গিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে যে ইতর ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা হয় তাহাও অতি নীচ ও অভদ্র নরশাবকের পরিচয় দেয়।

ঘটনাটি বিশেষ পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কলিকাতা মহানগরীতে বিগত দশকে যাহা ঘটিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত ইহার সাক্ষাৎ গুরুত্ব কিছু নাই। কিন্তু এই ব্যাপারের পিছনে যে সকল কার্যকারণ সম্পর্কিত বিষয়ের আভাষ-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে উদ্বেগের কারণ যথেষ্ট আছে। কেননা সেই আভাষ-ইঙ্গিতের সূত্র ধরিয়া চলিলে বহুদূরে যাইতে হয়। ছাত্রদের এইরূপ হঠকারিতা ও গর্হিত আচরণের নিন্দা করিয়া বা উহার পুনরাবৃত্তি নিরোধের ব্যবস্থার দাবী জানাইয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করা যায় না—কেননা উহারা আমাদেরই সন্তান।

ছাত্রদের মধ্যে কথা বলিলে বুঝা যায় যে তাহাদে[র] অধিকাংশই এইরূপ হল্লা-হাঙ্গামা চাহে না এব[ং] সাধারণভাবে তাহারা এইরূপ দুর্বিনীত ও ইতর আচ-রণের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু প্রত্যেকটি ছাত্রসংস্থায় কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রী আছে যাহাদের কাছে পড়াশুন[া] নিতান্তই একটি গৌণ ব্যাপার এবং যাহাদের সহি[ত] ছাত্রাবস্থাতেই শিক্ষাক্ষেত্র-বহির্ভূত নানা আন্দোলনের আন্দোলনকারীদের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। এ[ই] অশুভ যোগসূত্রের আরম্ভ হয় মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে বা তাহারও পূর্বে। ঐ যোগেরই কারণে ইহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এক শ্রেণীর পেশাদার হাঙ্গামাকারীর সহিত যাহাদের সাহায্যে ইহারা নিজ নিজ ছাত্র-গোষ্ঠীর মধ্যে সংযত ও শিষ্ট ছাত্রদের হটাইয়া দিয়া আধিপত্য স্থাপ[ন] করিতে পারে। এই সংযোগের ফলেই ছাত্রদের মধ্যে যাহারা প্রবল তাহারা অবাধে উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল আচর[ণ] চালাইয়া যায়। এইরূপ অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে যাহারা লেখাপড়া করিতে চাহে তাহাদের জ[ন্য] বলিষ্ঠ সমর্থনের প্রয়োজন। উহা সহজ নয়—কিন্[তু] অসম্ভবও নয়।

কবিতা ॥ ॥ কবিতা

নিতান্তই বোকা

অতীন্দ্র মজুমদার

বাজারে ইলিশ সস্তা—এ খবর যেই কানে এলো,
অমনি গিরিন সোম, ফেলু গুণ্ডা, কাঠের ব্যাপারী
হরিপদ কারফর্মা, এমন কি পতিতা রেণুও
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল, ঝুঁকে পড়ল মাছের ঝাঁকায়।
কাড়াকাড়ি মারামারি পরস্পর খালি ঠেলাঠেলি,
সমস্ত সকাল ধরে 'এটা কত? সেটা কত?' বলে
সূর্যকে ক্ষইয়ে দিল। তারপর ঘামে-ভেজা মুখে,
আহা, কী প্রসন্ন চোখে, হাতে নিয়ে জলের ফসল
উদ্ধত গর্বের সঙ্গে ফিরে এল। তখন দুপুর।

সে, কেবল সে গেল না। বোকা লোকটা বসেই থাকল
নিশ্চিন্তে নদীর ধারে। এক পাশে ভাঁটিবন, ছায়া
অল্প অল্প বেনাঝোপে, জলে-ভেজা সপ্‌সপে বালি,
তার ওপর বন-ভোমরা সকালকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিল;
মাকড়সায় জাল বুনে বসে আছে, রোদের আঘ্রাণে
মত্ত হয়ে কী আকুল ঘাস-ফড়িংয়ের জোড়াগুলি
—এই সবই বসে বসে সে দেখল। উঠল না একবারও
ভোর থেকে বেলা হল, বেলা থেকে আসন্ন দুপুর—
একভাবে বসে থাকল নিতান্তই বোকা সে লোকটা॥

খ্রীস্টের শরীর

সিদ্ধেশ্বর সেন

বিরল পর্বতে আজ কেউ নেই, কোনো পাপী-অনুতাপী
বসেছে নগর
একদৃষ্ট নক্ষত্রের আকাশের জাঙাল ভেঙে ভেঙে
বেথলেহেমের সেই বিচালি ও খড়

বিরল পর্বতে কোনো উপদেষ্টা নেই, কোনো উপদেশ
শ্রবণের মতো
প্রেরিত বাণীর মতো কোনো বাণী, বিশ্বাসীরো কানে
প্রগল্‌ভ অন্ততঃ

বৃত-অনুগত তারা পড়ে গেছে, ভয়াবহ নত, কারা বসে
শেষবারের আহার
তিনকাষ্ঠে তুলে ফেলে, কৃতকর্মা কাঁধের উপরও
নুয়ে আসে ঘাড়

সব পান্থশালা ধীরে নিভে যায়, পান্থেরা—
যদিও, চৌরঙ্গীর
রেস্তোরাঁয়, সারারাত, বারে কিম্বা ক্যাবারে-নিরত

পাত হয় খ্রীস্টের শরীর॥

নিরুপমা

অধীর সরকার

নিজেকে যতই ভাব শর্বারিণী সুরূপা সুন্দরী
আয়নায় মুখ দ্যাখ পড়ন্ত বিকেল ঘরে এলে
আকাশি রঙের শাড়ি, বেণীপ্রান্তে প্রস্ফুট মঞ্জরী,
তোমার রূপের শিখা দিকে দিকে হয়তো দেবে জ্বেলে।

সেই গর্বে হয়তো বা নিরুপমা করেছ নিজেকে;
প্রবঞ্চিত প্রেমিকের রক্তে দাও সমুদ্র-স্বনন;
বিজয়িনী অনায়াসে যৌবনের আকাঙ্ক্ষার থেকে
বিবিক্ত বিলুপ্ত কর—যন্ত্রণার ঝরুক শ্রাবণ!

অথচ আশ্চর্য দ্যাখো তরঙ্গিত পুরুষসত্তায়
দেহে মনে যে স্বপ্নের যৌবনের উচ্চকিত দিন
গন্ধে গন্ধে ভারাতুর, তোমারে সে সকালে সন্ধ্যায়
বারবার ভাঙে গড়ে কত রঙে বিচিত্র রঙিন।

তোমার রূপের শিখা পুরুষের চক্ষে দেবে জ্বেলে
অপ্রাপণীয়ের ব্যথা—যন্ত্রণার ঝরুক শ্রাবণ;
নিরুপমা হও তুমি নিভন্ত বিকেল ঘরে এলে
রক্তশিখা নেচে ওঠে মঞ্জরিত কৃষ্ণচূড়া মন।

জৈমিনি

কবি-সম্মেলন কাকে বলে জানেন কি আপনারা? নিশ্চয়ই জানেন। আজকাল খবরের কাগজের মারফত কতো রকমের সংবাদই ছড়িয়ে পড়ে, তার মধ্যে কবি-সম্মেলনের বিবরণও হয়তো আপনাদের চোখে পড়েছে। কিন্তু মাছের গল্প আর মাছ-খাওয়ার আস্বাদ যেমন দু জাতের জিনিস, তেমনি কবি-সম্মেলনের খবর শোনা আর উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা দু ধরণের অভিজ্ঞতা।

আমার এক কবিবন্ধু আছেন। তাঁর সঙ্গে আমি কবি-সম্মেলনে উপস্থিত থেকেছি মাঝে মাঝে। ঈশ্বর মানুষকে দুটি চোখ আর দুটি কান দিয়ে থাকেন, কিন্তু আমার বেলায় দিয়েছেন তিনটি করে। আমার সেই অদৃশ্য চোখ আর অস্পৃশ্য কানে কী আমি দেখেছি-শুনেছি, তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখছি এখানে। যাঁরা এ ধরণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেননি তাঁরা কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারেন।

প্রথমেই বলে রাখি, কবি-সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি তা আমি জানিনে। আজকাল আধুনিক কবিতারই একচ্ছত্র আধিপত্য। কবিরা নিশ্চয়ই এমন আশা করেন না যে, শোনা মাত্রই এ জাতের কবিতা পাঠকের মন কেড়ে নেবে। এ কবিতা পাঠ্য যদি হয় তো সে মনে-মনে এবং একাএকা, আবৃত্তিযোগ্য হলেও তা ঘরোয়া আসরে। মঞ্চ-মাইক-সভার ভিড়ে এর সমস্ত ব্যঞ্জনাই প্রায় হাওয়ায় উড়ে যায়, মনে এসে দানা বাঁধে না। কবিরা তাহলে কবিতা পড়তে যান কেন?

যান, নামের লোভে। আর যাঁরা ঈষৎ খ্যাতিসম্পন্ন তাঁরা যান দুর্নামের ভয়ে। কবিতা লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, কবির নামটা তারা শুনুক, কবিকে দেখুক। এতেই তাঁদের আনন্দ।

আর শ্রোতারা? তাঁদের মধ্যে কবিতা-রসিক কেউই থাকেন না একথা আমি বলব না। কিন্তু তাঁরা সংখ্যালঘু।

বৃহত্তম জনসংখ্যার মহত্তম উদ্দেশ্যই হল মজা-দেখা। এবং সেইসঙ্গে ছাপার অক্ষরে যাঁদের নাম দেখা যায় মাঝে মাঝে তাঁদের স্বচক্ষে দেখে নয়ন-সার্থক করা। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জনসংখ্যা বলতে বিশেষ কেউ থাকেন না। কিংবা থাকেনও যদি, তাঁদের বয়স, শ্রেণী ইত্যাদি লক্ষ্য করে মঞ্চের উপর আসীন কবিদের হৃদয়-মন যে খুব উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না তা বলাই বাহুল্য।

বেশি নয়, আমার দু দিনের অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছি আপনাদের।

একটি কবি-সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্যে উদ্যোক্তাদের আপিসে বসে আছি। সভামণ্ড সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে, একজন শিল্পী তখন পল্লীসংগীত পরিবেশন করছেন, তাও শোনা যাচ্ছে। অগণিত শ্রোতা, সভাস্থল কালো মাথায় একাকার হয়ে গেছে। বেশ লাগছে দেখতে।

তারপর গান শেষ হল। মাইকে ঘোষণা করা হল, 'এবার শুরু হবে কবি-সম্মেলন।'

কী আশ্চর্য, আপনারা বিশ্বাস করবেন না, আমার মনে হল—কথা নয়, মাইক থেকে যেন স্প্রে করা হল ফ্লিট, আর সভাস্থ অগণিত জনতা তার তোড়ে ড়ানামেলা মশার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে পালিয়ে যেতে লাগল এদিকে ওদিকে।

হাস্যকর, কিন্তু মর্মান্তিক দৃশ্য।

অথচ লোকে বলে বাংলাদেশ নাকি কবিতার দেশ। হায় বাংলা, হায় রে কবিতা।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বেশ কিছুদিন আগের ব্যাপার, অর্থাৎ কবিতাকে একটা আন্দোলনের আকারে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এই ধরণের প্রয়াসের কাছাকাছি সময়ের ঘটনা। উদ্যোক্তারা বেশ উৎসাহী মানুষ। খবরের কাগজে আগে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, প্রাচীরপত্র লাগিয়েছিলেন, এবং তাতেও যথেষ্ট হবে না বিবেচনা করে অনুষ্ঠানের দিন

> আগামী সংখ্যা থেকে একটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী নতুন ধরণের রচনা
>
> **টৌডামাণ্ডের চিঠি**
>
> ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। লেখক বহুদিন নীলগিরি পাহাড়ের বনরাজিনীলা টোডাভূমিতে বসবাস ক'রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেই আদিবাসী জীবনের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের অপরূপ জীবনালেখ্য অঙ্কিত করেছেন এই সহজ সরল রচনায়। সঙ্গে আছে বহু চিত্র ছবি। সম্পাদক ঃ—'অমৃত'

সভাস্থলের গেটে নহবত বসিয়ে বিয়েবাড়ির মতো সানাই বাজানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে যা ঘটল তা ভয়াবহ।

সভাস্থলে লোক জমল অনেক, কিন্তু দেখা গেল শ্রোতাদের প্রায় বেশির ভাগ মানুষই কবিতা পড়তে আগ্রহী। ভাবুন একবার ব্যাপারখানা। প্রায় সাত-আটশ' মানুষ, সকলেই কবি, সকলেই কবিতাপাঠের দাবিদার! উদ্যোক্তারা তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

শেষে সিদ্ধান্ত হল, একটা নীতি স্থির করা যাক—যাঁদের কবিতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি, তাঁদের কবিতা পড়তে দেওয়া হবে না। ও'রা বোধ হয় ভেবেছিলেন এইভাবে হয়তো কবিতাপাঠকারীর সংখ্যা আয়ত্তের মধ্যে আনা যাবে। কিন্তু মিথ্যাই সে দুরাশা। ইস্কুল-কলেজের ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার তো শেষ নেই। এক সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে উঠে গেছে এমন পত্রিকার কথা তো প্রত্যেক পাড়াতেই শোনা যাবে একাধিক। তার উপর আছে মফঃস্বলের কাগজ। ফলে অনেক চেষ্টা করেও আবেদনকারীর সংখ্যা শ' দুয়েকের কমে নামানো গেল না কিছুতেই।

অতএব বসল একটা নির্বাচনী কমিটি। সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক তাঁর দুজন সহকারীকে নিয়ে এক অসাধারণ কাজে ব্রতী হলেন। আবেদনকারীদের তালিকা নিয়ে একজন সহকারী নাম পড়ে যেতে লাগলেন, আর সম্পাদক তাঁর রায় দিয়ে যেতে লাগলেন। যেমন—

সহকারী। মন্মথ সিকদার—
সম্পাদক। কবি!
সহকারী। সুরেশ চৌধুরী—
সম্পাদক। কবি নয়।

তারপর ব্যাপারটা এগোল বেশ তড়িৎগতিতে। একটি করে নাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য—'কবি', কিংবা 'কবি নয়'। মিনিট পনের পরে সহকারীর মুখে গাঁজলা উঠল, সম্পাদক চোখ বুজে কপাল টিপে ধরলেন! কিন্তু তবু চলতে লাগল কবি নির্বাচনের কাজ।

হয়তো এভাবে নির্বাচন এক সময়ে শেষ হতো। হয়তো লটারীতে নাম-ওঠা কবিরা হৃষ্টচিত্তে কবিতাপাঠ করে অক্ষয় আনন্দলাভ করতেন। কিন্তু বাধা পড়ল।

একজন ষণ্ডাগোছের লোক এগিয়ে এসে সাধারণ সম্পাদকের জামার কলার চেপে ধরল, এবং সেইসঙ্গে এল তার হুকুম—

'মেরে পোস্ত বানিয়ে দেব। সুকুর নাম কাটা চলবে না।'

সুকু অর্থাৎ সুকুমার খাসনবীশ তাদের ক্লাবের ছেলে। ছোটবেলা থেকে সে 'পদ্য লেখে'; সে আলবৎ কবি। আর সে যদি কবি না হয়, তাহলে কোনো শা—ই কবি নয়। ওসব বুজরুকি চলবে না।

পেছন থেকে শোনা গেল জয়োল্লাস। যাদের বাদ দেওয়া হ'য়েছিল তারাই সংখ্যাগুরু। অতএব—

অতএব আর কি? কবি-সম্মেলন স্থগিত রাখা হল। যে যার বইপত্র গুটিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। কবিদের মুখর উৎসাহে মাইকযন্ত্রটি সেদিন নীরব হ'য়েই রইল।

এমন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার আমি জীবনে দেখিনি। একটি বাংলা প্রবন্ধে একদা পড়েছিলাম—'কবিতা স্বভাবতই মানুষের হৃদয়হারিণী।' এখন যদি কেউ ও ধরণের প্রবন্ধ লেখেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি লিখবেন—'কবিতা স্বভাবতই মানুষের প্রাণহারিণী।'

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তবে এই শতাব্দীরই মধ্যে। ইস্কুলে-পড়া মেয়ে তখন অনেক ছিল, কলেজে-পড়াও যে একেবারে ছিল না তা নয়, তবে সংখ্যায় কম। অতি-আধুনিকাদের অবশ্য তখনও আবির্ভাব হয়নি। চাকরে মেয়ে দু'চারজন দেখা যেত বটে, তবে তারা ট্রামে বাসে ভিড় করত না। ইস্কুলের গাড়ীতেই মেয়েদের সঙ্গে যেত।

এই রকম কালেই ইন্দিরার জন্ম ও শিক্ষা। মা ঠাকুরমার দল সনাতনী, বাপ খুড়োর দল খানিক আলোকপ্রাপ্ত। মেয়েরা ইস্কুল কলেজে যেতে কোনো উৎসাহ পেত না, তবে বাড়ীতে পড়াশুনো করত, শেলাই শিখত, গান শিখত। বাইরের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী একেবারে যে আসত না তা নয়, ঘরে যাঁর যা বিদ্যে ছিল ছেলেপিলেকে সেগুলি শেখাতে তাঁরা কার্পণ্য করতেন না।

ইন্দিরার মা, মাসী, পিসীরা বারো পার হতে না হতেই পাত্রস্থা হয়ে সংসার করতে ঢুকেছিলেন, ইন্দিরাও তেরোয় পড়তে না পড়তে মা বাবাকে তাড়া লাগাতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু খুব বেশী কাজ হয়নি তাতে। ইন্দিরা ছোটখাট মেয়ে, বাড় নেই। এখনও ফ্রক পরে বেড়ায়, ওর আবার বিয়ে কি? ভাবতেই হাসি পায়।

কিন্তু বাবার যতই হাসি পাক, মা ঠাকুরমা খোট ছাড়েন না, গানের ধুয়ার মত এক কথা তাঁরা বলেই চললেন।

বাবা বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও এখন মাঝে মাঝে তাঁদের কথায় কান দিতে আরম্ভ করলেন। ভাবলেন "যাক গে দু' চারটে বাজে খবর দিয়ে এদের ঠাণ্ডা রাখি এখনকার মত। আরো বছর দুই তিন যাক, ইন্দুটা অন্ততঃ বছর পনেরো-ষোলোর হোক।"

ইন্দিরা অল্পে অল্পে বড় হচ্ছে, ক্রমাগত বিয়ের গল্প শুনে শুনে তার কিশোর মনে রং ধরতে আরম্ভ করেছে। দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে, তবে মোটাসোটা হয়নি। প্রতিবেশিনী সখীদের মধ্যে কারো কারো বিয়ে হচ্ছে, তাদের কাছে অনেক রকম গল্প শুনতেও সে আরম্ভ করেছে। আবার দু' চারজন মেয়ে পরীক্ষাও দিচ্ছে, পাস করলে তারা হয়ত কলেজেও পড়বে। বেথুন কলেজের গাড়ী ইন্দিরাদের পাড়ায় আসে বড় বড় মেয়ে সব বই খাতা নিয়ে কলেজে যাচ্ছে, দেখে ইন্দিরার এক একবার মন খারাপ হয়ে যায়। সে কেন ভাল করে লেখাপড়া করতে পারল না? তার বুড়ো মাষ্টারমশায় ত বলেন যে অঙ্কটা একটু দেখেশুনে দিলে, ইন্দিরা স্বচ্ছন্দেই ম্যাট্রিক পাস করতে পারে।

সময় ত বসে থাকে না কারো জন্যে। ইন্দিরা ষোড়শী হয়েই উঠল, যতই না ঠাকুরমা বলুন যে তার বয়স বারো বছর।

এমন সময় দূর-সম্পর্কের এক মামাতো বোনের বিয়েতে ইন্দিরার মায়ের চোখে পড়ল দেবব্রত। ভারি প্রিয়দর্শন চেহারা, দেখলেই মন আকৃষ্ট হয়।

একটু উৎসুক হয়েই ইন্দিরার মা রাধারাণী তাঁর ভাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যা ভাই বউ, কে ঐ ছেলেটি?"

বউ বললেন, "দূর-সম্পর্কের কুটুম এদের। ভারি ভাল ছেলে, লেখাপড়ায় ওর জুড়ি নেই।"

রাধারাণী আবার প্রশ্ন করলেন, "পড়া শেষ হয়নি?"

বউ এবার হেসে বললেন, "হয়েছে, এই বছরই। চাকরীতেও ঢুকেছে। ইন্দুর জন্যে ভাবছ বুঝি? তা ভাই, ছেলে সকল দিক দিয়েই ভাল, তবে মা'টি বড় খাণ্ডার।"

রাধারাণীর মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। আবার তখনই জোর করে হেসে বললেন "তার আর ভাই কি করা যাবে? শাশুড়ীর কাছে গালমন্দ খায় না, এমন কটা মেয়ে আছে বাংলা দেশে? ওসব সয়েই থাকতে হয়।"

তাঁর ভাজ বললেন, "আমরা সব কাঁচবেলায় গেছি, যা খুশি করেছে আমাদের নিয়ে। কেঁদেছি কেটেছি, আবার ভুলেও গেছি। আজকালকার মেয়েরা সব বড় হয়ে, সেয়ানা হয়ে যায়। তারা অত কথা সইতে পারে না। সংসারে অশান্তি হয় বড়।"

রাধারাণী বললেন, "তুমি বাপু একটু যোগাযোগটা করে দেও না? তার-পর দেখা যাক ইন্দুর অদৃষ্ট। স্বামী ভাল হলে শাশুড়ীতে কি করবে? চিরকাল ত তার অধীনে থাকবে না?"

"আচ্ছা বাপু, তা দেব দেখাশোনার ব্যবস্থা করে। ভাল ঘটকী বিদায় চাই কিন্তু।"

"নিশ্চয়, সে আর বলতে।"

নিমন্ত্রণবাড়ী থেকে ফিরে এসে রাধারাণী পোশাকী জামা কাপড় খুলে রাখলেন, কিন্তু এ চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন না। স্বামীর সঙ্গে অনেক রাত অবধি ফিশ্ ফিশ্ করে গল্প করলেন। ছেলেটির এমনই বর্ণনা দিলেন যে, ইন্দিরার বাবাসুদ্ধ তাঁর দলে ভিড়ে গেলেন। বললেন "ও ত প্রায় জানা-শোনার মধ্যে। দাঁড়াও খোঁজ করছি।"

বাড়ীতে সকলের কানেই দেবব্রতের নামটা উঠে গেল। তার রূপ-গুণের বর্ণনা শুনতেও কারো বাকি রইল না। ইন্দিরার মনেও ভ্রমরগুঞ্জনের মত নামটা কেবলি ঘুরে মরতে লাগল।

দেবব্রত সম্বন্ধে যাবতীয় খবর দু'-এক দিনের মধ্যেই এসে গেল। ইন্দিরার বাবা বললেন, "ভাল ত মোটামুটি সকল দিকে। দেখতে ভাল, স্বভাবে ভাল, লেখা-পড়ায় খুবই ভাল। কিন্তু বড়লোক হবে না কোনোদিনও।"

রাধারাণী বললেন, "কেন গা অমন কথা বলছ? অত ভাল করে পাস করেছে, ওর ত খুব ভাল কাজ পাবার কথা?"

ইন্দিরার বাবা বললেন, "ভাল কাজ নিলে ত ভাল কাজ পাবে? মন যে এদিকে টুলো ভট্চাজের মত। কলেজের কাজ ছাড়া ও আর কোনো কাজ করতেই নারাজ। কলেজের কাজে পয়সা ত নেই, মান-সম্ভ্রম যতই থাক।"

রাধারাণী বললেন, "ঐ ভাল বাপু, ভদ্রলোকের কাজ। যত সব গুলিখোর মদখোরের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাওয়াটা বুঝি ভাল? মেয়ের অদৃষ্টে থাকে ত দুঃখের ভাত সুখের করে খাবে।"

আলোচনাটার মোড় ফিরে গেল। ইন্দুর বাবা এ-সব বিষয়ে বেশী কথা বলার বা শোনার পক্ষপাতী নন।

মেয়ে দেখানোর ব্যবস্থা হতে লাগল। ঝি, রাঁধুনী, ঘটকীদের সাহায্যে বরের বাড়ীর হাল-চালের সব রকম খোঁজ জোগাড় করতে লাগলেন। রাঁধুনী, ঝি, সবই আছে, মেয়েকে হাড়কালি করে খাটতে হবে না। বেশী পর্দার ঘটা নেই, তাঁদেরই বাড়ীর মত। তবে মেয়েরা একলা হট্ হট্ করে ঘোরে না। কর্তা-গিন্নির শাসন বেশ প্রবল, এই যা আশঙ্কার কথা। বাড়ীর ছেলেরা এর মধ্যে দু' চারবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, মেয়েরা এখনও মুখ ফুটে কিছু বলেনি।

মেয়ে দেখানটা ভালয় ভালয় উৎরে গেল। কনে অপছন্দের নয়, পছন্দই হল। বাড়ীর মেয়েরা একদিন দেখল। গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়ে বর ও কনেরও একবার দেখা হয়ে গেল এবং বলা বাহুল্য, দুজনেরই পছন্দ হয়ে গেল পরস্পরকে।

দেনাপাওনাটার কিন্তু অত সোজা-সুজিভাবে ব্যবস্থা হল না। বরপক্ষ নগদ টাকা বেশী চান, কারণ তাঁদেরও একটি মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়ে রয়েছে, ইন্দিরার চেয়ে বড় বই ছোট হবে না। কন্যাপক্ষ নানা কারণে গহনাগাঁটি জিনিসপত্রই বেশী দেওয়ার পক্ষপাতী। ওগুলো তবু দু'দিন থাকবে। নগদ টাকা ত এক হাতে নেবে, আর এক হাতে খরচ করে দেবে। তাছাড়া মায়ের এক মেয়ে, তাঁর গহনাতেই ইন্দিরার গা সাজান হয়ে যাবে। নগদ টাকা নেইও কিছু। ঘটিবাটি বাঁধা দিতে যাবার ইচ্ছা কনের মা বাবার নেই, ছোট ছোট তিনটে ছেলে রয়েছে ত? তাদের ভাল করে মানুষ করতে হবে ত?

কথাবার্তা ক্রমাগতই চলে, শেষ নিষ্পত্তি আর হয় না। এদিকে কনের বয়স ত গড়িয়েই চলেছে, এবং বর ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে।

যাক, যাঁদের মধ্যস্থতায় আলাপ পরিচয় হয়েছিল, তাঁরাই মাঝে পড়ে ঠিকঠাক করে দিলেন। ইন্দিরা এক গা গহনা পরে যাবে, বরপক্ষ যা চেয়েছিলেন তার চেয়েও বেশী। আসবাবপত্রও যথেষ্ট দেওয়া হবে। তত্ত্বতালাশ ভাল করেই করা হবে। তবে নগদ টাকার অঙ্কটা কমই রইল খানিক।

রাধারাণীর আর আনন্দ ধরে না। এমন সুন্দর জামাই! সভা যেন আলো করে বসেছে। রাধারাণীর মেয়ের মনের ভিতরটা অবশ্য কেউ দেখতে পেল না, কিন্তু সেখানেও গোধূলির রং সব রাঙা করে তুলেছিল।

বাসরে মহা ভিড়। শালী, শালাজ, দিদিশাশুড়ী সব বরকে চারদিক দিয়ে ছেঁকে ধরেছে। সে বেচারা ইন্দিরার দিকে তাকাবারই সময় পেল না। কনে বরং খানিকটা নিষ্কৃতি পেল, সে ত ঘরের মেয়ে, তার দিকে মন দেবার কারো অবসর নেই। অনেকগুলো মোটা মোটা বালিশে ঠেশ দিয়ে বসে সে অবশেষে ঘুমিয়েই পড়ল।

ভোরের দিকে যখন ঘুমটা ভেঙে গেল, তখন দেখল, ঘরে আর কেউ নেই দেবব্রত ছাড়া। সে চোখ তাকিয়েই আছে, ঘুমিয়েছিল কিনা বোঝা গেল না। ইন্দিরার দিকে চেয়ে বলল, "আর একটু ঘুমিয়ে নাও, অত ভোরবেলা উঠে কি হবে।"

ইন্দিরা নীচু গলায় বলল, "আর ঘুম হবে না।" সোজা হয়ে উঠে বসল।

দেবব্রত তার হাতখানা এক হাতে তুলে নিল। বলল, "তারপর?"

ইন্দিরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। দেবব্রত বলল, "মানুষটাকে পছন্দ হয়েছে?"

ইন্দিরা উত্তর দিল অনেক কষ্টে, "না পছন্দ হবার কিছু আছে নাকি?"

দেবব্রত বলল, "নেই ত? আচ্ছা, এই কথা রইল কিন্তু।"

শালী, শালাজদের সাড়া পাওয়া গেল, কাজেই কথাবার্তা আর এগোল না।

সন্ধ্যার সময় ইন্দিরা মায়ের কোল ছেড়ে চলল নূতন ঘরের দিকে। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, অথচ বুকের ভিতরটা দুরু-দুরু করে কাঁপছে, কি একটা অজানা ভাবোচ্ছ্বাসে।

বরের বাড়ী বেশী দূরে নয়। শাঁখ [illegible] দিক্ কাঁপিয়ে, মেয়েদের হুলু-ধ্বনিতে আকাশ যেন ছিঁড়ে পড়ল। ইন্দিরার ভয় হচ্ছিল পাছে তাকে কোলে নিয়ে কেউ নামাতে যায়। হয়ত ফেলেই দেবে। যাই হোক, কোলে কেউ করল না, দুটি তরুণী তাকে হাত ধরেই নামিয়ে নিয়ে গেল। দুধে আলতায় ভরা পাথরের থালায় পা রেখে দাঁড়িয়ে একটু ভয়ে ভয়ে সে তাকাল ঘোমটার ফাঁক দিয়ে।

বাবাঃ, এই নাকি শাশুড়ী! এ রকম বিপুল দেহ সচরাচর দেখা যায় না।

ভাগ্যে কোলে করে নামাতে যাননি। নিজের শরীরই বইতে পারছেন না, দেখে মনে হয়। আরো অনেক মানুষ চারিদিকে, বেশীর ভাগই মেয়ে। ননদ একজনকে চিনল দেবব্রতের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে, গৃহিণীকে 'মা' বলেও ডাকছে। সে শুনেছিল এই ননদটি তারই বয়সী, দেখে কিন্তু মনে হল বছর কুড়ি বয়স হবে। বেশ গোলগাল পুরন্ত চেহারা।

অনেক রাত অবধি বউ তোলার গোলমাল চলল। আত্মীয়স্বজনরা খেয়ে দেয়ে বিদায় হলেন। দেবব্রতকে আর সে তখনকার মত দেখতেই পেল না।

পরদিন ফুলশয্যা ও বউভাত। সকাল থেকে গোলমাল হৈ চৈ। বউয়ের সঙ্গে সারাক্ষণই বালিকা ও তরুণী কয়েকজন ঘুরতে লাগল। নাওয়া খাওয়া হল একরকম, খুব যে সময়মত হল তা নয়। বিকেল বেলা তত্ত্ব এল, পুরনো ঝি-চাকরদের দেখে ইন্দিরার খানিকটা ভাল লাগল। তারপর সবাই তাকে সাজাতে বসল, সে এক প্রচণ্ড উৎপাত। তারপর লোকজন আসা, প্রবল কলকোলাহল, এবং অনেক রাত করে তবে ফুলশয্যা। সারারাতই প্রায় নানারকম উৎপাত চলল। ভোরের দিকে গোলমালে ক্লান্ত ইন্দিরা ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেবব্রত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

এরপর উৎসব-কোলাহল জুড়িয়ে আসতে আরম্ভ করল। জোড় ভাঙতে ইন্দিরা বরকে নিয়ে একবার বাপেরবাড়ী ঘুরে এল। তার আজন্মের চেনা বাড়ী-ঘর আত্মীয়স্বজন সবই যেন নূতন লাগতে লাগল।

শ্বশুরবাড়ী ফিরে এসে দেখল, বাড়ীটাকে বড্ড আটপৌরে লাগছে। আত্মীয়স্বজন যাঁরা বিয়ে উপলক্ষ্যে এসেছিলেন, তাঁরা বেশীর ভাগই যে যার বাড়ী ফিরে গেছেন। বিয়েবাড়ীর কাজের জন্যে দু একটা বাড়তি ঝি-চাকর যা রাখা হয়েছিল, তাদের বিদায় দেওয়া হয়েছে। বাসন-কোসন, গৃহসজ্জা প্রভৃতি যা কিছু ধার করে আনা হয়েছিল বাড়ীর শোভা-বর্ধনের জন্য, সেগুলিও ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। বাড়ীর অধিবাসীগুলি বিয়ে-বাড়ীর সম্মান রক্ষার্থ এ-কদিন পরিপাটি সাজসজ্জা করে থাকত, এখন সে সব ত্যাগ করে নিজেদের অভ্যস্ত বেশভূষা ধারণ করেছে এবং অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় গা ঢেলে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

এতে ইন্দিরার আপত্তি ছিল না কিছু, এই রকম সাদাসিধাভাবে তারাও চিরকাল থেকেছে। কাজকর্ম দু একটা তার উপর পড়ল, তা ত পড়বেই। বউ ত আর পটের বিবি নয় যে, চিরকাল তাকে তোলা থাকবে? আর ইন্দু কুঁড়ে স্বভাবের মেয়ে নয়, কাজ করতে তার খারাপ লাগে না।

কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুণের ক্যাটকেটে কথাবার্তা ইন্দিরার একেবারে ভাল লাগে না। মিষ্টি করে কথা যেন বলতেই জানেন না ভদ্রমহিলা। যেমন বিপুল দেহ, তেমনি বাজখাই গলা। বাড়ীর সকলকে সারাক্ষণ তাড়া দিচ্ছেন, ইন্দিরা বউ বলে তার ভাগে একটু বেশীই পড়ছে। ননদ পুতুল ও রাণী মাকে খুব যে মানছে তা নয়, কিন্তু মা এমনি রাশভারী যে, সামনাসামনি তাঁকে অমান্য করা যায় না। কর্তা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কথাবার্তা বেশী বলেন না। তবে রোগা পাতলা মানুষ হলে কি হয়, অমন মহিষমর্দিনী গৃহিণীও তাঁকে বেশী ঘাঁটাতে সাহস করেন না। অনেক পরে পরে হলেও, "কামারের এক ঘা"-এর মত ঘা যখন একবার দেন, তখন সবাইকে চুপ হয়ে যেতে হয়। বাড়ীর মধ্যে এক দেবব্রত এ সব উৎপাতের উপরে। বাবা তাকে কিছুই বলেন না, এমন কি নিয়মবিরুদ্ধ আচরণ করলেও না। মায়ের একমাত্র ছেলে, তিনি তার কোনো দোষ দেখতে পান না। ছেলের নামে কেউ কিছু বলেছে জানলে তাকে একেবারে গিলে খেতে যান।

তাই বলে ইন্দিরা কিছু আদর পায় না, যতই সে আদুরে ছেলের বউ হোক। দেবব্রত যে বউকে অত সুনজরে দেখে তা তার মা মোটে পছন্দ করেন না। নানারকম ব্যঙ্গোক্তি করেন ইন্দুকে শুনিয়ে শুনিয়েই, তবে ছেলের কানটা বাঁচিয়ে চলেন। পুতুল আর রাণীও এতে বেশ মজা পায়। ইন্দুরও সঙ্গে ভাবও করে আবার খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়াও করে। বউয়ের সম্বন্ধে তাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। দেবব্রত যতক্ষণ বাড়ীর বাইরে থাকে, দুই বোন ইন্দিরার ঘরে চেপে বসে থাকে। বক্ বক্ করে গল্প করে আর সারা ঘর উলোটপালট করে। বউয়ের শাড়ী জামা, তার গহনা, তার গৃহসজ্জার যত রকম উপকরণ, সবই তাদের অনন্ত বিস্ময়ের খোরাক জোগায়।

শাশুড়ীর যতই দোষ থাক, একটা গুণ আছে। তিনি বড় ঘুমকাতুরে। দুপুরে ভাতটি খাওয়া হয়ে গেলেই ঘুমে তাঁর দু চোখ জড়িয়ে আসে। পান মুখে দিয়েই সেই যে ঘুমোতে আরম্ভ করেন ওঠেন সেই চারটে বাজলে। রাত্তিরেও সাড়ে নটার পর তাঁর আর সাড়া পাওয়া যায় না। কাজেই এ সময়টা বউয়ের কিভাবে

কাটে তার আর খবরদারি করতে পারেন না। বউ এবং ছেলে খুব বেশী মেশামেশি করে এটা তিনি চান না, কিন্তু পাহারা দেয় কে? মেয়ে দুটো কোন কাজের নয়, দাদা ঘরে ঢুকলেই তারা দৌড় দেয়।

এখন আবার পুতুলের বিয়ের কথা চলছে, প্রায় পাকা হয়ে এল বলে। যেমন বাঙালীর ঘরে দস্তুর, দেওয়া নেওয়া নিয়ে তর্কাতর্কি চলছে। এঁরাও নগদ টাকা খুব বেশী দিতে চান না, কিন্তু পাত্রপক্ষ একেবারে শক্ত হয়ে জেদ ধরে আছেন। টাকা তাঁরা যা বলেছেন তা দিতেই হবে, তারপর আর কিছু দিন বা না দিন। তাঁদের জানা আছে, নিজেদের মুখ রাখবার জন্যে এঁরা গহনা দু চারখানা এবং আসবাবও দু-একটা না দিয়ে পারবেন না।

সুতরাং যোট তাঁরা ছাড়লেন না, তাঁদের তৈরি রোজগেরে ছেলে, এঁরা তার দাম দিতে না পারেন অন্য লোক দেবে। পুতুলের বাবা এমন সুপাত্র হাতছাড়া করতে রাজী হলেন না, গিন্নীর সিংহনাদ উপেক্ষা করে তাদের পাকা কথা দিয়ে দিলেন।

পুতুলের মা ফোঁস্ ফোঁস্ করতে লাগলেন, "মেয়ে কি কাঁচের চুড়ি পরে শ্বশুরবাড়ী যাবে?"

কর্তা তামাক খেতে খেতে বললেন, "আর কিছু না জোটে ত তাই যাবে। ওদের বলবার কিছু নেই। সব কিছু নগদে নিচ্ছে।"

গিন্নী বললেন "লোকের কাছে মুখ থাকবে?"

কর্তা বললেন, "দাবী থাকবে।"

রাণী হঠাৎ বলে বসল, "কেন মা, তুমি অতগুলো করে চুড়ি পর, কয়েক গাছা মেজদিকে পরিয়ে দেবে।"

মা ধমক দিয়ে উঠ্লেন, "তুই থাম ত ছুঁড়ি, বেশী ফরফর করতে হবে না।"

রাণীর বাবা বললেন, "মন্দ আর কি এমন বলেছে, ওত সব মায়েই দেয়" বলে হুঁকোটা রেখে বাইরে চলে গেলেন।

ইন্দুর শাশুড়ী ক্রমাগত গজর্ গজর্ করেই চল্লেন। সেদিন শনিবার, কর্তা না খেয়েই অফিসে বেরোলেন, তাড়াতাড়ি ফিরে আরাম করে বসে খাবেন। দেবব্রত সময়মত খেয়েই বেরোল, তার অনিয়ম করা ভাল লাগে না।

ইন্দিরা সবে একটা পান খেয়ে, লাইব্রেরী থেকে আনা নতুন বইখানা

.....এই কঙ্কণজোড়াটা নিলাম পুতুলের জন্যে.....

নিয়ে শুতে যাবে, এমন সময় গিন্নি দুই মেয়ে নিয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন। বউ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

পুতুলের মা বললেন, "গহনার বাক্সটা একবার বার কর ত বউ মা।"

কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে বাক্সটা আলমারী থেকে বার করে ইন্দিরা টেবিলের উপর রাখল। গৃহিণী ডালাটা খুলে গহনাগুলি উলোটপালট করে দেখতে লাগলেন। মান্দ্রাজী প্যাটার্নের এক জোড়া কঙ্কণ তুলে নিয়ে পুতুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এইটের কথা বলছিলি?"

পুতুল বলল, "হ্যাঁ।"

শাশুড়ী ইন্দিরার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখ বাছা, এই কঙ্কণ জোড়াটা নিলাম পুতুলের জন্যে। শুনেইছ ত, নূতন কুটুম কি রকম চামার? গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করছে। যা কিছু যোগাড় করেছিলাম মেয়ের বিয়ের জন্যে সব তাদের নগদ ধরে দিতে হচ্ছে। এখন মেয়েটাকে ত শাঁখা শাড়ী পরিয়ে বিদায় দিতে পারি না? একটা মানসম্ভ্রম আছে ত? তাই নিজের চুড়ি ভেঙে আট গাছা চুড়ি করে দিচ্ছি। আর তুমি দিলে এই জোড়া। ডাল হার এক ছড়া দেবে এখন, বললেই। এই রকম জোড়াতালি দিয়েই এখনকার মত চালাতে হবে।"

ইন্দিরা এমনই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল যে, তার মুখ দিয়ে কথাই বেরোল না। খালি বিস্ফারিত চোখে গৃহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "দেখছ কি হাঁ করে? এমন কথা জন্মে শোনোনি, না? আত্মীয়স্বজনে দেয় না দরকারের সময়? তা আপন বলে জ্ঞান থাকলে তবে না? কলির মেয়ে সব। আপ্ত গরজে, স্বার্থপর।"

রাণী বলে উঠল, "মা, দাদা আসছে!"

"আসুক না? ফাঁসি ত দেবে না? এমন ত ঘরে ঘরে হয়। আমি কি চিরদিনের মত খেয়ে নিচ্ছি নাকি? হাতে পয়সা এলেই গড়িয়ে দেব না?"

রাণী আর পুতুল দেবব্রতের পায়ের শব্দ শুনেই পালিয়েছিল। তাদের মাও এবার তাদের অনুসরণ করলেন, যথাসাধ্য দ্রুতপদে।

ইন্দিরা খাটের উপর বসে পড়ল।

দেবব্রত ঘরে ঢুকে বলল, "কি ব্যাপার? মা সদলে এমন সময় কি করতে এসেছিলেন? আমাকে দেখে অমন করে সবাই পালালই বা কেন?"

ইন্দিরা বল্‌ল, "মা আমার একটা গহনা নিতে এসেছিলেন পুতুলের জন্যে!"

দেবব্রত কোটটা খুলে আলনায় টাঙিয়ে রেখে ইন্দিরার কাছে এসে বসল। তার মুখটা এক হাতে তুলে ধরে বলল, "ইঃ একেবারে জল এসে পড়েছে যে চোখে। কিন্তু তোমার গহনা পুতুলের জন্যে নেওয়া হবে কেন? এ আবার কোন্‌দেশী ব্যবস্থা?"

ইন্দিরা চোখের জলটা মুছে ফেলল। দেবব্রত নিশ্চয় তাকে ভীষণ বোকা ভাববে। এতবড় মেয়ে সামান্য একটা গহনার জন্যে কাঁদতে বসেছে। গলাটা পরিষ্কার করতে করতে বলল, "ওরা সব টাকা যে নগদ নিচ্ছে, গহনা গড়াবার টাকা নেই।"

দেবব্রত তাকে কাছে টেনে নিয়ে পিঠে হাত বুলোতে লাগল। বলল, "তারা ওঁদের টাকা নিচ্ছে বলে, ও'রা কি অন্যের জিনিস-পত্র কেড়ে নিয়ে দাঁড়িপাল্লা সমান রাখছেন? আচ্ছা, আমি দেখছি। বাবা নিশ্চয়ই এর কিছু জানেন না।"

সে উঠবার উপক্রম করতেই ইন্দিরা তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল। বলল, "না, তুমি যেতে পারবে না। যাকগে গহনা। এই নিয়ে কিছু বললে মা ভয়ানক চটে যাবেন। এত কথা শোনাবেন যে আমি পাগল হয়ে যাব। তুমি আমায় আবার গড়িয়ে দিও এখন।"

দেবব্রত বলল, "সেই ভাল, তুমি আমারই কাছ থেকে নিও। হয়তো একটু দেরী হতে পারে, কিন্তু ফিরে তুমি পাবেই। আমি বড় ভাই, আমারও পুতুলকে একটা কিছু দেওয়া উচিতই, তুমিই আমার হয়ে দিলে। আমিই ঋণী রইলাম তোমার কাছে।"

ইন্দিরা স্বামীর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, "বাঃ, আমার জিনিস আর তোমার জিনিস আলাদা নাকি? ঋণী কেন হবে তুমি? আমিই কত কিছুর জন্যে তোমার কাছে ঋণী।"

দেবব্রত তার গাল টিপে দিয়ে বলল, "বেশ ত কথা বলতে শিখেছ দেখছি। আচ্ছা, এর পর এ ব্যাপারটা ভুলে যাবে ত? একটুও দুঃখ করবে না?

ইন্দিরা বলল, "দেখো, আমি আর এর নাম করব না। তবে আমার বাপের বাড়ীর লোকেদের যদি চোখে পড়ে তাহলে লজ্জা পেতে হবে।"

দেবব্রত বলল, "সে সম্ভাবনা ত একটু রয়েইছে। অত তাড়াতাড়ি আমি জিনিসটা রিপ্লেস করতে পারব বলে মনে হয় না।"

ইন্দিরা স্বামীর হাতের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "আমি বানিয়ে যা তা একটু বলে দেব এখন।"

তখনকার মত কথাটা চাপা পড়ল। দেবব্রত ব্যাপারটা জানে কিনা তার মা সেটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বউকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করতেও পারলেন না। তবে স্বামীর কাছে কথাটা লুকোতে পারলেন না। এই নিয়ে মনোমালিন্য একটু তাঁদের ঘটে গেল। তবে ছেলেমেয়েরা সেটার বিশদ বিবরণ কিছু পেল না। বিয়ের দিন এগিয়ে এসেছে, সবাই মহাব্যস্ত অন্য নানা কাজে, ওকথা নিয়ে আলোচনা করবার সময় নেই।

বিয়ে হয়ে গেল যথোচিত হট্টগোল সহকারে। দুই পক্ষ পরস্পরকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখছে না। জোর করে টাকা আদায় করা হয়েছে বলে কন্যাপক্ষ রুষ্ট, আবার তাঁদের এহেন আস্পর্ধায় বরপক্ষও অপমানিত বোধ করছেন। যা হোক, খোলাখুলি ঝগড়াঝাঁটিটা হল না, মানে মানে কাজ চুকে গেল এবং যথারীতি পরদিন কনে বিদায় হয়ে গেল।

পুতুলের শ্বশুরবাড়ী হল কলকাতার বাইরে। মেয়েকে কবে যে আবার দেখতে পাবেন কে জানে? মেয়ের মা ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসলেন। কত না জানি সে কষ্ট পাবে সেখানে। কাজকর্ম খুব বেশী শেখেনি ত?

জোড় ভাঙতে পুতুল একবার এল বটে, কিন্তু বেশী দিন থাকতে পেল না। শ্বশুরবাড়ীর অনেক নিন্দে করল। তবে খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট নেই। তাদের নিজে-দের তরিতরকারির বাগান আছে, পুকুরের মাছও আছে।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "খুব খাটায়?"

মেয়ে বলল, "তা সবাই খাটে, আমাকেও খাটতে হয়।"

এরপর যে গেল, পুতুলের আর পাঁচ ছ'মাসের মধ্যে দেখাই পাওয়া গেল না। পুতুলের বড় বোন ডলির শ্বশুরবাড়ীও ঐ দিকেই। তার সঙ্গে কোথায় যেন এক দিন পুতুলের দেখা হয়ে গেল। ডলি লিখল তার মাকে, "পুতুল শারীরিক ত বেশ ভালই আছে দেখলাম, মাঝে শরীর একটু খারাপ হয়েছিল। শুনছি ছেলের মা হতে চলেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'যাচ্ছিস নাকি কলকাতায়?' তা বললে, 'শাশুড়ী এখন যেতে দেবে না, একেবারে শেষের দিকে যদি দেয়'।"

পুতুলের মা খুব বক্‌বক্‌ করতে লাগলেন। বেয়ানের কত যে মুণ্ডপাত করলেন তার ঠিকানা নেই। ইন্দিরার উদ্দেশ্যেও কিছু বাক্যবাণ ছাড়লেন। তার ঘরে ত নাতি-নাতনী কিছুই এল না? বউ খালি সারাদিন বইয়ে মুখ দিয়ে বসে আছেন। বিয়ে ত হয়ে গেছে, এখন কি আবার পাস দিয়ে জজ ম্যাজিস্টর হতে হবে নাকি?

ইন্দিরা সত্যিই আবার নূতন করে পড়াশোনায় ডুবে গিয়েছিল। সংসারের কাজকর্ম তাকে খুব বেশী করতে হয় না। ঝি আছে, রাঁধুনী আছে, গৃহিণী নিজে আছেন। কাজেই সারাটা দিন ইন্দু করেই বা কি? দেবব্রতকে বলল, "আমি পড়ি না আবার?"

দেবব্রত বলল, "খুব ভাল কথা। মাষ্টার রেখে দেব?"

ইন্দু ব্যস্ত হয়ে বলল, "ওরে বাপরে! এর উপর আবার মাষ্টার? মা তাহলে খেয়েই ফেলবেন। তুমি যা রাত কর, নইলে তুমিই ত পারতে।"

দেবব্রত বলল, "আগে আসতে হলে ত আর টাুশনি চলে না? তাহলে তোমার গহনা হবে কি করে?"

ইন্দু বলল, "দূর ছাই, চাই না আমার গহনা।"

দেবব্রত বলল, "তুমি না হয় না চাও, আমি ত চাই? আচ্ছা, একটু সময় করে নেবার চেষ্টা করছি।"

ছেলে পড়াবার সময়টার একটু অদল-বদল করল বোধ হয়। মোট কথা সন্ধ্যার পর ঘণ্টাখানিক ইন্দিরা স্বামীর কাছে পড়তে লাগল। রাণীর মারফত খবরটা অবিলম্বে পৌঁছে গেল গৃহিণীর কানে।

তাঁর মনটা একেবারে রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত হয়ে উঠল। কর্তার কাছে গিয়ে বিনা ভূমিকায় বলে বসলেন, "বামুন ঠাকরুণকে ভাবছি ছাড়িয়ে দেব। দেনা যা চেপেছে ঘাড়ে, তাতে খরচ কমান একান্ত দরকার।"

কর্তা বললেন, "কি, সবাই গান্ধী মহারাজের মত কাঁচা ফল তরকারি খাবে

নাকি? তোমাকে দিয়ে দু'বেলা হাঁড়ি ঠ্যালানো চলবে বলে ত মনে হচ্ছে না?"

গৃহিণী বললেন, "কেন, বউমা রয়েছে, রাণী রয়েছে। ওদের কি রান্নাবান্না কোনোদিন শিখতে হবে না নাকি?"

কর্তা এমনই গাঁক করে উঠলেন যে, গৃহিণীকে তখনকার মত থেমে যেতে হল। কিন্তু ইন্দিরার উপর তিনি আরো বেশী চটে গেলেন।

দিন গড়িয়ে গেল অনেকগুলো। ইন্দিরার মা তাকে একবার নিয়ে যাবার জন্যে চিঠি লেখালেখি শুরু করলেন। কিন্তু মত আর কারো হয় না। গৃহিণী বেঁকে বসলেন, তাঁর শরীর ভেঙে যাচ্ছে, তিনি আর সংসারের পিছনে খাটতে পারেন না। আসল কথা তাঁর মেয়েরা যখন আসতে পায় না তাঁর কাছে, তখন তাঁর বউই বা কেন বাপেরবাড়ী যাবে?

দেবব্রত বলল, "এই বুঝি? পালাবার চেষ্টা? আমার কষ্টটা কিছু নয় বুঝি তোমার কাছে?"

ইন্দু কাঁদ কাঁদ মুখে বলল, "কি যে বল। তোমার চেয়ে আমারই কষ্ট বেশী হবে। কিন্তু মাকে কি বলব?"

দেবব্রত বলল, "তোমার কংকণ গড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে যেতে দেব না। সবাই আমার নিন্দে করবে, বলবে বউয়ের গহনা বেচে খেয়েছে।"

ইন্দু যে কি বলবে ভেবেই পেল না। মায়ের কাছে যাবার জন্যে মনটা টানে, আর দেবব্রতর সঙ্গে কয়েক দিনও যে ছাড়াছাড়ি হবে এটা ভাবতেই তার কান্না এসে যায়।

হঠাৎ এক খবর এসে পৌঁছল। পুতুল আসছে বাপেরবাড়ী। একেবারে সন্তান হওয়ার পর সেরেসুরে ও শ্বশুরবাড়ী যাবে। তার শরীর ভাল থাকছে না, ডাক্তার বলেছেন কলকাতাতেই থাকা ভাল।

পুতুলের মাকে আর পায় কে? এখন বাড়ীতে কত কাজ বাড়বে। তিনি আসন্নপ্রসবা মেয়েকে দেখবেন না সংসার ঠেলবেন? বউমার যাওয়ার কথা এখন উঠতেই পারে না।

দেবব্রত বলল, "যাক, পুতুলটা একটা উপকার আমার করল, তোমার যাওয়াটা ত আটকাল?"

নকল রাগ দেখিয়ে ইন্দিরা তাকে ঠেলে দিল, বলল, "যাও, তুমি বড় স্বার্থপর।"

পুতুলের আসবার কথা সন্ধ্যার ট্রেনে। তার মা সারাদিন ধরে কত আয়োজনই তার জন্যে করছেন। কোথায় সে শোবে, কি সে খাবে, তার জন্য কোন লেডী-ডাক্তারকে ডাকা হবে। জামাই সঙ্গে আসছে না, দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয় পুতুলকে পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

কর্তা নিজে গেলেন ষ্টেশনে। মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু এতদিন পরে মেয়ে আবার ঘরে আসছে, মনটা তাঁর খুশীতে ভরপুর।

গৃহিণী ঘর আর বার করলেন, রাণীও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। ইন্দিরা মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে রাস্তা দেখছে।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। উল্টো দিক দিয়ে ট্রাম থেকে নেমে দেবব্রতও সদর দরজায় পৌঁছল।

কর্তা নামলেন প্রথমে। তাঁর পিছনে এ কে? এই নাকি পুতুল? হাতে বহরে প্রায় তার মায়েরই সমান, ফরসা রং, লাল হয়ে গেছে চর্বির বাহুল্যে, মুখখানা শুধু পুতুলের বলে এখনও চেনা যায়।

রাণী বলে উঠল, "এ রাম, মেজদিদি, এ কি জঘন্য চেহারা করেছিস?

পুতুল প্রায় কেঁদে ফেলছে দেখে তার মা তেড়ে উঠলেন, "বেশ করেছে, তোর কি লা? ঘরে পা ফেলতে না ফেলতে অমনি পিছনে লেগেছে। সবাই তোদের মত খ্যাংরাকাঠি হবে নাকি?"

ঝিকে মেরে বউকে শিখিয়ে তিনিও পুতুলকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন? কর্তা ও রাণীও তাঁর পিছন পিছন গেলেন।

ইন্দিরা নিজের ঘরে পালিয়ে এল। সে যদিও কিছু বলেনি কিন্তু রোগা ত সেও? সেটাও ত এখন একটা অপরাধ?

দেবব্রত ঘরে ঢুকে বলল, "বাবাঃ, কি চেহারাটাই করেছে! সাত আট মাসে মানুষ এমন বদলে যেতে পারে? ছিল ব্যাঙাচি, একেবারে কোলা ব্যাঙ হয়ে ফিরে এল।"

ইন্দিরা বলল, "আহা কি চমৎকার তুলনা! একেবারে কালিদাস! মা শুনলে দেবেন পিঠে এক কিল।"

দেবব্রত ধীরে সুস্থে কাপড়-চোপড় ছাড়তে লাগল। ইন্দিরা তার জন্যে চা জলখাবার আনতে যাবে, এমন সময় রাণী ছুটে এসে ঢুকল। ইন্দিরাকে বলল, "বউদি, মা তোমায় ডাকছেন একটু।

ইন্দিরা অগত্যা চলল শাশুড়ীর ঘরে। দেবব্রত ঝিকে ডেকে চা আনতে বলল।

ইন্দিরা ঘরে ঢুকে দেখে চারদিকে জিনিসপত্র ছড়ান। পুতুল খাটে বসে নাক মুছছে, তার মা ঘরটা একটু গোছাবার চেষ্টা করছেন এবং কর্তা বসে গম্ভীরভাবে তামাক খাচ্ছেন।

ইন্দিরা ঘরে ঢুকতেই তার শাশুড়ী পুতুলের বাক্স খুলে সেই কংকণ জোড়া বার করে তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বললেন, "নিয়ে যাও গো বউমা, ও আর এখন পুতুলের হাতে গলবে না। তার শাশুড়ী বলেছেন আমরা নাকি ফাঁকি দেবার জন্যে এত ছোট করে গহনা গড়িয়ে দিয়েছি।"

পুতুল বলল, "সব এমন অসভ্য, গুরুলঘু মানে না। তোমার জামাই বললেন, এবার বাবাদের গহনা গড়িয়ে এন, টানলেই বাড়বে। তোমার মাকে ত দেখেছি, তুমিও ঐরকমই হবে।"

ইন্দিরা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার শ্বশুর হুঁকোর নলটা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, "নিয়ে যাও বউমা, আবার কোথায় পড়েটড়ে যাবে। তোমার গহনা ফেরত দেবার ব্যবস্থা আমি করেইছিলাম, এই দেখ", বলে পকেট থেকে পুরনো চামড়ার মনিব্যাগটা বার করলেন। সেটি খুলে দেখালেন নোটে ভর্তি। বললেন, "পুতুল এলেই তোমার কংকণের নমুনাটা নিয়ে, ঠিক ঐ রকম একজোড়া তোমায় গড়িয়ে দিতাম। আজই সন্ধ্যায় স্যাকরাকে বলে রেখেছি আসতে। তা তোমার গহনা ত তুমি পেলেই, পুতুলকেই বড় করে একজোড়া গড়িয়ে দেব।"

গৃহিণীর চোখ দুটো চকচক করে করে উঠল, যেন বেড়ালের মুখের সামনের থেকে কেউ মাছের মুড়ো কেড়ে নিল। বললেন, "রাণীর কথাটাও ত একটু ভাবলে পারতে। সে কি বড় হচ্ছে না ছোট হচ্ছে?"

কর্তা গাঁক করে ওঠাতে তখনকার মত তাঁর গিন্নিকে থেমে যেতেই হল।

'সাম্প্রতিক বাংলা গল্প' প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃতে' পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পে'র যে আলোচনা করেছেন, নানা কারণে তা প্রশংসনীয়। ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত সমালোচক বাংলা ছোটগল্পের প্রায় গত তিন দশকের (অথবা দুই দশক বললো?) যত কিছু সৃষ্টি এবং অনাসৃষ্টি—তার সালতামামী গ্রহণ করেছেন। বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রচিত এই সাহিত্য বিচার অবশ্যই পাঠক সাধারণের বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। চেখভ সম্বন্ধে তাঁর আকস্মিক উক্তিগুলি পশ্চিমী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত পাঠকের পক্ষে সহ্য করা একটু শক্ত।

কিন্তু সব কথা মেনে নেওয়ার পরও, আমাদের জিজ্ঞাসা, বর্তমান প্রবন্ধটি বর্তমান দশকের ছোটগল্পের প্রতি সুবিচার করেছে কি? প্রশংসা আছে ঃ একটু পিঠ চাপড়ানী। সম্ভবতঃ প্রতিবাদ প্রত্যাশা করে প্রবন্ধটি লেখা নয়: কারণ বারংবার সামান্য ধর্ম নির্ণয়ে লেখকের আগ্রহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্রুততা এবং সর্বোপরি প্রবল আত্মবিশ্বাস,—ছোটগল্প রচয়িতাদের জন্য অনেক উপদেশ সঞ্চিত করেছে প্রবন্ধটিতে।

সরোজবাবুর মতই আধুনিক অনেক সমালোচকের মতে, যা কিছু ইউরোপীয়, তার প্রতিচ্ছায়া বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া,—জীবনের লক্ষণ নয়; মৃত্যুরই পূর্বাভাস। একথা শুনতে ভারি চমৎকার যে 'ভারতবর্ষ' মৃত্যুকে চূড়ান্ত বলে মানে না। এবং প্রতি মুহূর্তকেও অলীক বলে গণনা করে না। এই ঐতিহ্য আরও দৃঢ়তা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। এবং ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ এখনো মূলতঃ অব্যবহৃত। এই বোধ-সংকটের ফলেই গল্পের বিষয়-নির্বাচনে যেমন কৃত্রিমতা দেখা দিচ্ছে, প্রকরণেও তার নিশানা হয়ে উঠছে প্রকট।'—অর্থাৎ যা ভারতীয় নয়, যা রাবীন্দ্রিক নয়—তাইই কৃত্রিম, তাইই 'একটা প্রকরণ বা বিদেশাগত ছায়া' মাত্র।

আমরা চেখভ চাই। রবীন্দ্রনাথ চাই। খুব ভালো কথা। কিন্তু অভিজ্ঞতা এবং মনন, প্রকরণ ও প্রকাশ—স্বয়ম্ভু নয়। হয়তো ঐতিহ্যবাহী। কিন্তু সর্বদাই নয়। তাহলে আমরা চেখভকেও পেতুম না, রবীন্দ্রনাথকেও নয়।

আদর্শবাদের অভাবই আধুনিক ছোটগল্পের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো অভিযোগ। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধেও তাই। এত মৃত্যুচিন্তা কেন? নাস্তিক্য-বুদ্ধি এত প্রবল কেন? ঐহিকতার সঙ্গে ধ্বংসচেতনা মিলালো কেন? অবশ্য সামাজিক বিশিষ্টতায় আস্থা থাকলে আদর্শবাদ হারাবে না। রাবীন্দ্রিক ভারতীয়-চেতনায় আস্থা থাকলে আদর্শ-বাদ হারাবে না। দুটি পথ। যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। যেমন নিয়েছিলেন গত দুই দশকের লেখকেরা।

এই দশকের লেখকেরা তা করেননি। তাই তাঁদের লেখা কৃত্রিম। তাই তাঁদের কিছু উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন।

'জীবনের অভিজ্ঞতা'কে আশ্রয় করো। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা মানেই আশাবাদ? জীবনের অভিজ্ঞতা মানেই চেখভের তথাকথিত সরলতা? গত তিন দশকের বিদেশী ছোটগল্পের কথা বারে বারে মনে আসছে। কিন্তু সে কথা তুললেই, স্বদেশীদের কাছে জাতিপ্রেমের অভাবের জন্য নিন্দিত হতে হবে। কিন্তু বিদেশ ও স্বদেশ বিশেষ একটি কাল-মুহূর্তে একই চেতনায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয় না কি? যদি বলি, লেখকের চেতনায় যখন অসত্য নেই, তখন গল্পে দ্বান্দ্বিক বিশিষ্টতা খুঁজে লাভ কি? অথবা দ্বান্দ্বিকবিশিষ্টতা তাহলে আপনা থেকেই আসবে, তার জন্যে হাহুতাশ করবার প্রয়োজন নেই।

'এ এক ধরণের বিদেশিয়ানা'—শুধু একটি গল্প নয়, আধুনিক অধিকাংশ গল্পের বিরুদ্ধেই এই প্রচ্ছন্ন অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করি। মন ও মনন, বোধি ও বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও প্রকরণ মিলে রচিত হয় একটি গল্প। সমাজ-জিজ্ঞাসা থাকে ভালো, না থাকলেও ক্ষতি নেই। আশাবাদ বা আদর্শবাদ থাকে ভালো, না থাকলেও ক্ষতি নেই। বিশেষ একটি ব্যক্তিকেই চাই। তার কাল-জ্ঞান ও কলা-জ্ঞানের পরিচয়।

নমস্কারান্তে

অলোক রায়

॥ পূর্বপক্ষ প্রসঙ্গে ॥

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

১৮ই ফাল্গুন সংখ্যার 'অমৃতে' জৈমিনি ভদ্রতাবোধের অভাবের কথা ঠিকই বলেছেন। তবে "তরুণী স্ত্রী"র (তাঁর চোখে অশোভন) যে ব্যবহার উল্লেখ করে জৈমিনি দোষারোপ করেছেন তার সমর্থন করতে পারি না। জৈমিনি বোধহয় জানেন না ইউরোপ-আমেরিকার সভ্যসমাজে ড্রইং রুমে অতিথি এলে গৃহস্বামী ও উপস্থিত পুরুষরাই উঠে দাঁড়ান, স্ত্রী বা অন্য সমাগতা মহিলারা সোফায় বসে অভিবাদন করেন। এদেশে যাঁরা বিলাতী প্রথা সামাজিক ব্যবহারে কতকটা মেনে চলেন তাঁদের চোখে "তরুণী স্ত্রী"র উঠে না দাঁড়ান অপরাধ নয়। জৈমিনির উল্লিখিত অতিথি যে আধুনিক ড্রইং রুমে এসেছিলেন তার প্রমাণ জৈমিনি ও সম্ভবতঃ আরও পুরুষের উপস্থিতিতে সোফায় উপবিষ্টা গৃহস্বামীর স্ত্রী। কোন সামাজিক রীতি ভাল কি মন্দ সে আলোচনার ধারা অন্য। রীতি মেনে চলায় ব্যঙ্গ ছবি আঁকার সার্থকতা কি বুঝি না। বয়সের প্রতি সম্মান দেখান উচিত; কিন্তু সামাজিক প্রথায় বয়সের তারতম্য সবক্ষেত্রে করা হয় না। বসার ঘর থেকে খাবার ঘরে যাবার সময় বৃদ্ধ পুরুষকে তরুণী মেয়ের পরে যেতে হবে। বৃদ্ধ অতিথি আসায় গৃহস্বামীর স্ত্রী যদি উঠে দাঁড়ান তাহলে উপস্থিত অন্য মহিলাদেরও উঠে দাঁড়াতে একরকম বাধ্য করা হবে। অবশ্য ঘরোয়া ব্যাপারে স্ত্রী একলা থাকলে তিনি অতিথি এলে উঠে দাঁড়ালে আমাদের ভারতীয়দের অনেকের কাছে ভাল লাগবে, তাতে সন্দেহ নেই। নিবেদিকা

শিপ্রা বসু

৩১-৩-৬২ লক্ষ্মী রোড, দিল্লী।

॥ জৈমিনীর বক্তব্য ॥

পত্রলেখিকার বক্তব্য অতি প্রাঞ্জল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমি সর্বাংশে একমত নই। এদেশের আধুনিক ড্রইংরুমে যে 'ইউরোপ-আমেরিকার' সভ্য সমাজের অনুকরণ করা হয়, তাতে আমি অস্বস্তি বোধ করি, 'সভ্যসমাজ' তো ভুঁইফোঁড় কিছু নয়। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব রীতি-নীতির ভিতর থেকে তার উদ্ভব ঘটে। বাইরে থেকে যা আমদানী করা হয় তা যদি কোনো বিশেষ দেশের ধ্যানধারণার

সঙ্গে খাপ খেয়ে না যায় তাহলে চিরকালই সে সব ধরণধারণ উদ্বাস্তু হ'য়ে থাকে। ইউরোপ-আমেরিকার অনেক ভালো গুণ আমরা আত্মসাৎ করেছি, আরো করব তাতে লজ্জা নেই। কিন্তু যা-কিছুই তারা করে তাই আমাদের নির্বিচারে অনুকরণ করে যেতে হবে তা আমি মানতে রাজি নই। অতএব বাড়িতে বৃদ্ধ অতিথি এলেও অন্য মেয়েদের উঠতে হবে বলে তরুণী নারী বসে থাকবেন, পত্রলেখিকার এ ব্যবস্থাপত্র আমি ব্যবহার-যোগ্য মনে করিনে।

বিনীত—
'জৈমিনি'

হাঁসুলীবাঁকের উপকথার চিত্ররূপ প্রসঙ্গে

'অমৃত' পত্রিকার ৫০শ সংখ্যায় ২০শে এপ্রিল প্রকাশিত হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শীর্ষক চিত্রের সমালোচনা পড়লাম। সমালোচকের রচনাটি পড়ে মনে হ'ল, তিনি যেন বেশ কিছুটা অন্ধভাবে প্রশংসা করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম সৃষ্টির চিত্ররূপায়ণের প্রচেষ্টার জন্য পরিচালক শ্রীতপন সিংহ নিশ্চয়ই প্রশংসার পাত্র। কিন্তু চিত্ররূপ দেখে মনে হ'ল, পরিচালক যে বিরাট কাজে হাত দিয়েছিলেন, তার শেষরক্ষা করতে পারেননি এবং যে কাহার-জীবন উপন্যাসের উপজীব্য ছিল, সে কাহার-জীবনের যথার্থ রূপও ওর মাধ্যমে পাওয়া গেল না।

প্রসঙ্গতঃ, কাহিনীগত ঐক্য এমনভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে যে চিত্ররূপটি দেখলে কতকগুলি চিত্রের সংযোজন মাত্র বলে বলে মনে হয়। একমাত্র বনোয়ারী-করালীর দ্বন্দ্ব ছাড়া, কাহিনীর ঐক্য-স্থাপনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি কিছুই উপস্থিত নেই। বনোয়ারীর স্ত্রী গোপালীবালার অনুপস্থিতির ফলে মনে হয় বনোয়ারী যেন সংসারবন্ধনহীন একজন। কাজেই পরকীয়া প্রেমের ক্ষেত্রে তার মনে যে কোন দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, তাই তো মনে হয় না। পাখীর মা অনুপস্থিত। এবং তার ফলে পাখীর ব্যক্তিত্বের উৎসও অনেক ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাছাড়া সুচাঁদ যে বাবুদের সাথে 'রঙে'র খেলার কথা বলেছে পাখীর মা তার সাক্ষ্য। মোটের উপর, পাখী চরিত্রকে করালীর ভালবাসার ক্রীড়নকমাত্র করা হয়েছে। যার ফলে, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত নসুবালার কথাও উল্লেখযোগ্য। নসুবালাকে নারী করা হয়েছে। যার জন্য তার মধ্যেও অন্ততঃ দুইবার 'মনের মানুষ' খোঁজার চেষ্টা চিত্রে লক্ষ্য করা যায়। একে দিয়ে পরিচালকের একমাত্র গান গাওয়ানোর সুযোগ ছাড়া, আর বিশেষ সার্থকতা কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না।

প্রসঙ্গত, পরিচালককে জিজ্ঞাসা ক'রতে ইচ্ছা হয়, বাউড়িদের বিয়েতে বরের পিছনে গান গাইতে গাইতে মেয়েদের যেতে তিনি কোথায় দেখেছেন? তাছাড়া, রাত্রিতে গানের আসরে ঐভাবে পুরুষ-পরিবৃত হয়ে বাউড়ি মেয়েরা গান করে এ দৃশ্যও প্রকৃত বাউড়ি জীবনে ঘটে বলে জানি না। পরিচালক স্বয়ং বীরভূমের মানুষ। এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকা উচিত ছিল। একটি বিশেষ সমাজকে চিত্ররূপ দেবার সময়ে অন্ততঃ সেই সমাজের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি ক্ষুণ্ণ না করাই উচিত। উপন্যাসকার এটা জানেন। তাই তিনি নসুবালাকে অন্য রূপ দিয়েছেন। এখানে পরিষ্কারভাবে সামাজিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তারপর সর্বাপেক্ষা যে জিনিসটা দৃষ্টিকটু ঠেকে তা হ'ল, চরিত্রগুলির মৌখিক ভাষা। বীরভূমের ভাষার বৈশিষ্ট্য আদৌ রক্ষিত হয়নি। এক দুইবার 'হয়েন গেল' ব'ললেই কী আর আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যায়?

মূলত, বিভিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ক'লকাতার মৌখিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। এটা চিত্ররূপের আরেকটি বিরাট ত্রুটি। এর ফলে, বাউড়ি-জীবনের বৈশিষ্ট্য অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। চিত্র-পরিচালক এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন বলে মনে হ'ল। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের হাবভাবও বাউড়ি সমাজসুলভ অনেক ক্ষেত্রেই নয়। পুরস্কার আনার জন্য করালীকে যখন বনোয়ারী সনাক্ত ক'রতে থানায় নিয়ে গেল, তখন নসুবালা হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছে। বাউড়ি জীবনের আনন্দ প্রকাশ ঠিক ঐ ধরনের পরিমার্জিত পদ্ধতিতে হয় না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়ের সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে বলা যায় প্রকৃতির নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে দিনরাত লড়াই করে যারা জীবনের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখছে তাদের সর্বাঙ্গীণ বলিষ্ঠতা অনেকক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ থাকেনি। 'পাগল' চরিত্রও যেন অনেকটা Sophisticated। বাউড়ি-জীবন থেকে উদ্ভূত গায়ক এতটা পরিমার্জিত হতে পারেনি আজও।

এক কথায় বলা যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের চিত্ররূপ দেবার গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে নিয়ে পরিচালক সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেননি। এ ব্যাপারে তাঁর মতো খ্যাতিমান পরিচালকের পক্ষে আরো বেশি সচেতন হওয়া উচিত ছিল। তাহলে নিঃসন্দেহে বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র চিত্ররূপ একখানি স্মরণীয় সংযোজন বলে গণ্য হ'তে পারত। পরিচালক সে কাজে ব্যর্থ হয়েছেন।

আপনাদের সমালোচনায় এই দিকটি উল্লিখিত হওয়ার দরকার ছিল। নমস্কারান্তে।

অরুণ চৌধুরী,
নগরী, বীরভূম।

রঙ্গমঞ্চে যাত্রাভিনয়

অমরনাথ পাঠক

বনের পাখীকে সোনার খাঁচায় আটকে রাখলেও তার গলা দিয়ে যে-গান বার হয় তাতে সবুজ বা আকাশের নীলিমার কোন স্পর্শই থাকে না। সে-গান আর্ত-স্বরেরই নামান্তর। প্রত্যেক শিল্পেরই তেমনি নিজস্ব ক্ষেত্র আছে—আছে তার আপন পরিবেশ, সেই পরিবেশ থেকে যখন তাকে স্থানচ্যুত করা হয় তখন তার অবস্থাও হয় ঐ খাঁচার পাখীর মত। তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততার মহিমা থাকে না।

যাত্রাভিনয় ও মঞ্চাভিনয় এ দুয়ের ক্ষেত্র পৃথক—উভয় শ্রেণীর অভিনয়েরও আঙ্গিকে মূলগত ও গুণগত পার্থক্য আছে। এমনকি যাত্রার পালা ও নাটক এ দুয়ের রচনাতেও যথেষ্ট পার্থক্য। সেই কারণে থিয়েটারের নাটক যাত্রার আসরে অভিনীত হ'তে পারে না। যাত্রার পালার বেলাতেও ঠিক সেই কথা। যেমন, যাত্রায় কোনো চরিত্রের মৃত্যু হলে তাকে আসর থেকে সরিয়ে ফেলার বিভিন্ন নিয়ম আছে। কোথাও বা দেখা যায় বিজেতা নিজেই নিহত ব্যক্তির শবদেহ তুলে নিয়ে যান, কোথাও বা তাঁর অনুচরেরা ধরাধরি করে নিয়ে যায়, আবার আজকালকার আধুনিকতম পালায় আহত চরিত্র নিজেই 'অতিকষ্টে প্রস্থান' করে—অর্থাৎ তার মৃত্যু হয় নেপথ্যে। থিয়েটারে, বলাই বাহুল্য, এ সবের বালাই নেই। পটক্ষেপ হলেই ঝামেলা মিটে গেল। তাছাড়া নাট-কীয় দ্বন্দ্ব বলতে আমরা যা বুঝি, তার প্রভাব নাটকে যত বেশী, যাত্রাপালায় অতটা নয়। যাত্রার চরিত্র যে আদৌ নির্দ্বান্দ্বিক হবে এমন কথা নয়—কিন্তু ওর সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দেবার জন্য আছে "বিবেক"। এই বিবেক-চরিত্র যাত্রায় যেমন অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করে—নাটকে তেমন নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে নাটকে কোনো বিবেক-চরিত্রই নেই। গিরিশচন্দ্রের দু'একখানা নাটকে যাও বা দু'একটা আছে, তারা ঠিক যাত্রার বিবেক নয়, তবে অনেকটা বিবেক জাতীয়। এবং এসব চরিত্র গিরিশচন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন যাত্রার প্রভাবে পড়েই একথা অনস্বী-কার্য। গিরিশচন্দ্রের নাটকে এদেশী যাত্রা ও ও-দেশী থিয়েটারের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে একথা বলাই বাহুল্য। যাই হোক যাত্রার চরিত্রগুলো সাধারণত সহজ ও সরল হয়েই থাকে—এবং তাদের দ্বন্দ্বও অনেকটা সরল পথাশ্রয়ী। একটু-আধটু উত্থান-পতন থাকে এই মাত্র। সে তুলনায় নাটকের দ্বন্দ্ব অনেক উচ্চ শ্রেণীর এবং সেই কারণে সে-সব চরিত্র অভিনয় করার সময়ও অভিনেতাকে অনেকটা জীবনানুগ বা বাস্তবানুগ হ'তে হয়। এ ছাড়া, উভয় শ্রেণীর নাটকে অঙ্ক বা দৃশ্য সংস্থাপনের বেলাতেও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নাট্যকারকে যেমন প্রত্যেকটি দৃশ্যের দৈর্ঘ্যের দিকে নজর রাখতে হয় এবং অঙ্কবিভাগের বেলায় প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, যাত্রাকারকে ঠিক অতটা বিধি-নিষেধের মধ্যে দিয়ে চলতে হয় না—সেদিক থেকে তাঁর স্বাধীনতা নাট্যকারের স্বাধীনতার চেয়ে বেশী। যাত্রাকার তাঁর দৃশ্যের দৈর্ঘ্য ইচ্ছামত রাখতে পারেন—কেননা, যেহেতু যাত্রার দৃশ্য-পরিবর্তনের বালাই নেই, এবং চরিত্রের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্যারম্ভ হয়, সেই কারণে কোনো দৃশ্যের স্থায়িত্ব পাঁচ মিনিট হতে পারে, আবার কোনো দৃশ্যের স্থায়িত্ব আধ ঘণ্টাও হ'তে পারে। তাছাড়া যাত্রায় এক দৃশ্য থেকে আর এক দৃশ্যের পরিবর্তনও অনেক সময় বোঝা যায় না—কেননা এক দৃশ্য শেষের অভিনেতা সাজঘরে পৌঁছা-বার আগেই পরবর্তী দৃশ্যের অভিনেতা তাঁর পাশ দিয়েই আসরে প্রবেশ করেন। তবে যাত্রায় বিভিন্ন দলীয় চরিত্র এমন-ভাবে সৃষ্ট হয় যে, তার থেকে বোঝা যায় নতুন দৃশ্য আরম্ভ হয়েছে। নাট্যকারকে কিন্তু অপেক্ষা করতে হ'বে এক দৃশ্যের 'পটক্ষেপ' থেকে পরবর্তী 'পটোত্তোলন' পর্যন্ত। সেই কারণে নাটকে দৃশ্যের স্থায়িত্ব খুব কম হলে চলবে না, তাতে বারবার অল্পসময়ের ব্যবধানে পটক্ষেপ হলে তা' রসগ্রহণের পরিপন্থী হবে—এমনকি ঘূর্ণায়মান মঞ্চ সম্বন্ধেও একথা অনেকটা সত্য।

যাত্রার অভিনয়ও নাটকের অভিনয় থেকে বহুলাংশে পৃথক। কিন্তু উভয় শ্রেণীর অভিনয় কেন পৃথক সে কথা আলোচনা করার আগে যাত্রার ও নাটকের পরিবেশ আলোচনা করা প্রয়োজন।

'যাত্রার আসর' বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে যে ছবিটি—তার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় শিশুকাল থেকে। আমার তো মনে হয় আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই সিনেমা-থিয়েটার দেখার আগেই যাত্রার আসরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। আজকের শহরের ছেলে-মেয়েদের আমার গণনা থেকে আমি বাদ দিচ্ছি—কেননা এ'রা যাত্রা অথবা থিয়েটার এ দুটোর চেয়ে সিনেমাকেই প্রাধান্য দেন বেশী করে।

পূজার আঙ্গিনায় অথবা কোনো মেলায় কি বারোয়ারী মণ্ডপে যাত্রার আসর বসেছে। আসরের মাথায় জ্বলছে গোটাকতক হ্যাসাগ্ বা ডে-লাইট। তারই চারদিক ঘিরে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে দর্শক। দর্শক আর আসরের সীমারেখা নির্ণীত হয়েছে 'বাইন'দের দিয়ে। আসরের একদিকে দুখানা চেয়ার পাতা—সেই চেয়ার দু'খানা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব সময়েই আসরে থাকবে। সেই চেয়ার রাজসিংহাসন হবে আবার প্রয়োজন হ'লে বটগাছের বাঁধান বেদীও হবে, দৃশ্যের প্রয়োজনে যেমন দরকার। আসরের ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরে সাজঘর। সাজঘর থেকে আসরে আসার পথ দর্শকরাই ছেড়ে দিয়ে বসেছে। পেটা ঘড়িতে ঢং করে আওয়াজ হ'ল—শুরু হ'ল ঐকতান বাদন বা পূর্ব বাংলায় যাকে বলে 'ধুম্বল'। আগের দিনে আখড়াই ছাপ্-আখড়াই পদ্ধতিতে তিনপ্রস্থ ধুম্বল হ'ত—আজকাল আর তা' হয় না হয় কেবল একপ্রস্থ। এই তিনপ্রস্থ ধুম্বলের দরকারও আগে ছিল—ধুম্বল শুনে তখনকার শ্রোতা যাত্রা আরম্ভ হ'তে কত দেরী তা বুঝে নিত—সেইমত ঘরের কাজকর্ম সারার ব্যাপারে বাড়ীর মেয়েরা ত্বরান্বিত হ'ত।

যাই হোক, কনসার্ট শেষ হয়ে গেলে সখীর নাচ। সখীর নাচ হয়ে গেলে আসর-বন্দনা ও মহড়া গান। এ সবই প্রাচীন পদ্ধতি—এখন দু'একটি অপেশাদার দল

ছাড়া আর কোনো দলে আমি বন্দনা বা মহড়া গান শুনিনি। পেশাদার দলের পক্ষে বাইরে গাইতে গিয়ে অত সময় দেওয়াও সম্ভব হয় না—এক আসর সেরে দশ ক্রোশ দূরে সেই রাতেই আবার হয়তো সে দলকে আর এক খেপ গাইতে হ'বে। এক রাতে অনেক সময় তিন আসরেও গাইতে হয়—কালীপুজোর রাতে পুরোহিত ঠাকুরের এক রাতে তিনখানা পুজো সারার মত আর কি! সে কারণে বৃথা 'কালক্ষেপ সম্ভবে না'। অপেশাদার দলের পক্ষে এটা সম্ভব হয়—যেমন শিশির ইনস্টিটিউট্ বা দর্জিপাড়া নাট্য-পরিষদ কিংবা হাওড়ার নিমাই মঠের পালায়—আসর বন্দনা, গৌরচন্দ্রিকা, মহড়া গান এ সবই বজায় আছে। এ'রা এগুলিকে পালার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ধরে নিয়েছেন। আজকাল পেশাদার দল এ সবের বদলে পালা শুরু হবার আগে উড়িয়া নৃত্য বা কোনো নর্তকীর একক নৃত্য অথবা রাধাকৃষ্ণের যমুনা মিলন কিংবা মহিষাসুর বধ এই রকম সব নৃত্যের ব্যবস্থা রাখেন। এ-সব নাচ দশ-পনেরো মিনিটেই শেষ হয়, তারপর আরম্ভ হয় আসল পালা।

নাচ শেষ হয়ে গেলে পালা আরম্ভ হ'ল। প্রথম থেকেই একেবারে উচ্চগ্রামে গলা চড়িয়ে সংলাপ বলতে বলতে প্রবেশ করলেন—ধরুন, 'ভিক্ষুক বেশে রাজা দীর্ঘমুখ'—

> "একে একে কেটে গেল কত বর্ষ মাস
> ডুবে গেল কালচক্র অতীতের কোলে!
> আজি সেই দিনে—
> আমার সাম্রাজ্য-মাঝে উপনীত আমি,
> ভায়ার তাড়নে মোহ আকর্ষণে
> শনপথে ক্ষুদ্র এক তস্করের প্রায়!"
> (চন্দ্রহাস : ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ)

মনে রাখতে হবে অভিনেতা যখন এই দৃশ্য অভিনয় করছেন তখন কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরের দ্বারাই তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে তাঁর মানসিক অবস্থা, তাঁর পরিবেশ, এমনকি এর আগে যে ঘটনা ঘটে গেছে তারও আভাস দিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁকে। তাঁর চারপাশে অগণিত দর্শককে শোনাতে হচ্ছে তার জীবনের ব্যর্থতা—তাঁকে বোঝাতে হচ্ছে সময় রাত্রি এবং স্থান অরণ্যভূমি। সংলাপের প্রতি ছত্রের উচ্চাবচ ধ্বনি-মাধুর্যে দর্শককে তাঁর সমব্যথী করে তুলতে হ'চ্ছে—কেননা, আলোকসম্পাত, দৃশ্যপট এসব কিছুরই বালাই যাত্রায় নেই। এর উপর তাঁরো দর্শককে এমন তন্ডাবভাবিত করে রেখে যেতে হবে যে, যাতে তারপর যখন দীর্ঘমুখের বিপরীতে খল-চরিত্র রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি প্রবেশ করে তখন দর্শক আপনা হতেই তার প্রতি বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং রাজা দীর্ঘমুখের চরিত্রাভিনেতা শুধু নিজের সংলাপ বলেই কার্যসিদ্ধি করতে পারছেন না, পরবর্তী দৃশ্যের অঙ্কুর স্থাপন করে যেতে হচ্ছে তাঁকে। আর এ সবই করতে হচ্ছে কেবলমাত্র তাঁর কণ্ঠস্বরের সাহায্যে—অন্য কোনো যান্ত্রিক সাহায্য তিনি পাচ্ছেন না। এমনি করে কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরকে মূলধন করেই তিনি তাঁর চারপাশের পাঁচ-দশ হাজার শ্রোতাকে প্রতি মুহূর্তে এক রস থেকে অন্য রসে, এক ভাব থেকে অন্য ভাবে নিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচ-দশ হাজার তো অতি সাধারণ আসর—আমি মহিষাদলের রথের মেলায় দেখেছি দর্শকসংখ্যা কমপক্ষে পনেরো হাজার—আর সেখানেও অমন প্রচণ্ড ভিড়ে প্রতিটি দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছে অভিনেতার প্রতিটি কথা, বিবেকের গানে তারা একসঙ্গে হায় হায় করে উঠেছে, আবার হর্ষধ্বনিও করেছে—অর্থাৎ স্থান-কাল ভুলে গিয়ে তারা একেবারে অভিনীত পরিবেশে চলে গিয়েছে।

সেই তুলনায় থিয়েটারের পরিবেশ তৈরী করার অনেক যান্ত্রিক সুবিধা আছে। দৃশ্যপট আছে—সময়োপযোগী আলোকসম্পাত আছে—প্রয়োজন হ'লে বাকযন্ত্রের সাহায্যে অথবা টেপ রেকর্ডের সাহায্যে অভিনেতার পরিবেশ অথবা মানসিক অবস্থা পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তোলা যাচ্ছে। এখানে অভিনেতার সবচেয়ে সুবিধা তাঁর গন্ডীবদ্ধ প্রেক্ষাগৃহ। তাঁর জানা আছে শেষ সারির দর্শক তাঁর কাছ থেকে কতদূরে—সুতরাং কণ্ঠস্বরকে একটা দাগ-দেওয়া সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেই হ'ল। তাছাড়া বাইরের গোলমাল—বাতাসের গতি, এর কোনোটাই তাঁকে অব্যবস্থিত করতে পারছে না। তাই অভিনয়ের সামান্য সামান্য বিচ্যুতি অনেক সময় পরিবেশের সাহায্যে ভরাট হবার সুবিধা থিয়েটারে আছে। যাত্রার অভিনেতাকে সেদিক থেকে সম্পূর্ণই অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করতে হয়। কোন আসরে দর্শক কত হ'বে—মাঠের কোন দিক থেকে বাতাস কোন দিকে বইবে, দর্শকের মর্জি কোন সুরে বাধা, আগে থেকে এসব তাঁর কিছুই জানা নেই—সুতরাং তাঁকে সর্বত্রই 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা' করতে হয়। মোটকথা থিয়েটারের যেমন সবটাই বাঁধাধরার মধ্যে, যাত্রার তা নয়—তার সবটাই ছাড়াছাড়ির মধ্যে। এবং যিনি যতটা তাঁর কণ্ঠস্বরকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারবেন, তিনিই যাত্রায় তত বড় অভিনেতা।

অবস্থা যদি এই রকমটাই হয়, তাহলে বলতে হ'বে যে যাত্রার অভিনেতারা যদি মঞ্চে অভিনয় করেন, তাহলে তো মঞ্চাভিনেতাদের 'ভাতে হাত' পড়ে যাবে! ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। মঞ্চের যেগুলো সুবিধা, যাত্রাভিনেতার কাছে সেইগুলোই মহা অসুবিধা। আর সেই কারণেই ও দুটো জগৎ আলাদা। থিয়েটারের অভিনেতা যেমন যাত্রায় গিয়ে অসুবিধায় পড়েন—যাত্রাভিনেতাও স্টেজে তেমনি অসুবিধার সম্মুখীন হ'ন। যাত্রার আসর বসে মুক্ত অঙ্গনে—খোলামেলা তার পরিবেশ। দর্শকদের একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাত্রাভিনেতাকে অভিনয় করতে হয়—সেই জন্য তাঁর অভিনয় চারমুখো:—চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাঁকে অভিনয় করতে হয়। আর সেই কারণেই কোনো বিশেষ কম্পোজিসন থাকে না। রামচন্দ্র যখন উত্তর দিকে মুখ করে লক্ষ্মণকে সীতা উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করছেন—লক্ষ্মণ তখন দক্ষিণ দিকে মুখ করে রামচন্দ্রের কথার জবাব দিচ্ছেন। তারপর রামচন্দ্র আবার যখন লক্ষ্মণের দিকে ফিরে কথা বললেন—লক্ষ্মণ হয়তো তখন তাঁর বিপরীত দিকে মুখ করেই জবাব দিলেন। রাবণ যখন বিভীষণকে ভর্ৎসনা করছেন, বিভীষণ তখন হয়তো রাবণের কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে একেবারে রাবণের উল্টোদিকে মুখ করে ভর্ৎসনার প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশ করছেন। বিভীষণের দিকের দর্শক রাবণের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু অভিব্যক্তি লক্ষ্য করছে বিভীষণের। থিয়েটারের দর্শক কিন্তু একই সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের বা রাবণ-বিভীষণের কথা ও অভিব্যক্তি একই সঙ্গে উপভোগ করছেন। সেই কারণে, যাত্রার অভিনেতাকে সব সময় ঘুরে ঘুরে অভিনয় করার ফলে তাঁর অভ্যাস এমন হয় যে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একমুখো অভিনয় করতে তাঁর অসুবিধা হয়। থিয়েটারের অভিনেতাকে যে কারণে যাত্রার আসরে 'ঘুরে বলুন ভাই' শুনতে হয়—ঠিক তার বিপরীত কারণে যাত্রার অভিনেতাকে স্টেজে ঐ একই মন্তব্য শুনতে হয়। তাই বলেছি—ও দুয়েরই জগৎ আলাদা।

যাত্রায় কোনো অভিনেতা আসরে উপস্থিত হয়ে তারপর কথা বলেন না।

তাঁকে কথা বলতে বলতে আসতে হয়—যেতেও হয়। একটি চরিত্র কথা বলতে বলতে সাজঘরে পৌঁছবার আগেই পরবর্তী চরিত্র সেখান থেকে কথা বলতে বলতে প্রবেশ করেন। সেই কারণে যাত্রার অভিনয় পরিচ্ছেদ-শূন্য। স্টেজে এইটাই তাঁদের পক্ষে মস্ত অসুবিধা। এক হাত দূরেই তো উইং। সুতরাং ঐ যে গতি-বেগ তা স্টেজের ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে অন্তরায়। সবচেয়ে বেশী অসুবিধায় পড়েন বিবেক। সাজঘরের কাছে বিবেকের গলা শোনা যেতেই আসরের চরিত্র তাঁর অভিব্যক্তি বদলাচ্ছেন—কিন্তু স্টেজে বিবেক একেবারে হুট্ করে ঘাড়ে এসে পড়ায় ঐ রসটা ব্যাহত হয়। তাই প্রবেশ ও প্রস্থানের মুখে—বিশেষ করে প্রস্থানের মুখে—যাত্রার প্রায় অধিকাংশ চরিত্রই যে বিশেষ একটা প্যাঁচ মারার সুযোগ পান—স্টেজে সেটা ওঠে না। তাই অভিনয়ও কেমন যেন জমে ওঠে না।

আমি যেসব কথা এতক্ষণ বললাম তার কোনোটাই আমার অমূলক বা কল্পনা নয়—প্রতিটি কথা তথ্যাভিত্তিক। কলকাতার মঞ্চে অনেকগুলি যাত্রা আমার দেখা আছে। গিরিশ নাট্য-উৎসবে এ বছর যতগুলি যাত্রা বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনীত হয়েছে—তার মধ্যে মাত্র দুটি বাদে বাকী সব অভিনয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। কলকাতার কিছু কিছু পেশাদারী দলও নিজেদের ক্ষমতায় বিশ্বরূপায় কতকগুলি অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া, মহাজাতি সদনের মঞ্চে, বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনের স্টেজে, হাওড়া টাউন হলে যখনই কোনো যাত্রা অভিনয় হয়েছে আমি তা দেখেছি। তেমনি আবার কলকাতা, হাওড়ার অধিকাংশ পেশাদারী অপেশাদারী দলের সঙ্গে ঘুরে, কলকাতার বাইরেও প্রকৃত যাত্রার আসরে যাত্রাভিনয় আমি দেখেছি। এই তো গত পনের দিন ধরে কলকাতার থিয়েটার পাড়ায় শোভাবাজার রাজবাড়ীতে বঙ্গীয় নাট্য-সংগঠনের প্রযোজনায় যে যাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল—তার প্রত্যেকটি অভিনয় আমি দেখেছি। এতে আমার একটা লাভ এই হয়েছে যে, একই পালা আমি মঞ্চেও দেখেছি আবার প্রকৃত যাত্রার আসরেও দেখেছি। এবং এর থেকেই আমি উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কলকাতার বিখ্যাত পেশাদার দল 'নবরঞ্জন অপেরার' চণ্ডিমঙ্গল পালা আমি ও কয়েকজন অভারতীয় গবেষক ছাত্র কলকাতা থেকে মাইল চল্লিশ দূরের এক গণ্ডগ্রামে দেখতে গিয়েছিলাম। সে অভিনয় দেখে ম্যানিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ভদ্রমহিলা বলেছিলেন—

This is the best form of folk entertainment that can be ever produced—more so, when the audience and the actors feel the heart throb of each other. আর ঠিক সেই ভদ্রমহিলাই বঙ্গ-সংস্কৃতির মঞ্চে আর একটি যাত্রাভিনয় দেখে বলেছিলেন—the very flavour of jatra is absent—it is very much incipid. অথচ বঙ্গ-সংস্কৃতি মণ্ডপে সেদিন তিল-ধরণের ঠাঁই ছিল না—পালাও ছিল বিখ্যাত দলের এক সুখ্যাত ভক্তিমূলক যাত্রা। এর কিছুদিন পরেই বিশ্বরূপা মঞ্চে আমি আবার চণ্ডিমঙ্গল দেখার সুযোগ পাই। প্রত্যেকটি দৃশ্যে মনে হচ্ছিল যেন কোথায় গতি ব্যাহত হচ্ছে, যদিও এঁরা সর্বাংশে যাত্রার মেজাজ বজায় রাখারই চেষ্টা করছিলেন আপ্রাণ। বারে বারেই সেদিন মনে হচ্ছিল, এ যেন বনের পাখীকে সোনার খাঁচায় পুরে গান শোনা হচ্ছে। সেই দিনই অভিনয়ের শেষে ওঁদের দলের নাট্য-পরিচালক ও প্রখ্যাত অভিনেতা পঞ্চু সেনকে কথাটা বললাম। উনি যা বললেন তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে,—আমরা, দর্শকেরা যেমন অভিনেতার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি—ওঁরা, অভিনেতারাও, তেমনি দর্শকের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেন এবং তার থেকে বুঝতে পারেন নিজের অভিনয় কি পর্যায়ে উঠছে। প্রয়োজনবোধে সেটাকে বাড়ান অথবা কমান। স্টেজের অসুবিধা এই যে, সেখানে দর্শকের মুখে অভিনয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না—সুতরাং বুঝতে কষ্ট হয় যে, অভিনয় কোথায় উঠেছে। এটা খুবই সংগত কারণ, কেননা থিয়েটারের অভিনেতার মত ওঁদের অভিনয় ছকবাঁধা নয়। দর্শকের সংখ্যা, মেজাজ ইত্যাদি বুঝে অভিনয়ের মাত্রা চড়াতে বা কমাতে হয়—স্টেজের অভিনয়ে সেটা আদৌ বোঝা যায় না। তাছাড়া, তাঁর মূল বক্তব্য হ'ল এই যে, দর্শককে কাছে না পেলে—তাঁদের মাঝে দাঁড়িয়ে অভিনয় না করলে মনে হয় যেন দর্শক অনাত্মীয়। দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার এই যে আত্মীয়তার সম্বন্ধ—যাত্রাগানের সেইটাই মূল কথা। দর্শককে এঁরা নিজেদের কাছ থেকে দূরে রাখার কথা ভাবতেও পারেন না। এই কথাটাই নট্ট কোম্পানীর অচিন মৈত্র একটু কাব্য করে বললেন—"দর্শকের মাঝে মোরা বাঁচি আর মরি"। 'মাঝে' কথাটায় জোর দিলেন। যাত্রা আর থিয়েটারের পরিবেশের পার্থক্যটা তাই যেন সাধারণ মধ্যবিত্তের বাড়ীতে পাতা পেতে নিমন্ত্রণ খাওয়া আর বড়লোকের বাড়ীতে টেবিল-চেয়ারে বসে ছুরিভোজ খাওয়ার পার্থক্য। উভয় ক্ষেত্রের নিমন্ত্রিত আর নিমন্ত্রকের সম্বন্ধটাই এখানে প্রযোজ্য।

যাত্রার প্রকৃত পরিবেশে যে-সব যাত্রা আমি দেখেছি তার সম্বন্ধে আলোচনা করার স্থান এ নয়। শোভাবাজার রাজবাড়ীর যাত্রা-উৎসব সম্বন্ধেও এই পত্রিকায় পশুপতি চট্টোপাধ্যায় মশাই আলোচনা করেছেন—আমিও করেছি অন্যত্র। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে যাত্রাভিনয় দেখতে দেখতে একটা কথাই আমার মনে হয়েছে যে, স্বাধীন শিল্পকে যেমন বন্দী করে তাকে উপভোগ করা হচ্ছে—তেমনি আবার কিছু কিছু যাত্রার দলও স্টেজের যান্ত্রিক কুহকে পড়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েছেন। কিছু কিছু দল স্টেজের আলোক-সম্পাতের অপব্যবহার করেছেন—যত্র-তত্র যেমন-তেমন রঙের আলোর ব্যবহার করে দর্শকের হাস্যোদ্রেক করেছেন। কোন একটি দল বিশ্বরূপা মঞ্চে দু দিকের উইংসের এমন অপব্যবহার করলেন যাতে মনে হল যে গোটা পালাটাই একটা প্রহসন। যাত্রাতেও দুটো প্রবেশ-পথ রাখা চলতে পারে—অহীন্দ্র চৌধুরী মশাই এককালে তার প্রমাণও দিয়েছেন ভবানীপুরের যাত্রার আসরে। কিন্তু প্রবেশ-প্রস্থানের ভিতর-বাহিরের পার্থক্য তাতেও বজায় রাখতে হয়—তা না হলে যেখান-সেখান দিয়ে যখন-তখন প্রবেশ-প্রস্থান (যেমন এই দলটি করেছেন) দর্শকের বিরক্তির উদ্রেক করে। সেই জন্যেই বলেছি—থিয়েটারের নিয়ম যাত্রায় চলে না এবং স্টেজকে ব্যবহার করতে হ'লে তার নিয়ম জানা চাই।

আসরের যাত্রায় যেমন দর্শকসমাগম হয় প্রচুর পরিমাণে তেমনি স্টেজের যাত্রাতেও দেখা গেছে দর্শকসংখ্যা নেহাৎ অপ্রতুল নয়। সত্যম্বর অপেরার 'সোনাই দীঘি', নবরঞ্জন অপেরার 'চণ্ডিমঙ্গল', নিউ রয়্যাল বীণাপাণির 'ভাগ্যের বলি' অথবা অপেশাদার দল হাওড়া সমাজের 'নসীরাম' প্রভৃতি পালায় বিশ্বরূপায় 'হাউস ফুল' গেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে কলকাতাতেও কিছু কম যাত্রামোদী নেই। কিন্তু যেহেতু স্টেজের যাত্রাভিনয়ের মান আসরের যাত্রাভিনয়ের মত উন্নত নয় এবং যেহেতু কলকাতার লোকও যে প্রকৃত যাত্রার আসরে যাত্রা দেখতে পেলে আরও খুশী হবেন (শোভাবাজারে যাত্রাভিনয় উৎসব তার প্রমাণ) সেহেতু কলকাতায় মুক্ত-অঙ্গন যাত্রার আসর বা theatre in the round তৈরী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যতদিন তা না হয়, ততদিন হয়তো রঙ্গমঞ্চেই কলকাতার লোককে যাত্রা দেখতে হবে, কিন্তু সেটা হবে যাত্রাগানের অপমৃত্যু।

টুইস্ট একটি নতুন নাচ

কণাদ চৌধুরী

গানের যদি গুঁতো হতে পারে (সুকুমার রায় স্মরতব্য) তবে নাচের খোঁচাই বা হবে না কেন ? বিশেষ করে নাচটিতে যদি মার্কিণী "টুইস্ট" থাকে ? টুইস্ট নাচের বাংলা অনুবাদ "মোচড় নাচ" হবে কিনা বলা শক্ত, কারণ পাক না দিলে মোচড় হয় না। টুইস্ট নৃত্যে রক এণ্ড রোলের পাকামি নেই, কাজেই পাক-প্রণালী না জানলেও টুইস্ট নাচের আসরে নামা চলে। এই নতুন নাচটির খোঁচায় আমেরিকার তাবদ যৌবন আজকে আহত। আমেরিকায় নাচের ক্রমশঃই সরলীকরণ হচ্ছে। 'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা' প্রবাদটিকে প্রায় উচ্ছন্নে পাঠাবার প্রচেষ্টা সুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের তরুণেরা। নাচের জগত থেকে উঠোনকে প্রায় নির্বাসন দেয়া হয়েছে বলতে গেলে। 'টুইস্ট' যে-কোনো একটা জায়গাতেই দাঁড়িয়ে (ছবি দ্রষ্টব্য) নাচা যায়। কারণ 'টুইস্ট'এর তাল কটি-নিবন্ধ। তীব্র বেগে বাঁদিক থেকে ডান দিক, ডান দিক থেকে বাঁদিক মাকুর মতন কটি সঞ্চালন করতে পারলে তবেই নাচের আসরের নায়ক হতে পারেন আপনি।

টুইস্ট নাচের ভঙ্গী

শুধু আমেরিকাই বা কেন, ট্যাঙ্গো সাম্বা রাম্বা, চা-চা-চা, এবং রক এ্যাণ্ড রোলের পর টুইস্ট নাচের সাম্রাজ্য আটলাণ্টিকের পরপারেও ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়েছে। এমন কি এই কলকাতার কয়েকটি নাচ শেখানোর স্কুলে ইতিমধ্যেই —"Hey let us go for a twist" সুরু হয়ে গেছে।

প্রতীচ্যের সাম্প্রতিক নাচগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। যেমন পাশ্চিমী প্রায় সব আধুনিক নাচই দুর্মদ তাল যুক্ত 'কটি-মন্থন'। চাকা গতির প্রতীক বলেই হয়ত মার্কিণী নৃত্যের অগ্রগতির সঙ্গে এই চাকাকেও যুক্ত করা হয়েছে। একটি নাচে (হুলাহুপ) কটি-হিল্লোলকে দ্রুততর করবার জন্যে প্লাষ্টিকের চাকা পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সব নব্য নাচের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল রম্যতার অনুপস্থিতি। ললিত অনুভবে আর ওদেশের নৃত্যশিল্পীরা বিশ্বাসী নন। সাহিত্য জগতের 'বীটনিক' এবং "এ্যাংরি ইয়ংম্যান"দের মত তাঁরাও সম্ভবতঃ সামগ্রিক লালিত্যের বিরোধী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ভঙ্গুর অবিশ্বাসী হাওয়া ক্রমশঃ প্রবল হয়ে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যজগতে ঝড় এনেছে কিনা সহজে বলা সম্ভব না, তবে একথা স্বচ্ছন্দেই বলা চলতে পারে যে, 'নতুন কিছু করো'র উন্মাদনা যুদ্ধোত্তর যুগসঞ্জাতই।

টুইস্ট বা রক এ্যাণ্ড রোল জাতীয় নাচে দর্শকের ভূমিকা অনন্য। টুইস্ট বা রক এ্যাণ্ড রোলে দর্শকদের পক্ষে নির্বিকার নাচ দেখে যাওয়া শক্ত। তাঁদের পা আপনা থেকেই নাচের তালে তালে মেঝেকে ঘুম পাড়াতে থাকে। সঙ্গীত এবং বাদ্যের সঙ্গতের চেয়ে দর্শকদের পদ-সংগতেই সাম্প্রতিক পাশ্চিমী নাচ সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

ভবঘুরের খাতা

অয়স্কান্ত

॥ একটি আশ্চর্য সভার বিবরণ ॥

কোনো এক রবিবারের সকালে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমি এক আশ্চর্য সভায় হাজির হয়েছিলাম। সভা এই কারণে বলছি যে সেখানে একটি মঞ্চ ছিল আর মঞ্চের ওপরে ছিল মাইকের নিখুঁত বন্দোবস্ত। কিন্তু মঞ্চের ওপরে সভাপতির চেয়ারটি ছিল খালি। আর যাদের শ্রোতা হবার কথা তারা এলোমেলোভাবে ছড়ানো শ' দুয়েক চেয়ারকে এখানে-ওখানে টেনে নিয়ে ছোট ছোট চক্রে ভাগ হয়ে অনবরত নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করছিল। অথচ কোনো না কোনো বক্তা সব সময়েই মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলেছিলেন। দু' পাশে দুটি লাউডস্পীকারের চোঙ লাগানো ছিল। সেই দুটি চোঙ থেকে বক্তৃতার ঝড় উঠছিল যেন।

জায়গাটার একটু বর্ণনা দরকার। মাথার ওপরে একটি ছাউনি অবশ্যই আছে। কিন্তু তিনটি দিক খোলা। বাকি একদিকে উঁচু মঞ্চ। ছাউনির বাইরে তিনদিক ঘিরে ধাপে ধাপে কাঠের গ্যালারি। বেশ বোঝা যায় যে কয়েক হাজার শ্রোতার আসন এখানে অনায়াসেই হতে পারে। আর জায়গাটি যদিও কলকাতার ঠিক মধ্যখানটিতে কিন্তু ভারি শান্ত ও নিরিবিলি। চারপাশে যদিও রাজপ্রাসাদের মতো অট্টালিকা কিন্তু ঘন আর নিবিড় গাছের সারি অরণ্যের সবুজ রেখা ফুটিয়ে তুলেছে। পরিবেশটি এতই মনোরম যে দু-দণ্ড হাত-পা ছড়িয়ে বসতে ইচ্ছে করে।

শ্রোতাদের দেখেও মনে হচ্ছিল যে তারাও এই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে। নিতান্ত সভা বলেই হয়তো খুশিমতো হাত-পা ছড়ানো যাচ্ছে না, কিন্তু বসার ভঙ্গিটি কারও উৎকর্ণ নয়।

যাই হোক, শ্রোতাদের কথায় পরে আসছি। আগে বক্তৃতার একটু আভাস দেওয়া যাক।

মাইকের গুণেই হোক বা গলার গুণেই হোক আওয়াজটা খুব ভারী আর ভরাট। বক্তা বলছেন ঃ গোষ্ঠীবদ্ধতা অস্তিত্বের সহায়ক কিনা তা নিয়ে হয়তো তর্ক চলতে পারে। তবে জন্তুজানোয়াররা যে অনেকেই দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়—এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। মানুষের মধ্যেও এই জান্তব প্রবণতা নিশ্চয়ই কম-বেশি বর্তমান। অভিব্যক্তিবাদ এই লক্ষণকে আশ্রয় করেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কিনা—সে-সম্পর্কে আমার নিজস্ব চিন্তা অবশ্য কিছু আছে এবং সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তা আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করেছি। তবে, অবশ্যই, এ-আলোচনার স্থান এটা নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে মানুষের আসল পরিচয় তার ব্যক্তিসত্তায়। মানুষ যতোখানি একক, ততোখানি মানুষ। জোট বেঁধে থাকা, বছরে বছরে সন্তান উৎপাদন, বহু-অস্তিত্বের ভালগারিটির কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ—এগুলো সবই মনুষ্যত্বের নিগেশন। মানুষ একা, মানুষ নিঃসঙ্গ, মানুষের মনে প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণা—প্রমিথিউসের বিদ্রোহ, মাইকেল্যাঞ্জেলোর সেই বর্ণদ্যুতিময় বিভাস......

আমার ঠিক সামনেই তিনজন শ্রোতা দু'টি চেয়ার দখল করে বসেছিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেকেই একটি চেয়ারে বসেছেন ও অপর একটি চেয়ারে পা তুলে দিয়েছেন। তিনজনেরই মুখে জ্বলন্ত সিগারেট।

একজন বললেন, চল চা খেয়ে আসি।

অপর একজন মুখটাকে বিকৃত করে শুধু উচ্চারণ করলেন, চ্যা-অ্যা-অ্যা!

তৃতীয়জন দ্বিতীয়জনের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বললেন, কিরে, এই সক্কালবেলাতেই!

সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই যথাসম্ভব চাপা স্বরে হো-হো- করে হেসে উঠলেন।

আমি তিনজনকেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। প্রথমজন পরেছেন ধুতি-পাঞ্জাবি, দ্বিতীয়জন পাজামা-শার্ট, তৃতীয়জন ট্রাউজার-বুশশার্ট। মাথায় তিনজনেরই টাকের আভাস, চোখে তিনজনেরই চশমা। একজনের দাড়ি-গোফ পরিষ্কারভাবে কামানো। একজনের পাতলা ও সরু গোঁফ, দাড়ি নেই। আর একজনের দাড়ি ও গোঁফ দুই-ই, বিশেষ একটি বিন্যাসে।

ধুতি-পাঞ্জাবি এবার যেন একটু অসহিষ্ণু সুরে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে যাবি?

পাজামা-শার্ট একবার আলস্যভরে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, আচ্ছা,

এখানে চায়ের বন্দোবস্ত করা হয়নি কেন?

ট্রাউজার-বুশশার্ট হাতের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে আরেকটি সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না।

তারপরেও কিন্তু তিনজনেই সেই একই ভঙ্গিতে গা এলিয়ে বসে রইলেন।

এমন সময়ে দেখা গেল, দূরের একটি দল থেকে কে যেন এই দলটির দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন। তাই দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন পাজামা-শার্ট। জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চটি ঘষতে ঘষতে এগিয়ে গেলেন।

ধুতি-পাঞ্জাবির মন্তব্য শোনা গেল: দেখেছিস, সম্পাদকের কী প্রতাপ!

ট্রাউজার-বুশশার্ট মুখ টিপে হেসে মন্তব্য করলেন: কী না কাগজ!

তারপরে দূরগামী মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে দুজনের মধ্যে আরো কি-সব কথাবার্তা হল। অনেকটা সাঁটে বলার মতো অর্ধোচ্চারিত একটি বা দুটি শব্দ—বাইরের লোকের কাছে কোনো অর্থই নেই। কিন্তু দুজনেই তাতে এমন মশগুল হয়ে উঠলেন যে বোঝা গেল অত্যন্ত মুখরোচক কোনো একটা প্রসঙ্গ নিয়ে জাবর কাটা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় আরেকজন বক্তার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে: "......আমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করেছিলাম যে বক্তৃতায় কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তোলা হবে না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমার পূর্ববর্তী বক্তা নিজেকে ব্যতিক্রম হতে দিয়েছেন। তাঁর বিশেষ একটি প্রবন্ধকে বিজ্ঞাপিত করার জন্য পত্রিকার পৃষ্ঠাই প্রশস্ত জায়গা হতে পারত। তিনি হয়তো একথা মনে রাখা প্রয়োজন মনে করেননি যে এখানে আমরা এমন অনেকেই উপস্থিত আছি যাঁরা সম্প্রতিকালে বিশেষ একটি প্রবন্ধই শুধু নয়, আস্তো এক-একটি বইও লিখেছি। যাই হোক, আমাদের আলোচনায় যাওয়া যাক। মানুষ যে কতখানি নিঃসঙ্গ, মানুষ যে কতখানি যন্ত্রণাজর্জর তার প্রমাণ এই আমরা। আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন, মানুষ বড়ো হতে পেরেছে তার ক্রিয়েটিভ জিনিয়াসের জন্য। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষ আজ পর্যন্ত কোনো দিন জোট পাকিয়ে বা দল বেঁধে ক্রিয়েটিভ জিনিয়াসের নির্দশন দেখাতে পারেনি। হোমার থেকে এলিয়ট পর্যন্ত যা কিছু মহৎ অবদান—সবের মধ্যেই নিঃসঙ্গ মানুষের যন্ত্রণার ছটফটানি। মানুষের অবশ্যই বন্ধু থাকবে, বৌ থাকবে, ছেলেমেয়ে থাকবে। কিন্তু মানুষ যদি বানরের পর্যায়ে থাকত তবে এইটুকুতেই সুখকে সম্পূর্ণ করে উপভোগ করবার পথে তার কোনো বাধা থাকত না। রিলকের সেই [illegible] স্মরণ করুন......

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি দুটি—পাঞ্জাবি ও ট্রাউজার-বুশশার্ট কখন উঠে চলে গিয়েছেন। চেয়ারগুলো খালি। ছুটির দিনের সকালবেলার বাতাসেই বোধহয় একটা আলস্য আছে। আমিও আরেকটি চেয়ার টেনে নিলাম।

আমার ঠিক পেছন দিয়ে দুজন ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে চলে গেলেন। একজন বলছেন, আরে বাবা, কার নামের পরে কার নাম লেখা হয়েছে তাতে কী যায় আসে! দ্বিতীয়জনের উত্তেজিত হুংকার: না, এ কিছুতেই বরদাস্ত করা চলে না! একটু সময় দিয়ে আমি পাশ ফিরে তাকালাম। ততোক্ষণে দুজনেই চত্বর পেরিয়ে বাইরে পা দিয়েছেন। সকালবেলার নরম রোদে গা ডুবিয়ে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে আলতোভাবে পা টানতে টানতে এগিয়ে চলা দুটি তরুণ মূর্তি। দুজনেই এমন তন্ময় যে দূরে থেকে মনে হতে পারে কোনো একটি প্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে দুজনেই ভবিষ্যতের স্বপ্ন আঁকছে।

সামনের সারির একটি চেয়ারে বসা এক ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো পা ফেলে একেবারে পেছনের সারির একটি চেয়ারে রীতিমতো শব্দ করে বসলেন। তারপরে পকেট থেকে কাগজ বার করে দ্রুত হাতে কি যেন লিখতে লাগলেন। আর তাই দেখে আরেকজন ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বোঝাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে দুজনের মধ্যে সিগারেট বিনিময় হল। তারপরে এই দুজন ভদ্রলোকও প্রায় হাত ধরাধরি করে চায়ের দোকানের দিকে পা বাড়ালেন।

তৃতীয় বক্তা শুরু করলেন চড়া সুরে: ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আমার অনীহা। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে যাঁরা প্রতি বছরেই গোটা কয়েক আস্তো আস্তো বই লেখেন—মহৎ কীর্তি তাঁদের অন্বিষ্ট নয়। বাজারে লেখকরা অবশ্যই আত্মসমালোচনায় অস্বীকৃত। যাই হোক, যে-কথাটা বার বার এখানে বলা হচ্ছে—আমাদের সকল মহৎ সৃষ্টি একান্ত নিঃসঙ্গতার ফল, আমাদের সকল মহৎ অবদান একান্ত যন্ত্রণাবোধের ফসল। ক্যাকটাসের মতো আমরা সকল প্রতিকূলতাকে আনায়াসে তুচ্ছ করি। আমরা স্বতন্ত্র, আমরা অবিনাশী, আমরা, আমার—অর্থাৎ, আমাদের যন্ত্রণা ও আমাদের নিঃসঙ্গতা অতুলনীয়। লরকার সঙ্গে এলুয়ারের যতোটুকু সাদৃশ্য, র‍্যাবোঁর সঙ্গে বোদ্—

একটু দূরে ঠাস্ করে একটা শব্দ হল। একটি ছোট ছেলে ঠোঙা থেকে মুড়ি খাচ্ছিল। মুড়ি ফুরিয়ে যেতে ঠোঙাটি ফুলিয়ে দু-হাতের মধ্যে ফাটিয়েছে। তারপরে নিজের কৃতিত্বে নিজেই মুগ্ধ হয়ে হি-হি করে হাসছে।

আমি আচ্ছন্নের মতো সেই আশ্চর্য সভার এককোণটিতে চুপটি করে বসে রইলাম। মানুষ যে সত্যিই নিঃসঙ্গ, মানুষের যে যন্ত্রণার অন্ত নেই—আস্তে আস্তে এই পরম উপলব্ধিও আমি আমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে টের পেতে লাগলাম।

শ' দুয়েক চেয়ারে এলোমেলোভাবে ছড়ানো ছিটানো জন-পঞ্চাশেক মানুষ। সকলেই সকলের সঙ্গে কথা বলছে। সকলেই সকলের সঙ্গে গোল হয়ে বসে চক্র তৈরি করছে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়েও আমি একজন মানুষকেও কিছুক্ষণের জন্যে একা বসে থাকতে দেখলাম না।

তারপরে শেষ বক্তার বক্তৃতা শোনা গেল: বন্ধনকে অস্বীকার করার মধ্যেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। বন্ধুর রয়েছে প্রীতির বাঁধন, প্রিয়ার রয়েছে ভালোবাসার বাঁধন, সন্তানের রয়েছে স্নেহের বাঁধন। এ সবই মানুষকে ছোট করে। মানুষকে অমানুষ করে তোলে। কিন্তু যেখানেই এই বন্ধনকে ছিন্ন করে একক ব্যক্তিসত্তার প্রতিষ্ঠা সেখানেই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা। অবশ্যই এই নৈঃসঙ্গের সঙ্গে একাত্ম হবে তীব্র যন্ত্রণা। তাই আমি বলি—

ইতিমধ্যে সভাস্থলের পেছনদিকে কোথা থেকে এক চা-ওলা এসে হাজির হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণ ধরে যাঁরা নিঃসঙ্গতার ও যন্ত্রণাবোধের জয়গান করছিলেন তাঁরা দল বেঁধে হৈ-হৈ করতে করতে চা-ওলার দিকে ধাবিত হলেন। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সিগারেট অফার করছেন। প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের সঙ্গে কিছু না কিছু জরুরী কথা বলার আছে। একমাত্র মাইকের গর্জনটাকেই একজন নিঃসঙ্গ মানুষের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ বলে মনে হতে লাগল।

* * *

এ-পর্যন্ত লেখার পরে দেখা গেল, খাতার পাতার খানিকটা অংশ সাদা থেকে যাচ্ছে। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে সাদা অংশটি ভরাট করছি।

" গোলেস্তান এবং বোস্তান নামে যে দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে, তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। ঐ দুইখানি পুস্তকের স্থূল মর্ম এই যে, যুধিষ্ঠির নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মন্দোদরীকে হরণ করিয়াছিল। মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা করেন। পরিশেষে তাঁহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন।" (কোন "স্পেশিয়ালের" পত্র)

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। আট ।।

দীপ্তি ভেবেছিল, আজ আর বাড়ী থেকে বেরুবে না। শরীর আর মন দুই-ই তার ক্লান্তি আর ক্লেদে একাকার হয়ে গেছে। একটা দিন সে অন্তত পলাতক জানোয়ারের মতো মুখ গুঁজে পড়ে থাকবে, ভাবতে চেষ্টা করবে, এই কলকাতা শহরে—এই অসংখ্য মানুষের ভেতর ভালো হয়ে বেঁচে থাকবার আর কোনো পথ খোলা আছে কিনা।

সেই ক্রিব্‌ল ক্যাব্‌লের গল্পটা। অনেকদিন আগে বলেছিলেন তনুদি। আজকে তার অর্থটা পুরোপুরি বুঝতে পারে দীপ্তি। বিদ্যা দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়, অভিজ্ঞতায়। সে অভিজ্ঞতার প্রথম স্বাদ দিয়েছিল গয়াপ্রসাদ। সেই বাগানবাড়ীর নির্জন ঘরে, সেই নীল বাল্‌বের আলোয় তার রণের দাগধরা গাল-কপাল আর আঁতরিক্ত পান-খাওয়া মুখটা বাঘের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়েছিল গল্পের পোকাগুলোকে—যারা একটা আর একটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

দীপ্তি ভাবছিল, তবু বেঁচে থাকা যায়। তবু কেউ কেউ বাঁচে। অনেক মেয়ে দশটা-পাঁচটা সত্যিকারের চাকরি করে, টিউশন করে, সেলাই শিখিয়ে, গান শিখিয়ে, ক্যানভ্যাসারি করেও দিন চালায়। বছরে তারা তিনখানার বেশী শাড়ী কিনতে পারে না, ছেঁড়া জুতো টেনে টেনে পথ চলে, মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, দুবেলা পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পায় না। কিন্তু তবু তারা মাথা উঁচু করে চলতে জানে, চোর-গুণ্ডার অনুকম্পার পাত্রী হতে হয় না তাদের।

এই তো কিছুদিন আগে গিয়েছিল টালীগঞ্জের দিকে। জলাজমি আর বন-বাদাড়ের চিহ্ন লোপ করে দিয়ে উদ্বাস্তু মানুষের সারি সারি টিন আর টালীর ঘর। সেইখানে দূর-সম্পর্কের একটি বোন এসে আশ্রয় নিয়েছে।

ভগ্নীপতি একটা ছোট দোকান করেছে চারু মার্কেটে। সামান্য আয়। দিন চলে কি চলে না। লম্বা মানুষটা কুঁজো হয়ে হাঁটে, চল্লিশ বছরেই মাথার চুল তিনভাগ শাদা। তিন চারটি ছেলে-মেয়ে তেলমাখা মুড়ি দিয়ে জলখাবার খায়, সপ্তাহে দুদিন পাতায় করে চুনো মাছ আসে। তবু মাসতুতো বোনের ক্লান্ত মুখে এক টুকরো শান্ত হাসি লেগেই আছে। দুটি একটি লাউ কুমড়ো ফলিয়েছে, কয়েকটা ফুলের চারা রয়েছে, কলাগাছে কাঁদি ঝুলছে, চকচক করছে তার নিজের হাতে নিকোনো দাওয়াটি। আর এই বোনটির বিয়ের সময়েই মধুমতীর ঘাট থেকে আধ মাইল পর্যন্ত তোরণের পর তোরণ সাজানো হয়েছিল।

এমনি একটি সংসারও যদি পেতো দীপ্তি! যদি এমনি একটি আশ্রয়ও তাকে কেউ দিত!

কিন্তু সেকথা সেদিন কেউ ভাবেনি। হয়তো বিয়ে দেবার সামর্থ্য বাবার ছিল না, কিন্তু বিয়ের কথাই মনে হয়নি তাঁর। বাবা-মা-অভয়—সবাই চেয়েছিল সে রোজগার করুক—সংসারের অচল চাকায় হাত লাগাক। তাই তো করতে গিয়েছিল দীপ্তি, চাকরিও জোগাড় করেছিল, তারপর—

সে একা দায়ী? দায়ী সবাই। তাকে কলকাতার পথে ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু পাহারা দেবার দায় কেউ নেয়নি; বাঘের জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছিল, আত্মরক্ষার কোনো অস্ত্র তার হাতে ছিল না।

টাকা চেয়েছিল সবাই। আজ সে টাকা আনে। স্কুল-ফাইন্যালের বিদ্যায় চাকরি করে যা রোজগার করতে পারত, তার চাইতে অনেক বেশি। সে টাকা কোথা থেকে কিভাবে আসে, কেউ তা জানতে চায় না। সংসার ভালোই চলছে। আর সমস্ত বিষের জ্বালা জ্বলছে দীপ্তির শরীরে।

কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়।

আজকে সারাটা দুপুর সারা বাড়ীতে যে কদর্যতার ঝড় বয়ে গেছে তৃপ্তিকে নিয়ে, সেজন্যে তার নিজের দায়িত্ব অনেকখানি। পাড়ার ছেলেরা চোখ বুজে বসে থাকে না। তারা তাকে মাঝরাতে ফিরতে দেখেছে, দেখেছে অচেনা পুরুষের ট্যাক্সি থেকে নামতে। দু একটা শিস্ কিংবা অশ্লীল মন্তব্য যে কানে আসেনি তা-ও নয়। পাড়ার ছেলেদের উপর রাগ করতে পারে না দীপ্তি। তাদের কাছে দীপ্তি তৃপ্তির মধ্যে তফাৎ নেই কিছু। এক বোন যখন নরকের কাদা সর্বাঙ্গে মেখে বেড়ায়, তখন আর একজন তুলসী পাতার মতো পবিত্র—একথা কেন তারা বিশ্বাস করবে?

দীপ্তি একটা ট্রামে উঠে চোখ বুজে বসেছিল এতক্ষণ। যখন চোখ মেললো, তখন ট্রাম কার্জন পার্কে ঢুকে সাপের মতো বাঁক নিচ্ছে।

সেই চৌরঙ্গী।

আকাশে পড়ন্ত বেলার রক্তের ছোপ। নিয়নগুলো জ্বলে উঠছে একে একে। সেই ভিড়—সেই মোটর-ট্রাম-বাসের কোলাহল, বিকেলের হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়া সেই মাদকতা, যা শিরার মধ্যে ঢুকে মদের নেশার মতো জ্বলতে থাকে। সকালে শান্ত নির্জন, দুপুরে বিরাট আর বিকট—রাত্রে মায়াবিনী। চৌরঙ্গী!

দীপ্তি ভেবেছিল, আজ কিছুতেই সে এ পাড়ায় পা দেবে না। যেদিকে হোক ঘুরে বেড়াবে, যেখানে হোক, একটুখানি নির্জনতার ভেতরে নিজেকে নিয়ে বসে থাকবে কিছুক্ষণ। কিন্তু সূর্যের আলো হলদে হয়ে আসতে না আসতেই চৌরঙ্গী তার রক্তনাড়ীতে টান দিয়েছে। নিজেই জানে না, কখন সে চেপে বসেছে এস্‌প্ল্যানেডের ট্রামে।

দীপ্তি নেমে পড়ল—কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিতভাবে। সেই হোটেলটায় আজ আর যাওয়া যাবে না, কিন্তু আরো জায়গা তার আছে। এবং অন্য যে-কোনো দিনের মতো আজো তার খরিদ্দারের কোনো অভাব হবে না।

একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিলে দীপ্তি। রক্তে নেশাটা ঘন হয়ে উঠছে নিবন্ত দিনের সঙ্গে সঙ্গে। জোরালো কতগুলো আলো, বিলিতী বাজনার উন্মত্ততা, মেয়েদের প্রসাধন আর পুরুষের সিগারেটের গন্ধ—ভাজা মাংসের গন্ধে খিদে-জাগানো শুড়শুড়ি, কাঁটা-ছুরি আর মদের গ্লাসের ঝঙ্কার।

'লাইক টু কাম উইথ মী?'—কানের কাছে নতুন শিকারের ভীরু আবেদন। যারা পুরোনো, তারা আরো সোজাসুজি কথা বলে।

না—না। আজ নয়। আজ এখান থেকে পালাতে হবে তাকে।

কিন্তু পালিয়েও কি নিস্তার আছে? যত দূরেই যাক, চৌরঙ্গীর শিকল তাকে কঠিন হাতে টানতে থাকবে। কোথাও গিয়ে সে শান্তি পাবে না। তার চাইতে—

সামনে বিলিতী সিনেমার আলোর অক্ষরগুলো জ্বলছে। নতুন ছবি এসেছে একখানা।

দীপ্তি রাস্তা পেরিয়ে সিনেমার সামনে এসে দাঁড়াল। এয়ার-কণ্ডিশনিং-এর একটা শীতল হাতছানি এসে গায়ে লাগল—বৈশাখের গরম বাতাসের সঙ্গে কত তফাৎ।

সিনেমায় ঢুকলে কেমন হয়?

মন্দ হয় না! ওখানকার ঠাণ্ডা আশ্রয়ে তার আগুনধরা স্নায়ুগুলো জুড়িয়ে যাবে। তার চাইতেও বড় কথা, অন্তত তিন ঘণ্টা নিজের মনের শয়তানটার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবে সে। একটা দামি টিকেট কিনে সে ভেতরে ঢুকল।

একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, নিউজ রীল শেষ হতে চলেছে। কয়েকটি অসন্তুষ্ট বিরক্ত চোখের সামনে দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

মূল ছবি আরম্ভ হল।

আগে সে ইংরেজি ছবির বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারত না বললেই চলে। কিন্তু নানা মানুষের সঙ্গে মিশে, অনেকের সঙ্গে অনেকভাবে ছবি দেখবার পর এখন মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারে। কথা কিংবা রসিকতা এখন আর তেমন দুর্বোধ্য মনে হয় না।

ঐতিহাসিক ছবি—ভক্তি, বিশ্বাস আর আত্মত্যাগের সুরে বাঁধা। মরুভূমিতে পথ-হারানো কয়েকজন ক্ষুধার্ত সৈনিক—গল্পের নায়ক তাদের সেনাপতি। আসন্ন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে—সেই বালির ওপর হাঁটু গেড়ে তারা প্রার্থনা করছে, 'গিভ আস দিস ডে আওয়ার ডেলি ব্রেড্!' তাদের আচ্ছন্ন চোখের সম্মুখে হঠাৎ ক্যাকটাসের একটা কঙ্কাল ক্রসে পরিণত হল, তার মধ্যে দেখা দিল খৃস্টের করুণাঘন মূর্তি। তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল শুভ্র পক্ষ শুভ্র বেশ দেবদূতের দল—আর মরণাপন্ন মানুষগুলোর মাথার ওপর দিয়ে খৃস্ট তাঁর অভয় বাহু বাড়িয়ে দিলেন।

দীপ্তির চোখে জল এল। আর ঠিক সেই সময়—

একটা ঠাণ্ডা হাত অশ্লীলভাবে স্পর্শ করল দীপ্তিকে।

সামনের পর্দাটা শাদা হয়ে গেল মুহূর্তে, কেবল কয়েকটা হিজিবিজি আলোর রেখা কাঁপতে লাগল সেখানে। নীচের ঠোঁটটাকে দীপ্তি প্রাণপণে কামড়ে ধরল।

হাতটা আবার তার গায়ে খেলে বেড়াতে লাগল। দীপ্তি তাকিয়ে দেখল।

সেই তরল অন্ধকারে একজোড়া চশমা জ্বলজ্বল করছে। একটা চাপা হাসির রেখা টের পাওয়া যাচ্ছে একটি স্থূল ঠোঁটে। এই ঘর একটু আগেই ধর্মমন্দিরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, এখন সেখানে আদিম অন্ধকার নেমে আসছে।

লোকটি অচেনা নয়। বড়ো ব্যবসায়ী কোম্পানির চাকুরে।

ফিস ফিস করে একটা আওয়াজ কানে এল : ইণ্টারভ্যালের পর।

মুক্তি কোথাও নেই। কোথাও পালাতে পারবে না দীপ্তি। শুধু ওই একজোড়া চশমাই নয়—লক্ষ লক্ষ শানানো চোখ চারদিকে ঝকঝক করছে তার। সবাই তাকে চিনে নিয়েছে—নিজেকে লুকিয়ে রাখবে এমন একটুখানি জায়গা এই কলকাতায় কোথাও নেই।

কিন্তু আজ নয়—আজ কিছুতেই নয়।

সেই নির্মম লোভী হাতটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে দীপ্তি। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ালো সীট ছেড়ে। হলসুদ্ধ লোককে বিরক্ত আর চকিত করে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল 'এক্‌জিটে'র লাল অক্ষরের দিকে।

বাইরে পা দিতেই এক রাশ গরম হাওয়া চাবুকের মতো এসে তার মুখে আঘাত করল। এতক্ষণের শীতল আশ্রয় ছেড়ে হঠাৎ যেন এসে পড়ল অগ্নি-কুণ্ডের ভেতর। চারদিকের নিয়নের আলোয় সেই আগুনের শিখা নাচতে লাগল তাকে ঘিরে ঘিরে। জ্বলন্ত চৌরঙ্গী। জ্বলন্ত কলকাতা। সেই চশমাপরা চোখদুটোও কি বেরিয়ে এসেছে পেছনে পেছনে?

দীপ্তি আর দাঁড়াতে পারল না। এই অগ্নিকুণ্ডের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সোজা সামনের বাসটায় উঠে পড়ল।

আবার সেই পার্ক স্ট্রীটের বার। কাঞ্জিলাল-সাহেব এনার্জি সংগ্রহ করতে গেছেন। প্রভাত প্রতীক্ষা করছিল। সেই মাথাধরাটা আবার দেখা দিয়েছে, ঘাড়ের শিরা বেয়ে উঠে কানের পাশ দিয়ে আক্রমণ করেছে কপালকে। মনে হচ্ছে ফেটে বেরিয়ে যাবে।

স্নায়ু—না, চোখের যন্ত্রণা? একবার ডাক্তারের কাছে গেলে হয়। কিন্তু

কিছুতেই সময় হয় না। যখন সময় হয়, তখন শরীরে এক বিন্দু উৎসাহও আর অবশিষ্ট থাকে না।

আচ্ছন্ন চোখের সামনে কতগুলো ছায়া দুলছে। একবারের জন্যে দেখা গেল রানীকে, পরনে লাল চেলি, কপালে চন্দন, মাথায় টোপর। একরাশ বৃষ্টির ধারায় আর নিতল অন্ধকারে মিলিয়ে গেল মুখখানা। তৃপ্তি বলছে, 'জানো প্রভাতদা, দিদি কাল রাতে মদ খেয়ে এসেছিল।' আর সংগে সংগেই তীক্ষ্ণ হাসির আওয়াজ কানে এল রিনির : 'আমার বাবা যে একজন বিশ্বপ্রেমিক, ভুলে গেলেন সে-কথা?'

প্রভাতের চটকা ভাঙল।

একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে গাড়ীর আশপাশে ঘুর-ঘুর করছিল এতক্ষণ। হঠাৎ মনে হল, পেছনে খুট্‌ খুট্‌ করে একটা চাপা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে যেন। এক লাফে প্রভাত নেমে পড়ল গাড়ী থেকে।

ছেলেটা দৌড়ে পালাবারও সময় পেল না। প্রভাত তাকে চেপে ধরল বজ্র-মুঠিতে।

ছেলেটার হাতে একটা রেঞ্চ। গাড়ীর ব্যাক-লাইটা অর্ধেক খুলে ফেলেছে।

—চুরি করছিলি?

—আর করব না স্যার, ছেড়ে দিন।

প্রভাত তাকিয়ে দেখল ওর মুখের দিকে। অদ্ভুত শাদা শাদা দুটো চোখ—তারা আছে বলে মনে হয় না। যেন ভৌতিক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। চোয়াল-ভাঙা গাল—রোগা মুখের ওপর একটা চ্যাপটা নাকের অস্তিত্ব টেরই পাওয়া যায় না।

—ছেড়ে দিন স্যার আর করব না।

—পুলিশে দেব তোকে।

হাতটাকে নানাভাবে বাঁকিয়ে পালাতে চেষ্টা করছিল ছেলেটা। প্রভাত ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলে তার গালে। আর কেঁদে ফেলল ছেলেটা।

—কেন চুরি করছিলি?

—খেতে পাই না স্যার। পাকিস্তান থেকে আসছি।

প্রভাত হেসে ফেলল : তুই পাকিস্তান থেকে আসিসনি। তোর জন্মের অনেক আগে পাকিস্তান হয়েছে।

—মাইরি বলছি স্যার। বিশ্বাস না হয় চলুন গোবরায়। সেখানে আমার মা-বাবা সবাই রয়েছে।

—তার আগেই তোকে নিয়ে যাচ্ছি পার্ক স্ট্রীট থানায়। মল্লিকবাজারে আলোটা নিয়ে গিয়ে বেচলে পেতিস আট আনা কিংবা একটা টাকা—আর মালিকের কতগুলো টাকা বরবাদ হয়ে যেত, তা জানিস?

ঠিক সেই সময় হাতের মুঠোটা

একটু আলগা হয়ে গেল, আর সাপের মতো পিছলে বেরিয়ে গেল ছেলেটা। একটা চলন্ত ট্যাক্সির সামনে প্রায় চাপা পড়তে পড়তে, তীর-বেগে রাস্তা পেরিয়ে উধাও হল।

প্রভাত হাসল। ইচ্ছে করলেই ধরা যেত। কিন্তু মিথ্যে পরিশ্রম করে লাভ নেই। ছেলেটা হাতের রেঞ্চটা ফেলে গিয়েছিল, সেইটে দিয়েই সে স্ক্রুগুলোকে আটকে দিতে লাগল।

হয়তো পাকিস্তান থেকে এসেছে—হয়তো নয়। বাঁচবার জন্যে অনেককেই পাকিস্তানের স্মরণ নিতে হয়, যদিও ও-কথাটার আর কোনো ধার নেই, আজ উদ্বাস্তুর নাম শুনলে মানুষের অনুকম্পা আসে না—বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে আসে। তবু দুঃখটা মিথ্যে হয়ে যায়নি, তবু পূর্ববঙ্গের ঘরছাড়া এক দল মানুষ আজও স্রোতের শ্যাওলা। কলকাতার পথে-ঘাটে সদ্য বেরিয়ে-আসা কাঁকড়ার বাচ্চার মতো একরাশ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়ায়—দেশ নেই, পরিচয় নেই, ধর্ম নেই, কিছুই নেই। পথের ধারে ধারে দুর্গন্ধ আবর্জনার স্তূপের মতো এরা মনুষ্যত্বের মহামারী ডেকে আনছে।

কার ওপরে রাগ করবে প্রভাত? সবাই বাঁচতে চায়। কিন্তু সেই বাঁচবার জন্যে কোন পথে পা দিয়েছে দীপ্তি? কী করছে অমিয়? কিসের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে গৌরাঙ্গবাবুর সংসার?

কাঞ্জিলাল-সাহেব বেরিয়ে এলেন বার থেকে। ফর্সা মুখটা টকটকে লাল। নীলচে চশমার আড়ালে ঢুলু-ঢুলু চোখ।

—কী হল গাড়ীর?

—কিছু না স্যার। ব্যাক-লাইটের একটা স্ক্রু ঢিলে হয়ে গিয়েছিল।

আসল কথাটা বলতে প্রবৃত্তি হল না। অনর্থক আবার একরাশ জবাবদিহি করতে হবে। ছেলেটাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দেবার জন্যে শান্তিবাদী কাঞ্জিলাল-কী বলবেন, কে জানে।

গাড়ী চলল। কিছুক্ষণ পরেই প্রভাতের মনে হল, পেছন থেকে ফোঁস ফোঁস শব্দ আসছে একটা।

সামনের আয়নায় ছায়া পড়েছে কাঞ্জিলাল-সাহেবের। দেখা গেল রুমালে চোখ মুছছেন তিনি। কাঁদছেন!

ধরা গলার আওয়াজ এল : প্রভাত!

—বলুন স্যার।

—মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেছে। ও—আই ফিল সো সরি!

প্রভাত সাড়া দিল না। যা বলবার সাহেব নিজেই বলবেন। বার থেকে বেরিয়ে এলেই তিনি অন্য মানুষ। তাঁর বিশ্বপ্রেমিক হৃদয়ের কপাটটা খুলে যায়—তখন আর ছোট-বড়োর কোনো ভেদ রাখেন না তিনি। প্রভাতের ভয় করে, কোন দিন তিনি আবেগের ঝোঁকে তার গলাটাই জড়িয়ে ধরবেন।

—আই ফায়ার্ড হিম!

প্রভাত দারুণ চমকে গেল।

—কাকে গুলী করলেন স্যার?

—গুলী নয়—গুলী নয়। ডিসমিস করলুম। লোকটা কাঁদছিল। পুয়োর ফেলাহ্! কিন্তু আমি কী করতে পারি! ডিউটি বাউণ্ড।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রভাতের সীটে হাত রেখে ঝুঁকে পড়লেন কাঞ্জিলাল-সাহেব। প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন তাঁর।

—পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস লোকটার। ঘরে চার-পাঁচটি ছেলেপুলে। কোয়ালিফিকেশন আণ্ডার-ম্যাট্রিক। না খেয়ে মরবে এরপর। স্রেফ স্টার্ভ করবে লোকটা।

স্টিয়ারিঙে হাত শক্ত হয়ে গেল প্রভাতের।

—তবু ছাড়িয়ে দিলেন স্যার?

—ডিউটি। ক্যাশে বারশো টাকা শর্ট। বলে, ছেলেটা মরতে বসেছিল স্যার—ডাক্তার ডাকতে পারি না, মাথার ঠিক ছিল না তখন। আমাকে ছাড়াবেন না—মাইনে থেকে মাসে মাসে কেটে নেবেন। আমি বললুম, হোয়াই ডিড নট য়ু টেল মী? আমি নিজে হেল্প করতুম তোমায়। না—সাহস হয়নি। তাই বলে চুরি করবে? হি ইজ লাকি যে আমি প্রসিকুট করিনি।

—কিন্তু স্যার, মাইনে থেকে কেটে নিয়েও তো—

—টাট্—টাট্। কোয়েশ্চেন অফ প্রিন্সিপ্‌ল্। তা ছাড়া আজ যে বারশো টাকা সরিয়েছে, কাল সে দু হাজার সরাবে না, এ-কথা কে বলতে পারে? এনি গ্যারান্টি?

না, গ্যারান্টি নেই। অন্তত সেই অচেনা লোকটির জন্যে কোনো গ্যারান্টি দিতে পারে না প্রভাত।

—দিস ইজ লাইফ।—আয়নায় আবার দেখা গেল, কাঞ্জিলাল-সাহেব চোখ মুছছেন : কত কঠোর হয়ে যে ডিউটি করতে হয়। একবার ভাবলুম, নিজেই একটা হাজার টাকার চেক লিখে দিই ওকে। তারপরেই মনে হল, হি মাস্ট পে ফর হিজ সিন। টাকা পেলে ছ মাস নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে, ভাববে চ্যারিটির ওপর একটা রাইট জন্মে গেছে ওর। তখন কোনো কাজ করতে চাইবে না। এমনিতেই তো জাতটা ভিখিরি হয়ে গেছে—হোয়াই এন্‌কারেজিং এনি মোর?

ছেলেটা পালাতে পেরেছে মনে করে স্বস্তির শ্বাস পড়ল। নইলে কর্তব্য করতে বাধ্য হতেন কাঞ্জিলাল-সাহেব।

আরো বেশি করে তাঁর চোখের জল পড়তে থাকত।

—কিন্তু লোকটার কথাও ভাবো একবার। কী ইরেসপনসিবল! তোমার ছেলেপুলে, তোমার সংসার—একবার ভেবে দেখলে না পরিণামটা কী হতে পারে? অ্যাণ্ড য়ু আর এ ম্যান অফ ফরটিফাইড? এদের ওপর ভরসা করেই দেশ গড়বার স্বপ্ন—প্ল্যানিঙের পর প্ল্যানিং! কিচ্ছু হবে না—সব ফিডল-স্টিক! তোমার কী মনে হয়?

—আমি কী বলব স্যার?

—বলবে—বলবে। তোমাদেরই দেশ। রেইজ ইয়োর ভয়েসেস। ক্লীন পিপল—ক্লীন ইণ্ডিয়া। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

—আজ্ঞে।

—তবু— কাঞ্জিলাল-সাহেবের গলাটা আবেগে আবার আবিষ্ট হয়ে গেল : তবু সারা রাত আমি ঘুমুতে পারব না। লোকটার মুখখানা আমার চোখের সামনে ভাসবে নাইটমেয়ারের মতো। সেই হ্যাগার্ড চেহারা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি—সেই ঘোলাটে চোখদুটো। আমার পা ধরেছিল। সেই ঠাণ্ডা আঙুলগুলোর ছোঁয়া এখনো আমার শরীরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে—লাইক এ কোল্ড স্ট্রীম। উঃ—লাইফ ইজ সো ক্রুয়েল!

কাঞ্জিলাল-সাহেব দেবদূতের মতো কাঁদতে লাগলেন। আর গাড়ীটা সেই সময় বাঁক নিয়ে বাড়ীর লনে ঢুকল।

আরো এক ঘন্টা পরে মাথার যন্ত্রণায় জর্জরিত, ক্লান্ত আড়ষ্ট শরীর নিয়ে প্রভাত বাস থেকে নামল। দু পা এগোতেই পেছন থেকে ডাক এল : প্রভাতদা!

প্রভাত তাকিয়ে দেখল।

—দীপ্তি!

—এই বাসেই তো এলুম।

—দেখতে পাইনি তো?

—তুমি তো দু-হাতে মাথা গুঁজে ঝিমুচ্ছিলে। আমি উঠেছি শেয়ালদা থেকে।

—দেখতে পাইনি—প্রভাত শীর্ণ হাসি হাসল : ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল।

—বাড়ী চলো। অ্যাসপিরিন আছে আমার কাছে, দেব।

প্রভাত দেখল, দীপ্তির মুখ-চোখ শুকনো। অন্যদিনের মতো প্রসাধন নেই—শাড়ীটা আধ-ময়লা। খানিকটা রুক্ষ চুল উড়ে উড়ে পড়ছে মুখের ওপর। সবটা মিলিয়ে কেমন করুণ, বিষণ্ণ আর ছোটখাটো মনে হল দীপ্তিকে। গঙ্গার ধারে যে দীপ্তিকে সে নিজের চোখে ওভাবে দেখেছে, যে দীপ্তি মদ খেয়ে রাতে বাড়ী ফেরে, তার সঙ্গে কোথাও কোনো মিল যেন খুঁজে পাওয়া গেল না এই মেয়েটির।

প্রভাত কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সামনে লোহার বলের মতো কী একটা এসে আছড়ে পড়ল। চোখ ধাঁধানো খানিক নীলচে আলোর সঙ্গে জেগে উঠল বাজের মতো কান-ফাটানো আওয়াজ!

দীপ্তির মুখ-চোখ শুকনো

দুজনে গলির ভেতরে পা দিয়েছিল। দীপ্তি বললে, প্রভাতদা!

—বলো।

—একটা চাকরি কোথাও জুটিয়ে দিতে পারো আমাকে? চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট যে-কোনো মাইনের?

প্রভাতের ডান হাতে আর গালের পাশে তীব্র যন্ত্রণার আঘাত এসে লাগল। দীপ্তি একটা আর্ত চিৎকার করল : 'মা গো'—তারপর সোজা পথটার ওপর উবুড় হয়ে পড়ল।　　(ক্রমশঃ)

বাংলা সাহিত্যে ইন্দ্রনাথ

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়ে বাঙালী সমাজজীবনের দৃষ্টিভঙ্গির এক বিরাট রূপান্তর ঘটেছিল। একদিকে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণ-প্রীতি, অপর দিকে জাতীয় সংহতির চেষ্টা—এই দুয়ের মধ্যে তখন কোন অনুকূল ব্যবস্থার সৃষ্টি হতে পারে নি। বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে তখন জেগেছে জাতীয়তাবোধ, তার সামনে রয়েছে স্বাধীনতার আবেগ। অন্য দিকে বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার আওতায় সামাজিক ভিত্তি তখনও সামন্ততান্ত্রিক ভাবদুষ্ট। সেদিকে জাতিভেদ, বৈষম্যমূলক নীতি, ইংরেজ চক্রান্তের ফলস্বরূপ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক অসহযোগ, ধর্মসংস্কার, বিদেশী রাজশক্তির অত্যাচার, জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের প্রজা-নিপীড়ন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কুফল এবং অন্য দিকে সমাজের প্রচলিত দুর্বল প্রথার প্রতিকারে বাধা, প্রজাবিক্ষোভে আতঙ্ক প্রভৃতিতে তখনকার মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে একটা সংশয়পূর্ণ স্ববিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার সাহিত্যে এর প্রকাশ ঘটে ক্রমান্বয়ভাবে।

ইংরেজ শাসকের প্রীতি মোহে, ইংরেজীয়ানার প্রবল মোহে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের এ-দেশে পাকাপোক্ত হয়ে বসবার যে খুব সুবিধে হবে—এটা বুঝতে পেরে যাঁরা বাঙলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি দিয়ে লেখনী ধারণ করেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক লেখকদের ভূমিকা স্মরণীয়। এই বঙ্কিমমণ্ডলীর অন্যতম জ্যোতিষ্ক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনে পরাধীনতার বেদনা, জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম অনেক বেড়ে উঠেছিল কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী সমাজে তার আন্দোলন আলোড়নের দিক সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বাঙালী তখন সাহেবী-স্রোতে ভাসমান। বাঙলাকে তখন বাঙালী বুঝতে চায় না। উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে, হাঁচতে-কাশতে উৎকট সাহেবিয়ানা।

সে যুগের নব্য বাবুদের ইংরেজীয়ানা, কেরানী-জীবন, কবি-জীবন, ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির গল্প প্রভৃতি ইন্দ্রনাথের সাহিত্যের বিষয়বস্তু রূপে দেখা দেয়। বাঙলা সাহিত্যে satire এই সময় থেকে সার্থকভাবে শুরু হয়। আত্ম-বিস্মৃত বাঙালীকে তিনি তীক্ষ্ন-ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে তার মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুলবার প্রয়াস

পেয়েছিলেন এবং এক অদ্ভুত কল্পনা-শক্তি ও ভাবপ্রকাশের সহজ সরল মধুরতা ও স্নিগ্ধতা তাঁর রচনাগুলিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

১২৮১ সালে ইন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'কল্পতরু' প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তাঁকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন:—"তাঁহার গ্রন্থে বঙ্গদর্শনপ্রিয়তার ঈষৎ মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত হচ্ছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্রদৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুয়ের একেও নাই। ইন্দ্রনাথের গ্রন্থ রত্নময়, সর্বস্থানে মুক্তা প্রবালাদি জ্বলিতেছে। দীনবন্ধু-বাবুর মত তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, হুতোমের মত 'বেল্লেল্লাগিরিতে' প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রস উগ্র নহে, মধুর—সর্বদা সহনীয়।"

'কল্পতরু' প্রকাশের দু'বৎসর পর 'ভারত-উদ্ধার' প্রকাশিত হয়। 'ভারত-উদ্ধার' বাঙলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ-কাব্য। বাঙালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের অসারতা ও আস্ফালন ইন্দ্রনাথ অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করেছিলেন। বাঙালী সেদিন জাতীয় ভাবহীন, বাক্য-বাগীশ হয়ে পড়েছে. মুখে ভারত-উদ্ধারের কথা কিন্তু কাজের বেলায় শিথিলতা। ইন্দ্রনাথ এখানেই আক্রমণ করলেন। ভারত-উদ্ধারের জন্য গভীর রজনীতে মন্ত্রণাসভা বসল; বীররসে বক্তৃতাদি হয়ে গেল। অবশেষে—

"ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ সভা, সভ্য ভুজঙ্গম
যে যার বিবরে গেল গর্জিতে গর্জিতে।"

পরদিন ভারত-উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ হবে। প্রধান নায়ক বিপিন যুদ্ধে যাচ্ছে। তার স্ত্রী নানা কথায় বিপিনকে যুদ্ধে যেতে বারণ করলেন কিন্তু বিপিন ক্ষান্ত হলেন না। স্ত্রী প্রাতঃকালীন খালি পেটে কি করে স্বামীকে বিদায় দেবেন? তাই বললেন—

"নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়বল্লভ
নিতান্তই দাসীর কথা না রাখিবে যদি,
ফুকারি কাঁদিয়া এবে উঠিলা বিপিন।
আলুভাতে ভাত তবে দিই চাপাইয়া
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে। বিপিন সম্মত।
এইভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘরে ঘরে।"

এই 'আলুভাতে ভাত তবে দিই চাপাইয়া' আজ বাঙলায় বিদ্রূপাত্মক প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছে। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ-রসে ভরা। 'উদ্ধারে নাম শেষ সর্গে' কলিকাতা গড়ের-মাঠে ইংরেজ ও বাঙালীর যে অপূর্ব যুদ্ধ বর্ণনা আছে, তা ব্যঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের অসারতা ইন্দ্রনাথের 'ভারত ভক্তের গান'এ-ও ধ্বনিত হয়ে উঠেছে:—

(১)

"বীরত্ব আমার যত
মুখ ফুটে বলব কত
ভারত-উদ্ধারের ব্রত
নিয়ে থাকি দিনমান।
শুধু রাত্রিকালে, ইয়ার পেঁজো
গড়ের মাঠে সত্যের প্রাণ।

(২)

পোড়া ভারতের তরে
যখন আমার লোকে ধরে
ডেকে-ডুকে সভা কোরে
ইংরাজীতে ছাড়ি তান।"

'পাঁচুঠাকুর' ইন্দ্রনাথের অন্যতম কীর্তি। আজীবনব্যাপী সাহিত্য-প্রচেষ্টা। ধারাবাহিকভাবে কোন কিছু লেখা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। 'ভারত-উদ্ধার' লেখার পর ইন্দ্রনাথ ভবানীপুরে এলে 'কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ প্রমুখ কয়েকজনের চেষ্টায় ইন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'পঞ্চানন্দ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাতে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অনুবন্ধ, প্রেরিত-পত্র, সমালোচনা, কবিতা ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যময় অথচ বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশ হতো। এইসব রচনায় ইন্দ্রনাথের গতিবিধি ছিল অবাধ ও অব্যর্থ। এই পত্রিকা বন্ধ হওয়ার পর ইন্দ্রনাথ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অনুরোধে, 'বঙ্গবাসী'-তে পঞ্চানন্দ লিখেছেন, এবং গ্রন্থকারে তাই পাঁচুঠাকুর নামে প্রকাশিত হয়। পাঁচুঠাকুরের মধ্যে তৎকালীন সমাজের নানা অসঙ্গতির প্রতি তাঁর বিদ্রূপ ধ্বনিত হয়েছে। বাঙালী তখন হ্যাটকোট, নেকটাই আর মুখে সিগারেট নিয়ে আসার অপদার্থ "কেমিক্যাল সাহেবে"-এ পরিণত হয়েছে। এরা বোঝে না ইংরেজ অনুকরণে মানুষ হয় না, 'হনুকরণ' হয়। এসব দেখে ব্যঙ্গ-কবি ইন্দ্রনাথ লিখলেন :—

দে-গো তোরা দে, আমায় দে
বিলাত পাঠায়ে।
কালো কোটে অঙ্গ ঢাকি
কালো বরণ লুকিয়ে রাখি
এই কালো মুখে সাবান মাখি
কালো জনম ঘুচিয়ে।
নে-গো ঢিলে ধুতি খুলে
নেটিব আর রব না মূলে,
আমি ভার্নাকুলার যাবো ভুলে
চেয়ারে পা-ঝুলিয়ে।"

সেই সঙ্গে—"বাঙালী মন্ডামিঠাই
উঠাতে বিশ্বাস নাই
ডিম আর কাটলেট ভাল।"

বিদেশী শিক্ষার অনুকরণে উচ্চ-শিক্ষাকে ইন্দ্রনাথ বলেছেন 'ঘোড়ার ডিম'। লোকে—

"কিনিল ঘোড়ার ডিম সর্বস্ব বেচিয়া
দিল ধর্ম, দিল জাতি, দিল কুলমান
দিল পরকাল, দিল মুক্তির সোপান।"

॥ ইন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর ॥

বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার।

ভাষার সংস্কার বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলে ভাষার প্রকৃতি, ভাষার অবয়ব সংস্থান প্রভৃতি নানা দিক দিয়া ভাষার পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক। পৃথিবীতে নানা দেশ এবং দেশে দেশে পৃথক ভাষা আছে, নানা জাতি-ভেদ এবং সম্প্রদায় ভেদেও কোথাও কোথাও অসাধারণ ভাষা ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে নানা প্রকার পৃথক ভাষা বটে কিন্তু সেই হয় কোনও ভাষাই অন্য ভাষার সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ বা পরস্পর-সম্পর্কে সম্পর্কিত না হইয়া থাকিতে পারে না। বাণিজ্য ব্যবসায়ের অনুরোধে, পর্যটকদের প্রয়োজনের অনুরোধে এবং অন্য অন্য বিবিধ লোক-ব্যবহারের অনুরোধে এক ভাষা অন্য ভাষায় প্রবেশ করিয়া কোথাও অল্প পরিমাণে, কোথাও বা অধিক পরিমাণে বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং কোনও এক ভাষার সংস্কার বিষয়ে যিনি চিন্তা করিতে ইচ্ছা করেন নানা ভাষায় তাঁহার অধিকার থাকা আবশ্যক।

শেষ পর্যন্ত "দিন যায় রাতি যায় এইভাবে
ফাটিল ঘোড়ার ডিম কালের প্রভাবে
অপূর্ব জন্মিল জীব অদ্ভুত আকারে,
বিতিকিচ্ছি বস্তু এক নারি বর্ণিবারে।"

এই 'পাঁচুঠাকুর'-এর মুখপাতে স্বয়ং ইন্দ্রনাথ বলেছেন—"রহস্য ও রসিকতা এক পদার্থ নহে। আমি সরস রহস্য লিখিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। কিন্তু শুধু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই। ইহা যেন পাঠক মহাশয়দের, এখন আবার বলিতে হয় পাঠিকা মহাশয়াদের মনে থাকে। বাঙলায় এখন হাসিবার কিম্বা হাসাইবার দিন আইসে নাই। তবুও যে লোকে হাসে সে আমার কপালগুণে এবং হাসকদের বুদ্ধির অনুগ্রহে।"

পাঁচুঠাকুরের ভাষায় ও ভঙ্গিতে হাসির তরঙ্গ উঠবে তা ঠিক কিন্তু সেই হাসির মধ্যে এক নিগূঢ় ইঙ্গিতের সন্ধান পাওয়া যায়। মনে নানাবিধ গভীর প্রশ্ন উদিত হয়। রস ও রসিকতার আচ্ছাদন ভেদ করে জাতীয় রহস্যের এক সন্ধান পাওয়া যায় 'পাঁচুঠাকুর'-এ। ইন্দ্রনাথ কথিত "হাসিবার বা হাসাইবার" দিন এ-যুগে বোধহয় যথার্থভাবে এসেছে।

আজ ইন্দ্রনাথকে জানা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। ইতিহাস বিবর্তন ধারায় এক অতীত অধ্যায় তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে। তাঁকে না জানলে, তাঁর মনের জ্বালা ও লেখনীর দংশন অনুভব না করলে ইতিহাসের সমগ্র পরিচয় আধুনিকদের কাছে অনুদ্ঘাটিত থাকবে।

প্রবোধকুমার সান্যাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

।। সাতাশ ।।
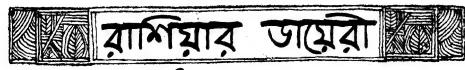
আমার বিদায় নেবার কাল এবার আসন্ন। টান দিচ্ছে আমার জন্মভূমি। সেটি মায়ার টান। মহামায়ার মায়ার খেলা! এবার ঝুলি কাঁধে তুলে বিদায় নেবো।

সোভিয়েট ইউনিয়নে পদার্পণ করার কালে একদা সেই ঝুলি আমার নানা সামগ্রীতে পূর্ণ ছিল। সংশয়, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, ভয় এবং সর্বোপরি কঠিন একটা বীতরাগ। কিন্তু যাবার সময় সেই ঝুলি তেমনি ভারী রইল কিনা, দেশে ফিরে গিয়ে তার বিচার করব। আমি বিপ্লবের পূজার দেশে এসেছিলুম, এসেছিলুম চোখরাঙ্গার দেশে, রক্ত-পাশবতা-হিংসা-ক্রূরতার দেশে, কুটিলতা-চাতুরি-ষড়যন্ত্র-লৌহযবনিকার দেশে! কিন্তু দেখে যাচ্ছি তার একটা বিপরীত জগৎ,—যেখানে নিত্যপ্রসন্ন শান্তি, এবং প্রসারিত দুই বাহুর উদার বন্ধুত্ব! আমার ভুল ভেঙেছে অনেক।

'সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়ন' আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন প্রচুর এবং আবদার মিটিয়েছেন অনেক। তাঁদের স্বচ্ছন্দ আতিথেয়তা এবং সহনশীলতার উপর জুলুম করেছি অনেকবার,—তাঁরা মধুর সৌজন্যে সেগুলি বরদাস্ত করেছেন। তাঁদের আধুনিক সাহিত্য এবং তাঁদের ওই 'নিয়ন্ত্রিত' সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মোহ কম, এটি জানা সত্ত্বেও তাঁদের অকৃপণ আতিথেয়তায় কোনও কুণ্ঠা ছিল না। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান এবং ট্রেড-ইউনিয়ন বৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টি তথা গভর্ণমেন্টের এক-একটি টুকরো। প্রত্যেকটি টুকরোই লৌহকঠিন। বহুবার মনে হয়েছে এ যেন দেশজোড়া এক বিরাট ঊর্ণনাভের জাল, এবং তার মূলকেন্দ্রে যে-প্রাণকুণ্ডলী নিত্যজাগ্রত হয়ে বসে রয়েছে, সে হ'ল সেই কালান্তক মহাকাপালিক লেনিন,—অযুত নিযুত সংখ্যক নরকপালের আসনের উপর ব'সে যে-ব্যক্তি আধুনিক সোভিয়েট ইউনিয়ন রচনার বীজমন্ত্র পাঠ করেছিল!

কে না জানে, পৃথিবীর এই এক-ষষ্ঠমাংশ ভূভাগ মাত্র ৫০ বছর আগেও ছিল ঐতিহাসিক কলঙ্কে মসীলিপ্ত। এ যেন ছিল এক বিরাট 'জঞ্জালের পাত্র'। যুগে যুগে অগণিত সংখ্যক মনীষী ও প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছিল এই ভূভাগে, একের পর এক ঋষি এদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন! কিন্তু কদাচারী রাষ্ট্র, পরস্বাপহারী গোষ্ঠী, বন্য ও বর্বর সম্প্রদায়, দাঙ্গাকারী ধর্মান্ধ শ্রেণী, প্রতারক-ডাকাত-হত্যাকারী-সর্বহারা ও শয়তানের দল,—এরা সবাই মিলে বৃহত্তর জনজীবনের উপর কায়েমী রাজ্যপাট বসিয়েছিল! তারপর এল মানহারা সর্বহারা সর্বপরিচয়হারা মানুষের দল। তারা নিয়ে এল দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী বিপ্লবের যুগ,—১৯০৫-এ যার আরম্ভ, ১৯১৭-এ যার শেষ! কিন্তু শেষ নয়, কেননা ওই দ্বাদশবর্ষে যথেষ্ট রক্ত ঝরেনি! কাপালিকের খড়্গাঘাত তখনও বাকি। অতঃপর যে-আগুন জ্বলল, যে-মৃত্যু চলল, যে সর্বনাশ আরম্ভ হয়ে গেল,—তাতে ছারখার হতে লাগল হাজার হাজার বছরের কদভ্যাস, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, ক্রূরতা, স্বার্থপরতা, শ্রেণীবৈষম্য, অনাচার, এবং ইতর ও অসৎ জীবনযাত্রার সমস্ত আবর্জনা! 'ঊষাকালের আগে রাত্রির সর্বশেষ লগ্ন সর্বাপেক্ষা অন্ধকার।' নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের যুগ হ'ল প্রায় লেনিনের মৃত্যুকাল অবধি! কিন্তু এই কাপালিক সেই ঘন অন্ধকারে মশাল হাতে নিয়ে চারিদিকের শ্মশানপ্রান্তরের বহু শবদেহের কানে-কানে মৃত-সঞ্জীবনীর অমোঘ মন্ত্রপাঠ করেছিলেন! লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রকৃত কর্মজীবন আরম্ভ! বলশেভিকবাদ স'রে গিয়ে এসে দাঁড়াল সাম্যবাদ বা সমতাবাদ!

কিন্তু আশ্চর্য, জনজীবনের মন চির-বিস্ময়ের আকর! মৃত্যু আর ধ্বংসকে মনে রাখে না কেউ। যে-আধুনিক জীবন দেখে যাচ্ছি, সেটি হাস্যোজ্জ্বল। অতীত কালের হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্তের দাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু রাষ্ট্রের রক্ত-পতাকা,—কিন্তু তার নীচে বিরাট ভূভাগব্যাপী সেই নিত্যকালের হরিৎ-সম্ভার! নবজীবনের সমারোহ ঘটেছে চারিদিকে। রুশ সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সম্রাট দ্বিতীয় নিকলস ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান ধনী, সোভিয়েট ইউনিয়ন সেই ঐতিহ্য বহন ক'রে আজ মাত্র ৪৫ বছরের মধ্যে সামগ্রিকভাবে হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় ধনীশ্রেষ্ঠ! শুধু ধন নয়, শুধু সম্পদ নয়, বিজ্ঞানের পরমাশক্তির বলে মহাকাশকেও সে শাসন ক'রে চলছে! পৃথিবীর হৃৎকম্প ঘটছে সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকে চেয়ে!

হোটেল উক্রাইনায় সম্প্রতি কয়েকজন ভারতীয় আইনজীবীর আবির্ভাব ঘটেছে। এঁরা হচ্ছেন, "Lawyers' Delegation." এঁরা সকলে এসেছেন সোভিয়েট আইন-সভা ও আইন-কানুনের প্রয়োগ এবং সোভিয়েট সুপ্রীম কোর্টের কার্যাবলী পরিদর্শন করতে। ভারতের নানা প্রদেশ থেকে অনেকেই এসেছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে বাঙ্গালী তিনজন আমার পরিচিত। শ্রীযুক্ত অশোককুমার সেন হলেন এই ডেলিগেশনের নেতা, এবং তাঁর দলের মধ্যে রয়েছেন অন্য দুজন বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীযুক্ত স্নেহাংশু আচার্য ও নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে নির্মলবাবু ইংরেজি 'এন-সি-চ্যাটার্জি' নামে পরিচিত। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, এবং প্রাক্তন জজ। তিনি উদার, অমায়িক এবং বন্ধু-বৎসল। সামাজিক জীবনে তিনি অতিশয় জনপ্রিয়। কিন্তু তাঁর রাজনীতিক 'বর্ণ' এখনও আমার কাছে সঠিক হয়নি। হিন্দু মহাসভা, জনসঙ্ঘ, রামরাজ্য, প্রজা-পরিষদ, আর-এস-এস, এবং ভারতের সর্বশেষ বিস্ফোটক 'স্বতন্ত্র দল'—এদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত না জানলে নির্মলবাবুকে ঠিক বুঝতে পারা যায় না! ভারতীয় কমিউনিস্টরা তাঁকে দিন-কয়েকের জন্য আত্মীয় মনে করেছিল কেন, এটি আমার জানা নেই। কিন্তু উক্রাইনা হোটেলেই একদিন নির্মলবাবু

অভিভূত কণ্ঠে আমাকে বললেন, "বাইরে থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে নানা মন্তব্য করেছি নানা সময়ে। কিন্তু এখানে না এলে এর সত্য পরিচয় কোনদিনই জানতে পারতুম না! চারিদিকে যা দেখছি তা অভাবনীয়!"

ভারত গভর্ণমেণ্টের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন এবং ব্যারিষ্টার শ্রীস্নেহাংশু আচার্য— এ'রা উভয়ে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ'দের মাঝখানে আমি বেমানান। কিন্তু এখানে আমার 'নিঃসঙ্গ ও নিবান্ধব' বসবাস তাঁদের পক্ষে ঔৎসুক্যের কারণ ছিল। অশোক-বাবু স্বভাবতই মিষ্টপ্রকৃতি এবং প্রীতিপরবশ। সম্ভবত সেই কারণেই তাঁর ঘরে আমার জরুরী আমন্ত্রণ জুটে গেল। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর আমন্ত্রণরক্ষা অতঃপর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এই কৃত-বিদ্য ব্যক্তি আমার নিকট বিশেষ শ্রদ্ধানুরাগের পাত্র।

শ্রীযুক্ত স্নেহাংশু আচার্য মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের একজন বিশিষ্ট সভ্য। এই সজ্জন, হৃদয়বান এবং প্রফুল্লপ্রকৃতি ব্যক্তির প্রতি মনে মনে বহুদিনের অনুরাগ বহন করেছি। ইনি ময়মনসিংহের আচার্য-চৌধুরী বংশের সন্তান,—যাঁরা এই সেদিনও 'মহারাজা' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। এ'রা 'মুক্তা-গাছা'র খ্যাতবিখ্যাত জমিদারগোষ্ঠী এবং এ'রা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। স্নেহাংশু হলেন মহারাজা জগৎ-কিশোরের পৌত্র এবং মহারাজা শশী-কান্তের পুত্র। ইনি একজন বিশেষ ধনবান কমিউনিস্ট। এ'র সৌজন্য, অমায়িক ব্যবহার এবং সতেজ তারুণ্য এ'কে বহুজনপ্রিয় করেছে।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এমন অগণিত সংখ্যক কর্মী এবং নেতা আছেন যাঁদের বিদ্যা, মনীষা, পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানগম্ভীরতা বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। কিন্তু তাঁদের একক চিন্তাধারায় যেমন বিজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তাঁদের দল-বদ্ধ সিদ্ধান্তে ঠিক তেমনি প্রকাশ পায় অজ্ঞতা! কমিউনিস্ট ব্যক্তি এবং কমিউ-নিস্ট দল,—উভয়ের মধ্যে নিত্য-অসংলগ্নতা বিদ্যমান। প্রথমটি বহুদর্শী, দ্বিতীয়টি অদূরদর্শী। ব্যক্তি হ'ল বুদ্ধির প্রতীক, দল হ'ল দুর্বোধ্যতার প্রতীক। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিদ্যা ও প্রতিভাকে যখন পর্বতপ্রমাণ মনে ক'রে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ঈষৎ অগ্রসর হই, তখন দেখি তাঁরা 'মূষিক' প্রসব করেছেন!

এই হোটেলেরই নীচের তলায় অপর একজন ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি 'জাতীয়তাবাদী' কমিউনিস্ট শ্রীযুক্ত এস-এ-ডাঙ্গে। ইনি খর্বকায়, প্রবীণ এবং মারাঠি। ইনি এসেছেন সপরিবারে। আমি নিজে কেন এখানে আছি এ যেমন জানিনে, ডাঙ্গে কেন এখানে এসেছেন, সেও তেমনি আমার অজ্ঞাত! কিন্তু একটি বস্তু আমার নিকট স্পষ্ট। কোনও ভারতীয় কমিউনিস্টের মুখে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের প্রকৃত পরিচয় অদ্যাবধি শুনিনি! স্তাবকতা ও চাটুবাক্যের মধ্যে নির্ভুল চিত্র নেই! মৌখিক সুখ্যাতির মধ্যে জীবনের সত্যস্বরূপকে দেখিনে। একথা কেউ বলতে চায় না, সোভিয়েট রাষ্ট্র তার ২০।২২ কোটি নরনারীর প্রাচীন কদভ্যাস, কুপ্রবৃত্তি, নোংরা প্রকৃতি, কুসংস্কার, অসৎ ভাবনা ও ব্যাধিগ্রস্ত বুদ্ধিকে কঠিন ও দয়াহীন শাসনদণ্ডের দ্বারা নির্মূল ক'রে একটি নূতন মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছে,—যার সঙ্গে পৃথিবীর অধিকাংশের মিল নেই! একশ' বা দু'শ বছর পরে এই মানবজাতির ভবিষ্যৎ কি প্রকার দাঁড়াবে, কেউ জানে না! কমিউনিজমের বিরাট গবেষণাগার সোভিয়েট ইউনিয়নে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে। জন-গণের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত, না রাষ্ট্রের দ্বারা জনগণ পরিচালিত,—এর নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। সমগ্র সোভিয়েট ইউ-নিয়নের ২০।২২ কোটি নরনারী শ্রমিকে অথবা মালিকে পরিণত, এটির নির্ভুল সিদ্ধান্ত এখনও কেউ গ্রহণ করেনি। সোভিয়েট সভ্যতার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর, এখনও তার শৈশব উত্তীর্ণ হয়নি! মিঃ খ্রুশ্চভ সেই কারণে আরও ২০ বছর সময় নিয়েছেন এই সভ্যতার পরিণত রূপকে প্রকাশ করার জন্য! উৎসাহের কথা এই, স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে এই সভ্যতা মানবতাবাদের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে চলেছে। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এবং লোকযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে জনকল্যাণের মূল লক্ষ্য থেকে এখানে কেউ ভ্রষ্ট হয়নি। কিন্তু তারা উদ্যত শাসনদণ্ডের নীচে ভীতচক্ষু কিনা, এটি ধীরে ধীরে প্রমাণিত হবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের পরিচয় অতি অল্পকালের। এখনও চলছে মন জানাজানি, কটাক্ষ বিনিময়, চিঠি লেখালেখি! ভালবাসার দস্তুর এখনও হয়নি। বন্ধুত্বটা এখনও মৌখিক, কিছু ব্যবহারিক, কিছু বা অর্থনৈতিক। এক পক্ষ আসছে নাচ দেখাতে, অন্য পক্ষ যাচ্ছে গান শোনাতে।

এখনও চলছে 'মৃদু হাসি টুকরো কথার নানান জোড়াতাড়া।' ভারতবর্ষ যতটুকু অগ্রসর হয়েছে, সোভিয়েট রাষ্ট্র তার চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়ে এসেছে! কিন্তু উভয়ের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনের পক্ষে দুটি প্রধান অন্তরায় বর্তমান। একটি ভয়, অন্যটি সংশয়। বিগত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গারিতে কমিউনিস্ট-বিরোধী জাতীয়তাবাদীদের গণ-অভ্যুত্থান সোভিয়েট রাষ্ট্রের দ্বারা ধর্ষিত হয়, এবং সেখানে ২৫ হাজার নরনারীর মৃত্যু ঘটে! ভিন্ন এক রাষ্ট্রের জনগণের উপর প্রবলের এই দুর্ধর্ষতা লক্ষ্য ক'রে ভারতের মন শঙ্কিত হয়ে ওঠে! পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েট-শক্তির কর্ম-তৎপরতার চেহারা কি প্রকার, সেটির প্রকৃত চেহারা না জানা অবধি ভারতের মন নানা দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হ'তে থাকে। দ্বিতীয় অন্তরায় হল, চীনের কর্তৃপক্ষের আচরণ। চীন জাতির জনসাধারণ যেমনি শান্তিপ্রিয় এবং মিষ্টভাষী, চীনের শাসকগোষ্ঠী অবিকলভাবে তার বিপরীত! হিমালয়ের প্রতিটি পাহাড়ে এক-একবার খোঁচা দিয়ে তাঁরা জানতে চেয়েছেন, সেই খোঁচা ভারতের গায়ে লাগে কিনা! তিব্বতের সঙ্গে সিংকিয়াংকে সংযুক্ত করার জন্য তাঁরা নিঃশব্দে 'আকসাইচিনের' যে-অংশটি রাতারাতি দখল করেছেন,—সেটি ভার-তীয় অঞ্চল বলে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে! কিন্তু প্রমাণ হওয়া এক জিনিস,—ফিরিয়ে দেওয়া অন্য কথা! অন্যমনস্ক ব্যক্তির পকেট থেকে নিঃশব্দে কাগজের টাকা তুলে নেবার পর অপরাধী যদি ধরা পড়ে, তখন সে নোটের উপর ময়লা আঙ্গুলের দাগ দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা পায়, এ টাকা তারই! চীনের নিরীহ এবং নির্লোভ জনসাধারণ অতিশয় হতভাগ্য। ভারত এবং চীনের দু' হাজার বছরের আত্মীয়তার উপরে যারা এই বিংশ শতাব্দীতে অশ্রদ্ধার কালি মাখিয়ে দিল, চীনের মিষ্টপ্রকৃতি অধিবাসীরা মনে মনে তাদেরকে মার্জনা করেছে কিনা এ খবর পাইনি এবং পাবার উপায়ও নেই! সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, মানবতার মহিমায়, ভাস্কর্যে, চারু ও দারুশিল্পে, প্রাচীন সভ্যতার গৌরবে—চীন জাতি প্রাচ্যলোকের গর্ব-স্বরূপ। কিন্তু সেই চীন আজ তার সমস্ত গৌরব হারাতে বসল পৃথিবীর ভদ্রসমাজের সামনে! এশিয়া এবং

ইউরোপের প্রত্যেক কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সম্বন্ধে ভারতের মন যে সংশয়াতুর, তার জন্য চীনের দায়িত্বই প্রধান। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কথায় ও কর্মে এখনও সম্পূর্ণ মিল খ‌ুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! সেইজন্য চীনের শাসকগোষ্ঠীর মুখে 'পঞ্চশীল'-এর উচ্চারণ শুনে ওটাকে 'ভূতের মুখে রাম নামের' মতো মনে হচ্ছে! বাস্তবিক, মাত্র দশ বৎসর কালের মধ্যে একটা অত্যুচ্চ সংস্কৃতিবান জাতির এমন নৈতিক অপযশ আর কোনও দিন কেউ বরদাস্ত করেনি!

বেশী দিনের কথা নয়, চীন জাতি যখন জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, সেই কালে অর্থাৎ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর তারিখে তৎকালীন চীনা লাল-ফৌজের অন্তর্ভুক্ত অষ্টম রুট সৈন্য-বাহিনীর অধিনায়ক এবং বর্তমান লালচীনের সর্বপ্রধান সেনাপতি মার্শাল চু-তে শ্রীযুক্ত জওয়াহরলাল নেহরুর নিকট যে পত্রখানি লেখেন তার মধ্যে যে সকাতর আবেদনটি ছিল, সেটি এই সূত্রে একবার স্মরণ করি :

"এই (চীনা) স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র আছে, কিন্তু তাদের কোনো শীতবস্ত্র নেই, কম্বল নেই, জুতো নেই; কখনও যৎসামান্য খাদ্যের সংস্থান থাকে, আবার কখনো বা একেবারেই থাকে না। সম্প্রতি দু' হাজার লোকের একটা দল এই প্রদেশের (উত্তর চীন) উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আমাদের সৈন্যবাহিনীর এক ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আমরা তাদেরকে মাত্র এক হাজার চীনা ডলার দিতে পেরেছি, অর্থাৎ গড়ে জনপ্রতি ৫০ সেন্ট। এ টাকায় একসপ্তাহকাল যাবে। আমাদের সমস্যা এত বিরাট যে, আমরা স্বেচ্ছাবাহিনীর প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম। মিস স্মেডলী বলেছিলেন, আমরা আপনার কাছে আবেদন করতে পারি এবং তাঁর নিশ্চিত ধারণা যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, যার সভাপতি আপনি,—কিছু অর্থ দান করবেন এবং সেটি আমাদের সৈন্যবাহিনী স্বেচ্ছা-সেবকদের দিতে পারব। এটুকু জানবেন যে, আপনাদের দানের প্রতিটি আনা সাদরে গৃহীত হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক-দের হাতে পৌঁছবে, যাতে তারা এই মুক্তিসংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে! চীনা স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীর নামে চাঁদা সংগ্রহের জন্য আপনি একটা সমিতি গঠন করতে পারবেন বলে মনে করি। যদি সম্ভব হয় তাহলে এখনই করুন। আমরা জানি আপনার দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী আমাদের এই সংগ্রামে সহানুভূতিশীল এবং তাঁরা এতে সাহায্যের জন্য কিছু কিছু দিতে রাজী হবেন।"

এই পত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত নেহরু কি প্রকার জবাব পাঠিয়েছিলেন সেটি আমার জানার দরকার নেই। কিন্তু রক্তিম চীনের বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত মাও সে-তুং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে 'শেনসি' নামক এক জনপদ থেকে সেদিন জওয়াহরলালকে যে পত্র-খানি পাঠান, তার একটি অংশ এখানে উদ্ধার করি :

"প্রিয় বন্ধু,

ডাক্তার এম-অটলের নেতৃত্বে যে মেডিক্যাল ইউনিটটি এসেছেন তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে, এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত চীনের জনগণের উদ্দেশে প্রেরিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শুভেচ্ছা ও উৎসাহের বাণী পেয়ে আমরা বিশেষভাবে আনন্দ-লাভ করেছি। আপনাকে জানাতে চাই যে, ভারতীয় মেডিক্যাল ইউনিট তাঁদের কাজ সুরু ক'রে দিয়েছেন এবং সমগ্র 'অষ্টম রুট আর্মি' তাঁদেরকে স্বাগত সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। তাঁরা যেভাবে হাসিমুখে ও স্বেচ্ছায় আমাদের দুঃখ-দুর্দশার ভাগ নিচ্ছেন, তা তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন তাঁদের সকলের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে! এই সুযোগে মহান ভারতীয় জনগণ ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—যাঁরা এই মেডিক্যাল ইউনিট ও 'অন্যান্য সাহায্য' পাঠিয়েছেন আমা-দেরকে—তাঁদের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করি ভবিষ্যতেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের জন-সাধারণের 'অবিচ্ছিন্ন সাহায্য' আমরা লাভ করব......আপনাকে আমাদের ধন্য-বাদ, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক প্রীতি নিবেদন করি।"

এই পত্রালাপের ২০ বৎসর কাল পরে বিগত ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখে লাদাখ অঞ্চলের ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ ক'রে লাল-চীনের এক দল সৈন্য অতর্কিতভাবে ভারতীয় প্রহরীদলের উপর গুলী চালায়। এই আক্রমণের পর চীনের সামরিক বাহিনীর সৈন্যরা ৯টি ভারতীয়ের মৃতদেহ এবং ১০ জন ভারতীয় প্রহরীকে বন্দী ক'রে নিজদের এলাকায় নিয়ে চলে যায়!

কিন্তু রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত মাও সে-তুং, চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এবং প্রধান সেনাপতি চু-তে,—এ'রা কেউ ভারতীয় মৃতদেহগুলির সৎকার করেননি! কেন করেননি, তার কারণটি তাঁরা ভেবে রেখেছিলেন। অর্থাৎ এই ঘটনার ঠিক ২৩ দিন পরে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী, উদারপন্থী এবং শান্তিবাদী ভারতবরেণ্য জওয়াহরলালের জন্মদিনের প্রভাতে উক্ত ৯টি ভারতীয় মৃতদেহ ভারতবাসীকে উপহার দেওয়া হয়! সেই দিনটি ছিল ১৪ই নভেম্বর, শনিবার, রাসপূর্ণিমার প্রাক্কাল! পৃথিবীর সকল দেশের রাষ্ট্রনায়করা যখন নেহরুর প্রতি

সেদিন অভিনন্দনবার্তা পাঠাচ্ছিলেন, তখন চীন কর্তৃপক্ষের এই সভ্যতা-লেশবর্জিত বীভৎস আচরণে শৈবভারত সেই গরল পান ক'রে নীল-কণ্ঠে পরিণত হয়েছিল! নেহরুর কিছু অপরাধ ছিল বৈকি! প্রাণভয়ভীত ধর্মগুরু দলাই লামা চীনের অবরোধ এড়িয়ে ভারতের উদার আতিথেয়তার নীচে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, এবং নেহরু তাঁকে পুনরায় অসম্মানের দিকে ঠেলে দিতে চাননি! প্রত্যেক কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে সেদিন চীন কর্তৃপক্ষ কলঙ্কিত করেছিলেন!

ভারতীয় প্রহরীদলের এই অপ-মৃত্যুতে মিঃ খ্রুশ্চভ সেদিন মর্মাহত হয়েছিলেন এবং রক্তিম চীন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন লাদাখ এবং অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চল থেকে চীনা সৈন্যদলকে প্রত্যাহার ক'রে নেন এবং নেহরুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেন!

চীন কর্তৃপক্ষ খ্রুশ্চভের অনুরোধ রাখেননি! ড্রাগন তার ধারালো দংষ্ট্রায় লাদাখের পূর্বাংশ কামড় দিয়ে আজও ধরে রয়েছে! চিবোয়নি, গেলেনি, উদ্‌গীরণও করতে চায় না! শুধু তার দুর্বোধ্য হিংস্র-চক্ষু শিকারের দিকে তাকিয়ে দপদপ ক'রে জ্বলছে! এ জন্তু প্রাগৈতিহাসিক আমলের, একালে এর জুড়ি মেলে না!

তাসকন্দের লেখক এহসান রহিমভ একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, "মধ্য-এশিয়ায় ও দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়ায় জনসংখ্যা বাড়াবার জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা পাচ্ছেন, এবং প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি-রাজধানীতে এ সম্বন্ধে সর্বব্যাপী প্রচারকার্য চলছে! সোভিয়েট মধ্য-এশিয়ার ধনসম্পদের প্রাচুর্য ভোগ করার মতো জনসংখ্যা দেশে নেই।" সরলমতি রহিমভের মনে একথা সেদিন আসেনি যে, সোভিয়েট জন-সংখ্যার তিনগুণ বেশি হল চীনের জন-সংখ্যা! সোভিয়েট তুর্কিস্থান এবং সোভিয়েটপন্থী 'আউটার মঙ্গোলিয়া'র ব্যাপারে নব চীন কর্তৃপক্ষের মনে কিছু প্রাচীন ক্ষোভেরও সঞ্চার আছে, এটি আমার বিশ্বাস। সোভিয়েট ইউনিয়ন এখন আন্তরিকভাবে শান্তিবাদী, কিন্তু চীন কর্তৃপক্ষ বিনাযুদ্ধে ক্যাপিটালিস্ট জগতের উচ্ছেদে বিশ্বাস করেন না! সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তি প্রচার এবং স্টালিনোচ্ছেদের ব্যাপার নিয়ে চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে মনোমালিন্য চলছে, তার পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেউ জানে না। উভয়ের প্রকৃতির মধ্যে স্পষ্টতঃ মূল পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু সেই পার্থক্যের উপরে মৌখিক বন্ধুত্বের চাদর মুড়ি দেওয়া রয়েছে!

স্টালিন আমলের সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীকে জানতে চায়নি এবং নিজে-দেরকেও জানতে দেয়নি। সেই অব-রোধের কালে অনুন্নত চীনের দরজা ছিল খোলা। উভয়ে এক পাড়ার লোক, খিড়কি দরজা দিয়ে আনাগোনা আর জানাশোনার ফলে বন্ধুত্ব জমে গিয়েছিল! এর ছেলের সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়েবাদীও কিছু হয়েছিল। কিন্তু স্টালিনের মৃত্যুর পর মিঃ খ্রুশ্চভ বন্ধ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে আরেকটা জগৎ আছে, সেটার নাম সভ্য জগৎ এবং সেখানকার মুক্ত মধুর বাতাস ক্রেমলিনের হাওয়ার মতো থমথম করে না! পৃথিবীর নানা দেশে যত পরিমাণ তিনি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরেছেন, ঠিক তত পরিমাণেই স্টালিন সম্বন্ধে তাঁর গা বমি-বমি করেছে! সেই স্টালিনের পুরনো রীতি ও নীতি আঁকড়ে ধ'রে চীন যদি পুরনো আমলের জীর্ণ থিয়োরী নিয়ে শুধু শ্লোগান আওড়ায়, তবে ভদ্রমন যেমন বিরক্তিতে ভ'রে ওঠে, তেমনি চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের **'eternal friendship'**-এও ফাটল ধ'রে যায়! মিঃ খ্রুশ্চভের এই প্রগতি-শীল চিন্তা সোভিয়েট ইউনিয়নে একটি নূতন ধরণের ক্ষুধা সৃষ্টি করেছে!

অতি-আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্যে এবং কাব্যে এই নূতন ক্ষুধার দাগ পড়ছে! কবিতার মধ্যে মাঝে মাঝে ঝলসিত হচ্ছে কেমন যেন একপ্রকার দুর্বোধ্য নৈরাশ্য, ছিদ্রান্বেষণের কৌতুক, জটিল এক প্রশ্ন এবং তার সকৌতুক মীমাংসা! লেখকদের মনে এসেছে যেন অসন্তোষ, তাদের ডানার মধ্যে এসেছে সুদূরের ডাক, জীবনের মধ্যে গভীর অতৃপ্তিবোধ, এবং বাইরের বায়ুর ঝাপটে তাদের ঘরের দরজা যেন আচমকা খড়খড়িয়ে উঠছে! সোভিয়েট সাহিত্য এবার ঘর ছেড়ে পথে বেরোতে চায়!

* * *

'বলশয় থিয়েটার' সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্যের কথা শ্রীমতী লিডিয়ার জানা ছিল। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কোনও দেশের থিয়েটার এবং অপেরা রুশ থিয়েটারের সমকক্ষ নয়—এটি সর্ববাদী-সম্মত। বলশয় থিয়েটারে কেবল নাচগান ও পালা নাট্য মঞ্চস্থ হয়, এবং এই রঙ্গালয় জার সম্রাটগণের আমলের সর্ব-শ্রেষ্ঠ রুচি ও আভিজাত্যের পরিচয় আজও বহন করে। অন্যান্য ভারতীয়-গণের অবস্থানকালে এই থিয়েটারে মেরামতি ও রংরেজির কাজ চলছিল। সম্প্রতি এর দ্বার খোলা হয়েছে। শ্রীমতী লিডিয়া যখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে এই রঙ্গালয়ের সোপানশ্রেণী বেয়ে উপরে উঠলেন, তখন এর একেকটি স্তম্ভের বিশালতা ও প্রবেশপথের বিস্তার এবং আভিজাত্য রাজপ্রাসাদকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

এই বিশ্বাস এখনও আঁকড়ে ধ'রে আছি, সম্রাটদের যুগ ছিল স্বর্ণযুগ! বিদেশীর চক্ষে যা কিছু সুশ্রী, সুরুচি-পূর্ণ, সৌন্দর্য ও মহিমাময়, আনন্দ-দায়ক, বিস্ময়কর,—তার প্রায় সমস্তই জারের আমলের। এগুলি এখন **'people's property'** বলে চলছে। বলশয় থিয়েটারের প্রথম পত্তন হয় রমানভ বংশের রাজত্বকালেরও আগে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এই থিয়েটারটি আগুনে লেগে ভস্মীভূত হয়। অতঃপর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট প্রথম আলেকজান্দারের আমলে এর পুনর্নির্মাণ কার্য চলে এবং ওই বছরেই আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর সম্রাট প্রথম নিকলাস এই রঙ্গালয়ের দ্বারো-দ্ঘাটন করেন। মস্কো তখন 'দ্বিতীয় শ্রেণীর' শহর। তারই পটভূমিতে এই বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা গ'ড়ে ওঠে। এই বলশয় থিয়েটারে শুধু যে নাচ-গান-পালানাট্যই মঞ্চস্থ হয় তা নয়, এখানে অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়রা আপন আপন নাটক অভিনয় করেও যায়। বাইরে থেকে আসে লোকনৃত্য ও লোক-নাট্য—তারাও তাদের পালা দেখিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। মস্কোয় মোট ৩০টি থিয়েটার বর্তমান,—এবং এ নগরের ৩০ হাজার নরনারী ও বালক-বালিকা প্রতি-দিন প্রতি থিয়েটারকে জনপূর্ণ ক'রে রাখে। সর্বসমেত প্রতি সন্ধ্যায় গড়ে ৬ লক্ষ টাকা পরিমাণ টিকিট এই থিয়েটার-গুলিতে বিক্রি হয়। সিনেমাগুলির হিসাব আমি জানিনে। লক্ষ্য করেছি, সিনেমা অপেক্ষা থিয়েটার রুশ জাতির বেশী প্রিয়। এবং তারও চেয়ে প্রিয় ক্লাসিক নাটক, পালানাট্য ও অপেরা। যাঁরা উচ্চাঙ্গ রসের রসিক তাঁরা সিনেমা তেমন পছন্দ

করেন না! বাঙ্গলার শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় সিনেমা-চিত্রের প্রতি বিশেষ বিরক্ত ছিলেন।

'বলশয়' শব্দটির অর্থ, বৃহৎ বা মহৎ। ভিতরে প্রবেশ করার পর মহামুনি বাল্মীকিবর্ণিত স্বর্ণলঙ্কাপুরীর দৃশ্যটি মনে আসে। ভিতরটি ৬ তলা, এবং আগাগোড়া স্বর্ণদ্যুতিমান! প্রত্যেকটি আসন স্বর্ণরঞ্জিত এবং রক্তনীল লোহিত-বর্ণ মখমলের দ্বারা বাঁধানো। প্রতিটি চেয়ার সিংহাসনের মতো লতা ও কল্কায় বিচিত্রিত। সমগ্র প্রেক্ষাগৃহতলে লাল মখমল ঢালা। তার উপর দিয়ে হে'টে গেলে পা-দুখানা ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হতে থাকে। সকলের উপরতলাকার সাহেব-মেমরা সাধারণত দূরবীনের সাহায্যে মঞ্চের অভিনয় দেখে! কিন্তু ঘাড় তুলে সেই উপরতলাকার ব্যক্তি-দেরকে নীচের থেকে দেখতে গেলে আমার পক্ষেও দূরবীন হাতে নেওয়া দরকার! উপরের লোকগুলি যেন অতি-ক্ষুদ্রাকার মানবক। এই রঙ্গালয়ের ভিতরটি অর্ধচন্দ্রাকার, এবং এর দ্বিতলের ঠিক মধ্যকেন্দ্রস্থলে সম্রাটের সিংহাসন-সদৃশ একটি চতুর্দোলার মতো চতুষ্কোণ 'গৃহাসন'! সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর জন্য যে দুটি আসন প্রায় শতবর্ষকাল অবধি সংরক্ষিত থাকত, সেই আসন দুটির দিকে নীচের থেকে চেয়ে দেখলুম, দুটি নতুন কালের মানুষ এসে বসেছেন! তাঁদের একজন হলেন মিঃ খ্রুশ্চভ, এবং অন্যজন তারই বিশিষ্ট অতিথি মিঃ গোমুলকা, —পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বাধিনায়ক।

মস্কোর ৩০টি থিয়েটারে প্রতি সন্ধ্যা ঠিক ৭-৩০ মিনিটে যবনিকা ওঠে। কোনও থিয়েটারে এর এক সেকেণ্ডের ব্যতিক্রম নেই। তারপর সেই যে নিঃঝুমে নীরবতা নামল প্রেক্ষাগৃহে,—সেটি অটল গাম্ভীর্য এবং উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল!

কে যেন মায়াবলে একটি অপ্সরা-লোকের দ্বারোদ্ঘাটন করল! প্রেক্ষাগৃহটি বাস্তব এবং সেই মায়ালোক অবাস্তব! কিন্তু মঞ্চের বিস্তৃতি এমন প্রসারিত যে, বাস্তব এবং অবাস্তব দুইয়ে মিলে একাকার হয়ে গেল। তখন আমি দর্শক আর নই, এই মায়াজগতেরই আমি একটা অবিচ্ছেদ্য অংশমাত্র! এই অদ্ভুত উপলব্ধির ফলে আমিও যেন তলিয়ে গেলুম সেই তন্দ্রাতুর মায়াচ্ছন্ন অপ্সরা-লোকে এবং জগৎপ্রসিদ্ধ ব্যালে-নর্তকী প্রতিভাময়ী 'শ্রীমতী উল্লানভা' যেন আমাকেই সাক্ষী রেখে সেই ইন্দ্রলোকে বিঘূর্ণীত নৃত্য ক'রে যেতে লাগলেন! আমার পার্শ্ববর্তিনী শ্রীমতী লিডিয়া মৃদু গলায় এই নাচের আঙ্গিকটি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা পাচ্ছিলেন, কিন্তু তখন আমার কানদুটো ভোঁ ভোঁ করছিল!

বলশয় থিয়েটারে অভিনয়কালে শিশু বালক-বালিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ। ৭-৩০ মিনিটের সময় প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে যায়; তখন মাথা খুঁড়লেও আর দরজা খোলে না। আবার খোলে মধ্যবিরতির কালে। অভিনয়-কালে কোনও ব্যক্তির পক্ষে বাইরে যাবার চেষ্টা নিষিদ্ধ। অলিখিত কতকগুলি নিয়ম এখানে কড়াকড়িভাবে পালন করা হয়। ধূমপানের জন্য প্রেক্ষাগৃহের বাইরে একটি পৃথক কক্ষ সংরক্ষিত। মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত এবং রুচিবান রুশীয় সমাজে 'মদ্যপ' এবং ধূম্রপায়ীর সংখ্যা অতিশয় কম। ইদানীং ভোদ্‌কা মদের উগ্র মাদকতার পরিমাণ নাকি অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে শুনলুম।

বিস্তৃত মঞ্চটির উপর একশত অশ্বারোহী, বা দশখানা ট্রেনের এঞ্জিন, বা ২৫০ জন লোক অনায়াসে চলে-ফিরে বেড়াতে পারে। কেউ যদি বলে, মঞ্চের উচ্চতা ৫০ ফুট,—হঠাৎ অবিশ্বাস করব না! যবনিকা উত্তোলনের পর দেখতে পাচ্ছি, মঞ্চের উপরে সবেমাত্র বসন্তকাল নামছে! গাছপালা এখনও কুয়াশায় জড়ানো,—এখনও বিশ্ব-প্রকৃতি অস্পষ্টতায় ভরা। আকাশে রয়েছে শীতের বিমর্ষতা, ক্বচিৎ কোনও চঞ্চল ক্ষুদ্র পাখী চুর্ণ-কণ্ঠে ডাক দিয়ে যাচ্ছে, কিশলয়ের আবির্ভাব ঘটছে ধীরে ধীরে, কোথাও নামহারা ফুল ধরেছে কোনও লতায়,—সেই দিকে চলেছে প্রজাপতি-পতঙ্গ, আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হচ্ছে বসন্ত-সূর্যের আবির্ভাবে, ঘুমজড়ানো প্রকৃতি যেন চোখ মেলছে এবার। এর পর একটি মিষ্ট প্রণয়কাহিনী দুটি তরুণ-তরুণীর নাচের সাহায্যে বলা হচ্ছে, এবং চারি-দিকের নববসন্তের মায়া, বৃক্ষচ্ছায়াতল, স্বচ্ছ সরোবরের কুমুদবল্লরী, মধুপের মৃদু গুঞ্জন, পার্বত্য গুহাগহবর, পুষ্প-দলের দোলা,—এবং আগাগোড়া সমস্তের পিছনে একটি মিলনবিধুর মধুর রাগিণী এই গল্পটিতে অতপ্ত যৌবনের নিবিড় প্রাণ সঞ্চার ক'রে দিচ্ছে। গল্পটি সামান্য, কিন্তু তার আয়োজন বিশ্ব-জোড়া। এই অভাবনীয় প্রযোজনা আমাকে তিন ঘন্টাকাল অভিভূত ও নিমেষ-নিহত ক'রে রেখেছিল!

আমার বিদায়কালের দিনগুলি সর্বার্থসাধিকা শ্রীমতী লিডিয়ার কল্যাণে কর্মবহুল হয়ে উঠেছিল। তাঁর দৌড়-ঝাঁপের সঙ্গে পেরে উঠিনি অনেক সময়, এবং তাঁকে কটুভাষণও করেছি অনেক-বার। সেই কটুভাষণ তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন এবং তার পুনরুক্তিও শুনতে চেয়েছেন। তিনি লেখক সঙ্ঘের কর্মী নন, কিন্তু ভারতীয় লেখকদের সকল প্রকার কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য সম্ভবত তাঁর মতো আর কেউ মেটায়নি। তিনি অনুবাদক, কিন্তু লেখিকা নন।

যথেষ্ট পরিমাণ শাস্ত্রজ্ঞ তিনি নন, কিন্তু লেখকের অন্তর্দৃষ্টি ঠিক কোথায় কি প্রকার কাজ করে, এ তিনি জানতেন। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর মতো এমন ক'রে আর কেউ আমার যোগাযোগ ঘটাননি। শান্তিবাদী সোভিয়েট ইউনিয়নকে তাঁরই সহায়তায় স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলুম।

সাবেক কালের মস্কোর এক নিরিবিলি পথের একটি পুরনো বাড়িতে এসে সেদিন উপস্থিত হলুম। ধুলোয়, জঞ্জালে এবং মেরামতের অভাবে এ বাড়িটি উপেক্ষিত। আশপাশের বাড়িগুলিও তাই। বালিখসা, চাপড়াখসা। কাঠের বারান্দা কোথাও ঝুলছে, অন্দরমহল সংকীর্ণ, ঘরগুলি এক একটি খোপ। সেই খোপগুলি আসবাবে ও মানুষে ঠাসা। এ বাড়িগুলি প্রধানত 'ব্যক্তিগত' সম্পত্তি! এ ধরণের পল্লী দেখেছি অনেক। এসব অঞ্চলে নিরীহ ভদ্রগৃহস্থরা বাস করে। এই প্রকার মধ্যবিত্ত এবং স্বল্পবিত্ত পাড়াপল্লীতে ছেয়ে আছে নতুন মস্কোর আশপাশ ও আনাচ-কানাচ। বসবাস ব্যবস্থার যে সকল কঠিনতর সমস্যা কলকাতার জনসাধারণকে নিত্য উৎপীড়িত ক'রে রেখেছে, মস্কোয় তার ব্যতিক্রম নেই! তফাৎ শুধু এই, মস্কোর জলের প্রাচুর্য, পৌরপ্রতিষ্ঠানের বিস্ময়কর কর্মনিষ্ঠা, নাগরিকদের সৎশিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে আপামরসাধারণের খরদৃষ্টি। সর্বাপেক্ষা পুরনো এবং ঘিঞ্জি পল্লীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখেছি, তার যে কোনও গলিঘুঁজির চলাচলের পথে শতরঞ্চি বিছিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে দিয়ে বিশ্রম্ভালাপ করা যায়।

এ বাড়িটি হল একটি আদালত। জঞ্জাল, ঝুল, ধূলো এবং অনাদর যেন নিচের তলাকার খুপেসি সিঁড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে দোতলার সর্বত্র পরিস্ফুট। মামলা মোকদ্দমা, পুলিশ কেস, কোর্টঘর উকীল-মোক্তার, — এগুলির প্রাধান্য কোথাও দেখিনে। এ সম্বন্ধে সর্বত্র একটা স্বাভাবিক উপেক্ষা দেখা যায়। সকল মামলার নিষ্পত্তি হয় একদিনে। খুন বা ষড়যন্ত্রের মামলায় কিছু সময় লাগে। কোনও মামলা কাগজে ওঠে না। দেওয়ানী মামলা নেই বললেই হয়। সম্পত্তিগত ব্যাপারে সমস্যাই নেই। বাড়িওলা আর ভাড়াটের মাঝখানে কমিটি দাঁড়িয়ে আছে। জলের পাইপ কেটে দিয়ে কিম্বা ইলেকট্রিক তার বেঁকিয়ে কেউ ভাড়াটে তোলবার চেষ্টা পায় না,—এ সব দায়িত্ব কমিটির। হয়ত বাড়িতে একটিমাত্র বাথরুম এবং একটিমাত্র রান্নাঘর—সেখানে পায়খানার ব্যাপারটা ঠিক বুঝিনে, তবে অন্যান্য ব্যাপারগুলির জন্য সময় নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু এ সব সমস্যা এখন আঞ্চলিক, সামগ্রিক নয়। এর দ্রুত মীমাংসা চলছে। কলকাতার বহু অঞ্চল অতিশয় নোংরা, বহু ভদ্রপল্লী নরককুণ্ডে পরিণত,—কিন্তু পৌরসভার ধারণা, সে সব অঞ্চলে জন্তুজানোয়ারের খোঁয়াড় ছাড়া আর কিছু নেই,—কেননা সেসব ক্ষেত্রে ভদ্রগৃহস্থের চাতালের সঙ্গে গরুরে খাটাল মিলিয়ে থাকে। কিন্তু মস্কো অপেক্ষা সেখানে সুবিধা এই, সেসব অঞ্চলে অসভ্যতাপ্রকাশের সুযোগ আছে, এবং সেই কারণে মস্কো অপেক্ষা স্বস্তি আছে! অধিক বর্ণনা বাহুল্য!

আমরা যে বাড়িটির দোতলায় এসে উঠলুম তার নানা কক্ষে নিঃশব্দে ছোট-ছোট মামলা চলছে। আদালতের বাড়ি,—কিন্তু নিঃঝুম। মেয়েপুরুষ ছড়িয়ে বসে রয়েছে আনাগোনার পথে, কিন্তু সব চুপচাপ। উঁচু গলা নেই কারও। কেউ গলা তুলে তা'র সমস্যার কথা বলছে না। বকশিস নেবার জন্য মুহুরি নেই। তালিমারা এবং রংচটা গাউন চড়িয়ে উকীল ঘুরছে না আশেপাশে। বাদী ও প্রতিবাদী নিজের কথা নিজেই বলে, এবং আইনের চক্রান্তে ফেলে প্রকৃত অপরাধীকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা নেই! বাদীকে বোকা বানাবার চক্রান্ত দেখছিনে। প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। অসংশোধনীয় অপরাধীর ঠাঁই হয় 'লেবার ক্যাম্পে'। ঠাণ্ডা রক্তে হত্যা করার শাস্তি—মৃত্যু!

বিবাহবিচ্ছেদের মামলা যে ঘরটিতে হয়, সেই ঘরটির 'স্যান্টি-চেম্বারে' ঢুকে শ্রীমতী হাকিমের সামনে এসে বসলুম। মহিলাটির বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। অতিশয় অমায়িক এবং মিষ্টভাষী। ইনি রুশীয় নারী এবং একজন বিশিষ্ট সমাজ-কর্মী। এই অঞ্চলের বিবাহবিচ্ছেদের সকল মামলাই তাঁর এখানে নিষ্পত্তি হয়। তাঁর কি কি গুণপনার জন্য তিনি এই কোর্টের হাকিমের পদে বসেছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, তিনি ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন, এবং তাঁর কর্মকাল সীমাবদ্ধ। নির্ভুল ও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি এবং সহজ ও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান—এইটি হল বিচারকের যোগ্যতার প্রধান পরিচয়। অতঃপর সেই রুশভাষিণী বিচারক মহিলা শ্রীমতী লিডিয়ার মারফৎ একে একে আমার প্রশ্নগুলির জবাব দিয়ে যেতে লাগলেন। এই এজলাসে প্রতি মাসে গড়ে ১০০ বিবাহবিচ্ছেদের মামলা নিষ্পত্তি হয়! বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ, বিবাহকে জীবনের প্রধানতম সংস্কার হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে বিমুখতা! খেয়াল-খুশির মতো বিবাহ করা! এখানে উকীলরা বেতনভোগী। দুষ্কৃতির সংখ্যা এখন কম। রাজপথের দৈবাৎ ঘটনা অতি সামান্য। শিশু বা বালক-বালিকা হত্যা একেবারেই নেই। নারীর উপর জুলুম বা পাশব অনাচার শোনা যায় না কোথাও। জমি জায়গা নিয়ে দাঙ্গা, প্রতারণা অথবা পকেটমার, নিষ্ঠুরতার ঘটনা, উন্মত্ত বা বেপরোয়ার কাহিনী, বেকার ব্যক্তির সংখ্যা—এসব কোনটাই নেই। রাজনীতিক অপরাধ ইদানীং কেউ করে না। অভাব বা দুরবস্থার জন্য কারও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে না। যৌন-ব্যাধির জন্য কোথাও বিবাহবিচ্ছেদ হয় না, কারণ ও ব্যাধি এদেশে এখন নেই। কিন্তু সন্তান জননে এবং ধারণে যদি উভয়ের কেউ অনিচ্ছুক হয়, সেখানে বিবাহবিচ্ছেদ তৎক্ষণাৎ ঘটবে! সামান্য চটুল কারণে বিবাহবিচ্ছেদ স্বীকার করা হয় না। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ আইন পাস ক'রে সোভিয়েট নাগরিকদের পারিবারিক জীবনের আনুগত্য, শুচিতা, সম্ভ্রম এবং স্থিতিশীলতা রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন! তাঁরা পারিবারিক আদর্শ ও পারস্পরিক সুসম্বন্ধতার উপর জোর দিতে চান। কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ লক্ষ কর্মী এবং গভর্নমেন্টের উচ্চতন ও অধস্তন কর্মচারিগণের পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত চরিত্রের সংযম, শুচিতা ও শোভনতার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়!

কিন্তু মস্কোয় থাকাকালীন আমি এমন দু-একটি ঘটনার মুখোমুখি এসেছিলুম, যেগুলি এই নীতির ব্যতিক্রম। অতিশয় শাসনের পাশাপাশি অতিশয় শৈথিল্যও আপন পথ খুঁজে নিয়ে চলে।

মহিলা বিচারক এলেন তাঁর কোর্ট-রুমে। তাঁর একপাশে বসলেন সরকার পক্ষের ইউনিফর্মপরা কৌঁসুলী—যিনি রাষ্ট্রের প্রতীক। অন্য পাশে বসলেন একজন পর্যবেক্ষক। বিচারের এই রীতিটি আমার পক্ষে দেখার দরকার ছিল। ঘরটি বড় নয়। জন কুড়ি নানা বয়সের নর-নারী

শান্ত হয়ে বসেছে যেন হেড মাস্টারনির সামনে! একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক—বোধহয় চাষী,—সে জানাল, তার স্বামী দু' বছর আগে কোন্ এক জনপদে কাজ নিয়ে চলে গেছে। কোনও খোঁজ-খবর তার নেই এবং এটি বিশ্বাস করার যুক্তি আছে, সে-ব্যক্তি আর ফিরবে না! বিচারক সই করলেন বিবাহবিচ্ছেদের কাগজে। মামলা মিটে গেল।

দুটি অভিজাত বংশীয় এবং অতি সুদর্শন তরুণ-তরুণী এতক্ষণ শান্ত-ভাবে বসেছিল। এবার তাদের ডাক এল। এরা দু'বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক-সঙ্গে পড়াশুনো করেছে। কারিগরী বিদ্যার বলে এখন উভয়ে যথেষ্ট উপার্জন করে। নূতন ও সুপরিসর ফ্ল্যাটে থাকে। অবস্থা উভয়েরই সচ্ছল। সন্তানাদি হয়নি। দশ দিন আগে এরা বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত করেছিল এবং হাকিম এই দশদিন সময় দিয়ে উভয়পক্ষে মিটমাটের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু মিটমাট ওদের মধ্যে সম্ভব হয়নি। ছেলেটি বলল, আমাদের মধ্যে চিন্তা-ধারার মিল ঘটছে না কোন মতেই! মেয়েটি শান্তকণ্ঠে জানান, আমাদের আদর্শের সংঘাত ঘটছে পদে পদে! আমরা দুজনেই এর থেকে মুক্তি চাই।

দশ মিনিট লাগে বিবাহ করতে, এবং দশ মিনিট লাগে বিবাহবিচ্ছেদ করতে! যদি সন্তান থাকে তবে পিতা-মাতার ইচ্ছানুযায়ী তারা ভাগাভাগি হয়, এবং এসব ক্ষেত্রে স্টেট তাদেরকে সহায়তা করে। শিশু বা বালক-বালিকার অনাদর স্টেট বরদাস্ত করে না! বিচারক আমাকে পরে জানালেন, এ ধরণের বিবাহবিচ্ছেদ সব দেশেই আছে। কিন্তু সোভিয়েট সমাজ পারিবারিক জীবনে বিশেষ রক্ষণশীল। অগণিত লক্ষ পরি-বার এবং কোটি কোটি স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান-সন্ততি পরিজন-স্বজনকে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করছে, এটি নিশ্চয়ই আপনি সর্বত্র ঘুরে দেখে থাকবেন!

মহিলা বিচারক অসত্য বলেননি। তাঁকে শ্রদ্ধা-নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিলুম।

* * *

অখ্যাত অনেক তীর্থপথে জনহীন ধর্মশালায় বাস করেছি কতদিন। তার-পর ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার আগে পিছন ফিরে দেখেছি, কালিঝুলিমাখা কাঠকয়লাআঁকা সেই শূন্য ঘর যেন বিষণ্ণ নয়নে তার দুদিনের বন্ধুটির দিকে চেয়ে রয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ছেড়ে যাবার কালে মনে পড়ছে, ফিয়োডোর জোরিনের ১১ বছরের ছেলেটা আমার জন্য কান্না নিয়েছিল, গলা জড়িয়ে চুপ ক'রে বসেছিল লকোনৎ-স্কির ছেলে সেরিওজা, কন্যাপ্রতিমা সোয়েৎলানা তার শিশুকে কাঁধে নিয়ে দূর থেকে এসেছিল শ্বশুরবাড়ির গল্প বলতে, শ্রীমতী মালৎজেভা আমাকে না জানিয়ে আমার মেয়ের জন্য বেরিয়ে-ছিলেন হাতঘড়ি কিনতে, বৃদ্ধা ম্যাডাম গোর্কি আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে-ছিলেন গোর্কির একটি স্মারক সামগ্রী। এগুলি সামান্য, কিন্তু এগুলিতে ছিল অমৃতের আস্বাদ। ওরা যেন সবাই চির-কালের ছায়া ফেলে রইল আমার মনে। আমি একে একে অনেকের কাছে বিদায় নিচ্ছিলুম, এবং বাঁধন কাটছিলুম। লেখক সঙ্ঘের চিন্তাধারার সঙ্গে আমার মন মিলতে চায়নি, আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্যে যথেষ্ট অভিভূত হইনি! কিন্তু লেখক জাতির প্রতি তাঁদের যে শ্রদ্ধা, অনুরাগ, প্রীতি, আকর্ষণ এবং যত্ন-শীলতা দেখে যাচ্ছি, সেটি পৃথিবীর অপর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। আমার মন অনেকবার মুগ্ধ হয়েছে তাঁদের দেশের জনসাধারণের শান্ত, নিরীহ ও প্রসন্ন জীবনযাত্রার দিকে চেয়ে। ওদের মজ্জার মধ্যে রয়ে গেছে ধর্মভীরুতা এবং স্বভাব সততা! সভ্যতা, শালীনতা এবং সত্যবাদের প্রতি এমন সহজ অনুরাগ দেখতে আমার বাকি ছিল। বিগত চল্লিশ বছরের পূর্ব-সংস্কার আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। সংশয় নিয়ে ঘুরেছি, অবিশ্বাসকে লালন করেছি মনে মনে, নিজের মধ্যে ঘা খেয়েছি বার বার। আপন বদঅভ্যাস-বশত ত্রুটি খুঁজে বেড়িয়েছি, অশ্রদ্ধা প্রকাশের চেষ্টা পেয়েছি, প্রতি ব্যক্তিকে সন্দেহের চোখে দেখেছি, এবং সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রের দ্বারা উৎপীড়িত মনে করার যুক্তি খুঁজেছি! এগুলি আমার চিত্তের দৌর্বল্য। কিন্তু এই দৌর্বল্যের কথা প্রকাশ করিনি কোথাও। বাইরের থেকে চাটুকার, স্তাবক, সুবিধাবাদী, স্বলথপ্রাণ,—এরা যায় নানা অভিসন্ধি নিয়ে, তাও চোখে পড়েছে। নিন্দুক এবং ছিদ্রান্বেষী গিয়ে আপন আপন বিষয়-বস্তু খুঁজে এনেছে, তাও লক্ষ্য করেছি। কমিউনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থার বহু গুণপনা এবং বিপুল কীর্তি স্বচক্ষে দেখে স্বদেশে ফিরে নিন্দিত হবার ভয়ে চুপ করে গেছে এমন লোককেও দেখতে আমার বাকি নেই!

সোভিয়েট 'লেখক সঙ্ঘ' আমার প্রতি প্রসন্ন রইলেন কিনা সেটি তলিয়ে ভাবিনি। কিন্তু 'পৃথিবীনিন্দিত' বরিস পলেভয়কে দেখে গেলুম অমায়িক, সজ্জন এবং সপ্রতিভ। কঠিন ব্যক্তিত্ব-শালী সুর্কভের সৌজন্য এবং সদ্ব্যবহার স্মরণীয় হয়ে রইল! মধুরভাষিণী রমানভার হাস্যচতুর মুখরতা যাবার আগে আরেকবার উপভোগ ক'রে গেলুম এবং তিনি বললেন, 'আবার আপনি এখানে আসবেন।' সহকারী সেক্রেটারী সংযত-বাক ও সৌম্যদর্শন চুগোনভ একটি ভোজে বসিয়ে নিতান্ত আত্মীয়ের মতো আমার পারিবারিক জীবনের খোঁজ-খবর নিলেন। 'অগনিয়োক' সম্পাদক সফ্রোনভ এসে কাছে বসে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন। 'ফরেন লিটারেচার ম্যাগা-জিনের চেকভস্কি, প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের বালাবুশেভিচ ও চেলিশেভ, ভারততত্ত্ব বিভাগের দানিলচুক—এঁরা টেলিফোন করছিলেন! ট্রান্স-ককেশাস থেকে জোরিন এবং উক্রাইন থেকে শ্রীমতী অলেসিয়া চিঠি দিয়েছেন! পরবর্তী সাড়ে তিন বৎসরকালের মধ্যে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বন্ধুগণের কাছ থেকে কম-বেশী ৪০০ চিঠি, টেলিগ্রাম, বার্তা, খৃষ্টমাস কার্ড, নববর্ষের শুভেচ্ছা বাণী ইত্যাদি আমার কলকাতার ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছয়। বই এবং সাময়িক পত্রাদি এসেছে সংখ্যাতীত।

সম্প্রতি লক্ষ্য করছি শ্রীমতী লিডিয়ার উগ্র কমিউনিজমে যেন কিছু ভাটা পড়েছে। তাঁর মুখরতা কিছু কমেছে। আমার বিদায় নেবার কালে তিনি যেন কিছু চিন্তান্বিত। তাঁর চিন্তার চেহারাটি কি প্রকার, এটি যখন জানতে চাইলুম, তখন তিনি একদিন প্রশ্ন করলেন, হিন্দু 'গড' শিব কি?

তিনি দেবাদিদেব। কল্যাণের প্রতীক।' And what is Parvati?

তিনি আদ্যাশক্তি, জগদ্ধাত্রী, জননী!' আমরা এঁদের পুজো করি।

শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, এগুলি শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু কোনও ভারতীয়ের কাছে এ সব কথা কখনও তুলিনি!

পরদিন আমাকে একটু আড়ালে ডেকে এনে তিনি তাঁর পোর্টফোলিও

থেকে রোলাপাকানো দুখানা কাগজ বা'র করলেন, সে দুখানা পুরনো ভারতীয় ক্যালেন্ডারের শস্তা ছাপা ছবি। একখানা শিবের,—তাঁর জটা থেকে তীরবেগে বেরোচ্ছে গঙ্গা, অন্যখানা রাধাকৃষ্ণের,—ওঙ্কারের মধ্যে যুগলমূর্তি! শ্রীমতী লিডিয়া বললেন, এ দুটি আমার ঘরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ! দু'বছর আগে এক ভারতীয় ডেলিগেশন এসেছিলেন, তাঁদের একজন এ দুটি পাঠিয়েছিলেন মাদ্রাজ থেকে। 'হাউ বিউটিফুল!' Who is this Krishna and this Radha?

সোভিয়েট ইউনিয়নে হিন্দুশাস্ত্রের ভাষ্যকার হয়ে আমি আসিনি, এবং অধ্যাত্মবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি থাকলে এই নাস্তিক্যবাদী কমিউনিজমের দেশে আমার আসবার দরকার হত না! কিন্তু এই মহিলার আন্তরিক ঔৎসুক্য এবং ধর্মায়িত অতৃপ্তির চেহারা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতুম বলেই আমাকে এলোমেলো-ভাবে বলতেই হল, এ ছবির মধ্যে কিছু একটা চিরন্তনকালের ব্যাখ্যা নিহিত আছে, সেটি হল হিন্দু 'কন্‌সেপশন্‌'! ওটার মধ্যে আমরা একটি পরম তত্ত্ব এবং সত্যের জোর খুঁজে পাই! কিন্তু আপনি একজন নিরীশ্বরবাদী কমিউনিস্ট, এ সব আলোচনায় আপনার আনন্দ পাবার কথা নয়!

এই প্রখরভাষিণী নারী সেদিন নিঃশব্দ নতমুখে বিদায় নিয়েছিলেন।

তখন নবেম্বরের শেষসপ্তাহ। প্রবল বাতাসের ঝাপটার সংগে তুষারপাত চলছে কথায় কথায়। কোন কোন দিন সকালে উঠে দেখি, বরফ চাপা পড়েছে সমগ্র মস্কো নগরী। বরফ কেটে মোটরগাড়িগুলি বার করতে হচ্ছে। আকাশ বলে কিছু নেই, আগাগোড়া একটা ধূসরতা! শূন্যলোক কিন্তু শূন্য নয়। হয় গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি, নয় তুলাগুঁড়ির মতো তুষারকণা উড়ছে। তুহিন ঠান্ডায় কোথাও স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এটি হেমন্তকাল, অদূরে শীতঋতু 'আসন্ন'। এবার ওভার-কোট বদলাবার সময় এল!

শ্রীমতী লিডিয়া আমার জন্য বাজার-হাট নিয়ে খুব ব্যস্ত। আমার হাতে যে টাকাগুলি জমে রয়েছে, সেই 'কাগজগুলি' খরচ করে যেতে হবে! সুতরাং তাঁর ছুটোছুটির বিরাম নেই। ওরই এক ফাঁকে তিনি একসময়ে প্রশ্ন করলেন, ঈশ্বর মানেন?

বললুম, দেশে ফিরে চিঠিতে জানাব!

আজ তিনি আর হাসলেন না। লুকনিৎস্কি তাঁর গাড়ি নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর গাড়িতে এসে উঠলুম। লুকনিৎস্কি আমার লেখক বন্ধু। তিনি কয়েকটি উপহার-সামগ্রী এনেছিলেন। ইতিমধ্যে আমার ঝোলা-ঝুলি ভারি হয়ে উঠেছে অনেক। নাট্যকার ভিনিকভ তার মধ্যে যোগ করেছেন কম নয়। প্রচুর বই কাগজ জমেছে এই দীর্ঘ-

কালের মধ্যে। পুতুলের দেশে এসে পুতুল জড়ো হয়েছে অগণ্য। আংটি ও সেফটিপিনের সংখ্যা গুনিনি। হোটেলের ধোপানীরা পোষাকপত্র কেচে রেখে গেছে,—কিন্তু তাদের কাজকর্ম ঠিক জুৎসই নয়! ওদের ফাঁকি এবং অযোগ্যতা দেখলে গা জ্বলে যেত! জুতো পালিশের মুচি খুঁজতে যাওয়া আর এভারেষ্ট শৃঙ্গ অভিযান একই কথা। পৃথিবীর সব দেশের হোটেলে ফাইফরমাসের লোক থাকে, কিন্তু সোভিয়েট হোটেলে, বাজারে, ষ্টেশনে—তারা অদৃশ্য। আমরা এটিতে অনভ্যস্ত বলেই এটি পীড়াদায়ক। বহুকাল পূর্বে উত্তর বিহারে এক বাঙ্গালী ডেপুটির আকিঞ্চনে তাঁর বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছিলুম। ব্যাগ-বিছানা ঘাড়ে নিয়ে তাঁর বাড়িতে যখন ঢুকলুম, তিনি তাঁর বহির্বাটির বাথরুম, আস্তাবলের ঠিক পাশে রান্নাঘর এবং তার সামনে সুন্দর গোলাপের বাগান—এইগুলি দেখিয়ে দিয়ে সেই যে বিদায় নিলেন, পরবর্তী ৩৬ ঘন্টার মধ্যে আর তাঁর দেখা পাইনি! অবশেষে ওই ব্যাগ-বিছানা আবার ঘাড়ে তুলেই মধ্যরাত্রে নিঃশব্দে আমাকে গা ঢাকা দিতে হয়েছিল! সোভিয়েট ইউনিয়নে 'শ্রমের মর্যাদা' রাখতে গেলে কথায় কথায় প্রাণান্ত!

শ্রীমতী লিডিয়া আমার জিনিসপত্রাদি গুছিয়ে বাঁধাছাঁদা ক'রে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যে অতিশয় অন্যমনস্ক এবং অগোছালো—এই তিরস্কার আমাকে বার বার সহ্য করতে হয়েছিল। আমার ঘরের মধ্যে লণ্ডভণ্ড চেহারাটার দিকে চেয়ে এই উগ্র কমিউনিস্ট নারী যখন স্তম্ভিতকণ্ঠে বলেছিলেন, 'টেরিব্‌ল্, আনইম্যাজিনেব্‌ল্'—আমি তখন বললুম, এই ঘরে বলশেভিক বিপ্লবের একটি চেহারা প্রকাশ পাচ্ছে, সুতরাং এঘরটি পূজ্য!

কিন্তু ইদানীং শ্রীমতী আর কোনও হাসি-তামাশায় যোগ দিচ্ছেন না। তাঁর এই ভাবান্তরের সুযোগটি আমার পক্ষে নষ্ট করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সেই পুরনো বক্তৃতার জের টেনে বললুম, শান্তি বন্ধুত্ব, জনসেবা, করুণা, দাক্ষিণ্য,—এদের মধ্যে ঈশ্বর আছেন! সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের নাস্তিক্যবাদের মধ্যেও তিনি বাসা বেঁধেছেন!

শ্রীমতী লিডিয়া ঘরময় তোলপাড় করছিলেন। বাইরে তুহিনতুষারের ঝটিকা। কিন্তু ভিতরে এই অক্লান্ত নারীর রাঙ্গামুখে ঘাম ফুটে উঠেছে! আমার কথায় তিনি চটে উঠে বললেন, চোখের জলে তিনি বাসা বাঁধেননি?

ঈষৎ ভীতকণ্ঠে আমি বললুম, আলবৎ! তবে শুনুন, আপনার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছত্র: "তাঁকে ডাকলে পাওয়া যায়না, ডাকলে বোঝা যায়না, কাঁদলেই শুধু তাঁকে মিলতে পারে! কিন্তু তেমন ক'রে ক'জনই বা কাঁদতে পারে," বলুন?

পাছে তিনি মারমুখী হন এজন্য দরজার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে ছিলুম। কিন্তু এবার তিনি মুখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, মার্ভেলাস! 'Am Compensated'! তাহলে এবার সেই কবিতাটি বলুন,—সেই যে রাধাকৃষ্ণের ছবিটি দেখে বলবেন বলেছিলেন—? Something 'Vaisnavite', as you told me?

হঠাৎ আমি প্রশ্ন করলুম, আমার সুটকেসের মধ্যে ওগুলো কী পুরে দিচ্ছেন লুকিয়ে?

লিডিয়া হাসিমুখে বললেন, "Communism! Which is your terror!"

কই দেখি?

সুটকেসটি বন্ধ ক'রে তিনি বললেন, না, দেখার দরকার নেই!—দিল্লী পৌঁছবার আগে এই সুটকেস খুলবেন না!

তাঁর কথা রেখেছিলুম। কলকাতায় ফিরে সুটকেস খুলে দেখেছিলুম, আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের জন্য বিবিধ সুন্দর কয়েকটি মূল্যবান উপহার-সামগ্রী এবং তাদের মধ্যে একখানি বন্ধকরা চিঠি। সেই চিঠিতে এই প্রকার লেখা ছিল: "পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু, আপনার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধ'রে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্ম বিষয়ে এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আপনি দু'একটি এমন কথা বলতেন,—যেগুলি আমাদের 'ডায়েলেকটিক মেটিরিয়লিজম' থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু আপনার কথাগুলি এক রুশনারীর মনে কি প্রকার কাজ করেছে, তার খোঁজ আপনি নেননি, এবং আপনার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা এবং রুক্ষ্ম প্রকৃতিবশত সেদিকে গ্রাহ্যও করেননি! কিন্তু আপনার বাক্যের বিষক্রিয়া আমার চিন্তার মধ্যে যে এক ধরণের অধ্যাত্মক্ষুধার জর্জরতা এনেছে, সেটি আমার পক্ষে নতুন। কেমন যেন মনে হচ্ছে, চাকাটা ঘুরে গেল বিপরীত দিকে! দোভাষিণীর কাজ শুধু নয়, আমি বোধ হয় আর কোনও কাজ করতে পারব না! এবার ছুটি নেবো, এবং মস্কো থেকে দূরে উক্রেনে আমার পিতৃভূমিতে গিয়ে আমার নাতিনাতনিদের সংসারে বাকি জীবন কাটাব। আমি জানি কতকগুলো এলোমেলো বিচিত্র চিন্তা আমার সেই জীবনকে পেয়ে (haunt) থাকবে। আমার শুভকামনা সপরিবারে গ্রহণ করুন। ইতি—'spiritual' লিডিয়া।"

জিনিসপত্র আগাগোড়া গুছিয়ে তিনি বাইরে এসে বললেন, চলুন, খাবার টেবলে ব'সে সেই কবিতাটি বলবেন!

কবিতার কিন্তু ইংরেজি হয় না, ম্যাডাম। তা ছাড়া আমার অভ্যাসও নেই!

তা হোক, যতটুকু পারবেন বলবেন। সেটি আমার শোনাই চাই!

* * *

"Yonder the clouds darkening
the horizon,
All colourless, the universe too,
The night falls blindly down,
the shadows gray,
Hopeless, tearful, thunders
hammer on heart,
Flash restless lightnings,
rains sobbing,
Ah, Miserable, how spend ye,
the nights so painful,
O, the weeping woman for ages,
Except for the Supreme
Lover?"

[বিদ্যাপতি]

"O, ye Beautious of mine,
'Have seen ye through births
and re-births,
Born or re-born,
'Have seen your form,
shape and beauty,
Semblence and manifest too.
O, my vision still unsaturated,
thirsty still,
Through millions of ages past,
through enternities,
'Have kept you templed this
breast within,
Discontented, and dreary,
O, ye Love, my Eternal,
though weep I do."

[চণ্ডীদাস]

"I keep on my ears alert
To the secret door of my heart,
craving and dense,
Whence the Bee comes out, a
wayward libertine,
Flies to the Unknown,
In blind search of the
Lotus Blue,
Rare and unobtainable
And the night-bird,
awake in outdoor,
Sings lonely songs, a friendless
and alone in darkness."

[রবীন্দ্রনাথ]

"For ages past, long forgotten,
Nursed I a tiny hope in heart:
'In a lone corner, beyond
all reach
Of the world,—unknown
and forsaken,
I'll find a little abode,
With myself within, left
to my own.
And self only!
No wealth, fame none,
only a little nest
I longed for ages past!"

[রবীন্দ্রনাথ]

হোটেলের বাইরে ঝড়ের ঝাপটার সঙ্গে তুষারবৃষ্টি চলছিল। সকল রেস্তোরাঁর ভিতরে কমবেশী দুই শত ইংরেজ, আমেরিকান, জার্মাণ, ফরাসী, ইতালিয়ান প্রভৃতি নরনারী প্রচুর উল্লাসের সঙ্গে [illegible] মেতেছে। সেখানে আমি একা একজন নিঃসঙ্গ ভারতীয় মাত্র। কিন্তু [illegible] আমি লক্ষ্য করিনি আমার ভাঙ্গা ও দুর্বল অনুবাদ সত্ত্বেও শ্রীমতী লিডিয়ার

দুই চোখে সেই কবিতাবিন্দুগুলি টলটল করছিল।

ঘরে যখন উঠে এলুম, রাত তখন কম হয়নি। অতঃপর একে একে এলেন মস্কোবাসী বন্ধুরা। বিনয় রায়, ননী ভৌমিক, শুভময় ঘোষ, আদিত্য সিংহ এবং এদিক থেকে বন্ধুবর অরেস্ত মালৎজেভ। দেখতে দেখতে হঠাৎ ঝড়ের মতো ছুটে এসে ঢুকলেন নাট্যকার ভিনিকভ! আমরা অবাক। তাঁর হাতে এক বোতল ফলের রস এবং দুই বোতল শ্যামপেন্ ও একটি মস্ত আনারস। মস্কোতে আনারস বড়ই দুর্লভ। ভিনিকভ আসছেন ট্রেনে প্রায় দু'হাজার মাইল দূরবর্তী 'শোচি' শহর থেকে। তিনি ভিতরে ঢুকেই আনন্দে, উল্লাসে এবং উদ্দীপনায় ঘরটি ভরিয়ে তুললেন। শ্রীমতী লিডিয়া ঈষৎ অনামনস্ক ছিলেন। বন্ধুবর ভিনিকভ বললেন, কিছু ভাববেন না, মালপত্রের সব ব্যবস্থা আমি করব। আপনাদের সঙ্গে আমিও যাই চলুন এয়ারপোর্টে!

মস্কোবাসী ভারতীয় একজন সাংবাদিক শ্রীশঙ্কর ক'দিন থেকে আমার পিছু নিয়েছিলেন, যেমন তিনি অনেকেরই নেন্। তিনি মস্কোর কাগজের জন্য আমার নিকট থেকে একটি 'বিদায়-বার্তা' চান্। সৌজন্যের দিক থেকে এটি মূল্যবান, এবং প্রায় সকল বিদেশীরাই এটি দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই 'নগদ বকশিস' দেওয়া আমার দু'চোখের বিষ। তিনি যেন আমাকে দিয়ে কিছু একটা সই করাতে পারলেই খুশী হন। শ্রীমতী লিডিয়া আমার এই মনোভাবটি জানতেন, এবং অনেক সময় তিনি বিরক্তকণ্ঠে শঙ্করকে সতর্কও ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ সে-ব্যক্তি যেন একটু বেপরোয়া হয়েই আগে-ভাগে গিয়ে আমাদের গাড়িতে উঠে বসল! সে রাত্রে শ্রীমতী লিডিয়ার রুদ্ধ আক্রোশ একবার গর্জে উঠেছিল! ফলে, মাইল কয়েক গিয়ে শঙ্করকে নেমে পড়তে হয়েছিল। এদেশে কোনও ভারতীয়ের পক্ষে ঠিক এ ধরণের জীবনযাত্রা সেদিন আমার ভাল লাগেনি।

তুষারপাত এবং তুহিন ঝাপটা সমানেই চলছিল। কখনও তার বেগ কম, কখনও বেশী। মস্কোর জনপূর্ণ বিমান-ঘাঁটিতে যখন এসে পৌঁছলুম তখন রাত এগারোটা। আমরা চারজন। বিনয় রায়, ভিনিকভ, লিডিয়া—এঁরা আমার সঙ্গে এসেছেন। অদূরে সোভিয়েট সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগী জজ শ্রীযুক্ত এন-সি-চাটার্জিকে সঙ্গে ক'রে এনে দিল্লীগামী বিমানটিতে তুলে দিতে এসেছেন। নির্মলবাবু আমাকে ডেকে বললেন, মিঃ শুভ্রচন্ড নিজে অনুরোধ জানিয়ে এঁদেরকে পাঠিয়েছেন যাতে ভারতীয়-গণের কিছুমাত্র অসুবিধা না ঘটে। অশোক আর স্নেহাংশু আগেই চলে গেছে।'—বলা বাহুল্য, আমরা একই বিমানে দিল্লী ফিরব।

রাত বারোটার পরে খবর পাওয়া গেল, তুষারের ঝাপটে এবং ঠাণ্ডায় সোভিয়েট বিমানের কলকব্জা কিছু বিগড়েছে এবং ভিতরের বৈদ্যুতিক শক্তি আপাতত কাজ করছে না। শ্রীমতী লিডিয়া এবং ভিনিকভ একপ্রকার 'সুখ সংবাদে' যেন একটু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন, এবং পৃথিবীর সকল দেশের স্ত্রীলোক ঠিক এই অবস্থায় যে বাক্যটি হঠাৎ উচ্চারণ করে, এই সোভিয়েট কমিউনিস্ট নারী সেইটিই করলেন,—'ভগবান চোখ মেলে চেয়েছেন!'

ভিনিকভ ও বিনয় রায় হেসে উঠলেন।

* * *

কিন্তু সেই হাসি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রাত ২-১০ মিনিটে ঘোষণা করা হল, বিমান ছাড়বে এবার, আপনারা গিয়ে জায়গা নিন। ভিনিকভ ঘন আলিঙ্গনে আমাকে যখন জড়িয়ে ধরলেন, তখন আমার কাঁধের পাশে তাঁর কণ্ঠস্বরটি অনুভব করলুম, এটি হাসির বিপরীত! ট্রান্সককেশাসে ভিনিকভের সঙ্গে প্রায় একপ্রকার বসবাস করেছি আট দিন। তাঁর প্রবীণ বয়সের পিছনে যে এমন নাবালক লুকিয়ে থাকতে পারে, এটি ভাবিনি!

নরম তুষারপাতে বিমানঘাঁটির সমতল পিচ্ছিল হয়েছিল। বায়ুর প্রবল তাড়না এবং তুষারবর্ষণে যে-দুর্যোগটি দেখা যাচ্ছিল—আমি হিমালয়ের লোক,—সেটিতে একদা আমি অভ্যস্ত ছিলুম। ভিনিকভ এবং শ্রীমতী লিডিয়া আমার দুই হাত ধ'রে সতর্কভাবে এনে বিমানে তুলে দিলেন। সিঁড়ির উপরে এসে দাঁড়িয়ে আমি তাঁদেরকে বিদায় অভিবাদন জানালুম।

বিমানের মধ্যে আমার সীটের পাশে একটি অতিশয় কঙ্কালসার বর্মী ছাত্র বসেছিল। ছায়ান্ধকারে তার সেই শীর্ণ বীভৎস চেহারা দেখে ভীত হয়েছিলুম। স্পষ্টত, ছেলেটি ক্ষয়রোগী, এবং তার বাঁচার আশা কম। ছেলেটি বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল। তার পাশে ব'সে আমার গায়ে কাঁটা দিল। মৃত্যু যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল!

অনেকক্ষণ পরে বিমানটি ভিতরে ভিতরে হাঁসফাঁস ক'রে উঠল। এবার ছাড়বে। শেষবারের মতো মস্কোকে দেখে নেবার জন্য গোলাকার কাঁচের জানলায় মুখ রেখে এদিক ওদিক তাকাতেই হঠাৎ দেখি, নীচের দিকে একা দাঁড়িয়ে শ্রীমতী লিডিয়া! ঝুপ ঝুপ ক'রে বরফ পড়ছে তাঁর সর্বশরীরে। পাশে কেউ নেই। বাতাসের প্রবল ঝাপটাতেও তিনি অটল এবং অকম্প। কিন্তু সেই বন্ধ কাঁচের জানলা দিয়ে আমি এই কর্তব্যপরায়ণা নারীকে একটি ধন্যবাদও দিতে পারিনি। এর পর কি হ'ল আর বুঝতে পারা গেল না! সেই ঘন দুর্যোগে জেটবিমান উড়ে চলে গেল দূরশূন্যে! মনে হচ্ছিল, আমি যেন কিছু একটা পিছনে ফেলে চললুম!

মিনিট দুই মাত্র। হঠাৎ জানলায় বাইরে দেখি, এ বিশ্বপ্রকৃতি আবার নিয়েছে নতুন এক চেহারা! কোনদিন কোনও দুর্যোগ ঘটেছে, শূন্যালোকে তার চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ অভাবনীয়। আজ রাসপূর্ণিমা! সেই চন্দ্রহাসিত আকাশের অত্যুজ্জ্বলে তারকাদলকে যেন আর বিদেশী মনে হচ্ছে না! জীবনরহস্যের নিগূঢ় পাথারে যেন ওদেরই কয়েকটি তারকা অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বলন্ত হয়ে রইল!

দুরন্ত গতিবেগে সেই বিমান জ্যোৎস্নালোক অতিক্রম করছিল। ভিতরে সবাই কম্বল চাপা দিয়ে গাঢ় নিদ্রায় তলিয়ে গেল। নির্মলবাবু ওদেরই একজন। কিন্তু আমার মধ্যে যে-তোড়নাটা ছিল, তার ভাষা দুর্বোধ্য হলেও প্রাণশক্তি তার প্রচণ্ড, সেটি উপলব্ধি করতে পারি। সেই ভাষার কোনও লিপি আজও আবিষ্কৃত হয়নি—সে-ভাষা হ'ল হৃদয়ের, সে-ভাষা শান্তির, বন্ধুত্বের এবং মানবতার! আমার মন ভারতীয়। এ বসুধাকে কুটুম্ব জেনে এসেছি মানব-বংশপরম্পরায়। সেই মানুষের ইতিহাসের সন্ধিযুগে যদি আমার এই ভারতীয় হৃদয় সাতটি মহাদেশ, সাত সমুদ্র, সপ্তম স্বর্গ, সপ্তাশ্ববাহী মহাসূর্য—এদেরকে ধারণ করতে আজ অসমর্থ হয় তবে এই রইল প'ড়ে আমার ব্যর্থ ভ্রমণ, আমার মিথ্যে আনাগোনা, অকারণ জানাশোনা,—সব পড়ে থাক ওরে পিছনে,—'বক্ষতলে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চল, একলা চল, একলা চল রে!'

সন্দেহ নেই, হৃদয়ের একটা বড় অংশ প'ড়ে রইল পিছনে। একদা হিমালয়ের এপার থেকে ওপারে যে বিরাট ভূভাগে অভিযান করেছিলুম, সেটি রাজনীতির পথ নয়, মানুষের পথ! সেখানে সমস্ত আন্তর্জাতিক জটিলতার আবরণ ঘুচিয়ে সামনে এসে যারা দাঁড়াল, তাদেরকে চিনতে দেরি হয়নি,—আমারই ঘরের চেনামুখ তারা! তারা কেউ সহোদর, কেউ বন্ধু, কেউ ভ্রাতা, শিক্ষক, কন্যা, জননী, ভগিনী,—তারা সবাই যেন আমার পরমাত্মীয়!

ভিতরে অন্ধকারে সবাই নিদ্রিত, বাহিরে বিশ্বলোক জ্যোৎস্নায় উচ্ছ্বসিত। তারই ভিতর দিয়ে বিমান উড়ে চলল শূন্য থেকে মহাশূন্যে।

[সমাপ্ত]

সার্থবাহ

পর্তুগীজ সাহিত্যের

অ আ ক খ (২)

ক্যামোয়েঁশের 'উশ লুসিয়াদাশ' ('লুসিয়াদ', বা 'পর্তুগীজ'-গণ) * মহাকাব্যের প্রণোদনারূপে যে-বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিল তা'র সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক খুব নিবিড়। ভাস্কু দা গামা কর্তৃক ভারত 'আবিষ্কার'-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ঘটনা ক্যামোয়েঁশের প্রত্যক্ষ প্রেরণা হয়েছিল। যদিও দা গামার এই নামমাত্র 'আবিষ্কার' আসলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে য়ুরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসার জলপথ নির্দিষ্ট করা বৈ কিছু নয়। (কারণ, দেশ হিসাবে আরো অনেক আগেই, ভারত য়ুরোপের কাছে পরিচিত ছিল), তবু দা গামার ভারতে পদার্পণ এমন একটি ঘটনা যার তাৎপর্য ইন্দো-য়ুরোপীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সামগ্রিক সত্ত্বে অনুভূত হয়। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কু দা গামার জাহাজ কালিকট বন্দরে উপস্থিত হওয়ার পর থেকে ১৯৪৭-এ ব্রিটিশের ভারত-ত্যাগ পর্যন্ত উক্ত ইতিহাসের একটি দীর্ঘ, একমুখী বিন্যাস। (সর্দার কে. এম. পানিকর এই সাড়ে চার শ' বছরকে 'দা গামা যুগ' নামে অভিহিত করেছেন)।

পর্তুগীজদের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগও নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ক্যামোয়েঁশের লুসিয়াদগণ, জলদস্যুরূপে কুখ্যাত যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও, অন্ততঃ আমাদের দেশে অসি ছেড়ে মসির মর্যাদা আহরণে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিলেন, মানতে হয়। শ্রীহুমায়ুন কবির তাঁর অক্সফোর্ডে-প্রদত্ত এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় জানিয়েছেন যে পর্তুগীজে ভারতবর্ষের প্রায় সবক'টি প্রাদেশিক ভাষার ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল একসময়। পর্তুগীজ মিশনারী মানুয়েল দা আসুম্পসাঁও-প্রণীত সাভিধান বাঙগালা ব্যাকরণের কথা সুবিদিত। বাঙগালা গদ্য-রচনার পুস্তকাকারে প্রথম মুদ্রিত নিদর্শনও একজন পর্তুগীজ, 'ভূষণার রাজপুত্র', দম আন্তনিয়ুর 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'। (অবশ্য, আন্তনিয়ুর বইখানির হরফ বাঙ্গালা নয়, তিনি রোমান অক্ষরে, পর্তুগীজ উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে, অনুলিপিতে বাঙ্গালা ভাষা লেখেন।)
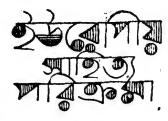
ক্যামোয়েঁশের প্রসঙ্গে ইন্দো-পর্তুগীজ সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অপরিণত তবু বিচিত্র বৃত্তান্তে নবভাবে উৎসাহ জাগে। এবং সে-ইতিহাসের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিপাত করলে চমৎকৃত না-হয়ে পারা যায় না ভারতভূমিতে পর্তুগীজদের সাংস্কৃতিক সচলতা লক্ষ্য ক'রে। সত্য যে এই লুসিতানীয় সংযোগ ভারতবর্ষের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে লাভজনক হয়নি। কিন্তু একথাও সমভাবে স্বীকার্য যে উক্ত সংযোগ ক্ষতিকারকও হয়নি। প্রথমতঃ ভারতীয় ভাষাগুলিতে, বিশেষত বাঙগালায়, শব্দ-সম্ভারকে বিস্তৃত করেছে 'জানালা', 'কেদারা', 'চাবি', 'চুরুট', 'বোতাম', 'মেজ', 'তোয়ালে', সাবান' ও 'কামিজের' মতো পর্তুগীজ শব্দগুলি। দ্বিতীয়তঃ ধর্মপ্রচারকার্যে সুবিধার জন্য যেমন পর্তুগীজ মিশনারীগণ ভারতীয় ভাষাগুলি আয়ত্ত করার প্রচেষ্টায় এদেশে ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নে পথিকৃৎ হ'ন, তেমনি ভারতীয়দের পর্তুগীজ ভাষা শেখানোর জন্য তাঁদের যে-অধ্যবসায় তা'তে একটি সাংস্কৃতিক লেনদেনের স্বভাব চিহ্নিত ছিল। পর্তুগীজ ব্যাকরণ শিক্ষা মনোজ্ঞ ও অনায়াস করার জন্য গ্রন্থকার আন্তোনিয়ু মারিয়া বার্কেরের তাঁর 'প্রশ্নোত্তর'-ভঙ্গীতে লিখিত 'দিয়ালোগু শাম্মাতিকাল দা লিংগুয়া পর্তুগেজা' নামক চটি বইখানিতে কী আন্তরিক প্রয়াস। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত এই পুস্তিকায় বিস্ময়কর অল্প পরিসরে পর্তুগীজ ব্যাকরণ, এমনকি অলঙ্কার শাস্ত্র পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। সন্দেহ নেই যে 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদে'র 'গ্রাঁদ্‌ কাতেশিস্তা' (প্রসিদ্ধ খৃষ্টশাস্ত্রজ্ঞ), রাজপুত্র আন্তুনিয়ু উন্নাসিক, অসহিষ্ণু ও চপল ঃ 'আর কহো যে বটপত্রে ভাসিয়েছেন। পরমো ব্রমো তিনি কাহারে আশ্রা করিয়া থাকিবেন?...নাশীন বটপত্রে বা কোথাএ ছিলো? বট বা কোথাএ ছিলো, সকোলি প্রত্তায়োগা (পৃঃ ৭৪)"। কিন্তু একেবারে ভিন্নপন্থী পর্তুগীজ লেখকও ভারতবর্ষ থেকে নিয়ন্ত্রাপ ও গঠনমূলক পুস্তক প্রকাশ করেছেন। ধর্মযুদ্ধ নয়, ইন্দো-পর্তুগীজ সাংস্কৃতিক সত্যে আস্থাই সম্ভব করেছে ব্রাগানসা কুন্যার বইখানি।* ইন্দো-পর্তুগীজ সাহিত্যিকদের পরিচয় যা, বলা বাহুল্য, সাধারণ্যে সামান্যই জ্ঞাত, লিপিবদ্ধ করেছেন গ্রন্থকার কেবল সংস্কৃতি-সাধনার উপলক্ষ্যেই নয়, মানবিক সহানুভূতি ও দায়িত্ব নিয়েও। অনেকের কাছেই হয়ত এ তথ্য অজানা যে ভারতবর্ষের পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে, প্রধানতঃ গোয়ায়, ঊনবিংশ ও • বিংশ শতাব্দীতে বেশ ক'জন ক্ষমতাবান সাহিত্যিকের অভ্যুত্থান লক্ষিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ বা য়ুরোপে এ'দের পরিচয় নেই বললেই হয়, এবং যেমন সেন্যর কুন্যা বলেন, এ'দের রচনায় গলদও নামান। গ্রন্থকার তাঁর ভূমিকায় 'দুটি কথা'য় জানান যে, যে-সব শিল্পীর কথা লিখিত হচ্ছে, তাঁদের দোষ-ত্রুটি আছে। তা'তে কিছু আসে-যায় না। যেটুকু আমরা পেরেছি সেইটুকুই করেছি।' ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টার লঘুকরণে সেন্যর কুন্যাকে মোটেই উন্নাসিক মনে হয় না, বরং অখ্যাত ও অনতিমহৎ এক সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর কার্যকলাপের প্রতি এই পর্তুগীজের দরদ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। কুন্যা-পরিবেশিত অনেক সংবাদের মধ্যে একটি ভারতীয়দের কাছে নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক বৈঠকে।—তুমাস্‌ রিবাইরু, যিনি ইন্দো-পর্তুগীজ কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হ'ন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'ইন্সিতুতু ভাস্কু দা গামা'র প্রতিষ্ঠা-কালে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'ভারত-বর্ষের মাটি হ'ল সাহিত্য-চর্চার মাটি।' 'ভারতীয় ভাবধারায় তা'র সম্যক্‌ অস্তিত্ব লাভ করেছিল এই ভারতবর্ষে-লেখা পর্তুগীজ কবিতা', এবং তুমাস্‌ রিবাইরুর সঙ্গে ফেরনাঁদ্‌ লেয়াল,

---

* 'লুসিয়াদ' অর্থে 'পর্তুগালবাসী' বা 'পর্তুগীজ', এই নির্ধারণ যথেষ্ট ভৌগোলিক কিম্বা ঐতিহাসিক যাথার্থ্য পায় না। 'লুসিতানিয়া' নামে যে প্রাচীন রোমক প্রদেশ ছিল, তা'র সঙ্গে পর্তুগালের যোগসূত্র স্থাপন করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর কতিপয় বিদগ্ধ পর্তুগীজ। তাঁদের মধ্যে ক্যামোয়েঁশ ঐ ক্লাসিকল নামটির প্রতি সর্বাধিক উৎসাহ দেখান তাঁর মহাকাব্যটির নামকরণ মারফত। এখন 'লুসিতানু' অর্থে 'পর্তুগাল সংক্রান্ত' 'লুসিয়াদ' অর্থে 'পর্তুগীজ', প্রচলনসিদ্ধ।

---

* Literatura Indo-Portuguesa: Figuras e factos, por Vicente de Braganca, C u n h a. Bombaim. MCMXXVI.

ফ্রান্সিয়ান্ বারেতু, পাউলিনু দিয়াস, জোসে পেস্তানা প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য ইন্দো-পর্তুগীজ কবি হিসাবে।

যে গোয়া শহরের নির্জনতায় বিষণ্ণ ঊনিশশতকী রিবাইরু তাকে সম্বোধন করেছিলেন 'মৃত শহর' (সিদাদ্ মর্তা) ব'লে, ষোড়শ শতাব্দীতে সেই শহরে পালিয়ে এসেছিলেন পর্তুগালের শ্রেষ্ঠ কবি লুইশ দ ক্যামোয়েঁশ। পালিয়ে এসেছিলেন স্বদেশের রাজধানী লিসবন থেকে, অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়ে। লিসবন ত্যাগ-করার রাজকীয় আদেশ জারী হয়েছিল তাঁর ওপর। কোনও কবির পক্ষে এ ধরণের দণ্ডাজ্ঞা আহরণ করা অস্বাভাবিক ব্যাপার নিঃসন্দেহে, কিন্তু ক্যামোয়েঁশের জীবন ছিল ঘটনায়, দুর্ঘটনায় ঠাসা। একটি প্রেমঘটিত দ্বন্দ্বে গরীব কবি ক্যামোয়েঁশকে বাস্তুত্যাগী ক'রে শায়েস্তা করেছিলেন বিত্তশালী প্রতিপক্ষ। প্রবাস হিসাবে দা গামার ভারতবর্ষ ক্যামোয়েঁশকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করেছিল ও বিপদসঙ্কুল সমুদ্র-যাত্রার সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে ক্যামোয়েঁশ ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। যে গোয়া শহরে ক্যামোয়েঁশ উপস্থিত হয়েছিলেন তা' অবশ্য তখন মোটেই 'মৃত' নয়, বরং অতিমাত্রায় সজীবই ছিল। সেখানকার শাসক-সম্প্রদায়ের নৈতিক অধঃপতন ও উচ্ছৃঙ্খল ভোগবিলাস তখন সারা বন্দরের আবহাওয়াকে ক্ষিপ্র ও জাঁকাল ক'রে তুলেছিল। স্থিরধী ক্যামোয়েঁশ এই অরাজকতার প্রতি অন্ধ থাকতে পারেননি, দুর্নীতিপরায়ণ শাসকদের লক্ষ্য ক'রে রচিত হয়েছিল তাঁর 'তামাশা' এবং সেই কারণে গোয়া থেকেও বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল তাঁকে।

গোয়ায় পৌঁছানর সময় ক্যামোয়েঁশের সঙ্গে ছিল তাঁর নির্মীয়মাণ মহাকাব্য, 'উশ লুসিয়াদাশ'-এর পাণ্ডুলিপি এবং গোয়া ছেড়ে যাবার সময়ও অসমাপ্ত মহাকাব্যের সেই পাণ্ডুলিপি তাঁর সঙ্গে গেছিল ম্যাকাও-এর পথে। 'উশ লুসিয়াদাশ'-রচনার ইতিহাসে চিত্রিত স্থান-কালের পরিবেশিত জড়িতঃ ক'য়রা শহরে পরিকল্পিত এই মহাকাব্য যথাক্রমে লিসবন, গোয়া ও ম্যাকাও-এ অংশতঃ রচিত হয় এবং অবশেষে আবার লিসবনেই মুদ্রণযোগ্য সম্পূর্ণতা লাভ করে। দোনা কাতেরিনার প্রেম যে-ক্যামোয়েঁশকে লিসবন ত্যাগ করায়, সেই ক্যামোয়েঁশ সারা জীবনই যেন নিরাশ্রিত। সৌভাগ্যের প্রসাদ কদাচই জুটেছে তাঁর বরাতে এবং তদনুপাতে দুর্ভাগ্যের যাতনাভোগ থেকেছে প্রায় অবিরত। গোয়ায় একটি অকৃত্রিম বন্ধুত্বলাভ যদি বা ক্যামোয়েঁশের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, গোয়ার সরকার তাঁকে একাধিকবার কারাবাসে বাধ্য করেছেন। উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ ক্যামোয়েঁশের উপর লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি কখনও পড়েনি। দীর্ঘকাল দেশ-দেশান্তরে ঘুরে লিসবনে প্রত্যাগত ক্যামোয়েঁশ কিছু নিয়ে আসতে পারেননি তাঁর অতিবৃদ্ধা, দরিদ্রা মায়ের জন্য। তাঁর সম্বল ব'লতে ছিল কেবল 'উশ লুসিয়াদাশ'-এর পাণ্ডুলিপি। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু পার্থিব জীবনের ক্লেশ ও অসম্পূর্ণতার ঘেরাটোপে শিল্পীর অস্তিত্ব ন্যস্ত হলেও, তাঁর শিল্প-সাধনার আকাশে মর্যাদা, পূর্ণতা ও আনন্দের আভাষ কখনও মোছে না। ক্যামোয়েঁশের এপিক শিল্পের এই নিরপেক্ষ উত্থানের প্রতি আমাদের আস্থা দৃঢ়তর করে। 'উশ লসিয়াদাশ'-এর সুদীর্ঘ কাব্যদেহের কোনওখানে বিরক্তি, অবসাদ কিম্বা লঘুচিত্ততার অপকার্য মহৎ শিল্পের সমগ্রকে ব্যাহত করেনি। কী সুঠাম সে কাব্যদেহ! বিস্তৃতি, স্থৈর্য, নন্দন ও সর্বোপরি শক্তি—একাধারে কাল্পনিক ও ভাষিক,—ক্যামোয়েঁশের এই আধুনিক মহাকাব্যের ছত্রে ছত্রে অনুভূত। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী অবশ্যই এপিকের কাল থেকে বহুধা বিলম্বিত ও বিযুক্ত এবং ঐ শতাব্দীতে এপিকের প্রচেষ্টা প্রথমতঃই শিল্পীর দুঃসাহসের কথা বলে। এবং তারপর, এপিকের বিশিষ্ট সদ্‌গুণ-গুলির যে নিশ্চিত প্রকাশ ক্যামোয়েঁশের মহাকাব্যে পাঠককে আশ্বস্ত করে, তাতে কলাবিচারে সার্থকই মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীর অকাল বসন্তে ক্যামোয়েঁশের কোটান এপিক ফুলটিকে। (আর, এখানে স্বীকার করতেই হয় যে, অন্যান্য 'আধুনিক' এপিক-প্রচেষ্টার, যেমন মিলটনের, তাসোর বা মাইকেল মধুসূদনের, চেয়ে 'উশ লুসিয়াদাশ' বাচনে ও আখ্যানে ধ্রুপদী মেজাজ বেশী আয়ত্ত করেছে।)

বিশেষতঃ বাচনে। মূলতঃ আখ্যান-সর্বস্ব এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু পর্তুগীজ বীরদের কাহিনী যদিও, তবু এর সার্থকতা অনেকাংশেই বাচনিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। বাচন তথা শৈলী সম্বন্ধে গোড়া থেকেই সজাগ, ক্যামোয়েঁশ সচেতনভাবে লাতিন কবি ভের্গিলিয়ুসকে অনুসরণ করেছিলেন। 'উশ লুসিয়াদাস'-এর প্রথম পংক্তিটি স্পষ্টতঃ 'আইনেইদস' মহাকাব্যের প্রথম পংক্তি মনে পড়ায়। ক্যামোয়েঁশ বুঝেছিলেন যে, একটি বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গি ব্যতীত নিছক ঘটনার আভিজাত্য পণ-ক'রে এপিক-রচনায় অগ্রসর হওয়া অনুচিত। তাই গ্রন্থারম্ভে ক্যামোয়েঁশ পর্তুগীজ নদী তেজুর জলপরীদের কাছে যাচ্ঞা করেন সম্ভ্রান্ত ও সচল এক বাগ্‌ভঙ্গি (উঁ এস্তিলু গ্রাঁদিলকু এ কররিয়েঁৎ)।*

ক্যামোয়েঁশের ভাষায় তাঁর প্রার্থিত দুই স্বভাবেরই মিলন ঘটেছিল। সম্পদ ও গতি দুই-ই তাঁর চেষ্টিত ধ্রুপদী তালের আয়ত্তে এসে তাঁর ভাষাকে মহা-কাব্যিক বাচনের উপযুক্ত করেছিল। একাধারে তাঁর অধীত ক্লাসিকল বিদ্যার ঐশ্বর্যময় ব্যবহার ও চমৎকার গল্প-বলার (অবশ্যই সে-বলা সর্বত্র মন্তব্য-বিহীন নয়) স্ফূর্তি, ক্যামোয়েঁশের বাচনিক প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করে। কখনও কখনও যদি-বা ক্যামোয়েঁশের স্বচ্ছন্দ আখ্যানের আসরে গ্রীক বা রোমক দেব-দেবীর আবির্ভাব কষ্ট-কল্পিত মনে হয়, তবু তাঁর মহাকাব্যের সামগ্রিক সত্তায় বুদ্ধি ও অনুভূতির ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এজ্রা পাউণ্ড যখন বলেন, "The quality of Camoens' mind is rhetorical, but his diction and his technique are admirable". ("The Spirit of Romance', পৃঃ ২১৫), তখন মনে হয়, ক্যামোয়েঁশের সাহিত্যিক-চরিত্রে ক্লাসিক্সে অতিপঠিত হওয়ার কারণে উপজাত দু-একটি ধ্রুপদী ঢঙের (এ ঢঙ অবশ্য রেনেসাঁসেরই অবদান) প্রতি পাউণ্ড আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবু পাউণ্ড ক্যামোয়েঁশের বাচন ও আঙ্গিক সম্বন্ধে যে-অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন তাতে ধারণা হয় যে, ক্যামোয়েঁশের অলঙ্কারিক মন নিশ্চয়ই কবিত্বকে ব্যাহত বা দুষ্ট করেনি। স্বয়ং পাউণ্ডই দেখান যে, ক্যামোয়েঁশের কবিতার আদত সৌন্দর্য রয়েছে তার 'তেজো' বা 'ভিগারে'। আরো বলতে হয় যে, এই 'তেজ' শব্দ বা অলঙ্কার, কিম্বা আখ্যান, থেকে আহৃত

---

* Os Lusiadas de Luiz Camoens: Pelo Dr Caetano Lopes de Moura. Pariz, 1847. Canto I, IV. বলা বাহুল্য য়ুরোপের প্রধান সব ভাষা-গুলিতে ক্যামোয়েঁশ একাধিকবার অনূদিত হয়েছেন। ইংরেজিতে স্যর রিচার্ড ফ্যানশ, উইলিয়াম জুলিয়াস মিকল ও এডয়ার্ড কুইলিনান যথাক্রমে সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা 'উশ লুসিয়াদাশ'-অনুবাদক। প্রসঙ্গতঃ ডক্টর জনসন পর্তুগীজ সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন এবং মিকলের বিখ্যাত ক্যামোয়েঁশ-অনুবাদে তাঁর উৎসাহ ছিল সক্রিয়।

নয়, এর উৎস তাঁর ভাবনার বিশ্বে কবির তন্ময়তা ও বিশ্বাস।

লোপে দে বেগা, তাস্সো ও এ-যুগে পাউন্ড যে-কবির প্রতি সশ্রদ্ধ থাকেন, সেই ক্যামোয়েঁশের মহাকাব্যের মূল্যায়ন বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে ও প্রবন্ধ-কারের বিদ্যায় প্রায় অসম্ভব। 'উশ লুসিয়াদাশ' নিশ্চয়ই সেই সকল বিরল কাব্যগ্রন্থের একখানি যাদের প্রতি বীতরাগ বা অবহেলা সভ্য জীবনবোধের পূর্ণতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ঋজু ও তাৎপর্যপূর্ণ যে ভাষণে একজন ক্যামোয়েঁশ জীবনযুদ্ধের কথিকাগুলি শোনান, তাতে কাব্যামোদ ও উপলব্ধি যুগপৎ লভ্য হয় শ্রোতাদের কাছে। সেই অসমসাহসী সমুদ্রচারীদের কথা বলেন ক্যামোয়েঁশ যাদের কোনও বাস্তবিক ভৌগোলিক অভিলাষের সঙ্গে যেন সভ্যতার ইতিহাস সংগোপনে লিপ্ত :

এবে দেখো তাহাদের
সমর্পিত সন্দেহসংকুল অর্ণবে
ভঙ্গুর তরণীবক্ষে। উচ্চতর
আকাঙ্ক্ষায় বদ্ধপরিকর......
তাহারা দেখিতে চাহে আলো
উৎসারিত হয় কোথা হ'তে,
চাক্ষুষ করিতে চাহে
প্রত্যুষের আশ্চর্য দোলনা
('উশ লুসিয়াদাশ', ১, ২৬)

দীর্ঘ আখ্যানের কোনও একটি বিশেষ অঙ্গে বিপর্যস্ত মানুষিক অবস্থার বর্ণনায় ক্যামোয়েঁশ যেন প্রাকৃতিক প্রজ্ঞারই নির্দেশ :

সমুদ্রে কতো না যন্ত্রণা,
আর কতো দুরন্ত ঝটিকা,
কতো অভিধায় হেথা
আবির্ভাব ঘটে মরণের!
কতো না আহবে ছিন্ন স্থল,
কতো হীন ছলনায়,
আর কতো ঘৃণ্য সাধিতব্যের সাধনে!
('উশ লুসিয়াদাশ', ১, ১০৫)

লাতিনদের সেই সুপ্রাচীন জাতীয় ক্রীড়া, 'বুল-ফাইট' বা 'বৃষ-যুদ্ধের' বর্ণনা করতে ছন্দে, ব্যঞ্জনায় ও চিত্র-ধর্মিতায় ক্যামোয়েঁশের পংক্তিগুলির সক্ষমতা নিঃসংশয়ে অসাধারণ। (এখানে মূল পর্তুগীজ উদ্ধৃত করার লোভ যে কোনও সমালোচকের পক্ষেই স্বাভাবিক, কারণ যে কোনও অনুবাদে স্তবকটির স্বকীয় সৌষ্ঠব্য নষ্ট হতে বাধ্য)—

Qual no carro sanguino o
ledo amante,
Vendo a formosa dama
desejada,
O touro busca, e pondo-se
diante,
Salta, corre, sibila, acena,
e brada:
('উশ লুসিয়াদাস': ১, ৮৮)

বৃষ-যোদ্ধা যাঁ তরেয়াদর যে পেশল ক্ষিপ্রতায় মারমুখী ষণ্ডের সঙ্গে খেলে আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণের চোট সামলে, তার সম্যক প্রতিধ্বনি ক্যামোয়েঁশের উপর্যুপরি সাতটি ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া-পদের ব্যবহারে (৩য় ও ৪র্থ পংক্তি)। এডয়ার্ড কুইলিনানের প্রশংসনীয় অনুবাদেও মৌলিক কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ :

So in the ensanguined ring
the lover gay,
In sight of her whose beauty
fires his mind,
Confronts the bull, runs round
him, leaps away,
Shouts, hisses, now before
him, now behind;

আখ্যানবস্তুর দিক থেকে 'উশ লুসিয়াদাশে' যা পরিবেশিত হয়েছে তার অধিকাংশই ঐতিহাসিক ঘটনা, এবং সে-হিসাবে ক্যামোয়েঁশের বাস্তবিকতা প্রশংস্য। কাল্পনিককে যথেষ্ট সুযোগ দিলেও, ক্যামোয়েঁশ মুখ্য বস্তুরূপে পর্তুগীজ ইতিহাসের মালমসলাই ব্যবহার করছেন। এই ব্যবহারেও কবির গ্রহণ ও বর্জনের শিল্পীজনোচিত বুদ্ধি প্রকাশিত। ভাস্কু দা গামার রোমাঞ্চকর অভিযান-কাহিনী বলতে বলতে ক্যামোয়েঁশ পর্তুগীজ রাজপরিবারের এমন কিছু কিছু কাহিনী মহাকাব্যের পরিচ্ছন্ন পরিণাহে সন্নিবেশিত করেছেন, যাতে এপিক-স্বরূপের সৌন্দর্য খণ্ডিত হয়নি। এই রকম একটি কাহিনীর উল্লেখ 'উশ লুসিয়াদাশ'-এর এক বিশেষ আকর্ষণ। সুন্দরী ইনেশ-এর কাহিনী। (প্রসঙ্গতঃ, এজ্রা পাউন্ড এই কাহিনীর অন্তর্নিহিত কাব্য সম্বন্ধে খুব আগ্রহী; তবে তিনি বলেন যে, বাস্তবে এই ইনেশ এমন পর্যাপ্তভাবে চেনা-জানা হয়েছিল, যে তার দায়ে শিল্পের করণীয় অংশ বোধ হয় সামান্যই ছিল।) *

'উশ লুসিয়াদাশ'-এর তৃতীয় খণ্ডে পর্তুগীজ-রাজ 'গর্বিত' আলফোনসুর প্রসঙ্গে পৌঁছে ক্যামোয়েঁশ ইনেশ দ কাসত্রু-র কাহিনী বিবৃত করেন। এই ইনেশের সঙ্গে জড়িত চতুর্দশ শতাব্দীর পর্তুগীজ ইতিহাসের এক মর্মন্তুদ কাহিনী। ইনেশ, যাকে লোকে বলত 'বক-কন্ঠী' (কোল্লু দ গার্‌শা) এবং

* ভাস্কু দা গামাকে স্মরণীয় করতে ক্যামোয়েঁশ ছাড়া অন্ততঃ আরেকজন শিল্পীর প্রচেষ্টা মনে করা যায় : ঊনিশ-শতকী ইতালীয় জিয়াকোমো মেইয়রবেরের 'আফ্রিকেন' নামক অপেরায় দা গামা এক প্রেম-কাহিনীর নায়ক। কিন্তু ইনেশ্‌ দ কাস্ত্রুর এই মর্মস্পর্শী আখ্যান নিয়ে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা কি একমাত্র ক্যামোয়েঁশেরই? পাউন্ড-উক্ত পদ্ধতিতে ইনেশ-বৃত্তান্ত নিঃশেষিতসত্ত্ব হয়েছে, এমতো ধারণা, অন্ততঃ বর্তমান প্রবন্ধ-কারের কাছে, যথেষ্ট সংগত ঠেকে না। হয়ত ইনেশ্‌ দ কাস্ত্রু সংক্রান্ত চর্চার আরো সাক্ষ্য য়ুরোপীয় সাহিত্যে ও ও শিল্পে বিন্যস্ত আছে। এ বিষয়ে বিদগ্ধ পাঠকের আলোকপাত বর্তমান প্রবন্ধকারকে উপকৃত করবে।—'সার্থবাহ'।

যে ছিল সম্ভবতঃ এক জারজ সন্তান, কস্তান্‌সা নাম্নী এক ডিউক-কন্যার সহচরী হিসাবে কোনও অভিজাত পরিবারে পালিত হয়েছিল। আলফোনসু-পুত্র দঁ পেদ্রু কস্তানসাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু অচিরেই ইনেশ পেদ্রুর প্রেমাস্পদা হয়ে ওঠে। কস্তান্‌সার অকালমৃত্যু ঘটে এবং পেদ্রু তাঁর রক্ষিতা ইনেশকে স্ত্রীর মর্যাদা দেন তাকে গোপনে বিয়ে করে। কিন্তু পুত্রের এই অনাচারকে প্রশ্রয় দিতে রাজী ছিলেন না অহংকারী আলফোনসু, যাঁকে আবার কাসত্রু বংশের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কতিপয় লোক উস্কানিও জুগিয়েছিল। তাই বিচক্ষণ নৃপতি—

এবম্বিধ কামনারে হেরিলেন
বৃদ্ধের নয়নে,
করিলেন মরণ বিধান সেই কুহকিনীর—।
('উশ লুসিয়াদাশ', ৩, ১২২)

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতা ইনেশ, আত্ম-প্রত্যয়ে সকরুণ তবু সঙ্গত। ক্যামোয়েঁশ তার মুখে এমন কথা জুগিয়েছেন যাতে রেনেসাঁসী নারীত্বের মহত্ত্ব প্রকাশিত। আতিশয্য নেই ইনেশের উক্তিতে, ভাগ্য-চক্রে অবমানিত নারীর যন্ত্রণা আশ্চর্য অভিব্যক্তি পায় ইনেশের আবেদনে।—

নির্বাসিত করো মোরে
নিষ্ঠুরতা যেথা প্রকৃতির
প্রত্যক্ষ আইন, থাকি ব্যাঘ্র
ও সিংহের রাজ্যে; দেখি
নারীর দুর্দশা করে না-কি
উদ্রিক্ত সে-করুণা পশুতে
যা আমি করেছি যাচ্ঞা
বৃথা এই মানুষের ঘরে।
('উশ লুসিয়াদাশ' : ৩, ১২৯)

বৃদ্ধ নৃপতিরও মন টলে। কিন্তু নৈতিক নিষ্ঠার সঙ্গে এসে যোগ দেয় কূটবুদ্ধি ও প্ররোচনা, আর ত্বরান্বিত করে ছুরিকাঘাতে ইনেশের মৃত্যু। ক্যামোয়েঁশের জ্বালাময় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় কাপুরুষ নারীহন্তৃদের বিরুদ্ধে। দ্রুপদী ক্যামোয়েঁশও যেন ভাবাবেগে মুহ্যমান হয়ে পড়েন ইনেশের হত্যা-কাণ্ডের কথা বলতে গিয়ে। ব্যথাতুর প্রচণ্ডতায় মহাকবি এই অমানুষিকতার স্মরণে সূর্যকে বলেন তার উদয়-অস্ত বন্ধ রাখতে (৩, ১৩৩)। মানুষিক ক্যামোয়েঁশ ভোলেন না ইনেশের সেই 'শুভ্র গ্রীবাদেশ' যা রক্তে নাইয়ে দিয়েছে আততায়ীর ছুরিকা (৩, ১৩২)।

পেদ্রু অবশ্য তাঁর প্রিয়তমা ইনেশের এই পরিণতি মেনে নেননি। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তিনি, রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ইনেশের হত্যাকারীদের আর স্নান কবরের ক্রোড় থেকে তুলে এনেছিলেন শবরূপী ইনেশকে তাকে রাণীর সজ্জায় সজ্জিত করে তাঁর রাজ্যাভিষেক পূর্ণ করতে।

॥ সিনেটোরিয়াম ॥

কিছুদিন আগে এদেশে সারকারামা নামক এক বিশেষ ধরণের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। সারকারামা চলচ্চিত্র-শিল্পের একটি আধুনিকতম অবদান। তাছাড়া যারা ইংরিজি ছবি দেখতে যান, তারা সিনেমাস্কোপ, টড-আও সিনেমিরাবেল কিম্বা সিনেরামা প্রভৃতি নামের সংগে নিশ্চয়ই পরিচিত। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গ শহরের সিনেমা-পাড়ায় সিনেটোরিয়াম নামে যে গোলাকৃতি সিনেমা তৈরী হচ্ছে, আগেকার সর্বকিছুকেই তা লজ্জা দেবে। সিনেটোরিয়াম হচ্ছে ছবি তোলা ও ছবি প্রক্ষেপনের অভিনব আশ্চর্য আবিষ্কার। পৃথিবীতে এই আধুনিকতম সিনেমাঘর তৈরী করছেন চিত্রপ্রযোজক এডালবার্ট বালটেস।

সম্পূর্ণ গোলাকার ছবি অবশ্য একেবারেই নতুন নয়। ১৯০০ সালে প্যারিস বিশ্ব প্রদর্শনীতে এরকম ছবি দেখান হয়। বারোটি ক্যামেরায় তোলা ছবি, বারোটি প্রক্ষেপন যন্ত্রের সাহায্যে গোলাকৃতি পর্দায় দেখান হয়—যাতে দর্শকেরা

৩৬০ ডিগ্রীর সবকোণ থেকেই ছবি দেখতে পান। পরে ঐ পদ্ধতির নানা উন্নতি হলেও খরচ খুব বেশী। বহু ফিল্ম লাগে। ছবির আলোছায়ার খুব তারতম্য হয় এবং বারোটি ছবির মাঝে মাঝে আলাদা দাগ দর্শকচক্ষুকে পীড়িত করে।

চিত্রপ্রযোজক এডালবার্ট বালটেস তাঁর নতুন পদ্ধতিতে সবরকম অসুবিধা দূর করতে সমর্থ হয়েছেন। ক্যামেরার পরকলার ওপর তিনি আরেকটি আধা-গোলাকার পরকলা লাগিয়েছেন। যার ফলে যে কোন ছবি ৩৬০ ডিগ্রী কোণ থেকে ধরা পড়ে। পারিপার্শ্বিকের বিকৃত মূর্তি আধা গোলাকার আয়নায় প্রতি-

ফলিত হয়ে ক্যামেরায় ধরা পড়বে। যে সিনেমাঘরে এই ছবি দেখানো হবে, সেটিও বিশেষভাবে তৈরী। টেনিস বলের মত বিরাট কক্ষে দর্শকেরা বসবে। কক্ষের নীচে থেকে ও মধ্যখান থেকে কক্ষের সিলিং থেকে ঝোলানো একটি গোলাকার আয়নার ওপর বিকৃত গোলাকার-মূর্তি ছবি ফেলা হবে এবং ঐ আয়না থেকে যখন ছবি সিনেমা হলে গোল করে টাঙ্গানো পর্দার ওপর প্রতিফলিত হবে, তখন তার আর কোন বিকৃতি থাকবে না এবং ছবিটি একটি সম্পূর্ণ ছবি মনে হবে। মাঝে মাঝে কোন দাগ দেখা যাবে না।
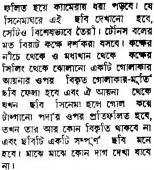
দর্শকেরা ঘোরা-চেয়ারে বসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে। সাতনলা স্টিরিও-সাউন্ড পদ্ধতিতে অবিকল ধ্বনি সৃষ্টি করা হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেলগাড়ীর দৃশ্যের সময় দর্শক ভাববে সে যেন রেলের কামরায় বসে আছে। পায়ের তলায় চাকার শব্দ, সামনে ইঞ্জিনের হুইশিল। হঠাৎ হুস করে আরেকটা ট্রেন বেরিয়ে গেল। আবিষ্কারকের মতে বারে বারে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে দর্শকদের অসুবিধে হবে না। কারণ মানুষ তো দিনের মধ্যে হাজার জিনিস হাজার বার মাথা ঘুরিয়ে দেখতে অভ্যস্ত।

সিনেটোরিয়াম পদ্ধতিতে এখন রোমাঞ্চ সৃষ্টি করা হলেও, ভবিষ্যতে পূর্ণ দৈর্ঘ্য সাদা কালো ও রঙীন ছবি যে তোলা হবে, সে বিষয়ে আবিষ্কর্তা নিঃসন্দেহ।

॥ খেয়াল ॥

মানুষের খেয়ালের শেষ নেই। কত রকম অদ্ভুত খেয়াল হতে পারে তা আমাদের সকলের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। খেয়ালের রকমফের আছে। আর সেই খেয়াল যদি হয় কিছু সংগ্রহ করার ঝোঁক, তাহলে বলা মুস্কিল কি সংগ্রহ করা সম্ভব। টিকিট ও হস্তাক্ষর সংগ্রহ আমাদের দেশে সবথেকে বেশী জনপ্রিয়। কিন্তু স্টুটগার্টের ৩৩ বৎসর বয়স্ক যুবক ম্যানফোর্ড ফ্রিট্জের খেয়াল কিছুটা অদ্ভুত ধরণের। বিশ্বের খ্যাতনামা ফুটবল ক্লাবগুলির ব্যাজ সংগ্রহ করাই হচ্ছে তার খেয়াল। ৩৩টি দেশের ৬২৫টি ব্যাজ সংগ্রহ করেছেন এই উৎসাহী সংগ্রাহক। আশেপাশের কয়েকটি ক্লাবের ব্যাজ নিয়ে তার এই সংগ্রহ শুরু হয়। বর্তমানে তার ভেলভেট কুশনে মাদ্রিদ, মস্কো, লিসবন, লণ্ডন, টিউটরিন, মিলান, ব্রাজিল, বুডাপেস্ট, বেলগ্রেড প্রভৃতি স্থানের খ্যাতনামা ফুটবল ক্লাবগুলির ব্যাজ সংগৃহীত হয়েছে। এই বিচিত্র বর্ণের উজ্জ্বল অভিনব সম্পদগুলি একত্রে একটি মূল্যবান সম্পত্তিতে পরিণত হতে চলেছে। গত আট বছরে সংগৃহীত এই দ্রব্যগুলি ২,০০০ মার্কে বীমা করা আছে।
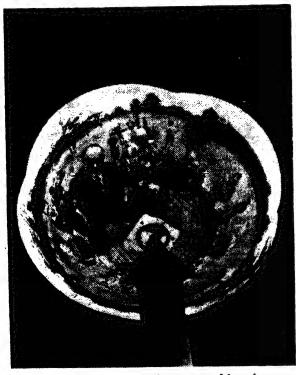
অর্ধবৃত্তের মধ্যে পারিপার্শ্বিক সমস্ত মূর্তি ধরা পড়ে। চারিদিকের চিত্রগ্রহণের জন্য ক্যামেরাটি মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়েছে। ক্যামেরায় ফিল্মে বৃত্ত থেকে প্রতিফলিত মূর্তির ছবি ওঠে। সিনেমা-কক্ষে অনুরূপ অর্ধবৃত্তের উপর ঐ ফিল্ম পুনরায় প্রক্ষিপ্ত হয় এবং সেখান থেকে ঐ মূর্তি কক্ষের বাঁকানো গোলাকার পর্দায় প্রতিফলিত হয়ে যথাযথ রূপ নেয়। বৃত্তের উপর প্রতিফলিত মূর্তিতে অ্যাডালবার্ট বালটেসকে এই চিত্রগ্রহণকারী প্রেস ফটোগ্রাফারের কাছে তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে দেখা যাচ্ছে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন স্কুলের কাজ শেষ হলে দিলীপ যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, হেড মাষ্টার বললেন, 'একটু দাঁড়িয়ে যাও। তোমার সংগে কথা আছে।' তারপর সকলে চলে গেলে বললেন, তুমি কি কাউকে ঐ সুতোটা বাঁধতে দেখেছিলে?

—না, স্যর। পরে সব শুনেছি।

—তাহলে বলতে গেলে কেন তুমি জানো?

—প্রথমটা আমি আন্দাজ করেছিলাম, তারপর সে নিজেই আমার কাছে স্বীকার করেছে।

—তাকে ঠিক 'জানা' বলে না। শোনা কথা সত্যি হলেও, তোমার চেপে যাওয়া উচিত ছিল।

দিলীপ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। হেড মাষ্টারমশাই বললেন, 'জানি' যখন বলে ফেলেছ, নামটা জানিয়ে দিতে বাধা কিসের?

—তাকে আমি কথা দিয়েছি, স্যর। তাছাড়া—

—কী, বল।

—এখন নয়, কদিন পরে আমি সব আপনাকে খুলে বলবো।

—কিন্তু তোমার নিজের দিকটা একবার ভেবে দেখেছ?

—দেখেছি। যে-কোনো পানিশমেণ্টের জন্যে আমি প্রস্তুত।

—শুধু পানিশমেণ্ট নয়, তার পরে আরেকটা ব্যাপার আছে, যেটা তোমার পক্ষে সত্যিই সিরিয়স্।

হেড মাষ্টার কিসের ইঙ্গিত করছেন, বুঝতে না পেরে দিলীপ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি বললেন, আমি নিজে থেকে বলছি না, সন্তোষবাবুই তোমাকে জানাতে বললেন। তুমি বোধহয় জান না, তোমার পরীক্ষার দরখাস্তের সংগে বর্ষ্টালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের একটা সার্টিফিকেট লাগবে। গুড কণ্ডাক্টের সার্টিফিকেট। এখন যদি তোমার কোনো বড় রকমের শাস্তি হয়, সেটা যে হবেই তুমি বুঝতে পারছ, ঐ সার্টিফিকেট তোমাকে দেওয়া হবে না। তার মানে—

বাকীটা হেড মাষ্টার অনুক্ত রাখলেও দিলীপ নিজেই পূরণ করে দিল। সুমুখের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে অনেকটা যেন আত্মগতভাবে বলল, পরীক্ষা দেওয়া হবে না।

—অথচ এত বড় একটা সংকট তুমি ইচ্ছা করলেই এড়াতে পার। শুধু একবার বলে দেওয়া—কে? এখানে আমার কাছেও বলতে পার। কেউ জানতে পারেব না।

—সে হয় না, স্যর।

হেড মাষ্টার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর এই দীর্ঘ-পরিচিত নিরীহ, শান্ত, নম্র, লাজুক ও ক্ষীণকায় ছাত্রটির মুখের পানে। এতখানি দৃঢ়তা সেখানে আর কখনো দেখেননি, এই স্থির সংকল্পের অবিচল কণ্ঠও কোনোদিন শোনেননি। প্রায় সারা জীবন এদের মধ্যে কাটিয়েও তিনি বোধহয় জানতেন না কিংবা জেনেও মনিবের নির্দেশে চেপে রেখেছিলেন যে, কিশোর-মন বিধাতার এক আজব সৃষ্টি। ভুলিয়ে, মিষ্টি কথা দিয়ে, স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে তাকে সহজেই নোয়ানো যায়। কিন্তু ভয় দেখালেই সে কঠিন ইস্পাত। শাসনের আঘাত সেখানে ঘা খেয়ে ফিরে আসে, ভবিষ্যৎ শুভাশুভের আবেদন সাড়া জাগায় না। কৈশোর সবকিছু মেনে নিতে পারে কিন্তু 'ভীতি প্রদর্শন' নামক মহাস্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করা তার ধর্ম নয়।

হেড মাষ্টার শেষ চেষ্টা করলেন। বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না দিলীপ, একটা জিদের জন্যে তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে চলেছে। ভালো করে আর একবার ভেবে দ্যাখ। এতদিনের এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে যাবে? তোমাকে দিয়ে আমাদের অনেক আশা।

মাষ্টারমশাই থেমে যাবার পরেও দিলীপ কিছুক্ষণ জানালার বাইরে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি মেলে নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সহসা বলে উঠল, আমি পারবো না, স্যর। বলেই আর দাঁড়ালো না, বিদায় পর্যন্ত নিল না, বইগুলো বুকে চেপে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল।

হেড মাষ্টারকে না বললেও, আর একজনের কাছে দিলীপ তার মনের কথাটা চেপে রাখতে পারেনি। তিনি প্রেস-মাষ্টার, বিনোদবাবু। পরদিন কাজের ফাঁকে এক সময়ে ওকে একান্তে পেয়ে বললেন, ছেলেটা কে আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুমি তার জন্যে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছ কেন? তার সংগে তো তোমার বিশেষ ভাবও নেই। কদিন আগেই সে তোমার নামে কত কী লাগিয়েছে চীফ্ অফিসারের কাছে।

দিলীপ মৃদু হেসে বলল, জানি।

বিনোদবাবু বিরক্তির সুরে বললেন, জানো যদি, তাহলে তার ওপরে এত দরদ কিসের? তোমার যে শুধু পরীক্ষা বন্ধ করেই ছেড়ে দেবে সন্তোষ সেন, তা মনে করো না। আরো একটা বড় ছোবলের জন্যে তৈরী থেকো। ভিজিটিং

কমিটিতে তোমার নাম যাবে না। পুরো টার্মটি খেটে তবে যদি বেরোতে পার।

দিলীপকে হঠাৎ অনামনস্ক মনে হল। কিছুক্ষণ কী ভেবে নিয়ে বলল, সে-ক্ষতি আমার সইবে, ওর সইবে না।

—কার?

—যাকে আপনি সন্দেহ করছেন। শচীন।

—ভিজিটিং কমিটির আসছে মিটিং-এ ওর নাম যাচ্ছে। সাহেব ওর বাবাকে কথা দিয়েছেন। এই সময়ে যদি একটা পানিশমেণ্ট হয়, সব ভেস্তে যাবে। খালাস পেতে অনেক দেরি হবে বেচারার। তদ্দিন ওর মা বোধহয় বাঁচবেন না। অনেক দিন থেকে অসুখ। কাল আমাকে তাঁর চিঠি দেখিয়েছে।

বিনোদবাবু বলতে যাচ্ছিলেন, তোমার মা-ও তো তোমার জন্যে পথ চেয়ে আছেন। কোথায় আছেন, তা-ও তুমি জানো না। তোমাকে গিয়ে তাঁকে পথে পথে খুঁজে বেড়াতে হবে। ঐ ভিজিটিং কমিটির অনুগ্রহ যে তোমারও চাই। শচীন বা আর কারো চেয়ে সে-প্রয়োজনটা কিছুমাত্র কম নয়।

বলতে গিয়েও থেমে গেলেন প্রেস-মাষ্টার। ওর চোখের দিকে চেয়েই বুঝলেন, সে-কথা ওকে মনে করিয়ে দেবার মত বাহুল্য আর কিছু হতে পারে না। সেটা কি ও জানে না? হয়তো জানে বলেই যাকে ও কখনো দেখেনি, তেমনি আর একজন রোগশয্যা-শায়িনী মায়ের কথা ভেবে আজ এত-খানি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শচীন এখানে কেউ নয়, সে শুধু উপলক্ষ।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা শচীন ব্যানার্জি তিনচারবার ব্যর্থ চেষ্টার পর হাসপাতা-লের পাঁচিলের ধারে গোপনে দেখা করল দিলীপের সঙ্গে। বলল, আমার জন্যে তোমার কেন সাজা হবে? সবাই বলছে তোমার পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি আমার নাম বলে দাও। তা না হলে আমি নিজেই গিয়ে—

'পাগলামো করো না, শচীন,' তির-স্কারের সুরে বাধা দিল দিলীপ। চুপ করে থাকো। কখ্খনো ভুলো না, তোমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে।'

—তাই বলে, এমনি করে?

দিলীপ আবার কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় অন্য দুতিনটি ছেলে এসে পড়ল। তারপরেই শোনা গেল চীফ অফিসারের হাঁকডাক। অবিলম্বে যার যার নিজের 'হাউস্'এ গিয়ে 'গুনতি' দিতে হবে। ওদের আর কোনো কথা হল না। দিলীপ তাড়াতাড়ি তার ওয়ার্ডে গিয়ে ঢুকল, শচীন চলে গেল মেইন ব্যারাকের দিকে। ঐদিন সকালেই তাকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করা হয়েছে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে সুপার দিলীপকে তার একগুঁয়েমির ফলাফল সম্বন্ধে আর একবার সাবধান করে দেবার প্রয়োজনবোধ করলেন। আরো স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, এ ব্যাপারে কঠোর শাস্তি অনিবার্য। তাছাড়া পরীক্ষা সম্পর্কে যে কথা কদিন আগে হেডমাষ্টারকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন, এবারে ঐ সঙ্গে নিজেই তার আভাস দিলেন। বললেন, কী করবো বল? আমি নিরুপায়।

দিলীপের কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। অধ্যক্ষ যখন উত্তরের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তখন, আগে যা বলেছিল তারই পুনরুক্তি করে বলল, প্রথম দিন যা জানিয়েছে তার উপরে তার আর কিছু বলবার নেই।

বর্ষ্টাল-ইন্‌মেট্‌দের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ থাকে, (রোজই আসে কিছু না কিছু), অধ্যক্ষ তাঁর আফিসে বসেই তার বিচার করেন। সাধারণ ক্ষেত্রে ঐটাই তাঁর কোর্টরুম। এই মামলাটি অসাধারণ। একজন কর্তব্য-নিরত সরকারী কর্ম-চারীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। সে-ও মাষ্টার বা কেরানী জাতীয় লোক নয়, প্রশাসন-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে পাহারা-কার্যে নিযুক্ত কর্মী, এ গার্ড, অন্ ডিউটি। বর্ষ্টাল স্কুলের মত পিনাল

কী করবো বল? আমি নিরুপায়

ইন্‌স্টিটিউশন, অল্পবয়স্ক ক্রিমিনাল্‌দের চরিত্র সংশোধন যার একমাত্র লক্ষ্য, সেখানকার একটি ইনমেটের পক্ষে এটা অতি গুরুতর অপরাধ। সে অপরাধ যে করেছে, এই চরম ইন্‌ডিসিপ্লিন এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সে দেখাতে পারে, তার সম্বন্ধে এখানকার সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাব দেখা দেবে, তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে অন্যান্যেরা নিজে থেকে এগিয়ে আসবে, এইটাই আশা করেছিলেন অধ্যক্ষ। কিন্তু তা হয়নি। উপরন্তু, একজন বিশিষ্ট ইনমেট্‌ দোষী কে জেনেও তার নাম প্রকাশ করতে বারংবার অস্বীকার করেছে। তার অপরাধ আরো গুরুতর, এবং সেজন্যে এমন একটি শাস্তি তাকে দেওয়া দরকার, অন্য সকলের কাছে যেটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। যাকে বলে, এ সিভিয়র অ্যান্ড এগ্‌জেম্‌প্লারী পানিশ্‌মেন্ট। সে শাস্তি সকলের সামনে ঘোষণা করা প্রয়োজন। অপরাধের গুরুত্ব এবং তার সঙ্গে এইসব নানা বিষয় বিবেচনা করে সুপার স্থির করলেন, অফিস রুমে নয়, স্কুলের মাঠেই এ মামলার বিচারের উপযুক্ত স্থান। চীফ্‌ অফিসারকে ডেকে সেইমতো ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলেন। স্কুল, ওয়ার্কশপ, কিচেন, হাসপাতাল সব জায়গা থেকে প্রতিটি ছেলেকে ডেকে এনে দেবদারু গাছের ছায়ায় অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড় করানো হল। সামনের দিকে অধ্যক্ষের চেয়ার, টেবিল, তার দুপাশে অন্যান্য কর্মচারী,—টিচার, ইনস্‌ট্রাকটর এবং কেরানীবাবুদের বসবার আসন। একে একে তারা এসে সেগুলো অধিকার করলেন। সকলের শেষে এলেন সুপার, তার পিছনে হেড্‌মাস্টার, হাতে একখানা ছোট বাঁধানো খাতা,—যার নাম হিস্ট্রী টিকেট। চোখের উপর সেই খাতাটা খুলে ধরে ডাকলেন, দিলীপকুমার ভট্টাচার্য। অর্ধবৃত্তের কোনো একটা ধার থেকে দিলীপ এসে নতমুখে দাঁড়াল অধ্যক্ষের টেবিলের ওপাশে। ছেলেদের মধ্যে এতক্ষণ যে চাপা গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছিল সব একমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলের চক্ষু একটি বিন্দুতে নিবদ্ধ। সকলের মুখেই রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা।

সুপার উঠে দাঁড়ালেন। ভূমিকা-স্বরূপ একটি ছোট্ট বক্তৃতায় বর্স্টাল স্কুলের অধঃপতনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। তারপর বর্তমান আসামীর অপরাধ এবং অনমনীয় মনোভাবের (যাকে তিনি ঔদ্ধত্য বলে মনে করেন) বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে, এখানকার আইনানুসারে কঠোরতম শাস্তিই তার প্রাপ্য, এই পর্যন্ত আসতেই হঠাৎ একটি অতিশয় বেঁটে, মোটা কালো ছেলে লাইন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে বলল, দিলীপের কোনো দোষ নেই, স্যর। সুতো আমি বেঁধেছিলাম।

তুমি! বিস্ময়ের এবং খানিকটা কৌতুকের সুরে বললেন সন্তোষবাবু। কেশব তেমনি দৃঢ়ভাবে বলল, হ্যাঁ, স্যর।

'কেশো'কে দেখলেই ছেলেমহলে হাসির ধুম পড়ে যায়। এই প্রথম তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। চারদিকে, ছোট বড় সকলের মুখেই কেমন একটা থমথমে মেঘ। বিদ্রূপঝলকের চিহ্নমাত্র নেই। সুপার কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বেরিয়ে এল আরেকজন। বুকের উপর আঙুল রেখে জোরের সঙ্গে বলল, কেশব মিছে কথা বলছে। দড়িটা আমি বেঁধেছিলাম।

—ও নয়, আমি। বলে উঠল আর একটি বড় ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে উঠল তার প্রতিধ্বনি—আমি, আমি, আমি।

'চুপ করো' ধমকে উঠলেন অধ্যক্ষ। 'যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও।'

সামনে যারা এগিয়ে এসেছিল আবার লাইনে মিশে গেল। কিন্তু ক্ষোভটা চাপা রইল না। তারই একটা অস্পষ্ট কিন্তু উত্তপ্ত গুঞ্জন বৃত্তার্ধের এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। সন্তোষবাবু হাত তুলে থামাতে চেষ্টা করলেন, বিশেষ ফল হল না, গোলমাল চলতে লাগল। তখন হেড মাস্টার উঠে দাঁড়ালেন। গলার পরদা যথাসাধ্য উঁচুতে তুলে কিন্তু অনেকটা আবেদনের সুরে বললেন, 'উনি কী বলতে চাইছেন শোনো। তারপর তোমাদের যদি কিছু বলবার থাকে, আমরা অবশ্যই শুনবো।'

এবারে গোলমালটা একটু থিতিয়ে আসতেই সুপার বললেন, শোনো, তোমরা ভুল করছ। তোমাদের মধ্যে কে দোষী, আমি জানি না। সে-ই হোক সে একে তোর কলঙ্ক করলেই, তোমাদের এই সমস্যকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। যার যদি ও নিজেও তাকে অর্থাৎ আসল অপরাধীকে দেখিয়ে দেয় কিংবা তার নামটা প্রকাশ করে। এবার বলতে পার কে একাজ করেছ?

—'আমি, স্যর।' ধীরপায়ে এগিয়ে এল শচীন ব্যানার্জি।

দিলীপ এতক্ষণ একটিবারও মাটি থেকে চোখ তোলেনি। এবার হঠাৎ চমকে উঠে তাকাল শচীনের দিকে। পরক্ষণেই যেমন ছিল, তেমনি আবার চোখ নামিয়ে নিল। সুপার তার দিকে ফিরলেন। ক্ষণকাল তার আনত মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলে বললেন, শচীন যা বলছে, সত্যি?

এই কঠোর প্রশ্নের রূঢ় আঘাতে বিরত, বিপন্ন দুটি নিরুপায় ক্লান্ত চোখ ধীরে ধীরে একবার অধ্যক্ষের মুখের উপর গিয়ে থামল। কয়েকটিমাত্র মুহূর্তের ব্যবধান। তারপরেই শোনা গেল, মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট কণ্ঠে সেই একই উত্তর—আমার যা বলবার, আমি আগেই বলেছি, স্যর।

—আর কিছু বলবে না?

দিলীপ একথার আর কোনো উত্তর দিল না। মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে সন্তোষ সেন সেই ছোট্ট বাঁধানো খাতাখানা যেন ছিনিয়ে নিলেন হেডমাস্টারের হাত থেকে, ক্ষীপ্রবেগে কলম চালালেন তার উপর, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন— solitary confinement for one month. একমাস তোমাকে নির্জন সেল্‌-এ কাটাতে হবে।......দুঃখের বিষয় এর চেয়ে কঠোরতর শাস্তি আমার হাতে নেই। থাকলে তা-ই দিতাম।

জেল-প্রাঙ্গনের প্রান্তসীমায় ঘন-গাছপালার অন্ধকারে তিনদিকে নিরেট দেয়াল আর একদিকে একটিমাত্র গরাদ-দেওয়া বন্ধ দরজার অন্তরালে 'সেল'-নামক সেই জনমানবহীন, ঠাণ্ডা-কনকনে খুপরিগুলোর কথা মনে করে এই শীতের সন্ধ্যায় শুধু ছেলেদের নয়, তাদের রক্ষীদের মুখেও আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠল। কিন্তু দীর্ঘ একটি মাস সেই নিঃসঙ্গ নির্বাসনে যাকে কাটাতে হবে তার চোখে মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। দুহাত তুলে যথারীতি সুপারকে নমস্কার জানাল। তারপর চীফ্‌ অফিসারকে অনুসরণ করে নিঃশব্দে পা বাড়াল তার নতুন আশ্রয়ের উদ্দেশে। তার কাছে নতুন হলেও, জেল-খানায় সেই চির পুরাতন 'নির্জন', যার [illegible] যেখানে ফেলে রেখে বেপরোয়া অবাধ্য কয়েদীকে শায়েস্তা [illegible] করতেন তখনকার দিনের জেল-কর্তারা।

সেইসব নামের 'লিস্টি'ওয়ালা গাড্‌-বুক যদি খুঁজে পাওয়া যায়, শেষদিকের শূন্য পাতায় আর একটা নাম যোগ করা হবে—একশ [illegible] নম্বর ইনডাস্ট্রিয়াল বয়, দিলীপ ভট্টাচার্য। (ক্রমশঃ)

ব্যক্তিত্বের সঙ্কট ও সঙ্গীত

শঙ্কর রায়

আধুনিক যুগপ্রবাহে যে পরিস্থিতি অনায়াসে বিধৃত, তার পরিপ্রেক্ষিতে একথা অনস্বীকার্য যে আধুনিক শিক্ষার পরিণতিপ্রবণ প্রভাব অন্ততঃ কলার ক্ষেত্রে আশীর্বাদরূপে বর্ষিত হয়নি, বরং গ্লানিলিপ্ত অধ্যায় সূচিত করেছে সর্বাংশে। সনাতন ভারতীয় শিক্ষাধারার সঙ্গে তুলনা করলেই এই দুই ধারার মধ্যবর্তী মেরু-অতিশায়ী ব্যবধান প্রতীয়মান হবে। অধিক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র প্রাথমিক মাত্রা-বিচারেই এই ব্যবধানবিশালতা স্বচ্ছ হবে। যেমন, সনাতন শিক্ষাধারার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক-স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে ফলবতী করা; ব্যক্তিবিকাশের পথনির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা সামগ্রিকভাবে মুক্তিসাধনায় পরিপূর্ণ হত। কিন্তু ইদানীংকালে শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকারসাম্য, সমরেখমান ও সাধারণীকরণের প্রসঙ্গ এসে গেছে, এদের সংহত অরাজকতা শিক্ষার মৌলকে বিচ্যুত করতে প্রয়াসমান। বলা বাহুল্য, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এই উগ্র আধুনিকতার গরল এক সর্বগ্রাসী প্রভাব ব্যাপৃত করেছে। যদিচ সঙ্গীতের সনাতন আভিজাত্যের গাম্ভীর্য আজও অনতিক্রম্য, প্রলয়সম্ভব নিরর্থ সাধারণীকরণের মনোবৃত্তি সঙ্গীতের শিকড় শিথিল করেছে অনেকাংশে, একারণে যে কোন বিচারের আলোকে এই ভয়াবহ মার্গচ্যুতি সমালোচ্য ও প্রতিবাদ্য।

অনেকে এই পরিবর্তনকে 'মার্গান্তর' বলার মতবাদে উপনীত হতে পারেন। কিন্তু 'মার্গান্তর' 'transition from one State to another' এর প্রতিশব্দ, পরোক্ষে মার্গচ্যুতির অর্থ 'relegation from higher to lower status'। এই বিবেচনার সংজ্ঞায় ব্যক্তিবাদী মনের শ্রেণীবিন্যাসে, মার্গান্তরিত ও মার্গচ্যুতের পঙক্তিভোজন স্বভাবতঃই সর্বান্তঃকরণ সমর্থিত নয়।

বিশ্বের সঙ্গীতেতিহাসের প্রাসঙ্গিক সাহায্য নিলে এই আলোচনার উদ্দেশ্য বোধগ্রাহ্য ও অনায়াস হবে, এবং প্রতীয়মান হবে যে, পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর মধ্যে শ্রেয় কে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও একই রূপের বেশান্তর, একই পুনরাবৃত্তির অন্যতম কণ্ঠসুষমা। য়োরোপে অন্ততঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক সৃষ্টিশীলতার আধিপত্য—ব্যক্তির পরিবৃত্তে সেথা মৌলিকতার সর্বতোমুখী অভিব্যক্তি, সুষমার মত নব নব আঙ্গিক স্পর্শ করেছে সেখানে সম্ভাবনা ও প্রাচুর্যের সঙ্গত সমীকরণ। এই কারণে য়োরোপের সঙ্গীতেতিহাসধারায় সঙ্গীতস্রষ্টাদের প্রাধান্য সঙ্গীতজ্ঞদের ইতিহাসই য়োরোপীয় সঙ্গীতেতিহাস। বেটোভেন, মোৎসার্ট হায়ড্‌ন—এঁরা সব এক একটা ইতিহাসের মত আমাদের স্বীকৃতিপ্রবণ স্মৃতিতে দাঁড়িয়ে আছেন। এঁদের কথা সাজিয়ে বললে আমরা অকস্মাৎ অজান্তে অনায়াসে য়োরোপীয় সঙ্গীতেতিহাসকে বিবৃত করে ফেলি।

আমাদের দেশেও একই কথার অনুরণন। ব্যক্তিস্বীকৃতি এখানেও প্রধান। পরিবেশনরীতির স্বাতন্ত্র্য বিশেষত্বের বর্ণে বিকশিত না হলে সঙ্গীতজ্ঞের স্বীকৃতি আজকের বিজ্ঞাপনসর্বস্ব যুগেও দুর্লভ, অর্থাৎ স্রষ্টা যে সৃষ্টি সর্বাংশে তার। কি তথ্যে, কি ইতিহাসে এই সত্য অভিন্নবীজপত্রীরূপে প্রতিভাত। যিনি স্রষ্টা, দ্রষ্টাও তিনি। তাই সঙ্গীতে বর্ণনীয় রূপটি প্রতিচিত্রিত হওয়ার নিশ্চয়তা সেখানে অনিবার্য। দর্শক তার রসপিপাসু-চাতকদলে আসীন। এ বোধ এত জাগ্রত ও সহজাত যে, নিছক অনুকারবাদ ভারতীয় শ্রোতাদের মনে বিন্দুমাত্র স্বাক্ষর রেখে যেতে অক্ষম এখনও। রুচি ও সাধনার মাপে রচনার সজীব রূপদান ও যথাসম্ভব শ্রেষ্ঠ পরিবেশনরীতির স্বাধীন অধিকার ইতিহাসের প্রারম্ভ হতেই এদেশীয় সঙ্গীতবিদদের অসামান্য উত্তরাধিকার। এর সাক্ষ্য দেবার জন্যে বেশী সাধনার প্রয়োজন নেই। ভেবেই দেখুন না কেন, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতেতিহাসের যে কোন দুই ঘরানার শিল্পীর মধ্যেই গায়কীর, পরিবেশনরীতির ও রাগরূপায়ণের বিস্তর প্রভেদ। সঙ্গীতের অগণ্য বাণী ও পদ রয়েছে। সেই পদাবলী থেকে বাণী নির্বাচন সঙ্গীতজ্ঞের স্বাধীন অধিকারভুক্ত। রাগরূপে সেই নির্বাচিত বাণীর সুসমঞ্জস পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের 'পরে নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ একটি বাণীর সাহায্য নেওয়া যাক, 'ভজলে তু হরি হরি, যা রে মন পিয়া পিয়া'—একটি সুপরিচিত বাণীর প্রথম পঙক্তি। কেউ এই বাণী দরবারী কানাড়ায়ও রূপদান করবেন, কেউ মারু বেহাগেও করতে পারেন। এতে ব্যাকরণগত অশুদ্ধির চিন্তামাত্রেই অবান্তর ও নির্বুদ্ধিতাজনিত। কেননা এমন সময়ও দুর্লভ নয় যখন শিল্পী অজ্ঞাতসারে ভাবের আধিপত্যে ব্যাকরণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতিক্রম করে যান; সেক্ষেত্রে বলা বাহুল্য, ত্রুটিমাত্রেই পরিপূরক। কিন্তু জ্ঞানসমন্বিতের অজ্ঞানোচিত কর্ম শ্লাঘনীয় নয়, তিনি ক্ষমারও অযোগ্য। অথচ এই ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদ ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতিকে নির্বস্তুক সুষমাদান করেছে। ভারতীয় সঙ্গীতের সিদ্ধি তাই অসাধারণ, অনন্য। কোন অপ্রচলিত বা অব্যবহৃত ভাষা শিক্ষা করতে গেলে

প্রাথমিকভাবে ব্যাকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু চলতি ভাষার ক্ষেত্রে এর বৈপরীত্যই সত্য। যে ভাষা রোজ বেড়ে উঠছে, পরিবর্তিত হচ্ছে, তার কাছে ঢিমে-তেতালা ব্যাকরণ পেরে উঠবে কেন? খেই সে হারাবেই। বিদেশী ভাষামাত্রেই অব্যবহৃত, সেক্ষেত্রে ব্যাকরণের তরণীতেই বাগ্বিধির হাল ধরে ভাষার বৈতরণী পার হতে হবে। সঙ্গীতবিদ সুরেলা হওয়ায় নিঃশ্বাসপায়ী, বাগ্বিধি তো তার কাছে আপনিই ধরা দেবে, ব্যাকরণ তো স্বাভাবিকভাবেই বেঁধে দেবে শুদ্ধির গণ্ডি। সঙ্গীতের মর্ম সেখানে তটের কাছে লুটিয়ে পড়া ঊর্মিল সমুদ্র, তার সাধনার কাছে সঙ্গীত প্রার্থনার মত নিবিড় হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।

ভারতীয় পাঠশালাশিক্ষাক্রম ভাষাশিক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। ব্যাকরণের 'বন্ধ্যাত্ব' সেখানে থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই ব্যাকরণের নিরঙ্কুশ আধিপত্যও সেখানে স্বাভাবিক। বিদ্যার সহোদরা সঙ্গীত, কেননা তারা কলান্তর্গত একই বিভূতির ভিন্নতর অভিব্যক্তি। সুতরাং বিদ্যা ও সঙ্গীতের নিয়তি পরস্পর অন্বয়ী। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাই এই গরল প্রবিষ্ট হয়ে সঙ্গীতকে সুপ্রা-[illegible], সীমিত, বৈচিত্র্যহীন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে।

উদাহরণস্বরূপ বিদ্যালয়শিক্ষার কথা ধরা যাক। আমাদের দেশে বিদ্যালয়শিক্ষার পদ্ধতি শিক্ষকের ব্যক্তিশিক্ষার বিরোধী, সেই ব্যক্তিপ্রাথমিকতা মুছে দেবার জন্যেই পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, আচরণের নিয়মাবলী ইত্যাদি abstraction এসে গেছে। ব্যক্তিচিন্তার সুষমাতেই গোষ্ঠীগতচিন্তা অনবদ্য লাভ করে, ব্যক্তিচিন্তা ব্যতিরেকে গোষ্ঠীচিন্তার গতিশীলতা কল্পনারও অতীত। এরজন্যে দায়ী রাষ্ট্র। এই [illegible] মুছে দিয়ে প্রতিষ্ঠান ও সংগঠককে প্রাধান্য দিয়ে বিষময় [illegible] অঙ্কুর পালিত করেছে। তবু কদাপি চিন্তা করি না : It is individual who organises, organisation does not make individuals. কারণ আমরা চিন্তায় অভ্যস্ত নই, চিন্তায় গভীরতা আমাদের সিদ্ধি নয় এখন আর; বরং এক তন্দ্রালু অনীহা চিন্তাকে ছায়াবৃত করে রেখেছে।

•জনসাধারণ আজও ব্যক্তিস্বীকৃতিতে মহৎ, অক্লান্ত ও অকুণ্ঠিত। অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রেও এর ব্যতিক্রম নেই, উপরন্তু এর ক্রিয়াবিশেষণ সে স্থানসমূহে প্রযুক্ত, সে সব দেশে সরকার এর উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। ভারতবর্ষে তুলনামূলকভাবেই এই বোধ আজও অনাগত। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সেই মতবাদে স্থিত হতে পারেননি, তাই তাঁরা সম্মেলক কণ্ঠে এখনও বলে থাকেন যে, সঙ্গীতসংস্থাকে ব্যক্তি-অতিগ না হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে হবে। কেননা পঞ্চভূতে সঙ্গীতের অস্তিত্বলাভে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের নির্বুদ্ধিতা সামান্য নয়, অসামান্য। ব্যক্তিস্বীকৃতি, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার কথা যাঁরা কুসংস্কার বলে নস্যাৎ করে দিয়ে নিজেদের সংস্কারমুক্ত বলে প্রচার করতে চান, আসলে তাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৈনাশিক। এই প্রথা বৈদিক যুগে হতে অদ্যাপি বহমান, এবং এর পরিণতি কোথাও স্থাবর হয়নি। তাই Individualism-এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা আজ গভীরভাবে প্রয়োজন।

অধুনাতন শিক্ষাধারায় যোগ্যতম ও শ্রদ্ধাস্পদ গুরুর পরিবর্তে কতিপয় সাধারণ গুণাবলীসম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করার নীতি চলমান। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র এর ফলে প্রতিদিন একাধিক দিশারীর সংস্পর্শে আসে, তারা ভিন্নভিন্ন মতবাদে উপনীত। এর পরিণতিস্বরূপ মতবাদ বিভিৎসা ছাত্রের চিত্তের চিন্তাপ্রবাহে সংঘাতধর্মী স্রোতবৈপরীত্য এনে দেয়। উপরন্তু, শিক্ষকের বিপর্যস্ত ব্যক্তিত্ব ছাত্রের কাছে অতিশয় গ্লানিময় ও বিধ্বংসী—এর চেয়ে ক্ষতিকারক আর কিছু কোন ছাত্রের কাছে নেই। এইরূপে ক্লেদাক্ত, সংগঠনহীন সংঘাতধর্মী ও স্বার্থসিদ্ধিমূলক শিক্ষা প্রগতিকে তো ব্যাহত করেই, অধিকন্তু প্রগতিস্তম্ভ ব্যক্তিবাদের আস্থা বিনষ্ট করে দেয়। ভারতের স্থিতপ্রজ্ঞ সঙ্গীতবিদ রবীন্দ্রলাল রায় বলেন :

"They are precocious at the age of ten and immature at twentyfive, finding no other way of self-expression than organised revolt against authority. It is not a matter of wonder that the broken down personality is a major psychiatric problem in educationally advanced countries."

সঙ্গীতে এর জীবাণু প্রবিষ্ট এবং বহুমুখী বিপর্যয় অঙ্কুরিত। কি লাভ হবে এর ফলে? কিছুই না। প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সঙ্গীতশিক্ষার্থী এই প্রকোপে, এই বিবিধ মতের খিচুড়িতে পড়ে দ্বিধাগ্রস্ত হবেই। এক একজনের এক একরকম গায়কী, পরিবেশন-রীতি। ফলে

নির্বাচনসঙ্কট এসে সব সম্ভাবনাকে ভ্রূণে বিনষ্ট করে দেয়।

ভারতে গুরুপরম্পরায় সাধনা এক সুমহান ঐতিহ্যের বাহক। গুরুকেন্দ্রিক সাধনা ভারতে চিরদিনই ফলপ্রসূ। যখন কোন সংগীতবিদ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শিখরে উপনীত হন, স্বাভাবিকভাবেই তখন তাঁকে ঘিরে সংগীতশিক্ষার্থীর এক বৃহৎ পরিমন্ডল রচিত হয়। কিন্তু একসংগে অত ছাত্র পরিচালনা সম্ভব নয়। একারণে তিনি তাঁর কৃতবিদ্য কতিপয় নিপুণ ছাত্রদের নিযুক্ত করেন। তাঁরা গুরুর যথার্থ পরিবর্ত হিসেবে নিজেদের নিয়োজিত করেন। গুরুর ঘরানা ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সমতা রেখে শিক্ষাদান করেন। এখানে ideal ও purpose উভয়েই অব্যাহত। এতদ্ব্যতীত অতিশয় বিচক্ষণতার সাথে ছাত্র নির্বাচন করা হয়। যাতে গুরুর সুনাম নষ্ট না হয়। এইভাবে ব্যক্তিত্বকে রচিত হয় পরিপুষ্ট প্রতিষ্ঠান, যার প্রতীক বৈশেষিক আঙ্গিক ও মৌলিকতার উৎকৃষ্ট ও সঙ্গত সমীকরণ। 'গুরুপরম্পরায়' প্রথা আজ দেশে অবলুপ্ত। তাই আঙ্গিক আজ সংগীতহীন, প্রাণহীন ফর্মের বিকৃতি। বিপর্যস্ত ও চূর্ণ ব্যক্তিত্বের অরাজক অভিব্যক্তি আজকের সাংগীতিক যুগকে নির্দেশিত করছে।

মৎস্য সাধনা

আঙ্গিকই ব্যক্তিত্বকে রূপবন্ত করে তোলে। কেননা শারীরিক ক্ষমতা শরীরকে গঠিত করলেও ব্যক্তিবাদকে ছায়াচ্ছন্ন করে রাখে, বিশেষকরে আঙ্গিক যখন সুনির্বাচিত না হয়। প্রমাণ চান? আজকের অনুভূতযোগ্য, নির্ভরশীল ও আকর্ষণীয় কন্ঠসম্পন্ন সংগীতবিদদের ভয়াবহ মন্দার কথা চিন্তা করলে কি এই কথাই পুনরাবৃত্তি করা হয় না? ধ্রুবপদী ও গম্ভীর আন্দোলনের কোন দান নেই, যতক্ষণ না আকস্মিকতা, দ্রুতি ও পরিবর্তনশীল গায়কী সংগীতজ্ঞের কন্ঠে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই অশান্ত আকুলতা, এই ব্যক্তির মধ্যে নৈর্ব্যক্তিকতা সমঝদারের চিত্তে হিল্লোল তুলে, সংগীতের কেদারাক্ত-ধূলি তখন মধুময় হয়ে ওঠে। আঙ্গিক হবে ঠিক তাই, যা বৈচিত্র্যের ছন্দে মুহুর্মুহু আলোকিত করবে সংগীতের সত্যসত্তা।

শ্রুতিলিপির সাহায্যে স্বরলিপিবদ্ধ-কৃতিতে চাক্ষুষ সাহচর্যের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু অহেতুক প্রয়োজনবোধ যদি এই যন্ত্রচালিত শিক্ষাধারায় প্রাধান্য বিস্তার করে তাহলে শিল্পগত কল্পনার বন্ধ্যাত্ব ও বিপদসঙ্কুল কন্ঠবিপর্যয় এসে সংগীতে অরাজকতা সৃষ্টি করবে—কারণ এই বলপূর্বক ক্ষমতা-অপব্যবহারে কন্ঠ সূক্ষ্মতা হারাবে এবং স্বতঃস্ফূর্ত গতিশীলতা হারাবে। এই স্বভাবের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যান গভীর ও ধৈর্যসাপেক্ষ। তবু সংক্ষিপ্ততম বাচ্যে, চাক্ষুষ প্রতীতিদান শ্রুতিপ্রধান চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে সংগীতে বিচ্ছিন্নতা আনে, একত্রীভূত সামগ্রিকতাময় অভিব্যক্তি অনাদরে পথভুলুণ্ঠিতা হয়—শৈল্পিক লক্ষ্যের সিদ্ধি তো প্রশ্নের অতীত।

কিন্তু এই প্রথার সবচেয়ে সমালোচ্য বিষয় পরীক্ষাগ্রহণপদ্ধতি। অত্যধিক দ্রুত প্রস্তুতিপর্ব এসে কুন্ডলী পাকিয়ে পরীক্ষার হলে জড় হয় এবং 'Commit to the memory, and omit to the examination paper'—তত্ত্ব এসে সংগীতের শ্বাসরোধ করে। এইভাবে অসংখ্য, অগুণতি প্রতিভা আমাদের দেশে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে। শিক্ষা যেখানে পরীক্ষাপ্রধান প্রশ্নে লাঞ্ছিত, সৃষ্টিধর্মী শৈল্পিক কর্ষণ যেখানে ব্যবহারিক মূল্যবোধে সংকীর্ণ, সেখানে অগ্রগতির আলো জ্বলবে এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, এমন কি 'examination made easy'র উদ্ভব হলেও আশ্চর্য হবার নেই। কেননা সংগীতের একটা কৌলীন্য আছে, যাকে সংস্কার বলে মনে করা মূর্খতা।

সিঁড়িটা ভেঙে পড়ার শব্দ হয়। বিশ্বেন্দু ছাড়া আর কেউ না। সংগে সংগে চীৎকার, করবী করবী, ধরো, তাড়াতাড়ি এসো, ধরো করবী। করবী—।

রান্নাঘর থেকে চেঁচানি শুনতে প্রায় করবী। বাচ্চাদের খাইয়ে দুধের কড়া চাপিয়েছিল। কড়াটা ধপ করে নামিয়ে তড়িতগতিতে আসে সিঁড়ির মুখে। বিশ্বেন্দুর হাতে দোনলা রাইফেল। পিছনে পিওন আশুতোষ। তার দুহাতে পিঠে একগাদা পাখি।

বাপরে বাপ! তোমাকে ডাকতে গলা বোধহয় ফেটে গেল। বিশ্বেন্দু রাইফেলটা করবীর হাতে পাচার করে। তোমার কি রান্না খতম। আমরা এক ফোঁটা চা পেলে বড়ই খুশী হতাম করবী।

তোমাকে খুশী করবার জন্যই তো আমার থাকা। আমার খুশীর কথা ভাবলে কি আর এখানে থাকতে পারতাম। আমার মানসিক মৃত্যু কবে ঘটে গেছে। তোমার যাদুঘরে আমাকে সাজিয়ে রেখেছ। এই সংসার আমার কাছে যাদুঘর ছাড়া আর কী। মনে মনে নিজেকে বলে করবী। নিঃশব্দে চলে যায় উনুনশালায়।

বাবার সাড়া পেয়ে বাচ্চার দল রিংকু ঝনু বুবুল ও অন্তু হাজির। ওরা আশুতোষকে নিয়ে পড়েছে। আশুদা ওগুলো কী পাখি। ডাকছে না কেন, ইত্যাদি প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। আশুতোষের কাঁধে পাখিগুলো না থাকলে এতক্ষণ ওরাই ঝুলে পড়ত ওখানে। রক্তাক্ত পাখিগুলো দেখে নির্ভয় দুরন্ত বাঁচিয়ে বাচ্চারা লাফালাফি শুরু করেছে।

হাত দিও না যেন। কামড়ে দেবে। বাসন্তী সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বলে।

ওগুলো তো মরা। একজন বলে। বিশ্বেন্দুর দ্বিতীয় সন্তান, পুত্র ঝনু।

বিশ্বেন্দু আশুতোষকে বলে, ওদিকে নিয়ে চল। যাও কেটে ফেল চট করে। হাতঘড়ি দেখে বলে, বারোটা তো বাজে। চা খাবি বাসু?

বাসন্তীর নরম ঠোঁটে হাসি ঝিলিক দেয়, আপত্তি কিসের। চলুন। চা খেয়েই যাবো। ক্ষীণমধ্যা বাসন্তীর পেলব মসৃণ কাঁধে মৃদু চড় মেরে বিশ্বেন্দু বলে, আয় তাহলে।

বাসন্তীর চলনে বহুদর্শী সপ্রতিভতা।

দোতলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাড়ার ফ্ল্যাট। মফস্বল শহর। আকাশ তাই সর্বদা নির্ধূম। বিশ্বেন্দু এ শহরে বছর দেড়েক হল এসেছে। এর মধ্যেই শহরে ও বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। ওর ব্যবহারটা হাজার-কোণ কাচের মত। যে কোন দিকে নরলেই কৌতুকের হাসি ছিটকোবে। সেখানে থাকে মাত করে থাকে। ও যে আছে সে কথা বলে দিতে হয় না। প্রচণ্ড স্বয়ং ঘোষণা।

রবিবারের ভোরে বাসন্তী ও

আশুতোষকে পার্শ্বচর করে বিশ্বেন্দু বেরিয়েছিল মোহনদীঘিতে শিকার করতে। মাইল দশেক দূরে শহর থেকে। জায়গাটা দুর্গম। নইলে অগণন বেলেহাঁস শিকারীদের কল্যাণে এখনো বেঁচে থাকত না। যখন হাঁসগুলো আকাশে ওড়ে আধমাইলব্যাপী দীঘিটার জল শামিয়ানার একটা মাত্র ছায়ায় ঢেকে দেয় যেন। ঘন সবুজ জল একেবারে কালো হয়ে যায়। আর ছেঁড়া ছেঁড়া রোদ্দুরের টুকরো-গুলো সারা দীঘিটাতে কোটি কোটি পান্নাখচিত জাজিমের মত ঝিকমিক করতে থাকে।

আসতে ইচ্ছে হয় না। কী বলিস বাসু। বিশ্বেন্দু চায়ে চুমুক মারে সশব্দে। ওঃ কী চমৎকার দীঘি।

অমন অশ্লীল শব্দ করবেন না। বাসন্তী মুখ টেপে। বিশ্বেন্দু বাগ করে। তুমি তো গেলে না করবী। সত্যিই বেশ আনন্দ করা গেছে। মাঝে মাঝে উত্তেজনা না থাকলে কি ভালো লাগে।

করবী নীরব। কাজ করে চলে নিজের মনে। বিশ্বেন্দুর উল্টো পিঠ করবী। চাকর আছে ঝি আছে। আফিসের পিওন-রাও আছে, তারাও টুকটাক কাজ করে দেয়। তবু রাত্রে শোওয়ার আগ পর্যন্ত করবী দম দেওয়া পুতুল। মুখে ভাষা অতি স্বল্প। চোখের নিচে গভীর ছায়াটাই ওর চড়া ফর্সা রঙের উপরে সব চেয়ে আগে নজরে পড়ে। একটা শিশুও বলে দেবে, ওটা দুঃখের অক্ষর। সহের আশ্রয়স্থল।

আমাদের সঙ্গে গেলে তোমার কোন অসুবিধা হত না। বিশ্বেন্দুর কণ্ঠে উষ্মার হাতছানি।

করবী বলে, এ বেলা তো আর পাখির মাংস হবে না। চান করতে যাও। তিন সের পাঁঠার মাংস, তার ওপর—

আমার জবাবটা পেলাম না। বিশ্বেন্দু চেঁচায় এবার।

আঃ সভ্যের মত কথা বলুন। খাবার টেবিল ধরে বিশ্বেন্দুর সামনে দাঁড়ায় বাসন্তী। করবীকে আড়াল করে।

আমি যেয়ে আর কী করতাম। উত্তর দেয় করবী। মালীর মা বলে ঝিটাকে আদেশ করে, অন্তুকে নিয়ে এসো তো মালীর মা, দুধ গরম হয়ে গেছে।

হাতের টিপ দেখতে। নটা বেলে হাঁস মেরেছি। বিশ্বেন্দুর দিকে স্থির দৃষ্টি রাখে করবী, বিশ্বেন্দু বলে চলে, হ্যাঁ সব কটাই উড়ন্ত। না, নটার বেশি কার্টিজ লাগেনি। আসবার সময় বট গাছে দেখলাম হরিয়ালের ঝাঁক। এক ফায়ারেই তিনটে সাবাড়। জানো, বেলে হাঁসগুলোকে চলন্ত নৌকা থেকে মেরেছি।

পাশের বাড়ির ছাদ থেকে বাসন্তীর ডাক আসে। বাসন্তীদের নিজস্ব বাড়ি।

বাসন্তী সাড়া দিয়ে বিশ্বেন্দুকে বলে, শুটিং কম্পিটিশনে নাম দেন না কেন।

শুটিং? হে হে হে। কোনটাতে নাম দেব বল। যে কোন খেলা যে কোন প্রতিযোগিতায় বিশ্বেন্দু ব্যানার্জি ফার্স্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে। বলতে বলতে বিশ্বেন্দু জামা গেঞ্জি খোলে। তার মোটা ভুঁড়িওলা কালো শরীরটা প্রায় নির্লোম। অর্ধজ্বলন্ত সিগারেট তখনো ঠোঁটে লেগে থাকে।

করবী দুধের বাটি কলতলায় রাখতে যাচ্ছিল, বিশ্বেন্দু তার হাত ধরে ফেলে, বলে, করবী, তুমিই বল আমি কি মিথ্যে বলছি।

নারী-হত্যা প্রতিযোগিতায়-ও যে ফার্স্ট হবেন, তাও বৌদি জানেন। বাসন্তী চেয়ার ছেড়ে ওঠে। বাড়ি যাবার উদ্যোগ করে।

করবী হাত ছাড়িয়ে চলে যায়। মুখে কোন ভাবান্তর হয় না।

কারুণ্য ঢালে গলার সুরে, বলে বিশ্বেন্দু, দেখেছ, আমার নামে কেমন বদনাম দিচ্ছে বাসু? বলে দাও তো, তুমি ছাড়া আর কোন মেয়ের দিকে খারাপ চোখে তাকিয়েছি কিনা।

কলতলা থেকে ফিরে এসে চৌকোণ থামে হেলান দিয়ে করবী বলে খুব শান্তভাবে, তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে বোধহয় উল্টো হয়ে গেল। ভেবে দেখ আবার।

নারীকণ্ঠের পুরুষালী হাসিতে ফেটে পড়ে বাসন্তী। তার বেশি সুন্দর তনুতে দমকা ঝড় লাগে। বাসন্তিক ঝড়। বিশ্বেন্দুর চোখে লোভের দর্পণ ঝক ঝক করে। সপ্রতিভ বিশ্বেন্দুর অভিব্যক্তিতে অস্বস্তির ছায়া মিশে যায়। কালো মুখে দেখা দেয় ফ্যাকাশে রঙের ক্ষোভ।

ভীষণ অবিশ্বাস তোমার করবী। বাসু তুই বল, তুই যে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস, সে দোষে কি তুইও দোষী।

কী সাহস! ওই কেঁদো মোটা বুড়ো লোকটা! ওয়াক থুঃ। বাসন্তী মুখ বিকৃত করে কপট ঘৃণায়।

বললি তো। দেখলে করবী? সব মেয়েই বদনাম দেয় আমার নামে। অথচ কেউ নিজের নাম করে না। ভুঁড়িতে চাপড় মেরে সরষের তেল বুলোয় বিশ্বেন্দু। হলদে চোখে অবোধ্য হাসি টেনে আনে।

বিশ্বেন্দুর শরীরে চোখ বুলোতে বুলোতে বাসন্তী বলে, আপনার দিদিমা আপনার নাম রেখেছিলেন বোধহয়।

কেন।

এমন মারাত্মক ঠাট্টা আর কে করবে। অমাবস্যার মত গায়ের রঙ, আর নামের বেলা বিশ্বেন্দু। মেজাজটাও তো শুনেছি চাঁদের বিপরীত।

ঠাট্টা নয় বলছিস?

না বাবা, তা বলব না। রাত্রে অত-গুলো পাখির মাংস—কথা শেষ না করেই বাসন্তী ছুটে পালিয়ে যায়।

বিশ্বেন্দু তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে জিজ্ঞেস করে, ছেলেরা সব খেয়েছে?

করবী বলে, হ্যাঁ।

তুমি?

না।

খেয়ে নিলেই পারতে। আমি তো বলেছি, আমার জন্য বসে থেকো না। অসময়ে খেয়ে খেয়েই শরীরটা নষ্ট করলে।

করবী নিরুত্তর। টেবিলে লুচির প্লেট, জলের গ্লাস, থালা সাজাতে থাকে। রোজকার কাজ, তাও অগোছালো হয়ে যায়। এদিকে বেলা থাবার ঢাকা-বারন্দা থেকে কলতলার দিকে নামতে থাকে।

করবী বলে, তোমাকে এক ভদ্রলোক দেড় হাজার টাকা দিয়ে গেছে। করবী জানে ওটা বিশ্বেন্দুর উপরি পাওনা।

দিয়ে গেছে! অগরাইট ভেরি গুড, পাঁউরুটি বিস্কুট। পাঁউরুটি বিস্কুট নয়; পোলাও। রাত্রে পোলাও হোক। তোমার বিয়ের জন্মদিনটা কবে করবী। এ মাসেই না?

আজ।

ইশ, খেয়াল নেই, দেখেছ। একেবারে খেয়াল নেই। ভালোই হয়েছে। আজই

তোমার বিয়ের জন্মদিন পালন করব। বেশ মুখরোচক করে।

বিশ্বেন্দু বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দেয় দুম করে। গায়ে জল ঢালার ঝমঝম শব্দ শোনা যায় বাইরে থেকে। একটু পরেই জলের শব্দকেও ছাপিয়ে ওঠে তার গানের বেসুর।

করবী হাত গুটিয়ে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে। বাসন্তীর মাকে দেখতে পাওয়া যায় ওদের ছাদের ঘরে। গিন্নি বোধহয় ম্যাটিনী শো দেখতে যাবার জন্য শাড়ি ভাঙছে। সব ছবি ডাক্তার গিন্নির দেখা চাই। বাসন্তীর বাবা শহরের সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। ডাক্তার সাহেব গিন্নিকে তাড়া লাগাচ্ছে। বেশ কেটে গেল ওদের জীবন। শুনেছে করবী, তের বছর বয়েসে সংসারে ঢুকেছিল বাসন্তীর মা। প্রেম ভালোবাসা মন দেয়া-নেয়া এসব জিনিসগুলির কোন কল্পনাই ছিল না তাদের। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ: খুনসুটি হয়েছে অনেক। বিনিদ্র রজনীও ঝরেছে অশ্রুতে। শেষে স্বামীর মনও ভরেছে। একালে মেলামেশা, মেয়েদের স্বাধীনতা, মেয়েদেরই সর্বনাশ করেছে। পুরুষদের কী, ওরা তো এই চেয়েছিল। মেয়েরা স্বাধীন হোক, পুরুষদেরও সুদিন আসুক।

বিয়ের প্রথম পর্বে করবী-বিশ্বেন্দুর কষ্টের দিন গেছে কয়েক বছর। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে যে ঠাসা আনন্দ করবী তখন পেয়েছিল, সে আর কোনোদিন ফিরবে না। করবীর গায়ের বর্তমান গয়নাগুলো সব নতুন। বিয়েতে পাওয়া গয়না তো সেই কবে ঘুচে গেছে। বিশ্বেন্দুর চাকরিতে মোটা ঘুষ। তাও দশ বছর চাকরি করার পর। এখন তার অঢেল আয়। আসছে যেমন গলে যাচ্ছেও তেমনি। রাজসিক খানাপিনা। তার উপর মদ জুয়া। এক এক সময় বিশ্বেন্দু দুরাত্তির তিন রাত্তির বাসায় ফেরে না। পাড়ার লোককে বলতে হয় টুরে গেছে। তা না হলে যে পাড়ায় সম্মান থাকবে না করবীদের।

খাওয়াদাওয়া চুকে যেতে প্রায় আড়াইটে বাজে। বিশ্বেন্দু নাক ডেকে ঘুমোতে থাকে। আর তখনও করবীকে বাচ্চাদের ঝামেলা পোহাতে হয়। বিশ্বেন্দুর ছেলেগুলিও সব বাবার মান রক্ষা করবে। দুরন্তপনায়। লোকের কাছে থাকে না। দুপুরে মাকে চাই। সকাল সন্ধ্যে খেলাধুলো নিয়ে মেতে থাকবে। কিন্তু দুপুরে বা রাতে মায়ের গায়ের স্পর্শ না পেলে তছনছ হয়ে যাবে সংসার।

মালীর মার ঘরদোর সাফ করা আলমারী গোছানো কাপড় তোলা হয়ে যায়। ফাল্গুনের বিকেলে সামনের খোলা মাঠ ছেলেদের খেলাধুলোয় উচ্চকিত হয়ে ওঠে। আকাশের কোল থেকে স্নেহের গন্ধ ভেসে আসে। ছাতিম ফুলের বর্তুল হাসি ঘরের ভিতরেও পা টিপে ঢুকে পড়ে। জানলার ধারে এসে করবী পথচলা লোকের বিচিত্র বেশ নিরীক্ষণ করে। কিছুই ভাবে না। নিরস নির্মম লাগে সব।

বিশ্বেন্দু এবার ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠবে। হুড়মুড় করে গা ধোবে। করবীর নিস্পৃহ রমণীত্বকে আড়ালে আবডালে আদর করবে। তারপর উন্মত্ত-গতিতে ছুটে যাবে বাইরে। কোথায় যাবে বলে যাবে না। প্রশ্ন করলেও কোন সদুত্তর দেবে না বিশ্বেন্দু। কিন্তু করবী জানে, বিশ্বেন্দু যাবে স্কুল মিস্ট্রেস সরকার, অথবা ইঞ্জিনীয়রনন্দিনী সঞ্চিতা ঘোষ অথবা বাসন্তীদের বাসায়। নয় তো আরও অন্য কোন তরুণীর সঙ্গ-পিপাসায়। বিশ্বেন্দু স্থূলকায় এবং কালোপাহাড়। শহরের তন্বীরা রূপসীরা বিশ্বেন্দুর কালো রূপের অন্ধকারেই বোধ হয় তাদের আবিলতা ঢাকতে চায়। বিশ্বেন্দুর সর্বত্র সহজগম্যতার কারণ—করবী বোঝে—ওর স্বভাবের মিষ্ট ছটফটানি। মেয়েরা সহজেই বিশ্বেন্দুর জালে পড়ে, আর করবীর মায়াতে ফাঁস লাগায়।

সিগারেটের মতই রাশি রাশি পয়সা ফুঁকতে বিশ্বেন্দু ওস্তাদ। আর মজার মজার গুলতানি করে মেয়েদের হাসাতে। শ্লীল অশ্লীল বলে বাছবিচার নেই। অবশ্য শ্লীলতার কাটাতার টপকানো বিষয়বস্তুই অধিকাংশ।

চাকর চিকেন স্যান্ডউইচ আর দুকাপ চা এনে রাখে টিপয়ে।

মাতাল হাওয়া ধুয়ে দিতে চাচ্ছে করবীর মনের উত্তাপ। জানালায় মুখ ডুবিয়ে বসন্তের ঝাপটা নিচ্ছে করবী।

চা থাকল মা। চাকর স্মরণ করিয়ে চলে যায়।

খাটের বাজুতে দাঁড়িয়ে বিশ্বেন্দুকে ডেকে তোলে করবী। চোখ দুটো একবার কচালিয়ে তড়াক করে লাফ মারে বিশ্বেন্দু।

অন্ধকার হয়ে গেছে? আমাকে ডাকো দাওনি কেন। বিশ্বেন্দু মৃদু ধমক দেয়।

আমাকে ডাকতে বলেছিলে? উত্তর দেয় করবী। মুখ ধুয়ে এস। চা জুড়িয়ে যাবে।

পলকে বিশ্বেন্দু কলঘর থেকে ফিরে আসে। নরম স্যান্ডউইচ চকচক করে চিবোয় সে। এক চুমুকে চায়ের কাপ নিঃশেষ করে।

আমাকে টাকা বের করে দাও। বিশ্বেন্দু জামা কাপড় পরে তৈরি হতে থাকে।

করবী শুধুই চা খেয়ে প্রশ্ন করে, কত।

পাঁচ শো।

আলমারীর চাবি খুলে করবী পাঁচটা একশো টাকার নোট বের করে বিশ্বেন্দুর হাতে দেয়।

কেন এত টাকা নিলাম জিগ্যেস করলে না? পকেটে টাকাগুলো ঢুকিয়ে বিশ্বেন্দু বলে।

তোমার টাকা।

তোমার নয়?

আমি তো রোজগার করি না।

বিয়ের জন্মদিনে তোমার জন্যে অনেক জিনিস কিনব। আর তার সঙ্গে যারা খেতে আসবে, তাদের জন্যেও। তাদেরও কিছু না দিলে বিশ্রী দেখায় না? করবীকে বিনীত আবেদন জানায় বিশ্বেন্দু।

তোমার বিয়ের বার্ষিকী করতে পার। আমার নয়। করবীর শীর্ণ ফর্সা শরীরটা অন্ধকারে রেডিয়ামের মত জ্বলতে থাকে।

আমার বিয়ে! তোমার নয়! বিশ্বেন্দু হাসির সুইচটা জেনলে দেয় দপ করে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরেরটাও।

দৈবাৎ ঘটে গেছে ওটা। ইচ্ছে ছিল কি ছিল না, কেউ কি জানতে চেয়েছিল।

এখনো কি তোমার পাড়াতুত দাদাকে ভুলতে পারনি।

বাজে বোকো না। করবীর কণ্ঠে উত্তেজনা সুস্পষ্ট।

ইচ্ছে ছিল না—ইচ্ছে নেই—বিবাহ-বিচ্ছেদ আনতে পার। গভর্ণমেন্ট পথ কেটে দিয়েছে। বিশ্বেন্দুর ঠোঁট দুটি সরে গিয়ে যা বেরিয়ে আসে তাকে ক্রোধের ছবি বলা চলে।

এতকাল আমরা বিয়েটাই জানতাম। বিচ্ছেদ জানতাম না। বেগতিক দেখলে তাও জানতে হবে বৈকি। করবী ঘর

থেকে চলে যেতে চায়। চোখে জল নেই, শুধু বইছে।

করবীকে চেপে ধরে। গুহায়িত গর্জন গুমরে ওঠে, কেন, কেন তুমি আনন্দ মাটি করে দিতে চাও? আমাকে খুলে বলতে হবে। কেন তুমি মেয়েদের সইতে পার না।

অত ছোট আমি নই। যা ইচ্ছে তুমি করতে পার। করবী বিশ্বেন্দুর আক্ষেপের আগুন থেকে বেরিয়ে আসে।

করবী ঘর থেকে চলে যেতে চায়

এখনো রাগের কথা বলছ। আশ্চর্য-ভাবে বিশ্বেন্দুর স্বর বদলে যায়। করবীর পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, যাও ছেলে-মানুষি কোর না। তারপর কয়েক মুহূর্ত মনে মনে হিসাব করে বলে, ছয়জন বেশি খাবে। রাত্রি তো হয়েই গেল। এখাখুনি খবর না দিলে কেউই আসবে না। আমি চললাম। রান্নাঘরে যাও, আর দেরি কোর না।

ছুটে যেতে যেতে বলে, করবী—দেরি কোর না।

সিঁড়িটা বোধহয় ভেঙে পড়ছে। ছেলেদের মিশ্রগুঞ্জন ওঠে আসছে সিঁড়িতে। ফ্ল্যাটটা এতক্ষণ নিরুপদ্রব ঝিম ধরে ছিল। বাচ্চাদের হুল্লোড়ে উল্লসিত হচ্ছে আবার। করবী শোবার ঘরের সুইচ নিভিয়ে দেয়। চাঁদের আলো পড়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার উপর। রান্নাঘর থেকে ছেলেদের কর্কশ চেঁচানি শুনতে পাচ্ছে করবী। দূর থেকে ওদেরকে মধুর লাগছে। কানের কাছে এলে বিরক্তই হত সে। ইচ্ছে হত কিল-চড় ঘুষিতে বিছের বাচ্চাদের নির্বিষ করাই একমাত্র করণীয়।

মশার ঝাঁকের মত তালগোল পাকিয়ে ছেলেরা মাকে খুঁজছে। এদিকেই আসছে। ওদের অনুসন্ধান স্পষ্টতর হচ্ছে।

তিনতলায় ঘর নেই। ফাঁকা ছাদ। ছাদের দিকে সরে পড়তে উদ্যত হয় করবী। একা থাকতে ভালো লাগছে। অপুত্রক অবিবাহিত একাকিত্বের স্বাদ কি আবার বিস্মৃতির কবর থেকে তুলে আনা যায় না। আনা যায় না, আঁচল ওড়ানো বেণীদোলানো স্বাধীনতার দুষ্টুমি? কেন যায় না? সময় শুধুই এগিয়ে যায়? পেছোয় না? এমন কি হতে পারে না আর আগামীকাল আসবে না কাল থেকে—ঘোষণা করে দেওয়া হল। ঘোষণা করল কেউ, বিগত দিনের দিকে ফিরে যাবে সময়। আঃ...

পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে করবী। রাইফেলটা সিঁড়ির গোড়ায়। বিশ্বেন্দু সাফ করে তুলে রাখেনি। ভুলে গেছে। খেয়েদেয়ে সাফ করতে বসেছিল। ঘুম আসতেই ফেলে রেখে উঠে গিয়েছিল বিছানায়। রাইফেলটা হাতে নেয় করবী। রেখে দিতে যায় ঘরে। আত্মহত্যা করে কত লোক তাদের জ্বালা মুছে ফেলেছে। ড্রয়ার থেকে কার্টিজ বের করে করবী ছুটে চলে যায় ছাদে।

আর একটা ছাদের কথা মনে আসে করবীর। সাত-আট বছর আগে। বাঁকুড়া শহরে বাসাবাড়িতে ওরা থাকে। তখনো কোন সন্তান হয়নি করবীর। সারাদিন বাসায় একা একা থাকতে হয়। সেই একা থাকার বিলম্বিতলয়ে এক একটা দিনকে মনে হত উঁচু পাহাড়। উঠছে তো উঠছেই। ফুরোচ্ছে না যেন। আর রাত্রিকে মনে হয় বুদবুদ, গায়ে লক্ষ রঙের ঝিলিক, কিন্তু বড্ড পলকা। অমনি এক রাত্রে লাল মাটির রুক্ষ গন্ধবহ ঝলসে দিয়ে যাচ্ছে রাত্রির নরম শরীর। ছাদে রান্নাবান্না চুকিয়ে করবী সতরঞ্চি পেতে শুয়ে আছে। ট্রাকের ব্যবসায় সর্বস্বান্ত হয়ে বিশ্বেন্দু হুমড়ি খেয়ে পড়ল এসে। বহুক্ষণ ধরে মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলে আঙুলে চালিয়ে দিয়েছিল করবী। আর কোলে মাথা গুঁজে কান্নায় ফুলে ফুলে উঠেছিল বিশ্বেন্দু। সেই ছাদ সেই রাত বাঁকুড়ার এক বাসায় ফেলে এল করবী। সেই কান্নায় যে তীব্র সুখ আত্মলীন হয়েছিল, পরে কতদিন করবীর মনে হয়েছে। বিশ্বেন্দু বলেছিল, দুঃখের আঘাত কি সারাতে পারব না করবী। ছোটবেলায় মা গেছে। দুর্দান্তপনায় বেড়ে উঠেছি। তার জন্য আঘাত পেয়েছি অনেক। তোমাকে বিয়ে করে মায়ের শোক ভুলেছি। স্নেহ পেয়েছি। স্নেহ কী, তার স্বাদই জানতাম না। স্নেহের কী প্রচণ্ড প্রয়োজন, তার ধারণাই ছিল না। এখন বুঝতে পারছি। আরও অনেকক্ষণ কেঁদে করবীর শাড়ি ভিজিয়ে দিয়েছিল বিশ্বেন্দু। কান্নার দমক শান্ত হলে, নিজের খোলসে ফিরে গেলে প্রেমের প্রসঙ্গে বলেছিল, করবী, তুমি হচ্ছ

আস্ত জীবন, আর মেয়েরা যারা ছিটকে ছিটকে গায়ে লাগে কাদার মতন তারা হচ্ছে এক একটা দিন।

করবী বলেছিল, ওরাই যদি এক একটা দিন হল, জীবন হলাম কী করে।

বিশ্বেন্দুর শ্বেত পাথরের মত দাঁতে জ্যোৎস্না ঠোঁটের কালো পর্দা সরিয়ে এল, হাসল বিশ্বেন্দু, বললে, বুঝলে না? ওরা তোমার হাত পা, তুমি পূর্ণ প্রতিমা।

বুঝলাম না। তোমার প্রেমের ব্যাখ্যা তুমিই বোঝ।

আরও সাত বছর কেটে যাবার পর করবী বুঝতে পারছে। এত মর্মান্তিক সে জ্ঞান যে করবী নিজেকে বোকা বানিয়ে চোখ বুজে বিভীষিকা দেখতে না চাইলেও, অনুভবের প্রতিটি রন্ধ্রে শরশয্যা রচিত হচ্ছে।

আসবাবপত্রগুলির মত সে-ও একটি। ধূপদানি, ছাইদানি, চেয়ার টেবিল, ফোল্ডিং ক্যামেরা, রেডিওগ্রাম। মালিকের রুচি অনুযায়ী তাকে সাজানো, সংরক্ষণ করা হবে। হয় কোণে পড়ে থাকবে মাসের পর মাস, ধুলো জমবে, ঝুল পড়বে, নয় আচম্বিতে কখনো খেয়াল পড়লে তাকে ঝাড় পোঁচ করবে, মাতোয়ারা হবে তাকে নিয়ে। নতুনত্বের ঘ্রাণে থাকতে প্রমত্ত হয়ে, টোল পড়লেই আকর্ষণ টলায়মান।

আম গাছটায় ঝাঁকড়া মাথায় হাওয়া লাগে। ছাদের পাশে জড়োকরা ভয়ভয় ছায়াগুলো নড়ে চড়ে বসে। ধূসর বাদুড়েরা ধাতব যান্ত্রিক শব্দের ক্যাঁচ-ক্যাঁচানিতে বিরাগ জানায়। পাড়াটা ইতি-মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ভূতুড়ে আবহাওয়া করবীকে চেপে ধরে। নিজের মূল্যায়ণ শেষ হতে চায় না। নিজের অস্তিত্বকে অপ্রয়োজনীয়তার পারাবার মনে হয়। আম গাছটারও দাম আছে, তার তলাতেও রোজ ঝাঁট পড়ে। করবী এ সংসারের কেন্দ্র দূরস্থান, একটা যে কোন বিন্দুও হতে পারল না। অথচ তার যৌবনের শেষ বিন্দুটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন ওর অবস্থান ছায়ার মতন। বিশ্বেন্দু থাকলে সেটুকুও শুষে নেয়, মুছে নেয়।

বিয়ের প্রাথমিক মাদকতায় বিশ্বেন্দু বাইরের পাপ করবীর হাতে তুলে দিত, রজনীগন্ধার ঝাড়ের মত। করবী বুকে করে বুলিয়ে স্নে পাপ দিত মধুর করে। তার কাছে বিশ্বেন্দু ছিল প্রখর আলোর মত প্রত্যক্ষ। গোপনতায় বা লুকোচুরিতে গাঁথা রচনা করত না বিশ্বেন্দু। করবীর মনে হয়েছিল, সে বিশ্বেন্দুকে নগ্নতায় চেনে। কিন্তু তার সেই পরিচয় বিশ্বেন্দুর সুকৌশল চালবাজি, ভালো-মানুষির চতুর মনোমুগ্ধকর আচ্ছাদন, একথা আস্তে আস্তে প্রকাশ পেতে লাগল করবীর কাছে। রটনায় যে ইতি-বৃত্তগুলি করবী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পায়ে দলে চলে যেত, সেগুলো করবীর দশ-দিকে ধীরে ধীরে খাঁচার গরাদের মত তর্জনী তুলে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। তার বোকামিতে চাবি দিয়ে বিশ্বেন্দু বৃহত্তর জগতে চলে যায়, হারিয়ে যায় তার দিগবলয় থেকে।

রাইফেলে কার্টুজ ভরতে জানে করবী। জানে গুলি চালাতে। বিশ্বেন্দুই তাকে শিখিয়েছে। অন্তত একটা শিক্ষার প্রতিদান দিতে পারবে বিশ্বেন্দুকে। ভেবে করবীর চোখে আশ্বাস ঝরে। রাইফেলের ঠাণ্ডা নলটা গালে চেপে ধরে করবী। মৃত্যুর স্পর্শ। নিচের চীৎকার ছাদের স্তব্ধতার গায়ে এসে এসে ছড়িয়ে পড়ছে। ছেলেরা তখন থেকে মাকে ডেকে চলেছে, রাস্তায় পাশের বাড়িতে খুঁজে চলেছে। ছেলেরা ভেসে যাবে। বিশ্বেন্দুর নতুন বউ কি আদর করবে ওদের। অসম্ভব। বিশ্বেন্দুও তখন নতুন মাংসল মোহের দাম দেবে চড়া দরে। আগাপাশ-তলা ভ্রূক্ষেপও করবে না তখন। চল্লিশের বার্ধক্যেও যার চতুর্দশ বছরের ছটফটানি, তাকে—তার পয়সাকে নিশ্চয় সমীহ করবে কন্যাকর্তারা। হ্যাঁ, বিয়ে বিশ্বেন্দুর মুহূর্তেই ঘটে যাবে।

ঘটুক। ছেলেদের ভাগ্যেও যা আছে তাই ঘটবে। করবী বেঁচে থাকলেও—

কে যেন অতর্কিতে ঝাপটে ধরে করবীকে। করবী ঝাপট মারে বিদ্যুত গতিতে।

কী হচ্ছে? মরবে নাকি? বিশ্বেন্দু ধমকায়। রাইফেলের নলের ডগায় হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরে। কখন এসেছে সন্তর্পণে, গাঢ় চিন্তায় করবী ঠাহর করতে পারেনি। কেন, কেন মরবে? কী হয়েছে তোমার, কী দুঃখ? বিশ্বেন্দু অপর হাতে ঝাঁকি দেয় তাকে।

ছাড়। কিছুই হয়নি। কিছু হলে তো বেঁচে যেতাম। করবী এতক্ষণ কী যাতা ভাবতে ভাবতে ভীষণ দেরি করে ফেলেছে। নিজের মুর্খামিকে যদি ঠাস করে চড় মারতে পারত। আমি যে কিছু না। কুকুর। আছি ভালো, তাড়িয়ে দিলেও আচ্ছা।

সে কী!

হ্যাঁ। আমি তোমার চক্ষুলজ্জা। সরে গেলেই তুমি নিঃসংকোচ হতে পারবে। ছাড়। আমাকে যেতে দাও।

না। তুমি তো কিছু করনি। করেছি আমি। জানি, আমার জন্যেই তুমি যেতে চাও। আমিই তোমার নিষ্ঠুর বিচারক, প্রাণদণ্ড দিয়েছি। আসলে দোষী আমি নিজে। এক ঝটকায় করবীর হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেয় বিশ্বেন্দু। রাইফেলের ঘোড়াটাকে উদ্যত করে ট্রিগারে আঙুল ছুঁয়ে প্রশস্ত বুকে মৃত্যুটাকে অনুপ্রবেশ করাতে যায়।

ঝাঁপিয়ে পড়ে করবী।

দ্রাম। আমগাছের পাতা খসিয়ে এক ঝলক আগুন চাঁদের আগুনে মিশে যায়। থপ করে পড়ে একটা কাঠবেড়ালী। পিঠের ত্রিশিরার মধ্যে সাদাটাতে রক্তের রেখা করবীর দীর্ঘায়ত সিঁথি মনে হয়। দুজনের দৃষ্টি ওখানে আছড়ে পড়ে, স্তব্ধ অমনোযোগী হয়ে যায় আবার।

বিশ্বেন্দু মুহ্যমান। এবার—ছেলেরা, মালীর মা, চাকর, বাসন্তী, মিস্ট্রেস সরকার, ইঞ্জিনীয়ারনন্দিনী সঞ্চিতা ঘোষ, বন্ধুর বোন হেনা, দূর-সম্পর্কের মাসতুতো বোন অনীতা, পিওন, পাড়ার লোকজন অতর্কিত গুলি ছোঁড়ার কারণ জানতে ছাদে উঠে আসবে। তাদেরকে কী বলবে বিশ্বেন্দু। কী বোঝাবে।

কেন আমাকে মরতে দিলে না। কেন তোমার বিষের শিশি চুরমার করলে না করবী।

করবী বিশ্বেন্দুকে জড়িয়ে ধরে। বলে, আমার ছেলেরা ভেসে যাবে যে। আমি না থাকলেও ওদের চলে যেত।

করবীর হাঁটুতে মুখ লুকোয় বিশ্বেন্দু। করবীর অবয়বে তার আর্তনাদ রোপণ করে যেন, তুমি মরলে যে আমি ভেসে যাব।

ছি ছি ছি। পা ছুঁয়ো না, অকল্যাণ হবে যে। করবী পেছিয়ে যায়। পায়ের পাতায় জলের ফোঁটা। আঁচল দিয়ে মুছে ফেলতেই একরাশ কলরব সিঁড়ি ভাঙছে—শুনতে পায় ওরা। চোখ মোছ। সবাই আসছে।

কী বলবে ওদের। রাইফেল, অন্ধকার ছাদ, রান্নাঘরে করবীর গরহাজির, গুলির শব্দ, ছমছমে পরিবেশ—সন্দেহ সঞ্চারের মোক্ষম রসদ। কী যে বলবে, দুজনে তাই ভাবছে। দুজনকে ত্রাসের গর্জন ফণা তুলছে সিঁড়ির শেষ ধাপে।

উত্তরপ্রদেশের দেবদাসী

প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন আমাদের কাছে প্রায়ই অবিশ্বাস্য যে, কখনও উত্তর প্রদেশের মন্দিরে দেবদাসী ছিল বা এখনও আছে। আমরা জানি যে দক্ষিণ ভারতে দেবদাসী ছিল আর এখনও আছে। তাদের নৃত্য থেকেই আবির্ভূত হয়ে ভারতনাট্যম্ নৃত্যরূপ নিয়েছে। যাঁরা আরও বেশী ভারতীয় নৃত্য চর্চা বা গবেষণা করেন তাঁরা জানেন যে উড়িষ্যাতে এখনও "মাহারী" (দেবদাসী) আছে, আর হয়ত কেউ কেউ তাদের নাচও দেখেছেন। নৃত্য গবেষকরা এও বলেন যে, মাহারী-দের নৃত্য থেকে "ওডিসি" নৃত্য উৎপন্ন হয়েছে। আসামেও এখনও দেবদাসীরা আছে। গৌহাটীতে কামাক্ষা মন্দিরের পাহাড়ের নীচে তারা থাকে ও এখনও উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে নাচ গান করে। এই ত গেল অন্য প্রদেশের কথা। সাধারণতঃ উত্তর প্রদেশের দেবদাসীদের কথা শোনা যায় না। কিন্তু এটা আশ্চর্যের বিষয় মোটেই নয় যে তারা ছিল আর এখনও আছে।

দেবদাসীর উল্লেখ আমরা পুরাকালের হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস থেকে পাই। মাটির নীচে থেকে খুঁড়ে অনেক নৃত্যমূর্তি বেরিয়েছে—তার মধ্যে সিন্ধু দেশের মহেঞ্জোদারোর মূর্তি একটি প্রধান নিদর্শন। এই নৃত্যমূর্তিকে দেবদাসীর প্রতীক বলা হয়। মহেঞ্জোদারোর মূর্তি উত্তর প্রদেশের মূর্তি নয় এটা ঠিক, কিন্তু এতে প্রমাণ হয় যে, উত্তর ভারতে দেবদাসী সম্প্রদায় নিশ্চয় ছিল। শিল্পীরা মূর্তি গড়ে বাস্তবে সেই রূপ দেখার পর, রূপ থেকে প্রেরণা পায় তারা, তারপর কল্পনা দিয়ে সেই প্রেরণাকে মূর্তির মধ্যে আবদ্ধ করে। আবার শিল্পী, চিত্রকর, ভাস্কর বা নর্তক নর্তকী সেই মূর্তি থেকে প্রেরণা নিয়ে নিজের শিল্পে সেই প্রেরণা ঢেলে দেয়। এই আদান-প্রদানের রীতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। ইতিহাস ছাড়া, ছড়া, গল্প, কিংবদন্তী ইত্যাদিতেও দেবদাসীর পরিচয় উত্তর প্রদেশে পাওয়া যায়।

দেবদাসীর নৃত্য থেকেই উত্তর প্রদেশের লোক-নৃত্য ("ব্রত" ইত্যাদি), পাহাড়ী অঞ্চলের মেয়েদের নৃত্য, নৌটাকী, রামলীলার নৃত্য, বানজারা নৃত্য ইত্যাদি হয়েছে। এই সমস্ত নৃত্য

দেবদাসী

মন্দির প্রাঙ্গণে ও পূজা-পার্বণে অনুষ্ঠিত হয়। এখন অনেক রকমের নৃত্যের লোপ হয়ে গেছে। আবার দেবদাসীদের নৃত্য থেকেই উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত ও মার্জিত কথক নৃত্য হয়েছে।

ভারতবর্ষ শক্তির উপাসক। শক্তিকে বিদ্বানেরা দুই রূপে রূপ দিয়েছে—পুরুষ ও নারী শক্তি। পুরুষ শক্তিকে রূপ দিয়েছে শিবের কল্পনায়। শিবকে স্থাপনা করেছে উত্তর ভারতে মন্দিরে প্রধানতঃ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে। লিঙ্গরাজ শিবের মন্দির ও পূজা। দক্ষিণ ভারত প্রধানতঃ শিবের অন্য এক রূপ নিয়েছে—"নটরাজ" হিসেবে। এখানে শিব নাটক ও নৃত্যের রাজা। বাঙ্গালাদেশ শক্তিকে নারীরূপে পূজা করে প্রধানতঃ—কালী, দুর্গা হিসাবে—সেখানে শ্যামা নৃত্যরূপিণী। মানুষের শ্মশানরূপী হৃদয়-রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করে সেই শক্তি। উত্তর ভারতে ধার্মিক কল্পনায় আবার একটু বড় রকমের বদল হল। তখন আদর্শ প্রেমের পূজা তারা করতে লাগল—তার রূপ দিল রাধা ও কৃষ্ণে। কৃষ্ণকে "নটবর" হিসাবে পূজা করতে লাগল উত্তর ভারতের অধিবাসীরা। কৃষ্ণ এখন হল নাটক ও নৃত্যের প্রধান। রাধিকার সঙ্গে যুগল নৃত্য ও গোপিনীদের সঙ্গে প্রেম-নৃত্য।

প্রথমে শিবের মন্দিরে দেবদাসী ছিল। পরে কৃষ্ণ-মন্দিরেও দেবদাসীরা কাজ করতে লাগল। হিন্দু রাজাদের সময়ে এই দেবদাসীদের নৃত্যের স্থান অনেক উঁচুতে ছিল। শিবের মন্দিরের দেবদাসী-দের নৃত্যের বিষয় এখন অনেক লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই তার নিদর্শন বেশী কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু কৃষ্ণ-মন্দিরের দেবদাসীদের নৃত্য খুব মার্জিত ও উঁচুদরের ছিল। তাকে "নটবরী" নৃত্য বলা হত। মুসলমানদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে "নটবরী" নৃত্য নিকৃষ্ট নৃত্যে পরিণত হল।

প্রয়াগ ও মথুরায় এখনও এই দেব-দাসী সম্প্রদায়ের মেয়ে পুরুষ পাওয়া যায়। তারা এখন "যোগী" নামে অভিহিত। এলাহাবাদে ভরদ্বাজ মন্দিরের চতুর্দিকে এই যোগীরা বসবাস করে আর তাদের বস্তিকে "যোগিনীয়া" বলা হয়। উত্তর প্রদেশের সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে এই-রকম যোগিনীয়া বস্তি আছে। এ বস্তি-গুলো পুরাকাল থেকেই আছে। এই যোগীদের পূর্ব মেয়েরা দেবদাসী ছিল। আর এদের বাড়ীর পুরুষেরা মন্দিরের সেবা করত আর এখনও করে। পুরুষ ও মেয়েদের কাজ এখন মন্দির পরিষ্কার রাখা, বারান্দা ও ঘর ধোয়া, মোছা, ঝাড়ু দেওয়া, পূজার বাসন মাজা, মন্দিরের ঘণ্টা মাজা, পূজার সময় সাজান (শৃঙ্গার), ঝুলনের সময় মন্দির সাজান, মন্দিরের গায়ে ছবি আঁকা, মাটীতে আল্পনা দেওয়া বা রং দিয়ে আঁকা, মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূল পরিষ্কার করা, পূজার সময় কাঁসর বাজান, চামর দোলান ও মন্দিরের এক কোণে রাখা বড় ঢাক

বাঈ

বাজান। আগে এই কাজগুলো ছিল দেবদাসীদের বাড়ীর পুরুষদের আর মেয়েদের কাজ ছিল দেবতার সামনে সঙ্গীত ও নৃত্য করা—সঙ্গীত ও নৃত্য দিয়ে দেবতাকে সন্তুষ্ট করা। এখনও অনেক যোগী পুজো-পার্বনে মন্দিরে গান করে ও বাজনা বাজায় ও সঙ্গীতই তাদের পেশা। আবার অনেক যোগী স্ত্রী এমনও আছে যারা লোকচক্ষের বাইরে নৃত্য করে পয়সা নেয়। তারা মেয়েদের অন্তঃপুরে নৃত্য করে বিবাহ বা শিশুর জন্ম উপলক্ষে। শিশু জন্মের সময় "সোহর" গান হয়, আর এই যোগীনিরা "সোহর" গানের সাথে নৃত্য করে।

মুসলমানদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দেবদাসীদের এই শিল্প-চর্চা ছেড়ে দিতে হল, আর তারা এই নৃত্যকলা ভুলে গেল। মদাচ্ছন্ন মুসলমান নবাব ও তাদের হিন্দু সেনাপতিদের চোখ পড়ল এই দেবদাসীদের ওপর। তারা সন্ধ্যা ও রাতে এদের নৃত্যের জন্য দরবারে ও মজলিসে ডেকে পাঠাতে লাগল। প্রাণ ভয়ে দেবদাসীরা এসে নৃত্য করতে লাগল সামনে। তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য ধর্মভাবের নৃত্যের বদলে কাম-চরিতার্থের নীচ নৃত্য তারা করতে লাগল। তাদের ভাবভঙ্গিতে ধীরে ধীরে পবিত্রতা লোপ পেতে লাগল। তখন নৃত্য মন্দির থেকে চলে গিয়ে দরবারে আসন নিল। দেবদাসীদের হাত থেকে চলে গিয়ে বাইজীদের হাতে এল। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে নৃত্য গেল বাজারে। কিন্তু তখন একদল দেবদাসী ও তাদের পুরুষ সহচরয়া সেই শিল্পকে লুকিয়ে রাখল নিজেদের কাছে। মুসলমান আক্রমণ থেকে শিল্পের পবিত্রতা ও মৌলিকত্বকে বাঁচিয়ে রাখল, আর তাকে বাইরের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। তাকে অনেক যত্নে বড় করতে লাগল, তাকে হৃষ্টপুষ্ট করলে তারা। এই লোকেরা ছিল ব্রাহ্মণ, তারা কথকতা করত—মহাদেব ও কৃষ্ণের গাথা দিয়ে কাহিনীকে ব্যক্ত করা ছিল তাদের কাজ। তাই 'কথা' থেকে তাদের নাম হল "কথিক" বা "কথক"। আর তাদের কথা বলার ভঙ্গী, মুদ্রা, গান ইত্যাদি থেকে হল কথক নৃত্যের সূত্রপাত। কিন্তু এই কথক নৃত্যের মূলে রয়েছে—উত্তর প্রদেশের দেবদাসীদের নৃত্য বা নটবরী নৃত্য।

কথক নৃত্যের প্রাধান্যের দুটি কারণ আছে। প্রথমত দেবদাসী নৃত্য বা নটবরী নৃত্য হিন্দু রাজাদের কালে ছিল। মুসলমানরা এ দেশে এল পারস্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে। উত্তর ভারতের কলা ও চারুশিল্পের সঙ্গে পারস্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হল। সেই মিলনের ফলে এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠলো—সেই সংস্কৃতি ভারত-পারস্য সংস্কৃতি আর তার ফলে ভারতীয় সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও কথক নৃত্যের উৎপত্তি হল। কথক নৃত্য উচ্চ ও মহান, তার কারণ এ নৃত্য ভারত-পারস্য সংস্কৃতির অবদান! এই সংস্কৃতিই পরে ধীরে ধীরে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় কারণ এই যে—যে কোন শিল্প বা এমনকি মানুষও, সে যখন কোন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে যুদ্ধ করে চলতে থাকে, আর নিজের পবিত্রতা, মৌলিকত্ব, চরিত্র আর সত্তাকে বজায় রাখে, এবং সে যখন দ্বন্দ্বে জয়ী ও সফল হয় তখন তার গুণ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়—সে হয় আরও মহান ও পবিত্র। কথক নৃত্যের ব্যাপারেও এই হয়েছিল। মুসলমানদের আক্রমণ, মুসলমানী প্রভাব, নবাবের দরবারে হিন্দু ও মুসলমান সেনাপতি-দের কাম-লোলুপ আকাঙ্ক্ষার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এ নৃত্য ধীরে ধীরে যুদ্ধ করতে লাগল কতকগুলো

কথক

"কথক" ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাই পরে এ নৃত্য হল এত উজ্জ্বল ও খাঁটি। কিন্তু এ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই কথক নৃত্যের পেছনে আছে উত্তর প্রদেশের দেবদাসী নৃত্য।

ভারতের সমস্ত প্রদেশের দেবদাসীরা নিজেদের বংশপরিচয় দেয় এই বলে যে, তাদের পূর্বপুরুষ হল অপ্সরা। অপ্সরা থেকেই তাদের জন্ম। এ কথা মালাবার ও কামাখ্যা মন্দিরের দেবদাসী ও জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মাহারীরা বলে। আবার এই কথা যোগীরাও বলে উত্তর প্রদেশে। এখানে একটা কথা বলা দরকার। এই অপ্সরা কবির কল্পনার সৃষ্টি, কিন্তু দেবদাসী তা নয়। দেবদাসী বাস্তব জগতের। অপ্সরার কল্পনায় তিনটি স্তর আছে। প্রথম—যখন শিল্পী অপ্সরাকে স্বর্গেই রাখল—দেবতাদের ভোগের জন্য অপ্সরা। এই কল্পনায় অপ্সরাকে খুব উঁচু আসনে বসান হল। দ্বিতীয় কল্পনায় অপ্সরাকে একটু নীচু আসনে টেনে আনা হল। অপ্সরার সঙ্গে পৃথিবীর নৃপতিদের প্রণয়, যৌন-সম্বন্ধ ইত্যাদি। এই কল্পনার ফলে "মালবিকাগ্নিমিত্র" ইত্যাদি লেখা হল। মালবিকা অপ্সরীর প্রতি পৃথিবীর ভূপতি অগ্নিমিত্রের প্রণয়। শকুন্তলার মা ও বাবার, মেনকা-দুষ্মন্তের ভালবাসা ইত্যাদি। স্বর্গ থেকে তারা নেমে আসে, মর্ত্যের লোকেদের সাথে মেলামেশা করে, আবার চলে যায় স্বর্গে প্রয়োজন ফুরালে। তৃতীয় স্তর হল সকলের চেয়ে নীচু স্তর। সে স্তরের কল্পনায় অপ্সরার স্থান আর স্বর্গে রইল না, তাকে টেনে নীচে নামিয়ে আনা হল এই পৃথিবীতে আর সে তখন মানুষের ভোগের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। সে আর স্বর্গে ফিরে যেতে পারল না।

এই রকম করে দেবদাসীরাও তিনটি স্বতন্ত্র ধাপে উঁচু আসন থেকে ক্রমে ক্রমে নীচে নেমে এসেছে। প্রথম ধাপে দেবদাসীর আসন ছিল খুব উঁচু। দেবদাসী যে মন্দিরে নৃত্য করে, সেই মন্দিরের দেবতার ভোগের বস্তু। এমন কি সেই দেবতার সঙ্গে বিবাহ পর্যন্ত তার হত। বিবাহ অনুষ্ঠানের অনেক উল্লেখ আছে। ধীরে ধীরে দেবদাসীকে নীচে টেনে আনা হল। দ্বিতীয় ধাপে দেবদাসী হল মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের ভোগের বস্তু। পুরোহিত সাধারণ মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রধান ও বড়। এখন দেবদাসী হল মানুষ, আগে ছিল দেবী—দেবতার স্ত্রী। এখন হল প্রধান মানুষের ভোগের সামগ্রী। সকলের শেষের ধাপে দেবদাসীর স্থান হল জঘন্য। সে তখন সাধারণ মানুষের ভোগের জিনিসে পরিণত হল—পরে সে হল বারবণিতা। মন্দির থেকে গেল বাজারে। ধর্ম অনুষ্ঠানে ও পূজো-পার্বণে, ধর্মমেলায় বা মন্দিরে যাত্রী যেত দেবতার পূজোয়। সেখানে দেবদাসীরা এই সব যাত্রীদের কাম-লিপ্সা চরিতার্থ করবার সামগ্রী হয়ে দাঁড়াল। তাই এ নোংরামী বন্ধ করবার জন্য মাদ্রাজ সরকার মাদ্রাজ প্রদেশে Devadesi Abolition Act চালু করলেন। অন্যান্য যায়গায় দেবদাসীরা মন্দির ছেড়ে প্রায় চলে গেল, যারা রইল তারা নিজেদের শিল্পচর্চা লুকিয়ে করতে লাগল। আমাদের আলোচনার বিষয় অন্য প্রদেশের দেবদাসীদের নিয়ে নয়, তাই আমরা আসাম, উড়িষ্যা বা দক্ষিণ ভারতের দেবদাসীদের পরের জীবন নিয়ে চর্চা করব না। শুধু উত্তর প্রদেশের দেবদাসী বা যোগীদের পরিণতি হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মুসলমানদের সময় থেকে নৃত্য ও নর্তক-নর্তকীকে ঘৃণার চোখে দেখা হল। ইংরেজদের আমলে এই ঘৃণা আরও বেড়ে গেল। তাই দেবদাসীরা নিজেদের শিল্প ছেড়ে দিল, আবার কেউ হল বারাঙ্গনা, আর অনেক মুসলমানদের কবল হতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। তারা হল বালুজারা। তারা এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে নৃত্যের পসরা নিয়ে ঘুরতে লাগল, তারা হল যাযাবর, পরে তারা মধু, মৃগনাভি ও গাছ-গাছড়া বা ওষুধ নিয়ে বেচতে লাগল এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায়। তাই যোগীদের ছোঁয়া জল এদেশে কেউ খায় না কারণ তারা ঘৃণ্যজাতি।

কিন্তু যদিও তারা ঘৃণ্যজাতির লোক তবু এখনও মন্দিরে তাদের স্থান মেনে নেওয়া হয়। তাদেরই অধিকার আছে মন্দিরের কাজে। পূজো-পার্বণে মন্দিরের নৈবেদ্য ও দক্ষিণা থেকে তারা আইনতঃ ভাগ পায় এখনও। এক এক মন্দিরের রেজিস্টারে তাদের নাম বংশ-পরম্পরাগত ভাবে লেখা হচ্ছে। আগে তাদের পরিবারের সমস্ত খরচ এই নৈবেদ্য ও দক্ষিণা থেকে চলে যেত। তখন সস্তার দিন ছিল আর লোকেরা ধর্মভাবাপন্ন ছিল, আবার ধনীও ছিল, তাই তারা পূজোয় ও মন্দিরে বেশী নৈবেদ্য ও অর্থ ছড়াত। কিন্তু এখন সেদিন আর নেই। উপরন্তু পুরুষানুক্রমে দেবদাসীদের পরিবারে লোকসংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, তাই মন্দিরের আয়ে তাদের ভরণপোষণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যোগীরা এখন তাই খুব দরিদ্র। অর্থের টানাটানিতে অনেকে চাকরী নিয়েছে, আবার অনেকে হয়েছে ভিখারী। আবার আইনতঃ মন্দিরের সিঁড়ি বা মন্দিরের সংলগ্ন জমির মধ্যে যোগী পরিবার ছাড়া অন্য কারুর ভিক্ষা করার অধিকার নেই। এই যোগীরাই মূলতঃ মন্দিরের মালিক। পুরোহিত শুধু পূজো করে আর তার বদলে নৈবেদ্য ও দক্ষিণার এক অংশ পাবার অধিকারী।

দক্ষিণ ভারতের আইনের দ্বারা দেবদাসী সম্প্রদায় বন্ধ করার চেষ্টা করা হল। উড়িষ্যাতে এ সম্প্রদায় এখনও আছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে এ সম্প্রদায় আপনা-আপনিই লোপ পেতে চলেছে। আর বাস্তবে মুসলমানদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পেয়েছে। পরে দেবদাসীরা বিবাহ করতে লাগল আর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে সাধারণ লোকেদের মত থাকতে লাগল। তারা নিজেদের জাতব্যবসা ভুলে গেল। এই যোগী থেকেই অনেক নৌটাকী, গায়ক ও নর্তক পাওয়া যায়।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, দেবদাসী নৃত্য থেকে উত্তরপ্রদেশের রামলীলার নৃত্য এসেছে। রামলীলায় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ও অনেক সময়ে অন্যান্য চরিত্রও যোগীদের পরিবারের ছেলেদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে সাজান হয়। নিয়ম অনুযায়ী অন্ততঃ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার চরিত্র যোগীর ছেলেরাই করবে। আবার অন্য অন্য জায়গার মত যোগীরা মায়ের সম্পত্তির অধিকারী। সম্পত্তি মায়ের, উত্তরাধিকারী হয় মায়ের মেয়ে ও ছেলে।

॥ পরলোকে অমূল্যচন্দ্র সেন ॥

সুপরিচিত প্রবীণ সাংবাদিক ও বিপ্লবী শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন গত ২১শে মে ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর দান অসামান্য। আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দুঃসাহসিক মনোবল নিয়ে তিনি এক্ষেত্রে নেমেছিলেন বলেই সাংবাদিকতার ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অল্প বয়সেই শ্রীসেন জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯১৬ সালে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় গ্রেপ্তার হন। মুক্তি লাভের পর দেশবন্ধুর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন এবং ১৯৩২ সালে ঐ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা প্রকাশিত হলে ঐ পত্রিকারও বার্তা সম্পাদক হিসাবে কাজ করতে থাকেন। বেশ কিছুকাল পরে আনন্দবাজারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'ভারত' পত্রিকার বার্তা সম্পাদকরূপে কাজ করতে থাকেন। তারপর যুগান্তর, কৃষক, ভারত, লোকসেবক, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে কাজ করে ১৯৫৬ সালে সাংবাদিকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহু সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন।

॥ লাওস পরিস্থিতি ॥

যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন করে প্যাথেটলাও বাহিনীর হঠাৎ অগ্রগতি ও তারপরেই "সিয়াটো" শক্তিজোটের অন্যতম সরিক থাইল্যাণ্ডের আমন্ত্রণক্রমে লাওস-থাই সীমান্তে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতির ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যে বড় রকম আন্তর্জাতিক সংকটের আশংকা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল তা নানাকারণে বেশীদূর গড়ায়নি। প্রথমতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তিক্রমে যে মার্কিন সৈন্য থাইল্যাণ্ডে প্রেরিত হয়েছে তা শুধু থাই-লাওস সীমান্তে মেকঙ নদীর প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে এবং কোন রকম আক্রমণ না এলে মার্কিন বাহিনী প্রতি-আক্রমণ করবে না। কিন্তু শান্তি অক্ষুণ্ন থাকার দ্বিতীয় কারণটি আরও বড়, এবং সেটিহোল এ ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংযত আচরণ। কোরিয়া যুদ্ধের পর এই দ্বিতীয়বার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক সিদ্ধান্তে সৈন্য বাহিনী অবতরণ করাল, কিন্তু সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভ এই ঘটনাটিকে শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট কেনেডির নির্বুদ্ধিতা বলে উড়িয়ে দিলেন, এ ব্যাপারে কমিউনিষ্ট দুনিয়ার

এখনই কিছু করণীয় আছে বলে মনে করলেন না। মঃ ক্রুশ্চেভের এই মনোভাবের পিছনের কারণ খুবই স্পষ্ট। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে আজ তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল চীন। একারণে কমিউনিষ্ট দুনিয়ার নেতারূপে মঃ ক্রুশ্চেভ আজ এমন কোন ঝুঁকি নিতে চান না যার সুযোগে কমিউনিষ্ট চীন একটা ভয়ংকর রকমের যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে পারে। তাই থাই সীমান্তে মার্কিন সৈন্যের অবতরণ চীনের পিকিঙ পিপলস ডেলী পত্রিকায় "চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি" বলে বর্ণিত হলেও মঃ ক্রুশ্চেভ তাকে নিছক নির্বুদ্ধিতা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। পশ্চিম এশিয়ার কোথাও এই জাতীয় মার্কিন সৈন্য সমাবেশের ঘটনা ঘটলে সোভিয়েট নায়কের মনোভাবের অবশ্যই পরিবর্তন ঘটত।

তাছাড়া লাওস সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব যে খুব বিরূপ নয় তার প্রমাণও প্রেসিডেন্ট কেনেডি দিয়েছেন। নিরপেক্ষ প্রিন্স সুভানা ফুমার নেতৃত্বে লাওসে জাতীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের মতই আগ্রহ দেখিয়েছেন, এবং সাহায্য বন্ধ করার ভয় দেখিয়েও তিনি লাওসের তিন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রিন্সের মধ্যে মিলন ঘটাতে চেষ্টা করেছেন। লাওসের লোক সংখ্যা মাত্র ২০ লক্ষ, সে জায়গায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তারা এ পর্যন্ত সাহায্য পেয়েছে ৩৭ কোটি ২০ লক্ষ ডলার। মাথাপিছু এত বেশী মার্কিন সাহায্য পৃথিবীর আর কোন দেশের ভাগ্যেই জোটেনি। স্বভাবতই এই বিপুল পরিমাণ সাহায্য বন্ধের ঝুঁকি অন্তত লাওসের দক্ষিণপন্থী বুন উম সরকারের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া লণ্ডন থেকে দেশে ফেরার পথে প্রিন্স সুভানা ফুমাও সম্প্রতি দমদম বিমান বন্দরে ও রেঙ্গুনে বলে গেছেন, প্রকৃত অবস্থার সম্মুখীন হয়ে লাওসের দক্ষিণপন্থী বুন উম সরকার এবার হয়ত বুঝতে পারবেন যে, জাতীয় সরকার গঠিত না হলে তাঁদের টিঁকে থাকার কোন উপায় নেই। সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে লাওসের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ এবার প্রকৃত আগ্রহ নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে মিলিত হবেন।

॥ টিটোর মৈত্রী প্রয়াস ॥

প্রেসিডেন্ট টিটো রাশিয়ার সঙ্গে পুনরায় মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন। টিটোর বর্তমান আগ্রহের প্রধান কারণ হল ইউরোপের খোলা বাজার ও সে সম্পর্কে জেনারেল দ্যগল ও চ্যান্সেলর আদেনুয়েরের বর্তমান মনোভাব ও কার্যসূচী, যা গত সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে। সত্যিই যদি কমিউনিষ্ট শিবির-বহির্ভূত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি অর্থনৈতিক ঐক্যের দৃঢ় ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত ফরাসী প্রেসিডেন্ট জেনারেল দ্যগলের পরিকল্পনা মত ইংগ-মার্কিন প্রভাবমুক্ত, পারমাণবিক শক্তি-সম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র কমিউনিষ্ট বিরোধী শক্তি-শিবিরে পরিণত হয় তবে সেটা সবচেয়ে বেশী অসুবিধায় ফেলবে যুগোশ্লাভিয়াকে। কমিউনিষ্ট ও অ-কমিউনিষ্ট দুই শক্তি-শিবিরের মধ্যে একটির সঙ্গে আপোষে আসা ভিন্ন যুগোশ্লাভিয়ার উপায়ান্তর নেই, এবং সে অবস্থায় সোভিয়েট ইউনিয়নকেই তার নিকটতর বন্ধু বলে ভাবা স্বাভাবিক। সম্প্রতি মঃ ক্রুশ্চেভও তাঁর এক ভাষণে মার্শাল টিটো সম্পর্কে হৃদ্যতাপূর্ণ উক্তি করেছেন। সুতরাং কমিউনিষ্ট শিবিরে টিটোর যোগদান ও সে কারণে কমিউনিষ্ট মতবাদ ও চিন্তাধারাতেও পুনরায় কিছুটা পরিবর্তন ও সংযোজন আসন্ন বলে মনে হয়।

॥ স্বপ্নবিলাসী দ্যগল ॥

চার বছর আগে এক দারুণ জাতীয় সংকটের মুহূর্তে ফ্রান্সের প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষের ইচ্ছাক্রমে জেনারেল দ্যগল জাতির পরিচালনা দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তারপর নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কারণে দ্যগল আজ ফ্রান্সের ভাগ্যবিধাতা। ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা, জাতীয় পরিষদ সবই তাঁর ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। সমগ্র ফ্রান্স আজ ক্ষমতালোভী সৈনিকের করায়ত্ত। কিন্তু বিপ্লবের দেশ, ব্যক্তিস্বাধীনতার দেশ ফ্রান্স কোনদিন যে এভাবে কোন এক-নায়কের উদ্ধত তর্জনীর সম্মুখে নতি স্বীকার করবে একথা বিশ বছর আগে দ্যগল বিশ্বাস করতেন না। বিশ বছর আগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়ংকর দিনগুলিতে ফ্রান্স যখন হিটলার-অনুগৃহীত মার্শাল পেঁতার শাসনাধীন সেই সময় জেনারেল দ্যগল মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লিখিত এক পত্রে বলেছিলেন, যে স্বপ্নবিলাসী নিজেকে একনায়করূপে ফ্রান্সের শাসন-ব্যবস্থার পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবেন, তাঁর যত বড় দেশসেবার স্বীকৃতিই থাকুক না কেন, অনতিবিলম্বেই তিনি দেখতে পাবেন, সারা ফ্রান্স তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তিনি লিখেছিলেন—

"The French nation is in character the most deeply opposed to a regime of personal power.... The 'dreamer' who would try to do that whatever services he may
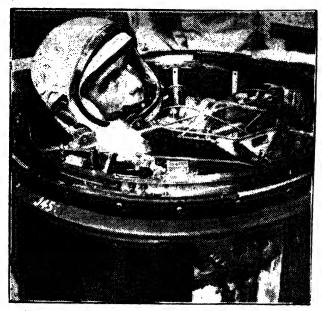
মার্কিণ মহাকাশচারী এম স্কট কার্পেণ্টার বৃহস্পতিবার ৩ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণের জন্য মহাকাশ যাত্রার পূর্বে লেক ক্যানাভেরালে এক মহাকাশ যানে তাঁর শিক্ষণ গ্রহণ কালীন গৃহীত চিত্র।

have rendered to the country in the past would find the whole nation ranged against him." — বিশ বছর আগে জেনারেল দ্যগলের বিবেচনায় যা ছিল স্বপ্নবিলাস, আজ তিনি নিজেকেই সেখানে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করেছেন, আর বোধহয় নতুন করে আবিস্কারও করেছেন যে এক-নায়কতা স্বপ্নবিলাস নয়। মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কিত একটি দলিল-গ্রন্থে সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখা জেনারেল দ্যগলের পত্রখানি প্রকাশিত হয়েছে।

॥ চীনা আশ্রয়প্রার্থী ॥

দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দক্ষিণ চীনের প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ মে মাসের মধ্যে বৃটিশ উপনিবেশ হংকঙে খাদ্যের সন্ধানে উপস্থিত হয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে। কারণ হংকঙ সরকার জানিয়ে দিয়েছেন, ইতিমধ্যেই হংকঙে যে বিপুল সংখ্যক ক্ষুধার্ত নরনারীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে তাতেই হংকঙ সরকারের সামর্থ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে, এরপর নতুন করে কোন ক্ষুধার্ত আশ্রয়-প্রার্থীকে হংকঙে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া হংকঙ সরকার নাকি সংবাদ পেয়েছেন যে দক্ষিণ চীনের প্রায় সাত আট লক্ষ নরনারী বর্তমানে খাদ্যের সন্ধানে হংকঙ অভিমুখে যাত্রা করেছে। এ অবস্থায় বর্তমান আগন্তুকদের সম্বন্ধে কোনরকম নরম নীতি অনুসৃত হলেই আশ্রয়প্রার্থীদের বিপুল বন্যায় ক্ষুদ্র হংকঙের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়বে। হংকঙ সরকার তাই সীমান্তে সৈন্য ও পুলিশ প্রহরা বসিয়েই নিশ্চিত হতে পারেননি, নতুন করে বিরাট এক কাঁটা তারের বেড়া গেঁথে তুলেছেন চীন-হংকঙ সীমান্তে, যাতে আশ্রয়প্রার্থীদের পক্ষে আর আসা সম্ভব না হতে পারে।

চীনের কোটি কোটি মানুষের বর্তমান দুর্গতির জন্যে হয়ত সে দেশের শাসন ব্যবস্থাই দায়ী, কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণেই এতবড় একটি মানবিক সমস্যাকে আজ উপেক্ষা করা চলে না। যদি তা করা হয় তবে তার পরিণতি হবে ভয়ংকর। হংকঙে সব আশ্রয়প্রার্থীর স্থানলাভ সম্ভব না হলেও তাকে সাময়িকভাবে আশ্রয়প্রার্থীদের শিবিররূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চীনের বর্তমান সমস্যার একমাত্র সমাধান হল পৃথিবীর উদ্বৃত্ত এলাকাগুলি হতে খাদ্য প্রেরণ। চীনের কমিউনিস্ট সরকার হয়ত অকমিনিষ্ট দেশগুলির এই জাতীয় সাহায্যের বিরূপ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আশংকা করে সাহায্য গ্রহণে সম্মত নাও হতে পারেন তবুও এব্যাপারে অকমিউনিষ্ট দেশগুলির অবশ্যই উদ্যোগী হওয়া উচিত। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জনৈক মুখপাত্র অবশ্য বলেছেন যে হংকঙে আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্যে তাঁরা এপর্যন্ত প্রায় দু'কোটি আশী লক্ষ ডলার মূল্যের খাদ্য সাহায্য পাঠিয়েছেন এবং চলতি বছরে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ডলার মূল্যের খাদ্য দেবেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই সামান্য। এখানে প্রখ্যাত লেখিকা ও চীনের বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ী শ্রীমতী পার্লবাকের আবেদনের কথা স্মরণীয়। তিনি আবেদন জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে, উদ্বৃত্ত খাদ্য চীনে পাঠিয়ে সে দেশের ক্ষুধার্ত মানুষ-গুলিকে বাঁচাতে। যদি সত্যই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলি এ আবেদনে সাড়া দেয় তবে হয়ত তারা দেখতে পাবে যে, চীনের ভূখণ্ডে সামরিক শক্তির জোরে যা তারা পেতে চেয়েছিল, মানবিক সহানুভূতি ও ভালবাসা দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী তারা পেয়েছে।

॥ সালাজারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ॥

পর্তুগালের তিন শহর লিসবন, কোইমব্রা ও ওপোর্তোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একসঙ্গে সালাজারের পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। গত ১৯শে মে কোইমব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় তিনশত ছাত্র তাদের ফুটবল ক্লাব ঘরে ব্যারিকেড রচনা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুলিশের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন এবং প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র বাসিন্দা জনতার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পুলিশের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ছাত্রদের ওপর পুলিশ হামলার প্রতিবাদে লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর, ও সালাজারের মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্য অধ্যাপক মার্সেলো সাইতানো পদত্যাগ করেছেন। ছাত্রদের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে সালাজার কমিউনিষ্ট প্ররোচনার অভিযোগ এনেছেন এবং এই মর্মে এক ডিক্রি জারী করেছেন যে ছাত্ররা এতকাল যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে আসছিল সে সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে, এবং ভবিষ্যতে তারা কোন বিক্ষোভে যোগ দিলে তাদের সাধারণ আইনভঙ্গকারীর মতই শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু ছাত্ররা তাতে বিচলিত হননি, এবং কমিউনিষ্ট প্ররোচনার অভিযোগ তীব্রভাবে অস্বীকার করে তারা বলেছেন, সালাজারের পুলিশী শাসনের বিরুদ্ধেই তাদের যাবতীয় অভিযোগ।

সারা পর্তুগালের মানুষ আজ সালাজারের পঁয়ত্রিশ বছরের অভিশপ্ত একনায়কতার অবসানকল্পে বদ্ধপরিকর, তাই গুরুতর বিপদের আশংকা সত্ত্বেও সেখানকার মানুষ বারবার বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। কিন্তু তবুও যে ঐ কুখ্যাত এক-নায়কের পতন ঘটছে না তার কারণ, জনস্বার্থবিরোধী তিনটি প্রবল শক্তি— সৈন্যবাহিনী, চার্চ ও অভিজাত শ্রেণী আজ তার প্রধান সহায়। সালাজার প্রকৃতপক্ষে তাদেরই স্বার্থের প্রতীক, এবং সালাজার-বিরোধীদের যে সংগ্রাম তা প্রকৃতপক্ষে এই তিন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম।

॥ ঘরে ॥

১৭ই মে—৩রা জ্যৈষ্ঠ : 'আজাদ কাশ্মীরকে' স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে রূপান্তরের চেষ্টা হইলে যুদ্ধবিরতি সীমারেখার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে—কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননের সতর্কবাণী।

'মার্কিণ সাহায্য না পাইলেও বোকারোতে ইস্পাত কারখানা স্থাপনে বিলম্ব করা হইবে না'—লোকসভায় ইস্পাত ও ভারী শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যমের উক্তি।

১৮ই মে—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ : দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার তৃতীয় ব্লাস্ট ফার্ণেসের উদ্বোধন।

পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সোয়া দুই কোটি টাকা বরাদ্দ—লোকসভায় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে এল শ্রীমালীর ঘোষণা।

সরকারী শিল্পোদ্যোগের কাজকর্ম তদারকীর জন্য শীঘ্রই কমিটি গঠন—লোকসভায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমান্ভাই শাহ কর্তৃক সরকারী সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।

১৯শে মে—৫ই জ্যৈষ্ঠ : দীর্ঘ ১৮ দিন পর কলিকাতা বন্দরের সংকটের অবসান—পদত্যাগী পাইলটদের কার্যে যোগদানের সিদ্ধান্ত।

কলিকাতার জনসভায় কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের বাংলা ভাষা আন্দোলনকালে শিলচরে পুলিশের গুলীতে নিহত একাদশ শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

রণজি ষ্টেডিয়ামে (কলিকাতা) নয়দিনব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন— উদ্বোধক : শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

২০শে মে—৬ই জ্যৈষ্ঠ : কেন্দ্র কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে সর্তাধীনে খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের ক্ষমতা দান—কয়লা-সমস্যা সমাধানের নূতন 'ফরমুলা' সম্পর্কে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় খনি ও জ্বালানি মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্যের সহিত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের দীর্ঘ আলোচনা।

মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রাণ্টস কমিশন গঠনের দৃঢ় দাবী—উড়িষ্যা মাধ্যমিক শিক্ষক সম্মেলনে সভাপতিরূপে শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ের প্রস্তাব।

২১শে মে—৭ই জ্যৈষ্ঠ : 'কূটনৈতিক রীতি লঙ্ঘনের জন্য 'চায়না টুডে'র (দিল্লীস্থ চীনা দূতাবাসের পত্রিকা) বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে'—লোকসভায় পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননের ঘোষণা।

প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেনের (৭২) লোকান্তর।

২২শে মে—৮ই জ্যৈষ্ঠ : এম্-বি-বি-এস্ পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া দিবার দাবীতে মেডিক্যাল ছাত্রদের বিক্ষোভ— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দ্বারভাঙ্গা ভবনে দশ ঘণ্টা আটক—পরিণতিতে পুলিশের লাঠি চালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেণ দুর্ঘটনায় ৫০ জন যাত্রী আহত—বাফারের সহিত ইঞ্জিনের সংঘর্ষের জের।

২৩শে মে—৯ই জ্যৈষ্ঠ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন এম-বি, বি-এস পরীক্ষা বাতিল—উপাচার্য শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ীর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ—ছাত্রনেতাগণ কর্তৃক ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠি চালনায় নিন্দা।

ইন্দোর সেন্ট্রাল জেলে কয়েদীদের দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা— কয়েকজন ওয়ার্ডার প্রহৃত—হাঙ্গামা দমনে বাহির হইতে পুলিশ আহ্বান।

॥ বাইরে ॥

১৭ই মে—৩রা জ্যৈষ্ঠ : মূল ভূখণ্ড ছাড়িয়া আরও ৭ লক্ষ চীনা নর-নারীর হংকং পলায়নের উদ্যোগ—পর্তুগীজ ম্যাকাওয়েও ৮০ হাজার চীনা শরণার্থীর ভিড়।

থাইল্যাণ্ডে অবতীর্ণ মার্কিণ সৈন্যদের লাওস সীমান্তে মোতায়েনের সংবাদ।

১৮ই মে—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ : রাশিয়া হইতে ভারতের 'মিগ' জেট বিমান ক্রয়ের উদ্যোগে আমেরিকায় আলোড়ন—এশিয়ায় মার্কিণ প্রস্তাব অবসানের সূচনা হইল বলিয়া মহলবিশেষে মন্তব্য।

পূর্ব পাকিস্থানের নানাস্থানে এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আক্রমণ—পাসপোর্ট ও মাইগ্রেশনের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে না পারায় সংখ্যালঘুদের উৎকণ্ঠা।

১৯শে মে—৫ই জ্যৈষ্ঠ : কাশ্মীর সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘ স্বস্তি পরিষদের পুনরধিবেশনে ভারতের বিরোধিতা—স্বস্তি পরিষদ সভাপতির নিকট শ্রী সি এস্ ঝা'র (রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি) পত্র—বৈঠক বাতিল না করা গেলে জুনের (১৯৬২) শেষাশেষি পর্যন্ত মুলতুবী রাখার দাবী।

পশ্চিম নেপালে বিদ্রোহীদের আধিপত্য বিস্তার—দুইটি জেলার থানাসমূহ হস্তগত করার দাবী।

২০শে মে—৬ই জ্যৈষ্ঠ : আর্জেণ্টিনার পার্লামেণ্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ—রাজনৈতিক দলগুলির কার্যতঃ অস্তিত্ব লোপ—প্রেসিডেণ্ট গুইদোর জরুরী আদেশ জারী।

২১শে মে—৭ই জ্যৈষ্ঠ : লণ্ডন হইতে করাচীতে আগমনের পর নাগা বিদ্রোহী নেতা ফিজো উধাও—'ডন' পত্রিকায় চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ।

সীমান্তে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি—সংখ্যালঘু শ্রেণীর লোকদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার।

২১শে মে—৮ই জ্যৈষ্ঠ : পশ্চিম ইরিয়ানের একটি শহরে (টার্মিনা বাউণ্ড) ইন্দোনেশীয় পতাকা উত্তোলন।

জেনেভা সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণ নিয়ন্ত্রণ প্রশ্ন সম্পর্কিত অচলাবস্থা দূরীকরণে রুশ ও সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের যৌথ উদ্যম।

২৩শে মে—৯ই জ্যৈষ্ঠ : 'লাওসের ব্যাপারে মার্কিণ হস্তক্ষেপ বিশ্বযুদ্ধ বাধাইতে পারে'—জেনেভায় ১৭-জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে রুশ প্রতিনিধি জোরিনের সতর্কবাণী।

ফ্রান্সের প্রাক্তন জেনারেল গুপ্ত সামরিক সংস্থার (ও-এ-এস) নেতা সালানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড— দেশদ্রোহিতার অভিযোগে সামরিক ট্রাইবুনালের রায়।

বর্ণারসিক

গ্রীষ্মের দাবদাহে মহানগরী কলকাতা জ্বলছে এখন। কিন্তু কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের রসধারা তাতে এতটুকু শুষ্ক মনে হচ্ছে না। উৎসব আর সম্মেলন এখনও কলকাতার মানুষদের কাছে নিত্যদিনের ঘটনা। যে শীত ঋতু এই কয়েক বছর আগেও ছিল চিত্র-প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠতম সময়, এখন তারও বিপুল আয়োজন সর্বঋতুব্যাপী। কলকাতার সব কয়টি প্রদর্শনী ভবনে প্রায় প্রতি সপ্তাহে নতুন চিত্র-শিল্পীর চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হচ্ছে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে উদ্বোধিত হয়েছে শিল্পী পূর্ণিমা গৌরীশ্বর ও সমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক চিত্র-প্রদর্শনী। তৃতীয় প্রদর্শনীটি চলছে পশ্চিমবঙ্গ যুব-উৎসবের অঙ্গরূপে রঞ্জি স্টেডিয়ামের অভ্যন্তরে। এটি শিশু, কিশোর ও যুব শিল্পীদের সম্মিলিত প্রদর্শনী।

॥ শিল্পী পূর্ণিমা গৌরীশ্বর ॥

শিল্পী পূর্ণিমা গৌরীশ্বর শ্রীগৌরীশ্বর ভট্টাচার্যের ছদ্মনাম। এই ছদ্ম নামেই গৌরীশ্বরবাবু শিল্পীরূপে নিজেকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। শুনেছি, গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তি। ভারত সরকারের কোনো এক বিশেষ বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে তিনি এখন কাঠমাণ্ডুতে অবস্থান করছেন। তাঁর এই গবেষণামূলক কাজের ফাঁকে তিনি স্ব-প্রচেষ্টায় যেভাবে শিল্প-চর্চায় সাফল্য লাভের পথে অগ্রসর হয়েছেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ইতিমধ্যে তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী মাদ্রাজ ও প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতায় এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ইন্দো-কন্টিনেন্টাল আর্টিস্টস' নামক সংস্থাটি তাই আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হলেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে শিল্পী গৌরীশ্বরের ৪১খানি চিত্র স্থান পেয়েছে। শিল্পীর মাধ্যম মুখ্যত জল-রঙ, তৈল-রঙ আর প্যাস্টেল। এই তিনটি মাধ্যমেই তাঁর শিল্পী-দক্ষতার পরিচয় প্রতিটি দর্শকই অনুভব করতে পারবেন। শ্রীগৌরীশ্বর বিশেষ কোনো শিল্প-শৈলীর মধ্যে তাঁর শিল্পী-সত্তাকে বেঁধে ফেলেননি। বরং বলা যায়, তাঁর শিল্পী-মনের প্রচণ্ড আবেগ বিষয় অনুযায়ী আঙ্গিক আহরণে সদা ব্যস্ত। বিষয় নির্বাচনেও তিনি অত্যন্ত উদার। একমাত্র প্রতিকৃতি চিত্র ছাড়া তিনি প্রায় সর্ববস্তুকে তাঁর চিত্রকলায় স্থান দিয়েছেন। তাঁর ড্রয়িং হয়ত সব সময় নিখুঁত নয়, কিন্তু চিত্র-সংস্থাপন, রঙ প্রয়োগের পদ্ধতি এবং ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তিতে শিল্পী যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাও অনস্বীকার্য।

জল-রঙে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে 'প্লে মেটস' (২), সরো (১২), 'হাই লাইট' (১৫) প্রভৃতি চিত্রগুলি কম্পোজিশান এবং রঙ প্রয়োগে সুন্দর। তৈল-রঙের মাধ্যমে শিল্পী কয়েকখানি চিত্রে যে চমৎকার জমিন সৃষ্টি করেছেন নিঃসন্দেহে তা প্রশংসার যোগ্য। তাঁর তৈল-রঙের চিত্রের মধ্যে 'প্রাইড' (২২) 'ট্রোটিং হর্স' (২৭), 'এনুই' (২৮), 'ব্লাক গার্ল' (২৯), 'কম্পোজিশান' (৩০) ও 'ভেস এণ্ড উয়োম্যান' (৩২) আমাদের খুব ভাল লেগেছে। প্যাস্টেলে অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে 'মুডি' (৮) ও 'ফিশ এণ্ড ফেস' (৩৭) মন্দ নয়।

শিল্পী পূর্ণিমা গৌরীশ্বর অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও যে সুন্দর চিত্রকলা উপহার দিয়েছেন তা আমরা সানন্দে উপভোগ করেছি। আশা করি এই তরুণ শিল্পী তাঁর সাধনায় অচিরেই প্রতিষ্ঠালাভ করবেন।

॥ শিল্পী সমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের একদিকে যখন শিল্পী পূর্ণিমা গৌরীশ্বরের চিত্র-প্রদর্শনী চলছে, অন্যদিকে তখন চলছে শিল্পী সমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র-প্রদর্শনী। শিল্পী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শিক্ষা-জীবন সদ্য শেষ করে এই প্রথম একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। আর, এই আয়োজনের মূলে উদ্যোক্তা হল 'মহেঞ্জোদারো' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

শিল্পী বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রদর্শনীতে ২৩খানি চিত্র উপস্থিত করেছেন। এর সবগুলিরই মাধ্যম তৈল-রঙ। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অন্য কোনো প্রদর্শনীতে এই-ভাবে কোনো তরুণ শিল্পী তৈল-রঙকেই একমাত্র মাধ্যম নির্বাচিত করেছেন বলে মনে পড়ছে না। সেদিক দিয়ে আলোচ্য প্রদর্শনীর শিল্পীর নিষ্ঠাকে প্রশংসা করতে হয়। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে শিল্পী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-দর্শন। তিনি আমাদের সমাজ-জীবন এবং তার সমস্যা ও যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে অন্য কোথাও শিল্প-জগতের সন্ধানে ধাবিত হননি। এবং সুখের কথা, এই সমাজ-জীবনকে তুলে ধরার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ফটোগ্রাফিক কিংবা দুর্বোধ্য বিমূর্ততায় পর্যবসিত হয়নি। বরং বলা যায়, তাঁর কল্পনা-প্রতিভা বাস্তবকে ভিত্তি করেও বাস্তবতর জগতের ব্যঞ্জনা আনয়নে সক্ষম হয়েছে।

তাঁর জোয়াল কাঁধে গরুর চিত্র (৩), 'বিদায়' (৭), 'পরিবার' (৯), 'স্বর্গের নিচে' (১২), 'খাবারের জন্য' (১৪), 'আলো, আরো আলো' (১৮), 'দৈনন্দিন জীবন' (২০) ও 'জীবনের আকাঙ্ক্ষা' (২১)-র মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে উপরোক্ত পরিচয়। অধিকাংশ চিত্রের সংস্থাপন, মৃদু রঙ প্রয়োগ-পদ্ধতি সত্যি মনোমুগ্ধকর। আমরা এই তরুণ শিল্পীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

॥ যুব উৎসবের চিত্র-প্রদর্শনী ॥

শান্তি ও মৈত্রীর জন্য আয়োজিত হেলসিংকিতে আসন্ন বিশ্ব যুব উৎসবের অঙ্গরূপে রঞ্জি স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসবে এবার বিরাট এক চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব কমিটি। এই প্রদর্শনীতে ৪ বৎসরের শিশু থেকে শুরু করে ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত যুবক-শিল্পী রচিত অজস্র চিত্রকলার নিদর্শন স্থান পেয়েছে। যুব-জীবনের সৃষ্টিশীল চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করাই এই জাতীয় প্রদর্শনীর আসল উদ্দেশ্য। এবং সে উদ্দেশ্য যে বহুল পরিমাণে সফল হয়েছে এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের বিরাট নামের তালিকাই তা প্রমাণ করছে।

আলোচ্য প্রদর্শনীর চারুকলা বিভাগে স্থান পেয়েছে ১০৫ খানি চিত্র। বলা বাহুল্য সব মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রই এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে গুণানুসারে কিছু চিত্রকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। শিল্পী একবাল উদ্দিন আহম্মদ, প্রদীপ বসু, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন চৌধুরী, চিত্রলেখা চৌধুরী, সান্ত্বনা গোস্বামী প্রমুখ বহু তরুণ শিল্পীর রচনার মধ্যে আমরা প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর লক্ষ্য করেছি। এত শিল্পীর রচনাকে ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমরা সকল শিল্পীকেই একটি মহৎ প্রচেষ্টায় যোগদানের জন্য অন্ততঃ অভিনন্দন জানাই।

শিশু-চিত্র বিভাগে আছে ১১৮খানি চিত্র। নানা বয়সের (৪ থেকে ১৫ বৎসর) শিশু ও কিশোরদের অঙ্কিত এই চিত্র আমরা উপভোগ করেছি। আলোক-চিত্র বিভাগটিও ভাল লাগল। আমরা উদ্যোক্তাদের প্রদর্শনী-সজ্জার প্রশংসা করতে না পারায় দুঃখিত।

অভয়ঙ্কর

॥ নব্বুই—নট আউট ॥

এ যুগের অগ্রজ দার্শনিক, ও বিশিষ্ট গ্রন্থকার মনীষী বার্ট্রান্ড (আর্ল) রাসেল বিগত ১৮ই মে তারিখে তাঁর জন্মদিবস পালন করেছেন। এই উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, নেহরু, ক্রুশ্চেভ, রাধাকৃষ্ণণ, উ থান্ট, নক্রুমা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবৃন্দ তাঁকে অভিনন্দনজ্ঞাপন করেছেন, হ্যারল্ড ম্যাকমিলন এবং প্রেসিডেন্ট কেনেডি কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের নেতা বার্ট্রান্ড রাসেলকে তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দনজ্ঞাপন করতে পারেননি।

নব্বুই পূর্তির প্রাক্কালে বিলাতের 'অবজারভার' নামক দৈনিকপত্রে এক আত্মকথামূলক প্রবন্ধে রাসেল লিখেছেন: "আমার বার্ধক্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত হত যদি পৃথিবীর সাম্প্রতিক অবস্থা ভুলতে পারতাম। আগে আগে মনে আশা ছিল যে পরিণত বয়সে সকল কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে অখণ্ডভাবে সারস্বত-কর্মে জীবনটা কাটিয়ে দেব। সে শুধু অলস মায়া। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে আমরা কেবলই ভ্রান্তপথে বিচরণ করছি, সবিস্ময়ে তাই লক্ষ্য করছি।"

এর পূর্বে ২১শে এপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষ এবং আরো সাতটি দেশের নেতৃবৃন্দকে আবেদন জানিয়েছেন যে ক্রীসমাস আইল্যান্ডে জাহাজ পাঠান, যুক্তরাষ্ট্র সেখানে আণবিক পরীক্ষা করবে সংকল্প করেছে। তারবার্তায় আর্ল রাসেল বলেছেন:

"The Great Powers violate international law with their ruthless behaviour, I appeal to the neutral countries to act in the rame of man. It is within your power to stop this race towards its deaths . . . ."

বার্ট্রান্ড রাসেল বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানকে বৃথা আবেদন জানিয়ে অবশেষে 'নিজেই করো' এই নীতি অনুসারে স্বয়ং সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন। এ তাঁর একক সংগ্রাম।

আটটি নিরপেক্ষ দেশকে বৃথাই তিনি আবেদন জানালেন, ক্রীসমাস দ্বীপে জাহাজ পাঠিয়ে প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে আণবিক পরীক্ষা বন্ধ রাখার জন্য বাধ্য করতে, তাঁর এই ডাকে কেউ সাড়া না দেওয়ায় অবশেষে—'তবে তুই একলা চলো রে' নীতি গ্রহণ করেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল। তিনি একাই ক্রীসমাস আইল্যান্ডে যাওয়া স্থির করেছেন। স্বয়ং রাসেল এবং যে-জাহাজে তিনি যাবেন তার নাবিকবৃন্দ হবে তাঁর যাত্রা-সহচর।

জওহরলাল নেহরু বার্ট্রান্ড রাসেলের আবেদনের অন্তর্নিহিত বাণীর প্রশংসা

বার্ট্রান্ড রাসেল

করেছেন, তবে তাঁর মনে সংশয় জেগেছে যে আণবিক বিষবাষ্পের মুখে গিয়ে দাঁড়ানোর মত সত্যাগ্রহী এবং উপযুক্ত নাবিকবৃন্দ পাওয়া কি সম্ভব হবে? বার্ট্রান্ড রাসেলের কোনো অসুবিধা নেই। এই জাতীয় পরীক্ষার প্রাথমিককালে এক জাপানী মৎস্যজীবির কি হাল হয়েছিল তা নিশ্চয়ই তিনি জানেন। যদি তিনি এই জাতীয় পরীক্ষা বন্ধ করতে পারেন তাহলে সমগ্র পৃথিবী তাঁর জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠবে। তিন মিলিয়ন মানুষের মনে কৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকবে না।। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ডঃ লাইনাস পলিং অনুমান করেছেন যে এই আণবিক পরীক্ষার ফলে অন্যূন তিন মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পারমাণবিক পদার্থবিদ রবার্ট ওপেনহিমার, প্রথমতম আণবিক বোমার উদ্‌গাতা, তার উন্নয়নের জন্য দায়ী। প্রথমবার পরীক্ষার পর তার ভয়ংকরত্ব দেখে তিনি সভয়ে গীতার বিভূতিযোগের নিম্নলিখিত লাইনটি উচ্চারণ করেছিলেন:

"মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।"

আমি সর্বহর মৃত্যু, এবং ভবিষ্যসকলের উদ্ভব। পরবর্তীকালে হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণে তাঁর আপত্তি দ্বারা তিনি যে বিবেকদংশন ভোগ করেছেন তা বোঝা যায়।

ডঃ পলিং এই জাতীয় আণবিক বোমার প্রতিযোগিতায় নিঃসন্দেহে অস্বস্তি বোধ করছেন। আণবিক বোমা পরীক্ষার প্রতিরোধে তিনি হোয়াইট হাউসে পিকেটিং করেছেন, কিন্তু তাঁর এই প্রতিবাদ অকিঞ্চিৎকর ও নিরর্থক হয়েছে। এই প্রতিবাদ-জ্ঞাপনের পরমুহূর্তেই তিনি প্রেসিডেন্ট কেনেডি কর্তৃক আয়োজিত নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত মনীষীদের সম্বর্ধনা-ডিনার-সভায় যোগদান করেছিলেন।

বার্ট্রান্ড রাসেল কঠোর প্রকৃতির মানুষ। বৃটেনের পারমাণবিক বোমা-বিরোধী আন্দোলনের তিনি নেতা। নিরস্ত্রীকরণের জন্য তিনি সংগ্রাম করে চলেছেন। সাম্প্রতিককালে যাঁরা এই আন্দোলনের সমর্থক তাঁরাও প্রশ্ন করেছেন যে অলডারমেস্টন থেকে হোয়াইট হল পর্যন্ত এই বাৎসরিক প্রতিবাদ মিছিলে সরকারের ওপর কি কিছুমাত্র চাপ পড়ে। মিছিলের ফলে কয়েকদিন সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় হেড লাইন পড়ে, কিন্তু সরকারী নীতির কিছুই পরিবর্তন ঘটে না।

প্রবল লড়াই-এর ফলে 'Unilateralists'-দল কোনো রূপ নীতি-গঠনে তাঁদের অক্ষমতা স্বীকার করে পরাজয় বরণ করেছেন বিশেষতঃ শ্রমিক দলের নীতিগত সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থেকে গেছে। জনমত গঠনের প্রচেষ্টা কিন্তু অব্যাহত আছে।

বার্ট্রান্ড রাসেল পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করার দাবী জানিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রনিবারক আন্দোলনের প্রথম পর্যায় উদ্বোধন করেছেন। নব্বুই বছরের

বৃদ্ধের ক্ষীণকণ্ঠে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের আর্তনাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই ভূমিকা সমগ্র পৃথিবীর কাছে এক বিরাট বিস্ময় এবং এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতের কাছে এর মূল্য কিন্তু অনেক বেশী, তার কারণ বার্ট্রাণ্ড রাসেলীয় এই পদ্ধতি ভারতের মহামানব গান্ধিজীর প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের পুনরাবৃত্তি। গান্ধীয় টেকনিকে সত্যাগ্রহের এই নবপর্যায়ের পরিণতি দর্শনের জন্য ভারতের সকল মানুষ উৎকন্ঠ আগ্রহে অপেক্ষমান। বৃটিশ জনগণ কর্তৃক আয়োজিত নিরস্ত্রীকরণের এই জন-সত্যাগ্রহের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলা হয় অলডারমেন্টেনের দ্বারা সরকারকে চাপ না দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এম-পি-দের মনোভঙ্গীর রূপান্তরেই সত্যাগ্রহীদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই আবেদন যুক্তির চেয়ে ভাবাবেগের প্রতিই অধিকতর প্রযোজ্য। একক সত্যাগ্রহের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণবিক নীতি-পরিবর্তনের এই প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল আর কোনো অস্ত্রের সন্ধানলাভ করেননি। বহু দেশের নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে আবেদন জানিয়ে ফললাভ করেননি, ব্যক্তিগত শহীদত্বের এই প্রচেষ্টা দ্বারা বার্ট্রাণ্ড রাসেল পরমাণবিক নীতির উপর একটা নৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই সত্যাগ্রহ শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির প্রতি যে প্রতিবাদ তা নয়, যাঁরা শুধুমাত্র আবেদন করেই শ্রান্ত হয়েছেন তাঁদের প্রতিও এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ যেন সমগ্র বিশ্বের অঙ্গন-তলে দাঁড়িয়ে এক নব্বুই বছরের শীর্ণ বৃদ্ধ ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করছেন:

"হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ
তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার
কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ
তোমার আমার মাঝে এক।।"

রবীন্দ্রনাথ যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে উপস্থিত থাকতেন তাহলে হয়ত বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই একক সংগ্রামের সহচর হতে পারতেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তাঁর সাহিত্য-চিন্তা বিশ্বের সাহিত্য ও দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে। নব্বুই বছর বয়সে মানবজাতির কল্যাণের জন্য বৃদ্ধের এই সংগ্রাম নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সাহিত্য-রসিক মানুষের পক্ষে বার্ট্রাণ্ড রাসেল বিশেষ গর্ব ও শ্রদ্ধার বস্তু। মানবজাতির এই সংকটে যে একটি কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে এ যুগের মানুষের এই সান্ত্বনা। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের জীবন দীর্ঘতর হোক।

বিবিধার্থ অভিধান—সুধীরচন্দ্র সরকার। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম: ৬·৫০ নঃ পঃ।

ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার 'পৌরাণিক অভিধান' সম্পাদনা করে আমাদের বহুদিনের একটি অভাব মিটিয়ে খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি আলোচ্য অভিধান সংকলন ক'রে অন্য একটি দিকে পথিকৃতের গৌরব অর্জন করেছেন। সাধারণত অভিধান বলতে যা বোঝায়, বর্তমান সংকলন ঠিক সে জাতের নয়। প্রায় পনের হাজার শব্দসম্বলিত এই অভিধানকে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং নিত্য-ব্যবহার্য 'রেফারেন্স বুক' বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলা ইডিয়ম ও ফ্রেজ, প্রবাদ ও প্রবচন, বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ, রাজনৈতিক, সাংবাদিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, যুদ্ধোত্তর নতুন বাংলা শব্দ, ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দ, অশিষ্ট বা স্ল্যাং শব্দ ইত্যাদি আরো বহু বিচিত্র পরিচ্ছেদ সংযোজিত থাকায় বইখানি বাংলা ভাষা চর্চার পক্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায় বলে স্বীকৃত হবে। তাছাড়া এতে বৃহৎবাচক ও ক্ষুদ্রবাচক শব্দ, সমষ্টিগত জিনিসের নাম, দ্বিত্বমূলক সহচর শব্দ, বিপরীতার্থক বা প্রতিচর শব্দ, উপচর বা বিকার শব্দ, বিপরীতার্থ যুগ্মশব্দ প্রভৃতি থাকায় অভিধানখানি উচ্চতর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষেও প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে এমন একখানি ছোটো আকারের অভিধানের কথা কল্পনাই করা যায়নি, যেখানে একই সঙ্গে এতগুলি বিষয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। সেই অসম্ভব-প্রায় দায়িত্বপূর্ণ কাজটিই সুসম্পাদিত করেছেন সংকলক। তাঁর শব্দ-নির্বাচনে সর্বদাই তিনি চোখ রেখেছেন সাধারণ পাঠকের প্রয়োজনের দিকে। এবং একাজ কেবল আয়াসসাধ্যই নয়, এর জন্যে যে ধরণের উঁচু জাতের উপযোগিতা-বোধ দরকার তাও শ্রীযুক্ত সরকারের মধ্যে বিশেষভাবে বর্তমান। একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাশীল গবেষকের ধৈর্য নিয়ে তিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় যে রকম একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করেছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। একই সঙ্গে সুবিস্তৃত অভিজ্ঞতা এবং গঠনমূলক কল্পনাশক্তির সাহায্য ছাড়া এ ধরণের কাজ কারো পক্ষেই করা সম্ভব নয়। এবং সব থেকে আনন্দের কথা, শব্দ-নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে পরিণত প্রবীণ বয়সেও শ্রীযুক্ত সরকার যে রকম গোঁড়ামিহীন খোলা মনের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তরুণতম আধুনিক পাঠকও তৃপ্তিবোধ করবেন।

বাস্তবিক মাতৃভাষার প্রতি তিনি যে পরিমাণ সেবার মনোভাব নিয়ে এ কাজে

ব্রতী হয়েছেন. আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাংলার পাঠক-সমাজ তার যোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হবেন না এবং ভবিষ্যতের সংকলকগণও একে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে উপকৃত হবেন।

বইখানির ছাপা-বাঁধাই অতি চমৎকার।

উপন্যাস পাঠের ভূমিকা— শিশির চট্টোপাধ্যায়। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম পাঁচ টাকা।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া কালে পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ, চরিত্র, বাচনভঙ্গী ও বর্ণনা-কৌশল, চেতনাপ্রবাহ, ভাষা, উপন্যাসে কালের সমস্যা, সম্প্রতিক বাঙলা উপন্যাস প্রসঙ্গ, উপন্যাসে আঙ্গিকের সমস্যা তথ্য ও যুক্তি সহযোগে আলোচিত হয়েছে গ্রন্থখানিতে। বাঙলা উপন্যাসের জন্ম বিদেশী সাহিত্য প্রভাবে। বর্তমানে সে প্রভাব প্রবল। বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাস আলোচনাকালে বিদেশী সাহিত্য এসে পড়ে স্বাভাবিকভাবে। গ্রন্থকারও সে পথে অগ্রসর হয়েছেন। বর্তমান যুগের সংশয়সম্পন্ন চিন্তাচেতনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে উপন্যাসের গতিবেগ কোন খাতে প্রবাহিত তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। আধুনিক য়ুরোপীয় সমালোচক ও উপন্যাসিকদের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। যে কোন পাঠক সেগুলির উপযোগিতা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের বক্তব্য বিতর্ক সাপেক্ষ। যে সমস্ত উপন্যাসিকের স্থান দেওয়া হয়েছে তাঁদের অনেকেই ভবিষ্যতের ইতিহাসে উল্লিখিত থাকবেন কিনা সন্দেহ। এমন কি কয়েকটি গ্রন্থ-বিচারে গ্রন্থকার তাঁর প্রথম পর্যায়ের গভীর সত্যধর্মী আলোচনা-পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন বলে মনে হয়। সব থেকে বিস্ময়ের বিষয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সমরেশ বসুর কোন উল্লেখ নেই। বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাসে এঁদের কেউ-ই উপেক্ষণীয় নন। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বক্তব্য অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সত্য। গ্রন্থখানিতে উপন্যাস প্রসঙ্গে যে সমস্ত বক্তব্য রয়েছে তা যে কোন শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে চিন্তার খোরাক জোগাবে। বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে। মুদ্রণ, প্রচ্ছদ এবং বাঁধাই প্রকাশকের রুচিশীল মনের পরিচায়ক।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে—ফিলিপ ইয়ং: অনুবাদক : রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা—বারো। দাম—দেড় টাকা।

আমেরিকার সাহিত্য বিশ্বের কনিষ্ঠতম সাহিত্যগুলির অন্যতম। যুদ্ধোত্তর কালের মার্কিনী সাহিত্যিকেরা স্বদেশে ও বিদেশে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে পাঠকদের মধ্যে যে কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে অন্যতম। এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য হ'ল আমেরিকার সেই অনন্য ঔপন্যাসিক সম্পর্কে পাঠকদের জাগ্রত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করা।

হেমিংওয়ের সামগ্রিক আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এখানে লিপিবদ্ধ। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ইন আওয়ার টাইম' থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিখ্যাত 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী' পর্যন্ত লেখকের পূর্বাপর জীবনের সাহিত্যিক আলোচনা অত্যন্ত সরল ও মনোজ্ঞভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও আছে হেমিংওয়ের একটি প্রামাণিক জীবনালেখ্য। প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই স্বকীয় অভিজ্ঞতার কাছে সমর্পিত। হেমিংওয়ের অভিজ্ঞতা ছিল জীবনব্যাপক। আর এই অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রণোদিত কল্পনা তাঁকে যে জগৎ সৃষ্টি করিয়েছে,—গল্পের 'নিক' চরিত্রের ধারবাহিকতা এবং ফ্রেডারিক হেনরি'র যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত, বেদনার্ত জীবনের মধ্যে তা' আপনার মূর্তিতে অঙ্কুরিত। জলের সঙ্গে মাছের যে সম্পর্ক; হেমিংওয়ের সঙ্গে যুদ্ধের সেই সম্বন্ধ। সৈনিক-জীবনের সশস্ত্র সংঘাতে তাঁর বেঁচে থাকা। কামানের গোলা বর্ষণের নীচে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা মানুষ দেয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখে এই রক্তলাল জগৎ।

হেমিংওয়ের জীবনী এবং তার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যকে জানতে হ'লে এই বই অবশ্যপাঠ্য। শ্রীবিদ্যুৎ চক্রবর্তীর আঁকা প্রচ্ছদটি সুন্দর।

অযাত্রায় জয়যাত্রা (ভ্রমণ কাহিনী)— বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—বাক্-সাহিত্য।। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য চার টাকা।

প্রবীণ রসসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ রসাত্মক গল্প এবং উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত হলেও আর একজাতীয় রচনায় তাঁর অতুলনীয় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা ভ্রমণ কাহিনী। 'দূরের হতে অদূরে' নামক গ্রন্থটি তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নানাবিধ সংলাপ এবং পরিচিত মানুষ এসেছে ভিড় করে চলচ্চিত্রের মত। লেখকের স্মৃতিচারণের ভঙ্গি অতিশয় মনোহর এবং সংযত। পত্রাকারে লিখিত 'অযাত্রার জয়যাত্রা' তাই নিছক ভ্রমণ-কাহিনী নয়, স্মৃতিচারণও নয়, জীবনের পটভূমিকায় অঙ্কিত কয়েকটি 'স্কেচ', অনেকটা তুর্গেনিভের বিচিত্র রচনার মত। এই জাতীয় রচনার অতি মন্থর গতিবেগ, পাঠককে একটু যে অস্থির করে তোলে সে কথা অস্বীকার করা যায় না, তবে আঙ্গিকের দিক থেকে তা ব্যাকরণসম্মত। বিভূতিভূষণের রচনার বৈশিষ্ট্য যে তার মধ্যে এক nostalgic মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, 'অযাত্রার জয়যাত্রায়' সেই বৈশিষ্ট্যের অভাব নেই। বিভূতিভূষণের পরিণত শিল্পমানসের পরিপূর্ণ পরিচয় 'অযাত্রার জয়যাত্রা'।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

বিশ্বভারতী পত্রিকা—(রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী উৎসব সমাপিত সংখ্যা)—সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭। দাম এক টাকা।

বিশ্বভারতী পত্রিকা বাংলার পাঠক সমাজে রবীন্দ্র চর্চার একটি শ্রেষ্ঠ বাহন হিসাবে সুপরিচিত। এই পত্রিকাটির আলোচ্য সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে আত্ম-

প্রকাশ করে বর্ষকালব্যাপী রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি উৎসব পালন করেছে। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ, যা ইতিপূর্বে কোনো বইয়ে সন্নিবিষ্ট হয়নি, প্রকাশ করে সম্পাদক মহাশয় একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। প্রবন্ধটির নাম হল—ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী। এছাড়া রয়েছে স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীবিনয় ঘোষ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপরিমল গোস্বামী প্রমুখ বিশিষ্ট প্রবন্ধকারদের লেখা রবীন্দ্রনাথের উপর আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্র, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের আলোকচিত্র এবং রবীন্দ্রসুহৃৎ কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও ডাক্তার নীলরতন সরকারের বিষয়ে প্রবন্ধ। এই শেষোক্ত খ্যাতিমান ব্যক্তিদ্বয়েরও জন্ম সাল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ। কাজেই তাঁদের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে সম্পাদক মহাশয় দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন সেটা তাঁর সদাজাগ্রত ঐতিহাচেতনারই পরিণাম। এই নিবন্ধ দুটি লিখেছেন শ্রীসুনীতি দেবী ও শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য রচনার মধ্যে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারকৃত একটি রবীন্দ্র সংগীতের স্বরলিপি, শ্রীভবতোষ দত্ত লিখিত 'বিংশশতাব্দীর কাব্য সূচনা' প্রবন্ধ এবং শ্রীহরপ্রসাদ মিত্রের পুস্তক সমালোচনা উল্লেখযোগ্য।

দৃষ্টি-শক্তি—বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস সংখ্যা। সম্পাদক : নীহারকুমার মুন্সী ও মুরলীধর সেনগুপ্ত। ৯৪ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২। দাম ২৫ নয়া পয়সা।

বঙ্গীয় অন্ধতা নিবারণী সমিতির মুখপত্র। পৃথিবীর মোট অন্ধের এক-পঞ্চমাংশের বাস ভারতবর্ষে। এই সমস্যাজড়িত দেশ থেকে অন্ধতা নিবারণের জন্য চিকিৎসক ও উৎসাহী নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সমিতিটি গড়ে উঠেছে। নানাবিধ পরিসংখ্যানের সাহায্যে তাদের বিগত বৎসরের কার্যবিবরণী তুলে ধরেছেন। এবং দেখিয়েছেন এ কাজে জনগণেরও সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। কয়েকটি গল্প এবং কবিতা এই সংখ্যায় সংকলিত হয়েছে। মিল্টনের 'অন হিজ ব্লাইন্ডনেস' নামক কবিতার নিপুণ ও সুন্দর অনুবাদ করেছেন শ্রীবিমল রায়চৌধুরী। এঁদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংকলন—সংস্কৃতি-চক্র যাদবপুর। দাম এক টাকা।

সংস্কৃতি চক্রের একাদশ-বর্ষ বার্ষিক সংকলনটি এবার রবীন্দ্র সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন অতুল গুপ্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রলাল সাহা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিনয় ঘোষ, নীতা চক্রবর্তী, অনিন্দ্য বসু প্রভৃতি। সংকলনে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির প্রতিলিপি ও একটি আত্ম-প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রিতা দেবীর রচিত 'রবীন্দ্র জন্মশত-বার্ষিকী' বিষয়ক একাঙ্কিকা সংকলনে স্থান পেয়েছে। এই সঙ্গে একটি ইংরেজী বিভাগও আছে। এ বিভাগে হুমায়ুন কবীর, ভেরানাডি-কভা এবং দুশানজার্ভেতিলের তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলনটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। চেকশিল্পী সুগভিল্লি, সোভিয়েৎ শিল্পী আজগর (ভাস্কর্য) ও শিল্পী যামিনী রায়ের রবীন্দ্র প্রতিকৃতি সংকলনটির অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ।

দৃশ্যপট—সম্পাদক শিবেন চট্টোপাধ্যায় ও অমলেশ ভট্টাচার্য। পরিবেশক—গ্রন্থ জগৎ, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৫০ নঃ পঃ।

এ সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন হরপ্রসাদ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অনন্ত দাস। গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় অনূদিত ফাউস্টের অনুবাদ সুখপাঠ্য। আরও অনেকগুলি লেখা আছে।

প্রচ্ছদপট—সম্পাদক আশুতোষ চক্রবর্তী ৪৩/পি, হালদার বাগান লেন, কলকাতা—৪। দাম পঁচিশ নয়া পয়সা।

পচ্ছপটের এইটি ছোটগল্প-সংখ্যা। ছোটগল্পে নতুন রীতির ওপর আলোচনা করেছেন শ্যামল সেনগুপ্ত। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, ও পরিমল সাহার গল্প আছে। ডিলান টমাসের একটি গল্পের অনুবাদ করেছেন বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া কয়েকটি গ্রন্থ-সমালোচনাও আছে।

একাল—সম্পাদক দীপক সেন ও মলয় দাশগুপ্ত। পূর্ব পল্লী, ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত। দাম ২৫ নয়া পয়সা।

সাহিত্য-কলা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এ সংখ্যায় লিখেছেন ত্রিদিব-রঞ্জন মালাকার, প্রীতিবিকাশ রায়, অপর্ণা সেন, তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীপক সেন, বিশ্বনাথ রায়।

নান্দীকর

।। নতুন রেকর্ডিং থিয়েটার ।।

গত শুক্রবার এক উৎসবানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি রেকর্ডিং থিয়েটারের উদ্বোধন হয়েছে। তাদের দীর্ঘদিনের অভিলাষ অবশেষে কার্যে রূপায়িত হল। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সমবায় ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পৌরপ্রধান শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার।

মাননীয় অতিথিদের স্বাগত জানান টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর পক্ষ থেকে কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর বিবৃতিতে বলেন যে, এক নিদারুণ আর্থিক অনটন সত্ত্বেও কর্মীদের আন্তরিক উৎসাহের জন্যই স্টুডিওটি এই নতুন রূপ লাভ করতে পেরেছে। তিনি এ কথাও বলেন যে, সরকার যেন এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করেন।

"একদিন নিউ থিয়েটার্স ছিল সারা ভারতে শ্রেষ্ঠ হিন্দী চিত্র নির্মাণের পীঠস্থান। কিন্তু আজ সেই স্থান অধিকার করেছে বোম্বাই ও মাদ্রাজ। যদিচ এ-দুটি অঞ্চলের কোনটিই হিন্দী ভাষাভাষী নয়।" একথা একটি চিত্তাকর্ষক ভাষণের মধ্যে তুলে ধরেন প্রধান অতিথি শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ। তিনি আরও বলেন যে, কলকাতার স্টুডিওগুলিকে আবার তাদের পূর্ব গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করা কর্তব্য। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি একাজে অগ্রসর হয়ে আসেন, তাহলে সরকার যে পিছিয়ে থাকবে না তিনি একথা যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রকাশ করেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন যে, "চিত্রজগতে অনেক সময় একটা বোহিমেনী ভাব লক্ষ্য করা যায়। সেটা যেমন আশঙ্কার, তেমনি আশারও। কারণ এমনিধারা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই বৃহৎ কর্ম রূপায়িত হয়ে ওঠে।" তিনি আরও বলেন যে, সরকারকে নানাবিধ সমস্যা নিয়ে বিব্রত থাকতে হয়েছে এতদিন। ফলে তাঁরা চিত্রশিল্পের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দিতে পারেননি। চিত্রশিল্প-জগতে যে দুর্দিন দেখা দিয়েছে তা তাঁদের দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সরকার দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছেন।

শ্রীদেবকীকুমার বসু তাঁর ভাষণে সরকারী সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন বলে গুরুত্ব আরোপ করেন।

সমাগত অতিথিদের ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে শ্রীসুশীল মজুমদার বলেন যে, মানুষের জীবনধারণের অন্যতম সহায় হল আনন্দ। সেই আনন্দের উপকরণ যাতে উপেক্ষিত না হয় সেদিকে সরকারের দৃষ্টিদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে শ্রীসত্যেন চট্টোপাধ্যায় ধ্বনি-গ্রহণের বিবিধ পদ্ধতি অতিথিদের সামনে ব্যাখ্যা করেন।

চিত্র সমালোচনা

অতল জলের আহ্বান ঃ

আর. ডি. বনশাল প্রযোজিত প্রতিভা বসুর কাহিনী "অতল জলের আহ্বানে"র চিত্ররূপ মুক্তিলাভ করল। পরিচালনা ও আলোকচিত্র-তত্ত্বাবধান অজয় কর। চিত্রনাট্য রচনা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

কাহিনীর নায়িকা সাবিত্রী পাড়াগাঁয়ের এক দুরন্ত মেয়ে। একটু ছিট-

ষ্টার থিয়েটারের চলন্তি নাটক "শেষাগ্নি"র তিনটি বিশিষ্ট চরিত্রে লিলি চক্রবর্তী (মাধুরী), আশীষকুমার (মানব) ও বাসবী নন্দী (দীপা)

মুক্তিপ্রাপ্ত 'আর-ডি-বি'র "অতল জলের আহ্বান" চিত্রের একটি দৃশ্যে তন্দ্রা বর্মণ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রস্ত। তাই তার আগে তার ছোট বোন গীতার বিবাহ স্থির হয়। আশীর্বাদের দিন সাবিত্রীকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেও সে ঠিক সময়টিতে এসে আশীর্বাদের আয়োজন সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ফলে তার বিধবা মা তাকে বাড়ী থেকে বার করে দেন। সাবিত্রী পথ চলতে শুরু করে। এই দৃশ্যটি অনেকক্ষণ ধরে দেখান হয়। তারপর কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। তখন প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে ছবির নাম এবং শিল্পীদের পরিচয় দেখতে পাই। এরপর দেখা যায় কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী সীমন্ত চৌধুরীর সঙ্গে শিলিগুড়ির ওয়েটিং রুমে তাঁর প্রাক্তন প্রণয়িনী অনুরাধা দেবীর বাইশ বছর পরে সাক্ষাৎ। তাঁদের কথায় জানা যে সীমন্ত চৌধুরী ব্রাহ্ম হয়েছিলেন বলে তার স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করেন। কিন্তু সীমন্ত চৌধুরী যখন অনুরাধা দেবীকে বিবাহ করতে উদ্যত হয় তখন তাঁর স্ত্রী অনুরাধা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সে বিবাহ বন্ধ করেন। সীমন্ত চৌধুরী তাঁর জীবনের এই অপূর্ণতাকে তাঁর বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার ছেলে জয়ন্তর সঙ্গে অনুরাধার কনভেন্টে পড়া মেয়ে লোটির সঙ্গে বিবাহ দিয়ে পূর্ণ করতে চান। জয়ন্ত মাকে কোনদিন দেখেনি বলে ক্ষুব্ধ এবং বিবাহে অনিচ্ছুক। বাবার ব্যাগে অনুরাধা দেবীর ছবি দেখে তার মনে প্রশ্ন জাগে। অনুরাধা দেবীর সংস্পর্শে এসে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁকে সে মা বলে মেনে নেয়। এবং লোটিকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। এদিকে সাবিত্রী জয়ন্ত-দের কারখানার গাড়ি চাপা পড়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। সুস্থ হবার পর তার পূর্বস্মৃতি লোপ হওয়ার দরুণ তাকে বাড়ি পাঠান সম্ভব হয় না। জয়ন্তের ভৃত্য-রাজতন্ত্রে শাসিত গৃহে সে আশ্রয় পায়। ক্রমে সে জয়ন্তের সুখ সুবিধের দিকে নজর দিতে আরম্ভ করে। ভৃত্যদেরও স্ববশে আনে। সাবিত্রীর রান্না খেয়ে জয়ন্ত লোটিদের বাড়িতে খাওয়া ছেড়ে দেয়। ইতিমধ্যে পারিবারিক চিকিৎসক পরামর্শ দেন যে এভাবে অজ্ঞাতকুলশীল মেয়েকে বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। জয়ন্ত তখন ধৈর্য হারিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে। সাবিত্রী রাত্রে করুণ একটি গান গেয়ে পরদিন ভোরে কাউকে না জানিয়ে গৃহত্যাগ করে। নিজের ঘরে একটি পুঁটলীতে বাজার খরচ থেকে বাঁচান তিনশ টাকা এবং জয়ন্তর প্রতি এক কৃতজ্ঞতাসূচক চিঠি রেখে যায়। জয়ন্তর তখন সব ফাঁকা লাগে। তাই আপিসের কাজের ছুতোয় সে কলকাতা ত্যাগ করে। অনুরোধা দেবী সমস্ত জানতে পেরে সাবিত্রীকে খুঁজে বার

রাজেন তরফদার পরিচালিত "অগ্নিশিখা" চিত্রের একটি দৃশ্যে বসন্ত চৌধুরী ও কণিকা মজুমদার

রেন। জয়ন্তর বাবা দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে জয়ন্তকে ব্ল্যাকমেল করে জানান। জয়ন্ত তার মানসিক দুরবস্থার কথা অনুরাধা দেবীর কাছে খুলে বলে তাঁর কাছে দেওয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি চায়। অনুরাধা দেবী উঠে গিয়ে সাবিত্রীকে পাঠিয়ে দেন। তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ।

• কাহিনী ভালো। চিত্র-গ্রহণ ও শব্দ-গ্রহণ সুন্দর। পরিচালনায় শ্রীঅজয় কর তাঁর গৌরব অম্লান রেখেছেন। সীমন্তের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, জয়ন্তের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুরাধার ভূমিকায় ছায়া দেবী, লোটির ভূমিকায় রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাবিত্রীর ভূমিকায় তন্দ্রা বর্মণ সাধ্যমত অভিনয় করেছেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থানে স্থানে হাসির খোরাক যুগিয়েছেন যাতে ছবিটা একঘেয়ে না হয়ে যায়। ছবিটি জনপ্রিয় হবে আশা করা যায়।

আশিক ।। পরিচালনা এবং সম্পাদনা ঃ ষি কে· শঙ্কু মুখার্জি। রুবেন-দুবে প্রোডাকসন্স।। সঙ্গীত শংকর-জয়কিশন।। ভূমিকা ঃ রাজকাপুর, পদ্মিনী, নন্দা, লীলা চিটনীস, অভি ভট্টাচার্য, মুকরী প্রমুখ।

আশিক শব্দের অর্থ প্রেমিক। কাহিনীর নায়ক গোপাল সম্ভবতঃ বর্তমান চিত্রের প্রেমিক। ছবির প্রথম-দিকে সে সঙ্গীত প্রেমিক। কেবল গান নিয়ে সে থাকতে ভালবাসে, বাবার জমিদারী কাজে মন দেয় না, কেবল ঘুরে বেড়ায় আর গান গায়। বাবা বকেন-বকেন, কানে তোলে না। গোপালের দাদা প্রতাপের সঙ্গে পিতৃবন্ধু ঠাকুরদাসের মেয়ে রেণুকার বিয়ের প্রস্তাব ওঠে। প্রতাপ রেণুকে একটা মালা উপহার দিতে গোপালের সাহায্য চায়। গোপাল মালা দিতে গিয়ে রেণুর অনুরোধে (!) তাকে মালা পরিয়ে দেয় নিজের হাতে। (চিত্রনাট্যে কন্দর্পদেব প্রবেশ করেন!) কিন্তু রেণুকা যখন শুনল তার বিয়ে হবার কথা গোপালের সঙ্গে নয়, তার দাদা প্রতাপের সঙ্গে, তখন সে বাড়ি থেকে মন্দিরে যাবার নাম করে গোপালের কাছে এল। গোপাল সেই মন্দিরে প্রণাম সেরে বাড়ি ফিরছিল। ঝড় জল আরম্ভ হল রাস্তায়। ওরা দুজন আশ্রয় নিল একটা পাহাড়ের গুহায়। সেখানে মনের কথা জানাল রেণুকা। গোপাল অনেক বোঝানোর পরও রেণুকা তার সংকল্পে অটল। এদিকে দেরী দেখে প্রতাপ

গোপালের খোঁজে সে গুহার মুখে এসে সব কথা শুনে তার সংকল্পও ঠিক করে নিয়েছে।

পাকা দেখার দিন মাতালের ভাণ করে আসরে ঢুকল প্রতাপ। ফলে তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হল। প্রতাপের বাবা গোপালের সঙ্গেই বিয়ে ঠিক করলেন রেণুকার। এদিকে রেণুকার বাড়িতে রেণুকার এক বান্ধবী প্রীতি আসে (সেই সঙ্গে প্রেমের ত্রিভুজটিও)। প্রীতিকে পেয়ে মেতে ওঠে গোপাল। গ্রামে কানাকানি হয়। অবশেষে জোর করে ছেলের বিয়ে দিয়ে দেন বাবা। প্রীতির মোহ কিন্তু যায় না তবু গোপালের মন থেকে। প্রীতির নাচ গান তাকে যেন আঁকড়ে ধরে থাকে। রেণুকা সব দেখে দেখে একদিন ভেঙ্গে পড়ে ক্ষোভে। প্রীতি সরে যাবার চেষ্টা করে গোপালের জীবন থেকে। ইতিমধ্যে রেণুকার একটি মেয়ে হয়। কিন্তু স্বামীর অবহেলা সইতে না পেরে পাহাড়ের ওপর থেকে ঝর্ণায় লাফিয়ে আত্মহত্যা করে রেণুকা। গোপাল বাড়ি থেকে চলে যায় এবং 'দেবদাসত্ব' অর্জন করে। রেণুকা কিন্তু জলে পড়েও মরেনি।

কাহিনীতে প্রায়-বিস্মৃত প্রতাপ হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে ভাইয়ের বৌকে উদ্ধার করে। গোপাল এদিকে প্রীতির আশ্রয়ে থেকে গান গেয়ে, 'সঙ্গীত ভারতী' উপাধি পেয়ে বিখ্যাত। তারপর...... তারপর অনেক ব্যাপারের পর ত্রিভুজের সবকটি চরিত্রকে অক্ষত রেখে পরিচালক রেণুকা-গোপালের মিলন ঘটিয়েছেন। ছবির মধ্যে এবং শেষে গোপাল দুজনের প্রেমিক, সঙ্গীতের এবং প্রীতির। একেকবার একেকজনের কখনো বা এক সঙ্গে দুজনের। ফুটবল খেলায় যেমন দক্ষ খেলোয়াড়রা স্থান পরিবর্তন করে খেলে খেলাকে উজ্জীবিত করবার চেষ্টা করেন, বর্তমান চিত্রের খল নায়িকা চরিত্রটিও তেমনি অনবরত চরিত্র পরিবর্তন করেছে। একেক সময় মনে হয়েছে রেণুকাই ঈর্ষাকাতর খল নায়িকা, প্রীতিই আসল নায়িকা, আবার প্রচলিত অর্থে প্রীতিই খল নায়িকা; কারণ সে বিবাহিত গোপালের প্রেমিকা! রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক শ্রীহৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় এদিক দিয়ে কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। আশিকের গান ভাল, নাচ ভাল, ফটোগ্রাফিও। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন অভি ভট্টাচার্য এবং নন্দা। মুকরী খুব হাসিয়েছেন, তিনি দৈর্ঘ্যে আরেকটু কম হলে আরো হাসাতে পারতেন।

"তরণী সেন বধ" চিত্রে গুরুদাস ও সন্ধ্যা

আশিক সুদীর্ঘ ছবি।

॥ অগ্নিশিখা ॥

উত্তরা, উজ্জ্বলা, পূরবী এবং অন্যান্য আরও নয়টি চিত্রগৃহে আজ মুক্তিলাভ করছে অগ্নিশিখা নামক বহু-প্রতীক্ষিত চিত্রটি। মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের 'একটি প্রেমের জন্ম' নামক কাহিনী অবলম্বনে রূপায়িত চিত্রটি পরিচালনা করেছেন 'গঙ্গা' খ্যাত রাজেন তরফদার। নাট্য-গুণান্বিত এই গভীর অনুভূতি ও আবেগপ্রবণ চিত্রের নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কণিকা মজুমদার ও বসন্ত চৌধুরী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন অনুপকুমার, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, জ্ঞানেশ মুখার্জি, দিজু ভাওয়াল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, মঞ্জুলা, জয়শ্রী সেন, ছায়া, সীতা মুখার্জি এবং নবাগতা শর্মীষ্ঠা। রবীন

চ্যাটার্জি'র সংগীত পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেছেন হেমন্ত মুখার্জি, সন্ধ্যা মুখার্জি, প্রতিমা, ইলা, তরুণ, শ্যামল, মৃণাল প্রভৃতি। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড চিত্রটির পরিবেশক।

॥ আরতি ॥

• রাজশ্রী প্রোডাকসন্সের 'আরতি' চিত্রটি আজ মুক্তিলাভ করছে। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন শ্রীফণি মজুমদার। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন রোশন। চরিত্রচিত্রণে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে আছেন অশোককুমার, মীনাকুমারী, প্রদীপকুমার, শশীকলা প্রভৃতি। ছবিটি প্রযোজনা করছেন দ্বিজ। হিন্দ, গণেশ, কালিকা, মেনকা, দর্পণা, প্রভৃতি চিত্রগৃহে ছবিটি দেখান হবে।

॥ তরনীসেন বধ ॥

সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের বিপুল অর্থ ব্যয়ে নির্মিত "তরণীসেন বধ" অদ্য শুভমুক্তি লাভ করবে বসুশ্রী, বীণা, প্রাচী, সুরশ্রী ও অন্যান্য চিত্রগৃহে।

বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন সন্ধ্যারাণী (সরমা), সুনন্দাদেবী (মন্দোদরী), নীতীশ মুখোপাধ্যায় (রাবণ), হরেন্দ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বিভীষণ), নৃপেন্দ্রপদ বসু (কালনেমী), নবাগতা ইন্দ্রাণী (সীতা), প্রবীর (রাম), শোভেন চট্টোঃ (লক্ষ্মণ), সুনীত মুখোপাধ্যায় (মহাবীর), পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সুগ্রীব) এবং (নাম ভূমিকায়) মাষ্টার তিলক। এঁরা ছাড়া আছেন আরও সহস্রাধিক শিল্পী। কলা-কুশলী বিভাগে আছেন কাহিনী-চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনায়—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়। সুরসৃষ্টিতে অনিল বাগচী, গীত রচনায় শ্যামল গুপ্ত, সম্পাদনায় অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, চিত্রগ্রহণে প্রভাত ঘোষ, শব্দ-গ্রহণে জে, ডি ইরানী, শিল্প-নির্দেশে বটু সেন প্রভৃতি।

ছবিখানি পরিবেশক ভবতারিনী পিকচার্স এবং রিলিজ করছেন রাগরূপা প্রাইভেট লিমিটেড।

নাট্যকার সংঘ ঃ

মঞ্চযুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার পুরস্কার দেওয়ার জন্য নাট্যকার সংঘ যে বিচারক-মণ্ডলী মনোনীত করেছেন, গত ১২ই মে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় ৩০২, আপার সারকুলার রোডে তাঁদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনান্তে স্থির হয়।

ক। বাংলাভাষায় ১৯৬১ সালে রচিত এবং বা প্রকাশিত যে কোন নাটক (সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ইত্যাদি) প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া চলবে। অনুদিত, ভাব বা ছায়া অবলম্বনে রচিত নাটকও গ্রহণ করা হবে। তবে অনুবাদ, ভাব বা ছায়া অবলম্বনের জন্য যথাযথ স্বীকৃতি থাকার প্রয়োজন হবে। যে সব নাটকে এইরূপ স্বীকৃতি থাকবে না অথচ যা অনুদিত, ভাব বা ছায়া অবলম্বনে রচিত বলে বিচারকগণ মনে করবেন তা প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল করা হবে।

খ। যে কোন ব্যক্তি অর্থাৎ নাট্যকার স্বয়ং, প্রকাশক বা তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি এক বা একাধিক নাটক পাঠাতে পারেন। প্রত্যেক নাটকের জন্য ধার্যকৃত প্রবেশিকা ৫্ না পেলে নাটক বিচারের জন্য দেওয়া হবে না। প্রত্যেক নাটক দুই কপি করে পেলে ভাল হয়। ফলাফল ঘোষণার পর এক কপি নাট্যকারকে ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু দুই
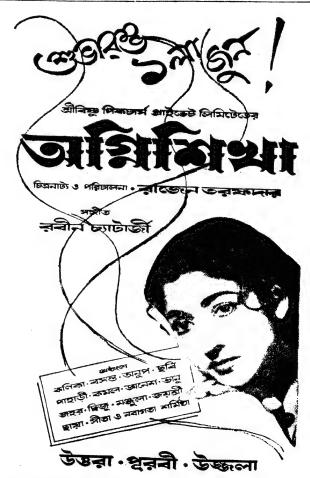
আরতি চিত্রে মীনা কুমারী

কপি না পেলে কোন নাটক ফেরত দেওয়া যাবে না।

গ। নাটক পাঠাবার শেষ তারিখ—৩০শে জন, ১৯৬২। সম্পাদক, নাট্যকার সংঘ, ৩০২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯ এই ঠিকানায় নাটক এবং প্রবেশিকা পাঠাতে হবে। ১৯৬৩ সালের প্রারম্ভে বিচারের ফল ঘোষণা করা হবে এবং যে নাটকটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে তার নাট্যকারকে মঞ্চযুগ কর্তৃক প্রদত্ত ১০০০্ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

নিয়মিত অভিনয় প্রয়াস সংস্থা :

ঋত্বিক ও নট-নাটাম্ সংগঠিত হাওড়ায় নিয়মিত অভিনয়-প্রয়াস সংস্থার ২য় পর্যায়ের অভিনয় গত ২০শে মে সুসম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এই সংস্থা আগামী মাসে ৩য় পর্যায়ের অভিনয় করবে হাওড়া টাউন হলে। এ পর্যন্ত এই সংস্থা, ওরা কাজ করে; গুপ্তধন; করুণা কোরো না, সংসার সীমান্তে, ব্যাণ্ডমাণ্টার প্রভৃতি নাটক অভিনয় করেছে। নাট্য পরিচালনায় ছিলেন শ্রীজগমোহন মজুমদার ও অরুণ মুখোপাধ্যায়।

বৈতানিকের 'মুক্তধারা' :

আগামী রবিবার ৩রা জুন সকাল দশটায় রক্সি সিনেমাতে বৈতানিকের শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' অভিনয় করবেন। পরিচালনা, সঙ্গীত ও শিল্প-নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে প্রফুল্ল ভোস, জয়দেব বেজ, সুধাংশু ঘোষ।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা :

গেল ২৩এ মে ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেণ্টারে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা ন্যাশনাল ফিল্ম বোর্ড অব কানাডা এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কতকগুলি ছোট ছ দেখাবার ব্যবস্থা করেন। "ওয়ার্লড এ মার্শ" হচ্ছে স্থল এবং জ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের একটি বিস্ময় রঙীন ছবি। ছবিটি আজ পর্যন্ত আ পুরস্কার পেয়েছে। "দি কলার লাইফ" আর একটি উপভোগ্য ছবি। পরেই নরউইজান ব্যালে অভি "ম্যাজিক ফিড্ল্" এবং মানু আকাশচারী হবার ইতিহাস সংব "দি ফ্লাইং ডেন"—এই দুটি স্ক্যা নেভিয়ান ছবি দেখানো হয়। সব শে আবার ন্যাশনাল ফিল্ম বোর্ড অব কান প্রযোজিত এবং সেই বিস্ময়কর নিরীক্ষক নর্মাণ ম্যাক্লারেন পরিচা "চেয়ারি টেল" ও "লাইনস্ হ জণ্টাল" ছবি দু'খানি দেখানো একটি ছেলে এবং একটি চেয়ার চেয়ার, কথা কয় না বটে, কিন্তু ন'ড়ে দুষ্টুমি, মান, অভিমান এবং ভা বাসাকে প্রকাশ করে, এমন চেয়ার সুন্দর একটি গল্প হচ্ছে "চেয়ারি টে এই ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন রবিশ এবং চতুরলাল, মাত্র সেতার ও ত সাহায্যে। "লাইনস্ হরাইজণ্ট কয়েকটি অনুভূমিক সমান্তরাল রেখার কম্পনের সাহায্যে দর্শ একটি অসামান্য নৃত্যছন্দের অন জাগানোর চেষ্টা সুস্পষ্ট; এই ছবি রবিশঙ্করের সুরঝঙ্কার শোনা গে

বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্রপ্রদর্শনীর আ ক'রে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা চ

বিমল ঘোষ প্রোডাকসনের 'বধূ' চিত্রে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়

॥ একটি প্রামাণ্য চিত্র ॥

'ওয়েস্ট বেঙ্গল : এ প্যানোরামা নামক একটি প্রামাণ্য চিত্র লাইট হাউস মিনিয়েচার প্রেক্ষাগৃহে সাংবাদিকদের নিকট দেখান হয়। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন হরিসাধন দাশগুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার ক্রম-বিবর্তনের ধারা বর্ণনাই চিত্রটির মুখ্য বক্তব্য। দুই রীলের এই ছবিতে কলকাতার পত্তন থেকে সুরু করে আধুনিক শিল্প নগরীরূপে গড়ে ওঠার ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও কৃষি উন্নয়ন, তথ্য ও বৈচিত্র্যময়তার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন এই চিত্রটির চিত্রগ্রহণ করেন হরিসাধন দাশগুপ্তের

...র্শকদের রসবোধকে উন্নত স্তরে পৌঁছে ...চ্ছেন, এ-কথা অনস্বীকার্য।

নাট্য সংস্থা 'অনুশীলন সম্প্রদায়' :

...দের বহু প্রশংসিত নাটকদ্বয় ...েষ সংবাদ' ও কবিগুরুর ...বুলীওয়ালা' পুনরায় মঞ্চস্থ করার ...য়োজন করেছেন, যথাক্রমে আগামী ...ই জুন মঙ্গলবার এবং ৮ই জুন ...ক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্বরূপা মঞ্চে। ...তাজ আহমেদ খাঁর পরিচালনায় নাটক ...টিতে অংশ গ্রহণ করছেন সর্বশ্রী ...রেশ্বর সেন, চারুপ্রকাশ ঘোষ, মমতাজ ...হমেদ খাঁ, শ্রীমতী সীতা মুখার্জি, ...নিমা দাশগুপ্তা, শাশ্বতী রায়, বন্না ...স্বামী, ভারতী মুখার্জি ও সম্প্রদায়ের ...ন্যান্য শিল্পিবৃন্দ।

॥ কান চলচ্চিত্র উৎসব ॥

১৯৬২ সালের কান আন্তর্জাতিক ...লচ্চিত্র উৎসবে ব্রেজিলিয়ান চিত্র 'দি ...মিসড্ ওয়ার্ড' গোল্ডেন এ্যাওয়ার্ড ...রস্কার লাভ করেছে শ্রেষ্ঠ চিত্র ...সাবে। ইটালিয়ান ছবি 'ডিভোর্স' ...রস্কার পেয়েছে শ্রেষ্ঠ কমেডি চিত্র ...সাবে।

ক্যাথারীন হেপবার্ণ, রালফ রিচার্ড-...ন, জেমস রোবার্ডস ও ডীন স্টপওয়েল ...মেরিকান চিত্র 'লং ডেজ জার্নি ইনটু ...ইট'-এর চারটি মুখ্য ভূমিকায় উৎকৃষ্ট ...ভিনয়ের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। ...াছাড়া রিতা তুসিনগাম ও মারে মেলভিন ...টিশ চিত্র 'এ টেস্ট অফ হানি'তে ...ৎকৃষ্ট অভিনয়ের জন্য উক্ত পুরস্কার ...পেয়েছেন।

ভ্রাতা সম্প্রতি পরলোকগত হলেন, দাশগুপ্ত। তাঁর সার্থক ক্ষমতার পরিচয় ছবিটিতে জীবন্ত হয়ে ফুটে আছে।

"শিশু রংমহল"-এর জন্মোৎসব :

"শিশু রংমহল"-এর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ৬ই মে, রবিবার, সকাল ১০টায় নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে নাচ, গান, মূকাভিনয়ের এক আসর বসেছিল।

খিদিরপুর কবিতীর্থ সাংস্কৃতিক পরিষদ :

পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ গেল ৪ঠা ও ৫ই মে যে-অনুষ্ঠানসূচী রচনা করেছিলেন, তাতে সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসর, শিশু উৎসব, বিতর্কসভা প্রভৃতি ছাড়াও দুটি মঞ্চাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। ৪ঠা মে তারিখে শ্রীমঞ্চ অভিনীত ও প্রেমাংশু বসু পরিচালিত "র‍্যায়সা কা ত্যায়সা" এবং ৫ই মে তারিখে খিদিরপুর কবিতীর্থ সাংস্কৃতিক পরিষদ অভিনীত ও মণি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "ঘুম নেই" অভিনীত হয়।

হলিউড চিত্রে জননী চরিত্র :

সম্ভবতঃ ম্যাডোনার সেই আবহমান কালের ছবিটি হলিউড থেকে হারিয়ে গেছে। হয়ত তাই হাল আমলের কয়েকটি হলিউড-চিত্রের জননী চরিত্রকে মা বলে চিনতে কষ্ট হয়। ছবিগুলি দেখলে মনে হয় মা তাঁর ছেলে মেয়েদের জন্ম দিয়েছেন তাদের সঙ্গে শত্রুতা সাধন করবার জন্যেই শুধু। এই প্রসঙ্গে "স্প্লেন্ডার ইন দি গ্রাস," "লাইট ইন দি পিয়াজা", 'সেসান শেড', 'অল ফল ডাউন' এবং 'ফাইভ ফিঙ্গার এক্সারসাইজ" প্রমুখ ছবিগুলির মাতৃচরিত্র বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। উপরোক্ত ছবিগুলির প্রায় সবকটি জননী চরিত্রই বুদ্ধিরহিত একদেশদর্শিতার চরম নিদর্শন। এবং তাঁদের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সন্তানরা। উপরোক্ত ছবিসমূহে পিতারাও এমন দুর্বলরূপে উপস্থিত যে প্রায়োন্মাদ মার কবল থেকে ছেলেমেয়েদের রক্ষা করবার শক্তিও তাঁদের নেই, এমন কি স্ত্রীর বিরূদ্ধে তাঁরা নিজেরাও বিপর্যস্ত।

দৃষ্টান্তস্বরূপে জন ফ্রাংকেন হাইমারের 'অল ফল ডাউন' চিত্রটির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। জেমস লিও হারলিহির উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি তোলা। বিশৃঙ্খল, ছিচ'কাঁদুনে মার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এ্যাঞ্জেলা ল্যান্সবেরী। এই চিত্রে তিনি, দুটী ছেলের মা এবং একটি বিশৃঙ্খল বাড়ির কর্ত্রী। ছোটছেলের চেয়ে বড়ছেলের প্রতি তাঁর আসক্তি বেশী—মাত্রাতিরিক্ত বললেও অতিকথন হয় না। মার আদরের আতিশয্যে উদ্ভ্রান্ত বড়ছেলে স্নেহাপ্লুত হবার পরিবর্তে সমগ্র নারীজাতির প্রতিই বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে। তার সংস্পর্শে যে সমস্ত মেয়েরা উগ্র কামনা তাড়িত হয়ে এসেছে প্রত্যেককেই সে নির্মমভাবে ঠকিয়ে যায়। ফলে তার এক প্রণয়িনী (অভিনয় করেছেন এভা মেরি সেন্ট) শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাও করে বসে। ছেলেটির বাবা (কার্ল মালডেন) হল গোবেচারী মদ্যপ সংসারে সে শুধু তৃণের মত ভেসে থাকে। ছেলেকে বলে 'বুনো গণ্ডার'। কিন্তু এই 'বুনো গণ্ডার' চরিত্রের সঙ্গে আধুনিক মার্কিণ যুবকদের পক্ষে একাত্মতাবোধ করা খুবেই স্বাভাবিক এবং রোমাণ্টিক মেয়েরাও চরিত্রটির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তার মাকেই দায়ী করবে সমস্ত অঘটনের জন্যে।

"ফাইভ ফিঙ্গার এক্সারসাইজ" ছবির জননী চরিত্র আরেকটি অস্বাভাবিক মার ছবি। রোজালিণ্ড রাসেল এই ছবির মার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ফাইভ ফিঙ্গার এক্সারসাইজের মা, প্রবঞ্চনার, স্বার্থগৃধ্নুতার এক জীবন্ত প্রতীক। নিজের স্বার্থের স্রোতে ছেলেমেয়েদের, স্বামীকে ভাসিয়ে দিতে একটু দ্বিধা নেই তাঁর। স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন জ্যাক হকিন্স এবং ছেলের ভূমিকায় রিচার্ড বেমার। চরিত্রটির অভিনয়াংশ আরেকটু উন্নত হলে নিঃসন্দেহে ছবি দেখতে দেখতে দর্শকবৃন্দ ঘৃণায়, আতংকে প্রায় মূহ্যমান হয়ে যেতেন, কিন্তু শ্রীমতী রাসেলের নাট্যকে অভিনয় তেমন রেখাপাত করার মতন হয়নি। এই ছবিতে মনে রাখার মত অভিনয় করেছেন মিলিয়ান শেল—হলিউডের অস্কারবিজয়ী অভিনেতা।

• • •

হলিউড বিদেশী বার্তাজীবী সংঘের রায় :

১৯-তম বার্ষিক ভোজে হলিউড বিদেশী বার্তাজীবী সংঘ ১৯৬২ সালের জন্যে মেরিলিন মনরো এবং চার্লটন হেস্টনকে জগতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও অভিনেতা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। "দি গানস অব নেভারোন" এবং 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরী" যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ নাট্যরসোত্তীর্ণ এবং সঙ্গীতসমৃদ্ধ চিত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

পঞ্চাশটি দেশের সংবাদপত্র পাঠকদের রায়ে "গোল্ডেন গ্লোবস" বিদেশী ছবিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতা সৃষ্টির জন্যে সবচেয়ে কার্যকরী বলে বিবেচিত হয়েছে। "জাজমেন্ট অ্যাট নুরেমবার্গ" ছবিটির জন্যে স্টানলি ক্র্যামার শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন।

এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতীয় হকি দল

জাকার্তায় আগামী আগষ্ট মাসে চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ১৭ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় হকি দল গঠিত হয়েছে। অলিম্পিক খেলোয়াড় গুরুদেব সিং (পাঞ্জাব পুলিস) দলের অধিনায়ক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। সহ-অধিনায়ক পদলাভ করেছেন লক্ষণ (সার্ভিসেস)।

ভারতীয় হকি দলে পাঞ্জাবের ৬ জন, সার্ভিসেস দলের ৫ জন, রেলওয়ে দলের ৪ জন, মহীশূর এবং উত্তরপ্রদেশের ১ জন করে খেলোয়াড় স্থানলাভ করেছেন। দলের অধিনায়ক গুরুদেব সিং ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ণ অলিম্পিকে এবং ১৯৫৮ সালের টোকিয়োর এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের ভারতীয় হকি দলে তিনি ছিলেন না। দলের খেলোয়াড়দের বয়সের গড় ২৬ বছর। দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় টপ্পো‌র বয়স ২৩ এবং প্রবীণ খেলোয়াড় চিরঞ্জিৎ সিংয়ের বয়স ৩১ বছর।

গোল : লক্ষণ (সার্ভিসেস) এবং কৃষ্টি (মহীশূর)।

ব্যাক : পৃথিপাল সিং (পাঞ্জাব), ঝমনলাল শর্মা (উত্তর প্রদেশ) এবং পিয়ারী সিং (সার্ভিসেস)।

হাফ-ব্যাক : দেশমুখ (সার্ভিসেস), এন্টিক (রেলওয়েজ), চিরঞ্জিৎ সিং (পাঞ্জাব), নির্মল (রেলওয়েজ) এবং গুরুমিৎ সিং (পাঞ্জাব)।

ফরওয়ার্ড : মদনমোহন সিং (পাঞ্জাব), গুরুদেব সিং (পাঞ্জাব), দর্শন সিং (পাঞ্জাব), বান্দু পাতিল (সার্ভিসেস), আব্দুল হামিদ (রেলওয়েজ), টপ্পো (সার্ভিসেস) এবং আরমান (রেলওয়েজ)।

ষ্ট্যান্ড-বাই : ধরম সিং (পাঞ্জাব), কাদিরেসন (মাদ্রাজ), যোগিন্দর সিং (বাংলা), পিটার (সার্ভিসেস)।

নিম্নলিখিত ৮ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রয়োজনসময়ে তাঁদের মধ্যে থেকেও কোন কোন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা যেতে পারে।

গজেন্দ্র সিং (সার্ভিসেস), গুরবক্স সিং (বাংলা), সাভান্ত (গুজরাট), রত্তি (রেলওয়েজ), ইনাম-উর-রেমান (ভূপাল), বলবীর সিং (বাংলা), গায়কোয়াদ (গুজরাট) ও নাগরাজ (মহীশূর)।

গুজরাট হকি এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত বরোদার শিক্ষাশিবিরে এইসব নির্বাচিত খেলোয়াড়, ষ্ট্যান্ডবাই এবং অতিরিক্ত খেলোয়াড়দের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাশিবিরে কোন খেলোয়াড় আশানুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে না পারলে তার বদলে অন্য খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা হবে।

বরোদার শিক্ষাশিবিরে এই চারজন কোচ শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করবেন :— গুরুবচন (পাঞ্জাব), নাইডু (মহীশূর), ডি এল দাশ (বোম্বাই) ও ত্রিলোচন সিং (পাঞ্জাব)।

সুইস লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা

গত সংখ্যায় পুরুষ এবং মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল খেলার ফলাফল পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। প্রতিযোগিতার মোট পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে খেলে; মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস খেলার ফাইনালে কেবল অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। মহিলাদের ডাবলস ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার জুটি জয়লাভ করে; বাকি চারটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে জয়লাভ করে অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা। পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে কৃষ্ণান এবং হিউটের জুটি অষ্ট্রেলিয়ার লেভার এবং এমারসন জুটির কাছে পরাজিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার রড লেভার এবং মহিলা খেলোয়াড় মিস মার্গারেট স্মিথ দুটি অনুষ্ঠানে জয়লাভ করে 'দ্বিমুকুট' সম্মান লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য অষ্ট্রেলিয়ার রড লেভার এবং মিস মার্গারেট স্মিথ এ বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত ইতালীয়ন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে পুরুষ এবং মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালেও জয়লাভ করেছিলেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের ডাবলস : রড লেভার এবং রয় এমার্সন (অষ্ট্রেলিয়া) ৬—৩ ও ৬—২ সেটে রমানাথন কৃষ্ণান (ভারতবর্ষ) এবং বব হিউইটকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : মিস মার্গারেট স্মিথ (অষ্ট্রেলিয়া) এবং যুষ্টিনা ব্রিক (আমেরিকা) ৬—৩ ও ৬—২ সেটে লেসলী টার্ণার এবং জে লেহানকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : রবার্ট হিউইট এবং রবিন এববার্ণ (অষ্ট্রেলিয়া) ৯—৭, ৫—৭ ও ৬—৪ সেটে মিস লেসলী টার্ণার এবং ওয়েন ডেভিডসনকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

॥ ডেভিস কাপ ॥

ইউরোপীয়ান জোন : গত দু'বছরের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার রাণার্স-আপ ইতালী ২য় রাউণ্ডে ৫—০ খেলায় রাশিয়াকে পরাজিত ক'রে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার যোগদান এই প্রথম। রাশিয়া ১ম রাউণ্ডে হল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ২য় রাউণ্ডে অপ্রত্যাশিতভাবে ৩—২ খেলায় ফ্রান্সকে পরাজিত করে।

কোয়ার্টার-ফাইনাল খেলার তালিকা :

(১) সুইডেন বনাম চেকোশ্লোভাকিয়া।

(২) দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম পশ্চিম জার্মানী।

(৩) বৃটেন বনাম ব্রেজিল।

(৪) ইতালী বনাম হাঙ্গেরী।

ফ্রেঞ্চ হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতা

বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতা হিসাবে ফ্রেঞ্চ হার্ডকোর্ট প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। ২১শে মে থেকে ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের গুণানুসারে বাছাই

খেলোয়াড়দের নামের যে ক্রমপর্যায় তালিকা প্রস্তুত হয়েছে তাতে পুরুষদের সিঙ্গলস বিভাগে ১৯৬১ সালের উইম্বলেডন এবং সদ্য সমাপ্ত ইতালীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) প্রথম স্থান লাভ করেছেন। মহিলাদের সিঙ্গলস বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছেন গত বছরের বিজয়িনী বৃটেনের এ্যান হেডন। ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান সদ্য সমাপ্ত ইতালীয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ৬ষ্ঠ স্থান পেয়েছিলেন, কিন্তু ফরাসী হার্ড কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতায় পেয়েছেন ১০ম স্থান। পুরুষ বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন ২য়, গত বছরের বিজয়ী ম্যানুয়েল শান্তানা (স্পেন) ৩য়, ইতালীর ডেভিস কাপ খেলোয়াড় নিকোলা পিয়েত্রাঞ্জলি ৪র্থ এবং নীল ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) ৫ম স্থান দেওয়া হয়েছে।

মহিলা বিভাগে ১৯৬২ সালের ইতালীয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) বাছাই তালিকায় ২য় স্থান পেয়েছেন।

১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতা এখনও চুড়ান্ত পর্য্যায়ে এসে পৌঁছয়নি। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র রমানাথন কৃষ্ণান ছাড়া বাকি তিনজন খেলোয়াড়—জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিৎ লাল এবং আখতার আলী প্রথম রাউণ্ডেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেন।

দশ নম্বর বাছাই খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান স্ট্রেট সেটে ৭নং খেলোয়াড় বোরো জোভানোভিককে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মহিলা বিভাগে ৩নং বাছাই খেলোয়াড় ক্রিস্টিন ট্রুম্যান (ইংল্যাণ্ড) অপ্রত্যাশিতভাবে আমেরিকার ডোনা ফ্লয়েডের কাছে পরাজিত হন। প্রতিযোগিতায় ট্রুম্যানের এই পরাজয়ই এ পর্যন্ত সবথেকে উল্লেখযোগ্য অপ্রত্যাশিত ফলাফল।

পুরুষদের সিঙ্গলস কোয়ার্টার-ফাইনালে ৮জন খেলোয়াড়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় ৪ জন এবং মহিলাদের সিঙ্গলস কোয়ার্টার-ফাইনালে ৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৩জন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার।

গত বছরের পুরুষদের সিঙ্গলস বিজয়ী ম্যানুয়েল শান্তানা (স্পেন) এবং

'অনেয় মাপ কর ভাই'

মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়িণী এ্যান হেডোন (বৃটেন) কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠেছেন। তাছাড়া দু'বছরের সিঙ্গলস বিজয়ী নিকোলা পিয়েত্রাঞ্জলী (ইতালী) কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবেন।

কোয়ার্টার-ফাইনাল খেলার তালিকা এইভাবে প্রস্তুত হয়েছে :

পুরুষদের সিঙ্গলস : রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) বনাম রমানাথন কৃষ্ণান (ভারতবর্ষ); এম সান্তানা (স্পেন) বনাম পি ডার্মন (ফ্রান্স); নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) বনাম পিয়েত্রাঞ্জলী (ইতালী); এম মুলিগ্যান (অস্ট্রেলিয়া) বনাম রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) বনাম ই বুডিং (পশ্চিম জার্মানী); ডি ফ্লয়েড (আমেরিকা) বনাম আর স্কুরম্যান (দক্ষিণ আফ্রিকা); এস রেনোল্ডসপ্রাইস (দক্ষিণ আফ্রিকা) বনাম লেসলী টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া); জে লেহান (অস্ট্রেলিয়া) বনাম এ্যান হেডোন (বৃটেন)।

ফুটবল খেলোয়াড়দের বাজার দর

ফুটবল খেলার সমতুল্য জনপ্রিয় খেলা নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা নানা দিক থেকে দেখানো যেতে পারে। বিদেশের নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়দের মোটা মোটা অংকের বাজার দর আমাদের দেশের খবরের কাগজেও মাঝে মাঝে বের হয়। খবর পড়ে আমাদের দেশের ফুটবল খেলোয়াড়দের আক্ষেপ করতে শুনেছি 'বেল পাকলে কাকের কি?' আমাদের দেশে প্রকাশ্য ভাবে পেশাদারী ফুটবল খেলার প্রচলন হয়নি। অবিশ্যি গোপনে টাকার বিনিময়ে ফুটবল খেলা অনেক দিন থেকেই চালু আছে। ফলে অংকের চেহারা খেলোয়াড় এবং ক্লাবের দু'চারজনের জানা ছাড়া লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়। তবে সে অংকের পরিমাণ ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার বাজার দর থেকে খুবই কম। আমাদের দেশে যাঁরা টাকার বিনিময়ে ফুটবল খেলা গোপনে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন তাঁদের অবস্থাটা কোন রকমে "ভাতে-কাপড়ে" থাকার মত। তাঁদের কাছে বিদেশের বাজার দর 'আকাশের চাঁদ'।

সম্প্রতি এই রকম এক 'আকাশের চাঁদের' খবর পাওয়া গেছে স্পেনের আকাশে। সংবাদে প্রকাশ, স্পেনের রিয়েল মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাবের রাইট-ইন লুই ডেল সোল দল ত্যাগ করে মালিয়ানের তোরিণো ক্লাবের পক্ষে নাম স্বাক্ষর করেছেন। তাঁর এই দল পরিবর্তনের অনুমতি দিয়ে মালিয়ানের তোরিণো ক্লাবের কাছ থেকে রিয়েল মাদ্রিদ ক্লাব ২৪০,০০০ ষ্টার্লিং পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। ফুটবল খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনের চুক্তির ইতিহাসে এই মূল্যই বর্তমানে বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বেসরকারী সূত্রে

প্রকাশ, লুই ডেল সোলকে তিন বছরের খেলার চুক্তিতে তোরিণো ক্লাবের কর্তৃপক্ষ ৪৮,০০০ ষ্টার্লিং পাউন্ড দক্ষিণা দিতেও রাজী হয়েছেন।

ডেল সোলের বয়স ২৭ বছর। আগামী চিলির বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় (জুল রিমে কাপ) তিনি স্পেনের পক্ষে খেলবেন। তাছাড়া স্পেনের ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতায় তিনি রিয়েল মাদ্রিদ দলের পক্ষেও অংশ গ্রহণ করবেন। সুতরাং আগামী ১০ই জুলাইয়ের আগে তাঁর পক্ষে নতুন ক্লাবে যোগদান করা সম্ভব হবে না।

রিয়েল মাদ্রিদ ক্লাবে সোলের যোগদান দু'বছরও পূর্ণ হয়নি; ১৯৬০ সালে ৩৬,০০০ ষ্টার্লিং পাউন্ডের লেন-দেনে তিনি বেটিশ ক্লাব থেকে রিয়েল মাদ্রিদ ক্লাবে এসেছিলেন এবং প্রকাশ, তিনি বছরে রিয়েল মাদ্রিদ ক্লাব থেকে ১২,০০০ ষ্টার্লিং পাউন্ড উপার্জন করতেন।

লুই ডেল সোলের নামের সঙ্গে স্পেনের আর একজন প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়ের নাম এসে পড়ে। তাঁর নাম লুই সুয়ারেজ। চিলির বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় স্পেনের পক্ষে সুয়ারেজ মনোনীত হয়েছেন। গত বৎসর মে মাসে সুয়ারেজ দলত্যাগ করেন—বার্সিলোনা থেকে মিলানের ইন্টারন্যাজিওনেল দল। তাঁর এই দলত্যাগের ফলে ২০৪,০০০ ষ্টার্লিং পাউন্ডের লেন-দেন হয়। বার্সিলোনা ক্লাব পায় ১৪৪,০০০ ষ্টার্লিং পাউন্ড এবং তিন বছরের চুক্তিতে খেলোয়াড় সুয়ারেজ ৬০,০০০ ষ্টার্লিং পাউন্ড পান।

এই প্রসঙ্গে ব্রেজিলের (দক্ষিণ আমেরিকা) স্যানটোজ ফুটবল দলের ইনসাইড ফরোয়ার্ড পিলের চাহিদার কথা উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব ফুটবলের বাজারে তাঁর দরই সব থেকে বেশী। একবার ইতালীর কোন ক্লাবের ১৪৫,০০০ ষ্টার্লিং পাউন্ডের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এখন পিলের বাজার দর ৫০০,০০০ ষ্টার্লিং পাউন্ডের কাছাকাছি। ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসের খবরে ছিল, ফুটবল খেলার দরুণ পিলের মাসিক আয় ১,২৫০ পাউন্ড। ফুটবল খেলার বাজারে তাঁর মত বড় চাকুরে আর নেই। পিলে সম্বন্ধে বলা হয়, একটা খেলায় তিনি কখনও দ্বিতীয়বার একই ধরণের বল পাশ করেন না। নতুন নতুন ক্রীড়া-পদ্ধতি উদ্ভাবনায় পিলের জুড়ি বর্তমানের আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় চোখেই পড়ে না।

॥ ভি এফ বি ফুটবল দল ॥

পশ্চিম জার্মানীর প্রখ্যাত স্টুটগার্ট ভি এফ বি ফুটবল দল ভারত সফরে অপরাজেয় সম্মান লাভ করেছে। ভারত সফরে দলটি মোট পাঁচটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় যোগদান ক'রে ১৯টি গোল দেয় এবং মাত্র ৪টি গোল খায়।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : কলকাতায় আই এফ এ একাদশ দলকে ৩—১ গোলে, বাঙ্গালোরে মহীশুর একাদশ দলকে ৮—১ গোলে এবং সাউদার্ণ জোন ফুটবল একাদশ দলকে ২—০ গোলে, হায়দ্রাবাদে অন্ধ্র প্রদেশ একাদশ দলকে ২—০ এবং সফরের শেষ খেলায় বোম্বাইয়ে বোম্বাই একাদশ দলকে ৪—২ গোলে পরাজিত করে।

॥ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা ॥

আজ সারা পৃথিবীর ফুটবল ক্রীড়া-অনুরাগীদের দৃষ্টি চলে গেছে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত দেশ চিলিতে। ৩০শে মে থেকে চিলির চারটি স্থানে সপ্তম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ের লীগ খেলা সুরু হবে। লীগের এই খেলায় যোগদান করার যোগ্যতা লাভ করেছে ১৬টি দেশ। দক্ষিণ আমেরিকায় বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন এই নিয়ে তিনবার। ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্ব ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়েতে এবং ১৯৫০ সালে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ব্রেজিলে; এবং দু'বারই উরুগুয়ে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় জয়লাভের পুরস্কার 'জুল রিমে' কাপ পায়। অর্থাৎ দু'বারই দক্ষিণ আমেরিকায় 'জুল রিমে' কাপ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল বনাম বি এন আর দলের খেলার একটি দৃশ্য। বি এন আর দলের গোলরক্ষক ডি দাস ইস্টবেঙ্গল দলের সুনীল নন্দীর গোল দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ করেছেন।

থেকে যায়। এবারের প্রতিযোগিতায় কোন দেশ শেষ পর্যন্ত 'জুল রিমে কাপ' জয়লাভ করবে তাই নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে। অনেকের ধারণায় এবারও 'জুল রিমে' কাপ দক্ষিণ আমেরিকায় থেকে যাবে এবং বিজয়ী দেশ হবে ব্রেজিল। আবার অনেকে বলছেন, এবার জুলে রিমে কাপ দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশই ধরে রাখতে পারবে না, ইউরোপ টেক্কা দিয়ে কাপ জয় করে নিয়ে যাবে এবং এ সম্পর্কে রাশিয়ার নামই বেশী ক'রে লোকের মুখে মুখে ঘুরছে। পশ্চিম জার্মানীর নামও অনেক মহলে উঠেছে। ১৯৫৪ সালের প্রতিযোগিতার ফাইনালে শক্তিশালী হাঙ্গেরী দলকে যেরকম অপ্রত্যাশিতভাবে জার্মানী পরাজিত করেছিল এবারও তাদের পক্ষে সেইরকম কিছু করা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে ফুটবল খেলার অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা রাশিয়ার শক্তির উপর বেশী নির্ভর ক'রে তাদেরই সাফল্য সম্পর্কে জোর ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। এক দেশের জলবায়ু এবং পরিবেশ ভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের সাফল্যলাভের পক্ষে বেশীরভাগ সময় যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি করে। কিন্তু রাশিয়ার পক্ষে তার কোন সম্ভাবনা আজ নেই। কারণ গত বছরই রাশিয়ান ফুটবল দল দক্ষিণ আমেরিকা সফর ক'রে গেছে; ফলে চিলির জলবায়ু ও পরিবেশ তাদের ধাতস্থ হয়েছে। গত বছরের এই দক্ষিণ আমেরিকা সফরে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে এবং চিলির শক্তিশালী জাতীয় ফুটবল দলকে পরাজিত করে রাশিয়া বিশ্ব ফুটবল মহলে যথেষ্ট বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। ভিন্ন দেশের মাটিতে শক্তিশালী ফুটবল দলগুলির বিপক্ষে রাশিয়ার এই সাফল্যের উপর অভিজ্ঞ মহল যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

॥ ফুটবল লীগ ॥

গত সপ্তাহে (২১শে মে—২৬শে মে) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার সবথেকে অপ্রত্যাশিত ফলাফল জর্জ টেলিগ্রাফ দলের কাছে মোহনবাগান দলের ০—১ গোলে পরাজয়। মোহনবাগান দল বেশীরভাগ সময় টেলিগ্রাফ দলকে চেপে রেখে গোল দেওয়ার কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে। অপরদিকে সারা খেলার মধ্যে টেলিগ্রাফ দল মাত্র একবারই মোহনবাগান দলের গোলে বল সট করার সুযোগ পেয়ে গোল দেয়। খেলা ভাঙ্গার একেবারে শেষ সময়ে এই গোল হওয়াতে মোহনবাগান দলের পক্ষে গোল শোধ করা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ বছরের লীগের খেলায় মোহনবাগান দলের এই প্রথম পরাজয়। এ বছরের লীগের খেলায় এখনও চারটি দল অপরাজেয় আছে—ইস্টবেঙ্গল, বি এন আর, ইস্টার্ণ রেলওয়ে এবং মহমেডান স্পোর্টিং। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গত সপ্তাহে একটা ম্যাচ খেলেছে, রাজস্থানের বিপক্ষে ১—০ গোলে জয়।

গত বছরের রানার্স-আপ বি এন আর দল পর পর চারটে খেলা ড্র ক'রে প্রথম জয়লাভ করে বালী প্রতিভার বিপক্ষে ১—০ গোলে তাদের পঞ্চম খেলায়।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকা
(২৬শে মে পর্যন্ত খেলা নিয়ে)
প্রথম তিনটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
ইস্টবেঙ্গল	৬	৫	১	০	৭	০	১১
মোহনবাগান	৭	৪	২	১	১৬	৭	১০
[illegible]লিগ্রাফস	৬	৩	২	১	৪	২	৮

২৭।৫।৬২

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

মুখশ্রী উজ্জ্বল করে
রোল্যাক্স স্নো
ব্যারন কসমেটিক প্রোডাক্টস, কলিকাতা

দি
ফোন: ৫৫-৪০৯২
বেঙ্গল ডেকরেটর
২২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-কলিকাতা-৬

সত্যজিৎ রায় ও
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
সম্পাদনায়
ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্র
মে ১৯৬২। বৈশাখ ১৩৬৯
থেকে ২য় বর্ষ
সুরু!

প্রতি সংখ্যা ৭৫ন.প.
বার্ষিক চাঁদা ৯ টাকা

সূচী পত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

প্রসাধনে অতুলনীয়
রোল্যাক্স
ট্যালকম পাউডার

বেঙ্গল ফ্যান্সী ষ্টোর্স
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

কিং কো'র
আর্ণিকা
হেয়ার অয়েল

ঘামাচি
প্রত্যহ নিকো সাবান মেখে স্নান করলে
ঘামাচির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
ত্বকের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য
নিকো
আসল জীবাণুনাশক সাবান।
NEKO
Germicidal Soap
PARKE DAVIS
এটি পার্ক-ডেভিসের তৈরী

সূচীপত্র

অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday 8th June, 1962.
40 Naya Paise

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে "Eternal Vigilance is the price of Liberty". যাহার অর্থ "স্বাধীনতার মূল্য অনন্ত সতর্কতা।" অর্থাৎ স্বাধীনতা রাখিতে হইলে স্বাধীনতাহারী শত্রুর ও অন্তর্বিপ্লবকারী শক্তিসমূহের উপর অনিমেষ ও অবিশ্রাম সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয়, অন্যথায় স্বাধীনতার বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

এই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইলে, যাঁহারা দেশের ও জাতির স্বাধীনতারক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কিরূপ মনোভাব লইয়া এই মহান দায়িত্ব বহন করা উচিত? সে বিষয়ে প্রাচীন গ্রীক জাতিসমষ্টির (যাহাদের স্বাধীনতা-প্রেম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ) এক প্রবীণ উপদেষ্টা, ডিমস্থেনিস বলিয়া গিয়াছেন ঃ

"There is one safeguard known generally to the wise, which is an advantage and security to all, but especially to democracies as against despots. What is it ? Distrust." ইহার অর্থ এইভাবে করা যায় যথা ঃ—নিরাপত্তার একটি উপায় সকল প্রাজ্ঞজনের বিদিত, যাহা সকল ক্ষেত্রে ও সকলের পক্ষেই লাভজনক ও ক্ষতি-প্রতিষেধক,—বিশেষে লোকতন্ত্রকে ক্রূর স্বৈরশাসকের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার বিষয়ে। উহা কি? অবিশ্বাস।"

ভারতের কর্ণধার যাঁহারা তাঁহাদের কাজে ইতিহাসের শিক্ষা ও প্রাচীনের উপদেশ যে পদে পদে উপেক্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করার প্রয়োজন নাই। তবে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহাতে মনে হয় ভারতের দুর্গ-প্রাকার ভেদ করা শত্রুর অসাধ্য নয় এবং সেই দুর্গের প্রত্যেকটি দুয়ারেই সতর্ক প্রহরীর প্রয়োজন, কেননা এখন দুই প্রধান শত্রুর মধ্যে সন্ধির ও চুক্তির আয়োজন চলিতেছে। তাহার উদ্দেশ্য কি তাহা বলার কি কোনও প্রয়োজন আছে?

চীনের অভিসন্ধি কি তাহা তো এখন সুস্পষ্ট—যদিও একজন কূপমণ্ডুকজাতীয় মহাপণ্ডিত সম্প্রতি লোকসভায় সে বিষয়ে অন্যমত প্রকাশ করিয়াছেন—এবং পাকিস্তান তো নিজের উত্তর সীমানার নিরাপত্তার জন্য সেই চীনের সঙ্গেই মিতালির ব্যবস্থা করিয়াছে। উপরন্তু ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আদালতে দাঁড়াইবার জন্য পাকিস্তান তাহার জন্মদাতা পিতাকে সরাসরি আহ্বান জানাইয়াছে। এই দুই দেশই এখন স্বৈরশাসনতন্ত্রে চালিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বহিঃরাষ্ট্র বিভাগ ও প্রতিরক্ষা বিভাগ এতদিন সতর্কতা বিশেষ দেখাইয়াছেন মনে হয় না। এতদিনে, গৃহদাহের আসন্ন মুহূর্তে, কূপ-খননের উদ্যোগ যাহা চলিতেছে তাহাও বিশেষ আশাপ্রদ নয়।

কিন্তু শত্রু-প্রবেশের ছিদ্রপথ আরও তিনটি আছে, যথা—নেপাল, সিকিম ও ভূটান। নেপাল মহারাজ নিজ বুদ্ধিতে ছিদ্রপথ প্রশস্ত করিয়া 'খাল কেটে কুমীর আনা' প্রবাদের সার্থকতা প্রমাণ করিতে চলিয়াছেন। সিকিমের মহারাজকুমারও কখন কি করিয়া বসেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া কঠিন। ভূটান তো এখনও প্রায় অজ্ঞাত দেশ, তবে সম্প্রতি পথ-ঘাটের কাজ কিছু জোর চলিতেছে।

এই তিনটি দেশই পশ্চিম বাঙ্গলার উত্তর ভাগে অবস্থিত। সম্প্রতি দার্জিলিং অঞ্চলে নেপালীদিগের অনুপ্রবেশ যেভাবে চলিতেছে এবং গুর্খা লীগ যেভাবে এই অঞ্চল অধিকার করিতে চেষ্টিত, তাহাতে মনে হয় যে, এই অঞ্চলের প্রতিরক্ষা বিষয়েও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ তুরীয়ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিম বাঙ্গলা সম্পর্কে অবশ্য কেন্দ্রের মন্ত্রিমণ্ডলে বিমাতৃসুলভ মনোভাব এখন আমাদের নিকট সুবিদিত। তবে প্রতিরক্ষা বিষয়ে পশ্চিম বাঙ্গলায় বিপদ ঘটিলে কেন্দ্রের নিরাপত্তা ধূলিস্যাৎ হইবে। আশা করি সেকথা সেখানের বিদগ্ধ-চূড়ামণিগণ জানেন।

পশ্চিম বাঙ্গলা বিপন্ন হইলে সমগ্র ভারত লৌহ ও লৌহজাত সকল দ্রব্য এবং কয়লা হইতে বঞ্চিত হইবে। বর্তমানে অবশ্য পশ্চিমবঙ্গকেই কয়লা ও লৌহ হইতে আপেক্ষিকভাবে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহণ সম্পর্কিত বিপরীত ব্যবস্থায়। এ বিষয়ে যাঁহারা গত সপ্তাহে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের ৭৫ বাৎসরিক অধিবেশনে তৎকালীন সভাপতি শ্রীকে. এন. মুখার্জির মন্তব্যাদি পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন যে, কেন্দ্রের মন্ত্রিগণের মস্তিষ্কে কি প্রকার বায়ুর প্রকোপ চলিতেছে। একদিকে বন্যার জলের মত যেন তেন প্রকারেণ সংগৃহীত অর্থের ব্যয় চলিতেছে দেশকে কল-কারখানা ও শিল্পসজ্জায় ঐশ্বর্যান্বিত করার জন্য, অন্যদিকে পশ্চিমবাংলায় সেই প্রগতির চেষ্টাকেই ব্যাহত করা হইতেছে নানা কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি করিয়া!

কবিতা ॥ ॥ কবিতা

কেবল ছায়া, কেবল হাওয়া

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

কেবল ছায়া কদমবনে, কেবলই চাঁদ রাকা—
আমার সুখে তোমার মুখ দুই আকাশে আঁকা।
একটি আকাশ অনেক দূরে, আরেক আকাশ কাছে—
দুই আকাশে তোমার মুখ আল্গা ভেসে আছে।
সেই মুখেরই জ্যোৎস্না ঝরে
রাতের মাঠে, দীপের ঘরে,
কদমবনে হাওয়ায় নড়ে অকারণের শাখা।
তোমার মুখে একেক রং দুই আকাশে আঁকা!

একটি আকাশ রইলো প্রাণে, অন্য আকাশ দূরে—
তোমায় বাঁধি দুই আকাশের মিশ্র কোনো সুরে।
অনেক আলাপ, অনেক প্রলাপ, বিতর্ক-বৈঠকে—
সারাজীবন আহাম্মকীর ধাঁধায় মানুষ ঠকে।
কেবল ছায়া, কেবল হাওয়া, কেবল তুমি আমি।
—এই কথাটাই শেষ অবধি রইলো হয়ে দামী॥

অন্য নায়ক

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

কোলে ওর কচি ছেলে, কপালে অনেক বড় করে
সিঁদুরের টিপ আঁকা, বাঁকা ভুরু রয়েছে তেমনই
যেমন দেখেছি আগে—এখন কেবল তার স্বরে
অন্য এক সুর আমি যা শুনিনি; বললাম, 'মনি
বলোত আবার দেখা হল আজ কতদিন পরে!'

ও কিছু বলল না, শুধু অবাক দু' চোখ মেলে যেন
আমাকে দেখছিল ওর আমি সেই আমি আছি কিনা
সেই বাঁধভাঙা বন্যা যে একদা কোন কী ও কেন
মানে নি, ভাবলে যাকে সংকোচের অবধি ছিল না।
একি সেই, যে একদা মনিমালা নামে মেয়েটির
শঙ্কিত দিগন্তে উঠে বাজিয়েছে সাহসের বীণা
তরঙ্গে তরঙ্গ হেনে প্রতিদিনই লজ্জার আবির
মাখিয়ে দিয়েছে তাকে, মুছে ফেলে সব কিন্তু, যদি,
এ কোন অপরিচিত ক্লান্ত, ম্লান অঘ্রাণের নদী!

দুঃখ, তুই হৃদয় ছুঁয়ে যা!

সমীর চক্রবর্তী

অন্ধকারে উচ্চারিত হয়েছিল মন্ত্রের অক্ষর:
'জীবন বহুধা-ব্যাপ্ত,—সূর্যাস্তেও সময়ের মুখ
অনাবৃত থেকে যায়।' এই কথা জেনে একদিন
রাজপথে অতি ধীর ছায়া ফেলে ফেলে
ভালোবাসা চলে গেল সমুদ্রের দিকে॥

দুঃখ, তুই শান্তি পেতে, অন্ধকারে হৃদয় ছুঁয়ে যা!
কোটরে নিশ্চল নারী হীনপণ্যে বেসাতি খুলেছে;
পৃথিবীতে প্রতিদিন নূতন প্রেমের কণ্ঠস্বর
শোনা যাচ্ছে; দুঃখ তোর মেঘ দেখে ভয়
কেটে যাক,—পেয়েছিস আশ্চর্য হৃদয়!

ছেলেবেলায় একটা কথা পাঠ্য বইয়ে পড়েছিলাম, আজও তার প্রভাব মন থেকে মুছে যায়নি। কথাটা ছিল বোধহয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কোনো রচনায়। যতোদূর মনে পড়ে বাক্যটা ছিল এইরকম—

মহামতি গোখলে একদিন বাঙালীর ললাটে গৌরবটিকা দিয়া বলিয়াছিলেন, বাঙালী আজ যাহা ভাবে, ভারতবাসী তাহা কাল ভাবিবে।

সে বয়সে অবশ্য 'মহামতি গোখলে' কে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তিনি যে অবাঙালী তা বুঝেছিলাম। এবং এটাও বুঝেছিলাম যে, অবাঙালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাগ্রহে স্বীকার করেছিলেন, তামাম ভারতবর্ষে বাঙালীর স্থান সর্বাগ্রে।

তারপর বহুদিন গত হয়েছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে শিখেছি, ওসব সোনার দিন এখন রূপকথা। বাঙালী আজ হৃতশক্তি, হৃতগৌরব। সারা ভারতে তার স্থান পিছনের সারিতে।

এই নিয়ে আমাদের মনে দুঃখ আছে, ক্ষোভও আছে। ক্ষোভটা এই কারণে যে, আমরা মনে করি বাঙালী আজ অবহেলিত, বাংলার সদ্‌গুণ কারো চোখে পড়ে না। বরং কী করে বাংলাকে সবদিক থেকে হটিয়ে রাখা যায় তারই চক্রান্ত যেন আকাশে-বাতাসে ফণা উঁচিয়ে ঘুরছে। এ হেন অবস্থায় হঠাৎ একটা খবর শুনে চমকে উঠতে হল।

খবরটা বলার আগে একটা গল্প শুনিয়ে নিই।

এক রাজার সাত ছেলে ছিল। তারা সকলেই অকর্মা, রাজশাসনে তাদের কোনো উৎসাহ নেই। যুদ্ধবিগ্রহ তারা তো পছন্দ করতই না, তার উপর তাদের স্বভাবও ছিল ভালোমানুষ ধরণের।

এইসব দেখে রাজার বড় দুশ্চিন্তা হল। এমন সব অপদার্থের হাতে রাজ্য এলে তারা তো দুদিনেই সব উড়িয়ে

দেবে। অথচ সাত-সাতটা ছেলে থাকতে বাইরের লোককেও তো রাজ্য দিয়ে যাওয়া যায় না। তখন তিনি তাঁর মনের দুঃখ মন্ত্রীর কাছে খুলে বললেন। মন্ত্রী জানালেন, রাজত্ব তো ছেলেদেরই কারো হাতে দিয়ে যেতে হবে, এ আর নতুন কি? তবে যাকে দেওয়া হবে বুদ্ধিতে যেন সে পাকা হয়—তাহলেই সর্বদিক নিরাপদ থাকবে।

কিন্তু, কে বেশি বুদ্ধিমান তা জানা যাবে কী করে?

জানা যাবে প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে। মন্ত্রী বললেন, ছেলেদের নিয়ে একটা নতুন ধরণের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা হল এই যে—এরপর কানে কানে কী সব মন্ত্রণা দিলেন তিনি রাজাকে।

নির্দিষ্ট দিনে সাত রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে রাজার কাছে হাজির হল। রাজা বললেন, 'আমার রাজ্য সেই পাবে, যে একটা নতুন ধরণের ঘোড়দৌড়ে প্রথম হবে। তোমরা ঘোড়দৌড় মাঠের মাঝ-বরাবর গিয়ে একটা খড়ির দাগ দেওয়া লাইন দেখতে পাবে। সেই লাইনে পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে ওয়ান-টু-থ্রি বলার পর তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে ঘোড়া ছোটাতে শুরু করবে।......রাজ্য পাবে সেই, যে থাকবে সবার শেষে।'

রাজার হুকুম, কাজেই ছেলেদের তা মানতে হল। খড়ির লাইনে সাত রাজপুত্র ঘোড়া নিয়ে দাঁড়ানোর পর সেনাপতি বললেন—'ওয়ান-টু-থ্রি'। আর অমনি নগরপাল হাতে তালি দিয়ে দিয়ে তিরিশ সেকেন্ড গোনার জন্যে হাঁকতে লাগল—এক, দুই, তিন, চার......।

রাজপুত্রেরা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। প্রত্যেকেই ঘোড়া ছোটাতে গিয়ে পাশে চেয়ে দেখল পাশের ভ্রাতাটি একটু দেরি করে ঘোড়া ছোটাবার ফিকিরে আছে। ফলে প্রথমোক্ত রাজপুত্রও তার লাগামে ঢিলে দিল। আর এইভাবে সকলেই দাঁড়িয়ে রইল যে যার জায়গায়।

কিন্তু ওদিকে নগরপাল হে'কে যাচ্ছে—ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ......

হঠাৎ ছোট রাজপুত্রের মাথায় একটা ব্রেন-ওয়েভ এল। সে ত্বরিৎগতিতে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উল্টো দিকে ছুটতে শুরু করল।

অন্য রাজপুত্রেরা দু'মিনিট থমকে দাঁড়াল। তারপর একে একে তাদেরও মাথায় এল ব্যাপারটা। তারা বুঝল, এই তো ঘোড়দৌড়! খড়ির লাইন থেকে ঘোড়া ছোটাতে হবে, আর যে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকবে সেই পাবে রাজ্য। ঐ তো ছোট রাজপুত্র পিছিয়ে যাচ্ছে! তখন সবাই ছুটল তাকে পিছনে ফেলতে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, তখন দেরি হয়ে গিয়েছিল। উল্টোদিকের এই দৌড়-প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হল ছোট রাজপুত্রই!

এখন, আগে যা বলছিলাম সেই খবরটার কথা বলি।

ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্প্রতি লোক-সভায় ঘোষণা করেছেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কলেরা রোগে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে বাংলা দেশ, আর বাংলা দেশের মধ্যে হাওড়া-কলকাতা, এবং হাওড়া-কলকাতার মধ্যে হাওড়া।

শুনে বড় আনন্দ হল। কে বলে বাংলাদেশে সব ব্যাপারেই পিছিয়ে আছে? এই তো দিব্যি আমরা এক নতুন প্রতি-যোগিতায় প্রথম হিসাবে নাম কিনলুম! ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছোটা কি ছোটা নয়? আমরা ছুটেছি। 'কলিকাতা কর্পোরেশনে'র নামে 'কলেরার টীকা নিন' বলে যতোই সাইন বোর্ড টাঙানো হোক না কেন শহরে, যতোদিন আমাদের ফুটো জলের পাইপ আছে, ততোদিন কাউকেই পরোয়া করিনে আমরা। প্রথম আমরা হবই।

আর এরপরও যদি কেউ আমাদের এ সুনামে বাদ-সাধেন, যদি শহরের উন্নতি করার জন্যে পরামর্শদাতা ডেকে আনেন, তাহলে—তাহলে সত্যি বলছি, ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেব আমরা। পরামর্শ-দাতাটিকে একবার বেড়াতে নিয়ে যাব এসপ্ল্যানেডে, আর ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাইয়ে দেব একফালি কাটা-তরমুজ। ব্যস্, আর ভাবতে হবে না। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সব সাফ্।

তখন নতুন করে কোনো অবাঙালী 'মহামতিকে' বলতে হবে—বাঙালী আজ যাহা ভাবে, কোনো মানুষই তাহা কোনোকালে ভাবিতে পারিবে না!

আমার জন্মভূমি মনিহারি গ্রামে একদা হর্ষ ডাক্তার আসিয়াছিলেন। আমার বাবা মণিহারি হাঁসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। তিনি কয়েকদিনের জন্য ছুটির দরখাস্ত করিলে হর্ষবাবু সদর হইতে আসেন বাবার অবর্তমানে হাঁসপাতালের ভার লইবার জন্য। আমি মনে করি, তাঁহার পদধূলিস্পর্শে মণিহারি গ্রাম পবিত্র হইয়াছে। মণিহারির লোকেরা তাঁহাকে চেনে না। তিনি মাত্র সাতদিনের জন্য আসিয়াছিলেন। অমন রিলিভিং ডাক্তার কত আসিয়াছেন গিয়াছেন, লোকের মনে কেহ দাগ কাটেন নাই। আমার মনেও হয়তো কাটিতেন না, কিন্তু দৈবক্রমে তাঁহার শেষ-জীবনে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ডাক্তারি পাশ করিয়া আমি যেখানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করিবার জন্য বসি সেখানেই হর্ষবাবুও রিটায়ার করিবার পর প্র্যাকটিস করিতে বসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই আলাপ হইল এবং কথা-সূত্রে যখন বাহির হইয়া পড়িল যে আমার বাল্যকালে মণিহারি গ্রামে বাবার জায়গায় তিনি সাতদিনের জন্য কাজ করিতে গিয়াছিলেন তখন তিনি এমন উচ্ছ্বসিত সাদরে আমাকে আহ্বান করিলেন যে আমি অবাক হইয়া গেলাম। তিনি একেবারে সোজা আমাকে অন্দর-মহলে লইয়া গিয়া হাঁক দিলেন, 'ওগো শুনছ, মণিহারি হাঁসপাতালের ডাক্তার-বাবুর ছেলে এখানে প্র্যাকটিস করতে এসেছে। কি সুন্দর ছেলে দেখ। বস বাবা বস।'

একটি হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসিলাম। একটু পরেই তাঁহার গৃহিণী একটি ডিশে দুইটি সন্দেশ ও জল আনিয়া দিলেন। স্ত্রীর মাথায় আধ-ঘোমটা, পরিধানের শাড়িটি আধময়লা।

"চা কর, চা কর, আমাকেও এক কাপ দিও বুঝলে।"

গৃহিণী মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। দেখিলাম ডাক্তারবাবুর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। দুইটি অবিবাহিতা মেয়েও কাছাকাছি ঘোরা-ফেরা করিতেছিল। তাঁহাদের মধ্যেই একজন আমাদের চা আনিয়া দিল।

"প্রণাম কর। এইটি আমার মেজ মেয়ে। বড়টা একটু কুনো গোছের, সাধ্য-পক্ষে কারো সামনে বেরুতে চায় না। শৈলিকে পাঠিয়ে দে।"

"দিদি তরকারি কুটছে—"

মেয়েটি চলিয়া গেলে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম— "কটি ছেলেমেয়ে আপনার।"

"হয়েছিল এগারোটি। তিনটি মারা গেছে। আটটি আছে। এদেরও

শরীর ভালো নয়। সব ক্রনিক্ ডিজেস্টি। কি করব বলুন, চিকিৎসার ত্রুটি করিনি, কিন্তু সারতে চায় না। এরা ঠিক ঠিক ওষুধও খায় না। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে যে সব পথ্য দেওয়া উচিত তাও সবসময় জোটাতে পারিনি। সুতরাং সারছে না। সব কটারই হাড় জিরজিরে, গলার কণ্ঠা বেরিয়ে পড়েছে। কি করব বলুন।"

সন্দেশ দুটি শেষ করিয়া জলটা খাইয়া ফেলিলাম। ঘরের তৈরি গুড়ের সন্দেশ, খুব ভালো লাগিল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া হাত-মুখ মুছিতেছি হর্ষবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এখানে একটা গামছা বা তোয়ালে দিয়ে যাসনি? কি যে তোদের আক্কেল।"

তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না, না তোয়ালের দরকার নেই"।

"আপনার দরকার নেই তা জানি, কিন্তু এদের তো একটা খেয়াল থাকা উচিত।"

একটু পরেই ডাক্তারবাবুর বড় মেয়ে শৈলবালা দুই কাপ চা লইয়া কুণ্ঠিতমুখে প্রবেশ করিল। মেয়েটি সত্যই রোগা, রং কালো, দেখিতে সুশ্রী নয়। তবে সারা দেহে আসন্ন যৌবনের একটা কমনীয়তা আছে। চা দিয়াই সে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু চায়ে একটা চুমুক দিয়া উৎসুক নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি চুমুক দিবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন লাগছে চা-টা?"

"ভালোই তো—"

"মোটেই ভালো নয়, অতি রাবিশ চা। ওই সাণ্ডেলের দোকান থেকে কিনেছি। ওজনে কম দেয়, জিনিস অতি খারাপ, দাম বাজারের চেয়ে বেশী, তবু ওর দোকান থেকেই কিনি, কারণ ও বাঙালী। ম্যাট্রিক পাস করতে পারেনি, কোথাও চাকরি জোটেনি, পরের-কাছ-থেকে-চেয়ে-আনা-খবরের কাগজ পড়ে কাঁকড়ার মতো হাত পা নেড়ে রাজা-উজির মারে। অসংখ্য দোষ, তবু ওর দোকান থেকেই কিনি, কারণ ও বাঙালী—।" হর্ষডাক্তার ক্রোধভরে ডিশে ঢালিয়া ঢালিয়া চা-টা এমনভাবে খাইতে লাগিলেন যেন ঔষধ খাইতেছেন। তাহার পর বলিলেন, "ওর ঠিক দোষও নেই। বাজারে সব চা-ই খারাপ। আট টাকা পাউণ্ডের নীচে ভালো চা পাওয়া যায় না, কিন্তু তা কেনবার সামর্থ্য নেই"। তাহার পর বলিলেন, "এক মহা ভুল করেছি সর্বস্বান্ত হয়ে বাড়িটা কিনে। মনে হ'ল শেষ বয়সে মাথা গোঁজবার একটা জায়গা হবে। প্র্যাকটিস যদি ঠিক থাকত তাহলে শেষ পর্যন্ত হয়তো সামলে যেতাম। মেয়ের বিয়ের খরচ, ছেলেদের পড়বার খরচ রোজকারেই করে ফেলতাম হয়তো। কিন্তু হঠাৎ চারিদিকেই ডিপ্রেশন এসে গেল। লোকের হাতে পয়সা নেই, ডাক্তার ডাকবে কোথা থেকে। যারা ডাকছে তারা ফি দিতে পারে না, অনেক সময় ঔষুধও কিনতে পারে না"। ডাক্তারবাবুর বড় মেয়েটি একটি ডিশে করিয়া কিছু ভাজা মশলা দিয়া গেল।

তিনি ভাজা মশলা মুখে ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "তার উপর এক কাল ব্যাধি শরীরে ঢুকেছে। প্র্যাকটিস করবার সামর্থ্যও কমে আসছে ক্রমশ—"

"কি ব্যাধি?"

"রেনাল কলিক। যখন হয় তখন কাটা পাঁটার মতো ছটফট করি। মর্ফিন নিতে হয়।"

চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার মেয়েরাই বুঝি বড়?"

"হ্যাঁ। সংসারের ভার নেবার মতো ছেলে কেউ তৈরি হয়নি এখনও। বেশী বয়সে বিয়ে করেছিলাম, প্রথমে গোটা-কতক মেয়েই হয়ে গেল। তারপর-ছেলে। বড়ছেলে ক্লাস সিক্সে পড়ে"।

"একটি মেয়েরও বিয়ে দেননি?"

"দিতে পারিনি। ওইতো চেহারা দেখলেন। কারো পছন্দ হয় না। একজনের পছন্দ হয়েছে, সে নগদ দশ হাজার টাকা চায়। কোথা পাব বলুন। সুতরাং 'যা হবার হবে' এই সুরটুকু ধরে দার্শনিক হয়ে বসে আছি।"

এইভাবেই হর্ষ ডাক্তারের সহিত সেদিন পরিচয় শুরু হইয়াছিল। তাহার পর পরিচয় ক্রমশ গাঢ়তর হইয়াছে। কলিকের ব্যথা হইলে এখন আমিই গিয়া তাঁহাকে রাত্রে মরফিন্ ইনজেকশন দিয়া আসি। আমি যদি তাঁহার স্বজাতি হইতাম তাহা হইলে আমিই তাঁহার বড় মেয়ে শৈলীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার ভার কিছু লাঘব করিতাম। অসবর্ণ বিবাহে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু হর্ষবাবুর ছিল। তিনি কথায় কথায় একদিন বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি আমাদের স্বজাতি হতে তাহলে তোমার সঙ্গেই শৈলীর বিয়েটা অনায়াসে হতে পারত। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি বদ্যি—"

আমি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলাম, "অসবর্ণ বিবাহ তো আজকাল প্রায়ই হয়।"

"তা জানি। কিন্তু তোমার বাবা মা বেঁচে আছেন, তাঁদের মনে কষ্ট দিতে চাই না। তাছাড়া এসব ব্যাপারে চিরাচরিত পথ ত্যাগ করতে ভয় হয়। যারা ত্যাগ করেছে তারা দেখি প্রায়ই অসুখী। অবশ্য এর থেকে কিছু প্রমাণিত হয় না। যারা অসবর্ণ বিবাহ করেনি তাদের মধ্যেও অনেকে অসুখী। কিন্তু তোমার বাবা মার মনে কষ্ট দিয়ে কিছু করতে চাই না। যে পাত্রটি দশ হাজার টাকা চাইছে, তার এখনও বিয়ে হয়নি। আবার চিঠি লিখেছি তাদের। বাড়িটা বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা যোগাড় হয়ে যাবে। আমার এক ধনী রোগী আশ্বাস দিয়েছেন। দেখি যাবে সব—"

তখন বোধহয় রাত্রি একটা।

হর্ষবাবুর চাকরের ডাকে ঘুম ভাঙিয়া গেল। "শিগ্‌গির চলুন, বাবু কলিকের ব্যথায় ছটফট্ করছেন।"

তাড়াতাড়ি গেলাম।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমার ব্যাগে মর্ফিনের একটা নতুন প্যাকেট আছে। তার থেকেই একটা অ্যামপুল বার করে নাও।"

ব্যাগ খুলিয়া দেখিলাম নামজাদা এক কোম্পানীর আনকোরা নূতন একটি প্যাকেট রহিয়াছে। তাহা হইতেই একটি অ্যামপুল (ampule) বাহির করিয়া ডান হাতের উপরের দিকে ডেলটয়েড্ মাস্‌লের (deltoid muscle) উপর ইন্‌জেক্‌শনটি দিলাম। দিয়াই চলিয়া আসিলাম। মরফিন দিলেই উনি ঘুমাইয়া পড়েন, আশা করিলাম সেদিনও পড়িবেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে আবার তাঁহার চাকর আসিয়া ডাকাডাকি শুরু করিল।

"বাবুর যন্ত্রণা কমেনি। যেখানে ইন্‌জেকশন দিয়েছেন সেখানটাও খুব ব্যথা করছে। আপনি আর একবার চলুন।"

গেলাম।

হর্ষবাবু বলিলেন, "ওহে এ যে হিতে বিপরীত হল দেখছি। কলিক কিছু কমেনি, হাতটাও ব্যথা করছে। তুমি এ হাতে আর একটা দিয়ে দাও। ওতে মরফিনের Strength বোধ হয় কম আছে।"

এত তাড়াতাড়ি উপর্যুপরি মরফিন দেওয়া অনুচিত। তাই একটু ইতস্তত করিতেছিলাম। কিন্তু হর্ষবাবু ধমকাইয়া উঠিলেন।

"আরে দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। মরফিন নেওয়া অভ্যাস আছে আমার, কিছু হবে না।"

দিয়া দিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে চাকরটা আবার আসিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল।

"ব্যথা কিছু কমেনি, আরও বেড়েছে। আপনি শিগ্‌গির আসুন।"

গিয়া দেখিলাম ডান হাত বাঁ হাত দুইটাই বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। লালও হইয়াছে বেশ। মরফিন্ ইনজেকশন আগেও অনেক দিয়াছি, কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা কখনও হয় নাই। মরফিনের পথে না গিয়া এবার অন্য পথে হর্ষবাবুর চিকিৎসা করিলাম। ভগবানের দয়ায় সুফলও ফলিল। দুই হাতের ফোলাটা কিন্তু কমিল না। দুইহাতেই অ্যাবসেসের (Abscess) মতো হইয়া মাংস পচিয়া বাহির হইতে লাগিল। হর্ষবাবু প্রায় মাসখানেক শয্যাগত রহিলেন এবং তাঁহার হাত দুইটি একেবারে অকর্মণ্য না হইলেও বেশ দুর্বল হইয়া পড়িল। আমি বেশ লজ্জায় পড়িয়া গেলাম। হর্ষবাবু হয়তো ভাবিতেছেন আমি ইন্‌জেকশন দিবার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করি নাই তাই এই দুর্ঘটনাটি ঘটিয়াছে। হঠাৎ একদিন আমার সন্দেহ হইল, ইন্‌জেক্-

শনের ঔষধের মধ্যেই কোন গোলমাল নাই তো। একটি অ্যাম্পুলে বাহির করিয়া কেমিকাল এক্‌জামিনের জন্য পাঠাইয়া দিলাম। উত্তর যাহা আসিল তাহাতে অবাক হইয়া গেলাম। অ্যাম্পুলে মরফিন নাই, আছে সাইট্রিক অ্যাসিড **(citric acid)**! অবিলম্বে সেই কোম্পানীর কর্তাকে চিঠি লিখিলাম। কেমিক্যাল এক্‌জামিনারের সার্টিফিকেটের নকল এবং তাঁহাদের প্যাকেটের নম্বর পাঠাইয়া দাবী করিলাম — অবিলম্বে যদি খেসারতের ব্যবস্থা না করেন, আপনাদের নামে মকোর্দমা করিব। কর্তা তারযোগে জানাইলেন, হর্ষবাবুকে লইয়া চলিয়া আসুন। আপনারা যাহা বলিবেন তাহাতেই আমরা রাজি হইব।

হর্ষবাবুকে বলিলাম, "চলুন, শৈলীর বিয়ের টাকাটা আদায় করে আনি।"

"হ্যাঁ চল। ভগবান দয়া করেছেন।"

কোম্পানীর কর্তা আমাদের রাজ-সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন, 'আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আপনার যে কষ্ট হয়েছে তার জন্যে আমরা বিশেষ লজ্জিত। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আপনারা খেসারত স্বরূপে যা চাইবেন তা আমরা এখুনি দিয়ে দেব। তবে একটি অনুরোধ আছে, কথাটা যেন জানাজানি না হয়ে যায়।'

আমরা পরামর্শ করিয়াই গিয়াছিলাম। হর্ষবাবু পনেরো হাজার টাকা দাবী করিলেন। ম্যানেজার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল ভাবিলেন, তাহার পর পনেরো হাজার টাকার একটি চেক লিখিয়া দিলেন।

সবিনয়ে আর একবার বলিলেন, "অনুগ্রহ করে কথাটা গোপন রাখবেন।"

আমরা আপিস হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর গিয়াছি, এমন সময় এক নাটকীয় কাণ্ড ঘটিল। 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে এক ছোকরা আমাদের পিছু পিছু ছুটিয়া আসিল এবং আমরা দাঁড়াইবামাত্রই সে হর্ষবাবুর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিল, 'আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু'। হর্ষবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি?"

"আমি প্যাকার। যে প্যাকেটে মরফিনের বদলে সাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া গেছে সে প্যাকেট আমিই প্যাক করেছিলাম। আমার চাকরি গেছে। আমার একঘর ছেলে-মেয়ে, বিধবা মা, বিধবা বৌদি, অপোগণ্ড ভাই, ভাগনা— আমার ওই চাকরির উপরই সবার নির্ভর।

"আমি কি করব। আমাকে যা প্যাক করতে দিয়েছে, আমি তাই প্যাক করেছি। আমার বিদ্যেই বা কি, বিশ্বাস করুন আমি জেনে কিছু করিনি। যা পেয়েছি তাই প্যাক করেছি—।" আপিসে গিয়া ডাক্তারবাবু ম্যানেজারকে চেকটি ফেরত দিয়া বলিলেন, "এই গরীবের চাকরিটি

"তুমি যদি......স্বজাতি হ'তে......বিয়েটা অনায়াসেই হ'তে পারত"

আমার চাকরি গেলে এতগুলো প্রাণী মারা যাবে। দয়া করুন আমাকে।" ছোকরা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হর্ষ ডাক্তার বিব্রত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন।"

আবার আমরা সেই কোম্পানির আপিসে ফিরিয়া গেলাম। পথে যাইতে যাইতে হর্ষ ডাক্তার চোখ পাকাইয়া বলিলেন—"তুমি কি কাণ্ড করেছ তা জান? আমার দুটো হাতই জখম হয়ে গেছে।"

খাবেন না। এইটুকুই আমি চাই। আমার যা হবার তাতো হয়েছে, গরীবের অভিশাপ আর কুড়োতে চাই না।"

আপিস হইতে গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। পথে আমাকে বলিলেন, "থ্যাঙ্ক ইউ—"

"হঠাৎ আমাকে থ্যাঙ্ক ইউ কেন!"

"তুমি আমাকে এই মহত্ত্বটা আস্ফালন করবার সুযোগ দিলে বলে।"

বলিয়া হা-হা করে হাসিয়া উঠিলেন।

।। ১ ।।

টোডা পল্লী থেকে লিখছি তোমাকে, পল্লী মানে পাঁচ-ছয়টি ঘরের সমষ্টি। একটি ছোট পাহাড়ের গা-কেটে খানিকটা জায়গা তৈরী করা হয়েছে আর তাতেই স্থান পেয়েছে ঘরগুলি। এক পাশে টোডাদের মন্দির। আকৃতিতে অন্য ঘর-গুলি থেকে খুব একটা স্বাতন্ত্র্য নেই, তবে মন্দিরের অনুষ্ঠান বিচিত্র, আর টোডা সমাজ জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে এই মন্দির। মন্দির বলতে আমাদের মনে যে ছবির আভাস উঠে তার সঙ্গে এ মন্দিরের খুব একটা সম্বন্ধ নেই। সে সব কথা ধীরে ধীরে বলা যাবে।

মন্দির থেকে একটু দূরে সামান্য ঢালু জায়গাতে রয়েছে একটি বড় পাথর, তার উপরে বসেই লিখছি। ঘাসে ঢাকা পাহাড়টি ধীরে ধীরে নেমে এসেছে। আসলে পাহাড়টি একটি বিস্তৃত মালভূমির অংশ। সমস্ত মালভূমিতে রয়েছে এ রকম ঘাসে-ঢাকা বহু ছোট-বড় পাহাড়। পূব দিকটার প্রান্তদেশে রয়েছে ইউকিলিপটাস গাছের সারি। হঠাৎ ছুটে আসা বাতাসের সঙ্গে তাদের মাতামাতি শুরু হয়ে যায় যখন-তখন, আর শোনা যায় শন শন শব্দ। ডান দিকটার জমি পাহাড় থেকে নেমে কিছু দূর পর্যন্ত সমতল হয়ে চলে গিয়েই আবার খাড়া নেমে গেছে আর সৃষ্টি করেছে ছোটখাট একটি উপত্যকার। ঢালু জমিতে রডডেনড্রন গাছে ফুটে আছে ফুল স্তবকে স্তবকে। তাতে ফাগের রঙ। দূরে ধোঁয়াটে পাহাড়ের হাট, মিলে গেছে দিগন্তে।

জায়গাটি উটকামণ্ড থেকে মাইল কয়েক দূরে। টোডা পল্লীর বেশী ভাগই পাবে উটকামণ্ডের পনের বিশ মাইলের ভিতর। নীলগিরির কোলে ঠাঁই নিয়েছে এরা। টোডা জীবনের পটভূমি নীল-গিরির উপত্যকা অধিত্যকা। এই পটভূমি সম্বন্ধে লিখছি দু-চার কথা।

নীলগিরি জেলা মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে। উত্তরে আর উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে মহীশূর প্রদেশের অংশ আর পশ্চিমে মালবার। পূব দিকে মাদ্রাজের কয়মটোর জেলা। মাদ্রাজ থেকে নীলগিরি এক্সপ্রেস ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় সাড়ে তিনশ মাইল রাস্তা পার হয়ে আসলে পাওয়া যাবে মেট্টোপলিয়ম ষ্টেশন। মেট্টো-পলিয়ামে এসে ব্রডগজ লাইন শেষ হয়ে গেছে। সহরটি প্রায় সমতলভূমির উপরেই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা সামান্যই। শৈলশ্রেণী যেন হঠাৎ ভুঁই-ফুড়ে উঠেছে। টানা পাহাড়ের তরঙ্গ উঠে গেছে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট পর্যন্ত। উঠে গিয়ে সৃষ্টি করেছে নীলগিরির মালভূমি। সেই মাল-ভূমিতে জটলা করেছে বহু ছোট-বড় পাহাড়। পাহাড়ের ভিতর উচ্চতম হল ডোডাবেটা—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই উচ্চতা ৮৬০০ ফিট। উটকামণ্ড সহরের উপর প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। মেট্টো-পলিয়ম থেকে উটকামণ্ডের দূরত্ব হবে মাইল-ত্রিশেক। মিটারগজের লাইন ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে উত্তর দিকে উটকামণ্ড পর্যন্ত। উটকামণ্ড সহরের উচ্চতা ৭০০০।৭৫০০ ফিট।

নীলগিরি মালভূমির দৈর্ঘ ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইলের ভিতর আর প্রস্থ দশ থেকে পঁচিশ। মালভূমির তিন হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত গভীর জঙ্গলে ঢাকা। তারপর যে গাছপালার শুরু হয়েছে তার সঙ্গে নাতিশীতোষ্ণ জল-বায়ুর গাছপালার সাদৃশ্য রয়েছে। মাল-ভূমির ভিতরের দিকে রয়েছে গম্বুজের মত ছোট-বড় পাহাড়—ঘাসে ঢাকা। পাহাড়ের গায়ে রয়েছে নরম উর্বর মাটি। সে মাটি থাকে-থাকে কেটে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। পাওয়া যায় প্রচুর বাঁধা-কপি, আলু, আরও অনেক কিছু। বন-বিভাগ অনেক আগেই আরম্ভ করেছে ইউকিলিপটাসের চাষ। উটকামণ্ডের চার দিকেই দেখতে পাবে ইউকিলিপটাসের বন, পাহাড়ের গায়ে গায়ে, আর আছে চা ও কফির চাষ অল্প-বিস্তর, শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশকারীদের কৃপায়।

বুঝতেই পারছ নীলগিরির মাল-ভূমির প্রসার বেশী নয়। তবুও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য রয়েছে এই অল্প-বিস্তর প্রসারের ভিতরই। আট-দশ মাইল অন্তর অন্তর প্রকৃতির নূতন নূতন রূপ দেখবে। উটকামণ্ডের কিছু দূরেই রয়েছে বনভূমি—যাকে বলা হয় শোলা, ইউকিলিপটাস ছাড়াও বহু রকম গাছ রয়েছে সেখানে, সে সবের নাম আমি জানি না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বনে-জঙ্গলে কাটিয়েছি অনেক

টোডাদের বাসগৃহ

দিন, কিন্তু কোথাও এত রঙিন ফুলের সমারোহ দেখিনি। যেখানে-সেখানে রয়েছে বনগোলাপ, বনজবা, রডডেনড্রেন আর ড্যাফোডিলেরা রঙের হাট বসিয়ে। আর রয়েছে কত বিচিত্র ঘাসের ফুল। বনের চারদিকে রয়েছে ঘাসের সবুজ প্রলেপে ঢাকা পাহাড়ের ঢেউ।

মালভূমির বিভিন্ন স্থানের ভিতর বৃষ্টিপাতের তারতম্য রয়েছে প্রচুর। কোথাও বছরে ১৫০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হচ্ছে কোথায়ও বা ৩০ ইঞ্চি। তাই একই উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানের ভিতরও উদ্ভিজ্জের বৈচিত্র্য রয়েছে। পাহাড়ে পাহাড়ে রয়েছে অজস্র ঝর্ণা। সে ঝর্ণা খাড়া পাহাড় থেকে নেমে ছুটে চলেছে উপত্যকা-অধিত্যকার ভিতর দিয়ে। মালভূমির ধারে কুন্দার ধূসর পাহাড় শ্রেণীর ভিতর দিয়ে চলে গেছে পাহাড়ে নদী। সাদা মেঘেরা জটলা পাকায় পাহাড়ের গায়ে—মনে হয় তারা মাটির পৃথিবীতে নেমে এসে পাহাড়ের সঙ্গে কোলাকুলি করে। সন্ধ্যার মেঘে-পাহাড়ে শুরু হয় আবির খেলা, আর মাথার উপরে যে মেঘ থাকে তাতে লেগে যায় রঙের মাতামাতি।

নীলগিরির জলবায়ু আর তাপে একটা সাম্য রয়েছে। শীত-গ্রীষ্মের তাপাঙ্কে খুব একটা পার্থক্য নেই। শীতকালে তাপাঙ্ক সাধারণতঃ চার থেকে কুড়ি ডিগ্রীর ভিতর ওঠানামা করে আর গ্রীষ্মকালে দশ থেকে পঁচিশের ভিতর। মৌসুমী বায়ুর প্রভাব মাল-ভূমির পশ্চিম দিকেই বেশী। যতই পূব দিকে যাবে দেখতে পাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ততই কমে আসছে।

মালভূমির অভ্যন্তরে যে ঘাসে ঢাকা পাহাড় রয়েছে, তাতেই টোডারা ঘর বেঁধেছে। উপত্যকাতে চরে বেড়ায় তাদের মোষ। পাহাড়ের ঘাস জোগায় তাদের খাদ্য। মোষেরা জোগায় টোডাদের দুধ, মাখন, ঘোল। জোগায় তাদের ভাত, কাপড়। এই তৃণভূমিতেই গড়ে উঠেছে টোডাদের মোহিষ-কেন্দ্রিক জন-জীবন, সমাজ-জীবন, ধর্মজীবন, সব কিছু। সেই টোডাদের মাঝেই আমি কাজ করছি, আর লিখছি তোমাকে।

।। ২ ।।

পাঁচ-ছয়টি কুঁড়ে নিয়ে এক একটি টোডা পল্লী আর এক একটি পল্লীতে আছে তিন থেকে পাঁচটি পরিবার। শুনে হয়তো অবাক হয়েছ একটু। মাত্র এ কটি পরিবার নিয়ে পল্লী হয় নাকি?—হতেই হবে। টোডারা যে মোষ প্রতিপালনের উপর বেঁচে আছে! এত আর কৃষির উপর নির্ভরশীল সমাজ নয় যে, পরিমিত জমিকে কেন্দ্র করে ঘন-বসতির গ্রাম গড়ে তুলবে। চারটি পরিবার যদি জীবিকার জন্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে মোষের উপর নির্ভর করে তবে কতগুলি মোষের প্রয়োজন হবে, বিশেষতঃ সে মোষ যদি নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েও সে রকম দুগ্ধবতী না হয়? আর সে মহিষ পাল খাদ্যের জন্য যদি একান্ত-ভাবে ঘাসের উপর নির্ভরশীল হয় তবে কতটা তৃণভূমির প্রয়োজন হবে তা সহজেই অনুমান করতে পার। কাজেই টোডাদের বসতি ঘন হতে পারে না। পল্লীর নাম হচ্ছে মাণ্ড। বিভিন্ন পল্লী বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন মুটানড মাণ্ড, কান্ডেল মাণ্ড, খজুরী মাণ্ড ইত্যাদি। বেশীর ভাগ মাণ্ডই পাহাড়ের তৃণভূমির মাঝখানে। নির্দিষ্ট মাণ্ডের মোটামুটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চারণভূমি রয়েছে।

কয়েক দিন হল মুটানড মাণ্ডে এসেছি, টোডাদের ভিতর কাজ করার প্রথম ক্যাম্প। টোডাদের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রথম অভিজ্ঞতা বলি। এই মাণ্ডে আসার পথেই পরিচয় হয়। বালসুন্দরম নামে এক তামিল ভদ্রলোক সাহায্য করছেন আমাকে—বিশেষতঃ ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম ভাষাতে। টোডা-দের ভাষা তামিল বা অন্য কোন দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাই নয়। ভাষা টোডা ভাষাই, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা যাবে সময়মত। তবে এদের তামিল বলতে বা বুঝতে কষ্ট হয় না। ছোট ছেলেমেয়েদেরও নয়।

বাস থেকে নেমে একটা চড়াইয়ে উঠতে হয়। চড়াইয়ের পর সামান্য

টোডাপল্লী

উতরাই, তারপর আবার চড়াই। এভাবে আমরা ক্রমেই উপরে উঠতে লাগলুম। সমস্ত মালভূমি জুড়ে রয়েছে ঘাসের আস্তরণ। একটা কল কল করে ছুটে যাওয়া ঝর্ণা পার হতে হল। ঝর্ণার এদিক সেদিকে ছাই রঙের তারা ফুলের ঝোপ রয়েছে অজস্র। চড়াইয়ের উপর দাঁড়ালে দেখা যায় চরে বেড়ান মোষের দল—টোডাদের মোষ। সাধারণ মোষ থেকে একটু স্বতন্ত্র রকমের। আকারে কিছুটা বড়। বড় এক জোড়া শিং প্রথমেই চোখে পড়ে। শিং বেঁকে পিছনের দিকে যায়নি, গেছে উপরের দিকে। রঙ সামান্য বাদামী, এমনিতে শান্ত হলেও বিদেশী পোষাকে ঢাকা মানব শরীরকে এরা তেমন পছন্দ করে না; স্বভাবটি তখন কি রকম বুনো হয়ে যায়। অতি উৎসাহী অনেক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক শিংয়ের গুঁতোয় বেশ জখম হয়েছেন, এ রকম নজীর আছে অনেক।

তখন আমরা গন্তব্যস্থল মুথানড মাণ্ড থেকে মাইল খানেক দূরে। একটা চড়াইয়ে উঠতেই দেখি অন্য দিক থেকে দুটি লোক উঠে আসছে। মনে হল আমরা যে দিকে যাচ্ছি ওরাও সে পথই ধরবে।

বালসুন্দরন বল্ল, বোধ হয় টোডা—হ্যাঁ টোডাই বটে।

থেমে গেলুম। তারা এগিয়ে এল। আমাদের থামতে দেখে একটু যেন বিস্মিত হয়ে তারাও থেমে গেল আমাদের সামনে এসে। ভাল করে চেয়ে দেখলুম। মনে হল গ্রীক অতীত ইতিহাসের দুজন দার্শনিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অথবা দুজন মধ্যযুগের খৃষ্টান ধর্মযাজক। মহাভারতের ঋষিরা রোমান পণ্ডিতদের ঢিলা পোশাক পরে যদি হঠাৎ এসে দাঁড়াতেন তবে হয়তো এমনই দেখাত। বয়স তাদের কত তা ঠিক বুঝতে পারিনি। কারণ উন্নত নাক ভরা ঠোঁট ছাড়া সবই দাড়ি-গোঁফে ঢাকা। দাড়ি-গোঁফ ঘন, ফাঁক পড়েনি কিছুমাত্র। দীর্ঘ গঠন, বলিষ্ঠ শরীর। মজবুত কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায় হাত-পায়ের গড়নে, বুক প্রশস্তই মনে হয়, তবে বুঝবার উপায় নেই, কারণ চাদরে ঢাকা। রঙ একটু বা তামাটে শ্যামবর্ণ। মাথা ঘন চুলে ঢাকা। কানের পাশ দিয়ে ঘাড়ের উপর দিয়ে গোল হয়ে চলে গেছে, যেন খাটো করে বব করা চুল। ঘন কাল ভ্রূ-যুগল কপালে এসে মিশেছে টানা চোখে আছে প্রশান্তি আর বুদ্ধির ইঙ্গিত।

টোডা রমণী

চাদর হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলে আছে। শুধু ডান হাত আর ডান কাঁধের খানিকটা অংশ ছাড়া সমস্ত শরীর চাদরে ঢাকা। এ হল টোডাদের বিশেষ চাদর। দশ হাত লম্বা আর তিন হাত চওড়া সাদা মোটা কাপড় দু-ভাঁজ করে তৈরী করা হয়েছে। প্রান্তে চওড়া লাল সুতোর বর্ডার আর কাল সুতোর বিচিত্র কাজ, তাতে রয়েছে টোডা মেয়েদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য বোধের পরিচয়। প্রায় দেড় হাত জুড়ে নিপুণ হাতের কাজ। চাদরটি এমনভাবে পরা হয়েছে যাতে কারুকার্যের দিকটা বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের সামনের সমস্ত জায়গাটা ঢেকে যায় এবং সহজেই চোখে পড়ে। টোডাদের এই বিশেষ চাদরের নাম পুটকুলী। চাদরের নীচে কিন্তু আর কিছু নেই, নেই কোন সার্ট বা ফতুয়া। নিম্নাংশ একটি ছোট কাপড়ে জড়ান। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সমস্তটাই খালি। পা ঢাকবার কোন প্রচেষ্টাই নেই পাদুকাতে। নীলগিরির ঠাণ্ডা আবহাওয়া উপেক্ষা করার মতন নয়। টোডারা কিন্তু এই পুটকুলী দিয়েই শীত আটকায়। শীতের সকালে ভিজা মাঠের হিমশীতল স্পর্শ অনায়াসেই খালি পায়ে গ্রহণ করে, যা আমাদের কল্পনার বাইরে।

বালসুন্দরন বল্ল, নমস্কার ভাই, মুটোনণ্ড মাণ্ডে যাচ্ছি। তারা ধীরে ধীরে হাত তুলে প্রতি নমস্কার করল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। যার বয়স একটু কম সে ধীর গলায় বল্ল, আমরাও যাচ্ছি! আমরা মুটোনণ্ড মাণ্ডেরই লোক।

গলার স্বর একটু গম্ভীর আর জোরালো। মনে হল গম্ভীর স্বরে কথা

বলছে ভেবেচিন্তে। হৈ চৈ করে কথা বলা বা উচ্ছ্বসিত ভাব প্রকাশ করা এদের স্বভাব বিরুদ্ধ। সমস্ত অবয়বের সঙ্গে যেন এই ভাবটা মিলে গেছে। মনে হবে এদের প্রকৃতিও গুরুগাম্ভীর। কিন্তু পরে জেনেছি তা ঠিক নয়। একটু স্বল্প আর ধীর ভাষী বটে তবে মনের দরজা আটকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা নেই এদের। বিস্তৃত চারণ-ক্ষেত্রের নির্জন উপত্যকায় যারা যুগের পর যুগ মোষ চরিয়ে এসেছে, সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করা সত্ত্বেও যারা পাহাড়ের উপরে মাত্র তিন-চারটি পরিবারে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে আর নীলগিরির নিবিড় বনে এককভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে জীবনের বহুদিন, তাদের গলার স্বর ধীর গম্ভীর আর জোরালো হওয়াটাই স্বাভাবিক। দীর্ঘ শক্তিমান দেহের সঙ্গে গলার স্বরের একটা সামঞ্জস্য রয়েছে।

আমরা হাঁটতে শুরু করলুম সবাই। টোডারা সাধারণভাবেই হাঁটছিল, কিন্তু আমাদের পক্ষে এই সাধারণ হাঁটার সঙ্গেও পাল্লা দেওয়া মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল। প্রাণপণেই হাঁটতে শুরু করলুম। মানুষ যে চড়াই উতরাই ভেঙে মাইলের পর মাইল এত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না। বালসুন্দরন বলেছিল, এক একটি টোডা যেন এক একটি চলন্ত গাড়ী। পৃথিবীর কোন দেশের লোকই বোধ হয় এদের সঙ্গে হাঁটার পাল্লায় জয়ী হতে পারবে না। অথচ হাঁটার ভিতর কিছুমাত্র ব্যস্ততা নেই, বরং প্রত্যেকটি পদক্ষেপে আছে আভিজাত্যের ছোঁয়াচ। ষাট বছর বয়সের বৃদ্ধের পক্ষেও চড়াই উতরাই ভেঙে বিশ পঁচিশ মাইল রাস্তা হাঁটা কিছু নয়। অনায়াসে তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড় পার হয়ে যায়।

টোডাদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল বালসুন্দরনের। বালসুন্দরন স্থানীয় লোক, কাজেই তার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য নেই তেমন, যতটা আমার সম্পর্কে। মনে হল টোডাদের বেশীর ভাগ প্রশ্নই আমাকে কেন্দ্র করে। আমি কিন্তু ভাবছিলুম অন্য কথা। ভাবছিলুম দীর্ঘ সবল লোমশদেহ উন্নত নাক, ঘন চুল, দাড়ি-গোঁফ ঢাকা মুখ, আজানুলম্বিত পুটকুলী, গুরুগম্ভীর জোরালো গলা নিয়ে টোডারা যে স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলেছে তার জুড়ি পাওয়া যাবে না ভারতের উপজাতি অনুপজাতি কারও ভিতরেই। এই নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চলেই আছে আরও কয়েকটি উপজাতি—কোটা, ইরুলা, কুরুম্বা আর পানিয়ানবা। কোন উপজাতির সঙ্গেই এদের মিল নেই আকৃতিতে আর উপজীবিকার ভিত্তিতে। আচার পদ্ধতিতেও রয়েছে বিরাট ব্যবধান। সোয়াশ' বছর আগে যখন ইংরেজরা নীলগিরির মনোরম জলবায়ু আর প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে, তখনই টোডাদের চেহারা চরিত্রের আভিজাত্য আর বিচিত্র পদ্ধতির কিছুটা তাদের চোখে পড়ে। তারা নিমন্ত্রণ করে আনে তাদের ধর্মযাজক ও নৃতত্ত্ববিদদের। তাঁরা টোডা জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশন করে গেছেন। টোডাদের এই স্বাতন্ত্র্য কোনকোন নৃতত্ত্ববিদদের এমন অভিভূত করে ফেলেছিল যে, তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন টোডাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতীয় হিন্দু বা অন্যান্য উপজাতিদের পূর্বপুরুষদের কোন সম্বন্ধ নেই। আসলে তারা এসেছিল সুমেরিয়া থেকে। নীলগিরির দুর্গম অঞ্চলে চলে আসার পর প্রধান শাখা হতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নীলগিরির বন আর পাহাড় দক্ষিণ ভারতের জনগণ থেকেও তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে। সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থেকে তারা তাদের মহিষ-কেন্দ্রিক চারণ-জাতির সংস্কৃতি গড়ে তোলে। কিন্তু অধিকাংশ নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব আর সমাজ-তত্ত্ববিদরাই সে কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন টোডাদের রক্তে রয়েছে ভারতীয় জনগণেরই রক্ত। ভারতের মাটির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ যুগ যুগ ধরে।

ক্রমে মুটানন্ড মান্ডের কুঁড়েগুলি চোখে ভেসে উঠল। একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে মান্ড পর্যন্ত চলে গেছে। উপরে উঠে দেখি ঘরগুলির সামনে ঢালু খোলা জায়গায় জনচারেক টোডা বসে আছে। বেশভূষা আর আকৃতি ঠিক আমাদের সাথী টোডাদের মতই। তবে বয়সে যে সবচেয়ে প্রবীণ তার মাথা পাগড়ি দিয়ে ঢাকা। মুখের সাদা দাড়ি-গোঁফের প্রাচুর্য ঋষির কথা মনে করিয়ে দেয়। টোডারা পাগড়ি পরত না, হয়ত বা এখন বাড়াগা উপজাতিদের কাছ থেকে পাগড়ি পরা শিখেছে দু-চারজন। আমা-

দের দেখে সবাই যে একটু অবাক হল তা বলাই বাহুল্য। যে দুজন টোডা আমাদের সঙ্গে এসেছিল তাদের একজন এগিয়ে গেল প্রবীণ লোকটির কাছে আর বালসুন্দরনের কাছে আমাদের যে পরিচয় পেয়েছিল তাই বোধ হয় বল্ল তার কাছে। একজন উঠে গিয়ে মাদুর এনে বিছিয়ে দিল আমাদের বসার জন্য।

নমস্কার বিনিময়ের পর আমি বল্লুম, তোমাদের কাছে এসেলুম তোমাদের দুধ মাখন খেতে।

সবাই হেসে উঠল। নিঃশব্দ মৃদু হাসি। তারপর চুপচাপ।

উবগর (প্রবীণতম লোকটির নাম) একটু পরে মৃদু হেসে বল্ল, তবেতো আমাদের এখানে থাকতে হবে তোমাদের।

—থাকতেই তো এসেছি, যদি অবশ্য থাকতে দাও।

উবগর বল্ল, টোডাদের কাছ থেকে কেউ ফিরে যায় না। সবাই আমাদের অতিথি। একটি ঘর খালি আছে, তা তোমাদের ছেড়ে দেওয়া যায়। থাকতে পারবে তো? এ ঘর কিন্তু তোমাদের ঘরের মত নয়।

—থাকতে পারব না কি রকম তা দেখা তো যাক।

—তবে ঘরটি দেখে যাও।

উবগরের সঙ্গে গেলুম। ঘরগুলির সামনে যেতেই অবাক হয়ে গেলুম। সবগুলি ঘর একই রকম দেখতে। ঘরের চালা দুদিকে ঢালু হয়ে গেছে প্যারাবোলার মত, চালার ধার মাটি থেকে মাত্র তিন ফুটের মত উঁচু। শুকনো ঘাস দিয়ে ছাওয়া থাকে। প্রত্যেকটি ঘর প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা দশ ফুট চওড়া আর উচ্চতাতেও ঐ রকমই। ঘরে ঢোকার যে পন্থা করা হয়েছে তা সকলের আগে চোখে পড়ে। ঢোকার ঠিক দরজা নেই, তবে দরজার মত রাস্তা আছে। তা আড়াই ফুটের মত উঁচু আর দেড় ফুটের মত চওড়া। কি করে টোডাদের মত দীর্ঘদেহ লোকগুলি ঘরের ভিতর যায় তাই ভাবছিলুম। এমন সময় দীর্ঘ একটি লোক প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসল। উবগর হেসে বল্ল, এভাবে হামাগুড়ি দিয়ে কায়দা কানুন করে ঘরে ঢুকতে হবে।

• কোন জানালা নেই। সামনের আর পিছনের দেয়াল কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী। তক্তা কেটেই ঢুকবার রাস্তা করা হয়েছে। ঘর বাঁধবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে বেত বা লতা জাতীয় জিনিষ।

—ভিতরে যাব?

—নিশ্চয়ই। তবে জুতো খুলে যাবে।

আমার ছোট দেহখানি নিয়ে ঘরে ঢুকতেও অনেক সার্কেসী কসরৎ করতে হল। একটা ঝাঁপ দিয়ে ঢোকার খোলা জায়গাটি আটকান হয়। ভিতরে ঢুকে দেখি ঘরে খোলা বাতাস ঢোকার কোন রাস্তা রাখা হয়নি। একই ঘরে রান্না হয়, খাওয়া হয় আর শোওয়া হয়। কাঠ দিয়ে রান্নার সময় ধোঁয়া জমাট হয়ে উঠে। বের হবার রাস্তা পায় না। শুধু টোডা মেয়েরাই এত ধোঁয়ায় রান্না করতে পারে। ঘরের ভিতর জায়গা আছে মন্দ নয়। মাথা উঁচু করে হাঁটতে কষ্ট হয় না। একধারে দু' ফুট উঁচু মাচা। মাটি দিয়ে তৈরী। তক্তপোশের মত ব্যবহার করা হয় শোবার জন্য। তক্তা দিয়েও তৈরী করা হয় সময় সময়। ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে রান্না করার উনুন আর কিছু আসবাবপত্র উঁচু জায়গায়। আর এক দিকে রয়েছে জ্বালানী কাঠের স্তূপ—মেজে থেকে ছাদ পর্যন্ত।

বের হয়ে আসলুম।

—ভারী চমৎকার তোমাদের ঘর, আরামেই থাকব।

উবগর খুসী। ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগল তাদের বস্তি। একটা ঘর খানিকটা দূরে, আকারে একটু বড় প্রকারে অন্য ঘরগুলির মতই। তবে সামনের দিকটা কাঠ দিয়ে তৈরী নয়, পাথর দিয়ে তৈরী। পাথর কেটে কেটে দু'-চারটি মূর্তি তৈরী করা হয়েছে দেয়ালে অস্পষ্টভাবে। ঘরটির চারদিক পাথরের দেয়ালে ঘেরা, শুধু সামনের দিকে দেয়ালের ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। এইটেই মন্দির, যার কথা আগে লিখেছি। ঘরগুলি থেকে বেশ একটু দূরে একটা ঘেরা জায়গা। প্রায় চার ফুট উঁচু একটি পাথরের দেয়াল চার-দিকে গোল হয়ে গেছে, একটা দিক খোলা, খোলা জায়গার দু' দিকে

স্তম্ভের মত, তাতে দুটি গরুর মূর্তি, কাল পাথরের। ঘেরা জায়গাটির পরিসর খুব বেশী, মনে হয় ছোটখাট একটি মাঠ।

—এটা কিগো?

ইল্লিয়ন নামে একটি লোক বল্ল, আমাদের মোষ রাখবার খোঁয়াড়। রাতের বেলা সব বাড়ীর মোষ থাকে এখানে। প্রায় দুশ মোষ থাকে। খোলা দিকটা দিয়ে মোষ খোঁয়াড়ে ঢোকে। মোষ ঢুকলে কাঠ দিয়ে আটকে দেওয়া হয়।

—ঠাণ্ডায় জমে যায় না? নীলগিরির ঠাণ্ডা বাতাসে? উপরের দিকটা যে একেবারে খোলা!

—মোটেই না। তবে ছোট বাচ্চাদের খোলা জায়গায় রাখা হয় না। ওদিকে দেখতে পাচ্ছ পাঁচটি ছোট ঘর, ওখানে বাচ্চারা থাকে।

সত্যি গাছের ডাল আর তক্তা দিয়ে তৈরী এক সার ঘর রয়েছে একদিকে।

উবগর একটি পাতার ছোট পুটুলী থেকে কি একটা জিনিষ বের করে নিয়ে আঙুলে দিয়ে দাঁতের গোড়ায় ঘষতে ঘষতে ধীরে ধীরে বল্ল, তবে আসছ?

হ্যাঁ কালই।

বালসুন্দরন বল্ল, টোডারা দাঁতে নস্যি মাখে।

উবগর তবে দাঁতের গোড়ায় নস্যি মাখছিল! পরে দেখেছি অনেকেই মাখে। উটকামাণ্ডে ফিরে যাব ভাবছি, এমন সময় একজন বল্ল, কফি না খেয়ে যেতে পারবে না। এরা কফি দিয়েও অতিথির অভ্যর্থনা করে! শুধু অভ্যর্থনা নয় দু-বেলা দু-গ্লাস কফি-পান টোডাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নীলগিরিতে কফি হয় প্রচুর। জনসাধারণের ভিতর কফি পান মজ্জায় মজ্জায় মিশে গেছে, সে প্রভাব টোডাদের উপরেও পড়েছে। অভ্যাসটি হালে আমদানী।

বসতে হল মাদুরে।
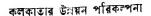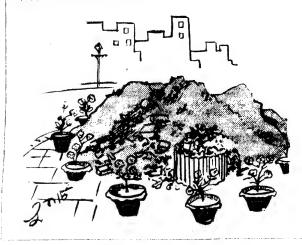
কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি মেয়ে দু-গ্লাস কফি নিয়ে এল। মেয়ে নয়, বৌ, কিন্তু বৌ বলে চিনবার নিশানা নেই চেহারায়। তবে চোখে পড়বার মত বিশেষত্ব আছে সমস্ত অবয়বে। টোডা মেয়েদের যে বিশেষত্ব থাকে। বয়স বোধ হয় বছর বাইশেক হবে। মোটামুটি লম্বাটে ধরনের বাঙালী মেয়েরা যতটা লম্বা হয়ে থাকে ততটা লম্বা, রঙ প্রায় ফর্সা আর মসৃণ ত্বকে লাবণ্যের আভা। দেহের গড়নে বিশ্বকর্মা পরিমাপ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, তবে খুব একটা বুঝবার উপায় নেই, কারণ গলা থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত পুটকলীতে ঢাকা—পুরুষেরা যে পুটকলী পরে সেই পুটকলীই। ঠিক সে রকমভাবেই নয়নাভিরাম ডিজাইনের ধারটি সামনের দিকে ঝুলোন। কিন্তু পুরুষদের মত একটি বগলের নীচ দিয়ে পুটকলী চলে যায়নি, সমস্ত অবয়বই পুটকলীতে ঢাকা। একটু লম্বাটে ধরনের মুখের মাঝে আছে পাৎলা নাক আর একজোড়া টানা চোখ।

কিন্তু যা সকলের আগে চোখে পড়ল তা মেয়েটির চুল। দশ-বারটি কোঁকড়ান চুলের গোছায় সমস্ত চুল ভাগ করা। ঝুলছে কানের দু পাশে আর পিঠে। সযত্নে তৈরী করা গুচ্ছ, দেখবার মত। হাতে আর পায়ে নানা রকম উল্কীর চিহ্ন।

বালসুন্দরন বল্ল, টিপিকাল টোডা মেয়ে!

টোডা মেয়েরা সুন্দরী।

পুটকলী চাদরের নীচে মেয়েদের আর কোন অঙ্গবাস নেই। শুধু নিম্নাঙ্গ একটি ছোট শাড়ীর মত কাপড়ে জড়ানো। আজকাল অবশ্য বেশের পরিবর্তন হচ্ছে কোন কোন পরিবারে। কিছু কিছু মেয়ে লম্বা হাতার ব্লাউজ আর শাড়ী পরতে শুরু করেছে।

মেয়েটি কফি দিতে দিতে হেসে বল্ল, সত্যি আমাদের মাখন খেতে আসবে?

পুরুষের মতো গলার গাম্ভীর্য নেই, স্পষ্ট কিন্তু তা নারীকণ্ঠই। মৃদু কিন্তু কোন জড়তা নেই। মেয়েরা বিদেশী দেখলে পালায় না, কৌতুক আর কৌতূহল নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। একশ বছর আগেও ঠিক এমনিই ছিল। ঘোমটা আর টানা আর রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকা মেয়েদের দেশে এ রকম সপ্রতিভ মেয়েদের দেখে পর্যটকেরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

কথা বলতে বলতে মেয়েটি হঠাৎ শরীরে জড়ানো পুটকলীটা একটু খুলে ঠিক করে নিল।

দেহবল্লরী গোপন করা সম্বন্ধে ততটা সচেতন নয় নাকি?

শুধু যে পুটকলীতে উত্তমাঙ্গ ঢাকা!

বালসুন্দরন আবার বল্ল, টিপিকাল টোডা মেয়ে! (ক্রমশঃ)

সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প : অন্য মত

সম্পাদক সমীপেষু,

বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প' শীর্ষক আলোচনাটির উপর কিছু কিছু পত্রাঘাত পত্রিকায় বেরুতে দেখে আমার কয়েকটি বক্তব্য রাখছি।

প্রথমত, আমার মনে হয়েছে এই প্রবন্ধের নামকরণ সার্থক হতে পারেনি। কথা ছিল 'সাম্প্রতিক বাংলা ছোটোগল্প' সম্পর্কে আলোচনা হবে, কিন্তু প্রবন্ধকার পশ্চাদ্‌পট রচনা করতে এত বেশি মনোযোগ দিয়ে ফেলেছেন যে, ফলে সাম্প্রতিক ছোটোগল্পের আলোচনা গৌণ হয়ে পড়েছে। বস্তুত রচনাকার সে দিকটায় অত্যন্ত দায়সারা গোছের, কেবলমাত্র এলোমেলো প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কতিপয় লেখকের নাম করে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বকে ক্ষুন্ন করেছেন। তিনি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ স্বাভাবিকভাবেই করেছেন, দেবেশ রায়ের নামও এসেছে। কিন্তু এ'দের কোন্ গল্প সম্বন্ধে তিনি কি বক্তব্য আনছেন তা পরিষ্কার না করেই পরবর্তীকালের কয়েকটি গল্পের তালিকা সাজিয়ে গেছেন। ফলে কোন্‌টা কার গল্প সে-সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের কোনো ধারণাই জন্মাবে না। আবার এলোমেলোভাবে তিনি কমলবাবু, মিহির গুপ্তকে খামোকা টেনে এনে আবার কয়েকজন লেখকের ফিরিস্তি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের গল্প সম্পর্কে কোনো দৃষ্টান্ত হাজির করেননি, যা করেছেন কয়েকজন সৌভাগ্যবান লেখকের বেলায়! অবশ্য 'আমরা সাম্প্রতিক ছোটোগল্প লেখকদের নিঃশেষিত তালিকা প্রণয়ন করতে বসিনি', সাফাই গেয়েও রচনাকার যে অসম্পূর্ণ তালিকা দিয়েছেন তা কোনো সমালোচকের দায়িত্ববোধের প্রমাণ নয়। যদি একথা সত্য হয়, সমালোচকের মতে, যে উল্লেখ্য লেখকগণই একমাত্র সার্থক সাম্প্রতিক গল্পের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তা হলে বলার কিছু নেই। কিন্তু রচনাকারই শেষ অধ্যায়ে গল্পলেখকদের সম্পর্কে তাঁর এবং আমাদেরও মোহভঙ্গ উপস্থিত করেছেন। যেখানে তিনি ন্যায্যত প্রশ্ন করেছেন : 'সামাজিক ব্যক্তির ভূমিকা এই গল্পগুলির মাধ্যমে ধরা যাবে কিনা' এবং 'দুঃখের বিষয় এই কৃত্রিমতার ঝোঁক অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এই মন্তব্যগুলি উল্লিখিত সাম্প্রতিক লেখকদের গল্পপাঠেরই ফলশ্রুতি। যদিচ সরোজবাবু শেষ মুহূর্তে সামলাবার চেষ্টা করেছেন : 'আমি অবশ্যই...... সাম্প্রতিকদের সার্থক গল্পগুলির কথা স্মরণে রেখেই কথা বলেছি।' কিন্তু কোন্‌গুলিকে তিনি সার্থক গল্পের মানদণ্ডে ফেলেছেন বর্তমান আলোচনায় তা গরহাজির।

দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিকদের আলোচনায় তিনি এমন এক রেডি-মেড রেফারেন্সের আশ্রয় নিয়েছেন যার ফলে সাম্প্রতিক গল্পকারদের সংজ্ঞা সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। সরোজবাবু কেমন করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর সমস্ত দৃষ্টান্ত তাঁর পরিচিত দু'একটি পত্রিকা এবং নতুন রীতি অভিধেয় ছোটোগল্প পুস্তিকার গল্পকারদের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে পারলেন! তিনি একটু উদার হলে দেখতে পেতেন এর বাইরেও অনেক সাম্প্রতিক গল্পকার রয়েছেন যাঁরা কমবেশি হালযুগের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন! 'অমৃতে' প্রকাশিত এক বছরের গল্পের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত কি তিনি কিছু পাননি? যাই হোক। সরোজবাবুর গোচরার্থে আমি কয়েকজন গল্পকারের নাম নির্ভয়ে এবং সমস্ত দায়িত্ব নিয়েই করছি। এ'দের মধ্যে আছেন : তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, নরেন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, কবিতা সিংহ, রাজলক্ষ্মী দেবী, মিহির সেন, বীরেন্দ্র নিওগী, কালিদাস দত্ত, চিত্ত সিংহ, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্র দত্ত প্রমুখ গল্পকাররা। দরকার হলে এ'দেরও সার্থক গল্পের উদাহরণ দেওয়া কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়!

তৃতীয়ত, সাম্প্রতিক গল্প সম্পর্কে কয়েকটি তত্ত্বের উপস্থাপন রচনাকার করেছেন যেগুলি আলোচনাসাপেক্ষ। 'চৈতন্যের মুকুরে এরা প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন সভ্যতার আবহমানের অনুভূতিকে'। এবং 'লেখকদের সকলেরই গল্পের বিষয় হল সময়'। চৈতন্যের মুকুর এবং সময়—এই আপাত-চকচকে কথাদুটির কি সবিশেষ অর্থ আছে? শিল্পীমাত্রই নিজস্ব চৈতন্যের মুকুরেই সৃষ্টি করেন এবং নির্দিষ্ট সময়ই থাকে যে কোনো শিল্পীর আবহলোকে। এটা যেমন শেক্সপীয়র তেমনি টলস্টয়ের বেলাতেও খাটে। অবশ্যই এই চৈতন্য সমাজপ্রতিক্রিয়াসম্ভূত এবং কালই তার প্রতিনিধি। তবে সাম্প্রতিক লেখকেরা নতুন চিত্তচমৎকারী কি করলেন, যাকে অভিনব এবং ন প্রভা তরলজ্যোতি-রুদেতি বসুধাতলাৎ বলে তারকণ্ঠ হতে হবে!

এর চেয়ে যদি সরোজবাবু তাঁর মনোনীত সাম্প্রতিক গল্পকারদের সম্বন্ধে বলতেন : এই তরুণেরা নিজস্ব একটি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তা একান্তই মন্ময়, তাহলে কথাটার অর্থ বোঝা যেত। আমার তো দৃঢ় ধারণা এই লেখকেরা তন্ময় হয়ে জগৎকে দেখছেন না, দেখতে পারছেন না, জীবন সম্পর্কে, লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁদের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। একটা দুরারোগ্য ফ্যাশনরোগে ভুগছেন। যেন সেলুনের নাপিত তাঁদের পেছনে আয়না তুলে ধরেছেন, সম্মুখের আয়নায় তাঁরা নিজেদের পশ্চাদ্দেশকে অবলোকন করে এক অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শন করছেন। সমাজসচেতনতা বলে একটি কথা ছিল, জীবনদর্শন বলেও একটি বস্তু ছিল—যা দুর্ভাগ্যের বিষয় সাম্প্রতিক গল্পলেখকদের মধ্যে বেদনাদায়কভাবে অনুপস্থিত। সরোজবাবু নিজেও 'সামাজিক ব্যক্তির ভূমিকা' সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। আসলে এই লেখকদের রীতিসর্বস্বতাই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং এই জন্য তাঁরা গর্বিত। কিন্তু রীতিই কী সাহিত্য? 'কী লিখব'-এর চেয়ে 'কেমন করে লিখব' তাই বড় হবে। প্রসঙ্গ-প্রকরণ যে পার্বতী-পরমেশ্বর-সম্পর্ক, অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে রয়েছে একথা নতুন করে বলার দরকার! তদুপরি এই রীতির কি বিশেষত্ব আমরা দেখেছি। দেখেছি অপ্রয়োজনে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অবান্তর বাগাড়ম্বর, চরিত্র-নির্বাচনে খণ্ড খর্ব অসুস্থ যুবকের প্রতিবিম্ব এবং তারই হলদে-চোখে দেখা বেচারা পুতুল-মানুষগুলি। এসেছে অবক্ষয়ের কথা, নৈরাশ্যের কথা, মৃত্যুর কথা, অস্তিত্ববাদের কথা—কিন্তু সমাজমনের সঙ্গে স্বীকরণ হয়নি। পরগাছা কখনো মহীরুহের গৌরব পেতে পারে না! ফলে রীতির অঙ্গে ওগুলি কেমন আলগা হয়ে লেগে রয়েছে। কাজেই নিঃসন্দেহভাবে প্রশ্ন জাগে সাম্প্রতিক গল্পকারদের

মধ্যে চাতুরী এবং ভান যত বেশি প্রকট, অন্তঃসারশূন্যতা তেমনি ভয়াবহ। মনে হয় রীতির আড়ালে এই পলায়নবাদী লেখকেরা আত্মরতিতে মগ্ন। সরোজবাবুও রীতির উপরেই সমস্ত জোর অর্পণ করেছেন। গহন চৈতন্য, প্রতিমুহূর্তচারী সংবেদনশীলতা, পুঙ্খানুপুঙ্খতা ইত্যাদি কোনো কোনো লেখকের বৈশিষ্ট্য হতে পারে, কিন্তু তাতে কি এসে গেল। এগুলি তো জীবন-দেখার ভঙ্গি, কিন্তু সত্যকার জীবন কোথায়! ভাবকে অবয়ব দেবার জন্যেই রচনাভঙ্গির দরকার। বক্তব্য যদি না-থাকে তাহলে পুঙ্খনাপুঙ্খতা কি গহন চৈতন্যে আমার কিসের প্রয়োজন? সার্ত্র, কেম্যু, মোরাভিয়া এঁদের রচনারীতির অভিনবত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু সর্বোপরি আছে এঁদের একটা জীবনদর্শন। অবক্ষয় নৈরাশ্য অস্তীতিবাদ এঁদের অনেকেরই গল্পের পরিমণ্ডল। কিন্তু সমাজমানসের প্রতিক্রিয়ারই সেগুলি ফসল। বর্তমান য়োরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজজীবনেরই সেগুলি মর্মান্তিক আলেখ্য। আমাদের সমাজে যদি সেই অবক্ষয় এসে থাকে, হালের লেখকদের লেখায় কই তার মর্মান্তিক চিত্রণ—যা দেখে পাঠক শিহরিত হবে, আতঙ্কিত হবে। তা যদি না হয় দুঃখ-বিলাস করে বিনিয়ে বিনিয়ে গল্প লিখে, ঘাম আর ওষুধের বিজ্ঞাপন, পতিতালয় আর মদ্যাসক্তি দেখিয়ে কি কাজ হবে! বাইরের থেকে চালানে পণ্যসামগ্রী আসতে পারে কিন্তু চালানী-সাহিত্য বলে কোনো বস্তু ধোপে টিকবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি সাম্প্রতিক গল্পকারদের সঙ্গে একমত যে, যে যুগে যে-ব্যবস্থায় আমরা বাস করছি সেখানে অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা অপ্রেম আর অবজ্ঞা ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেছে। বিরুদ্ধ সমাজবিন্যাসের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংবেদনশীল মনের নিঃসঙ্গ সংগ্রাম চলেছে। প্রতি পদে ব্যক্তিত্ব খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ছে, বিবেক আত্মা চৈতন্য ধর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভঙ্গিসর্বস্বতা আত্মসন্তুষ্ট চতুরালি করলে চলবে না। আলবেয়র কেম্যুর 'দি প্লেগ' উপন্যাসের কথা ভাবুন। নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে বন্দী মানুষ শত লাঞ্ছনা অপমান দৈন্য-গ্লানির মধ্যেও উত্তরণের জন্য সংগ্রাম করছে। স্বাধীন মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে পবিত্র শপথ গ্রহণ করেছে। বিরূপ সমাজের হাতে মানুষ মার খাচ্ছে, সে ভেঙ্গে পড়ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মানব-প্রবাহ থেমে থাকেনি, সে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে মহত্তর জীবনের নেশায়। ব্যর্থতা আছে বেদনা আছে, বিকৃতি আছে গ্লানি আছে—এবং তার সার্থক রূপারোপ অবশ্যই আছে সাহিত্যে, কিন্তু ত্রিকালদর্শী সাহিত্যিককে এর ঊর্ধ্বেও উঠতে হবে। এবং শুধু ভঙ্গি নয়, রীতি নয়, সম্পূর্ণ রূপারোপে তা অপূর্ব হিল্লোলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে।

সাম্প্রতিক গল্পকারদের শক্তিতে আমি বিশ্বাসী বলেই তাঁদের শুভবুদ্ধির উম্বোধনে আমি আস্থাশীল।

ভবদীয়—
মিহির আচার্য
কলকাতা।

।। জৈমিনি প্রসঙ্গে ।।

অমৃত সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই 'জৈমিনি'কে যাকে বলে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। কারণ ৫১ সংখ্যায় তিনি প্রাইভেট শিক্ষক ও বাড়ির অভিভাবক-অভিভাবিকা সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলেছেন তা বর্তমান যুগের পক্ষে যে শুধু প্রযোজ্য তা নয় মূল্যবানও। আজকাল যে সমস্ত অভিভাবক তাঁদের ছেলেদের পড়ার জন্য প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্ত করেন—তা কেবলমাত্র দায়ের জন্য। শিক্ষকও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলেজের ছেলে। কোন রকমে দু'একটা টিউশানি করে তারা নিজেদের পড়ার খরচ চালিয়ে নেয়। সুতরাং তাদের হাতে ছেলেদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিলে যে কি অবস্থা হবে তা আমরা বুঝেও বুঝতে পারি না। আর যে সমস্ত শিক্ষকদের খুব 'হাতযশ' তাঁরা হয়ত কেউ পড়ানর পূর্বে দু'তিন মাসের মত এডভান্স চান। তাঁরা শিক্ষকতাকে ব্যবসার দলে ফেলেছেন। এবং এই এডভান্স অর্থাৎ আগাম নেওয়ার ব্যাপারে 'জৈমিনি' যে কয়েকটি সর্তের উল্লেখ করেছেন তা মোটেই অমূলক নয়। কারণ আমার জানা একজন শিক্ষক কোনো ছাত্রকে পড়াবার পূর্বে তার নিকট হতে তিন মাসের আগাম না নিয়ে পড়াতেন না। আমার এই কথা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। অবাস্তব বলে মনে হলেও এটা কাল্পনিক নয়। তাঁর মনের মধ্যেও ঐ কয়েকটি সর্তই ছিল। পরে তিনি এইকথা তাঁর সহকারী শিক্ষক-মহাশয়দের বলতেন। তবে শিক্ষকমহাশয় মফঃস্বলের, তাঁর টিউশানি-ফি কম এই মাত্র। কিন্তু উভয়ের মনোভাব একই। মধ্যবিত্ত অভিভাবকেরা সারাদিনের পরিশ্রমের পরে যে উপায় করেন তাতে তাঁদের সংসার চালিয়ে আবার মাষ্টার রাখা কষ্টকর। সুতরাং বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এটা যে সমাজের পক্ষে কত ক্ষতিকর তা তাঁরা ভাবেন না।

এইরূপে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্বন্ধটা যে কিরূপ দাঁড়াচ্ছে তা আমরা দেখছি না। অভিভাবক টাকা দিয়েই নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত মনে করেন। শিক্ষকও কোন রকমে না পড়ালে নয় তাই পড়ান। জৈমিনি বলেছেন, "দুইপক্ষই যদি একটু সংযত না হয় তবে এই হৃদয়হীন পরিবেশের মধ্যে যে ছাত্ররা মানুষ হবে তারা সংসারে বাস করেই হয়ে উঠবে এক একটি বন-মানুষ।" জৈমিনির এই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাঁকে আবার ধন্যবাদ জানাতে চাই। নতুবা ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে প্রত্যেককেই। আর ভারতের ভবিষ্যৎও হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করলে অনেক কথাই বলা চলে। একটা কথা 'জৈমিনি' বাদ দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে আজকাল অভিভাবকেরা বেছে বেছে তাঁর ছেলেরা যে স্কুলে পড়ে সেই স্কুলের মাষ্টারদের প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তাতে সাধারণ ক্ষেত্রে পরিণতিটা খারাপ হয়। কারণ যে শিক্ষক ছেলেকে পড়ান তিনি হয়ত স্কুলের অঙ্কের মাষ্টার। ছাত্রটি ইংরাজিতে খারাপ পরীক্ষা দিল। তৎক্ষণাৎ তিনি ইংরাজীর মাষ্টারকে বলেন,

"—মশায় অমুকে রোল নাম্বারটা একটু ভাল করে দেখবেন তো!" তাতে এই হয় যে ছাত্র তেরো পাবারও অযোগ্য সে একত্রিশ পায়। এরকম ঘটনাও সম্ভব। আর ডাক্তারের নার্সিং হোমের মত প্রত্যেকের অর্থাৎ শিক্ষকদের প্রত্যেকেরও একটা করে নার্সিং হোমও থাকে। সেইগুলি এক একটা হরি ঘোষের গোয়ালে পরিণত হয়। শিক্ষার নামে এই ব্যবসা যত বেড়ে যাবে ততই ভারতের ভবিষ্যতও হয়ে উঠবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই সমস্ত পরিবেশে অনুন্নত নবগঠনমুখী ভারতের কিশোর-কিশোরীদের অ ক ল্যা ণে র আশঙ্কা রয়েছে বলেই আমাকে এই কথাকটি বলতে হলো।

নমস্কারান্তে ইতি—
অমলকুমার বোলার,
কলিকাতা-৯

রবীন্দ্রী দৃষ্টিপথ

সুধীর চক্রী

বিভিন্ন দেশের কবি ও সাহিত্যের বিচারের একটা চলিত মান আছে, তাতে মতের বৈপরীত্য বিঘ্ন ঘটায় না বরং বিচারের মর্যাদা বাড়ে। আমাদের দেশে এ ধরণের আলোচনার স্থান নেই। একা একা এখানে আলাপ, বিলাপ বা প্রলাপের সুযোগও মিলতে পারে। কিন্তু চিন্তার সংগে চিন্তার বা যুক্তির সংগে যুক্তির সামঞ্জস্যবিধান বাংলার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ঘটল না আজও। অবস্থাটা আরও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে যখন দেখি আমাদের বিদগ্ধমন্ডলী চক্রাকারে বসে গেছেন পশ্চিমী মানে রবীন্দ্রনাথের তৌল করতে। রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপের তুলনায় একজন চতুর্থ শ্রেণীর কবি এমন মন্তব্যও হয়! অভিযোগ ওঠে, তিনি নাকি বাস্তবের অলিগলি কিছুই চেনেন না।

অপর দিকে জ্ঞানী গুণী মহলে চলেছে রবীন্দ্রশিল্পের পংক্তি ভোজনে উদরপূর্তি এবং সশব্দ উদ্গার। ইংরাজি শিক্ষা অনুবাদ শিক্ষা থেকে শুরু করে চিত্রশিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, শব্দতত্ত্ব যা কিছু একটা নিয়ে রবীন্দ্রী ঐশ্বর্যের মহামূল্য ব্যাখ্যান আজ গজিয়ে উঠছে এখানে ওখানে। কাটাছাঁটা এই সর্ব তত্ত্ব ব্যাখ্যানে মিথ্যার চেয়েও কটু হয়ে উঠছে বিকৃত সত্যের সোরগোল। মূলের সংগে যোগ না রেখে এই সব বিচ্ছিন্ন শাখা-প্রশাখার শোভা হচ্ছে ঢের, কিন্তু তাতে যে ফুল আসবে না, ফল তো হবেই না! তা ছাড়া রবীন্দ্রী সম্পদের উত্তরাধিকার এতে প্রতিষ্ঠিত হবে কি? এ যে শুধু নিরাবরণ লুণ্ঠন! বৈজ্ঞানিক যুগের আওতায় নানা বিভাজন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে ঝাঁঝালো আরক তৈরী হতে পারে, একেবারে লাক্ষ ডাইলুশ্যান্। কিন্তু রবীন্দ্র-শিল্প-জীবন বা জীবন-শিল্পের একটু সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞানও তাতে থাকবার সম্ভাবনা কোথায়? রবীন্দ্র-শিল্পরত্নে আজ সিঁদকাঠি চলেছে লুণ্ঠনের অত্যুগ্র নেশায়, কিন্তু সে-সম্পদের চাবিকাঠি তাতে মিলবে কি?

টমসন সাহেব বেশ গাম্ভীর্যের সংগে মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কাব্যে, তাঁর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ত্রুটি তাঁর গভীর চিন্তাশীলতার অভাব (The worst flaw of his later writings is the lack of serious intellectual effort)। এখানে নিকৃষ্ট (Worst) ত্রুটির সংগে যে অন্য ত্রুটি আছে, এ আসে স্বতঃই। যে-ইয়েটস্ একদিন গদগদ হয়ে বললেন, রবীন্দ্রনাথ এমন-কিছু করছেন যা কখনই আজগুবি বা অসম্ভাব্য ঠেকে না বা পক্ষ সমর্থনের অপেক্ষা রাখে না। (He is doing something which has never seemed strange unnatural or in need of defence) সেই ইয়েটসই পরের দিকে রবীন্দ্রনাথকে হেয় করবার জন্য কোন ভাষা প্রয়োগেই কুণ্ঠা দেখাননি। অথচ ইয়েটস্ একজন প্রতিভাবান এবং খাঁটি কবি। তাঁর মন্তব্যগুলি স্বভাবিক নয় এমন সন্দেহেরই বা যুক্তি কই? বিশেষ করে, আমাদের দেশের দৃষ্টিভঙ্গি যখন অনেকটাই ঐ সব দৃষ্টিতে চক্ষুষ্মান হতে থাকে, তখন এ সন্দেহের অবকাশই বা কোথায়?

প্রসংগতঃ একটি ছোট্ট বিচারে নামা যাক। 'বর্ষশেষ' কবিতাটি শেলির 'West Wind'-এর তুলনায় নিতান্ত নিকৃষ্ট, বেশ কয়েকটি দিশি পণ্ডিত সমালোচকও এ অভিমত দিয়েছেন। ঝড়ের স্বরূপ এখানে রীতিমত প্রকৃতিগত হয়ে ওঠেনি তেমনি করে (অর্থাৎ শেলির মত হয়ে), ঝড়ের বস্তুসত্তাকেও ছাপিয়ে গেছে নানা উপমার পর উপমা আর ব্যর্থ ভ বসাংকর্য। চিত্রধর্মিতার একটি অচ্ছেদ্য অনুভূতির দিকে চোখ রেখে যাঁরা এই বিচারে বসেছেন, তাঁরা এই একক চিত্রানুভূতিকেই সার্থক মানদণ্ড বলে প্রচার না-ও করতে পারতেন। সমস্ত 'কল্পনা'-কাব্যখানাকে একটা সুসংগত রাগিণী-রূপে গণ্য বা গ্রাহ্য করলে, 'বর্ষশেষ'কে সেই রাগিণীরই একটি সুমধুর তান-সম্পদ বলে চিনতে খুব দেরী হয় না। এবং ব্যক্তির যে দুঃখ-সুখ আশা-নৈরাশ্য জীবনকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে খণ্ডতায় হীন, শোচনীয়তায় তুচ্ছ করে তুলেছে সেই কান্নাই রক্তাক্ত ভাববিধুরতায় একটি অপরূপ লিরিকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'বর্ষশেষ' কবিতায়। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি এবং সমস্ত মানব-মানস কবি-হৃদয়ের অবচেতন অংশ পর্যন্ত এমন করে ছুঁয়ে গেছে তাই ঐ বেদনার মূলকে। বেদনার এই মূলটি যদি উপলব্ধিতে না পৌঁছায় তাহলে সংঘাতের স্বরূপই থেকে যায় অগোচরে, এবং মুখভারী করে পাঠক-মন যে তখন হাত-পা ছড়িয়ে অভিযোগ আনবে এতে আর বৈচিত্র্য কি? অনুভূতির এ অধিকারটুকু পেতে হলে 'কল্পনার' সংগে মিলিয়ে পড়তে হয় 'বর্ষশেষ'।

প্রশ্নটা যখন এমনি জমকালো রকমের হয়ে ওঠে, তখন বিশুদ্ধভাবে রবীন্দ্র-শিল্পের রসগ্রহণ কিভাবে সম্ভব এটা নিশ্চয়ই আলোচ্য বলে গণ্য হবে। ছন্দ এবং শ্রুতিমধুরতাগুণে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেরই মন ভোলান, কিন্তু ভাষার রক্তমাংসে যে ভাবরূপের বিশিষ্টতা থাকে, তাকে ছেঁটে-কেটে দেখলে তার শিল্প-রূপকে হত্যা করা হয়। এটুকু হেলা করে গেলে উপভোগ ব্যাহত হয় এবং অপ-ব্যাখ্যারও অবকাশ ঘটে। রসপিপাসুদের কাছে তাই নিবেদন করি, রবীন্দ্র-শিল্প-উপভোগ সবারই জন্য খোলা থাক, কিন্তু শিল্পবিচারের একটা সিদ্ধ মান নির্দিষ্ট হোক্। পশ্চিমী সাহিত্যের বা শিল্পের সংগে তুলনা করে আমাদের সাহিত্যের বা শিল্পের আভিজাত্য বৃদ্ধি চলেছে বহুদিন ধরে। ঠিক এইভাবেই আমাদের সাহিত্যের অনেক অংশকে নীচে নামিয়েও দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিল্পরূপে এমনি কতকগুলি মৌলিক বার্তায় আছে যেগুলোর সূত্র উদ্ঘাটিত না হলে রবীন্দ্রনাথ অস্পষ্ট হয়েই থাকবেন। উচ্চ গণিতের যেমন কিছু প্রথম পাঠ আছে রবীন্দ্রী শিল্পবোধের জন্যেও তেমনি একটু প্রস্তুতি আবশ্যক। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেই নয়, অনুভবের দিক থেকেও একটা উন্নয়ন প্রয়োজন।

আমিত্বের ডোরে বাঁধা আমার চেতনার সংগে সকল বিশ্বের যে প্রতিনিয়ত পরি-চয় তারই উদ্দীপন রবীন্দ্র-অনুভূতির আলো এবং আভা। স্বদেশিকতাই হোক আর আন্তর্জাতিকতাই হোক, ঈশ্বর, ধর্ম, মৃত্যু, প্রেম বা যে কোনো কাব্যানুভূতিই হোক—ঐ আলো এবং ঐ আভাই তাকে বীণার তারে বেঁধে রেখেছে। রাগিণীতে যে-দীপ্তি বা যে-মীড় বা যে-মূর্ছনা উঠুক, প্রধান তানটিকে স্মরণে রেখে উপভোগ করতে হবে। ভিত্তিমূলের এই বোধের উপরে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র-শিল্পের বিরাট সৌধ।

কাব্য, কাব্যোৎকর্ষ বা শিল্প-বিচারে সংগ্রামী জীবনবোধের ক্রম-অগ্রগামিতাই

আলোচ্য বিষয়। মানুষের সঙ্গে শিল্পী মানুষের একটা একটানা দ্বন্দ্ব চলে। এই দ্বন্দ্ব ক্রমে অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনা হয়ে ওঠে এবং তা থেকেই ফুটে ওঠে শিল্পের মানস শতদল। যে-বঙ্কিম বিধবা বিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিতর্ক করেছেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র রোহিনী-কুন্দকে সেই দৃষ্টিতে দেখা চলে কি? চণ্ড-টলস্টয় আর ধর্ম-টলস্টয়ই শুধু নয়, জমিদার স্বার্থের পক্ষে টলস্টয় অনেকই উক্তি করেছেন, কিন্তু সেই সংস্কার দিয়েই কি টলস্টয়ের শিল্পরূপের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা হয়? শরৎচন্দ্র উচ্চ মধ্যবিত্ত আদর্শবাদের একজন নৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন। কিন্তু 'মহেশের' গফুরকে সেই আদর্শে কি ধরা যায়? মুমূর্ষু এবং জর্জরিত প্রাচীনতার কঙ্কালকে নিয়ে জ্যান্তমানুষের সংঘর্ষরূপের স্বাভাবিক স্বরলিপি নিয়েই প্রতিটি সাহিত্য। শিল্পীমনের এই বেদনা বা মর্মবেদনাই সাহিত্যের প্রাণবায়ু। এটা গণনায় না আনলে সাহিত্য নগ্নতত্ত্ব মাত্র।

'জীবনদেবতা' নিয়েই এক ধরণের বিচার হয়েছে। এ যেন একটি 'বাতিক' কবির স্কন্ধে ভর করলে এবং নেমে গেল কোন এক সময়ে। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় উদ্ধৃতি তুলে আলোচনার মূল্য এবং সিদ্ধান্ত একেবারে অতি-পাকা করবার আয়োজন দেখেই বোধ হয় কবি একসময় বললেন—তিনিও ঐ পাঠকদের মহলেই আছেন, এবং এ যে কী তা বোঝবার চেষ্টা করছেন। এইগুলি বিবেচনা করে, উন্নততর প্রেক্ষিতে জীবনদেবতামূলক কবিতাগুচ্ছকে চিহ্নিত করতে গেলে একটা মুস্কিল দেখা দেয়। রবীন্দ্রী কাব্যোৎকর্ষের সমগ্র বিকাশের সঙ্গে এগুলির সম্পৃক্তি কোথায়? প্রায় ইং ১৯০৫ থেকে শুরু করে 'সোনার তরী', 'চৈতালী' প্রভৃতি থেকে 'চিত্রা', 'খেয়া', 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' হয়ে 'বলাকা' এমন কি 'পূরবী' পর্যন্ত এই জীবনদেবতার পদধ্বনি শোনা যায় প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে। অবশ্য পদধ্বনির ইতিহাস এর আগেও আছে, এবং পরেও দেখি তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। যদি একে একজাতের অনুভূতি বলে লেবেল-মারা হয়, তাহলে জীবনদেবতাকে প্রণয়ী, প্রভু, স্বামী, জীবনস্বামী ইত্যাদি ভাবা চলে। তারপরেও ভাবা চলে কবির নব নব রসানুভূতির মূলেই এই দেবতা। শেষ পর্যন্ত এটা একটি অধ্যাত্ম অনুভূতি। এইভাবে এগুলিকে একঘরে করে দিলে কবির ক্রমশঃ উদ্ভিন্ন ব্যক্তিরূপের সঙ্গে এই আঙ্গিক সম্বন্ধ ও সারূপ্য আর স্বীকার্য হয়ে ওঠে না। অজিতবাবুর ('অজিতকুমার চক্রবর্তী') বিচার থেকে দেখলে এই অনুভূতির দল কবির ব্যক্তি-মন থেকেই উৎসারিত, অথচ ক্রমে তাঁর বিশ্ববোধে ছড়িয়ে পড়েছে।

মনের সমস্ত অবচেতনা এবং অচেতন অংশে লাগে কবিকামনার সংঘাত। তার ফলে বিশ্বপ্রকৃতির শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধে দেখা দেয় নানা দীপ্তি। নানা অস্ফুট অনুভূতি রাঙা হয়ে ওঠে কামনায় রঙে, খোঁজে আপনাকে, আপনার অহংকে। বেদনার লাবণ্য জাগে এইজন্য যে কামনার এই নৈর্ব্যক্তিক তরঙ্গাভিঘাত প্রায় অহংনিরপেক্ষ (Id-consicousness) প্রবৃত্তির পঙ্কস্রোতে বদ্ধ লালসালীন না হলে' তা আপনার মধ্যেই অনুভব করে আর একটি সত্তা—কবির কথায় তাকে বলা চলে বিশুদ্ধ কামনার সংস্কার। ফলে নৈর্ব্যক্তিক কাম বিশুদ্ধ কামনার সংস্কারে জেগে ওঠে। এমনি এক-একটি পদক্ষেপে বিশ্ববোধের এক-একটি ঋতু আসে এগিয়ে। যাকে বলা চলে, মানুষের নেহাৎ-জৈবস্বরূপ, স্থূল-অহং বা অপরিশুদ্ধ অচেতন-অবচেতন-মনন-অনুভূতি, তার সঙ্গে চলে পরিশুদ্ধ ইচ্ছার এক অভূতপূর্ব দ্বন্দ্ব। এর ঘূর্ণিপথে কবি অগ্রসর হন আপন স্বপ্নভঙ্গের বাঁকে বাঁকে (libids?)। বিশ্বৈক্যানুভূতির পর্বে পর্বে জাগে নতুন নতুন ভাবোন্নয়ন। প্রথম পর্যায়ে প্রকৃতির রহস্যসংকুলতার মধ্যে এর উপলক্ষণগুলির একটি বিশিষ্ট রূপ চোখে পড়ে। পরের দিকে, মানবতার স্পষ্ট সীমানায় এসে ঐ অনুভূতির দল ধীরে মিলিয়ে যায়, কারণ মানস-অনুভূতির রাজ্যে বিশ্ববোধ যেদিন মানব-অনুভূতির প্রতিষ্ঠা করে সেদিন তার ধারণক্ষমতা হারায়। জীবনদেবতা ধরা দেয় জীবনেরই কাব্যরূপে, যেখানে সমস্ত মনন চেতনা অনুভব সত্যশিবসুন্দর হয়ে ফুটে ওঠবার তাগিদে দেবতা-প্রতিম (apotheosised) হয়েছে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাব, ঈশ্বরানুভূতি, বা ঔপনিষদিকভাব বলে যে একদল কবিতাকে, বা কাব্যভাবকে দেখার চেষ্টা হয় তারা মূলতঃ কবির বিশ্ববোধেরই বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় মাত্র, এবং তা ঠেকেছে গিয়ে তীক্ষ্ণ এবং সর্বত্রগামী মানবতাবোধেরই একেবারে অন্তস্থলে। ঘরের সঙ্গে ঘাট ও পথের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে 'খেয়া' কাব্যে। স্বদেশী আন্দোলনকে (তখন সেইযুগ) নস্যাৎ করেই কি তবে কবি এই কাব্যের সুর ধরলেন? যখন স্বদেশী যুগের জোয়ার চলেছে তখন (১৯০৫) এ কাব্য কেন? যদি এতে মানবতাবোধই কিছু থাকে তবে তা কী জাতের? বঙ্কিমযুগ-প্রণোদিত নবাঙ্কুরিত জাতীয়তার ভৌগলিক চৌহদ্দিতে সীমিত উন্মাদনা কবিকে ধারণ করে উঠতে পারেনি বলেই কবি যেন ঘাট ও পথকে ইঙ্গিত করে বহির্বিশ্বে পাড়ি দিতে চলেছেন। 'ঘরে-বাইরে' এবং নানা কথায় এবং কাব্যে কবির আন্তর্জাতিকতা সেদিন ধীরে ধীরে স্ফটিকস্বচ্ছতায় দানা বেঁধে উঠছে। ইং ১৯১৪ সালে বলাকায় (প্রথম মহাযুদ্ধের সময়) এটা স্ফুটতর হল। 'ঐ মহামানব আসে' বলে' যখন তিনি মহামানবের (Superman) উজ্জীবনকে আবাহন জানাচ্ছেন—স্পষ্টতা আরও বাড়ল। এ ক্রমারোহণের শেষ এবং চরম পদক্ষেপ এলো 'রোগশয্যায়' (ইং ১৯৪০)। তিনি একটি সহমরণকে যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন পুঁজিপতির মৃত্যু হয়েছে, সভ্যতাসুন্দরীকে বা সভ্যতাসতীকে তারই সঙ্গে সহমৃতা করবার প্রস্তুতি চলেছে, চলেছে এক অভিনব সতীদাহের আজব ষড়যন্ত্র! এর পরেও কবি ভাবছেন সভ্যতা পাপমুক্ত হবে তো? এ একটি নিছক উৎপ্রেক্ষা নয়, এটা কবির বিশ্ববোধের অপারসীম বিস্ময়!

ক্রম ও পর্যায়ের অনুসন্ধান করে সমগ্র বিচারের বহুবিচিত্র অনাবিষ্কৃত পথ পড়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথে। আগামী দিনের উন্নত সাহিত্য-বিচার তাতে বিপুলায়তন হবে, এ ইঙ্গিত মিলছে ক্রমেই।

ক্রম ও পর্যায়ের যেমনই একটি বিশিষ্ট এবং স্পষ্ট সূত্র আছে রবীন্দ্রনাথে, তেমনিই আবার নেই-ও একটি স্পষ্ট ছক, যার ব্যবহার দিয়ে রবীন্দ্র-শিল্পকে সীমানাগত, ভঙ্গিগত, বা জাতিগত করে নিয়ে চট করে ধরে নেওয়া যাবে। রবীন্দ্র-শিল্পের এই সমস্যায় উপলক্ষণ কুড়িয়ে দিন যাবে, লাভ হবে না, অথচ অভিজ্ঞান যেখানে আছেই, তাকে অনুভব দিয়েও চিনে নিতে হয়। সন্ধানী বিচারক ফতোয়া দিতে পারেন সহজেই, কিন্তু মুস্কিল এই যে সেটি রসবোধের থেকে আসে না, আসে শুধু বিচারের অত্যুগ্র ঝোঁকে।

'সে' কি উপন্যাস? ব্যঙ্গচিত্র? রূপক? গদ্যকাব্য? না আরও কিছু? না সবই? লিপিকা কি গদ্য-কবিতা? গদ্য-কবিতা কি কবিতা, না মুক্তছন্দের বন্ধন-

হীন কাব্য? পঞ্চভূত কি নাটক, না দর্শন, না রূপক? নাটক নিয়ে নানা রকম গোলমেলে কাণ্ডই ঘটা স্বাভাবিক, কারণ রবীন্দ্রনাথের নাটক কী জাতের তা একটু দুরধিগম্য। রূপক এগুলি নয়, কারণ বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবের রচনা এখানে রেখায়িত হয়ে ওঠে না। আবার এগুলিকে সাঙ্কেতিক শ্রেণীতেও ফেলা মুস্কিল, কারণ তাতে রচনার বহিরঙ্গে 'ইহ বাহ্য' প্রতিনিয়ত এই সুরটি বাজে। অসংখ্য ইঙ্গিত, সরব এবং নীরব হয়ে একটি সমগ্র জীবনসত্যকে প্রমাণ করে সাঙ্কেতিকতায়। রবীন্দ্রনাথ দুই দলেরই দলছাড়া। বহু প্রশ্ন আসে যার ব্যাখ্যা চলে না, বিচারও কঠিন হয় (?)।

'চণ্ডালিকা'য় আনন্দের পরাজয়ই যদি প্রতিপাদ্য হয়, তবে চণ্ডালিকায় গভীরতম আকাঙ্ক্ষার সত্যটা কোথায়? 'অচলায়তন' ধ্বংস হল? না হল না? সে কি অতীতের? না ভবিষ্যতের? 'রক্তকরবী'তে রঞ্জনের মৃতদেহ নন্দিনীর সঙ্গে কি সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়? 'মুক্তধারা'য় ধনঞ্জয়ের গান ও মন্ত্র কি কেবল খেলো বিদ্রূপেরই প্রতীক? 'শারদোৎসবে'র বিজয়াদিত্য কি একেবারে ব্যর্থ? বাউল ঠাকুরদা, এরা কি চরিত্র, না কবির মনের এক একটা দিশা? ডাকঘরের অমল কি? কে? কি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাতে?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন দিয়ে এমনি পাহাড় জমিয়ে তোলা অসম্ভব নয়। একটা আকস্মিক সিদ্ধান্ত আসে—রবীন্দ্র-নাটকে নানা ত্রুটি ভিড় করে আছে। বাচ্যার্থের সঙ্গে ভাবার্থ-সম্পৃক্তি ব্যাহত হয়েছে, বিকৃত হয়েছে এবং রচনা অনেকখানে 'ঝুলে' পড়েছে।

ত্রুটিগুলো মেনে নেবার পরও যে হিমালয়-প্রমাণ অসমতা সৃষ্টি হচ্ছে তারও তো নিরসন হওয়া দরকার। তা না হলে এগুলো বিচার থেকে অপচয়ী ঝুড়িতে নিক্ষেপ করতে হয়, এবং তা 'হ্যাম্‌লেট'কে নিছক খুনোখুনি কাণ্ড বলে উড়িয়ে দেবার মতই হাস্যকর হয়ে ওঠে। উপলব্ধির উপর একটা নিদারুণ পীড়ন চলে।

আমাদের আরও একবার তাকাতে হয় কবির বিশ্ববোধের দিকে। এটি তাঁর জীবন এবং সম্পূর্ণ সত্তা। এই সত্তার প্রভাবে কবির দৃষ্টিতে ভাব এবং বস্তু অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মেশামেশি করেছে নিজস্ব রবীন্দ্রী সংস্কারে। নানা জটিল এবং জলীয় স্রোত এই ভাব বা
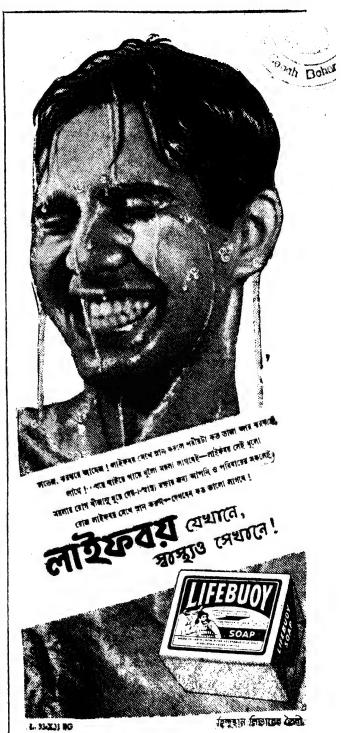
বস্তুকে আরও ঘন এবং গাঢ় করে তুলেছে প্রায় প্রতিক্ষেত্রে।

অন্য উদাহরণে কথাটা স্পষ্ট হবে। 'সাগরিকা'য় (মহুয়া) ভারতের অতীত ইতিহাস এবং জাভার অতীত ইতিহাসের সংযোগ, বিয়োগ এবং মিলনের একটি পুনরভিযানের চিত্র আছে; পুনরভিযান বা পুনর্মিলনের এ ইঙ্গিত একটুও কম সত্য বা রসবস্তু হয়ে ওঠেনি—কিন্তু এটি হয়েও প্রেমের প্রসাধন এবং সাধনবেগের একটি ক্রমস্ফুরণ তাতে এসে মিলেছে, গোটা মহুয়ার শিব-শিবানীর ছায়ায় তা লাবণ্যবিধুর। দুটিতে ঐক্যলাভ করেছে এবং কবির অনুভূতিতে তার সারূপ্য ঘটেছে। আমাদের অনুভূতির কেন্দ্রে এ সাযুজ্য যত সত্য হবে ততই উপলব্ধির অনিশ্চয়তা কাটবে। এই যে মিশ্র পথ এবং আলো কবির অন্তর্দেশকে একটি লগ্নে এসে নানা রঙে রাঙিয়ে তোলে রবীন্দ্রজগতের সেইটেই আসল সত্য।

এখানে লগ্নটি যেমন সত্য, ঠিক তেমনি সত্য নানা রঙের আলো এবং কবির ত্রিকোণকাচধর্মী (Prism) মনন-কল্পনা। 'রাজা' নাটক। নানা রাজা বা মিথ্যা-রাজার পূজার উপচারের মধ্য দিয়ে সত্য রাজা বা রাষ্ট্রকল্যানের স্বরূপকে খুঁজবার একটা নাটকীয় ইচ্ছা-ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছে এই নাটকে। রাষ্ট্রকল্যাণের নিগূঢ় সত্যটি নিষ্ক্রিয়, তবু জনইচ্ছার তোড়ে এই নিষ্ক্রিয় সত্যটিই সক্রিয় করে তুলেছে নাটকের ঘটনাচক্রের পরম পরিণতি। কিন্তু এইটুকুই শুধু নয়, তলীয় আবর্তের কামনাকে বিশুদ্ধ কামনায় রূপান্তরিত করবার যে বিক্ষুব্ধ আত্মিক সংগ্রাম চলেছে তারও রয়েছে বহুমুখী জোয়ার। সুরঙ্গমা এ সংগ্রামকে বাতাতপ-নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষেমাকে বহন করছে নইলে সুদর্শনা জ্বলে যেত। একদিকে সভ্যতারূপী সুদর্শনা প্রকৃত প্রতিভূ কোথায় তারই সাধনায় তৎপর, (এটা গোটা মানব-ইতিহাসের সত্য এবং ফরাসী বিপ্লব বা অক্টোবর বিপ্লবেও যার সার্থকতা আজও ধরা দেয়নি ;) অন্যদিকে সুদর্শনা কামনার পার্থিব সংস্কারে জ্বলছে তারই বা সার্থকতা কোথায়। দুয়ে মিলিয়ে পৃথিবীর ব্যক্তি ও সমষ্টিকে নিয়ে যে বিশাল বাসনার তরঙ্গাভিঘাত তা এখানে সিদ্ধ এবং অসার্থক নয়। ওষুধ বাতুলে দেবার তাগিদ কবির থাকবার কথা নয় তবু তারও ইঙ্গিত এখানে কল্পনার ধোঁয়া দিয়েই যায়নি শুধু। ঠাকুরদা, গানগুলো এবং গানের তান, ছন্দ এবং সুর এই জীবন্ত সত্যটারই সহায়ক। যদি মঞ্চ কোনোদিন এই 'রাজা'কে তার আপন যাথার্থ্যে ধারণ করতে পারে, সেদিন অসুবিধাটা কম প্রতীয়মান হবে।

'রক্তকরবী'তে নন্দিনীর ইতিহাস একটি লাবণ্যময়ী বালিকার। তার সঙ্গে রঞ্জনের সম্পর্ক যত আতীন্দ্রিয়ই হোক্, রঞ্জনের মৃতদেহ কিন্তু যক্ষরাজের রাজা-লিপ্সাকেও নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। সুতরাং বলা চলে সেটা এমনই মৃত্যু যা সমস্ত যন্ত্রযুগকে যাত্রা ফিরিয়ে নেবার ইঙ্গিত দিচ্ছে। কথাটা একটা মর্মান্তিক পীড়নের মধ্যে অসাড় হয়ে হৃদয় শুধু নীরবে উপলব্ধি করে। রবীন্দ্রনাথে 'মৃত্যু' কোনো কিছুর যবনিকা নয়, এ পীড়নের আড়ালে সম্ভাবনাটা আসে ধ্যানের মধ্যে।

আনন্দের পরাজয় চণ্ডালিকার বিজয়-বাণী হয়ে ওঠেনি সত্যই। কিন্তু তার বেদনার লাবণ্যই তাতে এনেছে অপরি-শুদ্ধ কামনার শুদ্ধির ইঙ্গিত। চণ্ডালিকা কামনার ঝড় উঠেছে। আনন্দ সে ঝড়ে নিজেকে সামলাতে পারে না, তার তপস্যা ভেঙে যায়। কিন্তু এ কী পরাভব আনন্দের! চণ্ডালিকা ম্লান হয়ে যায়, তার প্রেমে এসে লাগে এক অভাবিত অতীন্দ্রিয় স্পর্শ। তার বেদনায় ঐটেই যে সত্য এটা অনুভবে পৌঁছয়।

কবির প্রেমের এই আদর্শটিও আচমকা এখানে এসে দাঁড়ায়নি। 'আবির্ভাব' কবিতায় যৌবন বয়সের কবি বাসরঘরের দুয়ারে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। আবার সেই-কবিই বার্ধক্যের সীমায় এসে প্রেমের সৌন্দর্যসুধাকে সাধনাগত করেছেন। এ সাধনা সমগ্র মানবজাতির শ্রেয়ংকে নিয়েই মাত্র সার্থক হতে চায়। প্রেম এখানে কবির বিশ্বৈক্যা-নুভূতির সঙ্গে হরিহরাত্ম হয়েও গভীর মানবিকতায় লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে। মাঝখানে ক্রম ও পর্যায়ের নানা ঋতু তাকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত করেছে পদক্ষেপে-পদক্ষেপে। রবীন্দ্র সংস্কারে আজগুবি বলে কিছু নেই। হঠাৎ সেখানে কিছু আসেনি, আসে না, কিন্তু সমস্তটা আবার আকস্মিকতায়ও গাঁথা বটে। অনু-ভূতির অবকাশ সেইখানেই।

একটা কথা এইখানেই উল্লেখ করি। নৃত্য-গীত ও নাটক নিয়ে একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন সম্প্রতি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত হয়ে। রবীন্দ্র-নৃত্য-গীতনাট্যই যদি এ বিদ্যাকেন্দ্রের আদর্শ হয়, তাহলে রবীন্দ্রী দৃষ্টিপথকে এবং দৃষ্টিপথের স্বচ্ছতাকে তা যেন একটুও বিকৃত না করে অতি সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হয়। অভিনবত্বের মারাত্মক চটক রবীন্দ্রনাথকে রাবীন্দ্রিক ঢঙে পর্য-বসিত না করে। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি নাটকেরই রবীন্দ্রী সংস্কারের পাঠোদ্ধার হলে বোঝা যাবে, মঞ্চ তাকে ধারণ করতে গেলে কি তার সমস্যা। শব্দ, নৃত্য এবং কথায় যে একটি অঙ্গাঙ্গী ভাবত্ব আছে তা চোখে না পড়লে এ নাটক ভুলের চোরাবালিতে মুহ্যমান হবে। কাজেই, এসবের পাঠের আদর্শ মান প্রতিষ্ঠা এবং বিচারের সিদ্ধ আলোকেই সমস্ত সাধু প্রচেষ্টার উদ্ভব ও বিকাশ হওয়া উচিত। যদি এমনি হয় তা হলে যত দুটিই রবীন্দ্রী নাটকের থাক না কেন, তার দান সার্থক হ'য়ে উঠবে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যবিচারের পরিসর ক্রমেই বাড়ছে। লক্ষণ সাধু। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্য কতটা বস্তুবাদী আর কতটা রোমান্টিক, কি পরিমাণ আধ্যাত্মিক বা কি পরিমাণ ঈশ্বরানুভূতিনির্ভর এ সব প্রশ্নগুলিই গৌণ। পশ্চিমী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনাও তুলনামূলক সাহিত্যের খোরাক হতে পারে, কিন্তু সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথকে না দেখে বরং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সেগুলি দেখলে নূতন উপাদান অনেক মিলবে। কেবল-বিশ্বমানবকে বিশ্ববস্তু হিসাবে গ্রহণ এবং বিশ্বরস হিসাবে আনন্দলীলায় তার পরিবেশনে বোধ হয় একক রবীন্দ্র-প্রতিভাই সক্ষম হয়েছে। অথচ তা স্বগত, এবং স্বগত হয়েও তা পরগত মাত্র নয়, অনির্বচনীয় এবং অলোকিকও। একমাত্র বুদ্ধির প্রভুত্ব মেনে নিয়ে নগ্নবস্তুর অন্তরালের উদ্ঘাটন নেই বলে রবীন্দ্র-নাথকে নিয়ে যাঁরা আক্ষেপ করে থাকেন তাঁদের কাছে নিবেদন করি—গ্লানি ও কদর্যতা কি অস্তিত্বের বাত্যায় নয়। বিচ্ছিন্নতার এ স্বগস্থি রবীন্দ্রনাথের আনন্দরূপ এবং অমৃতরূপের কোনো কাজে লাগে না।

আমার শেষ বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথ-পাঠে যাঁরা ব্রতী হবেন, বা রবীন্দ্র-শিল্পে যাঁরা আসক্ত হয়েছেন তাঁরা যেন রবীন্দ্র-ঋতু-গুলির দিকে দৃষ্টি রাখেন। প্রতিটি ঋতুর একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গাঁথা আছে সমগ্র রবীন্দ্রনাথ। চিত্র হোক্, সঙ্গীত হোক, কাব্য হোক্, গদ্য হোক সবই এই ঋতুর ফলন এবং ঋতুরই ফসল। সময়াঙ্ক থেকে সময়াঙ্ক পর্যন্ত প্রতিটি প্রকারের শিল্পকর্মেরই একটি অতিস্পষ্ট অভিজ্ঞান-সূত্র মেলে প্রায় গাণিতিক নিয়মে সিদ্ধ হয়ে। এর প্রত্যেকেই যেন যথাযথতার সিদ্ধ এবং নিয়মিত। বিচারে বসে এটুকু মনে রাখলে রবীন্দ্রনাথ-পাঠের অভ্যাসে ক্রমে রবীন্দ্রসংস্কার দেখা দেবে। এবং তখনই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ কেন রবীন্দ্রনাথ।

[উপন্যাস]

।। নয় ।।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সাত আটটা দিন এই পরিবারের একটা দুঃস্বপ্নের ঘূর্ণির মধ্য দিয়ে কেটে গেল।

পুলিশ এল, তদন্ত হল, দৌড়োদৌড়ি করতে হল থানায়। যন্ত্রণার পিণ্ড শরীরটাকে কোনোমতে একটা রিক্সাতে টেনে তুলে গৌরাঙ্গবাবুকে পর্যন্ত একবার ঘুরে আসতে হল থানা থেকে।

—তাহলে অমলকেই আপনি সন্দেহ করেন?—দারোগার জিজ্ঞাসা।

—সন্দেহ আবার কী?—ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল অভয় : ওই বদমাসটাই—

—চুপ!—কড়া গলায় দারোগা ধমক দিলেন : তোমাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে না।

—আচ্ছা স্যার—হকচকিয়ে খেয়ে অভয় বাপের চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

—আপনি তা হলে মনে করেন, বোমাটা অমলই ছুঁড়েছে?

গৌরাঙ্গবাবু এতক্ষণ ফাঁকা দৃষ্টিতে ঘরটার চারদিক লক্ষ্য করছিলেন। দরজার সামনে লাল পাগড়িপরা একজন পাহারাওলা দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো। ও পাশের টেবিলে একজন পুলিশ অফিসার একরাশ কাগজপত্র নিয়ে নিজের কাজে ডুবে রয়েছেন, তাঁর সামনেই হাতজোড় করে মাটিতে বসে আছে চার-পাঁচটি শুকনো-মুখ গরিব মানুষ—রাস্তার ফিরিওলা—হল্লার গাড়ী তাদের ধরে এনেছে। খাকি শার্ট আর ধুতি পরা একটি লোক কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া আসা করছে। র‍্যাকে র‍্যাকে অসংখ্য ফাইল—ওপরের গুলোতে ধুলো জমেছে। দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় তিন জোড়া হাতকড়া ঝোলানো। একটা অপরিচিত আর অস্বস্তিকর ভাপসা গুমোট গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। যে দারোগা গৌরাঙ্গবাবুর সঙ্গে কথা কইছেন তাঁর বাঁ হাতের সিগারেট থেকে নীল ধোঁয়ার রেখাগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পাখার বাতাসে।

দারোগার জিজ্ঞাসায় গৌরাঙ্গবাবু চোখ তুলে চাইলেন তাঁর দিকে।

অমলকেই আপনি সন্দেহ করেন?

—করি।—আবছাভাবে জবাব দিলেন গৌরাঙ্গবাবু। গলার ভেতরটা শুকিয়ে গিয়ে খসখসে শিরিস কাগজের মতো মনে হচ্ছে। এক গ্লাস জল পেলে ভালো হত। কিন্তু চাইতে সাহস হচ্ছে না।

—সে-ই আপনার ছোট মেয়ের নামে বিশ্রী চিঠি লিখেছিল একটা?

—আজ্ঞে।

সিগারেটটাকে অ্যাস্-ট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে দারোগা বললেন, চিঠিটা যে তারই লেখা, জোর করে বলতে পারেন?

—নিজেই স্বীকার করেছে। আমার ছোট ছেলে অমিয়কে বলেছে, লিখেছি, বেশ করেছি।

—চিঠিটা আপনি দেখাতে পারেন না?

—না। তখুনি ছিঁড়ে উনুনে ফেলে দিয়েছিলুম।

দারোগার কপালে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল : চমৎকার। প্রমাণটাকে লোপ করে ফেললেন। কেস্‌টা বিলড্-আপ করব কিসের ওপরে? হাওয়ার?

সেই তীব্র তীক্ষ্ণ পিপাসা গৌরাঙ্গবাবুর জিভটাকে গলার ভেতর দিকে টানতে লাগল। বললেন, আজ্ঞে সেটা এত অশ্লীল—

দারোগা রুক্ষ হয়ে উঠলেন : অনেক ক্রিমিনাল কেসই অত্যন্ত অশ্লীল ব্যাপার। সেজন্যে চক্ষুলজ্জা করলে পুলিশের চলে না, কোর্টেরও না। যাই হোক, এই নিয়ে আপনার বড়ো ছেলে অভয় অমলকে মারধোর করেছিল?

অভয় বললে, একটা ঘুষি মেরেছিলুম।

—চুপ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে না। হাঁ, তারপরে অমল কী বলেছিল?

—বিশেষ কিছু নয়। শুধু বলেছিল, আচ্ছা।

দারোগা আবার একটা সিগারেট ধরালেন। ধীরেসুস্থে ধোঁয়া ছাড়লেন। ডান হাতের পেন্সিলটি ঠুকলেন টেবিলের ওপর।

—সেক্ষেত্রে বোমাটা অভয়ের দিকেই ছোড়া উচিত ছিল না কি? আপনার দূরসম্পর্কের ভাইপো প্রভাত সরকার কিংবা আপনার বড়ো মেয়ের ওপর তার কোনো আক্রোশ থাকার কথা নয়। কেমন কি না?

—আজ্ঞে ঠিক জানি না।

—হুঁ।—দারোগা কিছুক্ষণ গম্ভীর

হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, এবার আর দু-একটা প্রশ্নের জবাব দিন।

—বলুন।

—আপনার বড়ো মেয়ে দীপ্তি দের চাল-চলন সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

এতক্ষণ নিঃসাড় হয়ে থাকা গৌরাঙ্গবাবুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আবার তীব্র যন্ত্রণার বিদ্যুৎ চমকালো। মস্তিষ্কের ভেতরে রক্ত ছুটে গেল একরাশ।

—দীপ্তির কথা কেন আনছেন?

—কারণ আছে।—দারোগার মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে উঠল: পুলিশের এক চক্ষু হলে চলে না—তাকে চারদিকে তাকাতে হয়। শুনুন গৌরাঙ্গবাবু। পাড়ার লোকে অনেকেই দেখেছে সে অনেক রাত করে অচেনা পুরুষের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে, আমরা এ খবরও রাখি চৌরঙ্গীর দু-একটা খারাপ হোটেলে তার গতিবিধি আছে। এই মেয়েটি কী করে—কোথায় যায়—সব জানেন আপনি?

অভয়ের কপালে শিরাগুলো ফুলে উঠল, শ্বাস-নলীটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

—দিদির সম্বন্ধে এ সব কথা—

—শাট আপ!—দারোগা গর্জন করলেন: আর একটা কথা বললে তোমায় ঘর থেকে বের করে দেব। বলুন গৌরাঙ্গবাবু, আপনার বড়ো মেয়ে সম্বন্ধে কী জানেন আপনি?

—সে চাকরি করে। রাত্রে ওভারটাইম দিতে হয়।

দারোগার ঠোঁটের কোণায় একটা বাঁকা হাসি দেখা দিল: চাকরিটা কোথায় করে—জানেন?

—না।

—তার অফিসটা কোথায় তা-ও জিজ্ঞেস করেননি?

—না।

বাঁকা হাসিটা আর একটু বাঁক নিল: কলকাতা শহরে এমন একটা অফিসের খবর দিতে পারেন যেখানে মেয়েদের একটা দেড়টা পর্যন্ত ডিউটি দিতে হয়? আর সে ডিউটিটা চৌরঙ্গীর হোটেল পর্যন্ত গড়ায়? আর ডিউটি দিয়ে কোনো কোনোদিন মাতাল হয়ে ফিরে আসতে হয় তাকে?

গৌরাঙ্গবাবুর যন্ত্রণাভরা শরীরটা অস্তিত্বহীন শূন্যতার মধ্যে মিলিয়ে যেতে চাইল। সমস্ত শারীরিক যন্ত্রণার চাইতে যা তীব্র—যে আতঙ্ক, যে সংশয় দিনের পর দিন তাঁকে কীটের মতো কেটে চলেছে, এক একটা বিনিদ্র রাতে যে কথাটা ভাবতে ভাবতে মনে হয় নিজের মাথাটা যেন বিস্ফোরক দিয়ে তৈরী—যে কোনো সময় ফেটে চৌচির হয়ে যেতে পারে—সেই আতঙ্ক, সেই বিভীষিকা গৌরাঙ্গবাবুকে গ্রাস করছে। এই ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন না—দারোগার মুখখানা নয়—ওদিকের পুলিশ অফিসারের টেবিলের সামনে যে লোকগুলো হাত-জোড় করে বসে আছে—তারাও কেউ কোথাও নেই। শুধু ফাইল, ধুলো, সিগারেট, দেওয়ালের পুরোনো চুন—সব মিলে সেই ভাপসা গুমোট গন্ধটা তাঁর দম বন্ধ করে আনছে, আর আবছা চোখের সামনে কয়েকটা অতিকায় নিজের মতো জেগে জেগে আছে দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো তিনজোড়া হাতকড়া।

বাপের চেয়ারটা ধরে অভয় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কপালের শিরাগুলো তার ফেটে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম। এখন শুধু শ্বাসনলীটাই কাঁপছে না—সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে সেটা। চেয়ারের গায়ে সেই কাঁপুনিটা অনুভব করতে করতে গৌরাঙ্গবাবু নিজের মধ্যে ফিরে এলেন।

—এক গেলাশ জল খাওয়াতে পারেন?—এতক্ষণে আর গৌরাঙ্গবাবু নিজেকে শাসনে রাখতে পারলেন না। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো প্রায় নিঃশব্দ গভীর গলায় প্রার্থনা জানালেন।

—নিশ্চয়—নিশ্চয়।—দারোগা ডাকলেন: পশুপতি?

সেই খাকি শার্ট আর ধুতি পরা রোগা-লম্বা লোকটি এগিয়ে এল।

—খাবার জল আনো।

—আনছি স্যার।

জল এল। এক চুমুকে তার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত নিঃশেষ করলেন গৌরাঙ্গবাবু। মাথার উপরে পাখা ঘুরছিল, তবু দুটো বড়ো বড়ো ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে নামল তাঁর কপাল থেকে।

—এবার বাবাকে ছেড়ে দিন দারোগাবাবু।—অভয়ের মিনতি শোনা গেল: অসুস্থ মানুষ—

দারোগার মুখ কোমল হয়ে উঠল একটুখানি: না, আর বেশিক্ষণ আটকে রাখব না।—আবার পেন্সিলটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ঠুকতে লাগলেন টেবিলের উপর: আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি গৌরাঙ্গবাবু। কিন্তু সেন্টিমেন্ট নিয়ে থাকলে পুলিশের চলে না—তাকে সব অ্যাঙ্গেল থেকে জিনিসটাকে দেখতে হয়। অমলকে আমরা জানি না তা নয়। সে যে খুব চমৎকার ছেলে এমন কথা পুলিশের খাতা বলে না। কিন্তু বিনা প্রমাণে তো কিছু করা যায় না। একজন শ্যামবাজারে পকেট কেটেছিল বলেই সে যে বসিরহাটের গেরস্তবাড়ীতে সিঁদ দিয়েছে—এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই।

—কিন্তু ওরা ছাড়া আর—গৌরাঙ্গবাবুর ভীরু প্রতিবাদ খানিক দূর পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়ালো।

—হাঁ, সেই কথাতেই আসছি। এমনও তো হতে পারে আপনার বড়ো মেয়েটির কোনো একজন প্রেমিক জিলটেড হয়ে এইভাবে রিভেঞ্জ নিয়েছে?

গৌরাঙ্গবাবু জবাব দিলেন না। ঘোলাটে চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন।

ভদ্রঘরের মেয়েরা যখন অধঃপাতে নামে, তখন তার আর কোনো লিমিট থাকে না। এমন তো হতে পারে, সমস্ত নোংরা ব্যাপারটার জন্যে দীপ্তিই একমাত্র রেসপন্সিবল—এর সঙ্গে অমলের কোনো সম্পর্ক—কী হল আপনার?

বিশেষ কিছুই হয়নি। শুধু সেই যন্ত্রণা—যা শরীরের সমস্ত যন্ত্রণার চাইতে নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর—তাই গৌরাঙ্গবাবুকে আবার আচ্ছন্ন করে ধরেছে। এবার চোখের সামনে আর কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই। এমন কি দেয়ালের গায়ে সেই তিনজোড়া হাতকড়াও নয়। এসরাজের খোলের মতো ফাঁকা মাথাটা ধীরে ধীরে টেবিলের ওপরে নেমে আসছে গৌরাঙ্গবাবুর।

আর বুকফাটা আর্তনাদে চেঁচিয়ে উঠল অভয়।

—বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছে দারোগাবাবু—বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছে—

দারোগা কর্তব্যে ত্রুটি করেননি। জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছেন, চা খাইয়েছেন, রিকশা করে আসতে হয়নি, পুলিশের গাড়ী করে পৌঁছে দিয়েছেন বাড়ীতে।

বলেছেন, ভাববেন না—কালপ্রিট্‌কে আমরা খুঁজে বের করব ঠিক।

অমল এক রাত হাজতে থেকে ফিরে এসেছে। পুলিশের এনকোয়ারী চলছে এখনো। কিন্তু অমলকে খুব চিন্তিত বলে মনে হয় না। খুব জোরালো গলায় সিনেমার গান গায়। গৌরাঙ্গবাবুর বাড়ীর সামনে এসে কাকে যেন চেঁচিয়ে সাবধান করে দেয়ঃ এই খবর্দার, ও বাড়ীর দিকে তাকাসনি। মানী লোক সব—ফস করে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।

তালব্য শ দন্ত্য স কে ইংরেজি 'এস্'-এর মতো উচ্চারণ করে।

গৌরাঙ্গবাবু বিছানা নিয়েছেন। বাইরের বারান্দায় এসে বসা তাঁর বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকদিন আগেও ভাবতেন, যে-কোন উপায়ে হঠাৎ পাওয়া কোনো একটা আশ্চর্য ওষুধে তিনি ভালো হয়ে উঠবেন—একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখবেন আগেকার মতো আবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর শক্তিমান বাপের রক্ত আবার তাঁর শিরায় শিরায় ছুটতে আরম্ভ করে দিয়েছে, তাঁর পঞ্চাশ পেরুনো শরীরে ফিরে এসেছে আবার যৌবনের উৎসাহ, আবার ক্যানভাসিংয়ের বইয়ের ব্যাগ কাঁধে করে শীতের লাল সকালে কোনো পাড়াগেঁয়ে স্টেশনে নেমে শিশিরমাখানো আলপথ দিয়ে সাত মাইল দূরের গ্রামের দিকে রওনা হয়েছেন। যে গৌরাঙ্গবাবু জীবনে কখনো হার মানেননি, তিনি আবার নতুনভাবে বাঁচবার লড়াইয়ে নেমে পড়েছেন।

কিন্তু আর সে কথা ভাবেন না গৌরাঙ্গবাবু। এই সাত দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছেন, ফুরিয়ে গেছেন চিরদিনের মতো। যে স্ত্রী এতকাল ছায়ার মতো সঙ্গে থেকেছেন, সংসারের হাজার কষ্ট-দুঃখের মধ্যেও যিনি মুখ বুজে কাজ করে চলেন, নিজের ছেঁড়া কাপড় শতবার সেলাই করে পরেও যিনি কখনো একখানা কাপড় চান না—সেই পরম সহিষ্ণু স্ত্রীকেও তিনি আর সহ্য করতে পারেন না এখন।

—দূর হয়ে যাও—দূর হয়ে যাও সামনে থেকে—

একটা কাঁসার গ্লাস নোনা-ধরা দেওয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়ে, একরাশ বালি ঝরিয়ে দেয়—ঠক্ ঠনাৎ শব্দে কাতর প্রতিবাদ জানায়। আর মেজে দিয়ে গড়িয়ে চলে অনেক দুঃখে সংগ্রহ করা এক পোয়া দুধ—যার প্রতি ফোঁটায় এই সংসারের এক এক কণা অর্ধাহার-মেশানো। প্রভাত আর অভয়ের টাকায় সংসারের কুড়ি দিনও চলে না—দীপ্তি হাসপাতালে যাওয়ার পর থেকে চোখের সামনে এখন ক্ষুধার খড়্গ দুলছে!

স্ত্রী এতদিন কাঁদেননি। আজকাল তাঁর চোখে জল আসে।

আর কুৎসিত কটু গালাগাল করেন সকলকে। শুধু দীপ্তির নামটাই কখনো মুখে আনেন না—যেন তার অস্তিত্বটাকেই নিজের স্মৃতি থেকে চিরকালের মতো মুছে ফেলেছেন। তা ছাড়া আর কেউ বাদ পড়ে না। তৃপ্তি, অমিয়, অভয় —সবাই-ই তাঁর দু চোখের কাঁটা হয়ে উঠেছে।

রাগটা যেন সব চাইতে বেশি অভয়েরই উপরে।

—কেন তুই ওর গায়ে হাত দিতে গেলি? কিসের জন্যে?

অভয় জবাব দেয় না। একবারও মনে করিয়ে দেয় না, ভীরু অমিয়ের দিকে তাকিয়ে তখন কী অসহ্য ঘৃণায় গৌরাঙ্গবাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল।

—গুণ্ডার সঙ্গে গুণ্ডামি করে কেউ পারে? হতচ্ছাড়া বেকুব—গোঁয়ার কোথাকার।

অভয়ের ঠোঁট কাঁপে। তবু মাটির দিকে চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে।

হঠাৎ গৌরাঙ্গবাবুর স্বর নেমে আসে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় মুখ।

—ওদের যত রাগ সবই তো তোর ওপর। যদি একলা পথে পেয়ে তোকে ছোরা মেরে দেয় কখনো?

অভয় হাত মুঠো করে ধরে। পেশীতে পেশীতে অনুভব করে একটা হিংস্র বলিষ্ঠতাকে।

—ভয় নেই বাবা, আমার কিছু করতে পারবে না।

—গুণ্ডার সঙ্গে তুই পারবি?

—এবার হাত দুটো মুচড়ে ভেঙে দেব বাবা—যাতে চিঠি লিখতে না পারে, বোমা ছুঁড়তে না পারে। জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব—অভয়ের স্বরে আদিম জিঘাংসা ফুটে বেরোয়ঃ যাতে মুখ দিয়ে কোনো অশ্লীল কথা আর কোনোদিন উচ্চারণ করতে না পারে।

—না-না-না।—ভাঙা গলায় গৌরাঙ্গবাবু বলেন, ওরা গুণ্ডা। তোকে কিছু করতে হবে না। তুই খুব সাবধানে থাকিস বাবা—কারু সঙ্গে লাগতে যাসনে।

—দেশ তো অরাজক নয়, বাবা।

—অরাজক কেন হবে, অনেক রাজা আছে। কিন্তু আমাদের মতো গরিবের জন্যে কেউ নেই।

ঠিক সেই সময় হয়তো তৃপ্তি ঘরে আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে ফেটে পড়েন গৌরাঙ্গবাবু।

—এখানে কেন হারামজাদী? বাইরে গিয়ে দাঁড়া। শহরসুদ্ধ সবাই তোর রূপ দেখুক।

তৃপ্তি তার মার মতোই স্বল্পভাষিণী। নিঃশব্দে দুঃখ সহ্য করাই তার চিরকালের অভ্যাস। তবু তারও অসহ্য লাগে। তীরবেঁধা হরিণীর মতো বোবা বেদনায় চুপ করে থাকে সে।

শুধু অমিয় বাপের ত্রিসীমানায় আসে না। কোনোদিনই বাবা তাকে দু' চক্ষে দেখতে পারেন না—এই সময়ে বাবার ঘরে গলা বাড়িয়ে অকারণে গালাগালি খাওয়ার মতো কোনো কারণ দেখতে পায় না সে।

তবে একটা কাজ নিয়মিত করে অমিয়। রোজ বিকেলে দীপ্তিকে দেখতে যায়—তৃপ্তিও প্রায়ই যায় তার সঙ্গে। গৌরাঙ্গবাবু মেয়ের নামও করেন না। অ্যাপ্রেন্টিস খেটে ফিরতে ফিরতে অভয়ের যথানিয়মে রাত হয়ে যায়, প্রভাত দেখতে যায় কখনো কখনো। কিন্তু অমিয় রোজ দিদির খবর নিয়ে আসে। হাতে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে পড়ে আছে দীপ্তি —মারাত্মক ভয়ের কিছু নেই, তবু এখনো তাকে একমাস হাসপাতালে কাটাতে হবে। অমিয়ই তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেঃ তুই মন খারাপ করিসনে দিদি, অল্প কদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবি।

দীপ্তি সান্ত্বনা পায় কিনা কে জানে, কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। কখনো কখনো দু'চোখের কোণা দিয়ে জল গড়ায়।

অমিয় ভারিক্কী চালে বলে, ছিঃ দিদি, কাঁদছিস কেন? তুই ছেলেমানুষ নাকি?

তৃপ্তি সঙ্গে থাকলে আঁচল দিয়ে দিদির চোখ মুছিয়ে দেয়। দীপ্তি হয়তো জিজ্ঞাসা করেঃ হ্যাঁরে, মা-ও তো দুদিন এসে আমাকে দেখে গেল, বাবা একদিন আসতে পারে না?

তৃপ্তি উত্তর দিতে পারে না। গৌরাঙ্গবাবু কেন আসেন না, নিজের

মনে কোথাও সে তার একটা অস্পষ্ট উত্তর পেয়েছে। কিন্তু সে কথাটা সে বলতে পারে না, শুধু তার মুখের উপর দিয়ে ছায়া ঘনায়।

অমিয় নিঃসংকোচে বলে, বাবা আসবে কী করে? বাতের ব্যথা ভয়ানক বেড়েছে আবার। বিছানা ছেড়ে প্রায় উঠতেই তো পারে না আজকাল। একটু কমলেই আসবে।

তিন ভাইবোন আবার চুপ করে বসে থাকে। মস্ত হল ঘরটার অন্যান্য বেডে যারা রোগীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তৃপ্তি তাদের দেখে। কেউ ফল এনেছে, কেউ মিষ্টি, কেউ বই। তৃপ্তির ভারী কষ্ট হয়। তারও ইচ্ছে করে দিদির জন্যে ফল আনে, মিষ্টি নিয়ে আসে। কিন্তু পয়সা কোথায়? কে দেবে? সংসারের খরচ ছাড়া বাড়তি কিছু পয়সা-কড়ি দিদিই দিতে পারত, কিন্তু দিদিকে কে দেবে?

আইওডিন-বেন্‌জিন-বোরিক তুলো—সেইসঙ্গে আরো কত রকম ওষুধের মেশানো গন্ধ হাওয়ায় ভাসে। ডাক্তারেরা আসে যায়—নার্সদের জুতোর খুট খুট করে আওয়াজ হয়। একটি মেয়ের চাপা গোঙানি শোনা যায়, ঘরের একেবারে ওই দিকটাতে আর একজন কে সমানে কাঁদতে থাকে: 'এ যন্ত্রণা আর তো সহ্য হয় না—ভগবান, তুমি এবার আমায় নাও!' সব মিলিয়ে তৃপ্তিরও কেমন কান্না পেতে থাকে।

তখন হয়তো হঠাৎ দীপ্তি বলে, তোরা এবারে বাড়ী যা।

অমিয় বলে, এখনো তো আধ ঘন্টা সময় আছে দিদি। আমরা আর একটু বসি।

—না-না, হাসপাতালে বেশিক্ষণ থাকতে নেই। তোরা যা।

তৃপ্তির মনে হয়, দিদির তাদের আর ভালো লাগছে না। দিদি এখন একাই থাকতে চায়। কিন্তু অমিয় ওঠে না।

—আমাদের জন্যে তোকে ব্যস্ত হতে হবে না দিদি। আমরা ঠিক আছি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে কাটে—কেউ যেন কোনো কথা খুঁজে পায় না। তারপর অমিয় তার ফুটবলের গল্প আরম্ভ করে।—জানিস দিদি সেদিন বর্ধমানে খেলতে গিয়ে সে এক কাণ্ড! ওদের একজন ফরোয়ার্ড এমন ফাউল করে খেলে যে কী বলব। আর রেফারিরও এমন পার্শিয়ালিটি, কিছুতে ফাউল দেবে না। তখন আমি মনে মনে বললুম, আচ্ছা দাঁড়াও— আমিও অমিয় দে—তোমায় দেখাচ্ছি। শেষকালে তাক বুঝে হাঁটুতে এমন একখানা বসিয়ে দিলুম যে তিন ঘন্টার আগে আর বাছাধনের জ্ঞান এল না।

কিন্তু গল্পটা বলতে বলতে অমিয়ও টের পায়, সব যেন বেসুরো ঠেকছে। দিদি ফাঁকা চোখে শিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে—তৃপ্তি তার কথার একটি বর্ণও শুনেছে না। অমিয় লজ্জা পায়। বলে, চল তৃপ্তি, এবার আমরা যাই।

তৃপ্তি উঠে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই। অমিয় আর একবার সান্ত্বনা দেয়: কিছু ভাবিসনি দিদি, খুব শিগগীরই তুই ভালো হয়ে যাবি।

দীপ্তি ম্লানভাবে হাসে: আচ্ছা।

সেদিনও দুজনে যখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল, তখন সন্ধ্যার ছায়া নামছে। বাসের জন্যে অপেক্ষা করছে, এমন সময় নীল রঙের মস্ত একটা মোটরগাড়ী ঠিক ওদের পাশে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

—হ্যালো অমিয়!

—হ্যালো চন্দন সিং!

গাড়ী থেকে মুখ বের করল ত্রিশ-বত্রিশ বছরের একজন শিখ। পরিষ্কার বাংলায় বললে, এখানে দাঁড়িয়ে যে? কী ব্যাপার?

—আমার দিদি আছে যে হাসপাতালে। দেখতে এসেছিলুম।

—ওহো, তাও তো বটে।—চন্দন সিংয়ের চোখ একবার তৃপ্তির মুখে পড়েই আবার অমিয়র দিকে সরে গেল: তোমার দিদি কেমন আছে এখন?

—ভালো, ভয়ের কিছু নেই। তৃপ্তি, এ হল আমার ফ্রেন্ড চন্দন সিং, ট্যাক্সির ব্যবসা করে, অনেক টাকার মালিক। আর এ আমার ছোট বোন তৃপ্তি।

পরিচয়ের দরকার ছিল না, অমিয় এর আগেই অনেকবার তার ফ্রেন্ড চন্দন সিংয়ের গল্প সগর্বে শুনিয়েছে তৃপ্তিকে।

"বাবা একদিনও আসতে পারে না!"

আর চন্দন সিং হেসে বললে, নমস্কার, আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। তা উঠুন না আমার গাড়ীতে, পৌঁছিয়ে দিই।

তৃপ্তি দ্বিধা করছিল, কিন্তু অমিয় একপায়ে খাড়া। তৎক্ষণাৎ একটানে গাড়ীর দরজাটা খুলে ফেলল।

—আয়, আয়—ওঠ। লজ্জা করার কিছু নেই, চন্দন সিং আমার বুজুম ফ্রেন্ড।

লজ্জা করলেও আর উপায় ছিল না। খোলা দরজা দিয়ে তৃপ্তি গাড়ীতে পা দিলে

(ক্রমশঃ)

বাঙালীর আহারের ক্রমবিবর্তন

ভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

(১)

বাঙালীর আহারের বিলাস এবং অপচয় শুধু অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের নয়—বিদেশীদেরও চোখ এড়ায়নি। প্রায় তেরোশত বৎসর আগে চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং তাঁর ভারত-ভ্রমণের যে বিবরণ রেখে গিয়েছেন তার মধ্যে এর ইঙ্গিত পাই। তিনি লিখেছেন যে একবার তাঁর 'পূর্ব ভারতের তাম্রলিপ্ত নগরে' কয়েকজন ভিক্ষুকে খাওয়ানোর ইচ্ছা হয়। তিনি আহারের এমন ব্যবস্থা করতে চান যাতে নিমন্ত্রিতদের পেট ভরে। কিন্তু সকলে তাঁকে বললেন যে তিনি যদি নিমন্ত্রিতদের শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা করেন, তবে এ দেশের লোক হাসবে; তারা তাঁকে একটা ভূরি-ভোজের আয়োজন করতে পরামর্শ দিলেন।

বাঙালীর এই ভোজন-বিলাসের মূলে অবশ্য আছে বাংলার ভৌগলিক অবস্থান। এখানকার জলবায়ুতে প্রায় সব রকমের শস্য, অজস্র প্রকারের শাক-সব্জী তরি-তরকারি আর বিচিত্র ফলসম্ভার জন্মে। এখানকার খালে-বিলে, বাঁধে পুকুরে ঝিলে,—নদীর মিষ্টি জলে আর নদী-মোহনা আর সাগরের লোনা জলে,—বহু বিচিত্র প্রকারের মাছ। এর আর একটা কারণও আছে বাঙালীর ধর্মাচরণ যেমন বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, শৈব প্রভৃতি নানা মতবাদের সমন্বয়, বাঙালীর আহারও তেমনি ইতিহাসের প্রথম থেকে সে যে সব সংস্কৃতির প্রভাবে এসেছে তাদের সমন্বয়। আদি সংস্কৃতিতে বাঙালী অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত—যার আদি উদ্ভব-স্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। তাই ভাত, মাছই হয়েছে তার প্রধান খাদ্য—যব, গম, মাংস নয়। পশ্চিমের আর্য সংস্কৃতির প্রভাবে এসে সে গ্রহণ করেছে, মাংস, ডালজাতীয় এবং দুগ্ধজাত খাদ্য। তাছাড়া, পশ্চিম ভারতের সঙ্গে বাঙালীর আহারের একটি মূলগত পার্থক্য আছে, তা অনেকটা ইংরেজের সঙ্গে এবিষয়ে ফরাসীর পার্থক্যের মত। ইংরেজের কাছে খাওয়াটা জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক হলেও—একটা বিরক্তিকর কাজ, ফরাসীর কাছে তা একটা আর্ট, আনন্দ। আহার-বিষয়ে পশ্চিম ভারতীয়ের সঙ্গে বাঙালীর পার্থক্যও সেইরকম। তাই পশ্চিম ভারতের আহার সাদাসিধে, বাঙালীর আহার জটিল। পশ্চিম ভারতের আহারের উপাদানের স্থানই মুখ্য, রন্ধনটা গৌণ, তাই তারা অনেক খাদ্য কাঁচা বা অল্পপক্ক গ্রহণ করে, কিন্তু বাঙালীর আহারে রন্ধন-কৌশলই প্রধান স্থান অধিকার করেছে, উপাদানের স্থান গৌণ। তাই স্বচ্ছন্দ বনজাত কচু থেকে সুস্বাদু কচুর শাক আর সামান্য কলার মোচা থেকে অপূর্ব ঘন্ট, বাঙালীর রন্ধন-কৌশলেই সম্ভব হয়েছে।

অবশ্য বাঙালীর এই রন্ধন-কৌশলের মূলে আছে, রন্ধনকার্যে বাঙালী মেয়ে-দের নিষ্ঠা,—যা প্রায় ধর্মচর্চার কাছা-কাছি। অস্নাত বা অশুচি দেহে হাঁড়ি-হেঁসেল ছুঁতে নেই, বাঙালী মেয়েদের এই বিশ্বাস এই ধর্মনিষ্ঠা থেকেই সঞ্জাত। রান্না করে স্বামী-পুত্র অতিথি-অভ্যাগতকে খাওয়ানো বাঙালী মেয়েদের কাছে একটা ধর্ম অনুষ্ঠানের মত। বাঙালীর এই আদর্শই দেবতার মধ্যে অন্নপূর্ণার রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবশ্য এর আর অন্য একটি দিকও আছে। এই রাঁধা এবং খাওয়া বাঙালীর জীবনের অনেকখানি জুড়ে আছে, তাই বাঙালী মেয়েদের জীবনের অনেকখানি সময় রান্নাঘরে কেটে যায়। এই "রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা"র বিরুদ্ধেই আজকার বাঙালী নারীরা বিদ্রোহের বাণী তুলেছে।

বাঙালীর এই ভোজনপ্রিয়তার আর একটা ফল হয়েছে এই যে বাংলা সাহিত্যে আদিকাল থেকে এই রাঁধা এবং খাওয়ার বর্ণনা তার একটা বড় স্থান অধিকার করেছে। এমন প্রাচীন বাংলা কাব্য কমই আছে, যাতে রাঁধা এবং খাওয়ার বিস্তৃত বর্ণনা নেই। বাঙালী পুরুষের যেমন খেয়ে আনন্দ, বাঙালী মেয়েদের যেমন খাইয়ে আনন্দ, প্রাচীন বাঙালী কবিদের তেমনি দেখা যায় রাঁধা এবং খাওয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার আনন্দ। এর ফলে আমরা যেমন বাঙালীর গতপ্রায় হাজার বৎসরের আহার ও রন্ধন প্রণালীর একটা বিশদ বিবরণ পাই, তেমনি পাই এই সময়ব্যাপী তাদের বিবর্তনের একটা ইতিহাস।

বাঙালীর রাঁধার আদিতম বর্ণনা পাই ডাকের বচনে। দিনেশচন্দ্র সেনের মতে ডাকের বচনগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর আগে রচিত,—যদিও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তা মুসলমান বিজয়ের (ত্রয়োদশ শতাব্দীর) পরে রচিত। সম্ভবতঃ তাদের একাংশ প্রাচীন, অন্যাংশ মুসলমানদের আগমনের পরে সংযোজিত হয়েছে। সেজন্য তাতে আরবী ফারসী শব্দ ঢুকেছে, নীচের উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যাবে :—

নিমপাতা কাসুন্দীর ঝোল।
তেলের উপর দিয়া তোল।।
পলতা শাক রুহি মাছ।
বলে ডাক-বেঞ্জন সাছ।।
মদ্গুরে মৎস্য দাত্র কুটিয়া
হিঙ্গ আদা লবণ দিয়া।।
পোনামাছ জামিরের রসে,
কাসন্দী দিয়া বেঞ্জন পরশে।।
ইঁচলা মাছ তৈলে ভাজিয়া।
পাতিনেবু তাতে দিয়া।।
যাহাতে দেই তাতে মেলে।
হিঙ্গ মরিচ দিহ ঝোলে।।
পোড়া মাছে লবণ প্রচুর।
আর বেঞ্জনে পেলাহ দূর।।

এই বর্ণনার মধ্যে মাছ যে বাঙালীর প্রধান খাদ্য তা সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু মাংসের উল্লেখ নেই। মাংস সাধা-রণ বাঙালীর খাদ্যে ঢুকেছে পরবর্তী-কালে সম্ভবতঃ মুসলমান যুগে। তার আগে মাংস প্রচলিত ছিল রাজরাজড়ার মধ্যে, আর সম্ভবতঃ কোনও কোনও নিম্নজাতের মধ্যে, যারা পশু শিকার করে জীবনধারণ করত। পশ্চিম ভারতের ঘিয়ের স্থলে, বাংলায় তেলের ব্যবহারের কথা এতে পাই, আর পাই নিমপাতা পলতা শাকের কথা—যা আজও আমাদের সাধারণ খাদ্য। মশলার মধ্যে দেখি আদা, হলদী এবং সর্ষে বাটা (কাসন্দী)। হিং-এর ব্যবহারও আরম্ভ হয়েছে। তখনকার দিনে পোড়া মাছ খাওয়ার প্রথা ছিল, পরবর্তীকালে তা উঠে গিয়েছে। ডাক সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন। তিনি মাগুর মাছের যে ব্যঞ্জনটির উল্লেখ করেছেন,—তা পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত নেই। কিন্তু পূর্ববঙ্গে তা 'আদামাগুরী' নামে

আজও প্রচলিত। আর পূর্ব বাংলাতেই চিংড়ি মাছকে ইচা বা ইচিলা বলা হয়।

এরপর বাঙালীর আহারের বিস্তৃত বিবরণ পাই পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে। তখন দিল্লীতে পাঠান আমল, বাংলায় হোসেন শাহের রাজত্ব। কবি বণিক গৃহিণী সোণকার রাঁধার বর্ণনা দিচ্ছেন। সোণকা প্রথমে ষোলটি নিরামিষ ব্যঞ্জন রাঁধলেন:

প্রথমে পূজিন অগ্নি দিয়া ঘৃত ধূপ।
নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে মশুরীর
সূপ।।
পাটায় ছেঁচিয়া লয় পোলতার পাতা।
বেগুন দিয়া রান্ধে ধনিয়া পোলতা।।
মুগের ঝোল রাঁধে আর মাসকলায়ের
বড়ী।
দুগ্ধলাউ রাঁধে আর নারিকেল কুমারী।।
শুক্তপাতা দিয়া রাঁধে কলাইর ডাল।
পাকা কলা লেবুরসে রান্ধিল অম্বল।

এইরূপে ষোড়শ নিরামিষ পদ রেঁধে আমিষে হাত দিলেন :

মৎস্য মাংস কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।
থোড় দিয়া ইচার মুণ্ড মূলা দিয়া শাক।।
রোহিতের মৎস্য দিয়া রাঁন্ধে কলতার
আগ।
মাগুর মৎস্য দিয়া রাঁন্ধে গিমা গাচ গাচ।।
সাজকটু তৈলে রান্ধে খরষুলা মাছ।
তৈলে পাক করি রাঁন্ধে চিঙরীর মাথা।
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল।

এরপর মাংস :—

জীরা মরিচ রান্ধনী বাঁটিয়া করে মিল।
মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বুড়া খাসীর তেল।।
ছাগ মাংস কলার মূলে অতি অনুপম।

তারপর অম্বল ও মিষ্টান্ন :—

শোল মৎস্য দিয়া রান্ধে আমের অম্বল।
মিষ্টান্ন অনেক রান্ধে নানাবিধ রস।
দুই তিন প্রকারের পিষ্টক পায়স।।

এই বর্ণনায় দেখি বাঙালীর খাদ্যে ডালের ব্যবহার,—প্রধান মুশুরী, মুগ ও মাষকলাই। মাংস ঢুকেছে সম্ভবতঃ মুসলমান প্রভাবে। তখন অবশ্য মাংসে তরকারী দেওয়া হত 'কলার মূল' এবং নারিকেল। আলু অজ্ঞাত।

এরপর বাঙালীর আহারের বর্ণনা পাই দ্বিজবংশীবদনের মনসামঙ্গলে (রচনাকাল ১৫৭৫)। বংশীবদন ছিলেন ময়মনসিংহের অধিবাসী—ষোড়শ শতাব্দীর লোক, বাংলা তখন মোগলের অধীন। তাঁর রচনার মধ্যে আমরা পূর্ব-বঙ্গের প্রচলিত রন্ধনের পরিচয় পাই।

সোণাই রাণী রাঁধছেন :—

প্রথমে নালিতা শাকে
রান্ধিলেক তৈল পাকে
কচু শাকে নারিকেল বাঁটি।
সাঞ্চা শাক ঘৃতে ভাজে
আদা দিয়া তার মাঝে
মাটা শাক জিরা লঙ্গ বাঁটি।।
লাউ কুমড়া চাকি
হরিদ্রা পিঠালী মাখি
বসবাস জিরা লঙ্গ বাঁটি।
কাঠালের বীজগুলি
ভাজিলেক ঘৃতে তুলি
শিম্ব উড়শী দাল বাঁটি।।

এইরূপে 'একে একে নিরামিষ ব্যঞ্জন রান্ধিল ত্রিশ,' তারপর আরম্ভ হল আমিষ :—

নিরামিষ রান্ধে সব ঘৃতে সম্ভাবিয়া।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে তৈল পাক দিয়া।।
বড় বড় কই মৎস্য ঘন ঘন আঞ্জি।
জিরা লঙ্গ মাখিয়া তুলিল তৈলে ভাজি।
ইলিশ তলিত করে বাচা ও ভাঙনা।
শউলের খণ্ড ভাজে আর শউলের পোনা।।
বেত আগ পলিয়া চুচুরা মৎস্য দিয়া।
শুকুত ব্যঞ্জন রাঁধে আদা বাঁটিয়া।।
পাবতা মৎস্য দিয়া নালিতার ঝোল
পুরাণ কুমড়া দিয়া রোহিতের কোল।।

এরপর 'নবীন কুমড়া দিয়া' কই মৎস্য মাষদাল দিয়া রোহিতের মাথা,—প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি মাছের ব্যঞ্জন রেঁধে মাংসে হাত দিলেন :—

কাউঠার রান্ধে মাংস তৈল ডিম্ব দিয়া।
তলিত করিয়া তুলে ঘৃতে ত ছাকিয়া।।
কৈতরের বাচ্চা ভাজে কাউঠার হাতা।
ভাজিছে খাসীর তেল দিয়া তেজপাতা।।
মৃগ মাংস ঘৃত দিয়া ভাজিলেক কত।
রান্ধিছে পাঠার মাংস দিয়া খরঝাল।

এরপর আছে মিষ্টান্ন :—

কতমত ব্যঞ্জন সে নাহি লেখাজোখা।
পরমান্য পিষ্টক বান্ধিছে সণকা।।

তার মধ্যে আছে, ঘৃত পোরা, চন্দ্র-কাইট, দুগ্ধহুলী, জাতিপুলী ক্ষীরপুলী ইত্যাদি। সমস্ত পদ ধরলে একশ'র কম হবে না।

দ্বিজ বংশীবদন পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিলেন, সেজন্য তাঁর রচনায় পূর্ববঙ্গের প্রিয় খাদ্য কাউঠা (কচ্ছপের) মাংস, কৈতর (পায়রা), মৃগ মাংস ইত্যাদি স্থান-লাভ করেছে। আর পাঁঠার মাংসে 'খরঝালের' মধ্যে পূর্ববঙ্গে লঙ্কাপ্রীতি ফুটে উঠেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালীর আহারের আর একটা বিস্তৃত বর্ণনা পাই মুকুন্দরামের কবিকঙ্কন চণ্ডীতে। তখন মোগল আমল, আকবরের রাজত্ব। ততদিনে বাংলা ভাষায় ঢুকেছে বহু আরবী, ফারসী শব্দ, বাঙালীর জীবনে বহু মুসলমানী রীতিনীতি, কিন্তু বাঙালীর রান্নাঘরে মুসলমানী প্রভাব তখনও ঢুকতে পারেনি। রন্ধন ও আহারের বিস্তৃত বর্ণনায় কবিকঙ্কণ চণ্ডী পরিপূর্ণ। প্রথমেই ধনপতি সদাগরের জ্ঞাতিভোজন করাবার জন্য খুল্লনার রন্ধন-বর্ণনা। তাতে বাজার করা থেকে ভোজন পর্যন্ত বাঙালীর আহারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। দাসী দুর্বলা পঞ্চাশ কাহন (টাকা) নিয়ে বাজার করতে গেল। সে "আলু কিনে কচু কুমড়া" আর 'কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই'। পর্তুগীজ আনীত এই বিদেশী তরকারি ফল, আলু ও কামরাঙ্গা বাংলার মাটিতে ফলতে আরম্ভ করেছে। তখন একটা খাসীর দাম ছিল 'আট কাহন' তেলের দাম ছিল প্রতিসের "দশ বুড়ি"।

এরপর খুল্লনা রান্না আরম্ভ করলেন :

বার্তাকু কুমড়া কটা
তাহে দিয়া কলা মোচা
বেসার পিঠালি ঘন কাঠি।
ঘৃত সন্তোলনে তথি
হিঙ্গু জিরা দিয়া মেথি
সুক্তার রন্ধন পরিপাটী॥

এইরূপে 'ঘৃতে নালিতার শাক', 'নটেশাকে ফুলবড়ি', 'কাঁঠাল বীচি দিয়া চিংড়ি', 'ইক্ষুরস দিয়া মুগসূপ' রেঁধে চিতল মাছের কোল ভেজে, মানকচু ও মরিচ দিয়ে রোহিত মৎস্যের ঝোল রাঁধলেন।

তারপর :

কিছু ভাজে রাইখাড়া
চিঙড়ীর তেলে বড়া
খরসুলা ভাজি কিছু তেলে।
করিয়া কণ্ঠবাহীন
আম্রযোগে শোল মীন
খরলোল ঘন দিয়া কাঠি।

তারপর কলাবড়া মুগ সাউলী, ক্ষীরমোননা ক্ষীরপুলী প্রভৃতি পিঠা তৈরী করলেন। ভোজনের বর্ণনার মধ্যে মাংসের উল্লেখ আছে।

কবিকঙ্কন চণ্ডীতে খুল্লনায় আর এর প্রশস্থ রন্ধনের বর্ণনা আছে,

প্রায়শ্চিত্তের পর ধনপতি সদাগরের জ্ঞাতিভোজন উপলক্ষে। তাতেও আছে "পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন।"

এইসব উধৃতিতে দেখি বাঙালীর আজকার আহার্য তালিকায় বহু রন্ধন ও উপাদান প্রায় অবিকৃতভাবে প্রায় হাজার বৎসর ধরে চলে এসেছে—যেমন আদা বেটে শুক্তা, কলাই-এর ডাল দিয়ে রোহিতের মাথা। আবার বহু রন্ধন লোপ পেয়েছে, যেমন কলার মূল অথবা নারিকেল দিয়ে মাংস। আর আমাদের রান্নাঘরের নিত্যব্যবহার্য 'পরিভাষা'গুলি বহুকাল আগেই প্রচলিত হয়েছে। যেমন "বসবাস বা বেসারী" (বেসন), চাকি (খণ্ড) মাছ সাঁতলা (কাটার দাগ দেওয়া), পলিয়া (কুচি কুচি করিয়া কাটা), সম্ভার, সন্তোলন (সাঁতলানো), ঘিয়ে ছাকা ইত্যাদি। আর ফরাসী ভাষার 'সুপ' কথাটি বোধহয় ফারসীর মধ্য দিয়ে বাঙালীর রান্নাঘরে পাঁচশ' বৎসর আগেই ঢুকেছে।

এরপর আমরা আসি প্রায় দেড়শত বৎসর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। দিল্লীতে তখন মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থা। বাংলায় আলিবর্দি খাঁ এবং সিরাজের রাজত্ব। বাঙালীর জীবন এবং ভাষায় মুসলমানী প্রভাবের মধ্যাহ্নকাল। বাঙালীরা ইউরোপীয় জাতিদের সান্নিধ্যে এসেছে, কিন্তু বাঙালী সমাজের উপর ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার আরম্ভ হয়নি। এই সময় হয়েছিল ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব। ভারতচন্দ্র রচনার মধ্যে অন্নপূর্ণার রন্ধন বর্ণনায় তিনি তখনকার বাঙালীর আহারের বিস্তৃত বিবরণ রেখে গিয়েছেন। অন্নপূর্ণা প্রথমেঃ—

হাসামুখে পদ্মমুখী
আরম্ভিলা পাক।
শড়শাড়ি ঘণ্ট ভাজা
নানা মত শাক।।
ডালি রান্ধে ঘনতর
ছোলা অড়হড়ে।
মুগ মাষ বরবটি
বাটুলে মটরে।।
বড়াবড়ি কলা মুলা
নারিকেল ভাজা।
দুধ থোড় ডালনা
সুক্তানি ঘণ্টভাজা।।

এইরূপ "নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে",—তারপর মাছঃ—

আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাংসে।।
কাতলা ভেকুট রুই ঝাল ঝোল কোল।।
শিকপোড়া ঝুরা কাঠালের বীজ ঝোল।।
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে
চুই কাতলের মুড়া।
আম্র দিয়া শোল মাছের ঝোল চড়চাড়া।
আর রান্ধে আদা রসে দিয়া ফুলবড়ি।।
ঝাটার করিল ঝোল খয়রার ভাজা।।

তারপর মাংসঃ—

বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম।।
কচি ছাগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া, দোলমা বাগা সেকচী সমসা।।
অন্য মাংসে শিকভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেক মুড়া আগে মশলা পুরিয়া।।

এরপর চাটনি ঃ—

মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিল
আম আমসত্ত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মান্দার।।

তারপর রাঁধলেন পরমান্ন, পরমান্নের পর খেচরান্ন (খিচুড়ি।)

ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় আমরা দেখি বাঙালীর আহারে মুসলমানী প্রভাব স্থায়ী হয়ে বসেছে। এ পর্যন্ত বাঙালীর মাছ মাংস আহার তালিকায় ছিল ঝাল, ঝোল, রসা,—ভারতচন্দ্রের সময় মুসলমান প্রভাবে তাতে ঢুকেছে কালিয়া, দোলমা, সেকচী, কাবাব প্রভৃতি মুসলমানী খানা। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, 'আম দিয়ে শোল মাছ' পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয় গুপ্তের কাল থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরামের কালে এবং তারও দুইশত বৎসর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাঙালীর প্রিয় খাদ্য ছিল। তাঁদের সকলের লেখার মধ্যেই এর উল্লেখ আছে। আজ আর এর প্রচলন নেই। আরও লক্ষ্যণীয় যে, ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় খেচরান্নের (খিচুড়ি) উল্লেখ আছে, কিন্তু পোলাও-এর নাম নেই। অথচ মুসলমান আমল থেকে পোলাও ধনী-সমাজে সুপ্রচলিত। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ভারতচন্দ্রের গৃহে পোলাও-এর ব্যবহার না থাকলেও তিনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে দুই-এক দিন এই খাদ্যটির স্বাদ পেয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালীর আহারের আর একটা বর্ণনা আমরা পাই রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে। রামেশ্বরের শিবায়নের রচনাকাল ১৭৫০ সাল। তাতে শিবের ভোজনের যে বর্ণনা আছে, তার মধ্যে শুধু বাঙালীর সেকালের আহার্যের নয়,—বাঙালী গৃহস্থের ঘরে বাঙালী মেয়েদের স্বামী পুত্রকে পরিতোষ করে খাওয়ানোর একটি মনোরম চিত্র ফুটে উঠেছে। সমস্ত বর্ণনাটি স্নিগ্ধ হাস্যরসে সমুজ্জ্বল। শিব, কার্তিক গণেশ দুই পুত্রকে দুই পাশে নিয়ে আহারে বসেছেন, সতী পরিবেশন করছেনঃ—

তিনজনে বারো মুখে পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই, হাঁড়ী পানে চায়।।
শুক্ত খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে।।
কার্তিক গণেশ বলে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য হয়ে খা।।

তারপর "ঈষদুষ্ণ সুপ দিলে বেসারীর পরে।" তখন গণেশ বললেনঃ—

সুপ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি।।
দড়বড় দেবী এনে দিল দশ ভাজা।
উন্বন চর্বণে ফের ফুরালো ব্যঞ্জন।
এককালে শূন্য থালে ডাকে তিনজন।।
চটপদ পিশিত মিশ্রিত করি যুষে।
বায়ুবেগে বিধুমুখী
ব্যস্ত হয়ে আইসে।।

এরপর 'পায়স', 'পিষ্টক' এবং অন্যান্য 'গব্য' পরিবেশনের পর সকলের

'উদর হইল পূর্ণ, উঠিল উদ্গার।
অবশেষে গণ্ডূষ করিতে নারে আর।"
তখন সতীর একহাত নিবার পালা—
হট করে হৈমবতী দিতে আনে ভাত।
শার্দুল কম্পনে সভে আগুলিন পাত॥

আজও বাঙালীর নিমন্ত্রণের ভোজনে "ন দেয়ং ব্যাঘ্রকম্পনে" বাঘের মত ঝাঁপিয়ে উঠে হেঁট হয়ে না আগলানো পর্যন্ত পরিবেশনের যে প্রথা আছে—তা প্রাচীনকাল থেকেই এসেছে। রামেশ্বরের বর্ণনার মধ্যে দেখি, ফরাসী 'সূপ' কথাটির মত ইংরাজী 'যূষ' কথাটিও এদেশে ইউরোপীয় রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার আগেই বাঙালীর রান্নাঘরে ঢুকেছিল।

ভারতচন্দ্রের পর বাংলায় ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। বাঙালীর জীবনে, অশনে বসনে ইংরাজী প্রভাব ঢুকতে লাগল। বাঙালীর আহারেও ঢুকল বহু ইংরাজী খানা। কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় আমরা তার পরিচয় পাই। ঈশ্বর গুপ্তের কাল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি—আজ থেকে প্রায় একশত বৎসর আগে। ততদিনে ইংরাজ রাজত্বেরও প্রায় এক শতাব্দী অতীত হয়ে গিয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাবলী সমসাময়িক বাঙালীর আহারের এক সাইক্লোপিডিয়া বিশেষ। আহারের যে আনন্দ তা একান্ত দৈহিক হলেও, ঈশ্বরচন্দ্র তাকে তুচ্ছ করেননি। ভোজ্য ও ভোজন বিষয়ে তাঁর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পাঠকের রসনাকে রসসিক্ত করে তোলে। তিনি "রসভরা রসময় রসের ছাগল" বলে পাঁঠার প্রশস্তি গেয়েছেন, "কষিত কনক কান্তি কমনীয়-কায়" বলে এণ্ডাওয়ালা তপসে মাছের বন্দনা করেছেন। ধর্মীয় পর্বদিনগুলিতে তাঁর আনন্দ, তারা ধর্ম-অনুষ্ঠানে প্রেরণা দেয় বলে নয়, তারা রসনাতৃপ্তির সুযোগ আনে বলে। তিনি বড়দিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে খানাপিনার দিকটাই বড় করে দেখেছেন। সেদিন সকালেঃ—

ভেটকি কমলা আদি মিছরি বাদাম
ভাল দেখে কিনে লয় দিয়ে ভাল দাম

ইংরাজী নববর্ষের দিনেঃ—

আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে।
এখনি দেখিতে পাবি কত মজা চপে।।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক।
কারি ডিম আলুফিস
ডিসপোরা কাছে।
পেটপুরে খাও লোভ যত সাধ আছে।।

পৌষপার্বণে বাঙালী মেয়েরাঃ—

তাজা তাজা ভাজাপুলি
ভেজে ভেজে তোলে।
কেহ বা পিটুলি মাখে
কেহ কাই গোলে।।
আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকোল আর।
গড়িতেছে পিঠেপুলি অশেষ প্রকার।।

অন্যান্য কবি বর্ষা, শরৎ এবং বসন্তকাল নিয়ে কবিতা লিখেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র হেমন্তের কবি। তার কারণ বাংলাদেশে হেমন্তকালে বেশীর ভাগ খাদ্যশস্য এবং শাকসবজীর আবির্ভাব হয়। তাঁর 'হেমন্তের খাদ্য' কবিতাটিতে আমরা দেখি, আমাদের চিরন্তন বেগুন, মূলো, শিমের পাশাপাশি নানা রকম বিলাতী সবজী বাঙালীর রান্নাঘরে স্থানলাভ করেছে ঃ

মনোহর ফুলকপি পাতাযুক্ত তায়।
সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায়।।
শ্রেণীবদ্ধ চারুশোভা এলো (ওল)
আর বাঁধা।
সাহেবেরা প্রেমডোরে চিরকাল বাঁধা।।
পেটে দেয়া দূরে থাক দেখে তুষ্ট আঁখি।
ইচ্ছা করে পালঙ্গেরে
পালঙ্কেতে রাখি।।
বীট নামে পালঙ্গ কি মহাদ্রব্য তিনি।
বিলাতে তাহার রসে হইতেছে চিনি।।

আরও দেখি দেশী ফল কমলা, কুল, কলা ত আছেই, কাবুলী বেদানা এবং আঙ্গুরও বাঙালীর খাদ্য-তালিকায় স্থান পেয়েছে। অবশ্য তখনকার দিনে কাবুল থেকে আঙ্গুর আনা হত "কৌটার ভিতর তুলার তোষক গদীর মধ্যে থরে থরে" সাজিয়ে।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় আমরা দেখি, এক শতাব্দীর ইংরাজী সম্পর্কের ফলে বাঙালীর খাদ্যে মুসলমানী খানার পাশাপাশি নানা ইংরাজী খানা ঢুকেছে। এসেছে চপ, কারি, ডিম, আলুফিস, কেক, বিস্কুট আর ফুলকপি, ওলকপি, বাঁধাকপি, বীট, পালঙ্গ প্রভৃতি নানা রকম বিলাতী সবজি। অবশ্য তখনও টমেটোর আবির্ভাব হয়নি। বাঙালীর মিষ্টি খাদ্য আগে ছিল পিঠা, পুলী, পায়স, মণ্ডা, গোল্লা; মুসলমান যুগে এসেছিল খাজা, গজা; ইংরেজ যুগে এল "কেক বিস্কুট"। আর 'পোলাও' মধ্যবিত্ত বাঙালীর রান্নাঘরেও ঢুকেছে। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেনঃ—

গলদা চিংড়ি মাছ যার নাম মোচা।
কালিয়ে পোলাও রাঁধো, রাঁধ লাউ দিয়া।
ভাতে খাও, ভেজে খাও হবে মুখপ্রিয়া॥

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালীর বৃহত্তর জীবনে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির, সাধারণ কথায়, খৃষ্টানীর সঙ্গে হিন্দুয়ানীর যে সংঘর্ষ চলছিল, বাঙালীর রান্নাঘরের উপর তার প্রতিক্রিয়ার আভাষও আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় পাই। যেমন, পেঁয়াজ তখনও হিন্দুর রান্নাঘরে ওঠেনি, হোটেলে স্থানলাভ করেছে—

লুকোচুরির খেলা তার হিন্দুর নিকটে।
গোপনে করেন বাস বাবুদের পেটে।।

আর মুর্গি ও গোমাংস—

"একদিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্যাভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা বসে
মুর্গি মাংস নিয়া।।
একদিকে কোশাকুশি আয়োজন নানা।
অন্যদিকে টেবিলে ডেবিল খায় খানা।।
পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে।।

এই সময়েই এক উগ্র খৃষ্টানী এবং আধুনিকতার প্রভাবে কিছু কিছু ডিরোজিও শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গলের' মধ্যে মুর্গি ও গোমাংস খাওয়ার রোখ চেপেছিল। মুর্গি আজ বাঙালীর রান্নাঘরে অনুপ্রবেশ করেছে, কিন্তু সামাজিক ভোজে এখনও অপাংক্তেয়। গোমাংস কিন্তু আজও বাঙালী হিন্দুর রান্নাঘরে ত ঢুকতেই পারেনি, তাদের খাদ্য-তালিকাতেও স্থান পায়নি,—না হোটেলে, না গৃহে। একদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র এবং অন্যদিকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাব হিন্দুর সমাজ-জীবনে এই প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের প্রতিরোধ করেছিল।

ঈশ্বর গুপ্তই প্রাচীন বাংলার শেষ কবি। তারপর থেকেই বাঙালীর আহারের ভার গৃহিণীর হাত থেকে পেশাদার পাচক এবং ব্যবসাদার মিঠাইওয়ালার হাতে যাওয়া শুরু হয়েছে। তাই বোধহয় আধুনিক কবিদের রাঁধা ও খাওয়া থেকে কবিতার প্রেরণা পাওয়া বন্ধ হয়েছে। তবুও আমরা আজকার বাঙালীর বৌভাতের নিমন্ত্রণে শাক-ছক্কা থেকে শুরু করে দই-মিষ্টি-সম্বলিত সাধারণ মেনু বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে, তাতে আমাদের গত কয়েক হাজার বৎসরের সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ইতিহাস অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে।

॥ রোগা হতে হলে ॥

ছেলেবুড়ো, মেয়েপুরুষ সকলেই রোগা থাকতে চান। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় স্লিম। কিন্তু রোগা থাকাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে একটি বিশেষ বয়সের পরে তো বটেই। তবে আমাদের দেশে বয়সের কোঠা তিরিশের ঘর ছুঁলেই প্রবণতাটা যে সব সময়ে মেদবৃদ্ধির দিকে থাকে তা নয়। চামড়া-ঢাকা কঙ্কালের নিদর্শনও আমাদের দেশে খুবই বেশি। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, এ অবস্থা পুরোপুরি ভাবেই খেতে না পাবার জন্যে। এ সমস্যা যতোটা না চিকিৎসাগত, তার চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক। কাজেই, কঙ্কালসার শরীরকে কিভাবে মোটা করতে হবে সে আলোচনা বিজ্ঞানের কথায় হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু উলটোদিকের আলোচনাটা তুলতে কোনো বাধা নেই। আমাদের আশেপাশে একটু নজর দিলে আমরা দেখতে পাব, স্বচ্ছল অবস্থার সঙ্গে মেদবৃদ্ধি হওয়াটা যেন হাত-ধরাধরি করে চলে। যার যতো বেশি টাকা তার ততো বেশি ভুঁড়ি—এটা প্রায় একটা নিয়মের মতো। অথচ শরীরের মেদবাহুল্য কারোই কাম্য নয়। সকলেই চান শরীরটাকে—টিঙটিঙে রোগা অবশ্য নয়—মোটামুটি দোহারা রাখতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই চাওয়াটা শেষ পর্যন্ত একটা সদিচ্ছার বেশি কিছু হয়ে ওঠে না। ফলে মোটা শরীর মোটাই থেকে যায় বা আরো বেশি মোটা হতে থাকে। আর একটা ধারণা তৈরি হয় যে মোটা শরীর মোটা থাকাটাই ভবিতব্য। মনের এই অবস্থায় একবার পৌঁছলে মোটাদের আর রক্ষে নেই। তারা দিনে দিনে আরো মোটা হতে থাকে।

এই কারণে রোগা হতে হলে প্রথমেই দরকার অবিচল ও অদম্য একটি প্রতিজ্ঞা। শত প্রলোভনকে জয় করতে হবে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে বিশেষ একটি কর্মসূচী। আশু ফললাভে বঞ্চিত হলেও হতাশাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। হালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন যে ঠিকভাবে চলতে পারলে মোটারা অবশ্যই রোগা হবে। রোগা তাদের হতেই হবে। যদি না হয় তো বুঝতে হবে যে রোগা হবার জন্যে তৎপর ব্যক্তিটি নিজের অজান্তেই কোথাও না কোথাও নিয়মভঙ্গ করছে।

আমাদের দেশে অবশ্য মেদবৃদ্ধির ব্যাপারটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে মেদবৃদ্ধিকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে ধরা হয়। শরীরের ওজন বাড়ছে তো বাড়ুক—এমন একটা নিস্পৃহ ও নির্বিকার মনোভাবও আমাদের অনেকেরই। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে টেরও পাই না যে মোটা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্মক্ষমতাও কিভাবে আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং বেঁচে থাকার আনন্দ থেকে কিভাবে আস্তে আস্তে বঞ্চিত হই।

অয়স্কান্ত

তা ছাড়াও কথা আছে। মোটা শরীর খুব সহজেই রোগের আক্রমণে বিপন্ন হতে পারে। বিশেষ করে হার্টের অসুখ হবার সম্ভাবনা মোটাদের বেলায় যতোটা বেশি, রোগাদের বেলায় ততোটা নয়। আর যদি ভাগ্যক্রমে এ ধরনের মারাত্মক অসুখ নাও হয় তো ছোটখাটো অসুখের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। মোটা শরীরের চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে এমন সমস্ত চর্মরোগ দেখা দিতে পারে যা হাজার চিকিৎসাতেও সারবার নয়। কাজেই হাঁটা চলার অসুবিধে ও অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা বাদ দিলেও মোটা হওয়া মানেই নানা ধরনের রোগের একটি ক্ষেত্র তৈরি করে রাখা। রোগা থাকতে পারার সুবিধে যে কতখানি তা উপলব্ধি করার জন্যেই রোগা হওয়া দরকার।

হালে ক্যানসার রোগ নিয়ে সারা পৃথিবীতে তোলপাড় চলেছে। এই রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য বিজ্ঞানীরা উঠে-পড়ে লেগেছেন। বলা হচ্ছে যে ক্যানসার নিরাময় হলে পৃথিবীর মানুষের গড় আয়ু দু বছর করে বেড়ে যাবে। অন্যদিকে শরীরের মেদবাহুল্যকে ক্যানসারের চেয়ে অনেক কম মারাত্মক রোগ বলে ধরা হয় (আমাদের দেশে তো এটা কোনো রোগই নয়)—কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা হিসেব করে দেখিয়েছেন যে মেদবাহুল্যকে নিরাময় করা গেলে পৃথিবীর মানুষের গড় আয়ু বাড়বে চার বছর। অথচ, ক্যানসার রোগের নিরাময় যদিও এখনো পর্যন্ত অনায়ত্ত, মেদবাহুল্যের চিকিৎসার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে রোগীর ওপরে।

॥ মেদবাহুল্য ॥

কোন্ অবস্থাকে শরীরের মেদবাহুল্য বলা হবে? কোন্ অবস্থাকে বলব সঠিক ওজন? জবাবে কোনো অঙ্কের হিসেব দেবার প্রয়োজন নেই। কোনো মানুষকে দেখে যদি মোটা মনে হয় তাহলে নিশ্চয়ই ধরে নিতে হবে যে তার শরীরে মাত্রাধিক পরিমাণে মেদ জমেছে। সঠিক মাত্রাটি ঠিক কী, তা কারো ক্ষেত্রেই আগেভাগে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তা জানা যাবে সঠিক মাত্রায় পৌঁছবার পরেই।

কথাটা হয়তো অর্থহীন শোনাচ্ছে। কারণ, পথেঘাটে যে-সব ওজন-যন্ত্র দেখা

যায় তার সংগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি চার্টও থাকে। এই চার্ট থেকে জানা যায় স্ত্রী-পুরুষ ভেদে কোন্ শারীরিক উচ্চতায় কতখানি ওজন হওয়া উচিত। এ-প্রসংগে মনে রাখা দরকার যে এই হিসেবটা হচ্ছে নিতান্তই গড় হিসেব। ব্যক্তিবিশেষের সঠিক ওজন নিশ্চয়ই এই গড় ওজনের বেশি বা কম হতে পারে এবং তাই হওয়াটাই স্বাভাবিক। মোটামুটি ধরে নেওয়া চলে, ব্যক্তিবিশেষের ওজন গড় ওজনের শতকরা কুড়ি ভাগ বেশি হলে পরেই সম্ভবত মেদবাহুল্য ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটিও বলা দরকার যে গড় ওজনের সমান ওজন হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিবিশেষের শরীরে মেদবাহুল্য ঘটতে পারে। কাজেই, শরীরের ওজন থেকে সব সময়ে বোঝা যায় না শরীরের মেদ কতখানি।

শরীরে বাড়তি মেদ জমেছে কিনা তা জানার দু একটি খুব সহজ প্রক্রিয়া আছে। হাতের ওপরের অংশের পেছন দিকের চামড়া দু আঙ্গুলে টিপে তুলে ধরুন। এই চামড়ার ভাঁজটি আধ ইঞ্চির বেশি পুরু হওয়া উচিত নয়। তেমনি, উরুর ভেতরের দিকের চামড়াও দু আঙ্গুলে তুলে ধরে দেখা যেতে পারে। এই চামড়ার ভাঁজটি এক ইঞ্চির বেশি পুরু হওয়াটা মেদবাহুল্যের লক্ষণ। তবে, এ প্রসঙ্গেও বলার কথা এই যে শরীরে খানিকটা মেদের সঞ্চয় না থাকলে যাঁরা মনে মনে অস্বস্তি বোধ করেন তাঁদের পক্ষে এই মাপ কিছুটা ছাড়িয়ে যাওয়া অনুচিত হবে না। তবে এই মেদ-বিলাসীদেরও স্পষ্টভাবে জেনে রাখা দরকার যে শরীরের যে কোনো অংশেই চামড়ার ভাঁজ দু ইঞ্চি পুরু হওয়াটা বিপজ্জনক লক্ষণ।

অতএব ওজনের চার্ট নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই। ওজন-যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেও চলতে পারে। একটি আরশি ও হাতের দুটি আঙ্গুলের সহায়তা পেলেই আপনি আপনার শরীর সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল থাকতে পারবেন।

॥ ডায়েট বা সুনির্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণ ॥

এবারে সবচেয়ে জরুরি আলোচনায় আসা যেতে পারে। ডায়েট বা সুনির্দিষ্ট খাদ্যগ্রহণ। 'ডায়েট' শব্দটি যদিও ইংরেজি কিন্তু হালে বাংলাতেও চলে গিয়েছে। কিন্তু কোনো লোক ডায়েট করছে শুনলেই আমরা অনেক সময়ে ধারণা করে বসি যে লোকটি প্রায় উপোস দিচ্ছে। আসলে কিন্তু তা নয়। ডায়েট করা মানে, খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস্ত ধারাকে বাতিল করে নতুন একটি ধারা গ্রহণ। উপোস দেবার সঙ্গে ডায়েট করার কোনো সম্পর্ক নেই।

অবশ্য এই সঠিক অর্থে ধরলেও ডায়েট করাটা অনেকের কাছেই অপ্রীতিকর। বিশেষ দেশের বিশেষ অবস্থার মানুষেরা বিশেষ বিশেষ খাদ্যের সংগে আজন্ম পরিচিত ও অভ্যস্ত হয়ে থাকে। যেমন আমরা বাঙালীরা ডাল-ভাতের সংগে। চেষ্টা করলেও আমরা ডাল-ভাতের অভ্যেস সহজে ছাড়তে পারি না। তাছাড়াও আছে বিশেষ বিশেষ খাদ্য সম্পর্কে অতিমাত্রায় লোভ। একই পরিবারের ভাইবোনদের মধ্যেও দেখা যায় খাওয়ার ব্যাপারে রুচির পার্থক্য গড়ে ওঠে। কেউ হয়ে ওঠে মাছ-মাংসের ভক্ত, কেউ মিষ্টির, কেউ শাকসব্জির। তবে মোটামুটি বলা চলে ভাত বা রুটিই হচ্ছে পৃথিবীর মানুষের প্রধান খাদ্য এবং বিস্কুট-কেক, জ্যাম-জেলি, চিনি, চকোলেট, মিষ্টি ইত্যাদি হচ্ছে প্রিয়তম খাদ্য। মানুষ যে অত্যধিক মোটা হয় তা অত্যধিক পরিমাণে এসব খাদ্য খাবার ফলেই। অবশ্যই অন্য একটা কারণও আছে। তা হচ্ছে সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে কায়িক শ্রম হ্রাস পাওয়া। এই কারণেই দেখা যায়, যেমন-তেমন খাওয়া সত্ত্বেও খেটে-খাওয়া মানুষদের শরীর রীতিমতো মজবুত এবং মেদবাহুল্যের প্রবণতা সেখানে না-থাকার মতো।

॥ ওজন বাড়া ও ওজন কমানো ॥

আপনার শরীরের ওজন যদি ক্রমেই বেড়ে চলে তাহলে বুঝতে হবে গলদ রয়েছে আপনি যা খাচ্ছেন তার মধ্যে। আপনি যদি ওজন কমাতে চান তাহলে এই খাওয়ার অভ্যেসটিকে পাল্টাতে হবে।

খুব ভালো করে ভেবে দেখুন, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাত্রিবেলা ঘুমোতে যাবার আগে পর্যন্ত কী কী আপনি খাচ্ছেন। সকালে আপনি নিশ্চয়ই এক কাপ চা খেয়ে থাকেন। এবার থেকে এই চা আপনাকে খেতে হবে চিনি ছাড়া। চায়ের সংগে টোস্ট বা বিস্কুট খাবার অভ্যেস যদি থাকে তবে সেটিও বর্জন করুন। তার বদলে টাটকা ফল খেয়ে দেখতে পারেন। সারাদিন চা বা কফি যতোবার খুশি খাওয়া চলতে পারে—কিন্তু চিনিটি বাদ দিয়ে।

তারপরে দুপুরে ও রাত্তিরে খাবার সময়েও কতকগুলি আজন্ম অভ্যেস ছাড়া দরকার। যেমন, মাছ ডিম বা মাংস খেতে হলে ভাত দিয়ে মেখে খাওয়া। কয়েকদিন অভ্যেস করুন, তখন দেখবেন ভাত ছাড়াও এই খাদ্যদ্রব্যগুলিকে গলাধঃকরণ করতে আপনার কিছুমাত্র খারাপ লাগছে না। বুঝতেই পারছেন, উপোস দেবার কোনো প্রশ্নই নেই। প্রচুর পরিমাণেই খেতে পারেন, কিন্তু বিশেষ কতকগুলো খাদ্যদ্রব্যকে বাদ দিয়ে। বিশেষ করে কার্বোহাইড্রেটকে বিষবৎ ত্যাগ করতে হবে। সামান্য একটু চেখে দেখার জন্যেও কক্ষনো জিভে ঠেকাতে যাবেন না।

খবরের কাগজে বা পত্রপত্রিকায় প্রায়ই 'রোগা হবার ডায়েট' প্রকাশিত হয়ে থাকে। কোথাও হয়তো অতি সূক্ষ্ম ক্যালরির মাপ হিসেবে খাদ্যের ব্যবস্থা, কোথাও ব্যবস্থা শুধু কলা আর দুধের, কোথাও একদিন কঠিন ও একদিন তরল খাদ্যের। এসব ডায়েট যদি কড়াকড়িভাবে মেনে চলা যায় তবে অবশ্যই কয়েক পাউন্ড ওজন কমবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে এ ধরনের ডায়েট খুব বেশিদিন একনাগাড়ে বজায় রাখা চলে না। তাতে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ডায়েট এমন হবে যা ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠবে খাদ্যগ্রহণের নতুন ধারা। তখন আর ডায়েট একটা আত্মনিগ্রহের ব্যাপার থাকবে না, ডায়েট হয়ে উঠবে পুরোপুরি একটা অভ্যেস। কার পক্ষে কোন্ ধরনের ডায়েট উপযুক্ত তা সাধারণভাবে ছক কেটে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে। তবে এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, ডায়েটের হেরফের যদি না হয় তাহলে মোটা মানুষ অবশ্যই রোগা হবেন। যে বয়সের বা যে অবস্থার মানুষই হোন না কেন, এ-নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। এবিষয়ে যাঁরা বিস্তৃতভাবে জানতে চান তাঁদের একটি ইংরেজি বই পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। বইটির নাম 'স্লিম ফর হেল্থ', লেখিকা আন্ ডালি, ১৯৬০ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত। যাঁরা স্লিম হবার চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ হয়েছেন তাঁরা এই বইটি পড়ে দেখলে নিশ্চয়ই নতুন করে উৎসাহিত হবেন।

ব্রিটিশ টেলিভিশনের একটি প্রোগ্রাম

১৯৫৮ সালে ব্রিটিশ টেলিভিশনে একটি বিশেষ প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছিল। এই প্রোগ্রামে ন'জন মোটা মানুষকে উপস্থিত করে উল্লিখিত বইয়ের লেখিকার চিকিৎসায় ছ'মাসের ফল প্রত্যক্ষভাবে দেখানো হয়েছিল। বলা বাহুল্য, মোটারা সকলেই উল্লেখযোগ্য রকমের রোগা হতে পেরেছিলেন। এই ন'জন চিকিৎসিত ব্যক্তির মধ্যে এমন কয়েকজনও ছিলেন যাঁরা অনেক চেষ্টার পরে রোগা হওয়া সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। যে পদ্ধতিতে তিনি চিকিৎসা করেছিলেন তারই ব্যাখ্যা আছে উল্লিখিত বইয়ে। বইটি পড়ার পরে আমারও ধারণা হয়েছে, যিনি যতো মোটাই হোন, একটু চেষ্টা করলেই সুন্দর রকমের রোগা হয়ে বেঁচে থাকার আনন্দকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবেন।

রুমানিয়ার নাট্যকার মিখাইল সেবাস্তিয়ান

অমিতা রায়

সাহিত্যের আকাশে ক্ষণকালের জন্য উদিত হ'য়েও যাঁরা প্রতিভার দীপ্তিতে দিগন্ত উদ্ভাসিত ক'রে তোলেন, রুমানিয়ার নাট্যকার মিখাইল সেবাস্তিয়ান তাঁদের অন্যতম। রুমানিয়ান সাহিত্যে সেবাস্তিয়ানের অবদান মাত্র চারটি নাটক, দু'-তিনটি গল্প সংগ্রহ ও নাটক সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধ। কিন্তু সৌন্দর্যের মাপ তো ওজনে বা আয়তনে নয়। শিল্প-সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, এক দিকে আকাশভরা অন্ধকার আর এক দিকে একটি মাত্র তারা—তাতেও সৌন্দর্যের ওজন ঠিক থাকে। রুমানিয়ার সাহিত্য-গগনে সেবাস্তিয়ান তেমনি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—তাঁর সৃষ্টির আয়তন সীমাবদ্ধ, কিন্তু দীপ্তি সুদূরপ্রসারী।

সেবাস্তিয়ানের জন্ম হয় ১৯০৭ সালে। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে—রুমানিয়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে-সময়টাকে বলা যায় অব্যবস্থিতচিত্ততার যুগ। রুমানিয়ার দুই চক্ষু তখন ফরাসী ও জার্মাণ—এই দুই সংস্কৃতির প্রদীপ্ত আলোকচ্ছটায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল—আর তার ফলে দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিনে দিনে হচ্ছিল অন্ধকারে অবলুপ্ত। সেই সময় যে-কয়েকজন মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক রুমানিয়ার নিজ সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন সেবাস্তিয়ান তাঁদেরই একজন।

সেবাস্তিয়ানের সাহিত্যিক-জীবন শুরু হয় মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে সংবাদ-পত্রের সাহিত্যসমালোচক ও নাট্য-সমালোচকরূপে। তখন থেকেই রুমানিয়ায় তৎকালীন নাট্য-সাহিত্যের অপূর্ণতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ও সম্ভবতঃ তার থেকেই তিনি নিজে নাট্যসৃষ্টির প্রেরণা পান।

সেবাস্তিয়ানের প্রথম নাটক '**Jocul de-a Vacantsa**' বা 'ছুটির খেলা'য় প্রথম অভিনয় হয় ১৯৩৮ সালে। রুমানিয়ার রঙ্গমঞ্চে তখন আঙ্গিকের অভিনবত্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল নাটকের অন্তঃসারশূন্যতায় গিয়ে পৌঁছেছিল। সেই সময় অনাড়ম্বর পারিপার্শ্বিকের পটভূমিকায় সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে লেখা এই নাটকটি আঙ্গিকপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। নাটক-সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধে সেবাস্তিয়ান বলেছিলেন, "নাটকের আঙ্গিক, মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, এমন কি অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও নাটকের অংশবিশেষ, এই সবকিছুর যথাযথ সমন্বয়ে নাটকের প্রাণকে ফুটিয়ে তোলাই অভিনয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

নাটক সম্বন্ধে তিনি আরো বলেছিলেন, "সার্থক নাট্য-সাহিত্যের সৃষ্টি ছাড়া সার্থক অভিনয় সম্ভব নয়। আঙ্গিকের চাকচিক্য দিয়ে দু-দিনের জন্য চোখে ধাঁধা লাগানো যায়, কিন্তু একমাত্র সেই নাটকেরই মূল্য চিরন্তন, যার ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে নাট্যকারের অন্তরের অনুভূতি।"

'ছুটির খেলা' নাটকে সেবাস্তিয়ানের অন্তরের যে-কথাটি আকুল হয়ে বেজে উঠেছে। তা হোলো সেই চিরন্তন আনন্দের সন্ধান—যে-আনন্দ মানুষ কখনো পায়, কখনো হারায়, যে-আনন্দ বাঁশীর সুরের সাথে ভেসে এসে কিনু গোয়ালার গলিতে প্লাবন বইয়ে দেয়, হরিপদ কেরানীকে মুহূর্তে উত্তীর্ণ করে আকবর বাদশার সুখস্বর্গলোকে।

এই নাটকের ঘটনাস্থল—শহর থেকে অনেক দূরের এক স্বল্পমূল্যের সরাইখানায়। সেখানে ছুটি উপভোগ করতে এসে তরুণী কোরিণার সঙ্গে পরিচয় হোলো খেয়ালী যুবক শ্তেফানের। শ্তেফানের ছুটির খেলা—মনকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করা—সব চিন্তা-ভাবনার বাইরে নিয়ে যাওয়া—বিরাট পৃথিবীর অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যে সমুদ্র-বক্ষে ভেলার মতন ভাসিয়ে দেওয়া। কোরিণা শ্তেফানের ছুটির খেলায় যোগ দেয় কিন্তু কোন এক অলক্ষ্য শক্তির প্রভাবে শ্তেফান নিজেই নিজের অজ্ঞান্তে জড়িয়ে পড়ে অন্য এক খেলায়—তার মুক্ত মন অন্য এক বন্ধনে বাঁধা পড়ে।

তাই চলে যাবার সময় সে কোরিণাকে সাথী করতে চায়—তখন কোরিণাই তাকে বাধা দিয়ে বলে—"এই শেষের দিনের জন্যেই তো এত দিনের প্রস্তুতি মনকে মুক্ত করবার। এই তো তোমার ছুটির খেলা। আজ কেন তবে এই দু-দিনের আনন্দকে দীর্ঘস্থায়ী করতে গিয়ে নিঃশেষ করে দিতে চাইছ? যে পথ দিয়ে এসে দুজনে মিলেছিলাম সেই পথ দিয়েই আবার দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যাব। জানতে চেয়ো না আমার সেই ভাঙা ঘরের দারিদ্র্যের খবর—যেখানে কর্মক্লান্ত দিনের শেষে ফিরে এসে আমি আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখি। আমিও জানতে চাই না, তোমার আগামী ছুটির অবসরযাপনের সম্বল তুমি কত পরিশ্রমে অর্জন করবে, কত কৃচ্ছ্রসাধনে সঞ্চয় করবে। দুজনে শুধু মনে রেখে দেব এই একটি মাসের স্মৃতি যখন আমার চোখে তুমি ছিলে রূপকথার রাজপুত্র আর তোমার চোখে আমি ছিলাম হয়তো বা এক অপ্সরী।"

কোরিণা বিদায় নিয়ে চ'লে যায়—হারিয়ে যায় শ্তেফানের আনন্দলোক—নিজের আদর্শের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শ্তেফান অনুভব করে মানুষ নিজের অন্তরে কত দুর্বল, কত অসহায়!

'ছুটির খেলা' অভিনয় হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে। তার পরে যুদ্ধের সময় সাংবাদিক সেবাস্তিয়ান জড়িয়ে পড়লেন রাজনৈতিক কর্মকলাপে—ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গোপন রাজনৈতিক দলে তিনি যোগ দিলেন—ফলতঃ ফ্যাসিস্ত সরকার তাঁর সর্বপ্রকার রচনা-প্রকাশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। যুদ্ধের শেষ দিকে তিনি আবার নাটক লিখতে শুরু করেন—সেই সময় মৃত্যুর তাণ্ডবলীলার মধ্যে বসেও তিনি যে-নাটক সৃষ্টি করেন তার মধ্যে দিয়েও তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা তার '**Insula**' বা 'দ্বীপ' নামক নাটকটি এদিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ-আরম্ভের সংবাদে বিভ্রান্ত হয়ে রেলওয়ের অফিসে এসে উপস্থিত হল তিনজন—একজন বিখ্যাত শিল্পপতি, একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়, আর তৃতীয় জন এক তরুণী চিত্রশিল্পী। তারা তিনজন এসেছিল সমাজের তিন বিভিন্ন স্তর থেকে কিন্তু প্রাণভয়ে তিনজনই উঠল গিয়ে শহরতলীর আশ্রয়গৃহে—অপরিচয়ের ব্যবধান ভুলে তিনজনই হয়ে গেল এক পরিবারভুক্ত। চারদিকের অভাব, দৈন্য, মৃত্যুভয়ের মধ্যে অসহায়ভাবে বসে তারা উপলব্ধি করল—এই দুঃখের হাত

থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় মনকে এই অসুন্দর আবেষ্টন থেকে মুক্ত করা। মানুষের জীবনে যেন আছে দুটি মহল—এক মহল হল বাইরের জগৎ—যেখানে বোমা পড়ে, রুটি পাওরা যায় না, বাড়ীওয়ালা ঝগড়া করে—সেই দৈনন্দিন তুচ্ছতার মহল। আর এক মহল হল অন্তরের স্বপ্নের জগৎ—সে যেন উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রের মাঝখানে এক শান্ত, স্তব্ধ দ্বীপ—সেখানে অনেক আলো, অনেক রং, অনেকখানি খোলা আকাশ। বাইরের জগতের কুশ্রীতাকে ভুলে মানুষের মন বারে বারে পালিয়ে যেতে চায় সেই নিরালা দ্বীপে, যুদ্ধের কোলাহল ভুলে শুনতে চায় সেখানকার নারিকেলকুঞ্জের পাতার মর্মর, সমুদ্র-পাখীর ডানার ঝাপট।

পূর্ববর্ণিত দুটি নাটকেই সেবাস্তিয়ান মানুষের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন। তাঁর পরবর্তী দুটি নাটক 'Ultima ora' (শেষের ঘণ্টা) ও Steaua fara nume (নামহীন তারকা)-য় তাঁর নাট্য-প্রতিভা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে বহির্জগতের ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে অন্তর্জগতের সৌন্দর্যলোকের সমন্বয়সাধনে।

'শেষের ঘণ্টা' সেবাস্তিয়ানের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক আর সবচেয়ে রসোত্তীর্ণ নাটক 'নামহীন তারকা'। তাঁর চারটি নাটকের মধ্যে 'শেষের ঘণ্টা'ই একমাত্র নাটক, যার মধ্যে রাজধানীর কর্মময় জীবন চিত্রিত হয়েছে, শিল্পপতিদের ব্যবসায়-ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উন্মাটিত হয়েছে আর তারই পটভূমিকায় ফুটে উঠেছে এক আত্মভোলা অধ্যাপকের চরিত্র। তাই যুদ্ধোত্তরকালে এই নাটকের পারিপার্শ্বিক দর্শকের মনে কতখানি সাড়া জাগিয়েছিল তা' সহজেই অনুমান করা যায়।

সেবাস্তিয়ানের জীবন-দর্শন সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'নামহীন তারকা' নাটকে—যেখানে তাঁর ইঙ্গিতধর্মিতারও হয়েছে পরিপূর্ণ বিকাশ। 'ছুটির খেলা' ও 'দ্বীপের' অন্তর্নিহিত রোমান্টিক চিন্তাধারা সেখানে লাভ করেছে পূর্ণ পরিণতি—নাটকের মুখের সংলাপে নাট্যকারের অন্তরের অনুভূতির প্রত্যেকটি সুর অনুরণিত হয়ে উঠেছে।

জ্যোতিষ্কলোকের গবেষণায় মগ্ন ছিল অধ্যাপক মারিন—হঠাৎ এক আকস্মিক ঘটনাচক্রে তার জীবনে এল এক আশ্চর্য মেয়ে—যেন এক নক্ষত্রের গতিপথে এসে পড়ল অন্য এক পথভ্রষ্ট তারকা—তারায় তারায় লাগল সংঘাত—জ্বলে উঠল আগুন। সেই আগুনের আভায় আলো হয়ে উঠল তাদের অন্তর—দেখল পরস্পরকে, জানল নিজেকে—সন্ধান পেল আপন অন্তরের গোপন রহস্যালোকের।

প্রতিদিনের চেনা-জানার জগতে যে উপহসিত ছিল 'পাগল অধ্যাপক' বলে, অজানার সান্নিধ্যে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিজ্ঞানী-দার্শনিক। উড়ে গেল মারিনের নীরবতার আবরণ। তার অন্তরের যত অস্পষ্ট অনুভূতি—যে অনুভূতি দিয়ে মারিন অনুভব করেছে বিশ্বচরাচরের নাড়ীর স্পন্দন—সেই সব অনুভূতির পুঞ্জ বাণীরূপে ধরে বেরিয়ে এল। অপরিচিতার সঙ্গে মারিনের সংলাপের সেই সব অংশ পড়তে পড়তে অনিবার্যভাবেই মনে জেগে ওঠে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতির কথা, সমস্ত জগতের সঙ্গে নিজের একাত্মতা উপলব্ধি করার কথা। অপরিচিতাকে মারিন বলছে—"এক এক সন্ধ্যায় মনে হয় যেন সমস্ত আকাশটা কি এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে, অশ্রুত আহ্বানে পূর্ণ, যেন কান পেতে থাকলে দূরতম তারার অভ্যন্তরে সমুদ্রের গর্জন, অরণ্যের মর্মর শোনা যাবে...যেন এক গ্রহের জীবন অন্য গ্রহের জীবনকে অনুভব করছে, খুঁজছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে..."

এই কয়টি পংক্তির সঙ্গে বলাকার সেই কয়টি পংক্তির লক্ষ্যণীয় সাদৃশ্য মনকে চমকিত করে দেয়—

"মনে হল সৃষ্টি যেন
স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি'
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ
অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।"

অপরিচিতা মারিনকে প্রশ্ন করে, "কোন দিন কি এক গ্রহের জীবন আরেক গ্রহের জীবনকে খুঁজে পায়?" মারিন তার উত্তরে বলে—"পায় না। তবুও এ অনুভূতি বড় সুন্দর। মনে মনে ভাবি যে, এই বিশাল আকাশের নীচে আমি একা নই। এই জীবনের যত বিফল প্রয়াস, যত ভেঙে-যাওয়া স্বপ্ন, ধরা-ছোঁওয়ার অতীত যত কিছু সব হয়ত অন্য কোথাও, অন্য কোন নক্ষত্রে, হয়ত সপ্তর্ষিতে, হয়ত ধ্রুবতারায়, সার্থক সুন্দররূপে মূর্ত হয়ে ওঠে।"

বিশ্বচরাচরের সঙ্গে এই একাত্মতা-বোধ এ শুধু মারিনেরই নয়—এ তার সৃষ্টিকর্তারও বহু দিনের চিন্তার বাঙ্ময় রূপ। এইখানে এসে সেবাস্তিয়ানের কল্পিত 'দুই মহলের' আপাতবিরোধ ঘুচে গেছে—দৈনন্দিন জীবনের সব হাসিকান্না সুখদুঃখ ছাড়িয়ে মারিনের মন উধাও হয়ে গেছে অসীম আকাশে—ডুবে গেছে বিশ্বজগতের রহস্যের সাগরে। মারিনের জীবনে প্রেম এল আকস্মিকভাবে, এক অভাবিত, অযাচিত ঐশ্বর্যের মতো। সেই প্রেমের আলোয় সে দেখল নিজেকে—সেই আত্ম-পরিচয়েই তার প্রেমের সার্থকতা। প্রেমের পাত্র সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র—প্রেমের অনুভূতিতেই প্রেমের পরিণতি।

'নামহীন তারকা' সেবাস্তিয়ানের কল্পনার আদর্শ নাট্যসাহিত্য—যেখানে নাটকের সঙ্গে ওতঃপ্রোত হয়ে মিশে গেছে নাট্যকারের প্রাণের বাণী। এই নাটকের রচনাকাল ফ্যাসিস্ত শাসনের শেষ যুগ। তখন অন্য এক ছদ্মনামে এই নাটকটি প্রকাশিত ও অভিনীত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে রুমানিয়ায় স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর রুমানিয়ার জাতীয় নাট্যপরিষদ সেবাস্তিয়ানের সবকটি নাটক মঞ্চস্থ করার ভার নেন।

স্বাধীন রুমানিয়ার রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে প্রথম ফ্যাসিস্তবিরোধী নাটক অভিনীত হয় সেবাস্তিয়ানের 'Noptsi fara Luna' (চন্দ্রহীন রাত্রি)—এটি স্টাইনবেকের একটি উপন্যাস অবলম্বনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে লিখিত। তারপরে সেবাস্তিয়ানের সবকটি নাটকই অভিনীত হয়েছে—কোন কোন নাটক চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছে এবং দেশের বাইরেও অভিনীত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সবগুলি নাটকের অভিনয়-সাফল্য দেখা সেবাস্তিয়ানের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৪৫ সালের জুন মাসে বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যালজ্যাক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে যাবার সময় মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। মিখাইল সেবাস্তিয়ানের সাহিত্যিক জীবনের দৈর্ঘ্য স্বল্প, অবদান সীমাবদ্ধ—কিন্তু তার মধ্যেই তিনি অনন্তকালের খাতায় নিজের নামের স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। *

---

* [মিখাইল সেবাস্তিয়ানের মূল রুমানিয়ান রচনাবলী অবলম্বনে লিখিত। উদ্ধৃত অংশগুলির অনুবাদ লেখিকার স্বকৃত।]

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। এগার ।।

দিলীপ না?'

খোয়া-ওঠা রাস্তার ধারে ভেঙে-ফেলা বস্তির জঞ্জাল—টুকরো টিন, ভাঙা খাপরা আর ইঁটপাটকেল। সেইদিকে চেয়ে দিলীপ অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিল। হঠাৎ চমকে উঠল। এখানে তাকে ডাকবে কে! এইমাত্র একখানা লরী চলে গেছে। চারদিক ধুলোয় অন্ধকার। তারই ভিতর দিয়ে যে যুবকটি এগিয়ে আসছিল, প্রথমটা তাকে ঠিক চিনতে পারল না। পরক্ষণেই প্রায় ছুটে গিয়ে দুহাতে তার হাত চেপে ধরল—কী আশ্চর্য! তুমি এখানে!

—এখানেই তো থাকি আমি। ঠিক এখানে নয়, এই অঞ্চলে; মানে ঐ দিকটায়।

—কোথায়?

—ট্যাংরার নাম শুনেছিস?

—না ভাই; তবে ট্যাংরামাছের নাম শুনেছি, দেখেওছি। মনে আছে, বর্ষ্টালের কন্ট্রাক্টর একবার নিয়ে এসেছিল, পচা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ঘোষসাহেব? কী বিচ্ছিরি গন্ধ!

মকবুল হেসে উঠল। বলল, খুব মনে আছে। ঐ নিয়ে কত হৈ চৈ না করেছিলাম সেদিন! তখন কি জানতাম, পচা ট্যাংরার চাইতেও বিচ্ছিরি জিনিস আছে দুনিয়ায়, আর তাই একদিন ঘাঁটতে হবে।

কথাটার শুরুতে যে সুর ছিল, শেষের সুরটা তার চেয়ে অনেকখানি ভারী। দিলীপের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। লক্ষ্য করে মকবুল নিজেকে সামলে নিল। আগেকার হাল্কা সুরে ফিরে গিয়ে বলল, ভাবছিস, সেটা আবার কী। সেই আজব বস্তুটির নাম ট্যানারি। আমার বর্তমান আশ্রয়।

—তুমি সেখানে কি কর!

—কাজের কি আর অন্ত আছে? কাঁচা চামড়া শুকোই, শুকোলে ভিজতে দিই। ভিজলে আবার শুকোই। তারপর—থাক, শুনেই তোর বমি আসছে। এবারে তোর সব খবর বল। কোথায় আছিস? এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?

প্রশ্নগুলো দিলীপের কানে গেলেও মনে পৌঁছল না। একদৃষ্টে মকবুলের দিকে তাকিয়ে রইল। সে যে ভালো নেই, সুখে নেই, চেহারা দেখেই অনুমান করা গিয়েছিল, এই কটি সামান্য কথায় তার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেল। প্রচুর বিত্তশালী ও বনেদী ঘরের ছেলে মকবুল চৌধুরী। কলুটোলায় বিরাট কারবার তার বাবার। দিলীপ সবই শুনেছিল। মনে পড়ল, বর্ষ্টালে যেদিন প্রথম দেখা। যেমনি স্বাস্থ্য, তেমনি গায়ের রং। আজ তার কোনোটাই নেই। আর একটু কাছে সরে এসে মৃদু অন্তরঙ্গ সুরে বলল, বর্ষ্টাল থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাওনি?

—'বাড়ি!' কথাটা যেন হেসে উড়িয়ে দিল মকবুল।

'আরো গোটা কয়েক খড়মের গুঁতো খাবার জন্যে?'

—মার সংগে দেখা হয়েছে এর মধ্যে?

—মা নেই।

দিলীপ চমকে উঠল। 'মা নেই!' —এ যেন তার নিজেরই অন্তরের প্রতিধ্বনি। এই বস্তিগুলোর আনাচে কানাচে যখন ঘুরে বেড়ায়, ঐ দুটো কথা তার মনেও মাঝে মাঝে মাথা তুলে ওঠে। যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন তারা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। মা নেই। তবে কিসের জন্যে এই অন্তহীন ব্যর্থ সন্ধান? এই মিথ্যা আশায় পথে পথে ঘুরে মরা? কী লাভ?

কখনো কখনো এই চিন্তাধারাকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে। কিন্তু মন মানে না। রবিবার এলেই একটা অলক্ষ্য আকর্ষণ তার পা-দুটোকে টেনে আনে এই বেলেঘাটার কোন্ নাম-না-জানা বস্তির পানে। শেয়ালদ স্টেশন বাঁ দিকে রেখে, রেলের পুল পার হয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে আশেপাশের অলিগলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। কোনো কোনো দিন আরো পূর্বদিকে চলে যায়, যেখানে বিশাল এলাকা জুড়ে তৈরী হচ্ছে লেক। কত খোলার ঘর আর টিনের চালা ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে গেছে নতুন নতুন রাস্তা। ভারী ভারী স্টীম রোলার চলছে তার বুকের উপর। তবে কি এরই কোনো-খানে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সেই ছোট কুঁড়েখানা? সামনে এক চিলতে বারান্দা, একফালি উঠোন, তারপরেই রাস্তা; একটুখানি এগিয়ে এক পাশে জলের কল, আরেক পাশে সেই ঝাঁকড়া আম গাছ,—তার স্বপ্নভরা শৈশব দিনের সাক্ষী। ভাবতে গিয়ে বুকের ভিতরটা শিউরে ওঠে। তাই যদি হয়, সব যদি ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গিয়ে থাকে, কোথায় গেল মা? তবে কি?—

—কী ভাবছিস? বললি না তো এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি? দিলীপের

চিন্তাসূত্রে ছেদ পড়ল। বলল, বিশেষ কোথাও না। ঘুরছিলাম।

—ঘুরছিলাম! এখানে কেউ ঘুরতে আসে? ......কটা বেজেছে মশাই?

শেষ প্রশ্নটার লক্ষ্য একজন পথচারী ভদ্রলোক। তিনি হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, আটটা দশ।

—সর্বনাশ! আটটা বেজে গ্যাছে! আর তো আমার দাঁড়াবার উপায় নেই, ভাই। তুই আছিস কোথায়?

—শেয়ালদর কাছে, সার্পেণ্টাইন লেন।

—দাঁড়া ঠিকানাটা লিখে নিই। কত নম্বর?

দিলীপ নম্বরটা জানিয়ে দিল। মকবুল পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করে লিখতে লিখতে বলল, আসছে রবিবার বিকেলের দিকে যাবো। থাকবি তো?

—থাকবো। নিশ্চয়ই যেও কিন্তু।

মকবুল কথা রেখেছিল। পরের রবিবারই এসেছিল দিলীপের আস্তানায়। দরজা খোলা ছিল। নম্বর মিলিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে প্রথমটা মনে হল ভুল হয়নি তো? ঘরে ঘরে প্রেসের সাজসরঞ্জাম। লোক নেই। বোধহয় ছুটির দিন বলে কাজ বন্ধ। এখানে কোথায় থাকে দিলীপ? হঠাৎ চোখে পড়ল একটা কালো রং-এর পিপে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। আরে এ যে কেশো! কেশবও ওকে দেখতে পেয়েছিল। দেখেই এক বিকট চিৎকার—মকবুল এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে পিল পিল করে বেরিয়ে এল এক ক্ষুদ্র পঙ্গপাল। বেশীর ভাগই চেনা, কয়েকটি অচেনা মুখ। কিন্তু উল্লাসের বহরটা তাদেরও কম নয়। বোঝা গেল, প্রথম এবং সদ্য সদ্য পা দিলেও এখানে সে আগে থেকেই পুরনো হয়ে বসে আছে। 'আসাটা' কোনো খবর নয়, 'এসে পড়েছে' সেইটুকু ঘিরেই ঐ হুল্লোড়। সবাই যখন তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে, কে কী বলছে কেউ শুনছে না, তখন হঠাৎ পিছন দিক থেকে ভিড় ঠেলে অর্থাৎ দুচারটিকে ভূমিসাৎ করে এগিয়ে এল বাহাদুর—ব্যায়াম-পুষ্ট দৃঢ়, সবল পেশী, বিশাল বুকের ছাতি, শক্ত চাকার মত মুখ। বিরাশি ওজনের থাবাটা মকবুলের কাঁধে রাখতেই সে বেশ খানিকটা নুয়ে পড়ে বলল, উঃ, বক্সিং খেলবার আর জায়গা পেলে না, বাবা?

বাহাদুর একবার তার সর্বাঙ্গে সস্নেহ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, কী

করেছিস শরীরটাকে! একেবারে চেনা যায় না। চল, ওপরে চল।

মকবুল প্রসঙ্গটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই বোধহয় অন্য কথা পাড়ল। চলতে চলতে চারদিকে তাকিয়ে বলল, ব্যাপার কী বলতো? গোটা বর্স্টালটাই দেখছি উপড়ে এনে ফেলেছ এই গলির মধ্যে।

বাহাদুর কোনো জবাব দেবার আগেই কে একটি অচেনা ছেলে বলে উঠল, ঠিকই বলেছ; তবে এটা আমাদের নতুন বর্স্টাল দেখছ না? সেই ভুতুড়ে পাঁচিলটা নেই। সিপাই, জমাদার, কাঠ-মাস্টারের কানটানা, লোহা-মাস্টারের ঘুসি—সেসব কিছু নেই।

—তার চেয়ে বল, রোজ সাতবার করে শুনতে হচ্ছে না শাটকো সন্তোষ-বাবুর সেই 'রুলস'—

ঠোঁট বেঁকিয়ে 'রুলস' কথাটা এমন-ভাবে উচ্চারণ করল কেশব, যে, চারদিকে হাসির রোল পড়ে গেল। মকবুল আড়-চোখে একবার দেখে নিয়ে বলল, কেশো তো খুব কথা বলতে শিখেছে, দেখছি! তখন তো জানতাম একটা বিশেষ কথা ছাড়া—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে সকৌতুকে তাকাল ওর সুগোল ভুঁড়িটির দিকে। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে সকলের মুখেই কৌতুক-হাসি ছড়িয়ে পড়ল। কেশবের মুখেও কিছুমাত্র অপ্রতিভ হবার লক্ষণ দেখা গেল না। উন্মুক্ত এবং প্রসারিত উদরের উপর হাত বুলাতে বুলাতে বলল, তারও এখানে দেদার ব্যবস্থা। এসেছ যখন, থেকে যাও না দুচারদিন? নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

'দুচারদিন নয়,' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে যোগ করল বাহাদুর, একেবারে চলে আয়। তোকে আমাদের দরকার। তাছাড়া, দিলীপের কাছে আমি সব শুনেছি।

—দিলীপ কোথায়? তাকে তো দেখছি না।

—মাস্টারমশাই কোথায় বেরিয়েছেন তাকে নিয়ে। এখনি এসে পড়বে।

—কোন মাস্টারমশাই?

—আশুবাবু।

মকবুলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে বলল, যা কিছু দেখেছিস, উনিই তার মূলে। বসবি চল, চা-টা খা। তারপর সব বলছি। ......কেশো!

—ইয়েস, স্যর?

—মকবুলের 'অনারে' আজ তোর বিশেষ প্রোগ্রামটা কী?

—মাৎ ঘাবড়াও। সিঙ্গাড়া ভাজা হচ্ছে।

—গুড্। জলদি লেয়াও।

বেশীর ভাগই চেনা, কয়েকটি অচেনা মুখ

দিলীপ ফিরবার আগেই এখানকার মোটামুটি ইতিহাস মকবুলের জানা হয়ে গেল। সেই সঙ্গে নিজের কথাও বলল বাহাদুর। বর্স্টাল থেকে পালাবার অপরাধে এস-ডি-ও সাহেব পুরো ছটি মাস জেল ঠুকেছিলেন, সে খবর মকবুল ওখানে থাকতেই পেয়েছিল। রণমায়া ওর বোন বলে, বাকী চার্জগুলো আর চালানো যায়নি। সেজন্যে তিনি ক্লাবের বন্ধুদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন, এবং সেটা ঘোষসাহেবের কানে এসেছিল। কথাটা তিনি হেডমাস্টার-মশাইকে বলে ফেলেছিলেন। তারপর আর চাপা থাকেনি। জেল থেকে খালাস পাবার পর সেইদিনই বাহাদুর দিলীপের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ঘোষ-সাহেব তখন চলে গেছেন। সন্তোষবাবু তার মোলাকাতের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করেছিলেন। কারণ দেখিয়েছিলেন, 'তুমি তো দিলীপের কোনো আত্মীয় নও।' আশুবাবুর ঠিকানা জানবার চেষ্টা করেছিল, কেউ বলেনি, অথবা বলতে পারেনি।

পরের ইতিহাস বিশেষ সুখ-শ্রাব্য নয়। একটানা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কাহিনী। এমন কাজ নেই যা সে না করেছে। শুধু নিজের জন্যে হলে অতটা

না করলেও চলত। কিন্তু 'মায়া'কে আর কিছু না হোক, একটা ভদ্র আশ্রয় এবং একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য না দিয়ে সে পারে কেমন করে? সেটুকু সংগ্রহ করতে তাকে অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে। তারপর জুটেছিল এক কাগজের দোকানের দারোয়ানি। সেইখানেই আশুবাবুর সঙ্গে দেখা। উনি কাগজ কিনতে গিয়েছিলেন; সঙ্গে দিলীপ।" ও তখন সবে বর্স্টাল থেকে বেরিয়ে এসে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

—'পরীক্ষা ওখান থেকে দিয়ে আসেনি?' বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করল মকবুল

—না। সে অনেক কথা। আরেকদিন শুনিস।

—আচ্ছা, তারপর?

—এই প্রেস-এর কাজ তখন রোজ বেড়ে যাচ্ছে। স্যর-এর একার সাধ্যি নয় সামলানো। এক দিলীপ ছাড়া এমন কেউ নেই যার ওপরে খানিকটা ছেড়ে দেওয়া যায়। ওর আবার পরীক্ষার পড়া। কাজেই বুঝতে পারছিস। আমার ওপর হুকুম হল, কালই চলে এসো। এলাম। ....
বলে বাহাদুর হেসে উঠল তার সেই প্রাণখোলা হাসি। তারপর বলল, এসেই দিলীপকে সব ঝঞ্ঝাট থেকে সরিয়ে দিলাম—বললাম, 'ইউ আর এ স্টুডেন্ট: চুপচাপ বসে বসে পড়বি। ও আবার কী চীজ জানিস তো। বললে, "বাঃ, আমি বুঝি তোমাদের ঘাড়ে বসে খাবো?"

"আচ্ছা, তাহলে রোজ দুঘণ্টা করে প্রুফ দ্যাখ। বাস্; আর তোমাকে কিছু করতে হবে না।"

—এখন কী করছে ও? জানতে চাইল মকবুল।

—ওকে আমরা পড়া ছাড়তে দিইনি। আই. এস-সি পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছে। এবার থার্ড ইয়ার। ওরকম ছেলে হয় না।......
বলতে বলতে বাহাদুর কেমন আনমনা হয়ে পড়ল। সামনেকার জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল পাশের বাড়ির ছাদের দিকে। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। আবার এদিকে ফিরে বলল, আমরা বলি, স্যর বলেন, তুমি যে পড়ছ এইতো সবচেয়ে বড় কাজ। এতে আমাদের সকলেরই স্বার্থ আছে। পাশ করে যখন বেরোবে, আমাদের আর বাইরের ডাক্তারের ফিঃ গুণতে হবে না। কে শোনে কার কথা? রোজ অন্ততঃ ঘণ্টা চারেক করে প্রেসের জন্যে না খাটলে ওর চলে না। তবে বেশীর ভাগ আফিসেই বসতে হয়। মাস্টারমশাই বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছেন।
......কিন্তু কেশোটা কী করছে বল তো? দাঁড়া, একবার দেখে আসি।

—থাক না? ঠিক লোক ঠিক জায়গায় আছে। তুমি বসো। বোনের খবর কী?

বাহাদুর উঠতে যাচ্ছিল; বসে পড়ে বলল, ভালো আছে। বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। ছেলেটা পুলিশে কাজ করে। এখন বর্ধমানে আছে। ক মাস হল বাসা পেয়েছে।

বলতে বলতে ছোট ছোট চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, একটা তৃপ্তির আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল মুখময়। মকবুলের মুখেও খুশীর আভা দেখা দিল। ঐ নিয়েই বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাহাদুর দরজার দিকে চেয়ে কলরব করে উঠল, এই যে, এতক্ষণে আমাদের ডাক্তারবাবুর ফেরা হল। এদিকে যে বন্ধু এসে বসে আছে, সে খেয়াল নেই।

—'বন্ধু তো মাঠে বসে নেই,' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হাসিমুখে বলল দিলীপ।

—মাঠে বৈকি? কার এমন দায় পড়েছে, তোমার বন্ধুকে নিয়ে বকবক্ করতে?

—সব চেয়ে যার বড় দায়, তাকেই তো দেখছি।

—বটে? দিলীপ আর সে মুখচোরা দিলীপ নেই; বুঝলি মকবুল? আচ্ছা, তোরা কথা বল। আমি একবার দেখি কেশো হতভাগার মতলবটা কী। এক কড়া সিঙ্গাড়া বোধহয় একাই সাবড়ে দিলে।

বলতে বলতে বাহাদুর উঠে গেল। এতক্ষণ ফাঁকা অফিস কামরায় বসেই কথা হচ্ছিল। দিলীপ বলল, চলো, আমার ঘরে গিয়ে বসি।

—আশুবাবু আসেননি?

—না; উনি ওঁর গুরুদেবের ওখানে চলে গেলেন। কাল ফিরবেন।

দোতলার সিঁড়ি যেখানে ছাদে গিয়ে পড়েছে, তার পাশে এক ফালি চিলেকোঠা। ওটি দিলীপের নিজস্ব। পড়াশুনোর সুবিধার জন্যে শুরু থেকেই আশুবাবু ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একজন কোনোরকমে শুতে পারে এমনি একখানা তক্তপোষ। তার পাশে দেয়াল ঘেঁষে ছোট্ট একটি কেরোসিন কাঠের টেবিল। সামনে একখানা হাতলবিহীন চেয়ার। টেবিলের উপরেই একটি জানালা। খুলে দিলে গলির ওপারে দোতলা বাড়ির ছাদটা চোখে পড়ে। দিলীপের পরম ভাগ্য, এ হেন ঘরেও একটি দেয়াল-আলমারী আছে। কাঁচের পাল্লা; বর্তমানে কাঁচ নেই, আছে শুধু ফ্রেম। তিনটি তাক। উপরের দুটোতে ওর বই থাকে, আর নীচেরটায় কিছু হাড়গোড়।

ছোট্ট তক্তপোষ জুড়ে সতরঞ্চি পাতা। দুজনে গিয়ে তার উপরে বসল। দিলীপ হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপরকার
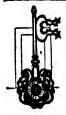
জানালাটা খুলে দিয়ে বলল, অনেকক্ষণ এসেছ, না?

—অনেকক্ষণ কোথায়? এই তো এলাম।

—আমি জানতাম, তুমি আসবে। কি করবো? 'স্যার'-এর সঙ্গে বেরোতে হল। কিছু কেনাকাটা ছিল। আমার হাতে দিয়ে উনি হুগলীতে ওঁর গুরুদেবকে দেখতে চলে গেলেন।

—ওখানে থাকতে মাঝে মাঝে যাঁর কাছে যেতেন, সেই গুরু?

—হ্যাঁ, তিনিই। তখন কি জানতাম, মানুষটা কত বড়? আমরা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতাম, আর তিনি বসে বসে আমাদের কথা ভাবতেন। এখানে যা কিছু দেখছ, সব তাঁর জন্যে।

—তাঁরই প্রেস বুঝি?

—না; প্রেস আমাদের। আমরাই এর মালিক। এখানে যারা কাজ করছে, সকলেরই সমান স্বার্থ, সমান স্বত্ব। এমন কি মাস্টারমশাই, যিনি এটা গড়ে তুললেন, তিনিও আমাদের মত একজন শেয়ার-হোল্ডার মাত্র।

মকবুল কৌতূহলী হয়ে উঠল। দিলীপ তখন গোড়া থেকে শুরু করে এই সমবায় প্রতিষ্ঠানের গোটা ইতিহাসটা তাকে খুলে বলল। আশু-বাবুর গুরুদেব যে-টাকাটা দিয়েছিলেন, সে শুধু ধার এবং এতদিনে তার মোটা অংশটাই শোধ দেওয়া হয়ে গেছে, এ কথাও ঐ সঙ্গে জানিয়ে দিল। প্রেস-এর প্রসার যে রকম গতিতে চলেছে, রোজ তাদের নতুন নতুন কর্মী দরকার, সে তুলনায় বর্স্টাল থেকে যারা বেরোচ্ছে, যথেষ্ট নয়, এবং আপাততঃ দু-একজন ট্রেণার ছাড়া বাইরে থেকে লোক নেবার ইচ্ছা নেই, সেটা এখানকার উদ্দেশ্যও নয়—ইত্যাদি তথ্য বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করে, এতক্ষণে যেন আসল প্রসঙ্গে আসবার ফুরসত হল এমনিভাবে বলল, যাক্‌গে; তারপর তুমি কবে আসছ, বল।

মকবুল তন্ময় হয়ে শুনছিল। এই আকস্মিক প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। একটু যেন থতমত খেয়ে বলল, আমি? ......আমাকে আসতে হবে? মানে, তুইও আসতে বলছিস?

—বলছি কি রকম? সবাই মিলে আমরা একেবারে স্থির করে ফেলেছি। মাস্টারমশাই তো তোমাকে আটকে রাখতে বলে গেছেন। গুরুদেবের বাড়াবাড়ি অসুখ না হলে উনিই তোমাকে বলতেন।

মকবুল কিছু বলবার আগেই, কলরব করতে করতে কেশব এবং তার সঙ্গে আরো তিন-চারটি ছেলে এসে ঢুকল। তাড়া দিয়ে বলল, চল, চল, সিঙ্গাড়া ফুরিয়ে গেল।

—শুধু সিঙ্গাড়া, না আরো কিছু আছে? জানতে চাইল দিলীপ। কেশব চোখে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, আছে, আছে। নাম শুনলেই জিব দিয়ে টস্‌ টস্‌ করে জল পড়বে।

—কী সেটা?

—চল না? গেলেই দেখতে পাবে।

একতলার খাবার ঘরে সবাই গিয়ে জড় হল, বর্স্টালের ডাইনিং শেডে অনেকদিন আগে যেমন হত। তফাৎ অবশ্য অনেক। প্রাণ খুলে হৈ-হৈ করবার স্বাধীনতা ছিল না। গলাটা একটা বিশেষ পর্দা ছাড়িয়ে গেলেই চীফ অফিসারের বিকট ধমক। সেখানে গোনাগুনতি যার যেটুকু বরাদ্দ তার বাইরে হাত বাড়ানো ছিল অপরাধ। এখানে সে সব বাধা-নিষেধ কোনোটাই নেই। কেশব এবং আরো দুটি ছেলে মিলে সিঙ্গাড়া পরিবেশন করল। জন-প্রতি ৪টা; খাইয়ে বুঝে দুটো একটা বেশীও পেল কেউ কেউ। চা আসবার ঠিক আগেটায় কেশব ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পল্টনের সেনাপতির মত উচ্চ-কণ্ঠে নির্দেশ জারি করল—'তোমরা সকলে চোখ বোজো দেখি। না বললে খুলবে না কিন্তু।'

সবাই চোখ বুজল। কেশবের এসব পুরনো পেটেণ্ট খেলা; এদের অভ্যাস আছে। মিনিট তিনেক পরে দ্বিতীয় আদেশ দিলেন সেনাপতি, আচ্ছা, এবার খোলো।

প্রত্যেকের পাতে একটি করে জয়-নগরের মোয়া। খুশীর ঝলকে গোটা পল্টনটা ঝলমল করে উঠল। দু-তিনজন উঠে পড়ে নাচতে শুরু করল। বাহাদুর এক কামড়ে অর্ধেকটা মোয়া মুখে পুরে বলে উঠল, বাঃ, এবারে আরো ভালো করেছে। বুড়োকে একটা মেডেল দেওয়া উচিত।

—ও মোটেই নিজে করে না। ভিড়ের ভিতর থেকে বলল কে একজন।

—তবে কে করে?

—ওর মা।

—মা! ঐ থুত্থুড়ে বুড়োর আবার মা আছে নাকি?

একটা অট্টহাসির রোল উঠল। তার মধ্যে মকবুলের হঠাৎ নজরে পড়ল, দিলীপ মাথা নীচু করে বসে মোয়াটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, তখনো মুখে দেয়নি।

—কী হল! খাচ্ছিস না যে?

—'খাচ্ছি' ম্লান হেসে মাথা তুলল দিলীপ। তারপর অন্যমনস্কের মত খানিকটা ভেঙে মুখে দিল।

গোটা পল্টন জুড়ে তখন ভীষণ সোরগোল শুরু হয়েছে। কে একজন দেখতে পেয়েছে কেশবের বাঁ হাতে আর একটি মোয়া। সংগে সংগে সরব প্রতিবাদ—ও কি! তুমি দুটো খাবে কেন?

—বাঃ, আমি এত কষ্ট করে হাঁটলাম, তার বুঝি মজুরি নেই?

—কে বলেছিল তোমাকে কষ্ট করতে? ও সব চলবে না। দাও, ভাগ দাও।

খাবার জিনিসের ভাগ দেওয়া কেশবের কোষ্ঠীতে লেখা নেই। তার বদলে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এগিয়ে দিল, এবং সংগে সংগে পিটটান। গোটা পল্টন হুল্লোড় করতে করতে ছুটল তার পেছনে।

দিলীপকে একান্তে পেয়ে মকবুল তার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বলল, ব্যাপার কী বল তো? হঠাৎ এরকম গম্ভীর হয়ে গেলি কেন?

—ও কিছু না। চলো, ওপরে যাই।

—কিছু না বললে শুনবো কেন? মা বলতে চাস সে আলাদা কথা।

বন্ধুর কণ্ঠে অভিমানের আভাস পেয়ে দিলীপ কুণ্ঠার সুরে বলল, সত্যি বলছি, বলবার মতো কিছু নয়। হঠাৎ মার কথা মনে পড়ে গেল। ছেলেবেলায় একদিন ঐ মোয়ার জন্যে ভীষণ কান্নাকাটি করেছিলাম। জানতাম না সেদিন মার হাতে একটিও পয়সা নেই। ...যাক গে।

তুমি কাল থেকেই আসছ তো?

মকবুল সে প্রশ্নের জবাব দিল না। বলল, মার খোঁজ পাসনি এখনো?

—না; সেইজন্যেই ওখানে ঘুরছিলাম সেদিন। আরো অনেকবার গিয়েছি। ঠিক জায়গাটা কিছুতেই বের করতে পারছি না।

—ওদিকটা যে আগাগোড়া বদলে গেছে। অনেক পুরনো বস্তি ভেঙে ফেলেছে। আচ্ছা, এবার যেদিন যাস, আমি তোর সংগে থাকবো।

দিন কয়েক পরে মকবুল আবার যখন এল, তখন আশুবাবু অফিসে ছিলেন। এই প্রেস-এর প্রতিষ্ঠা এবং তার ভিতরকার আশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সংগে অনেক কথাবার্তা হল। সেই প্রসংগে তিনি বললেন, ব্যাপারটাকে শুধু জীবিকার দিক দিয়ে দেখো না। তাহলে হয়তো তুমি যেখানে আছ, সেখান থেকে চলে আসা ঠিক হবে না। শিল্প হিসেবে ট্যানারির ভবিষ্যৎ অনেক বড়। টিঁকে থাকলে একদিন অনেক ওপরে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বৈষয়িক উন্নতি ছাড়াও মানুষের জীবনে আর একটা দিক আছে—সার্ভিস বা সেবার দিক। শুধু নিজের জন্যে নয়, অন্যের জন্যে কী বা কতটুকু করলাম—এ প্রশ্নের জবাবও তাকে দিতে হয়।

মকবুল ছাড়া দিলীপ এবং আরো দু-একজন পুরনো আমলের বর্স্টাল-ফেরৎ ছেলে সেখানে উপস্থিত ছিল। সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আশুবাবু আবার বললেন, সে 'অন্যের' মধ্যে প্রথমেই আসে আপনজন। বড় ভাই একদিকে যেমন নিজেকে বড় করবার, ক্রমশঃ আরো উঁচুতে তোলবার চেষ্টা করবে, তেমনি তার পরে যারা এসেছে, তাদেরও টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া শুধু কর্তব্য বলবো না, তার একটি বিশেষ দায়। সেজন্যে যদি তাকে খানিকটা খাটো হতে হয়, যতটা ওপরে সে যেতে পারত, তার কয়েক ধাপ নীচুতে পড়ে থাকতে হয়, ছোটোর মুখ চেয়ে সে ক্ষতি তাকে সইতে হবে। ......তোমরা যারা বর্স্টাল থেকে আগে বেরিয়েছ, তারা এক ধাপ এগিয়ে আছ। পরে যারা এসেছে এবং আরো পরে যারা আসবে, সকলেরই একটা দাবি আছে তোমাদের ওপর, বড় ভাই-এর কাছে ছোট ভাই-এর যে দাবি। তাদের জন্যে তোমাদের কিছু দেবার আছে, যার যতটুকু শক্তি, তা সে যত সামান্যই হোক।

একজন বাইরের ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। আশুবাবু তাকে বসতে বলে ক্ষণকাল মকবুলের দিকে চেয়ে বললেন, এর বেশী আমার আর কিছু বলবার নেই। বাকীটা তুমি ভেবে দ্যাখো।

দিন তিনেক পরেই মকবুল একটি টিনের সুটকেস এবং সতরঞ্চি জড়ানো ছোট্ট বিছানাটি নিয়ে সার্পেন্টাইন লেনের 'নতুন বর্স্টালে' এসে উঠল।

(ক্রমশঃ)

।। সাম্যের কবি ।।
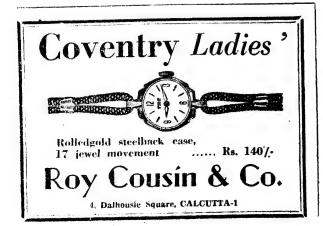
বর্তমানে উল্লেখযোগ্য মার্কিণ সাহিত্যিকদের মধ্যে কার্ল স্যান্ডবার্গ অন্যতম। ৮৩ বৎসর বয়স্ক এই কবি কেবলমাত্র দেশের মানুষের কাছ থেকেই শ্রদ্ধা লাভ করেননি—বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজ ও সাহিত্যিকমণ্ডলী তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। এমন কি ১৯৫৪ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর হেমিংওয়ে একথা স্বীকার করেন যে, স্যান্ডবার্গই আমেরিকান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মধ্যে এ পুরস্কার লাভের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। লিঙ্কনের জীবনী রচনার জন্য ১৯৪০ সালে এবং কবিতা লেখার জন্য ১৯৫১ সালে স্যান্ডবার্গ পুলিৎসার পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

ইলিয়নিয়সের তৃণাধ্যুষিত ক্ষুদ্র সহর গেলসবার্গের এক সুইডিস পরিবারে স্যান্ডবার্গের জন্ম হয় ১৮৭৮ সালে। পাঠ্যজীবন কাটে চরম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্য দিয়ে। সংসারের জন্য ছোটবেলা থেকেই কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করতে হয়। একালীন অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁর শিল্পীমনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

কর্ণহাসকার্স (১৯১৮), স্মোক অ্যান্ড স্টীল (১৯২০), স্লাবস অব দি সার্ণবার্ণট ওয়েস্ট (১৯২২), গুডমর্ণিং আমেরিকা (১৯২৮), আর্লিম্যন (১৯৩০), দি পিপল ইয়েস (১৯৩৬) কাব্যগ্রন্থগুলি স্যান্ডবার্গের উল্লেখযোগ্য রচনা।

সাধারণ পীড়িত দুঃস্থ অবহেলিত মানুষের কণ্ঠস্বর স্যান্ডবার্গের কাব্যে প্রতিধ্বনিত। এদেরই জীবনের সহজ সরল স্বাভাবিক অকৃত্রিম রূপটিকে নিরলঙ্কৃত ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। জীবন থেকে উপলব্ধ সত্যের বাঙ্ময় রূপদান করেছেন। গভীর মননশীল পর্যবেক্ষণগুণে যে চিত্তগ্রাহী কাব্যদেহ নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপও কোথাও কোথাও ফুটে ওঠে। স্যান্ডবার্গের শেষদিকের গ্রন্থগুলিতে গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় অধিক মাত্রায় প্রকট। কাব্যদেহে সুষমা আনয়নের প্রয়াস এ-পর্যায়েই বেশী। তাই অলংকারাদির বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়। জনগণের কবি হিসাবে স্যান্ডবার্গ সমাজের শ্রেণীভেদকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর কাব্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রবাদবাক্যের সুষ্ঠু প্রয়োগ।

চিরাচরিত কাব্যধারাকে স্যান্ডবার্গ অস্বীকার করেননি। অধিকাংশ কবিতায় গীতিকাব্যের ভাবসুষমা পরিস্ফুট। সপ্রযত্ন সংগীতময়তায় কাব্যজগত আপ্লুত।

স্যান্ডবার্গের গদ্যের হাত খুবই নিপুণ। তাঁর প্রথম ২১ বৎসরের জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'অলওয়েস দি ইয়ং স্‌ট্রেঞ্জার' নামক আত্মজীবনীমূলক রচনায়। সহস্রাধিক পৃষ্ঠার উপন্যাস 'রিমেমব্রান্স রক' প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। উপনিবেশ স্থাপন থেকে গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত কাহিনীর কালসীমা। একজন সমালোচক বইটি সম্পর্কে বলেছেন—

"A measured epic of the quest for individual freedom and self-realisation".

শৈল্পিক ঋজুতাই এ-উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট নয়—বক্তব্যের সততাও উল্লেখের দাবী রাখে। অপরের মনোরঞ্জনের জন্য কাহিনীবিন্যাস নয়—আত্মতৃপ্তি আত্মপ্রকাশই এখানে মুখ্য।

গভীর দুটি নীল চোখ, অকল্পিত দৃঢ়তাব্যঞ্জক দেহসুষমা, ললাটের ওপরে ঝুলে পড়েছে মাথার কয়েকটি চুল, সুপ্রিয় সদালাপী এই অশীতিপর বৃদ্ধ মানুষটি নিতান্ত কবিজনোচিত খেয়ালের দ্বারা জীবন কাটান না। রবার্ট ফ্রস্টের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য। রসিক মানুষ স্যান্ডবার্গ বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতি ও রাজনীতি সম্পর্কে যে গভীর ও তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন তা কখনই উপেক্ষণীয় নয়।

॥ গীতিকবিতা সংকলন ॥

গ্রেগরি কোরসো এবং ওয়াল্টার হোয়েশরার সম্পাদিত 'তরুণ আমেরিকানদের গীতিকবিতা'র সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছেন কার্ল হানসার। উনচল্লিশ জন তরুণ মার্কিণ কবি এই সংকলনে স্থান পেয়েছেন। অধিকাংশ কবিতা ইতিপূর্বে বিভিন্ন জার্মাণ কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি জার্মাণ ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই একসঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে।

॥ হাইনে সংগ্রহশালা ॥

ডুসেলডর্ফের হাইনে সংগ্রহশালায় হাইনের রচিত গ্রন্থের সর্বাধিক পরিমাণ পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংগৃহীত। তাছাড়া হাইনে সম্পর্কে আলোচিত বহু তথ্যও পাওয়া যাবে এখান থেকে। এই প্রতিষ্ঠান হাইনে ইয়ারবুক নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে হাইনে সম্পর্কে আরও গভীরভাবে গবেষণা করা এবং সমস্ত অপ্রকাশিত রচনাসমূহের প্রকাশ করা। হামবুর্গের হফমান এবং কাম্পে প্রকাশিত এই ইয়ারবুকের প্রথম খণ্ড সম্পাদনা করেছেন ডঃ এবারহার্ড গালি। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মাণী এবং সুইডেনের তরুণ হাইনে-বিশেষজ্ঞের রচনা নিয়ে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

॥ শাহনামার দ্বিতীয় খণ্ড ॥

দশম শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত কবি ফিরদৌসীর মহাকাব্য শাহনামার দ্বিতীয় খণ্ডটি গত সপ্তাহে মস্কোর প্রাচ্য সাহিত্য প্রকাশালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। টীকা ভাষ্যসহ মূল পাঠ ও তার রুশ অনুবাদে ফিরদৌসীর এই মহাকাব্যটি মোট ৯টি খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হবে।

নিখিল সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের এশীয় জাতিসমূহের ভাষাতত্ত্ব গবেষকরা শাহনামার প্রাচীনতম পাঠ হতে এই সংস্করণটি তৈরী করেছেন। ১২৭৬ সালের লেখা একটি অনুলিপি হতে এই পাঠ তৈরী করা হয়েছে। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এই পাঠটি মূল পাঠের সব থেকে নিকটতম।

দাগ

অনেক মানুষেরই দাগ আছে কারও বা দেহে, কারও মনে। দেহের দাগ চোখে পড়ে, মনের দাগ থাকে অন্তরালে। কারও সে দাগ মিলয়, কারো বা মিলয় না। যে মানুষের জ্বলুনীটা বাড়াবাড়ি রকমের, সে হয় বিবাগী। আবার কারও মনের জ্বালা জুড়িয়ে কখন যে ভিজে স্যাঁত-স্যাঁতে হয়ে গেছে সে কথা হয়ত সেই জানে না।

বছর পনের আগে আমারও এমনি এক দাগ পড়েছিল। এখনও তার জের আছে কিনা তার হদিশ পাই না, তবে মনে একটা আত্মপ্রসাদ জাগে। বিশেষ করে স্ত্রী ধীরার সঙ্গে মনকষাকষি হলে সেই ক্ষতের জায়গাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করি, তারের যন্ত্রের প্রত্যেকটি পর্দায় যেন ধাক্কা দিই, একসঙ্গে একটা অপূর্ব সংগীত সারা মনটার জুড়ে বসে। তখন আর আমি আজকের এই নিরীহ ছাপোষা মানুষটি নই, আমার জীবনে তখন নানা-রঙের বৈচিত্র্য। কিন্তু জীবনের এই একমাত্র সম্পদই ছিল আমার মূলধন। সেটি খোয়ালাম কি করে তাই আজ লিখতে বসেছি।

সে বছর পুজোর ছুটিতে সস্ত্রীক বেরিয়েছিলাম ছেলেমেয়ে নিয়ে উত্তর-ভারত ঘুরতে। ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে। তাদের সামনে ঘুরেফিরে ইতিহাসের পাতা মেলে দিয়েছি; শুনিয়েছি কত রাজা-বাদশার ভাঙাগড়ার ইতিহাস। ফেরার পরে শরীর-মন দুই অবসন্ন।

রেলগাড়ীতে বসে বসেই হিসেবের অঙ্কগুলো যেন মাথার মধ্যে কিলবিল করে বেড়ায়। আমার পুজোর বোনাস আর ধীরার স্কুলের মাইনে, এ দুটো মিলে ত আর এ যাত্রা পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। ভাবি কতদিনে এই সখ করবার দেনা চুকবে।

ধীরা বলে—এমনি করেই নিজের দেশ দেখতে হবে, নইলে মুখ্যু হয়ে থাকতে হয়! ভারতবাসী হয়ে ভারতবর্ষকে জানব না?

ধীরাকে ত বুঝিয়ে হার মেনেছি যে, আমার মত মার্চেন্ট আপিসের কেরানী-বাবু যাকে পুজোর বোনাসটুকু সম্বল করে আকাশ-কুসুম রচনা করতে হয়, তার পরিবার ভারতবর্ষ আবিষ্কার না করলেও ভারতবর্ষের কিছুই এসে যায় না। যাক সে কথা।

কলকাতা ফিরছি। সেকেণ্ড-ক্লাশ কামরায়, রিজার্ভেশন নেই, দিনরাত লোক নামছে উঠছে; তারই মধ্যে একখানি বেঞ্চিতে আমাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছি।

গতরাত্তিরে একটুও ফাঁকা পাইনি। আজ ওদিকে লোক নেমে যেতে একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে সটান শুয়ে পড়ি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, বোধহয় ভোর-রাত্তির হবে। একটা কড়া ওষুধের গন্ধে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি হাঁটুমুড়ে শুয়ে আছি, পায়ের কাছে আমার ঘুমন্ত ছেলেটা। কোন ষ্টেশন জানিনে ত! টাইম-টেবলটা কই, এরাই বা সব গেল কোথায়?

মাঝের বেঞ্চে মানুষ নেই, স্তূপাকৃত মালপত্র জড়ো হয়ে সিলিঙ ছুঁই ছুঁই হয়েছে।

হতবুদ্ধি ভাবটা কাটে চুড়ির টুং-টাঙ আওয়াজে।

দেখি বাথরুমের গোড়ায় একটা বেডিংয়ের ওপর বসে ধীরা একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে।

বলে—বাপরে বাপ, কী ঘুমের ঘটা। ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও হুঁশ হবে না, ধন্যি ঘুম যাহোক! ছেলেটাকে শুইয়ে সত্যি ভরসা হচ্ছিল না, ভাব-ছিলাম কখন না জানি লাথি মেরে ফেলে দাও।

লজ্জিত হয়ে বলি—সত্যি কি আশ্চর্য, ডাকনি কেন বল ত? রুণু কোথায়, কার বেডিংয়ে বসেছ? কামরাটাই বা কারা এমন করে গুদোম করলে? ডেটলের গন্ধ কোত্থেকে আসছে?

সামনের বেঞ্চিতে কেবিন ট্রাঙ্কটি আবিষ্কার করে সত্যি হৃৎকম্প হয়। লাগেজ ভ্যানে না গিয়ে কারা ভুল করে এটিকে টেনে তুলল এখানে?

মাঝরাত্তিরে ধীরাকে না জানি কত দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে। ছেলেমেয়েকে এধার ওধার করে শুইয়েছে আর নিজে ঠায় বসে আছে বেডিংয়ের ওপর। কেন, আমায় ডাকলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত? নেশাভাঙ ত আর করিনি? নাহয় একটু বেশীই ঘুমিয়েছি। তাই বলে কি আর স্ত্রীপুত্রের অভিভাবকত্ব লোকে এমনি করে অস্বীকার করে?

অপ্রস্তুত ভাব কেটে বেশ রেগে উঠেছি তা টের পেয়েই বোধহয় ধীরা উঠে আসে। তোলা উনুন, মাদুর-ঝাঁটা, পোঁটলা-পুঁটলি ডিঙিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দেই ধীরা উঠে আসে। বালতিটা এতক্ষণে আমি নিজে হাতেই সরিয়ে দিই যাতে ও সহজেই আসতে পারে। একটু আওয়াজ হতে ও শাসন করে—

—চুপচাপ, আওয়াজ করো না। মানুষটা কত কষ্টে ঘুমিয়েছেন!

কার ঘুমের জন্য আমার স্ত্রী এত উৎকণ্ঠিত ভেবে বিস্মিত হই।

এতক্ষণে চোখে পড়ে ফাঁক আছে, বদ্যিনাথের ঝুড়ির ওপাশে বেঞ্চের নিচে সুন্দর এক জোড়া জরির মেয়েলি স্লিপার। একটা দস্তানাপরা হাত আলতো হয়ে ঝুলে পড়েছে মেঝে অবধি।

মেঝেয় বসে দাসী দামী কাশ্মীরী শাল জড়ান একটি বিশাল বপুর গায়ে পায়ে হাত বুলোচ্ছে। একটা মগ থেকে ডেটলের তীব্র গন্ধে কামরাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

আবহাওয়াটা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই যেন বেমালুম পালটে গেছে। এতক্ষণ কতলোকই ত ওঠানামা করেছে, দূরে পথের যাত্রী আমাদের বরাতগুণে এ কামরায় তেমন ওঠেনি। মাঝে মাঝে ভিড় পাতলা হলে আমরা পরিবারের সবাই বেশ হাত-পা ছড়িয়ে নিয়েছি।

ধীরা তখন এটা ওদিকে ওটা সেদিকে সরিয়ে গুছোবে, যেন ওর নিজের ঘরখানা প্রাণভরে গুছোচ্ছে। বড় বড় জংশন স্টেশনে লোক ডেকে কামরা, বাথরুম সাফাই করবে। আমাকে বলবার অবসর না দিয়েই আপন মনে বকবক করবে—

—নাই বা হল নিজের বাড়ী, তাই বলে এতখানি পথ কি আস্তাকুঁড়ে পড়ে থাকতে হবে?

এতক্ষণে ধীরা রাতের সব বৃত্তান্ত বলে—

—ওগো দেখ না এই ট্রাঙ্কটা। আমি ত বাপু বাপের জন্মে এত বড় বাক্স দেখিনি। তিনজন কুলি ত এটাকে তুলতে হিমশিম খেয়ে গেছে। আর দুজন তুলেছে এই এতগুলো বেডিং। বাকী আর কজন মিলে এই সব টিনের বাক্স, সুটকেস, বালতি, তোলা উনুন, ইকমিক কুকার আর সব টুকিটাকি।

—জিনিসের লিস্ট জানতে চাইনে কিন্তু বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে। এত মাল তুলতে কেন দিলে প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে? মালগাড়ী নাকি এটা?

—আঃ চুপচাপ। অত জোর চেঁচিও না। মায়াদয়া একটুও নেই নাকি শরীরে? একটা রোগীর সঙ্গে কি আর লড়াই চলে! ঐ ত ওপাশের বোঁচকাটা ওঁকে ছেড়ে দিয়েছি। দুটো কুলি ত ওকে তুলতে হিমশিম খেয়ে গেছে। দেহ ত নয় যেন পাহাড়। হাঁকপাঁক করছে প্রাণটা।

কথায় কথায় গলাটা চড়ে গিয়েছিল, হঠাৎ যেন ধীরার হুঁশ হয়। ছি ছি যদি শুনতে পান। গলাটা যতদূর পারে খাটো করে আমার কানের কাছে ফিস-ফিসেয়ে বলে সে—

—এমন রোগী মানুষ, মাঝরাতে স্টেশন থেকে উঠেছেন একটা ঝি নিয়ে, তাও ত তার থার্ড ক্লাশের টিকিট, আমিই ত টিকিট-কালেকটরকে বলেকয়ে ঝিটাকে এ গাড়ীতে রেখে দিলাম। কে সামলাবে বাপু রাইগার উঠলে?

স্ত্রীর তৎপরতায় মুগ্ধ না হয়ে পারি না। তবে এর যে দেখছি সহ-যাত্রিনীর রোগের আদ্যোপান্ত ইতিহাস জানা হয়ে গেছে।

ধীরার মত গলা করে আমি বলি—

—সেবা আমিও একটু-আধটু না পারি এমন নয় তবে সেটা রোগিণীর বয়স দেখে।

—থাক থাক আর রসিকতা করতে হবে না। বয়স এঁর কম নয়, তা বলে চল্লিশের ওপারেও নয়, এখন অমন বেখাপ্পা হয়ে গেলে কি হবে, এককালে সত্যিই যে খুব সুন্দরী ছিলেন তা ঐ ঢলঢলে মুখখানা দেখলেই বোঝা যায়। বিহারে ওঁর একটি নিজস্ব আস্তানায় যান হাওয়া বদলাতে। স্বামী মস্ত ব্যবসা করেন। যখন-তখন ত আর তাঁর হুট করে যাওয়া চলে না।

—রোগটা কী?

—নানান রোগ রক্তশূন্যতা নিউ-রেলজিয়া, হাঁপের কষ্ট, এর ওপর আবার যখন-তখন রাইগার, শরীরের ওপর এতটুকু জোর নেই।

এহেন রোগিণীকে মেয়ে হয়ে বেঞ্চি ছেড়ে দেওয়া আর তেমন বেশী কী? তা বটে। এরপর এ প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়।

ভোর হয়ে আসছে—পুবের আকাশে এক মুঠো আবির যেন ছড়িয়ে পড়েছে।

এতক্ষণে আমরা বাঙলাদেশের ওপর এসে পড়েছি। দেখা যায় দুদিকে শ্যামলা মাঠ এঁদো ডোবা আর ভাঙা কুঁড়েঘর এধার-ওধার চোখে পড়ে।

ট্রেন এসে থামল একটি স্টেশনে, চায়ের যোগাড় করে সবে কামরাতে

ঢুকেছি, হঠাৎ শুনি ওপাশের বেঞ্চ থেকে কে যেন আমাকেই বলছে—

—মনতোষ, চিনতে পার ?

ঘরের মধ্যে যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল। নিজের চোখ কান দুই বেচাল হয়ে গেছে। তাল তাল চর্বির স্তূপের ভেতর এক জোড়া তীক্ষ্ন চোখে সেবা চ্যাটার্জি জানতে চাইছে আমি তাকে চিনি কিনা।

তাই বলছিলাম মনের মধ্যে যে মূলধনটুকু এই দীর্ঘকাল সঞ্চয় করে রেখেছিলাম কৃপণের মত, অতর্কিতে সেই সম্পদ হারিয়েছি এক অপমৃত্যুর মাঝে, কে চিনবে আজকের এই স্থূলাঙ্গিণীকে ? উদ্ধত, বেপরোয়া ধারাল তলোয়ারের মত যে মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বছর এবং তারপর আরও বেশ কিছুকাল আমাকে এক চুম্বকটানে টেনেছে, সে কি আজকের এই বীভৎসতা দেখাবে বলে ? আমি জানি সেই সেবা চ্যাটার্জিকে যার কাছাকাছি ঘুরেই সমুদ্রের স্বপ্ন দেখেছি, অন্তরঙ্গ হবার গভীর বাসনা নিয়ে যন্ত্রণায় মাথা খুঁড়ে মরেছি। শেষ পর্যন্ত তার হৃদয়ের গভীর অতলে ডুবতে না পেরে বৈরাগী হবার চেষ্টা করেছি।

আমার হতভম্ব ভাব দেখে ধীরা বলে—

—চেন নাকি একে ?

নিঃশ্বাস চেপে ওর নাম বলি।

এখন বোধহয় ধীরার বিস্মিত হবার পালা আসে। কারণে অকারণে কতবার এ নামটা সে শুনেছে আমার প্রথম জীবনে ব্যর্থতার এক করুণ কাহিনীকে কেন্দ্র করে।

সেই নীহারিকার কাছে ধীরা যে কিছুই নয়, নেহাতই শাদামাটা বৈশিষ্ট্য-হীন বাঙালী মেয়ে, একথা তাকে না শুনিয়েছি এমন নয়। কিন্তু সে কি এমন করে পরাজিত হব বলে ?

মৃদু গলায় ধীরাই বলে—যাও না অমন চুপচাপ বসে আছ কেন ? কতদিনের পরিচয়, দুটো গল্পও ত করতে পার !

উঠে কাছে গিয়ে টুকটাক মামুলি কথা বলার চেষ্টা করি। কিন্তু এ যে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক নারী। শরীরের এখানে ওখানে তাল তাল মাংস যেমন ইচ্ছে সেঁটে বসেছে। মাথার মাঝ-খানটায় টাকপড়া জায়গা জুড়ে সিঁদুরের চওড়া সড়ক, তার ওপর ঘাড় চেঁছে বব ছাঁটা। দক্ষিণ ভারতীয় দামী সিল্ক আর দামী কাশ্মিরী শালে বিরাট জড়পিণ্ডটা কোন রকমে আচ্ছাদন রক্ষা করছে, কিন্তু একজোড়া মরা চোখ স্পষ্টই বলে দেয়—দেহমনে সেবা চ্যাটার্জির অপমৃত্যু ঘটেছে।

—অমন অবাক হয়ে দেখছ কি মনতোষ ? ঝিকে সরিয়ে বালিশে ভর দিয়ে একটু আড় হয়ে বসে ও বলে—

তারপর মনতোষ, খবর সব কী বল ? কোথায় চাকরি কর ? বিয়েই বা কবে করলে ? ভারী ভাল তোমার বউটি। শরীরে কি মায়াদয়া, কত সহজেই মানুষকে আপন করতে জানে, তোমাকে ত দেখছি নড়ে বসতে দেয় না। খুব ভাগ্য করে জন্মেছিলে বটে !

শুনে লজ্জা পাই, কাল সারারাত স্ত্রী বোর্ডিংয়ে বসে এসেছে অথচ আমি দিব্যি ঘুমিয়ে এসেছি, এই ইঙ্গিত কি কথায় কথায় প্রকাশ পাচ্ছে না ?

প্রসঙ্গটা পালটে দেবার জন্য বলি—

—তা এত লটবহর নিয়ে দুজন মানুষের একা একা কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?

—লটবহর আর কী ? এই বাক্সটার কথা বলছ ? এত আমার স্বামীর, একপ্রস্থ জামাকাপড় ভরে যতবার বেড়াতে যাই, সঙ্গে করে নিয়ে যাই কী জানি যদি এসে পড়েন, তখন কত কী দরকার হতে পারে ত ! যা ব্যস্তবাগীশ মানুষ, হাতের কাছে মনোমত জিনিস না পেলে হৈচৈ শুরু করবেন। —একটু থেমে সেবা আবার বলে, এবারেও তাঁর যাবার ফুরসত হয়নি ! অথচ, দেখ এত সব বাক্স-তোরঙ্গ তাঁরই জন্য টেনে নিয়ে যাওয়া।

মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠি—এই ট্রাঙ্কে যা আছে তার চেয়েও অনেক গুণ বেশী জামাকাপড় হয়তো যাঁর বাড়ীতে সাজান আছে, তিনি না জানি কি বিরাট পুরুষ।

—এত করেও তোমার বউটির মত সহজে কাউকে আপনার করতে পারলাম না মনতোষ। বলে নিঃশ্বাস ছাড়ল সেবা।

প্রায় পনের বছর পর দেখা—সেবা গিয়েছিল মনের তলায় হারিয়ে। তবু যদিই বা দেখা হ'ল ত সে সারাক্ষণ শুধু তার স্বামী-কাহিনীই ইনিয়ে-বিনিয়ে শুনিয়ে গেল।

এক বেপরোয়া বিরাট স্বামী—যেমন তার বুকের ছাতি, তেমনি তার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। সে কি আমাদের মত সস্তার মানুষ যাকে সহজেই আপনার করা যায় ?

নিজের কথা আপন মনেই বলছিল সেবা, কারও শোনার আগ্রহের অপেক্ষা না করে। আড়চোখে চেয়ে দেখি একাগ্র হয়ে

ধীরা ওর কথা শুনছে আর ওর চোখের তারা যেন জ্বলছে।

দস্তানাটা মেজেয় পড়ে যেতে ঝি কুড়িয়ে আবার সেটি পরিয়ে দিল। বিশ্রী পোড়া হাতখানার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেবা বলে—পোড়া হাতখানা অমন করে দেখছ কি মনতোষ? ও ত আমার কপালেরই ছবি!

তারপর তার নাকের পাটা কাঁপতে থাকে আর কাঁপতে থাকে তার ভারী শরীরটা।

—ওমা একটু ধর ধর।

ঝিয়ের অস্ফুট চীৎকারে ছুটে আসে ধীরা, আমাকে প্রায় ঠেলা দিয়ে সরিয়ে মাথাটা নিজের কোলের ওপর টেনে নিয়ে হাওয়া করতে থাকে। মুখে চোখে জলের ছিটে, ওষুধের বড়ি খাওয়ান ইত্যাদি নানান প্রক্রিয়ার পর রোগিণী বোধহয় একটু সুস্থ বোধ করে।

তখন তার গলা যেন বিরক্তিতে ফেটে পড়ে।

—জ্বলে মলাম বাপু জ্বলে মলাম, এ জ্বলুনির আর শেষ নেই।

আমি আমার নিজের বেঞ্চিতে এসে বসেছি। ছেলেমেয়ে দুটো কেমন ঘাবড়ে গিয়ে আমার গায়ে গা ঠেকিয়ে বসেছে। জানালার বাইরে ওদের দৃষ্টি সরিয়ে কি একটা গল্প বলার চেষ্টা করি। কিন্তু কানে আসে ওদিকের কথাবার্তা।

—গোকুলের মা, তুমি আমাকে ওষুধ দেবার আগে হাতটা ভাল করে ডেটল জলে ধুয়েছিলে ত? কি চুপ করে আছ কেন? তার মানে ধোওনি। আঃ কিছুতেই কি কাজ শিখবে না? আর তোমার নামটি কি ভাই—ধীরা। আমার মাথায় হাত দেবার আগে হাতটা তুমিও ত একটু ডেটল জলে ধুলে পারতে!

বিস্মিত ধীরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বসে থাকে। তারপর কখন এসে সে আমাদের পাশে বসেছে টের পাইনি। চারজনে মিলে আমরা গল্প জুড়েছি আরব্যোপন্যাসের পাতা মেলে। সারা কামরায় আর যে কেউ আছে, কোথাও কোন স্মৃতির ভগ্নাংশ পড়ে আছে তার হুঁশ মাত্র নেই। শুধু ডেটলের গন্ধটা নাকে আসে বারবার।

তারপর এক সময় হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেন থামে। মালপত্র ছেলেমেয়ে নিয়ে আমরা নেমে পড়েছি। কুলীর মাথায় জিনিস চাপিয়ে বেরিয়ে যাব ঠিক করছি, পাঞ্জাবির পকেট ধরে টান দেয় ধীরা।

আশ্চর্য মানুষ, যাবার আগে একবার দেখা করে গেলে না? আর কই, ভদ্রমহিলার স্বামী কি বাড়ীর লোকজনও ত কেউ এল না, রুগ্ন মানুষ আর এত

"চেন নাকি এঁকে?"

মাল! বলছিলেন রওনা হবার আগে জরুরী তার করেছেন বাড়ীতে।

কাছে যেতে দেখি কাঁদ কাঁদ মুখ করে বসে আছে সেবা। মাথার ঘোমটা খোলা, বব্‌কাটা কাঁচা পাকা চুলের মাঝখানে চওড়া সিঁদুরের সড়ক। হাতের দস্তানা খুলে পোড়া হাতখানায় মুঠো পাকাচ্ছে আর খুলছে। আমাকে সামনে দেখে বলল,—দেখ দিকি মনতোষ, এমন করে মানুষ মানুষকে হেনস্তা করে, জরুরী তার করলাম তবু!

মাথা চুলকিয়ে বলি—তাইত, আমি না হয় এগিয়ে গিয়ে দেখি।

কুলীরা মাল নিয়ে চলতে শুরু করেছে। ধীরাও কেমন অনিচ্ছুক পায়ে তাদের পেছন পেছন চলেছে। ছেলেমেয়ের হাত ধরে আমিও ওদের অনুসরণ করি। রেলওয়ে টিকিট-কালেক্টার একজনকে বলি—ঐ গাড়ীর রুগ্ন ভদ্রমহিলাকে কুলী মারফত ট্যাক্সিতে চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন দয়া করে। যা লাগে উনিই দেবেন, সেজন্য ভাববেন না।

ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে ধীরা বলে—এদের নিয়ে আমি নিজেই যেতে পারি। সে পারে না তাকে একটু সাহায্য করলে ক্ষতি কী? মুখ ফিরিয়ে কথা বলছিল ধীরা, তাই ওর চাওনিটা চোখে পড়ল না।

তার কথায় কান না দিয়ে আমিও উঠে পড়ে গাড়ীর দরজাটা সশব্দে এঁটে দিলাম।

সেই বন্ধ দরজার শব্দটা এখনো আমার মনে পড়ে।

বাংলায় ইংরাজী Notes and Queries -এর ন্যায় কোন সাময়িক পত্র নাই, ইহাতে যাঁহারা গবেষণা করেন তাঁহাদের বহু অসুবিধা হয়। অনেক তথ্য নজরে আসে যাহা আমার কোনও কাজে আসিবে না; কিন্তু সেই সব তথ্য যাঁহার দরকার তাঁহার গোচরে আসিলে গবেষণার বা প্রবন্ধ রচনার কাজে আসিবে। আমাদের বক্তব্য আমরা দুই-চারিটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

(১) আমার এক ভাগিনেয় উড়িষ্যার সম্বলপুরে জন্মগ্রহণ করে। তাহার ঠিকুজী-কুষ্ঠি এক উড়িয়া পণ্ডিত করিয়া দেন। উড়িষ্যা ভাষায় তাহাতে লেখা আছে : ১৮—শকাব্দে (পুরীর) রাজা (রামচন্দ্রের) ৬ রাজ্যাঙ্কে অমুক মাসের অমুক দিন ইত্যাদিতে এই বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে যে, শকাব্দের সহিত পুরীর রাজার রাজ্যাঙ্কের উল্লেখ কেন তাঁহারা করেন? এককালে উড়িষ্যার গজপতিদের প্রতাপ ও প্রভাব খুব বেশী ছিল—পুরীর রাজার গজপতিদের সহিত সম্বন্ধ কি? সম্বলপুরও কি উড়িষ্যা-কৃষ্টির প্রভাবে প্রভাবান্বিত? ধরুন, প্রশ্ন হইতেছে যে, সম্বলপুর গজপতিদের শাসনভুক্ত ছিল কি? এই প্রথা দেখিয়া মনে হয় ছিল, এবং বহুদিন ছিল।

(২) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা হয়—বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বংশের কুলাচার অনুযায়ী মূর্তি বিভিন্ন রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। কত রকমের মূর্তি আপনি দেখিয়াছেন? কলিকাতায় হাটখোলা দত্ত-বাটীর মূর্তি তিনটি ফোকরের ভিতর স্থাপিত; চালচিত্র নাই—ইহার একটি ছবি কয়েক বৎসর আগে শারদীয় যুগান্তরে বাহির হইয়াছিল। এইরূপ তিন-ফোকরে স্থাপিত মূর্তি কদাচিৎ দেখা যায়। বান্ডুলীর (বর্ধমান জেলার দাঁইহাটের নিকট) মিত্র-বাটীতে মা-দুর্গার 'মুলো-গোঁজা হাত'—অর্থাৎ দুই হাত বেশ বড় যাহা দ্বারা মা মহিষাসুরকে বধ করিতেছেন, বাকী ৮টি হাত মায়ের চুলে প্রায় ঢাকা পড়িয়াছে, আর ছোট কোট—পাল মহাশয়দের বাড়ীতে শিব-দুর্গা বৃষে চাড়িয়া আছেন, পাশে লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি। মুঙ্গেরে মেথরদের দুর্গা প্রতিমা হইতেছেন, ফিকা নীল বর্ণের কালি ঠাকুর, পাশে লক্ষ্মী সরস্বতী। কার্তিক গণেশ নাই। সম্বলপুরে ময়ূরের ন্যায় পাখীতে-চড়া দুই হাত বিশিষ্ট হরিদ্রা রংয়ের ভুবনেশ্বরী মূর্তি—তিন দিন পূজা হয়, ভাসান হয়। জব্বলপুর শহরে এক ছে-মাথায় পাথরের তারা মূর্তি আছে, কেবল অষ্টমী ও নবমীতে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া এই মূর্তিতে দুর্গোৎসব করা হয়। ইহার তাৎপর্য বুঝি নাই, প্রশ্ন করি নাই—কেবল দেখিয়াছি মাত্র। কোথায় কোথায় মা-দুর্গার রং কমলা লেবুর রং, বেশীর ভাগ দুর্গা মূর্তির রং কাঁচা হলুদের রং। কেন এই পার্থক্য?

> আমাদের চারপাশে এমন অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যা বিস্ময়ের ত বটেই অনুসন্ধিৎসারও উপাদান হয়ে দাঁড়ায় সময় সময়। পাঠকদের পক্ষ থেকে যে কোন রকম অনুসন্ধিৎসা-পত্র এই বিভাগে প্রকাশিত হবে এবং উপযুক্ত উত্তর পেলে তাও উত্তরদাতার নাম ঠিকানাসমেত প্রকাশ করা হবে।
>
> সম্পাদক—অমৃত

কালিয়ার অরবিন্দ বৈসাদের মধ্যে কমলা লেবু রংয়ের দেবী প্রতিমা হয় বলিয়া শুনিয়াছি।

(৩) মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি, পাঁচথুপী প্রভৃতি স্থানে পাকা দো-তলা বাড়ীর সিঁড়ির একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। ছোট ছোট পাতার ৩টি সিঁড়ি উঠিলে একবার সমকোণ পরিমাণ ঘুরিতে হইবে, আবার ৩টি উঠিতে ৪।৫ বার ঘুরিতে হইবে। সিঁড়ি খুব সরু ও অন্ধকার। পুরানো বাড়ীতে ত বটেই, অনেক নূতন বাড়িতে (৫০।৬০ বৎসর আগে তৈয়ারী) এই প্রকারের সিঁড়ি। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলাম যে, এই অঞ্চলে বর্গীর হাঙ্গামার সময় হইতে এইরূপ সিঁড়ি করার প্রথা চালু হইয়াছে। বর্গীরা সাধারণত বর্শা হাতে আক্রমণ করিত—সরু সিঁড়ি দিয়া উঠিতে গেলে বর্শা খাড়া করিয়া উঠিতে হইবে, এই অবস্থায় সহজেই তাহাদের আক্রমণ করা যায়। বর্গীর হাঙ্গামা শেষ হইয়াছে ইং ১৭৫০ সালে; অথচ এই-ভাবের সিঁড়ি তৈয়ারী হইয়াছে ইং ১৯১০ অবধি; এখনও হয় তবে কম পরিমাণে। স্বর্গীয় বিমলচন্দ্র সিংহদের পুরানো বাড়ীর সিঁড়ি এই প্রকারের; আন্দাজ ইং ১৯২৫ সালে যে নূতন সিঁড়ি হইয়াছে, তাহা চওড়ায় বড় হইলেও এই প্রকারের। আন্দাজ ইং ১৯৪০ সালে যে নূতন বাড়ী হইয়াছে তাহার সিঁড়ি একালের প্রথা অনুযায়ী। পাঁচথুপী, রষোড়া প্রভৃতি স্থানেও এই-রূপ দেখিয়াছি।

(৪) কলিকাতা ও তাহার আশে-পাশে পুরাতন জমিদার ও বড়লোকের বাড়িতে দরজার কাঠের কাজ ও চৌকাঠ খোদাই করা দেখিয়াছি ও ধোঁয়া দিয়া কালো করা। খোদাই করা ছবি বেশীর ভাগই ফুলের ও জ্যামিতির প্যাটার্ণের। কাঠে রং দেওয়া হইত না। আমাদের যদি একটি তারিখ দিতে বলা হয়, তাহা হইলে বলিব যে, ইং ১৮২৫ সাল অবধি এই প্রকার কাঠের উপর খোদাই করা বাজু ও চৌকাট লাগান রেওয়াজ ছিল। অবশ্য আমরা অনুসন্ধান করিয়া এই তারিখ দিতেছি না। আন্দাজ ইং ১৭৭৫ সালে পানিহাটীর চৌধুরী-বাবুরা (জমিদার) সাতমহল বাড়ী তৈয়ারী করান, তাঁহাদের বাড়ীতে খোদাই করা কাঠের চৌকাট—কলিকাতার ছাতুবাবুর বাড়ীতেও এই প্রকারের চৌকাট ছিল—ইহা আন্দাজ ইং ১৭৯০ সালে তৈয়ারী। পানিহাটীর আনন্দ মুখোপাধ্যায় ১০৮ ঢাক বাজাইয়া দুর্গা পূজা করেন—ইঁহারা বড়লোক হইলেও তাদৃশ বড়লোক ছিলেন না। তাঁহার মা কানে কম শুনিতেন, পরে কালা হইয়া যান—একবার আনন্দবাবুকে তিনি বলেন, 'আনন্দ! এবার কি টাকা কম হইয়াছে যে, ঢাকের সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছ? আমি ত অন্দর থেকে ঢাকের আওয়াজ শুনিতে পাইতেছি না।' এই জন্য আনন্দ-বাবু মাকে ঢাকের আওয়াজ শুনাইবার জন্য ১০৮ ঢাকের ব্যবস্থা করেন। ইঁহার অভ্যুত্থান আন্দাজ ইং ১৮৫৪ সাল। ইঁহাদের বাড়ীতেও খোদাই করা কাঠের বাজু ও চৌকাট ছিল।

আমাদের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। আমাদের মতে ইং ১৮২৫ সাল অবধি এই রেওয়াজ ছিল, তাহার পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়াছে।

(৫) হিন্দুরা পুষ্করিণী, দীঘি, সাগর ইত্যাদি কাটাইলে ইহা উত্তর দক্ষিণে লম্বা হয়। এইরূপে হইবার শাস্ত্রীয় কোন বিধি আছে বলিয়া অবগত নই; অনেক সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কোনও সদুত্তর পাই নাই।

এইরূপে কাটিবার কারণ সম্বন্ধে মনে হয়, আমাদের দেশে সূর্য্য সাধারণত দক্ষিণ দিকে হেলিয়া থাকেন, গ্রীষ্মকালে মাথার উপরে আসেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে গাছ লাগাইলে ছায়া পড়িয়া জল শীতল থাকে।

মুসলমানেরা কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা করিয়া দীর্ঘি, পুষ্করিণী কাটান। এইরূপে করিবার হেতু কি? আরব দেশে পুষ্করিণী ইত্যাদি কাটাইবার সুবিধা নাই, সুতরাং এ বিষয়ে কোনও হদিস থাকিতে পারে না। দুই একজন পরিচিত সামস্-উল-উলেমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—উত্তর পাই নাই। ইহা কি হিন্দুদের হইতে নিজেদের পৃথক দেখাইবার প্রয়াস, না নমাজের সময় বাংলা দেশে তাঁহারা মক্কার দিকে (পশ্চিম দিকে) মুখ রাখিয়া নমাজ করেন বলিয়া, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা পুষ্করিণী কাটান।

(৬) কুলুপ ও তালার প্রভেদ কি?

(৭) ঠাকুর দালানের অর্ধ-বৃত্তাকার খিলান দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। এক ছিটাস খিলান—ইট মাটির সমান্তরাল হইতে আস্তে আস্তে বাঁকিয়া খিলানের মাথায় খাড়া হইয়া আবার মাটির সমান্তরাল হইয়াছে। আর ইট এমনভাবে সাজান যে ইটের সারি ইংরাজী ডি-এর মতন—সাজাইবার কায়দায় অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি খিলান হইয়াছে। শুনা যায় আগে প্রথমোক্ত চামচিকা খিলান এদেশে ছিল না, ইংরাজদের বা ফরাসীদের আগমনের সহিত আসিয়াছে। শেষোক্ত প্রকারের খিলান আমাদের নিজস্ব। পল্লী গ্রামে ২।৩টি শেষোক্ত প্রকার খিলান অনুসন্ধানে ২০০ বা ২৫০ বছরের পুরাতন বলিয়া মনে হয়। চামচিকা খিলান ২০০ বছরের মধ্যে তৈয়ারী। আমাদের শোনা কথা কি ঠিক?

যতীন্দ্রমোহন দত্ত
৪৫, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড
কলকাতা।

আঁতপাঁচ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

॥ লেখকদের নিয়ে গল্প ॥

লেখকদের লেখা যেমন আমাদের ভাল লাগে, তেমনি লেখকদের নিয়ে গল্পও আমাদের কৌতূহল আর আনন্দের খোরাক। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রকে ঘরোয়া গল্পের মাধ্যমে যখন পাই, তখন অমন দুজন যুগন্ধর প্রতিভাকেও কত সহজ আর আপনার মনে হয়। আর বলতে গেলে যে সাহিত্যিক আর শিল্পীকে আমরা রচনা পড়ে চিনি, তাকে পেতে চাই আপনার মানুষ হিসাবে। তাই তাঁদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে যদি অন্তরঙ্গ কোন গল্পের শ্রোতা হবার সুযোগ পাই, তখন আমরা মুগ্ধ হই। তাই এখানে বিদেশী দুই সাহিত্যিক-শিল্পী নিয়ে গল্প সংকলিত করা হল এই উদ্দেশ্যেই।

প্রথমেই বলি মার্ক টোয়েনের একটি কীর্তির কথা। মার্ক টোয়েন একদিন আঙ্কল টমস কেবিনের স্রষ্টা হ্যারিয়েট বীচার স্টোইর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন। লেখক মানুষদের পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর খেয়াল বলে বস্তুটি থাকে না, অতএব মার্ক টোয়েনও ব্যতিক্রম নন। পোশাক ও'র সবই ঠিক ছিল কিন্তু টাইটা গলায় ঝোলেনি। গিন্নীরা কর্তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সদা-সতর্ক, তাই মার্ক টোয়েন বাড়ি ফিরতেই মিসেস মার্ক টোয়েন দেখলেন যে মার্ক টোয়েনের এই গলবন্ধহীন হাস্যকর অবস্থাটা।

তারপর? কিছুক্ষণ পরে মিসেস স্টোইর কাছে একটি পত্রবাহক এল একটি প্যাকেট নিয়ে। কি ব্যাপার, কিসের প্যাকেট? প্যাকেটের ভেতর একটি কালো সিল্কের নেকটাই আর সঙ্গে তাতে লেখা—'হাঁ মাদাম, এটা একটা নেকটাই। এটা বার করে এর দিকে তাকান। আজ সকালে আপনাদের সঙ্গে এই নেকটাইবিহীন অবস্থায় আমি আধ ঘণ্টাটাক কাটিয়েছি। অতএব আধঘণ্টা ধরে এটি পর্যবেক্ষণ করে দয়া করে ফেরত দেবেন, কারণ এই একটা মাত্রই আমার নেকটাই আছে—ভবদীয় মার্ক টোয়েন।'

* * *

হাঁ, ইনি চার্লস চ্যাপলিন, বিশ্বের অন্যতম একজন সেরা শিল্পী। এঁকে নিয়েই এই গল্পটি। গল্পটির নাম দেওয়া যেতে পারে একটি মাছি বনাম চ্যাপলিন। 'গ্রেট ডিক্টেটরে'র হিটলার বনাম শিল্পী চ্যাপলিনের যুদ্ধের মতই এটি একটি যুদ্ধের গল্প।

ছবি নিয়েই কি একটা কনফারেন্সে গেছেন চ্যাপলিন। একটা মাছি ভনভন করে বিরক্ত করছেই ত' করছে। মহা জ্বালাতন! কয়েকবার চাপড় মেরেও বাগে আনতে পারলেন না ওটাকে। হতাশ হয়ে চার্লি একটা লাঠি আনলেন। কথাবার্তা চলতে লাগল, চার্লি কথাবার্তা বলতে বলতেই আড়চোখে মাছিটার দিকে চেয়ে রইলেন। তিন তিনবার লাঠি ছুঁড়লেন চার্লি, কিন্তু তা ব্যর্থ হল। পাখা নেড়ে ভেংচি কেটে মাছি উড়ে গেল।

অবশেষে মাছিটা চার্লির ঠিক সামনে টেবিলটার ওপর বসল, চার্লি মাছিটার মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে, খুব সাবধানে চার্লি লাঠিটা তুললেন। তারপর শেষ আঘাত করবার পূর্ব মুহূর্তেই ইচ্ছা করে অস্ত্র নামিয়ে নিলেন চার্লি আর মাছিটাকে উড়ে পালাতে সুযোগ করে দিলেন।

একজন বলে উঠল, 'একি, ওটাকে নিকেশ করলেন না যে?'

ভবঘুরে চার্লি তাঁর বিশ্বপরিচিত ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'দূর, ওটা সেই আগেকার মাছিটা নয়।'

ওপরের গল্প দুটো ত' বটেই, লেখক আর শিল্পীদের নিয়ে এমনি নানা গল্প কিছু কিছু আমরা সকলেই জানি। এই সব গল্পগুলো শুনলে মনে হয় পৃথিবীর সেরা শিল্পী সাহিত্যিক মাত্রই এক একজন পরম রসিকপুরুষ, আমাদের বিধাতাপুরুষের মতই।

প্রমাণ, সবচেয়ে বড় প্রমাণ ত আমাদের বিশ্বকবিই!

আউট প্রসঙ্গে

প্রবীর আচার্য

প্রেস গ্যালারি থেকে কি দেখা গেছে দর্শকদের তা জানবার বিষয় নয়। আম্পায়ারের আকাশমুখী আঙ্গুলই খেলোয়াড়কে তাঁবুতে ফিরিয়ে দেয়। সংবাদপত্রের ক্রীড়াসাংবাদিকগণ আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা পরদিন তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। তা তাঁরা করুন। আপত্তি নেই।

শিরোনামাই বলে দিচ্ছে আমাদের আলোচনা উট প্রসঙ্গে নয়। 'আউট' প্রসঙ্গে। 'আউট' আমাদের বর্তমান জীবনে নিত্যসাথী। কাজেকর্মে, ইস্কুলে-কলেজে, ট্রামে-বাসে সর্বত্রই আজ 'আউটে'র প্রভাব। এড়িয়ে যেতে চাইলেও আজ আর 'আউট'কে এড়ান সম্ভব নয়।

সংবাদপত্রের কল্যাণে আজ 'আউটে'র প্রভাব অপ্রতিহত। তাই 'আউট'কে সংবাদপত্রপালিত বলা যায়। কেউ যদি তাকে মুখপালিত বলেন তাতেও আমার আপত্তি নেই। কারণ, যখন রেডিওর কাছে রীতিমত ভিড় জমিয়ে কান দুটো সজাগ রেখে ধারাবিবরণী শুনি তখন প্রায়ই শুনতে হয় 'ভিজ্জি'র জড়ান গলায় 'ও……হি ইজ 'আউট' কিংবা অজয় বসুর সুন্দর স্পষ্ট উচ্চারণে—'এইমাত্র ভারতের একজন পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটস্‌ম্যান 'আউট' হয়ে তাঁবুতে ফিরে গেলেন।'

ক্রিকেট খেলা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। 'আউট' যে কত রকমে আজ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সেই সম্বন্ধেই বলছিলাম। আর 'আউট'ও কি এক রকমের! সে যেন যার যার বিয়ে করে (অবশ্য একাধিক বিয়ে আদালতের মত ছাড়া হবার উপায় নেই) পদবী পাল্টিয়ে নতুন বউ-এর মত আমাদের ঘরে আসে। সব থেকে আশ্চর্য এদিকে কেউ নজরও দেন না।

'অল আউট' হয়েও দুশো রাণ হয় না। বহুকষ্টে এড়াতে হয় ফলো অনের বেইজ্জতি। দর্শকদের দোষ দেওয়া যায় না। তাঁরা তো ব্রাইট ক্রিকেট দাবি করবেনই।

আবার বাৎসরিক মুনাফা ক্রমাগত বৃদ্ধি হ'লে শ্রমিকরা তো ন্যায়সঙ্গতভাবেই বোনাস দাবি করবেন। আর তার ফলে মালিক করবেন 'লকআউট'। সংবাদপত্রের কল্যাণে বড় হরফে 'আউটে'র সংবাদ আপনার ঘরে গিয়ে পৌঁছাবে।

একটু আগে যা বলছিলাম। 'আউট'কে অনেকে মুখপালিত বলতে পারেন। কারণ ধারাবিবরণী দিতে দিতে অজয়বাবুরা চিৎকার করেন কেউ 'আউট' হ'লে। চিৎকার করার অধিকার নিশ্চয়ই তাঁদের আছে এবং থাকবে। তেমনি মালিকেরা কারখানায় 'লকআউট' ঘোষণা করলে বাধ্য হয়েই শ্রমিকদের চিৎকার করতে হয়—'লকআউট' করা চলবে না। তাঁদের এ চিৎকার নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য।

সংবাদপত্রের পাতায় যেমন বড় হরফে প্রকাশিত হয় নিরানব্বুই রাণে অমুক 'আউট' তেমনি অমুক কারখানায় 'লকআউট'। কাজে কাজেই 'আউট' যে সংবাদপত্রপালিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কান টানলেই যেমন মাথা আসে 'আউট' প্রসঙ্গে তেমনি ক্রিকেট আসে। আপনি এড়াতে চাইলেও সে আপনাকে ছাড়বে না। কিন্তু তাই বলে দেশের যখন চরম বিপদ দেখা দেয় অর্থাৎ যুদ্ধ তখনও কিন্তু আড়কাঠির মত 'আউট' ঠিক পেছনে লেগে থাকে। তার ফলে যুদ্ধের সময় ব্ল্যাকআউট ঘোষণা করতে হয়। রাস্তায় আলো জ্বলে না। ল্যাম্পপোস্টের কাঁচে (ইলেক্‌ট্রিক'বা গ্যাসের নয়) আলকাতরা লাগাতে হয়।

ক্রিকেট ছেড়ে ভলিবল আর ব্যাডমিন্টন যাই আপনি খেলুন দান শেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে স্কোরার হাঁকবেন 'সাইড আউট'। তাই বলছিলাম 'আউটে'র কবল থেকে আর নিস্তার নেই। এ যেন অক্টোপাশের বাঁধনে জড়িয়ে ধরেছে।

ভালো একটা রুশপাশ কিংবা থ্রু-পাশ পেয়ে প্রান্তিক খেলোয়াড় হিসাবে আপনি হয়তো মাঠের প্রান্তসীমা দিয়ে তীব্রগতিতে ছুটছেন, কোথাও কিছু নেই সশব্দে রেফারীর বাঁশী বেজে উঠল। কি ব্যাপার! না বলটা 'আউট' হয়ে গেছে। তাই লাইন্সম্যান পতাকা উঁচিয়েছেন। গেল আপনার মেজাজটা বিগড়ে। গালাগালি দিল সমর্থকরা।

শুধু কি ফুটবলে। হকিতেও তাই। খেলা আমি ভালো বুঝি যে। কিন্তু তবুও 'আউটে'র কবলে পড়ে অনেক খেলোয়াড় যে কাবু হন তা বেশ বুঝতে পারি।

আপনি হয়তো ভালো ছাত্র। লেখাপড়া করেন। খেলাধুলো ভালো লাগে না। পরীক্ষায় রেজাল্ট ভালো করাই কাম্য। কিন্তু সেখানেও আপনার পিছনে 'আউট' লেগে আছে।

পড়া ভালোই তৈরী আছে। কিন্তু কোথাও কিছু নেই পরীক্ষার দুদিন আগে ছাত্রমহলে রটে গেল প্রশ্নপত্র 'আউট' হয়ে গেছে। পড়াশুনা মাথায় উঠল। যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় পড়বে বলে কেউই আশা করে না সেইগুলোই যে পড়বে বলে রটে যায়। অগত্যা সেগুলো নতুন করে পড়তে হয়। এ কথা বিশ্বাস না করলে কি হবে। সংবাদপত্রে 'আউট' হওয়া প্রশ্নপত্র এই পশ্চিমবঙ্গেই ছাপা হয়েছে। দেখুন কিভাবে 'আউট'কে সংবাদপত্র প্রশ্রয় দেয়।

আবার ভূগোল পরীক্ষার একটি প্রশ্নের কড়া নির্দেশ থাকে 'আউট লাইন'-সহ ভারতের মানচিত্র আঁকতে হবে। শুধু কি ভূগোল। শিল্পীর আর্টের বেলাতেও 'আউট লাইন' আছে বলে শুনেছি।

এক ব্যক্তি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এত টাকা আউটলে করলেন এবং তাঁর 'আউটপুট' এত হ'ল ইত্যাদি অঙ্ক তো কোনোদিনই আমার মাথায় ঢোকেনি। সেই কারণে অঙ্কের মাস্টারমশাই আমাকে যে কতদিন ক্লাশ থেকে 'গেট আউট' করে দিয়েছেন তার আর ইয়ত্তা নেই।

সেদিন সকালবেলায় বাড়ী থেকে বেরতেই ভাগ্নের হ'ল এ্যাক্‌সিডেন্ট। তাকে নিয়ে ছুটলাম হাসপাতালে। ছাপোষা মানুষ বলে গেলাম 'আউট ডোরে'। হাসপাতালের সুনাম বিসর্জন দিয়ে ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি রুগী দেখে

বললেন, প্লাস্টার করতে হ'বে। আমি মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে তিনি অভয় দিয়ে বললেন, 'আউট অব ডেঞ্জার'। 'আউট'কে যে আমি চিরদিনই ভয় করি তা আর ডাক্তারবাবুর কাছে প্রকাশ করলাম না।

হাসপাতাল কেন বই-এর দোকানে যান। সেখানেও একই ব্যাপার। চলতি বই ছাড়া একটু এদিক-ওদিক খোঁজ করলেই শুনতে পাবেন—'ও বই পাওয়া যাবে না, 'আউট অব প্রিন্ট'। কিন্তু রাগে আপনার 'আউটবার্স্' করার উপায় নেই। সেই বই জোগাড় করতে পারুন আর নাই পারুন।

গত শীতের সময় বেশ কিছু টাকা হাতে এসে গেল। ভাবলাম কিছু বইপত্তর কিনব। তারপরই দেখি স্ত্রীর মুখ থমথমে। কথা নেই বললেই চলে। কারণে অকারণে ছোটদের মারপিট। অনেক সাধ্য-সাধনায় জানা গেল, পাড়ার সকলেই নাকি নানা নতুন ডিজাইনের গহনা পরছে। তাঁর অবশ্য বেশী কিছু দাবি নয়। শুধু কানে একটা নতুন ডিজাইন চাই। বই কেনার আশা ত্যাগ করে বললাম, তাতে আর কি। কানবালা কি কানপাশা এক-জোড়া কিনে ফেল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লাউডগা সাপের মত আছড়ে পড়লেন। বললেন, তুমি একটা মানুষ না কি......ও সব ডিজাইন এখন 'আউট অব ডেট'। আজকাল কেউ পরে না। কি করে যে তুমি অফিসে চাকরি কর ভেবেই পাই না।

আমি তো তখন শামুকের মত গুটিয়ে গেছি। গহনার চলতি ডিজাইন বলতে না পারায় চাকরি কেন যাবে না এই রকম কোন 'শো কজ' কর্তৃপক্ষ করতে পারেন কিনা সেই ভাবনাতেই মুখ আমার আমসি। ভাগ্যিস আমার 'বস্' মহিলা নন।

শুধু কি এই। আমার চাকরিতে কেন 'আউট ইনকাম' নেই সেটাও যেন আমার অপরাধ। যাগ্‌গে। ঘরের কথা প্রকাশ করা উচিত নয়। 'আউট' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ঘরের খবর অনেক 'আউট' হয়ে গেল আর 'আউট সাইডের' জিনিস এসে গেল।

আগেই বলেছি খেলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। ফুটবল খেলার মাঠে ঢুকে প্রায়ই শুনতে পেয়েছি অমুক ভারতের সেরা 'আউটসাইড লেফ্‌ট'। বুঝতে না পেরে এবং 'আউট'কে এড়াবার জন্যে ভালোভাবে জিজ্ঞেস করাতে জেনেছি, আমরা যাকে এতদিন 'লেফ্‌ট আউট' বলে জানি তিনিই এখন 'আউট-সাইড লেফ্‌ট'। এ যেন বীরেন বাগচীর বিলেত থেকে ফিরে এসে বায়রণ বাগাচী হওয়ার মত। খেলার শেষে জিজ্ঞেস করলাম, যে জিতলো তাদের কত পয়েন্ট হ'ল? আমার প্রশ্ন শুনে পাশের লোক-জন আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমার প্রশ্ন করাটাই অন্যায় হয়েছে। অন্যায়টা কি করলাম বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি এমন সময় একজন গম্ভীরভাবে বললে, এটা লীগের খেলা নয়। 'নক্-আউট' শীল্ডের খেলা। এক 'আউট' এড়াতে গিয়ে ক্রমাগত 'আউট'ই তাড়া করছে।

ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে শুনেছি দলপতি এখন 'আউট ফিল্ডিং' সাজিয়ে-ছেন। কিছুই বলার উপায় নেই। কারণ, তিনি একজন 'আউট-স্ট্যাণ্ডিং' স্পোর্টস্-ম্যান। ক্রিকেট খেলার রেকর্ড সম্বন্ধে সিমেন্টের অসমান গ্যালারিতে বসে বেফাঁস কিছু বলেছেন কি তর্ক উঠে 'আউট-ভোটেড' হয়ে যাবেন।...... 'বোল্ড আউট' কি 'রান আউট' অথবা 'কট আউট' তা শুধু বিচারের ভার আম্পায়ের উপর। দর্শকরা যতই চটুক।

শুধু আমিই নই। আপনারাও পড়েন 'আউটে'র কবলে। গেলেন হয়তো বিশেষ কোন জরুরী কাজে উকিল, ডাক্তার, এনজিনীয়ার কি কোন পদস্থ কর্মচারীর বাড়ীতে, গিয়ে দেখলেন মিস্টার অমুকের নেমপ্লেটে জ্বল-জ্বল করছে সেই তিন অক্ষর 'আউট'। অর্থাৎ তিনি বাড়ী নেই। ফড়েপুকুর থেকে ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত আপনার যাতায়াতই সার হ'ল। এ ছাড়াও ট্রামে-বাসে, সিনেমার লবীতে, পথচলতি ফুটপাথে, ট্রামস্টপ কি বাসস্টপে নানান্ ধরণের 'আউট'এর কথা কানে আসবে। বেকার যুবক কোথায় 'আউট ডোর' ক্লার্কের পোস্ট খালি আছে তার আলো-চনা করবে; এ্যারিস্টোক্র্যাটরা এটিকেটের প্রশ্ন তুলে বলবেন—দিস ইজ 'আউট অব এটিকেট'। রেলের টিকিট-চেকারবাবুরা গিন্নীর কাছে সরস গল্প করবেন 'উইদাউট টিকেট'এর যাত্রীদের কথা।

প্রচ্ছদশিল্পী, প্রেসের লোক তো 'লে-আউট' নিয়েই ব্যস্ত। কি সাজালে দেখতে ভালো ও খুলবে (মানাবে) ভালো শুধু সেই চিন্তা।

অন্য কোন জায়গায় আছে কিনা জানি না। 'আউট' কিন্তু কোলকাতার লোকদের ছাড়ছে না। এই তো সেদিন কত ঘটা করে চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীটের মোড় থেকে 'আউটরাম'কে সরান হল। কিন্তু ভ্রমণবিলাসীরা কি 'আউটরাম' ঘাটে যাওয়া বন্ধ করেছেন?

আবার মেম্বার্স ওনলি ক্লাবে (যে ক্লাবে কেবলমাত্র সভ্যগণই যেতে পারেন) দু'চারদিন যাতায়াত করলেই শুনতে পাবেন, কিছু কিছু মেম্বার ক্লাবের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন—আজকাল ক্লাবে সব 'আউট-সাইডার'রা আসছে কেন? বুঝুন একবার 'আউটে'র কোপ।

কোন 'আউট গোয়িং' জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের যদি বাণী শোনার সৌভাগ্য হয় তবে শুনতে পাবেন, কিভাবে রাজ্যের পুলিশ 'আউটপোস্টের' উন্নতি করা যায় সেই সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ।

বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তিদের মুখে কেবলই শুনবেন 'আউটসাইড' ইণ্ডিয়ায় এসব জিনিস অচল। ইণ্ডিয়ার মত বাজে জায়গা বলেই এসব চলে।

'আউটে'র যে কত রূপ তা আপনার 'আউট অব ইমাজিনেশন'। কোন দিনও কি ঘুণাক্ষরে ভেবে দেখেছেন যে, আপনাকে আমাকে অর্থাৎ সবাইকে এই-ভাবে সর্বগ্রাসী 'আউটে'র কবলে পড়তে হবে? আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যেভাবে 'আউট' জড়িয়ে গেছে যে তাকে আর 'আউট' করা যাবে না। অর্থাৎ 'উইদাউট এনি আউট' আমরা চলতে পারব না।

অবশ্য এ ব্যাপারেও নিপাতনেসিদ্ধ আছে। তা না হ'লে 'আউটস্ট্যাণ্ডিং' ব্যাটস্ম্যান না হয়েও দশম উইকেটে ব্যাট করতে নেমে শূন্য রাণে 'নট আউট' থাকার কৃতিত্বটা কম নয়!

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

।। ছয় ।।

সংগীত সংঘের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৩৪নং পার্ক স্ট্রীটে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১৭।১নং ল্যান্সডাউন রোডে এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। আমরা সংগীত সংঘের ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের (আনন্দ সংগীত পত্রিকা; ফাল্গুন সংখ্যা—১৩২০ সন দ্রষ্টব্য) কার্যবিবরণী পাঠে জানতে পাই যে বাংলার বিশিষ্ট রাজা-জমিদারদের ও পদস্থ ব্যক্তিগণের ছেলেমেয়েরা যাতে উচ্চাঙ্গ-সংগীত শিক্ষার সুযোগ লাভ করে, সেই উদ্দেশ্যেই ভবানীপুরে ল্যান্সডাউন রোডে সংগীত সংঘ শিক্ষায়-তনটিকে তুলে আনা হয়। কেননা তৎকালে কোলকাতার গণ্যমান্য উচ্চ-শিক্ষিত এবং উদারপন্থী ব্যক্তি—বিশেষতঃ যাঁরা স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই তখন বালিগঞ্জে বা ভবানীপুরে বসবাস করতেন। আমরা উক্ত কার্যবিবরণী পাঠে আরও জানতে পাই যে কুচবিহারের মহারাণী মহোদয়া, বর্ধমানের মহারাজা, মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার, নাটোরের মহা-রাজা স্বর্গত জগদিন্দ্রনাথ ও দিঘাপতিয়ার রাজা নানাভাবে সংগীত সংঘের আর্থিক সাহায্যে ব্রতী হন। এই সকল রাজপরিবারের অনেকে এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পরিবারের মহিলাগণ সংগীত সংঘে নিয়মিত শিক্ষালাভ করেছেন। নাটোরের বর্তমান মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ সংগীত সংঘের তরুণ ছাত্ররূপে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। ইনি তখন কোকভ খাঁর নিকট স্বরোদ শিখতেন। জাস্টিস আশুতোষ চৌধুরীর সুযোগ্য পুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অশ্বিনী চৌধুরী মহাশয়ও যোগীন্দ্রনাথের সতীর্থ ছিলেন এবং প্রফেসর কোকভের নিকট সেতার শিখতেন। অধুনা পণ্ডিচেরীর আশ্রম-বাসিনী সংগীতের প্রতিভাশালিনী মহিলা শিল্পী দেশবন্ধুর ভাগ্নী শ্রদ্ধেয়া সাহানা দেবীর গোড়ার শিক্ষা সংগীত সংঘ থেকেই শুরু হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ থেকেই সংঘের ছেলে-মেয়েদের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং যথাযথ পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থাও হয়।

বিদেশী সুপ্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞগণের সহিত সংগীত সংঘের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ সংগীত অধ্যাপক ডাঃ ওয়েস্টর্প ডি-মিউজ, ভারতভ্রমণ উপলক্ষে কোলকাতায় অবস্থানকালে সংগীত সংঘের এক বিশেষ অধিবেশনে প্রাচীন হিন্দু সংগীতের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীত, একক ও যৌথ যন্ত্র-সংগীত ও রবীন্দ্র-সংগী-তের শিক্ষা ও অনুশীলনে সংগীত সংঘ অতি অল্পকালের মধ্যেই শুধু কোল্-কাতার শ্রেষ্ঠ সংগীত প্রতিষ্ঠানরূপে নয়, সারা ভারতেরই এক আদর্শ সংগীত বিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হয়। সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও নাটক শিক্ষারও ব্যবস্থা এখানে প্রবর্তিত হয়। ১৯১৪ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে "থিয়েটার রয়েল" রঙ্গমঞ্চে সংগীত সংঘের মহিলা ও পুরুষ সভ্যরা ও ছাত্র-ছাত্রিগণ অতি কৃতিত্বের সহিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "বাল্মিকী প্রতিভা"র অভিনয় সুসম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠানে বাংলার তৎকালীন জনপ্রিয় ও বিদ্যোৎসাহী গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ও তাঁর পত্নী উপস্থিত থেকে সংগীত সংঘের ছেলে-মেয়েদের উৎসাহবর্ধন করেন। উচ্চাঙ্গ-সংগীত শিক্ষার ক্ষেত্র সংগীত সংঘের মান যে কত সমুন্নত ছিল, তা সংঘের অধ্যাপকমণ্ডলীর তালিকা পাঠে আমরা সহজেই বুঝতে পারি। ঐ সময়ে সংঘের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রফেসর এ, কে, কোকভ খাঁন এবং তাঁর সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত কণ্ঠ-সংগীতকার বিশ্বনাথ রাও, কাশীর সুপ্রসিদ্ধ বীন্‌কার লছমীপ্রসাদ মিশ্র, অধ্যাপক শ্যামসুন্দর মিশ্র ও গঙ্গাগিরি এবং বাংলার স্বদেশী যুগের প্রধান চারণ এবং পরবর্তী যুগে রবীন্দ্র-সংগীত ও কীর্তনের বিশিষ্ট সংগীত-শিল্পী স্বর্গত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী। সংঘের বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট পরীক্ষকদের মধ্যে কাশিম-বাজারের মহারাজার সংগীত সভার প্রধান আচার্য স্বর্গত রাধিকা গোস্বামী ও বর্ধমানের মহারাজার সংগীত-গুরু মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম তখন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল।

সংগীত সংঘের প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসরের মধ্যেই ১৯১৪ সালের ২৭শে জুন বর্তমান যুগে ভারত সংগীতের প্রধান প্রতিভূ বঙ্গ-গৌরব রাজা স্যার সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর লোকান্তর গমন করেন। সৌরিন্দ্রমোহনের তিরোধানের পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ আহূত সংঘের অধিবেশনে ত্রিপুরার মহারাজা সভাপতি হন। নাটোরের মহারাজা সৌরিন্দ্র-মোহনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে সংঘের একটি বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের প্রস্তাব এনেছিলেন এবং সেই প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সৌরিন্দ্র স্মৃতি-সভায় লেডি প্রতিভা চৌধুরী যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা আজও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :—রাজা সৌরিন্দ্রমোহনের সম্বন্ধে আমার যে সব কথা মনে পড়ে তাহা অল্পের ভিতর কিছু আজ বলিতে ইচ্ছা করি। আমার বয়স যখন ছয়-সাত বৎসর, রাজা বাহাদুর ও তাঁহার স্বর্গীয় ভ্রাতা মহারাজ যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর মহাশয় আমাদের জোড়া-সাঁকোর বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন। তখন আমার পিতা স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তাঁহারা দুজনেই গান-বাজনা অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

আমাদের হলের ঘরে তাঁহারা বসিলে আমাকে মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া পাঠাইতেন। তখন শিখাইতেন না। মেয়েরা গান গাহিবে কি বাজাইবে, ইহা তখন ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল। আমার পিতা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আমাকে গান-বাজনা শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, তিনি ভাল কাজ করিতেছেন তাহার জন্য কাহারও নিন্দায় ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নহে। আমি অল্প-স্বল্প কিছু গান শিখিলে, আমাকে সকলের মধ্যে আনিয়া, আমার গান সকলকে শুনাইতেন। আমিও যেটুকু জানিতাম পিতার আজ্ঞানুক্রমে গাহিতাম। রাজা সৌরিন্দ্রমোহন ও মহারাজা সেইজন্য আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারা আমাকে উৎসাহ দান করিতেন, ও পিঠ্-

লেখকে ভাল করিয়া গান শিখাইবার জন্য যত্ন করিতে বলিতেন। তখনকারকালে বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী জোড়াসাঁকোর বাড়ীর গায়ক ছিলেন। তাঁহার নিকট ছোট ছোট খেয়াল শিখিয়া গাহিতাম; আর বাবু রামপ্রসাদ মিশ্রের নিকট সেতার শিখিতাম। আমাদের বাড়ীতে তখন বিদ্বজ্জন সমাগম হইত। রাজা সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর ও অন্যান্য অনেক সংগীতজ্ঞ লোক ও পণ্ডিতের সমাগম হইত। সেই সময় আমার ও আমার ভাই হিতেন্দ্রের পলাইবার জো ছিল না। বড় বড় ওস্তাদের সম্মুখে আমাদিগকে গাহিতেই হইত। ভাল-মন্দ যাহা পারি তাহাই গাহিতাম। পিতাঠাকুর উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহার সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, যাহা শিখিয়াছিলাম তাহাই নির্ভয়ে গাহিতাম। দুইবার বিদ্বজ্জন সমাগমে আমি সদারঙ্গের চতুরঙ্গ খেয়াল গাহিয়া সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট হইতে পুরস্কার পাইয়াছিলাম।

'কৃষ্ণধন গোস্বামীর সেতার-শিক্ষা, আর তাঁহার নিজের প্রকাশিত রাগ-রাগিণী সংক্রান্ত সচিত্র একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম। তখন মাঘোৎসবের সময় আমাদের বাড়ীতে খুব ধুমধাম হইত। এ বাড়ীর ও বাড়ীর সকল আত্মীয়-স্বজনও সেই সভায় আসিতেন। সেই সময়ও আমার গান গাহিতে হইত। মনে পড়ে রাজা বাহাদুর সেই সময়ে উপস্থিত থকিতেন, ও আমাকে গান ভাল করিয়া শিখিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। আমার ঠাকুরদাদা মহাশয় 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম হওয়াতে, আমাদের সঙ্গে, এ বাড়ীর ও বাড়ীর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যাওয়া-আসা ক্রমে বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। আমরা যেন একঘরে হইয়া পড়িয়াছিলাম। তবুও আমাদের বাড়ীতে গান-বাজনা, সকল রকম বিদ্যার চর্চা, ও ধর্মের চর্চা এত বেশী হইত যে, যাঁহারা এ সব বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন, ইহারাই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আমাদের বাড়ীর সকলের সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে ছাড়িতেন না। সেইজন্য দলাদলি হইলেও, গান, বাজনা অভিনয় প্রভৃতি বিশুদ্ধ আমোদের মিলনে ও বিদ্যার চর্চায় ইঁহারা সকলেই যোগ দিতেন। জ্যোতিকাকা মহাশয়ের বাজনার সঙ্গে রবিকাকার গান, বড় পিসামহাশয় স্বর্গীয় সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বলা বাহুল্য গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী, ইঁহাদের গান শুনিয়া সকলেই কি যে মোহিত হইতেন, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের বাড়ীর সকলকে ধর্মের জন্য একঘরে করিলেও, গান বাজনার আনন্দে সকলে দলাদলি ভুলিয়া এক হইয়া এ কাজে যোগ দিতেন এবং আনন্দ করিতেন।

আনন্দ সংগীত পত্রিকার ১৩২১ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (জুলাই ১৯১৪) সৌরিন্দ্রমোহনের জীবন-প্রসঙ্গে যে সকল নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, তা পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি যে সৌরিন্দ্রমোহন দেশের সংগীতানুরাগী গুণী সমাজ ও শিক্ষিত সমাজের আন্তরিক শ্রদ্ধার আসন চিরদিনের জন্য অধিকার করতে পেরেছিলেন। তাঁর স্মৃতি তর্পণ উপলক্ষে লিখিত বহু প্রবন্ধের মধ্যে সংগীত সংঘের প্রধান অধ্যাপক এ কে কৌকভ খাঁ সাহেবের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ 'সৌরিন্দ্র তিরোধান' প্রবন্ধটি আজও আমাদের মর্মস্থল স্পর্শ করে। তিনি আনন্দ সংগীত পত্রিকার জন্য বহু হিন্দী প্রবন্ধ লিখেছেন, যেগুলির বাংলা অনুবাদ সম্পাদিকারা পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতেন। সৌরিন্দ্রমোহন সম্বন্ধে কৌকভ খাঁ লিখেছেন:—

রাজা স্যার সৌরিন্দ্রমোহনের কীর্তি কাহিনী বিশ্ববিশ্রুত, দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত। অক্ষম লেখনী ভাষার গণ্ডি-মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মনের কথা প্রকাশ করিতে পারে না।

আজন্ম সংগীতসাধনায় তিনি সাধ্যাতীত সিদ্ধিলাভ করিয়া যে বিপুল সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহা এক জীবনে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর কথা কত বলিব, সংগীতের বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে সার্বজনিকত্বের মধ্যে বিতরণ করিয়া অমর কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই তাড়িৎ শক্তির প্ররোচনায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সূক্ষ্মরূপে তাঁর প্রকাশিত সংগীতের গ্রন্থ নিয়ে অনুশীলন ও সাধনার কথা তুলনা করিলে, তাঁকে সংগীতাচার্যের শীর্ষস্থান প্রদান করিতে কুণ্ঠা বা লজ্জা আসে না এবং তখন বুঝিতে পারি যে তিনি সংগীতের বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী ছিলেন। সংগীতের মনস্তত্ত্ববিধির অনুসন্ধান করিয়া আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক সমগ্র বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান সাধন করিয়া গিয়াছেন, এক তিনি; তার একমাত্র কারণ তিনি কক্ষভ্রষ্ট হন নাই, সুতরাং তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। সূর্য এক-রাশিতে যতদিন থাকেন ততদিনে যে মাস হয় তাকে সৌরমাস বলে। সৌরিন্দ্রমোহন তাঁর জীবনের সারা বেলা একই সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া সৌরিন্দ্র-সংগীত-যুগের প্রবর্তন তিনিই করিয়াছিলেন, সে যুগের সৌরিন্দ্র-দীপ্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত আলোকের সহায়ে তদানীন্তন অনেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

ভারতের প্রায় অধিকাংশ দরবারে ঘুরিয়া আসিয়া, আজ প্রায় ৮ বৎসর হইল কলিকাতায় আসিয়াছি। মহারাজা যতিন্দ্রমোহন ঠাকুরের মহাপ্রয়াণে বাংলা যে রত্ন হারাইয়াছে, তাহার আর পূরণ হইবে না। একাধারে সমজদার, গুণী, বিদ্বান, কবি ও সর্ববিষয়ে সমান বিচারক, তত্ত্বনির্ণায়ক এবং সর্বোপরি অমায়িক স্বভাববিশিষ্ট, প্রবীণ, বিজ্ঞ, মহানুভব ব্যক্তি আর বোধ হয় দেখিতে পাইব না। এখানে আসিয়া তাঁহারই দরবারে আমার প্রথম চাকুরী হয় এবং সেইখানেই রাজা সৌরিন্দ্রমোহনের সহিত প্রথম আলাপ হয়; সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম, "ছোট রাজার" (রাজা সৌরিন্দ্রমোহন) মত সংগীতজ্ঞ বাংলায় এমন কি সমগ্র ভারতে বুঝি আর নাই, বা হইবে না। তাঁহার কাছে গিয়া যে আনন্দ পাইতাম, তাঁহার সহিত কথা কহিয়া তাঁহাকে শুনাইয়া মনের যে তৃপ্তি হইত বুঝি আর তাহা হইবে না। সংগীতের একনিষ্ঠ ও অদ্বিতীয় সাধক বর্ণমাতৃকার চরণে প্রাণ ভরিয়া অর্ঘ্য ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গিয়াছেন; তাঁর অমর-আত্মা অমরলোকে চির-বিরাজমান থাকুন।

পরলোকে সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন

সম্প্রতি সাহিত্যিক শ্রীরমেশচন্দ্র সেন মহাশয় পরলোকগমন করেছেন। বাঙলা সাহিত্যে পরিণত বয়সে সাহিত্য সৃষ্টি করে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন রমেশচন্দ্র সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পরিণত বয়সে সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হলেও তাঁর মোট রচনার পরিমাণ কম নয়। উপন্যাস, গল্প প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ তাঁর অধিকাংশ গল্প বা উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমিকায় রয়েছে নোয়াখালি ও বরিশালের পল্লীজীবন। আজকের জীবনে গ্রামা-

জীবন গৌণ। কিন্তু এই কথাসাহিত্যিকের 'মিতবাক বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণের মুন্সীয়ানায়' সেই প্রায় বিস্মৃত গ্রামজীবন নবজীবন লাভ করেছে। তা হলেও নগরজীবনও তাঁর দৃষ্টিকোন এড়িয়ে যেতে পারেনি। কাজল, শতাব্দী, কুরপালা, গৌরীগ্রাম, মালঙ্গীর কথা, নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ, মৃত ও অমৃত, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, সাগ্নিক প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'অমৃতে' মন্তব্য করা হয়েছিল, "শুধু গ্রাম নয়, শহরের জীবনকেও তিনি সাহিত্যে রূপায়িত করতে সক্ষম। এর মধ্যে সাদা ঘোড়া, কাশ্মীরী তুষ, সাকীর প্রথম রাত্রি, ভাত ইত্যাদি গল্প বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। গল্পকার হিসাবে রমেশবাবুর সব থেকে বেশী সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে সমাজের নীচুতলার মানুষ—ঘোড়ার সহিস, কেরানী, নিম্নমধ্যবিত্ত বিধবা, ডোম, ফকির, গণিকা, এমন কি পকেটমার।"

১৩০১ সালে ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে রমেশচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। অর্ধশতাব্দী পূর্বে সাহিত্যজীবনে প্রবেশের সূত্রেই রমেশবাবু যে 'সাহিত্য সেবক সমিতি' প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন তা বাংলাদেশের প্রাচীন সাহিত্য সংস্থাগুলির অন্যতম। চিকিৎসক হিসাবেও কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেন খ্যাতিলাভ করেন।

॥ সাহিত্যিকের সম্মান ॥

সংবাদে জানা গেল খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর এই সম্মানে আমরা আনন্দিত।

॥ অস্ত্র ক্রয়ের অধিকার ॥

সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ থেকে ভারতের সুপারসনিক জেটবিমান কেনার প্রস্তাব পশ্চিমী মহলে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে বলে জানা গেছে। এসম্পর্কে ভারতের পরিকল্পনা জানার উদ্দেশ্যে বৃটেন ভারতের কাছে পত্রপ্রেরণ করেছে এবং ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত গলব্রেথও মার্কিন সরকারের কাছ হতে জরুরী আহ্বান পেয়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেছেন। ভারত সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সম্পর্কটা বর্তমানে মোটেই খুব হৃদ্যতাপূর্ণ নয়, যে কারণে কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় সেনেট কমিটির পক্ষ হতে আগামী আর্থিক বছরে ভারতকে প্রস্তাবিত আর্থিক সাহায্যের পঁচিশ শতাংশ কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট কেনেডির দাবীতে উক্ত সেনেট কমিটি শেষপর্যন্ত তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন এবং আর্থিক বছরে ভারতকে কিঞ্চিদধিক ৮১ কোটি ডলার মার্কিন সাহায্যের মূলপ্রস্তাবই সেনেটে অনুমোদিত হয়। সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ হতে ভারতের জঙ্গী-বিমান ক্রয়ের প্রস্তাবে পশ্চিমী মহলে আবার বিক্ষোভের গুঞ্জন প্রবল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু পশ্চিমী মহলের এই অবাঞ্ছিত মনোভাবের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ভারতীয় সংসদে ভারতের মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। সংসদের প্রায় সকল দলের সদস্য সমবেতকণ্ঠে এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, পশ্চিমী চাপ সত্ত্বেও ভারত সরকারের সোভিয়েট জঙ্গীবিমান ক্রয়ের প্রস্তাবে অবিচল থাকা উচিত। কারণ কোন রাষ্ট্রের কাছ হতে কি অস্ত্র কেনা হবে সেটা যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের নিজ সিদ্ধান্তসাপেক্ষ। এ-ব্যাপারে অপর কোন রাষ্ট্রের অভিমত বা আপত্তি সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। তাছাড়া ভারতের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন ও পাকিস্থান আজ যেভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর হামলা শুরু করেছে তাতে ভারতের পক্ষে উপযুক্ত অস্ত্রসজ্জা আজ অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনৈক সদস্য প্রস্তাব করেছেন, পাকিস্থান যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এপর্যন্ত যত অস্ত্রসাহায্য পেয়েছে, ভারতের আজ উচিত হবে ঠিক সেই পরিমাণ অস্ত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ হতে সংগ্রহ করা।

॥ পাক-চীন আঁতাত ॥

পাকিস্থান-অধিকৃত কাশ্মীর ও চীনের সিংকিয়াঙ প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমানা চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে চীন জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে করাচীতে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন পাঠাবে বলে স্থির করেছে। গত ৩রা মে

এসম্পর্কে একটা চুক্তি স্বাক্ষরের অভিপ্রায় সর্বপ্রথম উভয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। তারপর কাশ্মীর-প্রসঙ্গ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদে আলোচনা হয়েছে এবং সেখানে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হতে দৃঢ়ভাবে এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একথা স্বীকার করে নেওয়ার পর কাশ্মীর-সমস্যা বলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তার মীমাংসা করতে হবে. কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের এই অভিমত কমিউনিস্ট চীনের মনঃপূত নয়, এবং কাশ্মীর ভারতের অংশ একথা কখনও তার পক্ষ হতে প্রকাশ্যে স্বীকৃত হয়নি যদিও 'হিন্দী চীনী ভাই ভাই' ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছে ভারত ও চীন কয়েক বছর ধরে। পাকিস্থানের জবরদখল কাশ্মীর এলাকাকে পাকিস্থানের অংশ বলে ধরে নিয়ে চীন এখন তার সংগে "সীমান্ত নির্ধারণে" উদ্যোগী হয়েছে। চীনের পক্ষে বর্তমানে এই মনোভাবই স্বাভাবিক, কারণ পাকিস্থানের মত তারও অধিকারে রয়েছে বর্তমানে ভারতের কয়েক হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড। এসম্পর্কে সর্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, চীনের ক্রমিগ্রাস এখনও বন্ধ হয়নি। গত ২৯শে মে লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তর হতে জানানো হয়েছে যে, ভারতীয় এলাকায় স্পাঙ্গুরের প্রায় আট দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে একস্থানে চীনা সৈন্যরা একটি নতুন ঘাঁটি স্থাপন করেছে।

॥ বাঙ্কার পরিকল্পনা ॥

এতদিন পরে ওলন্দাজ সরকার স্বীকার করেছেন, পশ্চিম ইরিয়ান সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র-প্রস্তাবিত বাঙ্কার পরিকল্পনাকে আলোচনার ভিত্তিরূপে মেনে নিতে সম্মত আছেন। ইতিপূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে হল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যে আলোচনা হয় তাতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মধ্যস্থ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাঙ্কার। সেই আলোচনা-সভায় মীমাংসার সূত্ররূপে মিঃ এলসওয়ার্থ বাঙ্কার যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাই পরবর্তীকালে "বাঙ্কার পরিকল্পনা" নামে পরিচিতি লাভ করে। বাঙ্কার পরিকল্পনার প্রধান কথা হল দুই বছরের মেয়াদে পশ্চিম ইরিয়ানের পূর্ণমুক্তি ও ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্তি।

চন্দ্রলোকে অবতরণের জন্য পরিকল্পিত মার্কিণ মহাশূন্যযান রেঞ্জার-৪ এই নক্সায় উড্ডয়ন যন্ত্রপাতি ও ক্যাপসুল অংশটি দেখা যাচ্ছে। চন্দ্রপৃষ্ঠের টেলিভিশন চিত্র পৃথিবীতে প্রেরণের জন্যই এই মহাশূন্যযানের পরিকল্পনা।

এতদিন পর্তুগালের মত হল্যান্ড এক অদ্ভুত গোঁয়ার্তুমি দেখিয়ে পশ্চিম ইরিয়ানকে দখলে রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গোয়ায় ভারতীয় তৎপরতার মত পশ্চিম ইরিয়ানে ইন্দোনেশিয়ার তৎপরতা শুরু হয়ে যাওয়াতে হল্যান্ড এবার বোধহয় তার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছে। সে বুঝেছে যে, ইন্দোনেশিয়া যখন পূর্ণ বিক্রমে পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তি অভিযানে অগ্রসর হবে তখন নিতান্ত নিরুপায়ের মতই তাকে চরম অপমানিত হয়ে সে স্থান ত্যাগ করে চলে আসতে হবে। তাই শেষ পর্যন্ত ওলন্দাজ সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। ওলন্দাজ প্রধানমন্ত্রী ওলন্দাজ সংসদে ঘোষণা করেছেন, বাঙ্কার পরিকল্পনাকে আলোচনার সূত্ররূপে গ্রহণে তাঁরা প্রস্তুত আছেন।

ওলন্দাজ প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার উপর মন্তব্যকালে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, হল্যান্ড যদি বাঙ্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করে তবে বুঝতে হবে, ইন্দোনেশিয়া ইতিমধ্যেই পশ্চিম ইরিয়ান ফিরে পেয়েছে।

॥ বিপন্ন কমনওয়েলথ ॥

বৃটেনে নবনিযুক্ত ভারতের হাই-কমিশনার শ্রীচাগলা দায়িত্বভার গ্রহণের উদ্দেশ্যে লন্ডনে পৌঁছিয়েই যেকটি কথা বলেছেন তা বৃটেনের কূটনৈতিক মহলের কাছে বিশেষ চিন্তার কারণ হবে। তিনি বলেছেন, কমনওয়েলথের মধ্যমণি বৃটেনের কয়েকটি সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের ফলে কমনওয়েলথের ভবিষ্যত বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বৃটেনের সিদ্ধান্তগুলিরও উল্লেখ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি বলেছেন, বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে কমনওয়েলথ-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অবাধ যাতায়াত বন্ধ করে দিয়ে বৃটেন কমনওয়েলথের উপর সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত হেনেছে। তার ওপর দ্বিতীয় আঘাত হেনেছে সে ইউরোপের খোলা বাজারে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে। এর ফলে কমনওয়েলথ-ভুক্ত দেশগুলির সংগে বৃটেনের বিশেষ বাণিজ্যিক সম্পর্কেরও অনিবার্যভাবে অবসান ঘটবে। তারপর কমনওয়েলথ বজায় রাখার আর কোন সার্থকতাই থাকবে না বলে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কমনওয়েলথ সম্পর্কে ভারতের জনসাধারণের মনোভাব প্রথম থেকেই বিরূপ

ছিল, এবং ভারত সরকারের কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত ভারতবাসী কোন দিনই অন্তর থেকে সমর্থন করেনি। তবুও সম্প্রতি পূর্ব ও পশ্চিমী শক্তিজোটের সামরিক প্রস্তুতির মাঝে কমনওয়েলথের অস্তিত্বের একটা বিশেষ প্রয়োজন কোন কোন মহলে অনুভূত হচ্ছিল। কিন্তু কোন বিষয়েই কমনওয়েলথের পক্ষে আজ সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় কমনওয়েলথের অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় অস্তিত্ব যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে সেটা বোধহয় কমনওয়েলথভুক্ত কোন দেশের পক্ষেই বিশেষ দুঃখের বা দুশ্চিন্তার কারণ হবে না।

॥ সালাঁর কারাদন্ড ॥

কয়েক মাস আগে আলজিরিয়ার শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা প্রাক্তন ফরাসী জেনারেল জুহোকে প্যারীর আদালত রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন, তখন সকলেই আশা করেছিলেন যে, শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসবাদীদের শিরোমণি সালাঁর শাস্তিদানের সময়েও প্যারী আদালতের এই মনোভাব অবিচলিত থাকবে। কিন্তু তা থাকেনি। ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সামরিক আদালত প্রাক্তন জেনারেল রাওল সালাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। সালাঁর প্রতি ফরাসী সরকারের এই নরম মনোভাব বিভিন্ন কূটনৈতিক মহলে বিশেষ সমালোচনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্দী থাকাকালেও সালাঁ জেল থেকে আলজিরিয়ার শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসবাদীদের কাছে নানারকম নির্দেশ পাঠিয়েছেন, তাদের অর্থসাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন, বিচারকালে এমন অভিযোগও উঠেছিল। তবুও সালাঁর প্রতি মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিতে ফ্রান্সের সামরিক আদালত যে সাহস করলেন না সেটা পরোক্ষে আলজিরিয়ার শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসবাদীদেরই জয় বলে মনে করা হচ্ছে। সালাঁর প্রতি ফরাসী সরকারের এই দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার ফলে আলজিরিয়ার শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ যদি আবার তীব্র আকার ধারণ করে তবে সেটা বিস্ময়ের কিছু হবে না। ইতিমধ্যেই ও-এ-এস সংগঠনের কার্যকলাপ আবার মারাত্মক হয়ে উঠেছে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

॥ পূর্ববঙ্গে আবার অশান্তি ॥

পূর্ব পাকিস্থানে আবার যে একবার সাম্প্রদায়িক অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে তা কিছুদিন আগে থেকেই অনুমান করা যাচ্ছিল। কারণ পূর্ব পাকিস্থানের জাগ্রত তরুণ সমাজের প্রবল অভ্যুত্থানের ফলে সেখানকার জনসমর্থনহীন সামরিক শাসনকে যেভাবে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা থেকে তাদের উদ্ধারের আর কোনই সহজ পথ ছিল না। পূর্ব পাকিস্থান সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্থানের সামরিক শাসক ও উচ্চাভিলাষী রাজনীতিকদের উপনিবেশী মনোভাব ও আচরণ আজ এতই স্পষ্ট ও নির্লজ্জ যে পূর্ব পাকিস্থানবাসীরা তা আর কোন মতেই মুখ বুজে মেনে নিতে রাজী নয়। মৌলিক গণতন্ত্রের ছদ্ম আবরণে সৈন্য-প্রহরাধীন মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভীর যে জনসমর্থনহীন শাসন আজ পাকিস্থানে কায়েম করার প্রয়াস চলেছে তাও কোনভাবে দাগ কাটতে পারেনি পূর্ববঙ্গবাসীদের মনে। পূর্ণ গণতন্ত্র, পূর্ণ মৌলিক অধিকার ও প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ছাড়া আর কোন প্রস্তাবেই সম্মত হতে রাজী নয় আজ তারা। লাঠি, জেল, হুমকি ইত্যাদি কোন কিছু দিয়েই সংযত করতে পারেনি তাদের জনাব আয়ুবের জঙ্গী শাসন। এ অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার বিষধর সাপটিকে ঝাঁপি খুলে আর একবার খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না সাম্প্রদায়িক পাক শাসকদের, এবং সেই পথই তাঁরা বেছে নিয়েছেন। জাতীয় অভ্যুত্থানকে বিপথ চালিত করার আর কোন পথই জানা নেই তাঁদের, থাকলেও বোধহয় এই বহু পরীক্ষিত পথটি ছেড়ে সে পথে পা বাড়ানোর ঝুঁকি নিতে চাননি তাঁরা। এখন ঢাকা, রাজশাহী, চাঁদপুর, পাবনা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে সাম্প্রদায়িক অশান্তি। আরও যাতে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করছে পাক শাসন-পুষ্ট কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্রগুলি।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক হতভাগাই ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছে, হয়ত হারাতে হবে আরও অনেককে। তবুও এই ভয়ংকর কালো মেঘের ধারে ধারে যে রুপালী রেখাটুকুর সন্ধান পাওয়া গেছে তা নেহাতই নৈরাশ্যজনক নয়। শত প্ররোচনা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের বাঙালী মুসলিমদের এখনও নাকি টেনে আনা সম্ভব হয়নি এই সাম্প্রদায়িক হানাহানির মাঝে। অবাঙালী দুর্বৃত্ত ও গুন্ডারাই এখনও পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে হিন্দু হত্যা অভিযান। সমভাবে অত্যাচার ও লাঞ্ছনাবরণের মধ্য দিয়ে যে ভ্রাতৃবোধ জেগে উঠেছে পূর্ববঙ্গের মুসলিম ও হিন্দুদের মাঝে তাকে নাকি এখনও সাম্প্রদায়িকতার বিষে বিষাক্ত করতে পারেনি স্বার্থান্বেষী হৃদয়হীন কুচক্রীরা। এইটাই আমরা স্বাভাবিক বলে মনে করি, কারণ সাম্প্রদায়িকতা যে কত বড় অভিশাপ মানুষের জীবনে তা বার বার কঠিন মূল্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের কয়েক কোটি অধিবাসীর এতদিনে অবশ্যই উপলব্ধি করার কথা।

॥নেকড়ে শিশু ॥

রামুর কথা হয়ত অনেকেরই মনে আছে। ছ' বছর আগে জানুয়ারী মাসে এক শীতের সকালে লক্ষ্ণৌ স্টেশনের কাছে রেলের কয়েকজন সরকারী পুলিশ কুড়িয়ে পেয়েছিল ন' বছরের একটি মূক বিকলাঙ্গ বালককে। তার অদ্ভুত আচরণ ও কাঁচা মাংস খাওয়া দেখে সকলের সন্দেহ হয়েছিল, মনুষ্যসমাজে সে পালিত হয়নি। শৈশবে নিশ্চয়ই কোন পশু তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল লোকালয়ের বাইরে আর তারই বাৎসল্য স্নেহে বড় হয়েছে রামু। মনুষ্য শিশু পালনের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা আছে বেবুন, ভালুক ও নেকড়ে এই তিন জাতীয় পশুর। কিন্তু বেবুন ভারতের জঙ্গলে নেই। আর কাঁচা মাংস ছাড়া অন্য কিছুই রামু খেত না দেখে বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ হয়, রামুর পালিকা-জননী নেকড়ে। উদ্ধার পাওয়ার তিন বছর পরে রামু এমন এক ধরণের প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হয় যা সাধারণত পশুদেরই হয়ে থাকে। এতে রামুর পাশব সংসর্গ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা আরও স্থির নিশ্চয় হন।

এখন রামুর পনের বছর বয়স, ছ' বছর কেটে গেছে তার লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে, কিন্তু বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয়নি তার। আজও রামু নিজের শক্তিতে চলতে পারে না বা কথা বলতে শেখেনি সে। শুধু নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয় মাত্র। বসে বসে বিছানায় ঝিমানো ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ নেই তার। শুধু কাঁচা মাংস আর সে খায় না এখন। রামুর চিকিৎসকরা হতাশ হয়ে বলেছেন, তার আর 'মানুষ' হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এতদিন যে সে এইভাবে বেঁচে আছে এইটাই নাকি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর ঘটনা। প্রকৃতি-পালিত মানবশিশুকে আবার মানব-সমাজে ফিরিয়ে আনলে তারা নাকি খুব অল্পই বাঁচে।

।। ঘরে ।।

২৪শে মে—১০ই জ্যৈষ্ঠ : 'ভারতের খাদ্যপরিস্থিতি অতীব সন্তোষজনক'—লোকসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীএস কে পাতিলের ঘোষণা।

নবপর্যায়ে পূর্ব পাকিস্থান হইতে উদ্বাস্তু আগমনজনিত সমস্যা—সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার সহিত কলিকাতায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আলোচনা।

লোকসভায় সমাজতন্ত্রী সদস্য শ্রীমণিরাম বাগরী সাতদিনের জন্য সাসপেণ্ড—স্পীকারের নির্দেশ অমান্য করিয়া বক্তৃতা দিতে যাওয়ার জের।

২৫শে মে—১১ই জ্যৈষ্ঠ : বালুরঘাট সীমান্তে আবার পাকিস্থানী হানা ও একটি মৌজা (ভাটসালা) দখলের চেষ্টা—ভারতীয় ফৌজ হাজির হওয়া মাত্র হানাদাররা উধাও।

নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য-বৃদ্ধি সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা—কারণ ও প্রতিকারের পন্থা নির্ধারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক কমিটি নিয়োগ।

বিদ্রোহী নাগা নেতা ফিজোর গোপনে পূর্ব পাকিস্থানে উপস্থিতির সংবাদ।

২৬শে মে—১২ই জ্যৈষ্ঠ : 'স্বাধীন সংবাদপত্র গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক'—কলিকাতায় ভারতীয় বার্তাজীবী ফেডারেশনের দশম বার্ষিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের উদ্বোধনী ভাষণ।

দণ্ডকারণ্য-প্রসঙ্গ ও শিয়ালদহের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না ও শ্রীমতী আভা মাইতির (পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী) মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

২৭শে মে—১৩ই জ্যৈষ্ঠ : বার্তাজীবীদের জন্য দ্বিতীয় বেতন বোর্ড গঠনের দাবী—ভারতীয় বার্তাজীবী ফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলনে (কলিকাতা) প্রস্তাব গৃহীত।

'হিন্দী শিক্ষা ব্যাপক না হওয়া পর্যন্ত ইংরাজী বহাল রাখার ব্যবস্থা—সরকার কর্তৃক পার্লামেন্টে বিল উত্থাপনের সিদ্ধান্ত—ওয়ার্ধায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা।

'পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মাইগ্রেশনের বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিতে হইবে'—ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে (কলিকাতায়) অনুষ্ঠিত জনসভায় দৃঢ় দাবী—পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ।

২৮শে মে—১৪ই জ্যৈষ্ঠ : রাশিয়া হইতে পরিবহণ বিমান ও হেলিকপ্টার ক্রয়ের প্রশ্ন—কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া লোকসভায় দেশরক্ষা মন্ত্রী মেননের ঘোষণা।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রদিগকে ঋণদানের পরিকল্পনা—শিক্ষানীতি সম্পর্কে চারিটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সরকারী সিদ্ধান্ত—লোকসভায় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ কে এল শ্রীমালীর বিবৃতি।

২৯শে মে—১৫ই জ্যৈষ্ঠ : চীনের প্রতি ভারতের কঠোর সতর্কবাণী—ফৌজ সংযত কর : আর এক পা'ও অগ্রসর হইও না।

ভারতের প্রতিরক্ষাবাহিনী ও দেশরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন সম্পর্কে ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীবি কে নেহরুর বিরূপ মন্তব্যে লোকসভায় বিক্ষোভ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক ভারতীয় দূতের আচরণের কার্যতঃ নিন্দা।

৩০শে মে—১৬ই জ্যৈষ্ঠ : সোভিয়েট জঙ্গী বিমান ক্রয়ের প্রশ্নে পশ্চিমী শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপে লোকসভায় তীব্র সমালোচনা—যে-কোন দেশের সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের অধিকার ভারতের আছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ।

এভারেষ্ট বিজয়ের শেষ পর্যায়ে ভারতীয় অভিযাত্রী দল—২৭,৯০০ ফুট উচ্চে শিবির স্থাপন।

॥ বাইরে ॥

২৪শে মে—১০ই জ্যৈষ্ঠ : মহাকাশ বিজয়ে আমেরিকার আর একটি সাফল্য—লেঃ কমাণ্ডার ম্যালকম স্কট কার্পেন্টারের (৩৭) ভূপৃষ্ঠ হইতে অরোরা-৭ মহাকাশযানে ঊর্ধ্বে উঠিয়া তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ।

২৫শে মে—১১ই জ্যৈষ্ঠ : প্যাথেট লাও বাহিনী (কম্যুনিষ্টপন্থী) কর্তৃক দক্ষিণ লাওসের সারাভানে সহর (প্রাদেশিক রাজধানী) দখল।

পশ্চিম ইরিয়ানে নূতন ইন্দোনেশীয় প্যারাসৈন্য দলের আমদানী—বিভিন্ন স্থানে ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনীর সহিত অব্যাহত সংঘর্ষ।

'থাইল্যাণ্ডে মার্কিন সৈন্যের অবতরণ লাওস প্রশ্ন মীমাংসার বাধাস্বরূপ'—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের অভিমত।

২৬শে মে—১২ই জ্যৈষ্ঠ : কাশ্মীরের জন্য পাকিস্থানের পররাষ্ট্র নীতির আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা—রাওয়ালপিণ্ডিতে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সভাপতিত্বে উচ্চ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

মধ্য আলজিয়ার্সে সশস্ত্র পুলিশ ও সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে লড়াই—স্থানে স্থানে গুলীবর্ষণ ও বিস্ফোরণের ঘটনা : অসংখ্য লোক হতাহত।

২৭শে মে—১৩ই জ্যৈষ্ঠ : পশ্চিম ইরিয়ানের বিরোধ মীমাংসায় 'বাংকার পরিকল্পনা' (মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ বাঙ্কার নির্দেশিত) গ্রহণে ওলন্দাজ সরকার প্রস্তুত—রাষ্ট্রসংঘকে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের কথা।

'১৫ই জুনের (১৯৬২) মধ্যে লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হইতে হইবে'—নিরপেক্ষতাবাদী প্রিন্স সুভন্না ফুমার চরমপত্র।

২৮শে মে—১৪ই জ্যৈষ্ঠ : সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক নূতন স্পুটনিক (কৃত্রিম উপগ্রহ) মহাকাশে উৎক্ষেপ—প্রতি ১০২·৭৫ মিনিটে স্পুটনিকটির (কসমস-৫) পৃথিবী পরিক্রমা।

পশ্চিম ইরিয়ানের ফাক ফাক সহরের চতুর্দিকে প্রচণ্ড সংগ্রাম—ওলন্দাজ নৌ-সেনাদলের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশীয় প্যারাসৈনিকদের অগ্রগতি।

২৯শে মে—১৫ই জ্যৈষ্ঠ : নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের শেয়ার বাজারে চূড়ান্ত বিপর্যয়—অত্যধিক কমমূল্যে শেয়ার বিক্রয়ের প্রবল উন্মত্ততা—বিশ্বের সমস্ত বাজারে প্রতিক্রিয়া।

মহাঘাতক আইকম্যানের মৃত্যুদণ্ড বহাল—ইস্রায়েলী সুপ্রীম কোর্টের রায়।

পশ্চিম ইরিয়ানে যুদ্ধ-বিরতির জন্য উ থান্টের (রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী-জেনারেল) আবেদন—ডাঃ সুকার্ণো (ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেণ্ট) ও অধ্যাপক কুয়ের (নেদারল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী) নিকট আপোষ-আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির দাবী।

৩০শে মে—১৬ই জ্যৈষ্ঠ : তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে ভারতের সহিত কাশ্মীর প্রশ্নের আলোচনার জন্য পাকিস্তানের নূতন প্রস্তাব।

অভয়ংকর --

॥ কিশোর অভিধান ॥

'অমৃতের' প্রথম বর্ষের ৯ম সংখ্যায় (২২শে আষাঢ়, ১৩৬৮) এই স্তম্ভে 'লেখক সমবায়' এই নামে একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ বলা হয়েছিল :

"আমাদের বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা 'সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের একনিষ্ঠ অনুশীলনে রুচি ও পরিচ্ছন্ন বোধের প্রয়োজন' এই চিন্তা নিয়ে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে 'লেখক সমবায় সমিতি' গঠন করেছেন এবং রেজেষ্ট্রীকৃত করাও হয়েছে। এই সমিতির পুরোভাগে বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী এবং সাংবাদিকদের নাম আছে, তবে বোধকরি স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ব্যতীত আর বিশেষ কেউ সক্রিয় সাহায্য করেননি। ...সৎ এবং সুনির্বাচিত সাহিত্য প্রকাশের দায়িত্ব এঁরা গ্রহণ করেছেন। এঁরা জীবনীকোষ, গ্রন্থপঞ্জী, অভিধান, বিশ্বকোষ প্রভৃতি প্রকাশের আশা রাখেন। বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই লেখক সমবায় গঠন এক বিশিষ্ট পথচিহ্ন।" ইত্যাদি......। সুখের বিষয় আজ এক বছরের ভিতর তাঁরা এক উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক দপ্তর থেকে ২৬ হাজার টাকারও অধিক সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। সেই অর্থে উদ্যোক্তারা যে 'কিশোর অভিধান' প্রকাশের জন্য উদ্যোগ করেছেন তার আনুমানিক ব্যয়ের অর্ধাংশ মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক অনুনয়েও আজো নীরব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্ধাংশ সাহায্য যদি না পাওয়া যায় তাহলে লেখক সমবায়ের সমগ্র প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে উদ্যোক্তারা আবেদন জানিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তালাভের পর কি বিরাট পরিকল্পনানুসারে তাঁরা 'কিশোর অভিধান' প্রকাশের আয়োজন করেছেন তার একটি নমুনা-সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। এই নমুনা-সংখ্যা আমাদের দেশের লেখক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যরসিকগণের মতামত লাভের উদ্দেশ্যেই প্রচার করা হচ্ছে। এর ফলে অভিধানটির মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। অভিধান সম্পর্কে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের মতের মূল্য সর্বাধিক।

নমুনা-সংখ্যাটি বিচার করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রস্তাবিত 'কিশোর অভিধান' সম্পূর্ণ হলে বাংলা ভাষার একটা বিরাট অভাব পূরণ হবে। 'কিশোর অভিধানে'র যে সব মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল তার কিঞ্চিৎ বিবরণ দান করলে আমাদের পাঠকরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে কি বিরাট প্রচেষ্টা 'লেখক সমবায়' সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

কিশোর অভিধান এক হিসাবে কোষ-গ্রন্থের সমতুল। এই অভিধানে প্রতিটি অর্থ ব্যাখ্যামূলক। শুধু প্রতিশব্দ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করা হয়নি। শব্দ-প্রয়োগের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে শিশুদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে চলতি ভাষার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। শব্দ-নির্বাচন সংকলকের খুশীমত করা হয়নি। কিশোরপাঠ্য গ্রন্থাদি থেকে শব্দ সংকলন করা হয়েছে। যে সব শব্দের ব্যবহার আছে শুধু সেই সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া প্রায় প্রতিটি শব্দ বোঝানোর জন্য ছবি দেওয়া হয়েছে, ছবিগুলি ভালো হাতের আঁকা, সুতরাং সুদৃশ্য। বস্তুনিষ্ঠ-চিত্র গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই কিশোর অভিধানটি পরিকল্পিত। সম্পূর্ণ হলে অভিধানটি ডবল ডিমাই আকারের পাঁচশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হবে এবং তাতে আনুমানিক দশ হাজার মূল শব্দ ও পাঁচ হাজার প্রত্যয়ান্ত শব্দ থাকবে।

শুধু সমার্থক শব্দের পরিবর্তে 'শব্দের অর্থ স্পষ্টতর করার জন্য যেখানেই সম্ভব প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, আর ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করে ছবি।' যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে আদা শব্দের নমুনা উদ্ধৃত করা গেল :

"আদা বিশেষ্য, আদা গাছের মূল। রান্নায় মশলা হিসাবে এবং নানা ওষুধে দরকার হয়। মুখে দিলে ঝাল লাগে।। আদা-নুন খেলে কাশি কমে।

আদা জল খেয়ে লাগা ।। মনের ইচ্ছা সফল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা।। পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য বীরু আদা জল খেয়ে লেগেছে।।

আদায়কাঁচকলায়—কিছুতেই বনে না; সাপে-নেউলে ।। ওদের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়, দেখা হলেই ঝগড়া শুরু হয়।"

এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় যে এই জাতীয় অভিধান শুধু বড় অভিধানের সংক্ষিপ্তসার মাত্র নয়। এর সংকলন-রীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তা ছাড়া ছবি সংযুক্ত থাকায় ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে অতিশয় আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সমগ্র অভিধানটিতে প্রায় সাতশ ছবি থাকবে। নমুনা-সংখ্যায় বিভিন্ন বাদ্য-যন্ত্রের রঙীন চিত্র দেওয়া হয়েছে।

স্বর্গত রাজশেখর বসু মহাশয় 'চলন্তিকা'য় যে রীতিতে শব্দবিন্যাস করেছেন 'কিশোর অভিধানে'র সম্পাদকগণ সেই রীতি অনুসরণ করবেন। এর ফলে নতুন শিক্ষার্থীরা চন্দ্রবিন্দুযুক্ত শব্দগুলি অতি সহজেই খুঁজে পাবে।

উদ্যোক্তারা বলেছেন যে, সবচেয়ে বড় সমস্যা পনের হাজার শব্দ নির্বাচন করা। দশ হাজার মূল শব্দ এবং পাঁচ হাজার প্রত্যয়ান্ত শব্দ 'কিশোর অভিধানে' থাকবে। পরিশিষ্টে থাকবে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যাবলী।

শব্দ-নির্বাচনে আমাদের দেশের সংকলকদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ইংরাজী ভাষার অভিধানকারদের সেই সমস্যা নেই। সেখানে বিশেষজ্ঞেরা কোন্ কোন্ বয়সের ছেলেমেয়েরা কোন্ শব্দ ব্যবহার করে তা সমীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত করে তালিকা মুদ্রিত করা আছে। এতদ্বারা অভিধান-সংকলনকর্ম অনেক সহজ হয়, একটা নির্দিষ্ট ধারানুসারেও হয়। আমাদের দেশে রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' ও সম্প্রতি প্রকাশিত সুধীরচন্দ্র সরকারের 'পৌরাণিক অভিধান' ও 'বিবিধার্থ অভিধান', প্রাণতোষ ঘটকের 'রত্নমালা' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী অভিধান বিভাগে

অতিশয় মূল্যবান সংযোজন। প্রচলিত ধারা ব্যতীত নূতন প্রচেষ্টার যে বিশেষ প্রয়োজন এই বিষয়ে আমাদের সাহিত্যিকরা সচেতন।

'কিশোর অভিধান' সংকলনের জন্য 'লেখক সমবায় সমিতি' একটি উপদেষ্টা সমিতি গঠন করেছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও পুলিনবিহারী সেন এই উপদেষ্টা সমিতির সভ্য। 'কিশোর অভিধানে'র পরিকল্পনাটি তাঁরা অনুমোদন করার পর কেন্দ্রীয় সরকার অতিশয় তৎপরতার সঙ্গে আর্থিক সাহায্য দান করেছেন, এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৎপর হলেই পরিকল্পনাটির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়।

উদ্যোক্তরা বলেছেন : "শব্দ নির্বাচন করা হয়েছে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক এবং গল্পের বই থেকে। তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক, এবং অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রভৃতি লেখকের গল্প ও ছড়ার বই থেকে প্রায় পনের হাজার শব্দ কার্ডে লেখা হয়েছে। শব্দ সংগ্রহ করা হয়েছে শ' খানেক বই থেকে।" অভিধানের মূল-ভিত্তি হবে এই পনের হাজার শব্দ।

জাতিগঠনমূলক এই প্রচেষ্টার জন্য 'কিশোর অভিধানে'র সংকলক বঙ্গীয় লেখক সমবায় সমিতিকে অভিনন্দন জানাই। তাঁদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক। বাংলাভাষায় 'কিশোর অভিধান' সম্পূর্ণ হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই। *

---

* **কিশোর অভিধান**—(নমুনা সংখ্যা) লেখক সমবায় সমিতি।

৭৩বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে রোড, কলিকাতা—২৬।।

এক নদী বহু তরঙ্গ—মিহির আচার্য। বুক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া লিঃ। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ৪·৫০ নঃ পঃ।

শ্রীমিহির আচার্য নতুন লেখক নন। তাঁর কয়েকটি বই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এবং গল্পলেখক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর যে পরিণতি লক্ষ্য করা গেল তা গল্পের মধ্যে তেমনভাবে ধরা পড়েনি। সেজন্যে বই-খানি গভীরতর অভিনিবেশ দাবি করতে পারে।

উপন্যাসের নায়িকা গৌরী এবং সে-ই কেন্দ্রচরিত্র। কিশোর বয়স থেকে শুরু করে তার পূর্ণ-পরিণত নারী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনীই আলোচ্য উপ-ন্যাসের উপজীব্য। তার জীবনের প্রবাহ বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার তরঙ্গাভিঘাতে মোহানার দিকে এগিয়ে চলেছে, কিশোর

বয়সের কুয়াশামদির স্বপ্নচারণ থেকে বাস্তবের কঠিন জগতে উত্তরণ—তারই কতকগুলি সূক্ষ্ম-জটিল আলেখ্য লেখক অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করে তুলেছেন এখানে।

সকলেই জানেন, উপন্যাসের সার্থকতা নির্ভর করে চরিত্রসৃষ্টির মুন্সীয়ানার উপরে। মিহিরবাবু গৌরীকে একালের একটি অত্যন্ত পরিচিত মেয়ের চারিত্র্য দিতে পেরেছেন, এটা তাঁর কৃতিত্বের বিষয়। আনুষঙ্গিক চরিত্র হিসাবে গৌরীর দিদি সন্ধ্যা, নবেন্দু, পুলকেশ-বাবু, ভারতী ইত্যাদিও স্বপ্রতিষ্ঠ।

কিন্তু নায়ক হিসাবে এ উপন্যাসে যাঁকে উপস্থিত করা হ'য়েছে, তিনি গৌরীর পরিপূরকভাবেই এসেছেন। ফলে চরিত্রটির নিজস্ব গতিবেগ যেন কিছুটা স্তম্ভিত এবং সেইকারণে ঐ চরিত্রটি (বিনায়কবাবু) যথেষ্ট পরিমাণে জীবন্ত হ'য়ে উঠতে পারেনি। গৌরীর আজন্ম-অভ্যস্ত তুচ্ছতা এবং স্বার্থপরতার পট-ভূমিতে নায়ককে বেশ খানিকটা উদাসীন এবং মহৎ মনে হয় বটে, কিন্তু তাঁর প্রথম বিবাহিত দাম্পত্যজীবনের অসাফল্যের পর তাঁকে যে-অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে পার হ'য়ে আসতে হ'য়েছে তার দু'একটা ক্ষতচিহ্ন তাঁর ভিতরে আবিষ্কার করতে পারলে আমরা খুশি হতাম। বস্তুত, বিনায়ক যতোটা অন্যের জবানিতে স্পষ্ট, নিজের আচরণে ততো নয়।

এই প্রসঙ্গে মিহিরবাবু শক্তিমান লেখক বলেই একটা কথা উল্লেখ না করে পারছি নে। গৌরীর বাবা-মা ও কাকার ভিতরে যে ধরণের অস্বাভাবিক সম্পর্কের চিত্র বইয়ের প্রথমাংশে তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন, সেটা বাস্তবে একেবারে অমিল না হলেও আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিনিধিত্বমূলকও তা নয়। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা আজ বহুমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হ'য়েও কদাচার, দুর্নীতি এবং স্বার্থান্ধতার পাঁকেই একেবারে তলিয়ে যায়নি। কিন্তু মিহিরবাবু তাঁর নায়িকা গৌরীকে আলোকাভিসারিণী হিসাবে উপস্থিত করলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্ধকার দিকটাই যেন একটু বেশি ক'রে দেখিয়েছেন। এতে মনের মধ্যে কিছুটা অতৃপ্তিবোধ থেকে যায়।

অবশ্য যেটুকু মিহিরবাবু দেখিয়েছেন, তার মধ্যে কোনো ফাঁক তিনি রাখেননি। তাঁর শিল্পীদৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ এবং বর্ণনাভঙ্গি নিপুণ। তাছাড়া সততা নামক যে বস্তু না থাকলে কোনো রচনাই জীবন্ত হ'য়ে ওঠে না, সেই নিরভিমান বিষয়নিষ্ঠাও তাঁর মধ্যে সুগভীর। প্রকৃতপক্ষে এই সততার জোরেই তাঁর ভাষার মধ্যে একটি অন্তরঙ্গতার আকর্ষণ দেখা দিয়েছে, যার ফলে বইখানি পড়তে শুরু করলে শেষ না ক'রে পারা যায় না। অথচ কোথাও বাড়াবাড়ি নেই, অত্যন্ত নাটকীয় মুহূর্তগুলিও তিনি সংযতভাবে অতিক্রম করে গেছেন। কলমের উপর এমন ধরণের দখল বড় সুলভ নয়।

বইখানি ছাপা-বাঁধাই চমৎকার।

রবীন্দ্র নির্দেশিকা— নির্মলেন্দু রায়-চৌধুরী। ক্যারিয়ন পাবলিকেশনস্, ৭৬, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম— দশ টাকা।

নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী একজন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক। রবীন্দ্র-সাহিত্যের 'রেফারেন্স' গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনু-ভব করে 'আয়তনে শোভন' এবং প্রশ্ন সমাধানে 'যন্ত্রবৎ' একটি গ্রন্থ রচনায় তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রচুর পরি-

শ্রম করে তাঁর সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছে। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জী, রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ডানুক্রমিক সূচী, মূলগ্রন্থের সূচী, কবিতার বর্ণানুক্রমিক সূচী, ছোটগল্পের বর্ণানুক্রমিক সূচী ও প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পরিশিষ্টে গ্রামোফোন রেকর্ডে কবিকণ্ঠ, রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্র-সাহিত্যের চিত্রায়ণ, পেশাদার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি তালিকাও দান করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিক, গবেষক প্রভৃতিদের কাছে 'রবীন্দ্র নির্দেশিকা' একটি মূল্যবান রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠকের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। মূল-গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক সূচী থেকে দেখা যায় যে গ্রন্থগুলিকে কবিতা ও গান, নাটক ও প্রহসন, উপন্যাস ও গল্প এবং প্রবন্ধ এই চার শ্রেণীতে ভাগ করে বর্ণানুক্রমিক সাজানো হয়েছে। গ্রন্থের নাম ও তার পাশে প্রকাশকাল ও পরে রচনাবলীর খণ্ড সংখ্যা ও পৃষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া আছে। যেসব নাটক রবীন্দ্রনাথ পরে নতুন নামকরণ করেছেন তা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। নাটকের বিষয়ানুক্রমিক সূচীও দেওয়া হয়েছে। সংকলক নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী প্রচুর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে যে বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্য-সাগর মন্থন করেছেন তার তুলনা কোথায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এমন সুন্দর এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত নির্দেশিকা গ্রন্থ আর দেখা যায় না। রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগীদের করকমলে উৎসর্গীকৃত এই বিরাট গ্রন্থ নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য।

ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ সুরুচি-সংগত।

বৈষ্ণব সাহিত্য— ত্রিপুরাশঙ্কর সেন-শাস্ত্রী। এস, ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং। ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা।

প্রধানতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনে এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটি লিখিত। ইতিমধ্যে আরো দু'একটি ছাত্রবোধ বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে, বহু পণ্ডিত আলোচনা করলেও বৈষ্ণব-সাহিত্য অতলস্পর্শ সমুদ্রের ন্যায়। লেখক বলেছেন যে, "বর্তমানকালের স্বল্পপরিসর জীবনে অনেকের পক্ষেই বিপুলায়তন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করা সম্ভব নহে, তাঁহাদের পক্ষে গ্রন্থখানি 'বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রবেশিকা'র কার্য করিবে।" এই স্বল্পায়তন গ্রন্থে প্রাকচৈতন্য যুগের বৈষ্ণব দর্শন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণবচরিত্র সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য, বৈষ্ণব ধর্ম ও সহজিয়া তত্ত্ব প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পণ্ডিতপ্রবর ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী অতিশয় সুললিত ভঙ্গীতে ও সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। গঙ্গা-যমুনার ধারার মত বাংলা দেশকে রসপ্রবাহে সিক্ত করেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ও শাক্ত সাধনা। তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের পক্ষে এত সহজবোধ্য করে রচিত গ্রন্থ সংখ্যায় বেশী নেই। বৈষ্ণবসাহিত্য রসের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা দ্বারা লেখক ষোড়শ শতাব্দীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যজীবনকে কেন্দ্র করে যে মহাভাবের প্লাবন প্রবাহিত হয়েছিল তার পরিচয়দান করেছেন।

রবীন্দ্র-বীক্ষা (সংকলন)— সম্পাদনা: নীলরতন সেন। এশিয়া পাবলিশিং হাউস, এঃ ১৩২, ১৩৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম বারো টাকা।

শতবার্ষিকী বৎসরে প্রকাশিত রবীন্দ্র-সংকলন গ্রন্থের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থখানি নানাবিধ কারণে উল্লেখযোগ্য। পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ দুটি অংশে সমস্ত লেখা সাজান হয়েছে। পূর্বভাগে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদ বধকাব্য' সম্পর্কে দুষ্প্রাপ্য আলোচনা এবং বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিষয়ক বিতর্কমূলক মূল্যবান আলোচনা সংকলিত হয়েছে পুরনো পত্রিকাদি থেকে।

উত্তরভাগে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট), ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী (সংগীতে রবীন্দ্রনাথ), মোহিতলাল মজুমদার (রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ), প্রবোধচন্দ্র সেন (রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে অশোক), শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথের তিনসংগী), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (প্রকৃতির প্রতিশোধ), অমিয় চক্রবর্তী (রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা), শশিভূষণ দাশগুপ্ত (রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ প্রবন্ধ), প্রমথনাথ বিশী (রবীন্দ্র-তত্ত্বনাট্যের ভূমিকা), অন্নদাশঙ্কর রায় (জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ), অশোকবিজয় রাহা (রবীন্দ্রকাব্যে শিল্পের ত্রিধারা), অজিতকুমার ঘোষ (রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ ও নাট্যশিল্প চেতনা), নীলিমা ইব্রাহিম (রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ), বুদ্ধদেব বসু (রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা), রথীন্দ্রনাথ রায় (রবীন্দ্রনাথের বাঁশরী), দেবীপদ ভট্টাচার্য (রবীন্দ্র-জননী সারদা দেবী) ও ভবানী সেন (একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী)।

সংকলনের দিক থেকে সম্পাদক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পরম নিষ্ঠার সংগে পালন করেছেন বলেই 'রবীন্দ্রবীক্ষা' রবীন্দ্র-গবেষক, রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু পাঠক-সাধারণের প্রয়োজনের সহায় হবে। প্রবন্ধ সংকলন, মুদ্রণ, বাঁধাই, প্রচ্ছদ প্রভৃতির দিক থেকে গ্রন্থটি একটি সুপ্রকাশন।

বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত কাহিনী (তৃতীয় পর্ব)—ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—৩·৫০ নঃ পঃ।

এই পর্বে "রেড্ হুট্ স্করফিয়ন গ্যাংগ" বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গ্যাঙের রহস্য-কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে এই দল অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে। লেখক এই পুস্তকে অপরাধ-বিজ্ঞান আলোচনার পূর্বে ভূমিকায় হৃদ্যতার সংগে অপরাধী ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। মূল বিষয়বস্তুর সংগে সঙ্গতি ও যোগসূত্র রেখে অপরাধীর শ্রেণী বিভাগ এবং তার সার্থক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে লেখকের প্রয়োগকুশলতা প্রশংসনীয়। এই সংকলনের অংশটি সুখপাঠ্য এবং যুক্তিশীল মননকুশলতায় সার্থক প্রকাশ। লেখক একজন প্রখ্যাত পুলিস অফিসার। কর্তব্যোপদেশে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম ও বিশ্লেষণধর্মী মন দিয়ে তা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। পুলিস অফিসার হলেও অপরাধীর প্রতি তাঁর আন্তরিক মমত্ববোধ রচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাপকে তিনি উন্মুক্ত করেছেন, অপরপক্ষে পাপীকে ক্ষমার যোগ্য বিবেচনা করেছেন। সমাজের বিভিন্ন সমস্যাগুলি লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। এই মামলার প্রত্যক্ষ বিবরণ দেওয়ার সময় লেখক পুলিসের কার্যধারা, অসমসাহসিকতা এবং ধৈর্যের সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন; অত্যন্ত সহানুভূতি ও মমতার সংগে সমগ্র কার্যধারাটির বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

আমি মুসাফির— শ্রীমন্ত। অগ্রণী প্রকাশনী, এ১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

শ্রীমন্ত লেখক হিসাবে নতুন হলেও তাঁর কলমটি পাকা। অনেকদিন বাদে এই ধরনের গ্রন্থ পড়ে অভিভূত হলাম।

অন্যান্য সাধারণ মানুষের সংগে লেখক গিয়েছিলেন নেপালের পশুপতিনাথ ধাম দর্শনে। বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয়েছিল। সর্বভারতীয় মানব সমাবেশে তিনি স্রষ্টার ভূমিকাই শুধু গ্রহণ না করে তাদের অন্তরঙ্গ জন হিসাবে মিশে গিয়েছিলেন। যে ক'টি মানুষের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই রক্ত-মাংসের স্বাভাবিক রূপটা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। প্রতিটি চরিত্রই স্বকীয়তায় ভাস্বর। নারীমনের বিচিত্রতা সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম দক্ষতার সংগে রূপায়িত হয়েছে। নেপালের নানাবিধ সমাবেশে অংশগ্রহণ-লেখকের গোপনীয় পরিচয় সম্পর্কে পাঠককে উৎসুক করে তোলে। যে নারীর হস্তস্পর্শে সমস্ত ব্যথা বেদনা ভুলে গিয়ে বিদেশে নায়ক অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করেছিলেন তার পরিণতি যেভাবে সমাপ্ত হয়েছে তা লেখকের ভ্রমণবিলাসী মনকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। গ্রন্থকারের সহজ বর্ণনাভঙ্গীমা, চরিত্র-চিত্রণের নিপুণ দক্ষতা আলোচ্য গ্রন্থখানিকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থান দেবে নিঃসন্দেহে। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি আরও সার্থক রচনায় বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবেন।

মৃগতৃষ্ণা— (উপন্যাস)—দেবপ্রিয় দে। নব বলাকা প্রকাশনী, দাম ২·৫০।

উপন্যাসে জীবন এবং সমাজের পটে জীবনের চলন্ত ছবি দুইই আমাদের কাম্য। লেখকের অভিজ্ঞতার পারিপার্শ্বিককে এই দ্বৈত রূপের সাধনা চলে। বর্তমান লেখকের সার্থকতা তিনি মধ্যবিত্ত সমাজকে দেখেছেন আর দেখেছেন চিত্রার প্রেমকে যা অচলায়তন সমাজের চাপে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু চিত্রা এক দর্পিতা নারী। বাড়ির অমতে ভালবেসে রেজিষ্ট্রি মতে বিয়ে করে, তবু সুবীরের কাছে প্রেম নয়, স্বাধীনতা তার কাম্য। ছাত্রীদের কাছে সুনাম পায় সাজসজ্জার জন্য, বান্ধবীদের কাছে সুগায়িকা হিসেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিত্রা পরাজিত প্রেম নিয়ে মায়ের কোলে ফিরে আসে, আর অনুরোধা তখন কন্যার কলঙ্কিত আচরণের সংবাদে উন্মাদ। এই উৎকেন্দ্রিক আবহাওয়ায় উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

'মৃগতৃষ্ণা' উপন্যাসে চলিষ্ণু প্রগতিশীল সমাজের সংগে আচারধর্মী সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের সংঘর্ষে কাহিনী যেমন দানা বেঁধেছে, লেখকের বক্তব্যও সেই পরিমাণে পরিস্ফুট হয়েছে। এই দুয়ের সমন্বিত আকর্ষণ একটি নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে সমাপ্তি লাভ করেছে।

কিছু চরিত্র অস্ফুট এবং স্বতো-বিরোধের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। রমেন-অমলা কাহিনীর মাঝপথে মিলিয়ে গেছে। সুবীর চরিত্রে কোন আন্তরিক বিকাশ নেই। তবে গোবিন্দর মতো ক্ষমাশীল, কেশব-ভবেশের মতো উঞ্ছ-বৃত্তিজীবী টাইপ চরিত্র অঙ্কনে লেখকের দক্ষতা অসামান্য। 'মৃগতৃষ্ণা' পড়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে লেখক সন্নিষ্ঠ এবং সেইহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধে উত্তীর্ণ।

প্রকাশক ছাপা ও বাঁধাইয়ের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন।

মঙ্গলা—(উপন্যাস)—আনন্দাবাঈ সাঠে। বঙ্গানুবাদ—বোম্মানা বিশ্বনাথম। নয়া প্রকাশ। ২০৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬। দাম দুই টাকা।

বর্তমান মারাঠী সাহিত্যের অন্যতম মহিলা ঔপন্যাসিক শ্রীআনন্দাবাঈ সাঠে রচিত মঙ্গলা গ্রন্থটি অগ্নিযুগের পটভূমিকায় রচিত একখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। অত্যাচারিত জনসাধারণ কিভাবে ধীরে ধীরে শাসক-শ্রেণীর

অত্যাচারের বিরুদ্ধে নানাবিধ প্ররোচনা সত্ত্বেও সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল গ্রন্থখানি তারই বর্ণনায় মুখর। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এত অধিক চরিত্রের সমাবেশ সত্ত্বেও কাহিনীর গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি। চরিত্রগুলির জীবন্ত রূপ লেখিকার সার্থক প্রতিভার পরিচায়ক।

অনুবাদক বিশ্বনাথমের অনুবাদও সার্থক। বাংলা ভাষায় তিনি যে কতদূর দক্ষ তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে গ্রন্থটি পাঠ করলে। অনুবাদককে ধন্যবাদ জানাই এবং এ কাজে আরও সার্থকতর প্রয়াস কামনা করি। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে এইটিই বাংলায় অনূদিত প্রথম মারাঠী উপন্যাস।

জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে (দিব্য-চিন্তা)—**বঙ্কিমচন্দ্র সেন। প্রকাশক —রাইমোহন আচার্য। সি. আই. টি বিল্ডিংস। ব্লক নং ড. ফ্ল্যাট নং ৩২ কলিকাতা-১০। দাম—তিন টাকা।**

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন বাংলা দেশের একজন বরেণ্য সাংবাদিক। ময়মনসিংহ জেলার মানুষ যথাক্রমে শিক্ষকতা, পাটের অফিসে কেরানীগিরি প্রভৃতি কাজ করে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গলী' অফিসের কপি হোল্ডারী কর্ম গ্রহণ করেন, পরে 'সার্ভেন্ট' পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করে 'দৈনিক হিন্দুস্থানে'র সম্পাদনা করেন। ১৯২৬ সাল থেকে তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' যোগদান করেন এবং 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেন। এই সময় তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিকতার এক ধারা পরিস্ফুট হয়, প্রভাতে তিনি বাগবাজারের গোলাবাড়ি ঘাটে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। ১৩৫৬ সালের ৫ই আষাঢ় তিনি ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে গুরুতর আহত হন, হাসপাতালে তাঁর পায়ের গোড়ালির উপর পর্যন্ত কাটতে হয়, সেখানে তিনি অপরিসীম সাহস, ধৈর্য এবং মনোবলের পরিচয়দান করেন। ভক্তপ্রবর দিলীপকুমার রায় এই গ্রন্থের প্রাককথনে বলেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়কে দর্শন করতে যাই গভীর ঔৎসুক্য তথা শ্রদ্ধা নিয়ে। গিয়ে দেখি তিনি কাটা পা নিয়ে একটি ছেঁড়া মাদুরে বসে। ইন্দিরা ও আমাকে সম্ভাষণ তিনি কথার পর কথা বলে চললেন উজিয়ে উঠে—সে কি নির্বারিত আনন্দ-উচ্ছ্বাস যার বাদী সুরে ছিল ধর্মের বাণী, ভক্তির সুরঝংকার। তিনি একটিও প্রশ্ন করলেন না আমাদের—শুধু উচ্ছ্বসিত আবেগে নানা উপমায়, উৎপ্রেক্ষায়, কথিকায় আনন্দজ্ঞাপন যে, ভক্তের দেখা পেলেন। এই বঙ্কিমচন্দ্র সেন। নিরহঙ্কারী। আত্মাভিমানশূন্য বঙ্কিমচন্দ্র যখন শারীরিক ক্লেশে ক্লিষ্ট তখন তাঁর মনে হয়েছে যে সর্বৈশ্বর্যবিনির্মুক্ত সৌলভ্যে ভগবানকে মুমূর্ষু জীবের কাছে এসে ধরা দিতে হয়েছে। অবশ অবস্থায় আস্বাদিত শ্রীভগবানের অঘোঘনাশে প্রেমভক্তির বিলাস-লীলা মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে জয়যুক্ত হয়েছে। 'জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দিব্যচিন্তার এক অপূর্ব নিদর্শন। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশকালে এই নিবন্ধাবলী প্রশংসিত হয়েছিল, এখন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়ায় প্রকাশককে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। প্রচ্ছদপটটি আশ্চর্য সুন্দর এবং ভাবদ্যোতক। শিল্পীর নাম উল্লিখিত নেই।

ধর্ম ও অনুভূতি (২য় খণ্ড)—**ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃতে যৌগিক রূপ)—কুড়িয়ে পাওয়া মাণিক। প্রকাশক—জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১৪। দাম তিন টাকা।**

অমর গ্রন্থ কথামৃতের ভিত্তিতে 'শ্রীমাণিক' ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর যৌগিক রূপদানের চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন মহাপুরুষের বাণী তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারায়। গ্রন্থটি ভক্তজনের ভালো লাগা সম্ভব তবে আয়তনের অনুপাতে মূল্য কিঞ্চিৎ বেশী মনে হয়।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

পরিচয়—সম্পাদক : গোপাল হালদার ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মাসিক পত্র 'পরিচয়ের' এইটি নববর্ষ সংখ্যা। এ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন গোপাল হালদার, সুশোভন সরকার, অশোক রুদ্র। কবি রাম বসু লিখেছেন পাহাড়ের ডাক নামে একটি কাব্যনাট্য এবং 'কাব্যনাটক প্রসঙ্গে' আলোচনা করেছেন অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-চিত্রকলা ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্র মজুমদার ও সরোজ আচার্য। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, মনীন্দ্র রায়, চিত্ত ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, মৃগাংক রায়, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও শিবশম্ভু পাল। সমরেশ বসু, দেবেশ রায় এবং বরেন গঙ্গোপাধ্যায় গল্প লিখেছেন। চার্লি চ্যাপলিনের একটি গল্প অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণ ধর। এ সংখ্যার প্রচ্ছদপট এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়।

চতুষ্কোণ—সম্পাদক : শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। ২০৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

'চতুষ্কোণ' দীর্ঘ দিনের পত্রিকা না হলেও তার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বহু জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আলোচ্য সংখ্যার সব থেকে উল্লেখযোগ্য রচনা গোপাল হালদারের 'উচ্চশিক্ষার ভাষা'। অন্যান্য যাঁরা প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অমর্ত্য সেন, অতুল দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি মুখোপাধ্যায়, সুভাষ সরকার, সুকুমার মিত্র ও সুজিত দত্ত। আনা আখমাতোভা, আলেকজান্ডার ব্লক, নিকোলাই গুমিলেফ, নীটশে, কনরাড মেয়ার, স্টিফেন স্পেন্ডার পল এলুয়ার, চার্লস কসলে, জাক প্রেভের হুয়ান হিমেনেথ, গিয়েসেপ উনগারিত্তি, লুইস সার্কানিস, টমগান প্রভৃতির কবিতার অনুবাদ করেছেন কয়েকজন কবি। অনুবাদের সঙ্গে মূল পাঠ ছাপা হলে ভাল হত। 'নতুন বই' পর্যায়ের আলোচনাগুলি মূল্যবান।

বৃষ্টি ধোয়া পথে সমস্যা শুকনো পায়ে চলা।
এই সমস্যার সমাধান বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো।
রবারের জুতো আগাগোড়া ছিদ্রহীন, তাই জলের প্রবেশপথ বন্ধ।
এই ধরনের জুতোয় প্রয়োজন উৎকৃষ্ট রবার, বাটার জুতোয় তা পাবেন।
মসৃণ চিক্কণ রবার, বহু ব্যবহারেও কেনার প্রথম দিনের মতো আনকোরা, ছিমছাম।
আরামের জন্য জালি কাপড়ের লাইনিং।
চামড়া, সোল্ আর হিল্-এ এমন নকশার কৌশল,
যা পারতপক্ষে হড়কাবে না।

খেয়ালী এভারেস্ট

আনন্দকুমার সেন

অজানাকে জানা, দুর্গমকে অতিক্রম করা, অলভ্যকে লাভ করা মানবমনের চিরন্তন জাগ্রত জিজ্ঞাসা। বিপদসংকুল নদ-নদী সমুদ্র পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে মানুষ তার বিজয়-নিশানা এগিয়ে নিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। চির-তুষারাবৃত হিমালয়ের শীর্ষবিন্দু বিগত চল্লিশ বছর ধরে বহু দুঃসাহসিকের মনকে টেনে নিয়ে গেছে। মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে তাদের সে অভিযাত্রার পরিণতি কখনও হয়েছে বিয়োগান্ত কখনও আনন্দময়।

১৯৫৩ সালের ২৯শে মে জন হান্টের নেতৃত্বাধীন তেনজিং আর হিলারী চিরউন্নত এভারেস্টের শির নত করে দিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা স্তব্ধ হল না। ১৯২১ সালে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল কর্ণেল হাওয়ার্ড বারের নেতৃত্বে তাকে আজও প্রচণ্ড তুষারঝঞ্ঝার রাজত্ব অভি-মুখে এগিয়ে নিয়ে চলেছে মেজর জন দিয়াসের মত অসীম সাহসী মানুষেরা। ২৮ হাজার ফুট ওপরে গভীর ঠাণ্ডার মাঝখানে এবারের ভারতীয় অভিযাত্রী দলকে তিন দিন কাটাতে হয়েছিল। এর আগে অত উঁচুতে ২৪ ঘণ্টার বেশী কেউ থাকতে পারেননি। ভারতীয় অভিযাত্রী দলের এই রেকর্ড ভবিষ্যৎ অভিযাত্রী দলকে সাহায্য করবে।

ইতিপূর্বে যাঁরা এভারেস্টের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণে বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় রেখে গেছেন তাঁদের কথা স্মরণীয়। বিশেষ করে তাঁদেরই অভিজ্ঞতা একালের অভিযাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেছে। ১৯২২ সালে জে. জি. ব্রুসের নেতৃত্বে ২৬,৯৮৫ ফুট উঠেছিল একটি আরোহী দল: ১৯৩৩ সালে হিউজ রাটলেজের নেতৃত্বে ২৭,৪০০ ফুট ওপরে আরও একটি দল উঠতে সক্ষম হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৯২৪ সালে লেঃ জেঃ ই. এফ. নর্টন-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযাত্রী দল ২৮,১২৬ ফুট উঠতে সক্ষম হয়েছিল। এর আগেও যে সমস্ত অভিযান চলে তার মধ্যে বিশেষ কেউই উল্লেখযোগ্য রেকর্ড সৃষ্টি না করতে পারলেও ১৯৫২ সালে ডাঃ উইস-উনান্টের নেতৃত্বে ল্যাম্বার্ট ও তেনজিং ২৮,২১০ ফুট উঠতে সক্ষম হন। এই বৎসরই অপর একটি অভিযান হয়। তার-পর ১৯৫৩ সালে তেনজিং ও হিলারী এভারেস্টের অজেয় নাম ক্ষুণ্ণ করে মানব-ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করলেন।

১৯৫৬ সালে সুইস অভি-যাত্রী দল ২৩ মে ও ২৪ মে দুদিনেই এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন। ১৯৬০ সালের ২৫ মে একটি চীনা পর্বতারোহী দল এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেছেন বলে দাবী করা হয়ে থাকে। এ বৎসরই ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিংহের নেতৃত্বাধীনে প্রথম ভারতীয় দল ২৮,৩০০ ফুট উঠে প্রতিকূল আব-হাওয়ার জন্য ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

বর্তমান বৎসরে অভিযানটির উদ্যোগী ছিলেন ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউ-ণ্ডেশন এবং দলের নেতা ছিলেন মেজর জন দিয়াস। দলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন লেঃ কোহলি (উপনেতা): সোনাম গিয়াৎসো, গুরুদয়াল সিং, সি. পি. ভোহরা; ও. পি. শর্মা; ফ্লাইট লেঃ এ কে চৌধুরী: ক্যাপ্টেন এ বি যুংপালওয়ালা; কে. পি. শর্মা; হরি জং: ক্যাপ্টেন মুল্লিক রাজ ও সুমন দুবে: ডাঃ নানাবতী (ডাক্তার): ক্যাপ্টেন সোয়ারেজ (ডাক্তার): ও, পি, বৈবেদ্য (সিগন্যালম্যান); বাল-

এবারের অভিযাত্রী দলের নেতা জন দিয়াস (তৃতীয় সারির প্রথম) ও তাঁর অন্যান্য সহযোগিবৃন্দ
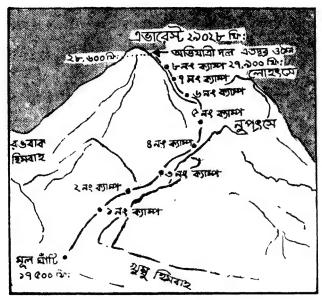
বর্তমান অভিযাত্রীদলের গমনপথ

কৃষ্ণান (সিগন্যালম্যান); আং থারকে (শেরপা সর্দার); সোনাম গিরমি (সহকারী সর্দার)।

শিখর-অভিযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন—লেঃ কোহলি, সোনাম গিয়াৎসো, গুরুদয়াল সিং ও হরি জং।

অভিযাত্রী দলের যাত্রা শুরু হয় ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ঐ দিন তাঁরা দিল্লী থেকে যাত্রা আরম্ভ করেন। ১৩ হাজার ফুট ওপরে ওঠেন ৭ই মার্চ। ২৭শে মার্চ পৌঁছান ১৬ হাজার ৪ শত ফুট—লাবজুতে। ২৯শে মার্চ মূল শিবির স্থাপন করেন আরও ৫ শত ফুট উঁচুতে।

১লা এপ্রিল—১৯ হাজার ফুট—এক নম্বর শিবির; ৫ই এপ্রিল—২০ হাজার ফুট—দুই নম্বর শিবির; ৭ই এপ্রিল—২১ হাজার ফুট—তৃতীয় শিবির; ৮ই এপ্রিল—২৩ হাজার ফুট—চতুর্থ শিবির; ৫ই মে—২৪ হাজার ফুট—পঞ্চম শিবির—এইভাবে শিবির স্থাপন করে তাঁরা ২১শে মে সাউথ কলে হাজির হলেন। সাউথ কলে পৌঁছবার আগেই কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে। যার ফলে সাউথ কলে পৌঁছতে দেরী হয়ে যায়। একজন শেরপা মারা যায় এবং দুইজন আহত হয়।

১৮শে মে ২৭,৯০০ ফুট উঁচুতে তাঁরা সপ্তম বা শেষ শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু আবহাওয়া সম্পূর্ণ প্রতিকূল থাকায় তাঁদের পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু তাঁরা সাউথ কলে ফিরে এলেন না। সপ্তম শিবিরেই অবস্থান করতে লাগলেন। ২৯শে মে আবহাওয়া আরও খারাপ হল। কিন্তু তাঁরা শিবির ত্যাগ করলেন না। এ অবস্থায় তাঁদের পক্ষে সাউথ কলে ফিরে আসা নিরাপদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সপ্তম শিবিরে দুর্যোগ অগ্রাহ্য করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

৩০শে মে আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও সকাল ৭টায় দলটি যাত্রা শুরু করে। ৯টা নাগাদ আবহাওয়া আরও খারাপ হয়ে এল। ২-৪৫ মিনিট পর্যন্ত তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও শেষপ্রান্তে পৌঁছতে পারলেন না। অবশেষে ইচ্ছা ত্যাগ করে তাঁদেরকে ফিরতে হল। তুষার-ঝঞ্ঝার সঙ্গে লড়াই করতে করতে রাত্রি দশটার সময় তাঁরা সপ্তম শিবিরে ফিরে আসতে সক্ষম হলেন। কিন্তু অনুকূল আবহাওয়ার আশায় দলটিকে তিনদিন তিন রাত্রি ২৮ হাজার ফুট ওপরে অবস্থান করতে হয়। আগেই বলেছি গত ৪০ বৎসর ধরে এভারেস্ট জয়ের যে অভিযান চলেছে তার মধ্যে কোন দলই এক রাত্রির বেশী এত উঁচুতে অবস্থান করতে পারেনি। পর্বত অভিযানের ইতিহাসে এই অভিজ্ঞতা অভিনবই মাত্র নয়, একটি রেকর্ডও বটে।

এভারেস্টের উচ্চতা ২৯,০২৮ ফুট। বর্তমানে অভিযাত্রী দলটি ২৮,৬০০ ফুট পর্যন্ত উঠতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মূল চূড়ার ৪০০ ফুট নীচ হতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। আবহাওয়ার কোন উন্নতির সম্ভাবনা না থাকায় এবং একদিনের মধ্যে বর্ষা নামার সম্ভাবনা থাকায় তাঁরা শৃঙ্গে আরোহণের কোন ঝুঁকি না নিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

এই অভিযান থেকে অভিযাত্রী দল যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা ভবিষ্যতের যে-কোন যাত্রীদলের পক্ষে সহায়তা করবে। যে সাহস, সহিষ্ণুতা ও দক্ষতার পরিচয় তাঁরা তুলে ধরেছেন তা বিশ্বের পর্বতারোহী দলের মধ্যে তাঁদের উল্লেখযোগ্য স্থান করে দেবে।

অভিযাত্রী দলের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ তাঁর বাণীতে বলেছেন যে, "অত্যন্ত মন্দ আবহাওয়া সত্ত্বেও আমাদের শৃঙ্গ-অভিযাত্রী দল ২৮,৬০০ ফুট পর্যন্ত উঠতে সক্ষম হয়। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হন। তাঁদের অত্যধিক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তিন রাত্রি ২৮ হাজার ফুট উচ্চের সপ্তম শিবিরে অতিবাহিত করতে হয়। এই অভিযান হতে তাঁদের অসীম সাহসিকতা, নিপুণতা ও নিয়মানুবর্তিতার পরাকাষ্ঠা প্রমাণিত হয়েছে"। প্রধানমন্ত্রী নেহরু, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী হুমায়ুন কবির ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননও অভিযাত্রী দলের উদ্দেশ্যে বাণী পাঠিয়েছেন।

এভারেস্ট বিদেশীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। ভারতীয়ের অবদানও সেখানে অসামান্য ঠিকই। কিন্তু একমাত্র ভারতীয়ের পরিচালনায় ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত জোয়ানদের যাওয়ার পথে এত বাধা কেন? একদিন নিশ্চয়ই সে বাধা সরবে। দেখতে পাব একমাত্র ভারতীয়ের হাতের স্পর্শে নতুন ইতিহাস রচিত হবে হিমালয়ের বুকে।

প্রেক্ষাগৃহ প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

শিশু চলচ্চিত্র সংস্থা :

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার বিভাগের আওতায় "শিশু চলচ্চিত্র সংস্থা" (চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি) নামে একটি প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েক বছর হ'ল জন্ম নিয়েছে। সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় হ'ল দিল্লী এবং এর সচিবের পদে অধিষ্ঠিত আছেন মহেন্দ্রনাথ নামে জনৈক ভদ্রলোক। সংস্থাটির নাম থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, এর কাজ হচ্ছে আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের আনন্দবিধানের জন্যে বিশেষ চলচ্চিত্র নির্মাণে সহায়তা করা, উৎসাহ দেওয়া এবং দেশে শিশু চলচ্চিত্রের যথাযথ প্রসারে উদ্যোগী হওয়া। এই প্রতিষ্ঠানেরই উদ্যোগে তৈরী ফণী মজুমদার পরিচালিত হিন্দী ছবি "সাবিত্রী" এ বছর রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত "সার্টিফিকেট অব মেরিট" লাভ করেছে। এই ছবির আগে গেল কয়েক বছরে সংস্থাটি "জলপরী" প্রভৃতি আরও খান কয়েক ছবি প্রস্তুতে সহায়তা করেছেন।

কিন্তু সম্প্রতি এই "শিশু চলচ্চিত্র সংস্থা" সম্পর্কে বেশ কিছু অভিযোগ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। গেল ২৮এ মে, সোমবার লোকসভার অধিবেশনে বিরোধী দলের বিভিন্ন সদস্য এই সংস্থার কার্যকলাপ এবং বিশেষ ক'রে এর সচিবের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ পেশ করেন, তার জবাবে নবনির্বাচিত তথ্য ও বেতার মন্ত্রী, মাননীয় গোপাল রেড্ডী সদস্যদের জানান যে, সরকার তিনজন সদস্যবিশিষ্ট একটি সমিতিকে এই সংস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে নিযুক্ত করবেন এবং এক মাসের মধ্যেই এই সংস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, সংস্থাটির হিসাব-পত্রও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ক'রে দেখা হবে।

লোকসভার সদস্যদের কাছ থেকে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে এই :

১। জনসংঘের সদস্য যুবরাজ দত্ত সিং বলেন, সংস্থা-নির্মিত ছবিতে প্রতি ফুটে যে খরচ হয়, ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিসনের তৈরী ছবির খরচ থেকে তা অনেক বেশী। ইতিমধ্যেই এস্টিমেটস্ কমিটি এ সম্পর্কে সুচিহ্নিত মন্তব্য করেছেন।

২। পি-এস-পি সদস্য হেম বড়ুয়া অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সংস্থাটির সংস্কার সাধন যদি সম্ভব না হয়, তাহ'লে সংস্থাটিকে ভেঙে দেওয়া উচিত এবং ফিল্মস্ ডিভিশনের ওপর এর কাজের ভার ন্যস্ত করা উচিত।

৩। সমাজতান্ত্রিক সদস্য কিষেণ পটনায়েক অভিযোগ করেন, সংস্থার সচিব তাঁর ইচ্ছামত সংস্থার সংবিধানের পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং প্রোডাকসান সেক্রেটারী, কোষরক্ষক ও সাধারণ সচিবের সকল ক্ষমতাকে এক সঙ্গে কুক্ষিগত করেছেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, কাল বিলম্ব না করে বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

মাননীয় মন্ত্রী গোপাল রেড্ডী যখন সামগ্রিক তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন, তখন আশা করা অন্যায় হবে না যে, "শিশু চলচ্চিত্র সংস্থা" অতি সত্বরই সকল রকম দোষমুক্ত হয়ে নিজ কর্তব্যে অগ্রসর হবে। কিন্তু এই সংস্থাটি যথাযথ পরিচালিত হ'লেই কি এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভব? আমাদের দেশে শিশু চলচ্চিত্রের প্রসার কি মাত্র শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণের ওপরই নির্ভরশীল? শিশু চলচ্চিত্র বিশেষ ক'রে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের জন্যেই নির্মিত, এই তথ্যটি যদি ভুলে না যাওয়া যায়, তা'হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে না কি, এই বালক-বালিকাদের শিশু চলচ্চিত্র দেখবার সুযোগ কোথায়? দেশে বালক-বালিকাদের জন্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত চিত্রগৃহ কৈ? কিংবা সাধারণ ছবিঘরেই মাত্র বালক-বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা বা কোথায়? দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র দেখাবার সুযোগই বা সৃষ্টি করা হয়েছে কৈ? এই যে, ফণী মজুমদার পরিচালিত "সাবিত্রী" রাষ্ট্রপতি দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে, কিংবা রঘুনাথ গোস্বামী ও বুলু দাশগুপ্ত পরিচালিত পুতুল চিত্র "হট্টগোল বিজয়", যা এ-বছরের শিশুচিত্রগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে, ভারতের অগণিত বালক-বালিকা যদি এই সব ছবি দেখবার সুযোগই না পায়, তা'হলে শিশুচলচ্চিত্র নির্মাণ করবার সার্থকতা কোথায়? পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত "শিশুচলচ্চিত্র সংস্থা" কিছু দিন আগে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রচনা "ডাকাতের হাতে"র চলচ্চিত্ররূপ দিয়েছিলেন বিশেষ ক'রে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা-

রাজেন তরফদার পরিচালিত ও শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাঃ লিঃ প্রযোজিত 'অগ্নিশিখা' চিত্রের একটি দৃশ্যে বসন্ত চৌধুরী ও কণিকা মজুমদার

দের জন্যেই। ছবিখানির আরও পাঁচখানি ছবির মত সাধারণ মুক্তি ঘটেছিল এবং তিনটি চিত্রগৃহে মাত্র হপ্তা দুয়েক দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এই সাধারণ মুক্তি মারফৎ কলকাতা শহরের ক'জন বালক-বালিকা ছবিখানি দেখবার সুযোগ পেয়েছিল? বালক-বালিকাদের জন্যে নিয়মিতভাবে স্বল্প মূল্যে বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা না করে শিশুচলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হওয়া ঘোড়ার আগে গাড়ীকে জোতারই সামিল। ছবি নিয়মিতভাবে তৈরী হবে, অথচ তা নিয়মিতভাবে দেখাবার কোনো ব্যবস্থা নেই—এমন অব্যবস্থার মধ্যে জাতীয় অর্থের সমূহ অপচয় আমাদের দেশেই সম্ভব।

চিত্র সমালোচনা

অগ্নিশিখা : শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন; ১১,৩৩৯ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : রাজেন তরফদার; সংগীত-পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়; চিত্র-গ্রহণ : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়; শব্দ-ধারণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও সুশীল সরকার; শিল্পনির্দেশনা : রবি চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; রূপায়ণে : কণিকা মজুমদার, শর্মিষ্ঠা, ছায়াদেবী, মঞ্জুলা, কবিতা, জয়শ্রী সেন, মাধুরী, সীতা মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, অনুপকুমার, দ্বিজু ভাওয়াল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ১লা জুন থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ও অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

কোনো একটি চলচ্চিত্র সাফল্য-মণ্ডিত হবার জন্যে একটি বলিষ্ঠ কাহিনীর যতখানি না প্রয়োজন আছে, তার চেয়েও ঢের বেশী প্রয়োজনীয় হচ্ছে সেই কাহিনীর একটি সুসমঞ্জ চিত্রনাট্য। একটি সুবিন্যস্ত চিত্রনাট্য কাহিনীর দুর্বলতাকে অতিক্রম করেও যে একটি অপরূপ চলচ্চিত্রের জন্ম দিতে পারে, খ্যাতনামা পরিচালক আর্নস্ট লুবিস্-এর ছবিগুলি তার জ্বলন্ত নিদর্শন। আমাদের এই বাঙলা দেশেও অতীত যুগে নির্মিত, নীতীন বসু পরিচালিত "জীবন-মরণ" বা হিন্দী "দুশমন" এমনি একটি দুর্বল কাহিনীর সার্থক চিত্ররূপ ব'লে চিহ্নিত হয়ে আছে।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য রচিত মূল কাহিনীটিতে ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক ও মানসিক বৈষম্য নিয়ে হয়ত 'কিছু জ্বালা' প্রকাশ ছিল; কিন্তু মাত্র সেই জ্বালাকেই উপজীব্য ক'রে একটি সুদীর্ঘ চিত্রনাট্যাকারে 'অগ্নিশিখা'র উদ্ভব কাহিনীর সংগতিসূচক চিত্ররূপ হয়েছে ব'লে মনে করতে পারছি না। ছবিতে ধনীপুত্র অসীম মিত্রের ছুটন্ত মোটর গাড়ীর নীচে পড়ে বৃদ্ধ কেরাণি বিনয় গাঙ্গুলীর অপঘাত মৃত্যুর পর অসীমের সুদীর্ঘকাল ধ'রে মর্মযাতনা অনুভব

অসিত সেন পরিচালিত বাদল পিকচার্সের 'আগুন' চিত্রের একটি বৃদ্ধ-দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কেন স্টেগেল ও অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য

ছায়ানট প্রযোজিত নজরুল গীতি ও নৃত্যালেখ্য "কেউ ভোলে না কেউ ভোলে"র একটি দৃশ্যে শুচিস্মিতা মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী ঘোষ ও সংঘমিত্রা।

যেমন আমাদের যথাযথ সহানুভূতি আকর্ষণে অক্ষম হয়েছে, তেমনই ধনীর মোটরগাড়ীর তলায় পিষ্ট হয়ে পিতার জীবনান্ত ঘটবার পর সুজাতার মনে সমস্ত বড়লোক সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটা বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করাও আমাদের কাছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। এবং এই দুই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যে গল্পর অনায়াসেই একটি তীব্র মধুর প্রেমের গল্পরূপে পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠবার অবকাশ ছিল, তাই হয়ে পড়েছে একটি ছন্দহীন অসংবন্ধ চিত্রকাহিনী, যার কোথাও আছে ঘটনার ভীড়, আবার কোথাও আছে অকারণ একঘেয়েমি; কোথাও বা স্বাভাবিক চরিত্রবিন্যাস, আবার কোথাও বা অস্বাভাবিক দৃশ্য বা ন্যাকামিপূর্ণ চরিত্রের সমাবেশ। এমন একটি খাপছাড়া, এলোমেলো ছবি আমরা রাজেন তরফদারের মত পরিচালকের কাছ থেকে আদৌ আশা করতে পারিনি।

এই ছবিতে ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, বসন্ত চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, সীতা মুখোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার প্রভৃতি বহু কৃতী শিল্পীই অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুযোগের অভাবে কেউই তেমন কিছু অভিনয় পারদর্শিতা দেখাতে পারেননি। বরং ছায়া দেবীকে সুরেশ-বেশী ছবি বিশ্বাসের ভগ্নী অঞ্জনার ভূমিকা দিয়ে তাঁর অভিনয় প্রতিভার প্রতি অবিচারই করা হয়েছে। একমাত্র রাখাল-বেশে অনুপকুমার আমাদের মনে কিছুটা রেখা কাটতে সমর্থ হয়েছেন।

ছবির আঙ্গিক বা কলাকৌশলের দিক সাধারণ পর্যায়ের।

নাট্যাভিনয়

রূপান্তরীর "স্বর্ণগ্রন্থি":

জোছন দস্তিদার প্রণীত "স্বর্ণগ্রন্থি"র অভিনয় হয়ে গেল ৩রা জুন, রবিবার নিউ এম্পায়ার রঙ্গালয়ে। এই উপলক্ষে প্রচারিত স্মারক পুস্তিকায় বলা হয়েছেঃ "পেশাদারী মঞ্চের মালিক এমন নাটকই শুধু মঞ্চস্থ করবেন, যাতে ব্যবসায়িক অসাফল্যের সম্ভাবনা থাকবে খুবই কম;......যে নাটক পরীক্ষামূলক, তাকে শতহস্ত দূরে থেকে বর্জন করেন তিনি। ...সংস্কৃতির ব্যবসায়ে এই যে ফাঁক থেকে যায়, তাকেই পূরণ করবার জন্যে উদিত হয়েছে অপেশাদারী নাটক প্রযোজনা..." এবং "স্বর্ণগ্রন্থি" সম্পর্কে

'আরতি' চিত্রে মীনাকুমারী ও অশোককুমার

এতে বলা হয়েছেঃ "স্বর্ণগ্রন্থি নাটক দর্জি সম্প্রদায়ের জীবন অবলম্বনে রচিত। ......যাঁরা জামাকাপড় পরিয়ে অসভ্য মানুষকে সভ্য ক'রে তোলায় সাহায্য করেন, তাঁদের জীবন যদি গভীর অন্ধকারে ঢাকা থাকে, তবে দেশের কলঙ্ক বৃদ্ধি পায়, না কমে যায়—সেই মহাজিজ্ঞাসাই স্বর্ণগ্রন্থির মূলে আবেদন।"

পেশাদারী, অপেশাদারী—উভয়বিধ নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রেই রচনা থেকে শুরু ক'রে অভিনয়পদ্ধতি উপস্থাপনা, আঙ্গিক প্রভৃতি প্রতি ক্ষেত্রেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। এবং সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর একটি নিদর্শন এই "স্বর্ণগ্রন্থি"র অভিনয় ব্যাপারেও পাওয়া গেল। কিন্তু দর্জি সম্প্রদায়ের দুঃখ-বেদনা, মায়ামমতা এবং জীবনজিজ্ঞাসায় ভরপুর হওয়া সত্ত্বেও "স্বর্ণগ্রন্থি" একটি নাটক হয়ে উঠতে পারেনি, দুই বিরোধী শক্তির অমোঘ সংঘর্ষের ক্রমান্বয়ী অবতারণার অভাবে। তিনটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এই নাটকের প্রতিপাদ্য কি, অসংলগ্ন এবং পরস্পর-বিরোধী কার্যলিপ্ত অসম্পূর্ণ চরিত্রগুলির সাহায্যে তা কোনোখানেই পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারেনি। ঋণের দায়ে কর্ম বিক্রয় থেকে ইজ্জত বিক্রয়ের ইঙ্গিত পর্যন্ত থাকা সত্ত্বেও নাটকটি সহজ গতিপথ ধরে এগিয়ে চলতে পারেনি ব'লে আমাদের এর চরিত্রগুলির সংগে একাত্ম ক'রে তুলতে সক্ষম হয়নি। প্রযোজনার ক্ষেত্রেও বাস্তবরূপে প্রকাশে অক্ষমতা এবং অজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া গেল।

অবশ্য অভিনয়ে সকল শিল্পীই অল্পবিস্তর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এ'দেরই মধ্যে বিশেষ ক'রে সুদীপ্ত বসু (নিমেচাঁদ), সুজিত ঘোষ (ফকির আলী), জোছন দস্তিদার (রহমান), স্টার বন্দ্যোপাধ্যায় (মহিম সায়েব), মিলন মুখোপাধ্যায় (আলীবক্স), চন্দ্রা দস্তিদার (সেলিমা) এবং মণিকা চক্রবর্তী (ফতেমা) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন।

"শিক্ষার্থী"-নাট্যসংস্থার 'একি হোলো!':
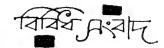
'শিক্ষার্থী'-নাট্য সংস্থা গেল ৩রা জুন থেকে শুরু ক'রে প্রতি রবিবার, সন্ধ্যা ৬৷৷টায় রাজাবাজার এলাকায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হ'লে অনিলবরণ দত্ত রচিত নতুন নাটক 'এ কি হোলো!' মঞ্চস্থ করছেন।

'শিল্পীমন'-এর নাট্যোৎসব:

গেল ৪ঠা ও ৫ই জুন 'শিল্পীমন'-এর শিল্পিবৃন্দ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে যথাক্রমে 'পুরাতন ভৃত্য' এবং 'বিচারের বাণী' অভিনয় করেছিলেন।

বিশ্বরূপা কর্তৃক 'নাট্যসেবী সংবর্ধনা':

গেল ৭ই জুন, বৃহস্পতিবার বিশ্বরূপা মঞ্চ তাঁদের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব পালন করেছেন। এই উৎসবের সংগে কর্তৃপক্ষ 'নাট্যসেবী সংবর্ধনা' নামে একটি নতুন অনুষ্ঠানের সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রতি বছর নাট্য-জগতের তিনজন ক'রে গুণীর—এক, নাট্যকার; দুই, অভিনেতা এবং তিন, অভিনেত্রী—সংবর্ধনা করবার আয়োজন থাকবে। এ-বছরে যাঁদের সংবর্ধনা জানানো হ'ল, তাঁরা হচ্ছেন—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং নীরদাসুন্দরী।

'সপ্তপর্ণা'র নাট্যোৎসব:

'সপ্তপর্ণা' নাট্যসম্প্রদায় গেল ৩রা জুন থেকে শুরু ক'রে তিনটি রবিবার (৩রা, ১০ই ও ১৭ই) সন্ধ্যা ৬৷৷টায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে যোগেশ-চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত বিখ্যাত নাটক 'দিগ্বিজয়ী' মঞ্চস্থ করেন। শিশিরকুমার অভিনয়দীপ্ত 'দিগ্বিজয়ী'র অভিনয় দেখবার জন্যে স্বভাবতঃই নাট্যরসিক মহলে, আগ্রহের অন্ত ছিল না; তাই ৩রা জুনের অভিনয়ে 'পূর্ণপ্রেক্ষা' (হাউস ফুল) ঘোষণা করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছিলেন। চারটি অংকে এবং ছটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এই নাট্যাভিনয়টিকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য 'সপ্তপর্ণা'-সম্পাদক মহেন্দ্র গুপ্ত যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তার নিদর্শন সমগ্র অভিনয়ের মধ্যেই পাওয়া গেল। প্রায় প্রতিটি ভূমিকা সুঅভিনীত হ'লেও বিশেষ ক'রে যাঁরা দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা-ভাজন হয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন মহেন্দ্র গুপ্ত (নাদির শাহ), নীতীশ মুখোপাধ্যায় (নেককদম), নবকুমার (রেজাকুলী), জহর গাঙ্গুলী (আলি আকবর), অমল ঘোষ (আহমেদ খাঁ), মাধবী মুখোপাধ্যায় (সিতারা), বীণা ভট্টাচার্য, (সিরাজী) এবং লীলা দেবী (ভারত-নারী)।

বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর চরিত্রোপযোগী সাজসজ্জা এবং সমগ্র নাটকে মঞ্চসজ্জা যথেষ্টই প্রশংসনীয় হয়েছিল।

চতুরঙ্গ সম্প্রদায়ের অভিনব আয়োজন:

প্রথিতযশা সাহিত্যিক 'বনফুল'-এর এ-বছর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে চতুরঙ্গ সম্প্রদায় তাঁকে আসছে ২২-এ জুন সন্ধ্যায় রঙমহল রঙ্গমঞ্চে একটি সংবর্ধনা দেবার আয়োজন করেছেন। চতুরঙ্গ সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত যতগুলি নাটকের অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে বনফুলের রচনাই সংখ্যায় বেশী; বিশেষ

করে এই কারণেই এ'রা 'বনফুল'-কে সংবর্ধিত করছেন। এই মনোরম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর চতুরঙ্গ সম্প্রদায়ের সভ্যরা বনফুলের 'কবয়ঃ' ও '...' অভিনয় করবেন।

চতুর্মুখ-এর নিয়মিত অভিনয় :

"চতুর্মুখ"-নাট্যসম্প্রদায় আজ শুক্রবার, ৮ই জুন থেকে শুরু করে প্রতি শুক্র ও মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে নিয়মিতভাবে যথাক্রমে অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "নচিকেতা" ও "নির্বোধ" নাটক অভিনয় করছেন। "চতুর্মুখ" অভিনীত এই দুখানি নাটকই নাট্যামোদী দর্শকগোষ্ঠীর প্রশংসা অর্জন করেছে। আশা করি, নাটক দুখানির পুনরাভিনয় সাধারণ দর্শকদের খুসীই করবে।

"গঙ্গা-যমুনা'র রজত জয়ন্তী সপ্তাহ :

দিলীপকুমার প্রযোজিত এবং নীতীন বসু পরিচালিত টেকনিকলার চিত্র, সিটিজেন্স ফিলমসের "গঙ্গা-যমুনা" আজ থেকে স্থানীয় ওরিয়েণ্ট ও ম্যাজেস্টিক সিনেমায় যুগপৎ রজত-জয়ন্তী সপ্তাহে পদার্পণ করল। একটি চিত্রগৃহে একটানা পঁচিশ হপ্তা ধরে চলা আজকের দিনে যে-কোনও চলচ্চিত্রের পক্ষে অত্যন্ত জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। তাই এই রজত-জয়ন্তী সপ্তাহকে স্মরণীয় করবার জন্যে চিত্রনির্মাতা দিলীপকুমার সদলবলে কলকাতায় এসে একটি আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করছেন।

পরলোকে গীতা সিং :

বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয়া অভিনেত্রী গীতা সিং অকালে পরলোকগমন করেছেন। আমরা পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

বৈতানিক সম্প্রদায় :

গেল রবিবার, ৩রা জুন বৈতানিক-এর সভ্যরা রক্সী চিত্রগৃহে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'কে মঞ্চস্থ করেন। 'মুক্তধারা'র মত রূপকনাট্যকে যথাযথ রূপে দেওয়া রীতিমত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বৈতানিকের সভ্যরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই নাট্যাভিনয়কে সব দিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করার ত্রুটি করেননি। আমরা আশা করি, বৈতানিক-সম্প্রদায় নাটকটির পুনরভিনয় ক'রে রসপিপাসু দর্শকবৃন্দকে আবার ক'রে পরিতৃপ্ত করবেন।

অনুশীলন সম্প্রদায় :

গেল ৫ই জুন সন্ধ্যায় বিশ্বরূপা মঞ্চে অনুশীলন সম্প্রদায় তাঁদের সুখ্যাত নাটক, উমানাথ ভট্টাচার্য রচিত "শেষ সংবাদ" অভিনীত করেন। আজ শুক্রবার, ৮ই জুন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা'র কানাই বসু প্রদত্ত নাট্যরূপটি মঞ্চস্থ করবেন। দুটি নাটকই পরিচালনা করেছেন মমতাজ আহমদ খাঁ।

বেলেঘাটা রাসবিহারী ম্যানসনের ছেলেদের রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব :

গেল ২রা জুন রাসবিহারী ম্যানসনের ছেলেরা রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করেছিলেন। তাঁদের অনুষ্ঠানসূচীতে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 'দুরাশা'-র নাট্যরূপ এবং কৌতুকনাট্য 'প্লেগের চিকিৎসা'-র অভিনয় ছিল অন্যতম।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ২৩শে মে, বুধবার সন্ধ্যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়া পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত পৌরোহিত্য করেন ও ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

ডক্টর মুখোপাধ্যায় কবিপ্রতিভার কয়েকটি দিক লইয়া মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। আবৃত্তিতে ডাঃ বিমান দত্ত, স্বপ্না দে, গৌতম রায়, সুজাতা পাঠক ও গোপীমোহন সব-পেয়েছির আসরের মেয়েরা ও রবি চক্রবর্তী নৃত্যে ও সঙ্গীতে বহু বিশিষ্ট শিল্পী এবং লোকনাট্যম কর্তৃক খ্যাতির বিড়ম্বনা সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

॥ হলিউডের সর্বাপেক্ষা ব্যস্তশিল্পী ॥

টনি কার্টিসের পণ, তিনি বছরে তিনটের বেশী ছবিতে অভিনয় করবেন না। "দি আউটসাইডার" গত দু'বছরের মধ্যে টনির একাদশতম চিত্র। ছবিটি নির্মিত হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ইণ্টারন্যাশনালের পতাকায়। একটা সত্যিকারের কাহিনী অবলম্বনে তোলা হচ্ছে 'দি আউটসাইডার।' নায়কের চরিত্রটি একটি ব্যক্তিপূজা-বিরোধী চরিত্র। ঘটনাচক্রে কিন্তু তাকেই জনগণের শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসতে হয়। কিন্তু সিংহাসনের সম্মানে পীড়িত হয়েই ইরা হেস (নায়কের নাম) আসবের মধ্যে মুক্তি খুঁজল শেষ-পর্যন্ত। নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে টনি কার্টিসের মন্তব্যঃ এই চিত্রের চিত্রনাট্য আমাকে "দি ডিফায়েণ্ট ওয়ানস"-এর চেয়েও বেশী অভিনয় সুযোগ দিয়েছে।

।। ওথেলোর নব রূপায়ন ।।

সেক্সপীয়রের বিষাদ নাটক "ওথেলো"র গল্পকে আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে ছবি তোলা নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ প্রয়াস। কিন্তু 'অল নাইট লং" চিত্রটি উক্ত প্রয়াস সিদ্ধির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। অল নাইট লং ছবির কাহিনী ওথেলোর

ছায়ার রচিত। এই চিত্রের ওথেলো হলো জনৈক জাজ সঙ্গীত পরিচালক। তার স্ত্রী ডেলিয়া ডেসডিমোনার আধুনিক সংস্করণ। ইয়াগো হল সঙ্গীত দলের ড্রামবাদক। তার সর্বক্ষণের চেষ্টা হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে গায়িকা ডেলিয়াকে নিয়ে নিজের দল গড়বার। চিত্রের পটভূমি হচ্ছে লণ্ডনের একটি সারারাতের সঙ্গীতের আসর। ইংলণ্ডের বিখ্যাত জাজ সঙ্গীতজ্ঞদের এই চিত্রে দেখা যাবে।

চিত্রনাট্যকার নেল কিং এবং পিটার এচিলিস সেক্সপীয়ারের নাটকটিকে নিপুণভাবে অনুসরণ করেছেন। এমনকি দর্শকদের সুবিধের জন্যে সেক্সপীয়ারের নামগুলি পর্যন্ত যতটা সম্ভব রাখবার চেষ্টা করেছেন, যেমন, ওথেলোর রোডারিগোর বর্তমান চিত্রের নাম হয়েছে রড। রড অপেশাদার অভিনেতা; নাটকের ক্যাসিও হলেন চিত্রকাহিনীর স্যাক্সোফোনিস্ট ক্যাস মাইকেলস। ইয়াগোর নাম অবশ্য পাল্টে জনি কাজিন রাখা হয়েছে। কাজিনের স্ত্রী এমিলি। কাজিন ওষুধ খাইয়ে ক্যাসকে উত্তেজিত করে। ক্যাস এক মান্যবর অতিথিকে অপমান করে সর্বসমক্ষে। অরিলিয়াম রেক্স (কাহিনীর 'ওথেলো') বরখাস্ত করে ক্যাসকে। তখন রেক্সের স্ত্রী ডেলিয়াকে কাজিন অনুরোধ করতে থাকে যাতে ক্যাসকে পুনর্বহাল করা হয়। ওথেলো নাটকে ডেসডিমোনা রুমাল হারিয়েছিলেন, এখানে ডেলিয়া তার সোনার সিগেরেট কেসটি হারায়। কিন্তু সিগেরেট কেসকে কাজিন ডেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেনি। আধুনিক ইয়াগো আধুনিক ডেসডিমোনার বিরুদ্ধে কাজ লাগালো একটি টেপ রেকর্ডার। পল হ্যারিসন অভিনয় করেছেন 'ওথেলো' তথা রেক্সের ভূমিকায়। ডেলিয়ার ভূমিকায় মার্টি স্টিভেন্স অসাধারণ অভিনয় করেছেন। ডিনার-জ্যাকেট পরে যতটা ধূর্ততা এবং হতাশা মেটানো সম্ভব, ফুটিয়েছেন প্যাট্রিক ম্যাকগুহান।

'দি আউট সাইডার' চিত্রের সুটিং-এর অবসরে টনি কার্টিস

।। পুরস্কৃত বৃটিশ তথ্যমূলক ছবি ।।

লণ্ডনের ওয়াটারলু ষ্টেশনের পটভূমিতে তোলা "টারমিনাস" একটি অসাধারণ ছবি। ছবিটি ছোট, মাত্র আধঘন্টার। পরিচালনা করেছেন জন শেলসিংগার এবং প্রযোজনা করেছেন বৃটিশ ট্রান্সপোর্ট কমিশনের পক্ষে এডগার এ্যানস্টে। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে "টারমিনাস" গ্র্যাণ্ড প্রিক্স পুরস্কার ত পেয়েছেই, অন্যান্য ছটি দেশের চলচ্চিত্র উৎসবেও ছটি পুরস্কার লাভ করেছে। বৃটেনের আরেকটি তথ্যচিত্র "সীওয়ার্ডস দি গ্রেট শিপস"ও দুটি পুরস্কার পেয়েছে চলচ্চিত্র উৎসবগুলি থেকে।

।। রাশিয়ায় ২৫টি দেশের চলচ্চিত্র ।।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সিনেমা গৃহে এই বৎসরে ২৫টি বিভিন্ন দেশের মোট ৯৭টি চলচ্চিত্র দেখানো হবে। ইতিমধ্যেই মস্কোয় ও অন্যান্য শহরে ইটালি, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, কিউবা, জাপান ও ভারতের মোট ২০টিরও বেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আফ্রিকার কয়েকটি দেশের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র সোভিয়েত দর্শকরা দেখার সুযোগ পাবেন।

—চিত্রকূট

খেলাধুলা ॥ **খেলাধুলা** ॥ খেলাধুলা

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান প্রথম টেস্ট

ইংল্যান্ড : ৫৪৪ **রান** (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কাউড্রে ১৫৯, পারফিট নট আউট ১০১, গ্রেভনী ৯৭, এ্যালেন নট আউট ৭৯ এবং ডেক্সটার ৭২। মামুদ ১৩০ রানে ২, ডিসুজা ১৬১ রানে ১ এবং ইন্তিখাব ১১৭ রানে ২ উইকেট)।

পাকিস্তান : ২৪৬ **রান** (মুস্তাক মহম্মদ ৬৩, হানিফ মহম্মদ ৪৭ এবং ইমতিয়াজ আমেদ ৩৯। স্টেথাম ৫৪ রানে ৪, ট্রুম্যান ৫৯ রানে ২, এ্যালেন ৬২ রানে ২ এবং লক ৩৭ রানে ২ উইকেট পান)।

ও ২৭৪ রান (সৈয়দ আমেদ ৬৫, ইমতিয়াজ ৪৬, নাশিমুল গণি ৩৫, ইজাজ বাট ৩৩ এবং হানিফ মহম্মাদ ৩১। লক ৮০ রানে ৩, এ্যালেন ৭৩ রানে ৩, ট্রুম্যান ৭০ রানে ২ এবং স্টেথাম ৩২ রানে ২ উইকেট)

প্রথম দিন (৩১শে মে) : ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট পড়ে ৩৮৬ রান। গ্রেভনী ৯৬ এবং পারফিট ২৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (১লা জুন) : ইংল্যান্ড ৫৪৪ রানে (৫ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। পাকিস্তানের ৫টা উইকেট পড়ে ১৪৯ রান ওঠে। ইমতিয়াজ আমেদ ১ এবং ম্যাথিয়াস ২ ক'রে নট আউট থাকেন।

৩য় দিন (২রা জুন) : পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ২৪৬ রানে সমাপ্ত হয়। ২৯৮ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট পড়ে ১৫৮ রান ওঠে। সৈয়দ আমেদ ৩০ এবং বার্কি ৯ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

৪র্থ দিন (৪ঠা জুন) : চতুর্থ দিনের ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিটের খেলায় পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ২৭৪ রানে শেষ হয়।

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ২৪ রানে জয়লাভ করেছে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের রান ছিল ৪ উইকেটে ১৫৮। চতুর্থ দিনে ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিটের খেলায় দ্বিতীয় ইনিংসের বাকি উইকেট পড়ে গিয়ে ২৭৪ রান দাঁড়ায়।

বার্মিংহামের এজবাস্টন মাঠে ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট খেলা গত ৩১শে মে থেকে শুরু হয়। পাঁচ দিনের টেস্ট খেলা ৪র্থ দিনে শেষ হয়েছে। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৪৪ রানের (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) উত্তরে পাকিস্তান তাদের প্রথম ইনিংসে ২৪৬ রান করে। ফলে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৪৪ রানের থেকে ২৯৮ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ায় তাদের ফলো-অন করতে হয়েছে। তৃতীয় দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪টে উইকেট পড়ে ১৫৮ রান দাঁড়ায়। ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে তখন পাকিস্তানের ১৪০ রানের প্রয়োজন হয়।

কলিন কাউড্রে

বিগত ১৯৬১-৬২ সালের ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সফরে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার মোট ৮টা টেস্ট খেলায় ৭ বার টসে হার স্বীকার করেছিলেন—উপর্যুপরি হার ছিল ৬ বার। সেই একটানা দুর্ভাগ্যের জের পাকিস্তানের বিপক্ষে আলোচ্য প্রথম টেস্ট খেলায় শেষ হ'ল। ডেক্সটার টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নেন। ইংল্যান্ডের পক্ষে প্রথম উইকেটে খেলতে নামেন কলিন কাউড্রে এবং পুলার। কাউড্রে প্রথম রান করে ইংল্যান্ডের পক্ষে বউনি করেন। দলের ৩১ রানের মাথায় পুলার ২২ রান করে বিদায় নেন। দ্বিতীয় উইকেটে কাউড্রের সংগে জুটি বাঁধেন অধিনায়ক ডেক্সটার। লাঞ্চের সময় স্কোর ছিল ১১৯ (১ উইকেটে)। ডেক্সটার ১৩৬ মিনিট খেলে ৭২ রান করে আউট হন। ডেক্সটার এবং কাউড্রের দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে দলের ১৬৬ রান যোগ হয়—এই ১৬৬ রানই পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের পক্ষে দ্বিতীয় উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড। পূর্ব রেকর্ড ১৪৭ রান (পুলার এবং ব্যারিংটন, ঢাকা, ১৯৬১-৬২)। কলিন কাউড্রে ১৫৯ রান ক'রে আউট হন। কাউড্রে ২৬৩ মিনিট খেলে ২১টা বাউন্ডারী করেছিলেন। কাউড্রে এবং গ্রেভনীর ৩য় উইকেটের জুটিতে ৮০ মিনিটের খেলায় ১০৭ রান ওঠে। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ডের ৪টে উইকেট পড়ে ৩৮৬ রান ওঠে। গ্রেভনী ৯৬ এবং পিটার পারফিট ২৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

গ্রেভনীর কপালে 'সেঞ্চুরী' লেখা ছিল না। দ্বিতীয় দিনে তিনি মাত্র ১ রান ক'রে ৯৭ রানে আউট হন। পারফিটের সংগে ডেভিড এ্যালেন ৬ষ্ঠ উইকেটে জুটি বাঁধেন। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের স্কোর দাঁড়ায় ৫৪৪ (৫ উইকেটে)। এই দিনের দু' ঘন্টার খেলায় ১৫৮ রান যোগ হয়। এই লাঞ্চের স্কোরের উপরই ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। পারফিট ১৯৭ মিনিট খেলে ১০১ রান ক'রে নট আউট থাকেন। বাউন্ডারী মেরেছিলেন ৯টা এবং ওভার বাউন্ডারী ২টো। ডেভিড এ্যালেন ৭৯ রান করে নট আউট থাকেন। পারফিট এবং এ্যালেনের অসমাপ্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ১৫৩ রান ওঠে। ১৯৫৭ সালের পর স্বদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের এই ৫৪৪ রানই (৫ উইকেটে) ইংল্যান্ডের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান। ১৯৫৭ সালে ট্রেন্ট-ব্রিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে ইংল্যান্ড ৬১৯ (৬ উইকেটে) রান করেছিল।

দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের পর পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং ৫ উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৪৯ রান করে। আলোর অভাবে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে আধ ঘন্টা আগেই এই দিন খেলা বন্ধ হয়ে যায়। খেলার এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৪৪ রানের থেকে পাকিস্তান ৩৯৫ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল এবং 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও পাকিস্তানের ১৯৫ রানের প্রয়োজন ছিল।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের বিরতির ১৫

মিনিট আগে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ২৪৬ রানে শেষ হয়ে যায়। পাকিস্তানের শেষের ৫টা উইকেটে ৯৭ রান ওঠে। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত 'ফলো-অন' থেকে ছাড়ান পেল না। পাকিস্তানের ২০২ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে এবং ২০৬ রানের মাথায় পরের ৩টে উইকেট পড়ে যায়। শেষ উইকেটের জুটিতে ইন্তিখাব এবং ডি'স্‌জা মাত্র ২৫ মিনিটে ৪০ রান করেন। এই দিনের খেলায় ব্রেন স্টেথাম ৯টা বলে কোন রান না দিয়ে ৩টে উইকেট পান। স্টেথামের পর পর বলে নাশিম এবং মামুদ আউট হলে ডি'স্‌জা খেলতে নামেন এবং স্টেথামের বল ঠেকিয়ে 'হ্যাট-ট্রিক' প্রতিরোধ করেন।

পাকিস্তান ২৯৮ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে লাঞ্চের বিরতির ৫ মিনিট আগে। দ্বিতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন ভালই হয়—১ম উইকেটে দলের ৬০ রান ওঠে ৮৬ মিনিটের খেলায়। কিন্তু ইমতিয়াজ আমেদ ছাড়া আর কোন খেলোয়াড় নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। ইমতিয়াজ আমেদ প্রথম ইনিংসে ৩৯ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৬ রান করেন। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে পাকিস্তানের ১৫৮ রান দাঁড়ায় ৪টে উইকেট পড়ে। ইনিংস পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে তখন পাকিস্তানের ১৪০ রানের প্রয়োজন হয়। ৩রা জুন, রবিবার খেলা বন্ধ ছিল।

চতুর্থ দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট স্থায়ী ছিল। এক ইনিংস ও ২৪ রানে পরাজিত হলেও পাকিস্তান প্রাণপন করে খেলেছিল এবং দর্শকদের খেলা দেখার আনন্দও দিয়েছিল। সৈয়দ আমেদ এবং জাভেদ বার্কি ৫ম উইকেটের জুটিতে দলের ৬০ রান তুলেন। নবম উইকেটের জুটিতে নাশিমুল্ল গণি এবং মামুদ হোসেন মাত্র ৪২ মিনিট সময়ের মধ্যে ৫০ রান তুলে দর্শককে প্রচুর আনন্দ দেন।

আলোচ্য প্রথম টেস্ট খেলা ধরে ইংল্যান্ড এবং পাকিস্তানের মধ্যে ৭টা টেস্ট খেলা হ'ল। খেলার ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ২, হার ১ এবং খেলা ড্র ৪।

ফ্রেঞ্চ হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতা

কোয়ার্টার ফাইনালে ২নং বাছাই খেলোয়াড় রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) ৪-৬, ৬-১, ৩-৬, ৬-২ ও ৬-০ সেটে ১০নং বাছাই খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণানকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন। কয়েক দিন আগে এই বছরের সুইস লন টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে এবং ১৯৬১ সালের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালেও এমার্সনকে পরাজিত ক'রে কৃষ্ণান যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। গত বছরের উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণানের কাছে পরাজয়ের পর এমার্সন ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতা এবং জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে কৃষ্ণানকে পরাজিত করে পূর্ব পরাজয়ের শোধ তুলে নেন।

কৃষ্ণান এবং বব হাউই (অস্ট্রেলিয়া) পুরুষদের কোয়ার্টার ফাইনালে নীল ফ্রেজার এবং রয় এমার্সনের কাছে ৬-৪, ৩-৬, ৬-১, ৩-৬, ৪-৬ সেটে পরাজিত হন। ফ্রেজার এবং এমার্সনের জুটি গত দু'বছর ফ্রেঞ্চ টেনিস চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় ডাবলস খেতাব পান। কৃষ্ণান এবং হাউই ২-১ সেটে অগ্রগামী থেকেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। বর্তমান সময়ে নীল ফ্রেজার এবং রয় এমার্সনের জুটিকে নিঃসন্দেহে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জুটি বলা যায়।

পুরুষদের একদিকের সেমি-ফাইনালে রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) গত বছরের বিজয়ী এবং এ বছরের ৩নং বাছাই খেলোয়াড় ম্যানুয়েল শান্তানাকে (স্পেন) ৬-৪, ৩-৬, ৬-১, ২-৬ এবং ৬-৩ সেটে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যান। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে ১৯৬১ সালের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৩-৬, ৬-৩, ৬-২, ৩-৬ ও ৭-৫ সেটে নীল ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করে ফাইনালে ওঠেন। বিশ্ববিখ্যাত টেনিস প্রতিযোগিতা বলতে অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতা বুঝায়। একই বছরে এই চারটি প্রতিযোগিতায় সিংগলস খেতাব জয়ের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন এ পর্যন্ত মাত্র একজন খেলোয়াড়—ডোনাল্ড বাজ ১৯৩৮ সালে। অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার গত বছর ঘোষণা করেছিলেন তিনি ডোনাল্ড বাজের সঙ্গে এই সম্মানের ভাগীদার হতে দৃঢ়সংকল্প। রড লেভার ইতিমধ্যে ১৯৬২ সালের অস্ট্রেলিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতায় সিংগলস খেতাব পেয়ে গেছেন।

মহিলাদের সিংগলস সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মিস লেসলী টার্ণার ৬-৪, ৫-৭ ও ৬-৩ সেটে গত বছরের বিজয়িনী এ্যান হেডোনকে (বৃটেন) পরাজিত করেন। মিস টার্ণার ছিলেন বাছাই তালিকায় ১৩শ স্থানে এবং মিস হেডোন ১ম স্থানে। অপর দিকের সেমিফাইনালে মিস মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) ৮-৬ ও ৬-৩ সেটে দক্ষিণ আফ্রিকার রিনি সুরম্যানকে পরাজিত করেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস : রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৩-৬, ২-৬, ৬-৩, ৯-৭ ও ৬-২ সেটে রয় এমার্সনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : মিস মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৩-৬ ও ৭-৫ সেটে মিস লেসলী টার্ণারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : রয় এমার্সন এবং নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৩, ৬—৪ ও ৭—৫ সেটে ভিলহেলম বুংগার্ট এবং ক্রিশ্চিয়ান কুহ্‌নেকে (জার্মানী) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : সান্ড্রা রেনোল্ডস-প্রাইস এবং রেনে সুরম্যান (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৬—৪ ও ৬—৪ সেটে জে ব্রিকা (আমেরিকা) এবং মার্গারেট স্মিথকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : রবার্ট হাউই (অস্ট্রেলিয়া) এবং মিস রেনে সুরম্যান (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৩—৬, ৬—২ ও ৬—৪ সেটে লেসলী টার্ণার এবং ফ্রেড স্টোলীকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

বিশ্ব ফুটবল কাপ

১নং গ্রুপের খেলা

খেলার স্থান আরিকা, ৩০শে মে : ১৯৩০ ও ১৯৫০ সালের বিশ্ব ফুটবল বিজয়ী উরুগুয়ে তাদের প্রথম খেলায় ২—১ গোলে কলম্বিয়াকে পরাজিত করে। প্রথমার্ধের খেলার ১৮শ মিনিটে কলম্বিয়া পেনাল্টি থেকে প্রথম গোল দেয় এবং বিশ্রাম সময় পর্যন্ত ১—০ গোলে অগ্রগামী থাকে। শক্তিশালী উরুগুয়ের বিপক্ষে কলম্বিয়ার প্রথমার্ধের খেলা দর্শকদের বিস্মিত করেছিল। কারণ অভিজ্ঞ সমালোচকদের মতে শেষ পর্যায়ের ১৬টি দেশের মধ্যে কলম্বিয়া সব থেকে দুর্বল দেশ। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৮শ মিনিটে কুবিলা এবং ৭৩শ মিনিটে সাশিষ উরুগুয়ের পক্ষে গোল করেন। উরুগুয়ের আরও বেশী গোল দেওয়া উচিত ছিল; গোলের মুখে ঠিকমত বল সট না হওয়াতে অনেকগুলি সহজ সুযোগ নষ্ট হয়।

৩১শে মে তারিখে রাশিয়া তাদের প্রথম খেলায় ২—০ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত করে। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ছিল।

২রা জুন তারিখে যুগোশ্লাভিয়া তাদের দ্বিতীয় খেলায় ৩—১ গোলে উরুগুয়েকে পরাজিত করে। বিশ্রাম সময়ে যুগোশ্লাভিয়া ২—১ গোলে অগ্রগামী ছিল। প্রথমার্ধের খেলার ১৯শ মিনিটে উরুগুয়ের সেন্টার ফরওয়ার্ড প্রথম গোল দেয়। ২৬শ মিনিটে পেনাল্টি থেকে যুগোশ্লাভিয়া সেই গোলটি শোধ করে।

৩রা জুন তারিখে রাশিয়ার বিপক্ষে কলম্বিয়া ৪—৪ গোলে খেলা ড্র ক'রে অসাধ্য সাধন করে। রাশিয়ার হাতে দুর্বল কলম্বিয়াকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে এই ছিল সকলের দৃঢ় ধারণা।

বিশ্রাম সময়ে রাশিয়া ৩—১ গোলে অগ্রগামী ছিল। প্রথমার্ধের খেলার ৮ম মিনিটে ১ম, ১১শ মিনিটে ২য় এবং ১২শ মিনিটে ৩য় গোল দিয়ে রাশিয়া ৩—০ গোলে অগ্রগামী হয়। অর্থাৎ চার মিনিটের মধ্যে রাশিয়া তিনটে গোল দেয়। খেলার ২১ মিনিটে কলম্বিয়া প্রথম গোল দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ৫৭ মিনিটে রাশিয়া তাদের ৪র্থ গোল দিয়ে ৪—১ গোলে অগ্রগামী হয়।

এর পর সম্পূর্ণ উল্টো দিক থেকে বাতাস বইতে আরম্ভ করে। কলম্বিয়া খেলার ৬৮ মিনিটে ২য়, ৭২ মিনিটে ৩য় এবং ৭৮ মিনিটে ৪র্থ গোল দিয়ে গোল সংখ্যা সমান দাঁড় করায়। সমস্ত দর্শক কলম্বিয়ার খেলা দেখে হতবাক হয়।

রাশিয়ার বিপক্ষে কলম্বিয়ার এই সাফল্য বিশ্বের ক্রীড়ামহলে এক উল্লেখযোগ্য বিস্ময়কর ঘটনা। কলম্বিয়ার এই সাফল্যের কারণ, দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ার আত্মরক্ষামূলক খেলা। ৪—১ গোলে অগ্রগামী থেকেও রাশিয়ার মত শক্তিশালী দলের আত্মরক্ষামূলক খেলার সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আত্মরক্ষামূলক খেলা যে কত মারাত্মক এই খেলাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। খেলা ভাঙ্গার একেবারে শেষ সময়ে কলম্বিয়ার একটা সুতীব্র সট রাশিয়ার গোলরক্ষক খুব জোর ফিরিয়ে দিয়ে খেলার শেষ মুহূর্তে দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন।

২নং গ্রুপের খেলা

সান্তিয়াগো, ৩০শে মেঃ সপ্তম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন দিনে সান্তিয়াগোর জাতীয় স্টেডিয়ামে চিলি তাদের প্রথম খেলায় ৩—১ গোলে সুইজারল্যান্ডকে পরাজিত করে। সুইজারল্যান্ড অপ্রত্যাশিতভাবে ইউরোপীয়ান জোনের ১নং গ্রুপে গত বারের রাণার্স-আপ সুইডেনকে পরাজিত করে মূল প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। তাই যখন প্রথমার্ধের খেলার ৬ষ্ঠ মিনিটে সুইজারল্যান্ডের ইনসাইড রাইট খেলোয়াড় রলফ উর্থারিচ প্রথম গোল দিয়ে নিজ দলকে ১—০ গোলে অগ্রগামী করেন তখন চিলির সমর্থকরা হতবাক না হয়ে পারেন নি। বিশ্রাম সময়ের এক মিনিট আগে চিলির লিওনেল স্যানচেজ গোলটি শোধ দেন। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় চার মিনিটের মধ্যে চিলি আরও দুটি গোল দেয়—৫১ মিনিটে রাইট আউট জেমী র‍্যামিরেজ এবং ৫৫ মিনিটে পুনরায় স্যানচেজ।

৩১শে মে তারিখে ইতালী বনাম পশ্চিম জার্মাণীর খেলা গোলশূন্য ড্র যায়। ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ে এইটাই প্রথম অমীমাংসিত খেলা।

২রা জুন তারিখে চিলি তাদের দ্বিতীয় খেলায় ২—০ গোলে ইতালিকে পরাজিত করে সর্বপ্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। প্রথমার্ধের খেলায় কোন গোল হয়নি। মারপিট করে খেলার দরুণ রেফারী ইতালির দুজন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বার করে দেন এবং দুজনের নাম লিখে নিয়ে যান। খেলার সূচনা থেকেই ইতালির কোন কোন খেলোয়াড় গায়ের জোর দিয়ে খেলতে থাকেন। খবরে প্রকাশ, বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এ ধরণের অমার্জিত খেলা নাকি কখনও হয়নি। খেলার শেষে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অবাধে হাত-পা চলে। রেফারীকে দুবার পুলিশের সাহায্য নিতে হয়।

৩রা জুন পশ্চিম জার্মানী তাদের দ্বিতীয় খেলায় ২—১ গোলে সুইজারল্যান্ডকে পরাজিত করে। লীগের খেলায় পশ্চিম জার্মাণীর এই প্রথম জয়।

বিভিন্ন দেশের অবস্থা
(৩রা জুন পর্যন্ত)

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পঃ
গ্রুপ ১							
সোভিয়েট ইউঃ	২	১	১	০	৬	৪	৩
যুগোশ্লাভিয়া	২	১	০	১	৩	৩	২
উরুগুয়ে	২	১	০	১	৩	৪	২
কলম্বিয়া	২	০	১	১	৫	৬	১
গ্রুপ ২							
চিলি	২	২	০	০	৫	১	৪
পঃ জার্মাণী	২	১	১	০	২	১	৩
ইতালী	২	০	১	১	০	২	১
সুইজারল্যান্ড	২	০	০	২	২	৫	০
গ্রুপ ৩							
ব্রেজিল	২	১	১	০	২	০	৩
চেকোশ্লোভাকিয়া	২	১	১	০	১	০	৩
স্পেন	২	১	০	১	১	১	২
মেক্সিকো	২	০	০	২	০	৩	০
গ্রুপ ৪							
হাঙ্গেরী	২	২	০	০	৮	২	৪
ইংল্যান্ড	২	১	০	১	৪	৩	২
আর্জেণ্টিনা	২	১	০	১	২	৩	২
বুলগেরিয়া	২	০	০	২	১	৭	০

৩নং গ্রুপের খেলা

খেলার স্থান ভিনা ডেল মার, ৩০শে মেঃ ১৯৫৮ সালের 'জুলে রিমে কাপ' বিজয়ী ব্রেজিল ২—০ গোলে মেক্সিকোকে পরাজিত করে। ব্রেজিলের পক্ষে গোল দেন খেলার ৪৬ মিনিটে লেফট আউট জাগালো এবং ৭৩ মিনিটে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় পিলে।

৩১শে মে তারিখের খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়া ১—০ গোলে স্পেনকে পরাজিত করে। খেলা ভাঙ্গার ১০ মিনিট আগে রাইট আউট গোল দেন। প্রথমার্ধের খেলায় স্পেনের সেণ্টার ফরওয়ার্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার রাইট ব্যাকের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। উরুগুয়েন রেফারীর সময় মত হস্তক্ষেপে ব্যাপার বেশীদূর গড়ায়নি, আড়াই মিনিট খেলা বন্ধ থাকে।

২রা জুন তারিখে ব্রেজিল বনাম চেকোশ্লোভাকিয়ার খেলা গোলশূন্যভাবে ড্র যায়। ব্রেজিলের বিশ্বখ্যাত লেফট ইন খেলোয়াড় পিলে খেলার ২৬ মিনিটে আহত হয়ে কোন রকমে এই দিনের খেলা শেষ করেন।

৩রা জুন স্পেন তাদের দ্বিতীয় খেলায় মেক্সিকোকে ১—০ গোলে পরাজিত করে।

৪নং গ্রুপের খেলা

খেলার স্থান রাঙ্কাগুয়া, ৩০শে মেঃ আর্জেণ্টিনা ১—০ গোলে বুলগেরিয়াকে পরাজিত করে। প্রথমার্ধের খেলার ৩য় মিনিটে আর্জেণ্টিনার হেক্টার এই গোল দেন; উদ্বোধন দিনে চারটি খেলার মধ্যে তাঁর গোলই প্রথম গোল।

৩১শে মে তারিখে ৪নং গ্রুপের দ্বিতীয় খেলায় হাঙ্গেরী ২—১ গোলে ইংলন্ডকে পরাজিত করে। প্রথমার্ধের খেলায় হাঙ্গেরীর লেফট ইনসাইড খেলোয়াড় টিচি প্রথম গোল দেন। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় পেনাল্টি কিক্ থেকে ইংলন্ডের লেফট হাফ ফ্লাওয়ার্স গোলটি শোধ দেন। খেলা ভাঙ্গতে ১৯ মিনিট বাকি থাকতে হাঙ্গেরীর সেণ্টার ফরওয়ার্ড এলবার্ট দলের জয়সূচক গোলটি দেন।

২রা জুন তারিখে ইংলন্ড তাদের দ্বিতীয় খেলায় ৩—১ গোলে আর্জেণ্টিনাকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার পথে অনেকটা অগ্রসর হয়।

৩রা জুন হাঙ্গেরী ৬—১ গোলে বুলগেরিয়াকে পরাজিত করে। প্রথমার্ধের খেলার প্রথম ১২ মিনিটের মধ্যে হাঙ্গেরী ৪টি গোল দেয়। বিশ্রাম সময়ে হাঙ্গেরী ৪—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। হাঙ্গেরীর পক্ষে গোল করেন সেণ্টার ফরওয়ার্ড ফ্লোরিয়ান এলবার্ট ৩, লেফট-ইন টিচি ২ এবং সেণ্টার-হাফ সোলিমেস ১। এ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় আর কোন দেশ এত গোল দিতে পারেনি।

এক নজরে ফলাফল
(৩রা জুন পর্যন্ত)

গ্রুপ ১

উরুগুয়ে ২	:	কলম্বিয়া ১
রাশিয়া ২	:	যুগোশ্লাভিয়া ০
যুগোশ্লাভিয়া ৩	:	উরুগুয়ে ১
রাশিয়া ৪	:	কলম্বিয়া ৪

গ্রুপ ২

চিলি ৩	:	সুইজারল্যান্ড ১
পঃ জার্মাণী ০	:	ইতালি ০
চিলি ২	:	ইতালি ০
পঃ জার্মাণী ২	:	সুইজারল্যান্ড ১

গ্রুপ ৩

ব্রেজিল ২	:	মেক্সিকো ০
চেকোশ্লোভাকিয়া ১	:	স্পেন ০
ব্রেজিল ০	:	চেকোশ্লোভাকিয়া ০
স্পেন ১	:	মেক্সিকো ০

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা : ব্রেজিল বনাম মেক্সিকো দলের খেলায় মেক্সিকো দলের জনৈক খেলোয়াড় হেড দিয়েছেন। ব্রেজিল ২—০ গোলে জয়লাভ করে।

গ্রুপ ৪

আর্জেন্টিনা ১	:	বুলগেরিয়া ০
হাঙ্গেরী ২	:	ইংলন্ড ১
ইংলন্ড ৩	:	আর্জেন্টিনা ১
হাঙ্গেরী ৬	:	বুলগেরিয়া ১

॥ ফুটবল লীগ ॥

গত সপ্তাহে (২৮শে মে—২রা জুন) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তিনটি ম্যাচ খেলে ৪ পয়েন্ট পায়। পুলিশের বিপক্ষে তারা ১—০ গোলে জয়লাভ করে; কিন্তু বালী প্রতিভার সঙ্গে ১—১ এবং ইস্টার্ণ রেল দলের সঙ্গে ০—০ গোলে খেলা ড্র করে। এ পর্যন্ত ৯টা ম্যাচ খেলে তারা ৩ পয়েন্ট নষ্ট করেছে। বালী প্রতিভার কাছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এ মরশুমের প্রথম গোল খায়।

মোহনবাগান ক্লাব গত সপ্তাহে তিনটে ম্যাচ খেলে পুরো পয়েন্ট পেয়েছে। গত বছরের রানার্স-আপ বি এন আর দলকে ২—১ গোলে, হাওড়া ইউনিয়নকে ১—০ গোলে এবং এ বছরের প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় প্রথম চ্যারিটি খেলায় মহমেডান স্পোর্টিংকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। এই জয়লাভের ফলে মোহন-বাগান ক্লাব দ্বিতীয় স্থান থেকে লীগ তালিকায় শীর্ষস্থানে উঠেছে এবং ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব দ্বিতীয় স্থানে নেমেছে। লীগের খেলায় মাত্র দুটি ক্লাব এখনও অপরাজেয় আছে—ইস্টবেঙ্গল এবং ইস্টার্ণ রেলদল।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকা
(২রা জুন পর্যন্ত)
প্রথম তিনটি দল

	খেঃ	জ	ড্র	হাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান—	১০	৭	২	১	২০	৮	১৬
ইস্টবেঙ্গল—	৯	৬	৩	০	৯	১	১৫
জর্জ টেলিঃ—	৭	৪	২	১	৬	২	১০

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
(ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

জলসা

STAR ISABGOL
FLEASEED HUSK
STAR ISABGOL
FLEASEED HUSK
SUPERIOR QUALITY
আপনার কোষ্ঠবদ্ধতায় সকল অসুবিধায় একটি নিরাপদ, দ্রুত এবং কার্যকরী প্রতিকার।
Tara Products
CALCUTTA

অমৃত ।। অমৃত ।।

অমৃত

।। অমৃত ।। অমৃত

২য় বর্ষ, ১ম খন্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 15th June, 1962.
40 Naya Paise

দিল্লী সম্পর্কে অনেক প্রবাদ-প্রবচন ও কথা-কাহিনী প্রচলিত আছে। তাহার মধ্যে দিল্লীর লাড্ডু-জনিত প্রবাদটিই বোধ হয় সাধারণের কাছে সকলের চাইতে বেশী প্রচলিত। যেভাবে সেটি আমাদের কাছে পরিচিত তাহা এইরূপ ঃ "দিল্লী কি লাড্ডু! যো খায়া সো পস্তায়া, যো নহী খায়া সো'ভী পস্তায়া!"

এই কাল্পনিক মিষ্টান্নটি যে কিরূপে বস্তু সে বিষয়ে নানা কথা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু উহা যে সম্পূর্ণ অবাস্তব নহে সে বিষয়ে আমাদের মনে কিছুদিন যাবৎ আর কোনও সন্দেহ নাই। এ কথাও আমরা কঠোর অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, 'খানেওয়ালা' আমরাই—অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণ—এবং 'ন-খানেওয়ালা' হইলেন দিল্লীর উচ্চ অধিকারিবর্গ, কেননা তাঁহারাই ঐ 'মজেদার মিঠাই বনানেওয়ালা' হালুইকর। এবং 'ময়রায় সন্দেশ খায় না' একথাও সর্বজনবিদিত সুতরাং দিল্লীশ্বরবর্গ যে ঐ মনোরম মিষ্টান্ন-ভক্ষণে আক্ষেপ কেন করেন না সেকথা সহজেই বুঝা যায়। এবং উদরস্থ করার ফলভোগ তাঁহাদের করিতে হয় না বলিয়াই তাঁহাদের লুব্ধ মনের লাড্ডু আস্বাদনের আশা মিটে না।

দিল্লীর উক্ত হালুকরদিগের মধ্যে পরিকল্পনা বিভাগ বৃহত্তম। ইঁহাদের কারিগরীর 'তারিফ' না করার উপায় নাই। লাড্ডুর স্বাদ, প্রয়োজনীয়তা ও উহার দ্রব্য-গুণ বিষয়ে উঁহাদের বক্তৃতা-বিবরণ ইত্যাদি অনবদ্য, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। শুধু যা তাঁহাদের ফলাফল বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে কোন কিছুরই স্থিরতা নাই। পণ্যদ্রব্য, ঔষধপথ্য ইত্যাদির উপর শুল্ক বসান হয় ইঁহাদের প্রয়োজনে এবং বিদেশী ঐ জাতীয় দ্রব্যাদির আমদানি বন্ধ বা সংকুচিত করা হয় তাঁহাদের বিবেচনা অনুযায়ী। পণ্যমূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে দেখা যায় যে, হিসাব দাঁড়ায় সম্পূর্ণ ভুয়া। তাহার পর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে তাঁহাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় কার্যকারণ বিবৃতির পর উদ্দেশ্য বিষয়ে যাহা বলা হয়, ফলে দেখা যায়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নানাভাবে এবং তাহার প্রধান কারণ এই যে, প্রস্তাবগুলি শুধু যে সুচিন্তিত নয় তাই নয় উপরন্তু তাহার বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে এরূপ অনেক কিছু আছে যাহার ফল হইবে দেশের ও জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর—অবশ্য দিল্লীশ্বরবর্গ সাধারণজন নহেন একথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এজাতীয় অভিনবতম প্রস্তাবের মধ্যেও অনেক কিছু আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে আমরা মনে করি। ঘোষণায় আছে যে, দেশের মুদ্রা সংরক্ষণের জন্য 'কঠোর ব্যবস্থা' অবলম্বিত হইবে, কেননা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলকে ক্ষয়রোগ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন,—জানিনা সে কথায় আশ্বস্ত হইয়াছে কে—যে সঞ্চিত মুদ্রাক্ষয়ের দরুণ বৃহত্তম লাড্ডুর 'পাক' বন্ধ বা মন্থরগতি হইবে না অর্থাৎ কিনা পরিকল্পনার কাজ সমানে বা দ্রুততর গতিতে চলিবে। এই পরিকল্পনাপ্রসূত দেশ উন্নয়ন-কল্পে মহানদীর বন্যার জলের মত অর্থব্যয়ের বিনিময়ে প্রস্তুত, রাউরকেলা লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে খবরটি সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে সেদিকেও আমরা এই সূত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাহাতে আছে যে, উক্ত কারখানা পূর্ণরূপে চালু হইবার পূর্বেই কিঞ্চিদধিক ১০ কোটি মুদ্রা মেরামতি বাবদ খরচ করা প্রয়োজন। সুতরাং পরিকল্পনার কাজ দ্রুততর হওয়ার আরও বিশদ ব্যাখ্যা যে শ্রীদেশাই কেন করেন নাই সেকথা সহজবোধ্য।

মুদ্রা সংরক্ষণের জন্য আমদানি হ্রাসের ফলে দেশের কতটুকু উপকার ও কতটা অপকার হয় সে বিষয়ে সবিশেষ সবৃত্তান্ত লিখিবার স্থান এখানে নাই। তবে শ্রীদেশাইয়ের প্রস্তাব যে সুচিন্তিত নহে, অর্থাৎ তাঁহার ব্যবস্থায় যে ফলাফল সম্পর্কে কোনও বিচারের লক্ষণ নাই সে বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা নিতান্তই প্রয়োজন। কেননা, উহাতে এই দেশের শিক্ষার বিষয়ে অপকারের সম্ভাবনা স্পষ্টই রহিয়াছে।

তাঁহার প্রস্তাবে দেখি যে, চোরাগলি দিয়া বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা অপচয় নিবারণের জন্য তিনি অবৈধ নির্গমন পথ বন্ধ করিতে উদ্যত। ব্যবস্থা হইবে কিরূপে? তিনি বলেন যে, বৈদেশিক মুদ্রার বিশেষ সাশ্রয়ের জন্য ব্যবসায় ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন আরও নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। এ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে যে, জাহাজ ও বিমান প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সঙ্গে সঙ্গে হুকুমজারি হইয়াছে যে, কোনও বিদেশযাত্রার টিকিট তাহারা কাহাকেও দিতে পারিবে না, যদি না সেই ব্যক্তি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছাড়পত্র দেখায়—অর্থাৎ দিল্লীশ্বরবর্গ বা তাঁহাদের আমলাতন্ত্রের অনুগৃহীত ব্যক্তি ভিন্ন কেহই বিদেশযাত্রা করিতে পারিবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজকাল এরূপই দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীদেশাই শিক্ষামন্ত্রী নহেন এবং শিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রার প্রয়োজন কি সে বিষয়ে তিনি সম্ভবতঃ বিস্মৃত, কিন্তু দিল্লীতে কি কেহ নাই যে এ বিষয়ে তাঁহাকে সচেতন করে?

কবিতা ॥ ॥ কবিতা

জোনা

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

অলক্ষ্যে ছিল কোন্ ক্ষতমুখ—
ভাবিনি ঝরবে রক্ত;
কাক-ডাকা খাঁ খাঁ দুপুরের মত
এ জীবন নিরাসক্ত।

খেলাছলে তবু হাত দিয়ে যেই
ছুঁলে তুমি, অয়ি নিদয়ে!
বজ্রের মত বাজলো গভীর
হৃদয়ে, আমার হৃদয়ে।

নামহীন এই টিলার সামনে
দুই পথরেখা দৈবাৎ,
মিলে গেল এসে, এক পলকেই
পুনরায় হলো সাক্ষাৎ।

এ বিশ্ব বড়ো ছোটো, ভাবলুম—
অকারণ চাঞ্চল্য
শরীরে শোণিতে তড়িৎ-বাহিত
রোমাঞ্চ কেন জ্বাললো?

প্রবাল গুঁড়ানো লাল মাটি হাসে
জড়োয়া সবুজ পান্নায়,
জোনা-প্রপাতের কিনারে দাঁড়াতে
আকাশ ভাঙলো কান্নায়।

এত বছরের নীরবতা যদি
ভাঙলে এ জনবিরলে,
পাত্র আমার ভরে দিলে শুধু
স্মৃতির ফেনিল গরলে।

কী পেয়েছি? আজ তোমাকে শুধাই,
স্মৃতিরঙ্গের নির্জন!
সময়ের ট্রেন গর্জায়, বাজে
চেতনা ছাপিয়ে গর্জন।

ধ্রুবছায়া

সুবোধকুমার গুপ্ত

দেখেছি নদীর—আমি তাও জানি অনির্বাণ এই যে জীবন
মোহনায় এসে গেলে তেমনি আর এক মৃত্যু তার—
মৃদু হেসে, এ আকার একাকার করে দেয়; তবুও তখন
নেচে চলে বাউলের গান গেয়ে গোলক-ধাঁধায়
ঘুরে অ-মৃত সত্তার।

মাঝখানে কড়িখেলা ঘড়িঘরে,—প্রহসন নাটকের যেটুকু সময়
আকুল আর্তিতে মগ্ন,—দূরলক্ষ্য হোমাগ্নিকে যেন তার
কান্না মনে হয়।
সৃষ্টির সম্ভাষে খুশি এই সূর্য আলো জল
ব্রহ্মাণ্ডের কাছে—
অনাদি কালের থেকে শিরার শোণিতে পীত ঋণ জমা আছে।

তবু কেন অন্য এক পরিসরে অন্বেষার তীরে
মত্ততর রক্তস্নান! অথচ আশ্লেষ-ধন্য আনন্দের গানে
এ-নিখিল স্রোতস্বতী; সেই সত্য বিন্দুটিকে স্থির রেখে
অতিকায় টানে
আবেশে বিবশ করে তন্বঙ্গী মৌসুমী চোখ—
চোখের নিবিড়ে।
পায়ে পায়ে পরিক্রমা প্রতি চিহ্নে আলিম্পন, সময়ের শাঁখ
বেজেছে। এসেছি বোধে বোধিতে। তবুও শুনি রক্তে
আজও আদিম গুহার বন্য কুমারীর ডাক।

মায়ের মতন স্নেহে—ভুলে গিয়ে, শ্লোক বলা মাটির অন্তর
কুঁড়ির এষণা নিয়ে গীতিময়—মৌল প্রেমে মনে তার বড়
তীব্র ঝড়।

অণুর শরীরে অণুতম থেকে সৌরলোকেদের দূরে
তারার যোজন
গিয়েও খুঁজেছি এক প্রজ্ঞার আলোক নিয়ে
সৃষ্টির সে দাম ঃ
নদীটিকে—জ্যোতির্বৃত্তলোক। বিপুল বিপন্ন
তবু অশেষ প্রসন্ন মন
নৌকাঘাটে গলুই-দড়িতে এসে চেয়েছে সে ধনাঢ্য বিশ্রাম।

বরফের মত ঠাণ্ডা মলিন বিবর্ণ, যত লাভ ক্ষতি ক্ষয়
গলে যায়—শেষে জলে জলাঞ্জলি। ক্ষ্যাপা বাদকের মত
ঢেউ নিয়ে নির্লিপ্ত সময়
দ্রিমি দ্রিমি মৃদঙ্গ বাজায়। গন্ধবনে পুষ্প গন্ধ হয়।
আকাশে আকাশ-তারা সরে।
শেষ অঙ্কে, সত্তার সমস্ত জুড়ে শিশিরের বুকে ধীর
নিরুত্তাপ ধ্রুবছায়া পড়ে।

জৈমিনি

আজ আমি আপনাদের রাস্তার গল্প শোনাব।

রাস্তার গল্প মানে অবশ্য 'রাজ-পথের' কথা নয়। সে গল্প শুনিয়ে-ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।......'আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় অরণ্য-পর্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া, দেশ-দেশান্তর বেষ্টন করিয়া, বহুদিন ধরিয়া জড়-শয়নে শয়ান রহিয়াছি।'......এমন ধরনের কল্পনাশক্তি আমার নেই, এত বিরাট পটভূমিতে বুঝি এখন আমাদের মন তেমন ক'রে সাড়া দেয় না। তাই আমি ছোট চৌহদ্দিতে নিজেকে বাঁধছি। তারই গল্প শোনাতে চাইছি আজকে, যে-রাস্তায় আমাদের প্রতিদিনের যাতায়াত। আমি কলকাতা শহরের রাস্তার কথা বলছি।

ভয় নেই, রাস্তায় এনে দাঁড় করালেও শেষপর্যন্ত পথে আমি আপনাদের বসাব না। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই যেসব অম্লমধুর কাহিনী আপনাদের মুখস্থ শক্তিকে তীব্র ক'রে তোলে তার আমি পুনরাবৃত্তি ঘটাব না। পাঁচ মিনিট বৃষ্টি হলে কোথায় কোথায় জল জমে, দশ মিনিট বৃষ্টি হলে কোন্ কোন্ রাস্তা প্রেস-ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা-আলোকিত করে, তা আপনাদের সকলেরই জানা আছে। তারপর, বৃষ্টি-পাতের ফলে যানবাহন বিকল হওয়ার স্ট্যাটিস্টিক্সও আমাদের নখদর্পণে। রাস্তায় কতখানি করে জল জমলে পর-পর ট্রাম, একতলা বাস ও দোতলা বাস বন্ধ হয়, এসবও আমরা ভালো করেই জানি। কাজেই সেদিকে আমি যাব না।

বরং আজ একটা অন্য গল্প ফাঁদা যাক। রাস্তা যেখানে রাস্তা নয়, রাস্তার সেই চরিত্রের কথা স্মরণ করা যাক আজ।

কথাটা একটু গোলমেলে, না? রাস্তা অথচ রাস্তা নয়, সে আবার কেমন

ব্যাপার? এমন কিছু কঠিন নয়। রাস্তা কথাটার মানে কি? শব্দকল্পদ্রুমে হাতের কাছে নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্ভয়ে বলতে পারি—কোনো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়াই রাস্তার স্বধর্ম। যেমন ধরুন, বাড়ি থেকে আপিস, এবং আপিস থেকে বাড়ি। কিম্বা বাড়ি থেকে ব্যবসার জায়গা, এবং ব্যবসার জায়গা থেকে বাড়ি। অথবা বাড়ি থেকে বাজার, সিনেমা হল বা খেলার মাঠে যাওয়া এবং আসা। এর বাইরে রাস্তার সংগে আমাদের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে।

অর্থাৎ রাস্তা হল আমাদের যাতায়াতের অবলম্বন। কিন্তু সকলের কাছেই কি রাস্তা তাই? না, তা নয়। এমন লোকও আছে, এবং কলকাতার মতো শহরে বেশ যথেষ্ট সংখ্যাতেই আছে, রাস্তা যাদের অবলম্বন নয়, লক্ষ্যস্থল। ঘর থেকে বেরিয়ে তারা রাস্তাতেই আসে, এবং রাস্তা থেকেই তারা ঘরে ফিরে যায়।

এমন লোক কি আপনি একটিও দেখেননি? দেখেছেন বৈকি! ভিখিরিদের কথা ভাবুন না। ঘর তাদের ঠিক কোথায় আছে জানিনে, হয়তো সকলের তা নেইও, কিন্তু রাস্তা ছাড়া এরা যে কোথাও যায় না, এ তো আমরা সকলেই জানি।

কিন্তু ভিখিরিরা অন্য জাতের মানুষ, তাদের সংগে আমাদের তুলনা চলে না। তারা মানব-সমাজের কাছাকাছি বাস করলেও সমাজের ঠিক মাঝখানে নেই। কাজেই ওদের সংগে সমাজবাসী মানুষদের এক ক'রে দেখা যায় না। আমরা বরং অন্য দৃষ্টান্তে আসি।

যেমন ধরুন ফিরিওয়ালা, বা ফুটপাতের দোকানী। রাস্তার সংগে এদের বন্ধন প্রায় অচ্ছেদ্য বললেও বেশী বলা হয় না। কিন্তু দশ মিনিটের মাপে একটা মাঝারী রকমের বৃষ্টি হলেও রাস্তায় যখন জলরেখা হাঁটু ছাড়িয়ে যায়, এদের তখন কী দশা দাঁড়ায় কখনো ভেবে দেখেছেন কি?

পুরনো কাগজ শিশি-বোতল, ছিট-কাপড়, ল্যাংড়া আম নিয়ে এদের অনেককেই আপনারা বৃষ্টির সময় ছুটে গিয়ে কোনো গাড়িবারান্দায় আশ্রয় নিতে দেখেছেন। তারপর, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি, রাস্তায় জলের চাপ যতো ঊর্ধ্বগতি হয়েছে, এদের মুখের চেহারাও ততো হতাশ হয়ে উঠেছে। হবে নাইবা কেন? একটি দিনের রুজি মারা গেলে একটি দিনই যাদের না-খেয়ে কাটাতে হয়, রাস্তায় জল জমলে নিশ্চয়ই তাদের মনে কবিত্ব-ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক নয়!

আর ঐ ফুটপাতের দোকানী? তাদের কথা বলার আগে আমি অনুরোধ করব, তাদের দোকানগুলোর দিকে একটু নজর দিয়ে দেখতে।

প্ল্যাস্টিকের ছোটখাট জিনিস, চুলের ফিতে, সেফটিপিন, কেবল এইটুকু বেসাতি নিয়েই হয়তো কেউ বসে আছে সারাদিন ডালহৌসির ফুটপাতে। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে কাউকে দেখা যাবে কাপড় আটকাবার কাঠের ক্লিপ, জুতোর কালি, ছুঁচ, সুতোর গুলি নিয়ে

এই বিচিত্র জনসমষ্টি, আশ্চর্য এদের জীবিকা, কী করে দিন চালায় জানিনে—হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে রাস্তায় জল জমতে শুরু করলে এরা যে কী পরিমাণ অসহায় হয়ে পড়ে তা আমি স্বচক্ষেই দেখেছি। তপ্ত খোলা থেকে খৈ ছিটকানোর মতো দিগ্বিদিকে ছুটতে থাকে এরা ছোট্ট একটি ছাউনি আর সামান্য একটু শুকনো জায়গার জন্যে। কিন্তু কলকাতা প্রাসাদপুরী হলেও বৃষ্টির দিনে ও-দুটি জিনিস এতো সহজে মেলে না। কাজেই যে যার বেসাতি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারা জলের মধ্যেই। দেখে মনে হয় নতুন প্রজাতির কোনো জলচর প্রাণী!

বসে আছে। কলেজ স্ট্রীটে একজনকে দেখেছিলাম, তার দোকানে শুধু গোটা-কুড়ি রুমাল, খুলে খুলে মন্দিরের মতো উঁচু করে রাখা। তাছাড়া দামী কাপ-ডিশ কিম্বা সস্তা ব্লাউজ-পিস অথবা বেলোয়ারী কাঁচের ও প্লাস্টিকের চুড়ি দিয়ে দোকান সাজায় কতোজনে, তার হিসাব রাখবে কে? গড়িয়াহাটের মোড়ে একজনকে দেখেছি শুধু ফুলের মালা বিক্রি করতে। শেয়ালদার কাছে আরেকজন বৃদ্ধ কেবল একটি ওজন নেবার যন্ত্র নিয়ে বসে থাকে, আর মাঝে মাঝে চ্যাঁচায়—আইয়ে বাবু, আইয়ে। ওদিকে রাজভবন বা ওয়েলিংটনের কাছে যারা বসে থাকে তাদের মুখে দেখেছি অপার নিঃস্পৃহতা, কারণ তারা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা—তাদের চেয়েও হা-ঘরে কেউ এসে হাত না পাতা পর্যন্ত তাদের ধ্যানভঙ্গ হতে চায় না।

এদের জন্যে কোনোদিকেই কোনো আশ্বাসের আভাষ নেই। শোনা যাচ্ছে, ময়লা জল নিষ্কাশনের ড্রেনগুলো নাকি কাদা-ময়লায় আকণ্ঠ বুজে এসেছে। শোনা যাচ্ছে, ময়লা-তোলার কর্মীরা নাকি কাজে সহযোগিতা করেনি। শোনা যাচ্ছে, ময়লা তুললেও নাকি কলকাতার ড্রেনগুলো দেড় ইঞ্চির বেশি বৃষ্টি হলে জল বইতে পারত না। শোনা যাচ্ছে আরো অনেক কিছুই। শুধু শোনা যাচ্ছে না সেই কথাটিই যে-কথা শোনার জন্যে আমরা, এবং আমাদের চেয়েও বেশি, ফুটপাতের ঐ মানুষগুলো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

কিন্তু আর নয়। রাস্তার গল্প আর বেশি টানলে আমি নিজেও হয়তো রাস্তা হারিয়ে ফেলব। হাজার হোক, এখনো আমার একটা ঘর আছে। সেই ঘরখানায় ঢুকলে রাস্তার কথা হয়তো আমিও ভুলে যেতে পারব আপনাদের মতোই।

নীলনেশা

শক্তিপদ রাজগুরু

অনেক ছোট বড় মাঝারি পাহাড় চলে গেছে অনেকদূর অবধি। ওইটাই বড়— প্যানচোত পাহাড়। পঞ্চায়েতের মজলিসে ওই যেন অগ্রজ প্রধান। দিনের সকাল দুপুর সন্ধ্যায় ওর রূপ বদলায়। সকালের সোনারোদে জেগে উঠেছে বনভূমি, পাহাড়ের গায়ে জিরি বনভূমি— শাল কেঁদ আর ছোট ছোট বাঁশের বন, উঠে গেছে পাহাড়টা আশমানের দিকে—আলোর দিকে।

ওদের অন্নদাতা ওই পাহাড়। ঝরনার জলে ওরা তৃষ্ণা মেটায়, ওর ডংরীর ফসলে ক্ষুধা মেটায়—কন্দমূল খেয়ে দিন কাটায়, কত দুঃখের দিন।

সকালের রোদমাখা পাহাড়চূড়ার দিকে চেয়ে থাকে ফকীর—নীল আকাশ আর পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘ তারই দিকে উঠে গেছে পাহাড়টা,

দুটো চোখ আর অনেক কিছুত এই উপত্যকা। কত দেখবে ফকীর! দেখার শেষ নেই। এক এক ঋতুতে এর বিচিত্র সাজ। উঁচু নীচু উপত্যকা—কোথায় মাথা তুলেছে কালো পাথর, কোথাও ঠাঁই ঠাঁই একটু সবুজের কৃপণ ছোঁয়া। অন্যদিকে বিশাল বাঁধের নীচে দামোদরের রুদ্ধ সঞ্চিত জলধারা। যতদূর দেখা যায় চোখে পড়ে নীল জল—ধোঁয়া ধোঁয়া। আরশির উপর ফুঁ দিলে যেমন ধোঁয়াটে দেখায় তেমনি।

আঁকড় পলাশ ফুল ফোটে বসন্তের সময়, ঘন লাল আর সাদা চন্দনের ছিটের মত ফুলগুলো চারিদিক ভরে তোলে, সকালের গিনিগলা রোদ রুদ্র রং ধরে দুপুরের গরমে।

বর্ষাতগুলো কেমন ঝিমিয়ে পড়ে—মনে হয় সব লোকজন কোথায় পালিয়েছে। চারিদিকে খাঁ খাঁ শূন্যতা।

ওদিকে জেঁকে বসে আছে চোখের উপর বিশাল পাহাড়টা। ঘাড়ে পিঠে

ওখানে ধোঁয়া নেই। কেমন হলুদ সবুজ আর সুন্দর আলোয় ভরা।

একটা শব্দ উঠছে।

ওদিক থেকে নয়—দামোদরের জল পার হয়ে কাঁপতে কাঁপতে আসছে ওই গর্জনধ্বনি, আকাশে একরাশ কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা দৈত্যের হাতের মত বীভৎসভাবে গ্রাস করতে আসছে আকাশের আলোটুকুকে। রুদ্ধ চাপা গর্জন শোনা যায়—জলে কেঁপে কেঁপে উঠছে শব্দটা।

—ভোঁ ও ও ও ...

ফকীর কেমন চমকে ওঠে। ভয় করে—আজ সেও ভয় করে ওই গর্জনধ্বনি।

আগে কিন্তু করেনি। সেদিন সে ছিল ভরা যোয়ান, শক্তসমর্থ একটি যুবক। সারা দেহমনে দুর্বার চাঞ্চল্য। ওই প্যানচোত পাহাড়ের উপর থেকে ওই লোহাকারখানার দিকে চেয়ে থাকতো মাঝেমাঝে। কত ছোট, এই-টুকু টিনের খেলাঘরের মত কত সারিবন্দী ঘর; টানা চলে গিয়েছে। ওখানে থাকতে পায়—পয়সা পায়। অনেক পয়সা।

তারই লোভে একদিন ফকীরও দামোদরের হাঁটুজল পার হয়ে বরাকরের দিকে গিয়েছিল। অনেকেই যায় ওই দিকে। বড় রাস্তা—লোকজন-গাড়ী আর কত ভিড়।

অবাক হয়ে যায় ফকীর ওই কারখানায় প্রথম দিন এসে। দুচোখ জুড়ে ওই কারখানা আর কারখানা, কালো লম্বা চিমনীগুলোর বুক জ্বলছে—বের হয় শুধু ধোঁয়া, আলোভরা নীল আকাশ কালো করে তুলেছে। আকাশ বাতাস কাঁপছে তাদের গর্জনে।

পিছনের দিকে চেয়ে দেখে আকাশ-জোড়া প্যানচোত পাহাড় কেমন রোদের ধোঁয়াটে আভায় বিবর্ণ হয়ে আকাশের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। এইটুকু একটা ঢিবি বলে মনে হয়। সবুজ গাছগাছালি পাখীর ডাক—সব স্বপ্ন বলেই মনে হয়।

মন কেমন করে, এতদিনের দেখা পৃথিবী ওই নীল পাহাড় সব যেন তার হারিয়ে গেল।

তবু এগিয়ে যায় ফকীর। ভয়ে ভয়ে ঢুকল বিশাল কারখানার গেট-এর ভিতর। টিনের ছাউনিগুলো আকাশ ছেয়ে ফেলেছে—একটানা লম্বা ওগুলো মুলুক জুড়ে জেঁকে বসেছে। সেখানের বাতাসে দম নিতে কষ্ট হয়, ধোঁয়া আর ধুলো জমাট বেঁধে আছে। বুকটান লাগে, কান পাতা যায় না। তারাফুলের মত কোথায় ছিটকে পড়ে লোহার লাল টুকরোগুলো—মাথার উপর হঠাৎ একটা বিশাল লোহার স্তূপ ছুটে চলেছে, এখুনিই যেন ছিটকে পড়বে নীচে—চুরমার করে দেবে।

লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াতে যাবে ফকীর একপাশে, কে গর্জন করে ওঠে—হুঁসিয়ার!

ছোট লাইন পাতা, তার উপর দিয়ে একটা বোঝাই ট্রলি চলে গেল। একপাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে ফকীর।

জীবনের এখানে যেন কোন দাম নেই। যে কোন মুহূর্তেই সব ফুরিয়ে যাবে।

মরণের রাজ্য! আঁধারের রাজ্য! দিনের আলো এখানে নেই, মুক্ত বাতাস নেই। চারিদিকে শুধু ওই মরণের কালোছায়া শাসনের কাল চোখ মেলে রয়েছে আর আকাশজোড়া কুশ্রী চেহারাটা রাগে শুধু গোঁ গোঁ করছে।

কোথায় সেই নীল আকাশছোঁয়া পাহাড়—আলোমাখা মেঘসীমা, সেই দামোদরের কালো জল পলাশীর চোখের মত মিশকালো তার রং। পলাশী আর প্যানচোতের সেই নীল জগৎ—দুটো তার মনে একাকার হয়ে ওঠে। কেমন দামোদরের উপছে পড়া জলস্রোতের চাঞ্চল্য তার সারা দেহে, তেলকুপীর মন্দিরের গায়ে সেবার দেখেছিল কালো পাথর কুঁদে তৈরী করা একটা সুন্দর মূর্তি। ছোট্ট কোমরটা ওই গুরুদেহের ভার বইতে যেন আর পারছে না। ফকীর ওকে দেখে আর পলাশীর দিকে চেয়ে থাকে।

—কি দেখছিস হাঁারে? পলাশীর দুচোখে নেশার আমেজ।

—তুকে। তুই যেন ঠেক কালের।

হাসে পলাশী, সারা দেহে ওর হাসির ধারা, বলে ওঠে—কেনে?

বিমুগ্ধ ফকীর জবাব দেয়—কাইলে কুনকালের দেওয়ালে তুর মতন আঁকা কেন?

খিলখিলিয়ে হাসে পলাশী। নুড়িতে ঘা লেগে ঝরনা যেন সুর তুলেছে।

পলাশীকে নোতুন চোখে দেখে ফকীর। মনে হয়, চড়াই-উৎরাইভরা ওই মাটি আর পাহাড়ের সব সুন্দর, সব রং ওতে মাখানো।

আজ সব যেন মুছে যেতে বসেছে ফকীরের মন থেকে।

বাতাসে ভোঁও-এর শব্দটা ওঠে—এরই রেশ শুনেতো সে ওই দূরে পাহাড়ের ধারে বস্তিতে। আজ এই ভিড়ে সেও হারিয়ে গেছে।

অবশ্য না এসে পারেনি এখানে—এই কারখানায়। এখানে পয়সা পাবে, ঘর বাঁধার পয়সা—জমি-জারাতও কিনবে।

ক্লান্ত পায়ে বের হয়ে এল কারখানা থেকে ফকীর। কদিনই এসেছে এখানে।

পলাশীর বাবাকে টাকা দিতে হবে। তাদেরও চাই ঘরবসতের টাকা। সেদিন ত পলাশীই যেন ওই পথ বলে দিয়েছিল তাকে। ওই কারখানায় অনেকেই যায়—পয়সা আনে।

ফকীরও গিয়েছিল তাই অনেক আশা নিয়ে।

বেলা হয়ে গেছে।

ডুংরীর অনেকেই গেছে পাহাড়ে, ফকীর অলস দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। দু'একটা গরু ছাগল চরছে এদিক ওদিকে, পাহাড়ের উপরেও উঠেছে অনেকে। এইটুকু বিন্দুর মত দেখায় তাদের। বনের আড়াল থেকে ওদের গলায় ঝোলান কাঠের ঘণ্টার ঘাটর ঘাটর শব্দ ভেসে আসছে। কেমন সুরহীন একটা কঠিন শব্দ, নিরস, ওই পাথুরে মাটির মতই কর্কশ ওই শব্দটা। কেমন ফাঁকা উদাস সুরে কোথায় বাঁশী বাজে।

বসে আছে ফকীর। বাঁ পাটা হাঁটুর উপর থেকে কাটা। শরীরের একটা ফালতু অংশের মত কাটা পাটা লেগে রয়েছে। ওর ঠাঁই নিয়েছে একটা গোঁড় ভাল্কি বাঁশের লাঠি। ভাল পাটায় ভর দিয়ে ওইটা সম্বল করে কেমন কদাকার একটা জানোয়ারের মত লাফ দিয়ে হাঁটে।

—এ্যাই।

পলাশীর ডাকে মুখ তুলে চাইল ফকীর। কেমন শূন্য চাহনিতে।

প্যানচেত ড্যামের নীল জল শুধু কালিগোলা নীল জল চোখে পড়ে। ওই জলে যেন ঝড়ের মাতন উঠেছে। শোঁ শোঁ শব্দ ওঠে। ধোঁয়া আর ঝাপসা একটা আবরণ চোখ আচ্ছন্ন করে দেয়।

সেই নিদারুণ দৃশ্যটা মনে পড়ে। পলাশীকে দেখলেই জীবনের এই চরম

দুঃখটা বার বার মনে হয়, পলাশী জানে না বোধ হয় ওর মনের গুমরে ওঠা সেই কান্না।

জলে কাঁপছে সেই ভোঁ-এর শব্দটা—এত দূরে অবধি যেন তাড়া করে আসছে দৈত্যটা, নীল আকাশে চাপা চাপা ধোঁয়ার ইসারায় তার কঠিন মূর্তিটা ফুটে উঠেছে।

লোহাকারখানার সেই নিষ্ঠুর দৈত্যটা ধারাল দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছিল তাকে। টানছে তাকে—ধীরে ধীরে, সংগোপনে। ছাড়াবার চেষ্টা করে ফকীর। ভয়ে আতঙ্কে কথা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাণপণে দুহাতে ওই চাকাটাকে সরাবার চেষ্টা করে কিন্তু সেই জগদ্দলকে নড়াবার শক্তি তার নেই। শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরাগুলো প্রচণ্ড টানে ছিঁড়ে টুকরো হয়ে যাবে।

ও কাঁপছে অব্যক্ত যন্ত্রণায় আর আতঙ্কে।

নীরব মসৃণ গতিবেগে চাকাটা ঘুরছে। একটার পর একটা ধারাল দাঁত মাংস শিরা হাড় ভেদ করে মিলছে খাপে খাপে, ফকীরের দুহাত ভিজে গেছে তাজা রক্তে। থর থরিয়ে কাঁপছে ফকীর।

ঝড়ে গাছ পড়তে দেখেছে পাহাড়ে।

মাথা নাড়াতে নাড়াতে ওর শিকড়ের বাঁধন আলগা হয়ে যায়, একটা মৃদু শব্দ ওঠে, মাটি ঝুরো পাথর সরে যায়। তার পরই—

একটা অতর্কিত আঘাতে লুটিয়ে পড়ে গাছটা, বন কেঁপে ওঠে তার ব্যর্থ মর্মরে।

তেমনি একটা অব্যক্ত শেষ আর্তনাদ ফুটে ওঠে ফকীরের কণ্ঠে। মনে হয় না ওই চীৎকার সেই-ই করছে। এ যেন অন্য কোন মানুষ—প্রাণপণে বুক ঠেলে সে চীৎকার করছে।

একটা কোলাহল! কারা এগিয়ে আসে কেমন ছায়ামূর্তির মত।

বাজছে ভোঁওটা! আনন্দে গর্জন করছে সেই দৈত্যটা!

কেমন গাঢ় অন্ধকার নামে তার চোখে! আর বুকজোড়া তেষ্টা।

সে তেষ্টা আজও মেটেনি ফকীরের।

এ্যাই। কি এত ভাবিস তু!

পলাশী ওর পাশে এসে বসেছে। ঝাপাড়টার ফাঁক দিয়ে ঠাঁই ঠাঁই রোদ পড়ছে। পলাশীর বলিষ্ঠ মুখে আদুড়

গায়ে ঠাঁই ঠাঁই সেই রোদের হিজিবিজি। ওর দিকে চেয়ে জবাব দেয় ফকীর—উঁহুঃ!

পলাশী আঁচল থেকে মুড়িগুলো সানকিতে ঢালছে। ফকীর দেখছে।

যেমন ভাল লাগে না, পলাশী দয়া করে যেন তাকে—পঙ্গু অক্ষম একটা বাতিল লোককে।

ভোঁ-এর রেশ তখনও মিলোয় নি। জলে কেঁপে কেঁপে উঠছে তীর ব্যঙ্গের মত।

ফকীর ঘর বাঁধতে চেয়েছিল ওই পলাশীকে নিয়ে।

তাই ঠাট্টা করে ওই কারখানার দৈত্যটা। ওদিকে প্যানচেত পাহাড়টা রোদ আর ছায়ার ভরে উঠে তাদের দিকে চেয়ে রয়েছে।

বস্তির সেকড়ের চোটখাওয়া ঠ্যাং-খোঁড়া ন্যাংড়া কুকুরটার কথা মনে পড়ে। তেমনি যেন সেও। বাঁচবার কোন মোহই আর নেই।

তবু পলাশীকে কেমন এড়াতে পারে নি। খাঁ খাঁ ঊষর পাথরে-প্রান্তরে ওই-খানে একটু রং একটু ছায়া জমাট বেঁধে রয়েছে।

টুকচেন নিশা এনেছি। পলাশী হাসছে। পাত্রটা এগিয়ে দেয় ওর দিকে। পলাশীর দেহে ওর সান্নিধ্যে কেমন একটা নেশা আসে। মহুয়ার নেশা।

গ্রীষ্মের খর রোদ সকালবেলা ভরে তুলেছে। মিষ্টি সোনারোদ-ভরা সকাল। প্যানচেত এবং আলোমাখা পাহাড়-চূড়ায় মেঘ জমেছে—সাদা টুকরো মেঘ। পাখী ডাকছে শালবনে, তখনও দু-একটি মহুয়া ফল ঝরছে, সরস নিটোল হলুদ ফুল তেমনি গন্ধ আর নেশাআনা স্বাদ।

পলাশী ওর এই পরিবর্তনে বেশ খুশীই হয়েছে।

ফকীরের দু'চোখে আগেকার সেই ভালবাসার নেশা—সেই আভা। পলাশী বলে ওঠে—ইবার ফসল বেশ ফলেছে, ওই দেখ!

সুন্দর আঙুলটা তুলে দেখায় ওই পাহাড়ের গায়ের ডুংরীর দিকে।

ফকীরের ওই দুর্ঘটনার পর কোম্পানী কিছু টাকা দিয়েছিল। পলাশীই ওর বাবাকে দিয়ে কিনিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের অনেক উপরে ঝরনার ধারে বেশ খানিকটা জায়গা: একটা তাকের মত উঁচুতে সমতল ক্ষেতের ধারেই ঝরনা—জলের সঞ্চয়: ক্ষেতে ফসল ফলে। এবার অনেক ফলেছে।

নীচে থেকে দেখা যায় রোদ লেগেছে ওখানে, সবুজ হলুদ আর পাকা যবের সোনা রং-এ মেশামেশি। ঝরনার ধারে একটা ঝুপড়ি তুলেছে, পিঁয়াজ খেতে সবুজ ডোঁড়ির মাথায় সাদা ঝুমকো ফুল, যব গমের খেত বাতাসে মাথা নাড়ে। সোনা রং ওর শিষে! পাখী ডাকে!

হাসছে পলাশী।

কিন্তু ওই উপরে—ওই আলো আর ছোট্ট ঘরে যাবার ক্ষমতা তার যেন নেই। খোঁড়া পা আর পঙ্গু দেহ তার পথে বাধা হয়ে আছে। দুস্তর বাধা। সেখানের স্বপ্ন তার কাছে সত্য আর হবে না যেন।

পলাশী ফিসফিসিয়ে বলে—আমি তোকে নিয়ে যাবো ওখানে।

ফকীর ওর দিকে চেয়ে থাকে, কেমন বিচিত্র আশাভরা নীরব চাহনিতে। জীবন তাকে নাশ করেছে; পলাশী তাকে পূর্ণ সার্থক করতে চায়। ফিরিয়ে দিতে চায় ওই আলো, শ্যাম সবুজ আর পাখীর ডাকভরা একটু ঘর।

নীচের বসত ছেড়ে দিতে হবে।

প্যানচেতের জল ঠেলে আসবে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে—ডুবিয়ে দেবে নামেবসত। অনেকেই এখান ছেড়ে চলে গেছে, বাকী যারা আছে তারাও উপরের ডুংরিতে চলে যাবে। ওই বন খেতখামারে।

কেউ বা চলে গেছে কারখানায়—ওই কলিয়ারীর দিকে। কোন অন্ধকার খাওড়ায় কয়লার ধুলোয় হারিয়ে গেছে।

পথ হারিয়ে ফেলেছিল ফকীর। হারিয়েছিল তার ঘর। সব আবার ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখে ওই পলাশীর মাঝে।

নিবিড় করে কাছে টেনে নেয় তাকে—মহুয়া আর শাল ফুলের গন্ধ ওঠে বাতাসে, তারই মাঝে মিলনের নেশার মত খোঁপায় ও গুঁজেছে লাল পলাশ ফুল।

...দুপুরের বাতাসে ঢেউ জাগে প্যানচেত ড্যামের নীল অথৈ জলের বাঁকে। ঢেউগুলো অনেক দূরে থেকে

আমি তোকে নিয়ে যাবো ওখানে

এগিয়ে এসে লাফ দিয়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে;... গাছগুলো কেমন হেজে গেছে—মরে... গেছে। মরা শিকড়গুলো এখনও মাটিধোয়া পাথরগুলোর উপর বিছিয়ে আছে। একদিন নরম মাটি ছিল ওখানে তারই 'রসে সবুজ হয়ে উঠেছিল তারা' ফুল ফোটাতো!

আজ জলের ক্রমাগত ঢেউ-এ মাটি ধুয়ে গেছে। পড়ে আছে রথ-কঠিন পাথরগুলো। ফকীরের মতই যেন ওরা—তবু আবার নোতুন মাটিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

ফকীরের শক্ত বাঁধুত দুটো হাত আজ পলাশীকে জড়িয়ে ধরতে চায়, বাঁচবার কি এক দুর্বার আগ্রহে মত্ততায়।

—পলাশী!

ওর কামনার দৃপ্ত ছোঁয়া লাগে পলাশীর সারা দেহে—অফুরান যৌবন-প্রবাহে।

—উঃ!...ঝড় উঠেছে পলাশীর বুকে।

—আমরা উপরে—ওই পাহাড়ে, ঝরনার ধারে যাবো। মেঘঠেকা উই উপরে।

—হুঁ!

পলাশী ওর মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

পাখী ডাকে—জলো হাওয়া বাতাস-টুকুকে মিষ্টি করে তুলেছে। বুক জুড়োয়—বুকের আগুন হিম হয়।

ফকীর আজ বাঁচবার স্বপ্ন দেখেছে—সার্থক স্বপ্ন! কোন বাধাই সে মানবে না!

হাতের লাঠিটা শক্ত করে ধরেছে। পলাশী আর সে, চলেছে উপরের দিকে, মেঘছোঁয়া সবুজ আলো-মাখা নোতুন জীবনের দিকে। বনহরিণীর মত সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে পলাশী। দেহ কাঁপে—নিটোল বুক কাঁপে, দুচোখের কামনা আর কণ্ঠের সুর মিশেছে নীচে প্যানচেতের নীল জলে চিলের পাখায় পাখায়।

...ফকীর চলেছে ওর সঙ্গে। শক্ত হাতে লাঠিটা ধরে উঠে চলেছে দুর্বার একটি কামনার মতই নোতুন ঘরের দিকে। ফল-ফসল ফলে সেখানে, তেষ্টায় জল পাবে আর পাবে পলাশীকে—এতদিন যার জন্য জীবনের অনেক পথই ব্যর্থ হয়ে ঘুরে এসেছে।

উঁচু অনেক উঁচু প্যানচোত। বহু নীচে উপছে উঠছে নীল জল—ফেনা জাগে ঢেউ-এর মাথায়, সাদা গুঁড়ি গুঁড়ি ফেনা। চিলগুলো ফুটকির মত ঘুরে বেড়ায়। সারা উপত্যকা মিশেছে পায়ের নীচে।

...মেঘ ছুঁই ছুঁই পাহাড়।

অনেকদিন পর আবার হারানো দিনগুলো ফিরে পেয়েছে ফকীর।

যৌবনের সেই নেশায় ভরা সুরে ভরা আলো-ঝলমল কতো দিন।

আলগা পাথরগুলো মাটির সঙ্গে মিশে আছে। লাল উর্বর মাটি। গজিয়েছে পুঞ্জ পুঞ্জ সবুজ গাছগাছালি। বাতাসে কলকল শব্দ উঠছে ঝরনার—পাখীর ডাক মিশেছে। বাতাস ভরে উঠেছে মহুয়া ফুলের সৌরভে। বুক ভরে ওঠে মিষ্টি বাতাসে।

—আয়!

...পলাশী ডাকছে উপর থেকে, পাকদণ্ডির পথটা খানিকটা উঠতে পারলেই সেই ঘর—ওদের খেত।...সোজা পথটা উঠে গেছে।

হাঁপাচ্ছে ফকীর। হাত আর পা-টা টনটন করছে। কাঁপছে সারা শরীর। পঙ্গু পা-টা বাঙের মত বোঝার মত ঝুলছে।

পলাশী!...

...কেমন যেন আর্তনাদ করে ওঠে ফকীর। সেই কালো দৈত্যটার কঠিন চোখ দুটো ফুটে ওঠে চোখের সামনে, ধারাল দাঁত দিয়ে পা-টাকে ছিঁড়ছে—টুকরো টুকরো করে। আকাশ-বাতাসে বনে বনে ঝড় উঠেছে।

তার একটা মাত্র পা—তাও মাটিতে রাখতে পারছে না। সরে যাচ্ছে!

একটা চীৎকার। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘা খেয়ে ব্যর্থ কান্নার সুরটা ফিরে আসে। কাঁদিছে পলাশী।

...নীচে, বহু নীচে একটা শব্দ উঠছে, গাছ—ছোট ছোট গাছগাছালিগুলো মাড়িয়ে হালকা ছোট-বড় পাথরগুলো সমেত একটা দেহ ছিটকে পড়ছে—পড়ছে তখনও অনেক নীচের দিকে।

...কেমন ধোঁয়া উঠছে বহু নীচের ওই নীল ঢেউভাঙ্গা জলের বুকে। ...উড়ে বেড়াচ্ছে গাং চিল দু-একটা।

একটি মুহূর্ত!

...জীবন একটি চরম আনন্দক্ষণের পরম অনুভূতিতে এসে ফুরিয়ে গেল—মেঘ আর আলো জাগে প্যানিচোত পাহাড়ের মাথায়।

বহু নীচে পাথরে-পাথরে ছিটিয়ে পড়েছে রক্ত।

জলের ধারে পাথরের উপর পড়ে আছে ফকীরের প্রাণহীন দেহটা।

স্তব্ধ নিঃসাড়। •

ফকীরের মুখে তখনও ফুটে রয়েছে আনন্দের স্পর্শ—মুক্তির স্পর্শ। ঘর বাঁধার আনন্দ—সেই ঘরে আর কোন দিন ফিরে আসবে না ফকীর।

গাংচিল ডেকে ফেরে ঢেউ-এর মাথায়, ফুলফোটা বনে বনে ওড়ে রঙ্গীন প্রজাপতি—একটা, দুটো!

ওরা অকারণেই ঘুরছে—ওরা যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে ওই ফকীরের মত।

শ্রীমধুসূদন, বাংলা সনেট ও ভের্সাই শহর

দক্ষিণারঞ্জন বসু

দুঃসহ দারিদ্র্য ভারতীয় কবিদের যেন চিরসাথী। কিন্তু ফ্রান্সের অন্তর্গত ভের্সাই শহরে আধুনিক ভারতের অন্যতম মহান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঠিক একশ বছর আগে রু দ্য শাঁতিয়েরস্থ যে বাড়িটিতে (12, Rue des Chantiers) বসবাস করতে আরম্ভ করেন সেই বাড়িটির বর্তমান দুর্দশা শুধু দুঃখের কারণ নয়, আমাদের জাতীয় অবমাননা স্বরূপ। এই বাড়িটিতে যে একদা ভারতীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট ও উচ্চ-শ্রেণীর সামাজিক নাটকের প্রথম রচয়িতা এক সময়ে বসবাস করতেন তার কোনো স্মারকচিহ্ন নেই। এই বাড়িতেই মধুসূদন প্রথম সার্থক বাংলা সনেট রচনা আরম্ভ করেন এবং এ-কথা আজ ঐতিহাসিক সত্য যে এই সনেটগুলি বাংলা, তথা ভারতীয় সাহিত্যের অগ্রগতির পথে স্মরণীয় অধ্যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহৎ-প্রাণ বন্ধুদের উদার সাহায্য সত্ত্বেও কিন্তু সনেট রচনার কালেই কবি কঠিন আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এবং দুঃখের সঙ্গেই আমি লক্ষ্য করেছি যে, কবির মাতৃভূমি, এই স্বাধীন ভারতবর্ষ, যে মধুসূদনের ন্যায় একজন স্রষ্টার কাছে তার অপরিমেয় ঋণ শোধ করতে উদ্যোগী হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ ভের্সাইয়ের ঐ ঐতিহাসিক বাড়িটিতে নেই। সাহিত্যসেবীদের, বিশেষতঃ ভারতীয় সাহিত্যসেবীদের পক্ষে তীর্থ-ক্ষেত্রস্বরূপ এই জীর্ণপ্রায় বাড়িটি এক কৃতঘ্ন জাতির প্রতি নীরব ভর্ৎসনা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

এক বছর আগে যখন পশ্চিম জার্মানী সফর শেষে ফ্রান্সে গিয়ে মধু-কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে ভের্সাইয়ের ঐ বাড়িটিতে গেলাম তখন আমি লজ্জায় মাথা নত না করে পারিনি। স্থানীয় লোকেরা কেউ কেউ এখনও মাইকেলের নাম শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করে থাকেন। এর একটা কারণ এই যে কবি নিজেকে ইউরোপীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছিলেন। প্যারী তাঁর কাছে ছিল স্বপ্নের শহর। প্রিয়বন্ধু গৌরদাস বসাককে তিনি একবার লিখেছিলেন যে, ফ্রান্সের তুলনায় লণ্ডন অর্ধেক মনোরমও নয়। একথাও উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপের ছ'টি ভাষায় তিনি ছিলেন কৃতবিদ্য। বিদ্যাসাগরকে এক পত্রে (৩ নভেম্বর, ১৮৬৪) তিনি লিখেছিলেন : "ফরাসী ও ইতালীয় আমি প্রায় আয়ত্ত করে এনেছি এবং এখন জার্মান শিখছি। কোনো বৈতনিক শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই আমি এইসব ভাষা শিখেছি।"

বন্ধুবর অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় ১৯৫৭ সালে ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে মধুসূদনের স্মৃতিপূত ঐ বাড়িটির জীর্ণাবস্থার কথা আমাকে জানান। দেশবাসীর অবগতির জন্যে আমি তাঁকে এ-সম্পর্কে লিখতে অনুরোধ করি। তিনি ১৯৫৮ সালে যুগান্তর পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় কবির ভের্সাই-প্রবাস ও বাংলা ভাষায় রচিত চতুর্দশ পদাবলীর অতুলনীয় কীর্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অধ্যাপক রায় ফ্রান্সে তদানীন্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সর্দার পানিক্কর মহোদয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে জানিয়েছিলেন যে, ভের্সাই শহরে ভারতের এই অগ্রণী কবির স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু (a kind of memorial and inscription) করা উচিত। ১৯৫৭ সালের ২৭শে জুলাই তারিখের পত্রে সর্দার পানিক্কর অধ্যাপক রায়কে জানান : I think it is an excellent proposal and I shall take the matter up as soon as possible

দুঃখের বিষয়, এখনও কিছুই করা হয়নি।

আমি যখন কবির স্মৃতিপূত বাড়িটি দেখতে যাই তখন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের পুত্র প্যারিস-প্রবাসী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মূল্যবান সহযোগিতা পেয়েছিলাম। শ্রীঘোষ এ-বিষয়ে ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। তিনিও আমায় বলেন, এই বাড়িটিতে একটি উপযুক্ত স্মারকচিহ্ন স্থাপনে আর বিলম্ব করা চলে না। তিনি এ-কথাও বললেন যে, এই সঙ্গে কবি-পত্নী হেনরিয়েটার এবং অকালমৃত কন্যার জন্মস্থান ও জন্মতারিখ অনু-সন্ধানের চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীঘোষ ও শ্রীদিলীপ মজুমদারের সঙ্গে আমি ঐ বাড়িটি দেখতে ভের্সাই গিয়েছিলাম। বাড়িটি সাধারণ। অধিকাংশ বাসিন্দাই সাধারণ শ্রেণীর। বাড়ির সামনের ফুটপাথটি ইতিমধ্যেই ভেঙে গেছে। আমরা যখন বাড়িটির কাছে পৌঁছলাম তখন জনৈক বৃদ্ধ জানালেন যে, এখানে একজন বিরাট ভারতীয় কবি বাস করতেন বলে তিনি তাঁর পিতার

ভের্সাই-এর যে বাড়িতে মধুসূদন বাস করতেন

কাছে শুনেছেন। আমি জানালাম যে, আমি সেই কবির দেশ থেকেই আসছি। মাইকেলকে যে অবস্থায় পড়ে দেশ ছাড়তে হয়েছিল আমার সেই কথা মনে পড়ল। আমার চিত্ত একই সঙ্গে আনন্দ ও দুঃখে ভরে উঠল।

মধুসূদন ১৮৬২ সালের ৯ই জুন ইংলন্ড যাত্রা করেন। দেশ ছাড়বার আগে তাঁর হৃদয় বন্ধু-স্ত্রী-পুত্রের জন্য বেদনায় ভরে গিয়েছিল। অপরদিকে মনে দেখা দিয়েছিল অসীম আনন্দ—কারণ এতদিনে উপস্থিত হয়েছিল তাঁর দীর্ঘ-দিনের এক স্বপ্নপূরণের সুযোগ। বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি এক চিঠিতে লেখেন :

And now God bless you. dearest friend, perhaps I shall go to England next month. If I live to come back, we shall meet; if not, what

will my countrymen say a hundred years hence:

Far away — far away,
From the land he loved so well,
Sleeps beneath the Golden ray.

যাত্রার ঠিক পাঁচদিন পূর্বে তিনি আর একটি চিঠি লেখেন :

Well — I am off my dear Rajnarain. Heaven alone knows if we are to see each other again. But you must not forget your friend. It's a long separation—four years. But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame. Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result and I hope the thing is, if not good, at least respectable".

এই সময়েই তিনি লেখেন সেই বিখ্যাত কবিতা "বঙ্গভূমির প্রতি" যা এখনও সমগ্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমমূলক কবিতা বলে গণ্য। রেখো মা দাসেরে মনে—এই প্রথম পংক্তিটি এখনও আমাদের মনে বাজে। চিরকাল বাঙালীর মনে বাজবে।

যদিও ব্যারিস্টার হবার বাসনায় মধুসূদন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, তবু ফরাসী, ইতালীয়, পর্তুগীজ ও স্পেনীয় ভাষা শিক্ষাও ছিল তাঁর আরেক প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা জানি যে অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ফরাসী ও ইতালীয় আয়ত্ত করেন এবং পর্তুগীজ ও স্পেনীয় ভাষার রাজ্যে প্রবেশলাভ করেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।

কিন্তু প্যারিসে স্বচ্ছন্দে তাঁর দিন কাটছিল না। তার ওপর তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা যখন ফ্রান্সে এসে উপস্থিত হলেন তখন অবস্থা আরো খারাপ হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা তখন ১২নং Rue des Chantiers-এর বাড়িতে এসে উঠলেন। এই সময় প্রতিবেশীরা এই কবি-দম্পতিকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। কোনো-না-কোনো প্রকারে তাঁরা কবিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ফরাসীরা কবি-দার্শনিককে শ্রদ্ধা করে, তারা শিল্প-সাহিত্যকে ভালোবাসে। তাই যখন তারা এক ভারতীয় কবির দুর্দশার কথা শুনল তখন সাহায্যার্থে এগিয়ে এল। এক সময় মধুসূদনের এমন অবস্থা হয়েছিল যে, ভারতে বন্ধুবান্ধবদের কাছে চিঠি লেখবার মতো কোনো পয়সাও তাঁর ছিল না। শেষে তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর।

ফ্রান্সে মধুসূদন সুখে ছিলেন না। দারিদ্র্য তাঁর মনকে ক্লিষ্ট করেছিল, কিন্তু তাঁর আত্মা, তাঁর কবি-প্রতিভা পূর্বের মতোই সতেজ ছিল। বিদ্যাসাগরকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

"You cannot imagine how unhappy I am. But you must save me, my dear Vid; for, if you do not send me all the money I want I shall lose another term and remain buried in France as I am at this moment.....God help me. My great hope is in you, and I am sure, you will not disappoint me".

আবার লিখেছেন :

"The money with which I have bought postage stamps for this letter, has been raised from a pawnbroker's office."

বিদ্যাসাগর কি-ভাবে কবিকে সাহায্য করেছিলেন সে-কাহিনী আমাদের কাছে সুপরিচিত।

ভের্সাইতে তাঁর দিন কাটত দুঃখে, কিন্তু সাহিত্য-প্রতিভা অবসিত হয়নি। ঐ সময় তিনি অন্ততঃ একশ' সনেট রচনা করেন—ভারতের যে-কোনো ভাষায় প্রথম সনেট। বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি লিখেছিলেন :

"I want to introduce the sonnet into our language. In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian".

১৮৬৫ সালে মাইকেল প্রথম সার্থক সনেট রচনা করেন। সনেটগুলি তিনি প্যারিস থেকে ভারতে পাঠান এবং ১৮৬৬ সালের ১লা আগষ্ট এগুলি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তদুপরি মাইকেল, কবি টেনিসন, ঔপন্যাসিক ভিকতর হুগো, দার্শনিক Maitre ও Goldstukor-এর সংস্পর্শে আসেন। তাঁরা সকলেই মাইকেলের ব্যক্তিত্ব, ব্যবহার ও প্রতিভায় মুগ্ধ হন। মধুসূদন অতঃপর চারটি সনেট রচনা করেন এবং সেগুলি টেনিসন, হুগো, Maitre ও দান্তের নামে উৎসর্গ করেন। তাঁর অধিকাংশ সনেটই ভারত সংক্রান্ত এবং মাত্র পাঁচটি সনেটের বিষয়বস্তু ইউরোপ। ১৮৬৬ সালে ফ্লোরেন্সে মহাকবি দান্তের ছয় শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। মধুসূদন তাঁর প্রিয় কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি সনেট রচনা করেন। সনেটটি তিনি স্বয়ং ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় রচনা করেন এবং ইতালীর তৎকালীন রাজা ভিকটর ইমানুয়েলের কাছে প্রেরণ করেন। রাজা এতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কবির কাছে এক পত্রে লেখেন যে, এরূপ প্রচেষ্টার দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে।

মধুসূদন শুধু একজন মহান ভারতীয় কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অগ্রণী-পুরুষ। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে তিনি গণ্য হবেন। বাংলায় তিনি যে চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তন করেন তা ভারতের যে-কোনো ভাষার পক্ষেই ছিল নতুন। ইউরোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্সে তাঁর অবস্থান তাঁর জীবনের ও ভারতীয় সাহিত্যের এক স্মরণীয় অধ্যায়। আর কোনো ভারতীয় কবি ইউরোপের কোনো এক স্থানে এত দীর্ঘকাল বসবাস করেননি। মধুসূদনের স্মৃতিমণ্ডিত ভের্সাইয়ের বাড়িটিতে একটি স্মৃতিফলক বা সম্ভব হলে একটি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন আমাদের জাতীয় কর্তব্য। ভারতের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধন স্থাপনের জন্য ভারত সরকার ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করছেন। মধুকবি একশ' বছর আগে এই বন্ধন স্থাপন করে গেছেন। আমাদের এখন শুধু বন্ধ-দুয়ার পুনরায় উন্মুক্ত করতে হবে। ভের্সাইয়ের বাড়িটিতে একটি সাংস্কৃতিক অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপন খুব দুরূহ কাজ নয়।

আমি ব্যথিতচিত্তে ভের্সাই ত্যাগ করেছিলাম। ইউরোপ সফর শেষে দেশে ফিরে আমি ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবিরের কাছে এ বিষয়ে একটি পত্র লিখি। অনেকেই এ-কথা জেনে আশ্বস্ত হবেন যে, শ্রীকবির গত বছর আগষ্ট মাসে নিজের সুপারিশসহ চিঠিটি ফ্রান্সে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শ্রীকবির তাঁর চিঠিটিতে নিম্নোক্ত যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

"Sardar Panikar was approached in this connection by some Indian writers and on 27th July 1957 he wrote that he would take up the matter of having a suitable plaque placed in the house. It however, seems that nothing has been done in the matter."

আমি আমাদের সাহিত্যিক-প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর কাছেও এ বিষয়ে একটি চিঠি লিখি। দুর্ভাগ্যবশতঃ, সে-চিঠির উত্তর এখনও আসেনি।

ভের্সাইয়ে যে-বাড়িটিতে মধুকবি থাকতেন সেই বাড়িটিকে একটি সাংস্কৃতিক তীর্থকেন্দ্রে পরিণত করতে ভারত সরকার ও পশ্চিম বাংলা সরকার যাতে উদ্যোগী হন তার জন্যে দেশবাসীকে চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে পশ্চিম বাংলা সরকার যদি আগ্রহসহকারে চেষ্টা করেন তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে সম্মত করানো কঠিন হবে না। আর, মধুসূদনের স্মৃতিপূত কলকাতার চিৎপুর রোডে অবস্থিত বাড়িটিকে উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারেও কি পশ্চিম বাংলা সরকারের কোনো দায়িত্ব নেই?

অয়স্কান্ত

বিকেল ও সন্ধ্যার কয়েকটি দৃশ্য

হাইড্রেন্টটা খোলা ছিল। ঘোলাটে জল জমে ছিল অনেকখানি জায়গা জুড়ে। রাস্তার দিকটা ছেড়ে দিয়ে সেই ঘোলাটে জলের অন্য তিনদিকে উবু হয়ে বসেছিল তিনজনে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আর প্রত্যেকবার বৃষ্টি থেমে যাবার পরে যা হয়ে থাকে, রাস্তার দুই ফুটপাথ জুড়ে মেলার মতো ভিড়। রাস্তার ট্র্যাফিকও যেন এই বৃষ্টি থামার অপেক্ষাতেই ছিল। এখন কে কার আগে যেতে পারে তারই পাল্লা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর ঠিক এই সময়েই কিনা একটা সিনেমার শো শেষ হল। ফুটপাথের ধারে সারি দিয়ে দাঁড় করানো প্রাইভেট কারগুলো ইলেকট্রিক হর্নের আওয়াজ তুলে তারস্বরে জানান দিয়ে ওঠে। চারদিকেই একটা ত্রস্ত ব্যস্ত ভাব। চারদিকেই আওয়াজ আর সোরগোল। শুধু এই তিনজনের মুখে কোনো কথা নেই। একটা হাইড্রেন্টের তিনদিকে উবু হয়ে বসে আছে তিনজনে।

মানুষ তিনটি খুবই ছোট। কারও বয়সই দশ বছরের বেশি নয়। উবু হয়ে বসে আছে বলে আরো ছোট দেখাচ্ছে। খালি গা, খালি পা। কোমরের নিচে কিন্তু আদুড় নয়। একটা কিছু আছে যা হাফ-প্যান্টও হতে পারে, ইজেরও হতে পারে বা সাধারণ একটা ন্যাকড়া হওয়াও বিচিত্র নয়। তিনজনেরই প্রায় বেহুঁশ অবস্থা, কোনো দিকে ফিরে তাকাবার অবসরটুকুও নেই।

একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তিনজনেই এমন অখণ্ড মনোযোগে যে-কাজটি করছে তা অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তিনজনের মধ্যে দুজনের হাতে দু-টুকরো আমের খোসা, একজনের হাতে একটা আমের আঁটি। কোনোটাতেই পদার্থ বলতে কিছু বাকি নেই। কিন্তু তিনজনের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, তারা এমন এক তুরীয় অবস্থায় পৌঁছেছে যে, আনন্দ পাবার জন্যে তাদের আর কোনো আধিভৌতিক আয়োজনের প্রয়োজন নেই। 'ক' অক্ষরেই কৃষ্ণ দর্শনের মতো শুধু খোসা আর আঁটিতেই তাদের আত্ম-আস্বাদনের তৃপ্তি।

এই হাইড্রেন্টটা বড়ো রাস্তা আর একটা গলির মুখে। গলির শুরুতেই অনেকখানি লম্বা জায়গা নিয়ে একটা ফলের দোকান। অন্যান্য ফল অবশ্যই আছে, তবে দোকানের বেশির ভাগ জায়গা জুড়েই থরে থরে সাজানো হরেক রকমের আম। দোকানী বসে আছে একটা উঁচু জায়গায় পা মুড়ে। মাঝে মাঝে হাতের নাগালের মধ্যে যে আমগুলো রয়েছে সেগুলোকে পরম আদরে নতুন করে সাজিয়ে রাখছে।

আর ঠিক এই সময়েই কিনা সিনেমার শো ভেঙেছে। বাঁধের মুখ খুলে দিলে যেমন জলের তোড় প্রবল একটা স্রোত হয়ে বেরিয়ে আসে, তেমনি ভাবে বেরিয়ে আসছে নানা বয়সের মেয়েপুরুষের একাকার একটা পিণ্ড।

ফলের দোকানের লোকটি কিন্তু মানুষ চেনে। হোক পরনে ট্রাউজার ও শার্ট, ট্রাম থেকে নেমে যতো মধ্যবিত্তের মতোই দাম জিজ্ঞেস করুক না কেন, সে নির্বিকারভাবে অনেকগুলো পচা আম দেখিয়ে বলে, নিয়ে যান বাবু, খুব ভালো আম।

এমন সময়ে শোনা গেল সরু সরু ছেলেমানুষে গলায় কে যেন জিজ্ঞেস করছে, আর পচা আম নেই?

দোকানিটি কোনো কথা না বলে চোখ লাল করে তাকাল। তারপরে হুংকার ছাড়ল, যা ভাগ!

অন্য দুজন হাইড্রেন্টের পাশে তেমনি উবু হয়ে বসেই উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তৃতীয়জন ফিরে আসার পরে কারও মধ্যে নতুন করে কোনো কথা হল না। তিনজনে ঠিক আগের মতোই তেমনি মশগুল হয়ে আমের খোসা আর আঁটি চাটতে লাগল।

আর আশ্চর্য এই যে ট্রাউজার ও শার্ট পরা যে-বাবুটি খরচের ব্যাপারে নিজের বৌকেও সন্দেহ করতে পারে সে কিন্তু দ্বিরুক্তি না করেই ফলওয়ালার কথায় বিশ্বাস রাখে আর অজস্র ফজলের একটি মরশুমেও পচা আম হাতে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

আর এই বাড়িটি যে-রাস্তার যে-কোণেই হোক, আশা করা চলে আম খাবার জন্যে সেখানে তিনটি শিশুকে হাইড্রেন্টের ধারে গোল হয়ে বসতে হবে না।

* * *

এই দৃশ্য দুটি আমি দেখে-

ছিলাম হাজরা রোড ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যের পর যদি কখনো এখানে বেড়াতে আসেন তাহলে আপনার মনে হবে এক লোভী শহরের মাঝখানে এসে আপনি দাঁড়িয়েছেন। খুব বেশি চলাফেরা করারও দরকার নেই। যতীন দাস পার্কের রেলিং ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণে, তারপরে দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে একবার শুধু সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে হেঁটে আসুন। চিনাবাদাম ভাজা থেকে শুরু করে ডিম-ভাজা মায় চপ-কাটলেট ইত্যাদি খাদ্য-সম্ভার নানা বিচিত্র চেহারা নিয়ে আপনার রসনাকে উদ্দীপ্ত করবার জন্যে এখানে হাজির। আর আপনি সবসময়েই একদল মানুষকে দেখতে পাবেন যারা গোগ্রাসে এই সমস্ত খাবার গিলছে। চিংড়িমাছ ভাজার লাল টকটকে রঙ দেখে আপনি হয়তো ইতস্তত করবেন কিন্তু আপনার চোখের সামনেই তা অপর একজনের উল্লসিত মুখ-গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আরো দু-পা এগিয়ে আসুন। একরাশ আবর্জনার ঠিক পাশটিতে উনুন বসিয়ে তেলেভাজার ভিয়েন চেপেছে। ভিয়েন এজন্যে বলছি যে, তেলেভাজার ম'-ম' গন্ধে নিশ্চয়ই মোহিত হবেন। লক্ষ্য করে দেখুন, প্রাইভেট মোটরগাড়ির যাত্রীকে পর্যন্ত এই গন্ধ আকর্ষণ করে।

অবশ্যই তারপরে আছে আলুকাবলি, ঘুগনি ইত্যাদি। রবারের চাকা লাগানো ঠেলাগাড়িতে ডায়নামো বসানো হয়েছে। মোটরের ভট-ভট শব্দ শুনে আপনিও নিশ্চয়ই একবার ফিরে তাকাবেন। উজ্জ্বল ইলেকট্রিক বাতি জ্বালিয়ে ফলের রস বিক্রি করা হচ্ছে। ফলের রসের জন্যে ততোটা নয়, ইলেকট্রিক বাতির জন্যেও নয়, মোটরের ভট-ভট আওয়াজটুকুকেই এই পরিবেশে অভিনব মনে হবে আপনার কাছে।

একটু লক্ষ্য করে দেখুন, কোথাও খদ্দেরের অভাব নেই। মনে হবে একদল মানুষ এই সন্ধ্যের সময় রাস্তায় বেরিয়েছে শুধু খেতে। পার্কের ভেতরে ঢুকে দেখুন, সেখানেও নানা ধরণের খাবারের আয়োজন। বিশেষ করে শোনা যাচ্ছে গরম মুড়ির হাঁকডাক।

আর আশ্চর্য বলতে হবে, এরই মধ্যে একটি গেটের পাশে মাঝবয়সী একটি লোক বসেছে রজনীগন্ধা নিয়ে। খাদ্য-বিলাসীদের ফুলে সম্পর্কে আগ্রহ আছে কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু ছবিটি যেন সম্পূর্ণ হল।

আরো অনেক কিছুই ঠাসা রয়েছে এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে। মোমবাতির পাশে পুরনো পাঁজি সাজিয়ে আর ফুটপাথের ওপরে হাতের ছবি এঁকে সারি সারি বসে আছেন ভূত-ভবিষ্যতদ্রষ্টা গুণৎকারের দল। মোটা দক্ষিণা কবুল করলে আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাবেন যে, আপনার শনির দশা কেটে গিয়ে বৃহস্পতির দশা শুরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে করলে একটি লটারির টিকিটও কিনতে পারেন আপনি। এই পার্কেরই রেলিং জুড়ে লটারির টিকিটের হাজার-হাজার লাখ লাখ টাকার ঘোষণা এ-অবস্থায় একেবারে অনর্থক নাও মনে হতে পারে।

তারপরে আছে ক্যালেন্ডারের ছবি আর 'সুখে থাকো' ও 'ভালোবাসা' লেখা বালিশের ওয়াড়। আছে আরো অনেক কিছুই, যা শুধু জরুরীরাই চেনে, যার কোনো বিজ্ঞাপন নেই। সুযোগসুবিধে মতো একদিন এখানে বেড়াতে আসবেন। আর কিছুর জন্যে না হোক, মানুষ কত-কি খায় আর কি-ভাবে খায় তা দেখাটাও একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা মনে হবে আপনার কাছে।

* * *

আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের গল্প বলে আজকের খাতা শেষ করছি।

তাঁর পদবীটি ছিল গোস্বামী। আমরা ডাকতাম গোঁসাই। একই অফিসে চাকরি করতাম আমরা।

একবার আমাদের একই সঙ্গে নাইট-ডিউটি পড়ে। তখনো যুদ্ধ শেষ হয়নি। সন্ধ্যা হতে না হতেই সারা শহর কালো ঘেরাটোপে অন্ধকার হয়ে যেত। নিজেদের মধ্যে আমরা বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলাম যে, সন্ধ্যে নামবার আগেই আমরা নাইট-ডিউটি শুরু করব যাতে বিকেলের শিফ্ট-এ যারা কাজ করছে তারা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারে। আমাদের অফিসটা ছিল কলকাতার বাইরে একটা জঙ্গলের মধ্যে যেখানে ব্রিটিশ ও আমেরিকার সৈন্যদের একটা ছাউনি পড়েছিল। আশেপাশে কোনো হোটেল বা রেস্তোরাঁর নামগন্ধ ছিল না। কাজেই রাত্রিবেলার খাবার আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতাম।

গোঁসাইকে দেখলাম মাঝারি সাইজের একটা রেশনব্যাগ হাতে নিয়ে অফিসে ঢুকতে। কৌতূহলী হয়ে আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম। রেশনব্যাগে ঠাসা রয়েছে কোয়ার্টার পাউন্ড পাঁউরুটি। অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশটা তো হবেই।

কৌতূহলী হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, গোঁসাই বুঝি কাল দেশে যাচ্ছ?

গোঁসাইয়ের দেশ ছিল কৃষ্ণনগরের কাছে একটা গ্রামে। নাইট-ডিউটি সেরে প্রায়ই সে দেশে যেত।

গোঁসাই সংক্ষেপে জবাব দিল, না।

আমি বললাম, তবে এতগুলো পাঁউরুটি কেন? আমি ভাবলাম তোমাদের দেশে বুঝি পাঁউরুটি পাওয়া যায় না।

গোঁসাই বলল, এই রুটি তো আমি রাত্রিবেলা খাবার জন্যে এনেছি।

তারপরে রাত্রিবেলা আমি সত্যি সত্যিই দেখলাম, সেই এক থলেভর্তি পাঁউরুটি খানিকটা চিনি সহযোগে গোঁসাই শেষ করল। শুকনো পাঁউরুটি খেতে হয়তো একটু কষ্ট হয়েছিল কিন্তু প্রচন্ড খিদের কাছে সেই কষ্টটুকু কিছুই নয়।

এই ঘটনার প্রায় বছরখানেক পরে এই গোঁসাইয়ের সঙ্গে আমেদাবাদের এক হোটেলে আমি ভাত খেয়েছিলাম। হোটেলের চার্জ ছিল নির্দিষ্ট এবং খুশিমতো পরিমাণে খাওয়া চলত।

হোটেলের সেই খাওয়ার দৃশ্য আমার এখনো মনে আছে। গোঁসাইকে ভাত দিয়ে ডাল আনতে যায় তো ভাত ফুরিয়ে যায়। আর ডাল দিয়ে ভাত আনতে যায় তো ডাল ফুরিয়ে যায়। যে লোকটি পরিবেশন করছিল তার সে এক হিমসিম অবস্থা। পরের দিন হোটেলের মালিক গোঁসাইয়ের জন্যে আলাদাভাবে বিশেষ বন্দোবস্ত করেছিল।

গোঁসাইয়ের কোনো নেশা বা বদ-খেয়াল ছিল না। শুধু ভালোবাসত খেতে। তাও খুব একটা ফলাও বন্দোবস্ত না থাকলেও চলত। পরিমাণের প্রাচুর্য থাকলেই ও খুশী হত। আমাকে অনেক-বার বলেছিল যে কোনোদিন যদি ওর অনেক টাকা হয় তো ও শুধু খাবে। পরিমাণ মতো খেতে পেলে ওর যে-রকম আনন্দ হত তা দেখে আমিও মনে মনে কামনা করতাম গোঁসাইয়ের অনেক টাকা হোক।

মাঝখানে অনেক বছর গোঁসাইয়ের কোনো খবর রাখতে পারিনি। তারপরে একদিন হঠাৎ এই যতীনদাস পার্কের সামনেই ওর সঙ্গে দেখা। মস্ত একটা চকচকে গাড়ি থেকে ও নামছে।

তারপরে আমার সঙ্গে ওর কি-কি কথা হয়েছিল তা এ-প্রসঙ্গে অবান্তর। শুনলাম, প্রচুর টাকা হয়েছে ওর, কলকাতায় তিন-চারটে বাড়ি, ইত্যাদি। আমি ওকে দুপুরের খাওয়ার নেমন্তন্ন করলাম। মার্জিত, বিনীত হাসি হেসে ও বলল, আমি কিন্তু ভাই দুপুরবেলা শুধু একটি কই মাছের ঝোল আর একপো দই খাই— ভাত তিন-চার চামচ। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আর রাত্রিবেলা? শুনলাম রাত্রিবেলার খাবার হচ্ছে এক স্লাইস পাঁউরুটি, একপোয়া দুধ ও একটি সন্দেশ। বাস, এই হচ্ছে সারাদিনের খাওয়া।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম। না, গোঁসাইয়ের কোনো অসুখ হয়নি। পুরোপুরি সুস্থ শরীর। তবে ওর ভাষাতেই বলি, একগাদা খেয়ে পয়সা নষ্ট করে লাভ কি।

রবীন্দ্রনাথের গান

পল্লব সেনগুপ্ত

"The working-class-approach to music combines the humanity of the folk-music, the continual search for genuine human imagery born out of the people's life and struggles against oppression, with the techniques to be learned from the cumulative developments of musical realism. It seeks both an art of daily use and on presenting the richest and broadest dramatic and social experiences."

[How music expresses ideas : Sidney Finkelstein]

॥ এক ॥

একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আমার সবচেয়ে অকপট ও আন্তরিক প্রকাশ হয়েছে বোধহয় গানে। গান আমার কাছে আসেনি কোনো প্রয়োজনের বরাত নিয়ে। আপন মনের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গানের রূপ দিয়েছি আমি। বকুলগাছ যেমন অফুরন্ত ফুল বর্ষণ করেও কোনোদিন নিঃস্ব হয় না, গানের পশরা আমার সেই রকম। আমার চরম বিচার হয়ত হবে একদিন গান দিয়েই। ভুবন ভারতীর আমি কেনা বাউল।" রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে হয়ত সব নিরীক্ষার এইটেই শেষ কথা। 'ইউনিভার্সাল মিউজ'-এর ঐ অসীম অনুভূতিকে বাঁধতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ গানের সীমানায়, অর্থাৎ রবীন্দ্র-দর্শনের যা হলো মূল তত্ত্ব, সেই সীমা-অসীমের মিলন-সাধনার পালাই এখানে অভিব্যক্ত হয়েছে।

সারা জীবন ধরে প্রায় আড়াই হাজার গান লিখেছেন, যার প্রায় অধিকাংশেরই সুরবিন্যাস নিজেই করেছেন। ঐ সুদীর্ঘ সাধনার ইতিহাসে কতকগুলি সুস্পষ্ট যুগ-নির্দেশ রয়েছে, যাদের সার্বভৌম সমন্বয়ে তাঁর গানের সর্বাঙ্গীণ পরিচিতি। এই সমন্বিত পরিচয়ের উৎসমুখই আপাতত অনুসন্ধিতব্য।

এ পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীত-কলা সুস্পষ্ট ভাবে দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল—মার্গ-সঙ্গীত এবং লৌকিক-সঙ্গীত। ইউরোপীয় সঙ্গীতের যেমন আধুনিক যুগের আগে 'কোর্ট' এবং 'ভিলেজ' ছাড়াও তৃতীয় আর একটি ধারাও ছিল 'চার্চ'—এদেশী সঙ্গীতে সে ব্যাপারটা ঠিক ততটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় নি। ভারতীয় ধর্মসঙ্গীতের মধ্যেও ঐ দুটি ভাগই বজায় ছিল—মার্গ-রীতি এবং লৌকিক-রীতি। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম থাকায় একদিকে বিভিন্ন দরবারগুলিই অন্যান্য শিল্পের মতো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নানান ঘরানার পৃষ্ঠপোষণ করতেন, অন্যপক্ষে লোক-সঙ্গীতের চর্চা এবং গতিশীলতা বজায় ছিল দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে। অর্থাৎ সাড়ে পনের আনা মানুষই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রস থেকে বঞ্চিত হতেন—এটাই হলো ইতিহাসের সত্য!

১৮শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এ দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে। তার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিস্বরূপ শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নগরকেন্দ্রিক বুর্জোয়া-সংস্কৃতির সূত্রপাত হওয়ায়, অন্যান্য ক্ষমতার সঙ্গে কলা-কৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকতাও স্বাভাবিকভাবেই নতুন গজিয়ে-ওঠা নগর-কেন্দ্রিক ধনিকগোষ্ঠীর আয়ত্তে আসে। এর ফলে, একদিকে যেমন এতাবৎ-দরবার-আশ্রয়ী উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত এই নতুন মনিবদের হাতে এসে কিছুটা খেলোমিকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হলো (কারণ এঁদের বিশেষ কোনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল না), অন্যদিকে তেমনি অহেতুক জটিলতার মারপ্যাঁচ থেকে রেহাই পেয়ে অধিকতর সর্বজন-গ্রাহ্য হবার দিকে এগোল। এই হলো একদিকের ছবি।

অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি, গ্রাম-নির্ভর সমাজব্যবস্থা ভেঙে যাবার ফলে, গ্রামের সাধারণ মানুষকে রুজি-রোজগারের চেষ্টায় শহরে আসতে হয়েছে। এতদিন লোকসঙ্গীতের যে বহু বিচিত্র রূপগুলি গ্রামের হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসত, এঁদের মুখে মুখে তারা শহরে এল লোক-কৃষ্টির দূত হয়ে।

এ পর্যন্ত মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে লোকগীতির কোনোরকম জলচল ছিল না। কিন্তু বুর্জোয়া-সংস্কৃতির প্রাথমিক যুগের প্রগতিশীলতার ফলে এরা পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়ল। রাম-নিধি প্রমুখ কবি-সুরকারেরা এই দুই ধারাকে এক মেলবন্ধনে আনবার চেষ্টা করেন ঐ সময় থেকেই—এবং তার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের বৈঠকী-কৃষ্টির নাগালে একই সঙ্গে মার্গসঙ্গীতের নতুনতর রূপ এবং লোকসঙ্গীতের মার্জিততর রূপ এসে পৌঁছুল। সামন্ত-তন্ত্রী সমাজের তুলনায় অর্থনৈতিক আওতায় কমতি ঐ মধ্যবিত্ত সমাজের সংস্কৃতিবোধের মধ্যে এই দুই রীতির মিলনে নতুন গীতধারার পটভূমিকা প্রস্তুত হল।

॥ দুই ॥

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে 'মিউজ'-দের সব ক'টি বোনেরই ছিল সমান আদর। বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের পীঠস্থান বিষ্ণুপুর ঘরানার দিকপাল গায়ক যদু ভট্ট থেকে শুরু করে বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রমুখ সেকালের প্রখ্যাত গায়কদের অনেকেই ও-বাড়ীর আবহাওয়াকে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের খানদানী আদবে দুরস্ত রেখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন ইউরোপীয় সুরের চর্চা, তাঁর সহযোগী ছিলেন অক্ষয় চৌধুরী। এ ছাড়া, পারিবারিক ধর্মমতে ব্রহ্মোপাসক হওয়ার ফলে ব্রাহ্মসমাজে গেয় ধর্মসঙ্গীতের চর্চাও যথেষ্ট হতো ঠাকুরবাড়ীতে। এর সঙ্গে লোকসঙ্গীত এবং কর্ণাটকী সঙ্গীতেরও আমেজ খুঁজলে সেখানে অল্পাধিক্যের পাওয়া যেত।

* * *

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারাক্রম লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তাকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। একেবারে প্রথম দিকে তাঁর গানের মূল অবলম্বন ছিল মার্গসঙ্গীতের প্রভাবিত। এর পরবর্তী যুগে এসে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলার লোকসঙ্গীতের বিবিধ রীতি। এই দুই যুগেই কিন্তু বিলিতি সুর এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক সুরের মিশেল যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। তৃতীয় যুগে এসে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত সর্বমানবিক হয়ে উঠল—যাকে পুরোদস্তুর আন্তর্জাতিক বলতে পারি। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, বাংলার নিজস্ব লোকগীতি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক গীতরীতি, ইউরোপীয় এবং এশীয় নানান দেশের সুরের

সার্বিক সমাহারের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিণত হল সম্পূর্ণ এক নতুন গীত-ধারায় এবং এইখানেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মুক্তির মোহানা। বলতে পারি ১৯শ শতকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যে প্রেরণা নিয়ে বাংলাদেশের জীবন ও মননের নতুন তীর্থযাত্রা শুরু হয়েছিল, বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে তার পরিণত-তম পূর্ণোফল রবীন্দ্রসঙ্গীতে।

রবীন্দ্রনাথের গানের অনেক অংশই একেবারে নিখুঁত ধ্রুবপদী মার্গসঙ্গীতের সমপর্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু একটা কথা এখানে অবশ্যস্মর্তব্য। ঠাকুরবাড়ীতে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের যে চর্চা ছিল তার মূল উৎসটা বিষ্ণুপুর ঘরানার অনু-প্রেরিত। হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীতের পরিবারভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিষ্ণুপুর ঘরানার কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—যাদের বলা চলে বাংলাদেশের একেবারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, ভাব-প্রকাশের প্রয়াসে বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতে ব্যাকরণের চেয়ে সেন্টিমেন্টের দাবীকে বেশি যৌক্তিক বলে মনে করা হয়। এই কারণেই বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতের প্রাণধর্মটা বাংলা লোকসঙ্গীতের সঙ্গেই নাড়ীর টানে বাঁধা। বাংলাদেশের সুরের স্বাভাবিক প্রেরণা মুক্তির প্রবণতা; ঐ একই প্রবণতাতেই রবীন্দ্রনাথও উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের কট্টর-ব্যাকরণসর্বস্বতার অংশটুকুকে বর্জন করে, তার গভীর আবেদনের অংশটিকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন; ঐ প্রেরণাতেই উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের সঙ্গে দেশী-বিদেশী আরো বিচিত্র সব সুরের মিলন ঘটিয়েছেন; ঐ প্রবণতাতেই হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের প্রচলিত সময়বিধিকে অস্বীকার করে, বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর মধ্যে তথাকথিত অশাস্ত্রসম্মত মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন নিত্য-নতুন সুরের সেন্টিমেন্ট সৃষ্টির প্রয়াসে। এককালে যেমন কলাবিদরা উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের রং ফেরাতেন দেশজ-রীতির গানকে ব্যাকরণের আওতায় ফেলে, তেমনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে ঘটেছে এর বিপরীত। ব্যাকরণের বন্ধন থেকে মার্গ-সঙ্গীতকে মুক্ত করেই তিনি তার মধ্যে নতুন নিশানা দেখালেন।

লোকসঙ্গীতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সব-চেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন সম্ভবত বাউল এবং ভাটিয়ালি গান থেকে। এ ছাড়া জারি, সারি, কীর্তন, রামপ্রসাদী—বাংলার লোকসঙ্গীতের প্রায় সমস্ত রীতিকেই কবি নিজের গানে একাত্ম করেছেন। শত শত বছর ধরে এই সব রীতিই এ দেশের মানুষের সংস্কৃতি-বোধকে নিবিড় করেছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের প্রাণসত্তার খোঁজ পেয়ে-ছিলেন এখানেই। তাই দেশ এবং বিদেশের অজস্র লঘু-গুরু গানকে তিনি মেলাতে পেরেছেন এদের সঙ্গে। নিজের দেশের সংস্কৃতির এত গভীর মর্মানুভব করতে পারার ফলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবেদনটুকু এমন সার্বজনীন আন্ত-র্জাতিক হতে পেরেছে। এ প্রসঙ্গে হয়ত স্মরণ করতে পারি সেই বিশ্বখ্যাত সংস্কৃতিবিদের বক্তব্য : "Internationalism arises from the very flowering of national arts. To forget this truth, is to lose sight of the guiding line, to lose one's own face, to become a homeless cosmopolitan. Only the nation which has its own highly develop-ed musical culture, can appreciate the music of other peoples. One can not be internationalist in music or any other realm, with-out being a genuine patriot of one's own country" [১৯৪৮ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত সোবিয়েৎ সঙ্গীতজ্ঞ সম্মেলনে এ. এ. ঝদানভের বক্তৃতার অংশবিশেষ]

॥ তিন ॥

পারিবারিক সাঙ্গীতিক আবহাওয়ার মধ্য থেকেই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের প্রাথমিক প্রেরণা পেয়ে-ছিলেন একথা আগেই বলেছি। প্রথম যৌবনে বিলাত যাত্রার ফলে সেই প্রেরণা গাঢ়তর হয়েছিল। ঠিক ঐ সময়েই (Post-romantic period) ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে নানান্ ধরণের অভিনব আন্দোলন শুরু হয়েছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ইউরোপীয় সঙ্গীতের ওপরও তার প্রভাব এসে পড়েছিল। যদিও বুর্জোয়া-শিল্পের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারেই পরবর্তীকালে ইউরোপীয় সঙ্গীতের সমস্ত আন্দোলনের বৈপ্ল-বিকতা মিলিয়ে গেল বাস্তব-বিমুখ প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পচর্চার মধ্যে, কিন্তু প্রাথমিক যুগে এদের অবদান অনস্বী-কার্য। চিরাচরিত রীতিতে সুর আরো-পণ করার পদ্ধতিকে অস্বীকার করে ঐ সমস্ত আন্দোলনের সূত্রপাত; এখানে মনে রাখতে হবে, যে সমস্ত সুরকারেরা এ সবের পেছনে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এ ব্যাপারে প্রাচ্যদেশের সুরের সাহায্য নিয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ নাম করতে পারি দেবুসী কিংবা স্ত্রস-এর। তবে রবীন্দ্রনাথের গানে যে ইউ-রোপীয় সুরের সঙ্গে আত্মীয়তা কিছু পরিমাণে খুঁজে পাওয়া যায়, তারও বেশির ভাগটা প্রচলিত লৌকিক রীতির অনুগামী। যেমন আইরিস মেলোডিজ। এইটেই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হয়েছে, কারণ সবদেশের লোকসঙ্গীতের মর্ম-বাণীই অভিন্ন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের এই সুরের মোহনায় এসে মিশেছে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সুরও। অসমীয়া বনুগীত-বড়গীত থেকে শুরু করে কানাড়ী, মহী-শুরী, পাঞ্জাবী, গুজরাটি নানান সুরের হেরফেরে বাংলা গানের বিচিত্র সম্ভারকে বিচিত্রতর করেছেন রবীন্দ্রনাথ। দেশ ও বিদেশের এত সুরের সমাহার, বিশ্ব-সঙ্গীতের ইতিহাসে অতুলনীয়।

সুরের এই দিগন্তবিস্তারী মুক্তির সঙ্গে পা ফেলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে তাল এবং কথারও মুক্তি এসেছে। বাংলা-দেশে প্রচলিত মার্গসঙ্গীতে এবং লোক-সঙ্গীতে ব্যবহৃত সবরকম তালের ব্যবহার তাঁর গানে আমরা তো দেখতে পাই-ই —তা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ তাদেরকে ভেঙে-চুরে নতুন ছন্দবিন্যাস করেছিলেন। এ ব্যতীত, বিভিন্ন প্রাদেশিক সুরগুলির সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজস্ব ছন্দরীতি-গুলো স্বভাবধর্মে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে এসে পড়েছে। এমন কি সেই সব তালেরও হেরফের ঘটিয়ে অধিকতর বিচিত্র ছন্দ-বিন্যাস করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ বিনা আয়াসেই। ...তালের অভিনবত্বের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রতিভার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে—তাঁর সৃষ্ট তালগুলির সবল গতিবেগ নির্বাধ রাখা—অর্থাৎ ফাঁকের বিরতি না দিয়ে ছন্দের চলাটুকু অব্যাহত রাখা।

গানের মধ্যে সুর এবং কথার আনু-পাতিক প্রাধান্য নিয়ে চিরন্তনী বিতর্কের কোনো সমাধান ভারতীয় সঙ্গীতে মেলে নি। এ দেশের মার্গসঙ্গীতে দেখি, কথাটুকু যেন নেহাৎই চক্ষুলজ্জার

খাতিরে রাখা। অন্যপক্ষে লোকসংগীতের বৃহত্তম আবেদন কিন্তু কথার মধ্যেই। এ দুয়েরও পারস্পরিক সম্পর্কটা নিবিড় করলেন রবীন্দ্রনাথ। মজার কথা এই যে সংগীত সংক্রান্ত গবেষণায় রবীন্দ্রনাথ বারবার এই কথাই বলছেন যে, কথা সুরের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবে—তাতেই তার সার্থকতা—অথচ তাঁর নিজের গানে দেখি ঐ আত্মনিবেদনটা উভয়-পক্ষেরই। সেখানে কথা আর সুর পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য প্রণয়ে বাঁধা।... গানের হয়ত এইটেই পরম বিকাশ।

॥ চার ॥

রবীন্দ্রসংগীতের মৌল প্রবণতার সঙ্গে লৌকিক গীতধর্মের আত্মীয়-বন্ধন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্য-আন্দোলনের কথাটা স্মর্তব্য। কারণ ঐ দুয়েরই প্রাণ-সত্তা এক।

ভারতবর্ষের ধ্রুবপদী নৃত্যকলার যে পুনর্জাগরণ এই শতাব্দীর প্রথম চতুর্থকে শুরু হয়, তার উদ্যোক্তা ছিলেন আনা পাভলোভা এবং উদয়শঙ্কর। ঠিক এই সময়েই বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ এবং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে মহাকবি ভাল্লাথোলও এই প্রয়াসে সচেষ্ট হন। আনা এবং শঙ্কর মোটামুটিভাবে ভারতীয় নৃত্যের অধিকতর ধ্রুবপদী পদ্ধতি দুটি, অর্থাৎ ভারত-নাটাম এবং কথকের দিকেই মনোযোগ দিয়েছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ এবং ভাল্লা-থোল, লোকনৃত্যের বেশি কাছাকাছি রীতি দুটি নিয়েই গবেষণা করেছিলেন। যে কারণে রবীন্দ্রসংগীতের ধারা আলোচনা করতে গিয়ে রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ এবং নজরুলের কথা মনে পড়ে, ঠিক সে কারণেই রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নৃত্য-আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, আনা, শঙ্কর এবং ভাল্লাথোলের কথাও এসে পড়ে।

...মধ্যযুগের পর থেকেই ভারতবর্ষে নৃত্যকলা সম্ভ্রান্ত সমাজের বাইরে চলে গিয়েছিল। বিভিন্ন উপজাতি এবং আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাদের নিজস্ব নাচ, অর্থাৎ লোকনৃত্য। অসম্ভ্রান্ত মহিলাদের মধ্যে নাচের প্রচলন থাকলেও—তার সাধনা এবং আবেদন, দুই-ই শিল্পবোধের এলাকা-বহির্ভূত বলে গণ্য করা হতো। এই পরিস্থিতি থেকে এ'রা ক'জন ভারতীয় নৃত্যকলাকে তুলে এনে সম্ভ্রান্ত সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এ'দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান তাঁর শিল্পমনের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়েই সামিল হয়েছে। এমনিই মণিপুরী নৃত্য বহুলাংশেই লোকনৃত্যের সমধর্মী। কট্টর ব্যাকরণসর্বস্বতার চেয়ে, তার মধ্যে লীলায়িত রসের স্বাভাবিক আবেদন-টুকুই তীব্রতর। রবীন্দ্রনাথ, তাকে আরও বহুল পরিমাণে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছেন।

শুধু এই নয়। ভারতের বিভিন্ন ধরণের লৌকিক নৃত্য, যাদের মাধ্যমে এদেশের গণমানসের ভাবধারা সার্থকতম ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে বলা চলে, তাদেরকে নিয়েও তিনি নানান ধরণের গবেষণা করেছেন। মণিপুরী এবং অন্যান্য ধ্রুবপদী ধারার বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে সাঁওতাল, রাইবেঁশে, গরবা প্রভৃতি নাচের এক বা একাধিক টেকনিকের মিশ্রণ তাঁর বিভিন্ন নৃত্যনাট্যে বারবার পরীক্ষিত হয়েছে। এমন কি, বিদেশী লোকনৃত্য—হাঙ্গেরীর কৃষকদের নৃত্য, সিংহলের ক্যান্ডি নাচ, জাভার বলিদ্বীপের নৃত্য—এসবও তাঁর নৃত্যের নিরীক্ষণে জড়ো হয়েছিল।

●

রবীন্দ্রসংগীতের সুরপ্রবাহ ভারতবর্ষের গণমানসের মূল খাতটিকে অবলম্বন করায়, এদেশের কৃষ্টির সার্থক বিকাশ তার মধ্যে। আর সেই কারণেই তার প্রেরণা বিশ্বমানবিকও বটে। একথা আগেই বলেছি। আর সেই প্রেরণারই অভিব্যক্তি দেখি দক্ষিণ ভারতীয় প্রার্থনা-সংগীতের ভাষা আর ইউরোপীয় চার্চ-মিউজিক টেকনিক, বাংলা অর্চনা-গীতি কিংবা বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে বেলায়, সেই অভিব্যক্তি দেখি এদেশী মহাকাব্যের কাহিনী-আশ্রয়ী নাটকের গানে আইরিস মেলোডিজ এবং নাচে হাঙ্গেরীয় লোক-নৃত্যের রীতি অবলম্বন করার মধ্যে। এরকম উদাহরণ অজস্র মিলবে।...... এই মিলনের ফলেই সুরের আশীর্বাদ, তাঁর গানে এত সহজ, সরল, প্রচুর হয়ে ঝরে পড়েছে! না কি, এজরা পাউন্ডের ভাষাতেই তাদের সম্পর্কে বলব, "Tagore's songs are blessed with Biblical simplicity!"

॥ সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প ॥

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় স্বখ্যাত সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত 'সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প' প্রবন্ধটী পড়লাম। এবং বলাবাহুল্য, পাঠান্তে প্রকৃত প্রীত হ'লাম। কারণ এতদ্বিষয়ে এযাবৎ অনেক আলোচনা-প্রবন্ধ পাঠের সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু সত্যিকারের স্বয়ংসম্পূর্ণের সাক্ষাৎ কুত্রাপি পাইনি। কখনো অবতারণাতেই অবলুপ্তিকে লক্ষ্য করেছি। কখনও বা ভাসা ভাসা ভাবের বন্যায় সামান্য ঝিলিক-টুকু দেখাতেই চক্ষু সার্থক করেছি কেবল। পুরোপুরি পরিতৃপ্তি প্রাপ্তি বোধকরি এই প্রথম।

অবশ্য এক্ষেত্রেও কিছু কিছু ত্রুটি আর বিচ্যুতি পেয়েছি, যার জন্যে মনের কোণায় কিঞ্চিৎ আক্ষেপ থাকলই, তবুও মোটামুটিভাবে যে বঞ্চিত হইনি, সেজন্যে অন্ততঃ আন্তরিক ধন্যবাদটা লেখকের প্রাপ্য।

আধুনিক ছোটগল্পের উৎসমূল যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধানের পর্বত-প্রান্তরেই হোক না কেন, প্রখ্যাত প্রেমেন্দ্র মিত্রের নৈঃসঙ্গ্য ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জটিলতা যে, তার যাত্রাকালের ঐকান্তিক শুভসূচনা-স্থান, সে-বিষয়ে আমরাও লেখকের সঙ্গে একমত। আর তার প্রকার-প্রকরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যত বিভিন্ন বিভাগ-উপবিভাগে বিস্তৃতিই পাকনা কেন, আসল সাফল্য যে, পুঁথিলভ্য নয়, বরঞ্চ জীবনের অভিজ্ঞতার অন্তর-লোকে অবগুণ্ঠিত, এখানেও কোনরূপ মতানৈক্যের স্থান নাই।

তবে সেখানে স্পষ্টোচ্চারিত না-থাকলেও বলার ধরনে একরকম প্রকাশ পেয়েছে যে, আধুনিক ছোটগল্পকে কাহিনীর অনভিপ্রেত হস্তাবলেপকে এড়াতে হবে, যাতে করে সমরেশ বসু সুবোধ ঘোষ প্রমুখের বার্থতায় পর্য-বসিত হওয়া থেকে নিস্কৃতি পেয়ে, কমলকুমার মজুমদার মাফিক সাফল্য-শীর্ষে আরোহণ করা যাবে, সেখানেই সম্পূর্ণ মতের অমিল দেখা যায়। যেহেতু শিল্প-প্রক্রিয়ার পৃথকতা সত্বেও বর্তমানে ছোটগল্প আর কবিতা বেশী দূরে অবস্থান করছে না, একের গুণাগুণ অন্যে অঙ্গীভূত করে নিচ্ছে, এবং আমাদের অস্বীকৃতির সুযোগেও নয়, সেহেতু এখানেও কেন কাহিনী ও ভাব-প্রবাহের মধ্যে প্রয়োজনানুগ প্রদান-গ্রহণে সার্থক সৃষ্টির সাক্ষাৎ মিলবে না? অন্য-দিকে 'মূল্যবোধের সমগ্র নিষ্প্রদীপ ঘটনা কলকাতায়' কথা কটা খটমট ঠেকছে। এবম্বিধ আরো আরো চুটকে ত্রুটির কথা বাদ দিয়ে বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, সামগ্রিকতার আবেদনে সরোজবাবুর সর্ব-সাফল্যে অস্বীকার করার উপায় নাই।

সবশেষে, অপ্রাসঙ্গিকতার অপবাদ-প্রাপ্তির সম্ভবনা সত্বেও উল্লেখ না করে পারছি না যে, মাত্র চল্লিশ নয়া পয়সার বিনিময়ে যে সমস্ত অমূল্য অমূল্য রচনার ডালি আপনি এ সংখ্যায় সুসজ্জিত করেছেন, তাতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার দুঃসাহস পর্যন্ত পাচ্ছিনে।

নমস্কার গ্রহণ করুন। নিবেদন ইতি—

বিনীত,
কাশীনাথ চিনা।
কলিকাতা—৭

॥ জৈমিনী প্রসঙ্গে ॥

সম্পাদক মহাশয়,

গত ৫১ সংখ্যার 'অমৃত' পত্রিকার 'জৈমিনি'র শিক্ষকমহাশয়দের প্রাইভেট টিউশ্যনির উপর মন্তব্যগুলি যথোপ-যুক্তই হয়েছে। শিক্ষকমহাশয়দের প্রাইভেট টিউশ্যনি না হলে সংসার চলে না। তাঁরা বাধ্য হয়েই একাজ করেন। প্রত্যেক শিক্ষকমহাশয়ই জানেন প্রাইভেট টিউশ্যনির মত অপমানজনক কাজ আর কিছুই নেই। ছাত্রের বাড়িতে তাঁদের অভ্যর্থনা 'দায়সারা' গোছের। শুধু কি তাই? অনেক বাড়িতে বেতনও পাওয়া যায় না। সারামাস পড়িয়ে বেতন না পাবার ঘটনা প্রত্যেক শিক্ষকমহাশয়ের জীবনে একবার না একবার ঘটেছেই। নিয়মিত বেতন পাওয়া সৌভাগ্যেরই কথা। অবস্থাপন্ন অভিভাবকদের মধ্যেই এই গুণটা দেখা যায়। এক শিক্ষকমহাশয় একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ছাত্রদের সিনেমা হল দোতলা হচ্ছে আর আমার টিউশ্যনির টাকাও বাকী পড়ছে'। বর্তমানে সকলের যা আর্থিক অবস্থা তাতে প্রাইভেট টিউটর রাখবার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে। পরীক্ষার একমাস আগেই টিউশ্যনি মেলে, এর আগে বা পরে খুব কম। এরপর আবার ছাত্রের 'কমিশন' আছে। 'কমিশন' ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পারেননি? তবে শুনুন ব্যাপারটা। আমার এক শিক্ষক-বন্ধু এক টিউশ্যনি নিয়েছিলেন। এক সপ্তাহ পড়াবার পর ছাত্রটি তাঁর কাছে দুটো টাকা ধার চেয়ে নেয়। পরের সপ্তাহে আবার ছাত্রটি দুটো টাকা চাইতে বন্ধুটি টাকা দিতে অস্বীকার করেন। ছাত্রটি তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে মাষ্টারমহাশয়কে টিউশ্যনি রাখতে হলে সপ্তাহে দুটি করে টাকা দিতে হবে। শিক্ষক-বন্ধুটি তার বাবাকে একথা জানাবেন বললে, ছাত্রটি উত্তর দেয়, তাহলে সে মাষ্টারমহাশয়কে এমন অঙ্ক কষতে দেবে যে তা করতে মাষ্টারমহাশয়ের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। আর কষলেও সে তা বুঝবে না। তাহলেই টিউশ্যনি খতম্। বলাবাহুল্য আমার শিক্ষক-বন্ধুটি এরপর আর পড়াতে যাননি। জৈমিনি বলেছেন, ইস্কুল-মাষ্টার হলে বাজারদর বেড়ে যায়। তা সত্য, কিন্তু ঐ বাজারদর রাখতে গিয়ে ইস্কুল-মাষ্টাররা টিউশ্যনি পান না। কলেজের ছাত্র আর কেরানী-বাবুরাই টিউশ্যনির বাজার খারাপ করে দিয়েছেন। এরপর আবার 'কোচিং ক্লাস' হয়ে টিউশ্যনির বাজার আরও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্কুলের যা সিলেবাস হয়েছে, তাতে একজন শিক্ষকের পক্ষে পড়ানো সম্ভব নয়। এ বিষয়ে কোচিং ক্লাসগুলিই একমাত্র অবলম্বন। এই তো বর্তমান অবস্থা। শিক্ষক ও অভিভাবক সংযত হয়েও বা কি করবেন? যাদের সংযমে কাজ হত সেই কর্তৃপক্ষের কথা বললেন্ কই?

নমস্কার জানবেন
ভবদীয়
অশোককুমার দত্ত (শিক্ষক)
কলিকাতা-১২

(২)

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সমীপেষু,

গত সপ্তাহের 'অমৃত' পত্রিকায় "পূর্বপক্ষ" বিভাগে শ্রীজৈমিনির আলো-চনাটি নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী ও যুক্তিনিষ্ঠ হয়েছে। উপসংহারে তিনি বলেছেন ঃ 'গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক এই দুপক্ষই যদি একটু সংযত না হন তবে এই হৃদয়হীন পরিবেশের ভিতর দিয়ে যে সব ছাত্রেরা মানুষ হ'য়ে উঠেছে তারা হয়তো সংসারে বাস করেই হ'য়ে উঠবে এক-একটি বন-মানুষ। সাম্প্রতিক কালে প্রাইভেট টিউটর অভিভাবক ও শিক্ষার্থী এই ত্রয়ীর সম্পর্কের কথা বিবেচনা করলে তাঁর এই উক্তির যাথার্থ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষাব্রতী ও অভি-ভাবক উভয়েরই এই বিষয়ে আশু অনু-ধাবন শিক্ষা-সমস্যা সমাধানে অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, শ্রীজৈমিনি উভয়কেই উদ্দেশ্য করে "পূর্বপক্ষে" আলোচনা করেছেন—তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পরিশেষে তাঁর কাছে আরও আশা করবো ঃ বর্তমানে টিউটোরিয়াল ব্যুরো, টিউটোরিয়াল হোম, প্রিপারেটরি কলেজ —এই জাতীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যে সর্বনাশা ছাঁচে-ঢালাই শিক্ষাদানে আমাদের দেশের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীর ভয়া-বহ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছেন, সেই সম্পর্কেও নিশ্চয়ই শ্রীজৈমিনির শাণিত লেখনী স্তব্ধ থাকবে না।

শুভান্তে—
সত্যজিত চক্রবর্তী
রামকৃষ্ণ মিশন।
নরেন্দ্রপুর।
২৪-পরগণা।

[উপন্যাস]

॥ দশ ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রিনি কাঞ্জিলালের সেদিনকার অদ্ভুত ব্যবহার প্রভাতের ভালো লাগেনি—খারাপও নয়। এক-আধটু চমক লেগেছিল, কিন্তু আশ্চর্য হয়নি। আশ্চর্য হওয়ার মতো মনটাই সে হারিয়ে ফেলেছে অনেক দিন আগে।

এই কলকাতা শহরে কত মানুষ তার চোখে পড়ল। সেই অ্যাক্সিডেন্টের পর এখানে এসে ছ' মাস ঘুরেছে এখানে ওখানে। সঙ্গে শ' দুই টাকা ছিল, তাই নিয়ে প্রথম একটা মেসে উঠল। তারা সবাই নীচেরতলার মানুষ। কেউ সাধারণ ওভারশিয়ার, কেউ ছোট ব্যবসাদার, কেউ দোকানের কর্মচারী, কেউ গেঞ্জীর কলের ফিটার মিস্ত্রী, কেউ বা ক্যানভাসার, আবার কারো জীবিকার আসল চেহারা যে কী তা কেউ জানে না।

সবাই নিজেকে ভদ্রলোক ভাবে—অথচ ভদ্রলোক হওয়ার উপায় কারো নেই। মাসের শেষ দশ দিন মেসে আর মাছ আসে না—তখন ডাল আর আলুর তরকারি। তবু তার ভেতরেও স্বপ্নের অভাব হয় না। কেউ রেসে যায়, কেউ কোনো লটারীর টিকেট বাদ দেয় না, কেউ কেউ নেশা-ভাংও করে। সকলেই জানে, দিনের পর দিন তারা ক্ষয়ে যাচ্ছে—ফুরিয়ে যাচ্ছে, বুড়িয়ে যাচ্ছে। তবু আকাশের দিকে চোখ—তবু চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের বড়ো বড়ো বাড়ী তাদের রক্তে দোলা লাগায়।

এই মেসে থাকতে থাকতেই প্রভাত প্রথম চিনল কলকাতাকে। তারপর কিছুদিনের জন্যে একটা সরকারী গ্যারেজে অস্থায়ী চাকরি। সেখানে অভিজ্ঞতার আর এক রূপ। তেলচুরির কোনো হিসেব থাকে না—নতুন গাড়ীর পার্টস দিনের আলোয় উধাও হয়, ছ' মাসের ভেতরে আনকোরা গাড়ী ছত্রিশ বছর বুড়িয়ে যায়—ত্রিশ হাজার টাকায় কিনে তিন হাজারে তাকে বিদেয় করতে হয়। না—কলকাতায় চমকাবার কিছু নেই।

সেই চাকরির সময় একটা গল্প শুনেছিল। সত্যি-মিথ্যে সে জানে না।

—খালি আমরাই চুরি করি?—একজন সাধারণ মানুষ বলেছিল : আর পরশু কী হল, শুনি? ওই তো অমুকে হুজুর মফঃস্বলে গিয়েছিলেন। আবগারী দোকানের সামনে গিয়ে হুজুরের মনে হল বড্ড শীত, একটু গা গরম না করলে চলছে না। গাঁট থেকে তো পয়সা খরচ করবেন না—তাই কোন জানাশুনো পাম্পে গিয়ে পাঁচ গ্যালন তেল বেচে—

ভাবতে কষ্ট হয়—স্বপ্নের চাইতেও অসম্ভব বলে বোধ হতে থাকে। তবু কলকাতায় সব সম্ভব। দামী পোশাক-পরা মানুষ ভিখিরীকে দেখে হাতজোড় করে : মাপ করো বাপ।' আবার আর এক ভিখিরী তারই হাতে পয়সা ফেলে দিয়ে যায়—এও তো তার নিজের চোখে দেখা।

কলকাতার পথে-ঘাটে হিন্দি সিনেমার ছবিগুলো বিজ্ঞাপন। কী উৎকট পোশাক—কী অদ্ভুত সব ছবি। কিন্তু ও সব তো বানানো জগতের বানানো গল্প। প্রত্যেক দিন এই কলকাতার চারপাশে—খিদিরপুরের ডক থেকে কাশীপুরের রেলওয়ে ইয়ার্ডে, হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাংরার ট্যানারীতে, চৌরঙ্গীর আলোয় আর নিউ আলিপুরের ঐশ্বর্যে—কী যেন ঘটে চলেছে কে তার হিসেব রাখে? ওই হিন্দি ছবির উদ্ভট বিজ্ঞাপন তার কাছে কিছুই নয়।

এই কাঞ্জিলাল-সাহেব—তার মনিব। দেশের দুঃখে ঝরঝর করে কাঁদতে থাকেন, অথচ কত সহজে একটা মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিলেন! অনেক ভালো ভালো কথা বললেন—প্রভাত তার একবর্ণ বুঝতে পারল না।

তাই রিনি কাঞ্জিলালও তাকে চমক দিতে পারেনি।

তবু যেটুকু অস্বস্তি জেগেছিল, সেটা চাপা পড়ল আধা-অন্ধকার রাস্তায় সেই বোমার আওয়াজে। সেই খানিকটা চোখ-ধাঁধানো আলোর ঝলক, হাতে-মুখে কয়েকটা যন্ত্রণার বিদ্যুৎ, আর দীপ্তির পথের উপর লুটিয়ে পড়া। থানা-পুলিশ-হাসপাতাল। হাসপাতাল থেকে গোটা দুই ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ছুটি পেলো, তারপর পুলিশের কাছে জবাবদিহি।

—কে বোমা ছুঁড়েছে, জানেন?

—না।

—কাউকে ছুঁড়তে দেখেছেন?

—না।

—আপনার কোনো শত্রু আছে?

—না, আমার কোনো শত্রু নেই।

—কাউকে সন্দেহ করেন আপনি?

—না, কাউকেই নয়।

তারপরে সব ঘটনাই কানে এল। তৃপ্তিকে লেখা চিঠি, অমল, অভয়ের কাণ্ড। কৌতূহলহীন নিরাসক্ত মন নিয়ে সব শুনে গেল প্রভাত। বোমাটা তৃপ্তির ওপরে না পড়ে দীপ্তির গায়ে গিয়ে লেগেছে—তাতেই বা কী আসে যায়। এখানে যে-কোন লোকের গায়ে যে-কোন সময় বোমা পড়তে পারে, অকারণে এক শিশি অ্যাসিড ছুটে এসে একটি স্কুলের ছাত্রী কিশোরী মেয়ের ফুলের মতো মুখখানাকে গলিয়ে দিতে পারে, কুষ্ঠ রোগীটা পথের ধারে মরতে মরতে বেঁচে থাকতে পারে, সংসারের একমাত্র রোজ-গেরে পঁচিশ বছরের ছেলেটি অফিসে যাওয়ার পথে সোজা চলে যেতে পারে স্টেট বাসের তলায়। কাজেই যে লক্ষ্য ছিল অভয় আর তৃপ্তির দিকে, সেটা যদি দীপ্তি আর প্রভাতের দিকেই ছিটকে আসে—তাতেই বা মনে করবার কী আছে।

এই কলকাতা। এখানে কারণ খোঁজার চেষ্টা করা বৃথা। এখানে যে-কোনো সময় যা কিছু ঘটতে পারে। আর সেইজন্যেই সেই শেষ মোটর দুর্ঘটনাটা—যার জন্যে প্রভাতের সমস্ত স্নায়ুগুলো উদগ্র হয়ে আছে, সেটা যে-কোনো দিন দেখা দিতে পারে, যে-কোনো মুহূর্তেই।

তবু এই শূন্যতার বোধের ভেতরও কোথাও একটা বেদনা যেন জেগে থাকে। দীপ্তি আত্মহত্যার পথ ধরে চলেছে, আজ হোক, কাল হোক, এর চাইতে অনেক বড়ো একটা দুর্ঘটনা হয়তো অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে। গৌরাঙ্গবাবুর সংসার মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তেও হয়তো এগিয়ে চলবে—যেমন করে বোঝাই গাড়ীর কঙ্কালসার গরু দুর্বল পায়ে জলকাদা ভেঙেও ঠিক চলতে থাকে। অভয়ের অ্যাপ্রেন্টিশিপের পালা শেষ হয়ে চাকরি পাকা হবে—কিছু মাইনে বাড়বে তার। দীপ্তির মতোই কলকাতার আর একটা চোরাগলি খুঁজে নিয়ে কোনো একটা বিকৃত জীবিকার সন্ধান পাবে অমিয়। রাত দিন সকলকে অভিসম্পাত দিতে দিতে দু-বেলা বিষাক্ত অন্ন গলায় তুলবেন গৌরাঙ্গবাবু। আর কলকাতা একই নিয়মে চলতে থাকবে। সল্ট্ লেকের ওপারে তালবনের মাথায় সূর্য উঠবে, গঙ্গার ওপারে হাওড়ার কলগুলোর কালো কালো চিমনির আড়ালে অস্ত যাবে। পথ দিয়ে ভুখা মানুষের মিছিল চলবে—পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁ থেকে ভাজা শুয়োরের মাংসের গন্ধ আসবে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আরতির ঘন্টা বাজবে আর সেই সময় পুলিশ গঙ্গার ধারের নির্জন ঝোপে-ঝাড়ে দুর্নীতির আসামী খুঁজে বেড়াবে। ভোর রাতে এক দল যাবে গঙ্গায় স্নান করতে—আর এক দল জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে খুনের রক্ত মুছে ফেলবার জন্যে।

ভালোয় মন্দে, পাপে পুণ্যে এই কলকাতা নির্বিকার। প্রতিদিন সকালে রাস্তা ধুয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার নতুন গল্প শুরু হয়—আগের দিনের কথা তার মনেও থাকে না। প্রভাতের নিজের সঙ্গে এই কলকাতার মিল আছে। হাসি-কান্না দুঃখ-সুখ—ফোটে আর মিলিয়ে যায়—কোনো জিনিসকে ধরে রাখবার শক্তি তার নেই। যেন মোটরের সামনেকার কাচের পর্দাটার মতো—বৃষ্টির জল পড়ছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে, আর অনুভূতিহীন মন ওয়াইপারের দুটো কালো কালো ডানা বুলিয়ে ক্রমাগত সেটাকে মুছে চলেছে।

শুধু তৃপ্তি।

এই মেয়েটিকেই যেন এর ভেতরে কোথাও মিলিয়ে নেওয়া যায় না। রানীর সঙ্গে কোথায় তার মুখের মিল আছে মনে হয়। মোটর গাড়ীর কাঁচের পর্দায় একটা আঁচড়ের দাগের মতো। ওয়াইপার দিয়ে মুছে-ফেলা যায় না। কিছুতেই। প্রভাতের স্তিমিত নিরুত্তেজ মস্তিষ্কে তৃপ্তির কথা মনে হলেই বিদ্যুতের মতো কী একটা চমকে যায়—একটা তীব্র ক্রোধে মনে হয়, অভয় কেবল একটা ঘুষি মেরেছে অমলকে, সে সামনে থাকলে গোটা কয়েক দাঁতই গুঁড়িয়ে দিত তার।

গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের করে প্রভাত পেট্রোল-পাম্পে নিয়ে এল। তেল দরকার।

—কত?

—দশ লিটার।

মিটার ঘুরছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। বাতাসে গ্যাসোলিনের গন্ধ। সব মিলিয়ে প্রভাতের মনে হয়, তারও সমস্ত জীবনটা একটা মিটার হয়ে গেছে। একটা চাকার মতো ঘুরছে সব কিছু। এক দিন সব ভেঙে-চুরে একাকার না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তার আর ছুটি মিলবে না।

প্রভাত গাড়ীটা বের করে আনল। পেছনে একটা বিরাট লরী ঘন ঘন হর্ণ দিচ্ছে। তার জরুরী দরকার।

সারা কলকাতাই একটা মিটার। ঘুরছে—একটানা ঘুরেই চলেছে। এক—দুই—তিন—চার—ঘূর্ণির আর বিরাম নেই। এই দোকানে কাঞ্জিলাল-সাহেবের অ্যাকাউন্টের মতো একটা হিসাব জমা হচ্ছে তার। কোথায় প্রভাত জানে না।

কাঞ্জিলাল-সাহেব কী কাজে তিন দিনের জন্যে দিল্লী গেছেন। গিন্নী ব্লাড-প্রেশারে কাতর। তিন দিন ধরে রিনিকে নিয়েই তাকে বেরুতে হয়।

এ দু দিন রিনিকে নিয়ে কোন অসুবিধে ছিল না। পরশু বিকেলে তার বন্ধু নিলীনার বাড়ীতে গিয়ে তাকে নিয়ে সিনেমায় ঢুকেছিল। কাল অর্ধেক কলকাতা চষে কী সব জিনিষপত্র কিনেছে। গড়ের মাঠের সেই সন্ধ্যাটার কিছুমাত্র আভাস তাকে দেয়নি। ঘন্টা-খানেকের সেই খামখেয়ালী গড়ের মাঠের হু হু হাওয়ায় কোন্ দিগন্তে মিলিয়ে গেছে।

আজও রিনি লনের সামনে অপেক্ষা করছিল। প্রভাত নেমে গাড়ীর দরজা খুলে রিনিকে তুলে নিলে।

—কোথায় যেতে হবে?

——আলিপুর।

গাড়ী ছুটল। রিনি নিস্তেজ। মধ্যে মধ্যে কী যেন একটা কাগজ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিচ্ছিল হাওয়ায়।

আলিপুরে ঢুকে প্রভাত জানতে চাইল : কোথায় যাব?

রিনি কী একটা ভাবছিল, ভ্রূকুটি করল।

—কোথাও না।

—আজ্ঞে?

রিনি সচেতন হল, আবার কত-গুলো কাগজের টুকরো ছড়িয়ে দিলে বাইরে।

—বর্ধমান রোড দিয়ে বেরিয়ে যান। ডায়মণ্ড হারবার রোড দিয়ে চলুন।

জনাকীর্ণ বেহালা দেখা ছিল। ট্রামে, বাসে আর গাদাগাদি মানুষে পথ প্রায় অবরুদ্ধ। আস্তে আস্তে এগোতে লাগল গাড়ী—বৈশাখের দমচাপা গরমে এই বিকেল পাঁচটাতেও রিনি ঘামতে লাগল।

—কোথায় যাব?—প্রভাত আবার জিজ্ঞেস করল।

তীব্র স্বরে সাপের মতো হিসহিস করে উঠল রিনি : চুলোয়। চেনেন তার রাস্তা?

প্রভাতের হাত স্টিয়ারিঙে ওপর শক্ত হয়ে গেল, আটকে বসতে চাইল চোয়ালদুটো। একবার মনে হল, এই মেয়েটাকে একটা প্রচণ্ড চড় বসিয়ে টেনে নামায় গাড়ী থেকে—তারপর যেদিকে খুশি বেরিয়ে চলে যায় একশো মাইল স্পীডে।

প্রভাত বলে ফেলল : না—চিনি না। আপনিই চিনিয়ে দিন বরং।

রিনি একেবারে আগুনের মতো জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

ইয়ার্কি দিচ্ছেন আমার সঙ্গে? সাহস তো কম নয় আপনার।

—ইয়ার্কি দিইনি।—নিজের জ্বলন্ত চোখ দুটো সামনে ফেলে গাড়ীটাকে ভিড় থেকে বার করে নিতে নিতে বললে, কোথায় যেতে চাইছেন, সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করছিলুম কেবল।

—আমাকে কচি খুকী পেয়েছেন, না—রিনির স্বরে বিষ ঝরতে লাগল : বাবাই আপনাদের প্রশ্রয় দেন। দুটো পেগ পেটে পড়লেই তাঁর বিশ্বপ্রেমে বান ডাকে—আর সোফার-দারোয়ান-বেয়ারা সবাই নিজের পজিশন ভুলে যায়।

স্টিয়ারিঙে রাখা হাতটা যেন হত্যাকাণ্ডের জন্যে নিশপিশ করছে। প্রভাত বললে, না—ভুলিনি। আপনারা ভুললেও আমরা ভুলতে পারি না। এখন দয়া করে কোথায় যাব তাই বলুন।

রিনি রুক্ষ গলায় বললে, সোজা চলুন ডায়মণ্ড হারবারের রাস্তায়। আর বাবা ফিরে আসুক কলকাতায়, আমি জানাব এই ধরনের ড্রাইভার রাখলে তাঁর গাড়ীতে চড়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

প্রভাত জবাব দিল না। অকারণে রিনি ঝগড়া বাধাতে চাইছে। বেশ কথা, ফিরেই আসুন কাঞ্জিলাল-সাহেব। একশো টাকা মাইনের একটা ড্রাইভারগিরি কলকাতা শহরে দুর্লভ নয়।

গাড়ী এগিয়ে চলল। পেরিয়ে ঠাকুরপুকুর ছাড়িয়ে দুপাশে দেখা দিল মাঠ, গ্রাম, সবজীর খেত, জলা। বিকেলের লাল আলোয় কলকাতা অনেক পেছনে স্বপ্নের মতো পড়ে রইল—দেখা দিলে চিরকালের বাংলা দেশ আর তার ওপর দিয়ে উদ্দাম আনন্দে খেলা করতে লাগল বঙ্গোপসাগরের বাতাস।

হঠাৎ রিনি বললে, থামুন।

প্রভাত গাড়ী দাঁড় করাল।

রিনি নেমে পড়ল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পশ্চিমের লাল আকাশের দিকে। তারপর নয়ানজুলির ওপরে পুরোনো ইটের সাঁকোটা পার হয়ে এগিয়ে চলল মাঠের দিকে। প্রভাত বসে রইল গাড়ীতে।

খানিকটা এগিয়ে রিনি মুখ ফেরালো।

প্রভাতবাবু!

—বলুন।

—আসুন এদিকে।

একরাশ বিরক্তিতে ভরে উঠল প্রভাতের মন। জবাব দিল না।

—শুনেছেন? আসুন এদিকে।

—গাড়ীটা পড়ে থাকবে যে?

—থাকুক, লক করে চলে আসুন।

চাকরি ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত হুকুম মানতে হবে—যতই খারাপ লাগুক। প্রভাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামল, বন্ধ করল গাড়ীটা, তারপর সাঁকোটা পার হল। লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে রিনি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, শাড়ীর আঁচল উড়ে যাচ্ছে, মাথার চুলে ঝড় বইছে। প্রভাত এসে দাঁড়াল যথাসম্ভব দূরত্ব বাঁচিয়ে হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে রিনির চোখ পড়ল প্রভাতের দিকে।

—আসুন, বসা যাক একটু। বেশ জায়গাটা।

একটা ছোট মাটির ঢিবির ওপর কয়েকটা বিবর্ণ ঘাস। রিনি বসে পড়ল।

—কই, বসলেন না?

সেই গড়ের মাঠের রাত্রির স্মৃতি। প্রভাত ভ্রূকুটি করল।

—আপনি বসুন—আমি বেশ আছি।

রিনি হাসল। বিকেলের লাল আলো পড়েছে তার শাদা কপালে—মনে হচ্ছে যেন সিঁদুরে মাখামাখি হয়ে গেছে। কুমকুমের তিলকটাকে দেখাচ্ছে একটা রক্তাক্ত আঁচড়ের মতো। কয়েকটা চুল পাগলামি করছে গালের ওপর। সব মিলিয়ে রিনির হাসিটাকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মনে হল।

—চটে গেছেন আমার ওপর?

—আজ্ঞে না।

—অত ভক্তিভরে কথা বলবার দরকার নেই। বসতে বলছি—বসুন একটু।

অগত্যা বসতে হল। সেদিনের মতো আজও মাঠ আর রিনির চুলের গন্ধ প্রদক্ষিণ করে যেতে লাগল প্রভাতকে। সবজীর ক্ষেত, দূরের তাল-খেজুর-বাঁশের বন, গ্রাম, এখানে ওখানে চিকচিকে জল—বিকেলের আলো মেখে সব একটা রঙিন ছবি বলে মনে হল। ওদিকে কয়েকটি গ্রামের মেয়ে তখনো কী সব খেতের কাজ করছিল—মনে হল, তারাও ছবিতে আঁকা। পাখির ডাক উঠতে লাগল, সামনেই এক ঝাঁক চড়ুই শেষবারের মতো খাবারের কণা খুঁটে নিতে লাগল।

প্রভাতের মনে পড়তে লাগল দেশের কথা। এমনি বিকেলে মেঘনার কালো জলে সারি সারি নৌকো বাদাম তুলেছে—ছলাৎ ছলাৎ করে বাজছে জলতরঙ্গ। আর একটা মফঃস্বল শহরের ছবিও ভেসে উঠছে তার ভেতর। এমনি বৈশাখের বিকেলে সারি সারি গাছ ভরে গেছে কাঁচা আমে—কোকিলের ডাকাডাকি সেখানে এখনো শেষ হয়নি।

রিনিই কথা শুরু করল।

—কী ভাবছেন?

—কিছু না।

—আপনি যাকে ভালোবাসেন—তার কথা—তাই না?—রিনি আবার হাসল: ভাবছেন, আমি না হয়ে সে সঙ্গে থাকলে বেশ হত। কী বলেন?

বিকেলের রঙে আর চারদিকের শান্ত নির্জনতায় প্রভাতের মন মগ্ন হয়ে আসছিল, রিনির কথায় যেন চাবুক পড়ল। আবার একরাশ জিঘাংসা ফেটে পড়ল মাথার ভেতরে।

যদি না যাই—জোর করে টেনে নিয়ে যাবেন আমাকে?

—আপনার জেনে দরকার নেই। —প্রভাতের কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল: দয়া করে বাড়ী ফিরুন, আমায় রেহাই দিন।

—যদি না ফিরি?—রিনি নীচু হয়ে একটা ছোট মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিলে, সেটাকে ছুঁড়ে দিলে ব্যস্ত চড়ুই পাখির ঝাঁকের দিকে।

কিচির-মিচির করে দলটা খানিক দূরে উড়ে গেল। রিনি আবার বললে, যদি না ফিরি? কী করবেন আপনি?

কী করবে প্রভাত সে কথার জবাব দেওয়া শক্ত। গলার কাছে একটা নিরুপায় ক্রোধ পাকিয়ে উঠতে লাগল কেবল।

—যদি না যাই—জোর করে টেনে নিয়ে যাবেন আমাকে?

—ক্ষমা করবেন। আপনি মনিব—এ সব কথা বলবেন না আমাকে।

—চুলোয় যাক মনিব। —রিনি জ্বলে উঠল: এই মাঠ—চারদিকে লোকজন কেউ নেই সকলেই চলে, আমি একা আছি আপনার কাছে—আর আমি যে দেখতে খুব খারাপ সে-কথা নিন্দুকেও বলতে পারবে না। এত সুযোগ রয়েছে—তবু জোর করে আমার হাত ধরতে পারেন না, আপনি—পুরুষ হয়ে উঠতে পারেন না?

প্রভাত দাঁতে দাঁতে চেপে বললে, আপনি কি চান আমি আজই রিজাইন দিই?

আঁকা ভুরুদুটোকে দু পাশে অনেকখানি ছড়িয়ে দিয়ে আহত বিস্ময়ের ভঙ্গিতে তাকালো রিনি।

—এত চটবার কী হল আপনার? বাঙালের মেজাজই আলাদা।

—বাঙালের কথা নয়। গরিব হলেও আমাদের কিছু আত্মসম্মান আছে।

—ও. ভালোবাসার কথা বললে বুঝি গরিব মানুষকে অপমান করা হয়? তাদের প্রেস্টিজ যে এ ব্যাপারে এত টনটনে সে তো জানতুম না।

প্রভাত সরকার ভেবেছিল, এই কলকাতা শহরে চমকাবার মতো কিছু নেই। সব তার চেনা হয়ে গেছে—এখানকার কোনো বিস্ময়ই আর তাকে ছুঁতে পারবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেল।

রিনি তীক্ষ্ম গলায় বলে চলল, কী করে রূঢ় হতে হয় জানেন না আপনি? যারা আপনার বোনের দিকে বোমা ছুঁড়েছিল, তাদের আপনি চেনেন না? জোর করে আপনি মুখ বেঁধে ফেলতে পারেন না আমার—গাড়ীটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারেন না যেখানে খুশি? শুধু শুয়োরের মতো বেঁচে থাকতে জানেন—বাঘের মতো কেড়ে নিয়ে যেতে পারেন না শিকারকে?

প্রভাতের কপাল বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল।

—আমি মানুষ, জানোয়ার নই। এ সব কথা শুনলেও পাপ হয়।

—পাপ!—রিনি হেসে উঠল : ও বেচারা মারা গেছে অনেক কাল আগেই, আপনারাই শুধু ওর কঙ্কালটা ধরে টানাটানি করছেন। আসুন, ধরুন আমার হাত : বলুন—'Away from the drawing-room's civilized cry'. আমরা দুজন আদিম মানব-মানবী, আবার আগেকার মতো পাহাড়ে বনে ফিরে চলেছি।

প্রভাত সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, আর তৎক্ষণাৎ রিনি এগিয়ে এসে হাত ধরল তার।

—একা পালাচ্ছেন কেন? আমাকেও নিয়ে চলুন। না—কলকাতায় নয়। যে-কোনো জঙ্গলে, যে-কোনো অন্ধকার পাহাড়ে—যে-কোনো নির্জন দ্বীপে। সাহস নেই? বিলিতী গল্পে এমন কত ঘটে—আপনি পারেন না?

রিনির চোখদুটো থেকে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। আর—আর একটু হলেই প্রভাত যখন তার গলাটা টিপে ধরতে যাচ্ছিল, তখন একটা হৈ-হৈ চিৎকার ছুটে এল।

—দাদা, বেশ বেশ। খাসা জমিয়েছেন।

তৎক্ষণাৎ প্রভাতের হাত ছেড়ে দিয়ে রিনি সরে দাঁড়ালো।—যেন হিপ্‌নটিজমের মোহ কেটে গেছে তার। ডায়মণ্ড হারবার রোড সুন্দরবন নয়—দুমকার আদিম পাহাড়ও নয়। চকিতে দেখা গেল একখানা জীপ দ্রুত ছুটেছে কলকাতার দিকে—আর তা থেকে দশ-বারোটি যুবকের হাস্যবিকশিত মুখ বাড়ানো রয়েছে তাদেরই দিকে।

—বৌদি, একটু ঝোপের আড়ালে গেলে ভালো হয়।—আর একবার অভিনন্দন শোনা গেল।

দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সূর্য অস্তে নেমেছে একটু আগেই—এইবারে মাঠের ওপর দীর্ঘ কালো ছায়া নামতে লাগল। কৃষক মেয়েরা একে একে ফিরে চলল গ্রামের দিকে।

প্রভাত বললে, এবার বাড়ী ফিরুন।

রিনি গাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করল। সেই সাঁকোটার ওপর এসে দাঁড়িয়ে পড়ল একবারের জন্যে।

—এখান থেকে নীচে যদি ঝাঁপ দিয়ে পড়ি—কী হয়?

প্রভাতের মুখে একটা কঠিন কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল : শুধু কাদা মাখবেন, কারণ এক হাঁটুর বেশি জল এখানে নেই। হাত-পাও ভাঙতে পারেন।

—ইডিয়ট! —বড়ো বড়ো পা ফেলে রিনি সাঁকোটা পার হয়ে গেল।

আর তখন প্রভাত সরকারের মনে হল, সেদিনকার দুর্ঘটনায় রানী কোনোমতে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু যদি কাঞ্জিলালের চাকরিতে সে রিজাইন না দেয়, তা হলে শেষ দুর্ঘটনায় নিজেকে হত্যা করবার আগেই রিনিকে তার খুন করতে হবে!

—প্রভাতবাবু!

রাস্তায় পা দিয়েই রিনি [illegible] করে উঠল : সাপ!

তিন লাফে এগিয়ে [illegible] রিনির কাছাকাছি আসতেই [illegible], রিনির পা থেকে হাত তিনেক দূরে ঘাসবনের ভেতর থেকে একটা ছোট গোখরো সাপের ফণা দুলছে।

প্রভাত একটা ইট তুলল। কিন্তু তার দরকার হল না। সাপটা ফণা নামিয়ে অদৃশ্য হল ঝোপের ভেতর।

এতক্ষণে সহজভাবে হা হা করে হেসে উঠল প্রভাত। বললে, আদিম জীবনের একটুখানি নমুনা দেখলেন তো? এর পরেও সাহস হয় আপনার?

রিনির চোখ দিয়ে বিষ ঝরল। প্রভাত দেখল, রোদ্রের সেই রঙটা রিনির মুখে আর কোথাও নেই, সন্ধ্যার কালো ছায়ায় মুখটা যেন ভেঙে-চুরে বিকৃত হয়ে গেছে—রিনিকে ঠিক ডাইনীর মতো দেখাচ্ছে এখন।

রিনি আবার বললে, ইডিয়ট!

—(ক্রমশঃ)
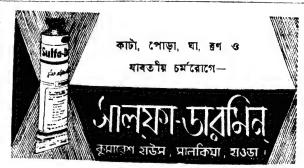
থোরো : আইন অমান্য আন্দোলনে প্রথম বন্দী

কণাদ চৌধুরী

ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পুরুষ মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী। কিন্তু গান্ধীজী স্বীকার করেছেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন "সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স" নামক একটি প্রবন্ধ থেকে। লেখক হেনরি ডেভিড থোরো—আমেরিকার প্রকৃতিবাদী দার্শনিক। শুধু প্রবন্ধের পাতায় আইন অমান্য আন্দোলনকে সীমিত রাখেননি থোরো, অন্যায় করের প্রতিবাদে তাঁর এক রাত্রির কারাবরণ, আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম বন্দী হিসেবে তাঁকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছে। গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে তাঁর চিন্তার সাযুজ্য বিস্ময়কর। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজ-সংস্কারের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে আত্মসংস্কার এবং আত্মশুদ্ধি। মানুষ নিজেই তার ভাগ্যের নিয়ন্তা—ভাগ্যের ক্রীতদাস সে কখনই নয়। যুক্তিরহিত নির্বোধ শৃঙ্খলার বরাবর বিরুদ্ধে ছিলেন থোরো। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি আজো অসামান্য :

If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer. Let him step to the music he hears however measured or far away."

সমসাময়িক বাস্তবতাবাদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে থোরো নিজেও হয়ত এমনি এক দূরাগত দুন্দুভিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন ভাগবত গীতার পাতায়।

মানুষ হিসেবে হেনরি ডেভিড থোরো উনবিংশ শতাব্দীর একটি আশ্চর্য চরিত্র। তাঁর জীবনীকাররা তাঁকে নানান অদ্ভুত বিশেষণে প্রসাধিত করেছেন। কেউ বলেছেন "সুখী বিদ্রোহী" কেউ ব্যঙ্গ করেছেন "মহাজাগতিক ইয়াংকি" বলে, আবার কারো কাছে থোরো প্রতিভাত হয়েছেন "প্রকৃতি-পূজক সন্ন্যাসী" রূপে।

জীবদ্দশায় তাঁর মাত্র দুটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি, "এ উইক অন দি কনকর্ড এণ্ড মেরিম্যাক রিভারস" মাত্র ৩০০ কপি বিক্রি হয়েছিল। পরের বই, "ওয়ালডেন, অর, লাইফ ইন দি উডস" অবশ্য জনসমাদর লাভ করেছিল। উত্তরকালে এই বইটি প্রায় ক্লাসিকস-এর মর্যাদা লাভ করেছিল, এবং বইটি পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

থোরোর জন্মতারিখ ১২ই জুলাই ১৮১৭ সাল। জন্মস্থান বস্টনের কাছে কনকর্ড নামে একটি ছোট্ট শহর। তাঁর বাবা ছিলেন দরিদ্র পেন্সিল প্রস্তুতকারক। ১৬ বছর বয়সে থোরো হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ভাষা শেখার

হেনরি ডেভিড থোরো

দিকে তাঁর আকৈশোরিক আগ্রহ তাঁকে পাঁচটি বিদেশী ভাষা শিক্ষায় প্রণোদিত করেছিল। দর্শন এবং গণিতও তাঁর শিক্ষার অন্যতম বিষয় ছিল। হারভার্ডের পড়াশোনা শেষ করে তাঁর ভাই জনের সহযোগিতায় একটি প্রাইভেট স্কুল খোলেন থোরো। এই সময় থেকেই অল্প-বিস্তর সাহিত্য-চর্চা শুরু হয় তাঁর। ভাইয়ের মৃত্যুর পর কিছুদিন তিনি মনীষী এমারসনের বাড়িতে এসে বাস করতে থাকেন। এখানে কয়েকজন তুরীয়বাদী তরুণ দার্শনিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই তুরীয়বাদীদের প্রভাব তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারাকে অনেকখানি আলোকিত করেছিল। নগর-জীবনের কোলাহল, বন্ধুবান্ধবের উষ্ণসান্নিধ্য, দর্শনের কূটতর্ক তাঁকে কিন্তু বেশী দিন শান্তির ছায়া দেয়নি। পৃথিবীর একটি নিবিড় নির্জন স্থানের অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন থোরো। অবশেষে তাঁর জন্মস্থানের খুব কাছেই প্রায় এক মাইলের মধ্যেই পৃথিবীর সেই নির্জনতম স্থানটিকে খুঁজে পেলেন তিনি।

১৮৪৫ সালের জুলাই মাসে ওয়াল্ডেন পণ্ড-এ হ্রদের ধারে একটা কাঠের ঘর বানিয়ে প্রায় সন্ন্যাসীর মত বাস করতে আরম্ভ করলেন। থোরো প্রায় দু' বছর ওয়াল্ডেন পণ্ড-এর নির্জন কক্ষে আত্মচিন্তায় কাটিয়ে দিয়েছিলেন। বন্ধুবান্ধবরা অবশ্য আসতেন মাঝে মাঝে। নিজের হাতেই ফসল ফলিয়ে নিজের আহার্য যোগাড় করতেন তিনি। কুটিরের সামনের জমিতে আলু, ধান ফলাতেন। বাড়তি ধান বিক্রিও করতেন। এই দু-বছরে থোরো অরণ্যাত্মাই হয়ে গিয়েছিলেন। প্রকৃতির নিরাভরণ ঐশ্বর্য তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, এমন কি অরণ্যের পাখিরাও তাঁকে আপন প্রিয় করে নিয়েছিল। একবার একটা চড়ুই পাখি এসে তাঁর কাঁধে নির্ভয়ে বসেছিল। সেই দিনটিকে থোরোর মনে হয়েছিল তাঁর রাজ্যাভিষেকের দিন। অরণ্য-বাস সম্বন্ধে তাঁর নিজের বক্তব্য তাঁর আবেগে স্পন্দিত :

I went to the woods because I wanted to live deliberately to front only the essential facts of life I wanted to live deep and suck out the marrow of life

(Walden or life in the woods)

জীবনের শেষের বছরগুলো থোরো বক্তৃতা দিয়ে, প্রবন্ধ লিখে এবং জমি জরীপের কাজ করে কাটিয়েছেন। চির-কুমার থোরোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ওয়াল্ট হুইটম্যান। তৎকালীন দাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলনে ক্রমশঃই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন তিনি। ক্রমশঃই তাঁর শরীর ভেঙে পড়তে থাকে এবং ১৮৬০ সালের নভেম্বর মাসে যক্ষ্মা রোগে শয্যাশায়ী হন। সেই থেকে আর সেরে ওঠেননি। আঠারো মাস বাদে পৃথিবীর প্রিয় প্রকৃতিকে ছেড়ে আরেক প্রকৃতির দিকে চলে যান হেনরী ডেভিড থোরো। গত ৬ই মে তাঁর শততম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। থোরো সম্বন্ধে এমারসনের শ্রদ্ধাঘাই উক্তিতম :

His soul was made for the noblest society......wherever there is knowledge, wherever there is virtue, wherever there is beauty, he will find a home.

॥ ৩ ॥

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

কদিন কেটে গেছে। মুথানডমাণ্ডের দু-চার মাইলের ভিতর আরও কয়েকটি মাণ্ড আছে। এ মাণ্ডে থেকেই অন্য সব মাণ্ডের সংবাদ সংগ্রহ করছি।

নীলগিরিতে সরকারী পরিকল্পনার কাজ চলছে অনেক। বাঁধ হচ্ছে, রাস্তা-ঘাট হচ্ছে। তামিল আর বাডাগা মজুররা কাজ করছে সেখানে সারা-দিন। কাজ করছে তারা চা-বাগানে আর কফির ক্ষেতে। তাছাড়া আছে জমির কাজ। এসব পাহাড়ে মাটি রসহীন কঠিন নয়—নরম উর্বর। পাহাড়ের ঢালু জমিতে লাঙল চলে না, মাটি খোঁড়বার ফর্ক দিয়ে জমি তৈরী করছে পরিশ্রমী শ্রমিকের দল। সেখানেও আছে তামিল, বাডাগা, কোটা আর অন্যান্য উপজাতির মজুররা। কিন্তু টোডারা নেই কোন-খানে। হয়তো তখন তারা কারণে-অকারণে পাহাড়ের চড়াই-উতরাই ভাঙছে বা শুধু বসে বসে দাঁতের গোড়ায় নস্য মাখছে। মোষ চরাতে আর ক'জন লোকের প্রয়োজন? অথচ এদের আর্থিক সঙ্গতি সে তুলনায় যে ভাল তা নয়। বরং চাষী বাডাগাদের চেয়ে এদের অবস্থা খারাপই। তবুও চাষবাসের উপর মন নেই এদের, মজুরের কাজ তো পরিত্যাজ্য। আজ পর্যন্ত কেউ টোডা মজুর দেখেনি। একবার এক টোডাকে কিছু দিনের জন্য জেলের কয়েদী হতে হয়। অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে তাকেও বাধ্যতামূলক শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে দেওয়া হল। কিন্তু টোডা জীবনের সঙ্গে মজুরের কাজের ব্যবধান এতই বেশী যে, নানা রকম ভয়-ভীতি দেখিয়েও তাকে অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে কাজে নামান গেল না।

আসলে টোডারা অলস নয়, তারা কর্মবিমুখ। যে সমস্ত কাজ থেকে কৃষি-কেন্দ্রিক বা শিল্পকেন্দ্রিক জীবন গড়ে উঠেছে সে সমস্ত কাজ টোডা জীবনে অবোধ্য। অন্ততঃ এতদিন অবোধ্যই ছিল।

তুমি ভাবছ, কেন কর্মবিমুখ জীবন-দর্শন গড়ে উঠল টোডা জীবনে? টোডারা কবে কোথা থেকে নীলগিরিতে এসেছিল তা কোন পণ্ডিতই ঠিক করে বলতে পারেন না, তবে তারা যে নীল-গিরির সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী সে বিষয়ে পণ্ডিতদের সন্দেহ নেই। বাডাগা বা অন্যান্য উপজাতিদের আসার আগেও তারা মোষ চরাত নীলগিরির তৃণ-ভূমিতে। হয়তো কোন কালে ঘরছাড়া এক দল মানুষ ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিল এখানে। এসে হয়তো দেখল শত শত বুনো মোষ আর উপত্যকায় ঘাসের প্রাচুর্য। ভবঘুরে লোকেরা ঘর বাঁধল। কিন্তু মাটিতে শিকড় গাড়ল না। মাটির উর্বরতার উপর তাদের চোখ পড়ল না, চোখ পড়ল বনের মোষ আর জমির ঘাসের উপর। পোষ মানাল মোষদের, টোডাদের ছোট ছোট উপনিবেশ গড়ে উঠল তৃণ-ভূমির উপর। পরিবারপিছু ছিল হয়তো কয়েক শ' করে মোষ। মোষের দুধ আর মাখনই যোগাত তাদের জীবন-রস। আর হয়তো কিছু বনের মূল আর শিকার-করা পশুর মাংস। পশু যে তারা শিকার করত তার পরিচয় পাওয়া যায় কোন কোন আচার-অনুষ্ঠানে। কিন্তু তারপর তারা শিকার করা ভুলে যায়। ভুলে যায় কারণ তার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। টোডারা এখন এক রকম নিরামিষাশী।

এরপর এল বাডাগারা। বাডাগারা চাষবাস নিয়েই এসেছিল। তাদের চাষী-মন জানিয়ে দিল যে নীলগিরির মাটিতে সোনা আছে। বাডাগারা সংখ্যায় অনেক আর টোডারা মাত্র কয়েক শ'। টোডাদের বর্তমান সংখ্যাও আটশ'র বেশী হবে না। বাডাগারা দেখল নীলগিরির জমিতে টোডাদের মোষ চরে বেড়াচ্ছে। আজ এখানে, কিছু দিন পরে অন্যখানে। যাযাবর লোকেরা ঘর বেঁধেছে বটে কিন্তু যাযাবরে স্বভাবটি একেবারে ছাড়তে পারেনি। শীতকালে এক জায়গায় ঘাস শুকিয়ে গেলে অন্য জায়গায় চলে যায় যেখানে বৃষ্টিপাত একটু বেশী। বছরের কোন-না-কোন সময় টোডাদের মোষ চরে বেড়ায় না—এ রকম কৃষিযোগ্য জমি খুঁজে পাওয়া ভার। টোডাদের না-ছিল তেমন অস্ত্র না-ছিল শস্ত্র। শুধু ছড়ি হাতে করে মোষ চরাত। সংখ্যায়ও মুষ্টিমেয়। তবুও সমীহ করার মত চেহারা তাদের, ভয় করার মত নয়, মনিব বলে মেনে নেবার মত। তাছাড়া টোডারা যে কোন সময় ফসলের ক্ষেত

কর্মব্যস্ত টোডা পল্লীর একাংশ

চড়াও করার জন্য ছেড়ে দিত পারত আধপোষা মোষদের।

একটা রফা হয়ে গেল। বাডাগারা চায় জমি আর টোডারা অক্লেশে পাওয়া কিছু ফসল। বাডাগারা জমি চাষ করার অনুমতি পেল উৎপন্ন ফসলের আট ভাগের এক ভাগের পরিবর্তে। ফসলের খাজনাকে বলা হত 'গুড়ু'। কোন্ গ্রামের বাডাগারা কোন্ মাণ্ডের টোডাদের গুড়ু দেবে তাও ঠিক হয়ে গেল। গুড়ুতে টোডারা যে ফসল পেত তাতেই তাদের প্রয়োজন মিটে যেত। প্রচুর দুধ মাখনের সঙ্গে প্রাণভরে খাবার মত ফসল পেল টোডারা, বিনা পরিশ্রমে। মোষ চরাতে বাঁধাধরা ঘানিটানা শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই, আছে মুক্ত আকাশের নীচে বিস্তৃত চড়াই-উতরাইয়ে ঘুরে বেড়াবার আনন্দ। শতাব্দীর পর শতাব্দী জীবনের রসদ জুটেছে অনায়াসে। এই অনায়াসলব্ধ জীবন-রসদই তাদের কর্মবিমুখ করে তুলেছে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে প্রান্তরে প্রান্তরে তারা যে মোষ চরিয়ে এসেছে সেই মোষ চরাবার তাগিদই তাদের স্থবিরত্ব থেকে বাঁচিয়েছে এবং তাই তারা হয়ে যায়নি অলস।

টোডাদের জীবন চলছিল একটানা ছন্দে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। এল ইংরেজরা নীলগিরির মনোরম জলবায়ু ও অপরূপ রূপের আমন্ত্রণে। সেখানকার সোনা-মাটির উপরও তাদের নজর গেল। শুরু হল চা-কফির চাষ আর গড়ে উঠল উপ-নিবেশ। ইংরেজরা মানবে কেন টোডাদের মত বুনো মানুষদের প্রভুত্ব! ধীরে ধীরে টোডাদের মোষ চরাবার জমির পরিমাণ কমে আসতে লাগল। মাণ্ডের চারদিকে কিছুটা করে জমি নির্দিষ্ট হল মোষ চরাবার জন্য, সে জমির উপরও নজর পড়ল দিশী উপনিবেশকারীদের। মহী-শূর থেকে ভাগ্যান্বেষীরা এসে নানা রকম টোপ ফেলে টোডাদের মোষ চরাবার জমি হাত করতে লাগল আর শুরু করল আলুর চাষ। কৃষিকেন্দ্রিক বাডাগা সমাজ আর্থিক অবস্থা আর সামাজিক প্রতিপত্তিতে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল, তারা টোডাদের গুড়ু দেওয়া বন্ধ করল। সরকারী বনবিভাগ আরম্ভ করল ইউকেলিপটাসের চাষ টোডা-তৃণভূমিতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে নীলগিরিতে যে সমাজ গড়ে উঠল তা থেকে টোডারা একঘরে হয়ে রইল, অথচ পুরানো জীবনের আর্থিক ভিত্তিতেও ফাটল ধরল। ঘাসের জমি কমল, তাই মোষের সংখ্যাও কমল। তাদের নিশ্চিত সংকট থেকে বাঁচাবার জন্য কিছু কিছু আইন হ'ল। বলা হ'ল, টোডা তৃণভূমিতে টোডাদের একচ্ছত্র অধিকার তবে সে জমি বিক্রি করা যাবে না কারও কাছে। জমি মোষ চরাবার জন্য—শুধু টোডাদের মোষ। সরকারের অনুমোদন নিয়ে কিছু কিছু চাষাবাদ অবশ্য তারা করতে পারবে সে জমিতে।

টোডারা বুঝেছে শুধু মোষের উপর নির্ভর করলে আর চলবে না, তাই চাষাবাদ শুরু করেছে কিছু কিছু, কিন্তু তা যৎসামান্য। এখনও অস্থি-মজ্জাতে মিশে আছে ওদের মোষ প্রতি-পালনের অভ্যাস। একজন বয়স্ক টোডা একদিন আমাকে বলেছিল, সরকারকে বলে কিছু জমির বন্দোবস্ত করে দাও না?

—পারি, তবে একটা সর্তে।

—কি?

—সরকার তোমাদের প্রচুর জমি দেবে, যদি তোমাদের মোষগুলি সর-কারকে দাও।

টোডা বুড়ো রসিকতাটি বুঝলো। হেসে বল্ল ইল্লে ইল্লে (না, না) মোষ

মহিষ-চারণ ভূমি

হারিয়ে বেঁচে লাভ কি? মোষ ছাড়া যে স্বর্গেও যেতে পারব না। স্বর্গেও আমাদের মোষ নিয়ে যেতে হয়। চাই না আমরা জমি।

॥ ৪ ॥

টোডাদের মন্দির সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। এখনও মন্দিরের সামনেই বসে আছি একটি পাথরের উপর, আর দেখছি পুরোহিতের কাজ-কর্ম। অবশ্য বাইরে থেকে যতটা দেখা যায়। ভিতরে তো আর যেতে দেবে না। দেখার ফাঁকে ফাঁকে লিখছি তোমাকে। সকালবেলা।

বাইরের লোকদের মন্দিরে ঢোকা নিষেধ, এমন কি মান্ডের লোকদেরও অবাধ গতি নেই। মেয়েদের তো নেইই। পুরোহিত ও তার সহকারী আছে মন্দিরের ভিতরে। একটু পরে এক টোডা গৃহিণী মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়াল, তার হাতে একটি মাটির বড় হাঁড়ি আর বাঁশের তৈরী একটি চুঙি জাতীয় পাত্র। পুরোহিত বের হয়ে আসল দুটি পাত্র নিয়ে—একটিতে ঘোল আর আর একটিতে মাখন। ঘোল-মাখন এনে ঢেলে দিল টোডা গৃহিণীর পাত্র দুটিতে—মাটির হাঁড়িতে ঘোল আর বাঁশের চুঙিতে মাখন।

জিজ্ঞাসা করলুম, ঘোল মাখন কি পুরোহিতই তৈরী করে?

গৃহিণী বল্ল, হাঁ, মন্দির তো ঘী-মাখন তৈরী করার জন্যই।

যে পাঁচটি পরিবার এই মান্ডে আছে তাদের সবার দুধই জমা করে আনে পুরোহিত আর তা থেকে ঘোল-মাখন তৈরী করে মন্দিরের ভিতর। মেয়েরা তাদের হিসাবমত ঘোল মাখন নিয়ে যায় পুরোহিতের কাছ থেকে। দুধ থেকে ঘোল মাখন তৈরী করা মহা পবিত্রতার কাজ; নানা প্রকার নিষ্ঠা-অনুষ্ঠান থাকে তাতে জড়িত। যে-সে করতে পারে না ও-কাজ, তার জন্য পুরোহিত চাই। পুরোহিতের কিন্তু বংশগত অধিকার নেই। প্রায় যে কোন লোক পুরোহিত হ'তে পারে। তবে পুরোহিত হ'বার আগে ও পরে তাকে নানা রকম নিয়ম-কানুনের ভিতর দিয়ে চলতে হয়। মন্দিরের ভিতরেও শ্রেণীবিভাগ আছে, পুরোহিতদের ভিতরও, এক এক শ্রেণীর এক এক নিয়মকানুন।

সকালে ঘুম থেকে উঠে পুরোহিত সূর্যকে করে প্রণাম, আর তারপর পবিত্র

উৎসবানুষ্ঠানে টোডা পুরুষেরা

মোষদের দুইতে যায়। 'পবিত্র মোষ' কথাটি বুঝিয়ে বলা দরকার। মান্ডের সব মোষ পবিত্র নয়, কিছু সাধারণ মোষও আছে। সাধারণ মোষদের সাধারণ লোকেরাই দুইতে পারে। পবিত্র মোষের সংখ্যাই বেশী, আর তাদের দুইবার ভার পুরোহিতের উপর।

পুরোহিত একটা পাত্রে কিছুটা দই নিয়ে মোষ দুইতে আরম্ভ করে। দুধ থেকে আবার দই হবে। এক একটা মোষ দুইতে সময় লাগে না। কারণ এ জাতের মোষের বেশী দুধ হয় না, আকারে বড় আর কান্তিতে নধর হ'লে কি হবে।

দই মাখন তৈরীকে কেন্দ্র করে মন্দিরে যে সব আচার পূজা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয় সে সম্বন্ধে কিছু জানতে পারিনি। সে যাই হোক, আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ঘোল মাখন তৈরীর কাজটার উপর গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, সেইটাই আসল কথা। মোষ চরানো আর ঘোল মাখন তৈরী করা যে টোডা জীবনে সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ কাজ সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। খানিকটা মাখন খাবার জন্য রেখে বাকীটা থেকে ঘী তৈরী করা হয়। সেই ঘী চলে যায় ওটীর বাজারে।

পুরোহিতকে যে নানা রকম আইন-কানুন মানতে হয় সে কথা তো বলেছি। পুরোহিত অনেক সময় মান্ডের লোকই হয়ে থাকে। কিন্তু মান্ডের লোক হলেও তার রান্নাবান্না হয় মন্দিরের ভিতর। পরিবারের ভিতরে থেকে খাওয়াদাওয়া তার নিষেধ। সপ্তাহে বিশেষ কয়েকটি দিন ছাড়া—যেমন রবিবার, বুধবার ও শুক্রবার। অন্যান্য দিন তাকে মন্দিরেই রাত কাটাতে হয়। বিশেষ দিনগুলিতে সে স্ত্রীসঙ্গ পেতে পারে, অন্য দিনে স্ত্রীলোকের ছোঁয়া লাগলেও তাকে পুরোহিতের গদি ছাড়তে হয়। কোন কোন শ্রেণীর মন্দিরের পুরোহিতদের বাধা-নিষেধের কড়াকড়ি আরও প্রবল। পুরোহিতরা যতদিন পুরোহিতের গদিতে আসীন থাকে ততদিন তাদের ঘরসংসার ছেড়ে থাকতে হয়, মন্দিরের বাইরে রাত কাটাবার উপায় নেই তাদের। যেমন 'তাই' মন্দিরের পুরোহিত। সে মন্দিরের পুরোহিতকে বলা হয় পেলল। পেললের গতিবিধি খুবই সীমাবদ্ধ। পেলল গদিতে আসীন থাকাকালে কয়েকটি নির্দিষ্ট মান্ড ছাড়া যে কোন মান্ডে বেড়াতে যেতে পারে না, হাটবাজার গঞ্জে যেতে পারে না, মাথার চুল আর নখও কাটতে পারে না। মন্দিরের বাইরে রাত কাটাবার প্রশ্ন তো ওঠেই না—একদিনের জন্যও না। নানা রকম আইন বাঁচিয়ে কেউ বেশী-দিন পুরোহিত—বিশেষতঃ পেলল হয়ে থাকতে পারে না, হয়তো চায়ও না। সাধারণতঃ দু'তিন বছরেই পুরোহিতত্ব ঘুচে যায়। কিন্তু এমনও দেখা গেছে কেউ কেউ পেলল হয়ে কাটিয়েছে একটানা আঠার বছর। আঠার বছর পূর্ণ হলে পেললের জীবনে আসে অপূর্ব মুহূর্ত। দীর্ঘ দিনের কৃচ্ছ-সাধনের পুরস্কার। মান্ডের এবং মান্ডের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য মান্ডে এ নিয়ে

চলে জল্পনা-কল্পনা, আলাপ-আলোচনা। অনেক ঘরোয়া বৈঠক বসে শেষ দিনের পুরস্কার নিয়ে। শেষ দিনই, কারণ এ অপূর্ব মুহূর্তকে আকণ্ঠ পান করার পর পেললকে পুরোহিতের আসন ছেড়ে দিতে হয়। পেলল নিজের পছন্দমত একটি মেয়েকে বেছে নেয় কাছাকাছি মাণ্ডগুলির ভিতর থেকে। তার দেহমন যে মেয়েকে চায় সে মেয়েকে সাজান হয় নানাভাবে, আর পাঠিয়ে দেওয়া হয় মন্দির থেকে খানিকটা দূরে বনজঙ্গলের ভিতর, পেলল অভিসারিকার সঙ্গে মিলিত হয় দিনের আলোতেই।

সব মাণ্ডে কিন্তু মন্দির নেই। যেখানে দু'তিনটি পরিবার আছে সেখানে প্রায়ই মন্দির দেখতে পাবে না। মন্দিরের অস্তিত্ব আর নিয়মকানুনেও ফাটল ধরেছে। মন্দিরের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। তবুও মোট ষাট-পঁয়ষট্টিটি মাণ্ডের ভিতর অন্ততঃ বিশটি মাণ্ডে মন্দির দেখতে পাবে।

॥ ৫ ॥

টোডাদের খাদ্য সম্বন্ধে খবর নেওয়ার বিশেষ কাজে এসেছি, সেটা তুমি জান, তারা কি খায়, কি রান্না করে, পুষ্টির দিক থেকে তার উৎকর্ষ কতটা, এসব খবর। তাই মেয়েরা যখন রান্নাবান্না করে তখন খানিকটা সময় কাটাই তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে, আর খানিকটা সময় কাটাই যেখানে সবাই খাবার জন্য পাত পাড়ে সেখানে। টোডা মেয়েরা যে সপ্রতিভ আর বিদেশীকে ঘরে টানতে জানে সে কথা আগেই বলেছি। কাজেই আমার মস্ত একটি সুবিধা হয়ে গেছে। আহারের যোগাড় থেকে আরম্ভ করে সব কিছু প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি।

সেদিন অঙুডের ঘরে গিয়েছি। তার ছেলের বৌ তখন রান্নার যোগাড় করছে। ভাতই প্রধান খাদ্য; দেখি একটা হাঁড়িতে ঘোল দিয়ে আগুনে চাপান হয়েছে।

—কি হ'বে গো?

—ভাত, ঘোলে সিদ্ধ হ'চ্ছে।

টোডারা প্রায়ই ঘোল দিয়ে ভাত রাঁধে, এত ঘোল হয়। জলে যে না হয় তা নয়, তবে ঘোল থাকলে জলে রান্না করা হয় না, বর্ষাকালে ঘাসের প্রাচুর্যে মোষের দুধের পরিমাণ বেড়ে যায়। তখন প্রায় সব মাণ্ডের লোকেরাই ভাত রাঁধতে জলের বদলে ঘোল ব্যবহার করে।

তরিতরকারি রাঁধাতে দক্ষিণ ভারতীয় প্রভাব আছে। তেঁতুল বা ঘোল মিশানো হয় তরকারিতে, চাটনিও হয়। রান্না কিন্তু তেলে হয় না, হয় ঘী-মাখনে। মাংসের স্থান নেই টোডা আহারে। খাদ্য হল ঘোল দিয়ে রাঁধা ভাত, সম্বর চাটনি আর তার সঙ্গে খানিকটা মাখন। কখনও বা ঘোল বা টক দিয়ে রাঁধা খানিকটা তরকারি।

উবগারের ঘরে গেলুম সেদিন খাবার সময়, উবগার আর তার বৌয়ের আমন্ত্রণে আমিও বসে পড়লুম। উবগারের এক ছেলে, ছোট নাতনী আর উবগার খেতে বসেছে; বৌ করছে পরিবেশন, ঘোলে রাঁধা ভাত দেওয়া হল থালাতে। ভাতের মাঝখানে একটি বড় রকমের চালু জায়গা করে উবগারের বৌ মাখনের চুঙি থেকে মাখন নিয়ে ঢালু জায়গাটা ভর্তি করে দিতে লাগল। মাখন না যেন ডাল দেওয়া হচ্ছে!

—এত মাখন!

—এত আর কোথায়? ছেলেপুলেরা এখন আর সে রকম মাখন পায় না। ছেলেবেলায় আমরা রোজ ছোট এক চুঙি করে মাখন খেতুম এক একজনে। তখন মাখন খাবার কোন সীমা ছিল না। যত পার তত খাও। এক ছোট চুঙি মাখন মানে আট আউন্স মাখন।

মাখনের পরে এল সম্বর আর তরকারি। এক গ্লাস জল চাইলুম খেতে। জল দেওয়া হ'ল।

উবগার বল্ল, আমরা কিন্তু জল খাই না, খাই ঘোল।

সত্যিই তাই। ভাত খাবার পর সবাইকে এক গ্লাস করে ঘোল দেওয়া হ'ল। বাঁধাধরা নিয়ম। দুবেলাই খাওয়া শেষ হ'লে সবাই এক গ্লাস করে ঘোল খায়। ঘোল আর মাখন ছাড়া মুখে ভাত তুলতে পারে না টোডারা। দৈনিক দু' গ্লাস কফি আর দু' গ্লাস ঘোল খাবার জন্য জল খাবার প্রয়োজনীয়তাটা বোধ করে না তারা। নীলগিরির ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় তাই যথেষ্ট।

মাখনের কথা বলছিলুম। ভারতের বহু জায়গায় ঘুরেছি খাবারের রীতি-নীতি আর খাদ্যের উৎকর্ষের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজে। কোথাও এত মাখন খেতে দেখিনি। এত কেন, জনসাধারণ হয়তো জীবনে দু'চারবারের বেশী মাখন আস্বাদনই করেনি। পৃথিবীর খুব কম দেশই আছে যেখানকার লোক খাবারের জন্য এতটা মাখন যোগাড় করতে পারে। মাখন খাওয়ার প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর সমস্ত জাতির ভিতর একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিতে পারে এরা।

একদিন উবগার একটি নতুন বস্তু দিল খেতে। সমাই নামে মিলেট জাতীয় শস্য থেকে তৈরী—ঘী জবজবে। তাতে একটা তাতান সরের গন্ধ। মুখে দিতেই মনে হ'ল স্বর্গপুরীর অমৃত।

—কি করে তৈরী হ'ল?

—জান তো মাখন গালিয়ে ঘী করি আমরা ঘরে। মাখন গালাবার আগে তার সঙ্গে খানিকটা সমাইয়ের চাল মিশিয়ে দিই। মাখনের সঙ্গে সব সময় কিছু ঘোল থাকে। মাখন গলে উপরে ভেসে উঠলে সমাই-চাল অল্প ঘোলে সিদ্ধ হ'তে থাকে। অল্প ঘোলে সিদ্ধ সমাই চালের সঙ্গে মেশে খানিকটা ঘী আর মাখনের তলানী। উপরে ভেসে ওঠা ঘী ভিন্ন করে রেখে দিলে যে জিনিসটা পাওয়া যায় তাই তোমাকে খেতে দিয়েছি। এটি আমাদের একটি প্রিয় খাদ্য, খুব খাওয়া হয়।

আর এক সন্ধ্যায় ইল্লিয়নের ঘরে গেলুম। ইল্লিয়নের বৌ সান্ধ্যভোজের আয়োজন করছে তখন।

—আজ কি হবে গো?

—ছাতু, খাবে?

—মন্দ কি?

ইল্লিয়নের একটি থালায় ছাতু মাখল ঘোল আর মাখন দিয়ে। একপাশে রাখল আরও খানিকটা মাখনের ডেলা, আর গুড়। তারপর আর একপাশে ঢেলে দিল গরম গরম তরকারি। সবশেষে এক গ্লাস ঘোল।

ইল্লিয়নের বৌ বল্ল, কি করে আমরা রাঁধি তা নিয়ে এত মাথা ঘামাও কেন বল তো? এত লিখালিখিই বা কেন?

—বাঃ লিখব না? তোমাদের রান্না জিনিস তো অমৃত, কলকাতা গেলে কোথা পাব বল? তাই লিখে নিচ্ছি বৌকে শিখাব বলে, আমার বৌর হাতে তোমাদের রান্না খাব।

ইল্লিয়নের বৌ হেসে গড়িয়ে পড়ল। ইল্লিয়নের মা-ও আমার কথা শুনে মহা খুশী।

বল্লুম, তবে একটা কথা। মাখন পাব কোথায় আমরা? আমাদের তো মোষ নেই।

ইল্লিয়ন ঘরের দাওয়ায় বসে কি করছিল। বল্ল, তা ভেব না, আমি একটি মোষ দেব তোমাকে।

উবগার, অঙুড আর আরও জনতিনেক কর্তাগোছের লোক ছিল কাছাকাছি। তারা সবাই আমাকে একটি করে মোষ দিতে চাইল। দেখলুম চাঁদা করে যে ক'টি মোষ পাওয়া যায় তার সংখ্যা ছ'টির কম নয়।

—কিন্তু কলকাতাতে ভাই তোমাদের মত ঘাসের জমি নেই। তাই তাও নিয়ে যেতে হয় সঙ্গে করে।

সবাই হেসে উঠল। সময়বিশেষে টোডা পুরুষেরাও মনের দরজা খুলে দিয়ে প্রাণভরে হাসতে পারে।

(ক্রমশঃ)

।। ব্রিটেনের একটি জনপ্রিয় হবি ।।

গরমের এক দুপুরে চলেছেন লন্ডনের রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ দেখলেন গাড়ির মাথায় নৌকা চাপিয়ে বা গাড়ির পিছনে চাকাওয়ালা নৌকা টেনে নিয়ে চলেছে বহু লোক। তারা যাচ্ছে নদীর ধারে। নদীর ধারে গিয়ে দেখা যাবে বাবা মা ছেলে মেয়ে সকলে মিলে পারিবারিক নৌকা চালাচ্ছে। ব্রিটেনে আজকাল নৌকা চালনা এক অতিশয় জনপ্রিয় হবি। এই ব্যাপারে মেয়েদের উৎসাহ পুরুষদের থেকে কিছুমাত্র কম নয়।

বর্তমানে ব্রিটেনের একজন নামকরা নৌকা ডিজাইনার হলেন ইয়ান প্রোকটর। যুদ্ধের সময় রাজকীয় বিমান বাহিনীর এই কর্মীর কাজ ছিল বিমান ও নৌ দুর্ঘটনায় পতিত বিপন্ন ব্যক্তিদের উদ্ধার করা। ১৯৬২ সালে লন্ডনের আর্লস কোর্টে আন্তর্জাতিক নৌকা প্রদর্শনীতে এঁর ডিজাইন অনুযায়ী নির্মিত ২৫টি নৌকা প্রদর্শিত হয়। এঁর কয়েকটি নৌকা চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেছে।

অনেক পরিবারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নৌকা চালাতে খুব উৎসাহী। বাজারে তাদের চালাবার উপযোগী বহু সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট নৌকা পাওয়া যায়। ফলে ছোট ছোট নৌকা তৈয়ারিও ব্রিটেনে একটি প্রধান শিল্পে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যবহারের জন্য আজকাল ব্রিটেনে অনেক পরিবারেই নৌকা নির্মাণের ও মেরামতের রেওয়াজ হয়েছে। যারা নিজে হাতে নৌকা নির্মাণ ও মেরামত করেন তাদের অবসর সময় আনন্দে তো কাটেই, উপরন্তু তারা একটি নতুন শিল্প সম্পর্কে দক্ষতা লাভ করছেন।

ইয়ান প্রোকটরের ডিজাইন অনুযায়ী নির্মিত 'গাল' ও 'ওয়েফেয়ারার' নামক নৌকা দুটি যথেষ্ট দ্রুত, আরামদায়ক ও নিরাপদ। এগুলির ওপর ক্যাম্প করে থাকা যায়, এমনকি প্রমোদভ্রমণ ও রেস দেওয়া উভয় কাজই চলে। মাত্র দুজন লোকদ্বারা স্বচ্ছন্দে চালনোপযোগী ওয়েফেয়ারারের মোট দৈর্ঘ্য হল ১৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। নৌকাটি বড় এবং খুবই মজবুত। ক্যাম্প করার সমস্ত সরঞ্জাম সমেত ছয়জন লোক আরামের সঙ্গে বসে যেতে পারে। চালানো সহজ এবং অতিশয় মজবুত বলে মেয়েরা এই নৌকাটি খুবই পছন্দ করে। এমনকি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এই নৌকা চালাতে পারে। গত গ্রীষ্মকালে একটি ওয়েফেয়ারার নৌকা স্কটল্যান্ড হতে যাত্রা করে ৩০০ মাইল দূরে নরওয়েতে গিয়ে পৌঁছায়।

১১ ফুট দীর্ঘ গাল নামক নৌকাটিও
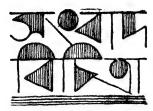
আর একটি বহুমুখী ও সর্বার্থসাধক নৌকা। এতে করে রিগাটা বা রেসে অংশ গ্রহণ করা চলে। এর ডিজাইন ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি এমনভাবে করা হয়েছে যাতে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ জলভাগের উপর দিয়েও স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে এগিয়ে যাওয়া যায়।

ইয়ান প্রোকটরের আর একটি নৌকা হল সিগনেট। এর দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ৫ ইঞ্চি। নৌকাটির ডিজাইনে ইয়ান প্রোকটরের নৌ-চালনা বিদ্যা, রেসিং ও নক্সা তৈয়ারির সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ এ্যামেচাররা নিজেরাই নির্মাণ করতে পারেন এবং তৈরী করার খরচও খুব কম।

১৪ ফুট দীর্ঘ গ্লাস ফাইবার নির্মিত 'বোসান' নামক নৌকাটিও একটি নতুন ধরণের উৎকৃষ্ট নৌকা।

।।তৃতীয় সোবিয়েত মহাকাশচারী।।

সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে লোকটি, তার নাম কেউ জানে না। ইনি হলেন গাগারিন, আর তিতোফের পর তৃতীয় সোবিয়েত মহাকাশচারী—যিনি শীঘ্রই মহাশূন্যোভিযানের ইতিহাসে আরেকটি নতুন অধ্যায় যোগ করবেন।

তিতোফের মহাকাশচারণ সম্পর্কে 'এগেন টু দি স্টারস' নামে যে তথ্যচিত্র দেখান হয়, সেই ছবিতে দর্শক-সাধারণ এঁকে মহাকাশযাত্রীর পোষাক আর শিরস্ত্রাণ পরা অবস্থায় তিতোফের মহাকাশযানে চাপার সময়ে তাঁর ঠিক পিছনেই একবার কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পান। যদি শেষ মুহূর্তে তিতোফ কোন কারণে অপারগ হতেন, তাহলে ইনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। তাছাড়া গাগারিন আর তিতোফের বইয়েও এঁর কথা আছে।

সম্প্রতি গেরমান তিতোফ তাঁর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে সাংবাদিকদের বলেন—তৃতীয় সোবিয়েত মহাকাশযাত্রী মহাশূন্যাভিযানের জন্যে প্রস্তুত।

কিন্তু আপাততঃ অজ্ঞাতনামা এই বীরকে সম্বোধন করে অসংখ্য সোবিয়েত নাগরিক বিশেষতঃ তরুণরা—দৈনিক চিঠি লেখেন এবং সেসব চিঠি তিনি পান, এইসব চিঠির ঠিকানা : "৩ নং মহাকাশচারী, মস্কো"। কলম দিয়ে মহাশূন্যে সফরের কালে তিনি নোট লিখবেন বলে গত সপ্তাহে লেনিনগ্রাদের এক ফাউন্টেন পেন তৈরীর কারখানার শ্রমিকরা খুব হালকা আর মজবুত এক বিশেষ ধরণের কলম তৈরী করে ও ঠিকানায় উপহার পাঠান। উপহারটি যথাস্থানে পৌঁছেচে বলে জানান হয়েছে।

শীঘ্রই হয়ত আমরা এই অসীম সাহসী মানুষটির পরিচয় জানতে পারব।

।। জার্মাণীর একটি চিড়িয়াখানা ।।

পশ্চিম জার্মাণীর হামবুর্গ শহরে এলে সবাই একবার কার্ল হাগেনবেকের চিড়িয়াখানা ঘুরে আসবেই এমনি এর প্রসিদ্ধি। বিরাট এর এলাকা। বছর বছর নতুন নতুন জীবজন্তু এখানে আসে। কার্ল হাগেনবেক কোম্পানীর শিকারী প্রাণীতত্ত্ববিদ ও দালালরা পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সেইসব পশুপাখী ধরে অথবা কিনে আনে। আলাস্কার ভাল্লুক, জাপানের ফ্লেমিংগো, দক্ষিণ আফ্রিকার বন্য পশু, গ্রীষ্মদেশের অজগর সাপ সব দেখতে পাওয়া যায় এখানে। জীবজন্তু এখানকার খোলা পার্কে স্ব-স্ব পরিবেশে ঘুরে বেড়ায়। এমনকি পেঙ্গুইন, ওয়ালরাস মায় একশৃঙ্গী ভারতীয় অশ্ব যাকে বলা হয় ইউনিকর্ণ—তাও এখানে আছে। এই একটি ইউনিকর্ণের দাম ৬৪,০০০ জার্মাণ মার্ক। এছাড়া রয়েছে ময়ূর, বন্য মোরগ, অদ্ভুত আকৃতির খরগোস, উটপাখী, অ্যানটিলোপ, হাতী, দৈত্যাকৃতি কচ্ছপ, গিরগিটি, টিকটিকি, বিষাক্ত মাকড়শা ও নানা জাতের সাপ। এই চিড়িয়াখানার নামের সঙ্গে কার্ল হাগেনবেকের স্মৃতি জড়িত। ১৮৪৪ সালে হামবুর্গে তাঁর জন্ম। প্রথমে সেখানে একটি পশুপাখির দোকান খোলেন—তারপর খোলেন একটি সার্কাস-এর দল। ১৯০৭ সালে "স্টেলিঙ্গেন-এ কার্ল হাগেনবেক" চিড়িয়াখানাটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটি এতবড় যে পায়ে হেঁটে দেখলে পাঁচ মাইল ঘুরতে হবে।

এই বিরাট পশুশালাটি আজও বেসরকারী সম্পত্তি। সরকার থেকে এক পয়সা সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। এর সমস্ত দেখাশোনা ও পশুপাখীদের খাই-খরচ চালায় হাগেনবেকের নাতি-নাতনীর দল। জীব-জন্তুর প্রতি বছর আহার যোগাতে লাগে ১,৭০,০০০ কিলো শস্য, ৩০,০০০ কিলো আলু, ২,৫০,০০০ কিলো শাক-সব্জী, ৭৫,০০০ কিলো মাছ, ২,০০,০০০ কিলো খড়, ১,০০,০০০ কিলো ফল-মূল, এবং ৮০০ কিলো সূর্যমুখী ফুলের বীজ। মোটকথা এমন সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে এতো হরেকরকম পশুপাখী একত্রে পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮
SADHANA AUSADHALAYA
Dacca (Bengal)
Maha Bhringaraj
Taila
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। বার ।।

মানুষের জীবনকে যদি দীর্ঘপথের সঙ্গে তুলনা করা যায়, সেই সঙ্গে একথাও মেনে নিতে হবে, সে পথ জ্যামিতিক সরলরেখা নয়। সেখানে অনেক বাঁক, অনেক মোড়। শুধু তাই নয়। সে পথ কখনো সমতল কখনো বন্ধুর। তার দুধারে যে দৃশ্যপট, সেও কখনো শ্যামল, কখনো ঊষর, কোথাও শস্য-সমৃদ্ধ প্রান্তর, কোথাও রুক্ষ, রিক্ত বন্ধ্যাভূমি। পথের বাঁকে বাঁকে একটি করে তোরণ। তার এ পারের সঙ্গে ও পারের মিল নেই। যেন দুটি আলাদা রাজ্য, আলাদা জগৎ। একটা স্তর পেরিয়ে আর একটা স্তরে প্রবেশ। আত্মভোলা শৈশবের পর সদ্যোজাগ্রত কৈশোর। তারপর সহসা মোড় ফিরে শৈশবের প্রাণচঞ্চল যৌবনের স্বর্ণ-দ্বার পার হয়ে পথ চলে যায় নির্লিপ্ত ধূসর বার্ধক্যের পানে।

একদা শুভক্ষণে দিলীপ এসে দাঁড়াল সেই স্বর্ণ তোরণের দ্বারপ্রান্তে। তার দুচোখ ভরা 'একুশ বছর'-এর স্বপ্ন। এতদিন যে জগতে, যে গণ্ডির মধ্যে তার দিন কেটেছে—এই প্রেস, মেডিক্যাল কলেজ, বন্ধু-বান্ধব, মাষ্টার মশাই এবং সকলের অন্তরালে ফল্গু-ধারার মত বহমানা বেদনাময় মাতৃস্মৃতি—সেইটুকু যেন যথেষ্ট নয়। সেই সংকীর্ণ সীমানায় তার সবখানি আর ধরছে না। তার বাইরে যে জগৎ, যার সম্বন্ধে এতকাল তার কোনো কৌতূহল ছিল না, যার জন্যে কোনো অভাব কখনো বোধ করেনি, সে আজ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে কিসের এক অপূর্ণতার বেদনা থেকে থেকে তার চেতনাকে চঞ্চল করে তুলছে। মনে মনে শঙ্কিত হল দিলীপ। এ তার কী হল? এই স্বপ্নবিলাস তো তাকে মানায় না। ঐশ্বর্যের অধিকার নিয়ে সে জন্মায়নি। কঠোর কঠিন বাস্তবের পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তার মত নিঃস্ব, রিক্ত, স্বজন-বান্ধবহীন হতভাগ্যের জীবনে এগুলো শুধু বাধা, শুধু অবাঞ্ছিত উপদ্রব। এই মোহপাশ তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে।

এই সংকল্প নিয়ে তার বর্তমান জীবনযাত্রার দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করল। প্রেস-এর কাজে এতদিন যে সময়টা দিয়ে এসেছে, তার উপরে আরো একঘণ্টা জুড়ে দিল। বাড়িয়ে দিল ল্যাবরেটরীর দৈনন্দিন কাটা-ছেঁড়ার পালা। কংকাল আর কেতাবের শুকনো জগৎটাকে আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরল। তাতে যখন মন বসতে চাইত না, কিংবা করবার মত আর কোনো কাজ খুঁজে পেত না, তখন কিছুক্ষণের জন্যে বসত গিয়ে মাষ্টারমশাই-এর কাছে, কখনো বা ছেলেদের আড্ডায়। চারদিকে এত করে আঁটঘাট বেঁধেও কিন্তু জানতে পারল না, হাতের কাছেই একটি রন্ধ্র রয়ে গেছে। জানা যায় না। আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন জানতে পারেনি। দিলীপও বুঝতে পারেনি, টেবিলের উপরকার ঐ নিরীহ জানলাটাই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর,—জেনেও ঐ জানালাটাকে সে বন্ধ করে দিল না। প্রতি মানুষের মত তার মধ্যেও যে দুটি মানুষ বাস করে, তার একজন হাত বাড়ালেও আর একজন এসে সেই হাত চেপে ধরল। একজন বলল, 'ওখানে কোনো কল্যাণ নেই', 'কিন্তু সুখ আছে' —উত্তর দিল দ্বিতীয় জন।

—'সুখের চেয়ে অনেক বেশী বেদনা।'

—'হোক; তবু ভালো লাগে।'

বর্ষা বিদায় নিয়েছে, শরৎ এখনো পুরোপুরি এসে আসর জমিয়ে বসেনি। মেঘের গতি মন্থর, দেহ নবনী-শুভ্র। তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিয়েছে সদ্যঃস্নাত আকাশের গাঢ় নীলাঞ্চল। চারদিকে ঝলমল করছে মেঘমুক্ত রোদ। মন আপনিই উদাস হয়ে ওঠে, কাজের বন্ধন, আর অক্ষরের বাঁধ পেরিয়ে উধাও হয়ে যেতে চায়। দিলীপ তার ঘরে বসে পড়ছিল। একটা জটিল জিনিসের মধ্যে নিবিষ্ট হবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল সামনেকার খোলা জানালায়। গলির ওপারে খোলা ছাদের রেলিং-এর পাশে, তার মুখোমুখী এসে যে দাঁড়াল, তারও পরনে নীল শাড়ী। মনে হল এক মুঠো আকাশই যেন মেঘলোক থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে তার চোখের উপর। যে-দুটি আঁখিপল্লব পলকের তরে খুলে গিয়েছিল চকিতে তখনই আবার ঢাকা পড়ে গেছে, সেখানেও দেখা গেল নীলাঞ্জন রেখা। দিলীপ চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। ক্ষণকাল পরে যখন তুলল, ওপারে তখনো কাপড় শুকোতে দেবার সংক্ষিপ্ত কাজটুকু শেষ হয়নি। হয়তো এই মাত্র তার স্নান সারা হয়েছে। একরাশ ভিজে চুলের গোছা ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের উপর। একটুখানি নুয়ে পড়ে ছড়িয়ে দেওয়া ডুরে শাড়ির একটা কোন বেঁধে দিচ্ছে রেলিং-এর শিকের সঙ্গে। বাঁধতে বাঁধতেই সহসা কি মনে করে চোখ দুটি আবার পাঠিয়ে দিল এপারের খোলা জানালায়। কে জানে, কেন? কী

ছিল সেই চোখে? শুধু কৌতূহল? না, তার সংগে—

পেছন থেকে দুখানা হাত হঠাৎ বেরিয়ে এসে জানালাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল। দিলীপ চমকে উঠে ফিরে তাকাল, এবং সংগে সংগে চোখ নামিয়ে নিল, যেন কোনো গোপন অপরাধ হাতে হাতে ধরা পড়ে গেছে। মকবুলের চোখে বিরক্তির ভ্রূকুটি। কপাল কুঞ্চিত করে বলল, মেয়েটা কে রে?

—জানি না।

—আমি জানি।

—কে বলতো? সাগ্রহে চোখ তুলল দিলীপ।

—ওকে চিনি না, তবে ঐ জাতটাকে চিনি।

দৃঢ় গম্ভীর স্বর, মুখের উপর যেন কোন দূরাগত আক্রোশের ছায়া। দিলীপ নিঃশব্দে চেয়ে রইল। সেই বর্ডালের মকবুলকে মনে পড়ল। বুঝল, এতগুলো বছর পার হয়ে এসেও সে এক-তিল বদলায়নি। ব্যাপারটাকে একটু লঘু করে দেবার উদ্দেশ্যেই বোধহয় মৃদু হেসে বলল, তুমি দেখছি আজও তেমনি ছেলেমানুষ রয়ে গেছ।

—ছেলেমানুষ! গভীর বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়াল মকবুল।

—তা বৈ কি? একজনকে দিয়ে তুমি গোটা জাতের বিচার করবে!

—একটা ভাত টিপলেই গোটা হাঁড়ির খবর পাওয়া যায়।

—ও সব মেয়েলী উপমা। ওতে কিছুই প্রমাণ হয় না। তাছাড়া, সেই একজনকেও হয়তো তুমি ভুল বুঝে বসে আছ। শেষদিকে সে যা বলেছিল, যা করেছিল নিশ্চয়ই কোনো চাপে পড়ে; ইচ্ছে করে করেনি। জানো না, ওরা কত অসহায়?

—জানি। তার চেয়েও অসহায় আমরা। একটা চাওনির ভার সইতে পারি না। ফিক্ করে একটু হাসল তো কথাই নেই। সংগে সংগে ঢলে পড়লাম। না, দিলীপ, আমি যতক্ষণ আছি ঐ ফাঁদে তোকে পা দিতে দেবো না। তোর জীবনটা এত খেলো নয়। তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে না।

শেষ হবার পরেও মকবুলের শেষের কথাগুলো যেন ঘরময় গমগম করে বেড়াতে লাগল। দিলীপ মাথা নত করে পলকহীন দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে চোখ তুলে বলল, তোমার কোনো ভয় নেই। আমি ঠিক আছি।

এতক্ষণে মকবুলের মুখে প্রসন্নতার আভাস দেখা দিল। হেসে বলল, এই দ্যাখো, যে জন্যে এসেছিলাম, তাই ভুলে গেছি। মাষ্টারমশাই তোকে একবার ডাকছেন।

—কেন, বল দিকিনি।

এ ফাঁদে তোকে পা দিতে দেবো না

—কে একজন ভদ্দরলোক এসেছেন। তোর সংগে বোধহয় আলাপ করিয়ে দিতে চান।

—কে ভদ্দরলোক?

—অত সব জানিনে, বাপু। ডাকছেন, চল।

দিলীপ বই বন্ধ করে উঠে পড়ল।

ওদিকে গলির ওপারকার রেলিং ঘেরা ছাদের পাশে দুটি কালো চোখের তারায় যে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ল, তার খবর এরা কেউ জানল না। তার একটা তীক্ষ্ণ শিখা শুধু ছুটে এসে আছড়ে পড়ল এদিকের রুদ্ধ জানালার গায়। এ কোন্ দেশী ভদ্রতা? অমনি করে তার মুখের উপর কপাট দুটো বন্ধ না করলে বুঝি পড়ার ব্যাঘাত হত? ভারী তো পড়া! পড়ার নাম করে একটা মড়ার মাথার খুলি আর কতগুলো হাড়গোড় নিয়ে খেলা করা। তার দায় পড়েছে সেদিকে তাকাতে। ওগুলো দেখলেই তার গা ঘিনঘিন করে। যারা ডাক্তারি পড়ে তাদের সে দুচক্ষে দেখতে পারে না।

ঠোঁট উলটে এমনি একটা অবজ্ঞার কটাক্ষ কপাটের উপর ছুঁড়ে দিয়ে তাচ্ছিল্য-ভরে চলে যাচ্ছিল ছাদ-বিহারিণী। হঠাৎ কী মনে করে থমকে দাঁড়াল। বন্ধ জানালার দিকে চেয়ে চোখদুটো যেন জ্বলে উঠল। না, না, এ শুধু অভদ্রতা নয়, এ অপমান! কিন্তু

কেন? কিসের জন্যে এ অপমান? কী করেছে সে? কথাগুলো মনে মনে বলতে গিয়েও গলাটা ধরে এল। এই মাত্র যে-চোখে ছিল আগুন, এক নিমেষে তারই ভিতরে দেখা দিল জলের আভাস। অর্থহীন অভিমানে ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে উঠল। দুম দাম করে পা ফেলে তখনই সে নীচে চলে গেল এবং নিজের ঘরে ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল।

পরদিন এই সময়ে আবার তাকে দেখা গেল ছাতের উপর। পিঠময় এলিয়ে পড়া ভিজে চুল, হাতে নিংড়ানো ভিজে শাড়ি। আজ আর এদিকে নয়, সিঁড়ি-দরজার ভিতর দিয়ে বেরিয়েই দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ঐ দিকে। রেলিং-এর উপর দিয়ে কাপড়খানা নীচে ছড়িয়ে দিয়ে, আঁচলের একটা ধার কোনো রকমে শিকের সঙ্গে বেঁধে, তাড়াতাড়ি নেমে চলে গেল, যেন কত কাজ পড়ে আছে সেখানে। একবার এদিকে ফিরেও তাকাল না। তাকালে দেখতে পেত সেই জানালাটি আজ খুলে গেছে। আরো দেখতে পেত, তার পাশে যে-মানুষটি বসে আছে, তার দুচোখ-ভরা ভীরু প্রতীক্ষা। তার পরেই নেমে এল নৈরাশ্যের অন্ধকার। এতক্ষণ তার দৃষ্টি ছিল কখনো বই-এর পাতায়, কখনো জানালার বাইরে। এবার সে সোজা হয়ে বসে একটানা চেয়ে রইল শূন্য ছাদের দিকে। এ কী হল! কী অপরাধ করল সে, যার জন্যে এই দিক-বদল! এদিকের রেলিংটাই বা কী দোষ করল যে, কাপড় শুকোতে দেবার এই সামান্য কাজটাও সেখানে চলতে পারে না? এতদিন যে চলছিল? আকাশ-পাতাল ভেবে সারা হল দিলীপ। কিন্তু একটা কথা তার মাথায় কিছুতেই ঢুকল না—অপরাধ সে করেনি, করেছে তার জানালার ঐ পাল্লা-দুটো, বড় অসময়ে বন্ধ হয়ে গিয়ে। একজনের অপরাধের ফল আরেকজনকে ভুগতে হয়—এ দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নয়। 'দশাননো হরেৎ সীতা, বন্ধনং স্যাৎ মহাদধেঃ।' সীতা-হরণ করল রাবণ, তার জন্যে বাঁধা পড়ল মহাসাগর। হিতোপদেশ পড়া থাকলেও এ রকম একটা সম্ভাবনা দিলীপের মনে এল না। মানুষ বড় আত্মসার। সে শুধু নিজের দিকটা দেখে, নিজের কথা ভাবে। আমি কি করলাম। কিছু না করেও যে অনেক কিছুর জন্যে দায়ী হতে হয়, সেটুকু সংসার-জ্ঞান তখনো তার হয়নি।

অনেকক্ষণ ঐ দিকে চেয়ে চেয়ে চিন্তাটা অন্য-পথে মোড় নিল। মনে হল, যে কারণেই হোক, ওর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো শুভ ইঙ্গিত আছে। কিছুদিন থেকে, থেকে থেকে নিজেকে সে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলছিল। মা কাজে মা পড়াশুনায়—কোথাও ঠিক মন বসাতে পারছিল না। কতদিন এইখানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে, একটি পাতা পড়া হয়নি। সারা মন একাগ্র হয়ে অপেক্ষা করেছে ঐ ছাতের পার্শটিকে, কখন ঘটবে সেই রমণীয় আবির্ভাব, অন্তর-দুয়ারে কখন শোনা যাবে সেই নিত্যপ্রত্যাশিত লঘু চরণ-ধ্বনি। সে এসেছে, চলে গেছে, যাবার আগে ফেলে গেছে একটি ক্ষণিকের চকিত দৃষ্টি। সেইটুকু সম্বল করে কৃপণের ধনের মত নাড়া-চাড়া করে সমস্ত সকালটা সে কাটিয়ে দিয়েছে। কখনো বা ঐ নিঃশব্দচারিণীকে আশ্রয় করে একটির পর একটি স্বপ্নের জাল বুনে বুনে চলেছে, শূন্যের উপর রচনা করেছে প্রাসাদের পর প্রাসাদ।

তারপর সহসা এক সময়ে এই মূঢ়তা তার নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেছে। নিজের সম্বন্ধে দিলীপ চিরদিন অতি-সচেতন, নিজের পরিধি সম্বন্ধে অতি-সজাগ। বাইরের পৃথিবীর কাছে কী তার পরিচয়, তা সে ভালোভাবেই জানে, সেই সঙ্গে একথাও জানে, জ্ঞান ফুটবার আগেই যে মসি-লাঞ্ছিত ললাটলিপি সম্বল করে সে সংসারের পথে পা দিয়েছে, সমাজের প্রখর দৃষ্টি শুধু সেই দিকেই চিরনিবদ্ধ! নিজের শক্তি ও চেষ্টা তাকে যেখানেই নিয়ে যাক, কেবলমাত্র ঐ রেখাটাই হবে তার মূল্যায়নের মাপ-কাঠি। সুতরাং জানালার ওপারে ঐ রাজ্যটি তার নিষিদ্ধ জগৎ। ওখানে তার প্রবেশের অধিকার নেই। ওখানকার আকাশে যে আলোক-রশ্মি তাকে টানছে, তার কাছে সে আলেয়ার আলো। একটি মনোহর বিভ্রম, বিপথে নিয়ে যাবার মধুর সঙ্কেত। ঐ কিশোরী মৃগনয়না অন্যের কাছে যত সত্যই হোক, তার কাছে শুধু মোহ-সঞ্চারী মায়ামৃগ। যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যে অপ্রাপনীয়, তাকে ঘিরে কী লাভ এই স্বপ্ন রচনায়?

সুতরাং এ ভালোই হল। ও যে আপনা থেকেই সরে গেছে, ধীরে ধীরে যে-মোহজাল বিস্তার করে তার দিকে এগিয়ে এসেছিল, নিজে থেকেই সেটা গুটিয়ে নিয়ে তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে, এ জন্যে তার কোনো ক্ষোভ নেই। বরং মনে মনে সে সত্যিই কৃতজ্ঞ। এবার সে নির্বিবাদে নিশ্চিন্ত মনে তার কাজ করে যাবে। ঠিকই বলেছে মকবুল। কঠিন কঠোর মাটির পথ ধরে তাকে এগোতে হবে। সেখানে আকাশ-কুসুমের স্থান নেই।

গা ঝাড়া দিয়ে নড়ে চড়ে শক্ত হয়ে বসল দিলীপ। অনেকখানি হালকা মনে হল নিজেকে। সারা দেহ থেকে যেন একটা শক্ত বাঁধন খুলে পড়ে গেছে। আকাশ-জোড়া অলস কল্পনার জগৎ থেকে বিক্ষিপ্ত মনটাকে কুড়িয়ে এনে অ্যানাটমির অতিবাস্তব সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে বন্ধ করবার চেষ্টা করল। সে মেডিক্যাল স্টুডেন্ট্। মানুষের মনের অদৃশ্য গোপন সূক্ষ্ম অলি-গলির গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে তার কী লাভ? তার চেয়ে সত্যিকার উপকার হবে যদি মানুষের এই দেহটার মধ্যে অস্থি, মজ্জা, শিরা-উপশিরার যে প্রকাশ্য অথচ দুর্বোধ্য জটাজাল জড়িয়ে আছে, তার সন্ধান পাওয়া যায়। একটা মেয়ের একদিনের সামান্য একটা খেয়ালের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা না করে, হাজার হাজার মেয়ে চির-দিন যে অসংখ্য দৈহিক যন্ত্রণায় ভুগে ভুগে মরে তার যে-কোনো একটির কারণ নির্ণয় করতে পারলে ঢের বেশী কাজ হবে।

ঘণ্টাখানেক নিবিষ্ট মনে পাঠাভ্যাস-প্রয়াসের পর দিলীপ হঠাৎ আবিষ্কার করল, বিশাল গ্রন্থের যে নতুন অধ্যায়টি শুরু করেছিল, তার প্রথম পাতা কোনো রকমে পার হয়ে দ্বিতীয় পাতায় এসে সে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে। বৃহত্তর নারী সমাজের ব্যাধিমুক্তির দুর্ভাবনা ঠেলে ফেলে দিয়ে, একটিমাত্র নিটোল-স্বাস্থ্য কিশোরী মেয়ের সেই তুচ্ছ 'খেয়ালটাই' তার ডাক্তারি-চিন্তার সব পথ জুড়ে বসে আছে। ঘুরে ঘুরে কেবলই মনে হচ্ছে, একটা দিনের মধ্যে কী কারণ ঘটল, যার জন্যে কাপড় শুকোবার এই এত দিনের পুরনো জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে তাকে অন্য দিকে সরে যেতে হল। বেশ, যাক; কিন্তু ক্ষণেকের তরে একটিবার এদিক পানে তাকালে কী দোষ হত? যাবার সময় সেই আশা নিয়েই দিলীপ এক দৃষ্টে চেয়েছিল, কিন্তু পলকের জন্যে মুখের একটা দিক ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়েনি। যেটুকু দেখা গেল, সবটাই যেন কেমন থমথমে, ভার-ভার। সে মুখ নয়, প্রতি প্রভাতে প্রথম সূর্যালোকের সজীব প্রসন্নতা দিয়ে যে এসে তার বিগত রাত্রির সব মালিন্য মুছে নেয়। এ অন্য মুখ—বিষণ্ণ, ম্লান, হয়তো

কোনো আহত অভিমানে ক্ষুব্ধ। কার উপরে, কিসের জন্যে অভিমান, দিলীপ অনুমান করতে পারল না। কিন্তু নিমেষের তরে দেখা সেই ক্ষোভক্লিষ্ট মুখখানা অ্যানাটমির শুষ্ক আবরণ ভেদ করে বারংবার তার চোখের উপর ভেসে উঠতে লাগল।

।।তের।।

'শহরতলী' কথাটার ধাতুগত অর্থ যা-ই হোক, আসল অর্থ 'শহরের তাঁবেদার'। তার মুখ্য কাজ শহরের অসংখ্য প্রয়োজনের যোগান দেওয়া। তার বুক জুড়ে এত যে আকাশচুম্বী চিমনি-ওয়ালা কল-কারখানার সমারোহ, তাদের মালিক থাকেন শহরে, এবং যে-সম্পদ সেখানে তৈরী হয় তাও ভোগ করে শহরের মানুষ। এখানকার মানুষ যে কিছুই পায় না, তা নয়। পায় ওদের ঐ অজস্রধারায় উগ্‌রে-ফেলা ধোঁয়া আর কালি। আর একটা মূল্যবান পদার্থ এদের ভাগে পড়ে—একরাশ খোলা ও খাপরার জঞ্জাল, তার ভিতরে আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে কিল্‌বিল করছে একপাল কুলী, রাজনীতির খাতায় যাদের নতুন দেওয়া ছদ্মনাম—মজদুর বা মেহনতী মানুষ। তাছাড়া মানুষে পদবাচ্য আর যারা এখানে থাকে, তাদেরও বলা যেতে পারে শহর-জীবনের ফ্যাকড়া। শহরকে আশ্রয় করেই তাদের অস্তিত্ব। ভোর হতে না হতেই দলে দলে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই দিকেই এরা ছুটতে শুরু করে, আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে তেমনি পঙ্গপালের মত ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। বিচিত্রবেশী মিছিল। কারো হাতে কলম, কারো কাঁধে গাঁইতি, কারো মাথায় ঝাঁকা। কেউ বাবু, কেউ মিস্ত্রী, কেউ ফেরিওয়ালা। বৃত্তি বিভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য এক—শহরের তাঁবেদারি, তার জীবনধারাকে সচল ও সবল রাখা, তার বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিপোষণ।

কিন্তু পরিপুষ্টির একটা সীমা আছে। সেটা যখন পেরিয়ে যায়, তখন সে ব্যাধি। প্রাণধারণের জন্যেই ভোজন, কিন্তু আকণ্ঠ-ভোজনে সেই প্রাণ নিয়ে টানা-টানি। শহরের বেলাতেও তাই। জীবন-যাত্রার উপকরণ বাড়তে বাড়তে এমন এক স্তরে তাকে নিয়ে যায়, যেখানে জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন যে-নিঃশ্বাস-বায়ু, তারই জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে। কোলকাতারও একদিন সেই অবস্থা দেখা দিল। একদিকে 'ইঁটের পরে ইঁট', আরেক দিকে মানুষের পর মানুষ—

দুদিক থেকে দুটো ফুসফুস চেপে ধরেছে। 'সিটি অব প্যালেসেস' এই গর্বে এককালে যার মাটিতে পা পড়ত না, সেই তখন হাঁসফাঁস করছে—কোথায় যাবে, কোথায় গিয়ে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

দেখা গেল, তার সব আছে—ধনবল, জনবল, ভোগ্য বস্তুর বিপুল সম্ভার,—অভাব শুধু ঐ এক জায়গায়, হাঁপ ছাড়বার মত একটুখানি ফাঁকা। নিছক বেঁচে থাকবার তাগিদে ঐটিই তখন তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। কে মেটাবে সেই প্রয়োজন? শহরতলী—তার সব চাহিদা মেটানোই যার একমাত্র দায়। এবার আর কল-কারখানা নয়, শুধু খানিকটা খোলা জমি, যেখান থেকে আসবে তার অক্সিজেন, তার প্রাণ-বায়ু। খোঁজ পড়ল, কোথায় আছে সেই জায়গা? উত্তরে হাত দেবার উপায় নেই। সেখানে বিরাট বিরাট কারখানা ফাঁদিয়ে এক-একটা রাজ্য জুড়ে বসে আছেন এ যুগের দুর্যোধন, চেঙ্গিস খাঁ, নাদির শাহের দল। সেখানকার 'সূচ্যগ্র মেদিনী'ও 'বিনাযুদ্ধে' পাবার কথা ভাবা যায় না। যুদ্ধ করতে গেলে তাদেরই জয় অনিবার্য। পশ্চিমে গঙ্গা, তার ওপারেও ঐ একই ইতিহাস। দক্ষিণে খানিকটা ফাঁক পাওয়া গেল,—কতগুলো খানাখন্দ, পড়ো ডোবা, পাঁক, দাম আর মশকবাহিনীর স্থায়ী আস্তানা, ঢাকুরিয়া এবং তার আশে-পাশের লোকগুলো যাদের দাপটে বছরের ছ'মাস কাঁথা মুড়ি দিয়ে হিহি করে কাঁপে। তারই উপর কোদাল চালিয়ে সব মিলিয়ে একটা ভদ্রগোছের জলাশয়ের আকার দেওয়া হল। পৌর-কর্তারা তার পোষাকী নাম দিলেন 'লেক'। স্বরাজোত্তর যুগে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের রবীন্দ্রভক্ত চেয়ারম্যান তার আবার নতুন নামকরণ করেছেন—'রবীন্দ্র-সরোবর'।

কিন্তু এ আর কতটুকু! এতবড় শহরের রাক্ষুসে প্রয়োজনের সিকিভাগও ঐ পুকুরটাতে মিটল না—হলই বা তার নাম রবীন্দ্র-সরোবর। তখন নজর পড়ল পুব দিকে—শেয়ালদ স্টেশন ছাড়িয়ে বেলেঘাটার বিস্তৃত এলাকা। সেখানে কল-কারখানা নেই, শুধু বস্তির পর বস্তি। তারও তো মালিক আছে। তারা সহজেই রাজী হয়ে গেল। দুটাকা চারটাকা ভাড়া আদায়ের ঝামেলা অনেক। তার চেয়ে একসঙ্গে মোটা হাতে দাঁও মারাই খেলো, টিন আর খাপরার কুঁড়ে ভেঙে দিয়ে আর একটা লেক, আর তার চারদিক ঘিরে বসতি পত্তনের আয়োজন করলেন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট। বস্তির ঘরে ঘরে গিজ-গিজ করছে লোক—কারখানার মজদুর নয়, ছানা-পোনাওয়ালা গৃহস্থ। তাদের উপর হুকুম হল—উঠে যাও। কোথায় যাবে? সে প্রশ্নের জবাব দেবার দায় জমিদার বা সরকার কারো নয়। যাও, যেখানে খুশি।

তাদের কথাই বলছিল গোকুল দাস। মাথা থেকে প্রায় খালি, হালকা ঝাঁকাটা নামিয়ে রেখে রাস্তার ধারে তার অনেক-দিনের চেনা এই বটগাছটার শিকড়ের উপর চেপে বসে বিড়ে খুলে খানিক হাওয়া খেল। তারপর বলল, এতগুলো মানুষ, বৌ-ছেলে নিয়ে রাত্তিরটা কাটাতে পারে এমন একটা গাছতলাও যে খুঁজে নেবে, সে সময়টুকু দিল না। ঘর ছাড়বার আগেই পশ্চিমা কুলীগুলো এসে মেঝের ওপর গাঁইতি মারতে শুরু করল।

—বল কি! বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করল দিলীপ।

—তবে কি মিথ্যে বলছি? আমি যে নিজের চক্ষে দেখেছি বাবু।

—তারপর? তারা সব গেল কোথায়?

যেখানে যাবার; এসব মানুষ চিরদিন যেখানে গিয়ে থাকে।'

এবার উত্তর দিল মকবুল। 'ইতিহাসই তার খোঁজ রাখে না, ও কেমন করে জানবে?'

...যাক; এবার আমাদের উঠতে হয়।

বলল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠবার উদ্যোগ করল না। গোকুল বোধ হয় মনে মনে একটু লজ্জিত হ'ল। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া-ঢাকা মাঠের পানে দু-একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, বুড়ো হলে মানুষ একটু বেশী বকবক করে। তোমরা কিছু মনে করো না, বাবু।

—না, না, মনে করবার কী আছে।' প্রতিবাদ জানাল মকবুল, 'এমনিই বলছিলাম, এবার উঠলে হয়। অনেকটা পথ যেতে হবে তো। তাছাড়া, এসব শোনা মানে মন খারাপ করা। করতে তো কিছুই পারছি না।'

—তা না পার, শুনলে; এতেই আমাদের ভালো লাগে। সেইটুকুই বা কজন করে বাবু?

দিলীপের উঠতে ইচ্ছা করছিল না। একদিকে ভেঙে ফেলা আরেক দিকে কোনো রকমে টি'কে থাকা এই বহু-বিস্তৃত বস্তিগুলোর উপর কেমন একটা অলক্ষ্য আকর্ষণ অনুভব করছিল। উঠি উঠি করেও যেন উঠতে পারছিল না।

কী একটা পর্ব উপলক্ষে আজ কলেজে ছুটি ছিল। প্রেসের কাজও বন্ধ। রোদটা একটু কম পড়তেই মকবুলকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। অনেক দিন এদিকে আসা হয়ে ওঠেনি। যদিও জানে, আসা বৃথা, এ রকম এলোপাতাড়ি খোঁজারও কোনো মানে হয় না, তবু মন মানতে চায় না। ঘুরতে ঘুরতে বড় রাস্তা থেকে নেমে অনেকদূর ভিতরে চলে এসেছিল। সেই ঝাঁকড়া আমগাছটা যদি আজও কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে। এই বটগাছের কাছাকাছি হঠাৎ গোকুলের সঙ্গে দেখা। ওরা লক্ষ্য করেনি, কত লোকই তো আসছে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, যদিও এই লোকটি, তার ঝাঁকা এবং তার ভিতরকার লোভনীয় বস্তুটির সঙ্গে ওদের পরিচয় কম দিনের নয়, বিশেষ করে দিলীপের। গোকুলও প্রথমটা খেয়াল করেনি। কয়েক পা গিয়ে নজর পড়তেই কলরব করে উঠল, কী সর্ব্বোনাশ! বাবুরা এখানে কী করছ? 'লেক' দেখতে এয়েছ বুঝি? এই তো সবে মাটি কাটা শুরু হল গো, এখন কি? বছর খানেক যাক, তখন এসো হাওয়া খেতে। কত লোক আসবে। হাঁটতে হবে না এক পা-ও। সোজা হাওয়া গাড়ি ছুটিয়ে চলে আসবে।

(ক্রমশঃ)

বাংলার একটি প্রাচীন মন্দির

মহীতোষ বিশ্বাস

আঁটপুর হুগলী জেলার একটি ছোট গ্রাম। এক সময় এই গ্রামের শ্রী ছিল, জনসম্পদ ছিল। কিন্তু এখন আর তা নেই। এরকম গ্রাম বাংলাদেশে একটা দুটো নয়, বহুশত রয়েছে। যেখানে এক-সময় বহু মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়েছে গ্রাম্য পরিবেশে এবং সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব শিল্পকলা, সাহিত্য। আঁটপুরের এই প্রাচীন মন্দির দেখতে এসে মনে মনে এই কথা ভাবছিলাম আর শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠছিল সেই সব অজানা শিল্পীর উদ্দেশে যারা গ্রামে থেকে নিতান্ত সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে এমন বিচিত্র শিল্পরচনায় দক্ষতা লাভ করেছিল। এই মন্দির দেখতে আসা তেমন পরিশ্রমসাধ্য কিম্বা ব্যয়-বহুল নয়। হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা রেলপথে আঁটপুর স্টেশনে নেমে অথবা হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথে হরিপাল স্টেশনে নেমে বাসে আঁটপুর গ্রামে আসা যায়। মন্দিরটি রাস্তার ধারেই বলা চলে। যাঁদের প্রাচীন শিল্পকলা দেখার ঝোঁক আছে, তাঁদের এই মন্দির-দর্শনে বিশেষ আনন্দলাভ হবে একথা বলা যায়।

মন্দিরের সম্মুখভাগ

অনেক মন্দির যেমন ধ্বংসের মুখে চলেছে, তার শিল্পকলা লুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে, এই মন্দিরের অবস্থা এখনও তেমন হয়নি। প্রাচীন হলেও এর শিল্পকাজগুলি এখনও ভালই আছে। মন্দিরের আশপাশ জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। দূরে দূরে দু-পাঁচঘর লোকের বাস। কিন্তু দেখলে বোঝা যায় এখানে এক সময় জনসমাগম ছিল। নিকটে এখনও ভগ্ন দালান, ইঁটের স্তূপ, দীঘি, পরিখা প্রভৃতি দেখে বোঝা যায় কোন প্রতাপশালী জমিদার বা রাজার বাস ছিল। কিন্তু এখন শুধু তার স্মৃতি হিসাবে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু নেই। মন্দিরে যে বিগ্রহ আছেন তার সেবার ভার স্থানীয় মিত্র-পরিবার গ্রহণ করেছেন।

প্রায় তিনশো বছর আগে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বাংলাদেশে এই ধরণের মন্দিরের সংখ্যা অনেক আছে। বর্ধমান জেলার কালনায়, বিষ্ণুপুরে যে মন্দিরগুলি এখনও রয়েছে, তা বাংলা-দেশের প্রাচীন মন্দির-গঠন এবং শিল্প-কাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। আগে এক-শ্রেণীর কারিগর ছিলেন যাঁরা গ্রামে থেকে এইসব শিল্পকাজের চর্চা করতেন এবং পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আজ বহুকাল পরেও সেই সব শিল্পকাজের যে নিদর্শন রয়েছে এগুলি বাংলার আপন সম্পদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইসব শিল্পকাজের আজ আর তেমন চর্চা বা চাহিদা নেই। এখানে এই মন্দিরে যে পোড়ামাটির শিল্পকাজ বা "টেরাকোটা" রয়েছে এগুলি শিল্প-সৌন্দর্যের দিক থেকে অপূর্ব। এবং এখনও এগুলি বিকৃত হয়নি। তবে এইসব শিল্পকাজের যে সব বিষয়বস্তু রয়েছে সে রকম বিষয়বস্তু বহুস্থানে দেখা যায়। যেমন, রামরাজা, হরপার্বতী, লবকুশ, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীর বহু বিষয়বস্তু নিয়ে এইসব মূর্তিগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষ্ণলীলার যে বিষয়বস্তু আছে সেগুলিও দর্শনীয়। গ্রাম্য শিল্পী আপন সাধনায় যে শিল্প-ধারার প্রবর্তন করে গিয়েছেন, সেই রসোত্তীর্ণ শিল্পকাজের কাছে যেন মাথা নত হয়ে আসে। এর অপূর্ব ছন্দ, অলঙ্কার, গঠনপদ্ধতি, কম্পোজিসন সকল ক্ষেত্রেই একটা বিশেষ সুরুচি এবং দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এইসব শিল্পকাজের বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা দিকে লক্ষ্য করলে একটু বিস্মিত হতে হয় যে, বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর এবং দেবদেবীর মূর্তি-নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীর মূর্তিও দেখা যায়। ঘোড়সওয়ার ইংরাজ সৈনিক সারিবদ্ধভাবে চলেছে, এমন বিষয়বস্তুও এখানে রয়েছে। অবশ্য এ রকম বিষয়-বস্তু বাংলার আরও বহু মন্দিরে দেখা যায়। এইসব বিষয়বস্তু রচনার কি উদ্দেশ্য তা সঠিক জানা না গেলেও এই-টুকু বোঝা যায় যে, ইংরাজের প্রভাব তখন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে হয়তো শিল্পীমনে এইরূপ রচনার প্রেরণা এসেছে।

বাংলাদেশে প্রাচীন মন্দির-সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কালের গতি এবং সমাজ-ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তনের মধ্যে আজও যে সব মন্দির এবং তার অপূর্ব শিল্পকলা দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলি

বাংলা তথা ভারতের শিল্পসম্পদ। এক সময় মানুষের রুচি এবং হয়তো প্রয়োজনের তাগিদে যে সব শিল্পসম্পদ —মন্দির, স্থাপত্যশিল্প সৃষ্টি হয়েছিল আজ হয়তো অনেকের কাছে তার কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমানকালে শিল্পকলা এবং গৃহনির্মাণ প্রভৃতি স্থাপত্য-শিল্পকাজের গঠনপদ্ধতির বহু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আধুনিক রুচিসম্মত বলে আমরা তার আদরও করছি। কিন্তু একথা সত্য যে, বহু প্রাচীন শিল্পকলাও আমাদের ভারতীয় জাতির শিল্পকলা ক্ষেত্রে গৌরবের স্থান অধিকার করে আছে। শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর বহু সভ্যদেশে আমাদের প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সম্মানের আসন লাভ করেছে। বহু শিল্পরসিক এর সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। সুতরাং আজও বাংলার যে সব প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন রয়েছে সেগুলির যত্ন নেওয়া সম্পর্কে দেশের রসিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার একান্ত প্রয়োজন। আমরা আজ স্বাধীন ভারতে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, নানা শিল্পকাজের উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের কাছের যে সম্পদ : বাংলার আপন যে সম্পদ সেদিকে আমরা ফিরে তাকিয়েছি বলে আমার আজও মনে হয় না। নচেৎ আজও এই-সব মন্দির-শিল্পকলার এত অযত্ন, এমন ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে কেন। আজও বাংলার শিক্ষার্থী শিল্পীদলের মধ্যে ক'জন আসেন এইসব গ্রাম্য-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন দেখতে ? কিন্তু বিশেষভাবে বলা যায় যে, আজ আমরা শিল্পকলার উৎকর্ষসাধনের জন্য যে ধারা, যে গঠন-পদ্ধতির সাধনা করছি, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের একটা দিক হচ্ছে এইসব প্রাচীন শিল্পকলা দেখা এবং তার গঠন-পদ্ধতি ও সৌন্দর্যরস উপলব্ধি করা। এক কথায় বলা যায় স্টাডি করা। কিন্তু এদিকে আজও তেমন উৎসাহ দেখি না। হয়তো আলোর নীচে যেমন অন্ধকার থাকে তেমনি এই সব গ্রাম্য শিল্পকলা আমাদের একান্ত কাছে আছে বলেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। অনেকের মত আমাদের প্রাচীন শিল্পকলা গঠন-সৌন্দর্যের দিক থেকে নাকি বিজ্ঞানসম্মত নয়। গ্রামের নিতান্ত অজ্ঞ কারিগর খানিকটা খেয়ালের বশে এই সব শিল্পের সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে বাংলার পটচিত্র এবং পোড়ামাটির কাজ সম্বন্ধে এই কথা শোনা যায়। অবশ্য এই মত পোষণ করেন এমন শিল্প-রসিকের সংখ্যা খুব বেশী নয়, কিন্তু তবুও আছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যরীতিতে যাঁরা আস্থাবান, তাঁরা এই মত প্রকাশ করে থাকেন। শিল্পকলা-সাধনার ক্ষেত্রে তাই তাঁরা এই সব শিল্পধারার তেমন তারিফ যেমন করেন না তেমনি স্টাডি করায়ও প্রয়োজন বোধ করেন না।

কৃষ্ণ ও গোপবালা

অবশ্য একথা বললাম বর্তমানে আমাদের দেশে চারুকলা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে খানিকটা সে-সম্বন্ধে। কিন্তু যাহোক আজ এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের গ্রামকে যেমন চিনতে হবে তেমনি গ্রামের যেসব প্রাচীন শিল্পকলা রয়েছে সেগুলিও প্রত্যক্ষ করে তার রস-সৌন্দর্য উপভোগ করতে হবে। সাধন-ক্ষেত্রে গ্রহণ-বর্জন অবশ্য শিল্পীর নিজের রুচির মধ্যে। কোন প্রাচীন ধারাকে আমাদের চিত্রাংকন পদ্ধতি হিসাবে যে গ্রহণ করতেই হবে, নূতন ধারার সাধনা কি সৃষ্টি আমরা করবো না—এমন কথা নয়। কিন্তু একেবারে প্রাচীন ধারাকে দেখবো না, তার রসসৃষ্টির যে উৎস সে সম্বন্ধে জানবো না--এমন কথা বলা শুধু অরসিকের কথা নয় আমাদের অজ্ঞতারও পরিচয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যে পুরাতনকে জানে না, সে নূতনও গড়তে পারে না। সুতরাং সাহিত্যের দিক দিয়ে যেমন পুরাতনকে জানার প্রয়োজন আছে, শিল্পের দিক থেকেও তেমন প্রাচীন শিল্পধারাকে জানার প্রয়োজন আছে। প্রকৃত রসোত্তীর্ণ শিল্পকলার যেমন কোন জাত নেই, সে সকলের, সকল কালের রসিকলোকের রসের খোরাক। তেমনি শিল্প-পদ্ধতিও কারও ব্যক্তিগত ধরা নয়। সূক্ষ্ম দৃষ্টি-বোধসম্পন্ন কোন শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিতে যে নতুনত্ব, যে সৌন্দর্যরসের সৃষ্টি হ'লো তা হয়তো এক সময় দেশের সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়, বহু শিল্পীর রচনার মধ্যে হয়তো একটি ধারা দীর্ঘদিন চললো, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হ'লো। গ্রাম্য শিল্পীদের রচনার ধারাও ঠিক এমনিভাবে বংশানুক্রমে অথবা বহু শিষ্যের কাজের মধ্য দিয়ে চলে এসেছে যা আমাদের কাছে শুধু শিল্পসম্পদ নয় তা আজকের শিল্পীদের শিক্ষণীয়ও।

শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমান

যথা সময়েই পেঁছান গেলো। আমার বন্ধু সমীরের কাকার শ্রাদ্ধবাসর। আশা করেছিলাম বন্ধু-বান্ধব অন্যান্য অনেকেই হয়তো আসবেন। কিন্তু গিয়ে দেখলাম আমি একা আর সবই সমীরদের আত্মীয়-স্বজন এবং পারিবারিক বন্ধু-বান্ধব। একা-একাই চুপচাপ বসেছিলাম, এমন সময় সমীর এসে আমার পাশে বসলো।

বাইরের ঘরের পাশে একটা প্যাসেজের মধ্যে বসে আছি। একে একে অতিথি-অভ্যাগত সব প্রবেশ করছেন। সমীর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে—'ইনি আমার মেজো মেশোমশাই, ইনি আমার রাঙাদির দেওর', ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও সময়োচিত গাম্ভীর্যসহকারে ভদ্রতা বিনিময় করছি। এর মধ্যে একজন মধ্য-বয়সী ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, সুসজ্জিত অবয়ব। কিন্তু সমীর তাঁর পরিচয় দিতেই আঁতকে প্রায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম, 'ইনি আমার যে কাকা মারা গেছেন, আজ যাঁর শ্রাদ্ধ...' ইতি-মধ্যে ভদ্রলোক আমাদের সামনে এসেছেন। আমি ইতস্ততঃ করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনার সঙ্গে দেখা হবে আশা করিনি।' ভদ্রলোক বিগলিত হাস্যে জানালেন, 'হ্যাঁ, আমি একটু দূরে থাকি আজকাল, তার উপরে আসা-যাওয়ারও অসুবিধা।'

ভদ্রলোক ভেতরের দিকে চলে গেলেন। আমি সমীরকে বললাম, 'আমি চলি ভাই। যাঁর শ্রাদ্ধে এসেছি তাঁর সঙ্গে দেখা হবে এ রকম আশা করতে পারা যায় না।' এইবার সমীর বললো, 'আরে, না, না শুনুন, ইনি হচ্ছেন আমার যে কাকা মারা গেছেন......'

আমি বাধা দিয়ে বলি, 'আমিও সেই জন্যেই বলছিলাম।' এইবার সমীর বাক্য সম্পূর্ণ করে, 'আরে ইনি হচ্ছেন যে কাকা মারা গেছেন, যাঁর শ্রাদ্ধ তাঁর বন্ধু।'

অতঃপর আশ্বস্ত হওয়া গেলো। সমীর ইতিমধ্যে আমাকে খুব নীচু চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে জানালো যে, এই ভদ্রলোক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—কোনো এক বিখ্যাত গন্ধতৈল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একমাত্র স্বত্বাধিকারী, থিয়েটার রোডে বিশাল বাড়ি এবং তাঁর অন্যান্য ঐহিক গৌরব সম্বন্ধে বহু বিষয়ও আমাকে অবগত হতে হলো।

খাওয়ার ডাক পড়লো। এবং সৌভাগ্যবশতঃ আমি ঠিক সেই ভদ্র-লোকের পাশেই বসলাম। খেতে খেতে একটা জিনিস দেখে ক্রমশঃই বিচলিত হচ্ছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি ভদ্রলোক বড় বেশী গলাধঃকরণ করছিলেন। একে ঠিক খাওয়া বলবো, সম্ভব নয়, কোনো ধনবান ব্যক্তি যে এরকম গোগ্রাসে খেতে পারেন আমার ধারণায় ছিল না। এবং শেষে সেই সর্বনাশ ঘটলো। আমি গুণে যাচ্ছিলাম। ষোড়শ অথবা সপ্তদশ মৎস্য-খণ্ডটি গিলতে গিয়ে ভদ্রলোকের গলায় কাঁটা ফুটলো। এতক্ষণ কাঁটা যে কেন ফোটেনি সেটাই আশ্চর্য। গলায় না ফুটলেও তাঁর পাকস্থলিতে অন্ততঃ শতাধিক কাঁটা ইতিমধ্যে সমবেত হয়েছিলো সে বিষয়ে আমি এবং হয়তো আরো অনেকেই নিঃসন্দেহ ছিলো। সুতরাং যখন তিনি ঘোষণা করলেন যে, তাঁর গলায় একটা কাঁটা ফুটেছে তখন আমরা কেউই বিশেষ আশ্চর্য হলাম না, বরং কেউ কেউ যেন এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে, এইবার খাওয়ার বহর একটু কমবে।

কিন্তু কার্যকালে দেখা গেলো ফলা-ফল অন্য আকার ধারণ করেছে। ভদ্রলোক, ইতিমধ্যে জানা গিয়েছিলো যে, ভদ্র-লোকের নাম শচীবিলাসবাবু, ভয়ঙ্কর হাঁস-ফাঁস শুরু করে দিলেন। তখন আমি ভদ্রলোককে বললাম, 'দেখুন, আমি খুব তাড়াতাড়ি খাই, আমার মধ্যে মধ্যেই গলায় কাঁটা ফোটে—ওতে কিছু হয় না।'

শচীবিলাসবাবু একবার গম্ভীর হয়ে আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন তারপর কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'সকলের জীবনের দাম সমান নয়।' সত্যিই এর পরে আমার আর কিছু বলার থাকে না।

একজন পরামর্শ দিলেন শুকনো সাদা ভাত গিলে খেলে কাঁটা নেমে যেতে পারে। সাদা ভাত আনতে বলা হলো। শচীবিলাসবাবু পর পর বড় লোহার হাতার চার হাতা সাদা ভাত গিলে ফেললেন। কিন্তু তাঁর মুখে-চোখে স্পষ্টই দেখা গেলো কাঁটা তখনো রয়েছে। এবার একজন পরামর্শ দিলেন আস্ত কলা গিলে খেলে হয়তো একটা সুরাহা হতে পারে। বাড়ির অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সুলভ হলেও কলা নেই। নিকটবর্তী বাজার তখন প্রায় বন্ধ, তবুও অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে একটা ফলের দোকান খোলানো গেলো, কিন্তু দোকানদার কিছুতেই দু' ডজনের কম এতরাত্রে কলা বেচতে নারাজ। যে কিনতে গিয়েছিলো সে বাধ্য হয়ে তাই কিনে আনলো। সবগুলি কলাই শচী-বিলাসবাবুর কাজে লাগলো, কিন্তু ফল হলো না, ন যযৌ ন তস্থৌ, কাঁটা স্থির। রসগোল্লার রস ফেলে শুকনো শুকনো ছিবড়ে খেলে বোধহয় উপশম হতে পারে—এবার শচীবিলাসবাবু নিজেই বাতলালেন। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় রস-গোল্লা গ্রহণ করা চললো, না গুনিনি। গোনা সম্ভব ছিলো না, প্রয়োজনও ছিলো না—কেননা আমাদের বাকী অন্যান্যদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। কিন্তু কাঁটাটি শচীবিলাস-বাবুর গলায় তখনো বিঁধে রয়েছে, 'না, না এখনো খচ্‌খচ করছে।' তাঁর কাতরোক্তি অনবরত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো।

সকলেই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। নমো নমো করে কোনোরকমে খাওয়া শেষ করা গেলো। ভাবলাম যাক এ যাত্রা কোনোক্রমে রক্ষা পাওয়া গেলো। কিন্তু শচীবিলসবাবুর মুখচোখ দেখে চিন্তান্বিত হতে হলো। শীতের রাত্রি, ডিসেম্বরের শেষাশেষি প্রবল ঠান্ডা পড়েছে। আমি খেয়ে উঠে ঠান্ডা জলে হাত ধুয়ে শীতে কাঁপছিলাম। অথচ শচীবিলাসবাবুর চোখ দেখলাম গোল

হয়ে গেছে, তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামও দেখলাম। আমি তখন বাধ্য হয়েই বললাম, 'একজন ডাক্তারের কাছে গেলে হয় না?'

'গেলে হয় কি? চলো।' শচীবিলাস-বাবু কঁকিয়ে কঁকিয়ে আদেশ করলেন। আমি সমীরকে বললাম, 'চলো, দেখা যাক।'

শচীবিলাসবাবুর গাড়িতে উঠতে উঠতে শচীবিলাসবাবু বললেন, 'হ্যারিসের কাছে গেলে হতো।' হ্যারিস পার্ক স্ট্রীটে বিখ্যাত কর্ণ-কণ্ঠ-নাসিকা বিশেষজ্ঞ। হ্যারিসকে আমিও অল্প অল্প জানি। রাত এগারোটা বেজে গেছে। রাত নটার পরে তাঁর কাছে কেউ ভীষণ বিপদে পড়লেও যায় না। পাঁড়মাতাল, বিশেষ করে এই এগারোটা নাগাদ নেশাটা চরমে ওঠে, এখন গলার কাঁটা বার করতে—গলা কেটেও ফেলতে পারে। আমি বিশেষ ভরসা পেলাম না। আমি ব্যাপারটা শচী-বিলাসবাবুকে একটু সংক্ষেপে বললাম।

শচীবিলাসবাবু বললেন, 'তা হলে?'

'তা হলে একটা হাসপাতালে গেলে হয়।' সমীর বিনীতভাবে জানালো।

'হাসপাতালে ...'—ভীষণ রকম আঁতকে উঠলেন শচীবিলাসবাবু। যেন তাঁকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত গত্যন্তর না দেখে তিনি হাসপাতালে যেতেই রাজি হলেন।

গাড়ি চলেছে। শীতের কন্‌কনে হাওয়া। শচীবিলাসবাবু আমাদের দুজনের মধ্যে বসে। একপাশে সমীর, আর একপাশে আমি। গলার ব্যথায় অল্প অল্প কাতরাচ্ছেন। কিন্তু এরই মধ্যে দেখলাম তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি যথেষ্টই প্রখর। আমার সৌভাগ্যবশত আমি শচী-বিলাসবাবু যে তৈলব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক সেই তেলটি ব্যবহার করে থাকি। শচীবিলাসবাবু এর মধ্যে একবার আমার মাথা, একবার সমীরের মাথা শুঁকে 'এ ছেলেটি তো বেশ ভালো, আমাদের তেল মাখে। সমীর, তুমি আমাদের তেল মাখো না কেন?' সমীর আমতা আমতা করতে করতে বললো, 'মাখি, মাখি, কিন্তু আমার মাথা এ রকম যে... আমার মাথায় গন্ধ বেরোয় না।' শচীবিলাসবাবু এই দু'জনার মধ্যেও বিচলিত বোধ করলেন এই উক্তিতে, আমি সমীরের এ ধরণের উক্তির সঙ্গে পরিচিত, তবুও হেসে ফেললাম।

গাড়ি হাসপাতালের সামনে এসে গেলো। তিনজনে নামলাম। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। একজন লোক বসে ঝিমুচ্ছিলো, আমাদের দেখেই উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো, কার গলায় কাঁটা ফুটেছে? প্রায় হকচকিয়ে গেলাম, লোকটির এই গোয়েন্দাদর্শিতা দেখে। অবশ্য পরে বুঝেছিলাম ব্যাপারটা, ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে এত রাত্রে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে জনকয়েক লোক এসে উপস্থিত হলে এদের পুরনো অভিজ্ঞতা থেকেই এরা বুঝতে পারে আসল ঘটনা, কোনো নিমন্ত্রণ-বাড়ি থেকে সোজা এত-রাত্রে চলে এসেছে। হামেশা এ রকম ঘটছে, রোজ রাত্তিরেই এত বড় শহরে কোনো-না-কোনো নিমন্ত্রণ বাড়িতে কারো-না-কারো গলায় কাঁটা ফুটেছে।

যা হোক, লোকটি ভেতরে গিয়ে ডাক্তারকে খবর দিলো। একেবারেই তরুণ ডাক্তার। শীতের রাত্তিতে লাল সোয়েটার গায়ে দিয়ে পিছনের একটা কম্পাউণ্ডে ব্যাডমিণ্টন খেলছিলেন। এত সামান্য

সবগুলি কলাই শচীবিলাসবাবুর কাজে লাগল

ব্যাপারে খেলায় বাধা পড়ায় বেশ একটু রাগতভাবেই প্রবেশ করলেন বলে বোধ হলো। অল্প একটু কথা বলে শচী-বিলাসবাবুর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।' ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন আর আমাদের পর্দার বাইরে দাঁড়াতে বললেন।

আমি আর সমীর দুজনে বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের কথোপকথন অনুসরণ করতে লাগলাম। শচীবিলাসবাবুর কণ্ঠ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ, সব সময় শোনা যাচ্ছিলো না আর ডাক্তারের প্রশ্ন উগ্র থেকে উগ্রতর হচ্ছিলো—

......'কটা মাছ খেয়েছিলেন? চল্লিশ, ত্রিশ? কম? কলা? কলা ক ডজন? লেডিকেনি, লেডিকেনি খাননি? রস-গোল্লা? দই খাননি কেন, সের কয়েক দই খেলে পারতেন, দই খেলে কাঁটা নামতে পারে—ও তা জানতেন না। দেখি, হ্যাঁ, হাঁ করুন, আরো, আর একটু। না কাঁটা নেই। কি বলছেন আছে, খচখচ করছে, নেই এখন আর নেই, তাহলে গলা কেটে দেখতে হয়। কেন, কাল সকালে আবার আসবেন কেন? এখন দেখছি নেই, আবার গিয়ে মাছ খেতে চান নাকি—তাহলে কাল সকালে আবার কাঁটা আসবে কোথা থেকে?...... এতক্ষণে শচীবিলাসের কণ্ঠ শোনা গেলো,

'না, এই দিনের বেলায় ভালো করে দেখবেন আর কি।'

'দিনের বেলায়, দিনের বেলায় কি আপনার গলার মধ্যে সূর্য উঠবে? দেখলাম টর্চ দিয়ে, এর আবার দিন-রাত্রি কি?' ডাক্তার রীতিমত উত্তেজিত।

একটু পরেই শচীবিলাসকে প্রায় নিরাশ হয়েই বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। তিনজনে আবার গাড়িতে উঠলাম। একটা ঢেঁকুর তুলে শচীবিলাস বললেন, 'এই এখনো একটু খচখচ করছে; ডাক্তারটা কোনো কাজের নয়।' গাড়ি থিয়েটার রোড পর্যন্ত প্রায় পেঁৗছে গেছে, এমন সময় আবার শচী-বিলাস চীৎকার করে উঠলেন, "এই ভীষণ সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে। আবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। এই গাড়ি ঘোরাও।' গাড়ি ঘোরাতে হলো, আমি আর সমীর বিস্মিত।

ভয়ানক ঠাণ্ডা চারদিকে। রাত একটা বোধহয় বেজে গেছে। ঘড়ির দিকে আর তাকাচ্ছি না। আবার হাসপাতালে পেঁৗছালাম। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে প্রায় এক ঘণ্টা পরে ডাক্তারকে ঘুম ভেঙে তোলা হলো। তিনিও বিস্মিত। চোখ কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হোলো আবার।'

শচীবিলাস বললেন, 'একটা কথা জানা হয়নি স্যার, রাত্রে কি খাব?'

সার্থবাহ

আধুনিক ফরাসী উপন্যাস

ভলতেয়রের উত্তরাধিকার

অষ্টাদশ শতকে ভলতেয়র-এর রচিত 'কাঁদীদ্'-কাহিনী পাঠ করলে তাঁর চতুরালি ও রসিকতায় এখনও আমাদের যে মুগ্ধ হতে হয় তা'র অন্যতম কারণ এই-যে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পরিহাসের ছকে-ফেলা এই উপন্যাসে নাম-চরিত্র কাঁদীদ্ (অর্থাৎ "স্বচ্ছ")-এর প্রবলভাবে ঘটনাসংকুল জীবনচরিত পরিবেশন করতে কাহিনীকার নিছক বর্ণনাধর্মেই আস্থা রাখেন নি (যেমন থেকেছে, বলা যায়, তাবৎ বাঙলা উপন্যাসের শতকরা নিরানব্বুই-টিতে)। বর্ণনার অন্তরালে, ভাষার মার-প্যাঁচে, কোনও রূপকান্ত অভিসন্ধির পরিচর্যা ক'রে কাহিনীকার আমাদের কাঁদীদ্-বৃত্তান্ত শোনানর সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর কিছুর ইঙ্গিত টের-পাইয়েছেন এবং মানতেই হয় যে এই 'গভীরতর'তেই মনুষ্যজীবনের চোখে-দেখা বাস্তবের বিচার, অর্থপ্রাপ্তি তথা সার্থকতা। উপন্যাসে-আখ্যেয় বাস্তব কোনও ভাবগত পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্ট বিশেষ বাস্তব, না-কি প্রত্যক্ষ বাস্তবই, এ বিষয়ে মতদ্বৈত মেনে-নিয়েও এটুকু বলা যায় যে উক্ত গভীরতর অধ্যায়ে যখন বাস্তব কোনও কাহিনীর অঙ্গীভূত হয়, তখন সেই বাস্তবের গতিবিধি সমসাময়িকতার বাইরে এসেও, অন্ততঃ কিয়দংশে, সংগত হ'তে পারে। যেমন, কোনও রোমান্টিক বিশ্ববীক্ষারই ভাষ্যনরূপে অন্বিত হতে হয় বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা বালজাকের বাস্তবকে, দুজনের অপারিমিত পার্থক্য সত্ত্বেও। ভলতেয়র-বিরচিত কাহিনীটি, অনুরূপভাবে, একটি বুদ্ধিজীবি কাঠামোর অন্তর্গত করে কাঁদীদের বাস্তবকে এবং তাই দুই শতাব্দীর ব্যবধানও উক্ত বাস্তবের আপাতঃ বাড়াবাড়ি বা গড়িমসিগুলির প্রতি আমাদের অসহিষ্ণু করে না। বরং সহানুভূতিকে ডেকে আনে।—ব্যারণ থুন্দের-তেন-ত্রংখের ভৃত্য, কাঁদীদ্, ব্যারণ-কন্যা ক্যুনেগ'দের প্রেমাস্পদ হও-য়ার জন্য 'পশ্চাদ্‌ভাগে বিপুল চপেটাঘাত' খেয়ে তা'র আশ্রয় থেকে বহিষ্কৃত হ'ল যদিও চূড়ান্তভাবে বিশৃঙ্খল এক জগতে প্রবিষ্ট হতে—ঝড়, জাহাজডুবি, মৃত্যুদণ্ড, বর্বর ওরেইয়' জাতি, এলদোরাদো, ইংলণ্ড, ইতালী ইত্যাদি হরেক উদ্ভট অভিজ্ঞতার চিত্র ম্যাজিক-লণ্ঠনের দ্রুততায় পাল্টে যায় সে জগতে,—তবু মঙ্গলময় সৌভাগ্যও যেন আগাগোড়া কাঁদীদের পিছু নিয়েছিল। দুর্বৃত্তের কবলে-পড়ার মতোই সত্য হয়েছিল কাঁদীদের বন্ধুলাভ এবং প্রলয়ঙ্কর ঘটনার সমাবেশ তাজ্জব নানান ওলট-পালটের শেষে কাঁদীদকে ফিরিয়ে দিয়েছিল শুধু তা'র শিক্ষাগুরু পাঙলস্‌কেই নয়, প্রণয়িনী ক্যুনেগ'দ-কেও। তাই উপসংহারে পাঙলস্ কাঁদীদকে বলতে পেরেছিলেন: 'সম্ভাব্য সকল জগতের শ্রেষ্ঠটির সঙ্গে শৃঙ্খলিত রয়েছে ঘটনাগুলি।...... (১)
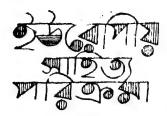
বস্তুতঃ এই মিলনান্তকের শুভে কাঁদীদ্‌কে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্যই ভলতেয়র তাঁর 'কাঁদীদ্ অথবা আশাবাদ' গল্পটি ফেঁদেছিলেন এমতো সন্দেহ মোটেই অমূলক নয়; লক্ষ্য তাঁর অবশ্যই উপসংহারটির অবিশ্বাস্যতাকে ব্যঙ্গ করা। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশশতকী মননশীলতা নিয়ে ভলতেয়র তাঁর উপন্যাসটিতে যে বাস্তব রূপায়িত করেছিলেন তা জার্মান দার্শনিক লাইবনীৎসের ব্যাখ্যাত মঙ্গল-প্রসূ, স্বয়ংক্রিয় সেই বাস্তব, যাতে বলা বাহুল্য, ভলতেয়রী বুদ্ধি আস্থা রাখতে অপারগ ছিল। 'কাঁদীদ্ বা আশাবাদ' এই শিরোনামা ব্যবহার করে ভলতেয়র বিদ্রূপ করতে চেয়েছিলেন লাইবনীৎসের প্রাঞ্জল সেই উপপত্তিগুলিকে যারা একটি আদর্শ ইতিপ্রধান বিশ্বের কল্পনা করেছিল বস্তুরই স্বকীয় সম্বৃদ্ধি পণ করে।

প্রথামতো কাহিনীসর্বস্ব উপন্যাসকে এইভাবে কোনও গুরুতর চিন্তার ভারবাহী করে তোলা ফরাসী ঔপন্যাসিকতার একটি বৈশিষ্ট্য, যদিও ফরাসী উপন্যাস মাত্রেই এই বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত নয়। অষ্টাদশ শতকে ভলতেয়র, রুশো, মাদাম দে লা ফাইয়াৎ, লাক্লু, কঁস্তা থেকে স্তঁদাল পর্যন্ত ঔপন্যাসিকদের সকলকেই মননের কোনও বিশেষ গুরুত্ব-অবলম্বনে কাহিনী ও চরিত্রের সংগঠনে —না হ'লে, অন্ততঃ সংলাপ নির্মাণে,—প্রযুক্ত দেখা যায়। গল্প-বলার স্বাচ্ছন্দ্য থেকে তত্ত্বের জটিলতায় উন্নীত 'জুলি বা নূতন এলয়সা'র রুসোও যেমন তেমন 'বিপজ্জনক সংযোগ-এর লাক্লু, কিম্বা, 'আদল্‌ফ'-এর কঁস্তা। যুগসম্মত যুক্তি আর ব্যক্তিগত হিস্পানীপণার দোটানায় উপনীত স্তঁদালের ঔপন্যাসিক আবহাওয়ায় তত্ত্বের আমেজ লেগেই থাকে। মননধর্মে আশ্রিত হয়ে ফরাসী ঔপন্যাসিকরা নিরুপদ্রব আখ্যানমূলকের কথকতায় যে ক্রমান্বয়েই কম আস্থাবান হয়েছিলেন তার সাক্ষ্য ঊনবিংশ শতকী ফরাসী উপন্যাসের প্রকৃতিতে স্পষ্ট। স্তঁদাল বর্ণন-ধর্মকে সচেতন-ভাবেই বরদাস্ত করতে পারেননি, স্বভাবতঃই জোর দিয়েছিলেন মনস্তত্ত্বের ওপর। যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও বালজাক নিশ্চয়ই কাহিনীতেই উপন্যাস-সর্বস্বের নিষ্পত্তি খোঁজেন নি এবং আর কিছু না হলেও বালজাকী বাগ্‌ভঙ্গীই প্রমাণ করে তার স্রষ্টার মননধর্মী সক্রিয়তা। ফ্লোবোর-এর লা তাঁতাশিয়ঁ দে সাঁ তাতোঁয়ান-এর মতো আজগুবী কাহিনীতেও উগ্র কাল্পনিকের রঙ্গভূমিতে বুদ্ধি-বিবেক-প্রসূত সমস্যাগুলির উঁকি অস্পষ্ট নয়। মননশীলতার ছোপ এমিল জোলার বিদ্রূপপ্রবণতায় উইস্‌মাঁস-এর নান্দনিক ভাবনায় ও গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বভাববাদী প্রত্যয়ে। অনেকক্ষণ ধরে কিছু দেখলেই আকর্ষণ জন্মায় তাতে। ফ্লোবোর বলতেন গঁকুর-ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের একটি উপন্যাস প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'পাঠকরা মিথ্যা উপন্যাস ভালোবাসেন, এটি একটি সত্য উপন্যাস' ঃ এই রকমের প্রস্তাবগুলি নিঃসংশয়ে ফরাসী ঔপন্যাসিকতার বিশেষ বুদ্ধিজীবি প্রণোদনা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। ফরাসী উপন্যাসের একটি বৃহদাংশ এই মননের দায়িত্ব পালনেই কাহিনী-মাধ্যম রচনামাত্র।

বিংশশতকী ফরাসী ঔপন্যাসিকরা উক্ত মননরীতির সম্মাননায় নিঃসন্দেহে যথেষ্ট অকুণ্ঠ। বলা যায়, ঐ নীতির চালে তাঁরা এতো রপ্ত হয়ে গেছেন যে তাঁদের ঔপন্যাসিকতায় কাহিনীকেন্দ্রিক দাহ্য বা অভিনবত্বের স্বধর্ম অনেকাংশে পরিত্যক্ত হয়েছে। ফরাসী উপন্যাসের ঐতিহ্যে আগাগোড়া বিদ্যমান এই ঝোঁক, বলা বাহুল্য, বিংশ শতাব্দীর যুগধর্মে তার খোরপোশের নির্বিবাদ প্রতিশ্রুতি পেয়ে ক্রমান্বয়েই আশ্বস্ত বোধ করেছে। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকের একজন ফরাসী ঔপন্যাসিক, শার্ল-লুই ফিলিপ, থেকে সম্প্রতিকালের জাঁ জেনে, বা রোব্-গ্রিইয়ে পর্যন্ত ফরাসী ঔপন্যাসিকদের অধিকাংশ রচনায় তাই মানসিকতার মূর্তি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গতঃ ফিলিপের শ্রেষ্ঠ রচনা 'মঁপার্নাসের বুবু'। ১৯০০ সালে রচিত এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু গণিকাবৃত্তি। মঁপার্নাস পাড়ার একটি রাস্তা, বুলু-ভার সেবাস্তপল-এর আশপাশের এক বিবর্ণ বিশ্বে ফিলিপ এনে জড়ো করেছেন পিয়ের ব্যেত্র্, জুল, ব্লাশ, বুবু প্রভৃতি কয়েকটি নীচুতলার নারীপুরুষকে এবং এ'দের কথাবার্তায় যাওয়া-আসায়, ম্রিয়মান তবু নিষ্ঠুর কোনও বৃত্তান্তের পরিণতি দেখিয়েছেন। কিন্তু ফিলিপ, যদিও তিনি মোটেই ভাবাবেগ বিবর্জিত, কিম্বা, বাস্তববিরাগী নন, তাঁর উপন্যাসে ইতিমধ্যে সঞ্চারিত করেছেন পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যের গুরুভার, এমনকি জীবন-দর্শনের খানিকটা এবং তা অনিবার্য-ভাবেই। তাই ফিলিপের বুবুর সঙ্গে

অনুরূপ বিষয় নিয়ে রচিত অন্য কোনও উপন্যাস, যেমন রুস আলেক্সান্দ্র ক্যুপ্রিণের 'ইয়ামার' যে প্রভেদ তা মৌল। ক্যুপ্রিণের ধারালো বাস্তবের পাশে বুর্ব্যু যে কম-বাস্তব তা নয়; বুর্ব্যুর ধর্ম অন্যরূপ।

ফরাসী ঔপন্যাসিক প্রথমতঃ চিন্তক। কাহিনীকারের ভূমিকা গ্রহণের আগে ও পরে তাঁকে জীবনচিন্তায় ব্যাপৃত দেখা যায় যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও বাস্তবিক অর্থে। 'শিল্পের জন্যেই শিল্প' এই অভিজাত স্বপ্রতিষ্ঠার কীর্তনে থেকে থেকে মাতোয়ারা-হবার দায়িত্ব নিতে যদিবা ফরাসীরা পিছপা হন নি, তবু উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে অন্ততঃ তাঁদের জীবনবোধে গুরুত্বের ও মানসিকতার খাঁকতি কমই লক্ষিত হয়। শার্ল-লুই ফিলিপ অবশ্য এই প্রতিপাদ্যের কোনও অসামান্য দৃষ্টান্ত নন'ই; তাঁর পরবর্তিদের রচনায়ই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 'লে-স্প্লেজির জেলে জুর'-এর আবছায়া নান্দনিক জগত থেকে ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্তকে তাঁর প্রকৃত আবাস সন্ধান করে নিতেই হয় অতীতকালের দুর্মর ও আন্তরিক জগতে, যেখানে নোঙর ফেলে তিনি বর্তমান কালস্রোতে ভাসমান থাকেন। প্রুস্তের চিন্তায় অতীত যেন ঐতিহাসিক অতীত নয়; আশ্চর্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বোধের চুম্বকে লেগে-থাকা অনুভূত কোনও অতীতের রূপরসগন্ধ টেনে নিয়ে আসার মহাপ্রয়াসে প্রুস্তের ঔপন্যাসিক সাধনা তাঁর 'আ লা রাশ্যার্শ দ্যু ত' পের্দ্যু' সাত খণ্ডে সিদ্ধ হয়। মনস্তত্ত্ব চরিত্র-বিশ্লেষণ সাবিকভাবে অন্তর্দৃষ্টি, প্রুস্তের আকর্ষণীয় কাহিনীর সুতোয় সুতোয় যে রং মেখে দেয় তা দুরপনেয়। এবং সেই রংয়েই প্রুস্তের ঔপন্যাসিকতার মহার্ঘ সার্থকতা। কাহিনী-করণের চাইতে অনেক বেশী যত্ন এসে পড়েছে কাহিনী-কথনে; কাহিনীকার প্রুস্ত সজাগ হয়েছেন পূর্ণাঙ্গ গল্প-বলার অনুপস্থিত সেই আঙ্গিক সম্বন্ধে যাতে অবচেতন ও অকথিত থাকবে না, ঘটনার চাক্ষুষ স্থির-বিন্দুকেও সমীক্ষার অধীনস্থ করে জীবনের গভীরতর অনুধাবন সম্ভব হবে। মননের নূতনত্বে শিল্পী প্রুস্ত উপন্যাসের ভাষা ও ভাবনা, ঔপন্যাসিকতার প্রয়োগ-ক্ষেত্র ও আঙ্গিক পাল্টে দিলেন। 'চেতনার স্রোত'—সংজ্ঞিত যে-আঙ্গিক কিছু পরে জেমস জয়সের যুগান্তকারী 'য়ুলিসিস'-এ ব্যবহৃত হবে, তার কতোখানি প্রুস্তে অংকুরিত এ প্রশ্নের মীমাংসা যদি বা দুষ্কর, তবু এটুকু নিশ্চিত যে প্রুস্ত ছিলেন জয়সের নিকট-পূর্বপুরুষদের একজন।

অবশ্য জয়সীয় 'চেতনার স্রোত' আঙ্গিকের সঙ্গে যে-ঔপন্যাসিক আঙ্গিকের সরাসরি যোগযুত্র স্বয়ং জয়স-কর্তৃকও স্বীকৃত হয়েছে, সে আঙ্গিকের জন্মও একজন ফরাসী, এদুয়ার দ্যুজার্দাঁ-র 'লে লোরিয়ে স' কুপে' নামক উপন্যাসেই। এবং যদিও প্রুস্ত-ব্যবহৃত আঙ্গিকের উদ্ভাবক হিসাবেও প্রুস্তের সঙ্গে সমান দাবীদার তাঁর সমকালীন আর এক ফরাসী ঔপন্যাসিক রনে বেয়েন্, তবু প্রুস্তের 'অতীতকালের সন্ধানে' যে ফরাসী (তথা য়ুরোপীয় ও মার্কিন) উপন্যাসের দিগন্ত বিস্তৃত করেছিল বিস্ময়করভাবে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, আঙ্গিকের প্রশ্ন বাদ দিলেও, প্রুস্তের সুদীর্ঘ আখ্যান উদারতম অর্থে মর্মস্পর্শী। নানান ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে প্রুস্ত-সৃষ্ট চরিত্রগুলির মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও, প্রুস্তে ছিল অচিন্তনীয়। তাঁর মননধর্মী জীবনবোধই ছিল সে উদাসীনতার সজাগ বিপক্ষ। সন্দেহ থাকে না প্রুস্তের ঔপন্যাসিক বৃত্তির সততায়। প্রুস্তের উপন্যাসটিতে অনেকগুলি চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে অষ্টাদশ শতকের বেশ ক'টি ঐতিহাসিক নারী ও পুরুষের চরিত্রের অনুকরণে, কিন্তু নিছক কাল্পনিকে অনাস্থা ছিল ব'লেই যে প্রুস্ত তাঁর অতীতের সন্ধানে ইতিহাসপ্রসিদ্ধদের মানুষিক বাস্তবে বাঁধা পড়েছিলেন, 'অতীতকালের সন্ধানে'র বিচিত্র আখ্যান ও চরিত্রগুলির দুরত্ব কেবল সেইটুকুই বলে। প্রুস্তের ক্যানভাসে একটি সচেতন-ভাবে অতীত জগৎ তার সচল, দুর্জয় ও করুণাহীন পরিমিতি নিয়ে বিন্যস্ত।

জীবন-দেখার যে-তীব্র, সন্ধানী চোখ ছিল প্রুস্তের তাকে আরো সক্ষম করেছিল তাঁর শিল্পী-চারিত্রের আরেকটি মহৎ গুণ, যার নাম, প্রখ্যাত সমালোচক শার্ল দ্যু বর ভাষায়, 'গভীরতা'। দ্যু ব বলেন যে, প্রুস্তের অবস্থিতি ছিল জীবনবোধের সেই স্তরে যে-স্তর কখনই বাহ্যিক ও গভীর এ দু'য়ের মধ্যবর্তীটি নয়, একেবারে আতির্যকভাবে গভীরই। এই গভীরতার প্রসঙ্গে ভাবতে হয় আরেক শক্তিশালী ফরাসী ঔপন্যাসিক আঁদ্রে জিদের কথা, যে-জিদ, প্রুস্তের প্রতিপক্ষ রূপেই বুঝি, বাহ্যিক জগতের বস্তুতান্ত্রিক সত্যাসত্যে আস্থা নিয়ে শুরু করেছিলেন। নন্দন-সর্বস্ব শিল্পে ঘোরতর অবিশ্বাসী জিদ বললেন : 'এখন প্রশ্নটা কৃষ্টিকে নিয়ে নয়, প্রশ্ন নিছক অস্তিত্ব নিয়ে। প্রুস্ত-আভাষিত বিশ্বের সঙ্গে সংঘর্ষ হবেই জেনে জিদ তাঁর চতুর ও রুক্ষ হৃদ্গতের সমস্যাগুলি নিয়ে আক্রমণ করলেন বর্তমানের চতুরঙ্গ। অস্তিত্ব ও তজ্জাত যন্ত্রণা, স্বভাব ও অবক্ষয়, পাপ ও চৈতন্যের দুর্বিপাক সন্দিগ্ধ জিদের ঔপন্যাসিক পরিক্রমায় স্বতঃস্ফূর্ত সমস্যার রূপ ধ'রে কাহিনীর সুর বেঁধে দিল।

কার্তেসীয় অস্তিত্ববাদের নির্দেশে জিদের একটি চরিত্র উপলব্ধি করে : 'নিজেকে যা-ব'লে আমি বিশ্বাস করি, তাছাড়া অন্য কিছু আমি নই।' সভ্যতার প্রত্যয়ে সন্দিহান জিদ জানান যে, 'কারণ-বাদী ব্যাখ্যাগুলি'র পিছনে শয়তানের চমৎকার ডেরা। এইভাবে মননের প্রখরতা জিদের উপন্যাসে সুপরিকল্পিত, বুদ্ধি-জীবী সত্ত্ব দান করে, এবং জিদের বিশ্ব-বীক্ষার প্রকাশক হয়ে ওঠে তাঁর সৃষ্ট কাহিনী ও চরিত্রগুলি। ব্যক্তিক বিকৃতি ও অপলাপের সাক্ষ্য নিয়ে 'লে ফো মনাইয়ের'-এ জিদের যে-পরিণত, বিস্বাদ ভুবন, তা যদি কোনও ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তবে সে-ব্যাধির বীজাণু বহু পূর্বেই তিনি আহরণ করেছিলেন তাঁর মননধর্মী জীবনবোধের মারফত। এক অজাচারী তবু নিষ্পাপ প্রেমের স্বচ্ছ কাহিনী হিসাবে যার শুরু এবং মর্মান্তিক বিয়োগান্তে যার শেষ, সেই আপাতঃ-কাব্যিক 'লা পর্ত এত্রোয়াৎ' (সংকীর্ণ দ্বার)-এ ও জিদের কথকতায় সংক্রামিত এক নিরুত্তাপ মানসিকতা, অবিশ্বাস ও বিদ্রূপপ্রবণতা। শার্ল-লুই ফিলিপের উপন্যাসে পিয়ের আপন সৌভাগ্যকে অভিনন্দিত করতে বিস্রস্ত হয়ে বলে : কী আমি করেছি, যার জন্য এতো সুখের যোগ্য আমি?' (২) বিধাতা-পুরুষের প্রতি এক ক্লান্ত বিশ্বাস তখনও টিঁকে ছিল, আস্থা ছিল কর্মফলে! কিন্তু জিদের উপন্যাসে নৈতিক বৈদগ্ধ্য অনেক দূর এগিয়েছে। নুসিল ব্যুকোলার অবৈধ প্রেমের আসরে তাঁর দুটি শিশু-সন্তানকে হাজির করেন জিদ : 'রোব্যের ও জুলিয়েৎ ছিল তাঁর পায়ের কাছে, পিছনে ছিল লেফটেনাণ্টের পোষাক-পরা এক অপরিচিত যুবক। এখন ঐ শিশু-দুটির উপস্থিতিকে আমার মনে হয় প্রকাণ্ড পশ্বাচার, কিন্তু তখন আমার নির্দোষ মনে সে-উপস্থিতিকে ভাল বৈ অন্য কিছু মনে হয় নি'। যাজক ডোতিয়ে ছিলেন 'আসতের সম্মুখে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র'। (৩)

ঘটনামূলক ও ন্যায্যভাবে মানবিক বাস্তবই ফরাসী-ঔপন্যাসিকদের ধর্তব্য থেকেছে, কিন্তু তাঁরা সে-বাস্তবকে কখনও উপর-উপর দেখে তাকে বর্ণনার হেফাজতে পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত বোধ করেন নি। বাস্তবের বিচার, ব্যক্তি ও বহুর বিশ্লেষণ, গ্রাহ্য মূল্যদের যাচাই, নান্দনিক তথা নৈতিক অর্থানর্থ খতিয়ে দেখা, অস্তিত্বের অন্বয় ইত্যাদি মনন-চিহ্নিত অঘটনের ঝুঁকি যেন তাঁদের সহজ ঘটনামূলকের কথাশিল্পে সর্বদা চেপে। বিচারে, ব্যাখ্যায়, পর্যবেক্ষণে ও মন্তব্যে তাই ফরাসী-উপন্যাসিকদের দেখা যায় তাঁদের জীবনদর্শন নির্ণীত করে ফেলতে। এক-একজন ফরাসী ঔপন্যাসিক যেন এক-এক মানসিক জলবায়ুর নির্ধারিত ভূখণ্ড। আঁদ্রে জিদ তাঁর ঔপন্যাসিক অন্বেষণের অন্তে বলেন এক 'নিয়তি-প্রস্তুতি' (disponibilite)-র কথা, যা মানুষকে ঘটনার হেরফেরে আপন স্বরূপ

প্রবর্তিত করার যুক্তি শেখাবে। জীবন অর্থে জিদের কাছে কোনও স্থির বস্তুতে গিয়ে পৌঁছান নয়, হওয়ার অনন্তই। অবশ্যই এই 'নিয়তপ্রস্তুতি' কোনও নিরীশ্বর মানসের সন্তান এবং শেষ পর্যন্ত প্রলয়ঙ্করও বা। ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক, সৎ ও অসতের (ফরাসী 'mal') বিশ্বে যাঁর প্রবেশ ও পরিভ্রমণ জিদের চেয়ে কমজোর নয়, জীবনচিন্তায় কিন্তু জিদসুলভ উৎকেন্দ্রিকতা পাশ কাটান। কোনও কোন অন্যায় কার্য যে কারণবাদী, কিম্বা, ভাগ্যবাদী বিচারেও মীমাংসা লাভ করে না, অভিব্যক্ত করে দুরধিগম্য মানুষিক অস্তিত্বের অস্বচ্ছ, সুদূর কোনও অনির্ণেয় বাসনাকে, তা'রই ইঙ্গিত মোরিয়াকের বিখ্যাত উপন্যাস 'তেরাাস্ দেস্‌কাইর‍ুতে। জেনে-শুনেও মাত্রাতিরিক্ত ঔষধ সেবনে আপন স্বামীকে বাধা দেয়নি যে-তেরাাস, সে কি স্বামীর মৃত্যুই কামনা করেছিল? স্বামী বোর্নাক্ যখন জানতে চাইলেন কী ছিল তেরাাসের ইচ্ছা, তখন মোরিয়াকের নায়িকার আরজিতে মনস্তত্ত্ব ঘোলাটে হয়ে যায় এবং এষণার ছায়াপাতে: 'কী চেয়েছিলাম? কী চাইনি'ক তা'ই বলা'ই আরো সহজ; চাই নি যে আমি এক ব্যক্তির ভূমিকায় অভিনয় করি, কতকগুলি ভঙ্গিমা ক'রে চলি, বাঁধা বুলি আওড়াই......। (৪)

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের লোক মোরিয়াক প্রকৃষ্ট অর্থে কাবাক ও বাহুল্যবর্জিত এবং যেন এক মেদুর আঞ্চলিকতায় অনুগ্র, দূরস্থ। কিন্তু তবু মননের শক্ত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তিনি তেরাাস্ দেস্‌কাইরুর আত্মিক বিপর্যয়কে কোনও বিশেষ অনাচার বলে মানতে অসম্মত। মুখবন্ধে মোরিয়াক বলেন: 'তেরাাস্, অনেকে বলবে যে তোমার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আমি জানি তুমি রয়েছো; আমি, যে অনেক বছর ধ'রে তোমাকে চোখে-চোখে রেখেছি, আর তোমায় আটক করেছি পথের মধ্যে, খুলেছি তোমার মুখোশ।' এইভাবে চিন্তক মোরিয়াক উপন্যাসের কাহিনীতে দাম্পত্য-বন্ধনের স্থিরত্বকে প্রশ্নাধীন করেন অনেকখানি সর্বাত্মক ভঙ্গীতে। তাঁর চোখে তেরাাস্‌রা টাইপ্ নয় অবশ্যই, কিন্তু সভ্য, সামাজিক জীবনের অবিশ্বস্ত স্থিতির কান্তারে দুষ্প্রাপ্য নয় এই তেরাাস্‌দের আবির্ভাব। অবশ্য মোরিয়াক যখন তেরাাস্‌কে সস্তা লোকুস্তা নামে ডাকতে চা'ন (উক্ত 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য), তখন তাঁর অনুকম্পা মননের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যায় নিঃসন্দেহে।

বস্তুতঃ এই অনুকম্পা বিংশশতকী ফরাসী জীবনবোধে একটু আকস্মিকই, এমন কি বেমানানও। অপর কোনও ফরাসী ঔপন্যাসিক, যেমন আঁদ্রে মালরো, হ'লে নিশ্চয়ই এমতো আনুকম্পার দায় পোয়াতে সম্মত হতেন না। মালরোর ঔপন্যাসগুলিতে প্রকাশিত জগৎ বস্তু-তন্ত্রের সদাসচল ও বিশৃঙ্খল চালে চলে। সেখানে তাজ্জব কোনও ঘটনা ঘটলে যুক্তির অথবা আবেগের মারপ্যাঁচে নয়, জীবনে কোনও মৌল অমীমাংসায়ই তার দেনা-পাওনার কথা আটক। মালরো এতাবৎ উল্লিখিত ঔপন্যাসিকদের সকলকে পিছে ফেলেন এই বিশৃঙ্খলার উপলব্ধিতে। অনির্ধারিত বাঁচার ও মরার যে প্রচন্ড নৈরাজ্যে স্বৈরাচারী বিংশশতকী জীবন সংজ্ঞিত, তা'র ভাষ্য রচনায় মালরো অক্লান্ত ও নিষ্করুণ। মালরোর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'লা কঁদিসিঁয় নুমেন' (মানবিক পরিস্থিতি)-এ হোটেলের শয়নকক্ষে ঘুমন্ত একটি লোককে হত্যা করে চেন্। এই হত্যাকান্ডের 'ফলস্বরূপে চেন্ বুঝতে পারে যে শুধু একটা পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। যে-চোখে সে অন্যদের দেখত, তা পাল্টে গেছে। পরিবর্তন আর পুনরাবিষ্কার কেবল। প্রথমবার বেশ্যালয় থেকে এসে নিজের ভগ্নীকে যে-পরিবর্তিত চোখে দেখেছিল চেন্, তেমনই এক পরিবর্তন মাত্র। একই উপন্যাসে, বহুকাল প্রাচ্যদেশে কাটিয়ে যখন বোর্জে ফিরে আসে মার্সেই বন্দরে, তখন চেনের মতো সেও টের পায় কেবল ঐ নিরর্থক, অবয়বহীন পরিবর্তনের কথা। মানবিক বৃদ্ধি কিছু থেকে কিছুতে পৌঁছানো,—উত্থান বা পতন, ঐকান্তিক কোনও ধর্মের নিরূপে যে অসম্ভব, এই সত্যে মালরোর রোহর্ষক মানবিক পরিস্থিতির কাহিনী আমাদের পুনর্বার উপনীত করে। মালরোর আরেকটি উপন্যাস, 'লা ভোয়া রোইয়াল' (রাজকীয় পথ)-এও মানবিক সত্তার গভীর আলোড়িত করেন। মালরো। এই কাহিনীর নায়ক স্বদেশবিহীন (heimatlos) পের্কেন, যে কাম্বোজের জঙ্গলে এসে প্রত্নতত্ত্ব আর রতিজের কুজ্ঝটিকায় লুপ্ত হয়ে যায় জীবনের কোনও দীপ্ত বা শুভ শপথে একবারও জেগে উঠতে না-পেরে। পের্কেনের নিঃস্ব পুরুষার্থ, তা'র ভয়, অবসাদ আর আমৃত্যু-বিনাস্ত শূন্য অহমিকার প্রলাপে মালরো আরেক মানবিক পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটান।

মার্সেল প্রুস্ত থেকে আঁদ্রে মালরো মাত্র দু-তিন দশকের ইতিহাস, কিন্তু এই পর্যায়ে ফরাসী উপন্যাসের বিবর্তন বহুমুখী ও প্রকট। ঔপন্যাসিক প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে এই হিসাবে যে, উপন্যাসের জগৎ অনেকাংশেই বর্তমানের প্রত্যক্ষে অবধারিত; ইতিহাস ও স্মৃতির অনচ্ছ অলিগলি নয়, অভিজ্ঞতার রাজপথই ঔপন্যাসিকের প্রশস্ত মার্গ। সে-অভিজ্ঞতাও আবার মনস্তত্ত্বের বৈদগ্ধে যাচাই-করা, সর্ববিধ ভাবালুতা থেকে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট, এবং তাই প্রজ্ঞার প্রলেপ-মাখানো নয়, বরং অশান্তই। ঔপন্যাসিকের আদর্শ—'উদ্দেশ্য' বলাই ভালো,—উদারনীতিক বিজ্ঞপ্তি বা চিত্তবিনোদনের যুক্তি কমই শোনে, তা'র লক্ষ্য, মোদ্দাকথায় এক বৈপ্লবিক (অরাজনৈতিক অর্থে) সত্যভাষণ। সেই সত্যভাষণে আছে এক আশ্রয়ের সন্ধান। মালরো বলেন, শিল্প হচ্ছে পুনর্সৃষ্টি, মানবিক নিয়তির এক উদ্বর্তন। মানুষের অস্থায়ী জগৎ ও ঈশ্বরের পরম জগৎ, এ দুয়ের মধ্যে শিল্প উপস্থাপিত করে তা'র তৃতীয় জগৎ। (৫) মালরোর চোখে শিল্প তাই নিজস্ব আইন-কানুনে নিয়ন্ত্রিত একটি 'আবদ্ধ রীতি', যার চর্চায় শিল্পীকে স'রে-যেতেই হয় 'অন্য' জগতে আর শিল্পের অবদানে, সূচিত হয় বস্তুতান্ত্রিক, বাহ্যিক জগৎ থেকে মানবিক সত্ত্বের মুক্তির কথা, যদিও সে-মুক্তির উপভোগও সম্ভবে 'অন্য' জগতে। ঔপন্যাসিক জাঁ পল সার্ত্রও অনুরূপ মুক্তিতে বিশ্বাসবান, কিন্তু মানুষকে মালরো-কথিত ঐ অন্য জগতে পাঠানোর প্রস্তাবে তাঁর অস্তিত্ববাদী 'যোগাযোগ' (engagement) স্পষ্টতঃই খণ্ডিত হয়।

---

1. Voltaire: Romans et contes, Classiques Garnier, p. 221
2. Charles-Louis Philippe: Babu de Montparnasse, Bibliotheque-Charpentier, p. 215
3. Andre Gide: La Porte Etroite, Librairie Artheme, Fayard, p. 22
4. Francois Maurias: Therése Desqueyroux, Calman-Levy, p. 185.
5. Andre Malraux: Psychologic de l'art: La monnaie de l'absolu Albert Skira, p. 28.

বিকেলের রং

খগেন্দ্র দত্ত

ধীরে ধীরে বাড়ির আনাচে-কানাচে গোধূলি নেমে এল, ছাদের উপর দাঁড়িয়ে একটু আগে দেখতে পাওয়া পশ্চিমাকাশের দিগন্তরেখার আগুনে-মেঘ উধাও। বাড়ির প্রবেশ-পথের ধারে দেবদারু গাছের পাতায় পাতায়, ওপরের আকাশের শূন্যতায় নীল ধোঁয়া-ধোঁয়া সন্ধ্যার আভাস।

কেয়া সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল তখনই। এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। গা ছমছম অন্ধকারে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টি বাইরে রাস্তায় নিবন্ধ রাখল। পথচলতি মানুষগুলোকে দেখল। খুঁজল নিজের মানুষটাকে। ফিরবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তবু ফিরে আসার নাম নেই। অফিসে এতক্ষণ কি করছে কে জানে। পাঁচটায় ছুটি। ফিরে আসতে এক ঘণ্টার বেশি লাগা তো উচিত নয়। এসেছেও এতকাল। ব্যতিক্রমও যে হয়নি তা নয়। মাঝে মাঝে দেরিও করেছে। সে রকম দিন খুবই কম। কড়ে গুণে শেষ করা যায়। বিবাহিত জীবনের তিন বছরের পরিধিতে বড় জোর দশ-বার দিন। গড়ে মাসে একদিনও পড়ে না। সেই দিন-গুলোতেই মন খারাপ হয়েছে কেয়ার। সময়টা যেন কাটতে চায়নি। বড় মন্থর মনে হয়েছে, এক একটি পলক যেন এক একটি দিন। দিনও নয়—যেন বছর।

আজও সেই অস্বস্তিকর অবস্থা কেয়ার। বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে টেবিল ঘড়িটার দিকে তাকাল। রেডিয়াম ডায়ালের কাঁটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছ'টা বিশ। বুকটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল, কিসের যেন একটা অভাববোধ, একটা যেন শূন্যতা। ভয়েরও শিরশিরানি রক্তের মধ্যে। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপল। আলোর বন্যায় ভাসল ঘর। ঘরের আসবাবপত্র।

আর সেই মুহূর্তেই মনে পড়ল ওর আসল কাজটা সারা হয়নি। রান্নার আয়োজন শেষ করে বীণার মাকে বুঝিয়ে দিয়ে স্নানও করে এসেছিল ঐ কাজের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ছাদের দড়িতে শাড়ি ব্লাউজ শুকোতে দিতে গিয়ে সব ভুলে গিয়েছিল। বিকেলের শান্ত পরিবেশ ওর চেতনাকে কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তাই কি? হ্যাঁ, তাইতো। তা' নাহলে ছাদের কার্ণিশে বুক ঠেকিয়ে কেউ কি এতক্ষণ উন্মনা হয়ে থাকে? কৈ এর আগে তো কোনদিন থাকেনি। ছাদে ওঠা তো আজ নতুন নয়। অনেকবার উঠেছে। কতবার যে উঠেছে তার হিসেব আছে কি? অসংখ্য অগুণিত বার।

এই অসংখ্য দিনের মাঝে কোনদিন তো এমন করে নিজেকে ভুলে যায়নি কেয়া। ঐ অগুণিত দিনের কোন একটি দিনেও স্নানের পরে প্রসাধন সারার কথা মন থেকে হারিয়ে যায়নি। আজ কেন এমন হল বুঝতে পারল না কেয়া। কারণটা খুঁজে পেল না কিছুতেই। পড়ন্ত বিকেলের রোদ ধূপছায়া সন্ধ্যের অন্ধকার রোজই তো দেখে কেয়া। কৈ, এমন করে তন্ময় হয়ে এমন আত্মহারা হয়ে তো কোনদিন দেখেনি। এমন করে তো কোনদিন মন উদাস হয়নি।

আজ যায়-যায় বিকেলের আলোয় ছাদের দড়িতে কাপড়খানা মেলে দিয়ে

নিচে নামবার জন্য সি'ড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে ও কি ভেবে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল একবার। শ্রাবণের আকাশ। তবু স্বচ্ছ নীল, মাঝে মাঝে দু' এক টুকরো পে'জা তুলোর মত সাদা মেঘের আভাস। তাও স্থির, অচঞ্চল। একটা শংখচিল উড়ছিল। উড়ে বেড়াচ্ছিল বলা যায় না। পাখা মেলে স্থির হয়ে ছিল। এত উধের্ব যে, একটা বিন্দুর মত দেখাচ্ছিল। ভাল করে তাকিয়ে না দেখলে বোঝা যায় না যে ওটা শংখচিল। হয়তো সেই বিন্দুটির হদিশ পাওয়ার লোভেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। ভুলে গিয়েছিল যে ওর প্রসাধন সারার কাজ বাকী।

নীচে নেমে আসার পরও মনে পড়েনি। মনে পড়ল আলো জ্বালাতে। দ্রুত পায়ে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মুখের উপর পাউডারের হাল্কা প্রলেপ আর কাজলের রেখায় আয়ত চোখ দুটিকে করে তুলল দীর্ঘায়ত। কপালের কেন্দ্রবিন্দুতে কুমকুমের ফোঁটা অনুপম লাবণ্যে ঝলমলিয়ে উঠল। আয়নার মধ্যে প্রতি-ফলিত মূর্তি দেখে নিজেই চমকে উঠল কেয়া। এত রূপ ওর দেহে, এত লাবণ্য ওর চোখেমুখে?

এ মুহূর্তে যদি সে মানুষটা থাকত তাহলে? মুখের দু' একটি কথায় অন্ততঃ প্রশংসা করত। একটু স্তুতি। কিন্তু কি অদ্ভুত লোকটা, সন্ধ্যার হাল্কা অন্ধকার রাস্তার কাল পীচের মত ঘন হয়ে উঠেছে বাইরে। তবু ফিরবার নাম নেই লোকটার। নিজের রূপ দেখে যে মনটা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল একটুক্ষণ আগে, সে মনটাই এবার যেন ঝিমিয়ে পড়ল। নিস্তেজ হয়ে গেল—হতাশ মনের প্রতিক্রিয়ায়। প্রশংসা করার লোকটাই যদি না আসবে কি হবে এই সযত্ন প্রসাধনে। কি হবে রূপকে অপরূপ করে?

তাহলে কি ব্যর্থই হয়ে গেল এই সন্ধ্যাটা! এত ব্যস্ততা এত আয়োজন সব বৃথা? না, বৃথা নয়। আসবে এক্ষুনি। হয়তো কোন কাজে আটকা পড়ে গেছে, হয়তো কোন বন্ধুর পাল্লায় পড়েছে। না হলে ওর নিজেরই কি তাগিদ কম বাড়ি ফিরে আসার? বাড়ি এলে তো শুধু কেয়ার কাছে বসে গল্প, শুধু কথা। একটু ছোঁয়া, একটু সান্নিধ্য, একটু চটুল রসিকতার জন্য কি লোকটাও কম উদ্গ্রীব।

বাইরে অস্পষ্ট একটা শব্দ হতেই আবার জানলায় এল কেয়া। সুইচ টিপে প্রবেশ পথের আলোটা জ্বালিয়ে দিল। উঁকি মারল পথের দিকে। কান সজাগ করল। না, কেউ আসেনি। হাওয়া বইছে বাইরে। উদ্দাম হাওয়া। একটা শুকনো পাতা উড়িয়ে এনেছে বাইরে। তারই শব্দ। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আকাশের গায়ে একটিও তারা নেই। তারার নিশানাও নেই। কে যেন ঘন কৃষ্ণ তুলির আঁচড়ে মুছে নিয়ে গেছে। এদিকে হাওয়ার দাপট—ঝড়ো হাওয়া। কেয়া আশ্চর্য হয়ে গেল। সে ভাবতেও পারেনি কয়েক মিনিটের মধ্যে আকাশের বুকে এত বড় পরিবর্তন ঘটে যাবে। কেন এমন হয় বুঝতে পারে না কেয়া। তবু বুঝবার চেষ্টা করল। কারণ খুঁজতে চাইল। কারণ খুঁজতে গিয়ে একটা ভাল উপমাও মনে এল কেয়ার। শ্রাবণের আকাশ তো নয় যেন মানুষের মন। এই খুশীর আলো—এই হতাশার কালছায়া। মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ বদল।

এই উপমাটা কার? নামটা মনে হতেই সারা দেহ শিরশিরিয়ে গেল কেয়ার। ন-বে-ন্দু। হ্যাঁ, নবেন্দুদাই-তো। নবেন্দুদা গল্প লিখতেন। লেখার চেয়েও বলতেন বেশি। আর বলার ভঙ্গিটা ছিল অপূর্ব। সুন্দর করে কথা বলতেন তিনি। আর অবাক হয়ে শুনতো কেয়া। সেই নবেন্দুদা। সেই নবেন্দুদার উপমা।

টিপ টিপ করে জল পড়ছে। হাওয়ার মাতামাতিও চলছে সমানে। দু'চার ফোঁটা ছিটকে এসে ওর কপালে মুখেও লাগল। জানলা বন্ধ করে দিল কেয়া। চোখেমুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। এতক্ষণ ধরে প্রসাধন সারল ও, আর জলের দু' চারটে ফোঁটা কিনা সে প্রসাধন নষ্ট করে দিল?

আয়নার সামনে এল কেয়া। আয়নার ভেতরে ওর যে প্রতিবিম্ব সেটা ভাল করে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। না, তেমন কিছু নয়। ছোট্ট দু' তিনটে ফোঁটা। রুমালের আলতো স্পর্শে জলের ছাপটা তুলে নিল। পাউডারের পাফটা বুলিয়ে নিল তার উপর। চোখের নিচে কাজলের টান, কপালের মাঝখানে কুমকুমের ফোঁটা। সব ঠিক আছে। নিখুঁত।

কিন্তু কি হবে নিজেকে এত সাজিয়ে। যে মানুষটি সামনে থাকলে বলতো তোমাকে তো অদ্ভুত ভাল মানিয়েছে কেয়া! কিংবা উচ্চারণ করতো একটি অব্যয় ঃ বাঃ। অথবা অপূর্ব! সে মানুষটি তো এল না। আসবেও না এখন। আসতে পারবে না। এই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে আসবে কি? অসম্ভব। বৃষ্টির ফোঁটা নয় এখন—ধারা-বর্ষণ শুরু হয়েছে।

তবু কেন এ আয়োজন? কেন এ সজ্জা? মনটা একেবারে দমুড়ে গেল সীমাহীন হতাশায়। দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কয়েক পা গিয়ে বিছানার

উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। সারা দেহ টান টান করে।

এই মুহূর্তে যদি লোকটা আসত? তাহলে—ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা দুলে উঠল। দেহের শিরায় উপশিরায় অনুভব করল অব্যক্ত পুলকের শিহরণ।

না, আসতে পারবে না লোকটা। বৃষ্টির ঝমঝমানি আরও বেড়েছে। হাওয়ার তোড়ও। জানলায় খটখট খটাখট আওয়াজ উঠছে। আবার উঠে বসল কেয়া। পায়ের গোড়ালির দিকে শাড়ির প্রান্ত টেনে দিল, দু'এক জায়গায় কোঁচকে যাওয়া শাড়ি আঙুলের চাপে ঠিক করে নিল। উঠে গিয়ে দরজাটাও বন্ধ করে দিয়ে এল। কেউ যখন আসবে না দরজা খোলা রেখে লাভ কি? কিন্তু, দরজা বন্ধ করেই বা কি করবে কেয়া? ঘরের চারিদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিল। কোথায় কি আছে দেখে নিল। সুন্দর করে সাজানো ঘর, নিখুঁত। অগোছালো ঘর কেয়ার ভাল লাগে না। মেহগিনি কাঠের আলমারীর সামনের দিকটাই কাচের আড়াল। সেই আড়াল দিয়ে দেখা যাচ্ছে একখানা বই। আলমারী খুলে বইখানা হাতে নিল কেয়া। চেয়ারে এসে বসল। মলাটটার উপর আলতোভাবে হাত বুলোলো। সঙ্গে সঙ্গে উন্মনা হয়ে গেল কেয়া। স্মৃতির সমুদ্র টলে উঠল। সমস্ত অতীতটাই মুখর হয়ে উঠল। বইখানা উপহার হিসেবে পেয়েছিল সকলের সামনে। সকলের জ্ঞাতসারে। অজ্ঞাতেও একটা জিনিস দিয়েছিল। বাঁ হাতের তর্জনীটা তুলে ধরল কেয়া। চকচক করছে নবেন্দুদার দেওয়া সেই আংটি। আঙুলটাকে জড়িয়ে ধরে আছে। আদর করছে, সোহাগ করছে। একদিন বা দু'দিন নয়—দীর্ঘ তিন বছর ধরে। তর্জনীটাকে তুলে ধরল চোখের সামনে। ভাল করে দেখল, ডান হাতের আঙুলে বুলোলো তার উপর। সোহাগভরে স্পর্শ নিল। নাকের কাছেও নিয়ে গেল একবার। কিন্তু কেন? সে কি ঘ্রাণ নেবার লোভে, সৌরভ পাবার তৃষ্ণায়। কিন্তু সোনার তো প্রাণ নেই। এটা তো গেল যুক্তির কথা। কেয়া কিন্তু পেল। নবেন্দু যখন রোদ ভেংগে ওর কাছে এসে দাঁড়াত তখন যেন কি রকম একটা ঘ্রাণ ওর নাকে লাগত। দেহে মনে মাদকতা ছড়াত। দীর্ঘ তিন বছর পরেও যেন তেমন একটা ঘ্রাণ ওর মনকে আচ্ছন্ন করল। এই নির্জন মুহূর্তে, এই বৃষ্টি-ঝরা রাতে সেই নবেন্দুদা যদি আসত—

কী আনন্দই না হত। ওকে এই পোশাকে দেখে খুবেই খুশী হত। উৎফুল্ল হত। তিনি নিজে খুব সেজেগুজে থাকতেন না কিন্তু অপরের সাজগোজ পছন্দ করতেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশংসা করতেন। সব চেয়ে বেশি পছন্দ করতেন হাল্‌কা কমলালেবু রং। কেয়া নিজেও সে রং-এর শাড়ি বেশি পরতো। ওকে নাকি হাল্‌কা রং-এর শাড়িতে বেশি মানায়। সুন্দর দেখায়। এ কথাটি ওর ঘরের মানুষটিও স্বীকার করেছিল।

কি আশ্চর্য! আজও সে রং-এর শাড়িই পরেছে কেয়া। এবং ইচ্ছে করেই। তাহলে কি নবেন্দুদা আসবেন আজ? এতদিন পরে যখন হঠাৎ মনের মধ্যে হাজির হয়েছেন, চোখের সামনেও কি তাহলে হাজির হবেন সশরীরে? আসেননি কতদিন? কতকাল হয়ে গেল চোখের দেখা দেখেছে। দু' বছর। না, আরও বেশি। বিয়ের মাস তিনেক পর একবার এসেছিলেন। বাড়ির কর্তা নবেন্দুদাকে অভ্যর্থনাও জানিয়েছিলেন সসম্মানে। কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল কেয়া বুঝে উঠতে পারে না আজও।

কি একটা কাজে যেন ঘরের মানুষটি বাইরে গিয়েছিল। কথা হচ্ছিল ওদের মধ্যে। কেয়া আর নবেন্দুদা। খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া। নিতান্ত গতানুগতিক আলাপ-আলোচনা। সে আলোচনার অবকাশেই নবেন্দুদা প্রশ্ন করেছিলেন হঠাৎ : শাড়ির এই রংটা এখনও ভাল লাগে বুঝি?

লজ্জার ছোপ লেগেছিল কেয়ার মনে। আনত হয়েছিল আপনা থেকে। উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিল : এ ভাল লাগা তো ক্ষণিকের নয় নবেন্দুদা—চিরকালের, তাই ছাড়িনি আজও।

—কারণ?

—কারণ আমি জানি না।

—কারণটা খুঁজে দেখনি বুঝি?

—না, তবে মনে হয় আমার প্রথম যৌবনের রঙ মিশে গিয়েছিল এক শিল্পীর রঙের সঙ্গে—

—তাই নাকি? মুহূর্তের মত নির্বাক থেকে এই দুটো শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন নবেন্দুদা।

আবার খানিকক্ষণ নিশ্চুপ থেকে তারপর একসময়ে মুখ তুলে বলেছিলেন : আগে তোমার স্বাধীনতা ছিল পছন্দমত শাড়ি কেনার এখন তো নেই। উত্তর দিতে একটুও দেরি করেনি কেয়া। বলেছিল : এখানেও সে সুযোগ পাচ্ছি কারণ ইনিও পছন্দ করেন হালকা কমলালেবু রং।

কথাটা শেষ হবার আগেই দরজার সামনে দেখা গিয়েছিল কর্তার মুখ। শুধু কথার শেষটাই তাঁর কানে গিয়েছিল হয়তো। তাতেই যেন একটু সজাগ দেখিয়েছিল লোকটাকে। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল দুটো চোখের তারা। একবার কেয়ার মুখ আর একবার নবেন্দুদার চোখে কি সন্ধান করে ফিরেছিল তার শানিত দৃষ্টি। হাতের মুঠো আলগা করে সিগারেটের প্যাকেটটা রেখে দিয়েছিল টেবিলের উপর। তারপরেও চুপ হয়ে ছিলেন কয়েকটা পলক, যদি ওরা আবার কথা শুরু করে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলেনি আর। আগের প্রসঙ্গ কেউ তোলেনি। না কেয়া, না নবেন্দুদা। নিজের হাতেই সিগারেট এগিয়ে দিল সুরজিৎ। নবেন্দুদাও নিয়েছিলেন, কথা-বার্তা হয়েছিল ওদের মধ্যে, কিন্তু তেমন জমেনি। কোথায় যেন কি একটা হয়ে গেছে! কি যেন ঘটে গেছে।

সন্ধ্যার আগেই চলে গিয়েছিলেন নবেন্দুদা। কেয়া আশা করেছিল সুরজিৎ ভদ্রতার খাতিরে হলেও নবেন্দুদাকে আবার আসার জন্যে অনুরোধ জানাবে, কিন্তু তা করেনি সুরজিৎ। শেষ পর্যন্ত কেয়াই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সুরজিৎকে। কানে কানে বলেছিল : আবার আসবার জন্য বললে না?

কেমন এক ধরণের দৃষ্টি নিয়ে সুরজিৎ বলেছিল : সে তো তোমার কাজ। তুমিই তো বলবে।

কথাটার মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে, কটাক্ষের তীক্ষ্ণতা আছে তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল কেয়া। তাই কথা বাড়ায়নি। চুপ করে গিয়েছিল। নবেন্দু-দাও হয়তো আঁচ করতে পেরেছিলেন কিছু। সুরজিতের মনের খবর হয়তো বা কিছুটা পেয়েছিলেন। সে কারণেই তো এতদিনের মধ্যে একবারও আসেননি নবেন্দুদা। একবার চোখের দেখাও দেখতে এলেন না।

এলে কি ভাল হত? নিজের মনকেই প্রশ্নটা করল কেয়া। না, ভাল হত না। বরং না আসাটাই ভাল হয়েছে। কেয়া বেঁচে গেছে। এলে কি অঘটন ঘটে যেত কে জানে? সেই অঘটনের কথাটা ভাবতে গিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার কেঁপে উঠল কেয়ার। ভয়ে অসাড় মনে হল সারা দেহ। হাত পা অবশ মনে হল। হৃৎপিণ্ডটা দুলতে লাগল বুকের ভেতর। ভয়ে, আতঙ্কে।

নবেন্দু চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই সুরজিৎ একখানা শাড়ি হাতে করে ঘরে ঢুকেছিল। কেয়া জানতো ওর জন্যে কেনা হয়েছে শাড়িখানা, ওরই উদ্দেশ্যেই আনা। তবু বোকার মত জানতে চেয়েছিল :—কার জন্যে? কোথায় বিয়েটিয়ে আছে নাকি?

—না,

—তবে?

শাড়িখানা ওর দিকেই বাড়িয়ে ধরেছিল সুরজিৎ উত্তরের পরিবর্তে।

—কার?

—তোমার গো।

হাত বাড়িয়ে শাড়ি নিয়েছিল কেয়া। ভাঁজ খুলতে খুলতে জানতে চেয়েছিল : আমার জন্যে এ রং নিয়ে এলে কেন?

—এ রং খারাপ কি? আকাশী রং তো ভালোই।

—খারাপ তো আমি বলিনি। আমার কিন্তু বেশী পছন্দ হালকা কমলালেবু রং।

—সব সময় তোমার পছন্দ নিয়ে থাকলে তো চলবে না, সংসার যখন দুজনের আর একজনের পছন্দকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

—কিন্তু, হালকা কমলালেবু রং তোমারও তো ভাল লাগতো আগে, একথা বহুবার বলেছ—

নিজের জালে নিজে জড়িয়ে একটু-ক্ষণ নীরব থাকল সুরজিৎ। বুঝি বা নিজের মনের রাজ্যে উত্তর খুঁজে বেড়াল।

এক সময় বলল ঃ বন্ধুরা পছন্দ করে দিলে কিনা......

—তাই বল ....

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সুরজিৎ।

কেয়াও মেনে নিয়েছিল। হয়তো সুরজিতের কথাই সত্যি। বন্ধুরা ধরে বেঁধে কিনিয়েছে। কাপড়ের জমি ভাল। ঠাস বুনুনি, রংটা তো খারাপ নয়। ওরা কি করে জানবে যে কেয়া অন্য রং পছন্দ করে।

ওর ভুল ভাঙল আরও কিছুদিন পর। সেবারও কাপড় এল অন্য রং-এর, তার পরের বারও। কেয়া বুঝল তর্ক করে লাভ নেই। রং-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করাও হবে বোকামী। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপই বেরিয়ে আসবে হয়তো। ও বিষয় নিয়ে আলোচনা চালালে তিক্ততাই বাড়বে। সংসার জীবনে অশান্তির বীজ ছড়িয়ে লাভ কি? ঐ প্রসঙ্গ চাপা দেওয়াই ভাল। অতীতকে হারিয়ে যেতে দিয়েই স্বস্তি।

এই বোধ ওর ছিল বলেই হালকা কমলালেবু রংকে এড়িয়ে গেছে। অনেকগুলো ঐ রং-এর শাড়ি থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার করেনি কেয়া। যত্ন করে রেখে দিয়েছিল, বাক্সবন্দী করে। সে তো কতদিন হয়ে গেল। ভুলেই গিয়েছিল কেয়া। আজ হঠাৎ কেন যে সেই শাড়ি বের করে পরল ভেবে পেল না। কারণ খুঁজে পেল না। তাহলে কি সেই ভাল লাগার রং আজও মন থেকে মুছে যায়নি? না—যায়নি। ভুলে যদি এ রং-এর শাড়ি উঠে আসত একখানাই আসত। আলনায় আজ যে তিনখানা শাড়ি বের করে ঝুলিয়ে রেখেছে সবকটাই এ রং। নবেন্দুদা কি আসবেন আজ? তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য কি এ আয়োজন। না, তিনি আসবেন না আর। অন্য প্রকৃতির লোক নবেন্দুদা, ভাবপ্রবণ। একটি কথার আঘাতে এ বাড়ি কেন এ জগৎ থেকেও চলে যেতে পারেন। কেয়া জানে লোকটাকে। কতকটা চেনে। কোথায় আছেন কে জানে? কি করছেন তাই বা কে জানে? মনের মধ্যে অনেক প্রশ্নের তোলপাড়। অনেক ভাবনা।

ভাবতে ভাবতে বহুপড়া সেই বইখানার পাতা খুলল কেয়া। কিন্তু পড়া হল না। পাতা খোলাই সার হল। মনটা যেন কি রকম হয়ে আছে। কিছুতেই পড়ার মধ্যে বসতে চাইছে না। কেমন যেন উড়ো উড়ো ভাব। চঞ্চল। বইটার উপরে মাথা রেখে নির্জীবের মত পড়ে রইল কিছুক্ষণ। এলোমেলো আরও অনেক ভাবনা ভিড় করে আসতে লাগল ওর মনের মধ্যে।

সব ভাবনা যখন থিতিয়ে এল তখন মনে হল—মনে হল একটি কথা শুধু। একটি কামনা, বাসনার একটি ছোট্ট কুঁড়ি ফুটল ওর মনের সরোবরে। এ মুহূর্তে যদি সুরজিৎ আসত, যদি কাছে থাকত লোকটি তাহলে কত ভাল হত, কত মধুর লাগত মুহূর্তগুলো।

এমন সময়ে—হ্যাঁ, এমন সময়ে দরজার কড়া নড়ে উঠল। ঝনঝন শব্দে। কেয়া সরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। এসে গেছে লোকটা। রুমালের ছোঁয়ায় মুখের উপর থেকে বাড়তি পাউডার তুলে নিল। আবার দরজার কড়া নড়ল। কেয়া ছুটে এল দরজায়। খিল খুলল, হ্যাঁ, সুরজিতই। দুটো চোখে চোখ রেখে সাদর অভ্যর্থনা। দুটো অতলস্পর্শী চোখের তারায় রাজ্যের বিস্ময়ও ফুটে উঠল। বললে ঃ ভেতরে এসো।

হাসি হাসি মুখে সুরজিৎ ভেতরে পা রাখল।

তারপর হঠাৎ-ই বদলে গেল ওর দৃষ্টি, একটা অবরুদ্ধ ক্রোধে ফেটে পড়বার আগে দম নিয়ে কঠিন গলায় বলল ঃ আবার, আবার তুমি এই রঙের শাড়ি পরেছ!

কেয়া কাঁপল না, বিচলিতও না—আশ্চর্য শান্ত এবং স্বাভাবিক দেখাল ওর চেহারা। শাড়ির কথা তার এতক্ষণ মনেই হয়নি। কিন্তু কেন? ওই রঙটা ওর শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে একাকার হয়ে গেছে বলেই হয়তো। এখন আর আলাদা করে ভাবতে পারে না, আলাদা করে দেখতে পারে না।

কেয়া উত্তর দিতে গিয়ে বলল ঃ জীবনে একটি রঙ ভালোবাসি সেটি মিথ্যে নয়। ভয় দেখিয়ে মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে সে রঙকে তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু একটি রঙকে ভালোবাসি বলে জীবনে আরও একটি রঙকে ভালোবাসতে পারব না, এ কথা তোমার কেন মনে হল?

সুরজিৎ কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে পারল না। হঠাৎ তার মনে হল সে যেন একটা হিংস্র বাঘের মতো দাঁড়িয়ে আছে তার নিজের ভেতরে। প্রাণপণ চেষ্টায় ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে সে বলল, বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু!

আর্য নামটি কোত্থেকে এল বলতে পারেন?

এসম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে বিস্তর জল্পনাকল্পনা চলেছে। একদল অরি+অন=আর্য প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বলে মনে করেন। অরি অর্থ নিশ্চয়ই জানেন শত্রু। ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানেন? এই আর্যেরা এদেশে এসে আর্যেতর জাতিকে রাক্ষস দস্যু ইত্যাদি বলে অভিযুক্ত করেছিল। ওরাও প্রতিশোধ নিল ওদেরকে 'অরি' বলে। মজার ব্যাপার হচ্ছে অধুনা আর্য শব্দটি ভদ্রের সমার্থক। শব্দতত্ত্বের নিয়মে শব্দের আমূলে অর্থ পরিবর্তনের এটা একটি নজির। কিন্তু আমার মনে হয় এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি এবং ঠিক কোন শতাব্দী থেকে আর্য শব্দটি দিয়ে একটি বিশেষ শ্রেণীকে অভিহিত করা আরম্ভ হয়েছিল জানতে পারলে বাধিত হই।

প্রণব বসু, সন্তোষপুর, যাদবপুর।

* * *

আজকাল প্রায় কোনো বই-ই উৎসর্গহীন ভাবে প্রকাশিত হয় না। উৎসর্গপত্রটির কারণ কিন্তু আমাদের কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। আগের দিনে ধনী পৃষ্ঠপোষকের সাহায্য ছাড়া দরিদ্র গ্রন্থকারদের পক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ অসম্ভব ছিল, তাই তাঁরা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ "জ্ঞানবীর", "দানবীর" পৃষ্ঠপোষকদের গ্রন্থ উৎসর্গ করতেন। কিন্তু পশ্চিমী দেশে এই পুস্তক উৎসর্গ প্রথাতো অনেকদিন থেকেই প্রচলিত। আমাদের দেশের মত অর্থনৈতিক সমস্যায় ত আর পশ্চিমী লেখকরা কাতর নন, তবু তাঁরা বিশেষ বিশেষ লোককে গ্রন্থ উৎসর্গ করেন বা করতেন কেন? আবার ইদানীং কালে মাশ একটা কবিতাও কখনো কখনো কারো নামে উৎসর্গ করা হয় লক্ষ্য করেছি। হয়ত প্রিয়জনকে বিখ্যাত করার প্রচেষ্টা থেকেই এই উৎসর্গ প্রথার জন্ম। কিন্তু তাই যদি হয় তবে অনেক বইয়ের উৎসর্গে দেখেছি কোনো বিশেষ কাউকেই বইটি দেয়া হয়নি। যেমন "যাঁরা আমার বই পড়তে ভালবাসেন না তাঁদের দিলাম", "আগামী দিনের মানুষদের" অথবা "অচেনা সেই মেয়েকে" প্রভৃতি। এ সমস্ত দেখে মনে হয় শুধুমাত্র প্রিয়জনকে স্মৃতি-গ্রথিত করবার জন্যেই যে লেখকরা বই উৎসর্গ করেন তা নয়, অনেক সময় নিজের ব্যক্তিত্বকে পুস্তকের প্রারম্ভে পাঠকদের আগাম উপহার দেন। শুধুমাত্র প্রিয়জনের দিকে লক্ষ্য রাখলে বইয়ের নামকরণই করতে পারতেন লেখকরা যেমন বাড়ির নাম রাখা হয়। গ্রন্থের নাম তখন হয়ত এই রকম হত: "মা'র নামে এই বইয়ের নাম মমতাময়ী রাখা হল।"

যাইহোক এবিষয়ে কেউ কি কিছু জানাতে পারেন? যেমন কোন দেশে প্রথম বইয়ের উৎসর্গ প্রথার প্রচলন হয়? বাংলা ভাষায় প্রথম কোন্ পুস্তকটি উৎসর্গীকৃত হয়?

নরেন চক্রবর্তী, চক্রবেড়িয়া নর্থ, কলিকাতা।

* * *

আপনাদের "জানাতে পারেন" বিভাগটি খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বাস্তবিক এমন অনেক অদ্ভুত জিজ্ঞাসা সময় সময় মনের মধ্যে উত্থিত হয়, যাহার মীমাংসা সহজে হয় না। যেমন ধরুন লক্ষ্য করিয়াছি কলিকাতা কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার ডাস্টবিনগুলিতে লেখা থাকে, "সাবধান! ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে"। এখন জিজ্ঞাস্য যে এই সাবধানবাণীটি কাহার বা কাহাদের উদ্দেশ্যে লিখিত? ময়লা সাধারণতঃ ঘাঁটে কাগজ কুড়োনি যারা তাহারা কি প্রত্যেকেই অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন যে বিজ্ঞপ্তিটি পড়িতে পারে? অবশ্য দুঃশীল বালক বালিকাদের উদ্দেশ্যেও সাবধান বাণীটি প্রযোজ্য হইতে পারে কারণ উল্লিখিত সাবধান বাণীর শেষ ক্রিয়াপদটি "পাইবে" পাইবেন নহে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে আজ পর্যন্ত কাহাকেও ময়লা ছুঁবার জন্য শাস্তি দেওয়া হইয়াছে কি? এবং জানিতে ইচ্ছা করে কলিকাতা কর্পোরেশনের বিধানে ময়লা ছুঁইবার জন্য কি ধরণের শাস্তি নির্দিষ্ট আছে।

বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, কলিকাতা।

> আমাদের চারপাশে এমন অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যা বিস্ময়ের ত বটেই অনুসন্ধিৎসারও উপাদান হয়ে দাঁড়ায় সময় সময়। পাঠকদের পক্ষ থেকে যে কোন রকম অনুসন্ধিৎসাপত্র এই বিভাগে প্রকাশিত হবে এবং উপযুক্ত উত্তর পেলে তাও উত্তরদাতার নাম ঠিকানাসমেত প্রকাশ করা হবে। **সম্পাদক—অমৃত**

* * *

সম্প্রতি আমি মৃত্যু নিয়ে ভীষণ ভাবিত আছি। কারণটা আর কিছু নয়, সাম্প্রতিক বিমান দুর্ঘটনায় যে একত্রিশ জন লোক মারা গেছেন তাঁদের চিন্তা নিয়তই আমাকে আক্রমণ করছে। আর কয়েকদিন বাদে আমাকেও একটা বিশেষ কাজে উড়ো জাহাজে চড়তে হবে এবং ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে বুঝতেই পারছেন একেবারে যমের কাঁধে চড়া। তাড়াতাড়ি করে মোটা টাকার একটা ইন্সিওরেন্সও করিয়েছি, আমার পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। অবশ্যই মৃত্যু চিন্তা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, এবং বিষয়টি ঠিক একটি সাপ্তাহিক কাগজ মারফৎ ঘোষণা করবার মত নয়। কিন্তু আমার এই পত্রাঘাতটি ভিন্ন কারণে। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিমান দুর্ঘটনার খবরটা পড়া মাত্রই চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, "জানিস সাংঘাতিক একটা প্লেন অ্যাকসিডেন্টে একেবারে একশো একত্রিশ জন জলজ্যান্তো লোক পটল তুলেছে!" কথাটা শোনামাত্রই আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। না, ঠিক একশো একত্রিশ জনের শোকে নয়। আমি শোকগ্রস্ত হয়েছিলাম কারণ আমার পকেটে তখন সদ্য কেনা প্লেনের চেকবই-টিকিটটা গড়াগড়ি করছিল এবং পটল দ্রব্যটি আমার দু-চোখের বিষ। পটল আমি খেতে ভালবাসি না, আমার সামনে কেউ পটল খেলে আমি নিদারুণ একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ি। আমার বাড়িওয়ালার ছেলের ডাকনাম পটল, ছেলেটি সুবোধ শান্ত, কিন্তু তাকে তার নামই আমার কাছ থেকে দূরে রেখেছে। না শুধু দূরেই না তার সঙ্গে আমার ব্যবহারিক সম্পর্কও ভদ্রজন সমক্ষে বলবার মত নয়। এই পটলগত কারণেই আমাদের অচিরে বাড়িটাও হয়ত ছাড়তে হবে বলে বাবা শাসিয়েছেন।

যে কোনো বাঙালীর মতই মরতে আমি ভয় পাই না, ("মারী নিয়ে ঘর করি" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) আমি ভয় পাই আমি মরার পর হঠাৎ কেউ যদি আমার বন্ধুর গলায় বলে ওঠে, "বারীন পটল তুলেছে।" পটলকে মৃত্যুলগ্ন করার একান্ত বিরোধী আমি। আর লক্ষ্য করে দেখেছি হঠাৎ মারা গেলেই লোকে মৃত্যুর সঙ্গে অশোভন পটল ফলটিকে যুক্ত করে। আমি ভেবে কিছুতেই বার করতে পারিনি যে, মানুষের জীবনের একটি পবিত্র ব্যাপারের সঙ্গে এই নিকৃষ্ট দ্রব্যটির সংযোগ কি ভাবে ঘটল।

অমৃতের পাঠকবৃন্দের মধ্যে কেউ কি আমাকে জানাতে পারেন "পটল তোলা"র কৃষিকর্মটি মৃত্যুযুক্ত হল কেন এবং কবে থেকে? "শিঙে ফোঁকা" এবং "অক্কা পাওয়া"র বিষয়েও জানতে পারলে নিশ্চিন্ত হই।

বারীন ঘোষ, যতীন দাস রোড,
কলিকাতা-২৯

জাগরী পত্রিকার লেখক ও সহকারী সম্পাদক হল সৌরী, আর লেখিকা হল শর্বরী। পত্রিকাটি খুব বেশী দিনের নয়। লেখক লেখিকাও নামকরা নয়। কিন্তু তাহলে কি হবে কাগজটা হুহু করে বাজার জাঁকিয়ে বসল। সৌরী সেন-এর লেখা অন্য পত্র-পত্রিকাতেও বেরোত। শর্বরী সোম-এর বিশেষ নয়। সৌরীর লেখা শর্বরীরও ভাল লাগত। সেই ভাললাগার কথাও পত্রিকা মারফতেই জানতে পারল সৌরী। তারপর শুরু হল পত্র বিনিময় এবং লেখার সমালোচনা। সৌরী লেখে, আপনার লেখা তো বেশ ভালই, ফেরত পেয়ে দুঃখিত হচ্ছেন কেন? এরপর থেকে শর্বরীর বেশীর ভাগ লেখাই আগে যায় সৌরীর কাছে, সে একটু অদল বদল করে দেয় জাগরীতে পাঠিয়ে। আরও নাম হল শর্বরী সোম-এর। এখন অন্য পত্র-পত্রিকাতেও তার লেখা নেয় সাগ্রহে। শর্বরী খুবই কৃতজ্ঞ।

ও আবার গল্প ছাড়া লিখতেই পারে না। প্রবন্ধ তো মোটেই আসে না ওর হাতে। যখন লেখে মনে ভেবে নেয় সৌরী বসে আছে ওর সামনে। সুন্দর একটা মুড আসে ওর মনে। কথার পর কথা সাজিয়ে বুনে চলে গল্পের জাল। তারপর সেই গল্প সৌরীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে উৎকণ্ঠায় দিন কাটায়। একটা মন-গড়া চেহারা তৈরী করে নিয়েছে সৌরীর, অবশ্য ও সেই ধরণের চেহারাই পছন্দ করে। আসলে ওর গল্পের নায়কের মত দেখতে সৌরী। শ্যামবর্ণ উঁচু লম্বা দোহারা চেহারা। পেশীপুষ্ট অথচ কমনীয় গঠন। মাথাভরা কোঁকড়া চুল, ভাবে ভরা দুটি চোখ, ঈষৎ লম্বা নাক। একটু স্থূল ওষ্ঠ আর তাতে আছে প্রাণ-মাতান হাঁসি। সত্যি সব সময় ও ভাবে সৌরীকে। ওর ধারণা যাকে একান্ত মনে চিন্তা করা যায়, তারও মনে নিশ্চয়ই এর প্রতিক্রিয়া হবে, হতে বাধ্য। অবশ্য তেমন একটি অনুভূতিশীল মন যদি তার থাকে। আর সৌরীর তো তা আছেই, না হলে অমন সুন্দর লিখতে পারে? বিশেষ করে রাত্রে শুয়ে শুয়ে ও চোখ বন্ধ করে একমনে ভাবতে থাকে সেই তার অদেখা বন্ধুকে, আর নিজের আত্মাটা পাঠিয়ে দেয় তার কাছে, খুব কাছে।

এই তপস্যা বিফলে গেল না। কিছু দিনের মধ্যেই সাড়া এলো সৌরীর কাছ থেকে। ওর সেই 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' গল্পটির শেষটা সৌরীর পছন্দ হয়নি। ওর ইচ্ছে শেষের দিকে নায়ক ও নায়িকার মিলন করিয়ে দিক শর্বরী। এত দেরীতে তাদের দেখা করান হল কেন? এতে দু'পক্ষকেই অধীর অপেক্ষা করতে হল নাকি? আর এই অধীরতা বড় কষ্ট-কর। আবার পরেরবার আর একটি গল্প পেয়ে লিখল নায়িকার নামটা ঠিক যেন নায়কের নামের সঙ্গে মানাচ্ছে না। নিজেই অত সুন্দর একটা মিষ্টি নাম নিয়ে বসে আছেন তাই বোধহয় নায়িকার নাম খুঁজে পাচ্ছেন না। সোমেনের সঙ্গে শর্বরী নামটা কিন্তু সত্যি বেশ খাপ খেয়ে যেত।

ভারী ইচ্ছে করে সৌরীর অন্ততঃ একটিবার শর্বরীকে দেখতে। যার লেখার হাত এমন মিষ্টি সে দেখতে কখনই কুচ্ছিত হতে পারে না। কি সুন্দর ভাব, কত চমৎকার ভাষা। গল্প তো নয় যেন গান। ওর লেখা গল্প শেষ করার পরও মনে কিছুক্ষণ তার রেশ বাজতে থাকে। মনে হয় সুন্দর একটি মিষ্টি মেয়ে এইমাত্র তার কাছ থেকে উঠে গেল, রেখে গেল তার কথার ফুলঝুরি। সত্যিই কি আর ও সব গল্প বদলায়? বদলান তো সম্পাদক। বাহবাটুকু নেয় ও। তবে হ্যাঁ কি ধরণের গল্প এ'দের পছন্দ তার একটি আন্দাজ দেয়ও। কি করে এখন দেখা করা যায় শর্বরীর সঙ্গে, সে থাকে তো সেই সুদূরে প্রবাসে, এলাহাবাদে। আর ও থাকে কলকাতায়। এভাবে আর কতদিন চলবে, সত্যি 'ক কোনদিনই ও দেখতে পাবে না ওর সেই অদেখা পরিচিতাকে। কিন্তু কেমন যেন ওর মনে হয় আছে, সে ওর বড় কাছা-কাছিই আছে। কেন এমন হয়? তাই শর্বরী একটা গল্প লিখলে ও তারপর যে গল্পটা লেখে সেটা যেন খানিকটা তার উত্তরের মতই শোনায়। ততদিন বেশ

ভালই লাগত। কেমন যেন একটা নেশার আমেজ লাগত। যেমন গান হয় প্রেমের সহায়। গানের পর গান গেয়ে যেমন একে অন্যকে তার মনের ভাব প্রকাশ করে, তাদের সেটা হয়েছিল গল্পের মাধ্যমে। কিন্তু আর একটু পেতে ইচ্ছে করে শুধু এইটুকুতেই মন ভরছে না। সেকথা এবার প্রকাশ করেই লেখে ও শর্বরীকে। আর লুকিয়ে ছাপিয়ে কি লাভ? একেবারে তুমিতেই নেমে যায়। লেখে কবে তুমি আসবে? কোনদিনই কি তোমাকে দেখতে পাব না?

উত্তর আসে তেমনি মনের উদ্বেলতায় ভরা। শর্বরী লিখেছে, আমিও কি অধীর হইনি একটিবার তোমাকে দেখার জন্য। কিন্তু কি করব আমি তো স্বাধীন নই, চতুর্দিকে আমার বাধা। তবু আমি আমার চিন্তার মধ্যে দিয়ে তোমাকে আমার কাছে পাই। আর তার দরুণ হয়েছে কি আমি আর কিছুই লিখতে পারছি না। বহু কষ্টে একটি গল্প পুজা-সংখ্যার জন্য দাঁড় করিয়েছি। তবে দেখি যদি ভগবান সুযোগ করে দেন, দিদির বিয়েতে কলকাতা যেতে পারি। তোমাকে আগে থেকে জানাব। স্টেশনে এসো, দেখা হয়ে যাবে, কেমন?

তবু খানিকটা ব্যবধান ঘুচেছে। দুজনে দুজনের মন জেনেছে। কিন্তু হয়নি চারিচক্ষুর মিলন। দুজনেরি মনে আশঙ্কা আছে, কি জানি কেমন বা দেখতে? আবার মনে হয় যেমনই হোক সে তার আপনার; একান্ত আপনার। শর্বরী ভাবে আমার মন যেখানে গিয়ে যার মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে, যে আমাকে ঠিকমত চিনেছে, বুঝেছে, আজই আমি আমার জীবনের সাথী ব'লে বেছে নেব, কোন বাধাই মানব না। যদি আমাদের সেই ছোট্ট সংসারে অভাব থাকে তবু থাকবে না কোন অভিযোগ। এই মনে করে মন দিয়ে পড়াশুনা করে চলে সে। এবার এম-এ, পরীক্ষা দেবে।

ওদিকে সৌরী ভাবে যদি কখনো জীবনসঙ্গিণী করতেই হয় তবে নিজের সঙ্গে যার খাপ খায় এমন মেয়েকেই বেছে নেবে। নাহলে কোন রুঢ় বাস্তব-বাদী মেয়ে যদি তার বৌ হয়ে এসে রাতদিনই তার সংসারে চাল-ডালের হিসেব লেখে, আর অফিসের মাইনেটি পুরোপুরি হাতে পেলেই মনে করে সে এই সংসারের সম্রাজ্ঞী, তার বেশী কোন চাহিদাই যদি তার না থাকে, তাহলে সে কি করে দিন কাটাবে এই পরম গদ্যটিকে নিয়ে। নাঃ সে যাকে প্রিয়া বলে নেবে, তার মধ্যে থাকবে সুন্দর একটি রুচিশীল মন। করবে সে সবই, কিন্তু সবই তার পরশে হয়ে উঠবে পদ্য। তার কাজে, কর্মে, কথায় থাকবে ছন্দ।

নাঃ আর অপেক্ষা করে পারা যায় না। এমনি যখন মনের ভাব সৌরীর তখন মৃদু বসন্ত বাতাসের মত একটি চিঠি এলো শর্বরীর কাছ থেকে। সে লিখেছে, এতদিনে বোধহয় আমাদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। আসছে জুন মাসের তিন তারিখে ভেষ্টিবিউলে কলকাতা পেঁাছব। আমার অঙ্গে থাকবে সবুজ শাড়ী আর সঙ্গে থাকবে লাল বটুয়া, "দেখিব তুমি মোরে চিনিতে পার কিনা।" আজ তো মোটে মে মাসের আটাশ তারিখ, এ-মাসটা আবার একত্রিশে। উঃ এখনো এদিকে তিন, ওদিকে তিন, ছদিন, মানে একশো চুয়াল্লিশ ঘন্টা বাকি। কিন্তু দিনও যায়, সময়ও কাটে। এমনি করে এলো তেসরা জুন। কিন্তু ভেষ্টি-ভিউল যে আবার সেই বিকেল সাড়ে তিনটের আগে আসবে না। যাই হোক অফিসে ছুটি নিয়েছে সৌরী। নিউমার্কেট থেকে একরাশ ফুল কিনেছে। এযে তার পদ্য-প্রিয়া শর্বরী, সাহিত্যিকা। ফুলের মর্ম বুঝবে ঠিক। গদ্যপ্রিয়া হলে অবশ্য একটি শাড়ী কিম্বা ব্লাউজ-পিস পেলে বেশী খুশী হত। যাই হোক সব কিছু করেও ঘড়িতে দেখে সবে মাত্র আড়াইটা। কি আশ্চর্য! ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে নাকি? নাঃ তার মনের ঘড়িই আজ সব বাধা বন্ধ ডিঙিয়ে ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে।

বাজল সাড়ে তিনটে। হুড়মাড় শব্দে হাওড়া স্টেশনে আর সৌরীর বুক কাঁপিয়ে গমগমিয়ে এলো ভেষ্টিবিউল। কাঁচের পর্দা ভেদ করে দৃষ্টি চালিয়ে দেয় সৌরী। কত লোকই নামছে। কিন্তু কি মুস্কিলেই পড়েছে সৌরী সবুজ সাড়ী যদি বা মেলে হাতে থাকে না তার লাল বটুয়া। আর লাল বটুয়া যার হাতে তার অঙ্গে নেই সবুজ শাড়ী। অনেকক্ষণ পরে পিছন থেকে একটি সবুজ শাড়ী পরা তন্বীকে দেখে শর্বরী মনে করে ধেয়ে গিয়ে দেখে তিনি পাঞ্জাবিণী, তাঁর মাল নিয়ে কুলিদের সঙ্গে বিপুল বচসায় মেতেছেন। নাঃ, হাতের ফুল হাতেই শুকোল। ক্ষুণ্ণ মনে ভগ্ন হৃদয়ে বাড়ী এসেই দেখে শর্বরীর এক চিঠি এসেছে।

দিদির বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় কলকাতা যাওয়া আর হয়ে উঠল না। তোমাকে নিরাশ করার জন্যে আমি খুব ব্যথিত। এটুকু জেনো যে, তোমার সঙ্গে একই জ্বালায় আমিও জ্বলেছি। তুমি কি বোঝ না তোমাকে দেখার ব্যাকুলতা আমারও কম নয়। এক কাজ কর না তুমিতো পুরুষ মানুষ, স্বাধীন, তোমার আর কিসের বাধা, একবার এসো না এলাহাবাদে। সৌরী ভাবে তাতো বটেই, যেহেতু আমি পুরুষ মানুষ, আমার আর বাধা কিসের? সুতরাং এখন এলাহাবাদ ছুটি।

আরও মাস পাঁচেক কেটেছে। আজ অবধি কেউই কারুর দেখা পায়নি। অবস্থার তারতম্যও ঘটেনি। শুধু দুজনের লুকনো চিঠির স্থান আরও একটু স্ফীত হয়েছে। আর দুজনে মিলেই গল্প লিখেছে পুজো সংখ্যার জন্য। এবার পুজোয় আবার "মেয়েদের পত্রিকা" একটি নতুন ব্যাপার করছেন। ভূতপূর্ব লেখিকাদের ফটো ও পরি-চিতি ছাপছেন। তার মধ্যে শর্বরীরও ফটো থাকবে একথা লিখেছে শর্বরী। এতদিন এতবার চেয়েও সৌরী শর্বরীর একটা ছবি পায়নি। ও খালি লিখেছে, আমার একলার একটি ছবি নেই কি করে পাঠাই বল না। হঠাৎ ছবি তুলতে চাইলে সকলে কি ভাববে বল? সৌরীর ছবি চেয়েছে শর্বরী। কিন্তু ও দেয়নি, রাগ করে।

এবার তো দেখে নেবে ও শর্বরীকে। 'মেয়েদের পত্রিকার' পুজো সংখ্যাটা একবার বেরুলে হয়। আর আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।

মনে মনে ভাবে সৌরী—কেন এমন হল? কোথায় আছে শর্বরী আর কোথায় আছে সে? এত মাইলের ব্যবধান তো কই তাদের মনের ব্যাকুলতা জাগাতে বাধার সৃষ্টি করেনি। এই তো শর্বরী শেষ গল্পটা লিখেছে একটি বৌকে নিয়ে। বৌটির বিয়ে হয়েছিল তার ছেলেবেলার সাথীর সঙ্গে। একে-বারে পাশাপাশি বাড়ীতে থাকত তারা। মেয়েটি ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে ঐ সাথীর চোখের ওপরেই। সুতরাং বিয়ের পর তাদের মধ্যে এলো না কোন বৈচিত্র্য। কারণ তারা একে অপরকে বড় বেশী-রকম জানত, চিনত, তাই তাদের মধ্যে কোনরকম কৌতুহলের বালাই ছিল

না। বৌটি স্বামীকে ভয় পেত, শ্রদ্ধা করত কিন্তু ভালবাসতে পারেনি। হঠাৎ কি জানি আজ কেমনে যেন দুয়ার গেল খুলি—সেই বৌটির জীবনে প্রেমের পরশ নিয়ে এলো একটি অন্য পুরুষ। বৌটি জানল প্রেম কি? ভালবাসা কাকে বলে। জীবনে তার বৈচিত্র্য এলো। নিজেকে উজাড় করে দিল তার প্রেমিকের কাছে। কিন্তু এদিকে স্বামীকে সেবার ত্রুটি নেই। নেই সংসারের কাজে অলসতা। কিন্তু এই

তিনটি সন্তান পারেনি তার রূপের শিখা মৃদু করতে। তার মনেও ছিল একটা জ্বালা। খুব ভাল গান জানত সে। কিন্তু হলে হবে কি এদের বাড়ীর ভাবধারার সঙ্গে সে কোনদিনই নিজেকে খাপ-খাওয়াতে পারেনি। ফুলশয্যায় রাত্রে সে দাঁড়িয়েছিল জানলার ধারে। আকাশের চাঁদের আলো পড়েছিল তার সারা গৌর অঙ্গে। স্বামী এলো। ওর সারা অঙ্গে শিহরণ, এইবার বোধহয় তাকে একটি গান গাইতে বলবে। ওমা।

তাঁর মাল নিয়ে কুলিদের সঙ্গে বিপুল বচসায় মেতেছেন।

নতুন অভিজ্ঞতা এনে দিল তাকে বাঁচার আনন্দ। তার একঘেয়ে জীবনে এনে দিল বিচিত্রতার স্বাদ।

তবে বৌটি ছিল অসামান্যা রূপসী। তার বিশ বছরের বিবাহিত জীবন, বা

সে বলল, এই তাপী জানলাটা হাঁ করে খুলে রেখেছিস যে বড়, জানিস না আমার সর্দি হয়েছে? তপতী দিলো দুম করে জানলাটা বন্ধ করে। সেই বন্ধ জানলা যদি আজ বিশ বছর পরে আবার

একটু খুলে দিয়ে; একটুখানি চাঁদের আলোর আভাস নেয় চুরি করে, দোষ কি? বৌটি ভালবাসে তার প্রেমিককে দেহ দিয়ে নয়, মন দিয়ে, তার অন্তর-আত্মাকে দিয়ে, তবে? শেষ পর্যন্ত গল্পটি পড়ে মনে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, বৌটিকে কি দোষী বলব না নির্দোষী?

নাঃ বউটির যা হয় হোকগে এখন মেয়েদের পত্রিকাটা একবার বেরুলে হয়। সে একটিবার শর্বরীকে দেখে নেয়। অবশ্য সকলের চেহারার মত ছবি ওঠে না। কারুর খারাপ চেহারায় ছবি ওঠে ভাল, আবার কারুর সুন্দর চেহারায় ছবি ওঠে খারাপ। যাই হোক, তবু একটা আন্দাজ তো পাবে।

বহু প্রতীক্ষার পর বেরুল পুজো-সংখ্যা "মেয়েদের পত্রিকা"। এক কপি কিনে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলো সৌরী। আর কোন কথাবার্তা নয়, পাছে কারু চেখে পড়ে তাই অফিসের ফাইলের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে একেবারে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে, চঞ্চল হাতে ব্যস্ত-সমস্তভাবে পাতার পর পাতা উল্টে চলেছে, চোখ দুটো উত্তেজনায় ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড়—এই যে ঊষা রায়, কল্পনা সিংহ, হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে, এই যে শর্বরী সোম—অ্যাঁ-অ্যাঁ এ—ই শর্বরী সোম!

তক্ষুণি চিঠি লিখল শর্বরীকে—

মাননীয়া শর্বরী দেবী, আমি আপনাকে আপনার গল্পের সেই প্রৌঢ়া বধূ নায়িকা, তিন ছেলের মা বলে কল্পনা করিনি। আমি আপনাকে কুমারী জেনেই ভালবেসেছিলাম, আর নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করেছিলাম তবু সেই বৌটি ছিলেন সুন্দরী কিন্তু আপনি। ওঃ, এইজন্যই ছবি পাঠাননি। এবার বুঝেছি কেন এই ছল-চাতুরি। ছিঃ-ছিঃ, আপনারা মেয়েরা এত নিষ্ঠুর হতে পারেন জানতাম না।

এর পরের সংখ্যা "মেয়েদের পত্রিকায়" ভুল সংশোধন করে ছাপা হল গত পুজোসংখ্যার লেখিকার ফটো ও পরিচিতি কলমের শর্বরী সোম-এর স্থলে শর্বরী হোম হবে। এবং গত সংখ্যায় স্থানাভাবের জন্য এই সংখ্যায় সুলেখিকা শ্রীশর্বরী সোম-এর ফটো ও পরিচিতি দেওয়া হল।

সৌরীর ছোট বোন বলে, দেখ দাদা শর্বরী সোম-এর মুখটা পত্রিকার এই বাজে কাগজেও কি সুন্দর উঠেছে? ইনিইতো তোমাকে লেখা পাঠান? তাই তো নিয়ে এলাম বইটা।

ভীনাস ও অ্যাডনিস' এবং 'বিদায় অভিশাপ'

উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও শেক্‌স্‌পীয়র প্রতিভার ইতিহাসে দুটি বিস্ময়কর ঘটনা। আরো বিস্ময়কর একটি ঘটনা : এ'দের প্রতিভার প্রস্ফুরণ দুটি নভোচারী তারার মতো একবার খুবই কাছাকাছি এসেছিল। নর-নারীর শাশ্বত প্রেম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপ' ও শেক্‌স্‌পীয়রের 'ভীনাস ও অ্যাডনিস' যে কাব্যের মায়ালোক সৃষ্টি করেছে, তাদের কোথায় যেন ঠিক একই সুর ধ্বনিত। তফাৎ যে-টুকু সে কেবল তার বাঁধায়। 'ভীনাস ও অ্যাডনিস' বেজেছে চড়া পর্দায়। একটি লিরিক কবিতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রেমের অনায়ত্ত আবেগের দুঃসহ প্রকাশ জানিয়েছে, দেহের দেহলীতে প্রেমের শেষ সার্থকতাকে বার বার খুঁজেও পায় নি। 'বিদায়-অভিশাপের' সুরের ওঠানামা খাদে চড়ায়, বিলম্বিত লয়ে। একটি অপূর্ব নাটকীয় সংবেদন আগা-গোড়া সুখে দুঃখে আনন্দ-বেদনায় প্রচ্ছন্ন।

কবিতা দুটির মধ্যে একটি কথা-কাহিনী গ্রীসের। ভীনাস রূপসী দেবী, প্রেম সৌন্দর্যের কান্তা। তাঁর কুণ্ডলে হিন্দোলশাখা দোলে কি না জানা নেই, তবে আঁখি-ঠারে যে ব্রজপ্রিয়ার স্বপ্ন, তাইতে ফাঁকি কোথায়? আর অ্যাডনিস তরুণ কুমার, বনভূমিতে শিকারের খোঁজে ঘোড়সওয়ারী করে বেড়ায়। তার রূপে স্বর্গের দেবতা হার মানে। স্বচ্ছ নিষ্পাপ রূপ, সারল্যের সুষমায় চোখমুখ উদ্‌ভাস। প্রেম হ'লো। আকাশ-পাতালে প্রেম বিলিয়ে বেড়িয়ে ভীনাস নিজে প্রেম হয়ে গেলেন বনের মাঠে, শিকারী কুমার অ্যাডনিস তাঁকে বিমোহিত ক'রলো। ভীনাস বিহ্বলা হয়ে নিবেদন করলেন নিজেকে, যেচে। তাঁর ভাষায় চিরকালের প্রেমের গুঞ্জন বাজলো, তাঁর আকুতিতে একটি বিভোর হৃদয়ের স্পন্দন শোনা গেলো। প্রণয়ী নয়, প্রণয়িনী করলেন আত্ম সমর্পণ অভীপ্সিতের কাছে।

আর একটি কাহিনী আমাদের দেশের মহাভারতী যুগের। গুরুগৃহে কচের বিদ্যাশিক্ষা চ'লেছিল। দৈত্য-গুরু শুক্রের কাছে কচের প্রথম যাওয়া দেবসমাজ উদ্ধারের অসীম দায়িত্ববোধ নিয়ে, সেই বোধ-কে সে কৃতঘ্নতা জানায় নি। তার শিক্ষা-দীক্ষা-মনন তাকে লিপ্ত করে রেখেছিল শেষ বিদায়ের দিন পর্যন্ত। কখন গুরুকন্যা দেবযানী তাকে অলক্ষ্যে ভালবেসে ফেলেছে, পাঠরত শিষ্যকে দৈনিক তৃষার জল আর ক্ষুধার অন্ন যুগিয়ে দিতে গিয়ে কখন সে দিয়েছে নিজের শুচি হৃদয়, তা' কচের জানবার কথা নয়। এর প্রকাশ হ'লো বিদায়ের প্রাক্কালে, যখন কচের অজস্র কৃতজ্ঞবাণীর আড়ালে একটি কুমারী নিজেকে উন্মোচন ক'রলো, জীবনে প্রথম বারের মতো। আবার এখানে পুরুষের পশ্চাদ্ধাবন নয় নারীর পেছনে, নারী এলো যাচিকা হয়ে।

দুটি গল্প এই। দেশকালের বিভেদে তাদের স্থিতি ও প্রচলন সম্পূর্ণ বিভিন্ন পর্যায়ে। তবু দুইয়ের মূল সুর এক। নারী প্রথমে এসেছে পুরুষের কাছে তার সমর্পণ নিঃশেষ করতে, যা নারীর স্বভাবের সঙ্গে অসমঞ্জস। তবু গল্প গল্পই।

।। দুই ।।

এর পরের কথাটি কি? প্রেম কি অপরূপ হ'লো মিলনে?

এই কথাটি ব'লবার জন্যে সাগরের এপার-ওপারে তিন শতাব্দীর সেতু রচনা করেছিল রবীন্দ্রনাথ ও শেক্‌স্‌-পীয়রের লেখনী। দুটি লোককাহিনীর আশ্চর্য রূপান্তরন দুটি কালজয়ী কবিতায়।

এদেশে 'বিদায়-অভিশাপ' নতুন পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। আরম্ভ করি 'ভীনাস ও অ্যাডনিস' দিয়ে। শোণিতাভ সূর্য যখন ক্রন্দসী উষার কাছে শেষ বিদায় নিয়েছে, গোলাপ-অধর অ্যাডনিস তখন ছুটেছে শিকারের পেছনে। শিকার ভালবাসে, আর ভালবাসা হেসে উড়িয়ে দেয়। এই অ্যাডনিসকে ভালবাসা নিবেদন ক'রছেন ভীনাস। অ্যাডনিস ঘোড়া থেকে নেবে এলো ভীনাসের আগ্রহে, মাঠের ওপর পাশাপাশি শরীর এলিয়ে দুজনে। কি আকুল আবেদন ভীনাসের, স্বগতোক্তি থেকে সংলাপ, অশ্রু-হাসিতে মধুর মুখখানা তুলে অ্যাডনিসের সুন্দর মুখে কি একটি স্পর্শ-মাধুর্যের অপেক্ষা তাঁর।—

আকুতি জানায় সে, সুন্দর আকুতি তার,
সুন্দর শ্রবণকুহরে বাজে
তার আকুতির গাথা;
তবু অ্যাডনিস গম্ভীর,
নতশিরে অধীর হয়ে উঠছে—
লজ্জায় রক্তিম আর ধূসরাভ ক্রোধে,
রক্তলাল সে ভীনাসের প্রেয়,
আর শ্বেত-শুভ্রা ভীনাসের শ্রেয়তা
ছাপিয়ে গেলো আরো পুলকে।
('ভীনাস ও অ্যাডনিস', স্তবক : ১৩)

তবু অ্যাডনিস অদম্য। কিছুতেই সে ভীনাসকে দেবে না তার স্পর্শ, তৃষ্ণাতুরা ভীনাসের দিকে একবার চেয়ে সে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। কি হতাশা ভীনাসের। তবু :

—আমায় কথা বলাও,
তোমায় মুগ্ধ করবো আলাপিতা আমি,
বা একটি পরীর মতো
ছুঁয়ে যাবো সবুজ প্রান্তর,
অথবা কুহকিনী হয়ে চুল এলিয়ে
নেচে যাবো বালুকায়,
পদচিহ্ন পড়বে না,—
ভালবাসা যে জ্বলে আগুন হয়ে,
কাঠিন্যে ডোবে না,
তার মৃদুতা উড়ে যায় ঊর্ধ্বলোকে।
(স্তবক : ২৫)

ভীনাসের ভাষায় কি একটু শোনা যাচ্ছে দেবযানীর প্রতিধ্বনি?—

হেথা বেণুমতীতীরে মোরা দুইজন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জন বনচ্ছায়া-সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিলবিস্মৃত।
('বিদায়-অভিশাপ')

অ্যাডনিস যখন রোদ-গরমের কথা তুলে যাবার জন্যে উন্মুখ ভীনাস বলছেন :

হে তরুণ, কি নির্দয় তুমি,
কতটুকু কারণ দিয়ে
জানালে তোমার প্রস্থানের দোহাই
আমার স্বর্গীয় নিঃশ্বাসের শীকরে
অস্তসূর্যের উষ্ণতা আমি হ্রাস করবো,
ছায়া রচনা করবো আমার কেশদামে,
তবুও যদি তুমি জ্বলো,
মিটিয়ে দেবো জ্বলা অশ্রুতে অশ্রুতে।
(স্তবক : ৩২)

কি আশ্চর্য মিল বৃহস্পতি-তনয়ের আক্ষেপ শুক্র-দুহিতার অনুনয়ের সঙ্গে। এবার ভীনাসের বিলাপের পালা :

কি কঠোর তুমি
উপলের মতো, ইস্পাতের মতো,
না, তুমি কঠোরতর,
উপলও গলে বৃষ্টির ধারায়,
একটি নারীর কুমারী হয়েও বোঝো না
প্রেম কি, কি প্রদাহ অপ্রেমের।
(স্তবক : ৩৪)

এবং
ধিক তোমায়, প্রাণহীন ছবি,
শীতল পাথরের জড়তা,
নিষ্ঠুর বিগ্রহ-মূর্তি
তুমি নিষ্পন্দ মৃত্যু।
মাটির পুতুল,
শুধু প্রাণ তোমার চোখে
কোনো মেয়ের গর্ভে জন্ম
হয়নি তোমার, হে পুরুষ,
তুমি পুরুষ নও,
যদিও পৌরুষে সাকার,
পুরুষ তো নিজেরই আবেগে
সিক্ত হয় অনুভূতিতে চুম্বনে।
(স্তবক : ৩৬)

ঠিক যেন দেবযানীর কথায় :

ধিক্ ধিক্
কোথা হতে এলে তুমি নির্মম পথিক,

জীবনের সুখগুলি ফুলের মতন
ছিন্ন ক'রে নিয়ে মালা করেছ গুম্ফন
একখানি সূত্র দিয়ে যাবার বেলায়
সে মালা নিলে না গলে পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুইভাগ করে
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে। লুটাইল ধূলি-পরে
এ প্রাণের সমস্ত মহিমা।
('বিদায়-অভিশাপ')

'ভীনাস ও অ্যাডনিসে' কোথাও অ্যাডনিস ব্যগ্র নয়, তার উদ্দাম মন শুধু বরাহ-শিকারে উদ্দাম, নারী-প্রেমের স্থান নেই সেখানে। 'বিদায়-অভিশাপে' কচও একাগ্রমনা, দেব-সকাশে তার নতুন অধীত সঞ্জীবনী বিদ্যার পরিচয় দেবার জন্যেই তার নিদিধ্যাসন। প্রেম সেখানে কতটুকু?

অ্যাডনিস বলেছে :

আমি জানি না প্রেম, চাই না জানতে,
শুধু প্রেম যদি হয় বরাহ,
আমি পশ্চাদ্ধাবন করবো—
(স্তবক : ৬৯)

আর তার অনুনয় :

সুন্দরী নারী, যদি আমায় ভালবেসে
থাকো,
আমার বিস্মিত আচরণ
বিচার করো আমার অপরিণত
আয়ু দিয়ে,
নিজের আত্ম-সমীক্ষার আগে
জানতে চেয়ো না আমাকে।
(স্তবক : ৪৮)

এবং তারপর :

—আমরা বিলম্বিত,
মেষপাল ফিরেছে আলয়ে,
নীড়ে ফিরে গেছে পাখী,
স্তব্ধ কালো মেঘের ছায়ায়।
আকাশের আলো মুছিয়ে
আদেশ দিলো বিদায় নিতে,
শুভ রাত্রির বিদায়।
(স্তবক : ৪৯)

কচেরও একই বাণী :

দেব সন্নিধানে শুভে করেছিনু পণ
মহাসঞ্জীবনীবিদ্যা করি উপার্জন
দেবলোকে ফিরে যাবো, এসেছিনু তাই,
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই
অনন্তর :

হা অভিমানিনী নারী
সত্য শুনে কি হইবে সুখ; ধর্ম জানে,
প্রতারণা করি নাই;

এবং সর্বশেষ :

—ক্ষম মোরে, দেবযানী,
ক্ষম অপরাধ। ('বিদায়-অভিশাপ')

গল্প এর পরে করুণ হয়ে উঠেছে। নারীর আহত প্রেমের সঙ্গে এক চলতি প্রবচনে তুলনা আছে দলিত-ফণা সাপের। এর সত্যতা নিতান্তই অনুমেয় ব্যাপার। কিন্তু আমাদের কাহিনীতে খানিকটা স্বীকৃতি মিলবে। অ্যাডনিসের শিকারে প্রস্থানের দৃঢ় অভিপ্রায় শুনে বিচলিত ভীনাস বললেন :

আমি তোমার মৃত্যুর আগামী বাণী
দিলাম, আর
আমার অজস্র দুঃখের,—
কাল যদি বরাহের সঙ্গে ঘটে তোমার
সম্বন্ধ।
(স্তবক : ১১২)

তাই হ'লো। পরদিন উষায় দেবী ভীনাস নতুন রবিকরে শিউরে শিউরে উঠতে লাগলেন, অজ্ঞানিত শংকায় মৃত্যু-দেবতাকে কুকথা শোনালেন, তারপর সব ভয়কে সত্যি করে দেখতে পেলেন : অ্যাডনিসের রক্তাক্ত মৃতদেহ। শোকাতুরা ভীনাসের অশ্রু আর বাধা মানলো না, অ্যাডনিসের দেহে লুটিয়ে পড়ে বেদনার্তা দেবী শাপ দিলেন সর্বকালের সর্বদেশের প্রেমকে :

দুঃখ থাকবে প্রেমের চিরসঙ্গী হবে,
আর থাকবে দ্বেষ ছায়ার মতো,
সুন্দর আরম্ভের সমাপ্তি ঘটবে
অসুন্দরে।
(স্তবক : ১৯০)

অস্থায়ী, অসত্য আর প্রবঞ্চিত হবে প্রেম,
স্ফুটিত হয়ে একটি নিঃশ্বাসে ধূলিসাৎ
হবে,
অন্তরে হলাহল রেখে আশ্চর্য মিষ্টিতে
প্রতারিত করবে শিব সুন্দরকে।
(স্তবক : ১৯১)

প্রেম হবে মহাসমরের হোতা,
পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ ঘটবে,
শাসক ও শাসিতের মধ্যে আনবে
অশান্তি,
যেন শুষ্ক দাহ্য তৃণ প্রবল দাহিকা-
শক্তির কাছে।
ঐ অকাল মরণে আমার সব প্রেম
গেলো দগ্ধ হয়ে,
প্রেমের একনিষ্ঠাও আজ থেকে
পাবে না প্রতিদান।
(স্তবক : ১৯৫)

প্রেমিকা দেবযানীর ভাষাও ভিন্ন নয়। —
তোমা—'পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ; তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ;
শিখাইবে পারিবে না করিতে প্রয়োগ।
('বিদায়-অভিশাপ')

বজ্রকঠোর অভিশাপে দুটি অধন্য প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

।। তিন ।।

'ভীনাস ও অ্যাডনিস' শেক্সপীয়রের তরুণ জীবনের রচনা। কবিতা তাই আগাগোড়া লিরিকধর্মী এবং বক্তব্যে একটি অকৃত্রিম grande passion কোথাও ব্যক্ত, কোথাও অব্যক্ত। ভীনাসের দেহধর্মী প্রেম-নিবেদন তবু কবিতার

কোন সর্গেই অপ্রকাশ নয়। তার আকুলতা কবিতার প্রারম্ভেই সুস্পষ্টঃ

অশ্ব থেকে নেমে এসো,
ওগো অপরূপ পুরুষ,
তার উদ্ধত মস্তককে
সংযত করো বল্‌গা বন্ধনে—
যদি এই অনুগ্রহটুকু করো, তোমায়
পুরস্কার দেবো সহস্র
মধুক্ষরা গোপন বাণী,
উপবেশন করো যেখানে
নাগ কখনো ফেলেনি দীর্ঘশ্বাস,
তোমায় অভিভূত করবো
আমার অজস্র চুম্বনে।
(স্তবক ঃ ৩)

এবং দীর্ঘ দু'শো সর্গ ধ'রে ভীনাসের আকুলতা সব প্রত্যাখ্যানকে উপেক্ষা ক'রেছে, অ্যাডনিসের মৃত্যুকে প্রেমের অপমৃত্যু বলে ঘোষণা করেছে, এবং রুধিরসিক্ত প্রান্তরে যে রক্তকেশরী ফুলের জন্ম হ'লো, তাকে উপলক্ষ্য ক'রে উচ্চারণ ক'রেছে কবিতার শেষ কথাঃ

আমার বুকে পেতেছিলাম
তোমার জনকের শয্যাবিথান,
তার রক্ত হ'তে জাত পুষ্প,
নিজের অধিকারে
তুমি নন্দিত হও আমার শূন্য বুকে,
আমার হৃৎস্পন্দন তোমায়
দোলা দেবে রজনী-দিন,
দিবসযামের এমন নিমেষ
অতিক্রান্ত হবে না
যখন আমি চুম্বন করবো না
আমার মধুমিত, কুসুমিত প্রেমকে।
(স্তবক ঃ ১৯৮)

রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপ' মধ্য-যৌবনের রচনা। সেখানেও দেবযানী প্রেমিকা, কিন্তু তার প্রেম কোথাও সীমা ছাপিয়ে উদ্বেল নয়। বিচিত্র অভিব্যক্তিতে ও সূক্ষ্ম ভাব-পরিবর্তনে দেবযানী নিজেকে ক্রমে অনবগুণ্ঠিতা ক'রেছে, তার ইঙ্গিতধর্মী ভাষা বনভূমি থেকে হোমধেনু, বেণুমতী সরিৎ থেকে প্রবাস-সহচরীতে এসেছে, তবু সে ভাষার কারুকর্ম পংক্তি থেকে পংক্তিতে বিভিন্ন এবং রূপকে গভীর। তার উন্মুখ ভালবাসা যখন কচের কৃতজ্ঞতার প্রশ্রয়ে মুখর হ'লো, এবং কচের অকথিত মর্মবাণীর বিনিময়ে তাকে বেণুমতী-তীরে ভালোবাসার স্বর্গসৃষ্টির আহ্বান জানালো, তখনো সেই ভাষায় একটি বৈচিত্র্যময় শালীন মাধুরিমা রয়ে গেছে। এরপরে দেবযানী ক্রোধে আত্মহারা, তার শেষ নিবেদন স্বাগতি না পেয়ে ফিরে এসেছে। তখনো তার বিচিত্র সংলাপ সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ। 'বিদায়-অভিশাপে'র দেবযানী চরিত্রে একটি রসমধুর নাটকীয়তার আশ্চর্য আলো-আঁধারি খেলা।

শেক্সপীয়রের অ্যাডনিস শিল্পীর তুলির রঙের মাত্রাধিক্য থেকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত। তার কথাবার্তা অল্প, প্রেমনিবেদিতা ভীনাসের কাছে সে একটি প্রেমরসবিহীন জড়পুরুষ—যার জীবনের প্রথম ও শেষ নেশা বরাহ-শিকার, নারীর প্রেম তার মনে নিছক বিতৃষ্ণা ও ক্লান্তি জাগায়। সেই শিকারই তার কাল হ'লো, ভীনাসের সতর্কতা উপেক্ষা ক'রে প্রথম উষায় বন্য বরাহের আঘাতে সে প্রাণ হারালো। অ্যাডনিস কেমন যেন অপূর্ণ শেক্সপীয়রের লিরিকে।

রবীন্দ্রনাথের কচ একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টি। তারও ভাষা অল্প, কিন্তু সে ভাষার ব্যঞ্জনা অল্প নয়। বিদ্যার্জনে তার প্রয়াস একাগ্র ছিল, কিন্তু একক না, দেবযানীর স্থানও হয়তো ছিল মনের নিভৃতে। কিন্তু পৌরুষের অঙ্গীকার বাঁধা স্বর্গের দেব সকাশে, প্রতিজ্ঞা-রক্ষা জীবনের এক ও অনন্য লক্ষ্য বলে সে নিজেকে দৃঢ় করেছে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে কচের পুরুষাকারের প্রকাশ ঃ

বলো, কী হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালোবাসি কিনা আজ
সে তর্কে কী ফল।
আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব।
('বিদায়-অভিশাপ')

কচের মন বোধি দিয়ে চালিত, হৃদয়াবেগে নয়। সে দেবযানীকে সম্পূর্ণ বোঝে। দেবযানীর প্রতিটি কথা তার সংবেদনশীল মনেও সাড়া তোলে। ভীনাসের আকুতির প্রতি অ্যাডনিস অন্তরে ও বাইরে পাষাণ, দেবযানীর কথা ও ব্যথা কচের উষ্ণ মনে তার চেয়ে অনেক বেশী প্রতিধ্বনি জাগায়। কচ নিজেকে সংযত রেখেছে বোধি দিয়ে, পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্যে পৌরুষ-সম্মত দাঢ্য দিয়ে, অ্যাডনিসের হিম-শীতল হৃদয় দিয়ে নয়। তাই ভীনাসের কাছ থেকে অ্যাডনিস রূঢ়ভাবে বিদায় নিতে পারে কথার কশাঘাত ক'রেঃ

অতএব, দুঃখের সঙ্গে
আমি বিদায় নেবো,
লজ্জায় আমার বদন আনত,
ক্ষোভে আচ্ছন্ন অন্তঃকরণ,
আমার শ্রুতি তোমার
বিভ্রান্ত বিলাপ শুনেছে,
আর জ্বলছে শ্লেষে অবমাননায়—
(স্তবক ঃ ১৩৫)

কিন্তু কচ পারে না। দেবযানীর অভিশাপের প্রত্যুত্তর কচের উদার হৃদয়ের কি মহিমান্বিত প্রকাশ। তার মনের অগোচরে প্রজ্বলিত ভালোবাসার শিখা নিজেকে অনির্বাণ রেখে গেলো অপরূপ দ্যুতিতে।

শেক্সপীয়রের 'ভীনাস ও অ্যাডনিস' আগাগোড়া নিঃসন্দেহে লিরিকধর্মী, তার একটি মাত্র লক্ষ্য ভীনাসের impetuosity-র বিপরীতে অ্যাডনিসের frozen পৌরুষের তীক্ষ্ণ বৈসাদৃশ্য প্রতিফলিত করা। রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপ' সমান্তরাল লোক-কাহিনী নিয়ে গড়া হ'লেও শুধু লিরিক কবিতাই থাকেনি। শ্রোতার মনে অনুভূতি-সচেতন ও অনাগত প্রতীক্ষমান একটি জিজ্ঞাসাকে জাগিয়ে তোলা যদি নাটকের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হয়, 'বিদায়-অভিশাপের' ব্যঞ্জনা নাটকীয় ক্রম-বিকাশের হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে সফল। কবিতা শেষ হবার পরেও শ্রোতার মনে যে sweet pathos থেকে যায়, নাটক হিসেবেও তার চাইতে বেশী দাবী করা কখনো সম্ভব হ'তো না। ঘাত-প্রতিঘাতের অভাবে 'ভীনাস ও অ্যাডনিস' শুধু একটি সার্থক লিরিক। অনুভূতি ও ভাবের সূক্ষ্মতা, দেবযানীর সংলাপের বহুবিচিত্র বর্ণালী আর কচের পৌরুষের দৃঢ়তায় আবৃত একটি বেদনশীল মনের দ্যোতনায় 'বিদায় অভিশাপ' সার্থক লিরিকেরও অনেক ঊর্ধ্বে।

'ভীনাস ও অ্যাডনিসের' অনুবাদ লেখকের।

॥ প্রত্যাবর্তন ॥

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি শ্রীটি টি কৃষ্ণমাচারীকে দপ্তরহীন মন্ত্রীরূপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নিয়োগ করেছেন। এই নিয়োগের ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রীর সংখ্যা হল ১৮ এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভার সর্বশেষ সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ৫২। আপাতত দপ্তরহীন মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হলেও শীঘ্রই এই করিৎকর্মা ভদ্রলোকটির হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। হয়ত তিনি ভারী শিল্প ও ইস্পাত দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন, আর যদি তা না হন তবে হয়ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক দপ্তরের মধ্যে সংহতিরক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হবে। সবই এখন জল্পনা-কল্পনা, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, শ্রীটি টি কে'র ভাগ্যতারকা এখন খুবই উজ্জ্বল। কারণ ডঃ রাধাকৃষ্ণন, শ্রীনেহরু ও শ্রীকৃষ্ণ মেনন কেন্দ্রীয় শাসনের এই তিন শক্তিশালী ব্যক্তির সম্মিলিত অনুরোধে সাড়া দিয়ে মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন তিনি। তাই কোন পক্ষ থেকেই কোন সমালোচনার ভয় নেই তাঁর। যাঁরা সমালোচনা করবেন তাঁদেরই নিন্দিত হতে হবে স্বতন্ত্র দল, দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী বা প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থক অপবাদে। আর একদিন যাঁর অভিযোগে নিরুপায় হয়ে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করতে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণমাচারীকে সেই ফিরোজ গান্ধীও আজ পরলোকে।

॥ অদল-বদল ॥

দু'বছর আগে শ্রীসঞ্জীবায়ার হাতে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী কংগ্রেস-সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন। তারপর দু'বছর দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে তিনি বুঝলেন, অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদই ভাল ছিল তাঁর। তাই আবার তিনি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন এবং শ্রীসঞ্জীবায়াকে অপসারিত করে ফিরিয়ে নিলেন নিজের প্রাক্তন পদ। শ্রীসঞ্জীবায়া এতদিন অভিমান করে বসেছিলেন, শ্রীরেড্ডীর বারবার আমন্ত্রণ সত্ত্বেও তাঁর মন্ত্রিসভায় যোগ দেননি তিনি। সুতরাং ঊর্ধ্বতন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ শ্রীরেড্ডীর দ্বিতীয়বারের পরিত্যক্ত কংগ্রেস-সভাপতি পদে শ্রীসঞ্জীবায়াকে বহাল করাই উপযুক্ত সমাধান বলে মনে

করেছেন। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর শূন্যপদ পুনঃপূরণ করে শ্রীসঞ্জীবায়া শুধু অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনৈতিক সমস্যারই সমাধান করেননি, কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও একটি বিশেষ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কারণ বহু চেষ্টা করেও তাঁদের পক্ষে একজন নতুন সভাপতি খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মন্ত্রিত্ব ছেড়ে বেকার ঘুরে বেড়ানোর লোক আজ কংগ্রেসের ওপর-তরফে একজনও নেই।

॥ ইংরেজি ॥

বিলম্বে হলেও দেশের হিন্দী শাসকেরা এতদিনে বুঝেছেন, রাতারাতি গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার যে অসম্ভব পরীক্ষায় তাঁরা মেতেছিলেন তা ফলপ্রসূ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সংবিধানের সিদ্ধান্ত মত ১৯৬৫ সালের মধ্যে হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। রাষ্ট্রের যাবতীয় সরকারী ও বেসরকারী কাজকর্ম হিন্দীতে চালাতে হলে হিন্দী ভাষার যতটা উন্নতি হওয়া প্রয়োজন তা হতে আরও অনেক বছর সময় লাগবে। সুতরাং তাঁরা স্থির করেছেন, ইংরেজিকে অনির্দিষ্টকাল ধরে ভারতের অন্যতম সহকারী ভাষারূপে স্বীকার করে নেওয়া হবে এবং সরকারী কাজকর্ম এখনকার মত ভবিষ্যতেও প্রধানত ইংরেজিতেই চলবে। তবে রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং তাকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করার রাষ্ট্রীয় প্রয়াসও শিথিল করা হবে না। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী জানিয়েছেন, শীঘ্রই উপরোক্ত মর্মে লোকসভায় একটি বিল উত্থাপিত হবে।

বহু অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেশের শাসকবর্গ বুঝেছেন, ইংরেজির মত একটি সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করা কোনদিনই সুবিবেচনার কাজ হবে না। তাই মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে এবার ইংরেজিকে ভাল করে শেখার একটি সুচিন্তিত ও সুনিশ্চিত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। স্থির হয়েছে, ভারতের প্রত্যেক রাজ্যের শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিনটি ভাষা শিখতে হবে—একটি আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি, দ্বিতীয়টি মাতৃভাষা ও তৃতীয়টি রাষ্ট্রভাষা হিন্দী। আবার হিন্দী যাদের মাতৃভাষা তাদের শিখতে হবে ভারতীয় সংবিধানে তালিকাবদ্ধ চৌদ্দটি জাতীয় ভাষার যে কোন একটি। শ্রীশাস্ত্রী সেদিন লোকসভায় জানিয়েছেন, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ বিদ্যায়তনে নাকি স্থির হয়েছে, দক্ষিণের তামিল, তেলেগু, মালয়লম ও কানাড়া ভাষার যে কোন একটি শেখার সুযোগ দেওয়া হবে ছাত্রদের। বাংলার প্রচলন ত এখনই ব্যাপকভাবে আছে বাঙলার প্রতিবেশী পূর্ব ও উত্তর ভারতীয় রাজ্যগুলিতে। বলা বাহুল্য, মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত এই ত্রি-ভাষা নীতি ভারতের বর্তমান প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অভ্রান্ত ও যুগোপযোগী। এতে ইংরেজি-শিক্ষার ব্যাপারে যে অনিশ্চয়তা ও অব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল তা দূর হবে এবং হিন্দী একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন আসন্ন হওয়াতে অহিন্দীভাষীদের মনে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তারও অবসান ঘটবে। অহিন্দীভাষী ছাত্রদের মত হিন্দীভাষী ছাত্রদেরও যে এখন থেকে অপর একটি

জাতীয় ভাষা শিখতে হবে, জাতীয় সংহতি ও ভাবগত ঐক্যের প্রয়োজনে তার মূল্য সীমাহীন। বিভিন্ন জাতীয় ভাষা থেকে শব্দ ও ভাব সঙ্কলন করে হিন্দী যদি সত্যিই কোনদিন জাতীয় ভাষায় পরিণত হয় তবে তা গ্রহণে কারও কোন আপত্তি হবে না। বহুভাষী ভারতে প্রকৃত জাতীয় ভাষা গড়ে তুলতে হলে তার আগে অন্তত পঁচিশ বছর সব কটি আঞ্চলিক ভাষাকে এইভাবে অবাধে সংমিশ্রিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

॥ চীনের উত্তর ॥

চীনের সিংকিয়াঙ প্রদেশ ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীর এলাকার মধ্যে সীমান্ত স্থিরীকরণের উদ্দেশ্যে পাকিস্থান ও চীনের সরকারী কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই মিলিত হচ্ছেন--এই সংবাদ পেয়ে ভারত সরকার চীনের কাছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং তার খানিকটা এলাকা বর্তমানে পাকিস্থান অন্যায়ভাবে দখল করে থাকলেও সম্পূর্ণ কাশ্মীরের উপরেই ভারতের সার্বভৌম অধিকার অক্ষুন্ন রয়েছে। এ অবস্থায় কাশ্মীরের কোন অংশ নিয়ে প্যাকিস্থানের সঙ্গে আলোচনার অর্থ হবে ভারতের সার্বভৌম অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। অতএব চীন সরকার যেন ও কাজে বিরত থাকেন।

কিন্তু ভারতের এ প্রতিবাদে চীন সরকার কর্ণপাত করেননি। তাঁরা বলেছেন, কাশ্মীরের উপর ভারতের সার্বভৌম অধিকার তাঁরা কখনও স্বীকার করেননি। কাশ্মীর সম্পর্কিত পাক-ভারত বিরোধে তাঁরা বরাবরই নিরপেক্ষ থেকেছেন। ভারত সরকারের নোটে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে প্রমাণের চেষ্টা করা হয় যে, চীন ইতিপূর্বে বহুবার কাশ্মীরের উপর ভারতের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করেছে। কিন্তু চীন সরকারের পক্ষে তা অস্বীকারে কোন অসুবিধা হয়নি, কারণ লিখিত-পড়িত কোন প্রমাণই ভারত সরকারের প্রতিবাদলিপিতে ছিল না। এই ঘটনাটি থেকে ভারতের শাসকবর্গ, বিশেষ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া উচিত। চতুর চু এন লাই ভারতে এসে পঞ্চশীলের ছদ্ম আবরণে ভারত সরকারের কাছ থেকে তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌম অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়ে গিয়েছেন কিন্তু তার বিনিময়ে গত আট বছরের মধ্যে কোথাও লিখিতভাবে একথা স্বীকার করেননি যে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার বন্ধুত্বের যখন এতটুকুও চিড় ধরেনি তখনও রাশিয়া বার বার একথা বলা সত্ত্বেও চীন একবারও বলেনি যে, কাশ্মীর ভারতের। আজ সেই অবস্থারই সুযোগ নিচ্ছে চীন সরকার।

অবশ্য চীনের স্বীকৃতিতে এ ব্যাপারে খুব বেশী আসে যায় না। যে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এক্ট বলে ভারত ও পাকিস্থান স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, সেই এক্টেরই ধারা অনুসারে কাশ্মীর একদিন ভারতে যোগদান করেছে। সুতরাং ভারত ও পাকিস্থানের স্বাধীনতা যদি সত্য ও আইনসঙ্গত হয় তবে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সত্য ও আইনসঙ্গত। এ ব্যাপারে কোন ভারতবাসীর মনে অন্তত বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। তাদের শুধু অভিযোগ এই যে, এই আইনসঙ্গত অধিকার অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে দৃঢ়তা দরকার আজও ভারত সরকার তা দেখাতে পারলেন না।

॥ আলবানিয়া ॥

প্রধানত চীনের ভরসাতেই ইউরোপের ক্ষুদ্রতম বল্কান কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র আলবানিয়া রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ করেছিল। রাশিয়াকে তুচ্ছ করে সেদিন আলবানিয়া চীনের সঙ্গে কয়েকটি বাণিজ্যিক ও সাহায্য চুক্তি সম্পাদন করে মনে করেছিল তার বৈষয়িক উন্নতির অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পারবে। কিন্তু ছ মাস যেতে না যেতেই তার মোহভঙ্গ হয়েছে। আলবানিয়া বুঝতে আরম্ভ করেছে যে রাশিয়ার মত একটি উন্নত দেশের সহযোগিতার অভাব-পূরণের ক্ষমতা চীনের নেই। অথচ রাশিয়ার সঙ্গে তার বিরোধিতার আশু মীমাংসার কোন সম্ভাবনা নেই। সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভ কর্তৃক সাম্প্রতিক বুলগেরিয়া সফরকালে আলবানিয়ার অন্যতম বৈরী প্রতিবেশী যুগোশ্লাভিয়ার প্রশংসা ও মার্শাল টিটোর রাশিয়া সফরের আমন্ত্রণে আলবানিয়া এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছে। তাই জাতীয় স্বার্থে আলবানিয়া এখন বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপের সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মৈত্রী-স্থাপনের কথা চিন্তা করছে। ইতালীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলবানিয়ার কয়েকটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যার ফলে দুশ জন ইতালীয় যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ আলবানিয়ায় এসে রুশ যন্ত্র-বিশেষজ্ঞদের পরিত্যক্ত স্থানে কাজ করছেন। গত ডিসেম্বর মাসে আলবানিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল, তারপর অবস্থার কোনরকম উন্নতি না হওয়াতে আজও সে জরুরী অবস্থার নির্দেশ প্রত্যাহৃত হয়নি। উচ্চপদস্থ কয়েকজন সামরিক কর্মচারীর একটি বড় রকমের ষড়যন্ত্রও ইতিমধ্যে সরকারী সজাগ দৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে।

আলবানিয়ার পক্ষে কোন বড় রকমের সিদ্ধান্ত নেওয়া এখনও পর্যন্ত খুব কঠিন নয়, কারণ আলবানিয়ার প্রকৃত ক্ষমতার ধারক তার কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তিপান্ন জন সদস্যের মধ্যে বেশীরভাগই এখনও পর্যন্ত পরস্পরের আত্মীয় এবং একই মতাবলম্বী। দলের প্রথম সেক্রেটারী এনভার হোজা ও প্রধানমন্ত্রী আমেদ শেহু পরস্পরের আত্মীয়, আবার তাঁদের স্ত্রীরাও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। এ অবস্থায় জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে আলবানিয়ার পক্ষে ব্যাপক সাহায্যের আশায় পশ্চিমীদের শরণাপন্ন হওয়া একেবারেই অসম্ভব হবে না। আলবানিয়ার এ সিদ্ধান্তে একমাত্র চীন ছাড়া নতুন করে কেউ অসন্তুষ্ট হবে না, আর তাকে অসন্তুষ্ট করতে আলবানিয়ার ভয়ের কিছুই নেই।

॥ মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন ॥

মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে, কারণ নিয়াসাল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ প্রায় অবশ্যম্ভাবী। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রয় উইলনস্কি বলেছেন, ফেডারেশনের অবলুপ্তি তিনি এখনও অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করেন না। কিন্তু যদি তাই হয় শেষ পর্যন্ত তবে তিনিও আর থাকবেন না। বর্তমান রাজনীতিক সংগঠটি ভেঙে গেলে নিয়াসাল্যান্ডকে নিয়ে নতুন করে কোন অর্থনীতিক সংগঠন গড়ার চেষ্টা হবে কিনা—সাংবাদিকরা এই প্রশ্ন করলে মিঃ উইলনস্কি বলেন, তাতে কোন লাভ হবে না।

॥ বার্ধক্য ॥

বার্ধক্য আজ এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীতে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল হিসাব করে দেখেছেন—বর্তমানে পৃথিবীতে ৬০ বা তার চেয়েও বেশী বয়সের লোকের সংখ্যা কুড়ি কোটি ছাড়িয়ে গেছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়েও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়ছে। দশ বছর আগে বৃদ্ধের যত সংখ্যা ছিল তার চেয়ে তাদের সংখ্যা এখন সাড়ে চার কোটি বেশী এবং ১৯৬৭ সাল নাগাদ সারা পৃথিবীতে কর্মহীন বৃদ্ধের সংখ্যা ত্রিশ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এই বৃদ্ধেরা যাতে সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে পৃথিবীতে তার উপায় নির্ধারণ নিয়ে এবার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাধারণ সম্মেলনে আলোচনা হবে।

॥ ঘরে ॥

৩১শে মে—১৭ই জ্যৈষ্ঠ ঃ সোভিয়েট 'মিগ' জঙ্গী বিমান ক্রয় সম্পর্কে লোকসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ঘোষণা ঃ অপরাপর দেশের সামরিক শক্তির সমকক্ষতা অর্জনই অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের লক্ষ্য।

পূর্ব পাকিস্তান হইতে ক্রমাগত উদ্বাস্তু আগমনের সমস্যা সম্পর্কে লোকসভায় নিবিড় আলোচনা—পাকিস্তানের নিকট হইতে বিতাড়িত হিন্দুদের সংখ্যার অনুপাতে ভূমি দাবী করার অনুরোধ।

১লা জুন—১৮ই জ্যৈষ্ঠ ঃ চীন ও পাকিস্তানের প্রতি ভারতের হুঁসিয়ারী ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের সীমারেখা লইয়া পাক্-চীন চুক্তি গ্রাহ্য হইবে না।

দ্বিতীয় ভারতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের ২৮ হাজার ৬ শত ফুট আরোহণ—শীর্ষে পৌঁছিতে ৪২৮ ফুট বাকী।

ফিজোর সহিত বৈঠক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু নারাজ—বিদ্রোহী নাগা নেতার (লণ্ডনের পর পাকিস্তানে আশ্রয়গ্রহণকারী) প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য।

দিল্লীর বিড়লা ভবন জাতীয় করণের দাবীতে বিক্ষোভ—সমাজতন্ত্রী সদস্যদের লোকসভাকক্ষ ত্যাগ ঃ বিড়লা ভবনের সম্মুখে দলবদ্ধ অভিযান।

২রা জুন—১৯শে জ্যৈষ্ঠ ঃ এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের (ভারতীয়) অভিযান পরিত্যক্ত—তুষার-ঝঞ্ঝার ফলে শৃঙ্গের ৪০০ ফুট নীচু হইতে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য।

দিল্লীতে জাতীয় সংহতি পরিষদের বৈঠকে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মাধ্যম—এই তিনটি প্রধান সমস্যার আলোচনা—উদ্বোধনী ভাষণে পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীনেহরু কর্তৃক নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির নিন্দাত্মক আচরণের উল্লেখ।

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে নূতন বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত—পাকিস্তান হইতে ভারতে তুলা আমদানী ও ভারত হইতে পাকিস্তানে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা।

৩রা জুন—২০শে জ্যৈষ্ঠ ঃ 'হিন্দীর পূর্ণ বিকাশ সাপেক্ষে ইংরাজীই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম থাকিবে'—জাতীয় সংহতি পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ঃ জাতীয় সংহতি সাধনে সংবাদপত্রসমূহের বিশেষ দায়িত্বের উল্লেখ।

৪ঠা জুন—২১শে জ্যৈষ্ঠ ঃ 'পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু-বিরোধী দাঙ্গা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে'—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি—পূর্ববঙ্গ হইতে নবাগত উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বাসন নীতি সম্পর্কে অন্যতম মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার ব্যাখ্যা।

'উপাচার্য (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ও মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ডীনের নিকট ক্ষমা চাহিতে হইবে'—বিক্ষুব্ধ মেডিক্যাল ছাত্রদের সহিত আলোচনাকালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের (মুখ্যমন্ত্রী) দৃঢ় অভিমত প্রকাশ।

৫ই জুন—২২শে জ্যৈষ্ঠ ঃ ইংরাজীকে সহযোগী সরকারী ভাষা (হিন্দীর পাশাপাশি) করিবার জন্য পার্লামেন্টে শীঘ্রই বিল উত্থাপনের উদ্যোগ—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা।

নির্দলীয় ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনের উপর শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) গুরুত্ব আরোপ—দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে জোরালো বক্তব্য পেশ।

৬ই জুন—২৩শে জ্যৈষ্ঠ ঃ আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ রোধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন—লোকসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর ঘোষণা।

অবিলম্বে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার আহ্বান—এ. আই. সি. সি'র বৈঠকে নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব গৃহীত। কংগ্রেসের নূতন সভাপতিপদে শ্রী ডি সঞ্জীবায়া।

তিব্বতস্থ ভারতীয় বাণিজ্য এজেন্সীসমূহ বন্ধ—চীনের সহিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার জের—লোকসভায় শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

॥ বাইরে ॥

৩১শে মে—১৭ই জ্যৈষ্ঠ ঃ পশ্চিম ইরিয়ানে ওলন্দাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে ইন্দোনেশীয় গেরিলা সৈন্যদের নূতন সাফল্য—তিন দিবসব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আরও একটি শহর (সামসাপোর) দখলের সংবাদ।

আন্তর্জাতিক শান্তিবাহিনী গঠনের পশ্চিমী প্রস্তাব সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক প্রত্যাখ্যান—প্রস্তাবের পিছনে বিশ্বে মার্কিণ প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টার অভিযোগ।

১লা জুন—১৮ই জ্যৈষ্ঠ ঃ ইহুদী নিধন যজ্ঞের হোতা এডলফ আইকম্যানের (৫৬) শেষ পর্যন্ত ফাঁসি—ইস্রায়েলের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মহাঘাতকের প্রাণদণ্ডাদেশ মকুবের আবেদন অগ্রাহ্য।

২রা জুন—১৯শে জ্যৈষ্ঠ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের আসন্ন পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত—কারারুদ্ধ ছাত্রগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন।

কঙ্গোয় সামরিক সমস্যা পর্যালোচনার জন্য কমিশন নিয়োগ—কঙ্গোলী প্রধানমন্ত্রী আদোলা ও কাটাঙ্গার প্রেসিডেন্ট শোম্বের ঐকামত।

৩রা জুন—২০শে জ্যৈষ্ঠ ঃ ফ্রান্সে ইতিহাসের বৃহত্তম বিমান দুর্ঘটনা—১৩১ জন যাত্রী নিহত।

রোডেশীয় ফেডারেশন ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য জরুরী দাবী—লাগোসে ১৯টি আফ্রিকান রাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনের প্রস্তাব।

৪ঠা জুন—২১শে জ্যৈষ্ঠ ঃ গুপ্ত সামরিক সংস্থার (ও-এ-এস্) দ্বিতীয় অধিনায়ক প্রাক্তন জেনারেল জোহোর মৃত্যুদণ্ড বহাল—দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীলের আবেদন ফরাসী আদালতে নাকচ।

বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইবার মার্কিণ প্রয়াস (প্রথম দফা) ব্যর্থ—ধাবমান অবস্থায় অস্ত্রবাহী থর্ রকেট ধ্বংস হওয়ার জের।

৫ই জুন—২২শে জ্যৈষ্ঠ ঃ 'ভারতবর্ষ সর্বপ্রকার আণবিক বিস্ফোরণের বিরোধী' —১৭ জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে (জেনেভা) ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীআর্থার লালের ঘোষণা।

ঢাকা বিমান বন্দরে পাক্ জাতীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ নাজেহাল—ছাত্রদল কর্তৃক সমগ্র পাকিস্তানে এক ভাষা ও এক হরফের প্রস্তাবের সমালোচনায় শ্লোগান-দান।

৬ই জুন—২৩শে জ্যৈষ্ঠ ঃ আঙ্গোলায় ১৯৫৯ সাল হইতে এ পর্যন্ত ৩৫ লক্ষ লোককে হত্যার অভিযোগ।

অভয়ংকর

॥ বীটোফেনের পত্রাবলী ॥

লাডভিগ ফন বীটোফেনের সৃষ্ট সংগীতের তাত্ত্বিক দিক গভীরভাবে অনুশীলন করলেই যে তাঁকে মহৎ সুরস্রষ্টা হিসাবে বোঝা সহজ হবে তা নয়, তাঁর কর্মকান্ডের সংগে নিবিড় পরিচয় ঘটলে মনে হবে যে, তাঁর রচনায় একটা মরমী অধ্যাত্মবাদের আমেজ ছিল, বিশেষতঃ তাঁর ক্রমবিকাশের তৃতীয় পর্যায়ের রচনায় এই লক্ষণ সুস্পষ্ট। শ্রোতাকে ধ্বনির জগৎ অতিক্রম করে অন্য কোথায়, অন্য কোনোখানে যেন নিয়ে যায়।

আত্ম-অভিব্যক্তির মাধ্যম হিসাবে শিল্পী যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তার স্পর্শানুভবেই তাঁর জীবনের প্রথম ভাগ কেটেছে। তারপর, মনে হয়, একটা বিরাট ব্যক্তিগত সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হয়েছে শিল্পীকে। এই সংকটের সংগে তাঁর বধিরত্বের কোনও সম্পর্ক আছে এ কথা বলা চলে না। আর এই সংকটই তাঁর বিখ্যাত Heiligenstadt Testament -রচনার হেতু। আর তাঁর ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় সূচিত হচ্ছে Hamer Klaver Sonata রচনার কালে। এই সুর-রচনার মধ্যে কোনো এক মহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য আত্মত্যাগের একটা ইংগিত পাওয়া যায়।

বীটোফেনের ক্রমবিকাশের তৃতীয় পর্যায় বা Third Period শিল্পীর আত্ম-প্রত্যয়ের এক মহান রূপ প্রকাশিত করেছে, এতদ্দ্বারা মনে হয়েছে যে, সংগীতের মাধ্যমে শিল্পী মানব-সমাজকে আধ্যাত্মিক শান্তির এক নতুন পথ প্রদর্শনের প্রচেষ্টা করেছেন, কল্যাণের স্বর্গধামের চাবিকাঠির সন্ধান দিয়েছেন। একটা অস্পষ্ট ধারণা মনে জাগে যে, ব্যক্তিগত সুখের সব দাবী থেকে বীটোফেন আপনাকে মুক্ত করেছিলেন, সোজাসুজি একটা বেদনাদায়ক ব্যক্তিগত ট্রাজেডির অন্ধ নিয়তির সামনে দাঁড়াতে পেরেছিলেন, আর তার ফলে যে অপূর্ব সৃজনীশক্তি লাভ করেন তাকে কোনো-মতে মানবিক বলা যায় না, এ এক মানবাতীত ঐশী শক্তি।

'থার্ড পিরিয়ড' বা তৃতীয় পর্যায়ের বীটোফেনের সর্বাধিক রচনার শ্রেণী বিভাগ করা কঠিন। প্রতিটি সংগীত যেন এক বিরাট বিদগ্ধ পুরুষের ব্যক্তিগত উক্তি যার মূল্য আধ্যাত্মিক। এই মানুষটি যে 'অনরোনীয়ান, মহতো মহীয়ান' এক বিরাট ব্যক্তিত্ব সে কথা অনস্বীকার্য।

বীটোফেনের ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত অসুখী, তাছাড়া বধিরত্ব তাঁর জীবনের আর এক ট্রাজেডি, তাঁর চেয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণী হলে হয়ত এমন অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠত, কারণ বীটোফেন অত্যন্ত নিঃসংগ ছিলেন। আমরা জানি, কোনো মানুষই তার পরিমন্ডলকে একেবারে এড়িয়ে চলতে পারে না। বীটোফেনের জীবনের বিচিত্র পরিমন্ডল তাঁর সৃজনী প্রতিভার সংগে অসম্পৃক্ত নয় বরং ঘনিষ্ঠভাবে সংশিলষ্ট।

এই অতি-মানবিক প্রাণীটিকে তাই যদি আমরা প্রকাশিত হতে দেখি, যদি তাঁর রহস্যময় জীবনের যবনিকা কিছু-মাত্র উদ্ঘাটিত করা সম্ভব হয় তাহলে শিল্পীর প্রকৃত আকৃতি কিছু পরিমাণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৭৮৭ থেকে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বীটোফেন যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তার মধ্যে তাঁর প্রতিভার যেন একটা অস্পষ্ট বহিঃরেখা লক্ষিত হয়। এই চিঠিগুলি তাঁর বন্ধু-দের, সহচরদের, পৃষ্ঠপোষকদের এবং যে সব রমণী তাঁর জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল তাঁদের লিখিত।

'The Letters of Beethoven'—এ এই মহৎ শিল্পীর জীবনের এক বেদনা-নিবিড় চিত্র পাওয়া যায়। চিঠি-পত্রে দেখা যায় যে, বীটোফেন তাঁর পুরুষ-বন্ধুদের প্রতি হয় অত্যন্ত উচ্ছ্বাসপ্রবণ নয়ত অহেতুক রূঢ়। ব্যবসা সহকর্মীদের প্রতি সৌজন্যশীল, অপেক্ষাকৃতভাবে এই ধরণের চিঠিপত্র সংখ্যায় অল্প। কিন্তু অতি বিভ্রান্তিকর মনে হবে তাঁর বান্ধবীদের কাছে লিখিত চিঠিপত্রগুলি, সে সব চিঠি যথেচ্ছভাবে অনাবশ্যক আবেগ, এবং অনুরাগপূর্ণ উক্তির উষ্ণতায় পরিপূর্ণ।

বীটোফেনের চিঠিপত্রে দেখা যায় যে, মহিলাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অতি প্রবল, বিশেষতঃ যাঁরা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। এই কারণে কিন্তু একথা মনে করা উচিত হবে না যে, বীটোফেন উন্নাসিক দলভুক্ত 'স্নব' ছিলেন, তবে এতদ্দ্বারা মনে করা যেতে পারে যে, সেই যুগে যখন সংগীতশিল্পী বা সুরকারদের সামাজিক মর্যাদা তেমন উঁচু ছিল না, বীটোফেনের আকৃতিতে সাময়িক কদর্যতা থাকা সত্ত্বেও উঁচুতলার সমাজের দরজা তাঁর জন্য সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ তিনি থেরেসে মালফাত্তিকে বিবাহের প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হন, এই মালফাত্তি পরে বিবাহ করেন ব্যারণ ড্রসডিককে। অনুরূপ ঘটনা হয়ত কাউন্টেস জিউলেত্তা গুইচিয়ারদি সম্পর্কেও ঘটে থাকবে, ইনিই পরে কাউন্টেস গ্যালেনবার্গ হয়েছিলেন।

কাউন্টেস যোশেফাইন দেয়ীমের সংগে বীটোফেনের ছিল অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন কাউন্ট ষ্ট্যাকেলবার্গকে। যদিচ সুরশিল্পী বীটোফেনের সংগে এই মহিলার ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বের ভূমিতে তবু তত্ত্বান্বেষীরা মনে করেন যে, যোশেফাইনের দ্বিতীয় বিবাহের তৃতীয় সন্তানটি বীটোফেনের।

এর পর আছেন আমালী সেবলেদ। এই সব মেয়েদের কাছে লিখিত বীটো-ফেনের পত্রাবলী উষ্ণ আমেজে ভরপুর। প্রেম ও প্রীতিরসে সিক্ত। এদের মধ্যেই কেউ হয়ত "Eternally Beloved" —চিঠিপত্র পড়ে মনে হয় সম্ভবতঃ এই "Eternally Beloved" প্রাণীটি অন্য কেউ, হয়ত থেরেসে ব্রুণসভিক, থেরেসে বিবাহ করেননি, এবং তাঁর একটি প্রতি-কৃতি বীটোফেনের মৃত্যুর পর তাঁর এক এক গোপন দেরাজে Heiligenstadt Testament এবং "Eternally Beloved"-কে লিখিত বিখ্যাত পত্রটির সংগে পাওয়া যায়।

বীটোফেনের পত্রাবলী কোন রমণীকে আর সবাইকে ছাড়িয়ে গভীরভাবে ভালোবেসে ছিলেন তার কোনও ইংগিত দান করে না। তবে দেখা যায় ব্যক্তিগত

চাকর-বাকরের সঙ্গে বীটোফেনের প্রায়ই মতান্তর ঘটত। বন্ধুদের সততা সম্পর্কেও বীটোফেন সন্দেহাকুল ছিলেন, এই সন্দেহ কিছু পরিমাণে অহেতুক মনে হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র কার্ল-এর অভিভাবক হওয়ার পর বীটোফেন তার প্রতি নিবিড় অনুরাগের পরিচয় দেন, কিন্তু তেমনই কঠোর মনোভাব ছিল তার কামোন্মাদিনী জননীর প্রতি। ভাইপোর মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারছেন না দেখে তাকে কয়েকটি তিরস্কারপূর্ণ পত্র লেখেন। একথা মনে করা ভুল হবে না যে, এই বিরামবিহীন তাড়নার ফলে কার্ল শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে।

বীটোফেনের পত্রাবলী পাঠে মনে হবে তিনি অতিশয় খেয়ালী, বাতিকগ্রস্ত, অত্যাচারী, ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তি ছিলেন, এক ধরণের নিপীড়নমূলক কমপ্লেকসের শিকার হয়ে পড়েছিলেন, যার ফলে কিছু পরিমাণে আত্মনিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে। আত্মধিক্কারজীর্ণ এই মানুষটিকে নিয়তই অতি তুচ্ছ ধরণের পারিবারিক কলহ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়েছে। বীটোফেনের পত্রাবলীর মধ্যে তিনি যে যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন কিংবা পুত্রসন্তানের পিতা হয়েছিলেন এমন কোনও ইঙ্গিত নেই।

যে বিরাট মহামানব পৃথিবীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সুর রচনা করেছেন তাঁর কোনো চিহ্নই এই পত্রাবলীতে পাওয়া যাবে না। ফ্রানৎস ভেগেলারকে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি চিঠির মধ্যে ক্ষীণ আলোক-রেখা পাওয়া যায় ঃ

"You will find me as happy as I am fated to be on this earth, not unhappy — I will seize Fate by the throat; I shall certainly not bend and crush me completely".

অন্যান্য পত্রাবলীতে যে আত্মবিশ্লেষণ করেছেন বীটোফেন তা কিন্তু মনে কিঞ্চিৎ তিক্ততা আনে। সমসাময়িক অপর সুরকারদের মূল্য নিশ্চয়ই তিনি বিচার করতে পারতেন। "King of Harmony" জে, এম, বাখ্‌কে এই অভিধা দান করে বীটোফেন বাখের দুস্থ কন্যাকে সাহায্য-দান করার জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ফলবর্তী হয়নি।

এই চিঠিপত্র পড়ে একথা ধারণা করা যাবে বা একটা থিয়োরী খাড়া করা যেতে পারে বীটোফেনের জীবনের যে বিড়ম্বিত পরিবেশ তার ফলে তাঁর পক্ষে জীবনধারণ করা অর্থহীন। জীবনের সকল মাধুরী শুকিয়ে গিয়েছিল আর যে জিনিসটির অভাব ঘটেছিল তা করুণার পুণ্য পরশধারা। তবে এই চিঠিপত্র থেকে মহৎ সুরস্রষ্টা শিল্পী বীটোফেনের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে না, যা পাওয়া যাবে তা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস, দিনযাপনের, প্রাণধারণের গ্লানি।

চিঠিপত্রগুলি কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই, তবে যে মহৎ শিল্পী Hammerklavier Sonata, Erocia, Missa Solemnis, Great Quartets এবং Ninth Symphony প্রভৃতি ভুবন-মোহন সুরলহরী সৃষ্টি করছেন তাঁকে অনন্ত সন্ধান করতে হবে।

The Letters of Beethoven-এ ১৭৮৭ থেকে ১৮২৭ পর্যন্ত বীটোফেন লিখিত যে সব চিঠিপত্র আছে তার ১৫৭০ খানি চিঠি সংকলিত হয়েছে। অনুবাদ অতি সুন্দর, সম্পাদনা নিখুঁত, প্রতিটি পত্র বিশ্লেষিত ও পাদটীকাযুক্ত। এ ছাড়া ৮০ খানি মূল্যবান দলিলের প্রতিলিপিও আছে। সূচীটি মূল্যবান। এই তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি বীটোফেন-রসিক পাঠকের কাছে নিরতিশয় মূল্যবান সম্পদ। এমিলি এন্ডারসন পনেরো বছর ধরে গবেষণা করেছেন, অনুবাদ করেছেন এবং টীকা ও টিপ্পনী রচনা করেছেন। অনুবাদিকার সুগভীর নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেড় হাজার পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থ।*

---

* **THE LETTERS OF BEETHOVEN (তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ) এমিলি এণ্ডারসন কর্তৃক সংগৃহীত, সম্পাদিত ও অনুদিত এবং ভূমিকা-সম্বলিত। (প্রকাশক—MACMILLAN : মূল্য দশ পাউণ্ড, দশ শিলিং।**

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম বারো টাকা।

প্রাচীন ভারতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে শিল্পকলার প্রয়োজন ও প্রভাব কতটা ছিল জানি না, তবে আধুনিক ভারতে আজকের জীবনযাত্রা যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে আশঙ্কা হয় আমরা বোধহয় অচিরেই 'রূপ-কানা' জাতি হয়ে পড়ব। কারণ দীর্ঘকাল ধরে আমরা এমনি এক কুৎসিত বস্তুতান্ত্রিকতার নিষ্ফল আরাধনা করে যাচ্ছি, তাতে দৈবের পরিহাসেই বোধহয় আমাদের জীবন থেকে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুজনেই ক্রমে ক্রমে বিদায় নিচ্ছেন। আমাদের প্রাচীন শিল্পের ঐতিহ্য যা ছিল তাকে আমরা রাখতে পারিনি—আর নতুন কোন শিল্পের ঐতিহ্য সৃষ্টিও করতে পারিনি। এর একমাত্র কারণ হতে পারে আমাদের রূপবোধের অভাব, জীবনে সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা বোধের অভাব। রূপার সদ্যপ্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের বইটি পড়তে পড়তে এই কথাটাই বারে বারে মনে আসে। এর আগে বাংলা

ভাষায় রূপকলার আলোচনা কেউ করেননি, মানুষের সৃষ্ট শিল্পবস্তুরও রূপ-বিচার করবার কোন চেষ্টা হয়নি। তারও কারণ ঐ রূপবোধের অভাব। কোন ছবি বা মূর্তি ভাল লাগলে, কি ভাল লাগল বা কেন ভাল লাগল তা নিয়ে কেউ ভেবে দেখেনি বা আর পাঁচজনকে ভাবতে বলেনি। বলবার ভাষারও বোধ হয় অভাব ছিল। এই দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি বাংলা ভাষায় প্রথম করলেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিল্পীরা সাধারণত শিল্প-বিষয়ে লেখেন না। অবনীন্দ্রনাথও লিখতেন না যদি না আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে বাগেশ্বরী অধ্যাপক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারে বসিয়ে দিতেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ খৃঃ পর্যন্ত এই চেয়ারে বসে তিনি ছাত্রদের কাছে যা বলে গিয়েছেন তাকেই সাজিয়ে ১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বই আকারে বার করা হয়। তারপর প্রায় বিশ বছরেরও

ওপর হতে চলল বইটি অপ্রকাশিত থাকে। এতকাল পরে বইটি আবার বার হওয়ায়, একটা বড় অভাব পূরণ হল। ২৮টি পরিচ্ছেদে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিল্প-বিশ্লেষণের উপযুক্ত ভাষার অভাবে সাহিত্য এবং অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে প্রচুর উদাহরণ দিয়ে রূপশিল্পকে সরল ও মনোগ্রাহী করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর একান্ত নিজস্ব প্রকাশ-ভঙ্গীতে। কোথায় সৌন্দর্যের সন্ধান করব, কেমনভাবে সন্ধান করব, কিভাবে তাকে প্রকাশ করতে হবে ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। শেষের দিকে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আগাগোড়া বইয়ের মধ্যে যথার্থ শিল্পীর মত কোন শিল্পশাস্ত্রের ব্যাকরণকে তিনি প্রাধান্য দেননি। সমস্ত বইয়ের মধ্যেই তিনি বারে বারে রূপের দিকে আমাদের চোখ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। তবু দুঃখের বিষয় এই যে, এত দিনেও আমরা ছবি বা মূর্তি দেখতে শিখলাম না। আশা করি এই বইটি আমাদের মধ্যে রূপবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করবে। বইটির মুদ্রণ পারিপাট্য ও অঙ্গসজ্জার জন্যে প্রকাশককে ধন্যবাদ।

ত্রিনয়নী (উপন্যাস) সুশীল রায়। প্রকাশক—এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

সুশীল রায় কবি, ছোটগল্প লেখক এবং উপন্যাসকার হিসাবে একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। যাঁরা অনেক কম লিখেও স্থায়ী সুনাম অর্জন করেছেন সুশীল রায় সেই বিরল সংখ্যক সাহিত্যিকদের অন্যতম। ত্রিনয়ণী তাঁর নবতম উপন্যাস। মল্লিকপুরের মধ্যে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ভদ্রকালী সূচীশিল্পের সূক্ষ্মকর্মে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তিনি শেষবয়সে দৃষ্টিশক্তি হারালেন। বাঁড়ুজ্যেবাড়ীর গৌরবশশী অস্তমিত। এমন সময় কন্যা ত্রিনয়নী সিনেমার পর্দায় মিস পার্বতী হয়ে ভেসে উঠলেন। তার ছোট বোন নয়নতারার বিয়ে হল, সে কিন্তু দিদির মতো সিনেমাষ্টার হওয়ার জন্য ব্যাকুল। অবশেষে তার মনোবাসনা সিদ্ধ হল, নয়নতারাও সিনেমায় চান্স পেল। ত্রিনয়নী সিনেমা লাইনের যে হতাশা তা এতদিনে বোঝে, এই পথে আছে খ্যাতি আর অর্থ, কিন্তু মর্যাদা নেই। সে একদিন ঘরে ফিরে এলো। মনাক্কা নামে আর একজন সাধারণ বারবনিতা সিনেমা লাইনে খ্যাতি অর্জন করেছিল, কিন্তু গৃহীর জীবন তারও কাম্য। সে পেল গৃহকোণ। নয়নতারার জীবনের ট্রাজেডি, সিনেমা জগতের চিরন্তন সমস্যা।

সুশীল রায় তাঁর এই উপন্যাসে অসাধারণ সংযম ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এক বলিষ্ঠ কাহিনী অতিশয় সূক্ষ্ম রেখায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

প্রচ্ছদপট শোভন, মুদ্রণ সুন্দর।

মনসিজ (উপন্যাস)—জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। অগ্রণী প্রকাশনী। এ-১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

'অন্তর্মনা'র পরিণতি 'মনসিজে।' জ্যোতির্ময়বাবু তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। ছোড়দি, অরুদি, বাবা, মা, বলাইবাবু, শ্বেতাদি, স্মৃতি, অনিন্দ্য, অতীশদা এরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিবেশী। 'বেঁচে থাকার দায়' থেকে এরা কেউই মুক্ত নয়। প্রত্যেকের মাঝখানে সমস্যা রয়েছে। সমস্যাহীন-ভাবে আধুনিক জীবন গড়ে উঠতে পারে না। সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, ক্লান্তি, ক্লেদ, সংশয়, প্রতিনিয়ত অসুস্থতাবোধ বা চিন্তা আধুনিক জীবনের এই চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য রোমান্টিক জগতের নিঃসীম স্বপ্নলোকে মিলিয়ে না গিয়ে বাস্তবতার হাত ধরে লাভ করেছে শিল্পময় অভিব্যক্তি। অনিন্দ্যর এক-ঘেয়েমি জীবনে স্মৃতির স্পর্শ তাকে সজীব করে রাখতে পারত সত্য—কিন্তু যে শিল্পীমন তাকে স্মৃতির সান্নিধ্য হতে চরম মুক্তিপথে যাত্রা করবার সুযোগ করে দিয়েছিল—তা বাংলা সাহিত্যে অভিনব তো বটেই—এমন কি জীবনা-ভিজ্ঞতায় জ্যোতির্ময়বাবুর পরিণত সুরুচিপূর্ণ শিক্ষিত শিল্পমনের স্বাভা-বিকতা যেমন সুস্পষ্ট তেমনি এ উপন্যাস মনের গহন কোণে অন্বেষণী দৃষ্টির নব অভিজ্ঞান!

'মনসিজে'র চরিত্রগুলি অপরাজিত। এবং পরিণতি এখনও অসমাপ্ত। যে এপিক-ধর্মী উপন্যাস রচনায় জ্যোতির্ময়-বাবু হাত দিয়েছেন সেখানে অন্নদাশঙ্কর ও অসীম রায়ের কথা মনে পড়ে। এঁরা কেউই এ শ্রেণীর উপন্যাস রচনায় আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নেননি—যদিও অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে।

তাছাড়া আমাদের কালে উপন্যাসের সংজ্ঞা-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের রূপও গেছে পাল্টে। 'মনসিজ' জীবনকে নতুনভাবে দেখা ও নতুনভাবে প্রকাশের চেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। 'মনসিজে'র নিহিতার্থের সাহায্যেও লেখক বক্তব্য বিষয়কে আরও সুস্পষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। 'অন্তর্মনা' পড়বার পর মনের মধ্যে যে প্রশ্ন জেগেছিল এখানে তা সমাধিত। কিন্তু এই উপন্যাসের মধ্যে প্রশ্ন আরও বিরাটাকারে জেগে উঠেছে। ভবিষ্যতে সে প্রশ্নের উত্তরণ হবে আশা করি।

চর্যাপদের হরিণী—(গল্প সংকলন)—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

সাহিত্যের বাঁধাধরা পথে মাঝারী রকমের সার্থকতা অর্জনের চেয়ে নূতন পথের সন্ধানে বৃহৎ ব্যর্থতা স্বীকার করতে কতিপয় সাহিত্যিক সকল যুগেই উৎসুক থাকেন, এবং সেইজন্যেই সাহিত্যের ঋতু-বদল দেখা যায়। "চর্যা-পদের হরিণীর" লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিরল দুঃসাহসিকদের অন্যতম। তৃপ্তি-দেওয়া থেকে অতৃপ্তির হাহাকার জাগানো ও ঘুম-পাড়ানোর চেয়ে ঘুম-ভাঙানোতে দীপেন্দ্রনাথের আগ্রহ সর্বাধিক এবং বলা বাহুল্য এই-ই সৎ সাহিত্যেকের অন্বেষা। এই গ্রন্থে পাঁচটি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পকটি নাম-করা। এই প্রসঙ্গে চর্যাপদের হরিণী নামক গল্পটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গল্পের নায়ক সুধাময় যুগসঙ্কটের একটি মুহূর্তে একটি বিশেষ সত্যকে আত্মস্থ করার জন্য যে অনলস আত্ম-শুদ্ধির সংগ্রাম করে চলেছে লেখক তার অংশীদারত্ব দিতে চান পাঠকদেরও। সব চেয়ে সুখের কথা এই যে, তথাকথিত চেতনা-প্রবাহ-প্লাবিত সাম্প্রতিক গল্পের ক্ষেত্রে দীপেন্দ্রনাথ এমন নায়ক উপস্থিত করতে চান যারা ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত, স্থানে কালে বিধৃত; তারা কোন অংশে নিরাবয়ব ভাবনা ও নীরক্ত আবিলতা নয়। এবং সাম্প্রতিকদের মধ্যে দীপেন্দ্রনাথের উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য বোধ হয় এইজন্যই যে দীপেন্দ্রনাথ আত্মচরিত লেখেন না; তিনি খোঁজেন আমাদের চারপাশে থ্যাঁতলানো তোবড়ানো মুখ যারা মুক্তির দিকে চলেছে। আমরা

সাগ্রহে এই তীর্থযাত্রা দেখি, আমরাও সহযাত্রী হই। এই প্রসঙ্গে নরকের প্রহরী নামক গল্পটিও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। সুন্দর উপস্থাপনা ও ইঙ্গিতময় ভাবা ব্যবহারে দীপেন্দ্রনাথ প্রতীকের সার্থকতা অর্জন করার প্রয়াসী এবং কিছুটা অংশে সার্থক। অবশ্য তার মধ্যে বৈপরীত্য চোখে পড়ে, পীড়া দেয়। তাই অন্তর্লোক ও বহির্লোকের সাযুজ্য-বোধে যে শিল্পের মৃন্ময় তন্ময়তা গড়ে ওঠে, তা মাঝে মাঝে ভেঙে যায়। কিন্তু এ শিক্ষা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। জীবনের কাছ থেকে পাঠ নিতে দীপেন্দ্রনাথের সাহিত্য-চেতনা সতত প্রস্তুত বলেই আশা করি, বাংলাদেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত গল্পের জগতে তিনি সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখবেন। 'চর্যাপদের হরিণী' অভি-নন্দনীয় গল্পগ্রন্থ।

লালদীঘি (উপন্যাস)—দধীচি মৈত্র। এম দত্ত, এণ্ড কোম্পানী। ৭, টেমার লেন, কলিকাতা-৯। দাম তিন টাকা।

একটি প্রেমঘটিত কাহিনীই এই উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য। সতীনাথ বাসব-দত্তা পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করল। কিন্তু বাসবদত্তার মন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। সতীনাথকে সে ত্যাগ করে ধনীর দুলাল-দের কণ্ঠলগ্না হয়ে থাকল। সতীনাথ তখন উন্মাদ। খবর পেয়ে সতীনাথের মা এলেন কাশী থেকে। সঙ্গে এল জয়া। সতীনাথকে মনে-প্রাণে ভালবাসত। কিন্তু না-পাওয়ার বেদনায় দূরে সরে গিয়ে-ছিল। বাসবদত্তার ফাঁসি হল কিংকর নামক এক ব্যক্তিকে হত্যার জন্যে। সতীনাথ সুস্থ মন ফিরে পেয়ে জয়াকে লাভ করল।

মূল কাহিনী কলকাতা শহর থেকে খুব বেশী দূরে ছড়িয়ে না গিয়ে একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। চরিত্রগুলি মোটামুটি স্বাভাবিক। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খেয়ে গড়ে উঠেছে এবং তার ক্রমবিকাশও ঘটেছে। সতীনাথ, জয়া, বাসবদত্তা, নেপেনদা, নন্দরাণী, বিজয়া, আফিসের ও পাড়ার অনাহূত শুভাকাঙ্ক্ষীর দল সকলে মিলে পরিশেষে একাকার হয়ে গেছে।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ একরকম।

সীমান্ত প্রহরী— (কবিতা) হেমাঙ্গ বিশ্বাস। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস কবি হিসাবে বাংলাদেশের পাঠক সমাজে একটি পরি-চিত নাম। দীর্ঘ পনেরো বৎসর ধরে তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে আসছেন। সে সমস্ত কবিতার মধ্য থেকে কয়েকটি কবিতা নির্বাচন করে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। মূল অসমিয়া ভাষায় রচিত তাঁর কয়েকটি কবিতার অনুবাদও রয়েছে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের কাব্যজগৎ কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। সাধারণ মানুষের যে প্রতিচ্ছবি তাঁর কাব্যজগতে ফুটে উঠেছে তা যে কোন দেশের যে কোন সমাজের জীবন থেকে আহৃত। প্রকৃতির বুকে খেটে-খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে চীনের মহান কর্মী মানুষেরা আর কবিমনের বিচিত্র অভিযাত্রার রূপালেখ্য তাঁর কবিতাকে করেছে নির্মল ও পবিত্র। জীবন সম্পর্কে কবির ধারণা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। এই বলিষ্ঠ জীবনবোধই তাঁর কাব্যে যে জগৎ সৃষ্টি করেছে তা কেবলমাত্র কবি-কল্পনার জগতে পর্যবসিত না হয়ে সুস্থ মানবপ্রেমের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে। সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে কবি যেমন সচেতন তেমনি শব্দচয়নেও দক্ষতা লক্ষণীয়। চিত্রকল্পে কবির স্বাতন্ত্র্য চিন্তাবোধকে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরে। যে একনিষ্ঠ সাধনায় তাঁর এই স্বতন্ত্র কাব্যজগৎ গড়ে উঠেছে তা দীর্ঘকাল পাঠক-মনে স্বাক্ষর রেখে যাবে আশা করি।

দীর্ঘকাল বাদে শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় আনন্দলাভ করেছি। মুদ্রণ, প্রচ্ছদ ও বাঁধাই সুন্দর।

বিক্ষত অন্বেষণ (কবিতা)—অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। দাম দু টাকা।

বিষণ্ণ ঋতু (কবিত)—রত্নেশ্বর হাজরা। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ১-সি, রাণী শংকরী লেন, কলকাতা-২৬। দাম দেড় টাকা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের কবিদ্বয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগত। পূর্বে তাঁদের বিশেষ কোন কবিতা পড়বার সুযোগ না হলেও এখানে দুজন স্বতন্ত্র কবি-ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পেলাম—যাঁরা জীবন সম্পর্কে কেবলমাত্র আশাবাদীই নন—যন্ত্রণার অন্তরাল হতে বেরিয়ে এসে সত্য ও সুন্দরকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন।

বর্তমান জীবনের যন্ত্রণাময়তা, জটিলতা, সংশয়, আশাহীন জীবনকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাওয়া—'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আইখম্যানের অশুচি কঙ্কালে নৌকো বেঁধে ঘরে ফিরে যাবো,—'কেননা সূর্য উঠলে পবিত্র অরণ্যে অশ্রুত গান শুনবো'—'প্রতীক্ষিত বেদনার আঙুলে কাঁপে সৃষ্টির তুলিকা'—এবং 'সঙ্গীরা ফিরে এলে আমি ঝড়ের হাওয়ায় পাল উড়িয়ে দেবো'—'বিক্ষত অন্বেষণ' শীর্ষক কবিতার এ উপলব্ধি চিত্রকল্পের অভিনব ব্যঞ্জনা, পরিশুদ্ধ শিল্পবিবেকের উপ-স্থিতিতে অনুভূতিপ্রবণ কবিমনটি সৌন্দর্যময়তার মাঝখানে ভাস্বরিত। এই দীর্ঘ কবিতাটিতে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী যথার্থ শিল্পীজনোচিত মননশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য কবিতাংশে অনেকগুলি ভাল কবিতা আছে। একথা বলা অসঙ্গত হবে না আশা করি যে, ছন্দবদ্ধ কবিতা থেকে গদ্য কবিতা রচনার মধ্যে তিনি অনেক স্বাভাবিক ও সার্থক।

'আজ দেখো ঘরে ঘরে সব বধূ আঁকে আলপনা শরত-লক্ষ্মীর দিন, তাকে ছেড়ে সেতুবন্ধ চলে যাওয়া সে কখনো ভাল লাগে? তুমিই বল না?' এখানে যে রোমান্টিক কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে এক বিষণ্ণ, বিমূঢ় শিল্পবোধ ফুটে উঠলেও 'নিঃসঙ্গ যৌবন-শঙ্খে একদিন কালের রাখাল বাজাল যন্ত্রণা।' হার্দিক মনন-শীলতায় তার কাব্যচেতনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে জানিয়ে দেয় 'চিরশূন্য শূন্যের যন্ত্রণা।' যে বিষণ্ণতার সুর তাঁর কাব্যে প্রধান স্থান জুড়ে রয়েছে তা থেকে মুক্তির প্রয়োজন আছে মনে করি। তা না হলে 'অনাস্তির মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে লয়ে যাও'—অসার্থক হবে। জীবনযুদ্ধে পরাজিতের গ্লানি নিয়ে এক যন্ত্রণার গৃহে নির্বাসিত হতে হবে।' কয়েকটি মাত্র কবিতায় কবির মননশক্তির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

গঙ্গানদীর উৎসে—(অ ভি যা ত্রী-কাহিনী) — ভোলা চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : ত্রিবেণী প্রকাশন। ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দু টাকা।

লেখক গঙ্গাপ্রবাহের-গতিপথ অনু-সরণ করে তার উৎসে পৌঁছবার পথে যা দেখেছেন এবং যে অভিজ্ঞতার সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছেন তা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন এবং অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে সার্থকতা লাভ করেছেন। লেখকের ভাষা অবশ্য সর্বদা সমান নয়, যথা 'সীমিত পৃথিবীর বুকে ঘনিষ্ঠতার অনানুগ্রাহ্য হিমালয়ের আড়

দুরন্ত দুর্নিবার আহ্বান।' এই কথা-কটির পারস্পরিক অর্থ ঠিকমত না বুঝেই যেন ব্যবহার করা হয়েছে, এমন নমুনা অনেক আছে। আজকাল অনেকেই এই জাতীয় গ্রন্থ লিখছেন, তবে লেখক যেভাবে গোমুখের সন্ধানে ঘুরেছেন তার কাহিনী অতিশয় রোমাঞ্চকর।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

সাহিত্যের খবর—সম্পাদক : মনোজ বসু। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২ হতে প্রকাশিত। দাম ৭৫ নয়া পয়সা।

একমাত্র সাহিত্য-বিষয়ক এই পত্রিকাটি ইতিমধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মূল্যবান প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়ে এর প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে থাকে। পনেরটি নাট্য-বিষয়ক রচনা নিয়ে প্রকাশিত আলোচ্য নাট্য সংখ্যাটি নানা-বিধ কারণে উল্লেখযোগ্য। ডক্টর গোবিন্দ দাস রচিত 'ভারতীয় নাট্যশালা' নামক প্রবন্ধে ভারতীয় ভাষাসমূহে নাট্যশালার উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য আলোচকদের মধ্যে আছেন, ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (রবীন্দ্রনাথের মহলা), শুদ্ধসত্ত্ব বসু (নাটক লিখতে হলে), মন্মথ রায় (বাংলা নাট্য-দর্পণ), ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (কাব্যনাট্য), ভোলানাথ ঘোষ (রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটকের হাস্য-রস), দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ (রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা), রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায় (এ-কালের নাট্য-প্রযোজনা), গুলবদাস ব্রোকার (আধুনিক গুজরাটি নাটক), সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্র-নাটকের শ্রীরূপ), ব্রজেন চক্রবর্তী (শিশিরকুমারের মহলা), ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য (সাম্প্রতিক বাংলা-নাটকের সমস্যা), অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাটকে গানের মূল্য), নারায়ণ চৌধুরী (বাংলা নাটক : একটি ভবিষ্যৎ বাণী)। গত এক বছরে প্রকাশিত নতুন ও পুনর্মুদ্রিত নাটকের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। এ সূত্রে কয়েকটি বাঙলা নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া আছে দেশ-বিদেশের খবর ও নতুন বইয়ের তালিকা। এত অল্প মূল্যে মূল্যবান ও বৃহদায়তনের এই পত্রিকাটি প্রকাশ করার জন্য 'সাহিত্যের খবর'-এর কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

রূপ-ভারতী—সম্পাদক : মহাদেব সাহা। ৭৭, ধর্মতলা স্ট্রীট কলকাতা-১৩ হতে প্রকাশিত। দাম ৭৫ নয়া পয়সা।

রূপভারতীর আলোচ্য সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রচনা কে এ আন্তোনোভা লিখিত 'আকবরের ধর্মসংস্কারের সামাজিক পটভূমিকা'। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের 'ভারতের আদিবাসী' নামক রচনার দ্বিতীয় পর্যায় এ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের আদিবাসী সম্পর্কে এই নতুন দৃষ্টিসম্মত আলোচনা নতুন চিন্তার খোরাক যোগাবে। গোর্কির দুটি গদ্য কবিতার অনুবাদ করেছেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। লারমনতয়োর একটি কবিতা অনুবাদ করেছেন অরুণাচল বসু। বিষ্ণু দে'র একটি কবিতা আছে। শংকর চক্রবর্তীর 'মহাকাশজয়ী মানুষ' (দ্বিতীয় পর্ব) ও আরও কয়েকটি লেখা এ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

মানস—সম্পাদক : রবি রায়। ৬৪, বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম এক টাকা।

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক-পত্র 'মানসের' এইটি ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা। আলোচ্য সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন দেবব্রত চক্রবর্তী (সাহিত্য বিবেক : মান ও মূল্যায়ন) ও দেবেশ রায়চৌধুরী (রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা)। কবিতা লিখেছেন সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন আদক। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ও অজয় গুপ্তের গল্প আছে।

গন্ধর্ব—সম্পাদক : নৃপেন সাহা। ১৮, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২ হতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

নাটক ও নাট সম্পর্কিত আলোচনায় সমৃদ্ধ 'গন্ধর্ব' পত্রিকাটি বাংলাদেশের পাঠকসমাজে একটি সুযোগ্য স্থান লাভ করেছে। ইতিপূর্বে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির যেকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে নাটকরসিক মানুষের কাছে তার যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। বর্তমান কাব্যনাট্য সংখ্যাটির মূল্য সেগুলির থেকে কোন অংশে কম নয়। ডবলু বি য়েটসের 'রঙ্গমঞ্চে কাব্যনাট্য' অশ্রুকুমার সিকদারের 'কাব্যনাট্য : দুই ভুবন এক ভাষা' বর্তমান নাট্যান্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় রচনা বলেই মনে হয়। তাছাড়া আছে আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের রঙ্গমঞ্চ ও কাব্যনাট্য বিষয়ক আলোচনা ও তরুণ সেন লিখিত পুস্তক পরিচিতি। কাব্যনাট্য-রচয়িতাদের মধ্যে আছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, রাম বসু, দিলীপ রায়, কৃষ্ণ ধর, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, গিরিশংকর, শোভন সোম। সম্প্রতি-কালে রচিত কাব্যনাট্যের একটি তালিকাও আছে।

রাঙা মাটি—সম্পাদক : শক্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ : বর্ধমান শাখার মুখপত্র। দাম—এক টাকা।

আলোচ্য সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন রবীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, গোপেশচন্দ্র দত্ত, এককড়ি চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত রায়, শক্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ভট্টাচার্য। আলোক সরকার ও আরও কয়েকজনের কবিতা আছে। কয়েকটি গল্প ও একটি নাটিকা এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে।

বহ্নিশিখা—সম্পাদক : উত্তমকুমার দাস। বহ্নিশিখা প্রকাশনী, বারুইপুর, ২৪-পরগণা হতে প্রকাশিত। দাম : পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আলোচ্য সংখ্যায় তরুণ সান্যাল লিখিত 'কাব্যনিরপেক্ষ কাব্যতত্ত্ব ও আধুনিক কবিতা' নামক প্রবন্ধটি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সংযোজন। এ সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন আলোক সরকার, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, পরিমল চক্রবর্তী, উত্তমকুমার দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত দাস প্রভৃতি। রমানাথ রায়, প্রসাদ সেন ও মৃত্যুঞ্জয় সেনের গল্প আছে। তাছাড়া দীপালি দাশের একটি প্রবন্ধ সংকলনে স্থান পেয়েছে।

উত্তরকাল—সম্পাদক : সতীন্দ্রনাথ মৈত্র ও প্রসূন বসু। ৫৯, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ হতে প্রকাশিত। দাম—পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

উত্তরকালের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। চিন্মোহন সেহানবীশের 'উচ্চ-শিক্ষার বাহন' আলোচনাটি মূল্যবান। কবিতা লিখেছেন—দক্ষিণারঞ্জন বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়, তরুণ সান্যাল। শম্ভু মুখোপাধ্যায় ও সুশীলকুমার গুপ্ত আলোচনা করেছেন যথাক্রমে 'প্রগতি সাহিত্যের সংকট' ও 'কবিতার ধর্ম ও ক্রুদ্ধ দর্শক' প্রসঙ্গ। বীরেন্দ্র নিয়োগীর একটি গল্প ও এরিক হার্টলের 'সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতা'র দ্বিতীয় পর্যায় মুদ্রিত হয়েছে। তাছাড়া আরও কয়েকটি আলোচনা আছে।

নান্দীকর

যুগধর্ম :

সেদিন বিশ্বরূপার নাট্যসেবী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী বক্তৃতাস্থলে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের অতীত স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলছিলেন, বর্তমানের সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক তো দূরের কথা, নাট্যামোদী দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্যে পালন, শিরীফরহাদ বা পরদেশী গোছের কোনো সুন্দর গীতিনাট্যও মঞ্চস্থ হয় না। তাঁর ক্ষেদোক্তি মিথ্যা নয়। কিন্তু আজ যে সাধারণ, সৌখীন বা রঙ্গালয়বিহীন পেশাদারী নাট্য সংস্থাগুলি সামাজিক বা গার্হস্থ্য ছাড়া অন্য কোনো প্রকার নাটকেরই অভিনয় করছেন না, এর নিশ্চয়ই কোনো সংগত কারণ আছে। যে-কোনো কারণেই আজ মাত্র শহর কলকাতায় নয়, বাঙলা দেশের সুদূর পল্লীঅঞ্চলেও বহু নাট্যসংস্থা গ'ড়ে উঠেছে এবং এখনও উঠছে। এবং এই সংস্থাগুলি আগেকার অপেশাদারী নাট্যসমাজগুলির মত সাধারণ রঙ্গালয়ে সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত নাটকগুলিকে সম্বল ক'রে তাদের অভিনয় স্পৃহা চরিতার্থ করে না। এঁরা এঁদেরই কোনো সভ্য লিখিত মৌলিক নাটক বা নিদেন-পক্ষে কোনো উপন্যাস বা গল্পের নাট্যরূপকে মঞ্চস্থ করতে ঢের বেশী উৎসাহ বোধ করেন। বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন-পরিকল্পনা-পরিষদ অনুষ্ঠিত নাট্য সম্মেলন থেকে জানা গেল যে, গেল চার বছরের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা উপলক্ষে পরিষদের হাতে অন্ততঃ দু' হাজার নাটকের পান্ডুলিপি এসে জমা হয়েছে। ওঁদের হাতে এসে পড়েনি, এমন আরো দু' হাজার পান্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছে, এমন আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। এর অর্থ হচ্ছে, আজ বাঙলাদেশে প্রতি বছরে অন্ততঃ এক হাজার ক'রে মৌলিক নাটক—সে পূর্ণাঙ্গই হোক, বা একাঙ্কিকাই হোক—লেখা হচ্ছে। অবশ্য বলা বাহুল্য, এদের সবগুলিই কিছু নাট্যপদবাচ্য নয়; কোনো গল্প বা রচনা বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে সংলাপের আকারে লেখা এবং কয়েকটি দৃশ্য বিভক্ত হ'লেই যে তা নাটক হয়ে উঠবে, এমন দাবি অপরিণত বয়স্ক বালকেরা বা পরিণত বয়স্ক বালকোপম যুবকেরা ক'রে থাকলেও নাট্যসাহিত্যের সমঝদারেরা এমন অন্যায় দাবিকে কোনোদিনই মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু অধুনা যে-সব রচনা নাটক নাম দিয়ে লেখা হয়েছে, সে-সব রচনা সত্যিই নাটকের মর্যাদা পাবার অধিকারী কিনা, সে-বিচারের ভার নাটকের ধুরন্ধর উক্তারদের হাতে ছেড়ে দিয়েও এ-কথা বলতে পারা যায় যে, এই বিশাল নাট্যারণ্যের মধ্যে এমন একখানি নাটকেরও সন্ধান পাওয়া যাবে না, যা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা গীতিনাট্য নামে ভূষিত হ'তে পারে। পান্ডুলিপিগুলি পড়লেই দেখতে পাওয়া যাবে, প্রতিটি রচনারই উপজীব্য হচ্ছে বর্তমান সংসার বা সমাজ। বঞ্চিতের কথা, অভাবগ্রস্তের কথা, শ্রেণী সংগ্রামের কথা, উদ্বাস্তুর কথা—এই সব বিষয় রচনায় ভীড় ক'রে রয়েছে। চোর, পকেটমার, ভিখারী, জুয়াচোর, পতিতা, তথাকথিত সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত দুর্নীতিপরায়ণ যুবক-যুবতী, বালক-বালিকার চিত্র অংকিত ক'রে তাদের প্রতি সহানুভূতি জাগাবার চেষ্টা আছে এই রচনার কোথাও কোথাও। লেখক যেন বলতে চেয়েছেন, অবস্থার ঘূর্ণিপাকে প'ড়েই এরা পাঁকে প্রবেশ করেছে, এদের অপরাধের জন্যে এদের দায়িত্ব কতটুকু? কিছু কিছু যে রূপক নাটক লেখা হচ্ছে না, তা নয়; কিন্তু রূপকের খোলস খুলে নিলে তারাও ঐ একই কথা বলছে। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের "নচিকেতা" বা পরেশ ধরের "কালপুরী" বর্তমানের ধনতন্ত্রেরই তীব্র সমালোচনা।

আজকের নাট্য আন্দোলনে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে: নাটকের গঠন, ভাষা, চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি থেকে শুরু ক'রে নাট্যপ্রযোজনার আঙ্গিক, বিশেষ ক'রে দৃশ্যপট রচনা ও আলোকের বহু প্রকার ব্যবহার এবং অভিনয়ের রীতি-নীতি—সর্বক্ষেত্রেই চিরাচরিত প্রথাকে পিছনে ফেলে নূতন ভাবনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু যাকে অবলম্বন ক'রে অভিনয়, সেই নাটক রচনার সময় লেখকরা আজকের সমস্যাজর্জর সমাজকে কিছুতেই যেন ভুলতে পারছেন না। পৌরাণিক দেবদেবীর অলৌকিকত্ব, ঐতিহাসিক রাজাবাদশার প্রাসাদ বা হারেমের ক্রিয়াকলাপ, কিংবা রঙ্গীন প্রেমের নৃত্যগীত আনন্দহিল্লোলের দিকে

• রাখাল সাহা প্রযোজিত 'আগুন' চিত্রে কণিকা মজুমদার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যারাণী।

ভূপেন রায় পরিচালিত 'বধূ' চিত্রের একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস ও সন্ধ্যা রায়।

তাঁদের দৃষ্টি বা মন কিছুতেই আকৃষ্ট হচ্ছে না। তাঁদের দৃষ্টিতে রঙ্গমঞ্চ আজ ধনীজনের অবসরবিনোদনের বিলাসগৃহ নয়, 'রঙ্গমঞ্চ হচ্ছে সেই ফোরাম forum—, সেই বিচারপীঠ, যেখানে আজকের দিনের সমস্যাকণ্টকিত জীবনের প্রতিটি দিককে নগ্নভাবে তুলে ধরতে হবে দর্শকসাধারণের মনে তার সমাধানের ভাবনা জাগিয়ে তোলবার আশায়। এবং সেই জন্যেই আজ যে-নাটকই দেখি না কেন, তারই মধ্যে প্রেম প্রভৃতি আর যাই থাকুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমস্যার কোনো না কোনো দিক তাতে থাকবেই থাকবে।

চিত্র সমালোচনা

তরণীসেন বধ : সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের নিবেদন; ১২,৬৫৫ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়; পরিচালনা : চিত্রসারথী; সংগীত-পরিচালনা : অনিল বাগচী; চিত্রগ্রহণ : প্রভাত ঘোষ; শব্দধারণ : জে, ডি, ইরাণী; শিল্পনির্দেশ : বটু সেন; সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়; গীতি-রচনা : শ্যামল গুপ্ত; রূপায়ণ : সুনন্দা, সন্ধ্যারাণী, ইন্দ্রাণী, নীতীশ, গুরুদাস, প্রবীর, শোভেন, গঙ্গাপদ, পঞ্চানন, প্রীতিকুমার, কেষ্ট, মাষ্টার তিলক প্রভৃতি। ভবতারিণী পিকচার্সের পরিবেশনায় গেল ১লা জুন থেকে বীণা, বসুশ্রী, প্রাচী ও অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

তরণীসেন বধ কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি অশ্রুসজল অধ্যায়। লঙ্কাধিপতি দশাননের অনুজ বিভীষণ রামভক্ত হওয়ার অপরাধে 'ঘরশত্রু' ব'লে নিন্দা পেয়েছেন। তাঁর স্ত্রী সরমা অশোক বনে চেড়ীবেষ্টিতা সীতার একমাত্র অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী। এঁদেরই আত্মজ বালক তরণীসেনের পক্ষে রামানুরাগী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সে বীর; বাল্য বয়সেই ব্রহ্মার বরে সে অজেয়। যখন রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণ-সন্তানেরা একে একে নিহত হ'ল, তখন লঙ্কার শত্রু রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন বালক তরণীসেন জ্যেষ্ঠতাতের কাছে। মনে আশা, নারায়ণ-স্বরূপ রামের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাঁর বীরত্বকে তরণীসেন পরীক্ষা করবেন এবং সম্ভব হ'লে তাঁকে বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে স্বর্ণলঙ্কায় স্বর্ণমন্দির নির্মাণ ক'রে রাম এবং সীতাকে—লক্ষ্মী এবং নারায়ণকে সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাঁদের দুজনকে পূজো করবেন। কিন্তু তরণীসেনের সেই সাধ পূর্ণ হয়নি; পিতা বিভীষণ নিজ হাতে ব্রহ্মবাণ তুলে দিয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্রকে নিজপুত্র তরণীসেনের বধের জন্যে। তরণীসেনকে বধ না করলে সীতা উদ্ধার হয় না।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে-বর্ণিত এই ভক্ত এবং ভগবানের যুদ্ধকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করতে গিয়ে কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচয়িতারা ছবির আবেদনকে বাধিত করবার জন্যে ভক্তিরসের সঙ্গে বাৎসল্যরসের মিলন ঘটিয়েছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে। অমন যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাবণ, তিনিও নিজ আত্মজের থেকে অধিক ক'রে তরণীসেনকে স্নেহ করেন। বাপমার স্নেহ ত' অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ওপর বর্ষিত হয়েছে। অশোক বনে বন্দিনী সীতারও তাঁর প্রতি বাৎসল্যের অভাব নেই; তিনি তরণীসেনের সীতা-মা। এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং রামচন্দ্র

আর, ডি, বনশালের নতুন চিত্র 'এক টুকরো আগুনে' কালী ব্যানার্জি ও অনুভা গুপ্তা

বালকযোদ্ধা তরণীসেনের অপূর্ব যুদ্ধ-কৌশল দেখে খালি সাধুবাদই দিচ্ছেন না, ক্ষণে ক্ষণে বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হয়ে তার কাছে স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করতে চাইছেন। ফলে, ছবিখানি দর্শক-চিত্তকে অভিভূত করতে সমর্থ হয়েছে। গল্পের আরম্ভ থেকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত ছবিখানি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে এগিয়ে গেছে; কোথাও গল্পের গতি শ্লথ হয়ে পড়েনি বা কোনো দৃশ্যকে একেবারে অবান্তর ব'লে বোধ হয়নি। এমন কি, দুখানি নৃত্যগীতের দৃশ্যকেও ছবির মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় ব'লেই বোধ হয়েছে। চিত্রনাট্যকারদের পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে মরণোন্মুখে তরণীসেনের কাছে সরমার আবির্ভাবকে যথেষ্ট স্বাভাবিক ব'লে মেনে নেওয়া যায় না।

ছবিখানিতে যুদ্ধের দৃশ্য বেশ চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে। হাতী, ঘোড়া, রথ,—কিছুই বাদ পড়েনি; তার ওপর হাজার হাজার পদাতিক তো আছেই। এ ছাড়া ছবির মধ্যে অগ্নিবাণ, বারিবাণ প্রভৃতির সুকৌশল এবং সুপরিমিত সমাবেশও উপভোগ্য।

দৃশ্যপট এবং সাজসজ্জা ছবির পরিবেশ সৃষ্টিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সহায়তা করে এবং এর জন্যে শিল্প-নির্দেশক উচ্চ প্রশংসালাভের যোগ্য।

অভিনয়ের প্রথমেই আমাদের চিত্তকে অধিকার করেন নাম-ভূমিকায় মাস্টার তিলক। অপূর্ব আন্তরিকতাপূর্ণ তাঁর অভিনয়; তাঁর বাচনভঙ্গীটিও শ্রুতি-সুখকর। তাঁর কেশবাসের উপর আর একটু মনঃসংযোগ করলে তাঁর মুখশ্রী চিত্রে আরও সুন্দরভাবে প্রতিভাত হ'ত। রাবণের ভূমিকায় নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিভীষণের ভূমিকায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাবণ-মাতুলের ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসু, রামের ভূমিকায় প্রবীরকুমার নিজ নিজ ভূমিকানুযায়ী সুঅভিনয় করেছেন। স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে সীতার ভূমিকায় ইন্দ্রাণীর সংযত ও সুমিষ্ট অভিনয় আমাদের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সরমার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী স্বভাবসিদ্ধভাবে বাৎসল্যরসের প্রকাশ করেছেন। কিন্তু চিত্রে তাঁকে আরও সুন্দর দেখাবার সুযোগ ছিল; তাঁর মুখচ্ছবি আলোছায়ার সমন্বয়ের অভাবে বড্ড ফ্ল্যাট বোধ হয়েছে। মন্দোদরীর ভূমিকায় সুনন্দা দেবী গৃহীত ভূমিকাটিকে মর্যাদা দিয়েছেন। এ-ছাড়া ছোটখাট ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত হয়েছে।

ছবির মধ্যে মুখোশ-নৃত্যটি যথেষ্ট নূতনত্বপূর্ণ। গানের প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত। নির্মলা মিশ্রের গাওয়া, সীতার মুখের গানখানি 'কোথা তুমি গুণধাম' অত্যন্ত সুগীত এবং মাধুর্যপূর্ণ।

আমাদের বিশ্বাস, ভক্তি এবং বাৎসল্যরসসমৃদ্ধ পৌরাণিক চিত্র "তরণীসেন বধ" সকল শ্রেণীর দর্শককেই খুশী করবার ক্ষমতা রাখে।

তিনটি মঞ্চাভিনয় :

(১) শৌভনিক-এর "গোরা" :

রবীন্দ্রনাথের বহুজনপঠিত উপন্যাস "গোরা"র নতুন ক'রে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। নিজের জন্মপরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গে আচার-বিচারের কুম্ভীপাক থেকে মুক্তিলাভ ক'রে গোরার নিজেকে ভারতীয়ত্বে প্রতিষ্ঠা করার অপরূপ আলেখ্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় নেই, তাঁকে শৌভনিকগোষ্ঠী অভিনীত "গোরা" নাটকটি দেখতে অনুরোধ জানাই। ভারতবর্ষ কী, এবং যথার্থ ভারতীয়ত্বের আদর্শ কী, তা জানবার জন্যে গোরার মাতৃস্বরূপা আনন্দময়ীকে আজ আমাদের সকলেরই চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন রয়েছে। সত্য বটে, "গোরা"র অনেকখানিই জুড়ে রয়েছে ব্রাহ্মসমাজ ও পরিবারের কথা; তবু
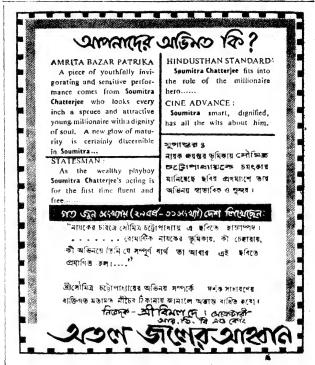
শক্তি ফিল্মস্-এর "চায়না টাউন" চিত্রে শাম্মি কাপুর ও শাকিলা।

সমস্তের উর্ধে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সত্যাদর্শ, যা গোরার মুখ দিয়ে বলেছে—"আমি আজ ভারতবর্ষীয়! আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন!......আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে, চণ্ডালের ঘরেও আর আমার অপবিত্রতার ভয় রইল না।......মা, তুমিই আমার মা! ......তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা! তুমিই আমার ভারতবর্ষ!"

দক্ষিণ কলকাতার "মুক্তাঙ্গন" রঙ্গমঞ্চে এই "গোরা" অভিনীত হচ্ছে শৌভনিক-নাট্য সম্প্রদায় দ্বারা। এবং সমগ্রভাবে বিচার করলে এই অভিনয় অত্যন্ত সার্থকতামণ্ডিত। দৃশ্যসজ্জার কোনো বালাই নেই এবং অত অগভীর মঞ্চে তার চেষ্টাও বাতুলতার নামান্তর মাত্র হ'ত। শুভ্র পশ্চাদপটের মধ্যে এক প্রবেশদ্বার এবং তার দু'পাশে তীর্যকাকারে অল্প চওড়া দু'টি কালো রেখা আর মঞ্চের দুই পার্শ্বে দুই প্রবেশ-প্রস্থানের পথ—এরই সামনে, বোধ করি, পনেরো ষোলটি দৃশ্যে বিভক্ত হয়ে সমস্ত নাটকটি অভিনীত হ'ল প্রায় সওয়া দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে। প্রথম যে-যবনিকা অপসৃত হ'ল, সেই যবনিকা আবার পড়ল নাটকের শেষে—মধ্যে কোনো বিরতি নেই। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর হয়েছে মাত্র আলোক নির্বাণের মাধ্যমে। প্রথম দৃশ্যেই নাটক যে চলতে শুরু করল, যতই দৃশ্য এগোতে লাগল, ততই নাটকের গতিবেগও বর্ধিত হ'তে লাগল এবং অভিনয় দেখতে দেখতে আমরা কখন যে নাটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়লুম, তা জানতেই পারলুম না। মুগ্ধচিত্তে নাটকের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম এবং যখন সেই চরম পরিণতি এল, তখন তাকে প্রত্যক্ষ ক'রে অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করলুম। একটি নাটকের অভিনয়ের সার্থকতা এখানেই।

যিনি "গোরা"র নাট্যরূপ দিয়েছেন, তিনি নাট্যরস পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত। বিশেষ ক'রে গুরুগম্ভীর বিষয়ের সঙ্গে যে-সুকৌশলে তিনি হাস্য বা কৌতুকরসের মিলন ঘটিয়েছেন, তাতে তিনি যে রসের ভিয়ানের একজন দক্ষ কারিগর, এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একটি জায়গায় দু'টি দৃশ্যের পারম্পর্যের অদল-বদল করলে নাটকটি আরও নিখুঁত হয় ব'লে আমাদের বিশ্বাস। যে-দৃশ্যে খবর এল যে, গোরার জেল হয়েছে, তার পরের দৃশ্য দেখানো হয়েছে—কলকাতায় পরেশবাবুর বাড়ী এবং তার পরের দৃশ্যে কৃষ্ণদয়ালের বাড়ীতে মহিমকে গোরার জেল হওয়ার খবর দেওয়া হচ্ছে। কৃষ্ণদয়ালের বাড়ীর দৃশ্যকে আগে দেখিয়ে একটি পাঁচ মিনিটের বিরতি দেবার পর পরেশবাবুর বাড়ীর দৃশ্য দিয়ে আবার যবনিকা উন্মোচন করলে নাটকটির উন্নতি হয় এবং ক্রমাগত দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখার ক্লান্তি থেকে দর্শকরাও মুক্তি পান।

সমগ্র অভিনয়ে একটি চমৎকার মান বজায় রাখা হয়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে কাউকে ফেলে অপর কারো নাম করা সঙ্গত হবে না। তবু বলবো পুরুষদের মধ্যে মহিমের ভূমিকায় গোবিন্দ গাঙ্গুলী এবং মেয়েদের মধ্যে ললিতার ভূমিকায় মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী তাঁদের নাট্যনিপুণতায় আর সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। এত স্বচ্ছন্দভাবে তাঁরা তাঁদের ভূমিকা দু'টির রূপ দিয়েছেন যে, আমরা রীতিমত বিস্মিত হয়েছি তাঁদের পারদর্শিতার পরিচয় পেয়ে। 'গোরা'র বেশে গোপেন মুখোপাধ্যায়কে মানিয়েছে চমৎকার এবং তিনি চরিত্রটিকে চিত্রিতও করেছেন সুষ্ঠুভাবে। 'স'-এর উচ্চারণ সম্পর্কে তিনি আর একটু অবহিত হ'লে ভালো হয়। আনন্দময়ীর ভূমিকায় নিবেদিতা দাসের আন্তরিকতাপূর্ণ অভিনয় দর্শকহৃদয়কে মথিত করে। চওড়া লালপাড় শাড়ী এবং সীমন্তে দীর্ঘ সিন্দুররেখা আনন্দময়ীর রূপকে আরও মহিমামণ্ডিত করতে পারত। কৃষ্ণদয়ালের ভূমিকায় রথীন ঘোষ পবিত্র সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের প্রতিমূর্তি। টুলু মুখোপাধ্যায় (বিনয়), বীরেশ মুখোপাধ্যায় (পরেশবাবু), কৃষ্ণ কুণ্ডু (পানু-

বাবু), গোর চট্টোপাধ্যায় (অবিনাশ), মিনতি চক্রবর্তী (বরদাসুন্দরী), অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (সুচরিতা), শিখা চক্রবর্তী (লাবণ্য) এবং মাসী নিজ নিজ ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। লীলারূপিনী অলকা রায় নেচেছেন সুন্দর। প্রথম নেপথ্যসংগীত ছাড়া সকল গানই সংগীত।

আশা করি, দক্ষিণ কলকাতার রসিক নাট্যোৎসাহীর "গোরা" নাট্যাভিনয় দেখে পরিতৃপ্ত হবেন।

(২) অনুশীলন সম্প্রদায়-এর "শেষ সংবাদ" ঃ

মৌলিক রচনা নয়, রুমানিয়ার প্রসিদ্ধ নাট্যকার মিহাইল সেবাস্তিয়ানের

সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের "তরণীসেন বধ" চিত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় সুনন্দা দেবী।

রচনা "Ultima Ora"-র ইংরেজী অনুবাদ "Stop News" অবলম্বনে "শেষ সংবাদ" লিখেছেন নাট্যকার উমানাথ ভট্টাচার্য। গেল সংখ্যার "অমৃত"-এ (২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) প্রকাশিত এবং অমিতা রায় লিখিত "রুমানিয়ার নাট্যকার মিহাইল সেবাস্তিয়ান" (মিখাইল নয়!)-প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় "Ultima Ora" বা "শেষের ঘন্টা" হচ্ছে সেবাস্তিয়ানের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক। শুধু তাই নয়, তাঁর লিখিত মাত্র চারখানি নাটকের মধ্যে এইটিই হচ্ছে "একমাত্র নাটক, যার মধ্যে রাজধানীর কর্মময় জীবন চিত্রিত হয়েছে, শিল্পপতিদের ব্যবসায়-ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে, আর তারই পটভূমিকায় ফুটে উঠেছে এক আত্মভোলা অধ্যাপকের চরিত্র।"

রুমানিয়ান নাট্যকারের মূল রচনার অনুবাদ-অবলম্বনে রচিত হয়েছে "শেষ সংবাদ"। কিন্তু এমনই নাট্যবস্তুর সার্ব-

জনীনত্ব যে, যদি এই তথ্যটুকু জানা না থাকত, তা'হলে "শেষ সংবাদ"-কে উমানাথ ভট্টাচার্য-রচিত একটি সার্থক মৌলিক নাটক ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করতুম না।

সাধারণের চোখে ছোট্ট একটি ঘটনা। দৈনিকের পাতা ভরাবার জন্যে কোনো লেখা হাতে না থাকায় প্রধান কম্পোজিটার নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে একটি ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছেপে বসল, যে-প্রবন্ধটি আসলে ছেপে বেরোবার কথা একটি ঐতিহাসিক সাময়িক পত্রিকায়। শুধু তাই নয়, ছাপাখানার ভূতের দৌলতে প্রবন্ধটির স্থানে স্থানে কিছু কিছু ভুল কথাও ছাপা হ'ল, 'পাঞ্জাবে'র বদলে 'প্রাইগম' এবং 'পাটালীপুত্রে'র জায়গায় 'পাঠান'। দৈনিক সংবাদপত্রে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ এবং তাতে কিছু ভুলভ্রান্তি! ও-প্রবন্ধ পড়ছেই বা কে যে, ঐসব ভুল নিয়ে তার মাথা ব্যথা করবে। কিন্তু মাথা ব্যথা যাদের করবার, তাদের করলই। এক, ঐ প্রবন্ধের লেখক, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন লেকচারার এবং দুই, একজন বিরাট শিল্পপতি, যাঁর অঙ্গুলিহেলনে রাজ্য টলমল করে, অপদার্থ ব্যক্তি মন্ত্রিত্ব পায়, স্বার্থের প্রয়োজনে দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। গোবেচারা অধ্যাপকের লেখার মধ্যে ছাপার ভুল 'প্রাইগম' তাঁর সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মায়, তাঁর গমের ব্যবসা সম্পর্কিত চোরাই কারবারের 'প্রাইগম' ফাইলের গোপন তথ্য অধ্যাপকের কাছে গিয়ে পেঁছোল কি ক'রে, সেই ভাবনায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। এক ঘটনা থেকে আর এক ঘটনা, গ্রন্থির ওপর গ্রন্থি পড়তে থাকে। অধ্যাপক যতই বুঝতে পারেন না ওই ভুল 'প্রাইগম' কথাটা কোথা থেকে এল, শিল্পপতির ততই মনে হয়, অধ্যাপক তাঁকে মোচড় দিয়ে বেশী টাকা আদায়ের ফন্দীতে কথাটা তাঁর কাছে ভাঙতে চাইছেন না। শেষ পর্যন্ত শিল্পপতি অধ্যাপকের গবেষণার সাহায্যের জন্যে "প্রাচীন ইতিহাস গবেষণা মন্দির" স্থাপন ক'রে তাঁর গোপন ফাইলের আলোচনার পথ রুদ্ধ করলেন ভেবে শান্তি পান।

হাস্যকর পরিস্থিতির মাধ্যমে পুঁজিবাদী সরকারের স্বরূপ উদ্ঘাটনে নাট্যকার যেমন অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তেমনই জনপ্রিয়তাও লাভ করেছেন। "শেষ সংবাদ"-এর রচয়িতা উমানাথ ভট্টাচার্য সম্বন্ধেও সমান কথাই বলা যায়। নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে উপযুক্ত সংলাপের সাহায্যে তাঁর নাটক প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সকল দর্শকের কাছেই চরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

অবশ্য এই উপভোগ্যতা সম্ভব হয়েছিল অনুশীলন সম্প্রদায়ের সভ্যবৃন্দের সুঅভিনয়ের দ্বারা। বিশেষ করে আত্মভোলা ইতিহাসের অধ্যাপক শশাঙ্ক সান্যালের ভূমিকায় চারুপ্রকাশ ঘোষ যে অসামান্য নাট্যনৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তাকে অবিস্মরণীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর ধীরস্থির মন্থরগতি, তাঁর বাচনের বিশেষ ভঙ্গী, মান-অপমান সম্পর্কে নির্লিপ্ততার ভাব প্রকাশ, তাঁর চরিত্রোপযোগী বেশবাস—সমস্ত মিলে তিনি তাঁর গৃহীত চরিত্রটিতে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন, যার সাক্ষাৎ ক্বচিৎ পাওয়া যায়। দৈনিক 'সম্মার্জনী'র সম্পাদক গোবিন্দ ভড় চরিত্রটিকে বিচিত্র মুখভঙ্গী, বেশ-বিন্যাস এবং বাচনিক বৈচিত্র্য দ্বারা জীবন্ত করে তুলেছেন মমতাজ আহমেদ খাঁ। শিল্পপতি মিঃ সরকারের ব্যক্তিত্বও যেমন ফুটেছে বীরেশ্বর সেনের অভিনয়ে, তেমনই প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি হারাবার আশঙ্কায় মাঝে মাঝে অসহায়তার ভাবও সমানভাবেই তিনি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশ্ব সেনের শিক্ষামন্ত্রী আদিত্যনাথ একটি টাইপ। এ ছাড়া বাকী সকল পুরুষ ভূমিকাতেই প্রত্যেকেই প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। বইয়ের একমাত্র স্ত্রী-চরিত্র ফিল্ম আর্টিস্ট স্মৃতির ভূমিকায় অনিমা দাশগুপ্তার অভিনয় কিছুটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে।

তিনটি অঙ্কে এবং প্রতি অঙ্ক একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এই নাটকটির মঞ্চসজ্জায় প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন মদন গুপ্ত। মিঃ সরকারের কক্ষসংলগ্ন কারখানার আলোর খেলা এবং আবহসৃষ্টিকারী শব্দ নিশ্চয়ই তাপস সেনের আর একটি বিচিত্র সৃষ্টি।

অনুশীলন সম্প্রদায়ের "শেষ সংবাদ" বাঙলার মঞ্চাভিনয়ে একটি সার্থক যোজনা।

(৩) চতুর্মুখ-এর "নচিকেতা" :

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "নচিকেতা" নাটকখানি আমরা পড়বার সুযোগ পাইনি। উপনিষদের নচিকেতা পিতা দ্বারা যমের কাছে অর্পিত হওয় সত্ত্বেও নিজ তপশ্চর্যাগুণে যমের কাছ থেকে ফিরে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন নচিকেতার এই উপাখ্যানকে আশ্রয় ক'রে প্রাচীন ভারতের পটভূমিকায় নাট্যকার 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' কিংবা 'জগৎ সত্য ব্রহ্ম মিথ্যা'র যে দ্বন্দ্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্য-অনার্যের যে-সংঘর্ষকে উপস্থিত করেছেন, তার মধ্যে কিংবদন্তীর চেয়ে কল্পনারই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এর আরও মনে হয়, নাট্যকার এই উপস্থাপিত দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষ থাকতে পারেননি স্বার্থান্বেষী ক্ষত্রিয়ের ক্রীড়নক ব্রাহ্মণ চতু বর্ণের সৃষ্টি করেছেন ক্ষত্রিয়ের শোষণ স্পৃহাকে বলবতী করবার জন্যে এব স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যসৃষ্ট এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ি যে-লোকই শ্রেণীহীন সমাজের জয় ঘোষণা করবে, সেই প্রতিষ্ঠিত শক্তি বিরাগভাজন হয়ে মৃত্যুবরণে বাধ্য হবে

এই কথাই নাট্যকার ঘোষণা করতে চেয়েছেন এবং আরও বলেছেন যে, শ্রেণীহীন সমাজই একদিন জয়ী হবে, এর সমর্থক নেতাদের বলিদান বৃথা হবে না, শ্রেণীহীন সমাজের মৃত্যু নেই।

নাটক দৃশ্যকাব্য এবং শ্রাব্যও বটে। কিন্তু শ্রাব্য মানে এ নয় যে, নাটককে রাজনীতির বক্তৃতামঞ্চ ক'রে তুলতে হবে, অথবা সূক্ষ্ম ও জটিল দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা-গৃহে পরিণত করতে হবে। নাটকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, নাট্যাভিনয়ে উপস্থিত জনমণ্ডলীর শ্রবণ এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁদের চিত্তে রসমূর্তির প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁদের আনন্দবিধান করা। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, চতুর্মুখ-গোষ্ঠী তাঁদের অভিনয়ের মাধ্যমে যে-ভাবে 'নচিকেতা' নাটককে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, তাতে নাট্যাভিনয়ের এই মূল শর্তটিই অতিমাত্রায় উপেক্ষিত হয়েছে। পুনরুক্তি দোষদুষ্ট এই নাটকখানির অভিনয় দেখতে দেখতে কখনও মনে হয়েছে আমরা দর্শনশাস্ত্রের দুরূহ বিষয়ের ব্যাখ্যা শুনছি, আবার কখনও মনে হয়েছে, বাচনভঙ্গী নিয়ে একটা রীতিমত কসরৎ—জিমন্যাস্টিকও বলতে পারি—দেখানো হচ্ছে। পরিচালক সম্ভবতঃ ইচ্ছে ক'রেই আর্যদের থেকে অনার্যদের মুখের উচ্চারণকে অধিকতর শুদ্ধরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। গুরুগম্ভীর এবং পরিহাসপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে একটি অতি সূক্ষ্ম সীমরেখা আছে, একথা বিস্মৃত হয়েই সমগ্র অভিনয়কে একটি সিরিওকমিক রূপদানের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এই চেষ্টা হয়ে পড়েছে নিতান্ত হাস্যকর।

এই হাস্যকর অভিনয়-প্রচেষ্টার মধ্যে নির্মল গুহরায়ের মঞ্চস্থাপনা এবং তাপস সেনের নক্ষত্রলোক ও জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসালাভে সমর্থ হয়েছে।
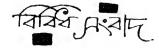
"বধূ" এবং "আগুন"-এর শুভমুক্তি :

আজ শুক্রবার, ১৫ই জুন একসঙ্গে দু'খানি বাঙলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। এক, বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্স-এর প্রথম চিত্রার্ঘ "বধূ" রাধা, পূর্ণ এবং অপরাপর ছবিঘরের রূপোলী পর্দায় আত্মপ্রকাশ করছে। শৈলেন দে রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির পরিচালনা করেছেন ভূপেন রায় এবং এতে সুরযোজনা করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। "বধূ"র বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন সরযূবালা, অনুভা, মঞ্জুলা, জয়শ্রী, মেনকা, সন্ধ্যা রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রীণা, ছবি বিশ্বাস, বসন্ত চৌধুরী, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশ্বজিৎ। ন্যাশনাল মুভীজ প্রাইভেট লিমিটেড ছবিখানির পরিবেশক।

দ্বিতীয় যে ছবিখানি আজ মুক্তিলাভ করছে, সেটি হচ্ছে বাদল পিকচার্স প্রযোজিত এবং অসিত সেন পরিচালিত তারাশঙ্করের কাহিনী অবলম্বনে গঠিত "আগুন"। কণিকা মজুমদার, সন্ধ্যা রায়, সন্ধ্যারাণী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি শিল্পীর সমন্বয়ে গঠিত

এই ছবিখানির সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। ছবিখানি মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে।

নাট্যসেবী সংবর্ধনা ঃ

বিশ্বরূপা থিয়েটার তাঁদের সপ্তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে গেল ৭ই জুন, বৃহস্পতিবার নাট্যসেবী সংবর্ধনা নামে একটি নূতন অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন। বাঙলার নাট্যজগতে যাঁদের দান অনস্বীকার্য, এমন তিনজন গুণীকে—যাঁদের মধ্যে থাকবেন একজন নাট্যকার, একজন অভিনেতা এবং একজন অভিনেত্রী—এ'রা প্রতি বছর সংবর্ধনা জানাবেন। এ-বছর যাঁদের সংবর্ধনা জানানো হ'ল, তাঁরা হচ্ছেন সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং বিগত যুগের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরী। এ'দের প্রত্যেককে জরীর মালায় ভূষিত করবার পর মানপত্র এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপহার দেওয়া হয়। এ'রাও প্রত্যেকে যথাযথ উত্তর প্রদান করবার পর বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে রাসবিহারী সরকার উপস্থিত সুধীমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পরে যথারীতি "সেতু" নাটকের অভিনয় হয়।

রূপদক্ষ-এর অভিনয় ঃ

আজ শুক্রবার, ১৫ই জুন, সন্ধ্যা সাতটায় রূপদক্ষের সভ্যরা থিয়েটার সেণ্টার হলে দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' এবং সুকুমার রায়ের 'চলচিত্তচঞ্চরী' প্রহসন দু'খানিকে তড়িৎ চৌধুরীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ করবেন।

মেলবোর্ণ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ঃ

খবর পাওয়া গেল, মেলবোর্ণ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (১৯৬২) সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "তিন কন্যা" প্রধান পুরস্কার লাভ করেছে।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে "কাঞ্চনজঙ্ঘা"র বৈদেশিক প্রদর্শনী ঃ

ভারতের বাইরে দেখাবার জন্যে "কাঞ্চনজঙ্ঘা" ছবির প্রযোজক সংস্থা এন. সি. এ. প্রোডাকসন্সের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ল্যাটিন আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, লুক্সেমবার্গ ও ব্রিটেন—এই আটটি দেশের চিত্র পরিবেশকরা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। এ ছাড়া রাশিয়া, জাপান, হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশেও ছবিখানি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবার যথেষ্টই সম্ভাবনা রয়েছে।

এলিট সিনেমায় "টেণ্ডার ইজ্ দি নাইট" ঃ

আজ শুক্রবার, ১৫ই জুন থেকে এলিট সিনেমায় জেনিফার জোন্স এবং জ্যাসন রোবার্ডস্ (জুনিয়ার) অভিনীত "টেণ্ডার ইজ্ দি নাইট" দেখানো হচ্ছে।

সাইকো ঃ একটি আতংকিত সমন্বয়

লোমহর্ষক ছবি তোলার ব্যাপারে আলফ্রেড হিচ্ককের একটি নিজস্ব সূত্র আছে। এই প্রসঙ্গে হিচককের ব্যাখ্যা হল ঃ

লোমহর্ষক ছবি তোলার মূলে সূত্রটি এমন কিছু জটিল বা কঠিন না। একজন সাধারণ লোককে অসাধারণ একটা পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিন এবং অন্তিম চমক পর্যন্ত তাকে বিহ্বল ঘটনাস্রোতে হাবুডুবু খাওয়াতে থাকুন। কিন্তু ব্যাপারটি একেবারে গুরুগম্ভীর কোরে তুলবেন না কারণ প্রমোদের মুখ্য উপাদান হচ্ছে কৌতুক।

চলচ্চিত্রে যৌনতার প্রসঙ্গে হিচককের মতামত, হাল আমলের আমেরিকান পরিচালকদের থেকে ভিন্ন ঃ

কেবলমাত্র কাহিনীর অগ্রগতির জন্যে [illegible] জন্যেই চলচ্চিত্রে 'যৌনতা'র আমদানী করা চলতে পারে। ছবিতে অহেতুক যৌনতার অতিরিক্ত অনুপ্রবেশ ঘটলে দর্শকরা অবচেতনভাবেই অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং এই বিরক্তিজনিত অস্বস্তি তাঁদের পক্ষে চিত্রের রসগ্রহণের পক্ষে প্রবল বাধা হয়ে জন্মায়।

আলফ্রেড হিচককের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি যে নেহাতই সাংবাদিক ভোলানো বাণীই না, তার প্রমাণ হিচকক প্রযোজিত এবং পরিচালিত 'সাইকো' ছবিটি। লাইট হাউসে সম্প্রতি ছবিটি দেখানো হচ্ছে।

ম্যারিয়ন ক্রেন একটি দোকানে কাজ করে। মালিকের অনুপস্থিতিতে দোকানের ক্যাশ ভেঙে সে তার প্রেমিক স্যাম লুমিসের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে। শুধুমাত্র অর্থের জন্যেই তাদের বিয়েটা আটকে ছিল এতদিন। কিন্তু লুমিসের কাছে পৌঁছবার আগেই মাঝপথ থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় ম্যারিয়ন। অবশ্য নিখোঁজ হবার আগে তার সঙ্গে নরম্যান বেট্স নামে একটি অদ্ভুত চরিত্রের যুবকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বেট্স বাস করত তার মার জগতে। জননীর প্রভাবে বেট্স সর্বদাই আচ্ছন্ন! ম্যারিয়নের হঠাৎ নিখোঁজ হবার পর, তার বোন লীলা ক্রেন, হবু ভগ্নীপতির সঙ্গে দেখা করে বোনের অনুসন্ধান আরম্ভ করে মিলিতভাবে। ছবির তৃতীয় অনুসন্ধানী হল মার্টিন বালসাম। সেও অপহৃত অর্থের সন্ধানে ম্যারিয়নের হদিস করবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু এর বেশী 'সাইকো' সম্বন্ধে জানাতে হিচকক ইচ্ছুক নন। কারণ ছবির শেষ ত্রিশ মিনিট দর্শকরা আসনে উত্তেজনায় না বসতে পারলেই পরিচালক তৃপ্ত হবেন। তাই সাইকোর চিত্রস্বত্বটি কেনার পর থেকেই কড়াকড়ি গোপনতার মধ্যে হিচকক ছবিটি তুলতে আরম্ভ করেন, এমনকি ছবির নামটি পর্যন্ত প্রকাশ করেননি স্টুডিও মহলে।

এই ছবির ভূমিকালিপিটিও দর্শকদের পক্ষে কম মনোজ্ঞ নয়। দীর্ঘ দশ বছর পরে এই ছবিতে হিচ্ককের কন্যা প্যাট হিচ্কক অভিনয় করেছেন। প্যাটের অভিনীত প্রথম ছবি "দি স্ট্রেঞ্জার অন এ ট্রেন"। এর পরিচালকও ছিলেন হিচ্কক। ভেরা মিলস-এর এইটে পঞ্চম ছবি। গত এক বছরের মধ্যে ভেরার অন্যান্য ছবি হল "এ টাচ্ অফ লারসেনী", "বিয়ণ্ড দিস প্লেস", "দি এফ. বি. আই স্টোরী" এবং "দি ফাইভ ব্রাণ্ডেড উওম্যান।" অন্যান্য ভূমিকায় আছেন জেনেট লে, এ্যানথনি পার্কিনস, জন গ্যাভিন, মিল্টন আরবোগাস্ট প্রভৃতি। সাইকোর কাহিনীকার হলেন রবার্ট ব্লক। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বার্ণাড হারম্যান, চিত্রনাট্য যোসেফ স্টেফানো।

—চিত্রকূট

বাঙলার চলচ্চিত্র জগতে ইন্দ্রপাত !

১১ই জুন, সোমবার, ১৯৬২ সাল। অপরাহ্ণ বেলা। নির্মেঘ আকাশে অকস্মাৎ বজ্রধ্বনির মত কানে এল—ছবি বিশ্বাস ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর অমোঘ হস্ত তাঁকে নির্মমভাবে স্পর্শ করেছে। এতখানি আকস্মিকতার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলুম না; কেই বা করে থাকে? যে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু তাঁকে আকর্ষণ করেছে, মনে হয়, তিনি নিজেও এই চরম পরিণতির জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। বংশদ্রোণী (বাঁশদ্রোণী) থেকে বারাসতের নিকটবর্তী ছোট জাগুলিয়া গ্রাম কতটুকুই বা পথ! মোটরে পৌঁছুতে বড় জোর ঘণ্টা দেড়েক সময়। কিন্তু ১১ই জুন তারিখে এই নাতিদীর্ঘ পথটুকু অকস্মাৎ অতিদীর্ঘ হয়ে গেল—এ-পথ অকস্মাৎ গিয়ে মিলিত হ'ল অনন্ত পথের সঙ্গে।

সহধর্মিণী, বালক-পৌত্র জয়ন্ত এবং একজন পরিচারককে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলেছিলেন দেশের বাড়ীর উদ্দেশে—ড্রাইভার তাঁর মোটর চালিয়ে চলেছিল যশোর রোড ধরে। ডাইনে দমদম বিমান-বন্দর ছাড়িয়ে মধ্যমগ্রামের কাছে যেতেই তিনি ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বললেন। কারণ? তিনি নিজে গাড়ী চালাবেন। না, কোনো আপত্তিই তিনি শুনবেন না। অতএব তিনি নিজে ধরলেন স্টিয়ারিং এবং পরিচারকের সঙ্গে ড্রাইভার বসল পাশে। নিয়তিই তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসাল ঐখানে। কারণ কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই একটা বাঁকের মুখে বিপরীত দিক থেকে আগত একটি মালবোঝাই দ্রুত-গামী মোটরভ্যান এসে পড়ল তাঁর WBP 2107 -নম্বর অ্যাম্বাসাডার মোটরের উপর; প্রচণ্ড সংঘর্ষে তাঁর গাড়ীর সম্মুখভাগ বিধ্বস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর স্টিয়ারিং তাঁর বক্ষপঞ্জর বিদীর্ণ করল। তাঁর রক্তাপ্লুত দেহ গাড়ীর সিটের ওপর লুটিয়ে পড়ল। গাড়ীর অপরাপর সকল আরোহীই অল্প-বিস্তর আহত হ'ল।

এর পরের বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অতি কষ্টে ছবিবাবুর দেহকে টেনে বার ক'রে বাকী আহতদের সঙ্গে কলিকাতা-গামী একটি লরী ক'রে আর, জি, কর হাসপাতালে নিয়ে আসা হ'ল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ছবিবাবুকে মৃত ব'লে ঘোষণা ক'রে অপর আহতদের সেবায় তৎপর হলেন। পরিচারকের আঘাত সামান্য; তাই প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। বাকী তিনজনকে—শ্রীমতী বিশ্বাস, শ্রীমান জয়ন্ত এবং ড্রাইভারকে ভর্তি ক'রে নেওয়া হ'ল। সন্ধ্যা নাগাদ ছবিবাবুর দেহকে সসম্ভ্রমে পুষ্পশোভিত ক'রে উত্তর কলকাতার রঙ্গালয়গুলির সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁর বাঁশদ্রোণীর বাসগৃহে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে কেওড়াতলার শ্মশানে তাঁর মরদেহ নীত হয় এবং অগণিত মুগ্ধ শোকার্ত জনতার উপস্থিতিতে শেষকৃত্য সমাপ্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে, ছবিবাবুর বড় ভাই নীনবাবুও এই রকমই পথ-দুর্ঘটনায় প্রাণ

হারান। আরও মনে হচ্ছে, এই সেদিন তিনি প্রায় মাস দেড়েক ধ'রে দীঘায় থেকে নিজের স্বাস্থ্যকে কতকটা পুনরুদ্ধার ক'রে কলকাতায় ফিরেছিলেন। আর আজ নিতান্ত অতর্কিতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প'ড়ে তিনি প্রাণ হারালেন।

বাঙলা চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভি-নেতা ছবি বিশ্বাস ১৯০০ সালের ১৩ই জুলাই শহর কলকাতার বিডন স্ট্রীটের বিশ্বাস-বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট জাগুলিয়ার বিখ্যাত বিশ্বাস-পরিবারের সুবিস্তৃত বংশলতা আমরা ছবিবাবুর বাঁশদ্রোণীর বাড়ীর বৈঠকখানার দেওয়ালে বিলম্বিত দেখেছি। পিতা ভূপতিনাথ বিশ্বাসের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস—এটাই হচ্ছে ছবিবাবুর আসল নাম। বালো হিন্দু স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সংস্রবে আসেন। অভি-নেতা হিসাবে তাঁর প্রথম খ্যাতি আমাদের কানে আসে শ্যামবাজার অঞ্চলের সিকদার বাগানের "নদীয়া বিনোদ" যাত্রাভিনয়ের নিমাই-এর ভূমিকায় তাঁর প্রাণমাতানো অভিনয় থেকে। এর কিছুকাল পরেই, সম্ভবতঃ ১৯৩৬ সালে তিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনায় কালী ফিল্মসের "অন্নপূর্ণার মন্দিরে" তিনি নায়কের ভূমিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু নায়কোচিত দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাট্যনিপুণতা সমধিক প্রকাশিত হয় চরিত্রাভিনেতারূপে। দেবকী বসু পরিচালিত "নর্তকী" চিত্রে এবং হেমচন্দ্র চন্দ্র পরিচালিত "প্রতিশ্রুতি" চিত্রে অত্যন্ত অল্পক্ষণস্থায়ী দুটি ভূমিকায় যে-প্রতিভাস্ফুলিঙ্গের প্রকাশ, তা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে বাঙলার—শুধু বাঙলার কেন, সমগ্র জগতের অদ্বিতীয় চরিত্রাভিনেতারূপে তাঁকে স্বীকৃতিধন্য প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। কাবুলীওয়ালা, জলসাঘর, হেডমাস্টার, শশীবাবুর সংসার, কাঞ্চনজঙ্ঘা, একদিন রাত্রে প্রভৃতি চিত্রে তাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়েও তিনি বহুবার আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রবোধচন্দ্র গুহের নাট্যনিকেতনে "পথের দাবী" থেকে শুরু ক'রে এই সেদিনও স্টার রঙ্গমঞ্চে "শ্রেয়সী" নাটকে দর্শক তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের নিদর্শন পেয়েছে। কিন্তু তবু বলব, তিনি মূলতঃ ছিলেন চলচ্চিত্রেরই অভিনেতা।

ব্যক্তিগত জীবনে অল্পভাষী, সুরসিক চিত্র ও মঞ্চ জগতের সর্বজনমান্য 'ছবিদা' অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ছোট-বড়, প্রত্যেকেরই কাছ থেকে তিনি স্বতোৎসারিত সম্ভ্রম পেয়েছেন। চিত্র-পরিচালকেরা বলবেন, অমন স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন শ্রুতিধর অভিনেতা তাঁরা আর দুটি দেখেননি। তাঁকে ভূমিকা লিখে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না; একবার এবং মাত্র একটিবার তাঁর সংলাপটি তাঁকে শুনিয়ে দিলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হ'ত—সংলাপের একটি বর্ণও এদিক ওদিক হ'ত না। চিত্রাভিনেতারূপে দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি N. G. করেছেন বলে শোনা যায়নি। বাড়ী সাজানো, কিছু দিন অন্তর অন্তর বাড়ীর আসবাবপত্রের স্থান অদল-বদল করা এবং বাগান করার শখ ছিল তাঁর সমধিক।

দুই পুত্র এবং এক কন্যার জনক ছবি বিশ্বাস অকস্মাৎ আনন্দলোকে চলে গেলেন। পাম অ্যাভেনিউয়ের সদাসমাপ্ত বাড়ীতে তাঁর পদার্পণ আর ঘটবে না। বাঙলা, তথা জগতের চলচ্চিত্র জগৎ আজ দীন হয়ে গেল। মনে পড়ছে, "একদিন রাত্রে" ছবিতে তাঁরই মুখ দিয়ে নিঃসৃত গানের কলি ঃ

> "ঘুরিয়ে এই দুনিয়ার লাট্টু,
> ভগবান হারিয়েছে লেত্তি।"

॥ বিশ্ব ফুটবল কাপ ॥

১নং গ্রুপের খেলা

৬ই জুন, আরিকা : উরুগুয়ের বিপক্ষে রাশিয়া তাদের লীগের শেষ খেলায় ২—১ গোলে জয়লাভ ক'রে এক নম্বর গ্রুপে শীর্ষস্থান লাভ করে—৩টে খেলায় ৫ পয়েন্ট। উরুগুয়ের বিপক্ষে রাশিয়ার রাইট-ইন ইভানোভ খেলা ভাঙ্গার শেষ মিনিটে জয়সূচক গোল দেন।

৭ই জুন তারিখে যুগোশ্লাভিয়া তাদের লীগের শেষ খেলায় ৫—০ গোলে কলম্বিয়াকে পরাজিত ক'রে এক নম্বর গ্রুপের রানার্স-আপ হয়।

২নং গ্রুপের খেলা

৬ই জুন, শান্তিয়াগো : পশ্চিম জার্মাণী ২—০ গোলে চিলিকে পরাজিত ক'রে ২নং গ্রুপে শীর্ষস্থান লাভ করে, ৩টে খেলায় ৫ পয়েন্ট। চিলি ৩টে খেলায় ৪ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স-আপ হয়।

৭ই জুন তারিখে ইতালী ৩—০ গোলে সুইজারল্যান্ডকে পরাজিত করে।

৩নং গ্রুপের খেলা

৬ই জুন, ভিনা ডেল মার : ব্রেজিল ২—১ গোলে স্পেনকে পরাজিত ক'রে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে—৩টে খেলায় ৫ পয়েন্ট।

৭ই জুন তারিখে মেক্সিকো ৩—১ চেকোশ্লোভাকিয়াকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত ক'রেও কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। এই গ্রুপে রানার্স-আপ হয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়া—৩টে খেলায় ৩ পয়েন্ট। মেক্সিকো করেছে ৩টে খেলায় ২ পয়েন্ট। মেক্সিকো প্রথম দুটো খেলায় কোন গোল দিতে পারেনি। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপক্ষে লীগের শেষ খেলায় ৩টে গোল দেয়।

৪নং গ্রুপের খেলা

৬ই জুন, রাঙ্কাগুয়া : হাঙ্গেরী বনাম আর্জেন্টিনার খেলা গোলশূন্যভাবে অমীমাংসিত থাকে। হাঙ্গেরী ৩টে খেলায় ৫ পয়েন্ট পেয়ে এই গ্রুপে প্রথম স্থান লাভ করে।

৭ই জুন তারিখে ইংল্যান্ড বনাম বুলগেরিয়ার শেষ খেলাটিও গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। ফলে বুলগেরিয়া ৩টে খেলায় ১ পয়েন্ট পায় এবং অন্য দিকে ইংল্যান্ড পায় ৩টে খেলায় ৩ পয়েন্ট। আর্জেন্টিনাও পায় ৩ পয়েন্ট। কিন্তু গোল এভারেজের বিচারে ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত এই গ্রুপে রানার্স-আপ হয়।

লীগের খেলায় ১নং গ্রুপে রাশিয়া, ২নং গ্রুপে জার্মাণী, ৩নং গ্রুপে ব্রেজিল এবং ৪নং গ্রুপে হাঙ্গেরী অপরাজেয় অবস্থায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে।

একনজরে লীগের খেলার ফলাফল

গ্রুপ ১

উরুগুয়ে ২ : কলম্বিয়া ১
রাশিয়া ২ : যুগোশ্লাভিয়া ০
যুগোশ্লাভিয়া ৩ : উরুগুয়ে ১
রাশিয়া ৪ : কলম্বিয়া ৪
রাশিয়া ২ : উরুগুয়ে ১
যুগোশ্লাভিয়া ৫ : কলম্বিয়া ০

গ্রুপ ২

চিলি ৩ : সুইজারল্যান্ড ১
পঃ জার্মাণী ০ : ইতালি ০
চিলি ২ : ইতালি ০
পঃ জার্মাণী ২ : সুইজারল্যান্ড ১
পঃ জার্মাণী ২ : চিলি ০
ইতালি ৩ : সুইজারল্যান্ড ০

গ্রুপ ৩

ব্রেজিল ২ : মেক্সিকো ০
চেকোশ্লোভাকিয়া ১ : স্পেন ০
ব্রেজিল ০ : চেকোশ্লোভাকিয়া ০
স্পেন ১ : মেক্সিকো ০
ব্রেজিল ২ : স্পেন ১
মেক্সিকো ৩ : চেকোশ্লোভাকিয়া ১

গ্রুপ ৪

আর্জেন্টিনা ১ : বুলগেরিয়া ০
হাঙ্গেরী ২ : ইংলন্ড ১
ইংলন্ড ৩ : আর্জেন্টিনা ১
হাঙ্গেরী ৬ : বুলগেরিয়া ১
হাঙ্গেরী ০ : আর্জেন্টিনা ০
ইংল্যান্ড ০ : বুলগেরিয়া ০

॥ লীগ পর্যায়ে চূড়ান্ত ফলাফল ॥

প্রথম গ্রুপ

	খে	জে	ড্র	প	স্ব	বি	পঃ
রাশিয়া	৩	২	১	০	৮	৫	৫
যুগোশ্লাভিয়া	৩	২	০	১	৮	৩	৪
উরুগুয়ে	৩	১	০	২	৪	৬	২
কলম্বিয়া	৩	০	১	২	৫	১১	১

বিশ্ব ফুটবল কাপ : চতুর্থ গ্রুপের হাঙ্গেরী বনাম বুলগেরিয়ার শেষ পর্যায়ের লীগ খেলার একটি দৃশ্য। হাঙ্গেরী ৬—১ গোলে জয়লাভ করে। ছবিতে সাদা পোষাক পরিহিত খেলোয়াড় বুলগেরিয়ার।

দ্বিতীয় গ্রুপ

পঃ জার্মাণী	৩	২	১	০	৪	১	৫
চিলি	৩	২	০	১	৫	৩	৪
ইতালী	৩	১	১	১	৩	২	৩
সুইজারল্যান্ড	৩	০	০	৩	২	৮	০
তৃতীয় গ্রুপ							
ব্রেজিল	৩	২	১	০	৪	১	৫
চেকোশ্লোভাকিয়া	৩	১	১	১	২	৩	৩
স্পেন	৩	১	০	২	২	৩	২
মেক্সিকো	৩	১	০	২	৩	৪	২
চতুর্থ গ্রুপ							
হাঙ্গেরী	৩	২	১	০	৮	২	৫
ইংলন্ড	৩	১	১	১	৪	৩	৩
আর্জেন্টিনা	৩	১	১	১	২	৩	৩
বুলগেরিয়া	৩	০	১	২	১	৭	১

॥ কোয়ার্টার ফাইনাল ॥

আরিকা, ১০ই জুন : চিলি ২—১ গোলে রাশিয়াকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। প্রথমার্ধের খেলায় ১১ মিনিটে চিলি প্রথম গোল দেয়। বিরতির সময় চিলি ২—১ গোলে অগ্রগামী ছিল। প্রতিযোগিতা থেকে রাশিয়ার এইভাবের বিদায় অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমান বিস্ময়কর। অভিজ্ঞ মহলের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, রাশিয়া সপ্তম বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ ক'রে ইউরোপের মুখ রক্ষা করবে। রাশিয়ার বিপক্ষে চিলির এই সাফল্য বিশ্ব ক্রীড়া মহলে যথেষ্ট বিস্ময় উদ্রেক করেছে। শেষ পর্যায়ে এক নম্বর গ্রুপের লীগের খেলায় রাশিয়া অপরাজেয় অবস্থায় শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। অপরদিকে চিলি ছিল ২নং গ্রুপের রাণার্স আপ—৩টে খেলায় জয় ২ এবং হার ১।

সেমি-ফাইনালে চিলির খেলা পড়েছে ১৯৫৮ সালের বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী ব্রেজিলের সঙ্গে।

শান্তিয়াগো, ১০ই জুন : এক নম্বর গ্রুপের রাণার্স-আপ যুগোশ্লোভিয়া ১—০ গোলে ১৯৫৪ সালের বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী এবং এবারের ২নং গ্রুপের শীর্ষস্থান অধিকারী পশ্চিম জার্মানীকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিরতির সময় গোলশূন্য ফলাফল ছিল। লীগের শেষ পর্যায়ের খেলায় পশ্চিম জার্মানী অপরাজেয় অবস্থায় প্রথম স্থান পেয়েছিল; যুগোশ্লোভিয়ার ছিল ২টো খেলা জয় এবং ১টা হার।

ভিনা ডেল মার, ১০ই জুন : গতবারের (১৯৫৮ সাল) বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী ব্রেজিল ৩—১ গোলে ইংল্যান্ডকে পরাজিত ক'রে চিলির সঙ্গে সেমি-ফাইনাল খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। বিরতির সময় খেলার ফলাফল ছিল ১—১। খেলার ৩১, ৫৩ এবং ৫৯ মিনিটে ব্রেজিল গোল দেয়।

র‍্যাংকাগুয়া, ১০ই জুন : তিন নম্বর গ্রুপের রাণার্স-আপ চেকোশ্লোভাকিয়া ১—০ গোলের ব্যবধানে চার নং গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরীকে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে যুগোশ্লোভিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। চেকোশ্লোভাকিয়া এক হিসাবে ভাগ্যবান দল—মোট চারটে খেলায় (শেষ পর্যায়ের লীগের ৩টে এবং কোয়ার্টার-ফাইনাল) মাত্র ৩টে গোল দিয়েই তারা সেমি-ফাইনালে উঠেছে।

কোয়ার্টার-ফাইনালের খেলায় মোট আটটি দলের মধ্যে সেমি-ফাইনালে উঠেছে যুগোশ্লোভিয়া (১নং গ্রুপের রাণার্স-আপ), চিলি (২নং গ্রুপের রাণার্স-আপ), চেকোশ্লোভাকিয়া (৩নং গ্রুপের রাণার্স-আপ) এবং ব্রেজিল (৩নং গ্রুপ—চ্যাম্পিয়ান)। চার নম্বর গ্রুপের কোন দলই উঠতে পারেনি। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে, সেমি-ফাইনালের চারটি দলের মধ্যে তিনটি দলই বিভিন্ন গ্রুপের রাণার্স-আপ এবং একমাত্র গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ান দল উঠেছে ব্রেজিল। ১নং গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ান রাশিয়া, ২নং গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানী এবং ৪নং গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরী কোয়ার্টার-ফাইনালের খেলায় বিভিন্ন গ্রুপের রাণার্স-আপ দলের কাছে হার স্বীকার ক'রে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়। গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ানের মুখ একমাত্র রেখেছে তিন নম্বর গ্রুপ-চ্যাম্পিয়ান ব্রেজিল। যেভাবে সেমি-ফাইনাল খেলার তালিকা তৈরী হয়েছে, তাতে দক্ষিণ আমেরিকা এবং পূর্ব ইউরোপের দেশই ফাইনালে খেলবে।

বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল খেলাগুলির মাঠ পরিবর্তন নিয়ে প্রতিযোগী দেশগুলির সঙ্গে ক্রীড়া-পরিচালকদের বেশ বিতর্ক বেধে গেছে। চিলির অনুরোধেই আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তাগণ হঠাৎ এই মাঠ পরিবর্তন করেছেন। মাঠ পরিবর্তনের ফলে প্রথম সেমিফাইনাল খেলা হবে শান্তিয়াগোতে (পূর্বে ছিল ভিনা ডেল মার) এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলা ভিনা ডেল মার মাঠে (পূর্বে ছিল শান্তিয়াগো)।

কোয়ার্টার ফাইনাল

ব্রেজিল ৩ : ইংল্যান্ড ১
চিলি ২ : রাশিয়া ১
যুগোশ্লাভিয়া ১ : পঃ জার্মানী ০
চেকোশ্লোভাকিয়া ১ : হাঙ্গেরী ০

সেমি-ফাইনাল

ব্রেজিল বনাম চিলি
(শান্তিয়াগো, ১৩ই জুন)

যুগোশ্লোভিয়া ব চেকোশ্লোভাকিয়া
(ভিনা ডেল মার, ১৩ই জুন)

ফাইনাল

শান্তিয়াগো, রবিবার, ১৭ই জুন

সর্বোচ্চ গোলদাতা

(কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত)

শেষ পর্যায়ের লীগের খেলা এবং কোয়ার্টার-ফাইনাল খেলা ধরে সর্বোচ্চ গোলদাতার নাম : আলবার্ট (হাঙ্গেরী) ৪ গোল এবং ইনভানোভ (রাশিয়া) ৪ গোল। ৩টি ক'রে গোল করেছেন : টিচি (হাঙ্গেরী), গ্যালিক এবং জারকোভিক (যুগোশলাভিয়া) এবং লিওনেল স্যানচেজ (চিলি)।

দলগত গোল

শেষ পর্যায়ের লীগের খেলা থেকে কোয়ার্টার-ফাইনাল পর্যন্ত।

৯টি গোল : যুগোশ্লোভিয়া; রাশিয়া
৮টি গোল : হাঙ্গেরী
৭টি গোল : ব্রেজিল; চিলি

॥ কৃষ্ণাণ এবং লেভারের পরাজয় ॥

স্পেনের আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে ম্যানুয়েল শান্তানা (স্পেন) ৩—৬, ৬—৩, ৬—৪, ৮—৬ সেটে ভারতবর্ষের রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণান সেমি-ফাইনালে রয় এমার্সনকে (অস্ট্রেলিয়া) ৬—২, ৬—২ ও ৬—২ সেটে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিলেন।

সুইডিস আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে উলফ স্মিড (সুইডেন) ৬—৪, ৬—৩ ও ৬—০ সেটে বর্তমান সময়ের বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় রড লেভারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত ক'রে বিস্ময় উদ্রেক করেন। রড লেভার ১৯৬১ সালের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান এবং ১৯৬২ সালের অস্ট্রেলিয়ান, ইতালীয়ান, সুইস এবং ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ান।

॥ সটপুটে বিশ্ব রেকর্ড ॥

পূর্ব জার্মানীর এক আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে রাশিয়ার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান তামারা প্রেস মহিলাদের সটপুটে ১৮·৫৫ মিটার (৬১ ফিট ১/২ ইঞ্চি) দূরত্ব অতিক্রম ক'রে তাঁরই পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড (৫৮ ফিট ৪ ইঞ্চি) ভঙ্গ করেছেন।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ইংল্যান্ড সফর

পাকিস্তান ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড সফরের সরকারী খেলার তালিকা অনুযায়ী এ পর্যন্ত ১০টা ম্যাচ খেলেছে। পাকিস্তানের পক্ষে খেলার ফলাফল জয় ৪, হার ২ এবং খেলা ড্র ৪। ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স দলের বিপক্ষে দু'দিনের খেলায় ৭ উইকেটে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি দলের বিপক্ষে এক ইনিংস এবং ১০৩ রানে, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির বিপক্ষে ৮ উইকেটে

এবং সারে কাউণ্টি ক্রিকেট দলের বিপক্ষে ৯২ রানে পাকিস্তান ক্রিকেট দল জয়লাভ করে। হার স্বীকার করে সাসেক্সের বিপক্ষে ৭ উইকেটে এবং প্রথম টেস্ট ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে এক ইনিংস এবং ২৪ রানে। আলোচ্য সফরে ইংল্যাণ্ডের কাউণ্টি ক্রিকেট দলের বিপক্ষে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রথম জয়--সারে কাউণ্টি ক্রিকেট দলের বিপক্ষে ৯২ রানে। পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ৩৪৮ রান (৬ উইকেটে) করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। সারে কাউণ্টি দলও প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে ৩৪৮ রানের (৯ উইকেটে) মাথায়। পাকিস্তান তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় যখন ২৩৭ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় সমাপ্তি ঘোষণা করে তখন খেলা ভাঙ্গতে ১৩০ মিনিট সময় বাকি ছিল। এই সময়ের মধ্যে সারে দলের পক্ষে জয়লাভের জন্যে ২৭৮ রানের প্রয়োজন ছিল। খেলা ভাঙ্গতে যখন মাত্র তিন মিনিট বাকি তখন সারে দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৫ রানে শেষ হয়। ফলে পাকিস্তান ৯২ রানে জয়লাভ করে। ঘড়ির কাঁটাই শেষ পর্যন্ত সারে দলের 'পথের কণ্টক' হয়ে দাঁড়ায়।

২ মাইল দৌড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড

আমেরিকান দৌড়বীর জিম বেটি গত ৯ই জুন তারিখে দক্ষিণ প্রশান্ত মার্কিন এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন প্রতিযোগিতায় ২ মাইল দৌড় অনুষ্ঠানে ৮ মিনিট ২৯·৮ সেকেণ্ডে দূরত্ব পথ অতিক্রম করে নতুন বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। পূর্ব রেকর্ড : ৮ মিঃ ৩২ সেকেণ্ড—এ্যালবার্ট টমাস (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৫৮ সাল।
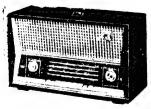
॥ ফুটবল লীগ ॥

গত সপ্তাহে (৪ঠা জুন—১০ই জুন) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোট ১৫টা খেলা হয়েছে—জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে ৬টা খেলায় এবং খেলা ড্র গেছে ৯টা।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আলোচ্য সপ্তাহে ৩টে খেলে ৪ পয়েন্ট পেয়েছে—হাওড়া ইউনিয়নের বিপক্ষে ১—১ গোলে খেলা ড্র যায়। পর পর তিনটে খেলা ড্র করার পর ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে পরাজিত করে। ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের চ্যারিটি খেলা গোল শূন্য ড্র যায়। কাগজে-কলমে মহমেডান স্পোর্টিং দল ইস্টবেঙ্গল দলের থেকে অনেক দুর্বল। ইস্টবেঙ্গল দলের যেখানে ১১টা খেলায় ১৮ পয়েন্ট, সেখানে মহমেডান স্পোর্টিং দলের ৭টা খেলায় ৬ পয়েন্ট; ইস্টবেঙ্গল অনেক পয়েন্টের ব্যবধানে অগ্রগামী ছিল। কিন্তু মহমেডান দলের গোলরক্ষক থঙ্গরাজের খেলা কি এই দিনের জন্যেই তুলে রাখা ছিল! তাঁর অপ্রত্যাশিত খুব ভাল খেলার দরুণই মহমেডান স্পোর্টিং দল এইদিনের খেলায় একটা অতি মূল্যবান পয়েন্ট নিতে পেরেছে। খেলার তুলনামূলক বিচারে ইস্টবেঙ্গল দল এইদিনের খেলায় নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ছিল। তবে গোল দিতে পারেনি মহমেডান দলের গোলরক্ষক থঙ্গরাজের অপ্রত্যাশিত ভাল খেলার জন্যে। বলতে কি, খেলাটা দাঁড়িয়েছিল ইস্টবেঙ্গল দল বনাম থঙ্গরাজ। খেলা ভাঙ্গার শেষদিকে ইস্টবেঙ্গল দলের প্রবল চাপে মহমেডান দলের রক্ষণভাগ প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। এই সময় ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড় বলরাম একটা গোল দেন; কিন্তু রেফারী সেই গোল অগ্রাহ্য করেন এই কারণে যে, গোল দেওয়ার আগেই বলরামের অফ-সাইড আইন ভঙ্গের জন্যে লাইন্সম্যান রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং রেফারীও সেই মত বাঁশী বাজিয়েছিলেন। লাইন্সম্যান এবং রেফারীর এই সিদ্ধান্ত মাঠের এক শ্রেণীর দর্শকদের মনঃপূত হয়নি। মাঠের মধ্যে এবং বাইরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ক'রে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। রেফারী এসোসিয়েশনের তাঁবুটি এই বিক্ষোভের ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বর্তমানে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলের সমান খেলায় সমান পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে-১২টা খেলায় ১৯ পয়েন্ট।

আলোচ্য সপ্তাহে মোহনবাগান দুটো ম্যাচ খেলেছে—এরিয়ান্সের বিপক্ষে ৫—০ গোলে জয় এবং ইস্টার্ণ রেল দলের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র। এরিয়ান্সের বিপক্ষে মোহনবাগান দলের ৫—০ গোলে জয়, উপস্থিত এ মরসুমের প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় সর্বাধিক গোলের ব্যবধানে জয় হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। মোহনবাগান বনাম ইস্টার্ণ রেল দলের খেলা গোলশূন্য ড্র হওয়া উচিত হয়নি। ইস্টার্ণ রেল দলের তুলনায় মোহনবাগান গোল দেওয়ার মত সুযোগ বেশী পায়। এইদিনও মোহনবাগান দলের অরুময়কে এবং ইস্টার্ণ রেল দলের পি কে ব্যানার্জিকে অফসাইড আইন ভঙ্গের দোষে অভিযুক্ত করায় এক শ্রেণীর দর্শক বিক্ষুব্ধ হয়ে মাঠে ইট-পাটকেলও পড়ে।

আলোচ্য সপ্তাহে সব থেকে মর্মস্পর্শী গোল খেয়েছে বাটা দল এরিয়ান্সের কাছে। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বাটা ০—১ গোলে পরাজিত হয়। খেলা ভাঙ্গার শেষ মিনিটে বাটা দলের গোলরক্ষক এরিয়ান্স দলের সেণ্টার-ফরওয়ার্ডের সঙ্গে এক আকস্মিক সংঘর্ষে যখন অচৈতন্য অবস্থায় ভূতলশায়ী, এরিয়ান্স এই সময়ে জয়সূচক গোল করে।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকা

(১০ই জুন পর্যন্ত)

প্রথম চারটি দল

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পয়েণ্ট
ইস্টবেঙ্গল	১২	৭	৫	০	১২	২	১৯
মোহনবাগান	১২	৮	৩	১	২৫	৮	১৯
বি এন আর	৯	৪	৪	১	৮	৫	১২
ইস্টার্ণ রেল	৮	৩	৫	০	৬	২	১১

॥ পুস্তক পরিচয় ॥

INDIA IN WEST INDIES: Published by Illustrated News (Sports), 203/2B, Cornwallis Street, Calcutta-6. Price — Re. 1/-.

ইংরেজীতে প্রকাশিত এই স্মারক পুস্তিকাটি ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯৬২ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর উপলক্ষে রচিত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে নির্বাচিত ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের জীবনী ও আলোকচিত্র, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট খেলোয়াড়দের আলোকচিত্র; ১৯৬২ সালের টেস্ট খেলা সমেত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ২০টি টেস্ট খেলার বিবিধ রেকর্ড এবং অসংখ্য মূল্যবান পরিসংখ্যান পুস্তিকাটির প্রধান আকর্ষণ। তাছাড়া প্রখ্যাত ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মুস্তাক আলী এবং ক্রীড়া-সাংবাদিক প্রভাস সিংহের প্রবন্ধ পুস্তিকাটির গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

কিং কো'র
আর্ণিকা
হেয়ার অয়েল
কিং এণ্ড কোং

মরামাস
NEKO
THE ORIGINAL
Germicidal
Soap
PARKE DAVIS

সূচীপত্র

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৭ই আষাঢ়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 22nd June, 1962.
40 Naya Paise

সাধারণতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার নানা দেশে নানাভাবে হইয়া থাকে এবং প্রাচীনকাল হইতেই দেশচালনা ও শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন পদ্ধতিকে ঐরূপ বিভিন্ন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ঐ শব্দগুলির কোনও বিশেষ সংজ্ঞা কোনও রাষ্ট্রনীতিবিদ এমনভাবে দিতে পারেন নাই যাহাতে এক হইতে অন্যকে সহজে পৃথক করা যায়। অর্থাৎ ঐরূপ রাষ্ট্রচালনা পদ্ধতি বা শাসনতন্ত্রগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে এরূপে কোন প্রকৃতিগত বিবাদি-সম্বাদি সূত্র সূক্ষ্মভাবে কেহ দিতে পারেন নাই যাহাতে বলা যায় যে এই দেশে শাসনতন্ত্রের ব্যবহারিক রূপে এই সকল ভ্রষ্টাচার দেখা যাইতেছে সুতরাং রাষ্ট্রচালকগণ নীতি অমান্য করিয়া দেশকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন এবং এইরূপ অসংগত আচরণের জন্য তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করা উচিত। এইজন্য শাসনতন্ত্রের বা রাষ্ট্রচালনার কোনও দোষ ধরিলেই তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায় এবং সেই তর্কের নিষ্পত্তি হয় দলের ওজনে, ন্যায়ের বিচারে নয়। অবশ্য দুই তিনটি বৈদেশিক রাষ্ট্রে, যেখানের জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ দেশের ও জাতির স্বায়ত্বশাসন অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন, সেখানে ঐরূপ নীতিগত বা জনসাধারণের অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন তীব্র ও প্রবল হইলে শেষ নিষ্পত্তি হয় সাধারণ নির্বাচনে বা ব্যাপক জনমত গ্রহণে,—যেমন হয় বৃটেনে ও ফ্রান্সে।

আগেকার দিনের স্বৈরতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র, বা স্বায়ত্তশাসন ও পরায়ত্তশাসন এগুলির সম্পর্কে কতকগুলি স্থূল ধারণা এখনও প্রচলিত আছে। যথা, সেগুলির মধ্যে রাষ্ট্রচালকদিগের অধিকার ভেদে বা ক্ষমতার সীমা নিরূপণ অনুসারে শাসনতন্ত্রের ভিন্ন নাম দেওয়া হইত, যেমন যদি রাজ্যের সকল অধিকার রাজার আয়ত্তে থাকিত তবে সেই রাজত্বকে বলা হইত একাধিপত্য প্রকৃতির। আবার রাজা সংবিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য হইলে তবে তিনি হইতেন সংবিধান অনুযায়িক নৃপতি, ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নৃপতিহীন স্বায়ত্বশাসনতন্ত্রকে লোকতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যা দেওয়া হইত সে সকল রাষ্ট্রের লোকমত গ্রহণ পদ্ধতি এবং সংবিধানের মূলে সূত্র অনুযায়ী। আজিকার দিনে সে সকল বালাই নাই তাই সালাজারের পোর্তুগালকে বলা হয় সাধারণতন্ত্র এবং মাও-সে-তুংগ ও চু-এন লাইয়ের দ্বৈতশাসনকে বলা হয় গণতন্ত্র এবং আয়ুব খাঁর পাকিস্তানকে বলা হয় লোকতন্ত্র।

ইংরাজী প্রবাদে বলে, শুধু নামের মাঝে আছে কি? কিন্তু রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পৃথিবীর দুই বৃহত্তম ইংরাজী ভাষাভাষী রাষ্ট্র নিজের দলগত স্বার্থে ঐ নামের মহিমাই মানিয়া চলেন যেমন সালাজারের অত্যাচার ও অনাচার প্রপীড়িত গোয়ার মুক্তিসাধনে ভারতের কার্যকলাপ দাঁড়াইল লোকতন্ত্রবিরোধী, অথচ সালাজারের অনুচরবর্গ আফ্রিকায় যে মানবত্ববিরোধী নৃশংস অত্যাচার চালাইতেছে সে বিষয়ে কোনও কথাই নাই। না আছে আয়ুবখানি শাসনে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনও কথা।

ঠিক ঐ দলগত স্বার্থেরই প্রভাবে এবং মার্কিন দেশের যুদ্ধবাদী সামরিক পন্থানির্দেশকারীদের পরামর্শে এখন পাকিস্তানকে অর্থসাহায্য ও অস্ত্রসাহায্য এরূপভাবে করা হইতেছে যে ভারতের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বিপন্ন হইতেছে। উপরন্তু সম্মিলিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন সরকারের প্রতিনিধি ভারতকে দোষী সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন।

সোভিয়েটবিরোধী গোষ্ঠীদের কার্যকলাপে এইভাবে ভারতরাষ্ট্র বিপন্ন। এই কারণে এই সময়েই আমাদের রাষ্ট্রচালকদিগের কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় জনসাধারণের সম্মুখে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা তাঁহাদের পৃথিবীতে কোনও সহায় বা আশ্রয়স্থল নাই, আছে শুধু এই অভাব-অনাটন-প্রপীড়িত দরিদ্র দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস ও মনোবল। সেই বিশ্বাস যদি তাঁহাদের কার্যকলাপে বা আচরণে নষ্ট হয় এবং দেশবাসীদের মনোবল যদি নষ্ট হয় প্রশ্ন এড়াইবার ফলে তবে রাষ্ট্রচালকদিগের আর থাকিবে কি?

ভারতের লোকতন্ত্র যাঁহাদের অধিকারে, তাঁহাদের পূর্ণ দায়িত্ব আছে শেষরক্ষার। এবং সে বিষয়ে প্রশ্ন করার এবং দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার পূর্ণ অধিকার আছে ভারতের প্রত্যেক লোকের—বিশেষতঃ তাঁহাদের যাঁহারা লোক-প্রতিনিধি হইয়া লোকসভায় বা রাজ্যসভায় গিয়াছেন, তাঁহাদের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ যাহাই হোক না কেন। এই অধিকার সম্পর্কে কোনও তর্কের বা কূটপ্রশ্নের অবকাশ নাই।

সম্প্রতি লোকসভায় (১৩ই জুন) ঠিক ঐরূপ প্রশ্নে উত্তেজিত হইয়া পণ্ডিত নেহরু অবান্তর অভিযোগে প্রশ্ন চাপা দিয়াছেন। পরে আরও সূক্ষ্মভাবে ঐ প্রশ্ন দশ জন সদস্য উপস্থাপিত করিতে শ্রীকৃষ্ণ মেনন উহা এড়াইয়া যান ও তাঁহার সমর্থনে পণ্ডিত নেহরুও উহা স্তোকবাক্যে চাপা দিয়াছেন। ইহাতে সমাজতন্ত্র অনুযায়িক দায়িত্বজ্ঞান দেখিতে আমরা অসমর্থ।

মোনালিসা

তরুণ সান্যাল

কারা দীর্ঘকাল ছিল ঘরের ভিতরে
প্লেটোর গুহায় সেই বন্দী দেখছে ছায়াপুঞ্জে,
জরামৃত্যুব্যাধি...
ভালোবাসা ঘৃণা নামধেয় বোধ অনুভবে ক্বচিৎ আভাসে
কিন্তু ফিরে চায় উৎসে পুনরায়, সংশয়িত জ্বরে
...অথচ বাহিরে ছিল লতানদীবিস্তীর্ণ অনাদি
এবং স্ফটিক দীপ্তি রৌদ্রে ঘাসে নক্ষত্রে আকাশে

বারো মাস মেঘরৌদ্র, রৌদ্রমেঘ বিস্তার সঙ্কোচ
পুনরায় ব্যাপ্তি ফিরে সংকুচনে...প্রত্যাশা ব্যর্থতা
যেন দিনরাত্রিগুলি হাতের আয়ত্তে রাখে
চিরঞ্জীব স্থিতিস্থাপকতা
উহাই যেনবা অস্তিনাস্তির কবচ...
কথাগুলি মূলশূন্য, ছুঁড়ে দিলে নীচে ফিরে আসে

দ্রুত বায়ু বহে যায়...দ্রুত ঐ বিশেষণখানি
স্থানকাল ত্রিমাত্রায় আয়ু হয় মানসদর্পণে.
এত গতিশীল বিশ্ব ধ্যানে স্তবে বিস্ময় বাখানি
অথচ আমার চোখে অতিস্থির মগ্নরূপ ভনে...
যেনবা প্রস্তরপিণ্ড অলকানন্দায় স্রোতে ক্ষণিক জাগর
গলন্ত হিমের লাফ, আঁচড় চিকুরে তার চিকন গর্জনে,

অথবা নতুন বালি চিহ্নে বেলারেখায় সাগর
চন্দ্রাতপে নতুন নীলিমা চাঁদমালা তারা উল্কার আভাসে
এবং স্ফুরিত ফুল্ল পুষ্প বালু উদ্যান বা বনে.
নবীনতা, হে নতুন, এইরূপে তোমাতে উদ্ভাসে

বন্দীশালা, হে নতুনে, ভাঙি..., দূরে চক্রবালশায়ী
নীলবননীলাকৃতি পর্বতমেখলা খেলা করে
নগ্ন স্থায়ী প্রস্তরের মগ্নতায় যাব, দেখি, বৃষ্টিরৌদ্রপায়ী
বরাঙ্গ পতনে, রঙ্গে, ক্রমাগত ভ্রূভঙ্গ নির্ঝরে...
অর্ধচন্দ্রপ্রায় ঐ তরঙ্গেরা গোল হবে বলে
বুকে ঢুকে নাই, কিন্তু পুনরায় জলে ও বালুর
কর্কশে আছাড় চিনে চেতনাবিহীনে, জলে ধাতুর তরলে
দেখতে চাই অশ্রুবিন্দু, আয়ুরেখা হাতের তালুর...
অনেক জাহাজে স্মৃতি নীলে চায়, শিল্পে, বারোমাস
জলের বর্ণালি তবু ধরে আছে জলের অন্তরে
রৌদ্রপাত বৃষ্টিবিন্দু, বৃষ্টি রশ্মি জ্যোৎস্না রেখাকারে
ধূমল যদিবা তবু বস্তুবিশ্ব করুণ মুখশ্রী হয়ে ঝরে

মোনালিসা, তুমি ছিলে স্থির, থাকো স্তব্ধ কালপ্রোথিতে,
ভিতরে ॥

তৃতীয় চিঠি

কেতকী কুশারী

যদিও বিরাট চান্স নিয়েছিলে দুর্মর আশায়,
মনে ভেবে সব ফাঁকি ঢেকে যাবে শেষ অভিনয়ে,
তবু ফেঁসে যেতে হোলো ছোটখাট কঠিন প্রলয়ে,
অপমান জানতে হোলো স্বীকৃতির অঙ্গার-ভাষায়।

তুমি বাঁচতে চেয়েছিলে। চার দেয়ালের অন্ধকারে
কখনও নিজের প্রেত দেখেছিলে ক্লান্ত বিছানায়;
ভুলে যেতে চেয়েছিলে; তারই নিদারুণ প্রচেষ্টায়
অদম্য জ্বরের ঘোরে এসেছিলে সান্ধ্য অভিসারে।

বার বার এসেছিলে। আর অন্তরালে জ্ব'লে জ্ব'লে
নিজেকে করিয়েছিলে অবচেতনায় এ বিশ্বাস,
হবে না শীঘ্রই আর ধূমকেতু কিংবা সূর্যগ্রাস,
আশঙ্কাকে বেমালুম চেপে গেলে তপ্ত কলরোলে।

চতুর্গুণ হ'য়ে আজ তাই এলো তাপমাত্রা বুকে,
কার বেশী সে হিসাব অনুভবে আসে না বিচারে,
বাবধি-উত্তাল সিন্ধু। আকাঙ্ক্ষার যে থার্মমিটারে
একদিন মেপেছিলে, আজ মাপো নিরশ্রু অসুখে।

রূপকে অনেকবার বলেছিলে কঙ্কাল-কাহিনী,
অনেক তরঙ্গহাস্যে স্পর্শ ক'রে রাতের সৈকত,
সেদিনের দ্বৈত কণ্ঠে পূর্ণিমার গানের সঙ্গত
চিন্তাহীন ক'রে গেছি। কালিচ্ছায়া কিছুই বুঝিনি।

তোমাকে জানাতে চাই অবিকল আছে সমস্তই,
অযথা নিও না দুঃখ দর্পসার বন্ধ্য অভিমানে,
সকাল সন্ধ্যায়, প্রিয়, গোষ্ঠীগত আদানপ্রদানে
দুনিয়ার চোখে আমি নির্বোধ বৈষ্ণবী শুধু হই ॥

জৈমিনি

সংসারে এমন লোক বোধহয় একজনও নেই গান শুনে যার ভালো লাগে না। কোনো একটি বিশেষ গান হয়তো সকলের ভালো নাও লাগতে পারে, যে গান ভালো লাগে তাও হয়তো সব সময়ে আনন্দদায়ক মনে হয় না, কিন্তু নির্বিচারে সমস্ত গানই এ৺জন লোকের সারাজীবন খারাপ লেগেছে এমন ঘটনা 'কোটিতে গুটিক'ও মেলে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, বাংলা দেশে আধুনিককালে এই সর্বজনপ্রিয় গান জিনিসটির যে রকম দুরবস্থা চলছে তাতে অচিরাৎ হয়তো আমরা গান-বিদ্বেষী হয়ে উঠব। কিম্বা তা যদি নাও হই, সে আরো ভয়াবহ অবস্থা। এ গান ভালো লাগতে শুরু করলে ভালোমন্দের ভেদ-রেখাই যাবে লুপ্ত হয়ে।

আধুনিক গানের মতো এমন অধঃপতিত সংগীতকলা ভূ-ভারতে আর একটিও নেই।

বাংলা দেশ গানের দেশ বলে আমরা বড়াই করি। সত্যিই তো, বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ গীতিকবিতা। বৌদ্ধ গান ও দোহার যুগ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী অনেক কবির রচনায় এ ধারা ছিল অব্যাহতভাবে প্রবহমান। কিন্তু বাংলা কবিতায় আধুনিক যুগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই গানের রাজ্যে নেমে এসেছে এক চরম সংকট। শক্তিমান কবিরা কেউই প্রায় গান রচনায় উৎসাহী নন। সেই সুযোগে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন অকবি এবং কুকবির দল। গানের জন্যে যেসব লিরিক লেখা হ'য়েছে, কিছুকাল আগে পর্যন্তও তা রবীন্দ্রনাথের ভাবচ্ছায়ায় লুকোচুরি খেলে আত্মদৈন্য গোপন রাখতে পেরেছিল বটে, কিন্তু ইদানীং কয়েক বছর ধ'রে তার দেউলেপনা অভ্রান্তভাবে প্রকট হ'য়ে উঠতে শুরু করেছে। এবং এসব ক্ষেত্রে সব শিল্প-কলার বেলাতেই যা ঘটে, অন্তঃসার-হীনতা যতোই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে ততোই চলছে ঝুটো জোলুশের বিকৃত প্রসাধান। শ্রোতা পাকড়ানোর জন্যে কোনো

ফিকিরই আজ আর যেন তার কাছে অনাচারনীয় নয়। বাংলা গান এখন লাফ-ঝাঁপ-হুল্লোরের ঠুনকোপনায় হিন্দি গানকেও লজ্জা দিতে পারে অনায়াসে।

বলা বাহুল্য বাংলা গানের সুরকার-রাও এ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই। যোগ্যের সংগেই মিলন ঘটে যোগ্যের। যেমন গান তার তেমনি সুর, একেবারে সোনায় সোহাগা। শুনে-যে আমরা এখনো গলে জল হয়ে যাইনি, এইটেই আশ্চর্য!

হাল্কা-চটুল ভাষার সংগে কানামাছি খেলা-সুর যখন কসরৎ দেখাতে শুরু করে তখন সত্যি বলতে কি মনে হয় যেন বসে আছি এক সার্কাসের তাঁবুতে। কিন্তু সুরকারের কায়দা আর চালিয়াতি উপলব্ধি করাই নিশ্চয় গান শোনার পরম মোক্ষ নয়। সুরের বিষয়ে প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি সংস্কার থাকে মনে, সেই পূর্বচেতনার বনিয়াদকে প্রবলভাবে বিপর্যস্ত করলে সুরের ইমারৎ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। অথচ আমাদের নবীন সুরকাররা বৈচিত্র্যের নেশায় এমন মারাত্মকভাবে পল্লবগ্রাহী হ'য়ে উঠেছেন যে কার সংগে কী মেশাচ্ছেন এবং কানের উপর তার প্রতিক্রিয়া কী, সে বিষয়ে মনে হয় যেন একেবারেই বেপরোয়া।

কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। এই উৎকট অ-সুরপনার হাতে আর আমরা নাজেহাল হতে রাজি নই। বাংলা গানকে আমরা স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই।

আমি জানি, যে গান এখন গাওয়া হয়, তার সুর ও ভাষা বাঙালী শ্রোতা-দের এক বিশেষ অংশে খুবই জনপ্রিয়। এবং এ জনপ্রিয়তা যে বাড়তির দিকে তাও আমি নিজের বাড়িতে কান পাতলেই মর্মে মর্মে অনুভব করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কিম্বা সেইজন্যেই, আমি বলব—এই জন-প্রিয়তা যাতে দাবানলের মতো আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ পুরুষকে গ্রাস না করে তার জন্যে এখনই আমাদের সচেষ্ট হওয়া দরকার। কচি কচি বাচ্চাদের মুখে পরম ছ্যাবলামোয় ভরা পাকা-পাকা গান শুনতে আমার হাত-পা সব হিম হয়ে আসে!

তাছাড়া জনপ্রিয়তা কথাটাও বড় মারাত্মক। কারণ সব রকম 'প্রিয়ত্ব'কেই জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সঙ্গত কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। আমরা জানি, ইতিহাসের এক বিশেষ কার্যকারণে চীনদেশে একদা আফিং এবং সমগোত্রীয় কয়েকটি মাদকদ্রব্য খুবই 'জনপ্রিয়' হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চীন-দেশের তদানীন্তন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নেতারা সেই সর্বনাশা জনপ্রিয়তাকে দীর্ঘস্থায়ী হ'তে দেননি। কাজেই একালের বাংলা গানের যাঁরা 'ধারক ও বাহক' তাঁদেরও ভেবে দেখা দরকার, গানের নামে এই ভাঁড়ামি ও পাকামি অপরিণত বালক ও কিশোরদের পক্ষে কী পরিমাণ ক্ষতিকারক হ'য়ে উঠছে!

অবিশ্যি একথা ঠিক, বাংলা গানের চেয়েও হিন্দি গানের প্রভাব আরো সুদূরপ্রসারী। বাংলা দেশের যে কোনো প্রত্যন্তশায়ী পাড়াগাঁতেও আজকাল হিন্দি ফিল্‌ম্‌-সঙ্গীত শুনে থমকে দাঁড়াতে হয়। হিন্দি ফিল্‌ম্‌ এবং তার গানের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাবার সবগুলো পথ আমাদের সামনে খোলা নেই, একথা সত্যি, কিন্তু একটা পথ নিশ্চয়ই খোলা আছে। সেটা হল, ভালো বাংলা ফিল্‌ম্‌ এবং ভালো গান তৈরি করা। এর প্রথমটা ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং সেই-জন্যে হিন্দি ছবি আমরা দেখলেও তাকে খারাপ বলে চিনতে পারি এবং সেইভাবেই গ্রহণ করি। কিন্তু গানের বেলায় সে স্ট্যান্ডার্ড আমরা এখনো অর্জন করতে পারিনি। বরং ঝোঁকটা দেখা যাচ্ছে, খারাপের সংগে প্রতিযোগিতায় খারাপতর হওয়ার দিকে। তাই হিন্দি আর বাংলা গান মিলে-মিশে একাকার হ'য়ে যাচ্ছে আজকাল, হিন্দি আর বাংলা গান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের পরিপূরক।

এদের এই পরস্পর নির্ভরশীলতার কথা ভাবলে মনে আসে বহুদিন আগে দেখা একটি কার্টুনের কথা। দুজন চলচ্ছক্তিহীন মদ্যপ পরস্পরের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নীচে ক্যাপশান— united we stand, divided we fall. এমন ইউনিটি সচরাচর দেখা যায় না।

কিন্তু বাংলাদেশে সুকবির অভাব নেই, শক্তিমান সুরকারও এখানে কম নয়। কেন তাঁরা এই অর্থহীন খেলোমি আর গোঁজামিলের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন না? কেন তাঁরা এমন জিনিস দিচ্ছেন না যা আমাদের অতীত গৌরবের যোগ্য উত্তরা-ধিকারী হতে পারে? সে কি শুধু শস্তায় জনপ্রিয়তা লাভের মোহে, না অন্য কিছু?

এ প্রশ্নের সদুত্তর এখনই দিতে হবে। কেবল মুখের কথায় নয়, কাজের ভিতর দিয়ে। না হলে যেভাবে আমাদের উত্তরপুরুষদের বিচারবোধ ও রুচি প্রতি-নিয়ত জখম হয়ে চলেছে তাতে অদূর-ভবিষ্যতেই হয়ত বাংলাদেশে স্থাপিত হবে এক চিন্তাহীন কালাপাহাড়ের রাজত্ব, নির্বিচারে সমস্ত কিছু সুকুমার-বৃত্তির ধ্বংসসাধনই হবে যার পরম বৈশিষ্ট্য।

"আমাকে তবে কি ভেবেছিলেন?"

পরিমল গোস্বামী

১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবর, তারিখটা মনে আছে। ঐ তারিখে মেদিনীপুর জেলার উপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছিল তা অনেকেরই মনে থাকবার কথা। আমি চলছিলাম মেদিনীপুরের দিকেই। খড়্গপুর স্টেশনে ট্রেণের মধ্যে বসে সে ঝড়ের কিছু স্বাদ পেয়েছিলাম। শোনা গেল মেদিনীপুর লাইনের উপর একখানা মালগাড়ি পড়ে যাওয়াতে আমাদের গাড়ি অনির্দিষ্ট কাল অচল অবস্থায় থাকবে।

গাড়ির মধ্যে আরও এক ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর নাম ভবতোষ চক্রবর্তী। প্রথম শ্রেণীতে সে দিন আমরা দুজনে মাত্র যাত্রী. কলকাতা থেকে অনেক সাহেব যাত্রী সে গাড়িতে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা সবাই ঝড়ের অবস্থা দেখে খড়্গপুরে নেমে গিয়েছিলেন।

এই ভবতোষ চক্রবর্তীকে আমি আগে কখনও দেখিনি. গাড়িতেই আলাপ। ঝড়ে অনির্দিষ্ট কাল বসে থাকতে হবে জেনে তিনিও আমার সঙ্গে আলাপে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। প্রিয়দর্শন চেহারা, শিক্ষিত সুমার্জিত কথা এবং আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়।

তিনি প্রথম পরিচয় শেষ হলে আমাকে বললেন, মশায়, এই ঝড়ে আমার ১৯১৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বরের এক ভয়াবহ ঝড়ের কথা মনে পড়ছে। সে ঝড় হয়েছিল পূর্ববঙ্গে। কিন্তু শুধু ঝড় বললে তার পরিচয় দেওয়া হয় না, সে এক প্রলয়ঙ্কর সাইক্লোন। মশায়, আপনি কি কখনও গোয়ালন্দ মহকুমার প্রধান শহর রাজবাড়িতে গেছেন?

আমি বললাম বিলক্ষণ! রাজবাড়ির বারো মাইল পশ্চিমেই তো আমার বাড়ি। অনেকবার গিয়েছি সেখানে, তার প্রত্যেকটি অংশ আমার চেনা।

তাহ'লে ভালই হ'ল, কারণ জায়গাটা জানা থাকলে আমার কাহিনীটা সহজে বুঝতে পারবেন। শুনুন, আমি একা মেয়ে কলকাতা যাব বলে স্টেশনে এসে ছিলাম লক্ষ্মীকোল থেকে। সন্ধ্যা সাড়ে নটায় ঢাকা মেল আছে। কোনো নির্দিষ্ট সময় রাখা সম্ভব হয় না, কারণ স্টীমারের সময়ের সঙ্গে তার যোগ। স্টীমার দেরিতে এলে মেল ট্রেনও দেরিতে ছাড়ে। যাই হোক, সেদিন দুর্যোগের আবহাওয়া ছিল বলে আমি একটু আগেই এসেছিলাম স্টেশনে। কলকাতা যাওয়াটা জরুরী ছিল বলেই এমন দিনেও রওনা

হয়েছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারিনি যে দুর্যোগটা এমন প্রবল হয়ে উঠবে। আশ্বিনের ঝড় বেশির ভাগ সময়ে এমনি ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায়। এ ঝড়ের কথা নিশ্চয় শুনে থাকবেন।

আমি বললাম, সেই ঝড়ের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা বাস করেছি মশায়, কোনো রকমে সেবারে বেঁচে গিয়েছিলাম সে কথা সবই মনে আছে।

তা হ'লে তো ভালই হ'ল। মনে আছে তো হাজার হাজার মানুষে গোরু ছাগল ভেড়ার অপঘাত মৃত্যু? কত যে নৌকো আর স্টীমার ডুবেছিল--ওঃ! মনে করতেও ভয় হয়। বড় বড় গাছ সব ভেঙে পড়েছিল। ঝড়ের শব্দ গাছপালার দেশে কেমন যেন একটা করুণ কান্নার মতো শোনায়। ঘুরে ঘুরে ঘূর্ণিবায়ুর সাইক্লোন। প্রবল বৃষ্টি সেদিন সেই ঝড়ের সঙ্গে পাগলের মতো নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল। প্রকৃতির রাজ্যে মশায়, এমন বিরাট হাহাকার আমি এর আগে আর দেখিনি।

শুনুন, বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনুন, নইলে আমার বলার উৎসাহ থাকবে না।

আমি বললাম, প্রত্যেকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছি, আপনি ব'লে যান।

শুনুন আমি আগেই টিকিট কিনেছিলাম কারণ তা নইলে ওয়েটিং রুমে বসবার অধিকার পেতাম না। ব'সে আছি সম্পূর্ণ একা। রাত বাড়ছে, তখন দশটা প্রায় বাজে, ঢাকা মেল ট্রেনের কোনো খবর নেই, মানে ঘণ্টা বাজার কোনো লক্ষণই নেই। প্ল্যাটফর্মটা আকাশে খোলা বেরিয়ে আসতে হ'লে ঝড়ের হাতে পড়তে হয়, অতএব অসহায়ের মতো বসে আছি। ঘরে কেরোসিনের যে আলোটি দয়া ক'রে জেলে দিয়ে গেছে স্টেশনের লোকেরা, তার মৃদু আলোয় এবং উগ্র গন্ধে ওয়েটিং রুমের মধ্যে এক ভৌতিক পরিবেশ। রেললাইনের এপারে হোক, ওপারে হোক, সব জায়গাতেই আমার পরিচিত বাড়ি আছে, গেলেই আশ্রয় পাওয়া যায়, অথচ এমন প্রলয় মাথায় নিয়ে ঘরের বাইরে যায় কার সাধ্য! কি ভয়ানক শীত করছে, অথচ সঙ্গে গায়ে দেবার মতো মোটা কোনো চাদর নেই।

ঝড় ক্রমে বেড়েই চলেছে। মনে হচ্ছে যেন সেই ঝড়ে বিধ্বস্ত হাজার হাজার মানুষের আর্তনাদ আমার কানে এসে বাজছে। বুঝতে দেরি হ'ল না যে এমন ঝড়ে ঢাকার স্টীমার গোয়ালন্দ ঘাটে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছবে না। হয়তো বা স্টীমার এতক্ষণ সেই উন্মত্ত পদ্মায় ডুবেই গেছে। মনে হতেই শিউরে উঠলাম। অভিজ্ঞতা ছিল আর এক দুর্যোগের রাত্রির, সে দিন আমি স্টীমারে বসে কাঁপছিলাম। ঝড়ো মেঘে ঢাকা কালো তরল আকাশটা যেন বর্ষার কালো নদীর সঙ্গে এক হয়ে মিশে গিয়েছিল।

মশায়, কল্পনায় মেতেছিলাম—স্টীমার ডুবির কল্পনায়। ভাবছিলাম আজ যদি সত্যিই স্টীমার ডুবে গিয়ে থাকে তবে তো সর্বনাশ! গাড়ি আর আসবে না। সমস্ত রাত এইখানে একা ব'সে কাটাতে হবে। আলোটার আয়ুও যেন ফুরিয়ে আসছে।

এমন সময় মশায়, দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা বাতাস এসে ঘরে ঢুকল। খুব ভাগ্য যে আলোটা নিবু নিবু ক'রেও নিবল না। দমকা বাতাসের সঙ্গে আর প্রবেশ করল একটি বিদ্যুতের রেখা। বিশ্বাস করবেন না মশায়, আমি শপথ ক'রে বলছি আমি স্বপ্ন দেখিনি যা দেখলাম তা স্বপ্নে দেখা যায় না।

আমার সামনে সর্বাঙ্গ ম্যাকিনটশে মোড়া এক নারী। সেই অপ্রত্যাশিত পরিবেশে তাকে হঠাৎ দেবী ব'লে ভুল হয়েছিল। কিংবা হয়তো ভুল হয়নি—ঠিকই দেখেছিলাম। ঘরের মৃদু আলোতে চকিতে তাঁর মুখখানা দেখলাম। কতদিনের আত্মপ্রত্যয় আর সরলতা সে মুখে একটা অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ছাপ এঁকে রেখেছে। বয়স পঁচিশের বেশি হবে না, বাঙালী মেয়ে, অথচ চালচলনে কোনো সঙ্কোচ নেই। আমি স্তম্ভিত, কিছুক্ষণ কথাই ফুটল না মুখে। শেষে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, ঢাকা মেলের প্যাসেনজার?

না, আমার নাম মিস মণ্ডল, আমি এখানকার গীর্জা থেকে এসেছি। সেবা কাজে বেরিয়েছি, অনুমান করলাম এখানে ওয়েটিংরুমে কোনো যাত্রী হয়তো বিপন্ন হয়ে পড়েছেন, একবার দেখা দরকার।

আমি মশায় আরও স্তম্ভিত হলাম একথা শুনে। বললাম, এই সাইক্লোনের দুর্যোগে এলেন কি ক'রে?

সেকথা ভাবিনি।

বলেন কি! না ভাবলেও তার ধাক্কাটা তো লেগেছে গায়ে? কি ভীষণ ঝড় হচ্ছে বাইরে।

তরুণী হেসে বললেন, ঝড়ের সাধ্য কি একটা মানুষকে তার কর্তব্য থেকে সরিয়ে নেয়। ক্রাইমীয়ার মৃতপ্রায় সৈনাদের কান্না শুনে আর এক দিন আর এক তরুণী এর চেয়েও কঠিন বাধা পার হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন সেখানে। আপনি ওসব কিছু ভাববেন না, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি বলুন?

আমি তখন শীতে কাঁপছিলাম। বললাম, এ সময় গরম দুধ খেতে পারলে ভাল হত, অথবা চা। কিন্তু তা তো আর এখন পাওয়া সম্ভব নয়। অগত্যা গায়ে দেবার মতো কিছু পেলে আর কিছু না হলেও চলবে। কিন্তু তাই বা পাওয়া যাবে কোথায়?

আমি ভবতোষবাবুকে বাধা দিয়ে বললাম, আপনি এমন সব অসম্ভব প্রস্তাব করলেন তাঁর কাছে?

ভবতোষবাবু বললেন, তখন সেই মুহূর্তে নিজেকে ভুলে গিয়েছিলাম, অত্যন্ত স্বার্থপর হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু শুনুন। মিস মণ্ডল আমার কথায় একটুখানি ভেবে বললেন, চলুন আমার সঙ্গে, দেখি কোথাও কিছু মেলে কি না।

আমি বললাম, অসম্ভব। বেরোতে পারলে তো আমার চেনা বাড়ি অনেক আছে। যদিও এখনও আছে কিনা বলতে পারি না। কিন্তু বেরোলে যদি গাছ ভেঙে পড়ে মাথায়? কিংবা উড়ে আসা একখানা টিন যদি গলা কেটে বেরিয়ে যায়?

মিস মণ্ডল হেসে বললেন, গাছ যা ভাঙবার সব ভেঙে গেছে, এখন শুধু ঝড় আর বৃষ্টি। শীত করছে, বেশ তো আমার গায়ের কোটটা খুলে দিচ্ছি গায়ে জড়িয়ে নিন।

লজ্জায় সঙ্কোচে মশায় আধমরা হয়ে গেলাম। একজন যুবতীর কাছে আমার ভীরুতা এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করবে ভাবতে পারিনি। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবটাও খুব যে সঙ্গত ছিল তা নয়। একটু যেন অতিরিক্ত সাহস মেয়েটির। প্রাণের ভয়ও নেই? কিন্তু এ সব কথা ভেবে লাভ নেই। আমি একটুখানি কৃত্রিম সাহস ফুটিয়ে একটু জোরের সঙ্গেই বললাম, আমি যাব না, কারণ

আপনাকে এতটা কষ্ট দিয়ে আমি সামান্য একটুখানি সুবিধা ভোগ করতে পারব না। আমার এ সবের এতটা দরকার নেই যাতে তার জন্য আপনাকে মরতে হবে।

আমার কথায় মিস মণ্ডল উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন এবং বললেন ঠিক আছে। বলেই একা বেরিয়ে গেলেন দরজা খুলে। আমি তাঁকে বাধা দিতে যাবার আগেই তিনি ঝড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে এতখানি ছোট ক'রে দিয়ে গেলেন ভেবে আত্মগ্লানিতে মনটা ভরে উঠল। তাঁর হাসির কাছে আমি পরাজিত হলাম।

চার্চের মেয়েরা কি যন্ত্র? খৃষ্টানদের সেবাধর্ম যে এত কঠিন, আর এমন বিপজ্জনক অবস্থাতেও অবিচল থাকে তা কিসের জন্য? ভাবতে লাগলাম। ব্যাপারটা চোখে দেখা ছিল না, তাই আগে অবিশ্বাস্য মনে হ'ত। কিন্তু কোথায় গেলেন তিনি? সব কিছু ভুলে এই প্রশ্নটাই বার বার মনকে উতলা ক'রে তুলতে লাগল। এদিকে সাইক্লোনের বেগ কমার কিছুমাত্র লক্ষণ নেই, এবং মনে হচ্ছে তা যেন ক্রমে বেড়েই চলেছে। বৃষ্টির ছাট একটুখানি যা লেগেছিল তাতেই আমার হাত জমে আসার উপক্রম হয়েছিল। এমন অবস্থায় শুধু রাত্রে নয় দিনেও লক্ষ্মীকোলে ফিরে যেতে পারব কিনা সন্দেহ। এবং কবে যেতে পারব তাও জানি না, কিন্তু একজন যুবতী এই ঝড়ের মধ্যে এত রাত্রে একা বেরিয়ে গেলেন শুধু আমার একটুখানি আরামের জন্য, এ ব্যাপারটি আমাকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত বিচলিত ক'রে তুলল। এখন তিনি কি বস্তু পাবেন এই বিধ্বস্ত শহরে? ভয়ও পেলাম বেশ। যদি তাঁর কোনো বিপদ ঘটে? কিন্তু না, আমার সৌভাগ্য, মিস মণ্ডল আগের মতোই সর্বাঙ্গ ম্যাকিনটশে ঢেকে এসে প্রবেশ করলেন আমার সেই ওয়েটিং রুমে। দেখলাম অসম্ভব সম্ভব করেছেন। একটা ছোট থারমোস ফ্লাস্কে গরম দুধ আর একখানা কম্বল তাঁর কোটের আড়াল থেকে বেরোল।

আমার কিছু বলবার ছিল না। বিনা কথায় তাঁর আদেশ পালন করলাম—দুধ খেলাম এবং কম্বলটি গায়ে জড়িয়ে নিলাম।

মিস মণ্ডলের প্রতি করুণায় মন ভরে উঠল। অবশ্য সেটি একজন ভীরু আর অক্ষম পুরুষের করুণা। তবু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে তাঁর মুখখানা দেখছি। স্নেহকোমল, অথচ দৃঢ় সে মুখখানা। মুখের রঙ ছায়াস্নিগ্ধ, গৌর নয়। নাকও একটুখানি মোটা। চোখ-দুটি আয়ত, চোখের তারা গাঢ় কালো নয়। ঠোঁট পুরু। ভ্রূদুটি ভারী সুন্দর, মনে হয় যেন মেক-আপ পেন্সিলে আঁকা। জীবনের একটা বিশেষ লক্ষ্য স্থির হয়ে গেলে মুখে যে একটা শান্ত ভাব ফুটে ওঠে, গম্ভীর চাপল্যহীন অথচ সরল মধুর এবং নিস্পৃহ, তেমনি সে মুখখানি। দেহটি পাঁচ ফুটের বেশি দীর্ঘ নয়, এবং মাঝারি গড়ন, সব সময় যেন ছুটে চলবার জন্য ব্যস্ত। তবু সব ছাপিয়ে কেমন যেন একটা বেদনাবিদ্ধ চাহনি, সোজা মর্মে এসে লাগে।

ভবতোষবাবু একটুখানি থামলেন। তাঁর দৃষ্টিও উদাস হয়ে এসেছে। খড়্গপুর স্টেশনে তখনও ঝড়ের আঘাত এসে লাগছে ঘুরে ঘুরে। তিনি মিনিট-খানেক চুপ ক'রে থেকে আবার বলতে আরম্ভ করলেন।—

আমি মিস মণ্ডলের দিকে চেয়ে আছি, মুখ ফেরাতে পারছি না। তাঁর প্রতি এতক্ষণে কেমন যেন একটা মমত্ব জেগে উঠেছে। আমার আর কোনো দিকে তখন কোনো খেয়াল নেই। কোথায় ঝড়, কোথায় আর্তনাদ—ওসব তখন আমার ভুল হয়ে গেছে। তখন আমার কাছে একমাত্র সত্য মিস মণ্ডল। তাঁকে আমি অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মিস মণ্ডল, আপনি ঝড়ে বিপন্ন বহু লোককে ফেলে আমাকে কি ক'রে খুঁজে বার করলেন? এ আমার কি সৌভাগ্য! আপনি জানলেন কি ক'রে আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত এই আমি এখানে একা আটকে পড়ে ছটফট করছি?

মিস মণ্ডল একটুখানি ইতস্ততঃ করলেন। তারপর বললেন, সে কথা শোনানোর মধ্যে একটা অহংকার ফুটতে পারে তাই বলতে সংকোচ হয়।

আমি বললাম তবে থাক মিস মণ্ডল, যেটুকু আপনার কাছে পেলাম তারই ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না।

ঋণের কথা থাক ভবতোষবাবু। তবে শুনুন। সেবা আমাদের কর্তব্য। এ কর্তব্য আজ রাতে আমি একা করছি না, রাজবাড়ি গীর্জার অন্তত কুড়ি বাইশ জন সেবিকা মিলে এ কাজ আরম্ভ করেছি, আর আমার ভাগে যে এলাকাটি পড়েছে সে এলাকার সব কাজ সেরে এসেছি আপনার কাছে।

রাজবাড়ি গীর্জায় তো আপনাদের আগে কখনও দেখিনি? এ কথার উত্তরে মিস মণ্ডল বললেন, আমরা মাত্র দু-দিন

হ'ল এখানে এসেছি। আমরা সবাই ঝড়ের আরম্ভ থেকেই কাজ করছি, যে যতটুকু পারি, ক'রে ধন্য হয়েছি। তা হ'লে এধারে আসি?

ভবতোষবাবু আরও একটুখানি থেমে বলতে লাগলেন, বুঝতেই পারলেন মশায়, এ কথায় আমার তখন মনের অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে। সেই ওয়েটিং রুম থেকে মিস মন্ডল যে এমন হঠাৎ চলে যাবেন সে কথাটা এতক্ষণ মনেই আসেনি। যেন একটা সুন্দর সুখস্বপ্ন হঠাৎ ভাঙতে চলল। আমি যে-কোনো সংকটে বুদ্ধিহারা হয়ে পড়ি, তাই তাঁর দিকটি আদৌ না ভেবে ব'লে বসলাম, সে কিছুতে হয় না, মিস মন্ডল। আপনি আমাকে এ অবস্থায় রেখে যেতে পারেন না। দেখছেন তো, বাইরের ঝড় আরও বেড়েই চলেছে?

মিস মন্ডল মৃদু হেসে বললেন, বেশ, আরও কিছুক্ষণ ব'সে যাই, কিন্তু খুব বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হবে না, ভবতোষবাবু।

দুজনেই, মশায়, আমরা চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত। মিস মন্ডলের মনে প্রবেশের আমার কোনো উপায় ছিল না, আমি শুধু আমার মনের কথাটাই বলতে পারি। তাঁর সান্নিধ্য আমার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। মনে করুন মশায়, সেই দুর্যোগের রাতে যখন সমস্ত আকাশ বাতাস পর্যন্ত আর্তনাদ করছে, মানুষের হাহাকার মর্মে এসে বাজছে, যখন কাছের মানুষ আমি মাত্র দু মাইল দূরের রাজবাড়ি স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ব'সে নিজেকে মহাসাগরের দ্বীপে নির্বাসিত মনে করছি, ঠিক সেই মুহূর্তে এমন এক করুণাময়ীর আবির্ভাব, তা যে আমার জীবনেরই এক মহা আবির্ভাব, সে কথাটা তখন আমার সকল সত্তা অনুভব করতে পারছিল। তাই সে দিন যা করেছি তার জন্য আমি আমাকে অবশ্যই ক্ষমা করেছি, সম্ভবত আপনিও করবেন।

আমি মশায়, মিস মন্ডলের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। কিন্তু কি ভাবে সে কথাটা আরম্ভ করব তা ভাবতে একটু দেরি হ'ল। বাইরে থেকে কেউ দেখলে মনে করতে পারত মিস মন্ডলকে আমি অকারণ বসিয়ে রেখেছি। হয়তো তাই। কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে তাঁর সঙ্গে কথা চলছে অবিরাম, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ, সব চেয়ে বড় আত্মীয় যে তিনিই একথা আমার মনের গভীরতম দেশে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে। তাই আমার মনের কাছে এমন একটি অসঙ্গত মুহূর্তে কিছুমাত্র অসঙ্গত বোধ হ'ল না। মনে হ'ল যেন এ ঝড় আর না থামুক, আর এই ঝড়-সমুদ্রের বুকে আমরা দুটি প্রাণী নিতান্তই ভেসে চলি। এমন অবস্থায় মনেই আসে না যে এ স্বপ্ন নিতান্তই একটি বিলাসিতা। তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভুল পথে চলতে লাগলাম।

মশায়, তাঁকে কি বললাম সব শুনুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন আমি যা বলছি তা কত সত্য। আমি মশায়, ঢাকা মেলের প্যাসেনজার হ'তে এসেছি, ঝড়ের জন্য বিপন্ন হয়ে ওয়েটিং রুমে প'ড়ে আছি। রাত বাড়ছে, ঝড় বাড়ছে, এমন সময় স্বর্গের কোনো দেবী সেবিকার মূর্তিতে দেখা দিয়ে আমার দুঃখ দূর করলেন। সেই দেবীকে আমি মুগ্ধাবেশত কি কথা বললাম তা একবার অনুধাবন করুন। মশায়, কৃতজ্ঞতার বদলে তত্ত্বকথা। তাঁকে বললাম, মিস মন্ডল, আপনার বয়স খুব বেশি নয় সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এই বয়সেই মনের সেই জোর আপনি কোথায় পেলেন যার উপর ভরসা ক'রে আপনি এই কঠিন সেবাধর্মকেই জীবনের ব্রত ক'রে তুলতে পেরেছেন?

মিস মন্ডলের ভ্রূকুঞ্চিত হল। বললেন, সে আপনি বুঝবেন না, ভবতোষবাবু।

আমি তাঁর কথার পিঠে কথা যোগ ক'রে বললাম, মনকে কিছু দিনের জন্য জোর ক'রে অনেক কিছু মানানো যায়, কিন্তু মন জিনিসটার কতটুকু পরিচয়ই বা আমরা জানি। আর এ কথাও তো সত্য যে কালের বদলে মনেরও একটা বদল ঘটে। অবশ্য আপনি সে কথা জানেন।

মিস মন্ডল একটুখানি অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলেন। বললেন, না আমাদের মনের বদল হয় না।

না, মিস মন্ডল। আজ যা আপনার কাছে সত্য মনে হচ্ছে কাল তা একেবারে মিথ্যা মনে হ'তে পারে।

মশায় আমি যে হঠাৎ এ প্রসঙ্গ তুললাম, তা আমি তখন কিছুতে বুঝতে পারিনি। যে কথা চলছিল, তার সঙ্গে এর কোনো সঙ্গতিই নেই। বোধ হয় আমার মন ভিতরে ভিতরে অনেক কথা আগেই বলেছে। তাই হঠাৎ মিস মন্ডলকে তাঁর মন-বদলের কথা বলা উচিত হয়নি এবং এ প্রসঙ্গ এ সময়ে কোনো মতেই উঠতে পারে না। বিষয়টা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তবু তো নিজেকে ঠেকাতে পারলাম না। আমি তাঁর নীরবতার সুযোগ নিয়ে বললাম, মনকে যন্ত্র মানানো সব সময় চলে না। হয়তো আপনি শপথে আবদ্ধ। কিন্তু হয়তো এর জন্য একদিন অনুতাপ করবেন।

মিস মন্ডলের চোখে মশায় আগুন জ্বলল। মানুষের সেবার ধর্মটি আজ সত্য, কাল মিথ্যা হয়ে যাবে?

না, তা হয়তো হবে না, কিন্তু সেবাধর্মের নামে শপথ গ্রহণটাও ঠিক মনে হয় না।

আপনি তবে কি বলতে চান?

বলতে চাই যে মনের স্বাভাবিক বিকাশ বন্ধ না ক'রেও এমনভাবে সেবা প্রতিষ্ঠান গড়া চলে যাতে সেবাধর্ম সহজ হয়।

দেখুন ভবতোষবাবু, আমরা শপথ-বন্ধ, আমাদের অন্য কিছু ভাবতে নেই। যাঁরা আমাদের চালাচ্ছেন আপনার কথা তাঁদের কাছে গিয়ে বললে বোধ ভাল হয়। আমাকে কিছু বলবেন না।

আমি বললাম, শপথ তা হ'লে ঠিক। কিন্তু ঐ কথাতেই তো প্রমাণ হয় স্বেচ্ছাব্রত নয় এটা।

স্বেচ্ছায় শপথ-গ্রহণ করেছি। নয় কেন?

আমি বললাম, না, তা হয় না। পিস্তলের মুখে লোকে যেমন আদেশ পালন করে, শপথের মুখেও তেমনি আপনারা আদেশ পালন করছেন। দুইয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

মিস মন্ডল বললেন, আপনার যুক্তিতে ভুল আছে। সৈনারা কড়া নিয়মে চলে বলেই আপনারা যুদ্ধে জেতেন। তারা মনের বিকাশ নিয়ে তত্ত্ব আলোচনায় মাতলে যুদ্ধ করতে পারত না।

মশায়, দেখছেন আমি কেমন ধাপে পড়ে ক্রমে তর্কে ডুবছি। বললাম, ঠিক কথা কিন্তু সেনাগিরির একটা সীমা আছে। তার কাজেরও সীমা আছে। কাজ শেষ হ'লে প্রত্যেক জীবনকে পুরো উপভোগ করতে পারে। কিন্তু আপনাদের কোথায় সীমা?

মশায়, কোথায় মিস মন্ডলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব, তা নয়, ক্রমে তাঁকে শত্রু বানিয়ে চলেছি। মজাটা দেখুন একবার। মনস্তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান থাকলে বিশ্লেষণ করতে থাকুন মনে মনে। নিজেকে মশায়, কোনো মতেই ঠেকানো গেল না। বোধ হয় একটি মেয়ের সামনে হঠাৎ পৌরুষের বৃথা অহংকার জেগে থাকবে। আশ্চর্য মানুষের মন! যিনি নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে এই সর্বনাশা দুর্যোগের মধ্যে আমার জন্য এতখানি অপ্রত্যাশিত আরাম এনে দিলেন তাঁর কাছে পৌরুষ ফলাতে গেলাম আমি! এ জন্য নিজের উপর কি পরিমাণ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম তা আমি কাউকে বোঝাতে পারব না।

আমার মনে বোধ হয় 'একটা দুর্দান্ত রকমের হীনতাবোধ জেগে

থাকবে, কারণ আমার ভীরুতা মিস মণ্ডলের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে অনেক আগেই। ঝড়ের মধ্যে আমি তাঁর সংগে বাইরে বেরোতে রাজি হইনি, অথচ আমার নিজেরই কাজ সেটা। সে জন্যও হয়তো আমার অবচেতন মনে একটা ক্ষোভ ছিল। অথচ আমার মনের চেতন অংশ তখন তাঁর পায়ের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে ধূসর হচ্ছে। মশায়, মানুষের মনের দুটো মোটা ভাগ আছে। একটার সংগে আর একটার বিরোধ চিরকালের। তাই মানুষ যা ভাবে

বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমি আবার নিজেকে ভুলে তাঁকে বললাম, দেখুন যদি কোনো দিন—খুব দূর ভবিষ্যতের কথা আমি বলছি না—ধরুন যদি কালই আপনার হঠাৎ মনে হয় আমি এ কি করছি! এ মিথ্যা, শপথ-বন্ধ সেবাকাজের চাপানো কর্তব্যবোধের সত্যটা শেষ সত্য নয়, যদি মনে হয় এ সব ছেড়ে বিয়ে ক'রে স্বামী সন্তানাদি নিয়ে কোনো এক নিরালায় বাস করব, তখন কি হবে?

আজ যা আপনার কাছে সত্য মনে হচ্ছে কাল তা একেবারে মিথ্যা মনে হতে পারে।

তা সব সময় করতে পারে না। ভিতরে একটা built-in মোটর আছে, সেই তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তার উপর চেতন মনের খুব বেশি হাত নেই। তবু প্রাণপণে নিজেকে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করলাম, ব্রেক কষতে লাগলাম মনের এঞ্জিনের, যদিও স্টিয়ারিংটি ধরা রইল মনের অপর অংশের হাতে।

খড়্গপুর স্টেশনে গাড়ির মধ্যে বসে এ সব বলতে বলতে ভবতোষবাবু ক্রমে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতে লাগলেন। বাইরে ঝড় চলছে অবিরাম। তিনি বলতে লাগলেন, শুনুন সে এক অতি মারাত্মক অবস্থা। আমি মিস মণ্ডলের মনের কোন দুর্বল অংশে আঘাত ক'রে বসেছি অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তা ভেবে সংযত হওয়ার শেষ চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে সে চেষ্টা আমি তাঁকে দেখাতে পারছি না। তাই মিস মণ্ডল যখন সৈন্যদের উপমা দিচ্ছিলেন আমি সে সময় তাঁর যুক্তির ভুল দেখিয়ে দেবার সংগে সংগে তিনি

মিস মণ্ডল হঠাৎ যেন দপ ক'রে জ্বলে উঠলেন, এবং আমাকে কঠিনতম রূঢ় ভাষায় কি যেন বলতে গিয়েই নিজেকে সামলে নিলেন। উত্তেজিত হওয়া সেবিকাদের ধর্ম নয়। কিন্তু তবু তো দেখলাম শপথবন্ধ মন থেকে সে শপথ সরেও যেতে পারে।

বাইরে ঝড় চলছে ভয়াবহ, মশায়, এতক্ষণে আমি যেন আত্মস্থ হলাম। অন্যকে নীতি কথা শোনাচ্ছি, আমি নিজে কটা নীতি মান্য ক'রে চলছি? আমি কৃতঘ্ন হয়ে মিস মণ্ডলকে হারাতে চাই না। তত্ত্বকথা শুনিয়ে তাঁকে আমি দুর্বল ক'রে ফেলতে পারি কিন্তু আমার বন্দিত্বের দুর্ভোগ থেকে যিনি স্বর্গের দেবীর মতো আবির্ভূত হয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছেন তাঁকে মানব জীবনের কর্তব্য শেখানোর আমার কি অধিকার আছে?

আমার মশায় এও এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব! যে মুহূর্তে মিস মণ্ডলের দুর্বলতা আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল সেই মুহূর্তে আমি আমার গ্লানি ভুলে গেলাম। আমি আমার কথার সুর পাল্টে ফেলে অতি অনুনয়ের সুরে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলাম। বললাম, আপনি এই যে আমার কাছে এসেছেন আমার জীবন-দাত্রীরূপে এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য সে আমি জানি। এবং এও আমি বিশ্বাস করি সাধারণ মানুষের সাধ্য নয় এ কাজ। শুধু শপথবন্ধ হলেই এ কাজ করা যায় না। শপথের মধ্যে অনেক ফাঁক থাকে, অনেক ফাঁকির সুযোগ থাকে, এ তার চেয়ে অনেক বড়, এ মানুষের কাজ নয়, তার সাধ্য নয়। আমি আপনাকে দেখে, আপনার সব কিছু দেখেও মনে করতে পারছি না যে আপনি আমাদের জানাশোনা জগতের কেউ, মনে হয় যেন স্থূলদেহী কোনো মানুষ এত বড় দুর্যোগ ঠেলে চলতে পারে না। যেন আপনার আত্মিক শক্তিটাই আপনার সব, যেন আপনি সব-খানিই আত্মা।

মিস মণ্ডলের মন ভিজল এতক্ষণ পরে। তিনি বেদনাবিদ্ধ মৃদু হাসি হেসে বললেন, আমাকে তা হলে কি মনে করেছিলেন এতক্ষণে? বলেই তিনি দেয়ালের দিকে পিছিয়ে দেয়াল হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর আমাকে হতবাক ক'রে তিনি দেয়ালের সংগে মিলিয়ে গেলেন। মশায় শুনছেন? মিস মণ্ডল দেয়ালের সংগে মিলিয়ে গেলেন। তারপর সম্ভবত আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ি।

কি আশ্চর্য ভবতোষবাবু! মিস মণ্ডল দেয়ালের সংগে মিলিয়ে গেলেন? কেমন ক'রে মেলালেন? এমন কথা আগে তো কখনও শুনিনি।

ভবতোষবাবু আসন থেকে উঠে আমাদের কামরার বাথরুমের দরজার পাশে কাঠের দেয়ালের সংগে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে বললেন—ঠিক এইভাবে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, এবং ঠিক এই ভাবে—

তারপর তাঁকে আর কিছু বলতে হল না। দেখলাম কামরার মধ্যে ভবতোষ-বাবু নেই। তিনি কাঠের সংগে মিলিয়ে গেছেন। আমি গিয়ে তেমনি মিলিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। কাঠের দেয়ালে প্রাণপণে পিঠ ঠেলতে লাগলাম, কিছুই হল না।

তখন আমি ধীরে ধীরে কাঁচের জানালা খুলে দিয়ে বাইরের হওয়ায় মিলিয়ে গেলাম।

মার্ক টোয়েন

ডাঃ রবার্ট গিল্‌কি

[অমৃতের জন্য লিখিত বিশেষ প্রবন্ধ]

স্যামুয়েল এল ক্লেমেন্স, যিনি মার্ক টোয়েন এই ছদ্মনামে সুপরিচিত, তাঁর জন্ম হয় ১৮৩৫-এর ৩০শে নভেম্বর আর মৃত্যু হয় ১৯১০-এর ২১শে এপ্রিল। গত ১৯৬০ তাঁর ১২৫তম জন্মদিবস আর ৫০তম মৃত্যু-দিবস উদ্‌যাপিত হল।

আমেরিকার সবচেয়ে বড় রস-রচয়িতা হিসেবে মার্ক টোয়েন প্রধানতঃ "টম সয়ার" আর "হাক্‌ল্‌বেরী ফিন্‌"-এর মত শ্রেষ্ঠ রচনার জন্যে বিখ্যাত। এগুলি আমেরিকার গণতান্ত্রিক জীবনের গভীরে গিয়ে পৌঁছেচে আর পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পাঠকের মনে আনন্দের খোরাক জুগিয়ে এসেছে।

এগুলিকে প্রায়ই ছোটদের বই বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, কারণ এর মধ্যে মিসুরীর হ্যানিবলে লেখকের বাল্য-কালের গ্রাম্য জীবনের অপূর্ব এক ছায়া-পাত হয়েছে। আমেরিকার প্রায় ভৌগোলিক কেন্দ্রে অবস্থিত এই ছোট্ট শহরের সামনে মিসিসিপি নদী মাইল-খানেক চওড়া। এর আশেপাশের প্রেয়ারীর খেত-খামার আর বনজঙ্গল মার্ক টোয়েনের জীবন আর তাঁর রচনার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু একথাও তিনি বলেছেন, "আমি যদি কোনো কোনো সময় নিজেকে ছোট ছেলের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে থাকি ত তার কারণ হল, আমার কাছে এই জীবনের বিশেষ এক ধরণের মাধুর্য আছে, জীবনের অন্য অবস্থার সঙ্গে আমার যে কোন পরিচয় নেই তা নয়।"

লেখক হিসেবে ছাড়াও বিশেষ বিচিত্র তাঁর কর্মজীবন। ছাপাখানার কর্মী, বাষ্পীয় পোতের পাইলট, গৃহ-যুদ্ধের সৈনিক, সোনার খনির সন্ধানী, খবরের কাগজের সাংবাদিক, বৈদেশিক সংবাদদাতা, বক্তা, লেখক, সম্পাদক এবং প্রকাশক—তাঁর এই বহু বিচিত্র কর্মধারা বেশ কয়েকজন লেখকের বেশ কয়েক-খানি বই লেখার মত মালমশলা যোগাতে পারে।

মার্ক টোয়েন
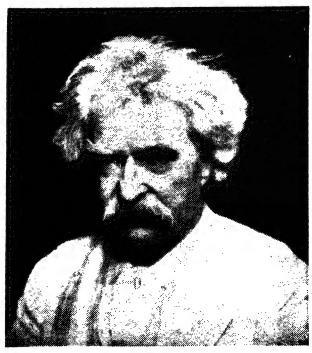
সুদূর পশ্চিমে নেভাদা আর ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে সাংবাদিকতা করবার সময় হাসির গল্পের লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতির সূত্রপাত হয়। খনির ক্যাম্পে শোনা এই রকম একটি গল্প "দি সেলিব্রেটেড জাম্পিং ফ্রগ অব দি ক্যালাভেরাস কান্ট্রি" ১৮৫৬ সালে ছাপা হতেই দেশময় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৬৭ সালে খবরের কাগজের জন্যে লেখা ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণ-কাহিনী, পরে "দি ইনোসেন্টস অ্যাব্রড" বলে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং অসাধারণ জনপ্রিয় হাস্যরসিক বলে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এর পরবর্তী ভ্রমণ-কাহিনী, উপন্যাস, গল্প এবং রচনা-সংকলন সবই প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয় আর অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বেশ পয়সা করে ফেলেন।

এই টাকা তিনি কতকগুলি ব্যবসায়ে লাগালেন। তার মধ্যে তাঁর নিজের এবং অন্যান্য লেখকদের বই প্রকাশের জন্যে একটি প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানও ছিল। বেশ প্রাচুর্যের মধ্যেই তিনি জীবন-যাপন করতেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়নে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। শেষে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বয়স যখন তাঁর ৫৮, তখন দেখা গেল যে, যে সব ব্যবসায়ে তিনি অর্থ নিয়োগ করেন তার কতকগুলি ঠিক সুবিবেচকের মত হয়নি, আর তাঁর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটিও ফেল পড়ল। তাঁর সর্বনাশ হবার উপক্রম হয়; কিন্তু দেউলিয়া হয়ে গা বাঁচাবার বদলে তিনি পৃথিবী পর্যটন করে বক্তৃতা দিতে বেরোন। এতে তিনি তাঁর দেনার প্রতিটি পাই পয়সা শোধ করতে সক্ষম হন।

টোয়েনের এই ভ্রমণ-বিবরণী "ফলোয়িং দি ইকুয়েটর" বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়। এইটি অসংলগ্ন, অতি-সাধারণ এবং তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীগুলির মধ্যে একে সবচেয়ে নিকৃষ্টই বলা যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর মধ্যে তাঁর কতকগুলি সবচেয়ে রোমাণ্টিক এবং সুন্দর স্মৃতিমধুর বর্ণনাময় অংশ রয়েছে। তিনি হনলুলু, ফিজি দ্বীপ-পুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া, সিংহল, ভারতবর্ষ, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লেখা থেকে একটি অংশ তুলে দেওয়া হল। এতে তাঁর শুষ্ক রসবোধ এবং বর্ণনার ক্ষমতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

"পক্ষীকুল চূড়ামণি...... ভারতীয় বায়স"

"......ওর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে পরিচয় আমার বেশ ভালভাবেই ঘটল, আমি একেবারে মোহিত হয়ে পড়লাম। পক্ষধারী প্রাণীদের মধ্যে ওর বরাতটাই বোধহয় সবচেয়ে খারাপ। ও কিন্তু আবার
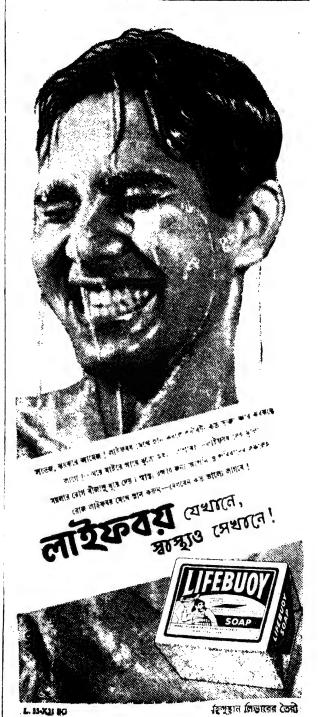
সবচেয়ে খোসমেজাজী—আর আত্ম-তৃপ্তও বটে। আজকে ও যা হয়েছে তা কোন অনবধানতার বশে বা আকস্মিকভাবে হয়ে পড়েনি। উনি একটি শিল্পকর্ম বিশেষ ঃ আর "শিল্পকর্ম হল অনন্ত পারং"; ও হল সেই কোন আদ্যিকালের সৃষ্টি; অনেক হিসেব করে ওকে তৈরী করা হয়েছে; এ রকম পক্ষীর সৃষ্টি এক দিনেতে হয় না। ওর পুনর্জন্মের সংখ্যা শিবঠাকুরের চাইতেও বেশী; আর ওর প্রতিটি জন্মের কিছু না কিছু নমুনা ও সংগ্রহ করে রেখেছে এবং নিজের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছে।

ওর প্রাণী-বিকাশের পদোন্নতির কালে, ওর পরিপূর্ণতা লাভের মহান্ যাত্রাপথে ও ছিল জুয়াড়ী, খেলো ভাঁড়, দুশ্চরিত্র পুরোহিত, খিটখিটে স্ত্রী-লোক, বদমাইস, বিদ্রুপকারী, মিথ্যাবাদী, চোর, চর, গুপ্ত সংবাদদাতা, ব্যবসাদার, রাজনীতিবিদ্, জোচ্চোর, পাকা ভণ্ড, অর্থলোভী, দেশপ্রেমিক সংস্কারক, বক্তা আইনজীবি, ষড়যন্ত্রকারী, বিদ্রোহী, রাজতন্ত্রী, গণতন্ত্রী, সব ভূতে অশ্রদ্ধাকারী ও অশ্রদ্ধার প্রচারক, অনধিকার চর্চাকারী, অনধিকার প্রবেশকারী, বাস্তবাগীশ বিধর্মী আর পাপের জন্যেই পাপের প্রেমিক।

এই সব বেয়াড়া বদখত স্বভাব ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়ে একটি অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ফল দেখা গেল। তা হল ও জানে না দুশ্চিন্তা কাকে বলে, ও জানে না দুঃখ কি, ও জানে না অনুশোচনা কি; ওর জীবন হল এক দীর্ঘ সুখের তীব্র আনন্দ আর পরজন্মে অবিলম্বেই লেখক বা অন্য কিছু হয়ে জন্মে আরো অসহ্যরকম ক্ষমতাশালী হয়ে আরামে থাকতে পারবে জেনে ও নিশ্চিন্তে মৃত্যুমুখে উপস্থিত হতে পারবে।

ওর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোনর ধরণে, পাশের দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলায়, ওর উদ্ধত আর ধূর্তের মত মাঝে মাঝে ঘাড় কাত করার ধরণ দেখে আমেরিকান ব্ল্যাকবার্ডের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু এইখানেই এই তীক্ষ্ম সাদৃশ্যের সমাপ্তি। মাপে ও ব্ল্যাকবার্ডের চাইতে বড় আর ব্ল্যাকবার্ডের ছিমছাম, রোগা, সুন্দর গড়ন বা অমন চমৎকার ঠোঁট ওর নেই। আর ওর ছাই রং-এর মর্চে-পড়া কালো পোশাকের দীনতা, ব্ল্যাকবার্ডের চকচকে পালক আর তার মাঝে মাঝে ব্রোঞ্জের ঝলকের সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই চোখে পড়ে। ব্ল্যাকবার্ড তার হাবভাব আর পোশাক-আসাকে নিখুঁত ভদ্রলোক এবং গোলমাল করে না বলেই আমার বিশ্বাস—খালি যখন গাছের ওপর ধর্মানুষ্ঠান বা রাজনৈতিক সভা করে তখন ছাড়া; কিন্তু এই ভারতীয় ভণ্ড কোয়েকার হচ্ছে স্রেফ একটি হামলাবাজ। যতক্ষণ জেগে আছে ততক্ষণ হল্লা করছে, সর্বদা ইয়ারকি মারছে, ধমকাচ্ছে, হাসছে, হৈহৈ করছে, গালাগালি করছে—কিছু-না-কিছু নিয়ে লেগেই রয়েছে।

সব তাতে এ রকম ফোড়ন-দেওয়া স্বভাব আমি কোন পাখীর দেখিনি। কিছুই তার নজর এড়ায় না। যা কিছু ঘটছে সবের উপরেই তার দৃষ্টি, আর তার ওপর ওর মতামত দেওয়া চাই-ই; বিশেষ করে বিষয়টার সঙ্গে যদি ওর কোন সম্পর্ক না থাকে। আর মতটা তার মোটেই মৃদু নয়, সর্বদাই বেশ জোরালো—জোরালো আর অশ্লীল...... মহিলাদের উপস্থিতিতে ওর কিছু আসে যায় না। ওর মতামত কোন চিন্তাপ্রসূত নয়, কারণ কোন বিষয়ে ও চিন্তাই করে না। সবচেয়ে আগে যে কথাটা মনে হয় সেটাই ও বলে বসে। আর প্রায়ই সেটা এমন একটি মত, বিষয়-বস্তুর সঙ্গে যার মোটেই খাপ খায় না। কিন্তু ওই হল ওর ধরণ, ওর প্রধান চিন্তা হল একটি মত দিয়ে ফেলা—ভাববার জন্যে থামলে যে সুযোগটা যাবে।

......যদি বারান্দার এক কোণে বসি ত কাকগুলো অন্যদিকের রেলিংয়ে জড়ো হয়ে আমার সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে, আর একটু একটু করে এগোতে থাকে, যতক্ষণ না আমার প্রায় নাগালের মধ্যে এসে পড়ে। অত্যন্ত নির্লজ্জের মত সেখানে বসে ওরা আমার পোশাক, আমার চুল, আমার রং আর সম্ভবত আমার চরিত্র আর কাজ আর রাজনীতি, কেমন করে আমি ভারতবর্ষে এলাম, কিই-বা এতদিন করছিলাম, আর কি করে এতদিন ফাঁসিকাঠ এড়িয়ে আছি এবং ফাঁসিটা সম্ভবত কবে হবে, আর যেখান থেকে আমি আসছি সেখানে আমার মত আরো সব লোক আছে কি না, আর তাদেরইবা ফাঁসিটা কবে হচ্ছে—এই সব নানা বিষয় নিয়ে একঘেয়ে বকর বকর চালাতে থাকে। শেষে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি যখন আমার একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে তখন ওদের দূর করে দিই। ওরা খানিকক্ষণ শূন্যে গোল হয়ে ঘোরে, হাসতে হাসতে দুয়ো দেয়; বিদ্রূপ করে; আর দেখতে না দেখতে রেলিংয়ের ওপর বসে আবার গোড়া থেকে শুরু করে।

খাবার থাকলে ওরা বেশ সামাজিকতা রক্ষা করে চলে—অসহ্য রকমের সামাজিকতা। একটু উৎসাহ পেলেই ওরা আমার প্রাতরাশে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে; একবার আমি যখন অন্যঘরে ছিলাম আর ওরা দেখলে যে ওরা বেশ একা আছে, তখন যা কিছু ওঠান যায় তাই নিয়ে সরে পড়ল, আর যে সব জিনিসে ওদের কোন প্রয়োজন নেই সেগুলোই বিশেষ করে নিয়ে গেল।

ভারতবর্ষে ওদের সংখ্যা হিসেবের বাইরে আর ওদের গোলমালও সেই রকম। আমার মনে হয় সরকারের চেয়েও বেশী টাকা ওদের জন্যে দেশের খরচ হয়। ব্যাপারটা তাই মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। তবু ওরা কিছু দেয়ও; ওদের সঙ্গ দেয়, ওদের আনন্দময় কন্ঠস্বর বন্ধ হলে যে গোটা দেশটাই বিষণ্ন হয়ে পড়বে।" ('ফলোয়িং দি ইকুয়েটর' থেকে)।

অধিকাংশ পাঠকের কাছেই টোয়েনের প্রধান আকর্ষণ হল তাঁর রসবোধ। এ ধরণের রস বিদেশীদের কাছে সর্বদা সহজবোধ্য নয়, কারণ এর সৃষ্টি দেশের মাটিতে, আমেরিকার চতুঃসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ ধরণের রসিকতা হল গণতান্ত্রিক জনসাধারণের একান্ত বৈশিষ্ট্য আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিথ্যা ভান আর ঝুটো আভিজাত্যবোধ যাকে আমেরিকানরা বলে "প্রিসি ম্যানারস" তারই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত। এর চরম এবং যুক্তিসঙ্গত সীমা হল "প্র্যাকটিকাল জোক"-এ, যাতে সর্বদাই এই ভণ্ড ব্যক্তিটিকে তাক থেকে পেড়ে এনে শোধনকারী বিদ্রূপ ছিটিয়ে সাম্ করা হয়।

পশ্চিমাঞ্চলের 'লম্বা চওড়া গালগল্পকে'ও টোয়েন অতি সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন। এ সব গল্পে অসম্ভব অতিশয়োক্তির সঙ্গে অতিরিক্ত মিতভাষণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ধরণের রসিকতা যে রকম প্রাণখোলা আর কতকটা ছেলেমানুষী হাসির উদ্রেক করে তার জন্যেই মার্ক টোয়েনের সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী নিউ ইংল্যাণ্ডের গুরু-গম্ভীর লেখকদের তফাত আর এই জন্যে আজও তিনি আমেরিকার লেখকদের প্রতিভূ।

কিন্তু মার্ক টোয়েনের সব লেখাই হাসির নয়, আর তাঁর সব রসিকতাও একই ধরণের নয়। পরিহাসের অনেকটাই কেবল অপরের প্রতি নয় তাঁর নিজের প্রতিও প্রযুক্ত হয়েছে। তার কারণ তিনি "হতচ্ছাড়া মানুষ জাত"টার মত নিজের খর্বতা সম্বন্ধেও তীব্রভাবেই সচেতন ছিলেন। গত ৪০ বছর ধরে তাঁর লেখা এবং ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমেরিকান সমালোচকেরা যে বিশ্লেষণ এবং নবমূল্যায়ন করে চলেছেন তাতে তাঁর পরিহাস-প্রবণতাকে খর্ব করে সমাজ-সংস্কার ও দার্শনিক নৈরাশ্যবাদকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। তাঁর প্রথম বই "ইনোসেন্টস্ অ্যাব্রড"-এই তাঁর নৈরাশ্যবাদের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সেটি ক্রমে বাড়তে বাড়তে তাঁর বিদ্রুপাত্মক উপন্যাস "গিল্ডেড এজ"এ (গোল্ডেন নয়) প্রকট হয়ে ওঠে, আর তার চূড়ান্ত সাক্ষাৎ মেলে

তাঁর "অটোবায়োগ্রাফি"তে এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত দুটি ছোটগল্প, "দি ম্যান দ্যাট করাপ্টেড হ্যাডলিবার্গ" আর 'দি মিস্টিরিয়াস স্ট্রেঞ্জার'এ।

টোয়েনের মন ক্রমান্বয়ে অতিরিক্ত উচ্চ আশাবাদ ও গভীর নৈরাশ্যবাদের মধ্যে দুলত। তাঁর দুই মেয়ে আর স্ত্রীর করুণ মৃত্যুতে এই ঝোঁক আরো তীব্রভাবে বেড়ে ওঠে। এছাড়া যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে সভ্যতার নৈতিক খর্বতা দেখেও তিনি ক্রমেই ক্রুদ্ধ আর হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের দাসপ্রথা, বিদেশে উপনিবেশবাদ এবং যেখানেই মানুষ মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে সেখানেই তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করে গিয়েছেন।

টোয়েনের প্রধান অস্ত্র অবশ্য বিতর্কমূলক ইস্তাহার বা নীতিমূলক রচনা নয়, সেটি ছিল বিদ্রূপাত্মক পরিহাস।

উদাহরণ স্বরূপ 'হাকলবেরী ফিন'এ, যেটিকে ওপর ওপর কেবল ছেলেদের অ্যাডভেঞ্চারের বই বলে মনে হয়, তার মধ্যে টম যেখানে তার পিসীকে একটা স্টীমবোট দুর্ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে, সেখানে দাসত্বপ্রথাজনিত মূর্খতার এই রকম তীক্ষ্ণ উদাহরণ স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

"হা ভগবান! কেউ জখম হল নাকি?"

"নাঃ, খালি একটা নিগার মারা গেছে মাত্র।"

"তবু রক্ষে; কখনো কখনো মানুষে জখমও ত হয়।"

এ ধরণের লেখায়, রসিকতার আড়ালে কেবল যে সোজা সরল চিন্তাধারার উদাহরণ মেলে তাই নয়, যে আপাত সরলতা তাঁর সমস্ত লেখাতেই বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে—এমন কি তাঁর সবচেয়ে রোমান্টিক আর বর্ণনাময় অংশগুলিকেও—সেটিরও সাক্ষাৎ মেলে। টোয়েনই হলেন প্রথম আমেরিকান লেখক যিনি ইংরিজি সাহিত্যের প্রচণ্ড প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন। তিনি যে রকম ধীরস্থির গল্প করার ভঙ্গিতে আমেরিকান জীবনধারা সম্বন্ধে লিখে গিয়েছেন তার সঙ্গে তাঁর সমকালীন লেখকদের অনুকরণপ্রিয় তিষ্যকভঙ্গিম গদ্যের সাদৃশ্য সামান্যই মেলে।

বোধহয় ওয়াল্ট হুইটম্যানের চেয়েও তাঁর প্রভাব বেশী এবং তাঁর চেয়ে তিনি প্রিয় ত বটেই। তিনি গোড়ারদিকের আমেরিকান গণতন্ত্রের একজন খাঁটি প্রতিনিধি। তাঁর বন্ধু উইলিয়াম ডীন হাওয়েলসের কথায় "আমাদের সাহিত্যের লিঙ্কন"। আর যিনি তাঁর কাছে অনেকখানি ঋণী, সেই আর্নেস্ট হেমিংওয়ে যে অতিশয়োক্তিটুকু করেছেন সেটিও ক্ষমার যোগ্য, 'সমস্ত আমেরিকান সাহিত্য আসছে মার্ক টোয়েনের একখানি মাত্র বই থেকে, সেটি "হাকলবেরি ফিন"। এটি আমাদের শ্রেষ্ঠতম বই। সব আমেরিকান রচনারই শুরু হল এইখান থেকে। এর আগে কিছু ছিল না, পরেও এত সুন্দর কিছু হয়নি।"

মার্ক টোয়েন সুভাষিতাবলী :

শিক্ষা—

কোন অভিজ্ঞতা থেকে যেন কেবলমাত্র জ্ঞানটুকুই আহরণ করি—এবং সেখানেই ক্ষান্ত হই; নইলে ব্যাপারটা বেড়ালের গরম স্টোভের ঢাকনার ওপর বসার মত হবে। জীবনে ও আর গরম ঢাকনার ওপর বসবে না—ভাল কথা; কিন্তু ঠাণ্ডা ঢাকনার ওপরেও আর কখনো বসতে চাইবে না।

মূর্খদের ধন্যবাদ। তারা না থাকলে বাকী এই আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারতাম না।

সত্য—

সদা সত্য কথা কহিবে। বেশীর ভাগ লোকেই তাতে অবাক হবে আর বাদবাকীরা তৃপ্ত হবে।

বেড়াল আর মিথ্যেকথার মধ্যে সব চাইতে অদ্ভুত প্রভেদ হল যে বেড়ালের প্রাণ নয় গণ্ডা।

সত্য আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি। একটু হিসেব করে খরচ করি।

সাম্রাজ্যবাদ—

বাইবেলে ইংরেজদের উল্লেখ আছেঃ "শান্তশিষ্টেরা ধন্য কারণ তাহারাই জগতের অধিকারী হইবে।"

রাশিয়ার সর্বময় কর্তা পৃথিবীর যে কোন লোকের চেয়ে বেশী ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু একটা হাঁচি আটকাবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

দুনিয়ায় অনেক মজার জিনিস আছে; তার মধ্যে একটা হল শ্বেতাঙ্গদের ধারণা তারা অন্যান্য অসভ্যদের চাইতে কম অসভ্য।

কৃতজ্ঞতা—

অনশনক্লিষ্ট কোন কুকুরকে খাইয়েদাইয়ে মানুষ করলে কামড়ে দেয় না। মানুষ আর কুকুরের মধ্যে ওইটুকুই তফাত।

সাংবাদিকতা—

পৃথিবীর আর সব খবরের কাগজের মতই ইংরিজি খবরের কাগজের একটি মাত্র কাজ। কতকগুলি বিষয়ের ওপর জনসাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা আর অন্য কতকগুলির ওপর থেকে প্রাণপণে দৃষ্টি সরিয়ে রাখা।

বিনয়—

মানুষই একমাত্র প্রাণী যে লজ্জিত হয়। কিংবা তার প্রয়োজন হয়।

বন্ধুত্ব—

মর্মান্তিক আঘাত দিবার জন্যে একজন শত্রু আর একটি বন্ধুর একত্রে কাজ করা দরকার। গালাগাল করবার জন্যে একজন আর সেই খবরটি এনে দেবার জন্যে আর একজন।

ধূমপান—

আমি নিয়ম করেছি কখনো একসঙ্গে একটার বেশী সিগার খাবো না।

পঁচিশ বছরের শিশু, যাদের অভিজ্ঞতা হল সাত বছরের, তারা কিনা শেখায় কোন সিগারটা ভাল আর কোনটাই বা মন্দ বোঝাতে চায়; আমি, যে লোকটা কোনদিন তামাক খেতে শেখেনি কিন্তু সর্বদাই খেয়ে গিয়েছে, আমি যে কিনা পৃথিবীতে এসেই তামাক চেয়েছি।

নীতি—

সৎ উদাহরণের মত অসহ্য জিনিস অল্পই আছে।

ভালবাসা পাবার জন্যে মানুষ অনেক কিছু করে, আর লোকের হিংসে জন্মাবার জন্যে সব কিছু করে।

রাগ—

রাগ হলে চার অবধি গুনবে, খুব রাগ হলে গালাগাল করবে।

হাস্যরস—

যা কিছু মানবিক তাই বড় করুণ। হাস্যরসের গোপন উৎস আনন্দ নয় দুঃখ। স্বর্গে কোন হাস্যরস নেই।

অনুবাদ : ধ্রুবজ্যোতি সেন

॥ সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প ॥

(১)

মাননীয় সম্পাদক সমীপেষু,

'অমৃত' বার্ষিক সংখ্যায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সাম্প্রতিক বাংলা ছোট গল্প' প্রবন্ধটি পড়লাম। পড়লাম শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মিহির আচার্যের মতামত দুটিও। এ সম্বন্ধে আমার কিছু পৃথক বক্তব্য আছে।

সরোজবাবু প্রবন্ধের নামকরণে দ্বিধায় ফেলেছেন প্রথমেই, কারণ 'সাম্প্রতিক গল্প' বলতে 'সাম্প্রতিক কালে লিখিত যে গল্প', অথবা 'বাংলা গল্প সাম্প্রতিক যে বিশেষ রূপ নিয়েছে, সেই ধরণের গল্প'—এর কোনটি বোঝা যাবে। প্রবন্ধ পাঠে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই তিনি গ্রহণ করেছেন মনে হল।

সরোজবাবু আবারও দ্বিধায় ফেলেছেন বিমল কর, সন্তোষ ঘোষ, দীপেন বন্দ্যোঃ, দেবেশ রায়ের নাম একই সঙ্গে লিখে। কারণ দীপেন্দ্রনাথ, দেবেশ রায় যে লেখকদলের অন্তর্ভুক্ত, 'সাম্প্রতিক' গুণোবিশিষ্ট বস্তুতঃ তাঁরাই। এই গুণগুলি বিমল কর প্রমুখের সাধনার কিঞ্চিৎ ফলশ্রুতি হলেও, তাঁদের 'সাম্প্রতিক' বলে চিহ্নিত করা যায় না। নিঃসন্দেহেই বলা যায় কি প্রসঙ্গ, কি প্রকরণে, 'নবীন' লেখকেরা 'বিমল জ্যোতিরিন্দ্র সন্তোষ' যুগও পেরিয়ে এসেছেন।

'সাম্প্রতিক' গল্পের উৎস-সন্ধান প্রসঙ্গে বিমল করকে নিয়ে আরও সুষ্ঠু এবং গভীর আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল। তা না করলে সাম্প্রতিকদের স্বরূপ নির্ণয়ে ত্রুটি ঘটাই সম্ভব। বিমল কর প্রসঙ্গে শম্ভুবাবু যে মন্তব্য করেছেন তা বিস্ময়কর। 'নকল বিদেশীয়ানা' বা 'বিদেশী প্রভাব' তিনি দেখলেন কোথায়? অমনোযোগ কিংবা দৃষ্টিবিভ্রমের ফলেই এরকম ভ্রান্ত ধারণা করেছেন তিনি। কারণ প্রসঙ্গ-প্রকরণে, ভাষা ব্যবহারে বা মেজাজে বিমল কর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ যুগে বাংলা গল্পের তিনিই শ্রেষ্ঠ রূপকার। ফলে স্বভাবতঃই সাম্প্রতিকদের পক্ষে তাঁর প্রভাব একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। সন্তোষ ঘোষ প্রসঙ্গে শম্ভুবাবুর একই মন্তব্য আরও হাস্যকর।

সাম্প্রতিক লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে বিস্তর। শম্ভুবাবু এবং মিহিরবাবুর মতামত দুটিই যার প্রমাণ। সরোজবাবুও কিছু কিছু অভিযোগকে স্বীকার করেছেন। অভিযোগগুলির মধ্যে প্রধান হল—জীবনবিমুখতা, নেতিবাচক মনোভাব, অভিজ্ঞতার অভাব, সমাজ-চেতনাহীনতা, ভঙ্গীসর্বস্বতা, ইচ্ছাকৃত দুর্বোধ্যতা প্রভৃতি।

আমার প্রশ্ন, এই অভিযোগগুলির বাস্তব ভিত্তি কতটুকু? এই যুগে যাঁরা গল্প লিখেছেন, তাঁরা এ যুগকে অস্বীকার করতে পারেন না। এ যুগে মানুষ অনেক বেশী জটিল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক

এবং অসহায়। সমাজে অবক্ষয়, নৈরাশ্য, স্বার্থপরতা। লেখকের চৈতন্য-জগতে স্বাভাবিকভাবেই অনেক কুটিল প্রশ্নের ভিড়। ফলতঃ লেখকদের বক্তব্যও ভিন্ন এবং জটিল। এই প্রসঙ্গের উপযুক্ত প্রকরণের তাগিদ অনুভব করেছেন তাঁরা। নতুন রীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাফল্য যেমন এসেছে, ব্যর্থতাও এসেছে তেমনই। এই ব্যর্থ ফসলের ওপর দৃষ্টি রেখেই উপরোক্ত অভিযোগগুলি আনা হয়েছে। সরোজবাবু দীপেন-দেবেশের নাম করেছেন। এঁরা দুজনই শক্তিমান লেখক, কিন্তু 'সাম্প্রতিকদের' একমাত্র মুখপাত্র এঁরা নন। আরও এমন অনেকের নামই অনুচ্চারিত রয়ে গেছে, যাঁদের আলোচনা ভিন্ন সাম্প্রতিক গল্পের স্বরূপ-নির্ণয় বা মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে আমি নাম করতে চাই প্রবোধবন্ধু অধিকারীর 'অন্য গ্রহ নকল নক্ষত্র', বরেনের 'কাল-বেলা, রাজায় রাজায়', কল্যাণশ্রীর খোকন—তুমি ও সে, জ্বালা। সোমনাথের 'দুর্ঘটনার পর', মিহির গুপ্তের 'সাদা পায়রা', শীর্ষেন্দুর 'ঘরে ফেরার দিন' প্রভৃতির, যেগুলির দিকে তাকালে অপরের অভিযোগগুলি কত ভিত্তিহীন মনে হয়। এই গল্পগুলিতে যে গভীর জীবনবোধ, যে দার্শনিক প্রত্যয়, সমাজ ও সময় সম্পর্কে যে সচেতনতা তা অস্বীকার করা যায় কি ভাবে? সরোজবাবু 'দুর্বোধ্যতার চূড়া' বলে অভিহিত করেছেন যে গল্প-দুটিকে, সেই 'নাসত্য এবং অনাম্য'ও কি বক্তব্যহীন বা ভঙ্গীসর্বস্ব? 'বিজনের রক্তমাংস' নামকরণে তিনি নাস্তিকতা দেখলেন কেন? রক্তমাংসের একটা মানুষকেই নায়ক করেছেন সন্দীপন, যে নায়ক অবক্ষয়ের প্রতিনিধি নয়—অবক্ষয় যার সমাজে। অসুস্থ যার পরিবেশ। গল্পে পতিতালয় এসেছে প্রায় প্রতীকী-রূপে। বিজনের সংগ্রাম, জীবনের প্রতি তার গভীর আগ্রহ গল্পের উপসংহারে যে বলিষ্ঠ ইঙ্গিত—সরোজবাবুর চোখ সেগুলি এড়িয়ে গেল কি করে? মিহির-বাবু পৌনঃপুনিকতার অভিযোগ এনেছেন, কারণ তিনি ভুলে গেছেন বা তাঁর নজরে পড়েনি, অপ্রয়োজনে এঁরা একটি লাইনও লেখেন না এবং চিত্রধর্মী এঁদের লেখা।

মিহিরবাবু সার্ত, কেমু, মোরাভিয়ার উল্লেখ করেছেন, তাঁদের লেখায় জীবন-বোধে গভীর সংগ্রামী মনোভাব দেখেছেন। কিন্তু তিনি দেখলেন না প্রবোধ-বন্ধুর 'প্রজাপতির রঙ, চতুষ্কোণ'। দেখলেন না দীপেনের 'স্বয়ম্বর সভা', দেবেশের 'পায়ে পায়ে', কল্যাণশ্রীর 'নির্বেদ', অজয় দাশগুপ্তের 'যন্ত্রণা থেকে', 'ছক', মিহির গুপ্তের 'তুমি,—শ্রীমঙ্গলাচরণ সর্বাধিকারী' প্রভৃতি। আশ্চর্য! এই প্রসঙ্গে মিহিরবাবু 'রাজলক্ষ্মী দেবী, খগেন্দ্র দত্ত' প্রমুখের নাম করে বেশ চমক দিয়েছেন। কিন্তু সেটা মিথ্যা।

সাম্প্রতিকদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ—তার সবগুলি হয়ত মিথ্যা নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দু-একটি ব্যর্থতার উদাহরণের উপরই তার ভিত্তি এবং আমার সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ 'জীবনবিমুখতা' এবং 'ভঙ্গীসর্বস্বতা'র অভিযোগের বিরুদ্ধে। সাম্প্রতিক লেখকদের শক্তিতে আমিও আস্থাশীল এবং এঁদের ছোটগল্পের একজন নিয়মিত পাঠক।

—ইতি ভবদীয়
শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য।
কলিকাতা।

(২)

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

ছোটগল্পকে নতুন রূপদানের প্রচেষ্টা কিছুদিন হল শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দিক হ'তে নানা প্রশ্ন উঠিতে হ'চ্ছে। সংশয় সন্দেহ প্রকাশ করছেন নানা জনে। ছোটগল্পের রূপ-গুণে ও প্রকৃতিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছুদূর এগিয়েছে মাত্র—একটি পূর্ণ রূপ পেতে এখনও অনেক দেরী। এই নবায়ণ প্রচেষ্টায় যে বিভিন্নতা, যে অস্পষ্টতা এবং যে অব্যবস্থিতচিত্ততা—তার দিকে দৃষ্টিপাত করে যে-কোন আগ্রহী ও সংবেদনশীল হৃদয়ের পক্ষেই কোন-না-কোন প্রশ্নে মুখর হ'য়ে ওঠা স্বাভাবিক। হ'য়েছেও তাই। মিহির আচার্য মহাশয় এতদ্বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পেশকালে আধুনিক ছোটগল্পের ভঙ্গিসর্বস্বতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ এবং, আমার মনে হয়, আলোচনা-সাপেক্ষ। ভঙ্গি কি? ছোট-গল্প বা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার সঙ্গে এর সম্পর্কই বা কি? বক্তব্য-বিশিষ্ট ভাবে ভঙ্গি-চর্চা কি সম্ভব? বিদগ্ধ সমালোচক হাডসন (Hudson)-এর মতে ভঙ্গি হ'চ্ছে লেখকের বিশিষ্টতারই সূচক—তাঁর স্বতন্ত্র 'ব্যক্তি-আমি'রই অভিব্যঞ্জনা (Index of his personality)। Hudson বলেছেন:

'The choice of the words, the turn of the phrases, the structure of the sentences, their peculiar rhythm and cadence — these all are curiously instinct with the individuality of the writer.' লেখক মাত্রেরই প্রতিভার স্বকীয়তাহেতু একটি বৈশিষ্ট্য আছে; বক্তব্যের সমতা যত তীক্ষ্ণই হোক না কেন—তথাপি এক-জনের রচনার সামগ্রিক গ্রন্থন-শৈলী, বক্তব্য—বিন্যাস-নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ

পরে ... No one else would have put it just in that way'. সুতরাং, ভঙ্গি (style) যে ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক— এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ভঙ্গি কখনও বক্তব্যকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। বক্তব্য-নিরপেক্ষও হতে পারে না। অতি-সাম্প্রতিক ছোটগল্পকারগণের সম্বন্ধে বক্তব্য-নিরপেক্ষ নিছক ভঙ্গিসর্বস্বতার অভিযোগই সাধারণতঃ উত্থিত হয়ে থাকে। 'কি লিখব' এ-প্রশ্নকে মনের গহনে নির্বাসিত করে 'কেমন করে লিখব'—এই প্রশ্নের সমাধানেই গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এর কারণ কি? আমার মনে হয়, জীবন-দর্শনের স্বল্পতা, অভিজ্ঞতার অপ্রাচুর্য, অনান্তরিকতা ইত্যাদিই এর জন্য অংশতঃ দায়ী। Hudson যাকে "......Deep and lasting human Significance" বলেছেন—সেই প্রখর জীবন-রূপ এখানে কোথায়? লেখকগণ ছোটখাট—অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। কোথায় দেওয়ালে ঝুল, একটা টিকটিকি কি মাকড়শা—এসব এ'দের দৃষ্টি এড়ায় না। অথচ, বৃহত্তর জীবনসত্যেরই কোন অনুরণন অনুভূত হয় না এ'দের রচনায়। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে যে তথ্যানুগত্য ও আপাত-বাস্তবতা উপস্থিত জীবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় তার কতটুকু মূল্য? ভঙ্গি-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকেও আমরা উচ্চ-কণ্ঠ হয়ে উঠতে দেখেছি বহুবার। 'শুধু ভঙ্গি দিয়ে' চোখ ভোলানর 'নকল সৌখীন মজদুরী' যে সাহিত্যে অক্ষমণীয় তিনি তা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন বহুবার। কাম্যু, সার্ত্র, দোপাশা, আগাথা ক্রিস্টি প্রত্যেকেই আপন স্বতন্ত্র ভঙ্গি-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বটে এবং সেটা তাঁদের সামগ্রিক সাহিত্য-প্রচেষ্টার মধ্যে আবিষ্কার করাও দুঃসাধ্য নয়—কিন্তু এ-ভঙ্গি তাঁদের ব্যক্তিত্বেরই অঙ্গীভূত। বক্তব্য-নিরপেক্ষ স্থূল ভঙ্গি-চর্চা নয়।

অতিমাত্রিক মন্ময়তা অতি-সাম্প্রতিক ছোটগল্পের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বস্তুজগৎ (objective world) আশ্রয় করে নাটকীয় গতি সঞ্চারের মাধ্যমে গল্প রচনার যে প্রচলিত রীতি—সম্প্রতিক ছোটগল্পকারগণ সেই চিরাচরিত রীতি অনুসরণ না করে একান্ত মনোজগৎ-নির্ভর (subjective) ছোটগল্প রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই মানসিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়া-কলাপ, এই গভীর একান্ত অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব-সংঘাত-এর বহির্জাগতিক স্থূল কারণটি প্রায়শঃই অননুমেয়—ফলে, স্বল্পায়াস-সম্ভব সাহিত্যানন্দ লাভেই যাঁদের প্রবণতা—সেই বৃহত্তর পাঠকসমাজই এই ছোটগল্পের রস গ্রহণে অপারগ হ'য়ে উঠেছেন। অতিমাত্রিক abstraction ছোটগল্পকে কিছুটা দুর্বোধ্যই করে তুলেছে! অনেকেই বলছেন—আধুনিক ছোটগল্প গল্পই নয়। এক জাতীয় অব্যবস্থিতচিত্ত জীবনানভিজ্ঞ লেখকগোষ্ঠীর উদ্ভট কল্পনাবিলাস! এ-জাতীয় উগ্র রক্ষণশীলতার কথা বাদ দিয়েও আমরা বলতে পারি—অতি-সাম্প্রতিক ছোটগল্পে যে দিকপরিবর্তন তা' খুব সহজগ্রাহ্য নয়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য এবং রাজলক্ষ্মী দেবী প্রমুখ লেখক-লেখিকাগণের মধ্যে (নামের তালিকা অপ্রয়োজনীয় বোধে দীর্ঘ করব না) যে জীবন-নিষ্ঠা দেখেছি, জীবনের যে বর্ণময় রূপ লক্ষ্য করেছি এ'দের ছোটগল্পের মধ্যে, প্রবোধবন্ধু অধিকারী প্রমুখ কতিপয় লেখক-শ্রেণীর ধোঁয়া-ধোঁয়া অস্পষ্ট রচনার মধ্যে তা' লক্ষ্য করিনি। জীবন-বিমুখ এ'রা কেউই নন হয়ত, তবে, জীবন-পর্যবেক্ষণে এ'দের তারতম্য প্রচুর—অথচ বলতে গেলে, 'অতিসাম্প্রতিক' আখ্যাভুক্ত লেখক-শ্রেণীর সাধারণ ভঙ্গি-বৈশিষ্ট্য ও বক্তব্য-বিন্যাস-শৈলী এ'দের সকলের রচনারই মোটামুটি উপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অক্ষম আধুনিক ছোটগল্পকারগণের রচনার মধ্যে ভঙ্গিগত উগ্র সাধর্ম্য হেতু তাঁদের 'ব্যক্তি-আমি'-কেই উপলব্ধি করা যায় না। চিনে ওঠা যায় না কোন গল্পের রচনাকার কে।

তবে, হতাশ হবার কারণ নেই। এও এক শ্রেণীর সাহিত্যিক নব-জাগৃতি। নতুন যুগের নব-মূল্যবোধ। সৃজন-যুগের অস্পষ্টতার অন্ধকার, অব্যবস্থিতচিত্ততা, দুর্বোধ্যতা—এ থাকবে না, থাকবার নয়। আজকের এ-রীতি এ-বৈশিষ্ট্য অনুশীলনের মাধ্যমে সামগ্রিক প্রস্ফুটনের সুযোগ পেলে অদূর-ভবিষ্যতেই আপন রূপ-লাবণ্য ও বর্ণ-সুষমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেই।

বিনীত—
শংকর চক্রবর্তী,
মধ্যমগ্রাম।

(৩)

বিনয়পূর্বক নিবেদন,

আপনার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় 'সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প' শীর্ষক রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন' গল্পপ্রসঙ্গে 'বিজনের রক্তমাংস' নামক গল্পের উল্লেখ করা হয়েছে এমনভাবে যে, মনে হতে পারে ওটি তাঁরই একটি নিকৃষ্টতর গল্প। ওই প্রসঙ্গে বা রচনার কোথাও, যে-কোনো কারণে, গল্প-লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্মানীয় লেখক এবং গল্পটির নিন্দা করা হয়েছে, শুধু এই-জন্যে, আমি এগিয়ে এসে স্বীকার করছি যে, 'ভয়াবহ অবক্ষয়ের প্রতিনিধি', ঐ 'অসুস্থমনা নায়ক'-এর সকল অপরাধ আমার, 'বিজনের রক্তমাংস' নামক গল্পটি আমিই লিখেছিলাম। ইতি, ভবদীয়,

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
হাওড়া।

॥ দুজন অতিথি কবি প্রসঙ্গে ॥

(১)

মহাশয়,

পিটার অরলভস্কী ও অ্যালেন গিন্সবার্গ সম্বন্ধে শ্রীকণাদ চৌধুরীর প্রবন্ধ 'দুজন অতিথি কবি' (২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ সন) নানা কারণে প্রশংসা পাবার যোগ্য; তবুও এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সাধারণ পাঠক যে Beatnikদের সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পেরেছেন এমন মনে করা অসম্ভব। আমেরিকার দুজন আধুনিক কবি সম্প্রতি ভারতবর্ষে বেড়াতে এসেছেন; হয়তো সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মতামত প্রচারের দায়িত্বও নিয়েছেন। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষেও Beat Generation -এর সূত্রপাত হয়েছে এবং আশা (বা আশংকা) করা যায় যে, কিছু দিনের মধ্যেই এই ধরনের সুরিয়ালিস্টিক সাহিত্য আমাদের সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করবে।

কেরুয়াক এবং তাঁর শিষ্যদের Beatniks কেন বলা হয় সে সম্বন্ধে শ্রীচৌধুরী বিশেষ আলোকপাত করেননি। কেরুয়াক্ এবং তাঁর বন্ধু একদিন হেমিংওয়ে-উত্তর আমেরিকান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় এক যুবক সেখানে উপস্থিত হয়। মুখে হতাশার চিহ্ন; তারই পাশে সব হতাশা-জয়ের প্রতিজ্ঞার লিখন। "Ash — this is the Beat Generation", কেরুয়াক্ বলে ওঠেন। তখন থেকেই সৃষ্টি হয় Beat spirit -এর — "the new spirit of enquiry and awareness"

Beatnik-রা কি চান না তা তাঁরা অনেক সময়েই বলেছেন। বর্তমান আমেরিকান সমাজের বিরুদ্ধে তাঁদের জেহাদ —"মা, বাবা, ধর্ম, সাহিত্য, আইন, বিবাহ, শিক্ষা, রাজনীতি"—কোনও কিছুই তাঁদের মনের মতো নয়। কিন্তু কি তাঁরা চান তা এখনও স্পষ্ট করে জনসাধারণকে বুঝিয়ে উঠতে পারেননি Beatnik-রা। তবুও তাঁদের হাবভাব, কথাবার্তা ও চলাফেরার এক বিদ্রোহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সমাজের কাঠামোকে তাঁরা ভেঙে ফেলবেন কঠিন আঘাতে। ১৯৫৭ সনে Los Angeles এ Beat poetry পড়ে শোনাচ্ছিলেন গিন্সবার্গ। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন চেঁচিয়ে ওঠেন "আপনি কি প্রমাণ করতে চাইছেন?" গিন্সবার্গ উত্তর দেন "নগ্নতা!" শ্রোতা আবার জিজ্ঞাসা করেন "নগ্নতা বলতে আপনি কি বোঝেন?" গিন্সবার্গ সকলের সামনে পোশাক ত্যাগ করে নগ্নতার অর্থ

খ্ঁজিয়ে দেন। মানুষের জীবনের যে নগ্নতা তাই প্রমাণ করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন Beatnik-রা।

প্রশ্ন হচ্ছে—সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের অবদান কতখানি? নগ্নতা সকলের সামনে তুলে ধরা নিশ্চয়ই সাহিত্যের ধর্ম, কিন্তু তা-ই কি সব? পথ দেখানোর দায়িত্ব কি সাহিত্যিকের নেই? সমাজের কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলা অন্যায় নয়, বিশেষ করে সমাজ যদি কেবল আবর্জনায় বোঝাই হয়ে যায়। কিন্তু ভেঙ্গে ফেলবার পর? সমাজকে আবার নূতন ক'রে গড়ে তোলবার দায়িত্ব নেবে কে? Shelly একবার বলেছিলেন— "We hope till hope creates from its own wreck the thing it contemplates" অর্থাৎ যে আশা নিয়ে সমাজ-ভাঙ্গার কাজ, সে আশার পূরণ হ[...]ই বাঞ্ছনীয়। Beatniks দের সাথে Angry young men দের পার্থক্য বোধহয় এখানটাই। Beatnik রা অতিরিক্ত মাত্রায় Shallow. তাঁদের ভেতরে সৃষ্টিমূলক কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। তারা সমাজের বিরোধিতা করলেও সমাজের অর্থনীতির দিকটুকুকে অবহেলা করতে পারেননি। Angry young men রা সত্যিই কষ্ট করেছেন—সমাজের কাঠামোর জন্য তাঁদের অন্যায় সহ্য করতে হয়েছে। তাঁদের অনুভূতি Genuine: কিন্তু Beatnik রা অনেকটা লোক-দেখানো বিদ্রোহী। নয়তো 'ধর্ম' শুনলে যাঁরা নাক সিঁটকান, তাঁরাই আবার গণেশ দেবতাকে নিয়ে নাচানাচি করেন কেন?

Beatnik দের ব্যর্থতার মূল এখানেই। সুররিয়ালিসিম্-এর নামে তাঁরা এক Shallow sentimetality র আমদানি করছেন। যে নগ্নতাকে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরবার দায়িত্ব তাঁরা নিয়েছেন সে নগ্নতার প্রকাশের পর কি হতে পারে তা তাঁরা দেখাতে পারেননি। মানুষের আদিম প্রকৃতি ভাল কি মন্দ সে বিচারের পর এও ভাবা উচিত, মানুষের আদিম প্রকৃতির প্রকাশ কতখানি গঠনমূলক। constructive outlook ছাড়া কোনও সাহিত্য কখনও বড় হয়ে দেখা দিতে পারেনি। Beat সাহিত্য তাই আজকে আলোড়নের সৃষ্টি করলেও ভবিষ্যতে ইতিহাসের পাতায় এঁদের স্থান মিলবে কিনা বলা শক্ত।

বিনীত—
রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
অধ্যাপক বারাসত গভর্ণমেন্ট কলেজ,
কলিকাতা—৩১

(২)

সম্পাদক সমীপেষু,

দুজন অতিথি কবি প্রসঙ্গে কণাদ চৌধুরীর আলোচনাটি বিশেষ মনযোগের সঙ্গে পাঠ করলাম। লেখক সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে অতি সুন্দরভাবে বীট কবিদের মূল্যায়ন করেছেন। এই সম্পর্কে ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা এবং আরো কিছু মতামত উল্লেখ করলে আলোচ্য কবিদের চরিত্র-নির্ণয়ের সহায়ক হবে বলে মনে করি।

বীট কবিরা খুবই জনপ্রিয়, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার আড়ালে কোন শ্রদ্ধা আছে কিনা, জানি না। বরং প্রথম দর্শনে যখন সকলে 'বীট', 'বীট' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, তখন তাঁদের মুখের স্মিত হাসি দেখে মনে হলো, বুঝি এঁরা উপহাসের পাত্র। কিছুটা করুণা, কিছুটা ঔৎসুক্য বুঝি জড়িয়ে ছিল এর সঙ্গে। এবং যাঁদের মুখে এই স্মিত হাসি দেখেছিলাম, তাঁরা সকলেই সমকালীন বাংলার প্রসিদ্ধ কবি। পশ্চিম-বঙ্গ যুব উৎসবের কবি-সম্মেলনে যখন আলোচ্য দুজন কবি সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছিলেন, তখন মণ্ডপে উপবিষ্ট কবিদের মুখে 'বীট' 'বীট', শব্দ ওঁদের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করালো। বন্ধুমহলে শুনেছিলাম বীট কবিদের কজন কলকাতায় এসেছেন। এখন সাক্ষাৎ দর্শনে কি অনুভব করেছিলাম মনে নেই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন মণ্ডপে এসে তাঁরা উপস্থিত হলেন, তখন তাঁদের সম্বন্ধে অনেক সঞ্চিত ধারণাই যেন ভ্রান্ত বলে মনে হলো।

পরদিন কফি হাউসে আমাদের কজন তরুণ কবির সঙ্গে আরো বিস্তৃত পরিচয় হলো। প্রসঙ্গত বলে রাখি, কণাদ চৌধুরী বলেছেন: ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অতিথি কবি দুজন খুব বেশী আগ্রহী নন দেখা গেল। কিন্তু আমাদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে এঁদের আগ্রহ কম নয়। অরলভস্কি প্রশ্ন করলেন—বাড়ীতে কে কে আছেন? উত্তর পেয়ে আবার বললেন—মা এবং বাবাকে কফি হাউসে নিয়ে আসতে। এবং পরে আবার বললেন, আমাদের মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হতে তাঁর খুব ইচ্ছা। ইত্যাদি নানা প্রশ্ন থেকে মনে হয়েছে—আমাদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন রয়েছে এঁদের।

কফি হাউসে আলোচনাকালে কিছু কিছু বাংলা কবিতার অনুবাদ করে দিতে অনুরোধ জানালেন। কাজটি দুরূহ। তবু তাঁদের অনুরোধে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কয়েকজন প্রখ্যাত বাঙালী কবির কবিতার শব্দ-অনুবাদ করেছিলাম। এর কোনটাই এঁদের ভাল লাগেনি। প্রতিবারই পাশে মন্তব্য লিখে দিচ্ছিলেন: To general & abstart. [বানান মূলের অনুরূপ]। অবশেষে নিজস্ব কবিতার অনুবাদ করে দিতে হলো। পড়ে অরলভস্কি লিখলেন: no details about utility or who girl you love or House you dark in." অবশেষে বাংলা কবিতা সম্পর্কে অরলভস্কি যে মন্তব্য লিখে দিয়েছেন, তা এখানে উল্লেখ করছি। তিনি লিখেছেন you say the same dark sadness over & over again. Thousands of Poets say same as you.......so it's boreing to hear the same thing again & again in so many poems. আপনাদের মতে কবিতা কি রকম হওয়া উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে William Carllor William র কবিতা পড়বার অনুরোধ জানালেন অরলভস্কি। এবং পরে কবিতার আদর্শ সম্বন্ধে, লিখলেন: Talk about your ass-hole as How you do things in your bathroom or at jobs or mother's cooking sweets as your servents washing cape date.

এইভাবে দীর্ঘ সময়ের আলোচনার মধ্যে দিয়ে মনে হয়েছে, বীট কবিরা একটি বিশেষ সময়ের ফসল। কিন্তু সময় এবং ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এঁদের নেই। কোন বিশেষ সত্য বা চৈতন্যের দ্বারা এঁরা প্রভাবিত নন। এবং সমকালীন সাহিত্যের সঙ্গেও এঁদের কোন যোগাযোগ নেই। বীট কবিদের সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, তা পড়ে মনে হয়েছিল, হয়ত বীট কবিরা অনেক যন্ত্রণায় দগ্ধ। কিন্তু আলোচনার পর মনে হলো, এঁদের এই বেশভূষা, এঁদের সাহিত্য-চর্চা একটা চীপ্ ফ্যাশন মাত্র। কেননা গিন্‌সবার্গ বার বার আমেরিকার একটি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি ছবি দেখাচ্ছিলেন। ছবিটিতে গিন্‌সবার্গ হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় বাসনপত্র পরিষ্কার করছিলেন। ছবিটি দেখিয়ে গিন্‌সবার্গ বাহবা আদায়ের চেষ্টা করছিলেন। মনে হল, দৃষ্টি আকর্ষণের পন্থা হিসেবেই তাঁরা এপথে নেমেছেন। সততার কোন নিদর্শন এই বেশভূষার মধ্যে লক্ষ্য করা গেল না। এ ছাড়াও আলোচনা চলার মধ্যেই তাঁরা যেভাবে নিম্নাঙ্গের বস্ত্র পরিবর্তন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন, তার পশ্চাতে কবিতার কি সম্পর্ক আছে জানি না।

যাই হোক, মনে হয়, বীট কবিদের সম্বন্ধে যে রকম একটা উৎসাহ জমে উঠেছিল আমাদের মধ্যে, বীট কবিরা এই দেশে আসায় অনেকটা মোহ ভেঙেছে এবং সাহিত্য-সাধনার দিক থেকেও উপকৃত হয়েছি অনেক।

ইতি—
আশিস সান্যাল,
যাদবপুর, কলিকাতা—৩২

ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যে স্বর্ণযুগ খাজুরাহো

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

মন্দিরস্থাপত্যের ইতিহাসে ভারতীয় আর্যরীতির এক গৌরবময় উজ্জ্বল অধ্যায়ের নিদর্শন মেলে খাজুরাহোর মন্দিরগোষ্ঠীর মধ্যে। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল অসংখ্য মন্দির বুকে নিয়ে খাজুরাহো ভারতের মন্দিরশিল্পে একটি যুগের সূচনা করেছে। প্রখ্যাত শিল্পজ্ঞ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক পার্সি ব্রাউন-এর ভাষায় এই যুগটি হ'ল "happy golden age"। বস্তুতঃ খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রে নানা ভঙ্গিতে, নানা পরিবেশে খোদিত দেব-দেবী, অপ্সরা-সুরসুন্দরীদের অগণিত মূর্তির মধ্যে দিয়ে সে যুগের যে সমাজচিত্র, যে জীবনচিত্র তদানীন্তন শিল্পীদের দৃষ্টিতে পাথরের বুকে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, পার্সি ব্রাউনের গবেষণা-মত তা এক সুখৈশ্বর্যময় স্বর্ণযুগের অস্তিত্বের কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করে।

প্রকৃত ধর্মবোধ ও শিল্পসৌন্দর্য-বোধের সুষম সমন্বয়ের সার্থক প্রকাশ মধ্যভারতের খাজুরাহোর এই মন্দির-গোষ্ঠী। ভারতীয় মানসের যে ঐশ্বর্য —ত্যাগ, তিতিক্ষা, অহিংসা ও ঐক্য— তারই সুসংহত রূপ এই মন্দিরগুলি। তাই বহু বিপরীত ও ভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় দেখি এখানে। শিল্পীর ধর্ম-বোধ ও সে যুগের মন্দিরনির্মাতা রাজ-পরিবারের শিল্পচেতনা তাদের মহা-মানবতায় এমন এক স্তরে নিয়ে এসেছিল যেখানে ধর্মের গোঁড়ামির ও ভেদাভেদ তাদের মনে কোন সঙ্কীর্ণতা আনতে পারেনি। তাইতো খাজুরাহো মন্দিরগুলির নির্মাতারা হিন্দু হলেও এখানে দেখতে পাই জৈন, বৈষ্ণব ও শৈব মন্দিরের পাশাপাশি অধিষ্ঠান। মন্দিরগুলির মধ্যে কোনটি শিব, কোনটি বিষ্ণু, আবার কোনটি বা জৈন তীর্থংকরদের নামে উৎসর্গীকৃত হলেও স্থাপত্যরীতির দিক থেকে এগুলির মধ্যে খুব বড় রকমের কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করলে এটুকু উপলব্ধি করা যায় যে, ধর্মগত বৈষম্য নির্দিষ্ট কোন একটি যুগের শিল্প-রীতির মধ্যে খুব বড় রকমের পার্থক্য আনতে পারেনি।

খাজুরাহোর অবস্থিতি মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ডে। প্রাচীন বুন্দেলখণ্ডের রাজধানী ছিল খর্জুরবাটক, মতান্তরে খর্জুরবাহক বা খর্জুরবাহ। মনে হয় খর্জুরবাহক নামটিই ক্রমে পরিণত হয়েছে খাজুরাহোতে। বুন্দেলখণ্ডে মধ্যযুগে চন্দেলা রাজপুত বংশীয় হিন্দুরাজাদের রাজত্বকালেই গড়ে উঠেছিল এই অনিন্দ্যসুন্দর মন্দির উপনিবেশ। গগনচুম্বী পর্বতমালা আর দিগন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তর যেখানে অনন্ত প্রেমে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে একাকার হয়েছে তারই এক অপূর্ব সুষমামণ্ডিত পটভূমিকায় গড়ে উঠেছিল একটি নয়, দুটি নয়, একেবারে ৮৫টি মন্দির, আর তা'ও নাকি খুবই অল্প সময়ের মধ্যে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে এইগুলির নির্মাণকালের পরিধি নাকি মাত্র একশ' বছর, অর্থাৎ ৯৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক পণ্ডিত এই অনুমান খণ্ডন করে বলেছেন, মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল অন্ততঃ তিনশ' বছর ধরে। এগুলির মধ্যে প্রাচীনতম চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরটি ৮০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। তাঁরা বলেন মন্দিরগুলির নির্মাণকার্য চলেছিল ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

যাই হোক ঐ ৮৫টি মন্দিরের মধ্যে কালের অমোঘ বিধান উপেক্ষা করে আজও প্রায় ২০টি মন্দির আংশিক অক্ষত দেহে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কালের নির্মম আঘাতে ঐ ২০টি মন্দিরেরও অনেকখানি সৌন্দর্য-গৌরব হয়ত নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তাও স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পের এক মহৎ সম্পদ।

প্রায় সমসাময়িককালে নির্মিত খাজুরাহোগোষ্ঠীর মন্দিরগুলির সঙ্গে উড়িষ্যার মন্দিরগঠনরীতির অনেকখানি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে খাজুরাহোর মন্দিরগুলি যে উড়িষ্যার মন্দিরের অনেক উন্নত সংস্করণ, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। বহিরঙ্গের সুষমায় ও নিখুঁত খোদাইয়ের বলিষ্ঠ রূপছন্দে খাজুরাহোর মন্দিরগুলি ভারতীয় মন্দিরশিল্পে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ইতিপূর্বে "অমৃত" পত্রিকাতেই একটি প্রবন্ধে আমরা উড়িষ্যার মন্দির-সমূহের ইতিহাস ও গঠনরীতি নিয়ে আলোচনা করেছি।* স্থাপত্যের দিক থেকে খাজুরাহোর মন্দিরে যেমন উড়িষ্যার মন্দিরের কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ভাস্কর্যের দিকটি এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। খাজু-

* "অমৃত", ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ সংখ্যায় "উড়িষ্যার মন্দির" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মন্দির গাত্রে ভাস্কর্য

রাহোর দেব-দেবী, অপ্সরা, কিন্নরী, অষ্টদিকপাল ও অন্যান্য নরনারীর মূর্তিগুলির প্রত্যেকটির অঙ্গসৌষ্ঠব ও অঙ্গ-সংস্থানের সামঞ্জস্য বিস্ময়কর। এদের প্রতিটি ভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে প্রাণের স্পন্দন, গতির ছন্দ। এ তো গেল শিল্পকৌশলের দিক। চিত্রকল্প ও ভাবব্যঞ্জনার দিক থেকেও এ মূর্তি-গুলির তুলনা নেই।

উড়িষ্যার মন্দিরের সঙ্গে খাজুরাহোর মন্দিরে পার্থক্য লক্ষণীয়। কয়েক শত-বর্ষব্যাপী সুসংহত ও সুসংগঠিত প্রয়াসের ফলেই উড়িষ্যার মন্দিরগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু খাজু-রাহোর মন্দিরগুলি হিন্দু মন্দির-স্থাপত্যের ইতিহাসে এক পরম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই।

খাজুরাহোর মন্দিরগোষ্ঠীর একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ভারতের আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। চিরা-চরিত রীতিবিরুদ্ধ শিল্পপদ্ধতি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলি প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নয়, প্রত্যেকটি মন্দির এক-একটি সুউচ্চ বেদী বা ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের বিভিন্ন অংশ, যেমন জগমোহন, গর্ভ-গৃহ প্রভৃতি এখানে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন-ভাবে নির্মিত নয়, এগুলি একত্র সংহত হয়ে স্থাপত্যের এক অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ রূপের প্রকাশ সম্ভব করে তুলেছে। এখানে 'জগমোহন' 'দেউলের' সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা সমগ্রতার ধারণা জন্মে দিচ্ছে।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলির সঙ্গে আর একটি পার্থক্য এই যে, খাজুরাহোর অধিকাংশ মন্দির নির্মিত হয়েছে প্রশস্ত চাতালের ওপর এবং মন্দিরের সুউচ্চ চূড়াগুলি সোজা ঊর্ধ্বাকাশে উঠে গেছে গম্বুজের আকৃতি নিয়ে, আর এরই মাঝে রয়েছে উন্মুক্ত গবাক্ষ সব দিক ঘিরে, যার ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো এসে প্রবেশ করতে পারে একে-বারে গর্ভগৃহ পর্যন্ত, অর্থাৎ যেখানে বিগ্রহের অধিষ্ঠান সেই পর্যন্ত। কিন্তু উড়িষ্যার মন্দিরগুলির অভ্যন্তরভাগ সাধারণতঃ অন্ধকারমগ্ন। মন্দিরগাত্রে এই উন্মুক্ত গবাক্ষ আর একটি উদ্দেশ্যও সাধন করছে। মন্দিরের ভিত্তিভূমি থেকে আরম্ভ করে গগনচুম্বী শিখর-গুলির বহির্গাত্রের ওপর দিয়ে স্তরে স্তরে চোখ বুলিয়ে একেবারে শীর্ষ-

বিশ্বনাথ মন্দির

কণ্টকবিদ্ধা কর্তৃক অপসারণরতা।
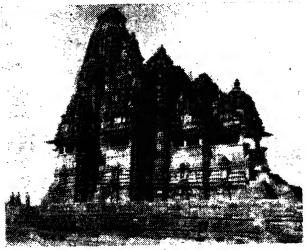
বিন্দুতে পৌঁছুলে এর ওপরকার কারুকার্য ও ভাস্কর্যের প্রাচুর্যে চোখ দুটি কিছুটা শ্রান্তি বোধ করতে পারে। মন্দিরগাত্রে এই গবাক্ষশ্রেণী শ্রান্ত চোখকে দেয় শান্তি ও বিশ্রামের অবকাশ। এদিক থেকেও এর মূল্য কম নয়।

খাজুরাহোগোষ্ঠী ও উড়িষ্যার মন্দিরগুলির মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় মন্দিরাভ্যন্তরে। উড়িষ্যার মন্দিরগুলির আভ্যন্তর কক্ষগুলি সাধারণতঃ সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। কিন্তু খাজুরাহোর মন্দিরগুলির আভ্যন্তর কক্ষগুলিতে রয়েছে অজস্র ভাস্কর্যের নিদর্শন। কক্ষের ভিতরের ছাদও অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত। ছাদটি যে স্তম্ভগুলিকে অবলম্বন করে রয়েছে, সেগুলিরও নিম্নভাগে ও উপরিভাগে অর্ধমানবমূর্তি ও পশুমূর্তি খোদাই করা আছে, আর মাঝখানটিতে আছে অপূর্ব শ্রীময়ী নারীমূর্তি—প্রকৃত সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। একই স্তম্ভে পশুমূর্তি ও নারীমূর্তি, যেন সুন্দর ও অসুন্দরের সহ-অবস্থান। এ দুয়ের পার্থক্য এই কথাই হয়ত প্রমাণ করতে চায় যে, অসুন্দরের ওপর সুন্দরের জয়, পশুশক্তির ওপর আধ্যাত্মিক শক্তির জয় সর্বত্রই।

সবশেষে আর একটি পার্থক্যের কথা না বললে তুলনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উড়িষ্যার শিল্পকর্মে অনেক ক্ষেত্রেই ফুল, লতা, পাতা ও জ্যামিতিক অলংকরণের দিকেই বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু খাজুরাহোর শিল্পীদের দৃষ্টিতে এগুলির খুব বেশি গুরুত্ব ছিল না। তাঁদের আদর্শ ছিল "সবার উপরে মানুষ সত্য।" তাই মানুষকে তাঁরা যত বড় করে দেখেছিলেন, পশু-পাখী, লতা-পাতাকে ততখানি নয়। তাই দেখি খাজুরাহোর মন্দিরে সুশ্রী নরনারীর মূর্তির এত প্রাধান্য। মানব-মানবী, দেব-দেবীর মূর্তির মধ্য দিয়েই খাজুরাহোর শিল্পীরা জীবনের সত্যকে অকপটে প্রকাশ করেছেন।

।। ২ ।।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলিকে অবস্থানের দিক থেকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—পশ্চিমগোষ্ঠী, পূর্বগোষ্ঠী ও দক্ষিণগোষ্ঠী। পশ্চিমগোষ্ঠীতে আছে ১২টি বৈষ্ণব ও শৈব মন্দির : চৌষট্টি যোগিনী মন্দির, কন্দর্প মহাদেব মন্দির, দেবী জগদম্বা মন্দির, মহাদেব মন্দির, চিত্রগুপ্ত বা ভারতজী মন্দির, থালগুয়া মহাদেব মন্দির, বিশ্বনাথ ও নন্দী মন্দির, পার্বতী মন্দির, লক্ষ্মণ বা চতুর্ভুজ মন্দির, মাতঙ্গেশ্বর এবং বরাহ মন্দির।

পূর্বগোষ্ঠীতে আছে পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ, আদিনাথ, ঘণ্টাই, ব্রহ্মা প্রভৃতি ৬টি জৈন মন্দির।

কন্দর্প মহাদেব মন্দির

দক্ষিণগোষ্ঠীতে রয়েছে দুলাদেব ও চতুর্ভুজ মন্দির। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব রয়েছে এগুলিতে।

শৈবগোষ্ঠীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ মন্দির কন্দর্য মহাদেব মন্দির—মহা-মহিমময় খাজুরাহো মন্দিরমালার মধ্য-মণি। উঁচু প্রশস্ত চাতালের ওপর নির্মিত মন্দিরটি শতাধিক ফুট উচ্চে আকাশের নীলিমায় তার গম্বুজাকৃতি শিখরটি মেলে ধরেছে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ১০২ ফুট ও ৬৬ ফুট, উচ্চতায় ১০১ ফুট ৯ ইঞ্চি। বিশালাকৃতি মন্দিরটি তার বিভিন্ন অংশ-গুলি নিয়ে একটি সংহত অখণ্ড রূপ লাভ করেছে। মন্দিরের প্রধান অংশ চারটি—অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ। প্রত্যেকটির উপরই একটি করে শিখর—উচ্চতার ক্রম-অনুযায়ী সাজানো। সবচেয়ে ছোট শিখরটি নির্মিত হয়েছে অর্ধমণ্ডপের ওপর, পাশাপাশি অন্য শিখরগুলি ক্রমে ক্রমে বড় হয়েছে। সবচেয়ে বড় মূল শিখরটি উঠেছে গর্ভগৃহের ওপর। কন্দর্য মহাদেব মন্দিরের এই মূল শিখরটির এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোন মন্দিরে নেই। এই শিখরটি প্রকৃতপক্ষে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরের সমষ্টি। মূল শিখরগাত্রে চারি-দিক ঘিরে একই ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখর স্তরে স্তরে উঠে গেছে শীর্ষ-দেশে। মন্দিরের প্রধান অংশ 'গর্ভগৃহ', উড়িষ্যার যার নাম 'দেউল'। গর্ভগৃহের মধ্যে রয়েছে বিগ্রহ। গর্ভগৃহের সম্মুখের অংশটিকে বলা হয় 'অন্তরাল'। এটি গর্ভগৃহে প্রবেশের অলিন্দ। অন্তরাল একদিকে গর্ভগৃহ ও অন্যদিকে 'জগ-মোহন' বা 'মণ্ডপকে' যুক্ত করেছে। জগমোহন হল সমাবেশকক্ষ। এছাড়া আছে 'অর্ধমণ্ডপ' বা প্রবেশকক্ষ। এই ঘনসংবন্ধ অংশগুলি মিলে মন্দিরের যে একটি অখণ্ড, পূর্ণাঙ্গ ঐক্যরূপ গড়ে উঠেছে, খাজুরাহো ব্যতীত আর কোথাও তা দৃষ্টিগোচর হয় না।

বেলে-পাথরে তৈরী এই মন্দিরটি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধুর মিলনের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। স্থাপত্যসুষমার দিক থেকে কন্দর্য মহাদেব মন্দিরের তুলনা নেই। প্রতিটি অংশ এককভাবে যেমন এক-একটি নিখুঁত স্থাপত্য-সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত, তেমনি এক অংশের সংগে অন্য অংশের শিল্পরুচিসম্মত সামঞ্জস্য একে নয়নাভিরাম করে তুলেছে। বিশেষ করে এই মন্দিরগাত্রে উন্মুক্ত গবাক্ষগুলি ভারতীয় মন্দিরস্থাপত্যে এক যুগান্তর এনেছে। পার্সি ব্রাউন এ সম্বন্ধে বলেছেন :

"There are few more attractive conceptions in the field of Indian architecture than these lovely balconied openings, and few, either structurally or aesthetically, more appropriate to their purpose."

মন্দিরের সারা অংগে ভাস্কর্যের রাশি রাশি নিদর্শন—এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানেরও অপচয় করা হয়নি। মন্দিরের প্রতি গবাক্ষে, স্তম্ভে, অলিন্দে, ভিতরের ছাদে মানুষ ও পশু মূর্তি থেকে শুরু করে পত্র-পুষ্প-ফলাদির বিচিত্র সুন্দর ভাস্কর্য নিদর্শন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য, উমা প্রভৃতি দেব-দেবী ব্যতীত অসংখ্য নারীমূর্তি রয়েছে সুমধুর লীলায়িত ভংগীতে—কেউ প্রসাধনরতা, কেউ বা পত্রলিখনরতা, আবার কোথাও দেখি কণ্টকবিদ্ধা কোন নারী কণ্টক-উৎপাটনরতা। এছাড়া আছে অষ্টদিক-পাল—অষ্টদিকের জাগ্রত প্রহরী, আর অপ্সরা, সুর-সুন্দরী, নরমিথুন, সর্প-মিথুন, শার্দুল প্রভৃতির অগণিত মূর্তি। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক কানিংহামের মতে কন্দর্য মহাদেব মন্দিরে সবশুদ্ধ ৮৭২টি মূর্তি আছে। প্রতিটি মূর্তি, বিশেষতঃ নারীমূর্তি-গুলি চরম শিল্পোৎকর্ষ লাভ করেছে। সুষম অংগ-বিন্যাসে, যুবতী নয়নের বিলোল কটাক্ষে, যৌবনতনুর কোমল লালিত্যে, দেহবল্লরীর স্নিগ্ধ ছন্দে এই নারীমূর্তিগুলি এক বিস্ময়কর আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। বলিষ্ঠ ভাবকল্পনায় ও শিল্পদক্ষতায় এগুলি এক মোহময় রূপ ধারণ করেছে। প্রতিটি মূর্তির পরি-কল্পনা ও রূপায়ণে শিল্পীর সুগভীর জীবনবোধ ফুটে উঠেছে।

বিশ্বনাথ মন্দির ও চতুর্ভুজ মন্দির দুটিও এই একই রীতিতে নির্মিত, তবে এগুলি কন্দর্য মহাদেব মন্দির অপেক্ষা ক্ষুদ্র। বস্তুতঃ বিশ্বনাথের মন্দির কন্দর্য মহাদেব মন্দিরেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। বহিরংগ পরিকল্পনায় এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই বললেই চলে। অভ্যন্তরীণ কারুকার্য ও অলংকারণেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। অবশ্য বর্ণাঢ্য অলংকরণ কন্দর্য মহাদেব মন্দিরের যে মহিমা এনে দিয়েছে বিশ্বনাথ মন্দিরের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। ১০০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ মন্দিরটি নির্মিত হয়ে থাকবে বলে অনুমান করা হয়।

চতুর্ভুজ বা লক্ষ্মণ মন্দির প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু মন্দির। এর গঠনরীতিতে একটু অভিনবত্ব আছে। এটি পঞ্চায়তন রীতিতে নির্মিত। পঞ্চায়তন বা পঞ্চ মন্দির রীতিটি আর কিছুই নয়, একটি মূল মন্দিরের চার কোণে চারটি শিখর মন্দির থাকে। লক্ষ্মণ মন্দিরটিও এই পদ্ধতিতেই নির্মিত। মূল মন্দিরটির সুউচ্চ ভিত্তিভূমির ওপর চার কোণে চারটি শিখর এক অপূর্ব সামঞ্জস্য-সুষমা সৃষ্টি করেছে। চন্দেশরাজ যশো-বর্মণ এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে-ছিলেন। দশম শতাব্দীর চতুর্থ দশকের গোড়ার দিকে এটি নির্মিত হয়েছিল। সূক্ষ্ম শিল্পসৌকর্য ও ভাস্কর্য-সুষমার বহু নিদর্শন দেখতে পাই এই মন্দিরের গায়ে।

বিশ্বনাথ মন্দিরের সামনাসামনি একই ভিত্তির ওপর রয়েছে নন্দীর মন্দির। মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলেও বৃষ নন্দীর যে মূর্তি এর মধ্যে রয়েছে তা অতিকায়। ৬ ফুট উঁচু, ৭ ফুট দীর্ঘ বৃষ নন্দীর এই মূর্তিটি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কন্দর্য মহাদেব মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত দেবী জগদম্বা মন্দিরটি মূলতঃ বিষ্ণু মন্দির ছিল। পরবর্তীকালে কোন সময়ে বিষ্ণুর স্থলে দেবী জগদম্বার মূর্তি স্থাপিত হয়ে থাকবে।

এর আর একটু উত্তরে চিত্রগুপ্ত বা ভরতজীর মন্দির। এর এই নামের মধ্যে মন্দিরের আসল পরিচয় পাওয়া যায় না। এটি প্রকৃতপক্ষে সূর্যমন্দির। মন্দিরের মধ্যে অতি মনোরম বিশালাকৃতি সূর্য-মূর্তি। বাস্তব জীবনের নানা পর্যায়ের জীবন্ত রূপ ফুটে উঠেছে এই মন্দির-গাত্রে। শিল্পীর বলিষ্ঠ রূপকল্পনা ও জীবনচেতনার সংগে তার শিল্পদক্ষতার অপূর্ব সমন্বয়ে এই বাণীমূর্তিগুলি পাষাণের বুকে ভাষা পেয়েছে।

বরাহ মন্দির খাজুরাহোর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। একটিমাত্র প্রস্তর-খণ্ডে খোদাই করে নিপুণ হাতে তৈরী অনুপম বরাহ মূর্তিটি কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত। এ হ'ল বরাহ-অবতার স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি।

লক্ষ্মণ মন্দিরের কাছেই মাতঙ্গেশ্বর মন্দির। এটি শিবমন্দির। এরূপ বিশাল

শিবলিঙ্গ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই লিঙ্গমূর্তিটি উচ্চতায় ৮ ফুট বা তার চেয়েও কিছু বেশী, আর এর ব্যাস হবে ৪ ফুটের মত। স্থাপত্য-ধারার যে বৈশিষ্ট্য খাজুরাহোর মন্দির-গোষ্ঠীর মধ্যে চোখে পড়ে মাতঙ্গেশ্বর মন্দির তার ব্যতিক্রম। চতুষ্কোণ ভিত্তি-ভূমির ওপর মন্দিরের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভাস্কর্যের নিদর্শন প্রায় অবর্ত-মান। কেন্দ্রীয় মন্দিরটির অভ্যন্তরভাগের গঠন এতই গোলাকৃতি যে তা বৌদ্ধ-স্তূপের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্ভবতঃ কোনকালেই এর শিখর ছিল না।

॥ ৩ ॥

পূর্বগোষ্ঠীর জৈনমন্দিরগুলির স্থাপত্যরীতিতে পশ্চিমগোষ্ঠীর সঙ্গে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কন্দর্য মহাদেব প্রভৃতি মন্দিরগুলিতে দেখেছি বাইরের আলো যাতে গর্ভগৃহ পর্যন্ত যেতে পারে সেজন্য মন্দিরের চারিদিক ঘিরে রয়েছে উন্মুক্ত বাতায়ন। কিন্তু জৈনমন্দিরগুলিতে এরূপ উন্মুক্ত গবাক্ষের কোন অস্তিত্ব নেই।

খাজুরাহোর সবচেয়ে বড় ও সব-চেয়ে সুন্দর জৈনমন্দির হল পার্শ্বনাথ মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহে রয়েছে একটি কারুকার্যখচিত সিংহাসন, আর প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের প্রতীক-স্বরূপ একটি বৃষ। ভাস্কর্যের নিদর্শন বৃষের সারা অঙ্গে। জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের যে বিশাল মূর্তিটি দেখা যায় তা অনেক পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়েছিল। পার্শ্বনাথ মন্দিরের গায়ে ও ভিতরের ছাদে ভাস্কর্যের সূক্ষ্ম মনোহারিতা মনে বিস্ময় আনে। নানা পরিবেশে ও নানা ভঙ্গিতে অসংখ্য নারী-মূর্তির অঙ্গসৌষ্ঠব ও সুসমঞ্জস দেহ-ছন্দ আধুনিককালের দক্ষতম ভাস্করকেও লজ্জা দেয়। আশ্চর্যের বিষয় এই জৈন-মন্দিরটিতেও অনেক হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি পরমতসহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে।

এর পাশেই আদিনাথের মন্দিরটি আকারে অনেক ছোট। শান্তিনাথের মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের সৃষ্টি। মন্দিরাভ্যন্তরে শান্তিনাথের বিরাট মূর্তিটি নগ্ন।

এই গোষ্ঠীর একটি অত্যন্ত বিস্ময়-কর নিদর্শন হল ঘন্টাই মন্দির। মন্দির বলতে অবশ্য এখন অবশিষ্ট আছে মাত্র উজ্জলখানেক স্তম্ভ। কিন্তু স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ অপূর্ব ভাস্কর্য-সৌন্দর্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট। পার্সি ব্রাউন এই শিল্পকর্মের উৎকর্ষ সম্পর্কে সুনি-শ্চিত হয়ে বলেছেন যে, এগুলি "handiwork of a group of the most accomplished chaftsmen of the time."

কানিংহামের মতে ঘন্টাই মন্দিরের নির্মাণকাল নবম শতাব্দী। কারণ তিনি মন্দিরের বাইরে একটি বুদ্ধমূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন, আর তাতে উৎকীর্ণ লিপিটি ছিল নবম শতাব্দীর। কিন্তু মন্দিরটি জৈন বলে এর সঙ্গে এই বুদ্ধ-মূর্তির সম্পর্ক কোথায় তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু কিছু বাদানুবাদ হয়েছে। তবে প্রাচীন বুদ্ধমূর্তিকে কোন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি বলে ভুল করার নজীর জৈন ইতিহাসে একেবারে অপ্রতুল নয়।

উড়িষ্যার মত খাজুরাহোর মন্দির-ভাস্কর্য সম্পর্কেও একই অভিযোগ উঠেছে যে এখানেও মন্দিরগাত্রে খোদাই-করা মূর্তিগুলির মধ্যে নর-নারীর দেহমিলনের সংকেত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। খাজুরাহোর মন্দিরশিল্পে বিষয়-বস্তুর রূপকল্পনার মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে মালিন্যের পরিচয় থাকলেও অনুপম শিল্পকর্ম নরনারীর মূর্তির মধ্যে যে ছন্দ ও জীবনবোধ ফুটিয়ে তুলেছে তা আর সব কিছুকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। মূর্তিগুলির যৌন-আবেদন দর্শকের চোখে বড় হয়ে দেখা দিতে পারে না, ভাস্কর্যশিল্পের মহৎ নিদর্শন তার মনকে তখন শ্রদ্ধায় ভরে দিয়েছে। বস্তুতঃ শিল্পকলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু অনেকখানিই গৌণ। শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর জন্যই কোন সৃষ্টি কখনও মহৎ বলে গণ্য হতে পারে না। বিষয়টি সৃষ্টির মধ্যে কিভাবে রূপায়িত হয়েছে, বিষয়কে অবলম্বন করে সৃষ্টি বিষয়াতীত কোন্ সত্যকে প্রকাশ করেছে, নীরব-নির্বাক সৃষ্টি কোন্ ছন্দে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, রূপকে অবলম্বন করে অরূপে পৌঁচেছে কি না, এ সকলের ওপরই নির্ভর করে শিল্পসৃষ্টির মহত্ব। বিস্ময়াবিষ্ট ও শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে দর্শক যখন তাকিয়ে থাকে খাজুরাহোর মূর্তি-গুলির দিকে, হৃদয়ে তখন তার অরূপের স্পর্শ এসে লাগে, অনিন্দ্য-সুন্দর শিল্প-কারিতা, মহৎ সৃষ্টির রূপময়তা তার প্রাণে দোলা দেয়। সে তখন হয়ে যায় সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ।

শিল্পী যে একজন মানুষ তার স্বাক্ষর সে রেখে গেছে খাজুরাহোর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে। মানুষের কামনা-বাসনার চোখ নিয়ে শিল্পী দেখেছে তার দেবতাকে। তাই তার সৃষ্ট দেবতা রূপ-লাভ করেছে মানুষের বাসনা-মলিন বেদীতে অধিষ্ঠিত হয়ে। দেবতার মহিমাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিল বলেই শিল্পী তার মানস দেবতাকে বাসনা-কামনার ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।" দেবতার সঙ্গে মানুষের মিলনের এক অতি সহজ সূত্র পাই খাজুরাহোর মন্দিরে মন্দিরে।

সর্বোপরি, ভক্তি ও কল্যাণের শান্ত সমাহিত যে রূপটি স্ফূর্তিলাভ করেছে খাজুরাহোর মন্দিরগুলিতে তার বুঝি তুলনা নেই। চিরকালের বিস্ময় খাজুরা-হোর এই মন্দিরগোষ্ঠী।

জীব-জগতের অস্বাভাবিক সম্পর্ক

অয়স্কান্ত

খাপছাড়া-র একটি কবিতা উদ্ধৃত করে আজকের আলোচনা শুরু করছি।

বিড়ালে মাছেতে হল সখ্য
বিড়াল কহিল, 'ভাই ভক্ষ্য,
বিধাতা স্বয়ং জেনো সর্বদা কন তোরে,—
ঢোকো গিয়ে বন্ধুর রসময় অন্তরে
সেখানে নিজেরে তুমি সযতনে রক্ষ।

অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে, বিড়ালের সঙ্গে মাছের কখনো বন্ধুত্ব হতে পারে না। আর এ থেকে হয়তো সাধারণ একটা সিদ্ধান্তও টানা চলে যে ভক্ষ্য ও ভক্ষকের সম্পর্ক চিরকালই শত্রুতার। জীবজগতের দিকে তাকিয়ে দেখলে মোটামুটি লক্ষ্য করা চলে, ভক্ষ্য ও ভক্ষকের মধ্যে তো বটেই, এমন কি দুই বিভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যেও মেলামেশা বা সখ্যতা বা বন্ধুত্ব থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে প্রায় সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। সখ্যতা বা বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যাপারেও কিছু কিছু অস্বাভাবিক রকমের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে। আজকের আলোচনায় এমনি কয়েকটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই।

গোড়াতেই বলে রাখা দরকার যে এই ব্যতিক্রমগুলো সাধারণত ঘটেছে নানা দেশের চিড়িয়াখানায়। স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে তাও নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের কিছুটা হাত ছিল। অর্থাৎ, বিশেষ একটি পরিস্থিতিতে গোড়ার যোগাযোগটুকু ঘটিয়ে দিতে হয়েছিল। আমাদের দেশের একটি চলতি প্রবাদে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার কথা বলা হয়। এই প্রবাদটিতে অবশ্য একটি অসম্ভব ঘটনার উল্লেখ করে ব্যক্তিবিশেষের দোর্দণ্ড প্রতাপের মহিমা-কীর্তন করা হয়েছে। কিন্তু লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় আফ্রিকার গণ্ডারের সঙ্গে সাধারণ ছাগলের একঘাটে জল খাওয়ার চেয়েও বেশি বন্ধুত্ব হয়েছিল। তারা যে শুধু একসঙ্গে ঘুরে বেড়াত তাই নয়, গণ্ডারের গায়ের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে ছাগলটি লাফালাফি করত, গণ্ডারের গায়ে ঠেস দিয়ে শুয়ে পরম আরামে ঘুমোত।

এমনি বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল বার্লিন চিড়িয়াখানায় গণ্ডারের সঙ্গে একটি নু-এর। এই বন্ধুত্ব এমনই প্রগাঢ় ছিল যে চোখের দেখার আড়াল হলে গেলেই গণ্ডারটি খাঁচাময় তোলপাড় শুরু করে দিত।

রোমের চিড়িয়াখানায় একটি বুনো-শুয়োর একদল বানরের সমস্ত অত্যাচার এমন মুখ বুজে সহ্য করত যে শেষ পর্যন্ত বুনোশুয়োরটির স্বাস্থ্যহানি ঘটার ভয়ে বানরগুলোকে পৃথক জায়গায় নিয়ে যেতে হয়েছিল। তাই বলে এই বুনোশুয়োরটি পরম বৈষ্ণব হয়ে যায়নি। একবার একটা খরগোশকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যথারীতি আহার্যবস্তুতে পরিণত করতে সে কিছু-মাত্র বিলম্ব করেনি।

হামবুর্গ চিড়িয়াখানায় একটি সোমালী ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল একটি বাচ্চা ওরাঙ ওটাং-এর। এদের দুজনকে গলাগলি করে ঘুরে বেড়াতে দেখে মাঝে মাঝে ভুলে যেতে হত যে একজন মানুষ, অপরজন মনুষ্যেতর জীব।

ওরাঙ ওটাং-এর জ্ঞাতিভাই শিম্পাঞ্জীর কাহিনী এর চেয়েও চমকপ্রদ। সাধারণত দেখা যায়, শিম্পাঞ্জীর হাতে ইঁদুর ধরা পড়লে শিম্পাঞ্জী খেলাচ্ছলে ইঁদুরকে এমনভাবে টেনে লম্বা করতে থাকে যে ইঁদুরকে আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে হয় না। কিন্তু লণ্ডন চিড়িয়াখানার এই শিম্পাঞ্জীটি একটি ইঁদুরের সঙ্গে খেলা করত ও ইঁদুরের গায়ে আলতো ভাবে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করত।

হাতির হাত নেই, কিন্তু একটি শুঁড় আছে। শুঁড়টিকে বাইরে থেকে দেখতে যেমনই হোক, এমন শক্তিশালী প্রত্যঙ্গ অন্য কোনো জীবের নেই। চল্লিশ হাজার পেশী আছে এই প্রত্যঙ্গটিতে। একটি হাতির পক্ষে শুঁড়ে জড়িয়ে মস্ত মস্ত কাঠের গুঁড়িকে তুলে নেওয়া কিছুমাত্র শক্ত ব্যাপার নয়। এ-হেন হাতি এ-হেন একটি শুঁড় দিয়ে যদি রবিনপাখির মতো নিতান্তই পলকা ক্ষীণজীবী একটি প্রাণীকে আদর করতে চেষ্টা করে—তাহলে এই আদরের পরিণতি ভেবে অনেকেই হয়তো আতঙ্কিত হবেন। কিন্তু ব্রোনক্স চিড়িয়াখানায় সত্যিই এমন ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছিল।

হাতির কথাতেই যখন এসে পড়া গিয়েছে তখন হাতি সম্পর্কে আরো কয়েকটি মজার খবর এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে। এরোপ্লেনের কল্যাণে আজকাল হাতিও আকাশপথে পাড়ি দিচ্ছে। গত কয়েক বছরে ভারতে কয়েকটি হাতিকে এরোপ্লেনে চাপিয়ে বিদেশে পাঠাবার খবর আমরাও পড়েছি।

একটি আশ্চর্য দৃশ্য—গণ্ডারের পিঠে ছাগলের নাচ।
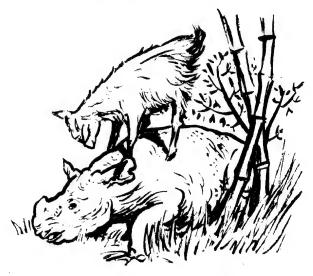
কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজসাধ্য নয়। আকাশে উড়বার সময়ে হাতি যদি সামান্য একটু গা-মোড়ামুড়ি দেয় তাহলে এরোপ্লেনের পলকা কাঠামো অনায়াসে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে পারে। অন্তত ভারসাম্য হারিয়ে এরোপ্লেনটি যে বেসামাল হতে পারে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, এরোপ্লেনের নিরাপত্তার জন্যেই হাতিকে শান্তশিষ্ট রাখার একটা কিছু ব্যবস্থা থাকা দরকার। শুনলে অবাক হতে হবে যে খুব সামান্য আয়োজনেই এই ব্যবস্থাটি করা হয়ে থাকে। একটি মুরগির ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে হাতির সামনের পায়ের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। দুই পায়ের মাঝখানে পালকধারী তুলতুলে জীবটিকে দেখে হাতি নাকি এমনই মোহিত হয়ে যায় যে সারা পথ তার আর নড়াচড়া কিছু থাকে না।

তেমনি রেসের ঘোড়াকে আকাশ-পথে পাঠাবার সময়ে গাধা বা ছাগল বা কুকুরকে সঙ্গী হিসেবে দেওয়া হয়। এমনি একটি সঙ্গী পেলেই নাকি রেসের ঘোড়া একেবারে শান্ত।

অন্যদিকে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুন অনেক সময়ে কোনো কোনো জীবের মধ্যে অস্বাভাবিক চালচলন লক্ষ্য করা গিয়েছে। আমেরিকার কোনো একটি চিড়িয়াখানায় একবার একটি মা-বেবুন একটি বেড়ালছানাকে নিজের শাবকের মতো লালন পালন করতে শুরু করেছিল। অবস্থা শেষকালে এমন দাঁড়িয়েছিল যে বেড়ালছানাটিকে মুহূর্তের জন্যে মা-বেবুনের কোলছাড়া করা যেত না। এই উৎকট বাৎসল্যের চাপে পড়ে বেড়ালছানার প্রাণবায়ু খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল।

এক প্রকৃতির জীবকে অন্য প্রকৃতির জীবের কাছে বাৎসল্যের টানে বাঁধা পড়তে এমনি একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার কৃত্রিম হ্রদে একবার একটি মা-তিমির বৎসলতা একটি হাঙরছানাকে আশ্রয় করেছিল। মা-তিমির যেমন মাঝে মাঝে জল থেকে মাথা তুলে নিশ্বাস নেবার দরকার পড়ত তেমনি হাঙরছানাটিকেও সে মাঝে মাঝে নিশ্বাস নেবার জন্যে জলের ওপরে তুলে ধরত। এই বাৎসল্যের দাপটে হাঙরছানাটির শেষ পর্যন্ত প্রাণ যায়। কিন্তু তারপরেও কুড়ি দিন পর্যন্ত মা-তিমি হাঙরছানাটিকে কাছছাড়া করেনি। এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সামুদ্রিক-জীব-বিশেষজ্ঞ ডেভিড এইচ ব্রাউন লিখেছেন যে খুব সম্ভবত মা-তিমিটি হাঙরছানাটিকে তিমির বাচ্চা বলেই মনে করত আর তাই সে তাকে শেখাতে গিয়েছিল কি-ভাবে জল থেকে মাথা তুলে বাইরের হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে হয়।

মা-তিমির পক্ষে অবশ্যই হাঙরের ছানাকে তিমি করে তোলা সম্ভব হয়নি। তবে মানুষ কিন্তু নানাভাবে ট্রেনিং দিয়ে অনেক জীবকেই তার স্বভাব ভুলিয়ে ছেড়েছে। ব্যক্তিবিশেষের দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত কিনা জানা যায় না, কিন্তু ট্রেনিং-এর ফলে

সিংহ খরগোশকে আদর করছে এমন দৃশ্য অভাবিত নয়। তেমনি অভাবিত নয় বেড়াল ও ইঁদুরের একই পাত্র থেকে খাবার খাওয়া, বেড়ালের পিঠে দাঁড়কাকের সওয়ার হওয়া, ইত্যাদি। এমন কি, ইঁদুর গাড়িতে বসে আছে আর বেড়াল সেই গাড়ি টানছে—এমন ঘটনাও নাকি ঘটাতে পারা গিয়েছে। বেড়ালের সঙ্গে পেঁচার বন্ধুত্বও নাকি অসম্ভব ব্যাপার নয়। আর বেড়াল ও কুকুর পরস্পরের প্রতি শত্রুতা ভুলে গিয়ে পরম বন্ধুর মতো গা-শোঁকাশুঁকি করছে—এ দৃশ্য তো আমাদের বাড়িতেও আমরা দেখতে পাই। অথচ রাস্তার কুকুর ও রাস্তার বেড়াল পারতপক্ষে কেউ কারও ছায়া মাড়ায় না।

হাঁসের বেলাতেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে। এমনিতে মা-হাঁস ডিমে তা দেবার ফলে হাঁসের ছানা ডিমের খোলা ভেঙে বেরিয়ে আসে। এ-অবস্থায় মা-হাঁসের সঙ্গেই তাদের প্রথম পরিচয় এবং কিছুদিন পর্যন্ত মা-হাঁসের সঙ্গে সঙ্গেই তারা ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ইনকিউবেটারে যদি ডিম ফুটিয়ে তোলা হয় এবং জন্মের পরে যদি একজন মানুষের সঙ্গে হাঁসের ছানার পরিচয় ঘটে তাহলে সেই ছানা আর কিছুতেই সেই মানুষটির সঙ্গ ছাড়তে চায় না। খুব সম্ভবত মানুষের বেলাতেও একই ব্যাপার ঘটতে পারে। কোনো মনুষ্যশিশু যদি জন্মের পর থেকেই মনুষ্যেতর জীব দ্বারা প্রতিপালিত হয় তাহলে সেই শিশুটি বড়ো হবার পরেও মানুষের

শিম্পাঞ্জী ইঁদুরের সঙ্গে খেলা করছে

সঙ্গ পছন্দ করবে কিনা সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

যাই হোক, এতক্ষণের আলোচনা পড়ে মনে হতে পারে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির প্রভাবেই দুই ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠতে পারে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিশেষ পরিস্থিতি মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু বিখ্যাত শিকারীদের বিবরণ থেকে জানা গিয়েছে যে, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশেও এমনি ধরনের অস্বাভাবিক সম্পর্কের নজির খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

বুনো বেবুন ও ভেড়ার মধ্যে এমনিতে কোনো সখ্যতা নেই। বরং সুযোগ পেলেই বুনো বেবুন ভেড়াকে আক্রমণ করে বসে। কিন্তু এই বুনো বেবুন ও ভেড়ার মধ্যেও নিবিড় সখ্যতার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছে। ব্যাপারটি ঘটেছে আফ্রিকায় এবং একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার বিবরণ সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা চলে। এই আফ্রিকাতেই অপর একজন প্রত্যক্ষদর্শী শেয়ালের সঙ্গে এক-জাতের হরিণের সহচারিতার দৃষ্টান্ত দেখে এসেছেন।

সবশেষে এই আফ্রিকারই আরো একটি আশ্চর্য সহচারিতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আজকের আলোচনা শেষ করি।

ঘটনাটি ঘটেছে আফ্রিকার গোল্ড কোস্ট-এ। একটি গিরগিটির পিঠের ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল ভয়ংকর বিষধর একধরনের গেছো সাপ। আর এই অবস্থায় দুজনে পরম আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি এই আশ্চর্য দৃশ্যকে ক্যামেরায় ধরে এনেছেন। ক্যামেরার সাক্ষ্যকে নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করা চলে না।

* * *

মনোযোগী পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে এই আলোচনার সবকটি দৃষ্টান্তই বিদেশের। সুতরাং তাঁরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, আমি কোনো বিদেশী বই থেকে দৃষ্টান্তগুলো সংগ্রহ করেছি। বইটি এনা পিনার-এর 'বর্ন অ্যালাইভ'। বইটি যদি সংগ্রহ করতে পারেন তো অবশ্যই পড়ে দেখবেন। বইটিতে জীবজন্তুদের সম্পর্কে নানা বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

জীবজগতের চালচলন লক্ষ্য করতে গিয়ে জীবের সঙ্গীনির্বাচনের আরো একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য জানা গিয়েছে। ভেড়ার কথাই ধরা যাক। কথায় বলে ভেড়ার পাল। অর্থাৎ ভেড়া কখনো দল-ছুট থাকে না। কিন্তু কোনো ভেড়ার ছানাকে যদি জন্মের পর থেকেই বেড়ালের দুধ খাইয়ে বড়ো করে তোলা হয় তাহলে দেখা যাবে স্বভাবের দিক সে একলসেঁড়ে হয়ে উঠেছে। মাঠে চরাতে নিয়ে গেলেও সে দলে ভিড়তে চায় না। একা একাই ঘুরে বেড়ায়। বরং যেন মানুষের সঙ্গই বেশি পছন্দ করে।

ভারতের চিড়িয়াখানাগুলিতেও নিশ্চয়ই এমনি ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে বা ঘটানো হয়ে থাকে। ভারতের বনেজঙ্গলে যাঁরা ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁরাও নিশ্চয়ই অনেক কিছু লক্ষ্য করেছেন। আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করছি, জানাবার মতো ঘটনা যদি কিছু থাকে তো আমাদের কাছে লিখে পাঠান। এটি এমনই একটি বিষয় যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ খুবই কম। অতএব অভিজ্ঞতা-বিনিময়ে সকলেই লাভবান হবেন।

চন্দন সিংই একদিন তাকে আভাস দিয়েছিল।

শেয়ালদা স্টেশন হয়ে গাড়ী করে বেরিয়ে আসছিল সার্কুলার রোডে। নোংরা রাস্তার এখানে ওখানে জমা হয়ে আছে আবর্জনা, তার চাইতেও কুৎসিত দুপাশে উদ্বাস্তুদের সংসার। দেওয়াল ঘেঁষে, রেলিঙের গায়ে, ছেঁড়া চট-মাদুরে-তিপল-কাঠ যা পেয়েছে তাই দিয়ে ঘর তৈরি করেছে। হাঁস-মুরগীর খাঁচার চাইতেও কদাকার। সেই তিন হাত চওড়া, কাকের বাসার মতো ঘরে হাড়-জিল্জিলে মায়েরা তোলা উনুনে এলু-মিনিয়ামের তোবড়ানো কড়াইতে কী সব রান্না চাপিয়েছে আর চারদিকে ঘুরছে একপাল ছোট-ছোট উলঙ্গ ছেলেমেয়ে। তাদের ভেতরে যারা একটু বড়ো তাদের পরনে ছেঁড়া প্যাণ্ট,—ছেঁড়া জামা। কখনো ভিক্ষে চাইছে, কখনো মাইকে শোনা হিন্দি ছবির গান গাইছে চিৎকার করে, কখনো বা চলন্ত রিকশার পেছন ধরে ছুটতে ছুটতে যাত্রীর গালাগাল খাচ্ছে।

আর সেই সময় অমিয়র মনে হয়েছিল, তাদের নারকেলডাঙার জীবন এর কাছে স্বর্গ। যে হিন্দুস্থানী বেদেরা ছ' পা-ওলা গোরু আর গলায় মালা-পরা ছাগল নিয়ে ইডেন গার্ডেনের পাশে তাঁবু গেড়ে রাত কাটায়, কিংবা চিঁড়ে-পট্টির পাশে হাওড়া ব্রীজের তলায় যে বাঙালীরা সংসার পেতেছে, তারাও অনেক সুখে আছে এর চাইতে।

চন্দন সিং বলেছিল, বাঙালী।

—হুঁ।

—রিফিউজি।

শুকনো গলায় অমিয় আবার বলেছিল, হুঁ।

চন্দন সিং বলেছিল, পাঞ্জাব সে ভি বহুৎ রিফিউজি এসেছিল। সারা হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে গেছে তারা। কিন্তু এমন হালৎ তাদের কোথাও তুমি দেখবে না। এমনভাবে ভেড়ী-বকরির মতো দিন গুজরাণ করে না তারা।

—কী আর করবে?

—না, কিছু করবে না।—চন্দন সিং বলেছিল, ভিখ মাংবে, নয় পান-বিড়ির দোকান করবে আর না হয় দু-চার পয়সার ফিরি করে বেড়াবে। সরকার সে কুছ কুছ ক্যাশ-ডোল মিলবে—ব্যাস্! আরে ভাইয়া, ভিখ্‌সে জাত বাঁচে না। কাম করো, কোসিস্ করো—লড়াই করো। নেহি, উস্‌মে কোই নেহি। ঝোপড়ীমে রহো, আউর ভিখ মাংতে মাংতে জিন্দগী খতম কর্ দো!

অমিয়র গা জ্বালা করছিল। বাঙালীর সম্পর্কে দু-চার কথা চন্দন সিংকে বলা দরকার এও মনে হয়েছিল তার। কিন্তু বলবার মতো কিছু সে খুঁজে পায়নি।

সেইদিন অমিয় বলেছিল, চন্দন সিং, আমি ব্যবসা করব।

—বহুৎ খুশীকা বাত।

—প্রথমে ট্যাক্সি চালাব, তারপর—

—ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়।

আজ দুমাস ধরে এই স্বপ্নেই বিভোর হয়ে আছে অমিয়। একটু একটু চালাতে শিখছে অমিয়, কখনো কখনো রেড রোডে তার হাতে স্টিয়ারিং ছেড়ে দেয় চন্দন সিং। কিছু দিনের ভেতরেই গাড়ীতে একটা এল্ হরফ লাগিয়ে সে আরো ভালো করে চালাবে। শেখা হয়ে গেলে চন্দন সিং ট্যাক্সির ড্রাইভারী জুটিয়ে দেবে তাকে। গাড়ী চালিয়ে অমিয় টাকা জমাবে, নিজের গাড়ী কিনবে, কিস্তিতে কিস্তিতে গাড়ীর টাকা শোধ করে দেবে, তারপর—

চন্দন সিংয়ের দাঁড়াতে বারো-তেরো বছরের বেশি সময় লাগেনি। তার কত-দিন লাগবে? মোজেইক-করা মেঝে, নরম গদীর বিছানার পাশে সাদা টেলিফোন, একটা প্রকাণ্ড মোটর—যা দেখতে দেখতে আশি-একশো মাইল স্পীড নেয়—অনেক টাকা—আর—

রাতে বাড়ী ফেরবার আগে, কখনো কখনো বেলেঘাটার খালের নোংরা পুলটার উপর দাঁড়িয়ে পড়ে অমিয়। নীচে কালো পঙ্কিল জলের ওপর সারি সারি বোঝাই নৌকো; কখনো নৌকো থেকে খড়ের অদ্ভুত গন্ধ আসে—কখনো বা পুলের তলায় এসে আটকানো একটা মরা বাছুর কিংবা কুকুর সুবাস ছড়ায়। অমিয়র পাশেই হয়তো একটা কুষ্ঠ রোগী বসে বসে রহমান খোদার নামে পথ-চারীদের কাছে ভিক্ষে চায়। কিন্তু পাশে তাকায় না অমিয়—নীচের দুর্গন্ধ ঘোলা জলের দিকেও না। তারপর রাজা-বাজারের মাথার ওপর দিয়ে ঈদের চাঁদের মতো এক ফালি বাঁকা চাঁদ উঁকি মারে, তার আবছা আলোতে টুকরো টুকরো মেঘগুলোর ওপর অমিয় কল্পনার ছবি দেখে। কোনো মেঘকে সাদা নতুন ফ্যাশনের বাড়ীর মতো দেখায়—কোনোটা স্ট্রীম লাইন মোটরের রূপ ধরে—কোনোটাকে রবারের গদী-আঁটা বিছানার মতো দেখায়। ওই চাঁদটা তখন কেবল আকাশেই জ্বলে না—অমিয়র বুকের ভেতরেও জ্বলতে থাকে—হৃৎপিণ্ডে এক-একটা তীরের মতো রক্ত ছুটে যায়।

বাড়ীতে যে কাণ্ডটা ঘটে গেছে, অমিয় তার সবটাই জানিয়েছিল চন্দন সিংকে। শুনে ক্ষেপে গিয়েছিল চন্দন সিং।

—চলো, দেখিয়ে দাও আমাকে। জান নিয়ে নেব একদম।

অমিয় আঁৎকে বলেছিল, না-না। পুলিশেই সব করছে।

পুলিশ কী করবে? দো-চার আদমিকে ধরে চালান করবে—ব্যাস। ওইসা নেহি। বদমাসের জন্যে দুসরা কানুন। চলো—কৃপাণ দিয়ে বিলকুল খতম করে দিচ্ছি।

—এখন নয়—এখন নয়।—অমিয় বলেছিল, দরকার হলে পরে তোমায় ডাকব।

কয়েকদিনের ভেতর চন্দন সিংয়ের সঙ্গে অমিয়র দেখা হয়নি। বাড়ীতে বিশ্রী আবহাওয়া—দিদি হাসপাতালে—সব মিলিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা অমিয়র মন থেকে আপাতত মুছে গিয়েছিল। কিন্তু আজ এই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে হঠাৎ তার দেখা হয়ে গেল চন্দন সিংয়ের সঙ্গে। তারপরেই একটা মস্ত মোটরগাড়ীতে লিফ্‌ট জুটল ভাই-বোনের।

নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে গাড়ীটা বেরিয়ে এল সার্কুলার রোডে। কিন্তু ডাইনে শেয়ালদার দিকে না ঘুরে চন্দন সিং বাঁক নিলে ধর্মতলার দিকে।

অমিয় ব্যস্ত হয়ে বললে, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? আমরা বাড়ী ফিরব যে। আমাদের রাজাবাজারের মোড়ে নামিয়ে দিলেই চলবে।

চন্দন সিং তার সামনের আয়নায় তৃপ্তির মুখের ছায়াটা দেখতে পাচ্ছিল। কোঁকড়া কালো চুলের ভেতরে ফুলের মতো ফুটে আছে। পাতলা ঠোঁটে লিপ্-ষ্টিক নেই, গালে রং নেই, ভুরুতে কালো পেন্‌সিলের ছোঁয়া নেই। তবু রাতের ঝলমলে আলোয় অনেক রং মেখে যারা কলকাতার পথ-সিনেমা-দোকান-রেস্তো-রাঁকে শাহী মীনাবাজার গড়ে তোলে—তাদের কারুর চাইতে কম যায় না। চন্দন সিংয়ের মনে হল—হাঁ, এমন মেয়ের জন্যে যদি দু-একটা বোম-ওম্ গিরেই—তাতে চমকাবার কিছু নেই।

কিন্তু অমিয়র কথার একটা জবাব দিতে হল।

—তোমার বহিনের সঙ্গে প্রথম জান-পহ্‌চান হল। থোড়া চা উ পিলাই।

তৃপ্তির বুকের ভেতর ভয়ে ছমছম করে উঠল। গৌরাঙ্গবাবুর ছায়া দুলে উঠল চোখের সামনে।

ফিসফিস করে তৃপ্তি বললে, বাড়ী

চল্ ছোড়দা। দেরী হলে বাবা রাগ করবে।

কথাটা চন্দন সিংয়ের কানে গেল। মুখ ফিরিয়ে তৃপ্তির দিকে চেয়ে দেখল একবার।

—দেরী হোবে না। ট্রামে-বাসে বাড়ী ফিরতে যে সময় লাগত, তার আগেই পৌঁছে দেব।

—না-না।—তৃপ্তি আরো ব্যাকুল হয়ে উঠল : আমি চা খাই না।

—অমিয় খাবে। আপনাকে মিঠাই খিলাব।

অমিয় দ্বিধায় দুলছিল। চন্দন সিং তার দোস্ত। শুধু দোস্তই নয়—লাখ টাকার স্বর্গে ওঠবার সিঁড়িটাও সে-ই অমিয়কে ধরিয়ে দেবে, এমনি আশাও দিয়েছে। চন্দন সিংকে চটিয়ে দেওয়াটা তার ভালো লাগল না।

—চল্ না—বেশি দেরী হবে না।—অমিয় ভীরুর মতো তাকালো তৃপ্তির দিকে : বাবা জানতে পারবে না।

তৃপ্তির ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে চেপে বসল। মাত্র পনেরো দিন আগেও সে আলাদা ছিল—দুঃখের সংসারে মা-র সংগে কাজের ভার টেনে চলা ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারত না—ভাববার সময়ও ছিল না। শুধু নিজের মনটাকে টের পেত তখনই, যখন দেখত বেলা সাড়ে দশটায় সামনে দিয়ে চলেছে স্কুলের মেয়েরা, ব্যাগ নিয়ে, বই নিয়ে, বিনুনী দুলিয়ে। তখন কান্না পেত তৃপ্তির। মনে পড়ত, স্কুলে সে সেকেন্ড, থার্ড হত—হেড্ মিস্ট্রেস্ হাফ-ফ্রী দিয়েছিলেন। কিন্তু বাতের যন্ত্রণায় বাবা যখন বিছানা নিলেন, তখন তা-ও আর চলল না। ওদিকে রিফিউজী স্টাইপেন্ড বন্ধ করে দিল—পড়া ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না আর। তৃপ্তি ভাবত, দিদি তো এখন অনেক টাকা রোজগার করে, তাকে বললে কি আবার স্কুলে ভর্তি করে দেয় না?

কিন্তু দিদি বাড়ী ফিরল মাঝরাতে—তার মুখে মদের গন্ধ। ঘুমের ভেতরে জড়িয়ে জড়িয়ে কী সব ইংরেজি বলছিল, বিশ্রীভাবে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল দু-তিনবার। তারপর বড়দার এক-আধটা কথার টুকরো তার কানে এল। এক মিনিটে যেন তৃপ্তির চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে গেল একটা। সব বুঝল না—অনেকটাই বুঝতে পারল। তারও পরে সেই চিঠি—বাবা যেটাকে টুকরো টুকরো করে আগুনে দিয়েছিলেন—সেই বোমা—

গাড়ীটা এর মধ্যে ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে এগিয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। তৃপ্তি প্রায় চিৎকার করে উঠল : ছোড়দা, বাড়ী চল্। বাবার শরীর ভালো নেই।

—তাই নাকি?—চন্দন সিং আবার তৃপ্তির দিকে ফিরে তাকালো : আমি জানতুম না—মাপ করবেন।

গাড়ী ফিরে সার্কুলার রোডে চলে এল।

অমিয় ক্ষুণ্নমনে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। এক সময় তৃপ্তির কানে কানে বললে, তোর সবটাই বাড়াবাড়ি। চন্দন সিং আমার বুজুম ফ্রেন্ড—ওর মতো ভালো লোক দেখা যায় না।

আমি জানতুম না—মাপ করবেন।

তৃপ্তি বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল—জবাব দিল না। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠছে—সেই আলোয় তার চোখ জ্বালা করতে লাগল। চারদিকে যেন অমলের মুখ দেখতে পাচ্ছে সে—পুরুষ মানুষের সব চোখগুলো ছুটে আসছে তার দিকে, সবাই যেন একটা করে বোমা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃপ্তি যদি আবার স্কুলে ভর্তি হতে পারত, তা হলে—

ও কে? কনকের বাবা নয়? ওই যে সামনের ট্রামে উঠে পড়ল?

সেই কনক। সেই অস্থিসার লম্বা মেয়েটা, মাথায় ঝাঁটার মতো চুল। ক্লাসে পেছনের বেঞ্চিতে বসে ঝিমুত, প্রায়ই কাশত খক খক করে, গায়ে জ্বর নিয়েও আসত কোনো কোনোদিন।

শেষ পর্যন্ত জানা গেল, কনকের যক্ষ্মা হয়েছে।

হেড্ মিস্ট্রেস যেদিন তাকে ছাড়িয়ে দিলেন স্কুল থেকে, সেদিন ছুটে এসেছিল ওই লোকটা—কনকের বাবা।

—স্কুল থেকে নাম কেটে দেবেন ওর। তা হলে রিফিউজী স্টাইপেন্ডের টাকা-টাও তো বন্ধ হয়ে যাবে।

হেড্ মিস্ট্রেস্ কিছুক্ষণ অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিলেন কনকের বাবার দিকে। তারপর বলেছিলেন, আপনি মানুষ না আর কিছু? আমার স্কুল থেকে বেরিয়ে যান।

ব্যাপারটা তৃপ্তির চোখের সামনেই ঘটেছিল। কী একটা কাজে হেড্ মিস্ট্রেস তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তখন।

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলে হেড্ মিস্ট্রেস বলেছিলেন, মেয়ের মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, তবু রিফিউজি স্টাইপেন্ডের টাকা আদায় করা চাই! রিফিউজি হলে সে কি আর মানুষ থাকে না? ছি-ছি!

তৃপ্তি ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু কনকের বাবাকে দেখবার সংগে সংগে সবটা জেগে উঠল চোখের সামনে। শুনেছিল কনক মরে গেছে। তৃপ্তির মনে হল, শুধু কনক মরেনি—ওরা সবাই মরছে। দিদি-মা-বাবা-দাদা সবাই। হয় মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে, নইলে বোমা পড়বে, আর না হলে—

আচ্ছা, দিদির সংগে কনকের কি মিল আছে কোথাও?

হঠাৎ তৃপ্তির চমক ভাঙল। চন্দন সিং গাড়ীটা নিয়ে এসেছে রাজাবাজারের মোড়ে।

—এইখানেই নামবে তো অমিয়? না এগিয়ে দেব আরো?

অমিয় বললে, থাক। এইখানেই নামব আমরা।

(ক্রমশঃ)

স্নানযাত্রা ও সেকালের সমাজে

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকালে কলকাতায় স্নানযাত্রা-উৎসব বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই পালন করা হতো। ডবলিউ এস সিটন-কার উল্লেখ করেছেন যে, গভর্ণর জেনারেলের আদেশানুসারে প্রকাশিত সেকালের বিভিন্ন পর্বদিনের তালিকা যা রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি কর্তৃক ৩০-৪-১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে এই কথাই বলা হয়েছিল যে, স্নানযাত্রা এমন একটি দিন যে প্রয়োজন হলে উক্ত দিনে সরকারী কর্মচারীরাও ছুটি পেতেন। জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিতে বিষ্ণুর মহাস্নান-রূপ উৎসব। বিষ্ণুর স্নানের জন্য উৎসব হয় বলে একে স্নানযাত্রা বলে। পুরীধামে এই জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে আড়ম্বরের সঙ্গে স্নানযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বহু দূরে-দূরান্তর থেকে ভক্তবৃন্দ ঐ দিনে উক্ত স্থানে সমাগত হয়ে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের দর্শন করে থাকেন। অনেকে গৃহে চতুর্দশী নিশায় মণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ দেবতার পূজা করেন। পরদিন পৌর্ণমাসীতে পূজা এবং বিগ্রহকে স্নান করান।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় স্নানযাত্রার তত্ত্বকথায় লিখেছেন—

"তুমি মনে করিতেছ, ভারি ঘটা করিয়া বিগ্রহ স্নান করাইতেছি। একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ—যিনি বিশ্বরূপ, তিনি কি রূপে স্নান করিতেছেন। আকাশ ঘন-নীরদ-নীল-দিঙমণ্ডল শ্যামায়মান —চতুর্দিকে ঘোর ঘটা। কখনও বা বজ্রের ভৈরব রোল, কখনও বা বিজলীর হাসি। তোমার চন্দ্রাতপ, ঢাক-ঢোল, আলোকমালা—এই গম্ভীর শোভার কাছে কি তুচ্ছ! আর দেখ, কি বিরাট স্নান! দর দর করিয়া মুষল ধারে বর্ষা নামিল। আতপ-তাপিত বসুন্ধরা স্নিগ্ধ হইল—বিশ্ব-প্রাণ জুড়াইল। ঐ দেখ শ্যামসুন্দর বল্লরী-বেষ্টন তরুবর স্নান করিয়া ফুলদোলে বিধৌনিত হইতেছে। তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে স্বয়ং সংস্বরূপ মায়াময়ী শ্যামা প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া স্নান-বিলাস করিতেছেন? আরও উপরে উঠ। ঐ যে নীরদ-নীলিমা উহাও তোমার জীবিতেশের রূপ। আর ঐ যে বর্ষা, উহাও সেই প্রেমিকের ছল। সবই একাকার। অরূপ আজ শ্যামরূপ ধরিয়াছেন—শ্যামঘন—শ্যামময়-শ্যাম-প্রকৃতি।

আজ স্নান-যাত্রার দিনে ভেদ ভুলিয়া যাও। অসীম অম্বর হইতে ঝরঝর ধারা পড়িতেছে বিপুল ভূমণ্ডল অভিষিক্ত হইতেছে। ভাল করিয়া বুঝিলে জানিতে পারিবে যে, ইহা বিশ্বরূপের স্নানযাত্রা ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

সেকালে স্নানযাত্রার পবিত্র দিনে এক শ্রেণীর লোক কোনরূপে ধর্মানুষ্ঠান বা পূজা-পাঠ কিছু না করে নিছক আমোদ করে সময় কাটাতেন। নৌকা নিয়ে বিহার করতে বার হতেন। কলকাতার আশ-পাশের কয়েকটি জায়গায় স্নানযাত্রা উপলক্ষে ভিড় হতো যথেষ্ট। বর্তমানে যেমন ১লা জানুয়ারী নববর্ষ উপলক্ষ করে শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনে ভিড় হয় এবং বনভোজন, গান-বাজনা অনেকে করে থাকেন। সেকালে স্নানযাত্রার দিনে অনেকে নৌকা নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করেই কাটাতেন।

সেকালে কলকাতা শহরে গাঁজা খাওয়া বেশ বেড়েছিল। শহরের বিভিন্ন স্থানে গাঁজার আড্ডা থাকত। বৌবাজারের দলকে বলা হতো পক্ষীর দল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা—"রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে,—"সহরের ভদ্রগৃহের নিষ্কর্মা সন্তানগণের অনেকে পক্ষীর দলের সভ্য হইয়াছিল। দলে ভর্তি হইবার সময়ে এক একজন এক একটি পক্ষীর নাম পাইত এবং গাঁজাতে উন্নতি লাভ সহকারে উচ্চতর পক্ষীর শ্রেণীতে উন্নীত হইত।"

"হুতোম প্যাঁচার নক্সা" গ্রন্থে উল্লেখ আছে—"এ সময় বোসপাড়ার ভেতরও দু-চার গাঁজার আড্ডা ছিল।"

সেকালের এক শ্রেণীর ধনী ব্যক্তিরা বাড়ীর বিভিন্ন উৎসবে অতিথিদের জন্য মদের ব্যবস্থা করতেন। মদ্য পান করে অনেকে পথে খোলা নর্দমায় হাবুডুবু খেতেন। অনেকে মদ খেয়ে চলার শক্তি হারিয়ে ধামা দিয়ে চলাতেন। মদ খেয়ে মুটের মাথায় ঝাঁকায় চেপে বাড়ী ফেরা ছিল সেকালের বাবুয়ানা। সেকালের বহু ধনী ব্যক্তি মদ্য পান করে সারা রাত প্রমোদকাননে কাটিয়ে ভোরের দিকে ফিরতেন জুড়িগাড়ী চেপে। অবশ্য এইটি ছিল আভিজাত্যের গৌরব।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেকালের সমাজ-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—"সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত ছিল না। তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোনও সুহৃদগোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত। ধনীগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে, পুত্র-কন্যার বিবাহে, পূজা-পার্বণে প্রভূত ধন ব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন।"

শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেছেন—"এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে "বাবু" নামে এক

শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগ সুখেরই দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমিরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনটকরা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগ্‌লস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতো। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত, এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।"

রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন—"আমার ইচ্ছা ছিল যে, আরো দুই-তিন বৎসর পড়ি, কিন্তু একটি উৎকট পীড়া জন্মানোতে আমি ১৮৪৪ সালের প্রথমে কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। উক্ত উৎকট পীড়ার কারণ অপরিমিত মদ্যপান। তখন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই।"

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন—"আমি পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল (ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া শান্তিপুরে অনেক দিন কার্য করিয়াছিলেন) প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদীঘিতে মদ খাইতাম, এবং যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিককাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না)।"

সেকালের সমাজচিত্রের বর্ণনা "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" গ্রন্থেও উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে—

"পূর্বে স্নানযাত্রার বড় ধুম ছিল—বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচ খেলা হত, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যাম্‌টা ও বাইয়ের হাট লেগে যেতো। কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুতোর, কাঁসারি, কামার ও গন্ধবেনে মশাইরাই ধা রেখেছেন, মধ্যে মধ্যে দু-চার ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন কোন ছোক্‌রা-গোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।"

সেকালের মাসিক "বসন্তক" পত্রিকায় (১৮৭২-৭৩) স্নানযাত্রা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল—

"এ পরবটি প্রায় মাঝারি দলের ইয়ার লোকেরাই একচেটে কোরে নেছেন। বড় বড় নামজাদা ইয়ারেরা এটাতে পূর্ব্বে বড় আমোদ করেছেন ও এখন নাম খাতায় উঠে ডাক সাইটে হয়ে পড়েছে। যারা সকল ইয়ারকির পথে নূতন কাক তাদেরই এটা বড় দরকারি, একখানি গহনার নৌকা বোঝাই কোরে মেয়ে মানুষ নে দু-চারবার স্নানযাত্রায় যেতে না পাল্লে ইয়ারের দলে নামজারী হবার যো নাই ও পুরানা কুরুচেরা তা না হলে কল্‌কে দেবেন না। স্নানযাত্রার জন্য সকলেই অগ্রের দিবস রাত্রে কলিকাতা থেকে রওনা হয়। তা এবার রবিবারে স্নানযাত্রা পড়াতে বড়ই সুবিধে হয়েছিল, অনেক চাকরকে সাহেবের নিকট বাপের ব্যামো হয়েছিল বলে ছুটি নিতে হয়নি। শনিবার রাত্রে সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে যাত্রা কোরেছিল—সকলেই সরঞ্জাম আপন আপন সাধ্য মত কোরেছিল—তিলকাঞ্চন থেকে দান-সাগর পর্যন্ত বল্লে বলা যায়। কিন্তু রবিবারের সকাল বেলা সহরে বড় রগড় উঠেছিল— মল্লিকদের ষোল বছরের ছেলেটীকে রাত্রে না দেখতে পেয়ে তাঁর মা কেঁদে কেটে পড়ে আছে, দত্তদের মেজকত্তা লোহার সিন্দুকে এক তোড়া টাকা কম দেখে বুকে হাতদে পড়েছেন, শীলদের সেজবোর হাতের খাড়ুগাছটা পাওয়া যাচ্ছে না, ঢোলেদের হাতবাক্সটা খিড়কির দ্বারে ভাঙ্গা পড়ে রয়েছে, নাপতেদের লালপেড়ে কাপড়খানি পাওয়া যাচ্ছে না, সেকরাদের পাতকোতলার ঘটিটী হারায়েছে। এইরূপ গণ্ডগোল সহর ভরা—স্নানযাত্রার এই কি ধর্ম?"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংকলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" গ্রন্থে ৫ই জুন ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের স্নানযাত্রার সংবাদ উল্লেখ আছে।

"আগামি মঙ্গলবার ৮ই জুন ২৭শে জ্যৈষ্ঠ মোং মাহেশে জগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা হইবেক। এই যাত্রা দর্শনার্থে অনেক ২ তামসিক লোক আবালবৃদ্ধবনিতা আসিবেন ইহাতে শ্রীরামপুর ও চাতরা ও বল্লভপুর ও আকনা ও মাহেশ ও রিসিড়া এই কএক গ্রামে লোকেতে পরিপূর্ণ হয় এবং পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা ও চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে বজরা ও পিনিস ও ভাউলে এবং আর ২ নৌকাতে অনেক ধনবান লোকেরা নানা প্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ ও অন্য ২ প্রকার ঐহিক সুখ সাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া আইসেন পরদিন দুই প্রহরের মধ্যে জগন্নাথদেবের স্নান হয়। যে স্নানে জগন্নাথদেবের স্নান হয়, সেখানে প্রায় তিনচার লক্ষ লোক একত্র দাঁড়াইয়া স্নান দর্শন করে।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই যাত্রা এমন সমারোহ অন্যত্র কোথাও হয় না।"

স্নানযাত্রা উপলক্ষে নৌকাযোগে বিহার করা সেকালের শুধু ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এমন কি সাধারণ মানুষ যারা দিন-মজুরী করে খেতো তাদের মধ্যেও ছোঁয়াচে রোগের মতই এর প্রভাব পড়েছিল। প্রচণ্ড গরমের পর মাঝে মাঝে দু-এক পসলা বৃষ্টির ছোঁয়ায় মানুষের মনে জাগে আনন্দের শিহরণ। স্বচ্ছ সলিলা ভাগীরথীর খরস্রোতের উপর দিয়ে নৌকায় ভ্রমণের মধ্যেও ছিল মাদকতা। ধর্মের নেশা, ভ্রমণের নেশা, প্রকৃতির হাতছানি, তা ছাড়া গাঁজাকার ধোঁয়ার আকর্ষণ এবং মদের পিপাসা সেকালের একদল মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য ঘরছাড়া করতো স্নানযাত্রার দিনে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ৬ ॥

দিন পাঁচেক হ'ল মুখানড মান্ড ছেড়ে নূতন মান্ডে এসেছি। নাম মল্লাই বাঁধি-মান্ড, মুখানড মান্ড থেকে মাইল পনের দূরে। কাছাকাছি আরও গোটা কয়েক মান্ড রয়েছে। সবগুলি মান্ড থেকেই সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। মুখানড মান্ডে থেকেছি মাস খানেক, এখানেও বেশ কিছুদিন থাকতে হবে।

একটি পাহাড়ের উপর মান্ড। পাহাড়টির পরিসর এত বেশী যে পাহাড় বলে মনে হয় না হঠাৎ, মনে হয় মাল-ভূমি। সামনের দিকে যে জমি নেমে গেছে তার ওপাশেই একসার ছোট পাহাড়। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত চলে গেছে দূসর পাহাড়ের সার। উপত্যকা দিয়ে চলে গেছে একটি নদী, কোথাও সরু, কোথাও চওড়া। তেমন স্রোত নেই, কারণ উপত্যকার জমি বেশ সমতল অন্ততঃ বেশ খানিকটা জায়গা পর্যন্ত। মান্ড থেকে দেখা যায় দুপুরবেলা পাহাড়ের নদীতে যে ছোট ছোট রূপালী ঢেউ ওঠে, সন্ধ্যায় নদীতে ফাগে ঢাকা পাহাড়ের ছায়া পড়ে, আর পড়ে সুদীর্ঘ ইউকালিপটাস গাছের ছায়া। উপত্যকার অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে ছোট ছোট কাঁটাগাছের ঝোপ। তাতে ধরে আছে অজস্র হলুদ রঙের ফুল, মনে হয় হলুদ কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে সেখানে। এতটা জায়গা নিয়ে হলুদ ফুলের এত সমারোহ আর কোথাও দেখিনি।

এখানে কিন্তু পাকাঘরে আছি। তিনটি টোডাদের বিশেষ ধরণের কুঁড়ের পাশেই পাকা কোঠাঘর। আসলে বড় কোঠাঘরের মাঝখানে দেয়াল দিয়ে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কোঠাঘরগুলির দেয়াল পাথরের চাপ দিয়ে তৈরী। চাপ চাপ পাথর জোড়া দেওয়া হয়েছে মাটির সিমেন্টে। ছাদ টালীর। উটকামন্ডের অনেক বাড়ী-ঘরই ঠিক এভাবে তৈরী। টোডারাও মাটি-পাথর-টালী দিয়ে ঘর তৈরী শুরু করেছে। পুরোনো দিনের কুঁড়েঘরগুলির অসুবিধা তাদের চোখে পড়েছে। চোখে পড়েছে ঘরের অন্ধকার, রান্নার ধোঁয়া, বদ্ধ বাতাস আর হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢোকা।

এ মান্ডে আছে চারটি পরিবার। একটি কুঁড়ে খালি ছিল, সেই খালি ঘরেই চলে গেল একটি কোঠাঘরের পরিবার আমাকে ঘরটি ছেড়ে দিয়ে। আর একটি কোঠাঘরে রইল আর একটি পরিবার। মান্ডের মন্দিরটি থাকার ঘরগুলি থেকে একটু দূরে।

কাল সকালে গিয়েছিলুম পিনাপেল মান্ডে। মাইল দুই দূরে। একটা মাঝা-মাঝি উতরাইতে নেমে এসে আবার চড়াই ধরতে হয়। পরিচিত ঘাসে-ঢাকা চড়াই-উতরাই। মাঝে মাঝে গ্রানাইট পাথরের বড় বড় চাপ। তার সবটাই মাটিতে প্রায় ঢাকা, শুধু একটু বেরিয়ে পড়া অংশ তার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। এখানে সেখানে 'কম্রোটী'রা সে পাথর ভাঙছে, বিরাট হাতুড়ি আর পাথরের বুক চিড়বার মত গোল বাটালী দিয়ে। জ্যামিতিক আকারের দাগ কেটে পাথর ভাঙা হচ্ছে। পাথর কাটা, পাথরের পর পাথর বসিয়ে দেয়াল গাঁথা, আর পাথুরে রাস্তাঘাট তৈরী করা এদের কাজ। পাথরের ব্যবহার খুব বেশী নীলগিরিতে। কম্রোটীদের কাজ এখন আরও বেড়ে গেছে। নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরী হচ্ছে, বাঁধ তৈরী হচ্ছে।

একটি ঝরনা পার হতে হ'ল। ঝরনার যে দিকটায় অ্যাকেসিয়া আর নাম-না-জানা গাছেরা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে সেই দিকটাই পথ। ঝরনা চলে গেছে ছোট বনটির ভিতর দিয়ে পাথর-নুড়ির বাধা অমান্য করে—গিরি-নদীর বিহারিণী হরিণীর মতো। একটি গাছের ডাল নেমে এসে ঝরনার জলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। তাতে অজস্র ছোট ছোট ফল। বেতফলের মত। পাকলে নাকি ভারী মিষ্টি হয়, এখন কাঁচা, তাই টক।

বনটা পার হতেই পিনাপেল মান্ড চোখে পড়ল। মান্ডে মাত্র তিনটি কুঁড়ে, মন্দির নেই। সামনের ঘরটির চত্বরে যেতেই ঘর থেকে একটি প্রবীণা বেরিয়ে এল। একটি কম্বল পেতে দিয়ে বিশ্রাম করার আমন্ত্রণ জানাল। ঘরে আর কে আছে? না বুড়ো আছে। ওই দূরে মোষের খোঁয়াড়ের কাছে দুধ দুইছে।

বুড়ো এল। বছর সত্তর বয়েস। দীর্ঘ দেহ, মুখ দাড়ি গোঁফে ঢাকা, প্রশান্ত দৃষ্টি। প্রবীণ টোডাদের চেহারা যেমন হয়ে থাকে। দু'হাতে দুধের ভান্ড। গৃহিনী ঘর থেকে দুটি বড় গ্লাস নিয়ে এল। বুড়ো দুটি গ্লাস কাঁচা দুধে ভরে দিয়ে আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিল। এক এক গ্লাসে আধ সের করে দুধ। সে দুধে মোষের গায়ের উত্তাপ রয়েছে তখনও।

একটি টোডা পরিবার

—মাখন।

—মাখন!

মাখন ব্যবহার হয় তেলের বদলে। শুধু কি চুলে? মাখন মাখা হয় মুখে, গালে স্নোয়ের মত করে। সারা গায়েও মাখা হয়, বেশ জবজবে করে। পুরুষরাও গায়ে মাখে। মাখন মাখার জন্যই টোডাদের গা থেকে কেমন একটি সামান্য উৎকট গন্ধ আসে। অনেকটা পুরানো ঘিয়ের গন্ধ।

মাখন মাখা আর আঁচড়াবার কাজ শেষ হয়ে গেলে, ভেঙে ভেঙে ভাজ করা হ'ল প্রত্যেকটি গোছা। তারপর গুঁজে দেওয়া হল গোছার গোড়াতে। এভাবে থাকবে বেশ কয়েক ঘণ্টা, তারপর খুলে দেওয়া হ'বে প্রতিটি গোছা।

॥ ৭ ॥

মাণ্ডের দুটি পাকাঘরের একটিতে যে আমি আছি সে কথা আগের চিঠিতে লিখেছি। যে টোডা পরিবার পাশের ঘরে আছে তাতে মাত্র তিনটি মানুষ, দুজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক। পুরুষদের একজনের বয়স পঞ্চান্নর মত আর দ্বিতীয় জনের চল্লিশ। স্ত্রীলোকটির বয়স পঞ্চাশের ভিতরেই হ'বে। কোন ছেলেপুলে নেই, এক ঘরেই সবাই থাকে। কি যে এদের ভিতর সম্পর্ক বুঝতে পারি না। একদিন প্রবীণ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিল যে মেয়েমানুষটি তার স্ত্রী, অথচ অন্য লোকটি কথায় কথায় আজ বল্ল যে তার স্ত্রীর শরীরটি তেমন ভাল নয়।

—তোমার স্ত্রী কোথায়?

যেখানেই গেছি অভ্যর্থনা হয়েছে এক প্লাস কফিতে বা এক প্লাস দুধে, না থাকলে এক প্লাস ঘোলে। কেউ টোডাদের কাছ থেকে খালিমুখে ফেরে না।

বসে জিজ্ঞাসাবাদ করছি, এমন সময় দেখি বাড়ীতে ঢুকল একটি বছর পঁচিশ বয়সের মেয়ে, আর কর্তা-গৃহিণীর চোখ-মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সমস্বরে বলে উঠল, এসেছে এসেছে, পুথনীর এসেছে! আমাদের মেয়ে এসেছে।

মেয়েটি মা বাবাকে দেখতে এসেছে, স্বামীর ঘর থেকে। মেয়েটি তার বাবার কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে মাথাটি বাড়িয়ে দিল তার দিকে। সযত্নে তৈরী করা চুলেরগুচ্ছ কয়টি ঝুলে পড়ল সামনের দিকে। বুড়ো দাঁড়িয়ে প্রথমে তার ডান পা মাটি থেকে প্রায় দু' ফুট তুলে মেয়েটির মাথায় রাখল, তারপর ঠিক সে ভাবেই বাঁ পা রাখল।

মেয়েটি এরপর গেল তার মায়ের কাছে। গিয়ে আবার হাঁটু ভেঙে মাথা নীচু করে বসল। মা বসে বসেই এক এক করে দু' পা-ই মেয়ের মাথার উপরে তুলে রাখল। এই হ'ল টোডাদের প্রণাম করার প্রথা। বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা দেখাবার নিয়ম। একে বলা হয় আডাবুড্ডিকেন। ...আমি পা ধরছি।

...মুল্লিমাণ্ড নামে আর একটি মাণ্ড থেকে ফিরে আসলুম। যে ঝরনাটির কথা ...য়েছিলুম, সে ঝরনাই এ মাণ্ডের পাশ দিয়ে বেঁকে চলে গেছে। মাণ্ডের কাছে যেতেই দেখি ঝরনার পারে একটা বেশ বড় পাথরে বসে তিনটি মেয়ে কেশ প্রসাধন করছে। স্নান সারার পর একজন আর একজনের কেশবিন্যাস করার ভার নিয়েছে। যেতে যেতে দেখলুম, প্রথমে মাথার সমস্ত চুল গোটা আটেক ভাগ করা হল পরিস্কারভাবে। এক একটি ভাগে এক একটি গুচ্ছ। প্রত্যেক গুচ্ছে চিরুণী চালাবার পর একটা বাঁশের কৌটা থেকে সাদা নরম মত জিনিষ নিয়ে বেশ করে মাখিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর আবার চল্ল চিরুণী।

—কি মাখছ গো চুলে?

উৎসবানুষ্ঠানে টোডা নারী

শিল্পী-বিচার করেননি দ্বিতীয়তঃ তৎকালীন শিল্পীরাও সমাজের সঙ্গে মোটেই জড়িত থাকতে ভালবাসতেন না। তাঁদের অন্য জগতের লোক বলে মনে হত এই কারণে সাধারণ মানুষের মন থেকে তাঁরা অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন, তাই যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে-বিদেশে যে নবজাগরণের স্রোত বয়ে গিয়েছিল তার ঢেউ সমাজে এসে লাগলেও সংস্কৃতির অন্যতম বাহন নাটকে প্রতিফলিত হয়নি। শিল্পীরা যদি সাধারণের সঙ্গে একাত্ম না হন তবে কোনদিনই তাঁদের পক্ষে শিল্পসচেতন হওয়া সম্ভব নয়, দেশের মানুষের জীবনের ব্যথা-বেদনা বা আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সঠিক রূপ দেওয়া যায় তখনই যখন মর্মের বাণী উপলব্ধি করার বোধশক্তি জাগে।

সুতরাং জনসাধারণ ও শিল্পীদের আঙ্গিক যোগাযোগ ঘটেনি বলেই বাংলা নাটক মাঝে মাঝে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং এই সব কারণেই তৎকালীন নাটক জনমনে উল্লেখযোগ্য সাড়া জাগাতে পারেনি। অন্যদিকে সৌখীন সংস্থাগুলি নাট্যাভিনয়ের আদিকাল থেকে সংযুক্ত থেকে নাট্য উন্নয়নের জন্য যে চেষ্টা করেছে এবং যার ফলে নূতন নূতন শিল্পী ও নাটক আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তাও ফলপ্রসূ হয়ে উঠেনি, নানা বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে এদের অনলস সাধনা ব্যাহত হয়েছে, মঞ্চমালিকদের কাছ থেকে এঁরা সহযোগিতা খুব কমই পেয়েছেন, তাই নাট্য উন্নয়নের প্রয়াস অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। রংগমঞ্চের মালিকেরা বেশীর ভাগ সময়ই নিছক ব্যবসাবুদ্ধির দ্বারা চালিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশে নাট্যশিল্পের বনিয়াদ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। পরস্পরে সৌহার্দ ও সহযোগিতা না থাকার ফলে যখন কোন প্রতিকূল অবস্থায় সম্মুখীন হতে হয়েছে তখনই নাভিশ্বাস উঠেছে। যদি সৌখীন সম্প্রদায়গুলির সাথে রংগমঞ্চের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকতো তবে বাংলার নাট্য আন্দোলন ও নাট্যকলা নূতন যুগের ধ্যানধারণা ও সমস্যাকে সার্থক রূপ দিতে সক্ষম হতো। সৌখীন সম্প্রদায়গুলির নাট্যসাধনা বহুকালের, এদের একনিষ্ঠতার অভাব কোনদিনই ছিল না, কিন্তু কিছুটা ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল ছিল বলে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে, অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে। তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সৌখীন সম্প্রদায়গুলির নিষ্ঠার জোর ছিল বলেই বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে নাটকের আবেদন অক্ষুন্ন রয়েছে।

প্রধান কথা নাটকের অভাব, জনরুচি অনুযায়ী নাট্য পরিবেশনায় গাফিলতি, তারই ফলে উদ্ভূত হয়েছিল নানা সমস্যা, এই সমস্যা নিরসনের কোন উপায় সেদিন মঞ্চমালিকদের পক্ষ থেকে কেউ উদ্ভাবন করতে পারেননি, প্রচুর অর্থাগমই নাট্য বিচারের চরম মাপকাঠি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মঞ্চমালিকেরা চলতেন। অন্যদিকে দেশে ছায়াচিত্র তার বর্ণবৈচিত্র্য নিয়ে নয়নলোভন বেশে এসে দাঁড়ালো। ছায়াচিত্র এলো পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে নানা রঙের অর্ঘ্য সাজিয়ে মানুষের মনকে রসায়িত করতে, ছায়াচিত্র দেখে ও তার বৈচিত্র্যময় কাহিনীর মধ্যে রসের সন্ধান পেয়ে জনসাধারণ মঞ্চনাটকের একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠার জন্য ছায়াচিত্রের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়লো। আর রংগমঞ্চগুলি দর্শকের অভাবে এবং পরস্পর প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। ছায়াচিত্রের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাটক পেরে ওঠেনি বলেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। অথচ ছায়াচিত্রের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাটক যে সমানতালে চলতে পারছে না তা জেনেশুনেও সেদিন মঞ্চমালিকেরা হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন, এই অবস্থার আশু প্রতিকারের জন্য কোন চেষ্টাই তারা করেননি বা সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে নূতন নাট্যকারদের আহবান জানাননি, বরং পুরানো নাটক মঞ্চস্থ করে দিনের পর দিন তার অভিনয় করিয়ে জনসাধারণের সংগে অসহযোগিতা করার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন।

যুগের পরিবর্তন ঘটছে, সংগে সংগে মানুষের মনেরও অতএব যুগোপযোগী বিষয় পরিবেশন করতে না পারলে তা যেন জনচিত্তে কোন সাড়া জাগাতে পারবে না একথা অনেকে বুঝলেও মঞ্চমালিকেরা বোঝেননি।

নাটকের এই স্থিতাবস্থা বেশীদিন চললো না। কারণ কোন কিছুই বেশীদিন চলতে পারে না। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। সৌখীন সম্প্রদায়গুলি এগিয়ে এলেন সেই চরম দুর্দিনে, হাল ধরলেন দৃঢ়ভাবে যুগোপযোগী নাটক পরিবেশন করে আবার মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটালেন এবং প্রমাণ করলেন যে নাটক কেবল আনন্দ বিতরণের জন্যই নয় শিক্ষারও অন্যতম বাহন।

বিরূপ মনোভাবাপন্ন জনসাধারণ আবার নাটকের দিকে আকৃষ্ট হলেন, শুরু হলো নাটকের জয়যাত্রা। অস্তাচলের রক্তিম রেখা মানুষের মনে হতাশার যে কালোছায়া ফেলেছিল তা

সরে গিয়ে প্রকাশিত হল দীপ্ত আলোকচ্ছটা। ভাবে ভঙ্গিতে প্রয়োগে নাটক জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। যে বাংলার প্রাণসত্তা যাত্রা, কথকতা ও লোকসঙ্গীত থেকে রস সংগ্রহ করেছে, যে বাংলা অনেক দুঃখ কষ্ট পীড়ন সহ্য করে সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে সে বাংলা ও বাঙালী কোনদিনই অন্তর থেকে নাট্যচেতনাকে অবলুপ্ত হতে দিতে পারে না, এ'দের চেষ্টা সফল হয়েছিল ও সার্থক হয়েছিল এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে নাট্য আন্দোলন এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। সেই নাট্যআন্দোলন এখনও অব্যাহত গতিতে চলছে।

নবনাট্য আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু আলোচনার আছে। নবনাট্য আন্দোলনের উদ্যোক্তা যাঁরা ছিলেন তাঁরা স্থায়ী কিছু করার চেয়ে সাময়িক আবেগকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তাই যখন সহযোগিতা ও ঐক্যের প্রয়োজন বেশী করে অনুভূত হল তখনই তাঁরা আন্দোলন থেকে সরে গেলেন ও একক প্রচেষ্টায় নাটক মঞ্চস্থ করার প্রয়াসী হলেন।

এরা যে আদর্শ প্রচার করে নাট্য উন্নয়নে ব্রতী হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হলেন কারণ সামগ্রিক উন্নতি অর্থাৎ সব দল এক হয়ে এক মনে কাজ না করলে কোনদিন কোন মহৎ প্রচেষ্টা সফল হয় না, বিশেষতঃ ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট দলকে একত্রিত করার মধ্যে শৈথিল্যের বা আত্মপ্রচারের স্থান নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ একক প্রয়াসের মধ্যে মাঝে মাঝে বিভেদের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। যাই হোক এই ধরণের প্রচেষ্টা খুব বেশীদিন চলেনি কারণ নাট্যরসপিপাসু জনসাধারণ নাটকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বড়-ছোট বাছবিচার না করে সকল দলকেই উৎসাহিত করেছেন আর করেছেন বলেই নাট্য আন্দোলন এগিয়ে চলছে অপ্রতিহত ভাবে।

বহু নূতন দল আমরা গত কয়েক বছরে দেখেছি, দেখেছি তাদের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা আর—গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির সংস্কৃতিমুখীন মনকে মহামানবের সাগরসঙ্গমে এক করার প্রচেষ্টা। শহর থেকে বাংলার সুদূর মফঃস্বলে নাটকের আবেদন ছড়িয়ে পড়েছে, শহরের সৌখীন দলগুলির অভিনয়ের সুযোগ সুবিধা কিছু আছে, কিন্তু গ্রামে আছে অনেক অসুবিধা, বাঁধা মঞ্চ নেই—সাজসজ্জার ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য নয়, এত অসুবিধা সত্ত্বেও গ্রামে আজ সাড়া জেগেছে পল্লীবাংলার মানুষ নাটকের তাৎপর্য গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাই সাহস ও উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

আর একটি বিষয় নাট্য আন্দোলনকে ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। নাটক তখনই রসোত্তীর্ণ হবে যখন তার মধ্যে থাকবে ঘাত প্রতিঘাত ও নাটকীয়তা, এমন অনেক নাটক চোখে পড়ছে যাকে প্রকৃতপক্ষে নাটক বলা চলে না। অথচ একথা অবহিত থেকেও কিছু কিছু লোক নাট্যআন্দোলনের মাধ্যমে সস্তায় নাম কিনতে চাইছেন। যদি এইরূপ নাটককে পরিহার করা না যায় তবে কালক্রমে যাঁরা সমাজের ছবিকে নাটকে ধরে রাখবার সাধনা করছেন তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

মূল কথা এই যে নবনাট্য আন্দোলন দেশবাসীর মনে যে উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করেছে তা যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য একযোগে চেষ্টা করে যেতে হবে, এই চেষ্টা এককভাবে নয় সামগ্রিকভাবে চললে তবেই জনচিত্তকে উদ্বোধিত করার পথ খুঁজে পাবে। সঙ্ঘবদ্ধ নাট্য আন্দোলন নূতন নাটক সৃষ্টির পরিবেশ তৈরী করবে, শিল্পীদের অভাব অভিযোগের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রেখে তাঁদের জীবনকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং বর্তমান যুগের যে জীবন-জিজ্ঞাসা তাকে সার্থক রূপ দেবে।

আরও একটি বিষয় যে, এখনও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সৌখীন সংস্থাগুলির সহযোগিতার একান্ত অভাব আছে। একদিন যে তরীর অকূলে সমুদ্রে পাল ছিঁড়ে গিয়েছিল সেই তরীকে যাঁরা তীরে এনে তুললো তারা যদি এখনও একপাশে পড়ে থাকে তবে আবার যদি দুর্যোগ আসে, সেই সর্বনাশা দিনে ব্যর্থ ক্রন্দনই কেবল মাত্র সার হবে কেউ আর পাশে এসে দাঁড়াবে না।

অতএব মঞ্চমালিকদের এখনই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। মঞ্চের অভাবে বহু নাটক অভিনীত হবার সুযোগ পায় না, অথচ একাডেমীক ডিসকাসন করে নাট্য উন্নয়ন সম্বন্ধে বড় বড় কথা অনেক হয়, তাই ও আলোচনা না করে যাতে সৌখীন সম্প্রদায়গুলি অভিনয়ের সুযোগ পায় সে বিষয়ে মঞ্চমালিকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার। এতে তাঁদেরও সুবিধা হবে, প্রয়োজন হলে শিল্পী দিয়ে পরামর্শ দিয়ে ও নাটক দিয়ে সৌখীন সম্প্রদায়গুলি এদের সাহায্য করবেন। একদিন বাঙালী তার হৃদয় সিংহাসনে নাটককে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে স্থান দিয়েছিল। যদি পরস্পর সম্প্রীতি বজায় থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে নাটক দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে ও মনঃভূমিকে উর্বর করে তুলবে ও বাংলা রঙ্গমঞ্চের ও নাটকের নবজাগরণ দেশবাসীকে উজ্জীবিত ও উল্লসিত করবে।
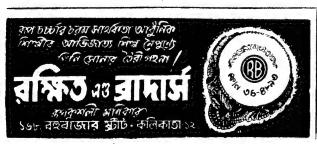
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গোকুল গল্প জমাতে জানে। দু-একটা অন্য কথার পর অজানতে কখন চলে এসেছিল সেই পুরনো কথায়—তার নিজের চোখে দেখা এই ভাঙা বস্তির ইতিহাস এবং তারই সঙ্গে জড়িত এক-দল নিরাশ্রয় মানুষের প্রতিকারহীন দুর্দশা। শুনতে শুনতে মকবুল ও দিলীপ কখন যে সেই একটানা কাহিনীর মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিল, বুঝতে পারেনি। এক ফাঁকে মকবুল হঠাৎ প্রশ্ন করল, তুমি এখানে কোথায় থাকো?

গোকুল তার ডান হাতটা ভ্রূর উপর রেখে বলল, উই যে দেখছ জোড়া তাল-গাছ, ওর ঠিক পাশেই আমার ঘর।

—তাহলে তোমাকেও তো একদিন উঠতে হবে।

—সেজন্যে ভাবি না। তার কিছুটা দেরিও আছে। ভাবনা আমার মার জন্যে। কাল আবার নুটিশ দিয়ে গ্যাছে ব্যাটারা। এদিকে মা কিছুতেই বাসা ছাড়তে চাইছে না।

—'তোমার মা!' একটু বোধহয় বিস্ময়ের সুর লাগল দিলীপের প্রশ্নে। 'তিনি বুঝি তোমার সঙ্গে থাকেন না?'

—'না গো। আমার সঙ্গে থাকবে কেমন করে? মা আমার বামুনের মেয়ে! ......বলে, সসম্ভ্রমে যুক্ত কর কপালে ঠেকাল। তারপর বলল, আমার গর্ভধা-ধারিণী মা নয়, তবে তার চেয়েও বেশী। যার হাতের মোয়া খেয়ে খুব তারিফ করছিলে তোমরা। মাকে আমি বলেছি সে কথা। শুনে কী খুশী! আরো বলেছি, জানো মা? ওখানে একজন বাবু আছে; ডাক্তারি পড়ে। সে-ই তোমার মোয়ার সবচেয়ে বড় ভক্ত। ......ঠিক বলেছি কিনা?

বলে দিলীপের দিকে এমন একটি বিশেষ ইঙ্গিত করে হেসে উঠল যেন তার মনের কথাটা ফাঁস করে দিয়েছে। মকবুলও সে হাসিতে যোগ দিতে যাচ্ছিল; হঠাৎ বন্ধুর মুখে নজর পড়তেই থেমে গেল। সেখানে যে শুষ্ক ম্লান বেদনার ছায়া ফুটে উঠেছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারেও সে অস্পষ্ট নয়। কিসের সে ছায়া তাও তার অজানা নয়।

গোকুল ওদের দুজনের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, বিশেষ করে দিলীপকে লক্ষ্য করেই বলল, যাবে নাকি আমার মাকে দেখতে? এই তো কাছেই। মা কিন্তু ভা-রী খুশী হবে তোমাদের দেখলে। আমি সব বলেছি কিনা।

—'না, থাক;' বলে, উঠে দাঁড়াল দিলীপ। মকবুলও তাকে সমর্থন করল—হ্যাঁ, আজ আমরা উঠি। আবার যদি আসি, তখন তোমার মার সঙ্গে দেখা করে যাবো।

ফিরবার পথে অনেকক্ষণ পাশাপাশি নিঃশব্দে চলবার পর মকবুলই প্রথম কথা পাড়ল। আজকের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। একেবারে আলাদা প্রসঙ্গ। বলল, সেই ভদ্দরলোকের সঙ্গে আলাপ করলি?

—কোন্ ভদ্দরলোক?

—সেই যে মাস্টারমশায়ের ঘরে যিনি বসেছিলেন সেদিন? আমিই তো তোকে ডকে নিয়ে এলাম।

—ও, সেই প্রফেসর? আলাপ আর কি? উনি এটা ওটা জিজ্ঞেস করলেন, আমি উত্তর দিলাম।

—আমাদের গলির ঠিক ওপারে যে বাড়িটা, ঐখানেই তো থাকেন উনি?

—তাই তো বললেন।

—ঐ মেয়েটা তাহলে ও'রই লোক। কোনো মতলব টতলব নেই তো? সে রকম কোনো আঁচ পেলি?

দিলীপ হেসে উঠল। মকবুল গম্ভীর ভাবে বলল, ব্যাপারটা মোটেই হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। কিছু বলা যায় না। আমাদের স্যার তো ঐ মানুষ। বোল-চাল দিয়ে কাৎ করে ফেলতে কতক্ষণ!

—তুমি দেখছি দিনের বেলাতেও ভূত দেখতে শুরু করেছ।

—হয়তো তাই। তবে ভূতকে আমার যত না ভয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ভয় করি পেত্নীকে। তাদের যে চেনা যায় না। পেশাই হল ছলা-কলা। কখন যে ভুলিয়ে নিয়ে ঘাড় মটকাবে, কেউ জানতে পারে না। আমার বলবার শুধু ঐটুকু—ওদের সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থেকো।

দিলীপ হাসিমুখে বলল, তুমি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছ। যা ভাবছ, ওসব কিছুই নয়। নিতান্ত সাধারণ একটা ব্যাপার। ভদ্দরলোক প্রফেসর মানুষ, প্রাণে কিছু দয়া-মায়া আছে। যাকে ভাব-বাদ বলে তার খানিকটা ছোঁয়াচও হয়তো একেবারে এড়াতে পারেননি। কতগুলো ছেলে-ছোকরা মিলে কী করছে এই গলির মধ্যে—খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে যখন জানতে পেরেছেন আমরা কারা, তখন পাড়ার বেশীর ভাগ লোকের মত নাকে কাপড় দিয়ে না পালিয়ে এগিয়ে এসেছেন সারকে খানিকটা সাহায্য দিতে।

—আর স্যার অমনি গলে গিয়ে তোমাকে নিয়ে হাজির করেছেন, এই দেখুন কি-সব ছেলে আমরা তৈরি করেছি—

খানিকটা ব্যঙ্গের সুরে যোগ করল মকবুল। দিলীপ মনে মনে একটু আহত

হল। তবু সহজ সুর বজায় রেখেই বলল, জিনিসটাকে ওভাবে দেখছ কেন? মাস্টারমশাই-এর ইচ্ছা, বস্টাল থেকে বেরিয়ে এসেও আমরা যেন চিরদিন তার লেজুড় হয়ে না থাকি, আমাদের গায়ে যে ছাপ লেগেছিল, সেটা যেন মুছে যায়, বাইরের সমাজের কাঠামোর সঙ্গে নিজেদের যেন খাপ খাইয়ে নিই, যাতে করে একদিন সংসারের অন্য দশজনের মত আমরাও কাজ বা বৃত্তি দিয়েই পরিচিত হতে পারি। অবিশ্যি উনি আমাদের আসল পরিচয়টা কখনো কারো কাছে গোপন করেন না। ঐ প্রফেসরের কাছেও করেননি। ও'র বিশ্বাস, আমরা যদি মানুষ হতে পারি, সংসারের চোখে আমাদের সে-পরিচয় একদিন লোপ পেয়ে যাবে। ঐখানেই ও'র ভুল।

বলতে বলতে দিলীপের মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল।

তখনো ওরা মাঠ ছেড়ে বড় রাস্তায় পড়েনি। নির্জন পথে পাশাপাশি যেমন চলছিল, তেমনি চলতে চলতেই মকবুল দৃঢ়স্বরে বলল, না; অন্য সকলের কথা জানি না। তবে একজনের বেলায় স্যর ভুল করেননি, এটা খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি—বলে, ওর একটা হাত সবলে চেপে ধরল।

দিলীপ ক্ষীণ একটা কাতর শব্দ করে বলল, সে জোরটা মুখেই থাক না বাপু, রোগা মানুষের কব্জির ওপর কেন?

জানিস দিলীপ, সেই হাতে এবার রীতিমত ঝাঁকানি দিয়ে বলল মকবুল, সেই জন্যেই তোকে নিয়ে আমাদের ভয়। তোকে যে অনেক ওপরে উঠতে হবে। সোজা পথ তো নয়। পদে পদে কত বাধা কত বিপদ। তার চেয়েও বড় ভাবনা কে এসে কখন বাগড়া দেয়। ঐ প্রফেসর একা হলে চিন্তা ছিল না। যত খুশি বাহবা দিন, পিঠ চাপড়ান, ক্ষতি নেই। ও'কে আমরা ঠেকাতে পারবো। কিন্তু ও'র মনের মধ্যে যদি আর কিছু থাকে, মানে, সেদিন ও'র ছাতের ওপর যা দেখলাম, সেই জাতীয় কিছু, তাহলে আমাদেরও রুখে দাঁড়াতে হবে।

বলে, সে হঠাৎ থেমে গিয়ে ডান হাতে ঘুষি বাগিয়ে সত্যিই যেন রুখে দাঁড়াল। সেই মূর্তি দেখে দিলীপ হো হো করে হেসে উঠল। তারপর তার ঘুষি-পাকানো হাতটা ধরে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, চলো, চলো। 'ছায়ার সাথে কুস্তি করে' কী হবে? লাভের মধ্যে খালি 'গাত্রে হল ব্যথা।' লড়তে হয় তো মুখোমুখী লড়বে চল।

কয়েক পা গিয়ে হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, তবে জেনে রেখে দাও, তার দরকার হবে না। সে রকম কিছু ও'র মনে নেই। থাকতে পারে না।

—আছে কিনা, তুই কি করে জানবি?

উনি একজন প্রফেসর; শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তোমার আমার ওপর ও'র মতো লোকের খানিকটা দয়া বা দরদ থাকতে পারে, অধঃপাতে না গিয়ে আমরা একটা কিছু ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি দেখে মনে এবং মুখে কিছুটা খুশিভাবও দেখাতে পারেন। বাস, ঐ পর্যন্ত। তার বেশী আর কী আশা কর তুমি?

—আশা আবার কী করবো! আমি যা করি সেটা আশঙ্কা। সেও শুধু ঐ এক জায়গায়—বলে চোখের ভঙ্গিতে একটা বিশেষ ইঙ্গিত করল মকবুল।

দিলীপের মুখে একটি সলজ্জ আভা ছড়িয়ে পড়ল। মৃদু হেসে বলল, নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর সত্যিই পারা যায় না। ইউ আর ইন্‌করিজিবল্।

বাহাদুর বড় একটা বাইরে যেত না। প্রেস ছুটির পর চাএর পাট মিটিয়ে ওদের আড্ডা জমে। মাঝে মাঝে আশুবাবুও এসে বসেন মাঝখানে। গল্প হয়, আলোচনা হয়, কোনো কোনোদিন কোনো সাময়িক পত্র বা বই থেকে সময়োপযোগী কিছু হয়তো পড়ে শোনানো হয়। সন্ধ্যার পর নাইট স্কুল। লেখাপড়ায় যারা অনগ্রসর সেই সব ছেলেদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে, ওদের মধ্যে যাদের বিদ্যা একটু বেশী তারা নিয়মিত ক্লাস করে। সে-সব বিলি-ব্যবস্থার ভার বাহাদুরের হাতে। 'হেড্‌মাস্টারি' কাজটা তাকেই করতে হয়। পড়ানো, এবং কে কাদের কী পড়াবে তার বন্দোবস্ত করে দেওয়া।

ইদানিং কদিন সন্ধ্যার পর সে অন্য কারো উপর এই সব কাজের ভার দিয়ে ঘন্টা কয়েকের জন্যে কোথায় যেন যাচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে রাতের খাওয়াটাও বাইরে থেকেই সেরে আসছিল। সেদিন একটু রাত করে ফিরে দিলীপের ঘরে গিয়ে বসল। দিলীপ পড়ছিল। বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করতে যাবে কদিন ধরে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না কেন, তার আগেই বাহাদুর নিজেই বলল, ওরা আবার কোলকাতায় এসেছে।

—কারা?

—রণমায়া আর পদম্।

—বদলি হয়ে এসেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ; হাবিলদার হয়ে এল আলীপুর পুলিশ লাইনে। কোয়ার্টার এখন খালি নেই। কাছাকাছি একটা বাসা ঠিক করে দিয়েছি। সেই জন্যেই কদিন ঘোরাঘুরি করতে হল। বেশ ভালো বাসা পাওয়া গেছে। মায়ার খুব পছন্দ হয়েছে। তোকে যেতে বলেছে কাল।

—আমাকে! (একটু যেন অবাক হল দিলীপ) কেন?

—কেন আবার? এমনিই। তোকে দেখতে চায়। কতবার বলেছে আমাকে। এতদিন বাইরে বাইরে ছিল। এবার এসেই জোর তাগিদ, দিলীপকে নিয়ে এসো।

দিলীপের মুখে একটা সঙ্কোচের ছায়া পড়ল। আমতা আমতা করে বলল, আমি, মানে আমাকে......... কদিন পরে বরং.........।

—আরে বোকা, মায়ার কাছে তোর
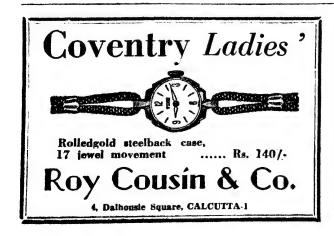
লজ্জাটা কী— তুই ওকে দেখিসনি; মেয়েদের দিকে চোখ তুলে চাইলে তো দেখবি? ও তোকে দেখেছে।

—কোথায়? আরো যেন সংকুচিত হয়ে পড়ল দিলীপ। প্রশ্নটা করেই সংগে সংগে চোখ নামিয়ে নিল।

—বর্ষটালে থাকতে। ও যখন ছিল, কতবার আমরা দল বেঁধে বাইরে পিক-নিক টিকনিক করতে গেছি। তখন দেখেছে। আমি যে তোর সব কথাই ওকে বলেছি। কাল তোর কটা পর্যন্ত কলেজ?

—চারটা।

—বেশ, তাহলে ঠিক সাড়ে চারটায় বেরোনো যাবে। কেমন?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বাহাদুর বেরিয়ে গেল।

দিলীপের চেয়ে সামান্য কিছু বড় হবে রণমায়া। আত্মীয় বা অনাত্মীয় এই বয়সী কোনো মেয়ের সংস্পর্শে কিংবা সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ ওর কখনো ঘটেনি। প্রথমটা তো মাথা তুলতেই পারল না। কথা বলতে গিয়ে ঘেমে উঠল। নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করা দূরে থাক, সাধারণ প্রশ্নের জবাব-গুলোও আটকে আটকে গেল। কিন্তু মেয়েটির কথাবার্তা এমন সহজ, ব্যবহার এমন স্বচ্ছন্দ যে শেষের দিকে দিলীপও তার আড়ষ্টতা অনেকখানি কাটিয়ে উঠল।

একটু আগেই নিজের হাতে পরোটা আর আলুর চোখা করে রেখেছিল রণমায়া। স্বামীকে দিয়ে দু-তিন রকমের মিষ্টিও আনিয়ে রেখেছিল। ঘরের মেঝেতে আসন বিছিয়ে পাশাপাশি ওদের দুজনকে খেতে বসিয়ে দিল। 'খাইয়ে' বলতে যা বোঝায়, দিলীপ তো একে-বারেই নয়। তার উপরে এই অনভ্যস্ত পরিবেশের বাধা। দুখানা পরোটা শেষ করতেই তার অনেকক্ষণ লেগে গেল। ততক্ষণে বাহাদুর প্রায় ডজনে গিয়ে পৌঁছেছে এবং 'আরো আরো' করে বোনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। এবারে আবার চাইতেই সে তাড়া দিয়ে উঠল, দাঁড়াও; একটু আস্তে আস্তে খাও। তোমার তাড়াহুড়োর জন্যে এ বেচারী মোটেই খেতে পাচ্ছে না।

—তা আমি কি করবো? আমি তো আর কুটুম আসিনি তোর বাড়ি।

—আর ও-ই বুঝি কুটুম? তুমিও যা ও-ও তাই।

—'শুনলি তো?' দিলীপের দিকে ফিরে বলল বাহাদুর। মাথাটা একবার তোল। নাঃ তুই দেখছি নতুন জামাইকেও হার মানালি। অতো খুঁটছিস কী? খেয়ে নে।

—'তুমি থামো তো'—ঝঙ্কার দিয়ে উঠল রণমায়া, তোমার মতো পেটুক নাকি সবাই?

দিলীপের দিকে চেয়ে সস্নেহ সুরে বলল, থাক, তুমি আস্তে আস্তে খাও। ওটা খেতে হবে না; ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি দুখানা গরম পরোটা নিয়ে আসি।

দিলীপ ঘন ঘন হাত নেড়ে বলল, না, না; আমি আর খেতে পারছি না বড্ড পেট ভরে গ্যাছে।

—"সে কি! এরই মধ্যে পেট ভরে গেল? তা বললে শুনবো না। আর দুখানা খেতে হবে। আচ্ছা, তরকারীটা ভালো না লাগে, মিষ্টি দিয়ে খাও।"—বলে বড় বড় দুটো মিষ্টান্ন তুলে দিল পাতের উপর।

আপনার হাতে খাবার সাজিয়ে আপন-জনকে এমনি করে কাছে বসে খাওয়ানো, তাকে উপলক্ষ্য করে এই সস্নেহ অনু-যোগ, 'এটা ফেলে রাখলে কিছুতেই শুনবে না' বলে এই জিদ ও জুলুম—তার সবটুকু মাধুর্য নিয়ে দিলীপের স্মৃতির মধ্যে সুপ্ত হয়ে ছিল। আজ দীর্ঘকাল পরে তারই নতুন স্পর্শ সমস্ত অন্তরময় ছড়িয়ে পড়ল। ফিরবার পথে বাহাদুরের সংগে যে দু-একটা কথা হল, সে যেন স্বপ্নের ঘোরে। আগাগোড়া সব পথটাই আচ্ছন্নের মত কেটে গেল। যখন চলে আসে, রণমায়া ওর পিছন পিছন দরজার বাইরে এসে বলেছিল, আবার কবে আসবে?

দিলীপ কী উত্তর দেবে ভেবে না

আবার কবে আসবে?

পেয়ে বাহাদুরের মুখের পানে তাকাতেই হেসে ফেলেছিল. দাদার দিকে কী দেখছ? তুমি বুঝি একা আসতে পার না?

বাহাদুর আড় চোখে ওর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, বোধহয় সাহস করছে না। যদি হারিয়ে যায়?

প্রায় সমবয়সী একটি তরুণীর সামনে এই 'অপমানজনক' উক্তিতে দিলীপ রীতিমত অপদস্থ বোধ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল, হারিয়ে যাবো মানে? কী বলছ তার ঠিক নেই।

বাহাদুর হো হো করে হেসে উঠল। প্রতিবাদের বহর দেখে রণমায়ারও ভীষণ হাসি পেয়েছিল। কোনরকমে সেটা চেপে রেখে বলল, ওর কথা শুনো না। ও আসুক না-আসুক তোমার যখন সময় হবে, চলে এসো। তোমার কাছে ওখানকার সব গল্প শুনবো। দাদা আমাকে কিছু বলতে চায় না।

'বলতে চাইলেই বা বলি কখন?' জবাব দিল বাহাদুর, 'যতক্ষণ থাকি, তোর বকবকানি শুনেই তো কান ঝালাপালা।'

'বেশ, শুনতে হবে না তোমাকে আমার বকবকানি', চোখ পাকিয়ে তেড়ে উঠল রণমায়া, 'আমি দিলীপ-ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করবো। তুমি শীগগিরই আসবে তো?'

দিলীপ ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, 'আসবো'। ভারী মিষ্টি লেগেছিল প্রাণ-চঞ্চলা পাহাড়ী মেয়ের মুখে এই অদ্ভুত সম্বোধন। প্রথম পরিচয়ের দিনে শুধু 'দিলীপ' হয়তো একটু বেমানান হত, শুধু 'ভাই' নিতান্ত মামুলী, দুটো মিশিয়ে এই 'দিলীপ-ভাই' যেন একটা মধুর আবিষ্কার। তার স্বাদটুকু ওর মনে লেগে রইল।

পথে যেতে যেতে বাহাদুর বলেছিল, এখানে এসে বড্ড একা পড়ে গেছে বেচারা। পদম্-এর একেবারে ফুর্সত নেই, গোটা দিনটাই কেটে যায় পুলিশ লাইনে। দুটো কথা বলতে না পারলে মেয়ের আবার পেট ফুলে ওঠে। তুই মাঝে মাঝে আসিস ভাই। বিকেলটা তো তোর ফাঁকা।

দিলীপ কথা রেখেছিল। সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে 'শীগগিরই' এসেছিল রণমায়ার বাসায়। বাহাদুরের কাজ ছিল, আসতে পারেনি। ও একটু ইতস্ততঃ করছে দেখে তাড়া দিয়ে উঠেছিল, তুই কি চিরদিনই কনেবৌ থেকে যাবি? মায়ার কাছে তোর লজ্জা কিসের?

লজ্জার জড়তা সেদিনও পুরোপুরি কাটেনি। তবে কথাবার্তায় অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল। সে কাজটি অবশ্য বেশীর ভাগই চালিয়েছিল অপর পক্ষ। ভাগিনীর এই গুণটি সম্বন্ধে বাহাদুর বিশেষ অত্যুক্তি করেনি। যখন পর্বটা বেশ কিছু-ক্ষণ একতরফা চালাবার পর হঠাৎ বোধহয় খেয়াল হল, এ বিষয়ে অতিথিকেও কিঞ্চিৎ সুযোগ দেওয়া দরকার। যেন নিজের আচরণে নিজেই অবাক হয়ে গেছে এমনিভাবে ডান গালের উপর তর্জনী রেখে বলে উঠল, ও মা! আমি করছি কী! সেই তখন থেকে নিজেই কেবল বকে মরছি। তুমি তো কিছুই বলছ না?

—'আমি শুনেছি', মৃদু হেসে বলল দিলীপ।

—শুনেছো না আরো কিছু। আমার কাণ্ড দেখে মনে মনে হাসছ।

—না, না, হাসবো কেন? বেশ লাগছে; বিশেষ করে আপনার এই বাংলা বলার ধরণটা।

—'কী করবো ভাই', হতাশার সুরে বলল রণমায়া, 'বাংলা দেশে জন্ম, চিরটা-কাল সেখানেই আছি, তবু এই পাহাড়ী টানটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।'

—সেই জন্যেই বোধহয় আরো মিষ্টি লাগে। নেপালীর মুখে বাংলা কথা আমি এর আগেও শুনেছি। কেমন যেন কানে লাগে। বাহাদুরদার কথা বলছি না। ও বাঙালীর চেয়েও ভালো বাংলা বলে। আপনার টানটা একটু আলাদা, কিন্তু অপূর্ব।

কথাটা বলে ফেলেই দিলীপ লজ্জিত হল। অজ্ঞাতসারে একটু বেশী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলেছে। নিজের কানেই সেটা অশোভন মনে হল, বিশেষ করে যেখানে মাত্র দুদিনের পরিচয়। ক্ষমা চাইবে কিনা ভাবছে, এমন সময় রণমায়া বলল, আমাদের সম্বন্ধে তুমি গোড়াতেই একটু ভুল করে বসে আছ, ভাই। আমরা নেপালী নই, বাঙালী। কয়েক পুরুষ আগে হয়তো নেপাল থেকে এসেছিলাম। চেহারায় তার ছাপ রয়ে গেছে। কিন্তু আসলে আমরা বাংলা দেশের লোক। দার্জিলিংএর কাছেই আমাদের দেশ।

দিলীপ বড়ই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কী বললে যে তার ভুল ধারণার ত্রুটি স্বীকার করা হবে সহসা ভেবে পেল না। রণমায়া হাসি মুখেই বলল, এবার বুঝেছি: এই জন্যেই তুমি আমাকে পর-পর মনে করছ; কথা বলতে গিয়ে বাধো বাধো ঠেকেছে।

—না, না; তা নয়। আপনি বোধহয় জানেন না, বাহাদুরের চেয়ে আপনারজন আমার আর কেউ নেই।

—'জানি ভাই', (এবারে একটা গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ল রণমায়ার মুখের উপর) জানি বলেই তো তোমার ওপর আমার এত জোর। তোমরা যখন বর্ডারে ছিলে, দাদার কাছে আমি সব শুনেছি। সেই দুঃসময়ে ওরও এক তুমি ছাড়া আপনজন কেউ ছিল না।

ক্ষণকাল দুজনেই নীরব। হয়তো দুজনেরই চিন্তা-স্রোত একই ধারায় বয়ে গিয়ে সেই বহু ঘটনাসঙ্কুল পুরানো দিনের পারে গিয়ে লাগল। তারপর যেন অকস্মাৎ এক ঝটকায় নিজেকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল রণমায়া। যেতে যেতে বলল, বসো, তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।

দিলীপের চা-এর অভ্যাস ছিল না। মিনিট কয়েকের মধ্যে রণমায়া খাবারের ডিস আর চা-এর পেয়ালা নিয়ে এঘরে যখন দেখা দিল, দ্বিতীয় বস্তুটি সম্বন্ধে মৃদু আপত্তি জানাতেই সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা নাকচ করে দিল। বলল, একবার খেয়েই দ্যাখ না। আমার শ্বশুরমশাই চা-বাগানে চাকরি করেন। আমার জন্যে দু-একটা বিশেষ রকম বাছাই-করা স্যাম্পল প্যাকেট পাঠিয়ে থাকেন মাঝে মাঝে। সেই চা। হালকা করে বেশী দুধ দিয়ে করেছি। খেলে কোনো অপকার হবে না। তাছাড়া—

একটুখানি থেমে আবার বলল, দিদি হাতে করে দিলে খেতে হয়।

দিলীপ আর কোনো কথা না বলে হাসিমুখে পেয়ালা তুলে নিল।

মাস কয়েক পরে একদিন বিকাল বেলা ঠিক ঐখানটিতে বসেই চা-এর কাপে প্রথম চুমুক দিয়ে দিলীপ অপ্রসন্ন মুখে বলে উঠল, উঁ; আজও তুমি অনেক দুধ

দিয়ে ফেলেছ মায়াদি। এমন সুন্দর চা-টাই মাটি।

—ও—ও; তার মানে এরই মধ্যে বেশ খোর হয়ে উঠেছ, দেখছি।

—তবে কি চিরটাকাল দুগ্ধপোষ্য শিশু বানিয়ে রাখতে চাও?

—আসলে তো তুমি তা-ই।... হাসি-হাসি মুখে বলল রণমায়া।

—কী রকম? দিলীপের কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদের সুর।

—তা বৈকি? একটা এক ফোঁটা মেয়ের ভয়ে জড়সড়। শুধু দূরে থেকে হাহুতাশ, কাছে গিয়ে দাঁড়াবার কিংবা একটা কথা বলবার সাহস নেই।

—না; আজই ফিরে গিয়ে বাহাদুরের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে।

—ওমা, সে কী ! সে বেচারা আবার এর মধ্যে এল কোত্থেকে ?

—সে-ই তো কি সব আজেবাজে খবর দিয়ে তোমার মাথাটা ভর্তি করে রেখে গ্যাছে।

—ভুল করছ। সে যা বলেছে, সে আর কতটুকু ! তার চেয়ে অনেক বেশী বলেছ তুমি।

—'আমি বলেছি !' রীতিমত আকাশ থেকে পড়ল দিলীপ।

—মুখ ফুটে কিছু বলনি, বলেছে তোমার চোখ, তোমার মুখের ওপরকার ছায়া। সেটা লুকোতে পারনি। আমার যে মেয়েমানুষের চোখ ভাই।

—তাহলে বলবো, ওসব মেয়ে-মানুষের কল্পনা।

রণমায়া মুখে কোনো প্রতিবাদ করল না, শুধু একটু হাসল। তারপর বললে, যাক গে, গলির ওপারের নতুন খবর কি, বল।

—জানি না।

—জানো না !

—আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর জেনে কী লাভ ? অনধিকার-চর্চা বৈতো নয়।

—কে বললে তুমি আদার ব্যাপারী ? কে বললে ওখানে তোমার অনধিকার ?

—বলবে আবার কে ? আমি নিজেই জানি। কোথায় কতটুকু আমার প্রাপ্য, কদ্দুর পর্যন্ত আমার সীমানা, আমি না জানলে জানবে কে ?

—আবার তোমার সেই পুরনো বাজে কথা। জানো, ওগুলো আমি একেবারেই সইতে পারি না ?

—তবু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওগুলো তুমিই তো টেনে আনো।...যাক গে; এবার অন্য কিছু বল। কোথায় গিয়েছিলে সেদিন ? আমরা দুজনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে গেলাম।

রণমায়ার কানে বোধহয় এ কথাগুলো পৌঁছল না। কিছুক্ষণ একটানা জানালার বাইরে তাকিয়ে থেকে এদিকে ফিরে বলল, তোমার ঐ কথাগুলো আমি মনে মনে ভেবে দেখেছি দিলীপ। আমার কী মনে হয় জানো ?

—কী ?

—ওটা তোমার অহঙ্কার।

দিলীপের বিস্ময়ের সীমা রইল না। প্রতিবাদ করবার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলল। যন্ত্রচালিতের মত শুধু আবৃত্তি করল, অহঙ্কার !

—হ্যাঁ; নিজের দাম নিজে কষবার, নিজের বিচার নিজে করবার অহঙ্কার।

দিলীপ এবার হেসে ফেলল। তারপর বলল, মাষ্টারমশাই ঠিক উল্টো কথা বলেন। তাঁর ধারণা নিজেকে আমি বড় ছোট করে দেখি, আমার আত্মবিশ্বাস নেই।

—কী জানি ? আমার যা মনে হয়েছে, তাই বললাম। আমি তো তোমাদের মত ইস্কুলে যাইনি, লেখাপড়াও জানি না। তবে এই বয়সে অনেক দেখেছি, অনেক ঘা খেয়েছি। তার থেকে একটা জিনিস শিখেছি। নিজের সম্বন্ধে কোনো অভিমান রাখতে নেই। তাতে শুধু কষ্ট পাওয়াই সার, আর কোনো লাভ হয় না।

দিলীপ দুচোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এই স্বল্প-শিক্ষিতা পাহাড়ী মেয়েটিকে যেন আজ আবার নতুন করে আবিষ্কার করল। এর অগাধ স্নেহের পরিচয় সে আগেই পেয়েছে, কিন্তু নানা অবস্থাবিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে, নানা ঘাটের জল খেয়ে, বিপদ, দুঃখ, অভাব ও লাঞ্ছনার পাঠশালায় যে কঠোর শিক্ষা ওকে এতদিন ধরে সঞ্চয় করতে হয়েছে, তার দামও কম নয়।

দিলীপের একাগ্র বিস্মিত দৃষ্টির দিকে নজর পড়তেই রণমায়া মনে মনে লজ্জিত হল। ওর চোখে পাছে সেটা ধরা পড়ে যায়, তাই হালকা সুরে অন্য কথা পাড়ল। বলল, চুপ করে গেলে যে ? ভাবছ, কী লেকচারটাই না দিতে পারে মায়াদি।

—সেটা আবার নতুন কথা কী হল, যে ভাবতে হবে ? কী বল দিলীপবাবু ?

বলতে বলতে ঘরে ঢুকল পদম্ বাহাদুর। অন্য সময় হলে রণমায়া এর একটা উপযুক্ত জবাব না দিয়ে ছাড়ত না। কিন্তু এই মুহূর্তে, স্বামীর এই অসময়ে ঘরে ফেরার মধ্যে যে চমক ও আনন্দ ছিল, সব মনটা সেইদিকেই চলে গেল, তার ঐ ফোড়নটা আর গায়ে মাখল না। খুশী ও বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল, তুমি ! আজ এত সকাল সকাল যে ?

পদম্ তার কারণটা না ভেঙে স্ত্রীকে তাড়া দিয়ে বলল, ন্যাও নাও, শীগ্গির তৈরী হয়ে নাও। দিলীপবাবু, তুমিও চল।' বলে, সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে ব্যস্তভাবে হাতঘড়ির দিকে তাকাল।

—কোথায় ? জানতে চাইল দিলীপ।

—কোথায়, এখনো বুঝতে পারছ না ? মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে মনটাকেও যাবার দাখিল করে তুলেছ, দেখছি। মাঝে মাঝে একটু টনিক ঠনিক দিও বেচারাকে।...চল, একটা খুব ভালো ছবি এসেছে পিকচার প্যালেসে। তিনখানা পাশ পাওয়া গেল।

—আপনারা যান, আমার নাইট ডিউটি আছে।

—আহা, নাইট ডিউটি তো নাইটে। এটা হচ্ছে ইভনিং শো' ছটা থেকে নটা।

সিনেমার নামে রণমায়ার চোখে মুখে তখন খুশীর জোয়ার উপচে পড়ছে। সে-ও স্বামীর সঙ্গে যোগ দিয়ে দিলীপকে দলে টানবার চেষ্টা করল—চল না ? একটা দিন নাইট ডিউটি না করলে আর কী ক্ষতি হবে ?

—'ক্ষতি তো নয়ই', মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলল পদম্ বাহাদুর, 'অন্ততঃ কয়েকটা লোকের উপকার হবে। যে-রুগী-গুলো নির্ঘাৎ মরত, তারা আর একটা দিন বেঁচে থাকবে।'

দিলীপও হাসি মুখে সায় দিল, তা মন্দ বলেননি, তবে আমরা এখনো অতটা উঁচুতে উঠতে পারিনি। যাক, অর্জুন এবার চলি।

পদম্ বাহাদুর স্ত্রীর দিকে চেয়ে তারস্বরে কলরব করে উঠল, এ কি ! তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ ? বিলকুল বরবাদ করবে দেখছি। এদিকে টাইম রয়েছে ফুল আধঘন্টা, আর শাড়ির ভাঁজ ঠিক করতেই তো লেগে যাবে তিন কোয়ার্টার।

রণমায়া পেছপাও হবার পাত্রী নয়। জোড়া ভ্রূ বাঁকিয়ে দুচোখে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে তেড়ে উঠল, কবে আমার তিন কোয়ার্টার লেগেছে শুনি ?

'ঠিক !' স্বর নামিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল পদম্, "আমারই ভুল হয়েছে। ব্যাপারটা অত সহজে কোনোদিন মিটেছে বলে তো মনে পড়ে না।'

'যাও ! আমি কক্ষনো যাবো না।' বলে এখান থেকেই চাবির গোছা বাঁধা আঁচলটা হাতে নিয়ে দুমদাম করে পা ফেলে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পিছনে মিলিত কণ্ঠের হাসির রোল।

(ক্রমশঃ)

॥ এরেনবুর্গের আত্মকাহিনী ॥

সম্প্রতি এরেনবুর্গের আত্মকাহিনীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। 'পিপল্ অ্যান্ড লাইফ' নামক এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এরেনবুর্গের বিগত জীবনের বহু তথ্য। বার্ধক্যের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আজ তাঁর স্মৃতিচক্ষে যাঁদের দেখতে পেয়েছেন, প্যারিস জীবন, রুশ বিপ্লবের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যাঁদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল—তাঁদেরকে কিছুটা অসংলগ্ন ভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। প্যারিসের খ্যাতনামা শিল্পীমহলে এরেনবুর্গের ছিল তখন অবাধগতি। নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত হয়েছে, পিকাসো, পাবলো নেরুদা প্রভৃতির মাঝখানে। টুকরো টুকরো স্মৃতিকথাকে একসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে এই স্মৃতিকথায়। সাংবাদিক এরেনবুর্গ এখানে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। শিল্পীজনোচিত বিবিধ গুণাবলী হয়ত এখানে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি; কিন্তু বর্তমান সোবিয়েত সাহিত্য ও শিল্পী-জগৎ সম্পর্কে অনেক কিছুই এখান থেকে জানা যাবে। যা বাইরের জগতের নানাবিধ প্রশ্নোত্তরদানে সক্ষম হবে।

॥ ড্রাইডেনের কাব্যসংগ্রহ ॥

অধ্যাপক জেমস কিনসলির সম্পাদনায় অক্স্ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে জন ড্রাইডেনের কবিতা ও উপকথার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দেশে ড্রাইডেন একটি পরিচিত নাম। অধ্যাপক কিনসলির চার খণ্ডে সম্পাদিত ড্রাইডেনের রচনাবলী অবলম্বনে বর্তমান খণ্ডটি সম্পাদিত হয়েছে। মাত্র একটি খণ্ডে সমগ্র রচনার স্থানসংকুলান সম্ভব না হওয়ায় অনেক কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য ইতিপূর্বে ড্রাইডেনের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। সর্বপ্রথম (সম্ভবতঃ) ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ডবলু. ডি. ক্রিস্টির সম্পাদনায় ড্রাইডেনের কাব্যসংগ্রহের গ্লোব সংস্কারণ প্রকাশিত হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে অক্স্ফোর্ড স্ট্যান্ডয়ার্ড অথর্স সংস্করণটি সম্পাদনা করেন জন সারজেন্ট। অবশ্য জি আর নয়াস-এর সম্পাদনায় আমেরিকায় ড্রাইডেনের কাব্যসংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৯০৮-০৯ খৃষ্টাব্দে। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়—সম্পাদকগণ পারস্পরিক ত্রুটিবিচ্যুতিকে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ মনোভাবের সাহায্যে গালাগালি করে নিজস্ব সম্পাদনার প্রশংসা করেছেন। যাই হোক, অধ্যাপক কিনসলির সম্পাদিত একপাতার ভূমিকাযুক্ত কাব্যসংগ্রহটি সাধারণভাবে ব্যবহার করবার ও মোটামুটিভাবে ড্রাইডেনকে জানবার উপযুক্ত সংস্করণ। তাছাড়া কিনসলি ব্যবসায়িক দিকটা

চিন্তা করে গ্রন্থের মধ্যে ড্রাইডেনের সামগ্রিক রূপটাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টাও করেছেন।

॥ পেট্রিক হোয়াইটের উপন্যাস ॥

বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান ঔপন্যাসিক পেট্রিক হোয়াইট-এর নাম পৃথিবীর সাহিত্য-প্রেমিকদের বিশেষ পরিচিত। বহু উপন্যাস রচনা করে স্বদেশে ও বিদেশে তিনি আপন খ্যাতিকে এখনও অম্লান রেখেছেন। কিছুকাল আগে প্রকাশিত তাঁর 'রাইডার্স ইন দি চ্যারিয়ট' নামক উপন্যাসটি সমালোচক-মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। বর্তমান বছরের সেরা উপন্যাস হিসাবে গ্রন্থটি ৫০০ পাউণ্ডের দুর্লভ পুরস্কারটি লাভ করেছে। অবশ্য ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দেও হোয়াইট তাঁর 'ভস' নামক উপন্যাস রচনা করে এই পুরস্কারটি লাভ করেছিলেন। মাইলস্ ফ্রাঙ্কলিনের স্টেট থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড ৩৪খানি উপন্যাসের মধ্য থেকে নির্বাচিত করেছেন হোয়াইটের 'রাইডার্স ইন দি চ্যারিয়ট' উপন্যাসটি। গ্রন্থটি সম্পর্কে বিচারকমণ্ডলীর মন্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরছি :

অবিবাহিতা খামখেয়ালী মেয়ে হেয়ার-এর সঙ্গে হিমেলফার্ব নামে এক ইহুদী উদ্বাস্তুর দেখা হল সিডনিতে। মেয়েটির বাবা রেখে গেছেন মস্ত বাড়ী আর হিমেলফার্ব ছিলেন জার্মানীতে ইংরিজির অধ্যাপক। অদ্ভুত দুটি চরিত্র একত্র মিলিত হল। এইসঙ্গে এসে মিলিত হল গ্রামের ধোপানী মিসেস গডবোল্ড এবং অসুস্থ ও অর্ধচেতনালুপ্ত আলফ ডুবো। উপন্যাসে তাদের মিলিত ধর্মানুসন্ধানের যাত্রা বর্ণিত হয়েছে। তারা রথে করে স্বর্গাভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে—সেই পথপরিক্রমার বেদনাদায়ক পরিস্থিতি ও পরিসমাপ্তিতে উপন্যাসটি মুখর।

বিচারকমণ্ডলী গ্রন্থ আলোচনাকালে মন্তব্য করেছেন :—

"The novel displays creative ability of a high order. It is complex in construction, yet its parts knit together to form a harmonious pattern. It explores the spiritual realities of human nature with exceptional and at times terrifying insight, yet always with clarity. It looks with poetic intensity, deep into the heart of man. Its portraits of dominant characters throb with Dobellian Vitality...... Its philosophy may not be original, but its people, their environment, and their actions are indisputably so".

॥ রুশ অনুবাদে ভারতীয় সাহিত্য ॥

গত কয়েক মাসের মধ্যে যেসব উল্লেখযোগ্য ভারতীয় সাহিত্য গ্রন্থ রুশ ও অন্যান্য সোবিয়েত ভাষায় অনূদিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড এবং রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ। বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর এই খণ্ডে আছে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর ও রাধারাণী। রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে মস্কোর রাষ্ট্রীয় কথাসাহিত্য প্রকাশালয় হতে নতুন যে ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে, তার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় গত বৎসর। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হবে অগাস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে।

মস্কো হতে প্রকাশিত রুশ অনুবাদে সম্প্রতি-প্রকাশিত অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার একটি নতুন রুশ অনুবাদ : পঞ্চতন্ত্রের দ্বিতীয় ও সচিত্র সংস্করণ। পঞ্চতন্ত্রের মুদ্রণ সংখ্যা ৫০,০০০ কপি। হিন্দী লেখক অমৃতরায়ের উপন্যাস 'প্রথম অঙ্কুর' পাঞ্জাবী কবি ও গীতিকার ধনিরামের কবিতা-সংগ্রহ 'জাফরানী ফুল'; হিন্দী লেখক এস চন্দ্রাকিরণের গল্পসংগ্রহ 'জন্মদিন', অমৃতলাল নাগারের একটি উপন্যাস এবং নির্গুণের একটি গল্পসংগ্রহ। গোয়ার জাতীয়, মুক্তি-আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত মহারাষ্ট্রীয় লেখক চন্দ্রকান্ত কাকোদকারের 'বিজয় আহ্বানের প্রতিধ্বনি' উপন্যাসটির রুশ অনুবাদ গত মাসে প্রকাশিত হওয়ার পর ইতিমধ্যেই সোবিয়েত পাঠকদের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

॥ কয়েকটি মূল্যবান চিঠি ॥

'স্টুটগার্টার জেটুঙ' শিলার এবং গোটের লিখিত পাঁচশত চিঠি জার্মান শিলার সোসাইটিকে দান করেছেন। এই সংগ্রহটি কোটা আর্কিভ নামে পরিচিত। এই নামকরণের একটি তাৎপর্যও রয়েছে। উনিশ শতকে কোটা (প্রকাশক) ছিলেন গোটে, শিলার এবং সেকালের খ্যাতনামা লেখক, শিল্পী এবং বিদগ্ধমণ্ডলীর বিশেষ অন্তরঙ্গ ও পরিচিত ব্যক্তি। মূল্যবান চিঠিপত্রাদি সংরক্ষণের জন্য স্টুটগার্টের সংবাদপত্র 'স্টুটগার্টার জেটুঙ' সমস্ত চিঠিগুলি কিনে নেন। পত্রগুলির সংরক্ষণের ফলে বহু নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। শিলার ও গোটের অন্তরঙ্গ পরিচয় ও পরিপূর্ণভাবে জানাও সম্ভব হবে।

নালাগিরি দমন

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সুবিখ্যাত অমরাবতীর শৈলীর একখানি চক্রাকার শিলাফলক অমৃত পত্রিকার ৪৬শ সংখ্যার প্রচ্ছদপটে ছাপা হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই বৌদ্ধ শিল্পের অনবদ্য মাস্টারপিসের কোনও পরিচয় বা বিবরণ ছাপা হয় নাই। অমৃত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে আমি ঐ শিল্পফলকের ভাষ্য রচনা করিয়া দিতেছি।

বৌদ্ধ-শিল্পের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় রচিত হইয়াছিল মধ্যদেশের সাঁচী ও ভারহুতের স্তূপ ও চৈত্যমালায়। ঐ শিল্পকৃতির দ্বিতীয় অধ্যায় রচিত হইয়াছিল—দক্ষিণদেশের অন্ধ্র প্রদেশের তীর্থক্ষেত্রে কৃষ্ণা নদীর তীরে দুইটি মহাচৈত্যে। একটি হইল অমরাবতীর স্তূপ (খৃঃ পূঃ ১ম শতক—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) অপরটি হইল নাগার্জুনী কুণ্ডের মহাচৈত্য। কৃষ্ণা নদীর তীর্থক্ষেত্রে পর পর তিনটি তরুণ পুরাতাত্ত্বিকদের খননকার্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, দুজ্ঞেয় পেট স্তূপে, অমরাবতীর স্তূপে ও নাগার্জুনী কুণ্ডের স্তূপে। দক্ষিণদেশের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে রচিত 'অমরাবতীর শৈলী—বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অতি উজ্জ্বল পৃষ্ঠা। মধ্যদেশের সাঁচী ও ভারহুত ও মথুরা শৈলীর সহিত দক্ষিণদেশের এই নূতন পর্যায়ের শৈলীর কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অন্ধ্রদেশের বৌদ্ধ-শিল্পে আদিম অপরিণত মথুরা-শৈলী নবকলেবর গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ-শিল্পকে নূতন পরিণতি দিয়াছিল—যাহা এই দুই রীতির শৈলী তুলনা করিলে আমাদের চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠে। মূর্তি কল্পনা ও রচনায় এক নূতন ধরণের সজীবতা ও সাবলীল ভঙ্গিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যাহা আদিম যুগের মথুরা-শৈলীতে দেখা যায় নাই। সাঁচী ভারহুতের অণ্ডাকৃতি স্তূপ কোনও রূপ অলংকারে সজ্জিত হয় নাই। কিন্তু অন্ধ্রশিল্পে স্তূপসজ্জা নূতন রীতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অমরাবতীর "চৈত্য বন্দকেরা" ভক্তির আত্যন্তিক আতিশয্যে অমরাবতীর গোলাকৃতি অণ্ড দেশ মর্মর-শিলার অসংখ্য শিলাপট্ট ও ঊর্ধ্ব পট্টকের মালায় অলংকৃত করিয়া তুলিল। এইসব শ্বেতবর্ণের মর্মর ঊর্ধ্বপট্টক—শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যদের সুনিপুণ কারুকার্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ঐ পট্টকমালার ক্ষুদ্র পরিসরে বৌদ্ধজাতকের এবং বুদ্ধদেবের জীবনচরিতের নানা আখ্যানে চিত্রিত হইয়া মুখরিত—প্রদক্ষিণকারী শত শত তীর্থযাত্রীদের নীরব ভাষায় বুদ্ধদেবের বাণী পরিবেশন করিয়া আসিয়াছে বহুশতক ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায়। অমরাবতীর মহাচৈত্যকে এইসব মর্মর কঞ্চুকে সজ্জিত করিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। এক একখানি পাথর এক একজন ভক্ত তীর্থযাত্রীর দানে নির্মিত হইয়াছিল। এবং অনেক সময়ে ঐ ফলকের দানপতিদের নাম ও ধাম ফলকে উৎকীর্ণ হইয়াছে—যথা ঃ (১) "নাসিক - গোরখিতায় থবো দানম্ বসুকস ভরিয়ায়"—'নাসিক-বাসী গোরক্ষিতের ভার্যার-স্তম্ভদান।' আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল অমরাবতীর স্তূপের গলদেশে সংলগ্ন একখানি অপূর্ব মর্মর শিলাফলক। ইহা আকারে চক্রাকার—শিল্পশাস্ত্রে ইহার নাম "পরিচক্র"। এই 'পরিচক্রে' অল্পপরিসরে পাথরের চমৎকার বাঙ্ময় ভাষায় লিখিত হইয়াছে—"নালাগিরির" প্রাচীন উপাখ্যান—প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি 'নিদান কথা' ও 'চুল্লভগ্‌গে' এই উপাখ্যান লিপিবদ্ধ হয়েছে। সমস্ত ধর্মের ইতিহাসে সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব, সুরাসুরের যুদ্ধ, ও খৃষ্ট ও শয়তানের উপাখ্যানে এই ধর্ম ও অধর্মের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-ধর্মের ইতিহাসে এই দ্বন্দ্ব রূপ নিয়েছিল বুদ্ধদেব এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্তের কলহে। বুদ্ধদেবের প্রত্যেক সৎ কর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শয়তান দেবদত্ত। তিনি বুদ্ধদেবের প্রাণনাশের নানা চেষ্টা করিয়াছিলেন। চুল্লভগ্‌গে লিপিবদ্ধ আখ্যানে লেখা আছে—

"সেই সময়ে রাজগৃহ নগরে একটি দুষ্ট প্রমত্ত মনুষ্যঘাতী হস্তী ছিল তাহার নাম নালাগিরি। বুদ্ধবৈরী দেবদত্ত রাজগৃহে গমন করিয়া—হস্তিশালায় প্রবেশ করিয়া হস্তিরক্ষকের সহিত ষড়যন্ত্র করিলেন—যে যখন বুদ্ধদেব তাহার পরিক্রমার পথে প্রশস্ত রাজপথে উপস্থিত হইবেন তখন ঐ মত্ত হস্তীকে বুদ্ধদেবের পথে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। বুদ্ধদেবকে আসিতে দেখিয়া হস্তিরক্ষক নালাগিরীকে বন্ধন মুক্ত করিয়া বুদ্ধদেবের সম্মুখে চালিত করিল। মত্ত হস্তী লাফাইতে লাফাইতে বুদ্ধদেবের দিকে ধাবিত হইল। রাজপথে ভীষণ কোলাহলের সৃষ্টি হইল—পথের যত মানুষ ভীত ও চকিত হইয়া নানাদিকে আশ্রয় লইতে ছুটিলে পথের ধারে গৃহের উপরের বাতায়নে—ভীত-সন্ত্রস্ত নরনারী এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার শুরু করিল। এই কোলাহলের ও বিশৃঙ্খলতার হুবহু চিত্র শিল্পকর নিপুণ হস্তে শিলাপটে বাস্তবিক রীতিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রাজপথে এমন চঞ্চল, বিশৃঙ্খলতার ভয়াবহ চিত্র ভারতের শিল্পের দীর্ঘ ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না। রাজপথের বাস্তবিক চঞ্চলতার চিত্র হিসাবে চিত্রখানি একখানি অদ্বিতীয় মাস্টারপিস। এই আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় নানাজনে নানাকথা বলিতে শুরু করিল যাহাদের বিশ্বাস দুর্বল তাহারা শঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলিল "বাস্তবিকই এই মহাশ্রমণের দেহসুষমা ও মুখাকৃতি অতীব মনোহারী কিন্তু আমাদের ভয় হইতেছে যে মত্ত-হস্তী তাঁহাকে আহত করিবে।" যাহারা বুদ্ধদেবের বিশ্বাসী ভক্ত তাহারা সাহস ভরে বলিলেন—এই মনুষ্যরূপী হস্তী 'গজোত্তম' অবতারের সহিত সামান্য হস্তী কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিবে।"

কিন্তু "গজোত্তম" করুণার অবতার—হস্তীর সহিত বাহুযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না—তিনি তাঁহার অন্তরের করুণা ও মৈত্রীর দ্বারা মত্ত হস্তীকে জয় করিলেন ('মেত্তেন কিৎতেন ফরি')। হস্তী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে ভগবান বুদ্ধদেব হস্তীর মস্তক সাগ্রহে স্পর্শ করিয়া বলিলেন—'হে যূথপতি! তুমি মত্ত হইও না' ('মা মদো মাচ পমাদো')। এই স্নেহ-বাণী শুনিয়া নালাগিরি বুদ্ধদেবকে নতশিরে প্রণাম করিল—এবং তাঁহার পদযুগলের চারিধার হইতে ধুলা সংগ্রহ করিয়া নিজের মস্তকে ছড়াইয়া দিয়া ধীরপদে পশ্চাতে ফিরিয়া শান্তচিত্তে সেই স্থান ত্যাগ করিল। দেবদত্তের দুষ্ট ষড়যন্ত্র বুদ্ধদেবের করুণার অস্ত্রে বিফল হইল।

অমরাবতীর কীর্তি-স্তূপের ভক্তদের প্রদক্ষিণ পথে এইরূপ নানা শিলাফলকের বুদ্ধদেবের জীবন-চরিতের নানা কাহিনী সুনিপুণ শিল্পীদের হাতে খচিত নানা শিলাফলকে চিত্রিত আছে।

চোখের পাতা খুলতে পারছিল না ইন্দ্র। সারা শরীর ঘোর ঘোর। ভারি। শুধু শিরা-উপশিরায় টান লেগে পাতা দুটো কিছুক্ষণ ধরে কাঁপল। অর্ধেকটা খোলার পর দেখা গেল মণির সাদা অংশ দুটোয় অল্প লালের ছাপ। দৃষ্টি ভাসা। ইন্দ্র এবার বুঝতে পারছে যে সে তার শোয়ার ঘরেই শুয়ে আছে। সামনের কাচ-পাল্লা জানালাটা খোলা। হ্যান্ডলুমে তৈরী শ্রীনিকেতনী কাজ-করা চেনা পর্দাটা। জানালার ঠিক পাশে উঁচু টিপয়ের উপর ফুলদানী। কিন্তু ফুল-গুলো শুকিয়ে কুঁকড়ে আছে।

গত তিনদিন আমি ফুল আনিনি। ইন্দ্র ভাবল। কি করে আনবে ইন্দ্র? সে যে মৃত্যুর জন্যে তৈরী হচ্ছিল। অবশ্য এ ইচ্ছেটা দীর্ঘ দু' বছর ধরে মনের মধ্যে লুকিয়েছিল। তারপর হঠাৎ পরশুদিন থেকে লাফিয়ে উঠে বিকট হয়ে উঠেছিল। আঙুলগুলো দুটো হাতের থাবার মধ্যে

ধরে মুচড়ে মুচড়ে সে ভেবেছে। কিংবা কিছুই ভাবতে পারেনি। ঝিমঝিম দপ দপ করেছে স্নায়ুগুলো। গতকাল; হ্যাঁ গতকালই; সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রেল-লাইনের পাশের গুমটি ঘরে বসেছিল ইন্দ্র। লোকাল ট্রেনটা আসতে দেরী করছে অথচ সাড়ে সাতটার মধ্যেই এসে পড়ার কথা। অনেকক্ষণ বসে থাকল ইন্দ্র। টেলিগ্রাফ পোস্টের গোঁ গোঁ আওয়াজ। একবার মনে হল রেললাইনের ওপর দিয়ে কারা যেন হেঁটে আসছে। ঘন অন্ধকারে আরো ঘন ছায়ামূর্তি। না, ওখানে কেউ নেই। গুমটি ঘরও ফাঁকা। কেউ থাকে না। আগে এখানে একটা লেভেল ক্রসিং ছিল। এখন পাশে একটা রাস্তা তৈরী হয়েছে। এটা ভেস্তে ফেলা হয়েছে। শুধু গুমটি ঘরটাই আছে।

তারার আলোয় রেললাইনটা চক চক করছে, গা এলিয়ে শুয়ে আছে যেন; কাছে থেকে দূরে। চোখদুটোকে দূরে পাঠাতে চেয়েছিল ইন্দ্র। দেখতে পেল ট্রেনের সার্চ লাইটটা দেখা যাচ্ছে। হুইসিল বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে ট্রেনটা। কোটি মাইল দূরের তারারা যেমন কাঁপে। ইঞ্জিনের আলোটা সেই গোছের মনে হচ্ছিল। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আলোটা তীব্র আরো তীব্র আরো বড় মনে হচ্ছে।

ইন্দ্র ততক্ষণ সব ভাবনা-চিন্তার ওপারে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথাটা যেন তুলতে পারছে না। ভারি হয়ে বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছে। ইন্দ্রর মনে হল ওর দুটো কষ বেয়ে লালা পড়ছে। ফাঁক হয়ে গেছে ঠোঁটজোড়া। জিভটাও বোধ হয় গ্রীষ্মকালের কুকুরের মত বেরিয়ে এসেছে।

লাইনের ওপর গলা দিয়ে এড়ো-এড়োভাবে শুয়ে পড়ল ইন্দ্র। এক আকাশ তারার নীচে শুয়ে পড়ে কতই যেন নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। মানুষ কেন এত ছোটখাট প্রয়োজন নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করে; হিসেব-নিকেসের ঘূর্ণিতে সব উপলব্ধি সব আনন্দ তলিয়ে যায়। ছেলেবেলাকে স্মরণে আনতে চাইল ইন্দ্র। কিন্তু কোথায় কে? ঘষা কাচের ওপারে যেন তারা। চেনা যায় না। শুধু মনে হয় আছে। এমন কি মায়ের মুখটাও মনে করতে পারছে না ইন্দ্র। প্রাণপণে মনে করতে চেষ্টা করল ইন্দ্র। ঠিক সাবানের ফেনায় ফুঁ দিলে যেমন হয়—ছোট ফেনার বুদবুদ বড় হতে হতে ফেটে গেল।

ইঞ্জিনটা কিছু দূর এগিয়ে এসে থামল। কি ওটা লাইনের ওপর পড়ে। সার্চ লাইটের আলোয় ইন্দ্রর সারা শরীর দেখা গেল। কান-ফাটানো হুইসিল

বাজলো দুবার। সড়াৎ করে পিছলে-খাওয়া মাছের মত লাইনের একটা পাশের কাঁটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল ইন্দ্র। ইঞ্জিনটা আবার চলতে শুরু করেছে। যেন কাছে এসে পড়েছে এবার। লোহার লাইনে কম্পন। খুব কাছে এসে পড়ায় সার্চ লাইটটা কিছু দূরে গোল হয়ে পড়েছে। ইঞ্জিনের সামনের হাত কয়েক নিরেট অন্ধকার।

ইন্দ্রর মনে হল মাথার ভেতরকার শিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাল পাকাচ্ছে। তরল আগুন চোখ নাক দিয়ে হলকা দিচ্ছে। এক নিমেষে কাঁটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ইন্দ্র। শরীরের যত শক্তি হাঁটুতে এনে ঝাঁপ দিল। মরণ ঝাঁপ।

সারা মুখে হাত বুলিয়ে, হাতটা আবার থুতনিতে নেমে এল ইন্দ্রর। মুখের ওপর পুরু ব্যাণ্ডেজ। শুধু চোখ আর নাকের ফুটো খোলা। "তুই এমন কাজ কেন করতে গিয়েছিলি দাদাভাই" ইন্দ্র এবার বুঝতে পারল তার মাথার কাছে বসে-থাকা মানুষটি তার বুড়ী ঠাকুরমা। অবশ্য তার টানা টানা নিশ্বাস আর খুক খুক কাশি শুনে তার অস্তিত্বের কথা টের পেয়েছিল ইন্দ্র। কথা শুনে আরো ভাল করে বুঝতে পারল। কথার বিষয়বস্তুটা মনের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে মনে হল, "কেন আমি মরতে গিয়েছিলাম।" কি দরকার ছিল মরার? দিব্বি তো শুয়ে আছি। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। জানলার ফাঁকে সূর্য-করোজ্জ্বল পৃথিবীর একটা টুকরো। আমলকি গাছের পাতায় সকালের হাওয়া খেলছে। "উঃ কি বোকা আমি!" "এমন করে কি মরে যেতে হয়", ইন্দ্র ভাবল। "তুই তো জানিস না দাদাভাই, তোর মা কাল সারা রাত ধরে কেঁদেছে, আজও পাশের ঘরে শুয়ে কাঁদছে।" "মাকে একবার ডাকো", ইন্দ্র বলতে চাইল। কিন্তু কথা বেরুল না। কথার ইচ্ছেটা জিভের ডগায় এসে বেঁধে যাচ্ছে, রিণ রিণ করে উঠছে অনুভূতির স্নায়ুগুলো। শুধু চোখের মণির দু'পাশে যে সব সরু সরু বহুবর্ণ শিরাগুলো চোখে জল আনে সেগুলোর আক্ষেপ দেখা গেল। জল বেরুলো দু' চোখ ভাসিয়ে।

চোখদুটো একবার বুজে খুলে ফেলল ইন্দ্র। দরজার চৌকাঠের কাছে মন্টু, শুভ আর তাতুন দাঁড়িয়ে। ইন্দ্রর দিকে আঙুল দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছে ওরা। মিট মিট করে হাসছে। ইন্দ্রর মনে হল তার এই ছোট ছোট ভাইপোগুলির ঠোঁটের ডগায় একটু একটু করে বিদ্রূপের হাসি দুলছে। "মরবারু মুরোদ নেই, অথচ যাওয়া চাই।" এইটাই বোধ হয় ভেবে নিয়েছে ওরা। দরজা থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে কড়িকাঠের দিকে ফেরালো ইন্দ্র। "সত্যি ত বাঁচল কি করে?"

ঝাঁপ মারা অবধি এখনো মনে আসছে। কিন্তু তারপর? তারপর কি হয়েছিল ওর? ভাবনাটাকে আরো ধারালো করে তুলবার চেষ্টা করল ইন্দ্র। কিন্তু কোন একটা ব্যথা-স্থানে খোঁচা লাগলে যেমন বিকট যন্ত্রণা হয় তেমন যন্ত্রণা করে উঠল মাথার ভেতরটায়। না, আর ভাবতে পারি না। পাশ ফিরে শুতে চাইল ইন্দ্র। ডান পা আর কোমরটা টন টন করে উঠছে। ও এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে বাঁ পায়ের গোছ থেকে উরুতের শেষ-প্রান্ত পর্যন্ত শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ করা।

"পাশ ফিরবে", শান্ত গম্ভীর আওয়াজ শুনে ইন্দ্র বুঝল বাবাও পাশে রয়েছেন। ফিস ফিস কে যেন কাকে বলছে, "পরিষ্কার জ্ঞান আজ এল, ডাক্তার-বাবু বলেই ছিলেন যে তিনদিন ঘোরের ওপরেই কাটবে।" তবে কি সেটা চারদিন আগেকার ঘটনা। অথচ ইন্দ্রর মনে হচ্ছে, এই ত গতকাল। ঘরের মধ্যে আরো কত-জন আছে তা হলে। ইন্দ্র একটা পাশে কাত হয়ে আছে। তাই মাথার দিকে পায়ের দিকে কারা বসে আছে বুঝতে পারছে না। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে ওর। হাঁ করা মাত্রেই এক জোড়া নরম সুন্দর হাত, মুখ ওর মুখের উপর ঝুঁকে দিল। ইন্দ্র চিনল এ মুখ বৌদির, দৃষ্টি দিয়ে অভিনন্দন জানাল বৌদিকে। বৌদি ততক্ষণ ফিডিং কাপে ভর্তি ফলের রস ইন্দ্রর মুখের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন। মিষ্টি মিষ্টি, নোনতা-মেশানো মিষ্টি। ইন্দ্রর মনে হল। ভাত খেতে কেমন? ডাল আর কই মাছের পাতুড়ি দিয়ে ভাত মেখে যেন কতদিন খায়নি ইন্দ্র। জিভের উপরটা লালায় ভিজে উঠেছে। ঠোঁটও ভিজে ভিজে। জিভ বার করে ঠোঁটের উপরটা একবার চেটে নিল। বৌদি আবার ঝুঁকলেন। "তোমার ক্ষিদে পেয়েছে ঠাকুরপো?" "এবার একটু দুধ, আর ওষুধ খাও।" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাতও এগুলো তার। অল্প দুধ আর ঔষধ খেয়ে ঘুম এল। চোখের পাতা ভারি আবার। হাজার চেষ্টা করেও খুলতে পারছে না ইন্দ্র। স্নায়ুতে স্নায়ুতে ঝিমুনি।

তুই শেষে আত্মহত্যা করতে গিয়ে-ছিলি? ইন্দ্রর ছেলেবেলার বন্ধু সরল বলে। ইন্দ্র তখন বেশ একটু সুস্থ হয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছে। ওর হাল্কা চুলগুলো ফ্যানের বাতাসে উড়ছে। ইন্দ্রর মনে হল এতগুলি বন্ধু ত ও একসঙ্গে কোনদিন দেখেনি। সকলেই বড় বড় চোখ মেলে ইন্দ্রকে দেখছে। পলক পড়ছে না। এত খুঁটিয়ে তাকে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেছে কিনা ইন্দ্র সে কথা মনে করতে পারল না। "পরমায়ু বটে তোর", সরল একটু থেমে বলে। "ইঞ্জিনের কাউক্যাচারে ধাক্কা খেয়েও যে কেউ বেঁচে থাকতে পারে এই প্রথম দেখলুম", শুভ বলে। ইন্দ্র এবার বুঝতে পারে—সে ঝাঁপ দিয়েছিল বটে কিন্তু তার মাথাটা চলন্ত ইঞ্জিনের চাকার তলায় না গিয়ে কাউক্যাচারে ধাক্কা খেয়েছে, তার দেহটা ছিটকে পড়েছে বাইরে। সত্যি মাথাটা ওর শক্ত বটে? মাথাটা কি আমার ফেটে গেছে? বোধ হয় না। যদি না হয় তবে মাথায় এত মোটা করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন? শুধু তাই নয়। মাঝে মাঝে টনটনও করছে। মাথাটা কি আমার ফেটে গেছে সরল? ইন্দ্রর কথা বলার ধরন দেখে ওরা হেসে উঠল। না তা কেন ফাটবে? তোমার মাথা তো আর মানুষের মাথা নয় যে, হাজার ধাক্কা লাগলেও ফাটবে না। ভাস্কর বলে। ওদের এই সম্মিলিত কথা, বিস্ময় আর ভালবাসা ভাল লাগছে না ইন্দ্রর। মনে হচ্ছে যে পরম বিস্ময়ের কিংবা চরম কৌতুকের একটা কিছু দেখতে এসেছে ওরা।

আমি এবার ঘুমাবো। তাকিয়াটা পাশে ঠেলে দিয়ে মাথায় বালিশটা ঠিক-ঠাক করে দিলেন মা। ইন্দ্রর চোখের ওপর চোখ রাখলেন। ইন্দ্র কিন্তু মায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ইন্দ্রর মাথার প্রতিটি কোষে দেহ বিস্তার করে চলেছে। কপালের ব্যাণ্ডেজটা খুলে দেওয়া হয়ে-ছিল, তাই ওর কপালের ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় জমে-ওঠা ঘাম মায়ের নজরে এল। উনি উঠে গিয়ে ফ্যানের স্পিডটা বাড়িয়ে দিয়ে ইন্দ্রর মুখের কাছে বসলেন।

চোখদুটো বুজে রয়েছে ইন্দ্র। পাতা কাঁপছে, ঘুম না এলে যে পাতা কাঁপে মা কি তা ভুলে গেছেন? তবু চুপ করে আছেন কেন? ভারি অবাক লাগছে ইন্দ্রর? ছেলেবেলা হলে এতক্ষণ এক ধাক্কা দিয়ে বলে উঠতেন, "ঘুমুচ্ছো না ছাই করছ, শিগগীর ঘুমাও বলছি।"

কতক্ষণ আর চোখ বুজে মায়ের মুখকে আড়াল করে থাকবে ইন্দ্র, একটু পরে ছোট করে চোখের পাতা দুটো ফাঁক করল। কিছু দূরে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন মা। ইন্দ্রর মুখের দিকেই তাকিয়ে। ইন্দ্রকে তাকাতে দেখে চোরা হাসলেন। চিবুকে ভাঁজ পড়ল। সেই মুহূর্তে মুখখানা ডান পাশে ঘুরিয়ে নিলেন।

এই দেখা না দেখার খেলাটা বেশীক্ষণ টি'কল না। উপলব্ধি দিয়ে ইন্দ্র বুঝতে পারলো যে ঘরের মধ্যে কারা এসেছেন। ইন্দ্র দেখল, যে বেতের চেয়ারটিতে মা বসেছিলেন, এখন সেখানে সাদা সার্ট পরা একজন হাড় জিরজিরে রোগা মতন লোক বসে আছেন। পাশে বাবা। দুজনে চাপা স্বরে কথা বলছেন। কথার দু-চার টুকরো ইন্দ্রর কানে আসছে। সে বুঝেছে যে, তার সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। আজ সব আলোচনার কেন্দ্রমূলে সে। একবার কলুর ঘানি দেখছিল ইন্দ্র। একটা পিপের মত বস্তুকে মাঝখানে রেখে কাঁধে জোয়াল দিয়ে একটা বলদ ঘুরছে। চোখ বাঁধা। মধ্য বস্তুটার নিচের দিকের থেকে তেল পড়ছে। ইন্দ্রর মনে হল সে যেন একটি কেন্দ্র। সব তরঙ্গ তাকে ঘিরে। সব কথা তাকে উদ্দেশ করে।

চেয়ারে বসে-থাকা ভদ্রলোকটি আস্তে আস্তে ইন্দ্রর মাথার কাছে এলেন। বাবা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। বললেন—ইনি কোর্ট থেকে এসেছেন, বুঝলে ইন্দ্র। তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান।

তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আবার উঠে বসল ইন্দ্র। শিরদাঁড়াটা একটু টন টন করল। মনে হল আগন্তুক ভদ্রলোক কিছু বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। তাঁর ফর্সা মুখে চিন্তার রেখা জমেছে। চোখে লেন্সের চশমা। তারই মধ্যে দুটো তীক্ষ্ণ চোখ। টেপা থুতনি। পুরু ঠোঁট নড়ল—এমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান আপনি, তবু কেন মরতে গিয়েছিলেন।

মুখ নীচু করে থাকল ইন্দ্র। বুঝল ভদ্রলোক শুধু উপরটাই দেখতে পান। না দেখার সন্ধান পান না। কি আশ্চর্য কথা। তার মনের ইচ্ছাটা এমন ভয়ানক আকার কেন নিয়েছিল—সে কথা তারই ভালমত জানা। এই ত মা, বাবা, দাদা, বৌদি আর বন্ধু-বান্ধবের কথা যখন সে ভাবছে, তখন তাদের উদ্বেগগুলো ভালবাসা বলে মনে হচ্ছে। জানালায় চোখ রেখে ঝকঝকে প্রকৃতির শান্ত সুন্দর চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে ইন্দ্র। মরতে ইচ্ছে করছে না। চুপ করে আছেন কেন? জবাব দিন; —আমি জানি না। ইন্দ্র বলে। চোখ পড়ে জানলায় দরজায়। বাড়ীর সকলের মুখ দেখা যাচ্ছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে ওরা। ইন্দ্র প্রতিটি কথা প্রতিটি ভঙ্গি যেন মনের মধ্যে পুঁজি করে নিতে হবে। অপলক তাকিয়ে ওরা। আপনি কি জানেন না যে, নিজেকে আপনি ধ্বংস করতে পারেন না? কি বলে লোকটা? ইন্দ্র মনে মনে হাসে। আমি আমার সম্পত্তি নই? আমার ওপর পূর্ণাঙ্গ অধিকার তবে কার? এই দেহ, এই মন আমার অথচ এটিকে নষ্ট করে ফেলতে আমি পারি না, কেন পারি না? ইন্দ্রর চোখের কালো কুচকুচে মণি দুটো জ্বলে উঠল। আগন্তুকের মুখের ওপর একবার দৃষ্টি রেখে মেঝের দিকে নামিয়ে নিল। একটা মরা কাঁচপোকা পড়ে আছে মেঝেয়। দুটো পিঁপড়ে ঘুরছে। কাঁচপোকাটা কেমন নিশ্চিন্তে মরে আছে। ওটা কি নিজেকে মেরেছে, কিংবা না চাইতে মৃত্যু এসে হাজির। ইন্দ্র বুঝতে পারছে ভদ্রলোক অনেক নূতন কথা বললেন। জীবন-দর্শনের অনেক তত্ত্বকথা মধুর ভাষায় ইন্দ্রর কানের কাছে আওড়ে গেলেন। যেন একটা দম-দেওয়া পুতুল। কথা বলাটাই ও'র পেশা। বিরক্ত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ভদ্রলোক বলে চলেন—আমরা কি করব বলুন। আইনের চাকর। কাজেই পুলিশ আপনার নামে কেস করতে বাধ্য হয়েছে। "কেন"? ইন্দ্রর ঠোঁট নড়ল। কথাটা তার মুখ থেকে যেন মগজে গিয়ে পৌঁছুতে দেরী হচ্ছে। ভাল করে বুঝে নিতে গিয়ে শরীরের সব স্নায়ুগুলো চীৎকার শুরু করে দিল। একটা তরল আগুনের স্রোত ব্রেণের ফ্রন্টাল লোব থেকে এগুচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ছে। নোংরা বস্তিতে এপিডেমিক যেমন ছড়ায়।

হ্যাঁ মামলা। তারই শমন জারি করতে আমি এসেছি। ভদ্রলোক পকেট থেকে মেটে রঙের একখানা কাগজ বার করলেন। বললেন—আপনি যে এটা পেলেন, এই মর্মে এখানে একটা সহি দিন। বলে ডুপ্লিকেট কপিটার একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন। কলমে হাত ঠেকাল ইন্দ্র, হাত কাঁপছে। দমকা হাওয়ার বেত-বনের কাঁপুনি। আঙ্গুল কাঁপছে। আমি মরতে গিয়ে বোধ হয় কাঁপিনি। এ তবে কিসের কম্পন। একবার চারিদিক তাকিয়ে নিল। বাড়ীর সবাই ঘরে। পাড়ার দু-চার জনও। মা, বাবা, দাদা, বৌদি, টুটুনু, মন্টু আরো যেন কারা সব তাকে দেখতে এসেছে। ইন্দ্র ওদের চিনতে পারছে না। বুঝতে পারছে না এমন ঝিমঝিম আওয়াজ কোথায় বেজে উঠল। মাথাটা ভারি হয়ে বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল।

কিছু সেদিন ভাল লাগল না। জিভ মুখ বিস্বাদ, ভাতের সঙ্গে ইন্দ্ররই পছন্দমত তরকারী হয়েছিল। কই মাছের পাথুরিও। খাগড়াই কাঁসার থালায় সরু চালের ভাতগুলি বেশ সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা। ফুল-কাটা রেকাবীতে নুন লেবু। সামনে বৌদি বসে আছেন। মধ্যম গতিতে হাওয়া কাটছে সিলিং ফ্যান। আসনপিঁড়ি হয়ে বসে মুখের মধ্যে ভাতের গ্রাস তুলে নিল ইন্দ্র। ভাতগুলি চিবিয়ে চিবিয়ে গালের একটা পাশ থেকে আর একটায় ঠেসে দিচ্ছে, কিন্তু গিলতে পারছে না। কষ্ট হচ্ছে।

বৌদি বললেন—আমি তোমায় খাইয়ে দেব ঠাকুরপো। বলে অল্প হাসলেন। সুন্দর সুঠাম দাঁতগুলি ঝিলিক দিল।

বৌদির এমন একটা মনোরম হাসি, স্নিগ্ধ ভঙ্গি অন্য সময় হলে ভাল লাগত ইন্দ্রর। এখন লাগল না। বরং কানের ডগাটা গরম মনে হল। নাকের পাটা অল্প ফুলেছে। ইন্দ্র বুঝতে পারল। চট করে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্র। এগুলো কলতলার দিকে।

তারপর এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। চোখ বোঁজা। বৌদি শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ইন্দ্রকে দেখছেন। চোখ না খুলেও বুঝতে পারল ইন্দ্র। আজ বোধ হয় বৌদির পরনে নূতন কোরা শাড়ী। এ গন্ধ ইন্দ্রর খুব ভাল লাগে। কিন্তু আজ এ গন্ধে বিরক্তি আসছে। একটি অসহ্য ধরনের অস্বস্তি মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। কি দরকার বৌদির এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার? যদি কিছু জানার থাকে পরিষ্কার করে জিজ্ঞাসা করলেই পারে। কি প্রশ্ন করবে বৌদি? হঠাৎ কেন রেগে উঠল ইন্দ্র। ভাত মুখে তুলেও খেল না কেন? কেন আবার? ভাল লাগছে না তাই। স্পষ্ট কথাটা কি বলে দিতে পারবে না ইন্দ্র। কিন্তু কথার জবাবে কথা বলা যায়। কিন্তু চুপ কথায় কিসের যেন হুল ফোটে। মনটা দপ দপ করে।

তার চাইতে ঘুম আসুক। মোটা চাদরের মত ঘুমের আস্তরণ তাকে ঢেকে ফেলুক। প্রাণপণে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল ইন্দ্র। মা বলতেন—ঘুম যদি না আসে তো এক কাজ করবি, মনে করবি, একটা নাগরদোলা ঘুরছে, তোর বন্ধুবান্ধব সবাই ঘুরছে তাতে, তুই শুধু দাঁড়িয়ে দেখছিস আর হাততালি দিচ্ছিস।

ইন্দ্র বুঝতে পারছে যে প্রচণ্ড ঘামে তার বিছানার চাদরটি ভিজে গেছে। গরমের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না সিলিং ফ্যানটা। ইন্দ্র সোজা সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকালো। ওটা নাগরদোলার মত ঘুরছে। কি একটা আটকে আছে ফ্যানের ব্লেডে। সেটাও ঘুরছে। ইন্দ্র তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তাকাতে দেখে ওর বৌদি ওর ঘর থেকে পাশের ঘরে গেলেন। একটু পরে মা এসে মাথার শিয়রে বসলেন। ইন্দ্র বুঝতে পারল যে, তার কোঁকড়ানো চুলগুলোয় মা আঙ্গুল ঢুকিয়েছেন। আস্তে করে বলছেন, তুই ভাত খেলি না কেন খোকা?—ভাল লাগছে না—ভাল না লাগলে তো শরীর থাকবে না। ইন্দ্রর মনে হল চিন্তার জটগুলো যখন কিলবিল করছে, সব ধরাছোঁয়াকে যখন বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে তখন শরীরের কথা। কি করে চিন্তা করবে ইন্দ্র। তার অস্তিত্বটাই তো মাঝে মাঝে শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু এসব কথা তো আর মাকে বলা যায় না। কাজেই চুপ করে মুখ বুঁজে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় কি? শুধু চিন্তার ঘোড়াটা লাফাবে। মা তো আর দেখতে পাচ্ছেন না।

সন্ধ্যার দিকে আরো বেশী গুমোট। ফ্যানের হাওয়াটা আগুন ছড়াচ্ছে। দরজার ওদিকে ব্যালকনিতে দাঁড়ালে কেমন হয়। ওটা পূব-মুখো। হাওয়া আসে। ঠান্ডা হাওয়া। অন্তত গরমকালের পক্ষে আরামপ্রদ। কাপড়টাকে ঠিক করে নিল ইন্দ্র। বিছানার নীচে রবারের শিলপারখানা রাখা ছিল। পায়ে গলিয়ে নিল। আস্তে আস্তে ব্যালকনিতে দাঁড়াল। দাঁড়াবামাত্রই এক ঝলক ঠান্ডা গরম হাওয়া ওর মুখের উপর দিয়ে বয়ে গেল। বাতাসে কিছু গরমের ছোঁয়া থাকলেও তেমন কষ্ট হয় না। মুক্ত প্রকৃতির বুকে থেকে উঠে এসেছে বলে বেশ মিষ্টি। চোখ মেলে থাকল ইন্দ্র। কিছু দূরে রাস্তা। সাইকেল রিক্সা, নূতন মডেলের চকচকে বাস হুস হুস করে ছুটছে। ইন্দ্র ছেলেবেলায় রিক্সার পিছু পিছু ছুটত। রিক্সওয়ালাদের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। রিক্সায় চেপে স্টেশনে অবধি গিয়েছিল। ফিরতে বড্ড দেরী হল ইন্দ্রর। বাড়ীতে ততক্ষণ উত্তেজনা। কোথায় গেল ছেলেটা। থানাতেও খবর দেওয়া হয়ে গেছে।

"মা দেখেছ! ছোটকাকু দোতলার বারান্দায়।" ইন্দ্রর ভাইপোগুলোর চিৎকারে মা আর বৌদি ঝড়ের মত ছুটে এলেন।

কি করছিলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? মা ইন্দ্রর চোখের ওপর চোখ রাখলেন, তখনো হাঁপাচ্ছেন মা। চোখের নীচে, কপালে, বিন্দু বিন্দু ঘাম। ইন্দ্র চোখ নামিয়ে নিল। ঘৃণা হল। মাকেই সে ঘৃণা করে বসল। বাড়ীর ছোটদের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করল না। কাকুর কাছে কান-মলা আর গাঁট্টা যাদের পাওনা—এখন তাদেরই নজর-বন্দী হয়ে আছে ইন্দ্র।

মাথার ভেতরটা দেখতে পারছে না ইন্দ্র, তবু মনে হচ্ছে, খানিকটা শুঁয়োপোকার মত অন্ধকার নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। পচা দই-এর উপর ইস্ট না না কি বলে সাদা পিচ্ছিল শ্যাওলা জমে ওঠে। তাকাতে পা গুলোয়। ঘিন-ঘিন করে। চারিদিকে তাকানোর আগে সারা শরীর কুঁকড়ে গেল। নাকের ওপরকার চামড়ায় ভাঁজ পড়ল। বুড়ো মানুষের মত কুঁজো হয়ে বিছানা অবধি ফিরে এল। বালিশে ঠিক খরগোসের মত মাথা গুজল। "আমায় যেন কেউ দেখতে না পায়, আমি আমার নিজের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখি—" তবু চারদিক থেকে কথা আসছে, টুকরো টুকরো কথা বিঁধছে। "এইটাই ওর রোগ", "এই রকম অদ্ভুত ভঙ্গী করাটাই হচ্ছে বিকার", "সারা রাত জেগে তোরা পাহারা দিবি," "আমি জেগে থাকব দিদি," "এবার ওকে চেঞ্জে পাঠালে কেমন হয়," দুটো আঙ্গুল কানের মধ্যে পুরে দিল মাত্র। ঠোঁটদুটো আবার ঝুলে পড়েছে। লালা বেরিয়ে বালিশ ভিজিয়ে দিচ্ছে। চোখে জল নেই। ঘড়ির কাঁটায় যখন ঠিক রাত দুটো—উঠে দাঁড়ালো ইন্দ্র। ওদের চোখে ঘুম। বারান্দা পার হয়ে সদর দরজার ঠিক পাশের রোয়াকটায়, পাটি বিছিয়ে কে একজন ঘুমুচ্ছে। পাড়ার একজনকে ওভাবে ঘুমুতে দেখল ইন্দ্র। "আমার গতিবিধির ওপর চোখ রেখেছে ওরা।" ম্লান হাসল ইন্দ্র। কে কাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আলোকলতাকে মনে পড়ল ইন্দ্রর। বিজ্ঞানের ভাষায় বলে "প্যারাসাইট"। সূর্যের আলো আর আকাশের জলই তার খাদ্য। যে গাছে সে বাসা বাঁধে সে-গাছ পারে না তাকে বাঁচিয়ে রাখতে। নিজে বাঁচে, নিজে মরে দরকার হলে। ইন্দ্রকে কি ওরা প্যারাসাইট ভেবেছিল। নিজের শরীরের দিকে তাকালো ইন্দ্র। পেশল বুক, পুষ্ট বাহু। কাঁধদুটোকে বৃষস্কন্ধ বলে কেউ কেউ। অথচ তাকেই ওরা চিনতে পারেনি, ওরা কি ভুলে গেছে পরীক্ষার আগে কটা রাত দু চোখের পাতা এক করেনি। পারবে ওরা ইন্দ্রর সঙ্গে পাল্লা দিতে।

অল্প হাঁটতেই ওদের তিনতলা স্কুলবাড়ীটার কাছে পৌঁছে গেল। রেলিঙ্ টপকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল। দোতলা থেকে তিনতলার ছাদ অবধি লোহার মই-এ উঠতে হয়। কাজেই লোহার মইটার পা-দানিতে পা ঠেকাল। দোতলা থেকে একটা ধাপ উঠছে, আর একটা করে চিন্তার পাক লাগছে। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাবে না আলো থেকে অন্ধকারে? অপ্রাপ্তির হিসেবনিকেশ শুরু করতে চাইছে না ইন্দ্র। শুধু চলে যেতে চাইছে। যাকে বলে,—ট্রান্স-ফরমেশন অব এনার্জি। শক্তির রূপান্তর। আজ আমার মধ্যে যে এনার্জি লুকিয়ে আছে, আমি চলে গেলে, ধ্বংস হয়ে গেলে, আরো একটা আধারের মধ্যে আসে। তার থেকে বিগত আমিকে খুঁজে বার করব। যদি চিনতে না পারি? চিনতে না পারলেই বা ক্ষতি কি? অতীতকে ভুলে গিয়ে শান্তি আছে, একটা দেহকে যেমন কবর দেওয়া যায়। পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা যায়। তেমনি অতীতের সব ঘটনাকে, সব ঘটনাকে পোড়ানো যায় না কেন? অতীতের গহ্বর থেকেই বা কেন বর্তমান কাল জন্ম নেবে? সূর্য ওঠা, রাত নামার মত এটাও চিরন্তন সত্য হয়ে আছে। অথচ মানুষ বদলায়। ঋতু বদলায়। ভূগোলও বদলায়। যেমন ইন্দ্রও আজ বদলিয়ে যেতে চলেছে।

(১) পাঁজিতে পুণ্যাহের দিন বার মাসই পাওয়া যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ বড় বড় জমিদার পুণ্যাহ করিতেন আষাঢ় মাসে। আষাঢ় মাসের প্রতি এই প্রীতির কারণ কি? এই সময়ে বর্ষা নামে, চাষবাস আরম্ভ হয়, এই জন্যই কি জমিদারী-সেরেস্তায় agricultural year এক পুণ্যাহ হইতে অপর পুণ্যাহ পর্যন্ত হইত? না ইহার কোন ঐতিহাসিক কারণ আছে? কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রোমিলা থাপার তাঁহার প্রণীত "অশোক এবং মৌর্যদের পতন" পুস্তকের ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

"The fiscal year was from Asadh (July), and 354 working days were reckoned in each year. Work during the intercalary month was separately accounted for."

অশোকের সময়েও (খৃঃ পূঃ ২৫০) আষাঢ় মাসে সরকারী বর্ষ আরম্ভ হইত—আর এই বর্ষ মোটামুটি হিসাবে তিথি ধরিয়া বা চান্দ্র মাস ধরিয়া করা হইত। মলমাসের জন্য পৃথক হিসাব রাখা হইত।

বাংলাদেশে আষাঢ় মাসে পুণ্যাহ আরম্ভ হইবার সহিত অশোকের এই বর্ষ আরম্ভের কি কোন সম্পর্ক আছে? অন্যান্য প্রদেশে কি হইয়া থাকে?

এই প্রসঙ্গে ইংরাজ সরকার ইং ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত সরকারী বৎসর ১লা জুন (=১৮ই জ্যৈষ্ঠ) হইতে আরম্ভ করিতেন। এখন অবশ্য সরকারী বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হয়।

(২) বিহারে ভূমিহার ব্রাহ্মণদের অনেকে ব্রাহ্মণের পূর্ণ মর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক; তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা নিজের ভাগতে জমি চাষ করেন এজন্য ব্রাহ্মণের পূর্ণ মর্যাদা পাইতে পারেন না। উড়িষ্যার খাড়েঙ্গা পদবীধারী ব্রাহ্মণদের অনেকে ব্রাহ্মণের পূর্ণ মর্যাদা দান করিতে চাহেন না—বলেন যে, ইঁহারা ক্ষত্রিয়ের কার্য করিয়া পতিত হইয়াছেন। খাড়েঙ্গা মহাশয়েরা বলেন যে, ঘন ঘন মুসলমান আক্রমণের ফলে যখন উড়িষ্যায় ক্ষত্রিয় শক্তি লোপ পাইতে বসিয়াছিল, তখন রাজার আদেশে যে সব ব্রাহ্মণ অস্ত্র (খড়্গ) ধরিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের পদবীর শেষে খাড়েঙ্গা শব্দ যুক্ত হইয়াছিল। কালক্রমে লোকমুখে খাড়েঙ্গা হইতেছে খড়্গধারীর অপভ্রংশ।

এই কৈফিয়ত কি সত্য?

(৩) প্রবাদ পুরীর রাজারা ৬ পুরুষ অন্তর একই নাম গ্রহণ করেন। যেমন—

১। পুরুষোত্তমদেব
২। প্রতাপরুদ্রদেব
৩। মুকুন্দদেব
৪। রামচন্দ্রদেব
৫। বীরকিশোরদেব
৬। পুরুষোত্তমদেব (২য়) ইত্যাদি।

এই প্রবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উড়িষ্যার ইতিহাসের কতকগুলি ঘটনার তারিখ নির্ধারণ করা সহজ হয়। এক পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিলে ৫ পুরুষে ৫×২৫=১২৫ বৎসর হয়। ধরুন জানিতে পারা গেল যে, রাজা-রাণী মন্দির বীরকিশোরদেবের আমলে হইয়াছে। এই বীরকিশোর হয় প্রতাপরুদ্রদেবের পৌত্র না হয় পিতামহ। মন্দির নির্মাণের শৈলী দেখিয়া স্থির করা গেল যে, প্রতাপরুদ্রদেবের পূর্ববর্তী। কত পূর্ববর্তী? অন্ততঃপক্ষে অর্ধশতাব্দী পূর্বের।

(৪) পিতল-কাঁসার দোকানে জিনিস কিনিতে গিয়াছি। দোকানী বলিল যে, সস্তায় গাছা বিক্রয় আছে, কিনিবেন? গাছা কি, দেখিতে চাহিলে দোকানী গাছা বাহির করিল। মাটি হইতে ৩।৩॥ ফুট উচ্চ মোটা পিলসুজের ডাঁট। উপরে পাঁচমুখী প্রদীপ—ওজন অর্ধ-মণের উপর, ভরাট কাঁসার তৈরী। দুর্গোৎসবের সময় ধনী-গৃহে সারা দিন-রাত্রি ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য এই গাছার ব্যবহার হইত। মধ্যে মধ্যে স্ক্রুপের প্যাঁচ দেওয়া আছে, খুলিয়া ছোট করা যায়। জমিদারী দখলের পর—বাবুরা দুর্গোৎসব তুলিয়া দিয়াছেন, আর পারেন না। দোকানীর কাছে বিক্রয়ের জন্য রাখিয়াছেন আর বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি কোন জানাশুনা গৃহস্থ হিন্দু পূজার জন্য কিনেন তাঁহাকে অতি কম দামে বিক্রয় করিবেন। পূজার জিনিস, যে জিনিস শতাবধি বৎসর পূজার কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা যেন পাষণ্ডের হাতে না পড়ে। এইরূপে পিলসুজের "গাছা" নাম হইল কেন?

(৫) চন্দননগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহার বাড়ী নবদ্বীপে বেড়াইতে গিয়াছি। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত বলিয়া খ্যাত শ্রীচৈতন্যদেবের নিম কাঠের একটি মূর্তি আছে; নিত্য পূজা হয়। এই মূর্তির একটি হাত অপর হাত অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হইল। প্রশ্ন করিলাম একটি হাত বড় কেন? শুনিলাম যে, চৈতন্যদেবের একটি হাত অপর হাত অপেক্ষা বড় ছিল। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রথমে তাঁহার খড়ম পূজা করিতেন, পরে ভাস্কর ডাকাইয়া যাঁহারা চৈতন্যদেবকে বহুবার দেখিয়াছেন তাঁহাদের দ্বারা এই নিমকাঠের মূর্তি করান। যখন মূর্তি করান তখন চৈতন্যদেব পুরীতে ছিলেন। এইরূপে এই মূর্তি তাঁহার সমসাময়িক মূরৎ বা statue. হাত দুইটি মাপিতে চাহিলে বলিলেন যে, ভগবানকে মাপিতে নাই, আপনি ত গৃহস্থ, আপনার অকল্যাণ হইবে।

এই প্রবাদ কি সত্য? বৈষ্ণব-সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া সমসাময়িক বৈষ্ণব-সাহিত্যে এ বিষয়ের কি কিছু উল্লেখ আছে?

(৬) ঠাকুরমা ইং ১৯০৩ সালে মারা গিয়াছেন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন, বাংলা ত জানিতেনই, ইংরাজীতে নিজ নাম সহি করিতে পারিতেন। ঠাকুরমা যখন আমাকে ক, খ, পড়াইতেন তখন মাঝে মাঝে সুর করিয়া প্রত্যেক অক্ষরের আকারের সম্বন্ধে ছড়া করিয়া বলিতেন। সবগুলি মনে নাই, দুই-একটি মনে আছে। যথা:—পাথায় পাগড়ী ঙ, বেগুনে ঠ, হাড়গোড়ভাঙ্গা দ, কাঁধে বাড়ি ধ, দুই পুঁটুলে শ, পেটকাটা ষ ইত্যাদি। বলিতেন যে, তাঁহাদের সময় গুরু-মহাশয়েরা ছেলেদের এইরূপে হাতের লেখা পাকাইতেন।

কেহ কি সম্পূর্ণ ছড়াটি উদ্ধার করিতে পারিবেন? পারিলে আমাদের পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ ছিল তাহার একটি আভাস পাওয়া যাইবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত
৮৫নং বারাকপুর ট্রাংক রোড
কলিকাতা—২

সূচনা

নিলীমা সেন (গঙ্গোপাধ্যায়)

গাড়ীবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে শুধু মাথাটাই বাঁচাতে পারল সুদীপ্ত। জুতো-জোড়া খুলে হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে। এখন সেটা ভারী লাগছে। জলটা ক্রমশঃ হাঁটু পর্যন্ত উঠে আসছে যেন। এখনও বিকেল পাঁচটা বাজেনি, এরই মধ্যে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেছে; বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে ইলেকট্রিকের আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। আকাশটাকে চেনা যাচ্ছে না, এমনই অদ্ভুত চেহারা হয়েছে।

দরজার মুখের সিঁড়িগুলো জলে ডুবে গেছে। পায়ের মধ্যে শির শির করছে। বৃষ্টি তো নয়—বন্যা। কাঁধে ঝোলান বি ও এ সি মার্কা কিট্ ব্যাগটা থেকে হাতড়ে হাতড়ে সিগারেট, দেশলাই বার করল।

জানলার ফাঁক দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছে মাধবী। কোঁকড়া চুলে জল পড়ে চিক চিক করছে; স্পোর্টস শার্টটা ভিজে গায়ের সঙ্গে আটকে গেছে। অল্প বয়স; ছাত্র হবে বোধ হয়। এখনও চোখে মুখে সংসারের চাপের রেখা পড়ে নি। বেশ বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টির অভদ্রতায় খুবই বিরক্ত হয়েছে।
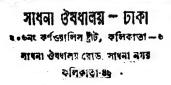
থাক্, দেখবে না মাধবী; কি ভাববে ছেলেটি। ভাববে বোকার মতো তাকিয়ে আছে। নিজের কাজ করাই ভালো। ঘরোয়া একটি মেয়ে সে; গৃহস্থবধূ। আলনায় কাপড় গোছাতে লাগল মাধবী। বিছানার চাদরটা টান করে আবার পাতল। বেশ বুঝতে পারছে ছেলেটির চোখ মধ্যে মধ্যে পর্দার ফাঁক দিয়ে চলে আসছে ঘরের মধ্যে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল বাঁধল খানিকক্ষণ ধরে। প্রসাধন সারল সযত্নে। বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যার রঙে রং মিলিয়ে একখানা শাড়ী পরল। জোরে জোরে অথচ গুন্ গুন্ করে দু'কলি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিয়ে দিল।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে এল। আরো অন্ধকার হল আকাশ। বোধ হয় রাস্তা দিয়ে বাস ট্রাম ট্যাক্সি রিক্সা কিছুই যাচ্ছে না। সব বন্ধ হয়ে গেছে। মাধবী পর্দা ফাঁক করে দেখল—তখনও উদাস হয়ে দরজায় হেলান দিয়ে ছেলেটি সিগারেট খাচ্ছে।

আলো জ্বালল। তারপর বসবার ঘর দিয়ে বেরিয়ে এলো দরজা খুলে।

'আর কতক্ষণ জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন এমন করে, তার চেয়ে আসুন ভিতরে।' মাধবী বিনীত হয়ে বলল।

হাত থেকে সিগারেটের টুকরোটা জলে ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সুদীপ্ত। মাধবীকে দেখে প্রথমে বিমূঢ় হয়ে গেল। ইতস্তত করে বলল—'কিন্তু কতক্ষণই বা জায়গা দেবেন। এমন সাংঘাতিক বৃষ্টি কতক্ষণ চলবে বোঝা যাচ্ছে না তো!'

—'তা হোক, দ্বিধা করবেন না। এরকম জলে দাঁড়ানর চেয়ে ভিতরে এসে বসা ভাল নয় কি?'

মাধবীর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে গেল সুদীপ্ত। ভালোই হল; জল থেকে পা

ফুলতে পারলে বাঁচে ও! পায়ের পাতা এতক্ষণে কুঁকড়ে সাদা হয়ে গেছে।

—আপনাদের অসুবিধা হবে না?

—অসুবিধা! হাসলো মাধবী। একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে এলো।—'কোনো অসুবিধা নেই যতক্ষণ খুশি আপনার থাকতে পারেন।'

ভিজে জুতোটা দরজার কোণায় রেখে দিল। কাঁধ থেকে কিট ব্যাগটা নামাবার আগেই মাধবী হাত বাড়িয়ে ধরে নিল। তাড়াতাড়ি আলমারী খুলে একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি বার করে দিল।

অসম্ভব বিব্রত হয়ে সুদীপ্ত বলে উঠল—'আচ্ছা এসব করার মানে কি? কেন এতো ব্যস্ত হচ্ছেন? এ জলটুকু গায়েই শুকিয়ে যাবে এক্ষুণি।'

—বাঃ আপনি ভিজে জামা-কাপড় পরে বসে আমার জিনিসপত্রগুলো সব ভিজিয়ে দিন আর কি?'

হি হি করে হাসল মাধবী। 'যান তর্ক করবেন না। মেয়েদের সঙ্গে তর্কে কখনই পারবেন না।' স্নানের ঘরের দিকে আঙ্গুলে দেখিয়ে দিল।

'তা অবশ্য ঠিকই বলেছেন।'

আর দ্বিরুক্তি করল না সুদীপ্ত।

বসবার ঘরে বেশ আরাম করে বসল সুদীপ্ত। সঙ্কোচ অনেকটা কেটে গেছে। স্পষ্ট চোখে দেখতে লাগল।

লোহা-সিঁদুরের কোন চিহ্ন নেই। ঢেউ তোলা চুলের মাঝে সরু সুন্দর সিঁথি। মুখটা সুন্দর, কিন্তু কেমন যেন বিষন্ন। চোখ দুটিতে অতি বিনীত ভঙ্গি। বড় নরম চেহারা। কোলের ওপর জড়ো করা হাত দুটো কত কোমল; মুখের হাসিটা আশ্চর্য মোলায়েম, যেন সূর্যাস্তের করুণ আকাশ।

একটু অপ্রতিভের হাসি হাসল মাধবী। একজন অপরিচিত মানুষকে নিঃসন্দেহে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়েছে। এতক্ষণে সঙ্কোচ হচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে বলল—'আচ্ছা চা করি—ততক্ষণ বই পড়ুন।'

সুদীপ্ত নিষেধ করার আগেই মাধবী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আসবাব-পত্রগুলো ঝাড়ামোছা ঝকঝকে। কোণের তিনকোণা টেবিলের ওপর মস্ত ফুলদানীতে হলদে আর মেরুন রঙের পাতা-বাহার সাজানো। ছোট্ট বুককেশে অনেকগুলো বই রয়েছে—সোনালী জলে নাম লেখা। পাশের টিপয় থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিল। পাতা ওলটানোর শব্দে হঠাৎ যেন নিজেই চমকে উঠল। বাইরে বৃষ্টির শব্দ ছাড়া এতক্ষণ পরে এই শব্দ; সুদীপ্ত চারিদিক চেয়ে দেখল; কেউ কোথাও নেই। সমস্ত ফ্ল্যাটটা নিরেট স্তব্ধতা নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে।

রান্নাঘর থেকেও একটুও আওয়াজ আসছে না। ম্যাগাজিন রেখে সুদীপ্ত ঘর ছেড়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল। রান্নাঘর দেখে মনেই হল না আজ সারাদিন রান্না হয়েছে। মাধবী জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপ করে; চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

—'একি আপনি কাঁদছেন? কি হয়েছে আপনার?' সুদীপ্ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

মুখ নীচু করে মিষ্টি হাসি হাসল মাধবী—"ছি ছি! আপনি রান্নাঘরে কেন? চলুন চলুন!' ঘুরে দাঁড়িয়ে টিপট থেকে চা ঢালল। 'দেখুন তো, এই বৃষ্টিতে কিছু যে খাবার যোগাড় করব তারও উপায় নেই।'

টপ্ করে চায়ের পেয়ালা দুটো তুলে নিয়ে সুদীপ্ত হো হো করে হেসে বলল—'সেইজন্য কাঁদছিলেন? আচ্ছা পাগল আপনি! আসুন।'

মাধবী একটা টিনের ভিতর থেকে কিছু চিনে-বাদাম ঢেলে ফেলল প্লেটের ওপর।

ঐ পর্যন্তই। এর বেশী সাধ্য নেই; এই বৃষ্টি-বাদলে, ঝড়-ঝাপটায় কে যাবে খাবার কিনতে?

একমুঠো বাদাম তুলে নিয়ে বলল সুদীপ্ত—'বাঃ, চমৎকার লাগছে। অপূর্ব চা। বেশ মিষ্টি হাত আপনার।'

—ও রকম বলতে হয় তাই বুঝি বলছেন?

—মোটেই তা নয়। আমি সে জাতেরই মানুষ নই যে অনর্থক খোসামোদ করব। মনের কথা প্রকাশ করছি মাত্র।

চায়ে চুমুক দিয়ে আবার বলল—'এতক্ষণ ঠিক কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না; বৃষ্টির পাগলামী দেখে নিজেই বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।'

চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল। কিছু মনে করছেন না নিশ্চয়!

—না, একেবারেই না।

—কিন্তু এখন কি করা যায় বলুন। গান জানেন?

—উঁহু। রেডিও চালাব?

—সর্বনাশ। বাইরে আকাশে বজ্র-বিদ্যুৎ উদ্দাম হয়ে উঠেছে, আর আপনি রেডিও খুলছেন?—নিজে গান করুন। ধরুন একটা গান।

—গান ছেড়ে দিয়েছি কতকাল হল! টেনে টেনে দুঃখের সঙ্গে বলল মাধবী।

—ছেড়েছেন তো কি? এটা তানসেন সঙ্গীত সম্মিলন নয়—এখানে আমার সামনে গাইতে পারবেন।

—'এমন দিনে তারে বলা যায়!' গান ধরে দিল সুদীপ্ত। চাপা গলায় মাধবীও গাইতে লাগল। দুকলি গান করে বলল—'কি সেকেলে একটা গান ধরিয়ে দিলেন।'

—গানের কখনও কাল আছে! বাইরে বৃষ্টি, আকাশে বিদ্যুৎ, এসময়ে এগান ছাড়া আর কিছু শোভা পায়? কিন্তু কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে কেবল। প্রায় সাতটা বাজে।

—এতো তাড়া কিসের? জলে পড়েছেন নাকি?

—জল থেকে উদ্ধার পেয়েছি বটে তবু চলে যেতে হবে। রাত নটার আগে হোস্টেলে পৌঁছতে হবে।

—কি করে পৌঁছবেন এই দুর্যোগে!

—চেষ্টা করব। তা না হলে মুস্কিলে পড়ব।

—কতদূরে আপনার হোস্টেল?

—শিবপুরে।

—ও, আপনি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়েন।

—এবারে ফাইনাল ইয়ার। তারপরেই বইপত্তর চিরদিনের মতো গুটিয়ে ফেলব।

মাধবী সে কথায় যেন কান দিল না; বলল—'তাহলে এই বৃষ্টিতে বেরোলেন কেন? সকাল থেকেই মেঘলা।'

—ভেবেছিলাম, এটুকুতে অসুবিধা হবে না। বিকেলে যে এমন একটা ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াবে তা ভাবিনি। এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, রাখতেই হবে। মধুর হাসি হেসে চুপ করে গেল সুদীপ্ত।

—আজকালকার ছেলেদের খুব এ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে হয়—তাই না?

—আর মেয়েদের বুঝি রাখতে হয় না?

অন্যমনস্কের মতো মাধবী বলল—'কি জানি, রাখতে হয়, হয়তো।' যাক সেকথা। একটা উইক-ডেতে এমনি করে হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এলেন কি করে?

—কৌশলে। তাই তো নটার আগেই গর্তে ঢুকতে হবে। তাছাড়া না বেরোলে চলত না; এত বৃষ্টি হবে আগে কে জানতো! কোন কাজই হল না।

হাসিটা ঠোঁটের প্রান্তে লেগেই রয়েছে—

—না এলে কি রক্ষে ছিল?

—গার্ল ফ্রেণ্ড নিশ্চয়।

—ধরেছেন ঠিক।

পকেট থেকে পার্শ বার করে এদিক ওদিকের ভাঁজ খুলল। ছবিটা খুঁজে পেল না।

—ছবিটা থাকলে দেখাতাম; খুব সম্ভবতঃ ডাইরীর মধ্যে রয়ে গেছে।

মাধবী ম্লান হয়ে গেল। বুকের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম খোঁচা অনুভব করল। একটা অদৃশ্য অপরিচিত মেয়ের প্রতি ছোট্ট ঈর্ষা কাঁটার মতো মুখ তুলে দাঁড়াল হৃদয়ের কোণে। এই যে ছেলেটি, ঘণ্টাখানেক আগেও সে অপরিচিত ছিল। ওকে সে জানে না, চেনে না। শুধু সুকুমার চেহারা আর পাঁচ মিনিটের আলাপে কেন ভালো লাগবে মাধবীর? এমন হয় নাকি? বয়সে হয়তো ছোটই হবে ছেলেটি।

গলা শুকনো করে মাধবী জিজ্ঞাসা করল—'তার নাম কি?'

—শকুন্তলা। টপ করে বলে ফেলল সুদীপ্ত।

—বাঃ চমৎকার নাম তো!

—আপনার ভালো লাগছে নামটা। আমারও খুব ভালো লাগে। বেশ রোম্যান্টিক, তাই নয়?

উচ্ছ্বসিত হয়ে নির্লজ্জভাবে বলতে লাগল সুদীপ্ত।

—যদি না আসতাম তাহলে অনর্থ করে দিত। ভীষণ রাগী।

কতদিনের আলাপ আপনাদের?

—প্রায় এক বছর হল। কিন্তু মনে হয় অনেকদিন!

মাধবী মনে মনে বলল—'ঐরকমই মনে হয়।'

পড়ে বুঝি?

হ্যাঁ, বি. এ পড়ে আর রবীন্দ্র-সংগীত করে।

—খুব গুণের মেয়ে দেখছি।

ও, সত্যি! স্বীকার করল সুদীপ্ত। খুব সুন্দর বুনতে পারে। তার কথা রাখুন। আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছি না কেবল নিজের কথাই বলছি।

—আমার কোন কথাই নেই।

—তা বললে কি হয়? নামটা জেনে ফেলেছি মাধবী। বইতে লেখা আছে। কিন্তু বাড়ীতে কাউকে দেখছি না যে?

—সকলেই বেরিয়েছে। বৃষ্টিতে আটকে গিয়েছে হয়তো কোথাও।

একটা অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল মাধবী। গলার মধ্যে কথা আটকে যাচ্ছে।

—পড়েন?

—না। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মাধবী।

ও কিছু করে না; শুধু এই ফ্ল্যাটের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন ধরে আর পাগলের মতো চিন্তা করে। চিন্তায় মুখের চেহারা কতোটা গভীর কালো হয়ে উঠেছে তাই দেখে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

তবু বলল—'গান শিখি।'

—তবে আবার গান করুন।

সুদীপ্ত বৃষ্টির সুরে সুর মিলিয়ে আবৃত্তি করল—'হে মাধবী দ্বিধা কেন।'

তাও চুপ করে বসে রইল মাধবী।

—নাঃ আপনি দেখছি নেহাৎ-ই ফর্ম্যালিটি করছেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল ইস! রাত হয়ে গেলো। কখনই বা যাবো। উঠে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি অনুভব করল—আর থাকা যায় না ভদ্রলোকের বাড়ী।

—আমি যদি কবিতা শোনাই, কেমন হয়?

—অপূর্ব! তবে কি জানেন, আমার মতো অপরিচিত রাস্তার মানুষকে হঠাৎ ডেকে এনে কেন এতো বিব্রত হচ্ছেন বুঝতে পারছি না। তাড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন?

বুকের মধ্যে শুকিয়ে গেল মাধবীর। কি ভাবছে ছেলেটা। একটি ভদ্রমহিলাই ভাবছে তো? নাকি আর কিছু ভাবছে। জোর করে হেসে বলল—ওসব কথা থাক। অতিথিকে কি কেউ তাড়িয়ে দেয়?

—তা দেয় না। তবে অতিথির নিজেরই কনসিডারেট হওয়া উচিত কি বলুন?

সুদীপ্ত নিজেই স্নানের ঘরের দিকে এগোল।

দুটো দশটাকার নোট সোফার ওপর পড়ে রয়েছে। পার্শ খোলার সময় পড়ে গেছে হয়তো, নাকি ফেলে রেখেছে ইচ্ছে করে।

মাধবী চোখ টান করে দেখতে লাগল।

উঠে এসে নোট দুখানা স্পর্শ করল। আজ সকাল থেকে কিছুই প্রায় খাওয়া হয়নি অর্থের অভাবে।

চোখের সামনের সাদা আলোটা যেন লাল নীল বিন্দু বিন্দু হয়ে মাথার মধ্যে ছড়িয়ে গেল। ছেলেটি কি বুঝতে পেরেছে সব? ধরে ফেলেছে সব ফাঁকি? ভদ্রতার মুখোসের অন্তরালের সব কৌশল দেখে ফেলেছে?

স্বামী ছিল। ওকে ফেলে চলে গেছে প্রায় দেড় বছর হল। কেউ বলে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে কেউ বলে অন্য কোথাও সংসার পেতেছে। মাধবী কোনটাই জানে না। শুধু অপেক্ষা করে প্রতিটি মুহূর্ত। যতদিন গয়না ছিল ততদিন সেগুলোই দিন চালাতে সাহায্য করেছে। সম্প্রতি অল্প অল্প আসবাবপত্র চালান দিচ্ছে। দুএকদিনের মধ্যে এতো সখের রেডিওটাও হারাতে হবে। তারপর সোনার জলে নাম লেখা বইগুলোও চলে যাবে। বাড়ীওয়ালা গত ছমাস ধরে ভাড়া পাচ্ছে না; উকিলের চিঠি দিয়েছে।

মাধবীর কেউ নেই। অতি দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল কাকার সংসারে। পড়াশোনা বেশীদূর এগোয়নি; আই. এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে গেল।

ক'মাস ধরে রাশি রাশি কাগজ দরখাস্ত করে নষ্ট করেছে—বিভিন্ন স্কুলে আর অফিসে। ওর জন্যে কোথাও জায়গা নেই। ভীষণ কম্পিটিশন। কোথায় দাঁড়াবে, ভবিষ্যতে কি হবে জানে না মাধবী।

নীচে নামবে আস্তে আস্তে। অনেক নীচে—পাতালে—রসাতলে। মনে হয়েছে আত্মহত্যা করলে সব পাপের শান্তি হয়। কিন্তু তাই বা কি করে করবে? তার চেয়ে বেঁচে বেঁচে মরবে। তারপর ওর স্বামী ফিরে আসবে ওর কাছে; নিশ্চয় আসবে, মাধবী সেইজন্যেই তো এইখানে অপেক্ষা করছে এতকাল ধরে। এখান থেকে যদি চলে যায় তবে ঠিকানা জানবে কি করে তার স্বামী? এসে ওকে তুলে নেবে এই গ্লানি থেকে!

এবাড়ীতে কেউ থাকে না। শুধু মাধবী একা একা ঘুরে বেড়ায় প্রেতের মতো। গুণ গুণ করে কাঁদে।

একসময় চোখের জল গেল শুকিয়ে; তৈরী হয়ে ওঠে মাধবী। সুযোগ খোঁজে কিভাবে শুরু করবে। আজকের ঝর-ঝর সন্ধ্যায় অভিসারিকার মতো রোম্যান্টিক হয়ে উঠতে পারবে না?

কেন মনে হচ্ছে এ সম্ভব নয়? কেন এই সন্ধ্যাটি নিঃসীম শূন্যতায় হারিয়ে যাচ্ছে? কেন আবার নতুন করে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে; সুন্দর জীবনকে নিবিড়ভাবে পেতে ইচ্ছে করছে।

ভিজে জামাকাপড় পরে নিয়েছে সুদীপ্ত। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল—'চলি তবে হে মাধবী।'

যেন স্বপ্ন দেখে হঠাৎ জেগে উঠল মাধবী। যদি সবই বুঝেছে তবে কিসের লজ্জা?

দরজায় দুহাত জুড়ে বলল—'না না! আজ রাত্রে থেকে যান আপনি। যেতে দেবো না।'

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল সুদীপ্তর। চোখের দৃষ্টি গম্ভীর হয়ে উঠল।

—'আপনি কি বলছেন, নিজেই কি তা জানেন?'

উত্তর দিল না মাধবী।

ওর ঠাণ্ডা কনকনে হাতটা মুঠো করে চেপে ধরল সুদীপ্ত।

—আমার বান্ধবী আমাকে রাত্রে থাকতে বলত না। যত দুর্যোগই হোক, নিষ্ঠুরের মতো চলে যেতে বলত।

কি শান্ত অথচ কি কঠিন জবাব। চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় মনটা যেন পাকানো কাগজের মতো মুচড়ে গেছে। জীবনে উঠতে গেলেও বাধা আসবে—নীচে নামতে গেলেও পা টলবে।

চোখ চেয়ে দেখুন আমাকে—বন্ধু বলে গ্রহণ করুন। উপকারীর মুখে কালি ছিটোতে পারব না। সুদীপ্ত এতো ছোট নয়।

কঠিন একটা চাপ দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিল সুদীপ্ত।

ট্রাউজারসটা গুটিয়ে ফেলল। ভিজে জুতোটা বি ও এ সি মার্কা কিট ব্যাগে ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে নিল কাঁধে।

জানলার কাছে ফিরে গেল মাধবী। বাস্তার আলোয় কোলকাতার জলে ভরা রাস্তা চিক চিক করছে। ছপ্ ছপ্ আওয়াজ করে চলে গেল সুদীপ্ত, মাধবীর সঙ্গে দেখা করতে।

কলারসিক

জুন মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতার ১নং চৌরঙ্গী টেরেসে এবং ক্যাথিড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনের রবীন্দ্র-গ্যালারীতে দুটি একক চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রথমটি ছিল কবি-শিল্পী দিলীপ রায়ের প্রদর্শনী আর দ্বিতীয়টির শিল্পী হলেন শ্রীমিলু বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের একক প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা হলেন মহেঞ্জোদারো নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার কর্মীবৃন্দ। আমরা এবার একে একে প্রদর্শনী দুটির আলোচনা উপস্থিত করছি।

শিল্পী দিলীপ রায়ের প্রদর্শনী

শিল্পী দিলীপ রায় কলকাতার কলারসিকদের কাছে অপরিচিত নন। তিনি মূলতঃ কবি হিসাবে পরিচিত হলেও গত কয়েক বছর ধরে তাঁর একক চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি শিল্পীরূপেও এখন পরিচিত হয়েছেন বলে আমাদের ধারণা। গত বছর আমরা 'অমৃতে'র পৃষ্ঠাতেই তাঁর চিত্র-প্রদর্শনীর আলোচনা করেছিলাম। সেই আলোচনায় আমরা তাঁর সবলতা-দুর্বলতা নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলাম এবারের প্রদর্শনী দেখেও সেই একই মন্তব্য করতে ইচ্ছা করছে। আমার স্পষ্ট মনে হয়েছে, দিলীপ রায়ের কবি-কল্পনা আর শিল্প-চেতনা একটি বৃত্তকে অবলম্বন করে যেন ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে। এই বৃত্ত ভেঙে অন্যত্র যদি তাঁর কবি-কল্পনা এবং শিল্প-চেতনাকে তিনি প্রসারিত করতে না পারেন তবে তাঁর চিত্রকলার আকর্ষণী শক্তি ক্রমান্বয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ শিল্পের বিষয়বস্তু রূপে তিনি যে ফুল, পশু-পক্ষীকে মূলতঃ নির্বাচন করেছেন, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যদি সেগুলিকে চিত্রে সংস্থাপিত না করা যায় তবে ওগুলি শুধু 'স্টাডি' হয়েই থাকবে নতুন শিল্প-বক্তব্যে শিল্পীর মানসলোককে নতুন করে উদ্ঘাটিত করবে না। সুতরাং যা দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে তার বর্ণ-রঞ্জিত চিত্র আমরা দিলীপ রায়ের কাছে প্রত্যাশা করি না, তাঁর কবি-মনের অন্তরালে চেতনার ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তিই আমাদের কাম্য।

এদিক থেকে দিলীপ রায় এবারের প্রদর্শনীতে কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'জনতা' (১২) 'অনুবীক্ষণের নীচে' (১৪) ও অরণ্য' (১৭) চিত্রে তিনি বিভিন্ন রঙ-প্রয়োগের নৈপুণ্যে এমন এক বিমূর্ত ভাব-ব্যঞ্জনাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন যা দেখে সত্যি আমরা আশান্বিত হয়েছি। এই সব চিত্রে অলঙ্কৃত সৌন্দর্য এখনও মুখ্য হলেও আমাদের চেতনা অলঙ্করণের ঊর্ধ্বেও অন্য কিছুর সন্ধান পেয়ে খুশী হয়।

আলোচ্য প্রদর্শনীর অন্য কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফুলের স্টাডিগুলি। সংখ্যায় ফুলের স্টাডিরই প্রাধান্য। আর এই স্টাডিগুলি যে যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে দিলীপবাবু করেছেন তাও স্বীকার্য। প্রদর্শনীর মোট ৩৬ খানি চিত্রের মধ্যে ফুলের স্টাডির সংখ্যা হল প্রায় ১৫ খানি। এখানে তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি প্যাস্টেল ও তেল রঙের মাধ্যমে সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। ফুলের প্রতি দিলীপবাবুর মুগ্ধ দৃষ্টি-পাত যেমন তাঁর গুণ তেমনি সীমাবদ্ধতারও দ্যোতক বটে। বারংবার তাঁর প্রদর্শনীতে এসে এগুলি দেখতে অনেক দর্শকই ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন। সুতরাং তাঁর পর্যবেক্ষণের জগৎ আরো প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিল্পীর পর্যবেক্ষণের জগতে এবার একটি কাক (১১), এবং একটি কুকুরও (১৫) রঙ রেখায় সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

আমাদের প্রাচীন কাহিনীর দেব-দেবীও শিল্পী-মনে সাড়া তুলেছে। দিলীপবাবুর দেবী (১) ও 'অগ্নিদেবতা' (২২) প্রশান্তি ও রুদ্রতায় আমাদের মুগ্ধ করেছে।

মোট কথা, শিল্পী দিলীপ রায়ের কবি-মন অনেক কিছু গ্রহণ করতে উদার হলেও এখনও কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিবদ্ধ হতে পারেনি। ফলে, তাঁর প্রদর্শনী দর্শক-মনকে তেমনভাবে প্রভাবিত করে না। এখানেই দিলীপবাবুর দুর্বলতা। আশা করি কবি দিলীপ রায় ভবিষ্যৎ প্রদর্শনীতে এ-সব ত্রুটি মুক্ত হয়ে আমাদের আরো সুন্দরতর শিল্প-কর্ম উপহার দেবেন।

শিল্পী মিলু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদর্শনী

শিল্পী মিলু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র-কর্মের সঙ্গে আমাদের পরিচয় গত বৎসর। স্কেচ ক্লাবের একটি সম্মিলিত প্রদর্শনীতে আমরা প্রথম তাঁর চিত্র-নিদর্শন দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপর এ বছরও স্কেচ ক্লাবের প্রদর্শনীতে তাঁর কয়েকখানি চিত্র ও স্কেচ দেখেছি। এবার তাঁর একক প্রদর্শনীতে ২৩ খানি তৈল চিত্র এবং ৩১ খানি স্কেচ স্থান পেয়েছিল। বলতে বাধা নেই, শিল্পী মিলু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রাথমিক আড়ষ্টতা অতিক্রম করে এখন শিল্পী-রূপে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গীতে আত্ম-প্রকাশে উদ্যত। তাঁর এই নিষ্ঠা ও সাধনাকে আমরা অভিনন্দিত করছি।

শিল্পী মিলু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি-কৃতি-চিত্রণে বেশ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর অঙ্কিত 'জনৈক চিত্র-শিল্পী' (৮), 'শয়তান' (১৩), 'আমি বোন' (১৪) কিংবা 'ক্যান্টিনের লোক' (২০) প্রভৃতি চিত্রে তিনি যেভাবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য। প্রত্যেকটি মুখ প্রায় নিখুঁতভাবে চারিত্রিক অভিব্যক্তিকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। একজন তরুণ শিল্পীর পক্ষে তৈল রঙের মত কঠিন মাধ্যমে এইভাবে ভাব-ব্যঞ্জনাকে মূর্ত করা সত্যি কঠিন কাজ। শিল্পী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতি-কৃতি চিত্রে সেই কঠিন কাজকে অনায়াস স্বচ্ছন্দে সমাধা করেছেন।

তাঁর কয়েকখানি চিত্র বিমূর্ত শিল্প-চেতনাকে রূপ দিয়েছে। এর মধ্যে 'মুক্তির পথ' (২১) 'আশা' প্রভৃতি কয়েকখানি চিত্র আমাদের ভাল লেগেছে। এর কোনটিতে লাল রঙের উপর ঈষৎ হলুদ, ফিকে নীল ও কালো রঙ প্রয়োগে সুন্দর এফেক্ট সৃষ্টি করা হয়েছে, আবার কোনটিতে কালো রঙ আর সামান্য আলোর আভাসে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যা অনায়াসে মনকে টেনে নেয়। তবে একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন বোধ করছি। বিষয়বস্তুকে অবহেলা করে আঙ্গিক রীতি তথা রঙ-প্রয়োগের নিপুণ কৌশলে মনকে মুগ্ধ করার প্রচেষ্টা শিল্পী-জীবনের সূচনা-কালে খুব বেশি প্রশংসনীয় উদ্যম বলে আমরা কিন্তু মনে করতে পারছি না। আশা করি শিল্পী বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বক্তব্যটি একটু অনুধাবন করবার চেষ্টা করবেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীর অনেকগুলি স্কেচ আমাদের ভাল লেগেছে। শিল্পীর রৈখিক চেতনা বেশ উন্নত। দৈহিক গঠন-ভঙ্গীকে তিনি রৈখিক বন্ধনে অনেক-গুলি স্কেচে বিধৃত করেছেন। নগ্ন নারীমূর্তির অনেকগুলি কুৎসিত স্কেচ এই প্রদর্শনীতে না রাখলেই ভাল হত বোধহয়। কারণ, ওগুলির মধ্যে শিল্প-কৃতিত্বের স্বাক্ষর ছিল না বলেই আমাদের ধারণা।

আমরা আশা করছি, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মরু-প্রান্তর পেরিয়ে শিল্পী মিলু বন্দ্যোপাধ্যায় অচিরেই নিজস্ব শিল্প-জগৎ গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

॥ পাক অনুপ্রবেশ ॥

আসামে পাকিস্থানী মুশ্লিমদের বেআইনী অনুপ্রবেশ সম্পর্কিত অভিযোগ অনেকদিন আগেই উঠেছিল, কিন্তু আসাম রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার সে অভিযোগে কর্ণপাত করার কোন তাগিদ অনুভব করেননি। এমনকি এ অভিযোগও বার বার শোনা গিয়েছিল যে, আসামের সরকারী মহলেরও একাংশের সক্রিয় সমর্থন আছে এই রাষ্ট্র-স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপে, তবুও এ ব্যাপারে দৃকপাত করার মত কোন দায়িত্বশীল লোক আসাম বা কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে যা অভিপ্রেত ছিল পাক মুশ্লিমদের এবং হয়ত পাক সরকারেরও, শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছে। কয়েক বছর ধরে হাজারে হাজারে পাক মুশ্লিম বিনা বাধায় আসামে প্রবেশ করাতে মুশ্লিম সম্প্রদায়ই এখন আসামে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ আসামে এখন মুশ্লিমদের চেয়ে অসমীয়ারাও সংখ্যায় কম। আসামে পূর্ববঙ্গীয় মুশ্লিমদের এই অবাধ অনুপ্রবেশের অনিবার্য পরিণতি কি তা আসাম-সন্তান শ্রীচালিহা এখনও ভালভাবে উপলব্ধি না করতে পারলেও একত্রিশ বছর আগে একজন বৃটিশ কর্মচারী তা বুঝতে ভুল করেননি। ১৯২১ সনের লোকগণনায় দেখা যায়, আসামে পূর্ববঙ্গ-আগত মুশ্লিমদের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। দশ বছর বাদে আবার লোকগণনায় দেখা যায়, সে সংখ্যা বেড়ে অর্ধলক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। বৃটিশ কর্মচারী মিঃ মুল্লান তখন শঙ্কিত হয়ে বলেছিলেন, পূর্ববঙ্গ থেকে মুশ্লিমদের এই অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে আসামের সমগ্র ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হবে। ১৮২০ সালে বর্মীদের আক্রমণের ফলে আসামের যে ক্ষতি হয়েছিল, এ ক্ষতির পরিণতি তার চেয়েও ভয়ংকর, কারণ এর ফলে আসামের সমগ্র সভ্যতা ও সংস্কৃতিই ধ্বংস হবে। এত বড় সাবধানবাণী উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও আসামকে এই বিপদ থেকে রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয়নি।

পাকিস্থানের সীমান্তবর্তী একটি প্রদেশে আজ মুশ্লিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং তাদেরও অধিকাংশ আবার পাকিস্থানী। এর পরেও ৬২৪ মাইল দীর্ঘ পাক-আসাম সীমান্ত এখনও প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে, যে কারণে কিছুদিন আগে প্রায় দুইশত বৈরী

নাগার সে পথ অতিক্রম করে পাকিস্থানে চলে যেতে কোন অসুবিধা হয়নি। সুতরাং এরপর একদল হানাদার হঠাৎ আসামে প্রবেশ করে যদি আর একটি কাশ্মীর-সংকটের সৃষ্টি করে তবে সেটা জাতীয় জীবনে যতই বিপর্যয়কর হোক না কেন ঘটনা হিসাবে মোটেই বিস্ময়কর হবে না।

॥ পাক জবরদখল ॥

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সীমানার অভ্যন্তরে জলপাইগুড়ি জেলার কতোয়ালি থানার অন্তর্গত দইঘাটা নামক স্থানটি এখন পাকিস্থানীদের দখলে। স্থানটি ফিরে পাওয়ার আশায় গত ১ই জুন পাক-ভারত সীমান্তে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ও পূর্ব পাকিস্থান রাইফেলসের সেক্টর কমান্ডাণ্ট মেজর উফজানের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু মেজর উফজান স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন দইঘাটা তাঁরা ছাড়বেন না, কারণ তাঁদের মতে ঐ স্থানটি পাকিস্থানের অংশ।

পাকিস্থানের এই উদ্ধত প্রত্যাখ্যান নিয়ে গত ১২ই জুন লোকসভায় আলোচনা হয়। কিন্তু সে আলোচনায় আমাদের ভাগ্যবিধাতা শ্রীনেহরু আরও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, অবৈধ প্রবেশকারী পাক সৈন্যের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে তিনি কোন মতেই বলপ্রয়োগ করবেন না। পাকিস্থানের এই অন্যায় কার্যের প্রতিবাদে ভারতের উচিত হবে বেরুবাড়ীর অর্ধেক পাকিস্থানকে হস্তান্তরের প্রস্তাব প্রত্যাহার করা—বিরোধী দলের এই মর্মের একটি প্রস্তাবও পাকিস্থানের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ শ্রীনেহরু গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং পাক-গ্রাস থেকে দইঘাটার যে আর মুক্তি নেই—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

॥ জাতির ভবিষ্যৎ ॥

বৈরী প্রতিবেশীদের শত্রুতায় ভারতের চতুঃসীমায় আজ বিপদের ঘনঘটা। এ অবস্থায় দেশরক্ষায় দায়িত্ব যাদের, তাদের সম্বন্ধে একটি ভয়াবহ তথ্য পরিবেশন করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বোর্ড। কলকাতার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩,৬৮৬ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য নমুনামূলকভাবে পরীক্ষা করে তাঁরা দেখেছেন তাদের মধ্যে ২,৪২৬ জন অর্থাৎ শতকরা ৬৬ জন কোন না কোন রোগে আক্রান্ত।

শতকরা ৩৮ জনের রোগ অপুষ্টি-জনিত দৌর্বল্য, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ শতকরা ৭০ জনের; কণ্ঠনালীর ব্যাধি আছে শতকরা ৪৫ জনের; দন্তরোগে ভুগছে শতকরা ৩৫ জন। এছাড়াও ব্যাপকভাবে আছে অজীর্ণ, আমাশয়, চর্মরোগ, ক্ষয়রোগ ও আরও অনেক ভয়ানক ব্যাধি। সন্দেহ হয়, দেশের প্রকৃত শক্তির এই অবস্থা জেনেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী শান্তিবাদী হয়েছেন।

॥ নাগাদের অভিযোগ ॥

পাকিস্থানের সীমান্ত অতিক্রম করে যে শ' দুয়েক বৈরী নাগা ঢাকায় উপস্থিত হয়েছে, তাদের ভারত-বিরোধী প্রচারের কাজে ব্যাপকভাবে লাগানোর ষড়যন্ত্র চলেছে। পলাতক নাগাদের নেতা বলেছেন, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে তাঁরা জানাবেন ভারত সরকার গত চৌদ্দ বছর ধরে কি "ভয়ংকর নির্যাতন" নাগাদের উপর চালিয়েছেন। ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী নাকি উত্তর-পূর্ব সীমান্তের দশ লক্ষ নাগাদের মধ্যে এ পর্যন্ত এক লক্ষকে গুলী করে হত্যা করেছে এবং বর্তমানে ১৮০টি বন্দী শিবিরে প্রায় চার লক্ষ নাগাকে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে!

রাষ্ট্রসংঘে কোন অভিযোগ জানাতে হলে তা কোন সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে জানাতে হয়, নাগাদেরও অনুরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকলে তাদের কোন রাষ্ট্রের

কাছে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আবেদন জানাতে হবে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের যা অবস্থা তাতে মনে হয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের দরবারে ভারতের বিরুদ্ধে নাগাদের অভিযোগ পেশ করতে অনেক রাষ্ট্রই এগিয়ে আসবে। এ অবস্থায় ভারত সরকারের অনতিবিলম্বে অবশ্য কর্তব্য হল, নাগাভূমির প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক প্রেস কমিশনকে আমন্ত্রণ জানানো। গত কয়েক বছর যাবৎ ভারত সরকার নাগাভূমিতে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে রেখেছেন, যে কারণে ভারতের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীর মনেও এ সন্দেহ জাগতে পারে যে নাগাভূমিতে কিছু কিছু আপত্তিজনক কাজ ভারত করেছে। সাংবাদিকদের অবাধ পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিলে এ সন্দেহ সহজেই দূর করা সম্ভব হবে, এবং বৈরী নাগাদের ভয়াবহ মিথ্যাপ্রচারও সেই সঙ্গে বন্ধ হবে।

॥ লাওসে শান্তি ॥

দীর্ঘকালবাদে যুদ্ধ ও অন্তর্বিপ্লবে ক্ষতবিক্ষত লাওস হতে অতি আশার সংবাদ এসেছে। নিরপেক্ষ প্রিন্স সুভানা ফুমার নেতৃত্বে একটি সংযুক্ত জাতীয় সরকার গঠন সম্পর্কে লাওসের বিবদমান তিন প্রিন্স গত ১২ই জুন আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তিন প্রিন্সের এই মতৈক্যের সংবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়েই সন্তুষ্ট হয়েছে। ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র দপ্তর এই মতৈক্যকে "স্বাধীন ও নিরপেক্ষ লাওস গঠনের পথে একটি পদক্ষেপ" বলে বর্ণনা করেছেন, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বেতার-ঘোষণায় একে একটি বিপুল সাফল্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। লাওসের দক্ষিণপন্থীদের আপত্তির জনাই এতদিন কোন চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হয়নি, বর্তমানে বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতেই এই ঐক্য সম্ভব হয়েছে। প্রস্তাবিত সংযুক্ত জাতীয় সরকারের বর্তমান দক্ষিণপন্থী প্রধানমন্ত্রী যোগ দেবেন না এবং তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থক ও লাওসের "শক্ত মানুষ" বলে পরিচিত জেনারেল ফুমি নোসাভান এই চুক্তি সম্পর্কে বলেছেন, তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন এমন কথা বলবেন না, কিন্তু তিনি জানেন যে লাওসের সমস্যা সমাধানের এই ছিল একমাত্র পথ।

তবে মার্কিন মহলের সংবাদে প্রকাশ, থাইল্যাণ্ডে প্রেরিত মার্কিন সৈন্যবাহিনী আরও কিছুকাল সেখানে থাকবে।

॥ ইরাকে অশান্তি ॥

ইরাকে জঙ্গী শাসক জেনারেল কাশেমের উপর দিয়ে এ পর্যন্ত বহু ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছে এবং বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে তিনি তা প্রতিরোধ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে উত্তর-পূর্ব ইরাকে কুর্দদের বিদ্রোহ জেনারেল কাশেমের সম্মুখে একটি গুরুতর জাতীয় সংকটরূপে উপস্থিত হয়েছে। ইরাকের বর্তমান অধিবাসীদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ কুর্দ বংশোদ্ভূত হলেও কুর্দ আন্দোলনের নেতা মোল্লা মুস্তাফা বারাজিনির মূল দাবীর সঙ্গে তাদের অধিকাংশেরই মতবিরোধ ছিল। মোল্লা বারাজিনির এতদিনের দাবী ছিল স্বাধীন কুর্দিস্থান। শুধু তাই নয়, তুরস্ক, ইরান, রাশিয়া ও সিরিয়ায় ছড়িয়ে-থাকা পঞ্চাশ লক্ষ কুর্দের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের কথাও তিনি বলতেন, যেটা অন্যান্য কুর্দদের কাছে একটি অবাস্তব চিন্তা বলে বিবেচিত হত। সম্প্রতি কুর্দ নেতা তাঁর মূল দাবী পরিবর্তিত করে বলেছেন, ইরাকের অভ্যন্তরেই স্বায়ত্তশাসিত কুর্দিস্থান তাঁর কাম্য। বারাজিনির এই দাবী ইরাকের কমিউনিস্ট দলসহ প্রায় সব কটি রাজনীতিক দলের সমর্থন লাভ করেছে। কমিউনিষ্টরা এখন প্রকাশ্যেই বারাজিনিকে সমর্থন করছেন এবং উদারপন্থী সমাজবাদী নেতা কামাল চাটারগি, যাঁর সঙ্গে কমিউনিষ্টদের এতদিন রীতিমত শত্রুতা ছিল, তিনিও কমিউনিষ্টদের সঙ্গে একযোগে মোল্লা বারাজিনিকে সমর্থন করছেন। আসলে জেনারেল কাশেমের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভগুলি ছিল, সেগুলি স্বায়ত্তশাসিত কুর্দিস্থান ধ্বনির আড়ালে একজোট হয়ে এখন কাশেমের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা কাশেমের পক্ষে অবশ্যই দুশ্চিন্তার কারণ।

॥ মার্কিন শাসনসংকট ॥

বৈদেশিক সাহায্যের প্রশ্নে কেনেডি সরকারকে এক গুরুতর শাসন-সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সিনেটের অধিকাংশ সদস্য প্রেসিডেণ্ট কেনেডি-প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য-বিলের সংশোধন দাবী করে বলেছেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন সমস্যায় যে সকল দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুসৃত নীতির সঙ্গে একমত নয় বা যে সকল রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে তাদের সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা উচিত। সংশোধনী প্রস্তাবের রচয়িতা রিপাবলিকান দলভুক্ত সেনেটর কীটিঙ এ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠে উদাহরণস্বরূপ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসাহায্য নিয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নাসের যদি তা মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় মার্কিন-বিরোধী প্রচার অভিযানে ব্যয় করেন, অথবা যুক্তরাষ্ট্রের টাকায় ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন যদি রাশিয়ার কাছ থেকে জঙ্গীবিমান কিনে তা যুক্তরাষ্ট্রের সুহৃদ পাকিস্থানের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চান, কিংবা নেদারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবহার উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডঃ সুকর্ণ যদি যুক্তরাষ্ট্রের টাকায় সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে অস্ত্র ক্রয় করেন তবে ঐ সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই মার্কিন সাহায্য বন্ধ হওয়া উচিত। কমিউনিষ্ট দেশ পোলাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়াকে এতদিন যে খাদ্য সরবরাহ করা হত তাও বন্ধ করার দাবী যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট থেকে উত্থাপিত হয়েছে।

সেনেটরদের যুক্তি খুবই স্পষ্ট। তাঁদের অভিমত, কমিউনিজমের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা যখন স্পষ্ট ও প্রকাশ্য, তখন শত্রুকে সাহায্য পাঠানোর কোন কথাই উঠতে পারে না। কিন্তু বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে তাঁরা যে কথাটি ভুলেছেন সেটি হল এই যে কমিউনিজম এখন আর নিছক আদর্শ মাত্র নয়, পৃথিবীর বহু দেশ ও বিরাট অংশ এখন তাদের শাসনাধীনে। শুধু তাই নয়, তাদের হাতে যে মারণাস্ত্র আছে তার ধ্বংসশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের মারণাস্ত্রের চেয়ে কিছু কম নয়। সুতরাং যুদ্ধ করে কমিউনিজমের অবসান ঘটানোর চিন্তা বাতুলতা মাত্র এবং সে চিন্তা আশা করি অতিবড় কমিউনিষ্ট-বিরোধী সেনেটরের মনেও আজ নেই। এ অবস্থায় কমিউনিজমের অবসান সত্যই যদি তাঁদের কাম্য হয় তবে কমিউনিষ্ট-শাসিত দেশগুলিতে কমিউনিজম অপেক্ষাও উন্নততর শাসনাদর্শ আজ তাঁদের তুলে ধরতে হবে। অসহযোগিতা ও বিরোধিতার মধ্যে নিশ্চয়ই তা সম্ভব নয়। সাহায্য এবং বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানই হল কমিউনিষ্ট-শাসিত দেশগুলির জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম। কমিউনিষ্ট-বিরোধিতায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যুক্তরাষ্ট্র যদি আজ এই যোগাযোগের মাধ্যমকেই ছিন্ন করে তবে তাতে কমিউনিজমকেই শক্তিশালী করা হবে।

॥ ঘরে ॥

৭ই জুন—২৪শে জ্যৈষ্ঠ : লোক-সভায় ভারতের সাহায্যদানের প্রশ্নে 'এড্ ইন্ডিয়া ক্লাবে'র (পশ্চিমীদের গঠিত) প্রতিকূল সিদ্ধান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত মনো-ভাবের কঠোর সমালোচনা।

তৃতীয় যোজনাকালে অধিক কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা—দিল্লীতে কেন্দ্রীয় খনি ও জ্বালানী মন্ত্রী শ্রীকে ডি মালব্যের সহিত বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের প্রতি-নিধিদের বৈঠক।

৮ই জুন—২৫শে জ্যৈষ্ঠ : আসামে পাকিস্তানীদের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে আসাম রাজ্য সরকারের নিশ্চেষ্টতা—শিলং-এ আসাম বিধানসভায় সদস্যদের গুরুতর অভিযোগ।

বৈদেশিক মুদ্রাসংকটরোধে সর-কারী ও বেসরকারী সকল খাতেই আমদানী হ্রাস—রিজার্ভ ব্যাংকের ছাড়পত্র ব্যতীত ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীদের বিদেশ ভ্রমণ নিষিদ্ধ লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই-এর ঘোষণা।

নাগপুর-টিটাগর প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুর্ঘটনায় ভিলাইয়ের নিকট ৯ জন নিহত ও ১২৩ জন আহত—প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাঘাতে সবকয়টি বগী লাইনচ্যুত।

৯ই জুন—২৬শে জ্যৈষ্ঠ : বৃটেন কর্তৃক ভারতকে শীঘ্রই ১২ কোটি টাকা ঋণ (সর্তবিহীন) দানের প্রস্তাব—ভারতের ব্যাপারে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পুনরায় সাহায্য দেওয়ার আগ্রহ।

ধর্মঘট ও কর্মবিরতি পরিহারের অবস্থা সৃষ্টির আহ্বান—ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ত্রয়ো-দশ বার্ষিক অধিবেশন (হাওড়া) উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শ্রম ও পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুল-জারীলাল নন্দের ভাষণ।

১০ই জুন—২৭শে জ্যৈষ্ঠ : মেডি-ক্যাল ছাত্রদের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কঠোর মনোভাব—মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত সিন্ডিকেটের (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) সদস্যগণের সভায় দৃঢ় দাবী : আন্তরিক দুঃখপ্রকাশই (ছাত্র-দের) যথেষ্ট নহে, বিনাসর্তে ক্ষমাপ্রার্থনা চাই। অবিলম্বে এম-বি-বি-এস পরীক্ষা আরম্ভের জন্য কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু ও ২৪ জন কাউন্সিলারের (কলি-কাতা কর্পোরেশন) আবেদন।

শিলিগুড়িতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশন সুরু—উদ্বোধক : পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়।

১১ই জুন—২৮শে জ্যৈষ্ঠ : বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীছবি বিশ্বাসের (৬২) পরলোকগমন—যশোহর রোডে শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনায় জীবনাবসান।

'অসামরিক কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহী নাগা-দের পাকিস্তানে পলায়নের জন্য দায়ী নহেন'—আসাম বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবি পি চালিহার বিবৃতি।

১২ই জুন—২৯শে জ্যৈষ্ঠ : সুতী ও পশমী বস্ত্র, ঔষধ, নিউজ প্রিন্ট প্রভৃতি সামগ্রীর ক্ষেত্রে উৎপাদন শুল্ক হ্রাস—লোকসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই কর্তৃক সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যার ধ্বংসলীলা—ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য নদীতে জলস্ফীতি।

দইখাটায় (বেরুবাড়ীর সংলগ্ন) ভারতীয় সীমান্ত প্রহরীদের উপর পাক্ সৈন্যদের অতর্কিত হামলা।

১৩ই জুন—৩০শে জ্যৈষ্ঠ : দেশরক্ষা দপ্তরের গাফিলতির ফলে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয়—১৯৬২ সালের অডিট রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ।

বাতিল এম-বি-বি-এস পরীক্ষা সংক্রান্ত পরিস্থিতি—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহিত ক্ষুব্ধ মেডিক্যাল ছাত্রদের বিরোধ-অবসানের সর্বশেষ প্রয়াস ব্যর্থ।

'কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি রেখার ভিত্তিতে মীমাংসা আর সম্ভব নহে'—সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

৭ই জুন—২৪শে জ্যৈষ্ঠ : পাকি-স্তানের সর্বত্র 'উপদ্রুত এলাকা অর্ডিনান্স' জারী— ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ অফিসার ও সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের উপর বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ।

লাওসে প্রিন্সত্রয়ের বৈঠকে প্রস্তাবিত কোয়ালিশন সরকারের স্বরাষ্ট্র ও প্রতি-রক্ষা দপ্তর সম্পর্কে মতৈক্য—বৈঠকান্তে নিরপেক্ষ নেতা প্রিন্স সুভন্না ফৌমার ঘোষণা।

৮ই জুন—২৫শে জ্যৈষ্ঠ : সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইনের অবসান ও নূতন শাসনতন্ত্র চালু—নবগঠিত পাকি-স্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনে (রাওয়ালপিন্ডি) প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের ঘোষণা—পাক্ প্রেসিডেন্ট হিসাবে আয়ুবের নূতন করিয়া শপথ গ্রহণ।

নিরস্ত্রীকরণের দ্বিতীয় পর্যায় শেষেও পারমাণবিক অস্ত্র উচ্ছেদে আমে-রিকা কার্যতঃ নারাজ—জেনেভা বৈঠকে (নিরস্ত্রীকরণ) ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীআর্থারলাল কর্তৃক পশ্চিমীদের মনো-ভাবের নিন্দা।

৯ই জুন—২৬শে জ্যৈষ্ঠ : চীন কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক উস্কানীর অভিযোগ—ভারত সরকারের নিকট চীনের সর্বশেষ নোটে (২রা জুন লিখিত ও সদ্য প্রকাশিত) হুমকী।

১০ই জুন—২৭শে জ্যৈষ্ঠ : আল-জিরিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত—মধ্য আলজিয়ার্সে গুপ্ত সামরিক সংস্থার (ও-এ-এস্) সহিত সশস্ত্র পুলিশের প্রচণ্ড লড়াই।

কাশ্মীর প্রশ্নে মিশর কর্তৃক ভারতকে পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি—কায়রো-এ প্রেসিডেন্ট নাসেরের ঘোষণা।

ভারতকে টেক্কা দিয়া পাকিস্তান রকেট শক্তিতে পরিণত—৭ই জুন প্রথম রকেট উৎক্ষেপণের সংবাদ প্রচার।

১১ই জুন—২৮শে জ্যৈষ্ঠ : যুদ্ধ-বিধ্বস্ত লাওসে অবশেষে সংকটের অব-সান—কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্পর্কে প্রিন্সত্রয়ের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা—সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নিরপেক্ষতা-বাদী প্রিন্স সুভন্না ফৌমার নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠনের উদ্যম।

পাকিস্তান কর্তৃক আরও একটি আবহ-সমীক্ষা রকেট উৎক্ষেপণ।

'আয়ুবী সংবিধান ঘৃণ্য ও আপত্তি-কর'—জাতীয় পরিষদের প্রথম বৈঠকেই (রাওয়ালপিন্ডি) তীব্র সমালোচনা।

১২ই জুন—২৯শে জ্যৈষ্ঠ : লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্পর্কে তিন প্রিন্সের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর—লাওস প্রশ্নের মীমাংসা হওয়ায় রাশিয়া, আমেরিকা ও চীনের পক্ষ হইতে প্রিন্সত্রয়কে অভিনন্দন।

১৩ই জুন—৩০শে জ্যৈষ্ঠ : পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের নূতন মন্ত্রিসভা ১০ জন সদস্য লইয়া গঠিত—পররাষ্ট্র-মন্ত্রী পদে শ্রীমহম্মদ আলি।

সমকালীন সাহিত্য

সমকালীন সাহিত্য সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ লরেন্স-প্রসঙ্গ ॥

লেডী চ্যাটারলি এবং তাঁর সেই কুখ্যাত 'লভার'টির সঙ্গে এতদিনে প্রায় তিন মিলিয়ন মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেছে। সুতরাং ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স নামক যে লেখকটির মাত্র প'য়তাল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছিল, হঠাৎ তাঁর পুনরাবিষ্কার শুরু হয়েছে। লরেন্সের জীবন ও তাঁর মৃত্যু তাঁর রচনার চেয়ে কৌতূহল জাগ্রত করেছে অনেক বেশী। লরেন্সের মৃত্যুর পরই তাঁর বন্ধুরা অনেকেই আত্মকথা, জীবনকথা ইত্যাদি অনেক লিখেছেন।

লরেন্সের জীবদ্দশায় অনেকেই তাঁর প্রতিভা স্বীকার করেছেন। তিনি যে এক-জন শক্তিশালী লেখক সে কথা সর্বপ্রথম উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেন ভার্জিনিয়া উল্ফ— "Mr. Lawrence, of course, has moments of greatness, but hours of something very different". লেখকরা মনের আনন্দে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে লিখে যান, সমালোচকরা যে ভাবে তার অর্থ করেন, পণ্ডিতরা যেমন ব্যাখ্যা করেন তা যদি অনেক লেখকের স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হত তাহলে তিনি যে কি করতেন বলা কঠিন, তবে মৃত্যুর পর যে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় তাতে তাঁরা নিশ্চয়ই কবরের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করেন।

লরেন্স বহুল আলোচিত সাহিত্যকার। তাঁর রচনার ভাষ্য, টীকা, সমীক্ষা, অসংখ্য রকমের হয়েছে। সাম্প্রতিক 'লেডী চ্যাটারলি'র বিচারের পর আবার কিছু নতুন লরেন্সীয় আলোচনা প্রকাশ হল, কিছু পুরাতন গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণও হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে যে মাত্র দু-তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার কারণ লরেন্স সম্পর্কে যা বক্তব্য তা ইতিমধ্যে অনেক বেশী বলা হয়েছে, অর্থাৎ কিছু আর নাই বাকী। মিঃ এলিসকো ভিভাস লিখেছেন, 'D. H. Lawrence: The Failure and the Triumph of Art": তাঁর গ্রন্থটিতে লরেন্সীয় দর্শনের পুনর্বিচার করার প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু যিনি তাঁর মতবাদকে শুধু মননে সীমিত রাখেন, রেখেছিলেন অনুভূতির মর্মমূলে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ কিঞ্চিৎ অসমীচীন হয়েছে।

লরেন্সের সাহিত্যে যা মুখ্য তা হল "the Constitutive Symbol" — মিঃ ভিভাসের এই উক্তিতে তাঁর কাল-ব্যাধির চাইতেও অধিকতর যন্ত্রণা পেতেন ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স। এই বিচিত্র বস্তুটি কি তা হয়ত তাঁর বোধগম্য হত না। অনুভূত অভিজ্ঞতাই ছিল লরেন্সের সর্বপ্রধান বক্তব্য।

মিঃ ভিভাসের প্রতি অনুকূলে পাঠকও তাঁর বিশ্লেষণ, যে ভাবে তিনি লরেন্সের সাফল্য এবং পরাজয়মূলক রচনার বিভাগ করেছেন তা সমর্থন করতে পারবেন না। The Rainbow কিংবা Women in Love নামক উপন্যাস দুটি লরেন্সের শ্রেষ্ঠ রচনা—এই বক্তব্যের তিনিই একমাত্র প্রবক্তা নন। লরেন্সীয় ভাবধারার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত তাঁর Rainbow, Women in Love এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থ The Captain's Doll এবং St. Mauor নামক সাহিত্যকর্মে পরিস্ফুট এবং বিভিন্ন সমালোচক কর্তৃক একবাক্যে উচ্চারিত।

লরেন্স সম্পর্কিত তিনখানি সমালোচনা গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলিতে শিল্পী হিসাবে লরেন্সের নৈর্ব্যক্তিক বিচার সার্থকভাবে করা হয়েছে, তাদের নাম: D. H. Lawrence: Novelist লেখক এফ. আর লিভিস, The Dark Sun — a study of D. H. Lawrence লেখক: গ্রেহাম হাউ (এই গ্রন্থটি সম্প্রতি পেঙ্গুইন সিরিজে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে), আর তৃতীয়খানির নাম D. H. Lawrence and Human Existence: লেখক: ফাদার টিভারটন।

এলিসকো ভিভাসের গ্রন্থটির উপ-নাম The Failure and the Triumph এই নামকরণটি লক্ষণীয়। ভিভাসে দুই লরেন্সের বিচার করেছেন, এক লরেন্স কবি, স্রষ্টা, শিল্পী আর অপর লরেন্স মিথ্যাবাদী, প্রচারক, অপবিত্র শিল্পী, এবং তাঁর সাহিত্য "excess of passion and the autocracy of ideas" দ্বারা কলুষিত।

এলিসকো ভিভাস এই গ্রন্থে ক্রমিক ধারানুসারে লরেন্সের সাহিত্য-বিচার করেননি, নির্বাচিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা করেছেন, যথা: 'Aaron's Rod', 'Kangaroo', 'The Plummed Serpent এবং লরেন্সের শিল্প-কর্মের বিচ্যুতি ঘটেছে যে গ্রন্থে সেই 'Lady Chatterley's Lover' এবং তারপর তিনি 'Rainbow' এবং 'Women in Love' গ্রন্থ দুটির বিচার করেছেন লরেন্সের কবি-মানস এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে। মিঃ ভিভাসের এই আলোচনা গ্রন্থটির প্রথমার্ধে শিল্পী হিসাবে লরেন্সের পরাজয়ের পরিচয় দান করা হয়েছে। 'Aaron's Rod' উপন্যাসে লরেন্স পিকারেস্ক রীতি প্রয়োগ করেছেন আর অন্তর্নিহিত ভাব এবং চরিত্রাবলী এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে, মনে হবে তারে গাঁথা মালা। 'Kangaroo' আত্মজীবনী আঙ্গিকে রচিত হওয়ায় সূচনাতেই তার গলা টিপে মারা হয়েছে আর 'The Plumed Serpent' উপন্যাসে লরেন্সের বাণী "the regeneration of Mexico and the World" ভার হয়ে উঠেছে।

এলিসকো ভিভাস 'Lady Chatterley's Lover' সম্পর্কে বহুবিধ প্রশ্ন তুলেছেন, তার মধ্যে একটি প্রশ্ন বিশেষ অর্থপূর্ণ, "Did Lawrence handle the Novel in proper manner?"—এই উপন্যাসে একটা সামগ্রিক বাঁধন নেই, ঐক্য নেই ভাবধারার। দুটি বিভিন্ন গল্পে উপন্যাসটি বিভক্ত, সেই কাহিনী এক সূত্রে বাঁধা হয়নি। একটি কাহিনী হল কনি ও মেলোরের কাহিনী আর অপর অংশ ক্লিফোর্ড ও তার নার্স মিসেস বোল্টনের কাহিনী। 'Sons and Lovers' সম্পর্কে ভিভাসের নতুন কোনও বক্তব্য নেই। লীভিস যে বলেছেন, লরেন্সের সব গ্রন্থগুলিই মহৎ সাহিত্যের একটা সিরিজ, এ বক্তব্য

সম্পর্কে ভিভাস সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। লরেন্সীয় মূল্যবোধের বিচারে তা যে নঞর্থক তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন কবি লরেন্সের পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর গদ্যরচনায়, আর তাঁর কবিতা কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর। "I respond it as one responds to a gauchenie committed in public" তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের প্রেমলীলার অংশ পাঠ করে অনেক পাঠকেরও তাই মনে হবে। নর-নারীর সম্পর্কে একটা স্বতোৎসারিত ভঙ্গীর অভিব্যক্তি সমগ্র ব্যাপারটিকে মস্তিষ্কঘটিত করে তোলে। তার একমাত্র ফল 'সেক্স' নামক বস্তুটিকে একটি আইডিয়ায় রূপান্তরিত করে মস্তিষ্কের-হিমঘরে বন্ধ রাখা—লরেন্সের মতে—এই জায়গাটিতে 'সেক্স'কে কখনই রাখা চলবে না। প্রতীকস্থ তা সে "Constitutive" কিংবা অন্য কিছু যাই হোক—যে উপন্যাস জীবনের এক নিবিড় কল্পনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রূপায়ণ তার মর্মোদ্ঘাটনে অতি সামান্যই সন্ধান-সূত্র দান করে। মিঃ ভিভাস বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, লরেন্সের প্রেম সম্পর্কিত আচার-বিধি "is a mixture of sense and non-sense" —সুইফ্‌ট কাফকা প্রভৃতির নামোল্লেখ করে 'সেন্স' এবং 'ননসেন্সে'র পৃথকীকরণের প্রচেষ্টা নীর থেকে ক্ষীরকে পৃথক করার মতো এক বাতুল প্রচেষ্টা। ভিভাস এখানে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয়দানের একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা করেছেন। কবি লরেন্স এবং গ্রাণকর্তা লরেন্সের মধ্যে যদি একটা সীমারেখা টানতে হয় তাহলে যে কেউ তা করতে পারে মনস্তত্ত্বের চাবিকাঠি হাতে না নিয়েই। জীবন সম্পর্কে লরেন্সের মনোভঙ্গী ছিল প্রকৃতিবাদী এবং মাঝে মাঝে বাইবেলের ভাষার মত সোচ্চার। লরেন্স বলেছিলেন—"For a Man, as for flower, beast, and bird, the Supreme triumph is to be most vividly alive. What-ever the unborn and the dead may know, they cannot know the beauty and the marvel of being alive in the flesh"

মিসেস ফ্রিডা লরেন্স রচিত স্মৃতিচারণ The Memoirs and Correspondence সম্পাদনা করেছেন ই. ডব্লু. টেডলক। এই গ্রন্থটি উপরোক্ত গ্রন্থটির চাইতে অনেক সার্থক এবং কৌতূহলোদ্দীপক। ফ্রিডার স্বামীর চাইতে অনেকখানি বেশী আলোকপাত হয়েছে এই গ্রন্থে তাঁর নিজের চরিত্রে। আরো অনেকে আমাদের জানিয়েছেন, লরেন্সের 'uncanny sense of what is real and what is not' সম্পর্কে এবং যৌন সংক্রান্ত সেই বিচিত্র সমস্যাটিকে তিনি 'open air and sunshine' ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন কারণ শুধুমাত্র সেই পরিবেশেই সেক্স 'naturally and sanely' বর্ধিত হতে পারে। সব কিছুই ছিল লরেন্সের চোখে বিস্ময় এবং রহস্যময়—এই সব অনেক জানা তথ্য ফ্রিডা লরেন্স পরিবেশন করেছেন। সূচনায় পরিবেশিত অংশটুকু আধা-কাহিনী এবং আধা-আত্মজীবনীমূলক। এই অংশটুকু পাঠে উভয়ের জীবনের এক নতুন অর্থ পাওয়া যায়। স্বামীর স্বপক্ষে তাঁর সব যুক্তি অবশ্য তেমন জোরালো এবং অব্যর্থ নয়, তবু যে-অধ্যাপক লরেন্সের গরু সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে উক্তিটি চমৎকার। লরেন্সের গরুটির নাম ছিল সুসান। ফ্রিডা লরেন্স লিখেছেন: "He forgets that great nations have had their sacred Bulls, their Europas and so on. But perhaps he is like New York Slum children who have seen the milk bottle at the door but have never seen a cow". এ যেন স্বয়ং লরেন্সের উক্তি।

এই গ্রন্থের চিঠিপত্র অংশে সংকলিত পত্রাবলী থেকে মিসেস লরেন্স সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। তিনি কোমল অথচ কঠোর হতে পারেন একই ব্যক্তির সম্পর্কে। মিঃ কোটেলইয়ানস্কীর লিখিত পত্রে মিডিলটন মারী সম্পর্কে অতিশয় জঘন্য উক্তি আছে। অথচ উত্তরকালে সেই মিডিলটন মারীকে লিখিত কয়েকটি মধুর পত্র আছে। লরেন্সের মত তাঁর স্ত্রী অতিশয় কোপন-স্বভাবা ছিলেন। মিসেস লরেন্স একবার ডেভিড লরেন্সের মাথায় রাগের বশে চিনামাটির প্লেট ভেঙেছিলেন। কয়েক বছর পরে এক লাঞ্চের টেবিলে বার্নার্ড শ প্রশ্ন করেন, এই প্লেট ভাঙার পিছনের ইতিহাস কি। হঠাৎ এত উত্তেজিত হলেন কেন? মিসেস লরেন্স জবাবে বলেন—"ডেভিড তাঁকে বলেছিল, মেয়েদের আত্মার বালাই নেই, ওদের বাঁচারও শক্তি নেই" (women had no souls and could not live).

এই স্মৃতিচারণে এমন এক মহিলার চিত্র পাওয়া যায়, যাঁর জীবনে স্বামী এক নিবিড় ভালোবাসার প্রতীক, তাঁর সঙ্গে যে কটি বছর আনন্দ ও বেদনায় কেটেছে তার ভাব-গাঢ় অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে মিসেস ফ্রিডা লরেন্সের এই স্মৃতিচারণে। অতীত সুখস্মৃতির হারানো মুহূর্তকে ধরে রাখা হয়েছে The Memoirs and Correspondence' এর পৃষ্ঠায়।

গ্রেহাম হাউ রচিত ডি. এইচ. লরেন্সের সাহিত্যকীর্তির সমীক্ষা—'The Dark Sun'—একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। সম্প্রতি পেঙ্গুইন এর সহজলভ্য সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ করেছেন। বিগত দুই-দশকে যাঁরা লরেন্সের পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা করেছেন এবং সাফল্যলাভ করেছেন তাঁদের নাম হাক্‌সলী, ফরস্টার এবং লীভিস। গ্রেহাম হাউ রচিত এই গ্রন্থে তার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। লরেন্সের জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন করেছেন অনেক মানুষ। হেনরী জেমস

১৯১৪ খৃীষ্টাব্দে এক তালিকায় ডি, এইচ, লরেন্সের নাম লিখেছিলেন শক্তিমান এবং প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখক হিসাবে। ১৯২০-তে লরেন্সের উপন্যাসের উপজীব্য ও মৌল বক্তব্য সম্পর্কে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে মনে করেছিলেন যে, লরেন্সের সাহিত্যে যৌন-জ্বালা প্রবল এবং তিনি যে ধর্ম প্রচার করতে চান তার নাম উদার যৌন-ধর্ম। ভিক্টোরিয়া যুগের উৎকট নীতিবাদ ও ভণ্ডামির জাল কেটে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা মাত্র।

লরেন্স বিশ্বাস করতেন নর-নারীর জীবনে প্রেমের সম্পর্ক একটি প্রাথমিক ব্যাপার। যদি কারো ধারণা হয় যে, তার প্রেম-জীবন অতৃপ্ত তাহলে বুঝতে হবে হয় লোলুপ মাংসের প্রতি অত্যধিক আসক্তি নয় অতিরিক্ত উচ্ছৃঙ্খলতা। আধুনিক মানুষের অসম্পূর্ণ জীবনের কারণ আধুনিক সভ্যতা। এই যুগে যৌন-সম্পর্ককে পবিত্র রাখতে হবে তার অর্থ এ নয় "ideal sterile innocence and similarity between a boy and a girl. We mean pure maleness in Man and Femaleness in a woman'. —

নর এবং নারী উভয়েই সমতুল, সখা এবং সচিব এই ধারণা সমর্থন করেননি লরেন্স। যৌন সমস্যার প্রতি 'চুপ-চুপ' নীতি অবলম্বন করে চোখ বুজিয়ে বসে থাকা লরেন্সের মতে অষ্ট্রিচের মত পলায়নী নীতি। লরেন্সের পুনর্বিচারে তার একবার প্রমাণিত হল তিনি আসলে প্রকৃতিবাদী উদারনীতিক। বলিষ্ঠতা এবং দৃঢ়তাই তাঁর সারস্বত-কর্মের সর্বপ্রধান লক্ষণ। মানুষের পূর্ণতা তখনই সম্ভব যখন সে স্বাভাবিক অবস্থায় সুসমঞ্জস ভঙ্গীতে বিচরণ করে। হার্মনি বা সুর-সঙ্গতি থেকে মানুষ যত দূরে যাবে ততই সে শান্তি এবং সুখের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে. এই ছিল লরেন্সের মনোভঙ্গী।*

---

* 1) D. H. LAWRENCE — The Failure and the Triumph of Art: By Elisco Vivas (Allen and Unwin: 25 shillings).

2) FRIEDA LAWRENCE—The Memoirs and Correspondence: Edited by E. W. Tedloc (Heinemann, 42 shillings).

3) THE DARK SUN: — A study of D. H. Lawrence. By Graham Hough: (Penguin Books — 5 shillings).

বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)—আশা দেবী। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য : আট টাকা।

এই গবেষণামূলক গ্রন্থটির জন্যে লেখিকা আমাদের ধন্যবাদের পাত্রী। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি ১৮০০—১৯০০, এই একশ বছরের বাংলা-শিশু সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য সমাধা করেছেন।

শিশু-সাহিত্য ইদানীং কিছুটা অবহেলিত। হাল আমলে তরুণ কবি-সাহিত্যিকেরা এদিকে বিশেষ মনোযোগী বলে মনে হয় না। কিন্তু শিশু-সাহিত্য ছাড়া একটি জাতি কখনোই পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। আধুনিককালে আমরা শিশু ও কিশোরদের যেভাবে মনের দিক দিয়ে উপবাসী করে রাখছি তার ফল মারাত্মক হতে বাধ্য।

অথচ যাঁদের হাতে বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন ঘটেছে, তাঁরা কিন্তু শিশু ও কিশোরদের কথাও সর্বদাই মনে রাখতেন। শ্রীযুক্তা আশা দেবীর এই বইখানি পড়ে এর পাতায় পাতায় সেই সদাজাগ্রত কল্যাণবুদ্ধি ও মমতার ইতিকথা পাঠ করে তাই আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ না করে পারিনি। বলা বাহুল্য, শিশু-সাহিত্যের প্রাথমিক আয়োজন ঘটেছিল মিশনারীদের হাতেই। তারপর থেকে কী করে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, মহাকবি মধুসূদন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি বহু মনীষীর অকৃপণ-দানে এই শিশু সাহিত্য ক্রমবিকশিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে বিচিত্র বর্ণসম্ভারে মুকুলিত হয়ে উঠল, তার কাহিনী রূপকথার চেয়েও মনোরম।

লেখিকার ঐতিহাসিক-বোধ বহু-ব্যাপ্ত, তাঁর চিত্তের প্রসারতা আনন্দদায়ক এবং আলোচনার গভীরতা উৎসাহজনক। তাছাড়া ভাষার উপর তাঁর এমন স্বচ্ছন্দ অধিকার রয়েছে যে, বইখানি নীরস গবেষণা পুস্তক না হয়ে সাহিত্যের কোঠায় স্থান পেয়েছে। সেজন্যে তিনি পাঠকের সাধুবাদ লাভ করবেন।

প্রচ্ছদ ও ছাপা-বাঁধাই সুন্দর।

সুন্দরবন— (গল্প-সংগ্রহ)—শিবশঙ্কর মিত্র। কথাশিল্প—১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র ইতিপূর্বে 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' লিখে চমক লাগিয়েছিলেন। সুন্দরবনের এক নিঃস্ব ও ক্ষীণকায় চাষী আর্জানের সাহস এবং দুর্জয় অভিযানের কাহিনীও যে কত রোমাঞ্চকর হতে পারে তা আমরা কখনো অনুমান করিনি। শিবশঙ্করবাবু সেদিক থেকে পথিকৃতের গৌরব দাবি করতে পারেন।

বর্তমান বইটিও সেই সুন্দরবনের পটভূমিতেই রচিত। অবশ্য এখানে আর্জানের মতো কোনো একক নায়ক নেই, ছোট ছোট কতকগুলি কাহিনী সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। কিন্তু ভাষার উপর যে পরিমাণ সহজ কর্তৃত্বের ফলে আর্জানের জীবনকাহিনী মনোগ্রাহী হতে পেরেছিল, সেই ভাষার জোরেই বর্তমান সংকলনের গল্পগুলিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

অবশ্য বইখানি পড়তে শুরু করলে ভাষার যাদু ছাড়াও আরো একটি জিনিস নজরে পড়ে। সেটা হল লেখকের অভিজ্ঞতা। সুন্দরবনকে তিনি অত্যন্ত ভালো

করে চেনেন, তার গাছপালা-নদীখাল-পশুপাখি সবই তাঁর ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। আর তেমনি তিনি জানেন সুন্দরবনের কাছাকাছি বাস করে যেসব মানুষ, তাদেরও। এরা কেউ বা চাষী, কেউ কাঠুরে, কারো পেশা মাছধরা, কারো বা মধু-সংগ্রহ করা। বাঘ-সাপ-কুমিরের হিংস্র আক্রমণকে উপেক্ষা করে এইসব মানুষ প্রায়-নিরস্ত্রভাবে জীবন-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু এদের পদে-পদে, তবু এরা হার মানে না। এই মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনসংগ্রামের রূপটিই অপার সহানুভূতির সংগে তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর কাহিনীগুলিতে।

'সুন্দরবন' কিশোরদের তো বটেই বড়োদেরও ভালো লাগবে। আর ভালো লাগবে, শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আঁকা ছবিগুলি। সুন্দরবনের একটা সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর তুলির টানে।

ছাপা-বাঁধাই চমৎকার।

অনেক আকাশ—(গল্প সংকলন)—সম্পাদক : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। এক্তারগুপ্ত পাবলিশার্স, ১১৯, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পাঁচিশজন নবাগত গল্পকারের রচনা নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের অনেকেই একেবারেই নতুন। ভাল গল্পের সংখ্যা খুবই কম। ভাল লিখতে হলে আরও দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন। নতুন লেখকদের রচনা এভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য সম্পাদক ধন্যবাদার্হ। অংগ-সজ্জা সুন্দর নয়।

কুমারী মন— শক্তিপদ রাজগুরু। প্রকাশক-গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ৩·৫০ নঃ পঃ।

লেখক একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক। শহর ও সুন্দরবন এই দুই বিপরীত পরিবেশের পশ্চাদ্‌পটে চলেছে তাঁর কাহিনী ও চরিত্রের পরিক্রমা। চিরন্তনী দ্বন্দ্বের আভাস মাত্র না দিয়ে নায়িকা কৃষ্ণা চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ দেখানোই যেন লেখকের উদ্দেশ্য। শহরের পরিবেশ কৃষ্ণাকে নিজের মন চিনতে কোনো দিনই সাহায্য করেনি—চাকচিক্যের চমকেই শুধু বিভ্রান্ত করেছে মাত্র; অপরপক্ষে অরণ্যের বন্য উদ্দাম অকৃত্রিম জীবনধারার মধ্যে আপন জীবন-চর্যার সুর সে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু শহরের আবহাওয়ায় গড়া মন অরণ্য-পরিবেশের স্বাভাবিকতাকে প্রথমে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। তারই ফলে রিসার্চ-স্কলার স্বামী অসীমের সাহচর্য তার কাছে বিস্বাদ ঠেকেছে—দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপনের সম্ভাবনা তার মধ্যে মুকুলিত হয়ে ওঠেনি। প্রণবের উপস্থিতি তাকে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যচ্যুত করেছে। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই কৃষ্ণা-অসীমের মিলন সার্থক হয়েছে। মূল কাহিনীর সংগে একই স্রোতে ভেসে চলেছে একটি ক্ষুদ্র উপকাহিনী। মরিয়ম ও ইনফ্যানের মিলন ও বিচ্ছেদ, মরিয়মের ঘরবাঁধার স্বপন এবং ইনফ্যানের মৃত্যুর পর নিতাই-বুনোর সংগে তার গৃহত্যাগ মূল-কাহিনীকে পুষ্ট করেছে। মরিয়ম ও ইনফ্যানের প্রেম কৃষ্ণাকে সহজ করেছে এবং অসীমের দৃপ্ত পৌরুষ তার কেন্দ্রচ্যুত মনকে লক্ষ্যে ফিরিয়ে এনেছে। সুন্দরবন অঞ্চলের জীবনযাত্রা, আঞ্চলিক ভাষা ও সমাজরীতি পরিস্ফুটনে লেখক সমর্থ হয়েছেন। বাদা অঞ্চলের জীবন-যাত্রার সংগে মানবমনের এক যোগসূত্র লেখক আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। বৃহত্তর ও জটিল সমস্যার মধ্যে প্রবেশ না করে সরল ঘটনা-বিন্যাসের মাধ্যমে লেখক কৃষ্ণা চরিত্রটি অংকন করেছেন। প্রণব চরিত্রটি সেই তুলনায় নিজীব। সম্ভবতঃ তাকে লেখক শহরের প্রতীকরূপে এঁকেছেন। মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন। সুন্দর ও মজবুত প্রচ্ছদপট বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা ১৩৬৮—সম্পাদক : সুকান্তকুমার রায়।

আশুতোষ কলেজ বার্ষিকী পত্রিকা। আলোচ্য সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, প্রণবকুমার মজুমদার, সুকান্তকুমার রায়। এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি কবিতা এবং বর্তমান ছাত্রদের গল্প, কবিতা, নক্সা, ভ্রমণ-কাহিনী প্রবন্ধও রয়েছে। তাছাড়া ইংরিজি ও হিন্দী—দুটি বিভাগ আছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ পত্রিকা—সম্পাদক : অধ্যাপক কল্যাণনাথ দত্ত।

আলোচ্য পত্রিকার ইংরিজি বিভাগটিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এ বিভাগে যে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা সংকলিত হয়েছে তারমধ্যে অনেকগুলিই যথেষ্ট মূল্যবান। বাংলা বিভাগটিতে ভাল লেখার সংখ্যা কম। তাছাড়া একটি হিন্দী বিভাগও আছে।

একক— সম্পাদক : শুদ্ধসত্ত্ব বসু। ৪৪৩।১, কালিঘাট রোড, কলকাতা-২৬ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

'একক বাঙলা দেশের' কাব্যান্দোলনের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের সাধক। বর্তমান সংখ্যাটি ২০ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা। এ সংখ্যায় যাঁদের কবিতা আছে, তাঁরা হলেন : জীবনানন্দ দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পুষ্কর দাশগুপ্ত, অনন্ত দাস, পরেশ মন্ডল, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। দুটি আলোচনা করেছেন শুদ্ধসত্ত্ব বসু ও বংগচন্দ্র পাঠক।

ছাত্র—সম্পাদক : প্রণব মুখার্জি। ৫৭, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম : চল্লিশ নয়া পয়সা।

'ছাত্রে'র বর্তমান সংখ্যাটি নজরুল সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। নজরুল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন অরবিন্দ পোদ্দার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অতীন্দ্র মজুমদার, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, আশিষ সান্যাল, কানাই সেন। কবিতা লিখেছেন—অন্নদাশংকর রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণ ধর, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়।

নজরুলের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাও মুদ্রিত হয়েছে।

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা

বধূ : বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্স-এর প্রথম নিবেদন; ১১,৯৯৮ ফিট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ কাহিনী : শৈলেশ দে: চিত্রনাট্য : দেবনারায়ণ গুপ্ত; পরিচালনা : ভূপেন রায়; গীতিকার: শ্যামল গুপ্ত; সঙ্গীত-পরিচালনা : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়: চিত্রগ্রহণ : দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়; শব্দধারণ : সুনীল ঘোষ; সঙ্গীতানুলেখক : শ্যামসুন্দর ঘোষ; সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় মুখোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা : শচীন মুখোপাধ্যায়: রূপায়ণ : ছবি বিশ্বাস. কমল মিত্র, বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, জহর রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্তা, সরযূবালা, জয়শ্রী সেন, মঞ্জুলা সরকার, কুমারী রীণা প্রভৃতি। ন্যাশনাল মুভীজ প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় গত ১৫ই জুন থেকে রাধা, পূর্ণ ও অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

চরিত্রটি একটু অসাধারণই বলতে হবে। ভুবনবাবু তাঁর বড় ছেলে বাণীব্রতর বিবাহ দেবেন একটি শর্তে—পুত্রবধূকে হতে হবে রূপেগুণে তাঁর পরলোকগতা পত্নী পদ্মিনীর মত। এমন মেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে?—কিন্তু হঠাৎ এমন মেয়েরই সন্ধান পাওয়া গেল। ঘরজামাই ফটিকচাঁদের বন্ধু এবং গ্রেট ইন্টারন্যাশনাল স্টোর্স নামে একটি ছোট মুদীখানার মালিক নটবরের ছোট বোন দীপালী সর্বদিক দিয়েই ঠিক যেন ছোট পদ্মিনী। কাজেই বিবাহে অসম্মতির কিছু রইল না। কিন্তু বিবাহের রাত্রে কনে হয়ে গেল বদল: ছোট বোন দীপালীর পরিবর্তে বড়বোন কল্যাণী বসল বিয়ের পিঁড়িতে। যার কারসাজিতে এই কাজ হ'ল, সেই ঘটক, শ্রীমান ফটিকচাঁদ খুব খানিকটা লোকদেখানো চেঁচামেচি করল; তারপর বাণীব্রতর ভদ্রতা গোলমালকে বাড়তে না দেওয়ায় কল্যাণীই বধূরূপে ভুবনবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করল সরকারমশাইয়ের সহায়তায়। কালো মেয়ে কল্যাণীকে ভুবনবাবু কিছুতেই বধূরূপে স্বীকার করতে চাইলেন না। কিন্তু কল্যাণী তার কল্যাণহস্তের গুণে ক্রমেই শ্বশুরের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠল। ভুবনবাবু তাকে স্ত্রীর ব্যবহৃত গহনায় সাজিয়ে তাকে পুত্রবধূর মর্যাদা দিলেন। তার পায়ের তোড়ার আওয়াজে তিনি তাঁর পদ্মিনীর পদধ্বনি শুনতে লাগলেন। কল্যাণী ধন্য হয়ে গেল। কিন্তু অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত! আবিষ্কৃত হ'ল কল্যাণী শুধু কালো নয়, সে নিরক্ষরা। ব্যস, শুধু যে সে আবার শ্বশুরের বিরাগভাজন হ'ল, তাই নয়; তার একান্ত গুণমুগ্ধ স্বামী নৈরাশ্যপীড়িত হয়ে পাড়ি দিল সাগরপার। মর্মাহত কল্যাণী প্রতিজ্ঞা করল—যেমন ক'রে হোক, লেখাপড়া সে শিখবেই শিখবে। ঠাকুরপো দেবব্রত তার সহায়তা করতে চাইল। কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় তার এই সাধনাও অসমাপ্ত রইল কূটবুদ্ধি ফটিকচাঁদের চক্রান্তে। সে ভুবনবাবুকে বোঝাল, কল্যাণী দেবব্রতর মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভাবপ্রবণ ভুবনবাবু তাই বুঝলেন এবং তার ফলে কল্যাণীকে করলেন বাড়ী থেকে বিতাড়িত। এর পর ছোট বোন দীপালীর সহায়তায় কল্যাণী যখন তার সাধনাকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল, সেই সময় এক বিচিত্র পরিস্থিতির মাঝে সব ভুল বোঝাবুঝির যেমন শেষ হ'ল, তেমনই ভুবনবাবু কল্যাণীকে ফিরিয়ে পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার ছোট বোন দীপালীকে পেলেন নিজের কনিষ্ঠ পুত্রবধূরূপে।

অসিত সেন পরিচালিত ও রাখাল সাহা প্রযোজিত 'কল্যাণী'-এর একটি দৃশ্যে কণিকা মজুমদার ও নির্মলকুমার।

গল্পটিকে কিছুটা সাজানো মনে হ'লেও এর অধিকাংশ জায়গাই মানবিক আবেদনে পূর্ণ এবং সেই কারণে অতিমাত্রায় হৃদয়গ্রাহী। পত্নীগতপ্রাণ অসুস্থ ভুবনবাবুই এই গল্পের প্রধান চরিত্র এবং এই চরিত্রটিকে দর্শক না ভালোবেসে পারবেন না এবং চিত্রনাট্যও এই চরিত্রটির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক'রে গল্পটিকে পর্দায় রসঘন ক'রে তুলেছে।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমে, মধ্যে এবং শেষে—বারংবার যে-নাম কীর্তন করতে হয়, সে-নামটি হচ্ছে ছবি বিশ্বাস। একমাত্র এঁরই অভিনয় দেখবার জন্যে ছবিখানিকে

করে ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে। নিজের ...তী আইনব্যবসায়ী বড় ছেলেকে ...দেশ ক'রে 'মোক্তারটা আমায় না খাইয়ে মেরে ফেলবে' বলা থেকে শুরু ক'রে একেবারে শেষে দুই পুত্রবধূকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে 'একটি দিন, একটি রাত্রি' ...লা পর্যন্ত সমস্ত ছবিটিতে আমরা দেখেছি—ছবি বিশ্বাস, ছবি বিশ্বাস এবং ছবি বিশ্বাস। কিন্তু এত দেখেও তৃপ্তি হয়নি; মনে হয়েছে—আরও দেখি। অদ্বিতীয় চরিত্রাভিনেতা ছবি বিশ্বাসই এই 'বধূ' চিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য তিনি ছাড়া এই ছবিতে কি আর কেউ নেই? নিশ্চয়ই আছেন এবং বেশ ভালো-ভাবেই আছেন। কূটচক্রী এবং রহস্য-প্রিয় ফটিকচাঁদকে প্রাণবন্ত করেছেন বিকাশ রায়। কল্যাণীর কঠিন চরিত্রের অনবদ্য রূপ দিয়েছেন সাবিত্রী চট্টো-পাধ্যায়। কালো এবং নিরক্ষর হওয়ার দুঃখ-বেদনা, শ্বশুরের বিরাগভাজন হওয়ার মর্মজ্বালা, আন্তরিক একাগ্রতা দ্বারা তাঁর কৃপালাভের আনন্দ এবং শেষ-পর্যন্ত নিজের আপ্রাণ সাধনায় নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্তিলাভ করে শ্বশুরকে বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে আসন্ন বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারায় আত্মপ্রসাদ লাভ—সকল রকম অভি-ব্যক্তিই তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া বসন্ত চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সরযূবালা, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, জয়শ্রী সেন, মঞ্জুলা সরকার, অসিতবরণ প্রভৃতি কৃতী শিল্পীরা নিজের নিজের ভূমিকায় সুযোগসুবিধা মত সুঅভিনয় করেছেন। 'বধূ' ছবির একটি বিশিষ্ট আকর্ষণই হচ্ছে এর ছোট বড় প্রত্যেকটি ভূমিকাই হয়েছে অত্যন্ত সুঅভিনীত।

ছবির চিত্রগ্রহণ এবং শব্দধারণের কাজ মোটের ওপর ভালই। সম্পাদনায় ছবিকে আরও গতিসম্পন্ন করার সুযোগ ছিল। ছবির দুখানি মাত্র গান সংগীত। আবহসংগীত ঘটনার উপযোগী।

আগুন : বাদল পিকচার্সের নিবেদন; ১২,০০০ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী ও সংলাপ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অসিত সেন; সংগীতপরিচালনা : হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়; গীত-রচনা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্র-গ্রহণ : অনিল গুপ্ত; শব্দধারণ : বাণী দত্ত; সংগীতগ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ; সম্পাদনা : তরুণ দত্ত; শিল্প-নির্দেশনা : বিজয় বসু; রূপায়ণ : সন্ধ্যারাণী, কণিকা মজুমদার, সন্ধ্যা রায়, কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টো-পাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, রবি ঘোষ, তুলসী চক্রবর্তী, ভুবন চৌধুরী প্রভৃতি। জি, আর, পিকচার্সের পরিবেশনায় গেল ১৫ই জুন থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

'আগুন' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় আজ থেকে অন্ততঃ পঁচিশ বছর আগে। একজন সাহিত্যসেবী (ধ'রে নিতে পারা যায়, তারাশঙ্কর নিজেই) তাঁর ছাত্র-জীবনের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সহাধ্যায়ীর ব্যর্থ-জীবনের ইতিহাস তাঁর স্মৃতি-চারণের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন এই উপ-ন্যাসখানিতে। চন্দ্রনাথ আপন শক্তিতে অসম্ভব বিশ্বাসী; জীবনে চলার পথে বারংবার প্রতিহত হয়েও সে পরাজয় স্বীকার করেনি—ক্রমাগত এক জীবন থেকে আর এক জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তারাশঙ্কর লিখেছেন, "মধ্যগগনচারী কালপুরুষ নক্ষত্রের মত দৃপ্ত ভঙ্গিতে সেও আপনার জীবনের কক্ষপথে চলিয়াছে, একদিন পিছনে ফিরিয়া চাহিল না, ক্ষণিক বিশ্রাম করিল না, যাহাকে কুক্ষিগত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার এ উন্মত্ত যাত্রা, তাহাকে আজও পাইল না, তবু সে চলিয়াছে।" আর এই চন্দ্রনাথকে দ্বিতীয় স্থান দিয়ে যে-ছেলেটিকে প্রথম করা হয়েছিল, সেই হীরু জীবনে বহু রকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও জীবনে কোনো উচ্চাদর্শ রাখেনি। সে দেশ ঘুরেছে রূপসীদের সন্ধানে পানপাত্র ঠোঁটে নিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত এক বন্য হরিণীসদৃশ যাযাবরীর প্রেমমুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে ঘর বাঁধবার ক্ষণিক স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু অতি শীঘ্রই তার অবসাদ এসেছে; তাই সে বলেছে, "দেহ ক্ষুধিত হ'লে তার তৃপ্তি আছে, কিন্তু মন ক্ষুধাতুর হ'লে বিশ্বগ্রাস ক'রেও তার পরিতৃপ্তি হয় না। আমার মন ক্ষুধাতুর হয়ে উঠেছে, নরু, জীবনের ক্ষয় ভিন্ন সে ক্ষুধাকে জয় অসম্ভব।" নরু ওরফে নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হচ্ছে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যুবকের বন্ধু ও

বিমল ঘোষ প্রোডাকসনের 'বধূ' চিত্রে অনুভা গুপ্তা, বিকাশ রায়, সাবিত্রী চ্যাটার্জি ও ছবি বিশ্বাস

সাহিত্যসেবী। দুই জীবনের মাঝে শুধু যোগসূত্রই নয়, দুই ব্যর্থ জীবনকাহিনীর সূত্রধরে। চন্দ্রনাথ ও হীরু—দুজনেই আগুনে জ্বলেছে; একজন অতৃপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুনে; অপরজন জীবন-সম্ভোগের মানসিক ক্ষুধার আগুনে।

উপন্যাস হিসেবে এই দুই ইতিহাসই সুখপাঠ্য এবং বর্ণনার গুণে দুটি জীবনেরই ব্যর্থতার কাহিনী হৃদয়কে দ্রবীভূত করে, চক্ষুকে করে অশ্রুসজল। এবং এদের সঙ্গে গৌণভাবে বর্ণিত হয়েছে চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথ এবং তাঁর সহধর্মিণীর করুণ কাহিনী। প্রথমেই বলেছি, উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র সাহিত্যিক নরেশচন্দ্রের জবানীতে এই কাহিনীগুলি রূপ পেয়েছে। কাজেই, স্বাভাবিকভাবেই চন্দ্রনাথ, হীরু বা নিশানাথ দম্পতির জীবন এতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়নি; প্রতিটি জীবন-কাহিনীতেই মধ্যে মধ্যে ছেদ পড়েছে। পাঠকের কিন্তু এতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতিচারণ পাঠকের কৌতূহলকে শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

কিন্তু যখন এই ধরণের রচনার চিত্ররূপ দিতে হয়, তখন চিত্রনাট্যকারের কাজটা ঔপন্যাসিকের মত অতখানি সহজ থাকে না। গল্পের কোন অংশ দেখানো হবে, কোনটুকু মাত্র উল্লেখ করলেই চলে যাবে, তিন গল্পের মধ্যে কাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং কাকেই বা মাত্র পাদপূরণের জন্যে গৌণভাবে দেখানো হবে, এ-বিচার করা খুবই কঠিন কাজ। তার ওপর 'আগুন' উপন্যাসে আরও দুটি বিপদ আছে। প্রথম, উপন্যাসের চন্দ্রনাথ পশ্চিমা মেয়ে মীরাকে বিবাহ করবার জন্যে দু'জনেই শিখ ধর্ম অবলম্বন করেছিল। ছবিতে মীরা বাঙালী, তবুও চন্দ্রনাথ ভ্রমরকৃষ্ণ দাড়ি ধারণ করেছে। দ্বিতীয়, উপন্যাসে যাযাবরী মুক্তকেশী যে ভাষাতেই কথা বলুক বা গান করুক না কেন, পাঠকের তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ছবিতে যাযাবরীকে দর্শকের মনে সে যাযাবরী, এ-বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে ভাষার দিক দিয়ে ঢের বেশী বাস্তবনিষ্ঠ হওয়া দরকার। তার ওপর হীরু-যাযাবরী কাহিনীর ট্রাজেডী দর্শক হিসেবে আমাদের মনকে খুব বেশী স্পর্শ করে না।

ছবিতে প্রতিটি অভিনয়ই অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের হয়েছে। বিশেষ করে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-তাড়িত চন্দ্রনাথের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জীবনমদিরা পানাসক্ত হীরুর ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়, অস্থিরচিত্ত চন্দ্রনাথের অনিশ্চয় জীবনের সঙ্গিনী মীরার ভূমিকায় কণিকা মজুমদার এবং যাযাবরীর ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় স্মরণীয় অভিনয় ক'রে আমাদের পুলকিত করেছেন। ব্যথিতা, বঞ্চিতা, গ্রাম্যবধূ, নিশানাথ সহধর্মিণীর ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর অভিনয় হয়েছে প্রাণস্পর্শী। এ ছাড়াও রবি ঘোষ (দরিদ্র উকিল), তুলসী চক্রবর্তী (পুস্তক-প্রকাশক), নির্মলকুমার (নরেশচন্দ্র) এবং পাহাড়ী সান্যাল (মীরার পিতা) নিজ নিজ ভূমিকার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

চিত্রগ্রহণে অনিল গুপ্ত অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বহির্দৃশ্যে এবং আভ্যন্তরীণ দৃশ্যগুলির মধ্যে আশ্চর্য-রকম সমতা রক্ষা করে। ছবির মধ্যে বহু দৃশ্যই আছে, যা অত্যন্ত যত্ন এবং শ্রম-স্বীকারের পরিচায়ক। শিল্পনির্দেশনার কাজ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। এবং ছবিটির আবহসঙ্গীত রচনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট অভিনবত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয় কলা-কৌশলের দিক দিয়ে 'আগুন' একটি বলিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে।

মঞ্চাভিনয়

পাল্কী (হিন্দী) ঃ বিহার আর্ট থিয়েটারের নিবেদন; কাহিনী ও প্রযোজনা ঃ অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়; পরিচালনা ঃ রাজা ভট্টাচার্য; সংগীত-পরিচালনা ঃ শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়; মঞ্চ-মায়া ঃ তাপস সেন; রূপায়ণ ঃ সবিতা বসু, অর্চনা মজুমদার, মীনাক্ষী দে, নবকুমার, রাজা ভট্টাচার্য, এ ডবল্যু খাঁ, এম এ সালাম, বিপুল দাস প্রভৃতি।

বিহার সরকারের বদান্যপুষ্ট বিহার আর্ট থিয়েটার সম্প্রতি নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে এক হপ্তার জন্যে অভিনয়ের আসর বসিয়েছেন। ভারত সরকারের জাতীয় সংহতি পরিকল্পনার অন্যতম হিসেবে এই "পাল্কী" নাটককে এ'রা বাঙলা এবং হিন্দী—এই উভয় ভাষাতেই অভিনয় করছেন বাংলা এবং বিহার রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্রকে দৃঢ়তর করবার উদ্দেশ্যে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ না ক'রে পারছি না। বিহার আর্ট থিয়েটার দাবি করেছেন, একই নাটককে বাঙলা এবং হিন্দী ভাষায় অভিনয় করার প্রয়াস ভারতবর্ষে এই নাকি প্রথম। এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁদের এই দাবিকে 'সম্ভবত' ব'লে সমর্থন জানিয়েছেন। এ'দের সকলেরই অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, ১৯৫৫ সালে ডাঃ রায়েরই প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের লোকরঞ্জন শাখা

"বয় ফ্রেণ্ড" চিত্রে নিশি

দিল্লী শহরে জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ সরকারী এবং বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে মন্মথ রায় রচিত নাটক "জটাগঙ্গার বাঁধ" বাঙলা এবং হিন্দী ভাষায় অভিনয় ক'রে শুধু যে অকুণ্ঠ প্রশংসাই অর্জন করে, তাই নয়; ভারতের বিভিন্ন *রাজ্যের লোকরঞ্জন শাখার অভিনয় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে পুরস্কৃত হয়। এবং এর দু' বছর পরেই সিপাহী বিদ্রোহ শত-বার্ষিকী স্মারকউৎসব উপলক্ষে ভারত সরকারেরই উদ্যোগে এই লোকরঞ্জন শাখা দ্বারা মন্মথ রায়ের "মহাভারতী" নাটকটি হিন্দীতে অভিনীত হয়ে উচ্চ-প্রশংসা লাভ করে। জেনে রাখা দরকার, এই স্মারকউৎসবে এই একটি মাত্র অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন ভারত সরকার। এবং আরও জানা দরকার, ১৯৫৬ সালে দিল্লীতে বাঙলা "মহা-ভারতী"র সার্থক অভিনয় দেখে মুগ্ধ হওয়ার ফলেই কেন্দ্রীয় সরকারের বেতার ও তথ্যবিভাগ পর বৎসরের সিপাহী-বিদ্রোহ শতবার্ষিকী উৎসবে "মহা-ভারতী"র হিন্দী নাট্যরূপকে অভিনয় করাতে মনস্থ করেছিলেন। বাঙালী অত্যন্ত আত্মবিস্মৃত জাতি। তাই এইটুকু অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন অনুভব করছি।

এইবার "পাল্কী" নাটকে আসা যাক। পাল্কী জিনিসটা যে গ্রামবাসী জনসাধারণের মনে শুধু ভীতিই উৎপাদন করে, "পাল্কী" নামটা যে মধ্যযুগীয় জমিদারী বর্বরতার প্রতীক, এ খবর "পাল্কী" নাটক দেখবার আগে আমাদের জানা ছিল না। আমরা এতদিন জানতুম, বাঙলাদেশে পাল্কী ছিল ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই গমনাগমনের যান; প'য়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেও এই কলকাতা শহরেই অনেকগুলি 'পাল্কীর আড্ডা' ছিল, যেখান থেকে লোকেরা প্রয়োজনমত পাল্কী ভাড়া করে নিয়ে যেত। আজও বাঙলা দেশের সুদূর পল্লীঅঞ্চলে পাল্কীর রেওয়াজ একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি।

বিহার আর্ট থিয়েটার প্রযোজিত "পাল্কী" নাটকে পাল্কী কিন্তু অত্যাচারেরই প্রতীক; কারণ ঐ পাল্কী চেপে অমানুষিক উচ্ছৃঙ্খল জমিদারপুত্র কুমার বাহাদুর মৃগয়াচ্ছলে যেমন পশু-বধ করেন, তেমনই প্রমোদচ্ছলে গ্রাম্য-সুন্দরীকে অপহরণ ক'রে নিয়ে যান। "পাল্কী" নাটকের বিশেষত্ব হল এই যে, অপহৃত গ্রাম্যসুন্দরী নিজের কঠোর অধ্যবসায় ও প্রেমের দ্বারা কুমার-বাহাদুরের ভিতরকার মনুষ্যত্বকে টেনে বার ক'রে তার পশুত্বের মৃত্যু ঘটায়। জমিদারপুত্রের ওপর গ্রাম্যসুন্দরী বসুন্ধরার এই আধ্যাত্মিক জয় "পাল্কী" নাটককে একটি অভিনব বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছে। "যে ভেঙেছে গানের বীণা, আমি গান শোনাব তারে", রবীন্দ্রনাথের এই গান যথার্থই রূপ পেয়েছে "পাল্কী" নাটকে।

"পাল্কী" নাটকের মঞ্চরূপে বিহার আর্ট থিয়েটার যথেষ্ট নূতনত্ব দেখিয়েছেন। শুরুতেই প্রেক্ষাগৃহ থেকে উঠে গিয়ে যবনিকার সামনের সংকীর্ণ জায়গাতে নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে বাউলের নৃত্য এবং তার নৃত্য শেষ হতে না হ'তেই প্রেক্ষাগৃহের পার্শ্ববর্তী অলিন্দ থেকে "হুঁশিয়ারী" আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মৃত পশুবাহী ভৃত্যদের পিছনে পাল্কীবাহিত কুমার বাহাদুরের প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখভাবে প্রবেশ এবং মধ্যবর্তী পথ বেয়ে পিছনের দরজা দিয়ে প্রস্থান এবং তারও পরে অট্টহাসির সঙ্গে কুমার বাহাদুরের চাটুকার দলের প্রবেশ ও মঞ্চকে লক্ষ্য ক'রে "এইখানে বসন্তপুর গ্রাম" বলার সঙ্গে সঙ্গে

যবনিকা অপসৃত হয়ে 'বসন্তপুর' গ্রামের দৃশ্য দর্শকসমক্ষে প্রকট হওয়া নিশ্চয়ই একটি নূতনত্বপূর্ণ মঞ্চরীতি (Stage Technique)।

অভিনয়ের মধ্যে খুব বেশী সূক্ষ্মতা না থাকলেও সমগ্র শিল্পী-গোষ্ঠী একটি উচ্চমান বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এবং ওরই বসুন্ধরার ভূমিকায় সবিতা বসুর আন্তরিক অভিনয় এবং গ্রাম্যবালিকা পদ্মর ভূমিকায় অর্চনা মজুমদারের অত্যন্ত সাবলীল অভিনয় একযোগে আমাদের উচ্চপ্রশংসা লাভের অধিকারী। এর পরেই নাম করতে হয় কুমার বাহাদুরের ভূমিকায় নবকুমারের নাটনৈপুণ্যের। এই ভূমিকায় তাঁকে যেমন চমৎকার মানিয়েছে, তেমনই ভূমিকাটির বিভিন্ন রূপ তিনি স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পেরেছেন। উচ্চহাসির সঙ্গে সদম্ভ উক্তিও তিনি যেমন অবলীলাক্রমে করেছেন, তেমনই মত্ত অবস্থায় বসুন্ধরার রূপজ মোহের বশবর্তী হওয়া এবং শেষে পরিশুদ্ধচিত্তে বিশুদ্ধ প্রেমের আলোকস্পর্শে উদ্ভাসিত হয়ে প্রাতঃসূর্য-প্রণাম করাতেও তিনি সমানই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে তাঁর পরলোকগত পিতার অভিনয়-ধারাকে প্রায়ই মূর্ত হ'তে দেখে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। এ ছাড়া রাজা ভট্টাচার্য, (নীলমাধব), মীনাক্ষী দে (নয়নতারা), এম-এ সালাম (বনমালী), এ ডবল্যু খাঁ (আনন্দ) এবং বিপুল দাস (বাউল) তাঁদের অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছ'খানি গানের মধ্যে দুটি হচ্ছে রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ। 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে" এবং

'খনা' ছবির একটি বেদনাত্মক মুহূর্তে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

"আলোয় আলোকময় কর"—এই দু'খানি গান অনুবাদ এবং গাওয়ার দিক দিয়ে চমৎকার। তা ছাড়া আরও দু'খানি গান বাউল ঢংয়ে। আবহ-সংগীতের প্রয়োগ-ঘটনাও ভাবসম্মত। অভিনয়ের মধ্যে, বিশেষ ক'রে দ্বিতীয় দৃশ্যে দীর্ঘস্থায়ী নেপথ্য-কণ্ঠ সংগীত নাটককে ব্যাহত করেছে অতিমাত্রায়।

মঞ্চমায়াসৃষ্টিতে তাপস সেন তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, যদিও গ্রাম পোড়ানোর দৃশ্য আরও জীবন্ত হওয়ার অবকাশ ছিল।

মোটের ওপর 'পাল্কী' নাট্যাভিনয় বিহার আর্ট থিয়েটারের একটি সার্থক প্রযোজনা।

(২) মুক্তধারা : গিরিশ নাট্যোৎসবে বঙ্গবাসী কলেজ প্রাক্তন ছাত্রসংসদের সদস্যবৃন্দের নিবেদন; রচনা : রবীন্দ্রনাথ; পরিচালনা : ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য; সঙ্গীত-পরিচালনা : প্রসাদ-কুমার সেন; দৃশ্য-পরিকল্পনা ও আলোক-সম্পাত : অমর ঘোষ; রূপায়ণ : ডঃ অজিত ঘোষ, ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, কালী সরকার, আর্য বল, মুরারি সেন, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, অশোক ঘোষ, অনঙ্গ চক্রবর্তী, নিবেদিতা দাস, দীপালী মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমনা বসু এবং আরও অনেকে।

'মুক্তধারা' রবীন্দ্রনাথের একটি রূপক নাটক এবং নাটকের প্রকৃতিভেদে প্রয়োগ-রীতিরও বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য। কাজেই আশা করা অন্যায় নয়, যেখানে নাট্য-সাহিত্যের ধুরন্ধর অধ্যাপক এবং সমালোচকরা অভিনয়ে মুখ্যভাবে জড়িত, সেখানে একটি সুষ্ঠু ইঙ্গিতধর্মী প্রয়োগ-নৈপুণ্যসহকারে এই রবীন্দ্র-নাট্যের রসমূর্তিটিকে মঞ্চের ওপর তুলে ধরা হবে। কিন্তু তা হয়নি। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, কি মঞ্চসজ্জায়, কি বেশবাসে, কি অভিনয়ে, কি যন্ত্রসংগীতে—সব দিক দিয়েই 'মুক্তধারা'কে একটি যাত্রাভিনয়ে পরিণত করা হয়েছে। অধিকাংশ শিল্পীরই নিজের ভূমিকা আদৌ মুখস্থ ছিল না, তাই রক্ষে। নইলে যিনিই কিছু দীর্ঘ কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরই অভিনয় হয়েছে সুরেলা, মেলোড্রামাটিক। স্বীকার করি, ছাপ্পান্নটি চরিত্রবিশিষ্ট এই নাটকটির সুষ্ঠু অভিনয় অতিমাত্রায় দুঃসাধ্য; কিন্তু কাপড়ের মাপ-অনুযায়ী কুর্তা বানানোই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? সত্যিকারের গাছের ডাল দিয়ে 'মুক্তধারা' দৃশ্য-সংস্থাপনের প্রয়াস রীতিমত কল্পনার দৈন্যই প্রকাশ করেনা কি? তার ওপর পাত্রপাত্রীদের বেশভূষা আজকের দিনের যাত্রার আসরকেও তার মানায়। 'মুক্তধারা'র মত নাটকের অভিনয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর স্থূলতা অবশ্য পরিহার্য। বিভিন্ন শিল্পীর অভিনয়-রীতি বিভিন্ন প্রকার—একটি বিশেষ অভিনয়-রীতিকে অনুসরণ ক'রে একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ দেওয়ার কোনো উদ্যমই লক্ষিত হ'ল না। এরই মধ্যে একটি মাত্র শিল্পী যেন এই রবীন্দ্র-নাট্যের রসরূপটি প্রকাশ করতে পেরেছেন ব'লে মনে হ'ল; তিনি হচ্ছেন ধনঞ্জয়ের ভূমিকাভিনেতা আর্য বল। গানে, বাচনে, ভঙ্গীতে তিনি রবীন্দ্র-মানসজাত ধনঞ্জয়কে মূর্ত ক'রে তুলেছিলেন; তিনি মঞ্চে রসের প্লাবন না বহালে আমাদের তৃপ্তিক হ'ত না। ভৈরবার ছোট্ট ভূমিকায় মুরারি সেন তাঁর অভিনয়োপযোগী কণ্ঠের সহায়তায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। বিশ্বজিৎ বেশে যশস্বী অভিনেতা কালী সরকার তাঁর নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। উন্মাদ বটুকের ভূমিকায় ডঃ সাধন ভট্টাচার্য রূপ-সজ্জা এবং অভিনয়ভঙ্গীতে পাগলের রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। নিবেদিতা দাসের অম্বার ভূমিকায় পর-হারা পাগলিনীর ভাব এবং 'সুমন রে,

সুমনা ডাকটি চমৎকার। ফলওয়ালী, মাস ও ঝোর্নাঝর ভূমিকায় যথাক্রমে দীপালী মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমনা বসুর অভিনয় চলনসই। পুরুষদের মধ্যে উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন নলিনী চট্টোপাধ্যায় (উত্তরকুরুর দ্বিতীয় দলের প্রথমজন), বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (অভিজিৎ), সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (জংকর), প্রমদা মজুমদার (উত্তরকুরুর প্রথম দলের প্রথমজন), অশোক ঘোষ (সঞ্জয়) এবং অনঙ্গ চক্রবর্তী (বিভূতি)।

বেংগল সিনে আর্ট সোসাইটি :

ছবি বিশ্বাসের পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বেংগল সিনে আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে গেল রবিবার, ১৭ই জুন বসুশ্রী চিত্রগৃহে কলিকাতা পৌরপ্রধান রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায় প্রবীণ চিত্র-পরিচালক দেবকীকুমার বসু প্রস্তাব করেন যে, টালিগঞ্জের স্টুডিও অঞ্চলের কোনো রাস্তাকে পরলোকগত ছবি বিশ্বাসের নামে চিহ্নিত করা হোক।

এম-কে-জি প্রোডাকসনস-এর 'রক্তপলাশ' :

এম কে জি প্রোডাকসনস-এর নির্মীয়মান রহস্যঘন চিত্র "সাক্ষী"র নব নামকরণ হল—'**রক্তপলাশ**'। পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, দীপক মুখো, বিপিন গুপ্ত, জীবেন বসু, নিরঞ্জন রায়, উৎপল দত্ত, মিহির ভট্টাচার্য, পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, পরিচালক ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং ন'বছরের কিশোর শিল্পী বাসুদেব। ছবির চিত্রনাট্য ও গীত রচনা করেছেন যথাক্রমে প্রণব রায় ও শ্যামল গুপ্ত। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এতে সুরযোজনা করেছেন। 'রক্তপলাশ'-এর পরিবেশক হচ্ছেন কল্লিকা ফিল্মস।

শিবানী ফিল্মস-এর 'মায়ার সংসার' :

মধুর ও করুণ রসের অপূর্ব মিশ্রণে গঠিত একটি ঘরোয়া কাহিনী অবলম্বনে শিবানী ফিল্মস-এর 'মায়ার সংসার'-এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় নিজেই। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেছেন সন্ধ্যারাণী, সুলতা, দীপ্তি রায়, শিখা বাগ, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, অসিতবরণ, বিকাশ রায়, বিশ্বজিৎ, মাস্টার তিলক প্রভৃতি। ছবিখানিতে প্রণব রায় রচিত সাতখানি গানে সুরযোজনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। চণ্ডীমাতা ফিল্মস ছবিখানির পরিবেশক।

সৃজনীর "অয়নান্ত" :

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসুর 'অয়নান্ত' উপন্যাসের চিত্রস্বত্ব কিনেছেন নবগঠিত সংস্থা সৃজনী। একটি গোষ্ঠী এই উপন্যাসের চিত্ররূপ দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

আর ডি বনশাল :

প্রযোজক আর ডি বনশাল গেল ২৭-এ মে বিমানযোগে বিদেশ যাত্রা করেছেন। তিনি ইওরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে চলচ্চিত্র ব্যবসা সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐসব দেশের প্রযোজকদের সংগে আলোচনা করবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

ইউ-এস-আই-এস-এর চিত্রপ্রদর্শনী :

গেল ১৭ই জুন সন্ধ্যা ৭-২০ মিনিটে কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টারে ইউ-এস-আই-এস-এর উদ্যোগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম শূন্যলোকযাত্রী জন গ্লেন-এর মহাকাশযাত্রা সম্পর্কীয় প্রায় একঘণ্টা স্থায়ী রঙীন চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

বৈতানিকের 'মুক্তধারা' :

গত রবিবার ৩রা জুন সকাল দশটায় রক্সি সিনেমাতে বৈতানিকের শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' অভিনয় করলেন। পরিচালনা, সংগীত ও শিল্পনির্দেশনায় ছিলেন যথাক্রমে প্রফুল্ল ভোস, জয়দেব বেজ ও সুধাংশু ঘোষ।

রঙ্গসভা

গত ১৭ই জুন '৬২, রবিবার রঙ্গসভা নাট্যসংস্থার উদ্যোগে উক্ত সংস্থার প্রথম সভাপতি নটশ্রেষ্ঠ ছবি

বিশ্বাসের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার। বিভিন্ন বক্তা শিল্পীর বহুমুখী প্রতিভার আলোচনার মাধ্যমে লোকান্তরিত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সংস্থার পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভায় পুনরায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, রঙ্গসভা নাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে শিল্পী ছবি বিশ্বাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর সৌখিন নাট্য সংস্থা পরিবেশিত শ্রেষ্ঠ নাটকের জন্য 'ছবি বিশ্বাস স্মৃতি-পুরস্কার' প্রদান করা হবে।

আনন্দধারা

আনন্দধারার প্রযোজনায় রূপকার সম্প্রদায় আগামী ২২শে জুলাই রবিবার সকাল দশটায় রসরাজ অমৃতলাল বসুর প্রমোদ-প্রহসন 'ব্যাপিকা-বিদায়' ও সুকুমার রায়ের ব্যঙ্গনাট্য 'চলচ্চিত্ত-চঞ্চরী' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করবেন।

॥ একটি পুরনো চিত্রের পুনর্নির্মাণ ॥

পুরোনো দিনের চিত্রামোদীদের কাছে "ফ্যান্টম অফ দি অপেরা"র স্মৃতি মুছবার নয়। বিশ্ববিশ্রুত অভিনেতা লন চ্যানী এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। হারবার্ট লম্ লন চ্যানীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। নায়িকা চরিত্রে আছেন হিদার সিয়ারস। ছবির সমস্ত ঘটনাই সংঘটিত হয়েছে একটি অপেরার অভিনয় কালে। অপেরার দৃশ্যগুলি তোলা হয়েছে লন্ডনের ওয়েম্বেলডন থিয়েটারে। জোয়ান অব আর্কের জীবনী অবলম্বনে একটি অপেরা-নাটক এই চিত্রের জন্যে রচনা করেছেন এডউইন এ্যাণ্টলে। ফ্যান্টম অফ দি অপেরার মূল কাহিনীর লেখক ক্যাস্টন লেরো। চিত্র-কাহিনীর স্থান হল প্যারিস, ১৮৯০ সাল। প্রায় বাহান্ন লক্ষ টাকার এই ছবির প্রযোজনা করছেন এ্যানথনি হিন্ডস; পরিচালনা টেরেন্স ফিশার। ছবিটি রঙীন হবে।

॥ ডি সিকার একটি জার্মাণ ছবি ॥

সোফিয়া লোরেন এবং ডি সিকার যোগাযোগে নির্মিত 'দি টু উইমেন' ছবিটি সম্প্রতি কলকাতায় দেখানো হয়েছে। এই চিত্রে অভিনয় করেই লোরেন অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন। সোফিয়া ডি সিকা জুটির আরেকটি ছবির খবর সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ছবিটি অবশ্য জার্মান ভাষায় তোলা হবে। সোফিয়া এই ছবির জন্যে বর্তমানে হামবুর্গে আছেন। ছবিটি জার্মান ভাষায় হলেও চিত্র-কাহিনী কিন্তু জাঁ পল সার্ত্রের 'লে সেকেস্ত্রে দা'লতনা' নামক একটি ফরাসী নাটক অবলম্বনে গৃহীত। চিত্রের জার্মান নাম 'ডি আইংগেশ লোসেনেন ফন আলটোনা'। লোরেনের সঙ্গে অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত ম্যাক্সিমিলিয়ান শেলও এই ছবিতে অভিনয় করছেন।

।। পেটিকোট পাইরেটস ।।

নামটা মজার। ছবিটিও কম মজার না। চার্লি ড্রেক—যিনি দৈর্ঘ্যে কৌতুক অভিনেতা নরম্যান উইজডমের চেয়েও ছোট—এই চিত্রের মজে যাওয়া লোক। ইতিপূর্বে "স্যান্ডস অফ দি ডেজার্ট" ছবিতে তিনি মধ্যএশিয়ার হারেমের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন; বর্তমান চিত্রে তিনি হারিয়ে গেছেন প্রমীলা-নাবিক রাজত্বে। ইংলণ্ডের "উইমেন্স রয়েল ন্যাভাল সার্ভিস"-এর সদস্যদের সংক্ষিপ্ত নাম "রেনস"। রেনসের মুখ্য অফিসার হলেন অ্যান স্টিফেন্স। অ্যানের রাগ, কেন তাকে এবং তার সহকর্মিণীদের কোনো যুদ্ধ-জাহাজে কাজ করতে দেয়া হয় না। অবশেষে অ্যান এবং তার দলবল একটা ফ্রিগেট দখল করে সমুদ্রের দিকে পাড়ি দেয়। সঙ্গে একমাত্র পুরুষ চার্লি ড্রেক। কিন্তু সমস্যা নিদারুণ জটিল হয়ে আসে যখন প্রমীলা নাবিকদের দ্বারা চালিত জাহাজটিকে ন্যাটো আয়োজিত একটা নৌ-মহড়ায় যোগ দিতে হয় বাধ্য হয়ে। ছবিটি যদিও দমফাটা হাসির ছবি, তথাপি নৌ-মহড়ার দৃশ্যগুলি নিখুঁত-ভাবে তোলা হয়েছে পোর্টল্যান্ড নৌ-ঘাঁটির কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়। প্রমীলা-নাবিকদের অধিনায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অ্যান হেউড। তাঁর সহকর্মিণীদের ভূমিকায় আছেন ম্যাক্সিন অডলে, এলিনার সামারফিল্ড প্রভৃতি। "পেটিকোট পাইরেটস" সিনেমাস্কোপে তোলা বর্ণাঢ্য চিত্র।

॥ বৃটেনের একটি সম্মিলিত চিত্র প্রতিষ্ঠান ॥

আন্তর্জাতিক ছবির বাজারে বৃটেনে নির্মিত ছবির ব্যাপক প্রসারের জন্যে ইংল্যাণ্ডের তিনটি চিত্র প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়েছেন। ব্রায়ানস্টোন ফিল্মস, প্রযোজকদের সমবায় সমিতি এবং সেভেন আর্টস প্রোডাকসন্স লিঃ এক হয়ে হয়েছে ব্রায়ানস্টোন সেভেন আর্টস লিঃ। এককভাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই চিত্র-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রযোজকদের সমবায় সমিতি দু বছরের মধ্যেই "স্যাটারডে নাইট এ্যান্ড সানডে মর্ণিং", 'এ টেস্ট অফ হনি' এবং 'দি এন্টারটেইনার' এর মত উল্লেখযোগ্য ছবি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। সেভেন আর্টস প্রোডাকসন্সের প্রযোজিত ছবি হল : 'ললিতা', 'দি রোমান স্প্রিং অফ মিসেস স্টোন', এবং 'গিগো'। সুতরাং এই তিনটি প্রথম শ্রেণীর চিত্র প্রতিষ্ঠানের সম্মেলনের ফল বৃটিশ চলচ্চিত্রের পক্ষে ভালোই হবে আশা করা যাচ্ছে। এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি হবে 'স্যামি গোয়িং সাউথ'। চিত্রের কাহিনীকার হলেন ডবলু, এইচ ক্যানাওয়ে, পরিচালক ফ্রেড ক্রানিসস। এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় ছবি হেনরি ফিল্ডিং-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'টম জোনস'। টম জোনসের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন লুক ব্যাক ইন এ্যাঙ্গার-খ্যাত জন অসবর্ণ এবং টনি রিচার্ডসন। 'টম জোনস' পরিচালনাও করবেন রিচার্ডসন।
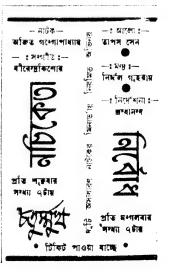
— চিত্রকূট

॥ বিশ্ব ফুটবল কাপ ॥

চিলির রাজধানী শান্তিয়াগোর জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সপ্তম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ব্রেজিল ৩—১ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বার 'জুলে রিমে কাপ' জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ১৯৫৮ সালের ৬ষ্ঠ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ব্রেজিল ৫—২ গোলে সুইডেনকে পরাজিত ক'রে প্রথম 'জুলে রিমে কাপ' লাভ করেছিল। ব্রেজিল ছাড়াও ইতালী উপর্যুপরি দু'বার (১৯৩৪ ও ১৯৩৮) 'জুলে রিমে কাপ' জয়ী হয়েছে।

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় ষোলটি দেশের মধ্যে ইউরোপের দশটি দেশ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রেজিল ১৯৫৮ সালের মত 'জুলে রিমে কাপ' (বিজয়ী দলের পুরস্কার) জয় ক'রে এবং চিলি তৃতীয় স্থান পেয়ে বিশ্ব ফুটবল খেলার আসরে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৫৮ সালের 'জুলে রিমে কাপ' বিজয়ী ব্রেজিল দলের ৮ জন খেলোয়াড় এবারের ফাইনালেও খেলে দেশকে জয়যুক্ত করেন।

সপ্তম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ব্রেজিল এবং চেকোশ্লোভাকিয়া শেষ পর্যায়ের লীগ খেলার ৩নং গ্রুপে যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হয়ে কোয়ার্টার-ফাইনাল এবং সেমি-ফাইনাল খেলায় জয়লাভ ক'রে ফাইনালে উঠেছিল। চেক দলের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা এবং তাদের এই সাফল্য খুবই অপ্রত্যাশিত।

ফাইনাল খেলার ১৫ মিনিটে চেক দলের হাফ-ব্যাক মাসোপুস্ট প্রথম গোল দিয়ে নিজ দেশকে ১—০ গোলে অগ্রগামী করেন। খেলার ১৬ মিনিটে ব্রেজিলের লেফট-ইন খেলোয়াড় আমারিল্ডো গোলটি শোধ দেন। ব্রেজিলের প্রখ্যাত শক্তিধর খেলোয়াড় পিলে ফাইনাল খেলাতেও নামতে পারেন নি। চেক দলের বিপক্ষে লীগের খেলায় তিনি আহত হন। পরবর্তী খেলায় আর তিনি যোগদান করতে পারলেন না। তাঁর শূন্য স্থানে খেলেন আমারিল্ডো।

ফাইনালের প্রথমার্ধের খেলা ১—১ গোলে শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৯ মিনিটে ব্রেজিলের রাইট-হাফ জিটো দলের দ্বিতীয় গোল দিলে ব্রেজিল ২—১ গোলে অগ্রগামী হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ৭৭ মিনিটে ব্রেজিলের রাইট-আউট গারিনচা চেক্

জুলে রিমে কাপ
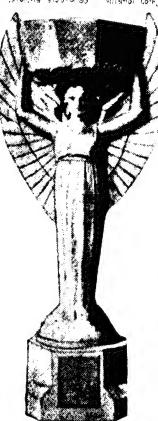
দলের গোলমুখে বলটা 'লব' করেন; চোখের উপর সূর্যের আলো পড়ায় সম্ভবতঃ চেক্-গোলরক্ষক বলের গতি বুঝতে পারেন নি; ব্রেজিলের সেন্টার-ফরওয়ার্ড ভাভা এই বল পেয়ে দলের তৃতীয় গোল করেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান

সেমি-ফাইনালে পরাজিত চিলি এবং যুগোশ্লাভিয়া প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভের জন্যে মিলিত হয়। চিলি ১—০ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত ক'রে তৃতীয় স্থান লাভ করে। চিলির জয়লাভ খেলার ধারা অনুযায়ী কোন অসঙ্গত হয়নি, কিন্তু এই গোলটির জন্যে তারা কোন কৃতিত্বের দাবী করতে পারে না। খেলায় এই গোলটি ছিল যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষে আত্মঘাতী গোল। চিলির হাফ-ব্যাক রোজাস একটা তীব্র সট করেন। বলটা যুগোশ্লাভিয়ার রাইট ব্যাকের গায়ে লেগে গোলে প্রবেশ করে। গোলে বল প্রবেশ করার সঙ্গে সংগে মাঠের উপস্থিত ৬০,০০০ হাজার দর্শক আনন্দে আকাশ কাঁপিয়ে তোলে। খেলার সময়ের মধ্যেই হাজার হাজার দর্শক খেলার মাঠের ভিতরে ঢুকে পড়ে।

॥ সেমি-ফাইনাল খেলা ॥

চিলির রাজধানী শান্তিয়াগোর জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমি-ফাইনাল খেলায় ১৯৫৮ সালের 'জুলে রিমে কাপ' বিজয়ী ব্রেজিল ৪—২ গোলে চিলিকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। প্রথমার্ধের খেলায় ৯ এবং ৩১ মিনিটে ব্রেজিলের রাইট-আউট গারিনচা গোল দিয়ে দলকে ২—০ গোলে অগ্রগামী রাখেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হ'তে তিন মিনিট বাকি থাকতে চিলির রাইট-ইন জোর্জে টোরো ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি গোল দিয়ে একটি গোল শোধ দেন। বিশ্রামের সময় ব্রেজিল ২—১ গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভের দু' মিনিট পর ব্রেজিলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ভাভা দলের ৩য় গোল দেন। ব্রেজিল ৩—১ গোলে অগ্রগামী হলেও চিলি হাল ছাড়েনি। খেলার ৬১ মিনিটে চিলির লেফট-আউট লিওনেল সানচেজ পেনাল্টি থেকে আর একটা গোল শোধ দিলে খেলার ফলাফল তখন দাঁড়ায় ৩—২ গোল। খেলা ভাঙ্গার ১৩ মিনিট আগে ব্রেজিলের সেন্টার-ফরওয়ার্ড ভাভা দলের ৪র্থ গোলটি দেন। ব্রেজিলের রাইট-আউট গারিনচা এবং সেন্টার-ফরওয়ার্ড ভাভা এই দিনের খেলায় দু'টি করে গোল করেন। ব্রেজিল বনাম চিলির এই সেমি-ফাইনাল খেলাটি উত্তেজনা এবং উৎকর্ষতার দিক থেকে ১৯৬২ সালের বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ খেলা হিসাবে গণ্য হলেও দুই পক্ষের কোন কোন খেলোয়াড় অশিষ্ট আচরণের পরিচয় দেন। ব্রেজিলের রাইট হাফ-ব্যাক জিটোকে মারাত্মক রকম আঘাত করার দরুণ পেরুর রেফারী চিলির সেন্টার ফরওয়ার্ড এইচ লান্ডাকে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করেন। এই ঘটনার এক মিনিট পর

ব্রেজিলের আন্তর্জাতিক খ্যাতসম্পন্ন রাইট-আউট গারিনচা চিলির লেফট-হাফ ব্যাক রোজাসকে বেআইনীভাবে আঘাত করে রেফারীর নির্দেশে মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। গারিনচার এই অশিষ্ট আচরণের ফলে তাঁর ফাইনাল খেলা বন্ধ হওয়ার যোগাড় হয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন তাঁকে সতর্ক করা ছাড়া অপর কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি।

চিলিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল খেলা পর্যন্ত এই ৬ জন খেলোয়াড়কে বে-আইনীভাবে খেলার জন্যে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিলঃ ইতালীর ফেরিনি এবং ডেভিড, যুগোশ্লাভিয়ার পপোভিক, উরুগুয়ের রেরা, চিলির লান্ডা এবং ব্রেজিলের গারিনচা। আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইতালীর ফেরিনি এবং চিলির লান্ডা কেবল পরবর্তী একটা খেলায় যোগদান করতে পারবেন না। মাঠ থেকে বহিষ্কৃত বাকি চারজন খেলোয়াড়কে কেবল সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ভিনা ডেল মারে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমি ফাইনাল খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়া ৩—১ গোলের ব্যবধানে যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত করে। চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় এই প্রথম ফাইনাল খেলা। ১৯৬২ সালের প্রাথমিক পর্যায়ের লীগের খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়া এবং স্কটল্যান্ড ইউরোপীয়ান জোনের ৮নং গ্রুপে সমান ৩টি খেলায় সমান ৬ পয়েণ্ট পায়। প্রথম স্থান নির্ধারণের জন্যে তখন উভয় দলকেই পুনরায় পরস্পর খেলতে হয়। এই খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়া ৪—২ গোলে স্কটল্যান্ডকে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করে এবং চিলির শেষ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। চিলিতে অনুষ্ঠিত শেষ পর্যায়ের লীগের খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়া ৩নং গ্রুপে রাণার্স-আপ হয়; এই গ্রুপে শীর্ষস্থান লাভ করে ব্রেজিল। ব্রেজিল বনাম চেকোশ্লোভাকিয়ার লীগের খেলা গোলশূন্য ড্র যায়।

বিশ্ব ফুটবল কাপ কোয়ার্টার ফাইনাল : ব্রেজিল বনাম ইংল্যাণ্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় ব্রেজিলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড গারিনচাকে ইংল্যাণ্ডের লেফট-ব্যাক খেলোয়াড় উইলসন বাধা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া বনাম যুগোশ্লাভিয়ার সেমি ফাইনাল খেলাটি বিশ্রাম সময় পর্যন্ত ড্র ছিল, কোন পক্ষই গোল দিতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ৩য় মিনিটে চেক দলের লেফট-ইন কাদ্রাবা হেড দিয়ে প্রথম গোল করেন। এই গোল হওয়ার পরই উভয় দলের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা এবং গায়ের জোর দিয়ে খেলবার আগ্রহ দেখা দেয়। যুগোশ্লাভ এবং চেক দলের রাইট-ইন খেলোয়াড়দ্বয় এক মারাত্মক সংঘর্ষে লিপ্ত হলে সুইস রেফারী তাঁদের সতর্ক করে দেন; এইখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি; দুই দলের অধিনায়ককে ডেকে এনে তিনি অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেন। রেফারীর কঠোর হস্তে খেলা পরিচালনার দরুণ বেশী দূর আর জল গড়ায়নি। খেলার ৭০ মিনিটে যুগোশ্লাভিয়ার জারকোভিক গোল শোধ করেন।

এরপর চেক দলের স্কেরার ৮২ এবং ৮৫ মিনিটে দুটো গোল দেন। দ্বিতীয় গোল হয় পেনাল্টি থেকে।

ফাইনালের পথে ব্রেজিল এবং চেকোশ্লোভাকিয়া

ব্রেজিল : শেষ পর্যায়ের লীগের ৩নং গ্রুপের খেলায় ব্রেজিল ২—০ গোলে মেক্সিকোকে, ২—১ গোলে স্পেনকে পরাজিত ক'রে এবং ০—০ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়ার সংগে খেলা ড্র রেখে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। কোয়ার্টার ফাইনালে ৩—১ গোলে ইংল্যান্ডকে এবং সেমি-ফাইনালে, ৪—২ গোলে চিলিকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যায়।

চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ ইউরোপীয়ান জোনের ৮নং গ্রুপের প্রাথমিক পর্যায়ের লীগের খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়া ৩—১ ও ৭—১ গোলে রিপাবলিক অব্ আয়ারল্যাণ্ডকে এবং ৪—০, ২—৩ ও ৪—২ গোলে স্কটল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে চিলিতে শেষ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করে।

চিলিতে অনুষ্ঠিত শেষ পর্যায়ের লীগের ৩নং গ্রুপের খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়া ১—০ গোলে স্পেনকে পরাজিত করে; মেক্সিকোর বিপক্ষে ১—৩ গোলে পরাজিত হয় এবং ব্রেজিলের বিপক্ষে ০—০ গোলে খেলা ড্র ক'রে কোয়ার্টার ফাইনালে যায়।

কোয়ার্টার ফাইনালে ১—০ গোলে হাঙ্গেরীকে এবং সেমি-ফাইনালে ৩—১ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে।

॥ বিশ্ব ফুটবল ফাইনাল ॥

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

বৎসর	বিজয়ী	রাণার্স-আপ
১৯৩০	উরুগুয়ে ৪	আর্জেন্টিনা ২
১৯৩৪	ইতালী ২	জার্মানী ১
১৯৩৮	ইতালী ৪	হাঙ্গেরী ২
১৯৫০*	উরুগুয়ে	ব্রেজিল
১৯৫৪	জার্মানী ৩	হাঙ্গেরী ২
১৯৫৮	ব্রেজিল ৫	সুইডেন ২

* লীগ প্রথায় খেলা হয়। উরুগুয়ে ৫ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান এবং ব্রেজিল ৪ পয়েণ্ট পেয়ে রাণার্স-আপ আখ্যা লাভ করে।

॥ ফুটবল লীগ খেলা ॥

গত সপ্তাহে (১১ই জুন থেকে ১৬ই জুন) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোট ১২টা খেলা হয়েছে—জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে ৮টা খেলায় এবং খেলা ড্র গেছে ৪টে।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ২—০ গোলে খিদিরপুরকে এবং ১—০ গোলে এরিয়ান্সকে পরাজিত করেছে। ইস্টবেঙ্গল দলের উপস্থিত খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ১৪টা খেলায় ২৩ পয়েণ্ট। লীগের তালিকায় তারা বর্তমানে শীর্ষ স্থান অধিকার করে আছে।

৯ই জুনের খেলার শেষে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের পয়েণ্ট সমান দাঁড়িয়েছিল—১২টা খেলায় দুই দলেরই ১৯ পয়েণ্ট। কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে মোহনবাগান ৩টে খেলায় তিন পয়েণ্ট নষ্ট করেছে। উয়াড়ীর বিপক্ষে মোহনবাগান ০—১ গোলে পরাজিত হয়েছে এবং বাটার সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র করেছে। শনিবারের খেলায় মোহনবাগান ৫—০ গোলে পুলিশকে পরাজিত করে। বর্তমানে মোহনবাগানের খেলার ফলাফল—১৫টা খেলায় ২২ পয়েণ্ট। গত বছরের রাণার্স-আপ বি এন আর ২টো খেলায় পরাজিত হয়েছে ০—১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং এবং ০—১ গোলে ইস্টার্ণ রেল দলের কাছে।

লীগের তালিকায় তৃতীয় স্থান নিয়ে আছে ইস্টার্ণ রেল দল—১০টা খেলায় ১৪ পয়েণ্ট।

॥ প্রথম বিভাগের লীগ তালিকা ॥

(১৭ই জুন পর্যন্ত)

প্রথম চারটি দল

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	পঃ
ইস্টবেঙ্গল—	১৪	৯	৫	০	১৫	২	২৩
মোহনবাগান—	১৫	৯	৪	২	৩১	১০	২২
ই আই আর—	১০	৪	৬	০	৮	৩	১৪
জর্জ টেলিগ্রাফ—	১০	৪	৪	২	৬	৩	১২

॥ ফুটবল মাঠে উচ্ছৃঙ্খলতা ॥

গত ১৪ই জুন তারিখে হাওড়া ইউনিয়ন বনাম উয়াড়ী দলের লীগের খেলায় উয়াড়ীর বিপক্ষে রেফারীর পেনাল্টি দেওয়ার নির্দেশ উপলক্ষ্য ক'রে মাঠে এক অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা হয়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট আগে পেনাল্টি সীমানার মধ্যে উয়াড়ী দলের রাইট ব্যাকের হাত দিয়ে বল ধরার দরুণ রেফারী পেনাল্টি কিকের নির্দেশ দেন। এই পেনাল্টি কিক্ থেকে হাওড়া ইউনিয়ন দল গোল দিয়ে খেলায় শেষ পর্যন্ত ১—০ গোলে জয়লাভ করে। ব্যাপার এইখানেই শেষ হয়নি। খেলা ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে উয়াড়ী দলের কয়েকজন খেলোয়াড় রেফারীকে পাকড়াও করে পেনাল্টি কিক্ দানের যৌক্তিকতা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, পেনাল্টি সীমানার বাইরে 'হ্যাণ্ড-বল' হয়েছিল সুতরাং পেনাল্টির নির্দেশ

ছিল। কিছু সংখ্যক উৎসাহী উগ্র দর্শকও আসরে নেমে পড়ে আসর গরম ক'রে তুলেছিল।

সংবাদে প্রকাশ, এই আসরে রেফারীকে শারীরিক লাঞ্ছনা পেতে হয়েছিল এবং সি-আর-এ তাঁবুতে যাওয়ার পথে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে জখম হয়েছিলেন।

এই ধরণের রেফারী নিগ্রহের ঘটনায় এবং খেলার মাঠে উগ্র সমর্থকদের উচ্ছৃংখল আচরণে সন্ত্রস্ত হয়ে রেফারীরা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যথোপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং খেলা পরিচালনার সুষ্ঠ পরিবেশ ছাড়া তাঁদের পক্ষে আই এফ এ পরিচালিত ফুটবল লীগের খেলা পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে ১৫ই জুন তারিখে কালকাটা• ফুটবল লীগের সকল বিভাগের খেলা স্থগিত রাখা হয়। আই এফ এ-র গভর্ণিং বডির এক সভায় দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে কলকাতার ফুটবল মাঠে উগ্র দর্শকশ্রেণীর উচ্ছৃংখলতার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং এই উচ্ছৃংখলতা দমনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

ইতিমধ্যে উয়াড়ী ক্লাব কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। উয়াড়ী এবং হাওড়া ইউনিয়নের খেলার শেষে তাঁদের যে কয়েকজন খেলোয়াড় রেফারীর প্রতি অশিষ্ট আচরণ করেছিলেন তার নিন্দা ক'রে আই এফ এ-কে এক চিঠি দিয়ে উয়াড়ী ক্লাব কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে আশ্বাসও দিয়েছেন যে, তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন যাতে ভবিষ্যতে এই রকমের ঘটনা পুনরায় না ঘটে।

ফুটবল খেলার মাঠে একশ্রেণীর দর্শকদের উচ্ছৃংখলতা এক সময়ে আধুনিক ফুটবল খেলার প্রবর্তক ইংল্যান্ডকেও দারুণ দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল।

ফুটবল মাঠে দর্শকদের উচ্ছৃংখলতার সম্ভাবনাকে ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশ-

বিশ্ব ফুটবল কাপ কোয়ার্টার ফাইনাল : হাঙ্গেরীকে ১—০ গোলে পরাজিত ক'রে চেক খেলোয়াড়রা জয়লাভের আনন্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করছেন।

গুলি কিভাবে প্রতিরোধ ক'রে থাকে আমাদের দেশের ফুটবল খেলার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান আই এফ এ-কে তার বিশদ খোঁজখবর নিয়ে আমাদের দেশেও তার প্রচলন করতে হবে।

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণে আমাদের দেশের ফুটবল খেলার মাঠে শান্তি ভঙ্গ হয়।

(১) ফুটবল খেলার আইন সম্পর্কে বেশীর ভাগ খেলোয়াড় এবং দর্শকের আকাট অজ্ঞতা।

(২) ফুটবল খেলার আইন-পুস্তকের অভাব।

(৩) উগ্র দলপ্রীতি এবং উগ্র জাতীয়তা-বোধ।

(৪) খেলোয়াড় এবং রেফারীদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে ক্ষমাহীন মনোভাব।

(৫) স্টেডিয়ামের অভাব—টিকিটের কালোবাজার— টিকিট সংগ্রহে দর্শকদের হয়রানি এবং হতাশা।

(৬) বিজয়ী দলের সমর্থকদের অশোভন উল্লাসধ্বনি এবং অঙ্গভঙ্গী।

(৭) খেলায় অসাফল্যের দরুণ নিজ দলের সমর্থকদের সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে বিখ্যাত দলের কোন কোন খেলোয়াড়ের বার বার অফ্-সাইডে থেকে রেফারীকে অপদস্থ করার চেষ্টা।

(৮) সময়ে সময়ে রেফারীর ত্রুটিপূর্ণ খেলা পরিচালনা।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড সফর

ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্থান ক্রিকেট দল ১৪ই জুন পর্যন্ত ১২টি ম্যাচ খেলেছে। খেলার ফলাফল : পাকিস্থানের জয় ৪, হার ৪ এবং খেলা ড্র ৪। গ্লামর্গান দলের কাছে ৭ উইকেটে এবং সামারসেট দলের কাছে এক ইনিংস এবং ৮৫ রাণে তারা সফরের যথাক্রমে ১১শ এবং ১২শ খেলায় উপর্যুপরি পরাজিত হয়েছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

'মিছে তোমার জরি শাড়ি
গজমোতির ঘটা
যদি কন্যা—না রয় তাতে
নয়া নক্সার ছটা।'

তাঁতবস্ত্র
হস্তশিল্প ও রেশমের
আধুনিক নক্সা

পরিদর্শন করুন

কলিকাতা ইনফর্মেশন সেন্টার • ২৬শে জুন থেকে ৪ঠা জুলাই, ১৯৬২
শিল্প অধিকার (কুটির শিল্প বিভাগ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী
লেখায়

রেনবো

ফাউণ্টেনপেন কালি

ঝরঝরে লেখা হয় • তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় • সাবলীল গতিতে কালি নামে

রেনবো ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিমিটেড
২১২এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সূচী পত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত ॥ অমৃত ॥

অমৃত

॥ অমৃত ॥ অমৃত

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার ১৪ই আষাঢ়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 29th June, 1962
40 Naya Paise

কৈশোরে একটি গল্প পড়িয়াছিলাম যাহার নাম দেওয়া ছিল "লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং"! গল্পটিতে ছিল এক রাজার ছেলে ও এক গরীবের ছেলের খেলাধুলা ও পরের জীবনের অভিজ্ঞতার বিষয়ে অতি সরস বর্ণনা। কিভাবে দুই বন্ধুর ঘোড়াচড়ার সখ হওয়ায় রাজপুত্রের জুটিল ঘোড়া এবং গরীবের ছেলের জুটিল এক কোলা ব্যাং এবং দুই বন্ধুর জীবনের চরম অভিজ্ঞতার অগ্নি-পরীক্ষায় কিভাবে রাজপুত্র হারাইল ঘোড়া এবং গরীবের গেল ঠ্যাং কাটা, ইহাতেই গল্পের আরম্ভ ও শেষ। সে সময়ে গল্পটি উপভোগ করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। আজ চতুর্দিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া সেই মর্মার্থের অন্তর্নিহিত নিদারুণ সত্য আমাদের সম্মুখে কঠোরভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

যে দেশে শতকরা ৭৫ জন নিরক্ষর, এবং তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও বারো আনার অধিক স্বল্পশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত, সেই দেশে যদি রাষ্ট্রচালকগণের দায়িত্বজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় সজাগ ও সচেতন না থাকে তবে সে দেশের জনসাধারণের অবস্থা হয় ঐ গরীবের ছেলেরই মত। কারণ ঐরূপ অবস্থায় লোকতন্ত্রমতে চালিত ও শাসিত দেশে সকল অধিকার যায় ভাগ্যান্বেষী কুটিল লোকের আয়ত্তে, যাহাদের বাক্যজালে আচ্ছন্ন হইয়া অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকে বুঝিতে পারে না যে দেশ কোন পথে চলিয়াছে, নূতন জীবনের উন্নতি পরিপূর্ণতার দিকে না বিষাদপূর্ণ তিক্ত ব্যর্থতার দিকে।

শিক্ষা ভিন্ন কোনও জাতির বা কোনও দেশের প্রগতি সম্ভব নয়, একথা সারা সভ্যজগতে স্বীকৃত—শুধু আমাদের দেশে নয়। শিক্ষার পথ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত না হইলে কোনও দেশের লোক স্বাবলম্বী ও পূর্ণরূপে সক্ষম হইয়া দেশের প্রগতির সহায়ক সকল ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ও সার্থক ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না, একথা সারা জগত জানে—জানিনা শুধু আমরা। এবং এই কারণেই এই বন্যার প্রবাহের মত টাকা খরচ হইয়া চলিতেছে নানা অপরূপ পরিকল্পনায়, কিন্তু দেশের লোকের অবস্থা পরিবর্তন অনুরূপভাবে হইতেছে না।

সকল দেশেই নবজাগরণের প্রথমদিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় তিনটি বিষয়ের দিকে যথা শিক্ষা, খাদ্য ও স্বাস্থ্য। কেননা জনগণ শিক্ষিত না হইলে কোনও উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাহাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহায়তা পাওয়া আবশ্যক—তাহা এতদিনেও বোধগম্য হয় নাই আমাদের পরিকল্পনাকারী বিশ্বজ্জনের ও তাঁহাদের পরিপোষক মন্ত্রীমণ্ডলের।

স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই দীর্ঘদিন দেশের জনগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অবহেলিতই হইয়াছে, শুধু কেন্দ্রে নয়, প্রদেশেও। দেশের লোকের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কোনটারই অগ্রগতি শ্লাঘনীয় নয়—বরঞ্চ তাহার বিপরীতই। শিক্ষামন্ত্রী নিয়োগ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিয়োগ এবং উঁহাদের ক্ষমতার পরিমাণ ও সীমা দেখিলেই বুঝা যায় আমাদের চালকবর্গের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে—বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে—জ্ঞান কতটুকু।

এইতো দেশে শিক্ষার অবস্থা, তাহার উপর আসিয়াছে ধুয়া যে প্রদেশের মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করিবার জন্য। যাঁহারা এ বিষয়ে উৎসাহী, যথা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, তাঁহারা একথা ভাবিয়াও দেখিলেন না যে উহাতে শুধু জাতীয় সংহতি সম্পূর্ণ নষ্টই হইবে না, উপরন্তু প্রাদেশিকতা উৎকটতর হইবে। মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক তো নাই উপরন্তু সেরূপ শিক্ষকও নাই যিনি উচ্চস্তরের শিক্ষা শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে সমর্থ।

যদি সেরূপ শিক্ষা সম্ভবও হয় তবে মাদ্রাজে শিক্ষিত ব্যক্তি বোম্বাইয়ে কোন কাজ করিতে সমর্থ হইবে না, বাংলার লোক গুজরাটে ঠাঁই পাইবে না। আর উচ্চস্তরে শিক্ষার বেলায় তো আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষিত লোক একেবারে জলে পড়িবে, কি এদেশে কি বিদেশে। বোধহয় সেই কারণেই আমাদের সদাশয় কর্ণধারবর্গ এদেশের ছেলেদের বিদেশযাত্রার পথ ধীরে ধীরে বন্ধ করিতেছেন। অবশ্য আছে "সর্বরোগহর" হিন্দী এদেশের সকল কাজ সিদ্ধির জন্য—বিশেষে হিন্দীর রাজ্যপাটবিস্তার ব্যবস্থায়।

আশ্চর্য ব্যাপার এই শিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রার পথে বিঘ্নের সৃষ্টি। কি কি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে কোথায় কোথায় দেশের সন্তান যাইতে পারিবে, সে বিষয়ে সমস্ত ব্যবস্থাই হইবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মত অনুসারে। আমাদের প্রশ্ন এই যে ঐ বিদেশে শিক্ষা বিষয়ক ঘোষণার পূর্বে কোন কোন বিদগ্ধ চূড়ামণির পরামর্শ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ লইয়াছেন। ঘোষণা নিরীক্ষণ করিলেই বুঝা যায় যে উহাতে দায়িত্বজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। দেশের লোক লাভের বেলায় পাইয়াছে প্রস্তর ও লৌহময় নির্জীব "পরিকল্পনা" এবং অপচয়ে হাটিতেছে শিক্ষা।

অমৃত ।। অমৃত ।। **অমৃত** ।। অমৃত ।। অমৃত

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার ১৪ই আষাঢ়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 29th June, 1962
40 Naya Paise

কৈশোরে একটি গল্প পড়িয়াছিলাম যাহার নাম দেওয়া ছিল "লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং"! গল্পটিতে ছিল এক রাজার ছেলে ও এক গরীবের ছেলের খেলাধুলো ও পরের জীবনের অভিজ্ঞতার বিষয়ে অতি সরস বর্ণনা। কিভাবে দুই বন্ধুর ঘোড়াচড়ার সখ হওয়ায় রাজপুত্রের জুটিল ঘোড়া এবং গরীবের ছেলের জুটিল এক কোলা ব্যাং এবং দুই বন্ধুর জীবনের চরম অভিজ্ঞতার অগ্নি-পরীক্ষায় কিভাবে রাজপুত্র হারাইল ঘোড়া এবং গরীবের গেল ঠ্যাং কাটা, ইহাতেই গল্পের আরম্ভ ও শেষ। সে সময়ে গল্পটি উপভোগ করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। আজ চতুর্দিকের পারিপার্শিক অবস্থা দেখিয়া সেই মর্মার্থের অন্তর্নিহিত নিদারুণ সত্য আমাদের সম্মুখে কঠোরভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

যে দেশে শতকরা ৭৫ জন নিরক্ষর, এবং তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও বারো আনার অধিক স্বল্পশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত, সেই দেশে যদি রাষ্ট্রচালকগণের দায়িত্বজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় সজাগ ও সচেতন না থাকে তবে সে দেশের জনসাধারণের অবস্থা হয় ঐ গরীবের ছেলেরই মত। কারণ ঐরূপ অবস্থায় লোকতন্ত্রমতে চালিত ও শাসিত দেশে সকল অধিকার যায় ভাগ্যান্বেষী কুটিল লোকের আয়ত্তে, যাহাদের বাক্যজালে আচ্ছন্ন হইয়া অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকে বুঝিতে পারে না যে দেশ কোন পথে চলিয়াছে, নূতন জীবনের উন্নীত পরিপূর্ণতার দিকে না বিষাদপূর্ণ তিক্ত ব্যর্থতার দিকে।

শিক্ষা ভিন্ন কোনও জাতির বা কোনও দেশের প্রগতি সম্ভব নয়, একথা সারা সভ্যজগতে স্বীকৃত—শুধু আমাদের দেশে নয়। শিক্ষার পথ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত না হইলে কোনও দেশের লোক স্বাবলম্বী ও পূর্ণরূপে সক্ষম হইয়া দেশের প্রগতির সহায়ক সকল ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ও সার্থক ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না, একথা সারা জগত জানে—জানিনা শুধু আমরা। এবং এই কারণেই এই বন্যার প্রবাহের মত টাকা খরচ হইয়া চলিতেছে নানা অপরূপ পরিকল্পনায়, কিন্তু দেশের লোকের অবস্থা পরিবর্তন অনুরূপভাবে হইতেছে না।

সকল দেশেই নবজাগরণের প্রথমদিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় তিনটি বিষয়ের দিকে যথা শিক্ষা, খাদ্য ও স্বাস্থ্য। কেননা জনগণ শিক্ষিত না হইলে কোনও উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাহাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহায়তা পাওয়া অসম্ভব—যাহা এতদিনেও বোধগম্য হয় নাই আমাদের পরিকল্পনাকারী বিদ্বজ্জনের ও তাঁহাদের পরিপোষক মন্ত্রীমণ্ডলের।

স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই দীর্ঘদিন দেশের জনগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অবহেলিতই হইয়াছে, শুধু কেন্দ্রে নয়, প্রদেশেও। দেশের লোকের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কোনটারই অগ্রগতি শ্লাঘনীয় নয়—বরঞ্চ তাহার বিপরীতই। শিক্ষামন্ত্রী নিয়োগ ও 'স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিয়োগ এবং উঁহাদের ক্ষমতার পরিমাণ ও সীমা দেখিলেই বুঝা যায় আমাদের চালকবর্গের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে—বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে—জ্ঞান কতটুকু।

এইতো দেশে শিক্ষার অবস্থা, তাহার উপর আসিয়াছে ধুয়া যে প্রদেশের মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করিবার জন্য। যাঁহারা এ বিষয়ে উৎসাহী, যথা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, তাঁহারা একথা ভাবিয়াও দেখিলেন না যে উহাতে শুধু জাতীয় সংহতি সম্পূর্ণ নষ্টই হইবে না, উপরন্তু প্রাদেশিকতা উৎকটতর হইবে। মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক তো নাই উপরন্তু সেরূপ শিক্ষকও নাই যিনি উচ্চস্তরের শিক্ষা শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে সমর্থ।

যদি সেরূপ শিক্ষা সম্ভবও হয় তবে মাদ্রাজে শিক্ষিত ব্যক্তি বোম্বাইয়ে কোন কাজ করিতে সমর্থ হইবে না, বাংলার লোক গুজরাটে ঠাঁই পাইবে না। আর উচ্চস্তরে শিক্ষার বেলায় তো আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষিত লোক একেবারে জলে পড়িবে, কি এদেশে কি বিদেশে। বোধহয় সেই কারণেই আমাদের সদাশয় কর্ণধারবর্গ এদেশের ছেলেদের বিদেশযাত্রার পথ ধীরে ধীরে বন্ধ করিতেছেন। অবশ্য আছে "সর্বরোগহর" হিন্দী এদেশের সকল কাজ সিদ্ধির জন্য—বিশেষে হিন্দীর রাজ্যপাটবিস্তার ব্যবস্থায়।

আশ্চর্য ব্যাপার এই শিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রার পথে বিঘ্নের সৃষ্টি। কি কি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে কোথায় কোথায় দেশের সন্তান যাইতে পারিবে, সে বিষয়ে সমস্ত ব্যবস্থাই হইবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মত অনুসারে। আমাদের প্রশ্ন এই যে ঐ বিদেশে শিক্ষা বিষয়ক ঘোষণার পূর্বে কোন কোন বিদগ্ধ চূড়ামণির পরামর্শ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ লইয়াছেন। ঘোষণা নিরীক্ষণ করিলেই বুঝা যায় যে উহাতে দারিদ্র্যজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। দেশের লোক লাভের বেলায় পাইয়াছে প্রস্তর ও লৌহময় নির্জীব "পরিকল্পনা" এবং অপচয়ে যাইতেছে শিক্ষা।

ঝড়ের পরে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

জলঝড় থেমে গেছে বাইরে এখন।
জলে ভেজা মন
তোমাকেই পায় ফিরে ফিরে
তুমি যৌবনের সেই জলকন্যা বসে আছ সমুদ্রের তীরে
নিঃসঙ্গ নির্জন।
হৃদয়ের সব আয়োজন
পায়ে ঠেলে যাবে বুঝি চলে
ফের নীল সমুদ্রের জলে।
সিক্ত সুষমায় তাই চুপ করে থাকি।
যা বলার থাক সব বাকি
থাক বৃষ্টি ভেজা স্নিগ্ধ মন,
ক'টি মুহূর্তের মধু, সুস্বাদু স্মরণ।।

কারো চোখে ঘুম নেই

নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

মাটি আছে মাঠ আছে
ছোট ছোট ধানগাছ এখনো তো খেলা করে দুরন্ত
বাতাসে
দাঁড়িয়ে বাপের কাছে
ছোট এক ছেলে দেখে নিড়ানির কাজ শান্ত সহজ
বিশ্বাসে।

সূর্য ডোবে রাত্রি আসে
দামোদর পারে ওঠে বিকট কঠিন কন্ঠে ক্রেনের
আওয়াজ......
পাখিরা সহসা ত্রাসে
অন্ধকারে ডেকে ওঠে, যেন কোন্ ইন্দ্র হানে দধীচির
বাজ।

চাষীর ছেলেটি জাগে
ঘুম নেই তারও চোখে সারারাত বুকে তার কীসের
কাঁপন।
পরিচিত অনুরাগে
কোথা যেন চিড় ধরে চারিদিকে ঝরে শুধু নিঃশব্দ
ক্রন্দন।

চুপি চুপি তারই ডাকে
ছেলেটি বাহিরে আসে, অদূরে বাঁধের চাপে গর্জে
দামোদর
ইস্পাত নগরী থাকে
তারই পাশে রক্তচক্ষু দৈত্যের আক্রোশে যেন, উদ্যত
নখর

চোখে তার কী যে ক্ষুধা,
ধীরে ধীরে পা ফেলে সে ক্রমেই এগিয়ে আসে
নিয়তির মতো
মুছে যাবে এ বসুধা,
এ ছেলে কি কোনো দিন ফিরে পাবে এই মাঠ
শস্যভারে নত?

ঘুম নেই ঘুম নেই,
কী জানি কী ভবিষ্যৎ পরিচিত জীবনের ওপারে
গোপন।
যন্ত্রের পরিধি এই
ঘিরে আসে চারিদিকে, আশঙ্কার স্তব্ধ ঢেউয়ে
কেঁপে ওঠে মন।

জৈমিনি

চালাকীর দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না, একথা ঠিকই। কিন্তু চালাকীর প্রতিষেধক হিসেবে চালাকীই যে অব্যর্থ ওষুধ তাও একেবারে পরীক্ষিত সত্য। যেমন, প্রণিধান করুন—

গাবলুদাকে তো চেনেন? আমাদের আড্ডার পরমাশ্চর্য নিউকাইণ্ড গাবলুদা? তাঁরই সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম সেদিন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেব ব'লে। গাবলুদার প্রয়োগনৈপুণ্যে ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল একেবারে অন্য-রকম।

রাস্তায় বেরিয়েই গাবলুদা বললেন, 'একটা ট্যাক্সি দেখা যাক—'

'ট্যাক্সি?' আমি প্রায় চমকে উঠে বললাম, 'সাড়ে চারটে বেজে গেছে, এখন কি আর ট্যাক্সি পাওয়া যাবে? তার চেয়ে বরং......।'

'না না ভাই, ট্রামে-বাসে নয়। জামা-কাপড় একেবারে যাচ্ছেতাই হ'য়ে যাবে। ঐ দেখ, একটা ট্যাক্সি আসছে।' গাবলুদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু ট্যাক্সিতে আরোহী ছিল, চলে গেল।

গাবলুদা বললেন, 'চল একটু এগিয়ে যাই, মোড়ের মাথায় পাওয়া যেতে পারে।'

আমি অপ্রস্তুত হাসি টেনে বললাম, 'গাবলুদা, বরং তার চেয়ে......!'

হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, 'এখনো সময় আছে। একটু দাঁড়াও না, ট্যাক্সি আজ একটা জোগাড় করবই।'

'কী যে বলেন', আমি রসিকতায় চেষ্টা করলাম, 'ট্যাক্সি পাওয়া ব্রহ্মলাভের চেয়েও কঠিন সাধনা। যে পায়, সে পায়। যে পায় না, সারাজীবন মাথা খুঁড়লেও তার গতি নেই।'

'বিশ্বাস করিনে। ওসব হল তোমাদের বিশুদ্ধ নাকীকান্না। চেষ্টা করলে আবার......ঐ যে একটা—।' গাবলুদা ধাবিত হলেন সেদিকে।

সত্যি বলতে কি, আমার পায়ের জোর কমে আসছিল। ট্যাক্সি দেখে উৎসাহ পেলাম। কাছে গিয়ে দেখি, গাড়ি খালি বটে, কিন্তু মিটার-ফ্ল্যাগটি ডাউন করা। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে আড়মোড়া ভেঙে জানাল, 'দেখছেনই তো, এনগেজ্‌ড্ আছে।'

গাবলুদা—সে তো দেখছি। কিন্তু লোক কই?

ড্রাইভার নিরুত্তর।

গাবলুদা—কী? যাবেন না?

ড্রাইভার—কোনদিকে যাবেন?

গাবলুদা—ঢাকুরিয়া।

ড্রাইভার — লাইনের এপারে না ওপারে?

গাবলুদা—ওপারে।

ড্রাইভার—(গাড়িতে উঠে বসে, স্টার্ট দিয়ে) না বাবু, এনগেজ্‌ড আছে। (নিষ্ক্রমণ।)

গাবলুদা নীরব। কিন্তু তাঁর চোখে দেখা দিল এক অস্বাভাবিক জ্যোতি। আমি ঈষৎ ভীত হ'য়ে বললাম—'সাড়ে পাঁচটা বাজে, এখনো চেষ্টা করলে—।'

'না না—! ট্যাক্সিতেই যেতে হবে।'

'কিন্তু গাবলুদা, দেখছেনই তো অবস্থা। এখন ডিম্যাণ্ড বেশি, ওরা এসপ্ল্যানেডের দিকে ছাড়া ভাড়া নেবে না।'

'আলবৎ নেবে। কী করে নেওয়াতে হয় দেখাচ্ছি।'

'কিন্তু সময় যে এদিকে আসন্ন। এরপর তো ট্রামে-বাসে গেলে আর পৌঁছনো যাবে না।'

গাবলুদা ঘুরে দাঁড়ালেন, তারপর স্থিরকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'দেখ ভায়া, আমার সে কথা সেই কাজ। বলেছি যখন

ট্যাক্সিতে যাব, তখন ট্যাক্সিতেই যাব। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি অন্যভাবে যেতে পার।'

একথার কোনো জবাব হয় না। সত্যিই তো আর একসঙ্গে বেরিয়ে তাঁকে ছেড়ে আমি চলে যেতে পারিনে। কাজেই নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইল না আমার।

ওদিকে রাস্তায় খালি-ট্যাক্সি বিরল থেকে বিরলতর হ'য়ে এল। হবেই। রোজই এইরকম হয়। এ সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দূরে থাক, বাড়িতে লেবার-পেন উঠলেও ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। মনে মনে গাবলুদার নির্বুদ্ধিতাকে নিন্দা করতে লাগলাম।

ট্যাক্সি পেলেও কি আর এখন সময় মতো পৌঁছানো যাবে!

'ট্যাক্সি, এই ট্যাক্সি......।'

পাশে চেয়ে দেখি গাবলুদা নেই, এবং পরক্ষণেই সামনে তাকিয়ে দেখি একেবারে রাস্তার মাঝখানটিতে একটা দ্রুত-আগত ট্যাক্সির সামনে হাত তুলে তিনি পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

ধড়াস করে উঠল বুকটা—একটা অ্যাক্সিডেন্ট হ'য়ে যাবে নাকি?

না, ট্যাক্সির গতি শ্লথ হল। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ফুটপাতের কাছাকাছি এনে দাঁড় করালো সেটাকে, তারপর নিঃস্পৃহ গলায় বলল ড্রাইভার—'গাড়ি খারাপ আছে।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার সত্যি ঠাহর করে দেখলাম, মিটারে লাল কাপড় বাঁধা।

গাবলুদাও বলাবাহুল্য সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিলেন। তিনি দরজা খুলে সোজা ভিতরে গিয়ে বসে বললেন, 'হোক খারাপ, চলুন।......এস ভায়া।'

আমিও ভিতরে গিয়ে বসলাম। যেতে পারব এ ভরসা অবশ্য ছিল না মনে, কিন্তু নাটকটা এবার কোনদিকে মোড় নেয় সে বিষয়ে কৌতূহল জেগে উঠেছিল। নীরবে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

'চলুন।' গাবলুদা তাগাদা দিয়ে বললেন।

'বললাম তো গাড়ি খারাপ।'

এই তো দিব্যি চালিয়ে আসছিলেন। ঐভাবে চালালেই হবে।'

'তা হয় না স্যার', ড্রাইভার বিজ্ঞের-হাসি টেনে বলল, 'প্যাসেঞ্জার নিয়ে খারাপ গাড়ি চালানো রিক্‌স্ (রিস্‌ক্!)।'

'তাহলে খারাপ গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন কেন?'

'লাইনে বেরিয়ে ভাড়া খাটতে খাটতে আউট হ'য়ে গেছে। গ্যারেজে যাচ্ছি।'

'কী খারাপ হ'য়েছে?'

'কেন ঝামেলা করছেন দাদু, ছেড়ে দিন না। ট্যাক্সি এখন মেলাই পাবেন।'

'আপনার কী খারাপ হ'য়েছে বললেন না তো?'

'আপনি কি মিস্ত্রি নাকি যে গাড়ির হ্যানো-ত্যানো সব বুঝবেন?'

'কিঞ্চিৎ জানা আছে।'

ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে গাবলুদার মুখের দিকে তাকালো। তারপর বলল, 'ব্রেক স্লিপ করছে।'

'তাই নাকি? আচ্ছা দেখছি।' বলে গাবলুদা উঠলেন। জামা খুললেন। ড্রাইভারকে দিয়ে যন্ত্রপাতি বার করালেন এবং পা-দানীর রবার সীট পেতে সোজা গিয়ে শুয়ে পড়লেন গাড়ির নিচে। মিনিট পাঁচেক কী খুটখাট করলেন, বুঝলাম না। তারপর বেরিয়ে এসে রাস্তার কল থেকে হাত-পা ধুয়ে জামা-টামা পরে আবার রেডি হ'য়ে বসলেন।

ড্রাইভার নীরবে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করল। রাত তখন আটটা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। কাজেই লেকের চারপাশে একবার চক্কর দিয়ে গাবলুদার বাড়িতে এসে নামলাম।

ভাড়া দিতে গেলাম আমরা, ড্রাইভার নিল না।

ট্যাক্সিটা চলে গেলে গাবলুদা বললেন, 'কী বুঝলে, বল তো?'

'গাড়িটা মেরামত করেছেন বলে নিল না।'

'ধুঃ, কিছু করিনি। জানিই না, তা করব কী? এটা হল ওর আক্কেল-সেলামী। হাঃ হাঃ হা, আমার কাছে চালাকী।......চল চা খেয়ে যাবে।'

সত্যি বলছি, শুধু ড্রাইভারই নয় আমিও 'থ' বনে গেলাম গাবলুদার এই মোক্ষম প্যাঁচের চালাকী দেখে।

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের গোড়ার কথা

নিখিল সেন

মেসার্স এ্যালেন ম্যাকলীন ও দা-এগুইলার ছিলেন গাজীপুরের কাছাকাছি এক নীলকুঠিরের কুঠিয়াল। দেনাপাওনার ব্যাপারে দুই সাকরেদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি। হাতাহাতি থেকে শেষে ঘুষোঘুষি। রাগের মাথায় ম্যাকলীন সাহেব তাঁর সহকুঠিয়ালের নাকে বসিয়ে দিলেন বিরাশি সিক্কা ওজনের এক ঘুষি। ম্যাকলীন সাহেব অবশ্য তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেন। দা-এগুইলারের নিকট ক্ষমা চাইলেন। ক্ষতিপূরণ দিতেও স্বীকৃত হলেন। কিন্তু দা-এগুইলার অত সহজে টললেন না। ঘোড়ায় চেপে তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদালতে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব "জাস্টিস্ অফ্ দি পীস্" ছিলেন না। তবু বিবাদী ম্যাকলীনের বিরুদ্ধে তিনি একতরফা রায় দিয়ে বসলেন। আসামীকে নির্দেশ দিলেন হাজতবাসের। তিনি তারপর বারাণসীর আপীল জজের নিকট এবিষয়ে মতামত চেয়ে লিখে পাঠালেন। এই মামলায় যদিও তাঁর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার ছিল না তবু আসামীকে বন্দীদশায় কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হোল এক খোলা বজরায় করে জনৈক সার্জেন্ট, এক কর্পোরাল, আর বারজন সেপাইর হেপাজতে। খোলা উন্মুক্ত বজরায় রোদ, জল, বৃষ্টি বাদলায় মাসাধিককাল কাটল আসামীর।

ইত্যবসরে এ্যালেন ম্যাকলীন কলকাতায় তাঁর স্বনামের ডাক্তার চার্লস ম্যাকলীনকে সব কথা জানিয়ে এক পত্র লেখেন। এ সময় মিঃ এ্যালেন ম্যাকলীন বারাণসীতে এক ডুয়েল লড়াইয়ে গুলীর আঘাতে নিহত হয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয় 'ইন্ডিয়া গেজেট' ও 'হরকরা' সংবাদপত্রে। ডাঃ ম্যাকলীন এই সংবাদের প্রতিবাদ করেন। এবং জানান যে ভদ্রলোক সশরীরে এখনও জীবিত আছেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি সেদিন (২৮শে এপ্রিল, ১৭৯৮) এক পত্র পেয়েছেন।

এই মানহানিকর সংবাদ পরিবেশনের জন্য ডাঃ ম্যাকলীনকে সরকার কর্তৃপক্ষ ক্ষমাপ্রার্থনা করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ডাঃ ম্যাকলীন তা সবিনয় তেজস্বিতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাঁকে বন্দীদশায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করা হয়। তাঁর বার্ষিক আয় ছিল তখন ৭০০ পাউন্ড। তা এবং প্রায় দু'হাজার পাউন্ড মূল্যের তাঁর ছাপাখানার সাজসরঞ্জাম সবই তাঁকে খোয়াতে হয়। ডাঃ ম্যাকলীন তাঁর স্ত্রীপুত্রের জন্য ভাল একটু ব্যবস্থার জন্য আবেদন-নিবেদন করেও ব্যর্থ হন। এবং ইংলণ্ডে না পৌঁছান পর্যন্ত তাঁকে জাহাজে অতি সাধারণ কয়েদীর মত অশেষ নিগ্রহ ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়। ডাঃ ম্যাকলীন পরবর্তী জীবনে অবশ্য বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। প্লেগ, ইয়েলো ফিভার কিংবা কুখ্যাত 'কোয়ারেন টাইন' প্রথা বর্জন করার জন্য তিনি সবিশেষ প্রসিদ্ধ হন। লর্ড ওয়েলেসলি ইংলণ্ডে ফিরে গেলে ম্যাকলীন তাঁর নির্বাসনের কথা ইংরেজ জনসাধারণের কাছে উত্থাপিত করেন। এবং এই অন্যায় কার্যের বিরুদ্ধে সমর্থন লাভে সক্ষম হন।

তখন থেকেই ভারতের সংবাদপত্রের সংবাদ নিয়ন্ত্রণের সূত্রপাত বলা যায়। ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত জন অগাস্টাস্ হিকির গেজেটের আগে উইলিয়ম বোল্টস্ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মিঃ বোল্টস্ ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী। পরে তিনি কোম্পানীর কাজ ছেড়ে দেন এবং ব্যবসাকার্যে লিপ্ত থেকে বিস্তর পয়সা উপার্জন করেন। "কনসিডারেসনস্ অন্ ইণ্ডিয়ান এ্যাফেয়ারস্" নামে একখানি তথ্যমূলক গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় কর্মকর্তাদের গলদ ও কীর্তিকলাপের বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উত্থাপন করেন। এহেন সাংঘাতিক ব্যক্তি যখন ১৭৬৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের সঙ্কল্প করলেন তাঁর সেই প্রচেষ্টাকে যে সমূলে উৎপাটিত করা হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? বিশেষ করে যখন মিঃ বোল্টসের হাতে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধে যায় এমন বহু গোপন তথ্য রয়েছে। সুতরাং মিঃ বোল্টস্‌কে সরাসরি স্বদেশে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়।

মিঃ বোল্টসের অপূর্ণ বাসনাকে জেমস্ অগাস্টাস্ হিকি বাস্তবে

স্থানান্তরিত করেন। বার বৎসর পর ভারতবর্ষ তথা সমগ্র এশিয়ার প্রথম সংবাদপত্র "বেঙ্গল গেজেট" (২৯শে জানুয়ারী, ১৭৮০) প্রকাশিত হয়। "সর্বদল নিরপেক্ষ, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যগত" এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানির দাপট কিন্তু কম ছিল না। শ্লেষ ও ব্যঙ্গময় হিকির ধারাল লেখনীর মুখে মহাপ্রতিম বড়লাট বাহাদুর, সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, কিংবা শক্তিমান ধর্মযাজক কেউ বাদ যেতেন না। এমনকি, বড়লাট-পত্নী কিংবা সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতির সহধর্মিণীও নিষ্কৃতি পেতেন না। হিকির এই লেখনীর মুখ বন্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। মানহানির দায়ে হিকিকে আষ্টেপিষ্টে বন্ধ করে ক্ষতিপূরণ, হাজতবাস, এবং শেষে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতেও কুণ্ঠিত হননি। পরিশেষে হিকিকেও ভারত ছাড়তে বাধ্য করা হয়।

'বেঙ্গল জার্নালে'র সম্পাদক উইলিয়ম ডুয়েনকেও সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামত প্রকাশের দায়ে এমনিধারা নিগ্রহ ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়। উইলিয়ম ডুয়েন মার্কিন ও আইরিশ কুলজাত। ভারতে-আসা জনৈক বিদেশী, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাইভেট সৈন্য হিসাবে তিনি প্রথম বাংলায় আগমন করেন। মুদ্রাযন্ত্রন কার্যে তিনি পরে লিপ্ত হন এবং কলিকাতাস্থ রাজস্ব দপ্তরে কিছুকাল কাজও করেন। মেসার্স ডিমকিন ও কাসেন সাহেবের সহযোগিতায় পরে তিনি 'বেঙ্গল জার্নালের' সম্পাদক নিযুক্ত হন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন ভারতে 'বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড-রূপে' দেখা দিয়েছে। বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিশ মহারাষ্ট্রীয়দের অভ্যুত্থান দমনে তৎপর। বেশ কিছুদিন থেকে যোগাযোগ ও সংবাদ সরবরাহের অভাবে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ও মহারাষ্ট্র যুদ্ধের কোন খবরাখবর আসছিল না। কলকাতায় এ সময় এক গুজব রটিয়ে পড়ে যে বড়লাট যুদ্ধে মারা গেছেন। উইলিয়াম ডুয়েন এই মৃত্যুসংবাদ তাঁর কাগজে ছাপিয়ে দেন এবং সংবাদের উৎস হিসাবে জানান যে জনৈক পদস্থ ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ এ সংবাদের সংবাদদাতা। ভারতস্থ ফরাসী দপ্তরের অধ্যক্ষ কর্ণেল দা কানাপোঁ ভাবলেন, তাঁকেই নাকি উক্ত সংবাদদাতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের নিকট এর প্রতিবাদ ও ক্ষতিপূরণ দাবী করে পত্র লেখেন। উক্ত সংবাদ-লেখককে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করতে নির্দেশ দেন। ফরাসী কর্মচারী কিন্তু অকুণ্ঠ ক্ষমাপ্রার্থনার সঙ্গে বিষয়টি সরাসরি প্রত্যাহার করার দাবী জানালেন। সম্পাদক ডুয়েন উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ ছাপতে রাজী হলেন। তিনি ফরাসী কর্ণেল ও তাঁর এজেন্টের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্তসার বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কিন্তু বিষয়টি সহজভাবে নিলেন না। বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিশ ফরাসী আর ইংরেজদের মধ্যে এই ব্যাপারে অকারণ একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলতে কিংবা বিরোধ সৃষ্টি করতে পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি তাই তাঁর আইন পরিষদের পরামর্শ নিয়ে সম্পাদক ডুয়েনকে গ্রেপ্তার ও স্বদেশে পাঠাবার হুকুম দিলেন। সম্পাদক ডুয়েনও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি সুপ্রীম কোর্টে বিনা-বিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে 'হেবিয়াস কর্পাস' মুক্তির দাবী জানিয়ে আবেদন করলেন। সুপ্রীম কোর্ট কিন্তু সরকারের মতেই সায় দেন এবং সম্পাদক ডুয়েন-এর নির্বাসনদণ্ড সমর্থন করেন।

কিন্তু ফরাসী এজেন্ট তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। তিনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের নিকট লিখে জানান যে কর্ণেল কানাপোঁ যখন আর জীবিত নেই এবং সম্পাদক ডুয়েন তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ও সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন, তখন তাঁর উপর এই শাস্তি নির্দেশ রহিত করা হোক।

বেঙ্গল সরকার তাই-ই করলেন। সম্পাদক ডুয়েন এই যাত্রায় রক্ষা পান। কিন্তু বৎসর তিনেক পর তিনি আবার তাঁর কৃতকর্মের জন্য বিপদে পড়লেন। "কোর্ট অফ রিকোয়েষ্টস"-এর ক্লার্কের নিকট তিনি ১০ই মার্চ, ১৭৯৪ তারিখে এই মর্মে এক পত্র লেখেন যে উক্ত কোর্টের জনৈক কনেষ্টবল তাঁর বাড়ি আসে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে। পরোয়ানায় উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট তিনি যে ঋণ করেছিলেন কিস্তিবন্দি তা যখন পরিশোধ করছেন, তখন তাঁকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া আইন-সঙ্গত হয়নি। শুধু তাই নয়, সরকারের সেক্রেটারি বাহাদুরের নিকট তিনি সাংবাদিকসুলভ এক পত্রযোগে জানান যে, একদল লোক জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোকের নেতৃত্বে লাঠি-সোটা, [illegible] তাঁর বাড়ি চড়াও করে এবং তাঁকে চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে হাজির করে যেখান থেকে তিনি এখন লিখেছেন, সেই 'কলকাতা টাউনের পেটি কোর্ট বা কোর্ট অফ রিকোয়েষ্ট'-এ। সপরিষদ বড়লাট বাহাদুরকে এই বিষয় অবগত করাতে অনুরোধ জানিয়ে তিনি আরও লেখেন যে, এই নির্যাতনের মূলে কারণ কিন্তু তাঁর সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই কোর্টের কোন কোন গলদ ও অসামঞ্জস্যমূলক আচরণের সমালোচনা করার দরুণ আমলা-বিশেষের ব্যক্তিগত অসন্তোষ। 'ন্যায়-বিচারের অন্যায় দন্ডে' তিনি আজ হাজতবাস করতে বাধ্য হয়েছেন বলে পরিশেষে মন্তব্য করেন (মার্চ ১৭৯৪)।

লর্ড কর্ণওয়ালিশের পর স্যার জন শোর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে নতুন বড়লাট হয়ে এলেন। তিনি সম্পাদক ডুয়ানকে ভারত ছাড়া করতে কৃতসংকল্প হন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে বিবাদ-বিসংবাদের ফলে ডুয়েনের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। তিনি তাই স্বদেশযাত্রা করার আগে তাঁর বিষয়-আশয়ের বিধিব্যবস্থা করে নিতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। তাই বড়লাট বাহাদুরের একান্ত সচিবের নিকট লিখে পাঠালেন যে স্যার জন শোরের সঙ্গে যদি তিনি সাক্ষাতের অনুমতি না পান তা হলে তিনি তাঁর প্রতি আচরণের কথা দলিল-দস্তাবেজসহ কাগজে ছাপিয়ে দেবেন।

বড়লাট স্যার জন শোর দেখলেন, ডুয়েনকে জব্দ করার এই সুযোগ। ডুয়েন গভর্ণর হাউসে পূর্ব নির্দেশমত এসে উপস্থিত হলেই তাঁকে সেপাই-সান্ত্রীরা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আটক করে রাখে দুদিন। তারপর 'ইণ্ডিয়া ম্যান' নামধারী এক সশস্ত্র জাহাজে জোর করে চাপিয়ে পাঠিয়ে দেয় ইংলণ্ডে। ভারতস্থ তাঁর বিষয়-সম্পত্তির জন্য (মূল্য প্রায় ৩০ হাজার টাকার মত) কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নি। ডুয়েন অবশ্য পরে ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় চলে যান এবং ফিলাডেলফিয়ায় বসতি স্থাপন করে "অরোরা" নামে একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদনা করতে থাকেন। এই পত্রে বৃটিশ-উপনিবেশিকতার যে মধুর সমালোচনা করা হত না, তা বলাই বাহুল্য।

সিল্ক বাকিংহাম

১৮১৯ থেকে ১৮২৩ খৃঃ পর্যন্ত জেমস্ সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জার্ণালে'র প্রকাশকাল। সমকালে ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে একাল

বিশেষ উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সংগে জেমস্ সিল্ক বাকিংহামের এ সময় বিরোধ বাধে সাংবাদিকের অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতারক্ষার জন্য। কাউন্সিল সদস্য জন এ্যাডাম সরকারী কর্মপন্থার সমালোচনার পথ বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন এবং স্বৈরাচারী চণ্ড নীতির আশ্রয় নেন।

মে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের গভর্ণর ইলিয়ট সাহেবের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা 'ক্যালকাটা জার্ণালে' প্রকাশিত হলে তিনি সম্পাদক বাকিংহামকে শায়েস্তা করতে অনুরোধ জানান কলকাতার কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিকট। বাকিংহামকে ফলে সতর্ক করে দেওয়া হয়। কিন্তু জন এ্যাডাম সহজে ছাড়লেন না। অপরাপর পরিষদ সদস্যদের দলে ভিড়িয়ে বাকিংহামকে ভারত থেকে স্বদেশে পাঠানোর জন্য তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। লর্ড হেষ্টিংসের সাহায্য আনুকূল্যে অবশ্য বাকিংহাম রেহাই পান। কিন্তু জন এ্যাডামের প্ররোচনায় কোম্পানীর সাত জন সচিব বাকিংহামের বিরুদ্ধে মানহানির এক মামলা দায়ের করেন। জুরীদের বিচারে যদিও সম্পাদক বাকিংহাম নির্দোষ প্রমাণিত হন তবু তাঁকে মামলার খেসারৎ বাবদ ৬০০ পাউন্ড অর্থদণ্ড দিতে নির্দেশ করা হয়। জুলাই ১৮২২ সালে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ডাঃ জেমসনকে ভারতীয়দের জন্য মেডিকেল স্কুলের সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে নিয়োগ করেন। বাকিংহাম তাঁর 'ক্যালকাটা জার্ণালে' এই নিয়োগের সমালোচনা করেন।

ক্যালকাটা জার্ণালের এই সমালোচনা পাঠ করে ডাঃ জেমসন্ তো রাগে অগ্নিশর্মা। তিনি অবিলম্বে বাকিংহামকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। এ্যাডাম তাঁর এই দাবীর সমর্থন জানালেন। মারকুইস অফ হেষ্টিংস্ কিন্তু এ বিষয়ে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। ফলে বাকিংহাম এ যাত্রায় রেহাই পান। সিল্ক বাকিংহাম ডাঃ জেমসন-এর সঙ্গে যে পিস্তলের লড়াই-এ নামেন সমানে সমানে পরিসমাপ্ত হয়।

কিন্তু পরের দফায় বাকিংহাম সহজে বুঝি নিস্তার পেলেন না। এবার কোলাকুলি সেয়ানে সেয়ানে। রেভারেণ্ড স্যামুয়েল জেমস্ ব্রাইস ছিলেন বাকিংহামের প্রতিপক্ষ 'জনবুল' পত্রিকার সম্পাদক। ঘটনাচক্রে এ সময় বড়লাট হেষ্টিংসকে ভারত থেকে বিদায় নিতে হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে লর্ড ক্যানিং-এর বড়লাট হয়ে আসার কথা ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের স্বরাষ্ট্রসচিব কাসেলরির মৃত্যুর পর তাঁকে কিছুকালের জন্য উক্ত পদ গ্রহণ করতে হয়। ফলে জন এ্যাডামস্ জানুয়ারী ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের অস্থায়ী বড়লাট নিযুক্ত হন। এ্যাডাম বড়লাটের মসনদে বসেই রেভারেণ্ড জেমস ব্রাইসকে বাৎসরিক ৬০০ পাউণ্ড বেতনে 'ক্লার্ক অফ দি ষ্টেশনারি' পদে নিয়োগ করেন।

বাকিংহাম এই স্বৈরাচারী স্বজনপোষকতার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন তাঁর 'ক্যালকাটা জার্ণালে'। উচ্চপদস্থ আমলা কর্তৃক একাধিক সরকারী পদ গ্রহণের এ যে শ্লেষাত্মক আক্রমণ তা বলাই বাহুল্য। সপরিষদ এ্যাডামস্ সরকারী কর্মের সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হয়ে 'ক্যালকাটা জার্ণালে'র লাইসেন্স দিলেন খারিজ করে।

এমনি ধারা সম্পাদক ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের নজীর ইতিপূর্বেও বলবৎ ছিল দেখা যায়। সংবাদপত্রের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ বা সেন্সরশীপ মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে প্রবর্তিত ছিল। বাংলায় প্রথম চালু হয় লর্ড ওয়েলেসলির আমলে। লর্ড ওয়েলেসলি তখন টিপু সুলতানের সংগে ভারতে বৃটিশ পতাকা কায়েমি করার মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। এমন সময় ইউরোপীয় ও 'নেটিভ' বিবদমান শক্তিবর্গের সামরিক সামর্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর 'এশিয়াটিক মিরর'
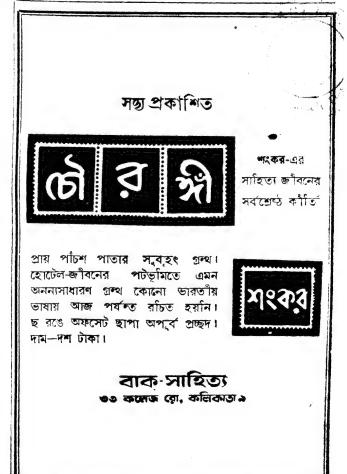
পত্রিকার সম্পাদক চার্লস ব্রুস তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত করতে থাকেন। সম্পাদক ব্রুস শক্তিমান লেখক। তাঁর লেখনীকে বড়লাট ওয়েলেসলি বৃটিশ স্বার্থের পরিপন্থী ও "ক্ষতিকর" বলে মনে করলেন। হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরে এসে ১৭৯৯ সালের মে মাসে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম হতে স্থানীয় প্রত্যেক সম্পাদক ও সংবাদপত্রের মালিকের নিকট নিম্নলিখিত এই বিজ্ঞপ্তিটি জারী করেন। প্রেসিডেন্সীর সংবাদপত্রগুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বিজ্ঞপ্তিতে জানালেন :

১ম—প্রত্যেক সংবাদপত্রের মুদ্রাকরকে তাঁদের পত্রিকার নীচের দিকে এক স্থানে তাঁর নাম ছাপতে হবে।

২য়—প্রত্যেক পত্রিকার সম্পাদক ও মালিককে গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর নিকট তাঁর নাম, ধাম ও ঠিকানা জানাতে হবে।

৩য়—রবিবারে কোন পত্রিকা প্রকাশিত করা চলবে না।

৪র্থ—গভর্ণমেন্ট সেক্রেটারী কিংবা তাঁর নিয়োজিত কোন আমলা কর্তৃক পরীক্ষা করা না হলে কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত করা চলবে না।

৫ম—উপরোক্ত এই আদেশ অমান্য করা হলে অপরাধীকে শাস্তিস্বরূপ ইউরোপে অনতিবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সেক্রেটারী বাহাদুরের এই নির্দেশনামা 'এশিয়াটিক মিরর', 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা জার্নাল', 'বেঙ্গল হরকরা', 'ক্যালকাটা কুরিয়র' প্রভৃতি তখনকার পত্র-পত্রিকাগুলির সম্পাদক ও কর্তৃপক্ষের ওপর জারী করা হয়। সংবাদপত্রগুলিও এই নির্দেশনামা যথারীতি প্রতিপালন করে বিনা প্রতিবাদে।

"এ্যাডাম সাহেবের অর্ডিন্যান্স"

এ্যাডাম সাহেবের প্রেস অর্ডিনান্স কিন্তু বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া হয়নি। অর্ডিনান্স জারীর দুইদিন পরে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়ম ম্যাকনটেনের এজলাসে এই আদেশ-জারির বিরোধিতা করে এক আবেদন করা হয়। রাজা রামমোহন নিজেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বের বিরুদ্ধে এই আবেদনের খসড়া রচনা করেন। এবং এই আবেদনের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রাজা রামমোহন নিজে, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ ব্যানার্জি, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ অনেকেই ছিলেন। প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়ম রামমোহনের এই আবেদনকে "AREOPAGETICA of the Indian Press" বলে উপহাস করেন এবং সরাসরি তা বাতিল করে জানান যে উক্ত অর্ডিনান্স জারীর সম্মতি তিনি পূর্বেই দিয়েছেন। তিনি অতঃপর মন্তব্য করেন যে : "If we are to have a free constitution which we have not — let a Free Press follow, not precede it".

সুতরাং ৪ঠা এপ্রিল ১৮২৩ সালে 'এ্যাডামস্ গ্যাগ্' আইনে পরিণত হ'ল এবং ঐ বৎসরেই ১৯শে ডিসেম্বর ছাপাখানা নিয়ন্ত্রণ করেও আর এক নতুন অর্ডিনান্স বলবৎ করা হয়। এই অবমাননাকর নিষেধ জারীর বিরুদ্ধে রামমোহন রায় আবার প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন, (কেননা তাঁর পার্শী ভাষায় প্রকাশিত ভারতে প্রথম সাপ্তাহিক "মিরাত-উল-আকবর" এই ছাপাখানার আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।) সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হলেও তিনি কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে সম্পাদকের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে অবিচলিত থাকেন।

এ্যাডামের প্রেস রেগুলেশনের বিরুদ্ধে রামমোহন King-in-Council এর নিকট এবার আবেদন জানালেন। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিলেও রামমোহনের এই আবেদন বাতিল হয়ে যায়। রাজা রামমোহনের সেই ঐতিহাসিক মহান্ আবেদনের অংশবিশেষ উদ্ধৃতি করে সেকালের ভারতীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ইতিকথা এখানেই শেষ করা যাক :

"A Free Press has never yet caused a revolution in any part of the world, because while man can easily represent the grievances arising from the conduct of the local Authorities to the Supreme Government, and thus get them redressed, the Grounds of discontent that excite revolution are removed; whereas, where no freedom of the Press existed, and grievances consequently remained unrepresented and unredressed, innumerable revolutions have taken place in all parts of the globe, or if prevented by the armed force of the Government, the people continued ready for insurrection.

[Rammohun's Appeal to the King-in-Council against Adam's Press regulations].

গ্রন্থপঞ্জী :

১ "ক্যালকাটা জার্নালের" ফাইল
2. Sketch of the History & Influence of the Press In Br-India —Leicester Stanhope.
3. Indian Press—Margaret Burns.

—'মাঝে-মাঝে মনে হত আর কখনো আসবো না, কোনদিন না। কী জানি, কে কী ভাবছে আমার এই আসা-যাওয়া নিয়ে!' সেবাব্রত মাথা নামালে হাওয়ায় বকের পালকের মত চুলগুলি উড়তে থাকে। মাথাটা পাতলা হয়ে এসেছে। শীতের মাঠের মত বাদামি চামড়া চুলের ফাঁকে বড় বেশী প্রকট। সেই বস্তু আর নেই। অথচ বিশ কি বাইশ বছর আগে চুলের বাহার ছিল। তখন রং ছিল ভিন্ন। কোকিলের শরীর যেমন নিকষ মসৃণ। সেবাব্রত মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে কী ভাবে।

—'আমি কিন্তু তাহলে দম আটকে মরে যেতুম।' সলজ্জ হাসি হাসে সান্ত্বনা। তেমন করে টোল আর পড়ে না। গালের চামড়া চিবুক বেয়ে শূন্যে ঝুলে পড়তে চাইছে। নাকের দু' পাশে, চোখের কোণে পেন্সিলের সরু আঁচড়। রংটা আগের চেয়ে ফ্যাকাশে। নিরাভরণ হাতে দড়ির মত শিরাগুলি বড় বেশী সজাগ। শিখার মত আঙুল এখন কাঠি-কাঠি। মাছের আঁশের মতই নখগুলি রক্তহীন। বুকের ওপরে পাটকরা শালের কোণটা খুঁটতে খুঁটতে কথা হাতড়ায়। ডান পায়ে ঘাসের চটিটা কার্পেটের ওপরে ঘসতে-ঘসতে কেমন আনমনা, উদাস হয়ে যায়।

—'বলছি বটে আজ। কিন্তু সেদিন না এসে পারিনি। বিকেল হলেই এই বাড়ি, এই ঘর আমাকে টানতো। নিশি-পাওয়া মানুষের মত আমিও চলে এসেছি।' এইবার মাথা থেকে হাত নামল। গলার ওপরে হাতের তালু চেপে চিবুকের পাশে আঙুল তুলে ধরে সেবাব্রত। 'সেই কবে প্রথম এসেছি মনে নেই। আপনার মনে পড়ে?' চোখে চোখ রাখল।

—'না।' মাথা নাড়ে সান্ত্বনা। ঘোমটাটা কাঁধের ওপরে খসে পড়ে। তুলে দেবার তাগিদ আর নেই। লজ্জা? কিন্তু কাকে? আর কেন? এতো সেই সেবাব্রত যাকে দিনের পর দিন একইভাবে দেখে আসছে। সর্বাঙ্গে সেই একই ভঙ্গী ফুটিয়ে সামনে বসে। অচেনা, অজানা আর নেই। বাঁ হাতের চেটোয় ডান হাত-খানাই বোলাতে-বোলাতে আঙুলে আংটির গায়ে হলুদ পাথরটা দেখে। ঘাড় কাত করে ধীর, মন্থর গলায় বলে, 'আপিস ফেরত উনিই একদিন আপনাকে নিয়ে এলেন।'

—'হ্যাঁ, ভয়ংকর শীত ছিল, তাই না?' সেবাব্রত লাফিয়ে ওঠে। উৎসাহিত

বোধ করে। মনে করবার চেষ্টা করে, কী ছিল সেদিন, আজ কী নেই! সান্ত্বনার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে দেয়ালে রাখল। দেয়াল থেকে মেঝেয়। তারপর ঘরের কোণে টিপয়ের ওপরে সাজিয়ে রাখা ফুলদানি আর কাগজের ফুলের ওপরে। চেনা যায় না। সেই মানুষটা আর নেই! আগা-গোড়া শাদা থানে জড়ানো অন্য কেউ। শাল আর নিকেলের চশমাটা অতিরিক্ত মর্যাদা এনে দিয়েছে। অথচ এত মোটা তখন ছিল না। আরো সুন্দর মনে হত। চুপ করে থাকলেই বরং গম্ভীর মনে হবে এখন। বয়সের ছোঁয়া লেগে স্বভাবটাও বদলে যায় নাকি মানুষের?

—'কিছু বলুন।'

—'বলার কী আছে? কী বলি নতুন করে?'

—'কিছু নেই, কিচ্ছু না।'

মাথা নাড়ে সান্ত্বনা। কানের টপ ঝিক-মিকিয়ে ওঠে। মসৃণ গালে আলোর ছটা দোল খায়।

—'কদিন তাহলে আসছেন আর!' চোখে-মুখে চাপা কৌতুক। স্বরে খানিকটা বিষাদ অথবা ঔদাসীন্য ফোটাতেই চেয়েছে সেবাব্রত। আসলে এ বাড়িতে তার কদর কতখানি খাঁটি তাই যাচাই করা। সবটাই সাজানো-গোছানো ভদ্রতা কিনা কে জানে। মাঝে-মাঝে সন্দেহ জাগে। তখন বিশ্রী, বিস্বাদ ঠেকে

সব। এমন কি সান্ত্বনাকেও মনে হয় অসহ্য। ও বুঝি নিষ্প্রাণ, পুতুল।

—'কোথায় যাবেন?'

—'কোথাও না। বাড়িতেই শুয়ে-বসে, বই পড়ে, গান শুনে সময় কাটাবো ভাবছি।'

—'আপনার সময় তো কেটে গেল। কিন্তু আমার? একলা এখানে মন টেকে মানুষের?' গলায় স্পষ্ট অভিমান ধ্বনিত হতে থাকে। কথাগুলি তাই ভারি। তাহলে সুনীতের বিরুদ্ধে নালিশ নয় তো!

হয়তো তাই। একলা এই রাজার পুরী। ঝি-চাকর ছাড়া সারাদিনে কথা বলার মানুষ নেই সান্ত্বনার। সুনীত তো নিজের স্বপ্ন নিয়েই মশগুল। উদয়াস্ত পয়সার ফিকিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কী করে ডেয়ারি ফার্মটাকেই আকারে-আয়তনে বিশাল করে তোলা যায়। গরু-মোষে পোষাচ্ছে না। এবার চাই হাঁস-মুর্গীর জন্যে পোলট্রি ফার্ম। তার লাগোয়া কয়েক একর জমি। একসঙ্গে শুরু হবে ফুল আর ফসলের চাষ। বৃত্তি আর প্রবৃত্তির শুভ পরিণয়।

—'আসবো, আসবো। আপনার জন্যেই আমাকে এখন থেকে আসতে হবে দেখছি।' গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে কথা বলে যেন। একই সঙ্গে উদারতা আর সহানুভূতি প্রকট করে তোলা।

এসেছে। কথার খেলাপ কখনো হয়নি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপবাদ অন্তত দেয়া যাবে না সেবাব্রতকে।

—'শালটা ভালো করে জড়িয়ে নিন গায়ে। যা শীত।' আদেশ না, এ যেন রীতিমত হুঁশিয়ারি। আসলে বয়স আর অভিজ্ঞতা মানুষকে এমনি ভীরু করে তোলে। পায়ে-পায়ে ঘুরে বেড়ায় শঙ্কা। কী হয়, কী হয় আতঙ্ক। নইলে রোদ, জল, ঝড়—কিছুই কাবু করেনি এই মানুষকে। তখন দেহ ছিল অটুট। সাহস ছিল অফুরন্ত।

—'ভয় নেই। কিছু হবে না, হয় না আমাদের।' চশমার কাচে হাসির ঝিলিক দেখা দেয়। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে উচ্ছল হয়ে ওঠে সান্ত্বনা। এ যেন সেই হারানো তারুণ্য ফিরে এসেছে আবার। গাম্ভীর্য কিছুটা কম হয়।

—'থাক।' প্রায় ধমকে ওঠে সেবাব্রত। 'এ বয়সে এত বাহাদুরি ভালো না। কিছু যদি হয়!'

অবাক হয় না সান্ত্বনা। পর বলে দূরে সরিয়ে রাখার উপায় তো আর নেই। ধরতে গেলে সেবাব্রত আজ এ সংসারেরই একজন। তাই ন্যায়ে-অন্যায়ে ডাক দেবার পুরোদস্তুর অধিকার। অথচ একদিন এসেছিল নিছক সুনীতের বন্ধু হিসেবেই। তখন কে জেনেছিল, নির্বান্ধব এই মানুষটাই হবে সবচেয়ে আপনার?

—'কেমন লাগল মানুষটাকে?'

—'ভয়ংকর আমুদে, তাই না?'

—'সাবধান, সাবধান!' চাপা গলায় আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলেছিল সুনীত। চোখ বড়-বড় করে মুখটা প্রায় কানের কাছে এগিয়ে এনেছিল। 'ইংরেজ সরকারের স্বপক্ষে ওকালতি করতে যেও না কিন্তু। টোটাভর্তি দুটো পিস্তল সব সময়ের জন্যে রেডি থাকে ওর দুদিকের দুই পকেটে। তখন পার পাবে না বলে রাখলাম।'

—'যাঃ কী যা-তা বকো যে ঠিক নেই।' অস্বস্তি বোধ করছিল সান্ত্বনা।

—'বিশ্বাস না হয় আর বলবো না।' কৃত্রিম রোষ আর অভিমানে গলা রুক্ষ আর ভারি হয়ে এসেছিল সুনীতের। খানিক থেমে দেয়ালে টাঙানো নিজের ছবিটাই দেখছিল। চেনার উপায় আছে? ষোল আনার ওপরে আঠারো আনাই যে সাহেব। 'আমি গিয়েছিলুম নিজের বনেদ পাকা করতে। ইচ্ছে, চাষ-বাস আর পশুপালন শিখে দেশে ফিরবো। ভালো চাকরি করার ইচ্ছে না থাকে তো নিজেই কিছু একটা ফেঁদে বসবো। কিন্তু কী আশ্চর্য! দেখি শ্রীমান আমার আগেই গিয়ে উপস্থিত! আইন পড়তে গিয়েছিল। গান্ধীজীর নন-কো-অপারেশনের খবর শুনেই ছেড়ে-ছুঁড়ে দিলাম ক্লাস। বাবু তখন সারা ইউরোপ চষে বেড়াচ্ছেন। গোপনে ফন্দি-ফিকির খুঁজছেন দেশোদ্ধারের।'

—'তারপর?'

—'তারপর আর কী? ফল যা হয় তাই হল। বোম্বে এসে পৌঁছতেই জাহাজঘাটায় আটক। শেষে শ্বশুরবাড়ি আন্দামানে চালান।'

শুনতে-শুনতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের সঙ্গে মিশেছিল শ্রদ্ধা। সুনীতকে মনে হয়েছিল কত তুচ্ছ, কত সাধারণ। মানুষ হিসাবেই সেবাব্রত তুলনাহীন।

পরদিন এলে শুধু মিষ্টিমুখ করিয়েই ছাড়েনি। রাতে খেয়ে যেতে হয়েছিল সেবাব্রতকে। আসলে কথা কওয়ার সময় চেয়েছিল সান্ত্বনা। কথায়-কথায় আরো আপন, ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল।

—'জানেন, আমার এক মামা ঐ আন্দামানেই মারা গেছে।'

—'তাই নাকি?' কেমন নির্জীব, নিরুৎসুক গলায় প্রশ্ন করেছিল সেবাব্রত। হয়তো সন্দেহ ছিল তার।

খাওয়াতে বসিয়ে সান্ত্বনা তাই ভিন্ন কথা পাড়ে। বলে, 'কী করবেন এখন? যার টানে গাঁয়ে থাকবেন সেই মা-ই নেই। কে দেখবে আপনাকে? চোখের তো এই হাল।' দুদিনেই লোকটার ওপরে মায়া পড়ে গেছে। দেখে কষ্ট হয় সান্ত্বনার।

—'কেন? এই তো আপনি আছেন, সুনীত আছে। আমার আর অভাব কিসের।' মোটা লেন্সের ভেতর দিয়ে চোখ দুটো দেখাচ্ছিল অস্বাভাবিক রকমের বড়। অমায়িক হাসি হেসে ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে লঘু, রমণীয় করে তুলেছিল সেবাব্রত।

—'সে তো আমাদের ভাগ্য। থাকুন না এখানে।' আবেগে সজল হয়ে উঠেছিল সান্ত্বনার গলা।

নাতি-নাতনীরা এখন ঠাট্টা করে। শুনে হাসতে হয়। কষ্টের কথাটা আর কেমন করে বলা যায়?

বাথরুমে ঢুকে সুনীত আর ফিরে এল না। দরজা ভেঙে লাশ বার করতে হল। দিন তিনেক পরেই পরিষ্কার হয়ে গেল সব। সুনীত সন্দেহ করেছিল। ভাগ্যিস প্রলয়ের হাতে পড়েনি চিঠিটা! দুদিন খাটিয়ে সান্ত্বনায় গয়নার বাক্সেই রেখে দিয়েছিল। নইলে মুখ দেখানো হত দায়। সব কিছু না হোক, অন্তত অনেক কিছুই বোঝার কিম্বা অনুমান করার বয়স তখন প্রলয়ের।

—'আমি কিছু বুঝতে পারছিনে! চাই-ওনে বুঝতে।' জরুরি কাজে কলকাতা যেতে হয়েছিল। খবর পেয়ে ছুটে না এসে পারেনি সেবাব্রত। তাকে দেখাচ্ছিল কত অসহায়। আন্দাজ করে কষ্ট পাচ্ছিল এই মৃত্যুর জন্যে আংশিক পরিমাণে সে-ই দায়ী। সব কথা কি চেঁচিয়ে বোঝাতে হয়? চলন-বলন দেখলেই টের পাওয়া যায়। লজ্জায় মাটিতে মিশে গিয়েছিল সেবাব্রত। তবু

না বলে পারেনি, 'আহা-উহ্ করার লোক আছে অনেক। আমি তাদের দলে নেই জানবেন। কিন্তু দরকার হলে আমি আপনার পাশেই আছি।'

মিথ্যে মন ভোলাবার গরজে বলেনি। সে ধাত সেবাব্রতের নয়। দুঃসময়ে তাকে তাই আসতে হয়েছিল।

—'কী করবো বুঝতে পারছিনে।' চারদিকে অন্ধকার। সান্ত্বনার তখন প্রায় ডুবন্ত অবস্থা। উপায়-অন্তর না দেখে তাই সেবাব্রতকে ডাকা। শত হোক পুরুষ মানুষের বুদ্ধি অনেক কাজে লাগে। পথ বাতলে দিয়ে যাক। সে ছাড়া আত্মীয়-বান্ধব কে আর আছে সান্ত্বনার। 'কে জানতো দেনার দায়ে আপাদমস্তক ডুবিয়ে রেখে গেছে আমাকে।' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল সান্ত্বনা।

—'অ, এই ব্যাপার?' হাই তুলে মুখের সামনে তুড়ি দিয়ে উঠেছিল সেবাব্রত। সমস্ত ব্যাপারটাকেই হালকা করে তুলতে চেয়েছিল। চা না খেয়েই উঠে পড়েছিল। যেতে-যেতে হঠাৎ দরজার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। 'ভয় নেই। বিকেলে আসবো। দেখি কী করা যায়।'

বিকেলে না, ঝামেলা মিটিয়ে দিন তিনেক পরেই দেখা দিয়েছিল সেবাব্রত। কাগজটা সান্ত্বনার হাতে গুঁজে দিয়ে অমায়িক হাসি হেসে বলেছিল, 'সব ভাবনা মিটিয়ে ফেলেছি। এবার আমি নিশ্চিন্ত।'

—'কী এটা?' কাতর কণ্ঠে জবাব চেয়েছিল সান্ত্বনা।

—নিলামটা আমিই ডেকে নিয়েছি। এটা উইল। বাড়ি-ঘরের মালিক এখন প্রলয়।'

চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। ছেলেমানুষের মতই ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলেছিল সান্ত্বনা। এমন মানুষে যাকে কৃতজ্ঞতার কথা শোনালে রুষ্ট হবে। অপমানিত বোধ করবে।

—'প্রলয় একা আপনারই না। ও আমারও ছেলে।'

—'অনেকদিন হয়ে গেল। অথচ মনে হচ্ছে যেন কালকেই এখানে প্রথম আসা আমার।' ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই কথা টেনে আনা। এ ছাড়া যেন কথা নেই আর। এখন বোঝা যায় বয়স হয়েছে। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে সেবাব্রত। যে কারণ স্মৃতির জাবর কাটা ছাড়া গতি নেই। ছল-ছুতো করে পুরনো কথায় ফিরে যেতে চায়। পুরনো দিনে। যে কারণ ক্লান্ত মনে হয়। ক্লান্ত আর করুণ। স্বরে বিষণ্ণতা ফুটিয়ে বলে, 'দেখা না হলে কী হত আমাদের?'

একথার কোন জবাব নেই। হয়তো অনেক কিছুই হত। কিম্বা কিছুই হত না। অর্থাৎ পরিবর্তন যা হত তার সঙ্গে আজকের এই পরিণতির মিল খুঁজে পাওয়া যেতো না আদৌ। মৃত্যুর দিন হয়তো আরো কয়েক বছর পেছিয়ে যেত সুনীতির। হয়তো আজকে, এখন তার সঙ্গেই সন্ধ্যা কাটতো। কী হত আর কী না হত ভাবতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

—'আপনার শরীর কিন্তু খারাপ হচ্ছে ক্রমশ।' সান্ত্বনা কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতেই চায়। এখন আর ভালো লাগে না এ সব। বরং শুনলে দুঃখ-কষ্টের বোঝাটা আরো ভারি হয়। তাছাড়া কে ওত পেতে বসে আছে কে জানে। 'নিজে কিছু টের পান না?' একি রাগ, না অভিমান, নাকি তিরস্কার? বোঝা ভার। আজ পর্যন্ত বোঝা গেল না সান্ত্বনাকে। আর চেনা গেল না বলেই মাঝে-মাঝে মনে হয় কী নিষ্ঠুর, কী স্বার্থপর। তখন কষ্ট হয়। ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে নিজেকেই। তার মত বোকা, ভীরু আর কাপুরুষ নেই। নইলে বুকের মধ্যে যে কথাটা হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায় মুখ ফুটে তাকেই বাইরে টেনে আনা গেল না কোনদিন।

—'টের পেলে এতকাল কেউ বাঁচে? মরে যেতুম না নিজেকে নিয়েই দিন-রাত মশগুল থাকলে।'

খুঁচিয়ে বিদ্ধ করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নেই সেবাব্রতর। সান্ত্বনা তবু আহত বোধ করে। যে কারণ কথা বলার সাহস আর হয় না। চুপ-চাপ বসে থাকে আরো কিছুক্ষণ। এ ওর মুখ দেখে। মুখ, চোখ, ভুরু, কপাল। কপাল থেকে চোখ সরিয়ে দেয়ালে রাখে। দেয়াল থেকে ছাদে। ভেণ্টিলেটারের ফোকর গলিয়ে কখন চড়ুইটা এসেছে কেউ জানে না। এখন মাথার ওপরে ছুটোছুটি করছে। গলায় খুশীর নূপুর বাজিয়ে চলেছে অনর্গল। ও হরি! বাসা বুনছে কড়ির আড়ালে। ঠোঁটে করে বয়ে এনেছে এক-গাছি শুকনো খড়। দেখে তন্ময় হয়ে যায় সান্ত্বনা। ভেতরে ভেতরে একটা অস্পষ্ট, প্রায় অননুভূত যন্ত্রণাই তাকে ক্রমশ অস্থির, অসহায় করে তোলে। কালকেই বাসা ভেঙে গেলে ও ফের গড়বে। সঙ্গী চলে গেলে দুদিন বাদেই নতুন করে জুটিয়ে নেবে কাউকে। অথচ—

—'দাদু কফি।'

যুগপৎ চমকে উঠল দুজনেই। চাকরকে না পাঠিয়ে নিশা নিজেই এসেছে। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি হাসিটা। এমনি করে ও। কী ভাবে কে জানে। কিন্তু মরমে মরে যায় সান্ত্বনা। মুখ তুলে তাকাতে পারে না। চোখে চোখ রাখার সেই সাহস আর নেই। কেন নেই তাও অজানা। তবে কি ভয় করে সান্ত্বনা?

হাত কাঁপছে সেবাব্রতর। পেয়ালার হাতলটা কোনমতে ধরতে পেরে বুঝি আশ্বস্ত হয়। দুধ কিম্বা চিনির পাত্র পাশেই। তবু কচে টানার সাধ্য যেন নেই আর। সে কারণ বুকের কাছে পেয়ালা ধরে ভাবুকের মতই উদাস চোখে চেয়ে থাকে। কী করবে কিম্বা আপাতত কী করা যায় সেইটেই যেন একমাত্র চিন্তা সেবাব্রতর। এমন অসময়ে নিশা না এলেই হয়তো স্বস্তি পেতো সে। কফি খাওয়ার বিন্দুমাত্র লোভ অথবা গরজ ছিল না তার। এখনও নেই। কী করবে তাহলে? কী কথা শুনিয়ে ইহজীবনের মত বিদায় দেবে নিশাকে?

—'কফি আমি খাবো না, দিদিভাই। রাত্রে ঘুমোতে পাবো না তাহলে।'

—'কফি না খেলেও ওরকম হতে পারে।' পেয়ালায় দুধ আর চিনি মিশিয়ে চামচ নাড়তে থাকে নিশা।

—'কী বললি?' রেগে ওঠার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। গলাটা তবু রুক্ষ, কর্কশ আর গম্ভীর শোনাল। সান্ত্বনার নিজেরই বিশ্রী লাগল কেমন। যেহেতু প্রশ্নটা করে ফেলেই চোখ বড় বড় করে হেসে উঠতে চাইল সে। লঘু করে তুলতে চাইল প্রসঙ্গটা।

কিন্তু তার আগেই খিল-খিল করে হেসে উঠেছিল নিশা। মুহূর্তে এ-ঘর থেকে উড়ে পালিয়ে গেল যেন।

এই হয়। এ-সবই হবে এখন। যন্ত্রের নিয়মেই ঘড়ির কাঁটা যেমন একটার পর দুটো, দুটোর পর তিনটে গুনবে ঠিক নির্ধারিত সময়ে, তেমনি প্রতিদিন সকাল ফুরিয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল আর বিকেল হলেই বাইরে সিঁড়ির ওপরে লাঠির ঠুক-ঠুক শব্দটা শুনতে হবেই।

"ভয় নেই।...দেখি কি করা যায়।"

এবং নিশার চোখের কৌতুকও যথানিয়মে ঝিলকিয়ে উঠবে তখন।

কফির পেয়ালা ছ‍ুঁয়ে দেখল না সেবাব্রত।

লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল সান্ত্বনা।

একটা আবছা অথচ অক্ষম অপরাধ-বোধে এখন তারা উভয়ে পীড়িত। যেন দীর্ঘদিন আড়ালে-আবডালে কাটিয়ে আজ আর কেউ কাউকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। তারা পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে গেছে। কঠিন, নিষ্ঠুর হাতে আড়ালটা সরিয়ে দিয়েছে নিশাই। হয়তো চেয়েছে, এই দুঃসহ লুকোচুরির একটা নিষ্পত্তি হোক! তাই কী? ভাবতে ভাবতে শূন্যে হাতড়ায় সেবাব্রত। সান্ত্বনা ভাবে, নিশাকে আর এখানে রাখা উচিত হবে না। আজকেই প্রলয়কে লিখবে সে। মেয়ে তোমার নিয়ে যাও। আমার পক্ষে তদারকি অসম্ভব। মাধবী রুষ্ট হলে হোক্। আমি নিরুপায়। লেখাপড়া হবে না মেয়ের? তা আমি কী করতে পারি?

—'চিঠি পেয়েছেন প্রলয়ের?'

চমকে ওঠে সান্ত্বনা। মুখ দেখে মনের ভাবনা-চিন্তা পড়তে পারে মানুষে? নইলে তার মনের খবর কেমন করে পায় সেবাব্রত? ভীত, বিস্মিত চোখে খানিক চেয়ে থাকে সান্ত্বনা। ভাবে, কী বলা যায়। শেষে আস্তে মাথা নেড়ে জানায়, না।

—'কী আশ্চর্য!' দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা কেমন দীর্ঘস্থায়ী মনে হয়।

সান্ত্বনা ভুরু কুঁচকে তাকায়। বলে, 'কী?'

—'এই প্রলয়ের কথাই বলছি আর কি।' মৃদু হেসে আরেকটু গম্ভীর হতে চেষ্টা করে সেবাব্রত। হয়তো তার উক্তির ওজন বাড়াতে চায়। 'মাধবীকে বিয়ে করার ব্যাপারে আপনার সায় ছিল না আদৌ। অথচ দেখুন আজ পর্যন্ত কোন বিরোধ কিম্বা অশান্তি দেখা দেয়নি ওদের জীবনে।'

—'সায় একদম ছিল না কেমন করে বলি?'

—'তবে কি সংস্কার বাধা দিয়েছিল আপনার?'

—'হয়তো তাই।' আমি এখনো ভুলতে পারছিনে, মাধবী তার স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছে।'

—'আহা, মন যদি না টেঁকে কী করবে বেচারি? তাছাড়া শুনেছি লোকটা নাকি—'

—'ক'টা বাজল বলুন তো?' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে সান্ত্বনা। এতক্ষণ গা এলিয়ে পড়েছিল। এবার সোফার হাতল আঁকড়ে ধরে উঠে বসে। শরীরের আড়ামোড়া ভেঙে অন্যমনস্ক হতে চায়। হাই তুলে বোঝাতে চায়, বসে থাকা তার পক্ষে কত কষ্টকর।

আহত বোধ করে সেবাব্রত। অপমানিত। সান্ত্বনা আসলে বেরিয়ে যেতে বলছে না তো?

—'ক'টা আর?' গলা অবধি বোতাম লাগিয়ে নিয়েছে। পট-পট করে কোটের দুটো বোতামই খুলে ফেলে। বাঁ পাশে বুক হাতড়ে চেনসুদ্ধ ঘড়িটা বাইরে টেনে আনে। ঢাকনা খুলে চেয়ে থাকে খানিক। যেন দেখছে না, দেখতে পাচ্ছে না কিছুই। এই মুহূর্তে তাকে বড় বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক দেখায়। সেবাব্রত যেন এই ঘরে বসে নেই। সান্ত্বনার মুখোমুখি শুধু তার প্রাণহীন খোলসটা পড়ে আছে মাত্র। চোখের ভাষা পড়া যায় না। পড়ে বোঝা যায় না কিছুই। মোটা লেন্সের আড়ালে দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, উদাস, অর্থহীন।

ঘড়িটা ফের বুকের ভেতরে গ‍ুঁজে ফেলে। বোতাম লাগিয়ে নড়ে-চড়ে বসে ফের। নুয়ে-পড়া মেরুদাঁড়াটা সোজা করে নেয়। এতক্ষণে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে আবার। প্রাণ ফিরে পেয়ে সহজ, সচেতন হয়ে উঠেছে কয়েক মিনিট আগের মতন। মনে-মনে বুকের শব্দ শুনতে পেয়ে আশ্বস্ত, উজ্জ্বল হয়েছে যেন। কিন্তু কথা বলতে ভুলে গেল। কী জন্যে ঘড়ি দেখা তাহলে? রকম-সকম দেখে সান্ত্বনা বিব্রত বোধ না করে পারে না। শক্ত কাঠ হয়ে বসে থাকতে হয়। তাকে বড় নিরুপায়, অসহায় দেখাচ্ছে এখন।

—'লোকটা নাকি বদ, খামখেয়ালি টাইপের ছিল।'

আবার সেই মাধবীর প্রসঙ্গ টেনে আনা। বিশ্রী, বিরক্তিকর লাগে। এ ছাড়া

কথা নেই নাকি? এই একটিমাত্র কথা শোনাতেই রোজ এখানে আসে?

—'কটা বাজল বললেন না?'

—'অ, হ্যাঁ।' আবার বোতাম খুলে ঘড়ি বার করে সেবাব্রত। সারামুখে বিরক্তির প্রচ্ছন্ন আভাস দেখা দেয়। গলায় মৃদু ঝাঁঝ মিশিয়ে বলে, 'ছটা বেজে পাঁচ।'

সোফার হাতলে ঠেসান দিয়ে রেখেছিল। কাত হয়ে দাঁড়িয়েছিল লাঠিটা। কাছে টেনে কী ভেবে মুঠোয় চেপে ধরে সেবাব্রত। মুখে-চোখে কী এক প্রত্যয় নাকি প্রতিহিংসা স্পষ্টতর হতে চায়? পলকে সে কেমন নিঃশব্দ কঠিন আর ক্রূর হয়ে ওঠে। দেখে ভয় পায় সান্ত্বনা। সংশয়ে শিউরে ওঠে। লাঠির মাথায় কুকুরের শাদা মুখটা ক্রমশ হিংস্র, জীবন্ত হচ্ছে। যেন ওর কাঁপশ বন্য চোখে সান্ত্বনাকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

শালটা এবার সর্বাঙ্গে ভালো করে জড়িয়ে নিলে। ভেতরে ভেতরে আড়ষ্ট, লজ্জিত বোধ করে। চোখের তারায় কিসের বিহ্বলতা। গলা শুকিয়ে আসছে সান্ত্বনার। তবু উঠে দাঁড়াবার সাহস নেই। দুই চোখের সম্মোহনে কুকুরটা তাকে অবশ করে রেখেছে।

কী ভেবে লাঠিটা এবার টেবিলের ওপারে শুইয়ে রাখল সেবাব্রত। সান্ত্বনা স্বস্তি ফিরে পায়। নিশ্চিন্তে বুকের ভেতরে হাওয়া পুরে নিলে খানিক। আস্তে-আস্তে শরীর শীতল হতে থাকে। কী আশ্চর্য! কান গরম হয়ে উঠেছিল তার। এতক্ষণ ঝিম-ঝিম করছিল মাথাটা। মুখটা তিক্ত, বিস্বাদ লাগছে এখন। এমন শীতের রাতে কপালের চামড়া ন্যাকড়ার মত ভিজে উঠতে চেয়েছিল!

আলোটা উস্কে দিলে সান্ত্বনা। চারদিক উজ্জ্বল হল। ঘর-দোর স্পষ্টতর হল আরেকটু। দেয়ালে, মেঝের ওপরে আসবাবের কিম্ভূত-কিমাকার ছায়াগুলি এক-একটা জন্তু-জানোয়ারের আকার নিয়ে কাঁপতে থাকে। ফের নির্জীব, নিরীহ মুখে কুকুরটা তার বুকের পাশে পড়ে। সান্ত্বনা আড়চোখে লাঠিটা দেখে।

—'মাধবীকে নিয়ে প্রলয়কে আসতে লিখে দিন। অনেকদিন দেখি না ওদের।' ভেতরদিকে দরজাটা হাঁ হয়ে আছে। ঘরটা অনুগত চাকরের মতই একপাশে জড়-সড়। ওপাশে অন্ধকার আবছা হয়ে আছে। সেবাব্রত কান পাতে; চেয়ে থাকে অপলক।

সান্ত্বনা নিরুত্তর। চোখ তুলে দেয়ালের ছবিটা দেখে সে। সুনীতের বুকের ওপরে টিকটিকিটা পুঁতির মত হিংস্র, পাথুরে চোখে এইদিকে চেয়ে। রাগে, অপমানে কেন যে গা রি-রি করে সান্ত্বনার! লোকটা তাকে ভালোবাসেনি কোনদিন, কোনদিনই না।

বাইরে এক ঝলক বাতাস উঠল বুঝি। গাছ-গাছালি সর-সরিয়ে উঠল। সাপ যেমন বুকের তলায় শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলে যায়, শব্দটা ঠিক তেমনি। জানলায় পাল্লাগুলি কেঁপে উঠল। খট-খটিয়ে উঠল ছিটকিনি। কাঁচের গায়ে হাত বুলিয়ে কোথায় ফের উধাও হল হাওয়া। শার্সির গায়ে পেরেকের মতই চোখ দুটো বিদ্ধ করে রাখে। এই মুহূর্তে শিশুর মতই নিষ্পাপ, নিষ্কলংক মনে হয় সেবাব্রতকে। চোখে তার কিসের মুগ্ধতা। ভেজা ডুমুর পাতার মত গালে আলোর অস্পষ্ট আঙ্গুল কেঁপে-কেঁপে উঠছে। তাকে উদার, মহৎ মনে হচ্ছে এখন। দেখে ভালো লাগে। কী এক অপার্থিব তৃপ্তি, নাকি আনন্দ ধীরে ধীরে অস্থির, উন্দাম করে তোলে সান্ত্বনাকে। কিছু বলতে ইচ্ছে করে এখন। না পেরে কষ্ট বোধ করে।

—'দেখেছেন, কালপুরুষের কোমরে তরোয়ালটা কেমন ঝক-ঝকে? এইখানে বসে দেখা যাবে ভাবিনি!'

—'আমি কখনো দেখিনি।' সান্ত্বনা চোখ তুলল। 'মাঝরাত্তিরে চাঁদ উঠলে এই ঘরে সব দেখা যায়। তখন জেগে থাকতে গা ছম-ছম করে। বাড়িটা বড় নির্জন, তাই না?' সান্ত্বনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বয়সের কথা ভুলে গেছে এইবার। কথায়-কথায় এখন তাই অনর্গল হতে চাইছে। সেই ঝিমিয়ে পড়া ভাবটা আর নেই। বরং কেমন সতেজ, প্রফুল্ল দেখাচ্ছে এখন।

—'দিদিভাই কাছে থাকলে ঠাট্টা করতে ছাড়তো না। বলতো, দরজা খুলে দিলে বাগান থেকে ফুলের গন্ধ ছুটে আসবে!' ঘর-দোর কাঁপিয়ে সেবাব্রত হেসে ওঠে এবার। বলে, 'পালাক্ষ্যো কোথায়?'

—'আছে ভেতরেই।' চাপা ঠোঁটের কোণায় হাসির ঢেউ খেলিয়ে খোলা দরজার দিকেই মুখ ফেরায় সান্ত্বনা। 'বড্ড মুখফোঁড় হয়ে উঠেছে। কোন কথারই রাখ-ঢাক নেই। আজকাল আবার আপনাকে দেখলেই বেড়ে যায়।'

—'লেখা-পড়ায় তো বেশ?'

মাথা কাত করে সান্ত্বনা। বলে, 'তবু ভাবছি যাদের জিনিস তাদের কাছেই পাঠিয়ে দেবো।'

—'সে কি কথা!' চোখ কপালে তোলে সেবাব্রত। 'আপনারও তো নাতনি। তাছাড়া মধ্যপ্রদেশের ঐ জঙ্গলে স্কুল-কলেজ পাবে কোথায়? সে তো পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ।'

—'তা হোক। আমি ভয় পাই। যা হচ্ছে চারদিকে দেখছেন তো? বয়স্থা মেয়ে নিয়ে ঘরে বাস করা এক সমস্যা।'

—'রাস্তায় বাস করা কি শোভন হবে তাহলে।' মৃদু হেসে মুখ তোলে সেবাব্রত। শেষে গম্ভীর গলায় বলে, 'কী ব্যাপার হয়েছে জানেন? ছেলে-মেয়েদের কোন দোষই আমি দিতে পারিনে। দোষ এই কালের। সুরাহা তাই আপনার আমার পক্ষে অসম্ভব।'

—'তবে কি হাত-পা গুটিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে বলেন?' গলায় স্পষ্ট ঝাঁঝ দেখা দেয় সান্ত্বনার।

—'না, আমি বলি চারদিকে পাঁচিল তুলে আরো অমঙ্গলকেই ঘরের ভেতরে

ডেকে আনা হবে। বরং দরজা বন্ধ থাকে থাক, এবার অন্তত জানলা ক'টা খুলে দেবো আমরা। যেখানে দাঁড়ালে আকাশ দেখা যাবে সেই পথেই অন্তত একফোঁটা আলো আসুক, এক ঝলক হাওয়া।'

কথাটা মনে পড়ে যায়। প্রলয়কে নিয়ে ঠিক এমনিভাবেই বোঝা-পড়ায় নামতে হয়েছিল একদিন।

—'ও গেলে এ বাড়িতে আমার পক্ষে একলা থাকা দায় হবে। তাছাড়া ওই কি আমাকে ছেড়ে থেকেছে কোনদিন?'

—'থাকেনি, কিন্তু থাকতে হবে এখন থেকে।' সেবাব্রত কঠিন হয়ে উঠেছিল। তবু ধীর, শান্ত গলায় বলেছিল, 'আপনি মা। আপনার স্নেহ খাঁটি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ও তো ছেলে? পুরুষ মানুষ। আপনার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকলে তো চলবে না। সেটা হবে ভয়ংকর অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার।'

সুতরাং যেতে হয়েছিল প্রলয়কে। সেবাব্রতর সুপারিশের জোরেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিল নির্বিবাদে। কিন্তু ছ'বছর বাদে ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে এসেছিল একলা নয়। সঙ্গে মাধবী।

—'আমার স্ত্রী। মাকে প্রণাম কর মাধবী। আর ইনি আমার কাকাবাবু। বাবার বিশেষ বন্ধু। আমাদের সব।'

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল দুজনেই। ওরা চলে গেলে পাগলের মত কেঁদে উঠেছিল সান্ত্বনা। মুখে আঁচল চেপে বলেছিল, 'আমি জানতুম, এমনি সর্বনাশই হবে। তখন বলিনি আপনাকে?'

সেবাব্রত কথা বলতে পারেনি। অপরাধীর মতই গম্ভীর, বেজার মুখে দাঁড়িয়েছিল সে। আবার বিকেলেই ফিরে এসেছিল। উৎসাহে, উদ্যমে সে তখন নতুন মানুষ। গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল, 'সারাটা দুপুর ভেবেছি। প্রলয়ের জ্ঞান-বুদ্ধির ওপরে আস্থা হারাবার পথ খুঁজে পেলুম না। তাই ওদের আশীর্বাদ করতেই এলুম। কোথায় বৌমা?'

—'কিন্তু লোক-জানাজানি হলে?' দ্বিধা তবু ঘোচে না সান্ত্বনার।

—'সে ব্যবস্থাও করে এসেছি। আমার চাকরকে পাঠিয়েছি হাটে। এক্ষুনি জিনিষ-পত্র এসে যাবে সব। লোক-দেখানো বিয়েটা কালকেই হবে। একশ' লোকের খাবার আয়োজন যেন থাকে।' সেবাব্রত হাঁক-ডাক শুরু করে দেয়। যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ায়। কী ভেবে সান্ত্বনাকেই কাছে ডাকে। 'আর একটা কথা। প্রলয় আজ রাত্রের ট্রেনে ফিরছে মনে রাখবেন। মেয়ে আমার আত্মীয়া। বড় দুঃস্থ। ভুলে যাবেন না।'

কৃতজ্ঞতায় দুই চোখ টল-টল করে উঠেছিল সান্ত্বনার।

—'দিন-দিন ঋণের বোঝাটাই ভারি হচ্ছে কেবল। কিছু নেবেন না, শুধু দিয়েই যাবেন?' কয়েকদিন পরে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সান্ত্বনা।

—'কে যে কেমন করে, কখন, কাকে ঋণী করে বোঝা ভার।' বাগানের দিকে মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে চেয়েছিল সেবাব্রত।

—'উঠি।' সত্যি-সত্যি উঠে দাঁড়াল সেবাব্রত। লাঠিটা হাতে তুলে নিল।

নির্বিকারভাবে সান্ত্বনা তবু বসে। ডান হাতখানা গালে চেপে কী ভাবছে। যেন দেখছে না, শুনছে না কিছুই।

—'কিছু বলবেন আমাকে?' আরো শান্ত, নরম এবং ঘনিষ্ঠ সুরে কথা বলতে চাইল সেবাব্রত।

—'না, কিছু না।' সারাটা মুখে বিষণ্ণতা জড়িয়ে রেখেছে সান্ত্বনা। গলাটা প্রায় অবিশ্বাস্য রকমে গম্ভীর আর থম-থমে। উঠে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে খানিক। তারপর শব্দটা না করে বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

দরজা খুলতেই হাড়কাঁপিয়ে এক রাশ ঠাণ্ডা বাতাস গায়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'পা পিছিয়ে গেল সান্ত্বনা।'

—'আপনি আর না এলেন।' সেবাব্রত অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রায় নিজেকে শুনিয়ে কথা বলে।

—'আমি আর কবে যাই আপনার সঙ্গে? যেতে পারলে তো।' কুয়াশা-জড়ানো গলাটা বড় সুদূরে মনে হয়। কেমন কাতর।

—'একটা কথা বলতে চেয়েছি বহুদিন। কিন্তু পারিনি। আজ ইচ্ছে হচ্ছে। বলবো?' বাইরে বাগান কালো করে অন্ধকার নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। ওপাশে বুনো কুলের ঝোপ থেকে জ্বলতে-জ্বলতে একটা জোনাকি ছুটে এল। ওদের মাঝখানে বার কয়েক পাক খেয়ে সেবাব্রতর লাঠির মাথায় বসে নিশ্চিন্ত হল যেন। কুকুরটাকে ফের জ্যান্ত মনে হচ্ছে। এখন আর কুকুর মনে হচ্ছে না। যেন সাপের মাথায় মণি জ্বলছে। 'আমি জানতুম সুনীত কী দুঃখ নিয়ে মরেছে। অথচ আমাদের জীবনে সে যে কী নিষ্ঠুর মিথ্যে!' গলা বুজে এল সেবাব্রতর। কথাগুলি কাঁপতে-কাঁপতে থেমে গেল।

—'কী বলছেন আপনি?' ভীত, সন্ত্রস্ত মনে হল সান্ত্বনাকে। তার কাছে অবিশ্বাস্য, দুর্বোধ্য ঠেকছে সব।

—'বলছি, সত্যিই যদি তেমন কিছু হত? সুনীতের মৃত্যুর আগে কিম্বা পরে? আমরা কি অসুখী হতুম তাহলে?' থেমে-থেমে, কেটে-কেটে কথাগুলি বললে সেবাব্রত। বলতে বলতে ঢোক গিললে দু'বার। এখন সে থর-থরিয়ে কাঁপছে। এ কিসের উত্তেজনা? মাথাটা যেন টলছে। লাঠির মাথাটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে সেবাব্রত। অন্য হাতে দেয়াল।

—'সিধু, সিধু!' সান্ত্বনা দরজার পাল্লা ধরে চিৎকার করে উঠল। যেন ডাকাত পড়েছে বাড়িতে। 'ইস, কী অন্ধকার! কী অন্ধকার!' আপন মনে বিড়-বিড় করে। যেন অন্ধকারের এমন চেহারা হবে জানা ছিল না তার। তাই ভয় হচ্ছে এখন।

—'চেঁচাচ্ছ কেন? কী হয়েছে?' বাড়ির চাকর সিধু না। সামনে দাঁড়িয়ে নিশা। মুখে আঁচল গুঁজে বেয়াদপের মত হাসছে।

—'বাইরে কী অন্ধকার দেখেছিস?'

—'কী হয়েছে তাতে? কাঁপছো কেন অমন করে?'

—'সিধুকে ডেকে দে। আলো হাতে ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

—'কাকে?' ভুরু কোঁচকালো নিশা। স্বরে স্পষ্ট বিরক্তি ফোটালো।

সামনে তাকিয়ে অবাক, আহত হল সান্ত্বনা। অন্ধকার কুয়াশার ভেতরে কখন হারিয়ে গেছে সেবাব্রত! তার লাঠির শব্দটা অবধি না শুনিয়ে চলে গেছে আজ!

শূন্য ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা বড় একা, অসহায় বোধ করে। নিশার উপস্থিতিকে আজ আর গ্রাহ্য করে না। সে এখন নির্লজ্জ, মরিয়া। দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। গলার নলীটা টন-টনিয়ে ওঠে। দমকা হাওয়ায় টেবিলের ওপরে কেরোসিনের বাতিটা দপ-দপিয়ে উঠেছে। হয়তো ফেটে চৌচির হবে এক্ষুণি। দরজা ভেজিয়ে আলোর কাছে ছুটে যায় নিশা। সান্ত্বনা তখনো পাথরের মত দাঁড়িয়ে।

বাইরে একটা চখা তার চখিকে অনর্গল ডেকে চলেছে তখনো।

ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

যে দেউলের বিনাশ নেই সোমনাথে

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্ত অসীম সিন্ধুর শান্ত-সুন্দর ঊর্মিমালা এসে আছড়ে ভেঙে পড়ছে মন্দিরের কূলে কূলে। সৌরাষ্ট্রের দক্ষিণ উপকূলে পুণ্য-পবিত্র তীর্থভূমি প্রভাস-পত্তনে নবরূপে নির্মীয়মান সোমনাথ মন্দিরের সামনে সকালের হাল্কা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম আরব সাগরের নীলাম্বুরাশির মধ্যে সোনালী রোদের ঝিকিমিকি আর রুপোলী ফেনার লুকোচুরি খেলা। আর আপন মনে তুলনা করছিলুম প্রশান্ত-গম্ভীর এই বারীন্দ্রের সঙ্গে ঐ ভাবগম্ভীর সোমনাথ মন্দিরের। সাগরের এমন শান্ত-সমাহিত রূপ তো আর কোথাও বড় একটা দেখি নি। আর মন্দিরের এমন কোমলতাই বা আর কোথায় দেখেছি? এমন শান্ত-সমাহিতের বুকে বুঝি ঐ কোমলতাই শোভা পায়। সোমনাথ মন্দির কোলে নিয়ে অসীম সিন্ধুর অনন্ত বিস্তার কি মোহময় রসসুন্দর ভাবঘন পরিবেশই না রচনা করেছে!

কোন্ মায়াবলে মুহূর্তে মনটা যেন সম্পূর্ণ অন্য সুরে বাঁধা হয়ে গেল। এই পবিত্র তীর্থভূমিতে নিঃসীম নীলাম্বুর পটভূমিকায় এই মহান্ দেব-দেউলের সামনে দাঁড়িয়ে মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারছি সোমনাথ কেমন করে কবির বীণার তারে এ শাশ্বত রসঝঙ্কার তুলেছিল :

"এ তীর্থ যোজনব্যাপী সুপ্রাচীন
অশ্বত্থের মতো,
ভারতের সব রস শান্তরসে
করে পরিণত।"

মনে মনে সহস্র অভিশাপ দিলুম সেই সব আক্রমণকারীদের, যাদের নির্মম অত্যাচারে ও নিষ্ঠুর আঘাতে বার বার পবিত্র সোমনাথ মন্দিরের চূড়া মাটির সঙ্গে মিশে গেছে ধুলোয়; আর সশ্রদ্ধ প্রধান [illegible] স্বর্গত রাষ্ট্রনেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্দেশে, যাঁর নির্দেশে গড়ে উঠেছে এই নতুন সোমনাথ মন্দিরটি সাগরের স্পর্শধন্য সেই পূত বালুকাবেলায়, যেখানে কতবারই না গড়ে উঠেছে এই পুণ্য দেউল আর কতবারই না অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণের মুখে তা ধরাশায়ী হয়েছে, মৌন অতীত যার মূক সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

প্রাচীন প্রভাসপত্তন কোন্ সুদূর অতীত থেকে সোমনাথ মন্দিরকে বুকে নিয়ে মহাপবিত্র প্রভাসতীর্থে পরিণত হয়ে আছে, বোধ করি ইতিহাসও তা জানে না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সৃষ্টির আদি থেকেই সোমনাথ মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল প্রভাসপত্তনে। প্রাগৈতিহাসিক কালেই কাথিয়াবাড়ের দক্ষিণ উপকূলবর্তী সোমনাথ শহরটি খ্যাতির উচ্চ শিখরে উঠেছিল। হিরণ্য, কপিলা ও সরস্বতী—এই তিনটি নদী যেখানে সাগরে এসে মিলিতা হয়েছে, সেই পবিত্র ত্রিবেণীসঙ্গমে গড়ে উঠেছিল এই পুণ্য প্রভাসতীর্থ।

প্রভাসতীর্থ ও সোমনাথের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণে ও মহাভারতে নানা কাহিনী রয়েছে। স্কন্দপুরাণ ও কালিকাপুরাণের উপাখ্যানটি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম স্কন্দপুরাণ দশটি শৈব পুরাণের একটি। স্কন্দপুরাণ সাতটি খণ্ডে বিভক্ত। তারই একটি হল প্রভাসখণ্ড। প্রভাসখণ্ডে যেমন এই উৎপত্তির কাহিনী পাই, তেমনি আবার পাই অষ্টাদশ উপপুরাণের অন্যতম কালিকা-পুরাণেও। এখানে সেই কাহিনীর সার-মর্ম দেওয়া হল।

প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার মানসপুত্র। দক্ষ প্রথমে নিজের মন থেকে মানসপ্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এইভাবে সৃষ্ট মানসপুত্রদের বৃদ্ধি ঠিকমত না হওয়ায় দক্ষ মৈথুনের সাহায্যে প্রজা-সৃষ্টির জন্য বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্নীকে বিবাহ করলেন। অসিক্নীর গর্ভে ও দক্ষের ঔরসে মোট ১৫ হাজার পুত্র ও ৬০ কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দক্ষ তাঁর এই ৬০ কন্যার মধ্যে ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, রোহিণী আদি ২৭টি কন্যাকে ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি মুনির পুত্র সোম বা চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ দেন।

দক্ষের সাতাশ কন্যাই রূপবতী ছিলেন বটে, কিন্তু সোম অনুরক্ত ছিলেন কেবলমাত্র রোহিণীর প্রতি। অন্যান্য পত্নীরা অভিযোগ জানালে দক্ষের অভিশাপে সোম ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয়ে ক্রমেই ক্ষীণতনু হয়ে পড়তে লাগলেন। দেবতারা প্রমাদ গণলেন। কারণ, চন্দ্রের ক্ষয়ের ফলে বৃক্ষ-লতাদি বীজ প্রজা, এমন কি স্বয়ং দেবতারা পর্যন্ত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছিলেন। দেবতারা তখন অভিশাপ প্রত্যাহার করতে দক্ষকে অনুরোধ জানালেন। দক্ষ বললেন, তাঁর অভিশাপ ব্যর্থ হবার নয়। তবে সোম যদি সকল স্ত্রীর প্রতি সমান আচরণ করেন, আর সরস্বতী নদী যেখানে সাগরে মিলিতা হয়েছে, সেই প্রভাস-তীর্থে অমাবস্যায় স্নান করে মহাদেবের পুজো করেন, তাহলে তিনি আংশিক নীরোগ হবেন। অর্থাৎ একপক্ষকাল ধরে তাঁর দেহের ক্ষয় হবে, আর পরবর্তী একপক্ষকালের মধ্যে তিনি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবেন। সেই থেকেই চন্দ্র প্রতি অমাবস্যায় প্রভাসতীর্থে স্নান করে মহাদেবের পুজার্চনা করেন, ফলে তিনি শুক্লপক্ষে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হয়ে ওঠেন। সোম এখানে 'প্রভা' ফিরে পেয়েছেন বলেই এই তীর্থের নাম প্রভাস; আর তিনি এখানে যে মহাদেবের অর্চনা করেছিলেন, তাঁর নাম সোমনাথ। ব্রহ্মার
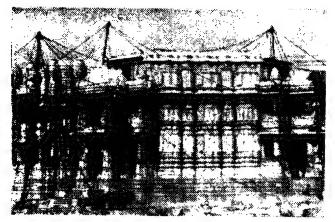
প্রভাসপত্তনে নির্মীয়মান সোমনাথ মন্দির

আদেশে এখানে শিবের মন্দির হল আর ব্রহ্মা স্বয়ং স্থাপন করলেন শিবলিঙ্গ।

এ তো হল সোমনাথ মন্দিরের পৌরাণিক কাহিনী। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকেও এই মন্দিরের প্রাচীনত্ব প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহাসিক ও বিদেশী পরিব্রাজকদের লেখা বিবরণে এই মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক সম্রাট সেলুকাসের দূতরূপে ভারতে এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খৃষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ পর্যন্ত মগধের রাজা ছিলেন। কাজেই মেগাস্থিনিস তাঁর ভারতভ্রমণ সংক্রান্ত বিবরণে সোমনাথের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় সোমনাথের প্রাচীনত্ব একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় সোমনাথে স্বর্ণময় চুড়াবিশিষ্ট মন্দির-শ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে।

সোমনাথ যে প্রাচীনতম কাল থেকে অন্যতম পবিত্রতম তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে, তার একটি কারণ বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের একটির অধিষ্ঠান সোমনাথ মন্দিরে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন শাঙ্ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে চীন থেকে ভারত অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে তিনি ভারত পর্যটনে এসেছিলেন। হর্ষবর্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হিউয়েন

মধ্যে কোন সময়ে ভারতে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে সোমনাথের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা অবলম্বনে লেখা কবিতায় কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক আপন অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন:

"এই সেই সোমনাথ—
জ্যোতির্লিঙ্গ যারে কয় লোক।"

আরব পর্যটক ও ভূগোলবেত্তা আলবেরুণি দশম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর বর্ণনাতেও সোমনাথের কথা আছে।

প্রাচীন যুগেও সোমনাথ মন্দিরের যে বিপুল ঐশ্বর্য ছিল, এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে তার একটা ধারণা করা যায়। সোমনাথ মন্দিরের সে গৌরবময় মধুর অতীতের কথা চিন্তা করলে আজও দেহে পুলক-রোমাঞ্চ জাগে। সে এক বিস্মৃত অতীত। দেশের দূরতম প্রান্ত থেকেও সহস্র সহস্র নরনারী পূজার্চনার ডালি নিয়ে এসে সমবেত হয়েছে এই মন্দিরে। দশ-বিশখানা নয়, দশ সহস্র গ্রাম থেকে যে রাজস্ব আদায় হত, তাই দিয়ে মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলতো। মন্দিরের রত্নসম্ভার ছিল এত বিপুল যে, কোন রাজকোষে তার দশ ভাগের এক ভাগও থাকতো না। বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত ছিল দু হাজার ব্রাহ্মণ সেবাইত। তিনশ পরিচারক, পাঁচশ নর্তকী, তিনশ বাদ্যকর নিযুক্ত ছিল দেব-মন্দিরের সেবায়। সন্ধ্যারতির সময় নিকটবর্তী হলে পুরোহিতের হাতের ইঙ্গিতে ঘণ্টায় বাঁধা সোনার শিকল উঠতো দুলে, আর আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতো

আবালবৃদ্ধবনিতা এসে সমবেত হত সোমনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে। সোমনাথের সে-মহিমা-ঐশ্বর্য আজ রূপকথার কাহিনীমাত্র। পঞ্চদশ শতকে লেখা 'রওজত-উস-সাফা' গ্রন্থে প্রাচীন সোমনাথ মন্দিরের এই ঐশ্বর্যের বর্ণনা রয়েছে। ভি এল মোর তাঁর 'সোমনাথ' নামক ইংরেজী পুস্তকে এই বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন।

সোমনাথের প্রথম মন্দির নির্মিত হয়েছিল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় শতাব্দীর শুরুতে, অথবা হয়ত বা তারও আগে। সম্ভবতঃ রাজানুগ্রহ লাভ না করার ফলেই প্রথম মন্দিরটির অস্তিত্ব স্থায়ী হয়নি। যাই হোক, মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল বল্লভীরাজাদের আনুকূল্যের ফলে। বল্লভীরাজাদের রাজত্বকাল ৪৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। একটি মত অনুসারে দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল বল্লভীরাজ চতুর্থ ধরা সেনের শাসনকালে, অর্থাৎ ৬৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে এই মন্দিরটি সম্ভবতঃ ধ্বংস হয়ে থাকবে। অবশ্য ইতিহাসে এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতবর্ষ আরব আক্রমণের লক্ষ্য হয়। আরব সৈন্যদল উজ্জয়িনী, মারওয়াড়, ও গুর্জরদেশ আক্রমণ করে বল্লভীরাজকে পরাজিত করে। কাজেই সোমনাথের দ্বিতীয় মন্দিরটি যে আরবেরা ধ্বংস করেছিল এ অনুমান অমূলক নয়।

তৃতীয় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে। এর সমর্থনে ইতিহাস থেকে এইটুকু জানা যায় যে, গুর্জর-সম্রাট দ্বিতীয় নাগভট এই মন্দির পরিদর্শন করেছিলেন। দ্বিতীয় নাগভট নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কোন সময়ে গুর্জর দেশের শাসকপদ অলংকৃত করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন কনৌজে। শ্রীকে এম মুন্সী তাঁর "Somnath: The Shrine Eternal" গ্রন্থে লিখেছেন যে, লাল বেলে পাথরে তৈরি এই মন্দিরটি তখন ভারতবর্ষে বৃহত্তম মন্দির হয়ে উঠেছিল, আর প্রভাস হয়ে উঠেছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান, এবং তা' সম্ভব হয়েছিল কনৌজের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

কিন্তু মন্দিরটির অস্তিত্ব স্থায়ী হল না। গজনীর সুলতান মামুদের

তম প্রধান লক্ষ্য ছিল এই সোমনাথ মন্দিরটি। তুর্কী সুলতান মামুদ ৯৯৮ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের গজনী জয় করেন। এর দু'বছর পরে ১০০০ খৃষ্টাব্দে মামুদ প্রথমবার ভারত আক্রমণ করেন। ভারতের সম্পদ মামুদের কাছে বেশ লোভনীয় বলে মনে হয়। তাই এর পর থেকে মামুদ বার বার ভারতে হানা দিয়েছেন—সবসুদ্ধ সতের বার। পাল রাজারা দীর্ঘ আঠারো বছর এই বর্বর আক্রমণ প্রতিরোধ মানসে যুদ্ধ চালিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাঁরা বার বার পরাজিতই হয়েছেন।

১০২৫ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে গজনীর সুলতান নতুন উদ্যোগে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। ১০২৬ সালের একেবারে প্রথমদিকেই গজনীর সুলতান সোমনাথ মন্দির লুন্ঠন করেন। তুর্কী সৈন্যদের বর্বর আক্রমণে পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় বীরের মত প্রাণ দিয়েও সোমনাথের মন্দির রক্ষা করতে পারেন নি।

আরব পর্যটক ও গজনীর সুলতান মামুদের সভাপণ্ডিত আল-বেরুণীর গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মামুদ দেবমূর্তির উপরাংশ ধ্বংস করেছিলেন এবং বাকী অংশের স্বর্ণালঙ্কার ও রত্নরাজি গজনীর রাজপ্রাসাদে স্থানান্তরের আদেশ দিয়েছিলেন।

মামুদের অন্ধ আক্রোশ শুধু যে একটি সুন্দর শিল্পবস্তু নিশ্চিহ্ন করেছিল তা নয়, ইতিহাসের পাতা থেকে একটা অতীত অধ্যায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে চিরকালের মত লুপ্ত করে দিয়েছিল। পুরনো সোমনাথ মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে গাঁথা ছিল পুরাতনী-গাথা।

মামুদ যখন সোমনাথ আক্রমণ করেছিলেন প্রভাসপত্তনের রাজা ছিলেন তখন ভীমদেব। তিনি তখন পালিয়ে গিয়ে এক দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মন্দির লুন্ঠন শেষে মামুদ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। এর কিছুকাল পরেই ভীমদেব পুনরায় নগর অধিকার করেন। সম্ভবতঃ তিনি মন্দিরের পুনঃ সংস্কারও করেছিলেন। কারণ মামুদ কর্তৃক সোমনাথ মন্দির লুন্ঠন ও দেববিগ্রহ ধ্বংস করার কয়েক দশক পরে একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লেখা একটি মুসলমান গ্রন্থে সোমনাথ মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। একশ' বছরের মধ্যেই মন্দিরটি আবার লুন্ঠিত হয়েছিল এবং পঞ্চম মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজা কুমারপালের পৃষ্ঠপোষকতায়।

এরপর শতাধিক বৎসর আর কোন অশান্তি দেখা দেয় নি। এই সময়ের মধ্যে মন্দিরটি অনেক সমৃদ্ধও হয়ে উঠেছিল। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার মুখে প্রভাসপত্তনের বুকে আবার এল মুসলমান বর্বরতার ঢেউ। আলাউদ্দীন খিলজি তখন দিল্লীর সুলতান। তাঁর নির্দেশে তাঁরই এক সেনাপতি আলফ খাঁ হানা দিলেন প্রভাসপত্তনে। এ. ১২৯৭ খৃষ্টাব্দের কথা। আবার লুন্ঠিত হ'ল সোমনাথ মন্দির। শ্রীমুন্সীর গ্রন্থে আছে, আলফ খাঁ জ্যোতির্লিঙ্গ অপসারণ করেন, মন্দিরের শিখর ধ্বংস করেন। বর্ব ধ্বংসলীলার বিবরণ পাই শ্রীমুন্সীর লেখা গ্রন্থে।

এর অল্প কিছুকাল পরেই জুনা গড়ের রাজা মহীপালদেব মন্দিরের সংস্কার করলেন। মহীপালের রাজত্বকাল ১৩০৮ থেকে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরও কিছুকাল পরে মহীপালের পু জ্যোতির্লিঙ্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

এমনি করে ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে দিয়ে আরও কয়েকটা শতাব্দী পার হয়ে গেল পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগা জুনাগড়ের হিন্দু রাজা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেন, আর সৌরাষ্ট্র এল আমেদাবাদের মুসলমান শাসকদে শাসনাধীনে। তা সত্ত্বেও সোমনাথ মন্দির

কিন্তু অক্ষত দেহেই ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেব সম্রাট হয়ে এই মন্দির ধ্বংসের আদেশ দিলেন. তবে সৌভাগ্যক্রমে এই আদেশ কার্যকরী হয় নি। যাই হোক, পরে তিনি সোমনাথ মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাও সম্ভব হয় নি, কারণ তার পূর্বেই আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়েছিল।

অবশেষে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাণী অহল্যাবাঈ ঐ প্রাচীন মন্দিরের কাছেই আর একটি নতুন সোমনাথ মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। বহুবার আক্রান্ত পুরনো মন্দিরের সংস্কার করতে সম্ভবতঃ তাঁর মন চায়নি। গুজরাট তখন মারাঠাদের অধিকারে। মন্দিরটি আজও বিরাজ করছে অক্ষুন্ন গৌরবে, আর অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে অদূরে নির্মীয়মান ঐ নতুন মন্দিরের দিকে, যার ভিত্তিভূমির সঙ্গে মিশে রয়েছে অকথ্য অত্যাচারের অজস্র কাহিনী।

সোমনাথের এই নতুন মন্দিরটি তো একেবারেই হাল আমলের সৃষ্টি। দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হলে স্বর্গতঃ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সোমনাথ মন্দির দেখতে এসে এর ভগ্নদশা দেখে ব্যথিত হ'ন। পুরনো মন্দিরটির সংস্কার আর সম্ভব নয় বিবেচনা করে ঐ মন্দির ভেঙ্গে ফেলে ঐ একই ভিত্তির ওপর নতুন মন্দির নির্মাণের আদেশ দেন। নতুন মন্দিরের নির্মাণকার্য চলছে ১৯৫১ সাল থেকে।

পুরাণ ও ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিলে সোমনাথ মন্দির সৃষ্টির আর যে কাহিনীটি পাওয়া যায় তা আছে কিংবদন্তীর আকারে। আমাদের সর্বজ্ঞ গাইডপ্রবর সেই কাহিনীটি আমাদের শোনাচ্ছিলেন। প্রথম সোমনাথ মন্দিরটি নাকি নির্মিত হয়েছিল সত্যযুগে। এটি ছিল স্বর্ণমন্দির, নির্মাণ করেছিলেন সোমরাজ নামে এক নৃপতি। পরবর্তীকালে ত্রেতাযুগে রাবণ নির্মাণ করেছিলেন
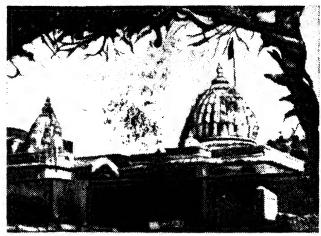
রাণী অহল্যাবাঈ নির্মিত সোমনাথ মন্দির

রৌপ্যমন্দির। তারপর দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ তৈরি করলেন কাঠের মন্দির।

সোমনাথপত্তনের আর একটি মন্দিরের কথা উল্লেখ করতেই হয়।

প্রভাসপত্তনে সূর্যমন্দির

এখানকার সূর্যমন্দিরের কথাই বলছি। তবে এ সূর্যমন্দিরের সে ঐশ্বর্য নেই, যা আছে কোনারকের সূর্যমন্দিরের। কোনারকের মত শিল্পসৌষ্ঠবও এর নেই। সোমনাথ মন্দিরের সন্নিকটে একস্থানে এই সূর্যমন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে— নিতান্ত নিঃসঙ্গ, অবহেলিত, অবজ্ঞাত। মন্দিরের শিখরটি খাজুরাহোর কন্দর্য মহাদেব মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কন্দর্য মহাদেব মন্দিরের মতই সোমনাথের সূর্যমন্দিরের শিখরগাত্রেও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখর দেখা যায়, যদিও খাজুরাহোর মন্দিরের স্থাপত্য-সৌন্দর্যের কণামাত্রও সোমনাথের সূর্য-মন্দিরে পরিলক্ষিত হয় না। সূর্য-মন্দিরের মধ্যে রয়েছে একটি সূর্যকুন্ড।

সোমনাথদর্শন শুধু পুণ্যসঞ্চয়ই নয়, এ এক বিচিত্রসুন্দর অভিজ্ঞতা। সেই বিস্মৃত কোন্ অতীত থেকে যুগ যুগ ধরে পুণ্যলোভাতুর ভক্ত হৃদয়ের জয় ঘোষণা করে আসছে সোমনাথ। পরাজয় সে কোনদিনই মানতে চায় নি। আঘাত এসেছে বার বার, আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তার দেহ, কিন্তু ভক্ত হৃদয় তাকে শেষকথা বলে স্বীকার করে নি। বার বার সে সংস্কার করেছে মন্দিরের, নতুন রূপ দিয়েছে তার। সোমনাথ মন্দির বিধ্বস্ত হয়ে আবার গড়ে উঠেছে। সোমনাথ মন্দিরের বিনাশ নেই। সমগ্র জাতির ভক্ত-হৃদয়ের মনোবাঞ্ছা আর প্রেম-আকুতির অম্লান স্বাক্ষর এই সোমনাথ। একটা গোটা জাতির স্বপ্ন যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে পাথরের এই দেব-দেউলে। কবি কুমুদরঞ্জনের ভাষায় ঃ

"......এ শুধু মন্দির মঠ নয়,
হেথায় প্রস্তরীভূত জাতির আকাঙ্ক্ষা
জেগে রয়।"

অয়স্কান্ত
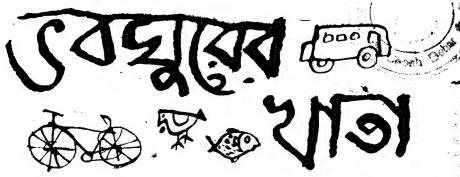
কলেজ স্ট্রীটের সাক্ষী রহমান খান

দেশ গয়া জিলা। যে-সময়ে কলকাতায় এসেছিল তখন ট্রেনের ভাড়া লাগত তিন টাকা চোদ্দ পয়সা। এখন লাগে এগারো টাকা তিরিশ নয়া পয়সা। তখন বয়স ছিল দশ-বারো কি বড়ো জোর পনেরো। এখন জিজ্ঞেস করলে বলে, হোগা ষাট সত্তর। অর্থাৎ, ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে যে-কোনো একটা সংখ্যাকে বয়স হিসেবে ধরে নিতে হবে। চেহারার দিকে তাকালে মনে হয়, বয়স হয়তো সবে ষাট ছুঁয়েছে। কিন্তু খানিকক্ষণ বসে বসে মুখের কথা শুনলে নিশ্চয়ই মনে হবে, বয়স অন্তত একটি শতাব্দী। কারণ ওর গলার স্বরে শতাব্দী-পারের একটি আর্ত কান্না আজকের এই বর্তমানকে যেন অভিশাপ দিচ্ছে।

নাম রহমান খান। কলেজ স্ট্রীটের বইয়ের দোকানের পাড়ায় গত পঞ্চাশ বছরের একটি ইতিহাস। এসেছিল বাবার হাত ধরে সেই "জার্মান-যুদ্ধ" (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) শুরু হবার বেশ কয়েক বছর আগে। ঠিক কোন্ সালে তা বলতে পারে না। তবে জার্মান-যুদ্ধ শুরু হবার আগেই ওর বিয়ে হয়েছিল আর বিয়েরও আগে ও এসেছিল কলকাতায়।

সেই কলকাতার সঙ্গে এখনকার কলকাতার কোনো মিলই নেই। বইয়ের পাড়া অবশ্যই এমন জমজমাট ছিল না। কিন্তু চালের মণ ছিল দু' টাকা থেকে আড়াই টাকা। সরষের তেল ছিল চোদ্দ পয়সা সের। মস্ত এক-একটা একসেরি-দেড়সেরি মাছের টুকরো পাওয়া যেত দু আনা থেকে তিন আনায়। একটু দেরিতে বাজারে গেলে মাত্র দু-পয়সায় যে চিংড়ির ভাগা পাওয়া যেত তা তিন-চারজন দু-বেলায় খেয়ে শেষ করতে পারত না। হোটেলে মাছ-মাংস দিয়ে ভাত খেলে দু-আনার বেশি খরচ পড়ত না। পাঁচ টাকায় একজন জোয়ান মানুষের হেসে-খেলে সারা মাসের খাওয়ার খরচ কুলিয়ে যেত।

কলকাতার এই স্বর্গরাজ্যে রহমান এসেছিল বইয়ের পাড়ায় কুলিগিরি করতে। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে।

বইয়ের পাড়া অবশ্যই এখনকার মতো জমজমাট ছিল না। রহমানকে জিজ্ঞেস করলে পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি হাতড়ে তিন-চারটি দোকানের নাম করতে পারে : সেন রায়, কমলা, বুক কোম্পানী, গুরুদাস। কিন্তু রহমানের কাছে এই তিন-চারটি দোকানই এখনকার কয়েক-শো দোকানের চেয়ে অনেক বেশি

পয়মন্ত ছিল। মাত্র এই তিন-চারটি দোকানে প্যাকিং-এর কাজ করে আর মোট বয়ে প্রতি মাসে গড়ে পঁয়ত্রিশ টাকা আয় হত ওর। "সীজনের" সময়ে কখনো কখনো একশো টাকা পর্যন্ত।

তখনকার বাজার ছিল এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায়। নাম মাধব-বাবুর বাজার। আর এখনকার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে তখন ছিল মস্ত এক খোলার বস্তি। এই বস্তিতে মাত্র পাঁচ-সিকেয় ঘরভাড়া নিয়েছিল রহমান। এখন যেখানে হিন্দু সৎকার সমিতির ও গুপ্তপ্রেসের বাড়ি—তখন এই গোটা এলাকাটা জুড়েই থাকত রহমানের দেশ-গাঁয়ের লোক। সারাদিনের খাটুনির পরে জমায়েত বসত মাঝে মাঝে। সিকি পয়সার চা আসত প্রত্যেকের জন্যে। মাঝে মাঝে ভরপেট ভোজ। সে-সব আশ্চর্য দিন গিয়েছে রহমানের।

হ্যারিসন রোড অবশ্যই ছিল। আর ছিল কলেজ স্ট্রীট ও মীর্জাপুর স্ট্রীট। কিন্তু এখন যেখানে সুরজমল নাগর-মলের বাড়ি তখন সেখানে থাকতেন স্যার নীলরতন সরকার। এই বাঙালী নামটি নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করে রহমান আর সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখদুটো স্মৃতির ভারে আপনিই যেন বুজে আসে।

হ্যাঁ, মানুষ ছিলেন বটে নীলরতন সরকার। দরাজ কলিজা, দরাজ হাত। বাড়িতে যদি বিয়েসাদির ব্যাপার থাকত তাহলে রহমানের মতো অনেকেরই কয়েক দিন আর বাইরে খেতে হত না। নিজেই ডেকে পাঠাতেন আর বলতেন—কী খাবি রে বাবা, খা! কথাগুলো রহমান এমনভাবে উচ্চারণ করে যেন স্যার নীলরতন সরকারই ওর গলায় কথা বলছেন।

আর শুধু কি খাওয়া? স্যার নীলরতনের মেয়ে ফিটনগাড়িতে চেপে বেড়াতে যেতেন। রহমান যেত সঙ্গে। প্রতি ঘণ্টায় ছ-আনা হিসেবে মজুরি পাওয়া যেত সেজন্যে। সে-যুগের ছ-আনা, যখন এক পয়সার চিনিতে রহমানের প্রকাণ্ড হাতের মুঠোটা ভরে যেত প্রায়।

কথা বলতে বলতে রহমান আবার চোখ বোজে। আশ্চর্য একটা সুখের স্মৃতি ওর চোখ দুটোকে নরম করে তোলে যেন।

জার্মান-যুদ্ধের কথা রহমানের বিশেষ মনে নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের স্মৃতি এখনো ওর মনে একটা বিষাক্ত ক্ষতকে খুঁচিয়ে তোলে। না, ব্ল্যাক-আউট বা জাপানী বোমা নয়। ও বলে, কন্ট্রোলের খিচুড়ি। পুণ্য-সঞ্চয়ের লোভে ধনী ব্যবসায়ীরা পার্কে পার্কে লঙ্গরখানা খুলেছিলেন। কিন্তু খিচুড়ি রান্না হত পচা চালের। রহমান এখনো সেই কটু স্বাদ ভুলতে পারেনি। কন্ট্রোলের খিচুড়ির কথা বলতে গিয়ে রহমানের মুখটা এখনো বিকৃত হয়ে ওঠে। ওকে দেখে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে পারে, স্যার নীলরতনের বাড়িতে ভোজ খাওয়া জিভ কন্ট্রোলের খিচুড়িকে ধিক্কার জানাবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু তারপরেও রহমান জো

আছে। চোখের ওপরে দেখেছে দাঙ্গা, দেশ-ভাগাভাগি, হিন্দুস্তান, পাকিস্তান। কিন্তু কোনো বড়ো ঘটনাই ওর মনে বড়ো রকমের ছাপ ফেলতে পারেনি। ওর যাতায়াতের চৌহদ্দী বড়ো জোর কলেজ স্ট্রীটের বইয়ের পাড়া থেকে হ্যারিসন রোডের ছাতার দোকানের পাড়া পর্যন্ত। দেশ ভাগাভাগি হবার ফলে ওর জীবনেও যে চিড় ধরতে পারে তা ও কোনো দিন ভাবেনি। দেশের ঘরজমি যদি ঠিক থাকে আর ওর শরীরে তাগদ যদি খোয়া না যায় তবে ওর আর পরোয়া কিসের?

তবুও এই বেপরোয়া রহমানকেও একসময়ে উপলব্ধি করতে হল যে আগেকার মতো আর বছরে দু-বার দেশে যাওয়া চলে না। তারপরে অনেক বছর ধরে বাপে আর ছেলেতে মিলে টাকা পাঠিয়ে পাঠিয়ে দেশে যতোটুকু জমিজমা করেছিল তাও একটু একটু করে উবে যেতে লাগল। মাঝে একবার দেশ থেকে বৌকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। এখন সেইদিনের কথা ভেবে চাপা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে গেলেও বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে।

রহমান ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু কোথা থেকে যেন একটা সর্বনাশের হাওয়া লেগেছে। সুখের দিনে অনেকগুলো ছেলে হয়েছিল। ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই কল্পনা করেছিল যে ছেলেরা একদিন জোয়ান হবে, কেউ কেউ চাষ করবে দেশের জমি, কেউ কেউ আসবে বাপের সঙ্গে কলকাতায়। সুখী ভবিষ্যতের রঙীন ছবি মস্ত একটা ফানুসের মতো কল্পনার আকাশে পাড়ি দিত নিশ্চয়ই। মনে মনে এমন ভাবনা থাকাটাও অসম্ভব ছিল না যে আল্লা তাকে চাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি দিয়েছিলেন।

তারপরে কোথা থেকে এক সর্বনাশের হাওয়া এসে সবকিছুকে তোলপাড় করে দিয়ে গেল। ছেলেগুলো একে একে মরতে লাগল রহমানের চোখের ওপরেই। এক ছেলে তো মরল বিয়ে হবার পরে। এই ছেলেটির ওপরেই সবচেয়ে বেশি ভরসা রেখেছিল রহমান। রহমানের গা থেকে কলেজ স্ট্রীটের বইয়ের পাড়ার খানিকটা হাওয়া একমাত্র এই ছেলেটির গায়েই লেগেছিল যেন। ম্যাট্রিক পাশ করে রেলের চাকরিতে ঢুকেছিল ছেলেটি। আশ্চর্য, এই সোনার টুকরো ছেলেটিকেও বাঁচাতে পারল না রহমান!

কিন্তু রহমান নিজেও বড়ো হয়েছে কলেজ স্ট্রীটের এই বইয়ের পাড়ায়। নিজের চোখে দেখেছে, কলেজ স্ট্রীট ফুলে ফেঁপে ছাপিয়ে উঠতে চাইছে। নিজের চোখে দেখেছে, এককালের দরিদ্রতম ছাত্র পরবর্তী কালে হয়ে উঠেছে কত মস্ত! সে কেন এত সহজে হার মানবে! এখনো অটুট রয়েছে তার শরীরের একজোড়া শক্ত হাত, একজোড়া শক্ত কাঁধ, একজোড়া শক্ত পা। মোট বাঁধতে আর মোট বইতে এখনো তার জুড়ি পাওয়া যাবে না হয়তো।

কলেজ স্ট্রীটের হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে রহমান শেষ সর্বনাশকে ঠেকাতে চেষ্টা করল। একমাত্র ছেলেকে হাত ধরে নিয়ে এল এই আবাল্য পরিচিত পরিবেশে। যেখানে পাঁচ সিকের ঘরভাড়া এখন হয়েছে বারো টাকা। তা হোক। তবুও রহমান কলেজ স্ট্রীটের ওপরেই ভরসা রাখতে পারে।

ছেলের নাম মহম্মদ গুলজার খান। জোয়ান সমর্থ ছেলে। তিন পুরুষের হাওয়া লেগেছে তার গায়েও। পাঁচজনের কাজ একাই করবার শক্তি নিয়ে কলেজ স্ট্রীটের মতোই উচ্ছল হয়ে উঠতে চাইছে।

বাপ বলে, মন দিয়ে কাজ করবি গুলজার। তোকে আমি সবার সঙ্গে চেনাপরিচয় করিয়ে দিয়ে যাব।

রহমান একথা বলতে পারে বৈকি। তার জীবনের পঞ্চাশটি শ্রেষ্ঠ বছরকে সে একটি একটি ঘামের ফোঁটায় কলেজ স্ট্রীটকে দান করেছে। একটি একটি নতুন দোকানের পত্তন হয়েছে আর রহমানই সবার আগে গিয়েছে সেখানে কলেজ স্ট্রীটের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। রহমানকে কে না চেনে! রহমান কাকে না চেনে! মহম্মদ গুলজার খানের সঙ্গে যদি কলেজ স্ট্রীটের পরিচয় করিয়ে দিতে হয় তবে রহমানের চেয়ে উপযুক্ত আর কে আছে। মন দিয়ে কাজ করুক গুলজার। কলেজ স্ট্রীটের রহমানই রয়েছে তার সহায়।

তারপরে কোথা দিয়ে যেন কী হয়ে গেল। জোয়ান তাগড়া ছেলেটা একটু একটু করে শুকিয়ে যেতে লাগল চোখের ওপরে। সেই সর্বনাশের হাওয়া কলেজ স্ট্রীটেও রেহাই দিল না রহমানকে।

শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল অসুখ। দুরন্ত যক্ষ্মা হিংস্র থাবা বাড়িয়েছে ছেলেটার দিকে। এ অসুখের নাম রহমানের জানা ছিল না।

রহমান অবশ্য যক্ষ্মা বলে না। বলে, টি-বি। বলে আর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ওর চোখের দৃষ্টি দেখে বোঝা যায়, এই সামান্য দুটি অক্ষর দিয়ে কী ভয়ংকর এক পরিণতি উচ্চারিত— সে-সম্পর্কেও ওর পুরোপুরি ধারণা নেই।

শরীরের দিকে তাকালে এখনো মনে হয়, বয়স যেন সবে ষাট ছুঁয়েছে। এখনো সোজা হয়ে হাঁটে। এখনো প্যাকিং-এর দড়ি টানতে গিয়ে হাতের আঙুল একটুও কাঁপে না। কিন্তু সেই আশ্চর্য সুখের ছোঁয়ায় নরম চোখ-দুটিকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্ধকার ভবিষ্যৎ ওর চোখের দৃষ্টি থেকে সমস্ত আলো আর রঙ নিঃশেষে মুছে নিয়েছে।

রহমান এখন আর অনেক হিসেব করেও বলতে পারে না, সারাদিনে ওর কত আয় হয়। পঞ্চাশ বছরের চেনা-পরিচিত কলেজ স্ট্রীট একেবারে বদলে গিয়েছে ওর কাছে। সমস্ত হিসেবই যেন গরমিল। আগেকার কালের তিন-চারটি দোকানে যা প্যাকিং হত, এখনকার কয়েক-শো দোকানেও তা হয় না কেন রহমান বলতে পারবে না। তবে লোকের কথাবার্তা শুনে একটু যেন আঁচ করতে পারে, পাকিস্তান না হলে, দেশের বড়ো একটা অংশ বিদেশ না হয়ে গেলে কলেজ স্ট্রীটের এমন সর্বনাশ হত না।

আর এই সর্বনাশ যে কত গভীর আর কত ব্যাপক তা বুঝতে হলে কলেজ স্ট্রীটের সাক্ষী রহমানের দিকে আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখতে হবে। একমাথা কাঁচাপাকা চুল খুবই ছোট ছোট করে ছাঁটা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রোদে-পোড়া তামাটে মুখ। এমনিতে আলাদা আলাদা ভাবে দেখলে কোনোটাই হয়তো বেমানান নয়। কিন্তু পরনের ছেঁড়া হাফশার্ট আর চিরকুট একফালি ধুতির পটভূমিতে ওর অস্তিত্বের এই সামান্য লক্ষণগুলিই অসামান্য একটা কান্না হয়ে ফুটে ওঠে। শুধু চোখের কান্নাকে মানুষ হয়েও সহ্য করা যায়। কিন্তু পুরোপুরি অমানুষ না হলে সমস্ত শরীরের কান্না সহ্য করা যায় না।

কোনো হিসেবই আর স্পষ্টভাবে ভাবতে পারে না রহমান। ছেলেকে দেশে পাঠিয়েছে। কিন্তু ছেলের চিকিৎসার ওষুধ কলকাতা থেকে পাঠাবার কথা। কয়েক জনের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে প্রথম দফার ওষুধ কেনা গিয়েছিল। তারপরে এখন দেশের চিঠির জন্যে উৎকণ্ঠিত হতেও ভুলে গেছে হয়তো। দ্বিতীয় দফার ওষুধ পাঠাবার জন্যে কার কাছে হাত পাতলে তাও ওর জানা নেই।

অথচ কলেজ স্ট্রীট দিনে দিনেই যেন ফুলে ফেঁপে উথলে উঠতে চাইছে। কলেজ স্ট্রীটের এই বাড়বাড়ন্ত অবস্থা অবিশ্বাস্য মনে হয় রহমানের কাছে। এমন অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরকে কানা-কড়িও দাম দিতে রাজি নয় সে।

কারণ, আর কেউ না জানুক, রহমান তো জানে, কলেজ স্ট্রীটের কোথাও যদি এতটুকু সঙ্গতি থাকত তাহলে রহমানকে এমন দোর থেকে দোরে কাজ খুঁজে বেড়াতে হত না। একসময়ে এই কলেজ স্ট্রীটই তাকে এতবেশি কাজ দিয়েছিল যে ভোর থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত একটানা কাজের ভরাট প্রহর-গুলো গানের মতো গুনগুনিয়ে উঠত। পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই কলেজ স্ট্রীটই এখনো রয়েছে। কিন্তু সেই গান আর রহমানের জীবনে কোনো দিনই হয়তো ফিরে আসবে না।

আর ফিরে আসবে না দু-বেলার সেই ভরপেট খাওয়া। রহমান এখন আর

মনেও করতে পারে না সারা মাসের মধ্যে ক'টা বেলা সে ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসে। তবে কলেজ স্ট্রীটের এখনো এটুকু বদান্যতা আছে যে সিকি পয়সায় চা না পাওয়া গেলেও সারাদিনে কয়েক কাপই জুটে যায়। খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে রহমান এখন শুধু পিঠের সঙ্গে প্রায় মিশে আসা পেটে হাত বুলোতে বুলোতে ম্লান হাসে। যেন একটা অমানুষিক ঠাট্টাকে হাসি দিয়ে ঢাকতে চাইছে।

নিজের খাওয়ার কথা এখন আর ভাবে না রহমান। এখন তার সর্বক্ষণের চিন্তা—কি করে দ্বিতীয় দফার ওষুধ পাঠাবে সেই ছেলেটির কাছে যার নাম মহম্মদ গুলজার খান। তিন পুরুষের হাওয়া লেগেছিল যার গায়ে।

পঞ্চাশ বছর আগেকার হ্যারিসন রোড আর মীর্জাপুর স্ট্রীট নাম পাল্টেছে। কলেজ স্ট্রীট কিন্তু এখনো সেই কলেজ স্ট্রীট।

॥ 'নজরুল জীবনী' প্রসঙ্গে ॥

'অমৃত' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ২৫শে মে, ১৯৬২ সালের 'অমৃতে' জনাব আব্দুল আজিজ আল-আমানের 'নজরুল জীবনী' শীর্ষক আলোচনার কতকগুলি তথ্যের ভুল চোখে পড়ল। আপনার পত্রিকায় আমাদের মত পাঠক-পাঠিকার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে বলেই এই চিঠি লিখতে অগ্রসর হচ্ছি। আমান-সাহেবের নজরুল বিষয়ক আরো দু-একটি প্রবন্ধ এখানে-ওখানে আমার চোখে পড়েছে। তাতে মনে হয়েছে নজরুলের বিষয়ে তিনি এ যাবৎ অজ্ঞাত তথ্য ও তত্ত্বকে প্রকাশ করতে উৎসাহী। এতো বেশ ভাল কথা। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরীদের বিষয়ে তিনি অনেক ভ্রান্ত উক্তি করছেন। একথা সকলেরই জানা আছে যে নজরুলের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত বই লেখা হয়েছে তাদের মধ্যে ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের 'নজরুল চরিত মানস' সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও পূর্ণাঙ্গ। এই গ্রন্থে নজরুলের জীবনী ছাড়াও কবি শিশু-সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, গীতিকার ও সুরকার হিসাবে নজরুল-প্রতিভার বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাছাড়াও এই গ্রন্থে নজরুলের যুগ-পরিবেশ, উত্তরাধিকার ও প্রভাবের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উপেক্ষিত হয়নি। তবুও আমান-সাহেব তাঁর উক্ত আলোচনায় কেমন করে বললেন যে, কবি নজরুলের সঙ্গীত সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোথাও কোন আলোচনা হল না। ডক্টর গুপ্তের গ্রন্থে গীতিকার ও সুরকার নজরুলের বিস্তৃত পরিচয় কি তাঁর চোখে পড়েনি? আমান-সাহেব নজরুলের বিষয়ে যে সকল তথ্য পরিবেশন করেছেন তার মূল কথাগুলি সমস্তই ডক্টর গুপ্তের গ্রন্থে আছে। তবে শুধু জীবনী-পাঠকদের জন্যে ছোটখাট খুঁটি-নাটি ডক্টর গুপ্ত তাঁর গ্রন্থে স্থান দেননি, কেননা সেখানে নজরুল-জীবনী প্রধানতঃ তাঁর সাহিত্য, সংগীত এবং অন্যান্য কৃতির ভূমিকা হিসাবেই স্থাপিত হয়েছে। আশাকরি আমান-সাহেব ভবিষ্যতে কোন মন্তব্য করবার সময়ে পূর্বসূরীদের প্রতি সুবিচার করবেন। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।

ইতি বিনীতা
জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য।
দমদম জংশন,
কলিকাতা ৫০

॥ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রসঙ্গে ॥

'অমৃত' সম্পাদক সমীপেষু,

গত ২৫শে মে, '৬২ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়ে নতুন করে আপনাদের নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার পরিচয় পেলাম। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে যে সকল ঘটনার পূর্বাভাস ঘটছে সে সম্বন্ধে আপনারা যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমার কয়েকটি কথা বলার আছে।

প্রথমতঃ 'কাশ্মীরের ব্যাপারে ত' আমাদের এখনও পণ্ডিত নেহরুর অবিমৃশ্যকারিতার ফলভোগ করিতে হইতেছে।' —আপনাদের এই মন্তব্য যদিও যুক্তিপূর্ণ তবুও একথা বলা হয়ত ভুল হবে না যে, নেহরুর শান্তিকামী নীতিই এর জন্য দায়ী—নেহরু নয়। মা ভালভাবেই জানেন যে সন্তান তাঁর, প্রতিবেশিনীর নয়, তাই তিনি চীৎকার করারও প্রয়োজনবোধ করেন না। প্রত্যেক ভারতবাসী এবং অগণিত অভারতীয় মাত্রেই জানেন যে কাশ্মীর ভারতের অংশ। দিল্লী, বিহার, পশ্চিম বাংলা যেমন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ তেমনই। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ওপর ভারত রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার সম্বন্ধে যেমন কোন (বিশ্বের কারও) প্রশ্ন থাকতে পারে না। তেমনি, কাশ্মীর সম্পর্কেও থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ চীনের সর্বগ্রাসী নীতির জন্য রাশিয়া কম্যুনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতকে সাহায্য করছে—এও এক আশ্চর্যকর ঘটনা! গোয়া উদ্ধারের অব্যবহিত পরেই যখন বিশ্বের বৃহৎ বৃহৎ শক্তিগুলি ভারতের নীতির তীব্র নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল তখন সোভিয়েট রাশিয়াই প্রকৃত বন্ধুরূপে ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিরাপত্তা পরিষদেও রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে ভারতের নীতির সমর্থন করে যেন প্রমাণ করে দিয়েছে যে ভারতের অসময়ের বন্ধু সোভিয়েট রাশিয়াই—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা পাশ্চাত্য শক্তি-পুঞ্জ নয়। ভারতের সামরিক শক্তি-বৃদ্ধিতে সাহায্যের জন্যও রাশিয়াই এগিয়ে এসেছে।

তৃতীয়তঃ ভারতের নীতি হিংসার নয়, অহিংসার নীতি। গোয়া সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত তাই দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে, শেষে ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘিত হবার পর আক্রমণ করেছে। কাশ্মীরেরও পরিস্থিতি সমানই। দীর্ঘকাল ধরে ভারত তার অবরুদ্ধ জমি ত্যাগ করে যাবার জন্য চীন এবং পাকিস্তানকে বারবার অনুরোধ করেছে কিন্তু 'কে কার কড়ি ধারে?' শেষে মরিয়া হয়ে ভারত উভয় দেশের বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে, কিন্তু শান্তির পথ এখনও ত্যাগ করেনি। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন চীন এবং পাকিস্তানের সমর্থনকারীদের উদ্দেশ্য করে জানিয়েছেন পাকিস্তান আক্রমণকারী, যেমন আক্রমণকারী কম্যুনিস্ট চীন। দুই আক্রমণকারী রাষ্ট্রই ভারতের রাষ্ট্র দখল করে রয়েছে : তাদের অবশ্যই ভারত ত্যাগ করে যেতে হবে। ......নয়ত? নয়ত চীন এবং পাকিস্তান যদি আরও অগ্রসর হয় তাহলে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠাও মোটেই অস্বাভাবিক নয় বলে কূটনৈতিক মহল মনে করেন।

চতুর্থতঃ লক্ষ্যণীয় যে, ভারত সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে শব্দ অপেক্ষা দ্রুতগতিসম্পন্ন জেট জঙ্গী-বিমান ক্রয়ের চেষ্টা করছে। এই খবর শুনে মার্কিন মুলুকে আলোড়ন আরম্ভ হয়েছে। 'গেল গেল' রব উঠেছে ওয়াশিংটনে—কেননা মার্কিন মহল মনে করছে যে যেহেতু পাকিস্তান তাদের তোয়াজ করে সেহেতু ভারতও তা করতে বাধ্য। কিন্তু এ ধারণা ভুল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ও দম্ভের কাছে ভারত মাথা নীচু করবে কেন? যে কোন দেশের কাছ থেকে বিমান ক্রয়ের ক্ষমতা ভারতের আছে।

সুতরাং ঘটনাগুলির পারম্পর্য বিচার করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কাশ্মীর সমস্যা ক্রমাগত জটিল রূপ ধারণ করছে। কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতালিপ্সু পশ্চিমী মহল যাতে না আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে সেদিকে তীক্ষ্ম লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

বিনীত নমস্কারান্তে—
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
শিবপুর, হাওড়া।

॥ সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ॥

আগ্রহীর কাছে সত্যজিৎ রায়ের নবতম চিত্র-নিবেদন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র প্রথম প্রকাশের উত্তেজনা কিছুটা স্তিমিত হবার পর এই চিত্রটি সম্পর্কে আমার

সামান্য কিছু বক্তব্য উপস্থিত করার সুযোগ নিচ্ছি। অন্যের মধ্যে এই বক্তব্য কিছুটা সাড়া জাগাতে পারলেই এর সার্থকতা।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র গল্পটি গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে দার্জিলিংয়ের শৈলনিবাসের বহি-র্দৃশ্যে— অবসরযাপনকারীদের ভ্রমণ-ক্ষেত্রের প্রান্তে প্রান্তে, উন্নত গিরিরাজির বক্ষোলগ্ন মসৃণ পথে পথে। রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথের দুই কন্যা, চিন্তাশূন্যে লঘুচিত্ত পুত্র, ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীনতাহীন, বিষাদস্পৃষ্ট স্ত্রী, বিপত্নীক আপাততঃ সরল শ্যালক এবং একটি ভাবী জামাতা ও প্রায়-অপরিচিত একটি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকার যুবককে নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে। একটি বৈকালিক ভ্রমণের গৃহাভ্যন্তরস্থ উদ্যোগ থেকে শুরু করে প্রমোদক্ষেত্রে ভ্রমণের পর আবার গৃহাভিমুখে ফেরার মধ্যে— একটি বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়ে কাহিনী সীমাবদ্ধ। দর্শকের সামনে চিত্রটির স্বল্প দৈর্ঘ্য উপস্থিত হতে যত সময় লেগেছে তার থেকেও অল্প সময় লেগেছে চিত্রটির আসল কাহিনী গড়ে উঠতে, কারণ, আমরা ধরে নিতে পারি, যদিও চিত্রে পৃথক পৃথকভাবে খণ্ড কাহিনী সূত্র-গুলি উপস্থাপিত হয়েছে, তবুও সেগুলির বেশ কয়েকটি বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে যুগপৎভাবে।

কাহিনীকার এবং চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসাবে সত্যজিৎ রায় এই খণ্ড সূত্র-গুলির নিপুণ গ্রন্থনা সম্পাদন করেছেন একদিকে ব্যক্তি-চরিত্র ইন্দ্রনাথের এবং অপর দিকে স্থান বা পরিবেশের কেন্দ্রগত সংস্থাপনার দ্বারা। স্থান ও কালের যে দৃঢ়বদ্ধ ঐক্যসংস্থাপন গ্রীক নাটকের একটি অবশ্য-পালনীয় শিল্পগত সর্ত তা বাংলা চলচ্চিত্রে আমরা সার্থক-ভাবে প্রযুক্ত হতে দেখলাম সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য়। কিন্তু গ্রীক নাটকের আর একটি শিল্প-সর্ত যে কাহিনীগত কার্য-ঐক্য তা এই চিত্রে খণ্ডিত করা হয়েছে ইন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা-জামাতা উপকাহিনীর প্রক্ষেপের দ্বারা। যদিও মূলে কাহিনীকে পরিস্ফুট করার জন্যে উপকাহিনীর বাণীগত বৈপরীত্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে বিশেষভাবে, তবুও উপকাহিনীর প্রাধান্যের জন্যে মূলকাহিনী (ইন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী মনীষার বিবাহ-ব্যাপার নির্দিষ্ট হওয়া) অনেক নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এবং এইখান থেকেই শিল্পগত অনেক জিজ্ঞাসা উৎসারিত হয়েছে।

এইখানেই প্রশ্ন ওঠে গ্রীক নাটকের উক্ত-প্রকার গঠনগত বৈশিষ্ট্য কি চলচ্চিত্রেও শিরোধার্য?

আমরা জানি চলচ্চিত্রকে (moving picture) অবশ্যই 'moving' হতে হবে। এই 'moving' কথাটা স্থূলে অর্থে ধরলে চলবে না; একে মুড, সেণ্টিমেণ্ট, ফিলিং, ইমাজিনেশন প্রভৃতি হৃদয়-ব্যাপার সম্পর্কে চিত্রের নিজের পক্ষে এবং দর্শকের পক্ষে ধরতে হবে। সেই অর্থে গ্রীক নাটকও 'moving' ছিল। কিন্তু তা হওয়া সম্ভব হয়েছিল নাটকায়িত জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা এবং গভীরতার দ্বারা। এর দ্বারাই গ্রীক নাটকের এই ঐক্যরক্ষার সীমাবদ্ধতা নাটকে এবং দর্শকের হৃদয়ে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে-ওঠা রসাস্বাদনের কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। পরবর্তী কালের নাটকে অবশ্য এই বাহ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণ এই ঐক্য সংস্থাপনের নীতিকে রসসৃষ্টির প্রয়োজনে বিশেষ সম্মান করা হয়নি। এবং আধুনিক কালে এই ধারাটি চলচ্চিত্রের মধ্যে এসে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে। তাই এখানে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় সত্যজিৎ রায় স্বেচ্ছায় যে সীমাবদ্ধতাকে বরণ করেছেন, আমাদের পরম আস্বাদনের জন্যে তাকে কি রসের সাগরে ডুবিয়ে দিতে পেরেছেন? এর স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি। কারণ এই সুকঠিন লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে ঐ সীমাবদ্ধতার মধ্যেই জীবন-সংগ্রামের যে তীব্রতা এবং গভীরতাকে প্রকাশ করা প্রয়োজন তিনি তা (করতে ব্যর্থ হয়েছেন না বলে বলব) করেননি।

বৃটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে আমাদের সমাজে যে একটি বৃটিশ ঐতিহ্যমুগ্ধ, স্বাচ্ছন্দ্যপুষ্ট শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে, তাকে দেশের পনের আনা লোকের জীবন-প্রত্যয় ও ভঙ্গীর দিক থেকে যতই দূরস্থিত এবং লঘু মনে করা হোক না কেন, তারও বিশেষ প্রত্যয় ও ভঙ্গীপূর্ণ জীবন-সমস্যা আছে। এই শ্রেণীকে প্রকাশ করা বা তার প্রতিভূ কাউকে চিত্রিত করা মানে মূলতঃ তার সমস্যার তীব্রতা এবং গভীরতাকে প্রকাশ করা এবং এইটে সার্থকভাবে করতে পারলেই তার প্রত্যয় ও ভঙ্গী সমেত তার সমগ্র জীবনের মর্ম উদ্ঘাটিত হয়। রচনার এখানে-ওখানে শুধু কিছু প্রত্যয় ও ভঙ্গীর প্রলেপ লাগালে গভীর জীবন-সমস্যা প্রতিফলিত হয় না। জীবনের (তা সে যে জীবনেরই হোক) বাহ্য এবং আন্তর রূপটিকে একটি সৃষ্টির মধ্যে ধরতে পারেন, তখন সেই বিশেষ জীবনগত প্রত্যয় ও ভঙ্গীও স্রষ্টার প্রতিভার স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দেখা যায়। জগতের সমস্ত মহৎ সাহিত্যের মধ্যে এই ব্যাপারটি ঘটেছে দেখা গেছে; প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টা ভিন্ন জীবন-কোটির মানুষ হলেও তাঁর সৃষ্টি তাঁকে দিয়ে একটি বিশেষ জীবনের অন্তর-বাহিরের পূর্ণ রূপটাই পরিস্ফুট করিয়ে নিয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে স্রষ্টা যে প্রধান সর্তটিকে আবশ্যিকভাবে স্বীকার করেছেন তা হচ্ছে ক্ষুদ্রের মধ্যেও বৃহৎ, আপাতের মধ্যেও গভীরকে দেখবার এবং দেখাবার ইচ্ছা এবং শক্তি। চলচ্চিত্রের এই আলোচনায় সাহিত্যের তত্ত্বের এই নজির তোলার সাহস করেছি যেহেতু আজকের দিনে চলচ্চিত্র হচ্ছে সক্রিয় চিত্র ও শব্দের দ্বারা লেখা একটি পূর্ণতর সাহিত্য। এখন প্রশ্ন এই যে, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় সত্যজিৎ রায় যে জীবনকে রূপায়িত করেছেন তার গভীর জীবন-সত্যের কোন বিস্ময়জনক, মহিমান্বিত ও সমুন্নত রূপটি অনুভূতির আন্তরিক স্পর্শে পরিস্ফুট হয়েছে? আমার মনে হয়েছে তিনি এখানে একটি বিশেষ জীবনের কিছু সুব্যক্ত প্রত্যয় ও বাহুল্য-পূর্ণ ভঙ্গী (এটাও বোধহয় তাঁর নিজের সাফাই—পরিবেশ-প্রসূত) ছাড়া কোন গভীরতর তাৎপর্যকে প্রত্যক্ষীভূত বা ইঙ্গিত-নির্দিষ্ট করতে পারেননি। তা করাবার যে তাঁর শক্তির অভাব ছিল এমন কথা 'পথের পাঁচালী', 'অপুর সংসার', 'জলসাঘর' ও 'দেবী'র স্রষ্টা সম্বন্ধে চিন্তা করা নিতান্ত অযৌক্তিক। তাহলে বুঝতে হবে এখানে পূর্বোক্ত ফললাভ হয়েছে অন্যতর কারণের প্রভাবে। জীবনকে গভীরভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছা এবং সুযোগের অভাবেই তাঁর সৃষ্টি রসবেদনের চূড়াকে স্পর্শ করতে পারেনি। ইচ্ছা এবং সুযোগের অভাব পরস্পরের সঙ্গে কার্যকারণগতভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাঁর এই সৃষ্টির দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে দেয়নি। দেহ গড়া হয়েছে, আয়োজন হয়েছে প্রচুর, অলংকারের ঘাটতি হয়নি কোথাও, কিন্তু শিল্পীর হাতে মাটির ঠাকুর প্রাণ পেয়ে প্রতিমা হয়ে উঠল না। সত্যজিৎ রায় এখানে বিষয়বস্তুর বাহ্যচটক ও রূপগত বাহ্যতার দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন। তার জন্যে situation-কে তিনি বাধ্য হয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শুধু সংলাপের সাহায্যে খেলিয়েছেন, তার গভীরে গিয়ে মানবজীবনের অন্তর্লীন প্রবাহকে ধরেননি—যেখানে বাক্যের

চেয়েও অবাচ্য হয় ব্যঞ্জিত। তিনি যে খণ্ডতাময় গল্প এবং তাকে প্রকাশ করার যে অধীর ও অতিধাবমান পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন, সেইজন্যে কোথাও তিনি গভীরে প্রবেশ করার অবসর পাননি। তবুও গল্পসূত্রের খণ্ডতার মধ্যে মধ্যে যে অবকাশ ছিল তাকেও তিনি সেই কাজে ব্যয় না করে কাহিনীসূত্রে প্রায়-অপ্রয়োজনীয় কিছু ইডিওসিনক্রেসী, ব্যক্তি-বিশেষকে পরিস্ফুট করার জন্যে (ক্রিয়ার দ্বারা নয়) কিছু দীর্ঘ বক্তৃতা, রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা-জামাতার মধ্যে অতীত কাহিনীসূত্রকে ইনট্রোডিউস করার জন্যে কিছু স্টেটমেণ্ট, ভাবী জামাতা চরিত্রের কিছু একতরফা ভারবোসিটি, সাধারণ বস্তাপচা বাংলা চলচ্চিত্রের কিছু সেণ্টিমেণ্টাল 'হিরো'-পনা ও রসাবেদনের পূর্ণতা সম্পাদনে অপারগ মনীষা-চরিত্রের অস্পষ্টতাকে ইতস্ততঃ বিন্যস্ত করেছেন; কিন্তু এ-সব কিছু মিলে দর্শক একটা পূর্ণ অনুভূতিগত অভিজ্ঞতার আস্বাদ পায় না। কাহিনীর সূত্রকে শুধুমাত্র পরিস্ফুট করার একটা আপাতঃ চটকদার বিসিনেস-এর মধ্যেই এখানে পরিচালক নিজেকে সব সময় ব্যস্ত রেখেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু যেমন কোন একটি জীবনের কাহিনীর চুম্বক পাঠ করা এক জিনিস আর সেই কাহিনীর ওপর গড়ে-ওঠা শিল্পবস্তুর রসরূপকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা ভিন্নতর অভিজ্ঞতা; তেমনই 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়' আমরা যা দেখেছি তা একটি 'কাঠামো'র স্তর থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি; এতে স্রষ্টার 'খসড়া' আছে, কিন্তু তা পূর্ণতর সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি।

অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে রায়বাহাদুরের স্ত্রীর জীবন-বেদনার মধ্যে দিয়ে পরিচালক একটি গভীরতা স্পর্শ করেছিলেন। কিন্তু সেই গভীরতাকে পরিচালক অন্য কোথাও—কি সামগ্রিকভাবে কি খণ্ডভাবে প্রত্যক্ষী-ভূত করাতে পারেননি। এ ত্রুটি কার? কাহিনীকার, চিত্রনাট্য-রচয়িতা অথবা পরিচালকের? যারই হোক, যেহেতু এখানে সত্যজিৎ রায় নিজেই এই তিনটি ভূমিকার দায়িত্ব নিয়েছেন, অতএব তিনি যদি মনে করতেন সমগ্র প্রশ্নটিকে এদিক থেকে ভেবে দেখবার মত কিছু ছিল, তবে হয়ত তাঁর এই তিনটি সত্তাকে একত্র করে একটি কেন্দ্রগত দৃষ্টির দ্বারা তিনি এই সমস্যার একটা কিছু সমাধান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এই প্রশ্নটিকে না দেখলে বা ছোট করে দেখলেও, আমার মনে হয়েছে মূলতঃ এইখানেই তার সাফল্য-অসাফল্য নির্ভরশীল হয়েছে।

আর একটি কথা। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র কাহিনীগত 'হিউম্যান এলিমেণ্ট'এর ওপর ক্যামেরার চোখ বেশিক্ষণ আবদ্ধ থাকলেও, দর্শক কি তার অভিনিবেশকে বেশিক্ষণ এই উপাদানের ওপর নিবদ্ধ রাখতে পেরেছে? যদিও সত্যজিৎ রায় পরিবেশকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখেছেন, তবু সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন দর্শক ক্ষণে ক্ষণেই ঐ কাহিনীগত মানবীয় উপাদানের ওপর বিরক্ত না হয়ে পারেনি। অথচ পরিবেশের দিকে সে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছে। তার কারণ মানবীয় উপাদানের ওপর দর্শকের আগ্রহকে জাগ্রত রাখার পক্ষে উপযুক্ত যে সক্রিয় জীবনলীলার অভাব সে লক্ষ্য করেছে, তা কিন্তু সুপরিস্ফুট হয়েছে পরিবেশের ক্ষুদ্র-বৃহৎ আয়োজনের মধ্যে—আসন্ন সন্ধ্যায় অশ্বতর দলের ঘণ্টাধ্বনিমুখরিত উৎকণ্ঠিত গৃহপ্রত্যাগমন, পর্বতিয়া অনাথ বালকের ভিক্ষাবৃত্তি এবং তার স্বচ্ছন্দ আবেগমথিত গান, পক্ষীকূজিত উন্নত বৃক্ষশ্রেণী, পশ্চাৎপটের লোক-জীবনযাত্রা প্রভৃতির মধ্যে।

তবুও মনে রাখতে হবে ঘূর্ণায়মান এবং আবরণ রচনাশীল কুয়াশা বা মেঘের এবং দীর্ঘ পাইন জাতীয় বৃক্ষের কিছু নয়নাভিরাম দৃশ্য ছাড়া অন্য প্রকারের প্রকৃতির বহির্দৃশ্যের সাক্ষাৎ এ চিত্রে মেলেনি। সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র হিমালয়ের মধ্যে সেই বহু-প্রথিত 'rugged and sublime beauty' নেই। এ-চিত্রের প্রকৃতি মানুষের দ্বারা 'trimmed' (আমরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পর্বতের বুকে মানুষের তৈরী রাস্তা এবং আধুনিক পূজার মণ্ডপসজ্জায় যে কৃত্রিম পাহাড়ী পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার বৃহৎ সংস্করণকেই যেন দার্জিলিং-এর পটভূমি বলে ভাবতে শিখেছি)। যদিও কাহিনীর একটি খণ্ডের প্রতিনায়কের (যদি বলা যায়) সস্তা সেণ্টিমেণ্টালিজমের সাফাই হিসেবে হিমালয়ের যে বিরাটত্ব এবং মহত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, এবং চিত্রের মধ্যে আমরা হিমালয়ের প্রতি প্রযুক্ত সেই ইঙ্গিতের বিশেষ কোন বাস্তব ভিত্তি পাইনি; জানিনা উল্লিখিত চরিত্র এবং অন্যান্যেরা এই অভিজ্ঞতা কেমন করে সংগ্রহ করল? কেননা চরিত্রের অভিজ্ঞতাকে দর্শকের সামনে হাজির করে দর্শকের অভিজ্ঞতার রাজ্যে স্থান করে দিতে হবে—এ ধরণের শিল্পবস্তুর এটা ত' একটি প্রাথমিক সর্ত। এই চিত্রে আমরা যে প্রকৃতিকে দেখেছি তার মধ্যে বাস্তবিকই বেশীর ভাগ আছে ইন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা-পড়া রূপ—দার্জিলিংয়ের শৈল-শহরের সেই ইংরাজ নির্মাতার কর-স্পর্শ বড় বেশী প্রাধান্য পেয়েছে এই চিত্রে। কিন্তু ইন্দ্রনাথের দৃষ্টি আর ঐ বেকার শিক্ষিত যুবকের দৃষ্টি এক না হলেও সেই যুবকের দৃষ্টির অনুরূপ ভিন্নতর প্রকৃতিকে আমরা বিশেষ জানলুম না এ-চিত্রে। অথচ সে তেমন প্রকৃতিরই প্রভাবের ইঙ্গিত করেছে।

তাই দেখা যাচ্ছে এই চিত্রে 'কী বলব'র চেয়ে 'কেমন করে বলব'র ওপর অর্থাৎ বিষয়ের থেকে পদ্ধতির ওপর জোর পড়েছে বেশী। কিন্তু একথা ত' সর্বস্বীকৃত যে, মূর্তি ও মূর্ত যেখানে সুষ্ঠু পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে সেইখানেই সৃষ্টির চরম সার্থকতা।

তাহলে কি 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়' সত্যজিৎ রায় যে পরীক্ষা চালালেন তা স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী কোন মহৎ সৃষ্টির ভূমিকা রচনা করল শুধু?

বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়,
কলিকাতা—৩৮।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ বারো ॥

পাশের বেডের মেয়েটি আলাপ করছিল।

—আপনাকে আরো কিছুদিন থাকতে হবে—তাই না?

একটু আগেই ড্রেস করে দিয়ে গেছে, শরীরের নানা জায়গায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। তবু দীপ্তি ছাদের দিক থেকে শূন্য দৃষ্টিটা নামিয়ে মেয়েটির দিকে তাকালো।

খুশিতে ভরা ছোটখাটো একটি মুখ। দীপ্তির বয়সীই হয়তো হবে, কিন্তু রোগা আর বেঁটে ধরণের বলে পনেরো-ষোল বছরের কিশোরীর মতো দেখায়। মেয়েটির নাম কল্পনা। স্বামীর জন্যে স্টোভে খাবার তৈরী করতে গিয়ে শাড়ীতে আগুন ধরিয়ে ছিল। বাঁ দিকের পাঁজরায় খানিকটা ঝলসে গিয়েছিল—স্বামী কাছাকাছি থাকায় অল্পের উপর দিয়েই রক্ষা পেয়েছে। আরো ভাগ্যের কথা, গাল, মুখ পুড়ে কোথাও বিকৃত হয়ে যায়নি। সেটা মৃত্যুর চাইতেও ভয়ংকর হত।

প্রায় তিন সপ্তাহ আগে এসেছিল কল্পনা। আজ চলে যাবে।

—আপনাকে আরো কিছুদিন থাকতে হবে তাই না?

—এ'রা বলছেন, আরো দিন কুড়িক।

—তা হোক, খুব বেঁচে গেছেন।—মেয়েটি কি ভেবে শিউরে উঠল: যা দিনকাল পড়েছে। মেয়েদের পেটের ধান্দায় পথে বেরুতেই হচ্ছে, কিন্তু বেরুলেও রক্ষা নেই। আপনার মতো সুন্দরী হলে, কিংবা দেখতে-শুনতে একটু ভালো হলে কত নোংরামোই যে সইতে হয়! রকবাজ অসভ্য ছেলে তো আছেই—দু-চারজন পাকা চুলো বুড়ো-মানুষও এমন ব্যবহার করে কী বলব!—কল্পনার মুখ রাঙা হয়ে উঠল: যখন কলেজে যেতুম, তখন এক বুড়ো ভদ্র-লোক—দিব্যি পাকা আমের মতো টুকটুকে চেহারা, পাশ দিয়ে যেতে যেতে ফিসফিস করে যাচ্ছেতাই কথা বলে চলে যেত। আর কেউ দেখলেও বুঝতে পারত না। সেই বুড়োর জ্বালায় অন্য রাস্তা দিয়ে আধ মাইল ঘুরে কলেজে যেতুম আমি।

—একদিন পায়ের চটি খুলে দু ঘা বসিয়ে দিলেই তো পারতেন।

—ছি-ছি, ঠাকুর্দার বয়েসী লোক—পারা যায় ও সব?

এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পেলো দীপ্তির। বয়েস। ও কথাটাকে সে আর বিশ্বাস করে না। জীবনের বাঁকা রাস্তাটায় বাঁক নেবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষকে সে অন্যভাবে দেখতে শিখেছে। চৌরঙ্গীর সেই হোটেলটাতে যারা তার 'পেট্রন' হয়ে দেখা দিয়েছে, তারা সবাই তরুণ নয়। বরঞ্চ বয়েস যাদের অল্প, তারা কিছু শ্রদ্ধা দেখিয়েছে, মুগ্ধ গলায় ভালোবাসার কথা শুনিয়েছে, কবিতা আবৃত্তি করেছে। একটি বিদেশী ছেলে শুধু দু ঘন্টা ধরে তার ছবি এঁকেছে, তার বেশি কোনো দাবি করেনি। কিন্তু যারা প্রৌঢ়, যাদের অনেকের ঘর-সংসার আছে—তারা টাকার দামটাই মিটিয়ে নিতে চেয়েছে, সম্মানের প্রশ্ন তাদের কাছে অবান্তর। এখন মাথায় পাকা চুল দেখলেই মন আর ভক্তিতে দুলে ওঠে না। দীপ্তি মানুষকে দেখেছে।

কল্পনা কথা বলছে, এতক্ষণে খেয়াল হল দীপ্তির।

—আপনি তো চাকরি করেন—তাই না?

হাজারবার বলা মিথ্যে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল দীপ্তি: হ্যাঁ, একটা মার্চেন্ট অফিসে।

—আমাদের সংসার ছোট—কল্পনা আবার নিজের কথায় ফিরে গেল: শাশুড়ী, আমরা দুজন আর আমার চার বছরের মেয়েটা। কিন্তু কুলোয় না ভাই। ও'র মাইনে তো বেশি নয়—মাসের শেষ সাতটা দিন যে কিভাবে কাটে সে আর বলবার নয়। এই ক'জন তো মানুষ, কিন্তু বাজারে রোজ তিনটে-চারটে টাকা খরচ। বেগুনের সের চৌদ্দ আনা, পটোল এক টাকা, মাছ সাড়ে তিন টাকা চার টাকা—বলুন দেখি, পারা যায়? আমি মাঝে মাঝে বলি, আই-এটা তো পাশ করেছি, কোথাও একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা করি। উনি কিছুতেই রাজী হন না। বলেন, তুমি যেদিন চাকরি করতে যাবে, আমি সেদিনই চাকরি ছেড়ে দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে

ঢুকব—ডিভিশন অফ লেবার। দেখুন তো, কী পাগলামো!

ভাগ্যবতী স্ত্রী—দীপ্তি ভাবল। একটি চেনা মেয়ের কথা মনে পড়ল তার। তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মা, ভাঙনলাগা অসুস্থ শরীর। চল্লিশ না পঞ্চাশ টাকায় কী সামান্য একটা চাকরি করত। একদিন বলেছিল, 'আমি আর সিঁড়ি বেয়ে অফিসের দোতলায় উঠতে পারি না, হাঁটু ভেঙে আসে—বুক ধড়ফড় করে। এক মাসের ছুটি চাইব।' স্বামী শিউরে উঠে উত্তরে বলেছিল, 'না-না— টেম্পোরারি চাকরি—ছুটি চাইলে হয়তো একেবারেই ছাঁটাই করে দেবে। তখন চলবে কি করে?

এ-ই আজকের জীবন। স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা—বাঁচবার প্রকাণ্ড একটা জাঁতার তলায় সব পিষে একাকার হয়ে যাচ্ছে। চাকুরি মেয়ে বিয়ে করতে চাইলে মধ্যবিত্ত বাপ-মা এখন হাহাকার করে ওঠে। দুর্ঘটনায় ছেলে মারা যাবার পর তার ইনসিয়োরেন্স আর ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে মা-বাপ, পুত্রবধূর ভেতরে পাড়া-কাঁপানো একটা কুৎসিত ঝগড়ার ছবি ভাসছে চোখের সামনে। সন্দেহ নেই, কল্পনা সুখী।

খুশিতে ঝকঝক করছে মেয়েটির মুখ। স্বামী তাকে চাকরি করতে দেয় না বলে অভিমানের চিহ্ন কোথাও ফুটে ওঠেনি সেখানে। একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব, খানিকটা স্নিগ্ধ পরিতৃপ্তি। দীপ্তির শরীরের ড্রেস করা জায়গাগুলোতে আবার নতুনভাবে জ্বালা করতে লাগল। এই মেয়েটাকে তার হিংসে হচ্ছে।

কল্পনা বলে চলেছে, উনি বলছেন—আর আমায় রাঁধতে দেবেন না, এবার কুড়ি-পঁচিশ যা হোক দিয়ে রান্নার লোক রাখবেন। দেখুন দেখি—এতেই কত কষ্টে চলে তার ওপর—

কল্পনার কথা শেষ হল না। মাথায় লাল রিবন, গায়ে টুকটুকে লাল ফ্রক—একটি ছোট্ট মেয়ে ছুটে এল ঘরে।

—মা-মা— তোমায় আমরা নিতে এসেছি। বাপী এসেছে, ঠাকুমা এসেছে—

দু হাত বাড়িয়ে কল্পনা মেয়েকে বুকের ভেতর টেনে নিলে।

দীপ্তি চোখের পাতা দুটো জোর করে বুজিয়ে ফেলল। সে আর ওদের দিকে চাইতে পারছে না।

শাশুড়ী কথা বলছেন, স্বামী কথা কইছেন—ছোট মেয়েটি কলধ্বনি তুলছে। ওদের সব কথা শুনতে পাচ্ছে দীপ্তি, কিন্তু একটা বর্ণও যেন বুঝতে পারছে না। সব যেন যন্ত্রণার ঘূর্ণির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। এই হাসপাতাল থেকে যেদিন সে ছাড়া পাবে, সেদিন কে নিতে আসবে তাকে? কেউ আসবে কি?

কেউ আসবে না। আবার একা সেই অন্ধকার পথ। যে অন্ধকারে মানুষ মানুষের মাংস ছিঁড়ে খায়—শুধু গুণ্ডারা দয়া করে ছেড়ে দেয়—সেই পথ। চৌরঙ্গীর অনেক আলোর পেছনে যে রাত কখনো ভোর হয় না— আবার তাকে সেই রাতের ভেতর দিয়ে একা চলতে হবে।

অথচ আর একটু এগিয়ে যেতে পারত দীপ্তি। সেই টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে উদ্বাস্তু পল্লী। বাড়ীর দুঃখী বৌটির কপালেও সিঁদুরটা কি অদ্ভুত জ্বলজ্বল করছে। দাওয়া নিকোতে নিকোতে উঠে এসেছিল, সারা গায়ে তার মাটির গন্ধ। এনামেলের বাটিতে করে খেতে দিয়েছিল মুড়ি আর পাটালী গুড়। দীপ্তি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল, ছোট্ট জমিটুকুতে দুটো কলা গাছে কাঁদি ঝুলছে, হাওয়ায় উড়ছে সজনে ফুল আর ছোট উঠোনটার ওপাশে তুলসীর বেদীর ওপর ঝারি থেকে টুপ-টুপ টিপ-টিপ করে জল পড়ছে—জল পড়ছে!

ওই রকম—অতটুকু জীবনেও সূর্য ওঠে। ফোটে দোপাটি, ফোটে সন্ধ্যামালতী। আর যে অন্ধকারে তার বাস, সেখানে চড়া বিদ্যুতের আলোয় মাথার প্লাসটিকের ফুলগুলো মড়ার দাঁতের মতো চকচক করে।

অমনি একটা উদ্বাস্তু পল্লীতেও কি জায়গা হত না দীপ্তির? সেও কি দাওয়া নিকোতে পারত না—ঝারি দুলিয়ে দিতে পারত না তুলসীমঞ্চের ওপর।

কিন্তু আর উপায় নেই। ওপথ তার বন্ধ হয়ে গেছে। যে ইহুদী মেয়েটা শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গিয়ে চারতলার ছাদ থেকে সোজা নীচের রাস্তায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, তারই মতো একটা পরিণাম হয়তো অপেক্ষা করছে তারও জন্যে।

দীপ্তিকে অনেক টাকা রোজগার করতে হবে। বাবার জন্যে, মা-র জন্যে, সংসারের জন্যে।

কার একটা আলগা ছোঁয়া গায়ে লাগল। চমকে চোখ মেলল দীপ্তি। কল্পনা।

সেই খুশিতে ঝকঝকে মুখ। এরও কপালে যে এত বড় সিঁদুরের একটা ফোঁটা জ্বলছে, এতদিন পরে প্রথম যেন দীপ্তি সেটাকে দেখতে পেলো, চোখে যেন একটা খোঁচা লাগল তার।

—আসি ভাই তা হলে।

—আচ্ছা, আসুন।

—আশা করি, খুব শিগগীরই ভালো হয়ে উঠবেন।

—জানি না।

—মন খারাপ করবেন না ভাই—বাঙালির ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মানোই পাপ। তার ঘরে শত্রু, বাইরে শনি। —কল্পনা দীপ্তির কানের কাছে মুখ নামিয়ে আনল: আর পারেন তো বেরিয়েই মনের মতো কাউকে বিয়ে করে ফেলবেন। এত রূপ নিয়ে পথেঘাটে এভাবে চলাফেরা ভালো নয়।

ছোট মেয়েটির আকুল গলা শোনা গেল: মা—কত দেরী করবে আর? বাপী যে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে।

—আঃ, দাঁড়া না বাপু একটু। দেখুন না, একটুও তর সইছে না। চলি ভাই তাহলে, নমস্কার।

—নমস্কার।

কয়েক জোড়া জুতোর শব্দ বেরিয়ে গেল বাইরে। দীপ্তি আবার চোখ বুজল।

এত রূপ নিয়ে বাইরে বেশি চলাফেরা ভালো নয়—তাই বটে! সমুদ্রে যে ডুবেছে, তার শিশিরের ভয়! কল্পনা তার সত্যিকারের চেহারাটা কল্পনাও করতে পারেনি। যদি এতটুকুও বুঝতে পারত, তাহলে উপদেশ দেওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় একটা কথা পর্যন্ত বলত না তার সঙ্গে।

আচ্ছা, দীপ্তি যদি আত্মহত্যা করে? যদি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা চলন্ত ট্রামের সামনে? কী ক্ষতি হয়? কিছুই না। শুধু কিছুক্ষণের জন্যে রাস্তার গাড়ী চলা বন্ধ হয়ে যাবে, শুধু ঘণ্টাখানেকের জন্যে রাস্তায় ভিড় জমবে, ব্যাস—ওই পর্যন্তই। কাল হয়তো কাগজের পাতায় এক টুকরো খবর—সেই ইহুদী মেয়েটির মৃত্যুর বিবরণ যতটুকু জায়গা নিয়েছিল, ততটুকুই। পরশু থেকে সে কথা আর কারো মনে থাকবে না।

সেই উদ্বাস্তু পাড়ার পথটা যদি পেতো দীপ্তি। যদি কল্পনার মতো—

অসম্ভব।

চোখ বন্ধ করেও পড়ে থাকা যায় না।

ঘরে বিকেলের ছায়া নেমেছে। রোগীদের কাতরানি, নার্সের এবং ঝিদের আসা-যাওয়া, ডাক্তারের দুটো একটা কথা—এই বাঁধা নিয়মে ছেদ পড়েছে এখন। অনেক অচেনা মানুষের গলার আওয়াজ। ওষুধের চেনা গন্ধকে ছাপিয়ে টাটকা ফুলের গন্ধ উঠছে। ভিজিটিং আওয়ার।

কল্পনার বেডটা খালি। ওর স্বামী আর ওর জন্যে ফল নিয়ে আসবে না। দীপ্তির মনে আগুন ধরিয়ে, আকুল হয়ে কল্পনা জানতে চাইবে না : তুমি পেট ভরে খাও তো? জামা-কাপড় খুঁজে পাও তো ঠিক মতো? খুকু বেশি কান্নাকাটি করে না তো?

কিন্তু ও বেড খালি থাকবে না। আবার হয়তো কেউ এসে হাজির হবে স্টোভে কিংবা উনুনে গা পুড়িয়ে, কিংবা এসে আশ্রয় নেবে দীপ্তির মতো আর কেউ—যার গায়ে বোমার টুকরো বিঁধে আছে, অথবা মুখের অর্ধেকটা অ্যাসিডে পুড়ে বিকৃত আর বীভৎস হয়ে গেছে।

—কেমন আছো দীপ্তি?

প্রভাত সরকার। তারও হাতে এক-গুচ্ছ রজনীগন্ধা, আর একখানা বাংলা উপন্যাস।

—তিনদিন পরে মনে পড়ল প্রভাতদা?

—পরের চাকরি— বড়োলোকের মোটর ড্রাইভার। —প্রভাত চেয়ারটা টেনে নিয়ে পাশে বসল : জানোই তো আমার অবস্থা। কর্তা যদি ছাড়েন, গিন্নীর দরকার পড়ে। আর নইলে মিসিবাবা তো আছেনই। —মুখটা বিকৃত করল একটু : মেয়েটার বোধ হয় মাথায় একটু ছিট আছে—মাঝে মাঝে এত বিরক্ত লাগে যে কী বলব। সে যাক—। তা কর্তা তিন চার দিনের জন্যে বাইরে গেছেন, আর মা মেয়েরও কী মতিগতি হল, চারটের পরেই গাড়ী তুলে দিতে বললেন। ভাবলুম, আজ তো একটু সময় আছে, তোমাকে দেখে যাই।

—আমার বরাত। —দীপ্তি শীর্ণ-ভাবে একটু হাসল : এই মিসিবাবাটি বুঝি খুব সুন্দর দেখতে—না প্রভাতদা!

নিরীহ একটা প্রশ্ন। যে কোনো মেয়েই অন্য মেয়ের সম্পর্কে এমনি করে অকারণে কৌতূহল প্রকাশ করে। কিন্তু প্রভাতের মুখের রঙ বদলালো সঙ্গে সঙ্গে।

—ভেবে দেখিনি কখনো।

—তোমার সঙ্গেই একাই বেড়াতে বেরোয়?

এ-ও সেই অকারণ নিরীহ কৌতূহল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা ক্রুদ্ধ বিরক্তির উচ্ছ্বাস প্রভাতের মাথার ভেতরে ফেটে পড়ল। কটু গলায় বলে ফেলল : তাতে কী আসে যায়? তোমাদের মন আশ্চর্য নোংরা!

বলেই লজ্জিত হল প্রভাত আর নিমেষে নিবে গেল দীপ্তি।

—আমায় মাপ করো প্রভাতদা, কিছু ভেবে বলিনি। —দীপ্তির গলা কান্নার মতো শোনালো।

লজ্জায় আর অনুতাপে মরমে মরে গিয়ে প্রভাত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। নানা কারণেই সে কদিন ধরে বিস্বাদ আর বিরক্ত হয়ে আছে, কিন্তু তাই বলে দীপ্তিকে এমনভাবে একটা কটু কথা বলবার চিন্তা তার কোথাও ছিল না। হঠাৎ কেন সে এমনভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল, এই কথাটাকে কে বার করে আনল তার মুখ দিয়ে?

প্রভাত ফুল আর বইখানা টেবিলের ওপর নামিয়ে একখানা হাত রাখল দীপ্তির মাথায়। দীপ্তির ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ডান হাতখানা অসহায়ভাবে পড়ে আছে এক পাশে, ডান পা-টাও সে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে পারে না। ডানদিকের গালেও একটা স্টিকিং প্লাসটার—সব মিলিয়ে একটা করুণ অসহায়তার ছবি। চোখ থেকে জলের ফোঁটা গড়িয়ে আসছে প্লাসটারটার দিকে। ব্যাকুল হয়ে প্রভাত বললে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে দীপ্তি —কিছু মনে কোরো না। হঠাৎ বলে ফেলেছি।

—কিছু অন্যায় হয়নি প্রভাতদা।—বাঁ হাতটা তুলে দীপ্তি চোখের জল মুছে ফেলল : ঠিকই বলেছ। আমি যে কত নোংরা—সে কথা আমার চাইতে বেশি করে কে জানে।

—আর একবার ও কথা বললে আমি এখুনি চলে যাব দীপ্তি।

দীপ্তি চুপ করে রইল। প্রভাতের আনা রজনীগন্ধার গুচ্ছটা একটা সৌরভের আবরণ রচনা করছে দুজনকে ঘিরে ঘিরে। অন্য বেডের রোগিণী-

দের আত্মীয়স্বজনের আলাপ-আলোচনা ভেসে আসছে টুকরো টুকরো হয়ে। প্রভাত ভাবছে, দীপ্তিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আরো কিছু ভালো! করে বলা দরকার—কিন্তু একটা কথাও মনে আসছে না। ঘরের ভেতর এই বিকেলের ছায়ায় মনে আসছে ডায়মণ্ডহারবার রোডের ধারে সেই মাঠ, যেখানে আকাশের লাল আলো রিনির কপালে এক মুঠো সিঁদুরের মতো ছড়িয়ে গেছে। না—রিনি নয়, ওদের কপালে সিঁদুর মানায় না। তৃপ্তি হলে—

প্রভাতই আবার কথা শুরু করল।

চলি ভাই তাহলে নমস্কার

—বাড়ী থেকে দেখতে আসে না?

ডান হাতটা একটুখানি সরাতে গিয়ে দীপ্তির মুখে যন্ত্রণার রেখা ফুটল। জবাব দিল একটু পরে।

—বাবার তো ক'দিন ধরে বাতটা খুব বেশি বেড়েছে। মা-ও আসতে পারে না বাবাকে ফেলে। তৃপ্তি আর অমিয়ই রোজ আসে।

—তোমাকে কবে ছাড়বে?

—বলছে আরো প্রায় হপ্তা তিনেক।

—তা হোক, তা হোক। একেবারে ভালো হয়েই বেরুনো উচিত।

হ্যাঁ, ভালোই হয়ে বেরুব।—দীপ্তির নিঃশ্বাস পড়ল একটা। আবার মিনিট দুই শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল উপরের দিকে। একটা পাখা নিঃশব্দে ঘুরে চলেছে —তার মস্ত বড় লোহার রডটা থরথর করে কাঁপছে। দীপ্তি প্রায়ই ভাবে, ওটা তার মাথার ওপর ছিঁড়ে পড়লে কেমন হয়? পরবার আগে কতখানি ব্যথা লাগবে? কতটা যন্ত্রণা?

প্রভাত বললে, তোমার জন্যে একখানা বাংলা উপন্যাস নিয়ে এসেছি।

—আচ্ছা, পড়ব।

—আমি যেদিনই আসব একটা করে বই আনব তোমার জন্যে।

—আচ্ছা।

বাইরে মেয়েলি গলায় কে যেন চিৎকার করে কেঁদে উঠল। ওই চিৎকার, ওই সুর সকলের চেনা—শুনলে আর বুঝতে বাকী থাকে না। অন্য কোনো ওয়ার্ডে কেউ চিরকালের মতো চোখ বুজেছে। হয়তো তার মা—তার বোন—তার স্ত্রী।

দীপ্তি শিউরে উঠল, অন্য ভিজি-টারদের কথা-গল্প-কুশল সংবাদ সব চমকে থেমে গেল একসঙ্গে। মিনিট দুই ধরে সেই বুকফাটা কান্নার আওয়াজ লহরে লহরে ভেসে আসতে লাগল, তার-পর শব্দটা আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে লাগল। সান্ত্বনা দিতে দিতে কেউ হয়তো নিয়ে গেল মেয়েটিকে।

দীপ্তি বললে, আমি মরে গেলে কেউ কাঁদবে না প্রভাতদা।

প্রভাত ধমক দিলে : কী পাগলামো হচ্ছে!

—আমি বেঁচে কী করব?—আবার জলের ধারা চোখ থেকে গড়িয়ে এসে গালের স্টিকিং প্লাসটারটা ভিজিয়ে দিতে লাগল : হয়তো মুখটা বিশ্রী হয়ে যাবে—হয়তো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটব, হয়তো বাবার মতো পঙ্গু হয়ে যাব—

কিছুই হবে না। সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে তুমি।

—যদি না হই? কে আমায় দেখবে প্রভাতদা? আমার কে আছে?

—আমরা সবাই আছি দীপ্তি। কিন্তু এসব বাজে কথা তোমায় ভাবতে হবে না।

দীপ্তি প্রভাতের একখানা হাত চেপে ধরল : আমায় সবাই ঘেন্না করে প্রভাতদা। মা, বাবা, ভাই-বোনেরা—সবাই। তুমি আমার দেখবে? ত্রিশ চল্লিশ টাকার স্কুল-মাস্টারি জুটিয়ে দেবে একটা?

—কিন্তু তুমি তো বেশ ভালো মাইনেতেই চাকরি করো।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রভাতের হাতটা ছুড়ে দিয়ে দীপ্তি বালিশে মুখ গুঁজল। একটা অবরুদ্ধ কান্নার স্বর উঠল গলা থেকে : না, কেউ নেই আমার—কেউ নেই!

চমকে উঠে প্রভাত বললে, কী হল?

—কিছু না—কিছু না।

প্রভাত বসে বসে দীপ্তির কান্না দেখতে লাগল। কেন কাঁদছে? হঠাৎ এমন কী হল, যার জন্যে এমন করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে হচ্ছে তাকে? মেয়েদের সে বুঝতে পারে না। রানীকে বোঝেনি, রিনি কাঞ্জিলালকে ধাঁধার মতো মনে হয়, দীপ্তিকেও সে বুঝতে পারছে না।

সেই সময় অমিয়র ডাক শোনা গেল : দিদি দ্যাখ্—কে এসেছে তোকে দেখতে।

প্রভাত ফিরে তাকালো, বালিশের ভেতর থেকে জলভরা চোখ তুলল দীপ্তি। অমিয় এসেছে, তৃপ্তি এসেছে, তাদের সঙ্গে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকও এসেছে একজন।

—এই যে প্রভাতদা, তুমিও আছো দেখছি।—একটু যেন অপ্রস্তুত হল অমিয়, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে তৎক্ষণাৎ : ভালোই হল, আলাপ করিয়ে দিই। এ আমার ফ্রেণ্ড্ চন্দন সিং—চমৎকার লোক।

এক ঝুড়ি ফল আর একটা সন্দেশের বাক্স বিছানার পাশে নামিয়ে দিয়ে চন্দন সিং নমস্কার করল। হেসে বললে, হাঁ দিদি, আমি অমিয়র বন্ধু। আমাকে আপনার ছোট ভাইয়ের মতোই দেখবেন।

আর দয়া করে এই ফল মিষ্টিগুলো খাবেন, ফেলে দেবেন না।

মুহূর্তের জন্যে সবটা পর্যবেক্ষণ করল প্রভাত। তারপর কী মনে করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—আচ্ছা বোসো তোমরা। আমি উঠছি।

দীপ্তি বললে, তুমি চলে যাচ্ছ প্রভাতদা?

—হাঁ, একটা কাজ আছে।

—আর একটু বসতে পারবে না?

—না।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে একটা চিন্তাই কেবল ঘুরতে লাগল প্রভাতের মাথার ভেতরে। তাকে হাসপাতালে দীপ্তির কাছে বসে থাকতে দেখে অমন করে চমকে উঠল কেন তৃপ্তি? কেন ভয়ের ছায়া পড়ল তার মুখে?

(ক্রমশঃ)

পোলের পরে পোল

গোবিন্দ চক্রবর্তী

হাতে সিগারেট থাকে একটা, রোজ এই পোলটায় এসে দাঁড়াই। নীচে বস্তি জংশন, মস্ত ইয়ার্ড। আর দু'পারে শহর। সেই দু'পারকে ছুঁয়েই এই পোল। পোলটায় হাওয়া খুব। মানে হাওয়া এত যে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। এই গ্রীষ্মে ও বসন্তে, দূরে দক্ষিণ সমুদ্রের বাতাস এখানে হুটোপুটি করে। লুটোপুটি খায়। এবং বলাই বাহুল্য, আমিও এই হাওয়া খেতেই আসি। সকালের কাগজের যেটুকু বাকি থাকে, সেটুকু বিকেলে এসে শেষ করি এখানে। নচেৎ চিনে-বাদাম কি সিগারেট—সে ত' আছেই। ইদানীং খবরের কাগজও বড়ই পানসে লাগছিল। কাগজটা সঙ্গে থাকে এই পর্যন্ত। বিশেষ কাজে লাগে না। সকালের কাগজ বিকেলে আর খুলতেই ইচ্ছে করে না। তা' খবরের কাগজেও মাঝে-মাঝে উত্তেজনামূলক কিছু থাকা দরকার বই কি! যদিও এখন দেশকালের হাওয়া অনেক বদলেছে—তবু সব দিক-টাই কেমন ভিজে-ভিজে, মিয়ানো-মিয়ানো না? বড় বেশী যেন নিরুত্তাপ। সকাল-বিকেলের রুটীনমাফিক সেই চায়ের উষ্ণতাটুকু বাদ দিলে, এই বাড়তি উত্তাপটুকু যা একান্তই জীবনের। জীবনের হরেক পাকচক্রের ও জটিলতার—তা' আমরা খবরের কাগজেই ত' খুঁজি। কিন্তু তাও যদি জুড়িয়ে জল হয়ে যায়! একটুকরো মজার খবরে তবু হঠাৎই সেদিন নজর পড়ে গেল! "বিপদ-জনক সেতু"-র শিরোনামায় বক্তব্যটুকু এইরকম :

'হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার কোলড়া গ্রামের কাছে খালের উপর একটি কাঠের সেতু আছে। এই সেতু দিয়ে প্রত্যহ চার-পাঁচটি গ্রামের লোক যাওয়া-আসা করে। সেতুটির দুই প্রান্তে দুইটি খেজুর গাছ। গাছ দুইটিতে দুইটি সাইনবোর্ড টাঙানো—পুলের অবস্থা বিপজ্জনক। যাতায়াত নিষিদ্ধ।'

বস্তুত, এর মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নেই। বরং একান্তই মামুলী সংবাদ। কিন্তু নিহিতার্থটুকু পরেই :

'বছর দশেক পূর্বে নাকি প্রথম বোর্ড দুইটি টাঙানো হয়। তারপর লেখাগুলি অস্পষ্ট হইয়া গেলে বছর তিনেক পূর্বে ঐ দুইটি অপসারণ করিয়া আরও দুইটি বোর্ড লাগানো হইয়াছে। সাইনবোর্ডের পর সাইন-বোর্ড পাল্টানো হইতেছে কিন্তু পুলটি মেরামতের কোন প্রচেষ্টা নাই। পুনর্বার সাইনবোর্ড দুইটি পাল্টাইবার পূর্বে কর্তৃপক্ষ যেন সেতুটি সংস্কারের কথা চিন্তা করেন এক অভিযোগ পত্রে স্থানীয় অধিবাসীরা এই আবেদন জানাইয়াছে।'

এ আবেদনে কর্তৃপক্ষ কতদিনে কর্ণপাত করবেন অথবা আদৌ করবেন কিনা কিছুই জানি না। কিন্তু সংবাদ-টুকুর মধ্যে গভীর একটি তাৎপর্য আছে, মনে হয়। সেই রহস্যটুকু পরিষ্কার হয়ে গেলে, অখ্যাত ঐ কোলড়া গ্রামের নিরি-বিলি মানুষগুলির জন্যে যত দুঃখই বোধ করি, কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেও আর ততখানি বুঝি দায়ী করতে চাইব না। তাহলে সেই ঘটনাটি এবং সেই ঘটনার সূত্রে আরো যে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল, দু'টিই খুলে বলতে হয়।

—এই পোলেই। সে-ও এমনি এক হাওয়ার এবং হাওয়া খেতে আসার বিকেল। সেদিনও এমনিই যখন অকারণে তন্ময়, নীচে এসে দাঁড়াল খুব ঝকঝকে একখানা ট্রেণ। অমনি কেমন একটা শূন্যতা নেমে এল চারিদিকে। প্লাটফর্ম থেকে লোক সরাচ্ছে। পোল থেকে লোক হটাচ্ছে। পারলে, পিঁপড়ের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রণ করে বুঝি। ভাবখানা এমনি। না-না, কারো এখানে থাকা চলবে না। তা ব্যাপার কি? না, খাস বড়লাট যাচ্ছেন এ গাড়ীতে। অ, তবে ত আমাকেও নামতে হয়! কিন্তু মজার যা, আমাকেই শুধু নামতে হল না। কেউ কিচ্ছুটি বললে না পর্যন্ত। হঠাৎ ভারি অদ্ভুত লাগল। আমিই বা কে এমন রাজরাজেশ্বর আমিই একা রইলাম ওপরে আর আমারই পায়ের নীচে পদা-বনত দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা—সেদিনের ভাইসরয় অব ইন্ডিয়া? সেদি-নের প্রবল প্রতাপান্বিত ভাইসরয় অব ইন্ডিয়াকে, হলেও কিছুক্ষণের জন্য এবং সম্ভবত তা সিকিউরিটির অভিভাবকদের সাময়িক অনবধানতাবশতই। হ্যাঁ, আমি পায়ের নীচেই পেয়েছিলাম। লোকে হাতে পায়, হাতেনাতেও পায় কদাচিৎ কোনো দুর্লভ বস্তুকে কিন্তু আমি? আত্ম-প্রসাদ লাভ করার এর থেকে যোগ্য উপ-লক্ষ্য আর কি? আমি পেয়েছিলাম একে-বারে পায়, পায়ের পাতায়, আঙুলের ডগায়! অবশ্য পেয়েই ছিলাম, করতে পারিনি কিছু। সেই সৎসাহস বা দুরন্ত দুঃসাহস, কবুল করতে লজ্জা কি—আমার ছিলও না। থাকলে, আমার ব্যক্তিত্বও যে এতদিনে ঐতিহাসিক হ'য়ে উঠত, সন্দেহ নেই। তা সে যা-ই হোক, ঐ সামান্য ঘটনার সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা-টুকু সত্যিই এখনো আস্বাদ করার মত। আমি এখন এটুকু মনে করে ত' আনন্দ লাভ করি—জীবনের অনুল্লেখ্য ঘটনা-পঞ্জীর মিছিলে একদা এমন একটি ঘটনার চকিত-চমকও এসেছিল, একটুও যা উল্লেখ্য বটে।

কিন্তু আপনি যা ভাবছেন, তাও আন্দাজ করতে পারছি। আপনি মনে করছেন—অতীত দিনলিপির কয়েকখানা ছেঁড়াপাতা হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়ে, সারবান কিছুর অভাবে, তাই দিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে যাহোক একটি কিছু খাড়া করার চেষ্টায় আছি। নয়ত ডোমজুড় থানার কোলড়া গ্রামের ভাঙা সেই কাঠের পোলের সঙ্গে এ খন্ড কাহিনীর এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনার যোগসূত্র কি? সত্যিই কিছু নেই। কোথায় হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার এক গেঁয়ো কাঠের সাঁকো আর নদীয়া জেলার রাণাঘাট শহরের এ এক জবরদস্ত রেল-পোল। সেটা দশ বছর ভেঙে পড়ে আছে আর এটা দশ সেকেন্ডও এতটুকু এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই! একটি দৃশ্যপট অতি অনুল্লেখ্য ক'টি সাধারণ মানুষের পদযাত্রার অপদস্থতা, অপর-টিতে বিপুল এক রাজপুরুষের সদম্ভ উপস্থিতির ত্রস্ততা, তটস্থতা। এত অমিলে তবে, মিলটা কোথায়? খোলা-খুলিই স্বীকার করছি, কিছুই নেই। তাছাড়া দিনলিপির কথা যদি ওঠে, দিন-লিপিও আমি রাখিনা। রাখিনা ইচ্ছে করেই। রাখার মত কিছু থাকলে ত রাখব! যে জীবনের একটি কি প্রত্যেকটি দিনই প্রায় সমান অনুজ্জ্বল ও বর্ণহীন,

সেই কন্টকর কান্নাতিহরণ-কথা লিপিবন্ধ করে রাখা আমার কাছে হাস্যকরই মনে হয়। বরং উপমা দিতে পারি—এ খানিক এলোমেলো অগোছালো চিন্তা, তারই কিছু টুকরো-টাকরা। একক যা মূল্য-হীন অথচ সবটা মিলিয়ে-মিশিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা তাৎপর্যময় কিছু। সর্বশেষ কোনো পোলে এসে দাঁড়ালে এবং হাতে এমনি নিরুদ্বেগ খানিক সময় থাকলে—এমনি সব অসংলগ্ন চিন্তাগুচ্ছ আমার মনে ভীড় করে আসে। ঠিক ভীড়ও নয়! রেখাপাত বা ছায়াপাত করে। ইঞ্জিনের ঐ ধোঁয়ার মতই হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হয় পুঞ্জিত হয়, ছিঁড়ে যায় আবার। ডোমজুড়ের ঐ খবরের কুচিটা তাতে আরো খানিক ইন্ধন জুগিয়েছে মাত্র।

কিন্তু এই ঘটনার সূত্রে আরো যে ঘটনাটি অবশ্যই উল্লেখ্য, সেটি না বললে ত' সবটাই আরো অহেতুক মনে হবে। সেই ঘটনাটি আমার ফাঁপা ব্যক্তিত্ববোধে অত্যন্ত আঘাত করেছিল। এবং সত্যিই খুব হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। আমি প্ল্যাটফর্মে তখন, নীচে। আর আমার মুখের ওপর মুখ এক কুষ্ঠরোগী ঠিক ওপরেই এই পোলে। উঃ, কী মর্মান্তিক সেই দৃষ্টিপাত। আমি নীচে দাঁড়িয়ে ট্রেণের অপেক্ষা করছিলাম। ট্রেণের দেরী দেখে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সেদিনের কাগজটা পড়ছিলাম। সেই কাগজের বুকে হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল। পড়ে আর নড়ল না। আমি লক্ষ্য করলাম—তা একটি মানুষেরই মুখাবয়ব! কিন্তু নড়ছে না কেন? কৌতূহলী হয়ে ওপরে তাকালাম। আর সেই মর্মান্তিক মুখো-মুখির ক' মুহূর্তে। চোখ আছে কিন্তু নাক নেই। সেই সঙ্গে বাকশক্তিও তিরোহিত। বোধহয় জিভও নেই। খসে গেছে। সে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। অবশ্য সে চাউনিরও কোনো অর্থ নেই। অতদূরে থেকে কিছু যে সে চায়—এমন কথাও মনে হয় না। এমনিই থমকে দাঁড়ানো, ঐভাবে থেমে থাকা। সুশ্রী তনুদেহের বহু মানুষের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে—কে বলবে, দেহগত সৌন্দর্যের প্রতি তা যে তির্যক এক উপহাসই নয়? অথবা ঈর্ষা, ঘৃণার মত কিছু কিংবা অন্যান্য চোখের আয়তনে নিজের দূরদৃষ্টকেই আরেকবার নিরীক্ষণ করা, একটি দীর্ঘশ্বাস সম্বরণ করা—এমনও হতে পারে। হতে যাই পারুক, তা বিশ্লেষণ করবার মত তখন মানসিক অবস্থা নয়। বরং আরো যা ঘটল, তাতে করুণা দূরে থাক, ক্রোধেরই উদ্রেক হয়েছিল। ভয় ত বটেই। কুষ্ঠ সংক্রামক কিনা জানি না। কিন্তু সভয়ে ক'হাত পিছিয়ে এসেছিলাম। তার ছায়াও যেন কত ভয়ংকর অথচ ছায়া কিছু সংক্রমণ ঘটায় না, তাও বিদিত সত্য। কিন্তু নাকের বদলে সেই গুহা-গহবর থেকে টস-টস করে ক'ফোঁটা পুঁজও গড়িয়ে পড়ল— ঠিক আমার পায়ের কাছেই। এবং আমি পিছু হটে এলাম। অতি এক হতচ্ছাড়াও কখনো-সখনো ক্ষমতাবান, শ্রীমানদেরও যে, যেভাবে হোক কোণ-ঠাসা করতে পারে মাথায় উঠে বসতে পারে—এ বোধহয় তারই আরেক নিদর্শন। সেদিনের বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিতে সেই লাটবাহাদুর এবং আমার সঙ্গে আজকের এই খণ্ড দৃশ্যের কুশীলবদের কোনো তুলনামূলক সমান্তরাল রচনা সম্ভব কিনা—তা' অবশ্য ভেবে দেখিনি। তবে খুবই যে বিরক্ত হয়েছিলাম সন্দেহ কি! অর্থাৎ ঘৃণিত এক গলিত কুষ্ঠের রোগীকে কেন এমনভাবে যাত্রী সাধারণের মাথার ওপর উঠতে দেওয়া হয়েছে—এইটেই বক্তব্য ছিল। কিন্তু পাশাপাশি আরো একটা জিজ্ঞাস্যঃ আটকায় কে? প্রতিবাদ করবই বা কার কাছে? পোলের মুখেই স্পষ্টাক্ষরে লেখাঃ 'সর্বসাধারণের যাতায়াতের জন্য এই পোল ব্যবহার করিবে'। ঘৃণিত কুষ্ঠের এই বিকৃত দেহ-ধারী কি সর্বসাধারণের সংজ্ঞা বহির্ভূত! তা যখন নয়—এই সেতুবন্ধনের যোজনায় তাহলে তার পারাপারই বা ঠেকে কিসে?

এই দুটো ঘটনাই বলতে গেলে, কিছুই নয়। সত্যিই কিছু না এমন। কিন্তু কিছুই নয়, এমন ব্যাপারও অনেক সময় অনেকখানি। অনেক কিছুই খুঁজে নেওয়া যায়—নিতে চাইলে, কখনো না চাইলেও। নয়ত 'পোল ত' কতই রয়েছে। এখনো উঠবে কত। যেখানেই বাধা, বিপত্তি, ব্যবধান, দুদিকের দুই একের মধ্যে মাঝখানে অন্য আরেকের অবস্থিতি—তাকেই না উত্তীর্ণ হয়েছে মানুষী কল্পনা এই সেতুবন্ধনেই। সেই কল্পনার এই বাস্তব রূপায়ণে। ইক্ষাকু বংশের সেই এপিক-খ্যাত উত্তরপুরুষটি এই আয়োজনেই না প্রথম সমুদ্র-বিজয়ের কেতন উড়িয়েছিলেন ইতিহাসে। ভারতেতিহাস আজো ত' সেই পুণ্য-নামের স্বাক্ষর বহন করছে তার অন্তিম এক সমুদ্রতটকে সেই কীর্তিতেই নামাংকিত করে! আমি বলতে পারব না—পাথরে ও গাছের গুঁড়িতে, বালির কুচো ছিটিয়ে নগণ্য একটি কাঠ-বিড়ালীরও যাতে কিছু স্বেচ্ছিত দায়ভাগ ছিল, মানুষের অমানুষিক পরিশ্রমের সেই সর্ব প্রাথমিক সাফল্যই মানুষকে এই অভিনব উত্তরণশৈলীতে সত্যিকারের উৎসাহদান করেছে কিনা! যদি তাই করে থাকে, ফার্ডিনান্ড ডি লিসেপস এই হাল আমলে শুধু একটা খাল কেটে দুটি মহাসাগরের তথা দুটি মহাদেশের হাত মিলিয়ে মানব-সংসারে যে কল্যাণ এনে দিয়েছেন, তার চেয়েও এ অনেক বড়, অনেক গুণ মহত্তর। কালের পালাবদলে, কর্মের রদ-বদল ঘটেই। তাই পদ্ধতি-প্রকরণে হয়ত এসেছে অনেক বিবর্তন বৈচিত্র্য। খেজুরগুঁড়ির আদিম সংযোজক হয়েছে পাকা গাঁথনির খিলেন।

কখনো বা কংক্রিটের কালভার্ট। তারপর ওভার ব্রীজ, ব্রীজ, এমন কি হ্যাঙিং ব্রীজ, রোপওয়েও আছে। কিন্তু উৎসসূত্রে সকলেই ত' স্বগোত্র-সমগোত্র। না কি? চোখের ওপর আরেকটা ছবিও এখনো উজ্জ্বল, জ্বল-জ্বল করছে: স্ক্রিনা নামের এক নদী, তার ওপর মর্মরশোভন এক সেতু এবং গোটা একটা দেশের প্রায় শতাব্দী ছোঁয়া এক ইতিহাস। সেই সেতুর ওপর দিয়ে অনেক নায়ক, মহানায়কের, দুর্জনের, দুর্বৃত্তের এমন কি অনেক অভাজনেরও নিরন্তর আনাগোনার ফেনিল একটি জাতির উত্থান-পতনের জীবনগাথা। হ্যাঁ, এমন কিও এই পোল নিয়েই একজন লিখেছেন—যা এই সেদিনই পেল সাহিত্যের সেরা শিরোপা। আসল ব্যাপারটাই অন্য। যে দেখতে জানে সে এমনিতেই জানে। স্বভাবতই চক্ষুষ্মান। যে জানে না, সে দেখেও দেখে না। চক্ষুষ্মান সামান্যেও পায় অসামান্যের সাক্ষাৎ। আমরা যে পাই না, আমাদের সেই তৃতীয় চক্ষু নেই বলেই।

তা অত দূরে গিয়ে কি হবে, কাছে, ধারেকাছে—একেবারে এই দোর-গোড়াতেই আসুন না? হ্যাঁ, এই কলকাতাতেই। এই শ্যামবাজার থেকে পাইকপাড়া। এইটুকুতেই ত' পর-পর দু'দুটো পোল। —একটা ডিচ ডিঙিয়ে। নীচে কত মানুষের খোলামকুচির সংসার। যেখানে পোলের কানা। মানুষ এখানে ঠিক কুকুরের মতই না? কুকুর মানুষের গায়ে গা দিয়ে শুয়ে। মানুষ কুকুরের মুখ থেকে খাবার ছিনিয়ে খাচ্ছে। কুকুর—মানুষের। আর মানুষের বাচ্চা, বাচ্চা ছাড়া কি, উচ্ছিষ্টে-উচ্ছিষ্টে ঠিক কুকুরের বাচ্চার মতই অনায়াসে মানুষ হচ্ছে। যতই বুক বাজাই, আমাদের আগামীকালের চেহারাটা তাহলে কেমন? ভাবতেও শিউরে ওঠার কথা। কিন্তু উঠি কি? না বোধহয়। কেন উঠি না? কারণ—এ নিয়ে কিছু ভাবি না। ভাবনা আমাদের অত ঢালুতে নামতে নারাজ। যাদের নামিয়ে দিয়েছি। সহৃদয় করপ্রসারে তাদের আর ওঠাতে পারি না। তাছাড়া, পোলের পাথুরে থামে নোংরা জলের কষানিতে অনেক শ্যাওলাও ত' মাথা কুটে মরে। কেউ তাদের আদর করে দু'হাত ধরে ওঠায়? হয়ত ওঠায়ও। কিন্তু তা ওঠানো নয়, উৎখাত। বড় বেশী তারা নৌকোর গতিপথ ও নৌকো আঁকড়ে ধরলে, হালের ঘায়েই তাদের উৎসাদন-পর্ব সমাধা হয়, ছিঁড়ে-ছুটকে বাড়-বাড়ন্তর বাচালতাকে দমিয়ে দেওয়া হয়। কারণ বেশী দল বাঁধতে দেওয়াটা বিপজ্জনক ব্যাপার। ঘেরাও করতে পারে। —ওরাও তেমনি। সভ্যতার তলানি। তাই ঐ তলাতেই আস্তানা। পোলের নীচু দিকে। আমরা উঁচুতে আছি। উঁচু দিয়ে, নাক ও চোখ, দুই-ই উঁচু করে উঁচিয়ে চলি। এইটেই রেওয়াজ। আর হৃদয়? হৃদয় পোষে নির্বোধ ব্যক্তিরা। সে দায় থেকেও আমরা অবশ্যই মুক্ত।

দু'নম্বর পোলটা ইয়ার্ড পেরিয়ে। এখানেও বেশীর ভাগ ঐ কুলি-কামিন, ড্রাইভার, ক্লিনার, ফিটার, ফায়ারম্যানদের ভিড়। ওদেরই জটলা। যদি না করে থাকেন, লক্ষ্য করবেন। এখানে রেলও নীচে দিয়েই। মহানগরকে শিরোধার্য করে, রেল এখানে নম্র-নত। শান্টিং, ডেসপ্যাচিং, লোডিং, আন-লোডিং, মাল-গাড়ীগুলোর একটু বা জিরেন, দূরেযাত্রার যাত্রাপূর্ব অপেক্ষা, কারও বা সিক-লাইনে একটু মেরামতি—এই সব কাজ এখানে দিনের পর দিন অবিরাম চলেছে। নীলকোর্তা গায়ে কতকগুলো বিনিদ্র মানুষ রাতের সেই তিন প্রহরেও লাল-নীল লন্ঠন দুলিয়ে এক হাতে খৈনী টিপতে-টিপতে শীতে-বৃষ্টিতে ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বা মরিয়া, গলদঘর্ম। ইঞ্জিনের গহ্বরে আগুনের সঙ্গে দুস্তর মল্লযুদ্ধে প্রায় জীবনপণ। আমরা যারা ট্রামের, বাসের, ট্যাক্সির কি পোলের নির্জন পথেরই পদযাত্রী, কাজে-অকাজে হরদম যারা পোল পেরোই—এই সব অবলোকন করতে করতে কেমন নির্বিঘ্নে পথ চলি। এ সব দেখি, দেখেছি কিন্তু এ নিয়েও ভাবিনি কিছু। নিজেরটুকু ছাড়া আর কোন্ ভাবনাটাই বা কবে ভাবি! কিন্তু ভাবতে হয়, ঘটনাই জোর ঝাঁকি দিয়ে কবে একদিন অনেক ভাবনাই ভাবিয়ে দেয় যা ভাবতে হবে বা ভাবার মত বলে কোনোদিনই মনে হয়নি। মজাটাই ত' এইখেনে। একেই বলে বুঝি ভবিতব্য। ভাবী-কালের গর্ভে যা নিহিত, ইতিহাসের চাবুক-মারা প্রতিশোধ।

হ্যাঁ, ভাবি তখনই যখন ঘটনা এসে চোখে আঙুল ফুটিয়ে দেয়। চোখের মণি দুটো কড়্ কড়্ করে, দেখতে না-দেখতে হু-হু করে জল গড়িয়ে আসে। এসে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করে দেয়। বেশী কিছু না, হয়ত' একমুঠো কয়লার গুঁড়ো কি কাঁকর। এই কুলি-কামিনদেরই পায়ের ধুলো বা ইঞ্জিনের পোল পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে উড়ন্ত কয়লার কুঁচি-গুলো। আমি বলছি সেই দৃশ্যের কথা। সেই দৃশ্যের দৃশ্যাবলীর কথা। যখন নীচে মহানগর, যখন নগরের মাথার ওপর দিয়ে আকাশ কেটে গিয়েছে রেল। রেল-পোল। ওদিকে বালিগঞ্জ পাড়ায়। এদিকে বালি থেকে ওতর-পাড়ায়। এই সানুদেশ ত' ঐ শিখর। ঘটনা এই রকমই যেন—কে কবে, কখন, কাকে, কোথায় টপকাচ্ছে, আপাত চক্ষে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যখন যাচ্ছে, তখনই বুঝি পোড় খেয়ে টোল খেয়ে একটু হুঁশ হচ্ছে। কিন্তু ঐ একটুই। আবার বিস্মৃতির ভারী পর্দাটা আস্তে আস্তে কখন নেমে আসছে চৈতন্যের ওপর। আবার যে নিহুঁশ, সেই নিহুঁশ। কোলড়া গ্রামের সেই 'বিপজ্জনক সেতু'টার সম্বন্ধেও বুঝি ঐ একই কথা। সাইনবোর্ডের পর সাইন-বোর্ড পাল্টানো হচ্ছে কিন্তু পুলটা, মানে পুলের সেই ভুলটা আর কিছুতেই শোধরানো হল না। কর্তৃপক্ষ ক্ষণেকের জন্য নড়াচড়া করে উঠেই আবার ঝিমিয়ে, ঘুমিয়ে পড়ছেন। দৈনন্দিনই এই ঘটছে। ইতরবিশেষ কিছু নেই। কিন্তু সব দেখেশুনে এই কথাটাই কি মনে হয় না—কী একটা সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত এই পোল তোলার কারিগরিতেও যদি না হয়, কল্পনাতে অন্ততঃ ছিল। যা পেয়েও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অথবা পাইনি, হাতড়ে বেড়াচ্ছি মাত্র। যদি কোনো দিন সত্যিই পাই এবং রাম-ধনুর মত এক লহমার মুগ্ধতার নিমেষে না হারিয়ে ফেলি—গোটা এই দুনিয়াটাই ছোট্ট একটা নরম বলের মত অত্যন্ত ছন্দা-তায় হাতের একেবারে মুঠোয় এসে যাবে না? তখন বাহির দুয়ারও যেমন অবারিত, ভিতর দুয়ারও তত না অবাধ। কিন্তু তা কি হয়, না হবে? কিন্তু হতেও ত' পারে। আর হয় যদি—।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যে পুরাসিটাপিমি অনুষ্ঠানের কথা আগের চিঠিতে লিখেছিলুম, তা আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল। সন্তান পেটে আসার সাত মাসে বিশেষ অনুষ্ঠানটি হলেও পাঁচ মাসেই এর ভূমিকার শুরু। সব কিছু দেখার সুযোগ পাইনি, এদের মুখেই শুনেছি। আমি সাধারণ কানে যা শুনেছি, আর সাদা চোখে যা দেখেছি তারই দু'চারটা কথা লিখছি।

শিশুর জন্ম হবার পর প্রসূতি আর নবজাত শিশুকে অন্ততঃ কিছু-দিনের জন্য আলাদা করে রাখার প্রথা আমাদের বাঙালী হিন্দু সমাজে আছে। এই সময়টাতে প্রসূতি আর শিশুটি সবারই কাছে অপবিত্র—নির্দিষ্ট দিনে স্নান ও অন্যান্য অনুষ্ঠান করে তাদের পবিত্র হতে হয়। টোডাদেরও অনেকটা সে রকম প্রথা আছে। তবে টোডা মেয়েদের শিশুর জন্ম হবার আগেও কিছুদিনের জন্য অপবিত্র হ'তে হয়। মাতৃ গর্ভে শিশুর বয়স যখন মাস পাঁচেক হয়, তখন মাকে কয়েক দিনের জন্য মান্ড ছেড়ে দিয়ে বনের ভিতর একটি ছোট কুঁড়েতে গিয়ে থাকতে হয়। তারপর আবার মান্ডে ফিরে এসে শুরু করে সাধারণ কাজ-কর্ম। আসে সপ্তম মাস। তখন বিশেষ দিনে হয় পুরাসিট-পিমির অনুষ্ঠান। টোডা সমাজজীবনে এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব খুব বেশী।

• অমাবস্যার আগের সন্ধ্যায় এই আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভাবী-মা তার স্বামী (অথবা স্বামীদের ভিতর একজন, যে ভবিষ্যৎ সন্তানের পিতৃত্বে অধিকার চায়) আর কয়েকজন আত্মীয়স্বজন মিলে বনের ভিতরের কুঁড়েটির কাছে যায়। একটি বড় গাছের কান্ড ছুরি দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে গর্ত মত করা হয়—এতটা উঁচুতে যাতে গর্তটি স্ত্রীলোকটির চোখ বরাবর থাকে। গর্তটিতে বসিয়ে দেওয়া হয় একটি ঘীয়ের প্রদীপ। স্বামী তৈরী করে ছোট তীর-ধনুক। তখন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই প্রণাম করে, প্রণম্যদের টোডা-দের বিশেষ ভঙ্গিতে। প্রণাম সারা হয়ে গেলে স্বামী স্ত্রীর হাতে তুলে দেয় তীর-ধনুক। স্ত্রী তীর-ধনুক কপালে ঠেকিয়ে দেখায় তার শ্রদ্ধা। তারপর প্রায় এক ঘণ্টা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে প্রদীপের দিকে। সবাই বনের ভিতরে রাত কাটিয়ে সকালে মান্ডে ফিরে যায়, আর আয়োজন করে ভোজের।

অনুষ্ঠানে তীর-ধনুকের যে একটি বিশেষ স্থান আছে, তাতে মনে হয়, এক কালে হয়তো টোডারা নীলগিরির বনে বনে তীর-ধনুক নিয়ে শিকার করে বেড়াত। তখনও হয়তো মোষ কেন্দ্রিক জীবন গড়ে উঠেনি। মোষ প্রতিপালনই পরে তাদের শিকার করা ভুলিয়েছে। শিকার করার সাধারণ হাতিয়ারের ব্যবহারও তারা ভুলে গেছে। সাধারণ একটি বর্শাও কোন মান্ডে দেখবে না।

আগেই বলেছি পুরাসিটাপিমি অনুষ্ঠানেই ঠিক করে সন্তানের পিতৃত্ব কে পাবে। প্রকৃত পিতৃত্ব যারই থাক না কেন, যে স্ত্রীর হাতে তীর-ধনুক তুলে দেবে সেইই ব্যবহারিক জীবনে গর্ভস্থ সন্তানের পিতা হ'বে। শৈশবে মেয়ে-দের বিয়ে হ'লেও তারা স্বামীদের ঘর করতে যায় ষোল সতের বৎসর বয়সে। কোন ঘটনায় (দুর্ঘটনায় নয়, কারণ সমাজ যৌন স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে) স্বামী বা স্বামীদের সঙ্গে বাস করতে যাবার আগেই যদি কোন মেয়ে মাতৃত্বের অধিকারিণী হ'তে যায়, তবে তা নিয়ে গোলযোগ বা নিন্দাবাদ হয় না। সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের বন্দোবস্ত থাকলেও স্বামী বা স্বামীরা স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ নিয়ে পঞ্চায়েৎ সভায় যায় না কখনও। স্বামী এসে পুরাসিটাপিমির বন্দোবস্ত করে আর স্ত্রীর হাতে তীর-ধনুক তুলে দেয়। প্রকৃত পিতাকে হয়তো সবাই জানে, তবুও তার কোন দায়িত্ব থাকে না। দায়িত্ব এবং সামাজিক পিতৃত্ব হল স্বামীর।

পুরাসিটাপিমির পর থেকে সন্তানের জন্মের দু'একদিন পর পর্যন্ত স্ত্রী মান্ডেই থাকে, তারপর আবার তাকে সন্তানসহ বনের আঁতুড় ঘরে ফিরে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে তাকে থাকতে হয় কিছুদিন।

আঁতুড় ঘরে যাবার পর শিশুর মুখ আলগা করে ঢেকে রাখা হয়—মা ছাড়া অন্য কেউ শিশুর মুখের দিকে তাকাতে পারে না। মান্ডে ফিরে আসার পরও কিছুদিনের জন্য তার মুখ ঢাকা থাকে। তিন মাস বয়সে শিশুর মুখ খুলে দেওয়া হয়। শিশুটি ছেলে হলে

কর্মব্যস্ত টোডা পুরুষ

একদিন সকালবেলায় ছেলের বাবা তাকে নিয়ে যায় মাণ্ডের মন্দিরের আঙিনায়, যে মন্দিরে পুরোহিত তৈরী করে মাখন ও ঘোল—টোডাদের জীবন-রস। মন্দিরে আঙিনাতে শিশুকে শুইয়ে দেওয়া হয়, যাতে তার মাথা আঙিনার ধূলি স্পর্শ করে। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মোষ রাখবার স্থানে। খুলে দেওয়া হয় মুখের কাপড়। শিশু টোডা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। শিশু যদি মেয়ে হয় তবে তার মা তাকে নিয়ে যায় মন্দিরের কাছে, যেখানে মেয়েরা পুরোহিতের কাছ থেকে ঘোল মাখন নেয়। তারপর খুলে দেওয়া হয় তার মুখের কাপড়। ভাবী টোডা গৃহিণী দেখে নেয় মন্দিরের দ্বার যেখানে এসে তাকে ভাণ্ড হাতে দাঁড়াতে হবে ঘোল-মাখনের জন্য।

॥ ৯ ॥

দু'দিন আগে সকালের দিকে গিয়েছিলুম আংকাল মাণ্ডে। গোটা চারেক পরিবার নিয়ে ঐ মাণ্ড। মাণ্ডের কাছে যেতেই মিলিত নারী কণ্ঠের শোকার্ত রব এল কানে। দেখি বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে আঙিনায়। সবার মুখেই বিষাদের ছায়া। পুরুষদের মধ্যেও কেউ কেউ মাঝে মাঝে চীৎকার করে কেঁদে উঠছে। মনে হ'ল মাণ্ডে অনধিকার প্রবেশ করেছি। একজন বয়স্ক লোককে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে?

—একঘরের পুরুষ মারা গেছে।

—কখন?

—পরশু। আজ দাহ হবে।

পরশু মারা গেছে আজ দাহ হবে, সে কি রকম কথা! জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলুম তার অর্থ। দাহ করার বিশেষ বিশেষ দিন আছে, যেমন রবিবার, মঙ্গলবার আর শুক্রবার। অন্য বারে মৃত্যু হলেও নির্দিষ্ট দিনগুলির জন্য মৃতদেহ রেখে দেওয়া হয়। নীলগিরির ঠাণ্ডা আবহাওয়া মৃতদেহকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া নানা রকম গন্ধদ্রব্যে ঢেকে রাখা হয় মৃতদেহ এবং দেহটি বসত ঘরেই রেখে দেওয়া হয়। শুনলাম, শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে ঢেলে দেওয়া হয় কিছু দুধ। মৃত্যুর পর সমস্ত দেহ ঢেকে দেওয়া হয় একটি কাল কাপড়ে।

আমি যখন মাণ্ডে ঢুকলাম, তার কিছু পরেই শব বের করে নিয়ে আসা হল। বের করে নিয়ে শব রাখা হ'ল মন্দিরের সামনে। এই মন্দিরের দরজাতেই তার দীক্ষা হয়েছিল টোডা জীবনে। একটি মোষ দুইয়ে খানিকটা দুধ এনে মৃতের মুখে ঢেলে দেওয়া হল। যে অমৃতে তার জীবন ছিল সিক্ত সে অমৃত মুখে করেই সে হ'ল পরপারের যাত্রী।

শব নিয়ে রওনা হ'ল সবাই শ্মশানের দিকে। অন্যান্য কয়েকটি মাণ্ডের লোক এসেও জমা হয়েছিল। স্ত্রী-পুরুষ সবাই শবানুগমন করল। আমিও গিয়েছিলুম তাদের সঙ্গে।

শব শ্মশানে নিয়ে যাবার বিশেষ রাস্তা আছে। মাণ্ড থেকে তিন মাইল দূরে শ্মশান। রাস্তায় নানা মাণ্ড থেকে বহুলোক এসে শবানুগমনে যোগ দিল। মেয়ে-পুরুষদের শোকার্ত রব মাঝে মাঝে উপত্যকায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। চড়াই-উতরাই ভেঙে অবশেষে আমরা শ্মশানে পৌঁছলুম। শ্মশান একটি বিস্তৃত উপত্যকার মধ্যে। শব নামান হল একটি কুঁড়ে ঘরের সামনে। কাঠ-খড়ে তৈরী ছন্নছাড়া কুঁড়ে ঘর—তাতে কোন শক্ত বাঁধুনী নেই। এ রকম কুঁড়ে নাকি প্রায় প্রত্যেক শ্মশানেই আছে। কুঁড়ে ঘরের কিছু দূরেই পাথরের দেয়াল ঘেরা মোষ রাখার খোঁয়াড়, যার কথা আগের কোন চিঠিতে লিখেছিলুম। তবে এখন আর এই খোঁয়াড়ে মোষ রাখা হয় না, এককালে রাখা হ'ত।

মৃতদেহ খাটিয়া থেকে মাটির উপরে নামিয়ে রাখার পর পুরুষেরা এগিয়ে এল একে একে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য। যারা বয়সে বড় বা সম্বন্ধে গুরুজনস্থানীয় তারা মাথার দিকে গিয়ে নত হয়ে ললাটের স্পর্শ নিল মৃতদেহের। আর কনিষ্ঠরা নত হ'ল মৃতের পায়ের দিকে। তারপর শব নিয়ে যাওয়া হল কুঁড়ের ভিতরে। যারা তখনও এসে পৌঁছায়নি তারাও শ্রদ্ধা দেখাবার সুযোগ পাবে। মৃতদেহ সরিয়ে নেবার পরই দেখি মেয়েরা বাইরে বসে গেল সবাই। সবাই শোকের আসর বসিয়ে কান্না শুরু করে দিল। মেয়েদের কান্নার প্রথা বিচিত্র। শুধু টোডা মেয়েরাই এভাবে কাঁদতে পারে। তারা বসল জোড়ায় জোড়ায়, একজন আর একজনের বিপরীত দিকে কপালে কপাল ঠেকিয়ে। উবু হয়ে মাটির দিকে চেয়ে শুরু করল বিলাপ।

বেশ খানিক্ষণ পর পুরুষেরা গেল পরিত্যক্ত মোষের খোঁয়াড়ের কাছে। মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হ'ল সেখানে। একজন পুরোহিত শ্রেণীর লোক খোঁয়াড়ে ঢোকার খোলা জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসে মাটির উপর মাথা নুইয়ে দিল, খোঁয়াড়ের দিকে মুখ করে। মৃতদেহ রইল তার পিছনে। এরপর পুটকলীতে বাঁধা থেকে খানিকটা মাটি খুঁড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল খোঁয়াড়ের ভিতরের দিকে। বারবার তিনবার। খোঁয়াড়ের দিকে মাটি ছোঁড়বার পর ছুঁড়ে দিল শবের দিকে—সেও তিনবার; পিছনের দিকে না ফিরেই। এক এক করে সব পুরুষেরাই

ঠিক একইভাবে শবের উপর মাটি ছুঁড়ে দিল। জানি না শবের দিকে মাটি ছোঁড়ার অর্থ কি। হয়তো এককালে টোডারা মৃতদেহের কবর দিত, তাই মাটি ছোঁড়াটা প্রতীক অনুষ্ঠানরূপে প্রতিপালন করে।

সেদিন ক্যাম্পে বিশেষ জরুরী কাজ থাকাতে ওখানে আর বেশীক্ষণ থাকা হয়নি, ফিরে আসতে হ'ল। পরে শুনেছি দেহ চিতায় তুলে দেবার আগে মৃতের মাথা থেকে এক গোছা চুল কেটে রাখা হয়, আর দাহের পর রাখা হয় এক টুকরো হাড়। হাড় আর চুলের গোছা রাখা হয় গাছের দুটুকরো ছালের ভিতর ঢেকে, আর সবটা জড়ানো হয় একটি চাদরে। মৃতের স্মৃতি চিহ্ন রাখা হয় মৃতের স্মৃতি-অনুষ্ঠানের জন্য। সে স্মৃতি অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য এখনও হয়নি। যদি হয়, তোমাকে লিখব।

ফেরার পথে বেলা গড়িয়ে এল। টোডা তৃণভূমির ভিতর দিয়ে পথ। সেই পরিচিত চড়াই উতরাই। ঘাসের সজীবতা আর নেই, ডিসেম্বরের জলহীন বাতাস ঘাসের রস টেনে নিয়েছে। হাঁটছি। একটি চড়াই পার হয়ে যখন নীচে নেমে এসেছি তখন দেখলুম একদল মোষ আসছে ডান দিক থেকে—দেড়শ'র কম হবে না। পিছনে দুজন লোক। একজন মন্দিরের পুরোহিত। কাঁধে ঘোল তৈরীর পাত্র ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র। দ্বিতীয় জন তার সহকারী—সেও মন্দিরের জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে।

—কোথা যাচ্ছ গো?

—কুন্ডার পাহাড়ের দিকে চলে যাচ্ছি কয়েক মাসের জন্য।

বালসুন্দরন বললে যে টোডারা তাই করে। মাঠের ঘাস যখন শুকিয়ে আসে তখন মাণ্ডের মোষদের নিয়ে যাওয়া হয় অন্যখানে। যেখানে তখনও বৃষ্টি হয় মোটামুটি আর ঘাস থাকে সরস ও সজীব। সেখানেই চলে দুধ দুইবার আর মাখন তোলার কাজ। মাণ্ডের লোকেরা সপ্তাহে বার দুই গিয়ে দুধ ঘোল নিয়ে আসে। তবে এ সময়টাতে কোনখানেই ঘাসের অতি প্রাচুর্য দেখতে পাবে না। তাই দুধের পরিমাণ কমে আসে অনেক। কমে আসে ঘোল মাখনের প্রাচুর্য।

॥ ১০ ॥

ক্যাম্প তুলে দিয়ে নতুন একটা মাণ্ডে এসে পৌঁছেছি। নাম কুন্তিকোড়ু মাণ্ড, উটি থেকে মাইল দশেক দূরে। শহর

কুটীরের চত্বরে নানারকম ডিজাইনশোভিত সুদীর্ঘ কাঠ...

থেকে যে রাস্তাটা বের হয়ে এসেছে তাতে বাস চলে না, কিন্তু জীপ বা ট্যাক্সি চলার কোন অসুবিধা হয় না। মাণ্ড ছাড়িয়ে জীপের রাস্তা চলে গেছে। নিবিড় বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে খানিকটা। রাস্তা—নাম পত্তর্ণর সোলা। [illegible] এখানে গাছের ডালে ডালে কালো বাঁদরেরা কিচির মিচির করে। রাস্তার দু পাশে যেখানে খোলা জায়গা আছে তাতে দেখবে অজস্র হলুদ ফুলের ঝোপ।

রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা উঁচু এরকম জমির উপর মাণ্ড, একটা টিলার মত। রাস্তার ওপাশে রয়েছে টোডা তৃণভূমি আর তাতে অজস্র ছোট বড় পাহাড়ের ঢেউ। মাণ্ডের পিছনে একটি বিরাট পাহাড়, মাণ্ড থেকে অন্ততঃ দেড় হাজার ফিট উঁচু পর্যন্ত উঠে গেছে—তারপর প্রায় খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে ছোট বড় গাছের জটলা পাকিয়েছে। শিকড় ছড়িয়ে পড়েছে এখানে সেখানে।

মাণ্ডে রয়েছে চারটি পরিবার। পুন্নাইয়ের একটি ঘরে আমরা আছি। পুন্নাই গেছে মহীশূরে গুড় কিনতে।

পুন্নাইয়ের বৌকে জিজ্ঞাসা করলুম, গুড় কিনতে গেছে কি রকম? একশ মাইল দূরে কেউ গুড় কিনতে যায় নাকি?

—ভাল ভেলীগুড় লাগবে যে কয়েক মণ। কাল হ'বে মারভেন নোলকেডর উৎসব।

মৃতের স্মৃতি উৎসব। যে স্মৃতি উৎসবের কথা আগের চিঠিতে লিখেছিলুম। এই মাণ্ডের এক প্রধান ব্যক্তি মারা গেছে মাস দুয়েক আগে, তাঁরই স্মৃতি উৎসব হবে কাল। চারদিকের [illegible] মাণ্ডে [illegible] আয়োজন। [illegible] দেখি

মেয়েরাও দল বেঁধে নামতে লাগল

ব্যস্ততা। সমাই মিলেটের খৈ ভাজা হচ্ছে। সমাই হল শস্যের ছোট ছোট দানা। সমাইয়ের খৈ-কে বলে সমাইপরী। প্রায় প্রত্যেক মাণ্ডেই দেখলুম দু'একজন স্ত্রীলোক ব্যস্ত নানা রকম ডিজাইন তৈরীর কাজে। এগুলি তৈরী হচ্ছিল রঙ-বেরঙের উলের সুতো, চকচকে কাচের পুঁতি আর ছিট কাপড় দিয়ে।

—কি হবে গো এগুলি দিয়ে?

—স্মৃতি উৎসবে লাগবে গো।

আগের চিঠিতে লিখেছিলুম, মৃতের খানিকটা চুল আর চিতাভস্ম থেকে এক টুকরো হাড় সরিয়ে রাখা হয়। স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখে দেওয়া হয় একটি চাদর দিয়ে ঢেকে। স্মৃতি উৎসবে এই স্মৃতি-চিহ্নের প্রয়োজন হয়। এই স্মৃতিচিহ্নের প্রতি সকলকেই শ্রদ্ধা দেখাতে হয়। যারা দূরে থাকার দরুণ শবানুগমন করতে পারে না তারা সুবিধা মত সময়ে এসে মাথা নত করে ললাটে স্পর্শ নেয় স্মৃতি-চিহ্নের। শারীরিক অসুস্থতার জন্য যারা শ্রদ্ধা দেখাতে পারে না, তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় স্মৃতিচিহ্ন।

বিকালের দিকে মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা মাণ্ডে জমা হ'তে লাগল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কর্মব্যস্ততা বাড়তে লাগল। ব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল, আবশ্যক আর অনাবশ্যক কোলাহল। অনাবশ্যক কোলাহলের শক্তি জোটাতে লাগল সরাব। সরাব আদিকাল থেকে টোডা জীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়। হালে আমদানি—ইংরেজ আমল থেকে। এখন সব টোডাদের রক্তেই মিশে গেছে সরাবের নেশা। রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভার ভার গুড় আর স্মৃতি উৎসবের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেতে লাগল মাণ্ড থেকে, যেখানে অনুষ্ঠান হ'বে সেখানে। তারপর দেখি জন পনের স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ে তৈরী হচ্ছে স্মৃতি তর্পণের স্থানে যাবার জন্য। প্রকৃত অনুষ্ঠান হ'বে কাল, তবে আজ রাতেও হয়তো কিছু কাজ আছে। গন্তব্যস্থল মাণ্ড থেকে মাইল চারেক দূরে। সঙ্গ নিলুম তাদের।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলুম, রাত ন'টা। অমাবস্যার হয়তো মাত্র দিন তিনেক বাকী। মসিকৃষ্ণ রাত। মাণ্ডের পিছনের খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলুম, দুঃসাধ্য ব্যাপার। এরা চলছিল মশালের আলোতে আর আমার হাতে ছিল একটা টর্চ। ছোট বড় গাছের শিকড় খামখেয়ালীভাবে এদিক সেদিকে ছড়িয়ে ছিল। সেই শিকড়কে অবলম্বন করেই আমরা পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলুম। দৃষ্টির অন্তরালের শিকড়ে হোঁচট খেতে খেতে। টর্চের আলোতে যতটা সম্ভব দৃষ্টি সজাগ রাখলুম গ্রানাইট পাথরের চাপের সাথে ঠোকাঠুকি হয়ে যাবার ভয়ে।

পাহাড়টির উপরে আসতে অন্ততঃ একঘণ্টা সময় লাগল। পিছনে বেশী নামতে হল না, পাহাড়ের পিছনের জমিটা একটু নেমে এসে মালভূমির সৃষ্টি করেছে। হাঁটতে শুরু করলুম আমরা নৈশ স্তব্ধতা ভেঙে। জমি কখনও একটু নীচু আবার কখনও বা সামান্য উঁচু। কিন্তু খানিক-ক্ষণ পরেই বেশ কিছুটা নেমে এলুম। মানে আবার একটি উপত্যকায় নেমে আসা হ'ল। বিস্তৃত উপত্যকা। উপত্যকাতে নামতেই মনে হ'ল আগুন জ্বলছে কিছু দূরে। গাঢ় কুয়াশা আর অন্ধকার সবকিছু দৃষ্টির অন্তরাল করে রেখেছে—শুধু মাঝে মাঝে দেখা যায় সামান্য ফিকে আলোর ঝিলিক।

সত্যি আগুন জ্বলছে। কয়েকজন লোক আগুনের চারদিকে বসেছে, সারা রাত থাকবে বলে। ডিসেম্বরের শেষ ভাগ। তাপাঙ্ক বোধ হয় নেমে গেছে দু' ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে, হাড়-কাঁপান শীত রুখতে গেলে আগুনের অতি সান্নিধ্যে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

স্মৃতি উৎসব পালনের প্রাঙ্গণে এসে গেছি। হঠাৎ কানে এল মিলিত নারী কণ্ঠের রব; কিছুদূরে থেকে। এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে বাতি জ্বলছে। টর্চের আলোতে দেখলুম জমিটা সামান্য ঢালু হয়ে গেছে। ঢালু জমি পাথরের প্রাচীর ঘেরা, মাঝখানে কুঁড়েটি। ছন্নছাড়া কুঁড়েঘর। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, এই কুঁড়েতেই মৃতদেহ রাখা হয়েছিল দাহের আগে। শ্মশানে নিয়ে মৃতদেহ যে একটি কুঁড়েতে রাখা হয় সেকথা তো আগেই লিখেছি। সেই কুঁড়েকে কেন্দ্র করেই স্মৃতি উৎসবের স্থান নির্দেশ করা হয়।

কুঁড়েতে রাখা হয়েছে স্মৃতি-তর্পণের জিনিসপত্র। বস্তা বস্তা গুড় আর স্তূপাকৃতি সামাই খৈ। কুঁড়ের বাইরে বসে কাঁদছে জনাতিরিশেক স্ত্রীলোক, জোড়ায় জোড়ায় বসে, কপালে কপাল লাগিয়ে। শব্দ হচ্ছে একটানা ও-ও-ও......

যে মারা গেছে তার বয়েস হয়েছিল। মারাও গেছে দু' মাস আগে। তাই নিকট ও দূর আত্মীয় মেয়েদের এত রাতে ঘটা করে শোক করার আন্তরিকতায় সন্দেহ হয়। হয়তো শুধু এটা টোডা জীবনের সামাজিক নিয়ম। কিন্তু আন্তরিকতা কিছুই ছিল না, তাও বলা যায় না। নিশীথে মৃতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্জন উপত্যকায় শ্মশানে জমা হওয়ার প্রভাব থাকবেই। কোন বিশেষ জনের জন্যই সবাই হয়তো চোখের জল ফেলছে না—ফেলছে পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া সমস্ত প্রিয়জনের জন্যই। তাছাড়া কান্না সংক্রামক, একটানা শোকার্ত রবে চোখের জল বিনা কারণেই আসে। দাঁড়িয়ে আছি একটু উঁচু যায়গায়, ঘাসের উপর। চার-দিকে গাঢ় কুয়াশা, মাথার টুপী ওভার-কোট ভিজে গেছে, দূরের ইউকিলিপটাস বন থেকে শন্ শন্ শব্দে বাতাস বইছে। সেই শন্ শন্ শব্দের সঙ্গে মিলে গেছে মেয়েদের একটানা শোকার্ত রব।

আরও যা অনুধাবন হয়েছিল, তা ভাল দেখতেও পারিনি, বুঝতেও পারিনি। যখন ক্যাম্পে ফিরে আসলুম, তখন রাত একটা।

॥ ২১ ॥

কালকের চিঠিতে স্মৃতিযজ্ঞের আয়োজনের কথা লিখেছি কিছু কিছু। আজ সকালে স্মৃতি অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলুম, যার নাম টোডারা দিয়েছে মারভেন নোলকেডর। সৌভাগ্যই বলতে হ'বে যে এই মাণ্ডে আসতে পেরেছিলুম। তা না হ'লে স্মৃতি উৎসব দেখার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ত না। সে অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়।

সকাল গোটা আটেকের সময় মাণ্ডের লোকদের সঙ্গে চলে গেলুম স্মৃতি উৎসব প্রাঙ্গণে। গিয়ে দেখি, অনেক লোক ইতিমধ্যেই জমা হয়েছে। দু ফিট উঁচু পাথরের প্রাচীর ঘেরা শ্মশান কুটীরের প্রাঙ্গণের একধারে একটি ছোট খাটিয়া। খাটিয়াতে রয়েছে চাদরে ঢাকা মৃতের দেহাবশেষ। এক গোছা চুল আর অস্থি। ব্যাণ্ডপার্টি এসেছে শহর থেকে, তারা প্রাচীরের বাইরে বাজনা বাজাচ্ছে। একটি প্রাচীন গাছের নীচে মেয়েরা জটলা করে শোকের হাট বসিয়েছে। একপাশে তিন চারটি তামিল মেয়ে ডোসা, ইডলী আর কমলা-লেবু নিয়ে বসেছে বিক্রি করতে। মেলাতে যেমন দোকান বসে তেমনি।

চারদিকটা দেখার সুযোগ হল দিনের বেলায়। ইউকিলিপটাস আর অ্যাকেসিয়া গাছের সারি রয়েছে ড্যালীর

প্রান্তে। মাঝে মাঝে রডডেনড্রন ফুলের গাছ, তাতে রক্তরাঙা ফুল ফুটে আছে স্তবকে স্তবকে।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা বেয়ে দূরদূরান্তরের টোডা মেয়ে পুরুষেরা দলে দলে নেমে আসতে লাগল। পুরুষেরা পাশাপাশি সার বেঁধে পরস্পর বাহুলগ্ন হয়ে গুরু-গম্ভীর গলায় একটানা শব্দ করতে করতে নেমে আসতে লাগল দ্রুত গতিতে, মেয়েরাও দল বেঁধে নামতে লাগল টোডা মেয়েদের বিশেষ ধরণের সাজসজ্জা করে। অতিথি-সজ্জনেরা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মৃতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনরা ব্যাণ্ডপার্টি নিয়ে এগিয়ে গেল তাদের অভ্যর্থনা করতে, মাটিতে নত হয়ে জানাল তাদের স্বাগত। স্বাগত জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠতে লাগল কান্নার রোল, কান্নার রোলের সঙ্গে ব্যাণ্ডপার্টির ঐকতান।

ওদিকে শ্মশানে কুঁড়ের প্রাঙ্গণে আনা হ'ল খুব লম্বা বাঁশের মত একটি কাঠ। কাঠটিকে সাজান হ'ল কাপড় পশম আর পুতির তৈরী নানা রকম ডিজাইন দিয়ে, যে ডিজাইনের কথা আগের চিঠিতে লিখেছিলুম। সাজান হ'লে কাঠটি পুঁতে দেওয়া হ'ল প্রাঙ্গণের মাঝখানে।

প্রায় প্রত্যেক মাণ্ড থেকে লোকজন এসে জমা হ'লে, প্রণাম, আশীর্বাদ ও প্রীতিসম্ভাষণের পর্ব শুরু হ'ল, টোডাদের বিশেষ ভঙ্গিতে, যার নাম আডাবুস্তিকেন। হঠাৎ চোখে পড়ল কিছু দূরের পাহাড়ের আড়াল থেকে বের হয়ে আসল সাত আটজন জোয়ান লোক কি একটা জীবন্ত বস্তুর সঙ্গে ধস্তা-ধস্তি করতে করতে। একটু কাছে আসতেই দেখি জীবন্ত বস্তুটি একটি সবল সুস্থ গাই মোষ। মোষটাকে টেনে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে আর মোষটা বাধা দিচ্ছে প্রাণপণে। এমনিতে টোডা মোষ টোডাদের কাছে শান্তই থাকে। সেই বাদামী রঙের বড় বড় মোষগুলির বিশাল টানা চোখগুলিতে ভারী একটা মায়া আছে। টোডাদের একটি ছোট ছেলেও অনায়াসে ত্রিশ চল্লিশটি মোষ চরাতে পারে। ছেলেরা মুখের সামান্য শব্দ করেই মোষগুলিকে এদিকে সেদিকে নিয়ে যায়। এখন কেন মোষটিকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাত আটটি জোয়ান লোকের প্রয়োজন হচ্ছে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি আরও চারটি গাই মোষকে জোয়ান লোকেরা অধিত্যকার মাঝখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে আর মোষেরা বাধা দিচ্ছে প্রাণ-পণে। কিন্তু মোষদের বাধা দিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হ'ল। এক এক করে তিনটি মোষকে নিয়ে আসা হ'ল শ্মশান কুটীরের খানিকটা দূরে একটি গম্বুজের মত পাথরের কাছে। আর দুটিকে নিয়ে আসা হ'ল শ্মশান কুটীরের চারদিকে যে প্রাচীর রয়েছে তার কাছে। তারপর দূরের তিনটি মোষকে দশবারজন লোক প্রচণ্ড শক্তিতে মাটিতে শুইয়ে দিল। কাত করে শুইয়ে দিয়েই দড়ি দিয়ে চার পা বেঁধে দিল। তখন এগিয়ে একটি লোক (বোধ হয় কোন মাণ্ডের পুরোহিত হ'বে) প্রকাণ্ড একটি কুড়াল নিয়ে। এগিয়ে এসেই কুড়ালের উল্টো পিঠ দিয়ে প্রত্যেকটি মোষের খুলিতে প্রচণ্ড শক্তিতে বসিয়ে দিল গোটা দুই করে ঘা। অবলা জীবগুলির পা একটু কেঁপে উঠল আর মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল এক ঝলক রক্ত। তারপর সব শেষ। শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ল মোষেরা। তিনটি মোষ নিঃশব্দে মাথা এলিয়ে দিল।

মোষগুলির শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ ষাটজন লোক কান্নার রোল শুরু করল হঠাৎ। কান্না যে শুধু শব্দেই প্রকাশ হ'ল ত নয়, অশ্রুও পড়তে লাগল দরবিগলিত ভাবে। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে মৃত মোষদের চারদিকে ঘুরতে লাগল সবাই। ঘুরছে আর মৃত মোষদের শিংয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। আর চল্ল আডাবুস্তিকেন। কনিষ্ঠরা মাথা নত করে এগিয়ে আসতেই প্রণম্য ব্যক্তিরা এক এক করে দু' পা-ই তুলে দিল তাদের মাথায়। আডাবুস্তিকেন সারা হচ্ছে জোড়ায় জোড়ায়। পরস্পরের শোক বিনিময়ের পরেই চল্ল আডাবুস্তিকেন। তার পর জোড়া ভেঙে দিয়ে জোড়ার

অংশীদাররা অন্য লোকদের সাথে নূতন করে জোড়া বাঁধতে লাগল।

যে দুটি মোষকে শ্মশানে কুঁড়ের কাছে রাখা হয়েছিল, তাদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হল ছোট ঘণ্টার মালা আর মাথাতে ফুলের মালা। এ মোষগুলি হল পবিত্র মোষ, অন্য তিনটি সাধারণ মোষ। এভাবে সাজিয়ে নিয়ে 'পবিত্র মোষ'গুলিকেও পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল যমালয়ে, কুঠারের আঘাতেই। যথারীতি মোষগুলির মৃতদেহ প্রণাম করা হ'ল। যারা সময়মত স্মৃতি উৎসবে যোগ দিতে পারেনি তারা এসে প্রথমেই প্রণাম করল মৃত মোষদের।

খানিকক্ষণ পরে কোটা ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা এসে মৃত মোষগুলিকে সরিয়ে নিল। তারা চামড়া নেবে, মাংস খাবে। মোষের মৃতদেহের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই টোডাদের।

নিশ্চয়ই সমস্ত ব্যাপারটি তোমার অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছিল, নীলগিরির উপত্যকায় যে বাতাস বইছিল তাতে ছিল অবলা জীবদের শেষ নিঃশ্বাস। নীরব ভাষার অভিযোগ। আর সবই যেন শোকের আড়ম্বর। আসলে এরা নিষ্ঠুর নয়। মোষ মারাটা অপরিহার্য পারলৌকিক কাজ। আগেই বলেছি মোষ প্রতিপালন এদের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে ওতপ্রোত ভাবে। তাদের জীবন-দর্শন গড়ে উঠেছে মোষকে কেন্দ্র করেই। কোন একটি চিঠিতে একটি প্রবীণ টোডার কথা তোমাকে লিখেছিলুম, যে বলেছিল, মোষ ছাড়া আবার জীবন?—জীবন অর্থশূন্য মোষকে বাদ দিলে। মোষ ছাড়া আমরা যে স্বর্গেও যেতে পারি না।

সত্যিই তো মৃতের আত্মা স্বর্গে গিয়ে কি করবে মোষ না থাকলে? স্বর্গ-সুখ উপভোগ করতে গেলে তাকে পৃথিবীর সমস্ত প্রিয় জিনিসই সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। প্রিয়তম পার্থিব জিনিস মোষ। তাই মৃতের আত্মা আর মোষের আত্মা একসঙ্গে স্বর্গে যায়। মোষ না মারা পর্যন্ত মৃতের আত্মা পৃথিবীতেই ছিল, কিন্তু মোষেদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে আত্মা পৃথিবীর আলো-বাতাস, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে স্বর্গে চলে গেল। তাই প্রিয়জনেরা আত্মার বিদায়কালে নতুন করে শোকের অবতারণা করল।

মেয়ে-পুরুষেরা সবাই ইতিমধ্যে সরাবে মন দিয়েছে। সরাব স্বল্প ভাষী নরনারীদের মুখর আর মুখরা করে তুলল। প্রবীণ রাশভারী টোডারাও এখানে সেখানে জটলা করে চীৎকার শুরু করে দিল।

কুটীরের চত্বরে যে নানা রকম ডিজাইন শোভিত সুদীর্ঘ কাঠ পোতা হয়েছিল সে কথা বলেছি। জন পঁচিশেক লোক সুরা পানের মত্ততা নিয়ে সেই খুঁটির চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করল হঠাৎ। হাত ধরাধরি করে। নাচের সঙ্গে চলল অদ্ভুত জোরালো গলার ঐকতান। একটানা নয়, মাঝে মাঝে সমবেত কণ্ঠের চীৎকার। নাচে ছিল উন্মত্ততা আর শক্তির আবেদন। জান তো, টোডা পুরুষদের অবয়বে আছে শক্তি আর সৌষ্ঠবের আভিজাত্য। একটি লোক অবিরত কি বলে যাচ্ছিল, আর সেই বলার ফাঁকে ফাঁকেই চীৎকার করে উঠছিল সমবেত কণ্ঠে—হাউ হাউ, নাচের তালের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে। আসলে লোকটি মৃত ব্যক্তির জীবন আলোচনা করছিল—মৃত ব্যক্তি যে লীলাখেলা করেছে মাটির পৃথিবীতে, মোষচারণ ক্ষেত্রে, রডডেনড্রন ঘেরা উপত্যকায়, পঞ্চায়েতের আসরে। পুরুষদের পরে তরুণী মেয়েরা নাচতে এল, তারাও সুরাপানে উন্মত্ত।

নাচের পর সবাই একটু বিশ্রাম নিল। বিশ্রামের সময় সকলকেই খানিকটা ডেলা গুড় ও কোঁচড় ভর্তি সমাই খৈ দেওয়া হ'ল। আমরাও বাদ গেলুম না। তামিল মেয়েদের ইডলী, দোসা, কলা ও কমলালেবু বিক্রী হ'ল প্রচুর। এর পর সবাই উঠে এল একটি ছোট পাহাড়ের উপর। পাহাড়ের উপরটা অনেকটা সমতল আর নরম মাটিতে ঢাকা। মেয়েরা এক ধারে বসে শুরু করল গান,—আবার মৃতের জীবনালোচনা। পুরুষেরা মাটি কেটে তৈরী করল পাঁচ ফিট লম্বা ও দু ফিট চওড়া ও তিন ফিট গভীর গর্ত। ডিজাইন শোভিত কাঠের খুঁটি, ছোট খাটিয়ার উপর মৃতের স্মৃতিচিহ্ন (হাড় ও চুল) আর মৃতের ব্যবহৃত জিনিসপত্র (যেমন কাঠের বাক্স, থালা, বাসন, পুটকলী ইত্যাদি) নিয়ে আসা হল। চিতা-অস্থিতে মাখানো হল মাখন, তারপর চলল আরও কিছু ক্রিয়াকর্ম। একটি স্ত্রীলোক—তার সঙ্গে মৃতের কি সম্পর্ক আছে জানি না—সমস্ত কাজকর্ম করছিল। সমস্ত ক্রিয়াকর্মের সমাধার পর গর্তে জ্বালানী কাঠ রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। আগুন ধরাবার আগে কাঠের উপর দেওয়া হয়েছিল, হাড়-চুলসহ মৃতের ব্যবহৃত জিনিসপত্র। আর সের দশেক সমাই খই ও গুড়। আগুন জ্বলে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠল শোকের ঢেউ। কিছুক্ষণের ভিতরেই সব স্মৃতিচিহ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ডিজাইন-সহ কাঠের খুঁটিটিও পুড়ে ছাই হল। মৃতের আত্মা স্বর্গভোগের জন্য মোষ আর অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে স্বর্গে চলে গেল, স্বর্গভোগ করার জন্য। খাবার জন্য দেওয়া হল সমাই খৈ আর গুড়। পিতলের থালা বাসন অবশ্য পুড়ে ছাই হ'ল না, তা বিলিয়ে দেওয়া হ'ল দর্শকদের ভিতর।

সব ভস্মে পরিণত হলে জল ঢেলে দেওয়া হ'ল। তারপর সব কিছু দেওয়া হ'ল মাটি চাপা। সে মাটির উপর বসিয়ে দেওয়া হ'ল একটি পাথর। এর পর একটি লোক মোষের গলার ঘণ্টা নিয়ে বাজাতে লাগল চাপা দেওয়া ভস্মের চারদিকে ঘুরে ঘুরে। মোষের গলার ঘণ্টা মোষ-কেন্দ্রিক জীবনের প্রতীক। তাই সে ঘণ্টাকেও শ্রদ্ধা দেখান হয়। ঘণ্টা টোডা জীবনের মঙ্গলঘট। আমি টোডাদের যে ঘরে আছি তাতে সাজান রয়েছে ছোট-বড় প্রায় সাতটি ঘণ্টা; মন্দিরে মাখন টানবার আগে পুরোহিত ঘণ্টা পূজা করে, ঘণ্টাকে দুধ মাখন খেতে দিয়ে!

ঘণ্টা বাজাবার পর আর কি কি করা হয়েছিল, তা জানি না। বিকালের দিকে ক্যাম্পে ফিরে এসেছি।

মৃতের স্মৃতিযজ্ঞ আসলে একটি সামাজিক ব্যাপার। শোকের অনুষ্ঠান আছে, সে অনুষ্ঠানে সবাই যোগ দেয়। আবার সমারোহ আড়ম্বরও আছে। সবাই —বিশেষতঃ মেয়েরা যোগ দেয় তাদের বিশেষ বসনে আর ভূষণে। দূর-দূরান্তরের মাণ্ড থেকে লোকজনেরা একত্র হয়ে তাদের সুখ দুঃখের কথা বলে। কল্যাণ-কল্যাণীরা বয়োজ্যেষ্ঠদের জানায় আভাবন্দী৺তকেন। চলে সরাব পানের মত্ততা। বিয়েতে যে অনুষ্ঠান হয়, তা স্মৃতিযজ্ঞের অনুষ্ঠানের তুলনায় কিছুই নয়।

টোডাদের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান এই স্মৃতিযজ্ঞ, অর্থাৎ মারভেন নোলকেডর। আমিও কয়েক দিনের মধ্যেই এদের স্মৃতি নিয়ে ফিরে যাব সভ্য জগতে।

(সমাপ্ত)

॥ পটল-তোলা মানে কি ? ॥
(উত্তর)

'অমৃত' সম্পাদক
সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের "জানাতে পারেন" পৃষ্ঠা খুবই ভাল লেগেছে। এই সংখ্যায় উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম। সঠিক মনে হলে প্রকাশ করতে পারেন।

শ্রীবারীন ঘোষ চিন্তিত হয়েছেন এই সমস্যায় যে "পটল তোলার" কৃষি-কর্মটি মৃত্যুদ্যোতক হ'ল কেন এবং কবে থেকে।"

"পটল" অথবা "পটোল" শব্দটির সঙ্গে আমাদের চোখের সম্বন্ধ রয়েছে। অক্ষিপট বা অক্ষিপটল-এর অর্থ বুঝায় Retina, চোখের তারাকে আমরা অক্ষিপটল বলি। কোন বিশেষ রকমের সুন্দর চোখকে আমরা পটোল-চেরা বলি। কেউ মারা গেলে তার চক্ষু বিকৃত-রূপে ধারণ করে সাধারণতঃ চোখের তারা উল্টে যায়, সেইজন্য মৃতদেহের চোখের পাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমার মনে হয়, কেউ মারা গেলে, আমরা বলি পটল তুলেছে। এখানে যে (চোখের) পটল তুলেছে অথবা গম্ভীরভাবে বলা যে সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে বলা একই; মৃত্যু-মুহূর্তের কোন বিশেষ শারীরিক অবস্থার কথাই বলা হচ্ছে।

আর শ্রীবারীন ঘোষ জানতে পারেন যে পলতার ফল "পটোল" শব্দটির বানান "পটল" নয়।

দীপককুমার বসুরায়চৌধুরী,
১১৮, বাগুইআটি রোড,
কলিকাতা—২৮

॥ এর তাৎপর্য কি ? ॥

মহাশয়,

'জানাতে পারেন' বিভাগটি আপনাদের এক অপূর্ব সৃষ্টি। এরজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। এই কয়েকদিন আগে আমি এক আশ্চর্য ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। হয়ত এমন ঘটনা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। কিন্তু আমাকে তা' রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে।

একদিন রবিবারের বিকালে আকাশে মেঘ জমেছিল। গাছের একটি পাতাও নড়ছিল না। জ্যৈষ্ঠ মাস। অসহ্য গুমোট গরম। ছুটির দিন—এই ভ্যাপ্‌সা গরমে কোথাও যেতে মন চাইল না কিন্তু ঘরেও মন টিকল না।

বন্ধুর দর্জির দোকানে এসে বাইরে চেয়ার টেনে বসলাম। বন্ধু ঘরে বসে কাজ করছিল। আমি একাকী বসে বসে কিছুদিন আগেকার একটা কথা মনে মনে ভাবছিলাম।

ভাবছিলাম, এই দোকান, একদিন চায়ের দোকান ছিল। চা খেতে এসে একদিন দোকানের মালিক সুকুমার ব্যানার্জির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ক্রমে হৃদ্যতা। অবশেষে তার পরিবারের সঙ্গে আপনজনের মত মিশে গেলাম। এমনি গরমের দিনে সে বাইরে বেঞ্চ পেতে দিত। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করে কাটিয়ে দিতাম। সেসব বেশী দিনের কথা নয়। কিন্তু আজ সে কোথায়?

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটল। দুটি ছেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। আমার বন্ধু তাদের ডেকে বলল, কি হে, সুকুমার ত জামার দাম দিয়ে গেল না? একটি ছেলে হেসে জবাব দিল, এপথে হয়ত আর কোনদিনই তার দেখা পাওয়া যাবে না। আমি হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, রাস্তার ওপাশ দিয়ে আমার বন্ধু সুকুমারবাবুর বিধবা স্ত্রী তাঁর ছোট্ট ছেলের হাত ধরে হন্‌হন্‌ করে চলে যাচ্ছেন। আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই ঠিক তৎক্ষণাৎ আমার সম্মুখে দুটি ছেলে পর পর চলন্তি সাইকেল নিয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ঘটনাটি আমার বন্ধুবরের নিকট বিবৃত করলাম। তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, "সংসারে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। ভাল করে চিন্তা করলে তা' থেকে অনেক কিছু চমকপ্রদ উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। হয়ত এমন হতে পারে—আপনি যখন সুকুমারবাবুর কথা ভাবছিলেন, সেই মুহূর্তে তাঁর আত্মা এখানে চলে এসেছিল।"

কিন্তু কথাটা আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারিনি। কেননা, সুকুমারবাবুর মৃত্যু হয়েছে আজ তিন বৎসর। এত দীর্ঘদিনের মধ্যে কি তার আত্মার সদ্‌গতি হয়নি? আর সদ্‌গতি না হয়ে থাকলেও আমার চিন্তার সঙ্গে তার আত্মার আবির্ভাবের কী যোগসূত্র থাকতে পারে? আর সেই সময়ই সুকুমারবাবুর স্ত্রীও তাঁর ছেলের হাত ধরে চলে যাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুটো অকারণ দুর্ঘটনা ঘটে যাবে—এরই বা কি তাৎপর্য থাকতে পারে?

এ সম্বন্ধে কেউ কিছু আলোকপাত করলে আনন্দিত ও বাধিত হ'ব।

সতীশ চক্রবর্তী,
৪৮নং আনন্দচরণ ব্যানার্জি রোড,
আড়িয়াদহ,
২৪-পরগণা।

রেফযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব সমস্যা

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাঙলা বানান বিষয়ে নতুন বিধান প্রবর্তনের পর থেকে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা যেন ক্রমশই আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। সম্প্রতি রেফযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব প্রয়োগ সম্পর্কে একটি সমস্যা আমার মনে জেগেছে। প্রশ্নটি 'অমৃত' পাঠকের সামনে তুলছি। কোন পণ্ডিত ব্যক্তি যদি এই সংশয় দূর করেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব।

'সর্বত্র নির্বিচারে দ্বিত্বলোপ হইবে না। যদি শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয়, তবে রেফের পর দ্বিত্ব থাকিবে, যথা কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক। অন্যত্র দ্বিত্ব হইবে না। যথা অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কর্দম, অর্ধ, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্য, সর্ব'। বানান সমিতি এ বিধান দেওয়ার পর আবার ঘোষণা করেন যে সর্বত্রই দ্বিত্ব বর্জন করা চলবে। কিন্তু একটি শব্দ হতে উৎপন্ন অপর শব্দের যথাযথ রূপ রাখাই কি ঠিক নয়। যেমন কৃত্তিকা হতে কার্ত্তিক, বৃত্তি হতে বার্ত্তিক—এখন লেখা হচ্ছে কার্তিক এবং বার্তিক। সমস্যা হল কোন কোন বইয়ের মধ্যে উভয় শ্রেণীর বানানই লেখা হয়। যাঁরা ব্যাকরণের নিয়ম সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন তাঁরা এই ব্যাপারে নানারকম সমস্যায় পড়েন। যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা অনেককিছুই না জেনেই ব্যবহার করেন; ফলে শিশুদের গৃহশিক্ষা এবং পরবর্তীকালে নিজের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বর্তমান বাঙলা ভাষাবিদ এবং পণ্ডিতদের এ সম্পর্কে সচেতন হবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে মনে করি।

মিলন চৌধুরী,
কলকাতা

মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮
SADHANA AUSADHALAYA
Dacca (Bengal)
Taila

কাকচক্ষু

জীবন সামন্ত

সারাক্ষণ দুখানা চোখ মেলে আকাশ দেখা, মেঘ দেখা। মাঝে মাঝে হয়তো পায়রার ঝাঁকের একটা বিচ্ছিন্ন অংশ কিংবা শঙ্খচিলের একক অবরোহণ। এদের নিয়ে পরিতোষ মনকে তৃপ্তি দেয় জীবনের অস্তিত্বের স্বাদ আহরণ করে। নৈঋত কোণে আকাশের শেষ রেখাটা যেখানে নীচের দিকে সটান নেমে গেছে সেখানে একটা গাছের মাথা উঁকি মারে। সে গাছটাকে দূর থেকে চিনতে পারে না পরিতোষ। বর্ষার আকাশে যখন ঐ গাছটার মাথা আরো একটু উঁচিয়ে আসে, তখন গাছটাকে বাড়ন্ত বলে মনে হয়। ডালপালা ঘন পাতার অস্থিরতা পরিতোষের মনকে অসহ্য আনন্দ দেয়। মনে হয় গাছটা যদি রাতারাতি জানালার পাশটিতে এসে দাঁড়ায়, তাহলে পরিতোষ গাছটাকে চিনবে, হাত বাড়িয়ে নরম নরম পাতার স্পর্শ নেবে।

পরিতোষ জানে এ সমস্ত তার জীবনের অনিশ্চিত কোন এক রেখাঙ্কিত আকাঙ্ক্ষার সাধ। অথচ জানালার বাইরে খণ্ড খণ্ড ছায়া, আলো। তেতলা বাড়ীর বারান্দা, দুতলা বাড়ীর চিলেকোঠা, একতলা বাড়ীর কোলাহলের সঙ্গে এক ঝলক ধোঁয়া। শব্দ আর শব্দ, দূরে কোথায় যেন কাদের বিয়ে, সময় সময় শব্দ আসে, সানাই বাজে, গানের রেশ ছড়ায়। একতলা বাড়ীর শিশুর কান্না বেশ লাগে, যেন চেতনার রাজ্যকে জাগিয়ে রাখছে। ও বাড়ীর বৌ এ বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে কথা বলে, খোঁজ নেয়, সিনেমার গল্প বলে। একঘেয়ে, তবুও নিরাশ করে না। সময় সময় শোনবার জন্যে প্রাণ ছটফট করে পরিতোষের। এই শব্দতরঙ্গের রাজ্যে পরিতোষই কেবল নিঃশব্দ। জানালার ফাঁকে যখন রোদের সীমা টানে, ছায়ার আবরণকে বাড়িয়ে ধরে, তখন পরিতোষ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আবার এক এক সময় পরিতোষ জানালাকে নিয়ে এক একটা নাটকের মঞ্চ তৈরী করে। সকালে, দুপুরে, বিকেলে। সন্ধ্যার পর রাত, জানালা তখন দিশেহারা—পরিতোষের চোখের সামনে তার মৃত্যু। তখন সে বিছানার সঙ্গে বিস্মৃত এক জীবন নিয়ে আচ্ছন্ন। ঘুমন্ত কিংবা ঘুমঘুম এক অবয়বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর একজনকে প্রত্যক্ষ করে, আর এক জীবনের অংশ নিয়ে ইতিহাস তৈরী করে। অথবা তার গায়ে হাত দিয়ে কিংবা চুলের ঘ্রাণ নিয়ে আর এক অতীতের রাজ্যে প্রবেশ করে। দূরে কোন এক অজানা বাড়ীর নবজাতকের কান্নার ইচ্ছে যেন পরিতোষের মধ্যে ঘনীভূত হয়। এমনি এক একটা দুর্বল আর দুর্বোধ্য অনুভূতিকে সে প্রতিদিনই পায়, প্রতিদিনই হারিয়ে ফেলে।

পরিতোষ একঠায় বসে চোখের পাতাকে নাচায়, আকাশের রং বদলানো স্বভাবকে ভারী আরামের সঙ্গে উপলব্ধি করে। তাই ঐ নৈঋত কোণের নাম-না-জানা গাছের নোংরা ধুলোমাখা মাথাটাকে কৃপণ বলে মনে করে।

সকাল হলেই রোদটা একেবারে জানালার গায়ে আছড়ে পড়ে না, ও বাড়ীর বাগানের বেড়ার গায়ে ইঁটের বড় থাকটা রোদটাকে আটকে রাখে। এ নিয়ে পরিতোষ অবুঝের মতো অনুযোগ করেছে করুণার কাছে। করুণা পরিতোষের ছেলেমানুষী দেখে হেসেছে।

এমন এক ফালি আকাশ, চৌকো-কাটা চার-চারটে ছাত, তারপরে পাশের বাড়ীর এক প্রস্থ ফাঁকা ঘাসের বাগান। ফুল নেই, ফল নেই, তবুও বেড়ার টান, ইঁটের স্তূপ। করুণা বোঝে না যে পরিতোষের এখানে নিশ্বাস নিতে কত আরাম। দূরের সেই চিলে-ছাদের কোণ বেয়ে যখন আলোর ফিনকি পূব থেকে পশ্চিমে নুইতে থাকে তখন পরিতোষের আনন্দের সীমা থাকে না। নৈঋত কোণের ঝাঁকড়া গাছটার পাতায় একটা বিশেষ সময়ে ছায়া-রোদ্দুর খেলা জোড়ে। পাখীরা গাছের ডালে ভিড় করে ডাক পাড়ে, আসর জমায়—এ সমস্ত অনুভব করে পরিতোষ। পাখীর কাকলি

সে যেন অনেক দিন শোনে নি। কাকও তো ডাকে, মাঝে মাঝে মনে হয় কাকেরাও বুঝি দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। ভোরবেলার কাক ডাকার শব্দ পরিতোষ শোনে না, ঘুমিয়ে থাকে, করুণার খুব ঘনিষ্ঠ আঁচলের মতো একটা অদ্ভূত চাপা চাপা ঘুম তাকে আচ্ছন্ন করে। দুপুরে এক একবার চোখে যখন ঢুলু-ঢুলু ভাব আসে তখন এক একটা ছুটো কাকের দুষ্টু ডাক শুনে পরিতোষের ভয় লাগে। জানালার গরাদ ধরে তাকালেই হয় তো দেখে ফেলে একটা বেড়াল বেড়া টপকিয়ে দিব্যি ঐ ইঁটের গাদির ওপর আলসে-পনা করে বসে আছে। বেঁচে যায় পরিতোষ, বেড়ালটার রং নিয়ে চিন্তা করে—ওর পায়ের নখ কি খুব তীক্ষ্ণ, খুব নিষ্ঠুর। ওর সরু চিকন দাঁতের সঙ্গে কারো নির্দয়তার তুলনা চলে কি?

করুণাকে আর বিশ্বাস নেই, পরিতোষকে স্তোক দেয় আশা দেয়—বলে, আমি আছি তো। হ্যাঁ, করুণা আছে। আছে বলেই যেন নেই নেই বলতে ইচ্ছে করে। একটা ফুল ফুল মুখ কেমন থমথমে ভাঙাভাঙা। চোখ-দুটো অদ্ভুত উজ্জ্বল, অথচ উদ্বিগ্ন। এ সবের জন্যে পরিতোষ একটু ভাবে, একটু মনোসংযোগ দিয়ে আকাশের মেরুদণ্ডকে দেখতে চেষ্টা করে। করুণার মতো খোলামেলা আকাশের তটে কোথাও কি একটু স্থিরবিন্দু আছে?

এখন পরিতোষ দুধ খেতে চায় না, চা খায়। করুণা চা-ই রাখে। আগে পরিতোষ সিগারেট খেত হয়তো দিনে বড়জোর পাঁচটা থেকে ছটা। এখন দশটাকেও ছাড়াতে যায়। করুণা সমস্তই যোগাড় করে ঠিক ঠিক ভাবে সাজিয়ে রাখে। এর জন্যে পরিতোষ রাগও করে-ছিল সেদিন। কেন এভাবে করুণা মেপে-মেপে চলছে, কি সে পাচ্ছে পরিতোষের কাছ থেকে, আর কিসের জন্যেই বা তার এতখানি আশা।

পরিতোষ খুব নিবিষ্ট মনে জানালার গরাদ ধরে একটু আড় হয়, চৈতন্য সঞ্চয় করে। বেড়ালের দিনের বেলার চোখের তারার সঙ্গে রাত্রের চোখের তারার কি পার্থক্য অনুধাবন করে। মনে হয় সব শেষে সব চেয়ে মজার এক অস্পষ্ট অথচ অভাবিত স্পন্দন সে টের পাবে। তারপর ঐ চিলে-ছাদ অথবা অজানা বাড়ীর নবজাতকের রাত্রির কান্নার সাধ নিয়ে তার বাঁচার দীর্ঘমেয়াদী ফাঁদটা ধরা পড়বে।

প্রতিদিন যাবার সময় করুণা পরি-তোষের জন্যে কি কি রইল, কি কি আবার পালটানো চলবে, কোন জিনিসটা

আরো পরিতোষের পছন্দের অন্তর্গত সেগুলো আবৃত্তি করে। পরিতোষের মাথার চুলে আর একবার চিরুনি দেয়, আর একবার খাবারের ডিস ফ্লাক্সের নিরাপত্তা, দৈনিক কাগজের নির্ভাজ দিস্তেটা ঠিক পাশাপাশি রাখে, আদরের ছোঁয়া লাগায় যেন। পরিতোষ তখন চোখ মেলে কিছুই দেখতে চায় না, কেবল অনুভব করে—এই বুঝি করুণা তার মাথাটা মাথার ওপর ঠেকাবে, গলাটা গালের ওপর ঘষে চোখের চাউনিটাকে এক রকম উদাস অথচ নিঃসীম রেখাংকিত করে, জানালার কপাটদুটো পরীক্ষা করবে। তখনো পরিতোষ কিছুই বলবে না, পায়ের প্রান্তে যেখানে অসাড় এক বেদনার কেন্দ্র সেখানে হাত দিয়ে মুখখানা যথাসম্ভব ভারাতুর করবে—হয়তো কিছু বলতে যাবে, বলবে না।

করুণা বলবে, 'আজ তবে বেরুবে না বলছো?'

পরিতোষ অসহায় হয়ে পড়বে আরো, বলবে, 'ক্ষতি হবে, নতুন চাকরি।'

পরিতোষ অভিভাবকের ভঙ্গী নিয়ে যেন সত্যিই করুণাকে মানা করছে না, অথবা করুণার ওপর তার জুলুমের অধিকার আছে বৈকি।

তারপর করুণা আর একবার ঝুঁকে পরিতোষের মুখখানা তার বুকে গলায় গালে ঠেকিয়ে একটু হাসি-হাসি মুখ করে বলবে, 'যাই, কেমন?'

করুণা সারাদিন থাকে না, নৈঋত কোণের সেই গাছটার মতই পরিতোষ একক। দুজনেই সমান, কারো জন্যে কারো মায়া নেই মমতা নেই। স্থিরবিন্দু করুণার কথাও কি ঐ গাছটা ভেবেছে? না, করুণাকে গাছেরা চেনে, তারা করুণাকে প্রত্যহ দেখে, প্রত্যহের সঙ্গে তাদের অন্তরতৃপ্তির এক একটা চিহ্ন পড়ে। পরিতোষ খুশী হয় আবার হিংসায় পুড়ে মরে। মাঝে মাঝে তাই সে গম্ভীর হয়, করুণার হাজার মিনতিতে সাড়া দেয় না।

পাড়ার লোকেরা আছাড় খেয়ে পড়েছিল। সহানুভূতিতে বিগলিত হয়ে করুণার ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিশ্চয় বিচলিতও হয়েছিল। পরিতোষ তখন বাঁচা আর না-বাঁচার কিনারে। বাঁচলে ভাল, মরলেও ক্ষতি নেই।

পরিতোষ যখন নিতান্ত বেঁচেই গেল, তখন সেই প্রথম দৃষ্টিতে, আজো পরিতোষের মনে আছে, করুণার কি ব্যাকুলতা। পরিতোষ বাঁচবে, হ্যাঁ শুধু বাঁচবে। এর বেশী আর কিছু নয়। করুণা আর কিছুই চায় না।

পরিতোষ জানে মানুষের তো পরিবর্তন আসে, যেমন তার নিজেরই এসেছে। সদর জানালার সম্মুখে হাজার চেষ্টাতেও করুণা তাকে টানতে পারে নি, ওখানে পরিতোষের স্বাভাবিক সত্তা দিশেহারা হয়। অথচ যখন পরিতোষ পরিপূর্ণ জীবন নিয়ে করুণাকে দেখত, দেখাতে চাইতো, তখন ঐ জানালার পাশটিই ছিল ওর প্রশান্তির নিবিড়তা। ওখান থেকে আর একটি রাজ্য, বড় রাস্তার গাড়ীর শব্দ, একখানা ছোট গলির দু সার ছোট-মাঝারী বাড়ী, রক বারান্দা আর লাইট-পোষ্ট। ছাদের আলসে উপচানো ভিজে শাড়ির আঁচল। চৈত্রসন্ধ্যা কিংবা শ্রাবণের মেঘলা দুপুর অথবা কালবৈশাখীর দুর্জয় আক্রোশ এই গলিটার মধ্যেই এক একবার সাড়া তোলে। জানালার বাইরে বৃহত্তর কিছু নেই বলেই যেন পরিতোষ আর করুণা, তাদের ছোট সংসার, স্বাভাবিক জীবনের অনুশীলন, ঐ জানালাটাই বেশী করে জানে। প্রতি মুহূর্তে এক একটি ঘনীভূত আশা আর আকাঙ্ক্ষা ঐ জানালা-টাই যেন প্রতিনিয়ত স্মরণ করে। জীবনের কোন এক চিহ্নিত ধারাকে নতুন রূপে লালন করার দাম আর দেবে না পরিতোষ।

এই তো সেদিন, ধরতে গেলে চোখের পলক পড়তে না পড়তেই এক বছর কেটে গেল। করুণা বাইরে যাচ্ছে সময়ে, আবার সময়ের তালে ফিরছে। খুব কষ্ট যে কদিন হয়েছিল পরিতোষের সে কদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটিয়েছে। করুণা শুইয়ে দিয়ে গেছে আবার ফিরে এসে তুলেছে। মুখে হাসি আনতে গেছে, চোখে জল এসে পড়েছে। কিছু বলার আগেই পরিতোষ ফুঁপিয়ে উঠেছে। এখন সামলে নিয়েছে, ভেবেছে মৃত্যু তো আছেই, বাঁচার জন্যে মানুষের মৃত্যু আরো অনিবার্য।

বাইরের দরজার কড়া নড়ে ওঠে। চাবি আর তালার সংঘর্ষের আচমকা শব্দটা পরিতোষকে উৎকর্ণ করে। করুণা কি?

করুণাকে এ সময়ে দেখার বা মনে করার যথেষ্ট কারণ থাকে না পরিতোষের। গড়িমশি ভাব নিয়ে উঠতি-পড়তি রোদ্দুর অথবা ছায়ার তারতম্য উপলব্ধি করে আনন্দ পায়। মাঝে মাঝে সিগারেট ধরায়, কয়েকটা টান দিয়ে ছাই-দানির ওপর সিগারেটের নিজে নিজে পুড়ে যাওয়ার রূপকে অনুধাবন করে।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘিরে এক একটা মানস-স্মৃতির প্রচ্ছদ সম্পূর্ণ হয়। ও প্রান্তের জানালার সাথী হলে পরিতোষ তার নিজস্ব নতুন জগতের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। করুণা আরো একটু বাসি হয়ে যাবে। তার বাইরে বেরুবার গতি, ফিরে আসার চলন পরিতোষের চোখে খুব জানা হয়ে যাবে। ঐ লাইট-পোষ্ট, ছোট মাঝারি বাড়ীর আঁকাবাঁকা ভুতুড়ে ছায়া, গলির সাঁৎসেঁতে হাওয়া—সবই পরিতোষকে আতঙ্কিত করবে।

এই নৈঋত কোণের টুকরো খণ্ড আকাশের গায়ে পৃথক পৃথক মূর্তি নিয়ে করুণা উদয় হয় না। গাছের পাতা, চিলেকোঠা অথবা চৌকো চৌকো আলসের ফাঁক কাটিয়ে যে সব দিগন্ত ধাঁধার মতো ইঙ্গিতময়, তাদের নিয়ে পরিতোষ সীমা খুঁজতে পারে।

একটু আগেই সামনের একফালি মাটির বাগান থেকে ঘাসগুলো যেন মাথা নাচিয়ে পরিতোষকে দেখেছে। পাশেই একটা ছাইগাদা, তা হোক—পরিতোষকে বিব্রত করে না। একটু-আধটু বাতাস এলোমেলো খেলা খেললেই ছাইগাদা খানিকটা চঞ্চল হয়, পাশের মানকচুর ডাগর পাতাগুলো ধূসর হয়। চড়ুই দুটো ইঁটের থাকের ওপর নাচানাচি করছিল, বেড়ালটা কাছে-পিঠে কোথাও ছিল না, কাকও নয়, এমন কি আকাশের গায়ে একটি দাগও নয়। হঠাৎ চড়ুইদুটো পরিতোষের মাথা ডিঙিয়ে ঘরের এ-কোণ ও-কোণ করে। আলনার ওপর দাপাদাপি, করুণার ড্রেসিং টেবিলের হরপার্বতীর গায়ে আঁচড়া-আঁচড়ি। পরিতোষ চোখ চারিয়ে যা যা দেখে, মনে হয় চড়ুই পাখীদুটো খেলতে জানে বাঁচতে জানে। সব শেষে এক বিচিত্র ব্যবহার নিয়ে দুই জানালা দিয়ে দুজনে পালিয়ে যায়। সিলিং-এর গায়ে চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ওড়ে, দুটো মাকড়সাকে দুজনে কায়দা করে, ছোট ছোট ঠোঁটদুটো হিংস্র হয়। তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে দুদিকে দুজনে উড়ে যায়।

পরিতোষ এক টানে প্রায় আধ গেলাশ জল খেয়েছে। কাঁচের গেলাশের গায়ে জলের দাগ পড়েছে কিনা দেখেছে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে নির্বোধ এক হাসি হেসেছে। বাইরের ঘাসের গায়ে আর কোন ক্ষুধার্ত জীব এসেছে কিনা উঁকি মেরে দেখেছে একটিবার। ইঁটের থাকে থাকে কোন সরীসৃপ উত্তেজিত হয়ে ফুঁসতে পারে কি-না তা নিয়েও পরিতোষ একটু সময় কাটিয়েছে। বসে বসে এই বিরাট অবসরের মুহূর্তে পরিতোষ এক নাগাড়ে যদি ইঁটগুলোর হিসাব করে মন্দ কি। এমনি রোজ একবার করে শুরু করার পর শেষ করতে যাবার মুখে না হয় করুণার কথা ভাববে, বা ঐ রকম এক চড়ুই দম্পতির আচরণ সম্বন্ধেও বিস্তৃত চিন্তা করবে।

এবারেও পরিতোষ সিগারেটের সবটা শেষ করতে পারে না, বিমূঢ় হয়ে পায়ের অসাড়তা যাচাই করে একটু হাতের তালুতে ভর দিয়ে নড়েচড়ে। পিঠের ওপর ঘাম দিয়েছে, বুকের চুলগুলো জামা চেপে চেপে শুকিয়ে তোলে। ধুতি জামা, এ সমস্ত পরিতোষের কাছে কিছুই নয়, পরা না-পরা দুই-ই সমান। তবুও করুণা দামী দামী জামা ধুতি পরিয়ে দেয়, যেন ছোট বয়সে করুণা তার পুতুলকে নিয়ে সোহাগ করছে, আদর জানাচ্ছে আর অষ্টপ্রহর সাজসজ্জা পালটে দিচ্ছে। অথচ পরিতোষ তো প্রায়ই কর্কশ হয়, অমানুষের মতো মনে মনে করুণার ওপর অবিচার করে। করুণা কেবল হাসে, মর্মান্তিক এক মমতার হাসি নিয়ে পরিতোষের কষ্টের ভাগ নেয়।

চড়ুই পাখিদের খেলা তো সাঙ্গ হয় এখনকার মতো। আবার আসবে, হয়তো একা একা, নয়তো জোড়ে নিজোড়ে। একটু আগেও প্রায় করুণা বাড়ীতে থাকতে থাকতেই দু-দুটো ধেড়ে টিকটিকি দেওয়াল থেকে আলমারির মাথা আবার সেখান থেকেই দরজার র‍্যাক ছাড়িয়ে শিলিং টপকে একেবারে এ-পাশের দেওয়ালে। একজন আর একজনকে নির্যাতন করে। রাত্রে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা মূর্তি। লাইটের খুব কাছাকাছি হয়ে দুজনেই দেওয়াল আঁকড়ে শিকার ধরে, কারো এলাকায় কেউ ধাওয়া করে না।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখে পরিতোষ একটা ছায়া আসছে পায়ের শব্দটা খুব চেনা। করুণাই আসে, খুব অসময়ে যে সময়ে পরিতোষ কল্পনাও করতে পারে না। চাবি-নাড়ার শব্দটাও পরিচিত ছিল, দরজা খোলা এবং বন্ধ করার পদ্ধতিটাও একান্ত নিজের নিজের মতো। এমন কি জুতোটা খুলে রাখার এবং সব শেষে ঘরের মেঝেতে ঢুকতে ঢুকতেই মাথার আঁচলটা খসে পড়ার যে মুহূর্ত-ছায়াটা দেওয়ালে পড়েছে সেটাও পরিতোষ প্রাণভরে দেখে, আপন আপন বলেই মানে, আর খুব খুশী হতে যেয়েও তার যা স্বভাব, একটু অমনোযোগী হয়।

করুণা শাড়ি আলগা করতে করতেই বলে, 'আচ্ছা কি আনলাম বলো।'

পরিতোষ হাসতে পারে না। মাথাটা এগিয়ে এসে আবার জানালার দিকে পৌঁছয়, চোখের পলক না ফেলেই বাইরে সেই ইঁটের থাকটাকে দেখে।

করুণা আটপৌরের আঁচল বুকে চাপিয়ে আলগা খোঁপাটা ছেড়ে দেয়। মাথার কাঁটাদুটো দাঁতে চেপে বলে, 'তুমি যা চাও তাই এনেছি আজ। খুব সুযোগ পেলাম, আর আমি ছাড়ি?'

মৃদু হাসে পরিতোষ। মাথাটা ফিরে এসে করুণার টেনে-হিঁচড়ে ব্লাউজ খোলার ভঙ্গিটা দেখে। চোখ নামায়, ড্রেসিং টেবিলের ছায়াটা অনুক্ষণ চোখকে ফাঁকি দিচ্ছে ভাবে। তারপর বলে, 'কি এনেছ করুণা?'

করুণা ভ্রূভঙ্গ করে বলে, 'আন্দাজটা শুনি?'

'তোমাকে তুমি এনেচ, আর আমি কিছুই চাই না তো।'

পরিতোষের চোখদুটো মনোজ্ঞ রূপ নেয়। ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরে, নির্ভর-যোগ্য একটা নোঙর বই তো কিছুই নয় করুণা। তখন পরিতোষ অনুভব করে—করুণা তোয়ালে দিয়ে তার মুখখানা মুছিয়ে দিচ্ছে, চুলে চিরুনি দিয়ে মাথাটা খুব বুকের কাছে নিয়ে বলে, 'কই বলতে পারলে না তো?'

পরিতোষ পুতুলের মতো চুপ করে থাকে। অনুভব করে করুণার বুকের রক্তকে, চুলের সুবাসকে আর আটপৌরে শাড়ির একটা মাজা মাজা গন্ধকে। পরিতোষ চুপ করে থাকলে করুণা আড়ষ্ট হয় না, বা কোন সন্দেহকে ছুঁতেও চায় না। পরিতোষের স্বভাবটা তার খুব চেনা। যখন পরিতোষ সুস্থ স্বাভাবিক ছিল, তখনো পরিতোষের একটা গোঁ ছিল, সেটা ন্যায় কি অন্যায় এমন কিছু ভাববার কারণও ছিল না।

করুণা বলে, 'দ্যাখো, এই যে।'

বাসকেট থেকে প্যাকেট খোলে। তারপর দেখায় রবীন্দ্রনাথের দু খণ্ড। হঠাৎ করুণার গলার স্বর চড়ে ওঠে, আনন্দের বাঁধ-ভাঙা ডাক দিয়ে বলে, 'দেখলে তো, যা কেউ পারে না, আমি

পারলাম। কেন জানো? শুধু তোমার জন্যে, তুমি ভালবাস যে।'

পরিতোষ নীরবে বই দুটোর পাতা ওল্টায়। নতুন বই-এর গন্ধ শোঁকে, খুব পুরনো চেনা গন্ধ। তারপর সত্যিই হেসে বলে, 'সময়টা আমার কাটবে ভালো।'

'ঠিক তো?' উচ্ছ্বসিত হয় করুণা। 'আর জানো, ভারী মজা হয়েছে, ছুটিটাও পেলুম, বাজি আর নয়, এক সেকেণ্ডও নয়। আচ্ছা কি তুমি বোকা বল তো, আপেলের মাত্র আধখানা খেয়েচ, এভাবে আমাকে সাজা দেওয়ার কি মানে হয়!'

কই বলতে পারলে না তো?

পরিতোষ যেন হঠাৎ অন্ধ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তার কি বলা উচিৎ সেটাও যেন তার বুদ্ধিতে আসতে চায় না। করুণা আবার এতেই মনে মনে খুশী, পরিতোষ তাকে ভয় পায়, এমন কি তাকে দেখার জন্যে সে সর্বক্ষণ অপেক্ষা করে। বাইরের যেটুকু নিশ্চলতা, মনের মধ্যে তার কেবল অকারণ আন্দোলন।

ফ্লাস্ক থেকে একটু চা ঢালে করুণা। ট্রেটায়ে এক কাপ। পরিতোষ কি আর এখন চা খাবে? কাপটা পরিতোষের ঠোঁটের কাছে এগিয়ে ধরে করুণা। বলে, 'এক সর্তে কিন্তু, আমিও ভাগ চাই।'

পরিতোষ চমকে ওঠে, নিজের হাসিতে এমন করে অবাক হবার অভিজ্ঞতা এই তার প্রথম। অনুনয়ের সুরে টেনে বলে, 'তুমি সবটাই খাও না করুণা, সত্যি বলচি আমি এই মাত্র খেয়েচি।'

'তা হয় না, বেশ আমিই না হয় প্রথমটায় চুমুক দিলুম।'

জানালার আকাশ ছাড়িয়ে চিলে-কোঠার ফাঁক ঘিরে যেটুকু ধূসর চিহ্ন দেখা যায়, সেখানে পরিতোষের নজর পড়ে। এখন করুণা বাথরুমে। কাচাকাচি সেরে সবশেষে মুখের প্রান্তে, ঘাড়ের দুটো ও কানের পিছনে সাবান মেখে পরিচ্ছন্ন হয়ে ফিরে আসবে। চুলটা আজ পরিপাটি করে বাঁধবে। বাঁধতে বাঁধতে আক্ষেপ করে বলবে—চুলটা সব উঠে গেল, ন্যাড়াই না হয়ে যাই। দ্যাখো, সত্যি দ্যাখো তুমি একবার। জানো আমার কান্না আসে। সত্যিই করুণার চোখ ছলছলিয়ে উঠবে। পরিতোষের পশু-গহ্বরের মুখটা একটু খুলে যাবে হয় তো। কিছুই বলবে না মুখে, মনে-মনে একটু কমবেশী আনন্দই অনুভব করবে।

করুণার এইমাত্র যে উচ্ছ্বাসের স্বরটা ঘরের চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলে হারিয়ে গেছে, সেটা নিয়ে পরিতোষ জানালাটাকে দোষী সাব্যস্ত করে, সেই নৈঋত কোণের মাথা-ঝাঁকড়া গাছটাকেও সুনজরে দেখে না। পরিতোষও তো বাইরে বেরুত, চাকরির চরকিতে ঘুরপাক খেতো। করুণার কথা ফাঁকে-ফাঁকে মনে পড়তো, বাড়ী ফেরার তাড়া থাকতো। মাসের মাইনেটা হাতে এলেই ভাল একটা কিছু (যেটা করুণা পছন্দ করতো) করুণার জন্যে আনতো। বাড়ী ফিরতে একটু দেরী হলে করুণার অনুযোগের অন্ত থাকতো না। দেরী করার বিশেষ একটা কারণ হয়তো থাকতো না পরিতোষের, তবুও মাঝে মাঝে দেরী করার ঝোঁক চাপতো। বাইরের সুখ বাইরের আনন্দ এমনকি বাইরের জগতের একটা ছোটখাটো টান থাকাও কি বিচিত্র! এমনো তো হয়েছে পরিতোষের, গল্প করতে করতে সময়ের কাঁটা অনেকখানি ঘুরে গেছে। পাশের টেবিলের নতুন মুখটির সংগে আলাপ জমাবার ইচ্ছা কার না হয়!

কিন্তু করুণার এত কথার মধ্যে কোন একটা ছেদ লক্ষ্য করে না পরিতোষ। সাহায্যের গায়ে গায়ে সহানুভূতিই আছে। তাই করুণা আজ বাইরের জগতের নিরূপিত সংজ্ঞা আর পরিতোষ অন্ধ-কারের মধ্যেও একটি বিশেষ পরিমণ্ডল।

করুণা বলে, 'কি এমন?'

পরিতোষ বলে, 'ঠিক তা নয়, মানে সুযোগ সন্ধানী।'

করুণা মুখভেরা হাসি নিয়ে চাটা শেষ করে বলে, 'নিজের নিজের একটা দায়িত্ব আছে।'

পরিতোষ উত্তেজিত হয়েও থেমে যায়, অস্ফুটে একটা শব্দ বার করে। করুণা চুপ করে শিরদাঁড়ার ঘাম তোয়ালে দিয়ে মুছে ফিক করে হেসে পরিতোষের মাথাটা হাতে চেপে নাড়িয়ে দিয়েছে, যেন একটা কচি মুখের আব্দারকে সহ্য করে আদর জানাচ্ছে।

মাত্র দুটি মাস কেটেছে। বাইরের জগৎ দেখে দেখে করুণার মনোবাসনার আঁকাবাঁকা গতিটা খুব, ঝিমিয়ে নেই,

হয় তো। পরিতোষ নিরর্থক ভাবে, অথবা জোর করে আর একজনের অধিকারকে দমন করার সুযোগ নেয়।

তারপরে করুণা বাথরুম থেকে ফিরে এসে ভিজে হাতটা পরিতোষের কপালে চেপে ধরে, বলে, 'ঠাণ্ডা হলে তো? বাপরে বাপ, বাবুর চিন্তার কারণটা শোন একবার!'

পরিতোষ যেন অনুতাপের দাহনে অসহায় চোখ করে করুণার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর বলে ওঠে, 'কিন্তু আমিই তো দায়ী করুণা।'

করুণা সিঁদুর পরতে পরতে ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, 'দায়ী কেউ নয়।'

একখানা কবিতা এরই মধ্যে শেষ করেছে পরিতোষ। বইখানা সজোরে মুড়ে ফেলে বলে, 'কিন্তু করুণা, তুমি কিছুই পেলে না, আমারই ভুলে তুমি ঠকলে। অন্ততঃ নিজের বাঁচার আনন্দকে চোখের সামনে আর মেলতে পারলে না।'

করুণা নীরবে পরিতোষকে লক্ষ্য করে, চোখ নামায়। হরপার্বতীর মৃণ্ময় মূর্তিটার দিকে দৃষ্টি নিয়ে কি এক গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়। যেন পরিতোষকে করুণা আর এক দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করছে। পরিতোষ তখন সেই ঊর্ধ্বগামী আলোছায়ায় বিচিত্র রেখাকে জানালার খুব কাছে আনতে চাইছে।

তারপরে করুণা কিছু না বলেই যেন অনেক বলার একটা সুডৌল পরিচ্ছেদ শেষ করেছে। পরিতোষ রবীন্দ্ররচনার পাতার মধ্যে অলৌকিক যে গন্ধ পেয়েছে, সেখানে করুণার মুখের মতো কোন এক ছায়া অথবা ছবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে পরিতোষেরই জেদের কথা। করুণা চেয়েছে, মুখফুটে দু-একদিন বলতেও বাধ্য হয়েছে, তবুও পরিতোষ রাজী হয়নি। একটা সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ সুখের চিত্রকে দেখিয়ে দেখিয়ে করুণাকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছে। জীবনটাকে করুণা যেভাবে এত সহজে পরিপূর্ণ করতে চেয়েছিল, সেটার ওপর পরিতোষেরও যে লোভ ছিল না এমন নয়। আটপৌরে সেই ধরা-বাঁধা সংসার যাত্রার চেহারাটা আরো কিছুদিন পরেই না হয় দেখবে তারা।

সেই একবার করুণা তার ধরাবাঁধা ছককাটা দৈনন্দিন জীবনের চাকা ঘুরিয়ে অসময়ে বাড়ী ফিরেছিল। এখন হয়তো ফিরতে পারে, কিংবা ফেরার চেষ্টাও করতে পারে, কিন্তু ভুলেও করুণা তা [illegible] পরিতোষের [illegible] দুটো ডানা পাখার মতো এ-পাশ ও-পাশ হয়ে এক-একবার ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আসে যদি আসুক, না এলেও ভাবনা নেই। যেমন করুণার জগৎটা কেবল রান্নাবান্না, খাওয়া-খাওয়ানো, আর প্রত্যাহের ঘরোয়া জীবনের মাপাজোখা চলাফেরা, কথাবার্তা ইত্যাদির সীমা অতিক্রম করেও আর একটা জগতে অনুপ্রবেশ করার অধিকার নেয়, তেমন পরিতোষও অনেক চেষ্টা করে নতুন কোন পাখির ডাক অথবা ঘাসের ফুল দেখার অফুরন্ত অনুসন্ধান চালায়। করুণা বাইরের পৃথিবীকে আকণ্ঠ পান করে তবে বাড়ী ফিরতে চায়। ফিরে পরিতোষকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে, ভেবে নেয় দেহহীন মানুষটার প্রাণটা এখনো নিশ্চল হয় নি, এখনো করুণার জন্যে অপেক্ষা করে, করুণার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি মেলে রাখে।

তার পরেই পরিতোষ বেশ বুঝতে পারে করুণা একটু বিচলিত হয়ে মনে-মনে পরিতোষের এই স্থূল অস্তিত্বটাকে একান্ত নিজের বলে স্মরণে পৌঁছে দেয়। অফিসে পথে ট্রামে-বাসে সে যা দেখছে, আর এইমাত্র যে-সব বস্তুর সঙ্গে তার বোঝাপড়া হয়েছে, সেগুলো খুব কাছের হয়েও দূরে সরে যায়। পরিতোষের অবুঝ আর অনড় চোখদুটোকে মমতার চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে বুঝে নেয়। পরিতোষ খুশী হয়, কথা বলে, আবার ওরই মধ্যে ঝিমিয়ে যায়। যেন করুণার খুব গায়ে গায়ে অথবা হাতের তালুর সংস্পর্শে পরিতোষের জানা কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু করুণা আরো উজ্জ্বল হয়, আরো অনুরাগের চেনা সুর তুলে পরিতোষের ঠোঁটের কাছটিতে মুখ এনে আদর করতে আসে। পিঠের শিরদাঁড়া, বাহুর প্রান্ত, আর অসাড় পা-দুটোকে হাতের স্পর্শে সজাগ করে। শিশুর মতো একটুও বা শূন্যে তুলে বিছানার আর এক প্রান্তে শুইয়ে দেয়। তখন পরিতোষের দুটো হাতই করুণার ঘাড়-পিঠ-বুক ছাপিয়ে গলা জড়িয়ে থাকে। যেন পরিতোষ সম্পূর্ণ এক নবজাতকের চেহারায় মায়ের কোলে আশ্রয় পেয়েছে। পরিতোষের অমনি মনে পড়ে করুণার সাধ-আহ্লাদ, আশা-বাসনার সেই বিয়ের বছরের প্রতিকৃতিটা। পরিতোষ কি নতুন এক বেশে করুণার সেই সাধকে সম্পূর্ণতা দিচ্ছে? এইখানেই করুণা সবটা শেষ করে না, ঘরের আলো জ্বালার আগে পর্যন্ত দম-চাপা এক নিবিষ্ট প্রহরীর মতো পরিতোষের সারা দেহটা বুকের কাছটিতে টেনে রাখে—যেন ঠিকঠাক একটা সারা সংসারের গোটানো মূর্তিটাই পরিতোষের চেহারার সঙ্গে মিশে আছে। পরিতোষ সে সময় চুপ করে কেবল নিশ্বাসের শব্দ শোনে—নিজের কিংবা করুণার বুঝতে চায় না। কেবল মনে করে, করুণার বুকের মধ্যে যে বিরাট আকাশ তার দিগন্ত কোথায় যেয়ে মিশেছে।

পরিতোষ নিশ্চয় বিশ্বাস করে, এমন কি অনুশীলনের ঐকান্তিকতা দিয়ে উপলব্ধি করে—করুণা নিজেকে বঞ্চনা করলেও পরিতোষকে ফাঁকি দিচ্ছে না। ছ মাস আগের চেহারায় যে নৈরাশ্য আর ঔদাস্য ছিল, এখন এই এক বছর পেরিয়ে যাওয়া চেহারায় বিশেষ এক সম্পদ ফিরে এসেছে। পরিতোষ তো বর্ষার নৈঋত কোণ দেখেছে, শরতের ভিজে ঘাসের ওপর নেচে-বেড়ানো ফড়িংও দেখেছে, কিন্তু ম্লান পাতার শিরার দাগ আর ডাঁটার সুডৌল রূপের তুলনা কোথাও মেলে নি। ইঁটের থাকের আশে-পাশে দু-একটা হলুদগাছের আধমরা পাতা মনে হয় সারা বছরটাই একই চেহারায় হেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোন পরিবর্তনই ঘটে নি।

বেড সুইচ টিপে আলো জেলেছে পরিতোষ, নিজের একক ছায়াকে প্রেতের মতো মনে হয়েছে, জানালার খোলা কপাটগুলো চৌকিদারের সাজ-পোষাক পরে যেন আলো থেকে অন্ধকারকে পাহারা দিচ্ছে। কড়িকাঠের নিচের সেই ক্ষীণবিন্দু ব্লু লাইটের বাল্বটা আর একটা অস্পষ্ট রেখাপাত করে করুণার ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটাকে ঝলসে তুলেছে। এইভাবে পরিতোষ কোনদিনই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘরের চতুষ্কোণ আবিষ্কার করে নি। একটা সুখ অথবা ভয়ের আনন্দ কিংবা অভাবের তীব্রতা—কোনটাই নিজের নিজের রূপ ধরে পরিতোষকে জবাবদিহি করতে পারে না। করুণার আটপৌরে শাড়ির পাড়ে একটা মথ এসে বসে ঝটফট করে খানিকটা নাচে। দেওয়ালের দুর্দান্ত টিকটিকিটা সরসর করে এগিয়ে আসতে আসতে আবার আর একটা বড় মথের সন্ধান পেয়ে বাঁক নেয়, জিবের লালচে রংটা গাঢ় হয়ে বার কয়েক মুখ থেকে বেরোয় আর ঢোকে। করুণার ড্রেসিং টেবিলের লম্বা কাঁচের পর্দায় ছবি হয়ে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে পরিতোষ দেখে। মাঝে মাঝে করুণার পায়ের শব্দ, চাবির সঙ্গে তালার ঠোকাঠুকি, তারপর সব শেষে দরজার একটা ঝড়ঝড়ে চীৎকার আশা [illegible]

থাকে। খাবারের প্লেটে তখনো খানিকটা ছাল্‌য়া অবশিষ্ট ছিল। পরিতোষ অজান্তে মুখে তুলে স্বাদ সম্বন্ধে সঠিক একটা ধারণা নেয়। বারবার ওল্টানো কাগজখানার হেডিং দেখে হাসে। ব্র্যাকেটে ঝোলানো করুণার ব্রেসিয়ার ব্লাউজ এমনকি বাদামী রংএর একফুট রিবন নিয়েও পরিতোষ গবেষণা চালায়। নিজের আর এক সেট ধুতি-পাঞ্জাবীর সযত্ন পারিপাট্য সম্বন্ধে তুলনামূলক চিন্তা করে। এই ঘরের মধ্যে যা-কিছু অবশিষ্ট সবই পরিতোষের মনের শালীনতাকে স্বধাধীনতা দেয় না।

পরিতোষ মনে করে, করুণার ভাবনার হালটা শূন্যে-ওড়া পালটাকেও বশে রাখতে পারে। সে করুণার স্থাবর কিংবা অস্থাবর কোনটাই চিহ্নিত নয়। তবুও করুণার মনোবলের চাবি-আঁটা কোন এক পৃথক অঙ্গনে পরিতোষের মানস রাজ্য পোষ মানতে পারে।

রাত্রির অন্ধকারে একখানা হাত এসে পরিতোষের বুকের স্পন্দন নিরীক্ষণ করে। ভাঙাভাঙা রাতজাগা চোখে পরিতোষ চুপ করে সেই হাতের ওজনের তারতম্য যাচাই করে। অনেক রোদের আকাশ, অনেক ঘাসের ফুল, ঝুরঝুর করে গড়িয়ে পড়া পাতার শিশির—সমস্তকে বিকীর্ণ করে পরিতোষ এবার মুক্তি চাইবে।

পরিতোষ যেন লক্ষ্য করেছে করুণার ডাগর চোখদুটো জলে ভরভর হয়ে উপুড় হয়ে গড়িয়ে পড়েছে। যেন করুণার করার মধ্যে শুধু কান্না অথবা মুখবুজে জানালার বাজুতে দাড়ি ঠেকিয়ে গলির ধোঁয়াটে বাড়ীগুলির একটানা চেহারা দেখা।

পরিতোষ এবার করুণার হাতের ওপর হাত রাখে। অন্ধকারের পাশাপাশি যে আবছা আলো ঘোরে তার মধ্যে থেকে করুণার মুখখানা খুঁজে বার করার সাধ জাগে পরিতোষের। সেই ডাগর চোখ, রোদ-বৃষ্টিতে বাইরে বেরোন মুখের খাঁজ, গলার কণ্ঠা—এমন কি নাকের গর্তের লালচে আভা, কানের সুচোল পাতা। সবই টুকেটুকে চোখ চারিয়ে দেখে পরিতোষ। আজ করুণা নীল আলোর সুইচ টিপে শুতে ভুলে গেছে, তাই পরিতোষের চোখের নীল তারা জ্বলে জ্বলে আলো ছড়াচ্ছে। করুণার সেই হাতটা এখনো পরিতোষের বুকের ওপর সমানে আঁকড়ে আছে। করুণার গলার বাঁক, বুকের আধখানা, ঢিলে ব্লাউজের বোতাম, চুলের গোড়ায় বাঁধা কালো ফিতেটাও যেন আজ পরিতোষের খুব চেনাচেনা মনে হয়। কতকাল এভাবে এই নীরব এক মুহূর্তের স্তরে স্তরে করুণাকে দেখে নি।

জানালার ধার ছাড়িয়ে ছোট গলির বাঁকে বোধ হয় একটা শব্দ হয়। যেন কারা খুব চুপিচুপি কথা বলে আবার সরে পড়ে। তাদের পায়ের শব্দ এই মাত্র মিলিয়ে যায়। পরিতোষ নিজের কাছে নিজের লজ্জা ঢাকতে পারে না।

'একটু জল।' পরিতোষের জড়ানো গলা।

করুণা যেন খুব একচোট ঘুমিয়ে নিয়ে স্বামীর ডাককে সবে মাত্র কানে তুলে বুকের হাতখানা সরিয়ে চিৎ হয়ে শোয়। গলাধরা স্বরে বলে, 'আচ্ছা দিই।'

হাই তুলে মুখখানা খুব সহজ করে দেখে পরিতোষকে। পরিতোষের মুখখানাকে খুব নরম বলে মনে হয়, যেন কোন এক বছর-আড়াই-এর রুগ্ন শিশুর মুখটি হঠাৎ আনন্দের সাড়ায় বিভোর হয়ে উঠেছে। করুণার মুখখানাও স্বাভাবিক ছিল না, কিছু রাগ, একটু বিরক্তি আর সব ছাড়িয়ে হতাশার স্পন্দনে সে কাতর হয়ে পড়েছিল। তারপর শুয়ে শুয়ে না ঘুমিয়ে নিজেকে শুধরে নিয়ে মনটাকে হাল্কা করে ফেলেছে। করুণা তো সবই পাচ্ছে, আলো-বাতাস, হাসি-কান্না, এমন কি আনন্দও। পরিতোষ কিছুই পাচ্ছে না, কিছুই চাইছে না—তার কাছ থেকে কতখানি আর আশা করতে পারে করুণা?

ওঠার আগে আরো একটু সরে পরিতোষের কপালের ওপর ঠোঁট ছুঁইয়ে, নিজের মাথার গড়ানো বেনীটাকে মোচড় দিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়, পরিতোষের চোখের দিকে চেয়ে থাকে। ঢিলে ব্লাউজের বোতাম সরে-সরে খালি খালি গলার খাঁজ, সেখানে পরিতোষের হাতটা টান-টান হয়ে জড়িয়ে থাকে। যেন পরিতোষ মনে মনে স্বীকার করছে করুণার ওপর তার কোন নালিশ নেই।

জল খেয়ে পরিতোষ একটু সজীব হয়। করুণার দেহের ওপর নিজের কনুয়ের চাপটা সহজ করতে ঘেরে পাশটিতে স্বচ্ছন্দে বসে থাকে। ওরা যেন দুজনেই এই মাঝ রাতে অনেককাল পরে কথা বলে যাবে অনর্গল, যেমন বিয়ের পর সারা বছরটাই কেটেছিল।

করুণা হেসে বলে, 'ঘুম ধরচে না বুঝি? খুব আমাকে নিয়ে চিন্তা, না?'

পরিতোষও হেসে ওঠে, বলে, 'আমি জানি।'

'কি জানো, বল বলচি?' পরিতোষের অনড় দেহটা প্রায় গায়ের জোরেই নিজের বাহুর মধ্যে আটকে রাখে করুণা। কেঁপে কেঁপে কান্নার মতো হাসে। নীল বাল্বের আলোয় ঘরের চৌ-দেওয়াল, ওদের বিয়ের ছবি, করুণার ড্রেসিং টেবিলের প্রসাধন সামগ্রী আলুথালু হয়। দূরে, অনেক দূরেই একবার মাত্র কুকুরের ডাক শোনা যায়। তারপরে গঙ্গার বড় জাহাজের ভোঁ বেজে ওঠে, যেন কানের কাছে কে শাঁখ বাজিয়ে দিয়েছে।

পরিতোষ সেই আগের দিনের মত সন্ধ্যা, খুব জোরালো আর পরিতৃপ্ত। করুণার ভাসাভাসা চোখদুটোকে খুব কাছে পেয়ে চিনে রাখছে। তার ভাবনা ও স্মৃতির রাজ্য টপকে যে যে জলছবি ঘোরাফেরা করবে তাদের ধরে রেখে পরিতোষ জানালার পাশে বসে নৈঋত কোণের কোণঠাসা সেই গাছটাকে নিয়ে কিছু একটা ভাববে। ইঁটের স্তূপ ছাড়িয়ে সূর্যের ওঠানামার পট-পরিবর্তনকে বড়জোর এক একবার উপলব্ধি করবে। ঘাসের শীষ, হলুদ-গাছের মড়াগ্রে পাতা কিংবা ইঁটের ফাটে গিরগিটির ভরাটি দৌড়—এসব দেখতে দেখতে তার সময় আর জীবন দু-ই কাটবে। সিগারেটের ছাই ফেলে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর আঁকাবাঁকা অক্ষর চিনবে। আর কিছুই নয়।

॥ পৃথিবীতে সর্বাধিক ॥

পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি সংবাদপত্র পাঠ করে ইংরাজরা, মার্কিনীদের মোটরগাড়ী সর্বাধিক, রুশ ও জাপানীরা রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় এবং হংকং ও লেবাননের অধিবাসীরা সর্বাপেক্ষা চলচ্চিত্র দেখতে উৎসাহী।

রাষ্ট্রসংঘের ১৯৬২ সালের বর্ষপঞ্জী থেকে আরও উল্লেখযোগ্য তথ্য জানা গেছে। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৭৮। মানুষের নানারকম কাজের সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে, সবই এখানে স্থান পেয়েছে। এমন কি ১৯৫৯-৬০ সালে পৃথিবীর মোট অশ্ব-সংখ্যা ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ এবং ১৯৬০ সালে সিগারেট উৎপাদনের পরিমাণ ১৮৩৯০০ কোটি, তা-ও জানা যাবে।

১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯ শতাংশ। অর্থাৎ ১৯৬০ সালে জনসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ২,৯৯৫ কোটি ৫০ লক্ষে।
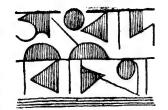
১৯৬০ সালে হাজার জনপিছু ৫১৪টি সংবাদপত্র পড়বার সুযোগ হয় বৃটেনে।

॥ দুটি গুপ্তধন ভাণ্ডার ॥

অবসরপ্রাপ্ত পেন্সনভোগী এক ব্যক্তি তাঁর বাড়ির কাঠের মেঝে তুলে ফেলে সিমেন্ট বাঁধানো মেঝে করার জন্যে কয়েক জায়গায় খোঁড়াখুড়ি করাছিলেন। এমন সময় ঘরের এক কোণে দেখতে পেলেন কয়েক ফুট গভীর একটা গর্ত। কৌতূহলী হয়ে তিনি গর্তটি আরও কয়েক ফুট খোঁড়ার পর মাটির নিচে একটি খুব ছোট প্রকোষ্ঠে মহামূল্যবান তিনটি মণিমাণিক্যখচিত সোনার ঘড়া পান। ওই ঘড়াগুলির ভেতরে ছিল কতকগুলি মুক্তার মালা, হীরার কণ্ঠহার ও অন্যান্য খুব দামী অলংকার। ভদ্রলোক এসব জিনিসই স্থানীয় প্রত্নশালার হেফাজতে দিয়ে আসেন। সেখানকার বিশেষজ্ঞরা এগুলিকে রঞ্জনরশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করে দ্বাদশ শতাব্দীর জিনিস বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা এসব জিনিসের দাম প্রায় আড়াই লক্ষ নয়া রুবল বলে মনে করেন। ঘটনাটি ঘটেছে লেনিনগ্রাদে এবং লোকটির নাম গুরেভিচ।

ঠিক এই ধরণের আর একটি ঘটনা ঘটেছে নেভেল শহরে। এখানে একটি কিন্ডারগার্টেন স্থাপন করার জন্যে মাটি খোঁড়ার সময়ে এক্স্‌কাভেটর-অপারেটর সেমেন জাদোরিন তাঁর যন্ত্রের বেলচার মুখে একটা বিরাট ভারি লোহার সিন্দুক উঠে আসতে দেখেন। এই সিন্দুকের ভেতর পাওয়া যায় ১,৩১৬টি রুশ স্বর্ণমুদ্রা, প্রায় ৮০০টি বিদেশী স্বর্ণমুদ্রা, অনেকগুলি সোনার আংটি আর অন্যান্য অলংকার। এ সমস্ত অলংকার ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের।

॥ মুংগা ॥

কোন অবাঙালী ভদ্রলোকের নাম 'মুংগা' নয়। মুংগা হল ফ্যাসানের মোটরগাড়ী। মুংগার জন্ম সামরিক প্রয়োজনে হলেও, বেসামরিক কাজেও তার তৎপরতা আশ্চর্যজনক। হেন কাজ নেই, যা মুংগা করতে অপারগ। অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষাতেও এই গাড়ীটি অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে। প্রচণ্ড গরমে, অতিরিক্ত ঠাণ্ডায়, জল, কাদায়, জঙ্গলে কাজ করতে পারে। গাড়ীটি নয় ইঞ্চি উঁচু সিঁড়িতে উঠে যায়, হাঁটু জল পেরিয়ে যায়, লাফিয়ে পাঁচিল, ঢিবি টপ্‌কে যায় এবং আটজন মানুষ নিয়ে চড়াই ভাংগতে পারে। দরকার হলে অতি ধীরে ঘণ্টায় তিন কিলোমিটার বেগে চালান যায় কিংবা নব্বুই কিলোমিটার বেগে হাঁকানো চলে। গাড়ীতে বাড়তি সাজসরঞ্জাম জুড়ে পাম্প চালানো, করাত চালানো, কংক্রীট মেশানো এবং আরও নানা ধরণের কাজ করা যায়।

আরাম রক্ষণাবেক্ষণ, অংশাদি পাল্টাবার ব্যাপারে এটি অন্য যে-কোন গাড়ীর সমান। গাড়ীটি চলে ৯৮০ ঘন সেন্টিমিটার স্ট্রোকের একটি দুই স্ট্রোক তিন সিলেন্ডার ইঞ্জিনের সাহায্যে এবং ঐ ইঞ্জিনটি ৪৪ এইচ, পি ক্ষমতাশালী। গাড়ীতে চার-গীয়ার সিস্টেমের পরিবর্তে থ্রী-গীয়ার সিস্টেম ব্যবহার হয়েছে, যার সাহায্যে সামনে চলার জন্য তিনটি গীয়ার ও পিছু হটার জন্য দুই গীয়ার ব্যবহার করা হয়। মুংগা হচ্ছে অল হুইল ড্রাইভ গাড়ী এবং এতে প্রতি একশত কিলোমিটারে এগার লিটার পেট্রোল লাগে। চারজন বসার উপযুক্ত মুংগা গাড়ীর দাম পড়ে সাড়ে এগার হাজার টাকা।

মুঙ্গা যে কোন অসম্ভব পরিস্থিতিতে নতুন সব কাজের উপযুক্ত গাড়ী। এই সব কারণে পশ্চিম জার্মাণীর কারিগরি, সৈন্যবাহিনী, শুল্ক কর্তৃপক্ষ, কৃষি বিভাগ ও সরকারী কর্মবিভাগ এই নতুন মজবুত গাড়ী বহু সংখ্যায় কিনেছে যাতে কাজকর্মের প্রকৃত সুবিধা হয়।

সারমেয় সংবাদ

কুঞ্জবিহারী পাল

যখন কুকুরের কথা বলা হয় তখন সাধারণভাবে গৃহপালিত কুকুরের কথাই আমরা বলে থাকি। এ দলের মধ্যে বিরাট আকৃতির ঘন লোমে ঢাকা নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের কুকুর থেকে শুরু করে লোমহীন ছোট্ট আকারের চিহুয়াহুয়া কুকুর পর্যন্ত পড়ে। অবশ্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে কুকুর বলতে গৃহপালিত কুকুরই শুধু বোঝায় না, বোঝায় 'ক্যানিডাই' জাতির সকল প্রকার প্রাণীকে। এর মধ্যে রয়েছে নানা জাতীয় বন্য কুকুর, নেকড়ে বাঘ, শিয়াল, খেঁকশিয়াল প্রভৃতি।

কুকুর জাতীয় প্রাণীদের এক বিরাট এবং প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। সায়ানো-ডিকটিস্ নামে অপেক্ষাকৃত ছোট এক প্রকার প্রাণীই হল কুকুরশ্রেণীর আদি পূর্বপুরুষ। প্রায় সাড়ে তিন কোটি বছর আগে এদের অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। দেহের সঙ্গে এদের লেজটাও ছিল বেশ লম্বা; ছোট পায়ে ছিল ধারাল নখ। তাদের মনে হয় এরা গাছে বাস করত; অথচ মজার ব্যাপার, এদের বর্তমান বংশধরগণের অনেকেই গাছে চড়তে পারেই না। সে যাই হোক, কালক্রমে সায়ানো-ডিকটিসরা গাছের বসতি ছেড়ে সমতল-ক্ষেত্রে বসবাস শুরু করে, দল বেঁধে অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। ফলে তাদের পা আকারে লম্বা হয়ে যায়, নখ হয় অনেকটা ভোতা আর দৌড়-বিশেষজ্ঞ বলে এরা বিশেষ পরিচয় লাভ করে প্রাণীসমাজে। বিড়ালশ্রেণীর প্রাণীর মত কুকুরদের দাঁতও বেশ ধারাল এবং বহুগুণসমন্বিত। দাঁতের প্রকার-ভেদের জন্যে কুকুর শ্রেণীর প্রাণীদের খাদ্য বিভিন্ন ধরণের হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপের লাল শৃগালেরা পোকা-মাকড়, শামুক এবং নানারকম ফল তাদের খাদ্যতালিকা-ভুক্ত করে নিল। উত্তর আমেরিকায় হায়নার মত দেখতে একরকম কুকুর ছিল, আজ-কাল তাদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। ভাল্লুকের মত দেখতেও একপ্রকার কুকুর ছিল, তাদেরও আজকাল বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের গৃহ-পালিত কুকুরশ্রেণীর একান্ত এবং নিকট-তম জ্ঞাতির মধ্যে নেকড়ে বাঘ, শিয়াল, খেঁকশিয়াল প্রভৃতি পড়ে। আফ্রিকা ও ভারতের শিকারী কুকুর, মালয় ও সাই-বেরিয়ার বন্য কুকুর, ব্রাজিলের বুশ কুকুর সবই এদের সমগোত্রীয়।

মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুকুরেরা মানুষের সবচাইতে উপকারী বন্ধু। গাড়ী টানা, বাড়ীঘর পাহারা দেয়া, মেষ বা খামার রক্ষা করা, শিকারে সাহায্য করা—কত রকমেই না এরা মানুষের সেবা করে। তাছাড়া কুকুরের প্রভুভক্তি অদ্বিতীয়। এদের তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির জন্যে অপরাধীর সন্ধানেও এদের কাজে লাগান হচ্ছে। পুলিশ কুকুর লাকি ও মিতার কথা সকলেরই জানা আছে।

গৃহপালিত কুকুরের চৌদ্দপুরুষের হিসেব নিলে দেখা যায় যে, এদের ঠাকুরদার ঠাকুরদা, তারও ঠাকুরদা হয়তো নেকড়েই ছিল। কাজেই কুকুরের মানব-হিতকর কার্যাদির জন্যে ধন্যবাদ যদি কেউ পাওয়ার যোগ্য মনে হয় তবে নেকড়েরাই সে যোগ্যতার সম্পূর্ণ অধি-কারী। এখানে আর একটা কথা বলে রাখা ভাল। নেকড়েদের আমরা কখনো কখনো নেকড়ে বাঘ বলে অভিহিত করলেও এরা আসলে বাঘ নয়, এমন কি বাঘের সম-গোত্রীয়ও নয়। সে যাই হোক, আমাদের জানা আছে, চোর দিয়ে চোর ধরার কাজ সহজ হয়। কাজেই কোন এক সময় হয়তো কোন একটি নেকড়ে মানুষের পোষ মেনেছিল—প্রভুর ছেলেমেয়ে, খামার, মেষ, বাড়ীঘর অন্য নেকড়েদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিল। কালে কালে এই প্রভুভক্ত নেকড়েটির বংশধররা পিতৃপিতামহের ঐতিহ্য ভুলে যায়নি—ফলে এক সময় তাদের নেকড়েত্ব ঘুচে গিয়ে প্রভুভক্ত কুকুরত্ব প্রাপ্তি ঘটল। হয়তো এ কারণেই যে-সব অঞ্চলে এক-সময় প্রচুর নেকড়ে বসবাস করত সে-সব স্থানে এদের অবস্থিতি বিরল হয়ে পড়েছে। অবশ্য এর অন্য কারণও আছে। আয়র্ল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচুর নেকড়ের উপদ্রব ছিল। আজ আর তা নেই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চল থেকে নেকড়ে চিরতরে বিলীন হয়ে গিয়েছে। মেক্সিকোর দক্ষিণের বন্য অঞ্চলে এখনো প্রচুর নেকড়ে দেখা যায়। কানাডার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল, ইউরোপের রাশিয়া ও স্কান্ডানেভিয়া অঞ্চলে এদের প্রাচুর্য এখনো বর্তমান। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং চীন-ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে এখনো অনেক নেকড়ে বিচরণ করে বেড়ায়। তবে দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশে নেকড়ে একদম দেখা যায় না।

ধূসর রংএর যে নেকড়ে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অংশে দেখা যায় তারা সকলেই একই বংশজাত। পাঁচ ফুটের মত লম্বা, ২৭ ইঞ্চির মত উঁচু একটা নেকড়ের ওজন হয় প্রায় ১০০ পাউন্ড। অবশ্য মেয়ে নেকড়েরা আকারে একটু ছোট হয়েই থাকে। গায়ের রং ধূসর, কখনো মাঝে মাঝে তার কালো দাগ থাকে; এ ছাড়া কানে ও মুখে থাকে বাদামী রংএর দাগ কাটা। হরিণ, মোষ প্রভৃতির ভীষণ শত্রু এই নেকড়েরা। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এদের অত্যাচার দিন দিন কমে আসছে। ছোট আকারের একরকম নেকড়ে আমেরিকায় দেখতে পাওয়া যায়। এদের দেহ চার ফুটের মত লম্বা হয়ে থাকে, তবে লেজের দৈর্ঘ্য হয় ১৪ ইঞ্চির মত। ওজন মোটে ২৮ পাউন্ড। এরা ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের নাম 'কোয়োট'। এরা ভারী ধূর্ত।

নেকড়েরা ভারী অত্যাচারী প্রাণী। মানুষের এরা নানাভাবে ক্ষতি করে। খেত-খামার নষ্ট করা, গরুভেড়া মেরে খাওয়া এদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। তবে সাধারণতঃ এরা মানুষ আক্রমণ করে না, করলেও খুব বেশী রকমের ক্ষুধার্ত বা দলে ভারী থাকলেই করে। মানুষ-

খাদক নেকড়ের অনেক গল্প আছে, তবে সে-সব মনে হয় গল্পই। কিন্তু মানুষ খুন না করলেও মানুষের এরা শত্রু। সভ্য মানুষও যে এদের উৎখাত করতে অনবরত সচেষ্ট তা বলাই বাহুল্য। তবে এরা যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ অবধি বহাল তবিয়তে বসবাস করতে পারছে তার কারণ হল এরা অবস্থা-বিশেষে যে কোন খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তা-ছাড়া মেয়ে নেকড়েরা একবারে ছয় থেকে দশটি বাচ্চা প্রসব করে থাকে। কাজেই এদের বংশ নির্বংশ হওয়ার সম্ভাবনা খুবেই কম।

গল্পে আছে, রোম শহরের প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস এবং তাঁর ভাই রেমুস এক মেয়ে নেকড়ে দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছিল। সত্যি-মিথ্যা জানি না, তবে কিছুদিন আগেকার রামুরে কাহিনী এখনো হয়তো অনেকে ভুলে যাননি।

• ভারতে সাধারণতঃ দু'রকমের নেকড়ে দেখা যায়। কাশ্মীর অঞ্চলের ঘন লোমাবৃত নেকড়ে আর সাধারণ নেকড়ে যা ভারতের সব জায়গায়ই কমবেশী দেখা যায়। এদের গায়ের রং বাদামী। আকারে এরা বড় হয় না। দলবদ্ধভাবে এরা বসবাস করে না।

কুকুরশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে নেকড়েরা নিঃসন্দেহে আভিজাত্যের দাবী করতে পারে। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার যোগ্য শিয়ালেরা। পশুদের মধ্যে শিয়ালেরা সবচাইতে ধূর্ত। শিয়ালের তীক্ষ্ম বুদ্ধির জন্যে এরা পশুরাজ্যে পাণ্ডিত্য পর্যন্ত পেয়েছে। পাণ্ডিত করলে কি হবে খাওয়াদাওয়ার রুচিবোধ এদের একদম নেই বললেই চলে। খায় না এরা এহেন নোংরা এ দুনিয়ায় নেই। ঘ্রাণশক্তিও এদের প্রবল, সামান্যতম গন্ধও এদের নাকে ঢোকে। এককথায় বলা যায় ময়লা পরিস্কারের কাজটি এরা ভালভাবেই করে থাকে। কবর থেকে পচা গলিত মনুষ্যদেহ পর্যন্ত এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না। বিচরণ করে এরা দলবদ্ধভাবে। ছাগল, বাছুর প্রভৃতি আক্রমণ করতে এদের প্রায়ই দেখা যায়। নিরামিষ ভোজনেও এদের অরুচি নেই। অনেকেরই জানা আছে যে, শিয়ালেরা সিংহ, বাঘ প্রভৃতির পেছনে পেছনে থাকে এবং এদের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করে। এদেরই আমরা বলি 'ফেউ'। পশুরাজ সিংহ অবশ্য বন্য কুকুরদের এহেন ব্যবহারে আপত্তিজনক কিছু মনে করে না; কিন্তু বাঘের কথা আলাদা।

সাধারণ খেঁকশিয়াল আকারে খুব বড় হয় না। উঁচুতে পনের ইঞ্চির মত—গায়ের রং ধূসর হয় এদের। দিনের বেলা লুকিয়ে থেকে রাতের অন্ধকারে দল বেঁধে বেড়িয়ে পড়ে এরা শিকার সন্ধানে। একটা মেয়ে খেঁকশিয়াল একসঙ্গে পাঁচ থেকে আটটা বাচ্চা প্রসব করে। মানুষ আক্রমণ এরা করে না। তবে ছোট শিশুদের অনেক সময় শিয়ালে টেনে নিয়ে গেছে এরকম ঘটনা বিরল নয়।

গায়ে দাগ কাটা আর একশ্রেণীর শিয়াল আছে; এদের লেজে থাকে সাদা দাগ। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এদের খুব দেখতে পাওয়া যায়। এরা বেশ জোরে দৌড়তে পারে—ঘন্টায় প্রায় ৩৫ মাইলের মত। পশ্চিম আফ্রিকার খেঁকশিয়ালদের গায়ের রং চিত্রবিচিত্র। পিঠের উপরদিকটা কালো, তার উপর সাদা ফুটকী কাটা; গায়ের রং লালচে, পেটের তলাটা সাদায়হলুদে মেশান।

অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরণের বন্য কুকুর দেখতে পাওয়া যায়। এদের সাধারণ নাম ডিংগো। বন্য হলেও এদের কখনো কখনো পোষ মানতে দেখা গেছে। এরা দল বেঁধে বাস করে। অনেকের অভিমত যে, ডিংগোরা অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী নয়, অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে হয়তো এদের আগমন হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। এরা খরগোস, মোষ, ছাগল এবং অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণী খেয়েই জীবন ধারণ করে। ডিংগোর অত্যাচার অস্ট্রেলিয়ায় এক সময় ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা ডিংগোর মাংস খেতে ভালবাসে। তাছাড়া ডিংগোর বাচ্চা ধরে এরা পোষ মানায়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ঢোল নামে একপ্রকার বন্য কুকুর দেখা যায়। এরা পাকা শিকারী। এমন গল্পও শোনা যায় যে, এরা নাকি খাঁটি বাঘকেও কাবু করে ফেলেছে। তবে দল বেঁধে এরা বন্য শূকর, ছাগল, এমন কি চিতা, ভল্লুক এবং বিরাট আকারের মোষকেও আক্রমণ করে থাকে। এদের শিকার করবার ধরণও ভারী চমৎকার। শিকার করবার সময় এদের একজন দলপতি থাকে। তারই নির্দেশে এরা আক্রমণকার্য চালায়। দলপতির নির্দেশে এরা প্রয়োজন হলে শিকারকে চারিদিক থেকে ঘিরে কাবু করে ফেলে।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে একরকম শিকারী কুকুর দেখা যায় যারা অনেকটা হায়েনার মত দেখতে। এদের নাম হায়েনা কুকুর। এরাও খুব ওস্তাদ শিকারী। কচ্ছপের খোলসের মত গায়ের রং এদের, মাঝে মাঝে সাদা, কালো হলদে দাগ কাটা। এরা একসঙ্গে ২০ থেকে ৬০টি একত্রিত হয়ে শিকার করে বেড়ায়—স্থায়ী হয়ে এক জায়গায় এরা কখনো থাকে না। এক অদ্ভুদ ধরণের শব্দ করে এরা দলের অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। সাঁতার কাটতেও মন্দ পারে না এরা।

সাধারণ খেঁকশিয়াল পৃথিবীর সব দেশেই কমবেশী দেখতে পাওয়া যায়, একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া ছাড়া। এদের চাইতে চালাক প্রাণী দুনিয়ায় আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। এদের খাদ্যতালিকার মধ্যে আছে খরগোস, শশক, ইঁদুর, ব্যাঙ, নানাধরণের পোকা, কাঁকড়া ইত্যাদি।

ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অংশে খেঁকশিয়াল পোষা হয় খেঁকশিয়াল শিকারের জন্যে। তাছাড়া কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে লোমের জন্যে খেঁকশিয়াল পোষা হয়। এরা যে কোন অবস্থায় জীবনধারণ করতে পারে। এদের এক জাতের গায়ের রং লাল; দেখতে অবশ্য খুব বড় আকারের নয় এরা। নাকটা একটু লম্বাটে। এদের আর এক শ্রেণী আছে যাদের গায়ের রং ধূসর। ছোটখাট প্রাণী খেয়েই এরা বেঁচে থাকলেও ফল খেতেও এরা বেশ ভালবাসে। তাড়া করলে গাছে চড়ে আত্মরক্ষা করতেও এরা পারে। মেরুপ্রদেশে একরকম খেঁকশিয়াল আছে যাদের গায়ের লোম গ্রীষ্মকালে ঘন বাদামী আর শীতকালে সাদা হয়ে যায়। গ্রীষ্মের দিনে সমুদ্রোপকূলে এরা শিকার করে বেড়ায় আর শীতকালে শিকার খোঁজে জমান বরফের মাঝে। শ্বেত-ভল্লুকদের ভুক্তাবশিষ্ট শীল মাছের অংশ খেতেও এরা ভালবাসে। তিব্বত অঞ্চলের বালু-খেঁকশিয়ালদের কান ও লেজ খুব ছোট। আমাদের দেশে সন্ধ্যার পর যারা দলবেঁধে হুক্কাহুয়া করে বেড়ায় তাদের আকারও ছোটই। তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার সিলভার ফকস, মিশর অঞ্চলের রূপেলস্ খেঁকশিয়াল, নীল নদ অঞ্চলের বালু-খেঁকশিয়ালরাও আকারে বড় নয়। এদের মধ্যে আকারে সবচাইতে যারা ছোট তারা হল ফেনেক জাতীয় খেঁকশিয়াল এদের বেশী দেখতে পাওয়া যায় সাহারা মরুভূমি অঞ্চলে। দেহটি এদের ১[illegible] ইঞ্চির মত লম্বা, তার উপর লেজটি [illegible] ইঞ্চি। কান দুটি খাড়া। বালুর রাজ্যে বাস করে বলে এরা এত নিপুণ যে মুহূর্তের মধ্যে বালু খুঁড়ে তার মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারে। দিনের বেলাটা বালুর গর্তের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে থেকে রাতের বেলা জল এবং খাবারের সন্ধানে এরা বের হয়। দেখতে এরা ভারী সুন্দর।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঋতুচক্রের বিরাম নেই। বছর ঘুরে ৎ আবার ফিরে এল। সার্পেনটাইন নের গলির মধ্যেও যথানিয়মে পেঁছিল সে তার নিঃশব্দ পদসঞ্চার। আকাশে তাসে 'পুজো' 'পুজো' গন্ধ। পোখানার একটানা ঘর্ঘর শব্দ ছাপিয়ে লেদের মনে মনেও সেই আসন্ন উৎসবের র বেজে উঠেছে। অন্য বছরের তুলনায় বার উৎসাহের মাত্রাটা কিছু বেশী। গার ওপারে 'গুরুদেবের' আশ্রমে ঘটা রে পুজোর আয়োজন চলছে। উদ্যোক্তা খানকার জেলেরা। মা গঙ্গা তাদের উপর খ তুলে চেয়েছেন। ইলিশের মরসুমটা বে ভালভাবে উৎরে গেছে। 'বাবাঠাকুর'- ব নতুন ব্যবস্থায় তার পুরো ভটাই ওদের হাতে এসেছে,

আগেকার দিনে যার মোটা অংশ চলে ত মহাজনের কবলে। কমিটি সর্ব- ম্মতভাবে সমবায় তহবিল থেকেই কিছু কা পুজো-ভান্ডারে দান করেছে। বারো- রী দুর্গোৎসব। বাবাঠাকুরের আশ্রমের ঙিনায় হোগলাপাতার ছাউনি দিয়ে ন্দির তৈরী হবে। এখন থেকেই তোড়- জাড় শুরু হয়ে গেছে। গান-বাজনার বস্থাও আছে। গ্রামেই একটা পুরানো াত্রার দল ছিল। এককালে নাম-ডাকও ম ছিল না। পুজোপার্বনে, বিয়ে, পৈতা, ন্নপ্রাশনে এখানে ওখানে বায়না হত। বশ কিছুদিন ধরে তাদের আর সাড়া- ব্দ নেই। একরকম উঠে যাওয়ার মত। দশব্যাপী অভাব—অন্নবস্ত্রের, স্বাস্থ্যের নানন্দের। জীবনযাত্রার তাড়না 'যাত্রার' প্রেরণাকে টিঁকে থাকতে দেয়নি। আজ জলেপাড়ার অবস্থা কিছুটা ফিরে াওয়ায় তারাই এগিয়ে এল, সেই মের্ষকে যদি আবার বাঁচিয়ে তোলা ায়।

তখনকার দিনের সেই সব বাঘা বাঘা অভিনেতারা—ভীম, মেঘনাদ, জনা ও মহিষাসুরের দল—প্রায় সকলেই অকালেই বিদায় নিয়েছেন। দু-চারজন যাঁরা এখনো টিকে আছেন, তাঁরাও দুর্যোধনের মত ভগ্নউরু, কিংবা ভীষ্মের মত শরশয্যায় শয়ান। সেদিনের গ্রামীণ সংস্থায় এরা ছিল পল্লবিত পরগাছা। সমাজবৃক্ষের স্কন্ধে ভর করে তারই দেহ থেকে যথেচ্ছ রস আহরণ করে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দিত। জীবিকার ভাবনা ভাবতে হত না। কিন্তু পরনির্ভর হলেও সে জীবনে কোনো অমর্যাদা ছিল না। যা পেত, তার বিনিময়ে তারাও কিছু দিত। তাদের প্রধান কাজ ছিল সেই আশ্রয়দাতা বনস্পতির অলংকরণ, নানাভাবে তার আনন্দবিধান। কালক্রমে এবং অবস্থা বৈগুণ্যে পরগাছা একদিন জঞ্জাল হয়ে দাঁড়াল। গাছ তাদের কাঁধের উপর থেকে মাটিতে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, করে খাওগে যাও। সে বিদ্যা তারা শেখেনি। তাই তিল তিল করে শুকিয়ে মরে গেছে।

জেলেপাড়ার সব সমস্যাতেই বাবা- ঠাকুর ভরসা। এ ব্যাপারেও ছেলে- বুড়ো সবাই মিলে তাঁর কাছে গিয়ে ধর্না দিল। মুখপাত্র অর্জুন মালো বিরষমুখে জানাল, সবাই ঠিক ছিল, শুধু এক 'মোশন মাষ্টারের' অভাবে যাত্রার আয়োজন পন্ড হতে বসেছে।

মৈত্রমশাই হেসে বললেন, 'ও বিদ্যে তো আমার জানা নেই। তোমাদের পাল্লায় পড়তে হবে জানলে না হয় শিখে আসতাম।'

কমবয়সীর দল হো হো করে হেসে উঠল। এক-ধমকে থামিয়ে দিল অর্জুন। তারপর দাঁতে জিভ কেটে জোড়হাত করে নিবেদন করল যে, বাবাঠাকুরকে দিয়ে মোশান মাষ্টারি করাবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা আসেনি, তাঁর এখানে কত রকম বাবু আসেন। তাদের মধ্যে দু- একজন থিয়েটারওয়ালা কি জুটবে না? নেহাৎ না পাওয়া গেলে তাঁরা কেউ বাইরে থেকে জুটিয়ে আনতে পারেন। রোজ না হলেও চলবে। মাঝে মাঝে দু-চারদিন এসে গলাটা, হাত-পা-চোখ-মুখের ভঙ্গিগুলো কোথায় কি রকম হবে দেখিয়ে-শুনিয়ে দিলে বাকী সব তারা ঠিক করে নিতে পারবে।

মৈত্রমশাই একটু ভাবলেন। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনিভাবে বললেন, হ্যাঁ, লোক আছে আমার হাতে। একেবারে পাকা লোক। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না।

সেইদিনই আশুবাবুর ডাক পড়ল। জরুরি ডাক। তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। গুরুদেবের শরীরটা ইদানিং ভাল যাচ্ছিল না। সেই রকম কোনো আশঙ্কাই ছিল তাঁর মনে। ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকতেই গুরু বললেন, ওহে মাষ্টার, তুমি তো এককালে বর্ষাঁলে বাঁদর নাচাতে শুনেছি।

আশুবাবু এ জাতীয় প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। খানিকটা থতমত খেয়ে বললেন, আজ্ঞে?

—আহা, তোমার সেই ছেলেগুলোকে নিয়ে কি সব নাটক-টাটক করতে না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা করতাম মাঝে মাঝে।

—এবার এই বুড়োগুলোকে নিয়ে কর।...কই হে কোথায় গেলে তোমরা?

দলের পান্ডাদের আগেই খবর দেওয়া ছিল। বাইরে অপেক্ষা করছিল। এবার হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তেই

বললেন, এই নাও তোমাদের মোশন মাস্টার।

ঘোষসাহেবের আমলে বছরে দু-তিনবার ছোটখাটো নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। সেখানেও ছেলেদের 'সেকেন্ড স্যর'কে না হলে চলত না। এ বিষয়ে ও'র খানিকটা দক্ষতাও ছিল। জেলেপাড়ার যাত্রার দলে এবারও তার পরীক্ষা দেবার প্রয়োজন দেখা দিল। সপ্তাহে দুদিন এসে ওদের তালিম দিতে শুরু করলেন।

'প্রেস'এ যখন খবরটা পৌঁছল, ছেলেরা মাষ্টারমশাইকে ধরে বসল, আমরা দেখতে যাবো না স্যার?

—'যাবি বৈকি? খালি পুজো আর যাত্রা শোনা নয়, অষ্টমীর দিন দুপুরবেলা আমাদের সঙ্কল্পের'—বলে চোখ টিপে মাথা নেড়ে একটা বিশেষ ইঙ্গিত করলেন।

'তাই নাকি!' হৈ হুল্লোড় করে বেরিয়ে গেল দলটা। যারা জানে না, এতবড় খবরটা তাদের তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেওয়া দরকার।

॥ চোদ্দ ॥

ফার্স্ট এম-বি পরীক্ষার ফল অন্য সকলের মনঃপুত হলেও দিলীপ নিজে তেমন খুশী হতে পারেনি। আরো ভালো করবার ইচ্ছা ছিল। তার জন্যে যতটা পড়াশুনোর প্রয়োজন তা সে করেনি। ইচ্ছা করে করেনি, তা নয়, করতে পারেনি। বাদ সেধেছে তার মন। পাশের বাড়ির ছাদের উপরকার ঐ নিষিদ্ধ এলাকায় সেই অবাধ্য মনের গোপন আনাগোনা অনেকবার চোখ রাঙিয়েও সে বন্ধ করতে পারেনি। অথচ কিছুদিন থেকে সেখানে কেউ নেই। তবু সেই একদা নিঃশব্দচারিণী শূন্য ছাদের উপর থেকে ছুটে আসা দমকা হাওয়ার মত অলক্ষ্যে কখন এসে তার ভাবনা-চিন্তাগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে যায়, সে জানতেও পারে না।

গলিপথ দিয়ে যেতে আসতে ঐ বিশেষ বাড়িটির দিকে রোজই তার নজর পড়ে। রোজই দেখতে পায় ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। ভাবতে গিয়ে তার মধ্যেও সে একটা বিশেষ তাৎপর্য আবিষ্কার করেছে। এগিয়ে যেতে যেতে অনেক দিন মনে হয়েছে ঐ রুদ্ধকপাট, অন্যের কাছে যা-ই হোক, তার কাছে একটা অলঙ্ঘ্য নিষেধের প্রতীক। ওর উপরে অদৃশ্য অক্ষরে লেখা আছে—'না'। ভাবতে ভাবতে আবার নিজের মনেই হেসে ফেলেছে। একি অদ্ভুত ছেলেমানুষি তাকে পেয়ে বসল! ঐ একটা বাড়ি তো নয়, সব বাড়িতেই দরজা বন্ধ। কোলকাতা শহরে এটাই সাধারণ নিয়ম। কতরকমের অচেনা লোক চলেছে রাস্তা দিয়ে। চুরি ডাকাতির ভয় আছে। সদর খুলে রেখে কোনো গৃহস্থই নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তার প্রয়োজন-টাই বা কী?

চিন্তাটা তখন অন্য পথ ধরত। দেখতে দেখতে যেত, কোনো বাড়ির বাইরের দরজা খোলা আছে কিনা। একটা দুটো যে চোখে না পড়ত তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা ম্লান ছায়া পড়ত মনের উপর।

একদিন সকাল সাড়ে নটায় কলেজে যাবার পথে ঐ সতের বাই চার নম্বর বাড়ির সামনে আসতেই দিলীপ নিজের অজানতে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কপাটের গায়ে একটা মস্ত বড় তালা ঝুলছে। বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল। কোথায় গেলেন এ'রা! অন্য কোথাও উঠে গেলেন, না এ শুধু কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যাওয়া? হয়তো এখনই এসে পড়বেন। কিন্তু এই সহজ সম্ভাবনাটা মন কিছুতেই মেনে দিতে পারল না। চলে গেছেন, এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়ে দেখা দিল। তার জানালার ওপারে যে আকাশ, সেখানে আর কোনোদিন উষার উদয় ঘটবে না। আগাগোড়া সবখানি জুড়ে রইল শুধু অন্ধকার। এতদিন তার চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে ছিল যে স্বপ্নলোক সেখানে আর তার প্রবেশের পথ রইল না। সে সিংহদ্বার চিরদিনের তরে রুদ্ধ হয়ে গেল। তারই অক্ষয় সাক্ষী ঐ তালাটা। আজ থেকে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ঐখানে বসে এই রূঢ় সত্য তাকে নীরবে স্মরণ করিয়ে দেবে।

প্রথমে গভীর নৈরাশ্যে তারপর দুরন্ত অভিমানে দিলীপের সমস্ত অন্তর মথিত হয়ে উঠল—যাবার আগে একটি বার জানিয়ে গেলে কী দোষ ছিল? সে তো পথরোধ করে দাঁড়াত না। সে অধিকার তার নেই, সে অন্যায় দাবি সে কোনোদিন জানাতে যায়নি। শুধু ঐ ছাদের কার্ণিসের পাশে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত বলে যাওয়া—আমি যাচ্ছি। মুখ ফুটে যদি না-ও বলত, তবু ঐখানটিতে এসে একবার দেখা দেওয়া। এর বেশী আর কোনো আকাঙ্ক্ষা তার নেই, আর কোনো প্রত্যাশাও মনে মনে কখনো পোষণ করেনি।

এই অর্থহীন অভিমানে যখন দুচোখ ফেটে জল আসতে চাইছিল, তখন একথা একবারও মনে হয়নি, কার উপরে এই অভিমান, কী সম্পর্ক তার সঙ্গে, তার কাছ থেকে এইটুকুই বা সে আশা করে কোন্ অধিকারে।

চলে গেছে—মনে মনে স্থির জেনেও সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছে কৈ? মাঝে মাঝে তারই মধ্যে আবার একটু ক্ষীণ আশা দেখা দেয়, হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছে, কদিন পরে আবার আসবে। কে বলতে পারে কোথায় গেছে, কবে আসবে? কাকে জিজ্ঞাসা করা যায়? মাষ্টারমশাই নিশ্চয়ই সব জানেন। ঐ প্রফেসর ভদ্রলোক তো মাঝে মাঝে আসতেন ও'র কাছে, উনিও কদিন গেছেন। পাড়া ছেড়ে চলে যাবার আগে পরিচিত প্রতিবেশীকে জানিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও করা হল না। কী মনে করবেন স্যর? যদি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন, কেন, ও'দের খবর জানতে চাইছ কেন? কী উত্তর দেবে সে?

রণমায়ার কাছেও অনেকদিন যাওয়া হয়নি। নিজের এই বিক্ষত হৃদয়টাকে নিয়ে কোথাও আর তার যাবার মুখ নেই। ঐ মেয়েটির তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টির সামনে কিছুক্ষণ বসতেও সে ভয় পায়। ধরা পড়ে যাবার ভয়। কে জানে, যে বেদনা শুধু তারই, যাকে সে সংগোপনে লালন করে চলেছে আপন অন্তরের অন্তঃস্থলে, তারই ছাপ হয়তো ফুটে উঠেছে মুখের উপর। মায়াদি যদি বুঝতে পারে, সে লজ্জা সে রাখবে কোথায়? কিন্তু দিনের পর দিন এই নিঃশব্দ বহনের যন্ত্রণাও কম নয়। এর চেয়ে সামান্য একটু আভাস

যদি কারো কাছে দিতে পারত, হয়তো এ গুরুভার এত দুঃসহ মনে হত না। একথা মুখ ফুটে না হলেও, নীরবে যাকে বলা যায়, এমন একজন মানুষই তার জানা আছে। সে রণমায়া।

পেঁছনোমাত্রই দীর্ঘ অনুযোগের ঝাঁপ খুলে দিল রণমায়া—এতকাল পরে দয়া করে চোখের দেখাটা না দিলেই হত, মুখ্যু দিদির একএকটি লেখাপড়া-জানা ভাইয়েরা কবে আর সহ্য করে থাকে, সে অভাগীরও যে মন বলে একটা বালাই আছে, সেটা আবার খারাপ হতে পারে ইত্যাদি। আরও খানিকক্ষণ চলত। দিলীপ তার আগেই ধমকের সুরে বলল, ঝগড়াটা থামাবে, না উঠবো?

—আচ্ছা, এখনকার মতো থামাচাপা দিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কী বল দিকিন? অসুখ-বিসুখ যে করেনি সে খবর দাদার কাছ থেকেই জেনেছি। তবে অসুখটা তো শুধু শরীরের নয়। কি বল?

চাপা হাসিভরা একটি অর্থপূর্ণ অপাঙ্গ দৃষ্টি দিলীপের মুখের উপর দিয়ে থামল। উত্তরে যে সলজ্জ মৃদু হাসিটি আশা করা গিয়েছিল তা পাওয়া গেল না। রণমায়ার মুখেও এবার দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। আর একটু কাছে সরে এসে ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বলল, আমাকে বলবে না?

—কী বলবো, মুখ তুলে ম্লান হেসে উত্তর দিল দিলীপ।

—ও বাড়ির খবর কী?

—কোন্ খবর জানতে চাও?

—'সব খবর'। সব কথাটায় বেশ খানিকটা জোর দিয়ে বলল রণমায়া।

—'সব'এর প্রথম নম্বর হল সদরে তালা বন্ধ।

—ও, এই ব্যাপার? তা কদিনের জন্যে হয়তো কোথাও গেছে।

—হবে।...নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল দিলীপ।

—কিন্তু কোথায় গেছে, কবে ফিরবে, এসব কিছু জানতে পারনি?

—দরকার? বাজে খবর নেবার মতো যথেষ্ট সময় আমার হাতে নেই।

রণমায়া মুখ টিপে হাসল। পরক্ষণেই উঠে পড়ে বলল, আচ্ছা, সে খোঁজ আমি দাদাকে দিয়ে নেওয়াচ্ছি।

—কেন, তোমারই বা এত গরজ কিসের?...তিক্তকণ্ঠে বলল দিলীপ। তার মধ্যে উষ্মার সুরও চাপা রইল না।

গরজ আছে বৈকি? তুমি একটু মাথা ঠান্ডা করে বসো। আমি চা করি। এবারে খুব ভালো চা পাঠিয়েছেন শ্বশুরমশাই।

গরজ আছে বৈকি?

বলতে বলতে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

একে অতি উৎকৃষ্ট জাতের সুগন্ধি চা, তার উপরে রণমায়ার হাতের তৈরী। কয়েক চুমুকে, কোনো রকমে গলাধঃকরণ করবার বস্তু নয়। একটু একটু করে উপভোগ করতে হয়। কতকটা সে জন্যেও বটে এবং বিশেষ করে তার ব্যক্তিগত কারণে দিলীপের চা-পান ধীর ও নিঃশব্দ গতিতে চলেছিল। রণমায়াও অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেনি, এবারে হাতের মগটা (পেয়ালায় তার কুলাত না) নামিয়ে রেখে বলল, আচ্ছা, তোমরা আর ওরা তো এক জাত, তাই না?

হঠাৎ এই অসংলগ্ন প্রশ্নে দিলীপ একটু চমকে উঠল। বলল, কাদের কথা বলছ?

—বুঝতে পারছ না? তোমাদের ঐ প্রফেসর গো।

—কে বললে এক জাত?

—বাঃ, ওঁরাও তো বামুন।

—হ্যাঁ, সেদিক দিয়ে এক। কিন্তু 'জাত' কথাটার অন্য মানে আছে। সেখানে ও'দের আর আমার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত।

—সেটা আবার কী?

—তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার কপালের এই কালো দাগটা। তাতেই আমি ও'দের থেকে, শুধু ও'দের কেন, সৎ এবং ভদ্র মানুষের সমাজ থেকে আলাদা হয়ে গেছি।

রণমায়া সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। শুষ্ক এবং কিছুটা রূক্ষ স্বরে বলল, থাক; ওসব কথা আমি শুনতে চাই না।

—'জানি' ম্লান হাসির সঙ্গে ধীরে ধীরে বলল দিলীপ। 'এতে তুমি কষ্ট পাও। তাই আমিও বলতে চাই না। কিন্তু যা সত্য তাকে আর কদিন ঠেকিয়ে রাখবে? একদিন না একদিন মেনে নিতে হবেই।'

—না, আমি কোনোদিন মেনে নেবো না। সকলের কথা আমি জানি না, জানতে চাইও না। আমি আমার দাদাকে জানি, আর জানি তোমাকে। সেই সঙ্গে একথাও জানি তোমাদের কপালে কোনো দাগ লাগেনি, লাগতে পারে না।

দিলীপ প্রতিবাদ করল না। মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

পরের সপ্তাহে বিকালের দিকে দিলীপ কলেজ থেকে ফিরছিল। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে পিছনে মোটরের হর্ণ শুনে রাস্তার ধার ঘেঁষে চলতে চলতে লক্ষ্য করল, গাড়িটা আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সতেরর চার বাড়ির সামনে সশব্দে ব্রেক্ কষল। কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে এগিয়েই চমকে উঠল। এত কাছে একেবারে মুখোমুখী দেখা হয়ে যাবে, এক মুহূর্ত আগেও ভাবতে পারেনি। গাড়ি থেকে বেরিয়ে সেও থমকে দাঁড়িয়েছিল। চকিত দৃষ্টিতে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। দিলীপের বুকের ভিতরে তখন যে তোলপাড় শুরু হয়েছে, তাতে করে, কোন্ পথে পালাবে তৎক্ষণাৎ স্থির করে উঠতে পারল না। ততক্ষণে প্রফেসর নেমে পড়েছেন। ওর দিকে নজর পড়তেই বিস্ময় ও আনন্দের সুরে বললেন, আরো, দিলীপ যে! কী খবর তোমাদের?

ঘাড় নেড়ে কোনো রকমে উচ্চারণ করল—'ভালো', কিন্তু আওয়াজ এত ক্ষীণ যে তার নিজের কান অবধিও বোধহয় পৌঁছল না। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কলেজ থেকে ফিরছ বুঝি?' তেমনি ক্ষীণ কণ্ঠে 'হ্যাঁ' বলে চোখের পাতা একটু তুলতেই আরেকজনের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। মনে হল, পাতলা ঠোঁট দুখানিতে যেন একটা চাপা হাসি ফুট্‌ব ফুট্‌ব করছে।

প্রফেসর তখন মালপত্রের দিকে নজর দিয়ে বললেন, তুমি একদিন এসো, বুঝলে? যখন তোমার সুবিধে। আমার তো এখন ছুটি চলছে।

'আচ্ছা' বলে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে এ পক্ষও যেন পালিয়ে বাঁচল। ফিরে তাকাবার দুর্দম লোভ মনেই চেপে রাখতে হল। একবার ভাবল, গুরুজন-স্থানীয় ব্যক্তি, ডেকে আলাপ করলেন, একটা প্রণাম কিংবা অন্ততঃ নমস্কার করে আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেজন্যে এখন আর ফিরে যাওয়া যায় না। সে সাহসও মনের মধ্যে খুঁজে পেল না।

আশুবাবুর ঘরে যেদিন প্রথম আলাপ, দিলীপ তখনই বুঝেছিল, প্রফেসর লোকটি সহৃদয় ও স্নেহশীল। সেইদিনই ওকে যেতে বলেছিলেন। আজ আবার বললেন। কিন্তু পিতার আহ্বানে কন্যার সমর্থন আছে কি? থাকবেই যে এমন কোনো কথা নেই। না-থাকাই স্বাভাবিক। এ তার পক্ষে নিতান্ত দুরাশা মাত্র। উন্মুখ মনের কোনো পরিচয়ই তো সেখান থেকে পাওয়া যায়নি। ছাত্রের এদিকটা সে যেমন করে এড়িয়ে গেছে, তার মধ্যে বরং বিমুখ রূপটাই প্রকাশ পেয়েছে বেশী। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। আজ অকস্মাৎ ঐ চমকিত দৃষ্টি এবং তারপরে ঐ অধরলগ্ন স্নিগ্ধ হাসিটি কোনো নতুন বার্তা নিয়ে এল কিনা কে জানে? কিংবা, ঐ দুটোই হয়তো অর্থহীন। চোখের তারায় ছিল শুধু হঠাৎ-দেখার বিস্ময়, আর হাসির রেখায় নিছক কৌতুক।

আসলে যাই থাক, অনেক দিন পরে পাওয়া ঐ দুটি দুর্লভ বস্তু, যে মন যুক্তি মানে না, তর্ক করে না, তারই একটা গোপন কোণে অকাতরে মধুবর্ষণ করতে লাগল।

দু'তিন দিন পরে দিলীপ প্রেস্-এর অফিস ঘরে বসে কাজ করছিল। মাস্টার-মশাই একটু আগে বেরিয়েছেন। বাহাদুর এসে বলল, কলেজ থেকে কাল একটু সকাল সকাল আসিস। সন্ধ্যে লাগিয়ে দিসনে যেন।

—কেন? কী করতে হবে? খাতা থেকে মাথা না তুলেই বলল দিলীপ।

—মায়ার ওখানে যেতে হবে। রাত্তিরে খেতে বলেছে, তোকে আমাকে আর মকবুলকে।

দিলীপ এবার মুখ তুলল, একেবারে তিনমূর্তি একসঙ্গে? ব্যাপার কী বল দিকিন?'

—সে সব কিছু ভাঙলে তো? খালি বলল, সকাল সকাল এসো। কাজ করতে হবে।

—মকবুলকে বলেছ?

—এখন যাচ্ছি বলতে।

বেরোবার একটু আগে তৈরী হবার তাগিদ দিতে গিয়ে দেখা গেল মকবুল নেই। নানাজনকে জিজ্ঞাসা করা হল। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না। এদিকে সময় হয়ে গেছে। আর দেরি করলে রণমায়া রণমূর্তি ধরবে। অগত্যা তাকে রেখে যাওয়াই স্থির হল। কেশবের উপর ভার রইল, যখনই ফিরুক যেন সঙ্গে সঙ্গে রওনা করে দেয়। এক টুকরা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে বাহাদুর চিন্তান্বিত মুখে চিলেকোঠায় দিলীপের ঘরে গিয়ে বলল, চল, আর দেরি করা যায় না।

দিলীপ জামাটা টেনে নিয়ে পরতে পরতে বলল, ও রাজী হয়েছিল তো?

প্রথমটা হয়নি। তারপর যখন বুঝিয়ে বললাম, না গেলে বোন কী মনে করবে, তখন বলল, আচ্ছা।

—মায়াদিকে সব বলেছ ওর কথা?

—'সব' আর কি? মেয়েছেলের কথা শুনলেই ও যে-সব লেকচার দেয়, তাই একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিলাম। তখন থেকেই মায়ার ইচ্ছা, ওকে একদিন নিয়ে যাই।

চুল আঁচড়াতে গিয়ে হাত-আরশিটা তুলতে যাবে হঠাৎ দিলীপের নজরে পড়ল একখানা চিঠি; উপরে বাহাদুরের নাম। ওর হাতে দিয়ে বলল, এই নাও।

—কী ওটা? বলে, বাহাদুর ভাঁজ-করা কাগজখানা খুলে তখনই পড়ে ফেলল। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে ধরল দিলীপের দিকে। দিলীপ মনে মনে পড়ল—

ভাই বাহাদুর,

আমার কথা তুমি হয়তো সব জান না। দিলীপ জানে। ঘটনাটা সামান্য, কিন্তু আমার জীবনে তার ফলাফল, এবং যে-শিক্ষা তার থেকে পেয়েছি, কোনোটাই সামান্য নয়।

ছেলেবেলায় যে আমাকে হাত ধরে পাপের পথে নামিয়েছিল, সে একটি মেয়ে। তারপর সুযোগ বুঝে সে দিব্যি হাত-পা ধুয়ে উপরে উঠে গেল, আর আমি পাঁকের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। আমার বাপ মা, আত্মীয়স্বজন থানা আদালত এবং তার পেছনে দাঁড়িয়ে গোটা দুনিয়াটা সেইখানেই আমাকে চেপে রেখে দিল। তাকে ভুলতে পারিনি, সেই সঙ্গে তার জাতটাকে। পথে, ঘাটে, ঘরে, বাইরে যেখানে যত মেয়ে দেখি, সকলের মুখেই আমি সেই একটা মুখ দেখতে পাই। যুক্তি দিয়ে বুঝি এ আমার ভুল দেখা। একজনকে দিয়ে সকলের বিচার হয় না। কিন্তু আমার এ চোখ দুটোকে তো উপড়ে ফেলতে পারি না। তারা আমার যুক্তি মানে না।

সেই চোখ নিয়ে আর যেখানেই হোক, তোমার বোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো যায় না।

তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।

তোমাদের মকবুল।

চিঠিটা শেষ করে নিজের টিনের স্যুটকেসের মধ্যে বন্ধ করতে করতে দিলীপ বলল, ও যে যাবে না, আমি আগেই জানতাম।

—কিন্তু মায়াকে কী বলবো!

বললেই হবে, অসুখ করেছে। আর আসলেও তো তাই। এখানে আমরা যারা আছি তার মধ্যে ও-ই বোধহয় সব চেয়ে অসুখী।

নিমন্ত্রণের আসল উপলক্ষ্যটা ওখানে পৌঁছেই বোঝা গেল। ঐ দিনটা ছিল ভাইফোঁটা। তারই আয়োজন করেছিল রণমায়া। আগে থেকে বললে 'চমক' চলে যায়, তাই বলেনি।

কাছাকাছি দু'তিনটি বাঙালী পরিবারে রণমায়ার যাতায়াত ছিল, এবং ওর মত মেয়ের পক্ষে ভাব জমাতে দেরি হয়নি। কথাপ্রসঙ্গে তাদেরই কারো কাছ থেকে ক'দিন আগে এই অনুষ্ঠানের নাম ও বিবরণ সে জানতে পারে। এই উৎসবের অন্তর্নিহিত সুরটি তার মনে দোলা দিয়েছিল। ভাইবোনের সম্পর্ক যে কত গভীর তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি রণমায়ার জীবনে যেমন করে ঘটেছে, তেমন ক'জনের ঘটে? আজ তার চারদিকে যা কিছু, সব কিছুর মূলে ঐ একটি মাত্র মানুষ—তার দাদা। মাকে সে দেখেনি বললেই হয়। যে-মেয়ে শিশুকালেই মাতৃহারা, তার কাছে বাপ একটা অস্তিত্ব মাত্র, শুধু ভরণ-পোষণের উৎস, তাও অনেক সময় নিশ্চিত নয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। মাকে হারাবার পর বাপকে আরো বেশী করে পেয়েছে, তেমন মেয়েও নিতান্ত দুর্লভ নয়। তারা পরম ভাগ্যবতী। রণমায়া সে ভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি। বরং বিমাতার অন্তরালে পিতার অস্তিত্বটাও তার কাছে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সেই দুর্দিনে চরম সর্বনাশের কবল থেকে যে তাকে রক্ষা করেছিল সে তার দাদা, যার নিজের অবস্থা তখন বোনের চেয়েও অসহায়। কিন্তু সে কথা সে একবারও ভাবেনি। অন্ধের মত কোনো দিকে না তাকিয়ে সুকঠোর সঙ্কটের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সে বিপদসঙ্কুল আবর্ত কাটিয়ে তীরে পৌঁছবার সম্ভাবনা সেদিন একবারও দেখা যায়নি। তারপর দিনের পর দিন বহু ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে একদিন এই নিরাপদ তটরেখার সাক্ষাৎ মিলেছিল। এর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি সহায় সম্বলহীন দুঃসাহসী ছেলের একটানা একক সংগ্রাম। সব দুঃখ সে একা বুক পেতে নিয়েছিল, বোনের গায়ে তার আঁচটুকুও লাগতে দেয়নি।

সেই দাদার জন্যে সে কিছুই করতে পারেনি। কীই বা করবে? মনে মনে অনেক কিছু ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্যে কুলায় না। বোন না হয়ে ভাই হলেও না হয় পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারত। পরঘরী মেয়ের সে সুযোগও নেই। মাঝে মাঝে ডেকে পাঠিয়ে ও যা ভালবাসে তেমন দু'একটা জিনিস রান্না করে খাওয়ানো, ঐ নিয়ে একটু হৈচৈ করা—এর বেশী আর সে কী করতে পারে? ক'দিন আগে তার নতুন পাতানো সই ও-বাড়ির ঐ বৌটির কাছে ভাইফোঁটার গল্প শুনে হঠাৎ মাথায় চাপল সেও ওদের মত দাদাকে ডেকে এনে ভাইফোঁটার উৎসব করবে। নতুন জামা কাপড় পরিয়ে বাঁহাতের কড়ে আঙুলে চন্দন নিয়ে তিলক পরিয়ে দেবে দাদার কপালে, বলবে যমের দুয়োরে পড়ল কাঁটা। তারপর শাঁখ বাজাবে, উলু দেবে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে নত মুখে ধীরে ধীরে তুলে নেবে তার পায়ের ধুলো। এমন সুন্দর, কাব্যময়, মধুর অনুষ্ঠান! ভাবতেও আনন্দে বুক ভরে ওঠে। একটি একটি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে কিসের পর কি করতে হবে সব কিছু জেনে নিয়েছে সই-এর কাছে। তাতেও খুশী নয়; দরজা বন্ধ করে তার সামনে বসে মহড়ার আয়োজন করল একদিন, 'আচ্ছা সই, ধর তুমিই যেন আমার দাদা। দ্যাখ তো ঠিক মতো হচ্ছে কিনা।'

এই উদ্ভট প্রস্তাব শুনে 'সই' তো হেসেই অস্থির। কিন্তু রণমায়া ছাড়বার পাত্র নয়। তখন বলল, দাঁড়াও; ঠিক ঠাক হয়ে বসি আগে?

(ক্রমশঃ)

একটি মসজিদের জন্মকথা

অমরেন্দ্র দাস
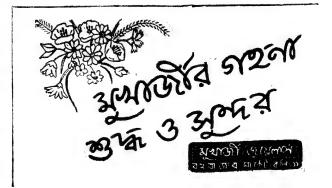
একমাত্র প্রমাণ একটি মসজিদ। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের (আগেকার ওয়েলিংটন স্কোয়ার) ধার ঘেঁষে এখনও জেগে আছে। পথ চলতে চলতে অনেকেরই হয়ত মনে হয় এখানে কেন এই মসজিদ? অনেকে হয়ত প্রশ্নের সমাধান করেন—স্কোয়ারে মুসলমানেরা বেড়াতে এলে প্রার্থনা করার সময় পায় না বলে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু তাহলে হিন্দুরা দোষ করল কি? তাদের জন্যও একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করা উচিত ছিল? কিন্তু না। মন্দির বা মসজিদ কোনটাই ঐ জন্যে প্রয়োজন হয়নি। মসজিদ করার প্রয়োজন হয়েছিল, এখানে জলের ট্যাঙ্ক ছিল। এবং পাম্পিং ষ্টেশনে মুসলমানদের সর্বদা থাকতে হত বলে তাদের সুবিধার জন্য একটি ছোটখাট মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল। এখন সবই লুপ্ত। জলের ট্যাঙ্ক উঠে জনসমাবেশের ক্ষেত্র হয়েছে, কিন্তু মসজিদটি লুপ্ত হয়নি। মসজিদটি ভেঙেচুরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েও আবার নতুন করে জাগিয়ে রাখা হয়েছে। জাগিয়ে রেখেছে আশেপাশের মুসলমানেরা। তারা ধর্মকে শুধু জাগিয়ে রাখেনি, জাগিয়ে রেখেছে ইতিহাস।

একমাত্র এই মসজিদই প্রমাণ করে—এখানে জলের ট্যাঙ্ক ছিল। ১৮৭৬-১৮৮৮ সালের মিউনিসিপ্যালিটির কার্য-বিবরণী থেকেও জানতে পারা যায় কিছু। আর কিছু অনুমান করা যায় স্কোয়ারের তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উচ্চতা দেখে। স্কোয়ারের মাঝখানে যে ফোয়ারাটি থেকে সদাসর্বদা জল গড়ায়—তা থেকে কিছু কি অনুমান করা যায় না? এখানে তো তারও আরও আগে সল্ট লেকের জল প্রবাহিত হত। জায়গাটিকে ক্রীক খাল বলা হত। ডিঙিগুলো এখানে এসে কোন অলৌকিক উপায়ে ধ্বংস হয়ে যেত, এই জন্যে এই জায়গাটিকে "ডিঙাভাঙা" বলা হত। তবু কিছুই বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না—এই অচেনা শহরটি একটু একটু করে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে!

তাই সম্পূর্ণ প্রমাণ দিয়েই আজকের কলকাতাবাসীকে বিশ্বাস করাতে হয় যে এখানে আজকে যা আছে দুদিন আগে তা ছিল না। এ সব সৃষ্টি সম্পূর্ণ নতুন। কলকাতা শহর সম্পূর্ণ নতুন শহর। এর গায়ে কোন প্রাচীনত্বের ছাপ নেই। জব চার্ণক কবে এসেছিলেন? ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট কি খুব বেশী দিনের? পলাশী যুদ্ধের ইতিহাস যতদূরই মনে হোক সে খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়।

ইংরেজ এল এখানে বাণিজ্য করতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট। তারপর দেশের সর্বাধিপতি হল পলাশী যুদ্ধের পর। দেশ হল বিদেশীর করায়ত্ত। একটা দেশের পক্ষে এত অল্প সময়ের মধ্যে ভূরি ভূরি পরিবর্তনে আশ্চর্য লাগে। বোধ হয় এ দেশের পরিবর্তন একটু দ্রুতই হয়েছিল।

তাই দ্রুতই এ শহরের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন ইংরেজ বাহাদুর। তখন কলকাতাতেই ইংরেজের সব। ইংরেজ নিজের থাকবার জন্যেই ভাল ভাল ব্যবস্থার খসড়া করতে লাগল। নতুন নতুন সুখ, নতুন নতুন সুবিধে। নেটিভ-দের অসুবিধে হলেও তাদের সুখ-সুবিধে দরকার। কারণ তারা এখন রাজা।

সিপাই বিদ্রোহের পর ইংরাজদের টনক নড়ল, কলকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির সুব্যবস্থা করতে হবে। ড্রেন ও কলের জলের ব্যবস্থা করলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়। কলকাতায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুহার ছিল হাজারকরা ছত্রিশ জনেরও বেশী। ইংরাজের চেয়ে নেটিভদের সংখ্যাই বেশী। ডালহৌসির স্কোয়ারের মত চৌরঙ্গীতেও গোটা কুড়ি পুকুর ছিল। নেটিভদের মৃত্যুহার দেখে ইংরাজরা শিউরে উঠল। ভয় হল যদি তাদের হয়? শেষকালে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, টাই-ফয়েডে মরতে হবে? মন্ত্রণাসভা বসল। খসড়া হল পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা হবে। সে জল প্রথমে পাবে ইংরেজ তারপর নেটিভ। ৬০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহের খরচ পড়বে সাতান্ন লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ক্লার্ক।

নেটিভরা টাকা দিতে চাইল না। তারা বলল—কলের জল আমরা খাব না। টাকাও আমরা দেব না। জাতধর্ম আমাদের যাবে। ইংরাজ কান দিল না সে
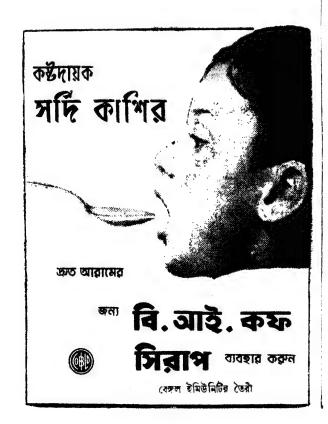
সব কথায়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। করবেই তারা। কিন্তু পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হবার আগেই ক্লার্ক মারা গেলেন, ভার পড়ল উইলিয়াম স্মিথের ওপর।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ। প্রথম জলপান করল কলকাতাবাসী। আজকের কলকাতায় পরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করপোরেশনের নয় ইংরাজের। ইংরাজরাই সৃষ্টি করেছিল এই উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু সেদিন ইংরাজ নিজের সুবিধের জন্যে মাথা ঘামিয়েছিল—নেটিভদের জন্যে নয়। ইংলিশ চ্যানেলের পথে ব্রিটেন থেকে এল, পাম্পিং ষ্টেশন, জলবাহী পাইপ এবং অন্যান্য পাইপ ও যন্ত্রপাতি।

কলকাতায় হল জলের কেন্দ্র। পরিশ্রুত জল জমা হবে টালার ট্যাঙ্কে ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাঁধানো ট্যাঙ্কে। তার আগে ফলতায় জল তুলে থিতানো হবে Settling Tank-এর মধ্যে। তারপর সেই Filtered জল পাঠানো হবে দুই ট্যাঙ্কে।

ইঞ্জিনিয়ার ক্লার্ক ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সাতান্ন লক্ষ টাকার পরিকল্পনা সমেত ইংলণ্ডে গেলেন। সেখানে কাজের জন্য ঠিকাদার, ইঞ্জিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করলেন। সেখানে ক্লার্ক সাহেব যে ইষ্টকনির্মিত পাইপের ব্যবস্থা করলেন তাতে ফলতা থেকে টালা পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় নব্বুই লক্ষ গ্যালন জল পাম্প করে পাঠানো হবে; কিন্তু ক্লার্ক মারা যাবার পর সে পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল। পরিবর্তে উইলিয়াম স্মিথ বিয়াল্লিশ ইঞ্চি মাপের ঢালাই লোহার পাইপের ব্যবস্থা করলেন। তার ভেতর দিয়ে যাবে ষাট লক্ষ গ্যালন জল—সেই ব্যবস্থাই বহাল রইল।

গঙ্গা থাকতে ফলতায় কেন জলের কেন্দ্র হল? কাশীপুরেও তো হতে পারত। কিন্তু তখন মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন রাসায়নিক মত প্রকাশ করেছিলেন—কাশীপুরের কাছে হুগলী নদীর জল বছরে চার মাস পানের যোগ্য থাকে। কলকাতা বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ষ্টেশন করলে ইছাপুর ও ব্যারাকপুর অঞ্চলের ইংরাজ সৈন্যরা জল পেত না। তাই ফলতায় হল জলকেন্দ্র। আর পাম্পিং ষ্টেশন হল টালা ও ওয়েলিংটনে। টালা ও ওয়েলিংটন থেকে যত বড় বড় লোহার পাইপ মাটির তলা দিয়ে ডালহৌসি, গভর্ণমেণ্ট হাউস, চাঁদপাল ঘাট, লালবাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, পার্ক ষ্ট্রীট, ধর্মতলা চৌরঙ্গী প্রভৃতি ইংরাজ-বসবাস অঞ্চলের দিকে গেল। আর নেটিভরা জলপান করতে লাগল—পথের ধারে ৪৭০টি লোহার সিংহের মুখ-মার্কা দাঁড়ানো কল থেকে। (এখনও মাঝে মাঝে পথের ধারে সিংহওয়ালা মুখের দর্শন পাওয়া যায়।) অবশ্য নেটিভদের ঘরে ঘরে কানেক্সন নেবারও অধিকার ছিল। কিন্তু ব্যয়-বহুল।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পাম্পিং ষ্টেশন তৈরী করা হয়েছিল—ইংরাজদের নিজের সুবিধের জন্যে। কারণ এইখান থেকেই ইংরাজ-অঞ্চলে জল সরবরাহের সুবিধা। তা ছাড়া ওয়েলিংটনে ভূনিম্নের ট্যাঙ্কের আয়তন আশী লক্ষ গ্যালন জল ধরার উপযোগী। টালার ট্যাঙ্কে জল ধরত মাত্র দশ লক্ষ গ্যালন। ওয়েলিংটনের পাম্পিং ষ্টেশন থেকে জল উত্তর কলকাতায় যাওয়ার জন্যে পাইপগুলো মেলানো ছিল কিন্তু যেত না। কারণ এখান থেকে ইংরাজদের বাড়ীতে জল যাবার পাইপগুলি ছিল বড়। ইংরাজ-বিশেষজ্ঞ এই চালাকিটি সুকৌশলে সম্পন্ন করেছিলেন। মোট কথা, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ট্যাঙ্ক ইংরাজদের জন্যেই হয়েছিল। এ কথা কলকাতার আদম-সুমারী ইংরাজী গ্রন্থের সংকলন-কর্তা মিঃ এ কে রায় বলেছেন।

সেদিনের সব কিছুই আছে। নেই শুধু ওয়েলিংটন স্কোয়ার ট্যাঙ্ক। ১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে চার লক্ষ অধিবাসীর জন্য দৈনিক ষাট লক্ষ গ্যালন পরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছিল। আজ এত বছর পরে দৈনিক সাত কোটি গ্যালন জল সরবরাহ হচ্ছে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কয়েক কোটি অধিবাসীর জন্য। শুধু পাইপগুলোয় কয়েক সহস্র জোড়াতালি পড়েছে মাত্র।

আজ সেই ওয়েলিংটন স্কোয়ার (অধুনা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) ভ্রমণবিলাসীদের ভ্রমণ ক্ষেত্র। কলকাতা শহরের জনসমাবেশের একমাত্র ক্ষেত্র। কালের কি অদ্ভুত খেয়াল? ইতিহাসের কি অদ্ভুত বিচার? এখন কাউকে গল্প করলে সে হয়ত রাঁচীতে পাঠানোর তোড়জোড় করবে। কিন্তু তাকে বিশ্বাস করানর জন্যে ঐ মসজিদই একমাত্র সম্বল। ঐ মসজিদের জন্ম তারিখ খুঁজতে গেলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাম্পিং ষ্টেশনের ইতিহাস বেরিয়ে পড়বে। একটি জন্মের সঙ্গে আর একটি জন্মের সূচনা।

কলারসিক

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতায় তিনটি প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। এর মধ্যে একটি শিল্পী শ্যামল দত্তরায়ের একক চিত্র-প্রদর্শনী এবং অন্য দুটি ভারতীয় বয়ন-শিল্প ও শ্রীকৃষ্ণসহায় বসুর সূচী-শিল্পের প্রদর্শনী। প্রথমটি সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস নামক সংস্থার উদ্যোগে ১৫৭।বি, ধর্মতলা স্ট্রীটের দ্বিতলে এবং অন্য দুটি ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে জুন মাসের চতুর্থ সপ্তাহ পর্যন্ত চলার পর শেষ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, বর্ষার মরশুমে হলেও এই প্রদর্শনী তিনটি কলকাতার শিল্প-রসিক মানুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

॥ শিল্পী শ্যামল দত্তরায়ের প্রদর্শনী ॥

শিল্পী শ্যামল দত্তরায় সমকালীন শিল্পী-সংস্থার একজন সদস্য। এই সংস্থার উদ্যোগে ইতিপূর্বে কয়েকটি সম্মিলিত ও একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। শ্যামলবাবুর চিত্র-কলার কিছু নিদর্শন আমরা সেই সম্মিলিত প্রদর্শনীতে এর আগে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। এবার সমকালীন শিল্পী-সংস্থা তার নিজস্ব স্টুডিওতে শিল্পী-সদস্যদের যে একক চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তারই বাস্তব রূপায়ণ ঘটলো শিল্পী শ্যামল দত্তরায়ের প্রদর্শনী দিয়ে। আমরা সমকালীন শিল্পী-সংস্থার এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করি।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে শ্যামলবাবুর চারখানি তেল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র ও দু'খানি জল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র স্থান পেয়েছিল। এ-ছাড়া ছিল দুখানি কাঠ-খোদাই চিত্রের নিদর্শন। এই আটখানি চিত্র-নিদর্শনের মধ্য দিয়ে শ্যামলবাবু তাঁর শিল্প-দক্ষতা প্রদর্শন করতে পেরেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আধুনিক বিমূর্ত-চেতনায় শ্যামলবাবুর শিল্পী-মানস হয়তো অনেকখানি আচ্ছন্ন, কিন্তু সেই বিমূর্ত চেতনাকে কি ভাবে চিত্রকলার আঙ্গিকে বেঁধে ভাবসত্যকে মূর্ত করে তুলতে হয় তাও তাঁর জানা আছে। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর দেখা ও জানার জগৎকে তিনি যখন দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করেন তখন দর্শকমনের দেখা ও জানার জগৎ নতুন উপলব্ধিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই শ্যামলবাবু তাঁর চেতনা অনুযায়ী মানুষের অবয়বকে ভাঙ্গলেও সেই ভাঙ্গা অবয়ব রঙ আর রেখার আবেষ্টনীতে নতুন এক মূল্যবোধে দর্শকমনকেও আকর্ষণ করে। বিশেষ করে তাঁর তীর্যক শিল্প-দৃষ্টি 'স্কুল-শিক্ষকের একটি প্রতিকৃতি' (১) নামক রচনায় এই লক্ষ্যভেদে সক্ষম হয়েছে। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে তাঁর 'মা' (২) চিত্রখানি। লোক-শিল্পের আঙ্গিকে মা ও ছেলের মধ্যে তিনি চমৎকার রঙ প্রয়োগে ভাস্কর্যের যে দৃঢ়তা এনেছেন, নিঃসন্দেহে তা প্রশংসার যোগ্য। তেল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত 'জেলে' (৩) ও বাঁশীওয়ালা (৪) মন্দ নয়। জল-রঙের চিত্রের মধ্যে শিল্পীর 'রাতের গান' (৬) নামক চিত্রখানি আমার ভাল লেগেছে। এর জটিল চিত্র-সংস্থাপনের নৈপুণ্য এবং রঙ-প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি সত্যি প্রশংসার যোগ্য। গ্রাফিক চিত্রকলার নিদর্শনরূপে কাঠ-খোদাইয়ের কাজ দুটি গতানুগতিক মনে হয়েছে।

আশা করি শ্যামল দত্তরায়ের সমকালীন শিল্পীমন আরো নতুন পথে নতুনতর বক্তব্য-আহরণে অতঃপর নিয়োজিত হবে।

॥ প্রাচীন বয়ন-শিল্পের প্রদর্শনী ॥

ভারতীয় বয়ন-শিল্প এক সুমহান ঐতিহ্যের অধিকারী। প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর ধরে ভারতীয় বয়ন-শিল্প তার আশ্চর্য শিল্প-সুষমায় আমাদের যেমন মুগ্ধ করেছে, তেমনি বিদেশ থেকেও কুড়িয়ে এনেছে অজস্র প্রশংসার বাণী। বিশেষ করে বেনারস, রাজস্থান, সুরাট, বোম্বাই, বাঙ্গালোর আর আমাদের বাঙলা দেশের অতুলনীয় বয়ন-কলা ও সৌন্দর্য-সৃষ্টির অননুকরণীয় দৃষ্টান্ত নিয়ে আজও আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি।

এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে দর্শক-সম্মুখে তুলে ধরার জন্য অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের কর্তৃপক্ষ এবার প্রাচীন বয়ন-শিল্পের যে সুন্দর প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছিলেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী করতে পারে।

ইতিপূর্বে বালুচর শাড়ির প্রদর্শনী করে অ্যাকাডেমী এক সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বর্তমান প্রদর্শনী দেখেও আমরা খুশী হয়েছি। বিশেষ করে বেনারসী ব্রকেড শাড়ির এমন নয়ন-ভুলানো বয়ন নৈপুণ্যের অজস্র নিদর্শন একসঙ্গে দেখার সুযোগ সাধারণ মানুষের ভাগ্যে খুব কমই ঘটে থাকে। বেনারসের বয়ন-শিল্পীরা যে কত সূক্ষ্ম শিল্প-চেতনার অধিকারী এগুলি দেখে তা অনায়াসে অনুমান করা যায়। শুধু তাই নয়, ঢাকার বিখ্যাত জামদানী, প্রায়-অবলুপ্ত মুর্শিদাবাদের বর্ণাঢ্য বালুচর শাড়ি, বাঙলার নক্সী কাঁথা, পাঞ্জাবের ফুলকড়ি, পূর্ব ভারতীয় পার্বত্য জাতির বয়ন-নৈপুণ্য, দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে দেবদাসীদের ব্যবহৃত শাড়ি, পশ্চিম ভারতের চম্বা প্রভৃতি অঞ্চলে পৌরাণিক কাহিনীকে সূচী-শিল্পে বিধৃত করার নৈপুণ্য, পাটোলা শাড়ির অপূর্ব সুষমা, কচ্ছ ও রাজকোটের চুমকী-বসানো ব্লাউজ প্রভৃতির মধ্যদিয়ে বয়ন-শিল্পীদের যে সৌন্দর্য-চেতনা ও দক্ষতা প্রকাশিত হয়েছে, সত্যি তা ভুলবার নয়। এমন একটি প্রদর্শনীতে বিশ্ব-বিখ্যাত মসলিনের কোনো নিদর্শন না দেখে আমরা একটু অবাক হয়েছি।

অ্যাকাডেমীর কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে ভারতের প্রাচীন শিল্প-সম্পদ নিয়ে এই ধরনের অন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে কলকাতার মানুষ তাঁদের উদ্দেশ্যে অবশ্যই অভিনন্দন জানাবে।

॥ সূচী-শিল্পের প্রদর্শনী ॥

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনের একদিকে যখন চলছিল প্রাচীন বয়ন-শিল্পের প্রদর্শনী তখন অন্যদিকের আর একটি ঘরে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণসহায় বসুর সূচী শিল্পের প্রদর্শনী। এতকাল দেখেছি সূচী-শিল্পে নারীদেরই আধিপত্য। শ্রীবসু তাঁর অবকাশের ফাঁকে নারীদের সেই আধিপত্যের দুর্গে হানা দিয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। অন্ততঃ এই দিক থেকে এই প্রদর্শনীর অভিনবত্ব স্বীকার্য।

এই প্রদর্শনীতে সূচী-শিল্পের ৮৪টি নিদর্শন স্থান পেয়েছিল। এর মধ্যে মনীষীদের প্রতিকৃতি, প্রাচীন কাহিনী-ভিত্তিক সূচী-চিত্র, পশু-পক্ষী ও নিসর্গ দৃশ্যকে অবলম্বন করে রচিত অনেকগুলি নিদর্শন আমাদের মুগ্ধ করেছে। কাপড়ের উপর সামান্য সূচ আর সুতোর সাহায্যে যে চমৎকার কলা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করা যায় এই প্রদর্শনীর ঠেলাওয়ালা, তরঙ্গের বুকে কিম্বা বিশ্ব-বৈজয়ন্তীর রূপায়ণ তারই চমৎকার দৃষ্টান্ত।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। শ্রীবসু যদি ক্যালেন্ডার থেকে তাঁর বিষয়বস্তু আহরণ পরিত্যাগ করে মৌলিক শিল্প-চেতনার সাহায্যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করে তাকে তাঁর কারু-নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তোলেন তবে বোধহয় এই প্রচেষ্টা অনেক বেশি শিল্প-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলারও তিনি সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।

আশা করি শিল্পী কৃষ্ণসহায় বসু আমাদের প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখবেন। আমরা সূচী-শিল্পের আরো সুন্দরতর নিদর্শন ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে আজ তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

॥ পাক-বর্বরতা ॥

অসহায় সংখ্যালঘুদের উপর পাক গুন্ডাদের নিষ্ঠুর আক্রমণের সংবাদের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। পাকিস্থান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে গত পনেরো বছরে অসংখ্যবার এ আক্রমণ এসেছে, এবং নিতান্ত নিরুপায়ের মতই সংখ্যালঘুদের তা সইতে হয়েছে। আর যখন একান্তই অসহনীয় বলে মনে হয়েছে তখন দলে দলে দেশত্যাগ করে সরকারের অবাঞ্ছিত অতিথি হয়ে তারা চলে এসেছে এদেশে। এমনি করে গত পনেরো বছরে পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি হিন্দু পাকিস্থান ত্যাগ করেছে, কিন্তু এজন্যে কোন কৈফিয়ৎ পাকিস্থান সরকারকে কারও কাছে দিতে হয়নি। দেশ যখন ভাগ হয় তখন ভারত ও পাকিস্থান উভয়েই এ সর্ত স্বীকার করে নিয়েছিল যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে তারা বসবাসের সুযোগ দেবে। এ কারণে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হলেও সেদিন লোক-বিনিময়ের কোন কথা ওঠেনি। তারপর ভারতে অবস্থানকারী মুশ্লিমরা পূর্ণ নাগরিকের স্বীকৃতিলাভ করেছেন, বিভিন্ন উচ্চ ও দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, দরকার হলে ভারতের যে কোন নাগরিকের মতই সভা শোভাযাত্রা করে সরকারের কাছে নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানিয়েছেন, এমন কি সরকারের তীব্র সমালোচনাও করেছেন। অথচ যেদিন পাকিস্থান হয়েছে সেইদিন থেকেই সেখানে অবস্থানকারী দেড় কোটি হিন্দুর কণ্ঠ চিরকালের জন্যে রুদ্ধ হয়েছে। পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা পর্যন্ত তাদের স্বীকৃত হয়নি। নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে সম্প্রতি পাকিস্থানে যে নির্বাচন হল তাতে পাকিস্থানের জাতীয় সংসদে একজন হিন্দুও নির্বাচিত হবার সুযোগ পায়নি।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বপ্রেমিক— একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অধিকারের কথা আলোচনা করে সময় নষ্ট করার চেয়ে তাঁর সামনে অনেক বড় কাজ। পাকিস্থানের কোন বর্বরতাতেই তিনি তাই বিচলিত হন না। লোক বিনিময়ের চিন্তা ও তাঁর কল্পনাতীত, তাহলে ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনীতিকদের কাছে তিনি মুখ দেখাবেন কেমন করে? তাই গত ১৪ই মে শেষ রাত্রে মালদহ-রাজসাহী সীমান্তে ভারতে আশ্রয়প্রার্থী সাঁওতাল ও রাজবংশীদের

উপর পাক সীমান্তরক্ষীদের বেপরোয়া গুলীবর্ষণে কতকগুলি নিষ্পাপ প্রাণ বিসর্জিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বিশ্বপ্রেমিক ও পাকিস্থানের অকৃত্রিম বন্ধু প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু উত্তেজিত লোকসভার সম্মুখে সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেছেন—এ নিহাতই মামুলী ব্যাপার, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, ভুল দুপক্ষেরই হয়েছিল! পাকিস্থানের শাসকবর্গ অবশ্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এই ঔদার্যের উপযুক্ত জবাবই দিয়েছেন। যেদিন নেহরুর ঐ বিবৃতি প্রকাশিত হয় সেইদিনই পাকিস্থানের সদ্যনিযুক্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহম্মদ আলী পাক জাতীয় সংসদে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে বলেছেন, সংখ্যালঘু মুশ্লিমদের উৎপীড়িত করে ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তারা কুমিল্লায় এসেছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে। এছাড়া রাষ্ট্রসংঘেও পাকিস্থান কাশ্মীর বিতর্কের ফাঁকে ফাঁকে ভারতের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনছে এবং পাকিস্থানের প্রচার-চাতুর্যে অনেকের কাছেই তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। ভারতের ঘরে-বাইরে নির্বীর্য নিষ্ক্রিয় নীতি অনুসৃত হওয়ায় সর্বত্রই আজ ভারত অবমানিত, ভারতের একান্ত আত্মীয়রা আজ পাক বর্বরতার যূপকাষ্ঠের অসহায় বলি। এ অবস্থায় এদেশের শাসকবর্গের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা নিতান্তই অর্থহীন। দেশের সাধারণ মানুষকেই আজ এগিয়ে আসতে হবে তাদের একান্ত আপনজনদের রক্ষা করতে। আন্তর্জাতিক সম্মানের প্রশ্ন যাদের নেই, সাম্প্রদায়িক অপবাদে যাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় না তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে মানবতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে।

॥ পার্বত্য রাজ্যের দাবী ॥

আসামের সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ সম্মেলনের এগারোজন সদস্যের মধ্যে আটজন আগামী ২৪শে অক্টোবর থেকে বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। বাকি তিনজনও হয়ত অনতিবিলম্বেই তাঁদের অনুসরণ করবেন। আসাম বিধানসভায় পার্বত্য জেলাগুলির মোট প্রতিনিধি-সংখ্যা পনেরো, তার মধ্যে এগারোটি আসনে জয়ী হয়েছিলেন পার্বত্য নেতৃ সম্মেলনের মনোনীত প্রতিনিধিরা, যাঁরা আসাম সরকারের সংকীর্ণ নীতির প্রতিবাদে দু বছর আগে স্বতন্ত্র পার্বত্য-রাজ্যের দাবী জানিয়েছিলেন। সমগ্র আসামের জনসংখ্যার তুলনায় অসমীয়ারা সংখ্যালঘু, কিন্তু গায়ের জোরে সমগ্র আসাম আজ তাদের শাসনাধিকারে। অসমীয়া ভাষা আজ আসামের একমাত্র সরকারী ভাষা, যা অধিকাংশ আসামবাসীরই ভাষা নয়। ১৯৬০ সালের ২৪শে অক্টোবর আসাম বিধানসভায় ভাষা বিল গৃহীত হয়, তাই ঐ দিনটিকেই আসামের খাসি, গারো, মিকির,

লুসাই প্রভৃতি পার্বত্য অধিবাসীরা তাদের প্রতিবাদ ও দাবী দিবস হিসাবে বেছে নিয়েছে। নির্বাচনে বিপুল সাফল্যের দ্বারা সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ সম্মেলন প্রমাণ করেছেন, স্বতন্ত্র পার্বত্য-রাজ্যের দাবী সমগ্র পার্বত্য অধিবাসী-দেরই দাবী। এ কারণে এবার কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র স্কটিশ ধাঁচের স্বায়ত্ত-শাসনের কথা বলে তাদের শান্ত করতে পারবেন না। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন অসমীয়াদেরও এ দাবীতে কোন আপত্তি নেই, আসামের ছয়টি অসমীয়া জেলার সমন্বয়ে একটি রাজ্য পেলেই তারা সন্তুষ্ট, এবং এই মর্মে দাবীও জানানো হয়েছে অসমীয়াদের পত্রিকা 'আসাম ট্রিবিউন' ও 'নূতন অসমীয়া' পত্রিকায়। কাছাড় মণিপুর ত্যাগ করতেও তাদের আপত্তি নেই, কারণ তাহলে আর এক ঝঞ্ঝাট বাঙালীদের হাত থেকে অনেক-খানি নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যবস্থায় রাজী নন, কারণ সীমান্ত রাজ্য আসামকে এইভাবে খণ্ডিতকরণকে তাঁরা বোধহয় নিরাপদ বলে মনে করেন না। তাই স্কটিশ ধাঁচের কথা বলে ও বাঙালীদের ন্যায্য দাবী অস্বীকার করে যেমন করে হোক তাঁরা আসামকে অখণ্ড রাখতে চান। কিন্তু সীমান্তের অধিবাসী বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত হওয়ার ফল যে কি মারাত্মক তা নাগা-দৌরাত্ম্য থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বোঝা উচিত ছিল। বিশেষ করে আসামের পার্বত্য অধিবাসীদের পূর্ণ আনুগত্য যখন ভারতের প্রতি, তখন অসমীয়াদের সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা থেকে তাদের রক্ষা পাওয়ার দাবীতে আপত্তি জানানোর কোনই কারণ থাকতে পারে না।

॥ কমিকন ॥

ইউরোপের খোলাবাজারের প্রতি-দ্বন্দ্বী কমিউনিষ্ট অর্থনীতিক সংগঠন, সংক্ষিপ্ত নাম কমিকন। সোভি-য়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই এর সদস্যপদ এতদিন সীমাবদ্ধ ছিল। কমিউনিষ্ট চীন কমিকনের সদস্যপদ প্রার্থনা করেও নিরাশ হয়েছে এই কারণে যে, সে ইউরোপীয় দেশ নয়। কিন্তু এইবার এশিয়ার অন্যতম কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র বহির্মঙ্গোলিয়াকে কমিকনের সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং আলবানিয়ার পরিত্যক্ত সভ্যপদ তাকে দিয়ে পূরণ করা হয়। আলবানিয়া ছাড়া ইউরোপের সব কটি দেশ যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন, এশিয়ার কমিউনিষ্ট দেশ-গুলির মধ্যেও ঠিক তেমনি বহি-র্মঙ্গোলিয়া ছাড়া সবকটি চীনের প্রভাবাধীন। সুতরাং চীনপন্থী ইউরোপীয় কমিউনিষ্ট দেশ আলবানিয়ার শূন্যস্থানে সোভিয়েটপন্থী এশিয়া কমিউনিষ্ট দেশ বহির্মঙ্গোলিয়ার আগমন সোভিয়েট-চীন বিরোধেরই অপর একটি অধ্যায় বলে মনে করা হচ্ছে। বহির্মঙ্গোলিয়া একটি পর্বত-বহুল মরুময় জনবিরল দেশ। তার অধিবাসীর সংখ্যা দশ লক্ষও নয় এবং অধিকাংশ অধিবাসী এখনও যাযাবর। তবুও গত পাঁচ বছর ধরে এই দেশটিতে সোভিয়েট সাহায্য অকৃপণ হাতে বর্ষিত হয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে, বহি-র্মঙ্গোলিয়ার প্রতি মানুষ এখন বছরে সোভিয়েট-সাহায্য পাচ্ছে পঁচিশ পাউন্ড করে। এত বেশি সাহায্য আমেরিকার কাছ থেকেও কোন অনুন্নত দেশ পায় না। অন্তর্মঙ্গোলিয়া চীনের অন্তর্গত একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ। তার সম্প্রসারণশীল নীতির ফলে তিব্বতের মত বহির্মঙ্গোলিয়াও একদিন তার বিশাল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে এই ছিল চীনের আশা। কিন্তু ঘটনা-পরম্পরায় বহির্মঙ্গোলিয়া এখন এশিয়ার আল-বানিয়ায় পরিণত হয়েছে।

॥ কানাডা ॥

উত্তর আমেরিকার বিশাল দেশ কানাডা। আয়তনে ভারতের চেয়ে চার গুণেরও বেশী বড় হলেও তার লোকসংখ্যা এখনও পর্যন্ত দুই কোটির কম। তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যও তার সীমাহীন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অনিবার্য ফলস্বরূপ এই দেশেও আজ নানা অর্থনীতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে তার রাজ-নীতিও এখন রীতিমত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত কানাডার শাসনক্ষমতা ছিল লিবা-রেল দলের হাতে। তারপর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জন ডিফেনবেকারের দল প্রগ্রেসিভ কনসারভেটিভ ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু তাঁরা নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেননি বলে ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে, অর্থাৎ এক বছর বাদে, আবার সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করেন এবং সে নির্বাচনে তাঁরা বিপুল সংখ্যক আসন অধিকার করেন। নিম্নকক্ষ হাউস অফ কমন্সের ২৬৫টি আসনের মধ্যে তাঁরা পান ২০৫টি; কানাডার ইতিহাসে কোন দলের এতবড় সাফল্যের কোন নজির নেই। অথচ চার বছর বাদে গত ১৯শে মে আবার যে সাধারণ নির্বাচন হল তাতে ডিফেন-বেকারের দল পেয়েছেন মাত্র ১১৭টি আসন। অর্থাৎ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁরা পাননি, মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে অন্য দলের শরণ নিতে হবে জন ডিফেন-বেকারকে, এবং এই অস্বস্তিকর অবস্থার অবসানকল্পে ১৯৫৮ সালের মত আবার হয়ত তিনি বিশেষ সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। চার বছরের মধ্যেই ডিফেনবেকার শাসন-ব্যবস্থার এই জন-প্রিয়তা হারানোর মূলে কারণ অর্থ-নীতিক। যে কানাডার প্রত্যেকটি লোকেরই বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে দিনাতিপাত করার কথা, সেখানে আজ কয়েক লক্ষ লোক বেকার। নির্বাচনের পূর্বে অবশ্য এক হিসাব প্রকাশ করে ডিফেনবেকার দেখিয়েছিলেন, গত এগারো মাসে কানাডার বেকার-সংখ্যা ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার থেকে কমিয়ে তিনি ৩ লক্ষ ২৫ হাজার করেছেন এবং সুযোগ পেলে আগষ্ট মাসের মধ্যে তিনি বেকার-সমস্যার পূর্ণ সমাধান করবেন। কিন্তু নির্বাচনের ফল দেখে বোঝা যায় সে যুক্তি কানাডার ১৮ লক্ষ ভোটারকে খুব বেশী প্রভাবিত করতে পারেনি। কানাডা ডলারের মূল্য মার্কিন ডলারের তুলনায় কমিয়ে ৯২½% করাতেও দেশবাসী বিক্ষুব্ধ হয়েছে। এই ডলার-মূল্য হ্রাসের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কানাডা লাভবান হবে সরকার পক্ষ থেকে এ যুক্তি দেখানো হলেও কানাডার সাধারণ মানুষের কাছে মনে হয়েছে, এর ফলে কানাডার আন্তর্জাতিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে। মুখ্যত এই দুটি কারণেই ডিফেনবেকারের সম্মুখে আজ বেকার হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে।

ঘটনা-প্রবাহ

ঘটনা-প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

১৪ই জুন—৩১শে জ্যৈষ্ঠ : ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় গোয়ালপাড়া জেলার (আসাম) বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত—চারটি সেকশনে ট্রেন চলাচল বন্ধ—কুশিয়ারা নদীর প্লাবনে করিমগঞ্জ শহরেরও একাংশ জলমগ্ন—প্রচণ্ড বন্যায় কাছাড়ের সহিত আসামের অবশিষ্টাংশের রেল ও সড়ক-সংযোগ বিচ্ছিন্ন।

১৫ই জুন—৩২শে জ্যৈষ্ঠ : রাজসাহী (পূর্ব পাকিস্তান) হইতে পলায়মান ১৫ শত সাঁওতালের উপর নৃশংস আক্রমণ—পাক্ ফৌজের ইতস্ততঃ গুলীতে ১০ জন নিহত ও ১৫০ জন আহত।

ভারত-চীন সীমান্ত আলোচনার ভিত্তি হিসাবে সীমান্ত হইতে উভয় রাষ্ট্রের সৈন্যাপসারণের প্রস্তাব খুবই যুক্তিসঙ্গত—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

১৬ই জুন—১লা আষাঢ় : ভারতের এক তরফা নিরস্ত্রীকরণের জন্য ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) প্রস্তাব—নয়াদিল্লীতে পরমাণু-বিরোধী সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ—আণবিক পরীক্ষা বন্ধ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের জন্য রাষ্ট্রপতি ডক্টর এস রাধাকৃষ্ণণ ও শ্রীরাজাগোপালাচারীর (স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল) আবেদন।

মেডিক্যাল ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধের অবসান—২৩শে জুলাই এম-বি-বি-এস পরীক্ষার তারিখ ধার্য—ছাত্রদের দুঃখপ্রকাশের পর সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

পলায়নপর সাঁওতালদের উপর গুলী চালনার তীব্র প্রতিবাদ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পাক্ সরকারের নিকট পত্র প্রেরণ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর (৮০) দেহরক্ষা।

১৭ই জুন—২রা আষাঢ় : দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত সফরকারী বৃটিশ কমনওয়েলথ মন্ত্রী মিঃ ডানকান স্যাণ্ডসের বৈঠক—ইউরোপীয় কমনমার্কেট, সোভিয়েট জঙ্গী বিমান ('মিগ') ক্রয় প্রভৃতি প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা।

আসাম বিধান সভায় নির্বাচিত সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ সম্মেলনের আটজন সদস্যের পদত্যাগ—২৪শে অক্টোবর (১৯৬২) হইতে পদত্যাগ কার্যকরী করার দাবী।

আগামী সাধারণ নির্বাচনের (১৯৬৭ সাল) জন্য অবিলম্বে কার্যারম্ভ করিতে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত।

১৮ই জুন—৩রা আষাঢ় : আণবিক অস্ত্রবিমুক্ত অঞ্চল গঠনের জন্য শ্রীনেহরুর আবেদন—একক নিরস্ত্রীকরণের 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণের জন্য পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির প্রতি আহ্বান। (দিল্লীতে আণবিক অস্ত্র-বিরোধী সম্মেলনে ভাষণ।)

ত্রিপুরা-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে পাক্ সৈন্য সমাবেশের সংবাদ।

১৯শে জুন—৪ঠা আষাঢ় : কাশ্মীরের প্রশ্নে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ভারত মানিবে না'—চীন সরকারের নিকট ভারতের কড়া নোট।

ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব ও শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ যথাক্রমে লোকসভা ও রাজ্যসভা হইতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির ডেপুটি লীডার নির্বাচিত।

২০শে জুন—৫ই আষাঢ় : পূর্ব পাকিস্তানের নবাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রশ্নে লোকসভায় তুমুল হট্টগোল—অবিলম্বে সর্বরকম সাহায্যের জন্য সরকারী প্রতিশ্রুতি দাবী—শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না (পুনর্বাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী) কর্তৃক দুই-একদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত ঘোষণার আশ্বাস দান।

॥ বাইরে ॥

১৪ই জুন—৩১শে জ্যৈষ্ঠ : ওয়াল ষ্ট্রীটে (নিউইয়র্ক) শেয়ার বাজারে পুনরায় শেয়ারের মূল্য হ্রাস—এক সপ্তাহে প্রায় ১৫৫০ কোটি ডলার ক্ষতি।

১৫ই জুন—৩২শে জ্যৈষ্ঠ : নিরাপত্তা পরিষদে (রাষ্ট্রসঙ্ঘ) কাশ্মীর সংক্রান্ত বিতর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে পুরোপুরি সমর্থন—উভয় পক্ষের (ভারত ও পাকিস্তান) আলোচনাই মীমাংসার একমাত্র পথ বলিয়া বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার প্যাট্রিক ডীনের অভিমত প্রকাশ।

১৬ই জুন—১লা আষাঢ় : 'ক্রীড়ায় বর্ণ-বৈষম্য নীতি চালু রাখিলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্র (অলিম্পিক) হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে'—দক্ষিণ আফ্রিকা অলিম্পিক কাউন্সিলের সভাপতি জেনারেল ফ্রেপারের ঘোষণা।

১৭ই জুন—২রা আষাঢ় : পশ্চিম ইরিয়ান বিরোধ প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়া ও হল্যাণ্ডের মধ্যে আলোচনা পুনরারম্ভের আবেদন—ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুকর্ণের নিকট উ থাণ্টের (রাষ্ট্রসঙ্ঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল) তার।

পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী—প্রাদেশিক আইন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মুলতুবী প্রস্তাব পাশ।

১৮ই জুন—৩রা আষাঢ় : 'একনায়কত্বের বিরুদ্ধে লাহোরে ৫০ হাজার লোকের বিরাট জনসভা—জনতার কণ্ঠে পাকিস্তানে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী।

১৯শে জুন—৪ঠা আষাঢ় : লাওসে অস্থায়ী কোয়ালিশন সরকার গঠনে নূতন অন্তরায়—রাজকীয় ঘোষণার বাক্যবিন্যাস সম্পর্কে লাওসের বিভিন্ন দলীয় নেতৃবর্গের মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ।

'পশ্চিম বার্লিনের প্রশ্নে আমেরিকা কিংবা পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত দ্বন্দ্ব বাধিবার কারণ নাই'—বুখারেস্টে শ্রমিক সভায় মিঃ ক্রুশ্চেভের (সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) ঘোষণা।

২০শে জুন—৫ই আষাঢ় : পাকিস্তানে ৮ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত লেঃ কর্ণেল ভট্টাচার্যের (ভারতীয় সামরিক অফিসার) কারাদণ্ড ৪ বৎসর হ্রাস—পাক্ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের আদেশনামা।

'পাক্-ভারত সরাসরি আলোচনা দ্বারা কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভবপর'—রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্বস্তি পরিষদে চারটি দেশের (সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, আয়ার্ল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও ঘানা) মিলিত সুপারিশ।

অভয়ঙ্কর

ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী—(প্রথম খণ্ড) : ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইন্দ্রনাথ স্মৃতি সমিতির পক্ষে শঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ৮বি, টেমার লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য : বারো টাকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর নবজাগ্রত জীবনবোধ বিচিত্র ধারায় স্পন্দিত হয়েছিল। বাঙালীর এই মানসচেতনার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর চিহ্নিত আছে এ যুগের সাহিত্যে। মধু-বঙ্কিমের সাহিত্যসাধনা যেমন উচ্চতর কল্প-পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছিল, তেমনি এ যুগের সাময়িক পত্র-পত্রিকা যুগ-জীবনের বিস্তৃততর টীকাভাষ্যও রচনা করেছিল। একদিকে যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্যসংস্কৃতির গভীর অনুশীলনের ফলে অভিনব রোমান্সের স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটিত হলো, তেমনি তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দক্ষতা ও কৌতুককটাক্ষে দেশ-কালের অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্ভাসিত হলো।

বঙ্কিম-অনুবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দ্রনাথের রচনাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) ব্যঙ্গকাব্য, (খ) বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস ও (গ) পাঁচুঠাকুর। অসঙ্গতি থেকেই হাস্যরসের উদ্ভব। তাই হাস্যরসিকের পর্যবেক্ষণনৈপুণ্য প্রয়োজন। তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, জীবনের অসঙ্গতিকে আবিষ্কার, তির্যক বাগ্ভঙ্গী হাস্যরসিকের অপরিহার্য উপকরণ। ইন্দ্রনাথ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, ভণ্ডামি, উৎকট অসঙ্গতি ও হাস্যকর আতিশয্যকে বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন।

ইন্দ্রনাথের তীক্ষ্ম শরজাল সবচেয়ে বেশি বর্ষিত হয়েছে ব্রাহ্মসমাজের উপর। কেশবচন্দ্র সম্পর্কে একাধিক রচনায় তিনি কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু এরজন্য প্রধানত দায়ী তৎকালীন সমাজ-প্রতিবেশ। হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করেছিলেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর উপন্যাসে, গিরিশচন্দ্র-অমৃতলালের নাটকে ও প্রহসনে এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়ও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

অবশ্য ইন্দ্রনাথের বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল একমাত্র ব্রাহ্মসমাজ এ কথা বলা যায় না। তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকেই তিনিই অসঙ্গতির উপকরণ আহরণ করেছেন। ইংরেজের ব্যর্থ অনুকরণ, দেশপ্রেমের অন্তঃসারশূন্যতা, ব্রাহ্মধর্মের আতিশয্য-প্রবণতা, নারী-প্রগতির ফলে সমাজ-জীবনের বিপর্যয় প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের উপর তাঁর বিদ্রূপাস্ত্র বর্ষিত হয়েছে।

বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপযুক্ত কলা-কৌশলও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। 'ভারত-উদ্ধার' বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় ব্যঙ্গকাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্রুপদী কাঠামোর মধ্যে লঘু বিষয়কে স্থাপিত করে তিনি বাঙালীর বক্তৃতা-সর্বস্ব শূন্যগর্ভ রাষ্ট্রনৈতিক অভিযানকে ব্যঙ্গ করেছেন। 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম' উপন্যাসের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গের ধারা বিদ্রূপের অগ্নিরেখায় বিলসিত। 'পাঁচুঠাকুরে'র সরস টিপ্পনীগুলি লেখকের অবলীলাকৃত রসসৃষ্টি ও সুচতুর শরসন্ধানের পরিচয় দেয়।

কিন্তু হাস্যরসের তরল বুদ্বুদ-বিলাসের অন্তরালে ইন্দ্রনাথের একটি গভীরাশ্রয়ী মন ছিল। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী ও আদর্শ হিন্দু। ইন্দ্রনাথ ছিলেন জার্নালিস্ট। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় তাঁর অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সাময়িকতার গন্ডী অতিক্রম করে তাঁর রচনার একটি প্রধান অংশ স্থায়ী মূল্যের অধিকারী। 'মোটা রসিকের প্রবন্ধ', 'বাংলা ভাষা', 'সুরুচির কথা', 'সুনীতির কথা', 'সুরুচির সাঁকো' প্রভৃতি রচনায় হাস্যরসের অন্তরালে গভীর সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলীর 'অন্যান্য-রচনা' অংশে কয়েকটি মননশীল প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। শিক্ষা-সমস্যা ও বাংলা ভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে প্রবন্ধকারের গভীর চিন্তা ও মনস্বিতা প্রকাশিত হয়েছে। ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী থেকে রচয়িতার আদর্শনিষ্ঠ গভীরাশ্রয়ী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতামত এ যুগে সম্পূর্ণ গ্রহণীয় না হলেও এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। ইন্দ্রনাথের রচনাবলী গত শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার একটি মূল্যবান উপকরণ হিসেবে গৃহীত হবে। এইখানেই এর ঐতিহাসিক মূল্য।

'বঙ্গবাসী' থেকে ১৩৩২ সালে এক-খণ্ডে ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় সাঁইত্রিশ বছর আগে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং এর পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ছিল। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ও ইন্দ্রনাথ স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে ইন্দ্রনাথের স্বরচিত জীবনী, কল্পতরু, ভারত-উদ্ধার, পাঁচুঠাকুরের কিয়দংশ, বঙ্গবাসী পত্রিকায় লিখিত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। 'পরিশিষ্ট' অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কল্পতরু' সমালোচনা ও ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় সংকলিত হয়েছে। সর্বশেষ একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবেশিত হয়েছে।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মননশীল ভূমিকাটি নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। ভূমিকাটিতে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের

ধারা ও তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে ইন্দ্রনাথের মানসজীবনকে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। তরুণ প্রকাশক এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে দেশ ও জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আশা করি দ্বিতীয় খণ্ডও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুরুচির পরিচায়ক। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

Indian Trade Union Movement
Gopal Ghosh: T. U. Publications. Price Rs. Two.

শ্রমিকশ্রেণী এবং মূলধনতন্ত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বিলেতে শিল্প-বিপ্লবের পূর্বে যেমন খোঁয়ার-আন্দোলনের মধ্যদিয়ে ভূমিহীন ভ্রাম্যমাণ জনসংঘের দাক্ষিণ্যে অগামী শিল্প শ্রমিকের উদ্ভবের গৌরচন্দ্রিকা চলছিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রসাপেক্ষ মধ্যযুগীয় গ্রাম্যজীবনে কুটীর শিল্পের অবসরসময়ের কর্মসংস্থানের ভূমিকা নতুন ফ্যাক্টরীনির্দেশিত উৎপাদনের ফলে ধ্বংস হয়ে আরও বেশি বেশি মানুষকে নতুন শিল্পসাপেক্ষ রুজিরোজগারের পথে ঠেলে দিচ্ছিল। এভাবে শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে মজুরশ্রেণীর উদ্ভব পশ্চিমী দেশগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। বিলেতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস নতুন নয়, পুরানো গিল্ডের শিক্ষানবীশদের সংগঠনের মধ্যেই তার সূত্র দেখা যাবে।

ভারতের মূলধনতন্ত্রের ইতিহাস অবশ্য খুব পুরাতন নয়। তবু তার জন্মের শতবার্ষিকী মুহূর্ত ঢের দিন আগে পার হয়ে গিয়েছে। ভারতেও ভ্রাম্যমাণ ও ভাসমান জনসমষ্টিও ইংরেজই তৈরী করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে পুরাতন গ্রাম্য সমবায়-সাপেক্ষ জীবনযাপন বিধ্বস্ত হওয়ায় বিশাল এক জনতা গ্রাম্যঅর্থনীতি-নির্ভর জীবনযাত্রা থেকে ছিন্নমূল হয়ে বাইরের জগতে রুজিরোজগারের তাগিদে ভেসে পড়ে। আবার অন্যদিকে বিদেশী শিল্পের অসম প্রতিযোগিতায় দেশীয় কুটীর শিল্পীরা কাজ হারিয়ে ঐ ভাসমান জনতা স্ফীত করে তোলে। সরকারী পূর্ত বিভাগ তাদের কাজে লাগিয়ে পথ-ঘাট তৈরী করেছে। এইভাবে ভারতে শ্রমশক্তি বিক্রেতা মজুরশ্রেণীকে প্রথমে দেখা গেল।

শ্রীযুক্ত গোপাল ঘোষ ভারতের শ্রমজীবী মানুষের উদ্ভব সংগঠন ও আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্মত চমৎকার আলোচনা আলোচ্য বইটিতে করেছেন। বইখানিতে ভারতের মূলধনতন্ত্রের বিকাশ, ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্রমোন্নতি এবং এ আই টি ইউ সির জন্ম—এই পাঁচটি মূল্যবান পরিচ্ছেদ আছে। রাজনৈতিক মতামতের কথা উঠলে অবশ্যই শ্রীগোপাল ঘোষের সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন না। কেবলমাত্র উদ্ভবের সময়ের এ আই টি ইউ সি কেন, পরবর্তীকালে ঐ সংস্থার সমস্যা এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠনের সূত্র জানাও পাঠকের আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে। সম্ভবতঃ লেখক মতদ্বৈধের আবর্তে নামতে চাননি। বইখানির মুদ্রণ এবং বাঁধাই সুরুচিসম্মত।

যাতায়াতের পথের ধারে—শ্রীপদাতিক নবজাতক প্রকাশন। ৬, অ্যান্টনিবাগান, কলিকাতা—৯। পরিবেশক বুকস অ্যান্ড বুকস, ৪০।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ—৯। মূল্য ৮ টাকা।

'শ্রীপদাতিক' ছদ্মনামে শ্রীআবুল কাশেম রহিম উদ্দীন যুগান্তরে ধারা-

বাহিকভাবে লিখেছিলেন 'যাতায়াতের পথের ধারে'। লেখাগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আগেই, এখন সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমরা খুশি হয়েছি।

পায়ে পায়ে বহু দূরে চলা, বৃদ্ধ শিক্ষক, পার্কে পার্কে গল্প শোনানো, সেই এক-চোখা লোকটা, ভাঙা পায়ে ভর রেখে খুঁড়িয়ে চলা মাণিক, ফুলের আস্বাদ না-পাওয়া ফুলবানু, ফুটপাথের কঠিন পাথরে ছবি এঁকে চলা শিল্পী—যাতায়াতের পথের ধারে কত মানুষ, কত জীবন—ফুটপাথের নাটিকা, কল-তলার কাব্য, অন্ধগলির কাহিনী। শ্রীপদাতিক দরদ দিয়ে দেখেছেন, দরদ দিয়ে লিখেছেন। আমাদের দেখেও-না-দেখা দৃশ্যের মর্মমূলে পৌঁছেছেন তিনি।

শ্রীযুত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভূমিকায় বলেছেন : 'বিরাট কলকাতার বিচিত্র জীবন-মর্ম'র এই বইয়ের পাতায় পাতায় শুনতে পাওয়া যাবে। তার অধ্যবসায় এবং সন্ধিৎসা বিদেশী ঔপন্যাসিকদের নোটবুকের কথা স্মরণ করায়—যেমন ডিকেন্সের, জোলার, সমারসেট মমের।... লেখাগুলি পড়তে পড়তে তার মানবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন-মমতা এবং সর্বাত্মক শুভবোধের উজ্জ্বল পরিচয় নিঃসন্দেহে লাভ করা যাবে।' বইটির প্রচ্ছদ-আবরণীতে শ্রীযুত প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শ্রীযুত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য মুদ্রিত হয়েছে।

খালেদ চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদপটটি সুন্দর। ভেতরের স্কেচগুলি এঁকেছেন শ্রীযুত বাণীকুমার মজুমদার, শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রেবতীভূষণ ঘোষ।

অমিল পয়ার— (গল্প সংকলন)—**বীরেন্দ্র দত্ত, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। দাম তিন টাকা।**

বাংলা গল্পের ঐতিহ্য এত পরিপুষ্ট যে, সেখানে নূতন সংযোজন করা রীতিমত গর্বের কথা। বিরাট ঐতিহ্য থাকার জন্য মোটামুটি রকমের পড়ার মত গল্প তৈরি করা হয়ত চলে কিন্তু দাগ কাটা যায় না। সুখের কথা এই যে, প্রতিশ্রুতিবান গল্প লেখক শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত আলোচ্য গ্রন্থে অন্তত এমন কয়েকটি গল্প উপহার দিতে পেরেছেন যা মনকে রীতিমত নাড়া দেয়। আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের ন'টি গল্প স্থান পেয়েছে। সবকটি গল্পের উপজীব্য প্রেম। লেখক বিভিন্ন পাত্রপাত্রীকে বিভিন্ন অবস্থায় এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। ফলে ন'টি রঙের বিচিত্র সমাহার হয়ে দেখা দিয়েছে। ভাষার দিক দিয়ে শ্রীবীরেন দত্তের দৃষ্টি প্রখর। গদ্যে ভাষা ও কবিতার ভাষার মধ্যে মূলগত প্রভেদ থাকেই। এই পার্থক্যটা স্বভাবের জন্য; গদ্য বলে আর কবিতা কবিতা বলেই। গদ্যও কাব্যধর্মী হয়ে ওঠে পাত্রপাত্রীর অবস্থা ও উপলব্ধির তাগিদে। শ্রীবীরেন দত্ত এমন কতকগুলি অবস্থায় পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে আসতে পেরেছেন যেখানে তাদের উপলব্ধি কাব্যের মর্যাদা ও সঙ্কেতধর্মিতা পেয়েছে। আমার মনে হয় পদ্যের ওপর বিশেষ দখল আছে বলেই এই পরিশীলিত গুণ লেখক আয়ত্ত করতে পেরেছেন। কিন্তু একটা কথা মনে হয়। লেখক যেন একটা পরিচিত গন্ডীর ভিতর থেকেই সমস্ত রসদ সংগ্রহ করেছেন। পরবর্তী গ্রন্থে তাঁকে ব্যাপ্ত পটভূমিতে দেখার আশা রাখি।

শিক্ষা-শিক্ষার্থী ও শিক্ষক—(শিক্ষাবিজ্ঞান)—শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত। **প্রকাশক॥ ন্যাশানাল পাবলিসার্স। ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট—কলিকাতা—৬। দাম পাঁচ টাকা।**

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একদা লেখক শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান প্রয়োগে কি ভাবে শিশুমনকে সহজে জয় করা যায় তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন অভিজ্ঞ লেখক। শিক্ষকতাকে যাঁরা পেশা হিসাবে গ্রহণ করবেন এবং শিক্ষকতা বিষয়ে ট্রেনিং নিতে চান তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থ অপরিহার্য। শিক্ষা-সংস্কারের জন্য আজ যে প্রচেষ্টা চলেছে অভিজ্ঞ লেখক অসীম নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে এই গ্রন্থ রচনা করে তার অগ্রগতিতে সহায়তা করেছেন।

ইলিনয়ে এব্রাহাম লিঙ্কন (নাটক) **রবার্ট এমেট সেরউড। অনুবাদক—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং। ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯॥ দাম ১·৫০ নপ।**

ইলিনয়ে এব্রাহাম লিঙ্কন তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ একটি জীবনালেখ্য—১৮৩০ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত এই নাটকের ঘটনা-কাল। লিঙ্কন বিশ্ব-ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। তাঁর জীবনের এক নাটকীয় ঘটনা এই নাটকের মধ্যে বিধৃত। রবার্ট এমেট সেরউড অতিশয় সতর্কতা সহকারে ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশে এই নাটকটি রচনা করেছেন। অনুবাদক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং নাট্য-রসিক হওয়ায় অনুবাদ বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছে। বাঙালী পাঠকের কাছে এই নাটকটির বঙ্গানুবাদ সমাদৃত হবে সন্দেহ নেই। ছাপা এবং বাঁধাই চমৎকার।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

ছোটগল্প—সম্পাদক : লালমোহন দাস ও সুভাষ বসু। ১৯।৪, নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে প্রকাশিত।

সাম্প্রতিক বাঙলা গল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পটভূমিতে 'ছোটগল্পে'র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। চার বছর ধরে গল্পের ওপর নানাবিধ আলোচনা এবং তরুণ লেখক-লেখিকার গল্প নিয়ে এঁরা পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন। একটি ক্ষুদ্রাকৃতি কাগজের পক্ষে এই ধরণের প্রয়াস প্রশংসনীয়।

'বাংলা ছোটগল্পের রূপরীতি' নামক প্রবন্ধে দেবব্রত ভৌমিক যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্য সহযোগে যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন সেক্ষেত্রে নানাবিধ মতপার্থক্য থাকলেও তাঁর মূল ভাষ্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে সময়োপযোগী কাজ করেছে বলে মনে করি। এই সংখ্যায় সবথেকে উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছেন কবিতা সিংহ। অন্যান্য যাঁরা গল্প লিখেছেন তাঁরা হলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন দাস, শম্ভু চক্রবর্তী, দীনেশ রায়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'তৃতীয় ভুবন'-এর আলোচনা করেছেন মহান চক্রবর্তী। 'ছোটগল্প' আরও বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করুক, এই কামনা করি।

বিদিশা—সম্পাদক : আশিষ ঘোষ প্রভৃতি। ৪০এ, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। দাম পঞ্চাশ নঃ পঃ।

সাম্প্রতিক বাঙলা ছোটগল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিদিশা একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। আলোচ্য ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় মোট ছটি গল্প আছে। রতন ভট্টাচার্য, আশিষ ঘোষ, রমানাথ রায় এবং দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে বলিষ্ঠ ভাবিষ্যতের স্বাক্ষর সমন্বিত তরুণ লেখকদের চিনে নিতে কোন অসুবিধা হয় না হলেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে কারও কারও বিষয়বস্তু অত্যন্ত পুরনো, এমনকি নানা জায়গায় ভাষাগঠনে অপটুত্বের লক্ষণ রয়েছে। অন্যান্য গল্পকারদের মধ্যে আছেন, সুব্রত সেনগুপ্ত, কল্যাণ সেন। আশাকরি ভাবিষ্যতে এঁদের লেখা ত্রুটিমুক্ত হবে। সাম্প্রতিক ছোটগল্পের আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাহসিকতাপূর্ণ আত্মপ্রকাশের জন্য সম্পাদকবর্গকে ধন্যবাদ জানাই।

নান্দীকর

নাটক কি অপাংক্তেয়?

সম্প্রতি ১৯৬২-৬৩ সালের রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার-এর জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেসনোট বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। ৫,০০০ টাকা ক'রে তিনটি পুরস্কারের মধ্যে একটি পুরস্কার দেওয়া হবে বাঙলা ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের লেখককে। প্রেসনোটে বলা হয়েছে, "সাহিত্য বিষয়ক বলিতে এইগুলি বুঝাইবে—কাব্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস, জীবনী, এবং সাহিত্য সমালোচনা, ইতিহাস দর্শন, কাব্যতত্ত্ব ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়।" দেখা যাচ্ছে, এরমধ্যে নাটকের নামগন্ধ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহিত্য আকাদামী থেকে সাহিত্য বিষয়ক যে-পুরস্কার দেওয়া হয়, তার মধ্যেও ঠিক একইভাবে নাটকের কোনো উল্লেখ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগ কি নাটককে সাহিত্য ব'লে স্বীকার করেন না? তা'হলে আমাদের দেশে প্রাচীনকালের কালিদাস, ভবভূতি, ভাস থেকে শুরু ক'রে বর্তমানের মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এবং ইয়োরোপের গ্রীক নাট্যকার ইস্কিলাস, ইউরিপিডিস, সফোক্লিস থেকে শুরু ক'রে শেক্সপিয়র, ইবসেন, গোর্কী, শেকভ, পিরেন্ডেলো এবং আমেরিকার ইউজিন ও'নীল, শেরউড, ওয়াইল্ডার, টেনেসি উইলিয়মস, উইলিয়ম সারোয়ান প্রভৃতি বহু লেখকের সর্বজনস্বীকৃত নাটকগুলিকে সাহিত্যের বেদী থেকে সাশ্রুনেত্রে নামিয়ে আনতে হয় এবং এ'দের মধ্যে অনেকেরই নামকে সাহিত্যের ইতিহাস থেকে বেমালুমভাবে মুছে দিতে হয়। যাঁরাই সাহিত্যচর্চা করেন, সে পাঠক, লেখক, সমালোচক বা অধ্যাপক—যাই হোন না কেন, তাঁরাই বলবেন সাহিত্যের মধ্যে নাটকের স্থানই সকলের উঁচুতে। এ-বিষয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যের আরিস্তোতোলের "আর্ট ইজ ইমিটেশন" (art is imitation) থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের "নাটককে পঞ্চম বেদ বলা হয়" পর্যন্ত বহু প্রবচনই উদ্ধার করা যেতে পারে। একটি গল্প, উপন্যাস বা কবিতা লেখার চেয়ে একখানি নাটক রচনা করা যে ঢের বেশী কঠিন কাজ, এ-কথা বহু মনীষীই স্বীকার ক'রে গেছেন। নাটক রচনার সময় স্রষ্টাকে দ্রষ্টার ভূমিকাও নিতে হয়, সৃষ্টি করবার সময়েও নিজেকে সৃষ্টবস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিরাসক্তভাবে যথেষ্ট দূরে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়, যে-দূরত্ব সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে যোগ্য

'ঢেউ এর পর ঢেউ' চিত্রের নায়িকা শম্পা।

পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে সাহায্য করে। এই কারণেই নাটক রচনাকে অত্যন্ত দুরূহ সৃষ্টিকর্ম ব'লে গণ্য করা হয় এবং প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নাট্যকারের আসন সাহিত্যের দরবারে সকলের আগে।

কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তর সম্ভবতঃ এই সত্যকে স্বীকার করেন না, কিন্তু এই সত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নন। অবশ্য এ'দের বিজ্ঞপ্তিতে প্রথমেই উল্লেখ আছে কাব্যের। এবং সকলেরই জানা আছে, নাটকের নাম দৃশ্যকাব্য। জানিনা, এ'রা সেইজন্য নাটককে আলাদা করে না দেখে কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিনা! কিংবা নাটককে এ'রা সত্যিই ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চান না!—আমরা এ-সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে খোলাখুলি উত্তর শুনতে চাই।—ভারতের অপরাপর রাজ্যের কথা বলতে পারি না। কিন্তু এই বাঙলা দেশে গেল চার বছরের মধ্যে যত নাটক লেখা হয়েছে, তারমধ্যে খুঁজলে এমন পাঁচ দশখানা নাটক নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, যাদের নিয়ে আমরা অনায়াসেই গৌরববোধ করতে পারি। কাজেই বাঙলা নাটককে কেন রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার বা সাহিত্য আকাদামী পুরস্কারের জন্যে বিবেচিত করা হবে না, তার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ জানতে চাই।

শুনে সুখী হলুম, বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীরের কাছে পুরস্কারের জন্যে নাটককেও তাঁদের তালিকাভুক্ত ক'রে যোগ্য মর্যাদা দেবার জন্যে অনুরোধ করে পত্র দিয়েছেন।

মঞ্চাভিনয়

(১) একটি স্মরণীয় নাট্যনিবেদন :

লুইজি পিরানদেল্লোর "সিক্স ক্যারেক্টার্স ইন সার্চ অব অ্যান অথার" নামে অবিস্মরণীয় নাটকটিকে বাঙলায় রূপান্তরিত করেছেন অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ঠিক অনুবাদ তিনি করেননি: তিনি যা করেছেন, তাকে রূপান্তর বলাই ভালো। কারণ, তিনি চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকের বাঙলা নামকরণ করেছেন এবং মূলের ইংরাজী অনুবাদের বাঙলা অনুবাদ করতে গিয়ে এখানে সেখানে স্বাধীনতাও নিয়েছেন। এমন কি, 'আসল সাজাহান কি অহীন্দ্র চৌধুরীর মত সাজাহানের ভূমিকা অভিনয় করতে পারবে?' এবং [illegible]

কমল মজুমদার পরিচালিত টাস ফিল্মসের 'অভিসারিকা' চিত্রের একটি দৃশ্যে নির্মলকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

সকাল বেলা সাদা পাথরের গেলাসে মিশ্রীর সরবত খেতেন' ইত্যাদি গোছের সংলাপও এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। তা'ছাড়া পিরানদেল্লো যেখানে পরিচালক-নাট্যকারের মুখ দিয়ে 'আমার সমস্ত দিনটাই বৃথায় গেল' বলিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন, তিনি সেখানে শেষ না ক'রে নাটককে আরও একটুখানি টেনে নিয়ে গেছেন। কতকটা স্টাণ্ট বা চমক দেবার জন্যেই যেন পরিচালক-নাট্যকার এবং "নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র"-এর প্রধানা চরিত্র বড়ো মেয়েকে প্রেক্ষাগৃহতে উপস্থিত করিয়ে বলান—"ঠিক কি যে হোলো, তা বুঝতে পারলুম না!—বুঝলেন না?—কি হ'লো—ঐ দেখুন!" এবং সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা অপসারিত হয়ে যখন দেখা যায়—বাপ তাকিয়ে রয়েছে মায়ের দিকে এবং মা তাকিয়ে রয়েছে তার ছেলের দিকে, তখন বড়ো মেয়েটি অট্টহাসি হাসতে হাসতে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে পিছনের দিকে ছুটে চ'লে যায় এবং তখনই নাটকের চরম যবনিকা পড়ে। কিন্তু এতে স্টাণ্ট যতখানি না হয়, তার চেয়ে বেশী হয়—অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স।

কিন্তু তবু শ্রীসেনগুপ্ত প্রদত্ত এই বাঙলা রূপ, "নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র"-এর প্রশংসাই করব। এত সুন্দর-ভাবে, এমন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ভাষার মাধ্যমে এই বাঙলা রূপটি দেওয়া হয়েছে যে, মনেই হয় না, নাটকটি কোনো বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ। অবশ্য শিল্পে কতখানি বাস্তবতা সম্ভব, শিল্পে স্বভাববাদ কতদূর পর্যন্ত এগোতে পারে, এই প্রশ্ন তোলবার জন্যে পিরানদেল্লো ছটি চরিত্রকে তাদের সমস্যার সম্যক প্রকাশে যে রূঢ় বাস্তবধর্মী সংলাপ ও আচরণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, শ্রীসেনগুপ্তও সেই বাস্তবতাকে যতদূর সম্ভব বজায় রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু যৌনসম্ভোগের প্রস্তাব সম্পর্কীয় কথাটিকে বড় মেয়ের মুখ দিয়ে অমন নগ্নভাবে বলিয়ে শালীনতার মুখে চপেটাঘাত না করলেও বাস্তবতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'ত না।

"নাট্যকারে সন্ধানে ছটি চরিত্র"-নাটকের মঞ্চাভিনয়ে আঙ্গিকের যথেষ্টই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। নিরাবরণ এবং নিরাভরণ মঞ্চে সাধারণ রঙ্গালয়গুলি যেভাবে নাটকের মহড়া করেন, এই নাটকের প্রথমাংশে দর্শকরা সেই জিনিস দেখবার সুযোগ পান। পরে সিন-সিফ্‌টাররা যে-ভাবে মঞ্চে দৃশ্যপট খাড়া করেন, তাও দেখানো হয় নাটকের প্রয়োজনে। নাটকেরই প্রয়োজনে স্টেজ ম্যানেজারের ভুলে নাটকের দৃশ্য চলবার সময় যখন একবার যবনিকা পড়ে, তখনই মঞ্চে কতকটা দৃশ্য-পরিবর্তনের সুবিধা নেওয়া হয়। এর পরেও নাটকের শেষা-শেষি একবার যবনিকা পড়ে বটে, বাপ-মা-ছেলের স্থাণুভঙ্গী দেখাবার জন্যে; কিন্তু সেটি হচ্ছে অতিরিক্ত এবং অপ্রয়ো-জনীয়। যাই হোক, নাটকান্তর্গত ছটি চরিত্রের বিষাদময় আখ্যানের গভীরতা
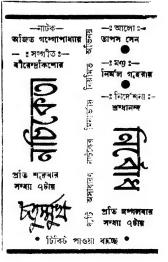
যেমন নিঃসন্দেহে এই নাটকের প্রধানতম আকর্ষণ, ঠিক তেমনই এর মঞ্চোপস্থাপনের আঙ্গিক বৈচিত্র্যও একে জনপ্রিয় ক'রে তোলবার আর একটি কারণ।

নাটকটির সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে নান্দীকার-গোষ্ঠী যে টীম-ওয়ার্কের পরিচয় দিয়েছেন,—বিশেষ ক'রে অভিনয়ের মধ্যে অনুচ্চ অথচ শ্রুতিগ্রাহ্য কণ্ঠে যে-পার্শ্বাভিনয় বা বাই-প্লের নিদর্শন দেখিয়েছেন, তা অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। নাটকের একটি ট্র্যাজিক মুহূর্তে মঞ্চের ওপর থেকেই অনুচ্চ কণ্ঠের গান যেভাবে আবহ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে, তা যেমন অভিনব, তেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু এই নাট্যাভিনয়ের সামগ্রিক সার্থকতার মূলে যে-শিল্পীর দান অবিস্মরণীয়, তিনি হচ্ছেন বড়ো মেয়ের ভূমিকাভিনেত্রী মায়া ঘোষ। অণুমাত্রও রূপসজ্জা বা মেক্-আপ না ক'রে যে-সাধারণ বেশে এই মেয়েটি মঞ্চে অবতীর্ণা হয়েছিলেন, সেভাবে এর আগে আর কোনো শিল্পীকে মঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না—না, 'নবান্ন'তেও দেখিনি। এবং কী অভিনয়! জন্ম এবং জীবনের জ্বালাকে চলনে, বসনে, ভঙ্গীতে এমন সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রকাশিত ক'রতেও কখনো কাউকে দেখিনি। মনে হয়, মেয়েটির বয়স খুব বেশী নয়; কণ্ঠও সেই কথাই বলে। তবু বলব, মায়া ঘোষ অবিসংবাদীভাবে রঙ্গমঞ্চে একটি উজ্জ্বল আবিষ্কার। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাই। বাবার ভূমিকায় অজয় গঙ্গোপাধ্যায় এবং ডাইরেক্টারের ভূমিকায় নাটকটির নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হয়েছে। মায়ের ভূমিকায় দীপালী চক্রবর্তী ব্যথিতা নারীকে মূর্ত ক'রে তুলেছেন। অপরাপর সকল

"সাহেব বিবি ঔর গোলাম" চিত্রে মীনাকুমারী

ভূমিকাই যথাযথ অভিনীত হয়ে টীম-ওয়ার্ককে সার্থক ক'রে তুলেছে।

"নান্দীকার"-গোষ্ঠীর "নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র" সকল দিক দিয়েই একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।

(২) চতুরঙ্গ অভিনীত 'কবয়ঃ' এবং "কাঞ্চি" :

'কবয়ঃ' এবং 'কাঞ্চি'—দুটিই বনফুলের রচনা। প্রথমটি একটি ছোট নাটিকা—কবিতা ও ছড়ার মাধ্যমে একটি মাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ। চন্দ্রমুখী নাম্নী এক সুরূপা বিদগ্ধা নারীর পাণিপ্রার্থী চার ব্যক্তির—একজন মুদি, একজন নাপিত, একজন মালী এবং একজন অতি আধুনিক গদ্য ছন্দ-রচয়িতার—বিবাহের শর্তানুসারে কবিতা-রচনার উৎকট প্রয়াসের ফলে কি ক'রে একজন নিঃসম্বল কবি বিবাহের দ্বিতীয় শর্তানুযায়ী দশটি টাকা সংগ্রহে সক্ষম হয়ে চন্দ্রমুখীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেয়ে ধন্য হয়, তাই হাস্যকৌতুকাশ্রয়ী ঘটনা এবং উপযোগী ছড়াবহুল সংলাপের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

'কাঞ্চি'-কে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক বলা চলে। কাঞ্চি ওরফে সুলতা চট্টোপাধ্যায় কেমন ক'রে সকল বাধাবিপত্তিকে নস্যাৎ ক'রে তার দয়িত ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকে তার পতিরূপে লাভ করল, নানা উত্তেজক এবং প্রধানতঃ কৌতুকপ্রদ ঘটনার মাধ্যমে তাই বিধৃত করা হয়েছে।

প্রথম নাটিকা 'কবয়ঃ'-র মঞ্চোপস্থাপনে আঙ্গিকের দিক দিয়ে বেশ একটা অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হ'লেও একমাত্র লেখকের ভূমিকায় মিহির চট্টোপাধ্যায়ের বাচন ছাড়া অন্য কারুরই বাচন স্পষ্ট শ্রুতিগ্রাহ্য হয়নি। মুদি, নাপিত বা বাগানের মালীর কাছ থেকে নির্ভুল এবং বিশুদ্ধ কথা কেউই আশা করে না; কিন্তু তারা যা বলছে, সেটাতো কানে পৌঁছোনো দরকার।

"কাঞ্চি"র অভিনয় আমাদের মোটের উপর আনন্দ দিয়েছে। তবে রঙমহলের ঘূর্ণিমঞ্চকে যদি ব্যবহার করা হ'ত,

তাহলে রসসৃষ্টিতে অযথা ছেদ পড়ত না। ক্ষিতীশ, যতীন, গোবর্ধন, সুকুমার, গাঙ্গুলি, ঠাকুদা, পুরন্দর, কণ্ঠি এবং মিসেস দত্তের ভূমিকায় যথাক্রমে মিহির চট্টোপাধ্যায়, বরুণ দাশগুপ্ত, অমল রায়, মোফাজ্জল হক, অর্ধেন্দু সেনগুপ্ত, নিখিল সেন, নিখিল রায়, মল্লিকা বসু এবং শাশ্বতী রায় আনন্দপ্রদ সুঅভিনয় করেছেন।

'কণ্ঠি' নিঃসংশয়ে একটি রসাল উপভোগ্য নাটকরূপেই দর্শকদের প্রচুর তৃপ্তি দিয়েছে।

(৩) বিশ্বরূপা নাট্যোৎসবে প্রাচ্যবাণী মন্দির কর্তৃক "ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্" :

ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত সংস্কৃত রচনা 'ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্' যদিও গেল শনিবার, ২৩এ জুন বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সভ্য এবং সভ্যাদের দ্বারা অভিনীত হ'ল এবং অভিনয়শেষে জনৈক পণ্ডিত-দর্শক শ্রোতাদের আসন থেকে মঞ্চের নিকটস্থ হয়ে সানন্দে ঘোষণা করলেন, তিনি তাঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়সের জীবনে এমন অপূর্ব সুললিত নাট্যাভিনয় দেখেননি, তবু আমরা বলব, 'ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্' সুললিত রচনা এবং সুরচিত গীতসমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও নাটক নামে অভিহিত হ'তে পারে না। ভগবান শ্রীচৈতন্যের সহধর্মিণীর জীবন-বৃত্তান্তের স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের সাহায্যে কয়েকটি দৃশ্যের মাধ্যমে পর পর উপস্থিত করলেই রচনাটি একটি অখণ্ড নাটকের রূপ পাবে, এমন আশা করা অন্যায়। নাটকের মধ্যে থাকবে পারম্পর্য, ক্রমবিকশিত ঘটনাবলী এবং সর্বোপরি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত; সমস্ত রচনার মধ্যে এমন একটি কৌতূহল সৃষ্টি করতে হবে, যার ফলে দর্শক অভিনয় দেখতে দেখতে নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবেন এবং দুই বিভিন্নমুখী শক্তির সংঘর্ষের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে রুদ্ধ আবেগে অপেক্ষা করতে থাকবেন। 'ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্'-এ এই নাটক-বস্তুটির সমূহ অভাব। অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিবাস এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকা গ্রহণকারী শিল্পিবৃন্দ।

(৪) ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটিতে 'বিভাব' :

অলঙ্কার শাস্ত্রে বলে, বিভাব হচ্ছে সেই জিনিস, যা চিত্তে শোকাদি নয় প্রকার স্থায়িভাব সৃষ্টির কারণ হয়। কিন্তু বহুরূপী সম্প্রদায় বিরচিত 'বিভাব' নামে একাঙ্কিকাটি দর্শকচিত্তে মাত্র একটি অনুভূতিরই সৃষ্টি করে এবং সেটি হচ্ছে—আনন্দ। গেল শনিবার, ২৩-এ জুন ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির প্রাঙ্গণে সোসাইটিরই সভ্য শোভেন ঠাকুর তাঁর আর দুই বন্ধু মলয় বসু এবং দীপক সরকারকে সঙ্গে নিয়ে এই 'বিভাব' নাটকটিকে কিছু পরিবর্তিত আকারে মঞ্চস্থ ক'রে উপস্থিত সভ্য ও সভ্যাদের প্রচুর আনন্দ দান করেছেন। কোনোরকম দৃশ্যপট, সাজসজ্জা এবং আসবাবপত্র ছাড়াও যে, আনন্দদায়ক অভিনয় সম্ভব, এই 'বিভাব' নাটকের অভিনয় তারই প্রমাণ।
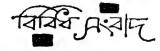
সাহেব-বিবি ঔর গোলাম :

আজ শুক্রবার, ২৯এ জুন গুরুদত্ত ফিল্মসের হিন্দী ছবি 'সাহেব বিবি ঔর গোলাম' মুক্তি পাচ্ছে প্যারাডাইস, প্রিয়া, দর্পণা, ইটালী টকীজ প্রভৃতি চিত্রগৃহে। ভূতনাথ, জবা, মেজবাবু ও মেজবৌয়ের ভূমিকায় যথাক্রমে অবতীর্ণ হয়েছেন গুরু দত্ত, ওয়াহিদা রহমন, রেহমান ও মীনাকুমারী। ছবিটিতে সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্তকুমার।

॥ "নীলি আঁখে" ॥

রহস্য-রোমাঞ্চ-প্রেম আর সংগীত রাগে সমৃদ্ধ এক অভূতপূর্ব কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে সোসাইটি পিকচার্স-এর "নীলি আঁখে"। আখতার-উল-ইমান রচিত কাহিনীটি পরিচালনা করেছেন ভেদ-মদন এবং সুরারোপ করেছেন দত্তারাম।

এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—শাকিলা অজিত জানিওয়াকার হেলেন তীওয়ারী, রাজমেহরা, বলরাম, নসরুদ্দিন এবং টুনটুন।

ছবিটি আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কোলকাতা ও মফঃস্বলের কয়েকটি চিত্রগৃহে এস, বি, ফিল্মস-এর পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে।

দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য :

বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের চেষ্টায় দুঃস্থ শিল্পীদের সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থা হয়েছে। যথার্থ দুঃস্থ শিল্পীরা আবেদন করলে যদি পরিষদ ঐ আবেদনটিকে তাঁদের সুপারিস সমেত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকার একযোগে তাঁদের এক বছরের জন্যে মাসিক ১০০৲ থেকে ২০০৲ পর্যন্ত সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন।

চতুরঙ্গ আয়োজিত বনফুল সম্বর্ধনা :

গেল ২২এ জুন সন্ধ্যায় রঙমহল রঙ্গমঞ্চে চতুরঙ্গ গোষ্ঠী একটি মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। 'হাটে-বাজারে' উপন্যাস লেখার দরুণ বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) সম্প্রতি যে রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছেন, সেই উপলক্ষ্যে এ'রা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন ঐ সন্ধ্যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে এবং বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান অতিথিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সম্বর্ধনার উত্তরে বনফুল যে-সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন, তার সার মর্ম হ'ল—এমন সাহিত্যই সৃষ্ট হওয়া উচিত, যা মানুষের মনকে করে উন্নীত, হৃদয়কে করে আনন্দিত, জীবনকে করে সুষমামণ্ডিত। বনফুল দীর্ঘায়ু হন।

পক্ষাধিক কালব্যাপী যাত্রাভিনয় :

আসছে ১২ই থেকে ২৮এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিডন উদ্যানে একটি যাত্রা উৎসবের আয়োজন চলছে। এই যাত্রা উৎসবে বাঙলাদেশের পেশাদারী এবং অপেশাদারী—উভয়বিধ সম্প্রদায়ই যোগ দেবেন ব'লে আশা করা যাচ্ছে। এই উৎসবটিও বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্ভব হচ্ছে।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

চলচ্চিত্রের মান এখন উন্নত। স্টুডিও-চত্বরে ছবি নির্মাণের ঢেউ চলেছে। স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের রচনাসম্ভারে চলচ্চিত্রের অগ্রগতির দিন চলেছে। বিভিন্ন সংস্থার পরিচালকগণ পরীক্ষামূলকভাবে চলচ্চিত্র প্রগতির

কথা ভাবছেন। গতানুগতিকতার বাইরে এখন বাংলা ছবির খবরাখবর।

'পুনশ্চ' সাফল্যের পর মৃণাল সেন তাঁর পরবর্তী ছবি 'অবশেষে'-র কাজ শুরু করেছেন টেক্‌নিশিয়ান স্টুডিওয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'স্বভাবের স্বাদ' কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সেন। বিবাহ-বিচ্ছেদের ওপর এ-কাহিনীর মূল বক্তব্য। উপন্যাসের 'আত্মকথা' পরিচ্ছেদের কয়েকটি চরিত্রের কথামুখ এ-ছবির বিশেষত্ব। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, উৎপল দত্ত, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল ও বিধায়ক ভট্টাচার্য। সংগীত এবং আলোকচিত্রে রূপ দিচ্ছেন নবীন চ্যাটার্জি ও শৈলজা চট্টোপাধ্যায়।

সংগীতবহুল এবং একটি লঘু পরিবেশের ছবি হল 'বর্ণচোরা'। শিল্প-ভারতী-র পক্ষ থেকে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় বনফুলের 'কাণ্ড' কাহিনী অবলম্বনে 'বর্ণচোরা' ছবিটি শেষ করে এনেছেন। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় রয়েছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, সুবোধ রায় ও প্রসাদ মিত্র। প্রধান দুটি চরিত্রে রূপদান করছেন সন্ধ্যা রায় ও অনিল চ্যাটার্জি। সংগীত-বহুল এ-ছবির সুরকার হলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'লুকোচুরি'-খ্যাত পরিচালক কমল মজুমদার 'অভিসারিকা' ছবির কাজ প্রায় সমাপ্ত করেছেন। সিরিয়াস রোমাণ্টিক কমেডির এ-কাহিনী লিখেছেন হরি-নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রধান ভূমিকায় নির্মলকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। আলোকচিত্রে দীনেন গুপ্ত এবং সংগীতে নবীন চ্যাটার্জি।

রাজেন তরফদারের পরবর্তী ছবি 'চৌধুরীবাড়ী'। কাহিনী রচনা করেছেন ডঃ বিশ্বনাথ রায়। সংলাপ লিখছেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য রচনায় ব্যস্ত রয়েছেন পরিচালক শ্রীতরফদার।

সমরেশ বসুর 'নির্জন সৈকতের'-র বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের জন্য পরিচালক তপন সিংহ পুরীর নির্জন সৈকতে রয়েছেন। এই কাহিনীর মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন অনিল চ্যাটার্জি ও শর্মিলা ঠাকুর।

একটি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে 'সাক্ষী'-র চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে। ক্যালকাটা মুভিটনে পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় নিয়মিত এ-ছবির কাজ করে চলেছেন। এ-ছবির কয়েকটি প্রধান অংশে অভিনয় করছেন অনিল চ্যাটার্জি, সন্ধ্যা রায়, কমল মিত্র, দীপক মুখার্জি, জীবেন বসু ও রেণুকা রায়।

স্টুডিওর বাইরে সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যের একটি মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি 'ঢেউ-এর পরে ঢেউ'। ছবির পরিচালক-দ্বয় হলেন ভূপেন সান্যাল ও স্মৃতীশ গুহঠাকুরতা। দীঘার সমুদ্র-সৈকতে নীল সাগরের উদার পরিবেশে এ-কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপ পেয়েছে। প্রধান তিনটি চরিত্রে তিনটি নতুন মুখ শঙ্কর, শম্পা ও বাদল।

হিন্দী ছবির চাহিদা এখন সবচেয়ে বেশী। বম্বের স্টুডিওয় হিন্দী ছবি নির্মাণের কয়েকটি ছবির কথা বলি।

আর কে ফিল্মসের 'সংগম' স্মরণীয় করতে রাজকাপুর বিশেষ পরিকল্পনায় ব্রতী হয়েছেন। ছবিটি রঙিন। 'ড্রিম' সিকোয়েন্সের জন্য জার্মানী থেকে যন্ত্রপাতি আনানো হয়েছে। বহির্দৃশ্যের জন্য এ-ছবির কলাকুশলী ইওরোপে যাচ্ছেন। ইটালী, ফ্রান্স এবং স্পেনে প্রথমতঃ ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হবে। নায়ক চরিত্রে রাজকাপুর এবং নায়িকা বৈজয়ন্তীমালা। আলোকচিত্র গ্রহণ করবেন রাধু কর্মকার।

'মোহব্বৎ ঔর খুদা' কে আসিফ পরিচালিত সিনেমাস্কোপে রঙিন একটি ছবি। দুটি প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন গুরু দত্ত ও নিম্মি। নৌশাদ এ-ছবির সুরকার। আউটডোর হবে ইজিপ্টে। আসিফের পরবর্তী ছবি হল 'তাজমহল' ও 'মহাভারত'।

'বিশ সাল বাদ' মুক্তি পেয়েছে বম্বেতে। ছবিটি জনপ্রীতি পেয়েছে। হেমন্তকুমার প্রযোজিত প্রথম হিন্দী ছবিতে পরিচালক বীরেন নাগ-প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং সেই সঙ্গে বাংলার অভিনেতা বিশ্বজিৎ পরিচিতি পেলেন।

ভ্রাতৃত্রয় অশোককুমার, কিশোরকুমার ও অনুপকুমারকে নিয়ে ছবি করছেন সত্যেন বসু। ছবির নাম 'জান বাঁচিতে'। কিশোরকুমারের বিপরীত অভিনয় করছেন আশা পারেখ। ছবিটির সুরকার হলেন কিশোরকুমার।

নবাগত সায়রা বানু চলচ্চিত্র জগতের একটি পরিচিত নাম। সুবোধ মুখার্জি পরিচালিত 'জংলী' ছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশের পর সায়রা এখন রীতিমত ব্যস্ত শিল্পী। সায়রা অভিনীত পরবর্তী কয়েকটি ছবি—ব্লাফ মাস্টার (নায়ক জয় মুখার্জি), দিওয়ানা (রাজকাপুর), আও প্যায়ার করে (জয় মুখার্জি), আই মিলন কি বেলা (রাজেন্দ্রকুমার) ও সাদী (মনোজ)।

সঙ্গীত পরিচালক নৌশাদ প্রযোজক হয়েছেন। এঁর প্রযোজিত প্রথম ছবি 'সাজ ঔর আওয়াজ'। ছবিটি পরিচালনা করবেন সুবোধ মুখার্জি। চরিত্রলিপির মধ্যে রয়েছেন অশোককুমার, জয় মুখার্জি, সায়রা বানু ও জনি ওয়াকার।

বিমল রায়ের দুটি মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি 'প্রেমপত্র' ও 'বন্দিনী'। পরবর্তী ছবি হল 'ভাইজান', 'স্বর্ণলতা', 'রূপ রোল অভিশাপ' ও 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'।

লরেন্স অলিভিয়ারের নতুন ছবি "টার্ম অফ ট্রায়াল"-এ একটি নতুন অষ্টাদশী মুখের আবির্ভাব ঘটবে। মুখটির অধিকারিণী সারা মাইলস। লরেন্সের ছবিতে অভিনয় করার পূর্বে তিনি ওয়ার্দি রিপেরটোরি থিয়েটারের নিয়মিত অভিনেত্রী ছিলেন। শ্রীমতী মাইলস ইংলন্ডের রয়েল আকাদেমী অফ ড্রামাটিক আর্ট-এর স্নাতক। "টার্ম অফ ট্রায়াল"-এ মাইলস একটি পঞ্চদশী স্কুল ছাত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। মেয়েটি তার শিক্ষকের প্রেমে পড়ে। শিক্ষকের ভূমিকায় আছেন অলিভিয়ার স্বয়ং। অন্য আরেকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সিমোন সিনরে।

উ-সি-জিবার্ট নবাগতা জার্মান অভিনেত্রী।

॥ ফ্রাংকোর ফ্যাসাদ ॥

'ভিরিদিয়ানি' ছবিটি জেনারেল ফ্রাংকোর অর্থানুকুল্যেই তোলা হয়েছিল স্পেনে। কিন্তু ছবিটি তোলার পর দেখা গেল ছবিটি সম্পূর্ণ ফ্রাংকো-বিরোধী ছবি। একটি রূপকথার সাহায্যে পরিচালক লুই বুইনেল আগামী দিনের স্পেনে বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর ছবিতে। বলা বাহুল্য স্পেনে ছবিটির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছেন ফ্রাংকো।

॥ ম্যানহাইমে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ॥

গত বছর থেকে ম্যানহাইমে চলচ্চিত্র উৎসব আরম্ভ হয়। গত বছর এই উৎসবের নাম ছিল "ম্যানহাইম ফিল্ম

ফেস্টিভেলস ফর ডকুমেণ্টারীজ"। বর্ত-মান বৎসরে নাম পাল্টে হয়েছে "ইণ্টার-ন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালস ইন ম্যানহাইম"। এই চলচ্চিত্র উৎসব প্রতি-যোগিতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে। এ বছর উৎসব আরম্ভ হবে আগামী অক্টোবর মাসের ১০ তারিখ থেকে। দশদিন ধরে বিভিন্ন দেশের সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং জাতিতত্ত্বের ওপর তথ্যমূলক ছবি প্রদর্শিত হবে। প্রতিযোগিতায় সকল ছবিকে ম্যানহাইম ফিল্ম ডুকেট (স্বর্ণ-মুদ্রা) এবং দশ হাজার ডি, এম পুরস্কার স্বরূপ দেয়া হবে। প্রামাণ্য দৈর্ঘের ছবির জন্যে অন্যান্য উৎসব পুরস্কারের মত গ্র্যান্ড প্রী দেওয়ার পরিকল্পনাও নেয়া হচ্ছে।

॥ মিউটিনি অন দি বাউণ্টি ॥

এম, জি, এম-এর এই ব্যয়বহুল চিত্রটির সারা পৃথিবীব্যাপী মুক্তির দিন ধার্য হয়েছে ১৯৬২ সালের ১লা নভেম্বর। 'বেন-হার' ছবিটির মতই বিশ্বের বড় বড় শহরগুলিতে একসঙ্গে মুক্তি পাবে 'মিউটিনি অন দি বাউণ্টি'। এই ছবির মুক্তি-প্রসঙ্গে একটি অভিনব প্রচার-ব্যবস্থার পরিকল্পনা নিয়েছেন প্রযোজকপক্ষ। 'মিউটিনি অন দি বাউণ্টি' ছবিটির শ্রেষ্ঠ 'তারকা' হল এইচ, এম, এস বাউণ্টি নামক জাহাজটি। এই ছবির জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত কাঠের জাহাজ চিত্রের মুক্তি উপলক্ষে পৃথিবী-সফরে যাত্রা করবে।

মূলতঃ প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলেরই ছবির দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। পরিচালনা করেছেন লিউস মাইলস্টোন, চিত্রনাট্যকার হলেন চার্লস লেডারার। চিত্রের কাহিনী গড়ে উঠেছে চার্লস নর্ড-হফ এবং জেমস নরম্যানের একটি উপন্যাস অবলম্বনে। চরিত্রলিপির তারকারা হলেন —মার্লোন ব্রাণ্ডো, ট্রেভর হাওয়ার্ড, রিচার্ড হ্যারিস, হিউজ গ্রীফিথ প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীবৃন্দ। নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে উনিশ বছরের পলিনেশিয়ান অভিনেত্রী টারিটাকে।

॥ বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ ॥

জুলে ভার্নের উপন্যাস অবলম্বনে তোলা ছবি বক্স অফিসের স্নেহলাভে কখনই বঞ্চিত হয়নি আজ পর্যন্ত। জার্নি 'টু দি সেণ্টার অফ দি আর্থ', 'এরাউণ্ড দি ওয়ারল্ড ইন এইটি ডেজ' প্রভৃতি ছবি দর্শকচিত্তে কখনোই পুরোনো হবার নয়। সম্প্রতি জুলে ভার্নের প্রথম উপন্যাসের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে পশ্চিম পৃথিবীর নানা দেশগুলিতে। এই উৎসব-কালের মধ্যে টুয়েণ্টিএথ সেঞ্চুরী ফক্স ভার্নের 'ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন' উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রায়িত করছেন। আরউইন এ্যালেনের এই দৃশ্যবহুল চিত্রটি যথারীতি রঙীন হবে। ছবির মধ্যমণি হল একটি বল্গাহীন খামখেয়ালী বেলুন। অচেনা, অজানা আফ্রিকাও পড়বে বেলুনের আকাশ-যাত্রার পথে। ছবিতে অভিনয়ের জন্যে নিযুক্ত হয়েছেন রেড বাটনস, কেভিয়ান, বারবারা ইডেন, পিটার লরী, রিচার্ড হেডেন।

॥ ক্যারি অন্ ক্রুজিং ॥

নার্স নিয়ে হৈচৈ ইতিপূর্বেই হয়েছে। এ্যাংলো এ্যামালগেমেটেড ফিল্ম ডিস্ট্রি-বিউটার্স-এর 'ক্যারি অন নার্স' যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এই 'হৈ চৈ'-এর মর্ম নিশ্চয়ই বুঝেছেন। এ্যামালগেমেটেড ফিল্ম এবার নাবিকদের নিয়ে হৈ চৈ ফেল-বার বাসনা রাখেন। এবং হৈচৈ-টি রঙীন হবে।

কাহিনীস্থল হচ্ছে জাহাজের ডেক। সিডনী জেমস অভিনয় করেছেন জাহাজের নাজেহাল ক্যাপটেনের ভূমিকায়, কেনেথ উইলিয়ামস প্রথম অফিসার, কেনেথ কোনোর জাহাজের ডাক্তার। স্ত্রী-ভূমিকায় লিজ ফ্রেজার এবং ডিলাস লে ছাড়াও থাকবে অনেক তন্বী নতুন মুখ।

উক্ত চিত্র সংস্থা শুধু মাত্র স্ল্যাপ-স্টিক্ কমেডিতেই সন্তুষ্ট না। গম্ভীর গল্পেও এ্যামালগেমেটেড ফিল্ম সমান সমান উৎসাহী। জন ব্রেবোর্ণ প্রোডাক-সন্স-এর 'দি প্যাট্রিয়টস', 'সিজি লাস্নার', এবং 'এ কাইন্ড অফ লাভিং' ছবি তিনটির প্রযোজনাও উক্ত প্রতিষ্ঠান করেছেন।

—চিত্রকূট

ইংলণ্ড বনাম পাকিস্তান
দ্বিতীয় টেস্ট

পাকিস্তান : ১০০ রান (নাশিমুল গনি ১৭; ট্রুম্যান ৩১ রানে ৬, কোল্ডওয়েল ২৫ রানে ৩ এবং ডেক্সটার ৪১ রানে ১)

ও ৩৫৫ রান (জাভেদ বার্কি ১০১, নাশিমুল গনি ১০১। কোল্ডওয়েল ৮৫ রানে ৬ এবং ট্রুম্যান ৮৫ রানে ৩ উইকেট পান)

ইংল্যান্ড : ৩৭০ রান (টম গ্রেভনী **১৫৩, ডেক্সটার ৬৫ এবং** কাউড্রে ৪১। **ফারুক ৭০ রানে ৪ উইকেট**)

ও ৮৬ রান (১ উইকেটে। স্টিওয়ার্ট নটআউট ৩৪, কাউড্রে ২০, ডেক্সটার নটআউট ৩২)

প্রথম দিনের খেলা (২১শে জুন) : পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১০০ রানে সমাপ্ত। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট পড়ে ১৭৬ রান; গ্রেভনী (২৩) এবং এ্যালেন (০) এই দিনের মত নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা (২২শে জুন) : ইংল্যাণ্ড দলের প্রথম ইনিংস ৩৭০ রানে সমাপ্ত। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৪ উইকেট পড়ে ১০৩ রান; জাভেদ বার্কি (১৫ রান) এবং নাশিমুল গনি (১৩ রান) নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনের খেলা (২৩শে জুন) : পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ৩৫৫ রানে সমাপ্ত হয়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে ৩০ মিনিট আগে ইংল্যাণ্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৬ রান (১ উইকেটে) তুলে দিয়ে ৯ উইকেটে জয়লাভ করে।

লর্ডস মাঠে ইংল্যাণ্ড-পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে পাকিস্তানকে পরাজিত করে ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। এখনও ৩টে টেস্ট খেলা বাকি। পাঁচদিনের টেস্ট খেলা তৃতীয় দিনেই শেষ হয়, খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে আধ ঘণ্টা আগে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে পাকিস্থানের দ্বিতীয় ইনিংসের রান ছিল ১০৩, ৪টে উইকেট পড়ে। অনেকেই ভেবেছিলেন তৃতীয় দিনের খেলায় পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস খুব কম সময়ের মধ্যে শেষ হবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের অপরাজেয় পঞ্চম উইকেটের জুটি অধিনায়ক বার্কি এবং নাসিমুল গণি দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের রান ভদ্রস্থ করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁরা উভয়েই সেঞ্চুরী

ফ্রেডী ট্রুম্যান

রান (১০১ রান) করে মাঠের কুড়ি হাজার দর্শককে খেলা দেখার আনন্দ দেন। ইংল্যাণ্ডের নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় লেন কোল্ডওয়েল বোলিংয়ে বিশেষ সাফল্য

টম গ্রেভনী

লাভ করেন; কোল্ডওয়েল দুই ইনিংসের খেলায় মোট **৯টা উইকেট পান** ১১০ রানে—প্রথম ইনিংসে ২৫ রানে **৩টে** এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৫ রানে **৬টা**। ফ্রেডী ট্রুম্যানও পান **৯টা উইকেট, ১১৬ রানে। প্রথম ইনিংসে ট্রুম্যান পান ৩১ রানে ৬টা এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৫ রানে ৩টে।**

পাকিস্তানের অধিনায়ক জাভেদ বার্কি টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নেন। পাকিস্তান দলের সূচনা মোটেই ভাল হয়নি। দলের মাত্র ২ রানের মাথায় প্রবীণ খেলোয়াড় ইমতিয়াজ আমেদ মাত্র ১ রান করে ইংল্যাণ্ড দলের নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় কোল্ডওয়েলের ৫ম বলে বোল্ড-আউট হন। তারপর দলের ২৪ রানে ২য়, ২৫ রানে ৩য়, ৩১ রানে ৪র্থ এবং ৩৬ রানে ৫ম উইকেট পড়ে যায়। লাঞ্চের সময় দলের রান দাঁড়ায় ৭৬, ৬টা উইকেট পড়ে। মোট ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের খেলায় পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১০০ রানে শেষ হয়। শেষ উইকেটের জুটি ডি'সুজা এবং ফারুক ২২ রান তুলেন। প্রথম টেস্ট খেলায় ফাস্ট বোলার ট্রুম্যান বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি; এবার প্রথম ইনিংসেই ৩১ রানে ৬টা উইকেট পান। তাছাড়া প্রথম দিনের খেলায় তিনি টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের দুর্লভ সম্মান—২০০ উইকেট লাভের গৌরব লাভ করেন যখন তাঁর বলে পাকিস্তান দলের অধিনায়ক জাভেদ বার্কি ক্যাচ তুলে ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটারের হাতে ধরা পড়ে আউট হন। ট্রুম্যানকে নিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ পর্যন্ত মাত্র ৬ জন খেলোয়াড় ২০০ অথবা তার বেশী উইকেট পাওয়ার দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন।

ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের এক ঘণ্টার খেলায় পাকিস্তান দলের অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ রান তুলে দেয়। এই রানের মধ্যে এক কাউড্রের ছিল ৩৭ রান। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের স্টিয়ার্ট, কাউড্রে, ডেক্সটার এবং ব্যারিংটন আউট হন—দলের রান ৪ উইকেট পড়ে ১৭৬। এই চারজনের মধ্যে শেষের ৩ জন আউট হন ফারুকের বলে। ফারুক পর পর বলে ডেক্সটার এবং ব্যারিংটনকে বিদায় করেন; এ্যালেন খেলতে নেমে ফারুকের হ্যাট-ট্রিক ঠেকান—তাঁকে বলটা খেলতে হয়নি; লেগ-স্ট্যাম্পের অনেক দূরে বল পড়েছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলা টম গ্রেভনীর খেলা। গ্রেভনী ১৫৩ রান করলেন পাকিস্তানের বিপক্ষে এই টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে গ্রেভনী মাত্র ৩ রানের জন্যে সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। গ্রেভনীর টেস্ট সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়াল ৫টা, ৫০টা টেস্ট খেলায়। টেস্টের এক ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ রান ২৫৮ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে, নাটিংহাম, ১৯৫৭)। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে গ্রেভনী তাঁর শেষ টেস্ট খেলেছিলেন ১৯৫৮ সালে। তারপর গত তিন বছরে তিনি ইংল্যাণ্ডের টেস্ট

ক্রিকেট দলে পাত্তা পাননি। ১৯৬২ সালের ক্রিকেট মরশুমে গ্রেভনী তাঁর হারানো দিন আবার ফিরে পেয়েছেন; পাকিস্তানের বিপক্ষে তাঁর রান খুবই উল্লেখযোগ্য : নিজ দল ওরস্টারসায়ারের পক্ষে ১১৭, এম সি সি'র পক্ষে ১১০, প্রথম টেস্ট খেলায় ৯৭ এবং দ্বিতীয় টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে ১৫৩ রান। আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসের খেলা ধরে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় টম গ্রেভনীর সাফল্য এই রকম দাঁড়িয়েছে : টেস্ট খেলা ৫০, মোট রান ২৮৪০, এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ২৫৮ এবং সেঞ্চুরী সংখ্যা ৫টি।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের স্কোর দাঁড়ায় ২৭৮, ৭ উইকেট পড়ে। প্রথম দু'ঘণ্টার খেলায় পূর্ব দিনের ১৭৬ (৪ উইকেট) রানের সংগে ১০২ রান যোগ হয়। লাঞ্চের সময় গ্রেভনীর ছিল ৯৩ রান। গ্রেভনী ২১৫ মিনিট খেলে তাঁর শত রান পূর্ণ করেন। তাঁর ১৫৩ রান তুলতে ৪ ঘণ্টা সময় লেগেছিল; বাউন্ডারী ছিল ২২টা। ৯ উইকেটের জুটিতে গ্রেভনী এবং ফাস্ট বোলার ফ্রেডী ট্রুম্যান দলের ৭৬ রান তুলে দেন।

ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৭০ রানে শেষ হ'লে ইংল্যান্ড ২৭০ রানে অগ্রগামী হয়।

আড়াই ঘণ্টার মত খেলার সময় হাতে নিয়ে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। প্রথম ইনিংসের মতই পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—৪টে উইকেট পড়ে ৭৭ রান।

খেলা ভাঙ্গার সময়ে রান দাঁড়ায় ...৭, ৪ উইকেট পড়ে।

তৃতীয় দিনের লাঞ্চের সময় পাকিস্তান দলের স্কোর দাঁড়ায় ২৪০; নাসিমুল ৮৩ এবং বার্কি ৭৫ রান ক'রে ...ও উইকেটে নট-আউট ছিলেন। দলের ২৭৪ রানের মাথায় নাশিমুল নিজস্ব ১০১ রান করে আউট হন। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে নাশিমুল গনি এবং বার্কি দলের ১৯৭ রান তুলে দিয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় পাকিস্তানের পক্ষে যে কোন উইকেটের রেকর্ড স্থাপন করেন। নাশিমুল তিন ঘণ্টা খেলে ১০১ রাণ করেন—বাউন্ডারী ১৫টা এবং ওভারের বাউন্ডারী ১টা। বার্কির শত রান পূর্ণ করতে ৩½ ঘণ্টা সময় লাগে, বাউন্ডারী করেন ১৪টা। বার্কিও নাশিমুলের মত নিজস্ব ১০১ রানের মাথায় আউট হ'ন। চা-পানের বিরতির সময় পাকিস্তানের রান ছিল ৩৫৪। এই ৩৫৪ রানের মাথায় ৯ম উইকেট এবং ৩৫৫ রানের মাথায় ১০ম উইকেট পড়ে যায়। তখন ইংল্যান্ডের পক্ষে খেলায়-জয়লাভের জন্যে ৮৬ রানের প্রয়োজন হয়। এইদিনে ৯০ মিনিট খেলার সময় ছিল। ইংল্যান্ডের জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৬ রান তুলতে ৬০ মিনিট সময় লাগে এবং মাত্র ১টা উইকেট হারাতে হয়। ইংল্যান্ড ৯ উইকেটে জয়লাভ করে।

টেস্ট ক্রিকেটে বোলিং সাফল্য ২০০ উইকেট

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ ক্রিকেট মাঠে ইংল্যান্ড - অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়। এই খেলাই পৃথিবীর প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা। সেই সময় থেকে আজকের তারিখ (২৩শে জুন) পর্যন্ত পৃথিবীর সাতটি দেশের—ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তানের মধ্যে অনুষ্ঠিত সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ৫২৫টি। এই ৫২৫টি টেস্ট ক্রিকেট খেলায় মাত্র নীচের ৬ জন খেলোয়াড় (ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া) তাঁদের টেস্ট ক্রিকেট-খেলোয়াড় জীবনে ২০০ অথবা তার বেশী উইকেট পাওয়ার দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন :

ইংল্যান্ডের পক্ষে

	টেস্ট	রান	উইকেট
বেডসার	৫১	৫৮৭৬	২৩৬
স্টেথাম	৬০	৫০৯৭	২১৯
ট্রুম্যান	৪৭	৪৫১৬	২০৭

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে

	টেস্ট	রান	উইকেট
লিন্ডওয়াল	৫৯	৫১৩৫	২২৫
বেনো	৫৪	৫৫৬৭	২১৯
গ্রিমেট	৩৭	৫২৩১	২১৬

টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ডের এ ভি বেডসারের বোলিং সাফল্য এই রকম :

বল ১৫৯৪১, মেডেন ৫৭২ ওভার, ৫৮৭৬ রানে ২৩৬ উইকেট এবং গড় ২৪·৮৯।

উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা

গত ২৫শে জুন থেকে অল্-ইংল্যান্ড লন্ টেনিস এ্যান্ড ক্রোকি ক্লাবের উদ্যোগে ৭৬তম উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার সরকারী নাম 'অল্ ইংল্যান্ড লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপস': কিন্তু এই সরকারী নামের থেকে উইম্বলেডন লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপস নামটাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। লন্ডন সহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে উইম্বলেডন সহরতলীর চার্চ রোডে অল-ইংল্যান্ড লন্ টেনিস এ্যান্ড ক্রোকি ক্লাবের অফিস এবং ক্লাবের টেনিস কোর্ট অবস্থিত। এই কারণেই জনসাধারণ প্রতিযোগিতার নাম দিয়েছে উইম্বলেডন লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়নসীপস। অনেকদিন আগের কথা, ১৮৬৮ সালের ২৪শে জুলাই 'দি ফিল্ড' সাময়িক পত্রের অফিসে ক্রোকি খেলার কয়েকজন অনুরাগী ক্রোকি ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছিলেন। এই দলে ছিলেন হুইটমোর জোন্স, তাঁর জ্ঞাতি-ভাই হেনরী জোন্স, 'দি ফিল্ড' পত্রিকার সম্পাদক জে ডবলিউ ওয়ালস এবং আরও দু'জন। এই ঘারোয়া বৈঠকের উদ্যোক্তা ছিলেন হুইটমোর জোন্স। এই বৈঠকেই তাঁরা একটি ক্রোকি ক্লাব প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেইদিনেই প্রস্তাবিত ক্লাব তহবিলে প্রত্যেকে চাঁদা দেন। এই দিনে হুইটমোর জোন্সের পকেট একেবারে শূন্য ছিল। তিনি তাঁর জ্ঞাতি-ভাই হেনরী জোন্সের কাছ থেকে তাঁর শেষ স্বর্ণ মুদ্রাটি ধার নিয়ে চাঁদা দিয়েছিলেন। হেনরী জোন্সের এই বাড়তি মুদ্রাটি পরবর্তীকালে লন্ টেনিস খেলার ইতিহাসকে যে ঐতিহ্যমণ্ডিত করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লন্ডন সহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে উইম্বলেডনের ওয়ারপল রোডে অল্ ইংল্যান্ড ক্রোকি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ডে টেনিস খেলার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে প্রগতিবাদী হেনরী জোন্স ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে টেনিস বিভাগের এক প্রস্তাব করেন। তাঁর এই প্রস্তাবে ক্লাবের সভ্য সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে টেনিস বিভাগ খোলা হয় এবং সেইসংগে ক্লাবের নামেরও পরিবর্তন হয়—ক্লাবের পূর্ব নামের সংগে টেনিস কথাটি যোগ করা হয়। এই বছর থেকেই উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভ।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে চার্চ রোডের মনোরম উদ্যানে ক্লাবটি উঠে যায়।

উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড়রা যোগদান করেন। এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভের গৌরব টেনিস খেলায় বিশ্ব খেতাব লাভের সমান। তাছাড়া উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার আসর খেলোয়াড় এবং দর্শকদের কাছে এক মহামিলন ক্ষেত্র হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের গুণানুসারে যে বাছাই তালিকা প্রকাশিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা সেই তালিকায় বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। মোট পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া চারটি অনুষ্ঠানে—পুরুষদের সিংগলস, মহিলাদের সিংগলস, পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছে। মহিলাদের ডাবলসে প্রথম স্থান পেয়েছে ব্রেজিল ও আমেরিকা। অস্ট্রেলিয়া পুরুষদের সিংগলসে পেয়েছে ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৮ম স্থান; মহিলাদের সিংগলসে ১ম এবং ৭ম স্থান; এবং পুরুষদের ডাবলসে ১ম, ২য় এবং ৩য়

স্থান। পরুষদের সিঙ্গলসের তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার (গত বছরের বিজয়ী), রয় এমারসন এবং নীল ফ্রেজার প্রথম তিনটি স্থান পেয়েছেন।

ভারতবর্ষের রমানাথন কৃষ্ণান ৪র্থ স্থান পেয়েছেন। গত বছর তিনি ৭ম স্থান পেয়েছিলেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রথম স্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মিস মার্গারেট স্মিথ। মিস স্মিথ ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ান, সুইস, ফ্রেঞ্চ এবং ইতালীয়ান চ্যাম্পিয়ানসীপে সিঙ্গলস খেতাব লাভ করেছেন। তিনি যদি উইম্বলেডন খেতাব পান তাহলে উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে নতুন অধ্যায় যোজনা করবেন। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার কোন খেলোয়াড় মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পাননি; এমন কি ফাইনালেও খেলেন নি। গত বছরের সিঙ্গলস বিজয়িনী মর্টিমার (ইংলণ্ড) এবার ৬ষ্ঠ স্থান পেয়েছেন। এবং বৃটেনের ক্রিস্টিন ট্রুম্যানকে কোন স্থানই দেওয়া হয়নি। মিস ট্রুম্যান গতবার ফাইনালে পরাজিত হয়েছিলেন।

গত বছরের পুরুষদের ডাবলস বিজয়ী রয় এমারসন এবং নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) প্রথম স্থান পেয়েছেন।

মহিলাদের ডাবলসে প্রথম স্থান পেয়েছেন মেরিয়া বুইনো (ব্রেজিল) এবং ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা)। মিক্সড ডাবলসে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার স্টোলী এবং লেসলী টার্ণারকে (গত বছরের বিজয়ী)।

গত বছরের উইম্বলেডন সিঙ্গলস বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা খেলোয়াড় রড লেভার একই বছরে উইম্বলেডন, অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং আমেরিকান খেতাব লাভের পথে অগ্রসর হয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি ১৯৬২ সালের অস্ট্রেলিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ সিঙ্গলস খেতাব লাভ করেছেন। এখন তাঁর লক্ষ্য উইম্বলেডন এবং আমেরিকান খেতাব। বিশ্বের এই চারটি প্রধান খেতাব একই বছরে এ পর্যন্ত পেয়েছেন মাত্র দুজন খেলোয়াড় ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা) ১৯৩৮ সালে এবং মিস মোরীন ক্যাথেরিন কনোলী (আমেরিকা) ১৯৫৩ সালে।

১৯৬২ সালের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় মোট ৩৫টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেছেন। প্রতিযোগিতা শেষ হবে আগামী ৭ই জুলাই।

উইম্বলেডন রেকর্ড

সর্বাধিকবার যোগদান : ২৯ বার; জিন বোরোত্রা (ফ্রান্স) ১৯২২ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত (১৯৪৬ ও ১৯৪৭ বাদে) যোগদান ক'রে এই রেকর্ড করেন।

সর্বাধিকবার খেতাব লাভ : ১৯ বার; মিস এলিজাবেথ রেয়ান (আমেরিকা) ১২ বার মহিলাদের ডাবলস এবং ৭ বার মিক্সড ডাবলস খেতাব পেয়ে এই রেকর্ড করেন। তাঁর প্রথম খেতাব ১৯১৪ সালে (মহিলাদের ডাবলস) এবং সর্বশেষ খেতাব (মহিলাদের ডাবলস) ১৯৩৪ সালে।

পুরুষ খেলোয়াড়ের সর্বাধিক খেতাব লাভ : ১৪ বার; উইলিয়াম সি রেনশ (বৃটেন) ৭ বার সিঙ্গলস খেতাব (১৮৮১—৮৬ এবং ১৮৮৯) এবং তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে ৭ বার ডাবলস খেতাব (১৮৮০-৮১; ১৮৮৪—৮৬; ১৮৮৮-৮৯) লাভ করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসে সর্বাধিক খেতাব লাভ : ৭ বার; উইলিয়াম সি রেনশ (বৃটেন) এই রেকর্ড (১৮৮১—৮৬ ও ১৮৮৯) প্রতিষ্ঠা করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে সর্বাধিক খেতাব লাভ : ৮ বার; মিসেস হেলেন উইলস মুডী (আমেরিকা) এই রেকর্ড করেন। তাঁর প্রথম খেতাব ১৯২৭ সালে এবং শেষ জয় ১৯৩৮ সালে।

পুরুষদের ডাবলসে সর্বাধিক খেতাব লাভ : ৮ বার; দুই ভাই—আর এফ ডোহার্টি এবং এইচ এল ডোহার্টি। ১৮৯৭ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত (১৯০২ সাল বাদে) ৮ বার জয়লাভ ক'রে এই রেকর্ড করেন।

মহিলাদের ডাবলসে সর্বাধিক খেতাব লাভ : ১২ বার; মিস এলিজাবেথ রেয়ান (আমেরিকা) এই রেকর্ড করেন।

মিক্সড ডাবলসে সর্বাধিক খেতাব লাভ : ৭ বার; মিস এলিজাবেথ রেয়ান (আমেরিকা) এই রেকর্ড করেন।

॥ ফুটবল লীগ ॥

গত সপ্তাহে (১৮ই জুন থেকে ২৩শে জুন) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোট ১৫টা খেলা হয়েছে—জয় পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে ১২টা খেলায় এবং ৩টে খেলা ড্র গেছে।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৪—০ গোলে [illegible] বিপক্ষে [illegible] ভাবে ড্র করে। গত শনিবারের চারিটি খেলায় ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে পরাজিত ক'রে মোহনবাগানের থেকে একটা ম্যাচ কম খেলে ২ পয়েন্টে অগ্রগামী হয়েছে। এই দিনের খেলার প্রথমার্দ্ধে কোন দলই গোল দিতে পারেনি। খেলা ভাঙ্গার ৬ মিনিট আগে সেন্টার ফরোয়ার্ডের পাশ থেকে সুনীল নন্দী বল পেয়ে জয়সূচক গোল দেন। এই প্রধান দুই দলের খেলায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল কিন্তু [illegible] মোহনবাগান দল এই দিন তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় মোহনবাগানের প্রাধান্য ছিল কিন্তু খেলায় কোন ধার ছিল না। দুই দলের খেলোয়াড়ই একাধিকবার গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তুলনায় গোল দেওয়ার সুযোগ বেশী পায় এবং তাদের আক্রমণ ভাগের খেলায় সংঘবদ্ধ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

আলোচ্য সপ্তাহের খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফল—হাওড়া ইউনিয়নের কাছে ০—১ গোলে ইস্টার্ণ রেল দলের লীগের খেলায় প্রথম পরাজয়, মহমেডান স্পোর্টিং দলের বিপক্ষে খিদিরপুরের ২—১ গোলে প্রথম জয়লাভ এবং গত বছরের রানার্স-আপ [illegible] এন আর দলের বিপক্ষে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের ২—১ গোলে জয়লাভ।

॥ প্রথম বিভাগের লীগ তালিকা ॥

(২৪শে জুন পর্যন্ত)

প্রথম চারটি দল

	খে	জ	ড্র	হার	স্ব	বি	প
ইস্টবেঙ্গল	১৭	১১	৬	০	২০	২	২৮
মোহনবাগান	১৮	১১	৪	৩	৩৫	১১	২৬
ই আই আর	১৩	৫	৭	১	১০	৪	১৭
এরিয়ান্স	১৪	৫	৩	৬	১৩	১৭	১৩

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচী পত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচী পত্র

অমৃত ॥ অমৃত ॥ অমৃত ॥ অমৃত ॥ অমৃত

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২১শে আষাঢ়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 6th July 1962.
40 Naya Paise.

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আকস্মিক লোকান্তরগমনে পশ্চিম বাংলার জাতীয় ও সামাজিক জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল তাহার পরিমাপ বা ফলাফল নির্ণয়ের চেষ্টা এখন বৃথা। স্বাধীনতার পর হইতেই খণ্ডিত বাংলার পশ্চিম অংশের ও বাঙ্গালী জাতির সমষ্টিগত ও সামগ্রিক জীবনের বর্তমান পর্যায়ের উপর যে সকল ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড আঘাত ক্রমাগত চলিতেছে, সে সকলের মধ্যে যে মহান ও বিরাট ব্যক্তিত্ব অটল পর্বতের মত সকলের আশ্রয়স্থল ছিল আজ তাহা অপসৃত হইয়াছে।

ভাগ্যের পরিহাসে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার পথে যে অফুরন্ত ও দুরপনেয় সমস্যারাজী বিধাতার অভিশাপের মত এই বিগত পনেরো বৎসরে একের পর এক কঠিন হইতে কঠিনতর ও জটিলতর বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে, সে সকলের সমাধান ও খণ্ডনের জন্য যাঁহার পৌরুষদীপ্ত কর্মজীবন, অক্লান্ত ও অটুট উদ্যম, অজেয় সাহস ও নহমুখী এবং তীক্ষ্ণধার প্রতিভা দেশের সকল আশা-ভরসা ও কর্মোৎসাহের উৎস ছিল, আজ তাঁহারই জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত। দেশ ও দেশবাসীকে প্রগতি ও কল্যাণের পথে চালিত করিতে, দুর্গম পথ চলিতে হতোদ্যম শ্রান্ত-ক্লান্ত জনগণকে উদ্দীপনা দিতে, যে উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান রণনায়কের তূর্য-নিনাদের ন্যায় মন্দ্রিত হইত আজ তাহা চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ।

কলিকাতা মহানগরীতে নানা উৎসবের আয়োজন ছিল গত সপ্তাহের শেষ দুই দিনে এবং এই সপ্তাহের আরম্ভে। কলিকাতা হাইকোর্টের শতবার্ষিকী উৎসব, রাষ্ট্রপতিরূপে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কলিকাতায় প্রথম আগমন ও নানা অনুষ্ঠানে যোগদান এবং সর্বোপরি মুখ্যমন্ত্রী ও দেশনায়ক বিধানচন্দ্র রায়ের অশীতি বৎসর পূর্তির আনন্দ-উৎসব এবং অন্য নানা সংস্কৃতি-মূলক জাতীয় অনুষ্ঠানের উদ্যোগে মহানগরী মুখরিত ছিল। রবিবার, ১লা জুলাই ছিল বিধানচন্দ্রের জন্মদিন, এবং সেই আনন্দে অংশগ্রহণের জন্য অগণিত দেশবাসী উন্মুখ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই উৎসবের সকল আয়োজন এবং নাগরিকদিগের সকল আনন্দ-উৎসাহ এক মুহূর্তে বিধ্বস্ত ও নিস্তব্ধ হইয়া গেল মহাকালের নির্মম ও কঠোর হস্তক্ষেপে। রবিবারের মধ্যাহ্নকালে অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মত সংবাদ আসিল যে দ্বিপ্রহর বারোটা তিন মিনিটে বিধানচন্দ্র পরলোকগমন করিয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদ সারা দেশে ও সমগ্র ভারতে বেতারযোগে প্রচারিত হইল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এবং সারা দেশ আচ্ছন্ন হইল শোকের ছায়ায়। লক্ষাধিক নাগরিক—নরনারী ছুটিল জাতির কর্ণধার এই মহান নেতার শেষদর্শন লাভ করিবার জন্য।

কোনও দেশমান্য ও বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুর পর কলিকাতার জনতা দলে দলে যায় অন্তিমযাত্রা দেখিবার জন্য। কিন্তু এইরূপ অল্পসময়ের মধ্যে এরূপ জনসমাগম এই মহা-নগরীর পক্ষেও আশ্চর্য। আরও আশ্চর্য ঐ বিপুল জনতার মধ্যে শোক ও আশঙ্কার আচ্ছন্ন ভাবটি। 'তামাসা দেখা'র মত উদ্দাম ভাব অতি অল্পই, প্রায় সকলের মুখেই যেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনার ছায়া পড়িয়াছে, সকলের যেন একই চিন্তা, "দেশের কি হবে গতি, কাণ্ডারী তো ছেড়ে চলে গেল।"

সে চিন্তা এখন সকলের মনকেই আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এখনও এই অপূরণীয় ক্ষতির কোনও পূরণের পথ বা নির্দেশ দেখা দেয় নাই। কোনও এক-জন যে এই বিরাট মহামানবের শূন্য আসন পূর্ণ করিয়া সেইরূপ সবল হস্তক্ষেপে পশ্চিম বাংলার সমস্যাকীর্ণ রাষ্ট্র-চালনার রশ্মি গ্রহণ করিবেন এ সম্ভাবনা কম, কেননা এ অভাগা দেশে এখন একের পর এক দিকপাল ব্যক্তি সরিয়াই যাইতেছেন, তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করিবার যোগ্য লোক কেহই আসিতেছেন না।

তবে বিধানচন্দ্র নিজে যে আদর্শ আমাদের দেখাইয়া গিয়াছেন, যে কর্মযোগের সমস্ত পন্থায় তিনি নিজের জীবনে ও কার্যের দৃষ্টান্তে তাঁহার সকল সহকর্মীকে বুঝাইয়া ও অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরবর্তী যাঁহারা শূন্য আসনের অধিকারী, তাঁহারা যদি সেই আদর্শ ও সেই কর্মযোগ অম্লান ও সজীব রাখিতে পারেন ও তাঁহারই মত জাগ্রতচেতন ও হৃদয়বান

হইয়া দেশবাসীর সকল কল্যাণকাজে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে বদ্ধপরিকর হ'ন, তবে আমরা বলিব মাভৈঃ! চিন্ময় বাংলার চিরন্তন সত্তা এখনও প্রাণবন্ত রহিয়াছে।

বিধানচন্দ্র পূর্ণজীবন যাপন করিয়া জীবন-সংগ্রামে অপ্রতিহত পৌরুষ দেখাইয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। বিশ্বনিয়ন্তার কাছে তাঁহার আত্মার চির-কল্যাণ প্রার্থনা করি।

অশীতি বর্ষের কালপরিক্রমায় বিধানচন্দ্রের জীবন-চিত্র

১৮৮২ ॥ ১লা জুলাই ॥ জন্মগ্রহণ।

১৮৯৬ ॥ ১৫ই জুন ॥ মাতৃবিয়োগ।

১৮৯৭ ॥ এনট্রান্স পরীক্ষায় সাফল্য।

১৮৯৯ ॥ এফ, এ, পরীক্ষায় সাফল্য।

১৯০১ ॥ বি, এ, পরীক্ষায় সাফল্য ও মেডিকেল কলেজে প্রবেশ।

১৯০১-১৯০৫ ॥ মেডিকেল কলেজের ছাত্র। লুকিস্ সাহেবের স্নেহ-সান্নিধ্য লাভ।

১৯০৬ ॥ ডাক্তারী ডিগ্রী লাভ ও প্রাদেশিক মেডিকেল সার্ভিসে কাজ।

১৯০৭-৮ ॥ মেডিকেল কলেজে হাউস-ফিজিসিয়ান।

১৯০৯ ॥ ২২শে ফেব্রুয়ারী ॥ উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডযাত্রা।

১৯১১ ॥ এম, আর, সি, পি ও এফ, আর, সি, এস ডিগ্রী লাভ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। মেডিকেল কলেজ পর্ব। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত। এই বছরেই 'প্রাইভেট প্রাকটিস' শুরু।
৭ই ডিসেম্বর ॥ পিতৃবিয়োগ।

১৯১২-১৫ ॥ উদীয়মান চিকিৎসকরূপে সুনাম এবং ডাঃ নীলরতন সরকার ও ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারীর সান্নিধ্য ও সহযোগিতা লাভ। এই সময়েই গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

১৯১৬ ॥ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য নির্বাচিত ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ।

১৯১৯ ॥ কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে 'প্রফেসর অফ মেডিসিন'এর পদে যোগদান।

১৯২০ ॥ দেশবন্ধুর সাহচর্য লাভ। শিলং ভ্রমণ-পর্ব ও শ্রম-শিল্পে প্রথম প্রয়াস এবং শিলং-বৈদ্যুতিকপ্রকল্প।

১৯২৩ ॥ রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। 'কাউন্সিল' নির্বাচনীতে স্যার সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়। দেশ-বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

১৯২৪-২৫ ॥ কংগ্রেসে যোগদানের সম্ভাব্য সময়। গান্ধীজীর সান্নিধ্য ও স্নেহলাভের সূত্রপাত।

১৯২৬ ॥ ২৪শে ফেব্রুয়ারী ॥ 'কাউন্সিলে' প্রথম বক্তৃতা। নেতাজী ও দেশপ্রিয় প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত।

১৯২৭-২৮ ॥ 'কাউন্সিলে' ডেপুটি লীডার—তখন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ছিলেন লীডার।

১৯২৮ ॥ ডিসেম্বর ॥ কলকাতা কংগ্রেসের বার্ষিক অধি-বেশনে রিসেপসন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও প্রথম বিশিষ্ট কংগ্রেসী দায়িত্বলাভ।

১৯২৮-২৯ ॥ প্রথম কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য নির্বা-চিত। মতিলাল নেহরু ও জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

১৯৩০ ॥ অসহযোগ আন্দোলনে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও কারাবরণ।

১৯৩০-৩১ ॥ প্রথম কলকাতা পৌরসভায় অল্ডারম্যান নির্বা-চিত ও অহিংসা মন্ত্রের ঋষি গান্ধীজীকে পৌর-সভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১৯৩১-৩২ ॥ প্রথম কলকাতা পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত।

১৯৩২-৩৩ ॥ পুনরায় মেয়র নির্বাচিত।

১৯৩৩ ॥ ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান।

১৯৩৪ ॥ 'ফরোয়ার্ড' কাগজের চেয়ারম্যান। বাঙলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

১৯৩৫-৩৭ ॥ চিকিৎসক সম্মেলনে যোগদান।

১৯৩৮ ॥ পুনরায় পৌরসভায় অল্ডারম্যান ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য।

১৯৩৯ ॥ অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিলের প্রথম বে-সরকারী সভাপতি।

১৯৪১ ॥ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার।

১৯৪২ ॥ পুনরায় পৌরসভায় অল্ডারম্যান।

১৯৪৪ ॥ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট লাভ।

১৯৪৭ ॥ চক্ষুরোগের চিকিৎসার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা যাত্রা।

১৯৪৭ ॥ নভেম্বর ॥ কলকাতা প্রত্যাবর্তন।
ডিসেম্বর ॥ পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার সভ্য।

১৯৪৮ ॥ জানুয়ারী ॥ অনশনব্রতী গান্ধীজীর শয্যাপাশে।

১৯৪৮ ॥ ২৩শে জানুয়ারী ॥ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

১৯৬১ ॥ 'ভারতরত্ন' গৌরবলাভ।

১৯৪৮-১৯৬২ ॥ সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

১৯৬২ ॥ ১লা জুলাই ॥ পরলোকগমন।

জৈমিনি

কলেরা উপলক্ষে আমাদের পাড়ায় একটা মিটিং হ'য়ে গেল সেদিন। পাড়ায় একটা ক্লাব আছে, উদ্যোক্তা ছিল তারই কর্মিবৃন্দ। এরা ফুটবল খেলে, লাইব্রেরী চালায়, দুর্গা পুজো করে, আবার কলেরা এপিডেমিক শুরু হলে (প্রতি-বছরই হয়) ডাক্তারী পড়া ছেলেদের নিয়ে ভলাণ্টিয়ার দল তৈরি করে ইন-জেকশান দেওয়ারও ব্যবস্থা করে।

এদের প্রতি আমরা, অর্থাৎ বড়রা, বেশ স্নেহপরায়ণ। কাজেই এরা যখন কলেরার উপর একটা পাড়াকিয়া মিটিং ডেকে বসল, হাজির হলাম আমরা অনেকেই।

সভার সূচনায় ক্লাবের সেক্রেটারী নীতীশ প্রস্তাব করল, 'আজকের সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্যে আমি কালুদার নাম উত্থাপন করছি। সকলেই জানেন, কালুদা আমাদের পাড়ার একজন প্রবীণ বাসিন্দা। তাছাড়া তিনি বাস করেন বস্তিতে। আজকের সভায় তাঁর সভা-পতিত্বই সবচেয়ে বিফিটিং, অর্থাৎ কিনা মানানসই।'

কথাগুলো মিথ্যা নয়। কালুকে আমরা সকলেই চিনি। বস্তির গায়ে তার একটা ছোট মুদিখানা আছে, হঠাৎ-দরকারে সেখান থেকে দু'চার পয়সার জিনিসপত্রও কেনা হয় আমাদের অনেকের বাড়িতেই। তাছাড়া কলেরা যখন প্রধানত বস্তিরই সমস্যা তখন এ মিটিঙে কালু সভাপতি হবে এইটেই তো স্বাভাবিক। সকলে সম্মত হলেন।

কিন্তু কালুর কাছে এটা মোটেই স্বাভাবিক মনে হল না। ঘোরতর লজ্জায় সে 'না না' বলতে লাগল। অবশেষে সকলের অনুরোধে সে রাজি হল বটে, কিন্তু সভাপতির জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারে এসে বসল না। যেখানে ছিল, সেখান থেকেই সভাপতির কাজ চালাতে লাগল।

অবিশ্যি, সব সভাতে যেমন, এ সভাতেও তেমনি, সভাপতির কাজ চলল উদ্যোক্তাদেরই ইঙ্গিতে। তাদের নেতা

হিসেবে নীতীশই বলে দিতে লাগল এটা-ওটা। ক্লাবের হেল্থ সেক্রেটারী বিজন ডাক্তার তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করলেন প্রথমে ঃ

'কলেরা একটা ডেনজারাস ডিজিজ, আর খুব ছোঁয়াচে, বুঝলেন। মানে, বাড়িতে কারো হলে আর সকলেরও হয়। অবিশ্যি সকলেরই হবে এমন কথা নেই। হয়ও না। তবে পসিবিলিটি থাকে। একটা আতঙ্ক। সেইজন্যে কারো কলেরা হলেই তাকে হাসপাতালে ট্র্যান্সফার করা উচিত। অবিশ্যি হাসপাতালেও রুগী মরে। মরছেই। কিন্তু বাঁচার একটা পসিবিলিটি থাকে। একটা চান্স। মানে, আমি বলছিলাম, শহরে তো এখন কলেরা লেগেছে, আমাদের সাবধানে থাকা উচিত। হ্যাঁ, সাবধান। যা-তা না খাওয়া, কলেরার ইনজেকশান নেওয়া, পরিষ্কার জল ব্যবহার করা। তা আমাদের এই পাড়ার ছেলেরা ব্যবস্থা করেছে ভাল। আমি তো এপর্যন্ত একটাও কলেরার রুগী পেলাম না। (সভাস্থলে চাপা হাসি।) না না তার জন্যে আমি হতাশ নই, সুখী, আই অ্যাম ভেরী গ্ল্যাড ফর দ্যাট। ইয়ে, আর কী বলব বলুন! সবই তো আপনারা জানেন।'

তিনি বসলেন। অলোক দত্ত ডাক্তারী পড়ে, ভলান্টিয়ার দলের নেতা। এবার তার পালা। সে বলল ঃ

'আমরা ইনজেকশান দিয়েছি ২৩ জনকে। বাড়িতে ৭ জন, বস্তিতে ১১ জন, রাস্তায় ৫ জন। কালুদা এখানে আছেন, ভালোই হল, বস্তির লোকজনেরা বড় রেসিস্ট করে—নিতে চায় না ইনজেকশান। এটা তাঁকে দেখতে হবে। ইনজেকশান মানে জীবন—না নিলে মৃত্যু। কোন্‌টা চাইব আমরা, জীবন না মৃত্যু? (কানে কানে ইতিমধ্যে নীতীশ কী যেন বলল) আর হ্যাঁ, খাওয়ার জল ফুটিয়ে নিতে হবে। কলেরা আসে জলের ভেতর দিয়ে। ফোটালে সব মরে যায়—মানে কলেরার বীজানু।...কলেরাকে আমরা রুখবই, এ পাড়ায় ঢুকতে দেব না। এটাকে একটা আদর্শ হিসাবে তুলে ধরব। (হাততালি) আমাদের পাড়ার একটা ঐতিহ্য আছে। বড় বড় সব উকিল-ব্যারিস্টার, ডাক্তার, প্রফেসার রয়েছেন এখানে—আমাদেরই পাড়ার ছেলে সাইকেল রেসে ফার্স্ট হ'য়েছে। (দ্বিগুণ

হাততালি) আমরা সেই মহান উত্তরাধিকারকে তুলে ধরব। এখন চাই শুধু সহযোগিতা। দলে দলে এগিয়ে আসুন আপনারা, সাহায্য করুন। আমরা দেখিয়ে দেব, বাঙালী ইচ্ছে করলে কী না পারে! জয় আমাদের হবেই হবে। (দীর্ঘস্থায়ী করতালি)।

অলোক তার বক্তৃতা শেষ করার পর ক্লাবের ছেলেরা তাকে ঘিরে ধরে সাধুবাদ জানাতে লাগল। প্রায় একটা হীরো বনে গেল সে।

'বেশ বলেছেন অলোকদা।'

'মার্ভেলাস! প্রেসের কোনো রিপোর্টার আসেনি?'

'না আসুক, আমরাই একটা রিপোর্ট তৈরি করে কাগজে পাঠিয়ে দেব।'

'নাঃ, অলোককেই এবার সেক্রেটারী করতে হবে। তাহলে আর চাঁদার ভাবনা করতে হবে না।'

'চুপ চুপ, কালুদা বলছেন!'

'বাবু মহাশয়রা', কালু একটা ঢোক গিলে বলল, 'কলেরার বিষয়ে আমি কী বলব? আমি কিস্যু জানিনে। আমার কলেরা হয়নি, কলেরায় আমি মরিওনি। (সভাস্থলে হাসি।) মরিনি, যাকগে সে কথা। আমি কলেরার রুগী দেখিনি। ডাক্তার তো আর নইরে বাবা, দেখিওনি,—দেখার খুব আহিঙ্ক্কাও নেই। (হাস্যধ্বনি)...হাসবেন না দাদা ভাইরা, বাক্তিমে জানিনে, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, জানেনই তো। তা কথা হল গে—কলেরা।...... অলোক দাদা বলল, আমরা বস্তির মানুষ ইঞ্জিশান নিতে ভয় পাই। পাই-ই তো। দরদ হয়, জর হয়। গতর খাটিয়ে খাই তো, কাজে কামাই গেলেই বিভীষণ অবস্থা। (হাস্যধ্বনি।) হাসবেন না, বড় কষ্টের কথা। যেদিকে তাকাই সে দিকেই অব্যবস্থা। কেন অব্যবস্থা? তা সে দোষ কর্পোরেশানের। এই তো বচ্ছর বচ্ছর শুনে আসছি। বলি, কর্পোরেশানটা কে হে বাবা? এমন বোম ভোলানাথ তো জম্মে দেখিনি। আমাদের ধ'রে ধ'রে না-ফু'ড়ে ওর গায়ে দাদারা একটা ইঞ্জিশান লাগাও দেখি তো! (হাস্যধ্বনি।) হাসো ক্যান, বলি হাসির কথাটা কোথায়? (রাগত স্বরে) কলেরা আমরা দুদিনে সারিয়ে দেব, তোমরা আগে 'কর্পোরেশান' সারাও। এ' হল গে আরও কঠিন ব্যামো। কলেরা আসে কলেরা যায়, বসন্ত আসে বসন্ত যায়, যক্ষ্মা যে যক্ষ্মা তাও কখনো কখনো যায়, কিন্তুক এই শিবের অসাধ্য ব্যামো কর্পোরেশান, এতে ধরলে আর রক্ষে নেই।... এইটে আগে সারাও তো দেখি দাদারা, তারপর হে'-হে'-হে', বলো 'খন আবার একটা মিটিং ফে'দে—কালু তুই বলছিলি বটে! নমস্কার বাবুমশায়রা। হে'-হে'-হে।'

কালু হাসল, কিন্তু আমরা কেউ আর সে হাসির সঙ্গে যোগ দিতে পারলাম না।
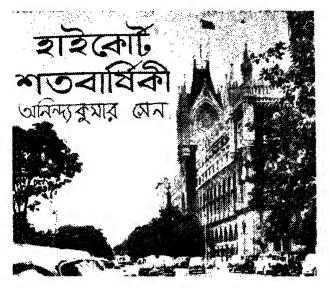
কলকাতার সংস্কৃতির মত এর বাড়ী-ঘরও কেমন যেন পাঁচমিশেলী কায়দায় তৈরী। আগাগোড়া এক ছাঁদে তৈরী বাড়ী এখানে অতি অল্পই দেখতে পাওয়া যায়। ইডেন উদ্যানের উত্তরে হাইকোর্ট বাড়ীটি কিন্তু খাঁটি গাথিক কায়দায় বানানো। ক্যাথিড্রাল ছাড়া এ-ধরণের বাড়ী কলকাতায় বিশেষ নেই। বেলজিয়ামের ইপ্রের বিখ্যাত টাউন হলের অনুকরণে এর নক্সা তৈরী করেন সরকারী বাস্তুবিদ মিঃ ওয়াল্টার গ্রেনভিল। হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬২-র ১লা জুলাই আর বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন হয় ১৮৬৪-তে এবং শেষ করা হয় ১৮৭২-এ। বাড়ী তৈরীর সময় এর মাঝখানের ভিত খানিকটা বসে যাওয়ায় পূব আর পশ্চিমে প্রয়োজনমত উঁচু করে গম্বুজ তৈরী করা সম্ভব হয়নি। বাড়ীর থামের নক্সাগুলির একটি অন্যটির মত নয়। মাঝখানের টাওয়ারটি কলকাতার মনুমেন্টের চাইতেও উঁচু (১৮০ ফিট)। টাওয়ারের মধ্যে দিয়ে প্রধান প্রবেশপথ গিয়ে পড়েছে বিরাট চত্বরে। তার মাঝখানে পাম গাছে ঘেরা একটি ফোয়ারা। উঠোনের চারদিক ঘিরে বাড়ীটি। ওপরে ওঠার সিঁড়ির মুখে হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রধান বিচারপতি সার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট-এর প্রতিমূর্তি। তার পাদপীঠের লেখাটি যে কেন পেছন দিকে উৎকীর্ণ সে রহস্য অজ্ঞাত। স্থানাভাব ঘটায় ১৯১০ সালে উত্তর দিকের অংশটি তৈরী করে চারটি ব্রিজ দিয়ে মূল বাড়ীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এখানেই ব্যারিস্টারদের বার-লাইব্রেরী ক্লাব, এ্যাড-ভোকেটদের বার-এসোসিয়েশন আর এ্যাটর্ণীদের ইনকরপোরেটেড সোসাইটি।

এখন একটু প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করা যাক। ১৬৯৮ খৃঃ ১৩০০ টাকায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলিকাতা এই তিনটি গ্রাম কিনে কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। কয়লাঘাট আর ফেয়ারলী প্লেসের মধ্যে প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ করা হয়। ইংরেজরা সুতানুটির বাস তুলে দিয়ে কেল্লার আওতায় বাস করতে আরম্ভ করেন। তখন মোগল আদালতে বিচার কার্য চলত। বাদশাহের জমিদার হিসেবে এই আদালতের অধীনে কোম্পানীর বিচারালয় ছিল। ১৬৯৯ খৃঃ বাংলার কুঠিকে প্রেসিডেন্সী বলে ঘোষণা করা হল আর নিজেদের বিচার কার্য চালাবার জন্যে কোম্পানী অনুমোদন লাভ করলেন।

প্রথম জর্জের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে রাজার সনদ অনুযায়ী ১৭২৬ খৃঃ কলকাতায় চারটি কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হল। মেয়র্স কোর্ট, কোর্ট অব অ্যাপীল (তাতে ছিলেন গভর্ণর অ্যান্ড কাউন্সিল)। আবার তাঁদের নিয়ে কোর্ট অব কোয়ার্টার সেসনস (এখানে রাজদ্রোহ ছাড়া আর সব রকমের বিচার হত), আর গভর্ণরের নির্বাচিত ২৪ জন কমিশনার নিয়ে কোর্ট অব রিকোয়েস্ট। মেয়র্স কোর্ট বসত মঙ্গলবার আর শুক্রবার রাইটার্স বিল্ডিং-এর পাশে পুরনো টাউন হলে।

পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৭০ খৃঃ সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে কলকাতায় গভর্ণর জেনা-রেলের অধীনে আনা হয়। এটি ছিল ফৌজদারী আদালত। ১৭৭৩ খৃঃ হেস্টিংস সদর দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮১-র অ্যাক্ট অব পার্লিয়ামেন্ট অনুযায়ী এটিকে কোর্ট অব রেকর্ড করা হয়। ৫০০্ টাকার ঊর্ধ্বে দেওয়ানী মামলার আপীল এখানে হত। ১৭৭৩-এর রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হয় এবং ১৭৭৪-এর সনদ অনুযায়ী মেয়র্স কোর্ট তুলে দিয়ে "সুপ্রীম কোর্ট অব জুডিকেচার অ্যাট ফোর্ট উইলিয়ম"-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এর প্রথম প্রধান বিচারপতি হন কেমব্রিজের গ্র্যাজুয়েট আর লিংকনস ইনের ব্যারি-স্টার স্যার ইলাইজা ইম্পে। বিখ্যাত শিল্পী জোফানীর আঁকা তাঁর একটি প্রতিকৃতি প্রধান বিচারপতির আদালত-গৃহে দেখা যায়। মিডলটন রো-তে বর্তমান লোরেটো হাউসে তিনি বাস করতেন। তাঁর বিখ্যাত হরিণের বাগান থেকেই ওই অঞ্চলের বড় রাস্তার নাম পার্ক স্ট্রীট। সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হলে কোম্পানীর অনেকগুলি বিচারালয় উঠে যায়। অবশ্য কতকগুলি তখনো চলতে থাকে। তাছাড়া কোর্ট অব কোয়ার্টার সেসনকেও সুপ্রীম কোর্টের অধীনে আনা হয়।

সুপ্রীম কোর্ট প্রথমে বসত তখন-কার মেয়র্স কোর্টেরই একটি ঘরে। বাড়ীটি ছিল ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণে বর্তমান সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চের জমিতে। নন্দকুমারের বিচার এইখানেই হয়। মাঝে মাঝে জজের বাড়ীতেও আদালত বসত।

১৭৮০ থেকে ১৭৮৬-র মধ্যে বর্তমান হাইকোর্ট বাড়ীর পশ্চিম অংশটিতে সুপ্রীম কোর্টের বাড়ী তৈরী হয়। এর পূর্ব অংশে থাকতেন বার-লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা লংভিল ক্লার্ক। কোর্টের চেহারাটি বাইরে থেকে তেমন দর্শনীয় না হলেও ভেতরটি ছিল খুব জমকালো। ওপর তলার গ্র্যান্ড জুরীদের ঘর জজেদের ছবি আর হাইডের প্রতি-মূর্তি দিয়ে সাজান ছিল। নীচের তলায় ছিল আদালত। বাইরে ঘোড়-সওয়ার প্রহরী। জজসাহেব আদালতে হাজির হলেই নকীব হাঁক দিয়ে তাঁর উপস্থিতি ঘোষণা করত। জজেরা আগে বিরাট লম্বা পরচুলা পরতেন। তবে এদেশের

পরমে নন্দকুমারের বিচারের পরই সেই খড় পরচুলা পরিত্যাগ করা হয়।

সদর দেওয়ানী আদালতের বাড়ী ছিল ভবানীপুরের উত্তর সীমায় লোয়ার সার্কুলার রোডে। প্রথমে মিলিটারী হাসপাতালের জন্যে বাড়ীটি তৈরী হয় কিন্তু বাড়ী তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে হেস্টিংসের সেটি পছন্দ হওয়ায় সেটিকে আদালতের জন্যে দখল করা হয়। পরে সদর দেওয়ানী আদালত উঠে গেলে আবার সেটিকে মিলিটারী হাসপাতাল করা হয়।

সুপ্রীম কোর্ট স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বিচারাধীন এলাকা নিয়ে গভর্ণরের সঙ্গে প্রধান বিচারপতির

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বিবাদ বাধে। কাশীজোড়ার রাজার মামলায় ব্যাপারটি গুরুতর আকার ধারণ করে। এক কাশীনাথবাবুর কাছে কাশীজোড়ার জমিদার প্রচুর টাকা ধার করে শোধ দেননি। কাশীনাথবাবু মামলা করলে জমিদার আত্মগোপন করেন। গভর্ণর আবার এক হুকুম জারী করেন যে, কোম্পানীর কর্মচারী নয় এমন কোন জমিদার যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচার মানতে অ-রাজী বলে জানিয়ে থাকেন ত সুপ্রীম কোর্টের হুকুমনামা অগ্রাহ্য করতে পারেন। সেই জোরে সমন জারী করতে গেলে জমিদার শেরিফের লোককে মারধর করেন। তাতে সুপ্রীম কোর্ট জমিদারের সম্পত্তি আটক করে তাঁকে কোর্টে হাজির হতে বাধ্য করবার চেষ্টা করেন। শেরিফ লোকজন নিয়ে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে যান। গভর্ণরও শেরিফকে বাধা দেবার জন্যে কর্ণেল আমুটিকে পাঠান। এতে সুপ্রীম কোর্ট মিলিটারী অফিসারদের আদালত অবমাননার দায়ে ফেলেন কিন্তু গভর্ণর ও সৈন্য দলের প্রতিকূলতায় কিছু করা সম্ভব হয়নি। পরে সুপ্রীম কোর্টের সঙ্গে বিবাদ মিটোবার উদ্দেশ্যে হেস্টিংস ইম্পেকে একই সঙ্গে সদর দেওয়ানী আদালতেরও প্রধান বিচারপতি করে দেন। তাতেও বিরোধ মেটেনি। শেষে জজেরা গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে এক রাস্তায় হাঁটাও বন্ধ করে দিলেন। ময়দানে "জাজেস ওয়াক" রাস্তা আজো তার স্মৃতি বহন করছে। এই বিরোধের ফলে বাংলায় বিচার কার্য পরিচালনা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। শেষে ১৭৮১ খৃঃ পার্লিয়ামেন্টের অ্যাক্ট অনুযায়ী কলকাতা শহরের এলাকাটুকু সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন এলাকা বলে স্থির হয়। তাও সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলির ওপর কোর্টের কোন হাত ছিল না।

এই প্রসঙ্গে সেকালের বিচার ও শাস্তির কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া অপ্রাসংগিক হবে না। তখন হাওড়ার পুল হয়নি। সামান্য অপরাধে অপরাধীকে হাওড়া পাঠান হত। বেতমারা, জুতোমারা, কানকাটা, হাত পোড়ানো, তুড়ুম ঠোকা ও ফাঁসি দেওয়ার প্রচলন ছিল। লালবাজার আর বৌবাজারের মোড়ের কাছে তুড়ুম ঠোকার "পিলরী" ছিল। অপরাধীকে অনেক সময় গরুর গাড়ী চড়িয়ে ঢোল পিটিয়ে শহরের নানা স্থানে ঘোরান

রাসবিহারী ঘোষ

হত। ১৭৯৬ খৃঃ টুলক কোম্পানীর ঘড়ি চুরির অপরাধে এক ফিরিঙ্গীর হাত পোড়ানো হয়। ১৭৯৫ খৃঃ নর-হত্যার দায়ে শেখ মোহম্মদ নামে এক ব্যক্তির হাত পোড়ানো আর এক বছর জেল হয়। ১৮০০ খৃঃ গৃহস্থ বাড়ী থেকে ২৫৲ টাকার জিনিস চুরির অপরাধে ব্রজমোহন দত্তের ফাঁসি হয়। জাল করার অপরাধে বিষ্ণুপ্রসাদ শ্রীমানীকে তুড়ুম ঠোকা, আর দু বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হত্যা ও নৌকা লুঠের অপরাধে জোসেফ লেপরুজের ফাঁসি হয় এবং ফাঁসির পর লোহার শিকলে বেঁধে মৃত-দেহ রাস্তার ধারে এক গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়। মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার অপরাধে আর্মানী পাদ্রী টার জ্যাকব আর টার পিদ্রুসের দু বছর জেল আর এক টাকা জরিমানা হয়। সেই অপরাধেই রামসুন্দর সরকারের সাত বছর দ্বীপান্তর

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হয়। ১৮০৪-এ নরহত্যার অপরাধে জন ম্যাকলীনের এক মাস জেল আর এক টাকা জরিমানা হয়। জেলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুব খারাপ ছিল। খাবার জল এবং পরিচ্ছন্নতার একান্ত অভাব ছিল। ১৮৩৫-এ মেকলের মিনিটের ফলে সরকার জেল পরিদর্শনের জন্যে এক কমিশন পাঠান।

১৮০০ খৃঃ সদর নিজামত আদালতে এক মজার মামলা হয়। নির্জা জান বলে এক উর্দু কবি 'তাপিশ' এই ছদ্মনামে লিখতেন। নবাবের হয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে তিনি অভিযুক্ত হন। বিচারে অপরাধীকে "গভীর অনুশোচনা প্রকাশের" আদেশ দেওয়া হয়।

সুপ্রীম কোর্টের প্রথম ফৌজদারী মামলাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল ১৭৭৫ খৃঃ নন্দকুমারের বিচার।

জালিয়াতির অপরাধে তাঁর ফাঁসি হয়। যদিও এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা সকলেই জানেন। তেমনি সুপ্রীম কোর্ট উঠে যাবার কিছু আগে ১৮৬১-তে পাদ্রী লং-এর "নীলদর্পণের" মামলাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। লং জরিমানা দিয়ে মুক্তি পান এবং জরিমানার টাকা দিয়ে ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। এই মামলার রাজনৈতিক গুরুত্বও লক্ষ্য করবার মত।

ইম্পের পর প্রধান বিচারপতি হলেন হাইড। তিনি তাঁর মামলাগুলি সম্বন্ধে ৭৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ এক নোট রেখে গিয়েছেন। এগুলি তাঁর বিলেতে নিয়ে গিয়ে ছাপার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু এদেশেই মৃত্যু হওয়ায় তা আর সম্ভব হয়নি। সেগুলি পরে বিচারপতি স্যার রবার্ট চেম্বার্সের হাতে এলে তিনি তা বার লাইব্রেরীতে দান করেন। দুঃখের বিষয় কতকগুলি খণ্ড এখন হারিয়ে গিয়েছে। হাইড বিলাসিতার মধ্যে বাস করলেও অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন এবং গোপনে প্রচুর দান করতেন। বার্ষিক ৮০০০ পাউন্ড আয় হলেও দশ বছর পরে তাঁর এমন অবস্থা হল যে, দেশের পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে দেনা শোধ করতে হয়। বর্তমান টাউন হলের জমিতে তাঁর বাড়ী ছিল।

তখনকার দিনে কোর্টের টার্ম শুরু হবার দিন সমস্ত জজ-ব্যারিস্টারেরা হাইডের বাড়ী এক সাধারণ প্রাতরাশে মিলিত হতেন। তারপর সেখান থেকে শোভাযাত্রা করে আদালতে হাজির হতেন। কিছুদিন বাদেই এই প্রথা উঠে যায়। পরে প্রধান বিচারপতি স্যার ল্যান্সেলট অ্যান্ডারসন কোর্টের 'লং ভেকেশন'-এর পরে জজেদের বার-লাইব্রেরীতে এক অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করতেন। এখন তাও অনেক দিন হল উঠে গিয়েছে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃঃ ভারতের শাসন ভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ইংরেজ সরকারের হাতে যায়। ফলে ১৮৬২-তে কলকাতায় "হাইকোর্ট অব জুডিকেচার অ্যাট ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল"-এর প্রতিষ্ঠা হল। এই হাইকোর্ট আর মফঃস্বলের নিম্ন আদালতগুলির ক্ষমতা এল ইংলন্ডের শাসনকর্তার সনদ অনুযায়ী। এর ক্ষমতা বিস্তৃত হল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আজকের উত্তরপ্রদেশ, উভয় বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর এমনকি কিছুদিনের জন্যে নেপাল পর্যন্ত। স্বাধীনতা লাভ ও দেশ-বিভাগের পর ১৯৫০ থেকে এর ক্ষমতা কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ আর আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে আর এর নাম হয়েছে কলিকাতা হাইকোর্ট। এই হাইকোর্টের যেখানে নতুন মামলা উত্থাপন করা হয়, সেটিকে বলে ওরিজিন্যাল সাইড। এই অংশটি হল পুরোনো মেয়র্স কোর্ট আর সুপ্রীম কোর্টের উত্তরাধিকারী। যেখানে মামলার আপীলের শুনানী হয় সেটি হল অ্যাপেলেট সাইড। এটি এবং মফঃস্বলের আদালত আর কলকাতার অন্য সব ছোট আদালতগুলি কোম্পানীর আদালতের উত্তরাধিকারী। এ ছাড়া আছে ক্রিমিন্যাল সেসন কোর্ট, যেখানে মাঝে মাঝে একত্রে কতকগুলি ফৌজদারী মামলার শুনানী হয়।

হাইকোর্টের প্রথম চীফ জাস্টিস ছিলেন স্যার বার্নেস পীকক। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মবিচারের জন্যে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ড্যানিয়েল ওকোনেলের মামলায় তিনি বিখ্যাত হন।

বিচার বিভাগের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি সর্বদাই সতর্ক ছিলেন। জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্রের কোন একটি রায় সম্বন্ধে ইংলিশম্যান পত্রিকায় অশোভন মত প্রকাশ করায় তিনি মিঃ টেলরের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনেন। মিঃ টেলর ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোক ও তাঁর বন্ধু। কিন্তু তাতে তিনি সমন জারী করতে দ্বিধা করলেন না। মিঃ টেলর তখন ফোর্ট উইলিয়মে আত্মগোপন করলেন। ফলে সমন জারি করা গেল না। এর পেছনে ইংরেজ রাজপুরুষদের হাত ছিল বলে মনে হয়। স্যার বার্নেস পীকক ক্ষিপ্ত হয়ে সরকারকে জানান যে, অবিলম্বে আসামীকে যদি আদালতে হাজির করা না হয়, তবে হাইকোর্টের অধীনে সমস্ত বিচারালয় তিনি বন্ধ করে দেবেন। তখন মিঃ টেলরকে হাজির করা হয়। ইংলিশম্যানের সম্পাদকও বেগতিক দেখে আগে থেকেই ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

আর একবার এক উৎসবে সমস্ত জজেদের নিমন্ত্রণ করা হয়। কেবল দ্বারকানাথ মিত্রের নামে নিমন্ত্রণ পত্র যায়নি। স্যার বার্নেস খোঁজ নিতেই কর্তৃপক্ষ বলেন যে, লিস্টে নাম ছিল না তাই ভুল হয়ে গিয়েছে। স্যার বার্নেস তখন তাঁদের ভ্রমটি সংশোধন করে নিতে বললেন। তখন তাঁরা বললেন যে, উৎসবে জজেরা ঘোড়ায় চড়ে প্যারেড করবেন। মিঃ মিত্র তো ঘোড়ায় চড়তে জানেন না। স্যার বার্নেস তখন বললেন যে, সে দায়িত্ব তাঁর। উৎসবের দিন মাঠে সকলে সমবেত হলেন। জজেরা যার যার ঘোড়ায় উঠলেন। স্যার বার্নেস আর দ্বারকানাথ মিত্রের জন্যে দুটি ঘোড়া আনা হল। স্যার বার্নেস দ্বারকানাথকে ঘোড়ায় উঠিয়ে সারাটা পথ ঘোড়ার লাগাম ধরে সহিসের মত হেঁটে গেলেন।

১৮৭০ খৃঃ তিনি অবসর নেন ও জুডিসিয়াল কমিটির সদস্য মনোনীত হন।

এর পর আসেন স্যার রিচার্ড কাউচ। ইনি বড়োদার গাইকোয়াড় কর্তৃক ইংরেজ

রেসিডেন্টকে বিষ প্রয়োগের ষড়যন্ত্রের মামলার অনুসন্ধান করেন। অবসর গ্রহণের পর ইনিও প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির সদস্য হন। এঁর পরবর্তী চীফ জাস্টিস সার রিচার্ড গার্থ ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তিনি জাস্টিস লুই জ্যাকসনের জায়গায় চন্দ্রমাধব ঘোষের নাম পাঠান। আর একবার ছুটিতে স্বদেশে যাবার সময় ভারতীয় বলে রমেশচন্দ্র মিত্রের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতিরূপে নিয়োগে আপত্তি করেন। কিন্তু লর্ড রিপণ আপত্তি অগ্রাহ্য করেন। শেষ জীবনে কিন্তু এই সার রিচার্ডই আবার তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন।

এঁদের পরবর্তী প্রধান বিচারপতিদের মধ্যে সার লরেন্স হিউ জেঙ্কিন্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৬-তে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের পুইন জজ হিসেবে এদেশে আসেন। পরে বোম্বাইয়ের প্রধান বিচারপতি হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে ১৯০৯ সালে আবার তিনি কলকাতায় আসেন প্রধান বিচারপতি হয়ে। সেই বিপ্লবের যুগেও তিনি অধৈর্য না হয়ে তীক্ষ্ম বিচার-শক্তি দেখান। তাঁর এজলাসেই মেদিনীপুর বোমার মামলা ও আলিপুরে বোমার মামলার বিচার হয়। এই মামলায় চিত্তরঞ্জন দাশ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত ইত্যাদির পক্ষ সমর্থন করে বিখ্যাত হন। এই মামলায় আপীলের ফলে অনেকেই মুক্তি পান। হাওড়া ষড়যন্ত্রের মামলায় ৪৬ জন ভদ্রসন্তানকে ডাকাতির ষড়যন্ত্রের অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। জেঙ্কিন্স রায় দেন যে, কয়েকজন ভদ্রসন্তান মিলে লাঠি, ছোরা ইত্যাদি খেলে স্বাস্থ্যচর্চা করলেই ডাকাতির ষড়যন্ত্র করা হয় না। অভিযুক্ত সকলকেই মুক্তি দেওয়া হয়। মহম্মদ আলি এবং অমৃতবাজার পত্রিকার মামলাতেও অনুরূপ সূক্ষ্ম বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সবের জন্যে তাঁর পেন্সন নিয়েও টানাটানি হয়েছিল। কিন্তু শেষে কিছুই করা হয়নি। ১৯২৫ সালে তিনি পদত্যাগ করেন এবং প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন।

এঁর পর আসেন সার জর্জ ক্লাউস র্যাঙ্কিন। ইনি সর্বপ্রথম স্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন; গভীর আইনজ্ঞ বলে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। হান্টার কমিশনে একে নেওয়া হয়। কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরাজ প্রধান বিচারপতি হলেন সার আর্থার ট্রেভর হ্যারিস। তিনি এলাহাবাদ, পাটনা, লাহোর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে জজিয়তী করেন এবং ১৯৪৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। ১৯৫২-তে এদেশেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় পুইন জজ হলেন রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়। তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের সিনিয়র গভর্ণমেন্ট প্লীডার ছিলেন। তখনকার দিনে ওকালতি পরীক্ষার প্রচলন হয়নি। শিক্ষিত ব্যক্তি কোর্টে দরখাস্ত করলেই উকীল হতে পারত। রমাপ্রসাদ রায়ের দরখাস্ত কিন্তু প্রথমে কেন জানিনা অগ্রাহ্য হয়। তাতে বেথুন সাহেব বলেন যে, ইংল্যাণ্ডে লর্ড নেলসনের ছেলে থাকলে যদি সে নৌ-বিভাগে ঢুকতে চাইত, ত তাকে কিন্তু প্রত্যাখ্যান করা হত না। তখন রমাপ্রসাদ রায়কে অনুমতি দেওয়া হয়। তাঁর জজ হবার নিয়োগপত্র যখন এসে পৌঁছয় তখন তিনি মৃত্যু-শয্যায়। খবর পেয়ে তিনি বলেন যে, এখন ওপরের আদালতে হাজিরা দেবার সময় হয়েছে। জজিয়তী করা তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। তাঁর জুনিয়ার কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ শম্ভুনাথ পণ্ডিতই ১৮৬৩-তে প্রথম ভারতীয় পুইন জজ হন।

এর পর ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই বিচারপতি হন এবং খ্যাতি অর্জন করেন। বিচারকার্য ছাড়াও তাঁরা দেশের উন্নতির জন্যে নানাবিধ সৎকর্ম করেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্যার সারদাচরণ মিত্র, আশুতোষ চৌধুরী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। এঁরা সকলেই প্রথম জীবনে বিখ্যাত উকীল বা ব্যারিষ্টার ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্যার গুরুদাস আবার অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং রোজ সকালে গঙ্গাস্নান করতেন। একবার এক বৃদ্ধা তাঁকে পূজারী ব্রাহ্মণ মনে করে তাঁকে দিয়ে পূজা করিয়ে নেন। আর একবার লর্ড কার্জনের সঙ্গে কাম্বাপা দেশে ট্রেনে করে যাবার সময় এক বিপত্তি ঘটে। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় কার্জন জানতে পারেন যে, নিষ্ঠাবান গুরুদাস ট্রেনে খাবেন না। তখন মাঝপথে এক ছোট স্টেশনে গাড়ী থামিয়ে, ব্রাহ্মণদের দিয়ে রান্না করিয়ে স্যার গুরুদাসের খাওয়ার বন্দোবস্থা করেন। প্রথম ভারতীয় স্থায়ী বিচারপতি হলেন ফণীভূষণ চক্রবর্তী।

এই হাইকোর্টে আবার দুটি হত্যাকাণ্ড হয়ে গিয়েছে। ১৮৭১ সালে জাস্টিস জন প্যাক্সটন নরম্যানকে টাউন হলের সিঁড়ির ওপর এক উন্মত্ত ওয়াহাবী হত্যা করে। হাইকোর্টের ওরিজিন্যাল সাইড তখন সেইখানে বসত। বাংলার বিপ্লববাদের সময় দারোগা সামসুল আলমকে হাইকোর্টের মধ্যে হত্যা করা হয়।

এবার উকীল-ব্যারিষ্টার পর্বে আসা যাক। ১৭৭২ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের গোড়ার দিকে
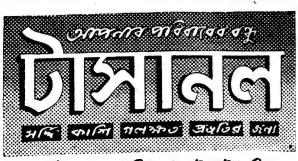
বিচারার্থীরা নিজেদের মামলা নিজেরাই চালাতে পারতেন। দরকার হলে উকীল দিয়েও চালাতেন। এই উকীলরা তখন ছিলেন বিচারার্থীদেরই আশ্রিত বা অধীনস্থ কর্মচারী। পরে এ'রা স্বাধীন ব্যবসায়ী হয়ে বিভিন্ন বিচারালয়ের সংগে সংযুক্ত হন। ১৭৯৩-এর রেগুলেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী এ'দের কলকাতা মাদ্রাসা এবং কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাচন করা হত। এখান থেকে না পাওয়া গেলে সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানকে সদর দেওয়ানী আদালত নিযুক্ত করতেন। সেখান থেকে রেজিস্ট্রারের সই-করা ওকালতীর সনদ এ'দের দেওয়া হত আর এ'দের শপথ গ্রহণ করতে হত। মুসলমান উকীলদের আবার ছ'মাস অন্তর নতুন করে শপথ নিতে হত। মামলা নেবার সময় যার মামলা তাকে উকীল নিযুক্ত করার জন্যে চার আনা ফি দিতে হত।

এক আদালতের উকীল অনুমতি ছাড়া অন্য আদালতে ওকালতী করতে পারতেন না। যে উকীল খালি মামলা করতেই উস্কানি দিতেন, তাঁকে সাসপেন্ড করার ব্যবস্থা ছিল। মামলার সময় কোর্টে হাজির না হলে উকীলের অর্থদণ্ড হত এবং তিনবার এই রকম হলে তিনি আর প্র্যাকটিস করতে পারতেন না। সেকালের উকীলরা আপীলের মামলাই করতেন। ওরিজিন্যাল সাইডে মামলা করতে গেলে প্রবীণ উকীলও মামলা করতে পারতেন না। অথচ তরুণ ব্যারিস্টার পারতেন। বার কাউন্সিল অ্যাক্ট হবার পর এই প্রথা উঠে যায়।

গোড়ার দিকে ব্যারিস্টারের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। ১৭৭৪ সালে সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশনের সময় কলকাতায় টমাস ফেরার নামে মাত্র একজন ব্যারিস্টার ছিলেন। ইনিই নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থন করেন। ওই বছরেরই শেষে ব্রিকস্ আর নিউম্যান নামে আরো দুজন ব্যারিস্টার আসেন। সেকালে মামলার জন্যে ব্যারিস্টার পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। ফলে, এ'রা সকলেই অল্পদিন মাত্র কাজ করেই প্রভূত অর্থ নিয়ে দেশে ফিরে যান। মিঃ ফেরারই মাত্র কয়েক বছর কাজ করে ৬০,০০০ পাউন্ড নিয়ে দেশে ফেরেন। প্রথম অ্যাডভোকেট জেনারেল হলেন মিঃ জন্ ডে। বার লাইব্রেরী ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে।

বিখ্যাত ব্যারিস্টারদের মধ্যে স্যর চার্লস পল (প্রথমে অ্যাডভোকেট জেনারেল ও পরে জজ হন) স্যর গ্রিফিথ ইভান্স, মনমোহন ঘোষ (যিনি বিনামূল্যে অনেক দরিদ্র ব্যক্তির মামলা পরিচালনা করেন), উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট), আর্থার ফিলিপ্স্, মিঃ হিল, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, উইলিয়ম স্ট্যানলকী জ্যাকসন (যিনি 'টাইগার জ্যাকসন' নামেই প্রসিদ্ধ), সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড সিংহ, বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর ও প্রিভি কাউন্সিলের মেম্বার) এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শরৎচন্দ্র বসু ও অতুল

গুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বাংলায় বিপ্লববাদের দিনে অরবিন্দ ঘোষের মুক্তির পর চিত্তরঞ্জন দাশের নাম ছড়িয়ে পরে। ফৌজদারী মামলায় তখনকার দিনে তাঁর মত নিপুণ আইনজ্ঞ কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর ব্যবসায়িক উন্নতির চরম শিখরে উঠে তিনি আইন ছেড়ে পুরোপুরি দেশ-সেবায় যোগ দেন। সেই ইতিহাস সকলেই জানেন। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যাঁরা ভিত্তি স্থাপন করেন তাঁদের মধ্যে বোধ হয় আইনজীবীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। এঁরা সকলে স্বাধীনচেতা ব্যক্তি বলেই এই স্বাধীন ব্যবসায়ে নামতেন।

সদর দেওয়ানী আদালতের প্রাচীন উকীলদের মধ্যে শ্রীনাথ দাস, কালীকৃষ্ণ সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির নাম করতে হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এবং 'টেগোর ল লেকচার'-এর জন্যে তিনি প্রভূত অর্থ দেন। তাঁর ছেলে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ও ব্যারিস্টার হন।

কালীমোহন দাশ ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যাঠামশাই, ১৮৬০ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত প্র্যাকটিস করেন। ইনি অত্যন্ত তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। ব্যারিস্টারদের ওরিজিন্যাল সাইডে কাজ করার সুবিধা তাঁকে দেওয়া হয়। তিনি কিন্তু সমস্ত উকীলদের পক্ষ হয়ে সে সুযোগ প্রার্থনা করেন এবং একা তা নিতে অসম্মত হন।

আর একবার এক নতুন উকীল এক মামলায় জজের রায় শুনে বলে ফেলেন যে, জজের মত শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। ফলে উকীলটি আদালত অব-মাননার দায়ে পড়ে যান এবং ভয়ে কল-কাতা ছেড়ে পালিয়ে যান। কালীমোহন দাশ তখন তাঁর হয়ে জজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এবং শেষে বলেন, 'হুজুর ওর বয়স অল্প তাই আপনার কথায় আশ্চর্য হয়েছে, আমার মত যখন বয়েস হবে তখন আর আশ্চর্য হবে না।' কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন। অন্ধ হয়ে যাওয়ায় অব-সর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র বোধ হয় প্রথম কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টর-অব-ল উপাধি পান।
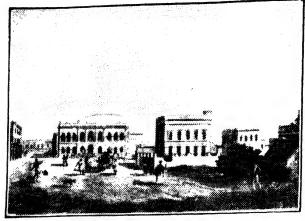
ওলড কোর্ট হাউস ১৭৯২ সালে ভেঙে ফেলা হয়)

রাসবিহারী ঘোষ এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম না করলে হাই-কোর্টের ইতিহাস অসমাপ্ত থেকে যায়। রাসবিহারী ঘোষের মত আইনজীবী বোধ হয় হাইকোর্টে আর আসেনি। এঁর বহু কাহিনী লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে তাই বাহুল্য ভয়ে সে সবের উল্লেখ করা হল না। আশুতোষ মুখো-পাধ্যায় চীফ জাস্টিসের পদ পান। রাসবিহারী ঘোষ তাও তিনবার প্রত্যা-খ্যান করেছিলেন। দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রেও রাসবিহারী ঘোষ গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠায় রাসবিহারী ঘোষের দানের কথা সকলেই জানেন। আর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমরা ভাবতেই পারি না।

অন্যান্য অনেক জায়গায় জুরীর বিচার উঠে গেলেও কলকাতা হাইকোর্টে এখনো তা আছে। এখানে তিনটি বার-লাইব্রেরী হয়েছে। একটি হল ইংরেজ বা বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টারদের জন্যে বার লাইব্রেরী ক্লাব, আর একটি হল অ্যাড-ভোকেটদের বার এসোসিয়েশন এবং তৃতীয়টি হল এ্যাটর্ণিদের ইনকরপোরে-টেড ল সোসাইটি। এদের মধ্যে নানা রকম বৈষম্যমূলক প্রথা এখনো আছে। অ্যাডভোকেটরা বার লাইব্রেরীর সভ্য হতে পারেন না, আগে এ্যাটর্ণিরা ব্যারিস্টার-দেরই মামলা দিতেন। বর্তমানে তাঁরা নিজেরা মামলা চালাতে পারেন। ইদানীং দেশের আইন বিভাগের নানারূপে সংস্কার হচ্ছে। তাতে ভবিষ্যতে আরো অনেক পরিবর্তন দেখা যাবে। এ্যাটর্ণিশিপ তুলে দেবার কথাও হয়েছে। সারা দেশে এক ধরনের বার করা হবে বলে কথা হচ্ছে।

দেশ-বিভাগের ফলে হাইকোর্টের মামলার কাজ কমে গেলেও ভারতীয় সংবিধান সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় মোট কাজের সংখ্যা বেড়েই গিয়েছে

আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনের সবচেয়ে বড় দান হল আইন এবং আইনের চক্ষে সকলের সমতার ধারণা। এই ধারণা প্রাচীন বা মধ্য যুগের ভারতে কোনদিনও ছিল না। আজকের স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার গুরু-দায়িত্ব এই হাইকোর্টের মহান উত্তরাধিকার।

নতুন আদালত গৃহ (সুপ্রীম কোর্ট) ১৭৮৭

প্রবন্ধের কয়েকটি কাহিনী ডাঃ নরেশ-চন্দ্র সেনগুপ্তের কাছে শোনা এবং কয়েকটি তথ্য শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে পাওয়া গিয়েছে।

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু, নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প।

॥ এক ॥
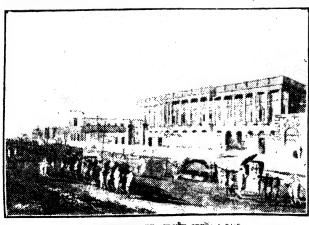
ওর হাসি নামকরণের পেছনে কোনো ইতিহাস আছে কিনা জানিনে। যতদূর মনে হয় ওর বাবাই এই নাম ওকে উপহার দিয়েছিলেন। আর পুরুষেরা যেমন সচরাচর সাদাসিদে হয় তেমনি নবজাতক কন্যার নাম দেবার সময় কোনো ঘটা না-করে ওই নামই রেখেছিলেন। কারণ গর্ভধারিণী ওর জননী সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখিয়ে নিজে চির-দিনের জন্যে চোখ মুদেছিলেন। বোধ করি শৈশব থেকেই মেয়েটি খুব হাসি-খুশি ছিল। কিংবা সব শিশুদের মুখে যেমন স্বর্গীয় লাবণ্য মুদ্রিত থাকে সেই কল্পনা মিশিয়ে তার ওই নাম হয়েছিল। যা বলছিলাম, হাসি জন্মের সঙ্গেই মাকে খুইয়েছিল, এইটে তার জীবনের এক অপূরণীয় ক্ষতি।

॥ দুই ॥

প্রাকৃতিক নিয়মে জল-হাওয়া-রোদ্দুর-উত্তাপ সহযোগে বাড়ন্ত হঠাৎ এক সন্ধ্যায় হাসি কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। ধোঁয়া-ধোঁয়া অনুভূতির মধ্য দিয়ে সে একটা কিছু বুঝতে চাইল। যেন চোখের সামনে একটা জটিল গোলকধাঁধা। হাসির মনে হল তার শরীর অনেক ভারি হয়ে উঠেছে এবং দেহকণিকায় কেমন এক জ্বর-জ্বর উষ্ণতা। নির্জন দুপুরে সে ঘাটের পুকুরে পা ডুবিয়ে চুপচাপ বসে থাকত, উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত আমবাগানের ছায়ার দিকে। নিজের মনে ভাবত, কিন্তু কি যে ভাবত তা স্পষ্ট করে বুঝতে পারত না। এর দিন কয়েক পরে ওর বাবা কি জানি কি মনে করে হাটের থেকে দু জোড়া ডুরে শাড়ি, একজোড়া সায়া, গায়ের জামা এনে মেয়েকে বললেন : 'এগুলি তোর জন্যে।' হাসি সেদিন একলা ঘরে শাড়ি পরতে গিয়ে কেঁদে-ছিল। মা না-থাকার জন্যে তার দুঃখ হয়েছিল। আমার স্মৃতি যদি প্রতারণা না-করে : তখন ওর বয়স তেরো।

॥ তিন ॥

নতুন-জাগা এই দেহবোধ নিয়ে হাসি যখন একলা একটি জগৎ সৃষ্টি করে হিম-সিম খাচ্ছে, এই সময় গ্রীষ্মাবকাশে কলকাতার কলেজে-পড়া ওর একমাত্র দাদা নিবারণ গ্রামে ফিরল। সঙ্গে তার বন্ধু সুকান্ত। দুয়ারে গাড়ির শব্দে দাদার গলার আওয়াজে হাসি বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। দাদার সঙ্গে তার চোখ মিলে-ছিল। তিন বছর দাদা দেশে ফেরেনি। দাদা বলল : 'ঈশ, তালগাছের মতো বেড়ে উঠেছিস।' আর সেই না শুনে পড়িমরি করে ছুটে ভেতর-বাড়িতে। মাগো, দাদাটা কি অসভ্য! সুকান্ত গাড়ি থেকে নেমে বিস্ফারিতনেত্রে দাদার পেছন থেকে বোনকে দেখছিল। শহরের ফুটপাথে শান-দেয়া ধারালো চোখের দৃষ্টি। গ্রামীণ আকাশপটে অকপট এই সম্পদকে দেখে অস্ফুটে কী উচ্চারণ করেছিল, নিবারণ বুঝতে পারেনি। তবে তার ওষ্ঠে একটি তৃপ্তির মুদ্রা ফুটে উঠেছিল।

॥ চার ॥

দাদার বন্ধু সম্বন্ধে বোনেদের মনে একটা সসম্ভ্রম গৌরবের আসন পাতা আছে। কেমন একটা বীরপূজোর ভাব। আর হাসির মনের বয়সটাও ঠিক এই স্তরে আটকে ছিল। প্রথম-প্রথম লজ্জার আড়ালে থেকে এই মান্য অতিথিকে উপ-যুক্ত সংকার সে করত। কিন্তু এই আড়ালটুকুও একদিন খসে গেল। কিন্তু সহজ সুরটি কিছুতেই বাজল না। জলের গ্লাস এগিয়ে দিতে কি চায়ের বাটি, হাত কাঁপত হাসির, চোখের পাতাও। এবং রক্তে ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনি কান পেতে শুনতে পেত সে। এর কারণ হয়তো এই

হবে : গ্লাসের সঙ্গে বাটির সঙ্গে সুকান্তের আঙুলের উষ্ণ স্পর্শের সৌরভ জড়িয়ে থাকত। এই স্পর্শটুকু সব সময় যে অন্যমনস্কতার নয় এইটে বুঝতে পেরে আরো বেশি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত হাসি। মহিলাবিহীন এই সংসারে অল্প বয়স থেকেই সে গৃহকর্ত্রীর ভূমিকা পেয়েছিল। রান্নাবান্না, বাসন মাজা, কাপড় কাচা যাবতীয় কাজ করতে হত তাকে। সুকান্ত আসার পরও একই ভূমিকা তাকে বজায় রেখে চলতে হল। এই ব্যস্ত-কাজের ফাঁকে চুরিকরা ওই সামান্য স্পর্শের উত্তাপ তার মনে সারা দিনে সুরের মৌমাছির মতো গুণগুণ করত। বলতে বাধা নেই : ঘরোয়া কাজগুলি অসীম উৎসাহে করতে ভালো লাগত হাসির। আর কেন জানি সব সময় মনে হত একজোড়া আলোভরা চোখ তার অস্তিত্বকে ঘিরে রেখেছে। তার ওপর কারুর যে মনোযোগ রয়েছে এতে সে নিজেকে ধন্য মনে করত।

॥ পাঁচ ॥

গ্রীষ্মের দিনগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে খরচ হয়ে যেতে লাগল। দাদা চলে যাবে। সুকান্তও। আবার গ্রামের এই উদাস জীবনযাত্রার ছন্দে একাকার হয়ে মিশে যাবে হাসির জীবন। সুকান্ত বড় দেরিতে বিছানা থেকে ওঠে। বিছানায় শুয়ে ওর চা চাই। পাবনার বিখ্যাত রায়বংশের ছেলে সুকান্ত। ওরা বড়লোক। সেদিন চা দিতে গিয়ে আটকাল সুকান্ত। ফিসফিস করে বলল : 'কথা আছে।'

হাসির শরীর চমকে উঠল, ঘাড় নুয়ে এল পায়ের দিকে। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। সুকান্ত বলল : 'পরশু আমি চলে যাচ্ছি।' হাসি কোনো উত্তর দিল না। সে ঘামছিল, মনে হচ্ছিল ছোটোবেলায় পাঠশালায় গুরুমশায়ের পড়ার উত্তর দিতে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরও দাঁড়িয়ে রইল যথেষ্ট সময়, কেউ কথা বলল না। এক সময় পা দুটো টেনে টেনে বেরিয়ে গেল হাসি। নিঃ[illegible] ওর রক্ত-উচ্ছ্বসিত মুখ দেখে কী প্রশ্ন করতে গিয়ে থমকে গেল। কুয়োতলায় বাসনের কাঁড়ির সামনে হেঁট হয়ে বসে হাসি হুহু করে নিঃশব্দে কান্নায় ভেসে গেল। মনে হল : তার জীবনের একটা বড় আঘাত তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।

॥ ছয় ॥

সুকান্ত চলে গেল। চলে-যাওয়ার তাৎপর্য জীবনে যে কী গভীরভাবে অনুভূত হয়, এর আগে কোনোদিন বুঝতে পারেনি হাসি। কিছুদিন পরেই বুঝতে পারল তার মনের জগৎটাকে সুকান্ত বলে যুবকটি রাতারাতি টেনে অনেক বড় করে দিয়েছে। এতদিন বাড়ন্ত দেহের সঙ্গে ছোট্ট গুটিয়ে-রাখা মনটা পাখির শাবকের মতোই ধুক-পুক করছিল, এখন দেহের সঙ্গে তার সঙ্গত হল। শরীরের আকস্মিক যে পরিবর্তনগুলির এতদিন সে কার্যকরী গুরুত্ব বুঝতে পারেনি এবার তা বুঝতে পারল। পেরে সে নিজেই চমকে উঠত, বহু সময় ধরে ভাবত, রান্নায় গোলমাল হত, ঘাটে নেমে জল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করত না। আর একেক রাত্রে চোখ ঘুমে জ্বালা করে উঠলেও কষ্ট করে জেগে থাকতে ভালো লাগত। ছোট্ট এক টুকরো কথা। 'কথা আছে।' ভোরে শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে গাছে ঝাঁকুনি দিলে শিশিরভেজা ফুলগুলির শিহরণ দুলিয়ে দিত শরীরকে। 'কথা আছে।' কি কথা? কই, সেই কথাটা তো সে বলল না। নাকি বলেছে। 'পরশু আমি চলে যাচ্ছি।' এইটেই কি সে বলতে চেয়েছিল। চলে-যাওয়ার কথা।

॥ সাত ॥

দিন কাটল। বাবা হঠাৎ একদিন বললেন, 'কলকাতা যাবি?' চমকে উঠে বাবার মুখে চোখ রেখেছিল হাসি। বাবার মুখখানা সেদিন অনেক বুড়ো দেখাচ্ছিল। কেন জানি বাবার জন্যে দুঃখ পাচ্ছিল সে। সদৃঢ় মাথা নেড়ে জানিয়েছিল, 'না।' নাঃ কলকাতা যাবে না সে। কোনোদিনও না। কোথায় যেন একটা রাগ ছিল শহরটার ওপর। মনে হয়েছিল : কলকাতা কথা বলতে জানে না। আর জানলেও সে-ভাষা তার জন্যে নয়।

॥ আট ॥

সেদিন বাবা পোস্টাফিস থেকে ফিরে এসে বললেন, 'তোর চিঠি আছে।' চিঠি! তার নামে চিঠি। এবং কলকাতা থেকে। দাদা লিখেছে! যে-দাদা কোনোদিন টাকার প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতে চিঠি লিখে না। ঘরে এসে চিঠি খুলল। সুকান্তর চিঠি। একজন যুবক তাকে চিঠি লিখেছে। নীল কাগজে দু পৃষ্ঠা হস্তাক্ষর একমাত্র তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা। একটা অপূর্ব ব্যাপার, অনাস্বাদিত একটি মুহূর্ত। পরমুহূর্তে একটা অজানিত আতংক তাকে আচ্ছন্ন করল। না, পড়বে না এই চিঠি। খামে বন্দী করে তোরঙে জামা-কাপড়ের নিচে লুকিয়ে রাখল চিঠি। বাবা জানলেন না, জানতে চাইলেন না কে দিয়েছে এই চিঠি। কিংবা বাবা জানতেন।

॥ নয় ॥

আরো চিঠি এল।

তারপর মস্ত প্যাকেটে উপহার। কাঞ্জিভরম শাড়ি আর চিকনের ব্লাউজ পীস। এবং সেদিন উপহার হাতে নিয়ে ভাবতে হল হাসিকে। অকারণ লজ্জায় ছেয়ে গেল মনের আকাশ। সেদিন বাবার হাতে শাড়ি পেয়ে রাত্রির ঘরে সে নিঃশব্দে কেঁদেছিল। আজ কাঁদল না। কেমন হতাশা ভয়ে শুকিয়ে গেল। আর মনে হল যে-মানুষ শাড়ি পাঠিয়েছে, সে তার শরীরের কথা নিশ্চয়ই ভেবেছে। তারপর হাসি এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। সুকান্তকে লিখল : 'আপনি আর কোনোদিন আমাকে চিঠি আর উপহার পাঠাবেন না।' কেন সে কথা লিখল হাসি জানে না। লিখে সে ক'দিন কাঁদল। তারপর একদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে হল ভালোই হয়েছে। তার পক্ষে লোভ সাজে না।

॥ দশ ॥

সুকান্তর চিঠি এল না। এল নিজে স্বশরীরে। এবং এবার একা। দাদার বন্ধুর জন্যে এ-সংসারে মর্যাদার আসন বিছানো আছে। যে লোক স্বেচ্ছায় অতিথি হয়ে আসে তাকে ফেরানো যায় না। দু-একদিন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াল হাসি। কিন্তু খাবার দিতে, জল দিতে, চায়ের বাটি দিতে কাছে আসতে হয়। তারপর হঠাৎ একদিন তাকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে ভীষণ ঝগড়া করে বসল সুকান্ত। মেঘ বৃষ্টি ঝড়। হাসির সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। বর্ষার মহানন্দার তোড়ে সে নিজে কুটোর মতো ভেসে গেল। সুকান্ত বলল : 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' বলল তার প্রেমের বন্যায় ছুটে-আসার ইতিহাস। চমকাল হাসি, দুরু-দুরু বুক, ক্লান্তি অবসাদ। তারপর ভেঙে পড়ল, সস্তা মোমের মতো গলে গলে ক্ষয় হল।

॥ এগারো ॥

ঘনঘোর বর্ষায় গ্রাম ভেসে গেল। হঠাৎ সারাদিনে ভারি মেঘ দুর্যোগের

ধ্বনি সহযোগে সৃষ্টি বুঝি লণ্ডভণ্ড করে দেবে। বাবা গিয়েছিলেন ভিন গাঁয়ে। দুর্বিপাকে আটকা পড়লেন। মেঘ মাথায় করে সুকান্ত বেরিয়েছিল নদীর ধারে। সিক্ত শরীরে ছুটতে ছুটতে বাড়িতে ঢুকল। বলল : 'শিগগির চা চাই।' চা নিয়ে আসতে দেরি হল হাসির। ঘরের উত্তরের জানালা খোলা। গল-গল ধারে জল এসে ঢুকছে। আর জানালার নিচে দাঁড়িয়ে সুকান্ত। ফিরে দাঁড়াল সুকান্ত। ওর চোখের তারায় বিদ্যুতের সাপ। একটা নাম না-জানা ভয়ে দুলে উঠল হাসির হৃৎপিণ্ড। 'না না।' চিৎকার করে উঠল হাসি। চায়ের কাপ চলকে উঠল। ছোটো-বেলায় একবার পুকুরে চান করতে গিয়ে গভীর জলে পড়ে গিয়েছিল হাসি, ডুবছিল, জল খাচ্ছিল, আজ আবার সেই শ্বাসরুদ্ধ অনুভূতি ফিরে এল। সুকান্ত কানের কাছে ফিশফিশ করে বলল : 'আমি তোমাকে বিয়ে করব।' গমেট বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে চাইল শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু। প্রচণ্ড শক্তিটাকে বাধা দিতে গিয়ে হেরে সর্বস্বান্ত হয়ে মরিয়া বোধে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ভাঙা গলায় হাসি বলল : 'আমাকে কোনোদিন ছেড়ে যেও না।'

॥ বারো ॥

সুকান্তের চিঠি এল হপ্তায় দুবার করে। তারপর হপ্তা সরতে-সরতে পক্ষ। অনিয়মিত হতে-হতে এক সময় নিঃশেষ হয়ে গেল। হাসি কাঁদল খুব। আরো তার মার কথা বেশি করে মনে পড়ল। হাসি ক্রমে ক্রমে পাথর হয়ে গেল।

॥ তেরো ॥

পুজোর ছুটিতে দাদা বাড়ি এল। একা। বাবা সম্বন্ধ নিয়ে এলেন : 'চৌধুরীদের হীরেন মোক্তারি পাশ করেছে। চমৎকার ছেলে।' হাসি দাদার পা জড়িয়ে ধরল, কান্নাগলা গলায় বলল : 'দাদা, পায়ে পড়ি আমাকে বিয়ে করতে বোলো না।' দাদা ভাবল মেয়েলি লজ্জা। তারপর অবাক হল। 'কেন, কেন বিয়ে করবিনে বল। মেয়ে হয়েছিস...' হাসি বলল : 'না আমি বিয়ে করতে পারব না।' প্রবাসী দাদা সেদিন বোনকে যেন নতুন করে পর্যবেক্ষণ করল। 'দিন দিন এমন কালিঢালা চেহারা হচ্ছে কেন তোর? নিশ্চয় অযত্ন করছিস শরীরের।' হাসি হাসতে চাইল, হাসতে পারল না।

॥ চোদ্দ ॥

কুয়োতলায় সেদিন জলের বালতি তুলতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল হাসি। পড়েই অজ্ঞান। নিবারণেরই বন্ধু ছোকরা ডাক্তার অনেকক্ষণ স্টেথেসকোপ লাগিয়ে বুক-পিঠ পরীক্ষা করল হাসির। চোখের পাতা টেনে দেখল। ওষুধ দিল। কয়েক-দিন ওকে পর্যবেক্ষণ করল ডাক্তার। তার-পর সেদিন সন্ধ্যায় ডাক্তারখানা থেকে রক্ষ চিন্তিত মুখ কালো করে ফিরল নিবারণ।

॥ পনেরো ॥

—'সর্বনাশী মেয়ে, তুই আমাদের মুখে এইভাবে কালি দিলি!' দাদা বলল। হাসির ভেতরটা কেঁপে উঠল, বাইরে

॥ সতেরো ॥

নিবারণ লিখল : 'আমি যাচ্ছি কল-কাতায়। তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে বিয়ের দিন ঠিক করতে।'

॥ আঠারো ॥

কলকাতায় গিয়ে নিবারণ শুনল সুকান্ত বাড়ি গেছে। নিবারণ ওর বাড়ির ঠিকানায় চিঠি লিখল। দরকার হলে ওর বাবা-মার সঙ্গে এ-ব্যাপারে পরামর্শ

বর্ষার মহানন্দার তোড়ে সে নিজে খড়কুটোর মতো ভেসে গেল

পাথরের মতো কঠিন। দাদা ফের বলল : 'বল্, কে এর জন্যে দায়ী?' হাসি মূক, রান্ত। 'এখন আর নাটক করার সময় নেই। দেরি হলে বিপদ হবে। তুই নাম বল্।' হাসি শুধু উত্তর দিল : 'আমাকে কিছু জিগ্যেস কোরো না। আমি কিছুই বলব না।' 'বলবিনে মানে?' দাদা চটল : 'ইয়ারকি করার এই সময়।' তারপর একটু থেমে কি চিন্তা করে হঠাৎ দাদা জিগ্যেস করল : 'সুকান্ত জুলাই মাসে এসেছিল না?' হাসি মাথা নেড়ে বলল : 'হ্যাঁ।'

॥ ষোল ॥

সুকান্ত তার অপরাধ স্বীকার করে নিবারণকে লিখল : 'চিন্তা কোরো না। আমি ওকে বিয়ে করব।'

করতে পারে। সুকান্ত এল না, চিঠি এল। অনেক অনুশোচনা, অনেক ব্যর্থতার পর সে মার্জনা ভিক্ষা করে লিখেছে : 'মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছিনে। মা কেঁদে হাট বাধিয়েছেন। পুত্রের ভবিষ্যতের চেয়ে ওঁর কাছে বংশমর্যাদা বড়। এই অবস্থায় বংশের এক ছেলে আমি, কি করে ওঁদের বুকে আঘাত হানতে পারি। এর চেয়ে আমার আত্মহত্যাই ভালো।'

॥ উনিশ ॥

আরো অনেক পত্রবিনিময়। 'তুমি একবার অন্তত এসো। দূরের থেকে ব্যাপারটার গুরুত্ব তুমি বুঝতে পারছ না।' নিবারণ লিখল। বলাবাহুল্য সুকান্ত

পত্রালাপ বন্ধ করল। পরাজিত নিবারণ ভীত ত্রস্ত জন্তুর মতো দেশে ফিরে এল। অনেক দেরি হয়ে গেছে সুকান্তের প্রত্যাশায় নির্ভর করে—নিবারণ ভাবল।

॥ কুড়ি ॥

ছোকরা ডাক্তার বলল : 'একটু ঝুঁকি আছে। আচ্ছা আমি চেষ্টা করে দেখব।'

দাদা বলল : 'আজ রাত্রে আমার সঙ্গে যেতে হবে। তৈরি থাকিস।' হাসি বলল : 'কোথায়?' 'নিরঞ্জনের ডিসপেন্সারিতে। বিপদ বাঁধিয়েছিস, উদ্ধার হতে হবে তো।'

হাসি কেঁদে ফেলল : 'আমি যাব না।' দাদা বলল : 'ন্যাকামি রাখ। যেতে হবে তোকে।'

॥ একুশ ॥

রাত্রে হাসিকে ডাকতে গিয়ে বাবা ডাকলেন : 'শোনো—'

নিম্নলিখিত কথোপকথন হল পিতা-পুত্রে।

ছেলে : তুমি কি বলছ? তোমার কি মাথার ঠিক আছে?

বাবা : বিনাদোষে একটি জীবনকে তুমি নষ্ট করতে পারো না নিবারণ।

ছেলে : কিন্তু কি পরিচয়ে সে আসবে?

বাবা : মার পরিচয়ে।

ছেলে : যে-মেয়ে স্ত্রীর অধিকার না পেয়েই মা হল......তাছাড়া সমাজ আছে, তারা মেনে নেবে কেন। আমাদের একঘরে করবে। দুর্নামে গ্রামে থাকা দায় হবে।

বাবা : কাল সকালেই আমি হাসিকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

ছেলে : বেশ, যা ইচ্ছে করো। আমাকে এ-ব্যাপারে দায়ী কোরো না। আমি জানব এ-পৃথিবীতে আমার কেউ নেই।

॥ বাইশ ॥

একজন প্রৌঢ় কন্যার হাত ধরে এল মহানগরীতে তার ভবিষ্যৎকে উদ্ভিন্ন করতে। যতদূর মনে পড়ে এটা একটা প্রচণ্ড সংগ্রাম গ্রামীণ সরল বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে শহরের তৈরি-করা নৈতিকতার। অনেক চেষ্টায় উল্টোডাঙ্গার খাল-পোল পেরিয়ে বস্তির ভেতরে থাকবার মতো আস্তানা যোগাড় হল।

পরদিন সকালেই মেয়ের হাত ধরে কাছের হাসপাতালে হাজির হলেন বাবা। টিকিট করতে হবে।

: নাম?

: হাসিরাণী চৌধুরী।

: স্বামীর নাম?

: আঁ।

: নাম বলুন।

: ওর স্বামী তো নেই বাবা।

: মারা গেছে?

: না।

: তবে? ছোকরা রহস্যপূর্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল : বুঝেছি। যান যান। 'এখানে ওসব কেস্ হয় না।'

থতমত খেয়ে বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বাবা। তারপর পা পা করে পিছিয়ে গেলেন। বাইরে এসে পাঞ্জাবির হাতায় ঘাম মুছলেন। বললেন : 'এখানে প্রসব করানো হয় না।'

॥ চব্বিশ ॥

হাসপাতাল।

॥ পঁচিশ ॥

আবার এক হাসপাতাল।

: আমি বলছি। আমি ওর বাবা।

: স্বামীর নাম চাই।

সংগ্রাম নিয়তই তীব্র হয়ে উঠল। বাবা কিছুতেই এই শহরের কাণ্ডকারখানা বুঝতে পারলেন না। আমি ওর বাবা, আমি ওর মাতৃত্বকে স্বীকার করেছি। বাবা ভাবলেন : কী আশ্চর্য সংসার, আমি বাবা হয়ে আমার কন্যাকে মাতৃত্বের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না!

॥ ছাব্বিশ ॥

বাবা বললেন : 'আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকত।'

হাসি অনেকদিন পরে কাঁদতে ভুলে গেছে।

বাবা আবার বললেন : 'আমি হার স্বীকার করব না।'

॥ সাতাশ ॥

বস্তিরই দাইয়ের কাজ-করা প্রৌঢ়া লক্ষ্মীর মাকে পাওয়া গেল। 'পোড়ারমুখ সংসারটাও হয়েছে এমন ধারা—' হাত নেড়ে বলল সে : 'মায়ের চেয়ে এ-পিথিমীতে বড় কে! ভয় নেই বাছা।'

॥ আটাশ ॥

শেষরাতে হাসি তার শিশুপুত্রকে জন্ম দিল।

॥ ঊনত্রিশ ॥

নাতিকে বড় করবার অভিলাষ নিয়ে প্রৌঢ় মাতামহ বড়বাজারে মারওয়াড়ীর গদিতে খাতা-লেখার কাজ নিল। ছোটো সুখ ছোটো দুঃখে খালপোলের তলা দিয়ে অনেক জল বেরিয়ে গেল।

॥ ত্রিশ ॥

দুলাল চার বছরে পড়ল। অহরহ তার কলকণ্ঠে ঘর মুখরিত হয়ে রইল। দাদু 'আজ এটা, কাল সেটা এনে ঘুষ দিয়ে ছোট্ট হৃদয়কে জয় করে ফেললেন। আর এই দুই শিশুর বিচিত্র কর্মকাণ্ড দেখে মাতৃত্বের রসে হাসির তনুমন ভিজে গেল।

॥ একত্রিশ ॥

মাসিক কিস্তিতে একটি সেলায়ের কল যোগাড় হল। জামা-কাপড় সেলাই করে কিছু কিছু রোজগার করতে শিখল হাসি। কয়েকটি দোকানের সঙ্গে বন্দোবস্তও হল।

॥ বত্রিশ ॥

বাবা এক সন্ধ্যায় অভিমানী পুত্রকে সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। হঠাৎ দেখা হাতিবাগানের মোড়ে। নিবারণ বলল : 'ভেবে দেখলাম তোমাদের ছেড়ে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।' বাবা সস্নেহে হাসলেন। বললেন : 'আমি জানতাম।' একমাথা কোঁকড়া চুল, উজ্জ্বল আকাশের মতো চোখ, পাতলা গোলাপী ঠোঁট, দুলালকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিবারণ বলল : 'কী সুন্দর ছেলে তোর হাসি। একে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না।'

॥ তেত্রিশ ॥

নিরাপদ দুর্গে পরিপূর্ণ নারীর মর্যাদায় বিকশিত হয়ে উঠল হাসি। মাথার ওপর বাবা, পাশে ভাই। বাইরের থেকে কোনো ধুলোবালি-খড়কুটো এই সংসারের শান্ত সুষমাকে বিঘ্নিত করতে পারল না। নিবারণ মাস্টারি আর টুই-শানি করে, বাবা খাতা লিখে আর হাসি স্তূপাকার সেলাই করে এই সংসারকে ঠেলে নিয়ে চলল। আমি হলপ করে বলতে পারি : যদি কোনোদিন আপনি এ-সংসারে এসে পড়তেন অস্বাভাবিক ছন্দপতন কিছু বুঝতে পারতেন না। দুলাল আপন অধিকারেই প্রতিষ্ঠিত। দাদুর কাছে বর্ষার মতো অনর্গল আদর আর মামার কাছে পড়াশোনার শাসন পেয়ে সে আরো দশটা শিশুর মতো বেড়ে উঠতে লাগল।

॥ চৌত্রিশ ॥

বাবার অভাব কোনোদিন দুলাল বুঝতে পারেনি। দাদুকেই সে মার অনুকরণে বাবা বলে ডাকতে অভ্যস্ত হয়েছিল।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

দিন কাটল।

॥ ছত্রিশ ॥

দুলাল মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে পালায়। বাইরে আশেপাশে নিজের সঙ্গী-সাথীর সন্ধান পায়। একেক দিন বিচিত্র খবর বিচিত্র প্রশ্ন নিয়ে সে দাদুর ওপর হানা দেয়। মামাকে চিন্তিত করে। মাকে ব্যস্ত করে। দুলাল ছ' বছরে পড়েছে। ওকে বাড়িতে আটকানো যায় না।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

একদিন দুলাল চোখ-মুখ আরক্ত ধূলিধূসর হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে মাকে প্রশ্ন করল : 'আমার বাবা কোথায়? হাসি শিউরে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল। ছেলে ছাড়ে না, মাকে আক্রমণ করে, ওর এক প্রশ্ন। 'কি হয়েছে?' নিবারণ গোলমাল শুনে কাছে এল। 'মামা, আমার বাবা কোথায়?' আবার প্রশ্ন দুলালের।

নিবারণ এক মুহূর্ত বিচলিত হয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা না-করে কঠিন গলায় বলল : 'তোমার বাবা মারা গেছে।' দুলাল কাঁদল না, নড়ল না, শুধু বলল : 'ও।'

॥ আটত্রিশ ॥

আর কোনোদিন জানতে চায়নি ছেলেটি। মৃত্যুর ব্যাপারটা সে জানত। কিন্তু এর পর থেকে কেমন সে ভাবুক হয়ে উঠল। বড় বেশি উদাস আর অন্যমনস্ক।

॥ উনচল্লিশ ॥

দুলালের জিজ্ঞাসার উৎসমুখকে এই-ভাবে চিরতরে পাথর-চাপা দিয়ে বন্ধ করে দেবার জন্যে দাদার উপর খুশী হয়নি হাসি। সে কিছু বলেনি। সেদিন রাত্রে সে ঘুমোতে পারেনি। অনেকদিন পর সে কেঁদেছিল। সে-কান্নার সাক্ষী কেউ ছিল না।

॥ চল্লিশ ॥

হাসি কুড়ি বছরে পা দিল। মেয়েদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। এই সময়ে হাসির শরীরে পরিণত সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে উঠল। রাস্তা-পথে পথিকচোখই ওকে সচেতন করে তুলল। অনেক আলো, অনেক রঙ ছড়িয়ে জীবন মোহের মতো দাঁড়াল বাহু বিস্তার করে। দুধারের প্রলোভনকে পিছনে যেতে দিল হাসি। কেউ কেউ ভালোবাসার অঞ্জলি ভরেও কাছে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্রয় দিতে পারেনি হাসি। দাদারই এক পরিচিত অধ্যাপক যুবক সব জেনেও দেবদূতের মতো এসেছিল জীবনে। কেঁদে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল হাসি। জীবন তার কাছে দীর্ঘ লেগেছিল আর ভবিষ্যৎ কালি-লেপা। দুলালকে অবাক করে দিয়ে বুকে আঁকড়ে ধরে মাতালের মতো সে বলেছিল : 'যদি বাঁচতে হয়, খোকা, তোর জন্যেই আমি বাঁচব।'

॥ একচল্লিশ ॥

বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে দাদা তাকে আর বিরক্ত করেনি। বাবাও না।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

পৃথিবী গোল আর-একবার প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যেই ধরমতলার ব্যস্ত-সমস্ত ফুটপাথে দুজনের দেখা। মনে হল কুরুক্ষেত্রের বিরাট সমরের পর দুজনে মুখোমুখি দেখা। কেউ কোনো কথা বলতে পারল না।

—'নিবারণ!'

—'সুকান্ত!'

'ভীষণ রোগা হয়ে গেছ তুমি।' সুকান্ত বলল, তারপরও ওর ঠোঁট কাঁপতে লাগল, মুখময় কেমন বিচিত্র আলোছায়া খেলে গেল।

'ভালো আছো?' নিবারণ বলল। আশ্চর্য তার কণ্ঠে কোনো উগ্রতা নেই।

'ক—ত দিন।' আরও কি বলতে যাচ্ছিল সুকান্ত, ও খুব পরিশ্রম করছিল, কষ্ট হচ্ছিল ওর শরীরে। দম নিয়ে বলল : 'গ্রাম ছেড়ে হঠাৎ কোথায় চলে গেলে। এই দীর্ঘ বছর তোমাদের কত খুঁজেছি......'

'কেন?'

হঠাৎ সুকান্ত নিবারণের হাত জড়িয়ে ধরল : 'আমাকে ক্ষমা কর।'

'ক্ষমা।' নিবারণ বলল : 'আমি তো বিচারক নই।'

এক পকেটমারকে ধরতে ভীষণ সোর-গোল তুলে রাস্তার লোকেরা তাড়া করছিল।

'একটা কথা জিগ্যেস করব, রাগ করবে না...,' সুকান্ত বলল।

'করো।' নিবারণ বলল।

'হাসি......'

নিবারণ আশ্চর্য-চোখে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবল। তারপর বলল : 'ভালো আছে।'

সুকান্ত মূক।

'আমি আজ চলি ভাই, কাজ আছে—' নিবারণ পা বাড়াল।

'দাঁড়াও।'

॥ তেতাল্লিশ ॥

নিবারণ বলল : 'হাসি কিছুতেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি নয়।'

সুকান্ত মাথা নিচু করে রইল।

ময়দানে ধূসর বিকেল। একটুও হাওয়া নেই।

'হাসি যদি এই জীবনেই শান্তি পেয়ে থাকে...' নিবারণ থেমে গেল। সুকান্তের পাথরের মতো চোখ ওকে থামিয়ে দিল। তারপর নিবারণ ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করল। তারপর—'বেশ। তোমাকে নিয়ে যাব। তুমি যদি ওর সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে পারো—'

॥ চুয়াল্লিশ ॥

মাঝখানের ঘরের দুদিকের দরজা বন্ধ। নিবারণই বাইরের থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। ধারে-কাছে বাবা দাদা কেউই নেই। ঘরের ভেতরে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। ওই অন্ধকার যেন মৃত সন্তান, নীরবে ঘরের দুটি প্রাণী তাকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছে।

—'হাসি।'

উত্তর নেই।

—'হাসি।'

—'কি?'

কোথা থেকে দুলাল হা হা করে ছুটে এল : 'মা—ও মা—'

দুলাল দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়েছে। হাসি ওকে কাছে টেনে নিল।

দুলাল বলল : 'উনি কে মা?'

হাসি যেন হেরে যাবে, তার সমস্ত শক্তি যেন খরচ হয়ে যাবে। সুকান্ত অনিমিষ তৃষ্ণায় চেয়ে আছে ওর দিকে, দুলালের দিকে।

হাসি বলল : 'উনি তোমার বাবার বন্ধু, ওঁকে প্রণাম করো—'

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

নিবারণ একবার বলল : 'ওকে ফিরিয়ে দিলি!'

হাসির সারা মুখ শাদা। মনে হল দীর্ঘরোগভুগে উঠেছে। আস্তে বলল : 'ওর বাবা যে মারা গেছে, দাদা।'

জৈমিনির 'আধুনিক গান' প্রসঙ্গে

(১)

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ৭ম সংখ্যা 'অমৃতে' 'পূর্ব-পক্ষে' জৈমিনি আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছেন,—আমি তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি সংগত কারণেই।

"আধুনিক গানের মতো এমন অধঃপতিত সংগীতকলা ভূ-ভারতে আর একটিও নেই",—এই কথার মধ্য দিয়ে জৈমিনির ঘৃণা প্রকটরূপে প্রকাশিত। এ ঘৃণা কোন বিশেষ সংখ্যক আধুনিক বাংলা গানের প্রতি নয়, এ ঘৃণা তাঁর সমস্ত আধুনিক বাংলা গানের উপর। এইখানেই আমার বিরোধিতা। আধুনিক গান যে কত উচ্চস্তরের হতে পারে তার উদাহরণ ভুরি-ভুরি।

নীল আকাশের নীচে, স্বরলিপি, ডাক হরকরা, দুই ভাই, কুহক, বেরী সাহেবের মুন্সী, পৃথিবী আমারে চায়, শুন বরনারী প্রভৃতি কথাচিত্রের সমস্ত আধুনিক গানগুলি বিচার করলে দেখা যাবে যে, এগুলি কি কথার দিক থেকে, কি সুরের দিক থেকে কত উচ্চাঙ্গের। এছাড়া "আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে", আমি জন্মে শুধু কান্না নিলাম", "উজ্জ্বা উরে", "ও দয়াল বিচার করো", "বাঁশে যদি ঘুণ ধরে", "বাঁশি কেন গায়" ইত্যাদি প্রচুর—প্রচুর গান রয়েছে যার উল্লেখ করতে গেলে আমার বক্তব্য হয়তো ভিড়ের চাপে অস্পষ্ট থেকে যাবে। যাই হোক এ সব গানের কথা ও সুর বিচার করে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জৈমিনি যা বলেছেন তা অসমীচীন। আধুনিক বাংলা গানের মধ্যে এই ধরণের গানই বেশী। এই সব গানের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বিকৃতরুচির পরিচয় নেই। তাই এ সব গান যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা কখনোই "অকবি", "কু-কবি"র আওতায় পড়েন না।

তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, খারাপ, চটুল গানও বাংলায় রয়েছে। তার বাহুল্য যাতে না হয় তার চেষ্টা করাও অবশ্য-কর্তব্য সু-কবিদের। রূপোর কাছে তাঁদের রুচিকে যাতে বিকিয়ে না দেন তার জন্য অনুরোধ আমরা নিশ্চয়ই করবো।

কিন্তু জৈমিনি সমস্ত আধুনিক বাংলা গানকেই নিম্নস্তরের সঙ্গীত-কলা বলেছেন। তিনি বাংলা গানকে হিন্দী গানেরও নীচে নামিয়েছেন। সত্যিই কি তাই? মোটেই নয়। বাংলা গান অধঃপতিত হতে চলেছে বললে হয়তো ঠিক বলা হতো। কিন্তু অধঃপতিত হয়েছে এ কথা বলা মোটেই যুক্তিসংগত নয়।

নমস্কারান্তে,

শ্রীনারায়ণ ঘোষ

বহরমপুর

(২)

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়, গত অমৃতের ৭ম সংখ্যায় (২য় বর্ষ) শ্রীজৈমিনি তাঁর স্ববিভাগে বাংলা আধুনিক গান ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত মতামত পেশ করেছেন, তা সত্যি প্রশংসার্হ। আধুনিক বাংলা গান সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য।

বর্তমান সমাজ এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সমাজের দেহের কোন এক দিকে যদি ক্ষত সৃষ্টি হয় তবে তা সমগ্র সমাজের দেহে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়বে। সংক্রামক রোগের মত এই হাল্কা মেজাজের ক্ষণস্থায়ী আধুনিক গান এই সমাজকে ক্রমশঃ পঙ্গু ও বিপর্যস্ত করে তুলছে। মনে হয় একটা মৃত প্রাণী রাস্তার পাশে পড়ে আছে আর তার ওপর পরম উল্লাসে আধুনিক গান নামক কীটেরা দংশন করে চলেছে। এর যেন শেষ নেই। বর্তমান এই মহামারী ব্যাধি থেকে মুক্তি না পেলে সমাজে ঘোর বিপর্যয় দেখা দেবে।

বর্তমান আধুনিক গানের কলি কানের কাছে শুনলে লজ্জা পেতে হয়। কোন মতে কয়েকটি শব্দ বসিয়ে দিতে পারলেই হল। নেই তার সুর, না আছে তাতে ভবিষ্যতের আশার সংকেত। এসব বিচ্ছিরি কথার গান সুকুমারমতি বালক-বালিকারা গেয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ তাদের কোথায়? যদিও তাদের দোষ নেই। যা দেখবে তাই শিখবে। এই সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্তি না পেলে বাংলার সামাজিক অবস্থা কিরূপ হবে, তা কি আমরা ভেবে দেখেছি?

মানুষ গান গায় কি সাময়িক আনন্দের জন্য না মনের সুপ্ত বেদনা প্রকাশের জন্য? আধুনিক বাংলা গানের স্থায়িত্ব কতটুকু? অনাগত বাংলা অথবা ভারতের কাছে এর দান কতটুকু? ভবিষ্যৎ ভারতকে কি দেওয়ার মত বাংলার কিছুই নেই? বাংলার অতীত ঐতিহ্যময়ী। সুতরাং দেওয়ার মত অনেক কিছুই আছে। কিন্তু তথাপি আমরা পিছিয়ে পড়ে আছি কেন?

আমি আশা করি বাংলার শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে অগ্রণী হবেন। আন্তরিক নমস্কার গ্রহণ করবেন।

ইতি

শ্যামলেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী

যাদবপুর, কলিকাতা।

(৩)

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনার 'অমৃতের' গত সংখ্যায় (৭ম সংখ্যা, ৭ই আষাঢ়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) শ্রীজৈমিনি আধুনিক সঙ্গীতের যে বিষময় দিকটা আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত করেছেন সেজন্য তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। বাস্তবিক, আধুনিক গানের চটুকদারী কদর্যতা যেভাবে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাসকে বিষিয়ে তুলেছে তাতে প্রকৃত সঙ্গীতানুরাগীদের ভীষণ উদ্বিঘ্ন করে তুলেছে, আর সেই সঙ্গে বাংলাদেশের সংগীত-রাজ্যেও মস্ত বড় ভাঙনের সৃষ্টি করেছে। এর প্রতিকার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা যে জিনিসটা করতে যাচ্ছি তার পরিণাম ভয়াবহ জেনেও আমরা তা থেকে বিরত হচ্ছি না। এই জিনিসটা যে কেবল সংগীতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ তা নয়। (আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান—জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই আমরা যেন কী এক অন্ধ মোহের যাদুমন্ত্রে কাজ করে চলেছি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে ত্রুটি রয়েছে, এই শিক্ষা যে ছাত্রের বিকাশলাভের পথে অন্তরায় তথা সমগ্র জাতির প্রগতির প্রতিবন্ধক তা আমরা ছাত্ররা যেমন বুঝি, তেমনি যাঁরা শিক্ষা দেন সেই শিক্ষকরা এবং অভিভাবকরাও সমানভাবে উপলব্ধি করেন। অথচ আশ্চর্যের কথা, বর্তমান শিক্ষার এই কুহেলিকাময় বিষময় ফল জেনেও আমরা প্রায় বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছি, দিনের পর দিন এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা দিচ্ছেন — অভিভাবকরাও নির্বিচারে তা গ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞানের সর্ববিধ্বংসী পরিণাম নিজে জেনেও বিজ্ঞানী কি সৃষ্টিনাশক বোমা তৈরী হতে বিরত হয়েছেন?) যৌন আবেদনে ভরা কুরুচিপূর্ণ সিনেমা-ছবির পরিচালক, কিম্বা অভিনয়ে অংশ-গ্রহণকারীরা কি দেশের অল্পবয়স্ক বালক-বালিকার উপর এর সুদূর-প্রসারী মারাত্মক প্রভাব বুঝতে পারেন না? যে শিল্পী গান রচনা করেন, আর সেই গীতিকার কিম্বা সুরকার—এঁরা কি তাঁদের কৃতকর্মের ফলাফল সম্পর্কে সচেতন নন? সামান্য অর্থের লোভে এবং ঠুনকো খ্যাতির মোহে এঁরা দেশের যে কত বড় সর্বনাশ করে চলেছেন তা বুঝতে পেরেও এঁরা কি এতটুকু লজ্জিত? আমার মতে, এঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে আমাদেরই—আমরা যাঁরা গান শুনি, সিনেমা যাই, ইস্কুল-কলেজে পড়ি আর অর্থহীন জঞ্জালময় শিক্ষার বোঝা বয়ে চলি। অবশ্য দেশের সরকার এ বিষয়ে আগ্রহী হলে আমরা নিজেদের অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করবো ইতি—

আশুতোষ দাস

তমলুক।

ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

মর্মর-স্বপ্ন দিলওয়ারা

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজস্থানের আবু রোড স্টেশন থেকে আমাদের বাসখানা যখন পাহাড়ের বুক চিরে কখনও সর্পিল আঁকাবাঁকা, কখনও বা চক্রাকার পথে অনেকগুলো বিপজ্জনক বাঁক অতিক্রম করে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চার হাজার ফুট উঁচুতে আবু পাহাড়ে এসে থামলো তখন এক অনাস্বাদিতপূর্ব রোমাঞ্চ আর বিস্ময়ের অনুভূতিতে মনটা আমার আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। পাহাড় কেটে কেটে পথ করে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় এমন সুরম্য শহরের পত্তন করেছে মানুষ—আর মানুষের বাসোপযোগী করতে গিয়ে তাকে কত সুখ-সুবিধা ও সুযোগেরই না ব্যবস্থা করতে হয়েছে এখানে। ছোট ছোট আঁকা-বাঁকা সরু পাহাড়ী রাস্তা কোথাও ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে, আবার কোথাও বা খাড়াই ওপরে উঠে এসেছে। বাজার অঞ্চলে পথের দু'ধারে সারি সারি দোকান। কি নেই শহরে? দোকান, বাজার, খেলার মাঠ, হোটেল, রাজপ্রাসাদ থেকে শুরু করে নয়নবিমোহন হ্রদ নক্কি তালাও পর্যন্ত সবই আছে। সুউচ্চ পর্বতশীর্ষে ছবির মত সাজানো শহর। মানুষের হাতে প্রকৃতির পরাজয়ের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে এই সব শৈলাবাস। ভেবেছি আর বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু তখন জানতুম না যে, এর চেয়ে অনেক বড় বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে আবু পাহাড়ে।

দিলওয়ারা মন্দিরের কথাই বলছি। জৈনদের অন্যতম পবিত্র তীর্থভূমি আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দির। শিল্প-ভাস্কর্যের উৎকর্ষের মহত্তম নিদর্শনরূপে এই জৈন মন্দিরগুলি যুগ যুগ ধরে বিশ্বের সকল মানুষের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে।

ভারতীয় আর্যরীতির স্থাপত্যের অনুসরণে কয়েক যুগ ধরে উত্তর ভারতে মন্দির নির্মাণের যে ঢেউ উঠেছিল তাতে একদিকে যেমন বহু হিন্দু মন্দির গড়ে উঠেছিল, তেমনি পাশাপাশি বহু জৈন মন্দিরেরও নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য উত্তর ভারতে এই হিন্দু ও জৈন মন্দিরশ্রেণীর মধ্যে গঠনশৈলীর দিক থেকে খুব একটা বড় রকমের ব্যবধানের সীমারেখা টেনে এ দু'য়ের মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য চিহ্নিত করা যায় তা নয়। বরং বলা যায় মন্দির নির্মাণ ব্যাপারে জৈনরা হিন্দুরীতিরই অনুসরণ করেছিল। উত্তর ভারতে যে সময়ে ভুবন-মনোমোহিনী হিন্দু মন্দিরগুলি গড়ে উঠেছিল একের পর এক, প্রায় সেই সমসাময়িক কালেই রাজস্থানে ও গুজরাটে গড়ে উঠছিল জৈন মন্দিরগুলি।

তবে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে হিন্দু মন্দিরের সঙ্গে জৈন মন্দিরের পার্থক্য আছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, জৈন তীর্থঙ্করদের বসবাসের জন্য স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে জৈন মন্দিরগুলির অভ্যন্তরেই। এজন্য জৈন মন্দিরের চারপাশে প্রশস্ত স্থানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু হিন্দু মন্দিরের ক্ষেত্রে ঠিক এরূপ কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না।

হিন্দু মন্দিরের সঙ্গে আর একটি পার্থক্য এই যে, জৈন মন্দিরগুলি সাধারণতঃ গড়ে উঠেছে সুউচ্চ পাহাড়ের বুকে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে জৈনধর্মের মূলতত্ত্বে ফিরে যেতে হয়। জৈনধর্মে মুক্তির উপায়স্বরূপ বলা হয়েছে, শুধু ব্রহ্মচর্য পালনই যথেষ্ট নয়—সমস্ত পার্থিব প্রলোভন থেকে দূরে থেকে নির্জন সাধনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই ধর্মে। তাই জৈন শ্রমণরা সাধনার আদর্শস্থান রূপে বেছে নিয়েছিলেন পাহাড়ের চূড়াকে। এছাড়া জৈনধর্মে পূর্ণ মোক্ষলাভের সর্তস্বরূপ আরও যে সকল কঠোর বিধি পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন অহিংসা, অনাসক্তি হবে জীবের ব্রত এবং জগতের সর্বকিছু, এমন কি বেশবাস পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে—এ সমস্ত সম্ভব এই পাহাড়ের নির্জনতার মধ্যেই। নগ্নতা নিয়ে অনেক সময় অনেক কথা উঠেছে। কিন্তু জৈন-ধর্মমতে নগ্নতা জাগতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে পরিপূর্ণ অনাসক্তির ভাবই প্রকাশ করে। বস্তুতঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত দেহকে সম্পূর্ণ আবরণমুক্ত রাখাই ছিল জৈন ধর্মাচরণের একটি অত্যাবশ্যক বিধি। অনেক জৈন মন্দিরে জৈন তীর্থঙ্করদের নগ্নমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। নিরাবরণ মূর্তি দ্বারা বিশ্ব-সংসার, সমাজ-ব্যবস্থা ও সংসার-জীবনের সকল সাধারণ মূল্যবোধ সম্পর্কে অনাসক্তিই প্রকাশ করা হচ্ছে।

যাই হোক, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই জৈনরা পর্বতশীর্ষে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। অনেক সময় একাধিক মন্দির নির্মিত হয়েছে পাহাড়ের এত উঁচুতে যেখানে মানুষের পক্ষে গমনাগমন এক রকম দুঃসাধ্য বলা যায়। দুর্গম পথে, দুস্তর বাধা পেরিয়ে মালমশলা, সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এসে কেমন করে পাহাড়ের বুকে একটির পর একটি বিশাল রমণীয় মন্দির নির্মিত হয়েছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। মনে পড়ছে এমনি বিস্মিত হয়েছিলুম জুনাগড়ে গিয়ে। সেখানে গিরনার পাহাড়ের বুক কেটে তৈরী পাহাড়ের সিঁড়ির ধাপ ভেঙেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, আর ভেবেছি এর শেষ কোথায়। কিন্তু মনের সমস্ত ক্লান্তি, দেহের সমস্ত শ্রান্তি দূর হয়ে গেছে যখন দেখেছি গিরনার পাহাড়ের সুউচ্চে স্তরে স্তরে সাজানো জৈন মন্দিরমালা। ভক্তি ও ধর্মবিশ্বাস মানুষের দেহে-মনে কি প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার করতে পারে গিরনার পাহাড়ের জৈন মন্দিরশ্রেণী তার
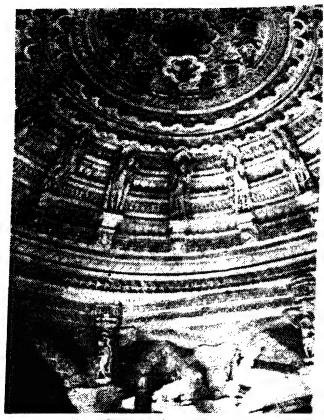
দিলওয়ারায় জৈমিনাথ মন্দিরের গোলাকৃতি মণ্ডপের ভিতরের ছাদ

প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ১২,০০০ সিঁড়ির ধাপ ভেঙে যেখানে পৌঁছুতে মানুষকে নাজেহাল হতে হয়, সেখানে কি অধ্যবসায়, মনোবল ও ভক্তির জোরে বিশ্বের বিস্ময় এই জৈন মন্দিরগুলি গড়ে উঠেছিল ভাবতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি।

জৈন মন্দিরগুলির আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণতঃ এক জায়গায় অনেকগুলি মন্দির গোষ্ঠীবদ্ধভাবে নির্মিত হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি, সংসারের কর্মকোলাহল থেকে দূরে কঠোর ব্রতপালন ও সাধনার ক্ষেত্র গড়ে তোলাই ছিল জৈন শ্রমণদের লক্ষ্য, তাই সুউচ্চ পর্বতের পবিত্র নির্জনতার মধ্যে এক এক স্থানে গড়ে উঠেছিল এক একটি মন্দির উপনিবেশ।

গুপ্ত রাজাদের কয়েক শতাব্দীব্যাপী শাসনের ফলে ভারতে মন্দির-নির্মাণ-শিল্পে যে অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছিল তারই ফলে পরবর্তীকালে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজস্থান ও তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে একটা নতুন স্থাপত্যরীতি প্রবর্তনের বিরাট জোয়ার এসেছিল, আর তারই টানে গড়ে উঠেছিল অজস্র মন্দির। অবশ্য এই সমস্ত মন্দিরের অনেকগুলিই মুসলমান অত্যাচারের কবল থেকে রেহাই পায় নি। মুসলমান অভিযানে কত মন্দিরই না ধ্বংস হল, ভাস্কর্যের কত সহস্র সূক্ষ্ম নিদর্শন বুকে-ধরা কত মন্দির-স্তম্ভ অপহরণ করে গড়ে উঠল দিল্লী-আফগানিস্থানের কত মসজিদ। এই সমস্ত মসজিদের স্তম্ভে স্তম্ভে নিপুণ কারুকর্ম থেকে উপলব্ধি করা যায় গুপ্তোত্তর যুগে হিন্দু-ভাস্কর্য উন্নতির কোন্ স্তরে এসে পৌঁছেছিল।

চতুর্থ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের একেবারে গোড়াতেই উত্তর ভারতে গুপ্ত রাজাদের শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল। যদিও গুপ্ত রাজাদের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক আধিপত্য পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্তই মাত্র বিস্তৃত ছিল, কিন্তু শিল্পরসিক গুপ্ত রাজারা যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশৈলী, যে শিল্পধারার প্রবর্তন করেছিলেন তার প্রবাহ প্রায় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। গুপ্ত রাজাদের প্রকৃতি-প্রেম এবং শিল্প ও সৌন্দর্যপ্রীতি প্রতিফলিত হয়েছিল যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে, তেমনি স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও।

এরই সার্থক প্রকাশ দেখতে পেয়েছি রাজস্থানের আবু পাহাড়ে জৈন মন্দিরগুলির স্তম্ভে, খিলানে, ভিতরের ছাদের সূক্ষ্ম, জটিল ও চারু শিল্পকর্মের মধ্যে।

একাদশ শতাব্দীতে গুজরাটের মন্দিরশিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল যেমন তদানীন্তন বহু বিত্তশালী বণিক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়, একাদশ শতাব্দীতে রাজস্থানও তেমনি এই ধরনের বণিক সম্প্রদায়ের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল, যারা নিজেদের ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিল মন্দিরের মধ্যে। সুতরাং বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অঞ্চলে মন্দির-স্থাপত্যের বিকাশের মূলে যেমন রাজ-পরিবারসমূহের আনুকূল্য লক্ষ্য করা গেছে, আবু পাহাড়ের দিলওয়ারায় অবস্থা কিন্তু তার বিপরীত। এখানকার মন্দির নির্মাণের পিছনে ছিল সাধারণ মানুষের উদ্যোগ।

অর্বুদ বা আবু পাহাড় সুপ্রাচীন কাল থেকেই পবিত্রভূমি বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে। পুরাণেও এর উল্লেখ রয়েছে। জনশ্রুতি এখানে নাকি একদা বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ছিল। এখনও এখানে তার স্মৃতি অক্ষুন্ন রয়েছে দেখতে পাই তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরের মধ্যে। বশিষ্ঠ মুনির সঙ্গে আবু পাহাড়ের যে যোগসূত্রটুকু কিংবদন্তীর মধ্যে পাওয়া যায় তা থেকে আবু পাহাড়ের উৎপত্তির যে কাহিনী জানা যায় তা রোমাঞ্চকর। গিরিরাজ হিমালয়ের গুহায় গুহায় কঠোর তপস্যা করে চলেছেন বশিষ্ঠ মুনি। যুগের পর যুগ অতীত হতে চলল। অবশেষে একদিন তাঁর তপস্যার অবসান হল। বশিষ্ঠ মুনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলেন। হিমালয় ত্যাগ করে চললেন তিনি। কিন্তু তপোভূমি ত্যাগ করার পূর্বে দীর্ঘকালের পরিচয়ের বন্ধনে অন্তরঙ্গ গিরিরাজের একটি স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার বাসনা হল তাঁর। হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ তিনি উঠিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। ব্রহ্মার কাছে মুনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা বললেন তথাস্তু। বশিষ্ঠ মুনিও সেইমতই কাজ করলেন। বশিষ্ঠ মুনির সঙ্গে আনা সেই শৃঙ্গটিই

এই আব্‌ু পাহাড়। আব্‌ু পাহাড়ে বস্তুপালের মন্দিরেও লেখা আছে, অর্বুদশেখর হিমালয়ের পুত্র ও গৌরীর ভ্রাতা। অর্থাৎ, অর্বুদকে হিমালয়েরই একটি অংশ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

আব্‌ু পাহাড়ের প্রধান মন্দিরগুলি গড়ে উঠেছে দিলওয়ারা অঞ্চলেই; আর আব্‌ু পাহাড়ের খ্যাতিও তার এই ভুবন-আলো-করা স্ফটিকে গড়া মন্দির উপনিবেশের জন্যেই। বস্তুতঃ 'দিলওয়ারা' শব্দটির অর্থই হচ্ছে 'দেউলের রাজ্য'। দিলওয়ারার প্রধান প্রধান মন্দিরগুলির নির্মাণকাল ধরা হয় মোটামুটিভাবে দুশো বছর—১০৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১২৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ঋষভনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি জৈন তীর্থঙ্করদের নামে উৎসর্গীকৃত মন্দির নিয়েই দিলওয়ারা মন্দির উপনিবেশ গড়ে উঠেছে।

দিলওয়ারা গোষ্ঠীর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির ঋষভনাথের মন্দির। চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যে ঋষভনাথ ছিলেন প্রথম তীর্থঙ্কর। এই কারণে তিনি আদিনাথ নামেও অভিহিত। ১০৩১ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন বিমল শাহ। তিনি ছিলেন গুজরাটের একজন বণিক, মতান্তরে গুজরাটের সোলাঙ্কি রাজবংশের অন্যতম রাজা প্রথম ভীমদেবের অমাত্য।

মন্দিরটির বহিরঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোন স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না, কিন্তু অন্তরঙ্গ ভাস্কর্যশোভায় এ ঝলমল করছে। আগাগোড়া শ্বেত পাথরে তৈরি এই মন্দিরটি জৈন শিল্পকলার অন্যতম প্রাচীন ও পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন। মন্দিরের মধ্যে ঋষভনাথ বা আদিনাথের একটি বৃহৎ মূর্তি আছে। মূর্তিটি ব্রোঞ্জের, তবে এর চোখদুটি বহুমূল্য পাথরে তৈরি।

দৈর্ঘ্যে ৯৮ ফুট ও প্রস্থে ৪২ ফুট মন্দিরটির চারিদিক ঘিরে রয়েছে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠের সংখ্যা ৫০টিরও বেশি। প্রকোষ্ঠগুলিতে রয়েছে জৈন তীর্থঙ্করদের মর্মর-মূর্তি। মন্দিরের প্রবেশপথের সামনে পর পর রয়েছে কয়েকটি শ্বেত পাথরের হাতী। প্রতিটি হাতীর পিঠে বিমল শাহের মূর্তি। প্রধান মন্দিরের সামনে একটি গম্বুজাকৃতি মণ্ডপ। ওপরে গোলাকৃতি ছাদ—চাঁদোয়ার আকারে। মণ্ডপটির অবলম্বন অনেকগুলি স্তম্ভ। মণ্ডপের চাঁদোয়াটি রয়েছে ১৬টি খিলানকে অবলম্বন করে। খিলানগুলিতে রয়েছে দেবীমূর্তি। সমস্ত কিছুই শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত। প্রত্যেকটি স্তম্ভ, খিলান, দেওয়াল, মণ্ডপের ভিতরের ছাদ, এমন কি জীবজন্তুর মূর্তিগুলি পর্যন্ত অতি উচ্চাঙ্গের ভাস্কর্য, কারুকার্য ও সূক্ষ্ম খোদাইয়ের কাজে অলংকৃত।

দিলওয়ারায় আদিনাথ মন্দিরের প্রবেশপথ

দিলওয়ারায় ঋষভনাথের মন্দিরের বিপরীত দিকে আর একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরটি দ্বাবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। নেমিনাথ অরিষ্টনেমি নামেও পরিচিত। বস্তুপাল ও তাঁর ভাই তেজপাল ১২৩২ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এঁরা দুই ভাই গুজরাটের রাজা বীরধবলের অমাত্য ছিলেন।

অকুণ্ঠিত অর্থব্যয়ের অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে নেমিনাথ মন্দিরের প্রতি স্তম্ভে, খিলানে, মণ্ডপে, প্রবেশদ্বারে সর্বত্র। এই মন্দির নির্মাণের সূত্রেপে জৈনদের মধ্যে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। মন্দির নির্মাণে কেন যে এরূপ বিপুল অর্থ ব্যয় করেছিলেন তেজপাল ও বস্তুপাল, তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই কাহিনীর মধ্যে।

কথিত আছে, এই দুটি ভাই তাঁদের জীবৎকালে অপরিমিত অর্থ ও ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন। এই বিপুল অর্থ কিভাবে নিরাপদে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে দুভায়ের দুশ্চিন্তার আর অবধি ছিল না। তাঁরা আহার-নিদ্রা পর্যন্ত বিস্মৃত হলেন। দিনরাত ঐ একই সমস্যার সমাধানে দুভায়ের পরামর্শ চলে। কিন্তু এ সমস্যার কোন সমাধান তাঁদের বুদ্ধিতে কিছুতেই আসে না। তেজপালের পত্নী অনুপমা দেবী তাঁদের এই উৎকণ্ঠার কারণ ক্রমে অবগত হলেন। তিনি দুই ভাইকে এক পথের সন্ধান দিলেন। পন্থাটা একটু অভিনব বৈকি। বললেন, এই সমস্ত অর্থ ও ধনসম্পদ এমনভাবে পর্বতশীর্ষে রক্ষা করতে হবে যাতে তা সর্বদাই সকলের দৃষ্টিগোচর থাকে। তাহলে ঐ ধনসম্পদ অপহৃত হওয়ার আশংকা আর থাকবে না। তেজপাল ও বস্তুপাল ধাঁধায় পড়লেন। অনুপমা দেবীর ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে তাঁরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। অনুপমা দেবী তখন তাঁর পরিকল্পনার কথা খুলে বললেন। বললেন, এই অর্থ দিয়ে তাঁরা যেন গিরনার, শত্রুঞ্জয় ও আব্‌ু পাহাড়ে মন্দির নির্মাণ করেন। অনুপমার পরামর্শমতই বস্তুপাল ও তেজপাল আব্‌ু পাহাড়ে এই মর্মরস্বপ্ন রচনা করলেন। অপর পর্বত দুটিতেও তাঁদের নির্মিত মন্দির বিরাজ করছে।

নেমিনাথ মন্দিরের পরিকল্পনাও মোটামুটি ঋষভনাথ মন্দিরের মতই।

দুটি মন্দিরই আগাগোড়া শ্বেত পাথরে তৈরি। দুটি মন্দিরেরই সামনে স্তম্ভ-সমন্বিত গোলাকৃতি মণ্ডপ। ভাস্কর্য, অতি সূক্ষ্ম কারুকৃতি ও মণ্ডনশিল্পের অজস্র বিস্ময়কর নিদর্শন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে উভয় মন্দিরেরই স্তম্ভে, খিলানে, মণ্ডপের ভিতরের ছাদে। ভারতীয় ভাস্কর্য চরম উৎকর্ষ ও পরিণতি লাভ করেছে দিলওয়ারার এই মন্দির দুটির মধ্যে।

তীর্থঙ্কর নেমিনাথের এক বিশাল মূর্তি রয়েছে মন্দিরের অভ্যন্তরে। নেমিনাথ মন্দিরের বৈশিষ্ট্য এর গোলাকৃতি মণ্ডপের ভিতরের ছাদের কেন্দ্রস্থলের প্রলম্বটি। পণ্ডিতপ্রবর ফার্গুসন বলেছেন, দেখলে মনে হয় এই প্রলম্বটি যেন একটি নিরেট প্রস্তর মাত্র নয়, যেন উজ্জ্বল স্ফটিকবিন্দুগুলি প্রলম্বিত হয়ে আছে একটি কেন্দ্রবিন্দু থেকে।

মন্দিরের উন্নত শিখর মানুষের ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষার প্রতীক বলে কল্পনা করা যেতে পারে। মানুষ যেন তার আকাঙ্ক্ষাকে ঊর্ধ্বে দেবতার পানে মেলে ধরেছে, আর মন্দিরের শিখর ক্রমান্বয়ে সরু হ'তে হতে যেখানে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে এসে শেষ হয়েছে, মানুষে-দেবতায় যেন মিতালী হয়েছে সেইখানেই।

ভক্ত যেমন ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আকুল, ভক্তের ভগবানও তেমনি মানুষের মধ্যেই নিজের দেবত্বের আস্বাদন করতে ব্যাকুল। তাই তিনি মানুষের অন্তরে প্রবেশের জন্যে ঊর্ধ্বলোক থেকে অবতরণ করেন। দিলওয়ারার নেমিনাথ মন্দিরের এই প্রলম্বটি দেবতার এই আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই প্রতীকের মধ্যে দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে ভগবান যেন পবিত্র দেবভূমি থেকে নেমে এসেছেন এই ধূলার ধরণীতে মানুষের সঙ্গে মিলনের বাসনায়।

খাজুরাহো ও ভুবনেশ্বরের মন্দির-সমূহের নির্মাণপদ্ধতিতে মন্দির-স্থাপত্যের যে রীতি লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তীকালে ভারতীয় আর্য স্থাপত্য-রীতিতে তার একটা মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। খাজুরাহো ও ভুবনেশ্বরে স্থাপত্যরীতিতে প্রধানতঃ নির্মাণশৈলীর ওপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল পাথরের বুকে সূক্ষ্ম খোদাইয়ের কাজের ওপর। এখানে স্থাপত্যরীতির ওপর ভাস্কর্য ও মণ্ডন-শিল্পের জয় সূচিত হয়েছে। মহীশূরে হয়শল রাজাদের শাসনকালে, সোমনাথপুরের কেশবমন্দিরে, শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুমন্দিরে, হালেবিদে হয়শল রাজা বীরনরসিংহদেব নির্মিত অসমাপ্ত শিবমন্দিরে এই পরিবর্তিত রীতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ভাস্কর যেমন হাতীর দাঁতের ওপর বা কাঠের ওপর সূক্ষ্ম অলংকরণ ও কারুকর্মের দ্বারা তার শিল্পীমনের স্বাক্ষর রেখে যায়, এই সমস্ত মন্দিরের স্তম্ভে, খিলানে ও দেওয়ালগাত্রে সেইরূপ সূক্ষ্ম অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। মন্দির নির্মাণের বহিরঙ্গ-স্থাপত্য এই সকল মন্দিরে অবহেলিত, এখানে শিল্পীর সমস্ত শক্তি, দক্ষতা ও শিল্পচাতুর্য নিয়োজিত হয়েছে মন্দিরাভ্যন্তরে সূক্ষ্ম-জটিল কারুকর্মের রূপায়ণে।

বোধ করি, এই রীতির সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত দিলওয়ারার মন্দিরগুলি।

দিলওয়ারার মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে এর অতুল বৈভব দেখে বিস্মিত হয়েছি। কি শিল্পদক্ষতা, অমানুষিক পরিশ্রম ও কি বিপুল অর্থ ব্যয় করে সুদীর্ঘকাল ধরে এই শিল্পৈশ্বর্য সৃষ্টি করা হয়েছিল চিন্তা করে হতবাক হয়ে গেছি। আজ থেকে হাজার বছর আগেও যে সকল দক্ষ-শিল্পী ও ভাস্করের হাতের ইঙ্গিতে এই মর্মরস্বপ্ন রচিত হয়েছিল, দিলওয়ারা-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাবনত অন্তরে তাদের শতকোটি প্রণাম জানিয়েছি নীরবে।

কিন্তু তথাপি অনেকসময় আমার মনে হয়েছে এর মধ্যে যেন প্রাণের স্পর্শ নেই। কোথায় যেন একটা কিসের অভাব অনুভব করেছি। যখনই এই অপরূপ সৌন্দর্যের সামনা-সামনি এসে দাঁড়িয়েছি তখনই মনে প্রশ্ন জেগেছে এই সৌন্দর্য কি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে? উপরে-নীচে, সামনে-পেছনে যে দিকেই তাকাই সমগ্র মন্দিরের সারা অঙ্গে দেখি সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের অকৃপণ সমাবেশ। এত বেশি কারুকার্যের ঠাসঠাসি যে এখানে যেন হাঁফ ছাড়ার অবকাশও নেই। কারুকর্মের এই ঠাসবুনানির মধ্যে চোখে আসে ক্লান্তি, তখন এই অপরিমেয় সৌন্দর্যও কেমন যেন ম্লান প্রাণহীন মনে হয়। মনে হয়, পাথরের বুকে সুন্দর যেন জমাট হয়ে আছে, সে সুন্দরের যেন রূপ নেই। এই রূপহীন সৌন্দর্য প্রাণহীন দেহের মতই।

দিলওয়ারা মন্দিরগোষ্ঠী ছাড়াও আবু পাহাড়ে আরও কয়েকটি মন্দির আছে। অম্বেশ্বরী মন্দিরে যেতে পাহাড় কেটে তৈরি সিঁড়ি ভেঙ্গে ৫০০ ফুটেরও বেশি ওপরে উঠতে হয়। আর আছে অর্বুদ মন্দির—পাহাড় কেটে তৈরি করা। গোমুখ একটি পুরোনো মন্দির —আবু থেকে মাইল ছয়েক দূরে।

জন গ্লেন-এর কক্ষ-পরিক্রমার ফলাফল

কলকাতার ইউ-এস-আই-এস থেকে আমরা একটি বই, একটি পুস্তিকা ও একটি প্রাচীরপত্র উপহার পেয়েছি। তিনটিই বৈজ্ঞানিক প্রকাশন। পুস্তিকাটি মহাকাশ-সংক্রান্ত নিবন্ধের একটি পঞ্জী এবং প্রাচীরপত্রটি সম্ভাব্য কয়েকটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিবরণ। বইটির নাম 'রেজাল্টস্ অফ দি ফার্স্ট ইউনাইটেড স্টেট্স্ ম্যান্ড্-অরবিটাল স্পেস ফ্লাইট'। অর্থাৎ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহাকাশচারীর কক্ষ-পরিক্রমার ফলাফল। বইটি পড়ে মনে হল মহাকাশ-ভ্রমণ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় খবর এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। অজস্র ছবি ও রেখাচিত্র থাকার ফলে বইটি অন্যদিক থেকেও খুবই আকর্ষণীয়।

খবরের কাগজের পাঠকরা নিশ্চয়ই জানেন, যে-মার্কিন ব্যোমযানটিতে মহা-

কাশচারী জন গ্লেন কক্ষ-পরিক্রমা করেছিলেন সেটি সম্প্রতি বোম্বাইয়ে প্রদর্শিত হচ্ছে। কলকাতায় অবশ্য ব্যোমযানটিকে আনা হবে না; কলকাতার আগ্রহীদের খবরের কাগজের ছবি দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এরোনটিক্স্ অ্যাণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃক প্রকাশিত উল্লিখিত বইটি যদি তাঁরা পড়ে দেখেন তবে নিশ্চয়ই এই ব্যোমযানটি সম্পর্কে আরো গভীর ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানলাভ

॥ অয়স্কান্ত ॥

করতে পারবেন। এই বইয়ে ব্যোমযানের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা-সমন্বিত ছবি দেওয়া হয়েছে।

তবে আমার কাছে ব্যোমযানের বর্ণনার চেয়েও অনেক বেশী কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়েছে মহাকাশ-যাত্রার প্রস্তুতিপর্বের বর্ণনা। মহাকাশচারী জন গ্লেন পৃথিবীকে মাত্র তিনটি পাক দিয়েছিলেন আর এজন্য সময় লেগেছিল মাত্র ৪ ঘন্টা ৫৫ মিনিট ২০ সেকেণ্ড। সোভিয়েত মহাকাশচারী তিতোভের প্রায় চব্বিশ ঘন্টাব্যাপী কক্ষ-পরিক্রমার পরে এই ঘটনাকে আর অভূতপূর্ব বলা চলে না। কিন্তু বইটি পড়ে অবাক হতে হয়—এই ঘটনাটিকে ঘটাবার জন্য কি বিপুল আয়োজনই না করতে হয়েছিল! দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ব্যোমযানের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্যে ও ব্যোমযানের গতিপথকে বিশ্লেষণ করার জন্য পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ জায়গায় ষোলটি স্টেশন বসাতে হয়েছিল। মোট ১৯,৩০০ জন মানুষকে কাজ করতে হয়েছিল এ-জন্য।

বইয়ের একটি অধ্যায়, শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের জন্যে মহাকাশচারীর প্রস্তুতি সম্পর্কে। এই একই বিষয়ে একটি সোভিয়েট দলিলচিত্র কিছুকাল আগে কলকাতায় দেখানো হয়েছিল। সেই দলিলচিত্রটি যাঁরা দেখেছেন বা এই বইয়ের এই অধ্যায়টি যাঁরা পড়বেন তাঁদের নিশ্চয়ই এই উপলব্ধি হয়েছে বা হবে যে, কয়েক ঘন্টার মহাকাশ-যাত্রার জন্যে মহাকাশযাত্রীকে কয়েক বছর ধরে কি অক্লান্ত অভিনিবেশে নিজের শরীরকে প্রস্তুত করে তুলতে হয়।

বইয়ের শেষ দিকে একটি পঞ্চাশ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট আছে যাতে মহাকাশচারী জন গ্লেন পৃথিবী থেকে কি-কি বার্তা পেয়েছিলেন ও পৃথিবীতে কি-কি পাঠিয়েছিলেন তার সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। ব্যোমযানে সংস্থাপিত একটি টেপ-রেকর্ডার যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেকটি কথা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ছিল। ঘণ্টায় মিনিটে সেকেণ্ডে সময় ভাগ করে করে হুবহু কথাগুলোকেই তোলা দেওয়া হয়েছে। ফলে, শুধু এই কথাগুলো পড়ে গেলেই যেন এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার স্বাদ পাওয়া যায়। ফ্রেণ্ডশিপ সেভেন দলিলচিত্রটি যাঁরা দেখেছেন

তাঁরা নিশ্চয়ই এই অভিজ্ঞতাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন।

অপর একটি অধ্যায়ে ব্যোমযানের যন্ত্রপাতি ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বর্ণনা পাওয়া যাবে। অজস্র ছবিও আছে সঙ্গে। শুধু ছবিগুলো চোখের সামনে থাকলে যে-কোনো নিস্পৃহ দর্শকেরও ধারণা হবে, বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখার কি নিবিড় সহযোগিতার ফল সামান্য আয়তনের এই ব্যোমযানটি।

কিন্তু আয়তন যতো সামান্যই হোক, ওজন উল্লেখনীয়। এই বিশেষ ব্যোমযানটির যাত্রা-শুরুর সময়ে ওজন ছিল ৪,২৬৫ পাউণ্ড, কক্ষপথে ২,৯৮৭ পাউণ্ড, অবতরণের প্রক্রিয়া শুরু হবার সময়ে ২,৯৭০ পাউণ্ড, জলে পড়বার সময়ে ২,৪৯৩ পাউণ্ড, জল থেকে তোলবার, সময়ে ২,৪২২ পাউণ্ড।

॥ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অনুসন্ধান ॥

গত ১৮ই জুন তারিখে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে এমন একটি অনুষ্ঠান হয়ে গেল যার কোনো তুলনা আমাদের দেশে নেই। সেদিন 'জগদীশ বসু সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ' সংস্থার উদ্যোগে পশ্চিম বাংলার নয়জন ছাত্র ও একজন ছাত্রীকে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্যে বৃত্তিদান করা হয়েছে। বৃত্তির পরিমাণও নিতান্ত সামান্য নয়। প্রথম তিন বছরের জন্যে মাসিক পঁচাত্তর টাকা হিসেবে এবং তারপরে উপযুক্ত বিবেচিত হলে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্যে আরো দুই বছর মাসিক একশো পঞ্চাশ টাকা হিসেবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সংস্থার নামেই প্রকাশ, উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অনুসন্ধান করা। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট এবং স্যার জাহাঙ্গীর গান্ধী চেয়ারম্যান। কার্যনির্বাহক কমিটিতে অন্যান্য যাঁরা আছেন সকলেই স্বনামখ্যাত ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তি। যেমন, বোস ইনস্টিটিউটের ডঃ ডি এম বসু ও ডঃ পি কে বসু, পশ্চিম বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডঃ ডি এম সেন, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ডঃ এস কে মিত্র এবং আরো অনেকে। ১৯৬০-৬১ সালটি ছিল এই সংস্থার কার্যকালের প্রথম বছর।

আমাদের মতো গরীব দেশে এ-ধরণের একটি সংস্থার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সংস্থার প্রথম বছরের রিপোর্টে যে-সমস্ত তথ্য উল্লিখিত হয়েছে তা সংস্থার পক্ষে খুব উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়। সারা পশ্চিম বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আবেদন-পত্র পাওয়া গিয়েছিল মাত্র ৩৩৯টি। এই ৩৩৯ জনের মধ্যেও ২১ জনের প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন যোগ্যতা ছিল না। অর্থাৎ, মোট আবেদন-পত্রের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৩১৮। ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২৮২, ছাত্রীর সংখ্যা ৩৬। কলকাতার কলেজগুলি থেকে আবেদন-পত্র পাওয়া গিয়েছিল ছাত্রদের থেকে ১৮২টি, ছাত্রীদের কাছ থেকে ৩১টি। মফঃস্বলের কলেজগুলির ক্ষেত্রে ওই সংখ্যা যথাক্রমে ১০০ ও ৫।

এই ৩১৮ জনের মধ্যে থেকে লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ইন্টারভিউর জন্যে ডেকে পাঠানো হয়েছিল ৩২ জনকে এবং বৃত্তি দেওয়া হয়েছে ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ১০ জনকে।

আমরা মনে করি, যোগ্য ও অযোগ্য মিলিয়ে মোট মাত্র ৩৩৯টি আবেদন-পত্র পাওয়াটা নিতান্তই অস্বাভাবিক ব্যাপার। এ থেকে মনে হয়, সংস্থার কর্মকর্তারা তাঁদের কর্মধারা ও উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করতে পারেন নি, কিংবা যে-কোনো কারণেই হোক সংস্থার প্রতি ছাত্রদের আস্থার অভাব ঘটেছিল। যাই ঘটে থাকুক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক প্রতিভা অনুসন্ধানের মূল উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হতে বাধ্য। আশা করি সংস্থার কর্মকর্তারা দ্বিতীয় বছরের কর্মসূচী গ্রহণ করবার সময়ে এ-বিষয়ে সচেতন হবেন।

এই প্রসঙ্গে প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু সংবাদ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সংস্থার নিয়মাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম বাংলার যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোনো কলেজে (খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি সমেত) পঠনরত যে-কোনো ছাত্রছাত্রী এই বৃত্তির জন্যে আবেদন করতে পারে। একটি শর্ত অবশ্যই আছে। আবেদনকারী ছাত্র বা ছাত্রী বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বা প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং বিজ্ঞানের বিষয়টিতে শতকরা অন্তত ষাট নম্বর পেয়েছে। বয়স সম্পর্কে কোনো বাধানিষেধ নেই। আবেদন করবার জন্যে বা পরীক্ষায় বসবার জন্যে কোনো ফি দিতে হয় না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, আবেদন-পর্বটিতে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই। তারপরে পরীক্ষা-পর্ব। এ-ব্যাপারটিও অনেকখানি বাহুল্যবর্জিত। মাত্র দুটি পেপারে পরীক্ষা দিতে হবে। একটি হচ্ছে প্রথানুযায়ী কোনো একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে রচনা লেখার পরীক্ষা। অপরটি হচ্ছে যাকে বলা হয় অবজেকটিভ টেস্ট, যার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ছাত্রদের জ্ঞান ও মেধা সম্পর্কে মোটামুটি একটা নিরীক্ষা স্থিরীকৃত হয়।

অবজেকটিভ টেস্ট ব্যাপারটি কি তা হয়তো অনেকেই জানেন না। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যাঁরা ছাত্রছাত্রী নন, অর্থাৎ রীতিমতো পরীক্ষায় বসে নিজেদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রমাণ দেবার সুযোগ আর যাদের নেই তাঁরাও অবসর সময়ে এই অবজেকটিভ টেস্ট প্রয়োগ করে নিজেদের প্রতিভাকে যাচাই করে নিতে পারবেন।

অবজেকটিভ টেস্টের ধরনটি হচ্ছে এই : একটি প্রশ্ন থাকবে আর তার কতকগুলো সম্ভাব্য জবাব। পরীক্ষার্থী শুধু সঠিক জবাবটি চিহ্নিত করবে। যেমন :

(১) জলকে জীবাণুমুক্ত করার সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় কি?

(ক) ক্লোরিনেশন।

(খ) রোদ লাগানো।

(গ) আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির প্রয়োগ।

(ঘ) অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যে একটানা ফোটানো।

(ঙ) পরিস্রাবণ।

লক্ষ্য করে দেখুন, অত্যন্ত সরল একটি প্রশ্নও পাঁচটি সম্ভাব্য জবাবের ফাঁদে পড়ে কি রকম গোলমেলে হয়ে উঠেছে। মনে হতে থাকে প্রত্যেকটি জবাবই সত্যি। কাজেই, সঠিক জবাবটি সম্পর্কে যদি পরীক্ষার্থীর মনে কিছুমাত্র দ্বিধা থাকে তাহলে এমন সম্ভাবনাই বেশী যে, সে জবাব দিতে ভুল করবে।

যেমন, উল্লিখিত প্রশ্নের সঠিক জবাব হচ্ছে (ঘ)। কিন্তু অন্য চারটি জবাবকে বাতিল করে নিয়ে এই জবাবটি বেছে নিতে হলে চিন্তা ও ধারণার স্বচ্ছতা থাকা দরকার।

আরো দুটি দৃষ্টান্ত :

(২) নিম্নলিখিত খাদ্যগুলির কোনটিতে সবচেয়ে বেশী প্রোটিন?

(ক) আলু, (খ) ঘৃত, (গ) মটর, (ঘ) চিনি, (ঙ) আম।

সঠিক জবাব : (গ)।

(৩) নিম্নলিখিত গ্রহগুলির মধ্যে কোনটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রে আবিষ্কৃত হবার আগেই কাগজে-কলমে আবিষ্কৃত হয়েছিল?

(ক) মঙ্গল, (খ) ইউরেনাস, (গ) বৃহস্পতি, (ঘ) নেপচুন।

সঠিক জবাব : (ঘ)।

জগদীশ বসু বৈজ্ঞানিক প্রতিভা অনুসন্ধান সংস্থা সাধারণত জুলাই মাসেই নতুন আবেদন-পত্র গ্রহণ করে। কাজেই এ-বছরে যে-সব ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বা প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় পাশ করেছে তাদের এই সুযোগ নেওয়া উচিত। সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করার ঠিকানা : ৯৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯।

[উপন্যাস]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

।। তেরো ।।

মুখুজ্জে তাঁর অভ্যাস মতো বড় রাস্তার ডাক্তারখানার দিকে চলেছিলেন। গৌরাঙ্গবাবুর বাসার এক-ফালি বারান্দাটার দিকে চোখ পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন।

দশ-বারোদিন পরে আজ আবার গৌরাঙ্গবাবু এসে নিজের সেই ছোট মোড়াটির উপরে বসেছেন। মুখুজ্জের মনে হল, এই ক'দিনে যেন অনেকটা বুড়িয়ে গেছেন ভদ্রলোক, মাথার ধূসর চুলগুলো শাদা হয়ে এসেছে, পিঠের ওপর যেন একটা কুঁজ ঠেলে উঠেছে। সামনে দিয়ে তিনি চলে যাচ্ছেন—অথচ তাঁকে যেন দেখতেও পাচ্ছেন না। চোখদুটো কোটরের কালো অন্ধকারে তলিয়ে আছে।

একবারের জন্যে দ্বিধা করলেন মুখুজ্জে, ডাকবেন কি ডাকবেন না। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলটাকে কিছুতেই আর ঠেকানো গেল না।

—এই যে, কেমন আছেন?

কোটরের অন্ধকার থেকে একটা শূন্য দৃষ্টি উঠে এল তাঁর দিকে।

—ভালোই।

—মাঝখানে ক'দিন আপনাকে দেখিনি।

শূন্য দৃষ্টির মতো একটা ফাঁপা আওয়াজ ভেসে এল : শুয়েই ছিলুম। আমার পক্ষে এখন সব সমান।

—তা বটে, তা বটে—বলেই মুখুজ্জে অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। অন্যদিনের মতো একটা দৈব মাদুলী কিংবা কোনো ভালো কবিরাজকে একবার দেখানো, নিতান্ত পক্ষে একবার রাজগীরের ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে আসা—এই ধরণের কিছু একটা সান্ত্বনা গৌরাঙ্গবাবুকে দেওয়া উচিত ছিল বলে মনে হল তাঁর। কিন্তু লোকটার এই অদ্ভুত নুয়ে পড়া দোমড়ানো শরীরটার দিকে তাকিয়ে এসব কিছুই বলতে পারা গেল না।

চিরকালের প্রগল্‌ভ মুখুজ্জে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ভাবলেন চলেই যাওয়া যাক—একটা মরা মানুষের সঙ্গে আলাপ করে সুখ নেই। কিন্তু যে মুখুজ্জে রাস্তায় একটি লোক কান চুলকোচ্ছে দেখলেও কৌতূহল দমন করতে পারেন না, জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হন : 'কি মশাই, কানে কী হল' এবং ছাতের কার্ণিশে বসে থাকা একটা বেড়ালকে উদ্দেশ করেও যিনি ঘণ্টা-খানেক বক্তৃতা করতে পারেন, তাঁর পক্ষে এ অবস্থায় চলে যাওয়া অসম্ভব। আরো বিশেষ করে এ বাড়ীতে এতগুলো রোমাঞ্চকর ঘটনা এমনভাবে ঘটে যাওয়ার পর। সত্যি কথা বলতে, এই ছোট বারান্দায় এতদিন গৌরাঙ্গবাবুকে না দেখে এমন সমস্ত ব্যাপারটার বিশদ পর্যালোচনা না করতে পেরে তাঁর দস্তুরমতো ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল। আজকালের মধ্যে হয়তো গিয়ে একটা ডাকই ছেড়ে বসতেন : কই গৌরাঙ্গবাবু, কি রকম আছেন টাছেন মশাই?

মুখুজ্জে হাতের লাঠিটাকে এক টুকরো রাস্তার নুড়ির উপরে ঠুকলেন বার-কতক। তারপর :

—বড়ো মেয়েটি বেশ ভালো আছে তো এখন?

আশা করেছিলেন এবার গৌরাঙ্গবাবু নড়ে-চড়ে উঠবেন এবং তাঁকে আর বিশেষ কিছু করতে হবে না। কিন্তু এবারেও কালো কোটরের ভেতর থেকে যেন দৃষ্টিহীন চোখদুটো সামনের একটা নোনা ধরা দেওয়ালের গায়েই আটকে রইল : ভালোই আছে বোধ হয়। ঠিক জানি না।

—জানেন না? সে কি মশাই?

—কী হবে জেনে? হয় বাঁচবে, নয় মরবে।

জিভের ডগায় 'তা বটে তা বটে' এগিয়ে এসেছিল, মুখুজ্জে সামলে নিলেন। লাঠি দিয়ে নুড়িটাকে ঠুকতে ঠুকতে তুলে ফেললেন খানিকটা, তারপর বললেন, না—না, ভালো হয়ে যাবে বইকি। আপনি কিছু ভাববেন না।

—কিছুই ভাবছি না আমি।

অসম্ভব, এ ভাবে আলাপ চালানো যায় না। মুখুজ্জে বিরক্তি বোধ করলেন। ঠিকই বুঝেছিলেন, মরা মানুষের সঙ্গে গল্প করে সুখ নেই। চলে যাওয়ার জন্যে দু-পা এগোলেন, দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার। মনঃস্থির করে ফেলেছেন। গৌরাঙ্গবাবু কিছু

বলতে না চাইলেও তাঁর অনেক কথা বলবার আছে।

—দিনকাল যা হয়েছে মশাই—মুখুজ্জে গলা খাঁকারি দিলেন : কলকাতায় থাকার চাইতে এখন সুন্দরবনে গিয়ে বাস করা ভালো। কথা নেই, বার্তা নেই, দুম্ করে একটা বোমাই ফাটিয়ে দিলে! তাও মেয়েছেলের গায়ে। ছি-ছি-ছি—

ও পক্ষ নির্বিকার।

—কাকে দোষ দেবেন মশাই? পুজোর চাঁদা চাইতে এসে ছোরা বের করে। দু দিনের ছোকরা, এখনো মুখে গোঁফ গজায়নি, বুড়ো মানুষের নাকের সামনে এসে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে দেয়। এসব কী হচ্ছে বলুন দিকি?

উত্তরে গৌরাঙ্গবাবুর মুখ একবার বিকৃত হল কেবল। হাতের বাঁকা বাঁকা আঙুলগুলোতে যন্ত্রণার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাঁ পায়ের হাঁটুতে কে যেন ছোট একটা করাত চালিয়ে হাড়গুলোকে কাটছে টুকরো টুকরো করে। সকালের হলদে আলোটা যেন চাকার মতো ঘুরপাক খাচ্ছে চোখের সামনে।

দূরে থেকে সুবিধে হচ্ছে না। মুখুজ্জে কাছে এগিয়ে এলেন।

—পুলিশে কিছু করল? —স্বরটা এবার অন্তরঙ্গ।

—জানি না।

—সব সমান—সব সমান—মুখুজ্জে মুখ বাঁকালেন : শিরে সর্পাঘাত মশাই, তাগা বাঁধবেন কোথায়? হত ইংরেজের আমল, থাকত টেগার্টের মতো দুঁদে লোক, দুদিনে সব ঠেঙিয়ে সমান করে দিত। কলকাতার তামাম গুন্ডাকে চিরকালের মতো হাওড়ার পুল পার করে দিয়েছিল। সত্যি বলুন তো, এর চাইতে ইংরেজের আমল ভালো ছিল কি না?

—বোধ হয়। —গৌরাঙ্গবাবু আবছা গলায় জবাব দিলেন। ভালোই ছিল হয়তো। ইংরেজ থাকলে পাকিস্তান হত না, এমন করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হত না, এমনিভাবে নারকেলডাঙার এই বাড়ীতে বসে গৌরাঙ্গবাবুকে ভাবতে হত না : মাজাভাঙা যে রাস্তার কুকুরটা শরীরটাকে হেঁচড়ে হেঁচড়ে খিদের তাড়ায় আবর্জনাস্তূপের দিকে এগিয়ে চলে, তার দুঃখ কি তাঁর চাইতেও বেশি? ঠিক কথা, ইংরেজ থাকলেই হয়তো ভালো হত এর চাইতে।

—মশাই, রাজ্য চালানো কি চাট্টিখানি কথা? দুশো বছর গোলামি করে মেরুদণ্ড বলে তো আর কিছু নেই। আমরা বড়জোর ওদের কেরাণী হতে পারি, বড় সায়েবের হুকুম তামিল করতে পারি—ব্যস ওই পর্যন্তই। স্বাধীন ভারতের ঝাঁপা সামলানো আমাদের কাজ? ওদিকে প্ল্যানের তো অন্ত নেই—পেল্লায় পেল্লায় সব কারখানা হচ্ছে, ড্যাম হচ্ছে, দেশের জৌলুস নাকি উপচে পড়বে কদিন পরেই। বলতে কইতে তো ভালোই লাগে, কিন্তু এই কলকাতা শহরের দিকেই চেয়ে দেখুন একবার! ভদ্দরলোকের ছেলেরা গুন্ডাবাজী ধরেছে মেয়েছেলেরা যা হচ্ছে—মুখুজ্জে একটু সামলে নিলেন : আর কলকেতার রাস্তাঘাটের যা চেহারা খুলেছে, তাতে দু-পা পথ চলতে গেলে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসে। আছি কোথায় মশাই?

কোথাও নেই—এই কথাটাই গৌরাঙ্গবাবুর মনে হল। হাঁটুতে আবার যন্ত্রণার করাতটা চলতে লাগল, হাতের দশটা আঙুল যেন ফেটে বেরিয়ে যেতে চাইল। না—আমরা কোথাও নেই। অতল জলের ওপর দিয়ে একটা কাগজের নৌকো ভেসে চলেছে—সেইটেকে আশ্রয় করেই আমরা বাঁচতে চেয়েছিলুম। কিন্তু সে নৌকোটা ভিজে গলে একাকার হয়ে গেছে, এখন কেবল অতলে তলিয়ে যাওয়াই বাকি।

কিন্তু তা-ও কি বাকী আছে আর?

মুখুজ্জে বললেন, সে যাক, দুঃখ করে আর লাভ নেই। বছর কয়েক আগে দিব্যি একটা বই পড়েছিলুম মশাই—চেতাবাণী। তখন তাই নিয়ে সেকি হৈ-চৈ কাণ্ড! মহাপ্রলয় হবে, কল্কি অবতার আসছেন—সে কি ব্যাপার! কিছুই হল না, ফাঁকতালে লোকটা বেশ কিছু কামিয়ে নিলে। যাই হোক মশাই, এখন সত্যি সত্যিই কল্কি অবতারের আসা দরকার—একটা কিছু বিপর্যয় কাণ্ড না হলে আর চলছে না। নিদেন পক্ষে একটা অ্যাটম বোমাই ফাটুক কলকাতার ওপরে একেবারে নিশ্চিহ্ন! কী বলেন?

গৌরাঙ্গবাবু কিছুই বললেন না।

কতক্ষণ আর ভিজে লাকড়িতে আগুন ধরানোর পণ্ডশ্রম করা যায়? মুখুজ্জের আবার বিরক্তি বোধ হতে লাগল। এতক্ষণ ডাক্তারের দোকানে গিয়ে বসে থাকলে এক ভাঁড় চা আর দুটো বিস্কুট এসে যেত, ডাক্তার বেলেঘাটায় যে নতুন বাড়ীটা করছে, সে সম্পর্কে অনেক উপদেশ দেওয়া যেত তাকে। কিন্তু গৌরাঙ্গবাবুর লোভটাও কাটানো যাচ্ছে না কিছুতে। অনেকগুলো রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটে গেছে এ বাড়ীতে, গৌরাঙ্গবাবু একবার মুখ খুললে চা বিস্কুটের বদলে ঢের বেশি খেসারত পাওয়া যেত।

সুতরাং আর একটু সোজাসুজি আলোচনায় আসতে হল।

—দেখুন —একবার গলা খাঁকারি দিলেন : ব্যাপারটা হচ্ছে, ঘরে বড়ো মেয়ে থাকলে গেরস্তের আর শান্তি নেই।

গৌরাঙ্গবাবু এবার সোজাসুজি তাকালেন তাঁর দিকে। আলোচনাটা ফলপ্রসূ হচ্ছে বলে মনে হল।

—বিয়ে-টিয়ের চেষ্টা দেখুন না।

—পাত্র এনে দেবেন?
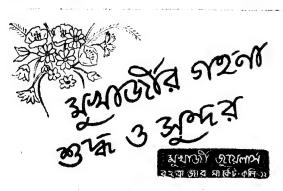
—পাত্র — তা — একবার ইতস্তত করলেন মুখুজ্জে ঃ আপনার ছোট মেয়েটির কথা যদি বলেন, তা হলে আছে একজন। মানে আমাদের ডাক্তারের কম্পাউন্ডারটি — ছেলেও ভালো—মধ্যম-গ্রামে ছোট বাড়ীও করেছে একটা—

—আমি ভেবেছিলুম, আপনি বোধ হয় অমলের জন্যে ঘটকালি করতে এসেছেন।

এবার মুখুজ্জে ভালো করে দেখলেন গৌরাঙ্গবাবুকে। তিন দিনের দাড়ি গজানো মুখটা বেন ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে গেছে, ঠোঁটের কোণদুটো বাঁকা, অন্ধকার চোখের ভেতর থেকে একটা বন্যদৃষ্টি ঠিকরে আসছে। পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি লোকটা? অসম্ভব নয়।

মুখুজ্জে আর দাঁড়ালেন না। সত্যি বলতে কি, একবার একথাও মনে হল, অমলের কথা বলে গৌরাঙ্গবাবু বোধ হয় তাঁকে অপমান করতে চেয়েছে।

—যাই তা হলে, ডাক্তার বসে আছে—

সেই নুড়িটাকে লাঠির ঘায়ে উপড়ে দিয়ে এগিয়ে চললেন। কিন্তু মনের ভেতরটা অস্বস্তিতে খচখচ করছে তখনো। দীপ্তি সম্পর্কে এর মধ্যে আরো কিছু মুখরোচক খবর কানে এসেছে, সেগুলো কিছুতেই ওগড়ানো গেল না।

এই লোকটার চোখের দৃষ্টি আপাতত ভালো লাগল না। পাগলই হয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। একটু নজর রাখতে হচ্ছে।

একবার পেছন ফিরে দেখলেন। ঠিক একভাবে বসে আছেন গৌরাঙ্গবাবু। পিঠটা কুঁজের মতো উঠে পড়েছে, মাথাটা এমনভাবে সামনের দিকে নুয়ে রয়েছে যে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবেন বলে মনে হয়। দেখে মায়াও হল একটুখানি।

কিন্তু কী আর করতে পারেন মুখুজ্জেমশাই! লোকটার সঙ্গে তো ভালো করে কথাও বলা যায় না!

রাস্তায় বেরিয়েই পট্ করে সেদিন কাবলী জুতোর স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গিয়েছিল অভয়ের। সেটাকে একটুখানি সারিয়ে নিয়ে এগোতে এগোতেই সামনে দিয়ে পর পর দুটো বাস বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। আর অভয় কটু গলার গাল দিয়ে উঠেছিল ঃ যাঃ শালা!

গাল দেবার কারণ ছিল। নারকেলডাঙা থেকে গার্ডেনরীচে প্রত্যেকদিন দুবেলা দৌড়োদৌড়ি করতে করতে স্টেট বাসের রহস্য আর অজানা নেই অভয়ের। ওদের চাল-চলনই আলাদা। কখনো কখনো পর-পর চারখানা সার দিয়ে চার ভাইয়ের মতো বেরিয়ে গেল, তারপর আধ ঘণ্টার মধ্যে আর দেখা নেই। শেষে যখন এল, তখন সামনের দিকটা ছাড়া আর কোনো অংশ দেখবার জো নেই—তার আষ্টে-পৃষ্ঠে মানুষ ঝুলছে। নিতান্তই সামনের দিকটা বাঁচা, নইলে তাতেও লোক চাপত।

সুতরাং দুখানা যখন গেল, তখন ঝাড়া মিনিট পনেরো নিশ্চিন্দি। অভয় একবার হাতের সস্তার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, তারপর পাথরচুনের অসংখ্য দাগ লাগা আর ধ্বজের মহৌষধের হ্যান্ডবিল মারা একটা ল্যাম্প-পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরিয়েছিল।

সেই সময় পেছন থেকে কে ডাক দিয়েছিল, দেখুন দাদা!

ফিরে তাকিয়েই মাথার ভেতরে চড়াং করে রক্ত ছুটে গিয়েছিল অভয়ের। অমল। হাতের মুঠিটা পাকিয়ে নিয়ে বলেছিল, কী চাই?

—আমাকে দেখেই চটে উঠলেন? —অদ্ভুত বিনীত আর নিরীহ মনে হয়েছিল অমলকে ঃ সেদিন তো পিটিয়ে হাতের সুখ করেই নিয়েছেন, কিছু বলিনি, তাতেও রাগ পড়ল না?

মানুষ এত নির্লজ্জ, এমন শয়তান হতে পারে! অভয়ের ইচ্ছে করেছিল, অমলের গলাটা তৎক্ষণাৎ টিপে ধরে। অবরুদ্ধ জান্তব স্বরে অভয় বলেছিল, আর বোমাটা ছুড়েছিল কে?

—বোমা! বোমার কথা কী করে জানব আমি?

—তুমি জানো না?

—আমার গা ছুঁয়ে বলছি দাদা—মাইরি, বোমার কথা কিছু জানি না। আপনারা পুলিশে আমার নাম বলে দিলেন, খামোকা ধরে নিয়ে হাজতে পুরে রাখল, এখনো জ্বালাচ্ছে। সে যাক, ওর জন্যে কিছু মাইন্ড্ করি না। খারাপ ছেলে বলে একবার বদনাম রটলে ওরকম অনেক দুর্ভোগই সইতে হয়। আপনি বিশ্বাস করুন বোমাটোমা আমি ছুঁড়িনি।

—তবে কে ছুড়েছে?

অমলের স্বর আরো মিহি হয়ে এল ঃ কার নাম করব বলুন। ওই ব্রীজের ওপাশটায় কতগুলো বদলোকের আস্তানা আছে, বে-আইনী চোলাইয়ের ব্যবসা চালায়—তাদেরই কারুর কাণ্ড হয়তো।

অমলের দাঁত কটা একটা শাঁড়াশী দিয়ে উপড়ে দিতে পারলে ঠিক হয়, অভয় ভেবেছিল। কিন্তু বাসের এখনো কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না—শোনাই যাক্ না রাস্কেলটা কী বলে।

—আর চিঠিটা?

—ইয়ে — ওটা — অমল একবার জিভ কেটেছিল ঃ মানে সংসঙ্গ তো বেশ পাইনি—মাথাটা তখন কেমন বিগড়ে গিয়েছিল। সেজন্যে দাদা

আপনার পায়ে ধরতে রাজী আছি আমি।

—থাক, অত ভক্তিতে কাজ নেই—অভয় সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল : এখন এসব কথা বলছ কেন? পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিতে হবে?

—না দাদা, তার দরকার হবে না। গরীবকে ভগবান দেখবেন।

—তাই নাকি? ভগবান মানো?

—বাস্‌রে — না মেনে উপায় আছে? না হয় ভালো ছেলে হতেই পারিনি, তাই বলে কি একেবারেই গোল্লায় গেছি নাকি?

—যাওনি? শুনে ভরসা হল। কিন্তু এখন কী চাও? হঠাৎ গালে পড়ে ভাব করতে এসেছ কেন?

—ঝগড়া কোনোদিন ছিল না দাদা—আপনারা পাড়ার লোক!

—তাই পাড়ার মেয়ে—যাকে বোনের মতো দেখা উচিত, তার নামে যাচ্ছে তাই চিঠি লেখো।

—ওই একটা কথাই কিছুতে ভুলতে পারছেন না—অমলকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাল এবারে : বলছি তো ওর জন্যে হাজার বার মাপ চাইছি আপনার কাছে। বলেন তো আপনাদের বাড়ীতে গিয়েও ক্ষমা চেয়ে আসতে পারি।

—অত কষ্ট করতে হবে না, এতেই যথেষ্ট—অভয় আবার অধৈর্যভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে সামনের বাঁকটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। এদিকে কারখানায় যেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে, অথচ স্টেট বাসের কোনো চিহ্ন নজরে আসছে না। দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছিল, শুধু এই কথাই বলতে এসেছ—না আরো কিছু মতলব আছে?

—মতলব নেই, একটা খবর দেবার ছিল।

—খবর? — চোখ পাকিয়ে অভয় জিজ্ঞেস করেছিল : কিসের খবর?

—আমরা বদ হতে পারি, তবু আমরা পাড়ার ছেলে। —অমলের চোখ একবার চিক-চিক করে উঠেছিল : কিন্তু একজন পাঞ্জাবী এসে যদি মাঝখানে দাঁড়ায়, সেটা কি ভালো হয় তার চাইতে?

—কে পাঞ্জাবী? —এইবারে চমকে উঠেছিল অভয়।

—নাম-ধাম জানিনে স্যার, কোত্থেকেই বা জানব! তবে ধর্মতলা স্ট্রীটে আমার এক ফ্রেণ্ডের একটা মোটর রিপেয়ারের দোকান আছে, সেখানে সন্ধ্যেবেলায় কখনো কখনো গল্প-গুজব করতে যাই। নিজের চোখে দেখেছি, একটা বেশ দামি মোটর এসে থামে, তার থেকে—

মতলব নেই, একটা খবর দেবার ছিল

—তা থেকে?

—একজন পাঞ্জাবীর সঙ্গে আপনার ছোট ভাই অমিয়, আর ইয়ে—মানে আপনার ছোট বোন তৃপ্তি—একটা চায়ের দোকানে গিয়ে ঢোকে।

—শাট্‌ আপ—বলে একটা উগ্র গর্জন তুলে অমলের টুঁটিটা চেপে ধরার জন্যে পা বাড়িয়েছিল অভয়, আর অমল সঙ্গে সঙ্গে একটা হেলে সাপের মতো পিছলে সরে গিয়েছিল।

—আমাকে মেরে আবার হয়তো হাতের সুখ করে নেবেন দাদা, কিন্তু সত্যি বলছি তাতে কোনো লাভ হবে না। পাড়ায় হয়তো আমরা কজন খারাপ ছেলে আছি, কিন্তু বাঙালী তো! একজন পাঞ্জাবী যদি বাইরে থেকে এসে আমাদের মেয়েকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যায়, তা হলে সেটা বড্ড গায়ে লাগে। তাই বলা!

অভয় এবার অমলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, তার আগেই বাসের হর্ণ শোনা গেল। বাঁকি দূরে, সর্বাঙ্গে কাঁটালের মতো মানুষ ঝুলিয়ে স্টেট বাস আসছে। তখন মনে পড়ে গিয়েছিল, কারখানা যেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে, আর এক বাসে যেখানে হোক ঝুলে পড়তে না পারলে আবার পনেরো মিনিট ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সুতরাং তখনকার মতো অমলকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল, পাঞ্জাবীর কথাও ভুলে যেতে হয়েছিল অভয়কে।

কিন্তু সম্পূর্ণ ভোলা যায়নি। তারপর চারদিন ধরে একটা তীর অস্বস্তিতে ছটফট করেছে অভয়। মনে পড়ছে অমিয়র ফ্রেণ্ড্‌ চন্দন সিং লোকটার কথা। চন্দন সিংই বটে, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তৃপ্তির সঙ্গেও তার ফ্রেণ্ডশিপ দাঁড়িয়ে যাবে, এটা কোনো কাজের কথাই নয়।

অমিয়কে জিজ্ঞেস করতে পারেনি, দেখাই হয়নি বলতে গেলে। তৃপ্তির ভীরু শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে এ-সব কথা তুলতে কেমন মায়া হয়—এই ছোট বোনটাকে ভারী ভালোবাসে অভয়। তা ছাড়া বাবার শরীর আর মনের যে-রকম অবস্থা, তাতে বাড়ীতে এ নিয়ে একটু গোলমাল হলে বাবা হার্টফেল করে বসতে পারেন। এক রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে প্রভাতদার সঙ্গে হয়তো খানিকটা আলাপ-আলোচনা করা চলে। কিন্তু প্রভাতদাও যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছে, সব সময় গুম হয়ে থাকে, ভালো করে একটা কথাই বলা যায় না!

অমলকে একবার পেলে একটু কথা-বার্তা বলা যেত। যদিও অত্যন্ত বদমাস ছেলে, তবু সব কথা একেবারে যে বানিয়ে বলেছে তা-ও মনে হয় না অভয়ের। বিশেষ করে অমিয়র ফ্রেণ্ড্‌ চন্দন সিং—যে তাকে ব্যবসার পার্টনার করবার আশা দিয়েছে তার কথাও তো একেবারে অজানা নেই।

কিন্তু আসা-যাওয়ার পথে অমলের সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি। বাড়ীতে গিয়ে ডাক দিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

এমনি অস্বস্তি নিয়েই সেদিন ফিরছিল অভয়।

বিকেলে ছাতার দোকান-বৌবাজারের মোড়। ট্রাফিক আর

মানুষের উৎকট ভিড়ে নিঃশ্বাস আটকে আসে। অভয়ের বাসও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর অসহ্য গরমে কালিমাখা হাফ্‌শার্টটার হাতটাকে কপালে ঘুরিয়ে এনে ঘাম মুছে ফেলছিল অভয়। তখন চোখে পড়ল।

একটা মোটরও দাঁড়িয়ে গেছে বাসটার পাশেই। আর সেই মোটরে এক পাঞ্জাবী ড্রাইভারের পাশে বসে সিগারেট টানছে অমিয়। পেছনের সীটে কে বসে আছে — সে — সে তৃপ্তি ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না!

—শুয়োর! —বিকৃত বীভৎস গলায় আওয়াজ তুলল অভয়, তারপর কনুইয়ের গুঁতোয় দু'পাশের কয়েকজন যাত্রীকে ছিটকে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল বাস থেকে। আর মোটরটার পাশে এসে বাঘের মতো গলায় হুঙ্কার ছাড়ল : অমিয়—হতভাগা, রাস্কেল কোথাকার!

(ক্রমশঃ)

রেফযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব সমস্যা

(উত্তর)

পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বানান সমিতি' বাংলা বানানে রেফযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব বর্জনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠচিত্তে এই নির্দেশ অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাহার অনুসরণ করিয়া পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। তদবধি বাংলার বহু পত্র-পত্রিকা এই নূতন বানানে ছাপা হইতেছে। এখন অনেক বাঙালী লেখক রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্বহীন বানান মানিয়া লইয়াছেন। ইহার ফলে বাংলা লেখা ও ছাপা কিছু সরল ও সহজ হইয়াছে।

কিন্তু কোন কোন সাময়িক পত্র এক সময়ে দ্বিত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন আবার 'সর্ব্ব' 'পূর্ব্ব' বানানে ফিরিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক কথায় কথায় বলিলেন যে, তিনি দ্বিত্বরহিত বানানের গ্রাহ্যতা স্বীকার করিয়াও বহু দিনের ব্যবহার আর ছাড়িতে পারেন না। এইরূপ দীর্ঘ ব্যবহারের ফলেই হয়তো শুদ্ধ সরল 'উষা' অবাঞ্ছিত জটিল 'ঊষা'কে হঠাইতে পারে নাই। অথচ বেদে পুরাণে সাহিত্যে -সংস্কৃত ভাষায় কুত্রাপি 'ঊষা'র প্রয়োগ দেখা যায় না; দীর্ঘ ঊ লেখাও বেশ কষ্টসাধ্য। বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে যে 'বাষ্প' স্থলে 'বাস্প' বানান স্থায়ী আসনলাভ করিয়াছে এবং 'চারি অক্ষরে মিশ্র সংযোগে'র উদাহরণে 'উর্দ্ধে'র সঙ্গে যে ব-যুক্ত অশুদ্ধ পদ 'মূর্দ্ধন্য'ও অটল হইয়া বসিয়া আছে, তাহাও দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফল। রেফযুক্ত ব্যঞ্জনে দ্বিত্বপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্য সকলের পক্ষে কেবল অভ্যাসই দায়ী নয়। মনে হয়, এক্ষেত্রে দ্বিত্বরহিত বানানের শুদ্ধতা সম্পর্কেও কেহ কেহ সন্দেহাচ্ছন্ন আছেন। 'কার্তিক' 'বার্তিক' প্রভৃতি বানানের বিশুদ্ধি লইয়া তো একাধিক ব্যক্তি তাঁহাদের সংশয় প্রকাশই করিয়া ফেলিয়াছেন। আমি এই সম্পর্কে একবার অন্যত্র কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু এখনও সংশয়ের নিরসন হয় নাই। আরও আলোচনা আবশ্যক।

ব্যাকরণের বিধান অনুসারে স্বরবর্ণের পরস্থিত রেফের পরবর্তী হ-ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়—'অচো রহাভ্যাং দ্বে' (পাণিনি ৮, ৪, ৪৬)। বিধানটি বৈকল্পিক, কাজেই প্রয়োগকর্তার ইচ্ছাধীন দ্বিত্বরহিত বা দ্বিত্বসহিত

উভয় প্রকার প্রয়োগই চলিতে পারে। স্বর্গ স্বর্গ্গ, অর্চনা অর্চ্চনা, ধর্ম ধর্ম্ম, সর্ব সর্ব্ব, কার্য কার্য্য, সবই শুদ্ধ। বৈকল্পিক বিধানের যে কোন একটি পক্ষ একান্তভাবে সর্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা বানানে সাম্য ও শৃঙ্খলা বজায় থাকিবে না। দ্বিত্বযুক্ত বানানে আমাদের অধিক প্রীতি। বাঙালীর মুখে রেফের সঙ্গে দ্বিবর্ণযুক্ত উচ্চারণই শোনা যায়—একথা সত্য। ব্যাকরণে দ্বিত্বসাধনের বিকল্প বিধানও অবশ্য এইরূপ কারণেই করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সকলক্ষেত্রেই বানানের রীতি একরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্ব স্থলে সর্ব্ব লিখিলে তর্ক স্থলে তর্ক্ক লেখা উচিত। দ্বিত্বপ্রিয় লেখকগণ পূর্বে এইরূপ লিখিতেন—প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থে গর্ভ স্থলে গর্ব্ভ বানান ছাপা হইত। সর্বত্র এই নিয়ম চলিলে মূর্খ স্থলে মূর্ক্খ, অর্ঘ্য স্থলে অর্গ্ঘ্য এবং অর্থ স্থলে অর্ত্থ লিখিতে হয়। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কোন পদে একই বর্গের দ্বিতীয় কিংবা চতুর্থ বর্ণ (খ, ছ, ঠ, থ, ফ এবং ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) পাশাপাশি স্থান পায় না; পূর্বস্থিত দ্বিতীয় বর্ণ প্রথম বর্ণে এবং চতুর্থ বর্ণ তৃতীয় বর্ণে পরিণত হইয়া থাকে। ইহা বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণগত ধর্ম—যেমন মূর্চ্ছা অর্দ্ধ (মূর্ছ্ছা বা অর্ধ্ধ নয়)। উচ্চারণের গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ব্যাকরণে নিয়ম বিহিত হইয়াছিল (পাণিনি ৮, ৪, ৫৩ ও ৫৫)।

বিচারশীল ব্যক্তিগণ অনর্থক বাহুল্য পছন্দ করেন না। সুতরাং তাঁহারা বিকল্পস্থলে সংক্ষিপ্ত পথের পক্ষপাতী হইবেন ইহা স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে বাংলার বাহিরে বহুস্থলেই সংস্কৃত বা দেশীয় ভাষায় রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্বহীন বানান লিখিত হইয়া থাকে; বিদেশে প্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থে রেফহেতু দ্বিত্ব একেবারেই লক্ষিত হয় না। বাংলাদেশেও এখন আর প্রাচীন বানানের অনুগামীরাও স্বর্গ্গ বা গর্ব্ভ লিখিয়া অকারণ ক্লেশ স্বীকার করেন না। সর্বত্রই লাঘব করার প্রবৃত্তি সুপ্রকাশ।

কার্তিক, বার্তিক, বার্ধক্য প্রভৃতি পদে একটু সমস্যা আছে, কারণ কৃত্তিকা, বৃত্তি ও বৃদ্ধ শব্দের মূলেই দ্বিত্ব রহিয়াছে, উহা রেফের প্রভাবে আসে নাই। 'বানান সমিতির' প্রথম নির্দেশে এই সমস্যার ইঙ্গিত ছিল। উহা ছিল এইরূপ—"সর্বত্র নির্বিচারে দ্বিত্বলোপ হইবে না। যদি শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয় তবে রেফের পর দ্বিত্ব থাকিবে, যথা কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক। অন্যত্র দ্বিত্ব হইবে না, যথা অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কর্দম, অর্ধ, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্য, সর্ব।" পরে 'বানান সমিতি' ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারেই এসমস্যার সমাধান করিয়া সর্বত্র দ্বিত্ববর্জনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে একজন প্রবীণ লেখক মন্তব্য করিয়াছেন—"কৃত্তিকা হইতে কার্ত্তিকের উৎপত্তি, কাজেই এখানে দ্বিত্ববর্জন ভ্রমাত্মক।" সম্প্রতি আর একজন লেখক অভিযোগ তুলিয়াছেন—"দ্বিত্ব উঠাইয়া দেওয়াতে শিক্ষার্থী ছাত্রেরা কিছু গোলযোগে পড়িয়াছে, কোথায় থাকিবে আর কোথায় থাকিবে না, প্রকৃতি-প্রত্যয় করিয়া তাহা তাহারা ধরিতে পারে না।"

কিন্তু শিক্ষার্থী ছাত্রদের গোলযোগে পড়িবার কোন কারণই নাই। কোন স্থলেই রেফযুক্ত ব্যঞ্জনে দ্বিত্ব অপরিহার্য নয়। এজন্য তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃতি-প্রত্যয়ের জ্ঞান অনাবশ্যক। ছাত্রেরা 'বানান সমিতি'র পরবর্তী নির্দেশ মানিয়া কার্তিক, বার্তিক, বার্ধক্য লিখিলে ভুল হইবে না। 'বানান সমিতি'র সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছিল। সমিতি সবিশেষ আলোচনার পর ব্যাকরণবিধানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 'বানানের নিয়ম' (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেকথা আমি জানি।

পাণিনি সূত্র করিয়াছেন 'ঝরো ঝরি সবর্ণে' (পা ৮, ৪, ৬৫)। যদি কোন পদে ব্যঞ্জনবর্ণের পর হ্ কিংবা য র ল ব ঙ ঞ ণ ন ম ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, তাহা হইলে মধ্যস্থ বর্ণটির বিকল্পে লোপ হয় — যেমন কৃষ্ণ। ঋদ্ধি কৃষ্ণর্দ্ধি= কৃষ্ণর্ধি। এই স্থলে ঋদ্ধি শব্দে প্রকৃতি-প্রত্যয় জাত মৌলিক দ্বিত্ব রহিয়াছে। তাহার উপর সন্ধির ফলে রেফ আসিল। সুতরাং রেফের জন্য দ্বিত্ব হয় নাই। তৎসত্ত্বেও সন্ধিসম্পন্ন পদ হইল দ্বিত্বহীন কৃষ্ণর্ধি। ব্যঞ্জনবর্ণ রকার ও ধকারের মধ্যস্থিত তৃতীয় বর্ণটির লোপ হইয়া গেল। অবশ্য বিকল্পে কৃষ্ণর্দ্ধি, এমন কি কৃষ্ণর্দ্দ্ধি পদও সিদ্ধ হইবে। এইরূপে

কৃত্তিকা হইতে কার্তিক, কার্ত্তিক ও কার্ত্তিক; বৃত্তি হইতে বার্তিক, বার্ত্তিক ও বার্ত্ত্তিক এবং বৃদ্ধ হইতে বার্ধক্য, বার্দ্ধক্য ও বার্দ্দ্ধক্য পদ নিষ্পন্ন হইবে। পদগুলির মধ্যে যেটির বানান সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত সেটিই আমাদের বরণীয়। কেহ দ্বিত্বযুক্ত কার্ত্তিক লিখিলে তাহা অশুদ্ধ হইবে না, বরং প্রকৃতিপ্রত্যয়বোধকই হইবে। কিন্তু দ্বিত্বহীন কার্তিক শুদ্ধ পদ। যদি এইরূপ সহজ বানানে ব্যাকরণের নিয়ম খণ্ডিত না হয়, তবে এ বানান সর্বত্র গ্রাহ্য।

কাহারও মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বাংলার কথা ভাষায় যখন কর্ম্ম, চর্চ্চা সর্ব্ব প্রভৃতি দ্বিত্বযুক্ত উচ্চারণ চলিত আছে, তখন লেখায় বা ছাপায় দ্বিত্ব-প্রয়োগে দোষ কি? দোষ নাই। কিন্তু আমরা মুখে তর্ক ও দুর্ঘট এইরূপে দ্বিত্বযুক্ত উচ্চারণ করিলেও লিখিবার সময় দ্বিত্ব বাদ দিয়া তর্ক ও দুর্ঘট লিখিয়া থাকি। এইরূপ অনেক স্থলেই বাংলা শব্দের উচ্চারণের সহিত লিখিত রূপের ঐক্য নাই। যেরূপে যুক্তির বলে 'বানান সমিতির' নির্দেশ ছাড়াই অর্ক, দুর্গ, দুর্ঘট, স্বর্গ, দুর্নীতি, সর্প প্রভৃতি শব্দে দ্বিত্ব পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেইরূপ যুক্তির আশ্রয়ে সকল স্থলেই রেফযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ববর্জন বিধেয়। ইহাতে লেখা ও ছাপা দুইই সুকর হইবে, বানানও সর্বত্র একরূপ হইবে। অশুদ্ধির শংকা না থাকিলে বানান বিষয়ে সংক্ষেপ ও সারল্যই কাম্য।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা

॥ তোপ দাগা ॥

বাংলায় আমরা কামান ছোড়াকে তোপ-দাগা বা কামান-দাগা বলি। কেন তোপ-দাগা বলি? তোপের সহিত দাগ্ বা দাগার কি সম্বন্ধ? সুবল মিত্রের অভিধানে দাগ বা দাগা যাবনিক শব্দ বলিয়া লিখিত। তোপ-দাগাই হইতেছে বাংলা বাগ্‌ধারা। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, কিন্তু কোনও সদুত্তর পাই নাই। এ বিষয়ে এক বৃদ্ধ তপাদার মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা খুব সঙ্গত মনে করি; এজন্য এ বিষয়ে যাহাতে আলোচনা হয় তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। তপাদার মহাশয় বলেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষ সীতারাম রায়ের মহম্মদপুরে গড়ের তোপদার ছিলেন; অব্যর্থ নিশানা। এজন্য লোকে তাঁহাকে তোপদার বলিত। শিরোমণি মহাশয়ের ছেলে যেমন লেখাপড়া না জানিলেও শিরোমণি হয়; আমরা তেমনি তোপ না ছুঁড়িলেও তোপদার বা তপাদার। আমরা আমাদের দেশে তপাদার বলিয়াই পরিচিত; আমরা আমাদের পূর্ব-উপাধি ভুলিয়া গিয়াছি। তপাদার মহাশয়ের বয়স ৭০; নিজে কখনও তোপ ছোড়েন নাই—যাহা বলিলেন সবই তাঁহার বাপ-ঠাকুরদার কাছে শোনা কথা; তবে এসব কথা তিনি বহুবার শুনিয়াছেন।

গড়ের মাঝে মাঝে বুরুজ; বুরুজের উপর থাকে কামান; কামান মাটি হইতে ১০।১২ হাত উঁচুতে থাকে। সেকালের কামান গাদা কামান; ঢালাই করা কামান; সামনের মুখ দিয়া পেটে বারুদ ঠাসিয়া দেওয়া হইত; বারুদ মাপ করিয়া দেওয়া হইত; বারুদের মাপের জন্য থাকিত হাতলওয়ালা কাঠের বাক্স—অনেকটা চামচের মতন দেখিতে। দুই বাক্স বারুদে (অড়হর কাঠের বা কুল কাঠের বারুদ খুব তেজী) পাঁচসেরী গোলা ছোটে; এক বাক্স বারুদে আড়াইসেরী গোলা ছোটে। এক বাক্সে কয় সের বারুদ ধরে তাহা তপাদার মহাশয় বলিতে পারেন না। তাড়াতাড়ি গোলা ছুঁড়িবার জন্য টাকার থলির মতন ছোট ছোট গোল থলিতে বারুদ মাপ করিয়া রাখা হইত; কামানের মুখে এই থলি ঢুকাইয়া দিয়া 'রামরদ' দিয়া গাদা হইত। তাহার পর গোলা ভর্তি করা হইত।

'রামরদ' কি ইংরাজী ramrod-এর অপভ্রংশ। তখনকার দিনে (আন্দাজ ইং ১৭২০ সালে) কি ইংরাজের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল? না তাঁহারা কামান, গোলা, বারুদ ইত্যাদি সরঞ্জাম বিক্রয় করিতেন?

কামানের পাল্লা নির্ভর করে অনেকটা কামানের মুখ উপর দিকে যতটা উঁচু হইয়া বা উঠিয়া থাকিবে তাহার উপর। শত্রু আসিতেছে, যে সব জায়গা দিয়া শত্রু কেল্লা দখল করিতে আসিবে, তাহার দূরত্ব ত পূর্বে হইতেই আমাদের জানা। ওই যে বটগাছ, উহার দূরত্ব হইতেছে এই বুরুজ হইতে ৪১০ গজ; পাশের বুরুজ হইতে ৪৩০ গজ। ঐখানে গোলা মারিতে হইবে। পনেরো-সেরী গোলার জন্য দুই কিস্তি বা দুই থলি বারুদ ঠিক করা আছে; এখন কামানের মুখ কতটা উঁচু করিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে পারিলেই হইল। কামানের মুখ উঁচু করিবার জন্য থাকিত বড় বড় শাল কাঠের 'গুঁজি' বা Wedge। এই 'গুঁজি' কাঠের হাতুড়ি দিয়া ঠুকিয়া কামানের নলের নীচে দরকার-মতন ঢুকাইয়া দেওয়া হইত। এই 'গুঁজির' গায়ে এক দিকে পাঁচসেরী গোলার জন্য, অপর দিকে আড়াইসেরী গোলার জন্য বাটালী দিয়া দাগ কাটা থাকিত। এক দাগে ছোট গোলা ২৫০ গজ যাইবে, দুই দাগে ৪০০ গজ যাইবে—ইত্যাদি পূর্ব হইতেই গোলা ছুঁড়িয়া ঠিক করা থাকিত। এখনও আমাদের (তপাদার মহাশয়ের) দেশের বাড়ীতে দুই-একটা গুঁজি আছে। দুইশত-আড়াইশত বৎসরে নষ্ট হয় নাই।

দাগ ঠিক করিতে পারিলেই কামানের অব্যর্থ নিশানা; শত্রুর গায়ে গোলা পড়িবেই পড়িবে। এই জন্য লোকে কামান-দাগা বা তোপ-দাগা বলে। কামান ছুঁড়িলেই কামান খানিকটা পিছু হটিয়া আসিবে; কামানকে আবার টানিয়া সামনের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। ঠিক জায়গায় কামান বসিল কিনা দেখিবার জন্য বুরুজের ছাদে ইঁটের উপর দাগ কাটা থাকে। সেই দাগে কামান টানিয়া আনিলে পাল্লা ঠিক ঠিক হয়।

এ বিষয়ে ইতিহাসবেত্তারা যদি মন দেন ও আলোচনা করেন ত ভাল হয়।

যতীন্দ্রমোহন দত্ত,
৪৫নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড,
কলিকাতা-২।

সবে স্কুলে গরমের ছুটি শেষ হল। গরমের ছুটিতে বাড়িতে বড়রা যাঁরা থাকেন তাঁরা জানেন, স্কুল ছুটির দিনগুলো অভিভাবকদের কাছে মাথা ধরার মাস। আশেপাশের সমস্ত ছেলেরা পাড়ার গলিতে ব্যাট-বল, ফুটবল নিয়ে অলিম্পিকের মহড়া দেয়। কারো বাড়ির কাঁচের জানলা ঝন্ ঝন্ করে ভাঙে। উঠোনে বল পড়লে ডাকাতের মত দরজা ধাক্কা দিয়ে দুপুরের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে একেবারে হুলুস্থূল ফেলে দেয়। তারপর ত বাড়িতে কারো যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি ফলন্ত পেয়ারা গাছ থাকে তাহলে আর দেখতে হবে না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পেয়ারা গাছটার দিকে তাকালে মনে হবে শুধু পেয়ারাই নয়, পেয়ারা গাছে কিছু কিছু ছেলেও ফলে! কারো কাছে নালিশ করার উপায় নেই। পাশের বাড়ির টুলুর নামে নালিশ করতে যান, আপনার ভাইপো ভোলার নামেই থান-আটেক নালিশ সঙ্গে সঙ্গেই পেশ করা হবে। এদের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হল ঘরবন্দী করে রাখা। কিন্তু ঘর ত দুটো! মধ্যবিত্তের সংসারে কার কটা ঘর আছে বাড়তি যে একাধটা ছেলেপিলেদের জন্যে ছেড়ে দেয়া চলবে। সেখানে তারা খুশী হলে পড়বে, খুশী হলে মেকানো প্লেট নিয়ে বাড়ি জাহাজ বানাবে অথবা জানলার কাছে বসে 'ডাকঘরের' অমলের মত যা খুশী ভাববে! একটু বড়ো যারা তারা অবশ্য তিনটে সাড়ে তিনটে বাজলেই সামনের প্রায়-নেড়া পার্কটায় বল নিয়ে চলে যায়। কিন্তু যে সব ছেলে এখনো ফুটবল-যোগ্য হয়নি অথচ পুতুল-ঝুমঝুমিতে ভুলে থাকার বয়সও হারিয়েছে তারা কোথায় যাবে? আর তাছাড়া একটা নেড়া পার্কের একটা ফুটবল খেলা না হয় বাইশটি বালকের ক্রীড়া সংস্থান করলো—কিন্তু যারা বাইশজনের একজন হতে পারলো না তারা?

ইংরেজীতে শুনেছি পার্কগুলোকে নাকি "লাংস অফ দি সিটি" বলে, অর্থাৎ শহরের ধমনী। পার্ককে এই উপাধি যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বয়স্ক। আমি বলি, তাঁদের কাছেই যদি পার্ক ধমনীরূপে প্রতিভাত হয়, শিশুদের কাছে পার্ক ত তাহলে ধমনীর স্পন্দন! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই স্পন্দন আমরা কেউ শুনতে পাই না। তাই আমাদের পার্ক বর্ষাকালে কাদা, গরমকালে নেড়া। এর পর দু-একটা পার্কে আবার ছেলে ডোবানোর অবারিত পুকুরও আছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোতে পার্ক আছে কিনা জানি না থাকলে কিন্তু বেশ হত। প্রত্যেকটি পাড়ায় না হোক, অন্ততঃ প্রতি মাইলে একটি করে শিশু-উদ্যান স্থাপন করলে সরকারের কিছু ব্যয় বাড়ে অবশ্য, কিন্তু তাতে অভিভাবকদের দুর্ভোগ এবং শিশুর স্বাস্থ্যহানি যোগটা কমত। এই সেদিন কাগজে পড়ছিলাম, ১৯৬৩ সালে হামবুর্গে যে আন্তর্জাতিক উদ্যান প্রদর্শনী হবে তার অন্যতম আকর্ষণ হবে একটি শিশু-উদ্যান। বিখ্যাত স্থপতিদের পরামর্শ মত হামবুর্গের নগর-প্রাচীর সরিয়ে দিয়ে সেখানে একটি অসাধারণ উদ্যান তৈরী হবে। চার হাজার বর্গফিটের এই উদ্যানে শিশুদের একটি খেলাঘর থাকবে, বল খেলা ও পরিখা, সাঁতারকাটার জন্যে অগভীর চৌবাচ্চা, ও মুক্তাঙ্গন মঞ্চ থাকবে। একটি পাহাড় থাকবে যাতে শিশুরা চড়তে পারে, এমন কি ওয়াটার মিল এবং স্লুইস গেটও বাদ যাবে না। তবে খেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস হবে কংক্রীটের তৈরী অদ্ভুত আকারের সব মূর্তি ও সুন্দর সুন্দর বিচিত্র সব পুতুল।

আমাদের ছেলেরা কি কোনোদিন কলকাতার কিনু গোয়ালার গলি থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে এই ধরণের শিশু উদ্যানের খোলা হাওয়ায় ডুবতে যেতে পারবে না?
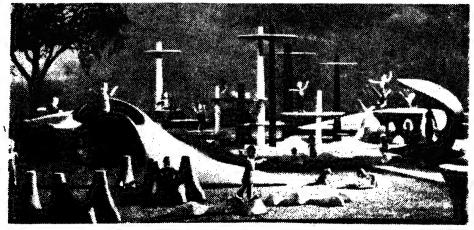
হামবুর্গে ১৯৬৩ সালে আন্তর্জাতিক উদ্যান প্রদর্শনীর সময় শিশুদের জন্য পরিকল্পিত নতুন ধরণের খেলার মাঠ যেমনটি দেখতে হবে। এখানে থাকবে পাহাড়, অদ্ভুত আকৃতির জীবজন্তুর মূর্তি আরও অনেক কিছু। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এটি হবে শিশুদের কল্পনার স্বর্গ।

বিচিত্র দেশ : বিচিত্র মানুষ

অতীন্দ্র মজুমদার

॥ জুয়া যাদের জীবিকা ॥

মানুষের ইতিহাসে জুয়াখেলাটা যে কত প্রাচীন তার হিসাব করা মুশকিল। মহাভারতের জুয়াখেলার ঘটনাটিই কৌরব এবং পাণ্ডব ভাইদের ভাগ্য-পরিবর্তনের মূল কেন্দ্র—শকুনি সেই জুয়াখেলার কলকাঠি নাড়ার মাত্র।

যীশু খৃষ্টের বিচারের পর তাঁকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয় তখন তাঁর প্রহরীরা সেই বধ্যভূমিতে বসে সময় কাটানোর জন্যে জুয়া খেলেছিল এরকম প্রমাণ আছে। যীশু খৃষ্টের পরিধানের পোশাক সেই জুয়ার বাজি ধরা হয়েছিল। যে-লোকটি সেই জুয়াখেলায় খৃষ্টের আলখাল্লা জিতে নিয়েছিল তার জীবনে পরে কী পরিবর্তন এল তাই নিয়ে এক বিরাট উপন্যাসই ত রচিত হয়েছে।

এক হাজার বছর আগে রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্যে 'নাঅবল' খেলার কথা আছে। কাহ্নপাদ বলছেন, 'নাঅবল খেলায় আমি ভাল দান দিই, চৌষট্টি কোঠা গুনে নিই।'

আধুনিক যুগে জুয়াখেলার ক্ষেত্র এবং পদ্ধতির মধ্যে বৈচিত্র্য এসেছে। ঘোড়ার দৌড়, কুকুরের দৌড়, ফুটবল পুল, তাস, দাবা, পাশা, মা-জং এমন কি বৃষ্টি হবে না রোদ হবে, রাণীর বাচ্চা ছেলে হবে না মেয়ে হবে, বেলুড় কলেজের ছেলে আই-এ পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে না প্রেসিডেন্সির ছেলে—এই নিয়ে পর্যন্ত আজকাল বাজি ধরা হয় অর্থাৎ জুয়া খেলা হয়। দেশে দেশে রুচি অনুযায়ী জুয়াখেলার রকমফের থাকলেও মূলে জিনিসটার পেছনে একটিই উদ্দেশ্য কাজ করে— ফাঁকতালে কিছু টাকা করে নেওয়া।

ফাঁকতালে কিছু করার অর্থই হচ্ছে সততাকে শিকেয় তুলে রাখা। যেমন তেমন করে তখন জুয়োয় জেতাটাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফুটবলে মোটা বাজি থাকলে রেফারী বা গোলকীপারকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে খেলার ফলটাকে নিজের পক্ষে আনার বহু নজীর আছে। সাকরেদের বুকে ছোট্ট আয়না লাগিয়ে প্রতিপক্ষের হাতে কি তাস আছে নিজের পক্ষের খেলোয়াড়কে তা জানতে সুযোগ করে দেওয়া, যে-ঘোড়ার জেতার সম্ভাবনা তাকে বিষাক্ত মদ খাইয়ে মাঝপথেই কাত করে দেওয়া, খেলোয়াড় গায়েব করা, এমন কি দরকার হলে নরহত্যা করা—সবই ত জুয়ায় জেতবার জন্যেই করা হয়। কোন ন্যায়নীতি এখানে চলে না চলতে দেওয়া হয় না। ফাঁকতালে টাকা করাই যখন লক্ষ্য তখন এসব ন্যায়নীতি বিবেক সততাকে ময়লা কাগজের মত আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতেই হবে, দেওয়াই উচিত। টাকার প্রতি মানুষের লোভ এবং তার জন্যে সমস্ত রকম নীচতা শঠতা করতে তার আগ্রহ—এই দুটি জিনিসই এই অমানুষিক আচরণের হেতু।।

> এই পর্যায়ে দেশ-বিদেশের মানুষের বিচিত্র নেশা ও পেশা সম্পর্কে কয়েকটি মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশিত হবে।

আধুনিক যুগে এই বিবেকবিক্রির দোকানগুলি পৃথিবীময় একটা সুশৃঙ্খল সংগঠনের আকৃতি নিয়েছে। পৃথিবীর এমন কোন বড় শহর নেই যেখানে কোন না কোন ভাবে জুয়াখেলার ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়ে আমেরিকা আর ভারতবর্ষে কোন তফাত নেই, তফাত নেই ইংলণ্ডে, জাপানে জার্মানী, পর্তুগালে, ফরাসী ও মালয়ে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিচিত্র জুয়ার আড্ডার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ইতালীর মন্টি কার্লো আর প্রাচ্য ভূখণ্ডের ম্যাকাও। মন্টি কার্লোর আয়ের চারভাগের তিনভাগ আসে বিদেশী পর্যটকদের জুয়াখেলার সেলামী থেকে। সে দেশের সর্বপ্রধান আকর্ষণই হচ্ছে জুয়ার আকর্ষণ। ম্যাকাও প্রাচ্য ভূখণ্ডের হয়ে মন্টি কার্লোর সেই সুনামের ভাগীদার।

ম্যাকাও হংকং-এর প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে একটি ছোট্ট শহর। দুর্ধর্ষ, পাপের নরক ম্যাকাও—জলদস্যু, খুনে ডাকাত চোরাকারবারী আফিং কোকেন-এর চোরাই চালানদার, নারীদেহ-ব্যবসায়ী, পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের আইনকে কলা-দেখানো পলাতক অপরাধীদের পীঠস্থান ম্যাকাও—পর্তুগীজ আর চীনের জারজ-সন্তান ম্যাকাও!

Macao is unconstrainedly free in her manners, she gambles, reeks of opium fumes and encourages all the usual concomitant sins. আবার অন্যদিকে তার আরেক রূপ। She smiles at you, innocent and lovely as a church going maiden on an Easter morn. ম্যাকাওয়ের দুই রূপই আছে। If you want her good, she is good: if you want her bad she will certainly oblige you.

বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝবে না প্রাচ্যের মন্টি কার্লো এই ম্যাকাওয়ের আসল রূপটি কি। কারণ চীনের এই প্রাচীনতম ইউরোপীয় কলোনিটির বাইরের সৌন্দর্য সত্যিই দেখবার মত। মস্ত মস্ত পাহাড়ের কোলে লুকিয়ে-থাকা এই ছোট্ট শহরটি একটি চমৎকার উপসাগরের কূলে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। লাল, হলুদ, নীল রঙের ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি—সামনে সুন্দর সমুদ্র—সবকে জড়িয়ে মস্ত মস্ত পাহাড়—অনেকটা ল্যাটিন আমেরিকার একটা টুকরো ভূখণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এর চরিত্র প্রাচ্যের, সেই চরিত্র স্পষ্ট তার সমুদ্রে ভাসমান ছোট ছোট সাম্পানের সারিতে ছইতোলা নৌকার দঙ্গলে, পালতোলা জেলে-ডিঙির সমারোহে। সমুদ্রের ধারে এলেই বোঝা যায় এদেশ ল্যাটিন আমেরিকার অংশ নয় তার ছদ্মবেশে প্রাচ্যেরই একমুঠো অস্তিত্ব।

ম্যাকাও কিন্তু এককালে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণিজ্য শহর ছিল। ওলন্দাজ বৃটিশ পর্তুগীজ চীনা ব্যবসায়ী—সবার কাছেই এর গুরুত্ব ছিল অসীম। কিন্তু শিকে ছিঁড়লো পর্তুগালের ভাগ্যে। তখন পর্তুগালের খুব রবরবা—জলদস্যুর পাল তখন পর্তুগালের মাথার মণি। তাদেরই দাপটে ম্যাকাও এল তাদের দখলে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে। দূরে থেকে তাকিয়ে দেখল ওলন্দাজ আর বৃটিশ বণিকরা আর তাকিয়ে দেখল চীনারা— দস্যুপর্তুগীজগুলি কিভাবে তাদের মাতৃভূমির বুককে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। কিন্তু খাস পর্তুগালের রাজার দখলে সেই ভূখণ্ড এল না, তাকে ছেড়ে দিতে হল সেই জলদস্যুদের হাতে, যারা তার বুকে উড়িয়ে দিল মড়ার মাথা আঁকা কালো নিশান, তরোয়াল উঁচিয়ে চীনাদের মাথা নিচু করালো সেই ভয়ঙ্কর পতাকার নীচে, শত শত নিরপরাধের লাল রক্তের ধারায় তর্পণ হল সেই সদ্য-জেতা দস্যুভূমির। তারপর ১৮৮৭ সালে

ম্যাকাওয়ের জুয়ার দোকান
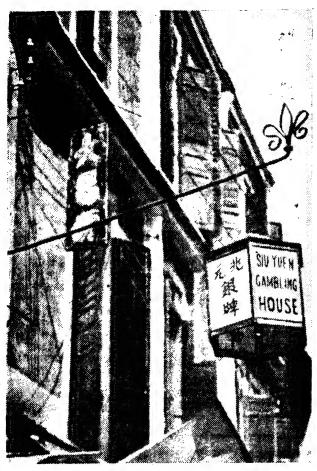
জলদস্যুদের হাত থেকে তা এল পর্তুগালের রাজার খাস শাসনের অধীনে, এল ম্যাকাও, ভার্দে তাইপে, কলোনে। কিন্তু ততদিনে জলদস্যুদের দ্বারা সম্ভুক্ত ম্যাকাও বারবনিতার রূপ পেয়েছে তার মোহিনী আকর্ষণের খবর পৌঁছে গেছে দেশবিদেশের নরকের কীটদের কাছে, পাপের পঙ্কিল জলে আকণ্ঠ ডুবে থাকার আনন্দে তখন ম্যাকাও পাপীদের স্বর্গপুরী। ম্যাকাও তার প্রথম যৌবনেই হল কীটদষ্ট, ব্যাধিগ্রস্ত বিষকন্যা।

ইতিমধ্যে আশেপাশে পরিবর্তন হয়েছে। ১৮৪১ সালে বৃটিশের অধীনে এসেছে হংকং। সেখানে তারা জাঁকিয়ে বসেছে ব্যবসার নামে রাজ্যবিস্তারের মতলবে। দলা দলা আফিং ঠাসবে চীনের মুখে, তাকে করতে হবে কর্মহীন শক্তিহীন নিবীর্য। তার জন্যে চাই আফিং কোকেন মদ। ইংরেজের নজর পড়ল ম্যাকাওয়ের ওপর। ম্যাকাও থেকে আসতে লাগল আফিঙের চোরাই চালান, বাক্সবন্দী কোকেন, নৌকার খোলে বোতলভর্তি মদ। জলদস্যুদের রক্ষিতা ম্যাকাওয়ের গলায় উঠলো ইংরেজের দেওয়া সোনার হার। লিসবনের কর্তারা দেখলেন ইংরেজের কল্যাণে চোরাই ব্যবসায়ের গলিপথে পর্তুগালের ঘরে আসছে কাঁচা সোনা। কি হবে ব্যবসায় কেন্দ্র হিসাবে ম্যাকাওকে সৎপথে এনে, পাপের জারজ কন্যাকে ব্যবহার কর পাপেরই ব্যবসায়ে, সে তার মোহিনীমায়া ছড়িয়ে ডেকে আনুক আরো অনেক ব্যবসায়ীদের—নরক জমে উঠুক। আর এদিকে লিসবনের রাজার সিন্দুক ভরে উঠুক সোনারূপায়, মণিরত্নে, সিল্কে, হাতির দাঁতে। অতএব, খোলা হোক সেখানে হাজার হাজার জুয়ার আড্ডা, পাশাপাশি গড়ে তোল পতিতাদের ব্যারাক আর দাও আফিং আর কোকেন—যাতে ডুবে থেকে সেদেশের অধিবাসীদের মুক্তিপিপাসা ধোঁয়া হয়ে উড়ে যেতে পারে নীল আকাশের বুকে। সাবধান হও বাইরের গোয়েন্দা-ঐতিহাসিকদের ব্যাপারে। তারা যদি ম্যাকাওয়ের কুৎসিত জীবনের বিবরণ লেখে—তাদের সব বই কিনে নাও, ম্যাকাওয়ের জুয়ার আড্ডায় চুরুট জ্বালানোর ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার কর তার ছাপানো পৃষ্ঠাগুলিকে, ধোঁয়া করে উড়িয়ে দাও সত্য বিবরণের উজ্জ্বল ঘোষণাকে! বানানো গল্প নয়, সত্যি সত্যিই এক ঐতিহাসিকের লেখা ম্যাকাওয়ের ঘৃণ্য জীবনের বিবরণ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তার প্রকাশকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে এই ভাবেই ম্যাকাওয়ের জুয়ার আড্ডায় আর পতিতালয়ে সদ্গতি করা হয়েছিল।

এই হচ্ছে ম্যাকাও, তার শাসক তার অধিবাসীরা। প্রাচ্যের মণ্টিকার্লো ম্যাকাও!

এবার ম্যাকাওয়ের জুয়ার আড্ডা আর তার জুয়াড়ীদের কথা কিছু বলি।

প্রথম বলি লটারীর নামে যে-সব জুয়া চলে তাদের কথা। ম্যাকাওয়ে লটারী আছে তিন রকম—প্রথম 'পাক কাপ্ পিয়ো'—দিনে তিনবার তার ড্রয়িং হয়। এই লটারী গরীবদের পকেট খালি করবার জন্যে। রিকশাওয়ালা, মুটে মজুর, রাস্তার ফেরিওয়ালা, হোটেল বয়, রাস্তার মস্তান, সাম্পানের মাঝি—এরাই এর খদ্দের। টিকেটের দাম কম, আনা কয়েক মাত্র। জিতলে যত টাকা খাটানো হবে তার একশ গুণ পুরস্কার পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় ধরনের লটারীর নাম 'সান্ পিয়ো'। এর ড্রইং হয় সপ্তাহে একবার। টিকেটের দাম একটু বেশি, পনের সেণ্ট কমপক্ষে। কুড়িটা থেকে ত্রিশটা পুরস্কার আছে জিতলে। তৃতীয় ধরনের নাম 'পো পিয়ো'। পঞ্চাশ সেণ্ট থেকে দশ ডলার পর্যন্ত টিকেটের দাম, জিতলে ২৫,০০০ ডলার পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। প্রতি পাঁচ দিন অন্তর ড্রইং। বলা বাহুল্য যে দিন 'পো পিয়ো'র ড্রইং হয় সেদিন ড্রইং অফিসগুলির সামনে হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ, কুমারী যুবতী বৃদ্ধা কুমার যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধের ঠাসাঠাসি গাদাগাদি, ঝগড়া হট্ট-

গোল মারামারি, চোখের জল, ঋণের চিন্তা এবং আত্মহত্যার হিড়িক।

এইসব লটারীর টিকিট বিক্রির জন্যে অলিতে গলিতে, সদর রাস্তায়, হাটে-বাজারে, মদের আড্ডায় পতিতালয়ে গিজ গিজ করছে শয়ে শয়ে দোকান। খাস ধুরে পাঁয়রা প্রত্যেকেই প্রায় লটারীর টিকিট কেনে, কিন্তু নলচে আড়াল দিয়ে। ডার্টি নিগারদের সঙ্গে তারা লাইন দিয়ে দাঁড়ায় না, চাকর পাঠিয়ে টিকিট বুক করে, জিতলে সেই চাকররাই মালিককে মদের বারে কিংবা পতিতালয়ের দরজায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসে।

'পাক্ কাপ পিয়ো' লটারী চালায় একটা বেশ বড় সিন্ডিকেট, মস্ত তাদের বাড়ী, বিরাট তাদের সংগঠন। সকাল সাড়ে সাতটায় সিন্ডিকেটের অসংখ্য হল-ঘরে সকলের সামনে ড্রইং—কুড়িটি পুরস্কার-প্রাপকদের নাম বাছাই হবে। সরঞ্জামের মধ্যে দুটি পেটমোটা কুঁজোর মত তামার পাত্র, তার একটির মধ্যে আশীটি শাদা কাঠের বল, প্রত্যেকটির গায়ে টিকিট নম্বর অনুযায়ী চিহ্ন খোদাই করা, অন্যটিতে কুড়িটি লাল বল। এক-সঙ্গে আশিটি বল আর আশিটি টিকিট নিয়ে জুয়াখেলা। লাল বল আর শাদা বল পাত্রের মধ্যে মিশিয়ে কাঠি দিয়ে প্রাণপণে ঘোরানো হয়। পরে পাত্রের নীচের ফুটো দিয়ে ছাড়া হয় একটি করে বল। শাদা হলে লবডংকা, লাল বল এবং তার টিকিট নাম্বার মিলে গেলে পুরস্কার। ফলাফল বেরোনোর পরেই হট্টগোল মারমারি, হতাশার দীর্ঘ-নিশ্বাস, আবার ধার করে টিকিট কেনা, আর যারা জিতল্লো তাদের আফিংয়ের আড্ডায় কিংবা পতিতালয়ে ছোটা। এলাকায় এলাকায় হল আর দোকান, প্রতি দোকানে আশিটা টিকিট বিক্রি এই শিকলে বাঁধা 'প্যাক্ ক্যাপ্ পিয়ো' লটারীর সিন্ডিকেট। টিকিট বিক্রি হয় লক্ষ লক্ষ টাকার তার কুড়ি ভাগের এক ভাগ মাত্র বায় হয় পুরস্কারে। এই জুয়া চালায় ফ্যান্-টান সিন্ডিকেট। তাদের এটা একচেটিয়া ব্যবসা।

টুরিস্টদের মরশুম যখন আসে তখন স্টীমার বন্দরে ভেড়ার আগেই হোটেল মালিক, কুলি, দালাল, 'চলুন স্যার শহর দেখিয়ে আনি'—গোছের গাইড, ফ্যান-টানের এজেন্ট, লম্পটপোষক মেয়ে-ব্যবসায়ী,—সবাই গিয়ে শকুনের মত হানা দেয় স্টীমারের ডেকে। দু'চার পয়সা যা রোজগার করে, নিয়েই ছোটে লটারীর টিকিটবিক্রির দোকানে। তিন ঘন্টায় সব ফুঁকে দিয়ে আবার ছোটে নতুন খদ্দেরের পিছনে, কিংবা ধার করতে, কিংবা কোথাও কিছু সুবিধা না হলে স্রেফ্ ভিক্ষা করছে। এই লটারীতে যে কি পরিমাণ লাভ হয় সিন্ডিকেটের আমরা কল্পনাও করতে পারব না। একা ফ্যানটান সিন্ডিকেটই কর হিসাবে ম্যাকাও সরকারকে দিনে ৫০০০ ডলার বা প্রায় কুড়ি হাজার টাকা করে দেয়। বছরে কত হয় অংক-জানা পাঠক হিসাব করে নিন।

জুয়ার দোকানী

শুধু এই লটারীই নয়, ফ্যানটানের পরিচালনায় আরো নানা রকম জুয়ার ব্যবস্থা আছে। রাতের ম্যাকাওয়ের যে-কোন রাস্তা দিয়ে হাটলেই দেখতে পাওয়া যাবে আলোর মালায় সাজানো অসংখ্য জুয়ার দোকান। সেখানে বড় বড় সাইন-বোর্ড—'এখানে দিবারাত্র এই এই ধরনের জুয়া খেলা হয়'—দরজার সামনে জন-দুয়েক পুলিশ শৃংখলা রাখার জন্যে। রিকশাওয়ালা, বিদেশী হলেই নিয়ে যায় সেই দোকানের সামনে, কারণ তারা জানে এই একটি জায়গাতেই আমেরিকান আর চীনা, ইংরেজ আর নিগ্রোয় কোন বিবাদ নেই। জুয়ার দোকানে চীনে, জাপানী, মালয়ী সব জাতের লোকের ভিড়, এখানে জাতিভেদ নেই বর্ণভেদ নেই। হাল্কা নীল আলোয় তারা এক একটা ক্ষুধিত লোভার্ত আত্মার শারীর রূপ। একপাশে একটি লম্বা টেবিলের পেছনে বসে 'ক্রোপিয়ার', সেই জুয়া চালায়। তার সামনে একগাদা চীনা পুরোনো মুদ্রা থাকবন্দী সাজানো, কাপড় দিয়ে ঢাকা—কত যে আছে কে জানে। সামনে একটি লম্বা আঁকশি। হাতির দাঁতের বা আবলুশ কাঠের তৈরী। একে একে যখন সকলের টিকিট কেনা হয়ে গেল তখন আরম্ভ হল জুয়ো খেলা। 'ক্রোপিয়ার' কাপড়ের ঢাকা খুলে আঁকশি দিয়ে টেনে মুদ্রার গাদা থেকে চারটি করে মুদ্রা ফেলে দিতে লাগল। সব শেষে কটি থাকবে কেউ জানে না—একটি, না দুটি, না তিনটি, কি চারটি।* যার যেরকম জুয়া ধরা আছে সে সেই রকম পুরস্কার পাবে জিতলে পরে। কিন্তু জিতলেই যে সব টাকা পাওয়া যাবে তা নয়, তার থেকে শতকরা দশ টাকা দোকান খরচ হিসাবে ক্রোপিয়ার কেটে নেবে। তার থেকে একটা অংশ যাবে ফ্যানটান সিন্ডিকেটে। এই মুদ্রা-জুয়ার দেশীয় নাম ফান্ (Faan)।

এই মুদ্রা-জুয়ার রকম-ফের 'কোক' (Kwok)। সেখানে আপনি দুটো করে নম্বর বলতে পারবেন অর্থাৎ শেষে একটা থাকবে না তিনটে, দুটো থাকবে না চারটে তার ওপর আপনি বেটিং করতে পারেন। জোড় সংখ্যা 'নিম্' আর বেজোড় সংখ্যা 'লিম্'। যদি একটাও বাকী না থাকে,—ধরা যাক ষোলটি মুদ্রার ক্ষেত্রে যেখানে চারটি করে এক একবার টানলে পাঁচের দানে একটাও থাকবে না—সেখানে

টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার নিয়ম, তবে পুরো টাকাটা নয় দশ পারসেন্ট বাদ দিয়ে।

চিং (Ching) জুয়ার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ধরারই আরেকটু জটিলতা আছে। এর ক্ষেত্রে আপনি বাজি ধরলেন মুদ্রা থাকবে একটা, শূন্যে আর দুটো বাকি থাকলে টাকা ফেরৎ, কিন্তু তিনটে বাকী থাকলে আপনার হার। চিং জুয়োই লোকে বেশি খেলে কিন্তু জেতে খুব কম। চারটে করেই যে প্রতিবার মুদ্রা ফেলা হবে তা নয়, তিনটে পাঁচটা সাতটা দুটো এক একবার এক এক রকম নিয়ম হ'তে পারে। তবে সব ক্ষেত্রেই ক্রোপিয়ার খেলার আগে কি নিয়মে খেলা হবে তা ঘোষণা করে দেবে।

জুয়ার আড্ডা দোতলা কিংবা তিনতলা বাড়ী। একতলায় ক্রোপিয়ার হলঘরে টেবিল সাজিয়ে বসে, দোতলা তিনতলায় আছে ঝুলে বারান্দা, সেখানে চেয়ার টেবিলে বসে আপনি জুয়ো খেলায় অংশ নিতে পারেন, ওপর থেকে দড়িতে ঝুলিয়ে আপনার বাজির টাকা টেবিলের ওপর নামিয়ে দিতে পারেন। দোতলায় তিনতলায় মদ আফিং চণ্ডু কোকেনের ব্যবস্থা আছে। পিছনে পর্দাঘেরা ঘরে ঘরে আরো নানা রকম কুৎসিত আনন্দের বন্দোবস্তও আছে। এই পৈশাচিক আনন্দ আর জুয়া ম্যাকাওয়ের প্রধান আকর্ষণ বলে ম্যাকাওয়ের জুয়ার আড্ডা আর
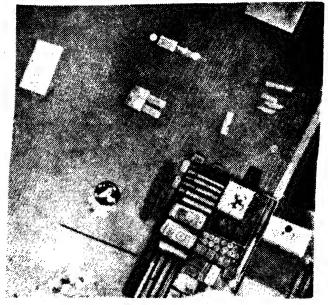
জুয়াখেলার টেবিল

পতিতালয়গুলি কখনও ফাঁকা থাকে না, বেকার থাকে না জুয়ার দোকানদার আর তাদের দালাল।

পথের ধারে ফুটপাথে, গলির মধ্যে রিক্‌শার আড্ডায়, বন্দরের পাটাতনের ওপর কোথাও জুয়ার কামাই নেই। রাস্তায় বাঘবন্দী খেলার মত ঘর কেটে—বোতাম, ইটের টুকরো, দেশলাইয়ের কাঠি, সিগারেটের প্যাকেটের ঢাকনা—যা হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাই নিয়েই জুয়া চলছে। এসব জুয়ায় ট্যাক্স দিতে হয় না ঠিকই তবে টাকার সীমা বেঁধে দেওয়া আছে। পাঁচ সাত টাকার বেশি এসব জুয়ায় জিততে পারা যায় না। এই রকম দশটা পথের জুয়ায় জিতে যে পাঁচ টাকা পায় সে সঙ্গে সঙ্গে ছোটে হয় প্যাক কাপ পিয়ো, কিম্বা নিম-লিম্, কি ফান্ কি কোক অথবা চিং খেলার দোকানে। সেখানে যতক্ষণ না সে সব ফুঁকে দিতে পারছে ততক্ষণ তার মনে শান্তি নেই। নেহাৎ পেট চালানোর জন্যে রিকশা না টানলে, মাল না বইলে চলে না তাই ওসব ছোট কাজ করা—না হলে জুয়ার আড্ডা ছেড়ে আর কোথাও যেতে, জুয়া খেলা ছাড়া আর কিছু কি করতে ইচ্ছা হয়! একটা দেশের সমস্ত লোককে কিভাবে জুয়ার নেশায় মাতাল করে রাখা যায় ম্যাকাও তার আদর্শ উদাহরণ। ম্যাকাওয়ের পোর্তুগীজ সরকারও তাই চান। আর সে দেশের সাধারণ লোক? তাদের মধ্যে প্রচলিত একটি ছড়া তুলে দিলেই বোঝা যাবে জুয়া জিনিসটাকে তারা কি চোখে দেখে—

জন্ম মৃত্যু জুয়ার কড়ি
ভগবানের হাতে
সেই জুয়াতেই প্রভুর সময় কাটে—
ভগবানকে খুঁজবি যদি
আয় তবে ফুটপাতে,
ঘর, ঘরে ঘর, জুয়ার হাটে হাটে!

পথের ধারে জুয়ার আড্ডা

পুতুল নিয়ে খেলা

কনাদ চৌধুরী

ওয়ারশতে পুতুল নাচ শিল্পীদের অষ্টম সম্মেলন এই জুন মাসে হয়ে গেল। এই সম্মেলনে যোগ দেন চল্লিশটি দেশের এক হাজার প্রতিনিধি। আবার ব্যাভেরিয়ার জাপ-জার্মাণ সমিতি মিউ-নিকে একটি পাপেট শিল্পের আয়োজন করেছেন। জাপান থেকে এই প্রদর্শনীর জন্য জাপান এয়ার লাইন্স সংস্থা অনেক পুতুল বহন করে এনেছেন জার্মাণীতে।

পৃথিবীতে পুতুল সাম্রাজ্যের যে ক্রম বিস্তার ঘটছে এই সম্মেলন দুটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একদা শিশু-শোভন সামগ্রী হিসেবেই পুতুল গৃহীত হত বয়স্ক সমাজে। কিন্তু ইদানীং বয়স্করাও পুতুল নিয়ে খেলা আরম্ভ করেছেন। আজকাল চলচ্চিত্রে, পাপেট শোতে এবং বয়স্কদের বাইরের ঘরেও পুতুলের অভি-যান ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়েছে। এমনকি পিকাসোর মতন বিশ্ববরেণ্য শিল্পীও পুতুলের হাতে বন্দী হয়েছেন সহজেই। ইয়োরোপে পুতুল নিয়ে খেলা শিল্পীদের মধ্যে পিকাসোই প্রথম আরম্ভ করেন সম্ভবতঃ। ঊনিশ শতকের বহু-নিষ্ঠ চোখ যখন নতুন দৃশ্যের নতুন মূল্যের এবং নতুন জগতের সন্ধানে জীবনপাত করছেন ঠিক তখনই নানান দেশের পুতুল নিয়ে ভাস্কর্য যেন পুরোনো দৃশ্যের জগতে রূপকথার আলো নিয়ে এল। পিকাসো নিগ্রোদের মূর্তি নিয়ে নানান পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। এবং পশ্চিমী হাওয়ায় আমাদের দেশের শিল্পরুচির বায়ু মোরগটিও লোক-শিল্পের পুতুলগুলির দিকে চোখ ফেরালো। পুতুলরসিক সুধীবৃন্দ বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার পুতুল আর মেদিনী-পুরের নাড়াজোলের পুতুলের পাথরে আবিষ্কারে উচ্ছ্বসিত হলেন। অনেক কথা শোনা গেল। মৈমনসিংহের মধুপুরের পুতুল, বারুইপুরের পুতুল ইত্যাদি সম্বন্ধে। কৃষ্ণনগরের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি-মূলক পুতুলগুলি অবশ্য অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশের নয়নমোহন ছিল। পুতুলের আধুনিকীকরণও আমাদের দেশে হালে আরম্ভ হয়েছে। পুতুলের সর্বাধুনিক ব্যবহার পাপেট শোতে এবং চলচ্চিত্রে। সম্প্রতি একটি পুতুল-চলচ্চিত্র কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছে। এবং একটি শিশু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাপেট শো প্রদর্শনীও কলকাতার প্রমোদ জগতে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছে।

কিন্তু সংগঠিতভাবে পুতুল শিল্পের আন্দোলন আজো পশ্চিমী দেশের মধ্যেই সীমিত। আজকে আমেরিকার খেলনার বিবর্তন নিয়ে রীতিমত গবেষণা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দু হাজার খেলনা এবং পুতুল শিল্পীরা পুতুল এবং খেলনা নির্মাণে মনোসমীক্ষকদের সাহায্যে আধু-নিক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের খেলনা শিল্পের হেনরী ফোর্ড লুই মার্কস এর একটি বক্তব্য হল :

'শিশুকে খেলনা দিয়ে বসিয়ে রাখুন, সে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে— আদিবাসী রমণীর পিঠে তার শিশুটি যেমন নিরাপদে থাকে অনেকটা ঠিক তেমনি।'

পুতুল এবং অন্যান্য খেলনার ক্রম-বিকাশ ধারায় চলতি সমাজরীতি ও শ্রম-শিল্পের প্রভাব ও ভূমিকাও যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃত। আমেরিকায় যখন রেলওয়ে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ চলছিল, খেলনা নির্মাতারা তখন খেলনার বৈদ্যুতিক ট্রেন বাজারে ছাড়লেন। স্বভাবতঃই সময়োপ-যোগী হওয়ায় এই ধরনের খেলনা সাধা-রণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল খুব বেশী করে। অবশ্য খেলনার রেলগাড়ি নির্মাণের আদি স্থান হল দক্ষিণ জার্মাণীর গোয়েপিংগেন শহরটি। গোয়ে-পিংগেনের কারখানায় তৈরী রেলগাড়ি পৃথিবীর প্রায় ৬৭টি দেশে রপ্তানী হয়। কারখানাটি স্থাপিত হয় ১৮৯০ সালে। আজকে গোয়েপিংগেনের 'রেল-গাড়ির' কারখানায় প্রায় আড়াই হাজার লোক কাজ করে এবং এক ঘণ্টায় বাহাত্তরটি ইঞ্জিন প্রস্তুত হয়।

মহাশূন্য সন্ধান যুগের সঙ্গে সঙ্গে পুতুল-খেলনার সংসারও নতুন রীতিতে

একটি [illegible] পুতুল

সাজানো আরম্ভ হয়েছে। রোবট মহাজাগতিক বন্দুক, কিম্ভূত পোষাকের রকেটযাত্রী পুতুল প্রভৃতি নিত্য-নতুন আগন্তুক এসেছে পুতুল মহলে। গণতান্ত্রিক জার্মাণীর ব্রাণ্ডেনবুর্গ কারখানায় ত আস্ত একটি খেলনার রকেট-ঘাঁটি-ই তৈরী হচ্ছে প্লাস্টিকের। পুতুল তৈরীর উপকরণ হিসেবে প্লাস্টিকের ব্যবহার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের আবিষ্কার। প্লাস্টিকের পুতুলের একটি বিশেষ সুবিধে হল পুতুলগুলো দুমড়োয় না, টোল খায় না, এবং পুতুলের বিশেষ কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহজেই বদলে নেয়া যায়।

পুতুল নিয়ে একা খেলতে খেলতে মানুষের বোধ হয় নিদারুণ ক্লান্তিই এসেছিল একদা। হয়ত তাই সকলের সামনে পুতুল নিয়ে খেলা আরম্ভ করতে হয়েছে তাকে। পুতুল নাচানোর প্রমোদ সেই ক্লান্তিরই ফসল সম্ভবতঃ। পুতুল-নাচের ইতিহাসের সূচীপত্রে প্রথম নামটি

কোরিয়ার পুতুল

ভারতবর্ষের। পুতুল নাচের জন্ম আমাদের দেশেই। ভারতবর্ষে এমন অনেক পরিবার আছে যাদের পুতুল নাচের পুতুল তৈরীই একমাত্র জীবিকা। তবে পুতুল নাচের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হলেও ধাত্রী-ভূমির গৌরব প্রতীচ্যের কয়েকটি দেশকে ছেড়ে না দিয়ে উপায় নেই। চেকোশ্লোভাকিয়া, রাশিয়া, আমেরিকা এবং গণতান্ত্রিক জার্মাণী নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম। আমেরিকাতে টেলিভিশনেও ইদানীং পুতুল নাচের প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ষোলোশ পুতুল নাচিয়ে দল আছে। কিছুদিন আগেও কলকাতায় একটি মার্কিনী পুতুল নাচিয়ে দল পুতুল নাচের প্রদর্শনী দেখিয়ে গেছেন। গণতান্ত্রিক জার্মাণীর পুতুল নাচের অনুষ্ঠান আরো ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক জার্মাণীতে পুতুল নাচ দেখাবার জন্যে নয়টি জাতীয় প্রেক্ষাগৃহ আছে। তাছাড়া আছে জাতীয় গণ-ফৌজের একটি আঁসেম্বল, চল্লিশটি বে-সরকারী মঞ্চ এবং সংখ্যাতীত শৌখিন দল। ১৯৫৫ সাল থেকে 'ডেফা'র কার্টুন-ফিল্ম্ ষ্টুডিওতে পুতুল-চলচ্চিত্রও নির্মিত হচ্ছে। এই সব 'পুতুল-ছবির' প্রযোজক হলেন কার্ল শ্রোয়েডার—অধ্যাপক সার্গে ওব্রাটজ্ভ-এর মতে যিনি "পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুতুল-নাচ শিল্পী"। আমেরিকার বিল এবং কোরা বেয়ার্ড দম্পতির মত শ্রোয়েডার দম্পতিও পুতুল-পাগল স্বামী-স্ত্রী। শ্রোয়েডার বিশ্ব-সাহিত্য থেকে বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গ বেছে বর্তমান কালের উপযোগী করে পুতুল নাচের মঞ্চে পরিবেশন করেন। এমনকি 'ডক্টর ফাউস্ট্‌স' নাটকটিও তিনি পুতুল অভিনেতাদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে অজস্র প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

বাঙলার একটি আধুনিক পুতুল

পুতুলের এই ব্যাপক ব্যবহার কেন আরম্ভ হয়েছে তার উত্তর একমাত্র মনোবিজ্ঞানীরাই মাথা চুলকে বলতে পারেন। কিংবা পারেন কি? যত দিন যাচ্ছে, আশাভঙ্গের তাড়নায় মানুষ ক্রমশঃই যেন ছোট হয়ে, ছোট হয়ে নিজের একান্ত মনের মতন সংসারের খোঁজে ফেরারী হয়েছে। অবক্ষয়ের হাতে বন্দী হয়ে আজকের মানুষ আরেক বন্দীর খোঁজে বেরিয়েছে। এবং কোন পুতুল হয়ত সেই অজাতশত্রু বন্দী। হয়ত তাই, আমরা কি রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে কিংবা নতুন রীতির সাহিত্যে নোরার সেই পুতুলের সংসারটাই ফেঁদে বসেছি। আর কূট-নীতি? কূটনীতিও কি বাদ পড়েছে? নইলে সেদিন ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পত্নী মিসেস কেনেডীকে পুতুলই বা উপহার দিতে যাবেন কেন?

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কথা হচ্ছিল রণমায়ার শোবার ঘরে খাটের উপর বসে। এক লাফে উঠে পড়ল মেয়েটি, আঁচলটা শক্ত করে কোমরে জড়াল। তারপর মেঝের উপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে, বুক ফুলিয়ে দু হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে গলাটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলল, জলদি কর।

দুই সখীর মিলিত কণ্ঠের উচ্চ হাসিতে ঘর ভরে উঠল।

উৎসবের আয়োজন করতে গিয়ে রণমায়ার মনে হল, ফোঁটা তো শুধু দাদার প্রাপ্য নয়, ছোট ভাইও সমান অধিকারী। তাছাড়া, দিলীপকে বাদ দিয়ে কোনো উৎসবই কল্পনা করা যায় না। তার সঙ্গে ওর যে সম্পর্ক সে শুধু আজকের নয়, বর্স্টালের বাসায় সেই চরম দুঃখের দিনে এই ছেলেটিকে দুএকবার দূরে থেকে দেখেই মনে মনে অন্তরঙ্গ আপনজন বলে গ্রহণ করেছিল। দাদার মুখে তার কথা এত শুনেছে যে, তখন থেকেই নিজেকে তার দিদির আসনে বসিয়ে রেখেছিল, তার পর এখানে এসে আস্তে আস্তে সে একান্ত কাছটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ 'মায়াদি' শুধু তার দিদি নয়, নিকটতম বন্ধু। ওর ঐ বুদ্ধি-দীপ্ত সুন্দর কপালে চন্দন পরিয়ে চিরদিনের তরে সেই সম্পর্কের স্বীকৃতি দেবে রণমায়া।

ঐ সঙ্গে আরেকজনকে ডাকতে হবে। মকবুল। ওদেরই বন্ধু, কিন্তু তার কাছে কখনো আসেনি। ছেলেটির সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছু জানে না। কথায় কথায় দাদা একদিন বলেছিল, মেয়েমানুষ জাতটা ওর দুচক্ষের বিষ। কথাটা নেহাৎ ঠাট্টা-চ্ছলেই বলেছিল বাহাদুর। তার থেকে রণমায়ার মনে হয়েছিল, হয়তো কোনো সর্বনাশী বিষ-পাত্র হাতে করেই এসেছিল ওর কাছে। সে রকম মেয়ের তো অভাব নেই সংসারে। ও বেচারা কিছু না জেনে সরল মনে সেই বিষ সুধা বলে পান করেছিল। সেই জ্বালা ওর চোখ দুটোকে ঝলসে ধাঁধিয়ে দিয়ে গেছে। এই অদেখা অচেনা ছেলেটির জন্য ভারী মমতা হল রণমায়ার। ওকে একবার কাছে পেলে চেষ্টা করে দেখত, ঐ দৃষ্টিটাকে বদলে দেওয়া যায় কিনা, ওর ঐ বিষজর্জর মনের উপর একটুখানি স্নিগ্ধ প্রলেপের স্পর্শ কতখানি কাজ করে। একদিন দুদিনে হবে না; সময় লাগবে। রণমায়ার মনে হল, এ যেন তারই কাজ। শুধু বাহাদুরের বোন, দিলীপের দিদি বলে নয়, নারী হিসেবে এটা তার বিশেষ দায়। একটি মেয়ে যে ক্ষতি রেখে গেল, আর একটি মেয়েকেই তার পূরণের ভার নিতে হবে। এই ভাইফোঁটা দিয়েই হোক তার শুভারম্ভ।

দাদাকে বলল, ওকে কিন্তু আনা চাইই। বাহাদুরের মুখে সন্দেহের সুর, সে কি আসবে?

—আসবে না মানে? বলো, আমি তাকে বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করছি।

বাহাদুর ও দিলীপ ঘরে ঢুকতেই রণমায়া ঝংকার দিয়ে উঠল, এই বুঝি তোমাদের সকাল সকাল! তারপরই রাস্তার দিকে চেয়ে বলল, মকবুল আসেনি?

বাহাদুর জবাব না দিয়ে খানিকটা বিব্রত দৃষ্টিতে দিলীপের দিকে তাকাল। সে ভারী গলায় বলল, তার শরীরটা তেমন ভালো নেই।

রণমায়া সঙ্গে সঙ্গে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল, তার সঙ্গে একটু যেন অন্য-মনস্ক। এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা তুলল না। শরীর ভালো নয় শুনেও কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করল না। ভিতরে যেতে যেতে বলল, তোমরা জামাটামা খুলে ভালো হয়ে বসো। আমি এখনি আসছি।

ভিতরের বারান্দায় পাশাপাশি তিনখানা আসন পেতে রেখেছিল, তার একখানা তুলে ফেলল। রান্নাঘরে তিন প্রস্থ থালাবাটি নামানো হয়েছিল। একটা থালা এবং কয়েকটা বাটি সেখান থেকে সরিয়ে রেখে বাকীগুলোয় খাবার সাজাতে বসেছে, এমন সময় বাহাদুর এসে পিছনে দাঁড়িয়ে বলল, হঠাৎ এত খাওয়াবার ধুম যে? মামা হচ্ছি নাকি আমরা?

—যাও; তোমার তো খালি ঐ ভাবনা...বলতে বলতে লাল হয়ে উঠল রণমায়া। ঠিক সেই সময়ে দই মিষ্টি হাতে পদম্ বাহাদুর এসে দাঁড়াতেই বাহাদুর চোখের ইঙ্গিতে তাকেও ঐ একই প্রশ্ন করল, ব্যাপার কী পদম্?

—না হে, না। সে-সব কিছু নয়।

—তবে?

—এটা হচ্ছে তোমাদের ব্যাপার। মানে—

—এই, এখন বলবে না, তর্জনী তুলে চোখ পাকিয়ে স্বামীকে তাড়না করল রণমায়া।

—বেশ, বলবে না। এগুলো নেবে, না হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকবো?

রণমায়া হাসিমুখে উঠে এসে ওর হাত থেকে জিনিসগুলো নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, লিস্টি মতো সব এনেছ তো?

—একটা জিনিস বেশী এনেছি।

—কী?

—বলবো কেন?

—না বললে। আমি যেন আর খুলে দেখতে পারি না।

—'দাদার খুব পছন্দ হবে।' বস্তুটি যেন অত্যন্ত লোভনীয় এমনিভাবে বলল পদ্মা।

—কী, বল না?

—লাড্ডু।

—দিল্লীকা? বলে, উল্লসিত হয়ে উঠল বাহাদুর।

—নেহি, দার্জিলিংকা।

দুজনের উচ্ছ্বসিত হাসি। রণমায়া সে হাসিতে যোগ দিল না। মুখ বেঁকিয়ে বলল, দূরে, আজকের দিনে ও সব বাজে জিনিস ওদের পাতে দিতে আছে?

—কী আজকে, তাই তো বলছিস না— এবারে রীতিমত অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠল বাহাদুর।

—এখখুনি দেখতে পাবে। বরং দিলীপকে ডেকে নিয়ে এসো।

তার নির্দেশমত বাহাদুর ও দিলীপ পাশাপাশি আসনে বসবার পর, রণমায়া পিলসুজের উপরে সাজানো ঘিয়ের প্রদীপটা জেলে দিল, ধুনচিতে আগুন দিয়ে খানিকটা ধুনো আর গুগ্‌গুল ফেলে দিল তার মধ্যে। তারপর উঠে গিয়ে শোবার ঘরের ভিতর থেকে দু-প্রস্থ ধুতি ও চাদরের জোড় হাতে করে ফিরে এসে প্রথমে দাদার কাছে গিয়ে বলল, 'হাত পাতো।' বাহাদুর হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল। রণমায়া ধমকে উঠল, 'দাও না?' তখন ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াল। চোখে দেখে মনে হল, এ রকম ব্যাপার কখনো সে পড়েনি। দিলীপের হাতে জোড়টা তুলে দিতেই সে বলল, আজ বুঝি তোমার ভাইফোঁটা? আগে বলনি কেন?

—আগে আবার কী বলবো!

—কিন্তু ভাইদের যে খালি হাতে আসতে নেই।

—বেশ তো, বড় হও, মানুষ হও। তখন দিও না কত দেবে? আমার পাওনা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

পদ্মা বাহাদুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এবার বলল, আমি যতদূর শুনেছি, এ ব্যাপারে দেবার কথা শুধু বোনেরই। ভায়েরা নিয়েই খালাস।

—তাই কি? সন্দেহের সুরে বলল দিলীপ, 'ছেলেবেলায় একবার মাত্র দেখেছি; আমার ঠিক মনে নেই।'

—যা আছে, তাই একটু আমাকে বুঝিয়ে দে তো ভাই।' অসহায়ভাবে বলল বাহাদুর, 'কী যেন বললি? ভাইফোঁটা?'

—হ্যাঁ; এবার চুপ করে বসো দিকিন, শাসনের সুরে বলল রণমায়া, একটুও নড়বে না কিন্তু।

বাহাদুর আর দ্বিরুক্তি না করে ধ্যানমৌন বুদ্ধের মত নিশ্চল হয়ে বসে রইল। রণমায়া একে একে দুজনের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিল। দিলীপ ওর পায়ের দিকে হাত বাড়াতেই ছিটকে পিছিয়ে গেল। জিভ্ কেটে বলল, ছিঃ ছিঃ, তুমি যে ব্রাহ্মণ।

—হোলামই বা। তুমি তো দিদি।

রণমায়া কোনো উত্তর দেবার আগেই বাহাদুর বলে উঠল, আমি তো বাবা ব্রাহ্মণ নই। আমাকে ওর পায়ে হাত দিতে হবে নাকি?

সকলে সরবে হেসে উঠল। রণমায়া কাছে সরে এসে তিরস্কারের সুরে বলল, কী কথার ছিরি? ওতে আমার পাপ হয়, জানো না? দাও, পাটা বাড়িয়ে দাও।

বাহাদুর এক গাল হেসে সাড়ম্বরে পা বাড়িয়ে দিল। রণমায়া নত হয়ে প্রণাম করতেই সস্নেহে তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, হয়েছে, হয়েছে। এবার যা; খাবার-টাবার কি করেছিস নিয়ে আয়। চন্দনের ফোঁটায় তো আর পেট ভরবে না।

আর এক দফা হাসারোলের মধ্যে রণমায়া রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, পেটুক কোথাকার!

ভোজের আয়োজন একটু ব্যাপক ধরনের ছিল বলে ভোজনপর্বটা মিটতে সময় লাগল। পদ্মা বাহাদুর আর দাঁড়াল না। পরদিন সকালে তার অফিসের ইনসপেকশন। ব্যস্তভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেল। বাহাদুর বসে বসে হাঁসফাঁস করছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল—'একটু গড়িয়ে নিতে পারলে হত।' রণমায়া মুখ টিপে হেসে বলল, যাও না? বিছানা তো করাই আছে।

বাহাদুর দিলীপের দিকে ফিরে বলল, তুই কী করবি?

—বসবো; আমার ঠিক তোমার মত অবস্থা নয়। মায়াদি, তুমি খেয়ে এসো; ততক্ষণ আমি এই ছবির বইএর পাতা ওলটাচ্ছি।

—তার চেয়ে ও পাশে চল না? খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

—বেশ, তাই চল।

বাহাদুর আগেই গড়াতে চলে গিয়েছিল। দিলীপ গিয়ে বসল ভিতর দিকের বারান্দার কোণে।

রণমায়া একটা ছোট মত কাঁসিতে সামান্য কিছু ভাত তরকারি নিয়ে এসে তার কিছুটা দূরে মেঝের উপরেই বসে পড়ল। দিলীপ সেই পাত্রটার দিকে এক নজর চেয়ে নিয়ে বলল, ওকি! ঐ টুকুন খাও নাকি তুমি?

—আর কত খাবো?

—তার মানে, আমার সামনে বসে খেতে লজ্জা করছে।

—নিশ্চয়ই; অত বড় একজন কর্তাব্যক্তির সামনে লজ্জা করবে না? ও সব বাজে কথা রেখে ও-বাড়ির খবর কী বল।

—এমন কী খবর আছে যা তুমি

জানো না? হ্যাঁ; একটা নতুন খবর আছে। ও'রা ফিরে এসেছেন।

—'বল কি!' প্রায় চে'চিয়ে উঠল রণমায়া, 'এত বড় ঘটনাটা চেপে যাচ্ছিলে?'

দিলীপ নীরবে হাসতে লাগল। রণমায়া নিজের মনে খানিকটা কি ভেবে নিয়ে বলল, ভাবছি, আমি একদিন ও'র সঙ্গে আলাপ করে আসবো।

—তুমি!

—হ্যাঁ; দোষ কি? গিয়ে কী পরিচয় দেবো, ভাবছ তো? বলবো, আমি দিলীপের দিদি।

—তাহলে তো খুব চিনবে!

-চিনবে না মানে? গেলে দেখা যাবে, শুধু নাম নয়, সেই সঙ্গে নাড়ি-নক্ষত্র পর্যন্ত তার জানা হয়ে গেছে।

দিলীপের আনত মুখের উপর মুহূর্তের তরে একটা অস্পষ্ট ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল। পরক্ষণেই মাথা তুলে বলল, ও সব কথা থাক। তোমার মাথায় এই ভাইফোঁটা চাপল কি করে বল দিকিন।

—সে এক মজার ব্যাপার।......বলে, রণমায়া তার সই-ঘটিত কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা করল। বলতে বলতে

এর চেয়ে ওপাশে চলনা? খেতে খেতে গল্প করা যাবে

এই হৃদয়স্পর্শী অনুষ্ঠানটির সমস্ত মাধুর্য তার কণ্ঠে এবং চোখে-মুখে ফুটে উঠল। তারপর এক সময়ে থেমে গিয়ে আনমনা অপলক চোখে তাকিয়ে রইল দিলীপের মুখের পানে। দিলীপও শুনতে শুনতে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সহসা সজাগ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী ভাবছ?

—ভাবছি না; দেখছি, কী চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে। চন্দন আর কপালের রং এক হয়ে মিশে গেছে।

দিলীপ লজ্জিত হল এবং প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে বলল, কই, তুমি খাচ্ছ কই?

রণমায়া সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। হয়তো শুনতেই পায়নি। সেই একই ভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, নিজের সম্বন্ধে কী মিথ্যা ধারণাই না করে বসে আছ ভাই। ঐ কপালে কখনো কালির দাগ লাগতে পারে?

দিলীপ হাসল; মৃদু কিন্তু অবিশ্বাসের হাসি। এই অগাধ বিশ্বাসপরায়ণা স্নেহময়ী মেয়েটির উপর হয়তো কিছুটা অনুকম্পাও প্রকাশ পেল তার মধ্যে। রণমায়ার চোখে তার কোনোটাই পড়ল না। নিজের দৃঢ় প্রত্যয়ে অটল থেকে খানিকটা যেন আপন মনে বলে গেল, এ তো শুধু একটা চন্দনের ফোঁটা নয়; দেবতার নাম নিয়ে আঁকা মঙ্গল-চিহ্ন। কালির স্পর্শ যদি লেগেও থাকে কোনোদিন, ওরই তলায় তা ঢাকা পড়ে গেছে।

এমন কিছু ছিল সেই ভাবগভীর ধীর কণ্ঠস্বরে, দিলীপের কানে যেতেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তর্ক বা প্রতিবাদের কথা ভুলে গিয়ে সে শুধু নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

॥ পনেরো ॥

সন্ধ্যা হতে কিছুটা দেরি আছে। কলেজ থেকে ফিরবার পর আর কোথাও না বেরিয়ে দিলীপ আফিসে গিয়ে বসেছিল। কিছু প্রুফ্ জমে গিয়েছিল। সেগুলো শেষ করে মুলতুবী চিঠিপত্রের ফাইলটা টেনে নিতেই আশুবাবু বললেন, ওসব থাক না? সারাদিন খেটে-খুটে এলে, রাত্রে আবার পড়া আছে। এখন খানিকটা ঘুরে এসো।

—আজ আর ঘুরতে ইচ্ছে করছে না।

—কদিন থেকেই তো দেখছি, কলেজ সেরে এসেই কাজ নিয়ে বসছ। বিকেল বেলাটা একটু না বেরোলে শরীর টিঁকবে কেন?

—'এই এবার উঠবো', বলে দিলীপ ঐ

প্রসঙ্গে আর কোনো কথাবার্তার সুযোগ না দিয়ে দত্ত এণ্ড সন্স কাগজ কোম্পানীর একটা চিঠি সম্পর্কে কয়েকটি দরকারী বিষয় উত্থাপন করল। আশুবাবু ফাইলটা দেখতে চাইলেন, এবং খানিকক্ষণ আলোচনার পর মীমাংসার পথ বাৎলে দিলেন। সে-ও সেই অনুসারে উত্তরের খসড়া তৈরী করতে বসল।

আরো কিছুক্ষণ পরে তখনকার মত কাজ শেষ করে যখন উঠবার আয়োজন করছে, আশুবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, প্রফেসর ব্যানার্জির ওখানে গিয়েছিলে?

দিলীপ দৃশ্যত চমকে উঠল। কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে গিয়ে এই মুহূর্তে ও'দের কথাই তার মনে হয়েছিল। রণমায়া নেই। কিছুদিন হল শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। সেখানে তার শাশুড়ীর অসুখ। কদিন থেকে মার কথা বারবার মনে পড়ছিল। ভেবে রেখেছিল, মোয়া-ওয়ালা গোকুল দাস এলে, তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ঐ অঞ্চলটা আরেক বার ঘুরে দেখবে। যে-মহিলাটিকে সে 'মা' বলে, যাঁর কাছে ওকে নিয়ে যাবার জন্যে সেদিন অত করে পীড়াপীড়ি করেছিল, তাঁর জন্যেও মনের কোণে কেমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করছিল। ভাবছিল, আবার যদি বলে, বুড়োর 'মা'কে একবার দেখে আসবে। কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেল গোকুল আসেনি। এটা মোয়ার সময় নয়। এদিকটায় খৈ-মুড়ির চাহিদাও হয়তো তেমন নেই। কিংবা বুড়ো মানুষ, অসুখ-বিসুখও করে থাকতে পারে।

মনটা যখন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, ধরবার মত সামনে কিছু পাচ্ছিল না, তখন হঠাৎ পাশের বাড়িটা তার স্মৃতিপথে ভেসে উঠল। প্রফেসর ব্যানার্জি নিজে থেকে যেতে বলেছিলেন না যাওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু 'যাব' বললেই কি যাওয়া যায়? প্রফেসর তো একা থাকেন না। যদি আর কারো সামনে পড়তে হয়? ছিঃ ছিঃ, কী মনে করবে! নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল, মনে করার কী আছে? সে তো আর কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছে না। যাচ্ছে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে। তাও সেধে যেচে নয়, গৃহকর্তার অনুরোধে।

তবু, যুক্তির জোর যতই থাক, পা দুটোয় ঠিক ততটা জোর পাচ্ছিল না। উঠতে গিয়েও ভাবছিল, আজ থাক।

এই দোটানার ভিতর থেকে মাষ্টার-মশাই তাকে টেনে তুললেন। বললেন, এখনই একবার ঘুরে এসো না?

—এখনই?

—দোষ কি? কদিন থেকে ও'র শরীরটাও ভালো নেই। প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত।

সদর দরজা যথারীতি বন্ধ। দু'একবার ইতস্ততঃ করে কড়া নাড়তেই একটি বয়স্ক গোছের চাকর এসে খুলে দিল এবং দিলীপ কোনো কথা পাড়বার আগেই বলে উঠল, ওপরে চলুন; বাবু শুয়ে আছেন।

—ওপরে যাবো!

—তাতে কি হয়েছে? বাবু যে নীচে নামছেন না।

—তাহলে তুমি বরং একবার জিজ্ঞেস করে এসো। আমি—।

—বলতে হবে না। আমি চিনি। আপনি তো ও-বাড়ির ডাক্তারবাবু।

দিলীপ হেসে ফেলল, কে বললে আমি ডাক্তারবাবু?

—আমি জানি। দিদিমণি বলেছেন।

দিলীপের মুখের উপর কে যেন এক-মুঠো আবির ছিটিয়ে দিল। তারপর কী হল কে জানে? রক্তাভ স্নিগ্ধতা মিলিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল কঠিন গাম্ভীর্য। চোয়ালের পেশীগুলো হঠাৎ যেন শক্ত হয়ে গেল। এটা কি বিদ্রূপ না উপহাস? কিংবা তাকে নিয়ে চাকরের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিহাস-কৌতুক! ইচ্ছা হল, তখনই ফিরে যায়। হঠাৎ নজরে পড়ল, চাকরটা তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এই লোকটার সামনে নিজের এই অসংযত ভাবান্তরে মনে মনে লজ্জিত হল। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, চল।

প্রফেসর তাঁর শোবার ঘরে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন। দিলীপ ঢুকতেই খানিকটা সোজা হয়ে বসে খুশির সুরে বললেন, 'দিলীপ এসেছ! বসো।' এই সামান্য নড়াচড়াতেই তাঁর মুখে যে যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠেছিল, অন্য কেউ হয়তো লক্ষ্য করত না, কিন্তু দিলীপের অভ্যস্ত চোখ এড়াতে পারল না। সে সামনের চেয়ারটায় বসে ও'র দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে উদ্বেগের সুরে বলল, কী অসুখ আপনার?

প্রফেসর মৃদু হেসে অনেকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, তা তো ঠিক বলতে পারবো না। সে সব তোমরা বুঝবে। তবে প্রেসারটা বেশ বেড়েছে, মনে হচ্ছে।

বলেই ঘাড় ফিরিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকালেন পিছনের দরজার দিকে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করতেই দিলীপের চোখে পড়ে গেল চৌকাঠের ও পাশে একটুকরা পরিচিত আঁচলের কোণ। প্রফেসরের প্রৌঢ় চক্ষু সম্ভবতঃ সেটা দেখতে পেল না। স্বর নামিয়ে বললেন, মেয়েটা শুনে ফেললেই মুস্কিল। এমনিতেই ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। ছেলেমানুষ, তায় একেবারে একা।

শেষের কথা কটির মধ্যে তাঁর স্বরটা কেমন উদাস শোনা গেল। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের মৃদু শব্দও দিলীপের কানে এসে লাগল। মুহূর্ত-পূর্বে তার বুকের ভিতরে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, জোর

করে সংবরণ করে বলল, ওষুধ-পত্তর খাচ্ছেন না?

—কী হবে! নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন ব্যানার্জি, এ রোগ তো সারবার নয়। চিরদিনের সাথী। যে কটা দিন চলে, চলুক।

—একেবারে না সারলেও, রিলিফ দেওয়া চলে। তা না হলে হয়তো—

কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল দিলীপ। মনে হল, প্রেসারের রোগীকে অপ্রীতিকর কিছু না বলাই উচিত। কিন্তু ব্যানার্জি তার অসমাপ্ত অংশটা নিজেই পূর্ণ করে দিলেন। বললেন, মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে, বলতে চাও তো? তার জন্যে তৈরী হয়ে আছি।

দিলীপ ও সব কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, প্রেসারটা কবে নিয়েছিলেন?

—ঠিক মনে নেই। তা, বেশ কিছুদিন হবে।

—আরেকবার নেওয়া দরকার। কে দেখছেন আপনাকে?

—আমার এক বন্ধু ডাক্তার। শ্যামবাজারে থাকে। সে-ই মাঝে মাঝে এসে দেখে যায়। এবারে অনেক দিন আসেনি। আমাদের ফিরে আসবার খবরটা বোধ হয় পায়নি।

—তাঁকে একবার ডাকলে হয়। ও'র বাড়িতে কিংবা চেম্বারে ফোন্ আছে কি?

—তা আছে।

—তাহলে আমি বরং তাঁকে একটা খবর দিয়ে দিই। তাঁর নাম আর নম্বরটা—

—না, না, এরই মধ্যে উঠবে কী? এতক্ষণ তো খালি আমার রোগের ফিরিস্তি শুনলে। তোমার কোনো কথাই তো শোনা হল না। প্রথম এলে, একটু চা-টা—রঘু আছিস?

দিলীপ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আজ্ঞে না। চা-টা আরেক দিন এসে খাবো। আজ উঠি।

—কিন্তু ডাক্তারের জন্যে এত তাড়া কিসের? খারাপ কিছু দেখছ কি?

—না, না। খারাপ কেন হবে? এমনিই একবার তাঁর আসা দরকার।

—কিন্তু একগাদা ওষুধ-পত্তর আর খেতে চাই না।

—ওষুধ-পত্তর বিশেষ কিছু দেবেন বলে মনে হয় না। দুটো একটা পিল্ হয়তো খেতে হবে। তাতে আপনার মাথার যন্ত্রণাটা চলে যাবে।

—আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, তোমাকে তো বলিনি। অনেকটা কৌতুকের সুরে বললেন প্রফেসর। দিলীপ উঠে পড়েছিল। মাথা নত করে মৃদু হেসে বলল, না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি।

রঘু এসে দাঁড়িয়েছিল। ব্যানার্জির হঠাৎ নজরে পড়তেই বললেন, তোর দিদিমণিকে বল, একটুকরো কাগজে হীরেণ ডাক্তারের নাম আর ফোন নম্বরটা লিখে দিক।

মিনিট খানেকের মধ্যেই রঘু একটা স্লিপ এনে দিলীপের হাতে দিল। গোটা গোটা ইংরেজি অক্ষরে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন দুটি লাইন—ডক্টর এইচ্ এন্ বোস এম-বি। তার নীচে একটা টেলিফোন নম্বর। কাগজখানা হাতে নিয়ে লেখাটার দিকে একবার তাকিয়েই দিলীপের বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল। ভাঁজ করে বুক-পকেটে রেখে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। নত হয়ে ব্যানার্জির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তিনি ওর হাতখানা ধরে বললেন, থাক, থাক; আবার কবে আসবে, বাবা?

—কাল সকালে এসে একবার খবর নিয়ে যাবো।

সেই চাকরটি পিছন পিছন নেমে এসে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে গেল। একটু বেশী কথা বলা বোধ হয় ওর স্বভাব। বলল, বাবুকে কেমন দেখলেন? দিলীপ কোনো উত্তর দেবার আগেই যোগ করল, দিদিমণি বড় মুষড়ে পড়েছে। মা নেই তো। জ্যাঠা-জ্যেঠী আছে। তাও কি ধারে কাছে? সেই পশ্চিমে কোথায় কানপুর না কি শহর আছে, সেইখানে থাকেন। তাঁদের কাছেই তো থেকে এল এক মাস। জ্যেঠী বড্ড ভালোবাসে। হলে কি হবে? একেবারে বাপ-অন্ত প্রাণ। আর বাবুরও তো ঐ সবেধন নীলমণি। একদণ্ড কাছছাড়া হবার যো নেই। ঐ কলেজ আর বাড়ি, বাড়ি আর কলেজ।

বন্ধ দরজার ভিতর দিকে ফালিমত পথটায় দাঁড়িয়ে দিলীপ নিঃশব্দে শুনছিল। না শুনে উপায় নেই। হাতের কাছে নিরীহ গোছের শ্রোতা পেয়ে রঘুরও বোধ হয় উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল। মুখখানা বিকৃত করে বলল, মামারা এদিকে মস্ত বড় লোক। এই তো ভবানীপুরে নিজেদের বাড়ি। মেয়েটার একবার খোঁজও নেয় না। বাবুর সঙ্গে বলে, দুহাতের তর্জনী আড়াআড়ি ভাবে জড়িয়ে চোখে ও ভ্রূতে একটা বিরোধ-সূচক ইঙ্গিত করে দেখাল।

যাক্; আপনার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একটু খোঁজ-খবর নেবেন বাবু।

(ক্রমশঃ)

একবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর মেলা

নগেন্দ্রনাথ দত্ত

পৃথিবীর সব দেশের বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিস্ময়কর জিনিস হবে মহাকাশ বিজয়। মহাকাশ বিজয়ের বিভিন্ন আবিষ্কার সমস্ত দেশকে চরম উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। কোন দেশ এই বিষয়ে সবচেয়ে এগিয়ে যেতে পারবে—তাই নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতামূলক অভিযান শুরু হয়েছে। এপর্যন্ত এই বিষয়ে যে বিরাট সূচনা আরম্ভ হয়েছে তা পৃথিবীর লোকদের দেখাবার জন্যে আমেরিকা গত এপ্রিল মাসে একটি বিরাট মেলা স্থাপিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ১৯৩৯ সালে একটা বিরাট বিশ্বমেলা হয়েছিল। এবারে যে মেলাটি প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে আমেরিকার Seattle শহরে খোলা হয়েছে তা আরও বিরাট ও বিস্ময়কর।

এই মেলার পত্তন করতে খরচ হয়েছে ১০০ মিলিয়ন ডলার এবং সব সুদ্ধ ৭৪ একর জমির উপর এটা অবস্থিত। একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী কি রকম অবস্থা হবে তারই একটা ছবি দেখানো এই মেলার উদ্দেশ্য।

এই মেলার সবচেয়ে দ্রষ্টব্য জিনিস হচ্ছে—৬০০ ফুট উঁচু Space Needle সূচ আকারের এই উচ্চতম জিনিসটি তিন জোড়া সরু ইস্পাতের উপর দাঁড়িয়ে সমস্ত মেলার উপর যেন আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এই Space Needle-এর মাথা হতে ক্রমাগত নির্গত হচ্ছে ৪৬ ফুট উঁচু Space গ্যাসের অগ্নিশিখা। এই Needle-এর মাথার উপরে তৈরী হয়েছে একটি গোলাকার ঘূর্ণায়মান রেস্তরাঁ। এই গোলাকার রেস্তরাঁর ভোজনকারীরা খাবার সময় ক্রমাগত এই Space Needle-এর সঙ্গে ঘুরছে। ভোজনকারীরা ঘুরতে ঘুরতে ও খেতে খেতে চারিদিকের পাহাড়, নদী ও অন্যান্য অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। আবার যন্ত্রচালিত কপিকলের সাহায্যে দর্শকরা এক নিমেষে Needle-এর শীর্ষস্থানে পৌঁছোয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই মেলাতে ১০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের জিনিস দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। আমেরিকার দৃশ্যমান জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে Spacearium—অর্থাৎ মহাকাশ বিজয় সম্বন্ধে যত রকম জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে বা যবার সূচনা হয়েছে তা এই স্থানে সমবেত করা হয়েছে।

একত্রিশটি বিভিন্ন দেশ তাঁদের বিশেষ বিশেষ জিনিস দেখাবার জন্যে এই মেলায় স্থান নিয়েছে। এই মেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—প্রথম বিভাগে আছে মহাকাশ সম্বন্ধে নানারকম আবিষ্কার ও গবেষণা, এ্যাটম শক্তির ক্রমোন্নতি এবং শল্য চিকিৎসার নানাবিধ উন্নতির জিনিস ইত্যাদি। আর অন্য বিভাগে আছে শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের বিবিধ ও অসংখ্য উন্নতির নিদর্শন। এক কথায় বর্তমান যুগে সর্ব বিভাগের বৈচিত্র্যময় উন্নতির চিত্র এখানে পাওয়া যায়।

মেলার 'অপেরা হাউসে' ৩,১০০ দর্শকের বসবার স্থান আছে। স্টেডিয়ামে ২০,০০০ দর্শক আরামে বসে খেলা দেখতে পাবে। আমেরিকার সর্ববৃহৎ আরামপ্রদ তাঁবু তৈরী করতে খরচ হয়েছে ১০,০০০,০০০ ডলার। থিয়েটার গৃহে ৮০০ জন দর্শকের স্থান করা হয়েছে। সার্কাসের তাঁবুতে অনায়াসে ৫,৫০০ জন বসতে পারবে। আর একটা দর্শনীয় জিনিস হচ্ছে ১০০ ফুট উঁচু International Fountain. এই ঝর্ণা থেকে ক্রমাগত নানা আকারের এবং নানা রং-এর বিচিত্র ফোয়ারার জল উৎসারিত হচ্ছে। এই উৎসের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে নানা রকম গানের সুর। মেলার কর্তৃপক্ষ আশা করছেন এই মেলাতে ১০ মিলিয়ন লোক ছয় মাসে দর্শক হিসাবে আসবে।
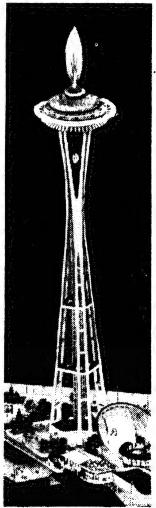
গোলাকার ঘূর্ণীয়মান রেস্তোরা

স্পেস নিডল

গালার কাজ

দীপঙ্কর সেনগুপ্ত

ভারতের প্রায় সর্বত্র গালার কাজ (Laquare Ware) হইয়া থাকে।

দক্ষিণ ভারতের মহীশূরের চেন্নাপত্তন, বেলগাঁওয়ের গোকক্, বোম্বাইয়ের কোলাপুর, গোয়া, সাবন্তবাড়ী, সৌরাষ্ট্রের সাংখেরা, কাঁথিয়াবাড়ের মোহুয়া, জুনাগড়, পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর, রাজস্থানের ইন্দোর, উদয়পুর, আজমেড় ও যোধপুর, উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ ও বেনারস প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণে গালার কাজ হয়।

গালার কাজ সাধারণতঃ কাঠের উপর হয়। কাঠের নানা প্রকারের খেলনা, ঘর-সাজানোর নানা সৌখিন আসবাবপত্রের মধ্যে গালার কাজ করা হয়। গালা ব্যবহারের অর্থ—শুধু নির্মিত বস্তুটির সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিই নয়, অধিক দিনের স্থায়িত্ব হিসাবেও ইহা নির্ভরযোগ্য।

দক্ষিণের চেন্নাপত্তন, গোকক্, কোলাপুরের পাটগাঁও, গোয়া ও সাবন্তবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে শুধু ঘর সাজানো ও শিশুদের খেলনা জাতীয় বস্তুই প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশে কৃষ্ণনগর মাটির ছাঁচে যে সমস্ত পুতুল ও ঘর-সাজানো ফলমূল, মাছ, সব্জি প্রস্তুত হয়—গোয়া, গোকক ও সাবন্তবাড়ীতে অনুরূপ বস্তুই কাঠের উপর গালার নক্সাকরা অবস্থায় পাওয়া যায়। এইসব কাজে গালা দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রথম, হাতে-টানা 'লেদে'র (Lethe) সাহায্যে প্রস্তুত খেলনাতে যে গালা লাগান হয়, তাহা নানা বর্ণে রঙিন করা হয় ও শুকনো কেয়াপাতার সাহায্যে উহাকে পালিশ করিয়া ঝকঝকে করিয়া তোলা হয়। আরেকভাবে যে গালা লাগান হয় তাহা হইতেছে কাষ্ঠনির্মিত বস্তুটির উপর রঙ তুলি দ্বারা নক্সা করিয়া লইয়া তারপর স্বচ্ছ বা Transparent প্রলেপ লাগান ও কেয়াপাতার সাহায্যে পালিশ করিয়া দেওয়া।

কিন্তু সৌরাষ্ট্রের সাংখেরা স্থানটি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গালার কাজে শ্রেষ্ঠ বলা চলে। সাংখেরা বরোদার অদূরবর্তী। স্থানটি এত প্রসিদ্ধ যে সাংখেরা বলিতে একমাত্র উহার গালার কাজকেই বুঝায়। ইউরোপ ও আফ্রিকায় যত গালার কাজ চালান হয়, তাদের মধ্যে সাংখেরার কাজই অধিক বলা চলে। সাংখেরার গালার কাজ মনকে আকর্ষণ করে খুব তাড়াতাড়ি। তাহার কারণ, সাংখেরার গালার কাজে আছে ডিজাইন প্রস্তুতের নিপুণতা (অবশ্য বেশীর ভাগ ডিজাইনই (Traditional)। কাষ্ঠনির্মিত বস্তুটির উপর ডিজাইন প্রস্তুত হয় চারিটি বর্ণের সাহায্যে। এই চারিটি বর্ণ হইতেছে প্রথম, ভায়োলেট বা বেগুনী, দ্বিতীয় লাল, তৃতীয় সবুজ ও চতুর্থ কলাই-পাউডার। বস্তুটির উপর নক্সা প্রস্তুত হইবার পর হাত-টানা লেদ মেসিনের সাহায্যে গালার প্রলেপ উহার উপর নিপুণভাবে লাগাইয়া দেওয়া হয়। এই গালার প্রলেপ লাগাইবার ফলে বর্ণের কিছু রূপান্তর ঘটে কিন্তু ডিজাইনটি হয় ঝকঝকে উজ্জ্বল। সাংখেরাতে বেশীর ভাগ প্রস্তুত হয় আরাম কেদারা, শিশুদের দোলনা (Cradle) আর কিছু কিছু খেলনা।

কাঁথিয়াবারের মৌহুয়া, জুনাগড় আর রাজস্থানের আজমেড়, ইন্দোর, যোধপুরের সুজৎ ও বোগড়া অঞ্চলে যে সমস্ত গালার কাজ পাওয়া যায়, তাহা কিছুটা দক্ষিণাঞ্চলের চেন্নাপত্তম্, গোকক্, বেলগাঁও বা গোয়ার সমতুল্য। এখানেও নানা প্রকার রঙিন গালার কাজ হয়, তবে বিশেষত্ব এই যে, এইসব কাজে ছোট ছোট নক্সা বা প্যাটার্ণের জৌলুস থাকে। এই নক্সা বা প্যাটার্ণ গলিত গালার ব্যবহারের ফলেই সৃষ্টি হয়।

পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর অঞ্চল গালার কাজের জন্য বিখ্যাত বলা চলে। কাঠের উপর গালা এখানে যেভাবে ব্যবহৃত হয় ও যেভাবে উৎকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয় তাহা ভারতের কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। প্রথমে নির্মিত বস্তুটির উপর ত্রিবর্ণ বা দুই বর্ণের গলিত গালার পলেস্তরা লাগান হয়। তারপর মরা খেজুর ডালের সাহায্যে পালিশ করার পর নক্সা আঁকিয়া সরু নরুনের দ্বারা উৎকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। এমনি কাজের জন্য বস্তুটি শেষ করিতে বেশ সময় লাগে ও মূল্যও বেশী হয়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে লক্ষ্ণৌ ও বেনারাসে গালার কাজের যে সব খেলনা তৈরী হয়, তাহা অনেক সহজলভ্য এবং এ-কারণ মূল্যও খুব কম। উহার তৈরীর পদ্ধতিও কঠিন নয়। পারিবারগতভাবে এইসব খেলনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেহ খেলনাটির 'ফর্মা' কাটে, কেহ উহার উপর বর্ণের প্রলেপ লাগায়, কেহ কালো কালিতে তুলি দ্বারা নাক-চোখ-মুখ ও নানা অলঙ্কার ফুটাইয়া তোলে, শেষে কেহ বা গলিত গালার পলেস্তারা লাগাইয়া ঠাণ্ডা ঘরে ফেলিয়া রাখে। মনে রাখিতে হইবে গালার কাজ বেশী গরমে নষ্ট হয় ও উহার কোন কোন রঙ জ্বলিয়া যায়!

গালার এইসব সৌখিন বস্তু ও খেলনা ছাড়াও বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে গালার চুড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। গোয়া বা সাবন্তবাড়ী অঞ্চলে লেদ মেসিনের সাহায্যে কাঠের চুড়ি প্রস্তুত করিয়া উহার উপর বিভিন্ন প্রকারের গালার রঙ লাগাইয়া দেওয়া হয়। কাঠের সিন্দুরের কৌটা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, লাট্টু, পিঁড়ি বা জলচৌকির পায়া, বেলচি প্রভৃতিতে নানা বর্ণের গালা লাগাইবার রেওয়াজ আছে ভারতের অনেক স্থানে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা কাঠের সৌখিন বস্তু দ্বারা ঘর সাজাইতে চান, এবং কাঠের খেলনা দ্বারা শিশুদের মন ভোলাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অবশ্যই গালার কাজের উপর আস্থা রাখিতে পারেন। এই ব্যাপারে ভারত সরকারের সর্বভারতীয় হস্ত কারিগর সংস্থার বোম্বাই-স্থ Design Centre সর্বপ্রকারের গবেষণাকার্য চালাইতেছে।

ভালো কবিতাও রোম্যাঁ লিখেছেন) অর্ধশতাব্দীকাল 'ক্রনিকের'র সাধনায় ঐকান্তিক থেকেছেন। দ্যুআমেল ও রোম্যাঁর জগৎ কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঔপন্যাসিক পরিণতি লাভের পূর্বে দ্যুআমেল ছিলেন ডাক্তার আর রোম্যাঁ ছিলেন, বলা যায়, কবি। 'লা ক্রনিক দে পাস্কিয়ে' উপন্যাসগুলিতে দ্যুআমেল বেছে নিয়েছেন এক মধ্যবিত্ত ফরাসী পরিবারের চটকহীন সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের কাহিনী এবং কোনও প্রকার আড়ম্বর না করে সে-কাহিনীর কথকতায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। দৃষ্টি-ভঙ্গীতে রক্ষণশীল মানবিক, আকাদেমি ফ্রাঁসেজ-এর সদস্য দ্যুআমেল তাঁর ভাষা ও শৈলীতেও প্রতিফলিত করেন তাঁর অজটিল, স্বচ্ছন্দ চিন্তন-পদ্ধতি। রোম্যাঁ অবশ্য আদপেই অজটিল নন, এবং 'ক্রনিকের' চিরক্রিয়তায় আস্থাবান হলেও তাঁর বিশ্ববীক্ষায় তীব্রতা ও তাঁর ভাষণে চিন্তাপ্রসূত ধার কম নয়। তরুণ বয়সেই রোম্যাঁর দার্শনিকতা দানা বাঁধতে থাকে। তাঁর একটি কবিতায় যখন তিনি বলেন : 'আমি হলাম আমার পাড়ার একটি লোক, তাদের একজন। যারা গিয়ে থিয়েটার দেখে আসে, পথ দিয়ে যায়', তখনি তিনি নির্দেশিত করেছেন তাঁর 'য়ুনানিমিজম্' বা 'একাত্মবাদ'। অসংখ্য ভিন্নতায় অস্থির, ছিন্ন এই বিশ্বে রোম্যাঁর একাত্মবাদ ব্যক্তিগতের প্রসিদ্ধ ধ্রুবতায় জীবন-বোধের সম্যক উপস্থিতি না দেখে, দেখেছিল অব্যক্তিক, গণচিত্তের অভি-ব্যক্তিতে। 'আনিমা' বা 'আত্মা'র এই অখণ্ড লীলার যে-কল্পনা রোম্যাঁর 'য়ুনানিমিজম্' প্রেরিত করে, তার ভিত্তি অবশ্য বৈদান্তিক নয়, বরং পুরোপুরি ঐহিক, বিদগ্ধ এক হৃদ্যতা। রোম্যাঁর বিখ্যাত 'লে জোম্ দে বন্ ভলাঁতে' উপন্যাস (সাতাশ খণ্ডে সমাপ্ত, দীর্ঘতম 'ক্রনিক') তার হাজার হাজার পাতায় রোম্যাঁর ঐ প্রাথমিক অনুধ্যানের প্রকাশ।

আধুনিক ফরাসী উপন্যাস ঐশ্বর্যে বিভ্রান্ত করে। প্রুস্ত, জিদ, মালরো, দ্যুআমেল, মোরিয়াক, মার্তাঁ দ্যুগার প্রধান ঔপন্যাসিকদেরও কয়েকজন মাত্র। জর্জ বের্নানস, অঁরি দে মঁতের্লাঁ, পল মোরাঁ, জাঁ শ্লাম্‌বের্জে থেকে জাঁ জিয়োনো পুরাতনদের মধ্যেও বাছাই-করা কয়েকজন, এছাড়া নূতনদের সংখ্যাও কম নয়। বের্নানস'র যুগান্তকারী রচনা 'স্যু লে সোলেই দে সাতাঁ' (শয়তানের সূর্যালোকে) থেকে যে নৈতিক চিন্তার পরিবাহক হতে হয় উপন্যাসকে, সে-চিন্তা ধর্মধ্বজী হলেও আধুনিকের মর্মে আঘাত হানে এবং পরবর্তীদের লেখায় তার প্রভাব লক্ষণীয়। লুই-ফের্দিনাঁদ সেলিনের প্রখ্যাত 'ভয়াজ্ ও বু দে লা ন্যুই'তে আধুনিক জীবনের যে নৈতিক ভাঙ্গন ও অন্তঃসারশূন্যতার নির্মম বিবরণ সমগ্র পশ্চিম য়ুরোপের সভ্য মানুষকে অভিভূত করে, তার বীজ বপন করেছিলেন বের্নানস, যদিও ক্যাথলিক বের্নানস'র সঙ্গে সেলিনের স্বাভাবিক গরমিল স্পষ্ট। প্রণয় সংক্রান্ত অনেক অপ্রিয় সত্য মোরাঁর উপন্যাস মারফত আধুনিক পাঠককে উচ্চকিত করে দেয়, লাক্লোর 'বিপজ্জনক সংযোগের' অনেক পরে। আঞ্চলিকতার স্বাদ, গ্রাম্য ও পার্বত্য ফ্রান্সের আবহাওয়া জিয়োনোর উপন্যাসে এক বেসুরো নূতনত্ব আনে। শ্লাম্‌বের্জের বিষয়বস্তু অনেকখানি ঘরোয়া, ভঙ্গী বর্ণনাত্মক, যদিও মনস্তত্ত্ব তাঁর অনায়ত্ত নয়। এছাড়া, উপন্যাস রচনায় প্রথিতযশাদের মধ্যেও থাকেন বৈমানিক স্যাঁৎ এক্সুপেরি, যাঁর মৃত্যু ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৌলিক চিন্তা তাঁর লিখিত উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর কথা-বার্তায় হামেশা অভিব্যক্তি পায়। থাকেন এ্যালাঁ ফুর্নিয়ে, আঁদ্রে মোরোয়া, জাঁ জিরোদু। আর কিছু না হলেও, কেবল তাঁর বর্ণনভঙ্গী ও ভাবনার অভিনবত্বের জন্য উল্লেখ্য সুইশ ঔপন্যাসিক রামুজ, যিনি ফরাসী ভাষায় লেখেন। আধুনিক ফরাসী (বা অন্য কোনও দেশীয়) ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আর কেউ নেই যিনি রামুজের ঢঙে সৃষ্টি-রহস্যের অনুভবে মথিত থেকে সদৈব ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জগতের সমপাত লক্ষ্য করেছেন নিসর্গে, ঘটনায়, দুর্ঘটনায়। (রামুজের বর্ণনভঙ্গী, বর্তমান লেখকের মতে, কবি স্যাঁ জন পের্সকে প্রভাবান্বিত করেছে)।

'লে ফ্যো' (আগুন)-এর লেখক অঁরি বার্‌ব্যুস্ প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় মানবিক প্রেক্ষণে যুদ্ধের বাস্তবকে দেখার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তা থেকে 'যুদ্ধ'-প্রসূত ফরাসী উপন্যাসের একটি ধারা স্বকীয় সম্পদে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দাবী করে। বলাই বাহুল্য, যুদ্ধের বিশেষ বাস্তব চিরস্থায়ী নয়, এবং সে-কারণে তার পরিক্রমা যেমন যুদ্ধ কালীন, তেমন ঔপন্যাসিকেরও চিন্তাকে অতিরিক্ত এক তীব্রতা দেয়, যা শান্তির সময় একটু বেখাপ্পা ঠেকতেও পারে। বার্‌ব্যুসের উপন্যাসখানিতে অনুরূপ তীব্রতা আছে অবশ্যই, কিন্তু আতিশয্য সত্ত্বেও বার্‌ব্যুস কদাচই অবিশ্বস্ত ঠেকেন। রোমাঁর 'ভেদ্যাঁ'ও যুদ্ধের ফসল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে মঁপার্নাস অঞ্চলের আবহাওয়া চমৎকার ধরেন তাঁর 'লা ফাম্ আসিস্' নামক উপন্যাসে কবি গিয়োম্ আপলিনেয়্যর, যিনি 'একসঙ্গে গোলন্দাজ ও বিকারগ্রস্তের জীবন জেনে-ছিলেন। (১) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফরাসী উপন্যাসের গতি ও প্রকৃতিতে প্রকট রদ-বদল কতোখানি করেছে, তা বলার সময় হয়ত এখনও আসেনি। তবু যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে বিবিধ ঔপন্যাসিক রচনার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ-প্রসূত উপন্যাস নেহাত কম নয়। সার্ত ও কামুর উপন্যাসগুলির অনেকাংশই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মানসিক আওতার অন্তর্গত এবং যদিও ফ্রান্সে সাম্প্রতিক কালে উপন্যাস কবিতার মতোই বিশৃঙ্খল ও অশক্ত অনেক ভুঁইফোঁড়দের শিল্পচর্চায়, তবু সার্ত্র এখনও জীবিত, জাঁ জেনে সম্ভবতঃ সাহিত্য থেকে

অপসৃত হবেন না, মালরো সক্রিয় আছেন, রোব্‌ গ্রিইয়ে উত্তরোত্তর পরিণত ঔপন্যাসিকতার নিশ্চিতি অর্জন করছেন। এতদ্ব্যতীত, যুদ্ধোত্তর ফরাসী উপন্যাসগুলির মধ্যে দু-একটির উল্লেখ করতেই হয় কেবল ঔপন্যাসিক মানসিকতার অবক্ষয় বোঝাতেই। যেমন, সেলিনের 'ক্যাস্‌ পিপ' নামক উপন্যাসটি। আঙ্গিকের দিক থেকে অভিনব এই উপন্যাসে সেলিন যে-ভঙ্গীতে তাঁর বক্তব্য বলিয়েছেন একজন সৈনিকের মুখ দিয়ে, তাতে নির্জলা বাস্তব পরিবেশনের মতলবে তাঁকে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা প্রলাপ ও অসংখ্য খিস্তি সংগ্রহ করতে হয়েছে। রণক্ষেত্রের ছবির সঙ্গে সাধারণ সৈনিক ও ব্রিগেডিয়ার জেনেরালের চলাফেরা, কথাবার্তা এলোপাতাড়ি মিশিয়ে সেলিন যে-চূড়ান্ত বাস্তবিকতার আস্বাদনে পাঠককে বাধ্য করেন, তাতে সামগ্রিকভাবে সাহিত্যিক কর্তব্য কতোটুকু পালিত হয়? মানসিক প্রতিক্রিয়া বোঝাতে ন্যায্য বাগ্‌ভঙ্গীর ব্যত্যয় ঘটান সেলিন তাঁর রচনাটির সর্বত্র। অধিকতর বোধ্য একাংশের একটু অনুবাদে লক্ষ্য করুন : "জে মেয়ো ফিরেছে?...... কেউ কিছু শোনেনি? না তাহলে কিছু নয়... কিসসু নয়...চুলোয় যাক! আমার আরো সময় আছে! বাজো, দামামা!" (২) জাঁ কর্দালিয়ের 'লে জিয়ো দে লা তেং' (মগজের চোখ) উপন্যাসখানি অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এর ভাষা ও বিষয়বস্তুর কোনওটাই অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দেয় না। সরল, স্বাভাবিক কথ্যে লিখিত বৃহদায়তন এই উপন্যাস জার্মানীতে অন্তরীণ এক ফরাসী ডাক্তারের জবানবন্দী। যুদ্ধ, বেলর্জিনের পতন, রুস সৈন্যদের জার্মানভূমি অধিকার—এই পটভূমিকায় ডাক্তার মোরেল মারফত কর্দালিয়ে যুদ্ধকালীন মনস্তত্ত্বের ব্যবহার করেছেন বেশ কয়েকটি জার্মান রমণীর পদস্খলন ও ব্যাভিচারের তদন্ত ক'রে। বাস্তববোধের প্রশ্নে এলে অনেক তারিফ যদিও কর্দালিয়ের প্রাপ্য হয়, তবু পুরুষসঙ্গবিহীনা জার্মান রমণীদের একের পর এক মোরেলের অঙ্কশায়িনী ক'রে যে যৌন অরাজককে তিনি অবশ্যম্ভাবী প্রতীয়মান করেন তা কোনও জাতিবিশেষের শুধু নয়, দাম্পত্য শুচিতার সমগ্র মানবিক সত্তাকে আক্রমণ করে। 'পানীয় ' প্রেম' (৩) শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়টি কর্দালিয়ের উপন্যাসে একটি প্রয়োজনীয় তথাপি বিপজ্জনক অংশ স্বীকার করতেই হয়। তবু, কর্দালিয়ের চিত্রপটের ব্যাপ্তি ও মননে বাস্তববাদী দৃঢ়তা অনস্বীকার্য এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কোনও একটি বিশেষ পর্বের ডকুমেণ্টারী চিত্রহিসাবেও 'মগজের চোখ' মূল্যবান। কিন্তু আরেকটি ফরাসী উপন্যাস, গত বৎসরে প্রকাশিত লে দ'তেল্‌ দে লা গোর্‌'-এ লেখক জাঁ দ্যুলাক্‌ যুদ্ধের কুশীন অবসরে তাঁর নায়ককে দিয়ে যা করান তা হচ্ছে নিছক রতি-পূজা। যুদ্ধের দুঃসময়ে আত্মগোপনকারী তরুণ নায়ক বোমার গর্জন উপেক্ষা ক'রে ন্যুড্‌ আঁকায় ও মডেলের সঙ্গে রতিরঙ্গে মাতায় সম্পূর্ণরূপে অনুশোচনাহীন। যুদ্ধের বাস্তব থেকে পলাতক নায়ক নিরপেক্ষ, পরিতাপহীন, চমৎকার এক কৈবল্যে আশ্বস্ত, দুর্নীতিও নয় সে! সুবিধাজনক স্মৃতিগুলি দিয়ে সে বানিয়েছে তার রক্ষাকবচ (৪) এবং ঘটনার বহির্বিশ্ব তাকে স্পর্শ করে না।

অপসারী নানান মানসিকতা ফরাসী উপন্যাসের বিশশতকী পুষ্টি ও বৃদ্ধিকে ধারণ করলেও, যে-মনন ফরাসী উপন্যাসকে একটি বিশেষ রূপ ও সত্তা দিয়েছে, তা অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রসব। জাঁ পল সার্ত্র এই মননের প্রধান হোতা এবং তাঁর অন্যান্য রচনার সঙ্গে তাঁর উপন্যাসগুলিতেও সার্ত্র অস্তিত্ববাদী নিশ্বরীক্ষার অন্বয়কে চরম বলে মেনেছেন। আলবেয়র কাম্যুকে সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষে সংশ্লিষ্ট ভাবা যদিও অসংগত, তবু, কাম্যুর ঔপন্যাসিক জগতে অস্তিত্বমূলক, সমস্যাগুলির প্রকৃতিতে এবং তাদের মীমাংসায় অস্তিত্ববাদী মননের স্বাদ আদৌ দুষ্প্রাপ্য নয়। মোটামুটিভাবে, ব্যক্তিগত জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে এই দুজনের যে চারিত্রকাণ্ড : কথা কাম্যু ও দার্শনিক সার্ত্র, তাঁদের পরিণত চিন্তার আঙ্গিক অনেকখানি নির্ধারিত করেছে। 'ফরাসী প্রতিরোধ' ও রাজনীতির সঙ্গে আলজেরীয় কাম্যুর যোগাযোগ সার্ত্রের চেয়ে অনেক নিবিড় ছিল এবং মনে হয়, মানসিক থেকে বাস্তবিক জগতে নির্বিচার অবস্থানের জৈবিক প্রেরণা নিম্নমধ্যবিত্ত কাম্যুর গোড়াগুড়িই বেশি ছিল দর্শনের-ছাত্র সার্ত্রের চেয়ে। জন্মভূমি আলজেরিয়ার জান্তীয় জলবায়ুর প্রচণ্ডতা কাম্যুকে যদি রক্তে রক্তে জৈব অনুভূতির তীব্রতা টের পাইয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই কম সুযোগ দিয়েছিল অধিবিদ্যাকে। সার্ত্রের দর্শন-চর্চায় সুরু, তাঁর প্রথম যৌবনের ঐকান্তিকতা ও ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সঙ্গে। দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রী, তাঁর সহপাঠিনী সিমোন্‌ দে বোভোয়াকে সহচারিণীরূপে গ্রহণ করেছেন সার্ত্র। 'সত্তা ও শূন্য'-এর ভারাক্রান্ত, অধিবিদ্যক মীমাংসার সার্ত্র রচনা করেছেন এই শতাব্দীর একখানি বিশিষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ। সাহিত্যের মূল সূত্রে যে-ভাবে দার্শনিক ব্যুৎপত্তিগুলির সঞ্চালন করেছেন সার্ত্র (এবং যে-সাহিত্যিক ভঙ্গীতে দুরূহ দার্শনিক সমস্যাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন) তার তুলনা নেই।

লাইবনীৎসের সমৃদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টিশীল 'মোনাড্‌' যে ঈশ্বর কেন্দ্রিক জগতে সচল থেকে নিত্য শুভ সূচনার কারণ হতে পারত—ভলতেয়রী বিদ্রূপে যাকে ক্ষত হতে আমরা দেখেছি—সেই জগৎ, কিংবা অন্য যে কোনও ঈশ্বর-নির্দিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের প্রস্তাবনা সার্ত্রীয় দর্শনে তথা ঔপন্যাসিক বিশ্বে এককথায় বহিষ্কৃত। নিরীশ্বর চৈতন্যের রাজ্যে কেবল অস্তিত্ব সম্বল ক'রে যে আধুনিক মানুষ বেঁচে থাকার দায়িত্বকে ও সভ্য সামাজিক

জীবনে উপস্থিত, সে-ই সার্ত্রের চোখে দর্শনের বিকট সমস্যা। ঈশ্বরকে বাদ দিলে মানুষ বিধাতার দেওয়া, পৈতৃক সেই 'মনুষ্যত্বের' মহত্ত্ব হারিয়ে কাঙাল হ'ল। তার তখন রইল শুধুমাত্র নিরলম্ব অস্তিত্ব, যার ব্যবহারে সে যেমন স্বাধীন, তেমনি আদর্শবিহীন। অস্তিত্বের এই মহাশূন্যে বাসিন্দা মানুষ তা'র চেতন, অচেতন মনের সকল শক্তি ও শৈথিল্য নিয়ে যে বিশ্বে চলে, থামে, হাসে, কাঁদে, উদ্বিগ্ন হয়, উপসংহারে পৌঁছায় সেই বিশ্ব সার্ত্রীয় মননে অবধানের জন্য আনীত হয় উপন্যাসের পাতায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লা নোজে' (বিবমিষা)-র মূল চরিত্র আঁতোয়ান রোকাঁ ত্যাঁ, যে গবেষকের ভূমিকায় নিজেকে নিয়োজিত ক'রে ব্যর্থ এক কর্মৈষণায় আপাতঃদৃষ্টিতে সুস্থ, সক্রিয় একটি মানুষ, তা'র ওপর অস্তিত্বের নিরর্থক অনুভব ভর করে এইভাবে : 'সাড়ে পাঁচটা বাজল। আমি উঠে দাঁড়াই, ঠাণ্ডা শার্টটা আমার মাংসের সঙ্গে লেপ্টে থাকে। বাইরে যাই। কেন? কেন যাই তা'র কারণ এই যে না-যাবার কোনও কারণ নেই। যদি ঘরে থাকিও বা, যদি গুড়িগুড়ি গিয়ে চুপচাপ একটা কোণে প'ড়ে থাকিও, তবু নিজেকে ভুলব না। আমি সেখানে অবস্থিত থাকব, মেঝের ওপর আমার দেহভার রেখে। আমি আছি।" (৫) এতোখানি ক্রিয়াশীল মন বা মগজ নিয়ে রোকাঁত্যাঁ অবশ্যই যন্ত্রচালিত পুতুল নয়। সে তার কার্যকলাপের হদিশ রাখেনা এমন-ভাবে যে আপন জৈব সত্তার নিরুদ্দেশ ইতিকে ভয় করে সে। সে কিন্তু কোনও ন্যায্য ক্ষোভে ক্ষুব্ধ কিংবা হঠাৎ নগ্ন অস্তিত্বের সার্থকতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু নয়। জীবনের চাবিকাঠি হারিয়ে ফেলার ঐতিহাসিক গলদ যে তাকে জীবননাট্যে কিছুকাল উদ্‌ভ্রান্ত বানিয়ে রেখেছে, তা নয়। বস্তুতঃ, রোকাঁত্যাঁ এসে পৌঁছেছে নিরবয়ব সেই অস্তিত্বের রাজ্যে, যেখানে মানবিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত সত্যাসত্য তাদের সর্বজনগ্রাহ্য স্বরূপ চিরতরে বিসর্জন দিয়েছে এক অস্থির, তামসিক জীবনলোকের উদ্ভাসে। সার্ত্রীয় দর্শনে রোকাঁত্যাঁর এই অপ্রত্যয় বা সংশয় ও তজ্জনিত উদ্বেগ (লাঁ' গোয়াস্) এবং তা'র চোখে প্রতিভাত জীবনের উদ্ভট-রূপ (লাব্ স্যুর্দ) আধুনিক মানুষের অস্তিত্বসম্বল জিজীবিষায় আদপেই অস্বাভাবিক নয়, বরং দুরারোগ্য এক অধিকার। সার্ত্রের প্রতিটি উপন্যাস রোকাঁত্যাঁর অনুভূত, অস্তিত্ববাদী বিশ্বে মানুষিক কর্ম, বোধ, পতন ও উত্তরণের ইতিবৃত্ত। তাঁর চার খণ্ডে সমাপ্য 'লে শেমাঁ দে লা লিবেত্যের্তে' (মুক্তির পথ) প্রসারিত, আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে অসংখ্য চরিত্রের মাধ্যমে, অস্তিত্ববাদী অনুসন্ধিৎসায় মানবিক স্থিতি, গতি ও মুক্তির পথনির্দেশ। ভেসে-চলা, অপসৃয়-মান একদল প্রতিরূপ, যাদের একটির সঙ্গে অপরটির মিলন-বিন্দু দুষ্প্রাপ্য, তা'রাই শেষ পর্যন্ত মানুষের বাস-করা ভুবনে ইন্দ্রিয়গোচর, অবিসংবাদী সত্য, নিছক অস্তিত্বের ভাষায় লেখা। মাতিয়ো, লোলা, দানিয়েল, মার্সেল, রিচি, গোমেজ, বোরিস, পিনেৎ প্রভৃতি অস্তিত্ববাদী 'মুক্তির পথে' অসংলগ্ন কর্ম ও অনির্দিষ্ট বাসনার ছায়াচ্ছন্ন বিশ্বে ঘুরে-বেড়ানো ব্যক্তি-চরিত্রের একটি দঙ্গল, নানাভাবে ব্যর্থ, বিভ্রান্ত, কপট-চারী তবু শুধু অস্তিত্বের আলোয় প্রনগ্ন, ব্যগ্র, অসহায়ভাবে কর্মলিপ্ত, নবভাবে চিত্তময়। মানুষিক জীবন অস্তিত্বের তন্মাত্রনির্ধার আবেষ্টনীর মধ্যে কতোখানি দুঃসহ এবং কী দায়িত্বে তার প্রতিপালন নব্য এক মানবিকতার মুখাপেক্ষী, জাঁ পল সার্ত্র তার বিচারে অক্লান্ত।

তাঁর দার্শনিক প্রতিপাদ্য বিষয় সার্ত্রের কাছে যেভাবে মুখ্য ও সে-হেতু সাহিত্যসৃষ্টি গৌণ, তার নিদর্শন মেলে বোধহয় একমাত্র অষ্টাদশশতকী মার্কি দে সাদ্-এর লেখকবৃত্তিতে। যে পরিমাণ একমুখিতা ও তীব্রতা নিয়ে সাদ্ তাঁর জীবন দর্শনের পরিশীলিত অভিব্যক্তি ক'রে 'সদমের ১২০ দিন' বা 'জুস্তিন্'-এর মতো উপন্যাস লেখেন, সার্ত্রও তদনুরূপ প্রচণ্ডতায় আপন বিশ্ববীক্ষার মুখপাত্র করেন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে, যদিও ধর্ষকামী ঐ মার্কির চিন্তালোক ও সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন-গোত্রীয়। আলবেয়র কামু নিঃসন্দেহে এই অতি-সাহিত্যিক চাপ থেকে অনেকাংশে মুক্ত এবং দর্শন ও রাজনীতি তাঁকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করলেও, ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি অনেক পরিচ্ছন্ন ও নিরপেক্ষ। অস্তিত্ববাদী জগতে অনিবার্যভাবে প্রবিষ্ট কামু, তবু দার্শনিক উৎকণ্ঠার ধকলে বাস্তবিক কাহিনীকে বিপর্যস্ত করা তাঁর প্রবল আন্তরিকতার কাছে বুঝি বা উন্নাসিকতা। সত্য যে কামু তাঁর উপন্যাসের পটভূমিকায়, চরিত্র-সৃষ্টিতে বা ভাষায় সার্ত্র-শোভন ভাবসমৃদ্ধির গুরু ভার আহরণ করতে অসমর্থ, তথাপি তাঁর মানসিকতার দার্ঢ্য বিংশ-শতকী মানুষিক অস্তিত্বকে বিবেচনা ও বিশ্লেষণের আশ্চর্য এক মর্মে সর্বদা ন্যস্ত করেছে; বুদ্ধি ও অনুভবের মিলিত তদারকি কখনো সে অস্তিত্বকে, অপসৃত হতে দেয়নি। নিস্পৃহ অবলোকন থেকে কামু তাই নীত হ'ন অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণ বৃত্তে, ঘটনার ভাববাদী প্রেক্ষণ থেকে, সংঘটিত কার্যের প্রকাশিত স্থূলত্বে। অস্তিত্ববাদী শূন্য ও বিশৃঙ্খলা কামুর জগতে অনায়াস প্রবেশাধিকার পায়, কিন্তু দুর্মর কোনও মানবিক মহত্ত্বের প্রতি তাঁর আস্থা সার্ত্রীয় অধিবিদ্যার বন্ধনী অমান্য করায় তাঁকে। কামুর 'লা পেস্ত্' (প্লেগ)-এর উপসংহারে তাই অস্তিত্বের প্রাকৃতিক চত্বরে সৃষ্টি-বিনাশের দুরপনেয় ধর্মে মানুষিক চিকীর্ষার অবদান কোনও মৃত্যুঞ্জয়ী মানবিকতার কোরক আঘ্রাণ করে :—প্লেগের কবল থেকে মুক্তি-পাওয়া ও'রা শহরের সর্বত্র জেগেছে আনন্দের কলরব, তাই শুনে ডাক্তার রিয়োর 'মনে হ'ল যে এই আনন্দ সদৈব বিপন্ন। কারণ তিনি জানতেন, আনন্দ-মগ্ন এই জনতা যা জানত না, এবং বই প'ড়ে লোকে যা জানতে পারত যে প্লেগের বীজাণু মরে না, কখনো লোপ পায় না; প্রসুপ্ত থাকে বেশ কয়েক দশককাল আসবাবপত্তরে, বাক্সপ্যাটরার মধ্যে; কাল গোণে ঘরে, ভাঁড়ারে, বাক্সে, রুমালে আর পুরানো কাগজে লোপে থেকে, আর হয়ত এসে-যাবে সেই দিন যখন, মানুষের দুঃখের ও শিক্ষার কারণে, প্লেগ জাগিয়ে দেবে তার ইঁদুরগুলোকে, তাদের পাঠাবে মরবার জন্য কোনও আনন্দময় শহরে।' (৬) 'দুঃখ ও শিক্ষার' নৈতিকতা কামুতে বেমানান নয়।

---

(1) La Femme Assise: Guillaume Apollinaire, Gallimard, p. 22.

(2) Casse Pipe: Louis-Ferdinand Celine, Frederic Chambriand, p. 146.

(3) Les Yeux de la tete: Jean Cordelier Editions du Seuil, pp. 335-528.

(4) Les dentelles de la guerre: Jean Dubacq, Grasset, p. 187.

(5) Nausea: J. P. Sartre, translated by Lloyd Alexander, the New Classics Series.,

(6) La Peste: Albert Camus, Gallimard, pp. 254-5.

।। কবিদের উপজীবিকা ।।

পৃথিবীর সব দেশেই কবিতার জন্ম আগে। তারপর এসেছে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ। যাদের হাত দিয়ে সৃষ্টি হয়ে আসছে এই জাতীয় ঐতিহ্য তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা কেবলমাত্র আমাদের দেশেই নয় সকল দেশে সমানভাবেই প্রবল। কোন লেখককে যখন শুনি সদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী, ওষুধের দালাল, ব্যবসায়ী, আইনজ্ঞ, সাংবাদিক তখন অনেক সময়ই আশ্চর্য হই। বর্তমানে আমাদের দেশে তরুণ লেখকদের শিক্ষকতা গ্রহণ করে শিল্পসাধনায় আত্মনিয়োগ করতে দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া আরও নানা রকমের স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন করে অনেকে লেখার কাজ সহজ করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

সম্প্রতি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'সানডে টাইমসে' কয়েকজন কবি সম্পর্কে একটি বিচিত্র খবর প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধপরবর্তীকালের অন্যতম রোমান্টিক কবি জন হল 'এনকাউণ্টার' পত্রিকার বিজনেস ম্যানেজার। প্রচার, বিজ্ঞাপন, বিক্রয় প্রভৃতি কাজ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি দেখাশুনো করেন। এ সমস্ত কাজের মধ্যে থেকে তাঁকে কবিতা লিখতে হয়। 'এ সামার ডান্স' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থটি সুসমালোচিত হয় এবং বিক্রয় হয় পাঁচশত কপি। তাছাড়া অন্যান্য উপায়েও কিছু অর্থ লাভ করেন। যাই হোক, হল তাঁর এই কাজের মধ্যেই উপযুক্ত সাহিত্যিক পরিবেশ খুঁজে পেয়েছেন বলেই তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট।

একজন ভাল কবি হওয়াই এডউইন ব্রুকের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। একটি কাগজে পাঁচ বছর সাংবাদিকতা করবার পর পুলিশের কাজে যোগ দেন। ৩৪ বৎসর বয়স্ক এই কবি বর্তমানে কপি রাইটার। কবিতা-রচনার উপযুক্ত পরিবেশ অনুসন্ধানের জন্যই এডউইনকে বার বার জীবিকা পরিবর্তন করতে হয়। তাঁর মতে, বর্তমান বৃত্তিটিই কবিদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত কাজ। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'এ ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার' পাঁচশত কপির থেকে বেশী বিক্রি হয়। এমন কি তিনি তাঁর পুলিশ-জীবনের অভিজ্ঞতাকে 'দি লিটিল হোয়াইট সঙ' উপন্যাসে ব্যবহার করছেন।

সলিসিটর এবং কবি রয় ফুলারের কবিতায় একজন আইন-ব্যবসায়ীর চিন্তা-জগতের ছাপ সুস্পষ্ট। যাঁদের রচনা দৈনন্দিন চিন্তা থেকে স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত র'য়র কাব্যজগৎ তা থেকে ভিন্ন। ফুলার কাজের পর কবিতা লেখার সময় বিশেষ পান না। তাই তিনি এই কর্মজীবন ত্যাগ করে অন্য উপযুক্ত কাজ আশা করেন।

যাই হোক এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত ভবিষ্যতে উপজীবিকার জন্য অন্য উপায় অবলম্বনে বাধ্য হবেন। যেমন হয়েছেন টি এস এলিয়ট গ্রন্থ-প্রকাশ ব্যাপারে জড়িত হয়ে। ডিলান টমাস বহু রকমের কাজে জড়িত হয়েছেন। আরও অনেকের কথাই হয়ত উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এ সমস্ত থেকে একটি সত্য বোঝা যাচ্ছে, একমাত্র লিখে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

।। কাব্যের প্রাণবন্ত ফুলগুলি ।।

সমালোচক নিকোলাই রাইলেনকভ সমকালীন সোবিয়েত সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সোবিয়েৎ পাঠকেরা কাব্যের প্রাণবন্ত ফুলগুলিকেই শুধু গ্রহণ করেন। চোখধাঁধানো আপাতঃ-সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রকৃত সৌন্দর্যের পার্থক্য তাঁরা বুঝতে পারেন। সোবিয়েৎ কবিও তাঁর যুগের দাবী সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন; তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, সোবিয়েৎ মানুষ উন্নত হয়ে গড়ে উঠছে। অচলায়তনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, যুগ-প্রাচীন গোঁড়ামির অবশেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই দৃষ্টি এবং চেতনার মধ্যেই অভিব্যক্তি লাভ করছে আমাদের কাব্যের অকপট মানবতা-বোধ।" সোবিয়েৎ ইঞ্জিনিয়ারের চোখে আধুনিক কাব্যজগৎ বিজ্ঞানের জয়-যাত্রার যুগে বাহুল্যের সামগ্রী হলেও যে আত্মিক প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি সাধনে শিল্পকলার জন্ম সেখানে প্রয়োগবিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে সাধারণভাবে আর্টের প্রতি এবং বিশেষতঃ কাব্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ কমছে না, বরং ক্রমান্বয়ে বেড়েই যাচ্ছে।

ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি, দেমিয়ান বেদনি ও সের্গেই ইয়েসেনিন এই তিনজন বিশিষ্ট ও অত্যন্ত স্বতন্ত্র কবি মহৎ বৈপ্লবিক যুগের অনন্যসাধারণ ঘটনা-বস্তুকে শিল্পরসসমৃদ্ধ কাব্যাভিব্যক্তি দান করে গেছেন। এঁদের হাতে সোবিয়েৎ কাব্য-বিকাশের প্রথম স্তরে কাব্যপ্রবাহ ও সম্ভাবনার দিকগুলি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন রূপ লাভ করে।

যুদ্ধোত্তরকালে যে সমস্ত কবির পুনর্জন্ম ঘটেছিল, নতুন সৃজনী কল্পনার আলোকে যাঁরা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন, যাঁদের কাব্যে ঘটে দ্রুত উন্নতি প্রগতি এন জাবোলোৎস্কি, এল মার্তিনভ, বি রুচিয়েভ, ভি লুগভস্কয়, এ প্রোকোফিয়েভ, ভি সায়নেভ, ভি ফিয়োদোরভ, এম লুকভ প্রভৃতির নাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

সোবিয়েত গীতিকাব্যের আধুনিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য জনগণের আত্মিক-জগতের ঐশ্বর্যকে উন্মোচিত করে তোলার মধ্যেই নিহিত। জনগণের মানসচিন্তাক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে, যার গতিধারা এখনও প্রবহমান সেখান থেকে কবিরা সরে দাঁড়াননি। এন আসতাকিয়েভা, আর কাজাকোভা, আর রজদেনৎভেনস্কি, ওয়াই ইয়েভতুশেংকো, এ পপেনেচনি, ভি ৎশাইবিন, ওয়াই স্মোলিয়াকভ, ভি ফিওদোরভ, এস অরলভ প্রভৃতির কবিতা সোবিয়েৎ সাহিত্যে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করেছে।

এম প্রিশভিন লিখেছেন, "আপনার প্রতি অনুরাগকে কী করে সকলের প্রতি অনুরাগে এবং সকলের প্রতি অনুরাগকে কী করে নিজের প্রতি অনুরাগে পরিণত করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করাই আমাদের যুগের কাহিনীর মর্মবস্তু; আমাদের খুঁজে বার করতে হবে কী করে নিজের প্রতি মনোযোগ রক্ষণের জন্যই সবাইকে ভালোবাসতে হয়।" সোবিয়েত সমাজ-বিকাশের বর্তমান স্তরে নৈতিক সমস্যাবলীর গুরুত্ব আর গৌণ হয়ে নেই। ইয়েভগেনি ভিনোকুরভের 'মানুষের মুখ' কাব্যগ্রন্থ পাঠে জানা যায় তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ মানুষের আন্তর সৌন্দর্যের প্রতি, যে সৌন্দর্য-বিকাশ নির্ভর করে মানুষের নিজের ওপর, নিজের ওপর মানুষের নৈতিক বিচারের দাবির কঠোরতার ভিত্তিতে যা প্রতিষ্ঠিত, মানুষের চেতনার ওপর যে সৌন্দর্য-বিকাশ নির্ভরশীল।'

কাব্য আত্যন্তিক সারল্যও নয়, আবার আঙ্গিকের ইচ্ছাকৃত জটিলতা-সর্বস্বতাই নয় কাব্য। যে কোন শিল্প-সৃষ্টির পেছনে থাকা চাই সততা এবং ঐকান্তিকতা, থাকা চাই মানুষের মনে সত্য ও গভীর চিন্তা এবং ভাবধারাকে সঞ্চারিত করে দেওয়ার অকপট আগ্রহ। শ্রেষ্ঠ সোবিয়েৎ গীতিকাব্য বিশিষ্টতা লাভ করেছে তার স্বচ্ছ স্পষ্ট ভাবধারার জন্যে এবং অতি উন্নত নৈতিক মানের জন্য।

।। একজন গীতিকবি ।।

সম্প্রতি গীতিকবি রুডলফ হেগেলস্টেজ-এর কাব্যসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হেগেলস্টেজ সাহিত্য-জগতে খ্যাতিলাভ করেন। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যযুগীয় কবিদের মধ্যে গীতিকবি হিসাবে তিনি অন্যতম। তাঁর জন্ম হয় ১৯১১ সালে। যুদ্ধ ও কারাজীবনের অনুভূতি নিয়ে প্রকাশিত হয় 'Venezianisches Credo' নামক গ্রন্থ। কাব্যসংগ্রহে তিন শতাব্দী ধরে হেগেলস্টেজের কবিমানসের পরিবর্তমানতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধ করা যাবে।

জুন মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় মাত্র দুটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে। এর একটির উদ্যোক্তা সোসাইটি অফ কন্টেম্পোরারী আর্টিস্টস নামক শিল্পী-সংস্থা, অন্যটির উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পাধিকার। প্রথমটির শিল্পী শ্রীসোমনাথ হোড় এবং দ্বিতীয়টির শিল্প-নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে। শিল্পী সোমনাথ হোড় তাঁর সাম্প্রতিক গ্রাফিক কাজের ১১টি নিদর্শন উপস্থিত করেছিলেন ১৫৭।বি, ধর্মতলা স্ট্রীটের সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গ্যালারীতে আর পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকার হস্তশিল্পের (সরকারী ভাষা 'কুটিরশিল্প') নক্সার নমুনা প্রদর্শনের জন্য লোয়ার সার্কুলার রোডের সরকারী তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত প্রদর্শনীতে উপস্থিত করেছিলেন নানা ধরণের প্রায় তিন শতাধিক নিদর্শন। প্রদর্শনী দুটি সম্পর্কে এবার আমরা আলোচনা করছি।

॥ শিল্পী সোমনাথ হোড়ের চিত্র-প্রদর্শনী ॥

সোসাইটি অফ কন্টেম্পোরারী আর্টিস্টস শিল্পী শ্যামল দত্তরায়ের চিত্র-প্রদর্শনীর পর শিল্পী সোমনাথ হোড়ের চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করায় কলকাতার শিল্পরসিক ব্যক্তিরা খুশীই হয়েছেন। কারণ, শিল্পী হোড় বোধহয় বাংলার সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে কৃতী শিল্পী। এবারও ললিত-কলা অ্যাকাডেমী-আয়োজিত সর্ব-ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনীতে শ্রীহোড় পুরস্কৃত হয়ে বাংলার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কিন্তু কর্মোপলক্ষে তিনি দিল্লীবাসী হওয়ায় বেশ কিছুকাল হল কলকাতার মানুষ তাঁর একক প্রদর্শনী দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অথচ, অনেকের মনে শ্রীহোড়ের সাম্প্রতিক কাজ সম্পর্কে প্রচুর কৌতূহল রয়েছে। সোসাইটি অফ কন্টেম্পোরারী আর্টিস্টস দীর্ঘকাল পরে সেই কৌতূহল নিবৃত্ত করে অনেকের প্রশংসাভাজন হলেন।

শিল্পরসিক ব্যক্তিদের প্রায় প্রত্যেকেই জানেন শিল্পী সোমনাথ হোড় গ্রাফিক চিত্রকলায় এপর্যন্ত অনেক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। বর্তমান প্রদর্শনীতে

কলারসিক

শ্রীহোড়ের যে ১১ খানি নিদর্শন স্থান পেয়েছে তা দেখেও আমরা তাঁর নৈপুণ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারি। বরং বলা যায়, শ্রীহোড় এচিং-এর নিত্য নতুন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অনেক চমৎকার ফলাফল আমাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন। প্রদর্শিত নিদর্শনগুলির কয়েকটিতে দেখা গেল শ্রীহোড় প্লেটকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে, একটি-মাত্র টানে কয়েকটি রঙের এফেক্ট আনতে সক্ষম হয়েছেন। আবার কোথাও রেখাকে প্রায় ম্লান করে রঙ কিংবা রঙকে ম্লান করে রেখার জালে সমগ্র চিত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিংবা কোনো প্লেটে ড্রিল ব্যবহার করেও শিল্পী তাঁর সামগ্রিক চিত্র-বক্তব্যকে তুলে ধরতে পেরেছেন। অর্থাৎ বলা যায়, শিল্পী হোড় শ্রমিকের নিষ্ঠা নিয়ে চিত্রকলার সাধনায় নিরত। এই নিষ্ঠা ও সততার পুরস্কার অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য।

তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। গ্রাফিক চিত্রকলার মত শ্রমসাধ্য কাজে কিংবা চিত্র-সংস্থাপনে শ্রীহোড় যত মনোযোগ দিয়েছেন, চিত্র-বক্তব্য সম্পর্কে যেন ততখানি মনোযোগ দিতে পারেননি। ইদানীং তাঁর চিত্র-বক্তব্যে বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনা প্রবল হয়ে উঠছে। ফলে, সাধারণ দর্শকের পক্ষে শ্রীহোড়ের রচনাকে হৃদয়ঙ্গম করা সত্যি কঠিন হয়ে পড়ছে। এ জিনিস ভাল কি মন্দ সে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। তবু শ্রীহোড়ের কাছে আমরা এমন জিনিস চাই যা শুধু আঙ্গিক নৈপুণ্যে আমাদের মনকে জয় করবে না, চিত্র বক্তব্যেও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করবে। এদিক থেকে আলোচ্য প্রদর্শনীর 'গ্রীষ্ম' (৫), 'মরুনৈঃসর্গ' (২), প্রজেক্ট (১), 'রাজ-কন্যা' (৪), কিংবা 'পিতা' (৭) বিমূর্ত ভাবানুসারী হয়েও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

আশা করি অদূর ভবিষ্যতে আমরা শ্রীহোড়ের চারু ও গ্রাফিক চিত্রের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পাব। আজ আমরা শিল্পী সোমনাথ হোড়ের উদ্দেশ্যে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

॥ পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকারের নক্সা-প্রদর্শনী ॥

লোয়ার সার্কুলার রোডের সরকারী তথ্য কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকার আয়োজিত নক্সা-প্রদর্শনীটি সময়োপযোগী হয়েছে। বাংলার হস্তশিল্পকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে তাকে কালোপযোগী নক্সায় সমৃদ্ধ করে আধুনিক মনের দরবারে উপস্থিত করা একান্ত প্রয়োজন। এদিক থেকে সরকারী উদ্যম অপরিহার্য। পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকার এই উদ্যমে কতখানি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন সেটাই জনসমক্ষে তুলে ধরবার জন্য এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল বলে আমাদের মনে হয়েছে।

কিন্তু একটা কথা দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, শিল্পাধিকার পরিচালিত নক্সাকেন্দ্রটি দীর্ঘকাল ধরে এ ব্যাপারে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু দান করতে পারেননি। প্রদর্শনীতে শিল্পাধিকার অংশ গ্রহণ করলে যেসব বস্তু আমরা কয়েক বছর ধরে প্রদর্শিত হতে দেখেছি, এই প্রদর্শনীতেও মূলত তাই-ই পরিবেশিত হয়েছে। আমাদের মনে হয়েছে, শিল্পাধিকার যদি নক্সাকেন্দ্রে নতুন শিল্পী-প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ না করেন তবে এই গতানুগতিক পথ পরিত্যাগ করে নক্সাকেন্দ্র নতুন যুগের সৌন্দর্য-চেতনাকে সার্থকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন না।

এই প্রদর্শনীতে যে-সব নিদর্শন উপস্থিত করা হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলির নক্সা-পরিকল্পনা আমাদের মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে হস্তী-দন্তশিল্পের কয়েকটি নক্সা, শিংজাত শিল্পদ্রব্যের নক্সা, শোলার তৈরী নক্সা, মাটির পুতুল এবং রেশমী শাড়ির কয়েকটি নক্সা আমাদের কাছে যুগোপযোগী বলে মনে হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য কিছুটা বক্তব্য উপস্থিত করতে চাই। এই প্রদর্শনীর নামকরণ করা হয়েছে 'এক্‌জিবিশন অব কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ'। কিন্তু কুটিরশিল্প কি সব সময় শিল্প-চেতনা অনুসরণ করে? চৌকি না মোড়া ছি-পাদান তো কুটিরশিল্প। কিন্তু সেখানে কি শিল্প-নক্সার প্রয়োজন হয়? আসলে সরকারী কর্তৃপক্ষ হস্তশিল্প (হ্যান্ডিক্রাফটস) এবং কুটিরশিল্প (কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ) এ দুয়ের পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষমতা প্রদর্শন করে এই প্রদর্শনীর এমন ভ্রান্ত নামকরণ করেছেন। আশা করি ভবিষ্যতে সরকারী প্রচেষ্টায় যেমন হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবনে নতুন নতুন নক্সা উদ্ভাবিত হবে, তেমনি এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত হওয়ার মত এইসব দপ্তরেরও তাঁরা অধিকারী হবেন। এসব সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এর উদ্যোক্তাদের আজ আমরা প্রশংসাই করছি।

মানুষের চোখ যদি জ্বলত তবে অন্ধকারের অভিজ্ঞতা নষ্ট হত কিছুটা। কিন্তু জ্বলে না। তাই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হয়। আলোর সাহায্য নিতে হয়। যেমন এই মুহূর্তে ভবেশ আলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। এবং এতদিনেও বিছানার পাশে একটি সুইচ লাগাতে পারেনি ভেবে নিজের উপর রাগ হচ্ছে। অথচ আলোটা একবার জ্বালতে না পারলে স্বস্তি পাচ্ছে না কিছুতেই। কিন্তু তার জন্যেই ঝামেলা কি কিছু কম করতে হবে তাকে? বিছানা থেকে উঠতে হবে। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে প্রথমে দেওয়াল তারপর সুইচটা খুঁজতে হবে। ঘুমের ঘোরে যে দেওয়ালে সুইচ আছে সেখানে না গিয়ে অন্য দেওয়াল হাতড়ানর ঘটনাও ঘটেছে একদিন। তবু বিছানার পাশে সুইচ লাগানর মত একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজকে কি করে যে এতদিন ভুলে ছিল, এটা ভেবে বিস্মিত হচ্ছে ভবেশ। এই সামান্য কাজটা, যা এতদিনে সহজেই করতে পারত কিন্তু করেনি বলে রাগ হচ্ছে।

আলোটা জ্বালা দরকার। ভবেশ ভাবল, আলোটা না জ্বাললে এই মুহূর্তে দেখা স্বপ্নটা, সেটা মনের গায়ে আলকাতরার মত লেগে রয়েছে, তাকে ছাড়ান যাবে না। যদিও বুঝতে পারছে, সে রাস্তায় নেই এবং বাবলুও সেই বিরাট বাসটার তলায় পড়ে একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়নি। তবু কেন যেন বুকটা এখনও কাঁপছে। বাবলুর মুখটা না দেখা পর্যন্ত যেন আশ্বস্ত হতে পারছে না। ভয় ভয় আড়ষ্টতার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। স্বপ্ন বিশ্বাস করবার মত দুর্বলতা তার নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে এ স্বপ্ন সে দেখতে গেল কেন? এমন কোন ঘটনা সে জীবনে কোনদিন ভেবেছে বলে মনে পড়ল না। তবু? ভাবতে গিয়েই ভবেশের মনে হল, এ স্বপ্ন তার অনেকদিন আগেই দেখা উচিত ছিল। কারণ বাসাটা তার অন্ধ গলির মধ্যে হলেও বাস-রাস্তার দূরত্ব খুব বেশী নয়। সেখানে আজ স্বপ্নে দেখা ঘটনাটা যে-কোন মুহূর্তে ঘটা অস্বাভাবিক নয় কিছু। কিন্তু এ কথাটা এতদিন কেন যে একবারও মনে হয়নি, এটা ভেবে বিস্মিত হল ভবেশ।

কাজলের মত অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে ঘরটায়। কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ভবেশ। দেওয়াল না, আলমারী না, এমন কি ঘড়িটাকে পর্যন্ত না। অথচ ঘড়িটা আছে। তার বুকের ধুক-ধুকুনির শব্দটা শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। যদি ঘড়িটা থাকে তবে আলমারীটাও আছে। কারণ তার মধ্যেই যে রয়েছে সেটা। এবং এ সবই যদি থাকে তবে ভবেশ তার নিজের ঘরেই যে শুয়ে রয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার। এই অসীম অন্ধকার সমুদ্রের তলে ছোট্ট একটা কীটের মত মনে হচ্ছে নিজেকে। ছোট্ট এবং একা। এখান থেকে সে আর কোনদিন উঠবে না। আলো সে আর দেখবে না কোনদিন। আলো-হাওয়াহীন অন্ধকার এই খনির মধ্যে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এলো ভবেশের। বুঝতে পারল তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। সারা দেহটা ঘামে ভিজে উঠেছে তার। এ ঘরে হাওয়া নেই। হাওয়া ঢোকে না এ ঘরে। তবু এর মধ্যেই

রমা ঘুমচ্ছে। বাবলুও। ওদের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। রমার নাকে কেমন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে একটা। তাছাড়া নিস্তব্ধ চারদিক। শান্ত। কোন শব্দ নেই। কোন শব্দ হচ্ছে না কোথাও। কিন্তু হঠাৎ সে নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে পথে একটা লরীর শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা কেঁপে উঠল ভবেশের। এবং সেই ভয়ংকর বাসটা তার চিন্তায় ছুটে এলো আবার। আর তখনই মনে হল, বাবলুকে সে বাঁচাতে পারত। মনে পড়ল, বাবলুর কাছ থেকে তার দূরত্ব খুব বেশী ছিল না। বাসটা আসছে দেখেই সে চিৎকার করে উঠতে পারত। কিংবা ছুটে গিয়ে সহজেই সরিয়ে আনতে পারত তাকে। কিন্তু সে তা করেনি। করেনি কারণ একটা বীভৎস দৃশ্য দেখবার কৌতূহল যেন চেপেছিল তার। স্বপ্নের ভবেশ যেন বাবলুর মৃত্যু দেখতে চেয়েছিল। তাছাড়া বাবলুকে না বাঁচানর পিছনে আর কোন যুক্তি ভবেশ খুঁজে পেল না। যুক্তি নেই। কিন্তু এও হতে পারে সেই মুহূর্তে যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ভবেশ। স্থবির। কোন কিছু চিন্তা করবার শক্তি তার ছিল না। এবং সেইজন্যেই এ-বীভৎস দৃশ্যটা দেখতে সে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ-দৃশ্য দেখবার পিছনে এক শ্বাসরোধকারী উদ্বেগ ছিল। এক অসহ্য যন্ত্রণায় প্রতিটি মুহূর্তে ছটফট করেছিল ভবেশ। মনে পড়ল, শেষ মুহূর্তে চিৎকার করে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। চোখ মেলে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অসহ্য যন্ত্রণায় কান্না এসেছিল তার। কিন্তু ভবেশ কাঁদতে পারেনি। কেঁদে উঠতে গিয়েই ঘুমটা ভেঙে গেছে। গেছে বটে কিন্তু কান্নাটা এখনও যেন দলা পাকিয়ে রয়েছে বুকের মধ্যে। একটা অস্বস্তি।

যদিও এ ঘটনা এখনও ঘটেনি। তবু এ ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয় বলেই তার আতঙ্ক। সত্যিই যদি এ ঘটনা ঘটত—বাবলুকে সত্যি যদি মরতে দেখত ভবেশ? তাহলে? ভবেশ ভাবতে পারে না। মনে মনে বাবলুকে মেরে তার শোকের পরিমাপ করতে গিয়ে দেখল সে কিছুই ভাবতে পারছে না। তার অনুভূতি কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে। বাবলুর মৃত্যুচিন্তায় একটা অস্বস্তি ছাড়া অন্য কোন কষ্ট কিংবা কোন যন্ত্রণা অনুভব করছে না ভবেশ। তবে কি বাবলুকে ভালবাসে না সে? না তারপরে খুব একটা মায়া নেই তার? নইলে তার মৃত্যু-চিন্তায় তার মনে কোন আলোড়ন উঠছে না কেন? অথচ, ভবেশের মনে পড়ল, কিছু আগে স্বপ্নে বাবলুর মৃত্যু দেখে কী এক যন্ত্রণায় বুকটা মুচড়ে উঠেছিল তার। কিন্তু এখন কেন আর সে অনুভূতি নেই? ভাবতে গিয়েই ভবেশ বুঝতে পারল, বাবলু মরেনি, সে যে বেঁচে আছে এই বোধই তাকে আশ্বস্ত করছে। এবং সম্পূর্ণ চিন্তাটাই যে নেহাত ছেলেমানুষি এই বোধও কাজ করছে কিছুটা।

বাবলু মরেনি। রাস্তায় না গেলে মরবেও না সে। অন্তত স্বপ্নে দেখা ঘটনাটা যে ঘটবে না কোনদিন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ভবেশের। কিন্তু বাবলুকে কি করে আটকাবে সে? স্কুলে তাকে যেতেই হবে। যদিও পাশের বাসার নন্টু ঝন্টু সঙ্গে থাকবে তার তবু এ ঘটনা ঘটা খুব একটা অস্বাভাবিক বলে মনে হ'ল না ভবেশের। এ ঘটনা ঘটতে পারে। স্কুলে যাবার পথেই মরতে পারে বাবলু। এবং বাবলুকে বাঁচাতে গেলে স্কুলে যাবার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে তাকে। ভবেশ ভাবল, বাবলুকে সে এমন একটা স্কুলে ভর্তি করে দেবে, যাদের গাড়ি এসে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে ওকে এবং বাড়িতে দিয়ে যাবে আবার। অবশ্য তার খরচ চালানর মত সামর্থ যে তার নেই সে ভাল করেই জানে। তবু সে ভাবল। কারণ এই মুহূর্তে ভাবতে তার ভাল লাগল।

কিন্তু স্কুলে যাবার ব্যবস্থা করলেই যে বাবলু বাঁচবে এ গ্যারাণ্টি ভবেশ খুঁজে পেল না। কারণ শুধু স্কুলে যাবার সময় ছাড়া সে যে রাস্তায় যায় না, কখনও এটা সত্যি নয়। তাই বাবলু যদি মরে তবে স্কুলে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েও তাকে বাঁচাতে পারবে না। রাস্তায় যাওয়াই বন্ধ করতে হবে। ভবেশ ভাবল, কাল সকালে উঠেই বাবলুকে রাস্তায় যেতে নিষেধ করে দেবে। ভাবল, কিন্তু চঞ্চল বাবলু তার নিষেধ শুনবে বলে মনে হ'ল না তার। এবং না শুনে সে যদি পালিয়ে একা একাই রাস্তায় চলে যায় কখনও? কোনদিন? ভাবতে গিয়েই ভবেশ বুঝতে পারল, সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ-ভাবে বাঁচা যায় না। পায়ে পায়ে এমন মৃত্যুর আশংকা নিয়ে বাঁচতে পারে না কেউ। ভবেশ ভাবল, সে এখান থেকে চলে যাবে। অন্য কোথাও। যদিও সেটা অসাধ্য তার কাছে তবু এখন ভেবে সে খুশী হ'ল।

'কিন্তু বাবলু যদি মরেই তাহলে কিছুতেই তাকে বাঁচান যাবে না। রাস্তায় না গেলে হয়ত স্বপ্নে-দেখা ঘটনাটা ঘটবে না কোনদিন। কিন্তু বাড়িতে রেখেই কি বাবলুকে বাঁচান যাবে? বাঁচাতে পারে কেউ? মৃত্যু আমাদের চারদিকে ওৎ পেতে বসে রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে সে এসে গলা টিপে ধরলে করার নেই কিছু। তার হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া যায় না কোথাও।' কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভবেশ যেন ফিস-ফিস করে উঠল। নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দিল যেন। তারপর বাবলুর মৃত্যুর কথা ভাবতে গিয়ে সেই বীভৎস মাংসপিণ্ডটার কথা মনে পড়ল ভবেশের। রক্তাক্ত সেই দেহটা। পা দুটো দুমড়ে গেছে। পেটের নাড়ি-ভুঁড়িগুলো বেরিয়ে এসেছে সব। বুকের পাঁজরাগুলো ভেঙে দলা পাকিয়ে গেছে। চোখদুটো বেরিয়ে এসেছে বাইরে। মাথাটা ভেঙে ঘিলু ছড়িয়ে গেছে পথে। হাতদুটো তার মধ্যে পড়ে রয়েছে রক্তাক্ত। ভবেশ শিউরে উঠল। শিউরে বিছানায় উঠে বসল সঙ্গে সঙ্গে।

আলোটা জ্বালাতে হবে। কিন্তু এই অন্ধকারে সুইচের দিকনির্ণয় করতে গিয়ে যখন বিরক্তি আসছে ঠিক সেই মুহূর্তে মনে পড়ল, সুইচ না টিপেও আমি আলো জ্বালতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে বালিশের তলা হাতড়ে দেশলাইটা বের করে জেবলে ফেলল ভবেশ।

বাবলু ঘুমচ্ছে। রমাও। এই শান্ত নির্জীব প্রাণীদুটোকে ভাল লাগল ভবেশের। দিনের সেই মুখরা রমা আর চঞ্চল বাবলু আগামী আর একটি দিনের মুখরতা ও চঞ্চলতার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে। আচ্ছা, ওরাও কি স্বপ্ন দেখছে? কি স্বপ্ন দেখছে ওরা এখন? ভাবতে গিয়েই ভবেশ চমকে উঠল। দেশলাই কাঠিটা পুড়ে তার হাতে এসে ছেঁকা দিয়েছে। কাঠিটা ফেলে দিয়ে আর একটি জ্বালতে যাবে ঠিক তখনই মনে হল, একটা বিড়ি ধরালে হত। বালিশের পাশ থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরিয়ে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়বার সময় কিন্তু মনে পড়ল কথাটা। বিড়িটা এখন ধরান ঠিক হল না। আগামীকাল সকালের দুটি বরাদ্দের একটিতে হাত দিয়ে কাজটা সে ভাল করল না। নিজের অপরিণামদর্শিতায় নিজের উপর কিছুটা বিরক্ত হল ভবেশ। তারপর বিড়িটা আগামীকালের জন্যে নিভিয়ে রাখবে কি রাখবে না ভাবতে ভাবতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি আর কিছু ভাবতে চাইনে। আমি এখন ঘুমব।

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

॥ সাত ॥

সংগীত সংঘের প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পরই রাজা সৌরিন্দ্রমোহনের তিরোধান শুধু এই প্রতিষ্ঠানের নয়, দেশের ব্যাপক সংগীতক্ষেত্রেরও অপূরণীয় ক্ষতিরূপে সে যুগে বিবেচিত হয়েছিল। তথাপি অনেকে এই ক্ষতি দৈবনির্দিষ্টরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কেননা তিরোধানের সময়ে সৌরিন্দ্রমোহনের বয়স যথেষ্ট পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। বার্ধক্যদশায় সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি রোগভোগ করেছিলেন। কিন্তু সৌরিন্দ্রমোহনের পরলোকগমনের পরের বৎসর সংগীত সংঘের অধ্যক্ষ প্রফেসর কোকভ খাঁ সাহেব যখন অকালে ইহলোক ত্যাগ ক'রলেন, তখন সেই ধাক্কা সামলানো সংঘের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা কোকভ খাঁ শুধু উচ্চাঙ্গ সংগীতে শাস্ত্র ও শিক্ষাদানে দেশের গুণীসমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন—তাই নয়, তিনি সংগীত সংঘের গঠন ও পরিচালনে সকল প্রেরণার নেতৃস্থানীয় ছিলেন। আনন্দ সংগীত পত্রিকাও তাঁর নিকট কম ঋণী নয়। তিনি এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হ'তে শুরু করে তাঁর জীবনান্তকাল পর্যন্ত সংগীত সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ নানা প্রবন্ধ পরিবেশন ক'রেছেন। এ সকল প্রবন্ধই তাঁর হিন্দী রচনার বঙ্গানুবাদ। "সৃষ্টিকল্প" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে তিনি নাদ হ'তে জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে বৈদিক ও পৌরাণিক সার সিদ্ধান্ত সকল অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত ক'রেছেন। "বিজ্ঞান" নামক আর একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে যোগবিদ্যার সহিত সংগীতের সম্বন্ধ এবং অনাহত নাদ হ'তে শুরু ক'রে বৈদিক সামগান, গান্ধর্ব-সংগীত এবং পরিশেষে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ সংগীতের ও বীণাযন্ত্রের ক্রমবিকাশ তিনি দেখিয়ে গেছেন। তাঁর মতবাদ গান্ধর্ব ও মার্গ সংগীতের সিদ্ধান্তই অনুসরণ করেছে। তাছাড়া মিয়াঁ তানসেনের শিক্ষানুযায়ী তিনি হিন্দুস্থানী সংগীতের অন্তর্নিহিত ভারতীয় যোগরহস্য ও সুফী সাধনার মর্মকথা খুলে প্রকাশ করেছেন। যাঁরা এই শিক্ষার আদর্শ অনুধাবন করেছেন, তাঁরা স্পষ্টই বুঝতে পারবেন যে যোগী, ঋষি ও প্রকৃত গুণীদের নিকট হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গণ্ডির কোনও মূল্য নেই ও সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত অনুভূতি একই। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে প্রৌঢ়দশার পূর্বেই তাঁর হৃদযন্ত্রে নানা উপসর্গ লক্ষিত হয়। অধিক রোগভোগ তাঁকে করতে হয়নি। ১৯১৫ সনের ১৭ই আগষ্ট তারিখে হৃদযন্ত্রের বিকলতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সেকালে সংগীতসাধক সমাজে তিনি যে কিরূপ শ্রদ্ধা অর্জন ক'রতে পেরেছিলেন—তা স্বর্গতা প্রতিভা দেবী লিখিত "শোকসংবাদ" প্রবন্ধ পাঠ করলেই আমরা বুঝতে পারবো।

(আনন্দ সংগীত পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ—১ম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩২০)

আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে সকলকে জানাইতেছি যে আমরা একটি প্রসিদ্ধ গুণী লোক হারাইয়াছি। বিগত ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার রাত্রি ৯টার সময় প্রফেসর এ. কে. কোকভ ইহলোকের সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল যে নিজ পরিবারবর্গকে শোকে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহা নয়। ইঁহার জন্য দেশেরও বিপুল ক্ষতি হইল। এক-একটি গুণীলোকের জীবনের অবসানে যেন এক-একটি নক্ষত্র আকাশ হইতে খসিয়া পড়িয়া যায়।

এ. কে. কোকভের বিয়োগে আমাদের সংগীত সংঘও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। চারি বৎসর পূর্বে সংগীত সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল. তিনি এই চারি বৎসর আমাদিগের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তাঁহার কার্যে উৎসাহের দরুণ সংগীত সংঘ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। শরীরের গ্লানি অবহেলা করিয়া, আর্থিক সুবিধা ছাড়িয়া দিয়া নিয়ত আমাদিগের জন্য কষ্ট করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এমনকি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াও আমাদিগকে একদিন পূর্ব পর্যন্ত কাতর বলিয়া কার্যে আসিতে পারিতেছেন না বলিয়া

ক্ষুণ্ণিত হইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার অনুরূপ বন্ধু হারাইলাম ইহাই আমাদিগের বিশেষ শোকের কারণ। তিনি সংগীতবিশারদ ছিলেন। ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাপাত্র না হইলে, লোক এমন গুণী হইতে পারে না, কেবল যে তাঁর হাতের কৌশল ছিল তাহা নয়। তাঁহার বাজাইবার রীতি-প্রণালীও অতি সুন্দর ছিল। তিনি দেশ-বিদেশের সংগীতশাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সংগীতে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া, অনেক বৎসর কাটাইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত জানিতেন ও বহুকষ্টে পুরাতন পুস্তকাদি উদ্ধার করিয়াছিলেন। উর্দুতে একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন; তাহাতে সকল দেশের সংগীতের কথা উল্লিখিত আছে। তাহা এখনও ছাপান হয় নাই। তিনি সম্প্রতি "সংগীত পরিচয়" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম খণ্ড মাত্র সংগীত সংঘ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সংগীত শিক্ষার এমন উপযোগী পুস্তক আর এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার বক্তৃতা করিবার, লিখিবারও বেশ ক্ষমতা ছিল। তিনি বাংলা ভাষায় বিশেষ পটু ছিলেন না। ইঁহারই যত্নে, পরিশ্রমে বালক-বালিকাগণের শিক্ষার এত শীঘ্র উন্নতি হইতে পারিয়াছিল। সংগীত সংঘ ইঁহার প্রাণ ছিল। আজ সংগীত সংঘ যে রত্ন হারাইল, তাহার স্থান পূরণ করিবার লোক পাওয়া দুর্লভ। ভগবান মঙ্গলময়। তাঁহার ইচ্ছায় পৃথিবীর সকল স্থানে সকল মঙ্গল ব্যবস্থা হইতেছে। তিনি শোকে দুঃখে তাপিত পরিবারবর্গকে তাঁহার সান্ত্বনা ও শান্তি দান করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

কোকভ খাঁ সাহেবের অধ্যক্ষতাকালে তাঁর সহযোগীরূপে বিশ্বনাথ রাও (ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ও ভজন), বীন্-কার লছমীপ্রসাদ মিশ্র (খেয়াল ও সেতার), গঙ্গাগিরি (এস্রাজ), দর্শন সিং (তবলা), ব্রজেন গাঙ্গুলী (রবীন্দ্র-সংগীত, কীর্তন ও অন্যান্য বাংলা গান) প্রভৃতি খ্যাতনামা গুণীগণ সঙ্গীত সঙ্ঘের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। দর্শন সিং বারাণসীর সুবিখ্যাত তবলা-বাদক ভয়রোঁ সা'র ঘরানার ওস্তাদ ছিলেন। ইঁহার ন্যায় ঠেকাবাদন সেকালে এবং একালেও বিশেষ সুদুর্লভ। কোকভ খাঁ'র স্বরোদের সহিত ঠেকা বাজাতে সে যুগের তবলা-বাদকগণ সহজে অগ্রসর হতেন না। কেননা খাঁ সাহেবের গৎ অতি দ্রুত লয়ে শুরু হতো এবং তাঁর বাজনায় ছন্দের কাজ ছিল খুব কঠিন। অন্যান্য তবলা-বাদকগণ খাঁ সাহেবের সহিত সঙ্গতে প্রায়ই বেতালা প্রতিপন্ন হতেন। কিন্তু দর্শন সিংয়ের সঙ্গে কোকভ খাঁ'র সঙ্গত আদর্শস্থানীয় ছিল। যন্ত্রসঙ্গীতের ঐরূপ সঙ্গতি আজকাল শোনা যায় না। কোকভ খাঁ জীবিত থাকাকালেই দর্শন সিংয়ের জীবনাবসান ঘটে। গৎপড়নে দর্শন সিংয়ের চেয়ে অধিকতর কুশলী তবলাবাদক এ যুগে আবির্ভূত হয়েছেন সত্য, কিন্তু ঠেকা ও সাথ-সঙ্গতে তাঁর স্থান অপূরণীয়। কোকভ খাঁ'র দেহান্তের পর সঙ্গীত সঙ্ঘের অধ্যাপনা বিভাগের পুনর্গঠন আবশ্যক হয়ে ওঠে, কেননা বিশ্বনাথ রাও অসুস্থতার জন্য অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং লছমীপ্রসাদও অতিরিক্ত বার্ধক্যের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। লছমীপ্রসাদ বারানসীর বিখ্যাত মিশ্র ঘরানার এক প্রবীণ গুণী ছিলেন। ইনি বেতিয়ার বিখ্যাত ধ্রুপদীগণের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং ঐ ঘরানার ধ্রুপদ গাইতেন। প্রথম বয়সে কাশীর দরবারে নিযুক্ত ছিলেন এবং অনেক পরিশ্রমের ফলে কাশীর সেনীয়া গুণী-গণের নিকট বীণা শিক্ষালাভ করে-ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কাওয়ালী ঘরের বিখ্যাত খেয়ালীদের নিকট হতে উৎকৃষ্ট অনেক খেয়ালও সংগ্রহ করে-ছিলেন। বহু বৎসর ইনি কোলকাতায় অতিবাহিত করেছেন এবং প্রথমত মহা-রাজা যতীন্দ্রমোহনের দরবারে ইনি আশ্রয় লাভ করেছিলেন। এঁর একমাত্র পুত্র বীণা-যন্ত্রে অদ্ভুত প্রতিভার পরি-চয় দেন। প্রায় সত্তর বৎসর বয়সকালে লছমীপ্রসাদ তাঁর এই প্রতিভাধর পুত্রকে হারিয়ে যে আঘাত পান,—তার ফলে তাঁর শেষজীবনে শরীর ও মন একে-বারেই ভেঙ্গে পড়ে। আশী বৎসর অতিক্রম করার পরে ইঁহার কোলকাতায় মৃত্যু ঘটে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সঙ্গীত সঙ্ঘের অধ্যাপকমণ্ডলীর পুনর্গঠন সুসম্পন্ন হয়। কোকভ খাঁ সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিখ্যাত স্বরোদী কেরামতুল্লা খাঁ সাহেব সঙ্ঘের যন্ত্রসঙ্গীতের ভার গ্রহণ করেন এবং মাননীয় সঙ্গীত-নায়ক দেশিকোত্তম শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় সঙ্গীত সঙ্ঘের ধ্রুপদ, খেয়াল ও উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

॥ ডাঃ বিধানচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ ॥

মহান জাতীয় নেতা ভারতরত্ন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পরলোক গমন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের এই বর্ষীয়ান নায়ক একাশীতি-জন্মদিবসে দেশবাসীর অকৃত্রিম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন লাভের অব্যবহিত পরেই তাঁর বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও অসীম শক্তিধর মানুষটির অতর্কিত মৃত্যুতে সমগ্র দেশবাসী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। লক্ষাধিক মানুষ তাঁদের প্রিয় নেতার শেষ-দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষায় ডাঃ রায়ের বাসগৃহের সম্মুখে এক জনসমুদ্রের সৃষ্টি করে। এই মহান নেতার মহাপ্রয়াণে সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

পরলোকে ভারতরত্ন পুরুষোত্তম-দাস ট্যান্ডন

প্রাক্তন কংগ্রেস-সভাপতি ভারতরত্ন শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন গত ১লা জুলাই পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর।

নির্ভীক ও নিরহংকার পুরুষ ট্যান্ডনজী গত তিন বৎসর রোগাক্রান্ত অবস্থায় এলাহাবাদে তাঁর পুত্রের বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। এলাহাবাদের ২০ মাইল দূরে সহয়াতপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে ট্যান্ডনের জন্ম। পিতা শালিগ্রাম ট্যান্ডন ছিলেন ধার্মিক ব্যক্তি। পুরুষোত্তম প্রবেশিকা পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হন। এম-এ ও ল পাশ করে ট্যান্ডনজী প্রথমে এলাহাবাদ জেলা আদালতে আইন ব্যবসা আরম্ভ করলেও কিছুকালের মধ্যেই উচ্চ আদালতে যোগদান করেন এবং ক্রমে সেকালের শ্রেষ্ঠ আইন ব্যবসায়ীদের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন।

শ্রীপুরুষোত্তম নাভা রাজ্যের বৈদেশিক মন্ত্রী এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সেক্রেটারীরূপে কিছুকাল কাজ করেন। তিনি ১১৯০ সালে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করেন। লালা লাজপৎ রায় প্রতিষ্ঠিত সার্ভেন্টস অব পিপলস্ সোসাইটির সভাপতি ছিলেন গত ২২ বৎসরকাল। এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকাকালে তাঁর বহু জনহিতকর কার্য আজও এলাহাবাদবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। সংযুক্ত প্রদেশের স্পীকার, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি এবং ১৯৫০ সালে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

শ্রীপুরুষোত্তম ট্যান্ডনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেন, উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপট্টনায়ক, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, উড়িষ্যার রাজ্যপাল, মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল, ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাব প্রভৃতি শোকবার্তা প্রেরণ করেছেন।

॥ কাশ্মীর বিতর্ক ॥

কাশ্মীর নিয়ে আরও একদফা বিতর্ক রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদে হয়ে গেল, এবং বলা বাহুল্য, কাশ্মীর সমস্যার কোন সমাধান তাতে হয়নি। তবে এবারের বিতর্কে অত্যন্ত আশংকার সঙ্গে ভারতকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে তা হল এই যে, বিশ্বে ভারতের বন্ধুর সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। স্বস্তি পরিষদের একাদশ সদস্যের অন্যতম আয়ারল্যান্ডের পক্ষ থেকে এবার কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল তার মূল কথা ছিল—১৯৪৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী স্বস্তি পরিষদে গৃহীত কাশ্মীর-সম্পর্কিত প্রস্তাব ও ভারত ও পাকিস্থানের উদ্দেশ্যে গঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ কমিশনের ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট ও ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে গৃহীত দুইটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সরাসরি আলোচনা। ভারতের পক্ষ থেকে প্রথমেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয় এই যুক্তিতে যে, গত তের-চোদ্দ বছরের মধ্যে কাশ্মীর-পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে. সুতরাং অতদিন আগের প্রস্তাব আজকের সরাসরি আলোচনার ভিত্তিরূপে স্বীকৃত হতে পারে না। তাছাড়া ভারতের পক্ষ হতে এ যুক্তিও পুনরাবৃত্তি করা হয় যে, কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্থানকে একই পর্যায়ভুক্ত করার প্রস্তাব ভারত কখনও স্বীকার করে নেবে না। কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থানের সংগে কোন আলোচনা শুরু করার আগে ভারত দেখতে চায়, পাকিস্থান কাশ্মীরের অধিকৃত এলাকা ত্যাগ করে চলে গেছে। ভারত কাশ্মীরকে তার রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে। সুতরাং পাকিস্থান কাশ্মীর সম্পূর্ণ ত্যাগ না করা পর্যন্ত ভারত তাকে আক্রমণকারী বলেই মনে করবে এবং আক্রমণকারীদের সঙ্গে সার্বভৌম অধিকারের প্রশ্নজড়িত কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে না। ভারতের এই প্রতিবাদের পর আয়ারল্যান্ডের প্রস্তাবটি যখন ভোটে দেওয়া হয়, দেখা যায় যে স্বস্তি পরিষদের এগারজন সদস্যের মধ্যে মাত্র দুইজন—রাশিয়া ও রুমানিয়া ভারতের পক্ষে ভোট দিয়েছে। কিন্তু তবুও প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায় এই কারণে যে, রাশিয়ার ভোট প্রকৃতপক্ষে ভেটো।

যতদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের পঞ্চ বৃহৎ শক্তির অন্যতম সোভিয়েট ইউনিয়নের ভেটো প্রয়োগের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কাশ্মীরের ব্যাপারে পশ্চিমী শক্তিবর্গের ভারতের স্বার্থ-বিরোধী যাবতীয় প্রয়াস ব্যর্থ হবে। কিন্তু তাতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের সাফল্য প্রমাণিত হবে না, বা ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে না। স্বস্তি পরিষদে বৃটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির ভারত-বিরোধী আচরণের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু ঘানা বা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মত নিরপেক্ষ ও ভারতের অভিন্ন হৃদয় মিত্র-রাষ্ট্রগুলির অকুণ্ঠ সমর্থন হতেও ভারত বঞ্চিত হল কেন—একথা অবশ্যই আজ স্থিরচিত্তে চিন্তা করার প্রয়োজন। এই কি ভারতের চোদ্দ বছরের সফল পররাষ্ট্র-নীতির নমুনা যে, আজ যাবতীয় ব্যাপারেই তাকে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভেটোর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়? এ বিষয়ে আজ কোন সন্দেহ নেই যে, কাশ্মীরে আক্রমণকারী হয়েও পাকিস্থান আজ বিশ্বের রাষ্ট্রসমাজে ভারতের চেয়ে অধিক সমর্থন লাভে সমর্থ হয়েছে। এর সবটাকেই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আয়ারল্যান্ড ভারতের দীর্ঘ দিনের বন্ধু, একই সঙ্গে ভারত ও আয়ারল্যান্ডের মুক্তিকামী মানুষ ইংরেজের শাসন-শৃংখলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। আজ সেই আয়ারল্যান্ডের আচরণকে এক কথায় অমিত্রজনোচিত বলে অবশ্যই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের একথা নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হবে যে,

আমাদের এতদিনের বন্ধু কেন এমন অমিত্রের মত আচরণ করল। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রই বা কেন কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতকে সমর্থনের পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারল না। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শুধুমাত্র কমিউনিষ্ট-শক্তিজোটের উপর নির্ভরশীলতা নিশ্চয়ই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য বা কাম্য নয়। আত্মসমীক্ষার প্রশ্ন তাই আজ আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

॥ দেশসেবার পুরস্কার ॥

পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে একদিন এদেশের যে অগণ্য মানুষ আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, কোন কিছুর প্রতিদানের প্রত্যাশা তাঁরা কখনোও করেননি। দেশের মুক্তিই তাঁদের একমাত্র কাম্য ছিল। কিন্তু ঐ সর্বত্যাগী মানুষগুলির নির্লোভ নিরাসক্ত জীবনের আদর্শ যাই-হোক না কেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশবাসীগণ নিশ্চয়ই তাঁদের প্রতি কর্তব্যবিস্মৃত হতে পারেন না। সেদিনের মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই আজ পরলোকে, যাঁরা জীবিত তাঁদের মধ্যেও অতি সামান্য জন এগিয়ে আসবেন নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা দেশবাসীকে জানিয়ে তাঁদের কৃপাপ্রার্থী হতে। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ বা শাসকবর্গও যদি তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেও নির্লিপ্ত থাকেন তবে তার চেয়ে লজ্জাকর দুর্ভাগ্যের কথা আর কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু সম্প্রতি এমনই একটা সংবাদের কথা দেশবাসী জানতে পেরেছেন। নির্যাতিত দেশপ্রেমিকদের সাহায্যার্থে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের হাতে একুশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু রাজ্য সরকার সে টাকা ব্যয় করেননি। নানারকম আইনগত প্রশ্ন ও ওজর-আপত্তি তুলে সে টাকাটি তাঁরা সম্পূর্ণ আটকে রেখেছেন। যাঁরা সারা জীবন ধরে এই দেশের মুক্তির জন্যে জেল খেটেছেন, দ্বীপান্তরে গিয়েছেন, ব্যক্তিগত ভোগসুখ বিসর্জন দিয়ে দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করেছেন তাঁদের প্রতি এই হৃদয়হীন উপেক্ষা ও অবজ্ঞা অমার্জনীয় অপরাধ। উচ্চপদস্থ সরকারী আমলারা তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারেন না তার কারণ আমরা বুঝি। কিন্তু শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানে বসে আছেন যাঁরা ঐ অগণিত হতভাগ্য মানুষগুলির অকৃপণ আত্মদানের সাক্ষ্য হয়ে তাঁরা আজ কেমন করে ভুললেন তাঁদের দীর্ঘদিনের সহযাত্রীদের?

॥ রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি ॥

আফ্রিকার আরও দুটি দেশ স্বাধীন হ'ল। প্রাক্তন বেলজিয়ান উপনিবেশ কঙ্গো ও প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশ টাঙ্গানিকার মধ্যবর্তী ২০ হাজার ৪৫০ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি প্রথম মহাযুদ্ধের আগে জার্মানীর উপনিবেশ ছিল। তারপর জার্মানী যুদ্ধে পরাজিত হলে ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে জাতিসঙ্ঘের সিদ্ধান্তমত রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি বেলজিয়ামের রক্ষণাধীন এলাকায় পরিণত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘও পূর্বব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়ে রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডিকে বেলজিয়ামের তত্ত্বাবধানে রাখে। ১৯৬০ সালে কঙ্গো স্বাধীন হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত কঙ্গোর পার্শ্ববর্তী এই ক্ষুদ্র উপনিবেশটির অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অতি সামান্যই ছিল। একারণে এই দুটি সদ্য-স্বাধীন দেশের পূর্ববর্তী অবস্থা সম্পর্কে বিশ্ববাসীর জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ।

সদ্য-স্বাধীন দেশদুটির সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হ'ল অবিশ্বাস্য অনগ্রসরতা। এ ব্যাপারে বোধ হয় শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে দুটি দেশে এক ইঞ্চিও রেললাইন নেই। মূলত কৃষিজীবী এই দেশদুটির শিল্পের অবস্থা এখনও প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করেনি। সেই সঙ্গে জনবাহুল্যও তার বিশেষ সমস্যা। প্রতিবেশী শিল্পোন্নত কঙ্গো রাষ্ট্রে যেখানে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১০.৯, রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির জনবসতির ঘনত্ব সেখানে প্রতি বর্গমাইলে ৯০। আর যে হারে এই ক্ষুদ্র দেশ দুটির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা যদি না হয় তবে এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে প্রায় এক কোটি হবে। এখনই ঐ দেশদুটিতে দারিদ্র্য সীমাহীন। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে পূর্ণবয়স্ক লোকও দুর্বল ভিক্ষাজীবী। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে রুয়াণ্ডা ও উরুণ্ডির সম্মিলিত লোকসংখ্যা ৪৯ লক্ষ। তা ছাড়াও আছে সাড়ে চার হাজার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশী ও তিন হাজার এশিয়াবাসী। রুয়াণ্ডার রাজধানী কিগালি ও উরুণ্ডির রাজধানী কিতেগা। স্বাধীনতালাভের পর উরুণ্ডির নাম হয়েছে বুরুণ্ডি।

রুয়াণ্ডার আরও একটি গুরুত্বের আশঙ্কিত সমস্যা হল উপজাতীয় বিরোধ। স্বাধীনতাঅর্জনের পরেই সেখানে বর্তমান শাসক উপজাতি হুটুদের সঙ্গে অন্যতম শক্তিশালী উপজাতি তুৎসিদের ক্ষমতার লড়াই সাংঘাতিক হয়ে উঠবে এ দুশ্চিন্তা আজ রুয়াণ্ডার শুভানুধ্যায়ী সকলের মনেই বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং রুয়াণ্ডায় যাতে কঙ্গোর রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে—তার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রথম থেকেই সতর্ক থাকা উচিত।

॥ কাসাব্লাঙ্কা শক্তিজোট ॥

গিনি, ঘানা, মালি, মরক্কো, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও আলজিরিয়া—আফ্রিকার এই পাঁচটি দেশ কাসাব্লাঙ্কা শক্তিজোট নামে পরিচিত। সম্প্রতি এই কটি রাষ্ট্রের এক শীর্ষ-সম্মেলন কায়রোয় হয়ে গেল। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটিতে আলজিরিয়ার মুক্তিফৌজকে তাদের সংগ্রামের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানানো হয়েছে, অপর একটি প্রস্তাবে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলিকে ইস্রায়েলের কাছ থেকে কোনরকম অর্থনৈতিক সাহায্য না নেওয়ার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে। সর্বশেষ প্রস্তাবে সেন্ট্রাল আফ্রিকা ফেডারেশনের অবলুপ্তির দাবী জানানো হয়েছে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে দাবী পেশ করা হয়েছে। সভায় এও স্থির হয়েছে যে, ১৯৬৩ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে আফ্রিকার খোলা বাজারের প্রস্তাব কার্যকরী করবার জন্য সব উপায়ে চেষ্টা করা হবে।

॥ লাওস ॥

এখনও পর্যন্ত যা সংবাদ তাতে মনে হয় লাওসের অবস্থা উন্নতির পথে। লাওসের ত্রিমুখী শক্তিগুলির মধ্যে বিবাদ দূর হয়েছে এবং লাওসের রাজা সাভাঙ ভাথানা আনুষ্ঠানিকভাবে নিরপেক্ষ নেতা প্রিন্স সুভানা ফুমার নেতৃত্বে গঠিত সংযুক্ত মন্ত্রিসভার হাতে রাষ্ট্রের শাসনদায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। ২৩শে জুন থেকে লাওসে বুন উম সরকার বা উত্তর লাওসে পাথেট লাও সরকারের আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। খোরতর কমিউনিষ্ট-বিরোধী জেনারেল ফুমি ও কমিউনিষ্ট-সমর্থিত পাথেট লাও নেতা প্রিন্স সুফানা ভঙ সংযুক্ত লাওস সরকারের দুই উপপ্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁরা যথাক্রমে লাওসের অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনামন্ত্রীও নিযুক্ত হয়েছেন। সুতরাং জাতীয়-উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যে তাঁদের উভয়কেই যাবতীয় পূর্ববিসংবাদ বিস্মৃত হয়ে একযোগে কাজ করতে হবে।

লাওসের সংযুক্ত সরকারের আশু কর্তব্য হল সমগ্র লাওসব্যাপী অবাধ সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশব্যাপী যে সরকার গঠন করবে একমাত্র তাদের হাতেই লাওসের ভবিষ্যৎ শান্তি ও সমৃদ্ধি নিরাপদ ও সুচিন্তিত হতে পারে।

॥ ঘরে ॥

২১শে জুন—৬ই আষাঢ় : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতকে আমেরিকার আরও প্রায় ১৩৬ কোটি টাকা ঋণদানের ব্যবস্থা—দিল্লীতে চারিটি চুক্তি স্বাক্ষরিত।

'পূর্ব পাকিস্তানের নবাগত উদ্বাস্তুদের সর্বতোভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে'—কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির বৈঠকে (নয়াদিল্লী) প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২২শে জুন—৭ই আষাঢ় : 'নেপাল আক্রমণ ভারত আক্রমণের সামিল বলিয়া গণ্য হইবে'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর দৃঢ় উক্তি : চীনের সহিত পাকিস্তানের সীমান্ত যোগাযোগ অস্বীকার।

ভারত-চীন সীমান্ত প্রশ্ন মীমাংসার জন্য চীনা সরকারের নিকট পুনরায় শ্রীনেহরুর পূর্ব প্রস্তাব পেশ—আলোচনার ভিত্তি হিসাবে বিরোধ এলাকা হইতে উভয় পক্ষেরই সৈন্যাপসরণ করা হউক।

২৩শে জুন—৮ই আষাঢ় : কাশ্মীর প্রশ্নে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের ভারত-বিরোধী ভূমিকায় শ্রীনেহরুর তীব্র ক্ষোভ—রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীর দৃপ্ত ভাষণ : শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসার প্রতিশ্রুতি পুনরায় জ্ঞাপন।

রাজসাহী (পূর্ব পাকিস্তান) হইতে নবাগত এক সহস্র সাঁওতাল শরণার্থীকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণের ব্যবস্থা—কেন্দ্রের সহিত পরামর্শক্রমে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সিদ্ধান্ত।

মেডিক্যাল কলেজসমূহে পড়াশুনার ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে 'রিভিউ কমিটি' গঠনের নূতনতম পরিকল্পনা।

২৪শে জুন—৯ই আষাঢ় : হুগলী নদীর (গঙ্গা) উপর নূতন সেতু নির্মাণের প্রস্তাব—পর্যবেক্ষণ কার্যে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য দানে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সম্মতি।

শান্তি আন্দোলনকে জোরদার করিয়া গণ-সংগ্রামের রূপ দিবার আহ্বান—[illegible] নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্ব-শান্তি কনভেনশনে (কলিকাতা) শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ।

২৫শে জুন—১০ই আষাঢ় : ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী নেতাদের আবার বিষোদ্গার—অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

২৬শে জুন—১১ই আষাঢ় : ক্রমাগত বর্ষণের ফলে তিস্তা নদীর সংহারমূর্তি—জলপাইগুড়ি শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন—ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় ডিব্রুগড়ের জাতীয় সড়ক প্লাবিত—গৌহাটিতে বন্যার জল বিপদসীমা অতিক্রম।

কলিকাতা মহানগরীতে কলেরা মহামারীরূপে ঘোষণা—একটি মাত্র ওয়ার্ড ব্যতীত সর্বত্র করাল ব্যাধির প্রকোপ।

মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্ন পর্যালোচনার জন্য কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টি কর্তৃক সাব্-কমিটি গঠন।

২৭শে জুন—১২ই আষাঢ় : 'ভারত কোন সময়ই কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয় নাই'—বোম্বাই-এ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের ঘোষণা।

পাণ্ডু-আমিনগাঁও ফেরী সার্ভিস বন্ধ—দুই তীরে হাজার হাজার যাত্রী আটক—ব্রহ্মপুত্রে প্রবল বন্যার জের।

॥ বাইরে ॥

২১শে জুন—৬ই আষাঢ় : ভারতের আপত্তি সত্ত্বেও কাশ্মীর বিতর্ক আরও চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত—রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীভি, কে, কৃষ্ণ মেননের ক্ষোভ—রাশিয়া কর্তৃক মার্কিন আচরণ ও কালহরণ কৌশলের সমালোচনা।

২২শে জুন—৭ই আষাঢ় : কুয়েময় দ্বীপের (চিয়াং সরকার অধিকৃত) বিপরীত দিকে চীনের মূল ভূখণ্ডে চীনা সৈন্য সমাবেশ।

কাশ্মীর বিরোধ সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ আলোচনার জন্য আয়ারল্যাণ্ডের সুপারিশ—নিরাপত্তা পরিষদে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ।

লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠনের নূতন অন্তরায়সমূহ দূরীভূত—মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে মতৈক্য—নিরপেক্ষ নেতা প্রিন্স সুভন্না ফৌমার ঘোষণা।

২৩শে জুন—৮ই আষাঢ় : কাশ্মীর সংক্রান্ত আইরিশ প্রস্তাবে রাশিয়ার 'ভেটো' প্রয়োগ—নিরাপত্তা পরিষদে পাক-দরদী পশ্চিমী শক্তিবর্গের নূতন চক্রান্ত বানচাল।

অবশেষে লাওসে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা (ত্রিদলীয়) গঠন—প্রধানমন্ত্রী : নিরপেক্ষতাবাদী প্রিন্স সুভন্না ফৌমা।

২৪শে জুন—৯ই আষাঢ় : দশ বৎসর সংঘর্ষের পর সমগ্র লাওসেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা—অস্থায়ী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রথম নির্দেশ—থাইল্যাণ্ডে মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া মন্তব্য।

পশ্চিম ইরিয়াণের (ওলন্দাজ অধিকৃত) আরও একটি স্থলে ইন্দোনেশীয় ছত্রী সৈন্যের অবতরণ।

'ছয় মাসের মধ্যেই পাকিস্তানে নয়া গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা চাই'—অ-গণতান্ত্রিক আয়ুবী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের নয়জন বিশিষ্ট নেতার দাবী।

২৫শে জুন—১০ই আষাঢ় : 'কাশ্মীর বিতর্ক ঠাণ্ডা যুদ্ধের মহড়া মাত্র'—লণ্ডনে সাংবাদিকদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ মেননের (ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী) মন্তব্য।

চীন সাগর অভিমুখে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ—উদ্দেশ্য সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নীরবতা।

২৬শে জুন—১১ই আষাঢ় : কাটাঙ্গার সহিত সর্বপ্রকার আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ—কঙ্গোলী প্রধানমন্ত্রী মিঃ আদোলার ঘোষণা।

'চিয়াং-চীনকে রক্ষার জন্য আমেরিকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'— ওয়াশিংটনে মার্কিন সরকারের পক্ষ হইতে বিবৃতি।

২৭শে জুন—১২ই আষাঢ় : গুপ্ত সামরিক সংস্থা (ও-এ-এস) কর্তৃক ওরাণে পোড়া মাটি অভিযান প্রত্যাহার—ও-এ-এস নেতা জেঃ পল গার্ডির ওরাণ (আলজিরিয়া) হইতে পলায়ন।

১লা জুলাই (১৯৬২) অছি-শাসিত (বেলজিয়ান) রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি নামে দুইটি স্বতন্ত্র আফ্রিকান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব।

অভয়ংকর

॥ বিপ্লবী চিন্তানায়ক ॥

প্রথমতঃ ফেবিয়ান সোসাইটির বক্তৃতা হিসাবে বার্ণাড শ ইবসেন সম্পর্কে ২৫,000 শব্দসম্বলিত এক প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন এবং সেণ্ট জেমস রেস্তোরাঁয় এক বিশাল জনতার সামনে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই এই প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৯১-এ সেই প্রবন্ধটির পরিমার্জিত রূপ হল বার্ণাড শ'র বিখ্যাত গ্রন্থ The Quintessence of Ibsenism. এই গ্রন্থ সম্পর্কে জি কে চেষ্টারটন বলেন—"এই আশ্চর্য গ্রন্থটি অনেকের মতে The Quintessence of Shaw। সে যাই হোক, আসলে এই গ্রন্থ সুনীতি সম্পর্কে শ'র মতবাদের সারমর্ম এবং ইবসেনের সাহিত্যকর্মের প্রচারণা।"

ইবসেন সম্পর্কে কোনো ইংরাজী লেখক ইতিপূর্বে এমন বিস্তারিত আলোচনা করেননি। চেষ্টারটন বলেছেন বার্ণাড শ প্রথম জীবনে সোস্যালিষ্ট এবং পরে কম্যুনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। সেই বিশ্বাস থেকে তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিচ্যুত হননি—একথা বলেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এবং বার্ণাড শ' জীবনীবিশেষজ্ঞগণ, আর ইবসেন ছিলেন স্বাতন্ত্র্যবাদী Individualist। তাঁর বন্ধু উইলিয়াম আর্চার ইবসেনের সমগ্র গ্রন্থাবলী ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। Ghosts নামক নাটকের ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকায় ইবসেনের একটি পত্র আর্চার উদ্ধৃত করেন, তার মধ্যে ইবসেনীয় মতবাদের পরিচয় আছে—

"আমার নতুন নাটক স্থিতিশীল সমাজের কাছে হয়ত নিন্দিত হবে, তবে আমি সেই নিন্দা চেনবাঁধা কুকুরের চীৎকার বলে মনে করব। আমি যা লিখি তার জন্য আমিই দায়ী। আর কেউ নয়। কোনও দলকে আমি বিরত করতে পারি না, কারণ আমি নির্দলীয় মানুষ।"

কিন্তু আর্চার এবং বার্ণাড শ'র প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইংলণ্ডে ইবসেন তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেননি। ১৮৯১-এ Ghosts নাটক অভিনীত হয়। তার আর পুনরাভিনয় হয়নি। Pall Mall Gazette লিখেছেন—"Old Ibsen is as dead as a door nail."

বার্লিন বা ভিয়েনা প্রভৃতি কন্টিনেণ্ট অঞ্চলে ইবসেনের কিন্তু জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁর স্বদেশীয়রা প্রথমটায় ছিলেন উদাসীন, মধ্যে ঘোরতর বিরোধী, তাঁরাই কিন্তু ক্রমে ক্রমে নরম হয়ে তাঁর সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী মহাসমারোহে পালন করেন। মৃদু আলোকমালায় সজ্জিত এক প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগৃহে নরওয়েজীয়ান সুন্দরীরা ইবসেনের নাটকের নায়িকার সাজে সজ্জিত হয়ে এসে নাট্যকারকে একটি করে লাল গোলাপ ফুল উপহার দিয়ে সম্বর্ধিত করেন।

কিছুকাল ধরে ইউরোপের আর কোনও লেখক ইবসেনের মত এত জনপ্রিয়তা ভোগ করার সৌভাগ্য অর্জন করেননি। তরুণ বিদগ্ধ সমাজে এই শতকের গোড়ার দিকে ইবসেন এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে সিগারেট, কফি, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি *a la Ibsen* বলে বিজ্ঞাপিত হত।

সোস্যালিষ্ট এবং কবি উইলিয়াম মরিস বার্ণাড শ'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। নরওয়েজীয়ান সাহিত্যে তাঁর গভীর অধিকার ছিল, তাঁর মতে ইবসেনের রচনা সাহিত্য-পদবাচ্য নয়। উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস ত' ইবসেনের রচনাকে কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বলে উপহাস করেছেন। ১৯০৬-এ ইবসেন মস্তিষ্ক-বিকৃতিহেতু বাকরোধের ফলে মারা যান। তখন আমেরিকার নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন লিখেছিল—"He was as cold as a fish and as hard as nails—it is certain that he had not an atom of humour."

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ শুক্রবার জেকব টমাস গ্রেইন অতিশয় দুঃসাহসের সঙ্গে Ghosts নাটকটি লণ্ডনে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়-দর্শনে চতুর্দিকে নিন্দার তুফান উঠল। বিখ্যাত সমালোচক ক্লিমেণ্ট স্কট লিখলেন—"ইবসেনের এই জঘন্য নাটক Ghosts একটি উন্মুক্ত নর্দমা, আবরণহীন কুৎসিত ক্ষত, প্রকাশ্যস্থানে বীভৎস কর্মের মত বিশ্রী।" তার সঙ্গে যোগ করলেন—"পুলিশ কি করছে? তারা কি ঘুমিয়ে আছে?"

এই উক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন বার্ণাড শ, ওয়েকলি, উইলিয়াম আর্চার প্রভৃতি। ওয়েকলি কিন্তু Star পত্রিকায় লিখেছিলেন—"ইংরাজী রঙ্গমঞ্চে এক নতুন যুগ সূচিত হল।"

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই হে মার্কেট থিয়েটারে সৈন্যদের মনোরঞ্জনে ব্রিটিশ সরকার Ghosts অভিনয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন।

এই ইবসেন সম্পর্কে Daily Telegraph লিখেছিল— "dramatic impotence, ludicrous amaturishness, nastiness, vulgarity egotism, coarseness, absurdity, uninteresting verbosity, suburbanity—" ইত্যাদি।

এসবের কারণ ইবসেন এমন সব মানবিক সমস্যা উদ্ঘাটিত করেছিলেন যা তৎকালে এমন বলিষ্ঠতার সঙ্গে প্রকাশের সৎসাহস কারো ছিল না। সমস্যার জটিলতাকে গোপন করে তার সমাধান সম্ভব নয়, প্রকাশ্যে লোক-

লোচনের সামনে আনাটাই প্রধান কর্ম। ইবসেনের বৈশিষ্ট্য, শক্তিমত্তা এবং বক্তব্য বুঝতে দশ বছর সময় লেগেছিল জনসাধারণের. কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জর্জ বার্ণাড শ লিখেছিলেন—

"Shakespeare has put ourselves on the stage but not our situations—Ibsen supplies the want left by Shakespeare. He gives us not only ourselves, but our situations. The things that happen to his stage figures are things that happen to us" (— Quintessence of Ibsenism—G. B. Shaw)

তবু ইবসেনকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে হাওয়া বদল হয়েছে এবং ইবসেনীয় ভাবাদর্শ এ যুগের মানুষের বোধগম্য হয়েছে। ইবসেন সম্পর্কে নতুন আগ্রহ জেগেছে। ইবসেনকে পুনরাবিষ্কারের একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এফ এল লুকাস রচিত 'Ibsen and Strindberg' একখানি এই জাতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতে বিশ্লেষণ, যুক্তি এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা ইবসেনের নব মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে, এবং লেখক অনেকাংশে সার্থকতা লাভ করেছেন।

আগে বলা হয়েছে যে ইবসেন ছিলেন স্বাতন্ত্র্যবাদী। অতিশয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক। লরা পেটারসনকে একটি চিঠিতে হেনরিক ইবসেন লিখেছিলেন—

"The main thing is to remain sincere and true in relation to oneself. It is not a matter of willing this or that, but willing what absolutely must, because one is oneself and one can not be otherwise."

এই জাতীয় উদগ্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভঙ্গীর ফলে মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। গ্যোতে পড়াশোনার সময় কেউ উপস্থিত হলে তার সঙ্গে কোনও কথা বলতেন না। সমাজ আমাদের সময় এবং প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে।

বন্ধুদের সম্পর্কে ইবসেনের উক্তিটি স্মরণীয় :—

"Friends are a costly luxury and when one stakes all one's capital on a calling and a mission here in life, then one has no means of keeping friends. The costliness of keeping friends does not lie in what one does for them but in what, out of consideration for them, one refrains from doing. Thereby one stunts many a growing shoot in one's life."

সমাজ এইসব ভাবাদর্শ গ্রহণ করে না, এর চরম প্রতিশোধ সমাজ গ্রহণ করে। কিন্তু তাই বলে ইবসেন সমাজ-বিরোধী প্রাণী ছিলেন না, সমাজের হিতের জন্য তিনি যা করেছেন তা এই শতকে এতখানি সাফল্যের সঙ্গে আর কেউ পেরেছেন কি?

তবে ইবসেনের নাটকে প্রচারক কখনও শিল্পীসত্তাকে অতিক্রম করতে পারেনি, যা বার্ণাড শ পারেননি, তাঁর শিল্পকে ক্ষুণ্ণ করেছে উৎকট প্রচার-প্রচেষ্টা। সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেননি ইবসেন। সমাধান করার চেষ্টা না করে সমস্যাকেই তিনি তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর নাটকের সামাজিক বিবর্তনের ইঙ্গিত সম্পর্কে কিছু আমাদের মনে জাগে না, যা জেগে থাকে তা তাঁর সৃষ্ট নাটকীয় চরিত্র, হেডডা গ্যাবলার, ডাঃ স্টকম্যান, নোরা, বা পীয়র গীন্ট। আগে চরিত্র পিছে ভাবাদর্শ।

একবার ইউজিন ও'নীল অধ্যাপক যোশেফ উড ক্রাচকে প্রশ্ন করেন তাঁর ছাত্রমহলে কোন নাট্যকার জনপ্রিয়। উত্তরে ক্রাচ বলেন—'ইউরোপে ইবসেন, আমেরিকায় আপনি!' এই জবাবে খুশী না হয়ে ও'নীল বলেছেন—'আপনি ইবসেনের পরিবর্তে স্ট্রীনড্‌বার্গের নাম করলে খুশী হতাম।'

আগস্ট স্ট্রীনড্‌বার্গ ছিলেন একুশ বছরের ছোট ইবসেনের চাইতে, তবু তিনি ইবসেনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন—ইবসেন বলতেন—ও পাগল। কিন্তু পাঠকক্ষে ক্রোগের আঁকা স্ট্রীনড্‌বার্গের প্রতিকৃতি টাঙানো থাকত। জনৈক অতিথি এই বিষয় প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন—"হ্যাঁ, ছবিটা স্ট্রীনড্‌বার্গের, আমার সঙ্গে প্রীতি আছে বলে টাঙাইনি ঐ ছবি, তবে ঐ উন্মাদ আমার দিকে তাকিয়ে না থাকলে আমি এক লাইনও লিখতে পারি না।"

বিচিত্র অপ্রাকৃত জীবনযাত্রার জন্য স্ট্রীনড্‌বার্গ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিলেন অনেক বেশী। তিনি একাধারে স্কুলমাষ্টার, গৃহশিক্ষক, মেডিক্যাল-ছাত্র, গ্রন্থাগারিক, অভিনেতা, সাংবাদিক, উদ্ভিদতাত্ত্বিক, ভূতাত্ত্বিক, রাসায়নিক এবং জ্যোতিষী। স্ট্রীনড্‌বার্গের বক্তব্য বিষয় দুটি—(১) তাঁর নিজের কথা, (২) স্ত্রীলোকের নষ্টামি। স্ট্রীনড্‌বার্গ ছিলেন নিউরোটিক, তবে জীবন বা সাহিত্যে সাধারণতঃ যা দেখা যায় সে জাতীয় নয়। এই নিউরোসিস সম্ভবতঃ Dance of Death, Ghost Sonata, Road to Damscus জাতীয় নাটক-রচনার সহায়ক হয়েছে। ভাবের অভিনবত্বে, চিন্তার গভীরতায়, কল্পনার বলিষ্ঠতায় আগস্ট স্ট্রীনড্‌বার্গের প্রতিভা অতিক্রম করে যেতে পারেন এমন শিল্পীর সংখ্যা অনেক কম। এই কারণেই হয়ত ইউজিন ও'নীল ইবসেনের চেয়ে স্ট্রীনড্‌বার্গকে পছন্দ করেছেন বেশী করে। স্ট্রীনড্‌বার্গের মনোভঙ্গীর স্বচ্ছতা ছিল না, নিরাসক্ত চিন্তা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল, তাই চিরায়ত চরিত্র-চিত্রণে তিনি সমর্থ হননি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র তাঁরই দুঃস্বপ্নময় ব্যক্তিজীবনের প্রতিচ্ছবি। *

---

* **IBSEN & STRINDBERG.** By F. L. Lucas. (Cassel) —দাম পঞ্চাশ শিলিং।।

জাপানী জর্ণাল— বুদ্ধদেব বসু। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু বছরখানেক আগে কয়েকদিনের জন্যে জাপানে গিয়েছিলেন কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে। সেই সুযোগে তিনি ঐ অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক দেশটিকে দুচোখ ভ'রে এবং মন দিয়ে দেখে নিয়েছিলেন। বর্তমান বইখানি তারই সাহিত্যিক ফসল।

জাপানের বিষয়ে আমাদের আগ্রহ জাগে রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় থেকে। একটি প্রাচ্য দেশ শক্তির খেলায় পশ্চিমী দেশকেও হারিয়ে দিতে পারে এতে আমরা তখন খুবই উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছিলাম। দুঃখের বিষয়, সে উৎসাহ আমাদের জাতীয় চরিত্রকে ঢেলে সাজাতে পারেনি। তার একটা প্রধান কারণ বোধহয় এই যে

জাপানকে আমরা ইউরোপীয় বিজ্ঞানমন্ত্রে দীক্ষিত একটি বলিষ্ঠ জাতি হিসেবেই শুধু দেখেছিলাম, তার শক্তিসাধনার গোড়ায় যে প্রবল কর্মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবোধ এবং সৌন্দর্যপ্রিয়তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হ'য়ে রয়েছে সেই মৌন গুণাবলীকে আমরা আত্মস্থ করতে পারিনি।

বুদ্ধদেববাবু তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও এই গুণগুলিরই সাক্ষাৎ লাভ করেছেন বারবার, এবং বিশেষ করে ওদেশে কর্মের সঙ্গে সুমিত সৌন্দর্য-বোধের অনায়াস মিশ্রণ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

অবশ্য 'জাপানী জর্ণাল' ঠিক ভ্রমণ কাহিনী নয়, স্থানকালপাত্রের বর্ণনা এখানে প্রধান নয়। একজন চিন্তাশীল এবং মনঃসম্পদের অধিকারী লেখক হিসেবে যা তাঁর মনে ছাপ রেখেছে এবং অন্যান্য স্মৃতি-আসঙ্গকে জাগ্রত করে তুলেছে তাই বুদ্ধদেববাবু লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন আমাদের জন্যে। সেদিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব প্রায় অসাধারণ। এ বই পড়তে পড়তে কেবল আমরা জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নরনারী এবং তাদের

আচার-ব্যবহারই প্রত্যক্ষ করিনে, তার অন্তরাত্মারও স্পর্শ লাভ করি।

বইয়ের শেষদিকটায় বুদ্ধদেববাবু আমাদের ইংরেজী শিক্ষা বনাম মাতৃ-ভাষার সনাতন বিতর্কটিকে জাপানী দৃষ্টান্তে নতুনভাবে বিচার করে দেখতে চেয়েছেন। মাতৃভাষার সপক্ষে তাঁর যুক্তিগুলি অকাট্য বলেই মনে হয়। যাঁরা অন্য মত পোষণ করেন তাঁরা পড়ে দেখতে পারেন। বাস্তবিক, জাপান যা পেরেছে, আমরা তা পারব না বলা মানে নিজেদেরই অপমান করা। এ বিষয়ে অন্যের সঙ্গে তর্ক করার আগে নিজের সঙ্গেই প্রত্যেকের একটা বোঝাপড়া করা উচিত।

বইখানির প্রচ্ছদ, মুদ্রণ পারিপাট্য, বিশেষ ক'রে এর অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক আকৃতি প্রকাশকবর্গের উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচায়ক।

CHITRALIPI RABINDRANTH Tagore: Published by Kanai Samanta, Visva-Bharati, 5, Dwarkanath Tagore Lane Calcutta-7. Second Edition, designed by Prithwish Neogi. Rs. 20 only.

বিশ শতকের গোড়ার দিকে এদেশের ছবি আঁকিয়েরা ছবির মধ্যে স্টোরি এলিমেন্টকে বড় বলেই মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ ন্যারেটিভনেস বা লিটারেরি সেন্টিমেন্টকে অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ নতুন ভাবকল্পনা বা রচনারীতিকে ছবিতে প্রাধান্য দিলেন। কম্পোজিশন, অ্যাপিয়ারেন্সকে মূল্য দিলেন বেশী মাত্রায়। একথা সত্য রবীন্দ্রনাথের এই স্বাতন্ত্র্য চিত্রকলা প্রাথমিক পর্যায়ে পাণ্ডুলিপি চিত্রকরণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। যে লিনিয়ারিজমকে ভারতীয় চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যরূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথের হাতে তার অভিনব প্রকাশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের আঁকা ছবি সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার আঁকা ছবির অর্থ কী লোকে প্রায়ই আমায় জিজ্ঞেস করে। আমার ছবিও যেমন নীরব, আমিও তাই। ব্যক্ত করাই তো ওদের কাজ, ব্যাখ্যা করা নয়। অভিব্যক্ত রূপের পিছনে কী আছে যে, চিন্তা দিয়ে খুঁজতে হবে, ভাষা দিয়ে বলতে হবে। রূপের সার্থকতা যদি রূপে ফুটে উঠে থাকে তবেই তো ওরা রইল: না হলে বিজ্ঞানের কোনো তথ্য বা সত্য নিহিত, নৈতিক কোনো যুক্তিযুক্ততা, এরূপ কোনো কারণেই ওরা স্থায়ী হবার নয়।'

নারী-পুরুষের মুখাবয়ব ও তাদের বিচিত্র ফিগার, জীবজন্তুর ছবি এবং দৃশ্যচিত্র—এইভাবে রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলিকে ভাগ করে নেওয়া সম্ভব। এই শ্রেণীবিভক্ত সমগ্র ছবিতে সুপরিস্ফুট রেখানির্ভর ছন্দবিন্যাসের অপূর্ব কারুকৃতি। তাঁর আঁকা জীবজন্তুর ছবিগুলি আমাদের চোখে অপরিচিত ঠেকলেও পরিশেষে একটি সাদৃশ্য খুঁজে পাই। কিন্তু মানুষের ছবি রচনায় তিনি আরও বাস্তবানুগ। দৃশ্যচিত্রে রঙের খেলা বিশেষ করে চোখে পড়ে। রঙের ব্যবহার, কল্পনার বিচিত্রগামিতা, আলোকময় দীপ্তির পরিস্ফুটন—এ সমস্ত ছবিগুলিতে যে রহস্যময়তার সৃষ্টি করে তা আমাদের চিত্রকলার ইতিহাসে অভিনব। মোটকথা ভারতীয় চিত্রে মডার্নিজমের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রসংগ্রহটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। জন্মশত-বার্ষিকী বৎসরে সংগ্রহটির পুনঃপ্রকাশের জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

ছোটদের ভালো ভালো গল্প—
—বনফুল
—হেমেন্দ্রকুমার রায়
—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপ্রকাশ ভবন, এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। প্রতি গ্রন্থের মূল্য দুই টাকা।

এলো মেলো— বুদ্ধদেব বসু॥ শ্রীপ্রকাশ ভবন। কলকাতা-১২। দাম—দু'টাকা।

কাঠ পুতুল— কল্যাণী ঘোষ। দীপ প্রকাশনী, ৩৭।২, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-১৯। দাম—দু'টাকা।

তাঁরা মহীয়সী— স্বদেশরঞ্জন দত্ত।। শ্রীপ্রকাশ ভবন। কলকাতা-১২। দাম—দু'টাকা।

শিশু-সাহিত্যের খনি থেকে সম্প্রতি আর তেমন সোনা উঠছে না। সাম্প্রতিক-কালের লেখকরা বড্ড বেশী সিরিয়াস; নিঃসঙ্গতাবোধ, অবক্ষয়, এবং মনস্তত্ত্বের জটিল অলিগলিতে তাঁদের নিরলস পদ-চারণাই হয়ত তার জন্যে দায়ী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্যে অকাতরে লিখেছেন, ইংলন্ডের অস্কার ওয়াইল্ড শিশু-সাহিত্যের কাননে একগুচ্ছ চির-কালের ফুল ফুটিয়েছেন ইত্যাদি অনির্বচনীয় উদাহরণগুলি স্মৃতির পাতায় মুহ্যমান হয়ে আছে আজকে। ছোটদের সাহিত্য এবং ছোটদের সাহিত্যের সীমারেখাটিও আমাদের কাছে তাদৃশ স্পষ্ট নয়। তার ফলে কিশোর উপন্যাস বলতে গেলে কয়েকটি মাত্র নাম বলার পরই চুপ করে যেতে হয়। এর কারণ হিসেবে মনে হয় আমাদের সাহিত্য থেকে সরসতার সামগ্রিক নির্বাসন ঘটেছে। অথচ শিশু-সাহিত্যের লেখককে

সরসতার আসনে আসীন হতেই হয়; নইলে শিশু-সাহিত্য, সাহিত্য না হয়ে, শুধুমাত্র বাক্য এবং বর্ণ-পরিচয়ের সামগ্রী হয়ে ওঠে। সবচেয়ে দুঃখের কারণ এই যে পুরুষানুক্রমে রূপকথার দোলনায় দুলে বড় হলেও বাংলা সাহিত্যের ইদানীং কাল, চিরকালের কথা ছেড়েই দিলাম, অর্ধদশক স্থায়ী একাধটা রূপকথাও রচনা করতে পারলো না। অথচ, 'রিপভ্যান উইংকল্' 'দি সেলফিশ জায়েন্ট' 'দি হ্যাপী প্রিন্স' ইত্যাদি সম্বন্ধে এদেশী সাহিত্যনবীশ ভদ্রমন্ডলী উচ্ছ্বসিত হতে কার্পণ্য করেন না। যাই হোক শিশু-সাহিত্য নামক বৈমাত্রীয় সন্তানটিকে আধুনিক বাংলো সাহিত্য কোন্ বনে ছেড়ে দিয়ে এসেছে তার হদিস গবেষকেরা করুন, আপাততঃ আজকেরদিনের লেখকরা এদিকে একটু মনোযোগ করলে শিশু-সাহিত্যের মিষ্টান্নে ইতরজনরা তৃপ্ত হতে পারেন। আমাদের দেশে আজকে যাঁরা ছোটদের জন্যে উল্লেখ-যোগ্য শিশু-সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই কল্লোল-কালের লেখক। আজো প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী ইত্যাদির নামই প্রাথমিক। এ ছাড়া অন্যান্য লব্ধকীর্তি লেখকরা যে শিশু-সাহিত্যে উল্লেখ্য সংযোজন করেননি তা নয়, তবে তাঁদের সংখ্যাল্পতা বেদনাদায়ক। শিশুগ্রন্থের প্রকাশক সংখ্যা সম্ভবতঃ আরো কম। যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীর মধ্যেই শিশু-গল্প প্রকাশনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল, শ্রীপ্রকাশ ভবন উক্ত পংক্তির উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের 'ভালো ভালো গল্প' গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রকাশকপক্ষ নিশ্চয়ই আবালবৃদ্ধ পাঠকের ধন্যবাদ ভাজন হবেন।

এতদিন জানা ছিল বড়দের ছোট্ট গল্পের অলিন্দে বনফুলই অদ্বিতীয় নাম, কিন্তু "ছোটদের ভালো ভালো গল্প" সিরিজের বনফুল-গল্পগুলি ছোটদের ছোট গল্পের (ছোট্ট নয়) কয়েকটি অসাধারণ উদাহরণ। বনফুলের বৈশিষ্ট্য তিনি ছোটদের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই কাহিনী রচনা করেছেন, ছেলে ভুলোনো অলীক কথার সুতোয় গল্পমালা গাঁথেননি। ফলে এই গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি গল্পই বয়স্ক পাঠকেরও আনন্দের সাহিত্য হতে পেরেছে। এই প্রসঙ্গে 'নেপথ্যে', 'আলোকপরী', 'হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে' এবং 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি গল্পগুলির নাম উল্লেখ না করে উপায় নেই। উল্লিখিত গল্পগুলি মহৎ কল্পনার আলোকে উজ্জ্বল, ছোট গল্প হিসেবেও অনন্য-সাধারণ। নিঃসন্দেহে বলা যায় এই সিরিজের এই গ্রন্থটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

হেমেন্দ্রকুমার রায় শিশু-সাহিত্যের অনেকদিনের রাজা। তাঁর রহস্য-রোমাঞ্চ অভিযানের কাহিনীগুলি আজো পুরোনো হয়নি। হেমেন্দ্রকুমারের মানিক-জয়ন্ত অথবা বিমলকুমার শিশু-সাহিত্যের অতিচেনা, অতি আপন লোক। বর্তমান গ্রন্থটি কিন্তু হেমেন্দ্র-কুমারের যথার্থ প্রতিনিধি গল্প সংগ্রহ নয়। ভূত, ডিটেকটিভ, বিদেশী গল্প—সত্য ঘটনা ইত্যাদি নানাধরনের গল্পের সম্মেলনে কেবলমাত্র বিদেশী এবং সত্য ঘটনাশ্রিত গল্পগুলিই চমকপ্রদ। এমন কি সূচাগ্র বুদ্ধি সখের গোয়েন্দা জয়ন্তও এই গ্রন্থের একটি কাহিনীতে অপরাধীর সন্ধান করছে "মেসমেরিজম"এর সাহায্যে। জয়ন্তভক্তরা নিঃসন্দেহে এতে দুঃখিত হবেন। পরিশেষে, প্রকাশকের নিকট একটি জিজ্ঞাসা—কোনান ডয়েলের জীবনীটি কি কারণে গল্পের সারিতে স্থান পেলো?

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূচীপত্র-হীন গল্প সংগ্রহটি সম্ভবতঃ ছোট্টদেরই উপযোগী। রূপকথা-শিকার এবং ভৌতিক কাহিনীগুলির মধ্যে শিকার কাহিনীটির মাধ্যমে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় একটি অশরীরী আতংককে পাঠকের ঘরের মধ্যে এনে উপস্থিত করেছেন। কৌতুক গল্পগুলির মধ্যে 'স্বামী চপেটানন্দ', 'শিবু মোক্তার' ছোটদের ভাল লাগবার মত গল্প।

ভালো ভালো গল্প সিরিজের কোনো বইয়ের প্রচ্ছদই শিশু অথবা কিশোর-শোভন হয়নি, ভবিষ্যতের সংস্করণ-গুলিতে এবিষয়ে যত্ন নিতে অনুরোধ করি।

বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের গল্পগুলির মেজাজ আলাদা। ললিত কল্পনার কলমে বুদ্ধদেববাবু গল্পের আয়োজন করেন। বর্তমান ছোট্ট উপন্যাসটির নায়ক মানিক। চেনা জগতের অচেনা ছবির ফ্রেমে আবদ্ধ হয়ে নানা রঙের পৃথিবীর মধ্যে চলে যায় সে। এই গ্রন্থের মানিক-সমান পাঠকরাও হয়ত যায় কখনো কখনো, বা যাবে। মানিকের অলৌকিক দেশটি যেন কবিতার সাম্রাজ্য। বইতে কয়েকটি আশ্চর্য ছোট-দের কবিতা এবং ছড়ার স্বাদ পাবেন পাঠকরা। যেমন :

'ঝাপসা আকাশ আবছা আলোর ঠাস,
অন্ধকারে আলকাৎরার গন্ধ,
চাঁদ খুঁজছে মনের মতন বাসা—
এখন খোকার জানলা হ'লো বন্ধ।'

কবিতার উদ্ধৃতি বাড়ালেও বাহুল্য হতো না, কিন্তু পাঠ-স্পর্শেই 'এলো মেলো' পুস্তকটি অধিক আলোকিত হবে পাঠক মনে। পুস্তকটির অঙ্গ সজ্জা আকর্ষণীয়।

কল্যাণী ঘোষের 'কাঠপুতুল' কয়েকটি সুন্দর রূপকথা উপকথার সংগ্রহ। কাঠ-পুতুল নামে পাহাড়ী উপকথাটি লেখিকার কবিত্ব শক্তির প্রমাণ বহন করে।

শিশুমনের তৃষ্ণা যেমন প্রবল তেমনি বহুধা। শুধু যে রূপকথা-শিকার কাহিনী, কৌতুক কাহিনী প্রভৃতিই তাদের প্রিয়পাঠ্য হতে পারে, তা নয়, তেমনভাবে পরিবেশিত হলে জীবনীও তাদের কাছে আদরনীয় হতে পারে। এই কথাটি স্মরণ রেখেই স্বদেশরঞ্জন দত্ত তাঁর 'যাঁরা মহীয়সী' গ্রন্থে ভারতবর্ষের কয়েকজন বরণীয়া অঙ্গনার জীবনী কাহিনী আকারে গ্রথিত করেছেন। এই গ্রন্থে বিস্মৃত মহিলা কবি তরু দত্তর কাহিনীও লেখক মনে রেখেছেন দেখে ভালো লাগল। বইটির ভাষা স্বচ্ছ, প্রচ্ছদ সেকেলে। প্রকাশক প্রচ্ছদকে আরেকটু আধুনিক করলে পারতেন।

অন্ধকার উদ্যানে যে নদী—(কবিতা) তরুণ সান্যাল। কথা-শিল্প—১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : দুই টাকা।

শ্রীতরুণ সান্যাল পঞ্চাশ দশকের অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। ছ' বছর আগে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'মাটির বেহালা' প্রকাশিত হওয়ার সময়েই তিনি পাঠক-সমাজে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। তাঁর এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ তাঁর খ্যাতির পরিধিকে সুবিস্তৃত করবে।

বাস্তবিক, 'অন্ধকার উদ্যানে যে নদী' সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। আমাদের জীবনে যে-উদ্যান সমস্তরকম রূপ ও রূপের সম্ভাবনা সত্ত্বেও অনুভূতি-হীনতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেখানে সৃষ্টি, প্রেম ও গতির পিপাসা নিয়ে এক অদৃশ্য নদীর কলধ্বনি কেবলি আমাদের ব্যথিত ও জাগ্রত করে তোলে —কবিতাগুলি পড়বার পর এই বোধই সঞ্চারিত হয় পাঠকের মনে।

তাছাড়া কাব্য-ভাষা ও ছন্দের উপরও তরুণ সান্যালের কর্তৃত্ব বিস্ময়কর। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত—বাংলা ছন্দের এই তিন রকম ব্যবহারেই তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। আর শব্দচয়নে তিনি অধুনা-আচরিত সাধু-ক্রিয়াপদের বিষয়ে ছুৎমার্গ এড়িয়ে তাঁর কবিতার পংক্তি-গঠনে একটা নতুন আসঙ্গ সঞ্চারিত করেছেন। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াটি এখন নবীনতর কবিরা অনেকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এতে আলোচ্য কবির গৌরবই সূচিত হয়।

অবশ্য তরুণ সান্যাল শক্তিমান কবি বলেই কাব্যরচনার ক্ষেত্রে সহজসাচ্ছন্দ্যে তাঁর তেমন আস্থা নেই। অর্থাৎ যেটুকু তাঁর আয়ত্তে এসেছে, কাব্যরাজ্যের সেই-টুকু ঐশ্বর্যের উপর চাকচিক্য ফুটিয়েই তিনি তৃপ্ত নন, নতুনতর সম্পদ অর্জনের দিকেও তিনি বিশেষভাবে আগ্রহশীল। সেইজন্য তাঁর কোনো কোনো কবিতা হয়তো ঈষৎ খাপছাড়া হয়ে ওঠে, কিন্তু এই আপাত-বিশৃঙ্খলার মধ্যে স্বধর্মি

কিছুটা রূপের আভাস ফোটে তখনি পাঠকের সমস্ত মন তাতে সায় না দিয়ে পারে না। তার কারণ, তরুণ সান্যাল নিজেই কেবল দুর্গম পথে নতুন রস আহরণ করেন তা নয়, পাঠককেও সেই দুর্গমতায় সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেন এবং পাঠককে দিয়েও নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়ে নেন। এই বইয়ের অনেক কবিতা, বিশেষ করে 'মেলায় আমি হারিয়ে গেলাম', 'হাসন সখী', 'অন্ধকার উদ্যানে যে নদী' এবং 'জীবনায়ন', 'তোমার নামের ছন্দ', 'স্মৃতি', 'প্রস্রবণ' প্রস্তরে রাখিয়ো', 'সে' প্রভৃতি সনেট এ উক্তির সমর্থন জানাবে।

কবি হিসাবে তরুণ সান্যালের প্রধান ঝোঁক দেখা গেল চিত্রকল্প-রচনার দিকে। অনেক সময় তিনি পরপর অনেকগুলি চিত্রকল্পের আভাষ দিয়ে যান, তাতে তাঁর কবিতার মধ্যে একটা যন্ত্রণাময় বেগের সঞ্চার হয়। এই বেগ অবশ্য শেষ পর্যন্ত দুঃস্বপ্নের প্রলাপ হ'য়ে উঠত, যদি না কবি তাকে বক্তব্যের সংহতি দিতে পারতেন। সুখের বিষয়, তরুণ সান্যাল বক্তব্যবান কবি এবং তাঁর সচল ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি কবিতাগুলিতে নতুন চরিত্র দিতে পেরেছে।

পত্রবিলাস—(গল্প সংকলন)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সুরভি প্রকাশনী, ৯ কলেজ রো, কলকাতা—৯। দাম তিন টাকা।

খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাম্প্রতিকতম গল্প সংকলন 'পত্রবিলাস' গল্পের চরিত্রগুলি আমাদের পরিচিত জগতের মানুষ। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে শুরু করে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষেরাই সর্বত্র বর্তমান। কাহিনীবর্ণনায় মাত্রাতিরিক্ত কল্পনা-বিলাস বা অবাস্তবতার ছাপ চোখে পড়ে খুব কমই। নিতান্ত সাধারণ ভঙ্গীতে ঘরোয়া কথার সাহায্যে চরিত্রগুলি পরিস্ফুট। 'পত্রবিলাস', 'দোলা', 'শ্বেতময়ূর', 'সোহাগিনী', 'শুভার্থী', 'সহযাত্রিনী', 'জন্মদিন'—এই সাতটি গল্পের সমস্তই যে সফল রসোত্তীর্ণ তা বলা যায় না। তবে আধুনিক জীবনের সমস্যা ও জটিলতা হতে শীলা, অতনু, হেমাংগ, অনিল বিশ্বাস, মতি মিত্র, ইন্দভূষণ কেউই মুক্ত নয়। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে বিব্রত। নরেন্দ্রবাবুর সার্থক বর্ণনাভঙ্গীমায় এদের রূপটি ফুটে উঠেছে সুস্পষ্টভাবে।

সলিউশন এক্স—বাদল সরকার। প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা-১২।

একটি বিদেশী চলচ্চিত্রের ছায়াবলম্বনে এই নাটকটি রচিত। থিয়েটার সেন্টারের সপ্তম একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগীতায় এটি প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এক বৈজ্ঞানিকের পুনর্যৌবনলাভের ঔষধ আবিষ্কারের কাহিনী এই নাটকের উপজীব্য। এবং সংলাপের স্বাভাবিকত্ব লক্ষ্যণীয়। বাংলায় ভাল হাসির নাটকের একান্ত অভাব। নাটকটি আশা করি সে অভাব কিয়ৎপরিমাণে মোচন করবে।

রসসার তন্ত্র—(Handbook of Indian Chemistry) কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন। প্রকাশক আরোগ্য নিকেতন, ৭১বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম তিন টাকা বার আনা।

কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন একজন বিশিষ্ট চিকিৎসা ব্যবসায়ী। এই গ্রন্থে তিনি মহর্ষি চরক ও সুশ্রুতের সংহিতা থেকে সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় ভারতীয় রসবিজ্ঞান সম্পর্কে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থে শিলাজতু, শঙ্খ, কড়ি, প্রবাল, মুক্তা, শুক্তি, মনঃশিলা প্রভৃতির বিশদ বিবরণ ও গুণ বর্ণনা আছে। বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সাধারণ মানুষের কাছেও গ্রন্থটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

ভক্তি প্রসঙ্গ—(৪র্থ গ্রন্থ)—স্বামী বেদান্তনন্দ॥ প্রকাশক : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিসার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট—কলিকাতা—১৩। দাম তিন টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—'ভক্তিযোগ যুগধর্ম'। কলিতে নারদীয় ভক্তি।' এই গ্রন্থের লেখক স্বামী বেদান্তনন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী থেকে প্রেরণা লাভ করে এই 'ভক্তিপ্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা-সম্বলিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে 'নারদ ভক্তিসূত্রে'র সমার্থক উপদেশসমূহ সংগ্রহ করে তার ব্যাখ্যা সুন্দর এবং সহজবোধ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন 'ভক্তিপ্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে। প্রথমেই 'দেবর্ষি নারদ' নামক পরিচ্ছেদটি অতিশয় সুলিখিত এবং আধিকারিক পুরুষ নারদকে বিচার করার পক্ষে সাহায্যকারী। নারদ আধিকারিক পুরুষ, বিশ্ব-লীলার পরিপুষ্টির জন্য তাঁর আবির্ভাব, সেই বস্তুটি কি সাধারণ পাঠকের জন্য তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি দ্বারা নারদীয় সূত্রের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

।। সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ।।

প্রবন্ধ পত্রিকা—সম্পাদক : রামেন্দু দত্ত ও চিত্তরঞ্জন ঘোষ। ২০ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৫। দাম দুই টাকা।

একমাত্র সুনির্বাচিত প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত আলোচ্য পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমান তৃতীয় বর্ষ ১ম সংখ্যাটিতে যে প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই মূল্যবান রচনা। সজনীকান্ত দাস (ফেলিক্স কেরী), মৃণালকান্তি ভদ্র (সার্ত্রের দর্শনে মানবতাবাদ), অধীর চক্রবর্তী (ভারতে দাসপ্রথা : বৈদিক যুগ : পুনর্বিচার), শান্তিকুমার দাশগুপ্ত (নাট্যকলা ও রবীন্দ্র-প্রতীক নাট্য), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বিশ্বকবি), বঙ্কিমকুমারী চক্রবর্তী (বাংলা গাথা-কাব্য : ভূমিকা), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আদিত্য ওহদেদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, গ্যারাসিয়েলা পি, নেমেস, শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রভৃতির লেখায় আলোচ্য নববর্ষ সংখ্যাটি শোভিত।

JOURNAL OF SMALL SCALE AND COTTAGE INDUSTRIES: Special Conference Number 1962. Madhav Nagar, Kidwai Road, Wadala, Bombay-31.

ভারতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দ্রুত যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বিভিন্ন রচনার মধ্যে একথা যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জাপানে কুটির-শিল্পের ক্রমবিকাশ ও ভূমিকা সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন দেশ কর্তৃক ভারতে সাহায্যকল্পে আর্থিক বিনিয়োগের তথ্য তুলে ধরে কুটির-শিল্পকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট না করার জন্য সম্পাদকমণ্ডলী অনুরোধ জানিয়েছেন।

আধুনিক কবিতা—সম্পাদিকা : রেখা দত্ত। পোস্টাল কলোনী, কলকাতা—৩২। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'আধুনিক কবিতা'র মাঘ-চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় প্রফুল্লকুমার দত্ত একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন 'আধুনিক কবিতা আন্দোলনে'র ওপর। টি, এস, এলিয়টের কবিতায় অনুবাদের কাজ করেছেন বিধুভূষণ কুণ্ডু ও প্রফুল্লকুমার দত্ত। অনেকগুলি কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

স্বগত—সম্পাদক : মৃণালকান্তি ঘোষ।

স্বগত সাহিত্য পরিষদ; ই এল ২। ১০৯ অশোক এভিনিউ, দুর্গাপুর—৪।

'স্বগত' সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমান সংখ্যাটি দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। এ সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অমলেশ ভট্টাচার্য, জেমস জি, এণ্ডিকট, সুখেন্দু রায় ও কমিক্ষ সেন। কৃষ্ণারেশ ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত ও চিত্ত ভট্টাচার্যের গল্প আছে। কয়েকটি কবিতা সংকলনটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

নান্দীকর

বাঙলা রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের অকৃত্রিম সুহৃদ এবং পশ্চিম বাঙলার অজিতবীর্য, অনন্যসাধারণ প্রাণোজ্জ্বল জননেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আকস্মিক পরলোকগমনে আমরা শোকাচ্ছন্ন অন্তঃকরণে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

কেন্দ্রীয় সরকার ও চলচ্চিত্র :
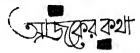
আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভবতঃ চলচ্চিত্রের আর্থিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক অবহিত নন। নইলে ছ'মাসে মাত্র ১৭ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করবার জন্যে কাঁচা ফিল্মের আমদানীতে তাঁরা এককথায় ৫০ ভাগ কমিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন না। মাত্র অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-ই নন, কেন্দ্রীয় সরকারের সতেরোজন পূর্ণ-মন্ত্রী, দশজন রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এগারজন উপমন্ত্রীর মধ্যে মাত্র খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ যে সাধারণভাবে চলচ্চিত্র শিল্প সম্বন্ধে কিছুমাত্র ওয়াকিবহাল, এমন কথা আমাদের কানে এসে পৌঁছোয়নি। যিনি বেতার ও তথ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সেই শ্রী বি গোপাল রেড্ডীও এই ক'দিনে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে কতটুকু জানতে পেরেছেন, সে-সংবাদ আমরা এখনও পাইনি। শ্রীপাতিলের চলচ্চিত্র-প্রীতির কথা আমরা জানি। এক সময়ে বহু কাজের মধ্যে থেকেও তিনি প্রায় প্রতি রাতেই সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং দেশী-বিদেশী কোনো রকম ছবিই তাঁর বাদ যেত না। এই চলচ্চিত্র-প্রীতি ছিল ব'লেই চলচ্চিত্র অনুসন্ধান সমিতির পুরোধা হিসেবে তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের বহুমুখী সমস্যার সমাধানের জন্যে অনেক মূল্যবান সুপারিশ করেন। কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পের দুর্ভাগ্য, শ্রীপাতিলকে যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নেওয়া হ'ল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কোনোদিনই তাঁকে তথ্য ও বেতার বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। জানিনা, বহুপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ বিষয়ের মন্ত্রিত্বভার গ্রহণের ফলে তাঁর আগেকার

সাহেব বিবি গোলামের একটি দৃশ্যে গুরু দত্ত ও ওয়াহিদা রহমান

চলচ্চিত্র-প্রীতি স্তিমিত হয়ে এসেছে কিনা।

১৯৫৭ সাল থেকে শুরু ক'রে কেন্দ্রীয় সরকার কাঁচা ফিল্মের আমদানীকে উত্তরোত্তর হ্রাস ক'রে চলেছেন। প্রথমে পুরো আমদানীর ৬৬⅔% অংশ এবং পরে কমিয়ে কমিয়ে মাত্র ৩৩⅓% অংশ আনাবার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুসারে এই সীমিত আমদানীরও যদি ৫০% অংশ কম করে দেওয়া হয়, তাহলে আগেকার সমগ্র আমদানীর মাত্র ১৬⅔% অংশ কাঁচা ফিল্ম ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজকরা পাবেন। অর্থাৎ ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হবে।

ভারতবর্ষ বছরে প্রায় ১৭৫ লক্ষ টাকার কাঁচা ফিল্ম আমদানী করে এবং এর মধ্যে মাত্র ৭০ লক্ষ টাকার ফিল্ম আমদানীর ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের প্রশ্ন ওঠে; বাকী ১৫০ লক্ষ টাকার ফিল্ম ভারতীয় মুদ্রা দ্বারাই আমদানী করা হয়। অথচ বিদেশে ভারতীয় ছবি রপ্তানী ক'রে আমরা বছরে প্রায় ১৬৫ থেকে ১৭৫ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। কাজেই ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প যখন বছরে অন্ততঃ ১০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ে সহায়তা করে, তখন তার আমদানীকে ৫০% কম ক'রে সীমিত করবার প্রয়োজনীয়তা কোন্‌খানে, তা আমাদের মত সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য।

বরং ছ'মাসে ১৭ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করতে গিয়ে উল্টো বিপত্তি ঘটবে ব'লেই বোধ হচ্ছে। কাঁচা ফিল্ম আমদানী সীমিত হওয়ার ফলে যথেষ্ট কম সংখ্যায় ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রস্তুত তো হবেই, উপরন্তু প্রয়োজনমত কাঁচা ফিল্ম সরবরাহের অভাবে চলচ্চিত্রের মান হয়ে পড়বে অবনত। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে ভারতীয় ছবির রপ্তানী যাবে কমে এবং আজ ভারতীয় ছবি বিদেশ থেকে যে ১৬৫ থেকে ১৭৫ লক্ষ টাকার পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ ক'রে আনছে, তা অর্ধেকেরও নীচে চলে যেতে বাধ্য

অর্থাৎ ১৭ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করতে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথই হয়ে যাবে সংকীর্ণ—১৭৫-এর স্থলে ৭০ কি ৮০ লক্ষ মুদ্রা পেয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দেখা যাবে, প্রায় ১০০ লক্ষ বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতিরই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এবং এ ছাড়াও কথা আছে। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ অপ্রশস্ত করার সংগে সংগে জাতীয় আয়ও যে কি পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে তাও ভেবে দেখা দরকার। কাঁচা ফিল্মের আমদানী যে পরিমাণ কমানো হবে ঠিক সেই পরিমাণে আমদানী শুল্কে তো কমবেই, তা ছাড়া কম ছবি প্রস্তুত হওয়ার ফলে আবগারী শুল্ক, প্রদর্শনী শুল্ক, আয়কর, উৎপাদন কর ইত্যাদিও কমবে। চলচ্চিত্র প্রস্তুতের আনুষঙ্গিক রসায়নদ্রব্য, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, প্রয়োজনীয় কাঠ, কাপড়, রঙ, পেরেক, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি হাজারো রকম জিনিসের চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে ঐসব ব্যবসায় থেকে যে সরকারী আয় হ'ত, তাতেও ভাটা পড়বে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী থেকেও আয় যথেষ্ট কমে যেতে বাধ্য। ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজনা শিল্পটি চালু থাকার ফলে ভারত সরকার জাতীয় আয়ের দিক দিয়ে কতভাবে কতখানি লাভবান হন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনই বা কতখানি করেন, এ সম্পর্কে যদি তাঁরা একটি সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে উৎসাহিত হন, তাহ'লে যতদিন না ভারত নিজেই কাঁচা ফিল্ম তৈরি করতে পারছে, ততদিন তাঁরা কাঁচা ফিল্ম আমদানীকে সীমিত না ক'রে তার আমদানীর পথকে প্রশস্ততরই করতেন তাকে ও-জি-এল্‌-এর (ওপেন জেনারেল লাইসেন্স-এর) আওতায় রেখে।

লাইট হাউস মিনিয়েচারে "কাঞ্চনজঙ্ঘা" চিত্র দেখে বেরুবার সময় ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বিধানচন্দ্র রায়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি। সঙ্গে পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়

অরবিন্দ বনসালের 'এক টুকরো আগুন' চিত্রে কালী ব্যানার্জী ও অনুভা গুপ্তা

বিবিধ সংবাদ

উদীচীর "শাপমোচন" :

উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট নৃত্যগীত-শিক্ষা সংস্থা গেল ১লা জুলাই, রবিবার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের "শাপমোচন" নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করেন। সকল ভূমিকাই অভিনীত হয় মেয়েদের দ্বারা। নৃত্যাংশে প্রধান দুটি চরিত্রে অবতীর্ণা হন কল্পনা কর এবং শুক্লা দাস। নৃত্যনাট্যটিতে কিন্তু নৃত্যের চেয়ে সংগীতাংশটিই উৎরেছিল বেশি। বিশেষ ক'রে মৃদুলা চট্টোপাধ্যায় এবং চন্দ্রকান্ত শীলের মুখের রবীন্দ্রসঙ্গীত পরম উপভোগ্য হয়েছিল।

কার্লোভি ভেরী চলচ্চিত্র উৎসব :

কার্লোভি ভেরী চলচ্চিত্র উৎসবে এবার রুশচিত্র "নাইন আওয়ার্স অব এ ডে" গ্রাণ্ড প্রিক্স লাভ করেছে।

জাতীয় সংহতি সাধনে সাংস্কৃতিক বিনিময় :

আন্তর্জাতিক সৌহার্দবোধ বর্ধিত করবার জন্যে ইউনেস্কো যে ক'টি কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে একটি হ'ল প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের সংস্কৃতি সম্পর্কে যথার্থ মূল্যাবধারণের সুযোগ-সাধন। ১৯৫৯ সালে দিল্লীতে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক পরিষদের যে অধিবেশন হয়েছিল, তাতে ডঃ সি, ডি, দেশমুখ প্রস্তাব করেছিলেন, প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে সাংস্কৃতিক সমঝোতা সৃষ্টি করবার আগে আমাদের প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত। পরে ডঃ জুনাঙ্কর এই পরিধিকে আরও কমিয়ে আমাদের ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধির সহায়ক কাজে সকলকে ব্রতী হতে অনুরোধ করেন। জাতীয় সংহতি পরিষদ ডঃ জুনাঙ্করের এই প্রস্তাবটিকে কার্যকরী করবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন এবং প্রতি রাজ্যের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপরাপর রাজ্যে নাটক, নৃত্য, গীত প্রভৃতি পরিবেশন দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সৌহার্দবন্ধন প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমেই দৃঢ়তর করবার জন্যে আহ্বান জানাতে উদ্যত হয়েছেন। একই নাটক বা নৃত্য-নাট্যকে দুই বা ততোধিক ভাষার মাধ্যমে যদি কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রাজ্যে অভিনয় করবার ব্যবস্থা করেন, তাহ'লে জাতীয় সংহতি পরিষদ তাঁদের যোগ্য বিবেচনা করলে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য পর্যন্ত করতে পারেন, এমন কথাও আমাদের কানে এসেছে। সম্প্রতি নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে বিহার আর্ট থিয়েটার হিন্দী এবং বাঙলা—এই উভয় ভাষার মাধ্যমে "পাল্কী" নামে যে নাট্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান ক'রে গেলেন, তা'ও জাতীয় সংহতি পরিষদের সাহায্যপুষ্ট।

উপযুক্ত সাংস্কৃতিক বিনিময়ের দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সৌহার্দ-বন্ধনকে দৃঢ়তর করার চেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে-বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নেই।

★

গত ৮ই আষাঢ়, ইং ২৩শে জুন শনিবার প্রখ্যাত অভিনেতা স্বর্গত ছবি বিশ্বাস মহাশয়ের আদ্যকৃত তাঁহার টালীগঞ্জস্থিত বাসভবনে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে সর্বশ্রী নিরঞ্জন সেন এম এল এ, প্রতাপ বসু, বীরেন্দ্রনাথ সরকার, মন্মথ রায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সলিল মিত্র, সত্যজিৎ রায়, পাহাড়ী স্যান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, হেমন্ত মুখার্জি, উত্তমকুমার, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা মুখোপাধ্যায় ও সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিশির মল্লিক প্রোডাকসনের অগ্রদূতে পরিচালিত চিত্র 'নবদিগন্তে' সাবিত্রী চ্যাটার্জি ও বসন্ত চৌধুরী

গত ২৬শে জুন মঙ্গলবার পর-লোকগত আত্মার শান্তি কামনার উদ্দেশ্যে উক্ত বাসভবনে দরিদ্র নারায়ণের সেবা করা হয়।

পশ্চিম বাঙলার জননায়ক মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের তিরোধানে তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে কলকাতার সকল নাট্যালয় ও সিনেমাগৃহ গেল রবিবার তাঁর মৃত্যুদিবসে বন্ধ ছিল। পরদিন সোমবার, তাঁর মরদেহের শোকযাত্রা দিবসে সকল ভারতীয় সিনেমাগৃহ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।

কলরবের অনুষ্ঠান

গত ১১ই জুন মহাজাতি সদনে মধ্য কলকাতার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'কলরব'এর উদ্যোগে শ্রীরমেন দাস (সবুজসাথী) রচিত 'সবুজ দেশের আলো' নাটিকাটি মঞ্চস্থ হয়। সাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে কুমারী জবা সিংহ পরিচালিত সঙ্গীত-সমন্বিত এই নাটিকাটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর নাট্য প্রযোজনা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। একটি রোমাঞ্চকর দৃশ্য ঘিরে এর শুরু। আলোক-শিল্পী তাপস সেনের অপূর্ব আলোর খেলা নাটকটিকে যেমন প্রাণ চঞ্চল করে তুলেছে, কিশোরের ভূমিকায় সুচিত্র চক্রবর্তীর অভিনয়ও তেমনি দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। অন্যান্য ভূমিকায় অশোকা দে, শুক্লা দে, গীতিশ্রী ব্যানার্জী, সুমিত্রা চক্রবর্তী, জয়শ্রী ব্যানার্জী, সাগরিকা বিশ্বাস, বেবী, ইতি ও মীনা ব্যানার্জির অভিনয়ও প্রশংসার দাবী রাখে। সংগীত পরিচালনায় শ্রীশম্ভু মল্লিকের বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কলরব সম্পাদক শ্রীহরিসাধন বিশ্বাস।

স্টুডিও থেকে বলছি

প্রেক্ষাগৃহে বসে অবসর বিনোদনের জন্য বাংলা ছবি দেখছেন। কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহে চরিত্রমিছিলের জীবন সাদা পর্দায় জীবন্ত হচ্ছে। কোন চরিত্র-নায়কের একটা সম্পূর্ণ দৃশ্যের অভিনয় দেখে কখনো আপনার মনে হয় না যে এটা ছবি—এ অভিনয়। সবটাই তখন সিনেমা। একটা সম্পূর্ণ কাহিনীর চলচ্চিত্র।

এই চলচ্চিত্র-শিল্পের যে প্রস্তুতি তার কর্মনিয়ন্ত্রণের একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। পরিচালনা থেকে পরিবেশনার মধ্যে বহু শাখা এই চলচ্চিত্র-রূপায়ণে দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিশেষ করে স্টুডিও হল এর প্রধান কেন্দ্র-বিন্দু। বাংলা যে সব ছবি মুক্তি পায় তার প্রধান শিল্পভূমি এই কলিকাতা শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে। টালিগঞ্জের চারপাশে প্রাচীর-ঘেরা ছড়ানো স্টুডিওগুলো চলচ্চিত্র-নির্মাণের পীঠস্থান বলা চলে। বড় বড় ঘর নিয়ে স্টুডিওর এক একটা ফ্লোর। ক্যামেরা, আলো, শব্দ, মেকআপ আর কলাকুশলী ও অভিনেতাদের দৈনন্দিন পরিশ্রমের শিল্প-প্রচেষ্টায় কতো কাহিনী, কতো উপন্যাস চলচ্চিত্রের দৃশ্যকাব্যে স্থান পায়।

যন্ত্রস্থ এমন একটা ছবি-নির্মাণের দৃশ্য দেখার জন্য সেদিন উপস্থিত হয়েছিলাম স্টুডিও চত্বরে। 'রাধা ফিল্মস' স্টুডিওর কথা বলছি। সম্প্রতি পরিচালক মৃণাল সেন 'পুনশ্চ'-র পর তাঁর পরবর্তী ছবি 'অবশেষে'-র কাজ আরম্ভ করেছেন। আপনারা জানেন এই ছবির কাহিনী লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। 'স্বভাবের স্বাদ' গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীসেন। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন সাবিত্রী চ্যাটার্জি, সুলতা চৌধুরী, ছায়া দেবী, উৎপল দত্ত, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল, বিধায়ক ভট্টাচার্য ও বিপিন গুপ্ত। সংগীত পরিচালনা করবেন রবীন চ্যাটার্জি।

এ কাহিনী বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রাত্যহিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সুখী পরিবারের একমাত্র ছেলে বিনু। প্রাত্যহিকতার জীবন-দ্বন্দ্বে স্ত্রী রমা স্বামীকে সন্দেহ করে। এই সন্দেহ-বাতিক অন্তর্দ্বন্দ্বে পারিবারিক জীবনে ঘুণ ধরে। বাধ্য হয়ে রমার কাছ থেকে গৃহকর্তা বিনুকে ভর্তি করে দেয় কলকাতার বাহিরে এক বোর্ডিংয়ে। এমন কি ছেলেকে দেখার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল রমা নিজে। বিবাহ-বিচ্ছেদের সূত্রপাত সূচিত হল।

রমা বাপের বাড়ীতে ফিরে আসে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে। ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে উকীলের পরামর্শ নেয়। উকিলী নালিশে রমা ছেলের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পায়। নির্দিষ্ট দিনে স্কুল বোর্ডিংয়ে দুজনেই উপস্থিত। রমা ও রমার স্বামী দুজনেই এসেছে দেখতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নিরাপরাধ বিনুর দুচোখের করুণ মায়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদের মিলন ঘটলো।

কন্যাপক্ষ অর্থাৎ রমার বাড়ীর দৃশ্যটির সেদিন স্যুটিং চলছিল। সাবেকী আমলের বাড়ী। বনেদী আসবাবে সজ্জিত একটি ঘর। পুরনো দিনের এক একটি নিদর্শনের ছাপ রয়েছে।

নবগঠিত অভ্যুদয় সংস্থা প্রযোজিত 'অবশেষে'র একটি দৃশ্যে পরিচালক মৃণাল সেন, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, ছায়া দেবী, শিশুশিল্পী ও সহকারীবৃন্দ

দেওয়ালে টাঙানো নজরুল, রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের ছবি। সোফায় বসে খুব গভীর আলোচনায় রমা এবং রমার বাবা পরামর্শ করছেন উকীল মদনগোপালের সঙ্গে। রমা উদ্বিগ্ন। পেয়ে হারানোর ব্যথায় মুহ্যমান। রমা বলছে উকীলকে—

—না, না, না! আমি কোন কথা শুনবো না। আমি আমার ছেলেকে চাই। হ্যাঁ চাই। আপনারা কি বুঝবেন কি হচ্ছে আমার ভেতরে। আজ দেড় মাস বিনু আমার কাছে নেই। চোখের দেখাও একবার দেখতে পাইনি। আমার মন কেমন করে না। আমার কান্না পায় না।

মদনগোপাল—আহা, এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

রমা—না ভেঙে পড়বে না। আপনার কি, আপনি তো উকীল। আপনি তো টাকা পাবেন। ভালই তো আপনার।

বাবা—রমা-মা, ছিঃ।

রমা—ভেঙে পড়বে না। আপনি আমার দুঃখ বুঝবেন কি করে। আপনার তো ছ' ছেলে—চার মেয়ে। আর আমার—

মদনগোপাল—এই দেখো, শুনুন শুনুন মিসেস রায় — মিসেস রায়।

রমা—আপনি আমায় ঐ নামে ডাকবেন না।

মদনগোপাল—কিন্তু আইনতঃ আপনি এখনও মিসেস রায়।

রমা—আইন, আইন, আইন! কেন আমার নাম নেই। আমার নাম ধরে ডাকা যায় না। আপনি তো আমার বাবার মত।

বাবা—নিশ্চয়ই, ওকে নাম ধরেই ডাকবেন।

মদনগোপাল—বেশ তো না হয় ঐ নামেই ডাকা যাবে। নামে আর কি আছে, মিসেস রায়!

এই দৃশ্যটি আপনারা ছবিতে দেখবেন। কিন্তু স্যুটিং-এর সময় কিভাবে দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে কয়েকটা কথা বলি।

ছবি দেখার সময় আপনারা ধরতেই পারবেন না যে এটা সেট না সত্যিই রমার ঘরের একটি দৃশ্য। এই শিল্প-নির্দেশনার কাজে বংশীচন্দ্র গুপ্ত এক-জন সুদক্ষ বলা চলে। এই আলোচনা-চক্রের দৃশ্যটি একবারেই সম্পূর্ণ অভি-নীত হয়নি। কিছু কিছু করে পরি-চালক শ্রীসেনের নির্দেশে এই সম্পূর্ণ দৃশ্যটি গৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে চিত্র-শিল্পী শৈলজা চট্টোপাধ্যায় ক্যামেরার আলো মিটার দিয়ে পরীক্ষা করে আলোর পরিমাপটুকু দৃশ্যানুযায়ী বজায় রাখলেন। দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে চরিত্র-শিল্পী রমার মুখের মেকআপ শেষবারের মত পরীক্ষা করলেন রূপকার অনন্ত দাস। আলো জ্বলে উঠলো। পাখা বন্ধ। মনিটর নেওয়া হল। সব ঠিক। পরিচালক মৃণাল সেনের কণ্ঠ শোনা গেল—সাইলেন্ট— টোকিং। শব্দগাড়ী

'হাইহিল' চিত্রে সম্প্রতি পরলোকগত খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে রেণুকা রায়

থেকে শব্দযন্ত্রী উত্তর দিলেন—রানইং। ক্ল্যাপস্টিক-র পর ফাইন্যাল টেক্ শুরু হল। পরিচালক শ্রীসেন বললেন—কাট্। দিস্ ম্যাচ।

চিত্রগ্রহণের অবসরে কলাকুশলী ও শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় হল। স্বাভা-বিক কথাবার্তায় তাঁদের শিল্প-সত্তার একটা আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ প্রত্যক্ষ করলাম। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাধারণ অভিব্যক্তি রয়েছে। তবে অভিনয়ের সময় এঁরা অন্য মানুষ। শিল্পী-গোষ্ঠী তখন শিল্প-সত্তার এক এক প্রতিনিধি। প্রাত্যহিকতার জীবন তখন স্তব্ধ। কাহিনীর জীবন তাঁদের চরিত্র। দৃশ্যটিকে অভিনয় করলেন রমা-র চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। রমার পিতার চরিত্রে উৎপল দত্ত এবং উকীল মদন-গোপালের ভূমিকায় রবি ঘোষ। চরিত্রানুযায়ী এই চরিত্রত্রয়ের অভিনয় ভাল লাগলো। সবশেষে মৃণাল সেনের পরিচালনার একটা বিশেষত্ব দেখলাম যে তিনি শিল্পীকে দিয়ে যথাযথ অভিনয় করিয়ে নেন অতি সহজ কথার মধ্য দিয়ে।

—চিত্রদূত

কলকাতা—

সলিল দত্তের পরিচালনায় 'সূর্য-শিখা'-র কাজ শুরু হয়েছে। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা শব্দ নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি ও দেবেশ ঘোষ। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অসিতবরণ, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, তরুণকুমার এবং পঞ্চানন। ছবিটিতে সুরসৃষ্টি করছেন রবীন চ্যাটার্জি।

জোয়ালা প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় ছবি 'দুই নারী' নিউ থিয়েটার্স দু' নম্বরে অগ্রসর হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন জীবন গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। কয়েকটি চরিত্রে রয়েছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, নির্মলকুমার, কাজল গুপ্ত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও হরিধন।

সুবর্ণরেখা' ছবির প্রায় এক মাস ঘাটশিলায় বহির্দৃশ্যের কাজ শেষ করে কলকাতায় ফিরেছেন ঋত্বিক ঘটক। ছবিটি সমাপ্তপ্রায়। অভি ভট্টাচার্য, মাধবী মুখোপাধ্যায়, গীতা দে ও জহর রায়কে দেখতে পাওয়া যাবে প্রধান চরিত্রে।

যুদ্ধোত্তর যুবশক্তির কাহিনী নিয়ে 'ভ্রষ্টলগ্ন' ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ করছেন 'সিনে এজ' নামক এক নব-গঠিত চলচ্চিত্র সংস্থা। এই ছবিতে কানু ব্যানার্জি, অসিতবরণ, নৃপতি চ্যাটার্জি, সুখেন ও দীপ্তি রায় অভিনয় করছেন। সলিল চৌধুরী এর সঙ্গীত পরিচালক।

অগ্রদূত গোষ্ঠীর 'রুচিরা'-র নতুন নামকরণ হয়েছে 'নবদিগন্ত'। বিহারের ম্যাসঞ্জর বাঁধে বহির্দৃশ্যের সপ্তাহ-কালীন দৃশ্য গ্রহণের কাজ সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। ছবিটি সমাপ্তপ্রায়। দুটি প্রধান চরিত্রে রয়েছেন বসন্ত চৌধুরী এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য প্রযোজিত 'শেষ অংক' ছবিটি পরিচালনা করছেন হরিদাস ভট্টাচার্য। বহুদিন পর এই প্রথম শর্মিলা ঠাকুর চলচ্চিত্রে পুনরাগমন করলেন। উত্তমকুমারের বিপরীতে তিনি অভিনয় করছেন। অন্যান্য চরিত্রে বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, দীপক মুখার্জি, জীবেন বসু ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি ভূমিকালিপিতে রয়েছেন।

'যাত্রিক' গোষ্ঠী এবারে বম্বে চলেছেন বাংলা ছবি করতে। বিশেষ সূত্রে জানা গেল এই সংস্থার অন্যতম পরিচালক তরুণ মজুমদার সম্প্রতি বম্বে গেছেন ভি শান্তারামের সঙ্গে কথা বলতে। মনোজ বসুর 'আংটী চ্যাটার্জির ভাইপো' এই গল্প অবলম্বনে 'পলাতক' ছবিটি প্রযোজনা করবেন ভি শান্তারাম।

আর্ট পিকচার্সের 'গঙ্গু' চিত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় কুমারী নাজ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে বিনু বর্ধনের পরিচালনায় আর-ডি-বনশালের পরবর্তী ছবি "এক টুকরো আগুন" প্রায় সমাপ্তির পথে। ছবিতে অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, অনুভা গুপ্ত, তন্দ্রা বর্মণ, মিতা চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরসৃষ্টি করেছেন এবং কণ্ঠদান করেছেন হেমন্তকুমার স্বয়ং, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন প্রভৃতি।

বোম্বে—

সম্প্রতি চিত্রজগতে বিশেষ করে প্রযোজক মহলে একটা হতাশার ছাপ পড়েছে। বহু অর্থব্যয়ে নির্মীয়মান ছবিগুলোর কাজ প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। কারণ একদল অভিনেতা, অভিনেত্রী ও কলাকুশলী বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদান করতে উপস্থিত হয়েছেন আর একদল রাজকাপুরসহ রোমের পথে বেরিয়েছেন 'সঙ্গম' ছবির বহির্দৃশ্যের জন্য। তাই হিন্দী ছবির প্রযোজকরা পথ চেয়ে বসে আছেন ঐ শিল্পীগোষ্ঠীর প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে।

বাংলার দুই জুটি বিশ্বজিৎ ও অনিতা গুহ সম্প্রতি অরুণকুমার গুহ প্রযোজিত হিন্দী ছবির জন্য মনোনীত হয়েছেন। কাহিনী লিখেছেন ধ্রুব চ্যাটার্জি। ছবিটি পরিচালনা করবেন এস এন ত্রিপাঠী। পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়

করবেন ওমপ্রকাশ, মুকরী ও আনওয়ার হোসেন।

দীর্ঘ আট বছর পর 'চাঁদী কী দিবর' চিত্রে ভারতভূষণ এবং নূতন এক সঙ্গে অভিনয় করছেন। এইচ, পি, গোয়েঙ্কার পক্ষ থেকে ছবিটি পরিচালনা করছেন দিলীপ বসু। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন এন দত্ত।

নবরঙ্গ ফিল্মস-এর 'জান মিলে ধরতি আকাশ' ছবিটি কিশোর শাহুর পরিচালনায় বহির্দৃশ্যে সঙ্গীত গ্রহণের কাজ শেষ হল। রাজকুমার, ফিরোজ এবং শিবি রাণা ছিলেন এই বহির্দৃশ্যে। প্রধান নারী চরিত্রে রয়েছেন বীণা রাই। ছবিটির সুরকার হলেন মদনমোহন।

গুরু দত্ত স্টুডিওর 'দো দিওয়ানে' ছবির দৃশ্য গ্রহণে কিশোরকুমার একটি প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন যমুনা, প্রাণ, আগা, মদনপুরী এবং সুজাতা। ছবিটির পরিচালক এবং সঙ্গীত পরিচালনা করছেন যথাক্রমে শক্তিসামন্ত ও চিত্রগুপ্ত।

প্রযোজক ও পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী তাঁর ছবি 'জিদ্দি'-র কাজ আরম্ভ করেছেন। আশা পারেখ, মামুদ ও শুভা খোটে পার্শ্বচরিত্রে থাকবেন এবং প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন জয় মুখার্জি। শচীনদেব বর্মণ এ ছবির সংগীত সৃষ্টি করবেন।

মাদ্রাজ

প্রযোজক এল ভি প্রসাদের ছবি 'হমরাহি' সমাপ্তপ্রায়। নায়ক রাজেন্দ্রকুমারের বিপরীতে নবাগতা যমুনা এ ছবির একটি আকর্ষণ। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শুভা খোটে, শশীকলা, ললিতা পাওয়ার, আগা, নাজির হোসেন এবং প্রেমনাথ-ভ্রাতা রাজেন্দ্রনাথ। সংগীত পরিচালনা করছেন শংকর-জয়কিশন। টি প্রকাশরাও এ ছবির পরিচালক।

জেমিনী-র পক্ষ থেকে রামানন্দ সাগর 'বৃক্ষকান্তের উইল'-র হিন্দী চিত্ররূপ দিচ্ছেন। কয়েকটি প্রধান চরিত্রে রাজেন্দ্রকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, পৃথ্বীরাজ ও রাজকুমারকে দেখা যাবে।

'ভাবী' চিত্রে অসাধারণ সাফল্যের পর এ ছবির সংগীত-পরিচালক চিত্রগুপ্তকে দিয়ে এ ভি এম স্টুডিওর কর্ণধার এ মৈয়াপ্পায়ান ছবি করছেন—ম্যায় চুপ রহুঙ্গী। এ ছবিতেও গান হিট

লণ্ডনের ইংরাজি ছবির প্রযোজক লেখক এবং চিত্রনাট্যকার শ্রীউমেশ মল্লিককে তাঁর বর্তমান ছবি 'এ গাইকলড্ সিজার'-এর সেটে ছবির প্রধান অভিনেত্রী মরীন টোল (মধ্যে) সংলাপ লেখিকা জড়ানেট বোনেটের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। ছবিটি কলম্বিয়া চিত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশিত হবে। শ্রীউমেশ মল্লিকই প্রথম ভারতীয়, যিনি ইংরাজিতে গ্রেটবৃটেনে ছবি প্রযোজনা করছেন নিজের কাহিনী অবলম্বনে।

করবে বলে আশা করা যায়। সুনীল দত্ত এবং মীনাকুমারী এই দুই শিল্পী প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন।

সম্প্রতি কিশোর সাহু জেমিনীর এস এস ভাসানের পক্ষ থেকে একটি সামাজিক হিন্দী ছবি করছেন। তিনটি প্রধান ভূমিকালিপিতে থাকছেন অশোককুমার, মনোজ ও নিরূপা রায়। শংকর-জয়কিশন এ ছবির সুরকার।

'ঝুলা' সাফল্যের পর প্রযোজক ভাসু মেনন নতুন ছবি করছেন। চিত্রনাট্য রচনা করছেন রাজেন্দ্রকৃষ্ণ। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অংশগ্রহণ করবেন গুরু দত্ত ও আশা পারেখ। এই জুটি ভাসু মেননের ছবিতে এই প্রথম।

মাদ্রাজের প্রবীণ বাঙালী ধীরেন দাশগুপ্ত 'মেরী বহিন' সম্প্রতি শেষ করেছেন। এটি তামিল ও তেলেগু ভাষায় চিত্ররূপ পাবে। নায়ক এম সি রামচন্দ্রণএর বিপরীতে অভিনয় করেছেন পদ্মিনী।

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' মাদ্রাজে দুই ভাষা তামিল ও তেলেগু চিত্রে চিত্রস্বত্ব নির্দিষ্ট হয়েছে। 'ভাবী' খ্যাত পরিচালক কৃষ্ণান পাঞ্জু এ ছবির পরিচালনা ভার নিয়েছেন।

এম জি আর পিকচার্সের হিন্দী ছবি 'হামে ভাই জীনে দো' সম্প্রতি সেন্সর হয়েছে। ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত। নায়কের যথাযথ রূপ পরিস্ফুট করেছেন এম জি রামচন্দ্রণ।

॥ নাইন আওয়ার্স টু রাম ॥

গান্ধীজির জীবন নিয়ে ছবি তোলার অসমসাহসিক ব্রত নিয়েছেন পরিচালক মার্ক রবসন। ব্যাপারটা যে সত্যিই অসমসাহসিক তার প্রমাণ ইতিপূর্বে দুজন বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক গান্ধীজির জীবন নিয়ে ছবি তুলতে গিয়েও পিছিয়ে এসেছেন। পরিচালক ডেভিড লীন এবং অটো প্রেমিঙ্গার শেষ পর্যন্ত ভালো চিত্রনাট্যের অভাবেই গান্ধীচিত্রে অগ্রসর হননি। মার্ক রবসন-পরিচালিত চিত্রের কাহিনীকার হলেন লস এঞ্জেলেস-এর ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক স্টানলি উলপার্ট। "নাইন আওয়ার্স টু রাম" নামক তাঁর উপন্যাসটি আমেরিকায় প্রকাশিত হওয়া মাত্র প্রচণ্ড বিক্রি হয়। উপন্যাসটির চিত্ররূপ দিয়েছেন নেলসন গিডিং। বর্তমান চিত্রে পরিচালক রবসন কতটা তথ্যনিষ্ঠ হবেন, ছবিটি মুক্তি না পেলে বিশদ বলা যাবে না হয়ত তবে উলপার্টের উপন্যাসটি খাঁটি উপন্যাসই। রবসন ইতিপূর্বে দুটি বক্সঅফিসধন্য ছবি তুলেছেন : ইন অফ দি সিক্সথ হ্যাপিনেস এবং পেটন প্লেস।

'নাইন আওয়ার্স টু রাম'এর একটি দৃশ্য

এই চিত্রের অনেক দৃশ্য বম্বেতে এবং দিল্লীতে তোলা হয়েছে। গান্ধীজির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জে এস কাশ্যপ নামক চৌষট্টি বছরের জনৈক ভূতপূর্ব স্কুলশিক্ষক। তাঁর চেহারার সঙ্গে গান্ধীজির সাদৃশ্য দেখে গান্ধীজির অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীযুক্ত বিড়লা পর্যন্ত নাকি চমকে উঠেছিলেন। গান্ধীজির হত্যাকারী নাথুরাম গডসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন প্রখ্যাত জার্মান অভিনেতা হর্স্ট বাকহোলৎজ। 'সিরানো ডি বারজারাক' খ্যাত জোস ফেরারকেও এই চিত্রের একটি ভূমিকায় দেখা যাবে।

তাঁর এই ছবির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পরিচালক মার্ক রবসন বলেছেন :

The film is about the struggle for the survival of non-violent principles in a violent world. I think this is just about the most important theme of our time.

॥ কার্লোভি ভেরি উৎসবের পুরস্কার ॥

এ বছরে কার্লোভি ভেরির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার গ্র্যাণ্ডপ্রী পেয়েছে সোভিয়েট ছবি "নাইন ডেজ অফ ওয়ান ইয়ার"। এই উৎসবে দুটি প্রধান পুরস্কার পেয়েছে একটি বৃটিশ এবং একটি ইটালীয় ছবি। বৃটিশ ছবিটি হল "এ টেষ্ট অফ হানি" (এই চিত্রের সংবাদ এই বিভাগে ইতিপূর্বে বিস্তারিত দেয়া হয়েছে)। চিত্রটির পরিচালক হলেন টনি রিচার্ডসন, নায়িকা রিটা টুসিংহাম। ইটালীয় ছবিটির নাম আকাটেন্স। পদ্মশ্রী নার্গিস এই উৎসবের অন্যতম বিচারক ছিলেন। ভারতীয় চিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এই উৎসবে 'গঙ্গা-যমুনা।"

॥ আদালতে সোফিয়া লরেন ॥

এ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়ার পর সোফিয়া লোরেন আবার সংবাদ-কলমের প্রথম পাতায় আশ্রয় নিয়েছেন। রোমের একটি সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে, ব্যাভিচারের অভিযোগে সোফিয়া লোরেন এবং তাঁর পরিচালক স্বামী কার্লো পন্টি আদালতে অভিযুক্ত হয়েছেন। লোরেন এবং পন্টির বিয়ে হয়েছিল ১৯৫৭ সালে মেক্সিকোতে। পন্টি তাঁর প্রথমা স্ত্রী গুলিয়ানা পন্টির সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের তিন বছর বাদে লোরেনকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু ইটালীর আদালত মেক্সিকোর আদালত মারফৎ প্রাপ্ত ডাইভোর্স গ্রাহ্য করেননি। গুলিয়ানার আবেদনক্রমেই ইটালীর আদালত মেক্সিকোর বিবাহ-বিচ্ছেদ ডিক্রীকে নাকচ করেন।

—চিত্রকূট

উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতা—১৯৬২

পুরুষদের সিঙ্গলসের খেলায় ভারতবর্ষের পাঁচজন খেলোয়াড়—রমানাথন কৃষ্ণান, জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিৎ লাল, নরেশ কুমার এবং আখতার আলি যোগদান করেছিলেন। নরেশ কুমার প্রথম রাউণ্ডের খেলায় গত বছরের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় রড লেভারের (অস্ট্রেলিয়া) কাছে পরাজিত হ'ন। আখতার আলিও পরাজিত হ'ন প্রথম রাউণ্ডের খেলায় ফিনল্যাণ্ডের রিনো নাইসোনের কাছে। তৃতীয় রাউণ্ড পর্যন্ত খেলেছিলেন কৃষ্ণান, মুখার্জি এবং লাল।

কৃষ্ণান তৃতীয় রাউণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার নীল ফ্রেজারের ভাই জন ফ্রেজারের সঙ্গে। এইদিনের খেলায় কৃষ্ণানকে বাঁ পায়ের হাঁটুতে মোটা রকমের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নামতে দেখা যায়। আগের দিনের ডাবলসের খেলায় তিনি এই বাঁ পায়ে বেশী রকম চোট খেয়েছিলেন। ডাক্তারের উপদেশ ছিল খেলায় যোগদান না করা। তবু কৃষ্ণান নেমেছিলেন শেষ চেষ্টা হিসাবে। কিন্তু কৃষ্ণান আহত পা নিয়ে দাঁড়াতেই পারেননি, খেলা দূরের কথা। প্রথম সেটে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ৫—২ গেমে জয়লাভ করে। কৃষ্ণানের পক্ষে পরবর্তী সেটের খেলায় যোগদান করা সম্ভব হয়নি; তিনি আম্পায়ারকে খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সংকল্প প্রকাশ করেন। সিঙ্গলসের খেলাতেই নয় প্রতিযোগিতার অন্যান্য খেলা থেকেও তিনি অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। পুরুষদের ডাবলসে কৃষ্ণান অস্ট্রেলিয়ার বব্ হাউয়ের জুটিতে দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠেছিলেন।

টেনিস খেলার বিশেষজ্ঞ মহলের দৃঢ় ধারণা ছিল কৃষ্ণান গত বছরের মত এবারও সেমি-ফাইনালে নিশ্চয় উঠবেন এমন কি ফাইনালে যাওয়ার পথে তাঁর কোন বড় রকম বাধা ছিল না। কারণ তিনি এ বছরে যথেষ্ট উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে বাছাই তালিকায় ৪র্থ স্থান পেয়েছিলেন। প্রতিযোগিতা থেকে কৃষ্ণানের এইভাবের বিদায় ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণানের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পায়ের অক্ষম অবস্থা উইম্বলেডনের দর্শকমণ্ডলীর মনে যথেষ্ট সহানুভূতি এবং বেদনার রেখাপাত করেছিল। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য! ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের শেষ এইখানেই হয়নি। তৃতীয় রাউণ্ডের অপর একটি খেলায় প্রেমজিৎ লাল অস্ট্রেলিয়ার বব্ হাউয়ের বিপক্ষে প্রথম দু'টি সেটে জয়লাভ ক'রে অগ্রগামী হন। তৃতীয় সেটের খেলা থেকে তাঁর মাংসপেশীতে যন্ত্রণা দেখা দেয় এবং তিনি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। জয়দীপ মুখার্জি তাঁর তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় জার্মাণীর ক্রিস্টিয়ান কুহনকের কাছে পরাজিত হ'ন।

ভারতবর্ষের তৃতীয় রাউণ্ডের খেলা

জন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) ৫—২ গেমে রমানাথন কৃষ্ণানকে (রিটায়ার্ড) পরাজিত করেন।

ক্রিস্টিয়ান কুহনকে (জার্মানী) ৯—৭, ৬—৪ ও ৭—৫ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

বব্ হাউই (অস্ট্রেলিয়া) ৫—৭, ৪—৬, ৬—৪, ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করেন।

অপ্রত্যাশিত ফলাফল

খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফল উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রতি বছরই

২৫শে জুন তারিখে উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র কোর্টের উদ্বোধনী খেলায় গতবারের বিজয়ী রডলেভার বনাম ভারতের নরেশ কুমারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃশ্য। এই খেলায় রডলেভার স্ট্রেট সেটে জয়ী হন।

খেলায় কিছু না কিছু অঘটন ঘটে থাকে। অখ্যাত খেলোয়াড়ের হাতে খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের পরাজয়ই অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর্যায়ে পড়ে। প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাগণ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের গুণানুসারে একটি ক্রম-পর্য্যায় তালিকা প্রতি বছর প্রকাশ করেন। এই তালিকায় স্থান পাওয়ার গৌরব যথেষ্ট; কিন্তু সময়ে সময়ে এই তালিকা অনুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। বাছাই তালিকায় কোন স্থান পাননি, অথচ বাছাই তালিকার উপরের দিকের খ্যাতনামা খেলোয়াড়কে পরাজিত করেছেন উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। তবে ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিংগলস খেলার উদ্বোধন দিনে যা ঘটেছে প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৮৫ বছরের ইতিহাসে তার সংগে কোন অঘটন ঘটনারই তুলনা হয় না।

১৯৬২ সালের মহিলাদের সিংগলসের বাছাই তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার ১৯ বছরের ক্রীড়া-পটীয়সী মিস মার্গারেট স্মিথকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়। মিস স্মিথ এই শীর্ষস্থানের যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন এই বছরে মহিলাদের সিংগলসে অস্ট্রেলিয়ান, ইতালীয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং সুইস খেতাব পেয়ে। ১৯৬২ সালের উইম্বলেডন সিংগলস খেতাব মিস মার্গারেট স্মিথই পাবেন এই ছিল সকলের দৃঢ় ধারণা এবং এ সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন কারণই ঘটেনি। কিন্তু মহিলাদের সিংগলস খেলার উদ্বোধন দিনে দর্শকমণ্ডলী হতবাক্ হলেন। এমন অভাবনীয় ঘটনার জন্যে দর্শকরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, কখনও কল্পনাও করেননি। প্রথম রাউণ্ডের খেলাতেই এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার মিস মার্গারেট স্মিথ প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিলেন উইম্বলেডন টেনিস কোর্টের চারদিক অন্ধকার ক'রে দিয়ে। আমেরিকার বিলি জিন মোফিট ১—৬, ৬—৩ ও ৭—৫ গেমে মিস স্মিথকে পরাজিত করে আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে রাতারাতি নাম করলেন। মিস মোফিট প্রতিযোগিতার বাছাই তালিকায় কোন স্থানই পাননি। তিনি আমেরিকার তিন নম্বর বাছাই খেলোয়াড় এবং আমেরিকায় জাতীয় লন্

১৯৬২ সালের উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী কয়েকজন মহিলা টেনিস খেলোয়াড় পরস্পরের অতি আধুনিক সাজ-পোষাক নিরীক্ষণ করছেন। উইম্বলেডন শুধু টেনিস খেলার পীঠস্থান নয়, মহিলা খেলোয়াড় এবং মহিলা দর্শকদের সাজ-পোষাকের প্রদর্শনী এবং সামাজিক মিলন-কেন্দ্র বলা হয়।

টেনিস প্রতিযোগিতার ডাবলসে এবার খেতাব পেয়েছিলেন।

উইম্বলেডনের প্রথম রাউণ্ডের খেলায় মিস স্মিথ প্রথম সেটে ৬—১ গেমে জয়লাভ ক'রে অগ্রগামী হয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী দুটি সেটে আমেরিকার মিস মোফিটের কাছে হার স্বীকার করেন। শেষের সেটেও মিস স্মিথ এক সময়ে ৫—৩ গেমে অগ্রগামী ছিলেন। কিন্তু স্নায়বিক দুর্বলতার চাপে তিনি তাঁর স্বাভাবিক খেলা ভুলে যান। প্রতিযোগিতার ৮৫ বছরের ইতিহাসে এমন অভাবনীয় ঘটনা কখনও ঘটেনি।

১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা, দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় গত বছরের সিঙ্গলস খেলার রানার-আপ চাক ম্যাকিনলের (আমেরিকা) পরাজয়। মাইকেল হান (বৃটেন) ৬—৩, ৬—২ ও ৬—২ গেমে ম্যাকিনলেকে পরাজিত করেন। এবছরের খেলোয়াড়দের নামের বাছাই তালিকায় ম্যাকিনলে পঞ্চম স্থান পেয়েছিলেন। অপরদিকে হান কোন স্থানই পাননি। বৃটেনের টেনিস খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্যায় তালিকায় হান সপ্তম স্থান পেলেও তিনি কোন বড় রকমের টেনিস টুর্ণামেণ্টে আজ পর্যন্ত খেতাব পাননি। ইংল্যাণ্ডের ডেভিস কাপ দলে হান কখনও খেলেননি। গত বছরের মহিলাদের সিংগলস বিজয়িনী এবং এ বছরের ৬নং বাছাই খেলোয়াড় এ্যাঞ্জেলা মর্টিমার চতুর্থ রাউণ্ডে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভেরা সুকোভার কাছে পরাজিত হন। সুকোভা খেলোয়াড়দের নামের বাছাই তালিকায় কোন স্থান পাননি।

১৯৬২ সালের উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতাঃ প্রথম রাউণ্ডেই আমেরিকার বিলি জিন মোফিট (বামে) প্রতিযোগিতার এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথকে (ডানদিকে) পরাজিত ক'রে আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে রাতারাতি খ্যাতিলাভ করেন

কোয়ার্টার ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে যে আটজন খেলোয়াড় খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ছয়জন, স্পেন এবং মেক্সিকোর একজন করে খেলোয়াড়। কোয়ার্টার ফাইনালের এই আটজন খেলোয়াড়ের মধ্যে মাত্র এই চারজন বাছাই খেলোয়াড় ছিলেন—রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ১নং, নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) ৩নং, ম্যানুয়েল শান্তানা (স্পেন) ৬নং এবং বব হিউইট (অস্ট্রেলিয়া) ৮নং। বাকি খেলোয়াড় জন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া), মার্টিন মুলিগান (অস্ট্রেলিয়া), রাফেল ওসুনা (মেক্সিকো) এবং কেন্ ফ্লেচার (অস্ট্রেলিয়া) বাছাই তালিকায় কোন স্থান পাননি।

পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় যেমন অস্ট্রেলিয়া প্রাধান্য লাভ করেছিল তেমনি মহিলাদের সিঙ্গলস-কোয়ার্টার ফাইনালে আমেরিকার বেশী খেলোয়াড় খেলেছিল। মহিলাদের কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলেছিল আমেরিকার তিনজন এবং একজন করে খেলেছিল ব্রেজিল, বৃটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার খেলোয়াড়। মহিলাদের সিংগলস-কোয়ার্টার ফাইনালে আটজন খেলোয়াড়ের মধ্যে বাছাই খেলোয়াড় ছিল এই ছয়জন—ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) ২নং, মারিয়া বুইনো (ব্রেজিল) ৩নং, আর স্কুরম্যান (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৪নং, এ এস হেডন (বৃটেন) ৫নং, লেসলী টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) ৭নং এবং জে আর সুসম্যান (আমেরিকা) ৮নং।

নতুন রেকর্ড

১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত বিষয়ে নতুন রেকর্ড হয়েছে।

তিন সেটের খেলায় সর্বাধিক গেমের রেকর্ড : ৭৬ গেম। পুরুষদের সিঙ্গলসে রোজার টেলর (বৃটেন) এবং জে শেপার্সের (অস্ট্রেলিয়া) খেলায় এই রেকর্ড হয়। টেলর ৯—৭, ১৩—১১ ও ১৯—১৭ গেমে জয়লাভ করেন।

তিন সেটের খেলায় সর্বাধিক সময়ের রেকর্ড : সাড়ে তিন ঘণ্টা। পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় রোজার টেলর (বৃটেন) এবং জে শেপার্স (অস্ট্রেলিয়া) এই রেকর্ড করেন। প্রথম

চিলিতে অনুষ্ঠিত ১৯৬২ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ব্রেজিল দলের অধিনায়ক মাউরো 'জুল রিমে' কাপ হস্তে দণ্ডায়মান।

সেটের খেলায় সর্বাধিক গেমের রেকর্ড : ৪৬ গেম (২৪—২২ গেম)। নিকোলা পিয়েত্রাঞ্জলি (ইতালী) এবং নিকোলা পিলিকের (যুগোশ্লাভিয়া) দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় এই রেকর্ড হয়। নিকোলা পিয়েত্রাঞ্জলি ২৪—২২, ৬—২ ও ৬—৪ গেমে নিকোলা পিলিককে পরাজিত করেন।

সেমি-ফাইনাল

১৯৬২ সালের উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা নানা দিক থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পুরুষদের সিঙ্গলস সেমিফাইনালে কেবল অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার এই রকমের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য এই প্রথম। এ বছরের সেমিফাইনালের খেলায় চারজন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়ের মধ্যে আছেন দুই ভাই—নীল ফ্রেজার এবং জন ফ্রেজার।

আধুনিক কালের এই প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে দুই ভাইয়ের খেলার দৃষ্টান্ত নেই। সেমি-ফাইনালের চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে দু'জন আছেন বাছাই খেলোয়াড়—রড লেভার (১ নং) এবং নীল ফ্রেজার (৩নং)। অপর দুই খেলোয়াড় জন ফ্রেজার এবং মার্টিন মুলিগান খেলোয়াড়দের নামের বাছাই তালিকায় কোন স্থানই পান নি। চতুর্থ রাউণ্ডের খেলায় ২নং বাছাই খেলোয়াড় রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) পায়ের যন্ত্রণায় খেলা থেকে অবসর নিলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মার্টিন মুলিগান সৌভাগ্যক্রমেই চতুর্থ রাউণ্ডে [illegible] যোগ্যতা লাভ করেন। তবে মার্[illegible] কোয়ার্টার-ফাইনালে ৮নং বাছাই খেলোয়াড় বব্ হিউইটকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে উঠেছেন।

॥ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

আগামী ২৪শে আগস্ট থেকে জাকার্তায় চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠান আরম্ভ হবে। এই প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ মোট ৯টি ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জাকার্তাগামী ভারতীয় দল এইভাবে গঠন করা হবে—৭৪ জন খেলোয়াড়, ১৪ জন কর্মকর্তা এবং ১ জন পাচক। ৯টি ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতবর্ষের ৭৪ জন খেলোয়াড় এইভাবে দলভুক্ত হবেন: হকিতে ১৬ জন, এ্যাথলেটিক্সে ১৬ জন, মল্লযুদ্ধে ৭ জন, ভলিবলে ১১ জন, বাক্সিংয়ে ৪ জন, ওয়েট লিফটিংয়ে ৩ জন, ফুটবলে ১৬ জন, রাইফেল স্যুটিংয়ে ১ জন এবং টেনিসে ৪ জন।

॥ ফুটবল লীগ ॥

গত সপ্তাহে (২৫শে জুন থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টা খেলা হয়েছে—জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে ৮টা খেলায় এবং খেলা ড্র গেছে ৮টা।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আলোচ্য সপ্তাহে ২টো ম্যাচ খেলে দু'টো খেলাই ড্র করেছে। জর্জ টেলিগ্রাফ এবং হাওড়া ইউনিয়ন দলের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল গোলশূন্যভাবে খেলা ড্র করে। ফলে লীগের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মোহনবাগানের থেকে গত সপ্তাহে যে ২ পয়েন্টের ব্যবধানে অগ্রগামী ছিল বর্তমানে তা ১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, একটা ম্যাচ কম খেলে। মোহনবাগান আলোচ্য সপ্তাহে ২টো ম্যাচ খেলে ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। রাজস্থানের বিপক্ষে ১—১ গোলে খেলা ড্র যায়; খিদিরপুরকে ২—০ গোলে পরাজিত করে।

ইস্টার্ণ রেলওয়ের গত সপ্তাহে পয়েন্ট ছিল ১৭, ১৩টা খেলায়। আলোচ্য সপ্তাহে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ২—০ গোলে এবং বাটা স্পোর্টিং ১—০ গোলে ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলকে পরাজিত করেছে। গত বছরের রানার্স-আপ বি এন আর দল আলোচ্য সপ্তাহে ৩টে ম্যাচে খেলে একটা পয়েন্টও সঞ্চয় করতে পারেনি। এরিয়ান্স ৩—১ গোলে, জর্জ টেলিগ্রাফ ৩—১ গোলে এবং মহমেডান স্পোর্টিং ১—০ গোলে বি এন আর দলকে আলোচ্য সপ্তাহে পরাজিত করেছে। ফলে বি এন আর দল একটানা লীগের ৭টা খেলায় পরাজয় বরণ করলো। এরিয়ান্স গত সপ্তাহে ছিল চতুর্থ স্থানে। আলোচ্য সপ্তাহের ২টো খেলায় তাদের ১টা জয় এবং ১টা হার (রাজস্থানের বিপক্ষে) হয়েছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, [illegible] আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আপনার
সৌন্দর্য
NEKO
Germicidal Soap
PARKE DAVIS
ত্বকের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য
নিকো
আসল জীবাণুনাশক সাবান।
এটি পার্ক-ডেভিসের তৈরী
NAS. PD-60/62

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 13th July 1962.
40 Naya Paise.

প্রবাদবাক্যে বলে "তোর শিল তোর নোড়া, ভাঙ্গি তোর দাঁতের গোড়া"। কার্যতঃ দেখিতেছি যে পররাষ্ট্রের সহিত আদান-প্রদানে পণ্ডিত নেহরুর **'পঞ্চশীল'** প্রবাদের শিল-নোড়ারই মত ভারতের নিরাপত্তা চূর্ণ করিবার জন্য শত্রুপক্ষ দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে। বান্দুং আফ্রো-এশিয় সম্মেলনে এই নূতন পঞ্চশীল নীতি যখন পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক উচ্চারিত হয় তখন তাহার সমর্থনকারীদিগের অন্যতম ছিল চীন। তারপর চীন তাহার রাজ্য-লালসা চরিতার্থ করার জন্য বিনা দ্বিধায় কাশ্মীর ও আসামে হিমালয় সীমান্তের ভারতীয় অঞ্চল জবর-দখল করিয়া কিরূপে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে ও করিতেছে তাহা এখন সর্বজন-বিদিত। পণ্ডিত নেহরু বৎসর চারেক চীন সরকারের সহিত পঞ্চশীল নীতির আলোচনায় কাটাইয়া পরে দৃঢ় মনোভাব দেখাইয়াছেন, যদিও চীন সরকার এখনও সমানে আক্রমণাত্মক কাজ চালাইতেছে এবং উপরন্তু ভারতের অন্য এক শত্রুর সঙ্গে মিতালি করিয়া ভারত-ধ্বংসের চক্রান্ত পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করিয়াছে। এই চক্রান্ত সম্পর্কে ভারত বিগত ৩০শে জুন চীনের নিকট যে পত্র দিয়াছেন তাহার মধ্যে এই চক্রান্ত ও তাহার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে।

ঐ চীন-ভারত পত্র-ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে যে তথ্যাবলি সম্প্রতি (৬ই জুলাই) প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমরা একথার উল্লেখ পাই যে ভারতস্থ চীন রাষ্ট্রদূত বিগত ২৩শে মে ১৯৫৯ সালে নয়াদিল্লীতে ভারতের পররাষ্ট্রসচিবকে বলেন যে ভারতের ক্ষমতা নাই যে সে একযোগে দুই বিপক্ষের সহিত (চীন ও পাকিস্তান) মোকাবিলা করে। যে শব্দগুলি চীন রাষ্ট্রদূত ব্যবহার করেন তাহার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে দুই শত্রুর সামরিক অভিযান প্রতিরোধের ক্ষমতা ভারতের নাই। চীন রাষ্ট্রদূতের এই মন্তব্যের পর চীন-পাকিস্তান মিতালি প্রচেষ্টায় উক্ত দুই শত্রুর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি সেকথা আমাদের মত সাধারণ জনের কাছে অতি সহজ ও সরলভাবে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

চীনের নিকট প্রেরিত ভারতের ৩০শে জুনের পত্রে আমরা দেখি যে ভারত সরকার অভিযোগ করিয়াছেন যে চীন যে শুধু নিজে কাশ্মীরে আক্রমণাত্মক কাজ চালাইতেছে তাহা নয়, উপরন্তু সে পূর্বেকার দিনের কাশ্মীর সম্পর্কে নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটি আক্রমণকারী রাষ্ট্রকে (পাকিস্তানকে) আইনতঃ ও নীতিগতভাবে প্রোৎসাহিত ও প্ররোচিত করিতেছে ও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি করিতেছে।

বুঝিলাম যে এতদিনে নেহরু সরকারের মনে চীন সম্পর্কে কোনও দ্বিধা বা দৌর্বল্য নাই। চীন যে কিরূপ কুটিল ও প্রবল শত্রু সেকথা এতদিনে আমাদের কর্তৃপক্ষের বোধগম্য হইয়াছে। কিন্তু ৩০শে জুনে লিখিত ঐ পত্রে যে অন্য একটি আক্রমণকারী রাষ্ট্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে সেই বিপক্ষ সম্পর্কে কি নেহরু সরকারের এখনও কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় হয় নাই? সেখানে কি এখনও আমাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য প্রতিরক্ষার সকল ব্যবস্থা জলাঞ্জলি দিয়া ঐ পঞ্চশীলের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আকাশকুসুমের স্বপন দেখিতে হইবে?

পূর্ব ভারতে, বিশেষে আসাম অঞ্চলে, পাকিস্তানী মুসলমান ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করিতেছে। কত লোক এতাবৎ ঐরূপে অবৈধভাবে প্রবেশ করিয়াছে তাহা বলা কঠিন; কিন্তু শুধু ত্রিপুরাতেই তাহাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইবে এরূপ অনুমান অনেকে করিয়াছেন। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ সেই সঙ্গে ধরিলে এইভাবে অনুপ্রবিষ্ট লোকের সংখ্যা লক্ষাধিক হওয়া আশ্চর্য নয়। আবার এইরূপে দলবদ্ধভাবে যাহারা প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে তাহাদের আচরণে পূর্ব ভারতের নানা স্থলে দেশের প্রকৃত অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বলা বাহুল্য যে যাহারা এইরূপে অবৈধভাবে ভিন্ন রাষ্ট্রে প্রবেশ করে তাহারা শান্তশিষ্ট সজ্জন একেবারেই নয় বরঞ্চ অনাচারে অভ্যস্ত দুর্বৃত্তই তাহাদের মধ্যে বেশী। এবং একথাও বলা বাহুল্য যে এই বিপুল সংখ্যায় অনুপ্রবেশের কাজ পাকিস্তান সরকারের সুপরিকল্পিত সামরিক নক্সা অনুযায়ী হইতেছে। নাহিলে বনে জঙ্গলে চলায় অভ্যস্ত কয়েকশত সাঁওতাল ও রাজবংশী যেখানে সীমান্ত পার হইতে সজাগ পাকিস্তানী প্রহরার গুলিতে হতাহত হয়, সেখানে পাকিস্তানী মুসলমান অযুতের সংখ্যায় সীমান্ত লঙ্ঘন করে কেমনে?

ইহাদের প্রবেশে দেশ শুধু ভারাক্রান্ত হইতেছে নয় উপরন্তু দেশে পঞ্চমবাহিনী ও গুপ্তচরের আশ্রয়স্থল সৃষ্ট হওয়ায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিপন্ন হইতেছে—নিরাপত্তার কথা তো বলাই বৃথা।

ত্রিপুরার কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার ও দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রাখিবার জন্য এই অনুপ্রবেশকারীদিগের উচ্ছেদ ও বহিষ্কার আরম্ভ করিতেই পাকিস্তান সরকারী মহলে সোরগোল চলে—এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর আদেশে ঐ উচ্ছেদ-নীতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে! কিমাশ্চর্যং অতঃপরম্!

কবিতা ॥ ॥ কবিতা

প্রেমশূন্য

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভালোবেসেছিলাম একদা, তাও কি হাওয়ায়
ভেসে যাবে? তাও কি উৎপন্ন
করবে স্রোত? আমার চাওয়ায়
এবং প্রাপ্তিতে হবে ধন্য?
একী ভিখারীর ভিক্ষা নয়,
একী ভগ্ন ভঙ্গিমা তোমার—
ভূত, ভয়, অন্ধকার-হারা?
ভালোবেসেছিলাম একদা, তাও কি হাওয়ায়
ভেসে যাবে? তাও কি ফলতঃ প্রেমশূন্য?

প্রদোষে ফেরালে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

প্রদোষে ফেরালে যা নয় আমার
করতলে নভোতল!
আমি জানি নাই ঐ কি অপাপ,
নৌকায় ভরা জ্যোৎস্নায়—
ভেসে যায় দেখি আমার গোলাপ গোধূলিসকল
তোমার লালকমল!

কভু কি মেনেছি তোমার চোখের বিহ্বল,
এই স্মরণীয় চিহ্ন রইলো, কখনো
পোড়ো ভিটা পরে নিদাঘে ও নির্ঝরে
যদি রাখো ছল কোনো,
কোন্ ঘরে কতো রয়েছে শূন্য
ব'লে যেয়ো,—এই বাহিরে ও অন্তরে—
হে বিস্মরণ, এই জীবনের
সামান্য সম্বল।

হে প্রহর, পুষ্পরাজি

অনন্ত দাশ

শুধু প্রেম বুকে নিয়ে বেঁচে আছি নিরবধি কাল......
যে কোমল পুষ্পরাজি ফুটেছিল আমার উদ্যানে—
একক আনন্দে যত সম্মিলিত মুখের প্রবাল
তারা সব ভেসে যায়, ভেসে যায় আর্দ্র, সান্ধ্য গানে।
বিপুল আকাশে আজ বিরহিত সায়াহ্ন বিষাদ,
এলোমেলো চৈত্র হাওয়া এই ঘরে, ছাদে খেলা করে।
শেষপাখী উড়ে যায় ঠোঁটে নিয়ে পাণ্ডু অবসাদ,
হায় চাঁপা, গন্ধরাজ, বিদায়ের স্খলিত প্রহরে।

বিষাদিত অন্ধকার, দিকভ্রষ্ট নিঃসঙ্গ যৌবন,
এমন আকুল দিনে ফিরে এস দর্পিত প্রলয়ে।
এই রাত মুগ্ধ হোক, এ-প্রহরে উঠুক গুঞ্জন
অস্ফুট বেদনা বুকে ফিরে যাব দৈনন্দিন ক্ষয়ে;
উদ্যানে মর্মর ধ্বনি, চারিদিকে বিরহিত সুর।
হে প্রহর, পুষ্পরাজি, চলে যাও দূরে, বহুদূরে ।।

জৈমিনি

সম্প্রতি এক খবরে জানা গেল, কলকাতা থেকে নাকি মাছির বংশ লোপাট করে দেওয়া হবে। এ জন্যে একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত হ'য়েছে। তার কর্মকর্তারা অচিরাৎ কাজ আরম্ভ করবেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্য মাছির জন্মস্থান— শহরের আবর্জনাসংকুল জায়গাগুলো পরিদর্শন করবেন তাঁরা; তারপর হয়তো তৈরী করবেন রিপোর্ট; এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে একটা প্ল্যানিং: প্ল্যানিঙের ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ; এবং ......ইত্যাদি।

মাছির বংশ ধ্বংস হবে।

হয় যদি, তার চেয়ে সুখের আর কী আছে? কবি ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকে আমরা জেনে আসছি—

রেতে মশা দিনে মাছি,
এই নিয়ে কলকেতায় আছি।

সে ছড়াটি তাহলে অর্ধসত্যে পরিণত হবে, মশা থাকলেও মাছি থাকবে না। এবং মাছি থাকবে না বলে মাছিমারা কেরানীও বোধহয় থাকবে না। কিন্তু সে সবই ভবিষ্যতের কথা। তার আগে ঐ পরিদর্শন, রিপোর্ট, প্ল্যানিং, অর্থবরাদ্দ ইত্যাদি ধাপগুলো পার হ'য়ে আসা চাই। কাজেই—!

ইতিমধ্যে অবশ্য একটা বড় খবর জানা গেছে মাছির বিষয়ে। জানিয়েছেন ঐ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেরই জনৈক কর্মকর্তা।—

একজোড়া মাছিকে যদি অবাধে বংশবৃদ্ধি করতে দেওয়া হয় তাহলে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা দাঁড়াবে—১৯১, ০০০, ৩০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০। (সংখ্যাটি উচ্চারণ করতে অসুবিধে হ'চ্ছে নিশ্চয়ই? এটা হল—উনিশ লক্ষ দশ হাজার কোটি কোটি!)

এই জ্যোতির্বিজ্ঞান-সম্মত অঙ্কটির জন্যে ধন্যবাদ। এর দ্বারা আমি স্পষ্ট

বুঝতে পারলাম, ছোট জিনিসের জোর কতো বেশি। চার পাঁচ মাস সময়ের মধ্যে একজোড়া হাতির একটিও বংশবৃদ্ধি ঘটত না, কিন্তু মাছির বেলায় কোটি-কোটির খেলা। ঠিক যেন পারমাণবিক শক্তি!

ভাবতে অবাক লাগে, একদা যখন মানুষ বড় বড় পাথরের টুকরো দিয়ে শত্রুনিপাত করত তখন তার আয়োজন ছিল কতো বিরাট, অথচ সিদ্ধিলাভ ঘটত কতো সামান্য। তারপর সেই পাথরের যুগ পার হয়ে ব্রোঞ্জ-তামা-লোহার শিক্ষানবীশীর পর আজ সে আবিষ্কার করেছে শক্তির মূল রহস্য। ছোট্ট একটি পরমাণুর মধ্যে দেখতে পেয়েছে বিশ্ববিধ্বংসী ক্ষমতা। কিন্তু তার প্রতিপক্ষও এতদিন চুপ করে বসে নেই। প্রাচীন যুগের অধিবাসী সেইসব বিশালকায় ম্যামথ-ডায়নসর আজ ইহলোক থেকে বিদায় নিয়ে জাদুঘরে স্থান নিলেও, তাদেরই জায়গা নিয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মশামাছির দল। পার-মাণবিক যুগের 'পারমাণবিক' শত্রু! শক্তির সঙ্গে পাল্লা লড়ার জন্যে যেন এক নতুন শক্তির সমাবেশ!

বাস্তবিক, মাছি যে কী পরিমাণ শক্তিধর প্রাণী তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। কলেরা-বিস্তারের কথা ছেড়ে দিলাম, সে চিন্তা করুন যোগ্যতর ব্যক্তিরা, সাহিত্যিক হিসেবে মানুষের উপর মাছির মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের কথাই আমি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলতে চাই।

সকলেই জানেন, মাছি অতি বুদ্ধিমান প্রাণী। পশু জগতে যেমন শেয়াল, কীটজগতে তেমনি মাছি। একটা মাছিকে ধরবার চেষ্টা করে দেখবেন, শূন্য-মুঠিই ফিরে পাবেন বারে বারে। অথচ সেই মাছিটাই যদি ইচ্ছে করে (সত্যিই কোনো কোনো মাছি এমন ইচ্ছে করে!) তাহলে ঠিক আপনার নাকের ডগায় বারে

বারে বসে আপনাকে যৎপরোনাস্তি নাকাল করতে পারে। আর সত্যি, মশা বা মাছি মারতে কামান দাগার কথা অত্যুক্তির মতো শোনালেও, এসব সময়ে তেমন একটা অঘটন ঘটালেও যেন মনের জ্বালা মেটে না।

অবশ্য তার মানে এ নয় যে মাছি খুব গোঁয়ার প্রকৃতির জীব। বরং আমার মনে হয়, পরিহাস-প্রিয়তাই মাছির মজ্জাগত স্বভাব। আমি স্বচক্ষে দেখেছি আমাদের বাড়ির পোষা কুকুরটির সঙ্গে কয়েকটা মাছি দলবদ্ধভাবে কী প্রবল ইয়ার্কি'ই না শুরু করেছিল একদিন। এখানেও অবশ্য তাদের আক্রমণস্থল ছিল কুকুরটির নাকের ডগা। কুকুরটি ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধরে সামনের পা দিয়ে নাক মুছে মাছি তাড়াবার চেষ্টায় বিফল হ'য়ে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে হাঁ করে মাছি ধরবার জন্যে হাওয়া কামড়াতে লাগল পাগলের মতো। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, কুকুরটাকে নিয়ে খেলা করাই ছিল মাছিগুলোর একমাত্র আনন্দ!

জানিনে, আমরা যারা এখন মাছির বংশ ধ্বংস করার জন্যে দ্বিতীয় চাণক্যের মতো উঠে-পড়ে লেগেছি, তাদের জন্যেও মাছিরা কী ঠাট্টা জমা রেখেছে ভবিষ্যতের দিনগুলোতে।

মাছিরা কলকাতার আদিম অধিবাসী। মানুষ আসার আগে থেকেই তারা বাস করছে এখানে। এ শহরের মানুষদের তারা বংশপরম্পরায় চেনে। যে কোনো নতুন জিনিস নিয়ে এই মানুষগুলো কেমন শিশুর মতো মেতে উঠতে পারে তা যেমন মাছিরা জানে, তেমনি জানে সেই মানুষদের মজ্জাগত বুদ্ধের ঔদাসীন্য—আরম্ভ করে শেষ করার ক্ষমতার অভাব। কাজেই—

কাজেই আর কী! মাছিদের পাখা আছে। সম্মুখ যুদ্ধে সামান্য কিছু হতাহত হবার পরই তারা বিমানবাহিনীর সহায়তা ছাড়াই আত্মগোপন করবে নিরাপদ দূরত্বে। তারপর, শহরবাসী আমরা যেহেতু অসংশোধনীয় রকম নোংরা, আমাদের পৌর প্রতিষ্ঠান যেহেতু ক্রনিক বিশৃঙ্খলার পীঠস্থান, সেইহেতু নতুনত্বের টাটকা উত্তেজনা থেমে গেলেই আবার তারা ফিরে আসবে পরম আহ্লাদে। এবং প্রতি জোড়ায় উনিশ লক্ষ দশ হাজার কোটি কোটি করে বংশবৃদ্ধি করে সংখ্যাবিজ্ঞানীর চিন্তার খোরাক জোগাবে।

অবশ্য ইতিমধ্যে কাজ যা হবার তা হবেই। তদন্ত, কমিশন, প্ল্যানিং, বাজেট ইত্যাদি চলবেই। অফিসার, এক্সপার্ট, ফাইল ইত্যাদিও বাড়তে থাকবে। এবং আরো বাড়বে কেরানী। মাছি যা মারার মারবে তা শুধু তারাই! কিন্তু বাস্তবের মাছি, যে মাছি মহামারী ছড়ায়, তার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটবে না তাতে। ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকে একেবারে আমাদের ঈশ্বরপ্রাপ্তির সময় পর্যন্ত এই কালজয়ী মাছির সঙ্গেই অশান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেই জীবন কাটাতে হবে আমাদের। কলকাতার ঐতিহ্য অটুট থাকবে!

কর্মযোগী বিধানচন্দ্র

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

এমন শূন্যতা বাঙালীর জীবনে কখনও অনুভূত হয়নি। কখনও এমন হতাশাজড়িতকণ্ঠে আবালবৃদ্ধ সকল বাঙালীকে বলতে শোনা যায়নি—আর কেউ রইলো না। সংখ্যাতীত সমস্যা-জর্জরিত এই খণ্ডিত প্রদেশের কয়েক কোটি মানুষ যে অসাধারণ ব্যক্তির অনুপ্রেরণায় আবার নতুন করে জাগার, নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছিল, মহাকালের আর এক নির্মম আঘাতে তা যেন মৃত্যুতে নিঃস্ব হয়ে গেল। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প ও বাণিজ্যের যে জাতীয় সত্তা গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতা অর্জনের পরে, মহানায়ক কর্মযোগী বিধানচন্দ্রের অভূতপূর্ব উদ্যোগে ও শ্রমে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে এমন সাফল্য আর একজন বাঙালীও অর্জন করেছেন কিনা সন্দেহ। বিধানচন্দ্রের কাছাকাছি হয়ত একে একে এসেছেন দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, নেতাজী, শ্যামাপ্রসাদ। তাঁদেরও আগে এসেছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের আপনাপন আলোকপ্রতিভার উজ্জ্বলে ভাস্বর উঠেছে বাঙলার দিগন্ত। সে আলোক উদ্ভাসিত করেছে ভারতকে, করেছে বিশ্বকেও। বিধানচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে অনুসরণই করেছেন তাঁদের, কিন্তু তথাপি

জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে অসাধারণ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে গেলেন তিনি তা সত্যই অনন্য, অতুলনীয়। চিকিৎসা, রাজনীতি, সমাজসেবা, শিক্ষা, শিল্প-বিস্তার—সকল ক্ষেত্রেই বিধানচন্দ্র ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী যুগনায়ক, নবীন উদ্যোগীর বলিষ্ঠ অনুপ্রেরণা।

জন্ম ও শিক্ষা

আশী বছর আগে যশোহর-রাজ প্রতাপাদিত্যের বংশে বিধানচন্দ্রের জন্ম। পিতা প্রকাশচন্দ্র কর্মজীবনে ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ধর্মজীবনে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের একনিষ্ঠ অনুগামী। ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধা-বিভক্ত হওয়ার পর কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় নব-বিধান সমাজ। আশী বছর আগে ঐ সমাজ প্রতিষ্ঠাকালেই ভূমিষ্ঠ হন বিধানচন্দ্র। তাই নব-বিধানের নামানুসারে প্রকাশচন্দ্র পুত্রের নাম রাখেন বিধানচন্দ্র।

বিধানচন্দ্রের শৈশব ও ছাত্রাবস্থা পাটনাতে অতিক্রান্ত হয়। ১৯০১ সালে বি-এ পাস করার পর তিনি আসেন কলকাতায়, ইঞ্জিনীয়ার বা ডাক্তার যা হ'ক কিছু একটা হওয়ার আশায়, এই উদ্দেশ্যে মেডিক্যাল কলেজ ও শিবপুরের বি-ই কলেজ দুই জায়গাতেই দরখাস্ত পেশ করেন তিনি এবং প্রতিভাবান ছাত্রের আবেদনে সাড়া আসে দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই। কিন্তু আগে উত্তর আসে মেডিক্যাল কলেজ থেকে তাই সেখানেই ভর্তি হয়ে যান। ১৯০৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল-এম-এস পাস করেন তারপর ১৯০৮ সালে প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতেই আবার অর্জন করেন এম-ডি ডিগ্রী। এরপর বিধানচন্দ্র প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এবং তারজন্যে বেশ কিছুকাল জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াতে হয় তাঁকে। ১৯০৯ সালে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিধানচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন এবং সেখানেও প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপে ১৯১১ সালে অর্জন করেন দুর্লভ এম, আর, সি, পি ও এফ, আর, সি, এস ডিগ্রী। এর মধ্যে প্রথম পরীক্ষাটিতে তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেন। এগারো সালেই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে এসিস্টান্ট সার্জন ও শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। ১৯১৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিধানচন্দ্রের এই সম্পর্ক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯১৯ সালে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের পদে ইস্তফা দিয়ে বিধানচন্দ্র কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

রাজনীতিতে প্রবেশ

রাজনীতিতে বিধানচন্দ্র প্রবেশ করেন ১৯২২ সালে। বাঙলার রাজনীতির তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ঐ মহান নেতার উজ্জ্বল অনুপ্রেরণাই বিধানচন্দ্রকে আকৃষ্ট করে তৎকালীন রাজনীতিতে। ১৯২৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর ডাঃ বিধানচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের এক স্মরণীয় দিন। ঐদিন স্বরাজ্যদলের সমর্থিত প্রার্থীরূপে ২৪ পরগণা মিউনিসিপ্যাল অমুসলমান নির্বাচন কেন্দ্রে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থাপকসভার বাজেট অধিবেশনে তিনি সর্বপ্রথম বক্তৃতা দেন। ঐ বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব-পর্ষদেরও তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৫ সালে তিনি স্বরাজ্যদলে সদস্যরূপে যোগ দেন। ঐ বছরেই ১৬ই জুন দেশবন্ধু পরলোক-গমন করেন। দেশবন্ধু সম্পাদিত ট্রাস্টডীডের তিনি ট্রাস্টী নিযুক্ত হন। দেশবন্ধুর বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত হয় চিত্তরঞ্জন সেবাসদন এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র হন তার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ১৯২৭ সালে স্বরাজ্যদলের পক্ষ হতে তৎকালীন বঙ্গীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় ডাঃ বিধানচন্দ্র তার অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৯ সালে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য মনোনীত হন, ঐ বছরেই লাহোরে কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন।

১৯৩০ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন। ঐ বছরেই মহাত্মাজীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী লবণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র তাতে যোগদান করেন। নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তিনি উপস্থিত হন এবং তারপরেই গ্রেপ্তার ও ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মুক্তির পর ১৯৩১ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নিযুক্ত হন। তিনি মেয়র থাকা-কালেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বৎসর বয়সপূর্তি উপলক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশন কবিকে বিশেষভাবে সম্মানিত করে। ১৯৩২ সালে ডাঃ রায় দ্বিতীয়-বারের জন্য মেয়র নির্বাচিত হন। ঐ সময় কর্পোরেশনের পক্ষ হ'তে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকেও দ্বি-সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধিত করা হয়। ১৯৩৯ সালে গান্ধীজীর অনুরোধে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তারপর মহাযুদ্ধ শুরু হয় এবং এই সময় কংগ্রেস-অনুসৃত নীতি তাঁর মনোমত না হওয়ায় সাময়িকভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে ডাঃ রায়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। তিনি শিক্ষা ও সমাজসেবা-মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪১ সালে বর্মা-প্রত্যাগত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য তাঁর উদ্যোগে বেঙ্গল সিভিল প্রোটেকশন কমিটি গঠিত হয় এবং মৌলানা আজাদের অনুরোধে তিনিই তার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজী যখন আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় একুশ দিনের জন্য অনশনব্রত উদ্‌যাপন করেন সে সময় তিনি জাতির জনকের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকেন।

১৯৪২ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন, এবং ১৯৪৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টর অফ সায়েন্স' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯৪৬ সালে কলকাতার কুখ্যাত দাঙ্গায় দুর্গতদের সেবাকার্যে তিনি এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডাঃ বিধানচন্দ্র উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। কিন্তু সেপদ তিনি গ্রহণ করেন না। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচক মণ্ডলী হতে বিনাবাধায় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অল্পদিন পরেই তিনি কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং তারপরেই হন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং সেপদে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর আশা ছিল, আগামী পাঁচ বছরে এই মহান জননায়কের সুনিপুণ পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাতীত সমস্যার সুসমাধান ঘটবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল, তাই বিধানচন্দ্রের জন্মদিনে সারা দেশ যখন উৎসবমুখর তখনই এই ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রচারিত হ'ল যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, কর্মযোগী বিধানচন্দ্র অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১২টা ৩ মিনিটে পরলোক-গমন করেছেন। ব্যথায় বিহ্বল-বিমূঢ় বঙ্গবাসীকে শুনতে হল, যে বিশাল বট-বৃক্ষের নিরাপদ ছায়ায় এতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল তারা, মহাকালের নিষ্ঠুর আঘাতে অকস্মাৎ তা অন্তর্হিত হয়েছে। এই শোকের সান্ত্বনা নেই। তবুও ব্যথাতুর হৃদয়ে আমরা লোকান্তরিত পুরুষসিংহের প্রতি আমাদের বিদায়-প্রণতি নিবেদন করছি। তাঁর কীর্তিময় উজ্জ্বল জীবন আমাদের ভবিষ্যৎ চলার-পথে দিগদর্শন করুক, ভারত ভাগ্য-বিধাতার কাছে এই আমাদের একান্ত কামনা।

জয়ন্তী ও জন্মের ইতিহাস

কালিদাস দত্ত

অফিস থেকে বেরুবার মুখে কথাটা আবার মনে হল সতীনাথের। জুতোর সেই অভদ্র কাঁটা পেরেকটা এই দ্বিতীয়বার বিঁধল গোড়ালিতে। পা নিজেকে সংকুচিত করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। সম্ভব না। আশেপাশে তাকিয়ে দেখল—ইঁটের একটা টুকরো মেলে কিনা। না, অফিস-পাড়ার পথ-ঘাট মোটামুটি পরিষ্কার, উপরে মালিন্য থাকে না। ভিতরে হলে আগের মতই আবার পেপার-ওয়েট দিয়ে ঠুকে নেওয়া চলত। অনেক দিনই এইভাবে সে মুচিকে ফাঁকি দিতে পেরেছে।

শ্রাবণের বৃষ্টি হয়ে যাওয়া ঝাঁ-ঝাঁ-রোদ—আকাশ। পশ্চিমমুখো কিছুটা এগিয়ে বাস-স্ট্যান্ড। অবনত সূর্য শেষবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখে নিচ্ছে। চোখ রাখা যায় না। চশমার ওপর হাতের কার্ণিশ বানিয়ে প্রায় খোঁড়াতে থাকল সতীনাথ। পা কিছু না। কিন্তু মনটা সে কিছুতে স্থির করতে পারছে না। ঠিক করতে পারছে না, হরলিক্স শেষ-পর্যন্ত কিনবে, কি কিনবে না।

অফিসে এতক্ষণ ফাইলের অরণ্যে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে সংসারের নিষ্ঠুর রৌদ্রকে আড়াল দিয়েছিল। এইবার যন্ত্রণাকে ঠেকাবার পথ নেই। ফাইল নেই, ফিগার-স্টেটমেণ্ট নেই। এইবার সব কথাগুলি নতুন করে তীব্র ছায়াছবির রূপ নিচ্ছে। কিন্তু সতীনাথের দোষ কি? সব দোষ তো সুষমার।

বাস-স্ট্যান্ডে পৌঁছেও মনটা স্থির হল না, সিদ্ধান্ত নেওয়া গেল না। মাইনে আজ পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু—

: এই মিস্ত্রি, এই জুতাকা অন্দরমে পেরেকটা একটু ঠুকে দাও তো। কেবলই ফুটছে।

জুতো সারিয়ে সতীনাথ উত্তরমুখো এগুলো। ময়দানের দিকে। একটু হাওয়া খেয়ে যাবে। না, হরলিক্স সে কিনছে না, কিনতে যাচ্ছে না। বাড়িও যাবে না এখন। বাড়ি তো একটা অগ্নিকুণ্ড। নিরানন্দ নিকেতন। কি সুখ আছে সেখানে? কে আছে তার? না, কেউ তার ছেলে-মেয়ে নয়, সুষমা তার স্ত্রী নয়। এবং সে নিজে মানুষ নয়।

সাধারণতঃ যেদিন মাইনে হয় সেদিন সতীনাথ দোকান থেকে কিছু একটা কিনে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে। সঙ্গে টাকা নিয়ে ঘোরায় ঝুঁকি অনেক। কিন্তু আজ আর বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই। পৃথিবীর আঁকিবুঁকি মানচিত্র থেকে আজ যদি ওই বাড়ির অবস্থিতিটুকু মুছে যেত, আঃ, যদি অবলুপ্ত হয়ে যেত! শুধু মিনুরাণীকে বাদ দিয়ে। লক্ষ্মী মেয়ে। মিনু ছিল বলেই সে সকালে ভাত খেয়ে অফিসে এসেছে নতুবা অন্য কারুর কথায়ই খেত না। সুষমার কথায় অবশ্যই নয়। অফিসে যদিও সে বেশি করে টিফিন খেত, খরচ বাড়ত, তবু নয়।

কাপড়ের খুঁটে গিঁট বেঁধে সাবধানে তলপেটের কাছে বেঁধে রেখেছে নোট-গুলো। বরাবরই এই অভ্যাস। সাবধানের মার নেই। হাত বুলিয়ে অনুভব করল।

না. ঠিক আছে। খোয়া যায়নি, ওখান থেকে খোয়া যায় না।

সে আর ভাববে না, আর ভাবা চলে না। অন্ততঃ সুষমার ওই কথার পর কোন ভদ্র-রক্তবাহী পুরুষই আর সংসার-ধর্ম পালন করতে চাইবে না। সতীনাথ সিদ্ধান্ত করল, সে নিশ্চয়ই ভদ্র-রক্তবহন-কারী পুরুষ।

ময়দানে কেল্লার সামনের উঁচু ঢিবি মতন জায়গায় বসল সতীনাথ। জায়গাটা নির্জন। এই নির্জনতাই সে চায়। মনে হল, একটু যেন খিদে পেয়েছে। একটু না, প্রচণ্ড। না, মোটেও পায়নি। ওটা নিতান্তই অভ্যাস। এতক্ষণ সে বাড়ি পৌঁছত। একটু চা, একটু সুজি-টুজি আসত। আজ আসেনি। না আসুক। পয়সা দুই বাদাম কিনলে কেমন হয়? বাদামে নাকি খিদে মরে। অনেকদিন সে বাদাম খায় না।

অফিস-ফেরতা কিছু তরুণ-তরুণী ময়দানে এক চক্কর দিয়ে যাচ্ছে। একটু বুঝি তাজা হাওয়া গিলে নিচ্ছে। ঘুপচির অন্ধকারে কোনমতে নিঃসঙ্গ রাত কাটিয়ে আবার তো সকালেই হাজিরা দিতে হবে অফিসে। অবশ্য, অফিসটা অনেকের কাছেই বাড়ির চাইতে ভালো। বেশ একটা ক্লাব-ঘর। কাজ-কাজ খেলা, হরলিক্স কয়লা এসব নেই।

বাদামঅলা সুদূরের এক জোড়া বায়ু-সেবীর দিকেই যাচ্ছিল। নিঃসঙ্গ সতীনাথকে চোখে পড়েনি, পড়ে না। সতীনাথ রাগ করতে গিয়েও রাগ দমন করল। ডেকে চার পয়সার বাদাম কিনল, বলল, ওরা ক'পয়সার কিনে গা?

ঃ কেরা বাবুজী?

ঃ পয়সা ধরো।

খোলা ভেঙে একটা বাদাম মুখে দিতে গিয়ে চকিতে মনে পড়ল সুষমাও বাদাম ভালোবাসে। কতদিন আনতে বলেছে। আঃ, কেন যে মনে পড়ল। ভালোবাসে, তাতে আমার কিছু না। সুষমা আমার কেউ না। মিনুর কথা মনে পড়ল। হাতের ছাড়ানো দানা মুখে ফেলল না, দূরে অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল। এগুলি মিনুর স্মরণে। ইচ্ছে হল, পকেটে রেখে দেয়, অভ্যেস নেই, খেলে উদর বিদ্রোহী হতে পারে। যাঃ, কী সব ছেলেমানুষী যুক্তি। এত দুঃখেও সতীনাথ হেসে ফেলল। তারপর হাসা উচিত নয় ভেবে বাদাম ছাড়িয়ে খেতে লাগল। মিনুর জন্যে (সুষমার জন্যে নয়ই) গোটা কয়েক বাদাম রেখে দেওয়া উচিত কিনা ভাবতে ভাবতে সে বাদামগুলো সব ফুরিয়ে ফেলল।

সকালে যে ঘটনাটা ঘটল, সতীনাথ তার জন্যে দায়ী নয়। সুষমাই দায়ী। আজকাল সদাসর্বদা সে সতীনাথকে ঠেস দিয়ে কথা বলে, যেটা ভদ্ররুচির পরিচয় নয়। মাত্রা ছাড়িয়ে অপমান করে, যেটা সুশিক্ষার ফলশ্রুতি নয়। এই যে কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে সতীনাথ তার স্বামী, সুষমার আচরণে তার বিন্দুমাত্র আভাস মেলে? কি দরকার ছিল সকালবেলায় অমন ঝংকারের? একটা কটু আঘাতে সেতারের সবকটা তার আঁতকে ছিঁড়ে গেল। অবশ্য পিণ্টু কিছুটা দায়ী। সাত মাসের অতটুকু শিশুর কণ্ঠে কী অসম্ভব শক্তি। যৌবনে টুইশন করতে গিয়ে প্রায়ই একটা কথা সে বলত। "এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়"। ছাত্রদের নয়, ছাত্রী হলে বলত, ঠাট্টা করত। চড়া গলা হলেই বলত। আজ মনে পড়ল। সেই সব অপমানিত ছাত্রীরা শিশু হয়ে, স্ত্রী হয়ে আজ শোধ নিচ্ছে। শান্তিপ্রিয় সতীনাথকে এতটুকুও কৃপা করছে না।

সকালে বৃষ্টি পড়ছিল টিপটিপ করে। রাত্রে ঘুমোট গেছে অসম্ভব। ঘুম মোটে হয়নি। তারপর পিন্টুকে সামলাতে সুষমার সারারাত কেটেছে। একবার এপাশ, একবার ওপাশ। দশবার তক্তাপোষ থেকে নিচে নামা, মশারি তুলে, মশা ঢুকেছে। নড়বড়ে তক্তাপোশ সারারাত দুলেছে দোলনার মত, সশব্দে। ঘুম হয় কারুর এর মধ্যে? সকালের দিকে তাই একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, কেননা বৃষ্টি হচ্ছিল। তন্দ্রার আমেজ যেটা কার্বন পেপারের মত কালো, নরম, একটা তীর বিঁধে চকিতে এফোঁড়ওফোঁড় হয়ে গেল।

ঃ সাতদিন ধরে পই পই করে বলছি হরলিক্স এনো একটা। বুক আমার ছিঁড়ে যাচ্ছে। কথাই কানে যায় না কারুর। যেন আমি খাব—

কোলের শিশুটি রবার চুষছিল। বায়ুশূন্য বেলুনের রবার। খাদ্যবস্তু কিছু জিভে আসুক বা না আসুক সে চুষছিল। বিরক্তিতে তার মাথাটা ধাক্কা দিয়ে সরাল সুষমা। বোতল থেকে ছিপি খোলার মত একটা ভোঁতা থ্যাতলানো শব্দ হল। মুহূর্তের জন্য অনিচ্ছুক অসহায় দুটি ঠোঁট কি খুঁজল চোখ বুজে, হাত-ড়াল এবং না পেয়ে তারস্বরে কঁকিয়ে উঠল পাড়া মাথায় করে। সুষমা তৈরীই ছিল। ঠাস্ ঠাস্ করে গালে, মুখে, নাকে ঘাতকের মত কতগুলো চড় চাপড় কষিয়ে তাকে মেজেয় ছুড়ে দিল। তীক্ষ্ণ, কান্না-ধোয়া কণ্ঠে শাসন করল, ফের যদি ছেলে তুমি কাঁদবে, শানে আছাড় দিয়ে শোধ দেব তোমাকে। কী হাতেই পড়েছি, হাড় কালি হয়ে গেল—

এরপর যে কথাটি সুষমা বলল তা কোন ভদ্রলোক বলে না। ভদ্রতার, সৌজন্যের শেষসীমা ডিঙিয়ে সেটা একটা অমানবিক অপমান। একটু দম নিয়ে সুষমা তার বক্তব্য শেষ করল এইভাবে ঃ আসিস্ কেন উদরে? কে চায় তোদের? খাওয়াবার কড়ি নেই, আদরের গোঁসাই—

ততক্ষণে সতীনাথ উঠে বসেছে। আর শুয়ে থাকা যায় না। তাকে অসময়ে ওঠানর জন্যেই কি এত কাণ্ড নয়? আর, এইভাবেই কি তার অবশিষ্ট স্বল্প আয়ুর আর একটি সকাল এল। অথচ, কুড়ি পঁচিশ বছর আগে অদূরের ঐ রুদ্র অগ্নিমূর্তিই কি তার মধুকণ্ঠী, মুগ্ধা, ষোড়শী, প্রিয়তমা বৌ ছিল না? গভীর আবেশে চোখ বুজে, গলায় নাক ঘষে, আদরের প্রত্যুত্তরে আদর জানাত না, শিহরণ দিত না? নাকি, সে ছিল অন্য কেউ। কে হরণ করল তাকে, সময় না আর কিছু?

ঠন্ করে আঁচল থেকে মেজের একটা আনি ছুঁড়ে দিল সুষমা। বললে, মিনি, চার পয়সার বার্লি নিয়ে আয় ছুটে। দেরি হলে তোমায় খুন করব।

বেচারী মিনু। তেরো বছরের অপুষ্টাঙ্গী মিনু। দুই দিদির অকালে বিয়ের পর এবার সে ফ্রক পেরোই পার হওয়ার অপেক্ষা করছে। মিণ্টু, সণ্টু, বুলো ওরা সব ছোট। কিছুই বোঝে না। মিনু বোঝে। মায়ের এই অগ্নিমূর্তির কাছাকাছি থাকা নিরাপদ নয় বুঝে তক্তা-পোশের তলায় সে বই খুঁজছিল এতক্ষণ। গুটি গুটি বেরিয়ে এসে আনিটা কুড়িয়ে নিল।

ঃ যাও, এখন বৃষ্টিতে ভিজে বার্লি নিয়ে এসো। যদি তোমার জ্বর হয়, রাস্তায় টেনে ফেলে দিয়ে আসব। আশ্চর্য! সাতদিন ধরে বলছি একটা হরলিকস এনো, গ্রাহ্যই নেই কারুর।

দৃশ্যশেষে সুষমা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। বোধ হয়, রান্নাঘরেই গেল। চা করে পাঠাবে মিণ্টুর হাতে। তা পাঠাক, তাতে অপরাধের কিছু স্খালন হয় না। সতীনাথ শুধু থরথর একটু কেঁপে

উঠতে চাইল রাগে। পারল না। কোন উত্তরই সে দেয়নি। উত্তর দিতে দুঃখ হয়েছে, সবচাইতে বেশি হয়েছে ঘৃণা। সুষমা যে এতটা ছোটলোক, এতদিন জানত না সতীনাথ। ছোটরা না-ই বুঝুক, মিনু বোঝে। পাশের ঘরের আই-এ ফেল-করা ছেলে শিবনাথ বোঝে, সে নিশ্চয়ই ট্যুইশনে এখনো বেরোয়নি। একটা ভীষণ শাস্তি দিতে ইচ্ছে হল, এবং ইচ্ছেটা পূরণের কোন পথ না পাওয়ায় কেমন যেন শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করল।

শেষে অফিসে না খেয়ে গিয়েই কিঞ্চিৎ শাস্তি দেওয়া যায় ভেবে স্নান করে না খেয়েই জামা জুতো পরে হাঁটা দিয়েছিল সতীনাথ। মনে মনে অবশ্যই সন্দেহ ছিল, সেই সুষমা এখন আর নেই যে অভুক্ত সতীনাথের কথা ভেবে দুপুরে না খেয়ে কাঁদবে। এখন দিব্যি খাবে, দুজনের খাবার একজনে খাবে, শুধু সে নিজেই বোকার মত না খেয়ে চলল সারাদিন অফিস ঠেঙাতে। বোকামি, স্রেফ বোকামি। কিন্তু পা যখন বাড়িয়েছে তখন ফেরা যায় না। মিনুই বাঁচাল। ছুটে এসে দুহাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল : তোমার পায়ে পড়ি বাবা, দুটি খেয়ে যাও বাবা। নইলে আমরা কেউ খাব না, চান করব না। শুধু শুধু কেন রাগ করছ বাবা? আমরা কি তোমায় কিছু বলেছি? তোমাকে কি আমরা দুঃখু দিই? তবে?

জুতোটা খুলে সতীনাথ খেতে বসেছে। রাগ করে কম খায়নি। প্রতিদিনের মতই খেয়েছে। মিনু রোজ মসলায় ডিবে এগিয়ে দেয়। আজ সুষমা লবঙ্গর কৌটোটা এনেছে নিজে নতুন বৌর মত মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে। নরম সুরে বলেছে, মিনু, কৌটোটা পকেটে দিয়ে দে। আর, একটা হরলিক্স আনতে বলে দে বাবাকে। মনে করে যেন আনে। আজ তো মাইনের তারিখ!

পাশেই উবু হয়ে বসে জুতোর ফিতে বাঁধছিল সতীনাথ। মিনু দুজনের মাঝে। সতীনাথও মিনুকেই সংবাদবাহক নির্বাচন করল। বললে, তোর মাকে বলে দিস, মিনু, মার্চেন্ট অফিসে মাইনের তারিখের ঠিক থাকে না। আজ মাইনে হবে না।

তারপর গট গট করে বেরিয়ে পড়েছে পথে। নিজেকে অনেকটা হাল্কা মনে হয়েছে জবাবটা ঠিকমত দিতে পেরে। তবু থেকে থেকেই সকালের সেই কথাটা মনে হয়েছে। অপমানকর সেই উক্তিটি। মেয়েমানুষের মুখে ওকথা শোভা পায় না। পুরুষকে ওভাবে আঘাত দিতে নেই।

মাইনে অবশ্য আজ হয়েছে। এবং সতীনাথ জানত, আজই হবে। তা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। তিরিক্ষি মেজাজে অপমানকর ভাষায় সুষমা হুকুম করলেই যে নতমস্তকে সতীনাথকে তা পালন করতে হবে এমন কোন আইন নেই। অপমানের যন্ত্রণাই মানুষের দুঃসহতম যন্ত্রণা। সুষমা তাকে, তার পৌরুষকে অশ্লীলতম ভাষায় অপমান করেছে। তার শাস্তি পাওয়া উচিত, ঠিক কি শাস্তি যদিও সে এই মুহূর্তে ভেবে পেল না, তবু একটা উচিত শাস্তি তার পাওয়া দরকার।

দূরে মনুমেন্ট ছাড়িয়ে রাস্তার ওপারে নানা রঙের নিয়নবাতিতে বিজ্ঞাপনগুলো জ্বলছে চোখ মটকিয়ে লিপস্টিক-রাঙানো ঠোঁটের চটুল হাসির মত। চোখে না পড়ে উপায় নেই। সুষমাকে যদি অমনি ওখানে লটকে দিয়ে পৃথিবীসুদ্ধ লোককে দেখিয়ে বলা যেত, "এই দ্যাখো, সেই সুষমা—" তবে বোধ হয় কিছুটা ওর শাস্তি হত, সতীনাথ কিছুটা শান্তি পেত।

সতীনাথ উঠে পড়ল। জায়গাটা অন্ধকার হয়ে গেছে এবং নির্জন। কচিৎ দূরে এক আধ জোড়া ছেলেমেয়ে মুখোমুখি গল্প করছে। করুক। কিছুদিন ওরা ভাগ্যবান থাকবে। কিন্তু জায়গাটা এখন আর নিরাপদ নয়। সঙ্গে টাকা আছে।

হাঁটতে হাঁটতে মনুমেন্ট পিছনে রেখে রাস্তা ক্রশ করে সতীনাথ ফুটপাতে উঠল। অসম্ভব ভিড়। রং-এর ছড়াছড়ি। ধাবমান যৌবন, রং, রামধনু। এই জীবন, রাত্রি।

সামনেই একটা ভ্যারাইটি স্টোর্স। সেল্‌স্‌ গার্লটিকে দেখা যাচ্ছে। বেশ সুশ্রী। প্রসন্নমুখে কী ভয়ংকর দ্রুততায় সঙ্গে কাজ করছে। কাস্টমারদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে ওরই ফাঁকে চোখ তুলে। সুষমা হলে পারত? সে শুধু শিখেছে ঈপ্সাতে অগ্নিবাণ ছুঁড়তে, ঠেস দিয়ে পিত্তিনাশ করতে।

দোকানের সিঁড়িতে পা বাড়িয়েছিল সতীনাথ, কিন্তু,—না, হরলিক্স নয়, একটা ব্লেড কিনবে।

দোকান থেকে গটমট করে নেমে রাস্তার ভিড়ে মিশে গেল সতীনাথ।

বাড়ি যখন ফিরল তখন শহরতলীতে সন্ধ্যে উৎরে গেছে। মাইনের দিন সতীনাথ সাধারণতঃ হাতে করে কিছু কিনে নিয়ে আসেই। সেইসঙ্গে নিজের জন্যে

এক প্যাকেট ভালো সিগারেট। যৌবনের এই একমাত্র বিলাসিতাটি ফসিল আকারে এখনও রয়ে গেছে। তারপর সারা মাসই দিনে গুণে পাঁচটার বেশি বিড়ি খায় না। আজ সেই শখের সিগারেটও কেনেনি।

শুকনো চিন্তিত মুখে উঠোনটুকু পার হয়ে ঘরে ঢুকলো সতীনাথ। বাস থেকে নেমে পাড়ার মুখেই নতুন দাশগুপ্ত ব্রাদার্সের স্টেশনারি দোকান থেকে কিনবে কিনা ভেবেছিল। দাম একটু বেশি নেবে, তা হোক। সুষমাকে শাস্তি দিতে গিয়ে মিন্টু কষ্ট পাবে ভেবে এক পা এগিয়েও ছিল সে। কিন্তু মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ইস্, কেন? ওই নোংরা কথা উচ্চারণ করার পরও সুষমার কথাই থাকবে—এ হয় না। এতে লাই পাবে, এতদিন পেয়েছে। তাই আজ তার এত সাহস। মিন্টু একদিন হরলিক্স না খেলে মরবে না, মায়ের পাপ সন্তানে বর্তায়, সতীনাথ কি করবে।

ঘরে ঢুকে আজ আর সংগে সংগে জামাটা খুলে জানলায় ঝোলালো না। জামাপরা অবস্থাতেই চৌকিতে বসল। চিন্তা করছিল। ভয়ও হচ্ছিল। ভয়কে দমন করতে গিয়ে মুখটা রুক্ষ হয়ে উঠেছিল।

সুষমা কি একটা কাজে ঘরে এসে আবার রান্নাঘরে ফিরল। মুখটা থমথমে। ঝড় ওঠার পূর্বলক্ষণ। নিশ্চয়ই দেখেছে সতীনাথের হাত খালি। দেখুক। সতীনাথ আজ আর কিছু পরোয়া করে না। এই সে বসে আছে। আসুক, উঠুক ঝড়। সে তৈরী।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে কড়ানাড়ার শব্দ এবং তারপর—মুহূর্তেই হুড়মুড়, দুড়দাড় করে একদল মেয়েপুরুষ বাড়িতে ঢুকে উঠনে পা ফেলল। কারা এল?

ঃ কইরে, সুষি কই?

ঃ সতীনাথ চাটুজ্যে মশাই বাড়ি আছেন—?

তারপরই খিলখিল মেয়েলি হাসি। বেশ বয়স্ক পরিণত হাসি, কিন্তু মিষ্টি। টুসটুসে পেঁপের মত নরম, কোমল।

ঃ ঐ তো। মেশোমশাই তো ঘরেই—

ঘর থেকে অপ্রসন্নমুখে বেরিয়ে সতীনাথ অবাক। বড়শালা আদিত্যনাথ, শালা-বউ মল্লিকা, শ্যালিকাপতি শোভাময়, শ্যালিকা সুরমা, এবং আরও দু'-তিনজন, অর্থাৎ শ্বশুরগোষ্ঠীর একটি রেজিমেন্ট। হাতে খাবারের বাক্স, পোটলা, ফুলের মালা, রজনীগন্ধার ঝাড়, বেলফুলের গোড়ে। রমেনের কাঁধে ক্যামেরা। ফুলের গন্ধে বাড়িটা বাগান হয়ে গেল। ব্যাপার কি?

বোকার মত হাসল সতীনাথ। হঠাৎ অতিরিক্ত ঘামে মুখটা চিটচিটে হয়ে উঠল। ময়লা পাঞ্জাবিটা ঘাড়ের কাছে লেপ্টে যাচ্ছে। কেমন থিকথিকে কাদা কাদা মনে হচ্ছে সেখানটা। বললে, আরে, আসুন, আসুন। কী সৌভাগ্য!

তিনদিন দাড়ি কামানো হয়নি। আজ দাড়ি কামানোর তারিখ ছিল। সকালে ওই পালার পর প্রসাধনে রুচি হয়নি। কী ভাবছে ওরা? সতীনাথটা গেছে একেবারে। কিন্তু ব্যাপার কি? সুষমার ষড়যন্ত্র নয় তো?

সুষমা রান্নাঘর থেকে হলুদমাখা হাত আঁচলে মুছতে মুছতে বেরুল। বললে, বড়দা আপনি? আরে? বৌদি, সুরমা, শোভাবাবু—এযে দেখছি একটা মিছিল। হঠাৎ কি সব পথ ভুলে নাকি?

উঠোনের মাঝখানেই সুষমা এসে বড়দা আদিত্যনাথকে প্রণাম করল বুট-জুতোয় আঙুল ছুঁইয়ে। এত রঙ-চঙ, স্নো-পাউডারের মধ্যে হঠাৎ তার কেমন একটু লজ্জা করতে লাগল। কাপড়টা ময়লা এবং রান্নাঘরের ধোঁয়া, মিন্টুর দুধ-তোলার টকটক গন্ধে কেমন যেন রেস্টুরেন্টের কিচেন ঘর হয়ে গেছে। ভিতরে একটা সেমিজও নেই। কী ভাবছে ওরা? আর সুষমাকে ওই অবস্থায় দেখে সতীনাথের ইচ্ছে হল, বাড়ি থেকে সে ছুটে বেরিয়ে যায় ধাপায়, কিস্কিন্ধায় যেখানে হোক।

সুষমা মিষ্টি করে হাসল, সতীনাথ অবাক হয়ে দেখল গালে টোল পড়ল যৌবনে যেমন পড়ত এবং গত অন্ততঃ পনের বছরে যা পড়তে দেখেনি। অবশ্য এমন কৌতূহলী দৃষ্টিতে সতীনাথের আর দেখতে ইচ্ছে হয় না ওই শ্রীমুখ। সুষমা হেসে, চোখে আলো ফুটিয়ে বললে, আসুন, ঘরে চলুন।

ছোটবোন সুরমার বড়ছেলে রমেন। কী চমৎকার চেহারা হয়েছে। কাঁধে ক্যামেরা। বললে, না, মাসি। একটু দাঁড়াও। আগে ফটোটা তুলে নিই। তারপর ঘর তো আছেই।

খবরের কাগজের রিপোর্টার রমেন। ক্যামেরা ফ্লাশবালব্ লাগিয়ে সে রেডি। ভিড় সরিয়ে সে বললে, মেশোমশাই, এগিয়ে আসুন। দু'জনের জোড়ে একটা ফটো তুলব।

সুরমা বললে, দিদি তেল-চিটচিটে মুখটা তুই একটু মোছ্। এখনও গা ধুসনি বুঝি? আসুন জামাইবাবু। কই বৌদি, মালাগুলো বের করো, তুমিই তো পরাবে?

মল্লিকা হেসে বললে, তুই থাকতে? শালীর আদরই বেশি। নে, ধর,—

সুরমা ফুলের মালা বের করে দুজনকে পরাল। হাতে গুঁজে দিল রজনীগন্ধার গুচ্ছ। তারপর বললে, নে, রমু, তোল। খুব লাইভলি হয় যেন। তারপর আমাদের নিয়ে গ্রুপ তুলবি।

সতীনাথ আবার বোকার মত হাসল। বললে, ব্যাপার কী?

আদিত্যনাথ বললে, সে কি সতীনাথ? এখনো ব্যাপারটাই জানো না? আজ না সতেরই শ্রাবণ? তোমাদের টোয়েন্টি-ফিফ্‌থ্ ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি? তাও মনে নেই?

সুরমা ঠাট্টা করে বললে, জামাইবাবু যে বিয়ে করেছিলেন, মনে আছে?

সতীনাথের মুখে সেই বোকার হাসি, দুর্বল, অপ্রস্তুত। সুষমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর সুরমার দিকে। দুই বোন। আকাশ আর পাতাল। নন্দনকানন আর নরকোদ্যান। অথচ পঁচিশ বছর আগে—?

সুষমা তো লজ্জায় করমচা। একেবারেই যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। বললে, নারে রমু। আমি ফটো তুলব না, যে না ছিরি। দাঁড়া, দাঁড়া লক্ষ্মীটি। তাহলে অন্ততঃ কাপড়টা ছেড়ে আসি।

মিন্টু, সন্টু, বুলো বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। খালি গা, অবশ্য সবাই ইজের পরা। বুলাটা এমন বোকা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে আঙুল চুষছে এবং ইজের পরাটাই ওর অসার্থক। কাল সেলাই করে দিতে হবে—ঘরের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে মিনু দেখল, এবং ভাবল। মা ফটো তুলছে, আর তার লজ্জা করছে। রমেনদার সামনে এই ময়লা ফ্রক পরে বেরুতে পারছে না ও, সংকোচ হচ্ছে। একটা শাড়ি পরার ইচ্ছে হচ্ছে।

রমেন বললে, কিচ্ছু না, ময়লা টয়লা ফটোতে ওঠে না, একটু গুছিয়ে নাও, কিচ্ছু বোঝা যাবে না। নিন জামাইবাবু, দুজনে খুব হাসুন, ওয়ান, টু, থ্রি—

বিদ্যুতের একটা ঝিলিক খেলে গেল গোটা বাড়িময়। মুহূর্তের জন্য সব শব্দ,

আলোয় আলো। নিস্তব্ধ, শুভ্রতা। কী শুভ্রতা, কী সুন্দর, যেন এইমাত্র বাজ পড়েছে, কিন্তু আগুন লাগেনি। সবাই কেমন যেন আনন্দে অভিভূত, অসাড় হয়ে গেল।

ঃ ফটো, ফটো, ফটো—

সমস্ত নিস্তব্ধতা গুঁড়ো করে ছবছরের সন্টু স্থানকাল পাত্র ভুলে তিন পাক নেচে দিল। বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললে, জানো, বাবা, আর বছর না, বেলেঘাটায় জহরলালের মিটিংএ এমনি ফটো তুলেছিল। ছোটদিও তো দেখেছে। নারে ছোটদি? কী আলো—?

সতীনাথ ভাবলে, ইয়েস্, আই অ্যাম এ জহরলাল টুডে, পারহ্যাপস্ মোর—টুবি ডেড্ অ্যান্ড ফরগট্ন ওন্লি টুমরো, বাট টুডে আই লিভ্—অ্যান্ড আই লিভ্ মোস্ট্ অনারেব্লি'—

সন্টুর মাথাটা নেড়ে দিল সতীনাথ ঃ আমি না বাবা। ওই তোমার মা জহরলাল—

হাসিতে ফেটে পড়ে সমস্ত দলটা ঘরে এসে ঢোকার চেষ্টা করল। মিনু প্রায় ছুটে রান্নাঘর থেকে ছিন্ন-পেখম হাত-পাখাটা নিয়ে এল, হাওয়া করতে লাগল দরজার পাল্লার পাশে দাঁড়িয়ে আত্মগোপন করে। পিন্টু, মিন্টু চৌকির তলায় ঢুকল। ঘরে জায়গা হল না দেখে দু-একজন বাইরে বসল।

তক্তাপোশের ওপর জাঁকিয়ে বসে আদিত্যনাথ বিশ্লেষণ করল ঃ এসব প্ল্যান ওই শোভাময়ের। ওর আর কি। খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করে, ছেলেকেও এইটুকু বয়সে ঢুকিয়েছে। এবার তো শুনেছি সব মিনিস্টারদের সমান মাইনে হল। আমরা গরমেন্টের বড়ো চাকরি ঠেঙিয়ে এখন রিটায়ার-অন্তে কী আর পেন্সন পাই!

শোভাময় মিটিমিটি হাসছে। আদিত্য-নাথ বলে চলল, ও একটা কমিটি বানিয়েছে। নাম দিয়েছে "টোয়েন্টি ফিফথ্ ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি সেলি-ব্রেশন কমিটি" না যেন কী। "ম্যারেজ সিলভার জুবিলি" নাম দিলেও ক্ষতি ছিল না। আমাকে করেছে কমিটির চেয়ারম্যান। দিন কয়েক আগে রমুর জ্যাঠার বাড়িতে হামলা দিয়েছিলুম দল বেঁধে। শোভাময় শুধু বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্মমৃত্যুর হিসেবই রাখে না অফিসে, আমাদের হিসেবও যে তলে তলে রাখছে কে জানত। আর কিছুদিন আগে করলে আমিও বাদ যেতুম না। তবে আমার গোল্ডেন জুবিলিটা এবার হবে মনে হচ্ছে। কি গো হবে না?

ব'লে চোখ মটকে স্ত্রী মল্লিকার দিকে চেয়ে হাসলেন।

শোভাময় বললে, সতীদা, আপনাকেও আমাদের কমিটির লাইফ-মেম্বার করে নিচ্ছি। দশটাকা চাঁদা। সুরমা অ্যাকাউ-ন্ট্যান্ট। অবশ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণ-মেন্টের মত বাজেট সর্বদাই ঘাটতি। কিন্তু আদিত্যদা থাকতে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছে না।

সতীনাথ যেন গৌরবান্বিত বোধ করল। ওরা তাহলে এখনও এই খোঁচা-দাড়ি সতীনাথকে ভোলেনি। হাজার হলেও সতীনাথকে ওরা শ্রদ্ধা করে। শিক্ষায় অন্ততঃ সে সবার চাইতে বড়ো, যদিও জীবনের দীক্ষাটা হয়েছে কাঁচা ভিতে। হেসে বললে, দেব, নিশ্চয়ই দেব। জীবনে এই হুল্লোড়ের, না হুল্লোড় ঠিক নয়, এই উৎসবের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে বৈকি। ইট মেকস্ লাইফ ওআর্থ লিভিং, জয়াস্, বিউটিফুল। মিনু, দ্যাখ তো শিবু এলো নাকি। বাজারে যাক, একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হোক।

আদিত্যনাথ বললে, না হে। ওসব হাঙ্গামায় আর যেয়ো না। এতেই হবে—বলে মিষ্টিমণ্ডার প্যাকেটগুলো ইশারায় দেখাল।

সুরমা বললে, দাদা তো বেশ! বাঃ, এত বড়ো একটা অকেশান, প্রায় বিয়েই বলা যায়, খাব না? মাংস লুচি খেয়ে তবে উঠবো। কি বলো, বৌদি? একটু নোনতা না পড়লে শুধু মিষ্টিতে কি মেয়েদের শানায়?

মল্লিকা লবঙ্গ খুলে পান খেলেন। বললেন, কি জানি বাপু, তোর তো খাওয়ার কথা উঠলেই আর নড়নচড়ন নেই, সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখছি। আমাদের কি আর দাঁত আছে। হ্যাঁরে, মিনু, তোদের ছাতের সিঁড়িটা সারিয়েছিস্? চল্ দিকিন, ছাতে বোধ হয়, একটু হাওয়া পাব। আমি মোটা মানুষ গরমে একটুতেই হাঁপিয়ে উঠি—

একটা দল ছাতে চলে গেল। শিবনাথ বাড়ি ফিরল টাইপ শিখে। আবার ছেলে পড়াতে বেরুবে পাড়ার কাছেই। আজ আর যাওয়া হবে না। প্রণাম করল এসে সকলকে। রমেন আর ও একই বয়সী। কিন্তু ওর পাশে শিবনাথকে মনে হয় শিশু। লাজুক এবং সংকুচিত, যেন প্রণাম-করাই ওকে মানায় ভালো। রমেনের মত কথা বলতে, ফটো তুলতে ও কোনদিন পারবে না। ভেবে সতীনাথ কষ্ট পেলেন। ওকে ডেকে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন।

সুষমাও এসে দাঁড়াল। কোঁচার খুঁট থেকে গিঁঠ খুলে মাইনের টাকা বের করে বললে, সের দুই মাংস আর কিছু ঘি নিয়ে আয় শিবু। তুমি কি বলো?

সুষমা বললে, থাক, দু'সেরের দরকার নেই। এক সেরেই হবে। তুই একসের মাংসই নিয়ে আয় শিবু। একটু দেখে আনিস। সুরোকে তো আমি চিনি,

মুখেই সব। পাখিরমত খায় এক ছটাক। এতেই টাকা দশেকের কমে পারবে না। করলে তো কতই করা যায়।

শিবু টাকা নিয়ে চলে গেল। সতীনাথ বাকি টাকাগুলো সুষমাকে দিয়ে বললে, এখন বাক্সে তুলে রাখো। কাল সকালে মাসকাবারির ফর্দ না হয় করব। আর তুমি এটা ছেড়ে বরং একটা পরিষ্কার শাড়ি পরো।

সুষমা বললে, আর নিজেরটা? ওটা বুঝি খুব পরিষ্কার? আমি একেবারে চান করে ধোয়া শাড়ি পরব। এসে যেন দেখি তুমি পাঞ্জাবিটা ছেড়েছ। মিনুকে বোলো, বের করে দেবে।

সুষমা টাকাটা বাক্সে তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ খেয়াল হল। ছি, ছি, সুষমা যে জেনে গেল মাইনে আজই হয়েছে। আঃ, ছি, ছি। কী যে গোলমাল হল সব। একটা দারুণ ক্রোধ আর অনুশোচনায় মরে যেতে ইচ্ছে করল। কাল এই হুজুগ কেটে গেলে দিনের আলোয় সুষমাকে মুখ দেখাবে কেমন করে? সেই আবার উগ্রমূর্তি ধারণ করবে সুষমা, অভদ্রভাবে অপমান করবে। একটা অবাধ্য কড়ার মত জীবনের পায়ে সে মাথা উঁচিয়ে প্রতিপদে নিজের অহমিকা টের পাইয়ে দিচ্ছে। নিস্তার নেই। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল সতীনাথের। কৌশলে কেন সে জেনে নিল আজ মাইনে হয়েছে। অসহ্য। অত্যাচার করছে সকলে মিলে অসহায় নির্বান্ধব সতীনাথের ওপর। ফুল মালা ফটো—এসব কিছুই সে চায় না, সে চায়—সে চায়—সে কি চায় হঠাৎ ভেবে পেল না। সে কি চায় বলতে পারে না, শান্তি ইত্যাদির অর্থ সে বোঝে না, কিন্তু এটা ঠিক সে কখনো অপমানিত হতে চায় না।

হৈ হুল্লোড় করে খাওয়া-দাওয়া, ছোড়াছুড়ি, লোফালুফির পর দলটা যখন ট্যাক্সি করে বিদায় নিল রাত তখন এগারটা। হুল্লুড়ে দলের সঙ্গেই সতীনাথকে খাওয়া সারতে হয়েছে। শুধু সুষমা বাকি। সে কিছুতেই একসঙ্গে খেতে রাজী হয়নি।

ওদের ট্যাক্সিতে তুলে সতীনাথ অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ছাতের এককোণে আশ্রয় নিয়েছে। আগেই একটা সতরঞ্চি পাতা ছিল। গোটাকতক ময়লা-ওয়াড়ের বালিশ গড়াগড়ি যাচ্ছে। কিছু ফুল বিপর্যস্ত। একটা মালা মুখ থুবড়ে। সতীনাথ হাঁটুতে মুখ গুঁজে এককোণে বসে সব কিছু ভাবার চেষ্টা করল।

আকাশে ছেঁড়া-নীলাম্বর মেঘ, ফাটা, ফাঁসা। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর চাঁদ প্রসবান্তে ঈষৎ পাণ্ডুর। উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসের মত হাওয়া বইছে। সতীনাথ গরমে ঘেমে উঠল। হাঁটু থেকে মুখ তুলে চাঁদের দিকে চাইল। এই হৈ-চৈ-র কী সার্থকতা? সত্যিই কি জীবন ওআর্থ লিভিং হয়? জীবনের মালিন্য ঘোচে? সুষমা কি বদলালো? আঃ, আবার সুষমা। জীবনটা সুষমা-কেন্দ্রিকই হয়ে গেল।

সিঁড়ির কাছ থেকে একটি ছায়ামূর্তি লঘুপায়ে ভেসে আসছে। সতীনাথ ভয় পেল। অস্বস্তি। নিশ্চয়ই মাইনের কথা উঠবে। কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না ঘটনাটা। সুষমাকে সহ্য করা যাচ্ছে না।

সতীনাথের পায়ের কাছে এসে বসল ছায়ামূর্তি। হাত বাড়িয়ে বললে, নাও, পান।

: পান কি খাই আমি?

: জানি। আজ খাও একটা। জাত যাবে না।

সুষমার ইচ্ছে ছিল কি ছিল না জানে না সতীনাথ। কিন্তু সে আজ সেজেছে। ছোট বোন সুরমা জোর করে সাজিয়ে দিয়েছে। একটা রঙিন শাড়ি পরেছে হাল্কা আকাশী রঙের। গায়ে শেমিজ। ভাঙা মুখে স্নো-পাউডারের পুরু প্রলেপ। গায়ে কেমন একটা তেল-মসলা-বেলফুলের মিলিত গন্ধ। বোধ হয়, এসেন্স ঢেলেছে। পাতাকাটা চুল। চাঁদের আলোয় দেখাচ্ছে অদ্ভুত। যাত্রা দলের চোয়াড়ে বালক সখীর মত। এর চাইতে মোটে না সাজলে তবু এখনও সহ্য হয়। সতীনাথ মুখটা ফিরিয়ে নিলে।

বিয়েবাড়ির কুমারী-চঞ্চলা মেয়ের মত ফুলের মালাটা হাতের কব্জিতে জড়াতে জড়াতে সুষমা বললে, ওরা বলছিল ছোটদের জন্মদিন করতে। মন্দ হয় না করলে, না? শিবুর একটা চাকরি হলে মিনুর জন্মদিন করব, কি বলো? ক'দিনই বা আর আছে এ বাড়িতে। বিয়ের পর তবু বলতে পারবে।

সতীনাথের জবাব দিতে ইচ্ছেই হল না। চুপ করে বসে রইল। সুষমা ওর কনুইয়ে নাড়া দিয়ে বললে, কি, ঘুমুলে? বসে বসেই ঘুম?

আরও কাছে সরে বসল সুষমা গা ঘেঁষে। সতীনাথের কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত বাহুর ওপর আলতো করে হাত বুলোল। রোগা হয়ে গেছে। বললে, কি হল? রাগ করেছ? কথা বলছ না কেন?

হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা বাতাস বইল এক ঝলক। শীত শীত করছে। পিঠের ডান ডানায় হাতটা নামিয়ে আনছে সুষমা বাঁ দিকে বুকের ঠেস দিয়ে আদুরী যুবতীর মত। শির শির করছে শরীর। বুঝল, ছলনাময়ীর আদিমতম লাস্যের ইন্দ্রজাল। এখুনি সে বলি হয়ে যাবে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সতীনাথ। স্বপ্নের জালটা যেন ছিঁড়ে-

খুঁড়ে গেল। সুষমাও চমকে উঠল। বললে : কি হল?

: হরলিক্সটা নিয়ে আসি—পালাতে চায় সে।

: এই রাত্রে?

: হুঁ, কাল সকালেই তো লাগবে। ডাকলে দাশগুপ্ত ব্রাদার্সের এখনও সাড়া পাব।

সুষমা মধুর হাসল, বাৎসল্যে ভরা, মোহে ভরা, মুগ্ধতার মদে ভরা। চাঁদের আলোয় সে হাসির অর্থ সতীনাথের

ফাঁদ। ইঙ্গিতে শব্দ ব্যবহার। হারে, কী ছলনাই শিখেছিস ছিনাল। ন্যাস্টি। আই হেট্। আই স্যাল বেটার হ্যাংগ্ মাইসেল্ফ্—। জোর করেই হাতটা ছাড়িয়ে নিল সতীনাথ।

: শোন, যেও না। মাথা খাও—

সুষমা শেষে ডুকরে উঠল : তুমি কি শেষে পাগল হলে? এই রাতে কেউ বাইরে বেরোয়? কী না কী বলেছি রাগ করে, তাইতে এত রাগ। শোনো, লক্ষ্মীটি শোনো—

কি হল? রাগ করেছ? কথা বলছ না কেন?

কাছে পুরনো। শরীর রী রী করছে অপমানে। সকালের সেই অপমান মনে পড়ছে। এখন সেই সুষমা আর নেই, এ অন্য। নিষাদী, হাতে ফাঁদ। সতীনাথ পা বাড়াল। টপ্ করে হাতটা ধরে ফেলল সুষমা : ক্ষেপেছ? এই রাত্রে মানুষ হরলিক্স আনতে যায়। মাথায় পোকা আছে তোমার। বোসো এখানে চুপ করে। কাল আনলেই হবে। তা ছাড়া, আজ তো অনেক খেলুম-দেলুম, বুকের দুধেই কাল পিন্টুর হয়ে যাবে।

সুষমা দু হাতে সতীনাথের পা চেপে ধরল।

এত মধুর কথা গত পনের কি কুড়ি বছর শোনেনি সতীনাথ হোক, তবু সে আর অপমানিত হবে না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটা শুরু করল। ছাতের বালি-ওঠা খসখসে মেজেতে সুষমার মণিবন্ধ থেকে কনুইয়ের হাড় পর্যন্ত ঘষে ছালের একটা পাতলা পর্দা উঠে গেল। যন্ত্রণায় চীৎকার করে

পা ছেড়ে দিয়ে উঠে বসল সুষমা। চোখে আগুন। আদিম মানবীর মত মনে হল ওকে চাঁদের আবছা আলোয়।

হঠাৎ কী হয়ে গেল সতীনাথের। এ কী? এ কী করল সে? সতরঞ্জি, বালিশ, ফুলের মালা, চাঁদ সবাই যেন হেসে উঠল একসঙ্গে। সুষমার সমস্ত শরীরটা যন্ত্রণায় কাঁপছে। প্রসাধন-করা গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের গা দিয়ে শীর্ণ ঝর্ণার মত। চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে সুদূর মরীচিকার মত। অপমানিতা।

সুষমা বাধা দেওয়ার আগেই সতীনাথ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। হাঁটু গেড়ে বসে মুঠিবদ্ধ বাঁ-হাতের পিঠটা ছাতের মেজের ওপর চেপে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে বার কয়েক ঘষল পাগলের মত। চাঁদের আলোয় হাতটা তুলল।

বাঁ-হাতের মুঠির পিঠ থেকে চামড়ার পর্দাটা উঠে গিয়ে সাদা নরম হাড় বেরিয়ে পড়েছে। বাঁধাকপির অনেক ভিতরের পাপড়ির মত সাদা এবং ভিজে। একটু একটু করে ঘাসের বিন্দুর মত লাল রক্তের ফোঁটা ফুটে উঠছে টলটল করে। তারপর দেখতে দেখতে জায়গাটা জবা ফুলের পাপড়ি হয়ে গেল। দুঃসহ যন্ত্রণায় সতীনাথের মুখটা কুঁচকে প্রসন্ন হয়ে এল এবং মনে হল, সে মরে ছিল, এই মাত্র বেঁচে উঠল।

ভাঙা গলায় সুষমা বললে, ছি ছি, কী করলে?

সুষমার ক্ষতের ওপর নিজের রক্তমাখা হাতটা চেপে ধরল সতীনাথ। মুগ্ধ চোখে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থেকে পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে, ধীরে ধীরে শরীরের মোচড় তুলে শুয়ে পড়ল। সতীনাথের মনে হল তার বয়স পঞ্চাশ নয়, সুষমার বিয়াল্লিশ। ওরা যেন সেই পঁচিশ বছর আগের যুবক-যুবতী, এ যেন সেই প্রথম রাত ফুলশয্যার। আমি সুষমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি। আঃ, সুষমা। আমরা দুজনেই জানি, আমরা পরস্পরের ওপর কী ভয়ংকর রেগে যাই, অসহ্য হয়ে যাই, যদিও আরও গভীরে জানি আমাদের রাগ পথ খুঁজে না পেয়ে যাকে ভালোবাসি তার উপর মিটিয়ে নিই। জানো সুষমা, এই হাত ঘষলুম, এ আমার রাগ। তোমার উপর নয়, কারণ, তোমাকে, তুমি জানো, আমি ভালোবাসি। আমাকে ক্ষমা কোরো।

তখন, দুই ক্ষতের নিষ্পেষণে, ওদের মণিবন্ধ এবং বাহু থেকে, ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ে চাঁদের আলোয় একটা ফুল ধীরে ধীরে ফুটে উঠছিল। অবশেষে রূঢ় রুক্ষ, বন্ধুর ছাদের ক্ষয়া মেজের ওপর পরিপূর্ণ একটা রাঙা গোলাপ তৈরী হল। ওরা এখনই তা দেখতে পেল না।

॥ কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রসঙ্গে ॥

মাননীয় 'অমৃত' সম্পাদক সমীপেষু—
সবিনয় নিবেদন,

'অমৃত'-র ২য় বর্ষ ১ম খণ্ডের ৮ম সংখ্যায় বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-র মূল্যায়ণে যে পরিশীলিত আগ্রহ ও বিচারনিষ্ঠ পরিচয়টি প্রকাশিত তার প্রতি যথোচিত সম্মান জানিয়ে আমার বক্তব্য প্রকাশ করতে চেষ্টা করবো। চলচ্চিত্র হিসেবে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-র প্রধান সার্থকতা বোধ হয় তাকে ঘিরে সযত্ন ও অকৃত্রিম চেষ্টা-চিহ্নিত আলোচনার মধ্যে।

পত্রলেখকের মূল বক্তব্য বোধ হয় এই : পরিচালকের জীবন-ভাবনা এচিত্রে পূর্ণতার রূপ নিয়ে প্রকাশিত নয়, খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্তের আপাত-মনোরম সমাবেশে পুরো গল্প গড়ে ওঠার সুযোগ বা অবকাশ, কোনটাই নেই এই চিত্রে। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য, পুরো গল্প উপহার দেবার কোন সক্রিয় ইচ্ছা পরিচালকের মধ্যে কাজ করেনি (অবশ্য এ আমার নিছকই অনুমান)। তিনি শুধু outlineটিই দর্শকের সামনে ধরে দিতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে দর্শকের কল্পনাশক্তি আর বিচার-বুদ্ধির ওপরই তিনি নির্ভর করেছেন বেশী। এটুকু maturity দর্শকের কাছ থেকে তিনি সঙ্গতকারণেই আশা করেছেন। এ আশা কতখানি সফল, তার আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে এটুকু বলা যায়, সত্যজিৎ রায়ের এযাবৎকাল-মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির এবং ঋত্বিক ঘটকের অযান্ত্রিক ও মেঘে ঢাকা তারা-র (এবং মৃণাল সেনের পুনশ্চ-র) প্রদর্শনের এর এই maturity দর্শকের কাছ থেকে আশা করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয়। যাক্, আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। পত্রলেখকের অনুযোগ, পরিচালক 'বিষয়বস্তুর বাহ্যচটক ও রূপগত বাহ্যতার' প্রতিই বিশেষ মনোযোগী। তার ফলেই, 'situationকে পরিচালক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শুধু সংলাপের সাহায্যে খেলিয়েছেন,' এ অভিমত কতখানি যথার্থ, বিচার করা যেতে পারে। আমি দ্বিতীয় মন্তব্যের ওপর বেশী জোর দিচ্ছি। সংলাপ যদি 'situation' সৃষ্টির সহায়ক হয় তাতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? বস্তুতঃ, শুধুমাত্র সংলাপের সাহায্যে, একটিমাত্র কথার সুনিশ্চিত ইঙ্গিতে সত্যজিৎ রায় চরিত্রের বিশেষ রূপের প্রতি আমাদের মনযোগ ও দৃষ্টি যেভাবে আকর্ষণ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে অভিনেয় চরিত্রের গভীরে প্রবেশের যে সুযোগ আমাদের দিয়েছেন, তা সত্যজিৎ-প্রতিভার বিকাশপথের নতুন দিশারী হিসেবে কাজ করতে পারে। অর্থবহ সংলাপের ফলশ্রুতিময় প্রকাশ সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে মনীষা ও মিঃ ব্যানার্জির কথপোকথন-অংশে। যে অংশটিতে মনীষার দ্বিধাগ্রস্থতা ও নির্মোহতার পরিচয় পেয়ে মিঃ ব্যানার্জি বললেন : আজ হয়ত দার্জিলিং-এর এই wonderful surroundings-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তোমার মনে হচ্ছে Love is the most important thing in the world. কিন্তু কোলকাতায় ফিরে গিয়ে তোমার যদি মনে হয় প্রেমের চেয়ে security বড় কিংবা security থেকেও প্রেম grow করতে পারে, তবে আমায় ডেকো, আমি আসব—সেই অংশটিতে মিঃ ব্যানার্জির জীবন সম্বন্ধে ধারণার একটা পরিষ্কার চেহারা আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। এই ছবিতেই সর্বপ্রথম সত্যজিৎ রায় সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের মর্ম-উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন, বিশিষ্ট জীবন-ভাবনা ও অনুভূতি-বিশ্বাসকে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। এতদিন তিনি অভিব্যক্তি এবং ব্যঞ্জনা-নির্ভর ছিলেন বহুল পরিমাণে। এদিক থেকে তাঁর নবতম সৃষ্টি নতুনতর অভীপ্সার দ্যোতনায় ভাস্বর। পত্রলেখকের আর একটি অভিযোগ, জ্যেষ্ঠ কন্যা-জামাতার উপকাহিনী মূল-কাহিনীকে বিঘ্নিত করেছে। এক্ষেত্রে আমার প্রথম বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী পরিচালক আমাদের দিতে চাননি, বিশেষ পরিবেশের পটভূমিকায় চরিত্রের মর্ম-উদ্‌ঘাটনেই তিনি সচেষ্ট। মূল-কাহিনী বা উপ-কাহিনীর প্রশ্ন এখানে অবান্তর। Outline এখানে একটা পুরো গল্পের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' কাঠামোর স্তর থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি, কিংবা এ চিত্র স্রষ্টার খসড়াতেই নিঃশেষিত, এ-হেন একটা সরলীকরণ কি করে পত্রলেখক করতে পারলেন, তা ভেবে আমি বেদনা বোধ করছি। কারণ লেখকের সচেতন বিশ্লেষণী প্রয়াসের মধ্যে আমি একটা তীক্ষ্ণ বিচারশীল মনোভাবের প্রকাশ দেখেছি। পত্রলেখকের আর একটি সিদ্ধান্ত, পরিচালক 'হিউম্যান এলিমেন্টের' উপর দর্শকের মনযোগকে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারেননি, অথচ পরিবেশ দর্শকের অভিনিবেশকে অতি সহজেই আকৃষ্ট করেছে। আমি কিন্তু 'হিউম্যান এলিমেন্টের' উপর পরিবেশকে স্থান দিইনি এবং মুহূর্তকালের জন্যেও পত্রলেখকের মতো 'হিউম্যান এলিমেন্টের' উপর বিরক্ত হইনি। আর পত্রলেখক যে বলেছেন, প্রকৃতিকে তিনি বড়ো বেশী ছোট করে ফেলেছেন, তাতে কিন্তু আমি এতটুকু অসন্তুষ্ট নই। কারণ, পরিচালক তো কাঞ্চনজঙ্ঘা আর দার্জিলিং-এর বিউটি স্পটগুলিকে ঘিরে মোটা কালির আঁচড়ে আঁকা চরিত্রের সমাবেশে গড়ে-ওঠা একটা মনোরম ও সুলভ (এবং নয়ন-লোভনও) ছবি উপহার দিতে চাননি। প্রকৃতির সঙ্গে দর্শকের সম্বন্ধ এখানে তির্যক। পরিচালকের জীবন-ভাবনাই এ ছবির কেন্দ্রবিন্দু। পরিবেশ আর প্রকৃতি তার শিল্পানুগ প্রকাশের উপাদান হলেও, তার অগ্রাধিকার এ ছবিতে স্বীকৃত নয়। এবং তা অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই।

নমস্কারান্তে ইতি—
দেবাশীষ দত্ত।
শ্রীরামপুর। হুগলী।

॥ মিখাইল, না মিহাইল ? ॥

'অমৃত' সম্পাদক মহাশয়,

৮ই জুন, ১৯৬২-র 'অমৃত' পত্রিকায় রুমানিয়ার নাট্যকার মিহাইল সেবাস্তিয়ান সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। আমার পাণ্ডুলিপিতে নাট্যকারের নাম "মিহাইল" থাকা সত্ত্বেও 'অমৃত'র পাতায় "মিখাইল" লেখা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম—কিন্তু সেই ভ্রম সংশোধন করানো অবশ্য-প্রয়োজনীয় বোধ করিনি। তার কারণ পরে বলছি।

পরবর্তী সংখ্যা, অর্থাৎ ১৫ই জুন, ১৯৬২-র অমৃত'র ৫০৫ পৃষ্ঠায় অনুশীলন সম্প্রদায়-এর "শেষ সংবাদ"-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে আমার রচনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সূত্রে একথাও লেখা হয়েছে যে, "রুমানিয়ার নাট্যকার মিহাইল সেবাস্তিয়ান (মিখাইল নয়!) ......!" রুমানিয়ান MIHAIL নামটি বাংলা অক্ষরে লিখতে হলে "মিহাইল" লিখতে হবে, না "মিখাইল" লিখতে হবে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে, রুমানিয়ান "H"এর উচ্চারণ বাংলা 'হ' এবং 'খ'এর মাঝামাঝি—সেজন্য 'হ' এবং 'খ' কোনো অক্ষর দিয়েই সেই উচ্চারণটি সম্পূর্ণ বোঝানো যায় না—তাই বিকল্পে দুটোই চলতে পারে। রুমানিয়ান ভাষা যাঁরা জানেন, তাঁরা অবশ্যই এ সম্পর্কে অবগত। 'অমৃত'র নাট্য-সমালোচক মহাশয় "মিখাইল নয়!" বলে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়ে আমাকে এ চিঠি লিখতে প্রবৃত্ত করেছেন।

নমস্কারান্তে—
অমিতা রায়
কলিকাতা-২৯

অয়স্কান্ত

যাদুঘরে একটি কল্পনার দুপুর

এসপ্ল্যানেডে যখন ছিলাম তখনো ঝাঁ-ঝাঁ রোদ। আকাশে অবশ্য থোকা থোকা কালো মেঘ কিসের জন্যে যেন ওত পেতে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখিনি। ছায়া খুঁজে খুঁজে এক আশ্রয় থেকে অন্য আশ্রয়ের দিকে উন্মুখ একটি চলা সমস্ত মনোযোগকে এমনভাবে কেড়ে নিতে পেরেছিল যে আকাশের আয়োজন চোখে পড়েনি।

কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হল যাদুঘরের সামনে এসে। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ তেমনিভাবেই গায়ে এসে পড়ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘের চক্রান্ত বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে নেমে এসেছে মুষলধারে। আষাঢ় মাসের আকাশ খাপছাড়া খেয়ালে মেতে উঠেছে রোদ আর বৃষ্টির খেলায়।

আশেপাশে অন্য কোনো আশ্রয় ছিল না। কিংবা বলা যেতে পারে, স্বয়ং যাদুঘরই আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি এই পরম নির্ভয়ের আশ্রয়কেই শিরোধার্য করলাম।

এখানে বলে রাখি, মানুষজনের কথা বলবার জন্যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিনি। যদিও যে-কোনো দুপুরের যাদুঘরের মানুষজনও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবার মতো। কলকাতা শহরের বিপুল বিস্তৃতি ও অজস্র মানুষের ভিড়ে এদের কিছুতেই আলাদা করে চেনা যাবে না। যাদুঘরের এই আশ্চর্য পরিবেশটিই যেন এদের জন্যে বিশেষ করে তৈরী। বাচ্চাকাচ্চা সমেত পুরো এক-একটি দল। দগদগে চড়া রঙের পোশাক, প্রচুর তেলে চকচকে চামড়া ও চুল, ভারী ভারী রুপোর গয়না ও তাবিজ, নতুন জুতোয় আড়ষ্ট পা আর আশ্চর্য রকমের নির্বোধ ও আশ্চর্য রকমের কৌতূহলী দৃষ্টি। এরা কলকাতার বিশেষ কোনো এলাকার মানুষ নয়। অথচ এদের বাদ দিলে কলকাতার যাদুঘরের ছবিটি কিছুটা যেন অসম্পূর্ণ।

মানুষজনের পাশ কাটিয়ে আমি ঢুকলাম ডানদিকের প্রশস্ত একটি দরজা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরের সমস্ত যান্ত্রিক কোলাহলের ওপরে কয়েক হাজার বছরের একটি পর্দা নেমে এল।

আমি ভাবতেও পারিনি যে আমাদের যাতায়াতের পথের ধারে এমন একটি পর্ণাঢ্য আয়োজন এমন নিঃশব্দ গাম্ভীর্যে এমনভাবে সারাটি দিন ধরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। আর আষাঢ় মাসের আকাশ আকস্মিক একটি বর্ষণে মেতে উঠলেই এমন অনায়াসে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ বছর পার হয়ে যাওয়া চলে তাই বা কে জানত!

যাই হোক, যাদুঘরের বর্ণনা দেবার জন্যেও আজকের এই প্রসঙ্গের অবতারণা নয়। কেমন করে আমি বৌদ্ধ ও জাতকের যুগের মহিমময় শিলাস্তূপের মধ্যে দিয়ে পথ করে, বুদ্ধের জীবন-কাহিনীর অতি-উজ্জ্বল আলেখ্যের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে, গুপ্তযুগের ব্যঞ্জনাময় শিল্পসম্ভারকে পাশ কাটিয়ে, কয়েক লক্ষ বছর পার হয়ে পুরোপলীয় যুগের তোরণে উপস্থিত হলাম—সে-কাহিনীও আজকের এই প্রসঙ্গে অবান্তর।

তোরণের মুখে একটি ঘড়ি মানুষের সমস্ত দম্ভের ওপরে নিষ্ঠুর একটি উপহাসের মতো পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই ঘড়ির এক-একটি ঘণ্টার পরিমাপ হচ্ছে দশ কোটি বছর। চব্বিশটি কোঠায় বিভক্ত এই ঘড়ির শূন্যের কোঠা থেকে জীবন শুরু। তারপরে একশো কুড়ি কোটি বছর পেরিয়ে যাবার পরে বারোর কোঠায় এসে বর্তমান কালটি জীবনের এক অতি-বিচিত্র ইতিহাসে মূর্ত। প্রথমে অমেরুদণ্ডী, তারপরে মাছ, তারপরে উভচর, তারপরে সরীসৃপ ও ডায়নোসর, তারপরে স্তন্যপায়ী ও পাখি, তারপরে শিম্পাঞ্জী ও গোরিলা—এই বিপুল বিস্তৃতিতে মানুষের চিহ্ন-মাত্র নেই। পিকিং মানুষকে পাওয়া যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটা বারোর কোঠায় পৌঁছতে আর যখন দেড় সেকেন্ড বাকি। দেড় সেকেন্ড! যে-ঘড়ির এক-একটি কোঠার পরিমাপ দশ কোটি বছর আর যে-ঘড়ি শূন্যের কোঠা থেকে রওনা হয়ে বারোর কোঠায় এসে পৌঁছেছে সেই ঘড়ির মাপে মাত্র দেড় সেকেন্ড! এই ঘড়ির কাছে মাথা নুইয়ে পুরোপলীয় যুগের প্রান্তরে আমি পা দিলাম।

তারপরেই সেই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটল।

আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম পুরোপলীয় যুগের কয়েকটি অকিঞ্চিৎকর হাতিয়ারের সামনে। হাতকুড়ুল, তীরের ফলা, ক্ষুর, কাটারি, ইত্যাদি। অনভিজ্ঞ চোখে কয়েক টুকরো পাথর ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেই নির্মম ও অপরিহার্য ঘড়ির সামনে দিয়ে মাথা নুইয়ে আসতে হয়েছিল বলে এই অতি-সামান্য পাথরের টুকরোগুলোই আমার চোখে বিপুল গৌরবে ভাস্বর হয়ে উঠল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আজ থেকে লক্ষ বছর আগেকার অমানুষিক চেহারার এক গুহাবাসী মানুষ অতি সতর্কতার সঙ্গে পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি করে হাতিয়ার বানিয়ে চলেছে। তার সর্বাঙ্গে লাল রঙের উল্কি, তার পরনে জানোয়ারের ছাল। মানুষটিকে কিছুতেই মানুষ বলে চেনা যাচ্ছিল না। অখণ্ড মনোযোগে ও অটুট অধ্যবসায়ে সে পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে পাথরের গা থেকে পরতের পর

পরত খসাচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম, বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় তার লাগবে এই সামান্য একটি হাতিয়ার তৈরি করতে। তারপরে একসময় আমার স্পষ্ট মনে হল, সে মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়েছে। ঘন দাড়িগোঁফের জঙ্গলের ভেতর থেকে একজোড়া ভয়ংকর চোখ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলতে লাগল।

আমি পায়ে পায়ে সরে এলাম।

তারপরে সেই জ্বলন্ত চোখ আমাকে যেন তাড়া করে ফিরতে লাগল। এক-একটি পদক্ষেপে লক্ষ হাজার বছর ডিঙিয়ে আমি সেই প্রান্তরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগলাম। কখনো সিন্ধুপ্রদেশের তাম্রপল্লীয় যুগের সংগ্রহ, কখনো বালুচিস্তানের মৃৎপাত্র। হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারো। তক্ষশীলা আর পাহাড়পুর। সীলমোহর ও অলঙ্কার। মাতৃকাদেবী ও নর্তকী। আমার মনে হতে লাগল, একটুকরো পাথরের হাতিয়ার কালের প্রবাহকে অন্ধগুহার বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নানা সজ্জায় ও নানা উপকরণে কালোত্তীর্ণ সার্থকতায় প্রবাহিত করেছে।

আচমকা একটা পরুষ ও কর্কশ ভর্ৎসনা কানে এল : থাম!

মস্ত লম্বা একটা কাঁচের শো-কেসের সামনে এসে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কালো বোর্ডের ওপরে সাদা হরফে কিছু লেখা :

"প্রাচীন যুগে মিশর দেশে সম্ভ্রান্ত লোকদের মৃতদেহ দাহ না করিয়া আরক প্রয়োগে রক্ষা করা হইত। এই উপায়ে রক্ষিত মৃতদেহকে 'মামি' বলা হয়। এই মামিটি মিশর দেশ হইতে প্রাপ্ত। ইহার বয়স প্রায় চারি সহস্র বৎসর। মামিটি কাষ্ঠনির্মিত আধারে আবৃত ছিল এবং সেই কাষ্ঠনির্মিত আধারের উপরিভাগে ইহার মুখাকৃতি খোদাই করা ছিল। উপরিভাগের আবরণ খুলিয়া পার্শ্বেই রাখা হইয়াছে। মৃতদেহটি কাপড়ের দ্বারা আবৃত ও বাহুদ্বয় জানু সংলগ্ন। ইহার মাংস খসিয়া পড়িয়া যাওয়ায় মুখের ও মাথার হাড়গুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মুখোশটি সরাইয়া বুকের উপর রাখা হইয়াছে।"

কুৎসিত ও দন্তুর একটি কঙ্কালের মুখ। কিন্তু পাশেই মানুষের ছবিটি অতি সুন্দর। কালো মুখোশটির মধ্যে খানিকটা কঙ্কাল, খানিকটা যেন রক্ত-মাংসের মানুষ।

কঙ্কালটি কথা বলছে শুনতে পেলাম : আমাকে ওই ঢাকনাটা পরিয়ে দেবে?

ঢাকনার মানুষটি সঙ্গে সঙ্গে যেন আঁতকে উঠল : না! না! না!

আর আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, মুখোশটি হাসছে।

চার হাজার বছরের পুরনো একটি হৃদপিণ্ড আরক-মাখানো কাপড়ের নিচে এখনো হয়তো রক্তে ভরাট হয়ে আছে। মাথার খুলির নিচে এখনো হয়তো কিছুটা মগজের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু চার হাজার বছরের যে ইতিহাস একটি একটি দাগ ফেলে একখানি সুন্দর মুখকে কঙ্কাল করে তুলেছে তাকে কি শুধু একটি মুখোশ দিয়েই চাপা দেওয়া যাবে?

আবার সেই হুঙ্কার কানে এল : থাম!

আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। সেই অমানুষিক চেহারার আদিম মানুষটি তখনো হাতিয়ার নিয়েই ব্যস্ত। ঠিক পাশেই রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি কবরের নিদর্শন। আমার মনে হতে লাগল, হুঙ্কারটা আসছে সেই কবরের ভেতর থেকেই।

এতক্ষণে আমার ভয় হতে লাগল। বড়ো বড়ো পা ফেলে হাজার-লক্ষ বছর পেরিয়ে আমি আবার এসে দাঁড়ালাম আমাদের এই বর্তমানে—সেই ঘড়ির মাপে যার দৌড় মাত্র দেড় সেকেন্ড!

* * *

অল্পবয়সী একটি সালংকারা বৌ তার স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে। ছেলেটির গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে সোনার ঘড়ি, পায়ে চকচকে জুতো। তার মুখের রেখায় সেই উদার আত্মসচেতনতা যা নতুন বিয়ের পরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত শহুরে-গ্রাম্য সকল স্বামীর মুখেই ফুটে উঠতে দেখা যায়।

বৌটি অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, মা গো!

ছেলেটি একগাল হেসে আশ্বস্ত মন্তব্য করল : দূর, ও তো মরে গেছে।

বৌটি বলল, দাঁতগুলো দেখেছ!

ছেলেটি বলল, চলো যাই।

চার হাজার বছরের দু-পাটি দাঁতের সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়ে এ-যুগের এক দম্পতি গিয়ে দাঁড়াল সেই মস্ত মস্ত মাটির পাত্রের সামনে যেগুলোকে তোলা হয়েছে কবরের ভেতর থেকে।

কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা—

বর্ষার জন্য ঠনঠনে কালীবাড়ীর সামনে সেতু নির্মাণ

বিচিত্র দেশ: বিচিত্র মানুষ

অতীন্দ্র মজুমদারের

।। দুই ।।

নির্বিঘ্ন নেশা ও প্রাণান্তক পেশা

বিয়ারের গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে মিশরীয় সাংবাদিক বন্ধুটি বল্লেন—'যাই বলুন মিঃ মজুমদার, আপনি যে-সব স্মাগলিং-এর কায়দা ব'ল্লেন, মানে যেগুলি আপনাদের দেশে চলে—যেমন, চোলাই মদভর্তি বোতলকে খোকা বানিয়ে মহিলাদের বুকে জড়িয়ে ট্রেনে চলা, গার্ডেন পাইপের দুই মুখ বন্ধ করে ভিতরে চোলাই মদ পুরে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে একসাইজ চেক্-পোস্ট পার হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি—এসবের মধ্যে চাতুর্য কম নেই, কিন্তু কিছু মনে করবেন না, এর মধ্যে কোথায় যেন বাংলাদেশসুলভ কবিত্ব আছে। বড় নরম বড় মোলায়েম এই পদ্ধতি। এক-সাইজের লোকদের একটু বুদ্ধি থাকলেই এগুলি ধরা যায়, খুব বেশি দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যবস্থাটা একটু অন্যরকম।'

সিগারেট কেসটা টেনে নিয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বল্লেন—'আমাদের দেশে এরও অতিরিক্ত লাগে কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা, আর সে পরিশ্রম শ্যামল মাটিতে নয়—কর্কশ বিস্বাদ নিষ্ঠুর মরু-ভূমির বিশাল বিস্তৃতিতে।'

—'কি রকম! কি রকম!'—আমরা সবাই নড়েচড়ে বসলুম, পকেট থেকে গোপনে কেউ কেউ সর্টহ্যান্ডের নোট-বইও বের করলেন।

মিশরীয় সাংবাদিক বন্ধুটি আড়-চোখে দেখে বল্লেন—'তবে শুনুন। এর একটি কথাও বানানো নয়, অতিরঞ্জন নয়। যার সন্দেহ হবে তিনি যেন মিশরের একসাইজ বিভাগের ভূতপূর্ব গভর্ণর শ্রীযুক্ত স্কুডামোর জারভিসের বিবরণটা পড়ে নেন। তিনি আগে ছিলেন সিনাইয়ের গভর্ণর—বর্তমানে অবসর-প্রাপ্ত।'

আপনারা সবাই জানেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকে ইউরোপ এবং আমেরিকার সর্বস্তরের কিছু কিছু লোকের মধ্যে মদ ছাড়াও অন্য নানারকম বিচিত্র নেশার ব্যাপক প্রসার হয়। সেইসব দেশের সরকারও উঠেপড়ে লেগেছিলেন এই 'এ্যাডিক্টদের সংখ্যা কমাতে,—মাদক-দ্রব্যের প্রকাশ্য আমদানি কোন কোন দেশে একেবারে নিষিদ্ধ হয়, গোপন আমদানির সমস্ত পথও কঠোর হস্তে বন্ধ করা হয়। এছাড়াও সরকারী প্রচারের মাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্র রেডিও সিনেমা টেলিভিসনকে ব্যাপক-ভাবে ব্যবহার করা হয়। সেসব দেশের লোকরাও আমার আপনাদের দেশের লোকের তুলনায় অনেক বেশি অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন। ফলে মাদকদ্রব্যবিরোধী প্রচার চালাতে এবং তাতে সুফল পেতে ঐসব দেশের সরকারকে খুব একটা অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি।

কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থাটা এত সহজ নয়। সেখানে এইসব বিজ্ঞানসম্মত সূক্ষ্ম প্রচারকার্যের চাইতে বেশি জোর দেওয়া হয় স্থূলে কঠোর এবং সংগ্রামী শক্তিগুলিকে মাদকদ্রব্যের চোরাই চালান বন্ধ করার ব্যাপারে। এরকম না করে যে কোন উপায় নেই তা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।

মিশরে ধনী ভদ্রশ্রেণীর লোকের মধ্যে মদ ছাড়া কোকেন এবং আফিং নেশা হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও, গ্রামের দরিদ্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চলে 'হসিস্'—গাঁজা থেকে তৈরী এক রকম কড়া মাদক, তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়—অনেকটা আপনাদের গাঁজা-মেশানো বিড়ির মত। কোকেন বা আফিং-এর তুলনায় এর দামও কম, অনিষ্টকরতাও কম। কিন্তু ক্রমাগত এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে এর ক্ষতি-করার ক্ষমতা কারো চেয়ে কম নয়। শক্তি-হীনতা, উৎসাহহীনতা, স্নায়ুগুলির কর্মক্ষমতা কমে গিয়ে শেষে উন্মাদ হয়ে যাওয়া—এই নেশার অবশ্যম্ভাবী ফল। দরিদ্র গ্রামবাসীরা এই অল্প পয়সার মারাত্মক নেশা করে দিন দিন জাতীয়-শক্তির অপচয় ঘটাবে—আমাদের সরকার নিশ্চয়ই তা সহ্য করতে পারেন না। সেজন্য প্রকাশ্যে হসিস্ আমদানি কঠোর-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু সব মাদকদ্রব্যের মত এরও তো চোরাই-চালান আছে—তাকেও তো বন্ধ করতে হবে। আমাদের সরকার এজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। কী ভাবে—সেটাই আপনাদের বলি।

হসিস্ আসে তিন জায়গা থেকে—সিরিয়া, আনাতোলিয়া এবং গ্রীস থেকে। আর এইসব দেশের স্মাগলাররা মিশরে এর বিরাট লাভজনক ব্যবসায়ের ক্ষেত্র দীর্ঘদিন থেকে প্রস্তুত করে বে-আইনী চালানের কারবারে সবচেয়ে বেশি

উৎসাহী। মোটামুটিভাবে এই কারবার চলে তিনভাবে—জাহাজে লুকিয়ে হসিস্ নিয়ে বন্দরের কিছু আগে জেলেদের ডিঙিতে পাচার করে দেওয়া, জেলেদের মারফত ডাঙ্গায় উটের পিঠে অন্য মাল-পত্রের সঙ্গে লুকিয়ে দেশের অভ্যন্তরে চালান দেওয়া অথবা আইনসম্মত মাল-পত্রের যেমন গম, চাল, লবণ, সোডার বস্তার নীচে হসিস্ লুকিয়ে খোলাপথে দেশের ভিতরে নিয়ে যাওয়া। চাল, গম, চিনির বস্তার একেবারে ভিতরে হসিস্ নিয়ে যাওয়ার সুবিধা এই, কাস্টমস্-এর লোকেরা সেক্ষেত্রে সমস্ত বস্তা উপুড় করে ঢেলে নিষিদ্ধ মাল খুঁজতে দ্বিধা করে। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একবার এক ব্যবসায়ী চার-গ্যালন অলিভ তেল আঁটে এরকম টিনের ভিতরে একটা ছোট বায়ুনিরুদ্ধ খোপে হসিস্ নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। এরকম তেলভর্তি টিন ছিল পাঁচশোরও বেশি এবং প্রত্যেকটি টিনে হসিস্ ছিল কমবেশি পঞ্চাশ গ্রাম করে। কাস্টমস্ প্রথমে তাকে ধরতে পারেননি—শেষে সেই ব্যবসায়ীর শত্রু আরেক চোরা-চালানদার এক বেনামী চিঠি পেয়ে শেষে তাকে আটক করতে সমর্থ হন। এই ব্যবসায়ী মিশরের বিশেষ সম্মানিত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একজন। অত্যন্ত পাকা মাথা, নিখুঁত পরিকল্পনা এবং হাজার হাজার টাকা এই ব্যবসার পিছনে খাটে। আর, শুনে অবাক হবেন না, যারা এই ব্যবসায় চালায় তারা বেশিরভাগই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, শিক্ষিত, অর্থবান ব্যবসায়ী।

জাগ্রত প্রহরী
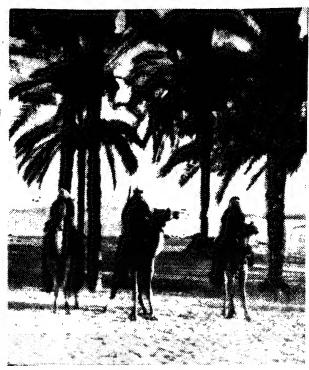
জাহাজে করে যখন হসিস্ আসে তখন সর্বদাই চামড়ার বা রবারের থলিতে তা প্যাক করা হয় যাতে বিপদে পড়লে জাহাজের লোক তা সমুদ্রে ফেলে দিতে পারেন এবং সমুদ্রে পড়েও জল লেগে যাতে জিনিসটা নষ্ট হয়ে না যায়। এই রবারের বা চামড়ার থলির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় ভারি নুনের পুঁটলি—এতটা পরিমাণ নুন থাকে যাতে তিনচারদিন পরে নুন গলে গিয়ে রবারের বা চামড়ার থলিটা আবার জলে ভেসে উঠতে পারে। তখন পূর্বে থেকে খবর পাওয়া জেলেরা সেগুলি তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট এজেন্টদের হাতে তুলে দেয় এবং নিজেদের পাওনা বুঝে নেয়। কাস্টমসের লোকরা তা জানে, তারাও সন্দেহভাজন জাহাজে কোন

পালাবার পথ নেই!

হাসিস্ না পেলেও সামুদ্রিক এলাকা-টুকুকে দিনরাত পাহারা দেয় যাতে কোন জেলে-ডিঙি সেদিকে না আসতে পারে। জেলে-ডিঙি আসতে দেখলেই তারা বুঝতে পারে এখানে জলের তলায় চোরাই হাসিস্ আছে এবং দু-চারদিনের মধ্যেই তা ভেসে উঠবে।

এই ফন্দী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে দেখে চোরাই চালানদাররা পাশা-পাশি ডাঙার পথেও কারবার চালিয়ে যায়। এতে সব চেয়ে পছন্দের রাস্তা হচ্ছে উটের পিঠে মাল চাপিয়ে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে গোপনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। প্রথমতঃ এই ব্যবস্থায় খরচ কম এবং দ্বিতীয়তঃ পেট্রোল পুলিশের সতর্ক চোখ এড়িয়ে কিছু না কিছু হাসিস্ ঠিক নিয়ে যাওয়া যায়—জাহাজের মত সবটাই মার যায় না। মিশরের বিশাল মরুভূমির সবটার ওপর চোখ রাখা যায়—এত বিরাট পেট্রোল পুলিশ পুষবার সামর্থ এখনও মিশর সরকারের হয়নি। চোরাই-চালান-দাররা এই বিশাল মরুভূমির কোন্ কোন্ এলাকায় পুলিশের সংখ্যা কম তা নিজেদের পিতামাতার নামের মত সযত্নে মনে রাখে এবং সব সময় চেষ্টা করে সেই সব জায়গা দিয়ে মাল পাচার করতে। তাতে ঝুঁকি কম, লাভ বেশি।

কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও মিশরীয় আবগারী পুলিশের বুদ্ধি এবং শক্তিও চোরা-চালানদারদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বিশাল মরুভূমি যেমন একদিক দিয়ে তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক, আরেক দিক দিয়ে তেমনি সবচেয়ে বড় সহায়ক। জলে জাহাজের দাগ থাকে না, কিন্তু মরুভূমির বালুকা পদচারী এবং উটের ক্যারাভানের পদচিহ্ন সযত্নে নিজের বুকে ধরে রাখে। আর এই পদচিহ্নই তাদের সবচেয়ে বড় বন্ধুর কাজ করে। এবিষয়ে মিশরীয় আবগারী পুলিশের অসাধারণ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা আছে। তারা বালির ওপর পদচিহ্ন দেখে বলে দিতে পারে কী রকম গতিবেগে উটের সারি গিয়েছে, উটের পিঠের মাল খুব ভারি না হাল্কা, দিনে গেছে না রাত্রিতে মরুভূমি পার হবার চেষ্টা করেছে, কতক্ষণ আগে করেছে। তারা যদি দেখে ছজন লোক আর ছটি উট, জানতে হবে তারা সাধারণ ব্যবসায়ী নয়—ছটি উট পুষতে পারে এমন ব্যবসায়ী মরুভূমির এদিক দিয়ে যাবে না। তারা যদি দ্রুত গিয়ে থাকে, জানতে হবে তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক। যদি সাধারণ মাল যেত—যেমন, কয়লা, কাঠকয়লা, গম, বার্লি, চিনি ইত্যাদি তবে প্রতিটি উট গাদাই হত বেশি, উটের পায়ের দাগ বালিতে আরও গভীর হয়ে চেপে বসতো, হাল্কা পায়ের দাগ মানেই হাল্কা মালপত্র, এবং ছটি উটের প্রত্যেকটিতে হাল্কা মালপত্র থাকা মানেই তাদের সংগে নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ কোন জিনিস আছে। উটের পায়ের ছাপে এখনও শিশির শুকোয়নি—জানতে হবে তারা রাত্রে মরুভূমি পাড়ি দিয়েছে। রাত্রে কেন? তখনই আবগারী পুলিশ নানাদিকে খবর পাঠায় এবং সম্প্রতি-দৃষ্ট পায়ের ছাপের অনুসরণ করে। যারা উটের পায়ের ছাপ দেখে এসব জিনিস দিবালোকের মত পরিষ্কার বলে দিতে পারে, তাদের বলে 'ট্র্যাকার'—বংশানুক্রমে তারা এ বিদ্যায় শিক্ষিত এবং আপনি আমি যেমন ইংরেজি বা বাংলা খবরের কাগজ নির্ভুল পড়তে পারি এবং পড়ে বুঝতে পারি—তারাও এই পায়ের চিহ্ন আঁকা হরফ পড়ে চোরাচালানদার-দের সমস্ত খবর নির্ভুল বলে দিতে পারে। অথচ এদের অধিকাংশই অক্ষর-জ্ঞানহীন 'অশিক্ষিত' লোক!
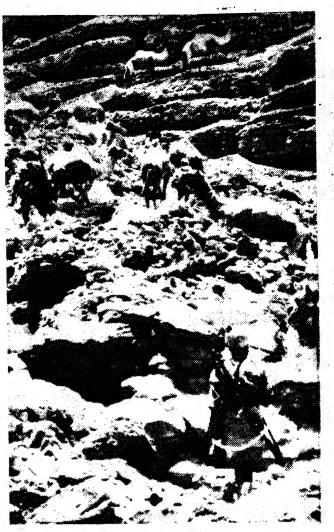
সিনাই পাহাড়ে অনুসন্ধান

উটের পায়ের ছাপ দেখে ট্র্যাকাররা যখন নিঃসংশয়ে বলে দেয়, এই ব্যবসায়ীরা অন্ধকারের রাজ্যের লোক তখন চলে বিনা দ্বিধায় সেই ক্যারাভানের অনুসরণ। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই

ট্র্যাকররা আশ্চর্য বুদ্ধি এবং অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেয়। কোন লোকের ফোটোগ্রাফ্ দেখে এরা কিছুই বুঝবে না বা বুঝলেও বোঝাতে পারবে না। কিন্তু সেই লোকেরই পায়ের ছাপ যদি এরা বালির ওপরে একবার দেখে, তারা লোকটির নির্ভুল বিবরণ দিয়ে দেবে—আর শুধু তাই নয়, এক বছর পরেও নানা পায়ের ছাপের মধ্যেও সেই বিশেষ ছাপটি তারা ঠিক খুঁজে বের করে দেবে। সেইজন্য পেট্রোল পুলিশবাহিনীর দশজন সিপাই-এর চেয়ে একজন অভিজ্ঞ ট্র্যাকারের দাম অনেক বেশি। চোরাই-চালানদারদের হিংস্র আক্রমণ থেকে এদেরকে রক্ষা করতে পেট্রোল পুলিশদের আন্তরিকতা দেখবার মত।

জেনে রাখুন, আপনাদের দেশের ছিঁচকে চালানদারের মত মিশরের হসিস্ স্মাগ্লাররা নিরীহও নয়, নিরস্ত্রও নয়। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে থাকে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দূরপাল্লার রাইফেল—আর তাদের 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন' হওয়ায় যে মুহূর্তে তারা বুঝতে পারে তারা পুলিশের নজরে পড়েছে, সে মুহূর্তে তারা হিংস্র বাঘের মত রুখে দাঁড়ায় এবং তাদের সঙ্গের অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ বেপরোয়া ব্যবহার করতে একটুও দ্বিধা করে না। ফলে মিশরের আবগারী পুলিশকেও সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়, জীবনের বদলে জীবন নেবার জন্যে।

পুলিশের নজরে এসেছে কিনা জানতে এদের খুব একটা অসুবিধা হয় না, কারণ মরুভূমিতে উজ্জ্বল দিবালোকে খালি চোখে এরা দু মাইল দূর পর্যন্ত দেখতে পায়! এদের শুধু নয়, আবগারী পুলিশের চোখও সেভাবে তৈরী। পুলিশ দেখতে পাওয়া মাত্র দলের অর্ধেক লোক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয় এবং বাকি লোক চোরাই মাল নিয়ে পালায়। প্রত্যেক সংগ্রামে এদেরকে পর্যুদস্ত করে পলায়নপর স্মাগ্লারদের ধরতে স্বভাবতই পুলিশের কিছুটা সময় নষ্ট হয়, কিন্তু সহজে কেউ তাদের এড়িয়ে একেবারে পালাতে পারে না। তার কারণ পুলিশের কাছে খাদ্য এবং জল থাকে বেশি, সেজন্য ধীরে-সুস্থে অধিক সংখ্যায় লোকবলে বলীয়ান হয়ে এরা চোরাকারবারীদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে অনেক দিন ধরে। তাড়াতাড়ি পালাতে হবে বলে চোরা-চালানদাররা খাদ্য, পানীয় বেশি সঙ্গে রাখে না, ফলে তাদের কাবু করতে সময় একটু বেশি লাগলেও পুলিশের লোকের অসুবিধা খুব হয় না। ধরা যখন পড়তেই হবে তখন চোরাকারবারীরা হসিসের বাণ্ডিল বালির মধ্যে ফেলে দিয়ে পালায়। বিশ ত্রিশ বছর আগে এক প্যাকেট চোরাই হসিস ধরলে পুলিশের পুরস্কার ছিল প্রায় দশ টাকা, আর চালানদার লোকটিকে ধরলে তার যা জরিমানা হবে (ধরা যাক তিনশো টাকা)—যে পুলিশ তাকে ধরবে; সে পাবে সেই জরিমানার টাকার শতকরা নব্বই ভাগ। সেজন্য তখন পুলিশ চোরা-চালানদারকে ধরবার চেষ্টা করত আগে, হসিসের বাণ্ডিল পরে। কিন্তু তাতে দেখা গেল খুব কম চোরাচালানদারেরই অত টাকা জরিমানা দেবার সামর্থ আছে—আর হসিসের দিকে বেশি নজর না দেওয়ায় পরে সেটা কোন অসৎ ব্যবসায়ীর হাতে চলে যেতে পারে এবং সে পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা হিসাবে সেই হসিসের চোরাকারবারে অংশ নিয়ে নিতে পারে। এখন এই আইন বদলানো হয়েছে। এখন হসিস ধরলে পুরস্কার বেশি, চালানদার ধরলে অপেক্ষাকৃত কম।

হসিসের ব্যবসায় ভাগীদার তিনজন। সিরিয়া বা গ্রীস কিম্বা আনাতোলিয়া থেকে যে মাল পাঠায় সে—দ্বিতীয় ব্যক্তি এজেন্ট বা উৎপাদকের ঘর থেকে যে জিনিস কেনে এবং নিজের দেশের সমধর্মী এজেন্টের কাছে পাঠায়,—তৃতীয় ব্যক্তি 'রানার'—যে এক এজেন্টের কাছে মাল নিয়ে অন্য এজেন্টের কাছে পৌঁছে দেয়। রানাররা অনেক সময় এজেন্ট বা প্রাপক এজেন্টের কাউকেই চেনে না বা জানে না, সাব-এজেন্টরা যোগাযোগ করে। তাই মাল-পরিবহকরা বা রানাররা ধরা পড়লেও প্রেরক বা প্রাপকের নাম বলতে পারে না, উৎপাদকের কথা তো এরা জানেই না। এই রানাররা হয় অত্যন্ত গরীব, ধরা পড়লে তাই এরা মোটা জরিমানা দিতে পারে না—পুলিশের গুলিতেও এরাই মরে বেশি। এদের পারিশ্রমিকও খুব কম—মালের মোট দামের শতকরা দুই ভাগ মাত্র!

কিন্তু পুলিশকে যন্ত্রণা এরাই দেয় সবচেয়ে বেশি। বিনা দ্বিধায় নরহত্যা করতে এদের জুড়ি নেই, সন্দেহজনক কোন লোককে এরা আশেপাশে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে। মরুভূমিতে পথ হারিয়ে এদেরকে নিরীহ ব্যবসায়ী মনে করে এদের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে কত নিরপরাধ লোক যে এদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে, তার সংখ্যা নেই। তাই এদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পুলিশও জনসাধারণের সাহায্য সহজেই ইদানীং পাচ্ছে। ধরতে না পারলে গুলি করে মারার অধিকারও পুলিশকে সরকার দিয়েছেন।

'কিন্তু তবুও,' মিশরীয় সাংবাদিক বন্ধুটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই নিষিদ্ধ নেশা এবং প্রাণান্তক পেশায় লোকের অভাব তো হচ্ছে না!'

[উপন্যাস]

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

॥ চৌদ্দ ॥

গাড়ীর তিনজনই দারুণভাবে চমকে উঠল, সব চাইতে বেশি করে চমকালো তৃপ্তি। তিনজনেই চেয়ে দেখল, অভয়কে একটা খ্যাপা খুনীর মতো ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। একরাশ বিশৃঙ্খল চুল ঘামে কপালের সঙ্গে লেপ্‌টে রয়েছে, খাকি শার্টটার বুক পর্যন্ত যেন বৃষ্টির জলে ভেজা, যে হাতটা গাড়ীর জানলায় রেখেছে, তাতে মেসিনের তেল-কালির দাগ। জ্বলন্ত চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে।

তৃপ্তি গাড়ীর গদীর ভিতরে মিলিয়ে যেতে চাইল, আর অমিয় বললে, দাদা?

অভয় তেলকালি মাখা একটা বিরাট মুঠোয় গাড়ীর জানলাটা আঁকড়ে ধরল। জিজ্ঞেস করল : কোথায় গিয়েছিলি?

অমিয় প্রাণপণে গলাটাকে পরিষ্কার করে নিতে চাইল। তারপর বললে, মানে দিদিকে দেখে আমি আর তিপু হাসপাতাল থেকে আসছিলুম। তখন আমার এই ফ্রেন্ড চন্দন সিং--

চন্দন সিং বললে, আপনিই অমিয়র দাদা অভয়বাবু? নমস্কার।

অভয় তাকিয়েও দেখল না। অমিয় আবার বলতে চেষ্টা করল : চন্দন সিং বললে, চলো—তোমাদের একটা লিফ্‌ট—

—নারকেলডাঙা বুঝি ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে পশ্চিম মুখে? —অভয় দাঁতে দাঁত ঘষল : নেমে আয়, এক্ষুণি নেমে আয়—

তৃপ্তি নেমে পড়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই। চন্দন সিং-ই আবার বললে, আপনিও আসুন, আপনাকে—

পথের সমস্ত লোককে আর একবার চমকে দিয়ে বাঘের মতো গর্জন করল অভয় : অমিয়, নেমে আয় বলছি—উল্লুক, রাস্কেল কোথাকার!

ট্রাফিকের 'জাম' খানিকটা কমে এসেছে, একটু একটু করে এগোতে শুরু করেছে গাড়ীগুলো। চন্দন সিংয়ের গাড়ীর পেছনে ঘন ঘন কয়েকটা অধৈর্য হর্ণের শব্দ উঠল। আর এর মধ্যেই ছোটখাটো একটা ভিড় নাটকের গন্ধ পেয়ে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসতে লাগল সেদিকে। একজন পাহারাওলা আকৃষ্ট হল, একটি লম্বা গলা বেশ উৎসাহের সঙ্গে জানতে চাইল : ব্যাপার কী দাদা?

অগত্যা লাফিয়ে নেমে পড়ল অমিয়। পেছনের হর্ণের তাড়ায় এগিয়ে গেল চন্দন সিংয়ের গাড়ীটা।

কৌতূহলী ভিড়টা তখনো আশা ছাড়েনি। সেই লম্বা গলাটি আবার প্রশ্ন করল : কী দাদা, কিড্‌ন্যাপিং নাকি?—আর প্রায় সবগুলো চোখ এসে জড়ো হল তৃপ্তির ওপরে। পরিস্থিতিটা বেশ ঘনীভূত বলে মনে হচ্ছিল তাদের।

অভয় তৃপ্তির একটা হাত চেপে ধরল। রুক্ষ স্বরে বললে, রাস্তার ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি হাঁ করে? চলে আয়।

তিনজনে নিঃশব্দে শেয়ালদা বাজারের চৌহদ্দি পার হল, পেরিয়ে এল হ্যারিসন রোড, তারপর এদিকের স্ট্যান্ড থেকে নারকেলডাঙার বাস ধরল। তৃপ্তি একটা লেডীজ সীটের কোণায় ঘাড় গুঁজড়ে বসে রইল, অভয় আর অমিয় বসতে পেলো না, হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আর অভয়ের ঘামে ভেজা ময়লা খাকি শার্টটার একটা তীব্র গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে অমিয় অনুমান করতে চেষ্টা করল, আজকের এই জল কোথায় আর কতদূরে পর্যন্ত গড়াবে।

বাসটা যখন খালের কাছে এল, তখন নড়ে উঠল অভয়। বললে, বাঁধকে—বাঁধকে। এই তিপু—নাম—

তৃপ্তি বিভ্রান্তভাবে উঠে দাঁড়ালো, আর অমিয় আশ্চর্য হয়ে বললে, এখানে নামব কেন দাদা?

—দরকার আছে। নাম—

রাগে চুলের ডগা পর্যন্ত জ্বলছিল অভয়ের, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানটা একেবারে লোপ পায়নি। নিজের চোখেই সে দেখেছে, অমল হলেই শয়তান হোক, সব কথা সে বানিয়ে বলেনি। কাজেই ব্যাপারটার একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া দরকার। আর বাসে আসতে আসতে মনে হয়েছিল, এ নিয়ে বাড়ীতে কোনো আলোচনাই করা উচিত নয়। বাবার শরীর আর মনের যে অবস্থা, তাতে জিনিসটা ঘুণাক্ষরেও তাঁর কানে উঠলে কী যে ঘটবে তা বলা শক্ত। তাই একটু নিরিবিলিতে একটু আলোচনা করা দরকার।

নিরিবিলি এদিকে কোথাও নেই। না মাটিতে—না আকাশে। চারদিকে গরিব

মানুষের গিজগিজে ভিড় আর অপরিচ্ছন্নতার চরম। গ্যাস কোম্পানি আর রেলওয়ে সাইডিঙের ধোঁয়া, পথের ধুলো, আবর্জনা থেকে গন্ধের উচ্ছ্বাস—সব মিলে মাথার ওপরের বাতাসটা যেন কালো কম্বলের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। গুমোট গ্রীষ্মের এই সন্ধ্যায় মনে হচ্ছে সেটা যেন আস্তে আস্তে নেমে আসছে নীচের দিকে, এক সময় সমস্ত মানুষকে চেপে ধরে, এক সঙ্গে দম বন্ধ করে দিয়ে হত্যা করবে।

নিরিবিলি কোথাও নেই—নিঃশ্বাস ফেলবার, নিঃসঙ্গ হওয়ার এতটুকু অবকাশ নেই কোথাও। তাই খালের পুলটাই বেছে নিল অভয়।

তিনজনে পুলটার ওপর পাশাপাশি দাঁড়ালো। পাশ দিয়ে মানুষের আসা-যাওয়া। একটা অন্ধ বুড়ী একটানা বলে চলেছে, 'আল্লা — রহমান — রহমতুল্লা।' আলো জ্বলে উঠেছে পুলের ওপর, চিকচিক করছে বুড়ীর সাদা চুল আর এলুমিনিয়ামের তোবড়ানো বাটিটা। আর সেই বাটির ভেতরে ঠনঠন করে দু' একটা নয়া পয়সা পড়বার শব্দ উঠছে।

অমিয় কাঠ হয়ে রইল, আর তুফান-ওঠা বুকে খালের কালো জলের দিকে তাকিয়ে রইল তৃপ্তি। অভয় জানতেও পারল না, এইখানে, এমনি সন্ধ্যাবেলায় কতদিন দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখে অমিয়। নানক সিং—গুরুবক্স সিংয়ের মতো বাড়ী, মোজেইক করা মেজেতে কার্পেট পাতা, ঝকঝকে চায়ের সেট, শাদা রঙের একটা টেলিফোন আর লাখ লাখ টাকা।

অভয় গোঁয়ার মানুষ। রাগটা চট করে যেমন ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়ে পৌঁছোয়, তেমনিই হঠাৎ সেটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এইখানে—মিনিট তিনেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর একবার তৃপ্তির দিকে চেয়ে দেখল সে। এই কলকাতার শহরের পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, কত রং-বেরংয়ের পোশাক পরা সুন্দরী মেয়ে সে দেখতে পায়। কিন্তু নিজের এই ছোট বোনটির মতো এমন মিষ্টি আর শান্ত চেহারা আর কোথাও দেখেছে বলে সে মনে করতে পারে না।

কোনো অন্যায় করতে পারে তৃপ্তি? কোনো দোষ? অভয় বিশ্বাস করতে পারল না। সব এই হতচ্ছাড়া অমিয়র জন্যে। না আছে বুদ্ধি, না আছে কাণ্ড-জ্ঞান। নিশ্চয় ওই পাঞ্জাবীটার কাছে বাহাদুরী দেখাবার জন্যে—

অভয় ডাকল : অমিয়?

—কী বলছ?

—দিদিকে হাসপাতালে দেখতে এসেছিলি?

অমিয় গোঁজ হয়ে জবাব দিলে, তাই তো বলছিলুম তোমাকে। চন্দন সিংয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, বললে, কষ্ট করে আর যাবে কেন, গাড়ীটা তো রয়েইছে, চলো—একটা লিফ্‌ট—

রাগটা একটু পড়ে এসেছিল, আবার ধাঁ করে জ্বলে উঠল মাথার ভেতরে।

ধরিয়েছিল, তার হাত থেকে সেটা খালের জলে গিয়ে পড়ল।

অভয় বললে, বাড়ী ফিরবি—তা' হলে ওদিকে যাচ্ছিলি কেন? আর শুধু আজই? এর আগে তুই তৃপ্তিকে ওই পাঞ্জাবীটার গাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্মতলার একটা চায়ের দোকানে ঢুকিসনি ক'বার?

অমিয় শাদা হয়ে গেল।

—আ-আ-আমি—

অভয় হাত বাড়িয়ে খপ করে অমিয়র চুলের মুঠো টেনে ধরল। তারপরে ঠাস

রাগটা.....ধাঁ করে জ্বলে উঠল মাথার ভেতরে

—মিথ্যে কথা বলছিস কেন উল্লুক কোথাকার?

—বা-রে, মিথ্যে কথা কেন—

—শাট্‌ আপ হতচ্ছাড়া ইডিয়ট।—অভয় এমন চিৎকার করল যে অন্ধ বুড়ীটার একটানা আকুতি মাঝপথেই থমকে গেল। দুটো শাদা চোখের শূন্য দৃষ্টি মেলে একবার ফিরে দেখল এদিকে। খানিক দূরে একজন লোক পুলের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি

ঠাস শব্দে দুটো চড় বসিয়ে দিলে তার গালে। 'রহমতুল্লা রহমান' বলতে বলতে বুড়ীটা থমকে গিয়ে আবার পর্দা পড়া শাদা চোখ দুটো এদিকে মেলে ধরল, যে লোকটার হাত থেকে বিড়িটি পড়েগিয়েছিল, সে খুশী হয়ে ভাবল : 'বাস্‌, লাগ গিয়া।' এ অঞ্চলে দু-চারটে ছোট-খাটো মারামারি এমনি প্রতি মুহূর্তের ঘটনা যে সে এর চাইতে বেশি কৌতুহল বোধ করল না। কেবল একটি সুন্দরী মেয়েকে পাশে

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটা কিছু নিজের মতো করে বুঝে নিলে, 'ওহি মামলা। একটো খুপসুরত লড়কি।'

রাগে আর অপমানে নীল হয়ে গেল অমিয়।

—খামোকা মারছ কেন আমায়?

—খামোকা?—আবার একটা চড় বসালো অভয়: তুই তো জাহান্নামে গেছিস, তিপুকে নিয়ে কেন ভিড়িয়েছিস এই পাঞ্জাবীটার সঙ্গে? তার ওপর মিথ্যে কথা বলে ঢাকতে চাইছিস সব? আমি তোর গলা টিপে মেরে এই খালের জলে ফেলে দেব।

—কিছু না জেনে-শুনেই আমার গায়ে হাত তুলছ তুমি?—অমিয়র জলভরা চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরুল: চন্দন সিং খুব ভালো লোক। একদিন শুধু চা খাইয়েছিল—

—একদিন?

—তা-তা—দিন দুই হবে। সে যে আমাকে কত ভালোবাসে—

তোকে ভালোই বাসুক আর তোর গলায় কৃপাণই বসিয়ে দিক, আমার কিছু যায় আসে না।—অভয়ের হাতটা তখনো শক্ত করে জামার কলারটা টেনে রাখল অমিয়র: এর মধ্যে তিপুকে কেন টেনেছিস তুই?

—বা-রে, হাসপাতাল থেকে দু জনে তো একসঙ্গেই বেরুই। তা ছাড়া চন্দন সিং তো দিদিকেও একদিন দেখে এসেছে হাসপাতালে। ফুল দিয়েছে, মিষ্টি দিয়েছে, গল্প করে এসেছে। জিজ্ঞেস করো প্রভাতদাকে, সেও—

—চুপ আর একটা কথাও নয়।—আবার হুংকার ছাড়ল অভয়।

আর সেই লোকটা আরো একটু সরে এল এদিকে। একটা চেনা উর্দু ছবির কোনো রোমাঞ্চকর দৃশ্য মনে পড়ছিল তার। এমনি কোনো পুলের ওপর এই ধরনের কিছু ঘটছিল সেখানে। তারপর দুজনে সড়াক্ সড়াক্ করে কোমর থেকে দু'খানা তলোয়ার টেনে বের করেছিল, আর যুদ্ধের তালে তালে ঘাগরা উড়িয়ে নাচতে শুরু করেছিল মেয়েটি। দর্শকেরা চেঁচিয়ে উঠেছিল: 'মারহাব্বা—মারহাব্বা।' এখানে তলোয়ার না হোক, স্বচ্ছন্দেই ছোরা বেরিয়ে আসতে পারে দু'খানা, তবে যে-মেয়েটি ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে কাঁদতে শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছছে, সে সঙ্গে সঙ্গেই নাচতে আরম্ভ করবে কি না, সেটা অবশ্য জোর করে বলা যায় না।

'নইনোমে বাত বোলি, নইনোমে চলি—' লোকটি মৃদু গলায় নেপথ্য সঙ্গীত ধরল। আর অন্য বুড়োটা সুর কেটে দিয়ে তীক্ষ্ণ ভাঙা গলায় আবার চিৎকার ছাড়ল: আল্লা-রহমান—রহমতুল্লা—

অভয় বললে, শেষবার সাবধান করে দিচ্ছি। তিপু ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না—তুই যেখানে নিয়ে যাস, সেখানে যায়। কিন্তু তোর একটা আক্কেল হল না লক্ষ্মীছাড়া। জাম্বুবান কোথাকার? এই সেদিন এত কেলেঙ্কারী হয়ে গেল, দিদি এখনো হাসপাতালে, সব ভুলে গেলি তুই? দেখতে পাচ্ছিস না আমরা গরিব—চারদিক থেকে আমাদের গিলে খাওয়ার জন্যে লোকে হাঁ করে রয়েছে?

—গরিব আমরা বেশিদিন থাকব না।—অমিয়র স্বর জোরালো হয়ে উঠল: শিগ্‌গীরই আমি ব্যবসায় নামছি চন্দন সিংয়ের সঙ্গে। দু বছরের মধ্যেই দেখবে—

—চুপ!

'নইনোমে বাত বোলি'—আর একটু

কাছে ঘেঁষল। ছোরা সত্যিই বেরুচ্ছে নাকি?

অভয় ভাবছিল, ফুটবল খেলোয়াড় অমিয়কে ফুটবলের মতোই একটা লাথি দিয়ে খালের জলে ফেলে দেয়। কিন্তু রাগটা নরম হয়ে এসেছে এবার। শুধু অমিয়র ঝুঁটি ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, জানি গর্দভ, ওইতেই তুমি মরেছ! আবু হোসেনের বাদশাহীর স্বপ্ন দেখছ, দুনিয়াশুদ্ধ শয়তান লোকের মতলব বুঝতে পারো না।

—চন্দন সিং শয়তান নয়।

—ফের?

অমিয় মাথা নীচু করে একটা বুনো মোষের মতো নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। সে—অমিয় দে—এখন একটা নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড়। নানা ক্লাবে তার অসম্ভব খাতির, অনেকে তো সোজা-সুজিই বলে, দু-চার বছর পরে ইস্টবেঙ্গল কিংবা মোহনবাগানের রাইট হাফে তার পজিশন বাঁধা। এখন আর কেউ তাকে 'তুমি' বলে না, 'আপনি' বলে ডাকে। চন্দন সিংয়ের মতে অমিয়র মাথা পরিষ্কার, স্বভাব চট-পটে, ট্যাক্সি একটা কোনোমতে কিনতে পারলে তর তর করে এগিয়ে যাবে উন্নতির দিকে। তা ছাড়া সে যখন রিফিউজী, তখন একটু তদ্বির করলেই সরকারী লোনও একটা পেয়ে যেতে পারে ট্যাক্সির জন্যে। অমিয় ভেবেও রেখেছে, হাতে কিছু জমলেই লেক কিংবা নিউ আলিপুরের দিকে জমি কিনে একটা মনের মতো বাড়ী করবে, বাবাকে তেতলার ঘরে নানক সিংয়ের বাড়ীর মতো একটা মস্ত ডিভানে শুইয়ে রাখবে! আর তার এত সব ভালো ভালো ইচ্ছের এই পরিণাম! সে—নামজাদা খেলোয়াড়, ভাবী ব্যবসায়ী অমিয় দে—এই নোংরা পুলটার ওপর দাঁড়িয়ে চোরের মার খাচ্ছে অভয়ের হাতে! আর যে অভয় নিতান্তই কার-খানার মজুর, যার গা থেকে উগ্র ঘামের গন্ধ বেরুচ্ছে এখন, যার হাতে তেল-কালি মাখানো।

অমিয় তৎক্ষণাৎ বুঝল, এই সংসারের জন্যে তার কিছুই করবার নেই। এবার তাকে স্বাধীন হয়ে নিজের পথ দেখতে হবে। নারকেলডাঙার ও বাড়ী তার জায়গা নয়।

অভয় বললে, আমি চেষ্টা করছি তোর জন্যে। বলেওছি দু'চার জনকে। আমাদের কারখানায় ঢুকিয়ে—

অমিয় বললে, মজুরের কাজ?

অভয় ব্যঙ্গ করে বললে, না—ম্যানেজারের চাকরি। দেড় হাজার টাকা মাইনে। পোষাবে না?

তেমনি ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল অমিয়। এসব তুচ্ছ কথার জবাব দেবার কোনো মানে হয় না।

অভয় এতক্ষণে তৃপ্তির দিকে ফিরে চাইল। বললে, চল্ তিপু, বাড়ী চল্। ফের যদি কোনোদিন তুই অমিয়র সঙ্গে রাস্তায় বেরোস, আমি তোর মাথা ভেঙে দেব।

ওরা তিনজন চলে যাওয়ার পরে সেই লোকটি কিছুক্ষণ নিরাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নাঃ—বাংলা ফিলিমের মতো বাঙালিও নেহাৎ নিরীহ—কেমন চট করে মিটিয়ে ফেলল সমস্ত। বিরক্ত হয়ে ঠনু করে দুটো নয়া পয়সা সে বুড়ীর এলু-মিনিয়ামের তোবড়ানো বাটিটায় ফেলে দিলে, এটুকু নাটকের জন্যে এর বেশি খরচ করা যায় না।

কল্পনা চলে যাওয়ার পর দীপ্তির পাশের বেডে যে এল সে এক সত্তর বছরের বুড়ী।

চানের ঘরে গিয়ে আছাড় খেয়েছিল, বাঁ পায়ের হাঁটুর হাড় ভেঙে গেছে। হাড় সেট করে প্লাস্টার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বুড়ীর চীৎকার আর থামে না। ওয়ার্ডশুদ্ধ সকলের মাথা ধরিয়ে দিয়েছে।

মেদিনীর মতো সর্বংসহা এ ঘরের ছোট্ট রোগা নার্সটি। কখনো রাগ করে না, বিরক্তি নেই কোনো সময়। তারও পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুতি হয়।

—একটু শান্ত হয়ে থাকুন ঠাকুরমা। একটু সহ্য করুন।

—সহ্য করব!—বুড়ীর গলা খন খন করে ওঠে: তোমার আর কী বাছা! নিজে তো খুরওলা জুতো পরে দিব্যি খুট্‌-খুটিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছ। আমার মতো পা ভেঙে গেলে বুঝতে পারতে।

—আজ্ঞে বুঝেছি তো সবই।—নার্স তবু বোঝাতে চেষ্টা করে: কিন্তু কী করবেন বলুন। এ ঘরে আরো তো মেয়েরা রয়েছে। তারাও যখন সয়ে যাচ্ছে, তখন আপনি অত ব্যস্ত হলে—

—থামো রে বাপু, থামো। তোমাদের বয়েস অল্প, রক্ত গরম। বুড়ো হাড়ে চোট খেলে কেমন লাগে, সে তুমি কেমন করে বুঝবে! তুমি তো বাছা নার্স সেজে মাথায় টুপি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, যদি ঘর-সংসার থাকত—

—আছে ঠাকুরমা।—নার্সটি অল্প হাসে: আমারও স্বামী আছেন, ছেলে আছে একটি।

—তা হলে এই হাসপাতালে কেন এসে জুটেছ বাছা, এই ছত্রিশ জাতের রুগী ঘাঁটতে? ঘরে বুঝি মন টেঁকে না?

—টিঁকবে না কেন। তবে সংসার তো চালানো চাই।

সংসারের কথায় বুড়ীর চিন্তা অন্যদিকে মোড় ঘোরে।

—ছাইয়ের সংসার—পোড়া সংসারের মুখে ঝাড়ু।—হাঁটুর ব্যথাটা চাগিয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে গলা-ফাটানো চিৎকার ছাড়ে বুড়ী: ওরে বাবা রে, হাঁটুটা আমার গেল রে! সংসার! সংসারে নুড়ো জেলে দিতে হয়। সেই হতচ্ছাড়ী বড় বৌটাই তো যত নষ্টের গোড়া।

—সেই বড় বৌটাই বুঝি আপনাকে আছাড় খাওবার জন্য বাথরুমে পিছল করে রেখেছিল ঠাকুরমা?—নার্সের মুখে রুমাল ওঠে।

—অ, হাসি হচ্ছে?—আগুন-গরম কড়াইয়ে কাঁচা তেল পড়বার মতো বুড়ী

জ্বলে ওঠে : তা হাসবেই তো বাছা। পড়তে সেই রাক্ষুসীর পাল্লায়, তা হলে টের পেতে। একটা কথা আমার কইবার জো নেই? বলে, সব জিনিসে আপনার আসবার দরকার কি মা, বয়েস তো ঢের হল, পুজো-আচ্চা নিয়েই থাকুন না। ছেলেকে পর্যন্ত ভেড়া বানিয়ে ছেড়েছে। বলে, মা চলো, তোমায় কাশীতে রেখে আসি। শেষ বয়সে বাবা বিশ্বনাথের পায়ের তলাতেই পড়ে থাকবে।

নার্স বলে, সে তো ভালোই।

—ভালোই?—দাঁত নেই, কালো কালো ফাঁকা মাড়িগুলোকেই বুড়ী বিশ্রীভাবে খিঁচিয়ে ওঠে : দাঁতে কুটো নিয়ে সংসার গড়েছিলুম, কর্তা চাকরি করত ষাট টাকা মাইনেতে। তাই থেকে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, দুই ছেলেকে কলেজ থেকে পাশ করিয়েছি। এখন বাড়ী হয়েছে, মোটর গাড়ী হয়েছে, নাতি-নাতনীতে ঘর ভরে গেছে। এখন তো বুড়ী একেবারে বাতিল—আপদ বিদেয় করতে পারলেই হল। গলার হার বিক্রী করে যখন পরীক্ষার ফিস্ দিয়েছি, তখন আমায় দরকার ছিল। এখন আর কী! যদি এই হাসপাতাল থেকে আর না ফিরে যাই, তা হলেই বাড়ীশুদ্ধ লোকের প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ই হি-হি—গেলুম রে! ওগো, তুমি কোথায় গো—এবার আমায় কাছে টেনে নাও গো, এই পাপপুরী থেকে আমায় তুমি উদ্ধার করো গো!

কুড়ি বছর আগে যে স্বামী স্বর্গে গেছেন, তারই জন্যে বুড়ীর শোক নতুন করে উথলে ওঠে।

নার্স আর দাঁড়ায় না। তার অনেক কাজ।

কিন্তু বুড়ীর কান্না আর কাকুতি দীপ্তির কাছে একটা অন্য অর্থ বয়ে আনে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সংসারে সকলেরই এক দশা। সেও যদি কোনোদিন সম্পূর্ণ সেরে না যায়? যদি তার একখানা হাত চিরদিনের মতো অকেজো হয়ে যায়, যদি মুখে কতগুলো বিশ্রী ক্ষতচিহ্ন জেগে থাকে, যদি—

যে পথে চলেছিল এতদিন, তা চির-কালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। যেখানে রূপেই একমাত্র বাঁচবার উপায়, সেখান থেকে চিরকালের মতো খারিজ হয়ে যাবে। বিলিতী হোটেলে, মদের বারে, সিনেমায় ছবি দেখবার ফাঁকে ফাঁকে নেশায় জড়ানো চোখ নিয়ে যারা নতুন শিকার খোঁজে, তার কেউ ফিরেও চাইবে না তার দিকে।

তারপর?

কল্পনা বলেছিল, আমার কথা শুনুন ভাই, বিয়ে করে ফেলুন। এত রূপ নিয়ে কলকাতার পথে চলাফেরা করা উচিত নয়। না হয় একটু কষ্ট করে চললই। আমিও তো আই-এ পর্যন্ত পড়েছিলুম, কিন্তু আমার স্বামী আমায় চাকরি করতে দেন না।

কল্পনার ভাগ্য সবার নয়। অসুস্থ স্ত্রী—দু পা চলতে যার হাঁটুতে ঠোকা-ঠুকি লাগে, তার স্বামী যে তাকে এক মাস ছুটি নিতে দেয় না, সে-ও তো নিজের চোখেই দেখেছে দীপ্তি।

আর বিয়ে! কে তাকে বিয়ে করবে? তাকে না চিনে, তার পরিচয় না জেনে—কেউ যদি তাকে নেবার জন্যে হাত বাড়ায়, দীপ্তি কি যেতে পারে তার ঘরে? সমস্ত জীবনটা যার পাঁকে ভরে গেছে, সে কেমন করে আর একজনের জীবনটাকেও সেই পাঁক দিয়ে ভরে দেবে? কেমন করে মিথ্যার অভিনয় চালিয়ে যাবে দিনের পর দিন? টালীগঞ্জের বস্তির যে মেয়েটি গোবর দিয়ে দাওয়া নিকোতে নিকোতে প্রসন্ন মুখে উঠে এসেছিল, একটা কলাই-করা বাটিতে মুড়ি আর গুড় খেতে দিয়েছিল, তার মতো অমন অম্লান উজ্জ্বল হাসি হাসতে পারবে সে? বাসি ফুল দিয়েও হয়তো মালা গাঁথা যায়, কিন্তু পচা ফুল কোন কাজে লাগবে—কার কাজে?

তা হলে? একটা রাস্তা আছে। সেই সারি সারি খোলার ঘরে। যেখানে মানুষের লোভের কাছে পেত্নী-শাঁকচুন্নি সব একাকার। শেষ পর্যন্ত সেইখানে গিয়ে নামতে হবে তাকে?

—ওগো মা গো!

দীপ্তির গলা দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে এল একটা। আজও বুড়ীটা চেঁচিয়ে চলেছে। দীপ্তির ইচ্ছে হল, বুড়ীটার কাছে গিয়ে গলা টিপে তার চিৎকার থামিয়ে দেয়, তারপর দেওয়ালে ঠুকে ঠুকে চুরমার করে দেয় নিজের মাথাটা।

সেই সময় একটা তীব্র অস্বস্তি ছড়িয়ে গেল সারা শরীরে। গলার ভেতরে পাক দিয়ে উঠল।

বমি আসছে। কালকেও একবার হয়েছে সন্ধ্যের দিকে।

প্রাণপণে দীপ্তি সেটা ঠেকাতে চাইল, পারল না। ডাকল : নার্স—নার্স—

নার্স এসে প্যানটা পেতে দেবারও সময় সইল না। তার আগেই হড় হড় করে গলা দিয়ে জল উঠল একরাশ।

একটি অল্পবয়েসী ডাক্তার এসেছিলেন ওয়ার্ডে। তিনিও এসে পাশে দাঁড়ালেন।

বমি করে অবসন্ন হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ল দীপ্তি। নার্স মুখ মুছিয়ে ভালো করে শুইয়ে দিলে তাকে, তারপর ফিরে তাকালো ডাক্তারের দিকে। বললে, কালও একবার বমি করেছে।

ডাক্তার বললেন, হুঁ।

—ঠিক এইরকম।

ডাক্তার আর একবার বললেন, হুঁ।

—কী মনে হয় আপনার?

ডাক্তারের চোখের কোনা চিক চিক করে উঠল : আপনারও সেটা মনে হওয়া উচিত মিসেস দত্ত।

—তার মানে?

মানে, এ ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে অন্য ওয়ার্ডে যেতে হবে ওকে।

দীপ্তির কপালের দিকে তাকিয়ে একবার শিউরে উঠল ছোটখাটো ভালো-মানুষ নার্সটি। তার শান্ত চোখ দুটোতে ছলছলিয়ে উঠল ভয়ের আভাস। প্রায় নিঃশব্দ গলায় সে বললে, তা হলে ডাক্তার গুপ্ত, আপনি বলছেন—

—ইয়েস।—ডাক্তার গুপ্ত ছোট্ট করে বললেন, মেটার্নিটি।

(ক্রমশঃ)

॥ অগ্নিভুক মণ্ডূক ॥

(প্রশ্ন)

"অমৃত" সম্পাদক সমীপেষু,

মাননীয় মহাশয়,

কার্পাস তুলোয় স্পিরিট ঢেলে টেস্ট টিউব গরম করছিলাম সকালবেলা। ঘুঁটে কয়লার ঘর, তা ছাড়া অন্য অনেক বাজে জিনিসও এখানে ওখানে জড়ো করা। জানালার বাইরে একফালি জমি, তাতে ঘাস ও গুল্ম জন্মেছে। রাত্রে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি একটি ধূসর বর্ণের ব্যাং কোথা থেকে এসে জ্বলন্ত তুলোর আগুন খাচ্ছে অত্যন্ত লোভীর মতো। বোধ হয় তাপ লাগছে বলে একটু ছেড়ে দিয়ে আবার খাচ্ছে। আমার কাজ নষ্ট হয় অতএব তাকে তাড়িয়ে দিতে হোলো। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে আবার অমনি আর একটি ব্যাং এসে (কিংবা সেই প্রথমদিনের ব্যাংটিও হতে পারে) জ্বলন্ত তুলোর উপর ঠোকর দিতে লাগলো ঠিক যেমন করে ব্যাং পোকা ধরে খায় তেমনি।

সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে জীবজগতে সবচেয়ে মূর্খ হোলো ব্যাং। এ কি তাদের মূর্খতার নিদর্শন, না কি শীতল-শোণিত ব্যাংকে অল্প আগুন তেমন কাবু করতে পারে না?

নমস্কারান্তে নিবেদন—

ভবদীয়

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী

এন-২১২ মুদিয়ালী রোড, কলিঃ-২৮

॥ গাছা প্রসঙ্গে ॥

(উত্তর)

শ্রীআশুতোষ দেব-এর "নূতন বাংলা অভিধানে" বলা হয়েছে—

গাছ—১। তরু, বৃক্ষ, গচ্ছ—শব্দজ, বি,
২। বৃহৎ, লম্বা (যথা—গাছ-প্রদীপ), দেশজ, বিন্,

গাছা—গাছ (সংখ্যা-বোধক) টা, টি প্রভৃতি (যেমন লাঠি গাছা),

দীপরক্ষক, পিলসুজ, দেশজ, বি।

উপরোক্ত অভিধান থেকে 'গাছ' ও 'গাছা' শব্দটির সংজ্ঞা উদ্ধৃত করছি এই জন্য যে ঐ সংজ্ঞা দুইটি হইতে বড় পিলসুজকে কেন 'গাছা' বলা হয়, তা বোধগম্য হবে।

পিলসুজ শব্দটি সংস্কৃতজ নয়, ওটি একটি ফার্সীমূলক শব্দ। ধারক-দণ্ড সহ প্রদীপকে সাধারণতঃ গাছ-প্রদীপ বলা হতো, কারণ গাছ কথাটি দেশজ প্রয়োগে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হলে যে কোন কিছুর সুদীর্ঘতা বোধ-নির্ণয় করতো (যেমন গাছ-বাড়ন্ত)। শ্রীদত্ত যে বড়

পিলসুজ দেখে 'গাছা'র কথা জানলেন,—তা যেমন সম্পূর্ণ পিলসুজটিকেও বোঝায়, তেমনি আবার কেবলমাত্র ভিত ও প্রদীপের সংযোগকারী দণ্ডটিকেও বোঝায়। সাধারণ দৈর্ঘ্যের পিলসুজের (বা হাল আমলের টেবিল-ল্যাম্পের), দণ্ডটিকেও গাছা বলা হয়।

'গাছা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে এর চেয়ে বেশী আলোচনা অনাবশ্যক।

দীপককুমার বসুরায়চৌধুরী,
বাগুইহাটি রোড, কলিকাতা-২৮।

বর্ণমালা পরিচায়ক বাঙলা ছড়া

(উত্তর)

অক্ষরের রূপ ও আকৃতির উপর প্রাচীন বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বহুবিধ ছড়া প্রচলিত ছিল। বাঙলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত এই ছড়াগুলির প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম। মুদ্রাযন্ত্রের পরবর্তী-কালে শিক্ষার্থী 'বর্ণপরিচয়' কিনিয়া বর্ণমালা শিখিতেছে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের পূর্ববর্তী কালে তো সে উপায় ছিল না। তখন একমাত্র অবলম্বন ছিল পাঠশালার গুরুমহাশয় অথবা পিতা বা অন্য অভিভাবক। তাঁহারাই বালি বা পাতার উপর দাগ কাটিয়া শিশুদের বর্ণমালা লিখিতে শিখাইতেন এবং শিক্ষার্থীরা যাহাতে বর্ণমালার আকৃতিগুলি ভুলিয়া না যায় সেজন্য কতকগুলি বিশেষ ছড়া ব্যবহার করিতেন। 'মাথায় বোঝা' বা 'মাথায় পাগড়ি ঙ' এই পদটি যে শিক্ষার্থীর জানা আছে লিখিবার সময় ঙ বর্ণের আকৃতিটি তাহার সহজেই মনে পড়িবে।

এই রকম একটি প্রাচীন ছড়া নিম্নে আগাগোড়া তুলিয়া দিতেছি।

ক—কাকুরিয়া ক (কাকুরিয়া শব্দের অর্থটি ঠিক বুঝা যাইতেছে না)

খ—বগা খ (বকের মত দেখিতে)

গ—কুলাকানা গ (কুলোর মত কান)

ঘ—বুক চিরা ঘ (বুক চেরা ঘ)

ঙ—মাথায় বোজাউমো—ঙ (মাথায় বোঝা বা মাথায় পাগড়ি ঙ)

...**চ**—বাইগুনিয়া চ (বেগুনের ন্যায় দেখিতে চ)

ছ—গামছা মুরা ছ (গায়ে গামছা জড়ানো)

জ—বর্গীয় জ

ঝ—উফ্‌রাউফ্‌রি ঝ (একটির উপর আর একটি)

ঞ—পিডে বোচ্‌কানিও—ঞ (পিঠে বোচ্‌কা এমন যে ঞ)

ট—বইরশা ট (বঁড়শির ন্যায়)

ঠ—গুইলঠা ঠ (গোলাকার ঠ)

ড—একমাত্রা ড

ঢ—কুকুরলেজি ঢ (কুকুরের লেজের ন্যায় বাঁকা)

ণ—নাই মাত্র আনো ণ (মাত্রাহীন ণ)

ত—গলা বাইরা ত (গলা বের করা)

থ—কান মুচুরি থ (মুচড়ান কান)

দ—আড় বাগা দ (হাঁটু ভাঁগিয়া বসিলে যে রূপ আকৃতি হয় দ-এর আকৃতি সেইরূপ)

ধ—কান্ধে বারি ধ (কাঁধে লাঠি আছে যাহার)

ন—পুডুলুইয়া ন (পুটলি আছে যাহাতে পাঁটুসে)

প—সুচইয়া প (অর্থাৎ সূচের ন্যায়; কেন সূচের ন্যায় বলা হইয়াছে তাহা পুরাতন পুঁথির প দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে)

ফ—ফিরা ফ (যে মুখ ঘুরাইয়া আছে)

ব—সিঙ্গড়ুইয়া ব (পানিফলের ন্যায় তিনকোণবিশিষ্ট)

ভ—চান্দমুহা ভ (চাঁদের মত মুখ যাহার)

ম—গোদা ম (গোদযুক্ত কি?)

য—পহরুইয়া য (পুখুরের মত?)

র—প্যাটকাড়া র (ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বাঙলায় পেটকাটা রয়েরই প্রচলন ছিল অসমীয়া ভাষায় সেইরূপ র আজও ব্যবহৃত হইতেছে।

ল—দোবাজুইয়া ল (দুই ভাঁজ-বিশিষ্ট)

ব—অন্তস্থ ব

শ—নাইরখোল জুরি শ (নারিকেল জোড়া বিশিষ্ট শ)

ষ—প্যাটকাড়া ষ (পেটকাটা ষ)

স—দন্তিয়ো স (দন্তিয়ো=দন্ত্য)

হ—লাঙ্গালিয়া হ (লাঙ্গলের ন্যায় দেখিতে)

ক্ষ—প্যাডে পুডলি খেয়ো ক্ষ (পেটে পুঁটুলির ন্যায় দেখিতে)

বর্ণমালার পরিচায়ক এই ছড়াটি বরিশাল হইতে সংগৃহীত।

—শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য,
১০৩ই, কাঁকুলিয়া রোড
কলিকাতা—১৯।

রহস্যময় কুমেরু মহাদেশ

প্রবোধবন্ধু সেনগুপ্ত

পৃথিবীর শেষ প্রান্তে বরফে ঢাকা বিচিত্র কুমেরু মহাদেশ বহুদিন অজ্ঞাত ও অনাদৃত হয়ে পড়েছিল। এমনকি পনের-ষোল শ' খৃষ্টাব্দেও পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে এই মহাদেশের অবস্থিতি সম্বন্ধে ভূ-বিজ্ঞানীদের মনে একটা আবছা কৌতূহল ছাড়া আর কিছু ছিল না। ইংরাজী ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরাজ নাবিক ক্যাপ্টেন কুক কয়েকবার মেরুবৃত্ত অতিক্রম করে মেরু মহাদেশের উত্তরে অবস্থিত নানান সামুদ্রিক পাখী, কিং পেঙ্গুইন ও এলিফেন্ট শীলের আস্তানা সাউথ জর্জিয়া দ্বীপে উপস্থিত হন। তিনিই ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে জানালেন যে, পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে বিরাট এক মহাদেশ আছে এবং সেটা সব সময়ই বরফে ঢাকা থাকে ও দুর্গম। তিনি এই অঞ্চলের তিমি ও শীলের আস্তানার খবরও জনসাধারণকে জানাতে ভুললেন না।

এর পর থেকে তিমি ও শীল শিকারীর দল, এবং নানান দেশের অভিযাত্রী ও বৈজ্ঞানিকের দল নানা সময়ে এই মহাদেশে উপস্থিত হয়েছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ কুমেরু মহাদেশের অংশবিশেষ আবিষ্কার করে তাদের নামে নামকরণও করে গেছেন। কিন্তু কেউ পুরোপুরি মেরু রহস্যোদ্ধারে সফলকাম হননি।

মেরু রহস্যের আবরণ উন্মোচনের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু হয় ইংরাজী ১৯৫৭ সালে—আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতি বৎসরে। এই উপলক্ষে নানান দেশের বৈজ্ঞানিকগণ এই মহাদেশে এসে হাজির হন এবং তাঁদের অনুসন্ধানের ফলে এবং আগেকার একক প্রচেষ্টায় এই মহাদেশ সম্বন্ধে যে সব খবর জানা গেছে, সেগুলি যেমন বিচিত্র তেমনি ভয়াবহ। বিশ্ববাসী অবাক হয়ে গেছে এই মহাদেশের বিশালতার ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কথা শুনে।

পৃথিবীর সপ্তম মহাদেশের অন্যতম কুমেরু মহাদেশ, আয়তনে প্রায় ষাট লক্ষ বর্গমাইল—অর্থাৎ ভারতবর্ষের আয়তনের প্রায় পাঁচগুণ এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সমষ্টিগত আয়তনের সমান। এই বিরাট মহাদেশে না আছে কোন লোকজন—না আছে কোন গাছ-পালা—সামান্য ঘাসটুকুও কোথাও জন্মায় না। এই মহাদেশের সবটাই বরফে ঢাকা--কোন সময়েই এই বরফ গলে না। মহাদেশটা এখনও তুষার যুগের কবলে। সারা পৃথিবীতে যত বরফ জমা আছে, তার নব্বুই ভাগই জমা আছে এই কুমেরু মহাদেশে। বিশেষজ্ঞদের মতে এখানে প্রায় ২৫ কোয়া ড্রেলিয়ন টনস—অর্থাৎ ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টনের মত বরফ জমা আছে। এই বরফ

তুলে যদি পৃথিবীর সব মহাদেশগুলিতে সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়—তবে সব মহাদেশগুলি চারশ ফিট পুরু বরফে ঢেকে যাবে। আর যদি পঞ্চাশ ফিট পুরু করে ছড়ান যায়, তবে সারা পৃথিবীর উপরিভাগ ঢেকে যাবে। পণ্ডিতেরা আরও বলেন যে, যদি এই বরফ তুলে কেবল আমেরিকায় ছড়ান যায় তবে গোটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায় এক মাইল পুরু বরফে মুড়ে দেওয়া যাবে এবং তার পরও যে পরিমাণ বরফ থাকবে, তাতে সমগ্র ইউরোপকেও সমপরিমাণ পুরু বরফে ঢেকে দেওয়া যাবে। ভারতে এই বরফ ঢাললে কি হবে নিজেরাই অনুমান করে নিন—ভারতবর্ষ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ⅓ ভাগ।

এই জমাট বরফ যদি গলে যায় তাহলে কি হবে? সারা পৃথিবীর চেহারাই পাল্টে যাবে। বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করে দেখেছেন যদি এ বরফ গলে যায়, তবে সমস্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ তিনশ ষাট ফিট উপরে উঠে যাবে। ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য মহাদেশের সমুদ্রের কাছাকাছি যায়গাগুলি তলিয়ে যাবে সমুদ্রের গর্ভে। আমেরিকা ও ইউরোপের সমুদ্রতীরবর্তী বড় বড় সহরের আকাশচুম্বী বাড়ীগুলোর কেবল চুড়োগুলোই দেখা যাবে জলের উপরে এবং মাছ ও জলচর জীবরা খেলে বেড়াবে সেই সব বাড়ীর ঘরে ঘরে। এক কথায় বলতে গেলে এই বরফ গলে গেলে সারা বিশ্বজুড়ে বাইবেল-বর্ণিত মহাপ্রলয় শুরু হবে। বৈজ্ঞানিকরা এও জানিয়েছেন যে, মেরু মহাদেশের বরফ বেশ দ্রুত গলতে শুরু করেছে এবং তাঁরা আশা করেন আগামী দশ বছরে সব সমুদ্রপৃষ্ঠ অন্তত এক ফুট উপরে উঠে যাবে। এতেই অনেক দেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল ও পোতাশ্রয় ইত্যাদি জলমগ্ন হবার সম্ভাবনা আছে—যদি না সমস্ত মত বাঁধ দেওয়া হয়।

কুমেরু মহাদেশের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ছয় হাজার পাঁচশ ফিট।

অভ্যন্তর ভাগের উচ্চতা আট হইতে দশ হাজার ফিট। অন্য কোন মহাদেশ সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে এতটা উঁচু নয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঠান্ডা যায়গা হলো এই কুমেরু মহাদেশ। তাপমাত্রা প্রায় সব সময় হিমাঙ্কেরও নীচে থাকে। শীতকালে এখানকার তাপমাত্রা হিমাঙ্কেরও প্রায় একশ ডিগ্রি ফারেনহিট নীচে নামে। ইংরাজী ১৯৫৭-৫৮ সালে মেরুতে আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তালিকাভুক্ত করেছেন, সেটা হিমাঙ্কেরও ১০০·৪ ও ১০২·১ ডিগ্রি ফার্নহিট নিচে ছিল। একই বছরে রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকেরা দক্ষিণ মেরুতে যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তালিকাভুক্ত করেন সেটা হিমাঙ্কেরও ১২৫·৩০ ডিগ্রি ফার্নহিট নিচে ছিল। মেরু ছাড়া পৃথিবীতে সর্ব-নিম্ন তাপমাত্রার যে রেকর্ড আছে তা হলো হিমাঙ্কের ৯০ ডিগ্রি ফার্নহিট নিচে। ইং ১৯৩৩ সালে সাইবেরিয়ার আয়্যাকন ও ভারকো ইয়ানস্ক নামক যায়-গায় এই তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। সমুদ্রের কাছাকাছি যায়গাগুলির উষ্ণতা অভ্যন্তর ভাগের চেয়ে বেশী। গরমের সময় এই অঞ্চলের উষ্ণতা মাঝে মাঝে ৩৪ ডিগ্রি ফার্নহিট পর্যন্তও উঠে থাকে; এখানের শীতে পেট্রল পর্যন্ত জমে যায়। যে সব বিমান অনুসন্ধান কার্যের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাতে পেট্রল ভর্তি করার আগে গরম করে নিতে হয়। উত্তর মেরু অঞ্চলের যে-সব কুকুর অভিযাত্রীরা দক্ষিণ মেরুতে নিয়ে গিয়েছিল, তারা পর্যন্ত খোলা অবস্থায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় আধ ঘণ্টার বেশী বাঁচেনি। সাইবেরিয়ার শীতপ্রধান অঞ্চলের ঘোড়া পর্যন্ত এই মেরু-শীত সহ্য করতে পারে না। খালি হাতে যদি কোন ধাতুনির্মিত দ্রব্য ধরা যায়, তবে হাতের চামড়াশুদ্ধ খুলে এসে তাতে আটকে থাকবে এবং আগুনে হাত পুড়লে যে রকম জ্বালা করে, সেই রকম জ্বলতে থাকবে। এই অত্যধিক ঠান্ডার জন্য এখানে কোন গাছপালা জন্মাতে পারে না এবং স্থায়ীভাবে কোন লোকজনও বসবাস করতে পারে না।

কুমেরু মহাদেশটা দেখতে অনেকটা হাতলওয়ালা রান্নার পাত্রের মত। এই মহাদেশের আশে-পাশে কোন স্থলভাগ নেই। দক্ষিণ আমেরিকার কেপ হর্ন থেকে এই মহাদেশের উত্তর অংশটুকু পাঁচশ মাইল দূরে অবস্থিত। এই বরফে ঢাকা মহাদেশে কোথাও ভূমির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। কেবল একটানা জমাট বরফের উপর কয়েকটা গাছপালাহীন রুক্ষ পাথরের পাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়। নেড়া পাহাড়গুলো 'নাটুকাট' নামে পরি-চিত। এখানে দুটো আগ্নেয়গিরিও আছে—একটির নাম এরিবাস এবং আর একটির নাম মাউণ্ট টেরর। এরিবাস থেকে এখনও মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে থাকে। মাউণ্ট টেরর মৃত। এই দুইটিই আবিষ্কার করেন ক্যাপ্টেন জেমস রস নামে এক ব্রিটিশ মেরু অভি-যাত্রী এবং তাঁর দুই জাহাজের নামেই এই আগ্নেয়গিরি দুইটির নামকরণ করেন।

মেরু মহাদেশটা মোটেই সমতল নয়—এবড়োখেবড়ো, খাঁজ কাটা কাটা। মরুভূমিতে বালির স্তূপগুলো যে রকম ঢেউ খেলান—এই মহাদেশের বরফে ঢাকা সমতল ভাগটা সেই রকম ঢেউ খেলান। ঢেউ খেলান বরফে ঢাকা সমতল ভাগকে ইংরাজীতে বলে 'সাসটুগি'। অসংখ্য ছোট বড় বরফের পাহাড় ও গভীর খাদে পরিপূর্ণ এই মহাদেশটা, এত বড় বড় খাদ আছে যে, একশ আট-দশতলা বাড়ীও তাতে অনায়াসে তলিয়ে যাবে। মেরু অভিযাত্রীদের কেউ কেউ আচমকা এই খাদে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। অনেক সময় অভিযাত্রীদের ট্রাক্টর প্রভৃতিও এই সব খাদের মধ্যে তলিয়ে গেছে।

কুমেরু মহাদেশকে প্রথমে দেখলে মনে হবে বুঝি বিরাট একটা দ্বীপ। কিন্তু দক্ষিণের সমুদ্রের অংশটুকু সব সময় জমাট বেঁধে থাকার দরুণ দ্বীপে পরিণত হতে পারেনি। বিশেষজ্ঞরা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি—কুমেরু মহাদেশ কি একটি মহাদেশ, না কয়েকটি বরফে ঢাকা দ্বীপের সমষ্টি। ভবিষ্যতে আরও অনুসন্ধানে হয়ত এই প্রশ্নটুকুও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কুমেরু মহাদেশের মাঝামাঝি যায়গায় হলো দক্ষিণ মেরু বা সাউথ পোল (South pole)। মেরু যায়গাটা প্রায় দশ হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত এবং এখানে বরফের গভীরতা প্রায় দুই মাইল। কি অদ্ভুত ব্যাপার! "কুমেরু" যেমন প্রায় দশ হাজার ফিট পাহাড়ের উপর অবস্থিত, তেমনি সুমেরুর অবস্থান প্রায় দশ হাজার ফিট গভীর সমুদ্রের উপর। 'দক্ষিণ মেরু' বা 'কুমেরু' যায়গাটা অনেকটা বাটির মত —অর্থাৎ চার ধারে বিরাট বিরাট বরফের পাহাড়গুলি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং এই পাহাড়গুলি এক একটা পনের হাজার ফিট পর্যন্ত উঁচু। 'মেরু' যায়গাটা একটা নির্জন সাড়া-শব্দহীন স্থান এবং চারধারে একটানা বরফ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। বৈজ্ঞানিকগণের আগে ধারণা ছিল 'মেরু'তে প্রচুর বরফ-পাত হয়। কিন্তু যে-সব বৈজ্ঞানিক আন্ত-র্জাতিক ভূ-প্রাকৃতি বৎসরে সেখানে জড় হয়েছিলেন, তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, 'মেরু'তে বৎসরে ১০ ইঞ্চির মত তুষারপাত হয় মাত্র। তবে যেটুকু বরফপাতই হউক না কেন, সে বরফ কোন দিনই গলে যায় না।

এই মহাদেশটা কেবল অসম্ভব ঠান্ডাই নয়—অধিকন্তু এখানে প্রায় সব সময় ঘণ্টায় নব্বই থেকে দু'শ মাইল বেগে ঝড় বইতে থাকে। এডিলি কোস্টের ধারেই ঝড়ের প্রকোপটা বেশী। প্রথম দিকে এর কারণটা জানা যায়নি। পরে বিমান থেকে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে—মেরুর কাছাকাছি যায়গার গভীর খাদের মধ্যে, দুইশ তিনশ মাইল চওড়া গড়ান পথ দিয়ে ভীষণ বেগে এই হাওয়াটা বেরিয়ে আসে। কিছুটা হাওয়া পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে এদিক-ওদিক চলে যায়; তবে বেশীর ভাগ হাওয়া ভয়ংকর সমুদ্র ঝড়ে পরিণত হয়। এই ঝড় আবার চার ধারে তুষারকণা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। শীতকালেই ঝড়ের প্রকোপটা বাড়ে। কুমেরু মহাদেশটা যেন একটি ঠান্ডা বায়ু তৈয়ারীর কারখানা। এখান-কার আবহাওয়া আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ ত করেই—বলতে গেলে সারা পৃথিবীর ঠান্ডা হাওয়ার গতি-প্রকৃতিও নির্ভর করে এখানকার আবহাওয়ার উপর।

কুমেরু মহাদেশকে ঘিরে আছে কুমেরু মহাসাগর বা দক্ষিণ মহাসাগর, কুমেরু মহাসাগর কোন নূতন মহাসাগর নয়। ভারত, আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহা-সাগরের শেষের অংশটুকু মিলে এই মহাসাগরের সৃষ্টি হয়েছে। এই মহা-সাগরের বুকে ভাসে অসংখ্য হিমশৈল। এই হিমশৈলগুলির জন্মকাহিনীও বড় বিচিত্র "মেরু"র কাছাকাছি যে সব বড় বড় পাহাড় আছে, সেখান থেকে অনবরত হিমবাহ নদীর মত গভীর খাদের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে এসে পড়ছে। সেইগুলো জমাট বেঁধে বিরাট বিরাট হিমশৈল ও বরফ দ্বীপ ইত্যাদির সৃষ্টি হচ্ছে। এই মহাদেশেই অবস্থিত পৃথিবীর সর্ব-বৃহৎ হিমবাহ "বিয়ারডমোর" গ্লেসিয়ার। প্রায় দশ মাইল চওড়া ও একশ মাইল

লম্বা স্থান জুড়ে এর প্রবাহ। ঝড়ের বেগে এই হিমশৈলগুলি উত্তরের গরম জলের স্রোতের দিকে চলে যায়। কতগুলি হিমশৈল আবার মূল অংশের সঙ্গে সব সময় আটকে থাকে—কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। এই রকম একটি ভাসমান বরফের চাঁই "রশ শেলফ আইশ"। এই ভাসমান বরফের চাঁই আয়তনে প্রায় ইউরোপের ফরাসী মহাদেশের সমান—অর্থাৎ পঃ বাংলার প্রায় সাতগুণ। বরফের চাঁইটি পাঁচশ থেকে পনেরশ ফিট পর্যন্ত পুরু হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সর্বনিম্ন উচ্চতা প্রায় তিনশ ফিট।

এই মহাদেশের কয়েক শ মাইলের মধ্যে কোন স্থলভাগ না থাকাতে ক্রমাগত পশ্চিম থেকে ভীষণ ঝড় উঠে সমুদ্রে বিরাট বিরাট ঢেউয়ের সৃষ্টি করে। এই ঝড়ো হাওয়া ও সমুদ্রের ঢেউয়ে বড় বড় হিমশৈল ও রশ সেলফ আইসের বড় বড় অংশ বিকট শব্দে ভেঙ্গে পড়ে এবং তা থেকে নূতন নূতন হিমশৈলের জন্ম হচ্ছে অনবরত।

এই ভেঙ্গে পড়ার ইংরাজী নাম কাভিং—যেন বড় বড় হিমশৈল বা বরফের চাঁইয়ের গর্ভ থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট বা বাচ্চা হিমশৈলের জন্ম হচ্ছে। বায়ু ও সমুদ্রতরঙ্গে এই হিমশৈলগুলি নানা আকৃতির হয়ে থাকে—কোনটা প্রাসাদের মত—কোনটা বা গির্জার মত—কোনটা বা দেওয়াল বা মোটরগাড়ীর আকারের। তবে দক্ষিণ মহাসাগরের হিমশৈলগুলি হয় বেশীর ভাগ চেপটা ধরনের—উপরিভাগটা টেবিলের মতই সমতল। সে জন্য এগুলো টেবুলার আইসবার্গ নামে খ্যাত।

কুড়ি-পঞ্চাশ মাইল লম্বা হিমশৈল এই মহাসাগরে প্রায় সব সময় দেখা যায়। ইং ১৯২৭ সালে একটি টেবুলার আইসবার্গ দেখা গিয়েছিল, যেটা প্রায় ১০০ মাইল লম্বা ও ১৩০ ফিট উঁচু ছিল। জমাট বরফ প্রায় হাজার ফিট পুরু ছিল। এই হিমশৈলের ৮৫০ ফিট ছিল জলের নীচে। কারণ হিমশৈলের যেটুকু উপরে দেখা যায় তার আটগুণ থাকে জলের নীচে। আমেরিকান নৌ-অভিযাত্রী বাহিনী ইংরাজী ১৯৪৬-৪৭ সালে এই কুমেরু মহাসাগরে আরও একটি টেবুলার হিমশৈলের সন্ধান পান স্কট আইল্যান্ডের পশ্চিমে—যেটা ২০৮ মাইল লম্বা ও ৬০ মাইল চওড়া ছিল। এই ক্ষেত্রেও জমাট বরফ প্রায়
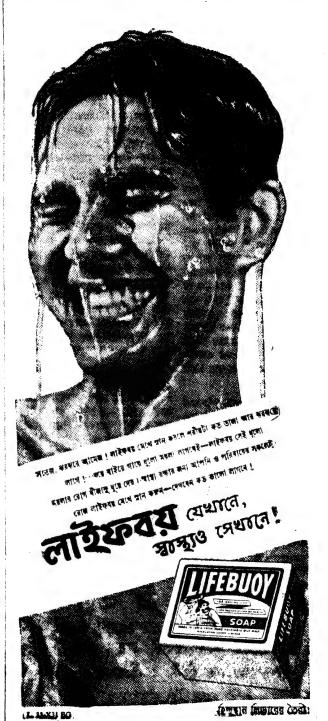
১০০০ ফুট পুরু ছিল। এই লম্বা-চওড়া হিমশৈলগুলি বরফ দ্বীপ (Ice Island) নামে পরিচিত। প্রথমে অভিযাত্রীরা এইগুলোকে বরফে ঢাকা দ্বীপ বলে মনে করেছিল।

যে সব হিমশৈল হিমবাহ থেকে সৃষ্টি হয়, সেগুলি দেখতে হয় নিলাভ সবুজ। সেগুলি ষ্টীল বা কংক্রিটের মত শক্ত হয়। কামানের গোলা ও বোমা ইত্যাদিও এগুলোর মধ্যে চিড় খাওয়াতে পারে না।

নানান আকারের হিমশৈল ও কয়েক শ মাইল চওড়া ও প্রায় দুই-তিন ফুট পুরু সমুদ্রের উপর বরফের স্তর এই মহাদেশকে বাহির বিশ্ব থেকে আড়াল করে রেখেছে। এই জমাট-বাঁধা সমুদ্রের জল কোন সময়েই গলে না এবং হিমশৈলগুলিও তাতে আটকে পড়ে বরফের পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। শীতের সময় এই মহাদেশের আশে-পাশের সমুদ্রের জল এমনভাবে জমে যায় যে কোন জাহাজের পক্ষেই সেই জমাট-বাঁধা বরফ কেটে এই মহাদেশে পৌঁছান সম্ভব নয়। গরমের সময় বরফ খানিকটা নরম হয় এবং ঝড়ে ও সমুদ্রের ঢেউয়ে সেগুলো ভেঙ্গে যায়—তখনই জাহাজগুলি এর মধ্যে দিয়ে পথ করে নিতে পারে।

এই মহাদেশের ও সমুদ্রের উপরের আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ। খুব কম দিনই উজ্জ্বল সূর্যকিরণ পাওয়া যায়। সারাক্ষণ ঝড়ো হাওয়া বরফ কণাগুলো উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বরফে ঢাকা সমুদ্রে ফেলছে। যখন হাওয়া কম থাকে তখনই দেখা যায় সারা সমুদ্র কুয়াশায় ভর্তি হয়ে গেছে। এই সব কারণে কুমেরু মহাসাগরে জাহাজ চালান ভয়ানক বিপজ্জনক। কুয়াশার জন্য হিমশৈলগুলি দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে বহু জাহাজ এইগুলিতে ধাক্কা লেগে ধ্বংস হয়েছে। অনেক জাহাজ জমাট-বাঁধা বরফে আটকে পড়ে আর বেরোতে পারেনি। বিরাট বিরাট ঢেউও অনেক জাহাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই সব কারণে বিখ্যাত আমেরিকান মেরু অভিযাত্রী এডমিরাল বায়ারড কুমেরু মহাসাগরকে 'শয়তানের কবরখানা'রূপে বর্ণনা করেছেন।

আজকাল আমেরিকান ও রাশিয়ানদের নতুন ধরনের বরফ-কাটা জাহাজগুলি—যেগুলি "আইস ব্রেকার" নামে পরিচিত—অনায়াসে দুই-তিন ফুট পুরু জমাট বরফ কেটে পথ করে নিতে পারে। এইগুলি সোজাসুজি বরফের উপর উঠে গিয়ে চাপ দিয়ে বরফ ভেঙ্গে পথ করে নেয়। শক্ত বরফের স্তর হলে অনেক সময় পিছন দিক থেকে জল পাম্প করে সামনে বা পাশে জমা করে জাহাজকে ভারি করে তুলে তার চাপে বরফ ভেঙ্গে জাহাজের পথ করে নিতে হয়। জমাট বরফ খুব শক্ত হলে ডিনামাইটের সাহায্যে বরফ ভেঙ্গে পথ করে নেওয়া হয়। জমাট বরফের স্তরের মধ্যে দিয়ে চলার সময় জাহাজকে সব সময় চালু রাখতে হয়, আর না হলে জমাট বরফে জাহাজগুলি আটকে পড়ার সম্ভাবনা।

কুমেরু মহাদেশই পৃথিবীর একমাত্র যায়গা যেখানে কোন নদী-নালা বা হ্রদ ইত্যাদি কিছুই নেই। চারধারে জমাট বরফ ছাড়া এক ফোঁটা জলের চিহ্ন কোথাও দেখা যায় না। গরমের সময় বরফ কিছু গলে বটে, তবে নদী-নালা ইত্যাদি তৈরী হবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সময় সময় অবশ্য উপকূল ভাগের যে দিকটা নিচু, সে দিক দিয়ে সমুদ্রের জল উপরে উঠে আসাতে, সে অংশটুকু হ্রদের মত দেখায়। এক ফোঁটা বৃষ্টিপাত হয় না এই মহাদেশে—বৃষ্টিটা তুষারের আকারেই নেমে আসে।

এখানে কোন গাছপালা জন্মায় না সত্যি,—তবে গরমের সময় পাথুরে পাহাড়গুলোর গায়ে গায়ে শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

মেরু মহাদেশে কোনরূপ বীজাণু নেই। সূর্যরশ্মি থেকে অত্যধিক আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি পাওয়াতে ও বাতাসে অত্যধিক অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বাষ্প থাকাতে—পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বায়ু এখানেই প্রবাহিত হয়। তবে, আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতি বৎসরে এই মহাদেশে বহু জন-সমাগম হওয়াতে তাদের দ্বারা কিছু কিছু রোগ বীজাণু এই মহাদেশে আমদানী হয়েছে। এখানে কোন ধুলো নেই। কোন কিছুতে মরিচা ধরে না। বর্তমান সময়ের অভিযাত্রীরা আগেকার অভিযাত্রীদের ঘর-বাড়ী পরীক্ষা করে দেখেছেন—কাঠ ইত্যাদি নতুনই আছে এবং পেরেক ও লোহার অন্যান্য দ্রব্যাদিতে কোন মরিচাই ধরেনি। কোন জিনিস এখানে পচে না। এমন কি চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর আগে যে-সব অভিযাত্রীরা মাংস, পশুর মৃতদেহ, বিস্কুট, রুটি, চকলেট, তামাক ইত্যাদি ফেলে গিয়েছিলেন—আজও সেইগুলি নষ্ট হয়নি এবং সেইগুলি আগেকার মতই সুস্বাদু আছে।

এই সব কারণে কুমেরু মহাদেশকে পৃথিবীর হিমকক্ষ হিসাবে ব্যবহারের কথা উঠেছে। যেখানে সারা পৃথিবীর উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য জমা রাখা হবে,—যাতে নষ্ট না হয়। মেরু মহাদেশে সূর্যকিরণ সোজাসুজি বরফের উপর পড়াতে চারধার সাদা আলোয় ভর্তি হয়ে যায় এবং মনে হয় সীমাহীন একটা যায়গাকে যেন সাদা কার্পেটে ঢেকে দিয়েছে। বরফে সূর্যকিরণ পড়ে এত চকচক করে যে, খালি চোখে তাকান যায় না—চোখ ঝলসে যায়। অভিযাত্রীরা তাই বাইরে বেরোবার সময় রঙিন চশমা ব্যবহার করে।

মাঝে মাঝে এখানে মজার মজার কাণ্ডও হয়ে থাকে। সামনে দাঁড়ান মানুষ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়—খানিক বাদে তাকে আগের যায়গায় আবার দেখা যায়। অনেক সময় নাবিকরা দেখে তারা যে জাহাজটিতে চড়ে আছে সেটা উল্টান অবস্থায় আকাশে দেখা যাচ্ছে। সূর্যকে দেখলে মনে হবে দিনে বুঝি অনেকবার উঠছে ও নামছে। এখানে কখন কখন বহু দূরের জিনিসকে মনে হবে কাছে এবং ছোট-খাট বরফের টুকরোকে মনে হবে বিরাট। সূর্য যখন নিচের দিকে

থাকে, তখন আকাশের রঙ্ হয় হালকা সবুজ। খানিক বাদে আকাশের রঙ্ হয়ে যায় গাঢ় নীল। সূর্যের আলো শুকনো ধুলো-বালিহীন বাতাসের মধ্যে দিয়ে এই মহাদেশে নেমে আসার দরুণ এই সব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। মাঝে মাঝে মেঘলা আকাশে মাটির বরফ প্রতিফলিত হওয়ার দরুণ, সেখানকার অভিযাত্রীদের সময় সময় দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন (white out) হয়—চারধারের সব কিছুই সাদা মনে হয়। ছায়া ও দিগন্ত লোপ পেয়ে যায়। তখন নানা মরীচিকার সৃষ্টি হয়। বরফের চেয়ে কালো বস্তুগুলি—মানুষ, জাহাজ, প্রভৃতি মনে হয় শূন্যে ভাসমান। এখানে সময় সময় ভূমিকম্পের মত প্রবল তুষার কম্পনও অনুভূত হয়। অভিযাত্রীদের তাঁবুগুলো কম্পনের চোটে দুলতে থাকে।

এই তুষার কম্পনের ইংরাজী নাম—এনটারটিক হাস (Antartic Hush)। এই কম্পনের সাথে সাথে ডিনামাইট ফাটা ও বজ্রগর্জনের মত প্রচণ্ড আওয়াজও শোনা যায়। জমাট বরফের উপর যখন নুতন তুষারপাত হয় এবং সেটা যখন জমাট বাঁধে, তখন জমাট বরফের অভ্যন্তরে বেশ খানিকটা হাওয়াও আটকে পড়ে। এই অবরুদ্ধ হাওয়া ফাঁপা অভ্যন্তরের ভাগ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পথ খোঁজে। অনেক সময় আবদ্ধ হাওয়া বিকট শব্দে জমাট বরফ ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে এবং হাওয়া বেরিয়ে যাওয়ার দরুণ উপরের বরফের স্তর বসে যাওয়াতেই এই কম্পনের সৃষ্টি হয়। এই কম্পন বহুদূরে পর্যন্ত অনুভূত হয়।

এখানকার ঋতুগুলো উত্তর গোলার্ধের চেয়ে ভিন্ন—অর্থাৎ আমাদের যখন শীতকাল, তখন এখানে চলে গ্রীষ্মকাল। আর আমাদের গ্রীষ্মকালের সময়টা হলো এখানকার শীতকাল।

অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত চলে এখানকার গরমকাল—তখন ছয়মাস ধরে সারা মহাদেশে ও মহাসাগরের উপর থাকে একটানা সূর্যের আলো। সূর্য অস্ত যায় না— সেই সময়ে। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হলো এখানকার শীতকাল। এই ছয়মাস এই মহাদেশ ও মহাসাগর ঘন অন্ধকারে ঢাকা থাকে—সূর্যের মুখ দেখা যায় না। এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার গ্রীষ্মকালেও এখানকার গড় তাপমাত্রা থাকে শূন্য ডিগ্রি।

শীতকালে আলো না থাকলেও মাঝে মাঝে বিচিত্র মেরু জ্যোতি দেখা যায় আকাশে। এই মেরু জ্যোতি ইংরাজীতে সাউদারন লাইট বা অরোরা অস্ট্রেলিস নামে পরিচিত। মেরু জ্যোতি সত্যিই বিচিত্র ও অদ্ভুত। প্রথমে মনে হবে যেন একটা উজ্জ্বল হলদে রঙের আগুনের হালকা একটি জলন্ত পাহাড়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। সেই আলো সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে একটা বিরাট গাছের ডাল-পালার মত, সোনালী গমের বা ধানের শীষ যেমন হাওয়ায় দুলতে থাকে—তেমনি এই আলো সামনে ও পিছনে দুলতে থাকে। সেই আলো ক্রমাগত উঁচুতে উঠতে উঠতে শেষকালে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়—পর মুহূর্তে সারা আকাশে দেখা যায় সমুদ্রের ঢেউ-এর মত নানা রঙের আলোর বিরামহীন তরঙ্গ। এই আলো এক এক সময় নিচ থেকে আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসে—আবার অনেক সময় আতস বাজীর মত হঠাৎ উঠে আসে আকাশে। শীতের একটানা অন্ধকারে, আকাশের বুকে এই মেরুরশ্মির রঙের খেলা সত্যিই বিস্ময়কর।

মনে হয় কে যেন আকাশের বুকটা বিরাট বুরুশ দিয়ে বারে বারে নানা রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে। এই আলো যখন হলদে থেকে সাদা, সাদা থেকে সবুজ, লাল ইত্যাদি হতে থাকে—তখন অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। যে-সব বৈজ্ঞানিকেরা শীতের সময়ও সেখানে থাকেন, তাঁরা এই মেরুরশ্মির বিচিত্র শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। আরও একটা কথা জানবার আছে—মেরুরশ্মি থেকে বিচ্ছুরিত নানা রঙের আলো এত স্বচ্ছ ও হালকা যে, তার মধ্যে দিয়ে আকাশের তারাগুলি পরিষ্কার দেখা যায়। মেরুরশ্মির আলোতে সমুদ্র ও বরফের বুকে আগুন জ্বলছে বলে মনে হয়। দেখা গেছে শীতের অধিবাসী এমপারার পেনগুইনরাও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে এই আলোর খেলার দিকে।

এই মহাদেশে মানুষ থাকে না সত্যি—কিন্তু মহাসাগরের জলে আছে নানা রকম প্রাণী ও উদ্ভিদ। কুমেরু মহাসাগরের জল অসম্ভব ঠাণ্ডা। এই জলে ছয় মিনিটের বেশী কোন লোক বাঁচতে পারে না।

দক্ষিণ মহাসাগরের জল এক রকম খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। এই উদ্ভিদগুলি এত ছোট যে, খালি চোখে দেখা যায় না। এইগুলির কোন মূল না থাকাতে সারা সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়। উদ্ভিদ বিজ্ঞান এইগুলি ডায়েটম নামে পরিচিত। ডায়েটম আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানান সামুদ্রিক প্রাণী ও মাছের পোনার খাদ্য। এই উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরা একসঙ্গে প্ল্যাঙ্কটন নামে পরিচিত। এই প্ল্যাঙ্কটন আবার এক প্রকার কুচো চিংড়ির খাদ্য—যারা ক্রিল নামে পরিচিত। এই ক্রিল ও প্ল্যাঙ্কটন মেরু মহাসাগরে এত প্রচুর পরিমাণে জন্মায় যে,—সমুদ্রের জল স্থানে স্থানে খুব ঘন হয় এবং লাল, সবুজ ও খয়েরী ইত্যাদি রঙ্ ধারণ করে।

ক্রিল ও প্ল্যাঙ্কটনের লোভেই গরমের শুরুতে এই মহাসাগরে আসে স্তনপায়ী তিমির দল, সেনা পিজিয়ান, ষ্টিনকার এলবাট্রস, স্কোয়াগাল ও অন্যান্য জাতের সামুদ্রিক পাখী ও কয়েক জাতের শীল। পেনগুইনরাও এই ক্রিল খেয়েই জীবনধারণ করে।

গরমের সময় এই মহাদেশে আসে নানান দেশের তিমি-শিকারীর দল এবং এই সময়ই জড় হয় নানা দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এই মহাদেশে—অনুসন্ধানের জন্য।

পশু, পক্ষী ও তিমি-শিকারীর দল ও বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিকেরা শীতের শুরুতেই চলে যায়। শীতে কুমেরু মহাসাগরের জল এত ঠান্ডা হয়ে যায় যে, পুরু চর্বিওয়ালা তিমিরা পর্যন্ত সেখানে থাকতে পারে না—গরম সমুদ্র-জলের সন্ধানে ধাওয়া করে। শীতের ছয় মাস—অর্থাৎ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কেবল এমপারার পেনগুইন ও কয়েক জাতের শীল ছাড়া আর কেউ থাকে না। অবশ্য আজকাল শীতের সময়ও কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক ও অনুসন্ধানকারী নানান অনুসন্ধানকার্যের জন্য মেরুশীত উপেক্ষা করেও এখানে অবস্থান করে।

অনুসন্ধানের ফলে এই মহাদেশে কয়লা, তামা, লোহা, টিটানিয়াম, কাল ও লাল সারপেট ও নানান আধা মূল্যবান পাথর পাওয়া গেছে। এই সব ধাতু ইত্যাদি পাওয়া যাওয়াতে বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন, এককালে এই মহাদেশের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের বিশেষ করে আমেরিকার সঙ্গে যোগ ছিল। আবহাওয়াও নাকি অনেকটা উত্তর ক্যালিফোরনিয়ার মতই গরম ছিল এবং দঃ-মেরু অঞ্চলের বেশী ভাগ জায়গাই জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার এনডিস ও রকি পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে কুমেরু অঞ্চলের পর্বতশ্রেণীর যথেষ্ট মিল আছে; হয়ত এককালে কুমেরু পর্বতশ্রেণীও উপরি-উক্ত পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত ছিল।

মেরুপ্রদেশে একটি পর্যবেক্ষণকারী দল

আমেরিকার এই সব পর্বতগুলিতে যথেষ্ট মূল্যবান ধাতুর খনি আছে। সে জন্য বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন কুমেরু মহাদেশের কোটি কোটি টন বরফের নীচেও সেই রকম মূল্যবান ধাতু ইত্যাদি লুক্কায়িত আছে। যদি সেই লুক্কায়িত ধাতুর সন্ধান কোন রকমে পাওয়া যায় এবং নিষ্কাষণের সুবিধা হয় তবে পৃথিবীটাকে আরও সমৃদ্ধিশালী করে তোলা যাবে।

ক্যাপ্টেন কুকের পরে নানান দেশের বহু অভিযাত্রী বিভিন্ন সময়ে এই মহাদেশে এসেছিলেন — নানান উদ্দেশ্যে। এঁদের মধ্যে কারও উদ্দেশ্য সফল হয়েছে—কেউ বা তুষার স্তূপের মধ্যেই শেষ শয্যা রচনা করেছে—স্বদেশে আর ফিরে যেতে পারেনি। আমুণ্ডসেন ও ক্যাপ্টেন স্কটের মেরু বিজয়ের জন্য ইতিহাস-বিখ্যাত দৌড়ের খবরও আমাদের অনেকের জানা আছে।

মেরুপ্রদেশে পর্যবেক্ষণ চলেছে

কিন্তু মেরু অভিযানে সব চেয়ে বিখ্যাত হলেন এডমিরাল রিচার্ড বায়ারড, ইনি আমেরিকা নৌ-বিভাগের অফিসার ছিলেন এবং সবশুদ্ধ পাঁচবার ইনি মেরু মহাদেশে অভিযান চালান। প্রথম অভিযান শুরু করেন ইং ১৯২৯ সালে—আবহাওয়া চুম্বকত্ব হিমবাহ ও মাধ্যাকর্ষণ ও আরও অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই সেখানে হাজির হয়েছিলেন। এডমিরাল বায়ারডই সর্বপ্রথম বিমান ব্যবহার করেন এই মহাদেশে। তিনি বিমানে করে সর্বপ্রথম "মেরু"র উপর দিয়ে উড়ে যান এবং বিমানে করে মেরু মহাদেশের ছবি তোলাতে এই মহাদেশের মানচিত্র তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

ইংরাজী ১৯৫৫ সালে শেষবারের মত এই মহাদেশে আসেন আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতি বৎসরে কাজ শুরু করার আগে সাতটি অনুসন্ধান ঘাঁটি স্থাপনের প্রাথমিক কার্যাদি সুসম্পন্ন করার জন্য।

আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতি বৎসরে, ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তাঁর পক্ষে আর নিজের দেশের অভিযাত্রীদলের সঙ্গে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে তিনিই মেরু অভিযানের নক্সা ইত্যাদি তৈয়ার করেন। এই আমেরিকান মেরু অভিযানের
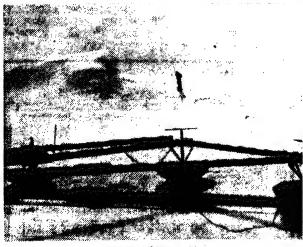
নামকরণ করা হয় "অপারেশন ডিপফ্রিজ টু"। এর আগে ইংরাজী ১৯৪৬-৪৭ সাল ও ১৯৫৫ সালে অপারেশন হাই-জাম্প ও অপারেশন ডিপফ্রিজ ওয়ান প্রভৃতি নামে যে অভিযান চালান হয়েছিল সেইগুলির নেতৃত্বও করেছিলেন এড-মিরাল বায়ারড। মেরু মহাদেশে বার বার অভিযান চালানর জন্য ও নানান আবিষ্কার করার জন্য তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল এডমিরাল এন্টারটিকা। ইংরাজী ১৯৫৭ সালের ১১ই মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়। সমস্ত মেরু অভিযানে এডমিরাল বায়ারডের সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য ডাঃ পল সিপেল। তিনিই আমেরিকার পক্ষ থেকে দঃ মেরু মহাদেশে আন্তর্জাতিক ভূ-প্রকৃতি বৎসরে অভিযান পরিচালনা করেন। ডাঃ পল সিপেলও অনেকবার কুমেরু মহাদেশে গিয়েছিলেন এবং নানা অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—সেজন্য তিনিও মিঃ এন্টারটিকা নামেই সকলের কাছে পরিচিত। এডমিরাল বায়ারডকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—কেন তিনি বার বার বিদ্ঘুটে মেরু মহাদেশে যান। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—"ঢেউ খেলান সীমাহীন একটানা বরফ, গাছপালাহীন নেড়া পাথরশ্রেণী ও ভয়ংকর হিমবাহ ইত্যাদি আমার দেখতে বেশ ভাল লাগে। আর ভাল লাগে আমার দেখতে প্রাণী-হীন রাজ্যে প্রাণের উচ্ছ্বাস—স্কোয়া-গালের কর্কশ ডাক, মজার পাখী পেঙ্গুইনের রকম-সকম, বরফের মধ্যে গর্ত করে সীলদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার ধরণটা ও তিমির ধনুকের মত বাঁকান পিঠ।"

আন্তর্জাতিক ভূ-প্রকৃতি বৎসরের প্রথম দিকে মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ী এডমন্ড হিলারী পশ্চিম দিক থেকে ট্রাক্টর চালিয়ে রস সাগরের দিক থেকে মেরুতে হাজির হয়েছিলেন। ঠিক তার উল্টো—উত্তরপশ্চিম দিক থেকে অভিযান চালিয়ে—অর্থাৎ ওয়েডেল সাগরের দিক থেকে মেরুতে হাজির হয়েছিলেন মে মাসের শেষের দিকে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসাবে ডাঃ ভিভিয়ান ফুকস। তিনি আবার অনুসন্ধানের জন্য প্রতি তিরিশ মাইল অন্তর থামতে থামতে আসছিলেন। আবহাওয়াও সে সময় খুব খারাপ ছিল। হিলারী ও ফুকস মেরুতে খানিক বিশ্রাম করে আবার রওনা হলেন ২১০০ মাইল অতিক্রম করে মহাদেশটাকে আড়াআড়িভাবে পার হওয়ার জন্য।

এই মহাদেশটাকে নিয়ে ঝগড়াঝাঁটিও কম হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে বৃটিশ, আর্জেন্টিনা, চিলি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ এই মহাদেশের অংশবিশেষ দাবী করে বসল। এমন কি হিটলারও এই মহাদেশের অংশবিশেষের দাবীদার ছিলেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার; এই সব দাবীদাররা এই মহাদেশের যে সব জায়গা দাবী করেছিল সে সব জায়গার ম্যাপ পর্যন্ত তখনও তৈরী হয়নি। এমন কি দাবীদাররা সে সব জায়গা এখনও পর্যন্ত দেখেইনি। আমেরিকান গভর্নমেন্ট কারও দাবী গ্রাহ্য করলেন না। তাঁরা জানালেন দাবীদারদের তখনই স্বীকার করা হবে যখন সে সব দেশের লোক সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করবে। কিন্তু মেরুশীতের জন্য কোন দেশই এগিয়ে এলো না বসতি স্থাপনের ইচ্ছা নিয়ে।

আন্তর্জাতিক ভূ-প্রকৃতি অনুসন্ধান বৎসরে এই মহাদেশ সম্বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছে। চুক্তিতে ঠিক হয়েছে যে, এই মহাদেশে কেবল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালান হবে। কোন অবস্থায়, এমন কি শান্তি-পূর্ণ কার্যের জন্যও কোন পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করা চলবে না এই মহাদেশে। সব দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ও অনুসন্ধানকারীরা মিলে-মিশে ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি, সূর্যকিরণ, কসমিক রে, জীবাশ্ম, জীবজন্তু, আয়নমণ্ডল, ভূ-কম্পন, মেরুজ্যোতি, হিমবাহ প্রভৃতি নিয়েই গবেষণাকার্য চালাবে।

সোভিয়েট তার প্রধান ঘাঁটি যেখানে করেছে—সেই স্থানটির নামকরণ করা হয়েছে "মিরনি"। এদের মেরু মহাদেশের অন্য একটি ঘাঁটির নাম ভোস্টক। ইং ১৮২০ সালে যে দুইটি রুশ জাহাজ দক্ষিণ মেরু মহাসাগরে অনুসন্ধান কার্যের জন্য গিয়েছিল—সেই দুইটি জাহাজের নামও ছিল মিরনি ও ভোস্টক। মিরনি ও ভোস্টক জাহাজের ক্যাপ্টেন ফোবিয়াল থেডিয়াশের সঙ্গেই প্যাথেনিয়েল পামারের দেখা হয়েছিল এবং ইনিই সীল-শিকারী পামারের আবিষ্কৃত মেরু মহাদেশের অংশ বিশেষের নাম "পামারল্যান্ড" রাখার পক্ষে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। আমেরিকার পক্ষে এই মহাদেশে আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতি বৎসরে প্রধান ঘাঁটি করা হয়েছিল যে জায়গায় সে জায়গার নাম ছিল ম্যাকমার্ডো। এই রকম এরা আরও ছয়টি ঘাঁটি করেছিল মেরু মহাদেশে। একটি ঘাঁটি ছিল ঠিক দক্ষিণ মেরুতে। আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতি বৎসরে রাশিয়া ও আমেরিকা এবং আরও দশটি দেশ—আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, চিলি, ফ্রান্স, জাপান, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, সাউথ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড প্রভৃতিও এই মহাদেশের নানান জায়গায় ঘাঁটি করেছিল। এছাড়া আরও পঞ্চান্নটি দেশ এই কুমেরু অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতও এই পঞ্চান্নটি দেশের অন্যতম ছিল।

সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতি বৎসর শুরু হওয়ার প্রায় সাত বছর আগে থাকতে সেখানে অনুসন্ধান কাজে রত আছে। তাঁরা বায়ুপ্রবাহ ও তার গতি সম্বন্ধেই সেখানে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সব সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকদের মতে—প্রাকৃতিক কোন নিয়মে বায়ুর গতি ও প্রবাহ নির্ধারিত হয়। এই অনুসন্ধানের ফলে ভবিষ্যতে হয়ত আরও অনেক কিছু জানা যাবে।

আগেকার দিনে এই মহাদেশে অভিযান চালান কি রকম কষ্টকর ছিল, তা আমরা স্কট ও আমুন্ডসেনের বিবরণে জানতে পারি। আজকাল যে সব স্থানে শিবির স্থাপন করা হয় সেখানে আধুনিক যুগের বসবাসের সমস্ত আরামদায়ক বন্দোবস্ত থাকে। বাড়ী ঘরদোরের সব অংশ আলাদা আলাদা নিয়ে গিয়ে সেখানে সে সব অংশ জোড়া দিয়ে ঘরবাড়ী তৈয়ার করা হয়। ইলেকট্রিক লাইট রেডিও টেলিভিশন এবং নিজ নিজ দেশের বেতারে খবর আদান-প্রদানেরও ব্যবস্থা আছে। সিনেমা ইত্যাদিও সেখানে দেখান হয়। বিমানেই

মেরুপ্রদেশের পেঙ্গুইন পাখি

বেশীর ভাগ জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়ীঘরগুলো চারফুট নীচু গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে বসিয়ে তিন দিকটা বরফ ফেলে ঢেকে দেওয়া হয়—যাতে ঘরের ভিতরটা গরম থাকে এবং ঝড়ো হাওয়া যাতে বাড়ীঘরের কোন ক্ষতি করতে না পারে। অনেক সময় জমাট-বাঁধা শক্ত ও গভীর বরফের মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটে তার মধ্যে ঘর তৈয়ারী করা হয় যাতে ঠান্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকতে না পারে। খাদ্যদ্রব্যাদিও বাড়ীঘরের আশে-পাশে গর্ত খুঁড়ে বরফ চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া হয়; যাতে না নষ্ট হয়। এখানে যে ঘরবাড়ী তৈয়ারী করা হয় তাতে কোন জানলা থাকে না। উপর দিকে হাওয়া যাতায়াতের জন্য সামান্য খোলা থাকে। আবহাওয়া লক্ষ্য করার জন্য বারে বারে বাইরে যেতে হয় না, বাড়ীর উপরে কাচে ঢাকা একটা চিমনির মত জিনিস থাকে। তাতে উঠে কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরের আবহাওয়া বেশ লক্ষ্য করা যায়। পোষাকগুলিও আগের মত জন্তু-জানোয়ারের চামড়ার তৈয়ারী নয়—বেশ হাল্কা এবং নড়াচড়া ও কাজকর্ম করার পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। আজকাল পোষাকগুলোর মধ্যে পাতলা পাতলা ইলেকট্রিক তার থাকে এবং সেইগুলি ছোট ব্যাটারীর সাহায্যে বেশ গরম রাখা যায়। এই ব্যাটারী এত ছোট যে, সঙ্গে নিতে কষ্ট হয় না। আগেকার মত মানুষ ট্রাক্টর ইত্যাদিরও খাদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে গেছে। আজকাল ট্রাক্টর ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার সময় "ডিসপ্যান (dispan) নামে একটা খাদ-নির্দেশক যন্ত্র চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যাত্রাপথের আগে আগে। কোন খাদ সামনে আসলে আগে থাকতে বাতি জ্বলে উঠে লোকজনকে সাবধান করে দেয়। ডিসপ্যান যন্ত্রটা অনেকটা মাকড়সার মত দেখতে এবং যন্ত্রের ঠ্যাং-এর মত অংশগুলিতে গামলার মত কতগুলি পাত্র লাগান থাকে।

বৈজ্ঞানিকদের মতে আমরা চাঁদের সম্বন্ধে যতটা জানি, কুমেরু সম্বন্ধে আমরা ততটুকু জানি না। পুরু বরফের নীচে যে রহস্য লুক্কায়িত আছে, তার হদিশ পেতে বৈজ্ঞানিকদের আরও বহু বছর লেগে যাবে। কুমেরু রহস্যের সন্ধানে আরও বহু বছর বৈজ্ঞানিকদের এই বরফে ঢাকা কনকনে ঠান্ডা ও একটানা রাতে ঢাকা মেরু মহাদেশে আসতে হবে। বরফ অন্ধকার ও ঠান্ডা আরও বহু বছর ধরে বাধা দেবে সাহসী অভিযাত্রীদের। আরও অনেক কাল ধরে এই বিদঘুটে জায়গায় কেউ স্থায়ী বাসিন্দা হতে চাইবে না। যে মহাদেশের গড় তাপমাত্রা থাকে হিমাঙ্কেরও নীচে—সেখানে হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। কাজেই বছরে বছরে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কেন্দ্র হয়ত অনেক গড়ে উঠবে এবং হাতুড়ি, বাটালী, ট্রাক্টর ও বিমানের আওয়াজে মেরু মহাদেশের নিস্তব্ধতাও হয়ত বারে বারে ভঙ্গ হবে। কিন্তু বসবাসের উপযুক্ত হতে আরও অনেক দেরী; এবং এাডলি ও এম্পায়ার পেঙ্গুইনরাই এখানকার প্রকৃত শাসনকর্তা হয়ে থাকবে আরও বহু বহু বছর।

বিপদজনক বরফের স্তূপ

ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

শিল্পীর স্বর্গ অজন্তা

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

।। ১ ।।

অজন্তা ও ইলোরার গুহামন্দিরগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না ঘটলে কি ভারতবর্ষকে জানা সম্পূর্ণ হয়? সেদিন অজন্তা গুহার বিপুল-বিস্ময়কর শিল্প-ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে এই একটা প্রশ্নই মনে জেগেছিল। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়ে দেখেছি ভারতের ঐশ্বর্যের নানা রূপ, তার শস্যশ্যামলা প্রকৃতির শোভা, দেখেছি কত প্রাচীন মন্দিরে শিল্পের মহৎ বিকাশ, কত দুর্গম গিরিশীর্ষে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সৃষ্টির দুরূহ প্রয়াস, দেখেছি প্রকৃতির দানকে কাজে লাগাতে মানুষের কত কারিগুরি, আর দেখেছি আধুনিক বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগে আধুনিক ভারতের সুখ ও সমৃদ্ধি। এমনি কতভাবে, কতদিক থেকেই তো ভারতকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু অজন্তার মহান সৃষ্টির সামনে গিয়ে যেদিন দাঁড়িয়েছিলুম, সেইদিন সেইমুহূর্তেই আমার মনে হয়েছিল এতদিনের সব দেখাই ছিল অসম্পূর্ণ। এই মায়াময় আনন্দলোকের সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে উপলব্ধি করেছি অজন্তা ও ইলোরা না দেখলে ভারতের শিল্প-ঐতিহ্য ও সভ্যতা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। ভারতীয় শিল্পকলা উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তরে এসে পৌঁছেছিল অজন্তায়। অজন্তা ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিজয়স্তম্ভ। প্রাচীন শিল্পীর নিপুণতা, শিল্পবোধ, সূক্ষ্ম ভাবকল্পনার রূপারোপের বিস্ময়কর ক্ষমতা, ভাবে ও রেখায় সমন্বিত প্রকাশের আশ্চর্য শক্তি এ যুগের প্রতিভাবান শিল্পীকেও লজ্জা দেয়। বস্তুতঃ অজন্তার চিত্রকলা শিল্পীর কাছে চিরকালের আদর্শ হয়ে আছে। নানা ভঙ্গিতে, নানা আবেশে অজন্তার সুঠাম নিখুঁত মূর্তিগুলি সুদীর্ঘকাল ধরে শিল্পীকে প্রেরণা দিয়ে আসছে, তাকে পথের নির্দেশ দিয়ে আসছে। অজন্তা শিল্পতীর্থ।
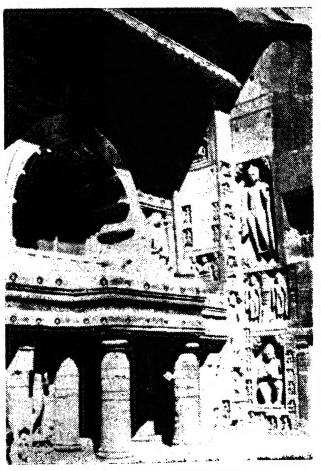
চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের

অজন্তার ১৯নং চৈত্য গুহামন্দিরের সম্মুখভাগ

এমন অপূর্ব সৃষ্টি সমন্বয় কল্পনাতীত। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, শিল্প ও স্থাপত্যের চারুতা ও সূক্ষ্মতা, ভাবাবেগের গভীরতা ও শিল্পকর্মের বলিষ্ঠতা দেশী-বিদেশী যে কোন দর্শককেই স্তম্ভিত করে দেয়। সারা পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা মেলে না। অজন্তা শিল্পীর স্বর্গ।

কাছ থেকে যখন দেখেছি অজন্তা চোখের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে শিল্প ও ভাস্কর্যভরা এক সৌন্দর্য-নিকেতন। কিন্তু সে তো কাছে এসে দুচোখ মেলে অন্তরঙ্গ নিরীক্ষণের ফলশ্রুতি। দূর থেকে দেখা তার বহিরঙ্গ রূপেও কি কম মুগ্ধ হয়েছি। যাত্রা শুরু করেছিলুম অজন্তার ৩৭ মাইল দূরে জলগাঁও রেলস্টেশন থেকে। দুঘন্টা অবিরাম চলার পর অজন্তা পাহাড়ের কোলে এসে আমাদের বাসটা যখন দম ফেললো তখনও এর পরিপূর্ণ রূপ উপলব্ধি করতে পারিনি। পাহাড় কেটে তৈরি সোপান ভেঙে কিছুটা ওপরে উঠে এসে অজন্তা গুহা-মন্দিরের পথ ধরলুম। এইবার অনুভব করলুম অজন্তার বহিরঙ্গ রূপ আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দূর থেকেই দেখলুম অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়ের গায়ে সারি সারি খোপের মত। পিছনে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে তার উত্তুঙ্গ শিখর তুলে, তার ওপর বিটপী-লতার কোমল হরিৎ আস্তরণ—যেন মখমলের প্রলেপ মাখানো, আর সামনে অতল খাদ। দূর থেকে মনে হল যেন প্রকৃতি দেবীর একটি নিখুঁত চিত্ররচনা। মনে মনে প্রণাম জানালাম সেই সব বৌদ্ধ শ্রমণদের যাঁরা প্রায় দু'হাজার বছর আগেও প্রকৃত শিল্পীমনেরই পরিচয় দিয়েছিলেন এই পাহাড়ী প্রকৃতিকে নির্বাচন করে সুন্দরের প্রকাশেরই যোগ্য প্রকৃত সুন্দর পটভূমিকা।

অজন্তার শিল্প-ভাস্কর্যের মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে হলে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকা কিছুটা আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

।। ২ ।।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় খৃষ্টীয় যুগ শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে ভারত যখন গ্রীক আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়েছিল তখন ভারতে এবং বিশেষ করে উত্তর ভারতে বেদোক্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য ছিল। উন্মুক্ত স্থানে যাগযজ্ঞই ছিল তখন ধর্মাচরণের প্রধান মাধ্যম। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস তখন বুদ্ধিবৃত্তিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। ক্রমে পৌরাণিক যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন হল। পুরাণে দেবতাদের গৌরব-মাহাত্ম্যের সালঙ্কার বর্ণনা দিয়ে দেখানো হয়েছে এই সব মহাশক্তিমান দেবদেবীর কাছে সাধারণ মানুষ কত অসহায়, এই দেবতাদের ওপর তারা কতখানি নির্ভরশীল। এমনিভাবে সাধারণ মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পর বৌদ্ধধর্মের সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রথম প্রবল আঘাত পেল। বুদ্ধ উপলব্ধি করেছিলেন ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর কাছে মানুষের অসহায়তা থেকেই মানুষের যতকিছু দুঃখ-ক্লেশের উৎপত্তি। প্রেম, তিতিক্ষা ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে জীবনের এই অভিশাপগুলি যে অতিক্রম করা যায় বুদ্ধদেব নিজের জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠিত সত্য করে তুলেছিলেন। সমস্ত কামনা বাসনা ও প্রলোভনের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন বলেই রাজকুমার গৌতম বোধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের শাসন ও নীতিগুলি ছিল কঠোর। সিদ্ধিলাভের যে পথ তিনি নির্দেশ করেছিলেন তা আদৌ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তাই বোধ করি বৌদ্ধদের মনেও কালক্রমে একটা দ্বিধার ভাব দেখা দিয়েছিল।

তাই দেখতে পাই, বুদ্ধের জন্মের প্রায় আট শতাব্দী পরে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরাই দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেল—হীনযান আর মহাযান। হীনযানীরা মোটামুটি বৌদ্ধধর্মের মৌলিক কঠোরতার নীতিকেই আঁকড়ে রইল। কিন্তু মহাযানীরা অনেকখানি উদার নীতি গ্রহণ করল। হীনযানীদের আচরিত ধর্মে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, কিন্তু মহাযানীরা জাতি-ধর্ম-ব্যক্তি-নির্বিশেষে সকলকেই আপন কোলে টেনে নিয়েছিল। মহাযানীরা চলেছিল বাস্তবতার পথ ধরে—যে পথ শুধু কঠোর নিরানন্দময় শাসনের পথ নয়, যে পথ সাধারণ মানুষের অন্তরের অনুভূতি ও ভক্তির পথ। স্বভাবতঃই মহাযান বৌদ্ধধর্ম অনেকখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

বৌদ্ধসমাজের কঠোর নিয়মনিষ্ঠা ও রক্ষণশীলতা সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের মূলে আঘাত হেনেছিল। শিল্পের স্বতঃস্ফূর্ততা এতে ব্যাহত হয়েছিল। মহাযান পদ্ধতির উদারতর দৃষ্টিভঙ্গি সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনেও সহায়ক হল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হীনযানীরা বুদ্ধের প্রতীক ও পূতাস্থি পূজার মধ্যেই নিজেদের সাধনার ক্ষেত্র সীমিত রেখেছিল, কিন্তু মহাযানীরা শুধু এইটুকুর মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকতে চাইল না। তারা বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করল। শুধু তাই নয়, যাদের তারা বুদ্ধের প্রায় সমতুল বলে মনে করত সেই বোধিসত্ত্বরাও প্রাধান্য পেল মহাযানীদের কাছে। এইভাবে শিল্প পেল প্রেরণা।

মহাযানীদের অনুপ্রেরণায় বৌদ্ধ সাহিত্যও গড়ে উঠল। বৌদ্ধ জাতক এর দৃষ্টান্ত। ক্রমে জাতকের কাহিনীগুলি চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের উপজীব্য হয়ে উঠল। এই কাহিনীগুলির মধ্যে যে চিত্র-কল্প রচনা করা হয়েছে, উৎকৃষ্ট শিল্পের যে প্রচুর উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে বৌদ্ধ জাতকের এখানে-ওখানে তা চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সৃষ্টিতে প্রচুর প্রেরণা জুগিয়েছিল।

শিল্প-ভাস্কর্যের প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনে মৌর্য সম্রাট অশোকের অবদানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। বৌদ্ধধর্মের সার্থক প্রচারে সম্রাট অশোকের শাসনকাল স্বর্ণাক্ষরে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। বৌদ্ধশিল্প নতুন করে প্রেরণা পেয়েছিল সম্রাট অশোকের শাসনকালে। এই মহান সম্রাটের আমলে পাহাড় কেটে তৈরি স্থাপত্যের কিছু কিছু নিদর্শন আজও অটুট রয়েছে। একটিমাত্র প্রস্তরখণ্ড থেকে নির্মিত স্তম্ভের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। ধর্মশাসন উৎকীর্ণ রয়েছে এই সকল স্তম্ভগাত্রে। এই স্তম্ভগুলির কোনটি রয়েছে সারনাথে, কোনটি সাঁচীতে, কোনটি বা আর কোথাও। স্তম্ভগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই খৃষ্টজন্মের প্রায় ২৫০ বছর আগেকার।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বৌদ্ধ-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উন্মেষকাল বলা যেতে পারে, আর পঞ্চম শতাব্দীতে এর পরিপুষ্টি। বৌদ্ধ ইতিহাসের এই স্বর্ণযুগে বৌদ্ধ পদ্ধতির শিল্পধারার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। আর এই বৌদ্ধ শিল্পধারারই এক গৌরবোজ্জ্বল প্রকাশ দেখি অজন্তা গুহামন্দিরে।

ছেনি-হাতুড়ির কঠোর আঘাতে আর তুলির কোমল টানে পাহাড়ের রুক্ষ-শুষ্ক বুকে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলে নির্জন-নিরানন্দ এক অরণ্যলোককে কেন সৌন্দর্যলোকে পরিণত করার দুরূহ সাধনা করা হয়েছিল সেই দূর অতীতে, তা বাস্তবিকই গবেষণার বিষয়।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই শিল্পী চেয়েছে তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে চিরঞ্জীবী করতে। শিল্পীর প্রাণের এই চিরন্তন আকুতিই সার্থক প্রকাশ লাভ করেছে বিভিন্ন গুহামন্দির-গুলির মধ্যে। শিল্পী চেয়েছে এমন কিছু সৃষ্টি করতে যা যুগযুগান্ত ধরে তার কীর্তি ও প্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর বহন করে চলবে। তাই সে অরণ্যঘেরা নিরানন্দ পাহাড়পুরীকে আনন্দলোকে পরিণত করেছে। সে জানে পাহাড়ের গায়ে শিল্পসৃষ্টি করতে পারলে সে অমর গৌরবের অধিকারী হবে, সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার যশও দীর্ঘস্থায়ী হবে। এ হল শিল্পীর দিক। এ ছাড়াও আছে সাধকের দিক। বৌদ্ধ শ্রমণেরা চেয়ে-ছিলেন লোকালয় ছাড়িয়ে শহরের কোলাহল থেকে দূরে এমন কোন নির্জন আবাস যেখানে প্রলোভন এসে তাঁদের সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না, যেখানে তাঁদের শাস্ত্রানুশীলন আর পূজার্চনায় ব্যাঘাত ঘটার কোন কারণ থাকবে না।

॥ ৩ ॥

অজন্তা গুহামন্দিরের এই অপরি-মেয় শিল্পৈশ্বর্য কোন একটিমাত্র যুগে গড়ে ওঠেনি, আর তা সম্ভবও নয়। প্রায় ন'শতাব্দীব্যাপী ঐকান্তিক সাধনার ফল এই অজন্তা। খৃষ্টজন্মের দু' শতাব্দী পূর্বে শুরু হয় এর শিল্পকর্ম, তারপর সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সৃষ্টি অব্যাহত-ভাবে চলেছিল। কিন্তু এই বিপুল মহান ঐশ্বর্যরাশিও হাজার বছরেরও বেশি দিন মানুষের দৃষ্টির আড়ালে পড়ে ছিল।

বৌদ্ধধর্মের জন্ম এই ভারতভূমিতে হলেও কালক্রমে এই ভারতভূমিতেই এর প্রভাব সংকুচিত হয়ে আসতে লাগল। সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রায় অবলুপ্ত হল। এই সঙ্গে অন্যান্য আরও অনেক বৌদ্ধমন্দির ও বৌদ্ধ স্মৃতিসৌধের মত অজন্তাও দৃষ্টির অগোচরে চলে গিয়েছিল। কারণ অজন্তা সম্পূর্ণতঃ বৌদ্ধ গুহামন্দির। তবে অনেক বৌদ্ধ স্মৃতি নিদর্শন যেমন

অজন্তার ১৬নং গুহায় বুদ্ধমূর্তি—ধর্মচক্রমুদ্রা ভঙ্গীতে।

ধ্বংস বা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, অজন্তার ক্ষেত্রে সেরূপ ঘটেনি। ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের কোলে অজন্তা গুহামন্দির আত্মগোপন করে রইল শতাব্দীর পর শতাব্দী। অবশেষে ১৮১৯ সালে এই গুহামন্দির আবিষ্কৃত হয়েছিল নিতান্ত আকস্মিকভাবেই।

মাদ্রাজ সৈন্যবাহিনীর কতিপয় অফি-সার ঐ সময়ে সর্বপ্রথম অজন্তা গুহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেন। পরে ১৮২৪ সালে স্যার জেমস আলেকজাণ্ডার নামে অপর একজন সামরিক অফিসার গোপনে অজন্তা পরিদর্শন করেন এবং রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে অজন্তা গুহা ও তার দেওয়ালচিত্রের কিছু বিবরণ ছিল। পুরাতত্ত্ববিদ ফার্গুসন সাহেব ১৮৩৯ সালে ও ১৮৪৩ সালে দু'বার অজন্তা পরিদর্শন করেন। এ সম্পর্কে তিনি যে বিবরণ দেন তা বিশেষ মূল্যবান।

অজন্তা গুহামন্দিরের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর বিভিন্ন গুহায় দেওয়ালে দেওয়ালে বহুরঙা ফ্রেস্কোয় মানুষের জীবন-চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অবশ্য বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এই দেওয়ালচিত্রকে ফ্রেস্কো নামে আখ্যাত করা যায় কিনা সে বিতর্ক এখানে না তোলাই ভাল। আমরা শুধু এর রসের দিকটাই তুলে ধরবো। অবশ্য আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই সকল শিল্পৈশ্বর্যের অনেকখানিই আজ আর অক্ষত-অটুট নেই। কোথাও এগুলি শিলার বুক থেকে একেবারে মুছে গেছে, কোথাও বা ম্লান হয়ে গেছে। দেওয়ালচিত্রগুলির বর্তমান অবস্থা নিরীক্ষণ করতে করতে পরম বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছি আরও কিছুকাল পরে এগুলির অস্তিত্ব হয়ত আদৌ থাকবে না। আর এগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার অর্থ ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস থেকে একটি গৌরব-ময় বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় মুছে যাওয়া।

ভগবান বুদ্ধের জীবনকথা, তাঁর জন্মকাহিনী, বাল্যশিক্ষা, মার ও অন্যান্য অশুভ শক্তি প্রদর্শিত প্রলোভন জয়, বৌদ্ধ-জাতকের গল্প, শিবি রাজার কাহিনী, নাগাদের কাহিনী প্রভৃতি এই

অজন্তার একটি বিহার গুহামন্দিরের প্রবেশদ্বারের সামনে অলংকৃত স্তম্ভশ্রেণী
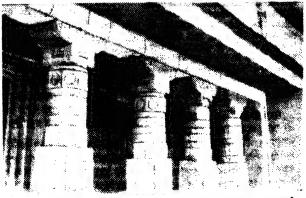
সকল দেওয়াল-চিত্রের প্রধান উপজীব্য। এ ছাড়া আছে শিকারের দৃশ্য, শোভাযাত্রা, নাচ, গান, বাজনার দৃশ্য। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে এগুলির মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অভিব্যক্তিই স্ফূর্তিলাভ করেছে। মানুষ এখানে চিত্রিত সামাজিক জীবরূপে। ধর্ম এগুলির অন্তর্নিহিত বাণী হলেও সেই বাণী বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে ঐগুলির জীবন-দর্শনের সুরে। এই বাণীর সঙ্গে সুর মিলে জীবনসঙ্গীতের যে শাশ্বত রাগিণী বেজে উঠেছে তা এই চিত্ররচনাকে মহান করে তুলেছে।

কিন্তু শুধু চিত্রকলাই নয়, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মিলন ঘটেছে এর সঙ্গে। ১নং, ১৭নং, ১৯নং, ২৬নং প্রভৃতি গুহার বহিরঙ্গে স্থাপত্যশৈলীর যে উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় তা প্রকৃতই বিস্ময়কর। তেমনি আবার গুহামধ্যে বুদ্ধমূর্তি এবং দেওয়ালে ও স্তম্ভগাত্রে দেব-দেবী জীবজন্তুর মূর্তি ও সূক্ষ্ম অলঙ্করণের মধ্যে এবং চৈত্যগুহাগুলির অভ্যন্তরে ভাস্কর্যের পরম পূর্ণতাও লক্ষ্য করা যায়।

শুধু দেওয়ালেই নয়, ভিতরের ছাদেও রঙীন চিত্ররচনা লক্ষ্য করবার মত। তবে এই চিত্রগুলি প্রধানতঃ ফুল-লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নক্সা। পশু-পাখী, উড্ডীয়মান অপ্সরার চিত্রও দেখা যায়। মন্ডনশিল্পের নিদর্শন হিসেবে অজন্তা গুহামন্দিরের ভিতরের ছাদের এই কারুকলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অজন্তা পর্বতগাত্রে বলিষ্ঠ চিত্ররচনা সম্পর্কে স্থাপত্য ও শিল্পে সুপণ্ডিত ই বি হ্যাভেলের মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন,—

"....vivid imaginative power and consummate executive skill .... traced the wonderful outlines of the Ajanta frescoes, and wrought in stone, bronze, or clay the Indian divine ideal, in which perfect simplicity is joined to sublime strength and dignity...."

॥ ৪ ॥

অজন্তা মোট ৩০টি গুহার সমষ্টি। এই বৌদ্ধ গুহাগুলি দু'টি ভাগে বিভক্ত —চৈত্য বা উপাসনাগৃহ এবং বিহার বা বাসগৃহ। ৯, ১০, ১৯, ২৬ ও ২৯নং গুহাগুলি চৈত্য এবং অবশিষ্টগুলি বিহার। কতকগুলি গুহা হীনযানীদের অপরগুলি মহাযানীদের। প্রাচীন গুহাগুলি হীনযানী সম্প্রদায়ের। এগুলি দ্বিতীয় খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত। পরবর্তীকালের গুহাগুলি মহাযানীদের।

চৈত্যগুলির অভ্যন্তরগঠন এরূপ যে, এখানে বহু বৌদ্ধ শ্রমণ একত্র সমবেত হয়ে উপাসনা করতে পারতেন। সুপ্রশস্ত কক্ষের একপ্রান্তে চৈত্য বা মন্দিরাকৃতি বেদীতে সাধারণতঃ বুদ্ধের মূর্তি থাকে। কক্ষের চারধারে অলঙ্কৃত স্তম্ভশ্রেণী। চৈত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এর ছাদটি সমতল নয়, সাধারণতঃ খিলানাকৃতির। কক্ষের মাঝখানটিতে খোলা জায়গা,—একত্র বহু ব্যক্তির সমাবেশের উপযোগী।

বিহারগুলি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের আবাস ছিল, তাই সেগুলি নির্মিতও হয়েছিল সেইভাবে। সমতল ছাদবিশিষ্ট কক্ষসমন্বিত গুহাগুলি বিহার। বিহারগুলির মূল বৃহৎ কক্ষের চারপাশে পর পর অনেকগুলি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থাকে। আবার বেশির ভাগ প্রকোষ্ঠেরই দেওয়াল ঘেঁষে থাকে একটি করে বেঞ্চি—সবই পাহাড় কেটে তৈরি। হয়ত সন্ন্যাসিরা এরই ওপর শয়ন করতেন। এরূপ অনুমানের একটি প্রমাণ এই যে, অনেক গুহাতেই এরূপ বেঞ্চির সঙ্গে পাথরের বালিশও দেখতে পাওয়া গেছে। এই ক্ষুদ্র শয়নপ্রকোষ্ঠগুলির কোন কোনটিতে দরজাও ছিল। পরবর্তীকালে নির্মিত কোন কোন বিহারে মূল গুহাকক্ষের দু'ধারে এই শয়ন-প্রকোষ্ঠগুলি ব্যতীত ঐ মূল কক্ষের একেবারে শেষ প্রান্তে থাকে আর একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠটিতে থাকে ভগবান বুদ্ধের সুবিশাল মূর্তি। যেমন আছে অজন্তার ১নং ও ২নং গুহা দু'টিতে। এইবার অজন্তার গুহাগুলির কিছু পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

অজন্তার ১নং গুহাটি বৌদ্ধবিহারের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সম্ভবতঃ অজন্তার আর কোন বিহার এত মনোরম অলঙ্কারমণ্ডিত নয়। যে বর্ণোজ্জ্বল দেওয়াল-চিত্রের জন্য অজন্তার বিশ্বখ্যাতি, যা বিশ্বের সকল স্তরের শিল্পীর মনে প্রেরণা জুগিয়ে আসছে, তার অধিকাংশই, এবং বলা যেতে পারে বিশিষ্টগুলিই রয়েছে এই প্রথম গুহাটির মধ্যে।

প্রমাণাদি থেকে জানা গেছে এটি গুপ্তরাজাদের রাজত্বকালের শেষদিকে অথবা চালুক্য রাজবংশের শাসনকালের প্রথম দিকে নির্মিত হয়ে থাকবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে বা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে এই গুহামন্দির নির্মিত হয়েছে। কারণ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল প্রায় ৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, আর চালুক্য রাজবংশের শাসনকালের বিস্তৃতি ছিল ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বা তারও কিছু বেশি।

এই গুহার সম্মুখভাগ ঐশ্বর্যময়। মূল গুহাকক্ষের প্রবেশদ্বারের সামনেই রয়েছে একটি বারান্দা। বারান্দার ছাদটির অবলম্বন ৬টি স্তম্ভ। প্রত্যেকটি স্তম্ভ এবং বারান্দার ছাদের বাইরের অংশটি পুরোপুরি ভাস্কর্যের সূক্ষ্ম কারুকর্মে সমৃদ্ধ।

কারুকার্যময় প্রবেশদ্বার দিয়ে সুবৃহৎ মূল গুহাকক্ষটিতে আসা যায়। কক্ষটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান—৬৪ ফুট ক'রে। এর সবদিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। এর প্রয়োজনের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্রবেশদ্বারের ঠিক বিপরীত দিকে বৃহৎ কক্ষটির অপর প্রান্তে আর একটি মন্দির-কক্ষ। এই কক্ষের মধ্যে বুদ্ধের এক সুবিশাল মূর্তি—একটি প্রস্তরখণ্ড থেকে তৈরি। বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর কতিপয় শিষ্যকেও এখানে দেখা যাচ্ছে।

ভগবান তথাগত এখানে শিষ্যদের উপদেশ দানের ভঙ্গিতে রূপায়িত। একটি আসনের ওপর তিনি উপবিষ্ট। পা দু'টি একটি অপরটির ওপর দিয়ে মোড়া, পায়ের পাতা দু'টি দৃশ্যমান। হাত দু'টির মুদ্রা লক্ষ্য করার মত। বাঁ হাতের আঙুলগুলি এক বিশেষ ভঙ্গিমায় মুড়ে নিজের দিকে ফেরানো, আর ডান হাতের তালুটি সামনের দিকে তোলা শিষ্যদের উদ্দেশ করে—অভয় ও উপদেশ দানের ভঙ্গিতে। মাথায় কোঁকড়ানো চুলের রাশি। পিছনদিকে জ্যোতির ছটা। দু'পাশে দুই পরী, হাতে ফুলের মালা, যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে আশীর্বাদ নিয়ে। বুদ্ধদেবের দু'পাশে দণ্ডায়মান দুই অনুচর। দেহে তাদের রাজকীয় সাজ-সজ্জা, শিরে মুকুট শোভা পাচ্ছে। বুদ্ধের মুখমণ্ডল এমন এক প্রশান্ত-মধুর মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত যা এই শিল্পরচনাকে মহনীয় করে তুলেছে।

দেওয়াল গাত্রে ফ্রেস্কো চিত্রকলার জন্য অজন্তার বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অজন্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দু'টি ফ্রেস্কো চিত্র রয়েছে এই গুহাটিরই মন্দির-কক্ষটিতে। কক্ষের বাঁ দিকে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর পদ্ম-

পাণি মূর্তি, আর ডানদিকে বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি মূর্তি।

পদ্মপাণি মূর্তিটি অতি মনোরম ও বর্ণাঢ্য পরিবেশে পরিকল্পিত হয়েছে। সহচর-সহচরী, ক্রীড়ারত বানর, আনন্দোদ্বেলিত ময়ূর-ময়ূরী, উড্ডীয়মানা অপ্সরা-গন্ধর্ব, কিন্নর-যক্ষ, প্রেমোন্মত্ত দম্পতি—সর্বস্তরের সর্ববিধ জীব ঘিরে আছে পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বকে। বোধিসত্ত্বের উপস্থিতিতে জীবজন্তু, মানুষ, স্বর্গের অপ্সরা, কিন্নর-কিন্নরী সকলের মনেই আনন্দের ঢেউ লেগেছে।

এই চিত্রে বহু ভিন্ন জাতীয় প্রাণী বিবিধ ভঙ্গিতে ও বিচিত্র পরিবেশে তুলি আর রঙের স্পর্শে একত্র রূপায়িত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কতকগুলি জীব যেন পাহাড়ের গায়ে এলোমেলোভাবে সাজানো। কিন্তু রসের একটু গভীরে প্রবেশ করলেই বুঝতে পারা যায়, এগুলি আদৌ এলোমেলো নয়, বরং এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বিধৃত।

বোধিসত্ত্বের মূর্তিটি এখানে প্রকৃতির কেন্দ্রবস্তুরূপে পরিকল্পিত। প্রকৃতির প্রয়োজন যে কেবল সর্ববিধ জীব ও মানুষের স্বার্থ ও সুখের জন্য নয়, মর্যাদার মানদণ্ডে যে কেউ কারও চেয়ে নীচে নয় সেই বক্তব্যটুকুই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই চিত্রে। দেখানো হয়েছে জীব, প্রকৃতি ও মানুষ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়—সবে মিলেই সৃষ্টির পরিপূর্ণতা।

কেন্দ্রচিত্র বোধিসত্ত্বের ডান হাতে নীল পদ্ম, মুখে প্রসন্ন হাসি। ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে তিনি দণ্ডায়মান। তাঁর মুখে ত্যাগীর নিস্পৃহতা, অথচ কি প্রশান্তিই না বিরাজ করছে সেখানে। ত্যাগী হলেও জীবনের মাধুর্যকে তিনি অস্বীকার করেন না, তাই জীবনের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা বা ঘৃণা নেই—ত্যাগের মহিমায় মুখমণ্ডল তাই ভাস্বর।

কেন্দ্রচিত্র বোধিসত্ত্বকে ঘিরে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ জীব, ঠিক যেমনটি দেখা যায় প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপগুলিতে। স্তূপের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি বুদ্ধের নির্বাণের প্রতীক। এই স্তূপকে ঘিরেও চারপাশে রেলিং ও প্রবেশদ্বারের ওপর থাকে পশু-পক্ষী, লতা-পাতা ও নানা মূর্তি। প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের এই আদর্শেই বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। কারণ মহাযান মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করত গৌতম বুদ্ধের মহা-পরিনির্বাণের পর থেকে বোধিসত্ত্বই বুদ্ধের স্থান গ্রহণ করে রয়েছেন। দ্বিতীয় বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি এইভাবে বিরাজ করবেন এবং সত্যের আলোক বিতরণ করতে থাকবেন ব'লে মহাযানী বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে।

জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশই এই চিত্রের মূলগত ভাব; জীবনের বহুবিস্তৃত ছন্দ, জীবনের প্রাণরসের কোমল-কঠোর প্রকাশ ঘটেছে এর মধ্যে। লতা-পাতা, পশু-পাখী ও অতিমানুষ নিয়ে সমগ্র চিত্ররচনাটি জীবনের ঐক্যের মূলে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। ডাঃ কুমারস্বামী এ সম্পর্কে সত্যই বলেছেন: "It is an art that reveals life.... as an intricate ritual filled to the consummation of every perfect experience."

চিত্রাঙ্কন বিদ্যার ব্যাকরণের দিক থেকেও এ একেবারে নিখুঁত প্রথম শ্রেণীর রচনা। শিল্পীর কৃতিত্বে বোধিসত্ত্বের দেহটি রক্তমাংসে গড়া বলে প্রতীয়মান হয়।

অপর চিত্রটি বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণির। এক সহচরের দেহের ওপর স্বীয় দেহভার ন্যস্ত করে লীলায়িত ভঙ্গিতে তিনি বিরাজ করছেন। জনৈক রাজা তাঁকে ফুল উপহার দিচ্ছেন। এই চিত্রে রঙ্ বহু ক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও শিল্পীর মুন্সিয়ানার পরিচয় এখনও পাওয়া যায়।

অজন্তার নারীমূর্তিগুলি এক বলিষ্ঠ আদর্শ তুলে ধরেছে শিল্পীদের সামনে। যে নারীমূর্তিগুলির জন্য অজন্তা শিল্পীর স্বর্গ হয়ে উঠেছে তার অনেকগুলিই রয়েছে এই ১নং গুহাটিতে। অজন্তার শিল্পীরা নানা আভরণে ও বেশে, নানা ভঙ্গিতে ও পরিবেশে নারীচিত্র অঙ্কিত করে কলাশিল্পকে তুলে নিয়ে গেছে এক অতি উচ্চ গ্রামে। তাদের শিল্পসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অবদান যে এই নারীমূর্তিগুলি একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। যুগে যুগে সেই আদর্শেরই অনুকৃতি চলে আসছে। বস্তুতঃ, অজন্তা-শিল্পীদের রচনায় নারী কেবল নারীমাত্রে পর্যবসিত হয় নি, সে হয়ে উঠেছে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক।

এই গুহাকক্ষের ভিতরের ছাদের চিত্রাঙ্কনও অনিন্দ্যসুন্দর। ছাদটিকে কতকগুলি খোপে বিভক্ত করা হয়েছে, আর সেগুলির কেন্দ্রস্থলে আছে একটি বৃহৎ বৃত্ত। বহু বিচিত্র নক্সায় এগুলি অলঙ্কৃত। বহুদর্শী শিল্পী ও শিল্পরসিক গ্রিফিংস এগুলি সম্পর্কে বলেছেন:
"For delicate colouring, variety in design, flow of line, and filling of space, I think they are unequalled."

২নং গুহার মোটামুটি পরিকল্পনাটি প্রথম গুহারই অনুরূপ। এটিও বৌদ্ধবিহার। গুহাকক্ষের বাঁ দিকের দেওয়ালে তৃতীয় প্রকোষ্ঠের পাশে বুদ্ধের জন্মকাহিনী চিত্রিত আছে।

এক-একটি প্যানেলে এক-একটি দৃশ্য। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু রাজ্যের রাণী মায়ার শ্বেতহস্তীর স্বপ্নদর্শন, স্বামীর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা, রাজসভার বিপ্রগণ কর্তৃক স্বপ্নের ব্যাখ্যাদান, পিতৃগৃহে গমনকালে লুম্বিনি উদ্যানে মায়ার সন্তান প্রসব প্রভৃতি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কিত। এই গুহামন্দিরের ভিতরের ছাদের অলঙ্করণও শিল্পবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

অজন্তার সর্ববৃহৎ বিহার চতুর্থ গুহামন্দিরটি। এর সুবৃহৎ মন্দিরকক্ষ ২৮টি স্তম্ভযুক্ত। সূক্ষ্ম ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন দেখা যায় এই গুহায়।

স্থাপত্যশিল্পের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ষষ্ঠ গুহাটি। এটি দ্বিতল। ঠিক এই ধরনের বিহার অজন্তায় আর নেই। বিবিধ ভঙ্গিমায় অনেক বুদ্ধমূর্তি এখানে খোদিত রয়েছে। জেমস বার্জেস অনুমান করেন ৪৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এটি নির্মিত হয়ে থাকবে।

এর নীচতলাটিতে চিত্রকলার নিদর্শনের অবশেষ এখনও দেখা যায়। গুহার পিছন দিকের দেওয়ালে বাঁ ধারে রয়েছে একটি বৃহৎ প্রাসাদদৃশ্য। মন্দিরের দরজার দু'দিকেই কোন কোন দেবমূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ভিতরের ছাদে কোথাও কোথাও মণ্ডন-শিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

৭নং বিহার-গুহাটি একটু বিশেষ ধরনের। এর বারান্দাটি প্রায় ৬৩ ফুট দীর্ঘ, এবং সাড়ে ১৩ ফুট প্রশস্ত। কিন্তু অন্যান্য গুহার মত বৃহৎ কক্ষ এ গুহায় নেই। বারান্দার প্রত্যেক প্রান্তে রয়েছে কতকগুলি কক্ষ এবং এই কক্ষগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে দিয়ে তিনটি করে প্রকোষ্ঠে যাওয়া যায়। এই প্রকোষ্ঠগুলি দৈর্ঘে-প্রস্থে সাড়ে ৮ ফুট

করে। এ গুহাতেও বুদ্ধমূর্তি আছে। বুদ্ধদেব উপদেশ দানের ভঙ্গিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট, মাথায় মুকুট, সিংহাসনের সামনে দু'পাশে দু'টি সিংহ ও মুখোমুখি দু'টি হরিণ। পাশের দেওয়ালে আগাগোড়া ছোট ছোট বুদ্ধ-মূর্তি খোদাই করা—কোনটি পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান, কোনটি বা উপবিষ্ট। এটি ৬নং গুহার সমসাময়িক।

৮নং গুহাটি প্রাচীনতম বিহার। মূল গুহাকক্ষটি ৩২ ফুট প্রশস্ত, কক্ষের দু'প্রান্তে দু'টি করে প্রকোষ্ঠ। গুহাকক্ষ সংলগ্ন মন্দিরকক্ষে একটি বেদি দেখা যায়, কিন্তু কোন মূর্তি নেই। এই গুহার সম্মুখভাগের অস্তিত্ব না থাকায় প্রমাণযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন এমন কিছু পাওয়া যায় নি যাতে এর নির্মাণ-কাল সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। তবে গুহাটির অবস্থান পাহাড়ের এত নীচের দিকে যে, তা এর প্রাচীনত্বের একটি নিদর্শন বলা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই গুহাটির সঙ্গে ৯নং গুহার অনেক সাদৃশ্য আছে এবং দুয়ের নির্মাণকাল একই। তাঁদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হলে গুহাটি ১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে কোন সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে বলে মেনে নিতে হয়।

৯নং গুহাটি চৈত্য বা প্রার্থনাকক্ষ। এই চৈত্য-গুহার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতেরা প্রায় একমত। খৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দী এর নির্মাণকাল বলে ধরা হয়। চৈত্য ও গুহাটি প্রায় ৪৫ ফুট দীর্ঘ ও ২৩ ফুট প্রশস্ত। এর বাঁদিকের দেওয়াল বরাবর প্রধানতঃ বুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত, আর পিছনদিকের দেওয়ালে নানাভাবে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের ছবি।

অজন্তার প্রাচীনতম চৈত্য ১০নং গুহাটি। ৯নং গুহা অপেক্ষা এটি আয়তনেও অনেক বড়। গুহার সামনের দিকে এক শিলালিপি থেকে অনুমান করা হয়, এটি খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত। কিন্তু পাহাড়ে এই গুহার অবস্থানের উচ্চতা এবং এর অলিন্দে পাথরের বুকে কাঠখোদাইয়ের অনুকরণে ভাস্কর্য সৃষ্টির চেষ্টা থেকে বার্জেস মনে করেন, এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা। তাঁর মতে, এর নির্মাণকাল খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী।

১১নং গুহাটি একটি বিহার। সামনের দিকের বারান্দার অবলম্বন ৪টি সাদা-সিধা অষ্টভুজ স্তম্ভ। স্তম্ভগুলির তলদেশ চতুষ্কোণ, আর শিরোদেশ ব্র্যাকেট আকৃতির। ভিতরের ছাদে ফুল, পাখী ও জ্যামিতিক নক্সা আঁকা। বারান্দার দু'ধারে একটি করে দরজা। অন্য গুহা অপেক্ষা এর দরজার কারু-কার্য অল্প।

দূরে থেকে অজন্তা গুহা

অজন্তার একটি যুগল মিলন মূর্তি

৩৭ ফুট প্রশস্ত ও ভিতরের দিকে ২৮ ফুট প্রসারিত মূল গুহাকক্ষটি অবস্থান করছে চারটি অষ্টভুজ স্তম্ভের ওপর। স্তম্ভগুলি একটু আদিম ধরনের। এ থেকে পণ্ডিতপ্রবর ফার্গুসন সিদ্ধান্ত করেছেন, সর্বপ্রথম যে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে স্তম্ভের রীতি প্রবর্তন করা হয়েছিল, অজন্তার এই বিহারটি তাদের অন্যতম।

কক্ষের মধ্যে একটি প্রকোষ্ঠে সিংহাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। পাশে চামর হাতে সহচরী নেই, তবে ওপরে গন্ধর্ব মূর্তির দেখা পাই। বুদ্ধের সামনে এক ব্যক্তি নতজানু হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে। অতি বাস্তব একটি শিল্পমূর্তি।

গুহাটি হীনযান অথবা মহাযান কোন্ শ্রেণীভুক্ত তা নিয়ে মতভেদ আছে। স্থাপত্যরীতির দিক থেকে এটি বেশ প্রাচীন, এবং প্রথম শতাব্দীর পর-বর্তী কালের নয় বলেই মনে হয়। সে দিক থেকে হীনযানীদের দাবীই জোরালো; কিন্তু বুদ্ধমূর্তির অস্তিত্বই জটিলতা সৃষ্টি করেছে। বুদ্ধমূর্তি শুধু গুহাপ্রকোষ্ঠেই নেই, বারান্দার দু'দিকেই গুহাগাত্রে উপবেশনের ভঙ্গীতে বুদ্ধ-মূর্তি খোদিত রয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন মূল নির্মাণকার্যের অনেকদিন

পরে কোন সময়ে গুহাটির সংস্কার করা হয়েছিল এবং সেই সময় এটিকে নতুন রূপে সাজানো হয়েছিল। এর স্থাপত্য অপেক্ষা ভাস্কর্যগুলি অনেক পরবর্তী-কালের।

১২নং গুহার সামনের অংশ ধ্বংস-প্রাপ্ত। কেবল চতুষ্কোণ একটি গুহা-কক্ষের অস্তিত্ব আছে। ভিতরের তিন দিকের দেওয়ালের প্রত্যেকটিতে চারটি করে প্রকোষ্ঠ। অধিকাংশ প্রকোষ্ঠতেই দু'টি করে পাথরের পালঙ্ক আর পাথরের বালিশ। প্রকোষ্ঠের দরজার ওপরের অংশ অলংকৃত।

বৃহত্তম না হলেও ১৬নং গুহাটি অজন্তার বিহারগুলির মধ্যে একটি আকর্ষণীয় স্থানের অধিকারী। গুহার সম্মুখভাগের বামপ্রান্তে একটি শিলা-লেখ আছে। লিপির অনেকখানিই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ডাঃ ভাউ দাজী যতটা সম্ভব অনুবাদ করেছেন। এই আংশিক অনুবাদ থেকে জানা যায়, বিন্ধ্যশক্তি নামে জনৈক রাজার কথা এই শিলালিপিতে লেখা আছে। বিন্ধ্য-শক্তি রাজার শাসনকাল সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন হয়ত বেরার ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ এ'র অধিকারে ছিল। সম্ভবতঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ইনি রাজত্ব করতেন। শিলালিপির বর্ণমালার গঠন ও প্রকৃতি ও গুহামন্দিরের স্থাপত্য রীতি থেকে অনুমান করা হয়েছে গুহাটি ৫০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ের রচনা।

বারান্দায় দেওয়ালচিত্র প্রায় বিলুপ্ত, তবে গুহাকক্ষের মধ্যে এখনও কিছু চিত্র দেখা যায় এবং তার মধ্যে কয়েকটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গৌতম বুদ্ধের বাল্যকাহিনী কিছু কিছু এখানে চিত্রিত দেখা যায়। কৃষি-শ্রমিক আর লাঙ্গলবাহী বলদের ক্লেশ দেখে জীবনের রূঢ় বাস্তব সত্য সম্পর্কে কেমন করে বুদ্ধের প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হয়েছিল অজন্তা-শিল্পীর নৈপুণ্যে শিলাগাত্রে তা রূপলাভ করেছে।

এক মৃত্যুপথযাত্রী রাজকুমারীর দৃষ্টিহীন নিমীলিত নয়নে বেদনার ছায়া, পৃথিবী থেকে সে চিরবিদায় নিতে চলেছে,—তাই এক অসহায় কাতরতা ফুটে উঠেছে তার মুখে। সঙ্গের সহচরীদের মুখেও আসন্ন মর্মান্তিকতার প্রতিচ্ছায়া। প্রথিতযশা শিল্পবিদ ও শিল্পরসিক জন গ্রিফিৎস বলেছেন, হৃদয় মথিত করা বেদনা ও নিদারুণ দুঃখাঘাতে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কলাশিল্পের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না।

এ ছাড়া এই গুহাতেই বুদ্ধের চরণে জনৈক নৃপতির শ্রদ্ধাঞ্জলি দান, কতিপয় শিষ্যের নিকট বুদ্ধের উপদেশবাণী প্রদান, সিদ্ধার্থের ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি এক একটি অনুপম চিত্র।

গুহাকক্ষ সংলগ্ন মন্দিরকক্ষে বুদ্ধ-দেবের একটি অতিকায় মূর্তি রয়েছে। তিনি সিংহাসনে বসে আছেন, পা দু'খানি নীচে ঝোলানো, আর হাত দুটি ধর্ম-চক্রমুদ্রা ভঙ্গিতে। অর্থাৎ তিনি বাঁ হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলটিকে ধরে আছেন ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার মধ্যে; ডান হাতের অন্য আঙ্গুলগুলি সোজা করে সামনের দিকে তোলা।

১৭নং গুহাটি আর একটি সৌন্দর্য-ময় বিহার। বহু চিত্রশোভিত গুহাটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিজয় সিংহের সিংহল অবতরণ, অভিষেক ও সিংহল বিজয় এ গুহার দেওয়াল-চিত্রের এক সম্পদ। ভিক্ষাপাত্র হাতে বুদ্ধদেবের বিশাল চিত্র এবং তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান ভিক্ষাদানোদ্যত শিশু ও পশ্চাতে তার মাতা। কেউ কেউ বলেন, শিশুটি বুদ্ধেরই পুত্র রাহুল। এই চিত্ররচনা বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মনকেও নাড়া দিয়েছে। ১৯নং গুহায় ভাস্কর্যের মাধ্যমে এই চিত্রটির রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যায়।

১৯নং চৈত্য গুহামন্দিরটি ৯ ও ১০নং গুহারই অনুরূপ, পার্থক্য কেবল এই যে, ১৯নং গুহাটি আগাগোড়া ভাস্কর্যের নিপুণ নিদর্শনে পরিপূর্ণ।

বৃহৎ গুহাকক্ষটিতে ১৫টি স্তম্ভ আছে। এ ছাড়া গুহার সামনের দিকে আছে আরও দু'টি স্তম্ভ। স্তম্ভগুলির গঠন ও কারুকার্য অপূর্ব। স্তম্ভের নীচের কিছুটা অংশ চতুষ্কোণ—এর কোণে কোণে ছোট ছোট মূর্তি খোদিত। তারপর কিছুটা অংশ অষ্টভূজাকৃতি, এবং তার ওপরের কিছু অংশ আবার গোলাকৃতি। অষ্টভুজ অংশে অতি সূক্ষ্ম মণ্ডন-শিল্পের নিদর্শন—নিপুণ খোদাইয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ। সবচেয়ে ওপরের অংশটি আবার চতুষ্কোণ, কিন্তু দু'পাশে বক্রাকৃতি হয়ে ছাদটিকে ধরে আছে ব্র্যাকেটের ধরনে। চতুষ্কোণ অংশটিতে উপবেশনের ভঙ্গিতে বুদ্ধের মূর্তি খোদিত আছে। দুপাশের বক্র অংশে কোনটিতে হস্তী, কোনটিতে বা শার্দুল অথবা উড্ডীয়মান কোন মূর্তি।

গুহার সম্মুখভাগ ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের এক অনিন্দ্যসুন্দর সম্মিলিত নিদর্শন। সামনেই অশ্বখুরাকৃতি খিলানটি এর ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। জেমস বার্জেসের মতে সামগ্রিকভাবে এই শিল্পরচনা ভারতে বৌদ্ধশিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলির অন্যতম। এর বর্ণনা দেওয়া সাধ্যাতীত, ভাষা এখানে আপনা হতেই মূক।

এই গুহায় কোন শিলালিপি নেই। তবে এর অবস্থান ও স্থাপত্যরীতি পর্যালোচনা করে কেউ কেউ একে ১৬ ও ১৭নং বিহার গুহাদ্বয়ের সমকালীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁরা একরূপ নিশ্চিত যে, ৫৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এটি নির্মিত হয়ে থাকবে।

এই গুহার দেওয়ালে নাগরাজ ও তাঁর পত্নীর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। অজন্তার অনেক স্থানেই চিত্রে ও ভাস্কর্যে নাগমূর্তি দেখা যায়। এই নাগেদের পরিচয় ও বৌদ্ধ গুহায় এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয়েছে। অনেকে মনে করেন নীচজাতীয় এই নাগজাতিই সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল।

২০নং গুহাটি এক বিহার। বারান্দার সামনে দু'টি স্তম্ভের একটি ভগ্ন। স্তম্ভের শিরোদেশে সুন্দর নারীমূর্তি লক্ষ্য করার মত। বারান্দার ভিতরের ছাদটি কড়ি-বরগার ধরনে খোদাই করা। গুহায় নাগ-দ্বারপালের মূর্তিও দৃষ্টি-গোচর হয়। দেওয়ালচিত্র প্রায় সবই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

২১ থেকে ২৫নং পর্যন্ত গুহাগুলি উল্লেখযোগ্য নয়।

২৬নং চৈত্য-গুহাটি ১৯নং গুহার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যযুক্ত, তবে পূর্বেরটির চেয়ে এটি আকৃতিতে বড়, আর ভাস্কর্য নিদর্শনও এখানে অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে।

সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে এই গুহার কাজ শুরু হয়েছিল, তবে ভাস্কর্যের নিদর্শন এখানে যা পাওয়া যায়, তাতে এগুলির রচনাকাল সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি বা তারও পরবর্তী-কালের বলে মনে হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এ সময়ে ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল আর তারই ছায়া এসে পড়েছিল এই গুহার শিল্প-কর্মের ওপর। তাই এই গুহার ভাস্কর্য অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

সামনের দিকে অশ্বখুরাকৃতি খিলানের দু'পাশে একটি করে কুবের মূর্তি, উপ-বেশনের ভঙ্গিতে। দু'পাশের দেওয়াল-গাত্রে বুদ্ধমূর্তি, দণ্ডায়মান অবস্থায়।

মূল গুহাকক্ষের মধ্যে দিয়ে চৈত্য বা পূজাকক্ষে প্রবেশ করলে বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়। চৈত্যটির গঠন চোঙ্গাকৃতি। বুদ্ধের সিংহাসন ধারণ করে আছে দুটি সিংহ। এই চৈত্যের মধ্যে নানা ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান বুদ্ধের আরও বহু মূর্তি রয়েছে।

বাঁদিকের দেওয়ালে বুদ্ধের একটি সুবিশাল মূর্তি দেখা যায়। একটি উচ্চাসনে বুদ্ধদেব নিমীলিত চোখে সটান শুয়ে আছেন সামনের দিকে পাশ ফিরে। বুদ্ধের নির্বাণ লাভ রূপায়িত হয়েছে।

এই হল অজন্তা গুহাগুলির মোটা-মুটি পরিচয়।

আমরা পূর্বেই দেখেছি দেওয়াল-চিত্রগুলি অজন্তার প্রধান সম্পদ। অজন্তার দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা বর্ণসমারোহময় কলাসৃষ্টির পিছনে প্রধানতঃ ধর্মের প্রেরণা ছিল সত্য, কিন্তু এগুলির মধ্যে দিয়ে যে জীবনছন্দ ফুটে

উঠেছে, জীবন-চেতনার যে বলিষ্ঠ রূপে শিল্পীর তুলিকায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবন-দর্শন যে সুষ্ঠু প্রকাশ লাভ করেছে, নানা অবস্থা ও পরিবেশে জীবনকে বিশ্লেষণের যে ব্যাপক ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি শিল্পীর তুলির প্রতি টানে ফুটে উঠেছে, তাতে এই শিল্পসৃষ্টিকে প্রকৃতপক্ষে প্রায় ন' শতাব্দীব্যাপী জীবনের মহাকাব্য বলা যেতে পারে। জীবন সম্পর্কে সুগভীর প্রীতি না থাকলে এ সম্ভব নয়। জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে জীবনের রূপ এভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় না। বস্তুতঃ, অজন্তার চিত্রকলার বিপুল ঐশ্বর্যময় রূপ একের পর এক দেখতে দেখতে মনে হয়, অতীতের একটা সমগ্র যুগ যেন বর্ণে ও রূপে মূর্তি পরিগ্রহ করে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় শিল্পসাধনা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। একে বলা যেতে পারে জীবন-সাধনা। জীবনকে বাদ দিয়ে শিল্পের ভিত্তি দৃঢ় হতে পারে না। নিছক 'শিল্পের জন্যই শিল্প' এ তত্ত্বকে ভারতীয় শিল্পীরা কোনদিনই আমল দেয় নি। তাই ভারতীয় শিল্প মহৎ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী বলেছেন :

"A race producing great art does so not by its love of art, but by its love of life."

অজন্তার শিল্প এর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

মসিরেখা

জরাসন্ধ
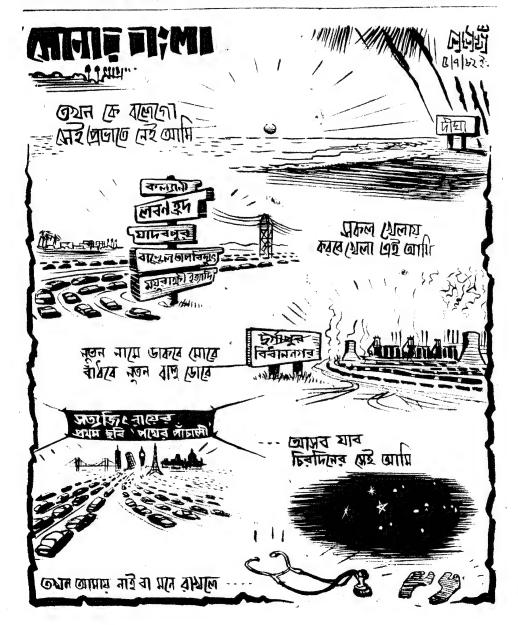
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রঘুর এই একটানা কাহিনী শুনতে শুনতে দিলীপের সমস্ত মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। প্রফেসর ব্যানার্জি তখন নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, মেয়েটা একেবারে একা। কথাটা তার অন্তর স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তার মর্মস্থলে যে এত বড় মর্মান্তিক অর্থ নিহিত ছিল, কেমন করে জানবে? এই মুহূর্তে সেটা তীব্রভাবে অনুভব করল। ঐ 'একা' কথাটার বিষণ্ণ ম্লান রিক্ত রূপ তার চোখের সম্মুখে মূর্ত হয়ে উঠল। দরজার বাইরে পা দিয়ে আপনার অজ্ঞাতসারে একবার উপরের দিকে তাকাল। দোতলার বারান্দায় রেলিং-এর পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটি বেদনার প্রতিমূর্তি। ঘনায়মান সায়াহ্নের স্বল্পালোকে যে-টুকু দেখা গেল, সমস্ত মুখখানা পরিম্লান বিষাদে ঢাকা। চোখো-চোখি হতেই দিলীপের মনে হল, ওষ্ঠ দুখানি যেন একটু ফাঁক হল। হয়তো কিছু বলবার ছিল। না শুনেই সে চলে যাচ্ছে। মুহূর্তের তরে পা দুখানা আপনা হতেই থেমে গেল। কিন্তু কোনো ডাক এসে পৌঁছল না।

পকেটের কাগজখানার কথা মনে পড়তেই সে দ্রুতবেগে পা চালিয়ে দিল। রাস্তার মোড়ে তার একটা জানাশুনো ওষুধের দোকান আছে। সেখান থেকে ডাক্তার বোসকে ফোন করতে হবে।

কিছুক্ষণ আগে এগারটা বেজে গেছে। প্রেস-বাড়ির কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। সব ঘুমে বিভোর। নটার সময় ওদের খাওয়া-দাওয়া মিটে যায়। তারপর ঘন্টাখানেক গল্প-গুজব চলে। দশটা বাজতে না বাজতেই সারাদিনের শ্রম-ক্লান্ত চোখগুলো আপনিই বুজে আসে। সব আলো নিভে যায়। গোটা বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে। একটি মাত্র আলো শুধু জ্বলতে থাকে—দিলীপের চিলেকোঠার ছোট্ট ঘরে। প্রেস-এর পেছনে সারা দিনমানে যে সময়টা তাকে দিতে হয়, রাত্রির কাছ থেকে তার প্রায় সবখানিই সে আদায় করে নেয়।

অন্যদিনের মত আজও সে পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত ছিল, যদিও মনটা ঠিক নিরুৎকণ্ঠ ছিল না। সমস্ত পাড়াটা নিঝুম হয়ে গেছে। এতক্ষণ মাঝে মাঝে দু-একখানা চলন্ত গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এখন তাও নেই। হঠাৎ কোথা থেকে একটা কোমল সুর ভেসে এল—'শুনুন।' দিলীপ চমকে উঠল—কে ডাকে? তারপর নিজের মনেই হাসল একটুখানি। এ ডাক বাইরে থেকে আসেনি, এসেছে তার উদ্বিগ্ন অবচেতনার ভিতর থেকে। তবু কান খাড়া করে রইল এবং কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার শোনা গেল সেই সানুনয় ব্যাকুল কণ্ঠ—'শুনছেন?' তার জানালার ওপার থেকেই যেন আসছে বলে মনে হল। ধড়মড় করে উঠে পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ছাদের দিকে তাকাল। না, ভুল নয়। আবছায়া অন্ধকারে তাকেই দেখা গেল। আলসের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, একটিবার শুনুন না?

—'আমাকে ডাকছেন?'

—হ্যাঁ; বাবা কী রকম করছেন। ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন না। একবার আসবেন?

—এখ্খুনি যাচ্ছি।

—আমি গিয়ে রঘুকে নীচে পাঠিয়ে দিচ্ছি; দরজা খুলে দেবে।

বলতে বলতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দিলীপ ক্ষণকাল সেই দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে গলিয়ে এক-রকম ছুটতে ছুটতে নেমে পড়ল।

দারোয়ানকে ডেকে তুলে সদর বন্ধ করবার নির্দেশ দিয়ে ও-বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছল, তার আগেই রঘু এসে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। দিলীপ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, বাবু কেমন আছেন রঘু?

—জ্ঞান নেই। তাড়াতাড়ি আসুন। এ রকম আরেকবার হয়েছিল বছর খানেক আগে।

—'আরেকবার হয়েছিল!' অনেকটা যেন আপন মনে বিড়-বিড় করে বলল দিলীপ। তারপর উপরে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করল ডাক্তার আসেননি।

—এইতো একটু আগে দেখে চলে গেলেন। তারপরেই—

দিলীপ ততক্ষণে কয়েক লাফে সিঁড়িগুলো পার হয়ে রোগীর ঘরে পৌঁছে গেছে। বাবার মাথার কাছে খাটের ঠিক পাশটিতেই সে দাঁড়িয়ে আছে। দু'চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। দিলীপ এক পলক সেদিকে তাকিয়েই রোগীর হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করল, চোখের পাতা টেনে দেখল। আরো যা যা দেখবার ক্ষিপ্রগতিতে শেষ করে মুখ তুলতেই ও পাশ থেকে ফেটে পড়ল আর্তস্বর—কী দেখলেন? বাবা নেই?

—না, না; সে কী কথা! হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এখ্খুনি ভালো হয়ে যাবেন। ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া দরকার। তার ফোন্ নম্বরটা—

—তাঁকে তো এখন পাওয়া যাবে না।

—কেন? কোথায় গেছেন?

—এখান থেকে আরো কোথায় যেন

যেতে হবে বলে গেলেন। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে।

—আমি তাহলে অন্য ডাক্তার নিয়ে আসছি।

ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যাবার মুখে পিছন থেকে শুনতে পেল, 'শুনুন'। থমকে ফিরে দাঁড়াল দিলীপ।

'বেশী দেরি করবেন না। আমার বড্ড ভয় করছে।'

—ভয় কি? আমি এখখুনি আসছি।

রোগীর অবস্থা যে আশঙ্কাজনক, পুরোপুরি ডাক্তার না হলেও দিলীপের সেটা বুঝতে বাকী ছিল না। অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না হ'লে, সর্বনাশ ঘটতে পারে, সে বিষয়েও সে নিঃসন্দেহ। ঘটনাচক্রে সে ব্যবস্থার ভার এই মুহূর্তে তারই উপর এসে পড়েছে। এই গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়েই সে ছুটে চলেছিল তার একজন প্রফেসরের কাছে। তিনি বড় ডাক্তার, এই জাতীয় ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং কাছেই থাকেন। রোগীর অবস্থা সম্পর্কে তিনি কি কি প্রশ্ন করতে পারেন, তার কী উত্তর দেবে, সেইগুলো মনে মনে স্থির করতে করতে সে নির্জন রাস্তা ধরে দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। রোগ, তার সম্ভাব্য চিকিৎসা এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারের মধ্যেই সে নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিল।

কিছুক্ষণ পথ চলবার পর হঠাৎ এক সময়ে সে থমকে দাঁড়াল। এ কী ভাবছে সে! রোগ এবং রোগীকে ঘিরে যে-উদ্বেগ তার সমস্ত মন এতক্ষণ অধিকার করে রেখেছিল, তার থেকে স্খলিত হয়ে অবাধ্য চিন্তাধারা কখন কোন্ গোপন পথ ধরে অজানতে ডুবে গেছে সেই রোগশয্যার পাশে উচ্চারিত একটি মধুর করুণ অশ্রু-জড়িত কণ্ঠের ব্যাকুল আহ্বানে। পেছন থেকে বলা সেই সামান্য দুটি কথা—তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার অনুরোধ। কিন্তু তার মধ্যে যে একান্ত নির্ভরতাময় অন্তরঙ্গ সুরটি জড়িত ছিল, তারই স্পর্শে দিলীপের সমস্ত বুকখানা বার-বার ভরে উঠছিল। সহসা সচকিত হয়ে মনে মনে লজ্জা বোধ করল। মাথার উপর যে কর্তব্যের ভার নিয়ে সে এই গভীর রাত্রে পথে বেরিয়েছে, সেইটাই এখন তার একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান, ধারণা। তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে এ কোন্ আত্মসুখময় মোহাবেশ তাকে পেয়ে বসল! নিজেকে বড় ছোট মনে হল নিজের কাছে।

দিলীপ তখনো জানত না, মানুষের মন নামক যে বিচিত্র বস্তু, ঐ ধরনের বিরুদ্ধ-রীতিই তার ধর্ম। নিবিড় সুখের মধ্যে বসেও সহসা কোন্ অর্থহীন বেদনায় সে ম্লান হয়ে ওঠে। চরম আত্ম-ত্যাগের গৌরব-মুহূর্তে অন্ধ স্বার্থ এসে তার পথরোধ করে দাঁড়ায়। দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর দরিদ্র সংসারকে শেষ ধাপে নিয়ে গিয়ে প্রাণাধিক সন্তান যখন চলে যায়, তার মৃত্যুশয্যায় বসে পিতামাতার মনে যে চিন্তাস্রোত বইতে থাকে, তার একদিকে যন্ত্রণা আরেক দিকে স্বস্তি। তাদের বুকের ভিতর থেকে যে দীর্ঘশ্বাস তখন বেরিয়ে আসে তার সবখানিই কি জ্বালা? না, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মুক্তির আরাম।

ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যাবার মুখে পিছন থেকে শুনতে পেল...

।। ষোল ।।

খাটে শুয়ে দেয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর ব্যানার্জি মনে মনে হিসাব করে দেখছিলেন, আজ কতদিন হল,—কবে থেকে তিনি এই বিছানা আঁকড়ে পড়ে আছেন। সেই রাত্রিটি তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু তারিখটা মনে পড়ছে না। জ্ঞান ফিরে পাবার দু-তিন দিন পর একটু যখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন, মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; উত্তর পাননি। উলটে বকুনি খেতে হয়েছিল—'আবার ঐসব ভাবছ?' ভারী মিষ্টি লেগেছিল এই সস্নেহ তিরস্কারটুকু। মেয়েকে রাগিয়ে দেবার জন্যে বলেছিলেন, আসলে তোর মনে নেই।

—হুঁ; মনে নেই বৈকি?

—তবে বলছিস না কেন?

—আমাকে বারণ করে গেছেন।

—ডাক্তাররা ওরকম কত কি বারণ করে। সব কথা শুনতে গেলে কি চলে?

—ডাক্তার কেন হবে?

—তবে? আবার কে বারণ করল?

মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। মুখখানা হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠল। নীচের দিকে চেয়ে, অকারণে আঁচলের খুঁটটা সোজা করতে করতে সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে বলল, দিলীপবাবু। সেই আরক্ত নত-মুখের দিকে চেয়ে ব্যানার্জির মনে একটা ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল। এই মাতৃহারা, নিতান্ত সরল, স্নেহ-পিপাসু মেয়েটির

কথা ভেবে ভিতরে ভিতরে তিনি শঙ্কিত হলেন। সে তো জানে না সে কোন্ পথে চলেছে। তারপর? কোথায় কিভাবে কোন্ পরিণামের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে, তিনিও বলতে পারেন না। যদি একদিন সহসা কোনো বাঁকের মুখে ছেদ টেনে তাঁকে অন্য পথ ধরতে হয়, সে আঘাত সইতে পারবে তো? বিদ্যুৎঝলকের মত নিজের দীর্ঘ জীবনটা চোখের উপর ভেসে উঠল। মনে মনে শিউরে উঠলেন। না; আর নীরব দর্শকের মত বসে থাকা যায় না। হয় অগ্রসর, নয়তো এইখানেই রাশ টেনে দিতে হবে।

মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, দিলীপ আজ আসেনি; দেখলেন সে ঘরে নেই। অনেকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, সেই ফাঁকে কখন চলে গেছে।

এই কদিনের মধ্যেই দিলীপ ছেলেটি তাঁর মনের অনেকখানি স্থান জুড়ে বসেছিল। তার জন্য কী না সে করেছে এবং এখনো করে চলেছে! সেই গভীর রাত্রে অতবড় খ্যাতিমান চিকিৎসক ডাক্তার দাশগুপ্তকে নিয়ে সে যদি ঠিক সময়ে এসে না পৌঁছত, হয়তো এ যাত্রা তিনি রক্ষা পেতেন না। অবশ্য পুরো-পুরি রক্ষা তিনি পাননি। প্রাণটা রেখে গেলেও দুর্জয় ব্যাধি প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর দেহের একটা দিক প্রায় অচল করে দিয়ে গেছে। তারপর থেকে চলেছে এই অক্লান্ত সংগ্রাম। তিনি আর কী করছেন? চুপ করে শুয়ে আছেন। সমস্ত ধকল সইছে ওরা—ঐ দিলীপ আর কজন বন্ধু। যেমন করে হোক তাঁকে টেনে তুলবেই, এই ওদের পণ। কী আশ্চর্য কটি ছেলে তৈরি করেছেন আশুবাবু! কোথাকার কোন বর্স্টাল জেলের সেকেন্ড মাস্টার! পদে, মানে, সামাজিক মর্যাদায় অতি নগণ্য। কিন্তু মনটা কত বড়! তিনি একজন অধ্যাপক। এই পাড়ায় ওদের চেয়েও পুরাতন বাসিন্দা। এপাশে ওপাশে অনেক সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচয় আছে। রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে নমস্কার ও মামুলী কুশল প্রশ্নের বিনিময় হয়ে থাকে। ছোটখাট অসুখ-বিসুখে মৌখিক উদ্বেগ প্রকাশে কখনো ত্রুটি হয় না। কিন্তু তাঁর এই ঘোর সংকটের দিনে তাঁদের একজনও তো দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াননি। দাঁড়ালেও ভাসা ভাসা খবর নিয়ে চলে গেছেন। যা কিছু করেছে ঐ ছেলেগুলো আর তাদের 'মাস্টারমশাই'। অথচ এরা সব দিক দিয়েই তাঁর কাছে ছোট এবং ছোট করেই দেখে এসেছেন বরাবর। সবচেয়ে তাজ্জব কথা—এরা সমাজবিরোধী জীব, অ্যান্টিসোস্যাল এলিমেন্টস। পুলিশ এদের উপর কড়া নজর রাখে। পাড়ার সৎ এবং ভদ্র গৃহস্থেরা শুধু যে সযত্নে ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলেন তাই নয়, এরা কখন কি করে বসে, সেই আশঙ্কায় সদাসন্ত্রস্ত।

প্রেস-এর ছেলেরা এসেছে, গিয়েছে, বাহাদুরের তৈরি রুটিনমত পালা করে রোগীর সেবা করেছে, আশুবাবু দুবেলা এসে নিয়মিত তদারক করে গেছেন, রোগীর অবস্থা এবং ডাক্তারের নির্দেশ প্রতিকূল না হলে কিছুক্ষণ বসে গল্প-গুজব করে তাঁর মনটাকে খানিকটা হালকা করবার চেষ্টা করেছেন। এ বাড়ির সঙ্গে ঐ পর্যন্ত তাদের যোগ। কিন্তু দিলীপ সেখানে থেমে যেতে পারেনি। যখন-তখন তার তাগিদ এসেছে ভিতর বাড়ি থেকে। কখনো কখনো রঘু গিয়ে সরাসরি হানা দিয়েছে ওবাড়ির চিলেকোঠায়। দিলীপ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, কী খবর রঘু?

—দিদিমণি ডাকছেন।

এ ডাকের সঙ্গে রোগের অবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই, রঘুর কথা বলবার ধরণেই তা সুস্পষ্ট। তবু উদ্বেগের ভান করেছে দিলীপ, কেন? বাবুর শরীরটা কি কোনো রকম—

—আজ্ঞে না; বাবু সেই রকমই আছেন; ঘুমুচ্ছেন দেখে এলাম।

—আচ্ছা, তুমি যাও। আমি একটু বাদে যাচ্ছি।

এই 'একটু বাদে'র আবরণ দিয়ে ভিতরকার চাঞ্চল্যকে ঢেকে রাখতে গিয়ে মাঝে মাঝে তাকে যে কি কঠোর ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে, সে শুধু সে-ই জানে। গিয়ে হয়তো দেখেছে, ডেকে পাঠাবার কারণ নিশ্চয়ই ছিল, তবে তার মধ্যে যাকে বলে 'আশু প্রয়োজন, তেমন কিছু নেই। তবু সেই তুচ্ছ কারণটাকেই

দু তরফ থেকে জয়নুরী করে তোলা হয়েছে—যেন এই সময়ে একজন যদি বুঁধি করে না ডাকত, এবং আরেকজনকে যদি সংগে সংগে না পাওয়া যেত, কী যে হত বলা যায় না। অন্তরালে যে মধুর ছলনা দুজনের কারো কাছেই সেটা গোপন থাকেনি। উভয়েই মনে মনে উপভোগ করেছে, কিন্তু বাইরে ধরা দেয়নি।

এমনি একদিন বিকাল বেলা দিদিমণির দৌত্য সেরে রঘুর প্রস্থানের পর পাঁচটা মিনিট কোনো রকমে পার করে দিয়ে এ বাড়িতে ছুটে এসে দিলীপ হঠাৎ থ' হয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে উৎকণ্ঠাভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে! শোবার ঘরের বারান্দায় একটা চৌকি দখল করে গালের উপর হাত রেখে বিমর্ষ মলিন মুখে যে বসে ছিল তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আর একটু কাছে সরে গিয়ে সস্নেহ অনুনয়ে প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করতেই সে ব্লাউজের ভিতর থেকে একখানা চিঠি বের করে এগিয়ে ধরল। দিলীপ মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে বলল, কার চিঠি?

'পড়ে দেখুন।' চাপা কান্নায় জড়ানো ভাঙাভাঙা মৃদু কণ্ঠস্বর।

দিলীপ আড়চোখে একবার সেই ফুলো ফুলো চোখদুটোর দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে চিঠিটা খুলে ফেলল।

চিঠি এসেছে কানপুর থেকে, লিখেছেন ওর 'বড়মা'। অতবড় অসুখের খবর পেয়ে প্রথমে খানিকটা দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্ন-প্রকাশ। পরের কটি লাইনে অনুযোগ ও সস্নেহ তিরস্কার—সংগে সংগে তাদের জানানো হয়নি কেন। তারপর জানিয়েছেন, ওর জ্যাঠামশাই ছুটির অপেক্ষায় আছেন। পাওয়া মাত্র কোলকাতায় রওনা হবেন এবং ওদের দুজনকে নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব কানপুরে ফিরবেন। আর যদি রোগীর পক্ষে বর্তমান অবস্থায় অতটা নড়াচড়া এবং এই দীর্ঘ রেলভ্রমণ সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁকে আপাততঃ একজন পরিচিত ডাক্তারের নার্সিং হোমে রেখে জ্যেঠামশাই শুধু ওকে নিয়ে চলে যাবেন। সে যেন তৈরী হয়ে থাকে।

চিঠিখানা পড়ে ভাঁজ করতে করতে দিলীপ উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ মনে হল, এতবড় শহরটা তার অসংখ্য বাড়িঘর, গাছপালা, গাড়িঘোড়া মানুষজন নিয়ে কয়েক পলকের মধ্যে তার চোখের উপর থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। অনাগত জীবনের যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার, একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মিও চোখে পড়ে না। বুকের ভিতরটাও কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে—বেদনা-বোধহীন, অসাড়।

কতক্ষণ এমনি নিজের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তার মনে নেই। হঠাৎ একটা বাষ্পরুদ্ধ কোমল স্বর কানে যেতেই চমকে উঠল—আসুন না জ্যাঠামশাই, আমি কখখনো যাবো না। বাবাকে ফেলে আমি কোথাও গিয়ে থাকতে পারবো না।

বলতে বলতে সেই রুদ্ধ অশ্রু গালে গালে ঝরে পড়তে লাগল। এতক্ষণে যেন সাড় ফিরে এল দিলীপের। তীব্র বেদনায় বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। দুর্দমা ইচ্ছা হল, ছুটে গিয়ে শিশিরসিক্ত পদ্মের মত ঐ অশ্রুলাঞ্ছিত মুখখানা বুকে চেপে ধরে বলে, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

কিন্তু কে সে? একথা বলবার তার কী অধিকার? এতটা ভরসা দেবার মত জোরই বা সে পেল কোথা থেকে? বলবার মত কিছুই তার নেই। সামান্য একটু সান্ত্বনা দেবে, তেমন কোনো ভাষাও সে খুঁজে পেল না। এই কটা দিন পিতা ও কন্যা উভয়ের কাছে এমন অনেক আচরণ সে পেয়েছে, যা শুধু

নিতান্ত আপনজনের প্রাপ্য। সেই স্বীকৃতির গর্বে ও আনন্দে তার বঞ্চিত হৃদয় ভরে উঠেছিল। আজ বুঝতে পারল, সেসব অলীক অসার। কয়েকটা দিন যেন ডানা মেলে কোন স্বপ্নাকাশে বিচরণ করছিল। একখানা মাত্র চিঠির আকস্মিক আঘাত তাকে সংসারের কঠিন মাটিতে ফেলে দিয়ে গেল।

'আপনি কী বলেন? বাবাকে রেখে আমি চলে যাবো?' আবার চমকে উঠল দিলীপ। দুটি ক্ষুব্ধ সপ্রশ্ন চক্ষু তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। একটি মাত্র উত্তর আছে—এ ক্ষেত্রে যা সংগত, বাস্তব এবং হয়তো সব দিক দিয়ে সমীচীন। কিন্তু সে উত্তর দেওয়ার চেয়ে নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে দেওয়াও বোধ হয় সহজ। তবু এদের পারিবারিক কল্যাণের দিকে চেয়ে সেই কথাই তাকে বলতে হবে। সেই চোখদুটি তখনও তার মুখের উপর নিবদ্ধ। তারা কী চায় তা কি সে জানে না? কিন্তু সব জেনে-শুনেও সে বলে ফেলল, আপনার জ্যাঠাইমা যখন বলছেন,—

"ও, তাহলে আপনিও তাই চান?" কথাটা শেষ করবার সময়টুকুও দিল না। দুচোখে একরাশ আগুন ছড়িয়ে চিঠি-খানা যেন ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঝড়ের মত বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

প্রফেসর ব্যানার্জি চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন এবং মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে, মা?

—কিছু না। বড়মার চিঠি এসেছে।

—ওদের খবর সব ভালো তো?

—হ্যাঁ; জ্যাঠামশাই আসছেন। তোমাকে নার্সিং হোমে রেখে আমাকে কানপুর নিয়ে যাবার জন্যে।

—সে কি! তুই বুঝি আমার এইসব অসুখের কথা লিখেছিলি ওখানে?

মেয়ে জবাব দিল না। তিনিও তার জন্যে অপেক্ষা করলেন না। নিজের মনে বলতে লাগলেন, না লিখেই বা তুই স্থির থাকবি কেমন করে? তবু একটিবার যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে লিখতিস, আমি এসব খবর দিতে বারণ করতাম।......... যাক্: যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। দেখি চিঠিখানা?

নিঃশব্দে পড়া শেষ করে কাগজ-খানা মেয়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ তেমনি চুপ করে পড়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ঠিকই লিখেছে বৌদি। কতদিন এভাবে শুয়ে থাকতে হবে কে জানে? তুই ছেলেমানুষ, পেরে উঠবি কেন? তোকেই বা কে দেখে? তার চেয়ে বরং মেজদার সঙ্গেই চলে যা। বড়মা তো তোকে কোনোদিন অনাদর করেননি। ভালোই থাকবি তাঁর কাছে। তারপর যদি সেরে উঠতে পারি—

মেয়ে চলে যাচ্ছিল। প্রফেসর ডেকে ফেরালেন, শোন; থাকতে পারবি তো?

—কেন পারবো না? তোমরা সবাই যখন চাও, আপদ বিদেয় হোক, তখন—

আর বলা হল না। সহসা স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

—'আয়, এদিকে আয়'—ডান হাত-খানা তুলে মেয়েকে কাছে আসবার ইঙ্গিত করলেন প্রফেসর। সে সংগে সংগে ছুটে গিয়ে তাঁর বুকের উপর মাথাটা লুটিয়ে দিল।

মেঘের মত এক বোঝা চুল। কদিন বোধহয় তাতে তেল পড়েনি, চিরুনিও পড়েনি। রুক্ষ, বিবর্ণ; মাঝে মাঝে জট পাকিয়ে গেছে। তারই উপর হাত বুলোতে বুলোতে ব্যানার্জির বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল। চিরদিন তাঁকেই এসব দেখতে হয়েছে। আজ তিনি পড়ে আছেন। কে দেখবে? মনে পড়ল, এই সেদিনও এমনি করে বুকের উপর শুইয়ে চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে চালিয়ে তিনি দুরন্ত মেয়েকে ঘুম পাড়াতেন। আজও তেমনি কোঁকড়া চুলগুলো চিরে চিরে দিতে লাগলেন। সেই স্নেহস্পর্শে মেয়ের চোখের জল আর বাধা মানল না। বুক ভাসিয়ে অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল।

এই প্রশস্ত বুকখানাই তার আজন্মের আশ্রয়। হঠাৎ তাকে ছেড়ে যাওয়া কি এতই সহজ?

দিলীপ কিছুক্ষণ হতভম্বের মত সেই বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে রইল। একবার ভাবল চলে যায়। তারপরেই মনে হল, এখনই হয়তো সে ফিরে আসবে। তখন সুযোগ বুঝে তার নিজের অবস্থাটা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে এল না। অগত্যা বাসায় ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে অধ্যাপকের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভিতরে নজর পড়তেই পা দুটো যেন হঠাৎ অচল হয়ে গেল। বুঝতে পারল, এর আগে পর্যন্ত ঐ চিঠিখানার পরিপূর্ণ অর্থবোধ তার হয়নি। এই মুহূর্তে আর একটা আশংকা তার মনের কোণে ছায়া ফেলল। অধ্যাপক যদি তাঁর সর্বনাশা ব্যাধির এই দ্বিতীয় আক্রমণ কাটিয়ে উঠতে না পারেন? পরের কথাটা কল্পনা করতেও সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে।

হঠাৎ মনে পড়ল, আজই তো সন্ধ্যার পর ডাক্তার দাশগুপ্তের আসবার কথা। এখনো সময় আছে। তবু বেশ কিছুক্ষণ আগেই তার চেম্বারে পৌঁছানো দরকার। আবার কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে দ্রুত-বেগে নেমে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)
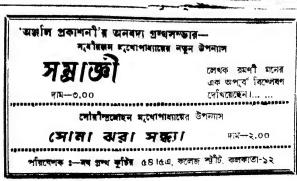
।। অভিনব বৈদ্যুতিক বালব ।।

আমেরিকার নিউজার্সির নর্থবার্গেন ডুরোটেস্ট কর্পোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান 'ফ্লেমসসেন্ট' নামে এক প্রকার অভিনব বৈদ্যুতিক বালব উদ্ভাবন করেছেন। বাজারে যে সকল বালব আছে তাদের তুলনায় অনেক বেশী আলো দেয়, তিনগুণ বেশী টিকে এবং শক্ত জমিতে পড়ে গেলেও ভাঙে না। ফাইবার গ্লাসতন্তু, গ্লাস বা কাচ এবং রবার যুক্ত সিলিকোন দ্বারা এই বালব নির্মিত হয়েছে।

অ্যালুমিনিয়াম বা টিনের কৌটা তৈয়ার করার অভিনব যন্ত্র

আমেরিকায় টিনের বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত হতে কৌটা তৈয়ার করার একটি অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। বর্তমানে যে সকল যন্ত্র আছে তাতে সর্বাধিক ৬০০ পর্যন্ত কৌটা এক মিনিটে তৈয়ার করা যায়। কিন্তু এই নতুন যন্ত্রটির সাহায্যে মিনিটে ২000 হইতে ঘণ্টায় ১২0000টি পর্যন্ত তৈয়ার করা যাবে। এবং আট ঘণ্টায় তৈরী হবে প্রায় ১000000 কৌটা।

॥ ১৩০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন ট্রাক্টর ॥

দক্ষিণ উরালাস্-এর চেলিয়াবিনস্ক ট্রাক্টর কারখানায় ১৩০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন একটি ট্রাক্টর নির্মাণ করা হয়েছে। এই
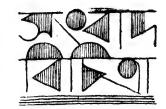
কারখানায় নির্মিত ১০০ অশ্বশক্তির ট্রাক্টরগুলির তুলনায় এই নতুন ট্রাক্টরটির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উন্নততর এবং এর ইনজিনে অনেক কম তেল খরচ হয়। এই সর্বার্থসাধক শ্রেণীর ট্রাক্টর দিয়ে অবিরাম দীর্ঘকাল কাজ করা যেতে পারে।

।। অনুবাদের যন্ত্র ।।

অলিম্পিয়ায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইলেকট্রনিক উপকরণ প্রদর্শনীতে পিকচার ভিজিটাইজার নামে যে উপকরণ প্রদর্শিত হয়েছে তা থেকে কি ভাবে অন্ধদের জন্য দ্রুত পুস্তক প্রস্তুত করা যেতে পারে এবং ইংরাজিতে বিদেশী ভাষায় লিখিত পুস্তকের অনুবাদ হতে পারে তার আভাস পাওয়া যায়। ভিজিটাইজার যন্ত্রটি মুদ্রিত অংশ বিশ্লেষণ করে সেই অংশটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে রূপান্তরিত করে। এ থেকে প্রস্তুত করা হয় পাঞ্চড্ বা সচ্ছিদ্র টেপ্। এই টেপ পরে কম্প্যুটারে প্রবেশ করানো হয়। পিকচার ভিজিটাইজার এইভাবে কম্প্যুটার 'মস্তিষ্কের' চক্ষু হিসাবে কাজ করে। ইংরিজি হতে ব্রেইল অথবা রুশ হতে ইংরিজিতে রূপান্তরের কাজ অতি দ্রুত গতিতে চলে।

।। একটি পরিসংখ্যান ।।

যুগোশ্লাভিয়ায় গত বৎসর ১,০৩৯টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাগুলির মোট বাৎসরিক প্রচার-সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০২ মিলিয়ন কপি। ১৯৫৭ সালের তুলার ৫০৬টি অধিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রচারসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে ২৪৯·৫ মিলিয়ন। গত বৎসর রেকর্ড সংখ্যক বই প্রকাশিত হয়। ৫,৫৩৯টি বিভিন্ন সংস্করণে ৩৩ মিলিয়ন কপির অধিক সংখ্যক বই পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৫৭ সালের তুলনায় তথ্যচিত্র-নির্মাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৬,000, অর্থাৎ ৬৩,000 থেকে ৭৯,000। ১৯৫৭-৬১ সালের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়ায় উচ্চ বিদ্যালয় বৃদ্ধি পায় ৯৮ থেকে ২0৪ এবং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৭২,000 থেকে ১৪0,000র অধিক। ১৯৬২ সালের প্রথম দিকে যুগোশ্লাভিয়ায় রেডিও গ্রাহক-সংখ্যার পরিমাণ ১,৬৮0,000 এবং টেলিভিসন সেট গ্রাহক হচ্ছেন ৮0,000 জন।
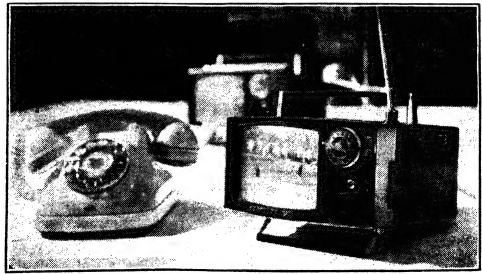
পৃথিবীর সব থেকে ছোট এবং হাল্কা টেলিভিশন সেট তৈরী হয়েছে জাপানে। ৫" অল ট্রানজিস্টরাইজড টেলিভিশন সেটটির ওজন মাত্র ৮ পাউন্ড, ১১ সেন্টিমিটার উঁচু, ১৮·৬ সেন্টিমিটার গভীর এবং ১৯ সেন্টিমিটার চওড়া এই সেটটিতে যে-কোন সাধারণ সেটের মতই সুন্দর এবং পরিষ্কার ছবি দেখা যায়। গৃহে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ সহযোগেই কেবলমাত্র এটিকে ব্যবহার করা চলবে এমন নয়, ১২ভি গাড়ী-ব্যাটারির সাহায্যেও চালান যাবে। ডানদিকে নতুন আবিষ্কৃত সেটটির সঙ্গে বাঁদিকে রাখা টেলিফোনটির তুলনা করে সেটটির আকৃতি সহজেই বোঝা যাবে। সেটটি জাপানের বিখ্যাত সোনি কর্পোরেশনের তৈরী।

"শুনছো? শীগ্‌গীর এসো। শুনে যাও একবার তাড়াতাড়ি।"

"এই তো চা দিয়ে এলাম ঘরে।" স্বামীর উত্তেজিত রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠস্বরের উত্তরে একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল অনুভার গলায়। "এর মধ্যে এমন কী প্রলয় কাণ্ড ঘটল শুনি? ময়দা মাখছি, এখন যেতে পারব না। দরকার হয় রান্নাঘরে এসে বলে যাও।"

"আঃ এসো না একবার। আমার কোন কথাতেই যদি কান দাও তুমি। গেরাজ্যিই হয় না আজকাল দেখছি। হবে কোথা থেকে? যেমন দেখবে তেমনই তো শিখবে?"

ব্যতিব্যস্ত অনুপমের গলার ঝাঁজেও খুব তাড়া দেখা গেল না অনুভার। অনেক বছর ঘর করছে। হাড়ে হাড়ে চেনে সে স্বামীকে। সদাসতর্ক সন্দেহপ্রবণ, অতিরিক্ত সাবধানী লোকটার হাতে পড়ে ওকে ভুগতে হয় কম নয়। এ রকম চেঁচামেচি প্রায় প্রত্যেক দিনই লেগে আছে। কাল বিকেলেই তো হয়ে গেল এক চোট।

"এ কি? সদর খোলা কেন?" অফিস থেকে ফিরে ঘণ্টাখানেক কড়া নাড়ার বদলে ভেজানো দরজা দেখেই চিৎকার শুরু করেছিল অনুপম।

"সদর খোলা কেন অ্যাঁ? পই পই করে বলেছি সদর দরজা বন্ধ রাখবে। একটা কথা যদি কানে যায়! শম্ভু, এই শম্ভু—"

"দরজা আবার হাট খোলা কোথায়? ভেজানোই তো রয়েছে তুমি এখুনি আসবে বলে।" সরোষ ঝঙ্কার ভেসে এলো ঘর থেকে। "সমস্ত দিনের পর এই তো শম্ভু তালাচাবি খুলে ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে শান্তিদের বাড়ি গেল। পাঁচ মিনিটও হয়নি। চোদ্দবার খুলতে বন্ধ করতে পারিনি বাপু।"

"তা পারবে কেন? যদি দরজা ঠেলে একটা চোরই ঢুকতো?"

"তোমার বাড়ি কি এমন সব মহামূল্য জিনিসপত্র ছড়ানো আছে যে তাই নিতে দিনদুপুরে চোর আসবে? ওদের কি আর মরবার জায়গা নেই?"

"আহা চোর না আসুক একটা গুণ্ডা বদমাসগোছের লোকও তো ঢুকে পড়তে পারে? একতলা বাড়ি, একলা তুমি মেয়েমানুষ, একটু সাবধানে থাকতে হয়। একে তো তোমার গায়ে মাথায় কাপড়ের ঠিক থাকে না। রাস্তা দিয়ে কত রকমেরই লোক যায়—"

"তুমি থামো তো! বাড়ির ভেতর বোরখা পরে বেড়াব এবার থেকে। অফিস থেকে বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই ভাগবত গীতা আরম্ভ হল।"

এক ধমকে স্বামীকে থামিয়ে দিয়েছে অনুভা।

শুধু কি এই?

সংসারে কত রকম লোকের কত রকম বাতিকই না আছে?

কিন্তু এই অতি-চরিত্রবান স্বামীর, অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণতার জ্বালায় এক এক সময় গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয় অনুভার।

জানলার পর্দা হাওয়ায় একটু এদিক-ওদিক হলে রক্ষে নেই। তৎক্ষণাৎ দুধারে দুটো ক্লিপ এঁটে তবে স্বস্তি অনুপমের। তাও আবার ফ্যাশান-দুরস্ত পাতলা নেটের হলে চলবে না। বেশ মোটাসোটা ছাপার, বাইরে থেকে যেন অনুভার ছায়া মূর্তিটিও কারো নজরে না পড়ে।

সিনেমা-থিয়েটার, দোকান-বাজার, বাপের বাড়ি?

না এখানেও স্বাধীনতা নেই অনুভার। অনুপম নিজেই সঙ্গে নিয়ে যাবে। নিতান্ত না পারলে বছর নয়েকের ছেলেটা সঙ্গে থাকবে। নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব খুব কম। অনুভা সেখানে প্রায় অসূর্যম্পশ্যা। দুটি ছেলে-মেয়ের মা হলে কি হবে, অনুপমের কাছে অনুভা ছেলেমানুষ। মেয়েমানুষ, যাদের বারো হাতে কাছা নেই। স্ত্রী-স্বাধীনতাও পছন্দ করে না। একেবারেই না।

বন্ধুরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করে। "সুন্দরী বৌ যেন কারু হয় না। হারেমে বন্ধ করে রেখেছে দেখছি। তুমি বাপু একেবারে চূড়ান্ত স্ত্রৈণ।"

অনুপম হাসে। স্পষ্ট জবাব দেয়, "পরের বৌ-এর চেয়ে নিজের সুন্দরী বৌ-এর স্ত্রৈণ স্বামী হওয়া ঢের ভালো।"

এক এক সময় অনুভাও রেগে যায়। "ও বাড়ির বিপিনবাবুর মত একটা কেলে মোটা হোৎকা বৌ বিয়ে করলেই পারতে। কেউ ফিরে তাকাত না। তা নয়, একবার দেখেই তো অজ্ঞান। ঘটক লাগিয়ে হাতে-পায়ে ধরে সেধে বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন তখন শুনি? দিন-রাত যদি টিকটিক্ করবে?

অনুপম কিন্তু মুখে যাই বলুক, বৌ রেগে গেলে একেবারে জল। তরতর করে নেমে যায় টেম্পারেচার। "আহা রাগ কর কেন? যা বলি ভালর জন্যেই বলি।"

"থাক থাক ঢের হয়েছে! আর ভালো দিয়ে কাজ নেই আমার।"

তবে রাগ করুক আর যাই করুক, শিক্ষিত সুদর্শন, মস্ত চাকরে অনুপমের স্বভাবচরিত্রের তুলনা হয় না। গঙ্গা-জলে ধোয়া বিল্বপত্রের মত। এজন্যে অনুভার মনে মনে একটু গৌরব আছে বইকি? এমন স্বভাবচরিত্র কটা পুরুষের হয়?

এ হেন বাতিকগ্রস্ত স্বামীর চিৎকারে ময়দামাখা হাতেই অগত্যা ছুটে আসতে হয় অনুভাকে। খবরের কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা অনুপম উত্তেজিতভাবে মুখ তোলে; কাগজটা ঠেলে দেয় স্ত্রীর দিকে। "দ্যাখো, ভাল করে পড়ে দ্যাখো; আমি মন্দ, আমি টিকটিক করি, আমি হেন-তেন কত কি! হল তো এবার?"

আইন-আদালতের খোলা পাতাটা চোখে পড়তেই ক্রুদ্ধ বিরক্ত অনুভা রান্নাঘরে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। "সাত সকালে কাজের তাড়ার সময় তোমার ঐ আইন-আদালতের কেচ্ছা আমার ভাল লাগে না। এত খবর কাগজে থাকে, তোমার নজর যত খারাপ খবরভর্তি ঐ পাতাটায়। কথায় বলে না, স্বভাব যায় না মলে, তোমার হয়েছে তাই।"

অনুভার রাগটা অকারণ নয়। অনুপম সকাল বেলায় কাগজ খুললেই ঐ বিশেষ পাতাটা আগে পড়বে। মুখ-রোচক খবর পেলেই অনুভাকে ডেকে ডেকে না-শোনানো পর্যন্ত নিস্তার নেই ওর। কার বৌ ঘর ছেড়ে পালালো। কোন ভাড়াটে বাড়িওলার মেয়েকে কি করলো, কোন প্রাইভেট টিউটর ছাত্রীর ব্যর্থ প্রেমে আর মুখে অ্যাসিড ছুঁড়লো, অনুভাকে সতর্ক করার জন্যে লেকচার দেবে; আপ্রাণ চেষ্টায় বোঝাবে।

অনুপম এবার খবরটায় আঙুল দিয়ে বেশ খুশি খুশি মুখ তুললো। "খবরটা না দেখে চলে যাচ্ছ কেন গো? পরের নয়, এটা ঘরের খবর। তোমার দূর-সম্পর্কের সেই বোন নাকি প্রাণের বন্ধু, ইন্দুপ্রতাপবাবুর সঙ্গে ডাইভোর্স স্যুট এনেছে। ভাল করে পড়েই দেখ।"

এবার থমকে দাঁড়ালো অনুভা। "ইন্দু—আমাদের ইন্দু? কি করেছে—?"

কাগজটা টেনে নিল ব্যগ্রভাবে। ভুরু কোঁচকাল।

নেই। স্বভাব ভাল নয়, তখনই বুঝেছি। এতো হবেই। জানা কথা।"

কাগজ ছুঁড়ে ফেলে অনুভা তীক্ষ্ম কণ্ঠে বিদ্রূপের তীর ছুঁড়লো, "তুমিও তো কম গড়িয়ে পড়নি তখন ওর গায়ে। ইন্দু বলতে অজ্ঞান। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আগে ইন্দুর খবর। কনে বলে না হয় মুখ বন্ধ করে ছিলাম, চোখের মাথা তো আর খাইনি তা বলে?"

ধমক খেয়ে অনুপমের মুখ শুকিয়ে গেল। "আহা কি যে বল? আমি আবার কি করলাম? ছোট শালী সম্পর্কে, তোমার প্রাণের বন্ধু, গায়ে পড়ে গল্প-গুজব করতে আসে, তাই—"

স্বামী সম্বন্ধে নিজের কথাগুলো একেবারে নির্জলা মিথ্যে। তাই

"ইন্দু—আমাদের ইন্দু? কি করেছে?"

নিজের আবিষ্কারে অনুপম উল্লসিত। "আমাদের বাসর ঘরে কি বেহায়াপনাই না করছিল মেয়েটা, মনে নেই তোমার? হলামই বা বর, একটা অপরিচিত পুরুষমানুষ তো বটে? হৈ হুল্লোড়, একটু লজ্জাসরম পর্যন্ত

অনুভার গলায় তেমন জোর ফুটল না। কিন্তু তা বলে হার মানাও তো চলে না। "না কিছুই করনি। ভারী সাধু-পুরুষ আমার!"

কথাটা শেষ না করেই অনুভা রান্না-ঘর মুখো পিছন ফিরল।

অনুপম, অনুভার কান পর্যন্ত

পেণছয়, এমন গলায় আবার বললে, 'আমি তেমন পুরুষ নই বুঝলে? হতাম প্রতাপবাবু, বেলেল্লাপনা দুদিনে ঘুচিয়ে দিতাম। আমাকে টলায়, এমন মেয়ে জন্মায়নি। ওসব খারাপ মেয়ে আমি খুব চিনি। একশো হাত তফাতে থাকি। বুঝলে?"

খবরটা যদি শুধু খবরই হত? ল্যাঠা চুকে যেত। অনুভার বিবাহিত জীবনে লতায়পাতায়জড়ানো সম্পর্কের বোন, তার চেয়েও বেশী কুমারী-কালের প্রাণের বন্ধুর স্বামী-ত্যাগের খবরটা পুকুরে ঢিল ছোঁড়ার মত কতকগুলো তরঙ্গ-বলয় সৃষ্টি করে এক সময় না এক সময় নিস্তরঙ্গ হত।

কিন্তু তা আর হল কই?

মাত্র কয়েকটা দিন পরেই ঘটলো ব্যাপারটা।

শনিবারের ভরদুপুরে। দরজায় তালাচাবি নেই। দেখেও দেখল না। লেটার বক্স থেকে অনুভার নামে আসা চিঠিখানা খুলে পড়ে দুচোখ কপালে তুলে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে এসে ঢুকলে অনুপম। জানলার পর্দা খানিকটা সরে গেছে হাওয়ায়। খাটের উপর এলোমেলো শাড়িতে শুয়ে আছে অনুভা। তাও নজরে পড়ল না আজ। স্কুল ছুটির পর ছেলেমেয়ে দুটো মহানন্দে ওঘরে আচার চুরি করে খাচ্ছে। সুতরাং গলাটাও চাপা রইল না। আধ-ঘুমন্ত অনুভার কাছে গিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলো: "নাও এবার ঠেলা সামলাও। যতো সব ঝামেলা।"

"আঃ জ্বালাতন কর না। একটু ঘুমোতে দাও তো।"

স্বামীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে যেন এক কলসী বরফ জল ঢেলে দিল অনুভা। সদ্য ঘুমভাঙা ফোলা-ফোলা চোখে একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে ফের পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বন্ধ করলো।

"ওগো চোখ খুলে তাকাও। এই নাও তোমার চিঠি। গুণধরী বন্ধুটি আসছেন যে এখানে—"

এ-কথার পর আর শুয়ে থাকা গেল না। অনুভা উঠে বসে চিঠিখানা পড়তে শুরু করলো।

অফিসের 'ধরাচুড়ো'গুলো খুলতে খুলতে সমানে বকবক করতে লাগলো অনুপম। "স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, ও-সব নষ্ট মেয়েমানুষের জায়গা এখানে হবে না। স্বামী স্ত্রী! কোথায় না ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে থাকে? স্বামী ত্যাগ করে বাহাদুরি করা হচ্ছে। এসব মেয়ে-মানুষকে প্রশ্রয় দিলে দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে যাবে। এখুনি একটা চিঠি লিখে ওকে বারণ করে দাও এখানে আসতে।"

"তোমার যেমন কথা! তাই আবার লোকে পারে নাকি?" অনুভার গলায় তেমন জোর নেই এখন। "তাছাড়া চক্ষু-লজ্জা বলে তো একটা কথা আছে? শুধু বন্ধু হলেও বা হত। সম্পর্কও তো একটা আছে।"

"ওর লজ্জা নেই, যত চক্ষুলজ্জা তোমার? দপ করে জ্বলে উঠলো অনুপম। "তবু যদি না ওর সব কীর্তি-কাহিনী কানে আসত। সাধে কি আর ভদ্রলোক দূর করে দিয়েছেন? ও সব পাপ জেনে-শুনে আমি ঘরে ঢোকাব না। তুমি না পার আমিই লিখে দিচ্ছি—"

সত্য সত্যই কলম প্যাড বার করে অনুপম চিঠি লিখতে বসলো তখনই।

"ছি ছি।" লজ্জায় সঙ্কোচে অনুভা স্বামীর হাত চেপে ধরলো। "লক্ষ্মীটি: মাথা গরম কর না। তুমি চিঠি লিখলে আমার মুখখানা কোথায় থাকবে বল তো? অত করে লিখেছে, আসুক না কদিনের জন্যে। চিরকাল তো আর থাকবে না। তেমন বেচাল দেখলে ভালভাবে বিদেয় করে দিলেই হবে।"

কিন্তু বেচাল বলে বেচাল?

ইন্দিরা যেন একটা ঝড়ের মতন এলো, এ-বাড়ির সব আইন-কানুন ভাঙবার জন্যে। সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে।

অনুপমের ঘৃণাকে বিন্দুমাত্র গায়ে না মেখে।

লজ্জা-সঙ্কোচের বালাই নেই এমন মেয়েমানুষ কে কবে দেখেছে? কেশে-বেশে, কথাবার্তায়, হাসিতে ইন্দিরা যেন সর্বদা গলে গলে পড়ছে। শান্ত-শিষ্ট গম্ভীর অনুভার একেবারে উল্টো।

ওর উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে পথের

লোক চমকে উঠেছে। পাশের ঘরে শিউরে উঠেছে অনুপম। অফিসের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। ভুল হয়ে গিয়েছে জরুরী কাজগুলো সারতে।

নিজে তো উচ্ছন্নে গেছেই, অনুপমের শাসনে-সংযমে মনের-মত করে-গড়া অনুভাকেও সেই পথে যেতে তালিম দিচ্ছে অনবরত। দুটো দিন না যেতেই।

"মাগো! এই বয়সেই বুড়ী হয়ে গেছিস দেখি। হ্যাঁরে অনু, এ কি ব্লাউজের প্যাটার্ণ? কাপড়পড়ার ছিরিই বা কি তোর? না না বাপু। এ যুগে এসব অচল। দাঁড়া। আজই তোর একটি ব্যবস্থা করছি। মুখুজ্যেমশাই তোকে একেবারে হাতের পুতুলটি করে রেখেছেন। কেন? তোর একটা আলাদা সত্তা নেই? পছন্দ-অপছন্দ নেই? একটু শক্ত হতো অনু।"

অনুপমের দুই কানে ইন্দিরা যেন গলিত ধাতু ঢালছে একটু একটু করে।

সোজাসুজি টেবিলের ফাইলে মাথা গুঁজে থাকা—অনুপমের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। "মুখুজ্যেমশাই, চোখ তুলে তাকানই না একবার পোড়ারমুখির দিকে। এত হেনস্থা? দেখুন তো, একেবারে হতকুচ্ছিত নই কিন্তু।"

ওর কথায়, গা-জ্বালানো হাসিতে বুকের রক্ত চলকে উঠেছে অনুপমের। অনুপম যে একটা শক্ত সমর্থ পুরুষ-মানুষ, এ জ্ঞানটাও যেন হারিয়ে বসেছে স্বামীত্যাগিনী বেহায়া মেয়েটা। মনে মনে দূর করলেও মুখে হাসি ফোটাতে হয়েছে জোর করে। সব কথা মুখে বলা যায় না, কিন্তু অনুমান করে নিতেও কি পারে না ইন্দু ওর হাব-ভাব দেখে?

কিন্তু কে জানে এটা ওর কিসের ভূমিকা? কি মতলব করে এসেছে? ভালমানুষ অনুভাকে কোন ফাঁদে জড়াবে। কি মন্ত্র কানে দেবে?

কবির সার্থক উপমা-দেওয়া ফুটন্ত পদ্মের মত মুখখানার দিকে তাকিয়ে অনুপম বলে, "তোমার মুখের দিকে তাকাতে বুকের জোর কমে আসে ইন্দু। ভয় করে।"

"ভয়? ওমা আমি বাঘ না ভাল্লুক? তা ছাড়া আমি তো আর অনুর মত কারো কেনা সম্পত্তি নই যে অপরে তাকালেই ক্ষয়ে যাবো।"

হাসির দমকে ইন্দু যেন অনুপমের গায়ের উপরই গড়িয়ে পড়তে চায়। "ও অনু, তোর সেকেলে বরটা কি বলে রে?"

আশ্চর্য, ইন্দুর এই চরম বেহায়াপনায় অনুভা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না। সর্বদা সব ব্যাপারেই ও যেন ইন্দুর পক্ষে। ওঘর থেকে জোরে জোরেই উত্তর দেয় ইন্দুর কথায়, "তুই-ই দ্যাখ ইন্দু, কেমন মানুষ নিয়ে আমি ঘর করি।"

বিহ্বল অনুপম দুরন্ত বাতাসে-দোলানো এক গুচ্ছ সবুজ শ্যামল ধানের মঞ্জরীর মত ইন্দুর হাসিতে উচ্ছল দেহ-বল্লরীর দিকে তাকিয়ে থাকে বিমূঢ়ের মত। গৃহত্যাগিনী সর্বনাশিনী নিজে ডুবেছে, এবার অনুভাকেও বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এমন করে। কিন্তু না, তা কিছুতেই হতে দেবে না অনুপম। প্রাণের চেয়েও প্রিয় অনুভাকে বাঁচাতেই হবে এর হাত থেকে। এর প্রভাব থেকে।

"এই তো, বেশ তাকিয়ে আছেন দেখছি। এবার মুখদেখার দর্শনী দিন। অমনি অমনি হবে না। ঠাট্টা নয় মুখুজ্যে-মশাই, টাকা দিন তো কিছু।"

কাকে টাকা, কেন টাকা, কিসের জন্যে মুখাগ্রে এলেও উচ্চারণ করতে ভুলে যায় অনুপম। নিয়তির হাতের পুতুলের মত, ইন্দুর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করার মত আলমারি খুলে টাকা বার করে দেয়।

চব্বিশ ঘণ্টাও কাটে না। সে টাকার সদ্‌গতি দেখে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হয়। রঙিন রঙিন কত কি সব বাহারের শাড়ি, আধুনিক ডিজাইনের ব্লাউজ, বডিস্ এসেছে; অনুভাকে নিজের মনের মতন করে সাজাচ্ছে ইন্দিরা।

এতেই যদি শেষ হত! যা করে করুক ঘরের মধ্যে। কিন্তু অনুপমের বুঝি আর নিস্তার নেই।

"রাত-দিন ঘরের মধ্যে কি ঘর-সংসার হাঁড়িকুড়ি হেঁসেল নিয়ে বসে থাকিস বল তো অনু? সন্ধ্যাবেলায় আবার কেউ বাড়ি বসে থাকে নাকি? চল সিনেমায় যাই দুজনে।"

"ও বাব্বা!" অনু আঁতকে উঠেছে। "সঙ্গে পুরুষমানুষ নেই, দুটো মেয়ে জলজ্যান্ত একলা একলা সিনেমায় যাবো কিরে? ফিরে এলে বাড়িতে ঢুকতে দিলে তো।"

গৃহকর্তার উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, তাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে হেসে অস্থির হয়েছে ইন্দিরা। "মগের মুল্লুক আর কি! এত ভয়ও করিস তুই অনু মুখুজ্যেমশাইকে? পুরুষেরা ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়ালে দোষ হয় না, যত দোষ বুঝি মেয়েদের বেলায়? দেখবেন মুখুজ্যেমশাই, রাগ করে যেন সত্যি-সত্যি আবার দরজা বন্ধ করে রাখবেন না—"

শেষের কথাটা অবশ্য অনুপমের উদ্দেশেই বলা। তারপর তার চোখের সামনে দিয়েই অনুকে নিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে চলে গেছে ইন্দু, বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করেই।

একদিন নয়। প্রায় প্রত্যেক দিন। অনুপমের জলদগম্ভীর মুখ, ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই। সিনেমা, থিয়েটার, মার্কেটিং, এখানে-ওখানে।

কি সাহস! কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে অনুভার এই অল্প কদিনের মধ্যেই? এতদিন যেন এর জন্যেই বসে ছিল! সুযোগ পেয়ে স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে। নারীচরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়। স্বভাব বদলাতে এতটুকু দেরী হয় না?

আড়ালে-আবডালে অনুপমের অনুনয়-বিনয়, উপদেশ-শাসনে, কোন ফলই হয় না। বাড়াবাড়ি করলে আজকাল আর এক ফ্যাসাদ। সটান বন্ধুর কাছে গিয়ে শুয়ে পড়বে রাত্রে। এমুখো হবে না। অর্ধেক রাত ধরে গল্প-গুজব চলবে দুজনে মিলে। জোরে জোরে। ওকে শুনিয়ে-শুনিয়ে।

আর এঘরে ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে দুটোর পাশে শুয়ে অনুপম অসহায় ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষবে।

সন্দেহ হয়, ছেলেমেয়ের উপরও বোধ হয় আর অনুভার আগের মত টান নেই। একদিন যাদের এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে চাইত না, আজকাল ইন্দুর পাল্লায় পড়ে স্বচ্ছন্দে ওদের ফেলে রেখে ওর সঙ্গে বাইরে বাইরে কাটিয়ে আসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এ বিষয়ে কোন কথা বললেই ইন্দুই অনুভার পক্ষ নিয়ে নিজের তীক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে ধূলিসাৎ করে দেয় অনুপমকে। "ওরা কি অনুর একলার? আপনার বুঝি দায়িত্ব নেই কোনো? আপনি ঘরকুনো মানুষ, ঘরেই তো রইলেন, ওদেরও তো পড়াশোনো আছে, না হয় দেখলেনই খানিকক্ষণ।

বদলে গেছে অনুভা। এই কদিনের মধ্যে অনুপমের কাছ থেকে ওকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে ইন্দিরা।

বন্ধুবান্ধবমহলেও বেশ একটু সাড়া পড়ে গেছে। মাঝে-মাঝে অনুভাকে

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ফাংশনে, একজি-বিশনে, নিউ মার্কেটে, এমনকি ইন্দুর সঙ্গে রেস্টুরেন্টে। আধুনিক সাজ-পোষাকে। এমন সুন্দরী বৌকে কি করে এতকাল ঘরে আটকে রেখেছিল অনুপম, তাই নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে অতিষ্ঠ করে তুলেছে তাকে অফিসে।

ইন্দিরাকে এবার সত্যসত্যই ভয় পেতে শুরু করলো অনুপম। অনুভাকে হারানোর ভয়। অনুপমের প্রতি এ যেন ইন্দুর চ্যালেঞ্জ। আমি শুধু মন্দ নই, চেয়ে দেখ, তোমার অত আদরের পুতুল, যাকে ওঠ-বোস করাতে প্রতি কথায়, সেও আজ কোথায় চলেছে! ইন্দু যেন পাকে-প্রকারে এই কথাটাই বোঝাতে চায় অনুপমকে।

শক্ত হয়ে ওঠে অনুপম। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। ঐ চরিত্রহীন খারাপ মেয়েটা অনুপমের হাতেগড়া সুখের আর শান্তির সংসারটা তচনচ করে দিচ্ছে। ওরই সঙ্গদোষে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে অনুভার। উচ্ছেদ করতেই হবে এই বিষাক্ত শিকড়টাকে। সমূলে অতি দ্রুত। না হলে সব রসাতলে যাবে। অনুপম আর অনুভার জীবন নিয়ে ওকে ছিনিমিনি খেলতে দেবে না সে। ওই সম্ভ্রমহীনা মেয়েটাকে।

ইন্দিরার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ একচোট ঝগড়াই হয়ে গেল সেদিন।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে অনুপম গলা চড়ালো, "ও আপদ কবে বিদেয় হবে শুনি? অনেক সহ্য করেছি এতদিন ধরে, কিন্তু সব জিনিসের একটা সীমা আছে। যা খুশী তাই করবে আমার চোখের সামনে, এ আমি হতে দেব না।"

বিরক্ত গলায় অনুভা সমানে জবাব দিল, "মাত্রা রেখে কথা বল। বিয়ের পর থেকে খাঁচায় পোরা পাখির মত ঘর-সংসারে পুরে রেখেছ। না সাধ না আহ্লাদ, কোনটা কোনদিন তুমি মিটিয়েছ? কোনদিন মুখ ফুটে কিছু বলিনি। আজ ওর সঙ্গে যদি একটু সিনেমায় কি গান শুনতে যাই, তা হলেই কি যা-খুশী তাই করা হল? পুরুষ জাতটাই এই রকম। ইন্দু মিথ্যে বলে না দেখছি। যেখানেই যাই তোমার সংসার-ধর্ম বজায় রেখে তবেই যাই। ইন্দু কবে যাবে না যাবে, তুমি বাড়ির কর্তা, তুমিই ওকে জিজ্ঞাসা কর। তোমার বাড়ি চির-কাল ও থাকতে আসেনি।"

তীব্র দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো অনুপম। সেই শান্ত, অতি নিরীহ গোবেচারা অনুভার ঔদ্ধত্য আর স্পর্ধা দেখে ও যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ধরতে চেষ্টা করলো ওর মুখের সেই চেনা চিরপরিচিত রেখাগুলোর অদল-বদল। বুঝতে চেষ্টা করলো সেই সাংঘাতিক শয়তানী মাকড়সাটার জালের শক্ত সুতোয় কতটা জড়িয়েছে অনুভা নিজেকে।

চাপা গলায় গর্জন করে উঠলো। "আর একটা দিনও নয়। যা সর্বনাশ করার ও তা করেছে। বন্ধু-বান্ধব মহলে ওকে নিয়ে যথেষ্ট কানাঘুষা চলছে। জীবনে যা কখনো শুনিনি, কল্পনাও করিনি, আজ তাও শুনতে হচ্ছে ওর সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে। ছি ছি! তুমি না পারো, আমিই বলবো। ওর মত মেয়ের থাকবার জায়গার অভাব হবে না সংসারে। নিজের স্বামীকে যে মেয়ে এতদিন ঘর করার পর ছাড়তে পেরেছে, সে মেয়ে সব পারে।"

কিন্তু রাগের মাথায় 'বলবো' বললেই কি আর ঠাণ্ডা মাথায় একটা মানুষকে চলে যেতে বলতে পারা যায়?

আর সে মানুষটা যদি অসহায় একটা সুন্দরী যুবতী মেয়ে হয়? কোনো চুলোয় তার যাবার জায়গা না থাকে?

এত বড় কঠিন কাজ কে কবে পেরেছে?

কেন অনুপমের ওর প্রতি এত প্রচণ্ড ঘৃণা-বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও ওকে দেখলে বুকটা দুরু-দুরু করে ওঠে? ওর হাসি-খুশীভরা ঢলঢলে মুখের দিকে তাকিয়ে জিভ শুকিয়ে যায়?

কিন্তু ঈশ্বর দয়া করলেন অনু-পমকে। রঙ্গবার, চলে যাবার কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার একটা ভয়ঙ্কর সুযোগ দয়া করে জুটিয়ে দিলেন মাত্র কয়েকটা দিন পরেই।

হঠাৎ কি কারণে অফিস ছুটি হয়ে গেছে দুপুরবেলাতেই। ইন্দু আসার পর থেকে এ বাড়ির দরজায় তালাচাবি দূরে থাক, খিল দেবার পাটটাও বুঝি উঠে গেছে। ভেজানো দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে বেশ একটু অবাক হয়ে গেল অনুপম। এই ভরদুপুরবেলাতেই অনুভা রান্নাঘরে কি সব রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে।

ঘরে একা বসে আছে ইন্দু। অসংবৃত বেশ-বাস। রুক্ষ চুল উড়ছে চোখে-মুখে। সামনে খোলা সুটকেস। শাড়ি-জামা গুছিয়ে তুলছে একটা একটা করে।

অনুপম দাঁড়ালো। এত বড় সুযোগ যখন পাওয়া গেছে কথাটা পাড়াই যাক। বাক্স গোছানোর কথা থেকেই আসল লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে শেষ পর্যন্ত।

"কি ব্যাপার ইন্দু? এত ব্যস্ত যে যে? সুটকেস গোছ-গাছ করছো? কোথাও যাবে নাকি?"

অনুপমের গলার ব্যঙ্গের সুর চাপা রইল না। তার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত হাসি হাসলো ইন্দিরা। "হ্যাঁ মুখুজ্যে-মশাই, এ আপদ বিদায় হচ্ছে এতদিনে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন এবার। খুব জ্বালিয়ে গেলাম আপনাকে। জীবনেও ভুলতে পারবেন না।"

"তার মানে?" বজ্রাহতের মত চমকে উঠলো অনুপম। ইন্দিরার কথার এক-বর্ণও ও যেন বুঝতে পারেনি।

"তার মানে আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই চলে যাচ্ছি।" হেসে উঠলো ইন্দিরা অনুপমের দিকে কটাক্ষের তীর ছুঁড়ে।

"এবার বুঝতে পারলেন তো সোজা কথাটা? এতবড় সুখবরটা যাবার আগে নিজের মুখে আপনাকে বলবো বলে অনুকে আপনাকে বলতে বারণ করে দিয়েছিলাম। টিকিট কাটাও হয়ে গেছে।'

ইন্দু চলে যাবে! টিকিট কাটাও হয়ে গেছে!

হঠাৎ যেন সমস্ত পৃথিবীটা দুলে উঠলো চোখের সামনে। রাশি রাশি অন্ধ-কারের স্রোতে কোথাও তলিয়ে যাচ্ছে অনুপম?

"যাক্ বাবা। ঘাড় ধাক্কাটা আর খেতে হল না। আর কিছুদিন থাকলেই ওটা খেতে হত। মানে-মানে বিদায় নিচ্ছি। না মুখুজ্যেমশাই? সত্যি-সত্যি এখানে থাকতে আমি আসিনি।'

সমস্ত শরীর অশক্ত অবশ হয়ে এসেছে। বুকের মধ্যে শূন্যতার প্রচণ্ড যন্ত্রণা। দেহের ভার বইতে যেন বড় কষ্ট হচ্ছে। কম্পিত হাতে শক্ত করে দরজাটা চেপে ধরলো অনুপম। "কোথায় যাচ্ছ?"

'জামসেদপুরের মাসিমার বাড়ি। ওখানেই থাকব এখন। যতদিন না তাড়িয়ে দেন উনিও—" প্রগলভা আবার হেসে উঠলো।

গলা শুকিয়ে গেছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তবু কার অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল অনুপম?

"তোমাকে ধরে রাখার মত ক্ষমতা আমার হয়ত নেই, তবু—তবু তুমি কি এখানে থাকতে পার না ইন্দু?"

"কি বলছেন আপনি মুখুজ্যে-মশাই?" হাতের কাজ স্থগিত রেখে ইন্দু তার দুই আশ্চর্য গভীর চোখ তুলে তাকালো অনুপমের চোখের দিকে।

আর সেই চোখে চোখ পড়তেই ওর সামনে থেকে চলে যাবার আগে নিজের বিবর্ণ পাণ্ডুর রক্ত-সরে-যাওয়া মুখখানা দুহাতে ঢাকতে ঢাকতে, বিশ্বাসঘাতক মনকে শত-সহস্রবার ধিক্কার দিতে দিতে অনুপম আবার কার আহত ক্ষতবিক্ষত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

"ইন্দু তুমি চলে যেও না। তুমি কোথা-ও যেও না ইন্দু!"

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যথেচ্ছাচার, দুর্নীতি আর পাশবিকতার পঙ্কিল আবর্তে ডুবে গেছে গোটা শহরটা। সেই সব ভয়ঙ্কর বাস্তব কাহিনী প'ড়ে বারবার শিউরে উঠেছে পাঠকের দল। উইলিয়াম ফকনারের কল্পনাপ্রসূত এই জনপদটির নাম ইয়কনা পাটাওকা কাউন্টি। তিনি তাঁর একাধিক উপন্যাসে এই কাল্পনিক নগরের অধিবাসীদের নিয়ে বিচিত্র ঘটনা আর চরিত্রের জাল বুনেছেন।

ফকনারের লেখনীর প্রচণ্ড শক্তি পাঠকদের মনে বিষম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তারা মনে করেছে, দক্ষিণ আমেরিকার মানুষ আর জনপদগুলি বুঝি এমনি জঘন্য জীবনাবর্তে পঙ্কিল। এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে অনেক সমালোচক ফকনারের রচনার বিরুদ্ধে এক সময় প্রবল জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, শক্তির অপব্যবহার করে ফকনার অযথা মানুষের জীবনযাত্রাকে বিকৃত এবং বীভৎস করে অঙ্কিত করেছেন, তাঁর রচনার মধ্যে আন্তরিকতা নেই, আছে চমক লাগাবার কৌশল।

১৯৫০ সালে যখন তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তখন আমেরিকার অগ্রণী সংবাদপত্র নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয়েছিল : "ফকনারের দৃষ্টি এমন একটি সমাজের দিকে নিবদ্ধ যার কোন সদ্‌গুণ নেই, যে-সমাজ পাপে আর লালসায় ক্লেদাক্ত, অবনতির শেষ ধাপে নেমে গিয়ে যে-সমাজ শুধু বিষ ছড়ায়, যার সর্বাঙ্গে শুধু দুরারোগ্য ক্ষতের চিহ্ন। আমেরিকায়, ইয়োরোপে বিশেষ করে ফরাসী দেশে ফকনারের লেখার অভূতপূর্ব চাহিদা আছে। আমেরিকার অধিবাসীদের এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা অসঙ্গত হবে যে, ওই সব দেশের পাঠক-সমাজ বা যে বিচারক-মণ্ডলী তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছেন তাঁরা ফকনারের বিকৃতরুচিসম্পন্ন চরিত্রগুলিকে আমেরিকার জীবনযাত্রার যথার্থ চিত্র বলে মনে করেন। তা মনে করে যদি তাঁরা ফকনারের লেখার তারিফ করেন তাহলে মস্ত ভুল করা হবে। নিজের প্রখর কল্পনাশক্তির সাহায্যে ফকনার যে নাগরিক জীবনের কুৎসিত বাস্তবচিত্র গ্রন্থন করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের

কোন স্থানেই তেমনধারা জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন নরনারীর সন্ধান পাওয়া যাবে না। অবশ্য উইলিয়াম ফকনার যে একজন অনন্যসাধারণ শক্তিধর কথাশিল্পী তা স্বীকার না করে উপায় নেই।"

নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর এই আত্মরক্ষামূলক মন্তব্যটি যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই।

তাঁর রচিত জীবন্ত বাস্তব চরিত্রগুলি পাঠকের মনে রীতিমতো ভীতির সঞ্চার করেছে। উন্মার্গগামী নিঃশেষ-বিত্ত দাক্ষিণী অভিজাত সম্প্রদায়, অতিলোভী সামাজিক জীবকুল, দক্ষিণাঞ্চলে সদ্য-আগত ক্রূর এবং কপট স্বার্থান্বেষীর দল—দক্ষিণ আমেরিকাকে কেন্দ্র করে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের এই সব চরিত্রগুলি পাঠকের মনের চারপাশে ঘুরেছে, তাদের মনে হয়েছে, চারিদিকের আবহাওয়া বুঝি সত্যিই বিষাক্ত হয়ে উঠল। ফকনারের রচনার মধ্যে আছে আগুনের উত্তাপ, বিস্ময়কর স্বচ্ছতা আর চিত্তবিভ্রমকারী নাটকীয়তা।

তাঁর সম্বন্ধে টাইম্‌স্ পত্রিকা মন্তব্য করেছিল : "ফকনার একজন বিরাট শিল্পী।"

নিজের শক্তি সম্বন্ধে লেখক কিন্তু কোনদিনই সচেতন ছিলেন না। অত্যন্ত শান্ত আর ভদ্র মানুষ ছিলেন তিনি। ছোটখাটো আকৃতি, কটা চুল, মুখের উপর একজোড়া ঘনবিস্তৃত গোঁফ আর তারই ফাঁকে সহজ স্বাভাবিক হাসি। মাথা নেড়ে বলতেন—"আমার সম্বন্ধে ওরা অতিশয়োক্তি করেছে। আমি কৃষিকর্ম করি আর অবসর সময়ে গল্প বলতে ভালবাসি।"

এক দেউলিয়া উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৯৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর এঁর জন্ম হয়। খুব সম্ভব অর্থের অভাবেই লেখাপড়া বেশীদূর এগোয়নি। স্কুলের গণ্ডী পার হবার আগেই তাঁকে রুজি-রোজগারের জন্যে বেরুতে হয়। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় সতেরো বছর বয়সে কানাডার বিমানবহরে যোগ দেন। পরে ব্রিটিশ বিমানবাহিনীতে ভর্তি হয়ে ফরাসী দেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের পর বাসভূমি মিসিসিপি শহরে ফিরে বছর দুই সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন, তারপর স্থানীয় এক ডাকঘরে পোস্টমাস্টারের কাজে নিযুক্ত হন। ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ফকনার ওই কাজেই বহাল ছিলেন। এই দু'বছর ছিল তাঁর জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাল। পরবর্তী সময়ে অন্য সব কাজ ছেড়ে তিনি যে সাহিত্যিক জীবন গ্রহণ করেছিলেন তার প্রস্তুতি হয়েছিল ঐ দু' বছরে, দীর্ঘ দু বছর ধরে তিনি চিন্তা করেছিলেন এবং সেই চিন্তাকে রূপদান করবার চেষ্টায় মোটা মোটা খাতা লেখায় লেখায় ভরিয়ে তুলেছিলেন। ১৯২৪ সালে তাঁর নিজের খরচে ছাপা প্রথম বই প্রকাশিত হয়, ছোট একখানি কবিতার বই, Marble Faun; তাঁর প্রথম উপন্যাস, Soldier's Pay এক মৃত্যুপথযাত্রী

সৈনিকের স্বপ্নভঙ্গের করুণ আলেখ্য। ১৯২৬ সালে এই উপন্যাস বাজারে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সাহিত্য-সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় শ্লেষাত্মক রচনা, Mosquitoes; ১৯২৯ সালে Sartoris। শেষোক্ত উপন্যাসে ফকনারের বাস্তব-ধর্মীতার চরম বিকাশ দেখা যায়। তারপর The Sound and Fury এবং As I Lay Dying উপন্যাস দু'খানিতে তিনি অধিকতর নির্মমভাবে সমাজের চিত্র উদ্ঘাটিত করেন। কিন্তু এই বইগুলি অর্থের দিক দিয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেনি। হতাশ এবং বিরক্ত হয়ে তিনি তখন এক কঠিন শপথ নিলেন : এমন এক বিষম ভয়াবহ উপন্যাস তিনি এবার লিখবেন যা উত্তেজনা-প্রিয় পাঠকদের অভিভূত করে দেবে। লিখলেন Sanctuary— চরিত্রবিকৃতি, পাশবিকতা আর খুনখারাবির এক উলঙ্গ চিত্র। লেখকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। কয়েক বছরের মধ্যে ওই বই-এর এগারো লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে গেল। এক আঠারো বছরের কুমারীর উপর বলাৎকারের জঘন্য কাহিনীকে অবলম্বন করে এই উপন্যাসের নানা কুটিল ঘটনা বিস্তৃতি লাভ করেছে। বইখানি দেশে-বিদেশে তুমুল আলোচনার ঝড় তুলেছিল।

তারপর কলমের মুখে রূপরঙের পরিবর্তন এলো। ফকনার তাঁর অনন্যসাধারণ মননশীলতাকে জীবনের রসসমৃদ্ধ চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত করলেন। পর পর কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হল। Light in August, Absalom, Hamlet এবং Intruder in the dust প্রকাশিত হয়ে তাঁর খ্যাতিকে শুধু সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিল। উক্ত চারখানি উপন্যাসের মধ্যে প্রথমখানিতে পাওয়া যায় এক গর্ভবতী কুমারী মেয়ের নিরুদ্দিষ্ট প্রেমিকের খোঁজে দেশদেশান্তরে ছুটে বেড়াবার মর্মন্তুদ কাহিনী; উনবিংশ শতকের এক অতিলোভী ব্যবসায়ীর পতনের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে দ্বিতীয়খানিতে; তৃতীয় উপন্যাসে একটি বংশের অভ্যুত্থানকে তিনি চিত্রিত করেছেন নানা অচিন্তাপূর্ব কাহিনী আর ঘটনার সহায়তায়; চতুর্থ উপন্যাসখানি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্যতম, রাজ-রাস্তার মাঝখানে এক নিরপরাধ নিগ্রোকে খুঁটিতে বেঁধে ঠেঙিয়ে মারবার আয়োজন করেছে সুসভ্য মার্কিন নাগরিকবৃন্দ আর সেই আয়োজনের বিরুদ্ধে লড়ছে তাদেরই এক ষোল বছরের ছেলে— উপন্যাসটির এই মর্মকথা। অপরূপ আন্তরিকতায় আর অসাধারণ জোরালো ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে।

মিসিসিপি শহরে এক একশো বছরের পুরনো অট্টালিকায় সস্ত্রীক বাস করতেন উইলিয়ম ফকনার। এস্টেল ওল্‌ড্‌হ্যাম ফ্রাংলিন নামে এক বিধবাকে তিনি ১৯২৯ সালে বিবাহ করেন। দু'জনে আদর্শ দম্পতিরূপে খ্যাত ছিলেন।

ফকনার শিকার করতে ভালবাসতেন। তুলার চাষের মস্ত বাগান আছে তাঁর, বহু লোক সেখানে কাজ করে, প্রকাণ্ড আপিস, ছোট-বড় অনেক কেরানী, সর্ব-সমেত বেশ একটা বড় ব্যাপার।

নিজের সম্বন্ধে ফকনার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতেন—"আমার মধ্যে প্রতিভা বা মনীষা আছে এমন বড় ধারণা আমার নেই। পড়াশোনাও বেশি করি না। করবার সময় পাই না। সাহিত্যের পত্রিকাও আমার কাছে বিশেষ আসে না। আমি যে-সব পত্রিকা পড়ি তাদের মধ্যে থাকে গোরু-ঘোড়ার' কথা আর শিকারের ঘটনা।"

যখন তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, তখন বিচারকদের মতামতের মধ্যে এই কথাগুলি ছিল—"আমেরিকার নবযুগের উপন্যাস-সাহিত্যে শক্তিসম্পন্ন এবং স্বাধীন চিন্তাসমৃদ্ধ অবদানের জন্য উইলিয়ম ফকনারকে এই পুরস্কার দেওয়া হল।" *

* গত ৬ই জুলাই এই বিশ্ববিশ্রুত ঔপন্যাসিক ৬৪ বছর বয়সে পরলোক-গমন করেছেন।

॥ শূন্যপূরণ ॥

ডাঃ রায়ের মৃত্যু আকস্মিক হলেও অস্বাভাবিক নয়। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল নানাভাবে দেশসেবা করে পরিণত বয়সেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। একাশী বছর ধরে এমন একজন মানুষকে আমরা আমাদের সেবক ও পরিচালক রূপে পেয়েছিলাম—সেইটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু তাঁর ওপর আমরা বড় বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম বলেই ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম, অনন্তকাল ধরে তিনি থাকবেন আমাদের মাঝে। মহাকালের এই অমোঘ আঘাত তাই এতখানি আমাদের বিচলিত করেছে, আর নিতান্ত অসহায়ের মত ভাবতে হচ্ছে আমাদের, কি হবে এর পর। পরিচ্ছন্ন বৃহত্তর কলিকাতা মহানগরীর পরিকল্পনা আর কি কার্যকরী হবে, লবনহ্রদে নূতন বসতি গড়ে তোলার স্বপ্ন আর কি সফল হবে, দীঘার সমুদ্র-সৈকত, কল্যাণী উপনগরী গঠনের কাজ আর কি অগ্রসর হবে, অব্যাহত থাকবে কি দুর্গাপুরের শৈল্পিক অগ্রগতি বা কলিকাতা-দুর্গাপুর গ্যাসগ্রীড পরি-পরিকল্পনা? এমনি অসংখ্য প্রশ্ন জেগেছে আজ বাঙালীর মনে, একটিমাত্র মানুষ পূর্ণ পরিণত বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে। এই থেকেই বোঝা যায় যে কি বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে আজ লোকনায়ক বিধানচন্দ্রের অতর্কিত তিরোধানে।

এমন শূন্যতা সহজে পূর্ণ হয় না, মহাপ্রাণ অতিমানবের শূন্যস্থান চিরকালই শূন্য থেকে যায়। কিন্তু তবুও একথা সত্য যে, কোন অবস্থাতেই জাতির অগ্রগতির প্রয়াস ব্যাহত হতে পারে না। নিরুপায় অসহায়ের মত বসতে পারে না কেউ, আর অগ্রগমন সম্ভব নয়, এই দুর্ভাগ্যই চিরস্থায়ী। জাতীয় জীবনে এ অসহায়তাবোধ গুরুতর অপরাধ। এগিয়ে চলতেই হবে আমাদের মহাজন-নির্দিষ্ট পথে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। রাজ্যের কর্ণধাররূপে আজ এমন এক ব্যক্তির কথা চিন্তা করতে হবে আমাদের যাঁর ব্যক্তিত্ব দলের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দলের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে যাঁর কল্যাণময় দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে সারা দেশ জুড়ে। শুধু দলীয় সংগঠন সুদৃঢ় করাই যাঁর কৃতিত্বের শেষ কথা নয়। মনে রাখতে হবে আমাদের যে জাতীয় জীবনে দলের স্থান গুরুত্বপূর্ণ হলেও দলই একমাত্র বা শেষ কথা নয়,

ডাঃ বিধানচন্দ্র কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা হলেও তাঁর বহুমুখী বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সে পরিচয় ছিল নিতান্তই গৌণ। তাঁর পরিচয় ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সাফল্যে, তাঁর কর্মময় জীবনের সাফল্যে। সংখ্যাতীত সমস্যা-কন্টকিত এই খণ্ডিত রাজ্যে আজ এমনই একজন মানুষের প্রয়োজন। রাজনীতির সংগে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেশের অতি সামান্য সংখ্যক লোকেরই থাকে, রাজনীতির বাইরের লোক নিয়েই দেশ। সেই কোটি কোটি মানুষ যেন আজ তাদের এই জাতীয় শোকের দিনেও এইটুকু সান্ত্বনা পাওয়ার অবকাশ পায় যে, বিধানচন্দ্র শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করামাত্রই বাঙালীর সমগ্র ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়নি।

॥ প্রফুল্লচন্দ্র সেন ॥

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর কংগ্রেস সংসদীয় দলের সহকারী নেতা ও পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘ চোদ্দ বছরের সহকর্মী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজ্যপাল কর্তৃক অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন, এবং সংবাদে প্রকাশ, স্থায়ী মুখ্যমন্ত্রীও তিনিই নিযুক্ত হবেন। কংগ্রেস দল ইতিমধ্যেই স্থির করে ফেলেছেন, দলের নেতা নির্বাচনের জন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না এবং মাত্র কয়েক মাস আগে ডাঃ রায় যেভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তা অপরিবর্তিত রাখা হবে। বলা বাহুল্য, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে যদি সত্যিই বর্তমান ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন না হয় এবং যে সকল কাজ অসমাপ্ত রেখে ডাঃ রায় পরলোকগমন করেছেন তা সমাপ্ত করার জন্য শাসকদল সর্বতোভাবে সচেষ্ট হন তবে সেইটাই হবে কর্মযোগী বিধানচন্দ্রের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন। মহাত্মাজীর অনুগত শিষ্য ও একনিষ্ঠ দেশকর্মীরূপে শ্রীপ্রফুল্ল সেনের পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা দীর্ঘদিনের। তাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অব্যাহত থাকুক দেশবাসীর এই একান্ত কামনা।

॥ স্মৃতি সংরক্ষণ ॥

কর্মযোগী বিধানচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে তা প্রশংসনীয়। 'অমৃত' সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে গঠিত স্মৃতিরক্ষা সমিতি বিধানচন্দ্রের নামে কয়েকটি মাতৃ ও শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে দেশবাসীর কাছে পঁচিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহের জন্য আবেদন জানিয়েছেন এবং কমিটি গঠিত হওয়া মাত্রই দেশের বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বদন্যতায় পাঁচ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হওয়া সম্ভব হয়েছে। বিধানচন্দ্রের প্রতি দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়েছেন তাতে মনে হয় পঁচিশ লক্ষ টাকার ভাণ্ডার পূর্ণ হতে খুব বেশী সময় লাগবে না। এই প্রসঙ্গে চলমান শক্তিমান জননায়কের নামানুসারে শিল্পনগরী দুর্গাপুরের নাম পরিবর্তিত করে বিধাননগর রাখার যে প্রস্তাব উঠেছে তাকেও আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

॥ আলজিরিয়া ॥

অবশেষে আলজিরিয়া স্বাধীন হল। এই স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে মুক্তিমূল্য দিল আলজিরিয়া, জগতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। এক শ বত্রিশ বছর আগে আলজিরিয়া অধিকার করে ফ্রান্স, এবং কোনদিন যে তারা ঐ আরব দেশটির উপর থেকে অধিকার ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যাবে একথা তারা কল্পনাতেও স্থান দিত না। শতাব্দীকাল ধরে ফ্রান্স প্রচার

করে আসছিল, আলজিরিয়া ফ্রান্সেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু ফ্রান্সের এই গায়ের জোরের কথা আলজিরিয়ার মানুষ কোন দিনই স্বীকার করেনি এবং সারা আফ্রিকার মানুষ জেগে ওঠার সংগে সংগে তারাও দাবী করে যে, ফ্রান্সকে আলজিরিয়া ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী উদ্ধত শাসকরা সে কথায় কর্ণপাত করে না, ফলে অনিবার্যভাবে সাত বছর আগে শুরু হয় এক প্রবল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। সুসজ্জিত ফরাসী সৈন্যবাহিনী ও আলজিরিয়ার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীদের বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ত্র অবস্থাতেই সংগ্রাম শুরু করে আলজিরিয়ার মুক্তিকামী আরব দেশপ্রেমিকরা। প্রবাসেই গঠিত হয় আজাদ আলজিরিয়া সরকার এবং তার নেতৃত্বে অবিশ্রান্তভাবে সংগ্রাম করে চলে আলজিরিয়ার মুক্তিফৌজ। এই সংঘর্ষের ফলে গত সাত বছরে কত ব্যক্তি যে প্রাণ হারিয়েছেন তার কোন হিসাব নেই। সরকারী হিসাবেও এ সংখ্যা দশ লক্ষাধিক, বেসরকারী হিসাবে আরও অনেক বেশী। গুপ্ত-ঘাতকের হঠাৎ আক্রমণে আলজিরিয়ার অরণ্যে ও মরু-প্রান্তরে কত মুক্তিসেনা যে সকলের অলক্ষ্যে প্রাণ হারিয়েছেন তার হিসাব করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। তবুও আলজিরিয়াবাসীরা নিরস্ত হননি বলেই এতদিনে অর্জন করলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। ১লা জুলাই আলজিরিয়ায় গৃহীত গণভোটের ফল প্রকাশিত হওয়া-মাত্রই ৩রা জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রান্স স্বীকার করে নিয়েছে আলজিরিয়ার সার্বভৌম রাষ্ট্রসত্তা এবং তারপর পৃথিবীর সবকটি বৃহৎ রাষ্ট্র একে একে ফ্রান্সের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে নিয়েছে।

তবে ইতিমধ্যেই আলজিরিয়ার অস্থায়ী সরকারের দায়িত্বশীল নেতাদের মধ্যে যে মতপার্থক্যের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা বিশেষ উদ্বেগজনক। অস্থায়ী সরকারের চীফ অফ স্টাফ কর্ণেল বো মদিয়ান প্রধানমন্ত্রী বেন খেদা কর্তৃক জাতীয় স্বার্থের হানিকর কার্য-কলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে পদচ্যুত হয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর এই কাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী বেন বেলা। তিনি অস্থায়ী সরকারের এই কাজকে সম্পূর্ণ বেআইনী বলে ঘোষণা করেছেন এবং আলজিরিয়ার স্বাধীনতাঅর্জনের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করে অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। বেন বেলা চরম-পন্থী নেতা, সমাজতন্ত্রের অনুরাগী আর বেন খেদা মধ্যপন্থী। এভিয়ান চুক্তিতে যেভাবে আলজিরিয়ায় ফরাসী স্বার্থ বজায় রাখার অন্যায় দাবী স্বীকার করা হয়েছে বেন বেলা তার বিরোধী। বেন বেলা ও বেন খেদার এই বিরোধ আলজিরিয়ার মুক্তি-মুহূর্তে যে অত্যন্ত দুঃখজনক ও ক্ষতিকর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তদুপরি উত্তর আফ্রিকার আরব দেশ-গুলিও আজ এই বিরোধের ফলে দ্বিধা-বিভক্ত। প্রধানমন্ত্রী বেন খেদা সমর্থন পাচ্ছেন তিউনিসিয়া ও মরক্কোর, সহকারী প্রধানমন্ত্রী বেন বেলার প্রধান সমর্থক সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র। এ অবস্থায় আলজিরিয়ায় ক্ষমতা হস্তা-ন্তরের অব্যবহিত পরেই যদি আবার এক ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী গৃহবিবাদ শুরু হয়ে যায় তবে সেটা বিস্ময়ের কিছু হবে না। কিন্তু তার ফলে আলজিরিয়াকে আবার যে সর্বনাশা আবর্তের মধ্যে পড়তে হবে তা থেকে তার মুক্তি খুবই কঠিন হবে।

॥ পাকিস্থানে গণবিক্ষোভ ॥

প্রায় চল্লিশ মাস ধরে সামরিক শাসন চালানোর পর আয়ুব খাঁ কিছু দিন আগে পাকিস্থানে সাংবিধানিক শাসন পুনঃপ্রবর্তন করেন ও সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেন। নিজের প্রতিষ্ঠাকে যতদূর সম্ভব নিরাপদ করে তিনি সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করেন এবং হয়ত আশা করেন যে, আর কোন কারণে না হলেও তাঁর ভয়ে অন্তত পাকিস্থানের অধিবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস করবেন না। কিন্তু সে ভুল তাঁর ভেঙেছে। সামরিক শাসন কায়েম থাকাকালে পূর্ববঙ্গের তরুণ সমাজ তাঁকে তুচ্ছ করে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েমের ও সকল রাজবন্দীর অবিলম্বে মুক্তির দাবী জানিয়ে পাকি-স্থানের সকল নাগরিকের সৈন্যশাসন-ভীতি দূর করে দিয়েছিলেন। তাই লাহোর, করাচি, পেশোয়ার, ঢাকা আজ মুখরিত হয়ে উঠেছে আয়ুবশাহীর অবসানের দাবীতে। কোন কোন সভায় লক্ষাধিক মানুষ সমবেত হয়ে দাবী জানিয়েছেন, অবিলম্বে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন পাকিস্থানে কায়েম করতে হবে, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন করে পাকিস্থানের আইনসভাগুলি গঠন করতে হবে, সকল রাজবন্দীকে বিনাসর্তে মুক্তি দিতে হবে, স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার স্বীকার করতে হবে। পূর্ব পাকিস্থানের বিধান-সভায় সরকার-বিরোধী সদস্যরা আয়ুব খাঁর মনোনীত মন্ত্রীদের এমনই পদে পদে পরাজিত করে নাজেহাল করে তোলেন যে, তার ফলে শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্থানের গভর্ণর বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। যে অবস্থা চলেছে এখন পাকিস্থানে তাতে মনে হয়, জঙ্গী-নায়ক আয়ুব খাঁকে হয় এই জনমতের কাছে নতি স্বীকার করতে হবে, নয়ত অনতিবিলম্বেই তাঁকে 'পাকিস্থান এখনও গণতান্ত্রিক শাসনের উপযোগী হয়নি' এই রকম একটা কিছু বলে পূর্ণ সামরিক শাসন পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। ক্ষমতার লালসায় জনাব আয়ুব হয়ত শেষের পথটিই বেছে নেবেন, কিন্তু তার ফলে পাকিস্থানের আন্তর্জাতিক মর্যাদা আরও কতখানি ক্ষুন্ন হবে তা হয়ত এখনও তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন না।

॥ ঘরে ॥

২৮শে জুন—১৩ই আষাঢ় ঃ মধ্যশিক্ষা (পশ্চিমবঙ্গ) পর্ষতের স্কুল ফাইন্যাল (১৯৬২) পরীক্ষার ফলাফল ঃ নিয়মিত পরীক্ষার্থী শতকরা ৪২·৮৬ জন উত্তীর্ণ; প্রথম শ্রীসিদ্ধার্থ রায় (তীর্থপতি ইনস্টিটিউশন)। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঃ নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের শতকরা ৫৮·৯ জন কৃতকার্য; প্রথম—শ্রীজয় দেব (বালীগঞ্জ সরকারী বিদ্যালয়)।

কলিকাতা মহানগরীতে মহামারী আকারে কলেরার প্রাদুর্ভাব—এই দিন অবধি বেলেঘাটা সংক্রামক হাসপাতালে ৪৫৭ জন কলেরা রোগী ভর্তি।

আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বন্যার বিধ্বংসী রূপ—রাত্রিতে আচমকা একটি গ্রাম গ্রাস—বন্যায় তেজপুরে শতাধিক লোকের সলিলসমাধি।

২৯শে জুন—১৪ই আষাঢ় ঃ কোশী ও বাগমতী নদীর প্রবল বন্যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত—সহর্ষ, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর ও মুঙ্গের জেলায় সর্বাধিক ক্ষতি।

রাজশাহী (পূর্ব পাকিস্তান) হইতে মালদহে সাঁওতাল ও রাজবংশী শরণার্থী-দলের আগমন অব্যাহত—চার দিনে প্রায় ৪ সহস্র উদ্বাস্তুর সীমান্ত অতিক্রমের সংবাদ।

৩০শে জুন—১৫ই আষাঢ় ঃ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ—হাওড়া ষ্টেশনে বিপুল সম্বর্ধনা—ষ্টেশন হইতে সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে উপস্থিত ও অসুস্থ জননেতা ডাঃ রায়ের (বিধানচন্দ্র) সঙ্গে সাক্ষাৎ।

কলেরা প্রতিরোধে মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ছয়শত নূতন নলকূপ বসাইবার সিদ্ধান্ত—কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যানদের জরুরী সম্মেলনের প্রস্তাব।

১লা জুলাই—১৬ই আষাঢ় ঃ পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, স্বনামধন্য চিকিৎসাবিদ্ 'ভারতরত্ন' ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কলিকাতাস্থ বাসভবনে লোকান্তর—৮১-তম জন্মদিবসে মহান্ জননেতার কর্মময় জীবনের অবসান—দেশের সর্বত্র গভীর শোকের ছায়াপাত—দোকানপাট, সিনেমা, খেলাধূলা প্রভৃতি বন্ধ—জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত—পশ্চিমবঙ্গে সাতদিন ব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক পালনের ব্যবস্থা।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি 'ভারতরত্ন' শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের (৮০) এলাহাবাদে জীবন-দীপ নির্বাণ।

লোকনায়ক বিধানচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে কলিকাতা হাইকোর্টের আয়োজিত শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান স্থগিত।

সরকারের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেলের যাত্রীভাড়া ও মালের মাশুল বৃদ্ধি—দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ।

২রা জুলাই—১৭ই আষাঢ় ঃ প্রিয় নেতা ডাঃ রায়ের মৃতদেহ লইয়া কলিকাতায় অভূতপূর্ব শোকযাত্রা—কেওড়াতলায় বৈদ্যুতিক চুল্লীতে দেশনায়কের নশ্বর-দেহ ভস্মীভূত—শ্মশানে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি।

'পুরুষ-সিংহ ডাঃ রায়ের শূন্যস্থান যথার্থ-পূরণ কঠিন'—কংগ্রেস সংসদীয় দলের সভায় (দিল্লী) প্রধানমন্ত্রী নেহরুর উক্তি—রাজর্ষি পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ।

বিদেশী নাগরিকদের ভারত হইতে অর্থ প্রেরণের সুযোগ হ্রাস—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন নির্দেশ।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত।

৩রা জুলাই—১৮ই আষাঢ় ঃ জলপাইগুড়ি শহর ও ডুয়ার্স এলাকায় প্রবল জলোচ্ছ্বাস—কোচবিহারেরও সদর মহকুমায় বন্যার তাণ্ডব।

রাজসাহী হইতে প্রতিদিন প্রায় তিনশত উদ্বাস্তুর মালদহে আগমন—মালদহ সফরান্তে শ্রীনেহরুর নিকট ব্যক্তি-স্বাধীনতা কমিটির নেতা শ্রীএন্ সি চ্যাটার্জির পত্র।

৪ঠা জুলাই—১৯শে আষাঢ় ঃ শিল্পনগরী দুর্গাপুরের নাম 'বিধান নগর' করার প্রস্তাব—ময়দানে বিরাট শোকসভায় পরলোকগত ডাঃ রায় 'কর্মযোগী' আখ্যায় ভূষিত—যথোপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা—রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডুকে পৃষ্ঠপোষক এবং শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও শ্রীঅতুল্য ঘোষকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করিয়া শক্তিশালী স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠিত।

ভারতের ব্যাংক কর্মচারীদের বেতন ও মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি—দেশাই ট্রাইব্যুনালের (বিচারপতি শ্রীকে টি দেশাই গঠিত) রোয়েদাদ প্রকাশ।

॥ বাইরে ॥

২৮শে জুন—১৩ই আষাঢ় ঃ বৃটেনের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চিল (৮৭) হোটেলে পড়িয়া যাইয়া গুরুতর আহত—উরুদেশের হাড় ভগ্ন।

২৯শে জুন—১৪ই আষাঢ় ঃ বৃটিশ মহিলা অভিযাত্রী দলের ২১,৫০০ ফুট উচ্চ একটি হিমালয় শিখরে আরোহণ—শিখরটির নতুন নামকরণ ঃ পিনাকল শিখর।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার দুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্য নিয়োগ।

৩০শে জুন—১৫ই আষাঢ় ঃ পশ্চিম ইরিয়ানে ইন্দোনেশীয় ছত্রী বাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযান—প্রকাশ্য দিবালোকে বহু ছত্রী সৈন্যের অবতরণ।

১লা জুলাই—১৬ই আষাঢ় ঃ আলজিরিয়ার সর্বত্র গণভোট গ্রহণ—ফ্রান্সের সহযোগিতায় স্বাধীনতার প্রস্তাবে বিপুল সমর্থন ঘোষিত।

২রা জুলাই—১৭ই আষাঢ় ঃ থাইল্যাণ্ডে প্রেরিত মার্কিন নৌ-সৈন্যদের মধ্যে এক হাজার সৈন্যকে অপসারণ—জাপান ও ফিলিপাইনের ঘাঁটিতে প্রেরণের ঘোষণা।

৩রা জুলাই—১৮ই আষাঢ় ঃ ১৩২ বৎসরব্যাপী পরাধীনতার অবসানে সংগ্রামী আলজিরিয়ার স্বাধীনতা লাভ—ফ্রান্স কর্তৃক অস্থায়ী সরকারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত—গণভোটে স্বাধীনতার পক্ষে আলজিরীয় জনগণ রায় দিয়াছেন বলিয়া দ্য গলের ঘোষণা—আলজিরিয়ার স্বাধীনতায় ভারত, রাশিয়া, বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের অভিনন্দন।

৪ঠা জুলাই—১৯শে আষাঢ় ঃ লণ্ডনে বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত সফরকারী ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই'র গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার—ইঙ্গ-ভারত আর্থিক সম্পর্ক ও 'এড ইণ্ডিয়া ক্লাবে'র সমস্যা লইয়া আলোচনা—বৈদেশিক সাহায্য না পাইলেও ভারতের 'তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ চলিবে বলিয়া শ্রীদেশাই'র উক্তি।

অভয়ঙ্কর

॥ একটি নানের কাহিনী ॥

সেফিলডের একটি ষোল বছরের মেয়ে 'নান' হয়ে শ্যামদেশে যায়, সেই অপরূপ দেশে অনেকদিন ধরে সেবাধর্ম পালন করে। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে তাকে একদিন আবার স্বদেশে ফিরে আসতে হয়, 'নান'গিরিও ত্যাগ করতে হয়, কারণ স্বদেশে ফেরার অনুমতি পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপর সেই মেয়েটি আপনাকে নার্সের কাজে শিক্ষিত করে আবার সেই দেশে ফিরে এল, যে দেশ তার দ্বিতীয় স্বদেশ। এই মেয়েটির নাম টেরেসা, আর 'Terresa of Siam' তার বিচিত্র স্মৃতি-চিত্রণ। এই হৃদয়স্পর্শী কাহিনীটি আমরা যারা ভারতীয় তাঁদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়, কারণ গ্রুপ ক্যাপ্টেন লিওনার্ড চেসায়ারের যক্ষ্মা-নিরোধী ফাউন্ডেশনের মানবিক কর্মে আত্মনিয়োগ করে টেরেসা এখন ভারতের মাটিতে সেবাধর্ম পালন করছেন। যক্ষ্মা-প্রতিরোধকল্পে তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করছেন।

আশ্চর্য মনে হতে পারে যে টেরেসা লাইটউড ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী খৃষ্টানকুলে জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর যখন আট বছর বয়স তখন বাপ-মা ক্যাথলিক মতবাদে ধর্মান্তরিত হলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে, সামাজিক ব্যবস্থা দ্রুত-পরিবর্তনশীল। বাল্যে অতিশয় শারীরিক ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে টেরেসাকে। ১৯২০-তে মাতৃবিয়োগে সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল, এমন আকস্মিক মৃত্যু একটা মানসিক বিপর্যয় সৃষ্টি করল। টেরেসা স্বীকার করেছেন যে এমন এক মনস্তাত্ত্বিক আলোড়ন সেই অসহনীয় শোক থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যাকে অস্বাভাবিক বলা চলে।

এর কিছুকাল পরেই টেরেসা কনভেন্টে আশ্রয় নেওয়া মনস্থ করলেন। লণ্ডনের একটি কনভেন্টে আবেদন পাঠালেন এবং গৃহীত হলেন। তবে লণ্ডন যাত্রা করতে ছ'মাস অপেক্ষা করতে হল, তারপর ১৯২২-এর ২৩শে মে তারিখে কনভেণ্টের প্রশস্ত উদ্যানে টেরেসা পদার্পণ করলেন।

এই কনভেন্ট প্রবেশের পনের মাস পরে তাঁকে তাঁর নবজীবনের পরিচ্ছদ দান করা হল, আর ১৯২৫-এর আগস্টে তিনি 'নান'-জীবন যাপনের শপথ গ্রহণ করলেন। 'নান'-জীবনের এক জীবন্ত চিত্র টেরেসা এঁকেছেন, কোনও রকম খেদ প্রকাশ না করে ধর্মের খাতিরে বেত্রাঘাত গ্রহণের কথাও লিখেছেন।

১৯২৮-এ সৌভাগ্যক্রমে টেরেসা এক রেভারেন্ড মাদার জেনারেলের নজরে পড়লেন, তাঁর কাছে তিনি বিদেশে মিশনারি কর্ম করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। রেভারেণ্ড মাদার রাজী হলেন এবং শ্যামদেশে কাজ করার জন্য টেরেসাকে নির্বাচন করা হল।

বিশ শতকের শ্যামদেশ এক তরুণী নানের পক্ষে এক অলৌকিক পুরী। শ্যামদেশের অর্ধ-নগ্ন রমণীদের দেখার জন্য টেরেসা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। সার্জ-পেটিকোট আর পুরা হাতা জামা-পরা টেরেসার পক্ষে এই প্রায়-নগ্ন অবস্থার অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করা কঠিন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন অপরূপ বিকাশ তিনি আর কখনও দেখেননি।

ব্যাংককের কনভেণ্ট-জীবন তাঁর কাছে মোটেই প্রীতিপদ হয়নি, যে রন্ধনকর্ম সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞানই ছিল না, তাঁর ওপর ভার পড়েছিল সেই রন্ধনশালার। টেরেসা কিন্তু সরল প্রকৃতির, নাগরিক সভ্যতা-বিরহিত থাইবাসীদের ভালোবাসতে শিখলেন। তাদের ভাষা শিখলেন, তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সবই শিখলেন। এইকালে থাই দেশে যে রাজনৈতিক আলোড়ন ও সামাজিক বিবর্তন ঘটেছে তার সঙ্গেও প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে টেরেসার।

১৯৩৯-এর জুলাই মাসে টেরেসার শরীর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠল, সুদীর্ঘ চিকিৎসা এবং নানাবিধ ডাক্তারি পরীক্ষার পর তাঁকে লণ্ডনে পাঠানো হল, আর লণ্ডনে আসার কিছু পরেই বাধলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। উইনগেট এবং করনিস উপকূলে তাঁকে এক বছর কাটাতে হল। ১৯৪১-এ যে-কনভেন্টে ষোলো বছর বয়সে প্রবেশ করেছিলেন সেইখানে আবার ফিরে এলেন।

১৯৪২-এর গ্রীষ্মকালে টেরেসার মনে এই ধর্মীয় জীবনযাপন ত্যাগ করার বাসনা উদিত হল। লণ্ডনস্থ পোপের প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি দেখা করলেন, তিনি বিশেষ সহৃদয়তার সঙ্গে সব শুনলেন। তিনি বুঝলেন এবং স্বীকার করলেন যে টেরেসার পক্ষে নানগিরি ঠিক খাপ খাচ্ছে না। টেরেসা তাঁকে জানালেন তাঁর নার্স হওয়ার মনোগত অভিপ্রায়। ১৯৪২-এর অক্টোবরের শেষের দিকে তাঁকে নানগিরির পণ থেকে মুক্ত করা হল।

প্রায় দু যুগের ছায়াচ্ছন্ন জীবন-যাপনের পর টেরেসা আবার ফিরে এল তাঁর নিজের জীবনে। সেফিলডের হাসপাতালে শিক্ষার্থিনী নার্স হিসাবে প্রবেশ করলেন টেরেসা এবং অতি অল্পকালেই দক্ষতা অর্জন করলেন। কনভেন্টে যেসব অভ্যাস মজ্জাগত হয়ে গিছল তার থেকে মুক্ত হওয়া যে কত কঠিন বুঝলেন টেরেসা। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

"জনৈকা নার্স প্রশ্ন করে—বিয়ে করছ না কেন টেরেসা ?

সরলমনে উত্তর দেন টেরেসা লাইটউড—আমার সময় কই ? অনেকদিন ধরে 'এ্যানাটমি'র পুরানো পড়া করা হচ্ছে না।

সকলে উচ্চহাস্য করে উঠল, হাসি থামার পর নার্সটি বলল—এখন কিন্তু তোমার একটি স্বামীলাভের প্রয়োজন। কাউকে সুখী করতে নিশ্চয়ই তোমার ভালো লাগবে ?

কিছু না বুঝেই টেরেসা জবাব দিলেন : একটিমাত্র প্রাণীকেই খুশী বা সুখী করতে গিয়ে আমি সময় নষ্ট করতে যাব কেন ? কতশত মানুষ পড়ে আছে, যাদের খুশী করা প্রয়োজন।" ইত্যাদি।

যুদ্ধের সময় টেরেসা রেডক্রসের নার্স হিসাবে কাজ করেছেন। কিন্তু যুদ্ধাবসানে তাঁর তত্ত্বানুসন্ধানী মন আবার সমগ্র অন্তরকে আচ্ছন্ন করে তুললো, অতিশয় বিশ্রী মনে হতে লাগল টেরেসার। ভাগ্যক্রমে ব্যাংককের সেই রেভারেণ্ড মাদার প্রথমতম ক্যাথলিক মেটারনিটি হস্পিটাল স্থাপনের উদ্দেশ্যে

টেরেসাকে থাইল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর কাছে মনের কথা জানিয়েছিলেন টেরেসা।

যে তরুণ থাই ডাক্তারটি এই হাসপাতাল পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁর নাম ডাক্তার থুলে। ছমাসের মধ্যেই টেরেসা তাঁর প্রিয় থাই শহরে ফিরে এলেন। ডাক্তার থুলের প্রায় ত্রিশ বছর বয়স, চমৎকার আকৃতি। আধাচীনা আধাথাই। যখন আয়ার্লাণ্ডে ডাক্তারী পড়তেন তখনই ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত হন, তাই ব্যাংকক কনভেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ। দুজনে মিলে চমৎকার এক মাতৃমঙ্গল সেবা সদন গড়ে তুললেন, কিন্তু চক্রান্তের ফলে দুজনকেই বেরিয়ে আসতে হল।

১৯৪৯ খৃীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ডাক্তার থুলে এবং টেরেসা ব্যাংককে সেন্ট জোসেফ মেটারনিটি হাসপাতাল এই নামে আরেকটি হাসপাতাল গঠন করলেন। জনৈক ধনী চীনা তাঁর ব্যক্তিগত হাসপাতালটি দান করলেন এই উদ্দেশ্যে। 'My Five Thousand Babies' নামাঙ্কিত পরিচ্ছেদে টেরেসা আবেগ এবং আকুলতা দিয়ে কিভাবে এই মাতৃমঙ্গল সেবা সদন গঠিত হয়েছিল তা লিখেছেন।

১৯৪৯-এর শীতকালে আইসক্রীম-বিক্রেতার স্ত্রী জনৈক চীনা রমণী হাসপাতালে যমজ শিশু প্রসব করেই মারা গেলেন। মেরী এবং জোস নামধেয়া সেই যমজ হাসপাতালেই বেড়ে ওঠে, তারপর একদিন টেরেসা তাদের দত্তক গ্রহণ করলেন।

১৯৫৪-এ টেরেসার হৃদয়ঘটিত ব্যাধির সূত্রপাত, হার্ট ট্রাবলের জন্য তাঁকে আবার ইংলণ্ডে ফিরতে হল। এইখানেই গ্রুপ ক্যাপটেন লিওনার্ড চেসায়ারের সঙ্গে পরিচয়। যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীদের জন্য তিনি আশ্রম এবং স্যানাটোরিয়ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি একটা 'ফাউণ্ডেশন' স্থাপন করেছিলেন। চেসায়ার ভারতবর্ষে নতুন যক্ষ্মা আশ্রম গঠনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, ভারতে অনেক যক্ষ্মারোগী, তারা সাহায্যের কাঙ্গাল, তাদের দেখতে হবে, বাঁচাতে হবে।

টেরেসা একরকম ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই প্রস্তাবে। গান্ধী ও নেহরুর দেশ ভারতবর্ষে আসার এবং দেখার এ এক সুবর্ণ সুযোগ। প্রথমদিকে কোদাই-কানালের একটি গ্রামে টেরেসা কাজ শুরু করেন, তারপর তাঁর কর্মজীবনের পটভূমি হল বাংলা দেশের শ্রীরামপুর।

এই শ্রীরামপুরে কাজ করার সময় পিটার ব্ল্যাকবরণের সঙ্গে টেরেসার পরিচয় ঘটলো, সেই পরিচয়ের পরিণতি ঘটলো পরিণয়ে। ১৯৫৮-এর নভেম্বরে টেরেসা আর ব্ল্যাকবরণের শুভবিবাহ ঘটে গেল। টেরেসা আর তাঁর দুই শ্যামদেশীয় যমজ এখন এক নতুন জগতে প্রবেশ করলেন, শান্তি ও সুখের এ এক প্রশান্ত পরিবেশ। টেরেসা স্বীকার করেছেন :

"With all that God has given me I should be a far, far better woman that I am...... but it can not be denied meantime that I am a far far happier woman than ever I was."

ব্রিটিশ নান টেরেসা লাইটউডের এই বিচিত্র স্মৃতিচিত্রণে আছে গভীর মানবিক স্পর্শ। নানের জীবনযাপনের মধ্যে যে শান্তির সন্ধান তিনি করেছিলেন, তা তিনি পাননি। ধর্মের কঠোর বাঁধন তাঁর মনে এতটুকু স্বস্তি আনতে পারেনি, তিনি অবশেষে পেয়েছেন শান্তির সন্ধান নির্জন গৃহকোণে, পেয়েছেন হাজার শিশুর প্রতিপালন আর সেবার রোমাঞ্চকর পরিবেশে।

উপন্যাসোপম সুন্দর কাহিনীতে এক ষোলো বছরের তরুণীর জীবনের ব্যথা ও বেদনা, আনন্দ ও আত্মোপলব্ধির ইতিহাস বিধৃত হয়েছে এই "Terresa of Siam" নামক স্মৃতিকথায়। *

---

* **TERRESA OF SIAM : By Terresa Lightwood (Cassell)**—পৃষ্ঠা ১৯০ ॥ মূল্য ষোলো শিলিং।

কবি মানসী— প্রথম খণ্ড ॥ জীবন-ভাষ্য—লেখক জগদীশ ভট্টাচার্য। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী ॥ ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ॥ দাম—বারো টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের 'কবিমানসী' রবীন্দ্রনাথের এক 'অন্তরঙ্গ' জীবনী। এই অন্তরঙ্গ কথাটি সম্ভবতঃ intimate কথাটির বঙ্গানুবাদ হিসাবে ব্যবহৃত। আমাদের দেশে আজো মনীষীদের 'intimate life-story' রচনার রেওয়াজ হয়নি, তাই জগদীশচন্দ্রের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। কবির জীবন যে এক আশ্চর্য মহাকাব্য তা তাঁর অসংখ্য কবিতা ও পত্রাবলীতেই প্রকাশিত। সেই জীবন-মহাকাব্য রূপায়ণের দুঃসাহসিক সংকল্প নিয়ে লেখক এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রথম খণ্ডে আছে জীবনভাষ্য, পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ডে আছে কাব্যভাষ্য। এই গ্রন্থে জগদীশচন্দ্র কবির বিভিন্ন উক্তি, কাব্যাংশ এবং প্রবন্ধাংশ সহযোগে এক দুরূহ চিত্রাঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছেন এবং আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করেছেন। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর ভ্রাতৃজায়া কাদম্বরী দেবীর অনুপ্রেরণা যে কিভাবে সহায়তা করেছে তার পরিচয় স্বয়ং কবি দিয়ে গেছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালিনী কাদম্বরী দেবী সম্পর্কে লিখেছেন—"a playmate and guardian angel" এবং তাঁর অকালমৃত্যু কবির অন্তরকে যেভাবে আকুল করেছিল তার বোধকরি তুলনা নেই। কৃষ্ণ কৃপালিনী তাই বলেছেন "no other loss ever had so profound an impact on his mind and genius. It did not break him, it made him." মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ঠিকমত বুঝতে হলে এই বিশ্লেষণধর্মী জীবনেতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন। যুক্তি, তথ্য এবং কবির উক্তি দিয়ে মূর্তিকারের মত কঠিন পাথর কেটে লেখক এক বিচিত্র জগৎ রচনা করেছেন। এক দিব্যজীবনের কাহিনী 'কবি মানসী'। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের মর্মোদ্ঘাটনে সহায়ক হবে এই গ্রন্থ। অতিশয় সতর্কতা এবং সশ্রদ্ধ মনোভঙ্গি দ্বারা লেখক এই আশ্চর্য গ্রন্থরচনায় সাফল্যলাভ করেছেন। তথ্যবিন্যাসে লেখক অপূর্ব সংযম ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। লেখক যেসব উপকরণ ব্যবহার করেছেন তার প্রমাণপঞ্জী দান করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের আত্মা এবং হৃদয়ের গহনে অবগাহন করেছেন লেখক আর এমন এক সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু আলোচনায় যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের প্রয়োজন তার পরিচয় দান করেছেন। লেখকের সকল ধারণা বা অনুমানের সমর্থন করা সংগত এবং সম্ভব নয়, তবু সম্ভাব্য পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং তথ্য-পরিবেশন দ্বারা তিনি

তাঁর যুক্তি পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। আকুল হৃদয়ের যে আর্তনাদ কবির বিভিন্ন রচনায় পরিস্ফুট তার উৎস-সন্ধানে লেখক অসাধারণ অধ্যবসায় প্রদর্শন করেছেন এবং সেই কারণেই এই দিব্য-জীবনকাহিনী সর্বত্র সমাদৃত হবে। এই গ্রন্থের লিখনভঙ্গি ও ভাষামাধুর্য প্রশংসনীয়। ছাপা ও বাঁধাই আশানুরূপ।

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা— (প্রবন্ধ) ডঃ অধীর দে। সৃষ্টি প্রকাশনী॥ ১৪১বি, ব্রাহ্মসমাজ রোড, কলিকাতা-৩৪॥ দাম বারো টাকা।

উনবিংশ শতকে বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি ও পরিণতি ঘটেছে। পরিণতি এই অর্থে যে সংক্ষিপ্ত প্রস্তুতিপর্বের পর বাংলা গদ্য একটা আকৃতি লাভ করেছে, বর্তমান বাংলা গদ্য সেই কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রস্তুতি ও পরিণতির মধ্যে ছিল প্রেরণা ও প্রয়াস। অতিদ্রুত বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটেছে, তাই তার সম্যক আলোচনার প্রয়োজন আছে। বাংলার গদ্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ তার প্রবন্ধ-সাহিত্যে। এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অভাব ছিল। ডঃ অধীর দে তাঁর স্নাতকোত্তর গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেছেন এই বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য। আধুনিক যুগের সূচনা অর্থাৎ উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের একটা ধারাবাহিক বিবরণ বিশ্লেষণ-সহকারে পরিবেশন করেছেন ডঃ অধীর দে। ১৮১৫—রামমোহন-পর্বে তাঁর গ্রন্থারম্ভ এবং ১৯৪৬—রবীন্দ্র-পর্বে তাঁর গ্রন্থ শেষ। ১৯৪৬ পর্যন্ত যাঁরা জীবিত ছিলেন এই গ্রন্থে তাঁদের সারস্বত কর্ম আলোচিত হয়েছে। ফলে অবনীন্দ্রনাথ, ক্ষেত্রমোহন, গিরিজাপ্রসন্ন, নলিনীকান্ত গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (পণ্ডিচেরী) প্রভৃতি এই গ্রন্থের আলোচনা-বহির্ভূত হয়েছেন। তবে জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র রায় (নব কমলাকান্ত), উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রবন্ধ-সাহিত্য এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। দীনেশচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংক্রান্ত আলোচনা আরো বিস্তৃত হওয়ার দাবী রাখে। যদি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড রচিত হয় তাহলে লেখককে এইদিকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। লেখক এই গ্রন্থের প্রতি পর্বের সূচনায় দেশের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকা উল্লেখ করে আলোচনাটি সমৃদ্ধ করেছেন। এমন একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ-রচনায় যে অসামান্য অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার পরিচয় লেখক প্রদর্শন করেছেন তা বিশেষ প্রশংসনীয়। স্বকীয় মৌলিকতা, চিন্তা ও বিশ্লেষণে তিনি একটি পরিচ্ছন্ন মানসের পরিচয়দান করেছেন। ডঃ অধীর দের এই গ্রন্থ 'পাইওনীয়ার ওয়ার্ক' হিসাবে বিশিষ্টতার পরিচায়ক। এই রূপরেখা অনুসারে ভবিষ্যতের গবেষক অনায়াসে বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাস সহজেই রচনা করতে পারবেন। 'পরিচায়িকা' প্রদান-প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন "বাংলা সাহিত্যের গবেষকদিগের মধ্যে এই প্রয়াস ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই। কারণ বিষয়টি যেমন জটিল, তেমনই নীরস।" সেই জটিল ও নীরস বিষয়ালোচনায় তরুণ গবেষক ডঃ অধীর দের কীর্তি প্রশংসনীয় রূপে প্রকাশিত। 'বিবিধ প্রবন্ধকার' শীর্ষক পরিচ্ছেদটির বিস্তারিত রূপায়ণে আরেকটি সুদীর্ঘ গ্রন্থের উদ্ভব সম্ভব। ১৯৪৬-উত্তর প্রবন্ধকারদের কথাও লেখক এইসূত্রে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

গ্রন্থটির মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সুরুচিসঙ্গত।

প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন— (প্রবন্ধ) মুজফ্ফর আহমদ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা-১২। দাম ঃ ২.৫০ নঃ পঃ।

লেখক শ্রীমুজফ্ফর আহমদ রাজনীতির জগতে সুপরিচিত। পরিণত বয়সে তিনি স্বকীয় রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। একাজে তিনি যে যোগ্যতম ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। কারণ এ বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, এবং বক্তব্য-বিষয়কে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থিত করার মতো প্রকাশ-ক্ষমতাও তাঁর আয়ত্তাধীনে।

এ বইয়ের চারটি অধ্যায়ের শিরোনামা এই রকম—রফিক আহমদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রবাসে পার্টি গঠন, ডক্টর দত্তদের 'মস্কো-যাত্রা' এবং সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বেআইনী পুস্তিকা'। এর মধ্যে আরো অজস্র ছোটখাট ঘটনা এবং রাজনৈতিক নেতার বিষয়ে আলোচনা আছে। বইটির পরিধি খুব সংক্ষিপ্ত নয়।

প্রসঙ্গত এ গ্রন্থে সে যুগের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পটভূমিও কিছুটা চিত্রিত হয়েছে। সাধারণ পাঠকের কাছে তা ঔৎসুক্যজনক হবে। কিন্তু নিছক

রাজনৈতিক মূল্যায়নের দিক দিয়ে এ বইয়ের অনেক সিদ্ধান্ত হয়তো সকলের মনঃপূত হবে না। তবু, একজন বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতার উক্তি হিসাবে সেগুলিরও দলিল-মূল্য যথেষ্ট।

যুক্তরাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (অনুবাদ) — লেখক ফ্রাঙ্কলীন এশার। অনুবাদ : সুবোধ রায়। প্রকাশক — প্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী। ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য তিন টাকা।

যাঁরা আমেরিকার ইতিহাস তেমন জানেন না এই গ্রন্থ তাঁদের উদ্দেশ্যে রচিত। যে সব ভাবধারা যুক্তরাষ্ট্রকে প্রভাবিত করেছে এই গ্রন্থে তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের প্রভাব আমেরিকাকে আজ পৃথিবীর সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করেছে। আমেরিকার ইতিহাসের রূপ-রেখা এই সংক্ষেপিত ইতিহাসে পাওয়া যাবে। অনুবাদ সাবলীল এবং সুন্দর। তবে Brief কথাটির অনুবাদ 'সংক্ষেপিত' না করে সংক্ষিপ্ত করা উচিত ছিল, Abridged—এই কথার পরিভাষা সংক্ষেপিত। এই বিষয়ে অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সমগ্র গ্রন্থটিতে দশটি অধ্যায় আছে, তার মধ্যে আবিষ্কার, ঔপনিবেশিক যুগ, আমেরিকার বিপ্লব, প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পর্যায়গুলির অতি মূল্যবান ইতিহাস এই গ্রন্থে বিধৃত।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

হসন্তী— (গল্প-সংগ্রহ) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। বাক-সাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রখ্যাত রস-সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঁচিশটি বিখ্যাত গল্প এই সঞ্চয়নে সংকলিত। গল্পগুলির মধ্যে তাঁর 'আদিম নৃত্য', 'তিমিঙ্গিল', 'টুথ ব্রাস', 'যস্মিন দেশে', 'কা তব কান্তা' প্রভৃতি বিখ্যাত গল্পগুলি আছে। শরদিন্দুবাবুর জনপ্রিয়তা অসীম। ছোট-গল্পের এক বিশিষ্ট কলাকৌশল তাঁর করায়ত্ত, 'হসন্তী'র এই অম্ল-মধুর-কাহিনীগুলি পাঠকের চিত্ত জয় করবে সন্দেহ নেই। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

মেঘমেদুর— (উপন্যাস)—ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। প্রকাশক—ন্যাশনাল পাবলিসার্স। ২০৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—তিন টাকা বারো আনা।

জনপ্রিয় লেখক ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের সাম্প্রতিক উপন্যাস মেঘমেদুর। বর্তমানকালের সমাজে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে লেখক সুকৌশলে তার ইঙ্গিত দান করেছেন। আধুনিক তরুণ-দের মধ্যে অবাধ প্রেম ও সংস্কারমুক্ত বিবাহ কি তাদের জীবনে সুখ ও শান্তি আনে, পরিণামে কি বিষময় ফল দেখা যায়। শিবানী চরিত্রটি অপূর্ব, দেবব্রতর প্রতি তার ক্ষমাসুন্দর ব্যবহারের ভিতর কি রহস্য আছে। শিবানী চরিত্রটি তাই উজ্জ্বল হয়ে আছে নারীত্বের অপরূপ মহিমায়। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ শোভন।

সেদিন চৈত্রমাস: (উপন্যাস)। দিব্যেন্দু পালিত। প্রকাশক : বসু চৌধুরী। ৬৭-এ, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯। মূল্য : ৩·৫০।

সমাজ আর আত্মস্বীকৃতির দ্বন্দ্ব আজকের নয়, বহু প্রাচীন। মানুষের ক্রমবর্ধমান চেতনার স্ফুরণের ধাপে-ধাপে জীবনকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে। মানুষের কাছে তাই তার আবেদন পুরাতন নয়, নূতন।

সেদিন চৈত্রমাসে একটি শিক্ষিতা তরুণীর জীবনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সেই পুরাতন ট্রাজিডিই নূতন করে নেমে এসেছিল। একদিকে তার স্বামী, আর একদিকে যাকে সে মহত্তর বলে মনে করে এমন একটি জীবনের হাতছানি। কাকে সে গ্রহণ করবে, এই হল তার সমস্যা। এই দ্বন্দ্বের পরিণতি কী?

তরুণ কথাসাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিতের মনস্তত্ত্বের জটিল বিশ্লেষণে এখানে আধুনিক যুগের একটি সমস্যা বলেই মনে হয়। বাচনভঙ্গির সাবলীলতা আর বক্তব্যের ঋজুগতিতে লেখকের বলিষ্ঠতা অনস্বীকার্য।

নারী ও নগরী— (উপন্যাস)—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—সুন্দর প্রকাশন। ৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—পাঁচ টাকা।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় অতি অল্প পরিমাণে লিখে পাঠকচিত্ত জয় করেছেন। 'নারী ও নগরী' তাঁর একখানি অতি-প্রশংসিত উপন্যাস। আলোচ্য সংস্করণটি সেই জনপ্রিয় উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ। নতুন সংস্করণে অনেক পরি-মার্জন করা হয়েছে এবং পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী ও নগরীর মধ্যে ভরতপুরের বৌরাণীর অভিনেত্রী জীবন এবং পুনরায় পুরাতন জীবনের স্পর্শলাভ শেখরনাথের আবির্ভাবে। উপভোগ্য কাহিনী। পূর্ণেন্দু পত্রী-অঙ্কিত মনোরম প্রচ্ছদটি গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

অলৌকিক কাহিনী— (ভৌতিক গল্প) গোপালচন্দ্র রায়। সাহিত্য সদন। এ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২।

লেখকের প্রচেষ্টা অভিনব সন্দেহ নেই তবে ছাপায় ও সম্পাদনায় আরও একটু যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ছিল মনে হয়। বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলি অলৌকিক কাহিনী নিয়ে এই মনোজ্ঞ বইখানি রচিত হয়েছে। তাই এই গ্রন্থের কাহিনীগুলি যে অলীক গল্প নয়, বরং প্রত্যেকটিরই একটি করে বাস্তব ভিত্তি আছে, সে কথা জোর করেই বলা যেতে পারে। আমরা আশা করি লেখকের এই অভিনব প্রচেষ্টা সাহিত্যানুরাগীদের ভালই লাগবে।

দন্তরুচি-কৌমুদী (রঙ্গ কবিতা) —কালিদাস রায় (বেতালভট্ট)। প্রকাশক—এস, কে, পালিত এণ্ড কোং। ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দুটাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

কবিশেখর কালিদাস রায় বেতালভট্ট এই ছদ্মনামে 'রসকদম্ব' নামে একটি রঙ্গ কবিতার সংকলন প্রকাশ করেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে। তার অনেকগুলি তখনকারকালে গ্রামোফোনের রেকর্ডেও বিধৃত হয়েছিল। সেইসব কবিতা ও কিছু নতুন কবিতা এই সংকলনে সঞ্চয়ন করা হয়েছে। ইদানীং ব্যঙ্গ কবিতার তেমন প্রচলন নেই, এই কবিতাগুলি অতীতদিনের স্মৃতি স্মরণে আনে। রঙ্গ কবিতা হিসাবে 'দন্তরুচি-কৌমুদী' এক সার্থক কাব্য-সঞ্চয়ন।

নান্দীকর

চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা :

যে-কোনো কারণেই হোক, বর্তমানে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে বোম্বাই। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানের জন্যে ছবি বা প্রতিনিধিদল প্রধানতঃ বোম্বাই থেকেই নির্বাচিত হয়ে থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ছবি বা প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যাপারে বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র-রাজ্যের কর্তাদের সঙ্গেই পরামর্শ ক'রে থাকেন। আমাদের সবেধন-নীলমণি সত্যজিৎ রায় না থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার এতদিনে সম্ভবতঃ বাঙলা দেশেও যে চলচ্চিত্র শিল্পের অস্তিত্ব আছে, এ-কথা সম্পূর্ণই ভুলে যেতেন। তাই দেখি, এবারের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে গেছেন নন্দা, কল্পনা কার্তিক, শেখ মুক্তার, অমরজীৎ, বিজয় আনন্দ, রামানন্দ সাগর ইত্যাদি শিল্পী ও সঙ্গীত-পরিচালক দেব আনন্দ, দিলীপকুমার প্রভৃতির সঙ্গে। "গঙ্গাযমুনা", "হাম দোনো" প্রভৃতি ছবি ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করেছে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে।

এবং এই বোম্বাইয়েরই জন কয়েক প্রযোজক অন্য দেশীয় প্রযোজকদের সঙ্গে মিশে আন্তর্জাতিক ছবিও তৈরী করছেন কিছু দিন ধ'রে। সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারতবর্ষের সহযোগিতায় 'পরদেশী' নামে যে-ছবি তৈরী হয়েছিল, ছবি হিসেবে তা আদৌ সাফল্যলাভ করেনি। এবং আজ পর্যন্ত যে-ক'টি ছবি তৈরী হয়েছে ভিন্ন দেশী প্রযোজকের সঙ্গে একযোগে কাজ ক'রে, তার মধ্যে একটিও যে উৎকর্ষ বা অর্থের দিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, এমন কথা শোনা যায়নি। অথচ আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় যে-ছবি তৈরী হবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তা' ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করবে, এইটিই অভীষ্ট হওয়া উচিত নয় কি? দুই দেশের অর্থ, সামর্থ এবং শিল্পজ্ঞানের মিলিত চেষ্টার ফল যদি উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্যমণ্ডিত না হয়, তা'হলে তা ভারতের সুনাম এবং অর্থ—উভয় দিক দিয়েই যথেষ্ট ক্ষতিকর। কাজেই এই ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ার আগে ভারত সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে চিন্তা করা উচিত এবং এ-রকম কোনো ছবির প্রস্তুতির সময়ে গোড়া থেকে শেষ অবধি সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখবার জন্যে ভারত সরকারের তরফ থেকে উপযুক্ত পর্যবেক্ষক বা পর্যবেক্ষক-সমিতিও নিয়োগ করা উচিত।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় এই রকম একটি ছবি সম্প্রতি প্রস্তুত হচ্ছে। রুথ প্রাওয়ার ঝব্‌ভালার "দি হাউস-হোল্ডার" নামে ভারত সংক্রান্ত একটি উপন্যাস প'ড়ে জেমস্ আইভরি নামে জনৈক মার্কিণ বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞ হঠাৎ রাতারাতি চলচ্চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করেন এবং ভারতবর্ষের বোম্বাই শহরে উপস্থিত হয়ে ইস্‌মাইল মার্চেণ্ট নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে যুগ্মপ্রযোজকরূপে সহযোগিতার কথাবার্তা পাকা করেন। ব্যস, ছবি তৈরী শুরু হয়ে গেল। এ'দের ধারণা, সত্যজিৎ রায় যদি পেরে থাকেন, আমরাই বা ভুঁই-ফোঁড় হয়ে পারব না কেন?" "দি হাউস-হোল্ডার" উপন্যাসে প্রাচীন ভারত থেকে নব ভারতের রূপায়ণের কথা বিবৃত আছে। পুরানো এবং নয়াদিল্লী পাশাপাশি থেকে এই উপন্যাসের যোগ্য পটভূমিকা রূপে নির্বাচিত হয়েছে। জেমস্ আইভরি নিজেই ছবিখানির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেছেন এবং চিত্রশিল্পীরূপে নিয়েছেন সুব্রত মিত্রকে। ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন শশী কাপুর, লীলা নাইডু, দুর্গা খোটে, জবীন জালিল, অচলা সচদেব, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, প্যাট্রিস ভ্যালস, ওয়াল্টার কিং এবং আর্নেষ্ট ক্যাস্টেল্‌ডো। ছবিটিতে সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ।

কিন্তু যাদের চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে কোনো রকম অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা যে-ছবির কর্ণধার হয়েছেন, সেই ছবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা কতখানি আশা পোষণ করতে পারি? এবং এই রকম অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ-সুবিধা ভারত সরকারের কাছ থেকে লাভ করেনই বা কি ক'রে, এ-ও আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

চিত্র সমালোচনা

সাহিব বিবি ঔর গুলাম (হিন্দী) : গুরু দত্ত ফিল্মসের নিবেদন; ১৫,৫৯৬ ফুট দীর্ঘ এবং ১৭ রীলে সম্পূর্ণ (কল্‌কাতায় ছবিখানি যে-ভাবে দেখানো হচ্ছে, তাতে এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১৪,২৭৬ ফুট এবং ছবিটি ১৬ রীলে সম্পূর্ণ): কাহিনী : বিমল মিত্র; প্রযোজনা : গুরু দত্ত; চিত্রনাট্য, সংলাপ এবং পরিচালনা : আব্রার আল্‌ভি; চিত্রগ্রহণ : ভি কে মূর্তি; শব্দধারণ : পি থ্যাকার্সে; সঙ্গীত পরিচালনা : হেমন্তকুমার; গীত-রচনা : শকীল; শিল্প-নির্দেশনা : বীরেন নাগ; সম্পাদনা : ওয়াই. জে. চৌহান; রূপায়ণ : মীনাকুমারী, ওয়াদিয়া রেহমান, প্রতিমা দেবী, রঞ্জিৎকুমারী, গুরু দত্ত, রেহমান, সপ্রু, নাজির হোসেন, ধুমেল, হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জহর কাউল, বিক্রম কাপুর ইত্যাদি। ল্যাডিয়া ফিল্মসের পরিবেশনায় ছবিখানি গেল ২৯-এ জুন থেকে প্যারাডাইস, কৃষ্ণা, দর্পণা, প্রিয়া, ইণ্টালী টকীজ ও অন্যান্য ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

বিমল মিত্র রচিত "সাহেব-বিবি-গোলাম" একখানি বহুপঠিত ও জনপ্রিয় উপন্যাস। কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বইখানির একটি সার্থক বাঙলা চিত্ররূপ আমরা বেশ কিছুদিন আগে দেখেছি। সম্প্রতি প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা গুরু দত্ত বইখানির একটি হিন্দী চিত্ররূপ চিত্ররসিক দর্শকবৃন্দকে উপহার দিয়েছেন।

"বর্ণচোরা"র নায়িকা সন্ধ্যা রায়। বনফুলের লেখা "কষ্টির" এই চিত্ররূপটি পরিচালনা করেছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

বাঙলা জনপ্রিয় উপন্যাসের বোম্বাই থেকে দেওয়া হিন্দী চিত্ররূপের কথা শুনলেই আমাদের মনে সাধারণতঃ একটি বিভীষিকার সঞ্চার হয়; কি বিকৃত রূপই না চোখের সামনে দেখতে হবে। তার ওপর সেই উপন্যাসের যদি একটি সুন্দর বাঙলা চিত্ররূপ চোখের সামনে ভাসতে থাকে, তাহলে তার হিন্দী চিত্ররূপের সার্থক সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। স্বীকার করতে বাধা নেই, "সাহিব বিবি ঔর গুলাম" সম্বন্ধেও আমাদের মনে অনুরূপ আতঙ্কই ছিল। কিন্তু ছবিখানি দেখবার পর বলতে পেরে সুখী হচ্ছি যে, আমাদের আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণিত ক'রে ছবিখানি হিন্দী চিত্ররাজ্যের একটি মহিমময় সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার অর্ধেক কল্‌কাতার ধনীসম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবন জমিদারী থেকে অজস্র অঢেল টাকায় আনুকূল্যে অবাধ বিলাসব্যসনের স্রোতপঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে যেভাবে ধীরে ধীরে মূলহীন, অন্তঃসারশূন্য, পতনোন্মুখ বটবৃক্ষের মত শকুনি-গৃধিনীর বাসস্থানে পরিণত হচ্ছিল, তারই একটি সকরুণ ইতিহাসকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলুম বিমল মিত্রের 'সাহেব-বিবি-গোলাম' উপন্যাসে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ইতিহাসকেই চিত্রায়িত করেছেন গুরু দত্ত তাঁর এই ছবির মাধ্যমে। ছবি দেখতে দেখতে কেবলই মনে হয়েছে, ভাষাটি খালি হিন্দী, কিন্তু গল্পটি পুরো বাঙলা—চরিত্রগুলি সবই খাঁটি বাঙালী, এতটুকু ভেজাল নেই। এমন কি, ছবি হিন্দী হ'লে কি হবে, চরিত্রগুলি সেই ভূতনাথ, জবা, বংশী, মেজবাবু, ছোটবাবু, ঘড়িবাবু, সুবিনয়, সুপবিত্র, আচার্য ধর্মদাস প্রভৃতি। ছোট বৌ বিস্ময় প্রকাশ করছেন, 'ও মা!' বলে; 'আই বাপ্!' ব'লে নয়। সাজসজ্জা, চলন-বলন, আসবাবপত্র, বাড়ীঘর প্রভৃতি সমস্ত দিক দিয়ে এমন অদ্ভুতভাবে বাঙলাঘেঁষা হিন্দী ছবি আমরা এর

আগে কখনও দেখিনি। পুরোনো কলকাতার ঘোড়ায় ট্রাম পর্যন্ত অত্যন্ত নিখুঁতভাবে দেখানো হয়েছে এই হিন্দী ছবিতে।

অভিনয়ে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই তাঁর গৃহীত ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন। তবে ওরই মধ্যে যে-দুটি ভূমিকা বহুদিন পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে, সে হচ্ছে গুরু দত্ত অভিনীত ভূতনাথ এবং মীনাকুমারী অভিনীত ছোট বৌ। সরল পল্লী-যুবক ভূতনাথকে জীবন্ত করে তুলেছেন গুরু দত্ত তাঁর ভীরু-সরল চাহনি, শঙ্কিত পদবিক্ষেপ, দ্বিধাগ্রস্ত বাচন এবং গ্রাম্য সাজসজ্জার মাধ্যমে। ছোট বৌয়ের প্রতি তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির প্রকাশ অপরূপ রসজ্ঞানের পরিচায়ক। আর সামান্য ঘর থেকে আসা রূপবতী মেয়ে ছোট বৌ পটেশ্বরীর জীবনের ব্যথা, বেদনা, ব্যর্থতা, শূন্যতা—সমস্তই অত্যন্ত অবলীলাক্রমে রূপায়িত করেছেন মীনাকুমারী। স্বামীকে নিজের কাছে ধরে রাখবার জন্যে গৃহস্থ কন্যার পক্ষে পাপকার্য জেনেও তার মদ্যপানে প্রবৃত্ত হওয়ার দৃশ্য উচ্চাঙ্গের কলা-নৈপুণ্যের প্রকাশক। কিছুদিন স্ত্রীর সঙ্গে থাকবার পর ছোটবাবু আবার যখন বাইরে যাবার উদ্যোগ করছেন, তখন তাকে ধ'রে রাখবার আপ্রাণ প্রচেষ্টার মধ্যে নেশাগ্রস্ত ছোটবৌ রূপে মীনা-কুমারী যে আশ্চর্য অভিনয়-প্রতিভার নিদর্শন দেখিয়েছেন, তা অবিস্মরণীয়। কিন্তু স্বামীর মঙ্গলকামনায় পুজো দিতে যাবার সময়েও ছোট বৌয়ের মত্ততা পরিত্যাগ করা উচিত ছিল বলেই মনে হয়।

ছোট্ট একটি দৃশ্যে ঘড়িবাবুরূপে হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিস্ময়কর অভিনয় করেছেন। জবার ভূমিকায় ওয়াহিদা রেহমান অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ অভিনয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। হিন্দী ছবিটিতে জবাকে ভূতনাথের প্রতি অনুরক্ত দেখানো হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত দু'জনে যে বিবাহিত হয়েছে, তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

সুবিনয়বাবু রূপে নাজির হোসেন এবং জবা বেশে ওয়াহিদা রেহমান তাঁদের সাজসজ্জা ও চলন-বলন মারফত সুস্পষ্ট রূপেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত। বিক্রম কাপুরের আচার্য ধর্মদাস এবং জহর কাউলের সুপবিত্র অল্পের মধ্যে সুন্দর। ছোটবাবুর চরিত্র-টিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন রেহমান। বড় ঘরের বাবুয়ানি সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা সে যুগে অভ্রান্তভাবে প্রচলিত ছিল, তাকে তিনি অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত করতে কার্পণ্য করেননি। বড়লোকের বাড়ীর সহানুভূতি-সম্পন্ন সদাই ব্যস্ত চাকর বংশীর ভূমিকায় ধুমল তাঁর সুন্দর অভিনয়ে দর্শকচিত্তকে সহজেই জয় করতে পেরেছেন। গৃহ-শিক্ষকের ভূমিকায় মীরাজকারও চমৎকার রূপদান করেছেন। এ ছাড়া সপ্রু (মেজবাবু), প্রতিমা দেবী (বড় বৌ) এবং রঞ্জিতকুমারী (মেজবৌ) স্ব স্ব ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয় ক'রে ছবিটির গৌরববর্ধিতে সহায়তা করেছেন।

ছবির শিল্প-নির্দেশনা, চিত্রগ্রহণ এবং শব্দধারণের কাজ উচ্চাঙ্গের হয়েছে। ছবিতে গান আছে আটখানি; সব ক'টি গানই যে অপরিহার্য, এমন নয়। তবু গানগুলি সুরসমৃদ্ধ ও সুগীত। আবহ-সঙ্গীত রচনায় হেমন্তকুমার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

"সাহিব বিবি ঔর গুলাম" ছবিটিতে পতিতালয়ের দৃশ্য আর একটু সংক্ষিপ্ত করলে এবং গানের সংখ্যাকেও সমানভাবে কম করলে ছবিখানি হিন্দী চিত্রজগতে একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি ব'লে অনায়াসেই পরিগণিত হ'তে পারত।

এল, বি, প্রোডাকসন্স-এর 'খনা' ঃ

গেল কাল, বৃহস্পতিবার, ১২ই জুলাই এল, বি, প্রোডাকসন্স-এর পৌরাণিক ছবি 'খনা' রূপবাণী, ভারতী ও অরুণাতে মুক্তিলাভ করেছে। বরাহ মুনির পুত্রবধূ খনা ছিলেন তাঁর শ্বশুরেরই মত জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা। মিহিরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ-কাহিনী পুরাণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই বিদুষী নারীর সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনাকে ঘিরে 'খনা' ছবিখানি নির্মিত হয়েছে। প্রথমে খ্যাতনামা চিত্র-সম্পাদক অধুনা পরলোকগত বৈদ্যনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং পরে শ্যাম চক্রবর্তী ছবি-খানির পরিচালনা করেন। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গে আছেন পদ্মা দেবী,

হিন্দী চিত্র 'মায়া'তে দেব আনন্দ ও মালা সিন্‌হা

তপতী ঘোষ, প্রবীরকুমার, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতি।

মঞ্চতীর্থের 'চেনা মুখ অচেনা মানুষ' ঃ

প্রধানতঃ ইবসনের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাট্যকার অমর গঙ্গোপাধ্যায় 'চেনা মুখ অচেনা মানুষ' নাটকটি সৃষ্টি করেছেন। নাটকের নাম হয়ত বলতে চেয়েছে, চরিত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে বাইরের দিক দিয়ে পরিচিত হ'লে কি হয়, অন্তরের দিক দিয়ে তারা পরস্পর থেকে বহু দূরে, একেবারে অচেনা মানুষের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু বহু ঘটনা, বহু সমস্যার ইঙ্গিত থাকলেও নাটকটি কোনো অবস্থাতেই দানা বাঁধতে পারেনি—তার কেন্দ্রটি ক্রমাগত স'রে স'রে গেছে ব'লে, নাটকের প্রধান বক্তব্য কি, তার কোনো প্রধান চরিত্র আছে কিনা, যাকে ঘিরে সমস্যাগুলি দানা বাঁধতে পারে,—এ-কথা শেষ পর্যন্ত বোঝাই গেলনা। যদি বলা যায়, হরেশই নাটকের প্রধান চরিত্র, তা'হলে তার পরিণতি কৈ? শেষ দৃশ্যে সে একেবারেই অনুপস্থিত। নাটকে ঘটনা এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক চরিত্র থেকে আর এক চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে,—সকলেই প্রধান এবং সকলেই অপ্রধান। কোনো সময় মনে হয়েছে, নাটকটি সাসপেন্সধর্মী, আবার কোনো সময় মনে হয়েছে করুণরসাত্মক। এমন বাস্তব এবং অবাস্তবের সমাবেশ করা হয়েছে নাটকটিতে যে, শেষ অবধি মনে হয়, সবই অকারণে ঘটেছে; তাই নাটকটি আমাদের মনে কোনো রকম সাড়া জাগাতে পারেনি।

কিন্তু এই অসার্থক নাটকে বহু শিল্পীই অত্যন্ত সার্থক অভিনয় করেছেন। ত্রিদিবের চরিত্রে খ্যাতনামা চরিত্রাভিনেতা কালী সরকার যে অসামান্য অভিনয়-দক্ষতা প্রকাশ করেছেন, তা আমাদের সময় সময় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয়-রীতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। প্রবীরের ভূমিকায় অভিনব গুপ্তের সাবলীল বাস্তবধর্মী অভিনয় উচ্চ প্রশংসা লাভের যোগ্য। মোটর ড্রাইভার পরেশের ভূমিকায় কান্তি দত্তের অভিনয়ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। রমার ভূমিকাকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছিলেন যশস্বিনী অভিনেত্রী বাণী গাঙ্গুলী; তিনি তাঁর বয়সকে ফাঁকি দিতে পেরেছেন। এ ছাড়া নির্মল বসাক (নরেন), গিরিজা দত্ত (শংকর), সলিল দাশগুপ্ত (অশোক), বারীন রায় (হরেশ), প্রতিমা চক্রবর্তী (মালা), মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় (শিখা) প্রভৃতি সকলেই অল্পবিস্তর সু-অভিনয় করেছেন।

বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ ঃ

(১) গেল ২রা জুলাই, সোমবার পরিষদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আকস্মিক পরলোকগমন উপলক্ষ্যে একটি মহতী শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পরিষদ-সভাপতি নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী।

পরিষদের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক রাসবিহারী সরকার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উঠে বলেন, "রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র-স্মরণী প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি বাংলার নাট্যজগতে চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয় হয়ে থাকবেন। নাট্য-নিবেদনের ক্ষেত্রে তিনি প্রমোদকর রহিত ক'রে সৌখীন ও পেশাদার নাট্য-সংস্থাগুলিকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে গেছেন। বাঙলার নাট্যেতিহাসে ডাঃ রায়ের এই কীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে।" একই দিনে তাঁর জন্ম-মৃত্যুর কথা স্মরণ ক'রে শ্রীসরকার বলেন, "২৫০০ বছর আগে ভগবান তথাগতের জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটেছিল।". নাট্যকার মন্মথ রায় বলেন, "পথের পাঁচালীর চিত্র-রূপায়ণে

াঃ রায়ের সাহায্য বিশ্ববিখ্যাত পরি-
লক সত্যজিৎ রায়কে আবিষ্কার
রেছে। সমগ্র চিত্রজগৎ এই একটি মাত্র
ারণেই ডাঃ রায়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ
াকবে।" সভাপতি অহীন্দ্র চৌধুরী
লেন, "ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের জন্যে
মন অনেক কিছু করেছেন, যা কোনো
াজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের
বনা অনুমতিতে করতে সক্ষম হতেন
া।" নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়,
াহিত্যিক মনোজ বসু এবং নট কানু
ন্দ্যোপাধ্যায়ও পরলোকগত আত্মার
্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রচুর জন-
মাগমে বিশ্বরূপার প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ
ছল।

(২) নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য
ম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীদেবেশ
াস এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র
্বরূপে নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরি-
দের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।

িহার আর্ট থিয়েটারের "পাল্কী" প্রসংগে :

অমৃত, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় বিহার
আর্ট থিয়েটারের 'পাল্কী' সম্বন্ধে সমা-
লোচনা করবার সময়ে আমরা প্রসংগতঃ
উল্লেখ করেছিলুম যে, একই নাটককে
বাঙলা ও হিন্দী ভাষায় অভিনয় করবার
প্রয়াস ভারতবর্ষে এই প্রথম, বিহার আর্ট
থিয়েটারের এই দাবি অযৌক্তিক। কারণ,
পশ্চিমবংগ সরকারের প্রচার বিভাগের
লোকরঞ্জন শাখা ১৯৫৫ সালে মন্মথ রায়
রচিত 'জটাগংগার বাঁধ' নাটকটিকে
বাঙলা এবং হিন্দীতে অভিনয় করে-
ছিলেন দিল্লী শহরে ভারতের মুখ্যমন্ত্রী
জওহরলাল নেহরু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি-
বর্গের সামনে।

এই উল্লেখটুকু দেখে বিহার আর্ট
থিয়েটারের জনৈক 'অভিমন্যু' উষ্মাপ্রকাশ
ক'রে আমাদের পত্রাঘাত ক'রে জানিয়ে-
ছেন, আমরা নাকি ভুল তথ্য পরিবেশন
করেছি। অথচ পত্রলেখক আমাদের
উক্তিকে মেনে নিয়েই বলেছেন, 'জটাগংগার
বাঁধ'-এর অভিনয় হয়েছে সম্পূর্ণ সর-
কারীভাবে এবং বিহার আর্ট থিয়েটারের
অভিনয় হয়েছে সম্পূর্ণ বে-সরকারী-
ভাবে; কাজেই "সম্পূর্ণ বেসরকারীভাবে
'পাল্কী' নাটকের দ্বিভাষিক প্রযোজনা
অর্থাৎ বাংলা ও হিন্দী ভাষায় অভিনয়-
প্রয়াস ভারতবর্ষে এই প্রথম বলে দাবী
করাটা অন্যায় বা অযৌক্তিক নয়।" সরকার
বা বে-সরকারী, এ প্রশ্ন তো আমরা
তুলিনি। আমরা বলেছি, ১৯৫৫ সালে
একই নাটক বাঙলা ও হিন্দী ভাষায়
অভিনীত হয়েছিল। এবং এখনও তাই

রূপকার গোষ্ঠীর জনপ্রিয় নাটক "ব্যাপিকা বিদায়"-এর একটি দৃশ্যে গীতা দত্ত ও সবিতাব্রত দত্ত। আগামী ২২শে জুলাই নিউ এম্পায়ারে নাটকটির অভিনীত হবে।

বলছি। এবং এর মধ্যে কোনো ভুল তথ্য
পরিবেশনের চেষ্টা নেই।

পত্রলেখকের অবগতির জন্যে
জানাচ্ছি, "জটাগংগার বাঁধ" এবং
"মহাভারতী"র অভিনয়ে একই শিল্পি-
বৃন্দ বাঙলা এবং হিন্দী—উভয় ভাষাতেই
অভিনয় করেছেন; কারণ শিল্পীরা হচ্ছেন
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার
এবং সেখানে বাঙলার জন্যে একদল ও
হিন্দীর জন্যে আর একদল শিল্পী নিযুক্ত
নেই। 'আনন্দ'-এর ভূমিকাতে দুজন
শিল্পীর নাম থাকায় আমরা স্বভাবতঃই
মনে করেছি, হিন্দীতে "এ ডারায়ু খাঁ"
অভিনয় করেছেন। আমাদের ভ্রমসংশো-
ধনের জন্যে লেখককে ধন্যবাদ।

॥ 'এর শেষ নেই' নাটক ॥

'এর শেষ নেই' নাটকটি রচনা করে-
ছেন তরুণ নাট্যকার অমরেন্দ্র দাস।
'থিয়েটার গিল্ড' নামে একটি বলিষ্ঠ
সংস্থা এই নাটকটি প্রথম অভিনয় করেন
গত ২৬শে মে, ১৯৬২, নেতাজী সুভাষ
ইনস্টিটিউট রঙ্গমঞ্চে। অভিনয়ে যাঁরা
প্রশংসা অর্জন করেছেন তন্মধ্যে দত্তা
মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, বীরেন
দাস, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল
ভৌমিক, রীণা সরকার, মায়া রায় প্রভৃতি।
আলোক-সম্পাতে ছিলেন— আশুতোষ
বড়ুয়া।

কলকাতা

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিযান' সমাপ্তপ্রায়। বিশেষ সূত্রে জানা গেল শ্রীরায়ের পরবর্তী ছবি হবে তাঁর পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'গোপী গায়েন বাঘা বায়েন' এই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গল্প অবলম্বনে। আগামী বছর শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর 'জন্মশতবর্ষে' ছবিটি নিবেদন করবেন শ্রী রায়।

আগুন-এর পর সম্ভবত অসিত সেন জনতা পিকচার্স এন্ড থিয়েটার্সের প্রযোজনায় এ্যামিলি ব্রন্টির 'ওয়েদারিং হাইট' অবলম্বনে 'মানসী' ছবিটি পরিচালনা করবেন।

সমরেশ বসুর উপন্যাস 'পুতুলের খেলা' অবলম্বনে 'দুই নারী' ছবিটি পরিচালনা করছেন জীবন গাঙ্গুলী। চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে নিউ থিয়েটার্স দু' নম্বরে। চিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত। জাওলা প্রোডাকসন্সের এই চিত্রে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন নির্মলকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কাজল গুপ্ত, শেফালী ব্যানার্জি, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, জ্ঞানেশ মুখার্জি ও কালী সরকার। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

একটি হাসির গল্প 'হাইহিল।' ছবিটি পরিচালনা করছেন দিলীপ মিত্র। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় ছবির দৃশ্যগ্রহণ করছেন চিত্রশিল্পী রঞ্জিত চ্যাটার্জি। এ ছবির নায়ক-নায়িকা অনিল চ্যাটার্জি ও সন্ধ্যা রায়। হাস্যকৌতুক শিল্পীর সমাবেশে বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন অনুপকুমার, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জি, অজিত চ্যাটার্জি, নৃপতি চ্যাটার্জি, শীতল ব্যানার্জি, নবদ্বীপ হালদার, কুন্তলা চ্যাটার্জি ও কমল মিত্র। এ ছাড়া স্বর্গত ছবি বিশ্বাস এবং তুলসী চক্রবর্তীর শেষ অভিনয় এ ছবির আর এক আকর্ষণ। সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।
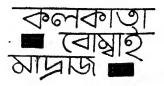
সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'দা-ঠাকুর' ছবির কাজ শেষ হয়ে সম্পাদনার কাজ চলেছে। এই ছবিতেও একটি বিশেষ চরিত্রে স্বর্গত ছবি বিশ্বাসের অভিনয় দেখা যাবে। এ ছাড়া অন্যান্য মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ, ভানু ব্যানার্জি, গঙ্গাপদ বসু, অমর মল্লিক ও নৃপতি চ্যাটার্জি।

আন্দামান-গভীর জঙ্গলে রমাপদ চৌধুরীর 'দ্বীপের নাম টিয়ারং' ছবিটির পরিচালনায় ব্রতী হয়েছেন গুরু বাগচী। চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ঋত্বিক ঘটক এবং রবীন চ্যাটার্জি। প্রযোজক অমর নান, শ্রী বাগচী এবং আলোকচিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত বহির্দৃশ্যের স্থান নির্বাচনের কাজ শেষ করেছেন। প্রধান তিনটি চরিত্রে সন্ধ্যা রায়, নিরঞ্জন রায় ও দিলীপ মুখার্জি অভিনয় করবেন।

অগ্রদূত গোষ্ঠী উত্তরায়ণের কাজ শেষ করে 'নবদিগন্ত' ছবির সুটিং শুরু করেছেন রাধা ফিল্মসে। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন বসন্ত চৌধুরী ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি।

তারক পাল প্রযোজিত বি, এ, পি, প্রোডাকসন্সের "কাজল" নর্মদা চিত্রের পরিবেশনায় শ্রী - প্রাচী - ইন্দিরা ও অন্যত্র পরবর্তী মুক্তি প্রতীক্ষায়। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানি পরিচালনা করেছেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুর-সৃষ্টি ছবিখানির বিশিষ্ট আকর্ষণ। প্রধান চরিত্রে আছেন ছবি বিশ্বাস, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অসীমকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ, গঙ্গাপদ বসু, সুনীল চক্র, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বম্বে

সম্প্রতি বম্বের মোহন স্টুডিওয় 'জিন্দগী কে রাস্তে' ছবিটি পরিচালনা করছেন আর ডি মাথুর। রহমান, হেলেন, প্রাণ, হনি ইরাণী, ললিতা পাওয়ার, মুকরী, তুনতুন ও উমা এ ছবির কয়েকটি চরিত্রশিল্পী। সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন রবি।

বিমল রায়ের নতুন ছবি 'ভাইজান'-এ গীতিকার শাকিল বাদুনী এই প্রথম গান লিখছেন। এই ছবির সুরকার শচীনদেব বর্মণ। মুসলীম সমাজের ওপর এ কাহিনীর আখ্যানবস্তু। অশোককুমার, মীনাকুমারী, নাশিম ও শশিকাপুর এই ছবির প্রধান আকর্ষণ। সুটিং শুরু হয়েছে এ মাসের প্রথম সপ্তাহে।

ঈগল ফিল্মসের রঙিন ছবি 'শিকারী' তুলছেন পরিচালক মহম্মদ হুসেন। বহির্দৃশ্যের কাজ শেষ করে স্টুডিওর কাজ চলেছে। কয়েকটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন কে এন সিংহ, হেলেন, রাণধির, কমল মেহেরা, রাগিণী ও মদনপুরী। জি এস খোলি এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক।

প্রযোজক ও পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী তাঁর পরবর্তী রঙিন ছবি 'জিদ' রূপতারা স্টুডিওয় আরম্ভ করেছেন। আশা পারেখ, মাসুদ এবং শুভা খোটে তিনটি প্রধান চরিত্রে ভূমিকাশিল্পী। নায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন জয় মুখার্জি। দৃশ্যগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ভি কে মুরথী এবং শচীন দেববর্মণ।

হৃষিকেশ মুখার্জির পরবর্তী রঙীন ছবি 'উপরওয়ালা।' ছবিটি প্রযোজনা করবেন লছমন লুল্ল। সাধনা ও রাজকাপুর অভিনীত এই চিত্রটির সুরারোপ করছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

'গঙ্গা-যমুনা'র সাফল্যের পর নীতিন বসু ছবি করছেন 'উমীদ।' ভূমিকালিপিতে রয়েছেন অশোককুমার, জয় মুখার্জি, লীলা নাইডু ও নন্দা। সুরকার হলেন রবি। কাহিনী লিখেছেন রঞ্জন বসু।

নাসির হোসেন তাঁর নতুন ছবির নামকরণ করেছেন 'ফির ওহি দিল লায়া হুঁ।' এ ছবির দুটি মুখ জয় মুখার্জি ও আশা পারেখ। সুরকার ওপী নাইয়ার।

মাদ্রাজ

সম্প্রতি মাদ্রাজের জনপ্রিয় অভিনেতা শিবাজী গণেশন আমেরিকা সফর শেষ করে ফিরেছেন। তাঁর অবস্থানকালে হলিউডের নায়ক মার্লন ব্রানডোকে ভারতে আগমনের জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিশেষসূত্রে জানা গেল মিঃ ব্রানডো সে নিমন্ত্রণ পালন করতে সম্মতি জানিয়েছেন।

'সাবাসমীনা'র হিন্দী চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক ও প্রযোজক বি আর পান্থালুস। শাম্মি কাপুর, মালা সিনহা, মামুদ, শুভা খোটে, ও ওমপ্রকাশ মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন। চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও গীত রচনা করেছেন যথাক্রমে ইন্দর রাজ-আনন্দ, শঙ্কর-জয়কিষণ ও শৈলেন্দ্র এবং হাসরৎ জয়পুরী।

চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

আষাঢ়ে লগন শুভই। শুভবিবাহের থাই বলছি। টালিগঞ্জের শেষ প্রান্তে উ থিয়েটার্স এক নম্বর-এ হরিদাস ট্টাচার্য পরিচালিত 'শেষ অংক' ছবির শ্যগ্রহণের শুভকার্য সমাধা চলছিল। ইরে থেকে কিছুই বোঝবার উপায় নই। লোহার ফটক পেরিয়ে স্টুডিও ফ্লোরে নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে ঢুকতেই বশ অবাক হলাম। মন্ত্রপাঠ চলেছে। তীত জীবনে এ দৃশ্য চিরদিনই রোমাঞ্চ আনে। তাই রোমাঞ্চিত হইনি বললে ল বলা হবে। আসন্ন টোপর-টুপুর পুরে ছবির এই শুভপরিণয় লগ্নে নটা রোমাঞ্চিত হয় বৈকি।

চিত্রগ্রহণ চলেছে। বর-বধূ দুটি মুখ ত্তমকুমার এবং শর্মিলা ঠাকুর। মাঝখানে াহাড়ী সান্যাল সম্প্রদান করছেন। রুতঠাকুর মন্ত্র পাঠে বিধান দিয়ে লেছেন। পূর্ণমাত্রা অভিনীত এই শুভ-বাহের কথা ভুলে গিয়ে সত্যিই ন্তর জীবনের কোন বিয়েবাড়ীর থাই মনে হয়েছিল।

ধনী পরিবার স্যার হরপ্রসাদ রায়ের কমাত্র কন্যা সোমা-র সঙ্গে বর্মার এক নী ব্যবসায়ী সুধাংশু গুপ্তের শুভ-রিণয় সুসম্পন্ন হতে চলেছে। আমন্ত্রিত াত্মীয়-পরিজনে এক আনন্দ অনুষ্ঠানের াড়া পড়েছে। বর্মা শহরে এই নব-ম্পতির পরিচয় হয়। সেই সূত্রে লকাতায় এই কন্যাগৃহে আজ বিবাহের নুষ্ঠান। সেতু বন্ধনের মিলন দৃশ্যে ঠাৎ বাধা পড়ল এক প্রৌঢ় আগন্তুকের নুপ্রবেশে। কন্যাপক্ষের সকলে প্রথমটা াগল বলে উড়িয়ে দিতেই আগন্তুক ক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে ঠলেন।

—দেখুন, পাগল-টাগল নই মশাই। ামি জজ কোর্টের সিনিয়র এ্যাড-ভাকেট। এই সুরেন বাঁড়ুয্যেকে বুড়ো াকিমরা পর্যন্ত সমীহ করে চলে।

স্যার হরপ্রসাদ—ও সব রেখে দিন শাই। আপনার বক্তব্যটা কি বলে ফেলুন।

আগন্তুক—আমি কিন্তু আলাদাই লতে চেয়েছিলাম, পরে যেন আমায় াষ দেবেন না।

হরপ্রসাদ—আঃ, কী আজেবাজে ময় নষ্ট করছেন। যা বলার তা াড়াতাড়ি বলে ফেলুন।

আগন্তুক—বেশ শুনুন তাহলে। এ য়ে সুধাংশুবাবু করতে পারেন না।

আগন্তুক—এই তো, আপনি যখন র, নিশ্চয়ই সুধাংশু গুপ্ত। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। আপনি একটু দয়া করে উঠে আসুন।

সুধাংশু—আপনাকে তো চিনতে পারছি না।

হরপ্রসাদ—এই সময়ে সুধাংশুবাবুর সঙ্গে আপনার কি দরকার থাকতে পারে?

'শেষ অংক'র একটি দৃশ্যে পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য নির্দেশ দিচ্ছেন। দৃশ্যে উত্তমকুমার, পাহাড়ী সান্যাল ও শর্মিলা ঠাকুর

আগন্তুক—সেই সম্পর্কেই আমি কিছু বলতে এসেছি।

এই দৃশ্যটি শেষ করেই পরিচালকের নির্দেশে 'ব্রেক'-এর বিরতি অর্থাৎ মধ্যাহ্ন-আহারপর্বের ঘন্টা পড়ল। এই অবকাশে পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে ছবি সম্পর্কে কথা হল। কাহিনী জানতে চাইলে তিনি গল্পের সাসপেন্স-টুকু বাদ দিয়ে সংক্ষেপে মোটামুটি কাহিনীর কাঠামোটি বললেন—শুভ-বিবাহের সেই লগ্নে ঐ আগন্তুক এই কাহিনীর একটি বিশেষ চরিত্র হিসেবে স্থান পেলো। তার ভাষণে জানা গেল সুধাংশুবাবু নাকি এর আগে আর একটি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী জীবিত। আগন্তুকের সঙ্গেই সে নাকি এসেছে। মাথার অসুখ সেরে গিয়ে পূর্ব বধূ লতা সুস্থ। বিয়ের আসরে বাধা পড়ে। সমস্যা জটিল হলে কোর্টে বিচার চলে। এইটুকু বলে শ্রীভট্টাচার্য থামলেন। এর পরের শেষ অংকটি তিনি জানাতে চান না, কারণ মূল কাহিনীর ঐ সাসপেন্সটুকুর মধ্যেই শেষ পরিণতি রয়েছে। আগে থেকে বললে হয়তো দর্শকদের কৌতূহল কিছুটা স্তিমিত হ'তে পারে। 'শেষ অংক' ছবিতেই এর পরিণতি আপনারা দেখবেন। আগে থেকে নাইবা জানলেন!

বহু শিল্পীসমাবেশে এক একটি দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ শুরু হল। নাট-মন্দিরের প্রাঙ্গণে এই শুভবিবাহের যথাযথ দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলতে শিল্প-নির্দেশক রামচন্দ্র সিন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। চার দিকে আলোর মালা। শত কণ্ঠের সঙ্গে শঙ্খধ্বনি মিশেছে। চিত্রগ্রহণের এক একটি দৃশ্য ভাগ করে আলোকচিত্রশিল্পী কানাই দে সুদক্ষ হাতে ক্যামেরা এগিয়ে পিছিয়ে কাজ করে চলেছেন। সেই সঙ্গে সহকারীদের বিরাম নেই।

পরের দৃশ্যটিতে আগন্তুকের সঙ্গে

পূর্ব বধূ লতা এসেছে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। হঠাৎ ঘটে যাওয়া পরিবেশে আত্মীয়স্বজন সকলেই বিহ্বল। লতা ছুটে এসে সুধাংশুর কাছে মিনতি জানাল।

লতা—আমি মরিনি ও গো বিশ্বাস কর্মো। তোমার স্ত্রী বে'চে আছে।

সুধাংশু—কি বললেন, আপনি কে? আমার স্ত্রী!

লতা—সত্যিই আমায় চিনতে পারছো না। আমিই তোমার স্ত্রী। বিশ্বাস কর আমি ভাল হয়ে গেছি। আমার মাথার অসুখ আর একটুও নেই।

সুধাংশু—দারওয়ান, এ'কে বাড়ী থেকে বের করে দাও।

বারকয়েক মহড়ার পর ফাইন্যাল টেক শুরু করলেন পরিচালক। অভিনয় করলেন সুধাংশুর ভূমিকায় উত্তমকুমার, সোমা—শর্মিলা ঠাকুর, স্যার হরপ্রসাদ—পাহাড়ী সান্যাল, আগন্তুক সুরেন ব্যানার্জি—কমল মিত্র এবং লতার চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া এই ছবিতে অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন বিকাশ রায়, দীপক মুখার্জি, শিশির বটব্যাল, জীবেন বসু ও রেণুকা রায়।

কলাকুশলীদের মধ্যে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে সহপরিচালনায় সুশীল মুখার্জি ও রবীন মুখার্জি। আলোকচিত্রে মধুসূদন ভট্টাচার্য। শব্দ-প্রক্ষেপণে নৃপেন পাল ও সম্পাদনায় সন্তোষ গাঙ্গুলী। ব্যবস্থাপনায় কৈলাস বাগচী। কল্পনা মুভিজ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে 'শেষ অংক' ছবিটি প্রযোজনা করছেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। —চিত্রদূত

ভিনদেশী ছবি

॥ শ্রীমতী হাইডি ব্রুল-এর পার্ট মুখস্ত ॥

শ্রীমতী ব্রুল জার্মান চলচ্চিত্রের একটি জনপ্রিয় নাম। বারো বছর থেকেই ব্রুল জনচক্ষের মঞ্চে। তাঁর পার্ট মুখস্ত করার বাতিকটি বেশ কৌতুকজনক। আমাদের দেশে কোনো কিছু মুখস্থ করা তেমন ভীতিপ্রদ ব্যাপার নয় কারণ, অবলম্বন করেছেন পার্ট মুখস্থ করার। প্রথমেই তিনি রেডিও কিংবা একটা গ্রামোফোন ভীষণ জোরে বাজাতে আরম্ভ করে দেন। তার ফলে কানের পর্দা ফাটার ভয়ে বাড়ির লোকজন যে যেখানে আছে বাড়ি ছেড়ে পালায়। বাড়িটা নির্জন হলে কৌচে শুয়ে চিত্রনাট্য থেকে তাঁর ভূমিকাটা একবার মন দিয়ে পড়ে নেন

হাইডি ব্রুল

শিশুকাল থেকেই মুখস্থের জোরে আমরা স্কুল কলেজের সিঁড়ি ডিঙোতে আরম্ভ করি। পশ্চিমদেশে কিন্তু স্কুল কলেজে মুখস্থের হাত ধরে চলতে হয় না। তাই অভিনেতা অভিনেত্রী মহলে ভূমিকা মুখস্থ করাটা বেশ আয়াসসাধ্য ব্যাপার। ব্রুল একটা নিজস্ব উপায় ব্রুল। একবার মাত্র পড়ার পর প্রিয় ঘোড়াটির পিঠে চেপে বনে প্রান্তরে জোরে জোরে পার্টটি আবৃত্তি করতে করতে ঘুরতে থাকেন। এই প্রক্রিয়াটাই নাকি তাঁর মতে পার্ট মুখস্থ করার সবচেয়ে সহজ পন্থা।

—চিত্রকূট

উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা—১৯৬২

১৯৬২ সালের উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। প্রতিযোগিতার মোট পাঁচটি খেতাব অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা সমানভাবে ভাগ ক'রে নিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া পেয়েছে পুরুষদের সিঙ্গলস এবং পুরুষদের ডাবলস খেতাব; আমেরিকা পেয়েছে মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস। মিক্সড ডাবলস খেতাব কোন একটি দেশ পায়নি—অস্ট্রেলিয়ান এবং আমেরিকান জুটি এই খেতাব মিলিতভাবে নিয়েছে। গত বছরে অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল তিনটি খেতাব। বাকি দুটি খেতাব পৃথকভাবে পেয়েছিল আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড। গত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য কিছু হ্রাস পেয়েছে; অন্যদিকে আমেরিকা অপ্রত্যাশিতভাবে সাফল্যলাভ করেছে। অপ্রত্যাশিত সাফল্য এই কারণে যে, আমেরিকার পক্ষে যাঁরা খেতাব পেয়েছেন তাঁদের স্থান বিচারকমণ্ডলী দ্বারা রচিত খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকায় নীচের দিকে ছিল। মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন প্রতিযোগিতায় আট নম্বর বাছাই খেলোয়াড় মিসেস সুসম্যান (আমেরিকা) এবং মহিলাদের ডাবলস খেতাব যদিও গত বছরের চ্যাম্পিয়ান আমেরিকার মিসেস সুসম্যান এবং মিস মোফিট পেয়েছেন কিন্তু তাঁরা এ বছরের বাছাই তালিকায় প্রথম স্থান পাননি।

প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্য বিচার ক'রে সরকারীভাবে খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকা প্রতি বছর প্রকাশ করা হয়। এই তালিকা প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ অঙ্গ বলা চলে। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায়, এই বাছাই তালিকা অনুযায়ী খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করেন না। এ বছরের প্রতিযোগিতায় অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম ঘটেছে। বাছাই তালিকা অনুযায়ী পুরুষদের সিঙ্গলসে এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ফাইনালে জয়লাভ করেছেন। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটেছে প্রতিযোগিতার বাকি চারটি অনুষ্ঠানে। মহিলাদের সিঙ্গলসে খেতাব পেয়েছেন আট নম্বর বাছাই খেলোয়াড় আমেরিকার মিসেস সুসম্যান এবং ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অবাছাই খেলোয়াড় চেকোশ্লোভাকিয়ার মিসেস ভেরা সুকোভা। মিসেস সুকোভা প্রতিযোগিতার দুই নম্বর বাছাই খেলোয়াড় ডার্লিন হার্ড, তিন নম্বর বাছাই খেলোয়াড় এবং ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালের সিঙ্গলস বিজয়িনী মারিয়া বুইনো এবং ছয় নম্বর খেলোয়াড় এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান এ্যাঞ্জেলা মর্টিমারকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে খেলেছিলেন। পুরুষদের ডাবলসের খেতাব পেয়েছে দুই নম্বর জুটি এবং এই জুটির বিপক্ষে ফাইনালে খেলেছিল যুগোশ্লাভিয়ার অবাছাই জুটি। এ বছরের এক নম্বর জুটি এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান রয় এমারসন এবং নীল ফ্রেজার সেমি-ফাইনালে বিদায় নেন। মহিলাদের ডাবলসের এক নম্বর জুটি ফাইনালেই যেতে পারেনি। মিক্সড ডাবলসে খেতাব পেয়েছে তিন নম্বর জুটি। এক নম্বর জুটি এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান স্টোলি এবং লেসলী টার্ণার সেমি-ফাইনালে তিন নম্বর জুটির কাছে পরাজিত হ'ন।

১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় একমাত্র সিঙ্গলসের আট নম্বর বাছাই খেলোয়াড় মিসেস সুসম্যান (আমেরিকা) দু'টি অনুষ্ঠানে খেতাব লাভ করেছেন—মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে প্রতিযোগিতার একনম্বর বাছাই খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) স্ট্রেট সেটে স্বদেশবাসী মার্টিন মুলিগানকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বছর খেতাব লাভ করেছেন। ১৯২২ সাল থেকে উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড খেলার প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত মাত্র এই চারজন খেলোয়াড় উপর্যুপরি দু' বছর পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন—বৃটেনের ফ্রেড পেরী (১৯৩৪-৩৬), আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ (১৯৩৭-৩৮) এবং অস্ট্রেলিয়ার দুজন খেলোয়াড় লিউ হোড (১৯৫৬-৫৭) এবং রড লেভার (১৯৬১-৬২)। এই চারজনের মধ্যে ফ্রেড পেরীর সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি উপর্যুপরি তিনবার খেতাব পেয়েছিলেন। ১৯২২ সাল থেকে এ পর্যন্ত মাত্র দুজন খেলোয়াড় উপর্যুপরি চারবার সিঙ্গলসের ফাইনালে খেলেছেন ফ্রান্সের বারোত্রা (১৯২৪-২৭) এবং অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার (১৯৫৯-৬২)।

১৯৬২ সালের সিঙ্গলস ফাইনালে রড লেভারের প্রতিদ্বন্দ্বী মার্টিন মুলিগান খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকায় কোন স্থান পাননি; প্রতিযোগিতার ইতিহাসে বাছাই তালিকায় স্থান পাননি এমন খেলোয়াড় ফাইনালে খেলেছেন মাত্র চারজন—আমেরিকার উইলমার এ্যালিসন (১৯৩০), ডেনমার্কের কুর্ট নেলসন (১৯৫৫), অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার (১৯৫৯) এবং মার্টিন মুলিগান (১৯৬২)। এ্যালিসন ১৯৩০ সালে ডিক সেক্সাসের কাছে, রড লেভার ১৯৫৯ সালে এ্যালেক্স ওলমেডোর কাছে এবং মার্টিন মুলিগান ১৯৬২ সালে রড লেভারের কাছে পরাজিত হ'ন। দেখা যায়, এ পর্যন্ত কোন অবাছাই খেলোয়াড় খেতাব নিতে পারেননি। ১৯৬২ সালের ফাইনাল খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হ'তে ৫৩ মিনিট সময় লাগে—আজ পর্যন্ত যুদ্ধের পরবর্তী কোন ফাইনাল খেলাই এত কম সময়ের মধ্যে শেষ হয়নি। গত বছরের ফাইনালে জয়লাভ করতে রড লেভার ৫৭ মিনিট সময় নিয়েছিলেন। ১৯৬২ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস ফাইনালে জয়লাভের ফলে রড লেভার একই বছরে তিনটি—অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং উইম্বলেডন খেতাব লাভ করলেন; এখন বাকি শুধু আমেরিকান খেতাব। এই আমেরিকান খেতাব পেলেই রড লেভার ১৯৩৮ সালে ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা) প্রতিষ্ঠিত রেকর্ডের (একই বছরে বিশ্বের প্রখ্যাত চারটি টেনিস খেতাব লাভ) সমান অংশীদার হবেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে উনিশ বছরের মিসেস কারেন হান্জ সুসম্যান (আমেরিকা) স্ট্রেট সেটে ত্রিশ বছরের মিসেস ভেরা সুকোভাকে (চেকোশ্লোভাকিয়া) পরাজিত করেন। দীর্ঘ চার বছর পর আমেরিকা মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেল। মিসেস সুসম্যান এ বছরের বাছাই তালিকায় শেষ স্থান (৮ম স্থান) পেয়েছিলেন। অপরদিকে মিসেস সুকোভা কোন স্থানই পাননি। কিন্তু তিনি গত বছরের চ্যাম্পিয়ান এ্যাঞ্জেলা মার্টিমারকে (৬নং বাছাই), ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান মারিয়া বুইনোকে (৩নং বাছাই) এবং আমেরিকার ডার্লিন হার্ডকে (২নং বাছাই) পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিলেন। ফলে লোকের দৃঢ়

১৯৬২ সালের উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়িণী আমেরিকার মিসেস কারেন সুসম্যান (ট্রফি হাতে)। পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ফাইনাল খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী মিসেস ভেরা সুকোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া)

ধারণা হয়েছিল মিসেস সুকোভা ফাইনালে আট নম্বর খেলোয়াড় মিসেস সুসম্যানকে সহজেই পরাজিত ক'রে সিঙ্গলস খেতাব পাবেন। মিসেস সুকোভা খেলার শেষ পর্যায়ে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। কিন্তু ফাইনালে মিসেস সুকোভা তাঁর আসল খেলা দেখাতে পারলেন না। খেলার আগের দিন হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তাঁর পায়ে মোচড় লাগে। পায়ে ব্যথা নিয়েই তাঁকে ফাইনালে নামতে হয়েছিল। উইম্বলেডন খেলার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোন অবাছাই খেলোয়াড় মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পাননি। মিসেস সুকোভার খেলা থেকে লোকের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল তিনি উইম্বলেডন খেলার ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করবেন। কিন্তু মিসেস সুকোভার দুর্ভাগ্য, তাঁকে দুর্ঘটনার কাছে শেষে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল যেমন এবার করতে হয়েছিল ভারতবর্ষের রমানাথন এবং অস্ট্রেলিয়ার রয় এমারসনকে।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : এক নম্বর খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৬-২ ও ৬-১ গেমে মার্টিন মুলিগানকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু'বার সিঙ্গলস খেতাব লাভ করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : আট নম্বর খেলোয়াড় মিসেস কারেন হানজে সুসম্যান (আমেরিকা) ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে মিসেস ভেরা সুকোভাকে (চেকোশ্লোভাকিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস : দুই নম্বর বাছাই জুটি বব হিউইট এবং ফ্রেড স্টোলী (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৫-৭, ৬-২ ও ৬-৪ গেমে বোরো জোভানোভিক এবং নিকোল্লা পিলিককে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস : মিসেস সুসম্যান এবং বিলি জিন মোফিট (আমেরিকা) ৫-৭, ৬-৩ ও ৭-৫ গেমে মিসেস সান্ড্রা প্রাইস এবং মিস রিনি স্কুরম্যানকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস : তিন নম্বর বাছাই জুটি নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) এবং মিসেস ডুপন্ট (আমেরিকা) ২-৬, ৬-৩ ও ১৩-১১ গেমে আর ডি র‍্যালস্টন (আমেরিকা) এবং এ্যান হেডনকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

সেমিফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনাল খেলায় অস্ট্রেলিয়া নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করেছিল—চারজন খেলোয়াড়ই ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার। এক দিকে খেলেছিলেন গত বছরের চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় রড লেভার এবং নীল ফ্রেজার। ১৯৬০ সালের সিঙ্গলস বিজয়ী ফ্রেজার এ বছরে তিন নম্বর স্থান পেয়েছিলেন। ন্যাটা খেলোয়াড়দ্বয়ের এই সিঙ্গলস খেলাটি খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। টেনিস খেলার বিশেষজ্ঞ মহলের মতে এই খেলাটিই এ বছরের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ খেলা এবং পুরুষের দিক থেকে ফাইনাল খেলা—বাছাই তালিকার এক এবং তিন নম্বর খেলোয়াড়ের খেলা। লেভার ১০-৮, ৬-১ ও ৭-৫ গেমে ফ্রেজারকে পরাজিত ক'রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন।

অপর দিকের সেমি-ফাইনালে খেলেছিলেন মার্টিন মুলিগান এবং নীল ফ্রেজারের ভাই ডাঃ জন ফ্রেজার। এঁরা দুজনই বাছাই তালিকায় কোন স্থান পাননি। মুলিগান ৬-৩, ৬-২ ও ৬-২ গেমে ফ্রেজারকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠেন। অস্ট্রেলিয়ার এই ফ্রেজার ভ্রাতৃদ্বয় এ বছরের সেমি-ফাইনালে খেলে আধুনিক কালের প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করেছেন। দুই ভাইয়ের সেমি-ফাইনাল খেলার নজির আধুনিক কালের প্রতিযোগিতায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

মহিলাদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কোন খেলোয়াড় ছিলেন না। এক দিকের সেমি-ফাইনালে মিসেস ভেরা সুকোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া) ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে তিন নম্বর বাছাই খেলোয়াড় মারিয়া বুইনোকে (ব্রেজিল) পরাজিত ক'রে ফাইনালে যান। বুইনো ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন; গত বছর প্রতিযোগিতা আরম্ভের মাত্র কয়েক দিন আগে ন্যাবা রোগে আক্রান্ত হওয়াতে তিনি প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করেছিলেন। মিসেস সুকোভার এই জয়লাভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ—উইম্বলেডন প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগে এই প্রথম চেকোশ্লোভাকিয়ার ফাইনাল খেলা। তাছাড়া ১৯৩৭ সালের পর এই প্রথম ইউরোপ মহাদেশ অন্তর্ভুক্ত দেশের খেলোয়াড় মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে

খেলবার যোগ্যতা লাভ করলেন। মিসেস সুকোভার এই জয়লাভ 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার' পর্যায়ে পড়ে না। তিনি চতুর্থ রাউণ্ডে গত বছরের মহিলাদের সিংগলস চ্যাম্পিয়ান বৃটেনের এ্যাঞ্জেলা মর্টিমারকে (৬নং বাছাই) এবং কোয়ার্টার ফাইনালে দুই নম্বর বাছাই খেলোয়াড় ডার্লিন হার্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেছিলেন। একজন অবাছাই খেলোয়াড়ের পক্ষে এই রকম সাফল্য খুবই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তাছাড়া মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে এই প্রথম একজন অবাছাই খেলোয়াড়কে দেখা গেল।

মহিলাদের অপর দিকের সেমি-ফাইনালে আট নম্বর বাছাই খেলোয়াড় করেন হানজে সুসম্যান (আমেরিকা) ৮-৬ ও ৬-১ গেমে পাঁচ নম্বর খেলোয়াড় এ্যান হেডনকে (বৃটেন) পরাজিত করেন। এ্যান হেডন এই নিয়ে তিনবার সেমি-ফাইনালে খেললেন। ১৯৫৮ সালে আলথিয়া গিবসনের (আমেরিকা) এবং গত বছর সান্ড্রা রেনল্ডসের কাছে (দক্ষিণ আফ্রিকা) পরাজিত হয়েছিলেন। আমেরিকার স্বল্পখ্যাত খেলোয়াড় বিলি জিন মোফিট প্রথম রাউণ্ডের খেলায় প্রতিযোগিতার এক নম্বর খেলোয়াড় মার্গারেট স্মিথকে (অষ্ট্রেলিয় পরাজিত ক'রে যথেষ্ট বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিলেন। এ্যান হেডন (বৃটেন) তাঁকে কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত ক'রে আমেরিকার সুসম্যানের সংগে সেমি-ফাইনালে মিলিত হন।

পুরুষদের ডাবলসের বাছাই তালিকায় প্রথম তিনটি স্থানই পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার জুটি—১ম স্থান গত বছরের চ্যাম্পিয়ান নীল ফ্রেজার এবং রয় এমারসন, ২য় স্থান বব্ হিউইট এবং ফ্রেড ষ্টোলী এবং ৩য় স্থান রড লেভার এবং জন ফ্রেজারের জুটি। সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়ার এই তিনটি জুটিই উঠেছিলেন। একদিকের সেমি-ফাইনালে বোরো-জোভানোভিক এবং নিকোলা পিলিক (যুগোশ্লাভিয়া) ৪-৬, ৬-৩, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের এক নম্বর জুটি রয় এমারসন এবং নীল ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত ক'রে বিস্ময়ের উদ্রেক করেন। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে দুই নম্বর জুটি বব্ হিউইট এবং ফ্রেড ষ্টোলি (অস্ট্রেলিয়া) ৮-৬, ৫-৭, ৭-৫ ও ৬-২ গেমে তিন নম্বর জুটি রড লেভার এবং জন ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত ক'রে ফাইনালে যান।

মিক্সড ডাবলসের এক নম্বর বাছাই জুটি ফ্রেড স্টোলী এবং লেসলী টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) সেমি-ফাইনালে নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) এবং ডু পন্টের কাছে (আমেরিকা) পরাজিত হন।

মহিলাদের ডাবলসের এক নম্বর বাছাই জুটি মারিয়া বুইনো (ব্রেজিল) এবং ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) সেমি-ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মিসেস প্রাইস এবং মিস স্কুরম্যানের কাছে পরাজিত হন।

সেমি-ফাইনাল

পুরুষদের সিংগলস :

এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ১০-৮, ৬-১ ও ৭-৫ গেমে তিন নম্বর বাছাই খেলোয়াড় নীল ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মার্টিন মুলিগান (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-২ ও ৬-২ গেমে জন ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন। এই দু'জন খেলোয়াড়ই বাছাই তালিকায় কোন স্থান পাননি।

মহিলাদের সিংগলস :

মিসেস ভেরা সুকোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া) ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে তিন নম্বর বাছাই খেলোয়াড় মারিয়া বুইনোকে (ব্রেজিল) পরাজিত করেন। মিসেস সুকোভার বাছাই তালিকায় কোন স্থান ছিল না।

আট নম্বর বাছাই খেলোয়াড় মিসেস কারেন হাঞ্জ সুসম্যান (আমেরিকা) ৮-৬ ও ৬-১ গেমে পাঁচ নম্বর খেলোয়াড় এ্যান হেডনকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস :

মিসেস এল ই জি প্রাইস এবং মিস স্কুরম্যান (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৬-৩ ও ৬-৩ গেমে মারিয়া বুইনো (ব্রেজিল) এবং ডার্লিন হার্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

বিলি মোফিট এবং মিসেস কারেন হাঞ্জ সুসম্যান (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) এবং জে ব্রিকাকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস :

বব হিউইট এবং ফ্রেড স্টোলী (অস্ট্রেলিয়া) ৮-৬, ৫-৭, ৭-৫ ও ৬-২ গেমে রড লেভার এবং জন ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

বোরো জোভানোভিক এবং নিকোলা পিলিক (যুগোশ্লাভিয়া) ৪-৬, ৬-৩, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে ১৯৬১ সালের বিজয়ী এবং এ বছরের এক নম্বর বাছাই জুটি রয় এমারসন এবং নীল ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস :

আর ডি র‍্যালস্টন (আমেরিকা) এবং মিস এ্যান হেডন (বৃটেন) ৬-৩, ৮-১০ ও ৬-৪ গেমে আর হাউ (অস্ট্রেলিয়া) এবং মিস মারিয়া বুইনোকে (ব্রেজিল) পরাজিত করেন।

নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) এবং মিস ডু পন্ট (আমেরিকা) ৪-৬, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে এক নম্বর বাছাই জুটি ফ্রেড স্টোলী এবং মিস লেসলী টার্ণারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তান তৃতীয় টেস্ট

ইংল্যাণ্ড : ৪২৮ রাণ (পারফিট ১১৯, স্টুয়ার্ট ৮৬, এ্যালেন ৬২। মুনির ১২৮ রাণে ৫ উইকেট)

পাকিস্তান : ১৩১ রাণ (আলিমুদ্দীন ৫০। ডেক্সটার ১০ রাণে ৪, ট্রুম্যান ৫৫ রাণে ২, স্ট্যাথাম ৪০ রাণে ২ এবং টিটমাস ৩ রাণে ২ উইকেট) ও ১৮০ রাণ (আলিমুদ্দিন ৬০ এবং সৈয়দ আমেদ ৫৪। স্ট্যাথাম ৫০ রাণে ৪, এ্যালেন ৪৭ রাণে ৩ এবং ট্রুম্যান ৩৩ রাণে ২ উইকেট)

প্রথম দিন (৫ই জুলাই) : ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট পড়ে ১৯৪ রাণ। পারফিট ৩১ এবং মারে ৩ রাণ করে নটআউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (৬ই জুলাই) : ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৪২৮ রাণে সমাপ্ত। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট পড়ে ৭৩ রাণ। মুস্তাক মহম্মদ (২) এবং হানিফ মহম্মদ (০) নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিন (৭ই জুলাই) : পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১৩১ রাণে এবং তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের সাত মিনিট আগে দ্বিতীয় ইনিংস ১৮০ রাণে সমাপ্ত।

লিডসে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তানের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস এবং ১১৭ রাণে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে। পাঁচ-দিনের টেস্ট খেলা তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের সাত মিনিট আগে শেষ হয়। এই জয়লাভের ফলে ইংল্যাণ্ড ৩—০ টেস্ট খেলায় জয়ী হয়ে ১৯৬২ সালের টেস্ট সিরিজে 'রাবার' লাভ করেছে। এখনও দুটি টেস্ট খেলা বাকি—চতুর্থ এবং পঞ্চম টেস্ট।

লিডসের তৃতীয় টেস্ট খেলায় কলিন কাউড্রে ইংল্যাণ্ড দল পরিচালনা করেছিলেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্ট খেলার অধিনায়ক টেড ডেক্সটার অবিশ্যি তৃতীয় টেস্টে খেলেছিলেন। পাকিস্তানের অধিনায়ক জাবেদ বার্কি টসে জয়লাভ করেও প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ নেননি, ইংল্যাণ্ডকে দান ছেড়ে দেন। পাকিস্তান এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে ৪০টা টেস্ট ম্যাচ খেলে ২২টা খেলায় টসে জয়লাভ করেছে; কিন্তু টসে জয়লাভ ক'রে এই প্রথম বিপক্ষ দলকে ব্যাট করতে ছেড়ে দেয়।

প্রথম দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি; বৃষ্টি এবং আলোর অভাবে ৮৭ মিনিট খেলার সময় নষ্ট যায়। আবহাওয়া খুবই দুর্যোগপূর্ণ ছিল—কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস উপেক্ষা ক'রে মাত্র ২০০০ হাজার দর্শক টস্ করার সময় মাঠে উপস্থিত ছিল। প্রথম দিনে পাকিস্তান খেলায় প্রাধান্য লাভ করে—৬টা

উইকেট পড়ে ইংল্যান্ডের ১৯৪ রাণ। ইংল্যান্ড মাত্র এক ঘণ্টা পাকিস্তানের বোলিংয়ের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে খেলেছিল। ওপনিংব্যাটসম্যান স্টুয়ার্টের সঙ্গে ৩য় উইকেটে টম গ্রেভনী খেলতে নামেন। এই জুটি ৬৯ মিনিটের খেলায় দলের ৬৫ রাণ তুলেছিলেন।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের খেলাকে ভদ্রস্থ করেছিলেন পারফিট (১১৯ রাণ) এবং ডেভিড এ্যালেন (৬২ রাণ)। পারফিট ২৬৬ মিনিট খেলে ১১৯ রাণ করেছিলেন, বাউন্ডারী ছিল ১৮টা। এ্যালেন খেলেছিলেন ১৫৩ মিনিট, রাণ ৬২। ৭ম উইকেটের জুটিতে পারফিট এবং মারে দলের ৬৭ রাণ এবং ৮ম উইকেটের জুটিতে পারফিট এবং এ্যালেন দলের ৯৯ রাণ তুলেছিলেন। শেষ উইকেটের জুটিতে দলের ৫১ রাণ উঠেছিল মাত্র ২৮ মিনিটের খেলায়।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে ৩টে উইকেট পড়ে ৭৩ রাণ ওঠে।

তৃতীয় দিনে প্রথম ৯০ মিনিটের খেলায় পাকিস্তানের বাকি ৭টা উইকেট পড়ে যায়; এই ৭টা উইকেটে এইদিন মাত্র ৫০ রাণ ওঠে। বেলা ১টায় পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১৩১ রাণে শেষ হয়। ফলে ১৯১ রাণের ব্যবধানে পিছনে পড়ে পাকিস্তান ফলো অন করে। দ্বিতীয় ইনিংস (১৮০ রাণ) শেষ হয় খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের সাত মিনিট আগে। পাকিস্তানের আলিমুদ্দিন যা খেলেছিলেন—প্রথম ইনিংসে ৫০ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ রাণ। তাঁর পরই সৈয়দ আমেদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৫৪ রাণ উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের দল গঠনে বেশ কিছুটা নীতিগত ত্রুটি ছিল। হানিফ মহম্মদের দুই হাত এবং হাঁটুর চোট উপেক্ষা করে তাঁকে দলভুক্ত করা হয়েছিল। তিনি ব্যাটিং (৯ ও ৪ রাণ) এবং ফিল্ডিংয়ে কোনই সাহায্য করতে পারেননি। হানিফ মহম্মদের অসহায় অবস্থার সুযোগ ইংল্যান্ড পুরোপুরি নিয়েছিল। বলগুলি কি জেনেশুনেই তাঁকে তাড়া করেছিল! তাঁর পক্ষে কিছুই করার ছিল না। দ্বিতীয় ত্রুটি, অফ্-স্পিনার জাবেদ আখ্তারকে দলভুক্ত করা। ইংল্যান্ড সফরে তিনি একটা ম্যাচও খেলেননি না অথচ ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে টেস্ট দলে স্থান পেলেন। ১৬ ওভার বলে ৫০ রাণ দিয়ে একটা উইকেটও তিনি পাননি।

কর্মযোগী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ভারতরত্ন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আকস্মিক তিরোধানে আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে আজ এক মহাশূন্যতা দেখা দিয়েছে। পশ্চিম বাংলার ক্রীড়া-মহলও সেই শূন্যতায় মুহ্যমান। ডাঃ রায় খেলাধুলোয় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সমস্যাসংকুল পশ্চিম বাংলার শত ভাবনা-চিন্তায় তিনি নিজেকে এমনভাবে উৎসর্গ করেছিলেন যে, গত কয়েক বছর তাঁর পক্ষে ক্রীড়ানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে জনসাধারণকে খেলাধুলোয় উৎসাহিত করা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি নিয়মিতভাবে খেলাধুলোর খোঁজখবর রাখতেন। পশ্চিম বাংলার খেলাধুলোর সমস্যা সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিম বাংলার খেলাধুলোর বর্তমান পরিস্থিতি এবং খেলাধুলোর বিবিধ সমস্যা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং তাঁরই চেষ্টায় কলকাতায় স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা আজ সফল হতে চলেছে।

ডাঃ রায়ের আত্মার প্রতি সম্মান রক্ষার্থে কলকাতা ময়দানের সমস্ত খেলাধুলো তিনদিন বন্ধ ছিল।

॥ বিশ্ব জিমন্যাস্টিক্স ॥

দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ

প্রথম : জাপান (৫৭৪·৬৫ পয়েন্ট
দ্বিতীয় : রাশিয়া (৫৭৩·১৫)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান

ইউরি টিটোভ (রাশিয়া), ১১৫·৬৫

॥ ফুটবল লীগ ॥

গত সপ্তাহে (২রা জুলাই থেকে ৮ই জুলাই) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোট ১০টা খেলা হয়েছে—জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে ৬টা খেলায় এবং খেলা ড্র গেছে ৪টে খেলা।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাব আলোচ্য সপ্তাহে ২টো ম্যাচ খেলেছে। ইস্টবেঙ্গল বনাম বাটা স্পোর্টস ক্লাবের খেলায় বাটা দল খেলা ভাঙ্গার ৪০ সেকেন্ড আগে একটা গোল দেয়। এই গোল নিয়ে রেফারী এবং ইস্টবেঙ্গল দলের গোলরক্ষকের মধ্যে প্রথম মতবিরোধ হয়। পরে ইস্টবেঙ্গল দলের অন্য কয়েকজন খেলোয়াড় গোল-রক্ষককে সমর্থন করেন। মাঠের সাধারণ দর্শকদের গ্যালারী থেকে যথারীতি মাঠের মধ্যে ইট ... পড়তে থাকে। রেফারী গোলের নির্দেশ দিয়ে পুনরায় খেলা আরম্ভের জন্যে আহ্বান জানান। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দল এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। ৪০ সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর রেফারী খেলা ভাঙ্গার সংকেত দেন। ইস্টবেঙ্গল দলের গোল-রক্ষকের মতে বাটা স্পোর্টস দল অফ্-সাইড আইন ভঙ্গ ক'রে গোল দিয়েছিল। অপর দিকে লাইন্সম্যান তাঁর এই মত সমর্থন করেননি। রেফারী লাইন্স-ম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। ইস্টবেঙ্গল বনাম বি এন আর দলের খেলা ১—১ গোলে ড্র যায়।

মোহনবাগান ক্লাব আলোচ্য সপ্তাহে একটা ম্যাচ খেলেছে, মোহনবাগান ... জয় ১—০ গোলে হাওড়া ইউনা... বিপক্ষে।

গত ব... বি এন আর পর ... ক'রে ... বিপক্ষে ১—১ গোলে ড্র ... পুরের বিপক্ষে ০—০ গোলে ... ক'রে দু' পয়েন্ট পেয়েছে।

দ্বিতীয় বিভাগের লীগের খেলায় পোর্ট কমিশনার্স ১৪টা খেলায় ২২ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম এবং তৃতীয় বিভাগের লীগের খেলায় রেঞ্জার্স ১৩টা খেলায় ২১ পয়েন্ট ক'রে উপস্থিত প্রথম স্থান অধিকার ক'রে আছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পান্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সত্যজিৎ রায় ও
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
সম্পাদনায়
ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্র
মে ১৯৬২। বৈশাখ ১৩৬৯
থেকে ২য় বর্ষ
সুরু!
প্রতি সংখ্যা ৭৫ নঃ পঃ
বার্ষিক চাঁদা ৯ টাকা

সূচী পত্র

অমৃত

অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 20th July, 1962.
40 Naya Paise.

কলিকাতায় কলেরা মহামারীর আকারে দেখা দিয়াছে। এই মহামারীর প্রকোপে কলিকাতার কয়েকটি অঞ্চলের নাগরিকদিগের জীবন বিপন্ন হইয়াছে এবং সেই সকল স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রত্যহই কলেরার সংক্রমণে বহুলোক সাংঘাতিকভাবে রোগাক্রান্ত হইতেছে। যে সকল রোগী সময়মত হাসপাতালে পৌঁছাইতে পারিতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকে আরোগ্য-লাভ করিতেছে বটে, কিন্তু রোগী পরিবহণের অভাবে কিছু লোক প্রায় বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে। হাসপাতালেও বেশ কিছু রোগী মরিতেছে। কলেরা হইতে মৃত্যুর সংখ্যা এখন ভয়াবহ পরিমাণে দেখা যাইতেছে। এই সকল কথা এখন তর্কের অতীত বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে।

কলেরা, টাইফয়েড, সংক্রামক হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগ শুধু পানীয় ও খাদ্যের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে—ইহাও চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠিত মত। ঐ জাতীয় রোগ এবং যাবতীয় সংক্রামক রোগের প্রতিরোধের প্রকৃষ্ট উপায় প্রচুর পরিশ্রুত ও জীবাণুশূন্য জল-সরবরাহ এবং নগরের আবর্জনা ও মল-ক্লেদ নিষ্কাশনের সক্ষম ও সক্রিয় ব্যবস্থা, এ বিষয়েও সকল বিশেষজ্ঞ একমত। অবশ্য সেই সঙ্গে সংক্রামক রোগের প্রতিষেধকের ব্যবহার ও রোগাক্রান্তের চিকিৎসারও পূর্ণ আয়োজন আবশ্যক। এই সকল ব্যবস্থা যদি যথাযথভাবে ও যথেষ্ট পরিমাণে সচল থাকে, তবে নগরে সংক্রামক রোগ ব্যাপকভাবে ছড়াইতে পারে না ইহাও সর্বজনবিদিত।

কলিকাতায় ঐ সকল ব্যবস্থার সকল দিকেই ত্রুটি থাকায় এই মহামারী দেখা দিয়াছে—সে কথা সকল সংবাদপত্র প্রচারিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। এবং এই নিদারুণ অবস্থার প্রতিকার যে আশু প্রয়োজন সে বিষয়েও সকলে একমত। তর্কের অবকাশ আছে শুধু দোষ-ত্রুটির দায়িত্ব-নির্ণয়ে এবং প্রতিকার কাহার কর্তব্য তাহা নির্ধারণে। আমরা আশ্চর্য হইয়া দেখিতেছি যে, ঐ তর্কেই এতকাল অতিবাহিত হইয়াছে কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মহলে। এখন যদিবা সরকার নগরের আবর্জনা পরিষ্কার ও মহামারী-নিরোধে অগ্রসর হইয়াছেন, পৌরসভায় তাহাতে ক্ষোভ দেখা দিয়াছে কর্তৃত্বের ব্যাপার লইয়া।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান যে এই মহানগরীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রুত ও বীজাণুশূন্য পানীয় জলের সরবরাহ এবং পথঘাট ও পল্লী মল-ক্লেদমুক্ত ও আবর্জনাশূন্য করিতে অক্ষম ও অপারগ, তাহার বাস্তব ও বিকট সাক্ষ্য দিতেছে নগরের অসংখ্য বস্তী নামক নরককুণ্ড এবং প্রকাশ্য রাজপথের দুর্গন্ধময় গলিত আবর্জনাস্তূপ। এ অসামর্থ্য ও ব্যর্থতার কারণ কি তাহা নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখন সেই অক্ষমতার বিষময় প্রতিক্রিয়ায় জর্জরিত নাগরিকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা ও মৃত্যুভয় হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করাই সর্বাপেক্ষা জরুরী কর্তব্য। যেখানে নাগরিক-জীবন বিপন্ন সেখানে কর্তৃত্ব ইত্যাদির প্রশ্ন শুধু যে সময়োচিত নহে তাহাই নয়, উহা সম্পূর্ণ অবান্তর।

কলিকাতা নগরের ক্লেদনালীর জলনিষ্কাশন, আবর্জনা-পরিষ্কার এবং মহামারী-নিরোধের ব্যবস্থা পূর্ণরূপে সক্রিয় করিতে রাজ্যসরকার অগ্রসর হইয়াছেন, একথা সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় এবং সবিস্তারে বলিয়াছেন। তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, তিনি আশা করেন যে, কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান রাজ্যসরকারের এই সক্রিয় সহযোগিতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবে। যদি ঐ সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করা হয় অথবা যদি এই সদিচ্ছাজনিত সহযোগিতাকে পৌর-প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ আখ্যা দিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয় তবে সেই দুঃখজনক পরিস্থিতির দরুণ রাজ্যসরকার কলিকাতার ৫০ লক্ষ নাগরিকের প্রতি তাঁহাদের যাহা ন্যায়নীতিসম্পন্ন কর্তব্য তাহা পালনে দ্বিধা করিবেন না—এ কথাও তিনি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা আশা করি কার্যক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের এই সিদ্ধান্তের কোনও ব্যতিক্রম দেখা যাইবে না।

পৌরসভায় কলিকাতার 'পৌরপিতা'দিগের আলাপ-আলোচনার সারবত্তা স্বীকার করিতে আমরা অক্ষম। কলিকাতার নাগরিক তাঁহাদের উপর যে দায়িত্ব, যে কর্তব্যের ভার দিয়াছে, তাহা পালনে তাঁহারা অক্ষম এবং তাহার ফলে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এহেন অবস্থায় তাঁহাদের কাজ যদি অন্য কেহ করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহার কাজের পথ সরল করিয়া দিলে তাহা শোভন ও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচায়ক হইত।

কবিতা ॥ ॥ কবিতা

তোমার বিন্দু

—লোকনাথ ভট্টাচার্য

একটি হঠাৎ বেদনার পরিক্রমায় তোমার বিন্দুটিকে
ছুঁয়ে এলাম, অতর্কিতে,
অনিশ্চিতে। জেনেও জানলাম না।

তারপর গোধূলি এল, শেষ পথে লোক এল-গেল,
কেউ কাউকে বললে ভাই,
হাতে হাত রাখল। পরে, আর কেউ এল না, গেল না—
রাস্তা মিলিয়ে
গেল অন্ধকারের স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে। কোথায় দূরে
যূথীর গন্ধ। আরো
দূরে, অরুন্ধতী।

সবই রইল, রয়েছে—যদিও দেখার অন্তরালে;
কেবল আমার প্রাণের
মুহূর্তটি হারিয়ে গেল, তাকে চিনিনি যখন চেনার ছিল।
অদূরের
আবছা মূর্খ চালাটার বিদ্রূপে যেন বুকে বেসুরে
সরোদ বাজায়। শেল
বিঁধছে।

তবু আনন্দ—ভীষণ, বিভাসিত। যন্ত্রণা।

কাকে ডাকব ভাই ব'লে? ডাকতে চাই।

একটি কবিতা

উৎপলকুমার বসু

ফল তাকে খেতে চায়। পাতা তাকে চেয়েছে ঝরাতে
দূত তাকে ঠেলে দেয় ক্রমাগত মালঞ্চে, বাতাসে
ঐখানে অবিশ্রাম কেশকলাপের মূলে ঢেউ লেগে
মদ্যপের রাণী
ভৃঙ্গারে চলকে ওঠা দুধটুকু খায় পূর্ণিমায়

নাবিক যা কিছু জানে—নক্ষত্রের ফুলে ওঠা পাল,
নদীর মোহনা, বালি, নারিকেলপুঞ্জে নীল মেঘ করে আসে
বাঘের সতর্ক চোখ, নেউলের উদ্যম, নখর,
কারো কোনো কাজ নেই, আলস্যের মূল হ'তে
সবই অভিপ্রায়

ছিঁড়ে নিয়ে লাল ফুল, সতর্কতা জ্বলে দূর
কার্থেজের তীরে।

মধ্যপদলোপী

হীরালাল দাশগুপ্ত

ইতিহাস কাঁদে ভূগোলের কারাগারে
ঢেউ সমুদ্র গর্জন করে অরণ্যে
কয়লাখনিতে সূর্যের ঝিলিমিল্!
ডানা ঝাপ্‌টায় পৃথিবী অন্ধকারে
তুষ্ট শিবের বরদান সতী শরণ্যে
জীবন-পাত্র মৃত্যু-মদে কে নিল!
আকাশের নীল আমন্ত্রণের সুরে
শূন্যে বিলীন চিল!

বক্র রেখায় ভ্রমণ চক্রাকারে
বেদের সূত্র ভাষ্যে কণ্টকিত
বিস্তৃতিহীন স্থিতির শূন্যে রথ!
মূর্খ-আঘাত মুক্ত গৃহের দ্বারে
কার্য-কারণ শত-রেখা-অঙ্কিত
প্রথমার পায়ে বহুবচনের পথ!
সুখদা বনিতা হয়না স্বয়মাগতা
আছে মন—নেই মত।

ভারি একটা মজার ব্যাপার ঘটছে আজকাল, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই? আমরা যখন শহরের আবর্জনা, বস্তি, জলাভাব, কলেরা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনামনস্ক, ঠিক সেই সময় আরো একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে মাঝেমাঝে।

অবশ্য আশ্চর্য বলা বোধহয় ঠিক নয়। কারণ, আমি শুনেছি, কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে বার-বার বিস্ময় প্রকাশ করা ন্যাকামির পর্যায়ে পড়ে। যে ব্যাপারটা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা নতুন নয়। গত বছরও ঠিক এমনি সময়, প্রায় এইভাবেই শুরু হয়েছিল ঘটনাটি। আর তখন সোরগোলও আমরা করেছিলাম যথেষ্টই। কাজেই এবছরে তার পুনরাবৃত্তিতে অবাক হওয়া যাবে না। বিস্মিত হব বরং এই ব্যাপারটা দেখে যে, আমরা কতো সহজে একটা পুরনো অভিজ্ঞতাকে ভুলে যেতে পারি।

ভুলেই গিয়েছিলাম বটে! নাহলে এর জন্যে প্রস্তুত থাকতাম, বেকায়দায়-পড়া প্রাণীর মতো ছটফট করতাম না।

আমি বলছিলাম বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা! মাঝেমাঝে সে ব্যবস্থায় যে আজকাল ছেদ পড়ছে, এ তো প্রায় পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু গত বছরের চেয়ে এবছরে তার জন্যে আমরা বেশি প্রস্তুত থাকতে পারিনি। আমি বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি, কলকাতায় এবছরে মোমবাতি বা হাতপাখার দোকান বেশি করে খোলা হয়নি। অথচ পরিস্থিতি অনুকূল ছিল। কেন-যে তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারিনি আমরা সেইটেই আশ্চর্যের।

সত্যি ভেবে দেখুন, ব্যবসার কথা ছেড়ে দিলেও, রুচির দিক দিয়েও কি সেটা কম নতুনত্বের হত? বাংলা উপন্যাসে যেভাবে একদা নায়ককে খেতে বসিয়ে নায়িকাকে দিয়ে হাতপাখার হাওয়া করানো হত, নিছক আর্টিস্টিক কম্পোজিশন হিসেবে তার জুড়ি মেলা ভার। সেই খাঁটি বাংলার দেশজ প্রথাটিকে অনায়াসেই ফিরিয়ে আনতে পারতাম আমরা। তাছাড়া সেজবাতির প্রচলন করে হয়তো আমাদের চক্ষুরত্নগুলিকেও বাঁচাতে পারতাম চশমার আক্রমণ থেকে। এ সুযোগ আমরা হেলায় নষ্ট করলাম।

জানিনে, কী আশায় হাত গুটিয়ে বসেছিলাম এতদিন। আমরা কি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম যে, যন্ত্রগত যে কারণে গত বছর বিদ্যুৎ সরবরাহে অকুলান ঘটেছিল, এবছর তার সংশোধন হবে? কিন্তু অন্য দশটা ব্যাপারের অভিজ্ঞতা কি এই ধরণের বিশ্বাস জন্মানোর সপক্ষে? আমাদের স্মরণ-কাল পর্যন্ত বরং এইটেই কি আমরা বছরে বছরে দেখে আসিনি যে, এ দুর্ভাগ্য শহরে যা একবার যায়, তা আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না? তবে?

অবশ্য এ সব প্রশ্নের কোনো জবাব হয় না, তা আমি জানি। এসব হল প্রায় আত্মজিজ্ঞাসার মত দার্শনিক ব্যাপার। উত্তর পেয়ে গেলে প্রশ্নটাই বড় অকিঞ্চিৎকর শোনায়। কাজেই এসব কথা ছেড়ে বাস্তবে যে অবস্থা আছে সেইদিকেই বরং মনোযোগ নিবন্ধ করা যাক এবার।

বাস্তব পরিস্থিতি হল—বিদ্যুৎ সর-বরাহে অনিশ্চয়তা। এই আকস্মিকতার মধ্যে মজা আছে, আবার দুঃখও আছে। অনেকটা ঠিক নাটকের মতো। ট্র্যাজেডির আশেপাশে কমিক রিলিফের ব্যবস্থা। দর্শকের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে ব্যাপারটা কম উপভোগ্য মনে হওয়ার কথা নয়।

ধরা যাক রামবাবু নামে এক ভদ্র-লোকের কথা। ভীষণ রাশভারী মানুষ, বাড়ির লোক ভয়ে তটস্থ। কিন্তু তাঁর যে এমন ভূতের ভয় আছে তা কেউ জানত না। অবশ্য তাঁর স্ত্রীর কথা স্বতন্ত্র, তিনি ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিলেন প্রথম জীবনেই। কিন্তু তাঁর কাছেও রামবাবু আসল কারণটা এড়িয়ে গিয়ে বলে এসেছেন ভয়টা আসলে চোরের বিষয়ে।

তা সে যাই হোক, এই রামবাবু সেদিন কলকাতার বাইরে একটা অফি-সিয়াল টুর সেরে এসে স্নান করতে গেছেন। রাত তখন প্রায় নটা। হঠাৎ সমস্ত বাড়ি নিষ্প্রদীপ হয়ে গেল। রামবাবু আমার-আপনার মতোই 'আত্ম-বিস্মৃত বাঙালী জাতির অন্যতম সংস্করণ'। তিনি মাথায়-জলঢালা অস্পষ্ট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই, আলো নেভালো কে?'

স্ত্রী বাইরে থেকে জানালেন, 'সারা বাড়িতেই গেছে।'

'তাহলে ফিউজ হ'য়েছে। বক্স কোথায়? কী আশ্চর্য। আঃ।'

স্ত্রীর উক্তি, 'সমস্ত পাড়াটাই অন্ধকার। কারেন্ট বন্ধ হ'য়ে গেছে।'

'কী মুস্কিল! আঃ!'

'আঃ আঃ করছ কেন? স্নান সেরে বেরিয়ে এস।'

'না না, একটা আলো দাও—মোমবাতি! এভাবে এখানে থাকা যায় না।'

'কেন, ওখানেও চোর ঢুকবে নাকি?' সুযোগ পেয়ে নারীকণ্ঠে পরিহাসের বিদ্যুৎ খেলে গেল, [illegible] সন্ধ্যাবেলায় ভূতই বা আসবে—!'

তাঁর কথা শেষ হ'তে পেল না। দড়াম ক'রে দরজা খুলে আদুলগায়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন রামবাবু। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার—'আরে ধ্যাৎ। যত্তো সব ইয়ে।......যাও, তোয়ালেটা নিয়ে এস ভেতর থেকে।'

'ভেতর' মানে অবশ্য বাথরুমের ভেতর—যেখান থেকে বক্তা এইমাত্র বেরিয়ে এসেছেন, এবং দ্বিতীয়বার প্রবেশ করতে নারাজ!

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের ঘটনাস্থল একটি রোগীর শয়নকক্ষ। অসুখ গুরুতর, হার্টের অবস্থা ভালো নয়। ডাক্তার এসেছেন, নাড়ি দেখে একটা জরুরী ইনজেকশান দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েছেন। রোগীর হাতের উপর অ্যাল-কোহল-তুলো ঘষে যেই ছুঁচটি প্রায় কাছাকাছি এনেছেন, অমনি সেই আসন্ন সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্ধকার। তারপর—

'টর্চ আছে?'

'না তো।'

'মোমবাতি?'

'ছিল তো। কাল বোধ হয় ফুরিয়ে গেছে।'

'কী আশ্চর্য, নিন, একটা দেশলাই জালুন।'

জ্বালা হল। সাতটি দেশলাই কাঠিতে ইনজেকশান দেওয়া হল, দশটিতে শেষ হল সিরিঞ্জ পরিষ্কার করে ব্যাগ গুছিয়ে ওঠা, তারপর বিনা-আলোয় ভিজিট গ্রহণ এবং পাঁচটি কাঠি জেলে বাড়ি থেকে নিষ্ক্রমণ।

এ রকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু তার দরকার নেই। এক কথায় বলা চলে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়া মানে কালপ্রবাহ বন্ধ হওয়া।

কিন্তু এত কথা না বললেও বোধ হয় চলত। কারণ, আগেই বলেছি, অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। আমি তাই একটা প্রস্তাব করতে চাই সবিনয়ে—

একদা মহাভারতের যুগে বক নামক এক রাক্ষস যেমন একচক্রা গ্রামের অধি-বাসীদের প্রতি সদয় হ'য়ে ব্যবস্থা করে-ছিল, প্রত্যেক দিন এক-একটি পরিবার থেকে একটি ক'রে মানুষকে তার আহার্য হিসাবে পাঠাতে হবে, তেমনি বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান দস্তুরমতো নোটিশ দিয়ে এক-একটি পাড়ায় পর্যায়ক্রমে তাদের সরবরাহ বন্ধ রাখুন। আমরা পূর্বাহ্নে প্রস্তুত হ'য়ে সেই অখণ্ডনীয় নিয়তির হাতে আত্মসমর্পণ করব এবং পর্যায়ক্রমে মোমবাতি এবং হাতপাখার দোকান খুলে যাব।

মন্দ হবে না তাহলে!

শার্লক হোম্‌স্‌ ফিরে এলেন

।কোনান ডয়েলের লেখা শার্লক হোম্‌সের রহস্য কাহিনী আজ জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু এমন একদিন এসেছিল যখন ডয়েল এ ধরণের কাহিনীর নিত্যনতুন প্লট ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই গল্পের মাধ্যমে শার্লক হোম্‌সের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ পাঠকের তীব্র দাবীর চাপে তাঁকে আবার শার্লক হোম্‌সের গল্প লিখতে হয়েছিল—"শার্লক হোম্‌স্‌ ফিরে এলেন" এই নামে। নীচের গল্পটি সেই নতুন পর্যায়ের একটি চিত্তাকর্ষক সৃষ্টি—বাংলা ভাষায় এই তার প্রথম অনুবাদ।।

প্রায়রি স্কুল

বেকার স্ট্রীটে আমাদের ছোট্ট রঙ্গমঞ্চে অনেক রকম নাটকীয় আসা যাওয়াই দেখেছি, কিন্তু ডঃ থর্নিক্রফ্‌ট্‌ হাক্সটেব্‌ল, এম, এ, পি, এইচ, ডি, ইত্যাদির প্রথম আবির্ভাবের মত চমকপ্রদ ও আকস্মিক আর কিছু মনে পড়ছে না। রাশি রাশি ডিগ্রীর অনুপাতে অত্যন্ত পুঁচকে একটা কার্ড আসার কয়েক সেকেন্ড পরেই ঘরে ঢুকলেন ভদ্রলোক। চেহারাখানা যেমন বিপুল, তেমনি জমকালো। সব মিলিয়ে দেখলে শ্রদ্ধা জাগে, মনে হয় এমন দশাসই বপু যাঁর, তিনি আর যাই হোক অন্তঃসারশূন্য নন এবং আত্মবিশ্বাসেরও অভাব নেই তাঁর। কিন্তু আশ্চর্য, এমন চেহারা সত্ত্বেও দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই সামনের টেবিলটা ধরে টলমল করে উঠলেন ভদ্রলোক, তারপরেই পিছলে গিয়ে দড়াম করে পড়লেন মেঝের ওপর। আগুনের চুল্লীর পাশে বিছোনো ভালুকের চামড়ার ওপর হাতপা ছড়িয়ে পড়ে রইল তাঁর জ্ঞানহীন বিশাল বনেদী বপু।

তড়াক করে আমরা লাফিয়ে উঠে ফ্যালফ্যাল করে কয়েক মুহূর্ত নীরব বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম তাঁর দিকে। আশ্চর্য দৃশ্য। যেন বিক্ষুব্ধ জীবন-দরিয়ায় বিধ্বস্ত একটা মস্ত মাস্তুল। পরক্ষণেই হোম্‌স্‌ ব্যস্ত হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি একটা কুশন এনে গুঁজে দিলে তাঁর মাথার নীচে আর আমি ফোঁটা ফোঁটা ব্র্যান্ডি ঢালতে লাগলাম, দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। মনের অশান্তি, দুর্ভাবনা বহু রেখায় ফুটে উঠেছিল তাঁর ভারী সাদা মুখে, মুদিত চোখের নীচে ঝুলে পড়া থলি দুটিতেও লেগেছিল সীসের মত ম্যাটমেটে রঙের ছোঁয়া, হাঁ হয়ে গেছিল মুখ—ঠোঁটের কোণে কোণে সে কি অসহায়তা, চিবুকে দাড়িতেও ক্ষুরের ছোঁয়া লাগেনি বেশ কিছুদিন। কলার এবং শার্টের কালি-ঝুলি দেখে মনে হল দীর্ঘপথ রেল-গাড়িতে আসতে হয়েছে তাঁকে। সুগঠিত মাথা, কিন্তু চিরুণীর সংস্পর্শবিহীন উস্কখুস্ক চুল। এক পলক দেখলেই বোঝা যায় যেন সম্প্রতি একটা প্রলয়ঙ্কর তুফান বয়ে গেছে ভদ্রলোকের ওপর দিয়ে এবং যাবার সময়ে তাঁর মত লোকেরও মূল পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়ে গেছে।

হোম্‌স্‌ অবাক হয়ে যায়—"কি ব্যাপার, ওয়াটসন?"

নাড়ী দেখলাম। জীবনের ধারা অত্যন্ত ক্ষীণভাবে ধুকধুক করে বয়ে চলেছে সুতোর মত সরু এতটুকু অংশ দিয়ে। বললাম, "খুব সম্ভব খিদে আর ক্লান্তিতে একেবারেই ভেঙে পড়েছেন—শেষ শক্তিবিন্দুটুকু ব্যয় করেছেন এখানে আসার জন্যে।"

ঘড়ির পকেট থেকে একটা রেলের টিকিট বার করে হোম্‌স্‌ বললে, "উত্তর ইংল্যান্ডের ম্যাকলিটন থেকে এসেছেন দেখছি—রিটার্ণ টিকিট। এখনও তো বারটা বাজেনি। অর্থাৎ ভদ্রলোককে খুব সকাল সকালই রওনা হতে হয়েছে বাড়ি থেকে।"

কুঁচকোনো চোখের পাতা অল্প অল্প কেঁপে উঠল, তারপরেই একজোড়া শূন্যদৃষ্টি ধূসর চোখ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালে আমাদের পানে। পরমুহূর্তেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক, লজ্জায় অরুণ হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখ।

"আমার এ দুর্বলতা মাপ করবেন, মিঃ হোম্‌স্‌; ভেতরে ভেতরে একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছি চিন্তায় ভাবনায়। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, এক গেলাস দুধ আর একটা বিস্কুট পেলেই আবার চাঙা হয়ে উঠব বলে মনে হয়। মিঃ হোম্‌স্‌, আমি

নিজে এলাম কেবল আপনাকে নিয়ে ফিরব বলে। আমার ভয় ছিল শুধু টেলিগ্রাম পাঠিয়ে এ ব্যাপারটা যে কতখানি জরুরী আর গুরুত্বপূর্ণ তা আপনাদের বিশ্বাস করাতে পারতাম না।"

"আপনি আগে সামলে উঠুন, তারপর—"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিঃ হোম্‌স্‌, সামলে নিয়েছি আমি। কল্পনা করতে পারছি না কিভাবে এতটা দুর্বল হয়ে পড়লাম। মিঃ হোম্‌স্‌, আপনি পরের ট্রেনেই আমার সঙ্গে ম্যাকলিটন চলুন।"

মাথা নেড়ে বন্ধুবর বললে, "ডঃ ওয়াটসন আমার সহকর্মী। এ'কে জিজ্ঞেস করলেই জানবেন এখন আমরা কতখানি ব্যস্ত রয়েছি। ফেরার্‌স্‌ ডকুমেণ্টের মামলা নিয়ে তো আটকা পড়েইছি, তাছাড়াও অ্যাবার গ্যাভেনি খুনের মামলাও কোর্টে উঠল বলে। কাজেই এরকম পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দরকারী আর জরুরী কোন ব্যাপার ছাড়া লণ্ডন ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"দরকারী! জরুরী!" দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ডঃ হাক্সটেব্‌ল্‌। "কি বলছেন আপনি? ডিউক অফ হোল্‌ডারনেসের একমাত্র ছেলে গায়েব হওয়া সম্বন্ধে কি কিছুই শোনেননি আপনি?"

"কি বললেন! আগে যিনি ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন?"

"এগ্‌জ্যাক্টলি। খবরের কাগজে যাতে এ সংবাদ না যায়, সে চেষ্টা আমরা আগাগোড়া করেছি। কিন্তু গত রাতে 'গ্লোবে' এ নিয়ে বেশ কিছু কানাঘুসো হয়েছে শুনলাম। ভেবেছিলাম খবরটা আপনার কানেও পৌঁছেছে।"

দীর্ঘ শীর্ণ হাত বাড়িয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রেফারেন্সের তাক থেকে 'H' মার্কা ভল্যুমটা টেনে আনলে হোম্‌স্‌।

" 'হোল্‌ডারনেস, ষষ্ঠ ডিউক, কে, জি, পি, সি'—বর্ণমালার অর্ধেকই দেখছি শুধু খেতাবেই গেল। '১৯০০ সাল থেকে হ্যাল্লামশায়ারের লর্ড-লেফটেন্যাণ্ট। ১৮৮৮ সালে স্যার চার্লস য়্যাপ্‌লেডোরের কন্যা এডিথের সাথে বিবাহ। লর্ড স্যালটায়ারের একমাত্র সন্তান এবং উত্তরাধিকারী। প্রায় আড়াই লক্ষ একর জমির মালিক। ল্যাঙ্কাশায়ার এবং ওয়েল্‌সে খনিজ সম্পত্তি। ঠিকানাঃ কার্লটন হাউস টেরেস; হোল্‌ডারনেস হল, হ্যাল্লামশায়ার; কার্সটন ক্যাসল, বাঙ্গোর, ওয়েল্‌স্‌। লর্ড অফ দ্য য়্যাডমির‍্যালটি, ১৮৭২; চীফ সেক্রেটারী অফ স্টেট—' থাক, থাক, ভদ্রলোক দেখছি রাজদরবারের স্বনামধন্য রাজ-পুরুষদেরই একজন!"

"শুধু স্বনামধন্য নয়, সম্ভবতঃ সবচেয়ে ধনীও। মিঃ হোম্‌স্‌ শুনেছি পেশাগত স্বার্থের দিকটা আপনি যতটা ভাবেন, ঠিক ততখানিই ভাবেন মনের মত তদন্ত পেলে। সেই কারণেই বলে রাখি আপনাকে, হিজ গ্রেস ইতিমধ্যেই মোটা অঙ্কের দুটি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। প্রথমটি পাঁচ হাজার পাউণ্ডের একটা চেক—যে তার ছেলের হদিশ দিতে পারবে তাকে, আর দ্বিতীয়টি এক হাজার পাউণ্ডের—ছেলেকে যে বা যারা গায়েব করেছে, তাদের নামধাম যে দিতে পারবে, তাকে।"

হোম্‌স্‌ বললে, "তোফা পুরস্কার—রাজপুরুষোচিত পুরস্কার! ওয়াটসন, ডঃ হাক্সটেবলের সাথেই উত্তর ইংল্যাণ্ডে রওনা হ'ব মনে করছি। ডক্টর, দুধ খাওয়া শেষ হলে শুরু করুন আপনার কাহিনী। ব্যাপারটা কি, কবে এবং কি ভাবে তার সূত্রপাত। প্রায়রি স্কুলের ডঃ থর্নিক্রফ্‌ট হাক্সটেবলের সাথেই বা এ ব্যাপারের সম্পর্ক কোথায় এবং যদিও বা কোন সম্পর্ক থাকে, তাহলে ঘটনার তিনদিন পরেই বা কেন তিনি আমার সামান্য সাহায্যের জন্যে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন এতদূরে—সব বলুন। ঘটনাটা যে তিনদিন আগে ঘটেছে, তা বুঝছি আপনার দাড়ির অবস্থা দেখে।"

দুধ-বিস্কুট খাওয়া শেষ হয়েছিল ডঃ হাক্সটেবলের। ধীরে ধীরে লালাভ হয়ে উঠছিল তাঁর গাল, আলো ফিরে আসছিল তাঁর চোখে। চেয়ারে বেশ করে জাঁকিয়ে বসে স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভঙ্গিমায় গড়গড় করে বলে চললেন তাঁর কাহিনী। উচ্চারণ আর বর্ণনভঙ্গির মধ্যে যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল নতুন উদ্দীপনা, নতুন প্রাণশক্তি।

"জেণ্টেলমেন, প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি যে প্রায়রি একটা প্রিপেরেটরি স্কুল অর্থাৎ উচ্চ বিদ্যা-লয়ের প্রস্তুতি হয় এইখানেই। এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আমি, অধ্যক্ষও আমি। 'হাক্সটেব্‌ল্‌স্‌ সাইডলাইটস অন হোরেস' যদি পড়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় আমার নাম আপনাদের অজানা নয়। শিশুমনকে উচ্চতর শিক্ষার উপযুক্ত করে তোলার আয়োজন করেছিলাম প্রায়রিতে এবং অবিসংবাদিতভাবে একথা বলা যায় যে সারা ইংল্যাণ্ডে প্রায়রির চাইতে সেরা, প্রায়রির চাইতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রিপেরেটরি স্কুল আর দুটি নেই। লর্ড লিভারস্টোক, আর্ল অফ ব্ল্যাকওয়াটার, স্যার ক্যাথক্যার্ট সোম্‌স্‌—এ'রা প্রত্যেকেই তাঁদের ছেলেদের আমার কাছে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু তিন হপ্তা আগে যখন ডিউক অফ হোল্ডারনেস তাঁর সেক্রেটারী মিঃ জেমস্‌ ওয়াইল্ডারকে পাঠালেন তাঁর একমাত্র ছেলে এবং উত্তরাধিকারী দশ বছরের লর্ড স্যালটায়ারকে আমার স্কুলে ভর্তি করার জন্যে, তখন আনন্দে আমার মন ভরে উঠেছিল এই কথা ভেবে যে সত্যি-সত্যিই আমার স্কুলের সুনাম তাহলে চরমে পৌঁচেছে। তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে আমার জীবনের চরমতম দুর্ভাগ্যের সূচনা আঁকা হয়েছিল সেদিনই।

"মে মাসের প্রথম তারিখে পৌঁছোলো ছেলেটি। গ্রীষ্মের পাঠক্রম শুরু হ'ল সেদিনই। ভারী মিষ্টি স্বভাব তার—দু'দিনেই আমাদের সঙ্গে একেবারে মিশে গেল সে। আমি অবিবেচক নই, মিঃ হোম্‌স্‌ এবং এ কেসে আধাআধি বিশ্বাস করাটাও সমীচীন নয়। তাই অকপটে সব খুলে বলছি। ছেলেটি বাড়িতে খুব সুখে ছিল না। ডিউকের বিবাহিত জীবন যে মোটেই শান্তিময় হয়নি, এ গুপ্ত কথা জানে না এমন কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি অনুসারে বিচ্ছেদ

হয় দুজনের মধ্যে—ডাচেস চলে যান দক্ষিণ ফ্রান্সে। এ সব ব্যাপার তো এই সেদিনকার। মাকে খুবই ভালবাসত ছেলে এবং ডিউক-ডাচেসের বিবাহিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও আগাগোড়া মা পেয়ে এসেছে ছেলের গভীর সহানুভূতি। এসব কথা সবাই জানে। ডাচেস 'হোলডারনেস হল' ছেড়ে চলে যাওয়ার পর দারুণ মুষড়ে পড়ে সে। এবং শুধু এই কারণেই ডিউক তাকে আমার প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পনেরো দিন যেতেই আমাদের একজন হয়ে উঠল ছোট্ট লর্ড স্যালটায়ার এবং বাইরে থেকে দেখে যতটা বোঝা যায়, মনে প্রাণে সুখী হয়েছিল সে।

"তেরোই মে রাত্রে অর্থাৎ গত সোমবার রাত্রে তাকে শেষবারের মত দেখা যায় প্রায়রিতে। ওর ঘর তিন-তলায়। সে ঘরে ঢুকতে হ'লে আরও একটা বড় ঘরের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়। দুজন ছেলে এই ঘরটায় সে-রাতে ঘুমিয়েছিল। ঘরের মধ্যে দিয়ে কাউকে যেতে দেখেনি তারা, কোন শব্দও শোনেনি। কাজেই, স্যালটায়ার যে এ ঘর দিয়ে যায়নি এ বিষয়ে কোন সন্দেহই রইল না। তার নিজের ঘরের জানলা খোলা ছিল। জানলা থেকে মাটি পর্যন্ত মোটা আইভি লতা থাকায় আমরা পায়ের ছাপ খুঁজেছিলাম মাটিতে—কিন্তু কিছু পাইনি। না পেলেও বেরোবার সম্ভাব্য পথ শুধু এইটাই এবং এ সম্পর্কে দ্বিমত থাকারও কোন কারণ নেই।

"মঙ্গলবার সকাল সাতটায় আমরা জানতে পারলাম যে রাতারাতি ঘর থেকে উধাও হয়েছে লর্ড স্যালটায়ার। বিছানা নিভাঁজ নয় দেখে বুঝলাম সে শুয়েছিল। যাওয়ার আগে স্কুলের বা পোষাক, কালো ইটন জ্যাকেট আর গাঢ় ধূসর রঙের ট্রাউজার পরে নিয়েছে। ঘরে যে কেউ ঢুকেছিল, সে রকম কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। ধস্তাধস্তি বা চেঁচামেচির শব্দও কান এড়াতো না কনটারের। মাঝের বড় ঘরটায় শুয়েছিল কনটার। ওর ঘুম খুব পাতলা, বয়সও এদের চাইতে একটু বেশি।

"লর্ড স্যালটায়ারের অন্তর্ধানের খবর কানে আসামাত্র আমি স্কুলের প্রত্যেককে ডেকে আনলাম নাম ডেকে মিলিয়ে নেওয়ার জন্যে—ছাত্র, শিক্ষক, চাকরবাকর—কেউই বাদ গেল না। তখনই জানা গেল যে লর্ড স্যালটায়ার একলা পালায়নি।

"জার্মান মাস্টার হেইডেগারও নিপাত্তা। তাঁর ঘরও তিনতলায়, বাড়ির একদম শেষ প্রান্তে, লর্ড স্যালটায়ারের ঘরের মুখোমুখি। বিছানা দেখে বুঝলাম হেইডেগারও ঘুমিয়েছিলেন। কিন্তু মেঝের ওপর পড়ে থাকা সার্ট আর মোজা দেখে মনে হল ধড়াচুড়ো অর্ধেক চাপিয়েই বেরিয়ে পড়তে হয়েছে তাঁকে। হেইডেগার কিন্তু আইভি লতা বেয়ে নেমেছেন। কেননা, লনের ওপর যেখানে উনি নেমেছেন সেখানে তাঁর পায়ের ছাপ পেয়েছি আমরা। লনের পাশে ছোট্ট একটা শেডে তাঁর বাই-সাইকেল থাকত। শেড খুলে দেখলাম হেইডেগারের সঙ্গে তাঁর সাইকেলও উধাও হয়েছে।

"বছর দুয়েকের মত আমার কাজে আছেন হেইডেগার। খুব নির্ভরযোগ্য সুপারিশ দেখে তবে তাঁকে কাজে বহাল করেছিলাম আমি। কিন্তু সবসময়ে বড় মুষড়ে থাকতেন ভদ্রলোক, কথাবার্তাও বড় একটা বলতেন না। ছাত্র বা শিক্ষক সবার কাছ থেকেই দূরে দূরে থাকার ফলে কেউই তাঁকে আপন বলে ভাবতে পারত না। যাই হোক, আজ পর্যন্ত ও'দের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার আমরা যে তিমিরে ছিলাম, আজ বৃহস্পতিবার সকালেও সে তিমির থেকে এক চুলও এগোতে পারিনি। 'হোলডারনেস হলে' খোঁজ নিয়েছিলাম তখুনি। প্রায়রি স্কুল থেকে হোলডারনেস হলে'র দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল। ভেবেছিলাম হঠাৎ হয়ত বাড়ির জন্যে মন কেমন করায় বাবার কাছেই ফিরে গেছে লর্ড স্যালটায়ার। কিন্তু সেখানেও কোন খবর পাওয়া গেল না তার। উদ্বেগ-উত্তেজনায় ডিউকের অবস্থা কি হয়েছে, তা তো অনুমানই করতে পারছেন। আর আমার অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখলেন আপনারা। এই তিনদিনের মধ্যে উৎকণ্ঠা আর দায়িত্ব-বোধ কুরে কুরে শেষ করে এনেছে আমার নার্ভের শক্তি। তাই শেষ শক্তিবিন্দু দিয়ে নিজেকে আপনাদের সামনে টেনে এনেই আর সামলাতে পারিনি। মিঃ হোমস্, জানি না এর আগে কোনদিন কোন ব্যাপারে আপনার সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ করেছিলেন কিনা। যদি না করে থাকেন, আমার একান্ত অনুরোধ, এ কেসে আপনি তাই করুন। এ ধরণের জটিল ব্যাপার আপনি সারা জীবনেও আর পাবেন না।"

অনন্যমন হয়ে বেচারা স্কুল-মাস্টারের কাহিনী শুনছিল শার্লক হোমস্। কুঁচকোনো দুই ভুরুর মাঝে গভীর দাঁড়ি দেখে বুঝতে বাকি ছিল না যে এ সমস্যায় তার সব শক্তি বিনিয়োগ করার জন্যে, তার সমস্ত চিন্তাক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্যে বাইরে থেকে আর কোন কাকুতি মিনতি অনুরোধ উপরোধের প্রয়োজন নাই। সমস্যা শুনলেই তার মধ্যে অপরিসীম আগ্রহের সঞ্চার তো হয়ই, তা ছাড়াও যত কিছু জটিল আর অসাধারণ ঘটনার প্রতি তার নিবিড় অনুরাগ অন্ততঃ আমার তো অজানা নয়। নোটবুক বার করে কয়েকটা পয়েণ্ট টুকে নিল হোমস্। তারপর কড়া সুরে বললে, "এত দেরিতে আমার কাছে এসে খুবই অন্যায় করেছেন আপনি। অত্যন্ত গুরুতর অসুবিধার মধ্যে দিয়ে আমায় এখন তদন্ত শুরু করতে হবে। যেমন ধরুন না কেন, তিনদিন পর আইভি বা লন দেখে কোন বিশেষজ্ঞের পক্ষেই কিছু বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।"

"মিঃ হোমস্, আমার কোন দোষ নেই। হিজ গ্রেস নিজেই প্রকাশ্য কেলেংকারী এড়োনোর জন্যে এ খবর পাঁচ কান হতে দেননি। পারিবারিক অশান্তি দুনিয়ার লোকে জানুক, এ তাঁর ইচ্ছা নয়। শুধু ইচ্ছা নয় বললে অল্প বলা হবে, এ ধরণের কিছু ভাবতেও শিউরে ওঠেন উনি।"

"সরকারী তদন্ত হয়েছে তো?"

"তা হয়েছে, কিন্তু উল্লসিত হওয়ার মত ফলাফল কিছু পাওয়া যায়নি।

সূত্রে বলা যায় এমনি একটা খবর অবশ্য তখুনি পাওয়া গেছিল। কাছাকাছি স্টেশনে ভোরের ট্রেন ধরতে দেখা গেছে একজন অল্পবয়সী ছেলের সাথে আর একজন যুবাপুরুষকে। কিন্তু গতরাত্রে খবর পেলাম লিভারপুলে তাদের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ, কিন্তু তাদের সঙ্গে এ ব্যাপরের কোন সম্পর্কই নেই। খবর পাওয়ার পর আরও ভেঙে পড়লাম। সারারাত ঘুমোতে পারিনি। ভোর হতেই প্রথম ট্রেন ধরে সিধে এসেছি আপনার কাছে।"

"মিথ্যে সূত্র পাওয়ার পর ও অঞ্চলের তদন্তেও নিশ্চয় ঢিলে পড়েছিল?"

"কোন তদন্তই আর হয়নি।"

"তার মানে পুরো তিনটে দিন বিলকুল বাজে নষ্ট হয়েছে। বাস্তবিক ডঃ হাক্সটেবল, প্রথম থেকেই এ কেস নিয়ে যা করেছেন আপনারা, তা অতি যাচ্ছেতাই, ক্ষমার অযোগ্য।"

"আমিও তা বুঝতে পারছি।"

"কিন্তু তবুও এ সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। কেসটা আমি নিলাম, ডঃ হাক্সটেবল। ভাল কথা, লর্ড স্যালটায়ার আর জার্মান মাস্টারের মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন কি?"

"একেবারেই না।"

"ছেলেটি কি মাস্টারের ক্লাসেই ছিল?"

"না। যতদূর জানি দুজনের মধ্যে কোনরকম কথাবার্তাই হয়নি।"

"ভারী আশ্চর্য তো! ছেলেটারও বাইসাইকেল আছে নাকি?"

"না।"

"আর কোনও সাইকেল উধাও হয়েছে?"

"না।"

"ঠিক তো?"

"হ্যাঁ।"

"ভালকথা। আপনি কি তাহলে মনে করেন মাঝরাতে জার্মান মাস্টার ছেলেটাকে কোলে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন?"

"নিশ্চয় না।"

"তাহলে আপনার থিওরীটা কি শুনি?"

"বাইসাইকেলটা নিছক ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। সাইকেলটা কোথাও লুকিয়ে রেখে দুজনেই হাঁটা দিয়েছে কোন গোপন জায়গার দিকে।"

"ঠিক। কিন্তু ধোঁকাটা একটু বিদঘুটে রকমের মনে হচ্ছে, তাই না? শেডে অন্য কোন সাইকেল ছিল নাকি?"

"কয়েকটা ছিল।"

"আপনার থিওরী অনুসারে দুজনেই যে সাইকেলে চড়ে গা-ঢাকা দিয়েছে, এ ধারণাই যদি আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে হেইডেগারের, তাহলে তাঁর পক্ষে একটা না লুকিয়ে একজোড়া সাইকেল লুকোনোই স্বাভাবিক নয় কি?"

"মনে তো হয় তাই।"

"আমার শুধু মনে হয় না, আমার বিশ্বাস যে এইটাই স্বাভাবিক। আপনার ধোঁকা দেওয়ার থিওরী এখানে খাটবে না, ডক্টর। তদন্ত শুরু করার পক্ষে ঘটনাটার গুরুত্ব কিন্তু অনেকখানি। আস্ত একটা সাইকেলকে বেমালুম লোপাট করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা বা নষ্ট করে ফেলাটাও খুব সোজা কাজ নয়। আর একটা প্রশ্ন। অদৃশ্য হওয়ার আগেরদিন কেউ কি ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?"

"না।"

"কোন চিঠিপত্র এসেছিল তার নামে?"

"একটা এসেছিল বটে।"

"কার কাছ থেকে?"

"বাবার কাছ থেকে।"

"ছেলেদের চিঠি আপনি খোলেন নাকি?"

"না।"

"কি করে জানলেন চিঠিটা তার বাবার কাছ থেকে?।

"খামের ওপর হোলডারনেস বংশের প্রতীক-চিহ্ন ছিল। তাছাড়া, ডিউক নিজের হাতে ঠিকানা লিখেছিলেন—ওরকম অদ্ভুত আড়ষ্ট হাতেরলেখা ডিউকের ছাড়া যে আর কারও নয়, তা আমি জানি। সবচেয়ে বড় কথা, এ চিঠির কথা ডিউকেরও মনে আছে।"

"এ চিঠি পাওয়ার আগে আবার কবে সে চিঠি পেয়েছে?"

"বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তো নয়ই।"

"ফ্রান্স থেকে কোন চিঠি এসেছিল তার নামে?"

"না। কোনদিনই না।"

"এসব প্রশ্নের পেছনে আমার উদ্দেশ্যটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন আপনি। হয় লর্ড স্যালটায়ারকে জোর জবরদস্তি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা নাহলে সে নিজেই গেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তার মত ছেলেমানুষের পক্ষে বাইরের জগৎ থেকে কোন রকম উৎসাহ বা প্রেরণা না পেলে এ ধরণের ডানপিটের মত কাজ করাও সম্ভব নয়। কেউ যদি দেখা করতে না এসে থাকে, তাহলে নিশ্চয় চিঠিপত্তরের ভেতর দিয়েই এ উৎসাহ সে পেয়েছে। সেই কারণেই আমি জানতে চাইছি কে কে তাকে চিঠি লিখেছিলেন।"

"এ সম্পর্কে আপনাকে খুব বেশী সাহায্য করতে পারব বলে আমার মনে হয় না, মিঃ হোমস্। যতদূর আমি জানি, বাবা ছাড়া আর কেউ তাকে প্রায়রিতে চিঠি লেখেননি।"

"এবং যেদিন ছেলে উধাও হয়ে গেল, সেদিনই এল তাঁর চিঠি। বাপ-ছেলের মধ্যে সম্পর্ক কি রকম ছিল, ডক্টর? বন্ধুর মত কি?"

"হিজ গ্রেস কারোর সঙ্গেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখেন না। দেশের এবং দশের কাজ নিয়েই অহরহ তাঁকে ডুবে থাকতে হয়—কাজেই সাধারণ মানুষের মধ্যে যে

সব আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখি, তার নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না তাঁর মধ্যে। তবে ওরই মাঝে ছেলের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসার অন্ত ছিল না। তাঁর কড়া-স্বভাবের নমুনাও কোনদিন পায়নি লর্ড স্যালটায়ার।"

"কিন্তু লর্ড স্যালটায়ার বেশি ভালবাসত তার মা'কে?

"তা সত্যি।"

"কোনদিন এ কথা তার নিজের মুখে শুনেছেন?"

"না।"

"ডিউকের মুখে?"

"সর্বনাশ! না, মশাই, না!"

"তাহলে জানলেন কি করে?"

"হিজ গ্রেসের সেক্রেটারী মিঃ জেমস্ ওয়াইল্ডারের সঙ্গে আমার কিছু গোপন কথাবার্তা হয়েছিল। মা'য়ের ওপর লর্ড স্যালটায়ারের দুর্বলতার খবর তাঁর মুখেই আমি শুনেছি।"

"বটে। লর্ড স্যালটায়ার নিখোঁজ হওয়ার পর তার নামে আসা ডিউকের শেষ চিঠিটা ঘরে পেয়েছেন কি?"

"না, যাবার সময়ে চিঠিটাও নিয়ে গেছে সে। মিঃ হোমস্, আর তো দেরি করা যায় না, এবার রওনা হওয়া যাক।"

"ঘোড়ার গাড়ি আনতে বলে দিই। মিনিট পনেরোর মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমরা। ডঃ হাক্সটেবল, রওনা হওয়ার আগে বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠানোর ইচ্ছে থাকলে আপনার প্রতিবেশি মহলে বেশ করে এই কথাটা ছড়িয়ে দিন যে পুলিশ এখনও লিভারপুল বা অন্য কোথাও তদন্ত চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে ধীরেসুস্থে আমরা কিছু কাজ সেরে নেব অকুস্থলে পৌঁছে। গন্ধ এখনও এমন ফিকে হয়ে যায়নি যে ওয়াটসন আর আমার মত দুদুটো বাঘা হাউণ্ডের নাকে তা ধরা পড়বে না।"

সেদিনই সন্ধ্যায় পীক কাউন্টির শীত-শীত স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় এসে পৌঁছোলাম আমরা। ডঃ হাক্সটেবলের বিখ্যাত স্কুল এই অঞ্চলেই। স্কুলে পৌঁছোতে পৌঁছোতেই আঁধার ঘন হয়ে এল চারদিকে। টেবিলের ওপর একটা কার্ড পড়েছিল। ডঃ হাক্সটেবল ঘরে ঢুকতেই বাটলার এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে তাঁর কানে কি বললে। শুনেই রীতিমত উত্তেজিত হয়ে আমাদের দিকে তাকালেন ডক্টর।

বললেন, "ডিউক এসেছেন। সেক্রেটারী মিঃ ওয়াইল্ডারকে নিয়ে উনি স্টাডিতে অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে। আপনারা আসুন, আলাপ করিয়ে দিই ওঁর সাথে।"

অতি বিখ্যাত এই রাজনীতিবিদের ছবির সঙ্গে অবশ্য আমি আগে থেকেই পরিচিত ছিলাম। কিন্তু ছবিতে শুধু মুখের আদলই দেখেছি—আসল মানুষটির সঙ্গে ছবির মানুষের আকাশ পাতাল তফাৎ। দীর্ঘ, সম্ভ্রান্ত চেহারায় উগ্র আভিজাত্যের ছাপ; পোষাক-পরিচ্ছদ নিখুঁত এবং সুরুচির পরিচয় বহন করে; পাতলা মুখ, কিন্তু বেশ গম্ভীর; দীর্ঘ নাক—সামনের দিকে অদ্ভূতভাবে বাঁকা। মরা মানুষের মত ফ্যাকাশে মুখের ওপর লাল টকটকে দাড়িটা কিরকম জানি বেমানান লাগে। সুদীর্ঘ দাড়ি সাদা ওয়েস্ট কোটের ওপরেও ঝুলে পড়েছিল ঝালরের মত—ফাঁক দিয়ে ঝিকমিক করছিল ঘড়ির চকচকে চেনটা। রাজপুরুষের মতই জমকাল চেহারা ভদ্রলোকের। আগুনের

চুল্লীর সামনে বিছানো পশুর চামড়ার ওপর দাঁড়িয়েছিলেন উনি। ঘরে ঢুকতেই পাথরের কঠিন চোখে তাকালেন আমাদের পানে। পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন খুবই অল্প বয়েসের একজন তরুণ—তিনিই যে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী ওয়াইল্ডার, তা কেউ না বললেও বুঝে নিলাম। ছোটখাট চেহারা ভদ্রলোকের, নার্ভাস, কিন্তু আকাশের মত হাল্কা নীল-নীল চোখ আর চটপটে হাবভাব দেখলেই বোঝা যায় আকারে খাটো হলেও সতর্কতায় আর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় অনেককেই হার মানিয়ে দিতে পারেন তিনি। আমরা ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ইনিই অনাড়ম্বর, তীক্ষ্ণ স্বরে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন।

"ডঃ হাক্সটেব্‌ল্‌, আজ সকালেই আমি এসেছিলাম আপনার লন্ডনে যাওয়া বন্ধ করতে। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার। শুনলাম আপনার লন্ডনে যাওয়ার উদ্দেশ্য মিঃ শার্লক হোম্‌স্‌কে আমন্ত্রণ জানানো এবং তাঁকে এ কেসের তদন্তভার দেওয়া। হিজ গ্রেস অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছেন, ডঃ হাক্সটেব্‌ল্‌—এ ধরণের কিছু করার আগে তাঁর সঙ্গে আপনার পরামর্শ করা উচিত ছিল।"

"যখনই শুনলাম যে পুলিশও ব্যর্থ হয়েছে—"

"পুলিশ যে ব্যর্থ হয়েছে, এ কথা হিজ গ্রেস মোটেই বিশ্বাস করেন না।"

"কিন্তু মিঃ ওয়াইল্ডার—"

"আপনি তো ভাল করেই জানেন, ডঃ হাক্সটেবল, প্রকাশ্য কেলেংকারী এড়োনোর জন্যে কতখানি উদ্বিগ্ন হিজ গ্রেস। এই কারণেই তিনি মনে করেন এ ব্যাপার যত অল্প লোকে জানে ততই মঙ্গল।"

ভ্রূকুটি করে ডক্টর বললেন, "যাক, যা হবার তা হয়েছে, এবার প্রতিকারের কথা ভাবা যাক। কাল ভোরের ট্রেনে মিঃ শার্লক হোম্‌স্‌ লন্ডনে ফিরে গেলেই সব ঝামেলা মিটে যায়।"

নির্বিকার নিরুত্তাপ সুরে হোম্‌স্‌ বলে উঠল, "উঁহু, ডক্টর, এত তাড়াতাড়ি লন্ডনে যাওয়ার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। উত্তর দেশের এই তাজা ফুরফুরে হাওয়ায় মনটা এত হাল্কা লাগছে যে কয়েকটা দিন আপনার জলাভূমিতে কাটিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে আমার। আপনার ছাদের তলায় মাথা গুঁজতে না পারি, গাঁয়ের সরাইখানা তো আছেই। অবশ্য সে ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই হবে।"

মহা ফাঁপড়ে পড়লেন ডঃ হাক্সটেবল। বেচারীর দোনামোনা ভাব দেখে বড় মায়া হল আমার। কিন্তু এই শাঁখের করাতের মত অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন ডিউক নিজেই। ডিনার-ঘণ্টার মত গুরুগম্ভীর গম্‌গমে গলায় কথা বলে উঠলেন উনি।

"ডঃ হাক্সটেবল, মিঃ ওয়াইল্ডারের বক্তব্যের সাথে আমি একমত। যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে আপনার পরামর্শ করা উচিত ছিল। কিন্তু মিঃ শার্লক হোম্‌স্‌কে যখন সব জানানোই হয়েছে, তখন তাঁর সাহায্য না নেওয়ার কোন মানেই হয় না। মিঃ হোম্‌স্‌, সরাইখানায় না গিয়ে আমার 'হোল্‌ডারনেস হলে' ক'দিন থেকে গেলে আমি খুবই খুশী হব।"

"ধন্যবাদ, ইওর গ্রেস। তদন্তের সুবিধের জন্যে লর্ড স্যালটায়ার যে জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়েছেন, সেখানে থাকাটাই আমার পক্ষে সমীচীন হবে।"

বেদনাদায়ক দু'একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখছি না। আপনার কি ধারণা এ ব্যাপারে ডাচেসের কোন হাত আছে?"

রীতিমত দ্বিধায় পড়লেন মন্ত্রী-মশায়।

অবশেষে বললেন, "আমার তা মনে হয় না।"

"তাহলে বাকী থাকে আর একটি সম্ভাবনা। মোটা টাকা দাঁও মারার জন্যে কেউ হয়ত আপনার ছেলেকে গুম ক'রেছে। এ ধরণের দাবীদাওয়া নিয়ে লেখা কোন চিঠি আপনি পেয়েছেন?"

"না, মশায়।"

"যা ভাল বোঝেন। আমার বা মিঃ ওয়াইল্ডারের কাছে যদি কোন খবর আশা করেন তো জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

হোম্‌স্‌ বললে, "আপনার সঙ্গে হয়ত 'হলে' দেখা করার দরকার হবে আমার। এখন স্যার শুধু একটা প্রশ্নই করব আপনাকে। আপনার ছেলের এই রহস্যজনক অন্তর্ধানের কোন কারণ কি আপনি ভেবেছেন?"

"না, মশাই, কোন কারণই পাইনি?"

"মাপ করবেন, আপনার পক্ষে

"আর একটি প্রশ্ন, ইওর গ্রেস। শুনলাম, যেদিন লর্ড স্যালটায়ার উধাও হয়, সেদিনই আপনি তাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন।"

"না, তার আগেরদিন লিখেছিলাম।"

"এগজ্যাক্টলি। কিন্তু চিঠিটা তার হাতে সেদিনই পড়ে?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার চিঠিতে এমন কিছু ছিল কি যা পড়ার পর বেসামাল হয়ে পড়তে

পারে সে অথবা এই ধরণের কাজ করার মত প্রবৃত্তি মনে জাগতে পারে?"

"না, মশায়, না, সে রকম কিছুই ছিল না।"

"চিঠিটা কি আপনি নিজেই ডাকে দিয়েছিলেন?"

ডিউক উত্তর দেওয়ার আগেই বেশ একটু গরম হয়ে কথা বলে উঠলেন তাঁর সেক্রেটারী, "নিজের হাতে চিঠি ডাকে দেওয়ার মত অভ্যাস হিজ গ্রেসের এখনও হয়নি, অন্যান্য চিঠির সঙ্গে এ চিঠিও ষ্টাডি-টেবিলে রেখেছিলেন উনি—আমি নিজে পোষ্ট ব্যাগে ফেলে দিয়ে আসি চিঠিগুলো।"

"এ চিঠিটাও যে সে সবের মধ্যে ছিল সে বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ নেই তো?"

"নিশ্চয় না, চিঠিটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম।"

"সেদিন হিজ গ্রেস ক'টি চিঠি লিখেছিলেন?"

"বিশ থেকে তিরিশটা। চিঠিপত্র আমাকে একটু বেশীই লিখতে হয়। কিন্তু এসব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে না?"

"পুরোপুরি নয়", বলল হোম্‌স্‌।

এবার ডিউক বলে উঠলেন, "আমি পুলিশকে বলে দিয়েছি দক্ষিণ ফ্রান্সে তদন্ত চালানোর জন্যে। আগেই বলেছি আপনাকে, এ রকম নোংরা কাজে ডাচেস কোনদিনই প্রশ্রয় দেবেন না। কিন্তু ছেলেটার মাথাটাকে উদ্ভট খেয়ালের একটা কারখানা বললেই চলে। হয়ত জার্মান মাষ্টারের সাহায্য নিয়ে সে মা-এর কাছে পালিয়েছে। ডঃ হাক্সটেবল, আমরা এবার 'হলে' ফিরব।"

হোম্‌সের মুখ দেখে বুঝলাম আরও কয়েকটা প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু মন্ত্রীমশায় এমনই আচম্বিতে কথা-বার্তার ওপর যবনিকা টেনে দিলেন যে তারপর প্রশ্ন তো দূরের কথা, সাধারণ আলাপ-আলোচনাও আর সম্ভব নয়। তাঁর মত উগ্র অভিজাত পুরুষের পক্ষে একান্ত ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে একজন আগন্তুকের সাথে আলোচনা করা যে একেবারেই অসহ্য, তা বুঝতে কারোরই বাকী রইল না। আরও একটা ভয় তিনি করেছিলেন। হোম্‌সের নতুন নতুন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হয়ত তাঁর ডিউক-জীবনের ইতিহাস-প্রসঙ্গও এসে যাবে, আর, অতি সংগোপনে যে সব অন্ধকারময় কোণগুলো এতদিন ধরে ঢেকে রেখেছেন ফ্যামিলির চৌহদ্দির মধ্যে, তা আর গুহ্য থাকবে না—সাধারণ লোকের মুখরোচক আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

সেক্রেটারীকে নিয়ে ডিউক চোখের আড়ালে যেতেই হোম্‌স্‌ আর একটুও দেরী করলে না, স্বভাব মত সঙ্গে সঙ্গে পরম আগ্রহে শুরু করে দিলে তদন্ত।

লর্ড স্যালটায়ারের ঘর তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করেও কোন সুরাহা হল না। জানলা ছাড়া যাওয়ার রাস্তা যে আর নেই, এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হ'ল সবকিছু দেখার পর। জার্মান মাষ্টারের ঘর থেকেও নতুন কোন সূত্র পাওয়া গেল না। ভদ্রলোকের দেহের ভারে আইভি লতাগুচ্ছের একগাছি লতা দেখলাম ছিঁড়ে গেছে। লণ্ঠনের আলোয় লন পরীক্ষা করে লতাগুচ্ছের গোড়ায় মাটির ওপর তাঁর গোড়ালির ছাপও পেলাম। ছোট-ছোট সবুজ ঘাসের ওপর শুধু ঐ একটি খাঁজ—গভীর রাতে রহস্যজনক-ভাবে অন্তর্ধানের পার্থিব সাক্ষী শুধু ঐটুকুই—আর কোন চিহ্ন লনের ওপর পাওয়া গেল না।

শার্লক হোম্‌স্‌ একলাই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেল কোথায়, ফিরল রাত এগারোটার পর। দেখলাম কার কাছ থেকে এ অঞ্চলের মস্ত বড় একটা সামরিক মানচিত্র যোগাড় করে এনেছে সে। আমার ঘরে এসে বিছানার ওপর ম্যাপটা বিছিয়ে ঠিক মাঝখানে ল্যাম্পটা রাখল ও। তারপর শুরু হল ধূমপান। মাঝে মাঝে পাইপের ধূমায়িত অঙ্গারের দিকটা দিয়ে আগ্রহের সঞ্চার করে এমনি জায়গাগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার কায়দায় কথা বলে চলল সে।

"কেসটা আমায় পেয়ে বসেছে, ওয়াটসন। সত্যি সত্যিই কয়েকটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আছে এ ব্যাপারে। প্রথমেই কিছু ভূগোল-তত্ত্ব বুঝে রাখ, তদন্তের সময় খুবই কাজে আসবে এসব খুঁটিনাটি।

"ম্যাপটা দেখছ তো। এই কালো রঙের চৌকোণা জায়গাটা হল প্রায়রি স্কুল। আলপিন গেঁথে রাখলাম এখানে। আচ্ছা, এই যে লাইনটা দেখছ, এটা প্রধান সড়ক। দেখতেই পাচ্ছ, সড়কটা স্কুলের পাশ দিয়ে পূব আর পশ্চিমে চলে গেছে। দুদিকেই মাইলখানেকের মধ্যে রাস্তাটা থেকে কোন শাখা-প্রশাখা বেরোয়নি। জার্মান মাষ্টার ছেলেটিকে নিয়ে যদি রাস্তা দিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এইটাই সেই রাস্তা।"

"ঠিক বলেছ।"

"সৌভাগ্যক্রমে, সেদিন রাতে এই রাস্তা দিয়ে যা কিছু গেছে, তার একটা মোটামুটি হিসেব আমি পেয়েছি। আমার পাইপটা যেখানে রয়েছে, এইখানে রাত বারোটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত একজন চৌকিদার পাহারায় ছিল। দেখতেই পাচ্ছ, পূর্বদিকের প্রথম শাখা-রাস্তা এইটাই—। চৌকিদারটা দিব্বি গেলে বলছে যে এক মুহূর্তের জন্যও চৌকি ছেড়ে এদিকে ওদিকে যায়নি সে এবং তার চোখে ধুলো দিয়ে কোন ছেলে বা লোকই এ রাস্তা দিয়ে সে রাত্রে যায়নি। কন-ষ্টেবলটার সঙ্গে কথা বলে দেখলাম তাকে অনায়াসেই বিশ্বাস করা চলে। কাজেই, পূর্বদিকের তদন্তে এইখানেই ইতি। এবার আসা যাক অন্যদিকে। দেখেছ, এদিকে 'রেড বুল' নামে একটা সরাইখানা রয়েছে। 'রেড বুলে'র ল্যান্ড লেডির শরীর অসুস্থ ছিল সে রাত্রে। ম্যাকলিটন থেকে ডাক্তার ডেকে আনার জন্যে লোক পাঠিয়ে-ছিলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু অন্য
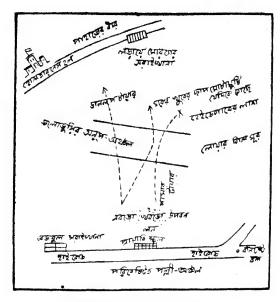
অঞ্চলটির একটি খসড়া মানচিত্র।

কেস নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ডাক্তার এলেন পরেরদিন সকালে। কাজেই সারারাত সজাগ থাকতে হয়েছে সরাইখানার লোকেদের। শুধু সজাগ নয় ডাক্তারের প্রতীক্ষায় রাস্তার ওপরও নজর রাখতে হয়েছে প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে। সে রাতে রাস্তা দিয়ে দুপেয়ে কোন প্রাণীই যে যায়নি, এ খবর বেশ জোর দিয়েই জানালে ওরা। সুতরাং, ওদের সাক্ষ্য সত্য বলেই মেনে নিয়ে আমরা বিনাবাক্যব্যয়ে পশ্চিম-দিকের তদন্তেও দাঁড়ি টেনে দিলাম। তাহলে সংক্ষেপে আমরা পাচ্ছি কি? না, চম্পট দেওয়ার সময়ে পলাতকেরা প্রধান সড়কটা একেবারেই ব্যবহার করেনি।"

"কিন্তু সাইকেলটা?" প্রতিবাদ জানালাম আমি।

"ঠিক, ঠিক। সাইকেল-প্রসঙ্গেও আসছি এখুনি। আপাততঃ শুধু যুক্তি নিয়ে আলোচনা করা যাক: এরা যদি রাস্তা দিয়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে বাড়ীর উত্তর বা দক্ষিণ দিক বরাবর এদের রওনা হতে হয়েছে রাতারাতি এ অঞ্চল পেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। আচ্ছা, এবার এইদুটো সম্ভাবনা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা যাক। বুঝতেই পারছ বাড়ীর দক্ষিণ দিকে এই বিরাট অঞ্চলটা আসলে মস্তবড় একটা আবাদী জমি ছাড়া আর কিছু নয়। চাষের সুবিধের জন্যে চাষীরা পাথরের দেওয়াল দিয়ে নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো জমিতে ভাগ করে নিয়েছে অতবড় জমিটা। এপথ দিয়ে সাইকেল যাওয়া অসম্ভব, কাজেই নাকচ হয়ে গেল এদিককার সম্ভাবনা। এবার এস উত্তর দিকে। এদিকে দেখছি লম্বা লম্বা গাছের ছোটখাট একটা কুঞ্জবন—নাম লেখা রয়েছে 'এবড়ো-খেবড়ো উপবন।' আরও উত্তরে দেখছি ধু ধু জলাভূমি, 'লোয়ার গিল মুর।' মস্তবড় জলাভূমি বিস্তারে কম করে মাইল দশেক তো বটেই, আস্তে আস্তে ঢাল পথে উঠে গেছে ওপর দিকে। এই ধু ধু তেপান্তরের একধারে 'হোলডারনেস হল', রাস্তা বরাবর গেলে পুরো দশ মাইল, জলা-ভূমির মধ্যে দিয়ে গেলে মাত্র ছ'মাইল। বড় অদ্ভুত জায়গা, এ রকম জনবসতি-বিরল জায়গা সাধারণতঃ দেখা যায় না। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কয়েকটা মাথা গুঁজবার মত ঠাঁই, জলাভূমির চাষীরা গরু ছাগল চরাবার জন্যে এরকম চালা বানিয়ে রেখেছে এদিকে সেদিকে। এ ছাড়া সমস্ত অঞ্চলটা ঘুরলে শুধু প্লোভার আর কারলুর পাখীর দঙ্গল ছাড়া আর কিছুই তুমি দেখতে পাবে না। চেস্টার-ফিল্ড হাই রোডে আসার পর আবার শুরু হল জনবসতি। একটা গীর্জে, কয়েকটা কুঁড়েঘর আর একটা সরাইখানা। এর পরেই আচমকা খাড়াই হয়ে উঠেছে পাহাড়ের শ্রেণী। কাজেই বুঝতে পারছ ওয়াটসন, আমাদের তদন্ত শুরু করতে হবে এই উত্তর দিক থেকেই।"

"কিন্তু সাইকেলটা?" আমি লেগে থাকি নাছোড়বান্দার মত।

অসহিষ্ণুস্বরে হোমস্ বললে, "আরে গেল যা! ওস্তাদ সাইক্লিস্ট কখনও রাস্তার বাছবিচার করে না এবং বড় রাস্তাকে সে বাদ দিয়ে গলিঘুঁজির ভেতর দিয়েও অনায়াসেই চালাতে পারে তার দ্বি-চক্রযান। জলাভূমিতেও অজস্র সরু সরু রাস্তার অভাব নেই, তাছাড়া সে রাতে আবার জোছনার ফুটফুটে আলোয় অস্পষ্ট ছিল না কিছু। আরে, আরে, একি!"

কে যেন দারুণ উত্তেজিত হয়ে খটাখট শব্দে টোকা দিলে দরজায়। পর মুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন ডঃ হাক্সটেবল স্বয়ং। হাতে একটা নীল রঙের ক্রিকেট খেলোয়ারের টুপী। টুপীর ওপরের অংশে সাদা জমির ওপর সোনালী জরি দিয়ে আঁকা উল্টোনো 'V' মার্কা মর্যাদাসূচক অলংকরণ।

"পেয়েছি, শেষ পর্যন্ত একটা সূত্র আমরা পেয়েছি! জয় ভগবান, এবার পাওয়া গেছে ছেলেটার হদিশ! এ টুপী লর্ড স্যালটায়ারের।"

"কোথায় পেলেন?"

"জলায় একদল জিপসি আস্তানা গেড়েছিল, তাদের ভ্যানে। মঙ্গলবার পাততাড়ি গুটোয় ওরা। আজকে পুলিশ ওদের পিছু নিয়ে ক্যারাভ্যান তল্লাশ করতেই এ টুপী পাওয়া গেছে।"

"ওরা কি বলছে?"

"ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে ছাড়া কি আর বলবে। মঙ্গলবার সকালে ওরা নাকি টুপীটাকে জলাভূমিতে পড়ে থাকতে দেখেছিল। রাস্কেল কোথাকার! সব জানে ওরা, ছেলেটাকে কোথায় গুম করে রাখা হয়েছে, সে খবর ওরা ছাড়া আর কেউই দিতে পারবে না। আপাতত তো হাজতে পচুক হতভাগারা। তারপর, আইনের চোখরাঙানি তো আছেই। তাতেও না হলে ডিউকের টাকার জোরে মুখ খুলবে ওদের।"

আনন্দে আটখানা হয়ে ডক্টর বেরিয়ে যাওয়ার পরেই হোমস্ বললে, "খবরটা মোটামুটি খুব খারাপ নয়, ওয়াটসন। সূত্র হিসেবে এর মূল্য কতখানি জানি না, কিন্তু এ থেকে যে থিওরী পাওয়া যাচ্ছে, তার মূল্য অনেক। আমাদের সমস্ত তৎপরতা লোয়ার গিল মুরেই সীমিত রাখতে হবে—আর কোথাও নয়। জিপসিদের গ্রেপ্তার করা ছাড়া পুলিশ এ অঞ্চলে সত্যিকারের কোন কাজই করতে পারেনি। ওয়াটসন, দেখেছ? জলার ওপর দিয়ে একটা জলের ধারা বয়ে গেছে। ম্যাপেতেই তো দাগিয়ে রাখা হয়েছে দেখছি। মাঝে মাঝে ধারাটা চওড়া হয়ে গিয়ে মিশেছে নীচু জলা জায়গায়। ধারাটা বিশেষ করে দাগানো হয়েছে স্কুল আর 'হোলডারনেস হলে'র মাঝামাঝি জায়গায়। এখন আবহাওয়া যা শুকনো, তাতে জলাভূমির অন্যদিকে মাথা খুঁড়লেও পায়ের দাগটাগ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না আমার। চিহ্নটিহ্ন পাওয়া যেতে পারে শুধু এই জলে স্যাঁৎসেঁতে জায়গাটাতেই। কাল ভোরেই তোমায় ডাক দেব, ওয়াটসন। দুজনে মিলে দেখা যাক এ রহস্যের কোন কিনারা করতে পারি কিনা।"

সবে পাখীর ডাক শুরু হয়েছে, রক্তরাগের আভা দেখা দিয়েছে পূবে,

হোমস এসে টেনে তুললে আমায়। চোখ মেলেই দেখলাম শয্যার পাশে ওর দীর্ঘ শীর্ণ মূর্তি দাঁড়িয়ে। অত ভোরেও সেজেগুজে তৈরী হয়ে নিয়েছে ও। মনে হল, ইতিমধ্যে এক চক্কর ঘোরাও হয়ে গেছে।

আমি চোখ খুলতেই ও বললে, "লন আর সাইকেল রাখার শেডটা দেখে এলাম, ওয়াটসন। 'এবড়ো-খেবড়ো উপবন'-এর মধ্যে দিয়েও এক পাক ঘুরে এলাম। পাশের ঘরে তোমার কোকো তৈরী হয়ে পড়ে রয়েছে। চটপট তৈরী হয়ে নাও, বিস্তর কাজ সারতে হবে আজকে।"

দু'টুকরো হীরের মত ঝকমক করছিল ওর চোখদুটো। কাজে হাত দেওয়ার আগে ওস্তাদ কারিগরের চোখ যেমন নিবিড় উৎসাহের রোশনাইতে জ্বলে ওঠে, এ যেন ঠিক তেমনি। এ যেন আর এক হোমস্। বেকার স্ট্রীটের আত্ম-সমাহিত হোমস্, দু'চোখে যার বিরক্ত স্বপ্নালু তন্ময়তা; আর আজকের চটপটে, তৎপর হোমস্, চোখেমুখে দেহে মনে যার শুধু কাজের দীপ্তি—চেনা যায় না, যেন দু'রকমের ধাতুতে তৈরী দুজনে। মানসিক শক্তিতে ভরপুর সেই দীর্ঘ নমনীয় মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে হল, বাস্তবিকই আজ বড় কঠোর পরিশ্রমের দিন।

কিন্তু তবুও চরম নিরাশার মধ্যে দিয়েই শুরু হল আমাদের অভিযানের প্রথম পর্ব। বুকভরা আশা নিয়ে গেছিলাম জলাভূমিতে। গাছপালার পচা শিকড়ে বোঝাই রাঙামাটির ওপর দিয়ে ফক্স হাউণ্ডের মতই এগিয়ে গেলাম, ভেড়া যাতায়াতের অজস্র পথে শতধা বিভক্ত জলাভূমির গোলকধাঁধার মত পাকদণ্ডিতে বৃথাই ঘুরে বেড়ালাম, তারপর এসে পড়লাম জলাভূমি আর হোলডারনেসের মধ্যেকার চওড়া হাল্কা সবুজ রঙের বৃত্তাকার নীচু জলা জায়গায়। ছেলেটা যদি বাড়ীর দিকেই গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে এ পথ মাড়িয়েই যেতে হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে কোন রকম চিহ্ন না রেখে তার পক্ষে যাওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু সে তো নয়ই, এমন কি জার্মান মাস্টারও যে কস্মিনকালে এ পথ দিয়ে গেছিল, তার কোন নিশানা দেখলাম না। মুখ কালো করে হোমস সবুজ জলাভূমির কিনারা বরাবর হাঁটতে লাগল—প্যাচপেচে জমির ওপর কোন রকম কাদা-চটচটে চিহ্ন দেখার প্রবল আশা তার আকুল চোখে। ভেড়া যাতায়াতের চিহ্ন পেলাম বিস্তর, কয়েক মাইল দূরে এক জায়গায় গরুর পায়ের ছাপও পেলাম। কিন্তু ঐ পর্যন্ত—তার বেশী নতুন কিছুই ধরা পড়ল না আমাদের ব্যগ্র সন্ধানী চোখে।

খুবই মুষড়ে পড়ল হোমস্। বিষাদ-মাখা চোখে জলাভূমির ধু ধু বিস্তারের পানে তাকিয়ে বললে, "এদিকটা তো কোন রকমে হ'ল, এখন ওদিকে রয়েছে আর একটা নীচু জলা জায়গা, মাঝামাঝি একফালি জমিও দেখতে পাচ্ছি। আরে! আরে! আরে! একি দেখছি, একি দেখছি এখানে!"

কালো ফিতের মত সরু একটা রাস্তার ওপর এসে পড়েছিলাম আমরা। ঠিক মাঝখানে ভিজে মাটির ওপর দেখলাম সুস্পষ্ট সাইকেলের চাকার দাগ।

'হুররে! পেয়েছি! পেয়েছি!" এবার উল্লসিত হওয়ার পালা আমার।

কিন্তু হোমস্ যেন হতভম্ব হয়ে গিয়ে মাথা নাড়তে লাগল আপন মনে, চোখেমুখে আনন্দের উচ্ছ্বাসের বদলে দেখলাম নতুন কিছু পাওয়ার আশা।

বলল, "সাইকেল তো বটেই, কিন্তু 'সেই' সাইকেলটা নয়। টায়ারের বিয়াল্লিশ রকম বিভিন্ন ছাপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। দেখতেই পাচ্ছ, এ ছাপটা ডানলপ টায়ারের, বাইরের কভারের ওপর একটা দাগও আছে। কিন্তু হেইডেগারের সাইকেলে পামার টায়ার লাগানো আছে। ভিজে মাটির ওপর লম্বালম্বি স্ট্রাইপের ছাপ পড়ে তার সাইকেলের টায়ারে। এ বিষয়ে গণিতের পণ্ডিত য্যাভেলিংয়েরও অগাধ বিশ্বাস। কাজে কাজেই, এ সাইকেল হেইডেগারের সাইকেল নয়।"

"তাহলে নিশ্চয় ছেলেটার?"

"তা হ'ত যদি প্রমাণ করতে পারতাম যে তারও দখলে ছিল আরও একটা সাইকেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা আমরা পারিনি। এই দাগটার সৃষ্টি যার সাইকেলে, সে কিন্তু স্কুলের দিক থেকেই এসেছে।"

"স্কুলের দিকেও তো যেতে পারে?"

"আরে না, না, মাই ডিয়ার ওয়াটসন। যে ছাপটা গভীর হয়ে ফুটে ওঠে মাটির ওপর, সেইটাই কিন্তু পেছনকার চাকার, কেন না ভারটা তো বেশীর ভাগ পেছনের চাকার ওপরেই পড়ে। কয়েক জায়গায় লক্ষ্য করলেই দেখবে পেছনের চাকাটা অনেক বার সামনের চাকার হাল্কা অগভীর ছাপের ওপর দিয়ে গেছে। সুতরাং স্কুলের দিক থেকেই আসছিল সাইকেলটা। আমাদের বর্তমান তদন্তের সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্পর্ক থাকুক আর না থাকুক, আমরা দাগ বরাবর গিয়ে দেখব কোথা থেকে এসেছে সাইকেলটা।"

করলাম তাই। কয়েক শ' গজ যাওয়ার পরেই জলাভূমির ভিজে মাটি ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই টায়ারের দাগও গেল মিলিয়ে। আবার পিছিয়ে এলাম খানিকটা। এক জায়গায় দাগের ওপর দিয়ে ঝির ঝির করে বয়ে চলেছিল ঝরনা। এইখানে পেলাম আবার সাইকেলের দাগ, কিন্তু গরুর খুরের অজস্র ছাপে দাগ প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে বললেই চলে। এরপর আর কোন ছাপ নেই। রাস্তাটা কিন্তু সিধে চলে গেছে স্কুলের পেছন দিককার এবড়ো-খেবড়ো উপবনের ভেতরে। বুঝলাম, সাইকেলের আবির্ভাব ঘটেছে এ উপবনের ভেতর থেকেই। হাতের ওপর চিবুক রেখে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে পড়ল হোমস্। পর পর দুটো সিগারেট শেষ করে ফেললাম, কিন্তু পাথরের খোদাই করা মূর্তির মত ওর মধ্যেও এতটুকু স্পন্দন দেখলাম না।

দু দুটো সিগারেট ছাই হয়ে যাওয়ার পর হোমস্ বললে, "এমনও তো হতে পারে যে, অচেনা ছাপ ফেলার উদ্দেশ্যে কোন চতুরচূড়ামণি সাইক্লিস্ট রওনা হওয়ার আগে টায়ার দুটো পালটে নিয়েছে? এ ধরনের বুদ্ধি যে ক্রিমিন্যালের মাথায় আসে, তার সঙ্গে বুদ্ধির প্যাঁচ কষেও আনন্দ আছে। আপাততঃ এ প্রশ্নের সমাধান না করে জলাভূমির

দিকেই ফিরে যাই চল। এখনও অনেক কাজ বাকী ওদিকে।"

ভিজে ভিজে জমির ওপর আবার শুরু হল আমাদের অভিযান, চোখে অনুবীক্ষণ লাগিয়ে ধুলো থেকে সোনা খোঁজার মতই তন্ন তন্ন করে অতি নগণ্য জিনিসও খুঁটিয়ে দেখতে কসুর করলাম না। অচিরেই আমাদের এত পরিশ্রম হল সার্থক, ফলাফল পেলাম হাতে হাতে।

জলাভূমির নীচের অংশে আড়াআড়ি একটা পাঁকাল রাস্তা চোখে পড়ায় সেদিকে এগুচ্ছি, এমন সময়ে খানিকটা তফাৎ থেকেই সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল হোমস"। পথটার ঠিক মাঝখানে একগোছা টেলিগ্রাফের সূক্ষ্ম তারের মত একটা লম্বা ছাপ। পামার টায়ার!

মহা খুশীতে রীতিমত চেঁচামেচি জুড়ে দিল হোমস্, "এই হল হের হেইডেগারের সাইকেল! এবার আর ভুল হবার জো নেই। কি হে ওয়াটসন, আমার যুক্তিটুক্তিগুলো খাঁটি মনে হচ্ছে না?"

"আমার অভিনন্দন রইল।"

"কিন্তু এখনও যে অনেক দূরে যেতে হবে, বন্ধু। দয়া করে রাস্তা ছেড়ে হাঁট। এবার শুরু হোক পামার টায়ার অনুসরণ পর্ব। বেশী দূরে যেতে হবে বলে তো মনে হয় না।"

কিছুদূরে এগিয়ে দেখলাম, জলাভূমির এদিককার অংশে নরম মাটির টুকরো টুকরো জমির সংখ্যা বড় কম নয়। কাজেই মাঝে মাঝে পামার টায়ার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল চোখের সামনে থেকে, কিন্তু একেবারে নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম সামনের দিকে এগিয়ে গেলেই।

হোমস্ বললে, "একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ ওয়াটসন? লোকটা সাইকেলের গতিবেগ কিন্তু এবার বাড়িয়ে দিয়েছে। না, কোন সন্দেহই নেই এ বিষয়ে। এই ছাপটা দেখ, দুটো টায়ারের দাগই পরিষ্কার উঠেছে এখানে। লক্ষ্য করেছ, দুটো ছাপই সমান গভীর। তার মানে কি? হেইডেগার হ্যাণ্ডেলবারের ওপর দেহের ভর দিয়ে সাইকেল চালিয়েছে। তীরবেগে সাইকেল চালাতে গেলে সামনের দিকে এইভাবেই ঝুঁকে পড়তে হয়। সর্বনাশ! একবার আছাড়ও খেয়েছে দেখছি।"

বেশ কয়েক গজ পর্যন্ত টায়ারের সুস্পষ্ট ছাপ নষ্ট হয়ে গেছে অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা ধ্যাবড়া দাগে। এরপর কতকগুলো পায়ের ছাপ। ঠিক তার পরেই আবার দেখা দিয়েছে পামার টায়ার।

"পাঁকের ওপর চাকা পিছলে গেছে মনে হচ্ছে", বললাম আমি।

দোমড়ানো মোচড়ানো কাঁটা ফুলের একটা শাখা তুলে ধরলে হোমস। সভয়ে দেখলাম টুকটুকে লাল রঙের ছোপ লেগেছে হলুদ কুঁড়িগুলোয়। এমনকি রাস্তার ওপরে আর ঝোপের মধ্যেও দেখলাম চাপ চাপ জমাট রক্তের কালো দাগ।

"খারাপ! ভারী খারাপ!" বিড়বিড় করতে থাকে হোমস্। "সরে দাঁড়াও, ওয়াটসন। এলোমেলো পায়ের ছাপ আর একটিও নয়! কি দেখছি জান? আহত হয়ে পড়ে গেলেন হেইডেগার, তবুও দাঁড়িয়ে উঠলেন রক্তাক্ত দেহে, বসলেন সাইকেলের সিটে, শুরু হল যাত্রা। কিন্তু নতুন দাগ তো আর দেখছি না। পাশের সরু পথটায় গরু ঘোড়া মোষ ভেড়া চলার চিহ্ন তো দেখছি অনেক। ষাঁড়ের গুঁতো-টুঁতো খায়নি তো? অসম্ভব! কিন্তু দ্বিতীয় প্রাণীর চিহ্নও তো দেখছি না যে। ওয়াটসন, চল এগিয়ে যাই, যা থাকে কপালে। রক্তের দাগ আর চাকার ছাপ, এই আমাদের সম্বল, চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়া এবার আর সম্ভব নয় বাছাধনের পক্ষে।"

এবারের অনুসন্ধান-পর্ব হল খুবই সংক্ষিপ্ত। ভিজে ভিজে চকচকে পাথরের ওপর দিয়ে হঠাৎ মাতালের মত এঁকে-বেঁকে এগিয়ে গেল পামার টায়ার। তার পরেই সামনের দিকে তাকাতে, আচম্বিতে আমার চোখে পড়ল ঘন কাঁটাঝোপের মধ্যে ঝকমকে ধাতুর মত কি একটা জিনিস। ভেতর থেকে টেনে বার করলাম পামার টায়ার লাগানো একটা সাইকেল। একটা প্যাডেল দুমড়ে গেছে, সামনের দিকটা আগাগোড়া ভিজে গেছে টস টস করে ঝরে পড়া রক্তে। বীভৎস। ঝোপের অন্যদিকে আকাশ-মুখো একটা জুতো দেখে ঘুরে দৌড়লাম আমরা। সাক্ষাৎ মিললো হতভাগ্য সাইক্লিস্টের। বেশ লম্বা চেহারা ভদ্রলোকের, একমুখ ঘন দাড়ি, চোখের চশমার একটা কাঁচের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। মাথার ওপর প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর—খুলির সামনের দিকটা একেবারেই চুরমার হয়ে গেছে সেই সাংঘাতিক ঘা-য়ে। এ রকম মারাত্মক আঘাত পাওয়ার পরেও যে পুরুষ এতটা পথ আবার সাইকেল চালিয়ে আসতে পারে, তার প্রাণশক্তি আর সাহসের প্রশংসা করতে হয় সহস্রমুখে। ভদ্রলোকের পায়ে জুতো আছে বটে, কিন্তু মোজা নেই, বুক-খোলা কোটের নীচে দেখলাম রাত্রে পরার একটা নাইট-সার্ট। না, কোন সন্দেহই আর নেই, এ লাশ পলাতক জার্মান মাষ্টার হেইডেগারেরই।

সশ্রদ্ধভাবে মোলায়েম হাতে দেহটা উল্টে ফেলে অনন্যমনা হয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল হোমস্। তারপর কিছু-ক্ষণ ডুবে রইল গভীর চিন্তায়। কুঁচ-কোনো কপালের অজস্র রেখা দেখে বেশ বুঝলাম, এই শোচনীয় আবিষ্কারে আমাদের সত্যিকারের সমস্যার সুরাহা হয়নি কিছুই এবং আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই আছি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ও বললে, "কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না, ওয়াটসন। আমার নিজের অভিমত হচ্ছে তদন্ত চালিয়ে যাওয়া। ইতিমধ্যেই পামার-টায়ার রহস্য নিয়ে এত সময় নষ্ট করে ফেলেছি যে আর একটা ঘণ্টাও বাজে ভাবে কাটাতে রাজী নই আমি। পক্ষান্তরে পুলিশের কানেও এখানকার খবর পৌঁছে দেওয়ার কর্তব্য আমাদেরই। হতভাগ্য মাষ্টারের দেহটার গতি যাতে হয়, সে ব্যবস্থাও তো করা দরকার।"

"খবর নিয়ে আমিই ফিরে যেতে পারি।"

"কিন্তু তোমার সঙ্গ আর সাহায্য আমার এখন বিশেষ দরকার। সবুর! ওদিকে ঐ যে লোকটা পচা শিকড় মিশানো মাটি কাটছে—ডাকো ওকে, ওকে দিয়েই খবর পাঠানো যাক।"

চাষী লোকটাকে ডেকে আনলাম। খুনখারাপী দেখে তো ভয়ের চোটে তার ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম। হোমস্ একটা চিরকুট লিখে দিলে তার হাতে ডঃ হাক্সটেবলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে।

লোকটা বিদেয় হলে হোমস্ বললে, "ওয়াটসন, আজ সকালে তাহলে মোট দুটো সূত্র পেলাম। এক নম্বর হচ্ছে পামার টায়ার লাগানো বাইসাইকেল এবং তার শোচনীয় পরিণতি। দু' নম্বর হচ্ছে ডানলপ টায়ার লাগানো বাইসাইকেল। তদন্ত শুরু করার আগে একবার

ভেবে নেওয়া যাক আমাদের হাতে এই মুহূর্ত পর্যন্ত কি কি তথ্য এসেছে। যে তথ্য নিছক দৈবাৎ, তা বাদ দেব, হাতে রাখব শুধু নিতান্ত প্রয়োজনীয় পয়েণ্টগুলো।

"সবার আগে একটা বিষয় তোমায় বলে রাখি, ওয়াটসন। ছেলেটা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় পালিয়েছে স্কুল ছেড়ে। নিজেই জানলা গলে আইভিলতা বেয়ে নীচে নেমেছে সে, যাবার সময়ে হয় একলা গেছে, আর না হয় সঙ্গে কাউকে নিয়েছে। এ বিষয়ে কোন রকম সন্দেহ আমার নেই।"

আমিও একমত হলাম হোমসের সাথে।

"বেশ, এবার তাহলে আসা যাক হতভাগ্য জার্মান মাস্টারের প্রসঙ্গে। যাওয়ার সময়ে ফিটফাট হয়ে বেরিয়েছে ছেলেটি। তার মানে, সে জানত কি করতে চলেছে সে। কিন্তু হেইডেগার মোজা না পরেই বেরিয়ে পড়লেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে তৈরী হয়ে নিতে হয়েছে—মোজা পরার সময় বা সুযোগ হয়নি সেই কারণেই।"

"নিঃসন্দেহে।"

"কিন্তু হেইডেগার গেলেন কেন? কারণ শোবার ঘরের জানলা থেকে ছেলেটার পলায়ন-দৃশ্য উনি দেখতে পেয়েছিলেন। সাইকেলে পিছু নিয়ে ওকে ধরে ফেলে ফিরিয়ে আনার অভিপ্রায় নিয়েই শুরু হয়েছে ও'র নিশা-অভিযান। তাই তাড়াতাড়ি সাইকেল বার করে বেরিয়েছিলেন উনি। কিন্তু ঐ বেরোনোই হ'ল ও'র কাল।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"এবার আসছি বিতর্কের সবচেয়ে গোলমেলে অংশে। একটা ছেলের পাছু নেওয়ার ইচ্ছে থাকলে যে কোন পুরুষের পক্ষে পেছন পেছন দৌড়োনোই স্বাভাবিক। কেননা, দৌড়ে তাকে টেক্কা দেওয়া তো আর ছোট ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অবাক কান্ড, জার্মান মাস্টার এই সহজ পথ না নিয়ে শরণ নিলে সাইকেলের। শুনেছি, ভদ্রলোক ওস্তাদ সাইক্লিস্ট ছিলেন এবং উনি কখনই তাঁর দ্বি-চক্রযানের সাহায্য নিতেন না যদি না উনি দেখতেন যে ছেলেটা চম্পট দেওয়ার জন্যে শরণ নিয়েছে কোন বেগবান বাহনের।"

"আর একটা বাইসাইকেলের সম্ভাবনা এসে গেল কিন্তু।"

"দেখাই যাক না যুক্তির পথে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। স্কুল থেকে পাঁচ মাইল দূরে খুন হলেন হেইডেগার। মনে রেখ, মৃত্যু কিন্তু বুলেটের চুম্বনে নয়। শক্তিশালী হাতের অত্যন্ত বর্বরোচিত আঘাতে। বুলেট ছুঁড়ে মানুষ খুন করা যে কোন ছেলে-মানুষের পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু মাথার খুলি গুঁড়ো করার মত পাশবিক আঘাত হানার ক্ষমতা তার হাতে নেই। কাজেই, ছেলেটির নৈশ-পলায়নের সঙ্গী ছিল একজন। এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এই পাঁচ মাইল পেরিয়ে এসেছে তারা—কেননা, এই সুদীর্ঘ পথেও হেইডেগারের মত পাকা সাইক্লিস্ট তাদের পেরিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু অকুস্থল পর্যবেক্ষণ করে, আশ-পাশের জায়গা-জমি তন্নতন্ন করে দেখেও আমরা পাচ্ছি কি? গরু ঘোড়া মোষ ভেড়ার আনাগোনার চিহ্ন—ব্যস, আর কিছুই নয়। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে ঘুরে এসেও পঞ্চাশ গজের মধ্যে কোন পথঘাটের সন্ধান পেলাম না। খুনের সঙ্গে আর একজন সাইক্লিস্টের কোন সম্পর্কই নেই। এমন কি, কোন মানুষের পায়ের ছাপও নজরে এল না।"

"হোমস, কি বলছ তুমি, এ যে অসম্ভব!"

"সাবাস! খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য! অসম্ভবই বটে, হয় আমার বলার ভঙ্গিমাই ভুল, আর না হয় ভুল লুকিয়ে আছে যা বলেছি তার মধ্যে। কিন্তু নিজের চোখেই তো তুমি সব দেখলে, যুক্তিতর্কের কোন কারচুপি নিয়ে তোমার খটকা লেগেছে?"

"আছাড় খাওয়ার সময়ে মাথার খুলি ভেঙে যায়নি তো?"

"এই রকম একটা জলা জায়গায়, ওয়াটসন?"

"ভাই, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে।"

"আরে ছ্যাঃ, কি বলছ। অনেকগুলো ঘোরালো সমস্যার সমাধান করলাম আমরা। মালমশলা পেয়েছি বিস্তর—এখন শুধু তাদের কাজে লাগানোই বাকী। পামার-পর্ব তো শেষ হল, এবার এস ডানলপের পাছু নিয়ে দেখা যাক কোথায় পৌঁছোই আমরা।"

শুরু হল ডানলপ-চিহ্নিত পথে শিকারী কুকুরের মত আমাদের অভিযান। কিছু দূরে যাওয়ার পরেই জলাভূমি ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে উঠে গেল ওপর দিকে, জলের ধারা পেছনে ফেলে এসে পড়লাম গুল্ম-সমাকীর্ণ বৃত্তাকার সু-দীর্ঘ একটা অংশের ওপর। এ রকম জায়গায় কোন চিহ্নই পাওয়া আর সম্ভব নয়। শেষবারের মত যেখানে ডানলপের চিহ্ন দেখলাম, সেখান থেকে হোলডারনেস হলের দিকে যাওয়া যায়। কয়েক মাইল দূরে বাঁ দিকে 'হলে'র আকাশ-ছোঁয়া জমকালো চূড়াগুলো চোখে পড়ছিল। আবার সামনের দিকে চেস্টারফিল্ডের হাই-রোডের পাশে ধূসর গ্রামটার দিকে যাওয়াও সম্ভব।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদ : শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন

॥ বিজ্ঞানের কথা প্রসঙ্গে ॥
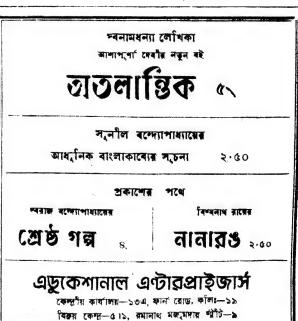
অমৃত সম্পাদক সমীপেষু,

গত ৬ই জুলাই তারিখে 'অমৃত' পত্রিকার 'বিজ্ঞানের কথা' বিভাগে জগদীশ বসুর স্মৃতিবিজড়িত জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিভা অনুসন্ধান সংস্থার যে বিশদ আলোচনা করেছেন তজ্জন্য আমাদের ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে এ সংস্থার উদ্দেশ্য প্রচারে আপনার পত্রিকাকে অগ্রণী বলা যেতে পারে। ভবিষ্যতে আমাদের কার্যাবলীর যথাযোগ্য সমালোচনা আপনাদের বহুলপ্রচারিত পত্রিকায় স্থান পাবে এ আশা রাখি।

১৮ই জুন তারিখে রবীন্দ্রসরোবর ষ্টেডিয়াম হলে অনুষ্ঠিত উৎসবটি এই সংস্থার দ্বিতীয় বার্ষিকী প্রতীক বিতরণের দিন ছিল। সেদিনের উৎসবে বৃত্তিধারীদের মধ্যে ছাত্রী কেহই ছিলেন না। আপনারা বোধহয় উপরিউক্ত তারিখের পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গত বৎসরের প্রতীক বিতরণী উৎসবের কথাই উল্লেখ করেছেন। গত বৎসর নয়জন বৃত্তিধারী ছাত্র ও একজন ছাত্রীকে প্রতীক বিতরণ করা হয়েছিল।

"যোগ্য ও অযোগ্য মিলিয়ে মাত্র ৩৩৯টি আবেদনপত্র পাওয়া নিতান্তই অস্বাভাবিক ব্যাপার" এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে আমরা সমর্থন করি। এই সংস্থার আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা দেশের ছাত্রছাত্রীদের উদাসীনতা আমাদেরও কম বিস্মিত করেনি। প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৯৬০ সালে কলিকাতা দুটি বড় বড় কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত। কিন্তু দুই কলেজের প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকদের চেষ্টা সত্ত্বেও দরখাস্তের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৩ ও ২৬। আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাস্বল্পতার হেতু অনুসন্ধান ফলে জানা গেল ছাত্রদের উদাসীনতা এবং কিছুটা পরীক্ষাভীতিমূলক মনোবৃত্তি। ভাবটা হল—স্কলারশিপ ত মোটে দশটি অতএব আমার চেষ্টা করা বৃথা।

পাছে ছেলেমেয়েরা এই প্রতিযোগিতার সংবাদ না পায় এই সংশয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমরা বাঙলা দেশের প্রায় ৩৫০ হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে আমাদের ঘোষণাপত্র পাঠাই ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। ও হেডমাষ্টার মহাশয়দের অনুরোধ করা হয়

যাতে তাঁরা ১১শ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এবিষয়ে অবহিত করেন। এবং পরীক্ষার ফল ঘোষণা হবার পরে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মার্কসীট বিতরণ করবার সময় যাতে তাঁরা একখানি করে দরখাস্তের ফর্ম তাঁদের হাতে দেন সে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ভর্তির কিছুদিন পূর্বে অনুরূপ ঘোষণাপত্র পাঠান হয়েছিল সমস্ত কলেজে কলেজে। তাঁদের অনুরোধ করা হয়েছিল সাক্ষাৎকারে বা পত্রযোগে যে ভর্তি হবার সময় তাঁরা একখানি করে দরখাস্তের ফর্ম বিলি করেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বৎসর দরখাস্তের সংখ্যা ছিল ৪১১ যদিও প্রায় ছ'হাজার ফর্ম বিলি করা হয়েছিল এবং আমরা অন্ততঃ ৮০০ দরখাস্তের প্রতীক্ষায় ছিলুম। আশা করা যাচ্ছে যে এবারে সংখ্যা আরও কিছু বাড়বে।

আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার সমালোচনার জন্য।

নমস্কারান্তে ইতি—
কালিদাস মিত্র
ডাইরেক্টর,
জগদীশ বসু ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ

॥ আধুনিক গান প্রসঙ্গে ॥

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ৭ম সংখ্যা 'অমৃতে' জৈমিনির আধুনিক বাংলা গানের সমালোচনাটি পড়লাম। ৯ম সংখ্যায় শ্রীনারায়ণ ঘোষ, আশুতোষ দাস ও শ্যামলেন্দুনারায়ণ ভাদুড়ীর মতামতগুলিও পড়লাম। আধুনিক বাংলা গানের উপর এঁদের প্রত্যেকেরই আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই শ্রীনারায়ণ ঘোষকে। আধুনিক বাংলা গানে, 'কোন মতে কয়েকটি শব্দ বসিয়ে দিতে পারলেই হল' একথা যে কতখানি ভুল, তা' নারায়ণ ঘোষের মতামতটি পড়লে সহজেই বুঝতে পারা যায়। আধুনিক বাংলা গান আমি ভালবাসি। কিন্তু ততোধিক ভালবাসি 'ক্লাসিকাল', 'রবীন্দ্র সংগীত' ইত্যাদি গান। কিন্তু জৈমিনি, শ্যামলেন্দুনারায়ণ ভাদুড়ী ও আশুতোষ দাস যা লিখেছেন, তাতে শুধু আমি কেন, সংগীত-অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন।

আধুনিক গান সত্যিই উচুস্তরের। তার প্রমাণও ভুরি ভুরি। নারায়ণ ঘোষ উল্লিখিত গানগুলি ছাড়াও 'লালু ভুলু,' ইত্যাদি কথাচিত্রের গানগুলি এবং আরো বহুগান আছে, যার কথা ও সুর অনেক উঁচু স্তরের। 'সাত ভাই চম্পায়' কথা ও সুর যদি না থাকতো, তবে সেটা কিছুতেই এ বছরের শ্রেষ্ঠ পুজো রেকর্ড হিসেবে খ্যাতি পেত না। শ্যামলেন্দুনারায়ণ ভাদুড়ী এই সকল গান শুনেও (নিশ্চয়ই তিনি শুনে থাকবেন) কি করে বলেন, "নেই তার কোন সুর, না আছে ভবিষ্যতের আশার সংকেত?" এগুলির রচয়িতারা কি "অকবি বা কুকবি"?

তারপর আধুনিক বাংলা গানের স্থায়িত্ব আছে বৈকি। আমাদের বাংলা ভাষাটা নাকি সংস্কৃতেরই সহজ রূপ। সংস্কৃত থেকেই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ বাংলা ভাষা Major Indian Language হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন যদি কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি বলেন (বা দু'শো তিনশো বছর আগেও যদি বলতেন) যে, 'বাংলা ভাষার স্থান কতটুকু?' তবে তাঁর কথাটা যেমন হাস্যাস্পদ হতো 'আধুনিক বাংলা গানের স্থায়িত্ব কতটুকু?' কথাটাও সেই রকম। আশুতোষ দাস সমাজের নানা বিষয়ের অবনতির একমাত্র মূলে কারণই আধুনিক গান, এইকথা বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু তা' কি করে সম্ভব? তবে একথা অবশ্যই মানব যে, কোন কোন বাংলা গান 'লাফে-ঝাঁপে-হুল্লোড়ে' হিন্দী গানকেও ছাড়িয়ে যায়। 'শুধালেম তারে আমি......', "কে কে কে, সে যে কলকাতার......" ইত্যাদি গানগুলি শুনলে সত্যিই লজ্জা পেতে হয়। তাই বাংলা গানকে একটা বিরাট সম্মান দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, সমস্ত বাংলা গানকেই নিম্নস্তরের না বলে, ঐসব বিশেষ গানগুলিরই বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জানানো উচিত। ইতি—

নমস্কারান্তে,
বিশ্ববিজয় গোস্বামী,
যাদবপুর।

বিচিত্র দেশ : অতীন্দ্র মজুমদারের বিচিত্র মানুষ

॥ তিন ॥

॥ প্রেতভীত বাত্তক্ ॥

তখনও ভোর হয়নি। অল্প অল্প অন্ধকার রাত্রির সঞ্চয়ে রয়েছে, এখনও দিবালোকের ততখানি স্পর্ধা হয়নি যাতে এই অন্ধকারকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তামাক ক্ষেতের সাহেব আরামে ঘুমোচ্ছেন, দোতলায়, নিজের বিছানায়। হঠাৎ কোরাসে খক্ খক্ কাশির শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চমকে বিছানায় উঠে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন জন কুড়ি লোক দল বেঁধে নীচে আঙিনায় সমস্বরে কাশছে—হয়ত এভাবেই তারা সাহেবের ঘুম ভাঙাতে চায় অসময়ে। দলে যেমন শক্ত-সমর্থ পুরুষ আছে, তেমনি আছে যুবতী কিশোরী, বৃদ্ধা এবং কিছু শিশু-বালক-বালিকা।

সাহেব তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন কোন রকমে জামাটা গায়ে গলিয়ে। পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন দলটার সামনে। —'কী ব্যাপার! সাতসকালে এত কোলাহল করে কাশির সমারোহ কেন?' সাহেবের নীরব প্রশ্ন তীব্র হয়ে ওঠে দুই চোখে। সমস্ত দলটার সামনে একটা উৎসুক জিজ্ঞাসার মত সাহেবের শরীরটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু কেউ কোন কথা বলে না। সকলে মাথা নীচু করে থাকে আর নীরব লজ্জার মত নিজেদের পায়ের ছায়ার দিকে তাকায়।

সাহেব একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর সরবেই তাঁর প্রশ্নটিকে সকলের মুখের ওপর ছুঁড়ে দেন—'কী চাও তোমরা? আমাকে কি কিছু বলতে এসেছ?'

সকলে তবুও নীরব। সাহেব এবার স্পষ্টই বিরক্ত হন। ফিরে যান নিজের ঘরে। সকালের খানা খেয়ে তাড়াতাড়ি তামাকের ক্ষেতে যেতে হবে কুলিদের কাজ তদারক করতে, নতুন একটা ক্ষেত পাশে পরিষ্কার করা হয়েছে, সেখানে নতুন করে তামাকের বীজ বপন করার ব্যবস্থা করতে। এই নীরব জনতার মূক ধৈর্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার অত সময় সাহেবের নেই।

বাংলো ছেড়ে সাহেব বেরোলেন তৈরি হয়ে, ক্ষেতে যাবার জন্যে। পিছনে নিরাপদ দূরত্বে চলেছে সেই জনতা। কোন কথা বলে না, শুধু সাহেবের পিছনে পিছনে চলে সেই নিস্তব্ধ শোভাযাত্রা। সাহেব ক্ষেতের কাজ দেখছেন ঘুরে ঘুরে, তারাও ঘুরছে পিছনে পিছনে। কেউ একটাও কথা বলে না, বলতে চায় না।

দিন গেল। সন্ধ্যা হল। বাদামী তামাকের ক্ষেত থেকে সাহেব ফিরে এলেন ক্লান্ত দেহে নিজের বাংলোয়। তখনও পিছনে আসছে সেই কুড়ি জন নর-নারী-বালক-বালিকা-শিশুর নীরব শোভাযাত্রা, কুণ্ঠায় এবং লজ্জায় তখনও তারা আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক।

সাহেব বাংলোর সিঁড়ির সামনে এবার সত্যিই অবাক হয়ে তাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন—এখন আর রাগ

শবাধারের ওপর ক্ষোদিত মূর্তি

নেই, একটা সদয় কৌতূহলে তাঁর মন পূর্ণ হয়ে গেছে।

তখন সেই দলের মধ্যে সবচেয়ে যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি, সে তার পিঠে কাপড়ের দোলনায় বাঁধা নাতির দিকে দেখিয়ে সাহেবের সামনে বাড়িয়ে দিল একটি সুপুষ্ট নারকেল—'সাহেব, আমার নাতি এটা তোমাকে উপহার দিতে চায়।'

সাহেব হাত বাড়িয়ে যত্নের সঙ্গে নিলেন। বুড়ির নাতির মাথায় হাত বুলিয়ে একটু আদরও করলেন। সামনে এগিয়ে এল দলের সর্দার—হাতে এক ঝুড়ি চাল—চালের উপর দুটি বড় বড় মুরগীর ডিম। সেটাও সাহেব গ্রহণ করলেন।

এবার বৃদ্ধাটি মুখ খুললো। কিছুই নয়, সাহেবের নতুন তামাকের ক্ষেতের এক পাশে তারা ধান বুনতে চায়!

—তা, এতক্ষণ সে কথা না বলে সারাদিন দল বেঁধে তোমরা আমার পিছন পিছন ঘুরলে কেন। ভোর বেলাতেই তো এই সামান্য কথাটা আমাকে বলে ফেলতে পারতে—সারাদিন এই রোদে তোমাদের এই রকম আমার পিছন পিছন ঘুরতে কি খুব ভাল্যে লাগল?

—সাহেবকে যে সারাদিন একটা 'ভূতে' আগলে ছিল! আমরা কাছে এগোবার সাহস পাইনি—দূরে দূরে ছিলাম। —এই এতক্ষণে ভূতটা সাহেবকে ছেড়ে গেল—আমরাও কথা কইবার ফুরসৎ পেলাম!

ভূত সম্বন্ধে সচেতন এই জাতির নাম বাত্তক্। সুমাত্রার আদিবাসী, প্রায় অসভ্য অরণ্যচারী এই উপজাতিরা এই শতাব্দীর প্রথম দিকেও ছিল নরমুণ্ড-শিকারী হিংস্রতম নরপশু। সুমাত্রায় পাশ্চাত্ত্য জাতিরা—শুধু সুমাত্রায় কেন সমস্ত ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিজ এলাকায় ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজ পোর্তুগীজ বণিক ও সরকারী কর্মচারীদের একাগ্র চেষ্টায় এই মানুষ-মারা আদিবাসীরা পনের-কুড়ি বছর সময়ের মধ্যেই অনেকটা সভ্য হয়ে ওঠে। মানুষমারা ছেড়ে দিয়ে তারা চাষবাস, পশুপালন, কুলি মজুরের কাজ করায় মন দেয়। কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাদের নরমুণ্ড-শিকারের খেলাকে চিরকালের মত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরা সেই সুমাত্রর আদিম অধিবাসী বাত্তক্ জাতি।

বাত্তকদের চারটি প্রশাখা—টোবা (Toba), টিমোর (Timor), পকপক্ (PakPak) এবং কারো (Karo)। এই চারটি প্রশাখার মধ্যে বহুকাল থেকে ঝগড়াঝাটি মারামারি কাটাকাটি লেগেই ছিল—এ-ওর রক্তে স্নান না করলে দিনটা বৃথাই গেল মনে করত। এদের গোষ্ঠীগত ঝগড়ার মূলে—'কারা হচ্ছে আদি বাত্তক্'—এই নিয়ে সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্তে আসতে না পারাই ছিল প্রধান। কারো বাত্তকরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি থাকায় তাদের দাপটই ছিল বেশি, চিরকাল মারামারি কাটাকাটিই তারা করে এসেছে। এখন অবশ্য তারা অনেক শান্ত, অনেক পরিবর্তিত। কিন্তু নরমুণ্ড-শিকার ছাড়লেও টোবা হ্রদের ধারে বসবাসকারী এই প্রায় সত্তর হাজার কারো-বাত্তক্ প্রেতের ভয়কে এখনও ছাড়তে পারেনি।

এই ভূতের ভয় কারো-বাত্তকদের কতখানি নৃশংস করে তোলে তার বহু বিবরণ দিয়েছেন শ্রীযুক্ত ট্যাসিলো এ্যাডাম্। তিনি ছিলেন ব্রুকলিন যাদুঘরের সহযোগী কিউরেটর। জীবনের প্রায় ত্রিশ বছর তিনি এই কারো-বাত্তকদের মধ্যে কাটিয়েছেন। যে-ঘটনা দিয়ে এই বিবরণ শুরু হয়েছে, সেটা তাঁর নিজের জীবনেই ঘটেছিল। তিনি লিখছেন, একবার নৌকা করে নদী পার হবার সময় কেমন করে পা পিছলে একজন কারো-বাত্তক্ জলে পড়ে যায়। লোকটি সাঁতার জানতো না। জলে পড়েই তার তো ডুবে মরার অবস্থা। নৌকায় আরো তার স্বজাতি ছিল কিন্তু কেউই জলে ঝাঁপ দিয়ে সেই হতভাগ্য লোকটিকে তুলবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও

বাত্তক্ গ্রাম
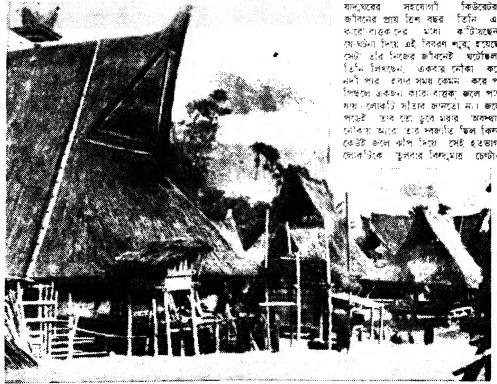
বাত্তক যুবতীর উকো দিয়ে দাঁত ঘষা হচ্ছে ও দাঁত তোলার পরে

কারো-বাত্তকদের বিশ্বাসে টোঁন্ডি বা আত্মা কেবল যে মানুষেরই আছে, তা নয়। সমস্ত প্রাণী এবং কোন কোন গাছেরও আত্মা আছে—যেমন ধান গাছ। প্রসংগত বলে রাখা ভালো, ভাত হচ্ছে বাত্তকদের প্রধান খাদ্য। আচার্য যোগেশ-চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন, আমরাও ভাত খেতে শিখেছি অস্ট্রেলায়েড্ গোষ্ঠীর মানুষের কাছ থেকে। আমাদের উপনিষদেও 'অন্ন'ই ব্রহ্ম। বাঙালীদের কাছে ভাত লক্ষ্মীর সমান এতো সবাই জানেন। সুতরাং কারো-বাওক্দের কাছে ধানগাছের মত খাদ্য ওষধি যে আত্মাসম্পন্ন সজীব মানুষের মতই মূল্যবান হবে এতো সহজেই বুঝতে পারা যায়। এই টোঁন্ডিই হচ্ছে মানুষের সব শক্তি বুদ্ধি সাহসের উৎস। এই টোঁন্ডি দেহ থেকে চলে যাওয়া মানেই মানুষের সব ভাগ্যোন্নের বিদায় নেওয়া। এমনকি স্বপ্ন দেখাটাও তাদের কাছে খুব খারাপ। স্বপ্ন দেখার সময় আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, সেজন্যে কেউ কোন স্বপ্ন দেখলেই গ্রাম-ওঝার নির্দেশে তাকে প্রায়শ্চিত্ত বা দেহশোধন করতে হয়—পথে পথে চাল ছড়িয়ে, পানের পাতা চিবিয়ে। বাত্তকদের গ্রামে এ্যাডাম এরকম অনেক রাস্তা বহুবার দেখেছেন—দেখলে মনে হয়, ফুটো বস্তায় চাল

করলো না, সবাই নীরবে সেই ডুবন্ত লোকটির দিকে নির্বিকারভাবে চেয়ে রইল। এ্যাডাম তখন নিজের জাভানীজ্ কুলিদের দিয়ে লোকটিকে নৌকায় তোলার পর সে বেচারী প্রাণে বাঁচে। তিনি তখন সহযাত্রী কারো-বাওক্দের তাদের নির্বিকার থাকার হেতু জিজ্ঞাসা করলেন—সকলে নিঃসংকোচে জবাব দিল, লোকটি জলে পড়ে গেছে প্রেতের ইচ্ছায়, তাকে যে বাত্তক্ জল থেকে তুলতে যাবে ভূতের রাগ এসে পড়বে তার ওপর। সেজন্যেই তারা কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি।

এ্যাডাম আরও লিখেছেন, বাওক্-দের ধর্মের সংগে এই প্রেতভীতি ওতপ্রোতভাবে জড়ানো। কারো-বাত্তক্-দের ধারণায় যে-লোকটি জলে পড়ে গিয়েছিল, জলে পড়ার সংগে সংগেই তার আত্মা 'টোঁন্ডি' তার দেহ থেকে চলে গিয়েছিল আর দেহটা এসেছিল 'বেগাস' বা ক্ষতিকর ভূতের কবলে। সাহেব তাকে বাঁচালেন, কিন্তু সাহেব জানেন না—যাকে তিনি জল থেকে তুললেন তার দেহে আর 'টোঁন্ডি' নেই, সেই টোঁন্ডি কোনদিন তার দেহে ফিরে আসবে না—তার আত্মা এখন বেগাসের প্রভাবে বেগাসের একটি অংশ হয়ে গেছে। ফলে যারা তাকে বাঁচাবে তাদের আত্মাও বেগাসের কোপে পড়বে এবং তার ক্রোধ এবং ঘৃণা থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।

কারো বাত্তক্ সিবাস্সো বা পুরোহিত

নিয়ে কেউ যেন একটু আগেই সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে।

অধিকাংশ আদিবাসীদের মত এদেরও বিশ্বাস মানুষের দেহের উত্তপ্ত রক্তের মধ্যেই তার আত্মা বাস করে। সেজন্য বাওকদের নানা অনুষ্ঠানে রক্তের ব্যবহার থাকবেই। বাত্তকদের পুরোহিত বা ওঝা—যাদের বলা হয় 'সিবাসুসো', তারা 'ভর'-এর সময় রক্ত পান করে বিনা দ্বিধায়—নিজের বা অপরের। এদের দৃঢ়বিশ্বাস, অপরের রক্ত পান করলে নিজের রক্তের আত্মা আরো সবল এবং সাহসী হয়, তখন বেগাস্ তাকে সহজে কাবু করতে পারে না। পৃথিবীর অধিকাংশ আদিবাসীদের এই রকম ধারণাই, নৃ-বিজ্ঞানীরা বলেন, বেশির ভাগ নৃমুণ্ড-শিকারীর নরহত্যা করার প্রেরণা। এই তত্ত্ব বাত্তকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাধারণ সভ্য লোক মনে করেন, নর-মাংসের প্রতি লোভ অথবা ক্ষুধা পরিতৃপ্তির উপকরণ হিসাবেই বুঝি তারা নরহত্যা করে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়। এরা বিশ্বাস করে শত্রুর রক্ত পান এবং মাংস আহার করলে শত্রুর দেহের আত্মা নিজের দেহে প্রবেশ করবে। নিছক ক্ষুধা নিবারণের জন্যেই নরহত্যা নয়। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। এ্যাডামকে একবার এক বৃদ্ধ বলেছিল, কিভাবে তার বুড়ি শাশুড়ীকে হত্যা করে সে 'প্যাপ্রিকা' এবং অন্যান্য মুখরোচক মশলা দিয়ে ঝাল চচ্চড়ি রান্না করে খেয়েছিল। বলতে বলতে বৃদ্ধ লোকটির জিভে জল এসেছিল। এর নরহত্যা স্রেফ মানুষের মাংস খাবার জন্যে। তবে অধিকাংশ লোক যে আগে নরহত্যা করত তার পিছনে মাংস রান্না করে খাওয়াটাই প্রধান ছিল না, নৃমুণ্ড-শিকারীরা শত্রুকে হত্যা করার পর তার দেহের কোন কোন অংশ —যেমন হৃৎপিণ্ড, মেটুলি, চোখ, ফুসফুস—কাঁচাই খায়, গোটা দেহটা নয়। কারণ, তারা বিশ্বাস করে মানব-দেহের এই এই অংশেই টেম্পি থাকে।

পা মেল্‌গা নামে 'কাবন্ ঝায়ে' জেলার সিবাজক গ্রামের গাঁওবুড়া ছিল এ্যাডামের অন্যতম প্রধান অনুচর। এ্যাডামের সঙ্গে যখন তার পরিচয় হয় তখনই তার বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেছে—কিন্তু দৈহিক শক্তি ও ব্যক্তিত্বে তাকে বৃদ্ধ বলে অবজ্ঞা করবার উপায় নেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তাকে প্রত্যেকে দুর্ধর্ষ নৃমুণ্ড-শিকারী বলে দারুণ ভয় করত—স্বয়ং ওলন্দাজ সরকার তাকে তখন বিশেষ ঘাঁটাতো না, সেও সরকারকে পরোয়া করত না। সত্তর বছর পার হয়ে গেলেও তখনও সে সোজা, সবল, দীর্ঘাঙ্গ, তীক্ষ্ণ-চক্ষু। পা মেল্‌গা এ্যাডামকে একবার কথায় কথায় একটা সুন্দর ছোরা দেখিয়ে

সাতটি লোকের গলা কেটেছিল—'কিন্তু দেখুন, কোথাও একটু মরচে পড়েনি!'

প্রেতভীতি সম্পর্কে পা মেলগা-ই নানা তথ্য এ্যাডামকে দিয়েছিল এবং শুধু তাই নয়, ভূততত্ত্ব সম্পর্কে কারো-বাওকদের নানা বিশ্বাসের চাক্ষুষ নিদর্শনও সে দেখিয়েছিল।

একদিন সকালে এ্যাডামের কাছে খবর এল পা মেলগার বাড়িতে বিরাট অনুষ্ঠান—সেখানে একজন মেয়ে-সিবাসুসো প্রেতধরার আয়োজন করেছেন। এ্যাডাম সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন তার ক্যামেরা নিয়ে। এ্যাডামের সঙ্গে জুটলেন একজন ওলন্দাজ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, একজন খৃষ্টান পাদ্রী এবং তাঁর স্ত্রী ও তাঁদের শুশ্রূষাকারী নার্স। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পা মেল্‌গার বিরাট কুঁড়েঘরের বিস্তৃত হাতায় প্রায় দু-তিনশো গ্রামবাসীর শঙ্কিত ভিড়—ভিড় ঠেলে এ্যাডাম এবং তার সহচররা এসে ঢুকলেন। গোটা দুয়েক অলিন্দ পার হতে হতেই এ্যাডাম দেখলেন সারা বাড়িটাই মাকড়সার জাল, ছেঁড়া কাপড়, মাদুর, শুকনো চাল, কাঠের টুকরোতে ভর্তি। যে-ঘরে ভূত-ধরার বা তাড়ানোর আয়োজন চলছে সেটি একটি বড় হলঘর, মেঝেয় মাদুর-পাতা—মাঝখানের অংশটি যাত্রার আসরের মত ফাঁকা—চারদিকে দর্শকের অর্থাৎ ভক্তদের ভিড়।

কাঠের ফাঁকা ড্রামে একঘেয়ে বাজনা শুরু হল, গুণগুণ করে সেই সঙ্গে গান। সিবাসুসো (এক্ষেত্রে একজন মহিলা) উঠে ধীরে ধীরে নাচতে শুরু করলেন। বাজনার তাল বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে নাচও দ্রুত লয়ে চলল এবং আমাদের গ্রামদেশে শীতলা চণ্ডী প্রভৃতি দেবীর কোন কোন সেবাইতের যেমন ভর হয়—তেমনি সিবাসুসোরও 'ভর' হল। সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচ-ছজন সিবাসুসো-শিষ্যা উঠে নাচে যোগ দিলেন। ভয়ংকর তার ভঙ্গি এবং ততোধিক বীভৎস সেই নাচের বাজনা। এই রকম ঘণ্টা দুয়েক চলার পর সিবাসুসো পা মেলগাকে আশ্বস্ত করলেন, তার বাড়িতে যে-বেগাস্ আস্তানা নিয়েছিল আপাতত তা দূর হয়েছে।

বড় বড় বাত্তক্ পরিবারে নিজস্ব একজন করে গুরু থাকেন। তিনি হচ্ছেন সমস্ত পারিবারিক অনুষ্ঠান—জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু—ইত্যাদির পরিচালক। সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান তো তাঁর হাতে হবেই, এমনকি পরলোকে যে-সব কারো-বাত্তকরা মহাপ্রয়াণ করেছেন—এঁরা তাঁদের সঙ্গেও মর্তবাসীদের যোগাযোগ রাখেন। তিনি একাধারে পুরোহিত ও যাদুকর। তিনিই ঠিক করে দেবেন কোনদিন ধান রোপণ করা হবে, কোনদিন

মারামারি শুরু হবে। এই গুরুর সঙ্গে থাকে একটি পাঁচ ফিট লম্বা যাদুদণ্ড—লাঠির আগায় পাগড়ি-মাথায় অশ্বারোহীর মূর্তি থাকে খোদাই করা—পাগড়ির সঙ্গে ঝোলে মানুষের বা ঘোড়ার চুল কিংবা মোরগের চিত্রিত পালক। সেই খোদাই-করা মূর্তির মধ্যে থাকে এক রকম মন্ত্রপূত মলম—'পাক্‌পাক্'। ম্যাকবেথের ডাইনীদের ব্যবহার্য নানা অদ্ভুত জিনিস—যেমন, হাতের বা পায়ের নখের মধ্যে আটকানো ময়লা, সাপের বিষ ও রক্ত, ব্যাঙের রক্ত, গিরিগিটির রক্ত, বাজে-পোড়া গাছের ছাল, সদ্যজাত শস্যের অঙ্কুর এবং মানুষের মস্তিষ্ক—এই সব দিয়ে সেই 'পাক্‌পাক্' মলম তৈরী হয়। বংশানুক্রমে গুরুরাই জানেন কোন্ জিনিস কতটা পরিমাণে মেশালে তবে জোরদার পাক্‌পাক্ তৈরী হবে। যাবতীয় অনুষ্ঠানে এই পাক্‌পাক্ এবং যাদুদণ্ড অপরিহার্য—আমাদের যেমন গঙ্গাজল ও কোশাকুশি।

বাত্তকরা মারা গেলে মৃতদেহ দাহ করা বা কবর দেওয়া হয় না। সুন্দর নৌকার মত কফিনে মূল্যবান পোশাক এবং অলংকারে তাকে সাজিয়ে শুইয়ে রাখা হয়। বহুকাল পরে যখন তা কংকালে পরিণত হয় তখন গুরু সেই কংকালের মাথার অংশটি মন্ত্র পড়ে আবার সাজিয়ে-গুজিয়ে কফিনে রেখে দেন—কংকালের বাকি অংশ শস্যক্ষেত্রে পুঁতে দেওয়া হয়। বংশানুক্রমে এই মাথার খুলি সংরক্ষণ করা কারো-বাত্তকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। কেউ মারা গেলে প্রথমে তাকে বাঁশের ডালায় চাপিয়ে আনা হয় খোলা জায়গায়—বিবাহিত লোক হলে তার বিধবা মৃত দেহের ওপর ছাতা ধরে বসে থাকে। দুজন মেয়ে দুই দিকে দুটি লাঠি পুঁতে অপেক্ষা করে। পুরোহিত এলে সবাই বিকট চিৎকার করে চলে যায়—থাকে কেবল দুজন সঙ্গিনী। তারা লাঠি দিয়ে বাতাসে আঘাত করতে করতে ভূত তাড়ায়। তারপর পুরোহিত তার শেষ-কৃত্য করেন। মুরগী বলি দেওয়া, বোমা ফাটানো ইত্যাদি সব অনুষ্ঠান যে করা হয় তারও তাৎপর্য ভূতকে খুশী করে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যাতে সে মৃত-ব্যক্তির আত্মাকে দূষিত করতে না পারে।

বাত্তকদের বিবাহপদ্ধতি খুব সরল। মেয়ের জন্য মেয়ের বাবার বংশ-মর্যাদা অনুযায়ী কিছু টাকা, গ্রামের লোকদের ভোজ এবং মেয়েটিকে ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু গয়নাপত্র দিলেই কন্যা স্ত্রীতে পরিণত হবে। তবে বড় বোন অবিবাহিতা থাকলে ছোট বোনের আগে বিয়ে হবে না—পাত্রের দিকেও তাই।

কারো-বাত্তকদের যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে

ঘষে ঘষে উঠিয়ে ফেলা হয় এবং চির-স্থায়ী কালো রঙ দিয়ে তাদের মাড়ি কালো করে দেওয়া হয়। সাদা দাঁত সর্বদাই বেগাস্ ডেকে আনে বলে এই নিয়ম অবশ্যপালনীয়। এই অনুষ্ঠানও পুরোহিতের নির্দেশে পালিত হয়। যার দাঁত তোলা হবে তাকে মদ পান করিয়ে এবং তামাক পাতা চিবোতে দিয়ে নাচ-গান শুরু হয় এবং নাচগানের চরম মুহূর্তে এই নিষ্ঠুর কাজটি করা হয়। মদের নেশাতেই হোক, বা অন্য কোন কারণেই হোক, যাকে যৌবনধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছে, সে এই প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক প্রথাটি নীরবে সহ্য করে। যে সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যায় তাকে চির-তরেই গোষ্ঠী থেকে নির্বাসন মেনে নিতে হয়—অন্য গোষ্ঠীতেও তার স্থান হয় না—কারণ, সে যে ভূতে-পাওয়া!

কলারসিক

জুলাই মাসে কলকাতার প্রদর্শনী-ভবনগুলিতে বিশেষ কোনো ভিড় নেই। বলা যায়, চিত্র-প্রদর্শনীতে এ-মাসে যেন ভাঁটা পড়েছে। ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবন, পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউস, থিয়েটার রোডের অশোকা গ্যালারী, পার্ক ম্যানসনের আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারী কিংবা গ্রান্ড হোটেলের কুমার গ্যালারী—কোথাও কোনো নতুন চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘটেনি।

এরি মধ্যে ব্যতিক্রম রূপে সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস্ তার সদ্য-উদ্বোধিত ১৫৭।বি, ধর্মতলা স্ট্রীটের গ্যালারীতে গত ১২ই জুলাই শিল্পী অনিলবরণ সাহার ১৩খানি চিত্রের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন এবং মার্কিন প্রচার দপ্তরের উদ্যোগে তাদের চৌরঙ্গী রোডের প্রদর্শনী-কক্ষে আমেরিকার ৩০টি অঙ্গরাজ্যের ৩০খানি নিঃসর্গ চিত্রের অন্য একটি প্রদর্শনী গত ৯ই জুলাই থেকে শুরু হয়েছে। সুতরাং জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতার শিল্পরসিক মানুষদের এই দুটি মাত্র প্রদর্শনী দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

।। শিল্পী অনিলবরণ সাহার প্রদর্শনী ।।

শিল্পী অনিলবরণ সাহার প্রদর্শনী দিয়ে সমকালীন শিল্পী সংস্থা তাঁদের তৃতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন। শিল্পী সাহার বিচ্ছিন্ন শিল্পকর্মের নিদর্শন আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন চিত্র-প্রদর্শনীতে দেখেছি। এবার একসঙ্গে তাঁর তেরখানি চিত্র-নিদর্শন দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। এর মধ্যে চারখানি তেল-রঙে ও পাঁচখানি জল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত। অন্য চারখানি ছিল কাঠ-খোদাই চিত্রের নিদর্শন। শিল্পী অনিলবরণ সাহা এই চিত্র-মাধ্যমে বলিষ্ঠ কোনো কল্পনাশক্তির পরিচয় না দিলেও চিত্র-সংস্থাপনে এবং রঙ-প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাঁর দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর তেল-রঙের চিত্রের মধ্যে 'ম্যান অন মুড' (৬), ও 'টুওয়ার্ডস সামিট' (৪) নামক চিত্র দুখানি আমাদের ভাল লেগেছে। প্রথম চিত্রের জমিনে হলুদ বর্ণের গাঢ় আস্তরণ আর উপরের দিকে ফিকে রঙ প্রয়োগ এবং তার মধ্যে গোরুর গাড়ির উপর বসে-থাকা মানুষটির কালো, লাল ও হলুদ বর্ণের সুষমা, দর্শক-মনকে নিঃসন্দেহে তৃপ্তি দেবে। দ্বিতীয় চিত্রখানির সংস্থাপন অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। কাছের থেকে দূরের বাড়ী ক্রমান্বয়ে উঁচু হয়ে সমগ্র চিত্রখানিকে এমন এক প্যাটার্ণে বেঁধেছে যে শিল্পীর দক্ষতা তাতে প্রকাশমান। বিশেষ করে দূরত্ব বজায় রেখে কালো, হলুদ, লাল, নীল, সবুজ ও সাদার বিচিত্র মনোহরণ বর্ণ-সম্পাত প্রশংসার দাবী রাখে।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে শিল্পী সাহা জল-রঙের কাজেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তাঁর কোনো কোনো চিত্রে সোনালী রঙ প্রয়োগের আধিক্য কেন তা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে না পারায় আমরা দুঃখিত। তাঁর 'অ্যাকটরস' (৮) ও 'ফিশারম্যান' (৫) জলরঙের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কিন্তু একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। সমকালীন শিল্পী সংস্থার অধিকাংশ শিল্পী মানুষের অবয়ব-রচনায় প্রায় একই আঙ্গিক অনুসরণ করছেন কেন? ফর্মকে ভাঙ্গা যদি একান্তই প্রয়োজন হয় কিংবা মনুষ্য-অবয়বকে যদি অন্যভাবে উপস্থিত করে দর্শক-মনে বিশেষ চেতনা সঞ্চার করা সম্ভব হয়, তবেই এর সার্থকতা। তা' না হলে শুধু আঙ্গিকের জন্য আঙ্গিক আমদানি বর্জন করাই উচিত। শিল্পী সাহার কাঠ-খোদাইয়ের কয়েকটি কাজও আমাদের ভাল লেগেছে।

আশা করি অনিলবরণ সাহা তাঁর নিষ্ঠা ও সততায় শিল্পে নতুনতর বক্তব্য উপস্থিত করে আমাদের মুগ্ধ করবেন।

।। আমেরিকার নিঃসর্গ চিত্র ।।

এতদিন আমরা আমেরিকার যে বিমূর্ত চিত্রকলা দেখে নানা প্রশ্নে দুলেছিলাম, সম্প্রতি এই প্রদর্শনী দেখে সেইসব প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে দিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। না, মার্কিন দেশে এখনও প্রথাসিদ্ধ নিঃসর্গ চিত্র আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়। এখনও সেখানকার শিল্পীরা হ্রদ, তুষার-পাত, পর্বত, সমুদ্র-সৈকত, ফসলের মাঠ, দ্বীপ, আগ্নেয়গিরি, অরণ্যানী ও বনরাজিনীলা নিঃসর্গে মুগ্ধ হয়ে ক্যানভাসের উপর চমৎকার বর্ণপ্রয়োগে সেগুলিতে প্রাণ-সঞ্চার করতে পারেন। বিমূর্ত চিত্রকলার প্রবল জোয়ারে শিল্পীমনের এই স্বাভাবিক রস-সঞ্চারের চেতনা এখনও সেখানে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। সত্যিকথা বলতে কি, নিঃসর্গ চিত্রের এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে উদ্যোক্তারা আমাদের নতুন স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দিলেন।

ওয়েণ্ডেরথ সোণ্ডার্স অঙ্কিত মিসিসিপির পাস্কাগোলার সমুদ্রতীর।

এই প্রদর্শনীর অধিকাংশ চিত্র জল-রঙ কিংবা টেম্পারায় অঙ্কিত। চমৎকার জমিন ও বর্ণাঢ্য রঙ প্রয়োগ-পদ্ধতি প্রতিটি নিঃসর্গ চিত্রকে অপূর্ব সুন্দর করে তুলেছে। এই ৩০ খানি চিত্রের সাহায্যে আমরা আমেরিকার প্রায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নিঃসর্গ দৃশ্যকে উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছি। এদিক থেকে প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর দক্ষতা স্বীকার্য। আমরা প্রদর্শনীটির উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

॥ হস্তী প্রসঙ্গে ॥

সরলীকরণের দিকে অত্যধিক ঝোঁক-বশতঃ হস্তী-র ঈ-কারকে লোপ করে আমরা ডাঙ্গার বৃহত্তম জীবকে হাতি বানিয়ে তুলেছি। এই দু-অক্ষরের ই-কারান্ত শব্দটির মধ্যে যতোই লালিত্য থাকুক, প্রায় বারো ফুট উঁচু ও সাত টন ওজনের শুঁড়ওলা জীবটির কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাতিকে আমরা আরো বেশি অবজ্ঞা করেছি গজ নাম দিয়ে। এই দু-অক্ষরের শব্দটি নিতান্তই হাল্‌কা এবং একেবারেই বাহুল্যবর্জিত, হস্তীর সঙ্গে যার কোনো দিক থেকেই মিল নেই। এমন কি কোনো কোনো মহিলার ক্ষেত্রে গজগামিনী শব্দটি আমরা যতোই প্রশংসার মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করে থাকি না কেন, গজের মর্যাদা কিন্তু তাতে খানিকটা ক্ষুণ্ণই হয়েছে। হাতির পক্ষ নিয়ে এত কথা বলছি তার কারণ এক হিসেবে মানুষের চেয়েও হাতির স্থান উঁচুতে। মানুষ তো এই পৃথিবীতে এসেছে বড়ো জোর দশ লক্ষ বছর আগে। কিন্তু হাতি রয়েছে অন্তত ছ-কোটি বছর ধরে। কোনো একটি বিশেষ এলাকায় নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে। কোনো একটি বিশেষ চেহারায় নয়, অন্ততঃ ৩৫২টি শাখায় বিভক্ত হয়ে।

চিড়িয়াখানার বা সার্কাসের পোষ-মানা হাতি দেখতে দেখতে আমরা বুনো হাতির কথা প্রায় ভুলতে বসেছি। অথচ ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণের দিকে তাকালে দেখা যায়, যদিও প্রস্তরযুগের গুহাচিত্রে হাতি-শিকারের দৃশ্য আছে, কিন্তু হাতিকে পোষ মানাতে পারা গিয়েছে আজ থেকে মাত্র চার হাজার বছর আগে। খ্রীষ্টপূর্ব দু-হাজার বছরের পুরনো যে-সমস্ত সীলমোহর ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে হাতির মূর্তি দুর্লভ নয়। কোনো কোনো মূর্তিতে রয়েছে হাতির পিঠ থেকে সামনের পা পর্যন্ত খাড়া একটা লাইন। হাতির শরীরের চামড়ার এই অংশে কোনো ভাঁজ নেই। কাজেই ধরে নেওয়া হয় যে এই লাইনটি হচ্ছে হাতির পিঠের ওপরে বিছানো কোনো একটি আসনের সম্মুখভাগ। তারপরে গ্রীকরা যে-সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল তখন এই দেশে হাতিকে যে রীতিমতো পোষ মানানো হয়েছিল তার প্রমাণের কোনো অভাব নেই। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ সালের যুদ্ধে দিগ্‌-বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডার যুদ্ধ করেছিলেন ঘোড়ায় পিঠে সওয়ার হয়ে আর রাজা

অয়স্কান্ত

পুরু ছিলেন হাতির পিঠে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের সময় থেকেই ভারতবর্ষের মুদ্রায় ও টেরাকোট্টা মূর্তিতে মাহুত ও হাতির অজস্র নিদর্শন রয়েছে। ঐতিহাসিকরা সাক্ষ্য দেবেন, ভারতবর্ষের বহু যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারণে হাতির ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য ছিল না।

॥ হাতির শরীর ॥

হাতির শরীরে অন্য যতো বৈশিষ্টই থাকুক, যে-কোনো দর্শক প্রথমেই দেখে থাকেন হাতির বিপুল শরীরটিকে। আফ্রিকার মদ্দা হাতির উচ্চতা ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি (মাটি থেকে ঘাড় পর্যন্ত) হয়ে থাকে। ওজন সাত টন। উচ্চতার দিক থেকে হাতি হার মানে একমাত্র জিরাফের

প্রস্তরযুগের গুহাচিত্রে হাতি-শিকারের দৃশ্য।

কাছে (জিরাফের উচ্চতা ১৮ ফুটেরও বেশি হতে পারে) কিন্তু ওজনের দিক থেকে হাতির ধারে-কাছেও অন্য কোনো ডাঙ্গার জীব আসতে পারে না। হিপোপটেমাস বা গণ্ডারের ওজনও ফেলনা নয়, কিন্তু তাও কোনো ক্ষেত্রেই চার টনের বেশি নয়। জীবজগতে হাতির চেয়েও বিপুলতর শরীরের নিদর্শন যদি খুঁজতে হয় তাহলে আমাদের তাকাতে হবে হয় মধ্যজীবীয় যুগের ডাইনোসরের দিকে বা এ-যুগের তিমির দিকে। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, মধ্যজীবীয় যুগের ব্রাকিওসরাসের ওজন ছিল ৫০ টন, গণ্ডার-জাতীয় কোনো কোনো জীবের আকার ছিল হাল আমলের ডবলডেকার বাসের মতো। আর এ-যুগের জীবন্ত প্রাণী নীল তিমি তো সকলকেই

টেক্কা দেয়। এই তিমির ওজন হয়ে থাকে ১২০ থেকে ১৫০ টন পর্যন্ত আর আকার হয়ে থাকে গোটা কুড়ি পূর্ণাবয়ব আফ্রিকান হাতির মতো। পৃথিবীর জীব-জগতের ইতিহাসে বৃহত্তম জীব হচ্ছে এই তিমি।

তবে হাতির শরীরে অপর যে বৈশিষ্ট্যটি আছে তা জীবজগতে অতুলনীয়। এটি হচ্ছে হাতির শুঁড়। এই শুঁড় দিয়ে হাতি যেমন আদর জানায় তেমনি প্রচণ্ড আঘাতও করতে পারে—অনেকটা মানুষের হাতের মতো। তাছাড়া, রাগ বা আনন্দ প্রকাশের জন্যে হাতি যে-সমস্ত আওয়াজ করে থাকে তাও এই শুঁড় থেকেই। খাদ্য ও পানীয় মুখে তোলবার জন্যে হাতি এই শুঁড়টিকেই ব্যবহার করে। হাতির নাকের ফুটোটিও এসে শেষ হয়েছে এই শুঁড়ের প্রান্তে। ফলে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বাতাস টেনে নিয়ে হাতি এই শুঁড়ের সাহায্যে একটা নয়া-পয়সার মতো পাতলা ও ছোট্ট জিনিসও মাটি থেকে অনায়াসে তুলে নিতে পারে। মাংস ও পেশী দ্বারা গঠিত এমন শক্তি-শালী প্রত্যঙ্গ অন্য কোনো জীবের শরীরে নেই।

শুঁড়ের পরেই হাতির দাঁতের কথা তোলা উচিত। মানুষ সমেত অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীবের মুখবিবরে তিন ধরনের দাঁত আছে—ছেদন, শ্ব ও পেষণ। কিন্তু হাতির বেলাতে এসে দেখা যাচ্ছে, শ্ব-দন্তের চিহ্নমাত্র নেই, ছেদন-দন্ত আছে মাত্র দুটি। এই দুটি ছেদন-দন্তই অনেকখানি লম্বা হয়ে হাতির মুখ-বিবরের দু-পাশ থেকে বেরিয়ে আসে। তবে শরীরের পুষ্টির ব্যাপারে এই দাঁত দুটি হাতিকে বিশেষ সাহায্য করে না। হাতির খাদ্য মুখবিবরে আসে সরাসরি শুঁড়ের সাহায্যে এবং এককালীন মাত্র চারটি পেষণ-দাঁতের সাহায্যে তার সদ্ব্যবহার হয়। হাতির পেষণ-দাঁত সম্পর্কেও কিছু বলার কথা আছে।

এককালীন মাত্র চারটি পেষণ-দাঁতের কথা বলা হয়েছে। ক্ষয় হতে হতে এই চারটি পেষণ-দাঁতের যখন প্রায় লোপ পাবার মতো অবস্থা, সেই সময়ের মধ্যে আরো চারটি পেষণ-দাঁত গজিয়ে ওঠে। এই চারটির পরে আবার আরো চারটি। এমনিভাবে ছ-বারে মোট চব্বিশটি পেষণ-দাঁত। তবে শেষ চারটি পেষণ-দাঁত লোপ পাবার পরে হাতির মুখবিবরে আর দাঁত থাকে না। ততোদিনে তার বয়েসও ষাটের কোঠায়। এই অথর্ব বার্ধক্যে পৌঁছবার

পরে তার পক্ষে আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

বয়সের কথাই যখন উঠেছে তখন চলতি কতকগুলো ধারণা দূর করা যেতে পারে। সেই প্রাচীনকাল থেকেই প্রবাদ চলে আসছে, হাতির আয়ু নাকি একশো বছরেরও বেশি। কথাটা ঠিক নয়। অনেক পর্যবেক্ষণের পরেও আজ পর্যন্ত কোনো হাতিকে ৬৯ বছরের বেশি বাঁচতে দেখা যায়নি। মোটামুটি বলা চলে, মানুষের আয়ু আর হাতির আয়ু প্রায় একই মাপের।

হাতির মদমত্ততা সম্পর্কেও এখানে কিছু বলা যেতে পারে। হাতির চোখ আর কানের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফুটো আছে। এই ফুটোটি গিয়ে মিশেছে একটি গ্ল্যাণ্ডের সঙ্গে যার নাম টেম্পোরাল গ্ল্যাণ্ড। হাতি পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্ত হবার পরে মদ্দা হাতির (কখনো কখনো মাদী হাতিরও) শরীরের এই গ্ল্যাণ্ডটি মাঝে মাঝে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে আর তখন সেই ফুটোটি দিয়ে গাঢ়রঙের তীব্রগন্ধযুক্ত তেলতেলে পদার্থ বেরিয়ে আসতে থাকে। এই হচ্ছে হাতির মদমত্ত অবস্থা। হাতির চালচলন তখন সমস্ত দিক থেকেই অস্বাভাবিক হয়ে যায়। পোষ-মানা হাতিরাও এর ব্যতিক্রম নয়। মদমত্ত অবস্থায় পোষ-মানা হাতিরা প্রিয় মাহুতকে পর্যন্ত খুন করে বসে।

॥ হাতির প্রেম ॥

শুনলে অবাক হতে হবে যে হাতিরা প্রায় মানুষের মতোই প্রেম করতে জানে। মদ্দা ও মাদী হাতির মিলন নিতান্তই একটা জৈব ব্যাপার নয়। পরস্পরের প্রতি তাদের আকর্ষণ, পরস্পরের জন্যে তাদের উৎকণ্ঠা, পরস্পরকে আদর ও ভালোবাসা জানাবার অতি পেলব ও মনোরম ভঙ্গিমা—এ সমস্ত দেখে কোনো কোনো জীববিজ্ঞানী এমন কথাও বলেছেন যে আদর্শ দম্পতির চালচলন কেমন হওয়া উচিত তা হাতিদের কাছ থেকে মানুষের শেখা উচিত।
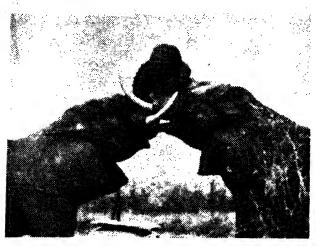
হাতির ভালোবাসা

প্রেমের প্রথম পর্বে হাতিদের মধ্যেও কিছুটা খুনশুটি, কিছুটা আদর-কাড়াকাড়ি বেশ কিছুদিন ধরেই চলে। এই পর্বে মানুষের প্রেমের সঙ্গে হাতিদের প্রেমের বিশেষ তফাৎ নেই। কিন্তু হাতিদের প্রেমের দ্বিতীয় পর্বটা আসে অতি আচমকা এবং প্রায় একতরফা ভাবে। এই দ্বিতীয় পর্বের সূচনা সঙ্গিনীর ঋতুবতী হবার সঙ্গে সঙ্গে। সে তখন প্রায় উন্মত্তের মতো সমস্ত রকমের ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে সঙ্গীর কামনাকে জাগিয়ে তোলে। কোনো কোনো জীববিজ্ঞানী বলেছেন যে ঋতুবতী হস্তিনীর ছলাকলার কাছে আধুনিক ক্লিয়োপেট্রাও সম্ভবতঃ হার মানবেন।

এই দ্বিতীয় পর্বের স্থায়িত্ব প্রায় তিন-চার মাস। এই সময়ে মুগ্ধ দম্পতি পরস্পরের প্রেমে আত্মহারা হয়ে গহন অরণ্যে মধুচন্দ্র যাপন করে।

তারপরে তৃতীয় পর্ব—মাতৃত্ব।

এই তৃতীয় পর্বে এসে দেখা যায়, ভাবী জননী ভাবী জনককে আর আগেকার মতো পাত্তা দিচ্ছে না। ভাবী জনকের ক্ষেত্রে কিন্তু এর ফলে বিশেষ কোনো মনখারাপের লক্ষণ নেই। এমন কি কখনো কখনো তাকে নিতান্তই বেহায়ার মতো অন্য সঙ্গিনীর প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। তারপর বাড়ি থেকে একুশ মাস পরে যখন তার সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয় তখন হয়তো সে নিজের সন্তানকে চিনতেও পারে না।

তাই বলে ভাবী জননী কিন্তু কোনো সময়েই পরিত্যক্ত হয় না। বৃহৎ একটি হস্তিযূথ তার রক্ষণাবেক্ষণে সজাগ থাকে। ভাবী জননীকে সবসময়ে সঙ্গ দেয় একজন বর্ষীয়সী ও বাচ্চার জন্মের পরে ধাই-মায়ের মতোই বাচ্চাকে চোখে চোখে রাখে।

হস্তিনীর গভীর বাৎসল্য সম্পর্কে বহু শিকারী বহু প্রত্যক্ষ ঘটনা লিপি-বদ্ধ করে গেছেন। সন্তানের জীবনরক্ষার জন্যে জননী নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করেছে এমন ঘটনা হাতিদের সমাজে বিরল নয়। 'সমাজ' শব্দটি লক্ষ্য করতে বলছি। শব্দটিকে সঠিক অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে। হাতি সমাজবদ্ধ জীব।

॥ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ॥

হস্তিসমাজের সামাজিক ইউনিটটিকে বলা হয় যূথ। সাধারণতঃ এক-একটি পরিবার নিয়েই এক-একটি যূথ হয়ে থাকে। বাপ-মা, সহোদর ও জ্ঞাতি ভাই-বোন, খুড়ো-জ্যাঠা, খুড়িমা-জেঠিমা—এমনি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিতদেরই এক-একটি যূথে দলবদ্ধ হতে দেখা যায়। সংখ্যায় দশ-বারো থেকে পঞ্চাশ-ষাট পর্যন্ত।

প্রত্যেকটি যূথের একজন করে নেতা থাকে। নেতা না বলে নেত্রী বলাটাই ঠিক—কারণ অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের মতে একজন হস্তিনীকেই এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়। এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নিদর্শন জীবজগতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আছে—মানুষের মধ্যে তো আছেই।

তাই বলে পুরুষেরা দলের কোনো প্রয়োজনেই আসে না তা ঠিক নয়। বিপদের সময়ে পুরুষেরাও তাদের বিপুল শরীর ও বিপুলতর দাঁত ও ক্ষমতা নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। তবে মোটামুটি বলা চলে, পারিবারিক দায়িত্বপালনে পুরুষেরা তেমন উৎসাহী নয়। নিজেদের সন্তানের প্রতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কোনো মমতা থাকে না। এমন কি অনেক সময়ে দেখা যায়, একটু বয়স হয়ে যাবার পরে তারা শুধু আহার ও স্নান ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারে দল থেকে নিজেদের তফাৎ করে রাখে।

হস্তিনীরা কিন্তু এদিক থেকে একেবারে উলটো স্বভাবের। বাচ্চাদের স্নান করানো খাওয়ানো থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাদের অতন্দ্র মনোযোগ। বাচ্চারা যাতে কোনো বিপদে না পড়ে সে-বিষয়ে তারা অতি-মাত্রায় সজাগ। এমন কি অবাধ্য সন্তানকে মায়ের স্নেহ নিয়ে ভর্ৎসনা করতেও তারা অপটু নয়। আর দলের মধ্যে কোনো বাচ্চার যদি মা মারা যায় তাহলে অন্য মায়েরা তাকে আপন সন্তানের মতো লালন-পালন করে।

কোনো একটি যূথ যখন চলতে শুরু করে তখন সবার আগে আগে যায় মায়েরা, তারপরে তাদের বাচ্চারা। বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে মায়েরা কখনো তাদের বাচ্চাদের ফেলে পালায় না।

॥ ভারতের হাতি ও আমরা ॥

যদিও বর্তমানে আমরা নানান দেশে ভারতের হাতি চালান দিচ্ছি, কিন্তু ভারতের হাতি সম্পর্কে এখনো আমরা তেমন অনুসন্ধিৎসু নই। বুনো হাতির কথা বাদ দেওয়া যাক, এমন কি চিড়িয়াখানার হাতিদেরও আমরা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করি না। অথচ যাদের দেশে হাতি নেই তাঁরা কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানি-করা হাতিকেই পর্যবেক্ষণ করেই হাতি সম্পর্কে নানা নতুন তথ্য পরিবেশন করে চলেছেন। আমেরিকার একজন অধ্যাপক পুরো ন-দিন ধরে দিনরাত্রির চব্বিশ-ঘণ্টা একটি ভারতীয় হাতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন শুধু এটুকু জানার জন্যে যে হাতি কতক্ষণ ঘুমোয়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি ফেয়ারফিল্ড অসবোর্ন পঁচিশ বছরের গবেষণার পরে হাতিদের সম্পর্কে ১৬০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এতখানি ধৈর্য ও অভিনিবেশ হয়তো আমাদের দেশে আশা করা চলে না। কিন্তু হাতির সম্পর্কে কিছু লিখতে হলেও বিদেশী লেখকের গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিতে হয়, এটা আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই লজ্জার কথা। একমাত্র ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কোনো ভারতীয় লেখক হাতিদের জীবন নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন কিনা আমার জানা নেই। আমি এই লেখার সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করেছি রিচার্ড ক্যারিংটনের "এলিফ্যান্টস" নামক গ্রন্থ থেকে। বইটি সংগ্রহ করতে পারলে অবশ্যই পড়ে দেখবেন।

॥ এর তাৎপর্য কী ? ॥

(উত্তর)

মহাশয়,

গত ২৯শে জ‍ুনের অমৃতের 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীসতীশ চক্রবর্তী কর্তৃক বিবৃত ঘটনাটির একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলাম। এ নিয়ে মতবিভেদ অবশ্যই হতে পারে।

প্রথমেই বলে রাখি,—মানুষ মারা যাওয়ার পর একটা বিশেষ অনুষ্ঠান সংঘটিত না হলে (অনেক ক্ষেত্রে হলেও) আত্মার সদ্গতি হয় না, আর তা না হলে আত্মারা যথেচ্ছ যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের চিন্তা-ধারাকে প্রভাবান্বিত করে,—এ ধারণা অবৈজ্ঞানিক। তাই পত্রলেখকের সঙ্গে একমত হয়ে বলছি, তিন বৎসর আগে মৃত সুকুমারবাবুর আত্মার সঙ্গে বর্ত-মানে সতীশবাবুর চিন্তার যোগাযোগ একটা অযৌক্তিক কল্পনামাত্র।

একথা আজ প্রায় সকলেই জানেন যে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের মনকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছে,—(১) Unconscious বা অচেতন (২) Pre-conscious বা অধিচেতন এবং (৩) Conscious বা সচেতন। আমাদের জাগ্রত অবস্থার চিন্তাধারা প্রধানত সচেতন মন থেকে উদ্ভূত হলেও তার অনেকাংশেরই মূলে নিহিত থাকে অধি-চেতন মনে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলো-চনার ক্ষেত্র এটা নয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মানুষের সচেতন মন যখন সজাগ থাকে না অর্থাৎ কোনও বিশেষ বিষয়ে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকে তখনও আমাদের অধিচেতন মন পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছুকেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে চলে। অথচ সচেতন মন তার আভাসটুকুও জানতে পারে না। কিন্তু অধিচেতন যে বিষয়টিকে জানলো, কিছু আগে বা পরে সেটা মানুষের সচেতন চিন্তাধারার ওপর ছায়া ফেলবেই।

অনুমান করছি এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। আমার মনে হয়, সতীশবাবু দোকানে বসে থাকাকালীন এমন কিছু দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন, যার সঙ্গে মৃত সুকুমারবাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ ছিল। অথচ তার সচেতন মন তখন হয়ত অন্য কোনও বিষয়ে ব্যাপৃত ছিল।

তাই এই 'দেখা'টা বা 'শোনা'টা তার সচেতন মনের আড়ালে অধিচেতন মনে গিয়ে বাসা বাঁধলো। এবং অনতিবিলম্বে, যখন তার সচেতন মন চিন্তামুক্ত হল তখনই অধিচেতন মন সুকুমারবাবুর বার্তা পাঠিয়ে দিলো সচেতন মনে। পত্র-লেখক তার বর্তমান চিন্তার উৎসটা জানতেও পারলেন না, ভাবলেন, নিতান্ত আকস্মিকভাবেই বন্ধু সুকুমারবাবুর চিন্তা তার মনে উদয় হল। এক্ষেত্রে পূর্বাপর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ জানবার উপায় নেই, তাই সঠিক কোন বস্তু বা ব্যক্তি তার ওই চিন্তার উৎস তা বলতে পারব না। তবে যতদূর মনে হয়, তিনি অনেকদূর থেকেই মৃত সুকুমারবাবুর বিধবা স্ত্রীকে দেখতে পেয়েছিলেন। তার এই দেখাটা ঘটেছিল তার সচেতন মনের অজ্ঞাতেই। তাই পুনর্বার যখন তিনি সুকুমারবাবুর বিধবা স্ত্রীকে দেখেছিলেন, তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন এই যোগাযোগ দেখে।

পরিশেষে বলি, যে অকারণ দুর্ঘটনার কথা পত্রলেখক উল্লেখ করেছেন তা নেহাতই অকারণ, তাৎপর্যহীন। যোগা-যোগটা শুধু, সে দুটো ওই সময় ঘটেছিল, এইমাত্র। যেমন সেই সময় সারা পৃথিবীতে ঘটা অন্য ঘটনাগুলোর কোনও যোগ নেই লেখকের চিন্তার সঙ্গে।

নমস্কারান্তে

শ্রীবিদ্যুৎবরণ দাস

৮।২সি, বীরপাড়া লেন,

কলিকাতা-৩০।

।।'য'-ফলার বিকৃত উচ্চারণ ।।

(প্রশ্ন)

'অমৃত' সম্পাদক

সবিনয় নিবেদন,

অনেক দিন থেকেই আমার মনে য-ফলার উচ্চারণ নিয়ে একটা সমস্যা উদয় হয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগে জানাচ্ছি।

শব্দের প্রথম বর্ণে য-ফলা থাকিলে আমি তার বিকৃত উচ্চারণ করি। শুধু আমি নয়, লক্ষ্য করে দেখেছি অনেকেই (আমার অভিজ্ঞতায় সকলেই) ঐ য-ফলা-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ ঠিক ঠিক করেন না। যেমন 'ব্যক্তি'। এই বানানটি যদিও ব-এ য-ফলা ক-এ ত-এ হ্রস্ব-ই তবুও উচ্চারণ 'ব্যক্তি'র-র মত না করে করা হয় 'বেক্তি'-র মত। এইরূপ অনেক স্থলে আ-কার ইত্যাদি যোগ করে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করা হয়। যেমন 'ব্যয়', 'ব্যস্ত', 'ন্যস্ত' শব্দগুলিকে যথা-ক্রমে 'ব্যায়', 'ব্যাস্ত', 'ন্যাস্ত' উচ্চারণ করা হয়। এই বিকৃত উচ্চারণ কি আমার নিজেরই ভুল না কোন ব্যাকরণগত নিয়মাধীন?

শ্রীমদনচন্দ্র মান্না, সুগন্ধ্যা, হুগলী।

।। কেন এই বৈপরীত্য ? ।।

(প্রশ্ন)

মান্যবরেষু সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের "জানাতে পারেন" বিভাগের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া ছাপাইলে বাধিত হইব।

(১) নবদ্বীপ। নূতন দ্বীপ না নয়টি দ্বীপের সমষ্টি? নামটির মধ্যে কেমন একটা সামুদ্রিক ভাবের বেশ আছে। শুধু তাই নয়, নবদ্বীপকে ঘিরিয়া যে সমস্ত জনপদ চন্দ্রকলার মত শোভা পাইতেছে যেমন সমুদ্রগড়, পূর্বস্থলী, অগ্রদ্বীপ, চর মাঝদিয়া, চর ব্রহ্মনগর—সব মিলিয়া নামগুলি কি আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় না যে, অতীতে এগুলি সমুদ্র-তীরবর্তী ছিল? কিন্তু কতদিন আগে? কি ইহার ইতিহাস?

(২) নবদ্বীপ বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান। কিন্তু শৈবধর্মের প্রাধান্য এত বেশী কেন? কয়েকটি বিপুলায়তন ও অজস্র ছোট ছোট শিবলিঙ্গ নবদ্বীপে বর্তমান। শৈব-উৎসবের এত জাঁকজমকও অন্য কোথাও বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এর তাৎপর্যই বা কি?

(৩) সমগ্র ভারতবর্ষে রাসপূর্ণিমা উৎসব কৃষ্ণ-রাধিকার উৎসব। কিন্তু নবদ্বীপে ঐদিন অজস্র বিভিন্ন শাক্ত দেব-দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কেন এত বৈপরীত্য?

এ সম্বন্ধে কেহ আলোকপাত করিলে বাধিত হইব। কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ থাকিলে জানাইবেন।

ইতি শ্রীবৈদ্যনাথ হোম, বাজার রোড,

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। পনেরো ।।

রিনি কাঞ্জিলাল তার এক বান্ধবী আর একটি বন্ধুর সঙ্গে সকালের শো-তে সিনেমা দেখতে ঢুকেছে। প্রভাতের এখন ঘণ্টা তিনেক গাড়ী নিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। রবিবারের সকাল—এভারগ্রীণ কাঞ্জিলাল সাহেব এখনো বিছানা ছাড়েননি। অবশ্য কাঞ্জিলালের কোনো দোষ নেই, কাল একটা পার্টি ছিল এবং সেখান থেকে বেরুবার সময় তাঁকে ধরে তুলতে হয়েছিল। প্রথমটায় কিছুতেই গাড়ীতে উঠতে চাননি, ক্রমাগত আবেগ-ভরে বলছিলেন, 'সো মেনি পিপ্‌ল—আন্‌লাকি পুয়োর ফেলা—মাই কাণ্ট্রিমেন পাথ হেঁটে বেড়ায়, কারো কারো ট্রামে ওঠবার মতো পয়সা নেই। অ্যাণ্ড্ দে আর অল মাই ব্রাদার্স! আজ আমি হেঁটেই বাড়ী যাব—আই শুড্ অলসো বেয়ার দি বার্ডেন অফ দেয়ার শাফারিং।'

কথাটা খুব ভালো এবং কাঞ্জিলাল সাহেবের মতো মহৎ প্রাণ থাকলেই একথা ভাবা সম্ভব। কিন্তু মুশকিল হল, তাঁর সমস্ত শরীরটাই তখন হুইস্কির বোতলে পরিণত হয়েছে, শুধু মাথাটা ছিপির কাজ করছে। এ অবস্থায় তিনি কেবল বোতলের মতো গড়িয়ে গড়িয়েই চলতে পারেন, তাঁর আনলাকি কাণ্ট্রিমেনদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং টেনেই তুলতে হল তাঁকে।

তখন একটা বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। ওঃ—ইট্ ইজ সো হট। তাঁর একটু ফ্রেশ এয়ার দরকার। গাড়ীর ভেতরে তিনি বসবেন না, এঞ্জিনের বনেটে চেপে যেতে চান। তাতে মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়াটাও লাগবে আর যেতে যেতে তিনি তাঁর 'বিলাভেড্' কাণ্ট্রিকে দু চোখ ভরেও দেখতে পাবেন।

প্রভাতের তখন বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। রাত এগারোটা বাজে, এর পরে নারকেলডাঙা ফিরতে বাসও আর পাওয়া যাবে না, হেঁটেই মাইল পাঁচেক পাড়ি দিতে হবে হয়তো। ক্লাবের যে বেয়ারাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছিল, তাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, হাসছ কি, তুলে দাও সাহেবকে।

জোর করেই তুলতে হল। যাওয়ার সময় বেয়ারাটা প্রভাতের কানে কানে বলে গেল, রাস্তাতেই ফেলে যাও না দাদা। গরিব মানুষ পথে মাতলামি করলে পুলিশে ধরে, তোমার সায়েবও এক রাত হাজতে থেকে মুখ বদলে আসুক।

মন্দ কথা নয়। যে দেশের লোকের জন্যে কাঞ্জিলাল সাহেব এত ভাবেন, হাজতে রাত কাটালে তাদের সঙ্গে আরো ভালো করে মিশতে পারবেন তিনি, খেনো আর হুইস্কির গলা-জড়াজড়ি চমৎকার একটা ব্যাপার হবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু প্রভাত ফেলে যেতে পারল না। মনিবের চাকরিটাও তো করা দরকার।

কাঞ্জিলাল সাহেব একটা বস্তার মতো গাড়ীর ভেতরে জমা হয়ে গেলেন। চোখ থেকে নীলচে কাচের দামী চশমাটা আর পকেট থেকে একটা ছোট নোটবই গাড়ীর মেজেতে পড়ে গিয়েছিল, সেগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হল প্রভাতকেই। আর নোটবইটার ভেতর থেকে যে চকচকে ফোটোটা বেরিয়ে পড়েছিল, সেটাও প্রভাতের দৃষ্টি এড়ায়নি, মনে হয়েছিল ছবিটা যেন কাঞ্জিলাল সাহেবের অফিসের সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লেডী টাইপিস্টটির। কিন্তু চুলোয় যাক—আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবরে তার কোনো কৌতূহল নেই।

গাড়ীতে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থেকে, খানিকটা হাওয়া মাথায় লাগবার পর কাঞ্জিলাল সাহেব ধাতস্থ হয়েছিলেন খানিকটা।

—ইয়ু প্রভাত!

—বলুন স্যার।

—ডু ইয়ু নো—বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলেন। প্রায় মিনিট দুই ধরে কান্নার আবেগটা চলেছিল, তারপর ফোঁস ফোঁস করে বুকভাঙা ব্যথার সঙ্গে জানিয়েছিলেন, আজকে ক্লাবে একজন জু অ্যাস্ট্রলজার এসেছিলেন। হি সেড্—পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। ইয়ু প্রভাত, শুনছ?

—আজ্ঞে হাঁ, শুনছি।

—থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যাণ্ড্ টোটাল ডেসট্রাকশন। নাইনটিন সিকসটি ফাইভ। তোমার কী মনে হয়?

—আমার আর কী মনে হবে স্যার? সবাই মরলে আমিও মরব।

—ইয়েস, সবাই মরব। ওফ—কিচ্ছু থাকবে না। লণ্ডন-বের্লিন-পারী-

ন্যু ইয়র্ক-মস্কো-ইজম্ ইয়োর ডেল্‌লি—অল্ ফিনিশড্। সভ্যতার শেষ। গ্রীড্—ইয়েস—মানুষের লোভই এর জন্যে দায়ী। আমরা যারা শান্তির জন্যে সারা জীবন সংগ্রাম করে গেলুম—তারা পৃথিবীকে বাঁচাতে পারলুম না! ও-ও-ওঃ!

কাঞ্জিলাল সাহেব আবার কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

কাঁদবার কথাই। সত্যিই তো শান্তির জন্যে কত সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে—বার থেকে বেরিয়ে বাড়ী ফিরতে ফিরতে কতদিন প্রভাতকে তিনি তাঁর বিশ্ব-প্রেমের কথা শুনিয়েছেন। আজ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে তাঁর মতো দুঃখ আর কে পাবে!

তারপরে আরো কী কী বলেছিলেন, প্রভাত ভালো করে শুনতে পায়নি, শোনবার চেষ্টাও করেনি। পৃথিবীর ভাবনা একটু পরে ভাবলেও চলবে, এখন তার তাড়াতাড়ি সাহেবকে পৌঁছে দিয়ে বাসটা ধরা দরকার।

সেই ধ্বংসের দুর্ভাবনাতেই রবিবার বেলা দশটা পর্যন্ত তিনি বিছানা ছাড়েননি—মর্মাহত হয়ে পড়ে আছেন। আর প্রভাত গাড়ী নিয়ে চৌরঙ্গীর এই সিনেমা হাউসের পাশে অপেক্ষা করছে। রিনি কাঞ্জিলাল তার বান্ধবী এবং বন্ধুটির সঙ্গে ভেতরে ছবি দেখছে এখন। বন্ধুটি অবশ্য বান্ধবীরই ভাই। চাকরির দিক থেকে চোখ কান বুজে থাকাই প্রভাতের দস্তুর, কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেটি যে রিনির মন ভোলাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সেটা সে লক্ষ্য করেছে আগেই।

'লাভ্‌লি গানের গলা আপনার।'

'বিলিয়ার্ডে চমৎকার হাত এসেছে আপনার রিনি দেবী।'

'আপনি বুঝি লাল রংটাই পছন্দ করেন? রিয়ালি, আমারও ওই কালারটাই পছন্দ। আর লালে কী যে মানায় আপনাকে!'

বান্ধবীটি অল্প অল্প হাসে, কিন্তু প্রভাতের গা জ্বালা করে। ছেলেটি নিরীহ—বয়েস অল্প, চেহারাটিও ভালো। প্রভাতের বলতে ইচ্ছে হয়ঃ 'কেন পণ্ড-শ্রম করছেন? রিনিকে আপনি চেনেন না। ও মেয়ে সাংঘাতিক—ওর মাথার ঠিক নেই। ওর বিশ্বপ্রেমিক বাপের চাইতেও ভয়ঙ্কর—ওদিকে পা বাড়াবেন না।'

কিন্তু নিতান্তই মোটর-ড্রাইভারের পক্ষে এ-সব কথা বলতে যাওয়া সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা। তবু জিনিসটা ভুলতে পারা যায় না। এই নির্বোধ ছেলেটির জন্যে যতখানি মায়া হয়, তার চাইতেও বেশি রাগ হয় রিনির উপরে। প্রভাত জানে, রিনি কাউকে ভালোবাসে না, ভালোবাসবার মতো মনই তার নয়। জীবনের সব কিছুই তার কাছে খেয়ালের খেলনা—যখন ইচ্ছা যে-কোনো একটাকে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলতে পারে।

সেদিন ডায়মণ্ড হারবার রোডে সেই সাপটা যদি সত্যিই রিনিকে একটা ছোবল বসিয়ে দিত—

ছিঃ ছিঃ—এসব কী ভাবনা। কেন সে মিথ্যে মৃত্যু কামনা করছে রিনির! এই কলকাতা শহরে অসংখ্য বেড়াল অসংখ্য নেংটি ইঁদুর নিয়ে খেলা করে চলেছে। রিনির দোষ নেই।

প্রভাত গাড়ী থেকে নেমে এল। একটা বিড়ি ধরিয়ে গাড়ীর গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালো।

রবিবারের দুপুর। ছাড়া ছাড়া ভাবে মানুষের আসা-যাওয়া, কোথাও কোনো তাড়া নেই কারো। বইয়ের স্টলগুলোর সামনে দু এক মিনিটের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ছে কেউ, এক আধখানা পত্রিকার পাতা উলটেই এগিয়ে যাচ্ছে আবার। হাইড্রান্টের মুখ দিয়ে এক জায়গায় বগ্ বগ্ করে ঘোলা জল উছলে উঠছে, একটা কাক এসে লোকের চলাফেরার মধ্যেই ঝটপট করে স্নান সেরে নিলে সেখান থেকে, তারপর তীব্র গলায় ডাক দিয়ে মাঠের দিকে উড়ে গেল। বেলা বারোটার রোদে চারদিক থেকে উগ্র জ্বালা ঠিকরে পড়ছে যেন, সিনেমা হাউসের নিয়নগুলোর দিকে তাকানো যায় না—চোখ ঝল্‌সে যেতে চায়।

একটা ফুলের গন্ধের ঝলক চলে গেল, এই দুপুরবেলাতেও কে যেন রজনীগন্ধা বিক্রি করতে বেরিয়েছে। হাত থেকে বিড়িটা ছুড়ে দিতে গিয়ে প্রভাতের মনে পড়ল একদিন সে ছোট ছোট ময়দার গুলি পাকিয়ে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছিল জলের ভেতরে। জায়গাটা কোথায় তার মনে পড়ছে না, কতদিনের আগেকার কথা তা-ও সে ভুলে গেছে—কিন্তু ছবিটা আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে চোখের সামনে। এই কলকাতার উগ্র নিষ্ঠুর রোদে জ্বলতে জ্বলতে দেখতে পাচ্ছে, মস্ত একটা দীঘির শ্যাওলাধরা বাঁধানো ঘাটের ওপর বসে রয়েছে সে। একটু আগে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু আকাশ এখনো মেঘে অন্ধকার। পূবের হাওয়া দিচ্ছে, দীঘির ওধারে শন্ শন্ করছে নারকেল বন, এপারে দুটো বেলগাছের পাতা থেকে টুপ টুপ করে জল ঝরে যাচ্ছে। দীঘির কালো জলে ঢেউ উঠেছে, পুঁটি মাছের একটা মস্ত ঝাঁক আনন্দে কখনো কখনো তালগোল পাকিয়ে লাফিয়ে উঠছে সিঁড়ির ওপর। প্রভাত জলে ছিপ ফেলেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু মাছে খাচ্ছে না। অন্যমনস্ক হয়ে সে হাতের ময়দার তালটা থেকে ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে ছুড়ে দিচ্ছে পুঁটি-গুলোর দিকে। গুরু গুরু করে মেঘ ডাকছে থেকে থেকে, আরো কালো হয়ে ছায়া নামছে আর ঘাটলার পাশে ঝোপ-ঝাড়ের বৃষ্টিভেজা গন্ধকে ছাপিয়ে তার একটা কোমল গন্ধের ঝলক আসছে হাওয়ায়—যুঁইয়ের গন্ধ।

যে-লোকটা রজনীগন্ধা নিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল, সে-ই এই ছবিটা জাগিয়ে দিলে চোখে। আশ্চর্য, স্বপ্নের চাইতেও যেন অসম্ভব মনে হয় এখন। যেন এমন একটা দীঘি, এমন ঢেউলাগা কালো জল, এমন মেঘে অন্ধকার আকাশ, এমন পাগলকরা পূবের হাওয়া আর সেই যুঁইয়ের গন্ধ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এমন ছুরির ফলার মতো ধারালো রোদ, এখন নারকেলডাঙার সেই বাসায় গৌরাঙ্গ-কাকার সংসার, এখন কলকাতা, বোমার শব্দ, হাসপাতালে পড়ে-থাকা দীপ্ত, বেনজিন-ফিনাইল আরো কী কী গন্ধ, একটা দৈত্যের মতো লরীর মুখোমুখি পড়ে কোনোমতে অ্যাকসি-ডেণ্ট থেকে বেঁচে যাওয়া, আর— রিনি কাঞ্জিলাল।

—প্রভাতদা নয়?

একটি বছর আঠারোর ছেলে, তার সঙ্গে একজন মহিলা। মহিলার পরনে শাদা থান, গায়ে শাদা জামা। দুজনের কাঁধেই দুটি ঝোলা।

সম্ভাষণ করেছিল মেয়েটিই। আর বৃষ্টিভেজা সেই দিনটার ছবি সরিয়ে দিয়ে আর একটা দীঘি এল সেখানে। তার জলে তালগাছের ছায়া পড়েছে, শ্যাওলা দুলছে, আর একটি মেয়ে ডুবে যাচ্ছে তাতে।

—রাণী!

—চিনতে পারলে এতক্ষণে?

কিছুক্ষণ ধরে দীঘির জলে কাঁপন-লাগা ছায়ার মতো চৌরঙ্গীটা দুলছিল, এবার সেটা শান্ত হয়ে এল। কিন্তু সামনের সিনেমা হাউসের নিয়নের টিউব-

গুলো থেকে যে ধারালো আলো এসে তার চোখ ঝলসে দিচ্ছিল, তারও চেয়ে তীক্ষ্ণ কিছু এসে প্রভাতের দৃষ্টিতে বিঁধল। রাণীর পরনে থান এর আগে সে আর দেখেনি। আর এ থান সেই পরিয়েছে, যখন সেই দুর্যোগের রাতে হাতের স্টিয়ারিংটা আর বশ মানেনি—কালো একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রলয়ের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

পাগলের মতো ছুটে পালাতে পারলে বেঁচে যেত প্রভাত, রাস্তায় ভিড় থাকলে খুনী যেমন করে তার মধ্যে লুকিয়ে যায়, তেমনি করে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারলে নিষ্কৃতি পেত সে। কিছুই করা গেল না—শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝড়ের গর্জন শুনতে লাগল বুকের ভেতর।

কতক্ষণ কাটল কে জানে। এক মিনিট, দু মিনিট, হয়তো আরো বেশি। তারপরে রাণীই আবার কথা কইল। সমস্ত জিনিসকে সহজ করে নেবার স্বাভাবিক শক্তি নিয়েই মেয়েরা জন্মায়।

—অনেকদিন পরে দেখা হল, তাই নয়?

—হাঁ, অনেকদিন।

আগের চাইতে রোগা হয়েছে রাণী, একটু যেন লম্বাও হয়েছে, আর শাদা কপালটাকে অতিরিক্ত চওড়া দেখাচ্ছে তার। সেই কালো চোখ দুটোর রং একটু পিঙ্গল হয়ে এসেছে মনে হল আর চোখের পাশে পাশে যেন ক্লান্তির ছায়া ঘনিয়ে রয়েছে।

রাণী আবার বললে, বেশ ভালো আছো তো?

—চলে যাচ্ছে।

—গাড়ীটা তোমার?

রাণী কি ঠাট্টা করছে তাকে? নাকি ভেবেছে কলকাতা এসে রাতারাতি আবু হোসেনের মতো রাজত্ব পেয়েছে প্রভাত? কিন্তু রাণীর শান্ত ক্লান্ত চোখে কোথাও কৌতুকের আভাস দেখা গেল না। আর প্রভাতের মনে হল, বিয়ের পরের রাতে যে তার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে, তার সঙ্গে আর যাই হোক, ঠাট্টা চলে না।

—না, মনিবের গাড়ী। আমি ড্রাইভার।

বলেই ঝুঁকড়ে গেল প্রভাত। রাণী যদি বলে, 'আবার ড্রাইভার? আবার আর একজনের সর্বনাশ করতে চাও?'

কিন্তু রাণী তা বলল না। জিজ্ঞেস করল, থাকো কোথায়?

—নারকেলডাঙা।— তারপরেই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জিজ্ঞেস করতে হল: তুমি?

—আমি তো কলকাতায় থাকি না। রিটায়ার করবার পর দেশে চলে এসেছি সবাই। নবদ্বীপে।

—বাবা কেমন আছেন?

—বেঁচে আছেন এইমাত্র। ডান দিকটা পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেছে গত বছর। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। মা-রও শরীর ভেঙে পড়েছে একেবারে।

বুকের মধ্যে আবার একটা কাঁটা নড়ে উঠল। প্রভাতই এর জন্যে দায়ী, সেই দুর্ঘটনাই হয়তো—

কিন্তু ভাবতে সময় দিল না রাণী। যেন কোথাও কিছু ঘটেনি—যেন সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলো মাটির ওপরে জলের দাগের মতো নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে তার কাছ থেকে।

—যদি নবদ্বীপে কখনো যাও, আমাদের ওখানে যেয়ো একবার। আগমবাগীশ পাড়ায় আমাদের বাড়ী। ওখানে গিয়ে বাবার নাম করলেই লোকে চিনিয়ে দেবে।

কত সহজে রাণী তাকে তাদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্যে নিমন্ত্রণ করছে। কিন্তু তাকে দেখে সহ্য করতে পারবেন মন্মথবাবু? সইতে পারবেন রাণীর মা? তবু জবাব দিতে হল, আচ্ছা যাব।

—যেয়ো তা হলে।—রাণী হাসল: তা ছাড়া আমিও ঘরে বসে নেই। একটা নারী-মঙ্গল আশ্রমের সঙ্গে জড়িয়ে আছি। সেটাও দেখবে।

—ও।

—তাই তো, পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি—রাণী এতক্ষণের সেই নির্বাক ছেলেটির দিকে তাকালো: এ হল আমার জেঠতুতো ভাই রণেন, আর—আর এ প্রভাতদা। প্রণাম কর রণেন—

রণেন প্রণাম করতে এল, প্রভাত দু হাতে ঠেকিয়ে দিল তাকে।

রাণী বললে, আচ্ছা তা হলে যাই এখন। অনেকগুলো কাজ হাতে নিয়ে এসেছি, সেগুলো সেরে আবার বিকেলের গাড়ীতেই নবদ্বীপে ফিরে যেতে হবে। নবদ্বীপ যদি কখনো যাও, আমাদের ওখানে একবার যেয়ো নিশ্চয়।

—যাব।

এবার রাণী নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিলে, সেই সঙ্গে রণেনও। প্রভাত আর বাধা দিতে পারল না, গাড়ীর গায়ে ঠেস

দিয়ে নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইল কেবল।

শাদা থান শাদা জামা আর ছিটের আধময়লা শার্ট আর পাজামা রোদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। এই গাড়ীটায় করে খানিক দূরে ওদের লিফ্‌ট দিয়ে আসতে পারে প্রভাত? না—পারে না। রাণী আর তাকে বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু আশ্চর্য—কী অদ্ভুত অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে সব। যে দুর্ঘটনার স্মৃতি নিয়ে এখনো অনেক রাতে তার ঘুম আসে না, যার কথা ভাবলে তার মাথার প্রত্যেকটা স্নায়ুতে স্নায়ুতে বিদ্যুৎ ছুটতে থাকে, খবরের কাগজে একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্টের খবর পড়লে এখনো তার চোখের সামনে একটা অন্ধকার গাছের গুঁড়ি দৈত্যের মতো এসে দাঁড়ায়, রাণীর কাছে তা কিছুই নয়? শুধু প্রভাত একাই জ্বলে যাচ্ছে সেই বিষের জ্বালায়, পৃথিবীতে আর কারো কিছু আসে যায় না?

ঘোর ভাঙল। সিনেমা শো শেষ হয়নি, কিন্তু রিনি এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ীর সামনে।

—স্বপ্ন দেখছেন?—একটা বাঁকা হাসি রিনির ঠোঁটের কোণায় : এবার জাগতে পারেন। বাড়ী ফিরব।

প্রভাত বিহ্বলের মতো তাকালো চারদিকে : কিন্তু ওঁরা—

—সব কিছুর কৈফিয়ৎ দিতে হবে আপনাকে? চলুন।

প্রভাত দরজা খুলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রিনি উঠে পড়ল, ধড়াস করে বন্ধ করল দরজা। রুক্ষ গলায় বললে, চলুন।

গাড়ী চলল।

বাপের সঙ্গে একদিকে মিল আছে রিনির, চুপ করে থাকতে পারে না। মিনিট কয়েক পরেই কথা আরম্ভ করল।

—নাম শুনে দেখতে এসেছিলুম, কিন্তু কী বোরিং ছবি। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে নায়িকা শেষে নানারিতে গিয়ে ঢুকল। ট্র্যাশ! এর পরে আর সহ্য করা যায়? ওদের 'একটু আসছি' বলে পালিয়ে এলুম।

—ফেলে এলেন ওদের?—বিরক্তি চাপতে না পেরে প্রভাত বলে ফেলল : সঙ্গে করে এনে—

—ভয় নেই, হারিয়ে যাবে না। তা ছাড়া ট্যাক্সি করে ঘরে ফেরবার মতো পয়সা ওদের আছে।

অভদ্রতা—না পাগলামি? কিন্তু রিনিকে বোঝবার চেষ্টা করা বৃথা।

রিনি ব্যাগ থেকে কী একটা বার করল। তারপর এগিয়ে দিলে প্রভাতের দিকে। বললে, কাজু বাদাম কিনেছিলুম। হঠাৎ মনে হল, আপনার জন্যেও এক প্যাকেট নেওয়া যেতে পারে। নিন—ধরুন।

—আমার জন্যে কেন আর—

—বাজে বিনয় করে এখন আর মাথা ধরিয়ে দেবেন না আমার। এমনিতেই সিনেমা দেখে মেজাজ চড়ে আছে—নিন।

হাত বাড়িয়ে নিতে হল প্যাকেটটা। এই বেলা বারোটার সময় কাজু বাদাম খাওয়ার প্রবৃত্তি কোথাও নেই। কিন্তু রিনির কথার প্রতিবাদ করে লাভ নেই—এখনি একটা কুৎসিত ঝগড়া আরম্ভ করে দেবে। প্রভাত আলগোছে প্যাকেটটা বুক পকেটে রাখল। আর অনুভব করল একটা মিষ্টি গন্ধ উঠছে তা থেকে। বাদামের নয়—রিনির ব্যাগের গন্ধ।

কিন্তু আসল জিনিসটাই বাকী ছিল তখনো।

পেছন থেকে সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা এল রিনির : কে ও মেয়েটা?

চমকে প্রভাত জিজ্ঞেস করল : কার কথা বলছেন?

—যার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করছিলেন, আর আমি লবিতে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম? কে উনি?

অদ্ভুত চোখ এবং আরো অদ্ভুত প্রশ্নের ভঙ্গি! শোনার সঙ্গে সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠতে চায়।

'তাতে আপনার কী'—এই উগ্র উত্তরটাকে জিভের ডগা পর্যন্ত এনেও প্রভাত ফিরিয়ে দিলে। বললে, আপনি ওকে চিনবেন না—আমার দেশের লোক।

সিনেমা-শো শেষ হয়নি, কিন্তু রিনি এসে দাঁড়িয়েছে।

—তাই নাকি? —প্রভাতের সামনের আয়নাটায় রিনির বন্য চোখ, বাঁকা ঠোঁট আর ধারালো দাঁত ফুটে উঠল : দেশের লোক? তা হবে। কিন্তু আপনি যেমন নায়কের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলেন, তাতে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মতো কিছু একটা হৃদয়-বিদারক ব্যাপার বলে বোধ হল। মনে হল যেন বিধবা। —তারপরেই বাঁকা ঠোঁট আর বুনো চোখ থেকে একেবারে

অশ্বিমান এল : সত্যি কথা বলুন তো— উনি কে?

স্টিয়ারিঙের ওপর প্রভাতের হাত কাঁপতে লাগল, ঘষা লাগল দাঁতে দাঁতে। বুকপকেট থেকে রিনির ব্যাগের সেই মিষ্টি গন্ধটা আসছে, কিন্তু এত কুৎসিত কেন মনের ভেতরটা?

—কী শুনলে আপনি খুশি হন?

—ওঁকে আপনি ভালোবাসতেন।

রিনি যাদুমন্ত্র জানে? কিংবা এই ধরনের কথা বলাতেই ওর আনন্দ? কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল প্রভাত, খানিকটা ক্ষ্যাপা উত্তেজনার দোলা থেমে যেতে চাপা বিকৃত গলায় জবাব দিলে : আপনি মনিব, যা খুশি ভাবতে পারেন।

—স্বীকার করছেন তা হলে?

প্রভাত চুপ করে রইল। এর পরে কথা বললে নিজের ওপরে শাসন থাকত না।

আর অকারণে তৎক্ষণাৎ ফেটে পড়ল রিনি। সামনের আয়নাটায় মুখখানা ঠিক প্রেতিনীর মতো মনে হল তার।

—মিথ্যে কথা—লায়ার। নিজেকে অকারণে ফ্ল্যাটার করছেন আপনি। কোনো মেয়ে আপনাকে ভালোবাসতে পারে না—কেউ নয়! আপনি কারো ভালোবাসার যোগ্য নন।

চন্দন সিং শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল, সাত আটদিনের মধ্যে দেখা নেই কেন অমিয়? একেবারে ভুলেই গেলে?

অমিয় গুম হয়ে বসেছিল কিছুক্ষণ, এইবারে গর্জন করে উঠল।

—দাদা একটা গোঁয়ার—কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই ওর। একেবারে লেবারার কিনা, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে শেখেনি। আমি দাদার হয়ে মাপ চাইছি চন্দন সিং, তুমি কিছু মনে কোরো না।

চন্দন সিং হাসল : ছোড় দো—ও বাত ছোড় দো। উনি তো আমায় চেনেন না।

—চেনে না বলেই অমন ছোটলোকের মতো ব্যবহার করবে? জানো, শুধু ওইখানেই শেষ হয়নি? রাগে দুঃখে অমিয়র গলা বুজে এল : আমার গায়ে পর্যন্ত হাত তুলেছে রাস্তার ওপর। নিতান্তই বড়ো ভাই—নইলে—অমিয় একবার থামল : নইলে অমিয় সে বুঝিয়ে দিত ফুটবলে আসল ফাউল কাকে বলে, কেমন করে তলপেটে হাঁটুর একটা জুৎসই ঘা দিয়ে দু ঘণ্টার মতো শুইয়ে রাখা যায়!

—নেহি, নেহি, এইসা নেহি কর না।

—তোমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাইনি কেন এখন বুঝতে পারছ তো? এই সব ইতর লোকের জন্যে। মাইরি বলছি চন্দন সিং, আমি ও বাড়ীতে আর থাকব না। চুলোয় যাক গুষ্টিসুদ্ধু। আমি তোমার কাছে এসে থাকব, মোটরের কাজ শিখব, তুমিই একটা ব্যবস্থা করে দাও আমার।

চন্দন সিংয়ের ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাচ্ছিল আর উত্তেজিত অমিয়র কোনো দিকে খেয়াল ছিল না। চন্দন সিং উঠে আলোটা জ্বালল : সেই আলোয় অমিয় দেখল চন্দন সিংয়ের খাটে একজন দশাসই জোয়ান চিৎ হয়ে ঘুমুচ্ছে, হাওয়ায় কাঁচাপাকা দাড়ি উড়ছে তার।

চন্দন সিং বললে, কুছ্ ডরো না নেহি। আমার চাচা হয় গ্রাম সুবাদে। দিল্লী থেকে একটা ট্রাক নিয়ে এসেছে আজ বিকেলে। রহনে দেও।

চন্দন সিং আবার নিজের জল-চৌকিটায় গিয়ে বসল। আর চেয়ারের উপর তেমনি গুম হয়ে রইল অমিয়।

—আমার জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দেবে না চন্দন সিং?

—হবে, হবে, ঘাবড়াচ্ছ কেন? ভেবে-চিন্তে একটা ঠিক করতে হবে তো। —চন্দন সিং একবার হাই তুলল, হাত দুটো দু ধারে ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল, তারপর বললে, আঃ, সারাদিন ভারী খাটনি গেছে আজ। একটু তাজা হয়ে না নিলে আর চলছে না। কিছু মনে করবে না তো অমিয়!

অমিয় কথাটা বুঝতে পারল না। বললে, না—না, মনে করব কেন?

—তা হলে—

চন্দন সিং আবার দাঁড়িয়ে উঠল। দেওয়াল-আলমারী খুলে একটা চ্যাপ্টা-মতন বোতল বের করল, তার রুপোলি লেবেলটা চিক চিক করছিল। আবার বেরুল এক বোতল সোডা, দুটো গ্লাশ। অমিয় তাকিয়ে রইল সেদিকে। চন্দন সিং এক আধটু নেশা করে সে জানে, কিন্তু চোখের সামনে এই প্রথম।

চন্দন সিং বোতল খুলল, সোডা খুলল, দুটো গ্লাশে ঢালল। তারপরে ডাকল : চাচা—

উত্তরে চাচার নাকের ডাক শোনা গেল কেবল।

—এ চাচা—চাচা—

চাচা পাশ ফিরল। বিরক্তি ফুটে উঠল মুখের ওপর।

—উঠবে না, ভীমের মতো পড়ে আছে এখন। মিছেই ঢেলেছি ওর জন্যে।

—হঠাৎ অমিয়র দিকে চোখ দুটো তুলল চন্দন সিং : খাবে অমিয়?

অমিয় আঁতকে উঠল : না—না।

—কেন, ভয় কিসের? আরে মোটরের কাজ করতে যাচ্ছ, বিস্তর খাটনি—এসব না হলে শরীর সইবে কেন?

অমিয় কালো হয়ে গেল।

—না ভাই, মাতাল হয়ে যাব, মুখে গন্ধ ছুটবে—

—অল্প করে খাবে, মাতোয়ালা হবে কেন? আর এলাচ দেব, খাওয়ার পরে চিবুতে চিবুতে চলে যাবে। গন্ধ উঠবে না।

—কিন্তু ভাই—আরো কুঁকড়ে গেল অমিয়। কপালে ঘাম ছুটল, জিভের ডগাটাকে কে যেন ক্রমাগত টানতে লাগল ভেতরের দিকে, গলাটা শুকিয়ে এল তার।

—কোনো ভাবনা নেই, খেয়েই দেখনা একবার। ভালো না লাগে আর কোনোদিন ছুঁতেও বলব না। ধরো—

অমিয় দুবার হাত তুলল, দুবারে ফিরিয়ে নিলে, তৃতীয় বারে গ্লাশটা ধরল মুঠোয়। সোনার মতো টলটল করছে গ্লাশের ভেতরকার জিনিসটা, শাদা ফেনা ফুটছে তার ওপর। আর কী অদ্ভুত গন্ধটা।

কপাল বেয়ে দু ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে পড়ল শার্টের ওপর। চন্দন সিং বললে, আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন? খেয়েই দেখনা এক চুমুক। দোস্তী করতে হলে দোনো জনাই তো করা চাই। তোমাকে আমার পার্টনার করে নিতে চাই—আমার একটা কথা তুমি রাখবে না?

পার্টনার! এই শব্দটা যেন থিয়েটারের স্টেজের মতো ঘুরে গেল অমিয়র চোখের সামনে। একটা সাজানো ড্রয়িংরুম—কার্পেটপাতা মেজে, সোফা-ডিভান, শাদা টেলিফোন। একটা চৌকো মতন গাঢ় নীল কাপে চায়ে চুমুক দিচ্ছে অমিয়—ঠিক সেই রকম কাপটা—যা ফ্রান্স থেকে আনিয়েছে গুরুবক্স সিং।

স্বপ্নের ঘোরে সেই নীল চৌকো পেয়ালাটাই উঠে এল অমিয়র ঠোঁটের কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে গলার ভেতর দিয়ে আগুনের স্রোত ছুটল একটা।

বাইরের অপরিচ্ছন্ন সন্ধ্যা-নামা পথের ওপর বিকট শব্দে লরীর টায়ার ফাটল, গ্লাশ থেকে খানিকটা সোনালি জিনিস চলকে পড়ল অমিয়র গায়ে, আর ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে কী বকতে বকতে চাচা একবার পাশ ফিরল।

(ক্রমশঃ)

॥ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া ॥

আমেরিকার প্রখ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ই এম ফস্টার রচিত "এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" উপন্যাসটির পটভূমিকা ভারতবর্ষ। কিছুকাল আগে খ্যাতনামা ভারতীয় লেখিকা শ্রীমতী শান্তা রমারাও উপন্যাসটির নাট্যরূপ দান করেছেন। এই নাট্য-রূপায়ণ ফস্টারকে যথেষ্ট খুশী করেছে। তিনি নাটকটির প্রশংসা করে বলেছেন যে নাটকের প্রথম অংকটি হয়েছে নিখুঁত। উপন্যাসটির নাট্য-রূপায়ণের সম্ভাবনা সম্পর্কে ফস্টারের মনে ইতিপূর্বে কোন প্রশ্ন জাগেনি। হয়ত এরূপ সম্ভাবনা তিনি চিন্তাও করেননি। কারণ কয়েকবার উপন্যাসটির চিত্ররূপদানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। শ্রীমতী রাওয়ের এই কার্য সাংবাদিক ও বহু বিশিষ্ট সমালোচকগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে।

॥ ফকনারের শেষ উপন্যাস ॥

ফকনার মারা গেছেন। কিছুকাল আগে তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস দি রীভার্স প্রকাশিত হয়। ১৯০৫—১৯৬২ সালের মধ্যে ঘটনা আবদ্ধ। যোকনাপটাওয়াফারের মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত। মোটরগাড়ী করে আশী মাইল পথ পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিচিত্র জীবন-কথা স্বাভাবিকভাবে এসেছে। গাড়ীর ড্রাইভার, গাড়ীর মালিক, মালিকের নাতি চরিত্রগুলি নানাবিধ কাহিনীর মধ্যদিয়ে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটিতে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রয়োজনীয়তার সন্ধান পেয়েছেন

ঔপন্যাসিক। কারণ ঐ অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়েই সবাইকে বাঁচতে হবে।

॥ তেলেগু ও ভারত সংস্কৃতি ॥

ভারতীয় প্রাচীন ভাষা-গোষ্ঠীর অন্যতম তেলেগু নিয়ে প্রচুর আলোচনা বাঙলাতে হয়নি। কিন্তু তার প্রয়োজনীতা রয়েছে। এককালে তেলেগু ভাষা বিশেষ মর্যাদার দাবী করতে পারত। পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ ডাঃ সি আর রেড্ডির মতে এককালে তেলেগু ভাষা ব্রহ্মদেশ থেকে শুরু করে ফিলিপাইন পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। এ সমস্ত অঞ্চলের ব্যবহৃত ভাষাসমূহের মধ্যে বহু তেলেগু শব্দ রয়েছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে অন্ধ্রের কবি ও পাণ্ডিতদের দান উল্লেখযোগ্য। মল্লিনাথ, কাঠায়ভেমা, রাও সিংগানো, জগন্নাথ পণ্ডিতারায়, বিদ্যানাথ প্রভৃতির নাম নানা কারণে স্মরণযোগ্য। বিশিষ্ট কবি সোমনাথের মহাকাব্য বাসবপুরানম একখানি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য গ্রন্থ। তাছাড়া আছেন নাগার্জুন, জিঙনাগ, নিম্বার্ক, সল্লভ, চেন্নাবাসব প্রভৃতি মনীষীগণ ভারতীয় চিন্তাজগতের স্মরণীয় ব্যক্তি। ক্ষেত্রোয়া ও ত্যাগরাজা এই দুজন সংগীত-রচয়িতা ও কবি দাক্ষিণাত্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তাছাড়া অন্যান্য কবি ও নাট্যকারগণ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে প্রভাব বিস্তার করে ভারত সংস্কৃতির যে নতুন অধ্যায় সূচনা করেছিলেন তা আজ সমগ্র ভারতের সম্পদ বিশেষ। একালে তেলেগু ভাষা ও সাহিত্য যে সমস্ত কবি, নাট্যকার ও উপন্যাসকদের অবদানে পুষ্ট হয়েছে, ভারতীয় সংস্কৃতির জাগরণে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছে তা নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

॥ হেমিংওয়ের চিঠি ॥

আজ থেকে ষোল বছর আগে সমসাময়িক মার্কিন লেখকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে প্রখ্যাত সোবিয়েত কবি কনস্তানতিন সিমোনফকে একটি চিঠি লিখেছিলেন কিউবার রাজধানী হাভানা থেকে। সেখানে সিমোনফের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা ছিল। কিন্তু সিমোনফ যেতে পারেননি। তাই হেমিংওয়ে সিমোনফের সঙ্গে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন, সেসব বিষয়ে বিস্তৃতভাবে তাঁর অভিমত জানিয়ে এই পত্রটি লেখেন। সেদিক দিয়ে পত্রটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বদেশের সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক মতবাদ-নিরপেক্ষ বিশ্বসংস্থা গঠনের পরিকল্পনার কথা হেমিংওয়ে এ পত্রে উল্লেখ করেছিলেন। স্পেনে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে তিনি যে লড়াই করেছিলেন সেকথা বর্ণনা করে হেমিংওয়ে এ চিঠিতে জানিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন তাঁর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানসিক অবস্থার কথা। আবেগপূর্ণ ভাষায় হেমিংওয়ে এই চিঠিতে সর্বজাতির মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে গেছেন সমস্ত দেশের মানুষের কাছে।

॥ প্রাচ্যদেশীয় ব্যঙ্গ-গল্পের সংকলন ॥

বইয়ের নামটি চমৎকার—'যে দিনটিতে কেউ মিথ্যা কথা বলে নাই'। সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় কথাসাহিত্য প্রকাশালয় হতে গত সপ্তাহে প্রাচ্যের ১৫টি দেশের ব্যঙ্গরসাত্মক গল্পের এই সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পই মূলভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনুদিত। এই ব্যঙ্গ-গল্পের সংগ্রহে ভারত, আফগানিস্তান, ইরাণ, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান, মিশর, সিরিয়া ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের সমকালীন লেখকদের শ্রেষ্ঠ কতকগুলি ব্যঙ্গাত্মক রচনা অনুবাদ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে সংগৃহীত ৩৫টি ভারতীয় রচনার মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথ ও পরশুরাম (রাজশেখর বসু) রচিত দুটি ব্যঙ্গরসের গল্প। তুরস্কের প্রখ্যাত লেখক ওরখান ভাইলী ওরখোন লিখিত ও এই গ্রন্থে সংকলিত একটি গল্পের শিরোনামকেই গ্রন্থের নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

রূপতীর্থ ইলোরা

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের সর্ববৃহৎ ও বহুবিচিত্র গুহামন্দির-গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ইলোরায়। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও জৈন গুহা-মন্দিরের একত্র সমাবেশে তিনটি ধর্মমতের সমাবেশ ঘটেছে এখানে। এগুলির বিরাটত্ব ও মহান ঐশ্বর্য দর্শককে এক অপার আনন্দলোকে নিয়ে যায়।

অজন্তায় আমরা দেখেছি একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের কীর্তি। তাই অজন্তার স্থাপত্য একটা বিশেষ রীতির মধ্যে সীমিত ছিল। কিন্তু ইলোরায় তিনটি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের শিল্প-রীতির সম্মিলন ঘটেছে। সম্প্রদায় ভেদে এই শিল্পরীতিগুলির প্রত্যেকটির নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তাই ইলোরার স্থাপত্য সামগ্রিকভাবে কোন একটিমাত্র নির্দিষ্ট রীতিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এখানে শিল্পকে দেখতে পাই এক উদারতর ও প্রশস্ততর ক্ষেত্রে। বিভিন্ন রীতি ও ভঙ্গির আশ্রয়ে স্থাপত্যশিল্প এখানে এক চরম উৎকর্ষে গিয়ে পৌঁছেছে। অজন্তার যেটুকু বৈচিত্র্য তা তার চিত্রকলার মধ্যে নিবদ্ধ। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের দিক থেকে অজন্তায় কিছুটা একঘেয়েমি আছে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইলোরা ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পে বহু বৈচিত্র্য এনেছে। সত্যই ইলোরা যেন সুন্দরের হাট বসিয়ে রেখেছে। রূপময় ইলোরার রূপের ঐশ্বর্য অলোকসামান্য। ইলোরা তাই রূপরসিকদের তীর্থক্ষেত্র।

ঔরঙ্গাবাদ থেকে ১৮ মাইল দূরে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত এক পাহাড়-গাত্রে প্রায় সওয়া মাইলব্যাপী খোদাই করে এই বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্ভব করে তোলা হয়েছিল। পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্ত যেখানে পশ্চিমে মুখ ঘুরিয়েছে ঠিক সেইখানে ইলোরার সবচেয়ে প্রাচীন গুহাগুলির অবস্থান। এগুলি বৌদ্ধ গুহা এবং সবগুলিই মহাযানীদের কীর্তি। উত্তর প্রান্তের পশ্চিমমুখী বাঁকে রয়েছে জৈন মন্দিরগুলি। আর এ দুয়ের মাঝখানে রয়েছে ব্রাহ্মণ্য গুহাগোষ্ঠী।

(১) বৌদ্ধ গুহা

বৌদ্ধ গুহাগুলির নির্মাণকাল পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী।

প্রথম গুহাটি আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। এর সম্পর্কে শুধুমাত্র এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, এটি এখানকার প্রাচীনতম বিহারগুলির অন্যতম। বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য এর মধ্যে ৮টি প্রকোষ্ঠ রয়েছে, অবশ্য দুটির নির্মাণকার্য অসমাপ্ত আছে।

দ্বিতীয় গুহাটি আকর্ষণীয়। এটি সম্ভবতঃ চৈত্য বা উপাসনা-কক্ষ ছিল। তবে যে খিলানাকৃতি ছাদ চৈত্যগুহার বৈশিষ্ট্য এখানে তা দেখা যায় না। কতকগুলি সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করে এই গুহায় পৌঁছতে হয়।

বারান্দায় ছোট ছোট অনেক বুদ্ধ-মূর্তি, আর গুহাকক্ষের প্রবেশদ্বারে দুটি দীর্ঘদেহ দ্বারপালমূর্তি।

মূল গুহাকক্ষের আয়তন দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান, ৪৮ ফুট করে। ছাদের অবলম্বন ১২টি বিশাল স্তম্ভ। অনেক-গুলি স্তম্ভেরই ওপর দিকে কোণে বামনমূর্তি। মূল কক্ষের দুদিকে রয়েছে অলিন্দ। এই অলিন্দগুলিতেও আবার ৪টি করে স্তম্ভ। অলিন্দ-গুলিতে পাঁচটি করে প্রকোষ্ঠ আছে। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেই উপবেশনের ভঙ্গিতে বুদ্ধমূর্তি দৃষ্ট হয়।

মূল মন্দিরে রয়েছে সুবিশাল বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধদেব সিংহাসনে উপবিষ্ট। সিংহাসনের ভার ন্যস্ত রয়েছে কতিপয় সিংহের দেহের ওপর। বুদ্ধের হাত দুটি ধর্মচক্র মুদ্রা ভঙ্গিতে রয়েছে, যা আমরা অজন্তা গুহাতেও অনেকবার লক্ষ্য করেছি।

হয়ত পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুহাটি নির্মিত হয়ে থাকবে।

তৃতীয় গুহাটি একটি বিহার। এটি দ্বিতীয় গুহারই সমসাময়িক। তবে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন দুয়ের মধ্যে এটি হয়ত প্রাচীনতর। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৪৬ ফুট গুহাকক্ষটি ১২টি চতুষ্কোণ স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভের শিরোদেশ গোলাকৃতি। দুদিকে পাঁচটি ক'রে ও পিছনে দুটি, মোট ১২টি প্রকোষ্ঠ রয়েছে শ্রমণদের জন্য।

গুহার উত্তরদিকের দেওয়াল গাত্রে দুটি ছোট বুদ্ধমূর্তি আর বারান্দার এক প্রান্তে একটি মন্দিরকক্ষে আর একটি বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়। অন্যান্য অধিকাংশ গুহার মত এখানেও বুদ্ধদেব পা দুখানি মুড়ে হাত দুটি উপদেশ-

পদ্মের ভঙ্গিতে রেখে পদ্মাসনে বসে আছেন। পদ্মের মৃণালটি ধরে আছে নাগজাতীয় কয়েকজন। বুদ্ধের দু'পাশে দুজন চামরধারী যথারীতি বিরাজ করছে।

এর পরের কতিপয় গুহার এরূপ ভগ্নদশা দেখা দিয়েছে যে পৃথকভাবে এগুলির বিচার প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুহা একটিও নেই। তাই আমরা একেবারে ১০নং গুহায় চলে আসতে পারি।

বিশ্বকর্মা গুহা

ইলোরায় বৌদ্ধদের একমাত্র চৈত্য গুহামন্দির এই বিশ্বকর্মা গুহা। এই মন্দিরে বুদ্ধদেবকে বিশ্বকর্মারূপে কল্পনা করা হয়েছে। তাই এর নাম বিশ্বকর্মা গুহা। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এর কোন সংস্রব নেই। এইভাবেই হিন্দুর দেবতা এসে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করেছে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এবং ক্রমে বৌদ্ধধর্মের কার্যতঃ বিলুপ্তি ঘটেছে। বিশ্বকর্মা গুহার নির্মাণকাল সপ্তম শতাব্দী যখন বৌদ্ধধর্মের দিন অবসান হতে চলেছে। এই পরিবর্তন-যুগে নির্মিত হয়েছিল বলেই সম্ভবতঃ এই গুহায় ধর্মমতের এই সংমিশ্রণ ঘটেছে।

ইলোরার ১৪নং গুহার শিব-পার্বতীর পাশা খেলা

ইলোরার বিশ্বকর্মা গুহা (১০)

আয়তনের দিক থেকে বা ভাস্কর্য-সৌন্দর্যের দিক থেকে হয়ত এটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে না, কিন্তু তবু এর পরিকল্পনার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যের বিচারে এটিকে ভারতে চৈত্যগুহার আধুনিকতম নিদর্শন বলা যেতে পারে।

গুহার সামনের দিকে একটা প্রশস্ত খোলা উঠান। উঠানের দু'পাশে দেওয়াল খনন করে কক্ষশ্রেণী নির্মাণ করা হয়েছে তিনতলা পর্যন্ত। উপরের তলায় বুদ্ধদেবের বহু মূর্তি রয়েছে, আর নীচের দু'টি তলার কক্ষগুলি বসবাসের জন্য। ভিতরের মূল মন্দির-কক্ষের দু'পাশেই অলিন্দ। ২৮টি অষ্টভুজ স্তম্ভ অলিন্দদ্বয়কে মূল মন্দিরকক্ষ থেকে পৃথক করে রেখেছে।

খিলানাকৃতি ছাদটি কাঠের কড়ি-বরগার ধরণে খনন করা।

গুহার সামনের দিকটা চিরাচরিত ধারার বিপরীত। চিরপরিচিত অশ্বখুরাকৃতি খিলানও এখানে নেই, আর এখানকার ভাস্কর্য-অলংকরণও একটু পৃথক ধরণের।

তিনতলা গুহা

১১নং ও ১২নং গুহা দু'টি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয়। ঠিক এই ধরণের গঠন ভারতে আর কোন গুহার দেখা যায় না। প্রথমটি 'দোতলা' ও

দ্বিতীয়টি 'তিনতল' গুহা নামে পরিচিত।
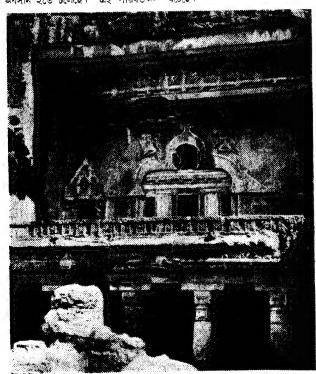
তিনতল গুহামন্দিরটি ইলোরার এক বিস্ময়। এটি একটি বিহার। একটি প্রাসাদোপম ত্রিতল অট্টালিকা একটিমাত্র পাহাড় কেটে কেমন করে নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল তা চিন্তা করলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। সামনে থেকে দেখলে মনে হয় যেন আধুনিক যুগে নির্মিত একটি বাসভবন।

সামনেই একটি প্রশস্ত উঠান। উঠান থেকে কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করলেই প্রথমতলায় আসা যায়। এখানে ৮টি স্তম্ভ দেখা যায়। স্তম্ভগুলির গোড়ার দিকটা চতুষ্কোণ। মাঝখানের স্তম্ভজোড়ার উপর দিকে লতাপাতার সূক্ষ্ম নক্সার কাজ। সামনের স্তম্ভসারির পিছনে ৮টি ক'রে আরও দুসারি স্তম্ভ দেখা যায়। এছাড়া একেবারে পিছনে আরও ৬টি স্তম্ভ, অর্থাৎ সব মিলে মোট ৩০টি স্তম্ভ।

মন্দিরকক্ষে প্রবেশদ্বারের বাঁ দিকে পিছনে একটি সুবৃহৎ কক্ষে অনেক গুলো ভাস্কর্য নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। মাঝখানে আছে বুদ্ধমূর্তি—তার ডানদিকে ও বাঁদিকে পদ্মপাণি ও বজ্রপাণি। প্রথম তলায় মূল মন্দিরে ও আরও বহু স্থানে বহু বুদ্ধমূর্তি নয়নগোচর হয়।

ইলোরায় একটি স্তম্ভগাত্রে কারুকর্ম

দ্বিতলে সামনের দিকে দীর্ঘ উন্মুক্ত বারান্দা। মূল মন্দিরের দ্বারদেশে দুটি সুন্দর দ্বারপালমূর্তি। ভিতরে বুদ্ধের অতিকায় মূর্তি।

ইলোরার কৈলাস মন্দিরে ধ্বজস্তম্ভ

ত্রিতলটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সুবৃহৎ কক্ষটিতে আড়াআড়িভাবে ৮টি করে পাঁচ সারি স্তম্ভ রয়েছে। পিছনে মন্দিরের সামনে আরও দুটি স্তম্ভ নিয়ে এই তলায় স্তম্ভের মোট সংখ্যা ৪২। পাঁচ সারি স্তম্ভ কক্ষটিকে পাঁচটি অলিন্দে বিভক্ত করেছে। প্রতিটি অলিন্দের দু প্রান্তে বৃহৎ বুদ্ধমূর্তি শোভা পাচ্ছে।

মন্দিরের মধ্যে অন্যান্য গুহার মতই ধ্যানাসনে উপবিষ্ট বৃহৎ বুদ্ধমূর্তি।

ইলোরার বৌদ্ধ গুহাগুলির মধ্যে এইটিই সর্বশেষ গুহা। ৭০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে যে এটি নির্মিত হয়নি তা প্রায় একরূপ নিশ্চিত।

'দোতলা' গুহাটিও আসলে একটি ত্রিতল গুহা। একটি তলা দীর্ঘকাল দৃষ্টিপথের বাইরে ছিল বলেই এটি দোতলা নামে পরিচিত ছিল। পরে খনন-কার্যের দ্বারা এর আরও একটি তলা

আবিষ্কৃত হল। এটিও মোটামুটি পূর্বের গুহাটিরই অনুরূপ।

(২) ব্রাহ্মণ্য গুহা

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত গুহাগুলি বৌদ্ধ-পরবর্তী কালের। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে বিরোধ জেগে উঠল। পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে এ সময়ে চালুক্য রাজাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চালুক্য রাজারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চালুক্য রাজাদের পরাজিত ক'রে রাষ্ট্রকূট বা রাঠোর রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী দু' শতাব্দীরও বেশি কাল দাক্ষিণাত্যে এদের প্রতাপ অক্ষুন্ন রইল। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটদের পরাস্ত ক'রে চালুক্যরা পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

ইলোরার সমস্ত বৌদ্ধ গুহা এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ্য গুহাই নির্মিত হয়েছিল এই চালুক্য রাজাদের রাজত্বকালে, অর্থাৎ ৫৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। কতকগুলি ব্রাহ্মণ্য গুহা গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্রকূটদের আমলে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ্য গুহা কৈলাস নির্মিত হয়েছিল রাষ্ট্রকূট বংশের দ্বিতীয় রাজা প্রথম কৃষ্ণের শাসনকালে, ৭৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তিনি ছিলেন গোঁড়া শৈব এবং শিবের একজন প্রবল অনুরক্ত ভক্ত। এ হেন একজন নৃপতি যে কৈলাসের মত একটি মন্দিরের নির্মাণ-কার্যে সহায়তা করবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সম্ভবতঃ এ'র শাসনকালেই কৈলাস মন্দির নির্মিত হয়েছিল। ইলোরার সর্বদক্ষিণে জৈন গুহাগুলি নির্মিত হয়েছিল পরবর্তী চালুক্যদের রাজত্বকালে।

বৌদ্ধরাই যে সর্বপ্রথম পাহাড়ের গুহাকে নিজেদের ধর্মসাধনের উপযুক্ত স্থান বলে নির্বাচন করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই গুহামন্দিরগুলি নির্মাণ করতে গিয়ে তারা নিজস্ব একটা রীতিও যে গড়ে তুলেছিল তাও আমরা দেখেছি অজন্তার আলোচনায়। কিন্তু সপ্তম শতাব্দী নাগাদ বৌদ্ধ ধর্ম যখন বিলুপ্তির মুখে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তখন আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল। তারই একটা প্রকাশ দেখতে পাই ইলোরার ব্রাহ্মণ্য গুহাগুলির মধ্যে। গুহা নির্মাণ করতে গিয়ে তারা বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠিত স্থাপত্যরীতিকেই অনুসরণ করেছিল। এদের গুহানির্মাণ-কার্য চলেছিল সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত। এদের গুহাগুলির মধ্যে কোন কোনটি প্রসারতা এবং অলঙ্করণের ব্যাপকতা ও উৎকর্ষের দিক থেকে বৌদ্ধ গুহাগুলিকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ইলোরায় ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দিরের সংখ্যা ১৬।

ধর্মাচরণ ও পূজার্চনা রীতিতে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তার প্রভাবে এই গুহাগুলির গঠন-রীতিতেও কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। তাই দেখি বৌদ্ধদের মূল গুহাকক্ষের দু'পাশে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলি ব্রাহ্মণ্য গুহায় অনুপস্থিত। এখানে দেওয়ালগুলির ভাস্কর্যে পৌরাণিক উপাখ্যান বা উপাখ্যানের অংশবিশেষ রূপায়িত। শৈব মন্দিরগুলির বিগ্রহকে ঘিরে প্রদক্ষিণ পথও দেখা যায়।

কৈলাস মন্দির

ইলোরার ১৬নং গুহাটি কৈলাস মন্দির—ইলোরার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। তাই প্রথমেই আমরা এর আলোচনা করব। ইলোরার কৈলাস মন্দিরের মত বিস্ময়কর সৃষ্টি ভারতে নেই বললেই চলে। মন্দিরটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটিমাত্র পাহাড় কেটে প্রয়োজনীয় সব কিছু ব্যবস্থা সমেত এরূপ সুবিশাল মন্দির-নির্মাণের প্রয়াস নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক। প্রায় একশ' ফুট উঁচু এই মন্দিরের ভিতরে-বাইরে ভাস্কর্যের অতুল বৈভব। চারিদিকে ছোটখাটো কয়েকটি দেউল, ভাস্কর্যখচিত জয়স্তম্ভ, অতিকায় হস্তী, অলিন্দ, তোরণ, অসংখ্য নিখুঁত দেব-দেবী মূর্তি সব কিছু নিয়ে কৈলাস মন্দির ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের এক জমকালো নিদর্শন। কৈলাস মন্দিরের পরিকল্পনার এই বিশালত্ব ও নিখুঁত রূপায়ণ দেখে ফার্গুসন মন্তব্য করেছিলেন : "The Hindu artists conceived like giants and executed like jewellers".

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, স্থাপত্য-রীতির দিক থেকে কৈলাস সম্পূর্ণ বৌদ্ধপ্রভাবমুক্ত। ইলোরার অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য গুহাগুলি বৌদ্ধ বিহার-গুলিরই প্রায় অনুকরণ বলা যেতে পারে। শ্রমণদের বিশ্রাম-প্রকোষ্ঠগুলির অনুপস্থিতি ও দেওয়াল-ভাস্কর্যে পুরাণ গাথার রূপায়ণ ব্যতিরেকে বৌদ্ধ গুহার সঙ্গে এগুলির পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু কৈলাস নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কৈলাসের গঠন-পরিকল্পনা ও নির্মাণ-কৌশল সম্পূর্ণ পৃথক। প্রকৃত অর্থে কৈলাসকে গুহা-মন্দির বলা যায় না, কৈলাস আসলে পর্বতখোদিত মন্দির।

অন্যান্য গুহামন্দির যেমন পাহাড়ের সামনের দিক থেকে খনন ক'রে তৈরি করা হয়েছিল, কৈলাসের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এখানে পাহাড়ের ওপর থেকে তার মধ্যে এমনভাবে তিনদিক থেকে তিনটি বিশাল পরিখা খনন করা হয়েছিল যাতে ঠিক মাঝখান-টিতে পাহাড়ের একটা অংশ সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে। পরে পাহাড়ের এই অংশটির ভিতরে ও বাইরে খনন করে কৈলাস মন্দির নির্মিত হয়।

কৈলাস মন্দির দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রশস্ত চত্বরের ওপর। সামনের দিকে একটি প্রবেশদ্বার আছে। প্রবেশদ্বারের দু'পাশেই কয়েকটি কক্ষ। প্রবেশদ্বার অতিক্রম করেই এক বিশাল পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্তি দৃষ্টিপথে আসে। এখানে পথ দ্বিধাবিভক্ত। উত্তরে ও দক্ষিণে দু'টি অতিকায় হস্তীমূর্তি। চত্বরে ৪৫ ফুট উঁচু একটি ধ্বজস্তম্ভ দেখা যায়। ধ্বজস্তম্ভের আগাগোড়া অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য।

প্রবেশদ্বারের একটু পিছনে নন্দী-মণ্ডপ। তারও পিছনে মূল মন্দির। মণ্ডপের সঙ্গে মন্দিরটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত।

মূল মন্দিরটি পূর্ব-পশ্চিমে ১৬৪ ফুট দীর্ঘ এবং এর যে অংশটি সবচেয়ে প্রশস্ত তার পরিমাপ ১০৯ ফুট। মন্দিরের উচ্চতা ৯৬ ফুট। বাইরে কার্নিসের ধারে হস্তী, শার্দূল ও অন্যান্য নানা পৌরাণিক জীবজন্তুর মূর্তি। প্রাণীগুলি নানা ভঙ্গিতে রূপায়িত—কোথাও আহাররত, কোথাও বা যুদ্ধরত।

মন্দির ও মণ্ডপের সংযোগ-সেতুর নীচে দু'টি বৃহৎ ভাস্কর্য-নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়—একটি কালভৈরব-রূপী শিব, অপরটি মহাযোগীরূপী শিব। সেতুর দু' পাশেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে মূল মন্দিরের বৃহৎ কক্ষটিতে আসা যায়। সিঁড়ি বাইরের দিকে একটি

দেওয়ালে রামায়ণের কাহিনী, ও অপরটিতে মহাভারতের কাহিনী প্রস্তর-বক্ষে বিধৃত হয়ে আছে।

এইখানেই একদিকে রাবণ ও কৈলাসের বিখ্যাত ভাস্কর্যটি দেখা যায়। কৈলাসকে স্থানচ্যুত করার বাসনায় রাবণ নীচে থেকে কৈলাসকে দু'হাত দিয়ে আন্দোলিত করছেন। এদিকে ভীতা-সন্ত্রস্তা পার্বতী শিবকে জড়িয়ে ধরেছেন। এই ভাস্কর্যটি আরও অনেক মন্দিরেই দেখা যায়। কাহিনীটি পুরাণে যা পাওয়া যায় তা এইরকম : ব্রহ্মার বরে রাবণ দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতির অবধ্য হলেন। এই সময় একবার কৈলাসের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দর্পী রাবণের পুষ্পক রথের গতি রুদ্ধ হয়। শিবের অনুচর নন্দী জানায় যে, এ জায়গাটি সকলের ব্যবহারের জন্য নয়, কারণ এটি হর-পার্বতীর আবাস। ক্রুদ্ধ রাবণ তখন বাহুবলে কৈলাসকে উত্তোলন করতে থাকেন। কৈলাস আন্দোলিত হতে থাকে। শিব তখন পদাঙ্গুষ্ঠের চাপে রাবণকে পিষ্ট করেন। পরে অবশ্য মহাদেবের স্তব করে রাবণ মুক্ত হন।

কৈলাস মন্দিরের মূল কক্ষটিতে ১৬টি স্তম্ভ আছে। কিন্তু বৌদ্ধ গুহা-মন্দিরের স্তম্ভের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। বৌদ্ধ গুহার স্তম্ভগুলি এমন-ভাবে সাজানো যাতে মাঝখানে থাকে প্রশস্ত স্থান শ্রমণদের মিলিত হওয়ার জন্য এবং দু'পাশে থাকে অলিন্দ। কিন্তু কৈলাসে সমস্ত কক্ষটি জুড়ে প্রায় সমানভাবে ছড়িয়ে আছে স্তম্ভগুলি এবং এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছাদটিকে ধারণ করে থাকা। এই কক্ষের মধ্যে দিয়ে মন্দিরকক্ষে প্রবেশ করা যায়। কক্ষটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৫ ফুট করে।

কৈলাস মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দিকেই এত বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির আছে যা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত।

রাজবংশের সর্বপ্রকার সহায়তা পেয়ে থাকলেও সে যুগের সীমাবদ্ধ সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করলে কিভাবে এরূপ এক বিশাল ও ঐশ্বর্যময় মন্দির-রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছিল তা কল্পনায়ও আনা যায় না। কৈলাস মন্দির ভারতে পাহাড় কেটে তৈরি মন্দির-স্থাপত্যের একক দৃষ্টান্ত। আজ থেকে প্রায় দেড়শ' বছর আগে লণ্ডনের একটি অভিজাত সান্ধ্য পত্রিকায় জনৈক মুগ্ধ সমালোচক কৈলাস মন্দির সম্পর্কে যা লিখে-ছিলেন তা থেকে দু'-একটি পংক্তি উধৃত করে আমরা কৈলাস প্রসঙ্গ শেষ করব। তিনি লিখেছিলেন : "The building itself is indeed the first in the kingdom. The architect who conceived and the proprietor who consented to execute so extensive a design, must have had a mind of great comprehension, great imagination, and great vigour".

অন্য ব্রাহ্মণ্য গুহাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু' একটির কিছু পরিচয় এখানে দেওয়ার চেষ্টা করব।

১৪নং গুহাটির সামনে ৪টি স্তম্ভ, গুহাকক্ষের মধ্যে ১২টি। স্তম্ভগুলির ভাস্কর্যে প্রচুর অলঙ্করণ। গুহাকক্ষ-সংলগ্ন মন্দিরে প্রশস্ত প্রদক্ষিণপথ রয়েছে। দেওয়ালে নানা পৌরাণিক কাহিনী উৎকীর্ণ। একদিকের দেওয়ালে শিব-পার্বতীর পাশা খেলা, শিবের তাণ্ডব নৃত্য, রাবণ কর্তৃক কৈলাস হরণের চেষ্টা, শিবের ভৈরবমূর্তি খোদাই করা, অন্যদিকের দেওয়ালে বিষ্ণু, বরাহ প্রভৃতি মূর্তি শিল্প-প্রেরণার উৎস।

দশাবতার গুহা

১৫নং গুহাটির নাম দশাবতার গুহা। গুহাটি দ্বিতল। প্রথম তলার দেওয়ালে গণপতি, সূর্য, বিষ্ণু, পার্বতী প্রভৃতি মূর্তি খোদাই করা।

উপরের তলায় উত্তর দিকটিতে শৈব স্থাপত্যের বহু নিদর্শন রয়েছে। দরজায় প্রথমেই ভৈরব বা মহাদেবের রুদ্রমূর্তি। দ্বিতীয় ভাস্কর্যটি শিবের তাণ্ডব নৃত্য। তৃতীয়টি অসম্পূর্ণ। চতুর্থটিতে দেখি শিব-পার্বতীর পাশা খেলা। পঞ্চমটি শিব-পার্বতীর বিবাহ-দৃশ্য; ব্রহ্মা পুরোহিতের ভূমিকায় সামনে বসে, আর চারিদিকে অন্যান্য দেবদেবী বিবাহবাসর সরগরম করে তুলেছেন। ষষ্ঠটিতে রাবণ কর্তৃক কৈলাস উত্তোলন। মন্দিরকক্ষের বাঁ দিকের শেষ প্রান্তে বিশাল গণপতি মূর্তি। মন্দিরের বাঁ দিকে পিছনের দেওয়ালে পদ্মাসনা পার্বতী মূর্তি।

রামেশ্বর গুহা

২১নং রামেশ্বর গুহাটি অতি বিশাল চিত্তাকর্ষক শৈবমন্দির। মন্দিরের দরজার চারপাশ সূক্ষ্ম ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ। গুহার সামনেই একটি উঁচু বেদীর ওপর শিবের অনুচর নন্দীর বিশাল মূর্তি। গুহার বাইরে বাঁদিকে মকরারূঢ়া গঙ্গা, ডানদিকে যমুনা।

গুহার বহির্দৃশ্য অতি সুন্দর। স্তম্ভগুলির গঠনসৌকর্য নয়নবিমোহন। স্তম্ভের ব্র্যাকেটে রয়েছে নারীমূর্তি, তাদের মাথার ওপরদিকে লতাপাতার নক্সা, পায়ের নীচে পদ্ম।

গুহাকক্ষে সামনের দিকে একটি বিরাট প্যানেলে হর-পার্বতীর বিবাহ-দৃশ্য বিস্ময়োদ্রেক করে।

সম্ভবতঃ ৬৪০ থেকে ৬৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুহাটি নির্মিত হয়ে থাকবে।

(৩) জৈন গুহা

বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দিরের মত জৈন গুহামন্দিরগুলির প্রাচীনত্ব খুব বেশি নয়। ভারতে জৈনগুহামন্দিরের সংখ্যাও খুব বেশি নয় এবং যা আছে তা খুব বেশি উল্লেখযোগ্য নয়। জৈনদের বৃহৎ ও আকর্ষণীয় গুহামন্দিরের সন্ধান যেটুকু পাওয়া গেছে তা এই ইলোরাতেই।

ইলোরাতেও জৈনগুহার সংখ্যা বেশি নয়, মাত্র পাঁচটি। কিন্তু এদের মধ্যে দু' একটি বিরাটত্বের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এগুলি নির্মিত হয়েছিল। জৈনগুহা-গুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল ইন্দ্রসভা ও জগন্নাথসভা।

অপর একটি গুহা 'ছোট কৈলাস' বস্তুতঃ কৈলাস মন্দিরের অতি ক্ষুদ্র একটি সংস্করণ। মাত্র ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ সরকারের আদেশে আংশিক খননকার্যের ফলে এই গুহামন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়। তার পূর্ব পর্যন্ত এটি লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল। ছোট কৈলাস প্রকৃতপক্ষে কৈলাস মন্দিরের অনুকরণ, তবে অনেক ক্ষুদ্র আকারে। মণ্ডপটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩৬ ফুট করে। কৈলাসের মত এতেও ১৬টি স্তম্ভ আছে।

ইন্দ্রসভার প্রবেশদ্বারে হস্তীমূর্তি, এবং ৩০ ফুট উচ্চ জয়স্তম্ভ কৈলাস মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পাশেই একটি অলঙ্কারমণ্ডিত মন্দির। মন্দিরের মধ্যে চতুর্বিংশ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্তি। অপর একটি কক্ষে ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি।

ইন্দ্রসভার উপরের তলায় একটি বারান্দা ও একটি বৃহৎ কক্ষ। পার্শ্বে

ব্রাউনের মতে শিল্পকলার পূর্ণতা ও সংগঠনের পারিপাট্যের দিক থেকে ইলোরার আর কোন গুহামন্দির ইন্দ্রসভার দ্বিতীয় তলের মত এতখানি উৎকর্ষ লাভ করেনি।

জগন্নাথসভাতেও বিভিন্ন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। গুহাকক্ষটি ১৪টি স্তম্ভসমন্বিত।

জৈন গুহাগুলির ভাস্কর্যের একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং সে বৈশিষ্ট্য ইন্দ্রসভা ও. জগন্নাথসভায় পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এখানকার মূর্তিগুলি সাধারণতঃ বিশাল, কিন্তু স্তম্ভ ও দেওয়াল-গাত্রের ভাস্কর্যে অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণ হাতের কারিকুরি লক্ষ্য করা যায়। এই শিল্পকর্মের মধ্যে এমন একটা কোমলতার স্পর্শ আছে, যা আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দির ও অন্যান্য জৈন মন্দিরে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গুহার ভাস্কর্যে এই কোমল-মধুর স্পর্শ পাই না।

সম্প্রদায় হিসেবে জৈনরা হয়ত বৌদ্ধদের চেয়েও প্রাচীন। কিন্তু প্রাচীন জৈন গুহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না এই কারণে যে গুহামন্দিরশিল্পের দিকে জৈনদের ঝোঁক খুব বেশি ছিল না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দিরগুলির সৌকর্যে আকৃষ্ট হয়ে ও তাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েই জৈনরা গুহামন্দির নির্মাণ করতে এগিয়ে এসেছিল।

ভারতীয় মন্দিরশিল্পে জৈনদের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। একাদশ-দ্বাদশ শতকে আবু পাহাড়, গিরনার ও পালিতানায় পর্বতশীর্ষে মহান মন্দির গড়ে তুলে জৈনরা তাদের সৌন্দর্যবোধ, শিল্পনৈপুণ্য ও কঠোর সাধনার যে অম্লান স্বাক্ষর রেখে গেছে, তার কথা ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কিন্তু এগুলির কোনটিই তো গুহা-মন্দির নয়। গুহামন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব কোন ধ্যান-ধারণা ছিল না। তাই গুহামন্দির নির্মাণ করতে গিয়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য রীতি তাদের ধার করে নিতে হয়েছিল হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছ থেকে।

ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পকে সমৃদ্ধতর করে তুলে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে জৈন গুহা-মন্দির যে বিশেষ কোন অবদান আছে এমন কথা অসঙ্কোচে বলা যায় না। তথাপি ইন্দ্রসভা ও জগন্নাথসভাকে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের দরবারে একেবারে অপাংক্তেয় করে রাখা যায় না। গুহা-মন্দির-শিল্পের ইতিহাসে বিশেষ স্থানলাভের যোগ্যতা এদের আছে।

একজন পুরুষ চাই, যাকে জানি

রজত সেন

এম-এ পাশ করার পর সুলতা বলল, 'আমার ত কিছুই হল না, তুমি ত তবু একটা সেকেন্ড ক্লাশ পেয়েছো, থার্ড ক্লাশ এম-এর থার্ড ক্লাশ স্কুলে একটা থার্ড মাস্টারের চাকরি জুটবে।'

'চাকরি করার তোমার দরকারটা কিসের? তোমার বাবার তিনখানা বাড়ির একখানা ত তোমার জুটবেই! তুমিই ত একদিন গল্প করছিলে—এই তোমার বাবার ইচ্ছা!'

'বাস! তাহলেই সব চুকে গেল আর কি! একটা সুস্থ জোয়ান লোক হাত-খরচের জন্য বাবার কাছে ধর্ণা দিই; কিন্তু সুধী, তুমি তোমার ক্যারিয়ারটা নিজের হাতে মাটি করলে, তোমার মত লোকের কি সেকেন্ড ক্লাশ পাওয়া উচিত হয়েছে?'

'পরীক্ষকদের এই আবেদনটা তুমি করে দেখলে পারতে, লতা!'

'রাখ, বাজে কথা! দিনে-রাতে পাগলের মত টুশানী করে বেড়িয়েছো, মা কি কারুর নেই নাকি, কিন্তু কারুকে এমন বাড়াবাড়ি করতে দেখিনি। তুমি ত নিজেই বলেছ তোমার এই অমানুষিক পরিশ্রম দেখে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন।'

'লতা, তোমায় একটা কথা বলি : মা যে আমাকে এই আমি করবার জন্য কি করেছেন, সে তুমি ভাবতে পার না, তার তুলনায়—'

'ভাবতে পারি, খুব ভাবতে পারি, মা যা করেছেন ছেলের জন্যই ত করেছেন।'

'আমিও মা-র জন্যই করেছি, আর কারুর জন্যই নয়।'

সন্ধ্যার পর গঙ্গার ধারে একটা বেঞ্চের ওপর বসেছিল তারা; ফাল্গুনের শেষ, স্ট্র্যান্ড রোডে গাছের শাখায় বাতাসের লুকোচুরি, গঙ্গার জলে আলো কাঁপছে!

'অনেক কিছুই তুমি করতে পারতে, সুধী, অনেক বড় হতে পারতে, তোমার মেধা আর—'

'থামলে কেন? অনেক বীরত্ব তুমি আমার কাছে আশা করেছিলে, এই ত? রেক্সিন-মোড়া টেবিলে কাজ করতে করতে টাই-টা আলগা করে দিলাম, (শীতের দিন) দু'পাশে চারটে টেলি-ফোন, রাস্তায় একশ হর্স-পাওয়ার চকচকে গাড়ির পাশে লিভেরিড্ সোফার দাঁড়িয়ে আছে—'

'চুপ কর!'

সুধীন হাসল। নীচে অস্পষ্ট জলোচ্ছ্বাস। দূরে জাহাজের আলো জ্বলছে! রাস্তার ওপাশে আরও গাড়ি থামল।

'চল উঠি।' বলল সুধীন।

সুলতা দাঁড়াল; একটু দ্বিধা করে সুধীনও দাঁড়িয়ে পড়ল।

রেল-লাইন পার হয়ে ওরা রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সুলতা আঙুল দিয়ে একটা রিক্সা দেখিয়ে দিল, 'চল রিক্সাটা নেয়া যাক, আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না! চৌরঙ্গীতে গিয়ে বাস ধরা যাবে, তোমার ত আবার সাড়ে সাতটায় পড়ানো আছে!'

'তা আছে, তবে ভেবেছিলাম আজ ফাঁকি দেব!'

'এখন ভাবছ যে-জন্য ফাঁকি দেবে, সেটা উপযুক্ত কারণ নয়। আজ আর পড়াতে যায় না, চল, তোমার মা-কে দেখে আসি, গত এক বছর ধরে তোমার সময় হচ্ছে না, কিংবা হয়ত ইচ্ছে করেই আমায় ঠেকিয়ে রেখেছ!'

'না, ঠেকিয়ে রাখিনি, চল!'

রিক্সায় উঠে বসল ওরা। 'চৌরঙ্গী!'

সুধীন তাকাল : ডান-দিকে একটু দূরেই অন্ধকার কেল্লা; বাঁ-দিকে জলের উপর আলো কাঁপছে! 'আর একটু থাকলে হত।'

'থাকতে পারলে কৈ? দেখ, তোমার মা আবার কিছু ভাববেন না ত?'

'না, কি ভাববে? তোমার কথা ত মা-কে বলেছি।'

'কতটুকু বলেছ?'

'কতটুকু আবার? এক সঙ্গে পড়ি, আলাপ আছে, বড়লোকের মেয়ে দেখতে-শুনতে ভাল!'

'ঘটকের মত কথাবার্তা বলছ, দেখছি! কিন্তু সত্যিই কি কিছু ঘটাবার মতলব আছে তোমার?' সুলতা একটা হাত হাঁটুর উপর থেকে তুলে রিক্সার পিঠে রাখল, বাহু স্পর্শ করে রইল সুধীনের পিঠ; সুধীন অনুভব করল কাঁধটা সরিয়ে নেবার সোয়া ইঞ্চিও জায়গা নেই, তাই সে চলন্ত রিক্সা থেকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পথের দিকে। 'কি, হল কি তোমার?' সুলতা আবার জিজ্ঞেস করল।

রাস্তার দিকে তাকিয়েও সুধীন বুঝতে পারল একজোড়া ব্যগ্র চোখ তার মুখের উপর স্থির হয়ে রয়েছে। 'কি আবার হবে?' বলল সুধীন; আর একখানি ব্যগ্র, উৎসুক আর ক্লান্ত মুখ ভেসে উঠল তার চোখের উপর। তার মা।

'আমি জানি কোথায় তোমার বাধা!'

জানে সুলতা কোথায় বাধা, কি কঠিন বাধা!

সুলতার গলার ধারটা সুধীনের কান এড়ালো না।

কেরোসিনের বদলে ইলেকট্রিক লাইট, টালির বদলে কনক্রীটের ছাদ, বাঁশের বেড়ার বদলে কোমর-উঁচু সীমানা-দেওয়াল। 'এসো, এই আমার আস্তানা', কাঠের গেটটা খুলে ধরল সুধীন; ছোট একটুখানি বাগান, অস্পষ্ট আলোয় কিছু ফুল দেখা যাচ্ছে! বাগান পেরিয়ে চওড়া বারান্দায় উঠে এল ওরা; রান্নার জায়গাটা ঘর করা হয়েছে, ছোট ঘর; তারই পাশে পাকা স্নানের ঘর। সুলতা তাকাল চার-পাশে; হয়ত বুঝতে পারল : সুধীন পরীক্ষায় যোগ্যতা দেখাতে পারেনি, কিন্তু মা-র কাছে নিজেকে যোগ্য প্রতিপন্ন করেছে! অস্পষ্ট হাসির আভায় সুলতার পাতলা ঠোঁট বাঁকা হয়ে উঠল। রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে এল একটি বর্ষীয়সী রমণী; ওদের দেখে মাথায় আঁচল তুলে দিল। 'বামুনদি, দু'পেয়ালা খুব ভালো করে চা করুন, আর—' সুলতার দিকে তাকিয়ে, 'কি খাবে? বেগুনী খাবে? বামুনদির চমৎকার হাত। মা, কোথায়?'

ঘর থেকে ক্লান্ত, সরু গলায় স্বর্ণলতা বলল, 'এই যে, আমি ঘরে, একটু শুয়ে আছি!'

'এসো, লতা, মা-কে দেখবে এসো!'

নিচু হয়ে জুতোর স্ট্র্যাপ খুলল সুলতা।

অন্ধকারেই শুয়ে ছিল স্বর্ণলতা। সুধীন বাতি জ্বালাল, তক্তপোষের উপর সাদা বিছানা; সাদা থান জড়ানো প্রায় সাদা একটি মানুষ শুয়ে আছে; এলোমেলো হাওয়ায় শুকনো চুল ওঠানামা করছিল। 'মা, এমন অসময়ে শুয়ে আছ? আবার কি শরীর খারাপ হল? এই—সুলতা দত্ত, যার কথা তোমায় অনেক-দিন বলেছি!'

সুলতা কাছে এগিয়ে আসতে স্বর্ণলতা উঠে বসল। 'আপনি উঠলেন কেন?' সুলতা তাঁর পা স্পর্শ করে মাথায় হাত ঠেকাল!

'থাক থাক, মা, বোসো! হ্যাঁ, তোমার কথা বলেছে সুধী, তুমিও ত এম-এ পাশ করলে! বোসো!' হাত দিয়ে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিল স্বর্ণলতা।

সুলতা বসল পাশে; সুধীন বসল কাছেই একটা মোড়ার উপর. 'মা, আমি বামুনদি-কে বলেছি চায়ের কথা, আর বেগুনী ভাজতে!'

'বেগুনী?' স্বর্ণলতা প্রশ্ন করল না, যেন জবাবদিহি, 'সে কি?' বেগুনীর হৃদ্যতাকে বরদাস্ত করতে পারল না সে, 'না, তা হয় না, এই প্রথম এল আমাদের বাড়ি, ছিছি! তুই যা খাবারের—'

সুধীন হাতের ভঙ্গি করল, হাসল, 'মিষ্টি ও একেবারেই পছন্দ করে না, মা, তারপর—এ-পাড়ার মিষ্টি!'

হাসির যে আভাটা লুকোচুরি করছিল স্বর্ণলতার পাণ্ডুর মুখে, এক নিমেষে সেটা যেন তাড়িয়ে দিল কেউ, আরও করুণ, আরও ক্লান্ত দেখাতে লাগল সে-মুখ।

আর—সুলতার নিঃশ্বাসটা একটু যেন ভারি হয়ে উঠল, একটু যেন উজ্জ্বল তার চোখ; 'দোকানের তেলে-ভাজাই আমরা কত খাই, আর এ ত বাড়ির তৈরী!' আমরা শব্দটার উপর অনাবশ্যক জোর দিল সুলতা।

স্বর্ণলতা সুধীনের চোখ অনুসরণ করে সুলতাকে দেখতে লাগল; সুলতা

আরও একটু তেরচা হয়ে বসল, মুখের অর্ধেকটা যেন স্বর্ণলতার চোখে পড়ে; ফ্রেমে-বাঁধানো সেই ছবি, যে-ছবিটার অকুণ্ঠ তারিফ করেছিল সুধীন। চিবুকটা ততটুকুই তুলল সে, যতটুকু স্টুডিওর ফটোগ্রাফার তাকে তুলতে বলেছিল।

যেন অকস্মাৎই শোনালো স্বর্ণলতার ক্ষীণ গলা, 'তুই ত রাত্রে চা খাস না, সুধী, বলেছিলি সন্ধ্যের পর চা খেলে তোর ঘুম হয় না!'

আবার হাসল সুধীন উঁচু-গলায়, 'সে কি আজকের কথা, মা? বরং সন্ধ্যার দিকে এক পেয়ালা চা না খেলে মনে হয় দিনটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল!'

'চা খাওয়া কি ভাল? এমন চায়ের অভ্যাস কবে থেকে হল তোর, আমি ত কিছুই জানি না।'

মা-র গলার শব্দে ব্যতিক্রম শুনল সুধীন, তাই সে হাসিমুখে বলল, 'জান, মা, আমায় চা ধরিয়েছে কে? ঐ যে! তোমার পাশে বসে আছে!'

সুলতা তাকাল: স্বর্ণলতার সংকীর্ণ ঠোঁটের অতি-সূক্ষ্ম কাঁপুনীটা তার চোখ এড়াল না; আরও উজ্জ্বল হল তার চোখ: বাঁ-হাতের মুঠো থেকে রুমালটা সে মেলে ধরল মুখের কাছে, বাতাসে ভাসতে লাগল ল্যাভেন্ডারের গন্ধ।

কথা, যে-কোনো কথার আড়ালে আশ্রয় খুঁজতে লাগল স্বর্ণলতা। 'তোমরা তিন বোন শুনেছি, তোমার মা-বাবার মনে কষ্ট আছে নিশ্চয়, একটি ভাই নেই তোমাদের!'

'কষ্ট?' সুলতা হাসল: 'মা ত অনেক দিনই গত হয়েছেন, 'আর বাবা ত রিটায়ার করবার পর থেকে পড়াশুনো নিয়েই দিন কাটান, যে-টুকু ফাঁক আছে, তিন বোনেই ভরিয়ে রাখি!'

'তোমার দিদিরা ত কাজকর্ম করে শুনেছি!'

'হ্যাঁ, বড়দি একটা স্কুলের হেড-মিসট্রেস, মেঝদি অফিসে কাজ করে।'

'বিয়ে করল না কেউ? তা ভাল, মেয়েরা ত আজকাল কাজকর্ম নিয়েই আছে, স্বাধীন জীবন, বেশ—'

'স্বাধীন কেউ নয়, মাসীমা, আমার মনে হয় স্বামী-সংসার নিয়ে যে-টুকু পরাধীনতা, তার চাইতে ঢের বেশি পরাধীনতা পরের চাকরি করা!' সুধীনের দিকে তাকাল সুলতা, গলায় অনেকখানি হৃদ্যতা এনে বলল, 'তুমি কি বল?'

মা-কেই বলল সে, 'এ সব ব্যাপারে কোনো শেষ উত্তর নেই মা, স্বাধীনতা পরাধীনতা এ-দুটোই ভিন্ন ভিন্ন লোকের মেজাজ আর পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে: দেখে ত মনে হয় সুলতার দিদিরা ভালই আছেন, চোখেমুখে কোনো অনুযোগ বা হতাশা কোনো দিন দেখতে পেয়েছি বলে ত মনে হয় না।'

'বাইরে থেকে দু-চার দিনের পোষাকী আলাপে', ডান পায়ের উরুটা বিছানার উপর তুলে একটু ছড়িয়ে বসল সুলতা, 'মানুষের মনের কথা কতটুকু বোঝা যায়?' উদ্ধত এক ভঙ্গিতে গলাটা উঁচু করল সে।

সুধীন দাঁড়াল, 'আমি দেখি, চায়ের কত দেরি!' হাসিমুখেই ঘরের বাইরে এল সে, রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াবার আগেই হাসির চিহ্ন পর্যন্ত রইল না।

স্বর্ণলতা এগিয়ে এল সুলতার গায়ের কাছে, সরু আঙুল দিয়ে ওর কব্জি চেপে ধরল, আর কাঁপতে লাগল—বাতাসের ঝাপটায় শুকনো পাতা যেমন কাঁপতে থাকে!

উত্তপ্ত, অসুস্থ মনে হল এই স্পর্শ! তবু এতটুকু নড়ল না সুলতা এতটুকু সরল না, মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'বলুন!' সুলতা জানে। ওর চামড়ায় বসে গেল স্বর্ণলতার নখ।

তখনও কাঁপছে স্বর্ণলতার রুগ্ন শরীর। আর ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ, সুলতার কানের কাছে গরম নিঃশ্বাসের স্পর্শ!

'বলুন!'

দরজার বাইরে শব্দ; স্বর্ণলতা সরে বসল।

দু'হাতে দুটো প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকল সুধীন; 'নাও, দেখো, জিভ পুড়ে যাবে।' হাতটা ধুয়ে নেবে নাকি? বারান্দায় জল আছে।'

'না, হাত ধোবার দরকার নেই।'

দুজনের হাতে প্লেট, সুধীন বসল মোড়ার উপর। 'ওখানে বসে খেতে তোমার আপত্তি নেই ত!'

স্বর্ণলতা বলল, 'না, আপত্তি কিসের?'

'ও হো। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম!' সুলতা মাটিতেই বসে পড়ল প্রায় সুধীনের মোড়া ঘেঁসে।

'আচ্ছা! এসব তুই কি খাওয়াচ্ছিস বল ত, সুধী!' স্বর্ণলতার গলার শব্দটা নিতান্তই অস্বাভাবিক শোনালো। রাগ না বিরক্তি না অন্য কিছু।

সুলতার একটা হাঁটু সুধীনের পায়ের কাছে, বেগুনী কামড়ালো সে ঠোঁট বাঁচিয়ে, মুখের পেশীগুলি যতটা নাড়ানো দরকার, তার চাইতে অনেক বেশি ভঙ্গি করতে লাগল সে মুখের আর মাথার। সুধীন একটা চোরা-চাউনি ছুঁড়ল মা-র দিকে, সুলতার হাঁটুর দিকে তাকিয়ে খাওয়া শুরু করল সে।

চায়ের পর এক সময়ে বলল সুলতা, 'মাসীমা, গেলাম আজ! ভাল হয়ে যাবেন, ভাববেন না কিছু।'

কনুইতে ভর দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল স্বর্ণলতা, সুধীন বলল, 'না, মা, তুমি
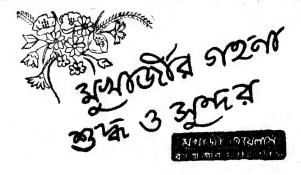
শুয়ে থাক, আমি ওকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।'

রাস্তায় বলল সুলতা, 'মা খুবই অসুস্থ মনে হল, ভালো করে চিকিৎসা করানো দরকার, আর দেরি করো না, কালকেই ডাক্তার দেখাও!'

বাস স্ট্যান্ডে : 'তাহলে মাস্টারিটাই নেবে ঠিক করলে?' অল্প আলোয় সুধীন সুলতার চোখ খুঁজল।

'আপাততঃ ওর চাইতে মনের মত আর কি পাওয়া যাচ্ছে? শূন্যতা আঁকড়ে ত বসে থাকতে পারি না!'

'শূন্যতা কেন?'

'তা ছাড়া আর কি!'

স্বর্ণলতাকে দেখে বারান্দায় এল প্রৌঢ় ডাক্তার; সুধীনের হাতে ডাক্তারের ব্যাগ; 'দুটো ফুসফুসই গেছে, ইমেডিয়েটলী এক্স-রে করা উচিত, তা ছাড়া বাড়িতে এ-রোগের চিকিৎসা হবে না, যাদবপুর, কাঁচড়াপাড়া—যদি সুবিধা থাকে ত সিমলা কিংবা মদনাপল্লী, না : এক্স-রে পরে হবে, আগে হাসপাতাল, লাউ-কুমড়োর বাগান কি আপনার তৈরী? ম্যারেড?'

সুধীন ঘাড় নাড়ল।

'কি করেন?'

'আপাততঃ বেকার।'

ডাক্তারের মুখ দেখা গেল না।

ড্রাইভার দরজা খুলে দিল; সুধীন ব্যাগ রাখল ডাক্তারের গাড়িতে আর ষোলটা টাকা রাখল ডাক্তারের হাতে।

'থ্যাংকস্।'

এঞ্জিনের শব্দ! কিছু ধুলো উড়ল।

সুধীন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কাঠের ভাঙ্গা গেটটার কাছে। ঐ তার এ-মাসের টাকা; জানে, মা-র কাছেও আর কিছু নেই!

দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখল মা-র চোখ বন্ধ, বুকের ওঠানামাটা মনে হল দ্রুত চলছে! স্নান করার সময় নেই, নিঃশব্দে আহার শেষ করে রাস্তায় এল সে; না, ওখানে মা-র পাশে বসে টাকার ভাবনা ভাবতে পারবে না সে!

বড়-রাস্তায় আসতে দু'তিন মিনিট লাগল তার, ফুটপাতে গাছতলায় দাঁড়াল সে। রোদ খাঁ-খাঁ করছে। কয়েকটি বাস আর ট্রাম ছাড়ল সে, আধ-ময়লা রুমাল দিয়ে কপালটা মুছল, তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। একটা চায়ের দোকানে ঢুকে এক পেয়ালা চায়ের কথা বলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল; দুটি ক্লান্ত লোক ভিন্ন চেয়ারে দু'-পেয়ালা চা নিয়ে বসেছিল; আপাততঃ চা-পান ছাড়া আর সবই চিন্তার কুয়াসা। রাস্তার দিকে সুধীনের চোখ, মগজে পরিচিত অনেক মুখের মিছিল, কিন্তু মনের কথা জানাবার মত একটি লোকেরও সন্ধান পেল না সে।

চা শেষ হবার পরও অনেকক্ষণ বসে রইল সে; তারপর এক সময় দাম মিটিয়ে রাস্তায় এল; প্রথম বাসটাই ধরল, সহযাত্রীর হাত-ঘড়িতে দেখল পৌনে চার। জগুবাবুর বাজার; পদ্মপুকুর রোড, বকুল বাগান; রাস্তায় জল ছড়ানো হচ্ছে, চটিজোড়া বোধ হয় আর বাঁচানো গেল না; পেট্রোল স্টেশান, একটা ফুল শিরিষের গাছ; তারপর পাশাপাশি একই আকার একই রঙের তিনখানি দোতলা বাড়ি; সুধীন থামল; দেওয়ালে-লাগানো চিঠির বাক্স, ইংরেজীতে লেখা : অবনী-প্রসাদ দত্ত, নমিতা দত্ত, বিনতা দত্ত, সুলতা দত্ত। বন্ধ দরজার পালিশ-করা পিতলের কড়াটা বার-কয়েক নাড়ল সে; লোহার কড়ার মত শব্দটা তেমন জোরালো নয়, তবু দরজা খুলতে দেরি হল না; খানিকটা ধোঁয়া তার নাকে ঢুকল।

মাথার আঁচলটা কপালের দিকে টানতে গিয়ে তরুণী-কিংবা-প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি পান-খাওয়া দাঁত বিস্তার করে হাসল; 'আপনি? বসুন, আমি ছোড়দিদিমণিকে ডেকে আনছি।' যাবার আগে দাঁত বন্ধ হল বটে, কিন্তু ষড়যন্ত্রের চটুল এক টুকরো হাসি রেখে যেতে ভুলল না সে। দুটো কাঁচের আলমিরায় বাঁধানো বইয়ের সারি, দেখে মনে হয় নিয়মিত ধুলো পরিষ্কার করা হয়। মামুলী টেবিল আর মামুলী চেয়ার, সুধীন বসল; চতুর্থবার দরজার দিকে চোখ পড়ার আগে সুলতা ঘরে ঢুকল। পিঠের উপর একরাশি খোলা চুল, কোমর ছাড়িয়ে আরও নিচে নেমে গেছে। 'কি, চৈত্রের হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে এল নাকি?'

'না, নিজেই ত এলাম।'

'আমার ভাগ্য, চল, ওপারে, এতো সময় নিয়ে এসেছ ত?' সুলতা কাছে এল, 'এমন চিন্তিত দেখাচ্ছে যে! মা কেমন আছেন?'

'মা ভাল নয়, যা সন্দেহ করা গিয়েছিল, তাই, সকালে ডাক্তার এসেছিলেন, এক্স-রে করলে বোঝা যাবে কতটা গুরুতর, ডাক্তারের মত : হাসপাতাল, বাড়িতে বিশেষ কিছু করা যাবে না।'

সুলতা চেয়ার টেনে বসল, শরীরটাকে সোজা করে চুলের একটা আলগা খোঁপা তৈরী করল সুধীনের চোখের উপর চোখ রেখে; সুধীনের চোখ নিচে নামল না।

'কিছু টাকার দরকার, লতা; আমার হাতে, বলতে গেলে, কিছুই নেই, কাল এক্স-রে করবার টাকাটাও নয়, অথচ হাসপাতালে না পাঠাতে পারলে কোনো চান্সই নেই, অতএব আমার প্রস্তাব হচ্ছে' : এবারে একটু হাসল সুধীন, 'কিছু টাকা ধার দাও, দু'হাজার, মাসে মাসে শোধ করব।' হাসিটা সে ধরে রাখতে পারল না, 'আমার নাম করেই তুমি বাবার কাছে চাইতে পার।'

খোলা দরজাটা দিয়ে তখনও কিছু কিছু ধোঁয়া আসছে ঘরের মধ্যে; দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল সুলতা, জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ, তোমায় ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?'

'ছিলাম একটা চায়ের দোকানে, এক পেয়ালা চা নিয়ে ভাবছিলাম কার কাছে যাওয়া যায়, এমন অবস্থায় লোকে কি করে, কি—'

'এবং সবার শেষে আমার কথাই মনে পড়ল, এই ত! কিন্তু ব্যাপার কি জান? দু'শ একশ টাকা হলে কথাই ছিল না!' সুলতা সময় নিল, সুধীনের মুখ থেকে চোখ ফিরাল রাস্তার দিকে; 'আচ্ছা, বাবাকে বলি, এই একটু পরে বাবার জন্য চা নিয়ে যাব, তখনই বলব। অবশ্য, বাবার নিজের তহবিলে তেমন কিছু জমানো টাকা নেই, তোমায় ত গল্প করেছি, সবই ভাগ করা। বোস না, দেখি কি করা যায়; একটা ত কিছু করতেই হবে। আমার ত কোনো দিন গয়নার শখ ছিল না, তাহলে আর এত মাথা ঘামাতে হত না। চল না, আমার ঘরে গিয়ে বসবে, আজ ত অনিকঙ্কণ।'

'আর সিঁড়ি ভাঙতে ইচ্ছে করছে না, বোস না, এখানে, মা-কে ফেলে এসেছি, একা।'

'একা কেন? বামুনদি নেই নাকি?' উৎকণ্ঠার পরিবর্তে সুলতার গলায় প্রকাশ পেল উল্লাস, 'এখন এমন একজন কারুর দরকার—সে সব সময়ে থাকতে পারবে মা-র কাছে; তাহলে ত তোমার আর দেরি করা উচিত হবে না, কিন্তু সেই সেক্রেটারীয়াল চাকরিটা ত তোমার হবার আশা আছে; মা-র এমন অবস্থা, কাজকর্ম তুমি কেমন করেই বা করবে?'

'বামুনদি আছেন, এমন সময়ে আমাদের ছেড়ে যাননি; তারপর—হাসপাতালে মা-র চিকিৎসার একটা বন্দোবস্ত তোমার কৃপায় হয়ে যাবে বলেই ত মনে হচ্ছে; তখন কাজকর্মে মন দিতে পারব।' এবারের হাসিতে অনেকখানি স্বস্তি প্রকাশ পেল।

'বোস, দেখি, চায়ের কদ্দুর, কি খাবে চায়ের সঙ্গে?'

'না, কিছু না, শুধু চা হলেই চলবে।'

'কেন, শুধু চা কেন?' সুলতা ভিতরে গেল।

সুধীন আলমিরার বই দেখতে লাগল।

একটু দেরি করেই এল সুলতা চায়ের পেয়ালা আর খুচরো খাবারের প্লেট নিয়ে; টেবিলের উপর রেখে বলল, 'চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে নাও, আমার চা-টা নিয়ে আসছি!'

'শোন, তুমি বরং বাবার কাছ থেকে কথাটা সেরে এস, আমি ততক্ষণ ধীরে-সুস্থে—'

'তুমি একা থাকবে?'

'একার কি আছে? তোমার চা নিয়ে—'

সুধীন চকিতে একবার তার চওড়া খোঁপাটার দিকে তাকাল। 'বাবা বলছেন, তোর নামে যখন রেখেছি, ওটা তোরই টাকা, আর সুধীনের যখন এমন একটা বিপদ, তখন আমাদের অবশ্যই উচিত ওকে সাহায্য করা, কিন্তু সত্যটা ত ভুললে চলবে না। বাবা বলছেন—' সুলতা হাসল। কিন্তু চোখ সরিয়ে নিল না।

না, নিজেই তো এলাম

সুধীন তার কথা শেষ করবার আগেই পিছন ফিরল সুলতা, মুখ না ফিরিয়েই বলল, বোস তা হলে, চা খাও।'

সুধীন খুব আস্তে পেয়ালাটা তুলে নিল।

আধ-ঘণ্টা পরে ফিরল সুলতা, চুলটা আঁচড়ানো; আর যে-টুকু পরিবর্তন, তা চোখে আর মুখে; বসল সে চেয়ারে, সুধীনের পাশেই, 'বাবা কি বলছেন, জান?'

একটু সময় নিয়ে সুধীন বলল, 'কিন্তু এখন, এ-সময়ে কি করে হবে?'

'তাও ত আমি বললাম বাবাকে, বাবা বললেন, হৈ-চৈ করবার কোনো দরকার নেই, রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে ফেল তোরা, আমি নিজেই একজন সাক্ষী থাকব।'

'মা-কে না জানিয়ে?' সুধীনের গলার শব্দটা কি আর্তনাদের মত শোনাল?

'বাবা বলছেন: সুধীনকে চিনি, সুধীনের মধ্যে ভেজাল নেই, তুই যে

সুধীনের জন্য অনেককেই বাতিল করেছিস, এও আমার অজানা নেই; যক্ষ্মা রোগ কঠিন রোগ, সারতে হয়ত দু'তিন বছর লেগে গেল, দু'হাজারের জায়গায় খরচ হল চার হাজার, আমি কি বলব সুধীনকে তুই টাকা দিসনে, তুইও কি পারবি না দিয়ে? আর কে বলতে পারে মানুষের মনের কথা, ঘটনাচক্রের কথা? হয়ত সুধীন শেষ পর্যন্ত বিয়ে করল না, বিয়ে করতে পারল না, বা তোর হয়ত অন্য কোথাও বিয়ে করার ইচ্ছে হল, তাহলে আমার টাকার সর্তটা রইল কোথায়? প্রয়োজনে কোথায় মিলবে টাকা? তখন—'

'কিন্তু মা-কে না জানিয়ে?' একটু ঘুরেই বসল সুধীন, একেবারে সুলতার মুখোমুখি।

'বাবা বললেন : ভদ্রমহিলাকে এখন জানাবারই বা দরকার কি? বিয়েটা হয়েই থাক না; পরে উনি সুস্থ হয়ে হাসপাতল থেকে ফিরে এলে ধীরে-সুস্থে বলা যাবে, এখন বললে হয়ত কাতর হয়ে পড়বেন, রোগ বেড়ে যেতে পারে, বা হয়ত এমন বিয়েতে আপত্তি করে বসলেন, বলা যায় না ত কিছু, অসুস্থ অবস্থায় সবই সম্ভব, তখন তোরা কি করবি? যতদূর শুনেছি তোর কাছে, ওকে ত মনে হয় ঘোরতর মাতৃভক্ত ছেলে ও কি পারবে মায়ের—'

'না, মা-র সঙ্গে এমন শঠতা আমি করতে পারব না'; চেয়ারের পিঠে গা লাগিয়ে দিল সুধীন, কিন্তু আবার সোজা হয়ে বসল; কপালে আবার দেখা দিল আড়াইখানি সূক্ষ্ম ভাঁজ; রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতান্তই মৃদু গলায় যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'বিয়েটা কি এমনি—যে মা-কে লুকিয়ে করতে হবে? বুঝিয়ে বললেই মা রাজি হবেন, যদিও বিশ্বাস করি না, পৈতেটা এখনও গলায় রাখতে হয়, মা—'

সুলতা ছোট একটু হাসল, বিশ্বাসের হাসি, আশ্বাসের হাসি, 'বিয়েটা বিয়েই, বুঝলে সুধী, অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানের মতই একটি; বাবা ভাবছিলেন কিছু সুবিধে অসুবিধের কথা। আর একটু চায়ের কথা বলব?'

'চা? নাঃ।' আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সুধীন, 'তাহলে আমি গেলাম।'

সুলতা উঠল, 'এই যে! এটা নাও!' বুকের কাছে জামাটা সামনের দিকে টেনে ধরল সে, আরও নিচে হাত ঢুকিয়ে একগোছা নোট বন্ধনমুক্ত করে বলল, 'নাও একশ পঁচিশ এই আমার কাছে ছিল, এক্স-রেটা করিয়ে ফেল, অন্ততঃ বোঝা যাবে অবস্থাটা, তারপর দেখা যাবে।' আঁচলটা তখনও সে সরিয়ে আনেনি; দুধ-মিশানো কফিরঙের চামড়ার ওপর শাদা অরগ্যাণ্ডির লেস-বসানো প্রান্তটা চৈত্রের বাতাসে বারবার নড়ে উঠছে! রাস্তায় মোটরের হর্ণ।

পকেটে রাখবার আগে টাকাটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সুধীন।

এক্স-রে প্লেট দেখে ডাক্তার বলল, 'হ্যাঁ, যা বলেছিলাম, হাসপাতাল।'

ব্রাউন খামটা নিয়ে সুধীন ছুটল সুলতার বাড়ি; মা-কে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে; টাকার জন্য মা মরে যাবে না-কি? বাঁচাতেই হবে মা-কে।

বসতে হল না সুধীনকে, সুলতা এল; বড় ব্রাউন খামটা দেখে জিজ্ঞেস করল, 'প্লেট না কি?'

'হ্যাঁ, খুব খারাপ! আর একটা দিনও অপেক্ষা করা উচিত নয়, যদি—'

'বোস সুধী!'

'না, বোসবো না, তুমি কি আমায় বিশ্বাস করতে পার না, লতা?'

'বিশ্বাস করতেই যদি না পারি—তাহলে বিয়ে করব কেমন করে? কেমন করে—'

'তাহলে কেন তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে অন্ততঃ হাজার খানেক টাকা আমায় দিতে পারবে না, আর টাকাটা যখন তোমারই জন্য উদ্বৃত্ত রয়েছে?'

'আমার জন্য নয়, আমার বিয়ের জন্য!'

'আমি যদি তোমায় কথা দিই বিয়ে হবে, বিয়ে করব, আমার সে প্রতিশ্রুতির কি কোনো মূল্য নেই? এই তুমি আমায় চিনলে?'

সুলতা কাছে সরে এল, খুব কাছে, একেবারে সুধীনের বুকের কাছে: 'না, এই নয়, সুধী, এর চাইতে অনেক বেশি চিনি বলেই আরও কাছে আসতে চাই, আরও কাছে পেতে চাই!' সুলতার নিঃশ্বাস লাগছে সুধীনের গলায়; নিস্তব্ধ দুপুর, চকিতে সুলতা তাকাল দরজার দিকে, তার বুক লাগল সুধীনের বুকে, ক্ষণিকের জন্য! 'কেন তুমি আমায় বিয়ে করতে পারবে না? বিয়েটা একান্তই তোমার নিজস্ব ব্যাপার, তোমার মা—; তোমার যদি একট আদর্শ থাকে ত আমার বাবারও একটা প্রিন্সিপল্ থাকতে পারে!'

একটু সরে দাঁড়াল সুধীন, বলল, 'চল!'

দু'শ পাওয়ারের একটা বাল্ব যেন জ্বলে উঠল হঠাৎ, এমনি আভা সুলতার মুখে, 'দাঁড়াও, আসছি!' ছুটে চলে গেল সে বাড়ির মধ্যে!

সিঁড়িতে থামল সে এক মুহূর্ত।। পনেরো দিনের নোটিশ যে দিতে হয়! সাক্ষী?

ট্যাক্সীতে ভাবা যাবে লোকের কথা; বিদ্যুতের মত কয়েকটা মুখ তার মাথায় ঝলসে গেল! নোটিশটা ম্যানেজ করা যাবে, কিছু ঘুষ! ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল সে, দরজাটা ভেজিয়ে এক টানে শাড়ি আর ব্লাউজ খুলে ফেলল, পা দিয়ে ঠেলে দিল খাটের নীচে! নূতন শাড়ি আর জামা পরতে আড়াই মিনিটও লাগল না; চিরুনী, পাউডার, এসেন্স, হাত ব্যাগ, কিছু টাকা, আর—

আলমিরা খুলল সে চাবি ঘুরিয়ে; এক স্তূপ শাড়ির নীচে হাত ঢুকিয়ে ভাঁজ-করা দু'হাজার টাকার বেয়ারারস্ চেকটা বার করে চকিতে একবার দেখে নিয়ে হাত-ব্যাগে ঢুকাতে গিয়ে থামল: ব্লাউজের নীচে চালান করে দিয়ে আয়নায় এক মিনিট তাকাল সে; তারপর দৌড়াল!

'চল, ট্যাক্সী পাওয়া যাবে ত? ঐ খামটা আমায় দাও না! আলমিরাতে রেখে দিই, আজ ত আর দরকার নেই!'

এক মুহূর্ত ভেবে এক্স-রে প্লেটের খামটা এগিয়ে দিল সুধীন। বই-এর আলমিরায় রেখে দিল সুলতা।

রাস্তায় ট্যাক্সী পেতে দেরি হল না। যথসম্ভব গা ঘেঁষে বসল সুলতা।

ট্যাক্সী দৌড়াল। ট্রাম লাইনে পড়বার আগে জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার 'কোন্ দিকে যাব, স্যার?'

'টালীগঞ্জ!' নির্দেশ দিল সুধীন।

গীয়ার বদলাবার আগেই সুলতা জিজ্ঞেস করল, 'টালিগঞ্জ কেন?'

'মা-র কাছে!'

গাড়ি দৌড়ে চলল।

'তোমার মা রাজি হবেন না, সুধী! অনর্থক চেষ্টা কোরো না!'

'আমি রাজি করাব! সুলতার দিকে মুখ ফিরিয়ে, 'তোমাকে দেখলে রাজি হবেন!'

রাস্তার দিকে তাকাল সুলতা; তার মুখে যে নিদারুণ হাসির আভা দেখা দিল, সুধীন তা দেখতে পেল না।

ট্যাক্সিটাকে দাঁড়াতে বলে দু'জনে একসঙ্গে এল স্বর্ণলতার বিছানার কাছে। বারান্দায় বামুনদি ঘুমোচ্ছিল মাদুর বিছিয়ে। পায়ের শব্দে চোখ খুলল স্বর্ণলতা, চোখে ক্লান্তি আর তন্দ্রা! সুধীন বসল শিয়রে, কপালে হাত রেখে ডাকল, 'মা!'

ভাল করে তাকাল স্বর্ণলতা! দেখতে পেল সুলতাকে; 'কেমন আছেন, মাসীমা!' বিছানার উপরেই বসল সে সুধীনের পাশে!

হাসির একটা প্রেতাত্মাই শুধু ফুটে উঠল স্বর্ণলতার মুখে। আস্তে আস্তে দেওয়ালের দিকে মুখটা ফিরিয়ে চুপ করে রইল সে।

'মা!' সুধীন আবার ডাকল। সাড়া নেই!

আর সেই মুহূর্তে বুঝতে পারল: এই সময়ে, এমন সময়ে এমন প্রস্তাব উত্থাপন করা কত অসম্ভব, কত হাস্যকর। কেন এই মুহূর্তে? কেন? কেন? কি কৈফিয়ৎ দেবে মা-র কাছে?

আস্তে উঠে দাঁড়াল সুলতা, বলল 'আমি যাচ্ছি!'

সুধীন বলল, 'মা, একটা কথা ছিল, একটু ফিরাবে মুখটা?'

স্বর্ণলতা মাথা ফিরাল, তাকাল।

'আমি সুলতাকে বিয়ে করব, তুমি মত দাও, মা!'

স্বর্ণলতার মুখটা সপ্রতিভ হয়ে উঠল, তন্দ্রা নেই চোখে, বরং একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; আর শীর্ণ, বিবর্ণ ঠোঁটে সেই হাসিটাই ফুটে উঠল, যেটা দেখা দিয়েছিল সুলতার মুখে ট্যাক্সীতে! আবার দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাল সে!

'আমি যাই!' বলল সুলতা।

'না, তুমি বোস মা-র কাছে, হয়ত ওঁর খাবার সময় হয়েছে!'

প্রস্তাব নয়, অনুরোধ নয়; এমন কি আদেশও নয়। সুধীন উঠতে পারল না বিছানা ছেড়ে, মা-কে ছেড়ে!

আধ মিনিটও নয়, এর্নাঞ্জনের শব্দে খুব সামান্য একটু চমকে উঠল সুধীন।

আর ট্যাক্সীটা যখন টালীগঞ্জের পুল পেরিয়ে জোরে দৌড় মারল, তখনই ছেঁড়া চেকের টুকরোগুলি গাড়ির বাইরে ছিটকে পড়ল রাস্তায়, হাওয়ায় উড়ে গেল দিকবিদিকে।

ইংরেজী ভাষাকে যদি কুকুরে কামড়ানো ভাষা বলি, বিদ্বৎ সমাজে প্রতিবাদের তুফান উঠবে। অবশ্য যে ছেলেটি তিন-তিনবার ইংরেজীতে কম্পার্টমেন্টাল পেয়েও পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে পারেনি তার কাছে উল্লিখিত উক্তিটির জন্যে আমার সাধুবাদই প্রাপ্য। ইংরেজরা স্বভাবতঃই কুকুরভূষণ। হয়ত তাই নিজেদের ভাষাকেও তাঁরা কুকুর দিয়ে সাজিয়েছেন। ইংরেজী ভাষায় কুকুরের আধিপত্যের • যদি প্রমাণ চান, যে কোনো ভাল একটি ইংরেজী অভিধানের পাতা খুলুন, মনে হবে একটা আস্ত সারমেয় রাজ্যেই অনধিকার প্রবেশ করেছেন আপনি। ইংরেজী ভাষায় 'ডগ্' কথাটির ব্যবহার বিবিধ এবং বিচিত্র অর্থে। শুধুমাত্র কোনো ইংরেজ তনয়কে 'এ ডগ্' বললে, সে হয়ত বক্তাকে ডুয়েলে আহ্বান করবে, কিন্তু তাকেই যদি 'গেম্ ডগ্' অথবা "গে ডগ্" বলে ডাকেন, উল্লসিত হওয়া ছাড়া তার আর উপায় নেই। এবং হতভাগ্য সারমেয়কুল যেহেতু নিরক্ষর তারা রবীন্দ্রনাথ অনুসরণে বলতে পারেও না!

'কুকুর-নামে করবে খেলা
সইবে না এ অবহেলা।...

কিন্তু তারা না পারলেও সপ্তদশ শতাব্দীর জনৈক কুকুর-প্রেমিক কুকুরদের পক্ষে মসীধারণ করেছিলেন। মানুষের নিকৃষ্ট এবং নিরস বৈশিষ্ট্য-গুলো কুকুরদের ঘাড়ে চাপিয়ে গালা-গালির ভাষা আবিষ্কারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন জন টেইলার। তাঁর বক্তব্য হল :

Many pretty ridiculous aspersions one cast upon *dogges, so that it would make a dogge laugh to here and understand them; as I have heard a man say, I am hot as a dogge, or cold as a dogge, and once a man said his wife was not to be beleeved for she would lye like a dogge.

শারীরিক দোষ গুণ বা অবস্থার বর্ণনায় মানুষের সবচেয়ে কুকুরকেই আগে মনে পড়ে। আমরা ক্লান্ত হলেই বলি ডগ টায়ারড্', কিছু-দিন ধরে অসুখে ভুগলেই আমরা 'এ্যাজ সিক্ এ্যাজ এ ডগ্'। ইদানীং কালে 'হর্স পাওয়ার' একটি মামুলী কথা প্রায় সবাই এর অর্থ জানি। কিন্তু ইংরেজী

অভিধানে কুকুর শক্তির কথাটিও সগৌরবে বিরাজ করছে। যদিও আজকে তার অর্থ আমাদের অনেকেরই অজানা। অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডের সরাইয়ালারা মাংস ঝলসানোর কাজে কুকুর ব্যবহার করতো। কুকুরকে দিয়ে একটা চাকা ঘোরানো হত এবং চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে উনুনের উপরে মাংসের টুকরো-টাও ঘুরে ঘুরে ঝলসে যেত।

*প্রাচীন বানান।

কুকুরের যে-সব গুণ নেই, কুকুরপ্রাণ ইংরেজরা সেই গুণগুলিও কুকুরের ওপর আরোপ করতে দ্বিধা করেননি। যেমন ধরুন কুকুরের বয়স। কুকুর সাধারণতঃ ১০।১২ বছরের বেশী বাঁচে না। অথচ দীর্ঘজীবন বোঝাতে ইংরেজরা 'ডগস এজ' কথাটি ব্যবহার করেন। এমন কি স্বয়ং সেক্সপীয়ারও তাঁর 'মাচ এডু এবাউট নাথিং' নাটকটি জনৈক মাথা-

'ডগ্ টায়ার্ড'

মোটা লোকের নামকরণ করেছেন 'ডগ-বেরী' এবং সেই থেকে 'ডগ্বেরীজম্' শব্দটি ইংরেজী ভাষায় স্থায়ী হয়ে গেছে। গোলাপের মত ফুলের সঙ্গেও ইংরেজরা কুকুরের উপসর্গ জুড়তে দ্বিধা করেননি—একটি বিশেষ জাতের বন্য গোলাপের নাম রেখেছেন 'ডগ্-রোজ'। রসিক হিসেবে ইংরেজদের সুনাম আছে, কিন্তু তারই কি প্রমাণ-স্বরূপ পুরুষ শেয়ালের ইংরেজী প্রতি-শব্দ 'ডগ-ফক্স'? শেয়ালের সঙ্গে কুকুরের অহিনকুল সম্পর্কের কথা ভেবেই যে এই নাম রাখা হয়নি কে বলতে পারে? ইংল্যান্ডের সারমেয়-কুলের অবস্থা আমাদের দেশের নেড়ি কুকুরদের মত নিশ্চয়ই নয়, অথচ যাবতীয় অতি সস্তা কোনো কিছুর উল্লেখ করতে হলেই 'ডগ্-চিপ' বলে উল্লসিত হয়ে ওঠেন ইংরেজরা। এক-গুঁয়েমির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'ডগেড্-নেস'।

পরিশেষে নিবেদন করি এই প্রবন্ধটি পরে পড়বেন অথবা অন্যকে পড়াবেন বলে যদি কোনো পাঠক-পাঠিকা পাতার কোনা মুড়ে চিহ্ন করে রাখেন, জানবেন তিনি কুকুরেরই কান ধরেছেন। কারণ গ্রন্থচিহ্নের জন্যে পৃষ্ঠার মোড়া কোনার ইংরেজী প্রতিশব্দ **'ডগস-ইয়ার'**।

[উপন্যাস]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যার দিকে আশুবাবু এলেন, রোজ যেমন এসে থাকেন। দ্রুত আরোগ্যের ভরসা দিলেন। তাঁর দীর্ঘ এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে দু'চারটি সরস কাহিনীর হালকা হাওয়া দিয়ে রোগশয্যার গুমোট খানিকটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। মেয়েকেও ডেকে এনে বসালেন অধ্যাপক। ঐটুকু মেয়ের মনের উপরে আজ অনেক মেঘ জড়ো হয়েছিল। এই আপন-ভোলা সদাশিব বৃদ্ধের প্রাণখোলা দন্তহীন হাসি তার কিছুটা অন্ততঃ উড়িয়ে দিতে পারবে।

বর্স্টালের বাসায় বাসায় সেই নোটিশ দিয়ে ব্রাহ্মণ-ভোজনের প্রসঙ্গ উঠতে অধ্যাপক হেসে বললেন, আপনি তো দেখছি তাহলে দ্বিতীয় কমলাকান্ত?

—আজ্ঞে, এক জায়গায় সে মহা-পুরুষের ধারেকাছেও যেতে পারিনি।

—কোন্ জায়গায় বলুন তো।

—আফিমটা ধরা হয়নি। —মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন আশুবাবু।

ব্যানার্জি হেসে উঠলেন। তারপর মেয়ের উদ্দেশে বললেন, এতক্ষণ উনি যা বললেন, তার মানেটা বুঝতে পারলি তো? একদিনও ও'কে নেমন্তন্ন করে লাউঘণ্ট আর পায়েস খাওয়ানো হয়নি, তার জন্যে কথা শোনাচ্ছেন।

—বেশ তো; কালই তার ব্যবস্থা করছি। কথা শুনতে যাবো কোন্ দুঃখে?

—না, মা-মণি, ও-সব হ্যাঙ্গাম এখন থাক। তোমার বাবা আগে সেরে উঠুন, তারপর একসঙ্গে বসে খাওয়া যাবে তোমার হাতের লাউঘণ্ট আর পায়েস।

—বাবার কথা বলবেন না। ওঁর কোনোটাই ও'র পছন্দ নয়।

—আমার পাশে বসিয়ে দিও; তারপর পছন্দ না করে কোথায় যান দেখবো। সঙ্গদোষ বলে একটা জিনিস আছে তো?

মেয়ে উঠে যাবার পর অধ্যাপক দিলীপের কথা পাড়লেন। আশুবাবুর হালকা সুর কোথায় ভেসে গেল। তাঁর এই পুত্রাধিক প্রিয় ছাত্রটির প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। প্রধানতঃ বর্স্টাল-জীবন এবং তারপর এখানকার এই প্রতিষ্ঠানে যে পরিচয় তার পেয়েছেন, একটির পর একটি তারই অনেক কাহিনী শুনিয়ে গেলেন। তার আগের ইতিহাস তিনি স্পষ্টভাবে জানেন না। যেটুকু জানেন, তাও বলবার অবসর হল না। ডাক্তার নিয়ে দিলীপ এসে পড়ল।

এর আগের বারে রোগীকে যখন পরীক্ষা করছিলেন, ডাক্তার দাশগুপ্তের একাগ্র তন্ময় মুখের উপর একটা দুশ্চিন্তার কালো ছায়া, আর কেউ হয়তো লক্ষ্য করেনি, কিন্তু দিলীপের অভ্যস্ত চোখে ধরা পড়েছিল, যদিও মুখে তিনি ভরসার কথাই বলেছিলেন। আজও সে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঐদিকেই চেয়েছিল। সে মলিন ছায়াটাকে দেখতে পেল না। তার জায়গায় বরং একটা আশ্বাসময় ঔজ্জ্বল্যের আভাস পেয়ে সেও মনে মনে আশ্বস্ত হয়ে উঠল। পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার রোগীর মুখের দিকে চেয়ে উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন, আর কি? ফাঁড়া কেটে গেছে। you are completely out of danger. অল্পের ওপর দিয়েই গেল বলতে হবে। তবে এবার থেকে কিন্তু খুব সাবধান। কোনো রকম অনিয়ম চলবে না।

'কদিনে টেনে তুলতে পারবেন, মনে হয়?' রোগীর কণ্ঠেও নতুন পাওয়া ভরসার সুর।

'টেনে আমরা তুলি না', মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বললেন চিকিৎসক, 'ব্যাধি মহাশয় যেদিন দয়া করে ছেড়ে দেবেন, সেদিন আপনি নিজে থেকেই উঠে বসবেন। তার জন্যে উতলা হলে চলবে না। ও'র যেটুকুন দরকার সে সময়টা ও'কে দিতেই হবে।'

বলতে বলতে বুক দেখবার রবারের নলটা গলায় ঝুলিয়ে দিলীপের দিকে হাত বাড়ালেন। দিলীপ তৈরী হয়েই ছিল। তাড়াতাড়ি কলম ও প্যাডটা এগিয়ে ধরল। তিনি যখন লিখছেন, সেই ফাঁকে সে ভিতরে চলে গেল। দরজার ঠিক ওপাশেই যার শাড়ির পাড়টা দেখা যাচ্ছে, তার আঁচলের খুঁটে বাঁধা আছে ডাক্তারের ফী। এই মুহূর্তে সেটি সংগ্রহ করতে হবে। দু-একটা প্রশ্নেরও হয়তো জবাব দিতে হবে।

যাওয়া মাত্র নোট কখানা ওর হাতে তুলে দিয়ে সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, কী বললেন ডাক্তারবাবু? কেমন দেখলেন? প্রশ্নটা যে অধিকন্তু, অর্থাৎ ডাক্তারের প্রতিটি কথা আগেই তার কানে গিয়ে পৌঁছেছে, প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের প্রফুল্ল ভাবটাই দিলীপকে সে কথা জানিয়ে দিল। তবু সে খুশী গলায় বলল, অনেক ভালো। কানপুরে বোধহয় আর যেতে হল না।

—হলেই বা আপনার তাতে কী এসে যায়? —ক্ষুব্ধ অভিমানের সুর, কিন্তু ছদ্ম। মুখের উপরকার ভার ভার ভাবটাও টেনে আনা। দিলীপের মুখ

থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, ঠিক বলছ? কিচ্ছু এসে যায় না?

বলেই চমকে উঠল। যার উদ্দেশে বলা তার চোখেও সচকিত দৃষ্টি, যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। ঠিক সেই মুহূর্তে এঘর থেকে ভেসে এল ডাক্তার দাশগুপ্তের রাসভারী গলার গম্ভীর ডাক—কৈ? দিলীপ কোথায় গেলে?

—'যাই, স্যার!' বলে ছুটে চলে গেল। তারপর ব্যাগটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে টাকাটা ওঁর হাতে গুঁজে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে পৌঁছে দিল।

ফিরে এসে প্রেস্‌ক্রিপশনটা নিয়ে বেরোতে যাচ্ছে, প্রফেসর ব্যানার্জি বাধা দিলেন, আবার কোথায় যাচ্ছ?

—ওষুধটা নিয়ে আসি।

হলেই বা আপনার তাতে কী এসে যায়?

—ওষুধ রঘু গিয়ে নিয়ে আসবে। তুমি বসো। সেই বিকেল থেকে তো এক মিনিট বিশ্রাম নেই।

আশুবাবু বললেন, ওটা আমাকে দাও। আমি আনিয়ে দিচ্ছি।

—আপনি আবার কষ্ট করবেন?

প্রফেসর ব্যানার্জির ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা গেল।

—তা একটু করতে হবে। কাগজখানা যে কোনো একজনের হাতে ধরে দিলে চলবে না। বাকী সবাই মুখ ভার করবে—মাস্টারমশাই ওকেই বেশী ভালোবাসেন। কাজেই আমাকে গিয়ে একটি লটারী করতে হবে। যার নাম উঠবে তিনিই যাবেন ওষুধ আনতে। কম জ্বালায় পড়েছি!

বলে, দিলীপের হাত থেকে প্রেস্‌ক্রিপশন ও টাকা নিয়ে হাসতে হাসতে প্রস্থান করলেন।

প্রফেসর পিছন থেকে বললেন, বেশ আছেন ভদ্রলোক! ...বসো বাবা।

দিলীপ ওঁর পায়ের দিকটায় একটা টুলের উপর বসে পড়ে বলল, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে আরো সাবধানে থাকতে হবে। নড়াচড়া, বেশী কথা বলা—

—তোমার ঐ ডাক্তারি এখন রাখো তো। দিনরাত কেবল অসুখ আর অসুখ। আর ভালো লাগে না বাপু! এবার দু-একটা তোমার কথা বলো, শুনি।

—আমার কথা! রীতিমত বিস্মিত হল দিলীপ।

—হ্যাঁ। কোথায় তোমাদের দেশ, বাড়িতে কে কে আছেন? কিছুই তো শুনিনি এতদিন।

দিলীপের মুখের উপর ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল। বলল, দেশ শুনেছিলাম কাটোয়ার কাছে কী একটা গ্রাম। সেখানে কেউ নেই।

—তোমার বাবা যখন মারা যান, তখন তুমি কত বড়?

—খুব ছোট। আমার কিচ্ছুই মনে নেই।

—মা আছেন তো?

—জানি না।

—জানো না!

—না; আপনি এবার বিশ্রাম করুন। আর কথা বলা ঠিক হবে না।

কথাগুলো ব্যানার্জির কানে পৌঁছল কিনা সন্দেহ। পৌঁছলেও আমল দিলেন না। আগেকার সূত্র ধরেই বললেন, বর্ডিংয়ে যাবার আগে কার কাছে ছিলে?

—মার কাছে।

—তারপর?

—একদিন রাগ করে চলে গিয়ে-

ছিলাম। তারপর পড়লাম পুলিশের হাতে।

—তারপরের সব ঘটনা আমি আশু-বাবুর কাছে মোটামুটি শুনেছি। কোথায় থাকতে তোমরা?

—বেলেঘাটায় একটা বস্তিতে।

—বেলেঘাটায়! আর একটু কাছে এসো।

দিলীপ অবাক হয়ে তাকাল এবং টুলটা টেনে নিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বসল। অধ্যাপক ওর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন মায়ের নামটা বলতে আপত্তি আছে?

—আপত্তি কিসের? কিন্তু আমি জানি না।

—সে কি কথা! মায়ের নাম জানো না?

—জানবার সুযোগ হয়নি। পাড়ার লোকেরা 'খোকার মা' বলে ডাকত। আমিও তাই জানতাম! নাম জানবার দরকার কোনোদিন দেখা দেয়নি।

ব্যানার্জি আপন মনে কী ভাবলেন। তারপর বললেন, বাবার নাম বলতে পার?

—তা পারি। সেটা শিখতে হয়েছিল। পাঠশালায় ভর্তি হবার সময় মা একটা কাগজে লিখে দিয়েছিলেন।

—কী বল দিকিন?

—ঈশ্বর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

—'কী বললে!' একটা অস্বাভাবিক চিৎকার করে মাথা তুলে উঠবার চেষ্টা করলেন অধ্যাপক। দিলীপ চেঁচিয়ে উঠল, 'না, না আপনি উঠবেন না, উঠবেন না।' বলতে বলতে ছুটে গিয়ে দু কাঁধে হাত দিয়ে জোর করে শুইয়ে দিল।

রোগীর অবস্থা সবে মাত্র ভালোর দিকে মোড় নিয়েছিল। এই আকস্মিক উত্তেজনার প্রবল আঘাত সইবার মত স্নায়ুবল তখনো ফিরে আসেনি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে নির্জীবের মত এলিয়ে পড়লেন। বাবার চিৎকার শুনে মেয়েও এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর শিয়রের কাছে। কিন্তু কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। দিলীপও প্রথমে খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল! কে ইনি? তার বাবার সঙ্গে ও'র কী সম্বন্ধ যে নামটা শুনেই এতখানি বিচলিত হয়ে পড়লেন! কিন্তু তার এই বিহ্বলতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সহজ কর্তব্য-জ্ঞান ফিরে এল। এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ওষুধ বা ইনজেকশনের ব্যবস্থা না করলে অবস্থা আরো জটিল হয়ে দাঁড়াবে, বুঝতে পেরেই ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। পেছন থেকে কানে এল চকিত ত্রস্ত স্বর—কোথায় যাচ্ছেন!

—এখনই আসছি। ও'র কাছ থেকে নড়বেন না। যদি জ্ঞান আসে, একটু দুধের সঙ্গে সেই ওষুধটা খাইয়ে দেবেন। কোন্‌টা মনে আছে তো?

'আছে'। বলে ঘাড় নাড়ল।

দিলীপ আর দাঁড়াল না।

কিছুক্ষণ পরে বিজন চোখ মেলে তাকালেন। বললেন কে, আলো? দিলীপ কোথায়?

—এখখুনি আসছেন। এখন কেমন লাগছে বাবা?

এদিকে ঘুরে এসে বাবার বুকের উপর হাত রাখল। বিজন তার উপর সস্নেহ মৃদু আঘাত করে বললেন, একটা কাজ করতে পারবি মা?

—ও, দাঁড়াও আমি আসছি। বলে, ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল, এবং দু'মিনিটের মধ্যে ফিডিং কাপ হাতে করে ফিরে এসে বলল, এই দুধটুকুন খেয়ে ফেল।

—আবার দুধ কী হবে?

—শীগগির নাও। এখখুনি খাওয়াতে বলে গেছেন। দেরি হলে রাগ করবেন।

একজন কি বলে গেছে, না হলে সে রাগ করবে—তাই ভেবে মেয়ের মুখে যে আশঙ্কাকুল মাধুর্যটুকু ফুটে উঠেছিল, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল সেই দিকে চেয়ে বিজন ধীরে ধীরে বললেন, আচ্ছা দে।

ওষুধ সমেত দুধটা মুখে ঢেলে দিতে দিতে আলো পাকা গিন্নীর মত বলল, বাস; এর পরে কিন্তু আর একটি কথাও বলতে পারবে না।

—বেশ; তাহলে আমার একটা কাজ করে দাও।

—ডান দিকের ড্রয়ার খুলে আমার নোটবুকটা নিয়ে এসো।

—এখন আবার নোটবুক দিয়ে কী করবে?

—দরকার আছে।......দেরি করিসনে, নিয়ে আয়।

আলো ওঘর থেকে নোটবুক নিয়ে এল। কিন্তু সে যে নিতান্ত অনিচ্ছায় তা তার হাব-ভাব এবং চলন-ভঙ্গিতে
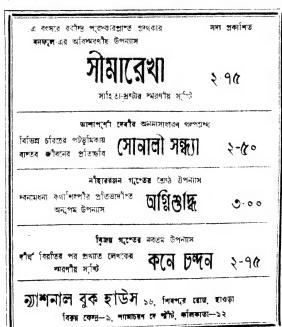
অস্পষ্ট রইল না। বিজন বললেন, 'বইটা আমার চোখের সামনে ধরে রাখ।' তাই করল আলো, এবং তিনি ডান হাতের দুটো আঙ্গুল দিয়ে একটি একটি করে পাতা উলটে চললেন। কিছুক্ষণ পরে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, এই তো পেয়েছি। দু নম্বর সরকার বস্তি। মধু মিস্ত্রী লেন, বেলেঘাটা।

—কার ঠিকানা ওটা?

—পরে বলবো। তার আগে তোকে যে আর একটা কাজ করতে হবে, মা।

—না, এখন আর কোনো কাজ-টাজের দরকার নেই। আলো নিবিয়ে দিচ্ছি। চুপ করে শুয়ে থাকো। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

—'আর ঠিক পাঁচটা মিনিট।' ডান হাতের আঙুলগুলো দেখিয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন ব্যানার্জি। 'তারপর তুই যা বলবি তাই শুনবো।'

—বলো কি করতে হবে।

—আমার রাইটিং প্যাড আর কলমটা নিয়ে আয়।

—ও মা! এখন আবার চিঠি লিখতে বসবে নাকি?

—আমি কি আর লিখতে পারি রে পাগলী? আমি বলে বলে দেবো তুই লিখবি।

'আদ্র আবহাওয়া শুষ্ক যাইবে ও রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইবে।'

প্যাড আর কলম নিয়ে আলো এসে বসল ও'র খাটের পাশে সেই টুলটার উপর। বিজনের কোনো সাড়া নেই। যেন কতদূরের কোন্ বিস্মৃত দিনের অতল অন্ধকারে ডুবে গেছেন। সেই শান্ত তন্ময় নিমীলিত চোখদুটির পানে চেয়ে আলো নিঃশব্দে অপেক্ষা করে রইল। মনে হল, এই মৌন প্রশান্তির মধ্যে এমন কিছু আছে যার কাছে চপলতা প্রকাশ করা অপরাধ। আরো কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর গভীর আবেশময়, শ্লথ কণ্ঠে উচ্চারিত একটি নাম তার কানে এসে লাগল—নির্মলা......। আলো হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠল—বাবা কি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন? রোগের ঘোরে ভুল বকতে শুরু করলেন? কিংবা হয়তো ঘুমিয়ে পড়লেন; স্বপ্নে-দেখা কাউকে বোধহয় ডাকছেন ঐ নাম ধরে। দিলীপই বা এত দেরি করছে কেন?

ক্ষণিক বিরতির পর বিজন আরো কয়েকটা কথা যোগ করতেই আলো বুঝতে পারল, ভুল নয়, যে-চিঠি তাকে লিখতে বলা হয়েছে এ তারই শ্রুতলিপি।

বিজন তখন বলে চলেছেন—'তোমার শেষ-দিনের সেই নির্দেশ আমি ভুলিনি। তবু হয়তো সেটা অমান্য করে তোমার খোকাকে আমি সঙ্গে করে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতাম। কিন্তু আমি আজ নিতান্ত অশক্ত ও অসহায়। তাই তাকে একাই যেতে হল।

অনেক দিন হয়ে গেল। মাঝখানে এতগুলো বছর তোমার কোনো খবরই রাখতে পারিনি। তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি ওখানেই আছ। তোমার দীর্ঘ প্রতীক্ষা এতদিনে সফল হল।"

লেখা শেষ হলে মেয়েকে বললেন, প্যাডটা আমার সামনে এনে ধর, আর কলমটা দে।

নির্দেশমত মেয়ে শক্ত করে লেটার-প্যাডটা ধরে রইল। বিজন তার হাত থেকে কলম নিয়ে কোনো রকমে নামটা সই করে দিলেন। আলো দুর্জয় কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, ইনি কে বাবা?

—দিলীপের মা।

—ওর মা!

থেমে থেমে আপন মনে এই দুটি কথা আউড়ে গেল আলো। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ও আনন্দে জড়ানো কী এক ধরনের মধুর লজ্জার আভা তার মুখখানি অপরূপ করে তুলল।

॥ সতেরো ॥

গলির মোড়ে সেই ওষুধের দোকান থেকে দিলীপ প্রথমে ডাক্তার দাশগুপ্তকে

টেলিফোনে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাঁকে বাড়িতে বা চেম্বারে কোথাও পাওয়া গেল না। ঐ ডিস্‌পেনসারীতে একজন ডাক্তার বসেন। তিনিও তখন বাইরে। অগত্যা অপেক্ষা করতে হল, এবং তিনি ফিরে আসতেই রোগের অবস্থা জানিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু ওষুধপত্র, ইনজেকশনের সরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাকে নিয়ে এ বাড়িতে এসে যখন পৌঁছল, তখন দেখল রোগী বিশ্রাম করছেন। ঘরের আলো নেভানো এবং চারদিকটা নিঝুম-- এই থেকে বাইরের লোকের পক্ষে সেই ধারণা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর অন্তর্লোকের চেহারাটা যদি কেউ দেখতে পেত, দেখত সেখানে চলেছে অবিশ্রাম আলোড়ন।

এতদিন পরে একি আশ্চর্য যোগাযোগ!---এই কথাটাই নানা দিক থেকে বিজন ব্যানার্জির সারা মনে আন্দোলন তুলেছিল। দীর্ঘ দিন আগে যার নিষিদ্ধ চিন্তাকে মন থেকে জোর করে মুছে ফেলে দিয়ে অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মত সংসারের স্বাভাবিক পথে পা দিয়েছিলেন, আজ এত বিপর্যয়ের পর এই অপরাহ্ন বেলায় সেই আবার তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠবে কে ভেবেছিল? নিজে আসেনি; আসতে চায়ওনি। তিনিও কি চেয়েছিলেন? না। তবু একমাত্র সন্তানের ভিতর দিয়ে তার এই অপ্রত্যাশিত পুনরাবির্ভাব। এর থেকে একটা সত্য স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল--জীবনে কিছুই হারায় না। তাকে যদি দর্শন বলে ধরা যায়, সেখানে যে রেখাই পড়ুক, কোনোদিন একেবারে মুছে যায় না। বিলুপ্ত হয়তো ঘটে, কিন্তু সেটা সাময়িক। আবার কখন কেমন করে কার একখানা অদৃশ্য হস্ত সহসা কোথা থেকে এসে সেই পুরানো রেখা নতুন করে টানে, সে রহস্য কে ভেদ করবে?

কিন্তু তাই বলে আজকের বিজন ও নির্মলা আর সেদিনের বিজন ও নির্মলা এক নয়। দুজনের জীবনেই অনেক ঝড় বয়ে গেছে। তারই প্রচণ্ড তাড়নায় তারা একে অন্য থেকে দূরে সরে গেছে। সেই দূরত্ব ঘুচে যাবে, এমন প্রত্যাশা নিশ্চয়ই তিনি করেন না। সেটা সম্ভবও নয়। আজ তাঁর একমাত্র কামনা---যা ছিল অলঙ্ঘনীয়, সেই শূন্য স্থান জুড়ে একটি সুন্দর সেতু রচিত হোক। সে ভার নিক ওদের সন্তানেরা---দিলীপ আর আলো।

খোলা দরজার সামনে একসঙ্গে কয়েক জোড়া জুতোর শব্দে বিজনের তন্দ্রা ভেঙে গেল। বললেন, কে? 'আমরা' বলে সাড়া দিয়ে দিলীপ ঘরে ঢুকে আলো জেলে দিল। ডাক্তার রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করলেন, বুক দেখলেন, দিলীপকেও দু-একটা প্রশ্ন করলেন। তারপর কম্পাউণ্ডারকে বললেন, ইনজেকশন রেডি করতে। যন্ত্রটা চোখে পড়তে বিজন দিলীপের দিকে চেয়ে অপ্রসন্ন মুখে বললেন, আবার কেন ফোঁড়াফুঁড়ি করছ? এখন তো আমার কোনো কষ্ট নেই।

দিলীপ কিছু বলবার আগেই ডাক্তার বলে উঠলেন, 'আপনি কথা বলবেন না।'

তারপর মিনিট কয়েকের মধ্যেই তাঁর সূচিকার্য সম্পন্ন হল।

ডাক্তারকে নীচে পৌঁছে দিয়ে দিলীপ ফিরে আসতেই বিজন তাকে ডাকলেন এবং কাছে এলে বললেন, কোলকাতায় এসে মায়ের খোঁজ করবার চেষ্টা করেছিলে?

---ওসব কথা কাল হবে। আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। ঘুম না হলে---

---'যা বলছি, তার উত্তর দাও।' অসহিষ্ণু কণ্ঠে কিঞ্চিৎ রূঢ়তার আভাস। দিলীপ প্রথমটা আশ্চর্য হল, তারপর সন্ধ্যাবেলার কথা মনে হতেই ধীরে ধীরে বলল,---অনেক করেছি। এখনো সে চেষ্টা ছাড়িনি, যদিও জানি, মা নেই।

---"আছে।" প্রত্যয়পূর্ণ দৃঢ় স্বর।

---আপনি জানেন কোথায় আছে মা? আপনি তাঁকে চেনেন?

বিজন এই ব্যাকুল প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিলেন না। শুধু বললেন, আমার বালিশের নীচে একটা চিঠি আছে। বের কর।

ক্ষিপ্র হস্তে কিন্তু সাবধানে খামটা বের করে দিলীপ শিরোনামাটা যখন দেখছে, তিনি আবার বললেন, অনেক দিন আগে ঐ বাড়িতে আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, আমার বিশ্বাস, আজও সে ওখানেই আছে। তার যে আর কোথাও যাবার উপায় নেই। ঐ চিঠিটা তাকে দিও।

দিলীপ অধীর হয়ে উঠল---আমি এখনই যাচ্ছি।

---এত রাতে কোথায় যাবে একা একা! তার চেয়ে বরং কাল সকালে---

---না; আমি আজই যাবো। আজই আমাকে যেতে হবে।

বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল। বিজন আর বাধা দিলেন না। বুঝলেন, দেওয়া বৃথা। সম্ভব-অসম্ভব, উচিত-অনুচিতের বিবেচনা এই মুহূর্তে ওর কাছে আশা করা যায় না।

চারদিকটা ভাঙাচুরো; আলো নেই, রাস্তা নেই, জনমানবের সাড়া পর্যন্ত নেই। একমাত্র সম্বল আকাশে দশমী বা একাদশীর চাঁদ। তারই আলোয় যতটা দেখা যায়, এক বস্তির পর আর এক বস্তি অতিক্রম করে দিলীপ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছল, যেখানে ডাইনে বাঁয়ে আর কোনো পথের চিহ্ন চোখে পড়ে না। সামনে যে গলিটা আছে তার নাম জানবার উপায় নেই, নেম-প্লেটটা হয় ভেঙে গেছে, নয়তো কেউ খুলে নিয়ে গেছে। অগত্যা যে দিক থেকে এসেছে, সেই দিকেই ফিরতে হল। খানিকটা গিয়ে একটা ঝুরি-নামা বটগাছ। তলাটা বেশ পরিষ্কার। ইচ্ছা হল, ওখানে বসে খানিকটা জিরিয়ে নেয়। পা দুটো আর চলতে চাইছে না।

কিছুক্ষণ বসতেই প্রতি অঙ্গে নেমে এল ক্লান্তির বোঝা। সেই কোন্ সকালে নাকে-মুখে দুটো ভাত গুঁজে কলেজ ছুটেছিল। বিকালে জলখাবারের সময়টা বাইরে বাইরেই কেটে গেছে। সারা দিন পেটে কিছু পড়েনি। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। এবার পেটের ভিতরটা জ্বালা করে উঠল। ছুটোছুটিতে গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে জল কোথায়? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি ও অবসাদে চোখ দুটো জড়িয়ে এল। তারপর কখন যে সেই বটের কোলে ধূলি-শয্যায় এলিয়ে পড়েছিল, মনে পড়ে না।　　(ক্রমশঃ)

কী আশ্চর্য যৌবন আর লাস্য ও দেহের গড়নে!

প্রকৃত নারীর মতই রূপসী ও। পোশাকের সোনালী পশমগুলি গায়ের পাশের কোমল শ্বেত রঙের আভার সংগে কি সুন্দর মিশে গেছে!

যখন সে নাচত, তার পায়ের প্রত্যেকটি শব্দ প্রতিধ্বনি তুলতো দর্শকের হৃদয়ে। যখন সে তার রঙীন রেশম আর লেসের পোশাকের আবরণে দেহ আবৃত করে দর্শক ও শ্রোতার সামনে বসে গান ধরত—তখন দর্শক-সমাজ একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করত। গানও গাইতো সুন্দর—এই নর্তকী।

—নাম তার "নিকী"।

'নিকী' উপন্যাসের নায়িকা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের এক শ্রেষ্ঠ নর্তকী—যে শুধু নাচগানের মাধ্যমেই পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল সেকালের সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সংগে। 'নিকী' নামেই সেদিন-কার ক'লকাতায় পরিচিত হ'লেও মনে হয় এটি তার ছদ্মনাম ছিল। ছদ্ম-নামেই সে প্রখ্যাত হয়েছিল। অনেকেই অনুমান করেন যে, তার আসল নাম নিকী নামের আড়ালে চাপা পড়ে যায়।

"নিকী" সেকালের মুসলমান বাঈজী হলেও এই ক'লকাতা শহরের অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তিকে এই নর্তকীর সঙ্গে আহার-বিহার করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে নিকীকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করার নজীরও আছে। তৎকালীন সমাজে অনেকেই তাকে হিন্দু বা'লে জানত।

এই নর্তকী সম্পর্কে তৎকালীন সাময়িক পত্র থেকে জানতে পারা যায় "শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক

তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসিক বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন।"—আবার একথাও উক্ত আছে যে, নিকী একরাত্রির নাচ-গানের জন্য এক হাজার টাকা পারিশ্রমিক পেত। সত্যাসত্য বিচার করা আজ আর সম্ভব নয়।

সেকালের নর্তকীদের মধ্যে কেউ ছিল হিন্দু, কেউবা ছিল মুসলমান। প্রকৃতপক্ষে যদিও তাদের কোন জাত ছিল না। কারণ, প্রভুর জাতই ছিল রক্ষিতা বা, নর্তকীর জাত। এরা বিবাহিত জীবন যাপন করুক বা না করুক নর্তকী-সমাজের সামাজিক বিধি অনুযায়ী নর্তকী-জীবন শুরু করবার পূর্বে কোন একজন পুরুষের সঙ্গে সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হ'ত। যদিও সেই বন্ধন ছিল নামে মাত্র।

জীবনে এরা হাজার হাজার টাকা রোজগার করেছে—বিলাসিতার মধ্যে জীবনযাপন করেছে—একথা সত্য। কিন্তু এদেরও হৃদয় ছিল। শ্রাবণ মাসের প্রতিটি সোমবার এরা যা আয় করত তার সম্পূর্ণ অংশটাই এরা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে ভগবানের কাছ থে.ক করুণা প্রার্থনা করত।

সেকালের নর্তকীরা কেউই প্রায় নিরক্ষর ছিল না। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার সুযোগ হয়ত তাদের জীবনে ঘটেনি। কিন্তু গৃহশিক্ষকের কাছে অনেকেই উর্দু ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করত।

প্রত্যেক নর্তকীরই একজন ওস্তাদ থাকত। এই ওস্তাদরা অনেক ক্ষেত্রেই নর্তকীদের অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। ওস্তাদদের নাচগান শেখাবার পারিশ্রমিক হিসেবে মাসিক আয় ছিল ৫০্ থেকে ৫০০্ পর্যন্ত।

সেকালের নর্তকীরা একরাত্রি নাচবার জন্য কমপক্ষে ৩০৲ টাকা থেকে ৬০৲ টাকা পেত। পারিশ্রমিক যতই হোক না কেন এরা পাবলিক বা প্রাইভেট যে কোন উৎসবে শুধু শোভাবর্ধনই করত না—উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলার এবং ঝিমিয়ে-পড়া মনটাকে চাঙ্গা করে তোলবার শক্তি এদের কন্ঠে ছিল। আর সেদিনকার ক'লকাতার ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে পাল্লা দেওয়া ও রেষারেষি এই সমস্ত নর্তকীদের মাধ্যমে জমে উঠত।

এরা যে কেবলমাত্র উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষেই নাচত—তা নয়। নিজেদের বাড়ীতেও এরা নাচগানের আসর বসাত। যারা সাধারণ লোক অর্থাৎ যারা নিজেদের বাড়ীতে নাচগানের বন্দোবস্ত করতে পারত না—তারা সাধারণতঃ এদের বাড়ীতে এসে গান শুনে যেত। এই শ্রোতারা গানের শেষে বাড়ীতে ফিরত একটা রঙীন স্বপ্ন ও আনন্দিত মন নিয়ে।

নর্তকী নিকী ছিল সে যুগের প্রধান আকর্ষণ। এই নর্তকী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নর্তকী হিসেবে শহর ক'লকাতার ধনী ব্যক্তিদের আসর মাতিয়ে রেখেছিল। এই সময়ের টুকরো টুকরো খবর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

"নিকী" সেকালের সমাজে এতবড় আকর্ষণ ছিল যে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকরাও তার সংবাদ পরিবেশনে কার্পণ্য করেননি। নিকী সম্পর্কে ১৮১৬ খৃঃ প্রকাশিত সংবাদটি নিম্নে প্রদত্ত হল:

"We had no opportunity on Monday evening of discovering in what particular house the attraction of any novelty may be found, but from a cursory view we fear that the chief singers "NIKHEE" and Ashroom, who are engaged by Neelmunnee Mullick and Raja Ram Chunder are still without rivals in melody and grace...."

রাজা রামচন্দ্র রায়ের প্রাসাদ। তিনদিন ধরে নাচগানের আসর চলেছে সেখানে। ক'লকাতার ধনী-নির্ধন, দেশী-বিদেশী সকলেই সেখানে উপস্থিত। কারণ, তৎকালীন শহর ক'লকাতার প্রধান নর্তকীর নৃত্য ও গান। সাহেবদের নিমন্ত্রণপত্র পাঠান হয়েছিল। তাঁরাও এসেছেন এই আসরে। কেবলমাত্র নাচগানই নয়—নানাবিধ খাদ্যসামগ্রীরও প্রচুর আয়োজন। সকলেই তৃপ্ত হলেন এবং মদিরা পান করে আনন্দিত হলেন। বাদশাহী পল্টনেরা ব্যাণ্ড বাজাল। এই নাচের আসরের আয়োজন করা হয়েছিল ২৬শে—২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। এই আসর অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য নর্তকীদের পরিচয় দিয়ে "ক্যালকাটা জার্ণাল"-এ ২২শে সেপ্টেম্বর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞাপনের একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল:

"....The friends of Maharaja Ramchunder Roy, and Baboos Nilmony and Bustom Das Muulick, ...ay indulge in anticipation of the highest gratification, from the arrangements which these gentlemen have respectively made, to render their mansions the scene of jocund festivity, and varied amusements. At an expense of no ordinary magnitude, they have retained for the occasion, groupes of the most celebrated female singers that have ever performed at this presidency; and those who have listened to the voluptuous melody and magic pathos of a NIKHI.....will require little inducement to partake once more of the festivities of the season.."

রাজা রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগান-বাড়ীতে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আয়োজিত নাচের আসরে নাচবার সৌভাগ্যও এই নর্তকীর জীবনে ঘটেছিল। এই আসরের বর্ণনা ও নিকীর উপস্থিতির সংবাদ ফ্যানী পার্কসের ভ্রমণ-কাহিনীতে বর্ণিত আছে:

"1823-May—The other evening we went to a party given by Ram Mohun Roy, a rich Bengalee baboo; the grounds, which are extensive, were well illuminated, and excellent fireworks displayed.

"In various rooms of the house *nachgirls* were dancing and singing. The style of singing was curious; at times the tunes proceeded finely from their noses; some of the airs were very pretty; one of them was *Niekee*, the catalani of the East."

একবার চিৎপুরের নবাব মিঃ নুজেফের জন্মদিন উপলক্ষে এক নাচের আসরের আয়োজন করেন। সেই আসরেরও প্রধান আকর্ষণ ছিল নর্তকী নিকী।

বিভিন্ন সাময়িক পত্র থেকে নর্তকী নিকী সম্পর্কে যে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করা যায় তা থেকে জানা যায় যে নর্তকী নিকী ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ক'লকাতায় ছিল। নিকী সম্পর্কে এই সময়ের পরের খবর আর জানা নেই।

একদিন এই নিকীর কন্ঠস্বর ও নাচের তাল ক'লকাতার একটি বিশেষ সমাজকে সুরের নেশায় বিভোর করে রেখেছিল। হয়ত কোন এক গভীর রাত্রে তার সুরের স্পন্দন আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত। একই ভাবনা বিদ্যুতচমকের মতো শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করে দিত। শ্রোতারা সুরের নেশায় মাতাল হয়ে উঠত।

॥ গতানুগতিক ॥

কোন চাঞ্চল্যকর সংবাদ নেই ভারতের রাজনীতিতে, সবই চলেছে গতানুগতিকভাবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখনও অসুস্থ তাই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় আবার তাঁকে যেতে হয়েছে কাশ্মীরে; ভারতের অর্থমন্ত্রী ভারতে অনুপস্থিত, ইউরোপে গিয়েছেন তিনি জাতীয় উন্নয়নকল্পে কিছু প্রাপ্তির আশায়। আর সেই সঙ্গে ইউরোপের খোলা বাজারে বৃটেনের যোগদানের ফলে ভারতের লাভ-লোকসানের সঠিক হিসাব ঠিকমত উপলব্ধির উদ্দেশ্যে। দেশরক্ষা-মন্ত্রী এখন দেশেই আছেন, আপাতত রাষ্ট্রসংঘে তাঁর উপস্থিত থাকার কোন প্রয়োজন নেই বলে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়েছিলেন কেরালায় সেখানকার সংযুক্ত মন্ত্রিসভার কোঁদল মেটাতে। তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি, ক্ষমতার লোভে অন্ধ শাসক-দল দুটির বড় তরফকে বোঝাতে পেরেছেন তিনি, বিধানসভায় সাময়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সব কথা নয়। যে শক্তির বিরুদ্ধে দল বাঁধতে হয়েছিল একদিন তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে মনে করার কোন কারণই ঘটেনি। বরঞ্চ লোকসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে তারা ক্রমবর্ধমান। এ অবস্থায় জোটভাঙার ঝুঁকি নেওয়া কোনমতেই উচিত হবে না।

ওদিকে পাকিস্তান-বিতাড়িত উদ্বাস্তুদের ভারতে আসা আগের মতই চলেছে, এবং উত্তর সীমান্তে চীনের অনুপ্রবেশও বন্ধ হয়নি ভারতের শত কড়া প্রতিবাদ সত্ত্বেও। ১০ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, ঐদিন সকালে চারশত চীনা সৈন্য লাডাকে একটি ভারতীয় ঘাঁটি অবরোধ করেছে এবং ভারত সরকারের অতি কড়া প্রতিবাদেও তারা কর্ণপাত করেনি। এর শেষ পরিণতি এই প্রসঙ্গ লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি, কিন্তু তা যে ভারতের অনুকূলে যাবে এতখানি আশা করার মত কোন কারণ এখনও পর্যন্ত ঘটেনি।

কেরালায় ক্ষমতাসীন দলগুলির আন্তঃ ও অন্তঃ বিরোধের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশেও অনুরূপ বিরোধ ঘনিয়ে উঠেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। এই অনৈক্য ও নৈরাশ্যের গতানুগতিকতার মধ্যে আশার সংবাদ পরিবেশন করেছে শুধু বাঙলা। বিধান-চন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব অপসৃত হলেই বাঙলার শাসকদলে সাংঘাতিক বিরোধ ও আত্মকলহের আশা বা আশঙ্কা পোষণ করত যারা তাদের সকলকেই অত্যন্ত নৈরাশ্যের বা আনন্দের সঙ্গে পূর্ব-ধারণা পরিবর্তন করতে হয়েছে। বাঙলার কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের সংযম ও বিচক্ষণতায় কংগ্রেসের নতুন নেতা নির্বাচনে সামান্যতম তিক্ততাও সৃষ্টি হয়নি। এর ফলে কংগ্রেস যে কতখানি সুনাম ও আস্থা অর্জন করল দেশবাসীর কাছে তা অনতিবিলম্বেই তার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

॥ পঞ্চাশ হাজার ॥

ভারতের সীমান্ত-প্রহরার ব্যবস্থা যে কি সাংঘাতিকভাবে দুর্বল তার একটি প্রমাণ সম্প্রতি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল ত্রিপুরার চীফ কমিশনারের উক্তি থেকে পাওয়া গেছে। তিনি বলেছেন, গত কয়েক বছরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাক মুশ্লিম কোন আইনসংগত প্রবেশপত্র ছাড়াই ত্রিপুরায় প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, কোন অনুমতিপত্র না দেখাতে পারার জন্য এ পর্যন্ত এগার হাজার মুশ্লিমকে পাকিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। ১৯৫১ সালের জনগণনার হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেছে, ত্রিপুরার অমরপুর নামক স্থানে গত দশ বছরে মুশ্লিম সংখ্যা বেড়েছে ২৪১·৯%, কমলপুর ও বেলো-নিয়ায় বেড়েছে যথাক্রমে ২১৭·৬% ও ১৭৮·১ শতাংশে। আসামে পাক মুশ্লিমদের সুপরিকল্পিত অনুপ্রবেশের ফলে সেখানে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। আরও একটি সীমান্ত রাজ্যের অবস্থার কথাও জানা গেল। এর শেষ পরিণতি কি তা বোঝা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু আমাদের রক্ষা-কর্তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার। নির্বিকার বললেও বোধহয় ভুল করা হবে, কারণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সম্প্রতি এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, কোন বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীকে যেন জোর করে উৎখাত করার চেষ্টা না হয়!

॥ আয়ুবশাহী ॥

পাক জাতীয় পরিষদের সদস্য, সর্দার আয়ুব খাঁর ভ্রাতা সর্দার বাহাদুর খাঁ রাজনৈতিক দল বিল সম্পর্কে আলোচনাকালে হঠাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, ১৯৫৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভার পতনের পর থেকে আজ পর্যন্ত পাকিস্তানে যত শাসনব্যবস্থার উত্থান-পতন হয়েছে তা সবই হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা ও নির্দেশানুসারে। এমনকি ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর "বিপ্লবের" মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে যে আয়ুবের জঙ্গী শাসন কায়েম হয় তারও পেছনে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গুলিহেলন। এমন কথাও সর্দার বাহাদুর খান বলেছেন যে, এতদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র যে পাকিস্তানের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে তা সে করেছে নিজেদের স্বার্থে পাকিস্তানের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে নয়।

আয়ুবশাহীর পেছনে যে যুক্তরাষ্ট্রের বলিষ্ঠ সমর্থন আছে তা কোন তর্কের অবতারণা করে প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, সংখ্যাতীত ঘটনার মধ্য দিয়ে তা সংখ্যাতীত বারই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আওতাবহ এই সরকারটি আজ যে পাকিস্তানে কি সাংঘাতিকভাবে ঘৃণিত ও ধিকৃত তা সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর যতদিন যাচ্ছে ততই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। লাহোর, করাচি, পেশোয়ার, ঢাকা আজ মুখরিত হয়ে উঠেছে আয়ুবশাহীর ধিক্কারে। দলমত-নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ এক একটি সভায় সমবেত হয়ে আয়ুবশাহীর অবসান ও পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছেন। অধুনালুপ্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব কায়ুম খাঁ প্রথমে জাতীয় পরিষদে, তারপর করাচি ও লাহোরের দুটি অর্ধ লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশে আয়ুব-শাসনের তীব্র সমালোচনার পর অগ্রসর হচ্ছিলেন ঢাকা অভিমুখে, কিন্তু তার পূর্বেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কায়ুম খাঁ কোনদিনই পাকিস্তানের জন-প্রিয় নেতা ছিলেন না। কিন্তু পাকি-স্তানের ঘৃণিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে-ছিলেন বলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এগিয়ে এসেছিল তাঁর ডাকে। জনতার ভয়ে-ভীত জনাব আয়ুব তাই তাঁকে আবার কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। এই-ভাবেই আজ পাকিস্তানের কারাগারগুলি পূর্ণ হয়ে আছে আব্দুল গফুর খান, আব্দুল সামাদ খান, জনাব সুরাবর্দী, মৌলানা ভাসানী প্রমুখ জনপ্রিয় নেতৃ-বৃন্দ ও সংখ্যাতীত রাজবন্দীতে। গত ৮ই জুলাই ঢাকায় সকল দলের আহ্বানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জন-

সভায় সদ্যমুক্ত আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন, সারা পাকিস্তানই আজ কারাগারে পরিণত হয়েছে।

আয়ুবশাহীর কাছে আবেদন জানিয়ে কোন লাভ নেই, কিন্তু এই জনসমর্থনহীন অবাঞ্ছিত শাসনের স্রষ্টা যারা, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আজ বোঝার দরকার যে, দেশের কোটি কোটি মানুষের সমর্থন যে সরকারের পেছনে নেই তাকে সমর্থন করার অর্থ পরিশেষে সেই দেশের মাটি থেকে চিরকালের জন্য বিতাড়িত হওয়া। চিয়াং কাইশেকের শোচনীয় পতন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের এ শিক্ষালাভ করা উচিত ছিল।

॥ ঊর্ধ্বাকাশে পরীক্ষা ॥

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ত একদিন ঘোষণা করেছিলেন, ঊর্ধ্বাকাশ সারা বিশ্বের সম্পদ, বিশেষ কোন জাতি নিজ প্রয়োজনে বা সামরিক প্রয়োজনে ঊর্ধ্বাকাশ ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের এই সুস্পষ্ট নীতি লংঘন করে যুক্তরাষ্ট্র গত ২৬শে এপ্রিল মহাশূন্যে প্রায় দুইশত মাইল ঊর্ধ্বে একটি এক মেগাটন শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। সে বোমার প্রতিক্রিয়া এতই তীব্র ছিল যে, পরীক্ষাস্থল জনস্টন দ্বীপ হতে ৭৫০ মাইল দূরে অবস্থিত হনলুলুতে ঐ বিস্ফোরণের আলো পরিলক্ষিত হয়। নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের বেতার-ব্যবস্থাও নাকি ঐ বিস্ফোরণের ফলে সাময়িকভাবে বিকল হয়ে যায়। পরমাণুবিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, বোমাটির তেজস্ক্রিয় ভস্ম আপাতত মহাশূন্যেই অবস্থান করবে কিন্তু বছরখানেক বাদে তারা পৃথিবীর বুকেই নামতে আরম্ভ করবে। যার ফল হবে বিষময়।

যুক্তরাষ্ট্রের এই পরীক্ষা যে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তবুও একথা সত্য যে, এর বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ আজ বিশ্বের চারিদিক হতে ধ্বনিত হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। তার কারণ বোঝাও কিছু কঠিন নয়। অনুরূপভাবেই গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ ক্রুশ্চেভ বিশ্বের জনমত উপেক্ষা করে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হতে একটি পাঁচ মেগাটন শক্তিসম্পন্ন বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। সুতরাং আজ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হতে এক মেগাটন বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার বিরুদ্ধে যত প্রতিবাদ উত্থাপনেরই চেষ্টা হোক না কেন বিশ্বের জনমত তাতে খুব বেশী সাড়া দেবে না। এবারের পরীক্ষার পর্যায় সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হতেই শুরু হয়েছিল, সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষাকে পৃথিবীর মানুষ তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া বলেই মনে করবে। সুতরাং এই ভয়াবহ পরীক্ষা বন্ধ হওয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের যদি সত্যই অন্তরের কামনা হয় তবে মস্কোতে বর্তমানে যে বিশ্ব-সম্মেলন হচ্ছে তাতেই তার ঘোষণা করা উচিত যে, শত প্ররোচনাতেও সোভিয়েট ইউনিয়ন আর পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে না। পাঁচ মেগাটন শক্তিসম্পন্ন বোমার সফল পরীক্ষাও তার পক্ষ হতে হয়ে গেছে। দরকার হলে ঐ বোমার জোরেই পৃথিবী নামক এই ক্ষুদ্র গ্রহটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া সম্ভব হবে তার পক্ষে। সুতরাং আরও মহাশক্তির সাধনা না করে সোভিয়েট ইউনিয়নের আজই ঘোষণা করা উচিত যে, পারমাণবিক পরীক্ষা তারা আর কোনদিনই করবে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হতে এই ধরণের একটা কথা জোর গলায় প্রচারিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও নিরস্ত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকবে না। ইতিপূর্বে যতদিন সোভিয়েট ইউনিয়ন সংযত থেকেছে যুক্তরাষ্ট্রকেও সংযত থাকতে হয়েছে। এই স্থিতাবস্থা আবার সোভিয়েট ইউনিয়নেরই ফিরিয়ে আনা উচিত। তাতে তার শক্তি ক্ষুণ্ণ হবে না, বাড়বে।

॥ কঙ্গো ॥

আবার কঙ্গোয় অশান্তি ঘনিয়ে উঠেছে। কঙ্গো ও কাতাঙ্গার সংযুক্তির জন্যে মিঃ আদুলা ও মিঃ শোম্বের মধ্যে এতদিন ধরে যে আলোচনা চলছিল তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ফলে আবার যদি গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় কঙ্গোয় তবে সেটা বিস্ময়ের কিছু হবে না। কিসের জোরে শোম্বে এতদিন কঙ্গোর কেন্দ্রীয় শাসনকে উপেক্ষা করে আসতে পেরেছেন তা রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ত এবার লন্ডন সম্মেলনে স্পষ্ট করেই বলেছেন।

তিনি বলেছেন, শোম্বের শক্তির আসল উৎস হল কাতাঙ্গার শ্বেতাঙ্গ খনি-মালিকদের টাকা। তিনি হিসেব করে দেখিয়েছেন, ১৯৬১ সালে শোম্বের কাতাঙ্গা সরকার বেলজিয়ান খনি-মালিকদের কাছে রাজস্বের নামে পেয়েছেন ৩ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার যা তাঁর মোট সরকারী ব্যয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। কাতাঙ্গা সরকারের মোট রাজস্বের পরিমাণ সাড়ে ছয় কোটি ডলার। অর্থাৎ বেলজিয়ান খনি-মালিকদের টাকার জোরেই শোম্বের পক্ষে আজও বারো হাজার সুসজ্জিত সৈন্য মোতায়েন রাখা সম্ভব হচ্ছে। অথচ স্বাধীনতা-চুক্তির সর্তমত বেলজিয়ান খনি-মালিকদের যে লভ্যাংশের ১৫% কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার কথা ছিল তার এক কপর্দকও তারা আজ পর্যন্ত দেয়নি। সুতরাং, উ থান্ত বলেছেন, শোম্বেকে যদি আজ বিচ্ছেদমূলক কার্যকলাপ হতে বিরত করতে হয় তবে সবার আগে শোম্বের শক্তির মূল উৎস বেলজিয়ান খনি-মালিকদের কাছ থেকে বছরে প্রায় চার কোটি ডলার পাওয়ার পথ তার বন্ধ করতে হবে।

॥ ঘরে ॥

৫ই জুলাই—২০শে আষাঢ় : কলিকাতা মহানগরীকে কলেরা বিমুক্ত করার জন্য কয়েকটি কার্যকরী ব্যবস্থা (ব্যাপক কলেরার টীকা দেওয়া, নলকূপ স্থাপন, আবর্জনা অপসারণ প্রভৃতি) অবলম্বনের সিদ্ধান্ত—কর্পোরেশন ও সরকারী প্রতিনিধিদের সম্মিলিত বৈঠকের প্রস্তাব।

কলিকাতার পার্শ্ববর্তী শিল্পসমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ শতকরা পনের ভাগ হ্রাস—ডি ভি সি (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন) কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়ার জের।

ব্যাঙ্ক ট্রাইব্যুনালের (দেশাই ট্রাইব্যুনাল) রোয়েদাদে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ব্যাপক অসন্তোষ।

৬ই জুলাই—২১শে আষাঢ় : চীন কর্তৃক কাশ্মীরের উপর ভারতের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার—লাডাক অঞ্চলে নূতন রাস্তা ও সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের সংবাদ—ভারত সরকার কর্তৃক চীনের বিরুদ্ধে নোটযোগে অভিযোগ।

৭ই জুলাই—২২শে আষাঢ় : প্রতিকূল আবহাওয়ায় প্রায় একশত যাত্রীসহ ইটালীয় জেট বিমান বোম্বাই অঞ্চলে ধ্বংস—পুণা হইতে ভূপালের পথে ভারতীয় বিমান বহরের একটি ক্যানবেরা বিমানও নিখোঁজ—বহু তল্লাসীর পর ৭ শত ফুট উচ্চ নির্মাগিরি পাহাড় শীর্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানের সন্ধান।

৮ই জুলাই—২৩শে আষাঢ় : পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতৃপদে অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত—শ্রীসেন কর্তৃক পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণের সংকল্প ঘোষণা।

৯ই জুলাই—২৪শে আষাঢ় : শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের (মুখ্যমন্ত্রী) নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ সম্পন্ন—সদস্যদের মধ্যে দপ্তর পুনর্বণ্টন।

গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে কলিকাতা হাইকোর্টের শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন—উদ্বোধক : ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রী বি পি সিংহ।

কেরলে কংগ্রেস - পি এস পি কোয়ালিশন সরকারই অব্যাহত থাকিবে—সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার্থ নূতন কমিটি গঠন—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর বিবৃতি।

১০ই জুলাই—২৫শে আষাঢ় : চীনা ফৌজ কর্তৃক লাডাকে ভারতীয় ঘাঁটি পরিবেষ্টিত—দিল্লীস্থ চীনা রাষ্ট্রদূতের নিকট ভারতের প্রতিবাদলিপি অর্পণ।

১১ই জুলাই—২৬শে আষাঢ় : ত্রিপুরায় অন্ততঃ ৫০ হাজার পাকিস্থানী নাগরিকের বসবাস—সাংবাদিকদের নিকট রাজ্যের চীফ কমিশনার শ্রী এন এম পট্টনায়কের উক্তি।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় পুনরায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

মাগগী ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে বোম্বাই-এ ৩০ সহস্রাধিক মিউনিসিপ্যাল কর্মীর ধর্মঘট।

॥ বাইরে ॥

৫ই জুলাই—২০শে আষাঢ় : বর্মী বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক সমগ্র ব্রহ্মদেশে একটি মাত্র সুসংহত দল গঠনের পরিকল্পনা।

এক বিবাহ আইন বলবৎ রাখার জন্য পাকিস্থানের বিভিন্ন স্থানে মহিলাদের দলবদ্ধ বিক্ষোভ।

৬ই জুলাই—২১শে আষাঢ় : বিশ্ববিশ্রুত মার্কিণ ঔপন্যাসিক নোবেল সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ী উইলিয়াম ফকনারের (৬৪) জীবনাবসান।

অধুনালুপ্ত পাক্ মুস্লিম লীগের এককালীন সভাপতি খান আব্দুল কায়ুম খান লাহোরে গ্রেপ্তার।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়কের হত্যাকারী সোমরামার শেষ পর্যন্ত ফাঁসি।

আলজিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা ঘনীভূত—অস্থায়ী সরকার-বিরোধী দল কর্তৃক সমগ্র ওরান এলাকা দখলের দাবী।

৭ই জুলাই—২২শে আষাঢ় : রেঙ্গুণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর নিরাপত্তা বাহিনীর গুলীবর্ষণ—১৫ জন নিহত ও ২২ জন আহত—১৪৪ ধারা ও কার্ফু জারী—অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ।

৮ই জুলাই—২৩শে আষাঢ় : পাকিস্থানে আয়ুবী (পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান প্রবর্তিত) শাসনতন্ত্রের অবসান ও পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দৃঢ় দাবী—ঢাকায় বিরাট সমাবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদী নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে জনমত ব্যক্ত।

চীনা অঞ্চলে ভারতীয় ফৌজের হামলার অভিযোগ—ভারত সরকারের নিকট চীনের লিপি প্রেরণ।

পশ্চিম ইরিয়ানে ইন্দোনেশীয় বাহিনী কর্তৃক আরও দুইটি সহর (আটিমো ও আইপাক) দখলের সংবাদ।

৯ই জুলাই—২৪শে আষাঢ় : আমেরিকা কর্তৃক প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় এক মেগাটন শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ—অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ফিলিপাইনে বেতার সংযোগ ছিন্ন।

মস্কো-এ নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ—ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের যোগদান।

১০ই জুলাই—২৫শে আষাঢ় : 'নূতন বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা এখনও সত্যই বিদ্যমান'—নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি সম্মেলনে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের ঘোষণা—আমেরিকার সাম্প্রতিক আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা মানবজাতির প্রতি চ্যালেঞ্জ বলিয়া মন্তব্য।

মহাশূন্যের মাধ্যমে টেলিভিশন প্রেরণের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে আমেরিকা কর্তৃক 'টেলস্টার' উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন।

'যে-কোন উপায়ে বিশ্বযুদ্ধ বাধাইতে আমেরিকার অভিসন্ধি : প্রয়োজনে কাশ্মীর প্রশ্ন ও পাকিস্থানের অস্তিত্ব বিসর্জনেও প্রস্তুত'— রাওয়ালপিণ্ডিতে আয়ুব খানের (পাক্ প্রেসিডেন্ট) ভ্রাতা সর্দার বাহাদুর খানের অভিযোগ।

১১ই জুলাই—২৬শে আষাঢ় : আলজিরীয় নেতৃবৃন্দের আত্মকলহের অবসান—অস্থায়ী ইয়ুসুফ বেন খেদা সরকার কর্তৃক দলত্যাগী আমেদ বেন বেল্লার উপদলের দাবী স্বীকার।

মার্কিণ কৃত্রিম উপগ্রহ 'টেলস্টার' মারফৎ মহাকাশ হইতে পৃথিবীতে টেলিভিশনযোগে ছবি ও শব্দ প্রেরণের দাবী।

অভয়ংকর

॥ হে মহাজীবন ॥

গান্ধীজীর জীবন-নাট্য আজ চিত্র-নাট্যের বিষয়-বস্তু। যে উপন্যাসটির চিত্ররূপ নিয়ে চারদিকে নানা রকমের আলোচনা এবং প্রতিবাদের ঝড় প্রবাহিত তার নাম 'NINE HOURS TO RAMA' এবং এই উপন্যাসের লেখকের নাম ষ্ট্যানলী ওলপার্ট। ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮-এ যে কয়েক ঘণ্টা 'নাটুরাম' (নাথুরাম গড়্সে) দিল্লীতে কাটিয়েছে, তারপর 'গুপ্ত হাউসে' (বিরলা হাউসে) গিয়ে সেই নৃশংস কান্ড করেছে, এ তারই কাহিনী। যে-নিদারুণ শোকাবহ ঘটনা ভারত এবং ভারতের বাইরেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এ সেই শোকাবহ ঘটনার ভিত্তিতে রচিত কাহিনী। গডসে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে ঘুরছে, সে জানে যে পুলিশ তার পিছনে ঘুরছে। কিন্তু গডসে এই কাহিনীতে নির্বোধ কান্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি নয়, সে রীতিমত "হীরো"। চরিত্রটির পরিকল্পনা ত্রুটি-পূর্ণ। অধিকাংশ চরিত্রই অতিরঞ্জিত, বিশেষ করে গডসে চরিত্র একেবারে অবাস্তব। "Society of Nation Saviours" নামক এক প্রতিষ্ঠানের সে সদস্য। একদা জনৈক বৃটিশ অফিসর ভারতীয় সেনা বিভাগে তাকে গ্রহণ না করে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। তারই প্রতিক্রিয়ায় এই 'সোসাইটি' গঠনে সে উদ্যোগী হয়। সে মদ্যপান করে, চমৎকার সুন্দরী এক 'সোসাইটি'-গার্লের সংগে তার ঘনিষ্ঠতা, সে জনৈক টেনিস চ্যাম্পিয়নের স্ত্রী। তারপর এই 'নাটুরাম' তার কুকীর্তির দু-তিন ঘণ্টা আগে গণিকালয়ে কাটাচ্ছে, কারণ তার চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর কোথায়?

এই রকম অতিরঞ্জিত চরিত্র ভারতের ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার শ্রীযুক্ত শংকরাচার্য রাও, বিরোধী দলের নেতা 'শ্যামা প্রহ্লাদ' (শ্যামাপ্রসাদ), তারপর দিল্লী জংশনের ষ্টেশনমাষ্টার, 'সোসাইটি অব নেশন স্যাভিয়রসের' পৃষ্ঠপোষক মহারাজ শিবাজী রাও, তিনি যে 'পান' তৈরী করেছিলেন তা রাজোচিত। বোম্বাই শহরে তার দাম এক•খিলি একশো টাকা। এই রকম কৃত্রিমতায় সারা গ্রন্থটি পূর্ণ। ইংরাজী ভাষার ভারতীয় লেখকগণ একজাতীয় 'ওরিয়েণ্টাল' ফিকস্যন রচনা করেন যার মাথা ও মুণ্ডু কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু মিস মেয়ো-মার্কা এইসব উপন্যাসের বিদেশের বাজারে চাহিদা বেশী। হলিউডও ত' এই রকমই চায়। তাই গান্ধীর চলচ্চিত্র এমন তোড়জোড় করে তোলার আয়োজন হয়েছে।

গান্ধী-হত্যার কাহিনীকে তিনশত পৃষ্ঠার এক উপন্যাসে পরিণত করেছেন। কে একজন বলেছিলেন যে, গোঁপ্ত ও গল্প দুই-ই টানলে বাড়ে। তাই এই গান্ধী-হত্যার কাহিনীকে টেনে অনেক বাড়ানো হয়েছে, অনেক কথা এর মধ্যে দিতে হয়েছে। যার ফলে ঐতিহাসিক সত্য ম্লান হয়ে গেছে। তবু কি যে সত্য তা এদেশের মানুষও বোধকরি আজো জানে না!

এই মার্কিণ লেখক কিন্তু এদেশে এসেছেন, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যেটুকু তথ্য পাওয়া সম্ভব তা সংগ্রহ করেছেন এবং দিল্লী, পুণা, নাসিক এবং নাথুরাম গডসের অন্যান্য আড্ডা ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি বিদেশী সে হিসাবে কিছু পরিমাণে কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। ওলপার্টের এই উপন্যাসটিকে দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিচার করতে হবে, প্রথম এটি একটি আধা-ডকুমেণ্টারী উপন্যাস, দ্বিতীয় মানবীয় ভাবাবেগের এক প্রতিচ্ছবির শিল্পসম্মত রূপায়ণ। তাহলে অবশ্য চরিত্রগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য এবং প্লটটি যুক্তিসংগত করা উচিত। এই দুদিক থেকে মিঃ ওলপোর্ট একটা ভালো এবং মন্দের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। তিনি অবশ্য তাঁর উপন্যাসের ভারতীয় পাত্র-পাত্রী সম্পর্কে হাস্যকর ভুল করেছেন, 'লোকাল কালার' দিতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খেয়েছেন, তবে মানবীয় মনোভংগী সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

মদ্যপ নাটুরাম গড্সে এবং নারী-হৃদয়-বিজয়ী ক্যাসানোভা। কাহিনীর পাত্র-পাত্রী ফ্ল্যাসব্যাকে অতীত জীবনের কথা বলে, দিবাস্বপ্নের মেজাজে সবাই আত্ম-চিন্তনে মগ্ন হয়ে যায়। এই বর্ণনা-ভঙ্গিতে কিন্তু মিঃ ওলপার্ট বেশ দক্ষতার পরিচয় দান করেছেন। সংলাপকে জোড়াতালি দিয়ে, আর চেতন-প্রবাহের তড়িৎ-তরংগে প্রাণোচ্ছল করে তুলেছেন। বিংশ শতাব্দীর যে সব লেখক-গড়া কারখানা সৃষ্টি হয়েছে সেই সব ওয়ার্কসপ-মার্কা উপন্যাসকারের বৈশিষ্ট্য মিঃ ওলপার্টের রচনায় পাওয়া যায়। আসল গডসে সম্পর্কে জানা যায় যে, সে ছিল উদাসীন প্রকৃতির, তার সহচর আপ্তেকে দেখানো হয়েছে একটা ভাবপ্রবণ দুর্বল মানুষ হিসাবে। আসল মানুষটি কিন্তু সুরা এবং নারীর উপাসক ছিল। গডসে এবং আপ্তের সংগে যাদের পরিচয় ছিল এমন মানুষ নিশ্চয়ই বিরল নয়, তাদের এই উপন্যাস সম্পর্কে কি প্রতিক্রিয়া তা অনুমেয়।

গান্ধীজীর পরিচিত আকৃতি কিন্তু এই উপন্যাসে রূপায়িত। এক আধুনিক যীশুখৃষ্টের চরিত্রের রূপায়ণ। হত্যার দৃশ্যটি যীশুর জীবনের মতোই হৃদয়বিদারক। এই কয়েকটি পৃষ্ঠায় অতলান্তিকের কূল থেকে ভারতের মাটিতে উপন্যাসের উপজীব্য অনুসন্ধানে লেখকের আগমনের সার্থকতা সূচিত হয়। গান্ধীজীর প্রতি লেখকের একটা ব্যক্তিগত অনুরাগ এই অংশে অতিশয় সুন্দর ফুটেছে।

এই অংশে লেখকের কল্পনা সেই সন্ধ্যায় গডসের মনোভাব চিত্রণের এক প্রচেষ্টায় আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করেছে। গান্ধী-হত্যার পর গড্সের অন্তরে নাকি একটা পরিবর্তন এসেছিল, ভারত সরকারের নথিপত্রে অবশ্য মানুষ গডসে সম্পর্কে কিছুই জানার উপায় নেই। যীশুখৃষ্টের মত স্বয়ং গান্ধীজীও হয়ত তাঁর হত্যাকারীকে ক্ষমা করতেন। জর্জ বার্ণাড শ উৎকণ্ঠিত হয়ে জানতে চেয়েছিলেন গান্ধীজীর হত্যাকারীর কি হবে? পণ্ডিত নেহরু তার উত্তরে বলেছিলেন ফাঁসী হবে এবং দু-চারজন এ রকম মারা গেলে কিছুই এসে যায় না। এই সব চিঠিপত্র জওহরলাল নেহরুর 'পত্রগুচ্ছ' পাওয়া যাবে।

মিঃ ওলপার্ট হত্যাকারীর রূপান্তরের এক বিচিত্র চিত্র এঁকেছেন। ওলপার্টের এই উপন্যাসটি পড়া শেষ হলে তবে লেখক হিসাবে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিচার করা সম্ভব এবং গান্ধীজীর পন্থায় তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা করা যায়।

মিঃ ওলপার্ট মহাত্মা গান্ধীর জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্য সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল। গবেষণামূলক উপন্যাস রচনায় ফাঁক এবং ফাঁকি দুই-ই আছে, ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করে যদি সমালোচক লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহলে লেখক বলেন, এ আমার নিছক উপন্যাস, সেই হিসাবেই এর বিচার, আর যদি উপন্যাসের ত্রুটি প্রদর্শন করা হয় তখন লেখক বলবেন, এ ত্রুটি-ইতি-

হাসের, আমি কি করব। মিঃ ওলপার্টেরও সেই সুবিধা আছে। তিনি গবেষণা করেছেন, ঘটনাস্থলে ঘুরে 'লোক্যাল কালার' সন্ধান করেছেন, তারপর উপন্যাস লিখতে বসেছেন।

গড্সের জীবনের পটভূমি, তার প্রেম, তার সামরিক বিভাগে চাকুরির প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে উপন্যাসটির অনেকগুলি পৃষ্ঠা নষ্ট করা হয়েছে। তবে যদি এই ত্রুটিটুকু উপেক্ষা করা যায় তাহলে লেখককে প্রশংসা করতেই হয়। আগেই বলেছি ইংরাজী ভাষার ভারতীয় লেখকগণ এর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট ধরণের ভুল তথ্যবিশিষ্ট উপন্যাস রচনা করেছেন। জন মাসটার্স ত' এদেশী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, তাঁর উপন্যাসগুলি কি? এমন কি শক্তিমান সাহিত্যিক এ জে ক্রোনিনের ভারতীয় পটভূমিতে রচিত সাম্প্রতিক উপন্যাসও তৃতীয় শ্রেণীর রচনা মনে হয়। ওলপার্টের নাট্য-জ্ঞান আছে, নাটকীয় ভঙ্গিতে পরিবেশনের জন্য উপন্যাসটি আকর্ষণীয় হয়েছে।

পুলিশ অফিসর গোপালদাস এই হত্যাকাণ্ড নিবারণে ভীষণ চেষ্টা করেছিলেন। বিপ্লবী গুরুদেব ধোনদো কানেতকর (নিঃসন্দেহে বীর সভারকরের আদর্শে গঠিত চরিত্র) এমন সব ঘটনা সৃষ্টি করেছেন যে তার একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি এই হত্যাকাণ্ড। ভারতীয় দৃশ্যাবলীর বর্ণনায় মিঃ ওলপার্ট কিন্তু অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই। সুখপাঠ্য এবং মনোরম এই বর্ণনাভঙ্গি পাঠককে মুগ্ধ করে। গান্ধী-হত্যার কাহিনী যেন গ্রীক ট্রাজেডির ছাঁচে গঠিত। মিঃ ওলপার্ট গড্সেকে এই বিয়োগান্ত কাহিনীর জুডাস করে এ'কেছেন, নতুন যুগের যীশুখৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে এই জুডাস। তবে এ-যেন একটা ডিটেক্টিভ কাহিনী। যে বিচিত্র মহাজীবন-কথা টমাস ম্যান, প্যার লাগেরকভিস্ট কিংবা রোমাঁ র'ল্যার মত লেখকের যোগ্য বিষয়-বস্তু সেই কাহিনী এক মার্কিণ লেখক-কারিগরের হাতে পড়ে উপন্যাস হয়েছে কিন্তু শিল্পকর্ম হয়নি।

বিরলা হাউসের প্রাঙ্গণে ৩০শে জুনের অপরাহ্নে যে মহাজীবনের জীবনাবসান ঘটেছে তার কাহিনী রচনা করার যোগ্য লেখক নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে বিরল নয়। আজো সেই প্রচেষ্টা যে কেন হয়নি তাই ভাবি। *

* **NINE HOURS TO RAMA — (NOVEL) By Stanley Wolpert Publishers: Hamish Hamilton — Price 18 Shillings.**

জাতীয় কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব

যে সকল প্রতিভাধর মনীষীকে বক্ষে ধারণ করে বাংলা তথা ভারত গৌরবান্বিত জাতীয় কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁদের অন্যতম। আজ হতে শতবর্ষ পূর্বে জন্মগ্রহণ করে তিনি দেশপ্রেমের সঞ্জীবনী মন্ত্রে দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আজ ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬৯ (২০শে জুলাই, ১৯৬২) তাঁর ৯৯তম জন্মবর্ষপূর্তি দিবস। এই দিনে কবির জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন করে এক বৎসরব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতিপূজার আয়োজন করা হয়েছে।

সাহিত্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের অবদান অপরিসীম। যখন বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্র-প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর সেই যুগেও দ্বিজেন্দ্রলালের কবিকৃতি স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল। দ্বিজেন্দ্রলালের কলা-নৈপুণ্য ছিল অভিনব। তিনি বিগত যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক কবি ছিলেন। হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গ কবিতায় ও গানে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন অদ্বিতীয়। বাংলা নাটকে ইংরাজী আঙ্গিক ও রীতি প্রবর্তন করে তিনি বাংলা নাট্য-সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

এই জাতীয় কবির উত্তরাধিকারী হিসাবে বাঙালীর যে মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা স্মরণ করে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম-শতবর্ষ পালন করার জন্য কবির জন্মস্থান কৃষ্ণনগরে "দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জন্ম-শতবার্ষিক পরিষদ" গঠিত হয়েছে। এই পরিষদের পক্ষ হতে বর্ষ-ব্যাপী অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে জন্ম শত-বার্ষিক উৎসব পালনের এবং কবির স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

'কৃষ্ণনগর দ্বিজেন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি' কর্তৃক সংগৃহীত ভূমিখণ্ডে 'দ্বিজেন্দ্র ভবন' নির্মাণ ও কবির মর্মর মূর্তি স্থাপন করে ভবন মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত যাবতীয় গ্রন্থাবলী, কবির জীবনী ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কীয় আলোচনামূলক পুস্তকাদির একটি গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা, চিঠিপত্র এবং পাণ্ডুলিপির একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করা হবে। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের উপর গবেষণাদির সুযোগ সুবিধাও এখানে থাকবে।

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে কবির গ্রন্থাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট এবং বৃহত্তর নাট্যসাহিত্য গবেষণার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দ্বিজেন্দ্র অধ্যাপক' পদ সৃষ্টি করার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট পরিষদের পক্ষ হতে আবেদন জানান হয়েছে।

কবির জন্মভূমি কৃষ্ণনগরে সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাটক অনুষ্ঠান, দ্বিজেন্দ্র-নাটক প্রতিযোগিতা, দ্বিজেন্দ্র মেলা এবং দ্বিজেন্দ্র বক্তৃতাবলী প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বর্ষব্যাপী উৎসব পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া একখানি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশ করা হবে।

পরিকল্পিত অনুষ্ঠানাদি এবং স্থায়ী স্মৃতিরক্ষা কার্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হলে অন্যূন দুই লক্ষ টাকা প্রয়োজন। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষে এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করা সাধ্যাতীত। সেজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিকট অর্থসাহায্যের জন্য পরিষদ অনুরোধ জানিয়েছেন। এক বৎসর ধরে পরিষদের সাধারণ সভ্য করা হবে—সাধারণ সভ্যের চাঁদা এক টাকা। তদুপরি দ্বিজেন্দ্র-অনুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট এককালীন দানের জন্যও পরিষদ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন।

হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ— প্রথম খণ্ড। সুধীরকুমার মিত্র। মিত্রানী প্রকাশন, ২ কালী লেন, কলকাতা-২৬। দাম নয় টাকা।

সুধীরকুমার মিত্র প্রণীত 'হুগলী জেলার ইতিহাস' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। ১৯৬২তে পরিমার্জিত

হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ
সুধীরকুমার মিত্র

ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশকালেই গ্রন্থটি বাঙলাদেশের পত্রপত্রিকা ও গুণীজনের দ্বারা বিশেষ অভিনন্দন লাভ করে।

হুগলী জেলার ইতিহাস ঐতিহ্যমণ্ডিত। বাঙলা তথা ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় হুগলীর অবদান অসামান্য। রেলওয়ে, কাগজ কল, মুদ্রাযন্ত্র, বাঙলা হরফ, মুদ্রিত পুস্তক, সংবাদপত্র, চটকল, সাময়িকপত্র প্রভৃতি ভারতের মধ্যে প্রথম হুগলীতেই দেখতে পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ বাঙালী সন্তানদের মধ্যে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল, বিহারীলাল চক্রবর্তী, টেকচাঁদ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গিরিশচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, রামকৃষ্ণ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির জন্য হুগলী জেলা গৌরবান্বিত। প্রাচীন রাঢ়দেশ, প্রকৃতি-পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক বিবরণ, যাতায়াত ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য—এই অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে প্রাচীন ও বর্তমান যুগের হুগলী জেলা তথা প্রাচীন বাঙলার নানাবিধ রূপটি খুব সহজেই ধরা যাবে। পুরানো ইতিহাসের নীরস আলোচনা না হয়ে গ্রন্থখানি সরস সুখপাঠ্য রূপলাভ করেছে তার জন্য অভিনন্দনযোগ্য লেখকের অকৃত্রিম সদিচ্ছা এবং অধ্যবসায়। সংগৃহীত পুরাতত্ত্বের তথ্যগুলি সরস বর্ণনা ভঙ্গিমার মাধ্যমে অনেক সজীব হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থটির সাহিত্য প্রসঙ্গ আলোচনাকালে ৪৭১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে 'উদীয়মান লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে মাহেশের শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (ওরফে বনফুল)......।' ১৯৬২ সালে প্রকাশিত কোন গবেষণামূলক গ্রন্থে যদি বনফুলকে উদীয়মান লেখক বলা হয় তবে তা শ্রুতিকটু লাগে। হুগলী জেলার খ্যাতনামা কবিয়াল রঘুনাথ দাস, লালুনন্দন মাল, রাসুনৃসিংহ, নীলমণি পাটনী, নিত্যানন্দ দাসবৈরাগী, ভোলা ময়রা, বলাই বৈষ্ণব, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী, নিধুবাবু, রামনিধি গুপ্ত, সর্বানন্দ পারিয়াল, শ্রীধর কথক, কালি মির্জা, রসিকচন্দ্র রায়, গোরক্ষনাথ যোগী, গোবিন্দ অধিকারী—এ'দের অবদান বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৮ সালের সংস্করণে অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী সম্পর্কে সামান্য আলোচনা ছিল ৭১৪ পাতায়। বাকি কয়েকজন সম্পর্কে গ্রন্থকার উদাসীন দেখলাম। ১৭৩৯ সালে মারাঠাগণ কর্তৃক হুগলী অধিকারের কোন বিবরণ নেই। ফরাসী, ওলন্দাজ, জার্মান ও বেলজিয়ান প্রভৃতি যারা হুগলীতে

বিবিধ কারণে এসে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করে ভারতীয় সভ্যতার মূলকেন্দ্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাদের সম্পর্কে এরূপ সংক্ষিপ্ত উল্লেখ বা অনুল্লেখ সত্যই বিস্ময়কর। এগুলি আলোচ্য বৃহদায়তনের ইতিহাসধর্মী গ্রন্থের অন্যতম ত্রুটি মনে করলে অন্যায় হবে না।

দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থকারের আলোচ্য বিষয়সমূহের সূচী এই খণ্ডে দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে বর্তমান খণ্ডের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থেকে যেতো না। যাই হোক সুধীরবাবু যে মূল্যবান কাজে হাত দিয়েছেন তা আরও ত্রুটিমুক্ত ও ত্বরান্বিত হোক এই কামনা করি। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর। গ্রন্থটিও নানাবিধ অলংকরণে সুশোভিত।

পথের সঞ্চয়— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

আলোচ্য . গ্রন্থটি শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ হিসাবে নতুনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নোবেল প্রাইজ পাবার ঠিক এক বছর আগে ১৯১২ সালে বিদেশযাত্রার প্রারম্ভে ও পথে এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার পরিভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন সেগুলিই আলোচ্য গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। শতবর্ষপূর্তি সংস্করণে ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি এরকম সাতটি প্রবন্ধ সংযুক্ত হয়েছে। পথের সঞ্চয় গ্রন্থটি নানা কারণে প্রণিধানযোগ্য। এই বইতেই কবি য়েট্স্, স্টপফোর্ড ব্রুক, সি. এফ. এন্ড্রুস সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান প্রবন্ধগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে। তাছাড়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ক্রমপরিবর্তনশীল যে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ তার প্রথমদিককার সূত্রপাত দেখা যায় এই গ্রন্থে। আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বজনীনতার আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমস্যাকে বিচার করার রবীন্দ্রনাথের যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী তার চমৎকার নিদর্শন মেলে পথের সঞ্চয়ের নিবন্ধগুলিতে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের বহু চিন্তাসূত্রের বীজ নিহিত রয়েছে এখানে। রচনার ঢঙ সেই ছিন্নপত্র বা শান্তিনিকেতন বক্তৃতাবলীর মত সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর অথচ গভীর তত্ত্বজিজ্ঞাসায় ভরা। আলোচ্য গ্রন্থে কবি য়েটস্-এর রোদেনস্টাইন অঙ্কিত প্রতিকৃতি ও স্টপফোর্ড ব্রুক এবং এলমহার্স্টের দুটি চিত্র অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বইটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়েছে। পথের সঞ্চয়ের এই নূতন সংস্করণকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য (গবেষণা গ্রন্থ) — শান্তিকুমার দাশগুপ্ত। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১ শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা-৬। দাম দশ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করে লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, ফিল উপাধি লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটক নিয়ে পূর্ববর্তী আলোচকগণ রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমাকালে এ সমস্ত নাটকের যে আলোচনা করেছেন তাকে যথেষ্ট বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বলা যায় না। সেক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থটি ব্যতিক্রম। সমগ্র আলোচনাটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে প্রতীকবাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রতীকের প্রয়োগ, প্রতীকবাদী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতীকবাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিশিষ্ট পাশ্চাত্য কবি, সমালোচক ও মনস্তত্ত্ববিদগণের বক্তব্যসহযোগে প্রতীকের সঙ্গে স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে প্রতীকের প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষক যে মনোজ্ঞ ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন সাম্প্রতিককালে এরূপ গভীর ও পরিশ্রমী প্রচেষ্টা খুব কমই চোখে পড়ে। এ পর্যায়ের তৃতীয় আলোচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে প্রতীকবাদী আন্দোলন সুরু হয় সেই প্রতীকবাদী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার যোগাযোগ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ, রথের রশি—এই নয়টি রূপক নাটক নতুনভাবে বিচার করে রবীন্দ্রমানসের সামগ্রিক পরিচয় উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন। পূর্ববর্তী বিভিন্ন ব্যক্তির নানাবিধ আলোচনা উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমান গ্রন্থকার যে নতুন সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। তৃতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নাটকে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক ব্যবহারের বৈচিত্র্য ও রবীন্দ্রমানসের সক্রিয়তা এবং রবীন্দ্র-নাট্যকলার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষক রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রসঙ্গে এই যে আলোচনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য অনুরোধ জানাই।

গ্রন্থটির একটি ত্রুটি উল্লেখ করব। বিদেশী নামোচ্চারণে যথার্থতার অভাব দেখা যায়। তা সত্ত্বেও যতদূর মূলানুগ হওয়া সম্ভব তার চেষ্টা করা উচিত। বিশেষ করে যে কোন গবেষণা গ্রন্থ যা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কোনরূপ উপাধি দ্বারা পুরস্কৃত তা ত্রুটিমুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভীলে গ্রীফীন নয় ফিলে গ্রীফীন, জুলস্ লাফর্গ নয় জুল্ লাফর্গ, বেনদেত্তো ক্রোচে নয় বেনেদেত্তো ক্রোচে, পল ভেরলেইন নয় পল ভেরলেন (দুরকম উচ্চারণই গ্রন্থমধ্যে আছে) সোয়েডেনবার্গ নয় সুভেডেনবার্গ, ভিলিয়ার্স ডিল' আইল-আডাম নয় ভিইয়ার দ্য লিল্-আদাম, জেরার্দ দ্য নের্ভাল নয় জিরার দ্য নেরভাল। যে কোন গবেষণা গ্রন্থের পক্ষে এইটি নিশ্চয়ই অমার্জনীয় ত্রুটি। বিশেষ করে যখন কোন কোন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও পণ্ডিত ব্যক্তি এ সমস্ত গবেষণার পরীক্ষক থাকেন।

বাঁধাই ও মুদ্রণ সুন্দর।

অপরাহ্নের নদী (গল্প সংকলন)— মিহির আচার্য। বুক সোসাইটি, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

সাম্প্রতিক কালের কথাশিল্পীদের মধ্যে মিহির আচার্য অন্যতম শক্তিশালী লেখক। যে জীবন-দর্শন তাঁর শিল্পজগতে উপস্থিত, সেখানে বিশ শতকের নতুন চিন্তাবোধ-জীবনজিজ্ঞাসা সার্থকভাবে রূপায়িত। এখানে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার ঘটেছে এক অপূর্ব সমন্বয়। শিল্পের প্রতি সততাবোধই মিহিরবাবুর শিল্পচেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অলোচ্য গ্রন্থে 'নির্বাণীতোষের গল্প', 'ঘরণী', 'একটি বিমর্ষ কাহিনী' 'রাতের সব তারাই', 'অপরাহ্নের নদী', 'অজগর', 'শতাব্দীর শব'—এই সাতটি গল্প স্থান পেয়েছে। 'অজগর' একালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প। 'পৃথিবীতে একটা মানুষকে আজ তুমি কল্পনা করতে পারবে যে, তার আত্মাকে বিক্রি করেনি।' — কালের জটিল জীবন-যন্ত্রণা বড় করে তুলল, তারই অপরূপ আলেখ্য এ গল্পটি। জয়নারায়ণ জৈবিক তাড়নায় নিজেকে বাঁচাবার জন্য দেয়াল আঁকড়ে ধরে ছিল সত্যি— কিন্তু ঐ একই তাড়নায় আমরা প্রতিনিয়ত বিব্রত এবং বিশ্বাসহীন আত্মপ্রেমিক। 'শতাব্দীর শবে' সাহসিকতার মধ্য দিয়ে যে নতুন কথা বলা হয়েছে সে শক্তি একালের সকল শিল্পীর নেই। মোটকথা যুদ্ধোত্তর কালের জটিলতায় মানুষের জীবন যে বহুমুখী অপরিসীম যন্ত্রণা আর বিভ্রান্তিতে পর্যবসিত মিহিরবাবুর কয়েকটি গল্পে তা সার্থকভাবে রূপায়িত। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের যে জীবন তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তার মধ্যে জীবন সচেতনতা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। হাল্কা প্রেম-কাহিনীর চটুলতা তাঁর রচনায় কমই চোখে পড়ে।

মিহিরবাবুর অপর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বক্তব্যের ঋজুতা। স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক বর্ণনাকুশলতায় প্রতিটি গল্পই বাঙলা ছোট গল্পের ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে

দেয়। অতিরিক্ত চাতুর্যের দ্বারা নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ এবং পাঠক ঠকানোর আত্মম্ভরিতা তাঁর নেই। তাঁর শিল্প-সার্থকতা এসেছে সার্থক জীবন-দর্শনের জন্যে।

বহু বিচিত্র (সঞ্চয়ন গ্রন্থ)—সৈয়দ মুজতবা আলি। প্রকাশক—গ্রন্থ-প্রকাশ। ৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলিকাতা—৯। দাম ছয় টাকা।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশক বলেছেন, "সৈয়দ মুজতবা আলি সিদ্ধ-লেখনী হাতে নিয়ে সাহিত্য-নিবন্ধ রম্য-রচনা কবিতা—সর্বক্ষেত্রে তাঁর অনায়াস রমণীয় বিচরণ। সমাজ-সমস্যা দার্শনিক-তত্ত্ব এমন কি রাজনীতিও তাঁর অনধিগম্য নয়। বৈদগ্ধ্য আশ্চর্যরূপে সরস ও লঘুপাচ্য করে তিনি পরিবেশন করেন।" এই সঞ্চয়নগ্রন্থে সৈয়দ মুজতবা আলির বিভিন্ন গল্পগ্রন্থ ভ্রমণকথা, উপন্যাস এবং কবিতার সুনির্বাচিত সংকলন পরিবেশিত। বাংলাভাষায় রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী 'বিচিত্রা' প্রকাশ করেছেন, তার দামও সস্তা। এই গ্রন্থটিও সেই জাতীয় 'Bedside Book'—তবে মূল্য কিছু বেশী মনে হয়।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

শ্রীমতী—সম্পাদিকা বাণী ঘোষ। ১২৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

'শ্রীমতী' সচিত্র মাসিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। এবং আলোচ্য সংখ্যাটিই এর প্রথম সংখ্যা। বিচিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব রয়েছে। গল্প লিখেছেন মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, প্রতিভা বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিদুর গুপ্ত। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর একটি মনোরম রম্য-রচনা 'ভীমবলশ্রী' অনেককেই আকর্ষণ করবে। বিধন দত্ত, অলকা সিংহরায়, বিনতা রায় প্রভৃতির কয়েকটি আলোচনা আছে। রঙিন চিত্রমুদ্রণে কয়েকটি রচনাশোভিত পত্রিকাটির অন্যতম ত্রুটি সুন্দর অলঙ্করণের অভাব। দামী কাগজে সুমুদ্রিত এ পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ইঙ্গিত—সম্পাদক : সমর ঘোষ। ঠাকুর পুকুর রোড, পোঃ ঘোলা। (সোদপুর), ২৪ পরগণা হতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র ইঙ্গিতের এইটি দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা। একটি প্রবন্ধ লিখেছেন হরপ্রসাদ মিত্র। মণি-ভূষণ ভট্টাচার্য, অবিনাশ সাহা, শিপ্রা ঘোষ, সাধন রায়ের কবিতা আছে। তিনটি গল্প লিখেছেন গোপাল চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ চট্টোপাধ্যায়, অকুচ।

প্রান্তর—সম্পাদক : পরমানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কুমারধুবি, ধানবাদ, বিহার হতে প্রকাশিত।

প্রান্তরের চতুর্থ সংকলনটি যথেষ্ট সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। শিশুমন ও শিশুসাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন ইন্দিরা দেবী, এই সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন : রাম বসু, তরুণ সান্যাল, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অনন্ত দাশ, রত্নেশ্বর হাজরা, পরেশ মণ্ডল প্রভৃতি। কয়েকটি গল্পও আছে।

ঋতুপত্র—সম্পাদক : সুবোধ ঘোষ। ১৫।এ, অবিনাশ ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

তরুণ সান্যাল আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কবিতা বিষয়ে আরেকটি আলোচনা লিখেছেন অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। এ সংখ্যায় যাদের কবিতা আছে সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, নবেন্দু চক্রবর্তী, সুধাংশু দে, সমীরকুমার গুপ্ত, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর দাশগুপ্ত, অনন্ত দাশ, পরেশ মণ্ডল ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্প লিখেছেন মিহির আচার্য ও অসীম বসু। গ্রন্থ-পরিচয় দুর্বল বক্তব্যপূর্ণ।

আরোগ্যম—সম্পাদক : ডাঃ সুশীলকুমার বসু। ১৩৭, বৌবাজার স্ট্রীট হতে প্রকাশিত।

বাঙলা ভাষায় স্বাস্থ্য পত্রিকা হিসাবে আরোগ্যমের এই আত্মপ্রকাশকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ সংখ্যায় বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেছেন শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, গুপ্ত মিত্র, অশোক রায় প্রভৃতি।

প্রেক্ষাগৃহ প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

চলচ্চিত্রের নতুন সম্মান :

ইংরাজী ১৯৬২ সালের ৫ই জুলাই তারিখটি জগতের চলচ্চিত্রেতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে রইল। ঐ দিনটিতে চলচ্চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা চার্লি চ্যাপলিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা ডি-লিট (ডক্টর অব লেটার্স) উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চ্যাপলিন তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আধুনিক সমাজ-জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে যে অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি করেছেন তা চলচ্চিত্রকে নাটক, সংগীত, অংকনবিদ্যা প্রভৃতির মতই চারুকলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে এবং জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় চার্লি চ্যাপলিনকে ডি-লিট উপাধি দ্বারা সম্মানিত ক'রে চলচ্চিত্রকে এই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

চলচ্চিত্র আদৌ আর্ট কিনা, এ নিয়ে তর্কের শেষ ছিল না। বহু যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে এবং বহু লোকের সহযোগিতায় চলচ্চিত্র নির্মিত হয় ব'লে চলচ্চিত্রকে চারুকলা ব'লে মানতে বহু বিদগ্ধজনই অসম্মতি জানিয়েছেন। কিন্তু মুদ্রণ-যন্ত্রের সহায়তায় মুদ্রিত কবিতা, উপন্যাস বা নাটক আমরা পাঠ করি ব'লে কবি, ঔপন্যাসিক বা নাট্যকারের সৃষ্টিকে চারুকলা বলব কিনা, এ জিজ্ঞাসা আমাদের মনে ক্ষণেকের জন্যেও উদিত হয় না। কোনো একটি চলচ্চিত্রও যে মূলতঃ একজনেরই শিল্প-ভাবনাপ্রসূত, এই তথ্যটি সকলের জানা নেই ব'লেই চলচ্চিত্রশিল্পকে চারুকলার পর্যায়ভুক্ত করতে এত দ্বিধা। সার স্টাফোর্ড ক্রীপস প্রধানতঃ একজন রাজনীতিজ্ঞ ব'লেই খ্যাত ছিলেন; কিন্তু সাধারণ সাহিত্যবুদ্ধি নিয়ে তিনিও বলতে পেরেছিলেন—"চলচ্চিত্রকে একটি শ্রমশিল্প (ইন্ডাস্ট্রি) বলা আমি পছন্দ করি না—এ জিনিস শ্রমশিল্পেরও বাড়া। আমরা সাহিত্যকে শ্রমশিল্প বলি না; সস্‌প্যান এবং মোটরকার বিক্রী সম্বন্ধে আমরা যেভাবে কথা ব'লে থাকি, চলচ্চিত্র-প্রযোজনা সম্পর্কে আমরা ঠিক সেইভাবে কথা বলব কেন?"

সিনেমা বা চলচ্চিত্র সবচেয়ে জনপ্রিয় আর্ট; কিন্তু তাই ব'লে জনপ্রিয়তাই তার শৈল্পিক সত্তার মাপকাঠি নয়। নাটক, সংগীত, অভিনয়, অংকনবিদ্যা প্রভৃতি সকল চারুকলা এবং পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমন্বয়ে

চার্লি চ্যাপলিন

গঠিত এই বিংশ শতাব্দীর শিল্পকলাটি মানুষের রসপিপাসার সম্যক চরিতার্থতা সম্পাদনে সক্ষম। সত্যং শিবম্ সুন্দরম্—আর্টের এই চিরন্তন চাহিদা চলচ্চিত্রের দ্বারাও যে পূরণ হওয়া সম্ভব, এ-কথা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। আজ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় চার্লি চ্যাপলিনকে সম্মানিত ক'রে চলচ্চিত্র যে চারুকলা, এই কথাই আর একবার জগৎ-সভায় ঘোষণা করলেন।

অক্সফোর্ড সেল্টজন কলেজের হলে ১,১০০ বিদগ্ধজনের সামনে ধর্মতত্ত্ব, আইন, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, সংগীত-কলা প্রভৃতি বিষয়ে ডক্টরদের সংগে ব'সে চার্লি চ্যাপলিন সেদিন ট্রিনিটি কলেজের চিরন্তন প্রথামত লর্ড ক্রু'র স্ট্রবেরী ও স্যাম্পেন পান করেছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাবলিক অরেটার মিস্টার এ. এন. ব্রায়ান-ব্রাউন ডি-লিট মানপত্র দান প্রসংগে ল্যাটিন ভাষায় বলেন, "দারিদ্র্যের সব'চয়ে কঠিনতম আঘাত হচ্ছে গরীবেরা যখন উপহসিত হয়। আমাদেরই লণ্ডনের একজন অখ্যাত লোক চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও ফ্রেড কর্ণোর কাছ থেকে হাস্যরসের অভিনেতা রূপে কাজ শেখেন। পরে হলিউডে গিয়ে তিনি এমন একটি পোষাক প'রে ছবিতে অবতীর্ণ হলেন, যেটি অন্য লোকের কাছ থেকে ধার ক'রে পরা ব'লে মনে হ'তে পারে। যদিও চরিত্র-চিত্রণের জন্যে তিনি পোশাকটিকে ভেবেচিন্তেই নির্বাচন করেছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীকে বুদ্ধির যুদ্ধে পরাস্ত করবার জন্যে ঐ রকম ছোটখাট বিচিত্র চেহারাই হওয়া দরকার। এ'র প্রতিটি ছবিতেই সমাজের উপেক্ষিত মানুষের প্রতি হিউমার বা সরস রসিকতার সংগে সহৃদয় সহানুভূতি দেখানো হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর রোশিয়াস — ব্রিটিশ নাগরিক চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন, আপনাকে আমি ডক্টর অব লেটার্স ডিপ্লোমা দ্বারা ভূষিত করছি।"

পার্চমেন্ট পেপারখানি নিতে নিতে এর জবাবে চ্যাপলিন মৃদু হেসে বলেছিলেন, "ধন্যবাদ।"

কিন্তু এই উপাধিবিতরণী সভাতেও একটি মজার ব্যাপার ঘটেছিল। যে-আমেরিকা চ্যাপলিনকে তাঁর গণতন্ত্র-

মূলক মতামতের জন্যে সেখান থেকে বিতাড়িত করেছেন, ভাগ্যক্রমে সেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ ডীন রাস্ক বসেছিলেন চ্যাপলিনের পাশেই।

চ্যাপলিনের এই সম্মাননায় সমগ্র চলচ্চিত্রজগৎ গর্বিত।

চিত্র সমালোচনা

খনা : এল বি প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ১৩,৬৬২ ফুট দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য : শচীন সেনগুপ্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ ও শ্যাম চক্রবর্তী; সঙ্গীত-পরিচালনা : প্রবীর গুপ্ত; গীতিকার : বিমলচন্দ্র ঘোষ ও প্রতিমা দেবী; চিত্রগ্রহণ : সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারক দাস; শব্দধারণ : শিশির চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা : শিব ভট্টাচার্য; শিল্পনির্দেশনা : গৌর পোদ্দার; রূপায়ণ : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী, প্রবীরকুমার, সতীশ মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। গেল ১২ই জুলাই থেকে রূপবাণী, অরুণা, ও অন্যান্য ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

প্রাচীন কালে যে ক'জন নারী তাঁদের বিদ্যাবত্তা, প্রজ্ঞা এবং মনীষার জন্যে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে "খনা" অন্যতম। সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার খ্যাতিমান সদস্য জ্যোতিষশাস্ত্রবিশারদ বরাহদেবের পুত্র হচ্ছেন মিহির এবং এই মিহিরেরই পরিণীতা পত্নী হচ্ছেন খনা। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, নবজাত পুত্রের জন্মপত্রিকা সম্পর্কে ভ্রান্ত গণনার ফলে বরাহদেব পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্যে তাকে জলে ভাসিয়ে দেবার আদেশ
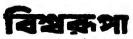
বি-এ-পি প্রোডাকসন্সের 'কাজল' চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী।

দেন এবং নিজ ভৃত্যের নবজাত কন্যাকে তারই স্থলাভিষিক্ত ক'রে প্রতিপালন করেন। কিন্তু ভৃত্য সেই নবজাত পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দেবার আগেই আচার্য রুদ্রভৈরব দ্বারা কবলিত হয়ে তাঁর হাতে তাকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। রুদ্রভৈরব দাক্ষিণাত্যে এসে সেই শিশুকে অপত্যস্নেহে প্রতিপালন করেন। একটি দাক্ষিণ দেশীয় রাজদম্পতি আততায়ীর হস্তে নিহত হ'লে তাঁদের শিশুকন্যাও রুদ্রভৈরবের যত্নে প্রতিপালিত হয়। খনা এবং মিহির—এই উভয় নামে পরিচিত হয়ে এরা দু'জনেই আচার্য রুদ্রভৈরবের কাছে নানা বিদ্যায় শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিংহলী জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে। শিক্ষা সমাপনান্তে খনা তার জন্মবৃত্তান্ত জানতে পারলেও রুদ্রভৈরব মিহিরকে তার পিতৃপরিচয় জানাতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ম্রিয়মান মিহির নিজের কুলশীল সম্বন্ধে অজ্ঞানতার জন্যে বিবাহ সত্ত্বেও খনাকে বধূরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে এবং সকলের অলক্ষ্যে উজ্জয়িনীর পথে রওনা হয় ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার বাসনা নিয়ে। কিন্তু সেখানে পরিচয়হীনতার জন্যে বরাহ তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। খনাও বরাহদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্যে এসে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের পত্নী ব'লে তাঁর দ্বারা অপমানিত হন। কিন্তু দৈবক্রমে বরাহদেব এবং তাঁর কন্যাপরিচয়ে পালিতা বাসন্তীর জন্মকোষ্ঠী দেখে খনা সমস্ত গোপন রহস্যের সন্ধান পান এবং বরাহদেবকে তাঁর ভ্রান্ত গণনার ফলে যে অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্যে দোষারোপ করেন। এর পর মিহির এবং খনা বরাহের সংসারে প্রতিষ্ঠিত হন এবং খনার যশ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হতে থাকে। কিন্তু স্ত্রীর যশগৌরবে মিহির যখন ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন, তখন খনা জিহ্বাচ্ছেদনে নিজের জীবনহানি ঘটিয়ে মিহিরের প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করলেন।

এই কাহিনীই "খনা" চিত্রে রূপায়িত হয়েছে অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং সাবলীল-

ভাবে। চিত্রনাট্যকারেরা যথেষ্ট সঙ্গত কারণেই কাহিনীটিকে উপস্থাপনের জন্য গৃটি-দুয়েক ফ্ল্যাশ-ব্যাকের সাহায্য নিয়েছেন। পতিপরায়ণা খনার জীবনের আনন্দ-বেদনা এমন চিত্তাকর্ষকভাবে ছবিটির মধ্যে চিত্রিত হয়েছে যে, দর্শক তার সঙ্গে একাত্ম না হয়ে পারেন না। খনার প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মিহিরের মনে ঈর্ষার উদ্রেক শেষ পর্যন্ত যে ট্রাজেডী ঘটায়, তা দর্শকের মনকে আপ্লুত করে, চোখকে করে অশ্রুসজল।

'খনার' ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিনয়নৈপুণ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন দেখিয়েছেন। বরাহদেবরূপী নীতীশ মুখোপাধ্যায় তাঁর গৃহীত চরিত্রের দম্ভ, দ্বন্দ্ব, স্নেহময়তা, অনুশোচনা, বধূগর্বে-গর্বিতভাব প্রভৃতি সকল ভাবই চমৎকার রূপে প্রকাশিত করেছেন। প্রবীরকুমারের মিহির সামান্য আত্মসচেতন হলেও চরিত্রানুগ। স্নেহশীল রুদ্রভৈরব রূপে কমল মিত্র যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করবার ত্রুটি করেননি। বরাহপত্নী জগদ্ধাত্রীর ভূমিকায় পদ্মা দেবী, প্রতিপালিতা কন্যা বাসন্তীর ভূমিকায় তপতী ঘোষ, সংসারত্যাগিনী ভৈরবীর ভূমিকায় অপর্ণা দেবী, বিক্রমাদিত্যের ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্য এবং বরাহ-ভৃত্যের ভূমিকায় সন্তোষ সিংহ গৃহীত ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন। এ ছাড়াও উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, প্রীতি মজুমদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মাঃ তিলক প্রভৃতি।

চিত্রগ্রহণ এবং শব্দধারণের কাজ মোটের উপর ভালই। দৃশ্যপট প্রভৃতি রচনায় পৌরাণিক বা প্রাচীন ছবির চিরাচরিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু সাজসজ্জায়, বিশেষ ক'রে স্ত্রী-চরিত্রের সাজসজ্জায় নিতান্ত বাঙালিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন যুগের চিত্র-নির্মাণে সব রকমে প্রাচীনত্ব ফুটিয়ে তোলা কিন্তু একান্তই বাঞ্ছনীয়।

ছবিতে অন্ততঃ ন'খানি গান আছে এবং বেশীর ভাগ গানই অত্যন্ত দীর্ঘ। এদের মধ্যে নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের মুখে দেওয়া "হরপার্বতী" স্তুতিটি সুগীত এবং হৃদয়গ্রাহী। নবান্ন উৎসব উপলক্ষ্যে বিচিত্র নাচ-গানটি ছবি থেকে যদি বাদ দেওয়া হ'ত তা'হলে ছবিটির কিছুমাত্র অঙ্গহানি ঘটত না।

"খনা"র পরিচালক বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আর ইহলোকে নেই। তিনি বাঙলার চলচ্চিত্রজগতে একজন সার্থকনামা সম্পাদক রূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পরিচালক রূপে "খনা"ই তাঁর প্রথম এবং শেষ ছবি। 'খনা'র পরিচালনায় হৃদয়াবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি যে সৃষ্টিধর্মী মনন-শীলতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, তাতে পরিচালক রূপেও তিনি যে ক্রমেই সার্থকতার পথে অগ্রসর হতেন, এই প্রতিশ্রুতি তিনি রেখে গেছেন 'খনা' চিত্রে।

(২) **টয় ট্রেণ** (খেলাঘরের গাড়ী) : সুন্দরম্-এর নিবেদন; ১০২৪ ফুট দীর্ঘ এবং এক রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা : উমাপ্রসাদ মৈত্র; সঙ্গীত পরিচালনা : সুভাষ সেনগুপ্ত; সম্পাদক : সুনীত সাহা।

"দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে" নামে যে পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ রেলপথটি হিমালয়ের পাদদেশে শিলিগুড়ি থেকে শুরু ক'রে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নানারকমভাবে এ'কে বেঁকে, ঘুরে-ফিরে, সর্পিল ভঙ্গীতে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৭,৫০০ ফুট পর্যন্ত উঠে আবার সুড়-সুড় ক'রে হাজার দেড়েক ফুট নেমে গিয়ে দার্জিলিং শহরে এসে থেমেছে, সেটিকে বিশ্বের বিস্ময় বলা হয়। নানান দেশ থেকে যে-সব পর্যটক ভারতে আসেন, তাঁরা সময় পেলে এই রেল-

পথটিকে দেখে চক্ষু সার্থক করতে ছাড়েন না।

"সুন্দরম্" নিবেদিত এই 'টয়-ট্রেন' চলচ্চিত্রটি এই রেলপথটিকেই দেখিয়েছে, ওই পথের একখানি ট্রেনের শিলিগুড়ি থেকে রওনা হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে দার্জিলিং পৌঁছোনোর দৃশ্যাবলীর মাধ্যমে। সত্যিই, সময় সময় ট্রেনটিকে খেলাঘরের রেলগাড়ী ব'লেই মনে হয়, যখন তাকে দূর থেকে পাহাড়পথের ওপর দিয়ে সরীসৃপের আকারে এঁকে-বেঁকে যেতে দেখি। কোথাও ছোট নদীর ওপর সেতু পেরিয়ে, কোথাও 'পাগলা ঝোরা' ডিঙিয়ে, কোথাও 'বাতাসিয়া লুপ' বেয়ে, কোথাও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার পেছিয়ে এসে, মোটরপথের ধার দিয়ে, কার্সিয়াং স্টেশন পেরিয়ে এবং 'ঘুম' স্টেশনকে পেছনে ফেলে ট্রেনটি গিয়ে পৌঁছোয় দার্জিলিং। পথে পাহাড়ী ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে দৌড়োয়, কেউবা তাকে দেখে হাত নাড়ে, কেউ বা গান গেয়ে ওঠে—"দুটি পাতা, এক কুঁড়ি"।

ট্রেণ-চলার সঙ্গে যে আবহ সৃষ্টি-কারী শব্দ, গান বা যন্ত্রসংগীত ব্যবহার করা হয়েছে, তা যেমনই অভিনব, তেমনই চমৎকারভাবে উপযোগী। ক্যামেরা যেখানে চলেছে, সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্প কাঁপলেও দৃশ্যগুলিকে গতি দিতে এবং জীবন্ত ক'রে তুলতে পেরেছে অনায়াসেই।

তথ্যচিত্র হিসেবে এই স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবিটি দার্জিলিং-শিলিগুড়ি রেল-পথটিকে বেশ আকর্ষণীয়ভাবে দেখাতে সক্ষম হয়েছে এবং এর জন্যে চিত্রশিল্পী পরিচালক উমাপ্রসাদ মৈত্র, সংগীত-পরিচালক সুভাষ সেনগুপ্ত এবং সম্পাদক সুনীত সাহা মিলিতভাবে আমাদের সাধুবাদ পাবার যোগ্য।

এলিটে 'ক্রাইমবাস্টার্স' :

এলিট সিনেমার পরবর্তী আকর্ষণ হচ্ছে এম-জি-এম-এর 'ক্রাইমবাস্টার্স'। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এটি প্রধানতঃ একটি অপরাধমূলক চিত্র। একটি কর্পোরেশনের আইন-সচিব কেমন ক'রে কর্পোরেশনের জনৈক প্রভাবশালী সদস্যের স্বৈরাচার ও দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেকে বিপন্ন ক'রেও কেমন ক'রে শেষ পর্যন্ত তার চক্রান্তের সমাপ্তি ঘটায়, তাই এই ছবির মধ্যে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক-ভাবে বলা হয়েছে। ছবিটির পরিচালনা করেছেন বোরিশ সাগাল এবং এর প্রধানাংশে অভিনয় করেছেন মার্ক রিচম্যান এবং মার্টিন গেবল।

মঞ্চাভিনয়

বৈতানিক-এর 'মুক্তধারা' : নাটক : রবীন্দ্রনাথ; পরিচালনা : প্রফুল্ল ভোস; সংগীত-পরিচালনা : জয়দেব বেজ; শিল্প-নির্দেশনা : সুধাংশু ঘোষ; রূপায়ণ : সত্যেন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র চক্রবর্তী, অমর চৌধুরী, রবীন মজুমদার, অসীম সেন, মানস মুখোপাধ্যায়, খোকন মজুমদার, বিমল রায়, নীতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল বসু, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবলাল বর্ধন, নিমাই ধাড়া, পাঁচু ধর, ছবি মিত্র, জয়ন্তী ঠাকুর প্রভৃতি।

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে সম্প্রতি মহাজাতি সদনে অষ্টাহব্যাপী যে উৎসব পালিত হ'ল, তারই সপ্তম দিবসে (১৫ই জুলাই, শনিবার) বৈতানিক সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'কে মঞ্চস্থ করেছিলেন।

শাসিতের ওপর শাসকের অত্যাচার যখন দম্ভভরে আকাশস্পর্শী হয়, মানুষের তৃষ্ণার জলকে কেড়ে নিয়ে তাদের জব্দ করবার উল্লাসে দেবতাকে পর্যন্ত অস্বীকার করে, তখন অত্যাচারীর শাণিত কৃপাণ বিধাতার অমোঘ বিধানে খান্-খান্ হয়ে গুঁড়িয়ে যেতে

অরবিন্দ মুখার্জি পরিচালিত 'বন্ধন' চিত্রে মাস্টার মিন্টু, রেণুকা রায়, সন্ধ্যা রায় এবং মাস্টার জয়।

অগ্রগামী পরিচালিত 'নিশীথে'র একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও নন্দিতা বসু।

বাধ্য, এই অতি সত্য তথ্যটি পরিবেশন করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মুক্তধারা' রূপক নাট্যের মাধ্যমে। শিবতরাইয়ের প্রজাদের দলপতি ধনঞ্জয় বৈরাগী তো আসলে, ভারতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলার কালে গান্ধীজীর সাত্ত্বিক রূপ। তাঁর কণ্ঠের গানগুলি গান্ধী আদর্শের বীজমন্ত্র।

এই রূপক নাট্যটির মঞ্চাভিনয়ে বৈতানিক-গোষ্ঠী সমগ্রভাবে একটি শিল্পচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। রূপক নাটকে যে সম্পূর্ণ প্রতীক-ধর্মী দৃশ্যপট ব্যবহার করা উচিত, এ-জ্ঞান তাঁদের আছে। অবশ্য যন্ত্ররাজ বিভূতির দানবীয় সৃষ্টির ভয়াবহতা তাঁদের কল্পিত যন্ত্র-রূপটির মধ্যে একেবারেই নেই। নির্মল আকাশকে কালো-করা, অস্তগামী সূর্যকে আড়াল-করা সেই উদ্ধত যন্ত্রটিকে প্রতীকের মাধ্যমেও সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলাও সম্ভব ব'লে মনে করি। অবশ্য এ'রা মহাজাতি সদন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উপযুক্ত আলোর সহায়তা পেলে তাঁদের সৃষ্ট প্রতীকটির উদ্ধত রূপ ফুটে উঠত কিনা, তা আমাদের জানা নেই।

পাত্রপাত্রীদের সাজপোশাকের মধ্যেও একটি পরিচ্ছন্ন শিল্পরূপ ফোটাবার চেষ্টা হয়েছে। মাত্র যন্ত্ররাজ বিভূতি এবং তাঁর সহকারীদের বেশে কিছুটা বিজাতীয় সজ্জাকে সমগ্র নাটকের পক্ষে কেমন যেন বিসদৃশ ব'লে মনে হয়েছে। বিভূতি এবং তার সহকারীরা ইঞ্জিনীয়ার,, এই তথ্যটি কি প্রতীকধর্মী পোশাকের মারফৎ ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য ছিল?

'মুক্তধারা'র অভিনয়ে সকল শিল্পীই একটি সামগ্রিক সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন। রাজা, মন্ত্রী থেকে শুরু ক'রে শিবতরাইয়ের প্রজা, এবং উত্তরকূটের নাগরিকরা পর্যন্ত, মায় গুরুমশায়ও একটি সুন্দর ছন্দ রক্ষা ক'রে অভিনয় করবার চেষ্টা করেছেন। মাত্র যুবরাজ অভিজিৎ-এর অভিনয়কে কিছুটা নিস্তেজ মনে হয়েছে এবং হুব্বার অভিনয় ও পোশাক-পরিচ্ছদকে বড্ড বেশী বাস্তবধর্মী ও কিছুটা বাড়াবাড়িই ব'লে বোধ করতে বাধ্য হয়েছি। অবশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় খোকন মজুমদারের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গান ও অভিনয়। গান্ধীজীর সাত্ত্বিক মূর্তি তাঁর অভিনয়গুণেই আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল। এবং এ'র পরে নাম করব রবীন চক্রবর্তী (রাজা), অমর চৌধুরী (মন্ত্রী), রবীন মজুমদার (খুড়ো মহারাজ), বিমল রায় (উত্তরকূটের ১ম নাগরিক), নীতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ ২য়), নির্মল বসু (ঐ ৩য়), মানস মুখোপাধ্যায় (সঞ্জয়), শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বটুক), ছবি মিত্র (অম্বা), জয়ন্তী ঠাকুর (ফুলওয়ালী) প্রভৃতির।

আমরা বৈতানিক গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নাট্য-প্রচেষ্টার সম্বন্ধে কৌতূহলী মন নিয়ে অপেক্ষা করব।
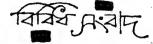
সপ্তক প্রাইভেট লিমিটেডের 'বন্ধন'

আজ শুক্রবার, ২০এ জুলাই থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে সপ্তক প্রাইভেট লিমিটেডের নবতম চিত্র-নিবেদন 'বন্ধন'।

এ, ভি, এম-এর "ম্যায় চুপ রহুঙ্গি" চিত্রের নায়িকা মীনাকুমারী

ছবিটির পরিচালনা এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং রাজেন সরকার। এর বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, জহর গাঙ্গুলী, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, গীতা দে, মাস্টার জয় প্রভৃতি। ছবিখানির পরিবেশনা করেছেন বিঠলভাই প্রাইভেট লিমিটেড।

ইনভিটেশন টু ইণ্ডিয়া :

গেল শনিবার, ১৪ই জুলাই ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেণ্টারে ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিসের উদ্যোগে 'ইনভিটেশন টু ইণ্ডিয়া' নামে একখানি তিন রীলের রঙীন ছবি দেখানো হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের সহধর্মিণী শ্রীমতী জ্যাকেলিন কেনেডীর বৈচিত্র্যময় ভারতভ্রমণ কাহিনী এই ছবিখানিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ অভিনেতা রেমণ্ড ম্যাসির নেপথ্যভাষ্য এই বর্ণাঢ্য ছবিখানিকে একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

এই ছবিখানির সঙ্গে ভারতের বর্ণালী চিত্রকলা নিয়ে গঠিত 'দি সোর্ড আণ্ড দি ফ্লুট' নামে আর একখানি চমৎকার ছবিও দেখানো হয়।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা :

গেল রবিবার, ১৫ই জুলাই সকালে জ্যোতি সিনেমায় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার প্রথম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে উদয়শংকর রচিত বিখ্যাত ছবি 'কল্পনা' প্রদর্শিত হয়।

চেনা-অচেনার 'ভীমপলশ্রী' :

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে চেনা-অচেনা নাট্যগোষ্ঠী জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তাঁদের বহুপ্রশংসিত নাটক বনফুলে রচিত 'ভীমপলশ্রী' দ্বিতীয়বার মঞ্চস্থ করবেন।
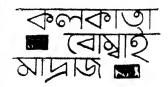
কলকাতা—

অগ্রগামী গোষ্ঠীর 'নিশীথে'-র সম্পাদনার কাজ চলেছে ল্যাবোরেটরীতে। রবীন্দ্রনাথের এই দুরূহ গল্পের চিত্ররূপ চলচ্চিত্রে একটি নতুন পরীক্ষা। শিল্প সৃষ্টির কয়েকটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, নন্দিতা বসু, গঙ্গাপদ বসু ও রাধামোহন ভট্টাচার্য। এ ছবির সংগীত পরিচালক হলেন সুধীন দাশগুপ্ত।

রমাপদ চৌধুরীর বহু পঠিত উপন্যাস 'লালবাঈ' খুব শীঘ্রই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবে। চিত্ররূপ দেবেন পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত। সম্ভবতঃ নায়িকার চরিত্রে সুচিত্রা সেন অভিনয় করবেন।

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের 'কাঁটা ও কেয়া'র নামকরণ হয়েছে 'শুভদৃষ্টি'। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মণি বর্মা। ছবিটি জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্সের পক্ষ থেকে পরিচালক চিত্ত বসু পরিচালনা করছেন। অরুণ মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় এ ছবির প্রধান দুটি চরিত্র। সুরসৃষ্টি করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত জরাসন্ধের কাহিনী অবলম্বনে 'ন্যায়দণ্ড' সমাপ্তপ্রায়। চরিত্রলিপিতে রয়েছেন উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, সবিতা বসু, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, ছায়াদেবী, আশীষকুমার, বিশ্বনাথন ও তন্দ্রা বর্মন। সংগীত পরিচালনা করেছেন ওস্তাদ আলীআকবর খাঁ।

দার্শনিক প্রবর রূপ ও সনাতনের জীবন নিয়ে পরিচালক সুনীলবরণ ছবি করছেন 'রূপ সনাতন'। প্রধান চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, রবীন মজুমদার, সমীরকুমার ও শিপ্রা মিত্র। সুরসংযোজনায় রথীন ঘোষ।

নিউ থিয়েটার্স দু নম্বর স্টুডিওয় বিনু বর্ধন পরিচালিত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'একটুকরো আগুন'-এর দৃশ্যগ্রহণের কাজ দ্রুত সুসম্পন্ন হচ্ছে। বিশ্বজিৎ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত এ ছবির তিনটি মুখ্য চরিত্র। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন।

রামধনু পিকচার্সের 'তের নদীর পারে' একটি সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে গৃহীত ছবি। ... দেয় জীবন নিয়ে এ ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। আলোকচিত্র ও পরিচালনা করছেন বারীন সাহা। প্রিয়ম হাজারিকা ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় দুটি প্রধান চরিত্র। সংগীত পরিচালনা করেছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত।

"পলাশের রঙ' ছবিটির পরিচালক হলেন সুশীল ঘোষ। অভিনয় অংশে রয়েছেন মঞ্জু দে, অসীমকুমার, মঞ্জুলা সরকার, চিত্রিতা মণ্ডল, বঙ্কিম ঘোষ প্রভৃতি শিল্পী। সুরসৃষ্টি করেছেন ভি বালসারা। এ ছবির কাজ শেষ করে পরিচালক শ্রী ঘোষ 'সিঁদুরের মেঘ' পরিচালনা করবেন। সম্ভবতঃ অশোককুমারকে একটি প্রধান চরিত্রে দেখা যেতে পারে।

বোম্বাই—

আগামী মাস থেকে বিমল রায় তাঁর পরবর্তী ছবি করছেন 'বেনজির'। এই নামকরণটির আগে ছবির নাম ছিল 'ভাইজান'। প্রধান চরিত্রের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন অশোককুমার, শশীকাপুর ও মীনাকুমারী। ছবিটি পরিচালনা করবেন খালিদ। সংগীত গ্রহণ করবেন শচীনদেব বর্মন।

উত্তম চিত্রের 'বিন বাদল বারসৎ' রনজিৎ স্টুডিওয় চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। ছবির পরিচালক হলেন জ্যোতিস্বরূপ। বিশ্বজিৎ ও আশা পারেখ দুটি প্রধান চরিত্রের সঙ্গে অভিনয় করছেন মামুদ, পদ্মা, নিশি, লীলা মিশ্র এবং মণি চ্যাটার্জি। সংগীত পরিচালনা করবেন হেমন্তকুমার।

বদরীনাথ দর্শনে নয়, সদলবলে প্রযোজক-পরিচালক এস এ আনসারী 'মুলজীম' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য রওয়ানা হয়েছেন। প্রদীপকুমার, শকীলা, জনিওয়াকর এবং পরিচালক আনসারী অভিনয় করছেন। সংগীতে রয়েছেন রবি।

শ্রীপ্রকাশ স্টুডিওয় 'হাম কদম'-এর প্রায় সপ্তাহকালীন একসঙ্গে ছবির দৃশ্যগ্রহণের কাজ শেষ হল বলরাজ শাহানী ও সজ্জনকে নিয়ে। এ ছবির অন্যান্য চরিত্রশিল্পী হলেন নন্দা, সুলোচনা, মুকরী ও হেলেন। বীরেন ত্রিপাঠী এ ছবির পরিচালক।

সম্প্রতি দুটি হিন্দী ছবির গান কল্যাণজী - আনন্দজী'র সুরে রেকর্ড করলেন মুকেশ এবং লতা মঙ্গেশকর ও মহম্মদ রফি। ছবির নাম—'বড়ী বহেন।' বৈজয়ন্তীমালা ও জয় মুখার্জিকে ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করবেন কে অমরনাথ।

প্রায় এক বছর অনুপস্থিতির পর নার্গিস তাঁর ভ্রাতার ছবি 'রাত অউর দিন' চিত্রে অভিনয় করছেন। ছবিটির পরিচালক হলেন আক্তার রসুল।

প্রযোজক - পরিচালক সুবোধ মুখার্জির পরবর্তী ছবি 'এপ্রিল ফুল'-এ প্রধান দুটি চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্বজিৎ ও সায়রাবাণু।

'বিশ সাল বাদ' সাফল্যের পর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর একটি জনপ্রিয় বাংলা ছবি 'মনের ময়ূর'-র হিন্দীতে চিত্ররূপ দিচ্ছেন জানা গেল। ছবিটি পরিচালনা করবেন বীরেন নাগ।

ওয়াহিদা রেহমান বর্তমানে অনেক ছবিতে কাজ করছেন। সম্প্রতি কারদারের আগামী ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। নায়ক হবেন দিলীপকুমার। এই জুটি প্রথম। ছবিটি রঙিন হবে। সুর দেবেন নৌশাদ।

মাদ্রাজ—

জেমিনীর আগামী ছবিতে রাজশ্রী শান্তারামকে মনোজ-এর বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা যাবে। ছবিটি পরিচালনা করবেন কিশোর সাহু।

বাংলা ছবি 'স্মৃতিটুকু থাক' অবলম্বনে তামিল ভাষায় চিত্র গ্রহণ শেষ হয়েছে। ছবিটি এ মাসে মুক্তি পাবে। সাবিত্রী এবং জেমিনী গণেশন দুটি মুখ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন। কমল ঘোষ এ ছবির চিত্রশিল্পী।

কাঁচা ফিল্মের অভাবে এখন প্রায় সব ছবির কাজ বন্ধ হতে চলেছে। ফিল্মের জন্য সুটিং নাকচ হচ্ছে। যেমন বসুচিত্র প্রযোজিত কে শঙ্করের একটি তামিল ছবির হিন্দী চিত্রগ্রহণের কাজ বন্ধ হয়ে আছে।

একটি হাসির ছবি—'রাখী'। সম্প্রতি পরিচালক ভীম সিংহ চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু করেছেন। অশোককুমার, ওয়াহিদা রেহমান, প্রদীপকুমার, অমিতা, মামুদ ও মালিকা কয়েকটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন। রাজেন্দ্রকৃষ্ণ এ ছবির গীতিকার এবং সঙ্গীতে রয়েছেন রবি। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রূপদানে সহায়তা করছেন ললিতা পাওয়ার, রাজ মেহেরা, রণধীর, শিবরাজ, মদনপুরী এবং মাষ্টার শাহিদ।

বসু ফিল্মসের সম্প্রতি 'পূজা' ছবির শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন হল। প্রধান ভূমিকায় গুরু দত্ত ও আশা পারেখ। পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করবেন নানা পালশিকর, কানহাইলাল ও সুলোচনা। দুটি গান রেকর্ড হয়েছে। গেয়েছেন মহম্মদ রফি এবং আশা ভোঁসলে। ছবির সঙ্গীত পরিচালক রবি। কে শঙ্কর ছবিটি পরিচালনা করছেন।

—চিত্রদূত

জাতির প্রতি আবেদন

ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকনাট্যসমূহের মধ্যে বাংলার ঐতিহ্যসম্পন্ন 'যাত্রানাটক' শ্রেষ্ঠতম হিসাবে সর্বজনবিদিত। লোক-সংস্কৃতির বিস্তৃতি ও প্রসারে বাঙ্গালীর অবদান সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিতে ধন্য। আজকের প্রয়োজন বঙ্গসংস্কৃতির দিগন্ত-প্রসারী ও বহুমুখী স্রোতধারাকে অধিকতর বেগবতী করে বিশ্বের দরবারে সম্মানিত স্থান গ্রহণের নিমিত্ত সমবেত প্রয়াস।

পরিষদ আয়োজিত বিডন স্কোয়ারে (রবীন্দ্র কানন) ২২ দিনব্যাপী ২৯টি যাত্রাভিনয় ৩০শে আগষ্ট হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর, '৬২) বাঙ্গালীর একান্ত নিজস্ব 'যাত্রা-উৎসব'ও অনুরূপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আনন্দ পরিবেশনের মাধ্যমে গণশিক্ষার বাহন হিসাবে সমগ্র জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে লোক-সংস্কৃতির অবদান অনস্বীকার্য। গণমানসে লোকনাট্যের শক্তিমান শাখা যাত্রানাটকের প্রভাব অপরিসীম।

জাতীয় সংস্কৃতির এই বিশিষ্ট সম্পদের প্রতি আমরা সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বহু শতাব্দী প্রসারিত বঙ্গসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ শাখা যাত্রাগানের উৎসবের আয়োজনও তাই নিছক একটি উৎসব মাত্রই নয় জাতীয় কর্তব্য।

এই সুমহান কর্তব্য পালনে দেশবাসীর সহৃদয় সহযোগিতা কামনা করি।

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ

• পরিষদের সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা •

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
" অজিত পাল
অধ্যাপক অজিত ঘোষ
অধ্যক্ষ অচ্যুত দত্ত
শ্রীঅতীনলাল
" অনাদিপ্রসাদ
" অরুণ ভট্টাচার্য
" অখিল নিয়োগী
" অমর মুখার্জী
অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য
শ্রীউত্তমকুমার
" উৎপল দত্ত
কবিশেখর কালিদাস রায়
" কালীশ মুখোপাধ্যায়
" কল্পতরু সেনগুপ্ত
" কবি ঠাকুর
" কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
" কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক
" গিরিন্দ্র সিংহ
" গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
" গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী ঘোষ
শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়
" জলধর চট্টোপাধ্যায়
" তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
" তাপস সেন
শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র
শ্রীতারাপদ ব্রহ্ম
" দক্ষিণেশ্বর সরকার
" দেবনারায়ণ গুপ্ত
" দেবেশ দাশ
" দুর্গা সেন
" ধীরেন মল্লিক

শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ
" নরেশচন্দ্র মিত্র
" নীরেন্দ্র লাহা
" নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়
ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
" পঙ্কজ দত্ত
" পরিতোষ দে
" প্রাণতোষ ঘটক
" পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক প্রশান্ত বসু
শ্রীপার্থিবেশ নিয়োগী
" প্রফুল্ল রায়
" ফনিভূষণ বিদ্যাবিনোদ
" বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
" বিজন দত্ত
" বিধায়ক ভট্টাচার্য
" বিমল মিত্র
" বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
" বীরেন ভঞ্জ
" বিল্টু গুপ্ত
" বিমল ঘোষ
" বিষণচাঁদ বড়াল
" বিভাস রায় চৌধুরী
" মনুজেন্দ্র ভঞ্জ
" মনোজ বসু
" মন্মথ রায়
" মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" মহাদেব আঢ্য
" মহেন্দ্র সরকার
" মহেন্দ্র গুপ্ত
" মধুসূদন মজুমদার
শ্রীযামিনী মিত্র

ডাঃ যতিন্দ্রবিমল চৌধুরী
ডাঃ রমা চৌধুরী
" রাইচাঁদ বড়াল
" রাসবিহারী সরকার
ডাঃ রথীন রায়
" রনজিৎ দত্ত
" শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোঃ
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
" শুদ্ধসত্ত্ব বোস
শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা
শ্রীশম্ভু মিত্র
শ্রীমতী শোভা সেন
শ্রীসত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়
" সতু সেন
" সুধাংশু বসু
" সুধী প্রধান
" সেবাব্রত গুপ্ত
" সুনীল বসু
" সন্তোষ সিংহ
মহারাজকুমার সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
শ্রীসরোজ দত্ত
" সরোজ সেনগুপ্ত
" সাগরময় ঘোষ
অধ্যাপক সাধন ভট্টাচার্য
শ্রীসুনীল ভঞ্জ
" স্মৃতিরঞ্জন গুহ
" সৌরেন কুণ্ডু
ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র
" হেমেন দাসগুপ্ত
প্রভৃতি

মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবির শেষ কর্মস্থল কিন্তু স্টুডিও নয়,—ল্যাবোরেটারী। দৃশ্যগ্রহণের পর এখানে পরিস্ফুটনের কাজ চলে। তারপর এডিটিং টেবিলে সম্পাদকের হাতে সে ছবির গতি চলচ্চিত্রে রূপ নেয়। মুক্তিপ্রায় এমন একটি ছবি টালিগঞ্জের ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটারীতে সম্পাদনার কাজ সুসম্পন্ন হতে চলেছে। কমল মজুমদার পরিচালিত 'অভিসারিকা' চিত্রের কথা বলছি।

নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওর এক অংশে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটারী গড়ে উঠেছে। বিরাট অংশ নিয়ে এর পরিব্যাপ্তি। পরিস্ফুটন থেকে আরম্ভ করে শব্দ-পুনর্যোজন পর্যন্ত প্রতিটি বিভাগের জন্য এর এক-একটি শাখা রয়েছে। যেমন এডিটিং রুম। এডিটার বা সম্পাদকের এই বিভাগীয় কর্মটি ছবির একটি প্রধান দায়িত্ব পালিত হয়। মনে হয় এটিই চলচ্চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। কারণ চিত্র সম্পাদনার ওপর ছবির সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। ছবিতে অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে গল্পটিকে গুছিয়ে এবং চিত্তাকর্ষক করে চোখের সামনে তুলে ধরাই সম্পাদকের দায়িত্ব।

ছবি যাতে কোথাও এক-ঘেয়ে না লাগে তেমনি করে দৃশ্যগুলি সাজানো এবং জোড়া দেওয়া, ভাব প্রকাশের সৌকুমার্য অক্ষুণ্ণ রাখা, ছবির পারম্পর্য, ঘটনার সংগতি ঠিক রাখাও অনেকখানি নির্ভর করে সুসম্পাদনার উপর। চিত্রনাট্য অনুযায়ী প্রত্যেক দৃশ্যের সংখ্যা মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ ছবির মালা গাঁথেন সম্পাদক তাঁর কাঁচি এবং সিমেন্টের সাহায্যে। অবশ্য ছবির যত-কিছু দোষ-ত্রুটি সব 'পসেটিভ ফিল্মের' ওপর পরীক্ষা চলে। আসল সম্পাদনা তারপরই প্রক্ষেপন-যন্ত্রের সাহায্যে ছবি ছোট পর্দায় ফেলে শৈল্পিক কলা-নৈপুণ্যের বিচার চলে। কোথায় কি রদবদল হবে। কোন দৃশ্যের পর কোন দৃশ্য দিলে গল্প জমবে. এই সমস্ত স্থির করে ছবিটি সম্পূর্ণ করেন সম্পাদক পরিচালকের সাহায্য নিয়ে।

সম্পাদক কমল গাঙ্গুলীকেও ঠিক এমনিভাবে কাজ করতে দেখলাম। 'মুভিয়ালা' যন্ত্রের সাহায্যে ছবি দেখে তিনি ছবির গতি ও গল্পের পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছেন। সম্পাদিত কয়েকটি দৃশ্য দেখার পর গল্পটি শুনলাম।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'পূর্বাচল' কাহিনী অবলম্বনে 'অভিসারিকা'র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক কমল মজুমদার। তিনি সংক্ষেপে গল্পটি বললেন।

কলকাতায় একটি সাধারণ প্রেসে চাকরী করতো রতীন চৌধুরী। এই তরুণ যুবকের তেমন দায়িত্ব ছিল না সংসারে। প্রাত্যাহিকতার একটি জীবন মেস বাড়ীতেই হৈ-হুল্লোর আড্ডার সংগে বেশ কাটতো।

ঘটনাচক্রে চাকরী জীবনের এক বন্ধুর সংগে বাজী ধরে বালীগঞ্জের এক বড়লোকের মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়ে এমন পরিস্থিতি হল যে রতীন পালাতে পথ পায় না। শেষ পর্যন্ত বাড়ীর পেছনের দরজার সামনে এসেই হঠাৎ বন্দী হল রতীন নববধূ সেই বাড়ীর কন্যার হাতে। কোন কথার সুযোগ না দিয়েই ট্যাক্সিতে বধূ উঠে পড়লো। রতীন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মেয়েটির সংগ নিতে বাধ্য হল, তবে চন্দননগর পান্থনিবাসে এসে মেয়েটির ভুল ভাঙলো যে এ ব্যক্তি তার পরমপ্রিয় নয়।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মেয়েটি বিয়ের রাতে বাড়ী থেকে পালিয়ে তার প্রেমাস্পদ গৃহশিক্ষক কল্যাণের সংগে মিলিত হবার জন্য বধূবেশী শুভ্রা বাড়ীর পেছনের দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল কল্যাণের প্রেরিত লোকের জন্য।

'অভিসারিকা'র সম্পাদনায় সম্পাদক কমল গাঙ্গুলী, সহকারী পরিচালক বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালক কমল মজুমদার ও সহকারী রঞ্জন মজুমদার।

সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে রতীনও পালাতে গিয়ে এই ভুল বোঝার কাহিনী শুরু হয়।

পান্থনিবাসে সেই বিয়ের রাত্রের আসল ব্যাপারটা মীমাংসা হবার পর রতীন শুভাকে পরের দিন বাড়ীতে পেঁৗছে দেবার আশ্বাস জানালে শুভা তাতে আপত্তি জানালো। কারণ শুভার পক্ষে এখন আর বাড়ী ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। যার উদ্দেশ্যে সে বাড়ী ত্যাগ করে এখানে এসেছে, সেই কল্যাণের কাছেই সে যেতে চায়। কিন্তু কল্যাণের আগমনের কোন লক্ষণ না দেখে রতীন কল্যাণের সন্ধানে ওর মেসের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। সেখানে গিয়ে জানতে পারলো কল্যাণ পাওনাদারদের ভয়ে মেস ছেড়ে তার বাড়ী নবদ্বীপে গেছে। ফিরে এসে রতীন শুভাকে সব কথা জানিয়ে পরদিন দুজনেই নবদ্বীপে রওনা হয়। শ্রীনিকেতন হোটেলে শুভাকে রেখে রতীন কল্যাণের বাড়ী খুঁজে বার করলো। কিন্তু রতীন খুব অবাক হল দেখে—কল্যাণের বিবাহিত স্ত্রী বর্তমান এবং একটি সন্তানও আছে তার। ওর স্ত্রীর কাছে জানতে পারলো যে কল্যাণ এখন্ কলকাতাতেই আছে।

হোটেলে ফিরে এসে শুভাকে এ সব কোন কথাই বললো না রতীন শুধু এই ফিরতে অনুরোধ ছাড়া। কিন্তু শুভা রতীনের এই অনুরোধে বিরূপ মন্তব্য করলো। উত্তেজিত শুভাকে শেষ পর্যন্ত কল্যাণের বাড়ীতে নিয়ে যেতেই এত-দিনের বিশ্বাসকে সহ্য করতে না পেরে শুভা মানসিক আঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়লো।

অসুস্থ শুভাকে সুস্থ করে তুলতে দিন রাত্রি সেবায় ব্যস্ত রইলো রতীন। কিন্তু অসুখ জটিলতর হতে থাকায় ডাক্তারের পরামর্শে রতীন শুভার বাড়ীতে চিঠি লেখে। শুভার দাদা-বৌদিরা নবদ্বীপে আসতে মনঃস্থির করলেন।

রতীনের অপরিসীম সেবা আর যত্নে শুভা সুস্থ হয়ে উঠলো। এই কয়েক দিনের পারস্পারিক হৃদ্যতায় পরস্পরের প্রতি কিছুটা দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তবে সে কথা কেউ প্রকাশ করেনি।

এর মধ্যে দাদা-বৌদি এসে পড়লেন শুভাকে ফিরিয়ে নিতে। এমন কি শুভার নিরুদ্দেশের জন্য পত্রিকায় দু' হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে-ছিলেন। শুভা এদের আগমন এবং পুরস্কারের কথা জানতে পেরে রতীনকে উত্তেজিতভাবে ধিক্কার দিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে সম্মত হল।

দাদা-বৌদির সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যেতে স্টেশনে গাড়ী ধরলো শুভা। রতীন পুরস্কারের দু' হাজার টাকা গ্রহণে অসম্মতি জানায়। ট্রেন ছেড়ে দিল। রতীন স্টেশনে দাঁড়িয়ে। শুভার দাদা এই বিচিত্র চরিত্রের সৎ উদার রতীনের প্রশংসা করে টাকার কথাটা বলাতে শুভার ভুল ভাঙলো। সে তক্ষুণি ট্রেনের চেন টেনে গাড়ী থামায়। বিমর্ষ রতীন দেখে শুভা ছুটতে ছুটতে তার কাছেই আসছে।

গল্প এখানেই শেষ। এই কাহিনীর কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, নির্মলকুমার, অসিত-বরণ, ভারতী দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, তপতী ঘোষ, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, নৃপতি চ্যাটার্জি, নিভাননী দেবী, রাজলক্ষ্মী, অনুপকুমার, মণি শ্রীমানী, আশা দেবী ও অমর গাঙ্গুলী। কলা-কুশলীদের মধ্যে দায়িত্ব পালন করেছেন

...গ্রহণে দীনেন গুপ্ত, শব্দে অতুল চ্যাটার্জি, শিল্পনির্দেশনায় সুনীতি মিত্র, সম্পাদনা কমল গাঙ্গুলী, সঙ্গীতে নবীন চ্যাটার্জি, পরিচালনায় কমল মজুমদার ও প্রযোজনায় তারা বর্মণ। প্রধান সহকারী রূপে পরিচালনায় বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রঞ্জন মজুমদার। ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সম্ভবতঃ আগামী আগষ্ট মাসের ১০ই তারিখে রূপবাণী-অরুণা ভারতী এই চিত্রগৃহে 'অভিসারিকা' মুক্তি পাবে। —চিত্রদূত

নতুনরীতির পরিচালক গ্রেগরী চুখ্‌রাই

গ্রেগরী চুখ্‌রাইয়ের "দি ব্যালাড অফ এ সোলজার" ব্রিটিশ ফিল্ম আকাডেমির পুরস্কার লাভ করার পর স্বভাবতঃই চুখ্‌রাইয়ের নবতম ছবিটির প্রতি দর্শক-সাধারণকে "আগ্রহী করে তুলেছে। চুখ্‌রাই তাঁর নবতম ছবি "পিপল অফ দি আর্ট"এর চিত্রনাট্যের কাজ শেষ করেছেন। যথারীতি তাঁর অন্যান্য ছবির মত এই ছবিটির পটভূমিও হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। একটি সোভিয়েট এবং শত্রুপক্ষের দুজন বৈমানিককে নিয়ে চিত্র-কাহিনী রচনা করেছেন চুখ্‌রাই। সোভিয়েট চলচ্চিত্র-জগতের নতুন-রীতির গ্রেগরী চুখ্‌রাই তাঁর প্রথম ছবি থেকেই বিশ্ব-বন্দিত। সোভিয়েট চলচ্চিত্রশিল্পের নতুন দিগন্তরেখাটি তাঁর প্রথম ছবি "ফর্টি ফার্স্ট"এর পর থেকেই উজ্জ্বল হতে আরম্ভ করেছে। "ফর্টি ফার্স্ট" চুখ্‌রাইয়ের প্রথম ছবি। এই ছবির পরই রাশিয়ায় পর পর কটি নতুন ছবি তোলা হয়েছে যথা : "দি ক্রেনস আর ফ্লাইং", "দি হাউস হোয়্যার আই লিভ", "দি ফেট অফ এ ম্যান" প্রভৃতি। চুখ্‌রাই-এর প্রতিটি ছবিই যুদ্ধকেন্দ্রিক। যুদ্ধকে তিনি দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জনৈক সৈনিক হিসেবে যুদ্ধকে চিনেও ছিলেন অবিকল। যুদ্ধের পর স্টেট ইনস্টিটিউট অফ সিনেমাটোগ্রাফির স্নাতক হন এবং তারপরে যোগদান করেন কিয়েভ স্টুডিওতে।

"দি ব্যালাড অফ সোলজার", 'ফর্টিফার্স্ট' এবং "দি ক্লিয়ার স্কাই"এর পরিচালক গ্রেগরী চুখ্‌রাই।

ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে চারপাশের সাধারণ মানুষেরাই তাঁর ছবিতে ভিড় করে। তীব্র সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায় তাঁর নায়ক-নায়িকারা। সামাজিক মাৎস্যন্যায়ের মধ্যে তাঁর নায়ক-নায়িকা সর্বদাই অনমনীয় এবং অজেয় চরিত্র। 'ফর্টি ফার্স্ট'এর নায়িকা মারিউট্‌কাও এমনি এক চরিত্র যে শেষ পর্যন্ত প্রেমিকের আহ্বানে সাড়া দেবার চেয়ে দেশপ্রেমে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয় মনে করেছে।

"ব্যালাড অফ এ সোলজার" চুখ্‌রাইয়ের দ্বিতীয় ছবি। ছবিটি নিয়ে পত্র-পত্রিকা মহলে হৈ-চৈ কম হয়নি। এই ছবিও যুদ্ধ নিয়ে, কিন্তু রোমাবর্ষণ, আহতের আর্তনাদ, সৈন্যসারির আক্রমণ ইত্যাদি যুদ্ধের আয়োজন এই ছবিতে প্রায় অনুপস্থিত; শুধু ছবির আরম্ভে স্বল্পকাল স্থায়ী একটি ট্যাঙ্ক-যুদ্ধের দৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রের আবহাওয়া রচনা করেছে। এই চিত্রের নায়ক প্রাইভেট আলোশা তাঁর এবং সমস্ত সোভিয়েট নাগরিকদের আত্মসম্মানরক্ষার্থেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি ছবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে : ফেলিনীর "সুইট লাইফ"। এই ছবিটিও "দি ব্যালাড অফ এ সোলজার"এর সঙ্গে কান্ চলচ্চিত্র-উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল। সুইট লাইফের চরিত্ররা যদিও শান্তি-কালীন মানুষ, তবুও তারা হাজার মরণে নিয়ত মরছে। কিন্তু 'সুইট লাইফ' মধুর জীবনের খোঁজ দিতে পারেনি। হতাশা, রুদ্ধশ্বাস এবং ক্ষয়িষ্ণু জীবনের ভয়াবহ প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন পরিচালক ফেলিনী। দুই মৃত্যুর দু রকম ভাষ্য করেছেন চুখ্‌রাই এবং ফেলিনী। চুখ্‌রাই-এর ছবি ভবিষ্যতের সঙ্গীতে সমাপ্ত। তাঁর নায়ক মরেছে শেষ পর্যন্ত বাঁচবে বলে।

চুখ্‌রাইয়ের তৃতীয় ছবি 'ক্লিয়ার স্কাই'। এই চিত্রের নায়িকা সাশা একটি অতি-সামান্য মেয়ে। 'ক্লিয়ার স্কাই'য়ের কাহিনী গড়ে উঠেছে এই মেয়েটিতে কেন্দ্র করে। —চিত্রকূট

ফাস্ট বোলার প্রসঙ্গ

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভায় স্থির হয়েছে, বিদেশ থেকে পাঁচজন ফাস্ট বোলারকে ভারতবর্ষে আমন্ত্রণ করে আনা হবে। এই পাঁচজনের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের চারজন—আর গিলক্রিস্ট, লেসলী কিং, সি ওয়াটসন এবং ...য়ার্স; তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার রে লিন্ডওয়াল। এই পাঁচজনের মধ্যে যদি কোন খেলোয়াড়কে না পাওয়া যায় তাহলে কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত দেশ থেকে ফাস্ট বোলার সংগ্রহ করে পাঁচজন ফাস্ট বোলারের কোটা পূর্ণ করা হবে। আরও প্রকাশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের চারজন ফাস্ট বোলার দলীপ সিংজী ট্রফির আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এবং রঞ্জি ট্রফির নক আউট পর্যায়ে অংশ গ্রহণ করবেন। তাছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই চারজন ফাস্ট বোলার ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে নেটে অনুশীলনরত ব্যাটসম্যানদের ফাস্ট বল খেলার পক্ষে সহায়ক হবেন। তাঁরা কোন সময়েই কোচের ভূমিকা গ্রহণ করবেন না—আমাদের ব্যাটসম্যানরা এই চারজনের বল খেলে ফাস্ট বল খেলার অভ্যাস করবেন। কোচের ভূমিকা গ্রহণ করবেন অস্ট্রেলিয়ার রে লিন্ডওয়াল। লিন্ডওয়াল ভারতবর্ষের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে পর কোচিং সাব-কমিটি একটি পূর্ণাঙ্গ গঠনমূলক পরিকল্পনা তৈরী করবেন।

এদিকে বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশন তাঁদের গত অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিদেশ থেকে ফাস্ট বোলার আমন্ত্রণের প্রস্তাবের উপর 'বোমা পড়ার' মত দাঁড়িয়েছে। ক্রিকেট খেলার ভাষায় বলতে পারেন 'বাম্পার'। বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশন বলেছেন, ছ'মাসের এই পরিকল্পনায় তাঁদের যে ১৫,০০০ টাকা চাঁদা দিতে হবে তা তাঁদের কাছে এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু আসলে পরিকল্পনাটি মোটেই লাভজনক ... তাঁরা পরিকল্পনাটিকে 'ব্যয় বহুল ...সতা' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এই চারজন ফাস্ট বোলারের মধ্যে যেখানে দুজন বোলারের বল দেওয়া সম্পর্কে যথেষ্ট প্রতিবাদ উঠেছে সেখানে তাঁরা এই ধরণের বোলারের বিপক্ষে খেলার পক্ষপাতী নন্।

॥ ভারতীয় হকি দল ॥

জাকার্তায় আগামী চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে যে ভারতীয় হকি দল যোগদান করবে তাতে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ মনোনীত হয়েছেন। খেলোয়াড় মনোনয়ন কমিটির সুপারিশ ভারতীয় হকি ফেডারেশন মঞ্জুর করেন। ভারতীয় হকি দলে ১৬ জন খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন। তবে আরও একজন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করার জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে। যদি শেষ পর্যন্ত ১৭ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় হকি দল গঠন করা সম্ভব হয় তাহলে দলের সপ্তদশ খেলোয়াড় হবেন গোলরক্ষক ক্রিস্টি।

ভারতীয় দলে নির্বাচিত ১৬ জন খেলোয়াড়ের নাম : এস লক্ষণ (সার্ভিসেস); পৃথিপাল সিং (পাঞ্জাব); জমনলাল শর্মা (ইউ পি); পিয়ারা সিং (সার্ভিসেস); দেশমুখ (সার্ভিসেস); এ্যানটিক (রেলওয়ে); চিরঞ্জিৎ (পাঞ্জাব); নির্মল (রেলওয়ে); গুরুমিৎ সিং (পাঞ্জাব); যোগীন্দর সিং (বাংলা); মদনমোহন সিং (পাঞ্জাব); গুরুদেব সিং (পাঞ্জাব); দর্শন সিং (পাঞ্জাব); বি পাতিস (সার্ভিসেস); হামিদ (রেলওয়ে) এবং আরম্যান (রেলওয়ে)।

দলের অধিনায়ক পদলাভ করেছেন পাঞ্জাবের গুরুদেব সিং। দলের সঙ্গে ম্যানেজার এবং কোচ হিসাবে যাবেন যথাক্রমে জে জেমসন এবং গুরুচরণ সিং। এই ষোলজন খেলোয়াড়ের মধ্যে পাঞ্জাবের ৬ জন, সার্ভিসেস দলের ৪ জন, রেলওয়ের ৪ জন, বাংলার ১ জন এবং ইউ পি'র ১ জন খেলোয়াড় আছেন। এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের পূর্বে এই ভারতীয় হকি দলটি মালয়ে ৬টি ম্যাচ খেলবে। কথা আছে, ভারতীয় হকি দল আগামী ২৮শে জুলাই মালয়ের পথে যাত্রা করবে এবং মালয়ের খেলা শেষ করে ১৪ই আগস্ট ইন্দোনেশিয়াতে পৌঁছবে।

ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়

বিগত উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় যে সব ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়রা যোগদান করেছিলেন তাঁরা এখন দুভাগ হয়ে ইউরোপ সফর করছেন। ইউরোপ সফর শেষে কৃষ্ণান, আখতার আলী এবং মুখার্জি আমেরিকান জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন।

রমানাথন কৃষ্ণান এবং প্রেমজিৎ লাল বেলজিয়ামের টেনিস খেলায় যোগদান করেন। অপরদিকে জয়দীপ মুখার্জি এবং আখতার আলি যোগদান করেন জার্মানীর টেনিস প্রতিযোগিতায়।

হেগে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ প্রদর্শনী খেলায় রমানাথন কৃষ্ণান ৮-৬ ও ৬-৪ গেমে ফ্রেড স্টোলীকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন। ডাবলসের খেলায় কৃষ্ণান এবং এ বছরের উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) জুটি বেঁধে ৬-৪, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে ফ্রেড স্টোলী এবং নীল ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

বেলজিয়ামের বিয়ারস্কট আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার ফাইনালে কৃষ্ণান ৬-২ ও ৬-৩ গেমে ওয়ারেন উডককে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণান এবং প্রেমজিৎলাল ক্রয়েড গ্রনকেল এবং এরিক ড্রোসার্টকে (বেলজিয়াম) পরাজিত করেন।

সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণান ৬-৪ ও ৬-১ গেমে নীল ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ফাইনালে কৃষ্ণান স্ট্রেট সেটে (৪—৬ ও ২—৬) জ্যাকি ব্রিচ্যান্টের (বেলজিয়াম) কাছে পরাজিত হ'ন।

ডুসেলডর্ফের আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের জয়দীপ মুখার্জি এবং আখতার আলির জুটি ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মান খেলোয়াড়দের কাছে পরাজিত হন।

॥ পলি উম্রিগড় ॥

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত চৌকশ টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উম্রিগড় টেস্ট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন। তবে তিনি রঞ্জি ট্রফি, আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবং দেশ-বিদেশের অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় যথারীতি অংশ গ্রহণ করবেন।

এক বিবৃতিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, মাঝেমাঝে তিনি পিঠের ব্যথায় খুবই কষ্ট পান এবং এ সম্পর্কে তিনি লন্ডনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষজ্ঞের মতে তাঁর পিঠে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। কিন্তু উম্রিগড় ক্রিকেট-খেলোয়াড় জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বড় রকমের কোনও অস্ত্রোপচারের পক্ষপাতী নন। সেই কারণে শ্রমসাধ্য পাঁচদিনব্যাপী টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে তিনি অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই অব-

র গ্রহণে ভারতীয় ক্রিকেটের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

পলি উম্রিগড় ভারতবর্ষের পক্ষে তাঁর জীবনের প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেন ১৯৪৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে (বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেস্ট)। তিনি এ পর্যন্ত ৫৯টি সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ঃ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৭টি (১৯৫১-৫২ সালে ৫, ১৯৫২ সালে ৪, ১৯৫৯ সালে ৪ এবং ১৯৬১-৬২ সালে ৪), ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে ১৬টি (১৯৪৮-৪৯ সালে ১, ১৯৫২-৫৩ সালে ৫, ১৯৫৮-৫৯ সালে ৫ এবং ১৯৬২ সালে ৫), পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৫টি (১৯৫২ সালে ৫, ১৯৫৪-৫৫ সালে ৫ এবং ১৯৬০-৬১ সালে ৫), নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫টি (১৯৫৫-৫৬) এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৬টি (১৯৫৬ সালে ৩ এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ৩)। এছাড়া তিনি ১৫টি বেসরকারী টেস্ট খেলেছেন। সরকারী টেস্ট খেলায় এক ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ২২৩, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে, হায়দ্রাবাদের প্রথম টেস্ট (১৯৫৫-৫৬)। তিনি ভারতীয় দলের পক্ষে অধিনায়কত্ব করেন ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫টি, ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩টি এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে ১টি টেস্ট খেলায়। তাছাড়া ১৯৬২ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কলকাতার চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের নিয়মিত অধিনায়ক কন্ট্রাকটরের অনুপস্থিতিতে খেলার শেষ দুদিন অধিনায়কত্ব করেন। এই খেলায় ভারতবর্ষ জয়লাভ করে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে ভারতবর্ষের পক্ষে টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ৫৬০ রানের রেকর্ড করেন রুসী মোদী (১৯৪৮-৪৯) এবং পলি উম্রিগড় (১৯৫২-৫৩)। ১৯৫২ সালে ইংল্যান্ড সফরে তাঁর মোট রান ছিল ১,৬৮৮ (গড় ৪৮·২২) এবং সফরে তাঁর সর্বোচ্চ রান ২২৯ নট আউট অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিপক্ষে; ১৯৫৩ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে তাঁর মোট রান ৮১৩ (গড় ৬২·৫৩) এবং সফরে তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ১৩০ প্রথম টেস্টে। ১৯৫৪-৫৫ সালে পাকিস্তান সফরে তাঁর মোট রান ৬৫১ (গড় ৬৫·১০) এবং সফরে তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ১৫১ পাকিস্তান সার্ভিসেস দলের বিপক্ষে। ১৯৫৯ সালের ইংল্যান্ড সফরে তাঁর মোট রান ১,৮২৬ (গড় ৫৫·৩৩) এবং সফরে তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ২৫২ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিপক্ষে; ১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কানপুরের যে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ১১৯ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করেছিল উম্রিগড় সেই খেলায় ২৭ রানে ৪টে উইকেট পান। তাঁরই অধিনায়কত্বে বোম্বাই দল গত চার বছর উপর্যুপরি রঞ্জি ট্রফি লাভ করেছে। ১৯৬২ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে উম্রিগড় টেস্ট খেলায় মোট ৪৪৫ রান (গড় ৪৯·৪৪) এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় মোট ৫৮৬ রান (গড় ৪৫·০৭) করে ব্যাটিংয়ের উভয় তালিকায় শীর্ষস্থান পান। টেস্ট খেলায় বোলিং গড়পড়তা তালিকায় তাঁর স্থান ছিল দ্বিতীয় (২৪৯ রানে ৯টা উইকেট, গড় ২৭·৬৬)। উম্রিগড় ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার এবং সেন্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সুদীর্ঘ ছ'বছর পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে যোগদান করে অগণিত দর্শকের চিত্তবিনোদন করেছেন।

ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় একমাত্র তিনিই তিন হাজার রাণ (৩৬৩১ রাণ) করার গৌরব লাভ করেছেন।

টেস্ট ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

মোট খেলা ৫৯ ঃ মোট রান ৩৬৩১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২৩, মোট সেঞ্চুরী ১২, মোট অর্ধ-সেঞ্চুরী ১৪। ১৪৭৫ রানে ৩৫ উইকেট।

॥ ডেভিস কাপ ॥

ইউরোপীয়ান অঞ্চল

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ইউরোপীয়ান অঞ্চলের এক দিকের সেমি-ফাইনালে ইতালী ৫—০ খেলায় ইংল্যান্ডকে পরাজিত ক'রে ইউরোপীয়ান জোনের ফাইনালে উঠেছে। ইতালী গত কয়েক বছরই ইউরোপীয়ান জোনের ফাইনালে জয়লাভ করেছে।

ফাইনালে ইতালীর সঙ্গে খেলবে সুইডেন। ইউরোপীয়ান জোনের অপর এক দিকের সেমি-ফাইনালে সুইডেন ৪—১ খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছে।

॥ ফুটবল লীগ খেলা ॥

গত সপ্তাহে (৯ই জুলাই থেকে ১৪ই জুলাই পর্যন্ত) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টা খেলা হয়েছে। খেলার ফলাফল ঃ ১১টা খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে এবং ৫টা খেলা ড্র গেছে।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আলোচ্য সপ্তাহে দুটি ম্যাচ খেলে ২ পয়েন্ট পেয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে রাজস্থানকে পরাজিত করে, কিন্তু পরবর্তী খেলায় পুলিশের কাছে ০—১ গোলে পরাজিত হয়। এ বছরের লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের এই দ্বিতীয় পরাজয়। প্রথম পরাজয় স্বীকার করে বাটা স্পোর্টস দলের কাছে ০—১ গোলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পুলিশের বিপক্ষে এ বছরের লীগের প্রথম খেলায় ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে জয়লাভ করেছিল। ইস্টবেঙ্গল বনাম পুলিশের ফিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের বাদুর একটা অফসাইড গোল বাতিল করা উপলক্ষ ক'রে সবুজ গ্যালারীর এক শ্রেণীর দর্শক লাইন্সম্যানের উদ্দেশ্যে ইট-পাটকেল, জুতা এবং সোডার বোতল নিক্ষেপ করতে থাকেন।

এ ঘটনা ঘটে দ্বিতীয়ার্ধের ১৮ মিনিটে এবং এই সময়ে পুলিশ ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। আত্মরক্ষার জন্যে লাইন্সম্যান মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং খেলা বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ উত্তেজিত দর্শকদের শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শেষে পুলিশকে আত্মরক্ষার্থে মাঠের মধ্যের ইট সংগ্রহ ক'রে মারমুখী দর্শকদের দিকে নিক্ষেপ করতে দেখা যায়। ১৬ মিনিট খণ্ড-যুদ্ধের পর উত্তেজিত দর্শক শান্ত হন এবং খেলা আরম্ভ হয়। মাঠের এই দিনের হাঙ্গামার ফলে কয়েকজন দর্শক এবং পুলিশ কর্মচারী আহত হন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইস্টবেঙ্গল বনাম বাটা স্পোর্টস দলের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের দুজন খেলোয়াড় রেফারীর সিদ্ধান্ত নিয়ে খেলার মধ্যে যে অশোভন আচরণ প্রকাশ করেছিলেন তার জন্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ উক্ত খেলোয়াড়দের ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং তাই এক এ-র কাছে এই ঘটনার জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ ক'রে যথেষ্ট খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। আমরা খুবই আশা করেছিলাম, এই দৃষ্টান্তের পর কলকাতার খেলার মাঠের দর্শক শ্রেণী আর কখনও বিরূপ সমালোচনার মুখে পড়বেন না।

(১৫ই জুলাই পর্যন্ত)

প্রথম তিনটি দল

	খে	জ	ড্র	হা	স্বঃ	বিঃ	প
মোহনবাগান	২৩	১৪	৬	৩	৪২	১৫	৩৪
ইস্টবেঙ্গল	২৩	১২	৯	২	২২	৭	৩৩
ই আই আর	১৯	৭	৯	৩	১৬	৭	২৩

আলোচ্য সপ্তাহে মোহনবাগান ক্লাব দুটো ম্যাচ খেলে ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। মোহনবাগান ২—২ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে খেলা ড্র করে এবং ১—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে। বর্তমানে মোহনবাগান ২৩টা খেলায় ৩৪ পয়েন্ট লাভ ক'রে লীগ তালিকার শীর্ষস্থান নিয়েছে এবং অপর দিকে ইস্টবেঙ্গল সমান খেলায় ৩৩ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

॥ ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার ॥

পাঁচশত বৎসরের পদাবলী

সুলভ ৬·০০; শোভন ৭·৫০

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য

১৫·০০

॥ সাহিত্য বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ ॥

অজিত দত্ত : **বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস** ১২·০০ ॥ ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : **মনসামংগল** (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ) ৩·০০; **বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস** ১·৫০ ॥ ডাঃ সুকুমার সেন : **বিচিত্র সাহিত্য—প্রথম খণ্ড** ৬·০০; **দ্বিতীয় খণ্ড** ৬·০০ ॥ অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত : **চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র** ৬·০০ ॥ ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র : **সাহিত্যের নানাকথা** ৬·০০ ॥ ডাঃ রথীন্দ্রনাথ রায় : **সাহিত্য-বিচিত্রা** ৮·৫০; **বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী** ৬·০০ ॥ ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : **নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার**—৪র্থ খণ্ড ৫·০০; ৫ম খণ্ড ৬·০০; **রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা** ৬·০০; **নাটক ও নাটকীয়ত্ব** ২·৫০; **নাটক লেখার মূলসূত্র** ৫·০০ ॥ ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : **ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য** ৮·০০ ॥ অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ : **আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য** ৮·০০ ॥ অধ্যাপক সত্যব্রত দে : **চর্যাগীতি পরিচয়** ৫·০০ ॥ অধ্যাপক প্রশান্ত রায় : **সাহিত্যদৃষ্টি** ৪·০০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী : **আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন** ৩·৫০ ॥ অরুণ ভট্টাচার্য : **কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল** ৪·০০ ॥ আজহারউদ্দীন খান : **বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল** ৫·০০ ॥ বিষ্ণু দে : **এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য** ৪·০০ ॥

॥ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ॥

ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ ৫·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫·০০

॥ অন্যান্য জীবনী গ্রন্থ ॥

বলাইদেবশর্মা : **ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়** ৫·০০ ॥ মণি বাগচি : **রামমোহন** ৪·০০; **মাইকেল** ৪·০০; **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ** ৪·৫০; **কেশবচন্দ্র** ৪·৫০; **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র** ৪·৫০; **শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার** ১০·০০ ॥ প্রভাত গুপ্ত : **রবিচ্ছবি** ৬·০০ ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী** ১·৫০ ॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : **বঙ্গের প্রাচীন কবি** ১·০০ ॥ খাজা আহমেদ আব্বাস : **ফেরে নাই শুধু একজন** ৪·০০ ॥

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯ ॥ **জিজ্ঞাসা** ॥ ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

সিমেনস স্পেশাল সুপার ৬৯২ ডব্লিউ-ও

- ৬ ভাল্‌ব ম্যাজিক ফ্যান টিউনিং ইন্ডিকেটরসহ
- ২টি ওয়েভ ব্যান্ডের জন্য শর্টওয়েভ ব্যান্ডস্প্রেড নিয়ন্ত্রণসহ ৪টি ওয়েভব্যান্ড
- ৬+৩ পুশ ব্যাটন্
- ৩ টোন স্প্যাকট্রাম কন্‌ট্রোল
- ৩টি লাউড স্পীকার (৬×১০½ সিম্‌ফোনিক পি এম স্পীকার—ডাইভার্জেন্স কোণ ও ল্যাটারাল টুইটার সমন্বিত—প্যানোরামিক সাউন্ডের জন্য)
- ম্যাকসিফ্‌ট অ্যানটেনা
- ট্রেবল কন্‌ট্রোল
- অটোমেটিক্ ফ্যাডিং কন্‌ট্রোল
- অ্যান্টেনা, গ্রাউন্ড, রেকর্ড প্লেয়ার এবং এক্সটেনশন স্পীকারের জন্য টার্মিনাল
- মূল্যবান ওয়ালনাট কাঠের পাতলা পাতে তৈরী স্টীমলাইনড্ কেবিনেট
- শর্টওয়েভ মাইক্রো টিউনিং

মূল্য ৫৭৫, টাকা উৎপাদন শুল্ক সহ এবং স্থানীয় কর।

SIEMENS
INDIA

পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও আন্দামানের পরিবেশক :

নান অ্যান্ড কোম্পানী ৯এ, ডালহৌসী স্কোয়ার, ইস্ট, কলিকাতা—১

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

● 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। অমনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

● প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

● রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

সত্যজিৎ রায় ও
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
সম্পাদনায়
সচিত্র মাসিক পত্র
মে ১৯৬২। বৈশাখ
থেকে ২য় বর্ষ
সুরু!

প্রতি সংখ্যা ৭৫ ন.প.
বার্ষিক চাঁদা ৯ টাকা

অমৃত ।। অমৃত ।।

অমৃত

।। অমৃত ।। অমৃত

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১১ই শ্রাবণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 27th July 1962.
40 Naya Paise.

'আজব শহর কোলকাতা!' এই মহানগরী ভারতের বৃহত্তম জনারণ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্য অনেক কিছুতেই কলিকাতার বৈশিষ্ট্য আমরা দাবী করিয়া থাকি, এবং সেই দাবীর কারণে কলিকাতার সঙ্গে অন্য দু-চারটি মহানগরীর (বিশেষ বোম্বাইয়ের) রেষারেষি আছে। কলিকাতা বলিতে বাঙ্গালী ও বাংলা বুঝায় এবং সেই কারণে কলিকাতা ও বাঙ্গালী ভারতের অন্য প্রান্তের লোকের কাছে হিংসার ও দ্বেষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কারণে বোধ হয় কলিকাতাকে আসনচ্যুত করিবার জন্য নানা দিক হইতে নানা শক্তি চেষ্টিত হইয়াছে।

আগেকার দিনে শুনিতাম যে, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলিকাতা ও বাংলা সারা ভারত হইতে বহু অগ্রসর। কোনও এক রসিকজন বলিয়া গিয়াছেন যে, 'কালচার' (কৃষ্টি-সংস্কৃতি) জন্মগ্রহণ করে মাদ্রাজে, তাহার লালন-পালন ও পোষণ হয় বাংলায়। বিহারে অনশনক্লিষ্ট হওয়ায় সে পলাইয়া যায় উত্তর প্রদেশে। সেখানে রোগে জর্জরিত হওয়ায় সে যায় পাঞ্জাবে এবং সেখানে তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে!

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক মার্কিন ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় লিখিত

মার্কিনী জীবন

আগামী সংখ্যা থেকে 'অমৃতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

এই কৃষ্টি-সংস্কৃতি আমাদের গর্বের কারণ ছিল বলিয়াই আমরা ভারতের অন্য সকল প্রান্ত ও প্রান্তীয় লোকজনকে উন্নাসিক মনোবৃত্তিতে দেখিয়াছি। সেই কারণে বোধ হয় কলিকাতা পৌর-সংস্থা দর্পহারী মধুসূদনের ন্যায় আমাদের সকল গৌরব চাপা দিতে চেষ্টিত হইয়াছেন আবর্জনার স্তূপে।

তারপর খ্যাতি ছিল কলিকাতার আলোকমালায় সজ্জিত প্রাসাদ ও পথের। কলিকাতার প্রধান রাজপথ-গুলির অন্য অনেক কিছু দোষ-ত্রুটি আছে যাহা প্রধানতঃ ঘটিয়াছে যুদ্ধের ও যুদ্ধোত্তর কালে, কিন্তু পথের ও পথের ধারের দোকানপাটের উজ্জ্বল বিজলী-বাতির শোভা এত দিন কলিকাতার মুখ রাখিয়াছিল। বোম্বাইয়ের মেরিন ড্রাইভের দীপমালা সুন্দর, কিন্তু সে সৌন্দর্য পথের ধারেই, এবং সেই কারণে দূর হইতেই দেখিতে ভাল। দোকানপাটের শোভা—যেমন চৌরঙ্গীতে—সেখানে নাই। দিল্লী বা মাদ্রাজ সে বিষয়ে অনেক পিছনে, বরঞ্চ লক্ষ্ণৌ নগরীর সে বিষয়ে কিছু দেখাইবার আছে। যুদ্ধের সময় দীপ-সংকোচের ঠেলায় এবং সামরিক যানবাহনের ধাক্কায় কলিকাতা ম্লান হইয়া গিয়াছিল কিছু কালের জন্য। তারপর পথঘাটে উজ্জ্বল আলোক দিবার জন্য গ্যাসের বাতির বদলে বিজলী বাতির ব্যবস্থা হইল। সেখানেও কলিকাতা 'চোরপোরেশন' নামের সার্থকতা জাহির করিয়াছে বিজলী বাতির স্তম্ভ 'পাচারের' ব্যাপারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এখন ধীরে ধীরে এই মহানগরের অলি-গলি পথ-ঘাট তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতেছে।

তারপর আসিয়াছে আর এক কর্পোরেশনের বিপরীত ব্যবস্থা। কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে যে কর্পোরেশন তাহার মহিমায় এখন কলিকাতার কোনও অঞ্চলে নিশ্চিত মনে আলো-পাখা ভোগ করা যায় না। দোকান, বাজার-হাট, এক মুহূর্তে উজ্জ্বল আলোকে উচ্ছ্বসিত, পরের মুহূর্তেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কখন কি হয় জানা যায় না কেননা কোনও বিজ্ঞপ্তি পূর্বাহ্নে দেওয়া হয় না। হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা, তাহাও বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে এই শক্তি-স্খলনের কৃপায়।

এত দিনে জানা গিয়াছে যে, এই অবস্থার প্রধান কারণ কতকগুলি কলকারখানার মালিকের স্বার্থপরতা। তাঁহারা জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্নকে অবহেলা করিয়া অত্যধিক বৈদ্যুতিক শক্তি টানিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্পোরেশনকে ক্ষমতা দিয়াছেন ঐ স্বার্থপর কলওয়ালাদের সায়েস্তা করিবার। এখন দেখা যাক এই আলো-আঁধারের ধাঁধার সমস্যা পূরণ হয় কিনা।

কিন্তু এ সকল গৌরবের চাইতে শ্রেষ্ঠ গৌরব আমাদের ছিল বিক্ষোভ মিছিলে ও শোভাযাত্রায়। এ বিষয়ে আমাদের প্রাধান্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই গৌরবও বুঝি আমাদের যায়, মাদ্রাজে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগাম নামক উত্তর-ভারত বিদ্বেষী সংস্থার কৃপায়! ইহাদের মতে উত্তর ভারতের আর্য-সংস্কৃতি দ্রাবিড়-সভ্যতার গৌরব আচ্ছন্ন ও ক্ষুণ্ণ করিয়াছে—সুতরাং বহিষ্কার ও বিচ্ছেদ প্রয়োজন, যাহাতে মাদ্রাজে ভূস্বর্গ স্থাপিত হয়!

কবিতা ॥ ॥ কবিতা

মুহূর্ত
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইলেকট্রিক তারের উদ্যানে
স্মৃতির ফুলের মত চড়ুয়েরা স্থির ব'সে আছে
বিকেলের শান্ত রোদ বুকে নিয়ে।

শহরতলীর এইখানটাতে
কোথাও ফুলের কোন চিহ্ন নেই
কোন বনস্পতি নেই;
শুধু, এ-বাড়ির ও-বাড়ির বারান্দা কার্নিশে
টবের ক্যাক্টাস আছে, করুণা অপার হ'লে
একটি দুটি ফুল দেবে ব'লে।

মাঝে মধ্যে উদ্দাম হাওয়ায়
চড়ুয়ের বুকগুলি সামান্য কাঁপছে, যেন
রজনীগন্ধার কুঁড়ি।

বিকেল গভীর হ'লে সব স্মৃতি রক্তে ডুবে যাবে ॥

চম্পক, ডেকো না তাকে
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চম্পক, ডেকো না তাকে কোনদিন জ্যোৎস্নার বাহিরে,
আহা, সে থাকুক একা, অন্যমনে নিভৃত বাগানে;
ভুলায়ে এনো না তাকে নীল রাত্রে আসক্ত গভীরে,
চম্পক, বোল না কথা গাঢ়স্বরে তার কানে কানে।

এখানে বৃক্ষের নীচে বিনিদ্র সমাধি স্নেহ যাচে;
রক্তের অঙ্গার দিয়ে অহংকার নিজস্ব পোড়ায়;
বাতাসে তীক্ষ্ণধার সংগোপনে ওৎ পেতে আছে,
দূরবর্তী কণ্ঠস্বর শবযাত্রী স্রোতে ভেসে যায়।

উত্তরে দরজা খোলা, দক্ষিণে পা বাড়াতে পারি না।
প্রীতি নৌকা ভালবেসে মোহনায় টেনে নেয় যদি,
তবে কি নিষ্ঠুর হাত গৃহাদের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে
দেয়ালে টাঙাবে ছবি? তা হ'লে কি নির্জন আঙিনা
ব্যাপ্ত ক'রে বয়ে যাবে গোধূলির অন্তহীন নদী?
চম্পক, ডেকো না তাকে কোনদিন দৃশ্যের বাহিরে।

✲

আমি কবি করি ধ্যান
বীরেন্দ্র মল্লিক

আমি কবি করি ধ্যান কোনো এক পরিতৃপ্ত নির্লিপ্ত
উদার মানুষের,
আকাঙ্ক্ষার হাত হতে চোখ যার পরিব্যাপ্ত দূর এক
নক্ষত্রলোকের
আঙিনায়; তবু সে ত বাঁধে বাসা, থাকে এই পৃথিবীর
মাটির উপর,
পিতা আছে, মাতা আছে, কন্যা পুত্র সবই আছে,
ঘরণী ও ঘর।
সুখ-দুঃখ আছে তারও; রোগ শোক জ্বালা ও যন্ত্রণা
সবই আছে,
অভাবের শত দায়;—চিতার আগুন যেন দিনরাত চলে
পাছে পাছে।
তবু তার মেরুদণ্ড থাকে ঋজু; ব্রহ্মাণ্ডের ভার বহি
করে না ত মাথা নত;
মনুষ্যত্ব দাবী তার; ভালবাসা স্নেহ প্রেম কোমল প্রবৃত্তি
আরো যত
সদাই জাগ্রত থাকে; ব্যগ্র দুটি বাহু মেলে সদা নাশে
রাত্রির আঁধার,
যে-আঁধার তিলে-তিলে কুরে-কুরে খায় প্রাণ এই সভ্যতার।

কবির কল্পনা না কি? হয়ত বা হতে পারে মস্তিষ্ক বিকার,
তবুও যে তারই ধ্যানে তন্ময় রয়েছি আজো—এই মোর
কবির নিজস্ব অধিকার।

জৈমিনি

আমাদের বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা প্রায়ই আবৃত্তি করা হত। কবিতাটির নাম বন্দী বীর। ইদানীং রুচি-পরিবর্তনের ফলে সেই কবিতাটি 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন' ইত্যাদি সংগীত-নৃত্যের সঙ্গে পশ্চাদ্‌পটে সরে গেলেও, তার কয়েকটি পংক্তি এখনও সমুজ্জ্বল হ'য়ে আছে আমার মনে। সেগুলি হল এই রকম—

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

কে জানত, পংক্তিগুলির এমন বাস্তব দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে এই কদিনের নাগরিক জীবনের ইতিহাসে। 'প্রাণ দান', অর্থাৎ এক্ষেত্রে জনসেবার জন্যে এমন 'কাড়াকাড়ি' কাণ্ড এর আগে আর কখনো প্রত্যক্ষ করা গেছে কিনা সন্দেহ!

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়, ময়লা পরিষ্কার। কিন্তু তাই নিয়ে যে এ ধরনের একটা কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ঘনিয়ে উঠতে পারে তা আমরা কেউই কল্পনা করতে পারিনি।

অবশ্য একথা ঠিক, রাস্তায় বসানো ময়লা-ফেলার ডাস্টবিনগুলোর গায়ে লেখা থাকতে দেখা গেছে 'ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে'। তবে সে বিজ্ঞপ্তি যে সেবার সদিচ্ছায় জাগ্রত ব্যক্তিবর্গের প্রতিও প্রযোজ্য হবে তা কখনো অনুমান করা যায়নি। কার্যকালে দেখা গেল, সরকারী পরামর্শে নিযুক্ত আবর্জনা পরিষ্কারকারী সংগঠন সেই ধমকানিতেই থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হ'য়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি আলাপ-আলোচনার ফলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটেছে বটে, কিন্তু প্রাথমিক উদ্দেশ্য থেকে তা অনেক দূরে। মাত্র মাসখানেক সেবা করার সুযোগ পাবেন তাঁরা। এই সময়ের মধ্যে শহরের সব থেকে বেশি আবর্জনা-আক্রান্ত অঞ্চলগুলোতে একটা মোটামুটি সেবা করে, আমাদের আবর্জনা-সচেতন করে, রঙ্গমঞ্চ থেকে তাঁরা বিদায় গ্রহণ করবেন। স্থায়ীভাবে সেবা করার মৌরসী অধিকার থাকবে কর্পোরেশনেরই করায়ত্তে।

উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। ভাগের মা গঙ্গা পায় না, এ কথা মিথ্যা। বরং ভাগের মা-ই তাড়াতাড়ি গঙ্গালাভ করে। অন্ততঃ বর্তমান ক্ষেত্রের শিক্ষা থেকে সেই সত্যই হাড়ে-হাড়ে টের পেলাম আমরা।

মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে বৃষ্টির জন্যে এক গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়েছিলাম, কানে এসেছিল একটুকরো খণ্ডিত সংলাপ। (এর মধ্যে 'স' ও 'শ'য়ের উচ্চারণ হবে ইংরাজির এস্-এর মতো।)

দ্বিতীয় কণ্ঠ : আরে ঘাবড়াস কেনে? দেখিস, ওসব কিস্‌সু হবে নি।

প্রথম : কেনে? এবার কোমর বেঁধে লেগেছে, বুইলি। ময়লা কুড়োনোর পাট গুটোতে হবে।

প্রথম কণ্ঠ : একে শালা বিষ্টি, তার উপরে আবার ঐসব কান্ড! দেশ উদ্ধারের ঠাঁই পেলনি কত্তারা। যত্তো সব ইয়ে—?

দ্বিতীয় : ইল্লে-ইল্লে, গুটোলেই হল। শলা, খাব কী করে? কথায় বলে, সাত পুরুষের ব্যাব্‌সা, ডকে উঠলেই হল? দেখিস সব ফেঁসে যাবে।

প্রথম : যাঃ?

দ্বিতীয় : (হাস্যসহকারে) হ্যাঁরে হ্যাঁ। মুরোদ সব জানা আছে। কত্তো এল, কত্তো গেল। তা শলা, ময়লা যেমনকে তেমনি রইল। আরে বাবা, আমাদের কপালটেও ভাব দিকিনি? ময়লা না থাকলে এ ধেন্নার ব্যাবসা যাবে কনে? তা আমাদের এই পোড়া কপাল যদ্দিন, ময়লাও তদ্দিন। কুছ পরোটা নাই!......

বুঝতেই পারছেন, এরা ময়লা কাগজ ইত্যাদি কুড়োনো-ওয়ালা। সেদিন তাদের কথাবার্তা শুনে মনে মনে হেসেছিলাম। কারণ আমি ভেবেছিলাম ওরা হতাশ হবে, শহরে আর আবর্জনা পাবে না ওরা। কিন্তু দেখছি, হাসবার পালা ওদেরই। মাছ যেমন জলকে চেনে, আমাদের চেয়েও তেমনি প্রাণ দিয়ে চেনে ওরা এই শহরকে। ওরা হতাশ হবে না।

ময়লা থাকবে। সাময়িকভাবে হয়তো অদৃশ্য হবে কোনো কোনো অঞ্চল থেকে। কিন্তু মাসখানেক পরেই রীতিমত হাওয়া বদল করে হৃষ্টপুষ্ট আকারে ফিরে আসবে যথাস্থানে। এবং ততদিনে যেহেতু আমাদের করালবদনা কলেরাদেবী প্রতিদিন অজস্র মানুষের আয়ু ভক্ষণ করে ক্লান্ত হ'য়ে পড়বেন, সেইহেতু আবর্জনার স্তূপ যে বিশেষ রকম একটি আলোচ্য বস্তু, তাও হয়তো আমরা ভুলে যাব।

অবশ্য কর্তৃপক্ষ আশা করেছেন, ইতিমধ্যে নাকি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা আমাদের অনেকটা ধাতস্থ হ'য়ে যাবে। কিন্তু সেই গল্পে-বর্ণিত মেছুনির কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? একরাত্রে গৃহস্থ-বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে যে চারিদিকে মেছো গন্ধ না পেয়ে শেষে আঁশ-বঁটি পাশে নিয়ে ঘুমোতে বাধ্য হয়েছিল? আমরাও কি সেইরকম চিরপরিচিত দুর্গন্ধের বদভ্যাসে সলিলসমাধি লাভ করিনি? এত সহজেই তার থেকে উদ্ধার পাব!

মনে তো হয় না! আমি দুর্জন নই, ভালো কাজের মধ্যে খুঁৎ আবিষ্কার করে বাহবা নিতে চাইনে। কিন্তু সত্যিই ভেবে দেখুন তো, আইন এসে লাঠি উঁচিয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত, কোন্ ভালো কাজটা আমরা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছি? সতীদাহ, বহুবিবাহ থেকে শুরু ক'রে শহরের যানবাহনে ধূমপান করা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই রয়েছে আইনের ধমক। কাজেই নোংরামির এই আজন্মার্জিত স্বভাবও যে নিজের তাগিদেই কাটিয়ে উঠব আমরা, এমন ভরসার কারণ খুঁজে পাইনে।

আমরা চির-নাবালক। আমাদের অভিভাবকত্ব দরকার। আইন-মহারাজ যতোদিন না সেই কর্ণধারের ভূমিকা গ্রহণ করে ততদিন কোনো ভালো কথাই আমাদের কানে ঢুকবে বলে মনে হয় না। ময়লা পরিষ্কার করা হচ্ছে, হোক। কিন্তু সেইসঙ্গে কর্তৃপক্ষের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ—একটি আইন পাশ করুন, যাতে আমরা নোংরা থাকতে ভয় পাই। এবং—

এবং অকালবৃদ্ধ জন্ম-হাবার মতো প্রতিনিয়ত সেবা-গ্রহণ করতেও লজ্জাবোধ করি।

দ্বিজেন্দ্রলাল

কবি ও নাট্যকার

ঊনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্য ছিল ক্লাসিক আর রোমান্টিক চেতনার এক মিশ্র অভিব্যক্তি। মধুসূদনের কাব্যে ক্লাসিক ভাবাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিক কবিমনকেও খুঁজে পাওয়া যায়। মধুসূদনের ক্লাসিক আদর্শের উত্তর সাধক হিসাবে একজনেরও আবির্ভাব হল না। নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের নীরক্ত ক্লাসিক-বোধ খুঁজে পাওয়া যাবে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতির শিল্পসাধনার মধ্যে। একালের অনেকের সাধনায় দেখতে পাওয়া যায় ক্লাসিক আদর্শের অনুপস্থিতি এবং রোমান্টিক আদর্শের আবির্ভাব। যে ক্লাসিক আদর্শ এতদিন গতানুগতিকতাকে আশ্রয় করে জীবিত ছিল তা ক্রমশঃই রোমান্টিক গীতি-কবিতার মাঝখানে অবলুপ্তির সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। তাছাড়া ঊনিশ শতকের শেষ দশকে বাঙলার কবিরা মহাকাব্য আখ্যায়িকা কাব্য আর গীতি-কবিতা রচনায় নিরত ছিলেন। সেকালের আনুকূল্যহীন পরিবেশে একমাত্র মধুসূদনই ছিলেন মহাকাব্য রচনার উপযুক্ত শক্তিশালী শিল্পী। অনেকেই মহাকাব্য-রচনার নামে প্রতিভার অপচয় করে গেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

রিভাইভ্যালিজম এবং ইমাজিনেশন ঊনিশ শতকে—এই দুই ভাবধারার সমন্বয়ে জাতীয় আদর্শ গড়ে উঠেছিল। সমস্ত কিছুকেই যুক্তি ও তথ্য দিয়ে বিচারের চেষ্টা, সংস্কার থেকে মুক্তি—বাঙালীর চিন্তাজগতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে থাকে। সামাজিক জীবনের মাঝখানে তখন যে হাস্য-রসধারা প্রবাহিত ছিল তাকে অবলম্বন করে বাঙলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শাখা গড়ে ওঠে। সাহিত্যের গতিপথে যে নতুন ভাবপ্রবাহ দেখা দিল তার দ্বারা প্রভাবিত হলেন প্রত্যেক সৎ কবিই। দেশাত্মবোধ এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষে প্রত্যেক শিল্পী ও সাহিত্যিক তাঁদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

ঊনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। অগ্রজ অনুজ অনেক কবিই তাঁর প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্রথমেই সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করে নেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্যে প্রচলিত ক্লাসিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে রাবীন্দ্রীক রোমান্টিক বোধ ফুটে উঠেছে। মানকুমারী বসু, কামিনী রায় এবং ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐ একই পংক্তিতে স্থান দিতে হবে। এই সাহিত্যিক পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব হলেও স্বকীয় প্রতিভা ও কাব্য-কলারীতিতে এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাথমিক কাব্য-প্রচেষ্টার ওপর বিহারীলালের ভাবতন্ময়তা অপেক্ষা হেমচন্দ্র,

নবীনচন্দ্রের প্রভাবই অধিক প্রতিফলিত। স্বদেশপ্রেম আর স্বাজাত্যবোধে অন্যতম অনুপ্রেরণাদানকারী মনীষী হিসাবে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের নাম স্মরণীয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালীন রচনায় হেমচন্দ্রের ছাপ কিছুটা থাকলেও দ্বিজেন্দ্রলালের মত গভীরভাবে স্বীকার করে নেন নি।

রবীন্দ্র-প্রভাব থাকা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য থেকে স্বতন্ত্র কবি-মানুষটিকে চিনে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। বাঙলা কাব্যের গতিপথে এক অভিনব সুর-সংযোজন করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ভাষারীতি ও শিল্প-ভঙ্গিমায় যে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা বলিষ্ঠ কলাকৃতি ও শিল্প-চেতনারই নিদর্শন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিমানস এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী। বাঙলা কাব্যজগতের ইতিহাসে তাঁর ব্যক্তিত্ব-নির্ভর বলিষ্ঠচেতনা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে গেছে। রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এই সচেতন পৌরুষদীপ্ত কবিকে। দ্বিজেন্দ্রলাল মুখ্যতঃ নাট্যকার হিসাবে খ্যাতিলাভ করলেও সমসাময়িক কালে তাঁর কাব্যের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের একাধিপত্যই মুখ্যতঃ তার জন্য দায়ী। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবর্তিত কাব্য-রীতিকে স্বীকার করে পরবর্তী কালে কোন কবি খ্যাতিলাভ করেননি, এমনকি ঐ পথে কোন কবি স্বীয় প্রতিভার মুক্তি দেননি।

দ্বিজেন্দ্রলাল সার্থক বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবি ছিলেন না। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত রোমান্টিক রূপোপলব্ধির চূড়ান্ত সাধনা চললেও তার মধ্যে ক্লাসিক শিল্পবোধও সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনায় বিশুদ্ধ রোমান্টিক চেতনা সার্থক পরিণতি লাভ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-মানস আর কাব্যরীতি বায়রণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। অতিরিক্ত স্বপ্নচারী না হয়ে বায়রণের কাব্যজগতে রোমান্টিক ভাব-রসের সঙ্গে এক অভূতপূর্ব বাঙ্গময়তা বা বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সমকালীন সমাজচিত্র বায়রণ ও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে সত্য। লিরিক ও স্যাটায়ারের সমন্বয়ে বায়রণের কাব্যে যে বৈচিত্র্য এসেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে সুস্পষ্টভাবে গ্রহণ করেছিলেন। লৌকিক জীবনাবদ্ধ রূপটির প্রতি কৌতুকময় দৃষ্টিপাতের সাহায্যে বুদ্ধিদীপ্ত চেতনার এক তীর্যক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য গীতিকাব্যের সূক্ষ্ম ভাবতন্ময় রূপটি সময় সময় তাঁদের কাব্যে ব্যঞ্জনা লাভ করেনি। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কাব্যরীতি-মনোধর্ম—কবিশক্তির দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল ও বায়রণের কোন তুলনাই হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল অনির্দেশ্য স্বপ্নরাজ্যে কল্পস্বপ্নের মায়ালোকে কবি-মানসের যথেচ্ছ বিহারে খেয়া পারাপার করেন নি; নিরুদ্দেশ যাত্রার স্বপ্নবিভোরতায় এক অপার্থিব হৃদয়াবেগে কবিমানসীর অভিসারে মুখর হয়ে ওঠেন নি: কষ্টকল্পনাহীন চিন্তা-চেতনার এক ঐতিহ্যময় রূপ উপলব্ধি করেছিলেন বলেই শ্যামলে নীলিমায়নীলা বনবীথিঘেরা মোহময় পরিবেশে কাব্য-লক্ষ্মীকে স্থাপিত না করে পার্থিব জগতের বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপের মাঝ-খানেই দেখতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত তাঁর কবিমানস বিচিত্রগামী নয়। একালীন রোমান্টিক উচ্ছ্বাসকে সংযত সংহত বলিষ্ঠ শিল্পকৃতির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ কবি আপন গন্ডীর মাঝ-খানেই উচ্ছ্বসিত স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল আপন সৃষ্টি ও ক্ষমতায় স্বতন্ত্র ও সমাহিত এক পরিচ্ছন্ন শিল্পী। রবীন্দ্র-যুগের এই পৌরুষদীপ্ত শক্তি-শালী কবি ভিন্নধর্মী কাব্যরীতি ও স্টাইলের জন্য এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী ছিলেন।

রোমান্টিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যে বুদ্ধিসচেতন মননধর্মী কাব্যরীতির এক স্বতন্ত্র জগৎ গড়ে তুলেছিলেন তা বলিষ্ঠ প্রতিভার ও মহৎ কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। সেকালীন কাব্য-সাধনার ধারায় যে ঋজু সংহত কলা-বিধির প্রবর্তন করেছিলেন, প্রচলিত কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে তা মহান ব্যতিক্রম। "রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রভাবের যুগেও দ্বিজেন্দ্রলাল যে মিশ্র-মানস ও তদনুগামী ভাষা ও ছন্দ ব্যবহার করেছেন তা বিস্ময়কর। রবিরশ্মির বিস্তার তাঁর কবি-ধর্ম ও কাব্যরীতিকে স্পর্শও করেনি, তাই রবীন্দ্র-যুগের অতি-কাঙ্ক্ষিত কাব্য-সংস্কার তাঁর কাব্যাচরণকে একেবারে বর্জনই করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-রীতির অনুগামী কেউ থাকলে হয়তো সে পথে রবীন্দ্র-প্রভাববর্জিত বাংলা কাব্যরীতির আর একটি দিক গড়ে উঠতে পারত। একালের কোনো কোনো কবি কবিতাকে প্রাত্যহিক জগতের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনতে চান। অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতাকে গদ্যের ধূসর-ধূলির ক্ষেত্রে নামিয়ে এনে এক অভিনব কাব্যরীতি আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তী কালের কবিরা সেই পথে অগ্রসর হলে নিঃসন্দেহে বাংলা কাব্যের নূতন সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই পথে সেদিনের মতো আজও দ্বিজেন্দ্রলাল একক।" (রথীন্দ্রনাথ রায়) কাব্য-সাধনার এই অভিনবত্বই তাঁকে সাহিত্য ক্ষেত্রে এক অসামান্য আসনের অধিকারী করেছে।

কাব্য নয় ক ছন্দোবন্ধ
মিষ্ট শব্দের কথার হার;
কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার,
তাহার কাব্য শব্দ সার।

কাব্য-সাধনার সত্য রূপটি ফুটে ওঠে এই বক্তব্যের মধ্য থেকে। ওজোগুণের অনুরাগী কবি সতর্ক প্রহরীর মত প্রত্যক্ষীভূত উপলব্ধিকে সদাজাগ্রত বিতর্কধর্মী বিচারশীল মনোভাবের দ্বারা স্পষ্টতর সত্যকে প্রকাশ করেছেন। "অস্পষ্টতার কুহেলীলোকে" স্বপ্নপ্রয়াণ করেননি। শব্দার্থবাদী কবিছন্দের ও বক্তব্যের সযত্ন প্রয়াসে কাব্যদেহ গড়ে তুলেছেন।

ছন্দ ব্যবহারে দ্বিজেন্দ্রলালের অবদান অসামান্য। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা'য় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অধিক ব্যবহৃত। কোনরূপ মৌলিক ক্ষমতার প্রকাশ না করে পূর্বসূরীদের ছন্দ-রীতিকেই স্মরণ করেছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রয়োগে গতানুগতিকতার পথ পরি-হারের চেষ্টা করেছেন কবি। 'মন্দ্র' কাব্যের 'নববধূ' কবিতায় ধীর লয়ধর্মী মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রবহমানতার সৃষ্টি করেছেন। এই ছন্দ ব্যবহারে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, এই ছন্দে ওজোগুণধর্মী ভাবের স্বচ্ছন্দ বিচরণ সম্ভব। 'আষাঢ়ে' কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দব্যবহার আরও সার্থক। স্বরবৃত্ত ছন্দে নতুন প্রাণের জোয়ার নিয়ে এলেন। সহজ কাব্যময়তা এবং সংলাপধর্মী গুণে এ ছন্দের মধ্যে প্রাকৃত জীবনের অসজ্জিত—অনলংকৃত ভাষা-ভঙ্গী পরিস্ফুট। যে মৌলিক দৃষ্টিশক্তির গুণে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা কাব্যে এই নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন তা অসামান্য।—

এই অতি গম্ভীর সভা, সবাই ধ্যানে মগ্ন
ছুরি এবং ফর্কে, ধারাল সব তর্কে
কঠিন এবং কোমল প্রশ্ন করেছে।

বসে ভগ্ন;
সবার হৃদয় ভক্তিপূর্ণ সবার বাক্য স্তব্ধ,
ধনুকে ধিনিক টঙাস ভিন্ন

নাইক কোনই শব্দ;
—স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রচলিত ধারায়, দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যকে ভঙ্গিমা এবং

সংলাপাত্মক ভঙ্গির সাহায্যে নতুনত্ব সৃষ্টি করলেন। 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গানে' ছন্দজ্ঞান আবদ্ধ ছিল ব্যঙ্গময়তার মধ্যে। 'মন্দ্র' কাব্যে সৃষ্টিক্ষমতা আরও সার্থক—আরও অভিনব। 'মন্দ্র' কাব্যের অক্ষরবৃত্ত ছন্দ নতুন রূপদানের চেষ্টা করা হলেও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাগুলিও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ দুটির থেকে এ কাব্যের বিষয়বস্তু সিরিয়স হয়ে ওঠায় ভাবগভীরতার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে প্রসাধন-কলায় অভিনবত্ব। গম্ভীর রসাশ্রিত ভাব ফুটিয়ে তোলার মধ্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কৌলিক মর্যাদা আবদ্ধ থাকলেও দ্বিজেন্দ্রলাল গম্ভীর তরল মূল্যবান মূল্যহীন মহৎ তুচ্ছ সাধারণ খণ্ড অখণ্ড যাবতীয় ভাব ও বিষয়কে ব্যবহার করে এক মহৎ ব্যত্যয় সৃষ্টি করলেন। ধ্বনি-গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রেখে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মাত্রাপদ্ধতির পরিবর্তন করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রবহমানতার সৃষ্টি করলেন প্রচলিত ছন্দরীতিকে আঘাত করে। 'আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় তিনি লিখছেন, "এ কবিতাগুলি ছন্দ-মাত্রিক (Syllabic); 'অক্ষর' হিসাবে ছন্দ নয়। দাশরথি রায়ের সময় কি তাহার পূর্ব হতে এ ছন্দ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ভারতচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী কবিগণ প্রায়ই এ ছন্দ বর্জন করে 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ প্রবর্তিত করেন। আমি সেই পুরাণো মাত্রিক ছন্দেই এ কবিতাগুলি রচনা করেছি। তফাৎ এই যে, আমি ছন্দকে সম্পূর্ণভাবে মাত্রার ও তালের অধীন কর্তে চেষ্টা করেছি।...এ ছন্দ প্রচলিত ছন্দের চেয়ে অধিক স্বাভাবিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "কোমল তরল জল" কেহ "কো—ম—ল—ত—র—ল—জ—ল" পড়ে না, "কোমল্ তরল্ জল্" পড়ে। এ ছন্দেও শেষোক্ত রূপ উচ্চারণ (অর্থাৎ শব্দের যেরূপ উচ্চারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ উচ্চারণ) কর্তে হবে। অন্যরূপে উচ্চারণ কর্লে ছন্দ-মাত্রিক হবে না ও যতি ভঙ্গ হবে।" দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দ সম্পর্কে কত গভীরভাবে চিন্তা করতেন এবং ছন্দ-সচেতন ছিলেন এ মন্তব্য থেকে তা সহজেই বোঝা যায়। কাব্যের জগৎকে প্রাকৃত জগতের ঊর্ধ্বে কৃত্রিমতার মাঝখানে স্থান দিতে চাননি বলেই ভাষা ব্যবহারে তাঁর বাস্তব জ্ঞান আরও চোখে পড়ে।

সে যদি তোর থাকত, খানিক
আবদার কর্তিস শোবার আগে
দাবি কর্তিস চুমা;
টেনে নিত বুকের মাঝে
গাইত সে সুমধুর স্বরে
"ঘুমা যাদু ঘুমা"

অথবা এসেছিলে সেদিন তুমি,
যেমন ক্লান্ত নিদ্রাবেশে
সুখ-স্বপ্ন আসে;
এসেছিলে, আসে যেমন
কান্তারে চামেলি গন্ধ,
বসন্ত বাতাসে;

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত হলেও স্বরবৃত্ত ছন্দের ঝোঁক রয়েছে। চলতি শব্দ প্রয়োগ করে যে প্রবহমানতার সৃষ্টি করেছেন তা সত্যই অভিনব। এ প্রসঙ্গে মোহিতলালের বক্তব্য স্মরণযোগ্য, "বাংলা বাক্যচ্ছন্দের প্রকৃতিমূলে যাহাই থাক, দুই ভাষার দুই ভঙ্গিকে একই নিয়মের অধীন করিয়া ছন্দ রচনা করিলে যাহা হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা দেখাইয়া দিয়া, এ বিষয়ে ছন্দরসিকের সব সংশয় দূর করিয়াছেন। এই ছন্দের পয়ারের যতি ও অক্ষরবৃত্তের (Syllabic) ঝোঁক এই দুইয়ের সমন্বয়ের চেষ্টা আছে—বাংলা ভাষার কথ্যরূপটিকে কথ্যভাষার উচ্চারণ-ভঙ্গিতেই ছন্দে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ ছন্দে কোনপ্রকার সুরের অবকাশ মাত্র নাই—খাঁটি সাদা জল, একটু রঙ বা গন্ধ নাই। ইহাতে ছড়ার ছন্দের একঘেয়ে চার মাত্রার চাল নাই। কাজেই স্বরের নৃত্যভঙ্গিও নাই; আবার পয়ারের বা পদভূমক ছন্দের ৮ বা ১০ মাত্রার চাল বজায় থাকিলেও, অর্থাৎ ইহার যতি পয়ারের মত হইলেও ইহাতে হসন্ত ও স্বরান্ত বর্ণের সেই প্রতি-যোগিতা নাই (কারণ, হসন্ত বর্ণগুলি

উহা হইয়া আছে) যাহার ফলে বাংলা পয়ার ছন্দ সাধারণ ধ্বনিবিজ্ঞানকে উপহাস করিয়া এক অপূর্ব সুর-বৈচিত্র্যের অধিকারী হইয়াছে।" দ্বিজেন্দ্র-লাল 'ত্রিবেণী' কাব্যে সিলেবিক ছন্দের ব্যবহার করে এক অভিনব পরীক্ষা কার্য চালিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্ত ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন, "......দ্বিজেন্দ্র-লালের এই অভিনব Syllabic ছন্দে স্বরবৃত্তের চটুলতা ও অক্ষরবৃত্তের অলস একটানা সুর বর্জিত হয়ে এক অভিনব পৌরুষ শক্তি জেগে উঠেছে, যার সন্ধান আমরা পাই ইংরেজি Iambic ছন্দের কবিতায়। আর দ্বিজেন্দ্রলালের এই Syllabic ছন্দেই প্রবহমানতা অর্থাৎ enjambement আনা সম্ভবপর ইংরেজির মতো। আমা-দের পরিচিত স্বরবৃত্তে enjambement আনা সম্ভবপর বলে মনে হয় না।"— মোট কথা দ্বিজেন্দ্রলাল লৌকিক রীতির ছন্দকেই কাব্যজগতে কৌলীন্যদানের জন্যই এই নিরলস পরীক্ষা কার্য চালিয়ে গেছেন। সংস্কৃত পজ্‌ঝটিকা ও অনুষ্টুপ ছন্দের প্রয়োগ করেছেন সার্থকভাবে। সংস্কৃত ও বাংলার মধ্যে ভাষাগত বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও যে কয়েকজন কবি-মনীষী সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্র-লাল সেই প্রতিভাবানদেরই একজন।

নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব বাঙলা নাট্য জগতে আধু-নিকতার সূচনা করে। ঐতিহাসিক নাটক-রচনায় সার্থকতা এসেছে যুক্তিগ্রাহ্য বুদ্ধিদীপ্ত মননশক্তির জন্য। পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক-রচনায় তাঁর কৃতিত্ব খুব বেশী নয়। জাতীয় চেতনা উন্মেষের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক নাটকগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। জনপ্রিয় নাটক হলেও এগুলি ত্রুটিমুক্ত নয়। আত্মভারাক্রান্ত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে সংলাপের অযাথার্থ্যে নাটকীয়তার রস-হানি ঘটিয়েছে। কোথাও কোথাও নাট্য-ধর্মবিচ্যুত হয়ে উদ্দেশ্য প্রচারই স্পষ্ট-ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবুও বলা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা নাটকে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। আঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গি ভাবভাষা প্রভৃতির দিক থেকে নাটকে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালীর মানসক্ষেত্রে পরিবর্তনের পালা শুরু হয়। বাঙলা নাটকের ওপর সেই প্রভাব উল্লেখ করে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার বিশ্লেষণই স্বাভাবিক। ইংরিজি নাট্যা-ভিনয়ের অনুকরণে যে বাঙলা নাট্যাভিনয় শুরু হয় তার মধ্যে দেশজ সুর বর্তমান ছিল। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ পৌরাণিক নাটক-রচনার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানি অসার্থক মৌলিক নাটকও রচিত হয়। বাঙলায় মৌলিক নাটক-রচনাকারীগণ সামাজিক সমস্যাকে নাটকে রূপ দিয়েছেন। নাটকে রামনারায়ণ, উমেশচন্দ্র মিত্র, তারকচন্দ্র চূড়ামণি, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির নাটকে সামাজিক বিষাক্ত স্ফোটক নানা-ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৮৬৭ খৃঃ হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয় সাহিত্যক্ষেত্রে তা দ্রুত প্রবেশ করে। স্বদেশপ্রেমের কথা স্মরণ করে নাটক রচনা করলেন কিরণ-চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, অক্ষয় চৌধুরী, হরলাল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, রজনীকান্ত গুপ্ত, গঙ্গাধর চক্রবর্তী প্রভৃতি। "হিন্দুমেলার পর হইতে কেবল আমার মনে হইত কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)। বাঙলা ঐতিহাসিক নাটকের পথিকৃৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এ মন্তব্য থেকে তৎকালীন নাট্য রচনার প্রেরণা উপলব্ধি করা যায়। জাতীয় চেতনা উন্মেষের জন্য ঐতিহাসিক নাটক রচনার সূত্রপাত। অতীত কাহিনী বর্তমান সমস্যার সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধকেই নাট্য-কারগণ ঐতিহাসিক কাহিনীর পট-ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন।

শক্তিশালী নাট্যকার হিসাবে গিরিশ-চন্দ্র তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অমৃতলাল বসু এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও দেশের মানুষের সঙ্গে সুপরিচিত। এঁদের অবদানে বাঙলা নাটক পুষ্ট হয়ে উঠেছে। ঊনিশ শতকের নবজাগ্রত চেতনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে অভিব্যক্ত। তবু শেষ পর্যন্ত অনুবাদ ও প্রহসন রচনার জন্য তাঁর কণ্ঠ তখন নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে অনুচ্চ। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' (১২৯৬), 'বিসর্জন' (১২৯৮), 'মালিনী' (১৩০২) প্রকাশিত হলেও তিনি জাতীয় চেতনা বা স্বদেশপ্রেমকে তখন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নাটকে স্থান দেননি। "জাতির প্রবল ভাবোদ্দীপনা অন্তরে অনুভব করিয়া তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ জাতীয় ভাবানুপ্রাণিত নাটক রচনা করিলেন। দর্শকগণ তাহাদের রাষ্ট্রিক সংগ্রামের প্রেরণা পাইল নাটকের মধ্যে। সুবিপুল উৎসাহে সেই নাটককে তাহারা সম্বর্ধনা জানাইল। আনন্দ-রসের প্রেক্ষাগৃহ ও আন্দোলনের রাজপথ এক প্রাণের যোগে সম্মিলিত হইয়া গেল।" (অজিতকুমার ঘোষ)। শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ হলেন গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদ-প্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর দু বছর আগে মারা যান গিরিশ-চন্দ্র; দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর চৌদ্দ বছর পর মারা যান ক্ষীরোদপ্রসাদ। দ্বিজেন্দ্র-লালের নাট্যকাররূপে আবির্ভাবের পূর্বেই অপর দুজন নাট্যকার প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিশেষ করে ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলি তখন জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে। গিরিশ-চন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের পথেই দ্বিজেন্দ্র-লাল তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সমসাময়িক বয়োজ্যেষ্ঠ নাট্যকার অপেক্ষা তিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনায় অধিক কৃতিত্ব ও সার্থকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। যদিও এঁদের প্রত্যেকেই [illegible] নিজ কাহিনীর স্থানে ইতিহাসকে [illegible] ভূমিকায় রেখে নাটকে রূপ দিয়েছেন [illegible] জাতীয় চেতনাকে। বিশ শতকের স্বদেশ-প্রেম পুরনো ইতিহাসের সাহায্যে মানব-মুক্তির পথে এগিয়ে গেল। দ্বিজেন্দ্রলালের হাতেই এই মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়েছিল। পূর্বসূরীদের কেউই যুগচেতনাকে তাঁর মত নাটকীয় সংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিধর্মী সংবেদনশীল মন সূক্ষ্ম অনুভূতিগুণে নাটকের মধ্যে এক সজীব আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। জাতিপ্রেম বা দেশপ্রেম পূর্ববর্তী নাট্যকারগণ অনুভব করে-ছিলেন ঠিকই—কিন্তু উদারচিত্ত দ্বিজেন্দ্র-লালই সর্বপ্রথম আদর্শের সুস্পষ্ট ঘোষণায় শৈল্পিকগুণধর্মিতার মধ্য দিয়ে মুখর হয়ে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রচার করে-ছিলেন মানবাদর্শের মহত্ত্বকে। তাঁর নাটকের আদর্শগত লক্ষ্যই ছিল সংকীর্ণ-তার ঊর্ধ্বে স্থিত মানব মহত্ত্বের নৈতিক প্রেরণা। নাটকীয় সংঘাত, চরিত্র সৃষ্টি সর্বোপরি নাটকীয় ঔৎসুক্য সৃষ্টিতে সার্থকতা এনে দিয়েছিল তাঁর কবিত্বময় ভাষা। "দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীতে এমন একটা তীক্ষ্ণতা, সুস্পষ্ট ছবি গ্রহণের শক্তি, ঋজুতা, বাস্তব-বুদ্ধি এবং প্রমোদ

আনন্দের পরিচয় আছে যাহা পূর্ব পূর্ব কবিগণের মধ্যে দুর্লভ—তাঁহার চরিত্রাঙ্কন প্রণালীর মধ্যেও তেমনি সুমার্জিত সীমা-পরিচিহ্ন এবং রেখা ব্যবহারের প্রণালীও বোধগম্য।" (শশাঙ্কমোহন সেন)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাস অপেক্ষা কল্পনাকে বেশী মর্যাদা দিয়েছেন; গিরিশচন্দ্র ইতিহাসকে অধিক মর্যাদা দেওয়ার ফলে চরিত্রগুলির নাটকীয়তা সম্পূর্ণভাবে ফুটে ওঠেনি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে ইতিহাসের মর্যাদারক্ষার চেষ্টা করেছেন এবং চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নাটকীয়তা সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছেন। নবোদ্ভূত চেতনার নাট্যরূপ দান করেন ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ অতিরিক্ত রোমান্স-আশ্রয়ী হওয়ায় কাহিনীতে অবাস্তবতার ছাপ পড়েছে অনেক সময়। কোথাও কোথাও চরিত্রগত বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গির অনুপস্থিতির ফলে স্থূল হয়ে পড়েছে; কেবলমাত্র "কাহিনীর মনোহারিত্ব ও প্লটের গল্পরস"ই বড় হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রোমান্সের আশ্রয় নিলেও তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ বিচারশীল মনের জন্য চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। "দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রোমান্সের কুহেলিকার মধ্যে মানব হৃদয়ের তীব্র আলোড়নগুলির স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তোলে।" ক্ষীরোদপ্রসাদ ব্যর্থ হয়েছেন অতিরিক্ত রোমান্স-প্রাধান্যের জন্য। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও ঐ ত্রুটির অভাব নেই। "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে সমস্ত ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছিল, তাদের ভাবাদর্শ ছিল স্বতন্ত্র। বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ আরও সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই যুগের নাটকগুলিতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের একটি প্রচেষ্টাও লক্ষিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের একাধিক নাটকে এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের কোনো কোনো নাটকে হিন্দু-মুসলমান মিলন স্থাপনের কিছু উৎ প্রচেষ্টাও আছে।" (রথীন্দ্রনাথ রায়)। মোটামুটি ভাবে গিরিশচন্দ্র ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল এই তিন প্রধানের মধ্যে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল অধিকতর সার্থক।

প্রহসনগুলি বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বীকৃতি পেয়েছেন ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্য। তাঁর 'পাষাণী', 'ভীষ্ম' এবং 'সীতা' পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত নাটক। চরিত্র-চিত্রণ যতই সার্থক হোক না কেন এ নাটকগুলিতে পৌরাণিক আবহাওয়া রক্ষিত হয়নি। ঊনিশ শতকের যুক্তিবাদী বাঙালী পুরাণকে সমকালীন যুগের প্রতিচ্ছবিরূপে অঙ্কিত করেছেন। "ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্য কাহিনী ও রোমহর্ষক অতিনাটকীয়তার প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি।......বিশুদ্ধ পৌরাণিক নাটক না বলে পুরাণাশ্রয়ী রোমান্টিক নাট্যকাব্য বলাই সঙ্গত।" ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক হিসাবে "তারাবাই" (১৯০৩) ব্যর্থ সৃষ্টি। 'সোরাব রুস্তম' সার্থক অপেরা বা সার্থক নাটক কোন গুণই অর্জন করতে পারেনি। 'পরপারে' (১৯১২) এবং 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) দুখানি সামাজিক নাটক। গতানুগতিকতার পথ বেয়ে রচিত এই কষ্টকল্পিত নাটক দুটিতে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার সার্থক বিকাশ ঘটেনি। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির কাছে এই নাটক দুটি ম্লান হয়ে গেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন বহুপঠিত ব্যক্তি। য়োরোপীয় নাট্যকলার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল গভীর। [illegible] তিনি সার্থকভাবে অনু[illegible] সাহিত্যের একটি শাখাকে [illegible] দিয়ে গেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি ত্রুটিমুক্ত নয়। যে যুগের কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচিত হয়েছে সে যুগের আবহাওয়াকে তিনি অনেক জায়গায় উপেক্ষা করেছেন। কোথাও কোথাও সমকালীন জাতীয় চেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে ঐতিহাসিক রসসৃষ্টির পথে বাধার সৃষ্টি করেছেন। দেশ ও কালের অত্যাধিক প্রাধান্যের জন্য অকারণ উত্তেজনা, সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস, সস্তা চমৎকারিত্ব, অসঙ্গত চরিত্র, অসংলগ্ন ও অতিনাটকীয় ঘটনার প্রবেশ ঘটেছে। তা সত্ত্বেও এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে একটি স্থায়িত্বের আবহাওয়া এনেছিলেন। আদর্শ ও চিন্তার স্বাভাবিকতার দ্বারা নাটক রচনার উপযুক্ত পরিবেশের সমাবেশ হয়েছে। আর তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে অসংখ্য ঐতিহাসিক নাটক।

'একটি স্মরণীয় নাট্য-নিবেদন প্রসঙ্গে'

মহাশয়,

আমি আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকার একজন পাঠক। বিগত ২৯শে জুন তারিখের পত্রিকার "প্রেক্ষাগৃহে"র 'একটি স্মরণীয় নাট্য নিবেদন' শিরোনামায় যে নাটকটির সমালোচনা করেছেন সেই "নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র" নাটকটির আমি একজন প্রত্যক্ষ-দর্শী। স্বভাবতঃই নাটকদর্শী হিসেবে নিজের মতামত প্রকাশের দাবী ক'রে আপনাদের নিকট এই পত্রখানি পাঠাচ্ছি।

আলোচনার প্রারম্ভেই আমি 'নান্দী-কার' নাট্যগোষ্ঠীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে রাখি। তাঁদের প্রচেষ্টা অভিনবত্বের দাবী ক'রতে পারে নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাই বলে আপনাদের সমালোচক নান্দীকারের 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' সকল দিক থেকেই (?) একটি স্মরণীয় সৃষ্টি"—ইত্যাদি অভিমতকে স্বীকার করে নেওয়া প্রায় অসম্ভবের আওতায় পড়ে যায়। আমি দুঃখিত।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা আলোচ্য নাটকটিকে দু'টি অংশে ভাগ ক'রে নিয়ে তাকে বিচার ক'রতে পারি।

'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র'—এই নাটকটির সুস্পষ্টভাবে প্রধানতঃ দু'টি দিক রয়েছে। একটি নাটকের গল্পাংশ বা কাহিনী, অপরটি নাটকটির বিশেষ টেক্‌নিক্।

টেক্‌নিকের দিক থেকে নাটকটির প্রস্তুতি 'অভূতপূর্ব'। 'অভূতপূর্ব' এই অর্থে যে এর পূর্বে এ প্রকার টেক্‌নিক বাংলা নাট্যজগতে বড় একটা দেখা যায় নি। ষ্টেজের অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে অডিটোরিয়ামের দর্শকদের এক ক'রে ফেলার প্রচেষ্টা রয়েছে যথেষ্ট। সার্থকতার প্রশ্ন-বিচার ক'রবেন সামগ্রিক দর্শকমন্ডলী। এ ছাড়া কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রশংসা ক'রতে হয় অবিসংবাদী মনেই। টিমওয়ার্কও যথেষ্ট প্রশংসার দাবী করে। অপরাপর টেক্‌নিকের বিষয় নন্দীকর যেভাবে আলোচনা করেছেন তা মোটামুটিভাবে সঠিক। কিন্তু আমরা বর্তমানে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রবো তা হ'লো নাটকের কাহিনী।

কাহিনীর দিক থেকে সকলেরই স্মরণ থাকা উচিত যে মূলে নাটকের নাট্যকার একজন ইতালীয়। কাজে কাজেই কাহিনী সর্বাংশেই বিদেশী সমাজ-ব্যবস্থার পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। আমাদের সমাজেও হয়ত এমন ঘটনা

ঘটে। কিন্তু বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে যাকে সত্য হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে ঠিক সে বিষয়কেই কি সাহিত্যের দিক থেকেও স্বীকৃতি দেওয়া সম্মত? ঠিক এই প্রশ্নই নান্দী-কারের 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' সম্পর্কে প্রযোজ্য। বাস্তব জগতে অনেক কিছুই সম্ভবপর—Fact is stranger than fiction! কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রেয় আর প্রেয়-র দ্বন্দ্বে শ্রেয়কে জয়ী করাই সাহিত্যের দিক দিয়ে সন্তোষজনক। তাছাড়া ইতালীয় সমাজ ও সাহিত্যের পরিবেশ এবং পটভূমিকায় যে নাটককে ইতালীয় দর্শক এবং পাঠক গ্রহণ করতে পারবে বাঙালী পাঠক এবং দর্শকের পক্ষে তা একরকম অসম্ভব। পাঠকের পক্ষে যদিবা সম্ভব হয়ও দর্শকের কাছে সেটি নিতান্তই অসম্ভব। ধরা যাক্ গী দ্য মোপাসাঁর 'বেলামি'কে যদি আজ নাট্যরূপ দেওয়া যায় এবং বাংলার রংগমঞ্চে তার অভিনয় করবার প্রয়াস পাওয়া যায় তবে বাঙালী দর্শক কি সে সৃষ্টিকে গ্রহণ ক'রতে পারবে? বর্তমানে আমাদের কল্পনাতীত। তবে এইসূত্রে মুষ্টিমেয় ইনটেলেকচুয়াল দর্শকদের আমরা অপাংক্তেয় ক'রে রেখে দিতে পারি। কারণ কেবলমাত্র ইনটেলে-কচুয়াল দর্শকমন্ডলীকে পৃষ্ঠপোষক সাব্যস্ত ক'রে এ্যামেচারিশ নাট্যাভিনয় সম্ভব, কিন্তু তার বেশী আশা করা অযৌক্তিক। আমাদের বক্তব্য হ'চ্ছে এই যে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্রে'র কাহিনী সম্পর্কে যে যাই মুখে বলুন না কেন বাঙালী দর্শকমন্ডলী একে মনে-প্রাণে স্বীকার ক'রে নিতে প্রস্তুত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। খুব সহজ করে বলতে গেলে বলা চলে যে নান্দীকারের এই নাট্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা আত্যন্তিক অভিনবত্বের দোষে দুষ্ট। এই একই প্রচেষ্টা যদি গ্র্যাজুয়্যাল হ'তো তবে হয়তো বর্তমান অভিযোগটিই অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্য দোষে দুষ্ট হতো। বাংলা নাট্যজগতে হঠাৎ এ ধরণের নাট্য-প্রয়াস অনেকটা যেন বেহিসেবী বলে বোধ হচ্ছে।

অবশ্য সবশেষে একথা বলা যেতে পারে যে কেউ যদি নাটকের কাহিনীর কথা গ্রাহ্য না করে শুধুমাত্র নাটকের টেক্‌নিক্ দেখতে চান তবে তিনি নিঃসন্দেহে লাভবান হবেন। অথবা কেউ যদি নিছক গল্পের সন্ধানে নাটকটি উপভোগ ক'রতে চান তিনিও খুশী হবেন যথেষ্ট। আবার কেউ যদি ইতালীয় নাট্যকার লুইজি পিরানদেল্লো এবং তাঁর একটি নাটকের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চান তা হ'লেও তিনি নিজেকে উৎসাহিত বোধ ক'রবেন। ধন্যবাদান্তে,

শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়,
১৭, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট,
ক'লকাতা—৫।

জীব-জগতের অস্বাভাবিক সম্পর্ক

শ্রদ্ধেয় অমৃত সম্পাদক মহাশয়,

গত ৭ম সংখ্যার (ইং ২২শে জুন) 'অমৃত'তে শ্রীঅয়স্কান্তের "জীব-জগতের অস্বাভাবিক সম্পর্ক" পড়ে নানা বিচিত্র বিষয়ে জানতে পারলাম। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই। তবে সমস্ত দৃষ্টান্তই বিদেশের।

আমাদের দেশেও যে একেবারেই এরূপ ঘটনা ঘটেনি তা নয়। এরূপ একটি ঘটনা আমার জানা আছে।

ঘটনাটি আমি দেখেছি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে প্রায় বছরখানেক পূর্বে। তাদের বাড়িতে একটি বিড়াল এবং একটি কুকুর ছিল। গৃহপালিত কুকুর এবং বিড়ালের মধ্যে সচরাচর কোনও শত্রুতা দেখা যায় না। তাবলে এরকম মিত্রতাও দেখিনি কোথাও। প্রায় একই মাসে বিড়াল এবং কুকুরটির বাচ্চা হয়। একটা কথা এখানে বলে নিই। কুকুরটি এদেশীয় নয়। নেপালি কুকুর। বিড়ালের দু'টি বাচ্চা মারা যায় এবং বিড়ালটিও কয়েক-দিন পর পাড়া বেরিয়ে আসবার সময়ে কয়েকটি কুকুরের আক্রমণে প্রাণত্যাগ করে। তখনও বিড়াল ও কুকুর ছানার চোখ ফোটেনি। শুনেছিলাম ন্যাকড়ার পলতে পাকিয়ে বিড়াল ছানাটিকে দুধ খাওয়া-বার চেষ্টা করা হয়েছিল।

তারপর যা শুনলাম এবং দেখলাম তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বিড়াল-ছানাটি কুকুরছানার সঙ্গে কুকুরের দুধ খাচ্ছে। আরও আশ্চর্য যে বিড়ালছানাটি ম্যাঁও ম্যাঁও করলেই কুকুরটা দৌড়ে এসে ওর গা চাটে। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে বিড়ালছানাটার শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল। ইতি—

কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য
গোরক্ষপুর।

শার্লক হোমস ফিরে এলেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীহীন, অপরিচ্ছন্ন সরাইখানার দিকে এগুচ্ছি দুজনে, দূর থেকেই দরজার ওপর লড়ায়ে-মোরগের প্রতীকটা দেখা যাচ্ছিল, এমন সময়ে আচমকা গুঙিয়ে উঠে আমার কাঁধ চেপে ধরে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিলে হোমস্। বেকায়দায় গোড়ালি মচকে গেলে যেমন অসহায় হয়ে পড়ে মানুষে, তারও অবস্থা হল তাই। অতি কষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার সামনে পৌঁছোলো ও। ময়লা রঙের স্থূলে চেহারার একজন প্রৌঢ় কালো মাটির পাইপে ধূমপান করছিল আসনপিঁড়ি হয়ে বসে।

"কেমন আছেন, মিঃ রিউবেন হেইজ ?" জিজ্ঞেস করে হোমস্।

"কে আপনি ? আমার নামটাই বা জানলেন কোত্থেকে ?" একজোড়া ধূর্ত চোখে সন্দেহের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

"আপনার মাথার ওপর বোর্ডেই তো লেখা রয়েছে নামটা। আর, বাড়ীর মালিককে দেখলে তো চিনতে কোন অসুবিধে হয় না। আপনার আস্তাবলে ঘোড়ার গাড়ী বা ঐ জাতীয় কিছু আছে নাকি ?"

"না নেই।"

"যন্ত্রণায় মাটির ওপর পা-টাও রাখতে পারছি না আমি।"

"তাহলে রাখবেন না।"

"হাঁটতেও যে পারছি না।"

"তাহলে লাফান।"

মিঃ রিটবেন হেইজের হাবভাব, আর যাই হোক, বরদাস্ত করার মত নয়। কিন্তু বলিহারি যাই হোমসের, যেন নিছক রঙ্গ-পরিহাস করছে অভদ্র লোকটা, এমনিভাবে দিব্বি কথাবার্তা চালিয়ে গেল ও।

বলল, "আরে মশাই, দেখতেই তো পাচ্ছেন কি রকম বেকায়দায় পড়েছি

আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে
আর্থার কোনান ডয়েলের
নাচিয়ে মূর্তিগুলো
(শার্লক হোমসের অভিনব রহস্য কাহিনী)

আমি। যানবাহন যা হয় একটা পেলেই হল, ও নিয়ে আমি অত ভাবি না।"

"আমিও না," গম্ভীর মুখে বলে সরাইখানার মালিক।

"এত হাল্কাভাবে নেবেন না, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণে এখুনি আমার একটা সাইকেল দরকার এবং ভাড়া হিসেবে একটা গিনি দিতে রাজী আছি আমি।"

কান খাড়া করে মিঃ রিউবেন হেইজ, "কোথায় যেতে চান ?"

"হোল্ডারনেস হলে।"

"ডিউকের চ্যালা-চামুন্ডা মনে হচ্ছে ?" আমাদের কাদামাখা পোষাকের ওপর সবিদ্রূপ চাহনি বুলিয়ে নেয় লোকটা।

হো হো করে হেসে ওঠে হোমস্। বলে, "ডিউকের সঙ্গে আমাদের দেখা হলে তাঁর আর আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।"

"কেন শুনি ?"

"তাঁর হারানো ছেলের খবর এনেছি বলে।"

দস্তুরমত চমকে ওঠে মিঃ রিউবেন হেইজ।।

"ছেলেটার পাছু পাছু এখানে এসে পৌঁছেছেন নাকি ?"

"খবর এসেছে, লিভারপুলে রয়েছে সে, যে-কোন মুহূর্তে পুলিশ তাকে পাকড়াও করার আশা রাখছে।"

চকিতে মুখচোখের ভাব পালটে যায় লোকটার। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফভরা ভারী মুখে আচম্বিতে ফুটে ওঠে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা।

বলে, "ডিউককে অভিনন্দন জানানোর ইচ্ছে মোটেই নেই আমার এবং তার কারণও আছে। এক সময়ে তাঁর প্রধান কোচোয়ান ছিলাম আমি। কিন্তু বড় জঘন্য ব্যবহার করেছিলেন আমার সাথে।

একটা মিথ্যেবাদী ছুট্টাওলার কথা বিশ্বাস করে আমায় বরখাস্ত করেছিলেন উনি। কিন্তু লিভারপুলে লর্ড স্যালটায়ারের খোঁজ পাওয়া গেছে শুনে খুশী হলাম। আমি দেখছি যাতে আপনি এ খবর 'হলে' নিয়ে যেতে পারেন।"

হোমস্ বললে, "ধন্যবাদ। প্রথমেই পেটে কিছু দানাপানি পড়া দরকার। সাইকেলটা তারপরেই আনবেন।"

"আমার কোন সাইকেল নেই।"

একটা গিনি বার করে হোমস্।

"আরে মশাই, বললাম তো আমার সাইকেল নেই। 'হল' পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে দুটো ঘোড়া আমি দিচ্ছি আপনাদের।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, আগে কিছু খেয়ে নিই, তারপর হবে'খন এ সব কথা।"

এবড়ো-খেবড়ো পাথরে বাঁধান রান্না-ঘরে আমাদের বসিয়ে মিঃ রিউবেন হেইজ বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পলক ফেলার আগেই বেমালুম সেরে গেল হোমসের গোড়ালির মচকানি।

দিনের আলো নিভে আসতে বিশেষ দেরী নেই। সেই কোন সকালে বেরিয়েছি দুজনে, সারাদিনে দাঁতে কুটোটি কাটবার সময় বা সুবিধে হয়নি। তাই, প্রথমেই কিছুটা সময় ব্যয় করলাম খাওয়ার জন্যে। চিন্তাচ্ছন্ন মুখে হোমস্ বার দুয়েক জানলার কাছে গিয়ে সাগ্রহে তাকালে বাইরে। নোংরা উঠোনটার খানিকটা নজরে পড়ছিল খোলা জানলা দিয়ে। দূরে এককোণে কামারশালায় কাজ করছিল কালিঝুলিমাখা একটা ছোকরা। আর একদিকে আস্তাবল। দ্বিতীয়বার জানলা থেকে ঘুরে এসে আবার বসে পড়েছিল হোমস্। তারপরেই, আচমকা দারুণ চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল ও।

"ওয়াটসন, ওয়াটসন, পেয়েছি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা ভেবেছি, তাই। ওয়াটসন, আজকে গরুর খুরের ছাপ দেখেছ বলে মনে পড়ে তোমার?"

"এন্তার দেখেছি।"

"কোথায়?"

"কোথায় নয়? জলা জায়গায় দেখেছি, দেখেছি রাস্তার ওপর, বেচারা হেইডেগার যেখানে শেষ ঘুমে শুয়েছে সেখানেও দেখেছি বলে মনে পড়ছে।"

"এগ্জ্যাক্টলি। আচ্ছা, ওয়াটসন, জলাভূমিতে আজ কটা গরু দেখেছ বলো তো?"

"আদৌ দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"আশ্চর্য, ওয়াটসন, সত্যিই আশ্চর্য! যেখান দিয়ে যেখান দিয়ে গেছি, দেখেছি এন্তার গরুর পদাংক, কিন্তু সারা জলাভূমিতেও দেখিনি একটাও গরু। আশ্চর্য। অদ্ভুত! কি বল, ওয়াটসন?"

"আশ্চর্যই বটে।"

"এবার একটু মাথা খাটাও দিকি ব্রাদার। মনটাকেও পাঠিয়ে দাও জলাভূমিতে! রাস্তার ওপর দাগগুলো দেখতে পাচ্ছো তো?"

"তা পাচ্ছি।"

"তোমার মনে পড়ে কি খুরের ছাপগুলো একবার ছিল এই রকম," বলে অনেকগুলো টুকরো রুটি এইভাবে সাজালে সে— : : : : : —" আর একবার ছিল এইরকম — : · : · : · : · —" এবং মাঝে মাঝে ছিল এই রকম— · · · · · · · · · "

"কি, মনে পড়ছে তোমার?"

"না, ভাই।"

"কিন্তু আমার মনে আছে। দিব্বি গেলে বলতে পারি ভুল হয়নি আমার। যাই হোক, অবসরমত ফিরে গিয়ে যাচাই করে দেখলেই হবে'খন। আমি একটা অন্ধ গর্দভ, ওয়াটসন। তখনই আমার সমাধানে পৌঁছোনো উচিত ছিল।"

"সমাধানটা কি, তাই শুনি?"

"সমাধান শুধু একটাই—এবং তা হচ্ছে একটা পরমাশ্চর্য গরুর পদাংক-দর্শন! এ গরু দিব্বি হাঁটে, কদম চালে চলে আবার দরকার হলে, লম্বা লম্বা লাফ মেরে ছুটতেও কসুর করে না। ওয়াটসন, আমি শপথ করে বলতে রাজী আছি, এ জাতীয় ধোঁকাবাজি যার মস্তিষ্কে আসে, তাকে আর যাই হোক, গেঁইয়া বলা চলে না। কামারশালার ঐ ছোকরাটা ছাড়া পথ পরিষ্কার বলে মনে হচ্ছে। চলহে, টুক করে বেরিয়ে গিয়ে দেখে আসি কি ব্যাপার।"

পড়ো-পড়ো আস্তাবলে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল দুটি ঘোড়া। কর্কশ চুল উস্কখুস্ক—যেন দলাই-মলাই হয়নি কতদিন। একটা ঘোড়ার পেছনের পা তুলে ধরে সজোরে হেসে উঠল হোমস্।

"পুরোনো খুর, কিন্তু লাগানো হয়েছে নতুন—পুরোনো নাল, কিন্তু পেরেকগুলো নতুন। ক্লাসিক কেসের পর্যায়ে ফেলা যায় এ কেসটাকে। চল, কামারশালায় একবার ঢুঁ মেরে আসি।"

আমাদের গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে এক-মনে কাজ করে চলল ছোকরাটা। মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ে ছিল লোহা আর কাঠের বিস্তর টুকরো। দেখলাম, ডাইনে-বাঁয়ে সমানে ঘুরছে হোমসের সন্ধানী দৃষ্টি এই সব আবর্জনার মধ্যে। আচম্বিতে পেছনে পায়ের শব্দ শুনেই চমকে ফিরে তাকিয়ে মুখোমুখি হয়ে গেলাম স্বয়ং রিউবেন হেইজের সঙ্গে;

ঝোপের মত পুরু কালো কুচকুচে ভুরু-জোড়া নেমে এসেছিল শ্বাপদের মত জ্বলন্ত চোখদুটোর ওপর, সমস্ত দেহ ফুলে ফুলে উঠছিল অবরুদ্ধ ক্রোধে।

ধাতুর টুপি লাগানো একটা খাটো লাঠি হাতে সাক্ষাৎ কালান্তকের মত এমন ভঙ্গিমায় সে এগিয়ে এল আমাদের পানে যে তৎক্ষণাৎ পকেটের মধ্যে রিভলভারটাকে আঁকড়ে ধরে সর্বস্তিবোধ করলাম আমি।

"শয়তান স্পাই কোথাকার! কি করছেন এখানে?" বাজের মত চীৎকার করে ওঠে লোকটা।

হোম্‌স্‌ বললে, "ঠিক আছে, মিঃ হেইজ—আপনার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে আমাদের নেই। আপনার ঘোড়াগুলো একটু দেখছিলাম। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে হেঁটেই যেতে পারব আমরা—খুব দূরে নয়, কি বলেন?"

"হলের ফটক এখান থেকে দু'-মাইলের বেশী নয়। বাঁদিকে ঐ রাস্তা ধরে এগিয়ে যান।" বাড়ী থেকে বেরিয়ে

সব খবর রাখে। এ-রকম ধরনের মূর্তিমান যমের মত বদমাস খুব অল্পই দেখেছি আমি—ওর চেহারাই ওর মনের ছবি।"

"আহা! লোকটার মধ্যে শুধু ঐটুকুই দেখলে তুমি? ঘোড়াগুলো রয়েছে, কামারশালাটা রয়েছে,—এসব কি

শয়তান স্পাই কোথাকার! কি করছেন এখানে?

নিরীহ স্বরে হোম্‌স্‌ বললে, "আরে মশাই, আপনার রকম-সকম দেখে তো লোকে ভাববে না-জানি কি গোপন-কথাই ফাঁস হয়ে গেল আপনার।"

প্রবল প্রচেষ্টায় নিজেকে সংযত করে নিলে মিঃ রিউবেন হেইজ। ভ্রূকুটির চাইতেও ভয়ংকর হয়ে উঠল তার মুখের দেঁতো হাসি।

"কামারশালায় কিছু দেখার ইচ্ছে থাকলে দেখতে পারেন, কোন আপত্তি নেই আমার। কিন্তু, মিস্টার, আমার চোখের আড়ালে আমার বাড়ীতে ঘুর-ঘুর করাটা একেবারেই পছন্দ করি না আমি। চটপট পাওনা মিটিয়ে দিয়ে সরে পড়ুন এখান থেকে, তাহলেই খুশী হই আমি।"

আসা না পর্যন্ত কুতকুতে চোখে আমাদের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বর্বর লোকটা।

রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হাটবার পর মোড় ঘুরে মিঃ রিউবেন হেইজের চোখের আড়ালে আসতেই দাঁড়িয়ে গেল হোম্‌স্‌।

বলল, "বেশ গরম ছিলাম সরাই-খানার ভেতরে। যতই দূরে যাচ্ছি, ততই যেন ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে বসছে আমার ওপর। না, না, ও জায়গা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

আমি বললাম, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস রিউবেন হেইজ এ রহস্যের

কিছুই নয়? না, হে, না, লড়ায়ে মোরগওলা এমন খাসা সরাইখানা ছেড়ে যেতে মন সরছে না আমার—ভারী ইন্টারেস্টিং জায়গা কিন্তু। চল, গায়ে পড়ে আর একবার দেখে আসি ভেতরটা।"

ঢালু হয়ে পাহাড়টা উঠে গেছিল ওপর দিকে, বড় বড় চূণাপাথরের ধূসর রঙের চাই পড়ে ছিল বিস্তর। রাস্তা ছেড়ে এই পাহাড় বেয়ে সবে উঠতে শুরু করেছি ওপরে, এমন সময়ে 'হোলডারনেস হলে'র দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের পানে বেগে ছুটে আসছে একটা সাইকেল।

"বসে পড়, ওয়াটসন, বসে পড়!" সজোরে আমার কাঁধে চাপ দিয়ে চেঁচিয়ে

উঠল হোম্‌স্‌। পাথরের আড়ালে লুকোতে না লুকোতেই ঝড়ের মত এগিয়ে এসে সাঁ করে আমাদের পেরিয়ে গেল লোকটা। কুণ্ডলি-পাকানো রাশি-রাশি ধুলোর মেঘের মধ্যে এক লহমার জন্যে চোখে পড়ল উদ্বেগে থর থর ফ্যাকাশে একটা মুখ—মুখের পরতে পরতে প্রকট হয়ে উঠেছে অপরিসীম আতঙ্ক; হাঁ হয়ে গেছে মুখ, চোখদুটো যেন উন্মাদ আবেগে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। গত রাতে চটপটে চালাক-চতুর যে জেমস্‌ ওয়াইল্ডারকে আমরা দেখেছি, এ যেন তাঁর এক কিম্ভূতকিমাকার প্রতিচ্ছবি, বিকট রূপ দেখিয়ে সঙের মত লোক-হাসানোর প্রচেষ্টা।

"ডিউকের সেক্রেটারী!" চেঁচিয়ে ওঠে হোম্‌স্‌। "নেমে এস ওয়াটসন, দেখা যাক, ভদ্রলোক যান কোথায়।"

পাথরের চাঁই ধরে ধরে খানিকটা নেমে এমন একটা জায়গায় এলাম যেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় সরাইখানার সামনের দরজাটা। দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ওয়াইল্ডারের বাইসাইকেলটা চোখে পড়ল। বাড়ীর মধ্যে কাউকে নড়াচড়া করতে দেখলাম না, জানলাতেও দেখতে পেলাম না কারো মুখ। 'হোল্‌ডারনেস-হলে'র সুউচ্চ চূড়োগুলোর ওপাশে সূর্য হেলে পড়তেই নেমে এল গোধূলির ম্লান বিষাদাভা। তারপর, আলো-আঁধারির মাঝে আস্তাবলের সামনে উঠোনে একটা ঘোড়ার গাড়ীর দু'পাশের আলোদুটো জ্বলে উঠতে দেখলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই শুনলাম অশ্বখুর-ধ্বনি। খটাখট শব্দে রাস্তার ওপর বেরিয়ে এল গাড়ীটা এবং প্রচণ্ড বেগে যেন উড়ে গেল চেস্টরফিল্ডের দিকে।

"কি মনে হয়, ওয়াটসন", ফিসফিস করে ওঠে হোম্‌স্‌।

"সরে পড়ল মনে হচ্ছে?"

"দু'চাকার গাড়ীতে শুধু এক-জনকেই বসে থাকতে দেখেছি আমি এবং তিনি জেমস্‌ ওয়াইল্ডার নন এই কারণে যে, দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক।"

একটা লাল চৌকো আলো ভেসে উঠেছিল অন্ধকারের সমুদ্রে। ফ্রেমে-আঁটা ছবির মতো লালের পটভূমিকায় দেখলাম সেক্রেটারীর কালো মূর্তি—সামনের দিকে মাথা বাড়িয়ে অন্ধকারের বুকে উঁকি মেরে কি যেন খুঁজছেন। হাবভাব দেখে মনে হল, কারও প্রতীক্ষায় রয়েছেন মিঃ ওয়াইল্ডার। বেশ কিছুক্ষণ পরে রাস্তার ওপর শোনা গেল কার পদশব্দ, আলোর পটভূমিকায় মুহূর্তের জন্যে আবির্ভূত হল দ্বিতীয় একটি মূর্তি, বন্ধ হয়ে গেল দরজা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিশ্ছিদ্র তমিস্রায় হারিয়ে গেল সব কিছু। পাঁচ মিনিট পরে দোতলার ঘরে একটা বাতি জ্বলে উঠল।

হোম্‌স্‌ বললে, "লড়াই-মোরগের আস্তানায় দেখছি অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা ঘটে রাতের অন্ধকারে?"

"মদ খাওয়ার জায়গাটা কিন্তু বাড়ীর অন্যদিকে।"

"ঠিক বলেছ। এখন যাঁদের দেখছি, তাঁদের তাহলে প্রাইভেট অতিথি বলা উচিত। কিন্তু ভায়া, এত রাত্রে এ-রকম একটা নোংরা সরাইখানায় মিঃ জেমস্‌ ওয়াইল্ডারের কি হেতু আগমন এবং চুপিসাড়ে তাঁর সাথে ঐ যে লোকটা দেখা করতে এল, সে-ই বা কে, তা না জানা পর্যন্ত তো আমি শান্তি পাব না। চল, ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। সাহস করে কাছে গিয়ে দেখে আসতে হবে কি ব্যাপার।"

কসরৎ করে দু'জনে রাস্তার ওপর নেমে এসে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম সরাইখানার দিকে। দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে হেলান দেওয়া ছিল বাইসাইকেলটা। ফস্‌ করে দেশলাইয়ের কাঠি জেলে পেছনের চাকার কাছে ধরল হোম্‌স্‌। আলো এসে পড়ল ডানলপ টায়ারের ওপর। নিঃশব্দে হেসে ওঠে ও।

মাথার ওপরেই আলোকিত জানলাটা দেখিয়ে হোম্‌স্‌ বললে, "ওয়াটসন, ঘরের ভেতরে উঁকি না দিয়ে আমি নড়ছি না এখান থেকে। দেওয়াল ধরে পিঠ পেতে দাঁড়াও তুমি, তারপর যা করবার আমি করছি।"

সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যে আমার কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে উঠল হোম্‌স্‌ এবং দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই লাফিয়ে নেমে পড়ল নীচে।

"বন্ধু, এবার যাওয়া যাক। সারাদিন বড় খাটাখাটুনি গেছে বটে, কিন্তু সব-রকম পয়েন্টই যোগাড় করতে পেরেছি বলেই আমার বিশ্বাস। স্কুল এখান থেকে অনেকটা দূরে—কাজেই চল, আর অযথা দেরী না করে রওনা হওয়া যাক।"

সুদীর্ঘ পথে আর বিশেষ কোন কথা বলল না হোম্‌স্‌। কাদা-প্যাচপেচে জলাভূমি পেরিয়ে এলাম শ্রান্ত অবসন্ন দেহে, কিন্তু সারা পথে প্রায় বোবা হয়ে রইল ও। স্কুলে পৌঁছে ভেতরে না ঢুকে গেল ম্যাকলিটন স্টেশনে। সেখান থেকে কয়েকটা টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফিরে এল স্কুলে। আরও রাত গভীর হলে শুনলাম বেচারী ডঃ হক্সটেবলকে সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছে সে। মাস্টারের মৃত্যু-সংবাদ শোনার পর থেকে ভদ্রলোক শয্যা নিয়েছিলেন। এবং এর পরেও যখন সে আমার ঘরে ঢুকল তখন তাকে দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। ভোরবেলা চোখমেলে শয্যার পাশে সতর্ক-চক্ষু প্রাণরসে ভরপুর যে মানুষটিকে দেখেছিলাম, সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের পরেও দেখলাম অবিকল সেই মানুষটিকে। এতটুকু বিরক্ত হয়নি, অফুরন্ত প্রাণরসে টলমল তার মুখচ্ছবি। ঘরে ঢুকেই খুশী খুশী গলায় ও বললে, "বন্ধু হে, হাওয়া অনুকূলে। কাল সন্ধ্যে হওয়ার আগেই এ রহস্যের সমাধান সম্পূর্ণ করে ফেলব—কথা দিচ্ছি তোমায়।"

পরের দিন সকালবেলা এগারোটা নাগাদ শার্লক হোম্‌স্‌ আর আমি 'হোল্‌ডারনেস হলে'র সুবিখ্যাত 'ইউ'-বীথিকার মাঝ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাজির হলাম রাণী এলিজাবেথের আমলের জমকাল তোরণের সামনে। সেখান থেকে পৌঁছোলাম হিজ গ্রেসের স্টাডিতে। মিঃ জেমস্‌ ঘরে ছিলেন। আমাদের দেখেই সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। বাইরে থেকে দেখে ভদ্রলোককে একটু গম্ভীর মনে হলেও গত রাতের বুনো আতঙ্কের ফিকে রেশ যেন তখনও লেগে ছিল তাঁর চোরা নজর আর থেকে থেকে কেঁপে ওঠা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

"হিজ গ্রেসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? দুঃখিত, ডিউক এখন অত্যন্ত অসুস্থ। খারাপ খবরটা শোনার পর থেকে উনি খুবই উতলা হয়ে পড়েছেন। গত-কাল বিকেলে ডঃ হাক্সটেবলের টেলিগ্রামে আপনার আবিষ্কারের কাহিনী জেনেছি আমরা।"

"মিঃ ওয়াইল্ডার, ডিউকের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে।"

"উনি এখন ও'র ঘরে।......"

"তাহলে তাঁর ঘরেই যাবো আমরা।"

"খুব সম্ভব শুয়ে আছেন এখন।"

"সেই অবস্থাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব আমি।"

হোম্‌সের নিরুত্তাপ কিন্তু অটল ভাবভঙ্গি দেখে সেক্রেটারী ভদ্রলোক বুঝলেন যে তার সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভই হবে না।

"ভাল কথা। আপনারা এসেছেন, এ খবর আমি নিজেই দিচ্ছি ও'কে।"

আধঘণ্টা পর ঘরে ঢুকলেন অভিজাত মহলের মুকুট-মণি ডিউক স্বয়ং। আগের চাইতেও বিরস, বিবর্ণ, হতশ্রী মনে হচ্ছিল তাকে, যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যে। কাঁধদুটো ঝুলে পড়েছে—আগের দিন যাঁকে দেখেছিলেন, তিনি যেন ইনি নন। এক লাফে যেন বেশ কয়েক বছর বয়স বেড়ে গেছে তাঁর। রাজকীয় সৌজন্য আর শিষ্টাচার শেষ হলে পর লাল দাড়ি টেবিলের ওপর লুটিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন উনি।

"তারপর? কি খবর, মিঃ হোম্‌স্?" গুরুগম্ভীর গলায় শুধোলেন ডিউক।

কিন্তু শার্লক হোম্‌স্ দেখি এক-দৃষ্টেই তাকিয়ে আছে সেক্রেটারীর পানে, ডিউকের চেয়ারের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন ভদ্রলোক।

ঐ ভাবে তাকিয়েই বলল ও, "ইওর. গ্রেস, আমার মনে হয় মিঃ ওয়াইল্ডার না থাকলেই বরং আমি খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারব।"

যেন আর এক পোঁচ ছাই রঙ চড়লো মিঃ ওয়াইল্ডারের মুখের ওপর। বিষাক্ত চোখে হোম্‌সের পানে তাকালেন উনি।

"ইওর গ্রেস যদি ইচ্ছে করেন—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এখন এস। এবার বলুন, মিঃ হোম্‌স্, কি বলার আছে আপনার?"

সেক্রেটারী বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইল বন্ধুবর।

তারপর বলল, "ইওর গ্রেস, ডঃ হাক্সটেবল আমাকে এবং আমার সহ-কর্মী ডঃ ওয়াটসনকে একটা খবর দিয়ে-ছিলেন। আপনি নাকি একটা মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন এ ব্যাপারে। খবরটা আপনার মুখ দিয়েই জমি যাচাই করে নিতে চাই।"

"তা করেছিলাম বইকি, মিঃ হোম্‌স্।"

"শুনেছি, আপনার ছেলে কোথায় আছে, এ খবর যে দিতে পারবে, তাকে আপনি দেবেন পাঁচ হাজার পাউণ্ড?"

"এগজ্যাক্টলি।"

"আর এক হাজার দেবেন যে বলতে পারবে আপনার ছেলেকে যে বা যারা লুকিয়ে রেখেছে, তাকে?"

"এগজ্যাক্টলি।"

"দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তাকে যাঁরা গুম করেছে তাঁদের নাম ছাড়াও তার বর্তমান অবস্থার জন্য ষড়যন্ত্রে যাঁরা লিপ্ত, তাঁদেরকেও নিশ্চয় ধরেছেন?"
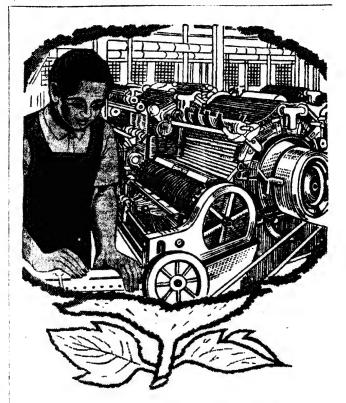
"হ্যাঁ, হ্যাঁ," অধীরভাবে চীৎকার করে ওঠেন ডিউক। "মিঃ শার্লক হোম্‌স্,

আপনার কাজ যদি সন্তোষজনক হয়, তা'হলে কৃপণতা করেছি, এ ধরনের কোন অভিযোগ করার কোন কারণ আপনার থাকবে না।"

এমন লোভাতুরভাবে দু'হাত ঘসতে লাগল হোম্‌স্ যে দেখে-শুনে তাজ্জব বনে গেলাম আমি। ওর পরিমিত রুচির খবর আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি।

চকচকে চোখে হোম্‌স্ বললে, "ইওর গ্রেসের চেকবইটা টেবিলের ওপরেই রয়েছে মনে হচ্ছে। ছ' হাজার পাউণ্ডের একটা চেক আমার নামে লিখে দিলে খুবই খুশী হব আমি। ক্রশ করে দেওয়াই ভাল। দ্য ক্যাপিটাল অ্যান্ড কাউন্টিস্ ব্যাঙ্কের অক্সফোর্ড স্ট্রীট ব্রাঞ্চ আমার এজেন্ট।"

ঋজু দেহে অত্যন্ত কঠোর ভঙ্গিমায় বসে পাথরের মত চোখে বন্ধুবরের পানে তাকালেন হিজ গ্রেস।

"তামাসা করছেন নাকি, মিঃ হোম্‌স্? রসিকতা করার মত বিষয় এটা নয়।"

"নিশ্চয় নয়, ইওর গ্রেস। জীবনে এতখানি উৎসুক আর আমি হইনি।"

"কি বলতে চান আপনি?"

"আমি বলতে চাই যে, পুরস্কারটা আমারই প্রাপ্য। আপনার ছেলে কোথায় আছে, তা আমি জানি। যাঁরা তাকে আটক রেখেছেন, তাঁদের অন্ততঃ কয়েক-জনকেও আমি চিনি।"

কাগজের মত অস্বাভাবিক সাদা মুখের পটভূমিকায় ডিউকের উগ্র লাল দাড়ি যেন আরও টকটকে হয়ে ওঠে।

"কোথায় সে?" রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন উনি।

"আপনার পার্ক-গেট থেকে মাইল দুয়েক দূরে লড়ায়ে-মোরগের প্রতীক-লাগানো সরাইখানায় আছে সে, অন্ততঃ গতকাল রাত পর্যন্ত ছিল সেখানে।

চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন ডিউক।

"অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন কাকে?"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম শার্লক হোম্‌সের উত্তর শুনে। চট করে এগিয়ে এসে ডিউকের কাঁধ স্পর্শ করে ও বললে, "আপনাকে। ইওর গ্রেস, চেকটার জন্যে এবার একটু কষ্ট দেব আপনাকে।"

ডিউকের সে মূর্তি আমি জীবনে ভুলব না। হোম্‌সের কথা ফুরোতে না ফুরোতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এমনভাবে বাতাস আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন যেন পাতালের অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন উনি কুটো আশ্রয় করার মতও অবলম্বন না পেয়ে। পরক্ষণেই অসাধারণ সংযমবলে নিজেকে সামলে নিলেন—এ রকম আর্তীর আবেগকে চকিতে দমন করে ফেলে সহজ হয়ে ওঠার মত আশ্চর্য ক্ষমতা বোধহয় শুধু তাঁর মত অভিজাত পুরুষেরই থাকে। চেয়ারের ওপর নিজেকে এলিয়ে দিয়ে দু' হাতে মুখ লুকোলেন উনি। বেশ কয়েকটা মিনিট কেটে গেল থমথমে নীরবতার মধ্যে দিয়ে।

তারপর, হাত থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, "কতখানি জানেন আপনি?"

"গত রাতে আপনাদের সবাইকে আমি দেখেছি।"

"আপনার বন্ধু ছাড়া আর কেউ জানে এ কথা?"

"না, কাউকেই আমি বলিনি।"

কাঁপা আঙুলে কলম তুলে নিয়ে চেক-বই খুললেন ডিউক।

"আমার কথার এতটুকু নড়চড় হবে না, মিঃ হোম্‌স্। আপনার আনা সংবাদ আমার কাছে যতই অপ্রীতিকর আর অবাঞ্ছিত হোক না কেন, চেক আমি লিখে দিচ্ছি। পুরস্কার ঘোষণা করার সময়ে আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি এ রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে আমায়। আপনি আর আপনার বন্ধু, দুজনেই তো স্বাধীন, মানে, কারো অধীন নয়, তাই না, মিঃ হোমস?"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না, ইওর গ্রেস।"

"আরও সরল করেই তাহলে বলি, মিঃ হোম্‌স্। এ ঘটনা যদি কেবলমাত্র আপনারা দু'জনেই জেনে থাকেন, তাহলে তা শুধু আপনাদের মধ্যেই সীমিত থাকুক। আপনারা যখন কারও অধীন নন, তখন তা তৃতীয় ব্যক্তির কানে যাওয়ারও কোন কারণ দেখছি না। তাহলে, বারো হাজার পাউণ্ড আপনাকে আমার দিতে হবে, কি বলেন মিঃ হোম্‌স্?"

কিন্তু হোম্‌স্ শুধু হাসল। মাথা নেড়ে বললে, "ইওর গ্রেস, এত সহজে এ কেলেঙ্কারী ধামাচাপা দেওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না আমার। স্কুলমাস্টারের মৃত্যুর কারণ আমাদের দর্শাতেই হবে।"

"কিন্তু জেমস্ সে ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গ জানে না। এ জন্যে তো আপনি তাকে দায়ী করতে পারেন না। এ কাজ ঐ জানোয়ার বদমাসটার। অবশ্য জেমস্‌ই তাকে কাজে লাগিয়েছিল ছেলেটাকে রাতারাতি পাচার করার জন্যে।"

"ইওর গ্রেস, একবার যদি কোন অপরাধের পথে কেউ অগ্রসর হয়, তাহলে পথ চলতে গিয়ে আরও পাঁচটা অপরাধের উদ্ভব হ'লে ন্যায়তঃ তাকেই সব কিছুর জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাই নয় কি?"

"ন্যায়তঃ মিঃ হোম্‌স্। ঠিকই বলেছেন আপনি। কিন্তু আইনতঃ নিশ্চয় নয়। খুনের দৃশ্যে হাজির না থাকলে আপনি কোন মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন না। বিশেষ করে, আপনার আমার মতই খুনকে যে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, খুনের কথা শুনলেও যে শিউরে ওঠে, তাকে তো নয়ই। এ খবর তার কানে আসামাত্র আতঙ্কে, অনুতাপে ভেঙে পড়ে সেই মুহূর্তে অকপটে সমস্ত আমার কাছে স্বীকার করেছে সে। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই খুনেটার সঙ্গে সব সম্পর্ক চিরকালের মত চুকিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। মিঃ হোম্‌স্, ওকে আপনি বাঁচান—ওকে আপনি বাঁচান! আমার একান্ত অনুরোধ, ওকে আপনি এ বিপদ থেকে বাঁচান!"

ভেঙে পড়ে তাঁর সংযমের বাঁধ। মুখের পরতে পরতে আকুল আকুঞ্চনের মধ্যে দিয়ে আর্তীর আকিঞ্চন ফুটিয়ে তুলে মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ে অস্থিরভাবে ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারী করতে থাকেন উনি। কিছুক্ষণ পরে আবার সংযমের নিগড়ে বেঁধে ফেললেন নিজেকে। টেবিলের সামনে বসে পড়ে বললেন, "আর কারও কাছে না গিয়ে আমার কাছে আসার জন্যে আপনার বিবেচনা আর বুদ্ধির তারিফ করছি আমি। এ জঘন্য কেলেঙ্কারী যাতে আর পাঁচ কান না হয়, সে সম্বন্ধে আসুন সবাই মিলে পরামর্শ করে একটা কিছু বন্দোবস্ত করা যাক।"

"ইওর গ্রেস, আমার বিশ্বাস আমরা পরস্পরের কাছে অসঙ্কোচে এবং অকপটে যদি সরল না হতে পারি, তাহলে আপনি যা বললেন, তা সম্ভব হবে বলে তো মনে হয় না আমার। আমার ক্ষমতায় যতদূর কুলোয়, ইওর গ্রেসকে সাহায্য করতে আমি রাজী আছি। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোন কিছুই

গোপন না থাকাই উচিত এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি শুনে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধেও আমার ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। আপনার কথা শুনে এটুকু বুঝলাম যে, আপনার সেক্রেটারী মিঃ জেমস্ ওয়াইল্ডার খুনী নন।"

'না। খুনী এখন আমাদের নাগালের বাইরে।"

গম্ভীরভাবে একটু হাসল শার্লক হোম্‌স্।

"ইওর গ্রেস আমার সামান্য নাম-যশের বিশেষ কিছু শুনেছেন বলে মনে হয় না। শুনলে পরে এমন কথা বলতেন না। আমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়া এত সহজ নয়। গতকাল রাত এগারোটায় আমার নির্দেশমত চেষ্টার-ফিল্ডে গ্রেপ্তার হয়েছে মিঃ রিউবেন হেইজ। আজ সকালে স্কুল থেকে রওনা হওয়ার আগেই এ সম্পর্কে একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি ওখানকার পুলিশের বড়কর্তার কাছ থেকে।"

চেয়ারের পিঠে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বিস্ফারিত চোখে সবিস্ময়ে বন্ধুবরের পানে তাকালেন ডিউক।

"আশ্চর্য! আপনি তো দেখছি অমানবিক ক্ষমতার অধিকারী! রিউবেন হেইজ তাহলে এখন হাজতে? শুনে সত্যিই সুখী হলাম আমি। অবশ্য জানি না এর ফলাফল জেমস্‌কেও স্পর্শ করবে কিনা।"

"আপনার সেক্রেটারী?"

"না, মশায়, না। আমার ছেলে।"

এবার অবাক হওয়ার পালা হোম্‌সের।

"ইওর গ্রেস, আমি স্বীকার করছি এ খবর আমার কাছে একেবারেই নতুন। আর একটু খুলে বলবেন কি?"

"কিছুই লুকোবো না আপনার কাছে। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত। জেমসের বোকামো আর ঈর্ষার পরিণামস্বরূপ যে সঙ্কটে আমরা পড়েছি, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় অকপটে সব কথা খুলে বলা। যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন, তবুও আমি কিছু গোপন করব না। মিঃ হোম্‌স্, যৌবনে আমি একজনকে ভালবেসেছিলাম। যে ভালবাসা জীবনে কেবল একবারই আসে মনের কোণে চির-বসন্তের ফুল ফোটাতে, এ সেই ভালবাসা। ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু তিনি রাজী হননি পাছে এ বিয়ের ফলে আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি বেঁচে থাকলে জীবনে আমি আর কাউকে বিয়ে করতাম না। মারা গেলেন তিনি, আমার হাতে সঁপে গেলেন শিশু জেমস্‌কে। ওকে আমি মানুষ করেছি শুধু ওর মায়ের কথা ভেবে। দুনিয়ার সামনে ওর পিতৃত্ব আমি স্বীকার করতে পারিনি বটে, কিন্তু ওকে আমি উচ্চশিক্ষা দিয়েছি, তারপর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সব সময়ে রেখেছি নিজের একান্ত কাছটিতে। কি কৌশলে জানি না, আমার গুপ্ত-কথা জেনে ফেলে ও। তারপর থেকেই তার অনেক আবদার আমি মেনে নিয়েছি। আমার ওপর ওর প্রকৃত অধিকার কি, তা তার অজানা নয়। এ নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী সৃষ্টি করার ক্ষমতাও যে তার আছে, এবং তাহলে সমাজে যে আমার মাথা তোলার উপায় থাকবে না, তাও সে জানে ভাল করেই। বিবাহিত জীবনে আমি সুখী হইনি—সেজন্যে জেমস্‌ই কতকাংশে দায়ী। সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন, প্রথম থেকেই আমার একমাত্র আইন-অনুজ্ঞাত উত্তরাধিকারীকে ও সমানে ঘৃণা করে এসেছে। অনুক্ষণ এই ঘৃণায় এতটুকু বিরাম দেখিনি আমি। আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, এত কাণ্ডর পরেও কেন জেমস্‌কে আমারই কাছে কাছে আমি রেখেছি। উত্তরে আমি বলব, এ দীর্ঘ যন্ত্রণা সহ্য করছি শুধু ওর মায়ের জন্যে। ওর মুখের মধ্যে আমি ওর মায়ের মুখ দেখি, আমার প্রথম যৌবনের প্রথম ভালবাসার ছবি দেখি। ওর প্রতিটি হাবভাব, চালচলন ঠিক ওর মায়ের মতই—এতটুকু অমিল এতদিনেও দেখিনি আমি। তাই ওর মধ্যে দিয়ে অতীতকে দেখি চোখের সামনে। এই কারণেই, ওকে আমি চোখের আড়াল করতে পারিনি। কিন্তু পাছে আর্থারের মানে, লর্ড স্যালটায়ারের কোন ক্ষতি করে বসে ও, তাই ওকে পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলাম ডঃ হাক্সটেবলের স্কুলে—নিছক নিরাপত্তার খাতিরে।

"হেইজ লোকটা আমার প্রজা ছিল এককালে। জেমস্ তখন আমার এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। তখনই ওদের আলাপ হয়। চিরকালই লোকটা পয়লা নম্বরের পাকা বদমাস। কিন্তু কি জানি কি বিচিত্র কারণে জেমসের সঙ্গে ওর নিবিড় সখ্যতা গড়ে ওঠে। বরাবর লক্ষ্য করেছি, নীচ সঙ্গের দিকে ওর কেমন জানি ঝোঁক আছে। লর্ড স্যালটায়ারকে গুম করার পরিকল্পনা ওর মাথায় আসার পর এই লোকটাকেই কাজে লাগাল জেমস্। আপনার মনে আছে নিশ্চয়, আগের দিন আর্থারকে একটা চিঠি লিখেছিলাম আমি। জেমস্ খামটা খুলে একটা চিরকুট ভরে দেয় ভেতরে। চিরকুটে লেখা ছিল, আর্থার যেন অমুক দিনে অমুক সময়ে স্কুলের কাছে 'এবড়ো-খেবড়ো উপবনে' দেখা করে তার সঙ্গে। চিরকুটে ডাচেসের নাম থাকায় আর্থার আর দ্বিধা করেনি। সেদিন সন্ধ্যায় জেমস্ সাইকেল চালিয়ে গেল সেখানে—আমাকে ও যেমনটি বলেছে,

ঠিক সেই রকমভাবে বলছি আপনাকে—বনের মধ্যে নিরালায় আর্থারকে বললে যে তার জন্যে তার মায়ের মন কেমন করছে বলে তার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। জলাভূমিতে আর্থারের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন। মাঝরাতে বনে এলে ঘোড়া নিয়ে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে সে। সে-ই তাকে পৌঁছে দেবে তার মায়ের কাছে। আর্থার বেচারা ফাঁদে পা দিলে। নির্দিষ্ট সময়ে উপবনে এসে হেইজকে দেখলে একটা ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। দুজনেই সওয়ার হ'ল একই ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু জার্মান মাস্টার যে তাদের পাছু নিয়েছিলেন, এ খবর জেমস্ শুনলে মাত্র গতকাল। হাতের লাঠি দিয়ে হেইজ তাঁর মাথায় মারতে পথের ওপরেই মারা যান ভদ্র-লোক। সরাইখানায় আর্থারকে আনার পর দোতলার একটা ঘরে তাকে নজর-বন্দী রাখা হয় মিসেস হেইজের তত্ত্বা-বধানে। ভদ্রমহিলার মনটি বড় ভাল, কিন্তু জানোয়ার স্বামীর কোন আদেশ ঠেলে ফেলবার মত ক্ষমতা তার নেই।

"মিঃ হোম্‌স্, দুদিন আগে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়ে আপনি যা জানতেন, তার থেকে একতিলও বেশী জানতাম না আমি। আপনি হয়ত জিজ্ঞেস করবেন, এ ধরনের অপকর্ম করার পেছনে জেমসের মোটিভ কি। উত্তরে আমি বলব, আমার আইনত উত্তরাধিকারীর প্রতি ওর উন্মাদ ঘৃণার মধ্যে যুক্তির কোন বালাই ছিল না। ওর ধারণায়, আমার যাবতীয় সম্পত্তির এক-মাত্র ওয়ারিস নাকি সে-ই হ'তে পারে। কিন্তু সামাজিক নিয়মকানুনের জন্যে তা সম্ভব নয়। তাই এদিক দিয়েও সীমা নেই তার বিদ্বেষের। এ সব ছাড়াও, তার একটা বিশেষ মোটিভ ছিল। তার প্রবল ইচ্ছে ছিল যে, আমি ওয়ারিস পরিবর্তন

করি এবং তার মতে আমার নাকি সে ক্ষমতা আছে। এই সম্পর্কেই আমার সঙ্গে দরাদরি করতে চেয়েছিল ও। আর্থারকে যদি সে উদ্ধার করতে পারে, তাহলে আমি পুরস্কারস্বরূপ আর্থারের নাম খারিজ করে ওয়ারিস হিসেবে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দেব তাকে। ও বেশ জানে, স্বেচ্ছায় আমি তাকে কোনদিনই পুলিশের হাতে তুলে দেব না। কিন্তু দরাদরি করার আর সময় পেল না জেমস্। এ প্রস্তাব আমার কাছে আনার আগেই অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতা ওকে দিশেহারা করে তুললে। ফলে, পরিকল্পনামত কাজ করার সুযোগই পেল না ও।

"ওর সমস্ত প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল আপনার আবিষ্কারে। জলায় হেইডেগারের মৃতদেহ পেয়েছেন আপনারা—এ খবর শোনামাত্র আতঙ্কে নীল হয়ে গেল জেমস্। গতকাল এই ঘরে আমরা বসে রয়েছি, এমন সময়ে ডঃ হাক্সটেবলের টেলিগ্রামে খবরটা পেলাম। শোকে উদ্বেগে এমনই অভিভূত হয়ে পড়ল জেমস্ যে দেখেই খটকা লাগল আমার। সত্য কথা বলতে কি, প্রথম থেকেই ওর সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল। ওর ঐ রকম মুহ্যমান অবস্থা দেখামাত্র সন্দেহ পরিণত হল স্থির বিশ্বাসে এবং তখনই ওকে চাপ দিলাম আমি। কাজ হল তৎক্ষণাৎ। স্বেচ্ছায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত স্বীকার করল জেমস্। করার পর আমাকে অনুনয় করলে যে দিন তিনেকের জন্যে আমি যেন মুখ বন্ধ করে থাকি, ইতিমধ্যে তার দুষ্কর্মের সঙ্গী গা-ঢাকা দিক। রাজী হলাম আমি। এইভাবেই চিরকাল আমি ওর কাকুতি-মিনতির কাছে স'পে দিয়েছি নিজেকে। সঙ্গে সঙ্গে ও ছুটল সরাইখানায় হেইজকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে রাতারাতি তাকে এ অঞ্চল থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। দিনের আলোয় সবার চোখের সামনে দিয়ে আমি যেতে পারলাম না, কিন্তু অন্ধকার হ'তে-না-হ'তেই রওনা হলাম মাইডিয়ার আর্থারকে দেখতে। দেখলাম, নিরাপদেই আছে সে। শরীরও সুস্থ। তবে চোখের সামনে ঐ বীভৎস খুন দেখার পর থেকে আতঙ্ক যেন ওর অণুপরমাণুতেও শেকড় গেড়েছে—কি পরিমাণে যে ভয় পেয়েছে ও, তা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না, মিঃ হোমস্। প্রতিশ্রুতি অনুসারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিন দিনের জন্যে মিসেস হেইজের হেপাজতে রেখে এলাম ওকে। কেননা, পুলিশকে সংবাদ দিতে গেলেই তাদেরকে প্রথমেই জানাতে হবে এতদিন তাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তারাই জানতে চাইবে, হত্যাকারী কে। হত্যাকারীর সমুচিত শাস্তির আয়োজন করতে গেলে হতভাগ্য জেমসেরও সর্বনাশ ডেকে আনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই সব ভেবেই তিন দিন চুপচাপ থাকাই বিধেয় বলে মনে করলাম। আপনি অকপটে সরল হতে বলেছিলেন, মিঃ হোমস্। তাই কোন রকম বাগাড়ম্বর বা কোন কিছু লুকোবার চেষ্টা না করে অসঙ্কোচে সব খুলে বললাম। আপনার কথায় নির্ভর করে আমার কথা রেখেছি। এবার আপনার পালা সরল হওয়ার, আমাকে সাহায্য করার।"

"এবং আমি তা করব", বলল হোমস্। "ইওর গ্রেস, প্রথমেই একটা কথা না বলে পারছি না। আইনের চোখে নিজেকে অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছেন আপনি। একটা মহাপাতক আপনি সহ্য করেছেন এবং একজন খুনে গুণ্ডাকে গা-ঢাকা দেওয়ার কাজে সহায়তা করেছেন। একথা বললাম এই কারণে যে, রাতারাতি এ অঞ্চল থেকে সাগরেদকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে জেমস ওয়াইল্ডারের যত অর্থের প্রয়োজন হয়েছে, তা যে আপনার পকেট থেকেই গেছে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন ডিউক।

"বাস্তবিকই ব্যাপারটা বড়ই সিরিয়াস? ইওর গ্রেস, তার চেয়েও নিন্দনীয় হচ্ছে আপনার ছোট ছেলের প্রতি আপনার অসঙ্গত আচরণ। তিন দিনের জন্যে একটা নোংরা আস্তানায় তাকে আপনি ফেলে এসেছেন।"

"কিন্তু প্রতিশ্রুতি রয়েছে—"

"এ ধরনের লোকেদের কাছে প্রতিশ্রুতির মূল্য কতটুকু? জেমস্ ওয়াইল্ডার যে আবার নতুন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে না, এ রকম কোন গ্যারান্টি কি কাউকে দিতে পারে? অপরাধী বড় ছেলেকে খুশী করার জন্যে নিরপরাধ ছোট ছেলেকে অনাবশ্যক অথচ আসন্ন বিপদের মধ্যে আপনি ফেলে এসেছেন। আপনার এই আচরণ অত্যন্ত অসঙ্গত এবং অন্যায়।"

নিজের 'হলে' দাঁড়িয়ে এভাবে ধমক-ধামক খাওয়ার মত দুর্দিন হোলডারনেসের দর্পিত লর্ডের জীবনে কোনদিন আসেনি। উন্নত ললাট রাঙা হয়ে উঠল রক্তোচ্ছ্বাসে, কিন্তু তবুও উনি মূক হয়ে রইলেন বিবেকবুদ্ধির তর্জনী হেলনে।

"একটিমাত্র সর্তে আপনাকে সাহায্য করব আমি। সর্তটা এই— ঘণ্টা বাজিয়ে আপনার পেয়াদাকে ডেকে পাঠান এবং আমার খুশিমত তাকে আদেশ দেওয়ার অনুমতি আমাকে দিন।"

একটি কথাও না বলে বৈদ্যুতিক বোতাম টিপলেন ডিউক। ঘরে ঢুকল একজন পরিচারক।

হোমস্ বললে, "সুখবর আছে তোমাদের জন্যে—লর্ড স্যালটায়ারকে পাওয়া গেছে। ডিউকের ইচ্ছে এই মুহূর্তে যেন একটা গাড়ী লড়ায়ে-মোরগওলা সরাইখানায় গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসে।"

আনন্দে আটখানা হয়ে পেয়াদা বেরিয়ে যেতেই হোমস্ বললে, "ভবিষ্যতের ব্যবস্থা পাকা করে নেওয়ার পর এবার অতীত নিয়ে পড়া যাক। আমি সরকারী কাজ করি না এবং যতক্ষণ সুবিচারের সম্ভাবনা রয়েছে, আমি যা জানি তা প্রকাশ করারও কোন কারণ দেখি নাই। হেইজ সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই। ফাঁসী তার হবেই এবং তা থেকে তাকে বাঁচানোর কোন প্রচেষ্টা আমি করব না। সে কি ফাঁস করবে না করবে, তা আমি জানি না। তবে ইওর গ্রেস তাকে অনায়াসেই সমঝে দিতে পারেন যে, বোবা হয়ে থাকাটাই তার স্বার্থের অনুকূলে হবে। পুলিশ জানবে মোটা দাঁও পেটার লোভেই লর্ড স্যালটায়ারকে গুম করেছিল সে। আসল তথ্য যদি তারা নিজেরাই খুঁজে না পায়, তাহলে যেচে তাদেরকে সব কথা বলারও কোন কারণ দেখছি না আমি। ইওর গ্রেস, এক বিষয়ে আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। এর পরেও যদি মিঃ জেমস্ ওয়াইল্ডার আপনার কাছে থাকেন, তাহলে আরও অনেক নতুন সংকটের সৃষ্টি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।"

"আমিও তা বুঝেছি, মিঃ হোমস্। এ বিষয়ে আমাদের কথা হয়ে গেছে। জেমস্ অস্ট্রেলিয়ায় যাবে ভাগ্যান্বেষণে।"

"তাই যদি হয়, ইওর গ্রেস, তাহলে আরও একটা কথা বলব। আপনি নিজেই বলছিলেন, আপনার বিবাহিত জীবনের অশান্তির জন্যে জেমস্ ওয়াইল্ডারই কতকাংশে দায়ী। আমার মতে, এতদিন ডাচেসের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, তা সুরাহা করার ব্যবস্থা এবার আপনি করুন এবং চরম অশান্তির ভেতর দিয়ে যে সম্পর্কে ছেদ পড়েছিল নিতান্ত আকস্মিক, আবার তা নতুন করে স্থাপন করার আয়োজন আপনার দ্বারাই হোক।

"সে ব্যবস্থাও আমি করেছি, মিঃ হোম্‌স্‌। আজ সকালেই ডাচেসকে চিঠি লিখেছি আমি।"

হোম্‌স্‌ উঠতে উঠতে বললে, "তাহলে, আমি এবং আমার বন্ধু নিজেদেরকেই অভিনন্দন জানাতে পারি এই কারণে যে, উত্তর দেশে এত অল্প সময়ের জন্যে বেড়াতে এসেও অনেক-গুলো অত্যন্ত সুখময় পরিণতির সূচনা করে যেতে পারলাম। ছোট্ট একটা পয়েন্ট সম্পর্কে আমার খটকা কিন্তু এখনও যায়নি। হেইজ ঘোড়ার খুরে কতকগুলো আশ্চর্য নাল লাগিয়েছিল। ফলে হয়েছে কি, মাটির ওপর ঘোড়ার খুরের ছাপ না পড়ে পড়েছে গরুর খুরের ছাপ। এ ধরনের অসাধারণ পদ্ধতি কি জেমস্‌ ওয়াইল্ডারই শিখিয়েছিলেন তাকে?

ক্ষণকাল চিন্তাচ্ছন্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন ডিউক। তার পরেই চোখের তারায় নিবিড় হয়ে উঠল বিস্ময়। দরজা খুলে মিউজিয়ামের মত সাজানো মস্ত একটা ঘরে নিয়ে গেলেন আমাদের। কোণের দিকে রাখা একটা কাঁচের আলমারীর কাছে গিয়ে আঙুল তুলে দেখালেন ভেতরে পাথরের ওপর খোদাই-করা কয়েক ছত্র বিবরণের দিকে।

বিবরণটা এই ঃ "হোলডারনেস হলের পরিখা খনন করে এই নালগুলি পাওয়া গেছে। নালগুলি ঘোড়ার পায়ে লাগানোর জন্যে। কিন্তু অনুসরণকারীদের বিভ্রান্ত করে দেওয়ার জন্যে তলার লোহা বিশেষভাবে খণ্ডিত, অনুমান মধ্য-যুগে হোলডারনেসের কয়েকজন লুঠেরা ব্যারণের আমলে এদের সৃষ্টি।"

কেসটা খুলে ফেলল হোমস্‌। তার-পর, থুথু দিয়ে আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে আলগোছে বুলিয়ে নিলে একটা নালের ওপর দিয়ে। টাটকা কাদার একটা পাতলা স্তর উঠে এল আঙুলে।

কাঁচের ডালাটা বন্ধ করতে করতে ও বলল, "ধন্যবাদ। উত্তর দেশে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু যা দেখলাম, তার মধ্যে এইটাই হল দ্বিতীয়!"

"আর প্রথমটা?"

চেকটা ভাঁজ করে সন্তর্পণে নোট-বইয়ের মধ্যে রেখে দিলে হোম্‌স্‌। তার-পর সস্নেহে বারকয়েক হাত বুলিয়ে নিয়ে "আমি বড় গরীব", বলে ভেতরকার পকেটের কোণায় বইটা চালান করে দিলে ও।

সমাপ্ত

অনুবাদ ঃ **অদ্রীশ বর্ধন**

(প্রশ্ন)
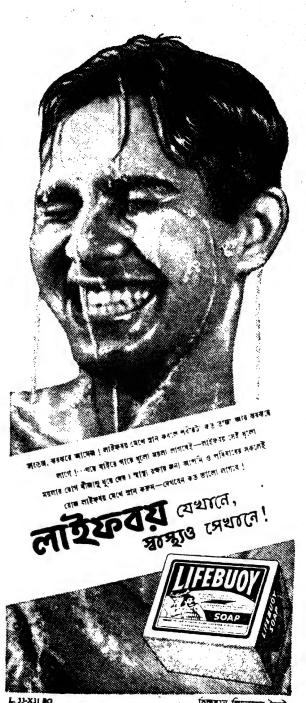
(১) কিরিচ ও বল্লমে প্রভেদ কি?

(২) আমরা খাতায় জমা লিখি বাঁদিকে, খরচ লিখি ডানদিকে। কতদিন হইতে এই প্রথা চালু আছে? শুক্রনীতি-সারে ২য় অধ্যায়ের ৭৪৫-৭৪৬ লাইনে এইরূপ বলা হইয়াছে :—আগে আয় লিখিবে, পরে ব্যয় লিখিবে। আয় লিখিবে বাঁদিকে, খরচ লিখিবে পাতার ডান দিকে। এই শুক্রনীতিসার কত প্রাচীন? অন্যান্য দেশে কিভাবে 'জমা খরচ' লেখা হয়?

(৩) হাতীর প্রকারভেদ আছে; প্রকারভেদে নামও আছে, যথা :—প্রভদ্র, ঐরাবত, পুণ্ডরীক ইত্যাদি, আবার আর এক প্রকার শ্রেণীভেদ আছে যেমন ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ ও মিশ্র। এই সব প্রকারভেদ ও শ্রেণীভেদ কি দেখিয়া করা হইত? ঐরাবত কত হাত উচ্চ?

(৪) গত বৎসর মথুরা, বৃন্দাবন পর্যন্ত তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলাম। প্রয়াগ হইতে পশ্চিমে কাক দেখিতে পাই নাই। কাশীতে কাক দেখিয়াছিলাম দুই-একটা। খুলনা সহরে পাতি-কাক দেখিতে পাই নাই, আগাগোড়া কালো কাক দেখিয়াছি। এই পাতি-কাক কি পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব? শুনিয়াছি বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহতাব চাঁদ মহতাব দুর্জয়-লিঙ্গের কাক দেখিতে না পাইয়া বর্ধমান সহর হইতে ৫।৭ খাঁচা কাক (পাতি-কাক) খাঁচায় করিয়া লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেন? এখন কি দুর্জয়লিঙ্গের কাক দেখিতে পাওয়া যায়? সাদা কাক দেখিয়াছি; ইহারা কোন দেশের?

(৫) সংস্কৃতে ছেদ-চিহ্ন নাই। পূর্বে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় ছেদ-চিহ্ন ছিল না। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক বৈয়াকরণিক অ্যারিস্টোফেনিস (নাট্যকার অ্যারিস্টো-ফেনিস হইতে ইনি ভিন্ন ব্যক্তি) খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রথমে গ্রীক ভাষায় ছেদ প্রবর্তন করেন। বাঙ্গলায় বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বপ্রথম ছেদ ব্যবহার আরম্ভ করেন। কোন সালে, কোন বইয়ে কি কি ছেদ তিনি ব্যবহার আরম্ভ করেন? প্রশ্ন চিহ্ন (?) ও আশ্চর্য হওয়ার চিহ্ন (!) তিনি কি ব্যবহার করিয়াছিলেন? না করিয়া থাকিলে কোন সালে, কোন বইয়ে, কে কে ইহা সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন? কোটেসান চিহ্ন " " বা ' ' কবে থেকে বাংলায় ব্যবহার আরম্ভ হইল?

(৬) ইটালীতে কোটেসান বুঝাইতে হইলে ইংরাজীর ন্যায় " " বা ' ' চিহ্ন

না ব্যবহার করিয়া ইঁহারা « » এই চিহ্ন ব্যবহার করেন। ইহাতে নাকি ছাপিবার সুবিধা হয়। বাংলায় ইহা ব্যবহার করিলে কেমন হয়?

(৭) পাদটীকা দিবার জন্য ইংরাজীতে *, +, ‡, , § ॥, ॥ ব্যবহৃত হয়। * ইহাকে আমরা তারকা চিহ্ন বলি; অন্যান্য চিহ্নগুলির বাংলা নাম কি? ইহাদের ব্যবহারের কি কোন সুষ্ঠু নিয়ম বাংলায় আছে?

(৮) জমীদারী সেরেস্তায় জমীদার-বাবু চিঠির ডানদিকের উপর দিকে নিজের নাম পুরা দস্তখত করিতেন না যেমন আমি জমীদার হিসাবে সহি করিলাম—শ্রীযুক্ত—এবং ... শেষে একটি এইরূপ Coil করা হইত ইহার অর্থ ইহার পরে আর কিছু নাই। জমি-দারবাবুরা কেন এইরূপ সংক্ষিপ্ত সহি করিতেন? কবে থেকে এই প্রথার উদ্ভব।

(৯) সাবাস! সাজাহানের সমসাময়িক পারস্যের সাহ-আব্বাস খুব বুদ্ধিমান, সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 'he could driggle out of any difficulty with honour. এই সাহ-আব্বাস হইতে সাবাস কথার উৎপত্তি? এই কথা কি ঠিক?

(১০) তামাসা—আলাউদ্দিন খিলজীর সময় দিল্লীতে মালিক তমাশ বলিয়া এক ভাঁড় ছিল, সে কথায় ও পোষাক পরি-চ্ছদের রকমফের ও অঙ্গভঙ্গি করে লোক হাসাতে পারিত। তামাস হইতে তামাসা কথার উৎপত্তি। এই কথা কি ঠিক? ইতিহাস কি বলে?

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত,
৪৫নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড,
কলিকাতা—২।

॥ কোহিতূর আমের রহস্য ॥

(প্রশ্ন)

মহাশয়,

আপনাদের পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগের জন্য একটা লেখা পাঠাচ্ছি "অমৃতের" বিজ্ঞ পাঠকসমাজের কাছ থেকে হয়ত এর যুক্তিসংগত উত্তর পেতে পারি এই আশায়।

আমের বৈচিত্র্যে এবং নামায়ণে মুর্শি-দাবাদ হচ্ছে বিখ্যাত। এখনো আমের মরশুমে কত বিভিন্ন ধরনের আম যে বহরমপুরের বাজারে দেখা যায় তার আর ইয়ত্তা নেই! আর তাদের নামেরই বা বাহার কত,—যেমন বেগম-পসন্দ, সা-দুল্লা, রাণী, রাণী ভবানী, মিছরি-দানা, তোতাপুরি, রাণী-পসন্দ, গোপাল ভোগ, আনারসী ইত্যাদি...। কিন্তু মুর্শিদাবাদের মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত আম হচ্ছে "কোহিতুর"। বাজারে যার আমদানী অত্যন্ত সীমিত এবং যার মূল্য উল্লেখযোগ্য রকম বেশী! এই আমের স্বাদ নাকি অতুলনীয়! এই আমের গাছ শুনেছি মুর্শিদাবাদ ছাড়া অন্য কোথাও নেই! খাগড়ার (বহরমপুর) নতুন বাজারে এক বৃদ্ধ মুসলমান আম-ব্যবসায়ীর কাছে "কোহিতুরের" গল্প শুনেছিলাম,—

মুর্শিদাবাদে এত বিভিন্ন ধরনের আমের উৎপত্তির কারণ কি? কারণ হচ্ছে বিলাসী নবাবদের সখ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তখন বাগানের মালীরা নতুন নতুন 'কলম' তৈরী ক'রতে পারলে ইনাম পেত এবং তাদের সম্মান ছিল প্রায় আমীর-ওমরাহদের সমান। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে আমের রাজা "কোহিতুরের"। একমাত্র নবাবের এক বিশেষ বাগান ছাড়া এই আম আর কোথাও পাওয়া যেত না এবং পাছে এর আঁটি থেকে বাইরে কেউ গাছ তৈরী করে সেই জন্য এর সমস্ত আঁটি 'তুরপুন' দিয়ে ফুটো করে নষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ত। নবাবী আমলে অন্য কারও এই আম খাওয়া বা লাগানো নাকি মারাত্মক অপরাধ ছিলো। যে মালী এই গাছের 'কলম' সৃষ্টি ক'রে ছিলো তাকে নাকি প্রাণ হারাতে হয় এর জন্ম-রহস্যের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য।

সেই জন্য নবাবের নিজস্ব বাগান ছাড়া 'কোহিতুর' আর কোথাও ছিলো না সে সময়ে এবং আজও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে কটা 'কোহিতুরের' গাছ আছে তা আঙ্গুলের গুণতির মধ্যে। নবাবদের 'কোহিতুরের' বাগান ছাড়া বাইরে বোধ হয় ৪।৫টি গাছ আছে। সেই বৃদ্ধ আম-ব্যবসায়ী বলেছিলো—বাবু, 'কোহিতুর' আম পেতে হ'লে ঐ সমস্ত গাছের মালিকদের কাছে অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে আসতে হয়, তারপরও আম পাওয়া ভাগ্যের কথা।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, এত দামী যে আম এবং বাজারে যার চাহিদা স্বভাবতঃই এত বেশী সে আমের চাষ এখনো বাড়ছে না কেন?

নবাবী বাগানের গাছের বয়স অনেক হয়েছে এবং স্বভাবতঃই তার ফলনও কমে এসেছে কিন্তু নতুন ক'রে এই গাছের বাগান সৃষ্টি করা হচ্ছে না কেন! নবাবী আমলের নিষেধের বিভীষিকা কি এখনো মুর্শিদাবাদের লোকেরা ভুলতে পারেনি, না অন্য কোন কারণ আছে?

ইতি, বিনীত
লালমোহন রায়
মৌভাণ্ডার
সিংভূম (বিহার)

ভবঘুরের খাতা

অয়স্কান্ত

কিছুদিন আগেও এ জিনিসটি এমন ব্যাপকভাবে কলকাতায় দেখা যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে বুশ-শার্ট পরতে শেখার মতো প্রত্যেকটি দোকানে আমরা শো-উইনডোও সাজাতে শিখেছি। তেলেভাজার দোকান বাদ দিলে এখন আর শো-উইনডো ছাড়া দোকানই খুঁজে পাওয়া ভার। চৌরঙ্গী বা নিউ মার্কেট বা লিন্ডসে স্ট্রীটের দোকানের কথা বলছি না। টালিগঞ্জ-ভবানীপুর-বাগবাজার শ্যামবাজারের গলির দোকানেও শো-উইনডোর জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে।

আপনার যদি কখনো এমন অবস্থা হয় যে, হাতে সময় রয়েছে অথচ কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না—তাহলে এই শো-উইনডোর দিকে চোখ রেখে এসপ্ল্যানেড থেকে লিন্ডসে স্ট্রীট পর্যন্ত হেঁটে আসুন। তারপর নিউ মার্কেটের ভেতর দিয়ে লাইটহাউসের গলি পার হয়ে আবার বেরিয়ে আসুন চৌরঙ্গীতে। ক'রেক ঘণ্টা সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যাবে তা আপনি টেরও পাবেন না।

আর শুধু কি সময় কাটানো! আপনার যদি দেখার চোখ থাকে তাহলে নিঃখরচায় এমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতার স্বাদ পাওয়া অন্য কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সারা পৃথিবীর ভূগোল ও ইতিহাসকে আপনি প্রত্যক্ষ করবেন স্বল্প-পরিসর সীমানার মধ্যে অতি উজ্জ্বল রঙে ও রেখায়। অথচ কত তুচ্ছ বিষয়কেই না তারা আশ্রয় করে! জামা, জুতো, সিগারেট লাইটার, ঘড়ির ব্যান্ড, চশমার ফ্রেম, হীটার, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, টেবিল-ল্যাম্প, গ্রামোফোন, টেপ-রেকর্ডার, রেডিও—আরো কত অজস্র টুকিটাকি জিনিস। সবই যে প্রয়োজনের তা নয়। হয়তো একটি সিগারেটের টিনকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ধু-ধু মরুভূমি, আর রোদেপোড়া তামাটে আকাশ। ঠিক মাঝখানটিতে একটি খেজুরগাছ। সেই গাছে ঠেস দিয়ে পায়ের ওপরে পা তুলে পরম আনন্দে ধোঁয়া ছাড়ছে যে-লোকটি তাকে দেখে অবশ্যই আপনার হিংসে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাটুকুও যে নিদাঘ-দিনের দুঃসহ ক্লেশকে আপনিও এমনি সিগারেটের ধোঁয়ার ফুৎকারে অতি অনায়াসে শূন্যে মিলিয়ে দিতে পারেন।

আপনি যদি ধূমপায়ী হন তো অবশ্যই আপনাকে এবারে একটি সিগারেট ধরাতে হবে।

কিন্তু দু-পা না এগোতেই প্রচণ্ড বৈশাখী দিনেও শিরশিরে হিমেল হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগবে যেন। বরফের মুকুট পরা পর্বতের চূড়োগুলো জমাট শীতের মতো চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। একটি নদী—তাও জমাট বরফে সাদা একটি রেখার মতো। একটি গাছ—তাও বিন্দু বিন্দু তুষারে সাদা একটি ছোপের মতো। একটি পাথর—তাও স্তূপ স্তূপ হিমে সাদা একটি হিমবাহের মতো। কিন্তু এই পরিবেশেও আপনি দেখতে পাবেন এক যুবকসদৃশ বৃদ্ধ ঋজু ভঙ্গিতে বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন। উজ্জ্বল প্রাণের বিরল একটি দৃষ্টান্ত। তার কারণটিও উদাত্ত ঘোষণার মতো বৃদ্ধের হাতেই ধরা আছে। বিশেষ ব্র্যান্ডের একটি মদের বোতল। আপনি নিশ্চয়ই মদ্যপ নন। কাজেই এই দৃশ্যটি অনায়াসেই পার হয়ে যেতে পারবেন। তবে নিতান্তই স্বাস্থ্যের কারণে যদি আপনার মদ খাবার ইচ্ছে হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে অনুরোধ করছি—এ ব্যাপারে এই শো-উইনডোর ওপরে পুরোপুরি নির্ভর না করে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চলবেন।

হাঁ, এখানে এসে অবশ্যই থামতেই হচ্ছে। এ-দৃশ্য দু চোখ ভরে দেখবার মতো। যার স্থান পায়ের নিচে, যাকে মাড়িয়ে চলতে হয় রাস্তার যত্তো ধুলো আর আবর্জনা, মাটিতে আর পাথরে অনবরত ঠোকর খাওয়াটাই যার ভবিতব্য —সেও কিনা এমন কাব্য-রচনার উপকরণ!

না, ওগুলো ফুল নয়, শিশুদের পায়ের জুতো! কিন্তু ফুলের মতোই নরম আর তুলতুলে। আর ফুলের মতোই চিত্র-বিচিত্র। প্ল্যাস্টিকের লতাপাতার মধ্যে থোকা থোকা ফুলের মতোই। একটু ওপরে সবুজ পানায় ঢাকা একটা পুকুর একাকার হয়ে গিয়েছে সবুজ মাঠের সঙ্গে। আর কাগজের একটা টুকরো ঠিক যেন একটা বুলডোজারের মতো, সবুজ পানার বন্ধুরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে করতে এগিয়ে আসছে। একটি বক এক-ঠ্যাঙে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। একটি বাঘ ঝাঁপ দিল বলে! ফ্রক-পরা খুকীটি কিন্তু তবুও গাল ফুলিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে।

আরো এগিয়ে আসুন। থ্রি-ডাই-মেনশনাল একটুকরো স্পেস। কিন্তু আকাশের সমস্ত রঙ ছোট্ট এক-একটি বইয়ের মলাটকে আশ্রয় করেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হবে, এই গ্যালাকটিক বিশ্বজগতের বিপুল এক ছায়াপথ এক-একটি নক্ষত্রকে চোখের সামনে মেলে ধরেছে যেন। এই বিপুল ভাণ্ডারকে শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে পুরোপুরি একবার ছুঁয়ে দেখাটাও বোধ হয় কোনো একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি। প্রথমে শুধু রঙ দেখুন। তাকেই

বোধ হয় প্রাধান্য। তবুও সব লালই এক নয়। হলুদের কোল জুড়ে যার অধিষ্ঠান তাকে দেখে মনে হবে মায়ের কোলের টুকটুকে শিশু। হাতে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঘোর কালোকে আধাআধি চিরে ভাস্বর একটা দ্যুতির মতো যে বেরিয়ে এসেছে, সে অনেকটা ভোরের আলোর মতো। সমস্ত আগল খুলে দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হয়। আর সবুজকে আলতোভাবে ছুঁয়ে ঢেউয়ের মতো যে এলিয়ে পড়েছে সে যেন নব-বধূর ব্রীড়ানম্র হাসি। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে আর মনে হয় পরম নির্ভয় একটি আশ্রয়ের মধ্যে এই হাসিটুকু অক্ষয় হয়ে থাকুক।

রঙের পরে নাম। নানা হরফে, নানা ছাঁদে, ছোট বড়ো বিচিত্র সব নাম। এই নামের মধ্যে দিয়ে শুধু এই পৃথিবী নয়, গোটা বিশ্বজগৎ হাতছানি দিয়ে ডাকে। শুধু এক দেশের একজন নয়, সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষ খুব অন্তরঙ্গ সুরে একান্তভাবে কিছু বলতে চায়। শুধু এক বিষয়ের একটি নয়, সমস্ত বিষয়ের সমস্ত কথা ঐকতানের মতো সমন্বিত সুরের ঝঙ্কার তোলে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিশ্চয়ই আপনার মনে হবে, আপনার জ্ঞান কত সীমিত, আর কত কিছু এখনো না-জানার অন্ধকারে। তখন আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত উপমাটি নিশ্চয়ই মনে পড়বে। আলোর একটি বলয় ক্রমেই পরিধিতে বাড়ছে। আর যতোই বাড়ছে ততোই আরো রূঢ়ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ছে আরো বেশি বেশি অন্ধকারের এলাকা।

যাইহোক, ফুটপাথের বইয়ের স্টলকে অবশ্য কিছুতেই শো-উইনডো বলা চলে না। বরং হয়তো পুরোটাই শো-উইনডো, যার অন্যবিধ নিদর্শন এই চৌরঙ্গী এলাকায় অপ্রচুর নয়। মসজিদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হয়তো দেখবেন, সারা রেলিঙের গায়ে ক্যালেণ্ডারের ছবির মেলা বসে গিয়েছে। কোন্‌টি দেবদেবী আর কোন্‌টি ফিল্মস্টার তা ওয়াকিবহাল ব্যক্তি না হলে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। আবার বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আচমকা টের পাবেন শিরা-ওঠা একটি হাতের মুঠোয় অতি কমনীয় একটি পোর্ট্রেট। ইচ্ছে করলে নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে টিনের আড়াল দেওয়া দোতলায় প্রায় একটি প্রাগৈতিহাসিক ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে আপনিও একটি প্রতিচ্ছবির মালিক হতে পারেন। তারপরে ইচ্ছে হলে একটি টাকা খরচ করুন। প্যাকিং বাক্‌সের মধ্যে খড়ের গাদায় সাজিয়ে রাখা প্রায় শ'খানেক ফাউণ্টেন-পেন থেকে যে-কোনো রঙের যে-কোনো ঢঙের তিনটিকে অনায়াসে তুলে নিতে পারেন। কিংবা যে সচল মোজার স্তূপটির ভেতর থেকে বারো-আনা বারো-আনা বলে একটানা চিৎকার হয়ে চলেছে তাকে থামাতেও কোনো বাধা নেই। বারো আনার কিছু কম কম খরচ করলেও গোটা স্তূপটিকে ওলোটপালোট করবার অধিকার আপনার থাকবে।

আর চৌরঙ্গীর ঘড়ির ঠিক নিচেই ফুটপাথের এক কোণে কিম্ভূত দাড়ি-গোঁফওলা মুখ, সাহেবী পোশাক পরা যে মানুষটি দাঁড়িয়ে থাকে তার সঙ্গে আলাপ জমাতে হলে বারো আনাও খরচ করবার দরকার নেই। আপনি হয়তো বুঝতে পারেননি এই লোকটি নিজের মুখ-খানাকেই শো-উইনডো হিসেবে ব্যবহার করেছে। কয়েক আনা পয়সা খরচ করলেই আপনি এমনি একটি গোঁফের মালিক হতে পারেন, বা এমনি দাড়ির। বা, ইচ্ছে করলে দুয়েরই।

তবে, আমার মতে, সবচেয়ে লোভনীয় শো-উইনডো পাঞ্জাবী হোটেল-ওলাদের। আপনি যতো ব্যস্তই থাকুন, একবার আপনাকে চোখ ফিরিয়ে তাকাতেই হবে। আপনার অজান্তেই স্তিমিত হবে আপনার চলা। আর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে আপনি নিশ্চয়ই একবার ভাববেন, আস্তো একটা মুরগির ঠ্যাঙ কড়মড় করে চিবিয়ে খাবার সখটুকুকে কল্পনা করতেও আপনি ভুলে গিয়েছেন। আর শুধু কি মুরগির ঠ্যাঙ? ভেটকি মাছের ফ্রাই? ডিমের কসুম পোরা মাংসের চপ? দইবড়া? লসিয়? নিজের অজান্তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আপনাকে শুধু টের পেতে হবে, বিপুল এক ভোজের আয়োজন শো-উইনডোতে সাজিয়ে আপনার নিশ্বাসের বাতাসকে ভারী করে তোলা হয়েছে। তবে সাবধান, পকেটে অন্ততঃ পাঁচটি টাকা না থাকলে এই শো-উইনডোর হাতছানিতে ভুলবেন না যেন।

তার চেয়ে অনেক সস্তা মেট্রোর গলির তেলেভাজা ও কোল্ডড্রিঙ্ক। শো-উইনডো বলতে যা বোঝায় তা এখানে নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও হয়তো প্রত্যেকটি দোকানই আস্তো এক-একটি শো-উইন্‌ডো। একেবারে রাস্তার ওপরেই গনগনে উনুনের ওপরে তেলেভাজার কড়াই চাপানো হয়েছে। সারা গলি গন্ধে ম'-ম'। পাশেই পানের দোকানে মস্ত এক-একটা বরফের চাঁইয়ের ওপরে সবুজ পানের স্নিগ্ধ প্রলেপ। গোলাপ আতর আর জর্দার মিষ্টি-মিষ্টি ঝিমধরা গন্ধ। কোল্ডড্রিঙ্কের বোতলের আশ্রয়ে রামধনুর মতো রঙের সমারোহ। সব মিলিয়ে গোটা গলিটাই যেন নতুন ধরণের শো-উইন্‌ডোর মতো মেলার মতো মানুষের ভিড় আকর্ষণ করেছে। অবশ্য এই গলিতে অন্য একটি প্রবল আকর্ষণও আবছা অন্ধকারে বিরাজমান। কোনো শো-উইন্‌ডোতে তার অস্তিত্ব প্রকট নয়। তবুও দলে দলে মানুষ সেখানেও ভিড় করে।

অতএব স্বীকার করতেই হবে যে, শো-উইন্‌ডোরও রকমফের আছে। সব সময়ে তা একটি সাজানো গোছানো বাতায়ন নাও হতে পারে। অবশ্যই শো-উইন্‌ডো কথাটা ব্যাপক অর্থে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ, এমন কিছু একটা আয়োজন যা ক্রেতাকে প্রলুব্ধ করে। সেজন্যে সব সময়ে লোভনীয় একটি পণ্যকে চোখের সামনে মেলে ধরবার প্রয়োজন নেই। যেমন, ফাউণ্টেনপেনকে কাপড়ের আড়ালে ঢেকে রেখে কেউ একজন আপনার কাছে বলবে, একটা ফাউণ্টেনপেন নেবেন স্যার? বলবে আর সন্ত্রস্ত চোখে চারদিকে তাকাবে। আপনার মধ্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ যদি প্রকাশ পায় তাহলে আপনাকে নিয়ে যাবে বড়ো রাস্তার আলো থেকে একটি গলির অন্ধকারে। এই হল শো-উইন্‌ডোর আয়োজন। আপনি যদি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি হন তাহলে আপনার আর নিস্তার নেই। তবে আপনার পক্ষে লাভ এইটুকু যে, পরদিন দিনের আলোয় যাচাই না করা পর্যন্ত এই আনন্দটুকু আপনার থাকবে যে আপনি মস্ত একটি দাঁও মেরেছেন।

কিংবা রাস্তায় চলতে চলতে মানুষের জটলা দেখে আপনিও নিশ্চয়ই একবার উঁকি দেবেন। নিরীহ চেহারায় একজন মানুষ একটা কার্ডবোর্ডের প্যাকিং-বাক্‌সে নানা টুকিটাকি জিনিস ঠাসা বোঝাই করে নিয়ে বসে আছে। চিৎকার করে লোকজন ডাকতে হচ্ছে না। পণ্য পরিবেশন করার কায়দাটাই এমন যে, এক্ষেত্রেও ক্রেতারা অনায়াসেই দাঁও মারবার কথা ভাবতে পারে।

আবার এই একই লোককে হয়তো দেখা যাবে এই একই জিনিস রীতিমতো সাজিয়ে-গুছিয়ে ফুটপাথের ধারে বসেছে। মুখে কোনো কথা নেই, শুধু মাথার ওপরে লাল শালুর বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়েছে যে, জিনিসগুলো সব "ফরেন মেড"। এক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তিটুকুই শো-উইন্‌ডোর কাজ করে।

শো-উইন্‌ডোর এমনি আরো অজস্র রকমফের হতে পারে। এমন কি প্রত্যেকটি মানুষের সাজপোশাকে ও চাল চলনে যে সরব বা নীরব আত্মঘোষণা থাকে তাও এক ধরণের শো-উইন্‌ডো। এই ব্যাপক অর্থে ধরলে, বেঁচে থাকার মানেই হচ্ছে দিনে দিনে বা মুহূর্তে মুহূর্তে শো-উইন্‌ডোকে নতুন নতুনভাবে সাজিয়ে চলা।

[উপন্যাস]

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

॥ ষোলো ॥

রবিবারে অভয় দীপ্তিকে দেখতে গেল হাসপাতালে।

ছ'টা দিনের ভেতর তার এতটুকুও সময় থাকে না—সেই সকাল আটটায় বেরিয়ে সন্ধ্যে সাতটা সাড়ে সাতটায় ফেরা। ততক্ষণে ভিজিটিং আওয়ারের পালা শেষ হয়ে যায় অনেক আগেই। প্রায় তিন সপ্তাহ হ'য়ে গেল দীপ্তি হাসপাতালে পড়ে আছে, এর মধ্যে প্রথম তিন-চারটি দিন ছাড়া আর একবার মাত্র সে হাসপাতালে আসতে পেরেছিল। গত দুটো রবিবারেও তাকে এক্‌স্ট্রা কাজ করতে হয়েছে। তিনটে ক'রে বাড়তি টাকা ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

দীপ্তি ভালো আছে, ভালো হচ্ছে দিনের পর দিন—এ খবর বাসাতে রোজই সে পায়। সেজন্যে ভাবনার কিছু নেই। এর মধ্যে পথে একদিন থানার দারোগার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, রাউণ্ড দিতে বেরিয়েছিলেন তিনি। দারোগা জানালেন, অমলের সম্পর্কে এখনো যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে চার্জশীট তৈরি করা যাচ্ছে না। তবে এনকোয়ারী চলছে।

চলুক, অনন্তকাল ধরে চলুক। সেজন্যে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই অভয়ের। সেদিন তো অমলের কথাবার্তা শুনে মনে হল তার মতো ভালো ছেলে বিশ্ব-সংসারে দুর্লভ। একখানা চিঠি সে তৃপ্তির নামে লিখেছিল ঠিকই, 'কিন্তু অন্যায় করে ফেলেছি দাদা, মাপ করবেন সেজন্যে।' অতএব অমলের ওপর আর রাগ করবার কিছু নেই। বরং পাড়ার মেয়ের সম্মান বাঁচানোর জন্যে সে-ই অভয়কে চন্দন সিংয়ের খবরটা জানিয়ে দিয়েছে।

এর পরে অমলের বেকসুর খালাস পাওয়া উচিত।

আর তা ছাড়া—সমস্ত জিনিসটা ধামাচাপা পড়াই ভালো বলে মনে হয় এখন। বাবাকে একবার থানায় নিয়ে যেতে হয়েছিল, সে অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। সেই কাগজপত্র, চুনের গন্ধ, মেজেতে বসে থাকা হাজার জনকয়েক শিকার, দেওয়ালে দু জোড়া হাতকড়া আর দারোগার এক-টানা জেরা—তার ভেতরে বাবার সর্বাঙ্গে যে যন্ত্রণা ফুটে উঠেছিল অভয় সেকথা এখনো ভুলতে পারেনি। সেদিন থানা থেকে ফিরে এসে বাবা প্রায় শয্যা নিয়েছেন—তার 'শক'টা তাঁর ভালো করে কাটেনি এখনো। এর পরে যদি তাঁকে কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তা হলে কী যে হবে জোর করে বলা শক্ত।

তাছাড়া—

তাছাড়া দারোগার সেই কথাগুলো এখনো যেন মাথার ভেতরে কতগুলো ধারালো সুচের মতো বিঁধছে।

'আপনার বড়ো মেয়ের সম্পর্কে যে খবর আমরা পেয়েছি, তাতে তার চলা-ফেরা—। এমন তো হতে পারে চৌরঙ্গীর হোটেলগুলোতে যাদের সঙ্গে তার কার-বার, তাদেরই কেউ জেলাস হয়ে বোমাটা ছুঁড়েছে? নইলে আপনার ছোট মেয়েকে বাদ দিয়ে বড়ো মেয়ের ওপরেই এসে পড়ল কেন বলতে পারেন?'

বোমা অমলই ছুঁড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দারোগার কথাই কি সবটা উড়িয়ে দেওয়া যায়? সকাল-সন্ধ্যা বাইরে খাটতে হয় বলেই যে অভয়ের চোখ-কান একেবারে গার্ডেনরীচের কারখানায় বন্ধ হয়ে থাকে, তা তো নয়। দীপ্তিকে কি বাবা নিজেও সন্দেহ করেন না? সন্ধ্যায় যে সাজ-পোশাক করে সে নাইট-ডিউটি দিতে যায়, যেভাবে রাত বারোটায় ফিরে আসে, তা থেকে—। আর দীপ্তির আনা মার্কেটের মাটন খেতে গিয়ে অভয়েরও কি কখনো ইচ্ছে হয়নি যে, গলায় আঙুল দিয়ে সবটা সে বমি করে ফেলে?

এখন অভয়ের মনে হয়, ব্যাপারটা একেবারে চাপা পড়াই ভালো। কেঁচো খুঁড়তে যদি সাপ বেরিয়ে আসে, তা হলে পায়ের তলায় আর মাটি থাকবে না। পাড়া ছেড়ে পালাতে হবে তখন। কিন্তু কোথায় বাড়ী মিলবে এই কলকাতা শহরে? আর এই সস্তার ভাড়ায়?

এলোমেলো ভাবনায় দুলতে দুলতে অভয় হাসপাতালে এল।

কোমর পর্যন্ত একটা পাতলা চাদর টেনে দিয়ে, বালিশদুটো উঁচু করে তাতে পিঠ রেখে আধশোয়া ভাবে বসে ছিল দীপ্তি। কোলের ওপর একখানা বাংলা উপন্যাস খোলা রয়েছে, সে পড়ছে না। মাথার দিকে পশ্চিমের জানলাটা খোলা—বিকেলের রোদ এসে পড়েছে তার মুখে। সেই আলোয় অভয় দেখল দিদি আশ্চর্য

রোগা হয়ে গেছে। চোখদুটোয় ঘন কালির ছায়া, শাদা কপালটা কঙ্কালের মাথার মতো, রুক্ষ লালচে চুল গালে এসে ছড়িয়ে পড়েছে। অভয়ের মনে হল দিদি যে মুখে গালে রং মাখে সেটা ভালোই করে, তা নইলে দিদিকে একেবারেই মানায় না।

—দিদি, ভালো আছিস?

—আয়—বোস।

অভয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পাশের বেডের কিম-ধরা বুড়ী নড়ে উঠল। প্লাসটার-করা পা-টা নাড়তে গিয়েই চিৎকার ফুটে বেরুল তার গলায়।

—আর কি ভালো হবো আমি? না—কোনোদিনই না। ছেলের বিয়ে তো দিইনি, খাল কেটে কুমীর এনেছি ঘরে। এখন যদি এখানেই মরি, আর ফিরে না যাই, তা হলেই ওদের হাড় জুড়োয়। হারামজাদী—হারামজাদী!"

দীপ্তি একটু হাসল : বুড়োমানুষ—পা ভেঙে গেছে।

—ও।

বুড়ী আরো কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে ঝিমিয়ে পড়ল আবার। অভয় চেয়ে রইল দিদির মুখের দিকে। ডান গালে দু-দুটো ক্ষতচিহ্ন এতক্ষণে যেন চোখে পড়ল তার। সবে শুকিয়েছে, কিন্তু এখনো টকটকে লাল। বিকেলের রোদে যেন রক্ত ঝরছে তা থেকে।

—এখন কেমন আছিস দিদি?

—জেনে কী করবি? তোরা তো খবর নিসনে আমার।—দীপ্তির চোখের পাতা ভারী হয়ে এল।

—কেন, অমিয় আসে না?

—আজ চার-পাঁচ দিন তার দেখা নেই। তিপু সঙ্গে আসত—সেও আর আসে না।

—অমিয় কোথায় ফুটবল খেলতে গেছে। আর—অভয় একবার থামল, তৃপ্তিকে আসতে সে-ই বারণ করে দিয়েছে, সে-কথাটা তাকে সামলে নিতে হল : অমিয় তো নেই—কে আনবে সঙ্গে করে?

—কেন, তুইও তো আনতে পারতিস আজকে।

অভয় অপরাধীর মতো মাথা চুলকোল : খেয়াল হয়নি দিদি।

দীপ্তি মুখ ফেরালো : আমার কথা কারুর খেয়াল হয় না। ওই বুড়ীর মতো আমারও বলতে ইচ্ছে করে, আমি সংসারের কাছ থেকে বাতিল হয়ে গেছি।

—ছিঃ—কী যে বলিস! আমার অবস্থা তো জানিসই—সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খাটুনি। বাবার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে, রিকশায় পর্যন্ত উঠতে পারেন না। আর মা যদি বাবার কাছে না থাকে—

দীপ্তি চুপ করে রইল। কোলের ওপরে বাংলা উপন্যাসটার পাতাগুলো খস খস করে উড়তে লাগল হাওয়ায়। অভয় চেয়ে রইল তার গালের সেই দাগদুটোর দিকে। যদি একেবারে মিলিয়ে না যায়, তা হলে সারা জীবনের জন্যে দিদির মুখটা বিশ্রী হয়ে যাবে।

অভয় জিজ্ঞেস করল : প্রভাতদা আসে না?

—এসেছিল কদিন আগে। পাঁচ মিনিটের জন্যে। বড়োলোকের বাড়ীতে চাকরি করে, হাসপাতালে পড়ে থাকার সময় কোথায়।—দীপ্তি একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলল : তবু দেখছি নিজের চাইতে পর ভালো। অমিয়র সেই বন্ধুটিই এসে খোঁজ-খবর নেয়।

—অমিয়র বন্ধু?—অভয় ভুরু কোঁচ-কালো : কোন্ বন্ধু?

—সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। চন্দন সিং।

অভয়ের মাথার ভেতরে বিদ্যুৎ ছুটল, লোহার কবাটের মত শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল : সেটা কোত্থেকে জুটল এসে?

—অমিয় সঙ্গে করে এনেছিল।

—তাই বুঝি?—অভয়ের দাঁত কড়-মড় করে উঠল, বিশ্রীভাবে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল, মনে হল, অমিয়কে সামনে পেলে এক টানে তার গলাটা মুরগীর মতো ছিঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু জায়গাটা হাসপাতাল আর দিদি অসুস্থ।

অভয় ধরা গলায় বললে, লোকটা অত্যন্ত বাজে।

—বাজে কেন? আমার তো বেশ ভালো আর ভদ্র বলেই মনে হল।

—হুঁ, ওই রকমই মনে হয়।—অভয় আবার দাঁত কড়মড় করল : সে যাই হোক, ওকে বেশি প্রশ্রয় দিসনি।

—প্রশ্রয় আর কী দেব। তবে অমিয়র বন্ধু—

—দুনিয়াসুদ্ধু সবাই ওর বন্ধু—ইডিয়ট।—অভয় আর একবার ফেটে পড়তে গিয়েও দীপ্তির খাটের কোণটা চেপে ধরে নিজেকে সামলে নিলে। বললে, সে যাক—আর কতদিন ওরা তোকে রাখবে এখানে?

—এই সপ্তাহেই তো ছেড়ে দেবে বলেছিল। কিন্তু হাতের ঘাগুলো এখনো শুকোয়নি বলে আরো দিন দশেক রাখতে চাইছে।—দীপ্তি হঠাৎ অভয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল খানিকটা : হাঁ রে, আমার মুখটা খুব বিশ্রী হয়ে গেছে তাই না?

মনের ভেতরে অমিয় আর চন্দন সিংয়ের ওপর যে অন্ধ বিদ্বেষটা সাপের মতো ফুঁসছিল এতক্ষণ, এক মুহূর্তে নিবে গেল সেটা। দিদির ওপর মমতায় অভয়ের বুকটা টনটন করে উঠল, জল আসতে চাইল চোখে।

—না দিদি, না—ও কিছু নয়। দুটো মাত্র দাগ—দুদিন পরেই মিলিয়ে যাবে।

—মিলিয়ে যাবে? ঠিক জানিস?

—ঠিক জানি।

দীপ্তি আবার একটু চুপ করে রইল : ঘাগুলো শুকিয়ে আসছে বটে, কিন্তু শরীরটা ভালো যাচ্ছে না তাই। কেমন একটা অস্বস্তি লাগে সব সময়, মাথা ঘোরে, মুখ দিয়ে জল ওঠে, ঘাম ছুটে যায়।

—ঘাম হবে কেন?—অভয় চিন্তিত হল : ডাক্তার কী বলে?

—কিছুই বলেন না। নার্সকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, সে জবাব দিয়েছে, "ওর জন্যে এখন ভাবতে হবে না।"

—এখন ভাবতে হবে না তো কখন ভাবতে হবে?—অভয় বিরক্ত হল : সাধে কি লোকে বলে হাসপাতালের রুগীদের মানুষ বলেই মনে করে না ওরা? ঘাম হচ্ছে, অথচ সেটা কিছুই নয়? এই জন্যেই তো খবরের কাগজে এদের নিয়ে এত লেখালেখি হয়।

একটা ফিডিং কাপ হাতে করে সাদা পায়রার মতো এগিয়ে আসছিল সেই ছোটখাটো নার্সটি। অভয় তাকে ডাকল।

—নার্স।

মেয়েটি দীপ্তির বেডের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল : বলুন।

—দিদি বলছিল, ওর প্রায়ই মাথা ঘোরে, ঘাম হয়ে যায়—অথচ সেজন্যে কোনো ট্রিটমেণ্ট করেন না আপনারা।—অভয়ের স্বরে অনুযোগ ফুটে বেরুল :

কিন্তু আপনাদের তো এ সব দেখা উচিত।

দীপ্তি লজ্জিত হয়ে বললে, না-না, ও'রা বলেছেন ভাববার কিছু নেই।

নার্স প্রায় মিনিটখানেক চুপ করে রইল। তারপরে জিজ্ঞেস করল : আপনি ও'র কে হন!

—আমার ছোট ভাই।—জবাবটা দীপ্তির কাছ থেকেই এল।

নার্স আস্তে আস্তে বললে, আচ্ছা—আমি ডাক্তারবাবুকে বলব—তারপর নিজের কাজে চলে গেল।

অভয় বললে, হার্টলেস। এই নার্স-গুলোর কোনো ফীলিং নেই কারোর জন্যে।

—না রে, মেয়েটা খুব ভালো। ওয়ার্ডের সকলকে যত্ন করে, কিছুতে বিরক্ত হয় না।

অভয় বেরুলে আরো পনেরো মিনিট পরে, ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেলে। তখন দীপ্তির বেডের পশ্চিম দিকের জানলা থেকে বিকেলের লাল রোদ মুছে গেছে, আলো জ্বলে উঠেছে ঘরে। আর সেই বুড়ীটা আবার তারস্বরে চিৎকার তুলে ছেলের বৌদের গালাগাল দিতে আরম্ভ করেছে।

বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সেই নার্সটি কোত্থেকে সামনে এসে দাঁড়ালো অভয়ের।

—শুনুন?

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হল অভয়।

—কী বলছিলেন?

—উনি আপনার নিজের বোন?

—নিশ্চয়। একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে তিনটে ঝাউ-গাছের দীর্ঘ ছায়া ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিকে চোখ রেখে মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করলে, আপনার দিদি কি ম্যারেড্?

—ম্যারেড্ হবে কেন?—অভয় চটে উঠল : আপনাদের টিকিটেই তো লেখা রয়েছে মিস্ দীপ্তি দে।

—তা আছে। কিন্তু—নার্স একবার গলাটা পরিষ্কার করে নিলে : এমন তো হতে পারে যে, গোপনে সিভিল ম্যারেজ করেছেন, আপনাদের জানতে দেননি?

—হতে সবই পারে—অভয় অধৈর্য হয়ে উঠল : কিন্তু এ সবই বাজে কথা। কেন এ সমস্ত জিজ্ঞেস করছেন আমাকে?

নার্স দুটো ছলছলে শঙ্কিত চোখে এবার সোজাসুজি অভয়ের দিকে তাকালো।

একটা কাটা ঘুড়ির মতো টলতে টলতে অভয় ফিরল। চোখের সামনে সব

তাদের এই পরিবারটা কতগুলো থ্যাঁত-লানো ইঁদুরের মতো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তার ভেতরে।

এরপর? এরপর দিদির কী হবে? কোথায় দাঁড়াবে সে? বাবা হার্টফেল করবেন—মা পাগল হয়ে যাবেন—দিদি? তাকে হয়তো আত্মহত্যা করতে হবে। অভয়কে যদি সেজন্যে বিষ আনতে বলা হয়, সেও আপত্তি করবে না।

"উনি আপনার নিজের বোন?"

যেন মুছে গেছে তার। বাড়ীতে ঢুকেই বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ল। মাথার ভেতরে যেন ভূমিকম্প চলছে।

জানলা দিয়ে এই নারকেলডাঙার গলির আকাশেও এক ফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে। দিদির গালের সেই রক্তমাখানো ক্ষতটার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। রাস্তার ওপারে আবার আবর্জনার স্তূপ বসেছে, তীব্র পচা গন্ধ উঠে আসছে সেখান থেকে। অভয়ের চোখের সামনে সমস্ত কলকাতাই এখন আবর্জনার স্তূপ আর

অভয়ের এক সময় খেয়াল হল, বিছানার চাদরের একটা কোণ কুড়িয়ে এনে সে কুকুরের মতো চিবুতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ময়লা, ঘাম আর পুরানো কাপড়ের একটা নোনা স্বাদ তার মুখটাকে ভরে দিয়েছে, আর সমস্ত লালাটা চাদরের টুকরোর ভেতরে জমা হয়ে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তার।

অভয় ক্ষিপ্তের মতো উঠে পড়ল। তেল-চিটচিটে বালিশটাকে হঠাৎ মড়ার বালিশের মতো লাগল। অভয় একটানে

সেটাকে ছিটকে ফেলে দিলে, দেওয়ালের ফাটল থেকে যে আরশোলাটা আসছিল, বালিশটা গিয়ে পড়ল তার ওপর।

মা ঘরে এলেন।

—বালিশটা অমন করে ফেলে দিলি যে?

অভয় ঝাঁ ঝাঁ করে বললে, বড্ড ছারপোকা।

—কাল রোদে দিয়ে দেব। দীপু কেমন আছে?

অভয় দাঁতে দাঁত ঘষল : খুব ভালো।
—কবে আসতে দেবে?

—আরো দেরী হবে দিন কয়েক।

মার নিঃশ্বাস পড়ল : কত কষ্টই যে পাচ্ছে মেয়েটা। কিন্তু আমার এমনি পোড়া কপাল যে, গিয়ে একবার চোখের দেখাও দেখতে পাই না। অমিয় নিয়ে যাবে বলেছিল, কিন্তু চারদিন আগে সে যে কোথায় খেলতে গিয়েছিল—

পাশের ঘরে বাবা আছেন, অভয় তাই চিৎকার করতে পারল না। কিন্তু তার চাপা গলাই এমনভাবে ঝনঝন করে উঠল যে, মা চমকে দু' হাত পেছিয়ে গেলেন।

—কেন, কী হবে গিয়ে? তুমি একবার দেখতে গেলেই কি সঙ্গে সঙ্গে দিদি সেরে উঠবে? না, হাসপাতাল একটা বেড়াবার জায়গা?

মা-র মুখ বেদনায় কালো হয়ে গেল।

—বেড়াতে তো যেতে চাই না। নিজের মেয়েটাকে একবার দেখতে পর্যন্ত পারব না?

—না, কোনো দরকার নেই।

—অভয়!

অভয় খেঁচিয়ে উঠল : আমি বলছি দরকার নেই, তবু মিথ্যে কেন ঘ্যানঘ্যান করছ?

মা মাথা নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চিরকাল কম কথা বলেন, চিরদিন এই সংসারের সুখে-দুঃখে ছায়ার মতো সকলের পেছনে লুকিয়ে থাকেন, রান্না করে, বাসন মেজে, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে তাঁর দিন কাটে। স্বামীর কাছ থেকে ধমক খেয়েছেন বরাবর, ছেলের কাছেও তার বেশি আশা তাঁর নেই।

অভয় কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে একটা বিড়ি ধরালো। মা-র সামনে প্রথম থেকেই সে খায়।

মা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিলেন : অভয় হঠাৎ ডাকল পেছন থেকে।

—শোনো।

মা দাঁড়ালেন।

—তিপুর এখন বিয়ে দিলে কেমন হয়?

মা বললেন, তা কী করে হয়। দীপুর বিয়ে হল না—

তোমার দীপুর সাতজন্মেও বিয়ে হবে না, এইটেই অভয়ের একমাত্র বলবার দরকার। কিন্তু সেদিক দিয়েই গেল না অভয়। বললে, দিদি চাকরি করছে, এখন ও বিয়ে করবে না। কিন্তু তিপুর জন্যে একটা ব্যবস্থা তো করা দরকার।

মা একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, উনি বলছিলেন, বাঁড়ুজ্জে মশাই কী একটা সম্বন্ধের কথা যেন তুলেছিলেন। ওঁর তখন মেজাজ ঠিক ছিল না—বাঁড়ুজ্জেকে আমল দেননি। কাল অবিশ্যি বললেন, একবার দেখলে হয় ব্যাপারটা।

—বাঁড়ুজ্জে? আমাদের পাড়ার কুঞ্জ বাঁড়ুজ্জে?

—হুঁ।

অভয় নিবিষ্ট হয়ে বিড়িতে গোটা দুই টান দিলে : পাত্র কোথাকার?

—কী যেন এক কম্পাউন্ডার। নিজের একটা বাড়ীও আছে। মোটামুটি চলে যায়।—মা-র স্বরে একটু ক্ষীণ উৎসাহ দেখা দিল : শুনেছিলুম পয়সা-কড়ি নেবে না। তা আমাদের যে অবস্থা, এর বেশি কী-ই বা আশা করতে পারি, বল?

—হুঁ।

অভয় আবার চুপ করে থেকে বিড়িটা শেষ করল। তারপর নেমে পড়ল বিছানা থেকে, চটিটা গলিয়ে নিলে পায়ে।

—একটু আসছি মা।

—কোথায় চললি?

—বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে একবার কথা কয়ে আসি।

—এত হুড়োতাড়ার কী আছে?—মা আশ্চর্য হলেন : কাল সকালেই খবর নিস বরং। রান্না হয়ে গেছে, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নে বরং।

—এসেই খাব। সকালে তো আমার টাইম হয় না—ঘুম থেকে উঠেই ছিটকে বেরিয়ে যাই। এই বেলাই কথাবার্তা বলে আসি। বুড়ো বাড়ীতেই আছে দেখলুম যেন—বারান্দায় পায়চারি করছে।

অভয় বেরিয়ে এল। আকাশে সেই ভাঙা চাঁদটা রক্তাক্ত ক্ষতের মতো তাকিয়ে আছে। গলিতে আবর্জনার দুর্গন্ধ।

অভয় আড়মোড়া ভাঙল একবার। ক্লান্তিতে ঘাড়টা যেন নুয়ে পড়ছিল, সেটাকে সোজা করে তুলে ধরল। হঠাৎ তার মনে হল, না—হার মানব না। কারখানার লোহাকে আগুনে গলাই—হাতুড়ি দিই। এই জীবনটাকে দুটো হাতুড়ির ঘা দিয়ে সোজা করে দিতে পারব না?

হাত দুটো মুঠো করে ধরে নিজের পেশীতে পেশীতে শক্তির একটা তরঙ্গকে যেন অনুভব করে নিলে অভয়।

—দুঃসময় এসেছে—তার কী! সব কেটে যাবে। আমি লড়ব, কিছুতেই হার মানব না।

কিন্তু কী করে লড়বে সে তার এখনো জানা নেই। তার আগে বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে দেখা করা দরকার। অভয় সেদিকে এগিয়ে গেল।

তৃপ্তিকে দেখতে এল কম্পাউন্ডার—পরের দিন রাত আটটার সময়। বাঁড়ুজ্জে তাকে সঙ্গে করে আনলেন, অভয় তাকে আপ্যায়ন করে ঘরে এনে বসালো।

কম্পাউন্ডারের বয়েস পঁয়ত্রিশের নিচে নয়। রোগা, কালো, মাথা-জোড়া টাক। চোখ দুটো ট্যারা। কিন্তু তাই বলে তার বিনয়ের অভাব ঘটল না। এসেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল গৌরাঙ্গবাবুকে।

(ক্রমশঃ)

ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

দ্বারকায় রনছোড়জীর মন্দির

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের পশ্চিমতম প্রান্তে গুজরাটে আরব সাগরের তীরে কৃষ্ণের নগরী পুণ্য-তীর্থ দ্বারকাধামে রণছোড়জীর মন্দির—কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী মেবারের রাণী মীরাবাঈয়ের রণছোড়জী—মীরাকে ঘর-ছাড়া করেছিল যে রণছোড়জী, যার অনিবার্য আকর্ষণে রাজার অতুল বৈভবও তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল রাজরাণীর কাছে। দ্বারকা সেই রণছোড়জীর রাজ্য, যে মীরার গিরিধারী গোপাল, দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ।

একদিন সত্যিই এসে হাজির হলাম মীরার সেই গিরিধারী গোপালের দেশে। পুণ্যসঞ্চয়ের লোভে নয়, তবে মরমী ভক্ত সাধিকা মীরার কৃষ্ণ-ভজনার করুণ-মধুর আকুলকরা সুরে কার হৃদয় না গলে! আর মীরার সঙ্গে দ্বারকাপুরীর নাম তো এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা হয়ে রয়েছে। যুগে যুগে ভগবান তাঁর ভক্তের মধ্যে দিয়েই আপন স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। তাই কৃষ্ণের ভাবে ভাবিতা মীরা রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে শেষজীবনে ছুটে এসেছিলেন এই দ্বারকাধামে; পার্থিব সুখ-সম্পদ, মান-মর্যাদার মোহ তাঁকে আর কোনদিন পূর্বজীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। এই দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণেই মীরা শরণ নিয়েছিলেন। আর ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তো ভক্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেননি। এই মন্দিরেই তিনি মীরার দেহ আপন অঙ্গে ধারণ করেছিলেন, ভক্তকে কোল দিয়েছিলেন।

মেবার ত্যাগ করে নির্যাতীতা, উৎপীড়িতা মীরাবাঈ প্রথমে এসেছিলেন বৃন্দাবনে। কিন্তু মীরার প্রাণের ঠাকুরের লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনও তাঁকে কাছে ধরে রাখতে পারেনি। সেখানেও শান্তি না পেয়ে মীরা শেষপর্যন্ত এলেন দ্বারকায়। ইতিমধ্যে চিতোরের নিদারুণ দুর্দিন শুরু হয়ে গেছে। মুসলমানদের আক্রমণে মেবারের তখন বিপন্ন অবস্থা। সাধারণ মানুষের নিশ্চিত বিশ্বাস তাদের এ ঘোর দুর্দিন মীরার দেশত্যাগেরই ফল। মীরার ওপর অত্যাচার-অবিচারই তাদের এ অমঙ্গল ডেকে এনেছে। তাই তারা চাইল মীরাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে। তাদের বিশ্বাস কুললক্ষ্মী ফিরে এলে আবার তাদের দেশের শ্রী-শান্তি ফিরে আসবে। কতিপয় পুরোহিত ব্রাহ্মণ তখনই ছুটলেন দ্বারকায়। তাঁরা মীরাকে অনুনয় করলেন দেশে ফিরে যেতে। মীরার মনে এল দ্বিধা। এ ভক্তিসমুদ্র থেকে গাত্রোত্থান করতে তাঁর মন নারাজ, অথচ মান্যগণ্য দূতদের ফিরিয়ে দিতেও তাঁর সৌজন্যে বাধছে। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে তিনি পারলেন না। প্রবেশ করলেন মন্দিরের মধ্যে। গিরিধারীলালের অনুমতি চাই। একমাত্র তাঁর প্রেমের ঠাকুর গোপালই এখন তাঁকে পথের নির্দেশ দিতে পারেন, বলে দিতে পারেন কোন্ কূলে তিনি রাখবেন।

দ্বারকানাথের মন্দিরের মধ্যে রণছোড়জীর মূর্তির সামনে ভজনারতা মীরা, আর বাইরে অপেক্ষমান রাজস্থানের কুলপুরোহিত ও সাধারণ মানুষেরা। তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কখন মীরা ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে বাইরে আসবেন, কখন তাঁদের সঙ্গে মেবারে ফিরে যাবেন। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু মীরার দেখা নেই। সকলেই অধৈর্য হয়ে ওঠেন। শেষপর্যন্ত মন্দির-দ্বার নিজেদেরই উন্মুক্ত করতে হয়। কিন্তু এ কী! মীরা কই? মন্দির শূন্য।

দ্বারকানাথজীর মন্দিরের একাংশের কারুকার্য
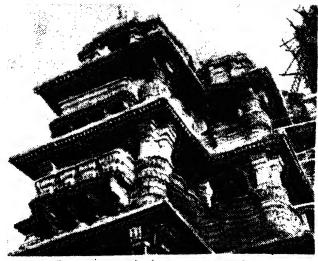
শুধু রণছোড়জী তেমনিই দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু আশ্চর্যের কথা তাঁর মুখে মীরার বস্ত্রের অংশ। গিরিধারীলাল মীরাকে আপন বক্ষে টেনে নিয়েছেন। মীরা তাঁর দেহে বিলীন হয়ে গিয়েছেন।

এ কাহিনী কতখানি সত্য জানি না, কিন্তু দ্বারকানাথের মন্দিরের এক পূজারীর কাছে শুনেছি, এখানে শ্রীকৃষ্ণের যখন শয়ন করানো হয় তখন তাঁর মুখে একখণ্ড বস্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়।

দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রণছোড়জী নামেই পরিচিত—মীরা তাঁকে যে নামে ডেকেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংস নিহত হলে কংসের শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন মথুরায়। কৃষ্ণের মহাপরাক্রমশালী শত্রুরূপে দেখা দিলেন জরাসন্ধ। জামাতা-হত্যার প্রতিশোধমানসে জরাসন্ধ আঠারো বার মথুরা আক্রমণ করেছিলেন। এঁরই ভয়ে কৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করে প্রভাসপত্তনের সন্নিকটে রৈবতক পর্বতের নিকট কুশস্থলীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দ্বারকার লোকেরা বলে শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে মথুরা থেকে পালিয়ে আসেননি। তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন ব'লে জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ এড়াতে মথুরা থেকে দ্বারকায় চলে এসেছিলেন। যুদ্ধ পরিহার করেছিলেন বলেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রণছোড়জী নামে পূজার্ঘ্য পেয়ে আসছেন।

দ্বারকায় রণছোড়জী বা দ্বারকানাথজীর মন্দির বহুদিনের পুরনো। তবে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কবে, কে বা এর প্রতিষ্ঠাতা তা নিশ্চিত জানা যায় না। টডের ভ্রমণ বিবরণীতে দ্বারকানাথজীর মন্দিরের নির্মাতারূপে এক বজ্রনাভের নামোল্লেখ দেখতে পাই। বলা হয়েছে—এই বজ্রনাভ ছিলেন ওখা-মণ্ডলের রাজা ও কৃষ্ণের পৌত্র। কিন্তু আমরা জানি, বজ্রনাভ ছিলেন একজন অসুর, ব্রহ্মার বরে যিনি দেবতাদের অবধ্য হয়েছিলেন। বজ্রনাভের অত্যাচারে দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠার ফলে শেষ-পর্যন্ত এই অসুরকে কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

মনে হয় টডসাহেব শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। বজ্র ছিলেন যদুবংশের এক রাজা। অবশ্য এই বজ্ররাজাই যে দ্বারকানাথজীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এমন কোন তথ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

ভারতে শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরসমূহের মধ্যে দ্বারকানাথের মন্দিরই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। তাই দ্বারকা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি।

ভূমি থেকে মন্দিরের অবস্থান কিছুটা উঁচুতে। গোমতী নদী যেখানে আরব সাগরে এসে মিশেছে তারই কাছে গোমতীঘাট। এই গোমতীঘাট থেকে প্রায় ষাটটি সোপান অতিক্রম ক'রে এসে তবে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। সোপানের একধারে দোকানের সারি নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত—পুণ্যসঞ্চয়লোভী অগণিত যাত্রীদের আকৃষ্ট করবার উপযোগী নানান পসরা সাজিয়ে বসে আছে দোকানীরা।

দ্বারকানাথজীর মন্দিরের প্রবেশপথ শুধু এই একটিই নয়, আরও একটি আছে। একটি প্রবেশপথ শহরমুখী, নাম মোক্ষদ্বার; অন্যটি সমুদ্রমুখী, নাম স্বর্গদ্বার।

দ্বারকানাথের মন্দিরটিকে কেন্দ্র করেই পুরনো দ্বারকা শহরটি গড়ে উঠেছে। একদা কোন এক অতীতে মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্যের নানা নিদর্শন ছিল বলে মনে হয়, কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আজ তা প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

মন্দিরের গঠনরীতি অনেকটা প্যাগোডা ধরণের। বেলে-পাথরের তৈরি সমগ্র মন্দিরটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ৭৮ ফুট ও প্রস্থে ৬৬ ফুট। মন্দিরের তিনটি অংশ—মণ্ডপ বা সমাবেশ-কক্ষ; গর্ভগৃহ, অর্থাৎ যেখানে বিগ্রহের অধিষ্ঠান; এবং শিখর।

মণ্ডপটি চতুষ্কোণ, পরিমাপ ভিতরের দিকে ২১ ফুট। পাঁচতলা উঁচু মণ্ডপের প্রত্যেক তলা তৈরি হয়েছে সারি সারি স্তম্ভের ওপর। নীচের তলার উচ্চতা ২০ ফুট। এইভাবে শেষপর্যন্ত প্রত্যেকটি তলাই চতুষ্কোণ। এই শেষ তলাটিতে আড়াআড়িভাবে বীম সাজিয়ে একটি ভিত্তিভূমি তৈরি করা হয়েছে। এই ভিত্তির ওপর থেকেই মন্দিরের শিখরের গম্বুজটি আকাশমুখী হয়েছে। ভিত্তি-ভূমি থেকে শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত শিখরটির উচ্চতা ৭৫ ফুট। এই বিশাল ভারটি বহন করার জন্য রয়েছে চারটি সুবিশাল স্তম্ভ—চতুষ্কোণ ভিত্তির প্রত্যেক দিকে একটি

ক'রে। কিন্তু এও পর্যাপ্ত নয় বিবেচনা ক'রে সে যুগের বিচক্ষণ স্থপতিরা দু'টি স্তম্ভের মাঝখানে আরও অতিরিক্ত স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন।

মণ্ডপের প্রতি তলেই দেওয়ালগাত্রে ছিল সারি সারি ভাস্কর্যের প্রচুর নিদর্শন। কিন্তু মুসলমান আক্রমণকারী-দের নির্মম অত্যাচারে আজ আর এই সমস্ত খোদাইয়ের কাজ বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না। তবে যেটুকুও দেখা যায় তাতে সূক্ষ্ম-জটিল কোন কারুকার্যের পরিচয় না পেলেও একটা সারল্য ও মাধুর্য আছে।

মন্দিরের সর্বনিম্ন চতুষ্কোণ তলটি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে মন্দিরের শিখরটি। প্রাচীনকালে এই সর্বনিম্ন তলটিতেই থাকতো বিগ্রহ।

মন্দিরের শিখর-নির্মাণে প্রাচীন স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিখরটি অনেকগুলি পিরামিডসদৃশ চূড়ার সমষ্টি। শিখরটি যতই ঊর্ধ্বে উঠেছে ততই যেমন ক্রমে সরু হয়ে গেছে, তেমনি ঐ পিরামিড-আকৃতির চূড়া-গুলির আকারও ক্রমেই ছোট হয়ে গেছে। মাটি থেকে শিখরের শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত উচ্চতা মোট ১৪০ ফুট। সাতটি ক্রমিক স্তরে সংকীর্ণ হ'তে হ'তে শিখরটি গিয়ে পৌঁছেছে শীর্ষবিন্দুতে।

দ্বারকানাথজীর মন্দির

দ্বারকানাথজীর মন্দির অনেকগুলি মন্দিরের সমষ্টি। বস্তুতঃ, একে মন্দির-উপনিবেশও বলা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে পরম সামাজিক—পরিজন-পরিবৃত হয়েই তিনি বিরাজ করছেন। দেবকীমাতা, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বলরাম, সত্যভামা কেউই বাদ যাননি—সকলেরই মন্দির রয়েছে এই উপনিবেশে। এ ছাড়া রয়েছেন আরও দেব-দেবী।

প্রধান মন্দিরটি দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির—বাংলা দেশের দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের নয়, নিকষকালো কষ্টিপাথরের চতুর্ভুজ মূর্তি। মূর্তিটি আকারে ছোট, কিন্তু চোখ দু'টি জীবন্ত—প্রথম দর্শনেই মনে হবে জাগ্রত দেবতা।
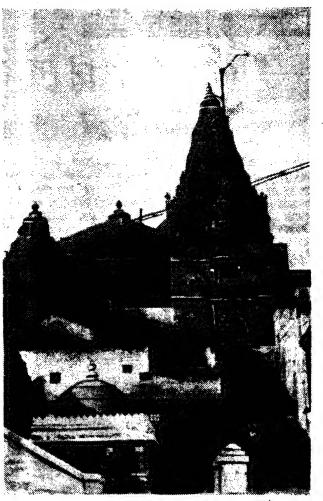
কৃষ্ণের মন্দিরটি একটি ঢাকা বারান্দা দিয়ে দেবকীমাতার মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। দেবকীমাতার মন্দিরটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। দুয়ের মধ্যবর্তী প্রাঙ্গণে নানা দেবদেবীর মন্দিরের সমাবেশ ঘটেছে, এমনকি বেণীমাধব, লক্ষ্মীনারায়ণ, অম্বিকা দেবী, গুরু দত্তাত্রেয়, ত্রিকম রায় পর্যন্ত রয়েছেন।

তীর্থস্থানরূপে দ্বারকার যে কি মাহাত্ম্য তা প্রায় দু' শতাব্দী পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। টডের ভ্রমণ-কাহিনী থেকে আমরা জানতে পেরেছি, সে যুগে যখন পথঘাট দুর্গম ও বিপদ-সঙ্কুল ছিল, যাতায়াত ছিল নিতান্তই কষ্টসাধ্য, তখনও অসংখ্য দেশী-বিদেশী ভক্ত ও তীর্থযাত্রীর সমাগমে দ্বারকা-নাথজীর মন্দিরপ্রাঙ্গণ হয়ে উঠতো মুখর। টড দেখেছিলেন মন্দিরের দেওয়ালে-দেওয়ালে তীর্থযাত্রীদের ভক্তি-নম্র স্বাক্ষর; দেখেছিলেন পবিত্র গোমতী-সঙ্গমে দাঁড়িয়ে পুরোহিতেরা ভক্ত পুণ্যার্থীদের অঙ্গে দিচ্ছেন দেবনামের ছাপ, আর ভক্তরাও পরিবর্তে যথাযথ দক্ষিণা দিচ্ছেন পুরোহিতদের হাতে।

সেই ঐতিহ্যের ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে, আজও তেমনিভাবেই ভক্তের দল ভক্তিনম্র হৃদয়ে অঞ্জলি দেয় দ্বারকা-নাথজীর পদতলে।

টম কাকার কুটির কাহিনী

হ্যারিয়েট বীচার স্টো

ফরিদ চৌধুরী

'অসি এবং মসীর দ্বৈরথে শেষোক্তের বিজয় যে অবিসংবাদী ঘটনা এ বিষয়ে বোধ হয় কিছু না লিখলেও চলে। তবু উদাহরণের জন্যে যদি কোনো পাঠক ইতস্ততঃ করেন, বাঙ্গালী হিসেবে 'নীলদর্পণ' নাটকটির নাম প্রথমেই মনে পড়লেও সাহিত্য পাঠকের স্মৃতিতে "আংকল টমস্ কেবিন" উপন্যাসটিই বিশ্ব-সাহিত্যের অদ্বিতীয় উদাহরণ। অবশ্য এই প্রসঙ্গে চার্লস ডিকেন্সের 'নিকোলাস নিকলবি' এবং "অলিভার টুইস্ট"এর নাম করা যেতে পারে। ইংলণ্ডের তদানীন্তন শিশু আশ্রমগুলির আমূল সংস্কার সাধিত হয়েছিল ডিকেন্সের দুটি উপন্যাসের প্রভাবে। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে "আংকল টমস কেবিন"কে একটি বিরাট সমাজতাত্ত্বিক নথি বলা যেতে পারে।

হ্যারিয়েট বীচার স্টো

এই উপন্যাসের লেখিকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন :

এই ছোটখাটো মহিলাটি এমন একখানি বই লিখেছেন যা এই বিরাট গৃহযুদ্ধ সম্ভব করেছে।

সাহিত্য-বিচারেও উপন্যাসটি কম অভিনন্দন লাভ করেনি। কবি লংফেলোর মতে :

বইটির নৈতিক প্রভাবের কথা ছেড়ে দিলেও সাহিত্যের ইতিহাসে এর সাফল্য বিরাট।

সুতরাং যে কোনো দিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন, যতদিন মানুষের মুক্তি যুদ্ধ চলবে পৃথিবীতে, টম কাকার কুটীর ততদিন মন্দির হয়ে থাকবে।

১৮৫১ সালে দাসপ্রথা-বিরোধী 'ন্যাশনাল এরা' পত্রিকায় 'আংকল টমস কেবিন' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরের বছরই গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি হয়েছিল এবং প্রকাশিত হওয়ার দিনই ৩০০০ কপি বিক্রী হয়ে গেল। এক বছরের মধ্যেই সংস্করণ হল একশো কুড়িটি এবং মোট বিক্রীর সংখ্যা দাঁড়ালো কুড়ি লক্ষ কপি। ইয়োরোপ, বিশেষ করে ফ্রান্স এবং জার্মানীর পাঠক সমাজে বইটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে, এমনকি পুস্তকটি পাঠান্তে ইয়োরোপের অনেক সহৃদয় ব্যক্তি তাঁদের ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ মহিলার স্বাক্ষরিত ধন্যবাদ পত্র পান লেখিকা উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর।

হ্যারিয়েট বীচার স্টো জন্মেছিলেন ১৮১১ সালের ১৪ই জুন। তাঁর বাবা ছিলেন থিওলজিস্ট। পড়াশোনার পালা শেষ করে কানেকটিকাটের হার্টফোর্ডের একটি স্কুলে শিক্ষকার কাজ নেন। পরে ওহায়োর সিনসিনাটিতে নিজেই একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। এই পর্যায়েই তাঁর সাহিত্য জীবনের হাতেখড়ি। ইতিমধ্যে তাঁর বাবার এক সহকর্মী রেভারেণ্ড ক্যালভিন স্টোর সঙ্গে হ্যারিয়েট পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বামী যখন বোডুন কলেজের অধ্যাপক তখনই মিসেস স্টো তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসটি রচনা করেন। শ্রীমতী স্টো আরেকটি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। এই বইটিও যথেষ্ট বিক্রী হয়েছিল; কিন্তু এটি সাধারণের মনে কোনোরকম দাগ কাটতে পারেনি এবং ক্রমে বিস্মৃতির গর্ভে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। তৎকালীন একটি সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল মহত্তম প্রতিবাদের। এই প্রতিবাদের প্রতীক "আংকল টমস কেবিন"।

আগামী বছর আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট লিংকন কর্তৃক নিগ্রো-মুক্তি দিবসের শততম বার্ষিকী উদযাপিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের টম কাকারাও নিশ্চয়ই সেদিন মহীয়সী হ্যারিয়েট বীচার স্টোকে স্মরণ করবেন।

রামতনু দাঁড়িয়ে রয়েছে লিফট-এর বন্ধ দরজার সামনে। লিফটম্যান-এর অপেক্ষায়। যার ওপর তাকে নন্দনকাননে নিয়ে যাবার জন্য পি-এ-টু ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সতী মিত্রের গোপন নির্দেশ দেওয়া আছে।

এখানে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর সমস্ত অফিস বাড়ীটাকে রামতনুর মনে হচ্ছিল দিগন্তবিশারী ধু-ধু মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড পত্র-পল্লবে নিবিড় এক ছায়া-শীতল গাছ—গাছতলায় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চতুর্দিক জুড়ে রোদে-কানা দুপুর, স্তব্ধ। শুধু গাছটার ঘন ডাল-পালার অগোচর আড়ালে কোথায় একটা মৌচাক আছে। সেখান থেকে মধু-সঞ্চয়রত মৌমাছিদের পাখার বিরামহীন অনুচ্চ গুন গুন ধ্বনি ভেসে আসছে।

রামতনু যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানকার পরিবেশ গাছতলার মতই ছায়াময়। এঁটে বন্ধ করা জানালার কাঁচের শাশীর গা-বেয়ে ফেলা নীল রং-এর পর্দায় ছেঁকে বাইরে থেকে যে আলোটুকু এসে পৌঁছচ্ছে তার রং নীলাভ। সেই আলো ডিমের কুসুমের মত রং দেয়ালের গা-বেয়ে তেলের মত গড়িয়ে পড়ছে মোজেকের মেঝেতে। সব মিলিয়ে গাছ-তলার মতই ছায়াময় ছায়াঘন পরিবেশ। ছায়াঘন আর শীতল। পুশিং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই রামতনুর গা-শিরশির করে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ তার মনে হয়েছিল পাঞ্জাবির ওপর কোটটা চাপিয়ে এলে ভাল হত।......কালকের ঠাণ্ডাটা তাকে বেশ জখম করেছে। রামতনু প্রথমটা বুঝতে পারেনি। পরে ভেবেছিল, আমি একটা আস্তো হাঁদারাম। এদিককার সবটাই, আপ-টু ফোর্টিন্থ ফ্লোর, যে এয়ার কনডিশনড বরা এতো আমি অন্ততঃ এক লক্ষবার শুনেছি—কিন্তু এতো জেনেও বুঝতে পারিনি। আর তারপরই রামতনু বল ও বীর্যবর্ধক বলে বিজ্ঞাপিত কবিরাজী ওষুধের শেষটুকু খাওয়ার জন্য জিভ বার করে থল চাটার মত খুব শ্রদ্ধাসহকারে এই শীতলতা শরীরের সমস্ত স্নায়ু দিয়ে শুষে নিতে শুরু করেছিল। আর মধুসঞ্চয়ে ব্যাপৃত মৌমাছিদের পাখার অনুচ্চ গুনগুন ধ্বনির মত রামতনুর যা মনে হচ্ছিল তা হচ্ছে মৌচাকের কোঠরের মত কোঠরে কোঠরে চেয়ার, টেবিল, র‍্যাক, ফাইল, কাগজ ফেলা ঝুড়ির সঙ্গে ঠাসা চার হাজার কর্মচারীর সমস্ত অট্টরোল। এই অট্টরোলকে এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল মৌমাছিদের সুর-ধ্বনি, গুনগুনানি। কেননা, বাইরের যাবতীয় কটকটে শব্দ করিডোরের পার্টিশানের মোটা ঘষা-কাঁচের আবরণ ভেদ করে এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে মিয়োনো স্তোকা ডাক্তার মত হয়ে যাচ্ছিল। রামতনুর মাঝে মাঝে এরকম মনে হচ্ছিল যে, পার্টিশানের সুদৃশ কাঁচটা হয়ত স্পেশ্যাল কোনো অর্ডার দিয়ে তৈরী। বিশেষ কেমিক্যাল কিছু মিশিয়ে অথবা বিশেষ কোনো প্রক্রিয়ায় তৈরী। যার বিশেষত্ব বা গুণ হচ্ছে বাইরের এই সমস্ত শ্রুতিকটু শব্দ-গুলোকে ছেঁকে নিয়ে একটা সুরের মত কিছু করে এখানে পৌঁছে দেওয়া। কেননা, এখান দিয়ে বস্-এরা সর্বদা যাতায়াত করেন। পরে রামতনু ভাবল কিছুই অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানের এ যুগে আর কিছুতেই অপারক নয়। নইলে মেরু প্রদেশের বরফের পাহাড়ের তলায় ভুঁই-পটকার মত কে-কামনে একটা বোমা ফাটালে। অত্যাদ্ভুৎ সব রশ্মি বেরিয়ে এল। ফলে, কোলকাতা শহরের সদর রাস্তায় ট্রাফিক যাম্! পুরোভাগে একটা ছ্যাকরা গাড়ী কোলকাতা দেখতে আসা দেহাতী শোয়ারী সমেত নট-নড়ন-চড়ন। পেছনে পিঁপড়ের সারির মত প্লি-মাউথ, স্টুডিবেকার, এ্যামব্যাসেডার থেকে ট্রাম, বাস পর্যন্ত তদবস্থায়। এদিকে ট্রাফিকের আলো লাল থেকে হলুদ, হলুদ থেকে সবুজ, সবুজ থেকে আবার হলুদ লাল হতে থাকল। অপারেশন থিয়েটারে রোগাভের ফুসফুস ছুরি বসিয়ে ডাক্তার, নার্স, আগ্রহী মেডিক্যাল স্টুডেন্টদের চোখের আলো দপ করে ফিউস হয়ে গেল। কিন্তু মাথার ওপর প্রকাণ্ড শ্যাডোলেস লাইটটা নিত্য যেমন জ্বলে তেমনি কোথাও এক তিল ছায়া না রেখে জ্বলতে লাগল খর দীপ্তিতে। কোলের ছেলেকে বুকে চেপে ধরে তার খড়খড়ে শুকনো ঠোঁটের কাছে ভারী পুষ্ট স্তন এগিয়ে দিতে দিতে মা-ছেলে, তৃষ্ণা—বাৎসল্য সব মিলিয়ে হিউম্যান

ক্যামেলি চিত্র-প্রদর্শনীর একটা চিন্তা-কর্ষক ষ্টীল ফটো হয়ে রইল।

এ প্রসঙ্গে শীর্ষশক্তিদের বৈঠকে ঢাকাখোলা হাঁড়ি থেকে ওঠা কষা মাংসের ঘ্রাণের মত উত্তেজক আলোচনা, মনিষীদের স্বেচ্ছা-কারাবরণ, বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীলদের পরস্পর-বিরোধী কথাবার্তা, রাত জেগে বাছা-বাছা শব্দ ঘষে মেজে দাঁত ধারালো করে প্রত্যুষের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিপক্ষ দলের দিকে তাকিয়ে দাঁত ঘষাঘষি এবং শেষ পর্যন্ত সব কিছু চলন্ত ট্রেণের কামরায় সময়-যাপনের আলোচনায়, চায়ের দোকানের গুলতানিতে, ছুটির দিনে মোড়ের মাথায় অবসর বিনোদনের আলোচ্য বিষয়ে পর্যবসিত হতে দেখে সমস্ত ব্যাপারটাকে রামতনু আঙ্গুলের ফাঁক থেকে পোড়া সিগারেটের মত আলগোছে ফেলে দিয়েছে।......এসব এখন আর তার মনে কোনো উত্তেজনাই জাগ্রত করে না।

এ প্রসঙ্গে তার সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে, এসব অমোঘ। হবেই। এসবই অদৃষ্টের বিধান...অদৃষ্টের মহালীলা... পাপ......পাপের পরিপূর্তি...... কলির অন্তিম...। ইনহেভিবটেবল ব্যাপার সব।

এখন কেউ যদি তাকে তার অভিমতকে যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করে, বোঝাতে বলে—সে পারবে না। সে দৃঢ়-স্বরে একটা কথাই বলবে, দ্যাখো ওসব কচকচির মধ্যে আমি নেই। আমার, আমার এই মনে হয়েছে।

রামতনুর নিজেরই খুব খারাপ লাগতে লাগল। বস্তুত ঠিক এই মুহূর্তে, নন্দকাননে যাবার জন্য লিফট-এর বন্ধ দরজার সামনে লিফটম্যান-এর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এসব নিরর্থক চিন্তায় নিজেকে ভারাক্রান্ত করা তার অভিপ্রেত ছিল না।

বরং, রামতনু ভাবল, অন্য কিছু ভাবি। আরকিছুক্ষণের মধ্যে আমি যে-রাজ্যে যাচ্ছি সেখানকার কথা ভাবি। যেখানে আমাদের বস্-এরা হাঁফ ফেলতে যান। হাফ ফেলে তাজা হতে যান। সেখানে শুধুই আনন্দ—অফুরন্ত, অ-ফুরন্ত। যেখানে শান্তি পায়ের পাতাডোবা নরম গালচের মত সর্বত্র বিছানো—সেখানকার কথা ভাবি।

পরম বিশ্বাসে এবং বিশ্বাসে একান্তভাবে নির্ভরতায় হর্ষে রামতনুর সমস্ত মন, সমস্ত শরীর পুনর্বার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

রামতনু ভাবল, আর আমি আমার সৌভাগ্যের কথা ভাবি। যে সৌভাগ্য আমায় সেই অপারিসীম শান্তি আর অফুরন্ত আনন্দের রাজ্যে নিয়ে চলেছে। যেখানে সব কিছুই ভাবহীন—যেখানে খালি মুক্তি আর মুক্তির উল্লাস।

রামতনুর অন্তরস্থিত বিশ্বাস যেন পিদিমের বুক ভর্তি টলটলে তেল। সেই তেল শুষে শুষে রামতনুর দুটি চোখ জ্বলতে লাগল। হর্ষে আবেগে জ্বলতে লাগল সজল শিখায়।

সত্যি করে গর্ব করার মত যে আমার কিছুই নেই এ আমার চেয়ে ভালো করে আর কে জানে। রামতনু ভাবল, এই সৌভাগ্যই আমার সেই গর্ব, একমাত্র গর্ব। যে-সৌভাগ্য এই অফিসের আড়াই হাজার কেরাণীর ছকে ফেলা ভাগ্য থেকে আমার ভাগ্যকে পৃথক করেছে। রামতনু মনে মনে বলল, সতী তুমিই আমার সেই ছকে ফেলা ভাগ্যকে সৌভাগ্যে উন্নীত করেছ। নইলে আমার মত এক মাছিমারা কেরাণীর ভাগ্যে কি আর সে-রাজ্যে যাবার সুযোগ মিলত। সতী, বুক থেকে উঠে আসা বাষ্পের মেঘ রামতনুর গলা বুজে এল। সতী, তোমার কাছে যে আমি কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ তা প্রকাশ করবার মত, জানাবার মত ভাষা আমার জানা নেই। তুমি যে আমাদের ছেলেবেলার সেই দিনগুলিকে পুরোপুরি ভুলে যাওনি, এত উঁচুতে উঠেও আমায় চিনতে পেরেছ, আমার যাচঞা পায়ে করে তুমি ঠেলে সরিয়ে দিতে পারতে কিন্তু তা না করে এত বড় একটা রিস্ক ফর-নাথিং নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে আমায় সে-রাজ্যে যাবার সুযোগ করে দিয়েছ—এ আমার চেয়েও বেশী। আশার চেয়েও, স্বপ্নের চেয়েও বেশী।......

রামতনু শব্দ করে গলা ঝাড়ল। শ্বাসনালী দিয়ে খানিকটা গাঢ় কফ জিভের ওপর উঠে আসতে তৎক্ষণাৎ রামতনু বুঝতে পারল ঠান্ডা লাগাতে যে সর্দিটা গতকাল মাথা, চোখ, মুখ ঝামরে তুলেছিল আজ সেটা বুকে বসেছে। আশ্চর্য মলমে ঠিকমত কাজ হয়নি, আজ বাড়ী ফিরে বুকে পুরোনো ঘি মালিশ করতে হবে। অভ্যাস মত রামতনু তারপর এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে বালিভর্তি লাল রং-এর গায়ে সাদা অক্ষরে লেখা 'থুথু ফেলিবার পাত্র' লেখা পাত্রটা খুঁজল। পেল না। না পেয়ে কফ গিলে ফেলল। রীতিমত পোষাক সজ্জিত এক-জন বেয়ারা এসময় পুশিং-ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে কোথায় যেন যাচ্ছিল। রামতনু চোখ তুলে তাকাতেই চোখা-চোখি হয়ে গেল। রামতনুর মনে হল লোকটা আগাগোড়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করেছে বলেই লোকটার দৃষ্টিতে বিস্ময় কৌতূহল এই সব স্বাভাবিক জিনিসগুলো ছাড়াও সেগুলোকে ছাপিয়েও ঘৃণা এবং অবজ্ঞা এবং একটা নাক সিঁটকোনো ভাব ফুটে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে বিস্ময় এবং কৌতূহলকে রামতনু স্বাভাবিক বলেই ধরে নিচ্ছিল। কেননা, যারাই এখান দিয়ে যাচ্ছিল-আসছিল তাদের দৃষ্টিতে যুগপৎ বিস্ময় এবং কৌতূহল ফুটে উঠছিল। সকলের দৃষ্টিতে একই জিনিস প্রত্যক্ষ করতে করতে রামতনু ব্যাপারটাকে খুব স্বাভাবিক বলে ধরে নিচ্ছিল। নিজের মনকে এই বোঝাচ্ছিল, হবে নাই বা কেন! আমার মত একটা লোককে এখানে, আর বিশেষ করে এই লিফটটার সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে লোকে অবাক তো হবেই। পাগল-ছাগল বলে এখনো অর্ধচন্দ্র দিচ্ছে না—এই রক্ষে।

কিন্তু বেয়ারাটার নাকসিঁটকানো ভাবটা রামতনু কিছুতেই যেন সহ্য করে নিতে পারছিল না। বেয়ারাটা তার দিকে পেছন ফিরেছে বুঝতে পেরেই রামতনু পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, ভা-রি ডাঁট! খাস ডিপার্টমেন্টের বেয়ারা কি না সব। রামতনু মনে মনে গলার পর্দা চড়াল, দেখতাম, দেখতাম ও'রকম গদাই-লস্করী চলন কোথায় থাকত—যদি আজ বস্-রা থাকতেন অফিসে। বস্-রা আজ সবাই দিল্লীতে কিনা। থাকলে দৌড়-ঝাপ করতে করতে আর সেলাম ঠুকতে ঠুকতে হাত-পায়ের নড়া ছিঁড়ে যেত।

রামতনু মুখ ঘুরিয়ে নিল। ঢেউ-খেলানো ঘোলারং-এর কাঁচের পার্টিশানের গায়ে ব্যস্ত সমস্ত ছায়ারা নড়ছে চড়ছে। চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। রামতনুর ছায়া-গুলোকে দেখে মনে হল যেন ময়রার দোকানে শো-কেসের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়া মৌমাছি, বোলতা। খাদ্য-সংগ্রহ করতে ঢুকে এখন আর বেরুতে পারছে না। পাখার ঝাপটা দিয়ে শো-কেসের কাঁচের গায়ে আঘাত করতে করতে নিস্তেজ এবং ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় স্নায়ু শ্লথ করে দিয়ে রামতনু প্রকান্ড একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, উঃ খুব বেরিয়ে এসেছি যা হক। ভাগ্যে আমার বেরিয়ে আসার গোপন ছিদ্রটা নজরে পড়েছিল। নইলে আমারও ওই দশা হত। অতঃপর রামতনু এই অফিসের আড়াই হাজার কেরাণীর ভাগ্য থেকে নিজের ভাগ্যকে পৃথক করতে পারার সৌভাগ্যের জন্য আরও একদফা গর্ব বোধ করে নিল।

পাঞ্জাবির হাতা ফাঁক করে রামতনু ঘড়ি দেখল। যদিও সামনেই দেওয়ালে একটা একেবারে হাল-ডিজাইনের ঘড়ি আটকানো রয়েছে। রামতনু নিজের ঘড়িতে সময় দেখে সে ঘড়িটাও দেখল এবং যথারীতি ঠিক করে উঠতে পারল না কোন ঘড়ির সময়টা সঠিক। তারপর ভাবল, আমার ঘড়িটা একবার অয়েলিং করা দরকার।

রামতনুর মনে হল, ঘড়ির কাঁটায় সময় যেন আর বইছে না। অথচ, এই আধ ঘণ্টা আগে সে যখন ডিপার্টমেণ্টে নিজের টেবিলের সামনে বসে আউট-ওয়ার্ড রেজিস্টারে দু'মাস আগের পেনডিং ডেস্‌প্যাচ্ এনট্রি করছিল, তখন তার মনে হচ্ছিল পার্ট-টাইম কাজের মত ঘড়ির কাঁটা দু-হাতে সময় সরাচ্ছে। সে কিছুতেই সময়মত, সতী যে সময় দিয়েছিল দেড়টা, সেই সময়ে লিফট্-এর সামনে পৌঁছতে পারবে না। লিফট্‌ম্যান তাকে লিফট-এর সামনে না-দেখে লিফট্ উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অথচ লোকটা ইউনিয়নের একজন পাণ্ডা-ব্যক্তি জোয়ারদারবাবুর মগজে কিছু প্রবেশ করাবার জন্য ব্যাড়র ব্যাড়র করে বকে চলছিল। জোয়ারদারবাবু এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন অখণ্ড মনোযোগ সহকারে সমস্ত শুনছেন। রামতনুর দৃঢ় ধারণা জোয়ারদারবাবু খটাস-চোখের দৃষ্টি খুব মোলায়েমপানা করে মনোযোগ দিয়ে শুনছে, যতই এই ধরনের একটা ভাব ফোটাতে চেষ্টা করুন না কেন, আসলে ভাবছেন অন্য কিছু। হয়ত ডানপাশের টেবিলের হিমাংশুর কথা ভাবছিলেন। পরশুদিন তার মুখের ওপর দেওয়া হিমাংশুর জবাবের কথা ভাবছিলেন। ঠিক কি ভাবে হিমাংশুকে টাইট্ দেওয়া যায় হয়ত এই তার অভিনিবেশের বিষয় ছিল। ফলে, এইসব সাত-পাঁচ ভেবে সে আগে থেকে বলে রাখা ছুটিটাও জোয়ারদারবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারছিল না। লোকটা ব্যাড়র-ব্যাড়র করে এক মুহূর্তের জন্যে না থেমে বকে চলছিল। এদিকে ঘড়ির কাঁটায় সময় ছুটে চলছিল হু হু করে।

সামনে ডেস্‌প্যাচ্ রেজিস্টারটা খোলা। রামতনু ছক্‌কাটা ঘরে ঘরে একের পর এক বসিয়ে চলছিল লেটার নম্বার, ডেস্‌প্যাচ্ ডেট্ ইত্যাদি ইত্যাদি।

—যদিও আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় আমাদের গত আন্দোলন ধর্মঘট ব্যর্থ.........

জোয়ারদারবাবু শুনছিলেন। লোকটা নন্-স্টপ্ বকে চলছিল। এলোপাথারী রেডিয়োর স্টেশন ধরা কাঁটার নব্ ঘুরিয়ে চললে যেমন এক-একটা স্টেশন বেজে উঠে মিলিয়ে গিয়েই আবার অন্য একটা স্টেশন রেডিয়োর স্পীকারে বেজে ওঠে—তেমনি লোকটার কথার টুক্‌রো মাঝে মাঝে রামতনুর কানের পর্দায় এসে আঘাত করছিল কখনো উঁচু, কখনো নীচু পর্দায়।

—তার জন্য আমাদের যে ক্ষয় এবং ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, সত্যি করে তা অপূরণীয়.........

স্রেফ্ বুক্‌নি—। তা এখানে কেন! মনুমেণ্টের চাতালে কি ঘাস গজিয়ে গ্যাচে নাকি। রামতনু মনে মনে লোকটাকে ভেংচি কেটেছিল।

রেডিয়োর স্পীকারে এবার যে শব্দ-তরঙ্গ ধরা পড়ল সেটা খুব কাছের। হয়ত আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রই—। খুউব জোর। বাংলায় খবরের মত।

—কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গত আন্দোলনের ব্যর্থতা আমাদের আগামী আন্দোলনের মেরুদণ্ড। ব্যর্থতা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। আমাদের অনেক ভুলকে আমরা জানতে পেরেছি, অনেক ত্রুটির বিষয় সচেতন হতে পেরেছি। এ সবকিছুই হবে আমাদের আগামী ধর্মঘটের......

ঘণ্টা হবে। রামছাগলের গলার।

তারপরের কথাগুলো রামতনু ঠিক শুনতে পাচ্ছিল না। কিন্তু গলার সুর শুনে, বলার ভঙ্গী দেখে, তার কেবলই মনে হচ্ছিল লোকটা যা বলছে তা যেন তার খুব পরিচিত। এই সুর, এই ভঙ্গী যেন তার খুব চেনা। নিঃশ্বাসের সঙ্গে গন্ধ টেনে নেবার মত রামতনু লোকটার কথার অন্তর্নিহিত বক্তব্যটুকু ধরার চেষ্টা করেছিল। পরক্ষণেই তার কাছে ব্যাপারটা জলবৎ হয়ে গেছিল। এতক্ষণে অরিন্দম, আসল কথায় এসো যাদুমণি। ধর্মঘট তহবিল নাম দিয়ে তোমাদের আরও কিছু খ্যাঁচার তাল। নইলে, তোমাদের পেট ভরছে না, বদমাইসি করার খরচ কুলোচ্ছে না। রামতনু মনে মনে নিজেকেই বলল, সব বিশ্বাস করতাম—যদি না সেদিন স্বচক্ষে দেখতাম লোকটাকে একটা হর্স-টেল্ করে চুলবাঁধা, হাতা আর পেট-কাটা জামা পরা মেয়ের সঙ্গে বাজনা-বাজা রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরুচ্ছে—।

তিতি-বিরক্ত হয়ে রামতনু ভেবেছিল, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে অন্তত এই-সব ফোর-টোয়েণ্টির কারবার নেই—।

জোয়ারদারবাবু তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, কই হে রামতনু, উঠলে না। তোমার যে একটার সময় কোথায় আরজেণ্ট্ দরকারে যাবার কথা ছিল।

এক মিনিট আগে আড়চোখে দেখা ঘড়ির দিকে রামতনু এবার সর্বসমক্ষে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুক পকেটে কলম গুঁজতে গুঁজতে সশব্দে উঠে দাঁড়িয়েছিল, একদম খেয়াল ছিল না স্যার—।

জোয়ারদারবাবু বলেছিলেন, যাও—। সঙ্গে সঙ্গে আগামী সপ্তাহের মধ্যে পেনডিং কাজের ক্লীয়ারেন্সের কথা মনে করে দিয়েছিলেন। রামতনু মনে মনে বলেছিল, চাইলেই যেন সবকিছু মোয়ার মত ঈশ্বর-পুত্র জোয়ারদারের হাতে এসে ধরা দেবে! মুখে বলেছিল, হয়ে যাবে স্যার।

রামতনু অস্থির এবং অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে এক পায়ের ওপর শরীরের ভর রেখে দাঁড়িয়েছিল। সেই অবস্থাতেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল—লিফ্‌টটার দরজাটা পাথরের দেওয়ালের মত স্তব্ধ নিরেট। অগত্যা রামতনু কাঁধের পেশীগুলোকে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে শলথ করে দিয়ে মুখে ছোট্ট একটা হতাশাসূচক শব্দ করে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। রামতনুর মুখটা দেখাতে লাগল রসকষহীন একটা শুক্‌নো হর্তুকির মত।

গতকালের কথা মনে পড়ল। মনে হতে রামতনুর সর্বাগ্রে যা মনে হল, তা হল কালকের একপশলা বৃষ্টিতেই তার ঠাণ্ডা লেগে গেছে। কাল যে-সর্দি মাথা-মুখে ঝামরাচ্ছিল আজ সেই-সর্দি বুকে বসেছে। আশ্চর্যমলমে কাজ হয়নি। বাড়ী গিয়ে বুকে পুরোনো-ঘি মালিশ করতে হবে। তারপর মনে পড়ল পাঁচটা সাতের লোকাল্ কাল সাঁইত্রিশ মিনিট লেট্ ছিল। বাড়ী পৌঁছতে তার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছিল। বিপত্তির মূলে এক ভদ্র-লোক। ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছিলেন—হাত-ফস্‌কে চাকার তলায়। পরে, কামরার মধ্যের আলোচনায় সে শুনতে পেয়েছিল ভদ্রলোক নাকি কোন এক অফিসের কেরাণী। তিনটে হুইসিল্ দিয়ে ট্রেণ থেমে যেতেই রামতনু মনে মনে বলেছিল, হল আজ—! এখন রামতনুর মনে হল, ভদ্রলোক যদি পুরোপুরি মারা পড়তেন—অর্থাৎ মৃত্যুটা স্থির জেনেও খানিকটা জ্যান্ত না থাকতেন তাহলে সম্ভবত ট্রেণটা অতটা লেট করত না। ট্রেণটা পঁয়ত্রিশ মিনিট লেট্ করাতে বাড়ী পৌঁছতে তার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছিল। এবং তারপরই রামতনুর মনে পড়ল তিনটে সিঁড়ি ভেঙে উঠোন থেকে রক-এ উঠেই সেই আবছা অন্ধকারে সাইকেলের চাকার সরু লিক্‌লিকে দাগটাকে তার বুকে হেঁটে যাওয়া সাপের বুকের দাগের মত মনে হয়েছিল। সাপের বুকের দাগের মত সাইকেলের চাকার দাগটা ঘরে ঢুকে গেছিল। সে বুঝেছিল, দুপুরে মৃণাল এসেছিল—কোনো সিনেমা-পত্রিকার কারেণ্ট ইস্যু দিতে। বৃষ্টিতে ভিজবে বলে সাইকেলটা ঘরে তুলে রেখেছিল। রামতনুর মনে পড়ল ঠাণ্ডাটা যে সত্যি করে তাকে আক্রমণ করেছে সে তখনই তা প্রথম অনুভব করেছিল। তার রগদুটো টন্‌টন্ করে উঠেছিল।

আঃ কখন যে লিফট্‌ম্যান আসবে। আমায় নিয়ে যাবে এখান থেকে। রামতনুর অধীরতা, অস্থিরতা আকুলতায় রূপান্তরিত হয়ে উঠছিল ক্রমেই।

মালতী রোজ যেমন করে তেমনি ডেলি-রিপোর্ট পেশ করেছিল, জান আজ শ্যামাপদবাবুর বড় ছেলেটা আদুরীকে পড়ে দিয়েছিল। বলতে গেলাম তো শ্যামাপদবাবুর বড় ছেলেটা বললে,

আদ্‌রী নাকি ওদের বাগানের বেড়া ভেঙে বাগানে ঢুকে কাশীর বেগুনের চারাক'টা মুড়িয়ে খেয়েছে। পণ্ড থেকে আদ্‌রীকে ছাড়াতে দেড় টাকা লাগল।

রামতনুর মুখের মধ্যে তখন পরোটায় প্যাকানো বেগুন-ভাজা। সেই অবস্থাতেই সে যথেষ্ট উত্তেজনা অনুভব করেছিল, উহুঃ কাশীর বেগুন। কোনোকালে কাশীর বেগুন দেখেছে। শুয়োরের বাচ্চা সব।

—জানো আজ কাণ্ড হয়েছে। মালতী উনুন থেকে কেট্‌লী নামাতে নামাতে বলেছিল, ছাদে বড়ি শুকোতে দিয়েছিলাম খেয়াল ছিল না। দুপুরে বৃষ্টি এসেছিল, আড়াই সের ডালের বড়ি ভিজে একেবারে ঘণ্টো।

পরোটা চিবোতে চিবোতে চোয়ালের পেশীগুলো কঠিন হয়ে উঠেছে। রামতনু অনুভব করেছিল। খেয়াল থাকবে কি করে! তুমি কি আর তখন তোমাতে ছিলে। মৃণাল এসেছিল যে—। লোকসান সব আমাতেই বর্তাক। ছাগল ছাড়াতে দেড় টাকা, আড়াই সের ডালের বড়ি—আসে কোত্থেকে এসব। মালতী চা ছাঁকছিল। মালতীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রামতনু বলেছিল, মৃণাল এসেছিল— ?

—এসেছিল। এসে বেচারীর এক ফেরান্—। বৃষ্টি নামল। যায় কি করে? ও তো বৃষ্টির মধ্যে যাবেই—। বলে ওদের ক্লাবের ম্যাচ্ আছে—দেখতে যাবে। আমি বললাম, পাগল হয়েছ। এই বৃষ্টিতে তোমায় ছেড়ে দি আর একটা অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে বস।

ভারি দরদ! রামতনু মনেমনে হেসেছিল ঠোঁট বেঁকিয়ে। এদিকে আমি যে পাক্কা ন'টায় দুটো ভাত কোনোরকমে নাকে-মুখে গুঁজে গেছি আর এই ফিরছি। নাক টানছি। চোখ-মুখ লাল। —এদিকে এখনও মহারাণীর নজর পড়ল না।

উনুনে এ সময় কিছু ছিল না। মালতীর সমস্ত শরীর জুড়ে আগুনের শিখার দাপাদাপি। রামতনু বেশ শব্দ করে কোঁচায় খুঁটে নাক ঝেড়েছিল। তাকের ওপর থেকে কাপ-ডিস্ নামাতে মালতী উঠে দাঁড়িয়েছিল। কাপ-ডিস্ নামিয়ে আবার ছেঁড়া কথার সুতো ধরেছিল, তার চেয়ে এক কাজ কর। মৃণালকে বললাম, সাইকেলটা ঘরে উঠিয়ে আমার সঙ্গে গল্প কর। বৃষ্টি না-থামলে তোমায় ছাড়ছি না আমি। আঙুলে ছুঁইয়ে চায়ের একটা কুচী পাতা তুলে নিয়ে মালতী তার দিকে কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, এ মাসের প্রেক্ষাপটটা জোড়াকুলুঙ্গিতে আছে। পড় যদি তো পড়। কালই ফেরত দিতে হবে।

এ এক মন্দ খেলা নয়। রামতনু মনে-মনে মালতীকে উদ্দেশ করে বলেছিল, এই বই দেওয়া-নেওয়া—এই তোমাদের পাতানো দেওর-বৌদির সম্পর্কটা কিন্তু মালতী—বেশ। বেশ মিষ্টি। অনেকটা সিলোফেন্ পেপারে মোড়া মিষ্টি টফির মত। যেহেতু ব্যাপারটা খুব মধুর তাই পিঁপড়ে লাগার ভয়, তাই সিলোফেন্ পেপার। বাজারে আজকাল সিলোফেন্ পেপারটা বেশ চালু হয়েছে।

মালতী ডালের কড়া চাপিয়ে দিয়েছিল উনুনে।

রামতনু ভেবেছিল, অথচ, এই মেয়েটাকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। ভালবাসায় বিশ্বাস করেছিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে রামতনু বলেছিল, আশ্চর্য-মলমের শিশিটা কোথায়?

মালতী চোখ তুলে তাকিয়েছিল, কেন? কি হবে?

আঃ, যা বলছি তার উত্তর দাও।

জোড়া-কুলুঙ্গিতে। মালতী চোখ নামিয়ে হাতের কাজ সারতে সারতে ছোট্ট করে উত্তর দিয়েছিল।

পাশ-বালিশ আঁকড়ে বিছানায় শুয়ে রামতনুর মনে হয়েছিল, সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখা রুমালটা সর্দিতে ভিজে সপ্‌সপে। টাগ্‌রা জ্বালা করছে।—তৃষ্ণা। চোখ তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। সারা মাথা মুখ সর্দিতে ঝামরে উঠেছে। —উঠোনের একপাশে বাঁধা ছাগলটা চেঁচাতে শুরু করেছিল এ সময়। রামতনুর মনে হচ্ছিল, উঠে গিয়ে ছাগলটার জিভ্‌টা টেনে ছিঁড়ে দিয়ে আসে।

এই, এদিক ফেরো, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

চৌকিটা শব্দ করে নড়ে উঠেছিল। রামতনু অনুভব করেছিল, মালতী চৌকির উপর উঠে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মালতীর হাতের স্পর্শ অনুভব করেছিল কপালের উপর। —রামতনু কথার উত্তর দেয়নি। ফেরেনি।

মালতী অপেক্ষা করেছিল খানিকক্ষণ। তারপর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। মালতীর ঠোঁট তার কানের পাশে। মালতীর বুক তার পিঠের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে। মালতী স্বরে গাঢ়তা এনেছিল, এই, কেন তুমি এরকম বদ্‌লে যাচ্ছ বলত? কেন এরকম হয়ে যাচ্ছ দিনদিন?

রামতনু সেই অবস্থাতেই একবার চোখ তাকিয়েছিল। মালতী ঘরে ঢুকে হ্যারিকেনের শিখাটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই আলোতে প্লাস্টার-খসা অপরিষ্কার ঘরের দেওয়াল, শ্যাওলা-ধরা ঘরের শিলিং, পাঁজরের মত কড়ি-বরগায় সাজানো নীচু ছন্দ—সমস্ত মিলে একটা অতি কদর্য চেহারা নিয়ে ঘরটা তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল। —ছাগলটা চেঁচিয়ে চলছিল তারস্বরে। রান্নাঘর থেকে ভাতের ফ্যান্-পোড়া কটু গন্ধ ঘরের বাতাস ভারী করে তুলেছিল। সর্বোপরি মালতীকে—মালতীর স্বরের গাঢ়তাকে রামতনুর মনে হচ্ছিল ছেঁদো ন্যাকামি, মালতীর স্পর্শকে তার মনে হচ্ছিল একটা মাকড়সার আলিঙ্গনের মত, রক্তমোক্ষণেই যার একমাত্র আনন্দ এবং পরিতৃপ্তি.........

—আপনার নাম রামতনু সরকার?

মাথার ঠিক হাতখানেক ওপরেই যেন একটা জলভরা মেঘ গুড়্‌গুড়ে করে ডেকে উঠল। রামতনু ভয় পেয়ে চমকে ঘাড় ফেরাল। দেখল বিশাল একটা লোক ঘাড় হেঁট করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—রামতনু সরকার? ডেস্‌প্যাচ্ ডিপার্টমেন্টের ক্লার্ক?

জলদগম্ভীর স্বরে লোকটা জিজ্ঞেস করল। তার মুখের বাতাস রামতনুর কপালে লাগল। —কপালের ওপর থেকে কয়েকটা চুল সরিয়ে দিল৬৮/ অন্য সময় যে-কেউ তাকে ঠিক এভাবে কেরাণী বললে রামতনু চটে যেত। কিন্তু এ-সময় এই বিশাল লোকটার কথায় [illegible]

পেল না। রামতনু বশংবদ কৃতজ্ঞের মত ঘাড় হেঁট করল। এতক্ষণ লোকটার বুকের কাছে রামতনুর মাথাটা ছিল। শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে ঘাড় হেঁট করাতে রামতনু যেন লোকটার কোমরের কাছে গিয়ে পড়ল। রামতনু কথা বলতে পারল না। সেই অবস্থায় মেরুদণ্ড, ঘাড়, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ......হ্যাঁ......।

আরও খাদে গলার স্বরের পর্দা নামিয়ে লোকটা বলল, চলুন।

রামতনু এতক্ষণে বুঝল, এতক্ষণে যেন রামতনু তার সংবিৎ পুনরায় ফিরে পেল, ফিরে পেয়ে বুঝল, এই লোকটাই সেই লিফট্‌ম্যান—। যে তাকে নন্দন-কাননে নিয়ে যাবে। স্বাতী যার ওপর তাকে নন্দনকাননে নিয়ে যাবার গোপন নির্দেশ দিয়েছে।

চকিতে রামতনুর দৃষ্টি দেয়ালের ঘড়িটার ওপর গিয়ে পড়ল। দেখল, কাঁটায় কাঁটায় দেড়টা।

লিফটের দরজাটা সম্পূর্ণ খোলা রয়েছে অনুভব করেও রামতনু লিফটের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিল না। কেননা, লোকটার বিশাল চেহারা তার সামনের সবকিছু আড়াল করে রেখেছিল।

• লোকটা পাশ ফিরে রামতনুকে লিফটের ভেতরে যাবার রাস্তা করে দিল। রামতনু এবার নরম স্বপ্নাভ আলোকে উজ্জ্বল লিফটের অভ্যন্তর ভাগ দেখতে পেল। পলকমাত্র. রামতনু মুগ্ধ হয়ে গেল। মুগ্ধ হয়ে ভাবল, এটা তো লিফট্ নয়, রথ। পুষ্পকরথ।—পুষ্পকরথে চড়ে আমি নন্দনকাননে চলেছি।

কখন যে লিফট্‌টা উঠতে শুরু করেছে রামতনু বুঝতে পারেনি। রামতনু এখন যে কোমল কার্পেটটার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সুখানুভূতি ঠিক কি রকম, কি জাতীয় ভেবে ঠিক করতে না-পেরে দিশাহারা হয়ে ভাবছিল, হবে না, এই লিফট্‌টা দিয়ে বস্‌-রা যে সর্বদা ওঠেন-নামেন।

রামতনু অনুমান করছিল, কাজ করতে করতে বস্‌-রা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তখন শ্রান্তিতে বসদের মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে। চোখের পাতা ভারী হয়। শরীরের স্নায়ুরা শ্লথ হয়ে পড়ে। পরিশ্রান্ত পায়ে বস্‌-রা গিয়ে দাঁড়ান নির্দিষ্ট জায়গায়। বেয়ারা বোতাম টিপে ডাক দেয় পুষ্পকরথকে। সোঁ করে পুষ্পকরথ এসে তাঁদের সামনে দরজা খুলে দাঁড়ায়। বস্‌-রা পুষ্পকরথে চড়ে সোজা চলে যান নন্দনকাননে। নন্দনকানন বস্‌-দের শ্রান্তি হরণ করে, ক্লান্তি হরণ করে। বস্‌-রা আবার সুস্থ, তাজা হয়ে ফিরে আসেন। •

লোকটা তার বিশাল অবয়ব নিয়ে লিফটের প্রায় সমস্ত দরজাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। রামতনু তার পেছনে। রামতনু লোকটার প্রকাণ্ড চেহারাটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। লোকটার মাথার ওপর ঘরে ঘরে লাল আলোর ফোটা জ্বলছে, নিভছে। অগত্যা রামতনু তাতেই মনোনিবেশ করল।

চারের ঘরের আলো নিভে গেল। পাঁচের ঘরে জ্বলে উঠল। রামতনু ভাবল, আর ক নিমেষই বা—।

লোকটা সামনে থেকে সরে দাঁড়াল।

রামতনু সবিস্ময়ে দেখল, তার মনকে ফাঁকি দিয়ে কখন পনেরোর ঘরে লাল আলোর ফোঁটা জ্বলে উঠেছে।

আলো এসে রামতনুকে স্নান করিয়ে দিল। বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল রামতনুর শরীরের ওপর।

আবেশে-আবেগে রামতনু চোখ মুদল, আঃ এ-হচ্ছে নন্দনকাননের আলো, বাতাস।

একঝাঁক প্রজাপতি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল—ছেঁকে ধরে অভ্যর্থনা করল তাকে। রামতনুর মনে হল সে-যেন এক প্রজাপতিদের রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। রোদ্রের মত প্রজাপতিদের পাখনার রং। প্রজাপতিরা তার পায়ের নীচে বিছিয়ে দিয়েছে নিজেদের—নিজে-দের উষ্ণ নরম শরীরকে। প্রজাপতিরা যেন তাদের শরীরকে তার পায়ের তলায় পিষ্ট হতে দেবে। তার চলাকে আর মসৃণ আরামপ্রদ, সুখকর করাই যেন প্রজা-পতিদের এই আত্মদানের উদ্দেশ্য। প্রজাপতিদের রাজ্য থেকে, নিজের শরীরের ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে রামতনু ঘাড় উঁচু করে তাকাল।—মাথার ওপর মাধবীবিতান। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছেঁড়া কাগজের মত টুকরো টুকরো নীল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। মাধবীবিতানে বাতাস লাগল মৃদুমন্দ—। মাটির ওপর শুয়ে থাকা প্রজাপতিরা আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। পাখা বাড়াল। যে প্রজাপতিরা তার সর্বশরীর ব্যাপে ছড়িয়ে ছিল তারা শিউরে উঠল। রামতনুর বিহ্বল দৃষ্টি তাকে ঘিরে অসংখ্য আনন্দ-উদ্বেল নৃত্যরতা প্রজাপতিদের ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না কিছুক্ষণ। তার চতুর্দিকে প্রজাপতিরা নানা ভঙ্গিতে উড়তে লাগল, নাচতে লাগল। তারপর প্রজাপতিরা আবার নিথর হল। শান্ত হয়ে বসল মাটিতে। তার গায়ে। সর্বশরীরে। যে যেমনটি ছিল ঠিক সেইভাবে। বসে ঝিম-ঝিম্ করে পাখা কাঁপাতে লাগল। রাম-তনু ভাবল, এই মাধবীবিতান দিয়ে বস্‌-রা যখন হেঁটে যান তখন রোদ রংএর এই সব প্রজাপতিরা হয়ত বা জ্যোৎস্নার বাদামী প্রজাপতিরাও তাদের এমনি করে জড়িয়ে ধরে, এমনি করে নৃত্য করে তাদের ঘিরে। বস্‌দের মনকে খুশী করে, আহ্লাদিত করে।

মাধবীবিতানের মৃদু-মন্দ বাতাস তখন বিতান থেকে নেমে নন্দনকাননের ফুটন্ত, অর্ধ-ফুটন্ত ফুলেদের সুড়সুড়ি দিয়ে হাসিয়ে নাচিয়ে অস্থির করে তুলেছে। ফুলেরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। ঢলে ঢলে পড়ছে এ ওর গায়ে। রামতনু বিমুগ্ধ হয়ে দেখল তার সামনেই নন্দনকাননের ফুলেদের রাজ্য। রাজ্য নয়, রাজ্য তুচ্ছ—এ সাম্রাজ্য। দিগন্ত পর্যন্ত নন্দন-কাননের ফুটন্ত, অর্ধ-ফুটন্ত আর কুঁড়িদের অবিচ্ছিন্ন বিস্তৃতি। শুধু সামনে নয়,—চতুর্দিকেই। চতুর্দিকের কোনো দিক থেকেই রামতনুর দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে এল না। রামতনুর চোখের মণিতে দিগন্তের ছায়া পড়ল।

একেবারে পাশেই শুকনো পাতার ওপর সাপ হেঁটে গেলে যেমন শব্দ হয় তেমনি সর-সর শব্দ হতেই রামতনু চমকে উঠল। যে-বাতাস ফুলেদের হাসিয়ে নাচিয়ে উধাও হয়েছে ভেবেছিল রামতনু, আসলে সে-বাতাস যে তার পাশেই নিঃশব্দে ছিল তা বুঝতে পারেনি। ফুলেদের স্পর্শে স্পর্শসুখে মূর্ছিত হয়ে সে বাতাস ফুলেদের বিছানায় শুয়েছিল। রামতনুর পায়ের সাড়া পেয়েই জেগে উঠে চন্দ্রমল্লিকাদের ছেড়ে হাততালি দিতে দিতে ছুটে গেল ফুলেদের অন্য পাড়ায়।

চন্দ্রমল্লিকাদের পাড়া ছেড়ে রামতনু ফুলেদের যে পাড়ায় এসে উপস্থিত হল সে ফুলেদের নাম সে জানে না। মোমের মত সেই সব ফুলেদের রং সাদা। মাথায় নীল পাগড়ীর টোপর। হাল্কা মিষ্টি একটা গন্ধ মস্‌লিনের ওড়নার মত এ-পাড়াকে ঢেকে রেখেছে। এ-পাড়ায় সূর্যের আলো ফুলেদের গা-বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। যেন মোমবাতি ফুলেদের মাথায় জ্বলছে নীল শিখা, আর তারই তাপে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে মোম।

রাস্তার দু-পাশে মন্দিরের চূড়োর মত লোহার জালের গা-বেয়ে লতিয়ে উঠেছে মধুলতা। লতায় লতায় ফুল ঝুলছে থোকা থোকা। আকণ্ঠ মধুর ভারে বাসন্তী-রংএর মধুফুলেদের শরীর ভারী। শরীরে মধুর ভার—তারা তাই নিশ্চুপে রোদ পোহাচ্ছে। রোদে গা-এলিয়ে, রোদে গা-সেঁকে সে বুকের মধুকে আরও গাঢ়, আরও মিষ্টি আরও সুগন্ধী করছে।

পথ এমনই মন্থর যে পথ কখনই শেষ হচ্ছে না। এই পথ দিয়ে রামতনু হেঁটে চলেছে। দু'পাশে ফুলেদের সাম্রাজ্য। অবিচ্ছিন্ন এবং অবিরাম। পথ নিজের খুশিমত দুমড়েছে, মুচড়েছে, বাঁক নিয়েছে—বাঁক নিয়ে অন্যদিকে ছুটে

গেছে। মোট কথা, রামতনু যে-পথ দিয়ে দিয়ে চলেছে তার যেন আদি নেই, অন্তও নেই। আর তাতে করে নন্দনকানন যে কত দূরে বিস্তৃত, কত প্রকাণ্ড, রামতনু দিগন্ত পর্যন্ত তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করেও হদিশ করতে পারছে না। পথটা যে তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে তা'ও সে বুঝে উঠতে পারছে না। পথের দু-পাশে ফুলেরা কোথাও পাড়ায় পাড়ায় আলাদা হয়ে রয়েছে। আবার কোথাও পাঁচ গাঁয়ের হাটুরে মানুষ এক হাটে এসে জড়ো হওয়ার মত জড়ো হয়েছে। বসে-দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে জটলা করছে।

মাঝে মাঝে রামতনু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। গন্ধটা যে কোথা থেকে ভেসে আসছে রামতনু বুঝতে পারছিল না। অথচ গন্ধটা তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছিল। প্রতিবার সামনে ফুলেদের যে-কোনো পাড়া দেখে রামতনুর মনে হচ্ছিল গন্ধটা বোধহয় সামনে ফুলেদের ওই পাশ থেকে আসছে। সেখানে গিয়ে সে হিস-হিস করে নিঃশ্বাস টানছিল। কিন্তু গন্ধ শুঁকে তার মনে হচ্ছিল, না এ-গন্ধটা সে-গন্ধ নয়। ......সেই বাতাস কোথায় ছিল। হঠাৎ একেবারে সামনেই ফুলেদের পাড়ায় এসে উপস্থিত। ফুলেদের হাসিয়ে নাচিয়ে ঝরা-পাপড়ীর ঘূর্ণি তুলে হাসতে হাসতে উধাও হয়ে গেল। আবার, আবার রামতনু সেই গন্ধটা পেল। বাতাসটা যেন মজা পেয়ে রামতনুকে খানিকটা ক্ষেপিয়ে দেবার জন্যে সেই গন্ধটা সঙ্গে করে এনে তার গায়ের ওপর সবটুকু ঝরিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। রামতনু পেছন ফিরে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তা'রপর প্রতিবারের মত আরও একবার একই ভুল করল।—সামনে ফুলেদের পাড়ায় বাতাস এতক্ষণ মাতামাতি করে গেছিল, সেই মনে করে হনহন করে সামনে এগিয়ে গেল। নাকের পাটা ফুলিয়ে ফুলিয়ে নিঃশ্বাস টানল।

যদিও রামতনু আবারও ব্যর্থ হল। সেই গন্ধটা পেল না বলে মনক্ষুণ্ণ হল। সত্যি বলতে কি এ-ফুলের কোনো গন্ধই নেই। কিন্তু ফুলগুলো দেখে রামতনু মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন ফুল তো সে ইতিপূর্বে দেখেইনি, এমন বর্ণসুন্দর ফুল যে হয়, হতে পারে এও তার ধারণার বাইরে ছিল। অবশ্য রামতনু তৎক্ষণাৎ মনেমনে বলল, আমি কিইবা দেখেছি। কতটুকুই বা জানি।

হেঁট হয়ে ফুলেদের দেখে মাথা তুলে সামনে তাকাতেই রামতনু অবাক হয়ে গেল। আবেগে, আনন্দে, উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, আরে সতী! তুমি?

সতী হাসল, মিস্টার রাঘবন নেই। হাতে কাজকর্ম'ও নেই। বসে থাকতে থাকতে—বোর করতে লাগল, তাই চলে এলে এখানে—। রামতনু সতীর কথার শেষটা এমনভাবে নিজে টেনে নিল যেন ব্যাপারটা তার খুবই জানা। তারপর বলল, কিন্তু আমি কি ভেবেছিলাম জানো সতী? তুমি গতকাল বিগ্-বসের সঙ্গে সকালের প্লেনে দিল্লী চলে গেছ।

সতী বলল, দিল্লীতে এমারজেন্ট মিটিং ডিরেক্টোরিয়াল বোর্ডের। যতদূর জানি, আগামী ধর্মঘটের ব্যাপার মিটিং-এর এজেন্ডা—টপ-সিক্রেট্ ব্যাপার। এসবের মধ্যে কি আমরা থাকতে পারি। হাজার হলেও—অন্যমনস্কতা থেকে ফিরে রামতনুর দিকে তাকিয়ে সতী বলল, হাজার হলেও মাস গেলে আমরাও তো পে-স্লিপে সই করি। যাকগে, তোমায় এখানে আসতে আটকায়নি তো কেউ—

সতী বলল, তারপর দেখলে সব। কি যেন বল তোমরা? ও হ্যাঁ, প্যারাডাইশ্—তোমাদের প্যারাডাইশের দেখলে সব?

সতী কথা বলতে বলতে ক'পা এগিয়ে গেছিল। রামতনু একটু জোরে পা ফেলে পেছন ধরল, কই আর দেখলাম। কতটুকুই বা দেখলাম। মজা কি জানো সতী, কি দেখেছি, কতখানি দেখেছি আসলে তাই-ই বুঝে উঠতে পারছি না। আমি শুধু গন্ধে পাগল হয়ে পথে পথে ফিরছি। বলতে বলতে রামতনুর যেন হঠাৎ মনে পড়ল, সতী, ওই গন্ধটা কোথা থেকে আসছে বলত—কিছুতেই আমি ধরতে পারছি না।

কোন্ গন্ধ?—ব্যালে-নর্তকীদের মত দীর্ঘল করে আঁকা সতীর ভ্রুতে ছোট-ছোট ঢেউ উঠল।

তোমায় এখানে আসতে আটকায়নি তো কেউ?

রামতনু চোখের দৃষ্টিকে কঠোর, মুখের পেশীগুলোকে শক্ত করল, আটকাবে কী সতী। দারোয়ান দরজা খুলে দাঁড়াল—গটগট্ করে হেঁটে এলাম। কাঁটায় কাঁটায় দেড়টা—লিফট এসে সামনে দরজা খুলে দাঁড়াল, যন্ত্রের মত ব্যবস্থা সব। তুমি অর্ডার দিয়েছ, আটকাবে কোন শা—রামতনু অতিযত্নে উৎসাহের বল্গা টেনে ধরল।

ওই যে, পাচ্ছো না তুমি? রামতনু নিজেই নাকের পাটা ফুলিয়ে দুবার ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস টানল, ওই যে—। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ একটা—।

ও, সতী গন্ধটা পেয়ে বলল।

অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে রামতনু বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওইটাই, ওইটাই।

ও গন্ধটা আসছে—বলতে গিয়ে সতী থামল। থেমে, হাসতে গিয়ে আলতো

করে দাঁত দিয়ে পাতলা ঠোঁট চেপে ধরল।

সতীর সহাস মুখের দিকে তাকিয়ে রামতনুর চোখ-মুখ কৌতূহল ও উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ব্যাপারটা কি, আঁ—। ব্যাপারটা কি!

সতী বলল, ওই গন্ধটা যেখান থেকে আসছে সেখানে আমরা সব শেষে যাব। বলতে গেলে ওইটাই তোমাদের নন্দন-কাননের লাস্ট্-ডেস্টিনেশন্।

প্রথমটা রামতনুর নিজেকে খানিকটা বিমূঢ় মনে হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি সে-ভাব কাটিয়ে উঠে বলল, কোথায় শেষ আর কোথায় শুরু সে আমার জেনেও কাজ নেই সতী। আমি এখানে চোখ থাকতেও কানা। তুমি যাবে, আমি তোমার পেছনে পেছনে। রামতনুর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসছিল ক্রমশঃই, তুমি আমায় এখানে আসবার সুযোগ করে দিয়েছ! শুধু তাই নয় নিজে এসেছ, নিজে আমায় নিয়ে চলেছ—এ যে আমার কাছে কি, কতখানি...... নামতে নামতে গলার স্বর এমন খাদে নেমে এসেছিল যে, রামতনু বুঝল এরপর কিছু বললেও সতী হয়ত শুনতে পাবে না। তাই চুপ করে গেল।

বুকের ওপর আড়াআড়ি হাতে হাত জড়িয়ে সতী এগিয়ে চলছিল। হাওয়ায় সতীর ঘাড়ের ওপর স্তবকে স্তবকে নেমে আসা ঈষৎ রুক্ষ চুল উড়ছিল, স্বর্ণচাঁপা ফুলের রংএর শাড়ীর আঁচল।

গ্যালারীতে সাজানো এই যে ক্যাক্টাসগুলো দেখছ—সতী ঘাড় ঘুরিয়ে রামতনুর মুখের দিকে তাকাল, এগুলো পৃথিবীর নানান দেশ থেকে আনান হয়েছে। কোনোটা হয়ত মরুভূমির মধ্যে হয়েছিল—কোনোটাকে হয়ত ন্যাড়া পাহাড়ের ফাটলের ভেতর থেকে উপড়ে আনা হয়েছে। দেশ-বিদেশের অর্কিড্ আর ক্যাক্টাস সংগ্রহ মিষ্টার সেনগুপ্তের একটা হবি।

সমোৎসাহে রামতনু বলল, মিষ্টার সেনগুপ্ত, মানে আমাদের সেজো বস্!

এই তো সেদিন প্লেনে নিউগিনি থেকে পাঁচটা পাঁচ রকমের অর্কিড্ এসে পৌঁছল। যতদূর জানি, সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজারের মত খরচ পড়েছিল।

বিস্ফারিত বিস্ময়ে রামতনু বলল, কতো!

হাজার পাঁচেকের মতন, ছোট, করে উত্তর দিয়ে সতী বলল, কিন্তু এর মধ্যে তিনটে গাছ কিছুতেই বাঁচানো গেল না। মিষ্টার সেনগুপ্তের মন-মেজাজ্ তো ভীষণ খারাপ।

ই—স্। তিন হাজারই বরবাদ। রামতনু খুবই বিমর্ষ বোধ করল।

সুতরাং, আবার অর্ডার দিতে হল।

যাক্—রামতনু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এখন মিষ্টার সেনগুপ্তের মেজাজ আর এতটা খারাপ নয়ত—জিজ্ঞেস করতে গিয়ে রামতনুর দৃষ্টি সামনে এক জায়গায় আটকে কৌতূহলী হয়ে উঠল, সতী, ওটা কি? কিছু একটা তৈরী হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে?

ও হচ্ছে তোমাদের ছোটো বস্ মিষ্টার পান্ডের কান্ড। ছোটো-খাটো একটা সুইমিং পুল তৈরী করাচ্ছেন। গয়া ডিস্ট্রিক্টের লোক। ছোটোবেলায় ফল্গুর তীরে দাঁড়িয়ে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হবার স্বপ্ন দেখতেন। যাক্, সে সব আর হয়নি। কিন্তু সাঁতার দেওয়ার অভ্যাসটা ছাড়তে পারেননি। তাই ওই সুইমিং পুল,—

রামতনুর ভীষণ ইচ্ছে করছিল এই সুইমিং পুলটা তৈরী করাতে কত খরচ পড়ছে সতীকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সোজাসুজি প্রশ্নটা উত্থাপন করতে সাহস পাচ্ছিল না। অথচ, কৌতূহল তাকে অস্থির করে তুলছিল। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে গলা পরিষ্কার করে রামতনু বলল, আচ্ছা সতী, এটাও বেশ একটা খরচার ব্যাপার তাই না?

এখানে খরচের কথা কেউ ভাবে না। এখানে শুধু ইচ্ছে—। সতী চলতে চলতে বলল, ইচ্ছা ছাড়া কেউ এখানে অন্য কিছুর মূল্য দেয় না।

সতীর মুখের দিকে চোরাচোখে চেয়ে রামতনু মুহূর্তে গুটিয়ে নিল নিজেকে, তাতো বটেই, তাতো বটেই। এটা হচ্ছে ইচ্ছা পূরণের রাজ্য।

সামনে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। বাঁক নিয়ে সামনে তাকাতেই রামতনুর দুটো চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল। রামতনুর মনে হল, এক গলিত প্রবালের সমুদ্রের সামনে সে দাঁড়িয়ে। তার সামনে এক গলিত প্রবালের সমুদ্র, ফুলছে, ফাঁপছে, ফুঁসছে। তার সামনে থেকে এইমাত্র যে-ঢেউটা গভীর থেকে মাথা তুলল সেই ঢেউ নীল দিগন্তকে আঘাত করতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগিয়ে গেল।

এখানকার একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছ? সতীর কথাগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল—নাকি হাওয়া, হাওয়া এখানে উদ্দাম বলে সতীর কথাগুলো বহু দূর থেকে বলা কথার মত মনে হল, রামতনু ঠিক করে উঠতে পারল না।

বিশেষত্ব! রামতনু খানিকটা বিহ্বল দৃষ্টি চারপাশে বুলিয়ে বলল, কি জানি সতী—ঠিক বুঝতে পারছি না।

এখানকার সব গোলাপই লাল। লাল রং ছাড়া এখানে অন্য কোন রং-এর গোলাপ নেই। জুনিয়ার মিষ্টার দেশাইয়ের লাল রং-এর ওপর ভয়ঙ্কর ফ্যাসিনেশন। ওনার পি-এ, স্টেনোর হয়েছে বিপদ। বেচারীরা কেউ লাল রং-এর পোষাক ছাড়া অফিসে আসতেই পারে না।

রামতনু চোখ মুখ কুঁচকে হাসল, রাঙ্গা বস্ কি না তাই রাঙ্গা রং ছাড়া আর কিছুতেই মন ওঠে না।

হাতের ছোট্ট রুমাল সতী মুখের ওপর বোলাল, ওঃ তোমার সঙ্গে বকর বকর করতে করতে আমার গলা শুকিয়ে গেছে। চল একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

রামতনু পুলকিত হয়ে উঠল, সে সব ব্যবস্থাও আছে নাকি সতী এখানে।

মানুষের সুখের জন্য যা যা দরকার —সতী আলগোছা ঘাড়ের ওপর থেকে চুলের ঝালর সরিয়ে দিল, সমস্তই এখানে কোল্ড স্টোরেজে রাখা অসময়ের সব্জীর মত সর্বদাই মজুত।

আহ্ সুখ! সে কি জিনিস! রামতনু মনে মনে বলল, তাইতো, সেই জন্যেই তো এখানে আসা—

সতী বলল, কি বিড়বিড় করছ আপন মনে?

রামতনু বাকী কথাগুলো গিলে ফেলল নিমেষে, ও কিছু না।

যদিও তখনও গোলাপের রাজ্যের মধ্যে দিয়ে তারা হেঁটে চলছিল, তখনও গোলাপের রাজ্য শেষ হয়নি কিন্তু রামতনু গোলাপের গন্ধ ছাপিয়েও আবার সেই গন্ধটা পাচ্ছিল। শুধু তাই নয় প্রতিটি পদক্ষেপে সেই গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল ক্রমেই। রামতনু বেশ বুঝতে পারছিল নন্দনকাননের শেষ গন্তব্য আর বেশী দূরে নেই। প্রতিটি পদক্ষেপ শেষ-গন্তব্যকে ক্রমেই নিকট থেকে নিকটতর করে আনছে।

সতী থামল। রামতনু দেখল, তার সামনেই পথের শেষ। এক লতাকুঞ্জের দ্বারে এসে পথ থেমেছে। দরজাটা ঘন সবুজ রং-এর ঢেউ-খেলানো কাঁচের. তাতেই রামতনু অনুমান করল সরস সবুজ ঘন-বুনোটের লতার চাদরের আড়ালে কংক্রিটের শক্ত দেয়াল রয়েছে। সবুজ লতার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অসংখ্য নীল রং-এর ফুল ফুটেছে। ফুলেরা তাদের গন্ধকোষের দ্বার খুলে দিয়ে বিহ্বল করে রেখেছে নন্দনকাননের বাতাস।

এস, সতী দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগল। —এ ঘরটাও এয়ার কন্ডিসন্ড করা, পূর্ব অভিজ্ঞতা রামতনুকে স্মরণ করিয়ে দিল।

ঘরে ঢুকে রামতনুর মনে হল, সে যেন ছোটোবেলায় ইংরিজি ছবিতে দেখা অরণ্যচারী কোনো সভ্য মানুষদের আস্তানায় এসে হাজির হয়েছে। ঘরের চতুর্দিকের দেয়ালে গহন অরণ্য, স্তব্ধ। নিশ্চিদ্র ঝোপঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে প্রাচীন সব গম্ভীর বনস্পতিরা তাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দিয়েছে, ঝুরী নামিয়ে দিয়েছে। খোলা ছাতির মত মাথার ওপর তাদের পত্র-পল্লবের নিবিড় সমারোহ। পত্র-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের আরক্ত বর্ণচ্ছটা। চতুর বর্ণ-ব্যবহারে সুমসৃণ মেঝে তৃণহীন কাঁকুরে মাটির মত বন্ধুর। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যে কোচ, সোফাগুলো রয়েছে রামতনুর মনে হল সেগুলো যেন অরণ্য থেকে আহরিত কাট কড়েল ফেড়ে আর কাঠের গাঁড়ি ঠুকেঠুকে তৈরী। মৃত বাঘ, বনমহিষ, মৃগচর্ম এই সব কোচ-সোফার গদির গাত্রাবরণ। আশেপাশে টি-পয়-এর মত যে টেবিলগুলো ছড়ানো রয়েছে সেগুলো যেন গাছের গুঁড়ির খণ্ডাংশ ছাড়া অন্য কিছু নয়। —যদিও রামতনু ঘ্রাণে যে মৃদু বার্ণিসের গন্ধটা পাচ্ছিল মনে হচ্ছিল সেটা এইসব টেবিল, কোচ, সোফার গা থেকেই আসছে। এমন কি, এই পরিবেশে টি-পয়ার ওপর কোনটাকে দেখে রামতনুর মনে হচ্ছিল যেন কালো কুচকুচে একটা পাহারদার কুকুরের বাচ্ছা। এখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। কারো সাড়া পেলেই শরীর কুকড়ে আর সাদা ঝকঝকে ধারালো দাঁত বার করে উঠে দাঁড়াবে।

এই সেই জায়গা,—রামতনু অনুমান করল, যেখানে এসে আমাদের বসেরা তাদের অফিসের আটোসাঁটো পোষাক আলগা করে দেন—টাইয়ের ফাঁস নামিয়ে দেন, সার্টের দুটি-একটি বোতাম ছেড়ে দেন, কোমরের বেল্টের ঘর বাড়িয়ে দিয়ে মটমট করে আঙ্গুলে মটকান।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন বস। সতী একটা সোফার ওপর শরীর ছড়িয়ে দিল।

মৃদু একটা আলো প্রায় গন্ধের মত সমস্ত ঘরটায় ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু রামতনু এদিক-ওদিক বিস্তর খোঁজা-খুঁজি করেও আলোর বাল্বগুলো দেখতে পাচ্ছিল না। মাথার ওপর তাকিয়ে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে আবিষ্কারের আনন্দে রামতনুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রামতনু মনে মনে বলল, বুঝেছি, বুঝেছি আকাশের এই রক্তিম বর্ণচ্ছটা আসলে অস্তগামী সূর্যের,—সমাসন্ন সন্ধ্যার—

শরীর টানটান করে মুখের ওপর হাতের উল্টোপিট রেখে সতী হাই তুলল, টায়ার্ড—।

রামতনুর চোখে সহানুভূতির ছায়া পড়ল, হবেই তো, বাইরে যা কটকটে রোদ এখন।

স্খলিত আঁচল কাঁধের ওপর বিন্যস্ত করে সতী উঠে দাঁড়াল, আসছি, বস।

কোথায় যাচ্ছ, চারপাশে তাকিয়ে রামতনু যেন খানিকটা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

এইখানেই —

সতী উঠে একটা সোফার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। দেয়ালের ওদিকটার বড় একটা কাঠের সিন্দুকের মত কি-যেন একটা রয়েছে— রামতনু লক্ষ্য করেও জিনিসটা যে কি বুঝে উঠতে পারছিল না। ওখানে দাঁড়িয়ে সতী কখনো ঝুঁকে পড়ছিল, ঝুঁকে পড়ে কিছু তুলে নিয়ে দেখে আবার নামিয়ে রাখছিল, এটাওটা নাড়ছিল—রামতনু পেছন থেকে খানিকটা বিমূঢ়ভাবে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। রামতনুকে সচকিত করে একসময় ঘরের মধ্যে বাজনা বেজে উঠল। বাজতে থাকল। সতীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রামতনুর চোখের পাতা ছোট হয়ে আসছিল—সেই চোখের পাতা পরিপূর্ণ খুলে গেল। অল্পক্ষণ বাজনা শুনে রামতনুর মনে হল, এই পরিবেশের সঙ্গে —এই অরণ্য, অস্তোন্মুখ সূর্যের ম্রিয়মাণ আলো, ঘুমন্ত কুকুরের বাচ্চার মত ফোনের সঙ্গে এই বাজনার কোথায় যেন একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। এই পরিবেশের জন্যই যেন এই বাজনা। এই বাজনার জন্যই চারিদিকের এই পরিবেশ যেন ক্রমেই জীবন্ত হয়ে উঠছে।

সতী ফিরে এল। রামতনুর দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন লাগছে?

গ্র্যান্ড, রামতনু কপালের মাঝ বরাবর ভ্রূ উৎক্ষেপ করল। একটু নীরবতা। যন্ত্রের সামান্য শব্দ। আবার বাজনা বেজে উঠল।

কি খাবে বল?

রামতনুর মনে পড়ল অফিসের চেয়ারে বসে থাকলে পরমেশ্বর এতক্ষণে দ্বিতীয়বার এসে সামনে দাঁড়িয়ে চায়ের দাগলাগা সিলভারের কেটলী নাড়িয়ে শব্দ করে ড্রয়ার থেকে গেলাস বার করে দিতে ইঙ্গিত জানাত। কে জানে এখানে সেসব ব্যবস্থা আছে কি না! দ্বিধাগ্রস্ত-ভাবে রামতনু সতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এক গেলাস জল পাওয়া গেলে হত সতী।

জল—।

রামতনুর নিজেকে ভীষণ বোকা বোকা লাগতে লাগল। কেননা, মনে হল সতী যেন অতিকষ্টে তার পাতলা ঠোঁট ফেটে বেরিয়ে আসতে চাওয়া ঝকঝকে দাঁতের সারি ঢাকল। উদ্‌গত শব্দ গিলে ফেলল।

আচ্ছা, দাঁড়াও দেখি কি ব্যবস্থা করতে পারি। সতী কোচের ওপর বসে বসেই পাশের একটা টি-পয়ার ওপর ঝুঁকে পড়ল। কাঁধের ওপর থেকে আঁচল খসে পড়ল। রামতনুর গা-শিরশির করে উঠল, তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল! তারপর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, আলমারীর কব্জা-দেওয়া পাল্লার মত টি-পয়ের একটা দিক খুলে গেছে। ভেতর থেকে সতী দুটো গেলাস্ বার করল, তারপর একটা সুদৃশ্য বোতল। আস্তে ঠেলা দিয়ে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল।

জিনিসটা কি সতী? রামতনু যেন অনেক চেষ্টা করেও আর কৌতূহল চাপতে পারছিল না।

বাজনার শব্দ ছাপিয়ে টুব্ করে ছিপি খোলার শব্দ হল। সতী হাসল, ভয় নেই, খারাপ জিনিস কিছু নয়।

কি যে বল—মুহূর্তে গলার স্বর কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র করে ফেলল রামতনু। অস্থিরতায় হাঁটু নাড়ল, তবু জিনিসটা, মানে জিনিসটা কি—অ্যাঁ।

স্যামপেন, সতী গেলাসের ওপর বোতলের মুখ কাত্ করে ধরল।

স্যাম্-পে-ন্। রামতনু হাঁটু নাড়াতে ভুলে গেল। সমস্ত শরীর যেন পাথর, রামতনুর দুটো চোখ অস্বাভাবিকভাবে বিস্ফারিত হয়ে সমস্ত মুখের আদলটাই একেবারে বদলে দিল।

একটা গেলাস পূর্ণ করে আর একটায় ঢালতে গিয়ে সতী মুখ তুলে রামতনুর মুখের দিকে তাকাল, আপত্তি আছে নাকি?

রামতনু যেন ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠল। হাতের তালুতে তালু ঘষল, না না আপত্তি কিসের—আপত্তি কেন হবে।

বাজনা থেমেছে। রামতনু যেন তার চতুর্দিকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঝিল্লিরব শুনতে পেল।

সতী গেলাস তুলে ধরল। রামতনু প্রথমটা বুঝতে পারল না কি করবে। তারপর ইংরিজি ছবির কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি গেলাস ঠোকাঠুকি করবার জন্য গেলাস তুলতে গিয়ে দেখল সতী ঠোঁটে গেলাস ঠেকিয়েছে। রামতনু গেলাসের দিকে বাড়ান হাত গুটিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

রামতনুর মনে হচ্ছিল তার চারপাশে অরণ্য আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। গুহা-গহ্বরে, ঝোপঝাড়ের অন্ধকার তলায়, গাছের ঘন ডালপালার আড়ালে অরণ্য জাগছে।

সতী গেলাসের ওপর বোতলের মুখ কাত্ করে ধরল। রামতনু স্মরণ করে উঠতে পারল না সতী ইতিমধ্যে কতবার এমনি করে নিজের গেলাস ভর্তি করে নিয়েছে।

রামতনুর গেলাসের ওপর বোতল কাত্ করতে গিয়ে সতী থম্‌কালো। মুখের দিকে তাকাল, কি ব্যাপার! গেলাস ভর্তিই রয়েছে যে।

খাচ্ছি, খাচ্ছি, রামতনু চোখ টিপল। তুমি চালিয়ে যাও—। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে দ্বিধাগ্রস্থ স্বরে বলল, সতী নেশা হয়ে যায় যদি—রক্তের ছিটে ফুটে উঠেছে সতীর গালে, কপালে। কাঁচপোকার মত ঝক্‌ঝকে চোখ তুলে সতী রামতনুর মুখের দিকে তাকাল, ক্ষতি কি, হোক না একটু।

বাজনা থেমে গেল।

দাঁড়াও রেকর্ড বদলে দিয়ে আসি, আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে সতী দেরী করল। সোজা হয়ে বসল অল্পক্ষণ। ফাঁপানো চুলের ওপর দিয়ে হাত টেনে নিয়ে ঘাড়ের ওপর রাখল। তরাপর কৌচের একটা হাতল খাম্‌চে ধরে উঠে দাঁড়াল।

টি-পয়ের ওপর গেলাসটার দিকে তাকিয়ে রামতনুর মনে হচ্ছিল, কানায় কানায় সুখ তার হাতের নাগালের মধ্যে। এখুনি সে তার দুটি তৃষ্ণার্ত ঠোঁট সিক্ত করে নিতে পারে—কিন্তু রামতনু সময় নিচ্ছিল, সময়কে বিলম্বিত করছিল। সেই রকম সময় নিচ্ছিল যে-রকম সময় চরম সুখে নিজেকে তৃপ্ত করতে প্রয়োজন।

আবার বাজনা বেজে উঠল। রাম-তনুর মনে হল, এবার যে বাজনা বাজাচ্ছে; সে বাজনার তালের দোলা তার রক্তকে আঘাত করছে। চারপাশের অরণ্যের মত তার রক্তও জেগে উঠেছে।

কিছু মনে কোরো না—সতী চিতা-বাঘের ছালে মোড়া একটা সোফার গদির ওপর শরীর এলিয়ে দিল। প্লিজ গ্লাসটা একটু এগিয়ে দেবে। —সতী হাত বাড়াল।

সতীর খোলা হাতের দিকে তাকিয়ে রামতনু গেলাস এগিয়ে দিল। সতী গেলাসটা বুকের ওপর বসাল।

বাজনার তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠেছে। অনেক গলায় একটা কোলাহল যেন বাজনার সঙ্গে তাল রেখে তালে তালে বাজনার শব্দকে ছাপিয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। সতীর চাঁপা রং-এর শাড়ীর আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে। একটা পা উঁচু করে তুলে দিয়েছে সোফার ঠেসান দেবার জায়গাটার ওপর আর একটা পা চিতাবাঘের ছালে মোড়া গদির ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে। বুকের ওপর গেলাসে তরল স্যামপেন টল্‌টল্ করছে। বাজনার তালে তালে সতীর কোমর নড়ছে—সতীর সমস্ত শরীর বাজনার ছন্দ আর তালের আরক রসে জরে উঠেছে।

রামতনুর চোখ সুচল হয়ে এল। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। রামতনুর মনে হল কোন ফাঁকে তার জুতোর ভেতর একটা পিঁপড়ে ঢুকে পায়ের তলার চামড়ায় সুড়সুড়ি দিতে শুরু করেছে। রামতনু পায়ের বুড়ো আঙুলের ঠেলা দিয়ে জুতো খুলে ফেলল। হাত বাড়িয়ে গেলাস তুলে নিল। ঠোঁটের সামনে গেলাস তুলে রামতনু মনে মনে বলল, এইবার, এইবার আমি এই গেলাসের বর্ণহীন সুখের রাজ্যে চলে যাচ্ছি—

মিসমিসে কালো রং-এর কুকুর বাচ্চার মত ফোনটা যেন এতক্ষণ রামতনুকে সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল, রাগে গরগর করে উঠল।

ঠোঁটে গেলাসের কানা ছুঁয়ে রয়েছে, রামতনু ফোনের দিকে তাকাল। তার-পর সতীর দিকে।

মুখে ছোট্ট একটা বিরক্তির আওয়াজ করে শুয়ে শুয়েই কানে রিসি-ভার চেপে সতী সাড়া দিল।

রামতনু কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। চমকে উঠল। সতী ধড়মড় করে উঠে বসেছে। সতীর চোখেমুখে আতঙ্ক, সর্বনাশ হয়েছে—রিসিভার ধরা হাত কাঁপছে সতীর।

কি হল! রামতনু সতীকে দেখে ভয় পেল।

মিষ্টার রাঘবন—। রিসিভারের দিকে তাকিয়ে সতী বলল।

আমাদের বিগ্ বস! কোথায়?

এই অফিসে—।

সে কি! রামতনুর গলা কেঁপে গেল, মিষ্টার রাঘবন তো দিল্লীতে—

মিটিং শেষ হতেই প্লেন ধরেছেন। তারপর দম্‌দম্ থেকে সোজা অফিসে। অফিসে এসে আমায় খোঁজ করেছেন, আমায় দরকার পড়েছে। ফোনে বললেন, এখুনি আসছেন এখানে।

চাকরি যাবে—। প্রচন্ড একটা আঘাতে সমস্ত শরীর যেন কেঁপে উঠল। রামতনুর হাত থেকে গেলাসটা মাটিতে খসে পড়ে চুরমার হয়ে গেল, কি করব সতী?

নিজের দিকটাই ভাবছ শুধু, সতীর চোখে ঘৃণা জ্বলে উঠল, এখানে তোমার সঙ্গে আমায় দেখলে মিষ্টার রাঘবন কি ভাববেন সেটা একবার ভাবছ কি—

তাতো বটেই, তাতো বটেই, রামতনু উঠে দাঁড়িয়েছিল, কি করব সতী এখন—

সতী ককিয়ে উঠল, যা হয় কর তাড়াতাড়ি—আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

রামতনু অসহায়ের মত চারিদিকে তাকাল। তারপর প্রায় এক রকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রোদে চোখ ঝল্‌সে গেল। গরম হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল শরীরের ওপর। সামনের দিকে তাকাতেই চক্রবালের নীল-দিগন্ত রামতনুকে আশ্বস্ত করল স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলে রামতনুর মনে হল, সে বৃথাই ভয় পেয়েছে। দিগন্ত বিস্তৃত নন্দনকাননের কোন ফুলের ঝোপের আড়ালে সে লুকিয়ে থাকবে—মিষ্টার রাঘবন তার হদিশই পাবেন না।

সময় নষ্ট করা উচিত নয়। রামতনু পরম নির্ভরতায় ছুটতে শুরু করল। দু-পাশে রঙ্গীন স্রোতের মত নন্দনকাননের ফুলেদের সাম্রাজ্য। ঘাড় তুলেই একেবারে সামনেই ডবল-ডেকার বাস দেখার মত রামতনু হুমড়ী খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে। ভয়ে রামতনুর সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ছলাৎ করে রক্তের ঢেউয়ের আঘাতে মনে হল তার ফুসফুস ফেটে যাবে। বিদ্যুতের মত ঘুরে দাঁড়িয়ে রামতনু চোখ বন্ধ করল। অন্ধের মত হাতড়ে পেছনে শক্ত মত কিছু পেল মনে হল, শক্ত করে চেপে ধরল। নিঃশ্বাস খানিকটা সহজ হতে রামতনু অনুভব করল, দুহাতের মুঠোয় শক্ত করে সে যা ধরে আছে, সেটা আসলে —ভয়ঙ্কর কষ্টে রামতনু বিকৃত স্বরে যেন নিজেকেই শোনাল, না না।

সময় নেই। রামতনু সামনের দিকে তাকাল। নীল-দিগন্ত তাকে বরাভয় জানাল।

রামতনু যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তবু পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে, গতিতে সাবধানতা এনে এগিয়ে গেল : শুঁয়োপোকার মত শুঁড় তুলে গুটিগুটি ট্রাম হাঁটছে, পিঁপড়ের সারির মত যানবাহনের স্রোত, রঙ্গীন ট্রেতে রাখা জলের মত সায়েবদের সুইমিং পুলের নীল জল, নক্সা করা সবুজ টার্কিস তোয়ালের মত ময়দান রোদে শুকোচ্ছে—রামতনুর এতক্ষণে যেন মনে পড়ল, মনে পড়ল এটা তাদের অফিস বাড়ীর ছাদ। ছাদের পরই ভয়ঙ্কর শূন্যতা। সে শূন্যতাকে বিস্তৃতি বলে বিশ্বাস করেছিল।

রামতনু ছুটতে ছুটতে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল, সতী—

বাজনা বন্ধ। সতী মেঝের ওপর হেঁট হয়ে বসে তাড়াতাড়ি গেলাসের ভাঙ্গা টুকরোগুলো হাতে তুলছিল। চমকে উঠেই মুখে যন্ত্রণায় বিকৃত একটা শব্দ করে আঙুলটা চোখের সামনে তুলে ধরল। রামতনু দেখল, সতীর আঙ্গুলের ওপর কুঁচ ফলের বীচির মত একফোঁটা গাঢ় রক্ত ফুটে উঠেছে। সতী দু-ঠোঁটের ফাঁকে আঙ্গুল চেপে ধরল। এখনও দাঁড়িয়ে আছ, সতীর গলা দিয়ে আর্তস্বর বেরিয়ে এল।

কোথায় যাব সতী,— রামতনুর স্বরে কাতরতা ফুটে উঠল। তুমি ফোন করে লিফটটা আনিয়ে দাও— নেমে যাই।

তুমি কি পাগল হয়েছ—। মিষ্টার রাঘবন হয়ত এতক্ষণে লিফট-এ উঠে পড়েছেন। লিফটু উঠতে শুরু করেছে হয়ত।

তাহলে, কি করব সতী।

উঃ আমি কিছু ভাবতে পারছি না। সতী যেন এক্ষুনি কান্নায় গলে পড়বে। তোমার সঙ্গে আমায় এখানে দেখলে মিষ্টার রাঘবন যে কি ভাববেন—

না না, তোমার কোনো ক্ষতি হতে আমি দেব না সতী, রামতনু গলায় জোর এনে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল সতীকে। অনুনয়ে রামতনুর স্বর চেপে এল, আচ্ছা সতী, তুমি যদি মিষ্টার রাঘবনকে একটু বুঝিয়ে বল, বুঝিয়ে বল আমি তোমার এ বয়সের নয়— বালিকা কালের ফিঁয়াসে ছিলাম, তাহলে......

সোফার ওপর হাত, হাতের ওপর মাথা রেখে সতী ডুকরে উঠল, তুমি কি আমায় মেরে ফেলতে চাও—

না না।

রামতনু বাইরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আর যেন তাড়াহুড়ো নেই, এমনি ভাবে নীল-দিগন্তের দিকে এগিয়ে গেল।

: রোদে শুকতে দেওয়া নক্সা করা সবুজ টার্কিস তোয়ালের মত ময়দান, রঙ্গীন ট্রেতে রাখা জলের মত সায়েবদের সুইমিং পুলের নীল জল, পিঁপড়ের সারির মত যানবাহনের স্রোত, শুঁয়োপোকার মত শুঁড় তুলে গুটিগুটি হাঁটা ট্রাম......ছোট হতে হতে রামতনুর দৃষ্টি পনেরোতলা নীচে পাথরের টালি বসানো ফুটপাতের সেই জায়গাটায় এসে কেন্দ্রীভূত হল যে-জায়গাটা যেখানে সে দাঁড়িয়ে ঠিক তার নীচেই।

বিচিত্র দেশ : বিচিত্র মানুষ

অতীন্দ্র মজুমদার

॥ ফুলে ফুলে পরিচয়...... ॥

এখন তো এসেছে এই শান্ত
বিকেলের নরম হাওয়া
চেরী ফুলের হালকা পাপড়িতে
তোমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের
ভালবাসার ফুলদানীতে
আমি রাখব তাদের সাজিয়ে
প্রতি সন্ধ্যায় প্রতি রাত্রিতে
হে আমার প্রিয়তম!

পাহাড়ের নীচে বিস্তীর্ণ চেরী ফুলের প্রান্তরে হাতে হাত রেখে বসে আছে প্রেমিক এবং প্রেমিকা—আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে তাদের কালো চুলে সোনার টুকরো। অনেক দূরে নদীর মৃদু স্পন্দনে একটি অলৌকিক সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা—তার সুরে সুর মিলিয়ে ভোরের হাওয়ার মত অস্ফুট কণ্ঠে গান গাইছে প্রেমিকা তার প্রেমিকের কোল ঘেঁষে। গানের মধুর আবেশে চেরী ফুলের পাপড়িগুলি যেন এখনই চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়বে।

এই ফুলের জলসায় একটি আশ্চর্য অমূল্য প্রতিশ্রুতির স্বপ্ন ছড়ানো। নিস্তব্ধ জীবনের আকাশে জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের মত সেই স্বপ্ন ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে—

আমার হৃদয়কে রাখব
ফুলের মত সাজিয়ে
তোমার জীবনের ভালবাসার
ফুলদানীতে
প্রেমিক আমার!

এই মধুর শপথের পর এমন কোন্ নিষ্ঠুর আছে যে সেই প্রতিশ্রুতিদাত্রীকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে বেছে নেবে না!

কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, বি-এ পাশ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পারদর্শিনী, বর্তমানে এম-এ পাঠরতা, লোভনীয় যৌতুক ইত্যাদি ইত্যাদি ঘোষণার উত্তপ্ত বিজ্ঞাপন বহু পাত্রকে টেনে আনে পাত্রীর বাড়ির দরজায়। কিংবা, 'পাত্রী ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান, মধ্যমশিক্ষিতা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, প্রয়োজনীয় স্থলে পাত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের অংশীদার করিয়া লওয়া হইবে' বিজ্ঞাপনের মাঝের অংশটুকু সম্বন্ধে পাত্র নিরুৎসুক থাকলেও বিজ্ঞাপনের ল্যাজা এবং মুড়ো তাদের উদ্বুদ্ধ করে পাত্রীপক্ষের দরজায় হানা দিতে—একথা সবাই জানেন। কিন্তু টাকা-পয়সা, রূপ, শিক্ষার চেয়েও পাত্রীর একটি বিশেষ গুণ কোন-এক দেশের পাত্রদের বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করত আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে এবং এখনও করে জানলে আমাদের দেশের বহু কন্যা সেই দেশের পাত্রীদের ভাগ্যকে ঈর্ষা না করে কিছুতেই পারবেন না।

গুণটি শুনতে সামান্য। সেলাই-ফোঁড়াই নয়, ধান-ভানা, জল তোলা নয়, শামী কাবাব রাঁধতে জানা নয়, এমনকি টপ্পার পকড় দিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়াও নয়। সামান্য ব্যাপার—ফুলদানীতে ফুল সাজানোর শিল্পে দক্ষ হওয়া। শুনতে সামান্য, কিন্তু কার্যত একটি অসামান্য গুণ।

তিব্বতে পাত্রী দেখতে গিয়ে পাত্রপক্ষ প্রশ্ন করেন—'মা, কম্বল কেমন বুনতে পার?' পাত্রীর বাবা জবাবে সামনে নমুনা ধরে দেন। কম্বলের বুনোটের নমুনা দেখে পাত্রপক্ষ স্থির করেন বধূ হিসাবে তাকে মনোনয়ন দেওয়া যায় কি না।

আসামে, মণিপুরে দেখা হয় পাত্রী মেখলো, এণ্ডির চাদর বুনতে পারে কিনা, নাগারা পছন্দ করেন লাল কালো পশমে বোনা কম্বল। কাশ্মীরেও তাই। পাঞ্জাবে দেখা হত একটানা গম ভাঙতে পারে পাত্রী কতক্ষণ। একশো বছর আগে বাংলাদেশে দেখা হত পাত্রী ধান-ভানতে পারেন কিনা অথবা রান্না-বান্না কেমন জানেন। দোস্তয়েভস্কি অথবা গোর্কীর উপন্যাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, একশো বছর আগে রুশ দেশেও পাত্রী পছন্দের প্রধান সর্ত ছিল লেস্ বোনা, কম্বল বোনা, ভোদ্‌কা তৈরী ইত্যাদি গেরস্থালীর ব্যাপারে পারদর্শিনী হওয়া।

এই সমস্ত পরীক্ষার সঙ্গে কেমন যেন একটা সাংসারিক স্থূলতার,

একটা প্রয়োজনের সম্বন্ধের সম্পর্ক জড়ানো আছে। পাত্রী স্বামীর ঘরে এসে কেবল ধান ভানবে, গম ভাঙবে, কুয়ো থেকে জল তুলবে, ঘর নিকোবে, কম্বল বুনবে, চাদর কাপড় তাঁতে বুনে উৎপাদন করবে—এই মাত্র। সে যে স্বামীর অবসরের ক্ষণটুকু সৌন্দর্য ও মাধুর্যে ভরে দেবে এমন দাবী সেখানে অস্ফুট। বোধ হয় অপ্রয়োজনীয়ও বটে। নইলে এমন মোটা রেখার প্রয়োজনের ছবি পাত্রীর সামনে তুলে ধরা হত না। সে ছবিকেও সাংসারিক দাবীর নিষ্প্রাণ বর্ণে পূর্ণ করে দিতেও বলা হত না।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান আজ স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে নর-নারীর দাম্পত্য-বন্ধনকে কেবলমাত্র সংসারের দরকারের খুঁটিতে বেঁধে রেখো না। ধূসর ঘোলা-রঙের অবলেপে নরনারীর মধুরতম সম্বন্ধকে একঘেয়ে করে দিও না— তাতে সুর আনো, ছন্দ আনো, দাও তার পটে বিচিত্র বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, জীবনের পবিত্রতম অবলম্বনের মন্দিরে আনো ফুলের সমারোহ। বস্তুত কেবলমাত্র সাংসারিক প্রয়োজনের মাপকাঠিতে যেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থিরীকৃত এবং সেই অনু-

একলা বসে হৃদয় কুসুমগুলি প্রেমের পাত্রে সাজিয়ে দিলেম তুলি......

যায়ী তা পরিচালিত, সেখানে যে দুর্লভতম রহস্যের জন্য মানব মন নিত্য উদ্‌গ্রীব তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না দিনযাপনের আর প্রাণধারণের গ্লানিতে। আমাদের প্রাচীন সমস্ত উৎসবগুলিতে এই রঙে-রসে পরিপূর্ণ রহস্যকে স্পর্শ করার একটা আশ্চর্য ইঙ্গিত ছিল। শ্রাবণের পূর্ণিমায় দীর্ঘ পুষ্পময় কদম্বের বা নীপের শাখায় ফুলডোরে-বাঁধা ঝুলনার দোলনে যে দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা ভালবাসার নতুন হিল্লোল অনুভব করতেন দেহে মনে, হেমন্তের কুয়াশাকীর্ণ আকাশের নীচে যে অরূপ ভালবাসা প্রাণ পেয়ে উঠত রাস-উৎসবের উচ্চকিত কোলাহলে, সহস্র দিনের মধ্যে স্বতন্ত্র চিরন্তনতার আশীর্বাদে মহান বসন্তের দোলপূর্ণিমা—যেখানে রেণু-লিপি নিয়ে বাতাস মুকুলে মুকুলে প্রশ্ন শুধায় কবে ফুল ফোটবার সময় আসবে, সুন্দরের ছন্দ পাখায় দুলিয়ে নিয়ে প্রজাপতি এক বন থেকে আরেক বনে উড়ে চলে উন্মত্ত মিলনের অজস্র প্রাণকণাকে ছড়িয়ে দিয়ে রঙীন ধুলোয়—তখন সেই শিরীষ রঙ্গন কাঞ্চন নীলমণিলতার সমবেত পুষ্পোচ্ছ্বাসে যে পরিপূর্ণতার স্পর্শ লাভ করতেন প্রণয়ী প্রণয়িনী, তাতে প্রাণ-দেবতারই নির্মল প্রসন্নতাকে পাওয়া যেত জীবনের অঙ্গনে। এই পুষ্পময় সঙ্গীতময় বর্ণময় উৎসবগুলি জীবনের সমস্ত তুচ্ছতার, দীনতার, সমস্ত প্রয়োজনীয়তার, যান্ত্রিকতার বেড়াকে ভেঙে ফেলে নরনারীকে সবচেয়ে যা সত্য সবচেয়ে যা পবিত্র তার আস্বাদ দিত অকৃপণ হাতে। যা তখন নরনারীর মনে বর্ণে গন্ধে রূপে রসে তরঙ্গিত সঙ্গীত-উৎসাহে প্রাণের মত্ত হাওয়াকে জাগিয়ে দিত, তার মধ্যে ফুলের ভূমিকা ছিল প্রধান এবং প্রথম। কিন্তু হায় সেখান থেকে আজ আমরা সরে এসেছি জীবনের সত্য আনন্দ থেকেও!

সৌভাগ্যের বিষয়, এই আনন্দের ভোজে আমরা অনিমন্ত্রিত থাকলেও জাপানের নর-নারী কিন্তু তার থেকে দূরে নেই। ফুল তাদের নিত্যসঙ্গী, তাই অন্য দেশে হোক বা না হোক, জাপানে কিন্তু পাত্রী পছন্দের অন্যতম সর্ত হচ্ছে, সে গৃহসজ্জায় ফুলের শিল্পসম্মত ব্যবহার জানে কিনা। পুরোদস্তুর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শহুরে পাত্রীর ক্ষেত্রে এখন এর প্রয়োগ কমে এলেও গ্রামদেশে কিন্তু এই বহু পুরাতন চমৎকার প্রথাটি নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও বাইরের বহু বিচিত্র প্রভাবের আঘাত সহ্য করেও এখনও টিকে আছে তার মাধুর্য ও পেলবতা নিয়ে।

এর প্রধান কারণ জাপানী জাতির পুষ্পপ্রিয়তা এবং তজ্জাত সৌন্দর্য-

প্রিয়তা। এই সম্পর্কে চমৎকার একটি কবিতার অংশ শোনাই—

শিকিশিমা নো
ইয়ামাতো গোকোরো ও
হিতো তোয়াবা
আশাহি নি নিয়ূ
ইয়ামা জাকুয় কানা!

এর বাংলা তর্জমা দাঁড়াবে—

যদি কোন বিদেশি তোমাকে শুধায়
জাপানীদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে তাকে
বোল—
'পাহাড়ের মত
একটি চেরী-গাছ
যার ফুলগুলি বিকশিত
হচ্ছে প্রভাত সূর্যের রশ্মিতে!'

এই ছোট্ট শ্লোকটি শুনলেই বোঝা যায় ফুলের সৌন্দর্য এবং পবিত্রতায় জাপানীরা একটি অপূর্ব অনাস্বাদিত বিশ্বজনীনতার দুর্লভ আস্বাদ লাভ করেন। চেরী ফুল তাঁদের কাছে আত্মত্যাগ ও মহত্ত্বের প্রতীক। সূর্যালোকে সফেন শুভ্র তরঙ্গের মত প্রস্ফুটিত চেরী ফুলের সমারোহ দেখে প্রতিটি জাপানী বারবার করে স্মরণ করেন সেই প্রাচীন প্রবাদটি—
The cherry is first among flowers as the Samurai is first among men."
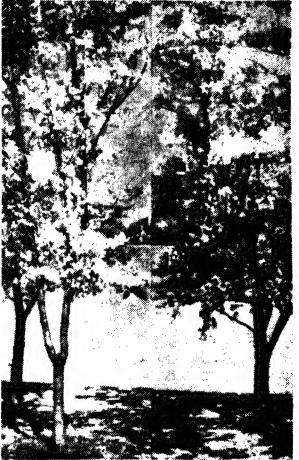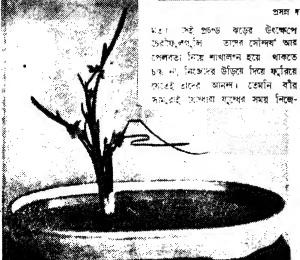
অতি প্রাচীনকালে সামুরাই যোদ্ধারা মন্ত্রের মত মনে রাখতেন, তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে নির্দয় ঝঞ্ঝার তাড়নায় অস্থির চেরী ফুলের মত। সেই প্রচণ্ড ঝড়ের উৎক্ষেপে চেরীফুলগুলি তাদের সৌন্দর্য আর কোমলতা নিয়ে শাখালগ্ন হয়ে থাকতে চায় না, নিজেদের উড়িয়ে দিয়ে ফুরিয়ে যাওয়াতেই প্রাণের আনন্দ। তেমনি বীর সামুরাই যোদ্ধারা যুদ্ধের সময় নিজেদের দেহ এবং অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবার কথা ভাবে না—লড়াই করতে করতেই নিজেদের নিঃশেষ করে দিতেই তাঁদের আনন্দ। শিষ্য যোদ্ধাকে গুরু তাই দীক্ষার সময় মন্ত্র দিতেন—'চেরী-ফুলের মত মহৎ হও, সুন্দর হও। প্রয়োজনের সময় অসহায় শত্রুকে ক্ষমা করার মহত্ত্ব যেন তোমার থাকে এবং সব শেষে প্রভু বুদ্ধের পায়ে নিজেকে নিবেদন করার দীনতায় তুমি সুন্দর হও।' এই মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন বলেই প্রাচীন যুগের দুর্ধর্ষ সামুরাই বীর কুমাগাই তাঁর পরম শত্রু আজুমোরি-কে তরবারীযুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত করার পর পরম অবহেলায় তাঁর অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন নদীর জলে, ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন যোদ্ধার মর্যাদ্য গাত্রাবরণ এবং মুণ্ডিত মস্তকে

প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে ভরা......

একাকী তোমার অপেক্ষায়...

আশ্রয় নিয়েছিলেন পরম কারুণিকের পায়ে—মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়ে সারা-জীবন করেছিলেন সেই হত্যার প্রায়শ্চিত্ত নম্র বেদনায়।

ফুল এবং ফুল সম্পর্কিত জিনিসগুলি জাপানীদের অত্যন্ত প্রিয় বলে তাদের মেয়েদের নামেও ফুলের পেলবতা। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তারা ধরে রেখেছেন তাঁদের মেয়েদের নামের মধ্যে। উমে, কিকু, য়ুরি, ফুজি, মাৎসু, হানা, য়ুকি, হারু, নমি, তাকি, মিনে, মিওয়া—এই সব বহুল প্রচলিত জাপানী কন্যাদের নামের অর্থ যথাক্রমে বনফুল, ক্রিসেনথিমাম, লিলি, উস্তারিয়া ফুল, পাইন বন, কুঁড়ি, তুষার, বসন্ত, ঢেউ, নির্ঝর, পর্বতচূড়া, বেণু, বাগান। এরকম নাম বাংলাদেশে অবশ্য কিছু কিছু আছে, যেমন টগর, বেলা, বকুল, পারুল, যূথিকা, মালতী, জবা, করবী, সন্ধ্যামণি, কমল (বা পদ্ম) ইত্যাদি। কিন্তু নামে যতই ফুলের বাহার থাকুক না কেন, বাঙালীর জীবনে ফুলের সমারোহ নিতান্তই অবজ্ঞাত। আমাদের ফুল লাগে জীবনে দুবার—ফুলশয্যায় আর শ্মশানশয্যায়। মাঝ-খানে পুষ্পহীন বৃক্ষের নগ্নশাখার রিক্ততা।

জাপানী জাতির ফুল সম্পর্কে এই মধুর আকর্ষণ থাকায় ফলে তাদের বালিকারাও ছোট থেকে ফুলসজ্জায় আকৃষ্ট হয়, কারণ তারা জানে এক হৃদয়ের সঙ্গে আরেক হৃদয়ের মধুর সম্পর্কের মূলে আছে ফুলে ফুলে পরিচয়।

জাপানে তাই অতি শিশুকাল থেকেই মেয়েদের একটি শিল্পকলা শিখতে হয়—তার নাম 'ইকেবানা' বা ফুলদানীতে ফুল সাজানোর শিল্প-সম্মত কলাকৌশল। স্বর্গ মর্ত ও মানুষ—এই তিনটি জিনিস সম্পর্কে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির নম্র প্রকাশ আছে এই 'ইকেবানা'-য়। ইকেবানা-র তিনটি প্রধান ধারা অনুসরণ করা হয়—এক, 'মোরিবানা' স্টাইল, দুই 'নাজেইর' স্টাইল এবং তৃতীয় গুচ্ছ বাঁধার স্টাইল বা নটিং এ্যারেঞ্জমেণ্ট। মোরিবানা পদ্ধতিতে জোর দেওয়া হয় পাত্রে ফুল গুচ্ছে দেওয়ার কায়দায় ওপর, 'নাজেইর' শিক্ষা দেয় পাত্রের ওপর কিভাবে আলগা করে ফুল ছড়িয়ে দিতে হবে এবং তৃতীয় ধারায় শিক্ষা দেওয়া হয়, কিভাবে ফুল তোড়া বাঁধতে হবে। তিনটি আলাদা পদ্ধতি হলেও তিনটি পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত, কারণ এই তিনটি আঙ্গিকই মানবজীবনের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরি-পূর্ণতার প্রতীক। ইকেবানা যাঁরা শেখান তাঁরা তাই কেবলমাত্র শিক্ষকই নন—তাঁরা অন্তরে অন্তরে কবি ও দার্শনিক। একজন দেশবিখ্যাত ইকেবানা শিক্ষক তাই বলেছেন—"It is very difficult to master the secret of this art which is a form of expression like dramatic poetry. Success cannot be determined by rules. Students must understand the colors and shapes of flowers and plants in order to have a power to interpret the beauty of nature and awaken emotion in others."

ফুল সাজানোর ব্যাপারটিকে একটি দার্শনিকতায় মণ্ডিত করা হয় বলে ফুল বাঁধার জন্য যে সব গ্রন্থির (Knot) প্রয়োগ করা হয় সেগুলির মধ্যেও একটি প্রতীক দ্যোতনা আছে। ফুল বাঁধা থেকে ফিতে বাঁধা পর্যন্ত সর্বত্র এই প্রতীককে মহৎ মর্যাদা দেওয়া হয়। যে সমস্ত গ্রন্থি জাপানে বহুল প্রচলিত সেগুলির কয়েকটি হচ্ছে চেরিফুল গ্রন্থি, প্রজাপতি গ্রন্থি, প্লাম নট্, বাড্ নট্, স্টর্ক নট্, ক্রিসেনথিমাম নট্, পলোনিয়া নট্, সবুজশুক্তি, গোলাপ, ঝোলানো ছবি, বেদী ইত্যাদি বহু বিচিত্র গ্রন্থি। এই সমস্ত গ্রন্থির কোন কোনটি মানব মনের নানা আবেগের প্রতীক। আনন্দ, বেদনা, বিরহ, আশ্বাস, প্রেম, করুণা, স্নেহ, আশা প্রভৃতির ব্যঞ্জনা আনে কোন কোন গ্রন্থির বিশেষ কৌশল, কোন কোনটি আবার বিবাহ, জন্মদিন, নাটকাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কাব্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। কোন কোন গ্রন্থি বৌদ্ধ মন্দিরের বেদীতে নিবেদিত পুষ্পগুচ্ছেই কেবল ব্যবহৃত। এদের মধ্যে 'শাকুরা মুশুবি'—বা চেরীফুল-গ্রন্থি সবচেয়ে জনপ্রিয়—এতে পাঁচটি পাপড়ির ছন্দে গ্রথিত একটি রঙীন শিল্কের ফিতে ব্যবহৃত হয়—এর ব্যঞ্জনা আনন্দ এবং উল্লাসের। চেরী-গ্রন্থি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় উপহারের বাক্স বাঁধায়, বিবাহের উপহারে এবং এপ্রিল মাসে প্রেরিত যে-কোন অনুষ্ঠানের স্মারক উৎসবে।

কবি এলিয়ট আক্ষেপ করে বলে-ছেন, 'এপ্রিল নির্দয়তম মাস'; কিন্তু জাপানীরা একথা বিশ্বাস করেন না, কারণ তাঁদের দেশে এপ্রিল সবচেয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে চেরীফুলের অজস্র দাক্ষিণ্যে। প্রসন্ন দাক্ষিণ্যভরে থরে থরে আকাশকে উদ্বেলিত করে তোলে, তখন চেরীর আমন্ত্রণ। তারা যেন পাখা মেলে উড়ে যেতে চায়, নীল অসীমের অনন্ত বিস্তারে আর আকাশ নেমে আসতে চায় ধরার কন্যার বিচিত্র পুষ্পময় সজ্জায় স্নিগ্ধ আমন্ত্রণে। গ্রামের প্রান্তরে, পর্বতের সানুদেশে তখন ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর—লক্ষ লক্ষ আকাঙ্ক্ষার কুঁড়ি তখন দল মেলেছে চেরীর পাপড়িতে। তখন কি কেউ ঘরে থাকতে পারে বিষাদখিন্ন চেতনার অন্ধকারে একটা নিষ্প্রাণ অস্তিত্বের মত। তখন যে নীল দিগন্তে ফুলের আগুন লেগেছে, মুক্ত চেরীর বন্যাধারায় তখন চিত্ত মুক্তি-আবেশে ভুলেছে; গগন আজ গন্ধে মাতাল, বাতাস আনন্দে মূর্ছিত, মধুকরের ক্ষুধা পাপড়িতে পাপড়িতে গুঞ্জন করছে অশ্রুত ছন্দে। চেরীর

আমন্ত্রণে সবাই তখন গেছে বনে, উৎসবে মত্ত হতে—চেরী উৎসব জাপানের সবচেয়ে বড় উৎসব। বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে কৃষক চলেছে দল বেঁধে মন্দিরের সামনের চাতালে—প্রত্যেকের হাতে একটি লম্বা দণ্ডে বাঁধা রঙীন কাগজের লণ্ঠন—লাল হলুদ সিঁদুর রঙের সেই লণ্ঠনগুলি হাওয়ায় দুলছে চেরীফুলের পাপড়ির মত। পাহাড়ের ওপর থেকে হাসতে হাসতে চিৎকার করে উঠছে যৌবনমদে মাতাল যুবকের দল—'শাকে! শাকে!'—দাও ভেতো মদ, ভেতো মদ! নীচে মেয়েরা হাসতে হাসতে ঘোষণা করছে—'এই আমাদের নতুন পিঠে—এসো এসো, টাট্‌কা পাবে গরম গরম!' ছোরা দিয়ে হাত কেটে রক্ত বার করে পরমুহূর্তেই 'গামা-নো-আবুরা' বা ড্রাগন তেল লাগিয়ে রক্ত বন্ধ করে ঘোষণা করছে, পুরুষেরা—'এই তেল কিনে ডাক্তারের পয়সা বাঁচাও।' চারিদিকে আমোদ আর মেলার আনন্দ। মাঝখানে একটি, পাটাতনে সারি সারি রঙীন লণ্ঠন আর চেরীর গুচ্ছ—উপরে গাছের শাখায়, নীচে অধিত্যকায় ছড়ানো চেরীর চন্দ্রাতপ। বাঁশি-বাজিয়ে, ঢোলকবাদক তাদের প্রাচীন জাতীয় পোষাকে উঠে আসে পাটাতনের একধারে, ছন্দে ছন্দে এগিয়ে আসে নর্তক যুবক,—একচক্ষু পর্বতদেবতার প্রতীক; অন্য পাশ থেকে উঠে আসে 'ওহিমে-শামা'—তিনি প্রেমিকা নায়িকা—আরেকজনের ভূমিকা নেন কোন একজন গ্রামবণিক—তাঁর ভূমিকা মানুষ-শেয়ালের। সুস্থ সবল যুবক পর্বতদেবতা ঝকঝকে ধারালো তলোয়ার ঘুরিয়ে নৃত্য করেন। তাঁকে স্নান করানো হয়েছে পবিত্র নির্ঝরের জলে, চিত্তে তাঁর সংযম—তাই ধারালো তলোয়ারে তাঁর শরীর কখনও আহত হয় না। পাটাতনের চারপাশে মন্ত্রপূত দণ্ড পোঁতা আছে, শিন্তো-পুরোহিতরা গুঞ্জন করছেন নিরাপত্তার মন্ত্র। তরবারীর আন্দোলনে ঝরে পড়ছে চেরীর পাপড়ি।—ওহিমে শামা আসেন সেই দেব-আশীর্বাদ, চেরীর পাপড়ি কুড়াতে। পিছনে পিছনে মায়াবী মানুষ-শেয়াল—তাকে এসেছে ভোলাতে। ক্রুদ্ধ গর্জনে এগিয়ে আসেন একচক্ষু পর্বতদেবতা—তাঁর হিংস্র আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারে না মানুষ-শেয়াল। পর্বতদেবতা তখন নৃত্য করতে করতে বিদায় নেন আলো পূর্ণোয়মান তাঁর তরবারী—অজস্র চেরীর বর্ষণ নীচে রঙ্গমঞ্চে—এবং
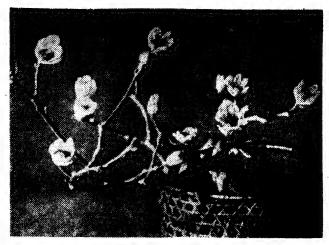
জড়ায়ে আছে বাধা ছড়ায়ে যেতে চাই......

মানবী নায়িকা ওহিমে-শামা নতজানু হয়ে সেই ঐশ্বরিক আশীর্বাদ নেন দুই হাত অঞ্জলি বেঁধে।

হাজার হাজার সরল গ্রামবাসী এতক্ষণ এই নৃত্যনাট্য দেখছিলেন মন্ত্রমুগ্ধ একটি অস্তিত্ব হয়ে। নৃত্যনাট্য শেষ হলে সন্ধ্যার অন্ধকারে জ্বলে ওঠে হাজার হাজার রঙীন লণ্ঠন রাত্রির

মেঘাবৃত ফুজি

আকাশে জীবন্ত খদ্যোতের মত। মন্দিরের সামনে সেই আলো দোলাতে দোলাতে চলে গ্রাম্য নৃত্য যুবকদের উচ্চ কণ্ঠে পল্লীগীতি আর মুগ্ধ নর-নারীর সমবেত গম্ভীর অথচ মধুর প্রার্থনা। ওধারে বিস্তীর্ণ চেরীফুলের অরণ্যে কখন চলে এসেছে দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা সবার চোখ এড়িয়ে। কোলের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছে প্রেমিক যুবক নিমীলিত নেত্রে আর তার বন্ধ চোখের পল্লবে চেরীর পাপড়ি বুলাতে বুলাতে প্রেমিকা তার কানে কানে উচ্চারণ করছে সেই মধুর প্রতিশ্রুতি—

আমার হৃদয়কে রাখব
ফুলের মত সাজিয়ে
তোমার জীবনের ভালবাসার
ফুলদানীতে প্রেমিক আমার!

জাপানে এই ভাবে প্রেমে প্রেমে ফুলের সমারোহের কারণ মানবজীবনের রহস্যকে তারা বুদ্ধের একটি উপদেশের সূত্রে গেঁথে নিয়েছে। বুদ্ধ বলেছেন—'পূর্ণচন্দ্রে ঘনাবে কালো মেঘের অভিশাপ, চেরীফুলের জলসায় আসবে অমোঘ ঝটিকা!' কিন্তু তবুও জেনো—

আশা পর্বত থেকে
চাঁদ উঠবে স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে
ঝড়ের মেঘকে দেবে
ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে,
বাতাস এবং বৃষ্টি করবে সংগ্রাম
কিন্তু চাঁদ চেরীফুলকে বলবে
ঝড়ের সংগে লড়াই করো
যতক্ষণ না তুমি মিশিয়ে যাও ধুলোয়।

মানুষ সংগ্রাম করে তার জীবনে—
চেরীফুল তাকে দিয়েছে মন্ত্র,
জীবনের সব দুঃখের
মাঝখানে এবং শেষে
আছে আশা, অনন্ত আশা,—
পাবে সেই আশার অমৃত-আশিস
যদি জীবনকে তার দুঃখকে
ভয় না পেয়ে লড়াই করো!

।। অভিনব জাহাজ ।।

সমুদ্র সম্পর্কে তথ্যসন্ধানের উদ্দেশ্যে মার্কিন বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় একটি অভিনব জাহাজ উদ্ভাবিত হয়েছে। ৬০০ টনের এই জাহাজটির দৈর্ঘ্য ৩৫৫ ফুট। চারজন নাবিকের স্থানযুক্ত জাহাজটি দুই সপ্তাহ সমুদ্রে অবস্থান করতে পারবে। জাহাজটির বৈশিষ্ট্য হল কোন অবস্থায়ই সমুদ্রে ডুবে যাবে না এবং সমুদ্রে সমান্তরাল বা খাড়াখাড়িভাবে অবস্থান করতে পারবে। অতিশয় তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ স্থানেও নোঙ্গর করে সমুদ্র-তরঙ্গের গতি, সামুদ্রিক প্রাণী এবং সমুদ্র সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। জাহাজটির সুদীর্ঘ পশ্চাদভাগ সমুদ্রের জলে ভর্তি করলে জাহাজটি খাড়া হয়ে থাকে এবং অতি উচ্চ বায়ুর চাপে এই জল বার করে দিলে পুনরায় সমান্তরাল হয়ে যাবে। যে দুটি নল আছে তাতে জল প্রবেশ করতে পারে না—এবং এর মাধ্যমেই বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের ১৫০ ফুট পর্যন্ত নীচে গিয়ে তথ্যসংগ্রহ করতে পারেন।

।। জার্মানীর খবর ।।

পৃথিবীর তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে ১৪৫ জন শিক্ষক জার্মান ভাষা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। গত বৎসর মোট ৩০০০০ জন জার্মান শিখেছেন। জার্মানীতে গত বৎসর সবথেকে বেশী লোক মোটরগাড়ী কিনেছেন। একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৬১ সালের মধ্যে বিগত বৎসরাপেক্ষা ১০০০০০টি নতুন গাড়ী রেজিস্ট্রি হয়েছে। এই ক্রেতার মধ্যে কর্মীদের সংখ্যাই বেশী।

।। পৃথিবীর উর্ধ্বে ।।
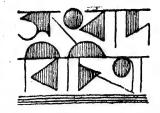
মার্কিন বৈজ্ঞানিক রবার্ট হোয়াইট রকেট-চালিত এক্স-১৫ বিমানে পৃথিবী হতে ৪৭·৩ মাইল উর্ধ্বে গিয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। মেজর হোয়াইট ১২৪০০০ ফুট উর্ধ্বে গমনের পর ঘণ্টায় ৩৬৮২ মাইল গতিতে সাড়ে নয় মিনিটের মধ্যে এই পথ অতিক্রম করেন। তাঁর পূর্বে জোসেফ ওয়াকার গত এপ্রিল মাসে এই এক্স-১৫ বিমানেই ৪৬·৭ মাইল উর্ধ্বে গমন করে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

।। সমুদ্রগর্ভে গ্যাসপাইপ লাইন ।।

কাস্পিয়ান সমুদ্রের তলা দিয়ে এক ৩৪ মাইল লম্বা গ্যাস-পাইপলাইন বসানোর চূড়ান্ত খসড়া তৈরী করেছেন সোবিয়েত ইঞ্জিনীয়াররা। এই পাইপের সাহায্যে ভূগর্ভের গ্যাস সরাসরি ৩৪ মাইল দূরে এক বিজলী-উৎপাদন স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হবে এই গ্যাসকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করবার জন্যে।

এই পাইপলাইন পাতার জন্যে সোবিয়েত ইঞ্জিনীয়াররা এমন এক স্বয়ংক্রিয় জোড় লাগানোর ব্যবস্থা করেছেন যার ফলে পাইপের অংশগুলি ঠিকমতো সমুদ্রের তলায় বসিয়ে দিলে তারা নিজের থেকেই পরস্পরের সঙ্গে জোড় লেগে গিয়ে এক অখন্ড পাইপলাইনে পরিণত হবে।

মার্কিনী-বিচিত্রা

আমেরিকার বি-৫২ বিমান বিগত ৭ই জুন ২২ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে গড়ে ঘণ্টায় ৫১০ মাইল গতিতে ১১৩০৩ মাইল অতিক্রম করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। এই সময়ে এর একবারই মাত্র ইন্ধন লাগে। ১৯৬০ সালে আর একটি বি-৫২ বিমান ১০০৭৮ মাইল অতিক্রম করে যে রেকর্ড স্থাপন করেছিল তা ভঙ্গ হয়েছে।

বিমানটি উত্তর ক্যারোলাইনার সিমুর জনসন বিমানঘাঁটি হতে যাত্রা করে বারমুডার দক্ষিণাঞ্চল, গ্রীনল্যান্ড, আলাস্কা এবং যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের ওপর দিয়ে পুনরায় সিমুর জনসনে ফিরে আসে।

আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত একটি অভিনব কামরা উদ্ভাবিত হয়েছে। সেখানে, সামান্য একটি বোতাম টিপেই বৃষ্টি, কুয়াশা অথবা বালুর ঝড় সৃষ্টি করা যায়। অতি উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের তাপমাত্রায়ও সেখানে বৃষ্টি সৃষ্টি করা যায়।

এই কামরায় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম, মেরু অঞ্চলের জন্য যন্ত্রপাতি এবং সাগরতলে ব্যবহার করার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখা যায়। এসোসিয়েটেড টেস্টিং লেবরেটরীজ ইনকর্পোরেটেড এই কামরাটি তৈরী করেছেন।

টমসন রামো উল্ড্রীজ কোম্পানী কৃত্রিম উপগ্রহের বেতার ও অন্যান্য যন্ত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের উদ্দেশ্যে প্রথম সানফ্লাওয়ার নামে একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র তৈরী করেছেন। এতে সৌরশক্তি ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে, সৌরশক্তি একটি বয়লারের উপর কেন্দ্রীভূত হয় এবং এর তাপে যে বাষ্প সৃষ্টি হয়ে থাকে তার সাহায্যে অলটারনেটার নামে একটি বিশেষ ধরণের বৈদ্যুতিক জেনারেটার চালু করা হয়। তবে এই বাষ্প সৃষ্টি করা হয় জল থেকে নয়, পারা থেকে।

অভিনব নৌকার উদ্ভাবক মিঃ জুলিয়াস রোজার ও তাঁর নৌকা। নৌকাটি এমনভাবে তৈরী যে, প্রচণ্ড ঝড়েও কাৎ হবে না বা ডুববে না। নৌকা চালনার যন্ত্র ও যাত্রীদের বসবার স্থান এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে সবসময় নৌকাটি জলের উপর সমান থাকতে পারে। পঃ জার্মাণীর হুপার্টালে আন্তর্জাতিক উদ্ভাবকদের ১৮শ প্রদর্শনীতে নৌকাটি দেখানো হয়।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লোকজনের ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙল, সমস্ত মাঠময় সূর্যের আলো ঝলমল করছে। ধড়মড় করে উঠে বসতেই তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার নিবাস কোথায় বাবু?' দিলীপ বুঝল, এরা পাড়াগাঁয়ের লোক, অচেনা পথচারী সম্বন্ধে অতিমাত্রায় কৌতূহলী এবং ভদ্রবেশী মানুষ দেখলে সাধুভাষায় প্রশ্ন করে থাকে। এদের আগ্রহের প্রথম এবং প্রধান কেন্দ্র—'নিবাস'। অন্যান্য তথ্য ক্রমশঃ জিজ্ঞাস্য। একে একে তাদের ডজন খানেক প্রশ্নের উত্তর দেবার পর সে যখন তার নিজের গন্তব্যস্থলের নিশানাটা জানতে চাইল, তারা বিশেষ কিছু হদিশ দিতে পারল না। বোঝা গেল, তারা ওখানকার বাসিন্দা নয়, দূরের কোন গ্রাম থেকে শহরের দিকে চলেছে চাকরির সন্ধানে। ও অঞ্চলে ব্যাপক অজন্মার দরুণ, ঘরে ধান-চালের অভাব দেখা দিয়েছে, কল-কারখানায় কাজ না মা পেলে অনশন ছাড়া গতি নেই, তা না হলে 'দেশ' ছেড়ে শহরে আসবার প্রয়োজন ছিল না, সেটা তাদের ইচ্ছাও নয়—ইত্যাদি বিষয় একটু সবিস্তারে বুঝিয়ে বলবার আয়োজন করতেই দিলীপ উঠে পড়ে জানাল, তাকে তখনই যেতে হবে। লোকগুলো মনে মনে ক্ষুণ্ন হল এবং পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কাঁধে কয়েকটা ছোট পোঁটলা এবং হাতে হুঁকো-কল্কে নিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা হল।

বটগাছ ছাড়িয়ে খানিকক্ষণ চলবার পর এবার যাদের সঙ্গে দেখা হল, তাদের জামা-কাপড় এবং সে সব পরবার ধরণ দেখে দিলীপের বুঝতে অসুবিধা হল না—এরা স্থানীয় লোক। দু নম্বর সরকার বস্তি তারা চেনে। কিন্তু সেটা তো কদিন আগে ভেঙে ফেলা হয়েছে।

—ভেঙে ফেলা হয়েছে! ওদের কথাটাই কোনোরকমে আউড়ে গেল দিলীপ। কিন্তু সে আওয়াজ এত ক্ষীণ যে নিজের কানেই পৌঁছল না। একজন বলল, সবটা এখনো ভাঙেনি। কাকে চাই আপনার?

দিলীপ সে কথার জবাব না দিয়ে তাকেই অনুরোধ করল, জায়গাটা আমাকে একটু দেখিয়ে দিতে পারেন।

লোকটি হাত তুলে দূরে কতগুলো খোলার ঘর দেখিয়ে, কিভাবে কোন পথে যেতে হবে বুঝিয়ে দিল। দিলীপ আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ছুটে চলল, যেন একটু দেরি হয়ে গেলেই মাকে আর সে দেখতে পাবে না।

কাছাকাছি এসে সামনের দিকে চেয়েই তার সমস্ত শরীরে যেন রোমাঞ্চ খেলে গেল। ঐ না সেই ঝাঁকড়া আম গাছ। হ্যাঁ; এই তো। ছুটে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছা হল, দীর্ঘকাল পরে ফিরে পাওয়া পুরনো বন্ধুর মত গাছটাকে সে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। মনে পড়ল প্রথম ইংরেজি লিখতে শিখে একদিন হারুর ছুরি দিয়ে কেটে কেটে একটা মস্ত বড় 'D' লিখে রেখেছিল এই গাছের গায়ে—তার নামের আদ্যাক্ষর। আজও সেটা আছে কি? খুঁজতে চেষ্টা করল, পাওয়া গেল না। অকৃতজ্ঞ বন্ধু তার হাতের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলে দিয়েছে। একবার সন্দেহ হল—সে গাছটা বোধ হয় নয়। এ যেন বড্ড বুড়ো হয়ে গেছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, এই তো সেই জলের কল। এবার সব মনে পড়েছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে গেল সেই চিরপরিচিত কুঁড়ে ঘরখানির দিকে। প্রথমে পড়বে বিনুদের বাড়ি। কই? এ যে শুধু ভগ্নস্তূপ। তার একটু পরেই—হ্যাঁ; ঐ ঘরটাই তো মনে হচ্ছে। টিনের দরজাটা যেন অন্য রকম ছিল। তবু ঢুকে পড়ল। না ভুল হয়নি। এই সেই উঠোন। কিন্তু জিনিসপত্র এমন তছনছ করে ছড়িয়ে রাখল কে?

ঘরের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল—কে? এই তো মায়ের গলা। এ যে তার সমস্ত চেতনার সঙ্গে এক হয়ে মিলে আছে। দিলীপ চিৎকার করে বলতে গেল, আমি। কিন্তু স্বর ফুটল না। সাড়া না পেয়ে নির্মলা বেরিয়ে এল। নীচে নেমে থমকে দাঁড়াল। কপাল কুঞ্চিত করে আর একবার সেই একই প্রশ্ন করল—'কে?'

দিলীপের বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। তার সেই সোনার প্রতিমার মত মা এ কী হয়ে গেছে! ছুটে গিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে দুহাত দিয়ে প্রাণপণে কোমরটা জড়িয়ে ধরল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, মা!

খোকা! বলে, নির্মলা ওর মাথাটা বুকের উপর চেপে ধরল।

অনেকক্ষণ কারো মুখে আর কোনো কথা সরল না।

কত কথা ছিল! একটি নয় দুটি নয়। কথার পাহাড় জমে আছে দুজনের মনে। বলতে হবে, শুনতে হবে। কিন্তু এ কী হল। কারোই যেন কিছু বলবার নেই। একজন ভাবছে, মাকে পেয়েছি, সেইখানেই সব কিছুর শেষ। আর একজন ভাবছে, খোকা ফিরে এসেছে, তারপরে আর কী থাকতে পারে?

জয়নগরের মোয়ার সময় এটা নয়। ঐ বস্তুটির যে একটি বিশেষ স্বাদ আছে, সেটি আনতে হলে চাই প্রথম শীতের নতুন খেজুর গুড়। তাই শীত ছাড়া অন্য ঋতুতে এর চলন নেই। কিন্তু গোকুল নন্দনের একটি বহুদিনের বন্ধু খদ্দের আছেন বৌবাজারে; সব ঋতুতেই তাঁর 'জয়নগর' চাই। নাই বা রইল নলেন

গড়ে। আর সব উপাদানের তো আকাল পড়েনি। ভুর-ভুর করবে এলাচদানার গন্ধ, তার সঙ্গে আলগোছে একটুখানি কর্পূরের সুবাস। চিনির পাকটি এমন হবে যে, খৈ-এর দানাগুলো মুখে ফেলা মাত্র টপ করে মিলিয়ে যাবে। তার কাছে কোথায় লাগে ভীমনাগের সন্দেশ? তবে হ্যাঁ: সবটাই হল কারিগরের হাতের যাদু। গোকুলের মোয়ায় নাকি সেই যাদু আছে। তাই ওখানে তার নিয়মিত যোগান লেগে আছে সারা বছর।

আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় নিজের হাতে তৈরী সেই টাটকা জিনিস ছেলেবেলায় যে কাঁসিথালায় করে খোকা ভাত খেত, তার উপর সাজিয়ে নির্মলা ছেলের সামনে ধরে দিয়েছিল। দিলীপ তার থেকে একটা তুলে ধরে মাকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলল, মা তোমার মনে আছে—

বাকীটুকু না শুনে মাও হাসতে হাসতে বলল, তা আর নেই? গোটা সকালটা আঁচল চেপে ধরে পেছন পেছন ঘুরেছিলি।

—আর কী বকুনিটা দিয়েছিলে তুমি!

এবারে মা আর হাসতে পারল না। গলাটা ধরে এল। নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তখন কি জানতাম সেই জিনিস একদিন নিজে হাতে কড়া-ভর্তি তৈরী করতে হবে আর প্রতি মুহূর্তে জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে?

দিলীপ বলতে যাচ্ছিল গোকুল বুড়োর মোয়া হাতে করে তার মনটাও জ্বালা করে উঠত। বলল না। মা তা শুনলে আরো কষ্ট পাবে। তাই চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগল। নির্মলা পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, বাসা চিনতে তোর কষ্ট হয়নি? যা ভাঙাচুরো চলছে এদিকটায়।

—ও! সেই চিঠিটাই তো তোমাকে দেওয়া হয়নি। এই নাও।

কার চিঠি? হাত বাড়াতে বাড়াতে বলল নির্মলা।

—প্রফেসর ব্যানার্জির।

—কে প্রফেসর ব্যানার্জি!

চিনতে পারছ না! উনিই তো তোমার ঠিকানা দিলেন। আমার কি মনে ছিল নাকি? কত বছর ধরে—

মায়ের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল। নির্মলার সমস্ত সত্তা যেন ঐ ছোট্ট

চিঠিটার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে বলল, কী হয়েছে ও'র?

—খুব কঠিন অসুখ—স্ট্রোক্‌!

—কি বললি?

—একটা দিক প্রায় অচল হয়ে গেছে।

নির্মলার গলা থেকে একটা ভীতি-সূচক ক্ষীণ শব্দ বেরিয়ে এল। তারপর বলল, তুই ও'কে কোথায় পেলি?

—আমি যেখানে থাকি, তার ঠিক সামনে যে ও'র বাড়ি।

—আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারিস?

—কেন পারব না? এখনই চল না?

—এখন! কিন্তু গোকুল-কাকা যে এসে ফিরে যাবে। মোয়াগুলো এবেলাই নিয়ে যাবার কথা।

—গোকুল-কাকা! মানে, সেই মোয়া-ওয়ালা বুড়ো?

—তুই চিনিস নাকি?

—বাঃ চিনি না? সে তোমার কাকা হয়?

—সম্পর্কে কাকা নয়, তবে তার চেয়ে অনেক বেশী। ভগবান তাকে জুটিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তো তোকে ফিরে পেলাম। তা না হলে হয়তো—এই যে নাম করতে করতেই এসে গেছে। তুমি অনেকদিন বাঁচবে গোকুল-কাকা।

গোকুলের কানে বোধহয় সে কথা গেল না। দিলীপের দিকে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত তাকিয়ে থেকে বলল, কী সব্বোনাশ! তুমি এখানে কী করছ?

দিলীপ উত্তর না দিয়ে হাসতে লাগল। নির্মলাও মৃদু হেসে বলল, আমার খোকা।

"অ্যাঁ"—গোকুলের মাথার ভিতরটা যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। খানিকক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে নির্মলার মুখের পানে চেয়ে থেকে বলল, এই তোমার খোকা! যে হারিয়ে গিয়েছিল? আর যার পথ চেয়ে—এবার বুঝলাম, কেন তুমি কিছুতেই এবাসা ছাড়তে রাজী হওনি।

নির্মলা অভিভূতের মত বসে রইল। গোকুল বলল, হবে না? তোমার যে পুণ্যির শরীর মা। ঠিক জানতে একদিন না একদিন খোকা তোমার এখানেই ফিরে আসবে। আর, কী কাণ্ড দ্যাখ। দুটো দিন দেরি হলে বাবু এসে তোমার দেখা পেত না।

—'অবাক হয়ে শুধু সেই কথাই ভাবছি'—তন্ময় সুরে বলল নির্মলা। 'আবার কোথায় চলে যেতাম!'

—যাবার জো থাকলে তো যাবে? ঐ ওপরে বসে একজন কলকাঠি নাড়ছে না? সে সব জানে। ঠিক সময় বুঝে কলটা টিপে দিয়েছে।

গোকুলের দার্শনিক আলোচনা কতক্ষণ চলত, বলা যায় না। দিলীপ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। মাকে বলল, তুমি তাহলে কখন যাচ্ছ, বল।

—গোকুল-কাকা যখন এসে গেছে, এখনও যেতে পারি। কিন্তু এত কাল পরে তুই এলি— বাকীটা অসম্পূর্ণ রইল।

—কোথায় যাবার মতলব করছ তোমরা? জিজ্ঞাসা করল গোকুল।

—তুমি তো চেন। আমাদের ঠিক উল্টোদিকে প্রফেসরবাবু আছেন না?

—যেনার অসুখ?

—হ্যাঁ; ও'কে দেখতে।

—উনি বুঝি তোমাদের কেউ হন?

দিলীপ মায়ের মুখের দিকে তাকাল। নির্মলা জবাব দিল, একেবারে আপনা-আপনির মধ্যে।

—মানুষটা বড় ভালো। এখন ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে উঠলে তবে তো? যা ভারী ব্যামো। মেয়েটার কী কষ্ট! আহা, মা নেই, বাপ পড়ে আছে বিছানায়। যেমন দেখতে, তেমনি স্বভাব। তোমার 'জয়নগরের' আরেক ভক্ত গো।

বলতে বলতে বৃদ্ধের শীর্ণ মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দিলীপের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সস্নেহ দৃষ্টি বুলিয়ে একগাল হেসে বলল, তোমার খোকার সঙ্গে বেশ মানায়।

দিলীপ চমকে উঠল। গোকুলের দিকে চেয়ে মুখখানা প্রথমে একটু ফ্যাকাশে

এবং সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। এই ভাবান্তর পাছে মায়ের চোখে ধরা পড়ে যায়, কিংবা কাণ্ডজ্ঞানহীন বন্ধু আবার কী বলে বসে, এই ভয়ে ব্যাপারটাকে তৎক্ষণাৎ চাপা দেবার জন্যে রীতিমত ধমকের সুরে বলে উঠল, আচ্ছা, তুমি এবার থামো দিকিন। খুব হয়েছে।

'ডাক্তার! তুই ডাক্তার হয়েছিস খোকা?' বিস্ময় ও আনন্দের সুরে বলল নির্মলা।

—তুমি ক্ষেপেছ! বুড়ো আমাকে ঠাট্টা করছে।

'ঠাট্টা কী রকম!' সগর্জন প্রতিবাদ জানাল গোকুল দাস, 'ডাক্তারি পড় না তুমি? তবে, ঐ মড়ার হাড়গুলো দিয়ে কী কর?'

"তোমার খোকার সঙ্গে বেশ মানায়"

গোকুল সমান তালে জবাব দিল, কেন? অন্যায়টা কী বললাম! বেশ তো; মা যখন যাচ্ছে, নিজের চোখেই দেখতে পাবে। তুমিও তো বাপু ওদের জন্যে কম করনি। সব্বাই বলছে, তুমি না হলে বাবুকে বাঁচানোই যেত না। জানো মা, ছেলে তোমার এরই মধ্যে বেশ ভালো ডাক্তার হয়ে উঠেছে।

'খেলা করি', বলে হো হো করে হেসে উঠল দিলীপ, এবং মায়ের মুখে চোখ পড়তেই হঠাৎ থেমে গেল। নির্মলার চোখ দুটো কখন সজল হয়ে উঠেছে, ওরা কেউ দেখতে পায়নি। কাছে সরে এসে ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ধরা-ধরা গলায় বলল, তুই ডাক্তার হবি, ও'র মনেও সেই সাধ ছিল। কতদিন বলেছেন, খোকা যদি বাঁচে ওকে ডাক্তারি পড়াবো। পাশ করে গাঁয়ে গিয়ে বসবে। ও-তল্লাটে একজনও ভালো ডাক্তার নেই। কত লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। খোকা তাদের বাঁচিয়ে তুলবে।

বলতে বলতে যেন সেই বহু দূরে পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার শোনা গেল সেই ভাঙা ভাঙা মৃদু স্বর—'ঐ গাঁ ছাড়া যেন আর কোনো কথা নেই। একটি দিনের তরেও সে জীবনটাকে ভুলতে পারেননি। সেখান থেকে টেনে এনে আমিই তো এতবড় সর্বনাশটা ঘটালাম। আজ যদি থাকতেন,—'

দুচোখের জল আর বাধা মানল না। চারদিকের সমস্ত আবহাওয়াটাই বদলে গেল। সব কথা ভুলে শুধু সেই অশ্রু-সিক্ত সকরুণ মুখখানার পানে চোখ দুটি অসমবয়সী নীরব দর্শক স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

আগে চেপে রাখলেও শেষ পর্যন্ত দিলীপকে বলতে হল, গত রাতে সে না বলে হঠাৎ চলে এসেছে, এবং এ বেলায় ফিরে না গেলে মাস্টারমশাই হয়তো পুলিশে খবর দিয়ে বসবেন। নির্মলা চমকে উঠল, বলিস কি! সারারাত ছিলি কোথায়? দিলীপ এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। গোকুল দাস বুঝল, এ অবস্থায় ছেলেকে না খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া নির্মলার পক্ষে অসম্ভব। তাই মুস্কিলআসানের ভারটা নিজের হাতে নিয়ে নিল। বলল, আচ্ছা, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তো ঐ দিকেই যাচ্ছি। বুড়ো মাস্টার-বাবুকে খবরটা দিয়ে দেবো। তুমি খেয়ে-দেয়ে একটা ঘুম দিয়ে নাও।

নির্মলাকে বলল, তোমার ভাঁড়ার কী বলে? বাজার-টাজার কিছু করতে হবে না?

—আর সব আছে। শুধু যদি একটু মাছ—

—'মাছ-টাছ-লাগবে না', বাধা দিয়ে বলে উঠল দিলীপ।

—তাহলে খাবি কি দিয়ে?

—কেন, আর যা রাঁধবে? মাছ অনেক-দিন ছেড়ে দিয়েছি।

—ওমা! সে কি কথা! মাছ ছেড়েছিস কেন?

—যেখানে ছিলাম, তোমার মত কেউ রাঁধতে পারলে তো।

নির্মলার মুখে একটা ম্লান ছায়া

পড়ল। 'যেখানে ছিলাম' কথাটার মধ্যে যে দীর্ঘ ইতিহাস চাপা দেওয়া আছে, তার কিছুই এখনো সে জানে না। তবু ঢাকাটা খুলতে কেমন ভয় ভয় লাগে। কে জানে হয়তো তার সবখানিই দুঃখ-বেদনায় ভরা।

।। আঠারো ।।

কপালের উপর একখানা অচেনা হাতের মৃদুস্পর্শ লাগতেই তন্দ্রা ভেঙে গেল। বিজন চোখ মেলে প্রথমটা যেন ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। পরক্ষণেই রোগ-ম্লান মুখে একটুখানি হাসির দীপ্তি ফুটে উঠল। বললেন, কখন এলে?

'এই আসছি,' শান্ত মৃদু-স্বরে বলল নির্মলা।

—দিলীপ কোথায়?

—নীচে, কোথায় গেল।

—তুমি তাহলে সেই বাড়িতেই ছিলে? খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি?

—খানিকটা ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে।

কয়েকটি মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে যাবার পর আবার বিজনের গলা শোনা গেল, আমি জানতাম, তুমি আসবে।

নির্মলা বলতে যাচ্ছিল, আপনি তো আমাকে আসতে বলেননি। বলল না। যে দিনগুলো কবে কোন্ বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গেছে, এই ছোট্ট একটুখানি অভিমানের ছোঁয়া দিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে কী লাভ? তাই অন্য কথা পাড়ল। বলল, আপনার কাছে আমি চিরদিনের তরে ঋণী হয়ে রইলাম।

—ঋণী! আমার কাছে! কী বলছ তুমি?

—আপনি আমার খোকাকে এনে দিয়েছেন।

—এবার তুমি হাসালে নির্মলা। এর মধ্যে আমার অংশ কোনখানটায়? আমি কী করলাম?

—আপনার হাতেই তো আমি তাকে ফিরে পেলাম।

—সে সব কিছু নয়। তবে কী অদ্ভুত যোগাযোগ! তাই নয়?......বলে একটু হাসলেন। সে হাসি বাঙ্ময়। অতীত দিনের অনেক কথা তার মধ্যে ফুটে উঠল। নির্মলা চুপ করে রইল। বিজন আবার বললেন, তুমি নিজে থেকে না এলে আমি তোমাকে ডেকে পাঠাতাম। ......তোমার কাছে আমার যে একটি ভিক্ষা আছে, নির্মল।

ভিক্ষা! নির্মলা সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। তার জানা আছে, অসুস্থ মানুষের সংযমের জোড়গুলো আলগা হয়ে যায়। সেই ফাঁক দিয়ে মনের তলাকার কোন্ নিগূঢ় কথা এতকাল পরে এই প্রৌঢ় মানুষটির মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে কে জানে? তাই বলে বাধা দিতেও মন সরল না। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু না; মিথ্যা আশঙ্কা করেছিল নির্মলা। বিজন সেদিক দিয়ে গেলেন না। অসুস্থ হলেও বিগত দিনের রঙীন স্মৃতি যেখানে তোলা আছে সে কক্ষের অর্গল আজও অটুট রয়ে গেছে। এ আবেদন পিছনের দিকে চেয়ে নয়, ভাবীকালের দিকে চেয়ে। চোখের কোণটা অন্দরের দিকে ফিরিয়ে মেয়েকে ডাকলেন, আলো.........

কাছেই কোনোখানে বোধহয় সে অপেক্ষা করছিল, ধীরে ধীরে খাটের পাশে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াল।

"দিলীপের মা। তোমারও মায়ের মত। তোমার বড়মার ছোট বোন। প্রণাম কর।"

আলো চকিতে একবার নির্মলার মুখের পানে চেয়ে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে বসে পড়ে পায়ের ধুলো নিল। নির্মলা ওকে দুহাতে তুলে বুকে চেপে ধরল। তারপর চিবুকে হাত দিয়ে বলল, বাঃ, মুখখানা তো ভারী সুন্দর। আলো তো সত্যিই আলো।

বিজনের হঠাৎ মনে পড়ল, নামটা ওর মায়ের দেওয়া। হয়তো অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে ঐ আলোর রশ্মিটুকু আশ্রয় করেই সে বাঁচতে চেয়েছিল। পারেনি। একটা উদ্গত নিঃশ্বাস বুকে চেপে নিয়ে বললেন, ওকে আমি তোমার হাতে দিতে চাই নির্মলা। ওর মা নেই। তুমি ওর সেই অভাব পূরণ কর।

'তা, বেশ তো,' আলোর আনত মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি রেখে বলল নির্মলা, 'আপনি যদি দেন, আমি ওকে আমার খোকার বৌ করে নেবো।'

কথাটি কানে যাওয়া মাত্র আলো তার লজ্জারুণ মুখখানা নির্মলার বুকে লুকিয়ে ফেলল। বিজন নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার জীবনের সব চেয়ে গুরু-ভার তুমি নামিয়ে দিলে, নির্মলা। ওকে আমি নিজে হাতে করে অত বড় করে তুলেছি। আশা করি, তোমার স্নেহের মর্যাদা রাখতে পারবে। আর......বলে আড় চোখে মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, মন্দুরে জানি, তোমার ছেলেও ওকে পছন্দ করেছে।

লজ্জায় মরে গিয়ে আলো তার মুখটা আরো জোরে চেপে ধরল নির্মলার বুকে। নির্মলা তাকে জড়িয়ে ধরে প্রতি-বাদের সুরে বলল, আর ও? মেয়ে বলে ওর বুঝি পছন্দ অপছন্দ নেই?

—আমি তো ছেলের দিকটাই দেখবো। মেয়ের ভার তোমার। ইচ্ছে করলে জিজ্ঞেস করতে পার।

—জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? আমার কি চোখ নেই?

এর পরে আলোর পক্ষে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। নির্মলার হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়ে বাঁচল।

বাইরের বারান্দায় ভারী গলার আওয়াজের সঙ্গে লাঠি ঠোকার শব্দ কানে যেতেই নির্মলা তাড়াতাড়ি ভিতরের দরজা দিয়ে অন্দরের দিকে প্রস্থান করল। দুজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে ঢুকলেন। ঘরের মাঝামাঝি এসেই একজন বেশ জোরে হেঁকে উঠলেন, কেমন আছেন, প্রফেসর ব্যানার্জি?

—'আসুন; আছি একই রকম।' বলে বিজন ডান হাতটা কপালে ঠেকালেন। ও'রা দুখানা চেয়ার দখল করলেন। যিনি এই মাত্র কুশল প্রশ্ন করছিলেন, এবার মুখখানা বিকৃত করে মাথা নেড়ে বললেন, হুঁ-উ; সেকেন্ড অ্যাটাক তো। যাকে বলে দ্বিরাগমন। সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া শক্ত। প্রাণটা রেখে গেলেও একটা অঙ্গ না নিয়ে ওরা ছাড়েন না। তা', বাঁ দিকটা এবার নাড়তে-চাড়তে পারছেন?

বিজন মাথা নেড়ে জানালেন, 'না।' এই সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি বক্তার দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করলেন। বোধ হয় খেয়াল করিয়ে দিলেন যে, এই সব রোগীর মুখের উপর ঐ ধরনের অপ্রিয় সত্য প্রকাশ না করাই সমীচীন। ইঙ্গিতটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। তিনি আগের মতই উচ্চকণ্ঠে রায় দিলেন, আমার তো মনে হয় না, ইউ উইল গেট ব্যাক ইউর নর্মাল মুভমেন্ট্স্, এই দেখুন না, আমার ভায়রা ভাই-এরও ঠিক আপনার অবস্থা। ছমাস হয়ে গেল। নো ইমপ্রুভ্-মেন্ট্।

—'তা হতে পারে' ভর্ৎসনার সুরে

বললেন দ্বিতীয় ভদ্রলোক, 'তবে ও'র কেস্ আলাদা। ডাক্তার দাশগুপ্ত যখন বলেছেন'—

—আরে রেখে দিন আপনার ডাক্তার দাশগুপ্ত। ওরা কী জানে? কতগুলো মুখস্থ বুলি আউড়ে যায়। আমার তো মনে হয়, প্রফেসর, আপনি একজন ভালো কবরেজ দেখালে পারেন।

—'কবরেজ কী করবে?' এবার দ্বিতীয়ও বেশ জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'এসব হচ্ছে নতুন রোগ। আয়ুর্বেদে উল্লেখ পর্যন্ত নেই।'

—আছে, আছে। এরই নাম সন্ন্যাস-রোগ। ডাক্তারবাবুরা নতুন নাম দিয়েছেন থ্রম্বসিস্।

—না, মশাই, সন্ন্যাস আলাদা জিনিস। •

তর্ক তুমুল হয়ে উঠল। দুজনেই সম্ভ্রান্ত এবং প্রবীণ প্রতিবেশী। কিন্তু স্থান, কাল, পাত্র—কোনো জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া গেল না। বিজন অসহায় নীরব শ্রোতা। মনে মনে প্রবলভাবে অনুভব করলেন, এই মুহূর্তে এদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া উচিত। কিন্তু সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের সৌজন্যবোধ তাঁর কণ্ঠ চেপে ধরল। ভদ্রসমাজে বাস করে এই সব ভদ্রতার দণ্ড দুঃসহ হলেও না মেনে উপায় নেই।

ভিতরের দিকের বারান্দায় একখানা জলচৌকি ছিল। নির্মলা গিয়ে দাঁড়াতেই আলো তার উপরটা আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বলল, বসুন।

—এটা বুঝি তোমার ঘর? পাশের কামরাটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল নির্মলা।

—হ্যাঁ।

ভিতরে ঢুকে ভারী খুশী হল। সব কিছু গোছানো-সাজানো ছিমছাম। তার ঠিক পাশেই আর একখানা ঘর; খালি, কিন্তু ঝাড়া-পোছা পরিষ্কার। পেরিয়ে গেলে আর একটা ছোট্ট বারান্দা। নির্মলা ওকে নিয়ে সব দিকটা ঘুরে দেখল।

এদিকের বারান্দায় ফিরে আসতেই আলো ছুটে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে কাঠের বাক্স খুলে একখানা নতুন পশমের আসন নিয়ে এসে পেতে দিল। তারপর তাকের উপর থেকে শ্বেত পাথরের ডিস্ ও গ্লাস পেড়ে আনতেই নির্মলা হাসিমুখে বলল, এত সব কিসের আয়োজন হচ্ছে শুনি?

—আয়োজন কিচ্ছু নয়, শুধু একটু জল মুখে দেওয়া।

—ও সব রেখে আমার কাছে এসে একটু বসো দিকিন। এ সময়ে আমি কিছু খাই না।

—বেশ, তাহলে এই ডাবের জলটুকু খেয়ে নিন।

বসে পড়ে ছুরি দিয়ে ডাবের মুখটা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, আর তার সঙ্গে—

—ওরে দুষ্টু মেয়ে! আবার 'তার সঙ্গে'ও আছে?

—শুধু একটা সন্দেশ। বলে, ডান হাতের তর্জনীটা তুলে ধরল।

নির্মলার ভারী ভাল লাগল। এইটুকু মেয়ের এই শুচি, নিষ্ঠা ও সশ্রদ্ধ আচার-জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মনে মনে বিস্মিত হল। এসব একে কে শেখাল! তারপর মনে হল, যার হয় তার আপনা থেকেই হয়। হাতে ধরে শেখাতে হয় না। ওর অনুরোধের মধ্যেও একদিকে যেমন মিষ্টি ছেলেমানুষি আর একদিকে তেমনি এমন একটা আপনজনের প্রাণের স্পর্শ ছিল, যাকে উপেক্ষা করা যায় না।

নির্মলা উঠে গিয়ে সেই পশমের আসনে বসল। আলোকে পাশে বসিয়ে একটি সন্দেশ ওর হাতে তুলে দিয়ে বলল, মাকে হারিয়েছ কদ্দিন হল?

—অনেক দিন। আমি তখন খুব ছোট। কিছুই বিশেষ মনে নেই।

—তারপর বুঝি মামাবাড়ি গিয়েছিলে?

—খুব অল্প দিন। একটু বড় হতেই বাবা গিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাইনি। মাঝে মাঝে শুধু কানপুরে গেছি বড়মার কাছে। তাও বাবার সঙ্গে।

ভদ্রলোকেরা তখন চলে গেছেন। নির্মলা যাবার আগে বিদায় নিতে গিয়ে দেখল, বিজন চোখ বুজে নিস্পন্দের মত পড়ে আছেন। গলায় একটু শব্দ করতেই চোখ মেলে তাকালেন। নির্মলা শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, সন্ধ্যা হয়ে এল। আজকে তাহলে আসি?

—আবার কবে আসবে?

—দেখি, কবে পারি।

—শুনলাম, কয়েক দিনের মধ্যেই তোমাকে বাসা বদল করতে হবে। সি, আই, টি নোটিশ দিয়েছে।

—আপনাকে এ খবর কে দিলে?

—আমার অনেক গোয়েন্দা আছে, জানো না?

—বুঝেছি, এ নিশ্চয়ই গোকুল-কাকার কাজ।

—লোকটি বড় ভালো। এদিকে যখনই আসে, আমার সঙ্গে দেখা না করে যায় না।...... বাসা কি ঠিক হয়ে গেছে?

—সে-ই একটা মোটামুটি ঠিক করে রেখেছে; আমি এখনো দেখিনি।

—একটা কথা বলবো? কিছু মনে করবে না?

নির্মলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল. দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে উদাস হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে সেই দিকে চেয়েই বলল, আমি জানি, আপনি কী বলবেন। কিন্তু সে হয় না, বিজনদা।

—'কেন হয় না নির্মল?' গাঢ় স্বরে বললেন বিজন, 'আমার আলোকে যখন তুমি বুকে স্থান দিয়েছ, তখন এ বাড়ি-ঘর সবই তো তোমার? তোমার ছেলে-মেয়ের। আমি একটা অচল পদার্থ মাত্র। অকেজো আসবাবের মত এক পাশে পড়ে থাকবো।

নির্মলার মুখে কতকগুলো যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠল। এদিকটায় আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল বলে বিজনের চোখে পড়ল না। আগেকার সূত্র ধরে আরো কি যেন তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমি এখন যাই।

অস্ফুটে এই কটি কথা বলেই সে একরকম ছুটে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। বারান্দায় কোনো লোক ছিল না। সেই-

খানে দাঁড়িয়ে মনে হল, এই মুহূর্তে পালিয়ে না এলে সে হয়তো নিজেকে আর শক্ত করে ধরে রাখতে পারত না। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। মনে হল, এতক্ষণে পা দুটো তাদের হারানো জোর ফিরে পেয়েছে।।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। দিলীপ এসে কখন কাছে দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পারেনি। 'মা' বলে ডাকতেই চমকে উঠল। বলল, গাড়ি এসেছে?

—এসেছে; চল।

নীচে নামতেই বাহাদুর এসে প্রণাম করল। নির্মলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দিলীপের মুখের পানে তাকাতে সে বলল, আমার বাহাদুরদা। আমরা দুজনেই যাচ্ছি তোমাকে পৌঁছে দিতে। ওখানে গিয়ে সব কথা বলবো।

—চল বাবা, বাহাদুরকে বলল নির্মলা। 'আমিও তোমাদের সব কিছু শুনবার জন্যে ছটফট করে মরছি। ওরা কারা?'

রাস্তার ঠিক ওপারে প্রেস-এর ছেলেরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। দিলীপ বলল, ওরা আমার বন্ধু।

—ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

বাহাদুর বলল, আপনার কাছে আসতে চায়, কিন্তু ঠিক সাহস পাচ্ছে না।

—কেন?

—বর্টালের ছেলে কিনা?

—কার ছেলে?

—বর্টাল......মানে...... জেলে ছিল এক সময়ে।

'জেলে ছিল!' অনেকটা আপন মনে এই দুটি কথা উচ্চারণ করে বিস্ময় ও আগ্রহভরা চোখ মেলে নির্মলা সেই ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। কেমন যেন মায়া হল চেয়ে চেয়ে। ধীরে ধীরে চোখ দুটোও করুণ হয়ে উঠল। বাহাদুরের দিকে ফিরে বলল, তা যেখানেই থাক বাবা, আর যার ছেলেই হোক, আমার খোকার যখন বন্ধু, তখন ওরাও আমার ছেলের মত। ওদের আমার কাছে আসতে বল।

বাহাদুর ইশারা করতেই সমস্ত দলটা হুড়মুড় করে এবাড়িতে এসে উঠল। একে একে এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল দিলীপের মাকে। নির্মলা কাউকে মাথায় হাত দিয়ে, কারো চিবুক স্পর্শ করে আদর করল। বলল, আমি আরেক দিন এসে, তোমরা যেখানে থাক, দেখতে যাবো। অনে-ক গল্প করবো তোমাদের সঙ্গে। আজ আসি, কেমন?

কেশব দাঁড়িয়েছিল সামনের দিকে। বলল, শুধু গল্প নয়, আমাদের একদিন খাওয়াতে হবে, মা-মণি। দিলীপের কাছে শুনেছি, আপনার হাতের রান্না একবার খেলে আর ভোলা যায় না।

সকলে হেসে উঠল। নির্মলাও হাসি-মুখে বলল, বেশ তো, সে আর বেশী কথা কী। কদিন যাক; তারপর একদিন তোমাদের রান্না করে খাওয়াবো।

রঘু এসেছিল দরজা বন্ধ করতে। নির্মলার পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে বলল, আপনি এসেছেন মা, আর বাবুর অসুখ অর্ধেক ভালো হয়ে গেছে। আবার কবে পায়ের ধুলো দেবেন?

—আসবো, বাবা। শীগগিরই আসবো। তোমরা খুব সাবধানে থেকো। ওঁর দিকে সব সময়ে নজর রেখো।

ঘোড়ার গাড়ির পেছনের সীটে বসল নির্মলা, সামনে ওরা দুজন। যেতে যেতে বাহাদুর বলল, মায়াটা এখানে থাকলে কত আনন্দ করত! কালই তাকে লিখে দেবো তাড়াতাড়ি চলে আসতে।

—মায়া কে?

—আমার বোন।

—আমার দিদি, সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল দিলীপ। পুরো নাম শুনলে তুমি চমকে উঠবে। রণময়া।

নির্মলা সকৌতুকে বলল, কেন, কথায় কথায় রণ-মূর্তি ধরে বুঝি?

ওরা দুজনে হেসে উঠল। নির্মলা বলল, তা হোক। আমার কাছে একদিন এলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কলারসিক
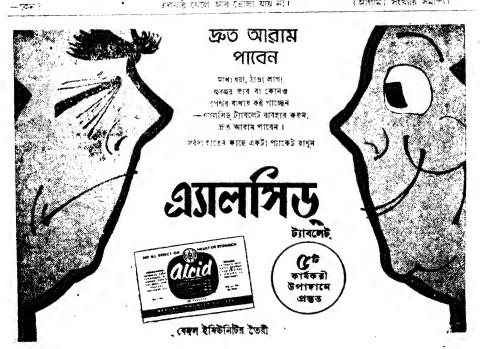
॥ শিল্পী অরুণ বসুর একক প্রদর্শনী ॥

সমকালীন শিল্পী সংস্থার অন্যতম প্রধান শিল্পী অরুণ বসুর একক চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে থিয়েটার রোডের অশোকা গ্যালারী তাঁদের মাসাধিক কালের বিরতিতে ছেদ টেনেছেন। কলকাতার শিল্প-রসিক মানুষেরা এ-সংবাদে হয়তো খুশী হবেন।

আবার প্রদর্শনী চালু হয়েছে, আমরা শুধু সে জন্যে খুশী নই। শিল্পী অরুণ বসুর এই প্রদর্শনীতে খুশী হবার মত চিত্র-নিদর্শনের প্রাচুর্য দেখেও বিস্মিত হয়েছি। সমকালীন শিল্পী-সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সম্মিলিত চিত্র-নিদর্শনের প্রাচুর্য দেখেও বিস্মিত হয়েছি। সমকালীন শিল্পী-সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সম্মিলিত চিত্র-প্রদর্শনীতে অরুণবাবুর একাধিক চিত্র আমরা একাধিকবার দেখেছি। কিন্তু এবারের চিত্র-প্রদর্শনীতে যে পরিণত শিল্পীকে আবিষ্কার করলাম, যে পরিমিতি বোধ, যে শিল্প-চেতনা, যে আঙ্গিক-নৈপুণ্য এবং ব্যক্তিত্ব প্রতিটি চিত্রকে ঘিরে মূর্ত হয়ে উঠেছে—এমনটি ইদানীংকালের কোনো তরুণ শিল্পীর প্রদর্শনীতে খুঁজে পাইনি। বাঙলা দেশের চারু-চিত্রের ঐতিহ্যকে যখন নতুন প্রতিভা এসে নতুনতর কোনো দানে সমৃদ্ধ করে তুলছেন না বলে আমরা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছি তখন শিল্পী অরুণ বসুর প্রদর্শনী আমাদের মনকে আশ্বস্ত করার মত প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছে।

অরুণ বসু আধুনিক শিল্পী। তাঁর চিত্র কোনো গল্প বলে না। কাহিনীকে চারুময়তা দান করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। কোনো মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানুষ কিংবা জন্তু যে নির্বিশেষ অবয়বের সাহায্যে তার চেতনাকে প্রকাশ করে অরুণবাবু তারই রূপমুগ্ধ শিল্পী। রেখার বন্ধন আর চাপ্টা রঙ-প্রয়োগের আশ্চর্য নৈপুণ্যে শিল্পী বসু শুধু চোখকে তৃপ্তি দেন না, আমাদের বোধির জগতকেও জাগ্রত করেন। এই অর্থেই, এবং যতদূর মনে হয়েছে এই প্রেক্ষাপটেই তিনি আধুনিক শিল্পী। অথচ, তাঁর জীব-জন্তুর অবয়ব গঠন আদিমতার অনুসারী হয়েও সচেতন শিল্পী-মনের স্বাক্ষর-দীপ্ত।

আলোচ্য চিত্র-প্রদর্শনীর ১৫ খানি চিত্র বিশ্লেষণ করলেই আমাদের উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রমাণ করা যায়। যেমন, অরুণবাবুর 'বালক এবং ঘুড়ি' চিত্রখানি লাল আর হলুদের মিশ্রণে গঠিত জমিনে এমনভাবে সংস্থাপিত হয়েছে এবং নির্জীব ঘুড়ির অবয়বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সজীব বালকটিকে এমনভাবে অঙ্কন করা হয়েছে, যাতে মনে হয় একের চেতনা অন্যের সর্বাঙ্গে প্রতিফলিত। 'কুকুর বিক্রেতা' (১), 'বংশীবাদক' (২), 'গায়ক' (৬), 'মৃৎশিল্পী' (১৪) প্রভৃতি চিত্র এমনি চেতনারই ফসল। সজীব এবং নির্জীব, দেহ এবং চিন্তা-প্রবাহ—এই দুইয়ের ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্ত রূপ বলিষ্ঠ রেখাকে ভিত্তি করে, কখনো জ্যামিতিক প্যাটার্নে, কখনো চাপ্টা রঙের আস্তরণে, কখনো বা ক্যানভাসের উপর শুধুমাত্র চিত্র-সংস্থাপনের গুণে এমনভাবে প্রকাশমান, যার প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়।

'ষাঁড়' (২), 'ছাগল ও কাক' (৩১), 'ছাগল' (৫) কিংবা 'বিড়াল' (১১)—এই চিরপরিচিত জন্তুগুলিকে শিল্পী শুধুমাত্র তাঁর বলিষ্ঠ রৈখিক বন্ধনে এমনভাবে বিধৃত করেছেন যা আমাদের আদিম শিল্পকলার কথাকে স্মরণ করিয়ে দিলেও অন্য কিছু বলে চিনে নিতে ভুল হয় না।

'মানুষ' (১৩) চিত্রখানিতে অরুণবাবু এমন নিপুণভাবে রঙ প্রয়োগ করেছেন যে, প্রতিটি দৃশ্য এবং আলো-ছায়া সেই রঙে উদ্ভাসিত। এই প্রদর্শনীর 'লাল কলস' (৮) চিত্রখানিই শুধু আমাদের তৃপ্তি দিতে অসমর্থ হয়েছে। মনে হয়েছে, এটি ভীষণভাবে 'ডেকরেটিভ' এবং কষ্ট-কল্পিত প্যাটার্নে বাঁধা।

প্রদর্শনীটি আগামী ২৯শে জুলাই সকাল ১০টা থেকে ১টা এবং বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

বিড়াল

মানুষ ও পাখি

শিল্পী ঃ অরুণ বসু

॥ অভিশপ্ত নগরী ॥

বহু বিশেষণে বিভূষিত কলিকাতা নগরীর বোধ হয় সবচেয়ে বড় পরিচয় এইটাই। তার সমাজ-জীবন, তার স্বাস্থ্য, তার শিক্ষা-ব্যবস্থা সবই যেন দারুণ অভিশাপে অভিশপ্ত। অনিয়ম, অব্যবস্থা, ঔদ্ধত্য ও অরাজকতা স্থায়ী আসন লাভ করেছে তার অস্তিত্বের সর্বক্ষেত্রে। মৃত্যু হয় এখানে পথ-দুর্ঘটনায়, হয় চিকিৎসার অব্যবস্থায়, হয় বন্দ্যাছেঁড়া ভয়ঙ্কর মহামারীতে। অথচ তার যে শুধু প্রতিকারই হয় না তা নয়, প্রতিকারের সদিচ্ছা নিয়ে কেউ অগ্রসর হলেও পদে পদে বাধা পেয়ে শেষ পর্যন্ত নিতান্ত নিরুপায়ের মত তাকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। আর এই অন্যায়ের মূল্য দিতে দলে দলে প্রাণ হারায় তারাই যাদের জন্যে চিন্তা করার মত কোন মানুষ আজ বোধ হয় এ মহানগরীর কোন কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত নেই।

সম্প্রতি মহানগরী কলেরা মহামারীর ভয়ংকর কবলে। পরিশুদ্ধ জলের অভাব, পরিচ্ছন্ন বাসভূমির অভাবে, উপযুক্ত পথ্যের অভাবে সংখ্যাতীত মানুষকে এখানে প্রতি বছরই কোন-না-কোন সংক্রামক রোগের বলি হতে হয়। কিন্তু এবার যেন কলেরা একটু ভয়ংকর রূপ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে। কলেরায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা এত বেড়েছে যে, পৌরকর্তৃপক্ষ তাকে মহামারী বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু মহামারী প্রতিরোধের কোন সক্রিয় ও সার্থক ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন বলে মনে হয় না। রাস্তায় এখনও স্তূপীকৃত আবর্জনা, মৃত্যুর হার এখনও অপ্রতিহত। এ অবস্থায় রাজ্যসরকারের পক্ষে আর নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা সম্ভব হয়নি তাই রাস্তার আবর্জনা অপসারণ ও কলেরা-নিরোধ অভিযানের দায়িত্ব তাঁরা নিজের হাতে তুলে নেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। একজন স্পেশ্যাল অফিসারকেও নিযুক্ত করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত কলিকাতা পৌরসভার কাছে এই সরকারী সিদ্ধান্ত অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে হয়েছে, তাঁদের স্বাধিকারের ওপর এটা সরকারী হস্তক্ষেপ বলে অভিযোগ করেছেন মহামান্য পৌরপিতারা। তবু আশার কথা যে, এই অক্ষমের অভিমানে, ব্যর্থের আস্ফালনে বিচলিত হননি রাজ্যসরকার। মহানগরীর আবর্জনা অপসারণের উদ্দেশ্যে ১৮ই জুলাই রাজ্যপাল এক আদেশ-বলে

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর এক হাজার লোককে নিযুক্ত করেছেন। একটি লরীবাহিনীকেও এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যসরকার কর্তৃক নিয়োজিত এই সব লোক ও লরী স্পেশ্যাল অফিসারের নির্দেশে কাজ করবেন, যদিও তাঁদের উপর আনুষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পৌরসভার।

পৌরসভার পক্ষ থেকে অনেক কিছু বলার থাকতে পারে এবং সবই হয়ত তার অযৌক্তিক নয়। কিন্তু সে-সব অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যে সময়টি তাঁরা বেছে নিয়েছেন তা অত্যন্ত অনভিপ্রেত। আমরা এখনও আশা করব, পৌরসভা রাজ্যসরকারের কাজে সহায়তা করবেন এবং তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে এই শহর আপাতত একটি অত্যন্ত শংকাজনক ও লজ্জাকর অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবে।

॥ পশ্চাদপসরণ ॥

ভারতের উত্তর সীমান্তে গলোয়ান উপত্যকায় চীনা সৈন্যবাহিনী কর্তৃক একটি ভারতীয় ঘাঁটি অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে অকস্মাৎ যে দুর্যোগের কালো-মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল শেষ মুহূর্তে চীনাবাহিনীর অপসারণের ফলে তা সাময়িকভাবে অপসারিত হয়েছে। প্রথমে চীনারা গলোয়ান উপত্যকার ঐ এলাকাটি চীনের অন্তর্ভুক্ত অংশ বলে দাবী করেছিল এবং তাদের প্রকাশিত মনোভাবে মনে হয়েছিল সহজে তারা ও অঞ্চল ত্যাগ করে যাবে না। অথচ ভারতের সমতলের সঙ্গে প্রায় সংযোগহীন সতের হাজার ফুট উর্ধে ঐ তুষারাচ্ছন্ন পর্বতশৃঙ্গে তখন ভারতীয় সৈনিকের সংখ্যা ছিল অর্ধশতেরও কম। হঠাৎ চীনারা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলে হয়ত তাদের কারও পক্ষেই জীবিত থাকা সম্ভব হত না। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যরা ঐ অবস্থাতেও যে সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও শৌর্যের পরিচয় দেন তাতে চীনা সৈন্যদের পক্ষে পশ্চাদপসরণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কারণ আরও অগ্রসর হতে হলে যে বড় রকমের যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হত তার জন্যে চীনারা বর্তমানে প্রস্তুত নয়। অর্ধশত ভারতীয় সৈন্যের এই দৃঢ়তার সম্মুখে পাঁচ-ছয়শত চীনা সৈন্যের পশ্চাদপসরণ আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের বীর সীমান্তরক্ষীদের আরও বেশী অনুপ্রাণিত করতে পারবে। গলোয়ান উপত্যকার ভৌগলিক ও সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম, তার কোন অংশ চীনা-কবলিত হ'লে ভারতের উত্তর সীমান্ত গুরুতরভাবে বিপন্ন হবে। আশা করি ভারত সরকার তা কখনোই হতে দেবেন না।

॥ ফরাসী শাসনের অবসান ॥

কার্যতঃ ভারতে ফরাসী শাসনের অবসান অনেকদিন আগে হলেও আইনত অবসান হ'ল এতদিনে। চন্দননগরের শাসন দায়িত্ব ফরাসী সরকারের হাত থেকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে আসে ১৯৫১ সালে। ফরাসী সরকার-আয়োজিত গণভোটের মাধ্যমে চন্দননগরবাসীরা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে বলে চন্দননগরের শাসনদায়িত্ব আইনগতভাবে ভারতের হাতে তুলে দিতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। কিন্তু মাহে, কারিকল ও পন্ডিচেরী ফরাসীরা ১৯৫৪ সালে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে চলে গেলেও এতদিন পর্যন্ত ফরাসী জাতীয় সংসদের অনুমোদনের অভাবে তা আইনসিদ্ধ হতে পারেনি। সম্প্রতি ফ্রান্সের জাতীয় সংসদে ভারতস্থ ফরাসী উপনিবেশ হস্তান্তর বিল অনুমোদন লাভ করায় প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশগুলির ভারতীয় ইউনিয়নের অংগীভূত হওয়ার পথে সকল বাধা অপসারিত হল। চন্দননগর এখন যেমন পশ্চিমবংগের অংগীভূত, অনতিবিলম্বে পন্ডিচেরী, মাহে, কারিকলও

হয়ত অনুরূপভাবে মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

॥ পূর্ববঙ্গে ছাত্র বিক্ষোভ ॥

আবার সারা পূর্ববঙ্গের ছাত্র-সমাজ আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এবারের বিক্ষোভের প্রত্যক্ষ কারণ চট্টগ্রামের ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচালনা। চট্টগ্রামবাসী ফজলুল কাদের চৌধুরী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর স্বস্থানে এসেছিলেন, গুণমুগ্ধদের কাছ থেকে বিপুল সম্বর্ধনার আশায়। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, সম্বর্ধনা তাঁর জোটেনি। তার বদলে হাজারে হাজারে ছাত্র ও যুবক-দল ছুটে এসেছিল কৃষ্ণপতাকা হাতে নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে। মন্ত্রীমশাইর তাতে ধৈর্যচ্যুতি হয় এবং তারপরেই অনিবার্যভাবে নেমে আসে প্রচণ্ড পুলিশী নির্যাতন। লাঠির আঘাতে প্রায় একশত যুবক আহত হয় এবং তাদের অনেককেই শুশ্রূষার জন্যে হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

ফজলুল সাহেব নাকি নির্বাচনের সময় এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দেশবাসীকে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের দাবী পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন না। কিন্তু নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি তাঁর পূর্বপ্রতিশ্রুতি ভুলে যান। স্বভাবতই তারপর খাদ্যমন্ত্রীরূপে তিনি যখন চট্টগ্রামে আসেন তখন অন্নক্লিষ্ট, বন্যাপীড়িত চট্টগ্রামবাসী ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে পারেননি। গত ৮ই জুলাই ঢাকায় পূর্ববঙ্গের সকল রাজনৈতিক দলের মিলিত উদ্যোগে যে বিরাট জন-সভা হয় তা থেকেও মন্ত্রীমশাইদের বোঝা উচিত ছিল যে, দেশের অবস্থা এখন তাঁদের সম্বর্ধনার উপযোগী নয়। কিন্তু তবুও ফজলুল সাহেব গিয়ে-ছিলেন চট্টগ্রামে, ক্ষমতাবানের সঙ্গসুখ-লাভে আগ্রহী অন্তত কিছু মানুষের সম্বর্ধনার আশায়।

চট্টগ্রামে পুলিশী তাণ্ডব আবার সারা পূর্ববঙ্গের যুবসমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। ইতিমধ্যেই ঢাকা ও চট্টগ্রামের ছাত্ররা পুলিশী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্মঘট করেছেন এবং সমগ্র পূর্ববঙ্গব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়েছে। যে কোন কারণে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীদের বিক্ষোভ এখন যেভাবে বারে বারে ভয়ংকররূপে প্রকাশিত হচ্ছে তাতেই বোঝা যায় আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে কি সাংঘাতিক ক্ষোভ ও ঘৃণা আজ পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে জমে উঠেছে।

"ওগো, তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছো—এদিকে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করছেন ঘুমের ওষুধটায় কাজ দিয়েছে কি না!"

॥ বৃটিশ মন্ত্রিসভা ॥

দুটি মাত্র উপনির্বাচনে পরাজিত হয়ে বৃটেনের রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাহারানোর ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছেন। বর্তমান মন্ত্রিসভার বিরাট পরিবর্তন করে তিনি বোধহয় দেশ-বাসীকে বোঝাতে চেয়েছেন, তাদের রায় তিনি মেনে নিয়েছেন। মন্ত্রিসভার ষোলজন মন্ত্রীকে ইতিমধ্যেই বিদায় নিতে হয়েছে এবং সংবাদে প্রকাশ, অন্যান্য মন্ত্রীও যে কোন মুহূর্তে অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। যাঁদের মন্ত্রিসভা থেকে ইতিমধ্যেই বিদায় নিতে হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন অর্থমন্ত্রী সেলুইন লয়েড, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়ার্টকিন্স। বৃদ্ধ ম্যাক-মিলানের এই সংহার মূর্তি দেখে জনৈক রক্ষণশীল সদস্য ক্ষোভ করে বলেছেন, বৃদ্ধ ম্যাক আর আমাদের পিতৃস্থানীয় ম্যাক নন, তিনি ঘাতক ম্যাকবেথে পরিণত হয়েছেন। আর জনৈক উদারনৈতিক নেতা বলেছেন, মন্ত্রীদের এভাবে বিতাড়িত না করে ম্যাকমিলানের নিজেরই পদত্যাগ করে জনমতের প্রতি সম্মান জানানো উচিত ছিল।

॥ পেরুতে সামরিক অভ্যুত্থান ॥

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী সেখানকার রাষ্ট্রপতি প্রাদোকে পদচ্যুত করে গত ১৮ই জুলাই রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করেছেন। সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট পদের সাম্প্রতিক নির্বাচন বাতিল করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেসিডেন্ট প্রাদোর নিকট যে দাবী জানান, প্রাদো তাতে সম্মত না হওয়ায় সৈন্যবাহিনী তাঁকে পদচ্যুত ও বন্দী করে। নানা দুর্নীতির সাহায্যে প্রেসিডেন্ট প্রাদো নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন—এই ছিল সৈন্যবাহিনীর অভি-যোগ। দক্ষিণ আমেরিকায় ক্ষমতার হাতবদল সব সময়েই জনগণের ইচ্ছা-নুসারে হয়। এ ঘটনাটিও তার ব্যতিক্রম বলে মনে হয় না।

॥ ঘরে ॥

১২ই জুলাই—২৭শে আষাঢ় : 'উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য মিলিবে'—বিধানসভায় (পশ্চিমবঙ্গ) উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতির ঘোষণা—পুনর্বাসন খাতে ৬০ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়-বরাদ্দের দাবী গৃহীত।

'গালোয়ান উপত্যকাস্থিত (লাডাক) ভারতীয় সৈন্যঘাঁটি কিছুতেই ছাড়া হইবে না'—চীনা অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের দৃঢ় সিদ্ধান্ত।

১৩ই জুলাই—২৮শে আষাঢ় : 'কলিকাতা মহানগরীকে আবর্জনা ও মহামারীমুক্ত করার জন্য সরকার কৃতসংকল্প'—রাজ্য বিধানসভায় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ঘোষণা।

গালোয়ান উপত্যকা-এলাকার চীনা সৈন্যরা আর এক পা অগ্রসর হইলেই প্রত্যাঘাত হানিতে ভারতের প্রস্তুতি—আক্রমণের জন্য ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি গুলী চালনার নির্দেশ—ভারতীয় এলাকায় চীনের নয়টি নূতন ঘাঁটি সংস্থাপনের সংবাদ—গণ-চীন সরকারের নিকট ভারতের আর এক দফা প্রতিবাদলিপি।

১৪ই জুলাই—২৯শে আষাঢ় : ভারতীয় ঘাঁটি (গালোয়ান উপত্যকা) হইতে চীনা সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণ—ভারতীয় ফৌজের দৃঢ় মনোবল ও ভারত সরকারের সতর্কবাণীর জের।

'আধুনিক বিজ্ঞান ব্যতীত এশিয়ার দেশসমূহের ধ্বংস অনিবার্য'—বাঙ্গালোরে ডঃ বিশ্বেশ্বরায়া শিল্প ও প্রয়োগবিদ্যা মিউজিয়ামের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য (পরলোকগত ডাঃ রায়ের স্থলে) মনোনীত।

১৫ই জুলাই—৩০শে আষাঢ় : কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থলে 'বিধানচন্দ্র দিবস' পালন—মহান্ কর্মযোগীর (ডাঃ রায়) স্মৃতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

গালোয়ান হইতে চীনা বাহিনীর অপসারণে শ্রীনেহরুর সন্তোষ—ভারতীয় বাহিনীর শৌর্যের প্রশংসা।

করিমগঞ্জের অদূরে পাক্ সৈন্যদের ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ।

১৬ই জুলাই—৩১শে আষাঢ় : 'কর্মচারী ছাঁটাইরোধের জন্য আইন প্রণয়ন সরকারের বিবেচনাধীন'—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহারের ঘোষণা—মজুরী প্রশ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।

জাতীয় সংহতি সাধনের ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকা নিরূপণের চেষ্টা—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি নিয়োগ।

১৭ই জুলাই—১লা শ্রাবণ—ভারতীয় এলাকায় লাডাকের অভ্যন্তরে চীনাদের অন্যূন ১৩টি নূতন ঘাঁটি স্থাপন—চীন সরকারের নিকট ভারতের আর এক দফা প্রতিবাদ—ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক চীনা ঘাঁটি বেষ্টনের অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া মন্তব্য।

১৮ই জুলাই—২রা শ্রাবণ : কলিকাতা হইতে ডি-ভি-সি'র সদর দপ্তর মাইথনে স্থানান্তর আপাততঃ স্থগিত—কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি মন্ত্রী শ্রীহাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিমের নির্দেশ।

মহানগরীর (কলিকাতা) আবর্জনা অপসারণে রাজ্যপালের আদেশে জাতীয় রক্ষী বাহিনীর এক হাজার লোক নিয়োগ—পৌরসভার নিকট রাজ্য সরকারের পত্র।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন কমিশনার পদে শ্রীএস্ বি রায়।

॥ বাইরে ॥

১২ই জুলাই—২৭শে আষাঢ় : প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ (ইন্দোনেশিয়া) কর্তৃক ১৭ই আগস্ট (১৯৬২) পশ্চিম ইরিয়ানের মুক্তিঘোষণার সিদ্ধান্ত—রকেট সহযোগে ইন্দোনেশীয় গোলন্দাজবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি।

অতলান্তিকের পরপারে প্রথম টেলিভিশন চিত্র প্রেরণ—পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী মার্কিন বার্তাবহ কৃত্রিম উপগ্রহ 'টেলস্টার'-এর কৃতিত্ব।

১৩ই জুলাই—২৮শে আষাঢ় : বৃটিশ মন্ত্রিসভায় চাঞ্চল্যকর রদবদল—অর্থমন্ত্রী মিঃ সেল্উইন লয়েড সহ ৭ জন মন্ত্রীর পদত্যাগের জের—প্রধানমন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান কর্তৃক মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন।

পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত-সন্নিহিত বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘুদের (হিন্দু) উপর দুর্বৃত্ত দল ও পাক্ সৈন্যদের হামলা—দিনাজপুর, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার স্থানে স্থানে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ।

১৪ই জুলাই—২৯শে আষাঢ় : মহাকাশচারীদের উপর মহাজাগতিক বিকিরণের সম্ভাব্য ফলাফল পরীক্ষার চেষ্টা—আমেরিকা কর্তৃক বেলুনযোগে মহাশূন্যে বানর, ইঁদুর ও গোবরে-পোকা প্রেরণ।

মস্কো-এ বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি সম্মেলনের অধিবেশনের সমাপ্তি—রণপ্রস্তুতি ও পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব গৃহীত।

চট্টগ্রামে পাক্ খাদ্যমন্ত্রীর (শ্রীফজলুর রহমান) বিরুদ্ধে বিক্ষোভ—পুলিশের লাঠিচালনায় একশত ব্যক্তি আহত।

১৫ই জুলাই—৩০শে আষাঢ় : 'কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের আশংকা থাকিবে'—পাক্-ভারত সম্পর্ক বিষয়ে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সতর্কবাণী।

চট্টগ্রামে শান্তিপূর্ণ ছাত্রদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ—ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে ছাত্রমহলে বিক্ষোভ।

১৬ই জুলাই—৩১শে আষাঢ় : 'অস্ত্রসজ্জা হ্রাস ও সামরিক মিশন বিনিময়ে রাশিয়া প্রস্তুত'—১৭ রাষ্ট্র জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সোভিয়েট প্রতিনিধি শ্রীজোরিনের ঘোষণা—এক মাস বিরতির পর সম্মেলন পুনরারম্ভ।

জীবকোষের উপর মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রেরিত প্রাণীসমূহের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আমেরিকার ঘোষণা।

১৭ই জুলাই—১লা শ্রাবণ : এলিজাবেথভিলে (কাতাঙ্গা) দশ হাজার আফ্রিকান নারীর বিক্ষোভ—ভারতীয় সৈন্যদের (রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীভুক্ত) উপর হামলা।

পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া বৃটেনে সাধারণ নির্বাচনের দাবী—ম্যাকমিলান মন্ত্রিসভা বিপর্যয়ের পর বিরোধী শ্রমিক দলের প্রস্তাব।

১৮ই জুলাই—২রা শ্রাবণ : সামরিক বাহিনী কর্তৃক পেরুর শাসন-ক্ষমতা দখল—প্রেসিডেন্ট গ্রেপ্তার—নির্বাচন বাতিলে প্রেসিডেন্টের অসম্মতির জের।

জেনেভায় ১৪ জাতি লাওস সম্মেলনে গৃহযুদ্ধজর্জরিত লাওসের শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদিত।

অভয়ঙ্কর

॥ পরিমাণ ও উৎকর্ষ ॥

সম্প্রতি জনৈক লেখক বন্ধু বলছিলেন যে, নোটবই-লেখকের নামটুকু যেমন প্রকাশক ব্যবহার করেন, তেমনই অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিকের নামটুকু টাইটেল পেজে বসিয়ে রাম-শ্যামকে দিয়ে উপন্যাস বা গল্প লেখান হচ্ছে, নইলে এত রাশি-রাশি গল্প-উপন্যাস কি করে বাজারে বেরোচ্ছে। গণেশের মত কলম না হলে নাকি এত প্রচুর পরিমাণে লেখা সম্ভব নয়। এই বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য তিনি কিছু তথ্য প্রকাশ করলেন, জানিনা তার কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য। তবে কথাটা নিঃসন্দেহে চিন্তা করার প্রয়োজন। যাঁরা খ্যাতিমান তাঁরা হঠাৎ রাম শ্যামকে তাঁদের নামটাই বা ধার দিতে যাবেন কেন, তাঁরা নিজেরাই লিখে এসেছেন এতদিন, প্রয়োজন হলে, প্রাণের তাগিদ পেলে তাঁরাই ত' লিখবেন। সেই অতি বুদ্ধিমান লেখক ভদ্রলোক বললেন—এত লেখার সময় কোথা, খ্যাতি হলে অনেক কাজ বাড়ে, সভা-সমিতি, ভক্তের দরবার ইত্যাদির ঝঞ্ঝাট তাঁরা নিজেরাই পোহান, তাই অবসর কম। বাংলা সাহিত্যে ভুতুড়ে লেখকের আবির্ভাব হচ্ছে। মানের বই-এ যেমন বিদ্যাদিগ্গজ পন্ডিতের নাম থাকলেও তা লিখতে হয় কলেজের সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারের ছাত্রদের, শিশু-সাহিত্যের বই যেমন প্রখ্যাত লেখকের নামে প্রকাশিত হয়, লেখেন অন্যে—এইবার বড়োদের সাহিত্যে তাই শুরু হল। নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, ক্ষুব্ধ ব্যক্তিটি কোনও খ্যাতনামা লেখকের লেখা পড়ে হতাশ হয়েই এই উক্তি করেছেন। সব লেখাই যে সমান হবে এ আশা করা অন্যায়। তবে পরিমাণ যদি প্রচুর হয় তাহলে লেখার উৎকর্ষ কিছু হ্রাস পায়। সে কথাও আবার সর্বত্র খাটে না।

অন্যদিক থেকে এ কথাও যুক্তির খাতিরে বলা যায় যে, লেখকরা সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে দিন-রাতই কেবল লিখছেন। একটা উপন্যাস লিখতে কতটা সময় লাগে? এডগার ওয়ালেস – 'The Devil's Man' নামক উপন্যাসটি নাকি একাসনে বসেই লিখে ফেলেছিলেন। রোমাঞ্চ-কাহিনী রচনায় তাঁর জুড়ি ছিল না।

তাঁর প্রায় ডজন খানেক সেক্রেটারি ছিলেন, সিফটে কাজ করতেন তাঁরা। এ ছাড়া ছিল 'ডিক্টাফোন', মাঝে মাঝে খাদ্য-পানীয় বা চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনে সামান্য বিশ্রাম করে তিনি ষাট ঘণ্টা একটানে খাটতে পারতেন। কিন্তু এই যে প্রচণ্ড পরিশ্রম কি এর মূল্য? কালের দরবারে তার ঠাঁই কই? ঠিক কথা, কিন্তু জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এই বিরামবিহীন কর্ম দ্বারা ওয়ালেস ৬০ ঘণ্টায় ৪০০০ পাউন্ড রোজগার করেন। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করেই তিনি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন।

> **॥ ভ্রম-সংশোধন ॥**
> গত সংখ্যা 'অমৃতে'র ৮৯৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুদিন ভ্রমক্রমে ৩০শে জুন ছাপা হয়েছে। ওখানে পড়তে হবে ৩০শে জানুয়ারী।

আলেকজান্ডার ডুমা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হ'ন, তাঁর রচনার পরিমাণ নাকি সবচেয়ে বেশী, ১২,০০০ বিভিন্ন গ্রন্থ তাঁর নামে প্রচলিত। এই ফরাসী ভদ্রলোক অবশ্য অনেক ভুতুড়ে লেখক (Ghost Writers) মাইনে দিয়ে রেখেছিলেন, তাঁরাই লিখতেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এই বোধহয় প্রথম 'ভুতুড়ে লেখকের' আবির্ভাব।

স্যার ওয়াল্টার স্কট সাত বছরে ১৩০,০০০ পাউন্ডের মত ঋণ করেছিলেন। শুধু লিখেই সেই ঋণ শোধ করা হয়। দুঃখের বিষয় তিনি নিজেই লিখেছিলেন এবং তার ফলে মারাও গিয়েছিলেন অতি পরিশ্রমজনিত শ্রান্তিতে। সাত বছরে তাঁর রোজগার ৯০,০০০ পাউন্ড, আর তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যেই গ্রন্থসত্ত্ব থেকে সব ঋণ শোধ হয়ে গেল। মৃত্যুকালে ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ষাট।

কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, জনৈক স্প্যানিস লেখক, ১,৮০০ নাটক লিখেছিলেন। তাঁর নাম লোপে ডি ভেগা। তার অনেকগুলি ক্ষুদ্র এবং লুপ্ত। ১৬৩৫-এ তাঁর মৃত্যু হয়, তখন এই নাটকগুলি ছাড়াও তাঁর পাঁচখানি উপন্যাস ছিল। লোপে ডি ভেগার সাহিত্যিক খামখেয়াল ছিল বিচিত্র রকমের। তিনি নাকি একটি উপন্যাস লিখেছিলেন যার মধ্যে 'এ' বর্ণটি একেবারে ব্যবহার করা হয়নি। বাকী চারটিতে আর চারটি ব্যঞ্জনবর্ণ বাদ।

সাম্প্রতিক কালের লেখকদের মধ্যে জর্জ বার্ণার্ড শ' লিখেছেন প্রচুর। অসংখ্য নাটক ছাড়া পত্র-পত্রিকার সমালোচনা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র লিখেছেন অজস্র। তাঁর সমালোচনা, ব্যঙ্গ-রচনা, মন্তব্য, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, বক্তৃতা, গ্রন্থ-সমালোচনা, একজনের পক্ষে প্রাচুর্যে প্রায় অতুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজী ও বাংলায় লিখেছেন, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকথা, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, মন্তব্য ইত্যাদি, তবে পরিমাণ এতই বেশী যে একটি মানুষের জীবনে সেগুলির সম্পূর্ণ কপি করাও সম্ভব নয়।

এইচ, জি, ওয়েলস, বার্ণার্ড শ' ও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। প্রায় ১৮০ খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উপন্যাস, ছোটগল্প, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, জীবতাত্ত্বিক নিবন্ধ, রাজনৈতিক বিবৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের রচনা। পরিচিত সব রকম বিষয়েই তিনি লিখে গেছেন।

রেনেসাঁসের কালে যেমন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর কালের পক্ষে যা কিছু জানা প্রয়োজন সবই জানতেন তেমনই প্রাক-আণবিক যুগের ওয়েলসও সর্বশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের এক প্রতিভাধর লেখক ছিলেন আরনলড বেনেট। একদা তাঁকে বছরে গড়ে এক মিলিয়ন শব্দ রচনা করতে হয়েছে। অনেকে আবার লেখার সময়, বিষয় ইত্যাদি বেঁধে নিয়ে কাজ করতেন। এনটনি ট্রলোপ স্টপ-ওয়াচ হাতে নিয়ে লিখতেন, পনের মিনিটে ২৫০টি শব্দ ঠিক ঠিক লিখছেন কিনা লক্ষ্য রাখতেন।

বার্নার্ড শ প্রতিদিন ফুলস্কাপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠা লিখতেন সকালবেলা, দিনের অপর সময়টুকু পড়াশোনা, আলাপ-আলোচনায় কাটাতেন। এনটনি ট্রলোপ পোস্ট অফিসে কাজ করতেন, যা কিছু লেখার লিখতেন ব্রেকফাস্ট খাওয়ার আগেই।

যোশেফ কনরাদ দিনে ৩৫০ শব্দ হিসাবে লিখতেন। এই ৩৫০টি শব্দই একেবারে নিখুঁত। জনৈক আমেরিকান লেখক এইচ, এস, এডওয়ার্ডস ১৫০,০০০ শব্দ-বিশিষ্ট একটি উপন্যাস ২৩ দিনে লিখে পুরস্কার লাভ করেন। 'Kidnapped' নামক উপন্যাসের ৬৪,০০০ শব্দ রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন লিখেছিলেন মাত্র ছ' দিনে। তিন দিনেরও কম সময়ে ভোলতেয়ার লিখেছিলেন 'Candide' এবং এ, জে, ক্রনিন তাঁর বিখ্যাত প্রথম উপন্যাস 'Hatter's Castle' এর ৫০,০০০ শব্দ লিখেছিলেন ন' দিনে।

এডগার ওয়ালেসেই ফেরা যাক—তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ১৫০, নাটক ১৪টি, আর গল্প এবং প্রবন্ধের কথা লেখা-যোখা নেই। মাত্র ১৯২৭-এই তিনি ছাব্বিশখানি উপন্যাস এবং ছ'টি নাটক লিখেছিলেন।

অনেক লেখক যাঁরা প্রচুর লিখেছেন তাঁদের তেমন খ্যাতি নেই। সম্প্রতি উ থান্ট বলেছেন যে, তাঁর ছেলেবেলায় বর্মার তরুণেরা পড়ত চার্লস গার্ভিস আর তিনি পড়তেন টমাস হার্ডি। এই গার্ভিস প্রেমের উপন্যাস লিখেছেন প্রায় দুশো-খানি। মার্জরী বাওয়েন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় ছদ্মনামে ১৬০ খানি উপন্যাস লিখেছেন। রবার্ট হফ-মর্নাক্রিফ ২০০ খানি বই লিখেছেন। ই. ফিলিপস ওপেনহীম মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত মোট ২০০ খানি উপন্যাস লিখেছেন।

এডগার ষ্ট্রাটমেয়ার এই শতকের গোড়ার ত্রিশ বছরে ছোটদের জন্য প্রায় আটশতখানি গ্রন্থ লিখে প্রচুর অর্থলাভ করেছেন।

আর সবচেয়ে ছোট বইটির কথাও উল্লেখ করা উচিত। সংযম ও শালীনতার চূড়ান্ত এই গ্রন্থ। এডমিরাল রোডডাম-হোয়েটহ্যাম চীন দেশ ছেড়ে চলে আসছেন, তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্য আয়োজিত ভোজ-সভায় তিনি সকলকে একখণ্ড করে 'What I know about China' নামক গ্রন্থটি উপহার দিলেন। সবাই পাতা উল্টিয়ে দেখলেন তার প্রতিটি পৃষ্ঠা একেবারে শাদা।

আমাদের বাংলা দেশের রেকর্ড এখনও রবীন্দ্রনাথেরই সর্বোত্তম। কোনও দিক থেকে পরিমাণ ও উৎকর্ষতায় তাঁকে আমরা অতিক্রম করতে পারিনি। যে-সব লেখক প্রচুর লিখছেন তাঁদের বিরুদ্ধে এই জাতীয় অপপ্রচার না করে প্রতি বছরে যাঁর সাহিত্য-ফসলের পরিমাণ সর্বাধিক তাঁকে পুরস্কৃত করার সরকারী বা বে-সরকারী ব্যবস্থা হ'লে কেমন হয়? পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তার ভিতর থেকে উৎকৃষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য রচনা নিঃসন্দেহে পাওয়া যাবে।

অন্য এক নাম— (উপন্যাস) প্রেমেন্দ্র মিত্র। আনন্দধারা। প্রকাশন—৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম দু' টাকা।

'অন্য এক নাম' শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের অধুনা-প্রকাশিত উপন্যাস। এর লিখন-রীতি অভিনব এবং বক্তব্যবিষয় বলতে যা বোঝায় তার মধ্যেও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রয়েছে।

কাহিনীটা শুরু হয়েছে একেবারে হাল আমলে। তারপর স্মৃতিচারণের ভিতর দিয়ে উদ্ঘাটিত হয়েছে পিছনের ইতিহাস। কিন্তু এ প্রক্রিয়া অবিচ্ছিন্ন কিংবা সুদীর্ঘ নয়, উপস্থিত কালের ফাঁকে ফাঁকে নায়কের চিন্তা-অনুষঙ্গের অনিবার্য টানে উঠে এসেছে খণ্ড খণ্ড ইতিহাস। সেগুলিকে জোড়া দিয়ে ঘটনার সমগ্র রূপরেখা রচনার দায়িত্ব পাঠকের। এজন্যে পাঠকের রসপিপাসাকে যে পরি-মাণ তীব্র করে তোলা দরকার, তা কেবল প্রথম শ্রেণীর লেখকের পক্ষেই সম্ভব। এবং, বলা বাহুল্য, সে ক্ষমতা প্রেমেন্দ্র-বাবুর আয়ত্তাধীন। ফলে উপন্যাসখানি একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না ক'রে ওঠা যায় না।

ঘটনার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। শশধর হলে এক জমিদার পুত্রের সঙ্গে অবনী নামে এক শিক্ষিত ভদ্র যুবকের পরিচয় ঘটে প্রায় কুড়ি বছর আগে। শশধরের জমিদারী এক অরণ্য-মহলে খাজনার চেয়ে গাছ-গাছালি সেখানে বড় সম্পদ। সেখানে ভাণ্ডারীদা বলে জনৈক

একদা-ডাকাত রহস্যময় ব্যক্তির প্রতাপও বড় কম নয়। অবনী শশধরের আমন্ত্রণে এই অরণ্য-মহলে এসে পক্ষীপালন করে জীবিকা অর্জন করতে শুরু করে। এবং কালক্রমে ভাণ্ডারীদার সঙ্গেও তার হৃদ্যতা জন্মে। তারপর কাহিনীর মধ্যে দেখা দেয় মঙ্গলা নামে একটি আদিবাসী তরুণী। সে অবনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু পরে জানা যায় সে শশধরের রক্ষিতা এবং প্রিয়তমা। শশধরও টের পায় মঙ্গলার এই সুতীব্র আকর্ষণ। তার মধ্যে প্রতিশোধের বাসনা উদগ্র হ'য়ে ওঠে। পরিশেষে বন্দুকধারী শশধর এবং নিরস্ত্র অবনীর মধ্যে এক উন্মাদ সংঘর্ষে বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ হারায় ভাণ্ডারীদা। কার হাত থেকে গুলীটা গিয়ে তাকে বিদ্ধ করেছিল তা বোঝা গেল না অবশ্য, তবু আকস্মিক হত্যার সমস্ত দায় নিজের উপরে নিয়ে অবনী হল দেশত্যাগী। বিশ বছর পরে মালয় ও দক্ষিণ এশিয়ায় জীবন কাটিয়ে সে বৃদ্ধ বয়সে ফিরে আসে আবার জঙ্গল-মহলে। এসে শুনল, শশধর তার সম্পত্তি ভাণ্ডারীদার ছেলেকে দান ক'রে বৈরাগ্য গ্রহণ করে ঠাকুরবাবা নামে আত্মসমাহিত জীবনযাপন করছে। অবনীও এখানে নতুন নামে পরিচিত করেছিল নিজেকে—রাজীব মল্লিক। সেই নামেই সে ভাণ্ডারীদার ছেলেকে দান করে ত্রিশ হাজার টাকা—অবলুপ্ত প্রতিশ্রুতির জন্যে। তারপর সে মিলিত হয় এসে ঠাকুরবাবার সঙ্গে। "দুজনের মাঝেই..... এক স্মৃতির ধারা তখন বইছে।"

সে স্মৃতি মঙ্গলার। এই না পাওয়ার বেদনা মানুষকে কী ভাবে এক নতুনতর জীবনবোধের জন্যে প্রস্তুত করে তোলে তারই যন্ত্রণাময় কাহিনী হল 'অন্য এক

নাম। এ যুগের মানুষ যখন হৃদয়মনে বহু আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত, তখন ব্যাপকতর মানবসমাজের জন্যে জন্মান্তর গ্রহণ করেই বুঝি তারা জীবনটাকে কিছু পরিমাণে সার্থক করতে পারে, এই বোধই গ্রন্থশেষের পরে আবর্তিত হ'তে থাকে আমাদের মনে। এবং এজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করি।

শ্রীঅজিত গুপ্তের অঙ্কিত প্রচ্ছদখানি অত্যন্তই নয়নাভিরাম।

রাজকন্যার স্বয়ম্বর— (উপন্যাস) মনোজ বসু। প্রকাশক—গ্রন্থ-প্রকাশ॥ ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—তিন টাকা বারো আনা॥

রোমান্সধর্মী কাহিনী রচনায় মনোজ বসুর তুলনা নেই। পূর্ব বাংলার এক জমিদার বংশে সোনাটিকুরির মেয়ে দেশবিভাগের পর এক ধনীর বাগানবাড়িতে জবর-দখল অধিকার করে আশ্রয় নেয়। সে রাজকন্যা, কারণ তার পূর্বপুরুষেরা রাজা-বাহাদুর। রাজাহারা এই রাজকন্যার লোভে অনেক মক্ষিকা উড়ে আসে। এমন কি জবর-দখল বাগানবাড়ির মালিক বেচারীও সেই দলে। রাজকন্যা কিন্তু রাখালের গলায় মালা দেয়। রাখালের বাঁশী রাজকন্যার মনোহরণ করে। আভিজাত্যের খোলস ছিন্ন হয়। রাজকন্যার স্বয়ম্বর এমনই এক মিষ্টি মধুর কাহিনী। যাঁরা প্রবলেমের কঙ্কর কঠিন পথ পছন্দ করেন না, এই একটানা পিচ্ছিল-মসৃণ কাহিনী তাঁদের মনোহরণ করবে সন্দেহ নেই।

দোটানা— (উপন্যাস)—দিলীপকুমার রায়। প্রকাশক—বাক সাহিত্য। ৩-৩ কলেজ রো। কলিকাতা—৯। মূল্য তিন টাকা॥

দিলীপকুমার রায় রচিত 'বহুবল্লভ' নামক উপন্যাসের পরিবর্তিত এবং রূপান্তরিত দ্বিতীয় সংস্করণ 'দোটানা'। দিলীপকুমারই প্রথম বাঙালী লেখক যিনি য়ুরোপের পটভূমিতে বাংলা উপন্যাস লিখেছেন। মনন ও চিন্তনের ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাস অতুলনীয়। প্রদীপ একই [illegible] ভালোবাসে দুটি মেয়েকে [illegible] [illegible] আশ্চ পরস্পরের সেই বহু-[illegible] [illegible]। [illegible] কামগন্ধহীন ভালোবাসার মোহ তার কাটে না। আত্মবিশ্লেষণধর্মী এই কাহিনীতে প্রদীপের মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের বিচিত্র চিত্র আছে [illegible] আঙ্গিকের দিক থেকেও উপন্যাসটি মনোরম। রোমান্সধর্মী এই কাহিনী পাঠকের চিত্ত জয় করে অনায়াসে। ছাপা ও বাঁধাই উত্তম।

নতুন দিনের আলো— উপন্যাস)—বিশ্বনাথ রায়। প্রকাশক—সুন্দর প্রকাশন। ৮, কলেজ রো—কলিকাতা—৯। দাম দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

নবীন লেখক বিশ্বনাথ রায়। এতদিন আর বিশ্বনাথন এই ছদ্মনামে লিখতেন। এখন মুখোস খুলে ফেলে আত্মপ্রকাশ করেছেন। 'নতুন দিনের আলোয়' আছে সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিকায় বিধৃত এক আধুনিক সমস্যার ইঙ্গিত। লিপিকা ও গৌতম তাই আমাদের মনে হতাশার সুর আনে না। শাশ্বত প্রেমের এক অনির্বাণ অগ্নিশিখা এই শুচিস্নিগ্ধ উপন্যাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ যুগের মানুষের যে প্রেম তার মাঝে আছে আশা ও আনন্দের আভাস, তাই রুচিরা, লিপিকা প্রভৃতি মেয়েদের দেখি নারীত্বের মহিমায় মহিমাময়ী। বিশ্বনাথ রায় শক্তিমান লেখক। তাঁর চিন্তাধারা বৈপ্লবিক। উপন্যাসটিতে প্রশংসনীয় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেল। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

সংগীত ও সাহিত্য (গবেষণা গ্রন্থ) —নীহারকণা মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম সাত টাকা।

বর্তমান গ্রন্থটি রচনার জন্য শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, ফিল উপাধি লাভ করেছেন। এরকম একটি দুরূহ বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণার জন্য সাম্প্রতিককালে কোন গবেষক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করেছেন বলে জানা নেই। ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন যে, 'ভারতীয় অভিজাত সংগীতের মূলে সুরের সঙ্গে বাংলা সংগীতের সম্বন্ধ উপস্থাপিত করাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী দুটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সংগীত ও সাহিত্য—যা নিয়ে বৈদিক যুগ থেকে [illegible] বর্তমান যুগের বহু মনীষীই গবেষণা করে চলেছেন নানা ভাবে বহুপ্রকারে। কিন্তু আমার গবেষণার বিষয়বস্তু ও ধারাটি এঁদের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ...ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে ভারতে সৃষ্ট সকল প্রকার সংগীতেরই সম্বন্ধ রয়েছে আটুট এবং তার প্রভাবেই প্রভাবান্বিত সর্বপ্রকার সংগীত, এইটিই প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছি।' প্রথমেই ভারতীয় সংগীতের বিকাশ ও বিস্তৃতি বিষয়ে যে আলোচনাটি রয়েছে সেরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ ও মনোজ্ঞ আলোচনা খুব কম সমালোচকের মধ্যেই দেখা যায়। বাংলায় গীতিরূপের পরিচয় দান করতে গিয়ে আলোচিত হয়েছে নাথগীতিকা, চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ পদাবলীকীর্তন, ঢপকীর্তন, ভাবানন্দের হরিবংশ, শিবায়ণ বা শিবমঙ্গল, মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গেই এসেছে বাউল, কবিগান, যাত্রা, সারি, জারি, ভাটিয়ালি, তরজা, বোলান, খেউড়, আখড়াই, মালসী প্রভৃতির আলোচনা। সংগীতের গবেষণা ক্ষেত্রে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা-গ্রন্থটি মূল্যবান। গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে সমগ্র বিষয়বস্তুর সমাবেশ। প্রকাশভঙ্গীর নিপুণতা ও সরসতাগুণে গ্রন্থটি সাহিত্য-স্বীকৃতিলাভের যোগ্য। সম্প্রতি আমাদের দেশে সংগীত সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা চলেছে। এমনকি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগীত পাঠক্রম হিসাবে নির্ধারিত হচ্ছে। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে ছাত্রছাত্রীরাও বিশেষ উপকৃত হবেন। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের এই সময়োপযোগী আলোচনা-গ্রন্থটি সাদরে গৃহীত হবে, আশা করি।

যখন যেখানে (রম্যরচনা)—সুভাষ মুখোপাধ্যায়। "বার্তিক" কলিকাতা-২৬। দাম দু টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলার আধুনিক সাহিত্য জগতে একটি অবিস্মরণীয় নাম। অতি অল্প লিখেও এই কবির জনপ্রিয়তা অসীম। কাব্যে যেমন স্বতোৎসারিত ভঙ্গী গদ্যেও তেমনই অসামান্য লিপিকুশলতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। 'যখন যেখানে' স্মৃতিচিত্রণ জাতীয় রম্যরচনা। 'রেমিনিসেন্ট মুডে' রচিত কাহিনীর মধ্যে যে অন্তরঙ্গ মেজাজ আছে তা সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে। বক্সার জেলের লম্বু পরিবেশে, বজবজের চটকলের কাহিনী, ঢাকার ভাষা আন্দোলন, রুসি-বিলির গল্প ইত্যাদির মধ্যে এক একটি বিচিত্র চিত্র ফুটে উঠেছে। এই গ্রন্থের মানুষগুলি অপরিচয়ের আড়াল থেকে কখন যে অতিপরিচিতের মত ঘনিষ্ঠ হয়ে

ওঠে তা বোঝা যায় না, যখন যায় তখন সেই আকস্মিক আবিষ্কারে মন ভরে ওঠে। লেখকের কবিসত্তা এমন সুন্দর ও নিখুঁত চরিত্র চিত্রণে সহায়ক হয়েছে। এই জাতীয় রচনা বাংলা ভাষায় অনেক কম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বহু গতানুগতিক পথের একঘেয়েমির মাঝে এ এক অপূর্ব হাওয়া বদল। 'যখন যেখানে' নামকরণটিও প্রশংসনীয়। জীবনের রূঢ়, রুক্ষ, কর্কশ দিকটাও যে গভীরভাবে দেখা প্রয়োজন 'যখন যেখানে' গ্রন্থে লেখক তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অলীমতি— কল্লোল মজুমদার। অমর লাইব্রেরী, ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

আলোচ্য নাটকটি তিনটি দৃশ্য-সম্বলিত একটি একাঙ্ক নাটক। নরক নগরের বিদ্রো-মন্ত্রী বিদ্রো আন্দোলনের চাপে পদত্যাগ করায় তাঁর শূন্য আসনের জন্য এক উপ-নির্বাচন হয়। এই উপ-নির্বাচনে সরকার পক্ষের প্রার্থী পান্দু বাড়ুজ্যে এবং বিরোধী পক্ষের প্রার্থী চিন্তামণি দাসী। সমগ্র নাটকটি এই দুজন প্রার্থীর নির্বাচন দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই রচিত।

লেখক এই প্রহসনমূলক রচনাটির মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের ভোট-দ্বন্দ্বকেই ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়েছে সে কথা বলা যায় না। তিনি সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ এই উভয় পক্ষকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের বাণে বিদ্ধ করতে চেয়েছেন। এতে আমাদের আপত্তি নেই। তবে কোন কোন রাজনৈতিক শ্লোগান নিয়ে তিনি যে রকম স্থূল পরিহাস করেছেন তার ফলে নাটকটির বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এ নাটকের কোন চরিত্রই সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি। তবে অধিকাংশ রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নাটিকার মত এ নাটকের একটি সাময়িক মূল্য আছে।

বীর পুরুষ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম এক টাকা তিরিশ নয়া পয়সা।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার সচিত্র নতুন প্রকাশ এই গ্রন্থ। কবিতাটিকে বিভিন্ন স্তবকে ভাগ করে প্রত্যেকটি স্তবকের ভাব উপযোগী আলাদা চিত্র সংযোজিত হয়েছে। বইটিতে এ রকম নয়টি ছবি আছে। এর মধ্যে দুটি ছবি এঁকেছেন আচার্য নন্দলাল বসু এবং বাকিগুলি তাঁরই কৃতি ছাত্র কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীসুখেন গাঙ্গুলী। মোটামুটি সব ছবিগুলিতেই আচার্য নন্দলালেরই চিত্রধারার বিশিষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করি। রবীন্দ্র শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বীর পুরুষ সম্পর্কে বিশ্বভারতীর এই অভিনব পরিকল্পনা আমাদের অপার তৃপ্তি দিয়েছে। শিল্পগত দিক থেকে বইটির প্রকাশমান অতি উচ্চ স্তরের। আশা করি এই নতুন সংস্করণ আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেরই আদরণীয় হবে।

গুরু দক্ষিণা— সতীশচন্দ্র রায়। বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ১·২০ টাকা।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের গোড়ারদিককার কর্মী শ্রীসতীশচন্দ্র রায় মাত্র একুশ বছর বয়সে অকাল মৃত্যুতে পতিত হন। রবীন্দ্রনাথ এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মধ্যে এক মহান আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপরিতৃপ্ত শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। বর্তমান রচনাটি উৎকের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। সতীশচন্দ্র ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের বালকদের জন্যই এটি রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "গ্রন্থটির মধ্যে সতীশ তাহার ভক্তিনিবেদিত তরুণ হৃদয়ের সমস্ত অসমাপ্ত আশা ও আনন্দ রাখিয়া গেছে। এই গ্রন্থটুকুকে সে শিল্পীর মতো রচনা করে নাই—এই আশ্রমের আকাশ বাতাস ছায়া সতীশের সদা-উদ্বোধিত প্রফুল্লনবীন হৃদয়ে মিলিয়া গানের মতো করিয়া ইহাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির পর আমাদের কথা আর সংযোজিত না করাই ভাল। গ্রন্থটিতে অজিতকুমার চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্রের লেখা একটি ক্ষুদ্র চিঠিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বহুদিন পরে এই গ্রন্থটি পুনরায় মুদ্রিত করার জন্য বিশ্বভারতীকে ধন্যবাদ।

রবার্ট ফুলটন (জীবনী)— রালফ ন্যাডিং হিল। অনুবাদ ॥ ধ্রুবজ্যোতি সেন। প্রকাশক—শ্রীভূমি পাবলিসিং কোম্পানী। ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা—৯। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পেনসিলভানিয়ার এক চাষীর ঘরে রবার্ট ফুলটন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অতি অল্প বয়সে ছবি আঁকার সঙ্গে যান্ত্রিক শিল্পচর্চার প্রতিও তাঁর আগ্রহ দেখা। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর রবার্ট ফুলটন একটা বাষ্পীয় পোত নির্মাণের জন্য আগ্রহশীল হন এবং তখন সারা পশ্চিম জগতেও চলেছে বাষ্পীয় পোতের নির্মাণ প্রচেষ্টা, দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় অবশেষে বাষ্পীয় পোত একদিন জলে ভাসল। রবার্ট-এর শিল্পীজীবন, বিশেষতঃ তার আশাবাদী মন এবং আবিষ্কার ও উদ্ভাবনময়ী প্রকৃতি একটি আদর্শ চরিত্র। এই জীবনীগ্রন্থটি তাই উপন্যাসের মত আকর্ষণীয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'ক্লেরমেন্ট' জলে ভাসার ইতিহাস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় কাহিনী। আমেরিকার 'ফুলটন দি ফার্স্ট' নামক বাষ্পীয় যুদ্ধ-জাহাজের ওপর থেকে তাই রবার্ট ফুলটনের মৃত্যুতে তোপধ্বনি করা হয়েছিল।

শ্রীযুক্ত ধ্রুবজ্যোতি সেন এই গ্রন্থটি অনুবাদে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। সমগ্র জীবনীগ্রন্থ মূলের মতই মনোরম। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা চমৎকার।

ব্রহ্মপুত্রের পারে (উপন্যাস)— কল্যাণী ঘোষ। বলাকা প্রকাশনী, ৫৩ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ব্রহ্মপুত্রের নদীর বাঁকে পঞ্চখীমারির চর নামক একটি গ্রাম ঘটনা-কেন্দ্র। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী 'নাকাড়ুচি' সম্প্রদায়কে নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে। ঢোল-নাকাড়া বাজিয়ে বংশানুক্রমে এরা অন্নসংস্থান করে আসছে। বাঁধনহারা বৈচিত্র্যের জীবনের মাঝখান থেকে যে বৈচিত্র্যময় জীবনকথা লেখিকা আমাদের উপহার দিয়েছেন তার সংগে আমরা অনেকেই অপরিচিত। ইশান নাকাড়ুচি, তার মেয়ে সুন্দরী, মোড়ল হাজীসাহেব মৈজুদ্দিন, জমিলা, বাউন্ডুলে গোবিন্দ, করুণা ডাক্তার, কুহকিনী পরী—এ সমস্ত চরিত্রগুলি এক অনির্দেশ্য সূত্রে পঞ্চখীমারির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাদেরকে বাদ দিয়ে পঞ্চখীমারি প্রাণহীন। কাহিনীর মাঝখানে প্রেমিক মৈজুদ্দিনের চরিত্র, সুন্দরীর জীবনের ব্যর্থ ক্রন্দন, জমিলার মর্মান্তিক পরিণাম, সরলার প্রেমজীবনে [illegible] ঘূর্ণি পরীর মানুষ [illegible] ফাঁদে পড়া ইশান [illegible] সাম্প্রদায়িক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] সুখ দুঃখ হাসি-কান্নার পরিচয় নিয়ে ফুটে উঠেছে।

[illegible] বাঙালী মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে এ ধরনের [illegible] কাহিনী [illegible] [illegible] সে ক্ষেত্রে [illegible] লেখিকা [illegible] [illegible] সংমিশ্রণে পঞ্চখীমারির [illegible] মানুষগুলির জীবন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

নান্দীকর

জাতীয় সংহতি ও চলচ্চিত্র :

কথাটা কবে থেকে চলে আসছে, তা জানা নেই। তবে জন্মাবধি শুনে আসছি, হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা। ছেলেবেলায় কথাটা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ ক'রে অবাক হয়ে ভাবতুম, এত দেবতা আমাদের! বহু ধর্মাবলম্বীদের ত' মাত্র একটি ক'রে দেবতা, আর আমাদের—আমাদের তেত্রিশ কোটি! কেন? আর এত দেবতা আছেনই বা কোথায়? আমাদের ঘরে একখানি 'গোমাতা'র ছবি টাঙানো ছিল; তাতে একটি গাই-গরুর দেহে বহু দেবদেবীর ছবি ছাপা ছিল। সেগুলো গুনে দেখেছিলুম, ছেষট্টি কি সাতষট্টির বেশী হয়নি। শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, নারায়ণ, ব্রহ্মা, কার্তিক, সরস্বতী, যম, বরুণ, শীতলা, বগলা, ওলাইচণ্ডী, প্রভৃতি নাম এক এক ক'রে মনে করতে করতে একশো, সওয়া শো পর্যন্ত পৌঁছেছিলুম; কিন্তু কোথায় একশো সওয়া শো, আর কোথায় তে-ত্রি-শ-কো-টি! ভেবেই উঠতে পারতুম না, এই তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রত্যেকের নামই বা কি, আর আকৃতিই বা কেমন! তাই শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত করেছিলুম ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা একটা কথার কথা মাত্র, বাজে!

শশির মল্লিক প্রোডাকসন্সের "নব দিগন্ত" চিত্রের একটি দৃশ্যে অভিনয়রতা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

বাল্যের ভাবনা এতকাল দিব্যি চাপা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের 'জাতীয় সংহতি' প্রচেষ্টা দেখে বাল্যের সেই ভাবনাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ইংরেজ আমলে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বই লিখেছিলেন, "এ নেশন ইন মেকিং"। ভারতবর্ষ আয়তনে এবং লোকসংখ্যায় একটি ছোটখাট মহাদেশ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিরাট দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দাদের মধ্যে আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ভাষাগত ব্যবধান অনেক। কিন্তু বিদেশী শাসনাধীনে তাদের আমলাতন্ত্রের মাহাত্ম্যে পরপদানত ভারতবাসী হিসেবে আমরা সবাই এক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন এবং সরকারী ভাষারূপে হিন্দীকে আশু প্রতিষ্ঠিত করবার দুরন্ত প্রচেষ্টার দাপটে ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গ বহু বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে বারে বারে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যবাসীকে একটি ঐক্যসূত্রে গাঁথবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে জাতীয় সংহতি পরিষদ নামে একটি শক্তিশালী সংস্থার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিনিময় ইত্যাদি নানা প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

এই সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়েই আজ যেন 'তেত্রিশ কোটি দেবতা'র নিহিতার্থটি মনের সামনে দিব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সব ব্যাপারেই যেমন, তেমনই ধর্মের ব্যাপারেও হিন্দু-ভারতবর্ষ চিরদিনই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার ক'রে এসেছে। তাই ভারতের তেত্রিশ কোটি (আদমসুমারীর হিসেবে আজ সংখ্যাটা আরও বেশী) নরনারীর জন্যে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর অস্তিত্বকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। তোমার যেমন খুশী, তেমন দেবতাকে পুজো কর; বাইরে থেকে কেউ কোনো দেব বা দেবীকে অবশ্য পুজো করবার জন্যে তোমার ওপর চাপিয়ে দেবে না। স্বীকৃত হয়েছিল, ধর্মবিশ্বাস বা পুজো-উপাসনা মানুষের ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষারুচির ওপর নির্ভরশীল তার একান্ত আপনার জিনিস; সেখানে কোনো জুলুম করলে ধর্মের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই অন্য ধর্মের মতো হিন্দু ধর্মে কোনও সাধারণ স্থানে একত্র জড়ো হয়ে সমবেত উপাসনার কোনো ব্যবস্থা নেই। এবং সেই একই কারণে ভগবানকে বহুরূপে কল্পনা করা হয়েছে—ভক্তের যেমনটি পছন্দ, সে যেন ঠিক তেমনি বেছে নেবার সুযোগ পায়।

একের মধ্যে বহুকে প্রত্যক্ষ করাই আমাদের ভারতীয়ত্বের বৈশিষ্ট্য। তাই দেখি, আমাদের এক একটি রাগকে আশ্রয় ক'রে গ'ড়ে উঠেছে ছয়টি রাগিণী; গায়ক একটি সুরকে অবলম্বন ক'রে কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্দা ছুঁয়ে যাবার সাধনায় মগ্ন। আমরা বিশ্বাস করি, এই বিশ্বসৃষ্টি ভগবানেরই লীলা এবং তিনিই 'রূপৈরনেকৈ বহুধাত্মমূর্তি' পরিগ্রহ করে এই বিশ্বসংসারে বিরাজ করছেন—খালি যে আমরাই তাঁর অংশ, তা নয়; বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত জিনিসের মধ্যেই তিনি বিরাজমান। তাই বহু বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতবাসী এক। চণ্ডাল হোক, ব্রাহ্মণ হোক, ধনী হোক, দরিদ্র হোক, হিমালয়-বাসী হোক কিংবা কন্যাকুমারিকাবাসীই হোক—সকল ভারতবাসী এক। শিবাজী স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি 'এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে' ঐক্যবদ্ধ করবেন। কিন্তু আজকের ভারত ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত রাষ্ট্র; তাই ধর্মশিক্ষার মারফত ঐক্যবন্ধনের চেষ্টা না ক'রে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

স্থাপনের দ্বারা জাতীয় সংহতি সাধনের চেষ্টা চলছে। বলা হচ্ছে, প্রতিবেশী রাজ্যবাসীদের সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য-কলা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা কর; দেখবে, তাদের সঙ্গে তোমাদের বহু মিল, বহু সঙ্গতি রয়েছে।

এই জাতীয় সংহতি সাধনে আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র সবচেয়ে বেশী পরিমাণে কার্যকরী সাহায্য করতে সক্ষম। আজ ভারতের নগর, শহর, গ্রাম—সর্বত্র স্থায়ী বা অস্থায়ী ছবিঘর রয়েছে; সেখানে যে-কোনও চলচ্চিত্র দেখানো সম্ভব এবং দেখানো হয়ে থাকে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সমাজের বাস্তব রূপ যদি তথ্য ও কাহিনীচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, তাহ'লে সেই রূপের সঙ্গে সকল ভারতবাসীরই পরিচয় হওয়া সম্ভব। ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার বিভাগের অন্তর্গত ফিল্মস ডিভিশন বহুদিন ধরে আমাদের এই বিরাট দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী-দের সমাজ ও সংস্কৃতিকে তাঁদের তথ্যচিত্রগুলির মাধ্যমে ছবির পর্দায় রূপায়িত করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইসব ছবির মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলবাসী-দের যে-রূপ ফুটে ওঠে, তাতে দর্শকের মনে পার্থক্যের কথাটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়, ঐক্যের সুরটি ধ্বনিত হয়ে ওঠে না। ফিল্মস ডিভিশন যদি বিভিন্ন রাজ্যবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কীয় চিত্র তোলবার সময়ে নানারূপ পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্যটি কোন খানে, তা ভালো করে দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, তাহ'লে এ জাতীয় সংহতি সাধনের সহায়ক হয়।

আর যাঁরা কাহিনীচিত্র নির্মাণে ব্রতী, তাঁদের প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ, তাঁরা যেন রীতিনীতি, চাল-চলন, পোশাক-আসাক, জিনিসপত্র প্রভৃতি এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করেন, যাতে কোনো একটি বিশেষ রাজ্যের একটি বিশেষ সমাজকে অবলম্বন করে কাহিনীচিত্রটি গড়ে উঠেছে বলে বুঝতে পারা যায়। সাধারণতঃ যে-সব কাহিনী-চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তাতে সেই চিত্রান্তর্গত চরিত্রগুলিকে যে-কোনো দেশের পক্ষেই অত্যন্ত অবাস্তব বলে মনে হয়, এরা মাত্র সিনেমাতেই সম্ভব—এরা রক্তমাংসের সংস্রব বর্জিত। যথার্থ সমাজের চেহারা কাহিনী মারফৎ উপস্থিত করলে ভারতের আপামর জনসাধারণ সেই বিশেষ সমাজের জনজীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে একাত্ম বোধ করবার সুযোগ পাবে এবং তা জাতীয় সংহতি সাধনের সহায়ক হবে। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের হিন্দী ছবিগুলি সারা ভারতে হিন্দী ভাষাকে প্রচার ক'রে জাতীয় সংহতি

সাধনের একটি কর্মসূচীকে অনেকখানি অগ্রসর ক'রে দিয়েছে।

চিত্র সমালোচনা

বন্ধন (বাঙলা) : সপ্তক প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন; ১১,৯৯৯ ফুট দীর্ঘ ও ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী: প্রশান্ত চৌধুরী (ডাকো নতুন নামে); পরিচালনা : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ : অজয় মিত্র; শব্দধারণ : শিশির চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ ঘোষ, অবনী চট্টোপাধ্যায় ও নৃপেন পাল; সঙ্গীত-পরিচালনা : রাজেন সরকার; গীত-রচনা : প্রণব রায়, রেণুকা ঘোষ ও পণ্ডিত ভূষণ; শিল্পনির্দেশনা : বটু সেন; সম্পাদনা : রবীন দাস; রূপায়ণ: সন্ধ্যা রায়, রেণুকা রায়, কেতকী দত্ত, সুচন্দ্রা বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, জহর রায়, মাস্টার জয় প্রভৃতি। বিঠলভাই প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ২০এ জুলাই থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা এবং অন্যান্য ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

এ সংসারে মায়ার বন্ধন এড়ানো বড়ই কঠিন। তাই দেখি, মথুরার দুর্ধর্ষ লম্পট গুণ্ডা সুন্দরলালের মনেও রঙ ধরে; মৃত নিতাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে তার অন্ধ বৃদ্ধা মা এবং বালক-পুত্র গোপালের আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারে না; কুশাবর্ত ঘাটে নিতাইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে বৃদ্ধা দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে যখন সে সমস্যার মুখোমুখী এসে দাঁড়ায় এবং মুহূর্ত পরে জানতে পারে, সে নিজে হচ্ছে নিতাইয়ের যমজ দাদা গৌর ও ঐ বৃদ্ধারই সন্তান, তখন সে আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে এই ভেবে যে, আজ তার একটি পরিচয় আবিষ্কৃত হয়েছে, সে কুলগোত্রহীন নয়, সংসারে তারও

'বন্ধন' চিত্রের একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায়।

আপনার জন আছে, সন্তানের মিথ্যা অভিনয় তাকে আর করতে হবে না। একদা দুর্বৃত্ত, চরিত্রহীন অমানুষ সুন্দরলালের স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা ও সাধুসঙ্গের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে প্রেমিক, হৃদয়বান, সুন্দর গৌর রূপে উত্তরণের ইতিহাসই আলোচ্য "বন্ধন" ছবির প্রধান উপজীব্য। আর এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে গ্রাম্য বালবিধবা ললিতার অন্তরের অন্তস্থলে প্রেমের শ্বেতপদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়ার কাহিনীটুকু।

"বন্ধন" ছবিকে অত্যন্ত ঘটনাপ্রধান না করলেও চলত। ছবির গোড়ার দিকের রাখাল-ললিতা অংশটুকু অনায়াসেই বাদ দেওয়া যেতে পারত। ললিতা একজন গ্রাম্য বালবিধবা—দর্শককে এইটুকু জানানোই কি ছবির মূল ঘটনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না?

ছবিতে বহির্দৃশ্যের প্রচুর সমাবেশ। ছবির একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে হিমালয়ের কোলে লছমনঝোলার প্রাকৃতিক পরিবেশ। হরিদ্বারের বিখ্যাত কুম্ভমেলার দৃশ্যাবলী এই ছবির একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

এবং অনিল চট্টোপাধ্যায় অভিনীত সুন্দরলাল "বন্ধন" ছবিখানিকে চিত্ররসিক দর্শকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছে। এ এক নতুন অনিল চট্টোপাধ্যায়, যার সাক্ষাৎ আমরা এর আগে পেয়েছি ব'লে মনে করতে পারছি না। মথুরার গুণ্ডা, লম্পট, মদাপ, বারবণিতার প্রতি আসক্ত, হিন্দী বাচনরত সুন্দরলাল, লছমনঝোলার সাধুজীর সান্নিধ্যে তার ব্যবহারমুগ্ধ ও বালবিধবা ললিতার প্রতি একটি অজ্ঞাত আকর্ষণ-অনুভবকারী সুন্দরলাল এবং পরে অন্ধ বৃদ্ধা ও বালক গোপালের কাছে মৃত নিতাইয়ের ভূমিকা-অভিনয়কারী, হৃদয়দ্বন্দ্বে দোলায়িত সুন্দরলাল—অনিল চট্টোপাধ্যায়ের বহুমুখী নাট্যনৈপুণ্যগুণে এমন সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। আর একজন প্রতিভাসম্পন্না অভিনেত্রী হচ্ছেন গীতা দে। এই ছবিতে অন্ধ বৃদ্ধা মায়ের ভূমিকায় যে অন্তরঢালা অভিনয় তিনি করেছেন, তা সহজে বিস্মৃত হবার নয়। সন্ধ্যা রায়ের ললিতা বালবিধবার ব্যথাবেদনা ও অব্যক্ত প্রেমকে অতি সহজেই প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় দীপক মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, প্রশান্তকুমার, রেণুকা রায়, কৃষ্ণধন

মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গীতা মুখোপাধ্যায় এবং মাস্টার জয় যথাযোগ্য সুঅভিনয় ক'রেছেন।

চিত্রগ্রহণের কাজ সব জায়গায় সমান নয়—কোথাও ভালো এবং কোথাও চলনসৈ। ছবিতে বহির্দৃশ্যের সংলাপ মাত্র একটি জায়গা ছাড়া আশ্চর্যরকম সুন্দরভাবে গৃহীত হয়েছে। শিল্প-নির্দেশনায় বটু সেন তাঁর অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বহু ঘটনাপূর্ণ ছবিটির গতি আরও একটু বাড়ানোর সুযোগ থাকলেও সম্পাদনার কাজ মোটের ওপর প্রশংসনীয়। ছবির গানগুলি সুরসমৃদ্ধ ও সুগীত; বিশেষ ক'রে "ওগো মানিনী মুখ তোলো", "চৈতালী রাত চ'লে যায়" এবং "জয় সিয়া রাম" গান তিনখানি জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনাপূর্ণ।

(১) **আদর্শ হিন্দু হোটেল :** রঙমহল শিল্পিগোষ্ঠীর নিবেদন; কাহিনী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়; নাট্যরূপ : গোপাল চট্টোপাধ্যায়; রূপায়ণ : সরযূবালা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, দীপিকা দাস, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, ঠাকুরদাস মিত্র, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, কার্তিক সরকার, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মীজনার্দন মুখোপাধ্যায়, মিণ্টু চক্রবর্তী, অনাদি দাস, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

প্রায় এক যুগ আগে এই রঙমহল মঞ্চেই অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আদর্শ হিন্দু হোটেল" কাহিনীটি অবলম্বনে গোপাল চট্টোপাধ্যায় কৃত যে-নাট্যরূপটি অভিনীত হয়েছিল, তার স্মৃতি আজও আমাদের মনে জাগরূক আছে। সে-অভিনয়ে পরলোকগত ধীরাজ ভট্টাচার্য হাজারী ঠাকুরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রেক্ষাগৃহে হাসির তুফান তুলতেন এবং তাঁরই সঙ্গে মুখরা পদ্মর ভূমিকায় পাল্লা দিয়ে অভিনয় করতেন শ্রীমতী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। আগেকার সেই "আদর্শ হিন্দু হোটেল" নাট্যাভিনয় প্রধানতঃ ছিল একটি হাস্যরসাত্মক নাট্য-নিবেদন, যাতে হাজারী ঠাকুর ছিল একটি সিরিও-কমিক চরিত্র।

বর্তমানে রঙমহলের শিল্পিগোষ্ঠী দ্বারা নবপর্যায়ে "আদর্শ হিন্দু হোটেল" কিন্তু যে-ভাবে অভিনীত হচ্ছে, তাতে তার সেই আগেকার রূপ গেছে একেবারে পালটে। কারণ, আজকের "আদর্শ হিন্দু হোটেল"-এর প্রধান চরিত্র হাজারী ঠাকুর মাত্র একটি সিরিও-কমিক ভূমিকা নয়, সে হচ্ছে একটি রক্তমাংসের মানুষ, যার ব্যথা-বেদনা আপনাকে আমাকে সহজেই স্পর্শ করে। হাজারী ঠাকুর গুণী—সে রাঁধে ভালো, তার রান্নার প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ। কিন্তু সে শুধু রাঁধুনীই নয়, সে সত্যাশ্রয়ী, সে পরদুঃখকাতর, সে ব্যথার ব্যথী, সে একটা আস্ত মানুষ। এ হাজারী যখন হাসে, তখন সত্যিই হাসে; আবার যখন কাঁদে, তখন খালি নিজেই কাঁদেনা, আপনাকে আমাকে কাঁদায়। এর স্থান রঙ্গমঞ্চের ওপরে নয়, আপনার আমার হৃদয়ে।

এই নবচেতনা দ্বারা নাটকটির প্রধান চরিত্রগুলি উদ্বুদ্ধ হয়েছে ব'লেই অপরাপর বহু ভূমিকাই সঙ্গে সঙ্গে সার্থকতা লাভ করেছে। নিজের একটি হোটেল খোলবার বাসনা যেদিন হাজারীর চরিতার্থ হ'ল, সেদিন দেখা গেল তার স্ত্রীকে যে অনেক কষ্টে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আলগোছে চলে, স্বামীর উপস্থিতিতে জামাইয়ের সামনে সাত হাত ঘোমটা দেয়। সর্বস্ব খুইয়ে বেচু চক্রবর্তী যেদিন হাজারীর কাছে এসে তার হোটেলের ক্যাশের চাবি নিয়ে গদীয়ান হয়, তখন সে যেন হাজারীর মহিমা বাড়াবার জনোই সেখানে আসে। এক এক ক'রে এমন বহু উদাহরণই দেওয়া যেতে পারে, যা আরও বেশী ক'রে প্রমাণ করবে নবপর্যায়ের "আদর্শ হিন্দু হোটেল" আজ দর্শকদের ঢের বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে।

বলা বাহুল্য, এই অভিনয়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় হাজারী ঠাকুরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে। ভূমিকার অন্তরের গভীরে প্রবেশ ক'রে এমন জীবন্ত অভিনয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ওপর বহুদিন দেখিনি। এ যখন চেঁচিয়ে উঠতে চাইছে, মুখ তখন বোবা— সেই বাণীহীন ঠোঁট নড়া সহজে ভোলবার নয়। ছোট্ট একটি ভূমিকা—টেঁপির মা, হাজারী ঠাকুরের স্ত্রী। বেচারা প্রাণ খুলে কথা কইতে পারেনি কোথাও, সব সময়েই চাপা কণ্ঠে ঘোমটার আড়ালে নিজেকে ঢেকে রেখেছে। এই ভূমিকাটিকে সার্থক ক'রে তুলেছেন প্রবীণা সরযূ দেবী। আর ঐ হাজারীর মেয়ে টেঁপী—গ্রাম্য অশিক্ষিতা কিশোরী, যার জীবনের একটি বড়ো সাধ শহরের 'টকী' সিনেমা দেখা। এই টেঁপী চরিত্রটিও উপভোগ্যভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে দীপিকা দাসের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক অভিনয়ের গুণে। আর জহর রায় অভিনীত মতি চাকর! গোপাল ভাঁড় বলে, কোথায় আছি? কৌতুক-রসের তুফান তুলেছেন তিনি প্রেক্ষাগৃহে। কানে খাটো বংশীধর বেশে হরিধন মুখোপাধ্যায় একটি দৃশ্যে অবতীর্ণ হয়ে দর্শকদের মাতিয়ে দিয়ে যান। এবং নটীলালের ভূমিকায় অজিত চট্টোপাধ্যায় একবার হারু ও যদু বাঁড়ুজ্জেকে কাবু করবার পর শেষের দিকে প্রতিদ্বন্দ্বী হোটেলের চাকর মতিবেশী জহর রায়কে কাবু করতে এসে নিজেই শেষ পর্যন্ত 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' ক'রে পালিয়ে দর্শকবৃন্দকে চমৎকার পরিতৃপ্ত ক'রে যান। এ ছাড়া হোটেল মালিক বেচু চক্রবর্তীর ভূমিকায় মৃণাল মুখোপাধ্যায়, শালাবাবুর ভূমিকায় রবীন মজুমদার, যদু বাঁড়ুজ্জের ভূমিকায় কার্তিক সরকার, মাসকাবারী খদ্দের যতীশের ভূমিকায় অনাদি দাস, বংশীধরের ভাগ্নে নরেনের ভূমিকায় নির্মল চট্টোপাধ্যায়, শিকারীর

বি এ পি প্রোডাকসন্সের মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'কাজল' চিত্রের একটি দৃশ্যে : পাহাড়ী সান্যাল ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

ভূমিকায় লক্ষ্মীজনার্দন মুখোপাধ্যায় এবং পদ্মর রূপে পাগল বন্ধুর ভূমিকায় মিণ্টু চক্রবর্তী প্রভৃতি সকলেই যথাযোগ্য অভিনয় ক'রে প্রশংসা অর্জন করেছেন। ঠাকুরদাস মিত্রের হরিচরণ-বাবুও অল্পের মধ্যে চমৎকার।

নবপর্যায়ের অভিনয়েও পদ্ম ঝির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সেই প্রথম পর্যায়ের ভূমিকাভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিঃসন্দেহে একজন ক্ষমতাসম্পন্না অভিনেত্রী এবং রঙ্গমঞ্চে তাঁর জনপ্রিয়তাও প্রচুর। কিন্তু সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাজারী ঠাকুরের পাশে তাঁর অভিনয়কে অভিনয় ব'লেই মনে হয়েছে; এমন কি যখন তিনি নাটকের শেষের দিকে হাজারী ঠাকুরের কাছে এসে দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করছেন, তখনও তাঁকে জীবন্ত পদ্ম ঝি ব'লে মনে করতে পারিনি; মনে হয়েছে, তিনি পদ্মঝি সেজে অভিনয় করছেন। বিশেষ ক'রে রাণাঘাট শহরের মত জায়গার একটি সামান্য হোটেলের ঝিকে আজকের দিনে অমন চড়া মেক্-আপ করা অবস্থায় দেখতে কোনো দর্শকই চায় না। যেমন চায় না কুসুমে মোরাজিনীকে অমন আধুনিক বিধবার সাজে দেখতে। শিপ্রা মিত্রের কুসুম অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ—ভারী মিষ্টি লেগেছে তাঁর অভিনয়; কিন্তু তাঁর বেশবাস এবং মেক্-আপ জীবন্ত কুসুমকে রঙ্গমঞ্চের ওপর উপস্থিত করতে পারেনি। বরং অতসী রূপী কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়কে সাজসজ্জা এবং অভিনয়ে আমাদের জীবন্ত মনে হয়েছে বেশী। অতসীর মধুর চরিত্রকে তিনি মধুরতর রূপে প্রকাশ করেছেন।

রঙমহল শিল্পিগোষ্ঠী প্রযোজিত এবং অভিনীত "আদর্শ হিন্দু হোটেল" যে-কোনও নাট্যরসিক দর্শককে মুগ্ধ করবার ক্ষমতা রাখে ব'লে এর শতরাত্রির অভিনয় রজনীতে মনে হয়েছে। নাটকখানি অক্লেশে বহুশত রজনী অতিক্রান্ত করতে পারবে।
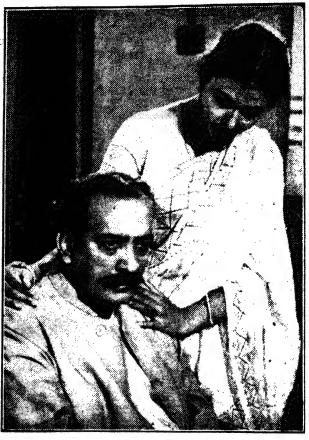
(২) কৃষ্ণকুমারী নাটক : অচলায়তনের নিবেদন; নাটক : মাইকেল মধুসূদন দত্ত; নবনাট্যরূপ ও প্রযোজনা : সুধী প্রধান; পরিচালনা : কালী সরকার; রূপায়ন : কালী সরকার, দেবু ভট্টাচার্য, সামু চট্টোপাধ্যায়, মাখন বসু, কেদার মল্লিক, পিনাকী বসু, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, দীপা হালদার, সবিতা মুখোপাধ্যায়, কল্পনা রায়, শেফালী দে প্রভৃতি।

"কৃষ্ণকুমারী নাটক"-এর রচনাকাল হচ্ছে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১০২ বছর আগে। মধুসূদনের এটি হচ্ছে ফরমাশি রচনা। তিনি যখন "সুলতানা রিজিয়া (রাজীয়া ?)"র জীবনী অবলম্বনে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটকের খসড়া রচনা করেন, তখন বেলগাছিয়া নাট্যশালার শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে মুসলমান চরিত্র নিয়ে নাটক লেখা থেকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে উপদেশ দেন, রাজপুত জাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করবার জন্যে। এবং তারই ফলে "কৃষ্ণকুমারী নাটক"-এর সৃষ্টি। নাটকখানির উৎসর্গপত্রে মধুসূদন লিখেছেন, "আমাদের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয়।" "কৃষ্ণকুমারী নাটক"-এই মাইকেল সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত পাশ্চাত্য রীতির প্রবর্তন করেন এবং এইখানিই হচ্ছে বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম দেশপ্রেম-মূলক ঐতিহাসিক নাটক ও ট্রাজিডি। কাজেই "কৃষ্ণকুমারী নাটক"-এর ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্টই আছে। কিন্তু আজকের দিনে এর নাটকীয় মূল্য কতখানি, সেটি বিচার্য বিষয়। দুজন রাজা একযোগে এক রাজকন্যার পাণি-প্রার্থী হ'ল; ফলে রাজকন্যার পিতা প্রমাদ গুনলেন এবং রাজ্যরক্ষা করবার জন্যে নিজ ভ্রাতাকে আদেশ দিলেন নিজ পুত্রীকে হত্যা করবার জন্যে। রাজভ্রাতা

আদেশ পালন করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত মমতাবশে তা' পারলেম না। কিন্তু রাজপুত্রী নিজে সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে আত্মহনন ক'রে পিতৃ-রাজাকে বিপন্মুক্ত করলেন। রাজমাতা শোকে প্রাণত্যাগ করলেন; রাজা নিজে হ'লেন উন্মাদ। —এই কাহিনী অবলম্বন ক'রে সেক্সপীয়র একটি অমর নাটক রচনা ক'রে যেতে পারতেন, কিন্তু মাইকেল তা' পারেননি। তিনি কয়েকটি অংক এবং গর্ভাংকের ভিতর দিয়ে কয়েকটি পাত্রপাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে গল্পটিকে বলেছেন, কিন্তু সার্থক নাটক রচনা করেননি।

এই অসার্থক নাটকটিকে বর্তমান যুগের দর্শকদের সামনে উপস্থিত করবার আগে নাট্যরসিক সুধী প্রধান তার ভাষাকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল করবার চেষ্টা করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে অবান্তর অংশকে যতদূর পেরেছেন বাদ দিয়েছেন। কিন্তু যে-নাটকীয়তা মূলে অনুপস্থিত, তাকে আমদানী করতে পারেননি বা করবার চেষ্টা করেননি 'খোদার •উপর খোদকারী' করা হবে, এই ভেবে।

কাজেই এই অভিনয় প্রচেষ্টাকে একশো বছর আগেকার বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম ট্রাজিডিটিকে দর্শকের সামনে নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরার মহৎ উদ্যম ছাড়া অন্য কিছুই ব'লে অভিহিত করা যায় না। এবং এদিক দিয়ে সুধী প্রধান প্রমুখ 'অচলায়তন' সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দিতই করব।

অভিনয়াংশে সামু চট্টোপাধ্যায় (জগৎ সিংহ), কালী সরকার (ভীম সিংহ), পিনাকী বসু (ধনদাস), মাখন বসু (সত্যদাস), কেদার মল্লিক (মন্ত্রী), শেফালী দে (মদনিকা), কবিতা মুখোপাধ্যায় (তপস্বিনী), কল্পনা রায় (বিলাসবতী) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

আড়ম্বরবর্জিত ক'রে মাত্র বিভিন্ন রঙের পশ্চাৎপটের সাহায্যে মঞ্চোপস্থাপন অভিনব প্রয়োগরীতির পরিচায়ক।
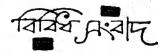
দ্বিজেন্দ্রলাল জন্ম শতবার্ষিকী :

নাট্যকার, কবি, গীতিকার এবং সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২০এ জুলাই কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে এই বছরের ২০এ জুলাই থেকে শুরু ক'রে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্ম-শতবার্ষিকী পালনের ব্যবস্থা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানে। কবির জন্ম-স্থান কৃষ্ণনগরে এই উপলক্ষ্যে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে। কবি-দুহিতা মায়া দেবী কবির বাস্তু-ভিটায় একটি স্মৃতিফলকের উদ্বোধন করেন। কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত সভা ছাড়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটেও একটি মহতী জনসভা আহূত হয়।

শিল্পিবৃন্দের 'চিরকুমার সভা'

উত্তর কলকাতার সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় "শিল্পিবৃন্দ" সম্প্রতি রবীন্দ্র-ভারতী ভবনে বিশ্বকবির 'চিরকুমার সভা' নাটকটি খুবই সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। এটি এ'দের তৃতীয় বার্ষিক প্রচেষ্টা। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী গীতা মিত্র। এই উপলক্ষে সভাকক্ষে বহু সুধীজনের সমাগম হয়েছিল এবং উৎসবটি একটি মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

সর্বশ্রী প্রভাতকান্তি ঘোষ (অক্ষয়), মুকুলকান্তি ঘোষ (দারুকেশ্বর), চিত্রানন্দ রায়চৌধুরী (রসিক), প্রফুল্ল মিত্র (শ্রীশ), গোরা গুহ (বিপিন) প্রদীপ মিত্র (পূর্ণ), শ্যামল দত্ত (চন্দ্রমাধব) এবং স্ত্রী চরিত্রে কুমারী মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায় (পুরবালা) সুস্মিতা মিত্র (শৈলবালা), সুপ্রিয়া মিত্র (নৃপবালা), কেকা মিত্র (নীরবালা) ও সুলতা মিত্র (নির্মলা) প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন।

সমগ্র নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীব্রজেন বসু এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্রীগোপাল বসু। এছাড়া পাদপ্রদীপের অন্তরাল থেকে সর্বশ্রী পীযূষ বসু, দীনেন রায়চৌধুরী, ভোলানাথ চন্দ্র ও তারাপদ রায় এ'দের সাহায্য করেন।

'শিল্পিবৃন্দ' অভিনীত 'চিরকুমার সভা'র দুটি দৃশ্যে (বামে) পুরবালা, রসিক ও অবলাকান্ত (শৈলবালা) (দক্ষিণে) সদ্য বিবাহেচ্ছু দারুকেশ্বর ও মৃত্যুঞ্জয় (দুই বন্ধু) এবং অতিথি আপ্যায়নরত অক্ষয়।

রঙমহলে "আদর্শ হিন্দু হোটেল"-এর ১০০তম অভিনয় :

গেল শনিবার, ২১এ জুলাই রঙমহলের শিল্পিগোষ্ঠী শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে "আদর্শ হিন্দু হোটেলে"র ১০০তম অভিনয় রজনীর স্মারক উৎসব পালন করেছিলেন। শিল্পিগোষ্ঠীর তরফ থেকে শ্রীমতী সরযু দেবীর অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর প্রধান অতিথিরূপে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সময়োচিত ভাষণের পর সভাপতি মহাশয় তাঁর সংক্ষিপ্ত ও সরস ভাষণদান করেন। পরে শিল্পিগোষ্ঠীর তরফ থেকে নাট্যকার গোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং মুখ্য ভূমিকাভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে পুরস্কৃত করবার পর শিল্পিগোষ্ঠীর সকলে সভাপতির হাত থেকে প্রশংসাপত্র গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে রঙমহল মঞ্চকে শিল্পিগোষ্ঠীর হাতে আনবার জন্যে সময়োচিত সহায়তাদানের জন্যে বাঙলার বরেণ্য জননেতা পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম বারংবার ধ্বনিত হয় এবং তাঁর স্মৃতি-রক্ষার তহবিলে ৫০১৲ টাকা প্রাথমিক দান দেওয়া হয়। পরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কর্তৃক যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর নাটকটি অভিনীত হয়।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা :

পোলিশ প্রজাতন্ত্রের ১৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে গেল রবিবার, ২২এ জুলাই সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে ১৯৬১ সালের ভেনিস স্বল্প দৈর্ঘ্য ছবির উৎসবে প্রথম স্থান অধিকারকারী, জ্যানুস ন্যাসফেতার পরিচালিত "কলার্ড স্টকিং" ছবিখানি দেখানো হয়।

নাট্যম্-এর 'বারো ভূতে' :

দক্ষিণ কলকাতার নাট্যম্ সম্প্রদায় গেল সোমবার, ১৬ই জুলাই মহারাষ্ট্র নিবাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বারো ভূতে' নাটিকাটি মঞ্চস্থ করেছিলেন।
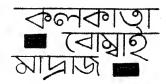
কলিকাতা

নিউ থিয়েটার্স দু' নম্বর স্টুডিওয় গত বৃহস্পতিবার থেকে পরিচালক তপন সিংহ তাঁর নতুন ছবি সরকার প্রোডাকসন্সের 'নির্জন সৈকতে'-র কাজ আরম্ভ করেছেন।

উত্তমকুমার ফিল্মস্ প্রাইভেট লিঃ সংস্থার আগামী কয়েকটি ছবির নাম— সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ', নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উত্তর ফাল্গুনী' এবং বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস'। চিত্র পরিচালনা করবেন যথাক্রমে তপন সিংহ ও অসিত সেন। প্রযোজক উত্তমকুমারের এই নতুন প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

বিদেশী উপন্যাস শার্লটি ব্রন্টি-র 'জেনআয়ার' অবলম্বনে 'শেষ বসন্তে' এই নতুন ছবিটি অজয় কর পরিচালনা করবেন বলে জানা গেল। চিত্রনাট্য রচনা করছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর।

'শিউলি বাড়ী'-র সাফল্যের পর পরিচালক পিযুস বোস একটি হাসির ছবি করবেন। ছবির নাম— লীলা মজুমদারের 'বক ধার্মিক।' এ ছবির পর শংকু মহারাজের 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' ছবিটির কাজ আরম্ভ করবেন শ্রীবোস।

চিত্রালয়ের আগামী ছবির নাম— 'দুই বাড়ী।' ছবিটি পরিচালনা করবেন অসীম পাল। অনিল চ্যাটার্জি ও তন্দ্রা বর্মণ দুটি প্রধান চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করবেন পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী অনুপকুমার, মিতা চট্টোপাধ্যায় এবং গীতা দে। সংগীত সংযোজনায় কালীপদ সেন।

উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাঃ লিঃ আগামী আর একটি ছবির প্রযোজনার কথা ভাবছেন। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' আবার নতুন করে চলচ্চিত্রে রূপ দেবেন সম্ভবতঃ পরিচালক অজয় কর। আশা করা যায় উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনের সম্মিলিত অভিনয় এ ছবির প্রধান আকর্ষণ হবে।

শিল্পী শ্যামল মিত্র ছবি-প্রযোজনার কথা ভাবছেন। সম্ভবতঃ দুটি ছবি প্রথমে আরম্ভ করবেন। কাহিনী দুটি লিখেছেন গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। প্রথমটি 'স্বর্ণস্বাক্ষর'-এর পরিচালক হলেন অগ্রদূত। প্রধান চরিত্রে উত্তমকুমার। দ্বিতীয়টি—'আড়ালে' পরিচালনা করবেন সুধীর মুখোপাধ্যায়। অভিনয় করবেন অনিল চ্যাটার্জি ও সুলতা চৌধুরী। সংগীত পরিচালনা করবেন প্রযোজক শ্যামল মিত্র।

সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরী 'অমৃতস্য পুত্র' ছবিটি পরিচালনা করবেন বলে শোনা গেল। কাহিনী ও সুরসৃষ্টি শ্রীচৌধুরী'র। কালী ব্যানার্জি ও তরুণকুমার দুটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন।

অঞ্জলি পিকচার্সের প্রথম ছবি 'মধুরেণ'-র শুভকাজ আরম্ভ হতে চলেছে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিনতা রায়। প্রধান নায়ক চরিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন বিশ্বজিৎ।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত একটি ছবি বিমল মিত্রের 'বেনারসী'। অরূপ গুহঠাকুরতা এ ছবির পরিচালক। প্রধান অংশে রুমা গুহঠাকুরতা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, সুরুচি সেনগুপ্তা ও শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত চিত্রের সুরকার হলেন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ.

'মিথুন লগ্ন'-এর পর পরিচালক শিব ভট্টাচার্য তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'মউঝুরি'-র কাজ আরম্ভ করেছেন ইষ্টার্ণ টকীজে। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রয়েছেন সাবিত্রী চ্যাটার্জি, মঞ্জুলা সরকার, দিলীপ রায়, অসিতবরণ, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, জ্ঞানেশ মুখার্জি ও দীপিকা দাস।

বোম্বাই—

মুনশি প্রেমচাঁদের বিখ্যাত উপন্যাস 'গবান'-এর হিন্দী চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক কৃষাণ চোপরা। সম্প্রতি আন্ধেরীর মোহন স্টুডিওতে চিত্রগ্রহণ শেষ হতে চলেছে। চিত্রনাট্য, গীত রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করছেন যথাক্রমে ভানুপ্রতাপ, শৈলেন্দ্র এবং হাসরৎ ও শঙ্কর-জয়কিষণ। প্রধান ও পার্শ্ব-চরিত্রে রূপদান করেছেন সুনীল দত্ত, সাধনা, প্রীতিবালা, মীনু মমতাজ, আনওয়ার হোসেন, প্রতীমা দেবী ও আনা।

চিত্র-সঙ্গমের 'আপনা বনাকে দেখো' পরিচালনা করছেন জগদীশ নিরুলা। ছবির দুটি গানের সম্প্রতি চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ হল। গানদুটি গেয়েছেন মহম্মদ রফি ও আশা ভোঁসলে। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন রবি। মনোজকুমার

এবং আশা পারেখ এ ছবির প্রধান আকর্ষণ।

রূপতারা স্টুডিওয় নীতিন বসু পরিচালিত 'নর্তকী' সমাপ্তপ্রায়। সুনীল দত্ত ও নন্দা এ ছবির নায়ক-নায়িকা। আশা ভোঁসলের কণ্ঠে দুটি গান অনবদ্য সুর করেছেন সংগীত-পরিচালক রবি। বোম্বাইয়ের পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন লক্ষ্মী চিত্রের পরিচালকেরা। এ ছবির প্রযোজনা করছেন মুকুন্দ ত্রিবেদী।

'হিন্দুস্থান' সংস্থা আগামী ছবির জন্য পরিচালক রমেশ সাইগল, কবি সাহির ও সংগীত-পরিচালক ও, পি, নায়ার—এই তিনজনকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন।

একটি নাটকীয় ছবি 'নকলী নবাব'-এর দৃশ্যগ্রহণের প্রস্তুতি চলেছে শ্রীসাউন্ড স্টুডিওয়। ছবিটি পরিচালনা করছেন তারা হরিশ। চরিত্র রূপায়ণে মনোজকুমার, শাকিলা, কে এন সিং ও ইন্দিরা। নাম-ভূমিকায় রয়েছেন অশোককুমার।

সম্প্রতি সেণ্ট্রাল স্টুডিওয় একটি ছবির (নামকরণ হয়নি) মহরৎ সুসম্পন্ন হল। কেদার কাপুর ছবিটি পরিচালনা করছেন। রাগিণীর অভিনয়ে মহরতের প্রথম দৃশ্য গৃহীত হল। অজিত, হেলেন, ইন্দিরা, লীলা মিশ্র প্রভৃতি শিল্পী এই ছবির ভূমিকালিপি। সংগীত পরিচালনা করবেন উষা খান্না।

শেখ ট্যান্ডন পরিচালিত 'প্রফেসার' সমাপ্তপ্রায়। ছবির মুখ্য অংশগুলির দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি সমাপ্ত হল। এই অংশে প্রধান ভূমিকালিপি ছিল শাম্মি কাপুর, কল্পনা, পরাভিন চৌধুরী ও ললিতা পাওয়ার। ইস্টম্যান রঙে এই রঙিন ছবির সুর-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

রঙিন ছবি 'তাজমহল'-র দৃশ্যগ্রহণ শুরু হল ফেমাস স্টুডিওয়। 'মুশায়েরা' দৃশ্যে প্রদীপকুমার, বীণা রাই, রেহমান, জীবন ও মীনু মমতাজ অভিনীত চরিত্রলিপি। সংগীত-পরিচালনা করছেন রোশান।

সম্প্রতি অলোক চিত্রের 'কঁহী দীপ জলে, কঁহী দিল' চিত্রের শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন হল রঞ্জিত স্টুডিওয়। নন্দা ও শশী কাপুর ছিলেন সেদিনের প্রথম দৃশ্যের শিল্পী। এ ছবির অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন ধর্মেন্দর, রেহমান, আনা, রসিদ খান ও নাসিম। কলাকুশলীদের মধ্যে রয়েছেন পরিচালক সুরজপ্রকাশ, সংগীত-পরিচালক কল্যাণজী, চিত্র-গ্রাহক তারা দত্ত ও শিল্প-নির্দেশনায় এস. এন. কালকার্ণী। কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার হলেন নির্মল সরকার। ছবিটি প্রযোজনা করছেন শ্রীষ পাঠক।

মাদ্রাজ—

মাদ্রাজ তথা ভারতের বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাণকেন্দ্র বিজয়া-বাহিনী স্টুডিওয় সম্প্রতি কলাকুশলীদের ধর্মঘটে চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ বন্ধ আছে। গত ১৭ই জুলাই থেকে প্রায় ৬৭৬ জন কর্মী এই ধর্মঘটে যোগদান করেছে। মোট এগারোটি স্টুডিও-ফ্লোরে একসংগে সাতটি ছবির সুটিং চলতো। এই ধর্মঘটের ফলে প্রায় ৫৮টি ছবির কাজ বন্ধ হয়েছে।

পরিচালক এস. বালাচন্দার অভিনীত ও পরিচালিত 'আবানা ইবান' এই রহস্য কাহিনীর চিত্রগ্রহণের কাজ সমাপ্তপ্রায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন চান্দিনী, বাসন্তী, সি, কে সরস্বতী, বেবি পদ্মিনী, গণপতি ভট্টাচার্য, এস, এন, লক্ষ্মী, শ্রীমান শ্রীধর এবং নবাগত রমেশ।

সম্প্রতি 'দি ফিল্ম ফ্যানস্ এসোসিয়েশন'এর তরফ থেকে ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মালায়ালম চিত্রের জন্য সম্মানিত হয়েছেন শিবাজী গণেশন, এ, নাগেশ্বর রাও, উদয়কুমার এবং সত্যান। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর মানপত্র পেয়েছেন জি. সাবিত্রী, কৃষ্ণা কুমারী, বি সরোজাদেবী এবং পদ্মিনী। 'পাথা মালার' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পত্র পেয়েছেন এ, ভীমসিংহ। শ্রেষ্ঠ কৌতুক-অভিনেতা হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন কে, এ, থাঙ্গাভেলু।

—চিত্রদূত

আমি এখানে এসেছি বারে বারে। এই বিশালতার কাছে। এই অশেষের বালুকাপারে। আমার বার বার ছুটে আসা জীবনের মাঝে ঐ সব চরিত্র-মিছিলের সারি সারি মুখ নির্জন সৈকতের দিগন্তহীন নিরালায় আমায় গল্প বলে। 'সাগর-ঘর হোটেল'-র ঐ এক চোখ কাণা সঞ্জয়ের দীর্ঘশ্বাসভরা জীবনে তার স্ত্রী বিম্বাধরী'র অনুপস্থিতিতেও আমায় তেমন দোলা দেয় নি যতটা না—সেইবার ! যেবার আমি প্রথম আসি এই নির্জন সৈকতে।

আমার দৌড় হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত। তারপর যাত্রী হয়েছি রাতের গাড়ীতে। কয়েক মুহূর্তের আলাপে চিরদিনের চেনা মনে হল ঐ ছোট বৌদি, রেণু, সেজদি, অবুদি আর শিবিদিকে। পুরীর জগন্নাথ মন্দির দর্শনে এ'রা বেরিয়েছেন। একবস্ত্রে আমার বৈরাগ্য দেখে বৈরাগী ভেবেছেন বুঝি! তাই চোখে চোখে তাঁরা রেখেছিলেন। কিন্তু আমি মুক্তি চেয়েছি। শুধু ছোটবৌদি আর রেণু আমায় হাতছানি দিয়েছে বারবার। কৌতূহল দমন করতে পারিনি। পুরীর নাটমন্দিরের এক কোণে বসে রেণুর জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি। রেণু তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে মৌন এক মূর্তি। চোখে ওর ব্যথা-করুণ দৃষ্টি।

ছোট বৌদি আমার উত্তর দিলেন—ও একটি ছেলেকে ভালবাসত। রেণুর বাবা, আমার ভাই সেটা পছন্দ করতো না। লেখাপড়া জানা ছেলে, বংশও ভাল। তবে জাতি আলাদা। বছর দুই কাটলো। রেণুর বাবা শেষে মত দিলেন। কিন্তু ছেলে বেঁকে বসল, বিয়ে সে করবে না। তার এখন আর ইচ্ছে নেই। আমরা জোর করতে রেণু আমাদের এক কথায় থামিয়ে দিল। বললে—'পিসীমা তোমরা এমন করলে আমি গলায় দড়ি দেবো। ওকে আর একটি কথাও তোমরা বলো না।' বললাম—'এখন কি করবি তবে?' বললে—'কেন যা করছিলাম। সংসারের কাজ করবো। একটু লেখাপড়া করব। তবে পিসী, পুরীতে তোমার মহেন্দ্র আশ্রমে যদি যাও, তবে এখান থেকে কিছুদিনের মত চলে যাই।' ভেবে দেখলাম সেই ভাল। স্বর্গদ্বারে মহেন্দ্র আশ্রমে আমার গুরুর ঠাঁই। তাই তো চলে এলাম এখানে।

ছোট বৌদি যেন রহস্যময়ী। তাঁর সঙ্গে যেন আমার অনেককালের আত্মীয়তা। এই কয়দিনের মধ্যে তিনি আমায় কত আপন করে নিয়েছেন। তাই তো যত ভাবি বন্ধন আর বাঁধবো না ততবারই নিজেকে ধরা দিয়েছি। ও'রা আমায় বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেজদি শিবি ও অবুদিকে ছোট বৌদি বলেছিলেন, 'ঠাকুরঝি ওকে যেতে দাও। ও পুরুষ মানুষ, ও এখানে ঘুরবে, সেখানে যাবে, ওকে কি আমরা ধরে রাখতে পারি।

সরকার প্রোডাকসন্সের কালকূট রচিত নির্জন সৈকতে চিত্রগ্রহণের অবসরে পরিচালক তপন সিংহ, রুমা গুহঠাকুরতা, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর।

তাতে আমরা হেনস্থা হবো, ও-ও হেনস্থা হবে। পুরীতে থাকলে দেখা হবেই।'

আমি মুক্তি পেয়েছি যাযাবর জীবনের মধ্যে। পথে পথে সে ছায়াস্মৃতি ভুলতে চেয়েছি। হোটেলে এসে উঠলাম। ম্যানেজার মহিমবাবু আমার জীবনে পরমপিতার স্থান অধিকার করলেন। পথ পরিক্রমায় সে সব ছবি আমি ভুলতে চেয়েছি বারবার। ইতিহাসের পাতায় পাতায় ঘুরে বেড়িয়েছি—খন্ডগিরি আর উদয়গিরি, রাণীগুম্ফা থেকে কোনারকে। পাষাণের মৌনতা আর ঝাউবনের দীর্ঘশ্বাস এই সমুদ্র পাড়ে বসে আমায় ফিরে যাবার ডাক পাঠিয়েছে। কিন্তু ফেরা আর হল না। এই বালিয়াড়ির আড়ালে একদিন আবিষ্কার করলো রেণু আমায়। ওরা এখনও আছে ঐ মহেন্দ্র আশ্রমে দুজনে—রেণু আর ছোটবৌদি। তবে রেণু বদলেছে। সেই শোকাতুর ছায়া অস্তমিত। দুচোখে কুমারীমনের প্লাবন এনেছে ঐ সমুদ্র ঢেউয়ে। রেণু এখন অনেক-কথা বলে।

ছোট বৌদি আগের মতই আছেন।

রেণু আমার সঙ্গে নির্জন সৈকতে বসে নিজের অনেক কথা বলেছে। আমিও আমার কাহিনী বলেছি। ভেবে দেখলাম আমি পরিব্রাজক নই, সন্ন্যাসী নই। তবু শান্তির সন্ধানে আমি একজন ফেরারী মানুষ। তাই মুক্তি-সন্ধানে আমি অস্থির হয়ে বারবার ছুটে আসি এই মহাসমুদ্রের কাছে।

এবার মহেন্দ্র আশ্রমে যেতে ইচ্ছে হল না। তাই নোঙর ঘরে সঞ্জয়ের জীবন-কাহিনী শুনে অগ্রহায়ণের বর্ষাঘন দিনগুলি কাটছিলো। খবর এল চিল্কার শেষ প্রান্ত রম্ভায় যাওয়া দরকার। কিন্তু তার আগে রেণুর মান ভাঙাতে হবে। কারণ রেণুকে যে ভালবাসত সেই ছেলেটি এখানে এসেছে রেণুকে জীবনসঙ্গিনী করে নিয়ে যেতে।

রেণু লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই সে ধরা দেবে না। সে সব ভুলে গেছে নিখিলের সঙ্গে ভালবাসার কথা। তাই রেণুকে বোঝাতে গিয়ে আমার পাষাণ শিলায় কাঁপন লাগলো। অতিকষ্টে ছোট বৌদির ভাষায় বললাম—'এরই বুকের ওপর বসে আমাদের হাসতে হবে। সেখানে আমরা সাবিত্রী সত্যবান।' রেণু চুপ করলো। তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। এত করুণ আর কখনোও মনে হয়নি রেণুকে। ওর চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। বললাম, 'চল'।

রেণু গেল সংসারের পথে। আমিও যাব। তার আগে রম্ভায় না এসে পারলাম না।

কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই। কালকূট রচিত এই উপন্যাস 'নির্জন সৈকতে' আপনারা এর আগে পড়েছেন। সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স দুনম্বর স্টুডিওর স্বত্বাধিকারী সরকার প্রোডাকসন্সের

প্রযোজনায় তপন সিংহ এ কাহিনীর চলচ্চিত্র রূপায়ণে ব্রতী হয়েছেন।

ছবির চিত্রগ্রহণের প্রথম দিনের খবর পেয়ে বর্ষণ-শ্রাবণের দুপুরে স্টুডিওতে উপস্থিত হলাম।

পুরীর মহেন্দ্র আশ্রমে ছোট-বৌদিরা যেখানে থাকেন সেই ঘরের দৃশ্য গ্রহণের কাজ চলছিল জোরে। আলোক-চিত্রশিল্পী বিমল মুখোপাধ্যায় ঘরের আলোর পরিমাপ কমবেশী করছিলেন লাইট মিটারের সাহায্যে। শিল্পনির্দেশক সুনীতি মিত্র ঘরটির চেহারা দৃশ্যসজ্জায় সাদাই আশ্রমের কোন একটি ঘর করে তুলেছিলেন। চারিদিকে ইতঃস্তত ছড়ানো টুকিটাকি জিনিসপত্র। মাঝখানে খাট সেখানে বসে রেণু। রান্নাঘরে ঘর-কন্নায় ব্যস্ত ছোটবৌদি। সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো সেই ভবঘুরে গল্পের 'আমি' রবীন।

রবীন—ছোটবৌদি?

ছোটবৌদি—আরে আসুন ভাই, আসুন।

রবীন—অবুদি কেমন আছেন?

ছোটবৌদি—ভাল।

রেণু—ভাল বলে ভোরবেলায় উঠে একচোট সমুদ্রে স্নান হয়েছে। তারপর মন্দিরে গেছে।

ছোটবৌদি—বসুন ভাই, আমি একটু চা করে আনি। এখানে সব সরঞ্জাম করা রয়েছে।

রেণু—ছোটবৌদি, তুমি বরং ওর কাছে বস, আমি চা করে আনি।

রবীন—হ্যাঁ, ওকে দিয়ে ভালভাবে কাজ করান তো, দিনরাত শুধু মুখভার করে থাকেন।

রেণু—আমি তো কাজ করতেই চাই। উনিই তো কিছু করতে দেন না।

এই দৃশ্যটিতে অভিনয় করলেন রবীনের ভূমিকায় অনিল চ্যাটার্জি। ছোটবৌদি—রুমা গুহঠাকুরতা এবং রেণুর চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর। ছবির কোন একটি অংশের এই দৃশ্যটির কন্টিনিউটি বজায় রেখে কিভাবে অভিনয় করতে হবে তার নির্দেশনা দিলেন তপন সিংহ। ফাইন্যাল মনিটরের পর দুতিনটি 'টেক' করলেন শ্রীসিংহ। ক্যামেরা ট্র্যাকিংয়ের ওপর দৃশ্যটি গ্রহণ করলেন বিমল মুখোপাধ্যায়। ওদিক থেকে সাউন্ডভ্যানে শব্দগ্রহণ করলেন অতুল চট্টোপাধ্যায়। এইসঙ্গে কলাকুশলীদের মধ্যে সহ-যোগিতা করলেন পরিচালনায় বলাই সেন, শ্যামল চক্রবর্তী ও পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। দৃশ্যগ্রহণে দীপক দাস এবং অমূল্য দত্ত। ব্যবস্থাপনায় রতন চক্রবর্তী ও শান্তি-শেখর চৌধুরী। অভিনয়ে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন ভারতী দেবী, ছায়া দেবী, রেণুকা দেবী, অমর মল্লিক, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, নৃপতি চ্যাটার্জি, রবি ঘোষ ও রথীন ঘোষ।

—চিত্রদূত

ফ্রাংক ভেডেকিন্ড-এর নাটক অবলম্বনে তোলা জার্মান চলচ্চিত্র 'লুলু'র একটি দৃশ্যে নায়ক ক্লাউস হোরারিং এবং নায়িকা নাদজা টিলার। চিত্রটির প্রযোজক রলফ্ থিলে।

॥ বৃটিশ ফিল্ম অ্যাকাডেমি পুরস্কার ॥

১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে বৃটিশ ফিল্ম অ্যাকাডেমি "এ টেস্ট অফ হানি" চিত্রটিকে মনোনীত করেছেন। শ্রেষ্ঠ বৃটিশ চিত্রনাট্য হিসেবে "এ টেস্ট অফ হানি" এবং অপরেকটি ছবি "দি ডে দি আর্থ কট্ ফায়ার" যুগ্মভাবে প্রথম হয়েছে। তথ্যচিত্র ভাগের পুরস্কৃত ছবি হচ্ছে 'টারমিনাস'। বিদেশী চিত্র বিভাগে যুগ্মভাবে প্রথম হয়েছে রাশিয়ার "ব্যালেড অফ এ সোলজার" এবং আমেরিকার "দি হাস্টলার" (সম্প্রতি কলকাতায় ছবিটি দেখানো হয়েছে।) কার্টুন ছবির বিভাগে ওয়াল্ট ডিজনের "ওয়ান হানড্রেড এ্যান্ড ওয়ান ডালমেশিয়ানস" ছবিটি পুরস্কৃত হয়েছে এবং বিদেশী তথ্যচিত্র হিসেবে ফ্রান্সের "ভলক্যানো" প্রথম পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েছে।

বৃটিশ ফিল্ম অ্যাকাডেমি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরও নাম ঘোষণা করেছেন। "এ টেস্ট অফ হানি"র অভিনেত্রী ডোরা ব্রায়ান শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান লাভ করেছেন পিটার ফিন্চ "নো লাভ ফর জনি" ছবিটিতে অভিনয়ের জন্যে। বিদেশী অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে মনোনীত হয়েছেন সোফিয়া লোরেন "টু উইমেন" চিত্রের জন্যে এবং পল নিউম্যান "দি হাস্টলার" চিত্রের জন্যে।

—চিত্রকূট
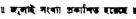
॥ ফুটবল লীগ ॥

গত সপ্তাহে (১৬ই জুলাই থেকে ২১শে জুলাই পর্যন্ত) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোট ১২টি খেলা হয়েছে। খেলার ফলাফল: ৮টা খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে এবং বাকি ৪টে খেলা ড্র গেছে। আলোচ্য সপ্তাহের শুক্রবার দিন বৃষ্টির জন্যে ক'লকাতা ময়দানের অনেক খেলাই বন্ধ হয়ে যায়। তার মধ্যে প্রথম বিভাগের এই তিনটি খেলা ছিল—ইষ্টার্ন রেলওয়ে বনাম পুলিশ, হাওড়া ইউনিয়ন বনাম বালী প্রতিভা এবং এরিয়ান্স বনাম খিদিরপুর। আরম্ভের কিছুক্ষণ পর খেলা তিনটি পরিত্যক্ত হয়। এ বছরের ফুটবল মরসুমে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বৃষ্টির জন্যে খেলা বন্ধ হ'ল।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আলোচ্য সপ্তাহে দুটো ম্যাচ খেলে তিন পয়েন্ট পেয়েছে। স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ১—০ গোলে পরাজিত ক'রে তারা মোহনবাগানের সঙ্গে শনিবারের চ্যারিটি খেলাটি গোলশূন্য ড্র করে। ফলে লীগ তালিকায় তাদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। সমান খেলায় মোহনবাগানের থেকে ১ পয়েন্ট কম পেয়ে ২য় স্থান। ইস্টবেঙ্গল দলের আর তিনটে খেলা বাকি—এরিয়ান্স, বালী প্রতিভা এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গে।

অপর দিকে মোহনবাগানও আলোচ্য সপ্তাহে দুটো ম্যাচ খেলে তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। উয়াড়ীর বিপক্ষে ফিরতি খেলায় মোহনবাগান ২—০ গোলে জয়লাভ ক'রে উয়াড়ীর কাছে পূর্বে পরাজয়ের শোধ নিয়েছে। লীগের প্রথম খেলায় মোহনবাগান ০—১ গোলে উয়াড়ীর কাছে পরাজিত হয়েছিল। এ পর্যন্ত মোহনবাগানের ২৫টা খেলায় ৩৭ পয়েন্ট—লীগের তালিকায় প্রথম স্থান। মোহনবাগানের আর তিনটে খেলা বাকি—এরিয়ান্স, ইষ্টার্ন রেলওয়ে এবং [illegible] টেলিগ্রাফের বিপক্ষে।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের লীগের ফিরতি খেলাটি পরলোকগত পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতি তহবিলের সাহায্যার্থে চ্যারিটি খেলা হিসাবে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এই চ্যারিটি খেলায় টিকিট বিক্রয় বাবদ ৬১ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়া এই দিনের খেলায় মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষ থেকে দু' হাজার টাকা এবং মোহনবাগান ক্লাবের কয়েকজন সদস্যের দেয় ৭৫৭১ টাকা পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর হস্তে অর্পণ করা হয়। পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই দিনের খেলায় উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের [illegible] বৃদ্ধি করেন।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল [illegible] এই ফিরতি খেলাটি মোটে [illegible] পর্যায়ের হয়নি। দুই দলেরই কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় এই দিনের খেলায় অনুপস্থিত ছিলেন, কারণ [illegible] আগামী চতুর্থ এশিয়ান গেমস [illegible] প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে হায়দ্রাবাদের শিক্ষা শিবিরে যোগদান করেছেন। তবে যাঁরা [illegible] তাঁদের খেলা একেবারে [illegible]। খেলোয়াড়দের মধ্যে [illegible] পাওয়া যায় [illegible] ভাল খেলার কৃতিত্ব [illegible]

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের লীগের ফিরতি খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করছেন।

প্রথম [illegible] ফুটবল লীগ খেলায় মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের ফিরতি খেলায় মোহনবাগানের লেফট-ব্যাক রহমন ইস্টবেঙ্গল দলের [illegible] সণীর, পদটির কাছ থেকে একটি বল কেড়ে নিয়ে নিজের আয়ত্তে এনেছেন।

[illegible] ইস্টবেঙ্গল দলের থেকে [illegible] বেশী ছিল। [illegible] মাঝে মাঝে দ্রুত [illegible] আক্রমণ চালিয়ে খেলায় উত্তেজনা [illegible] করেছিল। উভয় দলেরই আক্রমণ [illegible] খেলোয়াড়েরা বিপক্ষের গোলমুখে [illegible] নিয়ে গিয়ে সময়মত গোলে বল মারতে [illegible] পারেননি অথবা তাড়াতাড়ি বল মেরে গোল দেওয়ার সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। ফলে উভয় দলেরই রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের নাজেহাল হতে হয়নি। তাঁরা আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। খেলায় মাঝে মাঝে কোন কোন খেলোয়াড়কে বে-আইনীভাবে গায়ের জোর দিয়ে খেলতে দেখা যায়। রেফারীর কয়েকটি

ভ্রমাত্মক নির্দেশ খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ কিছুটা ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। তবে খেলার শেষে উভয় দলেরই খেলোয়াড়রা সমস্ত অপ্রিয় ঘটনা ভুলে গিয়ে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হন এবং মোহনবাগান [illegible] তাঁবু প্রাঙ্গণে একত্রে জলপান [illegible] উজ্জ্বল খেলোয়াড়সুলভ মনো[illegible]র দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

গত বছরের রানার্স-আপ বি এন আর দল গত সপ্তাহে (৯ই জুলাই থেকে ১৫ই জুলাই) তিনটে ম্যাচ খেলে ৫ পয়েন্ট পেয়েছিল। আলোচ্য সপ্তাহে দুটো ম্যাচ খেলে তারা ২ পয়েন্ট পেয়েছে —বাটা স্পোর্টস দলের সঙ্গে ০—০ গোলে এবং ওয়াড়ীর সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র করে।

ইস্টার্ন রেলওয়ে লীগের তালিকায় বর্তমানে তৃতীয় স্থানে আছে। আলোচ্য সপ্তাহে তারা দুটো ম্যাচ খেলে ২ পয়েন্ট পেয়েছে। তারা ১—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে, কিন্তু পরবর্তী খেলায় ০—১ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ দলের কাছে পরাজিত হয়। এখন তারা ২১টা খেলায় ২৫ পয়েন্ট করেছে।

মহমেডান স্পোর্টিং দল আলোচ্য সপ্তাহে দুটো ম্যাচ খেলে একটা পয়েন্টও সংগ্রহ করতে পারেনি। তারা ইস্টার্ন রেলওয়ের কাছে ০—১ গোলে এবং হাওড়া ইউনিয়নের কাছে ০—১ গোলে পরাজিত হয়েছে। ২০টা খেলায় তাদের ২০ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে। বাটা স্পোর্টস ক্লাব আলোচ্য সপ্তাহে দুটো খেলায় ২ পয়েন্ট পেয়ে মহমেডান স্পোর্টিং দলের ওপরে উঠে চতুর্থ স্থান নিয়েছে—২০টা খেলায় ২১ পয়েন্ট।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় বর্তমানে সর্বশেষ স্থানে আছে বালী প্রতিভা। আলোচ্য সপ্তাহে তারা ০—২ গোলে খিদিরপুর দলের কাছে পরাজিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ খেলায় জয়লাভের ফলে খিদিরপুর দল দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে উপস্থিত রক্ষা পেয়েছে। বালী প্রতিভার দুর্ভাগ্য, তারা লীগের ফিরতি খেলায় সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। লীগের প্রথমার্ধের খেলায় এই দলই মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গে খেলা ড্র রেখে 'জায়েন্ট কিলার' আখ্যা পেয়েছিল।

দ্বিতীয় বিভাগের খেলা

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে পোর্ট কমিশনার্স দল—১৬টা খেলায় ২৫ পয়েন্ট। পোর্ট কমিশনার্স দল মোট ১৬টা খেলার মধ্যে ১০টা খেলায় জয়লাভ করেছে এবং খেলা ড্র করেছে ৫টা।

লীগের খেলায় তাদের একমাত্র পরাজয় সদ্বায়ন দলের কাছে, ০—১ গোলে। আগামী বছর থেকে পোর্ট কমিশনার্স দল প্রথম বিভাগে খেলবে। দ্বিতীয় বিভাগে সর্বনিম্ন স্থান পেয়ে তৃতীয় বিভাগে নেমেছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব। তাদের ১৬টা খেলায় ৭ পয়েন্ট। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় এবং আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব হিসাবে সুপরিচিত ছিল। ক্যালকাটা ফুটবল দলের সঙ্গে যে কোন ভারতীয় ফুটবল দলের খেলাকে আমরা জাতীয় মর্যাদার পর্যায়ে স্থান দিতাম। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব তার সুদীর্ঘ কালের জীবনে ৮ বার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ এবং ৯ বার আই এফ এ শীল্ড লাভ করে। তারা উপর্যুপরি তিনবার (১৯২২-২৪) আই এফ এ শীল্ড পায় এবং অপরাজেয় অবস্থায় প্রথম বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে দু'বার —১৯১৬ এবং ১৯২২ সালে। একই বছরে প্রথম বিভাগের লীগ কাপ এবং আই এফ এ শীল্ড পায় দু'বার, ১৯২২ ও ১৯২৩ সালে। ১৯৫০ সালে তারা প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় সর্বনিম্ন স্থান পেয়ে ১৯৫১ সাল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে থাকে।

তৃতীয় বিভাগের খেলা

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের তৃতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে রেঞ্জার্স। আগামী বছরে রেঞ্জার্স দ্বিতীয়-বিভাগে খেলবে।

এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতীয় এ্যাথলেটিকস দল

জাকার্তায় আসন্ন চতুর্থ এশিয়ান গেমসের এ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ১৭ জন এ্যাথলেটকে নিয়ে ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছে। 'উড়ন্ত শিখ' নামে খ্যাত মিলখা সিং ভারতীয় এ্যাথলেটিকস দলের দলপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই দলে মাত্র একজন মহিলা—এলিজাবেথ ডেভনপোর্ট (রাজস্থান) স্থান পেয়েছেন।

১০০ মিটার ঃ পি রাজশেখরণ (মাদ্রাজ) এবং এন ফেরাও (মহারাষ্ট্র)।
২০০ মিটার ঃ মিলখা সিং (পাঞ্জাব)।
৪০০ মিটার ঃ মিলখা সিং (পাঞ্জাব) এবং মাখন সিং (সার্ভিসেস)।
৮০০ মিটার ঃ দলজিৎ সিং এবং মহীন্দর সিং (সার্ভিসেস)।
১,৫০০ মিটার ঃ অমৃত পাল এবং প্রিতম সিং (সার্ভিসেস)
৫,০০০ মিটার ঃ ত্রিলোক সিং (সার্ভিসেস)।
১০,০০০ মিটার ঃ ত্রিলোক সিং (সার্ভিসেস)।
৪×১০০ মিটার রীলে ঃ মিলখা সিং, মাখন সিং, দলজিৎ সিং এবং জগদীশ সিং
১১০ মিটার হার্ডলস ঃ গুরুবচন সিং (দিল্লী)।
ডেকাথলন ঃ গুরুবচন সিং (দিল্লী) এবং যোগীন্দর সিং (সার্ভিসেস)।
সট্‌পুট ঃ ডি ইরানী (মহারাষ্ট্র) এবং যোগীন্দর সিং (সার্ভিসেস)।
ডিসকাস থ্রো ঃ পরদুমন সিং এবং বলকার সিং (সার্ভিসেস)।
জার্ভেলিন (মহিলা বিভাগ) ঃ এলিজাবেথ ডেভনপোর্ট (রাজস্থান)।

বিদেশ সফরে ভারতীয় টেনিস দল

সুইডিশ আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে স্পেনের চ্যাম্পিয়ান ম্যানুয়েল শান্তানা (স্পেন) ৫—৭, ৬—২, ৮—৬ ও ৬—৪ গেমে ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন।

* * *

আমেরিকান জাতীয় ক্লে কোর্ট প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের জয়দীপ মুখার্জি তৃতীয় রাউণ্ড পর্যন্ত খেলেছিলেন। তৃতীয় রাউণ্ডে তিনি আমেরিকার মার্টিন রিসেনের কাছে পরাজিত হন।

* * *

সুইজারল্যাণ্ডের আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রেমজিৎ লাল দ্বিতীয় রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার মার্টিন মুলিগানের কাছে পরাজিত হন।

আখতার আলী পরাজিত হন অস্ট্রেলিয়ার কেন ফ্লেচারের কাছে দ্বিতীয় রাউণ্ডে।

প্রেমজিৎ লাল এবং আখতার আলীর জুটি ডাবলসের খেলায় প্রথম রাউণ্ডেই রৌজ্জল এবং টিলির জুটির কাছে পরাজিত হন।

তরুণ ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংল্যাণ্ড সফর

আগামী গ্রীষ্মকালে তরুণ ভারতীয় খেলোয়াড়পুষ্ট একটি ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ড সফরে যাবে। এই দলটি দু'মাস ধরে ইংল্যাণ্ড সফর করবে। ইংল্যাণ্ড সফরে এই তরুণ দলটি ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত উস্টারশায়ার, ওয়ারউইকশায়ার, ইয়র্কশায়ার কাউণ্টি দলের সঙ্গে খেলবে। এই কাউণ্টি ক্রিকেট দলগুলি বর্তমানে সারে কাউণ্টি দলের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এই ক্রিকেট সফরের ব্যবস্থা করেছেন ভারতীয় বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের ইংল্যাণ্ডস্থিত প্রতিনিধি মিঃ জিওফ্রে হাওয়ার্ড। মিঃ হাওয়ার্ড ল্যাঙ্কাশায়ার কাউণ্টি ক্রিকেট দলের সেক্রেটারি। এই সফরে তরুণ ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়রা বিদেশ সফরের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করবেন এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দল গঠনে বিশেষ সহায় হবেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্প্রতি প্রকাশিত

বিমল মিত্রের নূতন আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস

নফর সংকীর্তন ২·৫০

সুধীরচন্দ্র সরকার প্রণীত

বিবিধার্থ অভিধান ৬·৫০

[বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন প্রকার অভিধান। প্রায় পনেরো হাজার শব্দের সমন্বয়ে গ্রথিত]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুখপাঠ্য গল্পগ্রন্থ

এমন দিনে ৩·৭৫

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ

বঙ্কিমচন্দ্র ৫·০০

'বনফুল'-এর সর্বাধুনিক উপন্যাস

কন্যাসু ২·৫০

শ্রীদিলীপকুমার রায় সংকলিত

দ্বিজেন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ

দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন ৮·০০

[দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত, কাব্যগ্রন্থ, জাতীয় সঙ্গীত, ধর্ম-সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত ও খণ্ড কবিতার সংকলন]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিকতম গল্পগ্রন্থ

ব্যোমকেশের ছ'টি ৪·৫০

স্মরণীয় ৭

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই আষাঢ়ের বই

'বনফুল'-এর গল্প সংগ্রহ
" (প্রথম শতক) ৮·৫০
[একশতটি গল্প সংকলন]

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের
স্মৃতিচারণ (২য় খণ্ড) ৬·৫০
[এই খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, বারীন্দ্রকুমার, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণের বৃত্তান্ত সমৃদ্ধ]

কাজী আবদুল ওদুদের
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২·০০

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের প্রকাশনার আরও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
রবি-কথা ৩·৫০

বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কবি-প্রণাম ৫·০০

কানাই সামন্তের
রবীন্দ্র প্রতিভা ১০·০০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৩·৫০

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-কথা ২·০০

সদ্য প্রকাশিত

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহের
আকাশ ও পৃথিবী ১০·০০
[প্রাচীন মানুষ যা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল, তা হলো আকাশ ও পৃথিবী। তারই রহস্যময় পরিচয় সরস গল্পের ভঙ্গীতে লেখা।]

কয়েকখানি উপহারযোগ্য ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মৌসুমী ৩·০০

'বনফুল'-এর
১৯৬১-৬২ সনের
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ
হাটেবাজারে ৩·৫০
জলতরঙ্গ ৪·৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কাঞ্চনমূল্য ৫·৫০

বাণী রায়ের
আরও কথা বলো ২·৭৫

সত্যপ্রিয় ঘোষের
গান্ধর্ব ৩·৫০

দীপক চৌধুরীর
নীলে সোনায় বর্ণাঢ্য ৩·৫০

চিত্তরঞ্জন মাইতির
অগ্নিকন্যা ৩·০০

আশাপূর্ণা দেবীর
মেঘপাহাড় ৩·০০

গল্পগ্রন্থ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
শারদীয়া ৩·২৫

নরেন্দ্র ঘোষের
পাপুই দ্বীপের কাহিনী ৩·৩০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
সপ্তপদী ২·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রূপহলুদ ২·৫০

বিবিধ

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের
দেশে দেশে চলি উড়ে ৬·৫০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
দক্ষিণের বারান্দা ৪·০০

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত
পরমরমণীয় ৫·০০

কাব্যগ্রন্থ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের
Songs of the Sea
(সাগর সংগীত) ৪·০০

প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল)-এর
সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা ৫·০০

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭　ফোন ৩৪ ২৬৪১　গ্রাম: 'কালচার'

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত ॥ অমৃত ॥

অমৃত

॥ অমৃত ॥ অমৃত

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 3rd. August, 1962
40 Naya Paise.

বিগত ২৩শে জুলাই, সোমবার, পশ্চিমবঙ্গের পুলিস ও পরিবহনমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ রক্তচাপবৃদ্ধিতে ভুগিতেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তাঁহার বন্ধুবান্ধব সহকর্মী বা আত্মীয়স্বজন কেহই বুঝে নাই যে তাঁহার জীবনের শেষ এতই নিকট। শনিবার দিন তিনি অভ্যাসমত লাল-দীঘি মহাকরণে সমানে কাজকর্ম করিয়াছিলেন এবং রবিবারও সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত তাঁহার পূর্বনির্দিষ্ট সকল কাজে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার দিকে শরীরে অস্বস্তি অনুভব করায় তিনি ঘরে ফিরিয়া আসেন। পরের দিন তাঁহার রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং রাত্রি এগারোটার পর ৬১ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনান্ত হয়। কালীপদবাবুর মৃত্যুতে পশ্চিম-বাংলার কংগ্রেস মন্ত্রীসভা একজন বিশ্বস্ত এবং অক্লান্তকর্মী সহযোগী ও সদস্য হারাইল। পুরানো দিনের ঝড়ঝঞ্ঝায়, বিক্ষোভে ও দমন-নীতির পাল্টা আন্দোলনে, যাঁহারা কংগ্রেসের সমর্থনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ডাক্তার রায়ের মৃত্যুর পরের মন্ত্রীসভায় কালী-পদবাবু তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতম ছিলেন। এখন সেই দলের মধ্যে সাথীহারা অবস্থায় রহিলেন মুখ্য-মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন। স্বাধীনতার পূর্বকালে কংগ্রেসের অগ্নিপরীক্ষার সময়, কৃচ্ছ্রসাধন আত্মনিয়োগ ও কারাবরণ বর্তমান মন্ত্রিসভার আর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না।

কালীপদবাবুর জাতীয়তাবাদে দীক্ষা হয় ছাত্র-আন্দোলনে। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কারাবরণ করেন। তাহার পর লবণ-সত্যাগ্রহ ও ১৯৩২ সালের আন্দোলনে সক্রীয়ভাবে যোগদান করায় তিনি প্রথমে ছয় মাস ও পরে চার বৎসর কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি পুলিসের জালে পড়িয়া দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ ছিলেন।

তিনি প্রথমে কিছুদিন মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সচিব এবং কিছুদিন উপ-সভাপতিও হইয়াছিলেন।

স্বাধীনতার পরে সদস্য নির্ধারণে (১৯৪৬) তিনি বাংলার বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুলাই যখন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ তাঁহার "ছায়া" মন্ত্রীসভা গঠন করেন, তখন কালীপদ-বাবু আয় ও জেল দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তার রায়ের মন্ত্রীসভাগুলিতে তিনি শ্রমিক ও পরে পুলিস দপ্তরের ভার লইয়াছিলেন মৃত্যুকালে তিনি পুলিস ও পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী যে সংখ্যালঘু কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠন করেন তাহার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন কালীপদবাবু। বিদেশেও—যথা জেনেভায়—তিনি বিভিন্ন সম্মেলনে ভারতীয় শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব লইয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

কালীপদবাবুর মার্জিত ভাষায় বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। বিধানসভার তর্ক-বিতর্কে তিনি অবিচলিতভাবে সওয়াল-জবাবে অংশ লইতেন এবং যেরূপে সহজ ও সুন্দর ভাষায় তিনি বিতর্কে নিজের দিক সমর্থন করিতেন তাহা অধিকাংশ সভ্যকেই আশ্চর্য করিত। শ্রমমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী হিসাবে তাঁহাকে বহু বিক্ষোভ ও আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু কখনও কোনও অবস্থায় তাঁহাকে ধৈর্য হারাইতে বা বিভ্রান্ত হইতে দেখা যায় নাই।

কালীপদবাবু মিষ্টভাষী ও সদালাপী ছিলেন। পরিচিত লোকের মধ্যে বসিয়া তিনি যে গল্পগুজব করিতেন তাহার মধ্যে কৌতুকমিশ্রিত কথাবার্তা যথেষ্ট থাকিত কিন্তু তাহা শ্লেষ-বিদ্রূপ বা অসূয়াশূন্য।

তাঁহার মৃত্যুতে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে একজন প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট কর্মী অপসৃত হইল এবং তাঁহার সহকর্মী ও সহযোগীরা হারাইলেন একজন সঙ্গীকে যাঁহার কাছে কোনও অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইত না ও যিনি সকল বিষয়ে তাঁহার সঙ্গীদের তাঁহার শক্তির শেষ সীমানা পর্যন্ত সক্রীয়ভাবে পূর্ণ সহায়তা করিতে চেষ্টিত ছিলেন।

বীজের রোদসী কন্যা

রাম বসু

অলৌকিক শক্তি নেই অপহৃত প্রফুল্ল কানন
এখন নিজের ভার নিজে নিতে হবে
আমাদের পরিমাপ আমরা দুজন।

অভিজ্ঞ আঁধারে মৌন দ্যাখো দুটি প্রাচীন পাথর
একটি নিটোল বৃত্ত গড়ে তোলে জলের ভিতর
আমাদের দুটি মুখ এক হল জলে।

হে আত্মপীড়ন, যুগ
তুফানে মাতন নেই
দালানকে ধরে রাখবে নেই সেই অটুট স্তম্ভও
ভাঙা সিঁড়ি স্তূপাকার, ইতঃস্তত মূর্তি, গাছ, স্মৃতি
পৃথিবীর কাছ থেকে সরে গেছে উদ্দেশ্য, আকাশ।

বীজের রোদসী কন্যা, শস্য,
আমরা অন্তিমে নিবেদিত
সে অন্তিম আদির সূচনা।

মুখে রাখ অনুরাগ, লবণাক্ত স্বাদ
আমিও তোমার ভাষা দুয়ে মিলে বিস্তীর্ণ চেতনা
এক বাহু সমুদ্রকে অন্য বাহু পংকিল কাদায়
যদিও দিয়েছি, শস্য, নিষ্পাপ প্রতিভা
বিপুল ধ্বংসের মধ্যে পরিচ্ছন্ন পতঙ্গ আমরা
আমাদের মৃদু আলো শূন্যে আলোড়িত
যখন আমার মধ্যে তুমি শুদ্ধ উচ্চারিত হও।

যমজ

শিবশম্ভু পাল

সজ্জিত একোন মূর্তি চলে গেল না দেখে আমায়।
পিছনে পিছনে আমি ধেয়ে যাই, রেস্তোরাঁর নিভৃত ক্যাবিনে
জনৈকা নারীর কাছে ব্যক্তিগত সেই জন, অপলক দেখি,
হাত থেকে খসে গেল কী দুর্বল তীব্র কীর্কেগার্ড!

ফেরালো না পিঠ তার। পদক্ষেপে ফোটে অহঙ্কার
যদিও এখানে দেখি সমস্ত শরীর তার সমর্পিত ফুল
এবং সম্মুখে তার মুকুটবিহীন নারী লজ্জানত; কাঠের চেয়ার
মনে হয় সিংহাসন, বিদেহী আকাঙ্ক্ষাগুলি অভিষেক করে।

আমার শরীর থেকে নির্গত কে অই চলে অন্ধ কোন্ যুবা!
কে তারে লালন ক'রে এতখানি স্পর্ধা এনে দেয়?
আমার আত্মজ নয়, সহোদর, দুজনে যমজ
জন্মদাতা অন্ধকার অথবা, যৌবন, আমি সঠিক জানি না।

মাঝে মাঝে হেরে যাই, খসে যায় গ্রন্থ, প্রবীণতা;
দ্বিতীয় আমিরে দেখি ক্ষীণচক্ষে বিস্ময়ের অম্লান আলোয়।

সংগীতেরা ঢেউ তোলে

কুমকুম দে

সংগীতেরা ঢেউ তোলে, আমি তোলপাড়,
প্রতিটি শিরায় কাঁপে সংগীতেরি রেশ,
হাল ধরে বসে থাকি, আবেগের দাঁড়
অনায়াসে এনে দেয় স্বপ্নের প্রদেশ।।

নোঙর ফেলেছি কবে সে কার আহ্বানে,
অনড় নৌকায় তবু রোমাঞ্চিত ঝড়
কম্পিত চঞ্চল করে। ঘাটের শিথানে
দড়িবাঁধা নৌকা গোনে নিঃশব্দ প্রহর।।

হয়তো যাব না আর এ নদীর বাঁকে।
বিস্মৃত হয়েছি সেই নাবিকের দাবি।
উত্তাল তরঙ্গ তবু, তবু সে আমাকে
এ কোথায় টেনে নেয় মত্ত কুলপ্লাবী।।

ভেজাল। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী বলেছেন, বাজারে যতো ওষুধ আর যতো খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় তার আধাআধিই ভেজালে ভর্তি। কথাটা নতুন আবিষ্কার নয়, সকলেই আমরা জানি এ তথ্য। কিন্তু শ্রীরেড্ডীর মতো মানুষ যখন এ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন, তখন বিষয়টা নতুন করে ভাবতে হয় বইকি!

ভেজাল! কথাটার মধ্যে কেমন একটা ইতরতার ছাপ রয়েছে যেন। গোলাপ বললে যেমন কবিত্বময় বর্ণ-সুষমা ভেসে ওঠে মনের সামনে, ভেজাল বললেও তেমনি নাকে এসে লাগে সুড়ঙ্গচারী দুর্গন্ধ। এবং কেবল তাই নয়। ঐ কথাটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আতঙ্ক, ষড়যন্ত্র এবং মৃত্যু। সেদিক থেকে ভেজাল আর ভোজালি যেন সগোত্র, দুয়ের মধ্যেই ঝিলিক দিয়ে ওঠে আকস্মিক হত্যার বিদ্যুৎ-শিহরণ।

তাই, 'ভেজাল হইতে দূরে থাকিও।'—পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতেরই সার-মর্ম হল এই কথা। কিন্তু ভেজাল তবু আমাদের সংগ ছাড়ে না। কুসুমে কীটের মতো আমাদের এই দেবত্ব-অভিলাষী মনের মধ্যেও রয়েছে শয়তানের রাজত্ব। পাঁচ হাজার বছরের অক্লান্ত চেষ্টাতেও তাকে স্থানচ্যুত করা গেল না। বরং দিন যতো কাটছে ততোই যেন সূক্ষ্ম হ'য়ে উঠছে ভেজালের ঐন্দ্রজালিক চেহারা। প্রাচীনকালের পরব্রহ্ম এবং হালআমলের পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার মতো সর্বভূতে ছড়িয়ে পড়ছে তার অখন্ড প্রতাপ। লক্ষ টাকার হীরে থেকে চার পয়সার জিরে পর্যন্ত তার অস্তিত্ব।

কথাটা নিছক ভাবের ঝোঁকে লেখা নয়, ঘটনাগত সত্য। বছর কয়েক আগে স্বর্গত রাজশেখর বসু ভেজালের উপর একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাতে অন্যান্য অনেক খাদ্যদ্রব্য ও মশলা ইত্যাদির মধ্যে জিরের নামটাও ছিল। যতোদূর মনে পড়ে, সেখানে মাটি দিয়ে

জিরে তৈরি করে রঙের পলেস্তারা লাগানোর কথা বলা হ'য়েছিল। পড়ে শিহরিত হ'য়ে উঠেছিলাম, না ভয়ে নয়, মানুষের উদ্ভাবনী কৌশলের বিস্ময়ে। এত যত্ন ক'রে যারা ভেজাল তৈরি করে, ধরা পড়লে কেন যে আমরা তাদের উপর খাপ্পা হয়ে উঠি সেইটেই আশ্চর্য।

কিংবা এমনও হ'তে পারে যে, ভেজাল যারা দেয় তারাই কামনা করে ভেজালটা তাদের জানাজানি হ'য়ে যাক? গোয়েন্দাকাহিনীর ডাকসাইটে অপরাধী যেমন হতাশ গোয়েন্দাকে উদ্দিপ্ত করে তোলার জন্যে নিজে থেকেই দু-একটা সূত্রের জোগান দিতে যায়, তেমনি ধরনের ব্যাপার হলেও অবাক হব না। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ভেজালদানকারীদের আচরণ এমন বেপরোয়া যে সেটা আমাদের ভেজাল-নিরোধের ক্ষমতার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না।

চালের মধ্যে কাঁকরের অস্তিত্ব তো সর্বজনবিদিত। সে উদ্দেশ্যে পাথরগুঁড়ো করার কল আমদানী হ'য়েছিল তাও বলতে শুনেছি অনেককে। কিন্তু কাঁকর তাতে বাজার ছেড়েছে কি? ধানের ফলন কম হয় যে বছর আর বাজারে দেখা দেয় চালের অনটন, তখনই আবির্ভাব ঘটে কাঁকরের। আমরা সবই বুঝি। কিন্তু ধরতে পারি না। বাড়ির পরিচারককে ধমকাই, পাড়ার মুদিখানার মালিকের কাছে অভিযোগ পেশ করি এবং বন্ধুমহলে আবৃত্তি করি কবি অজিত দত্তের কালজয়ী ছড়া—

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস?
নইলে
রইলে
ভাত না-খেয়ে
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

কিংবা ধরুন সরষের তেল। শেয়ালকাঁটার বিচি মেশানোর ইতিহাস বহু-আলোচিত। কিন্তু এমনিতে তার হদিশ পাওয়া যায় না। হঠাৎ যেই শহরে বেরিবেরি ইত্যাদির হিড়িক পড়ে যায়, অমনি টনক নড়ে ওঠে কর্পোরেশন বাহাদুরের। দু-একটা তেলের গুদামে তালাচাবি পড়ে, মামলা হয়, কিন্তু তারপর কী হয় তা আমরা কেউই জানতে পারি না।

আর শুধু কি খাদ্যদ্রব্য? এই তো কয়েক বছর আগে ক্যানিং স্ট্রীট অঞ্চলে ধরা পড়েছিল ভেজাল ওষুধ তৈরির এক চোরাই কারখানা। শুনে চমকিত হ'য়েছিলাম, তারা মুমূর্ষু রোগীর ব্যবহার্য কারামিন ইনজেকশানের অ্যামপুল পর্যন্ত ভেজাল মালে ভর্তি ক'রে বাজারে পাঠাতো। এরপর আর বলার থাকে কী?

কিন্তু সেই অপরাধে কেউ যে দ্বীপান্তরে গেছে এমন খবর শুনিনি। এবং শুনিনি বলে আশ্চর্যও হইনি।

বরং আশ্চর্য হ'য়েছি এই কথা শুনে যে, কয়েকদিন আগে জনৈক ব্যক্তি সোডার বোতলে ভেজাল আছে মনে ক'রে অপরাধী ধরার জন্যে কী পরিমাণে মরীয়া হ'য়ে উঠেছিলেন।

ঘটনা বিবরণে জানা গেছে, এক বোতল সোডা কিনে তাতে ময়লা আছে দেখতে পেয়ে তিনি সোডা কোম্পানীকে ফোন করেন। কোম্পানী বোতল বদলে অন্য বোতল ব্যবহার করতে উপদেশ দেয়। ভদ্রলোক এ উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি অন্যায়ের প্রতিবিধান করার জন্যে পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগে ফোন করেন। এটা হ'ল দু-নম্বর ফোন। পুলিশ বলল, এ অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করার এক্তিয়ার তাদের হাতে নেই, খবর দিতে হবে কর্পোরেশনের ফুড ইন্সপেক্টারকে। ভদ্রলোক

নিরস্ত হলেন না, তিনি ফোন করতে লাগলেন। তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম ফোন করতে হল যথাক্রমে ফুড ইন্সপেক্টার, ডিস্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার এবং হেল্‌থ অফিসারকে। ক্যারামের ঘুঁটির মতো ঠোকা খেতে খেতে এই শেষ পর্যায়ে এসে জানা গেল, বোতলটি রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে জমা দিয়ে লিখিত অভিযোগ পেশ না করলে তাদের কিছু করার উপায় নেই।

বুঝুন ব্যাপার! সোডার দাম যদি হয় ২৫ নয়া পয়সা তো সেই সোডাটি খাচ্ছেন কি ভেজাল খাচ্ছেন এ প্রশ্ন তুললে পাঁচটি টেলিফোনের জরিমানা দিয়েও আপনি যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই থেকে যাবেন। ঘণ্টা দুয়েক সময় নষ্ট অবশ্য ফাউ।

কিন্তু নষ্ট করার মতো পয়সা এবং সময় যেহেতু সকলের অঢেল নয়, সেইহেতু ভেজাল-ধরার সৎ প্রবৃত্তিও এখন উপহাসযোগ্য। এবং ভেজালের সংসারে ভেজাল বাড়ছে ঠিক শশিকলার মতোই।

তবে ওর মধ্যেই একটা সুসংবাদ আছে। কিছু দিন আগে উত্তর ভারতের জনৈক মন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, বিষেও নাকি ভেজাল বেরোচ্ছে আজকাল। অতএব মাভৈ। আমরা যতো তাড়াতাড়ি মরে বাঁচব ভাবছি, অতো তাড়াতাড়ি খেল খতম হবে না।

নেই; কী করা যায় ভাবছি, এমন সময় এক চাবিধারিণী পড়োশিনীর কৃপায় ভাগ্যে ঢুকে পড়া গেলো। পরে জানলুম, প্রত্যেক ফ্ল্যাটের জন্য বাইরে একটি ক'রে বাক্‌যন্ত্র বসানো আছে: তার সাহায্যে বাড়ির অন্য লোকের কাছে প্রবেশ-প্রার্থনা জানানো সম্ভব। কিন্তু অন্য লোক যদি কেউ না থাকে? যদি, ধরা যাক, আমরা দু-জনেই রাত্রির বারোটায় ফিরে আবিষ্কার করি যে সদর-দরজার চাবি আনিনি? তাহ'লে কি নিজেদের বাড়ির সামনে শীতে জ'মে ম'রে থাকতে হবে? এটা কল্পনার দৌড় নয় কিন্তু:--ন্যু ইয়র্কের ইতিহাসে এ-রকম ঘটনার উল্লেখ শুনেছি।

এই সব...আর তার উপর প্র· ব· র দন্তশূল, আবেদকপ্রয়োগের ফলে ডেনটিস্টের কামরায় তাঁর চৈতন্যলোপ, দুঃখতর রাত্রি, ডাক্তারের কাছে আনাগোনা, ঘন্টায়-ঘন্টায় টেলিফোন, এবং এই সব-কিছুর উপরে, সব-কিছু পেরিয়ে—শীত।

কয়েকদিন অথবা কিছুদিন আগে, যখন উষ্ণ শ্যামল সমুদ্রবিলাসী হনলুলুতে ছিলুম, তখন একটি ঔৎসুক্যজনক বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়েছিলো। ছবি: কুয়াশা মেঘ তুষারের আড়ালে ঝাপসা দেখা যায় স্কাইস্ক্রেপার-সারি; একটি মনুষ্যমূর্তি, তার নাকের ডগাটুকু ছাড়া কিছুই অনাবৃত নেই, তীব্র হাওয়ায় ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে কোনোরকমে রাস্তা পার হচ্ছে। নিচে লেখা: 'ওখানে যাবার অত তাড়া কিসের? ধীরে-সুস্থে আরাম ক'রে জাহাজে যান। আমাদের লাইন সবচেয়ে...' ইত্যাদি। কৌতুক অনুভব করেছিলুম এই বিজ্ঞাপন দেখে, ন্যু ইয়র্কে পৌঁছবার জন্য আমার আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো ব'লেই কৌতুক। মনে-মনে বলেছিলুম: 'শুনুন, আমার মার্কিনী বন্ধুরা, আপনাদের পক্ষে যা বাৎসরিক ব্যাপার, অভ্যাসে জীর্ণ, গতানুগতিক, তা আমার পক্ষে নতুন, আশ্চর্য, রোমাঞ্চকর—রীতিমতো এক অভিজ্ঞতা। যেমন আপনাদের পক্ষে বরফ থেকে পালাতে চওয়া, তেমনি স্বাভাবিক তার প্রতি আমার আকর্ষণ--বিশেষত যখন আপনাদের দেশে কেন্দ্রীয় তাপের ব্যবস্থা এমন সার্বিক যে রাস্তায় যেটুকু কাটাতে হয় তার বাইরে শীতের আর নিপীড়ন নেই। আমার তো ভাবতেই ভালো লাগছে যে বাইরে যখন শূন্যের নিচে অনেক ডিগ্রি নেমে গেছে, তখন একটি উজ্জ্বল ঘরে ব'সে-ব'সে আমি দেখছি কাচের বাইরে শীতের দৃশ্য—শ্বেতকোমল পাপড়ির মতো নেচে-নেচে নেমে আসছে তুষার, যেন পৃথিবীকে দ্রব ক'রে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে কুয়াশা, তারপর একদিন যখন পাংশু আকাশে সূর্যদেব উঠলেন, তখন সেই হিমেল রোদে চোখ-ধাঁধানো পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষার, তৃণহীন বিস্তীর্ণ শুভ্রতা, কঙ্কালের মতো কালো-কালো গাছগুলি, ঢালু ছাদ থেকে ঝুলন্ত বরফের চিত্রলতা, আমরা কি কোনোদিন এ-সব দেখি যে দেখতে পেলে মুগ্ধ হবো না?'... শীতের বিষয়ে এই রকম প্রতিজ্ঞা ও প্রস্তুতি নিয়ে এক সন্ধ্যায় আইডলওয়াইল্ড বিমানবন্দরে অবতীর্ণ হলুম। প্রথম কয়েকদিন একটি ছোটো হোটেলে কাটলো, আমার কর্মস্থল কাছেই।

প্রসিদ্ধ এই পাড়া, মার্কিনী সংস্কৃতির এক আদিভূমি, সাহিত্যের ইতিহাসে স্মৃতিময়। কিন্তু এখন এই সবই অনুভূতির বহির্ভূত। যে-তথ্যটি এখন ইন্দ্রিয় ও মনের কাছে সবচেয়ে স্পষ্ট তা হ'লো—শীত। শহর যেন বরফে চাপা প'ড়ে আছে। উঁচু বরফ ছোটো, বড়ো সব রাস্তায়—মানুষের পায়ে-পায়ে তার শুভ্রতা নেই আর—রং-চটা, নোংরা, জলে কাদায় জঞ্জালে মাখামাখি, নাগরিক আবর্জনায় আবিল। বড়ো রাস্তাগুলিতে মাঝে-মাঝে আসে ক্ষমতাশালী বুলডোজার, কলের শাবল চালিয়ে-চালিয়ে অন্ততপক্ষে বাস-চলাচল অব্যাহত রাখে, কিন্তু ফুটপাতের দিকে পৌর প্রতিষ্ঠান দৃষ্টি দেন না, আর যেগুলি ছোটো রাস্তা, যেখানে মানুষের বসবাস বেশি, সেখানে চলে প্রকৃতির খেয়াল অপ্রতিহত। ফুটপাতে পাহাড়ের সারি বাড়িগুলোর একতলা পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে; মা, বাবা, ছেলেমেয়েরা--পালা ক'রে ক'রে সবাই খাটছে বরফ সরাতে, নিজের বাড়ির সিঁড়ি আর প্রবেশ-পথটুকু কোনোরকমে ব্যবহার্য রাখা, এর বেশি উচ্চাশা কারো নেই। মাঝে-মাঝেই ঘন আস্তরণে আবৃত যে-সব আকৃতি চোখে পড়ে সেগুলোকে গাড়ি ব'লে চিনতে একটু দেরি হয়—কখনো-কখনো, হঠাৎ তুষারবৃষ্টি নেমে এলে হয়তো দু-ঘন্টার মধ্যে রাস্তায় রাস্তায় অবরোধ, তখন মালিকেরা যেখানে-সেখানে গাড়ি ফেলে চ'লে যান, তাছাড়া উপায় থাকে না, বরফ গললে তবে গাড়ি উদ্ধার হবে। * একদিন শুরু হয় বরফ গলা: যা ছিলো কঠিন তা চুঁইয়ে পড়ে, গড়িয়ে নামে, ছড়িয়ে যায়, ব'য়ে চলে স্রোত হ'য়ে পঙ্কিল, তারপর আবার আকাশ কালো ক'রে নামে কুয়াশা, সূক্ষ্ম বৃষ্টি, শব্দহীন, প্রতিকারহীন তুষার।

'আপনাদের দেশে যন্ত্রের এত উন্নতি হয়েছে, অথচ রাস্তার বরফ সরানো যায় না কেন?' 'রাস্তার বরফ?' নিমন্ত্রণকর্তা সকৌতুকে তাকালেন আমার দিকে। 'সরাতে গেলে প্রতি বর্গ ফুটে খরচ হবে তিন ডলার: এখন ভেবে দেখুন ন্যু ইয়র্ক কত বড়ো, ব্যয়ের পরিমাণও চিন্তা করুন। আর যদি বা সেই টাকা জোগাড় হয়—হওয়া শক্ত, কিন্তু হ'লেও—সারা শহরের বরফ মিলোলে একটি হিমালয় কি রচিত হবে না? তা আপনি ফেলবেন কোথায়? হাডসন নদীতে? কিন্তু নদীর স্রোত বন্ধ হ'য়ে যায় যদি? খাবার জল চাই, জাহাজের আনাগোনা চাই, রাস্তার বরফ সে-তুলনায় এমন কিছু সমস্যা নয়। মজা দেখুন, ন্যু ইয়র্ক আর নেপলস-এর একই অক্ষাংশ, এখানে এত ঠান্ডা হবার কোনো কথাই ছিলো না, কিন্তু কানাডা আর আমাদের মধ্যে কোনো পাহাড় নেই তো, উত্তরমেরুর বরফ আর ব্লিজার্ড একেবারে সোজা চ'লে আসে--এই হ'লো মুশকিল।'

শীতের অনুভূতির বর্ণনা দেবার কি চেষ্টা করবো? আবরণের চাপে দ্বিগুণিত ওজন নিয়ে টলতে-টলতে রাস্তায় বেরোলাম। প্রথম কয়েক মিনিট ঘরের তাপ গায়ে লেগে থাকে, কিন্তু তারপরই পিঠ যায় বেঁকে, দেহ বিবশ, এক হিম চেতনার মধ্যে লুপ্ত হয় অন্য সব ইন্দ্রিয়বোধ। মেঘলা দিন? রোদ্দুর? না কি তুষার? যেটাই হোক, কিছু এসে যায় না, একই কথা আমাদের পক্ষে। সকাল? দুপুর? রাত্রি? একই কথা। রোদ যেন বরফ-গলা জল, আর যদিও জনরব শুনি যে তুষারপাতে শীতের মাত্রা ক'মে যায় সেটাও আমাদের অভিজ্ঞতায় ঠিক ধরা দেয় না। ডাকবাক্সে চিঠি ফেলতে, বা সিগারেট ধরাতে, যদি পকেট থেকে হাত বের করি কখনো, আঙুলগুলো অসহযোগ ঘোষণা করে, আর যদি মিনিটখানেক বাইরে হাত ঝুলিয়ে রাখি তাহ'লে মনে হয় ওটা আমার সংলগ্ন হ'য়ে থাকতে আর রাজি হচ্ছে না, ভারি হ'য়ে-হ'য়ে এক্ষুনি ছিঁড়ে প'ড়ে যাবে। হাতে কোনো জিনিশ থাকলে দস্তানা ভিন্ন উপায় নেই, কিন্তু দস্তানা হাতে কাজ আর মোজা পায়ে নৃত্য প্রায় একই রকম ব্যাপার। পাঁচ, সাত, দশ মিনিট হাঁটার পর আর

* ন্যু ইয়র্কবাসীরা, ধনী হ'লেও, গাড়ি কম রাখেন; তার প্রথম কারণ পার্ক করাবার স্থানাভাব, দ্বিতীয় কারণ শহরের পথে ট্র্যাফিকের মন্থরতা, তৃতীয় কারণ ট্রেন ও সাব-ওয়ের দ্রুতি ও প্রাচুর্য, চতুর্থ কারণ শীত ঋতুতে গাড়ির সচলতার অনিশ্চিতি। যদি আড়াই মিনিট পর-পরই লাল আলোর সামনে দাঁড়াতে হয়, দেড় মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে তবে পৌঁছতে হয় গন্তব্যে, যদি বছরের কঠিনতম সময়েই গাড়ির সুবিধে না পাওয়া যায়, আর সত্যি যদি ভূতলযানই সবচেয়ে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য হয়, তাহ'লে আর গাড়ি রেখে লাভ কী?

যেন পারা যায় না; তখন যে-কোনো ড্রাগস্টোর—ঢুকে পড়ামাত্র আরাম, যাকে বলে হাড় জুড়োনো ঠিক তা-ই, তাপ যেন ঘুমের মতো, নেশার মতো সারা শরীরে আমেজ এনে দেয়। এক পেয়ালা চা, আবার কষ্ট, কিছুক্ষণ পরে আবার কোথাও ঢুকে পড়া। কেনাকাটা, দৃশ্য দেখা, বা অন্য কোনো কারণে যদি হাঁটা-হাঁটি করতে হয় তাহ'লে এ-ই হ'লো টেকনীক। আর যদি বয় পিশাচীর মতো বাতাস * —বরফ ছড়াতে-ছড়াতে উত্তর-মেরু থেকে উড়ে এসে গালের মাংস উপড়ে নিতে চায়, তখন যেন কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়ে ফেলে লোকেরা; খালি ট্যাক্সি হাত তুললে থামে না, কিংবা—শৃঙ্খলা ও সাধারণ ভদ্রতা ভুলে গিয়ে, কেউ-কেউ ছুটে এসে গায়ে ধাক্কা দিয়ে উঠে বসে সেই ট্যাক্সিতে, আমরা যেটাকে আগে থামিয়েছিলুম। নিয়মনিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ-সমাজে এ-রকম ঘটনা প্রত্যাশিত নয়, স্বাভাবিকও নয়, এর জন্য দুঃখ জানাবার মতো অপরিচিত সজ্জনও রাস্তাতেই জুটে যায়;—স্থানীয় লোকেদের মধ্যে শীত কী-রকম ত্রাসের সঞ্চার করে তারই উদাহরণস্বরূপ এটা উল্লেখ করলুম।

ক-দিন ধ'রে সমানে বরফ পড়ছে। সবেমাত্র পনেরো স্ট্রীটের নিরালোক ফ্ল্যাটে এসেছি, ডাকের ঠিকানা এখনো আমার কর্মস্থল। দু-দিন ছেলেমেয়েদের চিঠি পাইনি; আজ নিশ্চয়ই আসবে এই ভেবে সোৎসাহে বেরিয়ে পড়লুম। রাস্তা প্রায় দেখা যায় না, সব বরফ। রবারের জুতোয় মোড়া ভারি পা, পাঁচ পাল্লা পশমের আচ্ছাদনে পরিস্ফীত দেহ, আবৃত শির, আবৃত কান, সজল চক্ষু ও নাসিকা—এই সব নিয়ে, সাবধানে, পরস্পরকে সাহায্য ক'রে-ক'রে, বন্ধুর ও পিচ্ছিল পথে ধীরে এগোচ্ছি। পথিক বেশি নেই, বরফের মধ্যে একটি আঁকাবাঁকা পদরেখার উপর দিয়ে পা টিপে-টিপে চলছে সবাই, কেউ কাউকে অতিক্রম করছে না, কেউ বা হঠাৎ পা পিছলে প'ড়ে যাচ্ছে। এইভাবে দেড় মাইল পথ পেরিয়ে এসে ব্যর্থ হ'তে হলো : চিঠি নেই। ফেরার পথে লাঞ্চ খেয়ে নিতে হবে, কিন্তু সিক্সথ এভি-নিউতে পনেরো মিনিট ধ'রে হেঁটে একটি আহারস্থল পাওয়া গেলো না। আছে সারি-সারি অনেকগুলো, কিন্তু বাইরের চেহারা পছন্দ হয় না আমাদের, আর যেটাকে মনে হয় আমন্ত্রণকারী, সেটাই বরফের স্তূপে দুর্গের মতো দুষ্প্রবেশ্য হ'য়ে আছে। অবশেষে কী ভাগ্যে চোখে পড়লো 'হাওয়াইয়ের কোণ' তার স্থান নির্বাধ, অভ্যন্তর সুচারু, খাদ্য ও পরিবেষণ রুচিসম্মত। সেখান থেকে যখন বেরোলাম, তখন মনে হ'লো তুষার আরো ঘন, আকাশ আরো অন্ধকার। রাস্তা যানবিরল, ট্যাক্সি নেই, আমরা সাবওয়ের নিশানা ঠিক জানি না। বাস্-এর জন্য দাঁড়াবো ? না, দাঁড়ানো অসম্ভব, বায়ুমণ্ডল ছুরির মতো বিঁধছে, বরং পা চালালে দেহ অন্তত নিঃসাড় হবে না। একই ভাবে, সবচেয়ে ব্যস্ত প্রহরে স্তব্ধ-হ'য়ে-থাকা পথ বেয়ে-বেয়ে, কোনো-এক সময়ে বাড়ি ফিরে এলুম।

পরের দিন কাগজে সবচেয়ে বড়ো খবর বেরোলো—শীত। এমন ঠাণ্ডা নাকি প'চাত্তর অথবা প'চাশ বছরের মধ্যে পড়েনি। অনেক ট্রেন বন্ধ ছিলো, অনেক প্লেন অচল; বাস্, গাড়ি আটকে গেছে হাইওয়েতে। ছবি দিয়েছে : ম্যানহাটানের বিজন বড়ো রাস্তায় চলেছে দু-একটি দুঃসাহসী পথিক। আমরা দুই বাঙালি যে গতকাল রাস্তায় বেরিয়ে বীরত্বের কাজ করেছিলুম, সেটা তখন জানতে পারলে কষ্টের কিঞ্চিৎ উপশম হ'তে পারতো।

মৃত্যুর মতো এই শীত, মৃত্যুর এক অবিকল চিত্রকল্প। শুধু ঘাস ফুল পল্লবের নয়, মানুষের প্রাণকেও এর আক্রমণ করাল; কিন্তু মানুষ কী-ভাবে এই অবস্থার উপর জয়ী হয়েছে, গ'ড়ে তুলেছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, তা

* অনেকদিন আগে, এক নায়িকার 'কুন্তলা' নামকরণ ক'রে, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলুম। 'কুন্তলা' ও 'অনিলা' বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিলো যে চুলকে 'চুলানি' বা হাওয়াকে 'হাওয়ানি' বলার কোনো মানে হয় না। (তখনও বাংলাদেশে 'ছন্দা' অথবা 'জয়িতা' প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটেনি।) কিন্তু 'পিশাচীর মতো বাতাস' ব্যাকরণসংগত হোক বা না-ই হোক, সার্থকতায় তর্কাতীত, কেননা পিশাচের চাইতে পিশাচীরা যে অনেক বেশি নিষ্ঠুর এ-বিষয়ে মুনিজনেরা সর্বদা একমত।

এবার ন্যু ইয়র্কের এই আর্ত ফেব্রুয়ারিতে উপলব্ধি করা গেলো। আগে একবার পিটসবার্গে এক শীত কাটিয়ে গিয়েছিলাম; আমার বাসায় যথোচিত তাপ ছিলো না ব'লে কষ্ট পেয়েছিলাম অনেক বেশি—রাত দশটার পর থেকে দু-তিনবার ক'রে চা খেতে হ'তো; দুটো বা তিনটে নাগাদ অগত্যা শবশীতল শয্যায় আশ্রিত হ'য়ে বহুক্ষণ ঘুমোতে পারতুম না। কিন্তু একে এবার শীত আরো তীব্র, তুষারপাত অনেক বেশি নিবিড়, তার উপর এই মহানগরে যত বিচিত্রভাবে ঋতুর শত্রুতা প্রকাশ পাচ্ছে, কোনো মফস্বলে তা সম্ভব ব'লে মনে হয় না। সত্য ব'লে অনুভব করছি টয়নবীর ঘোষণা যে প্রকৃতি মানুষকে মৌলিকভাবে যুদ্ধে ডাক দেয়, আর তার যথাযোগ্য উত্তর দিতে পারলে তবেই ঘটে মানবসভ্যতার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ, মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে যা উদ্বোধিত ক'রে তোলে তা আনুকূল্য নয়, বিরুদ্ধতা—বা বিরুদ্ধতাকেই আনুকূল্যে রূপান্তরিত করার প্রেরণা।

কিন্তু যাকে আমরা সভ্যতা বলি তার সবচেয়ে রহস্যময় উদ্ভাবন হ'লো সৌন্দর্যবোধ। যাতে আছে ব্যবহারিক সুবিধে, যা আমাদের জৈব প্রবৃত্তির পক্ষে যা উপযোগী বা উপকারী, শুধু তা-ই নয়—যা ক্ষয়িষ্ণু, স্খলনোন্মুখ, মৃত্যুর দ্বারা স্পৃষ্ট, তাও আমাদের মন ও দৃষ্টিকে আবিষ্ট করে—হয়তো বা বর্তমান কালে তারই আবেদন প্রবলতর। সন্ধ্যা, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ, হেমন্তের কুয়াশা বা পিঙ্গল পত্ররাশি—এ-সবে যিনি সৌন্দর্য খুঁজে পান না, যিনি শুধু প্রভাত, পূর্ণিমা ও বসন্ত ঋতুর অনুরাগী, তিনি যে সংবেদনে দুর্বল তাতে সন্দেহ নেই। এবং এই উত্তরদেশের তুষারও যে মনোহরণ রূপ নিতে পারে, তা আমাকে নতুন ক'রে মানাতে হ'লো এক রাত্রে, যখন দূরবর্তী শহরতলিতে এক বাঙালির গৃহে নিমন্ত্রণ সেরে আকাশের তলায় বেরিয়ে এলাম। স্তব্ধ পড়ে আছে ধবল হয়ে প্রান্তর, কালির আঁচড়ের মতো দূরে-দূরে নিষ্পত্র গাছগুলো, হলদে আলো ছড়ানো-ছিটানো জানলায়—কিন্তু তা ছাপিয়ে অন্য এক আভায় উদ্ভাসিত যেন পৃথিবী, ধবলের আভা, বিস্তীর্ণ তুষারের বিকিরণ। পূর্ণিমার রাত মেঘলা হ'লে যেমন হয় ঠিক তেমনি, যেন রূপসীর বসনাচ্ছুরিত গাত্ররূপ, যেন আকাশ ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে স্নিগ্ধ নীলাভ স্বপ্নময় এক নিস্রাব। টাটকা নরম বরফের মধ্যে পা ডুবিয়ে-ডুবিয়ে, কোনোরকম গৃহকর্তার গাড়িতে পৌঁছনো গেলো, তিনি তা শম্বুক-গতিতে চালিয়ে আমাদের নামিয়ে দিলেন সাবওয়ে-স্টেশনে। বাড়ির কাছে ভূতল থেকে উঠে দেখি, সেখানেও আলো হ'য়ে আছে রাত্রি, একদল যুবক বরফ নিয়ে খেলা করতে-করতে কলহাস্যে পথ চলেছে।

• • •

দুই সপ্তাহ বিবরবাসী হ'য়ে কাটাবার পর প্র. ব. একদিন বাসা-বদলের প্রস্তাব করলেন।

শাস্ত্রের যে-সব বচন আমি কিছুতেই মানতে পারি না, 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী' তার অন্যতম। তার কারণ, জীবনে আমি অনেকবার স্ত্রী-জাতির পরামর্শের দ্বারা উপকৃত হয়েছি। আমার স্বভাবে জাড্য দোষ কিছু বেশি, কোনো একটা অবস্থা যতক্ষণ সহনীয় থাকে ততক্ষণ তার পরিবর্তনে আমি এতদূর পর্যন্ত অনুৎসুক যে ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের নড়চড় হ'লেও আমার প্রতিবাদ সরব হ'য়ে ওঠে। আমাদের পনেরো স্ট্রীটের বাসাটাকে ঠিক সহনীয় বলা যায় না, কিন্তু তার সত্ত্বেও আপোশ ক'রে নিতে আমি মনে-মনে প্রস্তুত ছিলুম: এটা ছেড়ে যাওয়া যে সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, উপরন্তু সম্ভবপর, এই চিন্তায় একজন মহিলাই আমাকে উত্তেজিত করলেন।

খবর-কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা শুরু হলো। গ্রীনিচ গ্রামে জলের দরে পাওয়া যাচ্ছে স্টুডিও, ছোটো ফ্ল্যাট—বর্ণনা প'ড়ে ভালোই মনে হয়। টেলিফোনে প্রথম প্রশ্ন : 'ম্যান অ্যান্ড ওয়াইফ?'—শুধু স্বামী-স্ত্রী তো? (সন্তান-সহ দম্পতিকে দেয়া হবে না।) শেষ প্রশ্ন : 'কতদিনের জন্য ভাড়া নেবেন?' 'তিন মাস।' সঙ্গে-সঙ্গে জবাব : 'দুঃখিত, আমরা দু-বছরের লীজ চাই।' কয়েকবার এ-রকম অপঘাতের পরে আমি ভেবে দেখলুম যে এরা যাকে অ্যাপার্টমেন্ট-হোটেল বলে, আমাদের পক্ষে তারই একটা হবে সবচেয়ে উপযোগী: সেখানে কোনো অগ্রিম সময়ের বাঁধাবাঁধি নেই, এবং আছে দৈনিক পরিচর্যা ও অন্য অনেক সুবিধাজনক আয়োজন। আগের বারে অন্য পাড়ায় এমনি একটি আশ্রয় পেয়ে ন্যু ইয়র্ককে ভালোবাসতে শিখেছিলুম। একদিন 'ভিলেজ'-এর এক গলির মধ্যে ও-রকম একটি অ্যাপার্টমেন্ট দেখাও হ'লো। ভাড়া অবিশ্বাস্য শস্তা, কর্তৃপক্ষের সৌজন্য প্রকট—কিন্তু লিফট চলে কি চলে না, দুটি ঘরই ক্ষুদ্রাকার, আর কেমন একটা বস্তাপচা দুর্গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আবার বিজ্ঞাপন খুঁজে-খুঁজে প্র. ব. এক হোটেলের সন্ধান পেলেন: রাস্তার নম্বর দেখে বোঝা গেলো মোটামুটি কাছেই: আমার কর্মস্থল থেকে বেশি দূরে যেতে চাই না আমরা। মেঘলা দুপুরে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লুম দু-জনে—যেতে-যেতে অন্য বাড়ি হয়তো চোখে পড়ে যাবে, সেই সম্ভাবনাও রইলো। তেইশ স্ট্রীটে, আট এভিনিউর পশ্চিমে, পাওয়া গেলো ইংরেজ নামসম্পন্ন 'কিংস আর্মস হোটেল'। বাইরের চেহারা আশায় বুক বেঁধে বারো তলায় উঠে গেলুম। কী আলো, কী উজ্জ্বলতা, বিরাট বাতায়ন নিয়ে জানলার বাইরে আকাশ! আসবাবপত্র আধুনিক, দিনের সোফা রাত্রে বিছানা হ'য়ে যায়, বসার ঘরে দেয়াল-সংলগ্ন কিচেনেট, নিষ্কলুষ বাথরুম। প্রয়োজনীয় সবই আছে, কিন্তু ঘর দুটি এমন হৃদয়হীনভাবে অপরিসর যে চলতে-ফিরতে দু-জন মানুষেই ঠোকাঠুকি হ'য়ে যায়—এর মধ্যে, বন্ধুবান্ধব আহ্বান করা দূরে থাক, নিজেদের ঘরকন্না লেখাপড়া ইত্যাদি কী ক'রে চলবে তা-ই ভেবে পাওয়া শক্ত। নিরুৎসাহিত বিষণ্ন মনে তেইশ স্ট্রীট ধ'রে ফিরতে-

ফিরতে সাত এভিনিউর কাছাকাছি এসে চোখে পড়লো সাইনবোর্ড—চেলসী হোটেল। আমি কিছুটা হতোদ্যম হ'য়ে পড়েছিলুম, কিন্তু প্র. ব. বললেন, চেষ্টা করলে ক্ষতি কী? আচ্ছা, দেখা যাক।

এবারে যে সবই আমাদের পছন্দ-মতো জুটে গেলো সেটাকে ভাগ্যের দয়া ছাড়া আর কী বলবো? 'ঠিক আছে, আটাশ তারিখেই আসবেন আপনারা, আমি ঘরদোর সাফ করিয়ে রাখবো—' ডেস্কের কেরানির এই কথাগুলো আমাদের কানে মধুবর্ষণ করলে। দীর্ঘা-কার সহাস্য পুরুষ, জন্মস্থল জর্মানি, তখন নাম ছিলো আপফেলবাউম বা 'আপেল-বৃক্ষ', এখন সরলতর মিঃ আপেল-এ পরিণত হয়েছেন। 'আগাম ভাড়া দিয়ে যাবো?' 'দরকার নেই—তা ইচ্ছে হ'লে দিতে পারেন।' আমার দেবারই ইচ্ছে হ'লো; ব্যাপারটাতে কোথাও একটু ফাঁক রেখে লাভ কী! সপ্তাহান্ত কাটিয়ে এলুম ওয়াশিংটনে এক বন্ধুর আতিথ্যে; ফিরে এসে বাসা-বদল।

চার তলায় উজ্জ্বল ফ্ল্যাট। দু-খানা ঘরই বেশ বড়ো, আসবাবপত্র যথেষ্ট ও সুশ্রী, রান্নাঘরে প্রসারে বা ব্যবস্থায় কোনো কার্পণ্য নেই। চারটে 'ফরাশি' জানলা রাস্তার দিকে—আসলে দরজা সেগুলো; লোহার রেলিং-বসানো সেকেলে ব্যাল্কনিও আছে, যদিও শীতের প্রকোপে বাইরে দাঁড়ানো অসম্ভব। কিন্তু ইচ্ছে হ'লে ঘরে দাঁড়িয়েই দেখা যায় তেইশ স্ট্রীটের জনতা, দোকানপাট, রাত্রে নিয়নবাতির বর্ণচ্ছটা, তুষার, বৃষ্টি, সন্ধ্যারাগ। ম্যানহাটানের ভূগোল বেশ সরলভাবে জ্যামিতিক; বড়ো রাস্তাগুলি চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, সেগুলোকে এরা বলে এভিনিউ—হোটেল, দোকান, আপিশ, বাণিজ্য বেশির ভাগ সেখানে। আর পুবে-পশ্চিমে রাস্তাগুলোকে বলে স্ট্রীট, সেগুলো আবাসিক পল্লী, কিন্তু মাঝে-মাঝে এক-একটা স্ট্রীটকেও বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে— যেমন আমাদের পাড়ায় 'গরিবের ফিফথ এভিনিউ' চোদ্দ স্ট্রীট, তারপর তেইশ, তেইশের পরে চৌত্রিশ, বিয়াল্লিশ, ইত্যাদি। আমাদের যে বড়ো রাস্তায় বাসা জুটলো, আর ঘর থেকে যে উদারভাবে রাস্তা দেখা যায়, এটাও খুব সুখের হ'লো আমার পক্ষে; এক শতাব্দের চতুর্থাংশ কাল ব্রজ-বিহারী এভিনিউতে কাটাবার ফলে আমি হাড়ে-হাড়ে নাগরিক হ'য়ে গিয়েছি ঃ মাঝে-মাঝে যান, দোকান ও পথচারী আবালবৃদ্ধবনিতার দিকে তাকিয়ে থাকা আমার জীবনের একটি প্রধান বিনোদন।

সবদিক থেকেই ফ্ল্যাটটি ভালো। রবিবার ছাড়া রোজ ঝাঁটপাট দিয়ে যায় নিগ্রো পরিচারিকা; প্রতি সপ্তাহে বদলে দেয় বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড়, বাথরুমে ছিটিয়ে দেয় বীজাণুনাশক রাসায়নিক, রান্নাঘর ধুয়ে-মেজে ঝকঝকে ক'রে তোলে। মিঃ আপেল ও তাঁর সহ-কর্মীরা সুভদ্র, মনোযোগী, সহায়তায় উৎসুক; টেলিফোনের কেরানি-মেয়েটি মধুরহাসিনী; যখন আমরা বাড়ি নেই তখন কোনো টেলিফোন এলে নির্ভুল-ভাবে বার্তা পাওয়া যায়; সারারাত সামনের দরজা খোলা, আর ডেস্কেও লোক থাকে ব'লে কুঞ্চিকানির্ভর ভয়াতুর জীবন কাটাতে হয় না। অর্থাৎ, আমাদের প্রাক্তন ফ্ল্যাটে যা-কিছু ছিলো দুঃখজনক অভাব, তার কোনোটাই নেই এখানে। এবং এতগুলো সুবিধের তুলনায়, ও ন্যু ইয়র্কের হিশেবে, ভাড়ার অংকটাও অনুগ্র। উপরন্তু, দু-একদিনের মধ্যেই আমরা জানতে পারলুম, এই চেলসী হোটেলের বয়স প্রায় নব্বুই বছর, আমেরিকার পক্ষে প্রাচীন বললে অত্যুক্তি হয় না; আর এটি প্রথম থেকেই শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিবাসরূপে স্বীকৃত হয়েছে। এডগার লী মাস্টার্স বহুকাল কাটিয়ে গেছেন এখানে, টমাস উলফের প্রথম উপন্যাস নাকি এই হোটেলে ব'সে লেখা হয়েছিলো, ডিলান টমাস ন্যু ইয়র্কে এসে এখানেই উঠতেন। এমনি আরো গৌরবের কথা ম্যানেজার মশাই শোনালেন আমাকে, এ-মুহূর্তেও সাহিত্যিক অধিবাসীর অভাব নেই। আমাকে মনে-মনে মানতে হ'লো যে আমরা না-জেনে ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি।

চেলসী হোটেল আমাদের ভালো লাগার আর-একটি ক্ষুদ্র কারণ উল্লেখ করি। দেখা গেলো, বাথরুমে একটি-দুটি আরশোলা কখনো বা ঘুরে বেড়ায়। যাকে বলে অ্যাট হোম, আমাদের অনুভূতি হ'লো আক্ষরিক অর্থে তা-ই; আর আমেরিকা যে আসলে একেবারে নির্মম-ভাবে নির্বীজ নয় তার প্রমাণ পেয়েও তৃপ্তি পাওয়া গেলো। * প্র. ব. কিনে আনালেন ঘর সাজাবার আরো কিছু উপ-করণ, আমরা গুছিয়ে বসলুম; শীতের নির্যাতন প্রশমিত হ'য়ে রইলো তার তীক্ষ্ণতা: ন্যু ইয়র্কের সঙ্গে আমাদের ভালোবাসা আরম্ভ হ'লো।

(ক্রমশ)

---

* পরে শুনেছিলুম, এক মার্কিন মহিলা তাঁর রান্নাঘরে হঠাৎ একটি আরশোলা দেখতে পেয়ে এতদূর পর্যন্ত ভীত হয়ে-ছিলেন যে মধ্যরাত্রে স্বামীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে, জিনিশপত্র সব পরিত্যাগ ক'রে, গাড়ি হাঁকিয়ে তৎক্ষণাৎ চ'লে গিয়েছিলেন বহুদূরে অন্য এক শহরে। আর-এক মহিলার কথা শুনেছিলুম, যিনি ভারতে এসে ডিম ছাড়া কোনো স্থানীয় খাদ্য গ্রহণ করেননি; তাঁর স্বামীর পাঠানো টিনের খাবার এয়ার-পার্সেলে পৌঁছলে, তবে তাঁর প্রাণধারণ হ'তো। এবং এমন শাকাহারী ভারতীয়ের কথাও শোনা গেছে, যিনি কোপেনহেগেনে নিমন্ত্রিত হ'য়ে রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে ঢুকে গেছেন—রাঁধুনিরা তাঁর খাদ্যের মধ্যে কোনো আমিষরূপী ডিম মিশিয়ে দিচ্ছে কিনা, তা-ই পরীক্ষা করতে। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ সব দেশেই পাওয়া যায়, কিন্তু সুখের বিষয় তাঁরা সব দেশেই বিরল।

॥ আধুনিক গান প্রসঙ্গে ॥

মাননীয়

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ৭ই আষাঢ়, ১৩৬৮ তারিখের 'অমৃতে'তে আধুনিক গান সম্পর্কে জৈমিনীর রচনাটির বিষয়ে বহরমপুর থেকে শ্রীনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের চিঠি আমাকে যুগপৎ বিস্মিত ও ভাবিত করেছে এই কারণে যে, গানের সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা সে বিষয়ে মৌন অবলম্বন করে তিনি অযথা তর্ক বিস্তার করেছেন।

গান, অপরাপর শিল্পসৃষ্টির মতোই, একাধারে ব্যক্তিক ও সামাজিক। একদিকে যেমন নিঃসঙ্গ বেদনায় তার জন্ম, অপরদিকে তেমনি সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, রুচি ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয় গানের প্রকৃতিতে ও তার সমাদরের পরিচয়ে। গীতরচয়িতা শৈল্পিক আবেগকে সুরাশ্রিত ভাষায় বিধৃত করে সকলের অনুভূতির রসরূপ সৃষ্টি করেন। আবার যুগচ্ছবিও গানের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। কোন যুগ থাকে স্বদেশ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ, কোনটি আবার ধর্মবোধে জাগ্রত। যুগের চেতনা যাই হোক না কেন সকল ক্ষেত্রেই নিঃসঙ্গ শিল্পীর চেতনাতেই গান জেগে ওঠে, পরে মন্ডনের মায়ায় তা সমগ্র যুগকে সুরে সুরে বাঙ্ময় করে তোলে। গানের শ্রী যদি বর্তমান কালে ম্লান হয়ে থাকে, তবে বুঝবো স্রষ্টা ভ্রষ্ট হয়েছেন তাঁর তপস্যায় ও আমাদের চেতনার শুদ্ধতায় রাহুগ্রাস ঘটেছে। সর্বদা সার্থক গানের সৃষ্টি আশা করা যায় না, তবে একটি সাধারণ মান নিশ্চয়ই রক্ষা করা যায় এবং তা উচিত। যদি তা না ঘটে তবে জানবো যে প্রকৃত শিল্পীর অভাব হয়েছে, নয়তো তাঁরা দায়িত্বহীন ও শিল্পী নামের অযোগ্য।

আধুনিক গানের প্রবক্তাদের একটি কথা প্রায়ই বিস্মৃত হতে দেখি, তা হলো গান ও সংগীত যে দুটি বিভিন্ন শিল্প-রূপ—এই সাধারণ তথ্যটি। মার্গ-সংগীতের অতি-উৎসাহীরাও এই ভ্রান্তি করে থাকেন। আমি গান ও সংগীতের পৃথকীকরণে বিশ্বাসী। গানের দেহ হলো ভাবের ভাষা, এবং এই ভাষা বাগার্থসম্পৃক্ত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, সংগীতের ক্ষেত্রে বাণী ব্যতিরেকেই সুরের বিন্যাস ও তার আলাপ মনকে রসাপ্লুত করে। কিন্তু গানে যদি বাণী বাদ দিই তবে সর্বক্ষেত্রেই যে গানের সুর রসনিষ্পত্তিতে সমর্থ হবে এমন বলা যায় না। অতএব, গানের বাণী সুরের ডানায় ভর করে হৃদয় জয় করে বটে, কিন্তু সুর সেক্ষেত্রে সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্যতার মাধ্যম মাত্র। এই সাধারণ তথ্যটি বিস্মৃত হলেই গানের রচনায় কথা ও সুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। গানের সুরকার নিশ্চয়ই কোন রাগের আলাপ রচনা করেন না। তাই নারায়ণবাবুর সুরসৃষ্টির কথা উল্লেখ করার কোন অর্থই হয় না। কারণ, সেটা সার্থক গান হলো কিনা তাই বিচার্য।

আধুনিক বাংলা গানের প্রতিতুলনা মেলে আধুনিক নামধেয় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে। বাংলা কাব্যের এই বিশেষ রূপটি এমন ভাবৈক্য লাভ করেছে যে তার শিল্পগত সার্থকতা অনস্বীকার্য। অথচ বাংলা গানের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কেন তা হয়নি তার কারণ-নির্দেশ করার চেষ্টা করা যায়। নতুন কিছু করতে হলেই ভাঙাগড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কাছে পাঠ নিতে হয়। ভাঙাগড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা আধুনিক গানে হচ্ছে। কিন্তু পাঠ-নেওয়ার ব্যাপারেই যতো গলদ। আধুনিক সুরকার পাঠ নিচ্ছেন নিকৃষ্ট সৃষ্টির কাছে। তাঁদের লক্ষ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহৎ সৃষ্টি নয়, চটুল সহজ আবেদন তৈরী করা। এর পূর্বেও বাংলা গানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তার ফলে বাংলা গানের সম্পদ বেড়েছিলো। পাশ্চাত্য সংগীতের বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল কোনো কোনো ক্ষেত্রে নজরুল, একদা জনপ্রিয় হিমাংশুকুমার ও অজয় ভট্টাচার্য সকলেই উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু এর আগে বাংলা গানে জগঝম্প কখনোই শোনা যায়নি। সম্প্রতি বাংলা গানে পাশ্চাত্য সুরের যে উন্মত্ত তান্ডব শোনা যাচ্ছে তাতে সুরকারদের রুচি ও ব্যর্থতা দুয়েরই পরিচয় মেলে। আসলে তাঁরা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কাছে পাঠ নেননি। একবার মোৎসার্টের Phantasie d-moll শুনতে শুনতে মনে হলো একটি মুভমেন্ট যেন চেনা চেনা ঠেকছে, কোথায় যেন শুনেছি। পরে মনে পড়লো রবিশংকর মাঝ-খাম্বাজ বাজিয়ে ছিলেন ওইভাবে। এই হলো শিল্পী-প্রকৃতির সৃষ্টি। ব্রাউনিং বলেছেন যে শিল্পী দুটি সুর মিশিয়ে তৃতীয় কোন সুর তৈরী করেন না, তিনি সৃষ্টি করেন এক নূতন তারকা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালমৃগয়া, বাল্মিকী-প্রতিভায় কী বলিষ্ঠভাবে বিলাতী সুর মিশিয়েছেন, সরাসরি প্রয়োগ করেছেন, "মোহিনী মায়া এল" গানটিতে কতগুলি রাগ মিশিয়েছেন, কোথাও উৎকট হয়েছে কি?

পূর্বে বাংলা গানের রচয়িতারাই ছিলেন সুরকার। তিনি বুঝতেন, ভাবের ভাষাকে অপরের মনের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কতটুকু সুরের ছোঁয়া দরকার। অধুনা গান লেখেন একজন, সুর দেন অপরে। এক্ষেত্রে সুরকার যদি সাহিত্যবোধহীন হ'ন তাহলে স্বভাবতই সুরারোপনে আতিশয্য দেখা দেবে।

আজকাল যাঁরা গীতিকার তাঁরা নারায়ণবাবুর মতে 'অকবি' বা 'কুকবি' না হলেও, কেউই সুকবি নন। অন্তত বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তাঁরা কেউই পরিচিত নন। যাঁর কিছুমাত্র কাব্যবোধ আছে তিনি কখনোই আধুনিক বাংলা গানের বাণীতে তৃপ্ত হ'তে পারবেন না। ছন্দোবন্ধ বা দুর্বল মিলযুক্ত প্রলাপকে গান বলে স্বীকার করতে বাঙালীর দ্বিধা হওয়া উচিত। গানে বাণীর সংহতি বা বাগার্থ-সম্পৃক্তি যে কতো গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ ইংরেজী কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ সংকলনের পরিচয়ঃ "The Golden Treasury of the best songs and lyrical poems in the English Language". উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতা বলে যে সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে তার কোনটির সঙ্গেই বা আধুনিক গীতিকারদের রচনার তুলনা চলে? নারায়ণবাবু বলবেন কি?

জৈমিনী যে রুচিবিকারের কথা উল্লেখ করেছেন, তা প্রকট সত্য। আধুনিক যুবকদের ফ্যাসান যে, তারা ইওরোপীয় সংগীত খুব বোঝে, অথচ, ভারতীয় কোন রাগ চিনতে পারে না। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা কখনো সেতার সরোদ রবীন্দ্রসংগীত শোনে না, অথচ অনুরোধের আসর শুনতে ভিড় করে। খেয়াল বা ধ্রুপদ শুনছে, এতো ভাবাই যায় না। হিন্দীগানের চাষ ছড়িয়ে রেডিও সিলোন আসমুদ্র-হিমাচল পানের দোকান ও ভদ্রলোকের গৃহের সংগীতরুচিকে এক করে দিয়েছে। সংগীতজগতে এমন ডিমোক্রেসী ইতিপূর্বে কখনো আসেনি। রুচির এই অধঃপতনের জন্য দায়ী প্রধানত আমাদের স্কুলকলেজগুলি যেখানে সূক্ষ্মরুচিবোধকে জাগ্রত করার কোন চর্চাই হয় না এবং আমাদের বাড়ি যেখানে পিতামাতারা স্কুল-কলেজের মাইনে যোগানো ছাড়া ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে আর কোন চিন্তাই করেন না, আর করলেও হতাশোক্তিতেই তা নিবদ্ধ, কারণ, সন্তানদের বাল্যকালে তাঁরা তাদের রুচিকে গঠন করেননি।

পুনরায় জৈমিনীকে ধন্যবাদ তাঁর দায়িত্বশীল লেখাটির জন্য। নমস্কারান্তে ইতি।

পবিত্রকুমার রায়
শান্তিনিকেতন

---

* আধুনিক গানের উপর অনেক চিঠি এসেছে। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট মতামত ইতিমধ্যেই স্থান পেয়েছে 'অমৃতে'। সেজন্য এ প্রসঙ্গের এখানেই ছেদ টানা হ'ল। অমৃত-সম্পাদক।

শার্লক হোমস্ ফিরে এলেন

বেশ কয়েক ঘণ্টা হল চুপচাপ বসে ছিল হোম্‌স্‌। লম্বা রোগা পিঠখানা ধনুকের মত বেঁকিয়ে কেমিক্যাল পাত্রে যাচ্ছেতাই দুর্গন্ধময় কি একটা জিনিস চুয়াচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে তার বসে থাকার ধরন দেখে মনে হল যেন অদ্ভুত ধরনের লম্বা-গোছের কৃশকায় একটা পাখী বসে আমার সামনে। পাখীটার গায়ে ম্যাটমেটে ধোঁয়াটে রঙের বড় বড় পালক। মাথায় কালো রঙের মস্ত একটা ঝুঁটি।

হঠাৎ কথা কয়ে উঠল হোম্‌স্‌—"ওয়াটসন, তুমি তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকার শেয়ার মার্কেটে টাকা ঢালতে রাজী নও?"

দারুণ চমকে উঠলাম আমি। হোম্‌সের এই জাতীয় পিলে চমকানো নাটকীয়তার সঙ্গে আমার পরিচয় আজকের নয়। তবুও আমার মনের কোণের চিন্তাকে আচম্বিতে এক হ্যাঁচকা টানে বাইরে বার করে আনায় বাস্তবিকই হতভম্ব হয়ে গেলাম।

শুধোলাম—"আরে গেল যা, সে কথা তুমি জানলে কোত্থেকে?"

নাচিয়ে মূর্তিগুলো

বোঁ করে টুলের ওপর ঘুরে বসল হোম্‌স্‌। এক হাতে ধোঁয়া-ওঠা টেস্ট-টিউবটা তুলে ধরে কোটরে-বসা কৌতুক-তরল চোখ নাচিয়ে বললে—"ভায়া, স্বীকার কর তাহলে দারুণ চমকে দিয়েছি তোমায়?"

"করছি।"

"তাহলে একটা কাগজে একথা লিখে তোমায় সই করে দেওয়া উচিত।"

"কেন?"

"কেননা পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই তো তুমি বলে বসবে, ওঃ, কি সোজা!"

"সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তুমি।"

"দেখ, মাইডিয়ার ওয়াটসন," বলতে বলতে হোম্‌স্‌ হাতের টেস্ট-টিউবটা র‍্যাকে রেখে ভারিক্কি চালে ঠিক যেন ক্লাস-রুমে দাঁড়ানো প্রফেসরের ঢংয়ে হাত মুখ নেড়ে শুরু করল বক্তৃতা, "পর পর কতকগুলো সিদ্ধান্ত খাড়া করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তই হবে খুব সাদাসিদে, সরল। কিন্তু নির্ভর করবে ঠিক তার আগেরটির ওপরে। এরপর, মাঝের সিদ্ধান্তগুলো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেই থাকবে শুধু আগেরটা আর শেষেরটা এবং তা শুনে কারও যদি আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়, তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবে একটা কথা, এ ধরনের সিদ্ধান্তর চমক থাকলেও সব সময়ে যে তা নির্ভুল হবে, তার কোন মানে নেই। যাই হোক, এবার আসা যাক তোমার প্রসঙ্গে। ও রকম আঁতকে ওঠার কিছুই নেই, খুবই সহজ জিনিস। তোমার বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাঝের খাঁজটুকু পরীক্ষা করেই আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে তোমার সামান্য পুঁজি সোনার খনিতে খাটাতে রাজী নও তুমি।"

"দুয়ের মধ্যে কোন সম্পর্কই দেখছি না আমি।"

"না দেখাই সম্ভব। তবে তোমায় এখুনি দেখিয়ে ছাড়ব, এবং তা খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। চেইনটা খুবই সহজ ওয়াটসন; শোন তবে মাঝখানের হারিয়ে-যাওয়া সন্ধি-সিদ্ধান্তগুলো: ১। গত রাতে ক্লাব থেকে ফিরে এলে তোমার বাঁ-হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাঝের খাঁজে খড়ির দাগ ছিল। ২। বিলিয়ার্ড খেলার সময়ে 'কিউ' ঠিক রাখার জন্যে বাঁ-হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ফাঁকেই খড়িটা রাখ তুমি। ৩। থার্স্টন ছাড়া আর কারও সঙ্গে তুমি বিলিয়ার্ড খেল না। ৪। চার হপ্তা আগে বলেছিলে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছু টাকা লগ্নী করার ইচ্ছে আছে থার্স্টনের। আরও মাসখানেকের মত মেয়াদ আছে তাই থার্স্টনের ইচ্ছে তুমিও তার সাথে কিছু টাকা লাগাও সোনার
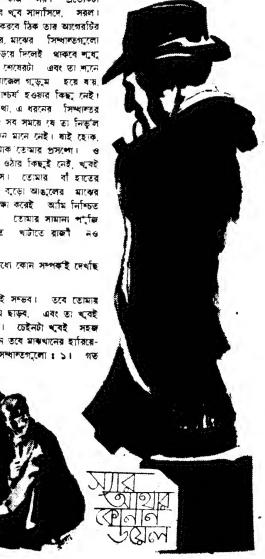
থলিতে। ৫। তোমার চেক-বই আমার ড্রয়ারে তালাচাবি দেওয়া, এবং আমার কাছে চাবি চাওনি তুমি। ৬। এভাবে টাকা লগ্নি করার ইচ্ছে তোমার নেই।"

"ওঃ, কি সোজা!" চীৎকার করে উঠলাম আমি।

"তা তো বটেই!" একটু বিরক্ত হয়ে বলে হোম্স্। "সব সমস্যাই বুঝিয়ে দেওয়ার পর জলের মত সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এই নাও আর একটা হেঁয়ালি। বল দিকি এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছ কিনা।" বলে একটা কাগজ টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে আবার ঘরে বসল হোম্স্ তার রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ নিয়ে।

কাগজটার ওপর আঁকা কিম্ভূতকিমাকার চিত্রাক্ষরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম আমি।

বললাম—"আরে, এ তো দেখছি ছেলেমানুষের আঁকিবুঁকি!"

"ওহো, তাই বুঝি!"

"তা ছাড়া আর কি শুনি?"

"মিঃ হিলটন কিউবিটও তো তাই জানতে চান। মিঃ কিউবিট নরফোকে রিডলিং থর্প ম্যানরে থাকেন। প্রথম ডাকেই এসেছে এই খুদে হেঁয়ালিটা, পরের ট্রেণেই তাঁর আসার কথা। ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনছি, ওয়াটসন। ভদ্রলোক বোধহয় এলেন।"

সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনলাম। পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন লম্বা চওড়া এক ভদ্রলোক। গোঁফ দাড়ি পরিষ্কার কামানো, চোখে মুখে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। চকচকে পরিষ্কার চোখ আর টসটসে রক্তিম গাল দেখেই বুঝলাম বেকার স্ট্রীটের কুয়াশা থেকে অনেক, অনেক দূরে তাঁর জীবন-ধারা বয়ে চলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে। পূর্ব-উপকূলের খানিকটা টাটকা তেজালো অথচ ফুরফুরে বাতাস সঙ্গে নিয়েই যেন ঘরে ঢুকলেন ভদ্রলোক। করমর্দনের পালা সাঙ্গ হলে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে তাঁর চোখে পড়ল টেবিলের ওপর আমার রাখা কিম্ভূতকিমাকার ছবি-আঁকা কাগজের টুকরোটা।

উৎসুক কণ্ঠে শুধোন মিঃ কিউবিট—"কি রকম বুঝলেন মিঃ হোম্স্? শুনলাম, হেঁয়ালি-টেয়ালি নাকি দারুণ ভালবাসেন আপনি। তাই কাগজটা আগেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম যাতে আমি আসার আগেই খানিকটা মাথা ঘামাবার সময় পান আপনি। এ রকম বিদঘুটে ধাঁধা আর দুটি দেখেননি, তাই না মিঃ হোম্স্?"

হোম্স্ বললে—"বিদঘুটে তো বটেই। প্রথম নজরে অবশ্য বাচ্চাদের আঁকিবুঁকি খেলা বলে মনে হয়। কাগজটার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত কতকগুলো আজব মূর্তি নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে, এই তো? কিন্তু এই কিম্ভূতকিমাকার জিনিস নিয়ে আপনি এত ভাবিত হয়ে পড়েছেন কেন, তাই তো বুঝছি না।"

"আমি হইনি মিঃ হোম্স্, হয়েছে আমার স্ত্রী। নিদারুণ ভয় পেয়েছে বেচারী। দু' চোখে তার দেখছি শুধু নিঃসীম আতঙ্কের প্রতিচ্ছবি—মুখে কিন্তু কোন কথা নেই। তাই ভাবলাম হেঁয়ালিটার তলা পর্যন্ত না দেখে আমি ছাড়ছি না।"

সূর্যের আলোর সামনে কাগজটা তুলে ধরল হোম্স্। নোটবই থেকে ছেঁড়া একটা পাতা। মূর্তিগুলো পেন্সিলে আঁকা :

কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর সযত্নে কাগজটা ভাঁজ করে নিজের পকেটে বইয়ের মধ্যে রাখল হোম্স্। তারপর শুধোলো—"দেখেশুনে মনে হচ্ছে রীতিমত অসাধারণ হয়ে দাঁড়াবে কেসটা। দারুণ ইণ্টারেষ্টিং লাগছে। চিঠিতে কিছু কিছু লিখেছেন মিঃ হিলটন কিউবিট, কিন্তু আর একবার যদি আগাগোড়া বলেন তাহলে বন্ধুবর ডঃ ওয়াটসনের অনেকটা সুবিধে হয়।"

মোটাসোটা গাঁট্টাগোট্টা হাত দুটো কচলাতে কচলাতে নার্ভাস ভাবে বললেন মিঃ কিউবিট, "দেখুন, আমি আবার জমিয়ে গল্প বলতে পারি না। কাজেই, বুঝতে অসুবিধে হলে জিজ্ঞেস করে নেবেন। গত বছরে আমার বিয়ের সময় থেকেই শুরু করছি। তার আগে বলে রাখি, আমি ধনবান না হলেও আমার পূর্বপুরুষেরা প্রায় পাঁচশ বছর ধরে বাস করছেন রিডলিং থর্পিতে। নরফোকে আমাদের বংশের নাম জানে না এমন কেউ নেই। গত বছর জুবিলী উপলক্ষ্যে এসেছিলাম লণ্ডনে। গ্রামের যাজক পার্কারের রাসেল স্কোয়ারের একটা বোর্ডিং হাউসে উঠেছিল, তাই আমিও ডেরা নিলাম সেখানে। একটি আমেরিকান মেয়ে থাকতেন বোর্ডিং হাউসে। মেয়েটি সুন্দরী এবং তরুণী। নাম, প্যাট্রিক—এলসি প্যাট্রিক। ক্রমে ক্রমে আমাদের মেলামেশা বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছোয়। আমার এক মাসের মেয়াদ ফুরোবার আগেই, গভীরভাবে ভালবেসে ফেললাম তাকে। রেজিস্ট্রি অফিসে বিনা ধূমধামে শেষ হল আমাদের বিয়ে। দু'দিন পর নরফোকে ফিরে এলাম তাকে নিয়ে—শুরু হল আমাদের বিবাহিত জীবন। ভাবছেন, ডাহা পাগলামি। আমার মত বংশমর্যাদাসম্পন্ন একজন পুরুষের পক্ষে পাত্রীর অতীত অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন রকম খবর না নিয়েই দুম করে বিয়ে সেরে ফেলা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি যদি তাকে দেখতেন মিঃ হোম্স্ আর দু'দিন মেলামেশা করতেন, তা হলেই বুঝতেন কেন আমি কিছু না জেনে কিছু না ভেবে সারা জীবনের সঙ্গী করে নিলাম তাকে।

"এ সম্বন্ধে এলসিও কোন লুকো-ছাপা করেনি। আমার সঙ্গে কোন রকম ছলাকলা করা দূরে থাকুক, সরল মনেই বলেছে সে আমাকে তার কথা। সুতরাং, ইচ্ছে করলে বিয়ে না করলেও পারতাম আমি। বিয়ের ঠিক আগের দিন এলসি আমায় বললে, 'অতীতে কতকগুলো অত্যন্ত বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম আমি সব কিছুই আমি এখন ভুলে যেতে চাই। অতীত আমার কাছে বড় বেদনাদায়ক, তাই সে সম্বন্ধে আমি কোনদিনই কোন কথা বলব না। কিন্তু, হিলটন, আমাকে বিয়ে করলে তুমি জানবে তোমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনে লজ্জা পাওয়ার মত কিছুই নেই। কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে তোমায়। বিয়ের আগে পর্যন্ত আমার জীবনে যা যা ঘটেছে, সে সম্বন্ধে কোন রকম কৌতূহল তুমি প্রকাশ করবে না, আমাকেও কোন কথা বলতে দেবে না। এ সর্ত যদি খুব কঠিন বলে মনে হয়, তাহলে ফিরে যাও নরফোকে। দুঃখ করো না আমার জন্যে—আমার শুধু হোক আমার নিঃসঙ্গ জীবন।' সেদিন মেনে নিয়েছিলাম তাঁর সর্ত এবং আজ পর্যন্ত আমার কথা আমি রেখেছি।"

"যাই হোক, বিয়ের পর এক বছর কেটে গেছে। সুখে শান্তিতে ভরে

উঠেছিল আমাদের দাম্পত্য জীবন। কিন্তু মাসখানেক আগে জুন মাসের শেষাশেষি সেই প্রথম চোখে পড়ল অশান্তির সূচনা। আমেরিকা থেকে একদিন একটা চিঠি এসে পৌঁছোলো আমার স্ত্রীর নামে। আমেরিকান ডাক-টিকিটগুলো চোখে পড়েছিল আমার। চিঠি পেয়েই কাগজের মত শাদা হয়ে গেল এলসির মুখ। পড়া শেষ হতেই চিঠিখানা সে ছুড়ে ফেলে দিলে আগুনের চুল্লীতে। পরেও এ সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করলে না এলসি। আমিও না। কথা এখন দিয়েছি, তখন ঘুচিয়ে দিতে পারতাম আমি। কিন্তু সে আগে না বললে সর্ত অনুযায়ী আমিও কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না। মিঃ হোম্‌স্‌, এলসির সততায় আমার কোন বংশমর্যাদার দিক দিয়ে আমাকে টেক্কা দেওয়ার মত মানুষ সারা ইংল্যাণ্ডে আর দুটি নেই। এলসি তা ভাল করেই জানে এবং সব জেনে তবে বিয়ে করেছে আমায়। এ বংশে কলঙ্কের কালো দাগ লাগে, এমন কিছুই যে সে করবে না—তা আমি জানি।

"এবার বলছি আমার কাহিনীর সবচেয়ে অদ্ভুত, সবচেয়ে গোলমেলে খানেকের মধ্যে নাচিয়েদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। তারপরেই গতকাল সকালে বাগানে সূর্য-ঘড়ির ওপর পড়ে থাকতে দেখলাম এই কাগজটাকে। এলসিকে দেখাতেই জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। তারপর থেকেই যেন তাকে ভূতে পেয়েছে, চেতনা আছে কি নেই বোঝা মুস্কিল। সবসময়ে আচ্ছন্নের মত যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বপ্নের মধ্যে—চোখের তারায় নিঃসীম নিষ্ঠুর আতঙ্কের কালো প্রতিচ্ছবি। তখনই মরিয়া হয়ে চিঠি লিখে কাগজটা পাঠিয়ে দিলাম আপনার কাছে মিঃ হোম্‌স্‌। এ জিনিস নিয়ে পুলিশের

তোমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনে লজ্জা পাওয়ার মত কিছুই নেই।

সন্দেহ নেই। অতীতে যাই ঘটুক না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেজন্যে তাকে দায়ী করা চলে না কোনমতেই। নরফোকের সামান্য লোক আমি। কিন্তু আর তার নড়চড় হবে না। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, সেইদিন থেকেই পুরো একটা ঘণ্টাও সহজভাবে কাটাতে পারেনি বেচারী। সব সময়ে তার চোখে মুখে দেখেছি আতঙ্কের ছায়া—সে আতঙ্ক কিসের তা বুঝিনি। শুধু এইটুকু বুঝেছি যে, যেন দুরু দুরু বুকে সে প্রতীক্ষা করে চলেছে কি এক আসন্ন বিভীষিকার। কিসের জন্যে এ সতর্ক পথ-চাওয়া, তা জানিনি। আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বললে হয়ত ভালই করত এলসি। তার সবচেয়ে দরদী বন্ধু হিসেবে নিশ্চয় তার দিবানিশার অশান্তির অংশটা। হপ্তাখানেক আগে—গত হপ্তার মঙ্গলবারে—একটা জানলার চৌকাঠে আশ্চর্য কতকগুলো নাচিয়ে মূর্তি দেখলাম। খড়ি দিয়ে আঁকা মূর্তিগুলো। ভাবলাম আস্তাবলের ছোকরাটার কাজ। কিন্তু সে ছোকরা দিব্যি গেলে বললে যে, এরকম বদখেয়াল কোনদিনই আসেনি তার মাথায়। যে-ই করুক, মূর্তিগুলো যে রাত্রে আঁকা হয়েছিল, তা বুঝলাম। জল দিয়ে দাগ-গুলো মুছে ফেলে পরে স্ত্রীর কাছে গল্প করতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম এই সামান্য ব্যাপারে তার বিরাট পরি-বর্তন দেখে। দারুণ সিরিয়াস হয়ে গিয়ে বার বার মিনতি করতে লাগল এলসি যেন আবার এ ধরনের মূর্তি চোখে পড়লে তাকে দেখাই আমি। হপ্তা-কাছে যাওয়া মানে তাদের হাসির খোরাক যোগানো। কিন্তু আপনার কাছে আমি নির্ভয়ে আসতে পারি। মিঃ হোম্‌স্‌, আমার কুলমর্যাদা থাকতে পারে, কিন্তু সে অনুপাতে টাকা নেই। তবে আমার এলসির জীবনে সত্যিই যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা বয়ে নিয়ে এসে থাকে এই কিম্ভূতকিমাকার নাচিয়েরা, তাহলে আমার শেষ কপর্দকটিও তাকে বিপদমুক্ত করার জন্যে খরচ করতে প্রস্তুত আমি।"

চমৎকার মানুষ মিঃ হিলটন কিউবিট। ঐতিহ্যময় বংশের যোগ্য সন্তানই বটে। বড় বড় নীল অকপট দুচোখে, শান্ত সুন্দর মুখে শুধু অকুণ্ঠ সরলতা, ভদ্রতা আর নম্রতার অপরূপ সমাবেশ। মুখের প্রতিটি রেখায় যেন জ্বলজ্বল করছিল স্ত্রীর প্রতি তার

নিবিড় প্রেম আর অটল বিশ্বাস। তন্ময় হয়ে শুনছিল হোম্‌স্‌। কাহিনী শেষ হলে পর বেশ কিছুক্ষণ চিন্তাকুটিল মুখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে।

তারপর বললে, "মিঃ কিউবিট, এরকম পরিস্থিতিতে আপনার কি মনে হয় না স্ত্রীর কাছে সরাসরি সব কথা জিজ্ঞেস করা? তাঁকে জানান না কেন যে তাঁর গোপন রহস্যের ভাগীদার হতে চান আপনিও?"

মস্তবড় মাথা দুলিয়ে বললেন মিঃ কিউবিট, "মিঃ হোম্‌স্‌, প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই। এলসির যদি সে ইচ্ছে হয় তবে সে নিজে থেকেই বলবে। না বললে আমি নিজে থেকে তার গোপন কথা কোনদিনই জানতে চাইব না। তবে আপনার কাছে আসা আমার অভিরুচি, তাতে তো আর কথার খেলাপ হচ্ছে না।'

"বেশ, তাহলে আমার আন্তরিক সাহায্য পাবেন আপনি। প্রথমেই একটি প্রশ্ন, আপনার বাড়ীর আশেপাশে কোন আগন্তুককে ঘোরাফেরা করতে কেউ দেখেছে কি?"

"না।"

"জায়গাটা নিশ্চয় খুব নিরিবিলি। নতুন মুখ দেখলেই কথা উঠত, তাই নয় কি?"

"বাড়ীর একেবারে কাছাকাছি হলে সে কথা খাটে। কিন্তু একটু দূরেই কয়েকটা জলসত্র আছে। বহিরাগতদের থাকার ব্যবস্থাও সেখানে রেখেছে স্থানীয় চাষীরা।"

"ছবি-অক্ষরগুলোকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না মিঃ কিউবিট। প্রত্যেকটা নাচুনের একটা না একটা মানে আছে। যদি এলোপাতাড়ি খেয়ালমাফিক আঁকিবুকি হয়, তাহলে অবশ্য এ প্রহেলিকার জট ছাড়ানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। আর যদি নিয়মমাফিক হয়, তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ ব্যাপারের শেষ না দেখে আমরা ছাড়ছি না। কিন্তু আপনার আনা নমুনাটা এতই পুঁচকে যে এ থেকে বিশেষ কিছু আলো আমি পাচ্ছি না। তাছাড়া, আপনার কাহিনী শুনেও বলিষ্ঠ কোনও ইঙ্গিত পেলাম না—কাজেই তদন্ত আরম্ভ করার মত মালমসলাই নেই হাতে। এই কারণেই আমার অনুরোধ, আপনি নরফোকে ফিরে যান মিঃ কিউবিট। কড়া নজর রাখুন চারদিকে। নতুন কোন নাচনেওয়ালার ছবি দেখলেই হুবহু কপি পাঠিয়ে দিন আমাকে। জানলার চৌকাঠে খড়ি দিয়ে আঁকা যে মূর্তিগুলো দেখেছিলেন তার কপি না পাওয়ার জন্যে যে কি আফসোস হচ্ছে, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবেন বাড়ীর কাছাকাছি অঞ্চলে কোন আগন্তুকের আগমন ঘটেছে কিনা। টাটকা কোন প্রমাণ-টমাণ পেলে বিনা দ্বিধায় চলে আসুন আমার কাছে। এ ছাড়া আপাততঃ আপনাকে আমার আর কিছু বলার নেই। পরিস্থিতি যদি গুরুতর হয়ে ওঠে, তাহলে আমাকে আপনার নরফোকের বাড়ীতেই দেখতে পাবেন।"

এই সাক্ষাৎকারের পর থেকে ক'টা দিন সবসময়ে গভীর চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকতে দেখলাম শার্লক হোম্‌স্‌কে। মাঝে মাঝে পকেট-বই থেকে ছবি আঁকা কাগজের টুকরোটা বার করে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করতে দেখলাম আশ্চর্য নাচুনেদের। কিন্তু চিন্তা ছাড়া এ প্রসঙ্গে একটা কথাও শুনলাম না তার মুখে।

দিন পনেরো কি তারও পরে একদিন বেরোতে যাচ্ছি, পেছন থেকে ডাকল হোম্‌স্‌।

"ওয়াটসন, আজকে আর নাই বা বেরোলে।"

"কেন বলো তো?"

"মিঃ কিউবিটকে মনে আছে তো? নাচিয়েদের খবর যিনি এনেছিলেন—মিঃ হিলটন কিউবিট। আজ সকালে ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা তার পেলাম। একটা বিশ মিনিটের সময়ে তাঁর লিভারপুল স্ট্রীটে পৌঁছোনোর কথা। যে কোন মুহূর্তে তাঁকে আশা করছি আমি। তারবার্তা থেকে বুঝছি বেশ গুরুতর কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে নরফোকে।'

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না আমাদের। স্টেশন থেকে ভাড়াটে গাড়ীতে সিধে আসতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন আমাদের নরফোকের মক্কেল। ভদ্রলোককে দেখে মনে হল বেশ দুশ্চিন্তায় রয়েছেন, দমেও গেছেন খুব। সুনীল চোখে আর কপালের রেখাতে ক্লান্তির ছাপ।

আর্ম-চেয়ারে অবসন্ন শরীর এলিয়ে দিয়ে বললেন মিঃ কিউবিট, "মিঃ হোম্‌স্‌, আমার নার্ভ আর সহ্য করতে পারছে না। দিনদুপুরে মূর্তি আঁকিয়ে অজানা অদেখা শত্রুদের চোখে চোখে থাকা খুবই খারাপ ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ওপরেও যদি নিজের স্ত্রীকে তিল তিল করে আত্মহত্যা করতে দেখি চোখের সামনে, তখন আর রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে তা সহ্য করা আর সম্ভব হয় না। বেশ বুঝছি, নিদারুণ আতঙ্কে ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে এলসির আয়ু—চোখের সামনে দেখছি তাকে শুকনো ফুলের মতই সাধ-আহ্লাদ আনন্দের একটি একটি পাপড়ি খসিয়ে ফেলতে।"

"কিছু বলেছেন নাকি?"

"না, মিঃ হোম্‌স্‌। বার কয়েক বলার চেষ্টা করেছিল বেচারী, কিন্তু বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত আর বলতে পারেনি। একথা সেকথা বলে আমি তার

মনের আগল খুলে ফেলতে সাহায্য করতে গেছিলাম। কিন্তু ভয় তাড়াবার বদলে যেন আরও ভয় পাইয়ে দিলাম বেচারীকে। আমাদের প্রাচীন বংশ, এ অঞ্চলে বংশের সুমহান ঐতিহ্য আর সুনাম এবং সেজন্যে আমাদের গর্ববোধ—নিজে থেকেই এসব কথা আলোচনা করেছে এলসি। ভেবেছিলাম, এই ভাবেই আস্তে আস্তে নিজেকে মেলে ধরছে সে। কিন্তু আমার বোকামোর জন্যেই হোক, বা যে কারণেই হোক, আসল কথায় না এসে প্রতিবারই অন্য দিকে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে সে।"

"কিন্তু আপনি নিজে তো অনেক খবর যোগাড় করেছেন?"

"তা করেছি, মিঃ হোমস্। আরও কয়েকটা নাচুনেদের ছবি এনেছি আপনার পরীক্ষার জন্যে। কিন্তু তার চেয়েও বড় খবর হচ্ছে এই যে, লোকটাকে আমি দেখেছি।"

"কাকে?—যে আঁকে?"

"হ্যাঁ, আমি তাকে আঁকতেই দেখেছি। কিন্তু এভাবে উলটোপালটা ভাবে না বলে গোড়া থেকেই সব বলছি। আপনার সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাওয়ার পরের দিনই সকালে প্রথমেই যে জিনিসটা দেখলাম, তা আর একদল নতুন নাচিয়েদের ছবি। টুল-হাউসের কালো কাঠের দরজায় খড়ি দিয়ে আঁকা ছিল মূর্তিগুলো। টুল-হাউসটা লনের পাশেই, সামনেই জানলা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় হাউসটা। যাই হোক, অবিকল একটা কপি তুলে এনেছি। এই নিন সেই ছবি।" বলে একটা কাগজের ভাঁজ খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন মিঃ কিউবিট। ছবি-অক্ষরগুলোর হুবহু প্রতিলিপি দিলাম নীচে :

"এক্সেলেন্ট! খুশী ঝরে পড়ে হোমসের কণ্ঠে। "এক্সেলেন্ট! তারপর?"

"কপি করে নেওয়ার পর মূর্তিগুলো মুছে ফেললাম আমি। কিন্তু ঠিক দুদিন পরেই সকালে উঠে দেখলাম আর একদল নাচিয়েদের। এই দেখুন তার কপি।" :

হাত ঘসতে ঘসতে খুশীর চোটে খিলখিলিয়ে হাসতে থাকেন হোমস্। বলে, "আলমসলাগুলো বেশ চটপট পাওয়া যাচ্ছে দেখছি।"

"তিন দিন পরে সূর্য-ঘড়ির ওপর নুড়ি চাপা দেওয়া আর এক সারি কাগজে-আঁকা মূর্তিদের পাওয়া গেল। এই সেই কাগজ। দেখতেই পাচ্ছেন নাচের ঢঙগুলো ঠিক আগেরটার মত। এর পর ঠিক করলাম ওত পেতে বসে থাকতে হবে। রিভলভার নিয়ে বসলাম স্টাডিতে—এখান থেকে লন আর বাগানটা পুরোপুরি দেখা যায়। রাত প্রায় দুটোর সময়ে জানলার সামনে চুপচাপ বসে আছি, বাইরে চাঁদের ফুটফুটে আলো ছাড়া আর সব অন্ধকার, এমন সময়ে ঠিক পেছনে পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি ড্রেসিং গাউন পরে আমার স্ত্রী। শোওয়ার ঘরে ফিরে আসার জন্যে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল এলসি। আমি খোলাখুলি বললাম, যে হতভাগা এ জাতীয় বাঁদরামো করছে আমাদের সঙ্গে তার শ্রীমুখটি আমার একবার দেখা দরকার। এলসি বললে, নিছক রসিকতা ছাড়া যখন কিছুই নয়, তখন আমার এ সামান্য বিষয় নিয়ে এত মাথা ঘামানো উচিত নয়।

'হিলটন, সত্যিই যদি ছবিগুলোর জন্যে উত্যক্ত মনে করো, তাহলে চল তুমি আর আমি বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসি।'

'কি, কোথাকার এক ফাজিলের জন্যে নিজের বাড়ীঘরদোর ছেড়ে পালাবো? লোকে দেখলে টিটকিরি দেবে যে!' বললাম আমি।

'যাকগে ওসব কথা। আপাতত তো ঘুমোও, কাল সকালে উঠে দেখা যাবে কি করা যায়।' বলল এলসি।

"কথা বলতে বলতে আচম্বিতে একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলাম। নিমেষে রক্তহীন সাদা হয়ে গেল এলসির ঠোঁট, মনে হল যেন চাঁদের আলোও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখের কাছে। লৌহ মুষ্টিতে আমার কাঁধ চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়েছিল বাইরে। টুল-হাউসের ছায়ায় কি যেন একটা নড়তে দেখলাম। গুঁড়িমারা কালো একটা মূর্তি। হামাগুড়ি দিয়ে মূর্তিটা কোণ থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটু পেতে বসল দরজার সামনে। পিস্তল বার করে ছুটে বেরোতে যাচ্ছি, কিন্তু বাধা পেলাম স্ত্রীর কাছে। প্রাণপণ শক্তিতে আমাকে জাপটে ধরে আটকে রাখলে এলসি। ঠেলে ফেলে বেরোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মরিয়া হয়ে আমাকে জাপটে ধরে রইল সে। অনেক কষ্টে ছাড়ান পাওয়ার পর দরজা খুলে টুল-হাউসে পৌঁছে আর দেখতে পেলাম না কৃষ্ণবর্ণ প্রাণীটাকে। উধাও হওয়ার আগে তার চিহ্ন রেখে গেছিল দরজার ওপর। আগের দুবারের মতই দেখলাম বিভিন্ন ঢঙে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে একদল মূর্তি। তখুনি এই কাগজটায় হুবহু কপি করে নিলাম ছবিটা। চারদিকে দৌড়োদৌড়ি করেও রাস্কেলটার আর টিকি দেখতে পেলাম না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লোকটা পালায়নি মোটেই—কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল। কেননা, পরের দিন সকালে কালো কাঠের দরজার ওপর দেখলাম আরও কয়েকটা নতুন মূর্তি আঁকা হয়েছে গত রাত্রে দেখা মূর্তিগুলোর নীচে।"

"নতুন মূর্তিগুলোও কপি করেছেন?"

"হ্যাঁ। যদিও মাত্র কয়েকটা মূর্তি, তবুও কপি করতে ভুলিনি। এই দেখুন।"

আবার একটা কাগজ বার করলেন মিঃ কিউবিট। নতুন নাচের ধরনটা এই রকম :

হোমসের চোখ দেখে মনে হল ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে। কাগজটা বাগিয়ে রেখে শুধোল, "এ মূর্তিগুলো প্রথম সারির মূর্তিগুলোর অংশ হিসেবে আঁকা হয়েছিল, না একেবারে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছিল, তা লক্ষ্য করেছিলেন কি?"

"দরজার অন্য পাল্লায় ছিল ছবিগুলো।"

'এক্সেলেন্ট! এতক্ষণে দারুণ একটা পয়েন্ট পাওয়া গেছে। শুনে আমার আশা জাগছে, মিঃ কিউবিট। তারপর? থামবেন না, আপনার কাহিনীর ইন্টারেস্টিং রিপোর্টের বাকীটুকুও বলে ফেলুন।"

"আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই, মিঃ হোমস্। সে রাতে আমি

স্ত্রীর ওপর বাস্তবিকই রেগে গেছিলাম আমাকে এ রকম বেমক্কাভাবে আটকে রেখে রাস্কেলটাকে পগারপার হতে দেওয়ার জন্যে। আমাকে ও ভাবে জাপটে না ধরলে আমি স্কাউণ্ড্রেলটাকে জন্মের শিক্ষা দিয়ে দিতাম। এলসি শুধু কাঁদ কাঁদ ভাবে বললে, পাছে আমি বিপদে পড়ি, তাই আমাকে সে আটকেছে। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল, আসল ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। আমি নয়, এলসির ভয়, লোকটা পাছে বিপদে পড়ে। কেননা, এলসি যে নিশাচর মূর্তিটাকে চেনে আর বিদঘুটে নিশানা-গুলোর মানে জানে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর স্বরে এমন এক সুর আছে, ওর চোখে এমন এক দৃষ্টি আছে যে, এরকম সন্দেহ মনে এলেও তা টেকে না। আমার বিশ্বাস, এলসি সত্য কথাই বলেছে। আমার মঙ্গলের জন্যেই আমাকে এভাবে আটকে রেখেছিল বেচারী। আমার রিপোর্ট শেষ হয়েছে, মিঃ হোমস্। এখন প্রয়োজন আপনার পরামর্শের। আমার ইচ্ছে খামারের জন্য ছয়েক ছোকরাকে পাহারায় বসাই। রাস্কেলটাকে ধরে বেশ করে উত্তম মধ্যম দিলেই স্বপ্নেও আর এমুখো হবে না হতভাগা।"

"এত সোজা দাওয়াইয়ে এ কেসের কোন সুরাহা হবে না মিঃ কিউবিট," বলল হোমস্। "লণ্ডনে কতদিন থাকবেন আপনি?"

"আজকেই ফিরতে হবে আমায়। এলসিকে রাত্রে একলা রাখা ঠিক নয়। দারুণ নার্ভাস বেচারী। তাছাড়া সে নিজেই আসার সময়ে বার বার আমায় সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসতে বলেছে।"

"তাহলে আপনার ফিরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু দু একদিন থেকে গেলে আপনার সঙ্গে একসঙ্গেই ফিরতাম নরফোকে। কাগজগুলো রেখে যান, মিঃ কিউবিট। খুব শীগগিরই আসছি আপনার ওখানে। তখনই আপনার কৌতূহল খানিকটা মেটাতে পারবো বলে মনে হয় আমার।"

মিঃ হিলটন কিউবিক চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত পেশাগত শান্ত গাম্ভীর্য বজায় রেখেছিল শার্লক হোমস্। কিন্তু তার সঙ্গে আমার পরিচয় তো আর আজকের নয়, কাজেই ভেতরে ভেতরে সে যে কি নিদারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তা বুঝতে আমার দেরী হয়নি। মিঃ হিলটনের চওড়া পিঠ দরজার আড়ালে যাওয়ামাত্র ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠে টেবিলের সামনে বসে মেলে ধরলো কাগজগুলো। তারপর শুরু হল অত্যন্ত জটিল এবং সূক্ষ্ম গণনার পালা।

পুরো দু'ঘণ্টা ধরে রাশি রাশি অঙ্ক আর অক্ষর দিয়ে তন্ময় হয়ে কাগজের পর কাগজ ভরিয়ে চলল হোমস্। আশ-পাশের জগৎ ভুলে গিয়ে কাজের মধ্যে তার ডুবে যাওয়া দেখে আমার তো মনে হল আমি যে ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে তার কান্ড-কারখানা দেখছি, তাও বুঝি ভুলে গেছে সে। মাঝে মাঝে গুনে গুনে গান গাওয়া আর শিস দেওয়া শুনে বুঝলাম, গবেষণা সন্তোষজনক। আবার কখনও কখনও ভুরু কপাল কুঁচকে, শূন্য চোখে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকা দেখে বুঝলাম, গতিক সুবিধের নয়। পুরো দুটো ঘণ্টা কাটল এইভাবে। তারপর, 'হুররে' বলে দারুণ এক খুশীর চীৎকার ছেড়ে দু'হাত জোরে জোরে ঘসতে ঘসতে পায়চারি করতে লাগল ঘরের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত। এর পর খস-খস করে লেখা হল সুদীর্ঘ একটা টেলিগ্রাম। আমার দিকে ফিরে বললে—"ওয়াটসন, টেলিগ্রামটার উত্তর যদি আমার আশানু-রূপ হয়, তাহলে একটা তোফা কেসের বিবরণ লেখার জন্যে তৈরী থেকো। মিঃ কিউবিটের বাড়ীতে সম্প্রতিক উৎপাতের আসল রহস্যের চাবিকাঠি নিয়ে খুব সম্ভব কালই আমাদের রওনা হতে হবে নরফোকের দিকে।"

বলাবাহুল্য, কৌতূহলের চাপে আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। কিন্তু হোমস্‌কে তো চিনি। সময় না হলে একটি অক্ষরও বার করা যাবে না তার পেট থেকে। কাজেই, অপেক্ষায় রইলাম কখন সে নিজে থেকেই আমাকে টেনে নেবে তার দলে।

কিন্তু দু'-দুটো দিন কেটে গেল অধীর প্রতীক্ষায়—টেলিগ্রামের উত্তর এসে পৌঁছোলো না। এই দু'দিন দরজায় সামান্য শব্দ শুনলেই কান খাড়া করে বসে থাকত হোমস্। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় একটা চিঠি এসে পৌঁছোলো হিলটন কিউবিকের কাছ থেকে। খবর সব ভাল। সেদিনই সকালে সূর্য-ঘড়ির নীচে মস্ত লম্বা একটা নাচিয়েদের সারি পাওয়া গেছে। কপিটা চিঠির সঙ্গেই এসেছিল :

রইল হোমস্। তারপরেই, আচম্বিতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই এক চীৎকার। শুনেই বুঝলাম, যেমন অবাক হয়েছে, তেমনই হতাশ হয়েছে সে। দারুণ উদ্বেগে চোখমুখের ভাবও পালটে গেল নিমেষের মধ্যে।

"ওয়াটসন, খামোকা দেরী করে অনেক দূরে গড়িয়ে এনেছি ব্যাপারটাকে। আজ রাতেই নর্থ ওয়ালস্যামের দিকে কোন ট্রেন আছে?"

টাইম-টেবল উলটে দেখলাম লাস্ট ট্রেন ছেড়ে গেল এই মাত্র।

হোমস্ বললে, "তাহলে কাল ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়েই ছুটতে হবে স্টেশনের দিকে। যেভাবেই হোক প্রথম ট্রেন ধরে যত তাড়াতাড়ি পারি নরফোক পৌঁছাতে হবে আমাদের, ওয়াটসন। এই তো এসে গেছে টেলিগ্রামটা। এক সেকেন্ড, মিসেস হাডসন—উত্তর থাকলে নিয়ে যাবেন। না, ঠিকই আছে দেখছি, যা ভেবেছিলাম তাই। খবরটা পাওয়ার পর উদ্বেগ আরও বাড়লো। আমাদের উচিত এখন আর একটুও দেরী না করে মিঃ হিলটন কিউবিটকে সব খবর জানানো। ব্যাপারটাকে উনি যতটা সহজ ভেবেছেন, ততটা সহজ নয়। অত্যন্ত সাংঘাতিক বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।"

শেষ পর্যন্ত হলও তাই। প্রথম যে ঘটনাকে কোন রসিকপ্রবরের নিছক বিট-লেমো বলে মনে করেছিলাম, তার পরি-ণতি যে এরকম ভয়ংকর হবে, তা কে জানত। সেকথা মনে পড়লে এখনও শিউরে উঠি আমি, ভয়ে বেদনায় দুঃখে ভরে ওঠে অন্তর। যদি পারতাম, পাঠক-পাঠিকাদের সামনে সুখাবহ পরিণতিকে হাজির করতে, তাহলে সত্যিই খুশী হতাম আমি। কিন্তু তাতো হবার উপায় নেই। এযে ইতিহাসের ধারাবাহিক বিব-রণ। যে সব ভয়াবহ ঘটনার মধ্য দিয়ে যবনিকা পড়েছে রিডলিং থর্প ম্যানরের আশ্চর্য কেসে, সব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যে কাহিনী সারা ইংল্যান্ডে প্রতিটি লোকের মুখে মুখে ফিরেছে বহুদিন পর্যন্ত—তা আমায় লিপিবদ্ধ করতে হবে ঠিক যেমনটি ঘটেছিল তেমনি ভাবে।

বেশ কয়েক মিনিট আবোল তাবোল বিদঘুটে মূর্তিগুলোর ওপর ঝুঁকে নর্থ ওয়ালস্যামে সবে নেমে জিজ্ঞাসা-বাদ করছি আমাদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে,

এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে শুধোলেন স্টেশন-মাস্টার—"আপনারা নিশ্চয় ডিটেকটিভ? লণ্ডন থেকে আসছেন, তাই না?"

বিরক্তির ছায়া ভেসে যায় হোমসের মুখের ওপর দিয়ে।

"এ রকম ধারণা কি করে হল আপনার?"

"কেননা, নরউইচ থেকে এইমাত্র এসে পেণীছোলেন ইন্সপেক্টর মার্টিন। আপনারা সার্জনও হতে পারেন। মেয়েটি মরেনি—মানে, একটু আগে পর্যন্ত শুনলাম সে বেঁচে আছে। আপনারা তাড়াতাড়ি গেলে হয়ত প্রাণটা রক্ষা পারে। কিন্তু তাতে লাভই বা কি—শেষ পর্যন্ত ফাঁসিকাঠে তো ঝুলতে হবেই।"

উদ্বেগে কালো হয়ে উঠল হোমসের মুখ।

"আমরা রিডলিং থর্প ম্যানরে যাবো বলেই এসেছি। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? সিরিয়াস কিছু ঘটেছে নাকি?"

"ব্যাপার শুধু সিরিয়াস নয়, অতি ভয়ানক। একই রিভলভার দিয়ে পর পর গুলি করা হয়েছে দুজনকে। গুলি চালিয়েছেন মিসেস কিউবিট নিজে। প্রথমে স্বামীর ওপর পরে নিজের ওপর। মিঃ কিউবিট মারা গেছেন। মিসেসের অবস্থা খুবই খারাপ। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! নরফোকের একটা নামকরা বনেদী বংশের একি দশা!"

আর দ্বিতীয় শব্দটি উচ্চারণ না করে একটা ভাড়াটে গাড়ীতে চেপে বসল হোমস্। দীর্ঘ সাত মাইল পথে একবারও মুখ খুলতে দেখলাম না তাকে। এরকমভাবে তাকে মুষড়ে পড়তে বড়-একটা দেখা যায় না। যে ভয় সে করেছিল, শেষ পর্যন্ত তাই হল। লণ্ডন থেকে আসার পথে ট্রেনের মধ্যে একটা পুরো মিনিটও আমি তাকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখিনি। তার মানসিক উদ্বেগ শুধু মুখের পরতেই প্রকাশ পায়নি, প্রাভাতিক দৈনিক উলটোনোর বহর দেখেও আঁচ করতে পেরেছিলাম। আর তারপরেই এই খবর। আঘাতটা স্বাভাবিকই বড় মুড়ে হয়ে গেছিল। সারাটা পথ সে ম্লানবিষণ্ণ মুখে শূন্য চোখে তাকিয়ে জানলা দিয়ে মুখে রইল সিটে। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, তখন চিন্তার তুফান বইছে তার মনে। চারপাশের দৃশ্য স্বাভাবিকই দেখার মত কিন্তু সে সম্বন্ধে হোমস্ ওয়াকিবহাল আছে বলেও মনে হল না। ছবির মত শহরতলী। এদিকে সেদিকে ছড়ানো কয়েকটা কটেজ থেকেই জায়গাটার জনবসতি অনুমান করে নেওয়া চলে। ঢালাও সবুজ প্রাকৃতিক শোভার মাঝে মাঝে ঠেলে উঠেছে চারকোণা-চুড়ো বিরাট বিরাট গির্জে। দেখলেই প্রাচীন ইস্ট অ্যাংগালিয়ার একদিনের ঐশ্বর্যের আর গৌরবের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। অনেকক্ষণ পর জেগে উঠল নরফোক উপকূলের সবুজ কিনারার ওপরে জার্মান সমুদ্রের বেগুনী বলয়-রেখা। একধারে গাছপালার মাথার ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল পুরোনো আমলের ইটকাঠে তৈরী দুটো বড় বড় খিলেন। চাবুক তুলে খিলেন দুটি দেখিয়ে হেঁকে উঠল গাড়োয়ান—"রিডলিং থর্প ম্যানর।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

টেলস্টার—বেতার ও টেলিভিশন বার্তা আদানপ্রদানে নতুন যুগের সূচনা

অয়স্কান্ত

বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক দিন ধরেই আলোচনা চলছিল, হাতে-কলমে পরীক্ষা হল এই প্রথম। টেলস্টারের মাধ্যমে আটলাণ্টিক পেরিয়ে বেতার-বার্তা ও টেলিভিশন-ছবি আদান-প্রদান করা গিয়েছে—এ খবর এখন আর নতুন নয়। জাপানী বিজ্ঞানীরা ইতি-মধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছেন যে, ১৯৬৪ সালে জাপানের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার অধিকাংশ অনুষ্ঠান এমনি এক বা একাধিক টেলস্টারের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে সারা পৃথিবীতে প্রচার করা সম্ভব হবে। সারা পৃথিবীর মানুষ ঘরে বসেই অলিম্পিক অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারবেন।

তবে ব্যাপারটি খুবই ব্যয়সাধ্য। সাড়ে চৌত্রিশ ইঞ্চি ব্যাসের এই একটি টেলস্টার নির্মাণ করতেই আমেরিকান টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কোম্পানির খরচ পড়েছে পাঁচ কোটি ডলার। আর এই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে আকাশে তুলতে খরচ পড়েছে ত্রিশ লক্ষ ডলার। এ-অবস্থায় একা জাপানের পক্ষে এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করা হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগের জন্যে যদি একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা যায় তাহলে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থাও সহজেই হতে পারে। বর্তমানে সামরিক উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-মূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্যে যে-পরিমাণ অর্থের অপব্যয় হয়ে থাকে তার সাহায্যে এমনি ধরনের হাজারটা পরিকল্পনা এই মুহূর্তেই রূপায়িত করা সম্ভব।

বলা হচ্ছে যে, টেলস্টার টেলিভিশন-যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করেছে। কথাটার মানে এই যে, এতদিন পর্যন্ত দূরপাল্লার রেডিও ও টেলি-ভিশনের ক্ষেত্রে যে-সমস্ত অসুবিধাকে মেনে নিতে হয়েছিল তা এবারে কাটিয়ে ওঠা যাবে। সকলেই জানেন যে, টেলি-ভিশনের প্রচার এখনো পর্যন্ত সত্তর কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। মোটামুটি বলা হয় যে, টেলি-ভিশনের ঢেউয়ের গমনপথ অনেকটা আলোর ঢেউয়ের মতো—চোখের দেখার বাইরের এলাকায় তা পৌঁছতে পারে না। নিউ ইয়র্কের মতো শহরেও আকাশছোঁয়া অট্টালিকার ছাদে মস্ত উঁচু অ্যানটেনা বসিয়েও টেলিভিশনের পাল্লাকে সত্তর কিলোমিটারের বেশি প্রসারিত করা যায়নি। কলকাতার হাওড়া-ব্রিজের মাথায় মনুমেণ্টের সমান উঁচু অ্যানটেনা বসিয়ে যদি টেলিভিশনের ছবি প্রচার করার ব্যবস্থা হয় তাহলে বড়ো জোর হয়তো চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত টেলিভিশনের গ্রাহক-যন্ত্রে সেই ছবি ধরা পড়তে পারে। তার কারণ হচ্ছে এই যে, টেলিভিশনের বার্তাবহ ঢেউ মাত্রার দিক থেকে না লঙ, না মিডিয়াম, না শর্ট। আমরা জানি, বেতারের ঢেউ এই তিনমাত্রারই হওয়া সম্ভব। বিশেষ ক'রে শর্টওয়েভের একটি গুণ এই যে তা বায়ুমণ্ডলের আয়োনো-স্ফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসে এবং এই কারণেই পৃথিবীর কোনো একটি বিশেষ স্টেশন থেকে প্রচারিত

নির্মীয়মান অবস্থায় টেলস্টার

বেতারবার্তা সারা পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে। কিন্তু টেলিভিশনের ঢেউ মাত্রার দিক থেকে আলট্রা-শর্ট। এই বিশেষ মাত্রার ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য কোনো ক্ষেত্রেই সাড়ে সাত মিটারের বেশি হওয়া সম্ভব নয়। এবং এই বিশেষ মাত্রার ঢেউ শর্ট-ওয়েভের মতো আয়োনোস্ফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয় না। টেলিভিশন প্রচারের ক্ষেত্রে এইটেই সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে। কাজে কাজেই টেলিভিশনের প্রচার এত-দিন পর্যন্ত চোখের দেখার এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। অর্থাৎ টেলি-ভিশনের অ্যানটেনাকে যতো বেশি উঁচু করা যাবে, টেলিভিশনের ছবিও ততো বেশি দূর পর্যন্ত প্রচারিত হবে। কিন্তু অ্যানটেনাকে উঁচু করারও একটা সীমা আছে। এর আগে কথার কথায় যা বলেছি—হাওড়া ব্রিজের মাথায় মনুমেণ্টের সমান উঁচু একটি অ্যানটেনা—বাস্তব ক্ষেত্রে তাও হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু, কল্পনা করা যাক, মাটি থেকে কয়েক মাইল উঁচুতে একটি হেলিকপটার স্থির হয়ে আছে আর সেই হেলিকপটার থেকে টেলিভিশন-বার্তা প্রচার করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কিন্তু টেলিভিশনের পাল্লা অনেকখানি বেড়ে যাবে। ভূপৃষ্ঠের যে-যে এলাকা থেকে এই হেলিকপটারটিকে দেখা সম্ভব, সেই সেই এলাকা টেলি-ভিশন-বার্তার পাল্লার মধ্যেও অবশ্যই এসে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে টেলি-ভিশন-প্রচারের জন্যে একটি হেলিকপ-টারকে সর্বক্ষণ আকাশে তুলে রাখা সম্ভব নয়। তার চেয়ে অনেক কম খরচে একশো মাইল পরে পরে মাটির ওপরেই রীলে-স্টেশন খাড়া করা যেতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থারও সীমাবদ্ধতা আছে। একটি বিশেষ দেশের টেলিভিশন-প্রচার দেশের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সমুদ্র বা পর্বতের বাধা তো আছেই, দেশের সীমানার বাইরে রীলে-স্টেশন বসাতে হলে রাজনৈতিক বাধাটাও কম প্রবল নয়। তাছাড়া, একশো মাইল দূরে দূরে রীলে-স্টেশন বসিয়ে যাওয়াটা পরিকল্পনা হিসেবে এতই অবাস্তব যে, অনায়াসেই অগ্রাহ্য করা চলে। সারা পৃথিবীর কথা

টেলস্টার মাধ্যমে গৃহীত টেলিভিসন চিত্র

বাদ দেওয়া যাক, এমন কি মহাদেশের কথাও, এই ভারতের মতো একটি দেশেও কোনো একটি বিশেষ স্টেশন থেকে প্রচারিত টেলিভিশন-বার্তা সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হলে এক হাজারেরও ওপর রীলে-স্টেশন বসাবার প্রয়োজন হতে পারে।

এই বাস্তব অসুবিধেকে দূর করার জন্যেই বিজ্ঞানীরা বলে আসছিলেন যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েক-শো মাইল উঁচুতে যদি একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা যায় আর সেই কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে টেলিভিশন-বার্তা রীলে করার ব্যবস্থা যদি থাকে, তাহলে সেই বার্তা অনেক অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর কৃত্রিম উপগ্রহ যদি একটির বেশি হয়—অর্থাৎ সারা পৃথিবীকে বেড় দিয়ে গোটা-কয়েক কৃত্রিম উপগ্রহ—তাহলে কোনো একটি বিশেষ স্টেশন থেকে প্রচারিত টেলিভিশন-বার্তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে কোনো বাধা থাকার কথা নয়। বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকেই কাগজে-কলমে বিষয়টি সম্পর্কে পরিকল্পনা করে আসছিলেন। টেলস্টার অনেক বছরের অনেক পরিকল্পনার প্রথম বাস্তব রূপায়ণ।

টেলস্টারও অবশ্যই একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ কথাটি ব্যবহার না করে আমরা বলব স্পেস-স্টেশন। অর্থাৎ, মহাকাশের ঘাঁটি। ঘাঁটি এই কারণে বলা হচ্ছে যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ একটি আয়োজন রয়েছে এখানে। ভিন্নতর উদ্দেশ্য নিয়ে এমনি ধরনের ঘাঁটি ভবিষ্যতে আরো অজস্র নির্মিত হবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য মহাশূন্যে, সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের কথাও কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন। এক্ষেত্রে আমরা আশা করব, যেহেতু মহাকাশ কোনো একটি বিশেষ দেশের অধিকারভুক্ত নয়, অতএব সামরিক-উদ্দেশ্যে মহাকাশের ব্যবহার নিবারিত হবে। তবে, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগের জন্যে যদি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা সম্ভব হয় তাহলে এই মুহূর্তেই পৃথিবীর আকাশে এমন অজস্র ঘাঁটি বা স্পেস-স্টেশন তৈরি হতে পারে যা মানুষের জীবনকে নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। যাই হোক, টেলস্টার সম্পর্কে আমাদের আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

এই স্পেস-স্টেশনটিকে মহাশূন্যে স্থাপন করা হয়েছে একটি তিন-পর্যায়ের থর-ডেল্‌টা রকেটের সাহায্যে। এর সর্বোচ্চ বেগ ঘণ্টায় ১৮,৩৮০ মাইল, সর্বনিম্ন বেগ ১১,২২০ মাইল। স্পেস-স্টেশনটি প্রতি ১৫৭·৮ মিনিটে পৃথিবীকে একবার করে পাক খাচ্ছে। কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব ৩৫০২ মাইল এবং সবচেয়ে কম দূরত্ব ৫৯৩ মাইল। স্পেস-স্টেশনের কক্ষ-সমতল পৃথিবীর বিষুব-সমতলের ৪৪·৭ ডিগ্রি কোনাকুনি। এই বিবরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রতি পাকে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে স্পেস-স্টেশনটি পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ এলাকার আকাশে অবস্থান করতে পারে। যেমন, ষষ্ঠ পাকের সময়ে আমেরিকার সঙ্গে ফ্রান্সের টেলিভিশন-যোগাযোগ উনিশ মিনিটকাল স্থায়ী হয়েছিল। তার মানে, কথাটা দাঁড়ায় এই যে, আমেরিকা ও ফ্রান্স মিলিয়ে ভূপৃষ্ঠের যে বিশেষ এলাকা, সেই এলাকার আকাশ পার হতে স্পেস-স্টেশনের সময় লেগেছিল উনিশ মিনিট। যে মুহূর্তে স্পেস-স্টেশন এই এলাকার সীমানা পার হয়েছে সেই মুহূর্তেই এই দুই দেশের মধ্যে টেলিভিশন-যোগাযোগও ছিন্ন হয়েছে।

এবারে তাহলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করা চলে : এমন ব্যবস্থা কি করা সম্ভব যাতে এই স্পেস-স্টেশনটি এই বিশেষ এলাকার আকাশে স্থিরভাবে অবস্থান করবে? 'স্থিরভাবে' কথাটার ভুল অর্থ

হবার সম্ভাবনা আছে। কথাটার মানে এই নয় যে, স্পেস-স্টেশনটির নিজস্ব কোনো গতি থাকবে না। তবে পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হবে, স্পেস-স্টেশনটি অনড়। যেমন, পাশাপাশি লাইনে যদি দুটি ট্রেন একই দিকে একই বেগে ধাবিত হয় তাহলে এক ট্রেন থেকে অপর ট্রেনের দিকে তাকিয়ে সেটিকে মনে হবে স্থির। স্পেস-স্টেশনের ক্ষেত্রেও এমনি অবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমরা বলেছি টেলস্টার পৃথিবীকে একটি পাক দিচ্ছে ১৫৭·৮ মিনিটে। কিন্তু যদি পুরো চব্বিশ ঘণ্টায় একটি পাক দিত তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াত? তাহলে পৃথিবী থেকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই মনে হত যে, টেলস্টার আকাশের বিশেষ একটি অবস্থানে স্থির হয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, একটি স্পেস-স্টেশনকে যদি পুরো চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীকে একটি পাক দেওয়াতে হয়, তাহলে পৃথিবী থেকে এই স্পেস-স্টেশনটির দূরত্ব হওয়া উচিত ২২,০০০ মাইল। এক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের বিশেষ একটি এলাকার আকাশে স্পেস-স্টেশনটি স্থির-ভাবে অবস্থান করবে। আবারও বলছি, 'স্থির' কথাটি আপেক্ষিক অর্থে, সত্যি-কারের স্থির নয়, ভূপৃষ্ঠের এই বিশেষ এলাকা থেকে তাকিয়ে মনে হবে যেন স্থির।

সহজেই অনুমান করা চলে, বাইশ হাজার মাইল দূরের একটি স্পেস-স্টেশনের দৃষ্টিসীমার মধ্যে ভূপৃষ্ঠের অনেকখানি এলাকাই এসে যায়। এবং এই স্পেস-স্টেশন থেকে রীলে করার ব্যবস্থা করা গেলে এই সম্পূর্ণ এলাকায় টেলিভিশন-প্রচার কিছুমাত্র বাধাগ্রস্ত হবে না। তারপরে ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য এলাকার আকাশে যদি এমনি ধরনের আরো গোটাকতক রীলে-স্টেশন স্থাপন করে নেওয়া যায় তাহলে কোনো একটি বিশেষ স্টেশনের টেলিভিশন-বার্তা পৃথিবীব্যাপী প্রচারিত হতেই বা বাধা কী?

এই আশ্চর্য ভবিষ্যতেরই সূচনা হচ্ছে টেলস্টার। ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক ক্রীড়া শুরু হতে এখনো অনেক দেরি। ইতিমধ্যে পৃথিবীর সমস্ত দেশের বিজ্ঞানীরা একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে যদি একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে মিলিত হতে পারেন, তাহলে অনতিবিলম্বেই এই আশ্চর্য ভবিষ্যৎ বাস্তব বর্তমানে রূপায়িত হতে পারে। আমাদের দেশে অবশ্য এখনো টেলি-ভিশনের যুগ শুরু হয়নি। তবে স্পেস-স্টেশন শুধু টেলিভিশন-প্রচারকেই সুসাধ্য করবে না, শর্টওয়েভ বেতার-প্রচারকে অধিকতর সুগম করবে। অর্থাৎ, এই আমরাও আমাদের শর্টওয়েভে লোকাল স্টেশন ধরার উপযোগী রেডিও-সেটেও জাপান থেকে প্রচারিত অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ধারা-বিবরণী খুব স্পষ্ট-ভাবেই শুনতে পারব। তখন দূর হয়ে উঠবে আরো নিকট।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ সতেরো ॥

ঘরে আর একটা খাটিয়া আমদানি করেছে চন্দন সিং। তারই উপরে চোখ বুজে চিৎ হয়ে পড়ে ছিল অমিয়।

সকাল হয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু এই মাত্র সামনের বাড়ীটার মাথা ছাড়িয়ে উঠে ঘরের ভেতর এক ফালি আলো বিলিয়েছে সূর্য। সেই আলোটা দেওয়ালের গায়ে জানলায় গরাদের সারি সারি ছায়া এঁকেছে, যেন জেলখানায় দরজা তৈরি করেছে ওখানে। একটা কালচে মোটা-সোটা টিকটিকি স্থির হয়ে আছে তার ভেতরে, বড়ো বড়ো দুটো হিংস্র চোখে এক দৃষ্টিতে অমিয়র দিকেই চেয়ে রয়েছে মনে হয়। লম্বা একটা জিভও লিক-লিক করল। যেন ভেংচি কাটল অমিয়কে।

জেলখানাতেই আছে অমিয়, তাতে আর সন্দেহ কী। ফুটবল খেলার নাম করে আজ চারদিন আগে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে, ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও আর নেই। বাবা রাতদিন যা মুখে আসে গালাগাল করছেন—দাদা রাস্তার উপর তার গায়ে হাত তুলেছে। আরো বলেছে, ঢুকিয়ে নেবে তার কারখানাতে। দাদার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। নিজে তেল-কালি মেখে কারখানার মজুর হয়ে গেছে, এখন অমিয়কে দলে না ভেড়ালে তার আর চলছে না। দাদার মতো গোঁয়ার-গোবিন্দ এ ছাড়া আর কীই বা ভাবতে পারে।

কিন্তু সে মজুর হবে? হাতুড়ি ঠুকে, নছ এঁটে, বয়লারের আঁচে আধপোড়া হয়ে কাটিয়ে দেবে জীবনটাকে?

অবশ্য আরো কিছুদিন ভালো করে খেলতে পারলে, একবার মোহনবাগান কিংবা ইস্টবেঙ্গলে চান্স পেলে হয়তো ব্যাপারটা অন্য রকম হত। ওসব টীমের খেলোয়াড়দের নাকি ডেকে ডেকে নিয়ে চাকরি দেয়। কিন্তু অতদিন অমিয়র দেরী সইবে না—এখনি তাকে যা হোক একটা কিছু আর রেল, পোর্ট কমিশনার কাস্টমস কিংবা কর্পোরেশনের চাকরিতে কটা টাকাই বা আসে? ওতে কোনোমতে বেঁচে থাকা যায়—বড়োলোক হওয়া যায় না।

শিয়ালদার সাউথ স্টেশনের ওদিকে, রেলিং ঘেঁষে, দেওয়ালের গায়ে যে-সব উদ্বাস্তু জন্তু-জানোয়ারের মতো দিন কাটায়, তাদের দেখিয়ে একদিন ঠাট্টা করেছিল চন্দন সিং। পাঞ্জাবী হলে এমন কুত্তা কিংবা বিল্লিকা মাফিক পচে মরত না, নড়ত, উঠে দাঁড়াত, নিজের পায়ের জোরে ভাগ্যকে গড়ে নিত। তার প্রমাণ তো চন্দন সিং নিজেই। কোই নেহি—কুছ নেহি থা। আভি দেখো। নিজের গাড়ী, নিজের ট্যাক্সি, সেই সঙ্গে বাস-সার্ভিস। এখনো ভবানীপুরের এই পুরোনো বাড়ীর একতলায় দিন কাটছে বটে, কিন্তু প্রায় বিঘে খানেক জমির ব্যবস্থা করে রেখেছে রিজেন্ট পার্কের ওদিকে। সময়-সুযোগ বুঝে জাঁদরেল বাড়ী হাঁকাবে একখানা। সেই সঙ্গে নিজের গ্যারাজ করে কারখানা তৈরী করবে।

আর অমিয়? অতরের পাল্লায় পড়ে—অবরেজব।

বালিশের তলা থেকে আমেরিকান সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা ধরালো। দেওয়ালের সেই বিশ্রী টিক-টিকিটা তেমনি করে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। পোড়া দেশলাইয়ের কাঠিটা তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলে অমিয়। লাগল না। দেওয়াল থেকে মুখ ফিরিয়ে পায়ের দিকে দরজাটার মাথার ওপর তাকালো। একটি মনোরমা ফিল্ম-স্টারের ছবি সেখানে।

এদের নাড়ী-নক্ষত্র অমিয়র জানা। ফিল্ম-পত্রিকার কল্যাণে এদের কে পাঁউ-রুটির সঙ্গে ক আউন্স মাখন খায়, কার বাড়ীতে কটা কুকুর এবং কে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে রোলস রয়েস মোটরগাড়ী আনিয়েছে, এগুলো গড়-গড়িয়ে মুখস্থ বলতে পারে অমিয়। সে জানে, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণঘাতিনী ওই মেয়েটি পাঞ্জাবী। হিন্দী ফিল্মে তো পাঞ্জাবী রূপসীদেরই একচেটে রাজত্ব। তবু চন্দন সিং-এর কেন মনের মতো পাত্রী জোটে না একটা?

—লো, চা পিয়ো।

ঘসঘসে কর্কশ গলার সম্ভাষণ। ঘরে ঢুকেছে চন্দন সিংয়ের সেই গ্রাম সম্বাদের চাচা। হাতে দুটো মোটা কাচের গ্লাসে চা এনেছে। আসানসোলে থাকে, রাঁচী, হাজারীবাগ, পাটনা—কখনো কখনো আরো দূরে লরী নিয়ে পাড়ি জমায়। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে, তখন আস্তানা গাড়ে চন্দন সিংয়ের আস্তানায় এসে।

—ক্যা, নিদ্ টুটা নেহি?—আবার কর্কশ গলায় সম্ভাষণ। এখনো বেণী

পাকানো হয়নি, খোলা লম্বা চুল, এক মুখ কাঁচা-পাকা বিরাট দাড়ি, সব মিলিয়ে ওজনের আতিকায় চেহারা—সব মিলে দৈত্যের মতো দেখালো লোকটাকে। অমিয় ধড়ফড় করে উঠে বসল।

—চন্দন সিং কাঁহা গিয়া?

—কামমে।—চাচা বললে, লো—লো।

হাত বাড়িয়ে চায়ের গ্লাসটা নিলে অমিয়। চুমুক দিলে একটা। চাচা প্লেটে করে কয়েকটা মোটা মোটা বিস্কুটও রাখল তার সামনে। ভাঙা বাংলায় বললে, চন্দন সিং বলে গেল তুমকো চা উ পিলাতে।

অমিয় একটা বিস্কুট নিয়ে চায়ে ভিজিয়ে চিবুতে লাগল। চাচা চায়ের গ্লাসটা সামনে রেখে কিছু একটা ভাবতে লাগল অন্যমনস্কের মতো। অমিয় চাপা অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল ভিতরে ভিতরে। শুধু প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো চেহারা নয়; চাচা কেমন যেন একটা ভঙ্গিতে তাকায় তার দিকে। সে চাউনিতে কী আছে অমিয় জানে না, কিন্তু তার গায়ের ভেতরে শির-শির করতে থাকে।

দেওয়ালে যেখানে সূর্যের আলো জানলার গরাদের ছবি এঁকেছে, বিছানায় উঠে বসাতে সেখানে অমিয়র ছায়াটাও গিয়ে পড়েছে—আর সেই টিকটিকিটা যেন এখন বসেছে তার মাথার উপরেই। যদিও ওটা তার মাথা নয়, মাথার ছায়া, তবুও অমিয়র মনে হল, তার কপালটা সুড়-সুড় করছে—যেন টিকটিকিটা কয়েকটা বাঁকা বাঁকা নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে সেখানে।

চাচা এখনো চা খায়নি—কী একটা ভেবেই চলেছে। তারপরে মুখ খুলল।

—ঘর ছেড়ে যে এখানে আছো, তোমার মা-বাপ ভাববে না?

অমিয়র দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল : আমার জন্যে কেউ ভাবে না।

চাচা হাসল : গোসা?

অমিয় জবাব দিল না। গরম চায়ের সঙ্গে একটুকরো বিস্কুট হঠাৎ গলায় আটকে গিয়েছিল, সেইটেই সামলে নিতে হল।

চাচা এবার নিজের গ্লাসটা মুখে তুলল, এক চুমুকে অর্ধেকটা শেষ করল তার। বিস্কুটে হাত দিয়েই সরিয়ে নিলে, অমিয় দেখল একটা মাছি এসে বসেছে তার ওপর।

চাচা বললে, তা হলে আর ঘরে যাবে না?

—না।

—ভালা।—চাচা তার চোখের সেই বাঁকা ভঙ্গিটা করে, বিরাট দাড়ির আড়ালে এক ঝলক হাসি ফুটিয়ে তুলল : মরদ কা বাত। কী করবে তা হলে এখন?

অমিয় বিরক্তি বোধ করছিল। সংক্ষেপে জবাব দিল, ব্যবসা।

—ট্যাক্সির?

—হুঁ।

চাচা এবারে বাকী চা-টুকুও শেষ করল। বিস্কুটের প্লেটটা সরিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। তার হাতের নাড়াচাড়ায় বিরক্ত হয়ে উড়ে গেল মাছিটা, কী করে মনে করে বসতে চাইলে দেওয়ালের গায়ে। আর অমিয় দেখল, হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছে টিকটিকটা—তার এতক্ষণের অনড় অচল ল্যাজটা নড়ে উঠেছে একবারের জন্যে।

চাচা বললে, সে তো গায়ের খাটুনির কাজ। পারবে?

—পারব বলেই তো এসেছি।

—যা ভাবছ তা নয়।—চাচা হাসেন : গায়ের রক্ত জল করতে হবে। ধুপে জলে কাজ করতে হবে। ডাল-ভাত চলবে না, রোটি আউর গোস্ত—আর মদ গিলে 'জানবরের' মতো দিন কাটাতে হবে। পয়সা আপসে আশমান থেকে গির পড়ে না।

অমিয়র মুখের সামনে এগিয়ে এসেছিল, তোমাকে আর এ নিয়ে মাতব্বরি করতে হবে না, আমি জানি। কিন্তু গাম সুবাদের হলেও চন্দন সিংয়ের চাচাকে চটানো যায় না—আরো বিশেষ করে যার অমন পাহাড়ের মতো চেহারা।

সংক্ষেপে বললে, আমি সব পারি।

চাচা আবার বললে, ঠিক হ্যায়। মদ খেতে শুরু করেছ, নিজের চোখেই তো দেখলাম সেটা। কাজ তা হলে খানিক এ গিয়েছে। লেকিন্ এক বাত। ট্যাক্সি কোথায় পাবে?

—চন্দন সিং বলেছে, ছ' মাসের ভেতরে যোগাড় করে দেবে। গাড়ী আর পারমিট। আমি এর ভেতর সব কাজ শিখে নেব।

—রুপেয়া?—চাচা চোখ দুটোকে কুঁচকে বন্ধ করে আনল : কাঁহাসে মিলবে?

—চন্দন সিং ধার দেবে। গাড়ী চালিয়ে চালিয়ে আমি শোধ করে দেব।

রাস্তায় একটা হৈ হৈ উঠল, খানিকটা অশ্লীল গালাগালের তুবড়ি ছুটল হিন্দীতে আর পাঞ্জাবীতে। চাচা একবার চট করে উঠে বাইরে গেল, ফিরে এল সঙ্গে সঙ্গে। বললে, পাকিটমার। শালেকো পাকড় লিয়া।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দু জনেই। কোলাহলটা আস্তে আস্তে জগুবাবুর বাজারের দিকে এগিয়ে গেলে চাচা আবার বললে, তো, ট্যাক্সি তুমকো মিল জায়গা?

—চন্দন সিং তাই বলেছে।

হঠাৎ গলা ফাটিয়ে হা হা করে হেসে উঠল চাচা। যেন বাজের আওয়াজের দমকে দমকে থর থর করে কাঁপতে লাগল ঘরটা। অমিয়র হাত থেকে আর একটু

হলেই কাচের গ্লাসটা আছড়ে পড়ত মাটিতে। এতক্ষণ ধরে যে টিকটিকিটা অমিয়র মাথার ছায়ার উপরে স্থির হয়ে ছিল, সেটা উর্ধ্বশ্বাসে তর-তর করে উঠে গেল, আশ্রয় নিলে ছাদের কোন-ঘেঁষা নিরাপদ একটা অন্ধকার জায়গায়।

হাসিটার অর্থ বুঝল না অমিয়, কিন্তু কান দুটো তার আগুনের মতো গরম হয়ে উঠল।

—হাসছ যে? হাসির কী হল এ কথায়?

চাচা আবার হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু অমিয়র মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল।

—কেন চন্দন সিং এতগুলো টাকা খরচ করবে তোমার জন্যে? তুমি তার আপনা আদমি নও, পাঞ্জাবী ভি নেহি। মুফৎ এতগুলো রুপেয়া ঢেলে দেবে তোমার জন্যে?

—আমি ওর দোস্ত্ বলে দেবে। ধার দেবে।

—ধার দেবে! দোস্ত্!—চাচা উঠে দাঁড়ালো। তীব্র স্বরে হিস্‌হিস্ করে বললে, বুদ্ধু! একদম বুদ্ধু!

অমিয়ও দাঁড়িয়ে পড়ল। কান দিয়ে আগুন ছুটেছে তার।

—গাল দিচ্ছ কেন?

—গালি কে'ও দুংগা?—মুখটাকে বিকৃত করে চাচা খানিক থুথু ফেলল ঘরের মধ্যেই। সচ্ বাত শুন্ লো। আশমানসে মঞ্জিল নেহি নন্‌তা। ইয়ে দুনিয়ামে দোস্ত্-উস্ত্ কুছ নেহি—সব কোই পুরা উশুল কর লেতা। ঘর যা উজবগ্—ভাগ যা হিঁয়াসে!

অমিয়র গলার শিরা থর থর করে কাঁপতে লাগল, রাগে অপমানে যেন অগ্নিকাণ্ড চলতে লাগল মাথার মধ্যে। প্রবল কণ্ঠে একটা কিছু বলতে চাইল অমিয়, বলতে চাইল চন্দন সিং আমাকে টাকা দিতে চাইছে বলেই তোমার এত গায়ের জ্বালা—হিংসেয় পুড়ে মরছ তুমি? কিন্তু ঘরের আধখানা জুড়ে যে প্রকাণ্ড জোয়ানটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, পিঠ পর্যন্ত খোলা যার চুল, বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে যার কাঁচা-পাকা দাড়ি, হাতের কব্জিদুটো যার শাল গাছের মতো মোটা আর কোঁচকানো ভুরুর তলায় যার ছোট চোখ দুটো যেন কপিশ আলোয় জ্বলছে, তার দিকে তাকিয়ে একটা কথাও বলতে পারল না সে।

চাচা আবার থুথু ফেলল ঘরের মধ্যে। দাঁতে দাঁতে ঘষে আবার বললে, ভাগ্ যা উল্লু, আবৃহি ভাগ্ হিঁয়াসে।

তারপরে নিজেই আর অপেক্ষা করল না। পায়ের মোটর টায়ারের চটিতে হাতির চলার মতো আওয়াজ করতে করতে একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে গেল সে। আর অমিয় দাঁড়িয়ে রইল সেইভাবে। সারা শরীরটা কাঁপতে লাগল, মাথার ভেতরে যে আগুনটা জ্বলে উঠেছিল, সেটা যেন ছড়িয়ে যেতে লাগল প্রত্যেকটা চুলের ডগায় ডগায়।

বোধ হয় মিনিট পাঁচেক এইভাবে দাঁড়িয়ে ছিল অমিয়। চমক ভাঙল চন্দন সিংয়ের গলার আওয়াজে।

—চা খাওয়া হল?

তীরবেগে ফিরে তাকালো অমিয়। কাঁপা অস্পষ্ট গলায় বললে, চন্দন সিং, আমি এখুনি বাড়ী ফিরে যাব।

চন্দন সিং এগিয়ে এল : কী হয়েছে?

—তোমার চাচা আমায় গাল দিচ্ছিল। বলছিল, ভাগ্ যা বুদ্ধু, ঘর যা।

মুহূর্তে মুখের চেহারা বদলে গেল চন্দন সিংয়ের—যেন হঠাৎ একটা মুখোস খসে পড়ল সেখান থেকে। চন্দন সিংয়ের সুন্দর ভদ্র চেহারাটা অকস্মাৎ অত্যন্ত জান্তব আর কুৎসিত দেখালো। কটু তীব্র গলায় বললে, কেন ওসব তোমাকে বলবে ও শালা? কোন এক্তিয়ার আছে ওর? বুড্‌ঢা মাতোয়ালা—ওর মগজটাই গড়বড় হয়ে গেছে—কাকে যে কী বলে তার ঠিক নেই!

—আমি চলেই যাব চন্দন সিং। —অভিমানে চোখে প্রায় জল এসে গেল অমিয়র।

—আরে ছোড়্ দো—উস্‌কো বাত ছোড়্ দো। তুমি আমার দোস্ত—আমি তোমাকে আদর করে ডেকে এনেছি। আমার ঘর থেকে তোমাকে যেতে বলবে, এতবড়ো বুকের পাটা কার আছে? চাচা যদি ফের তোমাকে কোনো কথা বলে, ওকে আমি দেখে নেব। এখন চলো, রাস্তা থেকে ভালো করে কিছু খেয়ে আসা যাক। বহুৎ ভুখ লাগ গিয়া।

অমিয় নড়ল না—গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—আও-আও! —চন্দন সিং এবার একটা থাবড়া দিলে অমিয়র পিঠে : বুড্‌ঢা মাতোয়ালাকো বাত ছোড় দো। উ তো পাগলা হ্যায়। এরপরে আর রাগ করে থাকা যায় না। আর চন্দন সিং তো সত্যিই তার প্রাণের বন্ধু! চুলোয় যাক বুড়ো চাচা—একটা পাগলের কথায় সেন্টিমেন্ট অমিয়র কিছু আসে যায় না।

কাঞ্চিলাল সাহেবের গাড়ীর ব্রেকটা গণ্ডগোল করছিল। লুকাস কোম্পানির দোকানে দিয়ে আসা হয়েছে কালকে। আজ বেলা একটার আগে সেটা পাওয়া যাবে না।

সুতরাং একটা পর্যন্ত প্রভাতের ছুটি।

প্রভাত ভাবছিল নটা পর্যন্ত আজ আরামে গড়িয়ে নেওয়া যাক। একটার পর একটা বিড়ি পড়িয়ে চলেছিল আর ক্ষতগুলো এলোমেলো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল মনে।

এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না—রানীর সঙ্গে তার রাস্তায় অমন করে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সেই রানী! একদিন নিজে যার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, আর একদিন নিজের হাতেই যার সিঁথের সিঁদুর মুছে দিয়েছে।

এতদিন ধরে একটা দুঃস্বপ্নের জগতে যেন বাস করছিল প্রভাত। প্রত্যেকটা মোটর দুর্ঘটনার খবর তার কাছে সেই ভয়ঙ্কর রাতটাকে ফিরিয়ে এনেছে, কোনো গাড়ী হঠাৎ শব্দ করে ব্রেক কষলে তার হৃদপিণ্ড চমকে থেমে যেতে চেয়েছে। মনে হয়েছে আর একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে নিজেকে শেষ করে না দেওয়া পর্যন্ত এর হাত থেকে আর মুক্তি নেই তার। গাড়ী চালাতে এই কলকাতার পথেই কখনো ধারাবর্ষণ নেমে এলে আচমকা ওয়াইপারের চলন্ত ডানা দুটোকে দেখে ভেবেছে বিরাট কোনো একটা অন্ধকার গাছের ডালগুলো যেন ঝোড়ো হাওয়ায় মাতামাতি করছে, এখুনি গাড়ীটা গিয়ে আছড়ে পড়বে তার উপর।

আশ্চর্য—এই চার বছরে সব কত সহজ হয়ে গেছে রানীর কাছে। দুই চোখ ভরে সেই ভয় আর নেই, বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে সেই সন্ধ্যায় গালের উপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়া অসহায় মুখখানাকে আর চেনা যায় না। রোগা হয়ে গেছে, লম্বা হয়েছে আর একটু চোখ দুটো শান্ত আর বিষণ্ণ! শাদা থান আর শাদা চটিতে ঠিক মানিয়ে গেছে তাকে—কত অনায়াসে জীবনের সঙ্গে সে রফা করে নিয়েছে।

কিন্তু প্রভাতই পারছে না--কিছুতেই পারছে না।

আর রিনি কাঞ্জিলাল! সেই খাম-খেয়ালী মেয়েটাই তার মাথা খারাপ করে দেবে। সেই শেষ মোটর অ্যাকসিডেন্টটা যদি ঘটে, তা হলে সেটা ঘটবে রিনির জন্যেই।

কাল বিকেলেই তো—

কিন্তু রিনি কাঞ্জিলাল চাপা পড়ল আপাতত। উত্তেজিতভাবে ঘরে এল অভয়।

—প্রভাতদা, ওঠো—ওঠো!

—কী হল?

—তৃপ্তিকে দেখতে এসেছে যে!

কথাটা প্রথম প্রভাত বুঝতেই পারল না।

—কে দেখতে এসেছে?

—কে আবার আসবে?—অভয় বিরক্ত হয়ে বললে, গাছ থেকে পড়লে যে? বিয়ে হবে—দেখতে আসবে না?

—বিয়ে!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, বিয়ে। বর নিজেই এসেছে। উঠে পড়। চটপট, একবার এসো এ ঘরে।

অভয় আবার ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে রইল প্রভাত। তৃপ্তির বিয়ে! দীপ্তির বিয়ে হয়নি, এখনো সে হাসপাতালে পড়ে আছে, এই সময় তৃপ্তিকে দেখতে লোক এসে গেল। সমস্ত জিনিসটাই কেমন অসংলগ্ন—কেমন দুর্বোধ্য মনে হল তার কাছে।

আর কোথায় যেন একটা যন্ত্রণার মধ্যে হাত পড়ল। রিনি আর রানীর সব বিশৃঙ্খলার ভেতরে কোথায় একটা সুর বাজত, সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর দুর্গন্ধ গলির এই দম আটকানো বাড়ীটার দিকে যে মনটা ছুটে আসতে চাইত, সে কি তৃপ্তির জন্যেই? এক পেয়ালা চা এনে দিত, সাজিয়ে আনত ভাতের থালা, তৃপ্তির মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা দুলে উঠত কখনো কখনো? আর অন্য কোনো কারণে নয়—শুধু এটুকুর জন্যেই কি এতদিন এ বাড়ী ছেড়ে সে চলে যেতে পারেনি?

যন্ত্রণাটা টনটন করে উঠল—সব বিস্বাদ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু মোটরড্রাইভার প্রভাত সরকারের কোনো আশা নেই—কোনো স্বপ্ন সে দেখতে জানে না। মোটরের মতোই কখনো কখনো মনটা বিকল হতে চায়, তারপরেই ঠনঠন করে দুটো ঘা এসে পড়ে—আবার ঠিক হয়ে যায়—আবার রাস্তা দিয়ে একটানা ছুটে চলা।

এ-ই তার জীবন। এর বেশি কিছুই নয়।

প্রভাত উঠে পড়ল। একটা গেঞ্জি চড়িয়ে উঠে এল পাশের ঘরে।

অভয় বোধ হয় খাবার আনতে ছুটেছে, তাকে দেখা গেল না। আধশোয়া ভঙ্গীতে গৌরাঙ্গবাবু বসে আছেন, হাত পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন বাঁড়ুজ্জে। একটি বেঁটে রোগা চেহারার টাকপড়া মানুষ বিনীত ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে বসে রয়েছে। লোকটিকে যেন চেনা চেনা মনে হল তার।

বাঁড়ুজ্জে বলছিলেন, ভালো বংশ মশাই। ঠাকুর্দা ওকালতি করতেন, অনেক জমিজমা ছিল খুলনাতে। বাপ তো তাই নাড়াচাড়া করেই কাটিয়ে গেলেন। ভেবেছিলেন ছেলেকেও গায়ে খেটে রোজগার করতে হবে না, তাই লেখাপড়ায় তেমন নজর দেননি। তারপরে পাকিস্তান হয়ে—

এই সময় তাঁর প্রভাতের দিকে চোখ পড়ল। বলতে বলতে থেমে গেলেন একবার।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, এসো প্রভাত। এঁরাই দেখতে এসেছেন তৃপ্তিকে। এইটিই পাত্র— করুণাময় হাজরা।

আমাদের পাড়ার ডাক্তার মজুমদারের কম্পাউণ্ডার।

করুণাময় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল তৎক্ষণাৎ। প্রভাতকে ভক্তিভরে প্রণাম করতে যাচ্ছিল—বাড়ীর ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে এসে এখন এখানকার সবাই তার প্রণম্য। হাঁ-হাঁ করে সরে গিয়ে প্রভাত আত্মরক্ষা করল। মনে পড়ল, রাস্তার উপরে ডাক্তার মজুমদারের ডিস্‌পেন্‌সারিতেই দেখেছে বটে লোকটিকে। কখনো ওষুধ বিক্রী করতে, কখনো বা একখানা খবরের কাগজ খুলে নিয়ে বসে থাকতে।

প্রভাত বললে, ছি ছি, আমাকে প্রণাম করবেন কেন? বসুন আপনি।

দাড়ি বের করে হেসে করুণাময় বললে, আ-আপনি তো আমার গু-গুরুজন।

—আমি কেউ নই। আপনি বসুন।

করুণাময় আবার অপ্রতিভ হয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে গেল।

দরজা ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রভাত। এই তা হলে তৃপ্তির ভাবী স্বামী! কম্পাউণ্ডার বলে কিছু নয়—গরিবের মেয়ে গরিবের ঘরে গিয়েই সুখের সংসার গড়ে নেবে। কিন্তু এ যে বয়সে তৃপ্তির দ্বিগুণ। টাকপড়া বেঁটে চেহারা দেখে মন খুশী হয় না—হাসলে কালো কালো দাড়ি অনেকখানি বেরিয়ে আসে—বড়ো বড়ো দাঁতের উপর পান-দোক্তার ছোপও নজর এড়ায় না। তাছাড়া একটু তোৎলাও—সংগে সংগেই বোঝা গেল সেটা।

হয়তো ভালো মানুষ—হয়তো সুখেই রাখবে তৃপ্তিকে। কিন্তু এর পাশে তৃপ্তি! স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না।

বাঁড়ুজ্জে বলছিলেন, চুলটা পাতলা হয়ে গেছে বলেই বয়েস একটু বেশি বলে মনে হয়। আসলে—

করুণাময় এবার বলতে চেষ্টা করল: পা'য়-পা'য়—

বাঁড়ুজ্জে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে, আর তৎক্ষণাৎ একটুকু হয়ে চেয়ারের মধ্যে কুঁকড়ে গেল করুণাময়। গলা খাঁকারি দিয়ে বাঁড়ুজ্জে আবার আরম্ভ করলেন, হাঁ, এই পাঁচিশ ছাব্বিশ। স্বাস্থ্যও ভালো—অসুখ বিসুখ কিছু নেই। আর অসুখ-বিসুখ হলেই বা কী? —রসিকতা করে বললেন, রাতদিন ওষুধের মধ্যেই তো রয়েছে। এক ডোজে অসুখ তাড়িয়ে দেবে—হা-হা।

গৌরাঙ্গবাবু হাসতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। বোধ হয় শরীরে কোথাও যন্ত্রণা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, হাসির বদলে সমস্ত মুখটা বিকৃত হয়ে গেল তার।

আর দাড়ি বের করে, দাঁতের উপর পান দোক্তার ছোপ দেখিয়ে সুখের হাসি হাসল করুণাময়।

অন্তরের গলা শোনা গেল: দাঁড়িয়ে পড়লি কেন—আয়, আয়, ভেতরে আয়।

প্রভাত দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো।

তৃপ্তিকে নিয়ে অভয় ঘরে এল। তৃপ্তির হাতে ধরা খাবারের থালা দুটো থরথর করে কাঁপছে। পা দুটো চলতে চাইছে না, যেন এখুনি মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

তবু যেন ঘরটা আলো হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। হয়তো দীপ্তির একখানা শাড়ী দিয়েই ছোট মেয়েকে সাজিয়ে

—যেন রূপকথার রাজকন্যা হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে এসেছে।

দিয়েছেন মা, দীপ্তির স্নো-পাউডার থেকেই একটুখানি প্রসাধনের ছোঁয়া বুলিয়েছেন হাতে মুখে। কিন্তু তাইতেই সম্পূর্ণ বদলে গেছে তৃপ্তি—যেন রূপকথার রাজকন্যা হঠাৎ আকাশ থেকে

নেমে এসেছে এই শ্রীহীন বিবর্ণ আলো-বাতাসহীন ঘরটার ভেতরে। প্রভাতের বুকে যেন ঝড় উঠল।

বাঁড়ুজ্জে বক্তৃতা বন্ধ করলেন। মুগ্ধ হয়ে বললেন, বাঃ-বাঃ!

উত্তেজনায় করুণাময় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বোধ হয় একটা প্রণাম করে ফেলতে যাচ্ছিল, তার বদলে বলে ফেলল: খাথ্‌-খাথ্‌-খাসা! আমার খুব প-প-প—

বাঁড়ুজ্জে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি বোসো।

আর প্রভাত দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল, এই রকম অবস্থাতেই বোধহয় খুব সহজে নরহত্যা করা চলে!

(ক্রমশঃ)

॥ দশমিক মুদ্রামান ॥

দশমিক মুদ্রামান আজ পাঁচ বৎসর কাল হয় প্রচলিত হইয়াছে এবং পুরাতন মুদ্রাসমূহ এখন প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত হইতে চলিয়াছে। গত কয় বৎসরে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই নূতন মুদ্রামানে অভ্যস্ত হইয়াছেন যদিও যদি ছোট-খাটো কেনাকাটায় বিক্রেতাই ক্ষুদ্রতম নয়া পয়সায় কখন কখন লাভবান হইয়া থাকেন, ক্রেতাও অবশ্য সেই ছোটখাটো লোকসান গ্রাহ্য করেন না। ইদানীং মেট্রিক ওজন প্রণালীরও প্রবর্তন হইয়াছে। তাহাতেও বিক্রেতা পুরাতন বাটখারায় দরের তুলনায় লাভবান্ হইয়া থাকেন ক্রেতা মাত্রেরই সেই অভিজ্ঞতা আছে। কিছুদিন কাগজেও এ সম্বন্ধে হৈ-চৈ মন্দ হয় নাই। যা'হোক নূতন মুদ্রামান এতদিনে সম্পূর্ণ চালু হইয়াছে বটে, কিন্তু দেখা যাইতেছে বিদ্যালয়ে পঠিত পাটিগণিত বইগুলিতে পুরাতন মুদ্রামানের অর্থাৎ টাকা আনা পাই-এর অঙ্ক ও প্রশ্নাদি রহিয়াছে। নূতন মুদ্রামানঘটিত বই এখন পর্যন্ত বাহির হয় নাই এবং ছাত্রদের পুরাতন মুদ্রামানেই অঙ্ক কষান হইতেছে। কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়েরা অবশ্য নূতন মুদ্রামানের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কিন্তু প্রায়শই পুরাতন প্রণালীর অনুবৃত্তি চলিয়াছে। আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি নিয়মকানুন পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে সে-সকল সম্যক্ পালিত বা অনুসৃত হয় না। বক্ষ্যমাণ বিষয়ে কিন্তু তাহার বিপরীতই লক্ষ্য করিতেছি। চক্ষুর সম্মুখে যে

প্রণালী অনুসৃত হইতেছে দেখিয়া ছাত্রেরা অভ্যস্ত হইতেছে তাহাদের পাঠ্যপুস্তকে ভিন্ন প্রণালী রহিয়াছে তাহারা লক্ষ্য করিতেছে এবং সেই ভিন্ন প্রণালীতেই তাহারা এখনও শিক্ষালাভ করিতেছে। এই বিসদৃশ অবস্থা ছাত্রদের কোমল মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতেছে ইহা বলাই বাহুল্য। মেট্রিক প্রণালী সম্বন্ধেও একই অবস্থা। ছাত্রেরা অভ্যস্ত পুরাতন মণ সের ছটাকের অঙ্ক এখনও কষিয়া চলিয়াছে। যদিও মেট্রিক্ প্রণালী

> আমাদের চারপাশে এমন অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যা বিস্ময়ের ত বটেই অনুসন্ধিৎসারও উপাদান হয়ে দাঁড়ায় সময় সময়। পাঠকদের পক্ষ থেকে যে-কোন রকম জিজ্ঞাসামূলকপত্র এই বিভাগে প্রকাশিত হবে এবং উপযুক্ত উত্তর পেলে তাও উত্তরদাতার নাম ঠিকানাসমেত প্রকাশ করা হবে।
>
> সম্পাদক—অমৃত

প্রবর্তনের সঙ্গে ঐ প্রণালী ঘটিত পাঠ্যপুস্তক এতদিনে সংকলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত তাহাও হয় নাই। এমনিই শিক্ষাক্ষেত্রের নানা সমস্যায় গোটা ছাত্রসমাজ বিভ্রান্ত, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই চিন্তিত, তাহার উপর নূতন মুদ্রা ও ওজন প্রণালীঘটিত পাঠ্যপুস্তকের অভাবে ছাত্রসমাজ আর এক অভিনব অবস্থার সম্মুখীন, অর্থাৎ "গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকঃ"। এই বিশৃঙ্খলার কারণ কি?

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য,
শিলং, রিলবং
কমলালয়, আসাম।

॥ সাহিত্যিকের প্রেম ॥

(প্রশ্ন)

অনেক দিন ধরেই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আছি। তাই সুস্পষ্ট বক্তব্যের মধ্যে উত্তরটা পাওয়ার জন্য আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগের শরণাপন্ন হলাম।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের বহু প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও মনীষীদের প্রেম-জীবন সম্পর্কে আমরা বহু মনোজ্ঞ আলোচনা পেয়েছি। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের প্রেমের কাহিনী লিখে গেছেন। তাঁদের প্রেমের কাহিনী ছড়িয়ে আছে বহু চিঠিপত্র প্রভৃতিতেও। সুকবি ব্রাউনিং ও এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের পরস্পরকে লেখা চিঠিগুলো উল্লেখের দাবী রাখে। সম্প্রতি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "সোনার আলপনা"তে এবং শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'লেখকদের প্রেম' বইতে বহু বিখ্যাত ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় এবং স্কাণ্ডিনেভিয়ান প্রভৃতি কবি সাহিত্যিক ঔপন্যাসিকদের জীবনের শুধুমাত্র একটা দিক নিয়ে চমৎকার মনোমুগ্ধকর আলোচনা করেছেন। এই সব খ্যাতনামা সাহিত্যরথীদের প্রেমজীবনকে সাধারণ পাঠকদের সামনে উপস্থিত করে লেখকদ্বয় ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিকের অভাব নেই। তাঁদের অনেকেরই জীবন-কাহিনী আমাদের জানা। কিন্তু তাঁদের প্রেমজীবন, তাঁদের প্রেমের বিচিত্র কাহিনীগুলো অন্ধকারে রয়ে গেল! তাঁরা কি কেউ প্রেমে পড়েননি? না তাঁদের প্রেমের কাহিনী সাধারণের গোচরে আনা যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি? বিভিন্ন বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের প্রেমজীবন সম্পর্কিত কোনো বই আছে কি, যে বই বিশেষভাবে তাঁদের প্রেমের গল্পগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে সাধারণ পাঠকের জন্য রচিত হয়েছে? ভবদীয়,

শ্রীভক্তপদ সিংহরায়
(ফুলবাগান)
পোষ্ট, বোলপুর
জেলা, বীরভূম

বিচিত্র দেশ : বিচিত্র মানুষ

অতীন্দ্র মজুমদার

॥ কুস্তি ও স্বয়ম্বর ॥

দ্রুপদরাজ পরিরক্ষিত দক্ষিণ-পাঞ্চাল দেশে এসেছেন বনবাসী পান্ডবরা—রমণীয় বন, সুশোভন সরোবর, স্কন্ধাবার, নগরপ্রাকার, সুবৃহৎ হর্ম্য—আস্তে আস্তে সব পার হয়ে তাঁরা এক কুমোরের বাড়িতে এসেছেন, সেখানে আতিথ্য নিয়ে ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতে লাগলেন। এদিকে রাজা যজ্ঞসেনের মনে মনে ইচ্ছা পান্ডুতনয় কিরীটীকে নিজের মেয়ে সম্প্রদান করবেন, কিন্তু আগে থেকে কাউকে একথা তিনি বলেননি। পান্ডবরা আছেন ব্রাহ্মণের বেশে আছেন ছেলো ... স্বাভিলষিত পাত্র পাইবার মানসে এক সুদৃঢ় দুর্নেম্য শরাসন প্রস্তুত করাইলেন এবং কৃত্রিম আকাশযন্ত্র নির্মাণ করাইয়া তৎসংযোগে লক্ষ্য স্থাপনপূর্বক ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে-ব্যক্তি এই সজ্য শরাসনে শরসন্ধানপূর্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে, আমি তাঁহাকেই কন্যা দান করিব।"

এই ঘোষণা শুনে চারদিক থেকে ভূপালরা আসতে লাগলেন—এলেন স্বয়ম্বরাদিদৃক্ষু ঋষিরা, কর্ণসমভিব্যাহারী দুর্যোধনপ্রমুখ কুরুবর্গ — দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় রাজারা সবাই রমণীয় বেশভূষা সমাধান করে "তত্রত্য বিমান শ্রেণীতে সমাসীন হইলেন এবং পরস্পর স্পর্ধাপূর্বক সমাগত নৃপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পৌরবৃন্দ ও জানপদগণ দ্রৌপদী দর্শনার্থ পরার্ধ মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন। পান্ডবরা সমাগত ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে আসন পরিগ্রহপূর্বক পাঞ্চাল রাজার ঐশ্বর্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।"

তারপর রাজসভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হল, রত্নোপকরণ ও সুনিপুণ নর্তকদের অভিনয়ে সভার শোভা দিন দিন বাড়তে লাগল। তারপর "সভারম্ভের ষোড়শ দিবসে কৃতস্নানা দ্রৌপদী অপূর্ব বেশভূষা পরিধানপূর্বক বিচিত্র কাঞ্চনীমালা গ্রহণ করিয়া নৃপ-সমাজে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রবংশীয় পুরোহিত হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদানপূর্বক অগ্নির তর্পণ ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তি বাচন করিলেন।" তারপর সভা হল নিস্তব্ধ: সেই নিঃশব্দ রাজসভায় "ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ভগিনী দ্রৌপদীকে লইয়া সেই রঙ্গমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঘন ঘোষণ গভীর স্বরে অর্থাৎ মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন—হে সমাগত নরেন্দ্রবর্গ! আপনারা শ্রবণ করুন। এই ধনুর্বাণ ও লক্ষ্য উপস্থিত আছে। যিনি যন্ত্রের ছিদ্র দ্বারা পঞ্চশর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য পাতিত করিতে পারিবেন, মদীয় ভগিনী কৃষ্ণা কুলশীল রূপলাবণ্যসম্পন্ন সেই মহাত্মার ভার্যা হইবেন সন্দেহ নাই।"

সবাই এই ঘোষণা শুনে ভাবলেন 'আমিই কৃষ্ণাকে লাভ করব।' কিন্তু যতই আস্ফালন করে সবাই শরসন্ধান করতে যান না কেন, সবাই একে একে ব্যর্থ হলেন। তখন ব্রাহ্মণগণের আসন

বুশম্যানদের রণসাজ
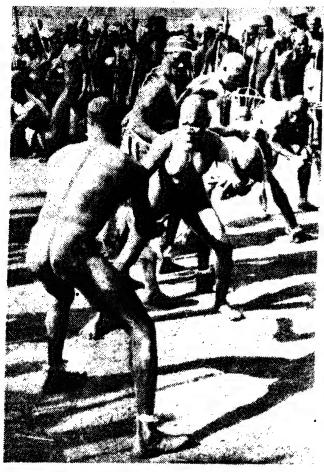
কুস্তির আখড়ায় কোরোগ্যো নুবা

থেকে বিপ্রবেশী অর্জুন উঠে এলেন সেই শরাসনে জ্যা রোপন ও শরসন্ধান করার জন্যে। শিশুপাল, সুনীথ, রাধেয়, দুর্যোধন, শল্য, শাল্ব যে ধনু সজ্জা করতে পারেননি, সেই ধনু অবলীলাক্রমে অর্জুন তুলে নিয়ে নিমেষমধ্যে শরাসনে জ্যা আরোপন করে পাঁচটি শর গ্রহণ করলেন, "পরে ছিদ্র দ্বারা সেই অতি কষ্টসাধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিলেন।...কৃষ্ণা লক্ষ্য ভেদ হইয়াছে দেখিয়া এবং শক্র-প্রতিম পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সহর্ষে মাল্যদান ও শুভ্র বসন গ্রহণপূর্বক কুন্তীসুতে সমীপে গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্মা পার্থ বিজয়লাভ ও দ্রৌপদী-দত্ত মাল্য লাভ করিয়া দ্বিজাতিগণ-পরিপূজ্যমান হইয়া পত্নী-সমভিব্যাহারে রঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।"

শক্তির পরীক্ষা দিয়ে গুণবতী স্ত্রী-লাভ প্রাচীন ভারতে যে দীর্ঘপ্রচলিত একটি সংস্কার এবং প্রথা ছিল মহাভারতের এই কাহিনী তার প্রমাণ। রামায়ণেও দেখি রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করে সাধ্বী সীতাকে লাভ করেছিলেন জনক-রাজসভায়। রমণীর মন জয় করার জন্য, তাকে লাভ করার জন্য আদি যুগে পুরুষকে এই রকম শক্তি-পরীক্ষা দিতে হত। বীর্যবান শক্তিমান স্বামী ছিল প্রাচীন কালের রমণীর পরম কামনার ধন। বর্তমানে অবশ্য রমণীর মন জয় করার জন্য খুব বেশি দৈহিক শক্তি-সামর্থের প্রয়োজন হয় না—তবুও পানি-প্রার্থীকে নিজের গুণ বা অর্থ বা অন্য কিছু দেখিয়ে রমণীর মন জয় করতে হয়। হরধনু ভঙ্গ করতে না হলেও প্রতিদ্বন্দ্বীর বাড়ি-গাড়ি-চাকরির সঙ্গে আরেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে লড়তেই হয়! আমার পাড়ার একটি মেয়ে তো গতবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যে-তাকে ভারত-ইংলন্ডের টেস্ট ম্যাচের একটি সীজন টিকিট দিতে পেরেছে তাকেই বরমাল্য দিয়েছে টেস্ট ম্যাচের অব্যবহিত পরেই জানুয়ারীর এক শীতস্নিগ্ধ সন্ধ্যায়!

আজকালকার দিনে এও এক হরধনু ভঙ্গের সামিল।

কিন্তু সত্যি সত্যিই দৈহিক শক্তি-সামর্থ দেখিয়ে সুস্ত্রী লাভ করতে হয় এমন দেশ পৃথিবীতে এখনও আছে। রীতিমত প্রাণান্তক কুস্তি লড়ে জয়লাভ করে তবে বরবর্ণিনীর পানি প্রার্থনা করা যাবে এমন প্রথা আজকের দিনেও পালিত হয় মিশরের এক আদিবাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে।

এদের দেখতে গেলে আমাদের যেতে হবে সুদানে। উত্তরে ইজিপ্ট এবং দক্ষিণে কেনিয়া উগান্ডা এবং বেলজিয়ান কঙ্গোর মাঝখানে সুদানের আয়তন প্রায় এক লক্ষ বর্গমাইল—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি বয়ে চলেছে নীল নদ। সুদানের মোট লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষের কাছাকাছি—তাদের মধ্যে আরবদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি—এ ছাড়াও আছে মিশরীয়, নীগ্রোট এবং নিম্নাঞ্চলের নিগ্রোয়েড্ গোষ্ঠীর নানা আদিবাসী সম্প্রদায়। সমগ্র উগান্ডা নটি প্রদেশে বিভক্ত—তার মধ্যে অন্যতম কর্দোফান্—সেখানে নুবা পর্বতমালা। কর্দোফানের রাজধানী এল্ ওবেদ।

কর্দোফান প্রদেশের তিগেল জেলাটি বেশ বড়—নিউ হ্যাম্পশায়ারের প্রায় দ্বিগুণ। সেখানে যাযাবর আরবদের পাশাপাশি বাস করে এক দল নিগ্রোবটু আদিবাসী—তাদের কোন গোষ্ঠীগত নাম নেই। নুবা পাহাড় এলাকায় তারা বাস করে বলে তাদের নামই হয়ে গেছে 'নুবা'। এই রকম গোষ্ঠী বা জাতি-নাম আমাদের দেশেও আছে—খাসিয়া পাহাড়ে বাস করেন বলে আসামের এক সম্প্রদায়ের নাম খাসিয়া, তেমনি লুসাই, গারো ইত্যাদি। নুবাদের মধ্যে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং লেখাপড়া শিখে একটু সভ্য হয়েছে তারা অবশ্য গোষ্ঠীর সঙ্গে থাকে না। আদিবাসীরা

তাদেরকে নিজেদের সঙ্গে থাকতেও দেয় না।

কর্দোফানের রাজধানী এল্ ওবেদের সঙ্গে সুদানের রাজনৈতিক ভাগ্যও জড়িত ছিল আজ থেকে আশি-নব্বুই বছর আগে। একজন সামান্য ডোঙ্গোলা মাঝির ছেলে মহম্মদ আমেদ নিজেকে দীর্ঘ প্রত্যাশিত 'মহ্‌দী' বা ঈশ্বর-নির্দিষ্ট শাসক বলে ঘোষণা করেন। সামান্য মাঝির ছেলে হলে কি হবে—মহম্মদ আমেদ ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ও জনপ্রিয় নেতা— ঘোর ইংরেজ-বিদ্বেষী স্বজাতিপ্রেমিক। তাঁর ডাকে গোটা কর্দোফান এলাকার হাজার হাজার গ্রামবাসী জমায়েত হল তাঁর পতাকার নীচে। ১৮৮৩ সালের ১৭ই জানুয়ারী তিনি দখল করলেন এল্ ওবেদ, সেই বছরেই নভেম্বরে তিনি জেনারেল উইলিয়ম হিক্‌সের অধীনস্থ দশ হাজার সৈন্যকে কচুকাটা করলেন। তাঁর বিজয়-অভিযান সেখানেই থেমে গেল না। দু'এক বছরের মধ্যেই তাঁর উত্তরাধিকারীরা সমগ্র সুদানকে ইজিপ্টের শাসন থেকে মুক্ত করে আনলেন। ১৮৮৫ সালে জেনারেল সি জি গর্ডন নিহত হলেন এবং খার্টুম সুদানের শাসনের অধীনে এল।

ততদিনে বৃটিশ সরকারের টনক নড়েছে। নীল নদের উত্তরাংশে বৃটিশ শাসনাধিকার বিপন্ন হয়। তাঁরা তখন উঠে-পড়ে লাগলেন তাঁদের হৃতরাজ্য উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু তা করতেও প্রায় বারো-তেরো বছর সময় লেগেছিল। শেষ যুদ্ধে জয়লাভ করেন লর্ড কিচেনার ১৮৯৮ সালে—সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ হয়েছিল ওম্‌ডারমানে। ইংলণ্ডের বিশ্ব-খ্যাত ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল তখন লর্ড কিচেনারের অধীনস্থ ২১নং ল্যান্সার বাহিনীর তরুণ অফিসার। তাঁর বিখ্যাত বই "The River War"-এ এই যুদ্ধের চিত্তা-কর্ষক বিবরণ আছে, আর আছে তৎকালীন সুদানের চমৎকার বর্ণনা। খার্টুম থেকে এল ওবেদ পর্যন্ত ট্রেন আছে। সেখান থেকে 'কুদ্রুদ' ১৫০ মাইল, হয় ঘোড়ার পিঠে নয় হেঁটে যেতে হবে। তারপর নুবা পাহাড়ের এলাকা।

নুবারা সংখ্যায় হবে প্রায় ত্রিশ হাজার। নুবা পাহাড়ের গ্রানাইট পাথরের গুহাবাস কিম্বা উপত্যকার ওপর কাদা-

গৃহপ্রবেশ

মাটির দেয়াল এবং ঘাসের ছাউনি দেওয়া ঘরে তারা থাকে। ঘরগুলি দেখতে গোল গম্বুজের মত, জানালা বলে কিছু নেই। দরজার আকৃতি দেরাজে চাবি ঢোকাবার যে গর্ত থাকে (key hole) একেবারে হুবহু তার মত। কোন রকমে একজন লোক তার মধ্যে দিয়ে একবারে ঢুকতে বা বেরোতে পারে। দেখতে খুব অদ্ভুত হলেও এই সামান্য ছিদ্রওয়ালা ঘর গরমে ঠাণ্ডা এবং শীতে গরম। বর্ষাকালেও তাদের ঘরের মেঝে স্যাঁৎসেতে হয় না।

আগেই বলেছি নুবাদের সংখ্যা এখন ত্রিশ হাজারেরও বেশি। ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত প্রায় বিশ হাজার নুবাকে দাস হিসাবে মিশরীরা ইজিপ্টের হাটে এবং আরব দেশে বিক্রী করেছিল। এখন, এই একশো বছরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, য়ুরোপীয় মিশনারীদের চেষ্টায় আইন করে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নুবাদের 'সভ্য' করার জন্য য়ুরোপীয় মিশনারীদের 'হোয়াইট মেন্‌স্ বার্ডন'-সংস্কার খুব প্রবল থাকলেও তাদেরকে খুব সহজে বশ আনা যায়নি। এত তাদের গোষ্ঠীপ্রীতি এবং য়ুরোপীয়-দের সম্বন্ধে ভীতি যে, য়ুরোপীয়রা তাদের বেশি ঘাঁটাচ্ছেন না।

নুবারা সবল, দীর্ঘকায়, প্রায় ছ' ফিট গড়ে তাদের উচ্চতা। দেহের

গঠনও নয়ন-মনোহর। এ রকম স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী জাতি উত্তর আফ্রিকায় আর নেই বললেও চলে। এদের প্রধান খাদ্য মাংস—বন্য পশু শিকার করে সংগৃহীত হয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আগুনে পুড়িয়ে তা ভক্ষিত হয়। ইদানীং চাষবাসের কাজ কিছু কিছু তারা করছে—গমের চাষে তাদের আগ্রহ কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে।

নুবাদের পোষাক বলতে কিছুই নেই, সামান্য কটিবস্ত্র পুরুষেরা ব্যবহার করে। কুমারী মেয়েদের কোমর থেকে এক ফালি লম্বা কাপড় ঝোলে মাত্র—চওড়ায় তা দশ ইঞ্চির বেশি নয়। উর্ধাঙ্গ সব নারীর উন্মুক্ত, অবশ্য যারা মিশনারীদের আওতায় এসে সভ্য হয়েছে তাদের মধ্যে বক্ষাবরণ ব্যবহৃত হয়, এক ধরনের মোটা কাপড়ের গাউনও তারা ব্যবহার করে। কিন্তু নিজেদের বসতিতে যাওয়ার সময় দলে পাহাড়ের কাছাকাছি এসে সেই 'সভ্য' নুবারা সবাই বিদেশী পোষাক ছেড়ে ফেলে তাদের 'আদিম পোষাক' অঙ্গে ধারণ করে—মেয়েরাও।

এবার নুবাদের কুস্তি এবং সংস্কৃতি কাজের কথা বলি।

নুবাদের খেলাধুলোয় তথা শরীর-চর্চায় সবচেয়ে বেশি শখ। অবশ্য খেলাধুলো বলতে সভ্য জগতের ফুটবল ক্রিকেট হকি টেনিস বেসবল নয়, তাদের নিজস্ব খেলা হচ্ছে বর্শা ছোঁড়া এবং কুস্তি। বিশেষ করে—'জেবেল' গোষ্ঠীর নুবারা—যাদের সকলের দৈর্ঘ্য অন্তত ছ ফিট করে—তাদের সমাজে কুস্তিটা ধর্মাচরণের মতই অবশ্য কর্তব্য। 'মোরো এবং 'মসোকিন' নুবাদের প্রিয় খেলা হচ্ছে লাঠি নিয়ে লড়াই। 'ক্যো' এবং 'ফুঙ্গার' নুবাদের অবশ্যকরণীয় হচ্ছে ফসলের আবাদের আগে দশ মাইল ম্যারাথন রেস। 'কর্দোফান' নুবাদের বিয়ে করার আগে 'বলয়-যুদ্ধ' বা ব্রেসলেট ফাইটিং করতেই হবে। যে ব্যক্তি বলয়-যুদ্ধ করে 'সুঅর' বা এলেম হয়নি তাকে বিয়ে না করে সারাজীবন থাকতে হবে। কারণ, বলয়-যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন অঙ্গে নেই এমন যুবককে বিবাহ করা নুবাদের মহিলা মহলে চরম পাপের কাজ—এমন কাজ কেউ করে না

'জেবেল' নুবাদের কুস্তির একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। এক ঢিলে দুই পাখী মারার মত কুস্তির সময়েই ফসল-আবাদ উৎসব এবং আপন আপন সহধর্মিণী নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। পাহাড়ের নীচে কুস্তির জন্য একটি জায়গা দীর্ঘদিন থেকে নির্দিষ্ট থাকে। সমাজের লোকরাও ছোট থেকেই কুস্তি-বিদ্যায় বয়স্কদের ট্রেনিং পেয়ে থাকে। কুস্তি জানে না অথচ সংসারে থাকে এমন লোক জেবেল নুবা সমাজে অসম্ভব ব্যাপার।

কুস্তির আসর জমে বিকেলের দিকে। চামড়ার বেল্ট, গরুর লেজ, ল্যাঙট, হাড়ের মালা—এই হচ্ছে কুস্তির পোষাক। মেয়েরা সেই পোষাক মাথায় ঝুড়িতে করে বয়ে নিয়ে আসে। কুস্তির আসরে নামার আগে গাছের কাঠ পুড়িয়ে প্রচুর ছাই সংগ্রহ করা হয় এবং যোদ্ধাদের গায়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে দেওয়া হয় যাতে কুস্তির প্যাঁচ মারার সময় 'গ্রিপ'টা খুব শক্ত হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হাত ফসকে পালাতে না পারে। জেবেল গোষ্ঠী ছাড়াও কোরোঙ্গো নুবাদের সমাজেও এই কুস্তির দঙ্গল হয় এবং বিবাহিত ও অবিবাহিত পুরুষরা এবং মহিলারা সেই কুস্তি দেখে। কোরোঙ্গো নুবাদের ক্ষেত্রে 'সিবর' বা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা দিবসে এই কুস্তির মেলার আয়োজন। দুই গোষ্ঠীতেই বালকরা যখন বয়ঃসন্ধিতে এসে পৌঁছায় তখন থেকে তাকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে কুস্তিবিদ্যায় পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অথবা তাঁদের অবর্তমানে অন্য নেতৃস্থানীয় কোন পুরুষ শিক্ষা এবং দীক্ষা দেন। প্রথম প্রথম সেই কিশোর হাল্কা ধরনের কুস্তির প্রতিযোগিতায় সমবয়সীদের

নুবাদের বসতি

সঙ্গে অংশ নেয়। প্রথম কুস্তি লড়ার আগে কিশোর-যোদ্ধার পিতা তাকে শাদা কাপড়ের টুকরো দিয়ে দীক্ষিত করেন। এ শাদা কাপড়ের টুকরো ফালি করে নিয়ে সে গলায় মালা এবং কোমরে লেঙটি করে ঝুলিয়ে নেয়। তারপর যখন তার বয়স দিনে দিনে বাড়ে এবং সে শক্ত সমর্থ যুবক হয়ে ওঠে তখন তাকে অন্য গ্রামের বা গোষ্ঠীর যোদ্ধাদের সঙ্গে শক্ত লড়াইয়ে নামতে হয়। তখন সে তার পিতার কাছ থেকে পায় একটি গরুর লেজ, তার আগের শাদা কাপড়ের স্কার্ফের বদলে এখন সে পায় রঙীন কাপড়ের টুকরো, তার কোমরে জড়ানোর জন্যে সে পায় একটি ছাগলের চামড়ার কোমরবন্ধনী। ছাগলের লোমও গুচ্ছ গুচ্ছ করে সেই কোমরবন্ধনীর সঙ্গে ঝুলিয়ে নেওয়া হয়। গোষ্ঠীর বড় বড় ওস্তাদরা, যারা এককালে বিখ্যাত লড়িয়ে ছিল কিন্তু এখন বৃদ্ধ হয়েছে, তারা তখন সে যুবক-যোদ্ধার সঙ্গে প্র্যাকটিস-লড়াই করে এবং কুস্তির সূক্ষ্ম প্যাঁচগুলি তাকে শিখিয়ে দেয়। যোদ্ধার মামা তাকে তখন একটি ষাঁড় উপহার দেয়—তার অর্থ সে তখন যোদ্ধধর্মে দীক্ষিত হল! ষাঁড়ের মত বলবান এবং বীর্যবান যেন সে হয়—মা তখন পুত্রের জন্য এই প্রার্থনা করেন। তারপর পুত্র যখন পুরোদস্তুর প্রতিষ্ঠিত যোদ্ধা হয় তখন সে নিজেই তার চামড়ার কোমর-বন্ধনীর সঙ্গে পিতলের ঘণ্টা এবং বাঁদরের লোমযুক্ত চামড়া লাগিয়ে নেয়। সে তখন চ্যাম্পিয়ান যোদ্ধা! প্রত্যেকটি লড়াইয়ে জেতার পর অতিথি এবং আত্মীয়দের ভোজ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশী বীয়ার পরিবেশন করা হয়। তারপর উপযুক্ত কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়—অবশ্য সেই দিনই নয়, পরবর্তী কোন-এক দিন। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনটাই সেদিন হয়ে যায়।

বলয়-যুদ্ধ বা ব্রেসলেট-ফাইটিং এর চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক। ক্যো, ফুঙ্গার এবং করোফান নুবাদের বলয়-যুদ্ধে জয়লাভ না করলে বিবাহ হয় না। ফুঙ্গার এবং ক্যো নুবাদের এর ওপর দশ মাইল ম্যারাথন রেসও দিতে হয় বৌ-ধরার জন্যে। বলয়-যুদ্ধ বিনা রক্তপাতে শেষ হয় না বলে শিশুদের এবং মেয়েদের তা দেখতে দেওয়া হয় না। বলয়-যুদ্ধের অস্ত্র পিতলের বালা—ডান হাতে পরা হয়। সেই বালার ধারগুলি শান দিয়ে ছুরির মত ধারালো করে নেওয়া নয়। আঘাত করার জায়গা হচ্ছে মাথার উপরের অংশ এবং পিছন দিকটা। মারাত্মক লড়াই বলে এক্ষেত্রে দুজন বিচারক থাকে—যারা লড়াইয়ের নিয়ম যোদ্ধাদের কঠোরভাবে মেনে চলতে বাধ্য করেন। মূল লড়াইয়ের আগে শরীর গরম করার জন্যে চলে ছোট ছোট লাঠি এবং ঢাল নিয়ে খেলা। লাঠির লড়াই জমে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে লাঠি-ঢাল ফেলে দিয়ে বালার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। নির্দিষ্ট জায়গায় আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে আহতকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং লড়াইয়ের প্রথম রাউণ্ড শেষ হয়। এমনিভাবে যতক্ষণ না প্রতিপক্ষ হার স্বীকার করে ততক্ষণ লড়াই চলে। অবশ্য হেরে-যাচ্ছে এমন যোদ্ধার আঘাত মারাত্মক দেখলে বিচারকরা নির্দিষ্ট রাউণ্ডের আগেই লড়াই থামিয়ে দিতে পারে—অনেকটা বক্সিংয়ের টেকনিক্যাল নক-আউটের মত, প্রতিপক্ষকে তখন হার স্বীকার করতেই হয়। এই লড়াইয়ে যোদ্ধারা আশ্চর্য ঠাণ্ডা মাথা, ধৈর্য এবং সহনশীলতার পরিচয় দেয়—নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া এরা কখনও অন্য জায়গায় আঘাত করে 'ফাউল' করে না বা বেআইনী আঘাত করে না। 'ফাউল' করলে খেলা থেকে সে তো সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়িত হবেই, সারা বছর আর কোন লড়াইয়ে যোগ দিতে পারবে না, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে গোষ্ঠী থেকেও তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আহত যোদ্ধার পরিচর্যায় মেয়েরা এগিয়ে আসে, ক্ষতস্থানে এক রকম তেল লাগিয়ে দেয়। সেই তেল এবং সূর্যের উত্তাপে অল্প দিনেই কাটা চামড়া জোড়া লেগে যায়।

তারপর স্বয়ম্বর সভা। বলয়-যুদ্ধে যে জেতে তাকে বলা হয় 'সাওর।' এই সাওরদের দল পাত্রীর সামনে নিজেদের হাজির করে। এই পাকা-দেখা উৎসবটি ভারী মজার। গ্রাম থেকে বিবাহযোগ্যা পাত্রীরা আসে নিরাবরণ দেহে; তাদের কালো অঙ্গে চীনাবাদামের তেল মাখানো, তার ওপর হলুদ এবং কালো দাগ। বাওবাব গাছের নীচে তাদের সারি বেঁধে দাঁড়ানো এবং অংগ-সঞ্চালন শুরু হয়। তারপর বন থেকে বেরুলো পাত্র—সম্পূর্ণ নগ্ন, লম্বা বলিষ্ঠ শক্ত দেহ ছাই এবং হলুদ দিয়ে ছোপানো, কারো কারো দেহ কাঠকয়লার গুঁড়ো মাখিয়ে আরো কালো, আরো চকচকে করে তোলা। খেলে দুলে তারা মহিলাদের সামনে আসে—এক হাতে লম্বা লাঠি, অন্য হাতে মুক্ত কিরিচ। একবার করে দোলে, একটু থামে তারপর মুখের সামনে হাত দিয়ে যুবক গরিলার মত উন্মত্ত গর্জনে আকাশ কাঁপিয়ে দেয়। মুগ্ধ পাত্রী স্বনির্বাচিত পাত্রের সামনে এসে দাঁড়ায়—মুগ্ধে চিৎকার করে আকাশ স্পন্দিত করে তোলে। সেদিন পাত্রী বাকদত্তা হল।

তারপর ম্যারাথন রেস—দশ মাইলের লম্বা দৌড়। তাতে সেই নির্বাচিত পাত্র জিততে পারলে তো সোনায় সোহাগা—না পারলে অন্তত সমস্ত পথটা কভার করতে পারলেও—তাকে বরমাল্য দিতে পাত্রীর আপত্তি নেই। পথটা দৌড়ে পার হতে না পারলে অবশ্য বিয়ে খারিজ করে দিতে পাত্রীর এক মুহূর্তও সময় লাগে না। এই দৌড়ে যারা জিততে বা সমস্ত পথটা পার হতে পারে—তারা আপন আপন বাগ্‌দত্তার কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। পথে সারাক্ষণ প্রণয়িনী তাকে মিষ্টি কথা বলে, তার বীরত্বের প্রশংসা করে, বাওবাব গাছের পাতা দিয়ে প্রণত প্রেমিকের গায়ের ঘাম এবং কপালের ধুলো মুছিয়ে দিতে থাকে, অঞ্জলি করে জল নিয়ে তার [illegible] ভিজিয়ে দেয়। এই অন্তিম [illegible], এত সরল প্রেমের অভিব্যক্তি [illegible]।

আমাদের দেশের লেখাপড়া জানা পাত্রীরা [illegible] এ রকম একটা প্রথা চালু করলে কেমন হয়!

।। শিল্পীর সম্মান ।।

কি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ! যে জার্মানীকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন, যে জার্মানীর সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ সেই জার্মানী ছেড়ে চলে যেতে হল। হিটলারী শাসনের বাহুপাশমুক্ত হয়ে টমাস মান আমেরিকায় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। সেদিনের জার্মানীর উন্মাদিক ক্ষমতাশালী মানুষেরা এই মহৎ শিল্পীকে সম্মান না জানালেও আজকের জার্মানী সে ভুল বুঝেছে।

মান একদিন আক্ষেপ করে জানিয়েছিলেন যে, জার্মানীতে প্রকাশিত তাঁর অধিকাংশ বই অসংখ্য ভুলে ভর্তি। নিজে সচেতন হয়ে অপরকে জানিয়েও এর কোন প্রতিকার পাননি। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে জার্মানীর মুদ্রণ-জগৎ যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে বারে বারে, তার জন্য কেবলমাত্র মানই নন জার্মানীর পাঠক-সমাজ তাঁর অসন্তোষের মাঝখানে দিন কাটিয়েছেন। মানের ক্ষোভ অনেককেই বিচলিত করে। মানের যাবতীয় গ্রন্থ ত্রুটিমুক্ত করবার জন্য তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। মানের ৮০তম জন্মবার্ষিকীতে গ্রন্থ-প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় জার্মান আকাদেমি অফ্ সায়েন্সের তত্ত্বাবধানে। সমগ্র জার্মানীর সাহিত্য-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠনেরও চেষ্টা শুরু হয়। সায়েন্সের পক্ষ থেকে এরিখ নিউম্যান মানকে এ প্রস্তাবের কথা জানান। আনন্দের সঙ্গে মান এ প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন। একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সমিতি এ ধরনের কাজ করতে উদ্যোগী হওয়ায় তিনি আশ্চর্য হয়ে যান। তাঁর রচনাকে এই মহান মর্যাদা দান করায় তিনি গৌরব বোধ করেন। 'আমার মনে এ প্রশ্নই জাগে আজকের শুভানুধ্যায়ী শিল্পী-মানুষেরা আমার রচনার যে মূল্য ও মর্যাদা দান করছেন ভাবীকালের পাঠকেরা তা দেবে কিনা! একথা সততার সঙ্গে বলতে পারি যে, আমার সৃষ্ট শিল্প সূক্ষ্ম বর্ণনাগুণে সত্যপথ-বিচ্যুত হয়নি, সত্যদৃষ্টির বা সততার প্রতি আস্থা তার মাঝখানে এনে দিয়েছে এক সহজবোধ্যতা'।

টমাস মানের উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য বার্লিনের জার্মান আকাদেমি অব সায়েন্সের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয়ও বটে।

খ্যাতনামা সমকালীন জার্মান কথা-শিল্পীদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও পাণ্ডুলিপির আলোচনাপূর্ণ ঐতিহাসিক সংকলন প্রকাশ করাই এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয় বেশ কিছুকাল আগেই। চব্বিশজন সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত সংস্থা অত্যন্ত দ্রুত এবং

টমাস মান

নির্ভুলভাবে এই কাজ করে চলেছেন। জার্মানী ছাড়া অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরাও আছেন এর মধ্যে। ডঃ গেরহার্ড স্টেনারের তত্ত্বাবধানে সমস্ত কাজ এগিয়ে চলেছে।

অতীত গবেষণার বস্তু নিঃসন্দেহে। মান এখনও ঐ পর্যায়ে যাননি। তা সত্ত্বেও মান-সম্পর্কীয় এই বিরাট প্রস্তুতি একটি মহান গবেষণার সামিল। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও নিবন্ধের এই অভূতপূর্ব সংকলন-গ্রন্থ মান-সম্পর্কীয় চিন্তা-ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে।

মান যে কোন রচনা গভীর চিন্তার পর লিখতেন। ফলে অনেক সময়ই চিন্তায় কেটে যেত। অচেতন মন এই অফুরন্ত সময়ে কালির রেখায় কাগজের পাতায় ঘুরে বেড়াত। তাই মানের যে কোন রচনার পাণ্ডুলিপির আকর্ষণ বিস্ময়কর। মান বার বার লিখতেন। একই রচনার বিবিধ পাণ্ডুলিপি থেকে রচনাটির পরিণতিদানের বিস্ময়জনক রূপটি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মানের বিভিন্ন গল্প বা উপন্যাসের মূল পাণ্ডুলিপি (হাতে-লেখা বা টাইপ-করা) বা ফটোস্টাট কপি দেখতে পাওয়া যাবে তাঁদের বিচিত্র সংগ্রহশালায়। সংকলনে নিজের লেখা সম্পর্কে মানের বক্তব্য, সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্পর্কে মানের অভিমত, ছোট প্রবন্ধাবলী যত্নের সঙ্গে সংযোজিত হবে। তার জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত মানের গ্রন্থগুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা হচ্ছে। রচনাবলীর প্রতি খণ্ডের সঙ্গে থাকবে গবেষণাত্মক পরিশিষ্ট। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির আলোচনা তার মধ্যে স্থান পাবে। টীকা সহযোগে যে আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তৈরি করা হচ্ছে তার মধ্যে কোন দুরূহতা থাকবে না। ফলে এর দ্বারা কেবলমাত্র সাহিত্য-সম্পর্কীয় গবেষকগণই উপকৃত হবেন না—সাহিত্যোৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেই লাভবান হবেন।

আর্কিভজ-এ সম্প্রতি-প্রাপ্ত প্রায় ৪০০ শত পাতা চিঠির ফটোস্টাট কপি আছে। অন্যান্য যে সমস্ত চিঠি রয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি মূল চিঠি আবার কতকগুলি কপি করে নেওয়া। সাময়িক বা সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত মান-সংক্রান্ত অথবা তাঁর যে কোন গ্রন্থ-সংক্রান্ত আলোচনা কঠোর পরিশ্রমের পর সংগৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই দুষ্প্রাপ্য। এমনকি, মানের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও পাওয়া গেছে। এগুলি রচনাবলীতে ব্যবহৃত হবে।

মান-সম্পর্কে আরও সুষ্ঠু ও সার্থক গবেষণা করা, গভীর জ্ঞানপূর্ণ আলোচনা করা, বিতর্কিত রচনাসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা তৈরি করা—এ সমস্ত ব্যাপারে সংস্থা অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। তাঁদের কাজে সহায়তা করবার জন্য আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সোবিয়েত দেশ, উত্তর জার্মানীর প্রতিনিধিরা নানা উপায়ে সহায়তা করে চলেছেন। ১৯৫৯ সালের জুলাই থেকে ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য খবরসহ প্রায় ৬০০টি চিঠি এসেছে।

মানকে যথোচিত মর্যাদাদানের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রন্থ-প্রকাশের এই যে অভিনব ব্যবস্থার কর্মযজ্ঞ চলেছে আমরা তার সার্থক পরিণতি আশা করি।

ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

পল্লবযুগের স্থাপত্যকীর্তি

মহাবলীপুরম

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
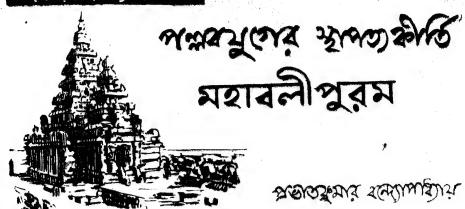
মাদ্রাজ থেকে মাত্র ছত্রিশ মাইল দক্ষিণে নিঃসীম সাগরের নীল জল যেখানে বালু-তটে এসে আছড়ে পড়ে শ্বেতশুভ্র ফেন-পুঞ্জ সৃষ্টি করছে, আর পলক না ফেলতেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই বেলাভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব রূপশ্রীমণ্ডিত সৈকত-মন্দির— সপ্ত প্যাগোডার অন্যতম, যুগ যুগ ধরে যার পা ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে সাগরের জল। সপ্ত প্যাগোডার অবশিষ্ট ছয়টি কোন্ দূর অতীতে হারিয়ে গেছে সাগরের অতলে, ইতিহাসে তার কোন সাক্ষী নেই। কিন্তু 'সপ্ত প্যাগোডার দেশ' বলেই লোকে আজও জানে এই মহাবলীপুরমকে।

মহাবলীপুরম ধর্মপ্রাণ নরনারীর তীর্থভূমি নয়, কিন্তু অনন্ত সিন্ধুর কোলে এক উদার স্নিগ্ধ পরিপ্রেক্ষিতে সৈকত-মন্দিরের শান্ত কোমল আহ্বান শিল্পপ্রাণ মানুষের কাছে অমোঘ। শিল্প-রসিক এর আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারে না। তাই মহাবলীপুরমের শিল্পস্থাপত্য দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে মানুষ ছুটে এসেছে, আসছে। এ ছাড়া সেই বিখ্যাত পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর রথ আর গুহা-মন্দির তো আছেই।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যবিদ পণ্ডিতেরা এখানকার শিল্পবস্তুর গঠনরীতি ও শিলালিপি বিচার করে প্রায় নিঃসংশয় হয়েছেন যে, মহাবলীপুরমের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য সপ্তম শতাব্দীর পরবর্তী কালের রচনা কিছুতেই হতে পারে না। তাঁদের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী পল্লব রাজাদের রাজত্বকালে ৬৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহাবলী-পুরমের কালো গ্র্যানাইট পাথরের বুকে ছেনি-বাটালির আঘাত নেমে এসেছিল, আর সৃষ্টি হয়েছিল এই সব বিস্ময়কর শিল্পরূপ, যা যুগ যুগ ধরে দেশী-বিদেশী সকল স্তরের মানুষের অকপট প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে মন্দির-নির্মাণের কাজে যে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল তার মধ্যে চালুক্য রাজাদের প্রয়াস কিছুটা উল্লেখের দাবি রাখে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্য-বংশীয় রাজাদের আমলে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধ চৈত্য মণ্ডপের অনুকরণে মন্দির-নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সে প্রয়াস আদৌ সন্তোষজনক হয়নি।

উত্তর ভারত থেকে এসে পল্লব রাজারা যখন দাক্ষিণাত্যে অনুপ্রবেশ করলেন এবং ক্রমে দক্ষিণ ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন তাঁদের কাছে চালুক্যের ঐ সমস্ত শিল্পসৃষ্টি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছিল। পল্লব রাজারা ছিলেন শিল্পের পূজারী। তাঁরা শিল্পে নতুন ধারার সৃষ্টি করলেন। তাঁদেরই শিল্পপ্রাণতার বিশিষ্ট-তম রূপ দেখি শিখরসমন্বিত পিরামিড আকৃতির মন্দিরের মধ্যে, যার গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন মহাবলীপুরমের সৈকত-মন্দির ও পঞ্চপাণ্ডবের রথ।

সপ্তম শতকের শুরু থেকেই পল্লব রাজারা দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে পর্বতগুহায় ও পর্বতগাত্রে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে আরম্ভ করলেন। বস্তুতঃ দক্ষিণ ভারতীয় বা দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যরীতির সূচনা করেছিলেন পল্লব রাজারাই। আবার দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যরীতি পূর্ণতাও লাভ করে পল্লব যুগেই।

সৈকত-মন্দির
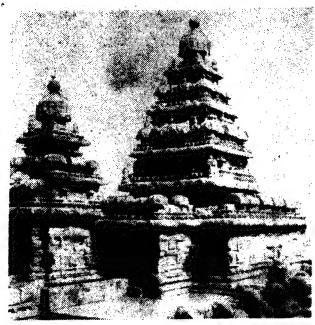
পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মণের আমলে সুশৃঙ্খল শাসনকার্যের ফলে রাজ্যে অভূতপূর্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করতে থাকে। ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-সঙ্গীতের বিকাশসাধনে যথেষ্ট সহায়তা হয়েছিল। ৬০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব-কাল।

এই সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটছিল। তাই এই পরিবর্তন-যুগে সৃষ্ট মহাবলীপুরমের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে কিছু বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও বৌদ্ধধর্মের কোন নিদর্শন এখানে কোথাও মেলে না। হিন্দুধর্মের পৌরাণিক কাহিনীই লিপি-বদ্ধ হয়েছে পর্বতগাত্রে। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মেরই জয়জয়কার এখানে, কারণ পল্লব রাজারা ছিলেন শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের গোঁড়া সমর্থক। প্রধানতঃ শৈব হলেও পল্লব রাজাদের যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিও অশ্রদ্ধা ছিল না তার প্রমাণ মহাবলী-পুরমের কৃষ্ণমণ্ডপ ও অন্যান্য কয়েকটি গোফাই।

মহেন্দ্রবর্মণের উত্তরাধিকারীস্বরূপ মহামল্ল প্রথম নরসিংহবর্মণ রাজ্যভার গ্রহণ করলেন ৬৩০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। ৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যের দায়িত্বভার ছিল তাঁর ওপর। তাঁর সুশাসনে পল্লব রাজ্য অনেক সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। মহামল্লের নামানুসারেই এই সমুদ্রোপকূলবর্তী নগরের নামকরণ হয় মহামল্লপুরম বা মামল্লপুরম, এবং আধুনিককালে মহাবলীপুরম। কারণ এই উপকূল-নগরের পত্তন করেছিলেন তিনিই। সে যুগে এক মহা সম্পদশালী বন্দরে পরিণত হয়েছিল এই মহাবলী-পুরম। এখান থেকে সিংহল পর্যন্ত যে বাণিজ্যতরী চলাচল করত তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। নরসিংহবর্মণের আমলেই এ সব সম্ভব হয়েছিল। আজ মহাবলী-পুরমে দাঁড়িয়ে তার সেই অতীত সমৃদ্ধির কথা কল্পনাই করা যায় না। তবে পার্থিব সমৃদ্ধির পরিচয় না থাকলেও শিল্পসমৃদ্ধির নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে। আর এটুকু সহজেই অনুমান করা যায়, সর্ববিধ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে শিল্প-স্থাপত্যের প্রতি এভাবে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হত না। ধর্মরাজরথ প্রথম নরসিংহবর্মণের কীর্তি। অন্যান্য রথ গুলিও এই যুগেরই সৃষ্টি।

প্রথম নরসিংহবর্মণের মৃত্যুর পর মহাবলীপুরমে শিল্পসৃষ্টি কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল। যাই হোক, তাঁর পৌত্র দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ ওরফে রাজসিংহ শাসনভার হাতে নিয়ে আবার শিল্প-সৃষ্টিতে মন দেন। সৈকত-মন্দিরের স্রষ্টা তিনিই। তাঁর রাজত্বকাল ৬৮০ থেকে ৭০০ খৃষ্টাব্দ।

পল্লব যুগের শিল্পরীতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। পল্লবীয় শিল্প ও স্থাপত্যের শুরু হয়েছিল রাজা মহেন্দ্র-বর্মণের আমলে। ৬১০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কালকে বলা হয় মহেন্দ্ররীতির যুগ। পল্লবীয় স্থাপত্য-রীতির বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই যুগেই। এখানে কয়েকটি

মাখন গোলা
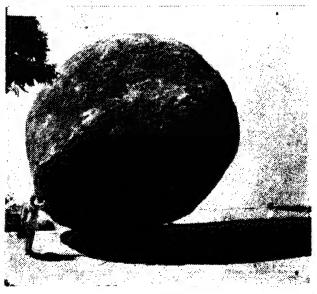
বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। স্তম্ভগুলি সাধারণতঃ ছিল সমচতুষ্কোণ, কিন্তু স্তম্ভের মধ্যভাগ অষ্টভুজাকৃতি। স্থাপত্যবস্তুর ঘনক্ষেত্রাকার অংশগুলি পদ্মফুল ও কোথাও কোথাও সিংহ-মূর্তি দ্বারা অলঙ্কৃত। স্তম্ভের শিরোভাগ সাধারণতঃ সাদাসিধে। স্তম্ভগুলির ওপর কার্নিস বরাবর অশ্বখুরাকৃতি কুলুঙ্গির মধ্যে গন্ধর্ব মূর্তি। পল্লব-যুগীয় স্থাপত্যের এই ধরনের কুলুঙ্গি এক অভিনব বৈশিষ্ট্য।

পল্লবীয় স্থাপত্যের দ্বিতীয় যুগটিকে বলা হয় মামল্ল যুগ। বস্তুতঃ এই যুগটিই পল্লবীয় স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ। এই যুগেই পল্লবীয় স্থাপত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। ৬৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগের পরিধি।

মহেন্দ্ররীতির সঙ্গে তুলনায় মামল্ল-রীতিতে কয়েকটি পরিবর্তন প্রকট। প্রধান পরিবর্তনটি দেখা স্তম্ভের গড়নে। মামল্ল যুগে স্তম্ভের ভিত্তিস্বরূপ পাই সিংহমূর্তি। অর্থাৎ উপবেশনের ভঙ্গিতে সিংহমূর্তি তৈরি করে তার মাথার ওপর থেকেই উঠে গেছে গোলাকৃতি স্তম্ভ। এখানে সিংহমূর্তিটি স্তম্ভেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এখানে একাকার হয়ে গেছে। পল্লবীয় শিল্পের এটাও এক বৈশিষ্ট্য যে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এখানে পৃথক ধারায় গড়ে ওঠেনি; ভাস্কর্যকে স্থাপত্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই দুই শিল্পধারার কোনটিরই আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকেনি। এই এক অঙ্গে দুই রূপই পল্লবীয় শিল্পের স্বাতন্ত্র্য এনেছে। দ্বারপাল মূর্তির অবস্থান ভঙ্গিতেও কিছু পরিবর্তন দেখা যায় মামল্ল যুগে।

মামল্ল যুগের পর রাজসিংহ যুগ—রাজা দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ ওরফে রাজসিংহের নামে। ৬৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ যুগের ব্যাপ্তি। মন্দির-নির্মাণে এ যুগে আর এক নতুন শৈলী দেখা গেল। পাহাড় কেটে মন্দির তৈরির পরিবর্তে ছোট ছোট পাথরের টুকরো সাজিয়ে মন্দির গড়ে তোলার দিকে ঝোঁক দেখা গেল।

মহাবলীপুরমের স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে সেই সমস্ত শিল্পবস্তু যেগুলির সৃষ্টি হয়েছে একটি মাত্র পাহাড় কেটে বা খোদাই করে। যেমন,

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন প্যানেলের একাংশ
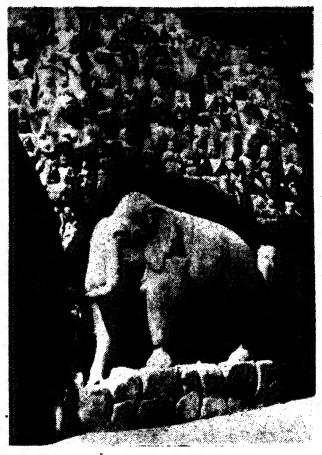
পঞ্চপাণ্ডবের রথ, দ্রৌপদীরথ ও গুহাগুলি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে সেই সব মন্দির যেগুলি গড়ে উঠেছে একের পর এক প্রস্তরখণ্ড সাজিয়ে। যেমন, সৈকত-মন্দির। এছাড়া আছে পর্বতগাত্রে খোদিত ঐশ্বর্যময় ভাস্কর্য নিদর্শন। আর মহাবলীপুরমের বিশেষ আকর্ষণগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল হস্তী, বানর, বলীবর্দ, সিংহ প্রভৃতির একক বা গোষ্ঠীবদ্ধ মূর্তিগুলি। এগুলির প্রত্যেকটিই পৃথক পৃথক এক একটি প্রস্তরখন্ড থেকে তৈরি। জনৈক বিশিষ্ট শিল্পবিদ বলেছিলেন, আর কোন নিদর্শন যদি নাও থাকতো তাহলেও একমাত্র এই হস্তী, বানর প্রভৃতি মূর্তিগুলির জন্যই মহাবলীপুরম ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিতে পারত।

মহাবলীপুরমের প্রধান আকর্ষণ এখানকার রথগুলি। যে পাহাড়ের গায়ে গুহাগুলি খনন করা হয়েছে তার কিছু দূরে দক্ষিণে প্রায় একই জায়গায় কাছাকাছি রয়েছে এই রথগুলি। রথগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল পাঁচটি। একটিমাত্র বৃহৎ গ্র্যানাইট পাথর খোদাই করে নির্মিত হলেও এগুলি এত নিখুঁত যে মনে হয় বুঝি পাথরের পর পাথর সাজিয়ে এগুলি গড়ে তোলা হয়েছে।

মহাভারতের বীর নায়ক-নায়িকাদের নামেই রথগুলির নামকরণ হয়েছে। তবে এই নামারোপ নিতান্তই অনেক পরবর্তী কালের। সাধারণের মনে একটা বিশ্বাস ছিল পাণ্ডবরা তাঁদের অজ্ঞাতবাস কালে এই রথগুলির নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই এগুলির এরূপ নামকরণ হয়। এছাড়া রথগুলির সঙ্গে এই সব নামের আর কোন সম্পর্ক নেই।

রথগুলির মধ্যে দক্ষিণতম প্রান্তে রয়েছে ধর্মরাজরথ, তার পরেরটি ভীম-রথ, তৃতীয়টি অর্জুনরথ এবং ঐ সারির সব শেষেরটি দ্রৌপদীরথ। এই রথ চারটি উত্তর-দক্ষিণে এক সারিতে আছে এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬০ ফুট জমি দখল করে আছে। ফার্গুসন মনে করেন, এগুলি মূলতঃ একটি পাহাড় কেটেই তৈরি হয়েছিল, তারপর কালক্রমে একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পঞ্চম রথটি যেন অপাংক্তেয় হয়ে রয়েছে। এটি পূর্বোক্ত সারির পশ্চিমে এককভাবে অবস্থিত। এর নাম নকুল-সহদেবরথ। ষষ্ঠ, অর্থাৎ গণেশরথের অবস্থান এগুলি থেকে একটু দূরে। অবশিষ্ট তিনটি রথের অবস্থানও এরই কাছা-কাছি। এগুলি সবই একই সময়ে ও একই রীতিতে নির্মিত। তবে এগুলো খুব উল্লেখযোগ্য নয়। অনেকগুলি রথেরই নির্মাণকার্য যে সমাপ্ত হয়নি তার প্রমাণ রয়েছে এগুলির অঙ্গে।

দ্রৌপদীরথ : রথগোষ্ঠীর উত্তরতম প্রান্তে রয়েছে দ্রৌপদীরথ। এর নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয়েছিল। রথটি আকারে ছোট হলেও এবং কোন জটিল-সূক্ষ্ম কারুকর্ম এতে না থাকলেও বেশ একটা শান্তশ্রী আছে এর মধ্যে। বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে চালাঘরে যে ধরনের ছাদ দেখা যায় সেই ছাঁদেই গড়ে উঠেছে এর ছাদটি। হয়ত এই ধাঁচ থেকেই পরবর্তীকালে হিন্দু মন্দিরের বিমান বা শিখরের উৎ-পত্তি হয়ে থাকবে।

রথটি সম-চতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে। প্রস্থে ১১ ফুট করে। রথের উচ্চতা প্রায় ১৮ ফুট। রথের প্রবেশদ্বারের দু'পাশে দু'টি দ্বারপালিকা মূর্তি। প্রবেশদ্বারের ওপর দিকে খিলান বরাবর পাথরের গায়ে নক্সা।

রথের মধ্যে প্রকোষ্ঠটি ক্ষুদ্র, আড়া-আড়িভাবে সাড়ে ৪ ফুট, আর সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত সাড়ে ৬ ফুট। পিছনদিকের দেওয়ালের গায়ে খোদাই-করা চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি—কেউ বলেন, দুর্গামূর্তি, কেউ বলেন লক্ষ্মী-মূর্তি। দেবী পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা, দুপাশে বন্দনারত আরও দুটি মূর্তি; আর মাথার উপর উড্ডীয়মান গন্ধর্ব।

ভীমরথ : এটি একটি দ্বিতল সমা-বেশ-গৃহ। এই গোষ্ঠীর বৃহত্তম রথ এইটিই। এর নির্মাণকার্য পুরোপুরি শেষ হয়নি। এর গঠনরীতিও একটু ভিন্ন ধরনের। এটি সমচতুষ্কোণ নয়, একটু লম্বা ধরনের। ছাদটি চালাঘর ধরনের, ফলে এর শীর্ষদেশটি ছাদের দৈর্ঘ্যের সমান একটি সরলরেখায় পরিণত হয়েছে—যে রেখার দু'পাশ থেকে নেমে এসেছে অর্ধবৃত্তাকার ছাদটি। ছাদের শীর্ষ নিরলংকার। কিন্তু ছাদের দুপ্রান্তে পল্লবীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনস্বরূপ কুলুঙ্গি রয়েছে, আর কুলুঙ্গির মধ্যে যথারীতি গন্ধর্বাদি মূর্তি।

অর্জুনরথ ও ধর্মরাজরথ : স্থাপত্য-রীতি ও সাধারণ আকারের দিক থেকে এই দুটি রথের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে; একমাত্র পার্থক্য এই যে, অর্জুনরথ অনেক ছোট কিন্তু ধর্মরাজরথ বড়।

গঠনরীতিতে পার্থক্য থাকলেও অর্জুনরথ আয়তনে প্রায় দ্রৌপদীরথেরই সমান। দুটির অবস্থানও পাশাপাশি। দ্বিতল অর্জুনরথের দু'টি তলারই ছাদ সারিবদ্ধ অশ্বখুরাকৃতি কুলুঙ্গিজাতীয় ফোকর দ্বারা অলংকৃত। আমরা পূর্বেই বলেছি, এই ধরনের অলংকরণ দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যরীতির একটি বৈশিষ্ট্য। মন্দিরের অভ্যন্তরে কোন দেব-দেবীর মূর্তি নেই।

চমৎকারিত্বের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে ধর্মরাজরথটি। এটি এই গোষ্ঠীর মধ্যে বৃহত্তমও বটে, সম্ভবতঃ প্রাচীনতমও। রথটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তা দৈর্ঘ্যে ২৮ ফুট ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ২৬ ফুট ৯ ইঞ্চি। রথের উচ্চতা ৩৫ ফুটেরও বেশি। চারতলা রথটির আকৃতি অনেকটা পিরামিডসদৃশ, স্তরে স্তরে সরু হয়ে গিয়ে শীর্ষবিন্দুতে মিশেছে। ৬৩০ খৃষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে রাজা প্রথম নরসিংহবর্মণ (মহামল্ল) এটি নির্মাণ করেছিলেন। রথের গায়ে শিব-গাথা খোদিত আছে।

সহদেবরথ : নকুল ও সহদেব এই দুটি নাম রথটির সঙ্গে একত্র যুক্ত থাকলেও এটি সাধারণতঃ সহদেবরথ নামেই পরিচিত। রথের শিখরদেশের গঠন গজপৃষ্ঠাকৃতি। দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট ও প্রস্থে ১১ ফুট এই রথটির উচ্চতা ১৬ ফুট। সামনের দিকে প্রথম তলার ছাদটি একটু বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং এর অবলম্বন দু'টি স্তম্ভ।

গণেশরথ : আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও গণেশরথের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার ছাপ আছে। দ্বিতল এই রথটির উচ্চতা ২৮ ফুট। এর বিশেষ গঠনরীতিটি পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতীয় গোপুরমের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে। অবশ্য 'গোপুরম' মন্দির নয়, মন্দিরের প্রবেশদ্বার মাত্র। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের এটি একটি বৈশিষ্ট্য। গণেশরথের শিখরটিও গজপৃষ্ঠবৎ, তবে তার ওপর অলঙ্কারস্বরূপ পাশাপাশি কয়েকটি কলসাকৃতি বস্তু সজ্জিত আছে।

সৈকত-মন্দির : মহাবলীপুরমের সৈকত-মন্দিরটি শুধু যে একটি সুচারু-গঠন মন্দির তাই নয়, এটি দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যরীতির প্রাচীনতম নিদর্শন-গুলির অন্যতম। পূর্ব-পশ্চিমে ৬০ ফুট দীর্ঘ এই মন্দিরটি পাঁচতল বিশিষ্ট। প্রতি তলের কার্নিসে বাইরের দিকে আগাগোড়া অশ্বখুরাকৃতি ফোকর এবং তার মধ্যে যথানিয়মে মূর্তি সন্নি-বিষ্ট। শিখরটি গোলাকৃতি। মন্দিরের উচ্চতা ৫০ ফুট। খণ্ড পাথর গেঁথে তৈরি এই মন্দিরটি অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

রাজা দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের বিশেষ অবদান এই সৈকত-মন্দির। একটির পর

একটি প্রস্তরখণ্ড সাজিয়ে কেমন করে মন্দির গড়ে তোলা যায়, দক্ষিণ ভারতে এ চেষ্টা সর্বপ্রথম করেছিলেন বোধ করি দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ ওরফে রাজসিংহ।

সৈকত-মন্দির বস্তুতঃপক্ষে একত্র সন্নিবদ্ধ দু'টি মন্দির। পিরামিড-আকৃতির এই মন্দিরটির গঠন ধর্মরাজ রথের অনুরূপ। তবে ধর্মরাজরথ একটিমাত্র পাথর কেটে তৈরি, আর সৈকত-মন্দির ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডের সমষ্টি। মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে।

গুহাগুলির মধ্যে বরাহমণ্ডপ, মহিষাসুরমণ্ডপ এবং কৃষ্ণমণ্ডপের নাম উল্লেখ করতে হয়।

বরাহমণ্ডপ : মামল্লযুগের উল্লেখযোগ্য গুহামন্দির এই বরাহমণ্ডপ। মামল্লযুগের বৈশিষ্ট্য সিংহস্তম্ভের পরিণত রূপ দেখি এই গুহামন্দিরে। এই মন্দিরের উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হল গুহাগাত্রে খোদাই করা চারটি প্যানেল—দু'টিতে দুর্গা ও লক্ষ্মীর মূর্তি, অপর দু'টিতে বামনাবতারের কাহিনী প্রস্তরীবদ্ধ।

মহিষাসুরমণ্ডপ : এই গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ দু'টি বিশেষ ভাস্কর্য-নিদর্শন হল মহিষাসুর মর্দিনীর রূপে দেবী দুর্গা এবং অনন্তশয়নে বিষ্ণু।

মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির পরিকল্পনায় যে কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ও প্রস্তরগাত্রে তার রূপারোপে যে নাটকীয়তা আনা হয়েছে তা একমাত্র সেই শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব, যিনি একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা।

একদিকে দেবী দুর্গার সৈন্যবাহিনী, অন্যদিকে মহিষাসুরের সৈন্যবাহিনী—এ দু'য়ের মধ্যে সংঘর্ষের এমন এক বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা এটিকে মহাবলীপুরমে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পে পরিণত করেছে। পল্লবযুগের ইতিহাসের গবেষক রেভারেণ্ড হেরাস বলেছেন : "The Mahisasura Mandapa is a painting in stone."

অনন্তশয়নে বিষ্ণুমূর্তিটিও ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি জয়স্তম্ভ।

কৃষ্ণমণ্ডপটি তত আকর্ষণীয় না হলেও শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন ধারণ, বৃন্দাবনে নন্দের গো-দোহন, কৃষ্ণ-রাধিকার মূর্তি প্রভৃতি যথেষ্ট আগ্রহ সঞ্চার করে।

ভগীরথের তপস্যা একটি অবিস্মরণীয় ভাস্কর্য-আলেখ্য। এই আলেখ্যটি সুদীর্ঘকাল অর্জুনের তপস্যা নামেই অভিহিত ছিল। এখনও মহাবলীপুরমের গাইডরা আগন্তুক দর্শকদের কাছে ঐ পরিচয়ই দেয় প্যানেলটির। অন্ততঃ আমার বিজ্ঞ গাইডটি তা'ই করেছিল। সুবৃহৎ প্যানেলটির দিকে আঙুলে দেখিয়ে অবলীলাক্রমে বলে গিয়েছিল "এটা অর্জুন তপস্যা"। এমনকি মূর্তিগুলির মধ্যে কোন্‌টি অর্জুন তাও দেখিয়ে দিয়েছিল। তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন জেনেছি ওটি অর্জুন তপস্যা নয়, গঙ্গাবতরণ বা ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন। তার বহু প্রমাণ রয়েছে ঐ খোদাইয়ের মধ্যেই।

সুবিশাল খোদাইয়ের কাজটি দু'টি ভাগে এমনভাবে বিভক্ত যে মাঝখানটিতে একটি খালের মত সৃষ্টি হয়েছে। ঐ খাল দিয়েই সম্ভবতঃ জলস্রোত বইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। শিল্পটিকে বাস্তবসম্মত রূপ দেওয়ার জন্যই এরূপ করা হয়েছিল। এর আশপাশে উৎকীর্ণ জীবগুলির মধ্যেও এই নতুন ধারণার সমর্থন আছে। স্রোতস্বিনীর মাঝখানেই দু'টি নাগ জলক্রীড়া করছে মহাসুখে, একব্যক্তি কাঁধে জলপাত্র নিয়ে ফিরে যাচ্ছে, ওদিক থেকে একটি হরিণ আসছে স্রোতস্বিনীর কাছে তৃষ্ণা নিবারণের আশায়। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে ভগীরথের প্রার্থনা শিবের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আমার সর্বজ্ঞ গাইডপ্রবর অর্জুন বলে যাঁকে চালিয়েছিল তিনি আসলে ভগীরথ। কাজেই ভাস্কর্যটির নাম 'অর্জুনের তপস্যা' না হয়ে হবে 'ভগীরথের তপস্যা'। Victor Goloubew ১৯১৪ সালে এশিয়াটিক জার্নালে প্রবন্ধ লিখে একথা প্রমাণ করেন। কাজেই দীর্ঘদিনের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করতে পারার কৃতিত্বটা তাঁরই।

সবশেষে মাখনের গোলাটির কথা না বললে প্রবন্ধের অঙ্গহানি ঘটবে। একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মাথায় একটা সুবিশাল গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ড—এর সামান্য একটু অংশমাত্র পাহাড়ের দেহ ছুঁয়ে আছে, দেখলে ভয় হয় পাথরের গোলাটি এখনই বুঝি গড়িয়ে পড়ে যাবে। বিস্মিত দৃষ্টি তুলে ভাবছি...... এমন সময় গাইডের ব্যাখ্যা এসে কর্ণকুহরে প্রবেশ করল। এটি নাকি প্রস্তরীভূত মাখনের গোলা। যশোদা মাখনের এইরকম গোলা পাকিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুঁড়ে দিতেন, আর শ্রীকৃষ্ণ তা টপ করে ধরে নিয়ে মুখে পুরে দিতেন। এইরকম একটি মাখনের গোলাই পাথরে পরিণত হয়ে যুগের পর যুগ এখানে রয়ে গেছে।

সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু স্থাপত্যের কোন একটা নির্দিষ্ট রীতির অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। রথগুলির নির্মাতা পল্লব রাজারা সম্ভবতঃ উত্তর থেকেই এখানে এসে থাকবেন। সেখানে তাঁরা নিশ্চয়ই বৌদ্ধ স্থাপত্যরীতির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁরা যখন দক্ষিণের এই নতুন দেশে বসতি স্থাপন করলেন ও মন্দিরাদি নির্মাণে হাত দিলেন, তখন স্বভাবতঃই সেগুলির নির্মাণরীতিতে বৌদ্ধপ্রভাব এসে পড়লো। অবশ্য ক্রমে ক্রমে নানাবিধ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে কিছু কিছু বৌদ্ধপ্রভাব আপনা থেকেই হ্রাস পেল, এবং তার পরিবর্তে নির্মাণরীতিতে কিছু কিছু নতুন ঢঙ এসেছে এবং তা ক্রমে তাদের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। এইভাবে ধীরে ধীরে দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হয়েছিল।

এই স্থাপত্যরীতি যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল মামল্ল যুগে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পল্লব যুগের শিল্পীরা সত্যই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁরা একটা নতুন যুগের পত্তন করে যেতে পেরেছেন। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে তাঁদের দান অসামান্য।

সাতপাঁচ

নির্মল সরকার

॥ নারী ও করোনারী ॥

ইদানীং করোনারী রোগের কথা হামেশাই আমরা শুনে থাকি—হঠাৎ যেন হার্টের অসুখের হিড়িক লেগে গিয়েছে।

দিব্যি জলজ্যান্ত মানুষ খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করছেন কিংবা অফিসে ফাইলের ওপর সবেমাত্র হয়ত মন্তব্য লেখা শুরু করেছেন অমনি টুপ করে টেবিলের ওপর মাথাটি নুয়ে পড়ল। আত্মীয়-স্বজনের ব্যস্ততা, বন্ধু বান্ধবদের ছুটোছুটি, এমন কি ডাক্তারবাবুদের কেরামতি দেখাবার পর্যন্ত আর অবকাশ রইল না। এর নাম হ'ল করোনারী! যেমনই আকস্মিক তেমনই সাংঘাতিক। করোনারী রোগ সম্বন্ধে নাকি এখনও গবেষণা চলছে—তা চলুক. তবে আমাদের প্রতিপাদ্য-বিষয় সম্বন্ধে যতটুকু জানা আছে তাই বলি।

হৃদযন্ত্রের এবং ব্লাডপ্রেসারের সঙ্গে দুশ্চিন্তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরা এই রোগের কবলিত হয় বেশী। হবারই কথা।

এ যুগে পুরুষদের বিশ্রামের সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। বিছানায় গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকলেই ত ক্লান্তি দূর হয় না—মাথার মধ্যে

চিন্তার পোকাগুলো যে কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায় তারা বিশ্রাম করতে দেয় কই!

করোনারী এবং ব্লাডপ্রেসার রোগের পটভূমিতে নারী অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজ করছেন—তিনি রাখলে রাখবেন, মারলে মারবেন। কথাটা হয়ত অতিশয়োক্তি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা নয়।

নির্ভরতা সকলেই চায়—স্ত্রীর চেয়ে পুরুষ কি কম নির্ভরশীল? হয়ত বেশী। অক্লান্ত পরিশ্রমের পরই তার প্রয়োজন হয় এমন একটা জায়গা যেখানে তার সব ক্লান্তির অবসান হবে, তিক্ততা আর অবসাদের গ্লানি মুছে গিয়ে স্নিগ্ধতায় মন ভরে উঠবে—যেখানে পৌঁছুতে পারলে পীড়িত স্নায়ুমণ্ডলী অসহনীয় চাপ থেকে মুক্তির নিশ্বাস ফেলবে। গৃহকে তাই হয়ত কবি 'সুইট হোম' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সেই গৃহে যদি তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা খর্পরধারিণী গৃহিণী বিরাজ করেন, তা হলে?

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক নাকি মারাত্মক হাঁপানী ব্যাধি মুক্ত হয়েছেন! আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিবাহ বিচ্ছেদের পর কিংবা ভিন্ন জায়গায় বসবাস করার ফলে অনেকেই স্ত্রীর নির্যাতন এড়িয়ে সুখে বসবাস করছেন বলে আমাদের জানা আছে। এই ধরণের রোগীদের চিকিৎসকরা শান্তিপূর্ণ আব-হাওয়ায় বাস করতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাড়ীতে যদি কলহ-পরায়ণা স্ত্রী থাকেন তাহলে আর শান্তি কোথায়!

অশান্তি এবং মানসিক আঘাতের ফলে মানুষের দেহের মধ্যে কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। যেমন প্রচণ্ড মানসিক দুর্যোগের সঙ্গে সঙ্গে এড্রিনালিন ক্ষরিত হয়ে রক্তস্রোতে মিশে যায়—ফলে শিরা উপশিরা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, নাড়ী এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বেড়ে গিয়ে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস পড়তে থাকে। বার বার এই ধরণের আঘাতে স্নায়ু আর মন দুটোই নিস্তেজ হয়ে যায় এবং করোনারী ও আনুষঙ্গিক রোগের উদ্ভব হয়।

এখন কথা উঠতে পারে, মেয়েদের কি মানসিক আঘাত সহ্য করতে হয় না? হয় বইকি। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত বেশী করেই সহ্য করতে হয়। তবে তাঁদের মানসিক গঠন ভিন্ন প্রকারের—বিশেষ ধরণে তাঁরা সেগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন। যেমন ধরুন—প্রতিবেশী, বন্ধু এমন কি ঝি চাকরদের কাছেও স্বামীর অত্যাচারের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে কিংবা কান্নাকাটি ও চীৎকার করে মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারেন। কিন্তু ভদ্রলোকের বেলায় তা সম্ভব নয়, সিন ক্রিয়েট করা তাঁর পক্ষে অশোভন এবং রীতি-বিরুদ্ধ। সেই কারণে নীরবে অথবা মৃদু প্রতিবাদ করে সব আঘাতটাই বরণ করে নিতে হয় এবং সেই সঙ্গে বিপদও ডেকে আনেন। অবশ্য অশিক্ষিত গোঁয়ার-গোবিন্দ লোকের কথা আলাদা, এ রকম অবস্থায় পড়লে তারা স্ত্রীকে দু'চার ঘা দিয়ে মনটাকে হাল্কা করে নিতে পারে। অপর পক্ষে আবার সাধারণ এবং অশিক্ষিতা স্ত্রীর চেয়ে শিক্ষিতা আধুনিকারা হন বেশী মারাত্মক। শ্লেষ-মিশ্রিত তীক্ষ্ণ এবং মর্মভেদী কথার শরজালে তাঁরা স্বামীদের অস্থির করে তোলেন। দিনের পর দিন এই ধরণের বিষোদ্গীরণের ফলে স্বামীরা সহজেই কাবু হয়ে পড়েন।

সক্রেটিস থেকে শুরু করে গেটে, শেক্সপীয়ার এবং বর্তমানের অনেক স্বামীকেই এই নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে একথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট ডাঃ রিচার্ড সি ক্যাবট সাধারণ ডাক্তারদের হার্টের রোগীদের সুচিকিৎসার জন্যে কতকগুলি প্রশ্ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন—রোগীর স্ত্রী স্বামীকে বকে, গাল কিংবা বন্ধুর স্বামীর সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে কি হীন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন? অতিথি অভ্যাগতদের সামনে তুচ্ছ

তাচ্ছিল্য করার অভ্যাস আছে কি? কাজ থেকে ফেরার পর ক্লান্ত স্বামীকে কি স্ত্রীর ফাইফরমাস খাটতে কিংবা সিনেমা বা নিমন্ত্রণে নিয়ে ছুটতে হয়? মাতা-ঠাকুরাণী কি কন্যার হয়ে ওকালতি করে থাকেন এবং স্বামীকে করায়ত্ত করার জন্যে ঐভাবে বিষোদ্গীরণ করতে উৎসাহ দেন। স্ত্রীর অন্যান্য বন্ধুরা তাঁর অপেক্ষা অনেক সুখে কালাতিপাত করছেন একথা কি বার বার স্বামীকে শুনতে হয়?

প্রশ্নগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায় কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়—নারীর সঙ্গে করোনারীর এত নিকট সম্পর্ক তা কে জানত?

সংগীতের শিক্ষাপদ্ধতি

ভাস্কর মিত্র

বিশ্বভারতী স্থাপনের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমরা এই যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করেছি সেখানে সংগীত ও ললিতকলাকে সম্মানের আসন দিতে হবে।" তাঁর এই মহৎ সংকল্প বিশ্বভারতীতে হয়তো সফল হয়েছিল, কিন্তু তার বাইরে বৃহত্তর বাংলা দেশে আজ প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরেও সংগীত ও ললিতকলা কবির আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদা পেয়েছে বলে মনে হয় না। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী ছাড়া সংগীতকে বৃত্তি হিসাবে নির্বাচন করে খুব কম ব্যক্তিই সফলতা অর্জন করেছেন। যাঁরা সাধারণ মানুষ, সংগীতের প্রতি যাঁদের আগ্রহ আছে, অনুরাগ আছে, তাঁরা তাকে অবসর-কালীন সৌখীন শিল্পসামগ্রী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শেষোক্ত পর্যায়ের শিল্পীই বেশি, এবং তাঁদের জন্যই কলিকাতা শহরের অলিতে-গলিতে ব্যাঙের ছাতার মতন অসংখ্য সংগীত-বিদ্যালয়ের আবির্ভাব। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বিশেষ বয়স আছে। সেটা দশ-বারো কিম্বা পনেরোও নয়, যখন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলে রীতিমত পরিচর্যার দ্বারা তারা সেই বিশেষ কলাবিদ্যাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে সক্ষম হতেন, অথবা বিগত-যৌবন প্রৌঢ়াবস্থাও নয়, যে-পর্যন্ত চর্চা রাখলে সংগীতের মর্মস্থলে প্রবেশ করে গভীর চিন্তা বা অভিজ্ঞতার দ্বারা তার সঠিক মূল্যায়নে সমর্থ হতেন। মাঝামাঝি একটা সময়, যখন কর্মভার অপেক্ষাকৃত লঘু, সাংসারিক দায়-দায়িত্বের দুর্ভাবনা নেই, অথচ যৌবন পূর্ণ শক্তি নিয়ে বিকশিত, তাকে নিয়োজিত করবার মত উপযুক্ত ক্ষেত্র-ও যেন খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই সময় সেই 'সার্প্লাস' শক্তিটুকু ব্যয় করবার জন্য যে সকল অবলম্বনকে আশ্রয় করা হয়, সংগীত-বিদ্যালয়গুলি সেগুলিরই অন্যতম। ভবিষ্যতের কর্মজীবনে এই বিলাসিতার চিহ্ন অল্পই থাকে। অতএব কবির অভিপ্রেত মর্যাদা থেকে সংগীত-কলা আজও বঞ্চিত এ-কথা স্বীকার করতে হবে। এর জন্য প্রধানত দায়ী সুপরিকল্পিত শিক্ষা-পদ্ধতির অভাব, বছর পাঁচেক সপ্তাহে দু'দিন সান্ধ্য-কালীন দু'এক ঘন্টা ক্লাস করে কয়েকটা গান বা গৎ শিখলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, এমন বিভ্রান্তিকর ধারণা।

সংগীতকে জীবনে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করতে হলে প্রথমত চাই সুনির্দিষ্ট পূর্ণকালীন শিক্ষাক্রম, দ্বিতীয়ত, উত্তর-জীবনে জীবিকার ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষার্জনের যথার্থ প্রতিদানের আশ্বাস, তৃতীয়ত, শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ে বিদগ্ধ কলারসিকের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি। যদিও সম্প্রতি সংগীত-নাটক আকাদমি স্থাপিত হয়েছে এবং কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়েও সংগীতের পাঠক্রম নির্ধারিত হয়েছে, কিন্তু এইটুকু প্রচেষ্টাই সংগীতকে প্রার্থিত আসনে অভিষিক্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এ-সম্পর্কে প্রথিতযশা সেতার-শিল্পী রবিশংকরের অভিমত প্রণিধানযোগ্য—"শিক্ষার মাধ্যমে সংগীত-প্রচারের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েছেন। কিন্তু এই শিক্ষা সর্বগামী নয়। নিজস্ব প্রবণতায় বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যাঁদের মধ্যে সংগীত সম্পর্কে একটা জ্ঞান পূর্বেই সঞ্চারিত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সঞ্চিত ভাণ্ডারকেই বাড়িয়ে তোলবার ব্যবস্থা করেছেন। ......শৈশব থেকে আবশ্যিকভাবে সংগীতের রস সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া দরকার।" (সংগীত পরিবেশনরীতি ও শিল্পীর সমস্যা, রম্যবীণা পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা)। এ-দেশে অন্নপ্রাশনের সময় বিক্ষিপ্তভাবে স্থাপিত বই, সোনা, মাটি, প্রভৃতি দ্রব্যগুলির মধ্যে শিশু স্বাধীনভাবে যেটা স্পর্শ করবে, তার উপর নির্ভর করে শিশুটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা করবার প্রথা আছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে শৈশব থেকেই বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করবার অবকাশ দিলে তার স্বাভাবিক প্রবণতা ধরা পড়তে পারে। সেইজন্য সাধারণ বিদ্যালয়সমূহের প্রথম কয়েকটি শ্রেণীতে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত, প্রভৃতি বিচিত্র পাঠ্য-তালিকা আবশ্যিকরূপে প্রচলিত, যাতে সেগুলির থেকে ছাত্রছাত্রীরা যে-বিষয়ে নিজেদের দক্ষতা আছে সেটি নির্বাচন করবার সুযোগ পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাথমিক শিক্ষায় আবশ্যিক বিষয়-গুলির মধ্যে সংগীতের স্থান নেই। তার দুটি কারণ। প্রথমতঃ সংগীতের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এতাবৎকাল-পোষিত একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা, অতএব এ-সম্পর্কে তাঁরা সচেতন নন। দ্বিতীয়তঃ যদি সচেতন হতেনও, তাহলে দেখতেন, শিশু-দের উপযুক্ত সংগীত এ-দেশে রচিত হয়নি, কেননা সেদিকে সংগীতজ্ঞদের কোনো প্রচেষ্টা নেই। এ-সম্পর্কেও পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ থেকে রবিশংকরের অপর একটি উক্তির উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না:—"জাপান, আধুনিক চীন অথবা পাশ্চাত্যের যে-কোনো অঞ্চলে গীতি-প্রাণতা বা Musicality বলতে বোঝায় সংবেদনশীল বা অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত দিয়ে সংগীতের রসটিকে গ্রহণ করবার প্রবণতা। এর প্রস্তুতি চলে শৈশব থেকে। নার্সারি ছন্দের আন্দোলনে, শিশু-সংগীতের মিষ্টতায় সংগীতের যে রস নিহিত থাকে, তা ক্রমশঃ তাঁদের মর্মে মর্মে গাঁথা হয়ে যেতে থাকে। ছোটবেলা থেকে পিয়ানো শেখানো হয় এমনভাবে যে কর্ড, হার্মনিতে তাদের কান তৈরী হয় এবং বাখ্, হ্যাণ্ডেল, হেডন, শোঁপ্যা প্রভৃতি সংগীতরচয়িতাদের সঙ্গে বেশ নিবিড় পরিচয় ঘটে যায়। এই শিক্ষায় এমন একটা

সার্বজনীন রূপ আছে যে সকলের মধ্যে রুচিবোধ জাগ্রত হয়। একজন সেল্‌স-ম্যানও বাদ পড়ে না তার থেকে। মোটা-মুটি একটা সুরবোধ সকলেরই থাকে। ব্যক্তিগত রুচি ও পন্থা অনুযায়ী পরে সেই সংগীতকেই জীবনের প্রধান অব-লম্বন হিসাবে গ্রহণ করেন......।" অতএব বিদ্যালয়সমূহে সংগীতকে পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত করতে হলে শিশু-সংগীত সম্পর্কে উপযুক্ত গবেষণার প্রয়োজন আছে। এমনভাবে শিক্ষাপ্রণালী নির্ণীত হওয়া আবশ্যক যাতে করে শিশুর স্বভাবসুলভ ছন্দবোধ পরিতৃপ্ত হয় আবার সংগীতের সাধারণ রসটুকু গ্রহণ করবার মতন অনুভূতি ধীরে ধীরে তার মধ্যে জাগ্রত হতে থাকে।

শৈশবকালীন সংগীতচর্চার অব-হেলার জন্য দায়ী উপযুক্ত উপকরণের অভাব এবং সে-সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্‌বর্গের ঔদাসীন্য। আবার অন্যদিকে পরিণত-কালের সংগীতশিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে উপকরণ এবং শিক্ষা-বিদ্‌দের মধ্যে অধুনাসঞ্চারিত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যে-ত্রুটি রয়ে গেছে, তার জন্য দায়ী, সুপরিকল্পিত পদ্ধতি-নির্ধারণের উপযুক্ত চিন্তার অভাব। সংগীত-চর্চার দুটি দিক আছে, একটি ব্যবহারিক, অপরটি উপপত্তিক। রাসায়নিকের কর্ম-স্থল তাঁর ল্যাবরেটারি, কিন্তু লাইব্রেরীকে তিনি বর্জন করে চলেন না। সংগীতের ব্যবহারিক দিকে রসবোধ পরিতৃপ্ত হয়, সেদিকেই তাঁর প্রধান কাজ। কিন্তু শাস্ত্র-অধ্যয়নে তাঁর বুদ্ধির বিকাশ, চিন্তা-শক্তির সক্রিয় ভূমিকা—অতএব সেদিকটি উপেক্ষণীয় নয়। অথচ এ-দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেবল ব্যবহারিক চর্চাটুকুই শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। উপপত্তিক জ্ঞানের উপর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সংগীতের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্গত বলে মনে হয় না। সাহিত্যিক বলতে কেবল কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার বা নাট্যকারকেই বোঝায় না, যাঁরা কবিতা, উপন্যাস, গল্প বা নাটকের মূল্যায়নের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁদেরও নির্দেশ করা হয়। তেমনই কেবল গায়ক, বাদক বা নর্তককেই সংগীতজ্ঞ বলা সমীচীন নয়, যাঁরা তার তত্ত্বটি অধ্যয়ন করেছেন এবং তাতে পারদর্শী হয়েছেন, তাঁদেরও সেই সম্মান দেওয়া উচিত। তা করতে হলে এদেশের সংগীত-শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কার-সাধন প্রয়োজন। আমাদের দেশে ক্রিয়া-সিদ্ধ সংগীতজ্ঞের অভাব নেই, বিশেষতঃ ধ্রুপদী (clasiscal) সংগীতের ক্ষেত্রে। কিন্তু চিন্তাশীল শাস্ত্রজ্ঞ সংগীতবিদের সংখ্যা নিদারুণভাবে অল্প। অতএব পাঠ-ক্রম এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত, যাতে এদিকে উৎসাহ ও আগ্রহ বৃদ্ধিলাভ করে।

সংগীতের সাম্প্রতিক রূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, উপযুক্ত শিক্ষা থাকলে এর বিশ্লেষণ ও মূল্যা-য়নের জন্য প্রচুর পরিমাণে চিন্তার অব-কাশ আছে। শুধু তাই নয়, এবম্বিধ চিন্তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতবর্ষে এখন উচ্চাঙ্গ ও লঘু-পর্যায়ের বিচিত্র গীতিরূপ প্রচলিত। কিন্তু তার সঠিক সংজ্ঞা, রীতি-পদ্ধতির (technique) যথার্থ স্বরূপ, উদ্ভব ও ইতিহাসের ক্রমসূত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ! বাংলাদেশের একান্ত গীতিরূপ কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি প্রাচীন ও পল্লীগীতির বিশ্লেষণ-মূলক কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই, এমন কি রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও কোনো পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ এ যাবৎ হয়নি। ভারতীয় সংগীতের অসংখ্য রাগরাগিণী-সম্পর্কিত তত্ত্ব, প্রাচীন শাস্ত্রোল্লিখিত বাদী, সম্বাদী, গ্রহস্বর, ন্যাসস্বর, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি শব্দের যথার্থ অর্থ প্রভৃতি অজস্র জ্ঞাতব্য বিষয় এখনও আমাদের অগোচর থেকে গেছে কিম্বা অস্পষ্ট ধারণার ফলে বিভিন্ন সংগীতজ্ঞের তর্কের বিষয় হয়েছে। শিশু-সংগীতের প্রসঙ্গ আগেই আলোচিত হয়েছে। যা এদেশে নেই, তার উপকরণ দেশান্তর থেকে সংগ্রহ করবার মত জ্ঞান ও ঔদার্যের প্রয়োজন। অতএব এ-ব্যাপারে বিদেশী নার্সারী সংগীতের চর্চা এবং আমাদের দেশের সংগীতে অনুরূপ গীতিরূপের প্রবর্তনার পন্থা নিয়ে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। শুধু এ ব্যাপারেই নয়। অধুনা এদেশে বৃন্দগান ও ঐকতানের প্রচলন হয়েছে, কিন্তু তার কোনো স্বতন্ত্র পদ্ধতি না থাকায় শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের ভাষায় তা একক সংগীতের সমবেত সংস্করণে পর্যবসিত। অথচ পাশ্চাত্য সংগীতের সাহায্য নিয়ে এ সম্পর্কে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। ভারতীয় সংগীতে হার্মনির প্রয়োগ সম্পর্কে কারো কারো মনে সংশয় থাকলেও রবীন্দ্রনাথ সুদৃঢ় ভাবে বলেছেন—"হার্মনি যদি দেশ-বিদেশের সংস্কারগত কৃত্রিম সৃষ্টি হোত, তবে তো কথাই ছিল না। কিন্তু যেহেতু এটা সত্য বস্তু, এর সম্বন্ধে দেশকালের নিষেধ নেই। এর অভাবে আমাদের সংগীতের যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি তবে তাতে কেবলমাত্র কণ্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাবে।......আমাদের সংগীতের পক্ষে একটা বড় মহল ফাঁকা পড়ে আছে, এটা যদি দখল করতে পারি, তবে এই দিকে অনেক পরীক্ষা উদ্ভাবনের জায়গা পাব।" (সংগীতের মুক্তি)। অনেক দিন আগের উক্তি, অথচ আজ পর্যন্ত ফাঁকা মহলটি অধিকার করবার মতন কোনো সুপরি-কল্পিত উদ্যোগ হয়েছে বলে জানা নেই। এ-জন্য প্রতীচ্য-সংগীতের সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজন আছে, হার্মনি ও কাউন্টারপয়েন্ট প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার দরকার। অতএব এ-দেশের শিক্ষাক্রমে পাশ্চাত্য সংগীতের স্বরতত্ত্বকেও পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করে নেওয়া সমীচীন। বক্ষ্যমান আলোচনায় এটাই প্রতিপাদ্য যে, সংগীতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটি দিক অবহেলিত রয়েছে, এ-দিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বিস্তারিত শিক্ষাক্রমের উল্লেখ স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নয়, তাছাড়া এ-জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন তার কার্য-কারিতার সম্ভাবনাসাপেক্ষ। এখানে তার প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্যতাটুকুই বিবৃত হল। জীবিকার ক্ষেত্রে এবম্বিধ শিক্ষার্জনের কি সার্থকতা থাকতে পারে, সে-প্রসঙ্গ ভবিষ্যতে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাতর্ভ্রমণ আশুবাবুর চিরদিনের অভ্যাস। বর্ধমানে থাকতে ছিল নদীর ধারের বাঁধ। বছরের আট মাস শুকিয়ে কুঁকড়ে পড়ে থাকলেও, তবু গঙ্গা। ইদানিং প্রায়ই হুগলীর 'আশ্রমে' কাটাতে হয়। সেখানে গঙ্গার আর এক রূপ—পূর্ণাঙ্গী, প্রশস্ত-হৃদয়া। তীর ধরে যতদূর ইচ্ছা, চলে যেতে কোনো বাধা নেই। এখানে নদী নেই, আছে গোলদীঘি। ভ্রমণ এখানে পরিভ্রমণ। তারও পদে পদে সংঘর্ষ। তবু তারই মধ্যে কয়েক চক্কর ঘুরে না এলে চলে না।

সম্প্রতি অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় অসুখে পড়বার পর ফিরবার পথে একবার ও'র খবর নিয়ে যাওয়া প্রায় দৈনন্দিন রুটিনে দাঁড়িয়েছিল। নির্মলা যেদিন এসেছিল সেদিন ভোরেই ও'কে হুগলী যেতে হয়েছিল। দু'দিন পরে কাল একটু বেশী রাত্রে ফিরেছেন।

ভোরে উঠেই 'পাক দিতে' বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে নিজের আস্তানায় ঢুকবার আগে ও-বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেলেন। রঘু ধুনো দিচ্ছিল। ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবু উঠেছেন?

—বাবুর আর ওঠাউঠি কি? সারা রাত তো জেগেই কেটেছে।

আশুবাবুর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল। ধীরে ধীরে কোন রকম শব্দ না করে ঘরে ঢুকলেন। তবু বিজনের কান এড়াল না। বললেন, কে, আশুবাবু? আসুন।

আশুবাবুর বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল। কথাগুলো কেমন জড়ানো জড়ানো। এ রকম তো ছিল না। মুখের চেহারাও আগের চেয়ে অনেকটা থমথমে। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে রঘুকে ডেকে বললেন, ও-বাড়ি থেকে দিলীপবাবুকে এখনই একবার ডেকে নিয়ে এসো তো। তাড়াতাড়ি আসতে বলো।

দিলীপ ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছল। আশুবাবু তখনো বারান্দার উপরেই অপেক্ষা করছিলেন। ওকে কাছে টেনে নিয়ে প্রায় কানে কানে বললেন, রুগীর অবস্থা তো তেমন ভালো মনে হচ্ছে না। তুমি একবার দ্যাখ দিকিন।

—সে কি! কালও তো বেশ ভালোই দেখে গেলাম।

ঘরে ঢুকে সামান্য যেটুকু দেখা দরকার, দেখে দিলীপের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। আশুবাবুকে গিয়ে বলল, আপনি একটু বসুন, স্যার। আমি একবার ডাক্তার দাশগুপ্তকে ফোন করে আসি। হয়তো গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

—তাই বরং যাও, আমি আছি। তুমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবো না।

ঐখানেই একটা চেয়ার ছিল: তার উপরে বসলেন আশুবাবু। ঘরে গেলে রোগী নিশ্চয়ই কথা বলবার চেষ্টা করবেন। এ অবস্থায় সেটা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। বারান্দার আর এক প্রান্তে আলো কোনো কারণে বেরিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলে গেল। আশুবাবুর সামনে এর আগে দু-এক দিন বেরোলেও, আজ কোথা থেকে এক রাশ লজ্জা এসে পা দুটোকে জড়িয়ে ধরল। অথচ পালিয়ে যাবার লজ্জাটা যে আরো বড়, তাও সে বোঝে। আশুবাবুও একটু অপ্রস্তুতে পড়লেন। এমনিতেই মেয়েদের সামনে তিনি ততটা সহজ বা সড়গড় বোধ করেন না, তা তারা যে রকমেরই হোক, এবং ও'র সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ স্নেহের সম্পর্কই থাক। এখানে যখন আসেন, প্রফেসর ব্যানার্জির সঙ্গেই কথাবার্তা চলে, তাঁর এই মেয়েটিকে নিজে থেকে কখনো ডাকেন না, সামনে পড়লে কুশল প্রশ্নাদি করেন। এখন যদি সে হঠাৎ বেরিয়েই আবার ঘরে গিয়ে না ঢুকত, হয়তো ডেকে খোঁজ-খবর নিতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কী করা যায় যখন ভাবছেন, দেখলেন আলো একেবারে তাঁর কাছে এসে পড়েছে। তিনি কিছু বলবার আগেই সে ঢিপ করে তাঁর পায়ের কাছে একটা প্রণাম করল। কারণটা বুঝতে না পারলেও সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, এসো, মা, বেঁচে থাকো, সুখী হও।

যিনি প্রতিদিন আসছেন যাচ্ছেন, আজ হঠাৎ তাঁকে এই প্রণাম জানাবার ইচ্ছা তার কেন হল, আলো নিজেই জানে না। কাল থেকে সমস্ত মনটা যেন ভরপুর হয়ে আছে। হয়তো তার সঙ্গে এই ইচ্ছার কোনো যোগ ছিল। এই মুহূর্তে মনে হল, তাদের পরম সুহৃদ ও দিলীপের পিতৃতুল্য এই শিশুপম বৃদ্ধের মুখে এই মাত্র যে কটি কথা উচ্চারিত হল, সে শুধু মামুলী আশীর্বচন নয়, আজকের দিনে তার কাছে তাদের যেন একটা বিশেষ অর্থ আছে, মূল্য আছে।

নির্মলা এসে দাঁড়াবার পর থেকে চারদিকের সব কিছুই আলোর চোখে নতুন রূপ নিয়েছিল। বাবার মুখের ঐ প্রসন্ন হাসিটি সে কতদিন দেখেনি। যা দেখছে তারই মধ্যে সেই প্রসন্নতার প্রতিফলন। একটা রাত না কাটতেই আবার একটা কালো মেঘ তাদের মাথার উপর ঘনিয়ে উঠছে, একথা সে কেমন করে জানবে?

সকালে উঠে বাবার ঘরে তখনো তার যাওয়া হয়নি।

ডাক্তার দাশগুপ্ত তাঁর পরীক্ষা শেষ করে বাইরে এসে দিলীপ এবং আশুবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একটু চিন্তা-

ন্বিত স্বরে বললেন, এরকম তো হবার কথা নয়। এতটা সেটব্যাক্ কী করে হল? হঠাৎ উত্তেজনার কোনো কারণ ঘটেছে কি? দিলীপ অপরাধীর স্বীকারোক্তির মত বলল, তা একটু ঘটেছে, স্যর।

—দ্যাট্‌স্ ইট্। কিন্তু, তা হলে তো চলবে না। ওঁকে এখান থেকে সরাতে হবে।

দিলীপের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ইউ আর গোয়িং টু বি এ ডক্‌টর। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, এই পেশেণ্টের জন্যে যে দুটো জিনিস নিতান্ত দরকার—অ্যাব্‌সোলিউট্ রেস্ট্ আর প্রপার অ্যাণ্ড্ কনস্‌ট্যাণ্ট নার্সিং—তার কোনোটাই হচ্ছে না। এটা তো একটা রীতিমত বৈঠকখানা। এখানে এ রকম সিরিয়স্ পেশেণ্ট রাখা চলে না।

দিলীপ মাথা নীচু করে ভাবছিল। এবারে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় নেওয়া যায়, স্যর? মেডিক্যাল কলেজে?

—যদি কেবিন পাওয়া যায়। তার চেয়ে ভালো হবে এ গুড্ কোয়ায়েট নার্সিং হোম। বল তো আমিও চেষ্টা করতে পারি।

আশুবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এর মধ্যে আমাদের বলবার কিছু নেই স্যর। আপনি যা ভাল বুঝবেন, সেইটাই শেষ কথা। তার ব্যবস্থাও আপনাকে করতে হবে।

—বেশ, আমি তাহলে এখনই গিয়ে খোঁজ-খবর করছি। আজকের মধ্যেই যেখানে হোক ফিক্‌স্ আপ্ করে ফেলতে হবে।

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, দিলীপ, তুমি এক কাজ ক'রো। ঘণ্টা খানেক পরে যেখান থেকে হোক্ আমাকে একটা টেলিফোন ক'রো। তার মধ্যেই কোথাও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে আশা করছি।

দিলীপ কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। দু-একবার ইতস্ততঃ করল। তারপর ডাকল, স্যর........

—বল। ছাত্রের মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার দাশগুপ্ত।

—আমাকে—আমাকে ঘণ্টা দুই সময় দিন, স্যর। তার মধ্যেই আমি এসে পড়বো।

—কেন, কোথায় যাবে তুমি?

—আমি আমার মাকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি।

—তোমার মাকে! ডাক্তার দাশগুপ্ত যেন ঠিক বুঝতে পারলেন না। কিন্তু তার চেয়ে অনেক গভীরতর বিস্ময়ের সুর আশুবাবুর—তোমার মা!

—হ্যাঁ, মাস্টারমশাই। মা এসেছিল পরে আপনাকে সব বলছি।

ডাক্তারের দিকে ফিরে বলল, মা বলে গেছে, তাঁকে জিজ্ঞেস না করে যেন কোনো কিছু করা না হয়।

—বেশ, বাট্ ইউ মাষ্ট্ বি ভেরী কুইক, মাই বয়।

—আমি যাবো আর আসবো।

ডাক্তার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। দিলীপও সেই সঙ্গে নেমে গেল। আশুবাবু ফিরে এসে রোগীর পাশে বসলেন।

এঁদের আলোচনাটা রঘুর কানে গিয়েছিল। সব কথা ধরতে না পারলেও, এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, বাবুকে অবিলম্বে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থাই স্থির হয়ে গেল। দিলীপের শেষের কথাগুলো সে শুনতে পায়নি। ঠিক ঐ সময়টাতে দরজা খুলবার জন্যে তাকে নীচে যেতে হয়েছিল। আলোকে এখনই এসব কিছু বলবার ইচ্ছা তার ছিল না। কিন্তু তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে আলো যখন পীড়াপীড়ি করতে লাগল, ডাক্তারবাবু কী বলে গেলেন তাকে জানাবার জন্যে, তখন চুপ করে থাকা কঠিন হয়ে পড়ল।

খবরটা শুনেই সে বাবার বিছানার পাশে ছুটে গিয়ে ডাকল, বাবা। বিজন তখন আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন। মেয়ের ডাক তাঁর কানে পৌঁছল কিনা বোঝা গেল না। আশুবাবু হাত নেড়ে ডাকাডাকি করতে নিষেধ করলেন। তারপর যতদূর সম্ভব নিচু গলায় বললেন, ভয় নেই, উনি একটু ঘুমুচ্ছেন। কিন্তু এ যে ঘুমের চেহারা নয়, ছেলেমানুষ হলেও সেটুকু বুঝবার জ্ঞান তার হয়েছিল। আশুবাবু তাকে ভরসা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজে যেতে বললেন। কিন্তু তার মনে হল পা দুটো যেন হঠাৎ অচল হয়ে গেছে। শঙ্কাকুল বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে বাবার মুখের দিকে চেয়ে সেইখানেই সে দাঁড়িয়ে রইল।

সিঁড়ির মুখ থেকে পরিচিত উচ্চকণ্ঠে নিজের নাম কানে যেতেই আলোর যেন হঠাৎ সংবিৎ ফিরে এল।

তাড়াতাড়ি বারান্দায় ছুটে গিয়ে বলল, জ্যাঠামশাই! বসে পড়ে পায়ে হাত দিতেই বিমান ওর বাহু ধরে তুলে বললেন, থাক, থাক। বিজু কেমন আছে?

আলো মুখে কিছু বলতে পারল না, মাথা নেড়ে জানাল, ভালো না। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। বিমান তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন, থাক কাঁদে না। আর ভাবনা কী? এসে যখন পড়েছি, এবার দুদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই কবে থেকে আসব-আসব করছি। এক ব্যাটা টাঁশ এসেছে নতুন ডি, টি, এস্ হয়ে। কিছুতেই ছাড়তে চায় না। কোনোরকমে তিনদিনের জন্যে—কই, সে কোন্ ঘরে?

আলো আঙুল দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিল। বিমান দরজা থেকে উঁকি মেরে আশুবাবুর দিকে দেখিয়ে চোখের ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন—কে? আলো ফিসফিস করে বলল, মাস্টারমশাই; সামনের বাড়িতে থাকেন। সব সময়ে আমাদের দেখাশুনো করেন।

ছোট্ট সুটকেসটা আলোর হাতে দিয়ে বিমান ঘরে ঢুকলেন এবং আশুবাবুর উদ্দেশে হাত দুটো জড়ো করে বললেন, নমস্কার। আমি বিজনের দাদা। কানপুর থেকে আসছি। ও বুঝি ঘুমুচ্ছে?

এবার দু'দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে

আশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ওঁকে বাইরে যাবার ইঙ্গিত করলেন এবং রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে রোগীর বর্তমান অবস্থার একটা মোটামুটি—আভাস দিলেন। প্রসঙ্গতঃ, ডাক্তার যে তাঁকে কোনো নার্সিং হোমে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন, সে কথাও উল্লেখ করলেন। বিমানও ঐ বিষয়টার উপর জোর দিয়ে বললেন, আমি সেটা আগেই জানি, মনে মনে স্থির করেও এসেছি। আমার একজন বন্ধু ডাক্তার একটি ভালো হোম্ খুলেছে। এখ্‌খুনি গিয়ে সব ঠিকঠাক করে ফেলছি, ঐ রকম রুগীর দেখাশুনো, সেবা শুশ্রূষা, এখানে সে সব কে করে? ঐ একফোঁটা মেয়ে, ওকে কে দেখে তার ঠিক নেই। ওর ঘাড়ে এত বড় একটা ঝক্কি। ছিঃ ছিঃ। অনেক আগেই আমি আসতাম। কিন্তু পরের গোলামি করি। বুঝতেই তো পাচ্ছেন।

অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। আশু-বাবুর দুবার ডাক এসে গেছে। রোগীকে একা ফেলে উঠতে পারেননি। এবার বিদায় নিয়ে নীচে নামলেন। বিমানও বেরিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হলেন। আলো বলল, এখন বেরোলে খাবেন কখন?

—সে হ্যাঙ্গামা ডাইনিং কার-এ চুকিয়ে এসেছি। আমার আসছিল কোলকাতায়। কিছুতেই ছাড়ল না। এক পেট খাইয়ে দিলে। তোদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

আলো জবাব দিল না। বিমান চেঁচিয়ে উঠল, সে কি! এখনো খাসনি! ঠাকুর আছে তো?

আলো মাথা নেড়ে জানাল, আছে।

—তাহলে তোর খাবার দিতে বল। আর দেরি করিসনে। বিজন যা খাবার, খেয়েছে?

—কিছু না; সেই সকাল থেকে এক-ভাবে পড়ে আছেন।

—তাই বলে তুইও না খেয়ে আছিস? তোদের ঐ চাকরটি, কি নাম যেন, ও-ই একটু বসুক রুগীর কাছে, ততক্ষণে তুই যাহোক দুটো মুখে দিয়ে নে। আমি বেরিয়ে পড়ি।

—কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

—বিজুর জন্যে একটা বেড ঠিক করে আসি। আজকের মধ্যে যদি হয়ে যায়, কালই ওকে নিয়ে রওনা হতে পারি। তোর বড়মাকে একটা টেলিগ্রামও করতে হবে।

জ্যাঠামশাই চলে গেলেন। আলো সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ঠাকুর এসে আরেকবার খেয়ে নেবার তাগিদ দিল, রঘু এসে কত করে বলল। সে নড়ল না। শুধু বলল, তোমরা খেয়ে নাও গে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা—সব বোধ তার চলে গিয়েছিল। তারই চোখের উপর দিয়ে বাবাকে ওরা নিয়ে যাবে কোথাকার কোন হাসপাতালে। সেও চলে যাবে কোন্ দূর দেশে। তারপর? একটা অদম্য কান্নার ঢেউ তার বুক পর্যন্ত ঠেলে উঠল। ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে বাইরে থেকে রঘুর গলা শোনা গেল, দিদিমণি, বাবু

ডাকছেন। আলো ধড়মড় করে উঠে বসল। লুটিয়ে-পড়া আঁচলটা কোনো রকমে কাঁধে তুলে ছুটতে ছুটতে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। কাছে যেতেই বিজন বললেন, মেজদা এসেছে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কোথায় গেল?

—তোমার জন্যে নার্সিং হোম ঠিক করতে।

বলতে গিয়ে ঠোঁট দুখানা কেঁপে উঠল, গলাটাও মনে হল ধরা ধরা।

বিজন হাতের ইশারায় মেয়েকে আরো কাছে ডেকে নিলেন। কম্পিত হাতখানা ওর মুখে কপালে বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তাছাড়া আর উপায় কী, বল? তুইও কিছুদিন গিয়ে তোর বড়মার কাছে থাক। আমি একটু ভালো হলেই আবার আনিয়ে নেবো। আর যদি ওখানেই আমার শেষ—

—বলো না, বাবা তুমি বলো না, আমি শুনতে পারবো না—তড়িৎপৃষ্টের মত সহসা তাঁর মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। এই আর্তস্বর আলোর মুখে বিজন এর আগে কোনোদিন শোনেননি। মেয়ে তাঁর চিরদিনই চাপা। বড় শান্ত, ছেলেবেলায় যখন কাঁদত, তখনও কেউ তার গলা শুনতে পেত না।

তিনি যে কী করবেন, কী বলবেন ভেবে পেলেন না। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল নির্মলা, পিছনে দিলীপ. চোখের নিমেষে আলোর বুকের ভিতরটায় কী যে হল, সে জানে না। কিসের এক দুর্নিবার আকর্ষণ যেন তাকে অন্ধবেগে চালিয়ে নির্মলার বুকের উপর নিয়ে ফেলল। দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত মাথা নেড়ে বলতে লাগল, মা, না; আমি যাবো না। আমি কিছুতেই না, যেতে পারবো না।

নির্মলা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করল, কী বলছ! কোথায় যেতে পারবে না?

তার কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে বিজনের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবার কথা বলছে?

—কানপুর।

—কানপুর কেন?

—মেজদা এসেছে ওকে নিয়ে যেতে। বৌদি বলে পাঠিয়েছে।

—ও, জামাইবাবু এসেছেন বুঝি?... থেমে থেমে বলল নির্মলা।

কয়েক পলকের তরে একটা চিন্তার ছায়া পড়ল তার মুখের উপর। তারপর আলোর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আচ্ছা, সে যাওয়া না যাওয়া আমি দেখবো। এসে যখন পড়েছি—। খোকা, তুই ওকে একটু ও-ঘরে নিয়ে যা তো। যাও মা। আমি এখনি আসছি তোমার কাছে।

মায়ের হুকুম শুনে দিলীপ একেবারে থ। এ কী বলছে মা! তার মাথা কেটে ফেললেও তো লোকজনের সামনে—। তার প্রয়োজন হল না। উপস্থিত বিপদ থেকে আলোই তাকে রক্ষা করল। এতক্ষণে খানিকটা সামলে উঠেছিল এবং হঠাৎ এতখানি দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ায় হয়তো লজ্জাও পেয়েছিল মনে মনে। মাথা নীচু করে চোখ মুছতে মুছতে দ্রুত পায়ে ভিতরের দিকে চলে গেল। দিলীপও যেন আপাততঃ ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় সামনের বারান্দায় গিয়ে হাঁফ ছাড়ল।

সব কটা জানালাই খোলা। ঘরের মধ্যেও রীতিমত রোদের তাত বোঝা যাচ্ছিল। নির্মলা একে একে সেগুলো বন্ধ করে দিয়ে খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। রোগীর বুকের উপর থেকে গা-ঢাকা চাদরটা এক পাশে সরে গিয়েছিল। তুলে যখন ঠিক করে দিচ্ছিল, বিজন ওর সেই আঙুল কটির উপর হাত রেখে বললেন, এ কদিন আসনি কেন?

নির্মলা হাতটা টেনে নিল না। বলল, এই তো এলাম। কিন্তু আর কথা না।

যথেষ্ট বকবক করেছেন। এবার একেবারে চুপ।

—আর কয়েকটা ঘণ্টা। তারপর আর বকবক কেন, একটা কথা বলতেও আসব না।

নির্মলা এবার আস্তে আস্তে হাতখানা মুক্ত করে নিল। তারপর কয়েক মুহূর্ত রোগীর মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা, বলতে পারেন, আপনাদের নার্সিং হোমে না কি সেখানে কী আছে?

এই আকস্মিক অসংলগ্ন প্রশ্নে বিজন প্রথমটা একটু চমকে উঠলেন। তার পর ধীরভাবে বললেন, সেকথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

—এমনিই; জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।

—সেখানে আমার মত রুগীর দেখা-শুনো করবার লোকজন আছে। আর কী থাকবে?

—কারা তারা?

—নার্স, অ্যাটেন্ডান্ট এইসব।

নির্মলা আবার মুহূর্ত কয়েক কী ভাবল। তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, তারা কি আমার চেয়েও বেশী আপনারজন, আমার চেয়েও বেশী দেখাশুনো করবে?

বিজন ব্যানার্জি শূন্য বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এ কী বলছে নির্মলা! এ কি ওরই মুখের কথা, না তাঁর অসুস্থ মস্তিষ্কের শ্রুতি-বিভ্রম? সত্যিই কি এই অক্ষম অচল একান্ত পর-নির্ভর মরণাপন্ন মানুষটার দীর্ঘ কঠিন পরিচর্যার ভার সে নিজের হাতে তুলে নিতে চায়?

নির্মলা অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার এদিকে চোখ ফেরাতেই বললেন, তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, নির্মলা।

—থাক; আপনার আর বুঝে কাজ নেই।

—বেশ; তবে তাই হোক। আর বুঝতে চাই না।

গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বিজন আবার চোখ বুজলেন। রোগপাণ্ডুর মুখের উপর একটি আশ্বাসময় পরম শান্তি ভাস্বর হয়ে উঠল।

সামনের বারান্দায় দিলীপের সঙ্গে একটা অচেনা উঁচু গলা কথাবার্তা শুনে নির্মলা একটু বিরক্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে রে, খোকা?

—অ্যাম্বুল্যান্স এসেছে মা।

—অ্যাম্বুল্যান্স!

—হ্যাঁ, কে একজন বিমান ব্যানার্জি পাঠিয়েছেন ওঁকে নিয়ে যাবার জন্যে।

—ও, উনি তোর মেসোমশাই, ওঁর দাদা। বলে দে, দরকার হবে না, আর তিনি যেন এখখুনি বাড়ি চলে আসেন

খোকা অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে নির্মলা এবার তাড়া দিয়ে বলল, বুঝতে পারছিস না।

তার মুখ থেকে বিমুগ্ধ সুরে শুধু একটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে এল—মা! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ চলে যাচ্ছিল। নির্মলা আবার ডেকে ফেরাল—'আর শোন বাহাদুরকে বল, ও-বাড়ি থেকে আমার জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে আসুক গোকুল-কাকাও যেন ঐ সঙ্গে আসে।'

দুটো করে সিঁড়ি একসঙ্গে ডিঙিয়ে দিলীপ ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে গেল

।। সমাপ্ত ।।

সার্থবাহ

আধুনিক ফরাসী নাটক

উৎকণ্ঠা, বাস্তব ও বাচনিক

ভিক্তর উগো কিম্বা কাত্যুল্ মেন্দেস্-এর মতন ঊনিশশতকীদের অপছন্দ সত্ত্বেও রাসীন যে ফরাসী জাতির প্রিয়তম কবি ও নাট্যকার তা'তে সন্দেহ নেই। যে বনেদী আলেকসাঁদ্রাঁ ছন্দের দ্বাদশ-মাত্রিক সংগঠনে রাসীনের সমুদয় নাটকীয় উক্তি, তা'র সৌন্দর্য ও প্রসর চপল আধুনিকের কানে যদিও বেখাপ্পা শোনাতে বাধ্য, তবু অন্ততঃ রাসীনের স্বদেশে এখনো লোকে তাঁর নাটকগুলি সোৎসাহে পড়ে, আবৃত্তি করে। জার্মান কন্সেনট্রেশন ক্যাম্পের বন্দী এক ফরাসী ডাক্তার কী ভাবে আত্মিক শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে কবিতা পড়েন—লুই আরাগঁ'র 'প্রতিরোধের' কবিতা নয়,—প্রাচীন রাসীনের 'বেরেনিস্' নাটকের অংশবিশেষ, সেকথা, স্বয়ং আরাগঁ'ই আমাদের জানিয়েছেন।—১

হেরিছো, ফেনিস্, এ-কি আশ্চর্য
বিভায় পূর্ণ আজিকার নিশা,
হয়নিক ভরপুর, বলো সখী,
এ-মহিমা হেরি তব দিশা।—(২)

রোমক সম্রাট তিতুস্-এর প্রেমাস্পদ তিনি, এই প্রত্যয়ে প্যালেস্টাইনের রাণী, বেরেনিকে, সহচরী ফেনিসের কাছে ঐ ভাবে তাঁর সুখাতিশয্য ব্যক্ত করেন। প্রেমমোহিতা রাণী, যিনি অবশ্যই জানেন না যে শেষাবধি তিনি বাধ্য হবেন রোম ছেড়ে চ'লে যেতে,—কী আশ্চর্য বিভায় তিনি নিজেই না পূর্ণ। আর কতো স্বচ্ছন্দ ঘটনাবিন্যাস ও সজীব চরিত্রায়ণে রাসীন প্রস্তুত করেন প্রেমাতুরা বেরেনিককে তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য ঃ তিতুস্-এর পাশে এনে তিনি দাঁড় করান প্রেমিক আন্তিয়োকুসকে, দোটানার যন্ত্রণা থেকে মহীয়সী বেরেনিককে মুক্তি বেছে নিতে দেন চূড়ান্ত ত্যাগের পথে। কবিতা—রাসীনীয় আলেকসাঁদ্রাঁ ও শব্দমাধুর্য আরো সংহতি পায় নাট্যকার রাসীনের অপর একটি কৃতিত্বের যোগ-সাজসে, যার মারফত, যেমন এমিল ফাগুয়ে বলেন, রাসীন সমন্বয় করেছেন মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পর্য-বেক্ষণের ভাণ্ডার।' কাব্য ও মনস্তত্ত্ব, অথবা, আরো স্পষ্টভাবে, এক মর্মানুসন্ধানী কাব্যিকতা, নানান হেরফেরের মধ্যে দিয়ে অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত ফরাসী নাটকের চরিত্র নিরূপিত ক'রে দিয়েছে ঐতিহ্যে যেন তা'র রাসীনীয় অন্তঃসার স্মরণ ক'রেই।

নাটককে কাব্যিক আচরণ করতে শেখানো আধুনিক ফরাসী নাটকের একটি প্রশংসনীয় ধর্ম। এবং এই স্বধর্ম রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তা'র বিনাশও যদিও বিশশতকী ফরাসী নাট্য-চর্চায় অচেষ্টিত থাকেনি, তবু রক্ষায়ই যে তা'র এক স্বাভাবিক বাহাদুরি প্রকাশিত, একথা সর্বদা স্বীকার্য। বলা বাহুল্য যে, আধুনিক ফরাসী কবিতার অগ্রগতি ও তা'র অবদান যে বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক পরিমন্ডল, তা এই কাব্যিক নাট্য-চিকীর্ষাকে সাহায্য করেছে। নাটকে কাব্যিকতার চরম উৎকর্ষ (যা কখনও কখনও নাটকের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে) সম্ভব করে ত্রিস্তা ৎসারার 'ল্য ফুইৎ' ও (পলায়ন)-এর মতো নাটক। ৎসারা অবশ্য সোজাসুজি 'নাটক' বলেন নি তাঁর রচনাটিকে। 'একটি নাটকীয় কবিতা', 'ল্য ফুইৎ' নাটকের যাবতীয় হাঙ্গামা পোয়ায়, চারটি অঙ্কে ও ঊনিশটি দৃশ্যে বিভক্ত হয়, চরিত্র-নির্মাণে প্রয়াস পায়, সংলাপগত আদান-প্রদানকে অবলম্বন ক'রে এগিয়ে যায়। বাবা, মা, ছেলে ও মেয়ে এই চারজনের একটি পরিবার। শান্ত, বৈচিত্র্যহীন, কিন্তু গতানুগতিক নয়. কারণ এই পরিবারের সকলেই অতিমাত্রায় মানসিক। ৎসারার এই নাটকে শক্তি একমাত্র সংলাপে এবং সেই সংলাপ. আগাগোড়া তাৎপর্যপূর্ণ ও অসাধারণ. উক্ত মানসিকতার অনুপ্রেরণায় স্বাভাবিক কথোপকথনেই রূপ পায়। ভাষা কখনও কবিতার, কখনও গদ্যের, কিন্তু কদাচই বাচন তা'র নিবিড় তাত্ত্বিক মোচড় হারিয়েছে। শুরু থেকেই বাবা মা'র কথাবার্তার বিষয় হয় সন্তান। দুজনেই কোনও মীমাংসিত জনক-জননীর দায়িত্বে সন্তানকে অধিকৃত করতে অপারগ। সত্তার সমস্যায় বেয়াড়াভাবে আক্রান্ত তাঁরা. সাংসারিক পাটিগণিতে আস্থা হারিয়ে অনুভবে আর জিজ্ঞাসায় দীর্ণ। ৎসারার নাটক যে পারিবারিক বিপর্যয়কে কেন্দ্র ক'রে ওঠে, তা হচ্ছে ছেলেটির গৃহত্যাগ ঃ বাবা, মা ও বোন, এদের সকলকে জানিয়ে, তা'র দুরারোগ্য অশান্তি ও অসীমার তাড়নায় ছেলে সংসার ছেড়ে চ'লে যায়। বাধা দেবার আজ্ঞা বা অনুরোধ দানা-বাঁধতে পারে না ছেলেটির নিষ্করুণ ঔদাসীন্যের সামনে। সে চ'লে যায় কোনও প্রতিবাদের নাটকীয় নির্ঘোষে নয়, কিম্বা, মরমীর দুঃসাহসে ভর ক'রেও নয়; কেবল নিরর্থক পারিবারিক সংযোগটা ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। কবি-নাট্যকার ৎসারা সরল কথ্য ভাষাকে ধারালো করেন তাঁকে এক নিঃসঙ্কোচ ভাব-সমৃদ্ধি দিয়ে। পলায়নের আগে ছেলেটি বলে ঃ

খুশির খাঁচায় আমি বন্দী ছিলাম
শেষ সুযোগ পর্যন্ত খেলেছি খুশি নিয়ে
ক্ষতি হয়নি আমার লাভ হয়নি
আমি যা তা-ই আছি।

নিখোঁজ ছেলেটির বৃত্তান্তে রূপকথার ছোঁয়াচ লাগাল গায়ক (লে রেসিতাঁ) ঃ 'আমি তাকে দেখেছি দুঃখ-পেতে ও আনন্দ করতে। বিস্তর প্রস্তুতি নিয়ে আসে তা'র দুঃখ। স্বল্পেতেই আসে আনন্দ। একটা কমলালেবু তাকে আনন্দিত করে। একটা পাথর। পুরানো একটা মিল্। একজন পাদ্রী তাকে হাসান।...' দৈবতালাপ, যদিও অনাড়ম্বর তবু অন্তর্নিহিত কাব্যশক্তি সর্বত্র তাকে রেখায়িত করে ঃ গায়ক মেয়েটির স্থৈর্য লক্ষ্য ক'রে বলে।—

আর তুমি, স্তব্ধতা, যে দেখো
বন্ধুদের বিলয়
আর তাদের পুনরাগমন
ভিন্নভিন্নরূপে তুমি জানো তারা একই
অবলুপ্তিগুলি আর চিরন্তন
সারূপ্যের বিস্মরণ
নির্জন করেছে তোমার চিত্ত......।

জন্মসূত্রে রুমানিয়ার লোক ৎসারা ও কুলীন ফরাসী জাঁ কক্তোর মধ্যে ফারাক্ কখনই অপ্রচুর হয়নি অবশ্যই, তবু নাট্যকার কক্তো ৎসারার মতোই কাব্যিক একথা বোধহয় সত্য। অবশ্য সুররেয়ালিস্ত ৎসারার কাব্য-ভাবনা বা তার বিশেষ আঙ্গিক, মানবিক কক্তোর কাব্যচিত্তে স্থান পায় না একটুকুও। স্বচ্ছভাবে বুদ্ধিজীবীও থাকেনি কক্তো। কিন্তু কক্তোর নাটক-গুলিতে বস্তুতান্ত্রিক বিশ্বের যে-রূপায়ণ তা এক রূপময়ী কল্পনায় যাদুতে

প্রাথমিকভাবেই প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে পৃথক। কবিতা, নৃত্য, গীত ও চিত্র-বিদ্যা যে-ককতোকে আকৃষ্ট করে, তাঁর পক্ষে নাট্যলোকের অনুসন্ধান কল্পনার দৌরাত্ম্য ত' সইবেই। যে-ককতো ফিল্মের জন্য 'সুন্দরী ও পশুর রূপ-কথা' বেছে নেন, তাঁর বৃদ্ধ বয়সে লিখিত কাব্যগ্রন্থখানি ('লে নাপ্ দ্যু কাত্রাল') স্বহস্তে চিত্রিত করেন, 'মৃত্যু ও যৌবন' ('লে জ্যুন্ অম্ এ লা মর্')-এর মতো ব্যালের পরিকল্পনা করেন, কিম্বা 'বাথুস্'-বিষয়ক নাটক লেখেন, তাঁর কাব্যিকতা দুর্মর ও সুপরিস্ফুট। রুশ নাট্য-পরিচালক দিয়াঘিলেফের 'ব্যালে রুশ'-এর অভি-নয়ার্থে লিখিত রচনাগুলি থেকে ককতোর বিখ্যাত 'লা মাশিন এ্যাঁফেরনাল' (নারকীয় যন্ত্র) ও 'লেগ্‌ল্ আ দ্যু তেৎ' (দুমুখো ঈগল) পর্যন্ত ককতোর কাব্যধর্মী—নাট্য-প্রতিভার নিদর্শন বিনাস্ত। তাঁর একটি একাঙ্কিকার ভূমিকায় ককতো জানান যে উক্ত নাট্য-রচনার তাগিদ এসেছে প্রথমতঃ সেই 'অলৌকিক তাড়না' থেকে যা কবিকে আলস্য ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সত্যই এই একাঙ্কিকার প্রেরণা তথা রচনা পুরোমাত্রায় কাব্যিক, যদিও গদ্য—নেহাত সাদামাঠা, অপরিচ্ছন্ন গদ্য—এর ভাষিক মাধ্যম। 'লা ভোয়া কাম্যুমেন' S (মানবিক স্বর)-এ বিষয়-বস্তু, পাত্রপাত্রী, মঞ্চনির্দেশনা ও সংলাপ সবকিছু এক কবি-নাট্যকারের সৃষ্টি। একটি টেলিফোন-আলাপের দৃশ্যে এই একাঙ্কিকার সমগ্র কার্যক্রম ব্যক্ত। সংলাপ বলতে অজস্র ছেদবিন্দুতে বিছিন্ন কতকগুলি বাক্য রিসিভারের মধ্যে বলে যায় এক রমণী—; অপর প্রান্তে তার প্রেমাস্পদ। দ্বিতীয়জনের উপস্থিতি বা কথাবার্তা, বলা বাহুল্য, কেবল অনুমেয়। তার কথাবার্তার রকম ও গতির কিছুটার অবশ্য আন্দাজ মেলে রমণীর উক্তি থেকেই। ঐতিহ্য-সিদ্ধ সর্বপ্রকার নাট্য-রীতি থেকে ভিন্ন ককতোর এই শিল্প; কার্যক্রম, চরিত্র, সংলাপ সব কিছুতেই এখানে ব্যতিক্রম। মঞ্চের উপর দেখা যায় কেবল একাকিনী রমণীকে তার শয়নকক্ষের টেলিফোন-সম্বল নির্জনতায়। তার কথার ঢঙে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা, উদ্‌ভ্রান্ত ওঠা-বসায় স্নায়বিক দুর্বলতার সাক্ষ্য। যে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে আমরা তাকে দেখি, তা যেন এমনিতেই একটি ব্যঙ্গ—সাদা ঘরের ফাঁকা শয্যায় ও যান্ত্রিক সাহচর্যে নির্বাসিত আধুনিকা। তার উপাখ্যান নগণ্য কি মূল্যবান প্রশ্ন তা নয়,—তার নৈঃসঙ্গ্য মর্মস্পর্শী। আরো মর্মস্পর্শী, ককতোর কাব্যিকতাকে ধন্যবাদ, সেই হাস্যকর দ্বৈতালাপ, যাতে অপর পক্ষ অদৃশ্য নাট্য-চক্রান্তে লিপ্তিহীন। বাচ-নিক উৎকণ্ঠা প্রকাশের এমন চতুর প্রণালী ঐতিহাসিক 'স্বগতোক্তি'কে কী যুগোপযোগী প্রয়োগ শেখায়!

ফরাসী নাটকের ভাবসংগ্রহে নিছক বাস্তবের চাইতে চমৎকারী ঠেকেছে কাল্পনিককে। ককতোর 'লা মাশিন এ্যাঁফেরনাল'-এ স্থান প্রাচীন গ্রীক শহর থেবাই। বস্তুতঃ বর্তমান শতাব্দীতে থেকে-থেকে ফরাসী নাটক যে-ধ্রুপদী মালমসলা ব্যবহারের প্ররোচনা পেয়েছে, তাতে তার কল্পনাবিলাসই ধরা পড়ে। গ্রীক নাটকের মূলতঃ পৌরাণিক আখ্যানগুলিতে, কিম্বা, রোমক সাহিত্যে ও ইতিহাসে, যে চিরন্তনতার স্বাদ, তাদের অন্তর্নিহিত কাব্যে ও প্রতীকী মর্মে যে গভীরতা, আধুনিক ফরাসী নাট্যকাররা সেই সার-গর্ভতার প্রতি আস্থাবান। কোনও হেলেনিস্টিক চর্চার সাক্ষ্য না-হয়ে, এই পুরাচর্চা ফরাসীদের কল্পনাপ্রবণতার কথাই বলে। য়ুলিসিসপ্রমুখ অনেক স্মরণীয় চরিত্রের সন্ধান দেয় গ্রীক পুরাণ ও নাটক; রোমক ইতিহাসে ও সাহিত্যের পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে বর্ণময় চরিত্র ও ঘটনা। সেগুলির বেশ কিছু আধুনিক ফরাসী নাট্যকাররা কাজে লাগিয়েছেন। সময়োপযোগী নাটকীয় রূপান্তরে বিংশতকেও আবির্ভাব ঘটান সার্ত্র ওরেস্তিসের, ককতো ওরফেয়ুসের, আনুয়িল অয়াদিকি ও আন্তিগোনির, জিদ ঈদিপুস্ ও থেসেউসের। কাম্যু রোমকসম্রাট কালিগুলার। আপোলিনে-য়ার, যদি নিদারুণ তামাসাচ্ছলে, তাইরেসিয়াসের। জিরোদু ইলেক্‌ত্রা ও আম্‌ফিত্রিয়োনের।

উপরোক্ত নাট্যকারদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই পুরাচর্চা অবশ্য তীব্র মান-সিকতার নির্দেশে চালিত এবং দস্তুর-মতো আধুনিক ক্ষেত্রেই প্রযোজিত। কল্পনা-গৌরব এঁদের রচনায় যেমন সুলভ, তেমন বাস্তব-সম্পৃক্ত ভাবনা কদাচই বানচাল। এবং প্রহসনের মেজাজ যদি বা আনুয়িল ও জিরোদুতে খুব বেমানান নয়, সার্ত্রে বা কাম্যুতে তা একেবারে দুর্লভ। তবু মলিঅ্যারের দেশে প্রহসনের লোপ অচিন্ত্য, এবং এই প্রহসন রচনায়ও ফরাসী নাট্য-প্রতিভা যে কতদূর কল্পনাক্রান্ত, তার উদাহরণ-স্বরূপ নাম করতে হয় কবি আপোলি-নেয়ারের 'লে মামেল্ দে তিরেসিয়া' ও (তাইরেসিয়াসের স্তন)-র। দুই অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকটির ভাষা কবিতা এবং উপজীব্য, এক কথায় যৌন অসহযোগ (আপোলিনেয়ারের ভাষায়, 'repopu-lation'-এর সমস্যা)। মৈথুনরত সর্প-দুটির একটিকে হত্যা করার অপরাধে (ভারতীয় 'নিষাদের' মতো) পুরুষ তাই-রেসিয়াস্ কিছুকালের জন্য স্ত্রীত্বে অভিশপ্ত হয়েছিলেন, এই পৌরাণিক

কাহিনীর দিকে চোখ রেখে, অতি-কাব্যিক আপলিনেয়ার একটি আষাড়ে গল্প ফে'দেছেন নারীপ্রগতি-চিহ্নিত আধুনিক জীবনকে নিয়ে। তামাসা ঠাসা, অলীক, তবু কাল্পনিক ও বাচনিক কৃতিতে অসামান্য, এই প্রহসনে পুরাণ কথাও ডিগবাজি খায় আপলিনেয়ারের হাতে। এই নাটকে প্রথমতঃ স্ত্রী তেরেয়াস্ সজ্ঞানে তার স্তন দুটি বিসর্জন করে সন্তান-ধারণের কর্তব্যে ইস্তফা দেয় এবং জবরদস্ত একটি পুরুষ বনে। —

টের পাচ্ছি রাক্ষুসে পৌরুষ
আমি একটা ঘোড়া
মাথা থেকে গোড়া
আয় না তেড়ে ষাঁড়

এই বলে তার আকস্মিক পুরুষত্বের মহিমায় তেরেয়াস্ বিদায় নেয়। অতঃপর সন্ততির আবাহন, ধারণ ও পালন সব-কিছুর ঝক্কি পোয়াতে বাধ্য হ'ন পতিদেবতা। ঐ মতো ব্যবহারিক কাপুরুষত্বে দণ্ডিত, তিনি অদম্য যুক্তিতে স্বীয় অযৌনতার একটা ভাষ্য খাড়া করেন যখন রাজপথে তাঁকে তরুণী ঠাওরায় এক নরশার্দুল সান্ত্রী— ।—

সান্ত্রী
চপলা রমণী—
(কটাক্ষ হেনে)
একটা সুন্দরী মেয়ে ত' বটে
স্বামী (স্বগতে)
সান্ত্রী ত' বলেছে ঠিক
স্ত্রী আমার পুরুষ যখন
নারী আমি যথার্থই হই
(সান্ত্রীর প্রতি সলজ্জভাবে)
আমি হচ্ছি একটা সাচ্চা নারী-পুরুষ
স্ত্রী আমার একটা পুরুষ-নারী—

এরপর 'প্রকৃতি পত্নী-ব্যতিরেকে সন্ততি-দান করে'; মাত্র একটি দিনে স্বামীটি ৪০ ০৪৯টি সন্তানের জনয়িতা হ'ন; সেই তাজ্জব শিশুদের কান্নার 'আধুনিক সংগীতে' তাদের উদ্ভট পিতাকে আশ্বস্ত করে যে 'দরকার নেই আর রুশ ব্যালে দেখতে বা ভিয়ো কলম্বিয়েতে যাবার'; মার্কিণ সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে স্বামী জানান যে 'ভলতে' বা ইচ্ছাশক্তিই সবকিছু সম্ভব করে। প্রহসনের নিষ্কলঙ্ক ছক আপলিনেয়ারের, তবু তারই মধ্যে, কল্পনার রাশ না-টেনে ধরেও, তিনি চিন্তার খোরাক জোগান। প্রতীকী তাৎপর্যও হয়ত এই নাটকের আছে। কিন্তু তাছাড়া শুধু প্রহসন হিসাবেই এই কাব্যিক প্রচেষ্টা অভিনব এবং আর কিছু না-হলেও, কেবল এর ভাষা, যা একাধারে স্বাভাবিক ও কলাকৌশল-চিহ্নিত, কাব্যনাট্যের ভাষিক অবধারণে উল্লেখ্য সংযোগ।

'তাইরেসিয়াসের স্তন'-এর ভূমিকায় আপলিনেয়ার জানিয়েছেন "আমি আমার 'সুররেয়ালিস্ত,' * নাটকটি লিখেছি মুখ্যতঃ ফরাসীদের জন্য যেমন আরি-স্তোফানিসের কমেডিগুলি রচিত হ'ত আথেনিয়ানদের জন্য?" এবং আপলি-নেয়ার-সৃষ্ট তেরেয়াস্-এর মধ্যে আরি-স্তোফানিসের নায়িকা লিসিসত্রাতিকে দেখতে পাওয়া যেমন কষ্টকর নয়, তেমন এ-ও স্বীকার করতে হয় যে, আপলি-নেয়ারও গ্রীক রসিকপ্রবরের মতো ঠাট্টা-তামাসা ও হাসির হুল্লোড়ের মধ্যে দু-একটা হক্ কথা বলার ব্যবস্থা করে নেন। 'উদ্দেশ্যমূলক' রচনার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও, আপলিনেয়ার অবশ্যই কল্পনার উদ্যোগকে অভিনন্দিত করেননি। আলোচ্য নাটকটিতে তিনি এ-ও কবুল করেন যে, জন্মনিরোধ ব্যতীতও রাষ্ট্রোন্নতি সম্ভব।

প্রান্তিক-ঊনিশশতকী আলফ্রেদ জারি ও এদমঁ রস্তাঁ এবং বিশশতকী গিয়োম আপলিনেয়ার ও জুল রোমাঁ প্রহসনের ক্ষেত্রে যে-কাব্যিক কল্পনার প্রাচুর্য সূচিত করেন, তার সার্থকতর ব্যবহার পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্ত নাটকে বা ট্রাজেডিতে। আধুনিক ফরাসী নাটক, যার প্রতিনিধি ক্লোদেল, সার্ত্র, কাম্যু ও জেনে, অধিকাংশেই ট্রাজেডিতে সংজ্ঞিত এবং তার মূর্তি কাব্যিক। ফরাসীতে দস্তুরমতো কাব্য-নাট্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যদিও পল ভালেরিকে সন্দিহান দেখা যায় **, তবু তাঁর সন্দেহ কেবল নাটকের ভাষা নিয়েই। ভাষা অবশ্যই পদ্য নয় আধুনিক ফরাসী ট্রাজেডির যে-হিসাবে রাসীন, কর্ণেই বা শেক্স-পীয়রের নাটকগুলি পদ্যে লিখিত। কিন্তু ভাবনায় ও ভঙ্গিতে এই আধু-নিকেরা যে অনেকাংশে কাব্যিক, তার প্রমাণ কেবল কবি ক্লোদেলের নাটক-গুলিই নয়। 'কাব্যিক' কথাটি যখন ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত,—এবং বস্তুতন্ত্র অপেক্ষা কল্পনাবিলাসে সামাজিক অপেক্ষা পৌরাণিকে বা ঐতিহাসিকে ও বক্তব্য অপেক্ষা বাচনে যে-ঝোঁক নাটকে প্রতিফলিত তাকেই যখন 'কাব্যিক' বলি, তখন সার্ত্রের 'লে মুশ' (মাছি)' বা কাম্যুর 'কালিগুলা' বা জেনের 'লে বন্' (পরিচারিকারা) গদ্যে লিখিত হয়েও কাব্যিক যেমন কাব্যিক ক্লোদেলের 'লা' নস্ ফেৎ আ মারী' বা 'লে স্যুলিয়ে দে সাত্যাঁ'। সার্ত্রের নাটকটিতে ওরে-স্তিস্ (৬) তার পিতৃভূমি আরগস্ নগরীতে ফিরে আসে, কিন্তু এই প্রত্যা-বর্তনকে গোড়া থেকেই এক প্রতীকী আবহাওয়ায় ভাববাদী পুষ্টি দেন সার্ত্র। সার্ত্রের ওরেস্তিস্ সেই রীতিসঙ্গত, প্রতিহিংসাপরায়ণ, বীর রাজকুমারই শুধু নয় যে মুক্তি পাবে তার পিতৃ-হন্তাকে ও তার ব্যভিচারিণী জননীকে বধ করে এবং পরিশেষে মাতৃহত্যার সরব গ্লানিতে পালিয়ে যাবে। সার্ত্রের নাটকে যুরিপিদিসীয় সদাসত্যের পরিমিতি ছাপিয়ে যায় মুক্তির চিন্ময় দ্যোতনা। সার্ত্রের ওরেস্তিস্ প্রতিপক্ষরূপে পেয়েছে দেবাদিদেব জিউস্কে পর্যন্ত, যে-জিউস্ ব্যভিচারীকে দণ্ড দেন অহর্নিশ তার ওপর একদল ক্লেদাক্ত মাছির ঝাঁক ছেড়ে দিয়ে। সার্ত্রীয় ওরেস্তিস্ কোনও পারিবারিক শক্তি নয়, কোনও ব্যবহারিক কর্তব্যপালনে সে আসেনি। তার মাতা ক্লিতাইম্-নিস্ত্রা ও পিতৃহন্তা আগিস্থুস্ তার কাছে সেই আচরিত ক্লিন্নতারই দায়ভাগ.

* প্রসঙ্গতঃ আপলিনেয়ারের এই ভূমিকায়ই 'সুররেয়ালিস্ত' শব্দটির জন্ম।

**'Notes on Tragedy and a Tragedy' : THE ART OF POETRY —Paul Valey. Routeledge & Kegan Paul, London.

যা জিউস-দেবতাদের আধ্যাত্মিক ছত্র-ছায়ায় নির্বিঘ্নে তার ঐতিহাসিক বৃত্তি ভোগ করে যুগে যুগে। এই ওরেস্তিস্ যে-উৎকণ্ঠা ভোগ করে তা যেন 'একটি সমগ্র জাতির পাপ' * থেকে উৎপন্ন। তাই যেখানে য়ুরিপিদিসীয় ওরেস্তিস্ পেরীক্লেসকে তার ভগিনী ইলেক্‌ট্রাকে ছেড়ে যাবার ব্যথায় মুহ্যমান কেবল খেদোক্তিতে বলে : 'তবু আমি চলে যাচ্ছি পৈতৃক ভিটে ছেড়ে' * * সেখানে সার্ত্রের নায়ক-হত্যার কালিমার সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত ক্লিষ্টতা—জিউসের সেই ভয়ানক মক্ষিকাকুল কাঁধে নিয়ে মুক্তি দিয়ে যায় আরগসবাসিদের। পাপের আতঙ্ক থেকে মুক্তি, মুক্তি কুসংস্কার ও অনুতাপের তামসিকতা থেকে—এই নব্য ওরেস্তিসীয় সম্পাদ্যের নাটকীয় উৎক্রান্তি, গ্রীক নাট্যকার হয়ত যার স্বাদ পর্যন্ত পা'ননি। সার্ত্রের ওরেস্তিস্ তার পিতৃরাজ্যের, কিংবা, তার ভগিনী ইলেক্‌ট্রার প্রতি কোনও অভ্যাচারী-ভালোবাসায়, নাগাল থেকে পালিয়ে যায় না। সে চায় 'এক প্রজা-হীন, রাজ্যহীন রাজা' হতে; একটি জাতির মুক্তিদাতা তবু মানুষিক, নির্ভীক তবু করুণ এই ওরেস্তিস্ গ্রীক নিয়তিবাদের সমর্পিত নায়ক, দেবতার ক্রীড়নক আর নেই।

পল ক্লোদেলের নাটকে ভাষায় ও আখ্যানে স্পষ্টতঃ এক দূরবর্তিতা; চরিত্রগুলি সুপরিচিত পার্থিবতার চাইতে কোনও বিশেষ আদর্শানুকূল আধ্যাত্মিকতার মুখপাত্র হতেই প্রস্তুতঃ; বক্তব্যে ওতপ্রোত কোনও মরমী নির্দেশ। স্থান-কাল-পাত্রের জন্য তাই তাঁকে বার-বার চমকপ্রদ অতীতে প্রস্থিত দেখা যায়। নাট্য-সংঘটনে ক্লোদেলের কল্পনা কতদূর কাব্যিক—রূপকের উজ্জীবনে তিনি কত-দূর নাটকীয় হতে পারেন,—তা'র একটি উদাহরণস্বরূপ : বিবাহিতা হিস্পানী রমণী, দোনা প্রুয়েথে, তার খরপার এক-পাটি রেখে যান কুমারী মেরীর মূর্তির সামনে এই প্রত্যয়ে যে যদি তাঁকে অবৈধ প্রেমের পাপপঙ্কিল পথে দৌড়ে যেতেই হয় কখনও, তবে সেই যাওয়া হবে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। কিন্তু এমতো বিসদৃশ ব্যবহার না-ক'রেও জাঁ জেনের 'দাসী দুজন', যারা অবশ্য দোনা প্রুয়েথের মতন

---

* 'Les peches d'un peuple'—'Angolsse', Mallarme.

* * 'আজি এগো ওইকন্ এক্সেমি পাত্রোস্'—Electra, 1.1316

অতীতকালীন বা আধ্যাত্মিক নয়, এমন কিছু করে যা সত্যাই রোমহর্ষক, কিন্তু যাতে মানবিক অস্তিত্বের এক জটিল সমস্যা-আত্ম-নির্ণয়, তা'র মীমাংসা খুঁজে পায় আত্ম-হননে। জেনের নাট্যপ্রতিভায় সামাজিক-নাটকের আপাতঃ নগণ্য ঘটনাচক্রের মধ্যে সম্ভব হয়েছে কাব্য ও মনস্তত্ত্বের আশ্চর্য সঙ্গম। জেনের 'পরিচারিকারা' (৭) নাটকে ক্লোদেল-শোডন লোকোত্তরগন্ধী বিশেষ বাতাস প্রবাহিত নয়, কিন্তু সহানুভূতি ও মর্মোদ্ধারের পন্থায় প্রাগ্রসর জেনে বাস্তবের ভূস্তরগুলি ভেদ করেন এবং পৌঁছান সেই অন্তরঙ্গ আধারে যেখানে লুক্কায়িত মানুষের হৃদ্‌গত। (সেই হৃদ্‌গতে অবশ্য সর্বদা তৃষ্ণানিবারক জলের শান্তি নেই; সে-তরল গরল বা সুধা বা বরফ-জমা বিস্বাদ কঠিন)। পরিচারিকা দুই বোন সোলাঁজ্ ও ক্লের্, দাসীত্বের দুরপনেয় গ্লানিতে মজ্জমান, কতকটা প্রাহসনিক ভাবভঙ্গিতে অভিনয় করত তাদের মনিবপত্নী মাদামের, তিনি যখন বাড়ী থাকতেন না। এইভাবে অভিনয়ের জগতে অন্ততঃ তা'রা খুঁজে পেত তাদের দাসীত্বের অবসান আর সেই মিথ্যাচরণের স্নায়বিক উত্তেজনায় দুই আত্মসচেতন দাসী তাদের ব্যক্তিস্বরূপের বিকট অপদার্থতাই বুঝি শি'খত। তারপর এদের মগজে এলো চায়ের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে মাদামকে হত্যা করার মতলব। ঘটনাটি এই পর্যন্ত হয়ত প্রভুত্ব-দাসত্ব দ্বৈতের এক স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। কিন্তু জেনের নাট্য-প্রতিভা নিঃসংশয়ে এই জাগতিক কাহিনীটিকে তা'র চরম মহত্ত্বে উপনীত করে যখন, মাদাম-বিনাশে ব্যর্থ হয়ে ঐ দাসী বোনদের ছোটজন, ক্লের, মাদাম সেজে স্বেচ্ছায় সোলাঁজ-এর হাত থেকে বিষাক্ত চায়ের পাত্রটি মুখে তুলে নেয়। মুক্তির উৎকণ্ঠায় ক্লের্-এর ক্ষুরধার আত্মশক্তি তা'র দাসী বড় বোনকে অন্ততঃ রূপকের প্রহেলিকায়ও একবার রাণী মাদামের বিলোপ ও মুক্তির অমরতা টের পেতে দেয়।

নাটকীয় রূপান্তর যতো আতিশয্যান্বিতই করুক-না সোলাঁজ-ক্লেরের মুক্তি সাধনা, তবু জেনের বাস্তবিকতা শ্রদ্ধেয় থাকে। মানসিক উৎকণ্ঠার প্রকাশ জেনেতে বাচনিক কলার কাছে ঋণী বটে, তবু অনিবার্য এক হৃদ্‌গত চক্রান্ত এখানে তা'র মর্মস্পর্শী স্বরূপ উদ্ঘাটিত করছে বাস্তবের প্রত্যক্ষ আঙ্গিকে। আলবেয়ার কামুর 'কালিগুলা'য় (৮) কিন্তু এক স্বৈরাচারী রোমক সম্রাট অসংজ্ঞিত শক্তির মরীচিকার পিছনে ছোটেন যে-উদ্বেগের তাড়নায় তা'র অনেকখানি নাট্য-বাচনের কৃতিত্বেই প্রস্ফুট। লাতিন ঐতিহাসিক সুয়েতোনিয়ুসকে মানলে, সত্যাই ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে চাঁদ ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন কালিগুলা, কিন্তু বাস্তবে যা ছিল বড়জোর একটা খামখেয়াল বা দুঃসাহস, কামুর নাটকে তা এক প্রায়-দার্শনিক ভূমিকা লাভ করে।—

কালিগুলা : হ্যাঁ, আমি চেয়েছিলাম চাঁদকে।......আমার যেসব জিনিস নেই তাদের মধ্যে ঐ একটা।......কিন্তু আমি পাগল নই, বরং এতোটা সজ্ঞান কখনো হইনি আমি। আমি শুধু হঠাৎ টের পেয়েছি অবাস্তবকে।......এই 'অসম্ভব', যার সাধনা কালিগুলার অরাজক অস্তিত্বকে নিষ্ঠুরতা ও মৃত্যুর এক বিকৃত ইতিবৃত্তে পরিণতি দেয়, কামুর নাট্যধর্মে ব্যক্তিগত বিকৃতির ভাবে মীমাংসিত হয়নি। কালিগুলার উক্তিগুলিতে কামু সঞ্চারিত করেছেন এক আচ্ছন্ন গীতিময়তা, তাঁর ব্যাভিচারও নির্দয়তার দর্শন জুগিয়েছেন তাঁকে, ন্যায্য আততায়িদের হাতে নিহত হবার প্রাক্কালে তাঁকে স্বগতে বলতে দিয়েছেন হৃদয়-বিদারক আত্ম-গ্লানির সেই কথা, যাতে গন্ধের মতো লেগে যেন কোনও ঐতিহাসিক বিষাদ-সম্ভোগ : 'কালিগুলা', তোকেও শাস্তি পেতে হবে, তোকেও! তবে একটু বেশী বা একটু কম, প্রশ্ন শুধু এই নয় কি? কিন্তু নির্ধারহীন এই বিশ্বে, যেখানে নির্দোষ নয় একজনও, কা'র সাহস হবে আমাকে দণ্ডিত করতে ?...... ঐ শোনো, অস্ত্রের ঝনঝন্! নির্দোষের জয়যাত্রা শুরু হচ্ছে!......যদি পেতাম চাঁদকে, যদি প্রেম হতো যথেষ্ট, পাল্টে যেতো সব কিছু। কিন্তু এ তৃষ্ণা মেটাবো কোথায়? কোন হৃদয়, কোন দেবতা আমায় ধ'রে-দেবে হ্রদের প্রশান্তি ?......

(1) Cimetieres sans Tombeaux : Preface d'Aragon—Gilbert Debrise La Bibliotheque Francaise.

(2) Theatre en deux volumes : Racine, Nelson Editeurs, Paris, 1944. 'Berenice', I, v.

(3) La Fuite : Tristan Tzara, Gallimand.

(4) The Human Voice : Jean Coctean. Translated by Carle Wildman. Vision.

(5) Les mamelles de Tiresias : Guillaume Apollinaire. Editions du Belies Paris.

(6) Les Mouches : Jean Paul Sartre Gallimard.

(7) The Maids : Jean Genet. Translated by Bernard Frechtman. Faber se Faber.

(8) Caligula : Albert Camus. Gallimard.

এখন অন্ধকার আলোর চেয়েও বুঝি স্বচ্ছ।

অন্ততঃ চটের বেড়ার এপাশে শুয়ে শুয়ে তাই মনে হলো সমরেশের। তাই বাবার প্রলাপের মত বলে ওঠা কথাটা শুনেই বুঝলো ও, মা কাঁদছে। আজ সন্ধ্যা থেকেই কাঁদছে মা। যতক্ষণ ছোটরা জেগেছিল ততক্ষণ অবশ্য প্রতি-দিনের মতই সব কাজ করে গেছে মা। যেন কিছু হয়নি। সমরেশ জানে তখনও কেঁদেছে মা। মা আজ সন্ধ্যা থেকে কাঁদছে! আয় বাবা...। সেই ফিরে আসার পর থেকেই মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে বলছে।

"কাল আমার শেষ দিন। কাল ওরা আমার...।"

অন্ধকারটা এখন আলোর চেয়েও স্বচ্ছ। অন্ততঃ তাই মনে হচ্ছে ওর।

আর মনে হচ্ছে, আজ কিন্তু মার কাঁদবার কোন দরকার ছিল না।

এতকাল এই দীর্ঘ পঞ্চাশটা বছর বয়স পর্যন্ত সংসারের যে জোয়ালটা একটানা টেনে এসেছে, কাল থেকে সেটাকে আর টানতে হবে না। কাল থেকে বাবার ছুটি।

জ্ঞান হওয়ার পর আজ কুড়িটা বছর পর্যন্ত সে নিজেই তো দেখছে মানুষটাকে। অসম্ভব রকমের ভালো মানুষটাকে। ভালো, এ বিশেষণটা যোগ করতে গিয়ে একবারও সমরেশ এর জন্য ভালো করে ভাবলো না যে, মহাপুরুষের মত চরিত্রের মানুষ ছিল তার বাবা। এমনকি তেমন কোন ত্রুটিও থাকতো লোকটার জীবনে, তাহলেও সে আজ বলতো, নিশ্চয় বলতো ভারী ভালো মানুষটা।

ভালো এই জন্য যে এই বিরাট সংসারটাকে নিজের বুকের মধ্যে করে দীর্ঘ পঞ্চাশটা বছর আগলে এসেছে মানুষটা। এই জন্যে ভালো যে আজ চরম দুরবস্থার মাঝে পৌঁছবার পূর্ব-মুহূর্তে, নিজের বয়সের জন্য নয়, ক্লান্তির জন্য নয়, মানুষটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে তার ছুটি আসন্ন বলে।

আর মা। কোথায় আজ খুশী হবে, তা নয় কাঁদছে। সারাটা সন্ধ্যা ধরে আজ কেঁদেছে মা। এখনো নিশ্চয় কাঁদছে।

কেন?

প্রশ্নটা মনে আসতেই, নিজের কাছেই নিজে যেন লজ্জা পেল ও। আশ্চর্য! কতবড় নির্লজ্জ সে যে সাহস করে প্রশ্নটা করছে। আজ যদি সে নিজে কবিতা না লিখে, মিথ্যে গানের জন্য মত্ত না হয়ে একটা পথ খুঁজে নিত? যদি সে একবার ভাবতো মানুষটাকে এবার বিশ্রাম নিতে দেয়া দরকার। তাহলে আজ এই রাতে ঐ মানুষটার দীর্ঘশ্বাস শুনতে হোত না।

ব্যথা পেত না বাবা।

আর তা হলে মাও সারা সন্ধ্যা ধরে নিশ্চয় কাঁদতো না।

এ কান্না থামানোর মত কেউ নেই। তবু বাবা বলেছে:

তুমি এত ভেঙে পড়ো না।

মা যেন ভরসা পায়নি। কি করে ভরসা পাবে? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল ও। সে কি এমন করতে পারলো আজ পর্যন্ত যার জন্য ভরসা পেতে পারে বাবা মা?

কোন উত্তর নেই। এখন পর্যন্ত এর কোন উত্তর নেই সমরেশের কাছে। যার কিনা উত্তরটা জানা উচিত ছিল। সেটাই তো সব চাইতে স্বাভাবিক ব্যাপার হতো। সব সংসারে যেমন হয়।

হয়তো বাবা এতক্ষণ পর্যন্ত সত্যি সত্যি জেগে নেই।

কোন কালেই এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারেনি মানুষটা। সারাদিন একটানা পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে যেন একটা তীব্র তন্দ্রায় তলিয়ে যেত মানুষটা।

অন্ততঃ আজ কুড়িটা বছর ধরে; সেই জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এমনিই দেখে আসছে সমরেশ। এটা বাবার বরাবরকার। নিশ্চয় এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে বাবা।

কারণ আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত কান পেতে থেকেও কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছে না সে। তবু প্রতিমুহূর্তেই ওর মনে হচ্ছে বাবা আবার বিড় বিড় করে প্রলাপের মত বলে উঠবে।

কাল আমার শেষ দিন। কাল আমাকে ওরা...।'

(২)

অসহ্য এই অন্ধকার। অসহ্য এই রাতটা। কম্বলের মধ্য থেকে হাত-দুটোকে বের করে আনলো সমরেশ। ডানহাতখানা মাথার নীচে দিয়ে, বাঁহাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে নিজের চুলে বিলি কাটতে শুরু করলো ও। এটা ওর বরাবরের অভ্যাস। কোন কিছু ভাবতে

হলেই ওভাবে চুলে বিলি কাটে ও। চোখদুটোকে যতদূর সম্ভব টান টান করে অন্ধকারে ডুবে থাকা ঘরটার মধ্যে মেলে ধরলো।

কিছুই দেখা যাচ্ছে না। (যদিও আলোর চাইতেও স্বচ্ছ অন্ধকারটা)

তবু চটের বেড়ার ওপারে যাদের নিশ্বাসের শব্দ উঠছে, মা, বাবা, মন্টু, (মন্টুটার নাক দিয়ে বিশ্রী শব্দটা বের হচ্ছে রোজকার মত) ছন্দা—এদের সবার মুখই যেন দেখতে পেল সমরেশ। চটের আড়ালটা যেন স্বচ্ছ হয়ে গেছে।

সবাই যেন তার দিকে ঘৃণার দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। তাকে ওরা সবাই যেন দোষ দিচ্ছে। অবাক। এসব ভাবনা ও'র আসছে কোথা থেকে?

একবারও আজ পর্যন্ত এবাড়ির কেউ তাকে ঘৃণা করেনি। না, তার এভাবে কোন চেষ্টা না করে বসে থাকার জন্যেও নয়।

শুধু আজ কদিন ধরে বাবা একবার এর কাছে একবার ওর কাছে যত পুরোনো দিনের বন্ধুবান্ধব আছে তাদের কাছে পাঠিয়েছে। অফিসে টিফিন খাওয়ার জন্য যে সামান্য কটা পয়সা নিয়ে যায় তাই হাতে তুলে দিয়েছে সমরেশের, গাড়িভাড়া বলে। এই শীতে নিজের যেতে কষ্ট হবে জেনেও পুরোনো শালখানা রেখে গেছে সমরেশ গায় দেবার জন্য।

বারবার এরি ফাঁকে আগের মত সদ্য লেখা কবিতা সম্বন্ধে এমনকি উৎসাহও প্রকাশ করেছে বাবা।

তবু মনে হচ্ছে এখন ওরা সবাই এই চটের পর্দার ওপার থেকে তার দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে।

আসলে এটা তার নিজের মনের অপরাধবোধ।

নিজেই বুঝলো ও। আর বুঝতেই চোখদুটো বন্ধ করে খানিকক্ষণ ভাবলো ও। ভাবলো কাল সকালের কথাটা।

যে করেই হোক শেষ চেষ্টা তাকে কাল করতেই হবে। আজ অবশ্য নৃপেনবাবু আশ্বাস দিয়েছেন।

বলেছেন; কাল একবার এসো।

যদি কাল কথা পাকা হয়ে যায় তাহলে খুব জোর দিন দশ বারো। তার পরই সব ঠিক হয়ে যাবে। তার একটা জুতসই কাজ জুটে যাবে। কাল নিশ্চয় যাবে সে। নৃপেনবাবুর কথাটা আজ আর বাড়ি ফিরে সে বাবাকে বলতে পারেনি।

কারণ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঢুকেই মাকে কাঁদতে দেখেছে।

বাবা হ্যারিকেনের আলোর পাশে শুয়ে শুয়ে অন্যদিনের মতই মন্টুকে ইংরাজী গ্রামার বোঝাচ্ছিল। তাই বলা হয়নি। মার কান্নাটা যেন দমিয়ে দিয়েছে। বলতে গিয়েও শেষপর্যন্ত বলা হয়নি।

যদি কাল নাই হয়। অনেকটা এই হতাশার জন্যই বলেনি সমরেশ।

এ অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়।

যখনই কোন জায়গায় কাজের কথা হয়েছে; মনে হয়েছে কাজটা সে নিশ্চয় পাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি। হলোও না। সেই একবার ছাড়া।

ওসব ভেবে লাভ নেই। কি হবে ওসব ভেবে? তার চাইতে কাল দেখতে হবে।

এমনকি সে নৃপেনবাবুর পা জড়িয়ে ধরে যদি বলতে হয় তবু বলবে। তবু কাজটা তাকে পেতে হবে। অনেক দেরী হয়ে গেছে। আর নয়।

মার কান্নাটা যদি আবার শুরু হয়?
এক্ষুনি যদি বাবা আবার বলে ওঠে;
'কাল আমার শেষ দিন। কাল আমাকে ওরা...।'

অসম্ভব রকমের একটা ভয় যেন সমরেশের পিছু নিয়েছে! মার কান্না কি তাহলে আর কোন দিনও থামবে না? কাল ছুটি হওয়ার জন্য বাবা কি শেষপর্যন্ত পাগলাই হয়ে যাবে? সত্যি সত্যি কি সবাই সমরেশকে ঘৃণা করছে? ওরা সবাই? সমস্ত মানুষগুলো?

তার মা-বাবা ভাই-বোন সকলেই?
তাহলে?

অসহায়। নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছে সমরেশের। বাঁ হাতের মুঠোয় চুলগুলোকে ধরে ক্রমশই মুচড়ে, চুলের গোড়ায় একটা অসহ্য ব্যথার সঞ্চার করলো ও। যেন এ ব্যথাটা আর সব ব্যথাকে ভুলিয়ে রাখবে।

আর অসহায়ের মতই অন্ধকারে আবার চোখ মেললো ও।

তবে এবার আর চটের পর্দার দিকে চাইলো না। পায়ের দিকের দেয়ালে চোখ পড়ল সমরেশের।

মাটির দেয়ালটা অন্ধকারে আবছা। শুধু উঁচুতে তারি গায় একটা আলোর বর্গক্ষেত্র। চারকোণা এক টুকরো আলো। শিয়রের দিকের দেয়ালে চোখ না রেখেও বুঝলো ও মাথার ওপরের ছোট্ট ঘুলঘুলিটা দিয়ে আসলে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। তার অর্থ এতক্ষণ পর চাঁদটা পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। না হয় ঘুলঘুলি দিয়ে আলো আসত না। এখন তার অর্থ অনেক রাত। রাত অনেক হলো।

যদিও সন্ধ্যায় বেশ শীত করছিল। তবু এখন যেন ততটা শীত অনুভূত হচ্ছে না! শীতটা যে লাগছে না তার কারণ ও এরি মধ্যে বুকের কাছ থেকে কম্বলটাকে সরাতে সরাতে হাঁটুর কাছ বরাবর ঠেলে দিয়েছে।

চুলের বিলিকাটা বন্ধ করে দুটো হাতকেই বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে নিয়ে এলো সমরেশ।

আর আলোর চৌকো ছবিটার দিকে চোখ রেখে ভাবতে শুরু করল। ভাবলো সমরেশ। ঐ আলোর টুকরোটার চারটা কোণে যেন এসে দাঁড়িয়েছে চারটা মানুষ। মা, বাবা, মন্টু, ছন্দা...। ওরা সবাই মিলে যেন ওকে বলছে ঐ ছোট্ট আলোর টুকরোটার মধ্য দিয়ে যেন বলছে;

'এবার কি করবে তুমি?'

ওরা প্রশ্ন করছে তাকে! যেন এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর চটের পর্দার ওপাশের মানুষগুলোই তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে।

যেন উত্তর চাইছে। জবাব চাইছে তার কাছ থেকে।

এবার কি করবে?

কি করবে সে? কি করতে পারে সমরেশ। কি করার আছে? উত্তরটা তার দরকার। উত্তরটা তাকে দিতে হবে। এই মুহূর্তে উত্তরটা তার চাই।

মাথাটা যেন ঝিমঝিম করছে। দুঃসহ কিছু একটা যেন কে তার মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। অসম্ভব ভারী কিছু একটা...। চোখ মেলতেও বুঝি কষ্ট হচ্ছে তার জন্য। যন্ত্রণা...ভীষণ একটা... যন্ত্রণা। ঠিক কোথায়? মাথায় না কপালে...না চোখে...নাকি আড়াআড়ি করে রাখা তার হাতদুটোর নীচের ধুকধুক করতে থাকা বুকটায়? কিছুই বুঝতে পারছে না ও।

যতক্ষণ ঘুম না এলো সমরেশের,

ততক্ষণ এই অসহ্য অবস্থাটার জন্য মনে হলো ঐ আলোর টুকরোটাই দায়ী।

আসলে ঘুলঘুলির সুযোগ নিয়ে এত রাতে এক ফালি চাঁদের আলো এসে দেয়ালে পড়াই যত কারণ।

অন্তত সমরেশের মনে তেমনি একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রইল। যতক্ষণ না ঘুম এলো ততক্ষণ ধারণাটা ওর মন জুড়ে রইল।

(২)

'একটা অনড় পাথর আমার পথ জুড়ে। অনড় একটা পাথর...। আমি পারছি না। কিছুতেই পারছি না।'

'কিন্তু কাল যে ওরা আমাকে...।'

'না না ওভাবে তুমি বলো না।' চারদিক অন্ধকারে অদৃশ্য। আকাশের দিকে তাকাতে পারছে না ও। কারণ এখন বুক জুড়ে দল বেঁধে যে মানুষ-গুলো কথাটাকে বলতে বলতে চলে গেছে, সে কথাগুলো সারাটা বুক জুড়ে।

"কাল আমরা ওকে নিতে আসবো।"

'কাল ওরা তোমায় নিতে আসবে?'

'হ্যাঁ। তুই ভয় পাসনে। ওরা অমনি করেই নিতে আসে। ভয় পাস না। শুধু তুই মাটিটাকে আঁকড়ে ধর আরো জোরে। আরো প্রাণপণে। আমিও ধরে-ছিলাম একদিন। আজ আমার শক্তি নিঃশেষিত। দেখছিস্ না, কেমন শুকিয়ে গেছি আমি। অনেক দিন যে ধরেছিলাম। অনেক নিয়েছি মাটির কাছ থেকে অনেক।

আর ওরা নিতে দেবে না। এবার আমায় নিয়ে যাবে।

'আমি মাটি ছাড়বো না। পাথরের আড়াল ভাঙবো। পাথরটা সরাবো। নড়তেই হবে পাথরটাকে। তারপর আর কোন দুঃখ থাকবে না। ওদেরকে আমার এই প্রকাণ্ড বুকের ছায়ায় আশ্রয় দেবো। যেমন তুমি দিয়েছিলে। ওরা এলে। ওদের ধারালো দাঁতের করাতটা নিয়ে এলেও তুমি ভয় পেয়োনা গো।

ওরা আমায় দেখে ফিরবেই। আমি আছি, তুমি ঘুমোও। এবার তোমার ছুটি। আমার পথ আগলে যে শিলা তাকে আমি সরাচ্ছি। শিলাকে আমি মুছে ফেলছি।'

সমস্ত শক্তি এক করে পাথরটা সরাবার জন্য যেন ব্যস্ত হলো ও। ব্যস্ত হলো গাছটা। যন্ত্রণা...অসহ্য একটা যন্ত্রণা। শিলাকে মুছতে গিয়ে অসহ্য একটা ব্যথা। ওঃ। তবু চিৎকার করা চলবে না। মূলের সমস্ত শক্তি দিয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

কারণ কাল ওরা ধারালো দাঁত করাতটা নিয়ে আসবে বলে গেছে। কারণ আজ সারা রাত ধরে ওরা করাতের দাঁত-গুলো শানাবে।

'না না অসম্ভব। তোমাকে ওরা নিতে পারবে না। একটা দাঁতও করাতের ছুঁতে পারবে না তোমাকে। আমি আছি।

শিলাকে পথ থেকে সরিয়ে আমি আছি। আমি আছি বাবা।

(৩)

চিৎকারটা নিশ্চয় অস্বাভাবিক রকমের জোরেই করেছিল সমরেশ। গুছিয়ে নিয়ে উঠে বসল সমরেশ। কোন কথা না বলে যেমন অনেক দিন অসুখের পর মার শীর্ণ হাতদুটোকে টেনে নিয়ে নিজের চোখের ওপর ধরে রেখে একটা অসম্ভব রকমের খুশি অনুভব করে, তেমনি করে নিজের চোখের ওপর মার হাতদুটো এনে রাখলো। কোন কথা বলছে না মা।

মা হয়তো বুঝেছে এমনি করেই সমরের অসুখটা সারে।

ক্রমশই কাল রাতের সেই দেয়ালে পড়া আলোর বর্গক্ষেত্রের নক্সাটার কথা সরে যাচ্ছে মন থেকে। মন থেকে মুছে যাচ্ছে সেই অদ্ভুত স্বপ্ন। সে পাথর সরাচ্ছে। শিলাকে মুছে ফেলছে। যেন

বিছানা থেকে শরীরটাকে গুছিয়ে নিয়ে...

কারণ চোখ মেলতেই ওর দিকে মাকে উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে থাকতে দেখতে পেল। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে মা। তাকিয়ে আছে অসহায় ভঙ্গিতে।
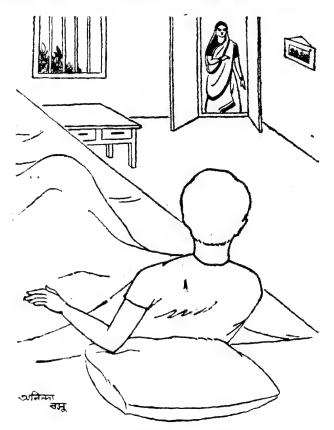
এক্ষুণি হয়তো কেঁদে উঠবে ঐ চোখদুটো। বিছানা থেকে শরীরটাকে

আর কোন যন্ত্রণা নেই। আবার যখন চোখ মেললো সমরেশ; তখন মাটির দেয়ালের ঘরটার দরজায় রোদ এসে পড়েছে। মা উনোনে আগুন দিয়েছে। আর ঘুলঘুলিটায় একটা ছোট্ট চড়ুই; কুটো মুখে করে বার বার ফিরে-ফিরে এসে বসছে।

■

॥ কালীপদ মুখোপাধ্যায় ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের অকস্মাৎ পরলোকগমনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শোকসন্তপ্ত। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর প্রায় তিন সপ্তাহ পরে তাঁর আর একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সহকর্মীর জীবনান্তের ফলে এ রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হ'ল তা দীর্ঘদিন পূরণ করা সম্ভব হবে না। পশ্চিমবঙ্গের শাসন-ব্যবস্থায় শ্রী মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি যে কতখানি প্রয়োজনীয় ছিল তার বোধহয় সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ পর্যন্ত তিনজন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে ছয়টি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে তিনি শুধু স্থানলাভই করেননি, অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দপ্তরের দায়িত্বভারও প্রত্যেকবার তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে। নিরহংকার, সদাচারী এই মানুষটির সঙ্গে এ রাজ্যের শাসক শাসিত সকলেরই ছিল আন্তরিক শ্রদ্ধার ও ভালবাসার সম্পর্ক।

মাতৃভূমির বন্ধনবেদনা ছাত্রাবস্থাতেই শ্রী মুখোপাধ্যায়কে বিচলিত করেছিল। তাই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বি-এ পাঠরত অবস্থায় তিনি জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন এবং দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সংগ্রামময় জীবনে মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম গ্রহণ করেননি। কারাগারের অভ্যন্তরেই তাঁর জীবনের বারোটি বছর অতিক্রান্ত হয়। তারপর দেশ যখন মুক্তি অর্জন করে তখন সর্বপরিমাণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়েই দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মাত্র ৬২ বছর বয়সে এমন একটি কর্মময় জীবনের অবসান হ'ল, সেটা বাঙলাদেশেরই দুর্ভাগ্য।

॥ জনবল ॥

কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত জনগণনার সর্বশেষ হিসাব অনুসারে ভারতের বর্তমান লোকসংখ্যা ৪৪ কোটি ২০ লক্ষ। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি ৬০ লক্ষ, তারপর এই সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ। এর সঙ্গে পরে আরও যুক্ত হয় পর্তুগীজ কবলমুক্ত গোয়া, দমন ও দিউর জনসংখ্যা। 'নেফা' এলাকার লোকসংখ্যাও '৬১ সালের লোকগণনার সময় জানা সম্ভব হয়নি। ঐসকল এলাকার লোক নিয়েই ভারতের লোকসংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ৪৪ কোটি ২০ লক্ষ। ভারতের ভৌগোলিক আয়তন কিঞ্চিদধিক বারো লক্ষ বর্গমাইল, অর্থাৎ তার প্রতি বর্গমাইলে এখন লোকসংখ্যার ঘনত্ব ৩৭০। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলেই বোঝা যায় যে, এই জনবল বর্তমানে জাতির বৈষয়িক উন্নয়নের পথে কি বিরাট অন্তরায়। সুঠাম সুগঠিত দেহের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মেদের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে পরিমাণ অতিক্রান্ত হলেই মেদ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, মেদবাহুল্য সুসমঞ্জস স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়। আজ এই জনবাহুল্যও ভারতের জাতীয় জীবনের সুসমঞ্জস উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবিলম্বে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা যদি অবলম্বিত না হয় তবে হয়ত বহু ব্যয় ও শ্রমসাধ্য জাতীয় যোজনাগুলির সুফল হতেই সমগ্র জাতি বঞ্চিত হবে।

॥ খুন ॥

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে হঠাৎ রহস্যজনকভাবে নরহত্যার সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হত্যার মধ্যে আবার নারী হত্যার সংখ্যাই বেশী। শহর ও শহরতলী এলাকায় গত সাত সপ্তাহে নারী হত্যা হয়েছে তেরটি। তার মধ্যে গত ১৯শে জুলাই শিয়ালদহ ষ্টেশনে পঁচিশ বছর বয়সের এক শিক্ষয়িত্রী মহিলার মৃতদেহ-প্রাপ্তিই সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সংবাদ। একটি ষ্টীল ট্রাঙ্কের মধ্যে গলিত অবস্থায় তাঁর মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে নিহত মহিলার এক তরুণী সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এইসব জঘন্য হত্যাকাণ্ডের শেষ পর্যন্ত কটির কিনারা করা সম্ভব হবে তা পুলিশ কর্তৃপক্ষের তৎপরতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু যদি নাও হয় তবুও এর মধ্যে দিয়ে আমাদের বর্তমান সমাজের নীচেরতলার মানুষদের যে ভয়ংকর জীবনযন্ত্রণার ছবি প্রকাশিত হচ্ছে তা শুধু ভয়াবহই নয়, আরও শোচনীয় ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট সূচক। ওপরতলার নিশ্চিন্ত মানুষ যাঁরা তাঁরা হয়ত আপাতত নিজেদের নিরাপদ ভেবে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন থাকতে পারেন, কিন্তু সমাজের এই পাপ বন্ধের জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা যদি অবলম্বিত না হয় তবে এই সর্বনাশা আবর্তের গ্রাস হতে নিজেদের খুব বেশীদিন তাঁরা নিরাপদ রাখতে পারবেন না। পঃ বঙ্গের মত মহারাষ্ট্রেও নরহত্যার সংখ্যা অত্যধিক। তবে কলকাতার সঙ্গে তার প্রধান পার্থক্য যে, সেখানকার অধিকাংশ নরহত্যারই মোটামুটি একটা কিনারা হয়। মহারাষ্ট্রে ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৬২ সালের ১০ই মে পর্যন্ত সাড়ে তের মাসে মোট নরহত্যার সংখ্যা ১১৬৪। অর্থাৎ সে রাজ্যে খুনের গড় হিসাব দৈনিক তিনটি। কিন্তু এর মধ্যে ৯০৪টি খুনের আসামীকে ধরা সম্ভব হয়েছে এবং ৪৮টি হত্যাকাণ্ডের আসামী পলাতক। কিন্তু বাকি যে ১৩১টি খুনের এখনও কিনারা করা সম্ভব হয়নি তার অধিকাংশেরই ঘটনাস্থল বোম্বাই শহর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মহারাষ্ট্রের মফস্বল অঞ্চলের পুলিশ বাহিনীর সতর্কতা ও কর্মক্ষমতা সন্তোষজনক হলেও বোম্বাই শহরের জনজীবন প্রায় কলকাতারই মত নিরাপত্তাহীন।

॥ গাধা মো ॥

একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ কিন্তু গুরুত্ব সীমাহীন। কারণ সংবাদটি আমাদের রাষ্ট্রবুদ্ধির অভ্রান্ত পরিচায়ক। তথ্যটি পরিবেশন করেন মহীশূরের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণাপ্পা বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরকালে। দেশ বিভাগের সময় একটি গাধার স্বত্বাধিকার নিয়ে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত গাধাটিকে নিলামে দেওয়া হয়। দুইপক্ষের ডাকাডাকির ফলে গাধাটির দাম শেষ পর্যন্ত ৬০ হাজার টাকা দাঁড়ায় এবং ভারতই শেষ পর্যন্ত সেটিকে কিনে নেয়। অর্থাৎ ভারত পায় একটি গাধা ও পাকিস্থান পায় ৬০ হাজার টাকা। মন্তব্যের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

॥ সাধারণ ঘটনা ॥

পাকিস্থান যখন পুরোপুরি সামরিক শাসনাধীনে ছিল সেই সময় জনাব আয়ুব খান 'পারিবারিক আইন অর্ডিনান্স' জারী করে পাকিস্থানে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন। সেদিন সামরিক' আইন বলবৎ ছিল বলে দেশের আর সকল লোকের মত মোল্লাদেরও কণ্ঠ রুদ্ধ ছিল, তাই নীরবেই তাদের সে নির্দেশ মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু 'গণতান্ত্রিক' শাসন পুনঃপ্রবর্তিত হওয়া মাত্রই এই 'অনৈশ্লামিক' আইনের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের মোল্লারা মুখর হয়ে উঠেছেন এবং তাদের সে দাবীর প্রতিধ্বনি উঠেছে পাক জাতীয় পরিষদেও। পাক জাতীয় পরিষদের মহামান্য সদস্যরা দাবী তুলেছেন, অনতিবিলম্বে বহুবিবাহ নিরোধক অর্ডিনান্সটি বাতিল করে জনগণের একটি অতি মূল্যবান 'ঐশ্লামিক অধিকার' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পাক গণনেতাদের এই অধিকারের দাবী যে কতখানি ন্যায়-সংগত ও যুগোপযোগী তা অন্য কয়েকটি মুশ্লিম রাষ্ট্রের এ সম্পর্কিত আইন পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে। আরব রাষ্ট্র তিউনিসিয়ায় এখন সকল অবস্থাতেই একাধিক বিবাহ আইনতঃ গুরুতর অপরাধ। মিশর, সিরিয়া ও লেবাননে আইনতঃ দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ না হলেও আদালতের অনুমতি ছাড়া তা সম্ভব নয় এবং আদালতও আবেদনকারীকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেন বিস্তৃত তদন্তের পর। ঐ সকল দেশের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইনসমূহেরও যুগোপযোগী পরিবর্তন করা হয়েছে। পাকিস্থানের সুপরিচিতা মহিলা নেত্রী ও পশ্চিম পাকিস্থান ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা বেগম শাহনাওয়াজ এ সম্পর্কে মন্তব্যকালে সখেদে বলেছেন—একাধিক বিবাহ ও প্রথমা পত্নীকে সন্তানসহ পথে বর্জন আজ পাকিস্থানে অতি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

॥ রাষ্ট্রীয় বিপত্তি ॥

মাদ্রাজ রাজ্যের সর্বত্র দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম ও শাসকদল কংগ্রেসের মধ্যে একদফা শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেল। মাদ্রাজ তথা কেন্দ্রীয় সরকার যদি ডি-এম-কে দলের শক্তিকে এখনও সামান্য বা উপেক্ষণীয় বলে ভেবে থাকেন তবে তাঁরা বাস্তববুদ্ধিবর্জিত বলে প্রমাণিত হবেন। একদিনে সাড়ে ছয় হাজার মানুষের গ্রেপ্তার বরণের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায়, রাষ্ট্রসংহতি-বিরোধী এই দক্ষিণী দলটি বর্তমানে কি সাংঘাতিক শক্তিশালী। যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন মাদ্রাজ বিধানসভা ও কেন্দ্রীয় লোকসভার অর্ধশতাধিক সদস্য ও মাদ্রাজ শহরের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র।

ডি-এম-কে দলের এই সুসংগঠিত অভ্যুত্থানকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা চলে না। কারণ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদের অজুহাতে এই বিক্ষোভ পরিচালিত হলেও নিজেদের সাংগঠনিক ও সংগ্রামী শক্তির রাজ্যব্যাপী মহড়া দেওয়াই ছিল এই সুসংগঠিত প্রবল বিক্ষোভের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বিক্ষোভ দমনে রাজ্য সরকার যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয় হলেও স্বতন্ত্র দ্রাবিড়স্থান প্রতিষ্ঠা যে দলের মূল দাবী তাদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দুর্বলতাও সরকারপক্ষ হতে প্রকাশিত হলে তার ফল হবে ভয়ংকর। একদিন মুশ্লিম লীগ সম্বন্ধে আপোসমূলক মনোভাব দেখিয়ে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ যে সর্বনাশা ভুল করেছিলেন, দেশকে ত্রিখণ্ডিত করে তার জাতীয় প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। আজ ডি-এম-কে দলকেও যদি একই-ভাবে অবাধবৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হয় তবে আগামী নির্বাচনেই হয়ত তারা মাদ্রাজে শাসনক্ষমতা দখল করবে এবং তারপর পাঁচ বছরের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে তারা হয়ত এমন অবস্থার সৃষ্টি করে তুলবে যখন ডি-এম-কে দলের স্বাতন্ত্র্যের দাবী মেনে নেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকবে না। তবে ডি-এম-কে দমনের অর্থ লাঠিবাজী নয়। যতই বলপূর্বক ডি-এম-কে দমনের চেষ্টা হবে ততই তারা শক্তিশালী হয়ে উঠবে। মাদ্রাজ রাজ্য সরকার ও বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে আজ বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে যে, কোন্ ক্ষোভে মাদ্রাজের মানুষ আজ ভারতের অখণ্ড রাষ্ট্রসত্তার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে। কেন আজ দক্ষিণের ঘরে ঘরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ। শুধুমাত্র কয়েকজন দক্ষিণী রাজনৈতিক নেতাকে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত করলেই এ সমস্যার সমাধান হবে না। ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন প্রয়াসে দক্ষিণ উপেক্ষিত এই আজ তাদের প্রধান অভিযোগ। সে অভিযোগ কতখানি সত্য এবং দাক্ষিণাত্যের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে সে অভিযোগের প্রতিকার কতখানি সম্ভব অবিলম্বে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দ্বারা তা স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। সমবেত ও সার্বিক প্রয়াসের মাধ্যমে দক্ষিণ যতই উত্তরের সমীপবর্তী হবে, ডি-এম-কে জাতীয় রাষ্ট্রীয় সংহতি-বিরোধী দলগুলির অস্তিত্বও ততই অর্থহীন ও অসম্ভব হয়ে পড়বে।

॥ মিত্র পরিবর্তন ॥

চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন ঈ জেনেভায় লাওস সম্পর্কিত পূর্ব-পশ্চিম চুক্তি সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে বলেন, চীনের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার মতবিরোধের সংবাদ অসত্য নয়। চীন একটি বিশাল দেশ এবং স্বভাবতই সে কারও ক্রীড়নক হতে রাজী নয়। একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে চীনের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির এই উক্তি ভবিষ্যতে চীন-সোভিয়েট প্রকাশ্য বিরোধের সূচনা বলে মনে হয়। ঠিক এই অবস্থায় সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থায় দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি অনাস্তাস মিকোয়ানের নয়াদিল্লী উপস্থিতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে শ্রীনেহরুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বিশেষ ইঙ্গিতবহ বলে মনে হয়। চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরোধ যত ব্যাপক হয়েছে, ভারতের সঙ্গে সোভিয়েটের সম্পর্ক ততই নিকটতর হয়েছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে ভারতই হয়ত এশিয়ায় সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান মিত্র ও ভরসা হয়ে দাঁড়াবে। ভারতের বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে এ মৈত্রী বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কমিউনিষ্ট আন্দোলনেও এই মিত্র-বিনিময়ের প্রতিক্রিয়া হবে সুদূরপ্রসারী।

ঘটনা-প্রবাহ

ঘটনাপ্রবাহ

ঘটনা-প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

১৯শে জুলাই—৩রা শ্রাবণ : মাদ্রাজে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম দলের ছয় সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার—দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠানের জের—স্থানে স্থানে পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ ও লাঠিচালনা।

'নীতি' বিসর্জন না দিয়া চীন ও পাকিস্তানের সহিত বিরোধ মীমাংসায় ভারত সর্বদাই প্রস্তুত' হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস-কর্মী সম্মেলনে শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) উক্তি।

২০শে জুলাই—৪ঠা শ্রাবণ : 'পাকিস্তানী হানাদারদের মোকাবিলার জন্য সীমান্তে পুলিশ ও ফাঁড়ির সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইয়াছে'—রাজ্য বিধানসভায় (পশ্চিমবঙ্গ) স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের ঘোষণা—পুলিশ বাজেটে সীমান্তের জন্য অতিরিক্ত ৭৫ লক্ষ টাকা ও অস্ত্রাদির জন্য ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ।

স্বনামধন্য কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের শুভ সূচনা—কলিকাতার সভায় জয়ন্তী-অনুষ্ঠানে কবির অমর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন—কৃষ্ণনগরে কবির জন্মভিটায় কবি-দুহিতা শ্রীমতী মায়া দেবীর (বন্দ্যোপাধ্যায়) নবনির্মিত প্রস্তর-ফলকের আবরণ উন্মোচন।

২১শে জুলাই—৫ই শ্রাবণ : কলিকাতা নগরীকে আবর্জনামুক্ত করার অভিযান আরম্ভ—জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যদের জঞ্জাল অপসারণে অংশ গ্রহণ—রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, মেয়র প্রভৃতি কর্তৃক অভিযানে উৎসাহদান।

দন্ডকারণ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন খাতে আরও অর্থ বরাদ্দের দৃঢ় দাবী—বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দন্ডক উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীসুকুমার সেনের পত্র।

পাটনার অদূরে ডুমরাও স্টেশনে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা—দন্ডায়মান মালগাড়ীর সহিত ডাউন অমৃতসর-হাওড়া মেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ—৬১ জন যাত্রী নিহত ও ৫৭ জন আহত।

লাডাকের দুই স্থানে ভারতীয় রক্ষীদের উপর চীনাদের গুলীবর্ষণ—দুইজন ভারতীয় সীমান্ত-রক্ষী আহত।

২২শে জুলাই—৬ই শ্রাবণ : যশোহর, খুলনা ও পাক-ত্রিপুরার ভারতভুক্তি দাবী—পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ কমিটির উদ্যোগে আহূত জনসভায় প্রস্তাব—পাকিস্তানের নিকট দাবী পেশের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট বা লক-আউট এড়াইবার উপায় নির্দেশ—শ্রমিক ও মালিক সংস্থাসমূহের নিকট কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের প্রস্তাব।

২৩শে জুলাই—৭ই শ্রাবণ : পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের (৬২) স্বগৃহে (কলিকাতা) সন্ন্যাস রোগে জীবনাবসান।

'লাডাক সীমান্তের সর্বশেষ পরিস্থিতি খুবই গুরুতর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য—দেশবাসীকে সজাগ থাকার জন্য আহ্বান।

২৪শে জুলাই—৮ই শ্রাবণ : দুর্গাপুরে ডি ভি সি'র তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুইটি ইউনিটই বিকল—কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে আবার গভীরতর সংকট সৃষ্টি—রাত্রিতে বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘ সময় নিষ্প্রদীপ।

সোভিয়েট প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীআনাস্তাস মিকোয়ানের দিল্লী উপস্থিতি—চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্ন সমেত পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীনেহরুর বৈঠক।

নয়াদিল্লীতে ভারতীয় সেনানায়কদের সম্মেলন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা।

২৫শে জুলাই—৯ই শ্রাবণ : বৃহত্তর কলিকাতায় আঞ্চলিক বিদ্যুৎ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের নয়া পরিকল্পনা— বিদ্যুৎ সঙ্কট-ত্রাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের বিবৃতি।

নেতাজীর অবমাননাকর প্রবন্ধ লেখার (বোম্বাই'র উইমেন্স ওন উইকলি' পত্রে) দরুণ কলিকাতার আদালত কর্তৃক শ্রীমতী প্যাট শার্পের দুই মাস সশ্রম কারাদন্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদন্ড।

॥ বাইরে ॥

১৯শে জুলাই—৩রা শ্রাবণ : চট্টগ্রামে ছাত্রদের উপর পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে ঢাকায় বিরাট ছাত্র-বিক্ষোভ—হাজার হাজার ছাত্রের শোভাযাত্রা ও বিভিন্ন ধ্বনি—পূর্ব পাকিস্তানের জেলায় জেলায় ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘট।

মহাকাশের মধ্য দিয়া মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ 'টেলস্টার' মারফৎ বার্তা প্রেরণের সর্বপ্রথম উদ্যম—নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ প্রেরিত ও লন্ডনে ধৃত।

২০শে জুলাই—৪ঠা শ্রাবণ : পূর্ব জার্মানী কর্তৃক বাল্টিক উপকূলে নিষিদ্ধ 'সীমান্ত এলাকা' গঠিত—উপকূল এলাকাটিকে সুরক্ষিত পূর্ব-পশ্চিম জার্মান এলাকার সমপর্যায়ে আনীত।

পাকিস্তানের সামরিক শক্তিবৃদ্ধির উপর প্রেসিডেন্ট আয়ুবের গুরুত্ব আরোপ—সৈন্যদল বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন যুক্তি হাজির।

২১শে জুলাই—৫ই শ্রাবণ : লাওসের নিরপেক্ষতা রক্ষা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদিত—আনন্দপূর্ণ পরিবেশে জেনেভায় চতুর্দশ রাষ্ট্র লাওস সম্মেলনের পরিসমাপ্তি।

২২শে জুলাই—৬ই শ্রাবণ : খুলনায় বিক্ষোভকারী জনতা ও ছাত্রদলের উপর পুলিশের লাঠিচালনা—দুইজন পাক-কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সম্বর্ধনাকালে কৃষ্ণ-পতাকা ও পাদুকা সঞ্চালন।

আমেরিকার উদ্যমের পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে রাশিয়ারও আধুনিক পারমাণবিক অস্ত্রসমূহের পরীক্ষা আরম্ভের সিদ্ধান্ত।

২৩শে জুলাই—৭ই শ্রাবণ : ভারতস্থ প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশগুলির (পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে ও ইয়ানন) আইনত হস্তান্তর—ছয় বৎসর পর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত চুক্তি ফরাসী সেনেটে অনুমোদন।

'নিতান্ত বাধ্য না হইলে আমেরিকা আর আণবিক বিস্ফোরণ চালাইবে না'—সাংবাদিক বৈঠকে (ওয়াশিংটন) মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির ঘোষণা।

২৪শে জুলাই—৮ই শ্রাবণ : 'বৃহৎ শক্তিবর্গকে অন্যান্য দেশে পারমাণবিক অস্ত্র সরবরাহে বিরত থাকিতে হইবে'—জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ মেননের দাবী—চতুঃশক্তির (আণবিক অস্ত্রধারী) মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ।

২৫শে জুলাই—৯ই শ্রাবণ : আলজিরিয়ার দুইটি শহর (কনস্টেনটাইন ও বোন শহর) বেনবেল্লা বাহিনীর (বিরুদ্ধবাদী উপ-প্রধানমন্ত্রী মিঃ আমেদ বেন বেল্লার সমর্থক) দখল।

অভয়ঙ্কর

॥ রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষাগুরু ॥

রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বলেছিলেন :

"আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। যখন বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মত বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল, তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগত কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোন নূতন তত্ত্ব, নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে; বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজী শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ-সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল।"

—(শিক্ষার হেরফের)

'রাশিয়ার চিঠিতে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রাশিয়ায় গিয়েছিলাম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্য।" প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষাগুরু' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে বলেছেন—"শিক্ষাই যে জনগণের অভ্যুদয়ের প্রধান সহায়, এ জ্ঞান তিনি রাশিয়ায় গিয়ে লাভ করেননি, তাই তিনি বলেছেন—'গ্রামের কৃষি ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি এতকাল যা ভেবেছি এখানে তার বেশি কিছু নেই, কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আছে কর্মকর্তাদের ব্যবস্থা-বুদ্ধি।' এক কথায় শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা রাশিয়ার দেহলাভ করেছে, ভারতবর্ষে করেনি।"

সম্প্রতি বাংলাদেশের বিধানসভায় মন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় কম্যুনিটি প্রোজেক্ট সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের উক্তির জবাবে বলেন—কম্যুনিটি প্রোজেক্ট বিদেশী আমদানি নয়, এই আদর্শ রবীন্দ্রনাথের, তাঁর স্বপ্নকেই রূপায়িত করা হচ্ছে ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের জনশিক্ষার আয়োজনে যাঁরা সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এল কে এলমহার্স্টের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ন্যুইয়র্কের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র যখন এলমহার্স্ট সেই ১৯২১-এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁকে ভারতে এসে পল্লীর মানুষের সঙ্গে কাজ করার উপদেশ দেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা পালনের উদ্দেশ্যে ১৯২২-এ এলমহার্স্ট শান্তিনিকেতনে এলেন। রবীন্দ্রনাথ পল্লী-সংগঠনের উদ্দেশ্যে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন তার নাম 'শ্রীনিকেতন'। এলমহার্স্ট সংরাজে সেই প্রতিষ্ঠানে থেকে গ্রামের চাষীদের উন্নত ধরণের কৃষিপদ্ধতি শিক্ষা দিতে লাগলেন, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সহায়তা করতে লাগলেন হিতোপদেশ দান করে।

কিছুকাল 'শ্রীনিকেতনে' কাজ করার পর এলমহার্স্ট কবির সঙ্গে (মার্চ, ১৯২৪) বিদেশযাত্রায় সঙ্গী হলেন। [illegible] তিনি শিক্ষাসত্র সম্পর্কে বিশ্বভারতী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন— "Sikha-Satra, a Home for orphans।" তাঁর সহধর্মিণী ডারোথির সঙ্গে পরে ডেভনসায়রে 'Diretington Hall' স্থাপন করলেন, বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল ধরে এই প্রতিষ্ঠান কৃষি, পশুপালন, বন-সংরক্ষণ, স্থানীয় গ্রামশিল্পের উন্নয়ন এবং শিক্ষা ও শিল্প সম্পর্কে সেখানকার মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।

কবির সঙ্গে এলমহার্স্টের যোগাযোগ ছিল কবির সমগ্র জীবনব্যাপী। সম্প্রতি তিনি RABINDRANATH TAGORE : PIONEER IN EDUCATION এই নামে এক সংকলন-গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। এই সংকলনে আছে "Essays and exchanges between Rabindranath Tagore and L. K. Elmhirst." শিক্ষা সম্পর্কে কবির মনোভঙ্গির পরিচয়দান করা হয়েছে এই সংকলন-গ্রন্থে। এই গ্রন্থে পাঁচটি প্রবন্ধ আছে, দুটি এলমহার্স্টের এবং তিনটি রবীন্দ্রনাথের। এ ছাড়া আছে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গল্প 'তোতাকাহিনী'র অনুবাদ।

এলমহার্স্ট তাঁর দুটি প্রবন্ধে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বলেছেন এবং শ্রীনিকেতনে আয়োজিত পল্লীবাসীদের জন্য যে 'শিক্ষাসত্র' স্থাপনা করা হয়েছিল তার কথা বলেছেন।

'তোতাকাহিনী' বাঙালী পাঠক মাত্রেরই পরিচিত। শেষ পর্যন্ত তোতার কণ্ঠরোধ হয়, তার সব শিক্ষা তখন সমাপ্ত।

"পাখিটা মরিল। কোনকালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, "পাখি মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন—'ভাগিনা, একী কথা শুনি?'

ভাগিনা বলিল—'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন—'ও কি আর লাফায়?'

ভাগিনা বলিল—'আরে রাম!'

—'আর কি ওড়ে?'

—'না।'

—'আর কি গান গায়?'

—'না।'

—দানা না খাইলে আর কি চেঁচায়?

—না।

রাজা বলিলেন—'একবার পাখিটাকে আনো ত দেখি।'

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুখনো পাতা গজগজ করিতে লাগিল।

বাহিরে নব বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।"

এই গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধটি এলমহার্স্ট এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক আলাপ-চারের সংক্ষিপ্তসার। রবীন্দ্রনাথ নৃত্যের উদ্ভব সম্পর্কে বলছেন যে, শিশু তার মনোভাব প্রকাশ করে দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে, তার ফলে তার দেহও সুন্দর হয়। বাল্যকালে ডেস্কে বসে লিখতে হত, সেই সময় তাঁর মনে হয়েছে একমাত্র হাত এবং মাথা ছাড়া আর সবাই চুপচাপ বসে আছে।

তাঁর মতে চিন্তাকালেও দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছন্দে আন্দোলিত হতে চায়, চিন্তার বিকাশের সঙ্গে তার অদৃশ্য সংক্রমণ ঘটছে মস্তিষ্কে, এই-ভাবেই হয় নৃত্যের উৎপত্তি। অভিনয়ের উদ্ভব এইভাবে।

রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য আছে 'Poet's School' নামক প্রবন্ধটিতে। এই প্রবন্ধে তিনি আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিকে আক্রমণ করেছেন। শহরে শিক্ষাকে আবদ্ধ করে রাখার তিনি বিরোধী, সেখানে নেই কৃষি-লক্ষ্মীর মুক্ত অঙ্গন, নেই শ্যামল বনভূমি। কিষাণের চোখের বাস্তব জগতকে শহর প্রচ্ছন্ন রেখেছে। তার ফলে সে প্রাণে অনুপ্রেরণা লাভ করে না। এ যেন পাখিকে তার নভোঅঙ্গন থেকে ধরে বিরাট সোনার খাঁচায় আটক রাখা। সেখানে পাখির সব সুখ আছে, শুধু স্বাধীনতা নেই কর্মের, স্বাধীনতা নেই মুক্তপক্ষ বিচরণের।

রবীন্দ্রনাথের আহ্বান আদিম জগতে ফিরে যাওয়ার জন্য নয়, দারিদ্র্যের জীবন বরণ করার ডাক নয়। তিনি চান ছাত্ররা প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতির নিবিড় স্নেহাঞ্চলে বর্ধিত হোক। প্রকৃতিকে দেখুক, ভালোবাসতে শিখুক। দেহ ও মনে শান্তি ও স্বস্তিলাভ করুক।

পাশ্চাত্য শিক্ষাকে, সভ্যতাকে তিনি তাচ্ছিল্য করেন না। তিনি বলেছেন—"I always felt the need of Western genius for imparting to my educational ideal that strength of reality which knows how to clear the path towards a definite end of practical good."

প্রাচীন ভারতের তপোবন তাঁর মনে এনেছে এক নতুন প্রেরণা। তপোবনের আদিম সংস্কৃতি বা মন নয়, তপোবনের শান্তিই তাঁর কাম্য। তিনি আদর্শবাদী হলেও আবার প্রত্যক্ষবাদী। এই বিষয়ে ১৩৫৭ সনের ২৩শে বৈশাখে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্র ও মহাত্মাজীর বুনিয়াদি শিক্ষা' নামক মূল্যবান প্রবন্ধটির প্রতি আগ্রহশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, "Elmhirst believes, as I do, in an education which takes count of the organic wholeness of human individuality that needs for its health a general stimulation to all faculties, bodily and mental."

বহুধাশক্তিবিশিষ্ট কবির শিক্ষা-চিন্তার মৌলিকত্ব এবং গভীরত্ব এলমহার্স্ট-সম্পাদিত এই গ্রন্থে প্রমাণিত। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি দিয়েই এই প্রবন্ধ শেষ করা যাক—"রবীন্দ্রনাথ লোকশিক্ষায় যে ideal গড়েছেন, তা কোনো সম্প্রদায়বিশেষের ideal নয়—সমগ্র মানবসমাজের ideal এবং তিনি মনে করেন যে, বর্তমান রাশিয়া সেই idealকে সার্থক করেছে, এতেই তাঁর আনন্দ।" রবীন্দ্রনাথের কম্যুনিটি প্রোজেক্টের মূলকথা অনুধাবনে এই উক্তি সাহায্য করবে সন্দেহ নেই। •

• RABINDRANATH TAGORE: PIONEER IN EDUCATION II Edited by L. K. Elmhirst II Published by John Murray, 50, Albermarle Street, London, W. 1.—II Price 15 Shillings.

অন্য ভুবন— (অতি-প্রাকৃত গল্প-সঞ্চয়ন)—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রকাশক—'বর্তিক'। প্রাপ্তিস্থান : কথাশিল্প—১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম দশ টাকা।

অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কবি, সমালোচক ও সার্থক রম্য-রচনাকার। 'অন্য ভুবন' নামক সংকলন-গ্রন্থে তাঁর এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান। 'অন্য ভুবন'কে অলৌকিক কাহিনীর সঞ্চয়ন না বলে অতি-প্রাকৃত কাহিনী বলা হয়েছে ইচ্ছা করেই। এর কাহিনীগুলিতে ভূত প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই, অনেক স্থলে সে প্রচ্ছন্ন—সেই বৈশিষ্ট্য এর নির্বাচনে। সম্পাদক তাঁর গল্প-নির্বাচনেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "অলৌকিক গল্প, ভূতের গল্প, ভূত ছাড়া ভূতের গল্প সব গল্পেরই উদ্দেশ্য পাঠককে অস্বস্তিকর, অপ্রীতিকর, অথচ ভালো লাগার কয়েকটি মুহূর্ত উপহার দেওয়া। এ সব গল্পের যাদু হচ্ছে ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায়।" এই সংকলনে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র দত্ত, পরশুরাম, জগদীশ গুপ্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ধূর্জটিপ্রসাদ, বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় পরিমল গোস্বামী, মণীন্দ্রলাল বসু, বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, মনোজ বসু, প্রমথ বিশী, সরোজ রায়চৌধুরী, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিমল মিত্র, সুশীল রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিনারায়ণ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল কর, সমরেশ বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন লেখকবৃন্দের সুনির্বাচিত গল্প সংকলিত হয়েছে।

'অমৃত' ১ম বর্ষ, ২৫শ সংখ্যায় 'অবসর-রঞ্জনী সাহিত্য' সম্পর্কিত যে প্রবন্ধ সমকালীন সাহিত্য বিভাগে

কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই গ্রন্থে ডক্টর সুকুমার সেনের যে প্রবন্ধটি 'পরিশিষ্ট' অংশে সংযোজিত হয়েছে তা বিশেষ মূল্যবান। সম্পাদক যে ভূমিকাটি রচনা করেছেন, বাংলা সাহিত্যে সেটি এক অপূর্ব রচনা। প্রবন্ধ যে কত রমণীয়-ভাবে রচনা করা যায় এ তার নিদর্শন। তবে ভূমিকায় সম্পাদক বলেছেন : "এ গ্রন্থে যে সব গল্প সন্নিবেশ করা গেল,

তাদের সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। গল্পের পরিচিতি গল্পই, সেই জানাবে তার মর্ম।" এই উক্তিটুকু আমাদের তৃপ্ত করেনি। অভিজ্ঞ সম্পাদকের গল্প-সম্পর্কিত মন্তব্য নিঃসন্দেহে সাহিত্য-পাঠকের কাছে, উত্তরকালের সমালোচকদের কাছে মূল্যবান বিবেচিত হত। গ্রন্থটির ছাপা সুন্দর, কয়েকটি রেখাচিত্র গ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। আর সবচেয়ে বিচিত্র এর প্রচ্ছদ—যেটি এঁকেছেন কৃষ্ণ রেড্ডি (প্যারিস)। এমন একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর সংকলনের জন্য সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েই অভিনন্দনযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ : উত্তরপক্ষ (সংকলন-গ্রন্থ)—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ানা। ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা।

গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর প্রবন্ধ-সংকলন। মোহিতলাল মজুমদার, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটি-প্রসাদ, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, মুলকরাজ আনন্দ, হুমায়ুন কবির, নীহাররঞ্জন রায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরবিন্দ পোদ্দার, প্রমথ চৌধুরী এই এগারজনের এগারটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত। সম্পাদকের লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনার প্রতি। তাই তিনি বলেছেন, 'যাঁরা বয়সের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ এবং চিন্তার দিক থেকে শুধু বিংশ শতাব্দীর ধ্যান-ধারণাকেই নিজেদের চেতনায় বহন করেছেন সেই উত্তরকালের মানুষদের চোখে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যরূপটি উপস্থাপিত করা—'। মোহিতলালের রবীন্দ্র-চেতনার অপূর্ব বিশ্লেষণ, অতুলচন্দ্রের 'আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ', অমিয় চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্র-নাথের দৃষ্টি', অন্নদাশঙ্করের 'রবীন্দ্র-নাথের অপরাধ', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', অরবিন্দ পোদ্দারের 'রবীন্দ্র হিউম্যানিজম', এবং প্রমথ চৌধুরীর 'শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ' এই সংকলনের অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যের বহুধাবিচিত্র সমন্বয়ের একটি অংশ এই মূল্যবান সংকলনে গ্রথিত, তার জন্য সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেক ভালো প্রবন্ধ শতবার্ষিকী বৎসরে রচিত হয়েছে, অনেক পুরাতন লেখাও আবিষ্কৃত হয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথ : উত্তরপক্ষ' তাদের অন্যতম। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

ঋতুর শেষ নাম বসন্ত— পৃথ্বীশ সরকার। অমর লাইব্রেরী, ৫৪।৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি একাঙ্ক নাটক। এ নাটকের লেখক পৃথ্বীশ সরকার ইতিপূর্বে 'লবণাক্ত' নামে একখানি নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এ নাটকটি একটি 'ড্রইংরুম নাটক।' এ নাটকের নায়িকা কমলা অনূঢ়া। সে সুরূপা নয়। তার বয়স হয়েছে। বিয়ের কথাবার্তা অনেক হয়েছে, অনেকবার তাকে দেখানো হয়েছে কিন্তু কোন পাত্র পক্ষেরই তাকে পছন্দ হয়নি। এ বিড়ম্বনার হাত থেকে কমলা মুক্তি চায়। নাটকের পরিণতিতে তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় শংকর স্বেচ্ছায় কমলার পাণিগ্রহণ করায় এ বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্তি পায়।

নাট্যকারের কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি লঘু পরিহাসের সুরে একটি জটিল সামাজিক সমস্যাকে এ নাটকে সার্থক ভাবে উপস্থিত করেছেন। একমাত্র গোবিন্দের কোন কোন সংলাপ এবং আচরণ অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

সপ্তর্ষি—সম্পাদক : ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়। ৬২, গণেশচন্দ্র এভিনু, কলিকাতা-১৩, থেকে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

'সপ্তর্ষি'র বর্তমান সংখ্যাটিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলি লিখেছেন—কবিতা সিংহ, রজত সেন, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য ও চিত্ত সিংহ। 'বাংলা কথাসাহিত্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়'—এ পর্যায়ে ধারাবাহিক আলোচনা করছেন অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র। অন্যান্য যাঁদের প্রবন্ধ আছে—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, সুবন্ধু ভট্টাচার্য, শোভন আচার্য। কবিতা লিখেছেন কিরণশংকর সেনগুপ্ত, অজিত মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ ধর ও তরুণ সান্যাল। কনাদ গুপ্তের সম্পূর্ণ উপন্যাস 'শ্বেত করবীর দোসর' মুদ্রিত হয়েছে। এক বছরের বাঙলা ছবি নিয়ে আলোচনা করেছেন অজিত মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া আছে যোগেন চৌধুরী ও ধ্রুব রায়ের স্কেচ। সপ্তর্ষির এই সংখ্যাটি পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অলংকৃত।

মানব মন—সম্পাদক : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩২।১এ, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক পত্রিকা হিসাবে 'মানব মনের' আত্ম-প্রকাশকে আমরা অভিনন্দন জানিয়ে-ছিলাম পূর্বেই। পাঠক সাধারণের মধ্যে পত্রিকাটি যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা সহজেই বোঝা যায় মূল্যবান প্রবন্ধ নিয়ে পত্রিকাটির যথাসময়ে প্রকাশের দ্বারা। বর্তমান সংখ্যায় 'ইয়ারকস্ ও কোয়েলারের চিন্তাধারা সম্পর্কে'—আই পি পাভলভের একটি প্রবন্ধ অনূদিত হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য যাঁদের রচনায় বর্তমান সংখ্যাটি সমৃদ্ধ তাঁরা হলেন : সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (উপজাতিদের সংঘচেতনা), ডঃ সুরেন্দ্রকুমার পাল (মানব মনের সুস্থতা ও বিকার), জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় (পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা), মনোবিদ (মানব মনের ক্রমবিকাশ), প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত (মাধ্যমিক শিক্ষায় আমেরিকা, ভারত ও সোবিয়েত) এবং ডঃ অজিতকুমার দেব (মনোরোগীর স্বরূপ নির্ণয়)। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

মহাদেশ (রবীন্দ্র সংখ্যা)—সম্পাদক : প্রদীপ দাশগুপ্ত। কোন্নগর, হুগলী।

আলোচ্য রবীন্দ্র সংখ্যাটি পেয়ে আমরা খুশি হয়েছি। মফস্বল থেকে এমন রুচিশীল পত্রিকা খুব কমই প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যায় যাঁদের লেখা আছে তাঁদের মধ্যে নরহরি কবিরাজ, ভবানী মুখোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ ও প্রদীপ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ এবং আলোচনা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

নান্দীকর

যাত্রার পুনরুজ্জীবন :

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, মৃতপ্রায় যাত্রা আবার বেঁচে উঠছে। নাট্যপ্রিয় শহুরে বাঙালী যেমন একদিন সবাক চিত্রের উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়ে সাধারণ নাট্যশালাগুলিকে ভুলতে বসেছিল, তেমনই আরও বছর পনেরো-কুড়ি আগে ঐ রঙ্গমঞ্চেরই মোহে তারা যাত্রাভিনয়কে শহর-ছাড়া করেছিল। কিন্তু বন্যার জল যখন থিতিয়ে গেল, তখন আমরা দেখতে পেলুম, সবাক চিত্র যেমন মঞ্চনাটকের শত্রু নয়, ঠিক তেমনই মঞ্চ-নাটকও যাত্রা-নাটকের পরিপন্থী নয়। কাজেই মঞ্চাভিনয় এবং যাত্রাভিনয়—দুইই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। একটু পিছন দিকে চাইলে দেখতে পাওয়া যাবে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দাপটে পেশাদারী যাত্রাদল যখন শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে নিজেদের জীবিকার্জনের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন এই শহরে নতুন ক'রে যাত্রার পত্তন করেন শিক্ষিত সৌখীন সম্প্রদায়। তখনই গড়ে উঠেছিল তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ভুজঙ্গ রায় প্রভৃতিকে নিয়ে শহরের দক্ষিণাঞ্চলে 'ভবানীপুর নাট্যসমাজ', সিমলা মদন মিত্র লেনে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বংশধরদের সহায়তায় 'বারবেলা বৈঠক', বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির উৎসাহে 'হাওড়া সমাজ', উত্তর কলকাতায় 'শিশির ইন-স্টিটিউট', 'সিকদারবাগান বান্ধব সম্মিলনী', 'সুহৃদ সম্মিলনী', 'রাজবল্লভপাড়া যাত্রা পরিষদ', 'বাগী বৈঠক', মধ্য কলিকাতায় জ্যোতিষ বিশ্বাসের নেতৃত্বে 'জেলেপাড়া সম্মিলনী' প্রভৃতি সৌখীন প্রতিষ্ঠান, যাঁরা হামেশাই যাত্রার আসর বসিয়ে শহরকে সরগরম রেখেছিলেন।

আবার যখন সবাক চিত্রের রূপোলী পর্দার মোহে নাট্যপ্রিয় দর্শকের দল রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপকে প্রায় পরিহার করতে বসেছিল, বিগতযৌবন শিশির-কুমারের শ্রীরঙ্গম-ও যখন নানা রঙের সমন্বয়েও দর্শকের মনে রঙ ধরাতে পারছিল না, তখনও নব-নাট্য আন্দোলনের ঢেউ তুলে এগিয়ে এসেছিল এই শিক্ষিত সৌখীন সমাজই। অবশ্য, এর প্রথম পত্তন করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাঙলা শাখা, যাঁরা একটি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই

অগ্রগামী পরিচালিত 'নিশীথে'র একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

প্রচারের মনোভাব নিয়ে 'উলুখাগড়া', 'ল্যাবরেটারী' প্রভৃতির অভিনয় শুরু করেন। কিন্তু ভারতীয় গণনাট্য সংঘ যখন "নবান্ন"-এর সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, তখন নাটকাভিনয় করার মোহে এর বহু সভ্যেরই জীবনে রাজনৈতিক আদর্শ রইল পিছনে প'ড়ে; দল ভেঙে বেরিয়ে পড়ে তাঁরা নাট্যকে দল তৈরী করার কাজে কোমর বাঁধলেন। এর ফলে, রাজনীতির কতখানি ক্ষতি হয়েছে, তা জানি না; কিন্তু বাঙলা রঙ্গালয় যে উপকৃত হয়েছে, এ-কথা অনস্বীকার্য। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাঙলা শাখা বাঙলায় নবনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ। এবং আজ বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয় যে তার জনপ্রিয়তাকে নতুন ক'রে ফিরিয়ে পেয়েছে, তার জন্যে বাঙলার এই নবনাট্য আন্দোলনই দায়ী। শুধু তাই নয়, আজ সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় এবং প্রযোজনার ধারাও যে বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে, তারও মূলে নবনাট্য আন্দোলনের দানকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কিন্তু বহু পেশাদারী, অর্ধ-পেশাদারী এবং অ-পেশাদারী গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত নবনাট্য আন্দোলন যেভাবে বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়-গুলিকে প্রভাবিত করেছে, উনিশ শো কুড়ি-একুশ থেকে উনিশ শো সাতাশ-আটাশের (১৯২০—১৯২৮) মধ্যে শিক্ষিত সৌখীন সম্প্রদায়গুলি যে সব যাত্রাভিনয় করেছিলেন, তারা পেশাদারী যাত্রাদলগুলিকে সেভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। এমন কি বললে আদৌ অত্যুক্তি হবে না যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যাত্রা এদের উপর কোনো প্রভাবই বিস্তার

আর ডি বনশল প্রযোজিত ও বিনু বর্ধন পরিচালিত "এক টুকরো আগুন" চিত্রে বিশ্বজিৎ ও তন্দ্রা বর্মণ।

করতে পারেনি। এবং এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, পেশাদারী যাত্রাদলগুলি সৌখীন যাত্রাভিনয় থেকে যোজন দূরে ছিল। পেশাদারী যাত্রাদলের অধিকারীরা কোনো দিনই 'নদের নিমাই', 'নদীয়াবিনোদ', 'ভীষ্ম', 'কর্ণপ্রতিজ্ঞা', 'পাণ্ডবগৌরব', 'বিজয়বসন্ত', 'জগন্নাথ' প্রভৃতি সৌখীন যাত্রাভিনয়ের আসরে পদার্পণ করেননি। তাঁরা যে-কোনো কারণেই হোক, কিছুটা রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং সমাজের শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায় থেকে দূরে থাকতেই ভালোবাসেন আজও।

তবু যে পেশাদারী যাত্রাভিনয়ের মধ্যে আজ নানা বিষয়ে বহু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তাকে আমরা অনায়াসেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রভাব বলে অভিহিত করতে পারি। আজ আর যাত্রাভিনয় আগেকার মতো আট থেকে বারো ঘণ্টা স্থায়ী হয় না; আজ বহু যাত্রাভিনয়েই স্ত্রী-চরিত্রে নারীদেরই অবতীর্ণ হতে দেখা যায়; আজ যাত্রার পালা মাত্র পৌরাণিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক বা ঐতিহাসিক-সামাজিক কাহিনীকে তার উপজীব্য করেছে—এ-সবই হয়েছে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে। কিন্তু যাত্রাকে তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে আরও সংস্কারের প্রয়োজন আছে বলেই মনে হয়। আমাদের মনে রাখা উচিত, বিদেশী জাহাজে চেপে রঙ্গালয় আমাদের দেশে এসেছে, আমাদের দেশের মাটির সোঁদা গন্ধ তার মধ্যে আমরা পেতে পারি না। রঙ্গমঞ্চকে যতক্ষণ না আমরা আমাদের আসরের মাঝখানে মাটির ওপর বসাতে পারি, ততক্ষণ তার সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগ হওয়া সম্ভবপর নয়। অথচ আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে শিক্ষিত শ্রোতৃসম্প্রদায়ের সামনে যাত্রাপালা যে-ভাবে অভিনীত হলে শ্রোতৃমণ্ডলী অভিনয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠবেন, ঠিক সেইভাবের অভিনয় আজকের কোনো পেশাদারী দলের দ্বারাই সম্ভব নয়। আজও পেশাদারী দলের যাত্রাভিনয়ের মধ্যে যে-মোটা রসের পরিবেশন হয়, দর্শকের হাসির খোরাক জোগাবার জন্যে যে ভাব, ভাষা এবং পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়, তা এমনই রুচিবিগর্হিত যে, শিক্ষিত দর্শক তাতে স্বভাবতঃই বিরক্ত হয়ে নাসিকাকুঞ্চন করেন। মনে হয়, আজও পেশাদারী যাত্রাদলগুলিতে যথার্থ সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষিত নট, নাট্যকার এবং নাট্য-পরিচালকের যথেষ্টই অভাব আছে। এ ছাড়া অপরাপর বিষয়েও যাত্রাভিনয়কে অপেক্ষাকৃত কালোপযোগী করবার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা উচিত। যে-সব জায়গায় বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য পাওয়া যায়, সেখানে অভিনয়ের দৃশ্যগুলিকে ভাবোজ্জ্বল করবার জন্যে উপযুক্ত আলোক-প্রক্ষেপণের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। যাত্রাভিনয়ে বৈদ্যুতিক আলোক-প্রক্ষেপণ দ্বারা দৃশ্যগুলিকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও সজীব ক'রে তোলার কৌশল উদ্ভাবনের জন্যে তাপস সেনের মত মস্তিষ্কের প্রয়োজন আছে। বহুবিধ আনুষঙ্গিক কৃত্রিম শব্দ-সৃষ্টির জন্য উচিতমত টেপরেকর্ডারের ব্যবহারও যাত্রাভিনয়ের রসসৃষ্টির সহায়তা করতে সক্ষম। রণক্ষেত্রের কোলাহল, অসির ঝনৎকার, অশ্বাদির গমনাগমন, নৌকাযাত্রা প্রভৃতি বহু বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টিতে টেপরেকর্ডারের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

• •

বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত বাইশ দিনব্যাপী যাত্রা উৎসবের বিরাট আসর আসচে ৩০-এ আগস্ট থেকে বসছে উত্তর কলকাতার চিৎপুর রোড এবং বিডন স্ট্রীটের সংযোগস্থল রবীন্দ্র-কাননে—ঠিক যে-জায়গাটি আজও পেশাদারী যাত্রাদলগুলির আস্তানার অতি সন্নিকটে। এবং উৎসব-লিপি থেকে দেখতে পাচ্ছি, এই উৎসবে নট্ট কোম্পানী, নবরঞ্জন অপেরা, সত্যম্বর অপেরা, আর্য অপেরা, নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা, জনতা অপেরা, তরুণ অপেরা, নিউ গণেশ অপেরা, অম্বিকা নাট্য কোম্পানী, সাজের আসর প্রভৃতি প্রখ্যাত পেশাদারী যাত্রাদলগুলির পাশাপাশি আই-পি-টি-এ (ভারতীয়

গণনাট্য সঙ্ঘ), সিকদারবাগান সঙ্গীত সমাজ, শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট, শিল্পশ্রী, বালী শিশু সমিতি প্রভৃতি সৌখীন সম্প্রদায়গুলিও যাত্রার আসর বসাচ্ছেন। বাঙলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির বাহন 'যাত্রা'কে একদিন বিশ্বের দরবারে হাজির ক'রে সম্মানের শ্রেষ্ঠতম আসনে বসানোর জন্যে যে-সাধনার প্রয়োজন, তা' এখন থেকেই শুরু করবার সময় এসে গেছে।

চিত্র সমালোচনা

ম্যায় চুপ রহুঙ্গা (হিন্দী) : এ. ভি. এম্. প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ১৩,৮৩১ ফুট দীর্ঘ এবং ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : এ. ভি. মায়াপ্পা; কাহিনী : জবর এন. সীতারামন; পরিচালনা : এ. ভীম সিং; সঙ্গীত-পরিচালনা : চিত্রগুপ্ত; সংলাপ ও গীতরচনা : রাজেন্দ্রকৃষ্ণ; চিত্রগ্রহণ : জি. ভীটল রাও; শব্দধারণ-তত্ত্বাবধান : মুকুল বসু; শব্দধারণ জে. জে. মাণিকরাম; শিল্পনির্দেশ : এইচ্. শান্তারাম; সম্পাদনা-তত্ত্বাবধান : এ. ভীম সিং; সম্পাদনা : এ. পল ডোরাইশঙ্গাম্ এবং আর. তিরুমলয়; রূপায়ণ : মীনাকুমারী, শান্তি, হেলেন, সুনীল দত্ত, জাগীরদার, নানা পালশিকার, রাজ মেহরা, মোহন চোটি এবং মাস্টার বাবলু। ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় গেল ২৭-এ জুলাই থেকে ওরিয়েণ্ট, ম্যাজেস্টিক বসুশ্রী, বীণা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

কনক মুখার্জি রচিত ও পরিচালিত 'মায়ার সংসার' চিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুলতা চৌধুরী

বহুদিন হোলো ভুলে গিয়েছিলুম যে, চোখের জল ফেলেও এত আনন্দ পাওয়া যায়। উন্নাসিকেরা বলবেন, সেণ্টিমেণ্টাল সবস্টাফ—কান্নাভরা ভাবাবেগের ছবি। কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা থেকে শুরু ক'রে সেক্সপীয়ারের ওথেলো পর্যন্ত কোন্ কাহিনী ভাবাবেগে ভরা নয়? এবং এগুলি যে মহৎ সাহিত্য, তা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না। শাণিত বুদ্ধির কসরতভরা বহু ছবি দেখে বিস্মিত হয়েছি, চমৎকার আর্টের নিদর্শন ব'লে ধন্য ধন্য করেছি, কিন্তু হৃদয়গঙ্গায় বান ডাকানোর ক্ষমতা তাদের কারুরই মধ্যে খুঁজে পাইনি। তাই আজ "ম্যায় চুপ রহুঙ্গা" দেখতে গিয়ে যখন কাহিনীর এক একটি নাট্যমুহূর্ত মনের তারে আনন্দ-বেদনার ঝঙ্কার তুলে চোখকে কখনও ক'রে তুলছিল অশ্রুসজল এবং কখনও বা তার থেকে অশ্রুর প্লাবন বইছিল, তখন ছবিটিকে আন্তরিক বাহবা না দিয়ে পারিনি। ছবিটি তার কাহিনীগুণে যে-কোনও দর্শককে—বিশেষ ক'রে বাঙালী দর্শককে—খুশী করবার ক্ষমতা রাখে।

গোড়ায় মনে হবে, ছবিটি গতানুগতিক ধরণের। ট্রেনে যেতে যেতে একটি ছেলে এবং একটি মেয়েতে আলাপ এবং প্রথম সন্দর্শনেই প্রেম—একে আমরা 'বয় মিটস্ গার্ল'-গল্প ব'লে থাকি। এর পর আবার যখন বড়লোকের ছেলে এবং গরীবের মেয়ে গুরুজনদের না জানিয়েই গোপনে বিবাহ ক'রে বসল, এবং ছেলে যখন প্রায় পরক্ষণেই কর্মোপলক্ষ্যে বিদেশে চ'লে গেল, তখনও মনে হয়, একটি অতি-পুরাতন ছকে-ফেলা কাহিনীকেই পুনরভিনীত হতে দেখছি। এর পরে যখন মর্যাদা-অন্ধ জমিদার নিজের ছেলের গোপন-বিবাহের কথা জানতে পেরে প্রথমে মেয়েটাকে ভয় দেখায় এবং পরে ওর কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'রে গোপন
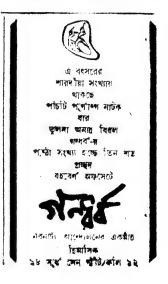
বিবাহের কথা চিরকালের জন্যে মন থেকে মুছে ফেলবার জন্যে এবং মেয়েটি দেবতার সামনে সত্যবদ্ধ হয়, "ম্যয় জিন্দেগী ভর চুপ রহুঙ্গী", তখনও গল্পটি মামুলী ছককে অতিক্রম ক'রে যায় না। কিন্তু পরে যখন দেখি, মেয়েটি সন্তানসম্ভবা জানতে পারায় প্রতিবেশীরা নিন্দায় শতমুখ হয়ে উঠেছে এবং বাপ মেয়ের কাছ থেকে কিছুতেই সত্য আবিষ্কার করতে পারছে না—দুষ্কর্মটি সাধিত হয়েছে কোন পাপাচারী দ্বারা, তখন মনে প্রথম প্রত্যাশা জাগে, মেয়েটির প্রতিজ্ঞানিষ্ঠা গল্পটিকে কোনো নতুন পথে চালালেও চালাতে পারে। এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে যখন মেয়ের বাবা (নবজাতকের দাদামশাই) অনাথ-আশ্রমের সামনে ফেলে রেখে এসে কন্যাকে মিথ্যা ক'রে বলে—শিশুটি জন্মলাভের পরেই মারা গেছে, তখন প্রত্যাশা আরও ঘনীভূত হয়। এরও পরে যখন সেই সদ্যোজাত শিশুকে বছর ছয়-সাতের ছেলে শ্যামরূপে অপরাপর অনাথ বালকের সঙ্গে 'তুমহি হো মাতা পিতা তুমহি হো' গাইতে শুনি, তখন থেকে বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্যে সমস্ত মনপ্রাণ উদগ্র হয়ে ওঠে এবং বলতে বাধা নেই, ঐ অল্পবয়স্ক বালক-শ্যামের অপরূপ চরিত্র-চিত্রণ কাহিনীটিকে একটি অপরূপ স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত করেছে।

এই কাহিনী-চিত্রটিতে প্রত্যেকটি শিল্পী অত্যন্ত সুঅভিনয় করেছেন। কিন্তু সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীর সকল সু-অভিনয়কে ম্লান করে দিয়ে যে-শিশু অভিনেতা এককভাবে ছবিখানিকে সাফল্যের গৌরীশৃঙ্গে তুলে নিয়ে গেছে, সে হচ্ছে শ্যামের ভূমিকাভিনেতা মাস্টার বাবলু। দেশী-বিদেশী বহু চিত্রেই বহু শিশু-অভিনেতার নাট্যনৈপুণ্যে মুগ্ধ হবার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি কথাবার্তা, গান এবং বহুতর ভাবপ্রকাশক মুখ-চোখের ভঙ্গী দিয়ে এমনতরো মনপ্রাণ-কেড়ে-নেওয়া অভিনয় আর কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না; না, জ্যাকি কুগান বা জ্যাকি কুপারও আমাদের মাস্টার বাবলুর পাশে দাঁড়াতে পারে না। মাত্র একটি কথাই তাকে বলতে ইচ্ছে করছে—সাবাস্, বাবলু। গরীবঘরের শিক্ষিতা মেয়ে গায়ত্রীর ভূমিকায় সত্যবদ্ধা, লাঞ্ছিতা, নিগৃহীতা নারীরূপে মীনাকুমারী যে মর্মছোঁড়া অভিনয় করেছেন, তা তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের একটি স্মরণীয় নিদর্শন হয়ে থাকবে। এ ছাড়া

টাস্ ফিল্মসের 'অভিসারিকা'র একটি দৃশ্যে নির্মলকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল ও অনুপকুমার

নায়ক কমলরূপে সন্তোষ ... জমিদার রতনকুমার বেশে জাগীরদার, ... ভূমিকায় মোহন চৌটি এবং ... নারায়ণের ভূমিকায় ... ভূমিকাগুলিকে জীবন্ত ... হেলেনের নৃত্য-রচনার জন্যে যিনিই ... হোন, তিনি চলচ্চিত্রের প্রয়োজনকে আজও উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই ও-রকম দ্রুত অঙ্গভঙ্গীসহ ... প্রবর্তন করেছেন। বাকী সকল ভূমিকাই যে সুঅভিনীত, তা জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে।

ছবিটিতে অন্ততঃ সাতখানি ... আছে ; তার মধ্যে বনাপ্রাণী ... ভিনয়ে ব্যবহৃত 'চাহে কোই মুঝে জংলী কহে' নামে অনুকৃত-গানটি ছাড়া প্রায় সকল গানই সুলিখিত, সুগীত এবং সুন্দর সুরারোপিত বলে জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনাপূর্ণ।

ছবির সকল রকম কলা-কৌশলের কাজ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের।

'মার চুপ রহুঁগী' একটি অসামান্য সফলতাপূর্ণ চিত্ররূপে পরিগণিত হবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী আমরা অনায়াসেই করতে পারি।

বিবিধ সংবাদ

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ :

'বিশ্বরূপা' নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ বাঙলা নাটক ও তার অভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে যে-সব কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে একটি হোলো নাটক ও তার আঙ্গিক নিয়ে বহুতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করবার জন্য যে-জিনিসটি সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে একটি অভিনয়মঞ্চ। বলা বাহুল্য, মাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে ব্যবহৃত হবে, এমন একটি মঞ্চ আজ কলকাতা শহরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই কথাই পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীরাসবিহারী সরকার সেদিন ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর মহাশয়কে সখেদে জানিয়েছেন। এবং প্রত্যুত্তরে শ্রীকবীর আশা দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এ-ব্যাপারে পরিষদকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।

শ্রীকবীর আরও জানিয়েছেন যে, কলকাতা শহর বা শহরতলীতে যদি একটি মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের উদ্যোগ হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার তাতে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। অবশ্য আমাদের ধারণা, একটি আধুনিক রীতিসম্মত মুক্তাঙ্গন মঞ্চ, তাকে ঘিরে অ্যাম্ফিথিয়েটার ধরণের বসবার আসন এবং আনুষঙ্গিক কক্ষাদি নির্মাণ করতে খুব কম করেও দশ লক্ষ টাকা খরচ পড়বে।

আন্তর্জাতিক অভিনয়োৎসবে যোগদানের জন্যে যদি বাঙলাদেশ থেকে কোনো উপযুক্ত নাটকে দল পাঠানো সম্ভব হয়, তাহলেও কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত সাহায্য করতে পারেন বলে শ্রীকবীর জানিয়েছেন।

শ্রীকবীর বিশ্বরূপা ... পরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গে পরিষদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার জন্যে ... ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করবেন ... প্রকাশ।

গেল ২১এ জুলাই পরিষদের সহ-সভাপতি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পরিষদ নাট্যকার এবং কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মশতবার্ষিকী পালন করেন।

গেল ২৮এ জুলাই থেকে পরিষদ আয়োজিত চতুর্থ বার্ষিক গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। প্রথম দিন অভিনয় করলেন প্রতাপপুর মিলন মন্দির ; আগন্তুক রচিত "রং তুলি"।

নিখিল বঙ্গ নাট্যোৎসব :

বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর প্রযোজনায় গেল ২৩এ জুলাই থেকে নিখিল বঙ্গ নাট্যোৎসব শুরু হয়েছে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। তিরিশটি নাট্য সম্প্রদায় এই উৎসবে যোগ দিয়েছেন এবং ১৩এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উৎসবটি চলবে।

"গোরা"র ১০০তম রজনী :

দক্ষিণ কলকাতার মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক সম্প্রদায় আসছে ৫ই আগস্ট রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় তাঁদের নিয়মিত নাট্যাভিনয় "গোরা"র শততম স্মারক

উৎসব পালন করলেন। "গোল্লা" অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা কামনা করেছিলুম, এ-রকম সার্থক অভিনয় প্রচেষ্টা যেন আশু জনপ্রিয়তালাভ করে।

নটলীলার "যোগাযোগ" :

গার্ডেনরীচ অঞ্চলের নাট্যসংস্থা নটলীলা আজ, ৩রা আগস্ট থেকে শুরু ক'রে এই মাসের প্রতিটি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬॥টায় দক্ষিণ কলকাতায় থিয়েটার সেণ্টার হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ" উপন্যাসটির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করবেন। নায়িকা কুমুদিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন সুখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী তপতী ঘোষ।

হাওড়া রেশনিং রিক্রিয়েশন ক্লাবের "বৈকুণ্ঠের উইল" :

রেশনিং রিক্রিয়েশন ক্লাবের হাওড়া সেণ্ট্রাল জোনের সভ্যবৃন্দ আসছে শুক্রবার, ১০ই আগস্ট হাওড়া রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে শরৎচন্দ্রের "বৈকুণ্ঠের উইল" অভিনয় করবেন।

ছন্দবেশীর "নিষ্কৃতি" ও "শেষ বর্ষণ" :

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা ছন্দবেশী গেল রবিবার, ২৯এ জুলাই সকাল নটায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন উপলক্ষ্যে কবির "নিষ্কৃতি" কবিতার নাট্যরূপ এবং "শেষ বর্ষণ" নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করেন।

উন্মেষ-এর "নিষ্কৃতি" :

উত্তর কলকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা উন্মেষ তাঁদের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে গেল রবিবার, ২৯শে জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় রবীন্দ্রভারতী ভবনে কবিগুরুর 'নিষ্কৃতি' কবিতাটির বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রদত্ত নাট্যরূপটি পরিবেশন করেন।

মহুয়ার "তৃতীয় প্রহর" :

দক্ষিণ কলকাতার নবগঠিত নাট্য-সংস্থা মহুয়ার সভ্য-সভ্যারা গেল সোমবার, ১৬ই জুলাই থিয়েটার সেণ্টার হলে অশোক সরকার রচিত রহস্যঘন সামাজিক নাটক "তৃতীয় প্রহর" বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে মঞ্চস্থ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, নাটকখানি এঁদের দ্বারা এর আগেও একবার অভিনীত হয়ে প্রশংসা অর্জন করেছিল।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গৌহাটি শাখায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব :

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গৌহাটি শাখার উদ্যোগে গেল ২৪এ জুন স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী হলে "রবীন্দ্র জন্মোৎসব" সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে অসমীয়া ও বাঙালী শিল্পীরা মিলিতভাবে কবিগুরুর "বাল্মিকী প্রতিভা" গীতিনাট্যটি নৃত্য-নাট্যের আকারে পরিবেশন ক'রে উপস্থিত সুধীবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। বাল্মিকীর ভূমিকায় বলদেব শর্মার পুরুষোচিত ব্যঞ্জনা এবং বালিকার ভূমিকায় নন্দিতা পালের লাস্য-সুষমামণ্ডিত নৃত্য পরম উপভোগ্য হয়েছিল। সঙ্গীত-পরিচালনা, দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাতে যথাক্রমে দিলীপ শর্মা, শুক্লা রায় এবং অনিল দাস যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন ক'রে নাটকটির সৌষ্ঠব বর্ধনে সহায়তা করেন।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা :

১৯৬১ সালের ২৪এ জুন তারিখে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যেই এর সভ্যসংখ্যা হয় অন্ততঃ ৫০০; বর্তমানে ক্লাবটির সভ্যসংখ্যা হচ্ছে ৮০০ এবং সভ্য হবার জন্যে আরও কয়েক শো আবেদন-পত্র সম্পাদকের দপ্তরে অপেক্ষা করছে। সাধারণতঃ যেসব বিদেশী চলচ্চিত্র আজও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এখানে দেখানো হয় না, সেইগুলি দেখবার যথাসম্ভব সুযোগ ক'রে দেওয়াই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্যতম কর্ম। প্রথম বছরে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা তার সভ্য-সভ্যাদের অন্ততঃ ২২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং ৫০খানি স্বল্প-দৈর্ঘ্য ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। এছাড়া পোলিশ এম্বাসির সহায়তায় সপ্তাহব্যাপী পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব ক'রে প্রতিষ্ঠানটি যে-অসামান্য সাফল্যলাভ করেছিল, তা চিত্ররসিক-মাত্রেরই স্মরণে আছে। কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন, যাতে তাঁরা জাপান, ইতালি এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির চলচ্চিত্র সভ্যবৃন্দকে দেখাতে পারেন। বিদেশী ছবি দেখাবার সুযোগকে বর্ধিত করবার জন্যে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা ভারত সরকারের সেন্ট্রাল ফিল্ম লাইব্রেরী, ব্রিটিশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ, ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট, ফ্রেণ্ড অব দি ব্রিটিশ ফিল্ম আর্চিভ, আমেরিকান ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়েছেন।

আমরা এ জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

পরলোকে বিশিষ্ট সুরকার হরিপ্রসন্ন দাস :

গেল ১৯এ জুলাই, বৃহস্পতিবার বিশিষ্ট সুরকার ও চলচ্চিত্রজগতের

সংগীত-পরিচালক হরিপ্রসন্ন দাস পরলোকগমন করেছেন। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য সংগীতে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য। বেহালা এবং পিয়ানোবাদক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি পঙ্কজকুমার মল্লিকের সহকারী হিসেবে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন এবং পরে স্বাধীনভাবেও সংগীত পরিচালনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ছিলেন; তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হ'ত। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

ফটোপ্লে সিণ্ডিকেট-এর শিশুচিত্র :

শিশুদের উপযোগী ছায়াছবি নির্মাণের নবসৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ফটোপ্লে সিণ্ডিকেট (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড'।

এ'দের হয়ে মনোরঞ্জন ঘোষ বর্তমানে রূপকথা ও বাস্তবের সুসমঞ্জস সংমিশ্রণে যে কাহিনী রচনা করেছেন, তার মধ্যে থাকবে আবালবৃদ্ধ সকলের আনন্দের রসদের সঙ্গে মানবিক আবেদন।

সংগীত, আলোকচিত্র ও শিল্প-নির্দেশনার ভার নিয়েছেন যথাক্রমে সন্তোষ সেনগুপ্ত, ফ্রান্স ও জার্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং নিউ থিয়েটার্স, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর অভিজ্ঞতাপুষ্ট আলোকচিত্রশিল্পী পণ্টু চৌধুরী এবং অবনীন্দ্রনাথ ও রদেনস্টাইনের শিষ্য প্রখ্যাত শিল্পী সুধাংশু চৌধুরী।

মাধবী চিত্রম্-এর "একলা চলরে" :

বৈচিত্র্যময় এই সংসারের এক দুর্জয় যুবকের জীবনের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ কুমার প্রযোজিত মাধবী চিত্রম্-এর প্রথম নিবেদন "একলা চলরে"। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন—বীরেন চট্টো, দীপক মুখুজ্যে, মলয়া সরকার, অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, কবিতা সরকার, নৃপতি, রাজলক্ষ্মী, হরিধন, অপর্ণা দেবী এবং আরো অনেকে। ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছেন—অনিল বাগচী। বাসন্তিকা প্রাইভেট লিঃ-এর পরিবেশনায় ছবিটি খুব শীঘ্রই শহরের কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'হামরাহি' চিত্রে শশিকলা ও রাজেন্দ্রকুমার।

বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্স-এর পরবর্তী চিত্রের মহরৎ :

গেল রথযাত্রার দিন বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্স-এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ছবির মহরৎ বিনা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরলোকগমনের জন্যেই এই আড়ম্বরহীনতা। ছবিগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ শিগ্গিরই ঘোষিত হবে।

কলকাতা
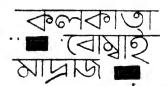
সত্যজিৎ রায় পরিচালিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিযান'-এর দৃশ্যগ্রহণের কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটারীতে ছবিটির সম্পাদনা করছেন দুলাল দত্ত। দুবরাজপুরে বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে আলোকচিত্র-শিল্পী সৌমেন্দু রায় 'হেলিকপ্টার' থেকে কয়েকটি বিশেষ দৃশ্যকোণ বেছে ছবি নিয়েছেন। বাংলা ছবিতে 'হেলিকপ্টার সট' এই প্রথম এবং সেইসঙ্গে বোম্বাই-এর ওয়াহিদা রেহমানের অভিনয়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এ'র বিপরীত চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেছেন। কয়েকটি মুখ্য চরিত্রে রুমা গুহঠাকুরতা, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও অরুণ রায় রূপদান করেছেন। একটি বিশেষ সূত্রে জানা গেল যে সত্যজিৎ রায় 'অভিযান' হিন্দীতে dubb করবেন। আগামী শারদীয়ায় ছবিটি মুক্তি পাবে।

শ্রীতারাশঙ্কর পরিচালিত প্রমথ চৌধুরীর 'বীণাবাঈ' ছবিটির সংগীত গ্রহণ করলেন সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী। আটটি গান এ ছবির সম্পদ, গান করেছেন তারাপদ চক্রবর্তী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়।

ইন্টারন্যাশনাল মুভিজ-এর 'অনামিকা' ছবিটি পরিচালনা করছেন হেমেন গুপ্ত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এ ছবির একটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন। সংগীত-পরিচালক হলেন সুধীন দাশগুপ্ত। বর্তমানে শ্রীগুপ্ত বোম্বাই গেছেন এবং ফিরে এসে ছবির কাজ শুরু করবেন।

প্রযোজক অনন্ত সিং-এর প্রযোজনায় '[illegible]' পরিচালনা করছেন চিত্ত বসু

চরিত্রাভিনয়ে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, দীপ্তি রায়, ছবি বিশ্বাস, বিশ্বনাথন, তরুণকুমার ও অমর মল্লিক। সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোনে দৃশ্যগ্রহণের কাজ প্রায় সমাপ্ত হতে চলেছে।

দেবী চিত্রমের 'ওরা কারা' পরিচালনা করছেন বীরেশ্বর বসু। নন্দিতা দে একটি নতুন মুখ এ ছবিতে অভিনয় করছেন। নায়কের চরিত্রে অসীমকুমার।

নবাগত প্রযোজক কৃষ্ণলাল পাল নতুন চলচ্চিত্র-প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'স্টার পিকচার্স' প্রতিষ্ঠিত করলেন। বৈশাখী গোষ্ঠী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। ছবির নাম 'কাঁচা-পাকা'।

চিত্ররথ গোষ্ঠী সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে সুন্দরবন গহন অরণ্যে 'কুমারী মন'-এর দৃশ্যগ্রহণের কাজ শেষ করেছেন। সম্পাদনা চলেছে। ছবির প্রধান ভূমিকালিপিতে রয়েছেন কণিকা মজুমদার, সন্ধ্যা রায়, অনিল চ্যাটার্জি, দিলীপ মুখার্জি, ও দেবী নিয়োগী। এ ছবির সুরকার হলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। মিতালী ফিল্মস-এর পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত আর একটি ছবি কনক মুখোপাধ্যায়ের 'মায়ার সংসার'। শিল্পীদের মধ্যে ছবির পুরোভাগে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, অসিতবরণ, বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, বিশ্বজিৎ ও সুলতা চৌধুরী। সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন রবীন চ্যাটার্জি।

এ ভি এম-এর 'ময় চুপ রহুঙ্গী' চিত্রে মিনাকুমারী ও বালক

বোম্বাই

গুরু দত্ত স্টুডিওয় সত্যেন বসু পরিচালিত 'রাত আউর দিন'এর দৃশ্যগ্রহণের কাজ নিয়মিত চলেছে। শঙ্কর-জয়কিষণের সুরে নার্গিশের মুখে কয়েকটি গানের দৃশ্য সম্প্রতি গৃহীত হল। নায়কের চরিত্রে রূপদান করছেন প্রদীপকুমার। পার্শ্ব চরিত্র-প্রধানে রয়েছেন কুমারী নাজ, আনওয়ার হুসেন, হারিন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, সুলচনা চ্যাটার্জি, কে এন সিং ও ফিরোজ খান।

'জংলী' ছবির অসাধারণ সাফল্যের পর শাম্মি কাপুর রোহি ফিল্মস-এর 'জানওয়ার' ছবিতে অভিনয় করছেন। এই রঙিন ছবির প্রযোজক হলেন হরদীপ। ছবিটি পরিচালনা করছেন বাপি সোনি। রাজশ্রী শান্তারাম এ ছবির নায়িকা।

'আশিক'-এর পর রেউবেন ভাবি প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় ছবি 'আবদুল্লা দিওয়ানা' পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন মাদ্রাজের তরুণ পরিচালক শ্রীধর। রাজকাপুর ও নন্দা এই ছবির দুটি প্রধান চরিত্র। সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

রাজকাপুর প্রোডাকসন্সের 'সঙ্গম'-এর সুদূর পাশ্চাত্যের সুইজারল্যাণ্ডের আলপাইন হিমাবাহের ওপর ছবির দৃশ্যগ্রহণের পালা শুরু হয়েছে। রাধু কর্মকার এ ছবির আলোক-চিত্রশিল্পী। প্রযোজক-পরিচালক রা জ কা পু রে র নির্দেশে বহির্দৃশ্যের অভিযান চলেছে স্বয়ং রাজকাপুর, বৈজন্তীমালা ও রাজেন্দ্রকুমারকে নিয়ে।

সায়রা বাণু ও জয় মুখার্জি অভিনীত একটি রঙিন ছবির নাম 'দূর কী আওয়াজ'। সম্প্রতি ছবির প্রথম গানটি সঙ্গীত-পরিচালক রবি শিল্পী মহম্মদ রফিকে দিয়ে রেকর্ড করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন দেবেন্দ্র গোয়েল।

ফিল্মালয়ের 'এক মুসাফির এক হাসিনা' ছবির কাশ্মীর বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ করেছেন পরিচালক রাজ খোসলা। রোমান্টিক চরিত্রে সাধনা ও জয় মুখার্জি অভিনীত ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন ও পি নায়ার। আলোক-চিত্রশিল্পী ফলি মিস্ত্রি-র চিত্র নির্দেশে অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজেন্দ্র-
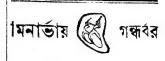
'রূপান্তরী'র একটি ৮ মিঃ মিটার শিশুচিত্রে দু'জন অভিনেতা

নাথ, নীরা, মালীকা, সিধু, শ্যাম চ্যাটার্জি ও জগদীশ রাজ। ছবিটি সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে।

গুরু দত্ত স্টুডিওর শক্তি সামন্ত তাঁর নতুন ছবি 'এক রাজ'-এর কাজ আরম্ভ করেছেন। কিশোরকুমার, যমুনা, প্রাণ, ললিতা পাওয়ার, আগা মদনপুরী, সুজাতা ও মমতাজ বেগম এ ছবির বিভিন্ন চরিত্র-শিল্পী। চিত্রগুপ্ত ছবির সংগীত-পরিচালক।

প্রদীপকুমার, কল্পনা ও বিজয়া চৌধুরী অভিনীত 'সহেলী'-র চিত্রগ্রহণ সেণ্ট্রাল স্টুডিওয় সম্প্রতি এক সপ্তাহ-ব্যাপী চলাকালীন শেষ হল। ছবির পরিচালক অর্জুন হিঙ্গোরাণী। সংগীত পরিচালন করছেন কল্যাণজী ও আনন্দজী।

মাদ্রাজ

সম্প্রতি তেলেগু চিত্র-কাহিনীকার শ্রীশামুদ্রালা ভি রাঘবচারিয়ার ৬০তম জন্মদিবস মহাসমারোহে পালিত হল। অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী রাজা সুলচনা ও অভিনেতা এ নাগেশ্বরা রাও চন্দন ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করেন। শ্রীরাঘবচারিয়া বর্তমানে 'মহাকাব্যম' রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। গুণির জন্ম-সম্বর্ধনায় চলচ্চিত্রশিল্পের বহু গুণিজ উপস্থিত ছিলেন।

'মধুপস্মম' চিত্রের সংগীত গ্র শেষ হল। নয়টি গান এ ছবির সম্পদ সুরসৃষ্টি করেছেন বাবুরাজ। ছবি পরিচালক বর্তমানে হেলসিঙ্কির যু উৎসবে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আগাম সপ্তাহ থেকে ছবির দৃশ্যগ্রহণের কা শুরু হবে। পরিচালকের নাম রা কারিয়াৎ।

ঐতিহাসিক পটভূমি বিজয়নগরে কৃষ্ণদেব রায় জীবন-অবলম্বনে 'মহামন্ত্র তিম্মাকসু' তেলেগু ভাষায় চিত্রর দিচ্ছেন পরিচালক কে কামেশ্বর রাও নামভূমিকায় অভিনয় করবেন গুম্মা ভেঙ্কটেশ্বরাও। অন্যান্য চরিত্রে দেবীক রাজশ্রী, এল বিজয়লক্ষ্মী, প্রভাক রেড্ডি ও এ সুভারাও।

নাগেশ্বর রাও অভিনীত 'কু গোল্লালু' তেলেগু ছবিটি মু প্রতীক্ষিত। কয়েকটি মুখ্য চরিত্রে অভি নয় করেছেন নির্মলা, মালাড়ী, সু কান্তম ও রামানা রেড্ডি। সংগীত ও চি পরিচালনা করেছেন রাজেশ্বর রাও কে প্রত্যাগত্মা।

তামিল ছবি 'পাশা মালার' তেলেগু ভাষায় চিত্ররূপ দিচ্ছেন মধুসূদন রাও। ছবিটির নাম রা হয়েছে 'রক্ত সম্বন্দম'। প্রধান দুটি মু চরিত্রে রূপদান করছেন এন টি রাম রা ও জি সাবিত্রী। —চিত্রদূ

ছবি দেখছেন—নায়ক গান করছে। সে গান আপনারা নায়কের মুখ থেকে শুনছেন। আসলে কিন্তু তিনি ছবিতে গান করেন না। চিত্রগ্রহণের সময় 'প্লে-ব্যাক' যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত কোন শিল্পী-কণ্ঠের গান বাজানো হয় নায়ক শুধু গানের কথার সঙ্গে মুখ মিলিয়ে যান। মাঝে মাঝে এর মধ্যে তিনি যে ধরা পড়েন না এমন নয়, কিন্তু সম্পাদকের হাতে সে ভুল সংশোধনের পর দর্শকদের কাছে মনে হবে নায়ক সত্যিই ছবিতে গান গাইছেন। সংগীত-গ্রহণের কৌশলটুকু এবারে বলি।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটারীর এক অংশে এই ছায়াছবির সংগীত-গ্রহণের একটি স্টুডিও আছে। 'বর্ণচোরা' ছবির 'মিউজিক টেক্'-এ উপস্থিত হয়ে দেখলাম এলাহি কাণ্ড। এই বিরা স্টুডিওর এক পাশে বসে সংগীত পরি চালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গানের মহড় দিচ্ছেন। সামনের চেয়ারে সারি সারি যন্ত্রী যন্ত্রসংগীতের সুরধ্বনি বাজিয়ে চলেছেন গানের সঙ্গে সঙ্গে। স্বরলিপি

নির্দেশে কখনো কখনো পরিবর্তন হচ্ছে। পাশের কাচ-ঘরের জানলা থেকে শব্দযন্ত্রী শ্যামসুন্দর ঘোষ রেকর্ডিং করছেন। পর পর চারটি গান তিনি 'সাউণ্ড ফিল্ম'-এ রেকর্ড করলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে গানগুলি রচনা করেছেন গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। প্রথমটি সমবেত সঙ্গীতে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কণ্ঠদান করলেন বাসন্তী ঘোষাল, বাণী দাশগুপ্ত এবং বাণী ঘোষ। গানটির কয়েকটি কথা হল—

'এখানে সবই ভালো
আলোতে মিলায় কালো
ভালবাসার চশমা দিয়ে
দেখতে যদি পাও।'

দ্বিতীয় তৃতীয় গানটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজ কণ্ঠে গাইলেন—

আর কত নেভা দীপ জ্বালি (আমি)
সবুজ স্বপন ভেঙে দিয়ে ওই
ধূধূ করে শুধু বালি।'
'এসো ধীরে ধীরে এসো
বসন্ত হয়ে মাধুরী ছড়ায়ে
আমার ভুবন ঘিরে এসো।'

শেষ গানটি দ্বৈত কণ্ঠে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীমুখোপাধ্যায় কণ্ঠদান করলেন।

'ওরে বাতাস ফুল শাখাতে
দিসনে আজি দোল রে
আমার এ মন যেন
কেমন কেমন করে।'

এই গানগুলি রেকর্ড হয়ে যাবার পর সহকর্মী সঙ্গীত-পরিচালক সমরেশ রায় ও নিখিল চট্টোপাধ্যায় গল্পের বিশেষ বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে গানের যোগাযোগটুকু বুঝিয়ে দিলেন। দৃশ্যানুযায়ী সুরের বৈচিত্র্য আছে এবং প্রতিটি গান সুগীত বলা চলে। এই গানগুলির 'পিকচারিজেসন'-এর সময় নায়ক বা নায়িকার মুখ মেলানো ছাড়া আর কিছুই শোনা যাবে না।

সঙ্গীত-গ্রহণের পর বনফুলের 'বর্ণচোরা' ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ সমাপ্ত-প্রায়। নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওয় শেষ অংশটুকুর কাজ চলেছে। স্টুডিও ফ্লোরে শিল্পনির্দেশক প্রসাদ মিত্র একতলা পাকাবাড়ি নির্মাণ করেছেন। সেই বাড়ির একটি আধুনিক পরিবেশে সজ্জিত ঘরে চিত্রগ্রহণ করছেন চিত্রশিল্পী বিজয় ঘোষ। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে অভিনয় করছেন ক্ষিতীশের ভূমিকায় অনিল

এম. সি প্রোডাকসন্সের 'শুভদৃষ্টির' মহরৎ অনুষ্ঠানে ক্ল্যাপস্টিক দিয়েছিলেন পরলোকগত শিল্পী ছবি বিশ্বাস।

চ্যাটার্জী, সুলতার চরিত্রে সন্ধ্যা রায় ও পিসীমার ভূমিকায় সুরুচি সেনগুপ্তা। সুলতার বাড়িতে ক্ষিতীশ ভৃত্য সেজে সুলতার হৃদয় জয় করতে এসেছে। কিন্তু ধরা পড়ে যায়। ক্ষিতীশ ভাল গাইতে পারে। একটা গান সুলতা সুরে ভুল করাতে ক্ষিতীশ শুনিয়ে দিল—'এসো ধীরে ধীরে এসো, বসন্ত হয়ে মাধুরী ছড়ায়ে'। পিসীমা হঠাৎ ঘরে এসে বললেন—

পিসীমা—ছেলের গলা শুনলাম। কে গাইল রে?

সুলতা—উনি রেডিও খুলে শুনছেন।

পিসীমা—এই রেডিওয় সর্বনাশ করবে।

পিসীমা চলে গেলেন। ক্ষিতীশ তখন রেডিও বন্ধ করে দিয়েছে।

সুলতা—অদ্ভুত আপনার উপস্থিত বুদ্ধি!

ক্ষিতীশ—তোমার উপস্থিতি আমার উপস্থিত বুদ্ধি এনে দেয়।

সুলতা—রসিকতা করছেন?

ক্ষিতীশ—রসিকতা করতে এসে এখানে এমন রসে ডুবে গেছি—

সুলতা—কি যা-তা বলছেন?

ক্ষিতীশ—মনে হয় এটা যা-তা আর আমার চাকর সাজাটা, কিন্তু—

'বর্ণচোরা' ছায়াচিত্রের সংগীত গ্রহণ করছেন সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শিল্পী বাসন্তী ঘোষাল, বাণী দাশগুপ্ত, ঝর্ণা ঘোষ। ডানদিকে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

সুলতা—এতে আর কিন্তুর কি আছে—আমাকে নিয়ে মজা করবেন বলেই চাকর সেজেছেন।

ক্ষিতীশ—হ্যাঁ, সুলতা আমি মজা করতেই ভালবাসি, কিন্তু তোমার সঙ্গে মজা করতে এসেই—

সুলতা—কথাগুলো সামলে বলুন, ভুলে যাবেন না আপনি চাকর।

ক্ষিতীশ—ভুলে যাইনি প্রেমের জন্যে মীরাবাঈ-এর মতন আমিও গাইছি—'ম্যায়নে চাকর রাখো জী'।

এই দৃশ্যটি টুকরো টুকরো ভাবে অভিনীত হল। সহকারী পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গল্পের কাহিনীটুকু সংক্ষেপে জেনে নিলাম।

ক্ষিতীশের ইচ্ছে ছিল বিলেতে গিয়ে সঙ্গীত চর্চা করবে। কিন্তু বাবার ইচ্ছে ওকালতী করা। শেষ পর্যন্ত এ দুটির কোনটাই সুপ্রতিষ্ঠিত হল না। তাই শহরে এসে ক্ষিতীশ 'সঙ্গীত কলা কেন্দ্র' এই সঙ্গীত শিক্ষায়তনটি গড়ে তুললে। অনেকদিন উত্তীর্ণ হল, কিন্তু তেমন ছাত্র-ছাত্রী হল না। অনেকেই অনেক পরামর্শ দেয়। কেউ বলে ভাল শিক্ষয়িত্রী না এলে স্কুল চলবে না। সুতরাং মহিলার প্রয়োজন। তবেই ছাত্র আসবে স্কুল থেকে কলেজ হবে। তাই মহিলা শিল্পী সন্ধানে ক্ষিতীশ সুলতাদের বাড়িতে ভৃত্যের ছদ্মবেশে এসে চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যদিকে ক্ষিতীশ-সুলতার বাবা কিছুই জানতেন না এই ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত এরা পরস্পরে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে চাইলে অভিভাবকদের কাছ থেকে কোন নির্দেশ পেল না বরং মিথ্যে চুরির অপরাধে ক্ষিতীশকে তাঁর বাবা পুলিশে দিলেন। সুলতাকে ঘরে বন্দী করলেন ওর বাবা। গল্পের শেষ পরিণতি ঐ শহরের ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে। তিনিই সমাধা করলেন। ক্ষিতীশের সঙ্গীত-কলা-কেন্দ্রে জীবনসঙ্গিনী হল সুলতা।

শিল্পভারতী প্রোডাকসন্সের তরফ থেকে এ ছবির আংশিক প্রযোজনার ভার গ্রহণ করেছেন গৌর দে। অন্যান্য কুশলীদের মধ্যে রয়েছেন সম্পাদনায় সুবোধ রায়, রূপসজ্জায় বসির আমেদ, সহকারী চিত্রগ্রহণে পঙ্কজ দাস ও শব্দধারণে নৃপেন পাল।

এ ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেছেন জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, গঙ্গাপদ বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অবনিশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, গীতা দে, রেণুকা রায় ও অনিল মুখোপাধ্যায়।

'বর্ণচোরা'-র স্থিরচিত্র তুলছেন এডনা লরেন্স। —চিত্রদূত

।। পাঁচ দিন, পাঁচ রাত্রি ।।

সোভিয়েট দেশ এবং পূর্ব জার্মানীর যুগ্ম-প্রযোজনায় "পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি" ছবিটি তোলা হয়েছে। গত বিশ্বযুদ্ধে ড্রেসডেন গ্যালারীর কয়েকটি বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের ছবি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যায়। রামব্রাণ্টের অংকিত আত্মপ্রতিকৃতিও ছিল তার মধ্যে। সোভিয়েট সৈনাদল এবং জার্মান অধিবাসীদের মিলিত চেষ্টায় একে একে সমস্ত ছবি উদ্ধার করা সম্ভব হল। এই সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে একটি, অসাধারণ চিত্রনাট্য রচনা করেছেন লিউ আর্নস্টাম। আর্নস্টাম এই

'পাঁচদিন পাঁচরাত্রি' ছবির একটি দৃশ্য গ্রহণ। দৃশ্য গ্রহণকালে যুদ্ধকালীন আবহাওয়া নিপুণভাবে ক্যামেরাধৃত হয়েছে চিত্রটিতে।

বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট হাতে 'বেনহুরে'র উল্লেখযোগ্য অভিনেতা চার্লটন হাসটন

ছবির যুগ্ম-পরিচালকও। অপর পরিচালক হলেন হাইনংস থিল। যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের দৃশ্যগুলি একেবারে নিখুঁতভাবে তৈরী করা হয়েছে চিত্রের জন্যে। ভূমিকালিপিতে আছেন, উইলহেলম কথ হুগে, আনেকাথরীন বায়ুগার, হাইনংস-ডিটারনাউপ প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ।

।। এ কাইন্ড অফ লাভিং ।।

জন শ্লেসিংগার বাস্তবিক বৃটেনের ভাগ্যবান তরুণ পরিচালক। তাঁর তথ্যচিত্র "টারমিনাস" এবং "এ কাইন্ড অফ লাভিং" দুইই চলচ্চিত্র-উৎসবে সম্মানিত হল। 'নিউ ওয়েভ' গোষ্ঠীর পরিচালকদের মধ্যে শ্লেসিংগার নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক। 'এ কাইন্ড অফ লাভিং'এর কাহিনীকার স্টান বারস্টো। ছবিটি তোলা হয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার, অলড্‌হাম এবং প্রেস্টনের ধোঁয়াধূসরিত কারখানা অধ্যুষিত অঞ্চলে। কাহিনীর নায়ক স্বপ্নবিলাসী যুবক। যুবকটি একটি মেয়ের প্রতি আসক্ত হয় এবং তাদের ঘনিষ্ঠতার ফলে মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হয়। একটি সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল যুবকটি। বিয়ে করল তার প্রেমিকাকে। কিন্তু সেই সুখী ঘরটি বোধ হয় তখনও অনেক দূরের বাড়ি। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাদের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। ওরা স্থির করল, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার পৃথিবীর পথে নামবে। কিন্তু সুখী জীবনের হাতছানিকে তারা শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারেনি।

পরিচালক শ্লেসিংগার একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চিত্রে কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ছবির পাত্রপাত্রীরা সকলেই পেশাদারী অভিনেতা অভিনেত্রী নন। উত্তর ইংলন্ডের অনেক আসল লোকেরও যাতায়াত আছে চিত্রকাহিনীতে। তাদের কথাবার্তাও একেবারে আটপৌরে। কাউকে দিয়ে পরিচালক নাটকীয় সংলাপ বলাবার চেষ্টা করেননি। হয়ত তাই ছবিটি জায়গায় জায়গায় দর্শকদের তথ্যচিত্রের ক্লান্তি এনে দেয় কিন্তু সেদিক দিয়ে ভেবে দেখলে বলা যায় মহত্ত্বের লক্ষণাক্রান্ত অনেক চলচ্চিত্রই এই দোষ থেকে মুক্ত নয়।

ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করেছেন নায়কের ভূমিকায় অ্যালেন বেট্‌স। তাঁর পূর্ববর্তী ছবি "হুইস্‌ল ডাউন দি উইন্ড"এর অভিনয়ের সঙ্গে এই ছবির অভিনয়ের এতটুকু মিল নেই। জুন রিচি এই ছবির নবাগতা নায়িকা। থেরা হার্ড নায়িকার মার ভূমিকায় স্মরণীয় অভিনয় করেছেন।

॥ ফোর হর্সমেন অফ দি অ্যাপোক্যালিপ্‌স ॥

ভিনসেন্ট ব্লাস্কো ইব্যানেথ-এর 'ফর হর্সমেন অফ দি অ্যাপোক্যালিপ্‌স' ছবিটি ১৯২২ সালে এম, জি, এম একদা তুলে পৃথিবীময় সাড়া ফেলেছিলেন। এই ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন চিরকালের নায়ক রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনো। সম্প্রতি এক খবরে প্রকাশ ছবিটি আবার তোলা হচ্ছে ভিনসেন্ট মিনেলির পরিচালনায়। ভ্যালেন্টিনোর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন গ্লেন ফোর্ড। পূর্ব সংস্করণের ছবির সঙ্গে বর্তমান চিত্রের কালগত পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। "ফোর হর্সমেন অফ দি অ্যাপোক্যালিপ্‌সি"র পটভূমি ছিল প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ। নবতম সংস্করণে চিত্রের পটভূমি হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ফ্রান্সের নাৎসী অবরোধকে কেন্দ্র করে এই চিত্রের চার ঘোড়সওয়ারের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। জুলিও এই কাহিনীর নির্বিরোধী নায়ক। যুদ্ধ থেকে সে দূরে থাকতে চেয়েছিল। চারদিকের ধ্বংসের মধ্যে যখন তার স্বদেশবাসী মুমূর্ষু তখন সে পালিয়ে থাকতে চেয়েছিল নিরপেক্ষতার আত্মপ্রবঞ্চনায়। ঠিক এমনি সময়ে সে স্বপ্নে দেখলো সেই চারজন ঘোড়সওয়ারকে। ঘোসওয়ার চারজন মৃত্যু, বিজয়, যুদ্ধ এবং মহামারীর প্রতীক।

পুরোনো সংস্করণের ছবিটির প্রধান আকর্ষণ ছিল ভ্যালেন্টিনোর অভিনয়। ১৯২২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত চলচ্চিত্রে যান্ত্রিক উন্নতির সমস্ত প্রমাণই বর্তমান চিত্রে থাকবে।

—চিত্রকূট

আমেরিকা বনাম রাশিয়ার এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতে আমেরিকা বনাম রাশিয়ার বাৎসরিক এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই দুটি দেশ যেমন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে দুই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তেমনি করেছে বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে। আধুনিককালের অলিম্পিক গেমস আরম্ভ হয়েছে ১৮৯০ সালে। এবং সেই সময় থেকেই আমেরিকা একটানা আধিপত্য অক্ষুন্ন রেখে এসেছিল; কিন্তু ১৯৫২ সালে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে রাশিয়ার যোগদানে আমেরিকার পূর্বের প্রাধান্য অনেক হ্রাস পেয়েছে।

রাশিয়া অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে খুব বেশী সাফল্যলাভ করেনি। আমেরিকা পুরুষদের এ্যাথলেটিক অনুষ্ঠানে পেয়েছিল মোট ৩০টি পদক (স্বর্ণ ১৪, রৌপ্য ১০ এবং ব্রোঞ্জ ৬)। অপর দিকে রাশিয়া মাত্র ৫টি পদক (স্বর্ণ ০, রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ১)। রাশিয়া মহিলাদের অনুষ্ঠানে প্রথম বছরেই আমেরিকাকে টেক্কা দেয়। মহিলা বিভাগে রাশিয়ার পদক সংখ্যা ছিল মোট ১১ (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ৫)। এই তুলনায় আমেরিকা অনেক কম পদক পেয়েছিল, মাত্র ১টি স্বর্ণ পদক। কিন্তু রাশিয়া পরবর্তী দুটি অলিম্পিকে—১৯৫৬ সালের মেলবোর্ণ এবং ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের এ্যাথলেটিক অনুষ্ঠানে আমেরিকার সুদীর্ঘকালের একটানা সাফল্যের পথে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা গ্রহণ করে।
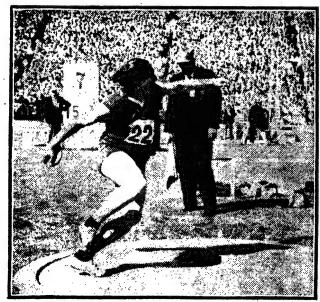
১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের এ্যাথলেটিক অনুষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলা বিভাগ ধরে আমেরিকা পেয়েছিল ২৬টি পদক এবং রাশিয়া ২১টি। পুরুষ বিভাগে আমেরিকার পদক সংখ্যা ছিল মোট ২২ (স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ৮ এবং ব্রোঞ্জ ৫) এবং মহিলা বিভাগে মোট ৪ (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ০ এবং ব্রোঞ্জ ১)। অপরদিকে পুরুষ বিভাগে রাশিয়ার পদক সংখ্যা মোট ১৩ (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ৪) এবং মহিলা বিভাগে মোট ৮ (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ১ এবং ব্রোঞ্জ ১)। আমেরিকা পুরুষ বিভাগে এবং রাশিয়া মহিলা বিভাগে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। ১৯৫৬ এবং ১৯৬০ সালের অলিম্পিক গেমসের সমস্ত অনুষ্ঠানের ফলাফল ধরে রাশিয়া দু'বারই সর্বাধিক পদক এবং পয়েন্ট পেয়ে তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছিল। আমেরিকা পেয়েছিল দ্বিতীয় স্থান। ১৯৫৬ সালের অলিম্পিকে রাশিয়ার পদক প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৯৯ (স্বর্ণ ৩৭, রৌপ্য ২৯ এবং ব্রোঞ্জ ৩৩) এবং আমেরিকার ৭৪ (স্বর্ণ ৩২, রৌপ্য ২৫ এবং ব্রোঞ্জ ১৭)। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে এই দুই দেশের পদক প্রাপ্তির হিসাব দাঁড়ায়: রাশিয়া ১০৩ (স্বর্ণ ৪৩, রৌপ্য ২৯ এবং ব্রোঞ্জ ৩১) এবং আমেরিকার ৭০ (স্বর্ণ ৩৪, রৌপ্য ২০ এবং ব্রোঞ্জ ১৬)। পয়েন্টের হিসাবে রাশিয়ার ৬৭৬½ পয়েন্ট এবং আমেরিকার ৪৪৯½ পয়েন্ট।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে রাশিয়া দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান আরম্ভ করেছে। তাছাড়া ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি কয়েকটি দেশের সঙ্গে রাশিয়া পৃথকভাবে বাৎসরিক এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। রাশিয়া বনাম আমেরিকার বাৎসরিক এ্যাথলেটিক অনুষ্ঠান ১৯৬২ সালে চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করেছে।

১৯৬২ সালে রাশিয়া বনাম আমেরিকার বার্ষিক এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা সম্প্রতি আমেরিকার স্টানফোর্ডে শেষ হয়েছে। গত বছর দুই দেশের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাশিয়ার মস্কোতে। ১৯৬২ সালের ক্রীড়ানুষ্ঠানে আমেরিকা ১২৮—১০৭ পয়েন্টে পুরুষ বিভাগে এবং রাশিয়া ৬৬—৪১ পয়েন্টে মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে। লক্ষ্য করার বিষয়, বিগত চারটি বাৎসরিক

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ডে অনুষ্ঠিত আমেরিকা বনাম রাশিয়ার বাৎসরিক এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় তামারা প্রেসকে (রাশিয়া) ডিস্কাস নিক্ষেপ করতে দেখা যাচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে ১৯৮ ফিট ৫ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন।

ক্রীড়ানুষ্ঠানেই আমেরিকা পুরুষ বিভাগে এবং রাশিয়া মহিলা বিভাগে শীর্ষস্থান পেয়েছে। গত বছর পুরুষ বিভাগে আমেরিকার পয়েন্ট ছিল ১২৪ এবং রাশিয়ার ১১১। মহিলা বিভাগে রাশিয়া ৬৮—৩৯ পয়েন্টের ব্যবধানে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের ফলাফল একত্র ধরে সমগ্র এ্যাথলেটিক অনুষ্ঠানের ফলাফল পয়েন্টের হিসাবে ঘোষণা করলে রাশিয়াই প্রথম স্থান পায়—১৯৬১ সালে রাশিয়ার ছিল ১৭৯ পয়েন্ট এবং আমেরিকার ১৬৩ পয়েন্ট। ১৯৬২ সালের ফলাফল—রাশিয়া ১৭৩ এবং আমেরিকা ১৬৯।

১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় মোট দর্শক সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১,৫৩,৫০০; প্রথম দিনে ৭২,৫০০ এবং দ্বিতীয় দিনে ৮১,০০০। এত দর্শক সমাগম ১৯৩২ সালে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের পর আমেরিকায় আর কোন ক্রীড়ানুষ্ঠানে হয়নি। মস্কোতে অনুষ্ঠিত ১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় ৬টি অনুষ্ঠানে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়েছিল। এবার মাত্র দুটি অনুষ্ঠানে—হাইজাম্প এবং হ্যামার থ্রো-তে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। রাশিয়ার ভ্যালেরি ব্রুমেল হাইজাম্পে ৭ ফিট ৫ ইঞ্চি উচ্চতা লংঘন ক'রে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড (৭ ফিট ৪½ ইঞ্চি) ভংগ করেন। হ্যামার থ্রো-তে আমেরিকার হল্ কনোলি ২৩১ ফিট ১০ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম ক'রে ১৯৬০ সালের আগষ্ট মাসে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড (২৩০ ফিট ৯ ইঞ্চি) ভংগ করেন।

১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ৯ এবং মহিলা বিভাগে ৩—মোট ১২টি অনুষ্ঠানে এই দুই দেশের পূর্ব রেকর্ড ভংগ হয়। এ ব্যাপারে দুই দেশই সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

গত বছরের ১৪ জন চ্যাম্পিয়ান একই অনুষ্ঠানে ১৯৬২ সালেও প্রথম স্থান লাভ করেছেন। আমেরিকার পক্ষে পুরুষ বিভাগে এই কৃতিত্ব লাভ করেছেন ৪০০ মিটারে উইলিয়াম্‌স, ৮০০ মিটারে জেরী সিবার্ট, ১৫০০ মিটারে জিম বেটি, লংজাম্পে বোস্টোন এবং মহিলা বিভাগের ১০০ মিটারে উইলমা রুডলফ ওয়ার্ড। রাশিয়ার পক্ষে পুরুষ বিভাগে ৫,০০০ মিটার দৌড়ে পিওৎর বলৎনিকোভ, ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে নিকোলাই সোকোলোভ এবং হাইজাম্পে ভ্যালেরি ব্রুমেল। মহিলা বিভাগে রাশিয়ার কৃতিত্ব—৮০০ মিটারে লাইসেঙ্কো, ৮০ মিটার হার্ডলে ইরিনা প্রেস, সটপাট ও ডিসকাসে তামারা প্রেস, লংজাম্পে তাতিয়ানা শেলকানোভা, জ্যাভেলিনে ওজোলিনা এবং হাইজাম্পে চেনাজক।

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ডে অনুষ্ঠিত আমেরিকা বনাম রাশিয়ার বাৎসরিক এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় রন মরিসকে (আমেরিকা) পোলভল্ট অনুষ্ঠানে ১৬ ফিট ০¼ ইঞ্চি উচ্চতা লংঘন ক'রে নতুন রেকর্ড স্থাপন করতে দেখা যাচ্ছে।

১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় দুটি অনুষ্ঠানে প্রথমস্থান লাভ ক'রে 'দ্বিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন রাশিয়ার দুই প্রতিনিধি—মহিলা বিভাগে তামারা প্রেস এবং পুরুষ বিভাগে পিওৎর বলৎনিকোভ। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান তামারা প্রেস সটপাট (দূরত্ব ৫৭ ফিট ০¼ ইঞ্চি) এবং ডিসকাস (দূরত্ব ১৮৯ ফিট ৫ ইঞ্চি) অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ ক'রে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। তামারা প্রেস ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে সটপাট অনুষ্ঠানে ৫৬ ফিট ৯⅞ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম ক'রে প্রথম স্থান পান এবং নতুন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন।

পিওৎর বলৎনিকোভ ৫,০০০ মিটার (সময় ১৩ মিঃ ৫৫·৬ সেঃ) এবং ১০,০০০ মিটার দৌড়ে (সময় ২৯ মিঃ ১৭·৭ সেঃ) প্রথম স্থান পেয়ে পূর্বের রেকর্ড ভংগ ক'রে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বলৎনিকোভ গত বছরও ৫,০০০ মিটার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন এবং ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে ১০,০০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান পেয়ে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড (২৮ মিঃ ৩২·২ সেঃ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১০,০০০ মিটার দৌড় বলৎনিকোভের ২৮ মিঃ ১৮·৮ সেকেণ্ডের বিশ্ব রেকর্ড এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

পুরুষদের লংজাম্পে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান আর বোস্টোনের (আমেরিকা) কাছে বিশ্ব রেকর্ড স্রষ্টা রাশিয়ার ইগর তেরওভেনাসিয়ানের পরাজয় ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতায় এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইগর তেরওভেনাসিয়ান ২৭ ফিট ৩ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে আর বোস্টোনের সরকারী বিশ্ব রেকর্ড ভংগ করেছিলেন। তেরওভেনাসিয়ানের এই বিশ্ব রেকর্ড এখনও সরকারীভাবে স্বীকৃতিলাভ করেনি।

১৯৬২ সালে রাশিয়া বনাম আমেরিকার বাৎসরিক এ্যাথলেটিক অনুষ্ঠানে এই দুই দেশ এইভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে :

রাশিয়া পুরুষ বিভাগে ৮টি এবং মহিলা বিভাগের ৭টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পেয়েছে।

আমেরিকা পুরুষ বিভাগে ১৪টি এবং মহিলা বিভাগের ৩টি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান পেয়েছে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান বনাম ইস্টার্ণ রেল দলের ফিরতি খেলায় মোহনবাগানের পুরকায়স্থ (১নং) মধ্য মাঠ থেকে বল নিয়ে একক প্রচেষ্টায় দর্শনীয় গোল দিয়েছেন।

ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্তান ক্রিকেট দল

ইংল্যান্ড সফররত পাকিস্তান ক্রিকেট দল ২রা মে থেকে ২৪শে জুলাইয়ের মধ্যে ২১টি ম্যাচ খেলেছে। খেলার ফলাফল : পাকিস্তানের জয় ৪, হার ৬ এবং খেলা ড্র ১১। পাকিস্তান দলের এই পরাজয়ের মধ্যে আছে তিনটি টেস্ট ম্যাচ। হ্যাম্পসায়ার দলের বিপক্ষে ১৯৬২ সালের ইংল্যান্ড সফরের বিংশতি ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান দলের মুস্তাক মহম্মদ সেঞ্চুরী (১০৮) করেন এবং পাকিস্তান দলের পক্ষে আলোচ্য সফরে ব্যক্তিগতভাবে সর্বপ্রথম ১,০০০ রান করার গৌরব লাভ করেন।

বিদেশ সফরে ভারতীয় টেনিস দল

ডাচ লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১৯৬২ সালের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৪—৬, ৬—৩, ৬—৩ ও ৭—৫ গেমে রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণান সেমি-ফাইনালে মার্টিন মুলিগানকে (অস্ট্রেলিয়া) ৩—৬, ৬—৩, ৬—১, ৪—৬ ও ৬—০ গেমে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিলেন। মুলিগান এ বছরের উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে রড লেভারের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

ডাবলসের সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণান এবং অস্ট্রেলিয়ার বব হো ৬—১, ২—৬, ৬—৪ ও ৬—২ গেমে আফ্রিকার ফোরবেস এবং নরওয়ের থোরবল্ডকে পরাজিত করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ১৯৬২ সালে অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ান, সুইস, উইম্বলেডন এবং ডাচ লন টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব লাভ করেছেন।

ডাবলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে রড লেভার এবং জিম শেফার্ড (অস্ট্রেলিয়া) ১৫—১৩, ৪—৬ ও ৬—৪ গেমে ভারতবর্ষের আখতার আলি এবং ফিলিপাইনের হার্নান্ডেজকে পরাজিত করেন।

॥ ফুটবল লীগ ॥

গত সপ্তাহে (২৩শে জুলাই থেকে ২৮শে জুলাই পর্যন্ত) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টি খেলা হয়েছে। খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—১০টা খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি এবং ৪টে খেলা ড্র।

মোহনবাগান ক্লাব আলোচ্য সপ্তাহে দুটো ম্যাচ খেলে ২ পয়েন্ট পেয়েছে। মোহনবাগান ২—১ গোলে ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে কিন্তু পরবর্তী খেলায় ১—২ গোলে জর্জ টেলিগ্রাফ দলের কাছে পরাজিত হয়। এই নিয়ে এ বছরের লীগের খেলায় মোহনবাগান দলের চতুর্থ পরাজয়। লীগের প্রথম খেলাতেও জর্জ টেলিগ্রাফ দল ১—০ গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত ক'রেছিল। টেলিগ্রাফ দলের কাছে দ্বিতীয়বার পরাজয়ের ফলে মোহনবাগান সমান খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের থেকে যে দু' পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে ছিল তা আর রইল না। এখন দুই দলেরই সমান খেলায় সমান পয়েন্ট —২৭টা খেলায় ৩৯ পয়েন্ট। মোহনবাগানের আর একটা খেলা বাকি—এরিয়ান্স দলের সঙ্গে।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আলোচ্য সপ্তাহে দুটো ম্যাচ খেলে তিন পয়েন্ট পায়। ইস্টবেঙ্গল বনাম এরিয়ান্সের খেলা ১—১ গোলে ড্র যায়। পরবর্তী খেলায় ইস্টবেঙ্গল ১—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে। ইস্টবেঙ্গল দলেরও আর একটা খেলা বাকি—বালী প্রতিভার সঙ্গে। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল—এই দুই প্রধান দলের যে কোন একদল এ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান হবে, না এই দুটি দল যুগ্ম-ভাবে লীগ চ্যাম্পিয়ান হবে এই নিয়ে নানা গবেষণা আরম্ভ হয়ে গেছে।

লীগের অধিকারী ইস্টার্ণ রেল দল দুটো ম্যাচ খেলে একটা [illegible]সংগ্রহ করতে পারেনি। রেলদল [illegible] খেলায় মোহনবাগানের কা[illegible] [illegible]লে রাজস্থানের কাছে [illegible] পরাজিত হয়েছে।

বাটা স্পোর্টস ক্লাব ৩—২ গোলে এরিয়ান্সকে পরাজিত ক'রে লীগের তালিকায় তৃতীয় স্থান পাওয়ার পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী খেলায় হাওড়া ইউনিয়ন দলের কাছে ০—১ গোলে পরাজিত হয়ে পিছিয়ে পড়েছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত

রোজপরার কাপড়
সানলাইটে কেচে
কত ফরসা, ঝলমলে !
SUNLIGHT SOAP
পরিষ্কার, ঝলমলে, ধব্‌ধবে ফরসা কাপড় !
সানলাইটে কাপড় কাচার এই গুণ!
সব কাপড়জামা বাড়ীতে সানলাইটে কাচুন…
সানলাইট—উৎকৃষ্ট ফেনার, খাঁটি সাবান
S. 32A-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সূচীপত্র

লোকটিকে
চিনে রাখুন
এই-ই অপরাধী! এই লোকটা এবং এর মত আরও অন্যান্য দুষ্কৃতকারী রেলের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি চুরি ও ধ্বংস করে থাকে। এই ধরনের চুরি প্রভৃতি কাজে আপনার নাগরিকবোধ নিশ্চয়ই আহত হয় এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে রেলকর্তৃপক্ষের হাতে এই অপরাধীদের আপনি ধরিয়ে দেবেন। জাতীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে আপনার সহযোগিতা অপরিহার্য।
যাত্রী ও মালগাড়ীর সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি চুরি ও তার ইচ্ছাকৃত ধ্বংস সাধনের ফলে প্রতি বছর পূর্ব রেলওয়ের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় আনুমানিক ১১ লক্ষ টাকা।
পূর্ব রেলওয়ে

নিরাপদে ও সহজে
সব রকম রান্নার জন্য.
আজই কিনুন...
নতুন ধরনের
ফুইফ
(কেরোসিন কুকার)
প্রস্তুতকারক-ইণ্ডিয়ান ট্রেডার্স
গৌর মোহন দাস

সূচীপত্র

Sulfa-D
কাটা, পোড়া, ঘা, ব্রণ ও
যাবতীয় চর্মরোগে—
আলফা-ডারমিন
কুমারেশ হাউস, সালকিয়া, হাওড়া

অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত ।। অমৃত অমৃত

অমৃত

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৪শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 10th August 1962.
40 Naya Paise.

বিগত শুক্রবার (১৮ই শ্রাবণ) কলিকাতা কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক সভায় ঐ পৌরসভার সদস্যবর্গের মধ্যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য পৌরপ্রতিষ্ঠানের অকর্মণ্যতা বা এই মহানগরের অধিবাসীগণের কোন অভাব-অভিযোগ সম্পর্কিত কোনও কারণের দরুণ এই উত্তাপের সৃষ্টি হয় নাই। ইহা হইয়াছিল পৌরসভার সদস্যবর্গের অধিকারগত প্রশ্ন লইয়া। নাগরিকদিগের অভাব-অভিযোগ-বিশেষে বেআইনীভাবে গৃহ নির্মাণ বা ভাঙ্গার বিষয়ে—সদস্যগণের সোজাসুজি কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করার অধিকার আছে কিনা এই প্রশ্ন ছিল সেই দিনের "বিক্ষোভের" মূল কারণ এবং উহাতে কংগ্রেসী ও বিরোধী ইউ-সি-সি দল একযোগে যোগদান করেন।

বিরোধী দলের জনৈক সদস্য তাঁহার এলাকায় এক গৃহ ভাঙ্গার নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করাইবার জন্য নূতন কমিশনার শ্রীসুনীলবরণ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু কমিশনার শ্রীরায় নাকি ঐ গৃহ ভাঙ্গার নির্দেশ সংক্রান্ত ফাইল না দেখিয়াই সদস্য মহাশয়ের এই সাক্ষাৎকারে বিরক্তি প্রকাশ করেন। সদস্যের বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গেই পৌরসভার বর্তমান মতিগতি অনুযায়ী গণ্ডগোলের আরম্ভ হয়। ডেপুটি মেয়র তখন কমিশনার শ্রীরায়কে তাঁহার বক্তব্য বলিতে আদেশ দেন। কমিশনার তাহাতে কলিকাতা পৌর আইনের ৪১৪ ও ৪১৫ ধারার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কর্পোরেশনের যে কোন এলাকায় বেআইনী গৃহ নির্মাণ ও ভাঙ্গার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা ঐ ধারা অনুসারে তাঁহার উপর অর্পিত। সুতরাং সে বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করা তাঁহার কাজের উপর হস্তক্ষেপেরই সামিল। এই মন্তব্যের পর "বিক্ষোভ" চরমে উঠে। এবং ইহাতে দুই পক্ষই (কংগ্রেস ও বিরোধী) সমানে যোগদান করেন। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস দলের সভানেতা শ্রীসাহা পৌর আইনের ৪১ ধারা অনুযায়ী করদাতাদিগের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়ে সদস্যগণের সরাসরি কমিশনারের সহিত দেখা করার যে অধিকার আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীরায়ের ঐরূপে বিরক্তি প্রকাশ ঠিক হয় নাই। বিরোধী দলের নেতা এই বক্তব্যের সমর্থন করার পর সভা শান্ত হয়।

সত্যই তো! বেআইনী গৃহ নির্মাণ ইত্যাদির সম্পর্কে "তদ্বির" করার অধিকার না থাকিলে পৌরসভার সদস্যদের আর রহিবে কি? এই তদ্বির তদন্তের অধিকারই তো পৌরসভার মধুভাণ্ডারের চাবী। তাহাই যদি না থাকে তবে চলিবে কেমনে? যাহা হউক পৌরসভার সদস্যবর্গ যে কাজে বা অকাজে কোন কিছুতে একমত একজোট হইতে পারেন তাহা দৃষ্টে কলিকাতার নাগরিকগণ চমৎকৃত ও পুলকিত হইয়াছেন নিশ্চয়।

এখানে আমাদের মনে একটি অবান্তর প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। যে সময়ে পৌর আইনের নানা ধারার আলোচনায় সদস্যবর্গের "অধিকার" প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, সে সময়ে এই সদস্যগণের দায়িত্ব—এ মহানগরের ও তাহার নাগরিকদিগের সম্পর্কে—বা কর্তব্যের কোন প্রশ্ন উঠে নাই কেন?

এই মহানগর যে দুর্গন্ধময় মহানরকে পরিণত হইয়াছে—পথ-ঘাটের তো কথাই নাই, জল সরবরাহের নালীও দূষিত—নাগরিক জীবন যে দুর্বহ ও বিঘ্ন-বিপদে ক্রমশঃই পূর্ণ হইতেছে ও করদাতাগণ যে অধিকারে বঞ্চিত হইতেছে, এই সকল ব্যাপারে কি এই সদস্য মহাশয়দের কোনও দায়িত্ব বা কোনও চিন্তা নাই?

যে আবর্জনার স্তূপে কলিকাতা ডুবিতে বসিয়াছিল তাহার সংস্কার তো করিল দেশমাতৃকার তরুণ সন্তানগণ। এই কাজে তাহারা যে উৎসাহ, দায়িত্বজ্ঞান ও একযোগে কাজ করিবার ক্ষমতা দেখাইয়াছে তাহার শতাংশও তো আমরা দেখি না এই বয়োজ্যেষ্ঠ তথাকথিত "পৌরপিতা"গণের কার্যকলাপে। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কার্যক্রমের উদ্দীপনায় পৌর-প্রতিষ্ঠানের ফাঁকিবাজ কর্মীদের মধ্যেও ক্ষণিক উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে। শুধু এই সদস্যবর্গের মধ্যে কর্তব্য বা দায়িত্বজ্ঞানের কোনও জাগরণ বা সাড়া পাওয়া গেল না।

একজন সদস্য অবশ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, এই এক মাসের পরও দুইশত স্বেচ্ছাসেবক ও পঞ্চাশটি লরী কর্পোরেশনের আবর্জনা পরিষ্কার করিবার জন্য মজুত রাখিতে। বলা বাহুল্য এই স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ ব্যাপারেও সদস্যবর্গ প্রথমে কোনও উৎসাহ দেখান নাই বরঞ্চ তাহারা কাহার অধীনে কাজ করিবে সেই প্রশ্নেই ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

স্বেচ্ছাসেবকদিগের কাজে সারা দেশ খুশী হইয়াছে। সুতরাং পৌরসভার মতামতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু যদি তাহারাই কাজ চালায় তবে পৌরসভার সদস্যদের অস্তিত্বের সার্থকতা কোথায়?

কবিতা ॥ ॥ কবিতা

ছায়া প্রতিম

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

আমাদের ওষ্ঠে আঁকা আলোর স্বাক্ষর—ভালোবাসা।

তবু রাত্রে আকাঙ্ক্ষারা ছায়া হয় প্রতি মনে বিবর্ণ দেয়ালে;
নড়ে চড়ে ছোটো বড়ো সংখ্যাহীন ছায়ার পুতুল—
যেন কতো অভিনেতা, অভিনেত্রী ওরা; সর্বনাশা
পাশার মতন খেলা শুরু হয় জীবনের—মৃত্যুর খেয়ালে।
দিন তো হাঁপিয়ে ওঠে, আর আমরা ধরে থাকি ভুলের মাশুল

কখনো বা মনে হয়, দেয়ালটাই কাঁপছে যেন, পুতুলেরা স্থির।
জীবনের যন্ত্রণায় মৃত্যুর উৎসব, তারই হাসি।
ছায়ারা অদৃশ্য হয় দিনে, ওরা কোথায় যে থাকে!
দেখেছি পথের বাঁকে উৎসুক চাহনি, কতো উৎকণ্ঠা-ভিড়,—
কেউ বলছে, এই আসি, কেউ—কতো ভালোবাসি
তোমাকে—তুমিই—; দীর্ঘশ্বাস শুনি পথের আরেক বাঁকে।

সূর্য খরে যায়, দিন পুড়ে যায়, তবু পাখি-মন
হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়ে, কোথা যেন লেগেছে আগুন—
পাহাড়ে, সমুদ্রকূলে; মরু কি অরণ্য বেয়ে আমাদের পথ—
চড়াই উৎরাই ভেঙে; সরাইখানায় মাতাল রক্তের নেশা খোঁজে কি নির্জন।

ঝর্ণায় প্রাণের সাড়া—যেথা বন্য পশুদের অবোধ মিথুন
জল খায়! কোথায় বুকের বোঝা রাখবে ভবিষ্যৎ!

প্রশ্ন : তোমাকে

সুশীলকুমার গুপ্ত

আরও বহু দূরে আমি যাব, শুধু বল একবার—
কি দেবে, কি দিতে পার, কোন স্বপ্নগোধূলির দেশে
নিয়ে যাবে, তোমার শরীরে কোন মেঘের সঞ্চার
সমুদ্রের শুভ্র নামে, কোন তারা চোখে ওঠে হেসে।

তোমার আহ্বানে কবে অন্তরঙ্গ ঘর ছেড়ে পথে
নেমেছি, শুনেও যেন শুনিনি স্মৃতির পিছুডাক;
তারপর থেকে শুধু চলেছি, যদিও ক্ষয়ক্ষতে
এসেছে বিরোধ তবু পেরিয়েছি নব নব বাঁক।

ক্রমশ নিয়েছ টেনে শূন্য থেকে মহাশূন্যতায়;
কোথায় দাঁড়াব বল, কিভাবে ফুলের চাষ ক'রে
সাজাব মালঞ্চ, শান্ত নীলকণ্ঠ গিরির গলায়।
জড়াব বনের বাহু, খেলাব নদীর সাপ ধ'রে।

ডেকেছ অপুর ঝড়ে, গ্রহে গ্রহে পেতেছ বন্দর;
যাব, শুধু বল কোনখানে পাব হৃদয়ের ঘর।

শেষ আলো

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

দরিদ্র ধূসর বর্ণে অপরাহ্ন মুছে গেল মাঠে।
বসন্ত দিনের দৈর্ঘ্য ছিন্ন হ'ল গ্রামের আকাশে
এখন দিগন্তে দ্যাখো স্তব্ধ কালো সমুদ্রের ছায়া,
নারিকেল বনে বনে অন্ধকার ঘন হয়ে আসে।

মাটির প্রসন্ন পথ শহরের প্রান্তভূমি ছুঁয়ে
নিথর চোখের মত থেমে গেছে যে পারের কাছে,
সেখানে বিশীর্ণ সাঁকো ওপারের আমন্ত্রণ আনে,
সন্ধ্যার সকল গান যে জগতে জড়ো হয়ে আছে।

এতো যে ছবির দৃশ্য, সব তুচ্ছ; তার সঙ্গ শুধু
সুন্দরের ছোঁয়া দিয়ে স্নিগ্ধ এক জীবনের ডাকে
অব্যক্ত বেদনাগুলি ফেলে গেল স্টেশানের পথে,
আলোর অমৃত সে-যে, কী গভীরে ডেকেছে আমাকে!

অপরাহ্ন মুছে গেছে, অন্ধকার এখন এ-ঘর
নিঃসঙ্গ রাত্রির দূর পদাবলী ভেসে ভেসে আসে,
নম্র এক ভালোলাগা কবেকার সঙ্গীতের মতো
বিছায় নীরব অশ্রু মৌনপথে, অবসন্ন শ্বাসে।

যে গোপন স্পর্শটুকু এনেছে সে সবার নিভৃতে
স্তব্ধ আমি বসে আছি, তারি সুর গানে তুলে নিতে!

জৈমিনি

অবশেষে গরু। কলকাতা থেকে জঞ্জাল পরিষ্কার করার পর এখন চোখ পড়েছে গরুর দিকে। স্থির হ'য়েছে, গরুগুলোকেও সরিয়ে ফেলা হবে শহর থেকে।

যে হাতে জঞ্জাল সরানোর ভার ছিল, সেই হাতই গ্রহণ করেছে গরু সরানোর দায়িত্ব। কাজেই, একমাত্র বুদ্ধির দোষে যারা 'গরু' আখ্যা পাবে তারা ছাড়া অন্যান্য চতুষ্পদ গরু যে কালক্রমে শহর ছেড়ে বিদায় নিতে বাধ্য হবে তাতে আর সন্দেহ করার অবকাশ নেই বোধহয়। ঘোড়ার গাড়ি বিরল হ'য়ে আসার পর কলকাতার ছেলেরা ঘোড়া দেখতে পায় না আজকাল। অদূর ভবিষ্যতে তারা গরু-দর্শন থেকেও হয়তো বঞ্চিত হবে। তখন তাদের 'এসে' লেখার সুবিধার জন্যে দু'-একটা গরুকে চিড়িয়াখানায় রাখতে হলেও বিস্মিত হব না।

কিংবা এমনও হতে পারে, গরুর উপর 'এসে' লিখতে বলার আদি ও অকৃত্রিম পদ্ধতিটাও লুপ্ত হয়ে যাবে প্রশ্নপত্র থেকে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমরা গরুর যুগ পার হ'য়ে উপস্থিত হব এক গরু-উত্তর, অথবা গরুত্তর যুগে।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'তে তবু কেমন যেন বাধোবাধো লাগছে। সত্যিই কি গরুগুলো চলে যাবে? পুরনো ইতিহাস-ঘাঁটা যাঁদের পেশা তাঁরা সন-তারিখ উদ্ধার করে বলে দিতে পারেন, গরুর গুঁতোয় ধরাশায়ী হওয়ার ঘটনা এ শহরে কতো প্রাচীন। Between the horns of dilemma কথাটা এখানে আক্ষরিক অর্থে সত্য। গরু, বিশেষ ক'রে ধর্মের ষাঁড় নামে পরিচিত জীবগুলির স্বধর্মই হ'ল অসাবধানী পথিককে ঐ সুতীক্ষ্ণ উভয়-সংকটে নাজেহাল করা। এই জন্যে আমার অনেকবার মনে হ'য়েছে, কোনো কোনো সদাশয় ভদ্র ব্যক্তি যেমন বাড়িতে বাঘের মতো পররক্তলোলুপ হিংস্র কুকুর পুষে মানবহিতৈষণার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেটের সামনে বিজ্ঞপ্তি লটকে রাখেন 'কুকুর হইতে সাবধান', সেই রকম হাওড়া ব্রীজের

পশ্চিম প্রান্তে একটা নিয়ন সাইনের ব্যবস্থা করা: 'গরু হইতে সাবধান'! অনভ্যস্ত নবাগত ব্যক্তিরা তাহলে এ শহরের আশ্রম মৃগের মতো স্বেচ্ছাবিহার-শীল গরুগুলোর বিষয়ে সচেতন হ'তে পারতেন!

এখন জানা যাচ্ছে, সে রকম কিছু না-করলেও আমাদের চলবে। গরুগুলোই নাকি শহর-ছাড়া হবে?

হবে কিনা, সে প্রশ্ন পরে আলোচনা করছি। কিন্তু তার আগে আমার বলে নেওয়া দরকার, আমি গো-বিদ্বেষী নই। বরং পরম গো-অনুরাগী। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর বিষয়ে আমার কৃতজ্ঞতার কথা বলতে গেলেই আমাকে শুরু করতে হয় গরু দিয়ে।

আর শুধু আমি কেন? সমস্ত ভারতীয় সভ্যতাই তো গরুর কাছে ঋণী। বৈদিক যুগের ঋষির হবি থেকে শুরু করে একেবারে হাল আমলের চাষীর লাঙল পর্যন্ত সবই একান্তভাবে গো-নির্ভর। গরুকে তাই বলা হ'য়েছে গোধন, ভগবতী। এই পরম ঐশ্বর্য-দায়িনী গরুকে অবহেলা করার কোনো কথাই উঠতে পারে না।

কিন্তু সময় বদলায়। এক যুগের প্রয়োজন অন্য যুগের আবিষ্কারের সামনে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়। পাথরের হাতিয়ার ফেলে এইভাবে একদা আমরা তুলে নিয়েছিলাম তীরধনুক, তীরধনুক ফেলে হাতে নিয়েছি বন্দুক।

আজ যন্ত্রযুগের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গরুর বিষয়েও তাই আমাদের পুনর্বিবেচনা করতে হচ্ছে। যেটুকু তার প্রয়োজন, সেটুকু আমরা মেনে নেব নিশ্চয়ই। বৈজ্ঞানিক মতে গো-পালনে মন দেব, ব্যাধির বীজাণু-মুক্ত দুধের চালান আনব ঘরে ঘরে। কিন্তু জীবনে-মরণে গরুর প্রতিবেশী হ'য়ে থাকব না। কারণ, তাহলে আমাদের অন্য যারা প্রতিবেশী আছে, এবং যারা গরু নয়, মানুষ, তারা গোমুর্খের চেয়েও হেয়জ্ঞান করবে আমাদের—কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাইবে অধীনতার জোয়াল।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এই চ্যালেঞ্জকে কি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছি আমরা! না পারি নি।

তাই শহর থেকে গরু সরাবার প্রস্তাব উঠলেই চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। দুধে জল মিশিয়ে একই সঙ্গে যারা গৃহস্থের গাঁট কাটে এবং উপরি পাওনা হিসাবে টাইফয়েডের বীজাণু জোগান দিয়ে যায় তারা শুধু নয়, অনেক ভদ্র ব্যক্তিও কেমন যেন উৎকেন্দ্রিক হ'য়ে পড়েন গরু সরানোর বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়লে।

আসলে, বড় বড় খাটালের কথা ছেড়ে দিলেও, এই সব ছোটখাট গয়লা-বন্ধু ভদ্রলোকই শহর থেকে গরু সরানোর সব থেকে বড় প্রতিবন্ধক। এঁরা কেউ হয়তো গয়লার বেনামীতে নিজেই ব্যবসা করেন দুধের, কেউবা বাড়ির মধ্যে একফালি ফাঁকা জায়গা ছেড়ে দেন গয়লাকে—খাঁটি দুধের আশায়। পুলিশের হামলা হলে

এঁরাই গোপন হাতে জরিমানার টাকা জুগিয়ে গরুগুলোকে ফিরিয়ে আনেন যথাস্থানে এবং আবর্জনা-ক্লেদ ও মশা-মাছির বংশ আবার গোকুলে বাড়তে থাকে এঁদেরই দয়ায়।

এঁদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে কী উপায়ে? এতদিন যাওবা ভয়ে ভয়ে ছিলেন, এবার তো এঁরা দস্তুর মতো লাইসেন্স নিয়ে আসর জাঁকিয়ে বসবেন? তখন?

সরষের মধ্যে এই যে ভূতের অস্তিত্ব রয়ে গেল, এইখানেই কেমন যেন খটকা লাগছে আমার।

তাছাড়া ঐ ষাঁড়গুলো, ওদেরও শুভাগমনের তো শেষ নেই। 'জন্মিলে মরিতে হবে' এবং 'মরিলে ষাঁড় দিতে হবে', অর্থাৎ শ্রাদ্ধের সময়, এ নিয়মের কোনো নড়চড় হওয়া সম্ভব কি? কাজেই মরণশীল মানুষের সমাজে নড়নশীল ষাঁড়ের অস্তিত্বও প্রায় চিরস্থায়ী! অগ্রদানী ব্রাহ্মণের মতো কোনো পুণ্য-কামী সংস্থা যদি উৎসর্গ হওয়া মাত্র শিশু-ষাঁড়গুলোকে গ্রহণ করে; তবে হয়তো এর সুরাহা হ'তে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ষাঁড়গুলোর ভরণপোষণের সমস্যার সমাধান করবে কে, সেও এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন। নিশ্চয়ই বৃষোৎসর্গ-কারী ব্যক্তিরা সে ঝামেলা পোহাতে রাজি হবেন না। উৎসর্গ করার পর বৃষগুলোকে যদৃশ বিহারের সার্টিফিকেট দিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া যায় বলেই না নিরাপদ পুণ্যের দিকে আমাদের এত উৎসাহ। খরচ দিতে বললে তো ভয়াবহ পরিস্থিতি!

কাজেই অন্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত, ধাড়ী ষাঁড়গুলোই শুধু শহর ছাড়বে, নবাগত কচিগুলো থেকেই যাবে পথে ঘাটে। এবং যেহেতু কিছুকাল পরে আমাদের ষাঁড় খেদানোর উৎসাহে ভাটা পড়বে, সেইহেতু এরাই আবার বেড়ে উঠে শহরের শোভাবর্ধন করবে।

অতএব, জ্যামিতিক সিদ্ধান্ত হল এই যে, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহু (এক্ষেত্রে গরু এবং ষাঁড়) একত্রে তৃতীয় বাহুর চেয়ে (অর্থাৎ আমাদের গরু সরানোর পরিকল্পনার চেয়ে) বড়। কিউ, ই, ডি।

মার্কিনী জীবন

বুদ্ধদেব বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। দুই ।।

ভ্রমণ ব্যাপারটা উপন্যাস পড়ার মতো। যতক্ষণ অভিজ্ঞতাটি ঘটছে ততক্ষণ তাতে মগ্ন হ'য়ে আছি; কিন্তু—যত ভালো উপন্যাসই হোক—কিছুদিন পরেই অনুপুঙ্খগুলো ভুলে যাই, ঘটনাস্রোত হারিয়ে ফেলে তার পারম্পর্য, পাত্রপাত্রীরা অস্পষ্ট হ'য়ে আসে। শুধু ভ্রমণ কেন, সমস্ত জীবনটাই এই রকম, কিন্তু এখানে তত্ত্বালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, যেমন উপন্যাস পড়ায় তেমনি ভ্রমণে, শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে যা সঞ্চিত ও সন্নিবিষ্ট থাকে, তা কিছু আবহ, কয়েকটি ছবি, বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা হয়তো, এবং সেই লেখক অথবা দেশ সম্বন্ধে কিছু ধারণা। আমার দু-বারের অভিজ্ঞতাপ্রসূত দু-একটা ধারণাকে এখানে সংক্ষেপে উপস্থিত করার চেষ্টা করছি।

কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে হয়তো অবান্তর হবে না। আমি প্রথম প্রতীচ্য দেশে এসেছিলুম মধ্যবয়সে; ততদিনে, সাহিত্যচর্চার বদভ্যাসের ফলে, তার প্রায় কিছুই আমার পক্ষে নতুন ছিলো না। তবু, বই পড়া আর চোখে দেখায় একটা তফাৎ থাকেই, যদিও সেটা ঠিক কী-ভাবে অনুভূত ও সংকলিত হয় তা বলা খুব শক্ত। সেখানে যাবার আগে আমার যা ধারণা ছিলো, প্রতীচ্য পৃথিবী তা থেকে কিছু আলাদা নয়, কিন্তু সাহিত্যপাঠের স্মৃতির সঙ্গে এখন কয়েকটা জৈবনিক স্মৃতি যুক্ত হয়েছে। তার একটা অন্য রকম স্বাদ আছে তা মানতেই হবে।

'প্রতীচ্য পৃথিবী' কথাটা বড্ড বড়ো হ'লো; য়োরোপীয়রা যেমন তুর্কি থেকে জাপান পর্যন্ত সমগ্র 'প্রাচী'কে একই বস্তার মধ্যে পুরে ফেলার চেষ্টা ক'রে ভ্রান্তিতে মজেন, এও যেন তেমনি শোনাচ্ছে। কিংবা হয়তো তা নয়; কেননা ইংলণ্ডের সঙ্গে ইটালির আচারে-ব্যবহারে যতটা পার্থক্য, তার চেয়ে ঢের বেশি পার্থক্য (এখন পর্যন্ত) বাংলার সঙ্গে তামিল প্রদেশের; আর আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যগুলোর মধ্যে পার্থক্য (অন্ততপক্ষে 'গভীর দক্ষিণ' বাদ দিলে) প্রাকৃতিক, তাত্ত্বিক অথবা অনুমেয় ব্যাপার, সামাজিক তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু অন্য এক প্রভেদ, সেবারে যখন প্রথম দেশান্তরে যাই, আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিলো : তা আমেরিকার সঙ্গে য়োরোপের। এবং, আবাল্য য়োরোপীয় সাহিত্যের প্রেমিক হ'য়েও, আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে এই তুলনা সর্বতোভাবে য়োরোপের প্রতি পক্ষপাতী হ'তে পারেনি।

অভারতীয় পৃথিবীর যে-অংশ আমি প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলাম, এবং একমাত্র যেখানে আমি বসবাস করেছি, তা হ'লো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। লণ্ডনে বিশ্রামের জন্য একরাত মাত্র কাটিয়ে, সেবারে সোজা উড়ে যেতে হ'লো কলকাতা থেকে নু ইয়র্কে। সেই দেশে কাটলো প্রায় এক বছর—ক্লাশ পড়িয়ে, বক্তৃতা ক'রে, প্লেনে, ট্রেনে, বাস্-এ অথবা বন্ধুর গাড়িতে ঘুরে বেড়িয়ে, স্থিত অথবা ভ্রাম্যমাণ অবস্থায়। পূর্ব থেকে পশ্চিম তট পর্যন্ত অনেকগুলো রাজ্যে, শহরে, বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ হ'লো। রাত কাটলো দামি হোটেলে, শস্তা হোটেলে, বিশ্ববিদ্যালয়িক অতিথি-শালায়, কখনো ছাত্রাবাসে, কখনো বা সাহিত্যিক বা অধ্যাপকের ছাদের তলায়। পথে-পথে বন্ধু পেলাম অনেক; তাঁদের কারো-কারো সঙ্গে, দূরত্ব সত্ত্বেও, এখনো আমার সংযোগ ছিন্ন হয়নি। তারপর দেশে ফেরার পথে য়োরোপ : সেই জগজ্জয়ী মহাদেশে পদার্পণ ক'রেই চমক লাগলো।

প্রথম চমক : এত মলিন য়োরোপ! এমন অনিপুণ! এরা তো আমাদের মতো নির্ধন নয়। আর এদের কি কথার কোনো মূল্য নেই? মনে পড়ে লণ্ডনের হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন রাত বারোটা পেরিয়ে গেছে। বাইরে শীত, ট্যাক্সিওলা কর্কশ। ডেস্কের কেরানিটি আমাকে নিরীক্ষণ ক'রে বললে, 'আজ রাতে ঘর দিতে পারবে না।' 'তার মানে? কুড়ি দিন আগে থেকে রেজার্ভেশন আছে আমার!' 'আপনার পৌঁছতে দেরি দেখে সে-ঘর আমরা অন্যকে দিয়ে দিয়েছি।' 'জাহাজ বা ট্রেন যদি দেরি করে তার জন্য আমি দায়ি নই!' 'আপনাকে অন্য হোটেলে ঠিক ক'রে দিচ্ছি।' 'না, অন্য হোটেলে আমি যাবো না, এখানেই আমাকে ঘর দিতে হবে।' লোকটি দিলে আমাকে ঘর, কিন্তু, নিজেকে অসাধু ও অনৃতভাষী প্রমাণ ক'রে তারপর দিলে। মনে-মনে না-ব'লে পারলুম না, 'আমেরিকায় কখনো এ-রকম হ'তে পারতো না!' ঘরের সংলগ্ন বাথরুম নেই, পরদিন সকালে উঠে তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লো, আর ভিতরে গিয়ে যা দেখলুম তা এত অপরিচ্ছন্ন যে স্নান করতে

...ন্তু হ'লো না। দেয়ালে ঝুলছে নোটিশ : 'স্নানের পরে টব পরিষ্কার করবেন।' আবার মনে জাগলো আমেরিকার সঙ্গে তুলনা, সেখানকার সাধারণ হোটেলেও এই রকম মালিন্য বা নির্দেশ কল্পনাতীত। যে-হিস্প্যানি হোটেলে লাঞ্চ খেলুম সেখানে আইস-ক্রীম চেয়ে অপ্রস্তুত হ'তে হ'লো। 'আপনার কি ধারণা এখনো আমেরিকায় আছেন?' টিপ্পনি কাটলেন আমার ইংরেজ বন্ধু। জুলাই মাসেও সে-বছর বেশ ঠান্ডা ছিলো, প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাপের ব্যবস্থা বন্ধ—কেননা ঋতুটা যে পাঞ্জিকামতে নিদাঘ। প্যারিসে এসে দেখলাম ভদ্রোচিত এমন এক বাসা, যেখানে স্নানের কোনো ব্যবস্থা নেই—বাসিন্দারা মাঝে-মাঝে ভাড়াটে বাথরুমে পয়সা দিয়ে মার্জিত হ'য়ে আসেন। কান্-এ যাবার পথে কষ্ট পেলুম ট্রেনে, বসার ও শোবার ব্যবস্থা অনুদার, যাত্রীরা দাঁড়িয়ে পর্যন্ত আছে, সারারাত এক ফোঁটা পানীয় জল জুটলো না। এমনি সব বৈষম্য ধরা পড়লো পদে-পদে। মনে হ'লো য়োরোপ যে আমাদের ও আমেরিকার মধ্যবর্তী দেশ, তা শুধু ভৌগোলিক নয়, অন্য অর্থেও; জীবন-যাপনের মানে আমাদের সঙ্গে য়োরোপের যতটা, য়োরোপের সঙ্গে আমেরিকারও প্রায় ততটাই পার্থক্য।

আমি জানি, তথ্য ও গণিতের সাহায্যে আমার এই কথাটাকে দেড় মিনিটে অপ্রমাণ ক'রে দেয়া যাবে। এবং এও আমি মানতে বাধ্য যে আমার এই লেখাটা বিশ্বধর্মী, অর্থাৎ ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় ও পরিবেশে আমার মন যে-ভাবে সাড়া দিয়েছে, আমার 'উপাদান' তা ভিন্ন অন্য-কিছু নয়। কিন্তু আমাদের মন বিনা চেষ্টায় যে-সব বিম্বকে গ্রহণ করে, আমাদের অনুভূতি, আমাদের ইন্দ্রিয় ও সহজবুদ্ধির দ্যোতনা—সত্যানুসন্ধানে এ-সবের কোনো মূল্য নেই, তা-ই বা কেমন ক'রে বলি? ইংলণ্ডের গৌরবময় ইতিহাস, তার ভাষা, সাহিত্য ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়—সব সত্ত্বেও লণ্ডনে এসে আমি যে ঠিক সুখী হ'তে পারলাম না, দেশটাকে মনে হ'লো কৃপণ, ধূসর ও বিবর্ণ, এটাকে নিতান্তই আমার দুর্ভাগ্য ব'লে ভাবলে বোধহয় ভুল হবে, কেননা, যতদূর মনে পড়ে, আমার আগে কোনো-কোনো বৈদেশিক অতিথি অনুরূপ ধারণা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। হয়তো এটাই ইংলণ্ডের চরিত্র—অর্থাৎ অতিথির পক্ষে তা-ই, এদিক থেকে আমেরিকার সে উল্টো যে দীর্ঘকাল বসবাস না-করলে তাকে ভালোবাসা অসম্ভব। *

দ্বিতীয় চমক : য়োরোপীয় শ্রেণী-ভেদ। আমেরিকায় এসে প্রথম এক মাসের মধ্যেই আমি যা গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম, আর যেখানে ভারতের সঙ্গে তার প্রতিতুলনা সবচেয়ে তীক্ষ্ণ, তা মানুষের মর্যাদা ও মুক্তশ্রী। প্রত্যেক মানুষ এখানে মাথা তুলে দাঁড়ায়, চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে; কারো পিঠ বাঁকা নয়, কেউ হাত কচলায় না, যাকে বলে চোখ রাঙানো তাও দৈনন্দিন সামাজিক ও কর্মজীবনে সম্ভবপরতার বহির্ভূত। ধনে, বৃত্তিতে ও শিক্ষাদীক্ষায় প্রভেদ আছে নিশ্চয়ই—সেটা অনিবার্য, কিন্তু মানুষ, শুধু মানুষ হ'য়ে জন্মেছে ব'লেই, কয়েকটা মৌলিক বিষয়ে শ্রদ্ধেয়, এই চেতনা ও স্বীকৃতির পরিচয় সর্বত্র পাওয়া যায়। এক শ্রেণীহীন সমাজ, যেখানে পদবি, খেতাব, উপবীত অথবা নীল রক্তের উপদ্রব নেই, যেখানে ধনী ও অধনীর মধ্যে বিভেদ কখনো রূঢ় হ'য়ে ওঠে না; এক বিরাট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, সবচেয়ে মহার্ঘ যেখানে শ্রম, সুযোগ সকলের পক্ষেই অপর্যাপ্ত, আর গুণ, বুদ্ধি ও উদ্যমের পথ অনবরত নির্বাধ—এই হ'লো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ব্যতিক্রমস্বরূপ একমাত্র যা উল্লেখ করা যায় তা নিগ্রোদের অবস্থা—ঐ তিমিরবর্ণ ভীমবল তরলচক্ষু মখমলকণ্ঠ গীতরসিক অধিবাসীদের উপর পুঞ্জীভূত লাঞ্ছনা ও অপমান। আমি ততদূর পর্যন্ত দক্ষিণে যাইনি যাতে নিগ্রোদের চরম দুর্দশা প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু লোকমুখে বর্ণনা শুনে বুঝেছি যে ব্যাপারটা প্রায় দক্ষিণ ভারতীয় অস্পৃশ্যতার মতোই শোচনীয়। যাঁদের মুখে শুনেছি তাঁরা সকলেই শ্বেতাঙ্গ, এবং সকলেই এ-ব্যাপারে বিবেকদুঃখী। এতদিনে হয়তো কারোরই অজানা নেই যে আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকার—এবং অধিকাংশ মনীষী—এই কলঙ্কময় বৈষম্য অপসারণের জন্য যথা-সাধ্য সচেষ্ট; কিন্তু বুদ্ধ, চৈতন্য ও মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ ও উদাহরণ, এবং দিল্লির লোকসভায় প্রণীত নববিধান সত্ত্বেও, যেমন এখন পর্যন্ত ভারতীয় অস্পৃশ্যতা—বা এমনকি জাতিভেদ—দূর হ'তে দেরি হচ্ছে, তেমনি, নিগ্রোদের বিষয়ে, আমেরিকায়। মার্কিনী গৃহ-যুদ্ধের সময়ে উত্তরে-দক্ষিণে যে-বিভেদ উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো, যে-অন্ধতার ফলে লিঙ্কন নিহত হন, এই একটি ব্যাপারে আজ পর্যন্ত তার নিরসন হ'লো না। বলা বাহুল্য, দক্ষিণী রাজ্যগুলি অশ্বেত বিদেশীর পক্ষেও সব সময় সুখধাম হয় না, এবং সেখানে বর্ণভেদের বিরুদ্ধতা ক'রে মার্কিনী শ্বেতাঙ্গরা মাঝে-মাঝে স্বেচ্ছায় যে-সব শাস্তি নিয়ে থাকেন,

---

* একটি ক্ষুদ্র কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করছি। এক ইংরেজ যুবক কলকাতায় আমাদের পরিচিত ছিলেন; লণ্ডনে আমাকে দেখতে পেয়ে তাঁকে মনে হ'লো হর্ষোৎফুল্ল, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আজকের রাতটা তাঁর গ্রামের বাড়িতে কাটাবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি রাজি হলুম। যাত্রার প্রথম ধাপ সাব-ওয়েতে; আমাকে কাউন্টারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমার নিমন্ত্রণকর্তা বললেন, 'আমার মাসিক আছে, আপনি একটা এক পেনির টিকিট কিনুন।' কিনলুম এক পেনি মূল্যে টিকিট, কিন্তু বাঙালি অভ্যাসদোষে একটু অবাক না-হ'য়ে পারলাম না। এর পরে একটা রেল-স্টেশন; এবার নির্দেশ : 'ঐ যে আট নম্বর জানলায় কিউ দেখছেন আপনি সেখানে দাঁড়ান, স্টেশনের নাম অমুক, টিকিটের দাম—' দামটা ঠিক মনে নেই আমার, তবে এক-আধ টাকারই ব্যাপার। হঠাৎ ইংলণ্ডের গ্রাম দেখার সব ইচ্ছে আমার মন থেকে নিঃশেষে উবে গেলো, মনে প'ড়ে গেলো যাবার একটা বাধাও আছে। ফিরে দাঁড়িয়ে বললুম, 'দুঃখিত—আমি যেতে পারবো না, এইমাত্র মনে পড়লো কাল বিকেলে স্ট্র্যাট-ফোর্ড-অন-অ্যাভনে নাটক দেখার টিকিট কেটেছি, দৈবাৎ লণ্ডনে ফিরতে দেরি হ'লে মুশকিল হবে।' (মিথ্যে বললুম না।) কারণটা তেমন জোরালো ছিলো না, কিন্তু যুবকটি আমাকে পীড়াপীড়ি না-ক'রে লম্বা লম্বা ইংরেজ পায়ে হনহন ক'রে তাঁর ট্রেনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমার না-যাবার আসল কারণটাও, আমার বিশ্বাস, তাঁর অনুমানের মধ্যে প্রবেশ করলো না।

এই প্রসঙ্গে পাঠকের হয়তো মনে পড়বে 'জীবনস্মৃতি'র সেই হাস্যকর ও শোকাবহ ঘটনা, যখন ইংলণ্ডে বর্ষীয়সী বেহাগ-ভক্ত বিধবার দ্বারা নিমন্ত্রিত হ'য়ে যুবক রবীন্দ্রনাথকে শূন্য জঠরে ঠান্ডা সরাইখানায় বিনিদ্র রাত কাটাতে হয়েছিলো। হয়তো বা অনুরূপ ফাঁড়া আমি সেই তারিখে দৈব দয়ায় এড়িয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের অর্থবল নেই, কিন্তু কাউকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ ক'রে, তারপর তাঁকে এক আনা দিয়ে বাস্-এর ও সাড়ে চোদ্দ আনায় ট্রেনের টিকিট কিনতে বলা, এটা—আমাদের মধ্যে যারা 'হাত থেকে মুখে' বেঁচে থাকে, তাদেরও কখনো মাথায় খেলবে ব'লে মনে হয় না আমার। অথচ এই যুবকটি হীনচেতা নন, স্বজাতির মধ্যে স্বভাবী। আসলে এটা মানসতার তফাৎ; ইংরেজের কাছে যেটা মিতব্যয়িতা, আমাদের হিশেবে সেটাই কার্পণ্য—আর কৃপণতা এমন এক প্রকার রুক্ষ দারিদ্র্য, যার প্রতিকারের কোনো উপায় নেই।

তাও চমকপ্রদ। ডাজিনিয়াতে এক মহিলা-কলেজে গিয়ে শুনলুম, দুটি ছাত্রী সম্প্রতি কারারুদ্ধ হয়েছে ঃ অপরাধ—তারা সিনেমা-গৃহে নিগ্রোদের জন্য পৃথক্কৃত অংশে বসেছিলো। প্রায় একই সময়ে, দক্ষিণতর অন্য এক রাজ্যে, একদল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণদের সঙ্গে এক বাস-এ ভ্রমণ করতে গিয়ে যার দ্বারা প্রতিহত ও বিপর্যস্ত হলেন তার নাম বিশুদ্ধ পশুশক্তি। কিন্তু এই উপলক্ষে সংবাদপত্রে ও লোকমুখে যে-প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জাগালো তাতে অন্তত এটুকু প্রমাণ করে যে সংস্কার বা কুসংস্কার দুর্মর হ'লেও, আঠারো-শতকী 'আলোকপ্রাপ্তি'র উত্তরাধিকার তার বিরুদ্ধে অনবরত দাঁড়িয়ে আছে।

এ-মুহূর্তে এটুকু বলা যায় যে উত্তরের রাজ্যগুলিতে, প্রচ্ছন্ন অবিচার থাকলেও, নিগ্রোদের অবস্থা ভারতীয় 'হরিজন'দের চাইতে অনেকাংশে ভালো। মার্কিনী আদর্শে তারা দরিদ্র নিশ্চয়ই (পুয়েটো-রিকানরাও তা-ই), কিন্তু কাতর বা অনশনক্লিষ্ট বা উঞ্ছজীবী নয়; নূ ইয়র্কের হার্লেম পাড়ায়, অন্তত বাইরে থেকে, দীনতার লক্ষণ চোখে পড়ে না, রাস্তায় বরং শ্রেণীবদ্ধ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। যানবাহনে অধিকার অবারিত হ'লেও ভালো-ভালো রেস্তোরাঁয়, হোটেলে ও বাসভবনে নিগ্রোদের প্রবেশ সাধারণত নিষিদ্ধ *। অধিকাংশেরই জীবিকার উপায় কায়িক শ্রম, কিন্তু 'শ্বেতকণ্ঠী' কলম-পেষা কাজে তাদের যে কখনো দেখা যায় না তা নয়, আর যে-সব দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, যেমন আয়-কর অথবা ডাকবিভাগ, সেখানে তো শাদা-কালো কেরানি সংখ্যায় প্রায় সমান-সমান; এমনও একটা কথা প্রচলিত আছে যে জাতীয় রাজধানীতে সবচেয়ে আদৃত সম্প্রদায় নিগ্রোরাই। আছে তাদের জন্য স্বতন্ত্র স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু বহু খ্যাত ও অখ্যাত শিক্ষায়তন ক্রমশ 'মিশ্রিত' হ'য়ে যাচ্ছে, যদিও উচ্চতর স্তরে নিগ্রো ছাত্রছাত্রী এখন পর্যন্ত সংখ্যায় নগণ্য। (এর কারণ হ'লেও হ'তে পারে তাদেরই দিক থেকে অনীহা, কেননা আমেরিকায় অর্থাভাব শিক্ষা-লাভের অন্তরায় হয় না।) এক নিগ্রো সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ ক'রে তৃপ্তি পেয়েছিলাম ঃ স্নিগ্ধ ব্যবহার, সুকুমার মুখশ্রী, নিজেকে যেন অন্তরালে রাখতে চান এমনি একটি প্রাচ্য ভঙ্গি; তাঁর মতো আরো অনেকে আছেন, কিন্তু এ'দের প্রভাব মুষ্টিমেয় স্বজাতির মধ্যেই আবদ্ধ ব'লে মনে হয়। নিগ্রো জনসাধারণ বিষয়ে এটুকু বললে বোধহয় ভুল হয় না যে তারা এখন পর্যন্ত আত্মোন্নয়নে যতটা সচেষ্ট, তার চেয়ে বেশি উৎসাহী শ্বেতাঙ্গের বাহ্যিক অনুকরণে। তারা করুণভাবে চেষ্টা করে রাসায়নিক বা পরামানিকের সাহায্যে কুঞ্চিত কেশ ঋজু ক'রে নিতে; শ্বেত-শোণিত মিশ্রণের ফলে যাদের ত্বক কিঞ্চিৎ শুক্ল হয়েছে তারা কৃষ্ণবর্ণ স্বজাতির প্রতি বিমুখ হয়; কোনো মেয়ে দৈবাৎ কোনো শ্বেতাঙ্গ ছেলেকে বন্ধুরূপে পেলে ব'র্তে যায়; অর্থবল কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেলে তাদের মার্কিনীত্ব যেন মার্কিনী হিশেবেও উগ্র হ'য়ে ওঠে। এই সবেরই কারণ অবশ্য স্পষ্ট: বংশ-পরম্পরায় যে-অপমানে তারা জর্জর, এ তারই প্রতিক্রিয়া। এই নিগ্রহভোগের ফলে, আর নিজেদের মধ্যে কোনো আদর্শনির্ভর সংকল্প বা পুনরুজ্জীবনী আন্দোলন এখনো জেগে উঠছে না ব'লে—কিংবা কখনো নিরুপায় প্রতি-শোধস্পৃহায়, হয়তো তাদের ব্যবহারও হয় কখনো-কখনো ঈষৎ অম্ল, বা প্রবণতাগুলি ভ্রান্ত পথ খুঁজে নেয়। যাকে বলে বিষাক্ত বৃত্ত, এ যেন তা-ই।

কিন্তু আমি মার্কিনী নিগ্রো সমস্যার আলোচনা করতে বসিনি—তার কোনো যোগ্যতাও আমার নেই—আমেরিকায় মানুষ কী-রকম মর্যাদা পেয়েছে সে-কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। আর—দক্ষিণী নিগ্রোদের বাদ দিলে—এখানে মানুষ মানে সব মানুষই বলা যায়; নূ ইয়র্ক বা সান ফ্রানসিস্কোতে বেড়াতে এসে, কোনো বিদেশীর হঠাৎ

---

* একবার শিকাগোতে এক দম্পতির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো; তাঁরা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে আর্তের ত্রাণে নিযুক্ত ছিলেন। শিকাগোতেও সমাজসেবা তাঁদের কর্ম; লক্ষ্য—যাতে বর্ণভেদ অপসারিত হয়। তাঁরা যে-বাড়িতে থাকেন তার নাম এব্রাহাম লিংকন সেন্টার, সেখানে তাঁরা ছাড়া অন্য সব অধিবাসীরা নিগ্রো। একই পাড়ায়, ও একই ফ্ল্যাটবাড়িতে, শ্বেত-কৃষ্ণের প্রতিবাসিতা সম্ভব ক'রে তোলার জন্য মহিলাটি এক সংঘ স্থাপন করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে জানতে পারিনি। কখনো কোনো বাড়িওলা ছলছুতো ক'রে ভারতীয়দেরও ফিরিয়ে দেয়, লন্ডনেও সব হোটেলে এশীয়রা গৃহীত হন না। বিদেশী বা বিধর্মীর প্রতি অপক্ষপাত ইতিহাসে নতুন নয়, এবং সাধারণত সব মানুষই স্বজাতির প্রতিবেশ পছন্দ করে; যে-কোনো মহানগরে এক-এক জাতির এক-এক পাড়ায় বসবাস লক্ষণীয়। —কিন্তু নিগ্রোদের অবস্থাটা যেন 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'র মতো, কিংবা তারা যেন দুকূলহারা হ'য়ে আছে—সেটাই সবচেয়ে কষ্টের।

গম্য হবে না যে উচ্চ ও নীচে, বা শ্বেত ও কৃষ্ণে, কোনো অধিকারগত বিভেদ আছে। তিনি দেখবেন, আপিশ-গুলোতে বেয়ারা বা পিওনজাতীয় কোনো কর্মী নেই, আসন ত্যাগ না-ক'রে এক গ্লাশ জল পাওয়াও দুঃসাধ্য; বড়ো-বাবু ও ঝাড়ুদার একই কাফেটেরিয়ায় কফি পান করছে; শ্যামাঙ্গী পরিচারিকা (যদি কোনো ভাগ্যবান গৃহে তা থাকে) কাজের ফাঁকে কর্ত্রীর সঙ্গে ব'সে গাল্প-গল্প করছে সিগারেট ধরিয়ে। মানুষে-মানুষে অসাম্যই প্রকৃতির বিধান, কিন্তু মার্কিনীরা এমন একটি অভেদানন্দ সংস্কার রচনা করেছে, যা আমাদের কাছে ভারি আশ্চর্য ব'লে বোধ হয়। 'শ্রমের মর্যাদা' নামক যে-বিষয়টিতে আমাদের দেশে স্কুলের ছেলেরা এখনো বোধহয় রচনা লিখে থাকে, তার সত্যিকার অর্থ আমি আমেরিকায় উপলব্ধি করেছিলাম।

ইংলণ্ডের প্রজাবৃন্দ প্রায় সকলেই ধবল, কিন্তু সেখানে পা দেয়ামাত্র যা টের পাওয়া যায়—না-পেয়ে উপায় থাকে না, সত্যি বলতে—তা এদের শ্রেণীভেদ। উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন—এই তিন শ্রেণীতে এমনভাবে বিভক্ত এই সমাজ যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, চেহারা ও বেশবাস দেখে, বা উচ্চারণ শুনে, আমার মতো বিদেশীও ব'লে দিতে পারে, কে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূত। যারা নিম্নবর্ণ, তারা খর্বকায়, অসুন্দর, ব্যবহারে রূক্ষ, উচ্চারণে বিদেশীর পক্ষে প্রায় দুর্বোধ। খবর-কাগজ, পানশালা, বিদ্যালয়, আহারস্থল, আমোদ-প্রমোদ—সব-কিছু শ্রেণী হিশেবে পরিচ্ছন্নভাবে বিভক্ত। এক বন্ধুকে জিগেস করলুম: 'আপনাদের সমুদ্র-তীরবর্তী একটি শহর দেখতে চাই। আপনি কোনটি অনুমোদন করেন?' 'আপনি কী দেখতে চান—উচ্চ, মধ্য, না নিম্নশ্রেণীর উপযোগী সমুদ্রতীর—তার উপর নির্ভর করছে।' আর-একজন বললেন, 'আমাদের নিম্নশ্রেণী আগে পনির খেতো না—কিন্তু যুদ্ধকালীন র‍্যাশনের ফলে তাদের আহারের অভ্যেস বদলে গেছে—স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়েছে সেজন্য।' মনে রাখতে হবে এই বিভেদ ধনগত নয়, শ্রেণীগত—আদর্শের দিক থেকে, এবং অংশত ব্যবহারেও, আমাদের জাতিভেদের মতোই; নিম্ন থেকে মধ্যে, বা এমনকি উচ্চস্তরে, প্রতিভাবানের উত্থান সম্ভব হ'লেও সাধারণ সমাজ-ব্যবস্থার নড়চড় নেই।

কোনো-কোনো পাঠকের হয়তো স্মরণে আছে যে কিছুদিন আগে 'এনকাউণ্টার' পত্রিকায় একটি সোৎসাহ আলোচনার বিষয় ছিলো—'ইউ' ও 'নন-ইউ' বচন (U=Upper class)। সব দেশেরই ভাষাতে আছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, আছে শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের বিভিন্ন শব্দপ্রয়োগ ও উচ্চারণ; কিন্তু ভাষার মধ্যে এই শ্রেণীগত পার্থক্য যেন ইংরেজ সমাজের মর্মস্থল থেকে উৎসারিত, আমার মনে হয় না পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তুলনীয় আলোচনার কোনো অবকাশ আছে। সাধারণ বুদ্ধিতে যা বলে, ব্যাপারটা সে-রকম নয় ব'লেই চর্চা-সাপেক্ষ; অর্থাৎ 'উচ্চ' ভাষা সর্বত্র নয় 'অনুচ্চে'র তুলনায় সুষ্ঠু, বা যুক্তি-সংগত, বা এমনকি শালীন। আমি, এই সব গূঢ় রহস্যে অদীক্ষিত বহু-দূরবর্তী বিদেশী মাত্র, আমি সবিস্ময়ে ও সকৌতুকে জেনেছিলাম যে 'উচ্চ' বাগ্‌ধারায় 'Yours faithfully' লিখলে সূচিত হয় বন্ধুতা, আর 'Yours sincerely' মানে লৌকিকতা-মাত্র, এবং সবান্ধবে সুরাপানের পূর্বে 'চীয়র্স' ব'লে যারা শুভেচ্ছা জানায় তারা হ'লো অনুচ্চভাষী, উচ্চ মহোদয়েরা তৎপরিবর্তে শুধু জন্তুর মতো অস্পষ্ট একটি ধ্বনি নির্গত করেন। আমি যতদূর লক্ষ করতে পেরেছি, তাতে মনে হয়নি ব্যবহারে ও বিধানে সর্বত্র সামঞ্জস্য আছে—তা থাকতেও পারে না—কিন্তু এ নিয়ে যে সূক্ষ্ম ও সবিস্তার তাত্ত্বিক আলোচনা সম্ভব, তার কারণই ইংলণ্ডের শ্রেণীবন্ধমূল মনোভাব।

ভাষার সামান্যতা, পিলগ্রিম-পিতাদের স্মৃতি, রাজনৈতিক সহযোগ—এই সব কারণে ইংলণ্ড ও আমেরিকার নাম অনেক সময়ই যুক্ত হ'য়ে থাকে, কিন্তু এই দুই দেশে চারিত্রিক ব্যবধান দুস্তর*। পাৎলা ঠোঁটে কাটাছাঁটা কথা, কম কথা, লাজুকভাবে চোখের দিকে প্রায় না-তাকানো, প্রয়োজনীয় কর্মটুকু সমাধা হওয়ামাত্র নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়া, হাসির অভাব, ঔৎসুক্যের অভাব, শ্লেষ্মার আধিক্য, 'তুমি কারে করো না প্রার্থনা, কারো তরে নাহি শোক'—এই ধরনের আত্মধৃত উদাসীনতা: এই হ'লো ইংরেজের সাধারণ চরিত্র। আর মার্কিনীরা খোলামেলা সহজ ও উচ্ছল; তারা কাছে এগিয়ে আসে, হাসে, অপ্রয়োজনেও কথা বলে; তারা আতিথ্যে উদার, মেলামেশায় স্বচ্ছন্দ, বন্ধুতায় আগ্রহশীল। সব দিক থেকেই খুব খোলা মনে হয় দেশটাকে: আকারে বৃহৎ, প্রজাসংখ্যায় বিচিত্র, সুযোগে প্রচুর, মানসতায় জঙ্গম ও পরিবর্তনপ্রিয়। আমি মানতে বাধ্য যে স্বল্পভাষী ও নতচক্ষু ইংরেজের একটি বিশেষ ধরনের রমণীয়তা আছে, আর মার্কিনী সরল-তাকে কখনো-কখনো মনে হ'তে পারে তরলতা, কোনো আচরণ কিছু বা ঝাঁঝালো, হঠাৎ কোনো প্রকাশভঙ্গি খর। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের সভ্যতা কত প্রাচীন, বহু যুগের স্রোত আমাদের যে-রকম মৃদু, ক্লান্ত, বহুস্তর ও বিনষ্ট* ক'রে রেখে গেছে, এই আনকোরা তাজা টগবগে নতুন দেশে তা আশা করা অন্যায়; এবং য়োরোপীয় মানসপটে 'ইয়াঙ্কি' নামে যে-ছবিটা মুদ্রিত আছে বা ছিলো, সেটা ব্যঙ্গচিত্র ছাড়া কিছু নয়। আর, শেষ পর্যন্ত, যদি কখনো বেছে নেবার কথা ওঠে, তাহ'লে প্রবাসযাপনের পক্ষে, আমি মার্কিনী ধরনটাকেই পক্ষপাত জানাবো।

কখনো কোনো অশোভন বা রূঢ় ব্যবহার পাইনি তা বলতে পারি না, কিন্তু মোটের উপর মার্কিনী জীবনে আমি যা অনুভব করেছি, তা এমন একটি সহজ মানবিক ভঙ্গি, যা পথিকের মুহূর্তগুলিকে স্বাদু ক'রে তোলে। যাঁরা গুণী বা বিদ্বান তাঁদের প্রীতি ও উদারতা অন্যান্য দেশেও ভোগ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার; এ-প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করতে চাই না, যদিও মার্কিন দেশে কারো-কারো সৌহার্দ্য আমার পক্ষে সম্পূর্ণ আশাতীত হয়েছিলো। কিন্তু যারা জনসাধারণ, নামহীন এবং ক্ষণকালীন, এবং যাদের সঙ্গে সংযোগ ভিন্ন বেঁচে থাকা যায় না, তাদের বিষয়ে উল্লেখ না-করলে আমার এই ভ্রমণবৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। লণ্ডনের ট্যাক্সি-ওলাদের বিষয়ে আমার মনে একটি স্বাস্থ্যকর ভীতি গ্রথিত হ'য়ে আছে; কিন্তু আমেরিকায় ঐ সম্প্রদায় আমাকে শুধু স্থান থেকে স্থানান্তরে পৌঁছিয়ে দেয়নি, অনেকে প্রবৃত্ত হয়েছে আলাপে, তারিফ করেছে তেনজিং বা (ফিল্মে দেখা) তাজমহলের, আমি কৌতূহল-বশত কোনো প্রশ্ন করলে তার যথোচিত উত্তর দিয়েছে, দু-একটা রসিকতা করাও তার অধিকারের বহির্ভূত ব'লে ভাবেনি, কখনো বা গন্তব্যে পৌঁছে এ-কথাও বলেছে,— 'আপনাকে চালিয়ে এনে খুব

* অ্যাংলো-স্যাক্সন দ্বৈপায়ন ইংরেজদের অনন্য বললে অত্যুক্তি হয় না; য়োরোপীয় মহাদেশবাসীদের অনেক বিষয়েই তাদের সঙ্গে গরমিল, এমনকি স্কচ, ওয়েলশ বা আইরিশ চরিত্রেও তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য নেই। এডিনবরায় এক হৃষ্ট ও সদালাপী ভদ্র-লোকের সঙ্গে গাড়িতে ভ্রমণ করেছিলাম; তাঁর মুখে অনর্গল কথা শুনে আমি নিশ্চয়ই অবাক হতাম, যদি-না তিনি মাঝে-মাঝেই বলতেন—'আমাকে মাপ করবেন—বড্ড কথা বলছি—আমি ওয়েলশ কিনা!' আঠারো শতক থেকে ইংলণ্ডের ভাগ্য তাকে যুক্ত করেছিলো এশিয়া ও আফ্রিকার সঙ্গে; সম্প্রতি সে তার য়োরোপীয় সত্তাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করছে।

* এই শব্দটিকে ইংরেজি 'sophisticated' অর্থে ব্যবহার করছি।

ভালো লাগলো আমার। গুড-বাই। গুড-লাক্‌।' কোনো নতুন দেশে বা শহরে পৌঁছনোমাত্র একটি মানুষের স্পর্শ যদি পাওয়া গেলো, তাতে যে প্রবাসীর মন স্নিগ্ধ হ'য়ে ওঠে তা বোধহয় বুঝিয়ে বলার দরকার করে না।* পূর্বোল্লিখিত চার্লি ও পনেরো স্ট্রীটের গোমস্তাকে পাঠক যেন ব্যতিক্রম হিশেবে ধ'রে নেন, কেননা উল্টো দিকে নজিরের অন্ত নেই। প্রায় সর্বদাই দেখেছি, দোকানের কর্মী ও কর্মিণীরা চোখে-চোখে তাকায়, হেসে কথা বলে, একটু অবকাশ পেলে কিঞ্চিৎ ঘরোয়া গল্প ক'রে নেয়, এমনকি কখনো-কখনো 'হানি' বা 'ডার্লিং' ব'লে সম্বোধন করতেও বাধে না তাদের। যাদের কাছে ঘন-ঘন যেতে হয় তারা বলে—'আজ আপনি কেমন আছেন? ক'দিন থাকবেন এ-দেশে? জানেন আমার স্বপ্ন কী? একবার ভারতে যাওয়া।' বা হয়তো—'আপনার স্ত্রী আজ কোথায়? She's a nice lady.' পিটসবার্গে ক্রিসমাসের ছুটিতে কলেজের ডাইনিংরুম বন্ধ, ক্যাম্পাস জনহীন, আমাকে খেতে হ'তো পরিচারিকাদের সঙ্গে বেসমেন্টে ব'সে; সেই ললনারা যে-রকম যত্ন ক'রে খাওয়াতেন আমাকে, গল্পগুজবে নিঃসঙ্গ বিদেশীকে সান্ত্বনা দিতেন, তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ না-ক'রে পারি না। ডাক্তারের কেরানি, হাসপাতালের নার্স, কসাইখানার ছোকরা—সকলেরই চোখে হাসি, ভাষায় ও ভঙ্গিতে হৃদ্যতা। এ-সবের কোনো অর্থ নেই তা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু কোনো মূল্য নেই তা কেমন ক'রে বলি? শুধু ব্যবসায়িক সম্বন্ধের জন্য নয়, আমাকে যে একজন ব্যক্তি ব'লেও স্বীকার ক'রে নেয়া হচ্ছে, এই চেতনাটুকু দিনযাপনকে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ক'রে তোলে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ভঙ্গি য়োরোপেও কোনো-কোনো দেশে দেখিনি তা নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে-একমাত্র য়োরোপীয় দেশের ভাষা আমি বলতে পারি, সেখানে এটি একেবারেই পাওয়া যায় না। —কিন্তু 'একেবারেই' কথাটা ভুল হ'লো, কেননা রেক সত্য লিখেছিলেন: লণ্ডনে অন্তত একটি স্থান আছে যেখানে প্রবেশ করলে অনুভূত হয় তাপ, সজীবতা, মানুষের হৃৎস্পন্দন, এবং যেখানে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয় না পাছে গলার আওয়াজ ফিশফিশানির উপরে উঠে যায়। সেটি হ'লো—পাব্‌। প্যারিসের কাফের মতোই ব্যাপ্ত এই প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ, খ্যাতিমান মৃত ও জীবিতের দ্বারা নন্দিত, স্মৃতিভারে গরীয়ান—যদিও আকারে-প্রকারে এ-দুই বস্তু যতদূর সম্ভব আলাদা। উত্তর ও দক্ষিণ, প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক ধর্ম, কুয়াশা ও দ্যুতি, শেক্সপীয়র ও রাসিন, স্বপ্ন ও স্বচ্ছতা—য়োরোপকে যতদিক থেকে ভাগ করা সম্ভব, লণ্ডনের পাব্‌ ও প্যারিসের কাফের কথা ভাবলে এই বিভেদের চিত্রকল্প যেন চোখে দেখা যায়। এবার লণ্ডনে যে-সব বাঙালির সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো, তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সাংবাদিক বা সাহিত্যিক; এক সন্ধ্যায় দল বেঁধে যাওয়া হ'লো ফ্লীট স্ট্রীটে। যে-পাব্‌-এ আমরা ডিনার খেলুম তার নাম 'চেশিয়র চীজ়'; পুরোনো, তিনতলা বাড়ি, চিৎপুরের মতো অন্ধকার গলি দিয়ে ঢুকতে হয়, সিঁড়িতে দু-জনের বেশি পাশাপাশি হাঁটা যায় না, ঘরগুলির স্তর অসমতল। লোকেরা গল্প করতে-করতে খাচ্ছে—হাসছেও, কেউ বা—হয়তো একা হবারই জন্য, বা কোনো বন্ধুর অপেক্ষায়—ব'সে আছে পাশের ঘরে নিরিবিলি—কোলে বই, সামনে এক গ্লাশ গিনেস। তেতলার একটি ঘর অব্যবহৃত, সেখানে কিছু দ্রষ্টব্য আছে। এই পাব্‌-এ ছিলো ডক্টর জনসন-এর আড্ডা; ঐ যে তাঁর চেয়ার, কাচের বাক্সে তাঁর অভিধানের প্রথম সংস্করণ। 'Household Words'-এর বাঁধানো কয়েকটা ভলুম নেড়ে-চেড়ে দেখা গেলো, এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন চার্লস ডিকেন্স। দেয়ালে দুটো চেক রেখে দিয়েছে বাঁধিয়ে, প্যাঁচালো স্বাক্ষর উদ্ধার করতে বেশ চেষ্টা করতে হ'লো, যদিও সেই নাম আমার বহুকালের চেনা। ছেলেবেলায় এঁর কাছে শোনা গল্প—হাসি, কান্না, উৎকণ্ঠা, আন্দোলন—পেগটি, উরিয়া হীপ, মিকবর, লিটল নেল—সমুদ্রের শব্দ শুনতে-শুনতে জেগে-থাকা একলা ছেলেটা—সব মনে প'ড়ে গেলো। একটি চেক-এর টাকার অঙ্ক, একশো বছর আগেকার হিশেবে, এত বড়ো যে মনে হয় ডিকেন্স এক বছরের সবান্ধব খাদ্য-পানীয়ের ঋণ এই একবারে শোধ করে দিয়েছিলেন। মালিকেরা বুদ্ধিমান—চেক বাঁধিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু লণ্ডন বড়ো বেশি গৃহস্থ; প্যারিসের মতো প্রায় সারা রাত দূরে থাক, আড্ডা দিয়ে এগারোটা পর্যন্ত বাজানো সেখানে সহজ নয়। অথচ, গ্রীষ্মকালে, এগারোটা তো আক্ষরিক অর্থে সবে সন্ধে। চেশিয়র চীজ় থেকে অনিচ্ছায় উঠতে হ'লো আমাদের। 'পাশে আর একটা আছে—দি বেলস—সেটা বোধহয় বন্ধ হয়নি এখনো—চলুন।' বন্ধুর এই পরামর্শমতো, দেড় মিনিট হেঁটে, আবার কিছুটা গলি পার হ'য়ে আমরা অন্য এক আশ্রয়ে উপস্থিত হলুম। একতলার ঘর, বড়ো নয়, আলো কম, সিগারেটের ও পাইপের ধোঁয়ায় ঝাপসা হ'য়ে আছে, আর এমন সরগরম যে প্রায় বিশ্বাস হয় না লণ্ডনে আছি। সবাই দাঁড়িয়ে, সবাই সরব, মনে হয় সকলেই সকলের চেনা। আমরা ভাবছি, ঐ কোণের আসনগুলি দখল করা যাক, এমন সময় সেই আবছায়া থেকে অচেনা গলায় হঠাৎ আমার নাম শুনতে পেলাম। কে একজন ব'লে উঠলো—'এই যে! তুমি! What a pleasure! কতকাল পরে দেখা বলো তো!' আমার পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ হ'লো না যে এখানে আমাকে 'তুমি' বলার মতো কেউ থাকতে পারে, স্পষ্ট বাংলা ভাষায়, প্রথম নামে সম্বোধন ক'রে। 'কী? চিনতে পারছো না?......না? ঢাকার কথা মনে পড়ে? আর সেই যে কলকাতায় একবার—' ভদ্রলোক তাঁর নাম বললেন, উল্লেখ করলেন অন্য দু-একটা তথ্য, ধীরে-ধীরে তাঁর উনিশ-কুড়ি বছরের চেহারাটা—যখন আমারও ছিলো ঐ বয়স আর কিছুটা চেনাশোনা ছিলো তাঁর সঙ্গে—সেই সময়ের ছবি আমার মনে জেগে উঠলো। 'আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি যে—' চেষ্টা ক'রে আমিও 'তুমি' বের করলাম—'যে তুমি আমাকে চিনতে পেরেছো! কিন্তু—খুব ভালো লাগছে।' এর পরে উভয়ে দলে পরিচয়, অনেক হাত-ঝাঁকাঝাঁকি, প্রশ্নোত্তর, হাসা-বিনিময়। আমার ফিরে-পাওয়া বন্ধুটি দীর্ঘকাল ধ'রে প্রবাসিত, অথবা এটাই তাঁর স্বদেশ হয়ে গিয়েছে, লণ্ডনের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক তিনি, তাঁর সঙ্গীদেরও ঐ পেশা। বোঝা গেলো, এ-পাড়ার সবগুলো পাব্‌ই সাংবাদিকদের দ্বারা 'অধিকৃত', এক-একটা এক-এক পত্রিকার (বা বার্তাসংঘের) এলাকা ব'লে গণ্য হয়ে থাকে। এই আকস্মিক সাক্ষাতের ফলে, আর যেটুকু সময় বাকি ছিলো, বেশ দিল-খোলা আড্ডা জমলো আমাদের। যাকে বলে আবহাওয়া, তার কোনো অভাব ছিলো না: অল্প আলো, স্ফটিকের দীপ্তি, সেকেলে আসবাব, পরিশ্রমী দিনের শেষে বিরামভোগী একদল মানুষ—আর সবই পুরোপুরি ইংরেজি ধরনের, অগ্নিবর্ণী, ক্ষিপ্র-ভাষিণী সামনের এক-দাঁত-পড়া, আস্তিন-গোটানো পরিচারিকাটি পর্যন্ত যেন চসার অথবা শেক্সপীয়র থেকে উঠে এসেছে। জীবনে এমনি দু-একটা ভালো জিনিশ দৈবে কখনো জুটে যায়।

—ক্রমশ

---

*নিউ ইয়র্কের বাস্‌-চালকেরা সাধারণত খুব রাশভারি গম্ভীর চেহারার পুরুষ, কিন্তু একদিন এর ব্যতিক্রম দেখেছিলাম। শীতের শেষ তখন; সেণ্ট্রাল পার্কের বরফ গলেনি, কিন্তু সবেমাত্র একটি-দুটি কচি পাতা দেখা দিয়েছে। বাস্‌-এর চালকটি ছিলো তরুণ ও সুশ্রী। যাত্রীদের নামা-ওঠার সময় সে জনে-জনে প্রত্যেককে সম্ভাষণ করছে: 'Watch your step, fair lady,' 'Good afternoon, sir,' 'Nice day, sir.' 'Good night, ma'am. Have a nice evening."—এমনি অনবরত চলছে তার শুভেচ্ছাজ্ঞাপন। আমার আনন্দ হচ্ছিলো তাঁকে দেখে: মনে-মনে ভাবছিলাম, যুবকটি কি আজ বাগদত্ত হয়েছে, না কি সে বসন্তের দ্বারা স্পৃষ্ট, না কি শুধু বেঁচে থাকার সুখেই এমন উচ্ছল?

॥ পূজা কবে ? ॥

অমৃতে সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
প্রিয় মহাশয়,

১৩৭০ বঙ্গাব্দ অনেক কিছু নূতন বহন করিয়া আনিবে। সাধারণতঃ তিন বৎসর পরে পরে একটি করিয়া মলমাস বা অতিরিক্ত মাস হয় কিন্তু আগামী ১৩৭০ সালের ভিতরে দুইটি মলমাস উপস্থিত হইবে। জ্যোতিষ-গণনাতে এক বৎসরের মধ্যে দুইটি মলমাস সংঘটিত হওয়ার পূর্বনজির পাওয়া যায়, কিন্তু বহু বৎসর পরে এরূপ ঘটনা পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনায় পঞ্জিকাকার ও জনসাধারণ সকলেই বেশ চঞ্চল হইয়াছেন। আবার এবারের মলমাস নির্ণয়ে বিভিন্ন গণনামতে মাসের প্রভেদ হইতেছে। সংস্কারবাদী পঞ্জিকামতে কার্তিক ও চৈত্র মলমাস হইবে এবং তদ্ভিন্ন অন্য পঞ্জিকামতে আশ্বিন ও চৈত্র মলমাস হইবে। সংস্কারবাদীদের মতে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা সাধারণ নিয়মে আশ্বিনে অনুষ্ঠিত হইবে এবং মলমাসের দরুণ কালীপূজা একমাস পিছাইয়া কার্তিকের শেষ অমাবস্যায় হইবে। কিন্তু অন্য পঞ্জিকামতে নবম্যাদি কল্পারম্ভ ভাদ্রের শেষে আরম্ভ হইয়া কার্তিকের প্রথমে দুর্গাপূজা হইবে অর্থাৎ পনরদিনব্যাপী নবম্যাদি কল্পারম্ভীয় পূজাস্থলে ৪৫ দিনব্যাপী পূজা হইবে। এইমতে প্রতিপদাদি কল্পারম্ভীয় পূজা কিন্তু নয়দিনব্যাপীই হইবে। এইখানেই শেষ নয়; বাংলা দেশের পঞ্জিকাকারদের মধ্যে উপরোক্ত মতভেদ ছাড়া সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মলমাস নির্ধারণে বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে। কার্তিক ও চৈত্র মলমাস স্থলে সংস্কারবাদী ও অসংস্কারবাদী সমস্ত বঙ্গীয় পণ্ডিতবর্গই কার্তিককে মলমাস বা অধিক মাস এবং চৈত্রকে ভানুলঙ্ঘিত বা সাধারণ অশুদ্ধ মাস হিসাবে নির্ধারণ করিতেছেন কিন্তু সরকারী পঞ্জিকায় কার্তিককে ভানুলঙ্ঘিত ও চৈত্রকে মলমাস বলা হইয়াছে। সংস্কারবাদী পঞ্জিকার সহিত ভারত সরকারের পঞ্জিকার গণনায় মিল হইতেছে বটে, কিন্তু কার্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত তিথিকৃত্যাদির ব্যবস্থায় একমাস তফাৎ হইবে। অবশ্য উত্তরভারতীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয় স্মৃতি-ব্যবস্থার সহিত বঙ্গীয় স্মৃতিব্যবস্থার কিছু কিছু অমিল চিরকালই আছে। যেমন—বাংলা দেশে দিবাতে বিবাহ হয় না, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে দিবাবিবাহ প্রচলন আছে। অহোরাত্রব্যাপী একাদশী হইয়া পরদিনে অল্পকালস্থায়ী একাদশী থাকিলে বাংলা দেশে পরদিনে স্বল্পকালস্থায়ী তিথিতেই একাদশীর উপবাস বিহিত, কিন্তু কোন কোন প্রদেশে অহোরাত্র প্রাপ্ত একাদশী দিনেই উপবাস হয়, পরদিন মলতিথিতে হয় না। তদ্রূপ এক বর্ষ মধ্যে দুইটি মলমাস হইলে পূর্বেরটি মল বা পরেরটি মল এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের স্মার্তব্যবস্থায় মতভেদ দেখা যায়। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্জিকায় মধ্যভারতীয় পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুযায়ী মলমাসের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গীয় স্মৃতিব্যবস্থার সহিত মতভেদ দেখা যায়। আগামী বর্ষের দীপান্বিতা কালীপূজার দিননির্ণয় সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া সম্প্রতি বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতদিগের অভিমত-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তদুত্তরে দক্ষিণভারতের পণ্ডিতমহাশয় বলিয়াছেন তাঁহাদের পঞ্জিকায় কালীপূজার উল্লেখ হয় না। সুতরাং এবিষয়ে তাঁহারা কিছু বলিতে পারেন না। উত্তরভারতীয় পণ্ডিতমহাশয় তিনদিনব্যাপী দেওয়ালী-উৎসবের কথা বলিয়াছেন, কালীপূজার উপরে কোন গুরুত্ব দেন নাই। অথচ এই প্রধান উৎসবটি সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রে ও তন্ত্রশাস্ত্রে কত আলোচনা আছে। আমরা অবশ্য বঙ্গীয় বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের অভিমত সংগ্রহ করিয়া কালীপূজার দিন স্থির করিয়াছি। এরূপ বিরোধস্থলে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থা কোনকালে হইবে কিনা তাহা ভবিতব্যই জানে।

কিন্তু জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ শাস্ত্র। আকাশে সূর্যচন্দ্রের অবস্থানের সহিত মিলাইয়া এ শাস্ত্রের গণনায় শুদ্ধাশুদ্ধির পরীক্ষা করা যায়। জ্যোতিষের সিদ্ধান্তে সমগ্র ভারত, শুধু ভারত কেন, সমস্ত পৃথিবীর সম্ভ্রান্ত সমাজ মিলিতভাবে গ্রহণ করে। সুতরাং মলমাসের মূলীভূত গণনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইতেছে। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় গ্রহগতির পরিবর্তনের জন্য বহুবার গণনা-প্রণালীর সংস্কার করা হইয়াছে। মাত্র ৫০০ বৎসর পূর্বে দেখা যায় ১৪০০ শকে মকরন্দ সারনীমতে তিথ্যাদি গণিত হইত, পরে অয়নাংশাদির পরিবর্তন হেতু ১৫২১ শকে রাঘবানন্দী দিনচন্দ্রিকামতে তিথ্যাদি নির্ণয় হইতে থাকে। এবং তারপরে ১৫৬৬ শা পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা-রচিত দি কৌমুদীমতে তিথি নির্ণয় আরম্ভ হয়। ঐ পুস্তকে বলা আছে ঐ সারনী মতে অংশ অয়নাংশ অনুসারে প্রস্তুত অর্থা ঐ সময়ের উপযোগীভাবে প্রস্তুত। কিন্ত অনুসন্ধিৎসু পাঠক লক্ষ্য করুন, ১৪০০ শক হইতে ১৫৬৬ শক পর্যন্ত ১৬৬ বৎসরের মধ্যে অয়নাংশ ও গ্রহগতির পরিবর্তন-জন্য তিনবার সারনী গ্রহ পরিবর্তন হইলেও ১৫৬৬ শক হইতে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩১৮ বৎসরের মধ্যে গণনা-গ্রহের কোন পরিবর্তন বা সংস্কার না করিয়া ঐ ১৫৬৬ শকে রচিত দিন-কৌমুদী পুস্তকানুসারে গণনা আমাদের ধর্মকর্মের উপযোগী একথা এখনও নির্বিকারভাবে প্রচারিত হইতেছে এবং এই গণনার অনুসরণকারী পঞ্জিকাকারগণ আশ্বিন ও চৈত্রকে মলমাসরূপে প্রচার করিবার দুঃসাহসপ্রকাশপূর্বক সমস্ত ধর্মকর্মের বিশেষতঃ মহাপূজার দিন নির্ণয়ে বিভ্রাট সৃষ্টি করিতেছেন। অপর পক্ষে ১৩২২ সালের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা ও ১৩৫৭ সালে কলিকাতা পণ্ডিতসভার পঞ্জিকাবিষয়ক মূল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সর্বজনমান্য সূর্যসিদ্ধান্ত পুস্তকানুসারে বর্তমান কালোপযোগী বীজ-সংস্কৃত গণনায় কার্তিক ও চৈত্র মলমাসরূপে পাওয়া যায়। এই সুসংস্কৃত গণনা ভারতবর্ষের সমস্ত সংস্কারবাদী পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ভারত সরকারও এই মূলগণনার ভিত্তিতে গণনা করিয়া কার্তিক ও চৈত্র মলমাসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত সরকার যখন যথার্থ শাস্ত্রাদর্শে গণনা করিতেছেন তখন তাঁহাদের উচিত এই গণনা সর্বভারতে প্রচলিত করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া। তাহা হইলে অসংস্কৃত পঞ্জিকাকারগণ গণনা সংস্কার করিতে বাধ্য হইবে, জনসাধারণও এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬২ সালের ছুটির তালিকা সুসংস্কৃত গণনানুসারে করিয়াছেন। আমরা আশাকরি ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত গণনানুসারে ১৯৬৩ সালেও প্রগতিশীল গণনা অনুসৃত হইবে। প্রসঙ্গতঃ পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিই যে বর্তমান ১৩৬৯ সালে সংস্কার-বাদী গণনামতে চারদিনব্যাপী দুর্গা-মহোৎসবের দিন ধার্য আছে; আর পূর্বকথিত ১৫৬৬ শকে রচিত পুস্তকের গণনানুসারে (যাহা বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান কালোচিত বিজ্ঞান ও শাস্ত্রসম্মত তিথি ও সংক্রান্তি-গণনার সহিত চার-পাঁচ ঘণ্টা পার্থক্য যুক্ত হইয়াছে) তৃতীয় দিনে বিসর্জন হইতেছে। এই সমস্ত মতভেদ সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে তথ্যানুসন্ধান করিতে পুনরায় অনুরোধ জানাই।

ইতি—ষষ্ঠীচরণ জ্যোতির্ভূষণ

[উপন্যাস]

গ্রন্থারম্ভ

ভোর হ'তে না হ'তে আসতে শুরু হয় হাওড়া ও শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে প্ল্যাটফর্মে—কেরাণী ও কুলিবোঝাই ট্রেন-গুলো। হাজার হাজার মানুষ নামে গাড়িগুলো থেকে। লিলুয়া-বেলুড়-দমদমের নানান কারখানার শ্রমিক এরা, অসংখ্য অগণিত অফিসের কেরাণী। এই দু'দলই বেশী—কিন্তু তা ছাড়াও আসে অনেকে। আসে ছোট-বড় দোকানদার, দোকানের কর্মচারী, মাল কিনতে আসে বহুরকমের কারবারী মানুষ, সারাদিন ঘুরে ঘুরে ব্যস্ত ক'রে সন্ধ্যার সময় ফেরে বিপুল মালের বোঝা টেনে; আসে হোটেল-রেস্তোরাঁ-মিষ্টান্নভাণ্ডারের বয়-খানসামা-কারিগরি; বিপুল পণ্যের পসরা নিয়ে আসে ব্যাপারীর দল। শাক-সব্জী-ফলমূলের ফসল নিঃশেষ ক'রে টেনে আনে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে; ইস্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরাও আসে কিছু কিছু; আসে কর্মপ্রার্থী বেকারের দল। আরও ছোট-বড় বহু উদ্দেশ্য ও আশা নিয়ে আসে বহু বিচিত্র মানুষ। সকাল থেকে বেলা দশটা-এগারোটা পর্যন্ত বিরাট জনতা দলে দলে এসে পৌঁছতে থাকে এই সুবিপুল মহানগরীর দুটি দ্বারপ্রান্তে।

এরা থাকে নানান জায়গায়। বহুদূরে—চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল কিংবা আরও দূরে থাকে কেউ কেউ। দূরাভ্যন্তবর্তী স্টেশন থেকেও হয়তো দু-তিন মাইল তফাতের ঝিঁঝিঁ-ডাকা, জোনাকি-জ্বলা জনবিরল নিভৃত গ্রাম সে-সব। আবার খুব কাছাকাছি জায়গা থেকেও আসে অনেকে। কলকাতার একেবারে কাছে, গায়ে-গায়ে লেগে থাকা গণ্ডগ্রাম ও উপনগরীর জনাকীর্ণ স্টেশন থেকেও বিস্তর লোক আসে। সংখ্যায় এরাই বরং বেশী। বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, কালিঘাট, উল্টোডাঙ্গা, দমদম, আগড়পাড়া, সোদপুর, বালি, উত্তরপাড়া, বেলুড়, রাম-রাজাতলা, সাঁতরাগাছি, মৌরিগ্রাম, কদমতলা, বড়গেছে, মাকড়দা—আরও অসংখ্য নামের স্টেশন থেকে আসে তারা গাড়ি-বোঝাই হয়ে। ট্রেনগুলো যেন অজগরের মতো স্টেশনে স্টেশনে গিলতে গিলতে আসে মানুষগুলোকে—একেবারে এখানে পৌঁছে উগরে দেয়। ঐটুকু ট্রেনের একটা কামরায় অতগুলো মানুষ ছিল তা চোখে দেখেও বিশ্বাস হ'তে চায় না। যেমন বিশ্বাস হ'তে চায় না কাছাকাছির ঐসব স্টেশনগুলোয় দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য লোকও শেষ পর্যন্ত উঠবে এই ঠাস-বোঝাই কামরাগুলোর মধ্যে।

নিঃশেষে শুষে নেয় এই শহর আর তার আশপাশের কলকারখানা, অফিসগুলো বহুদূরস্থিত উপকণ্ঠের কর্মক্ষম মানুষ-গুলোকে। অনেককে ভোরবেলাই বেরোতে হয়—ফেরে একেবারে রাত্রে। বহুদূরের গ্রাম থেকে আসে যারা, অথচ ঠিক আটটায় যাদের হাজির দিতে হয়, তাদের কেউ কেউ সূর্য অনুদয়েই ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। গরমের দিনেও দিবালোকে তাদের মুখ দেখতে পায় না ঘরের লোকে। মেচাদা-বাগনান থেকে যারা লিলুয়ার কারখানায় চাকরি করতে আসে, তাদের ছেলেমেয়েরা রবিবার বাড়ির মধ্যে একটা অপরিচিত লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখে অবাক হয়ে যায়।

এমনি করে আসতে আসতে বেলা দশটার মধ্যেই নিঃশেষে চলে আসে খেটে-খাওয়া মানুষের দল। পড়ে থাকে শুধু রুগ্ন অশক্ত শিশু ও মেয়েছেলেরা। তারপর সারাটা দিন যেন ঘুমিয়ে থাকে এই সব জায়গাগুলো।

এখন—এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা লাভ ও ভারতভঙ্গের পর হয়ত আর অতটা নেই। এখন শহর এগিয়ে গেছে দহুদূর পর্যন্ত। এখন জনবিরল ও নিভৃত সুপ্ত-শান্ত গ্রাম খুঁজে পাওয়া কঠিন। অসংখ্য সমস্যার জটিল ও কুটিল ঘূর্ণাবর্তে শান্তি বা সুপ্তি গেছে তলিয়ে। কিন্তু ১৯২০-২৫-৩০-এও এরকম ছিল না। তখন সকাল আটটা থেকেই এই সব জায়গা-গুলোতে শুরু হয়ে যেত প্রমীলার রাজত্ব। আপন আপন গৃহস্থালীতে খেটে-খাওয়া বাঁধা জীবনযাত্রার মেয়ে তারা। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল সীমিত, শক্তি ছিল সামান্য। তাদের জ্ঞান ছিল সংসারের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ। অতি সংকীর্ণ গণ্ডীবাঁধা পথে আবর্তিত হ'ত তাদের জীবনযাত্রা। বাইরের বিপুল জগত তাদের কাছে অস্পষ্ট ধারণার বস্তু মাত্র। সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজেদের বিশেষ বিশেষ সমস্যার ঠুলি পরে তারা সংসারের ঘানি গাছে ঘুরে মরত দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। ছোট ছোট সুখ-দুঃখ ছোট ছোট আশা-কামনা—অতি ক্ষুদ্র স্বার্থ-বুদ্ধি, কলহ-কচকচির মধ্যেই একদিন তারা চোখ মেলত এ-পৃথিবীতে; আবার তার মাঝেই একদিন বুজে যেত সে-চোখ চিরকালের মতো। অতি ছোট ছোট তৃপ্তি বা অতৃপ্তি বুকে নিয়ে সেদিন যাত্রা করত তারা বিধাতার দরবারে—যিনি এ-পৃথিবীতে পাঠিয়েও তার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয়ের সুযোগ দেননি তাদের।

আমার এ-কাহিনী আরম্ভ হচ্ছে এমনি সময়েই—এমনি মানুষদের নিয়েই। শ্যাওলা-দামে ভর্তি টোপাপানায় ঢাকা ডোবার মতোই নিস্তরঙ্গ তাদের জীবন। সেখানে বাইরের ঝড়ঝাপ্টা সামান্য স্পন্দন মাত্র জাগাতে পারে—তরঙ্গ তুলতে পারে না। বাহির বিশ্বের বিপুল কোন বিপর্যয় তাদের কাছে দূরশ্রুত মেঘ গর্জনের মতোই,

বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস তাদের অলস অবসর বিনোদনের উপাদান মাত্র। সে-সব যুগান্তকারী ঘটনার পরিণাম তাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর, তার থেকে নিজেদের কূপমণ্ডূক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্যাও তাদের কাছে ঢের বড়।

তবু কাল বদলায়। বিশ্ব-সংসার নিজের নিয়মে আবর্তিত হয়। সে পরিবর্তন তাদের আপাত-স্থির জীবনেও চাঞ্চল্য আনে, ভাঙ্গন সৃষ্টি করে।

এ-কাহিনী সেই নিস্তরঙ্গতার ও সেই চাঞ্চল্যের। সেই স্থাবরতার ও সেই ভাঙ্গনের।

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

লোকে বলে ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়—এ হবেই। যে সৎপথে থাকে, যে ধর্মকে ধরে থাকে শেষ পর্যন্ত তারই জিৎ হয় এ সংসারে। বহু লোকের মুখেই কথাটা শুনেছে মহাশ্বেতা। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছে। নানা বিভিন্ন রূপে, নানা বিভিন্ন শব্দ-বিন্যাসে। তবে শব্দে বা রূপে যে তফাৎই থাক—সব কথারই সার-মর্ম এক। দীর্ঘদিন ধরে শোনার ফলে বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল কথাটায়। আর সেই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি ক'রেই দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে একটা অস্পষ্ট আকারহীন আশার প্রাসাদও গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সে প্রাসাদের ভিত্তি-মূল এবার নড়ে উঠেছে, সেই বিশ্বাসটাকেই আর ধরে রাখা যাচ্ছে না কোনমতে।

'মিছে কথা! মিথ্যে কথা ওসব! কথার কথা! লোকের বানানো গালগপ্প! ...ধম্মপথে থাকো তাহ'লেই তোমার সব হবে। মরে আগুন অমন সব হওয়ার। মুড়ো খ্যাংরা মারতে হয় অমন এক-চোকো ধম্মের মুখে আর ঐ ধম্মের গৎ যারা আওড়ায় তাদের মুখে! গুণে গুণে সাত ঘা ঝ্যাঁটা মারতে হয়! আমার দরকার নেই আর ওসব ধম্মের বুলিতে। অরুচি ধরে গেছে একেবারে। জম্মেরশোধ অরুচি ধরে গেছে। সব মিছে, সব ভুয়ো। আসল কথা যে যা সুবিধে করে নিতে পারো এ সংসারে—নাও। হয়ে-হম্মে হোক, লুটপাট করে হোক—আপনার কাজটি বাগিয়ে নাও—তোমারই জিৎ। কিছু হবে না। হবেই বা কি? অকা সরকার বলত না—মাকড় মারলে ধোকড় হয়—চালতা খেলে বাকড় হয়—তাই ঠিক।......যার বুদ্ধি আছে, ক্ষ্যামতা আছে, বুকের পাটা আছে—এ সংসারে তারই জয়-জয়কার—বুঝেছ? খোদ ভগবানও তাকে ভয় ক'রে চলে!'

কথাগুলো যে কাকে বোঝায়—নিজেকে না প্রতিপক্ষকে, তা মহাশ্বেতা নিজেও জানে না। বেলা নটা দশটার সময় পুকুরঘাটে যখন কেউ থাকে না তখন সকালের একপাঁজা এ'টো বাসন নিয়ে গিয়ে জলে ভিজোতে দিয়ে বসে বসে আপনমনেই গজরাতে থাকে সে। যেন বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করে।

মাঝে মাঝে শ্রোতাও জুটে যায় অবশ্য। ওবাড়ির জাঠতুতো বড় জা লীলার মা মাঝে মাঝে এই সময়টায় ঘাটে আসেন। তার ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে, দুই বৌই বলতে গেলে সংসার বুঝে নিয়েছে—সুতরাং কাজ কম। প্রথম প্রথম বৌদের সঙ্গে ঝগড়া করে দিন কাটত, এখন তারাই গিন্নি, তাদের স্বামীর রোজগারে সংসার চলে, কাজেই সেদিক দিয়ে বেশী সুবিধে হয় না। একটা কথা বললে তারা দশটা কথা শুনিয়ে দেয়। এখন সকাল থেকে একটি গামছা কোমরে, একটি গামছা বুকে দিয়ে তিনি বাগানে ঘুরে বেড়ান। নিজের বাগানে উচ্ছে গাছে ঠেকো দেওয়া, শসা গাছের মাচা ঠিক করা হয়ে গেলে কোন কোন দিন নিচু বেড়া ডিঙ্গিয়ে এসে এদের বাগানেরও তদ্বির করেন। অবশ্য একেবারে নিঃস্বার্থভাবে নয়—কারণ যেমন নিঃসংকোচে তিনি এসে এদের বাগানে বেগার খাটেন তেমনি নিঃসংকোচেই যাবার সময় এদের বাগান থেকে ডুমুরটা, খাড়াটা—সুবিধে হলে গোটাকতক আমড়া, এমনকি কাঁদি থেকে দুটো চারটে কাঁচকলাও পেড়ে নিয়ে যান। এরা তা' জানে, কারণ লীলার মা চুরি করেন না—প্রকাশ্যেই নেন। প্রমীলা প্রথম প্রথম ঝগড়া করত—বৃথা দেখে এখন আর করে না। লীলার মা সপ্রতিভ-ভাবেই হেসে বলতেন, 'রাগ করিস কেন নতুন বৌ, এ তো আমার নেয্য পাওনা—ফী। কাজ করে দিই তার মজুরী নেই?'

প্রমীলা হয়ত বলত, 'কে কাজ করতে বলে আপনাকে? কে সাধে?'

'ওমা—সাধাসাধির আবার কী আছে? এ তো পরের বাগানের কাজ নয়—আপনার লোক, দশরাত্তিরের জ্ঞাতি। আমারটা করব তোদেরটা করব না? এ আবার কি কথা!'

ভোর থেকে বাগানের তদ্বির ক'রে এই সময়টা লীলার মার স্নান করতে আসার সময় হয়। বিশেষ করে মহাশ্বেতার গলার আওয়াজ পেলে হাতের দুটো একটা কাজ বাকী রেখেও চলে আসেন। ওধারের ঘাটের একটা পৈঠেতে বসে হাঁক দিয়ে প্রশ্ন করেন, 'কী হ'ল লা সেজ বৌ, আজ আবার ধম্মকে নিয়ে পড়লি কেন?

'ওর আবার পড়াপড়ির কি আছে! অসহ্যি হয় বলেই বলা। তোমরা তো দেখছ, সেই সাত বছরের মেয়ে এদের বাড়ি এসেছি, একদিনের জন্যে কারুর মন্দ করেছি না কারুর কুচ্ছো করে বেড়িয়েছি? ভূতের খাটুনি খেটেছি চিরকাল—গুরুজনরা যা বলেছে করেছি, কখনও উঁচু বাগে চেয়ে দেখেছি এমন কথাও কেউ বলতে পারবে না......তা কী ফলটা হল বলতে পার? আমি যে দাসী সেই দাসীই রয়ে গেলুম এ বাড়িতে। যিনি রাণীগিরি করতে এসেছিলেন তিনি রাণীগিরি করে যাচ্ছেন। এই কি ধম্মের বিচার হ'ল? কেন, আমি তাঁর কি করেছি?'

কৌতুকের ও তৃপ্তির হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায় লীলার মার। যতদূর সম্ভব কণ্ঠে সহানুভূতি টেনে এনে বলেন, 'আর দুটো চারটে বছর কাদায় গুণ ফেলে কাটিয়ে দে, তারপর আর তোর ভাবনা কি? ষেটের এখনই তো তোর ছেলেরা সব মাথাধরা হয়ে উঠেছে, ওরাই তো বড়—দুদিন পরে তো ওরাই বাড়ির কর্তা হবে। তখন তোর কাছেই জোড়হস্ত থাকতে হবে সবাইকে।'

'ওগো রেখে বোস, রেখে বোস। ওসব কথা আমাকে শোনাতে এসো না। বলে অত সুখ তোর কপালে তবে কেন তোর কাঁথা বগলে।......আমার কপাল কত পোড়কার দেখছ না! আমার দিদ্‌মা বলতেন যে; যে আঁটকুড়ো হয় তার পোত্তুরটি আগে মরে।...ছেলেদের কথা আর তুলো না। ওরা আরও এক কাটি সরেশ। নিজেরা তো নিজেদের গণ্ডা বুঝে নিতে পারেই না, আমি কিছু বলতে গেলে উলটে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে।...হবে না, কেমন ঝাড়ের বাঁশ সব। ওদের গুষ্টি চিরকাল মহারাজা মহা-রাণীর সামনে হাতজোড় করে কাটালে আর যথাসব্বস্ব এনে তাদের খপ্পরে তুলে দিলে—ওরাও তাই শিখবে তো! এখনই সপুরী সব সেইখেনে দেখগে

খাও হাতজোড় করে আছে. তাও যদি তারা মুখপানে চাইত একটু!...লজ্জা ঘেন্না পিরবিত্তি কিছু কি আছে ওদের! থাকবেই বা কি করে, জন্মে এস্তক যা দেখছে তাই তো শিখবে! বলে আগ-ন্যাঙলা যেমনে যায় পেছ-ন্যাঙলা তেমনে ধায়। ঝ্যাটা মারো এমন সংসারে আর এমন ছেলেপুলেতে!'

নির্গমনের পথ পেলেই নাকি বাষ্পের বেগ প্রবলতর হয়ে ওঠে, সেইটাই নাকি বাষ্পযন্ত্রের মূল কথা। মহাশ্বেতার অন্তরের পুঞ্জীভূত বিষ বাষ্পও বহিরা-গমনের এই সামান্য পথ পেয়ে প্রবলতর বেগ ধারণ করে। তারই উত্তেজনায় সে আর কিছু করার মতো খুঁজে না পেয়ে হাত দিয়ে ঢেইয়ে জল তুলে তুলে অকারণেই ঘাটের পৈঠেগুলোকে ধুতে শুরু করে!

আসলে মহাশ্বেতার সবচেয়ে বড় ব্যথার জায়গাটাতেই ঘা দিয়েছেন লীলার মা।

জীবনে সব কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে মনে মনে এই শেষ আশাটিকেই ধরে ছিল সে। ছেলেরা তো তার আপন, ওরা তো তার পেটেই হয়েছে—ওদের ওপর অন্তত তার কর্তৃত্বটা খাটবে। আর ওরা বড় হয়ে উঠলে সেই কর্তৃত্ব একদিন সংসারের ওপরও প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু সেই সর্বশেষ আশাটিতেই বুঝি ছাই পড়তে যাচ্ছে। ছেলেরা কেউ লেখাপড়া শেখেনি, কেউ শিখছে না—। ওর মা বলেন, 'বামুনের ঘরের গোরু! ওরে তোর জন্মদাতাকে দেখে শিখলি না —ভদ্দরলোকের ছেলে বামুনের ছেলে মুখখু হলে কী হয়! যেমন করে পারিস লেখাপড়া শেখা। খানিকটা অন্তত ইংরিজী শিখুক। করছিস কি!' কিন্তু সেটা নিয়ে তত মাথা ঘামায় না মহাশ্বেতা। সে জানে যে এদের বংশে তেমন কেউ হবে না। লেখাপড়া শিখুক না শিখুক—ওদের দাদামশায়ের মতো অমানুষ হয়ে উঠবে না। সভ্যতা সহবৎ এ আর নতুন ক'রে জানবার দরকার নেই, এ ওদের মধ্যেই আছে। এদের—মানে ওদের বাপ-কাকার ধারা খানিকটা তো পাবেই!...আর রোজগার? তার জন্যেও ভাবে না সে। ওদের গুষ্টিরা কে কত লেখাপড়া শিখেছিল? তারা যদি মোট মোট টাকা রোজগার করে আনতে পারে —ওরা পারবে না! সে একরকম ঠিক হয়েই যাবে, বয়স বাড়লেই বাপ-কাকারা যেখানে হোক ঢুকিয়ে দেবে। ওদের বাপ-কাকার সে আমল থেকে কালের হাওয়া যে খানিকটা পালটেছে, এ কথাটা মহাশ্বেতার মাথায় ঢোকে না। সেটা বোঝবার মত শিক্ষাদীক্ষা বা অনুকূল আবহাওয়া কিছুই তো সে পায়নি!

না, সে সব চিন্তা নেই ওর।

ওর জ্বালা অন্যত্র। ছেলেগুলো, মেয়েটা—যত বড় হচ্ছে সব যেন এককাঠ্ঠা হচ্ছে, সবাই গিয়ে জড়ো হচ্ছে ওদিকে, শত্রুর দিকে। কেউ কি তার দিক টানতে নেই! এই জন্যেই তো আরও এত আক্রোশ ওর জায়ের ওপর। গুণতুক যে কিছু করে সে সম্বন্ধে মহাশ্বেতার মনে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু কেন? কেন? এত করেও কি আবাগী সর্বনাশীর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল না? ছেলের বাপকে তো স্বামী-স্ত্রী মিলে চিরকাল ভেড়া করে রাখলে— আবার ছেলেমেয়েগুলোকেও ধরেছে! মেয়েটাও তো ওর দিকে হতে পারত! কী মন্তর যে ঝাড়ে মেজবৌ, ছেলেমেয়ে-গুলো সব যেন ওর কথায় ওঠে বসে। একটা কিছু বলবার জো নেই—ন্যেয্য কথা যথা-কথা বলবার থাকলেও বলতে পারে না—ঐ ওদের জন্যে। শত্রু হাসবার লজ্জায় অপমানে সরে আসতে হয় মুখে কুলুপ এঁটে।

এ বাড়িতে এসে পর্যন্ত কম সইতেও তো হ'ল না মহাশ্বেতাকে।। সাত বছরের মেয়ে সে এসেছে বৌ হয়ে—এখনকার দিনে সে বয়সে মেয়েরা পুতুল খেলে। সাত বছরের বৌ আর বাইশ বছরের বর! কথাটা শুনলে হাসে সবাই। এমন কি সেদিনও হেসে-ছিল অনেকে। কিন্তু এমন অসম বিবাহ দেওয়ার জন্য মহাশ্বেতা অন্তত তার মাকে দোষ দিতে পারে না। সেদিন না হোক, পরে সে বুঝেছে যে কী অবস্থায় পড়ে তাকে এ বিবাহে মত দিতে হয়েছে। বরং সেদিন যে তার মনে সামান্য এই বয়সের ব্যবধানটুকু বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি এ জন্য মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়।

মহাশ্বেতার মা শ্যামা তখন একেবারে অসহায়। সরকার বাড়ির নিত্যসেবার আধসের চাল, কখানা বাতাসা আর এক

পো দুধ এই তাঁর তখন একমাত্র ভরসা—তিন চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঐটুকু সম্বল করেই দিন কাটছে তাঁর, অর্থাৎ দিনের পর দিন উপবাস করছেন। স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতেন অর্ধেক দিন, সে জন্য সে চালটুকুও ভোগে আসত না প্রায়ই, কারণ পরকে ডেকে পুজোর কাজটা চালাতে হ'ত সে সময়। যে পয়ের বাঁধা কাজে বেগার দিতে-আসবে সে অবশ্যই শুধু হাতে যাবে না। অতগুলি প্রাণীর ঐ সামান্য সম্বলটুকুও তাকে ধরে দিতে হ'ত। ঠাকুরের সেবা না হ'লে ঐ তিনদিক চাপা ঘরখানাও থাকে না—একেবারেই পথে বসতে হয়। উপবাস করে পড়ে থাকবার জন্যও তো মাথার ওপর একটু আচ্ছাদন চাই!

এই চরম দুঃসময়ের মধ্যেই সরকার-গিন্নী মঙ্গলা প্রস্তাবটা এনে ছিলেন। দোষেগুণে জড়ানো বিচিত্র মানুষ মঙ্গলা, কিন্তু দোষ যাই থাক, তিনি যে ওদের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই প্রথম ও'দের বাড়ি আসার দিনটি থেকেই, শ্যামা ও'র কাছে নানাভাবে উপকৃত। তাছাড়া তিনিই সেদিন বলতে গেলে শ্যামাদের একমাত্র অভিভাবিকা। মনিবগিন্নী তো বটেই। সুতরাং তিনি যখন এই বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলেন এবং 'তুই ভাবিসনি বামনী যেমন করে হোক হয়ে যাবে' এই আশ্বাস দিয়ে বিয়ের ভারটা সত্যি সত্যিই এক-রকম নিজের হাতে তুলে নিলেন তখন আর শ্যামার ইতস্তত করা সম্ভব হয়নি, সে অবস্থা তাঁর ছিল না। তাই সাত বছরের মেয়ের চেয়ে বরের পনেরো বছর বেশী বয়সটা সেদিন কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

কিন্তু বয়সের এই প্রায় দ্বিগুণ ব্যবধানটাই মহাশ্বেতার কাছে খুব বড় কথা ছিল না। বাইশ বছরের পুরুষ তারপর ঢের দেখেছে মহাশ্বেতা, এখনও ঢের দেখছে—ঐ বয়সে এমন রাশভারী পুরুষে পরিণত হ'তে আর কাউকে চিরদিনই বেঁটেখাটো গোলগাল—অভয়পদ লম্বা চওড়া দশাসই পুরুষ। মহার রঙ মাজামাজা, অভয় ফিট্ গৌরবর্ণ। অতবড় পুরুষ ঘনকালো

'তুই ভাবিসনি বামনী যেমন করে হোক হয়ে যাবে'

দেখেনি। তার কপালেই যেন এমনি সৃষ্টিছাড়া হয়ে জন্মেছিল অভয়পদ। শুধু কি বয়সের, আরও বহু ব্যবধান ছিল দুজনে। মহাশ্বেতা চাপ দাড়ি নিয়ে বিয়ে করতে এসেছিল একরত্তি একটুখানি মেয়েকে। সেই প্রথম চার-চোখে চাওয়ার ক্ষণটি থেকেই মহাশ্বেতা স্বামীকে যে ভয় ও সমীহের চোখে দেখেছিল, সারা জীবনেও তার আর কোন পরিবর্তন হয়নি। পরবর্তী-কালে তার সম্বন্ধে স্বামীর স্নেহেরও কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছে, তাঁকে পরম আশ্রয় বলে অবলম্বন করতে পেরেছে, তবু সেই স্বল্পভাষী, গম্ভীর স্থিতধী মানুষটি সম্বন্ধে ওর সেই সবিস্ময় সম্ভ্রমের ভাবটা কখনও কাটেনি; আজও সে তাঁকে মনে মনে ভয় ও সমীহ করে চলে।

শ্বশুরবাড়িতে এসে পর্যন্ত কাজেই বা সে ভয় না করত!

একে তো ঐ বয়সে বলতে গেলে মূলসুদ্ধ উৎপাটিত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন
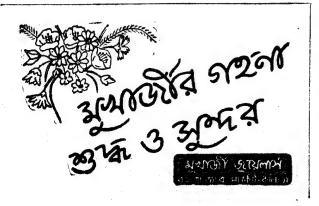
আবহাওয়া নতুন জগতে আসা। তার ওপর উপদেশ ও হুঁশিয়ারীরও অন্ত ছিল না সেদিন। শ্বশুরবাড়িতে কীভাবে চলতে হয়, কী রকম আচরণ করলে বাপের বাড়ির নিন্দা হতে পারে এবং সেটা যে কী পর্যন্ত গর্হিত কথা ও বাপ-মার সম্বন্ধে অপমানকর—কোন মতেই সে নিন্দা যে হ'তে দেওয়া উচিত নয়—সে সম্পর্কে বিচিত্র ও বিবিধ উপদেশে বিহ্বল ও দিশাহারা হয়েই এ বাড়িতে প্রবেশ করেছিল সে। সে জন্যে ভয়ের অন্ত ছিল না। তার ভালমানুষ শাশুড়িকে পরবর্তীকালে আর কেউ ভয় করেছে বলে জানা নেই মহাশ্বেতার, কিন্তু সে করেছে। ফলে সে দেবর ননদ কারুর কাছেই জ্যেঠাবধূর পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি কোনদিন। সকলেই তাকে অবহেলা করেছে, ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেনি কোনদিন। তার অনেক পরে মেজ বৌ এসে অনায়াসে তাকে ডিঙিয়ে এ বাড়ির কর্তৃত্বের রশি টেনে নিয়েছে নিজের হাতে।

আসলে বুদ্ধি ও সাংসারিক অভিজ্ঞতাতেও সে সকলের পিছনে পড়ে আছে চিরকাল। বুদ্ধিটা হয়ত স্বাভাবিক ভাবেই তার কম, তার ওপর যখন তার বিয়ে হয়েছে তখন তার মস্তিষ্ক পরিণত হবার কথা নয়, বুদ্ধিও নিতান্ত অপরিণত। আর এখানে এসে এমন ভাবেই এদের সংসারের ঘানিগাছে আটকে গেছে যে, আর কোন দিকে তাকিয়ে দেখার—এ বাড়ি বা এ সংসারের বাইরে-কার কোন অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ ঘটেনি। সুবিপুল জগৎ তার কাছে এই বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং সব দিক থেকেই সে যেন তার সেই সাত বছরের বয়ঃসীমার কাছাকাছিই থেকে গিয়েছে।

কিন্তু মেজ জা প্রমীলা এসেছিল অনেক বেশী বয়সে। তাছাড়া স্বভাবতই সে তীক্ষ্ন বুদ্ধিশালিনী। ভগবান এক একটি মেয়েকে অনেকের ওপর আধিপত্য করবার সহজ সনদ দিয়েই পৃথিবীতে পাঠান, প্রমীলাও সেই ধরনের মেয়ে। সে এসে স্বাভাবিকভাবেই শাশুড়ি, জা, ননদদের ডিঙিয়ে গেছে। চেহারাও অবশ্য তার খারাপ নয়, কিন্তু পুরুষ রূপের চেয়ে অনেক বেশী আকৃষ্ট হয় মেয়েদের বুদ্ধির দীপ্তিতে, ব্যবহারে, কথাবার্তায়। প্রমীলার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ছোট দেওর দুর্গাপদ তো দিনকতক উন্মত্তই হয়ে উঠেছিল ওকে নিয়ে;. ছোট বৌ তরলার কী দুঃখেই না দিন কেটেছে সে সময়টা—নিতান্ত তার কপালে আছে স্বামী পুত্র ভোগ করা তাই ফিরে পেয়েছে দুর্গাপদকে, সেও নিতান্ত দৈবাৎ। কিন্তু তবু পুরোটা পেয়েছে বলে মনে করে না মহাশ্বেতা—নইলে আজও তো সেই মেজ বৌয়ের কথায় দুর্গাপদ ওঠে বসে, মাইনের টাকা পাই পয়সাটি এনে ধরে দেয় তাকেই।

অবশ্য সেদিক দিয়ে অভয়পদ সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই মহাশ্বেতার। দেবতাদের চরিত্রেও দোষ আছে, অভয়-পদের চরিত্রে নেই। সেদিক দিয়ে সাক্ষাৎ মহাদেব। মহাশ্বেতার ক্ষোভ অন্যত্র। অভয়পদও মুখে স্বীকার না করুক, মনে মনে প্রমীলাকেই এ সংসারের প্রকৃত গৃহিণী বলে জানে। আর বোধ হয় সেই জন্যেই, না কখনও সে মহাশ্বেতার সঙ্গে কোন সাংসারিক বিষয়ে আলোচনা করে, না তাকে কোন কথা খুলে বলে। স্নেহ আছে—কিন্তু সে স্নেহ ছেলেমানুষের প্রতি বয়স্ক লোকের। জীবনের অংশীদার বলে গ্রহণ করতে পারলে না কখনও। ঠিক এমনভাবে গুছিয়ে হয়ত ভাবতে পারে না মহাশ্বেতা কিন্তু এই ধরনেরই আকারহীন একটা নিরুদ্ধ অভিমান তাকে নিরন্তর পীড়া দিতে থাকে। কিছুতেই কোন মতে স্বস্তি পায় না।

এত ছেলেমেয়েদের জানবার কথা নয়, তারা জানেও না। এর মূল চলে গেছে বহুদূর অতীতে। এর ইতিহাস শুরু হয়েছে তাদের জন্মের পূর্ব থেকে। এ অভিমানের কারণ ও মূল্য বোঝবার মতো জীবন-অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। তারা শুধু এর বহির্প্রকাশনটাই দেখে। কারণ খুঁজে পায় না বলেই ভাবে অকারণ। মহাশ্বেতাকে দোষী করে তাই।

এমন কি সেদিনের মেয়ে স্বর্ণলতা পর্যন্ত বলে, 'মা যেন সব্বদা কী এক জ্বালায় ছিটফিটিয়ে বেড়াচ্ছে। তোমার বাপু মনটা ভাল নয়, যাই বল। বড্ড রীষ তোমার। তোমার কোনদিন ভাল হবে না, দেখে নিও। দিদিমা ঠিকই বলে, খল যান রসাতল। তোমার ভাল হবে কী ক'রে?'

মহাশ্বেতা শোনে আর আরও জ্বলে যায়। ললাটে করাঘাত করে। ছুটে চলে যায় নির্জন জায়গায় মনের বিষ উদ্গীরণ করতে।

(ক্রমশঃ)

॥ কয়েকটি প্রশ্ন ॥

'অমৃত'র জনপ্রিয় 'জানাতে পারেন' বিভাগে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরা গেল। আশা করি সাহিত্যানুরাগী পাঠকবর্গের কাছে এগুলি কৌতূহলজনক হবে।

॥ অশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার ॥

(১) অশুদ্ধ শব্দ অতিপ্রচলনের ফলে কখনো কখনো অচলতা ত্যাগ করে, 'ইতিমধ্যে', 'ইতিপূর্বে' তার দৃষ্টান্ত। এখন প্রশ্ন, ভাষায় যে-শব্দের অতি-প্রচলন দেখা যাচ্ছে, অশুদ্ধ বলে জানলেও কি তা ব্যবহারযোগ্য বলে মানবো?

॥ পাঠ-নির্ণয় ॥

(২) শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিকে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' লিখি, মহিলাদের ক্ষেত্রে কি পাঠ লেখা যেতে পারে?

॥ সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষেপিত ॥

(৩) 'সংক্ষিপ্ত' ও 'সংক্ষেপিত' শব্দ দুটির মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য কি কিছু আছে?

॥ সম্পাদকীয় স্তম্ভ ॥

(৪) *editorial column*-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'সম্পাদকীয় স্তম্ভ' ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু শব্দটি কোনমতেই শ্রুতি-মধুর নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছেও এটি অসহ্য ছিল। তিনি নানাস্থানে নানাভাবে তাঁর রাগ প্রকাশ করেছিলেন। *editorial column*-এর ভাল প্রতিশব্দ কি করা যেতে পারে?

॥ রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের পোষাক-পরিচ্ছদ ॥

(৫) রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে প্রাত্যহিক জীবনে কি ধরণের পোষাক পরতেন?—এ তথ্যটি আজও প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের যে দু'একটি ফটো আছে তা থেকে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের পোষাক-পরিচ্ছদ কি ছিল তা নির্ণয় করা সংগত নয়। কারণ ছবি তোলার সময় পোষাক-পরিচ্ছদ বিশেষ-ভাবে পরা হয়। সে পোসাককে ঘরোয়া পোষাক বলা চলে না।

॥ 'শ্রী' পরিহারের কারণ ॥

(৬) রবীন্দ্রনাথ মধ্যবয়সে এবং তারও কিছু পর পর্যন্ত 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' ব্যবহার করতেন। কিন্তু তারপর তিনি 'শ্রী' ত্যাগ করলেন। কেন?

॥ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের আসল নাম ॥

(৭) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের আসল নাম কি—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' না 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাম সম্পর্কে 'অমৃতে'র পাঠকবর্গের মধ্যে কি কেউ কোন নতুন তথ্য জানাতে পারেন?

॥ পদ্যের পরে গদ্য ॥

(৮) প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যে দেখা গেছে আগে পদ্যের উদ্ভব পরে গদ্যের। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। অথচ মানুষ গদ্যেই কথা বলে, পদ্যে নয়। এ রকম হবার কারণ কি?

॥ লেখক ও সাহিত্যিক ॥

(৯) সাহিত্যিকের সংজ্ঞা কি? কি কি কারণ থাকলে আমরা একটি লেখককে সাহিত্যিক আখ্যা দিতে পারি?

॥ বাঙালী ও মাদ্রাজী ॥

(১০) মাথা একাধিকবার পাশাপাশি দক্ষিণে বামে নাড়ালে 'না' অর্থ বোঝায়।

নতুন জামাইকে দ্বিতীয়বার অন্ন পরিবেশন করতে গিয়ে শাশুড়ী-ঠাকুরাণী জিজ্ঞেস করলেন,—বাবা আর দুটি ভাত দিই? লজ্জাশীল জামাতা তার উত্তরে কেবল দু-তিনবার পাশাপাশি ঘাড় নাড়লেন। শাশুড়ী তখন অন্নপাত্রটি নিয়ে রন্ধনশালায় চলে গেলেন।

আমরা যে ভাবে ঘাড় নেড়ে 'না' বলি দ্রাবিড়ীরা আবার ঠিক সেইভাবেই 'হ্যাঁ'র সংকেত করে থাকেন। সেদিন এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম—কলকাতার কোন এক বড় কলেজে নাকি ভারী মজার একটা কান্ড ঘটে। অধ্যাপকমহাশয় বক্তৃতা দিতে দিতে এক মাদ্রাজী ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেন, 'Do you follow?' ছাত্রটি অধ্যাপকের বক্তৃতা ভালভাবেই বুঝতে পারছিল। তাই সে পাশাপাশি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। কিন্তু এই পাশাপাশি ঘাড় নাড়াকে অধ্যাপক যে 'না'র সংকেত বলে অনুমান করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ বক্তব্য বিষয়টি তিনি আরও কয়েক-বার ব্যাখ্যা করেছিলেন। পরে অবশ্য ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

বাঙালী ও মাদ্রাজীর মধ্যে এই বৈপরীত্যের কারণ কি?

॥ নমস্কারান্তে ইতি ॥

(১১) পত্রশেষে 'নমস্কারান্তে ইতি' লেখা বর্তমানে একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শব্দটি মনে হয় ইংরেজী পত্রলিখন-রীতির অনুকরণ। ইংরেজী with thanks, with kind regards প্রভৃতি বাক্যাংশের অনুকরণেই 'নমস্কারান্তে'র উদ্ভব। কিন্তু এখানে প্রশ্ন অন্তের পর ইতি লেখা কি ব্যাকরণ-সম্মত?

—শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
১০৩ই, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯।

ভবঘুরের খাতা

অয়স্কান্ত

॥ জঞ্জাল-নগরী ও ঐতিহ্য ॥

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বিশেষ একটি ছবি আপনারাও নিশ্চয়ই দেখেছেন। বড়বাজারের ডাঁই-করা জঞ্জালের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জওয়ানরা জঞ্জাল পরিষ্কার করছে। কাগজে এই ছবির যে-বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী নেহরু নাকি জিজ্ঞেস করেছেন যে যন্ত্রের সাহায্যে জঞ্জাল পরিষ্কার করার কোনো উপায় আছে কিনা। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জবাবে জানিয়েছেন যে বিশেষ একটি সংস্থাকে জঞ্জাল পরিষ্কারক করার যন্ত্র সম্পর্কে উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে।

খবরটি আপাতদৃষ্টিতে খুবই নিরীহ। অনেকেই হয়তো এই খবরটির ওপরে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেননি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা যারা কলকাতাকে ভালোবাসি, আমরা যারা আজন্ম কলকাতার সঙ্গে পরিচিত তাদের প্রত্যেকেরই উচিত বিষয়টি নিয়ে গম্ভীরভাবে চিন্তা করা। আমার নিজের ধারণা, জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্য কলকাতায় যদি যন্ত্র প্রবর্তিত হয় তাহলে কলকাতার ঐতিহ্য বিলুপ্ত হবার আশঙ্কা আছে।

আপনারা ভাববেন না যে আমি ধরে নিচ্ছি—কলকাতার জঞ্জাল পরিষ্কার করার যন্ত্রও ডি-ভি-সি'র থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের মতো ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে বিগড়ে যাবে। এমন সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। বরং এই সম্ভাবনাটিই প্রবল। কিন্তু শুধু একটা সম্ভাবনার ওপরেই আমরা আমাদের ভবিষ্যতকে নির্লিপ্তভাবে ছেড়ে দিতে পারি না। এই কারণেই আমি এবারের ভবঘুরের খাতায় এই বিষয়টিকেই তুলে ধরতে চাই।

আপনারা জানেন, প্রত্যেকটি শহরেরই নিজস্ব একটি প্রতীক আছে। যেমন, মনুমেণ্ট দেখলেই বলতে পারা যায় শহরটি কলকাতা, ঈফেল টাওয়ার হলে প্যারিস, ব্রাণ্ডেনবুর্গ তোরণ হলে বার্লিন, ক্রেমলিন প্রাসাদ হলে মস্কো ইত্যাদি। কলকাতার কথাই ধরা যাক। মনুমেণ্টকে বাদ দিয়ে কলকাতার কথা আমরা ভাবতে পারি না। এই মনুমেণ্ট শুধু একটি বিশেষ স্থাপত্যের নিদর্শন, বা শুধু একটি বিশেষ ঘটনার স্মারক (কী বিশেষ ঘটনা তা আমরা অনেকেই জানি না), বা শুধু একটি আকাশছোঁয়া অস্তিত্ব—শুধু যদি তাই হত তাহলে

কলকাতার জীবনের সঙ্গে মনুমেণ্ট এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হতে পারত না। রোজ আপিস যাবার পথে আমরা হয়তো কেউ-ই মনুমেণ্টের দিকে একবারও তাকিয়ে দেখি না। তাকিয়ে দেখার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না। কিন্তু পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে যখন মনুমেণ্টের চুড়ো থেকে আলোর মালা দুলিয়ে দেওয়া হয় তখন সেই দৃশ্যটুকু দেখার জন্যেই আমরা ট্রাম-বাস-ভাড়া খরচ করে অনেক দূরে দূরে থেকে পাড়ি জমাই। তেমনি এই মনুমেণ্টের গায়ে যদি ইতিহাসের লেখা ফুটে উঠতে পারত তাহলে আমরা কলকাতার প্রত্যেকটি বড়ো আন্দোলনের খবর পাঠ করতে পারতাম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হিজলি জেলে গুলি-চালনার প্রতিবাদে এই মনুমেণ্টের নিচে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ কারা-শাসনের প্রতি তাঁর ধিক্কার ঘোষণা করে গিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী সম্ভবত তাঁর জীবনের বৃহত্তম সভার ভাষণ দিয়েছিলেন এই মনুমেণ্টের নিচে দাঁড়িয়েই। এমনি নাম আরো অজস্র করা চলে। এমন কি আমরা যারা কোনো সরকারী বা সওদাগরী আপিসে চাকরি করি এবং কোনো না কোনো সময়ে কোনো না কোনো দাবি আদায়ের জন্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সামিল হই—এই আমরাও, নিতান্ত অখ্যাত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, কখনো কখনো হয়তো এই মনুমেণ্টের নিচে দাঁড়িয়ে বিপুল জনসভায় ভাষণ দেবার সুযোগ পেয়েছি। আর যদি এমন কেউ থাকেন যাঁরা জীবনে কোনো দিন মনুমেণ্টের কোনো সভায় যোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি, তাঁরাও হয়তো নিতান্ত অপ্রয়োজনেই ফুচ্‌কা বা আলুকাবলি বা দইবড়া খাবার জন্যেই মাঝে মাঝে মনুমেণ্টের সিঁড়িতে গিয়ে বসেছেন। যাই হোক, যে-ভাবেই চিন্তা করা যাক না কেন, এই উপলব্ধি আমাদের নিশ্চয়ই হবে যে কলকাতার মনুমেণ্ট আমাদের জীবনের অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে। এখন যদি প্রস্তাব ওঠে যে কলকাতার এই মনুমেণ্টটিকে ভেঙে ফেলা হোক তাহলে আমাদের অস্তিত্বের দায়েই আমরা প্রবলভাবে প্রতিবাদ করব।

মূল আলোচনায় আসবার আগে প্রসঙ্গত আরেকটি কথা বলে নিই। হালে

কোনো কোনো বিমান কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে হাওড়ার ব্রিজটি কলকাতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটু ভাবলেই আমরা বুঝতে পারব, হাওড়ার ব্রিজ মর্যাদার দিক থেকে মনুমেণ্টের সমতুল্য কিছুতেই হতে পারে না। হাওড়ার ব্রিজের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ কতটুকু? একটি নদী পারাপারের সেতু মাত্র—তার বেশি কিছু নয়। নদী পারাপারের অন্যতর সুবিধাজনক ব্যবস্থা থাকলে এই বিশেষ সেতুটির প্রতি আকর্ষণ বোধ করারও হয়তো আর কোনো কারণ থাকবে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। কচিৎ কালেভদ্রে যে দু-একজন ভদ্রলোক নিতান্তই বায়ুসেবনের জন্যে হাওড়া ব্রিজের টঙে গিয়ে বসেন এবং অভদ্র ফায়ার ব্রিগেডের জবরদস্তি প্রয়োগ করে যাঁদের শেষ পর্যন্ত নিচে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হয়—তাঁদের কাছে হাওড়া ব্রিজের আকর্ষণ কিছুতেই লোপ পাবার নয়। কিন্তু আমরা যারা ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করি আর প্রতিদিন বাড়ি থেকে রওনা হবার সময়ে ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করি যেন হাওড়া ব্রিজের মুখে ট্র্যাফিক-জ্যাম না হয়—তাদের কাছে হাওড়া ব্রিজের অন্যতর তাৎপর্য নেই।

আপনাদের কাছে হয়তো মনুমেণ্ট ও হাওড়া ব্রিজের এই আলোচনা অবান্তর মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার বক্তব্যকে প্রণিধানযোগ্য করে তোলবার জন্যই প্রসঙ্গটির বিস্তৃত অবতারণার প্রয়োজন ছিল।
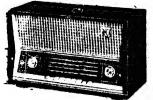
কথা হচ্ছিল, কলকাতার জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্যে যন্ত্র প্রবর্তিত হলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? আমরা বলেছি, কলকাতার ঐতিহ্য লোপ পাবে। কথাটা ঠিক কিনা বোঝবার জন্যে আমি প্রথমে একটি পরোক্ষ উপায়ের সাহায্য নেব।

মনে করুন গাগারিন বা তিতোফের মতো একটি ব্যোমযানের যাত্রী হয়ে আপনি পৃথিবীকে গোটাকয়েক পাক দিয়েছেন আর তারপরে যান্ত্রিক নির্দেশে নিরাপদে নেমে এসেছেন পৃথিবীতে।

কোনো উন্মুক্ত মাঠে নয়, আপনি নেমেছেন বিশেষ একটি শহরের লোকালয়ে। আপনি দেখছেন, পিচবাঁধানো রাস্তা দিয়ে ট্রাম যাচ্ছে, বাস যাচ্ছে, আধুনিক ডিজাইনের মোটরকার যাচ্ছে—কিন্তু শুধু এইটুকু দেখেই শহরটিকে আপনি চিনে উঠতে পারবেন না। কিন্তু যে-মুহূর্তে আপনার চোখে পড়বে যে পায়ে-চলার ফুটপাথের ওপরে ডাঁই-করা জঞ্জাল জমে আছে আর তাছাড়াও যেখানে সেখানে পড়ে আছে আবর্জনা ও ফলের খোসা, ময়লা ন্যাকড়া ও কাগজের টুকরো এবং এই নিত্য পায়ে-চলার ফুটপাথের ধারেই নিত্যকর্ম সমাধা করার অসংকুচিত আয়োজন—তখন বুঝতে পারবেন শহরটি নির্ভেজাল কলকাতা।

ময়দান ও চৌরঙ্গীর নিয়ন-উদ্ভাসিত যে কলকাতাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি—তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হাওড়া ব্রিজের মতোই প্রাত্যহিক প্রয়োজনের। তার সঙ্গে আমাদের অস্তিত্বের যোগ নেই। কিন্তু ময়লা জলের ড্রেন ডিঙিয়ে, থকথকে পাঁক পেরিয়ে, সরু গলির ঘুঁটে লাগানো থেকে গা বাঁচিয়ে, বাতাস-চলাচলহীন কামরার ঠাসাঠাসিতে যে-মুহূর্তে আমরা পা ফেলতে পারি, আমাদের জীবন দিয়ে গড়া জগতটিকে তখনই যেন আমরা আমাদের উপলব্ধির মধ্যে পুরোপুরি ভাবে পেয়ে যাই। এই কলকাতাকেই আমরা ভালোবেসে এসেছি। এই কলকাতার সঙ্গেই আমরা আজন্ম পরিচিত।

তারক গাঙ্গুলি থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যেও এই কলকাতাকেই নানারূপে আবিষ্কার করা যেতে পারে।

কলকাতার জঞ্জাল কলকাতার মনুমেণ্টের মতোই প্রতীকী তাৎপর্য অর্জন করতে পেরেছে। আজ যদি যন্ত্রের সাহায্যে কলকাতার সমস্ত জঞ্জাল নিশ্চিহ্নভাবে অপসারিত হয় তাহলে—আমাদের সাহিত্যে আমাদের গালগল্পে আমাদের নির্বিকার প্রশ্রয়ে যে কলকাতাকে আমরা গড়ে তুলেছি তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এমন কি, আমার ধারণা, জঞ্জালহীন কলকাতায় যে নতুন পরিবেশটি গড়ে উঠবে সেখানে কলকাতার মানুষের মধ্যেও একটি গুণগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই নতুন মানুষেরা হয়তো জঞ্জাল ও আবর্জনার ঠিক পার্শটিতে চাপানো তেলেভাজার কড়াই-নিঃসৃত অপরূপ সুবাসসম্পৃক্ত খাদ্যবস্তুর লোভ অনায়াসে ত্যাগ করতে পারবে। তখন আর ময়লা ড্রেনের জলে ধোয়া রাস্তার ধারের কাটাফল এখনকার মতো উপাদেয় মনে হবে না। মনুমেণ্টের সিঁড়িতে বসে ফুচকা বা আলুকাবলি বা দইবড়া খাবার বিলাসিতা হয়তো চিরকালের মতো অতীতের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে।

কলকাতার ঐতিহ্যকে এমন সর্বাংশে নির্মূলে করার এমন সরলতম উপায় যে আবিষ্কৃত হতে পারে তা কি আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম!

তবে ভরসার কথা এই যে যন্ত্রের সাহায্য নেবার কথা উঠেছে। আমরা আশা রাখতে পারি, ডি-ভি-সির থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের জেনারেটরের মতোই বা হাইডেল পাওয়ারের আশ্বাসের মতোই এই যন্ত্রও যথাকালে বিকল হবে।

আর এই আশা যে নিতান্তই দুরাশা নয় তার নজিরও অপ্রত্যক্ষ নয়। কলকাতার এতকালের জঞ্জাল অপসারণের ব্যবস্থার মধ্যে যান্ত্রিক আয়োজনও কিছুটা ছিল। তা হচ্ছে যাকে আমরা বলি লরি। যদিও নিউম্যাটিক টায়ার সমন্বিত চারচাকার এই আধুনিক যানটি পরিবহনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি সময়কাল পর্যন্ত মোটামুটি সচল থাকে—কিন্তু আমাদের ঐতিহ্যপ্রীতির দরুন এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। কলকাতার একশ্রেণীর মানুষের এই আশ্চর্য অবদানটি সম্পর্কে আমরা এতকাল যথেষ্ট অবহিত ছিলাম না।

অতএব প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জওয়ানদের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করব। নানা হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে তাঁরা কলকাতার এমন একটি অঙ্গকে স্পর্শ করেছেন যার সঙ্গে আমাদের অস্তিত্বের যোগ। তাঁদের শল্যচিকিৎসার অস্ত্র একদিন অপসারিত হবেই। সেদিন আবার আমরা জঞ্জাল-নগরী কলকাতাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করব।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গাড়ী-বারান্দার দিকে যেতে টেনিস-লনের পাশে লক্ষ্য করলাম অদ্ভুত এই কাহিনীর সংগে বিজড়িত কালো রঙের টুল-হাউস আর বেদীওলা সূর্য-ঘড়িটা। দু' চাকার একটা উঁচু ঘোড়ার গাড়ী থেকে সবেমাত্র চালাক-চতুর চেহারার চটপটে খর্বকায় একটি পুরুষ নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ নেড়ে নিজের পরিচয় দিলেন ভদ্রলোক— নরফোক কন্সট্যাবুলারীর ইন্সপেক্টর মার্টিন। বন্ধুবরের নাম শুনে কিন্তু রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর।

"অবাক কাণ্ড দেখছি! খুনটা হয়েছে রাত প্রায় তিনটের সময়ে। কিন্তু লণ্ডনে বসে এত তাড়াতাড়ি খবর পেয়ে আমার সংগে সংগেই এসে পৌঁছোলেন কেমন করে, তা বুঝলাম না তো মিঃ হোমস্?"

"আমি আগে থেকেই অনুমান করে-ছিলাম খুন-জখম যা হয় একটা কিছু হবে। এবং তা রোধ করতেই আমার নরফোকে আসা।"

"তাহলে তো আমার চাইতে অনেক খবরই রাখেন আপনি। আমি তো মশাই ভেবেই পাচ্ছি না কি করে শুরু করা যায় তদন্ত—মিঃ এবং মিসেস কিউবিটের দাম্পত্য-প্রেমের কথা কে না জানে বলুন।"

হোমস্ বললে—"প্রমাণ শুধু একটাই পেয়েছি আমি এবং তা হচ্ছে নাচিয়েদের মূর্তি। সব কথা আমি পরে খুলে বলব'খন। আপাততঃ আমি যা জানি তারই সাহায্যে সুবিচার যাতে হয়, তার ব্যবস্থা করতে চাই। খুন রোধ করতে পারিনি—এ অত্যন্ত আফশোসের কথা। কিন্তু সে জন্যে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আপনি কি তদন্তে আমায় সাহায্য করতে চান, না, নিজের নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করে যেতে চান?"

"আপনার সাথে একসংগে কাজ করতে পারার সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাই না, মিঃ হোমস্।" আন্তরিকভাবেই বললেন, ইন্সপেক্টর।

"তাই যদি হয়, তাহলে আর এক মুহূর্তও সময় বাজে নষ্ট না করে আসুন সাক্ষীদের জেরা করা যাক প্রথমে, তারপর তন্ন-তন্ন করে দেখা যাক সমস্ত বাড়ীটা।"

ইন্সপেক্টর মার্টিন বুদ্ধিমান পুরুষ। হোমস্‌কে তার খুশিমত কাজ করতে দিয়ে নিজে শুধু ফলাফলগুলো সযত্নে নোট করে নিতে লাগলেন। মিসেস হিলটন কিউবিটের ঘর থেকে একজন সাদা চুল প্রবীণ ভদ্রলোক এসে খবর দিলেন, ভদ্রমহিলার আঘাত সিরিয়াস তো বটেই, কিন্তু মারাত্মক নয়। শুনলাম, ভদ্রলোক এ অঞ্চলের সার্জন। আরও বললেন, বুলেটটা গেছে মগজের সামনের দিক দিয়ে এবং খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। মিসেস কিউবিট নিজেই নিজেকে গুলী করেছেন, না, অন্য কেউ তাঁকে গুলী করেছে এ প্রশ্নের উত্তরে কোন মতামত প্রকাশ করতে রাজী হলেন না ভদ্রলোক। বুলেটটা অবশ্য ছোঁড়া হয়েছে খুবই কাছ থেকে। ঘরের মধ্য পাওয়া গেছে শুধু একটা পিস্তল—দুটো ব্যারেল তার খালি। মিঃ হিলটন কিউবিটের হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে গুলীতে। এমনও হতে পারে যে, আগে মিঃ কিউবিট মিসেসকে গুলী করার পর আত্মহত্যা

॥ ঘোষণা ॥

'অমৃতে'র পরবর্তী ১৫শ সংখ্যা বিশেষ স্বাধীনতা সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। ঐ সংখ্যায় শার্লক হোমসের কোন গল্প প্রকাশিত হবে না। ১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে

দ্বিতীয় দাগ
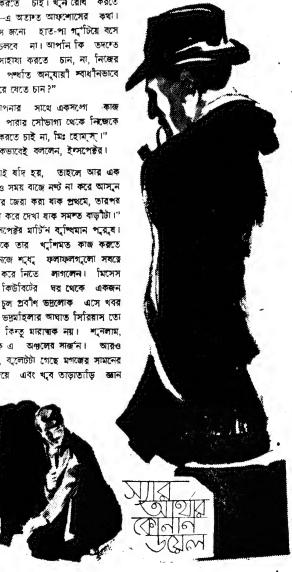
করেছেন। অথবা, মিসেস কিউবিট স্বামীকে খুন করার পর আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন। রিভলভারটা দুজনের মাঝখানেই মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেছে—তাই সন্দেহ দুজনের ওপরেই এসে পড়ছে।

"মিঃ কিউবিটের লাশ সরানো হয়েছে নাকি?" শুধোলো হোম্‌স্‌।

"মিসেস কিউবিটকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন কিছুতে হাত দিইনি আমরা। ভদ্রমহিলাকে মেঝের ওপর ফেলে রাখা সম্ভব ছিল না।"

"এ বাড়ীতে কতক্ষণ আছেন, ডক্টর?"

"ভোর চারটে থেকে।"

"আর কেউ?"

"হ্যাঁ একজন কনস্টেবলও আছে।"

"কোন কিছুতে হাত দেননি তো?"

"না।"

"আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণ পুরুষ, ডক্টর। আপনাকে খবর পাঠিয়েছিল কে?"

"সন্ডারস্‌—এ বাড়ীর ঘরকন্নার কাজ দেখা-শুনো করে সে।"

"সে-ই কি সবাইকে ডেকে তোলে?"

"সে আর রাঁধুনী—মিসেস কিং।"

"কোথায় তারা?"

"খুব সম্ভব রান্নাঘরে।"

"তাহলে এখুনি তাদের ডেকে আনা হোক। আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা ওদের মুখেই শুনতে চাই—আমি।"

ওক কাঠের প্যানেল দেওয়া, উঁচু-উঁচু জানলাওলা বহু পুরোনো হলঘরটাকে আমরা ধর্মাধিকরণ বানিয়ে ফেললাম। মান্ধাতা আমলের একটা প্রকাণ্ড চেয়ারে বসল হোম্‌স্‌। অনমনীয় চোখে তার আশ্চর্য দীপ্তি। বিষণ্ণ মুখে ফসফরাসের মত জ্বলজ্বলে সেই চোখ দেখেই বুঝলাম তার বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞা—এত কষ্টে হেঁয়ালীর সমাধান করেও যে মক্কেলের জীবন সে রক্ষা করতে পারল না, যার চক্ষের ঘাটে এসেও তরী ডুবল এবং চকিতে নিভে গেল একজন নিরীহের জীবন-দীপ—তার সমুচিত শাস্তির আয়োজন সম্পূর্ণ না করে আর সে জল-গ্রহণ করবে না। এই বিচিত্র ধর্মাধিকরণে হোম্‌স্‌ আর আমি ছাড়াও হাজির রইল ছিপছিপে ইন্সপেক্টর মার্টিন, ধূসর-দাড়ি প্রবীণ ডাক্তার আর একজন বোকা বোকা চেহারার গ্রাম্য-কনস্টেবল।

জেরার উত্তরে দুজন স্ত্রীলোকই একই কথা বলে গেল গড় গড় করে। ফায়ারিংয়ের দারুণ শব্দে একই সাথে ঘুম ভেঙে যায় দুজনের এবং এক মিনিট যেতে না যেতেই শোনা যায় আর একবার গুলী ছোঁড়ার আওয়াজ। পাশা-পাশি ঘরে ঘুমোয় দুজন। তাই ঘুম ভাঙতেই আগে মিসেস কিং ছুটে যায় সন্ডারসের ঘরে। তারপর দুজনে মিলে দুড়-দুড় করে নীচে নেমে এসে দেখে দুহাট করে খোলা স্টাডির দরজা; আর, টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা মোম-বাতি। ঘরের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন মিঃ কিউবিট। খুব সম্ভব দেহে তখন প্রাণ ছিল না। জানলার সামনে দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন মিসেস কিউবিট। বীভৎসভাবে জখম হয়েছিলেন তিনি, কেন না, মুখের একটা পাশ রক্তে একেবারে ভেসে গেছিল। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন উনি, কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ধোঁয়ায় ভরে উঠেছিল ঘর এবং প্যাসেজ। সেই সাথে বারুদের বিশ্রী গন্ধ। জানলার ছিটকিনি তোলা ছিল ভিতর থেকে। এ বিষয়ে দুজনেরই মতবিরোধ দেখা গেল না। দেরী না করে তখুনি দুজনে ডাক্তার আর কনস্টেবল ডাকতে লোক পাঠায়। তারপর, সহিস আর আস্তাবলের ছোকরাটাকে ডেকে এনে ধরাধরি করে মিসেস কিউবিটকে তুলে নিয়ে যায় তাঁর শোবার ঘরে। কর্তা-গিন্নী দুজনেই শুয়েছিলেন শয্যায়। সাধারণ পোষাক পরেছিলেন মিসেস, কিন্তু মিস্টার কিউবিট রাত্রিবাসের ওপর ড্রেসিং-গাউন চাপিয়ে নিয়েছিলেন। স্টাডির আর কোন কিছুতে হাত দেওয়া হয়নি। যতদূর তারা জানে, স্বামী-স্ত্রীতে কোনদিন ঝগড়া করতে দেখা যায়নি। দুজনেই দুজনকে গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং বাস্তবিকই বড় সুখী দম্পতি ছিলেন।

চাকরবাকরদের জেরা করার ফলে প্রধান পয়েন্ট পাওয়া গেল এই ক'টাই। ইন্সপেক্টর মার্টিনের প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল যে প্রত্যেকটা দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় কারো পক্ষেই বাড়ী থেকে সরে পড়া সম্ভব নয়। হোম্‌সের প্রশ্নের জবাবে বললে ফায়ারিংয়ের শব্দ শুনে ওপরের তলার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসামাত্র বারুদের বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসে দুজনের নাকেই। শুনে হোম্‌স্‌ ইন্সপেক্টর মার্টিনকে বললে, "এ পয়েন্টটা একটু ভাল করে ভেবে দেখবেন ইন্সপেক্টর। আচ্ছা, এবার তো মনে হয় অনায়াসেই আমরা ঘরটাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি।"

স্টাডি-রুমটা বিশেষ বড় নয়। তিন-দিকে সাজানো বই, আর বাগানের দিকে মুখ করা সাদাসিদে জানলার সামনে একটা লেখবার টেবিল। ঘরের মাঝেই লম্বা হয়ে পড়েছিল হতভাগ্য মিঃ কিউবিটের বিশাল দেহ। প্রথমেই আমরা ঝুঁকে পড়লাম তাঁর ওপর। বিস্রস্ত জামা-কাপড় দেখে মনে হল ঘুম ভাঙতেই খুব চটপট বেরিয়ে পড়তে হয়েছে তাঁকে। গুলীটা ছোঁড়া হয়েছে সামনের দিক থেকে এবং হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় করেও তখনও দেহের মধ্যে থেকে গেছে বুলেটটা। মৃত্যু খুবই আকস্মিক এবং যন্ত্রণাবিহীন। হাতে অথবা ড্রেসিং-গাউনে বারুদের কোন দাগ দেখা গেল না। ডাক্তার বললেন, "মিসেস কিউবিটের মুখে বরুদের চিহ্ন পাওয়া গেছে—কিন্তু দুটো হাতই একদম পরিষ্কার।"

হোম্‌স্‌ বললে, "হাতে বারুদের দাগ নেই, অর্থাৎ কোন ঘোরপ্যাঁচ মানেও নেই। থাকলেই কিন্তু যত গোলমেলে সম্ভাবনার কথা এসে পড়ে। খারাপভাবে লাগানো কার্তুজ থেকে পেছন দিকে বারুদ না ছিটকোলে হাতে কোন দাগ না ফেলে এন্তার ফায়ার করা চলে। তাহলে, ইন্সপেক্টর, এবার মিঃ কিউবিটের লাশ সরানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভাল কথা, ডক্টর, মিসেস কিউবিটের দেহ থেকে বুলেটটা বার করেছেন নাকি?"

"বুলেট বার করতে গেলে এখন বড় রকমের অপারেশনের দরকার। কিন্তু রিভলভারে তো এখনও চারটে কার্তুজ রয়েছে দেখছি। ছোঁড়া হয়েছে মাত্র দুটো এবং হতাহতের সংখ্যাও দুজন। সুতরাং—"

"সেই রকমই মনে হয় বটে। জানলার ধারে যে বুলেটটা লেগেছিল, আমার তো মনে তার হিসেবটাও আপনি দিয়ে দিতে পারবেন।"

বলেই, আচম্বিতে সবাইকে চমকে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হোম্‌স্‌। দীর্ঘ, শীর্ণ আঙুল তুলে দেখালে জানলার পাল্লার

নীচের দিক থেকে ইঞ্চিখানেক ওপরে একটা পরিষ্কার ফুটো।

"বাই জর্জ! এ জিনিস আপনার চোখে পড়ল কি করে?" সোল্লাসে চীৎকার করে ওঠেন ইন্সপেক্টর মার্টিন।

"কেন না, আমি এ ঘরে ঢুকে পর্যন্ত খুঁজছিলাম ফুটোটাকে।"

"ওয়ান্ডারফুল!" এবার ডাক্তারের উচ্ছ্বসিত হওয়ার পালা। "আপনার অনুমান নির্ভুল, স্যার। দু'বার নয়, ফায়ার করা হয়েছে মোট তিনবার এবং দুজন নয়, সবশুদ্ধ তিনজন হাজির ছিল খুনের দৃশ্যে। কিন্তু কে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি? আর কি করেই বা সে উধাও হল দরজা-জানলা বন্ধ বাড়ীর ভেতর থেকে?"

"সে সমস্যাই এবার আমাদের সমাধান করতে হবে," বললে শার্লক হোমস্। "ইন্সপেক্টর মার্টিন, আপনাকে একটা পয়েন্ট বিশেষ করে স্মরণ রাখতে বলেছিলাম, আশা করি তা ভুলে যাননি। মনে পড়ছে না? চাকরবাকরদের জবানবন্দীতে শুনলেন না, ওপরতলার ঘর থেকে বেরোনোমাত্র বারুদের গন্ধ ভেসে এসেছিল তাদের নাকে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু, স্যার, বিনা দ্বিধায় স্বীকার করছি—এ পয়েন্ট মনে রেখে আমার লাভটা কি, তা আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না।"

"আশা করি এবার পারবেন। ওপরতলায় বারুদের গন্ধ পাওয়ার অর্থ শুধু একটিই—গুলী ছোঁড়ার সময়ে ঘরের দরজা-জানলা দুটোই খোলা ছিল। তা না হলে পোড়া বারুদের ধোঁয়া এত তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যেতে পারত না। দমকা হাওয়ার ঝাপটা থাকায় ধোঁয়া একেবারে ওপরতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। অবশ্য খুব অল্পক্ষণের জন্যেই খোলা ছিল দরজা-জানলা দুটো।"

"এ ধারণার প্রমাণ?"

"তা না হলে মোমবাতিটা নিভে যেত!"

"ক্যাপিটাল!" রীতিমত চেঁচিয়ে ওঠেন ইন্সপেক্টর। "ক্যাপিটাল!"

"খুনের সময়ে জানলা খোলা ছিল। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর ভাবলাম, তাহলে নিশ্চয় কোন তৃতীয় ব্যক্তি হাজির ছিল সে সময়ে। খোলা জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে গুলী চালিয়েছে সে-ই। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে তার ওপর গুলী চালালে জানলার পাল্লায় তা লাগলেও লাগতে পারে। তাই খুঁজছিলাম যদি কোন ফুটোটুটো পাই এবং দেখতেই তো পাচ্ছেন—আমার খোঁজা বৃথা যায়নি—এই সেই বুলেটের দাগ!"

"কিন্তু জানলাটা ভেতর থেকে বন্ধই বা হল কেমন করে, ছিটকিনিই বা পড়ল কেমন করে?"

"গুলি ছোঁড়াছুঁড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে জানলা টেনে বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দেওয়াই তো মিসেস কিউবিটের পক্ষে স্বাভাবিক, তাই নয় কি? আরে, আরে, একি দেখছি?"

জিনিসটা একটা লেডীজ হ্যান্ড ব্যাগ। কুমীরের চামড়ার ওপর রুপোর কারুকার্য করা রুচি-সুন্দর ছোট্ট ব্যাগটা পড়েছিল স্টাডির টেবিলের ওপর। হোমস্ ব্যাগটা উপুড় করে ধরলে টেবিলের ওপর। রাবার-ব্যান্ড লাগানো কুড়িটা পঞ্চাশ পাউন্ডের ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের নোট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না ভেতর থেকে।

নোট সমেত ব্যাগটা ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দিয়ে হোমস্ বললে, "জিনিসটা সাবধানে রেখে দিন—মোকদ্দমা চলার সময়ে কাজে আসবে। এবার তিন নম্বর বুলেটের রহস্য নিয়ে একটু মাথা ঘামানো যাক। কাঠের টুকরোটা যেভাবে উড়ে গেছে আর চোঁচগুলো যেদিকে মুখ করে রয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে গুলীটা ছোঁড়া হয়েছে ঘরের ভেতর থেকে। এ সম্পর্কে মিসেস কিংয়ের সঙ্গে আরও একপ্রস্থ আলোচনা দরকার।......এই যে মিসেস কিং, তখন বলছিলেন না ফায়ার-

রিংয়ের দারুণ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছিল তোমার। একথা বলার মানে কি? তোমার কি মনে হয়, দ্বিতীয় শব্দের চেয়ে অনেক জোরালো হয়েছিল প্রথমটা?"

"শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেছিল ঠিকই, কিন্তু কোন আওয়াজটা বেশী আর কোনটা কম, তা বলা কঠিন। তবে, স্যার, আওয়াজটা খুব জোর বলেই মনে হয়েছিল।"

"দুটো রিভলভার থেকে একসঙ্গে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল বলে মনে হয়?"

"আজ্ঞে, তা তো বলা মুস্কিল।"

"হ্যাঁ, তাই হয়েছিল, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। ইন্সপেক্টর মার্টিন, আমার তো মনে হচ্ছে—এ ঘরে আর কিছু করার নেই আমাদের। এবার চলুন বাগানটা ঘুরে দেখা যাক যদি নতুন কিছু প্রমাণ টমাণ পাওয়া যায়।"

স্টাডির জানলার ঠিক নীচেই ফুলের চওড়া ঝোপটার কাছাকাছি এসেই আমরা প্রত্যেকেই একসাথে চীৎকার করে উঠলাম মহাউল্লাসে। ঝরাফুলগুলোকে কে যেন নির্দয়ভাবে মাড়িয়েছে, নরম মাটির ওপর তারই অগুন্তি পায়ের ছাপ। ছাপগুলো পুরুষের পায়ের। অদ্ভুত রকমের লম্বা, আঙুলগুলো ছুঁচোলো। ঘাস-পাতা নেড়ে, উল্টে, ফুঁ দিয়ে এমন কাণ্ড জুড়ে দিলে হোম্‌স্ যেন মুখ দিয়ে লাল ঝরিয়ে শিকারী-কুকুর হন্যে হয়ে খুঁজছে গুলী খাওয়া পাখীকে। তারপরেই, দারুণ এক খুশীর চীৎকার ছেড়ে, তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠল সে—হাতে তার পেতলের তৈরী ছোট্ট একটা সিলিণ্ডার।

"যা ভেবেছিলাম, তাই। রিভলভারটায় 'ইজেক্টর' ছিল, তাই খালি খোলটা ছিটকে পড়েছে এখানে। ইন্সপেক্টর মার্টিন, এই হল আপনার তিন নম্বর কার্তুজ এবং আমার কেসও প্রায় সম্পূর্ণ।"

হোম্‌সের তদন্ত ধারার দ্রুত কর্তৃত্বময় অথচ নির্ভুল কার্যপরম্পরা দেখে রীতিমত তাজ্জব বনে গেছিলেন বেচারী ইন্সপেক্টর মার্টিন। প্রথম প্রথম দু'-একটা কথা বলে নিজের অস্তিত্ব জাহির করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এখন এমনই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে বাঙনিষ্পত্তি না করে হোম্‌সের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই বোধহয় বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ বলে মনে করলেন তিনি।

শুধোলেন, "কাকে সন্দেহ হয় আপনার?"

"সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। প্রথম থেকেই তো কেসটার অনেক পয়েন্ট অপরিষ্কার থেকে গেছে আপনার কাছে, এটাও না হয় থাকুক। পরে একসাথে সব কিছু খোলসা করা যাবে, কি বলেন?"

"যা অভিরুচি আপনার। আমার শুধু খুনেটাকে পেলেই হল।"

"মিছিমিছি সাসপেন্স বানাবার কোন অভিলাষ আমার নেই, ইন্সপেক্টর মার্টিন। কিন্তু এই মুহূর্তে লম্বা-চওড়া জটিল বক্তৃতা দিয়ে রহস্য কি করে সমাধান করলাম, তা বলার সময়ও নেই। এ ব্যাপারের সব কটা খুঁটি আমার হাতে। এখন যদি মিসেস কিউবিটের জ্ঞান নাও ফিরে আসে, তাহলেও জানবেন, গত রাতে এ বাড়ীতে যে সব কাণ্ড ঘটেছে, তার প্রতিটি আপনাদের শোনাবার মত ক্ষমতা আমার আছে। আমার লক্ষ্য শুধু একটি এবং তা যেন তেন প্রকারেণ অপরাধীর সমুচিত শাস্তি-বিধান। প্রথমেই আমি জানতে চাই, এ অঞ্চলে 'এলরিজি' নামে কোন সরাইখানা আছে কিনা?"

চাকরবাকরেরা সবাই একবাক্যে জানালে যে এ নামের কোন সরাইখানা ধারে কাছে কোথাও আছে বলে তাদের জানা নেই। তবে আস্তাবলের ছোকরাটা একটু কিন্তু কিন্তু করে বললে, সরাইখানা নেই বটে, তবে এলরিজি নামে এক চাষা মাইল কয়েক দূরে ইস্ট রাস্টনের দিকে থাকে।

"খামার-বাড়ীটা খুব নিরালা নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দারুণ নিরালা।"

"এ বাড়ীতে রাত্রে যে সব কাণ্ড-কারখানা ঘটেছে, নিশ্চয় এখনও পর্যন্ত সে সব খবর ওদের কানে পেঁৗছোয়নি?"

"আজ্ঞে, খুব সম্ভব না।"

কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চিন্তা করল হোম্‌স্, তারপর ওর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি।

বললে, "চটপট একটা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে তৈরী হয়ে নাও। একটা চিঠি দিচ্ছি—এখুনি দিয়ে এস এলরিজির খামার-বাড়ীতে।"

পকেট থেকে নাচিয়েদের ছবি আঁকা কাগজের টুকরোগুলো বার করল হোম্‌স্। তারপর স্টাডির টেবিলে বসে, কাগজগুলো সামনে মেলে ধরে বেশ কিছুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে রইল। ইতিমধ্যে ছোকরাটা তৈরী হয়ে আসতে ছোট্ট একটা চিরকুট—তার হাতে দিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়ে দিলে হোম্‌স্, ওপরে যার নাম লেখা, শুধু তারই হাতে চিরকুটটা দিয়ে এবং কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে যেন সিধে ফিরে আসে সে এখানে। হোম্‌সের হাতের লেখা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মুক্তোর মত গোটা-গোটা। কিন্তু চিরকুটের ওপর দেখলাম আঁকাবাঁকা হোঁচট-খাওয়া কায়দায় লেখা: মিঃ অ্যাবি স্ল্যানে, এলরিজির খামার-বাড়ী, ইস্ট রাস্টন, নরফোক।

ইন্সপেক্টর মার্টিনকে হোম্‌স্ বললে—"আমার অনুমানই যদি সত্য হয়, আমার গণনা যদি নির্ভুল হয়, তাহলে অত্যন্ত বিপদজনক প্রকৃতির একটা লোককে আপনাকে হাতকড়া লাগিয়ে হাজতে ঢোকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং, আমার মনে হয় আপনি এখুনি একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিন আরও পাহারাদারের জন্যে। এই ছোকরাই আগে টেলিগ্রামটা পেঁৗছে দিয়ে তারপর চিঠি নিয়ে রওনা হবে এলরিজির খামার-বাড়ীতে। ওয়াটসন, বিকেলের দিকে লণ্ডনের কোন ট্রেণ থাকলে, আমরা তাইতেই ফিরে যাব। কেন না, এখানকার ঝামেলা তো প্রায় চুকে এল। তাছাড়া, আমাকে আবার একটা ইন্টারেস্টিং কেমিক্যাল অ্যানালিসিস আজকেই শেষ করতে হবে।"

চিরকুট নিয়ে ছোকরাটা রওনা হয়ে যাওয়ার পর—হোম্‌স্ চাকরবাকরদের ডেকে কড়া হুকুম দিয়ে দিলে, যদি কোন আগন্তুক এসে মিসেস কিউবিট-এর সঙ্গে দেখা করতে চায়, তাহলে তাকে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে কোন খবর না জানিয়ে যেন সিধে নিয়ে আসা হয় ড্রইং-রুমে। বার বার এই কটা পয়েন্টই এমনভাবে জোর দিয়ে বুঝোতে লাগল হোম্‌স্ যে দেখে-শুনে মনে হল অনেক কিছুই নির্ভর করছে এর ওপর। তালিম দেওয়া শেষ হলে পর হোম্‌স্ এবার পড়ল আমাদের নিয়ে। হাতের তীর যতক্ষণ না লক্ষ্যে গিয়ে বিঁধছে, ততক্ষণ ড্রইং-রুমে বসে নির্ভেজাল গুলতানি দেওয়া যাক—এই বলে সবাইকে নিয়ে এসে বসল বসবার ঘরে। রোগী দেখার দেরী হয়ে যাচ্ছিল বলে আগেই ডাক্তার বিদায় নিয়েছিলেন। কাজেই আসর জমিয়ে বসলাম আমি, হোম্‌স্ আর ইন্সপেক্টর মার্টিন।

টেবিলের কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে পকেট হাতড়ে নাচুনেদের বিদঘুটে মূর্তি আঁকা কাগজগুলো বার করল হোম্‌স্। তারপর, টেবিলের ওপর মেলে ধরে বললে,—"ঘন্টাখানেক সময় যাতে ভালভাবেই কাটে, সে ব্যবস্থা করছি। প্রথমেই বন্ধুবর ওয়াটসনকে অভিনন্দন জানাই দীর্ঘকাল কৌতূহলের টুঁটি টিপে মুখখানা আমসির মত শুকিয়ে বসে থাকার জন্যে। তোমার স্বাভাবিক ঔৎসুক্যকে এভাবে দাবিয়ে রাখার জন্যে আমি অনুতপ্ত, মাই ডিয়ার। ইন্সপেক্টর মার্টিন, প্রথম থেকেই ঘন ঘন আপনাকে অবাক হতে দেখলেও এটুকু বুঝেছি যে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি আঙুল নাড়া আপনি আপনার পেশাগত কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে

এসেছেন। আর, তাই আর আপনাকে সাসপেন্সে না রেখে সবই খুলে বলব। বেকার স্ট্রীটে মিঃ হিলটন কিউবিটের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার আগে এবং পরে যে সব ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটে, প্রথমেই সে সম্বন্ধে একটু-আধটু না বললে আপনার বুঝতে অসুবিধে হতে পারে। কাজেই—।" বলে, হোমস্ সংক্ষেপে যা-যা বললে, তা আমি এ উপাখ্যানের গোড়ার দিকে লিখেছি।

"এ সব আজব কাণ্ড-কারখানা শুনলে সত্যি কথা বলতে কি সিরিয়াস হওয়া দূরে থাকুক, হাসি পায়। এবং এক্ষেত্রেও প্রত্যেকেই হাসত যদি না ইয়ার্কি-তামাসার পরিশেষটা এত শোচনীয় হত। সবরকম সাংকেতিক লিপির সঙ্গে আমার মোটামুটি পরিচয় আছে। এ সম্বন্ধে ছোটখাট একটা প্রবন্ধর বইও লিখেছি আমি—বইটায় বিভিন্ন রকমের মোট একশো ষাটটা হেঁয়ালী-লিপির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি এ সাবজেক্টে যৎসামান্য জ্ঞান আমার আছে। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এ জাতীয় হেঁয়ালী আমার কাছে একেবারেই নতুন। এ পদ্ধতির আবিষ্কর্তা যেই হোক না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মূর্তিগুলো যে আসলে ছদ্মবেশী অক্ষর তা যেন কেউ ধরতে না পারে এবং বাচ্ছাকাচ্ছার এলোপাতাড়ি নক্সা ভেবে উড়িয়ে দেয়।

"মূর্তিগুলো যে আসলে অক্ষরের প্রতীক, তা জানার পর সব সাংকেতিক-লিপির মূলে নিয়মটি খাটাতেই জলের মত সরল হয়ে এল হেঁয়ালীর অর্থ। প্রথম বার্তাটা আমার হাতে আসার পর দেখলাম খবরটা অত্যন্ত ছোট। যদিও এত ছোট খবর থেকে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব নয়। তবুও ওদের মধ্যে একটা প্রতীকের অর্থ যে E, সে সম্বন্ধে আমার খুব বেশী সন্দেহ ছিল না। জানেন তো ইংলিশ বর্ণমালায় E-র ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। এমন কি একটা ছোট বাক্যের মধ্যেও বেশ কয়েকবার দেখতে হয় E-র শ্রীমুখ। প্রথম খবরটার পনেরোটা প্রতীকের মধ্যে চারটে প্রতীক হুবহু এক। সুতরাং এ প্রতীকের অর্থ যে E, তা ধরে নিলে খুব বেশী অযৌক্তিক হয় না। অবশ্য মাঝে মাঝে প্রতীকটার হাতে নিশান দেখা গেছে। কিন্তু নিশানওলা মূর্তিগুলো পাশাপাশি নেই—ছড়িয়ে আছে সমস্ত খবরটার মধ্যে। সুতরাং, আমরা যদি অনুমাণ করি, নিশানমূর্তি দিয়ে আসলে এক একটা বাক্যের সমাপ্তি চিহ্নিত করা হয়েছে, তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে না। মাথায় অনুমানটা আসার পরেই দেখলাম, E অক্ষরের প্রতীক হল এই মূর্তিটা।

"এ পর্যন্ত হল বেশ। কিন্তু আসল ঝামেলা শুরু হল এর পরেই। E-র পরেই কোন ইংলিশ অক্ষরটি জোর বেশী এ সম্বন্ধে কেউই কোন পাকাপাকি সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। আপনি হয়ত দেখলেন, একটা পাতার মধ্যে E-র পরেই অমুক অক্ষরটা গড়ে সবচেয়ে শক্তিশালী। তারপরেই আবার দেখবেন, একটা ছোট বাক্যের মধ্যেই সে অক্ষরটিকে দাবিয়ে দিয়েছে আরও কয়েকটা অক্ষর ঘন ঘন তাদের শ্রীমুখ দেখিয়ে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, T, A, O, I, N, H, R, D আর L-কে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে এইভাবেই পর পর সাজানো যায়। এদের মধ্যে আবার T,A, O আর I এত ঘেঁসাঘেঁসি যে কে যে বেশী পাওয়ারফুল তা বলা মুস্কিল। তাই, নতুন খবরের অপেক্ষায় রইলাম। মিঃ হিলটন কিউবিটের সাথে আমার দ্বিতীয়বার মোলাকাৎ হওয়ার পর পেলাম দুটো ছোট সেনটেন্স আর একটা খবর। খবরটায় কোন নিশান না থাকায় একটা গোটা শব্দ বলেই মনে হল। এই দেখুন প্রতীকগুলো। যেটাকে একটা শব্দ বলে মনে হয়েছে, তার মধ্যে E এসেছে দু'বার—দ্বিতীয় স্থানে আর চতুর্থ স্থানে—শব্দটার মোট অক্ষর সংখ্যা পাঁচ। ফলে SEVER, LEVER অথবা NEVER শব্দটা ব্যবহার করা যেতে পারে কোন কাকুতি-মিনতির উত্তরে। এবং এক্ষেত্রে এই অনুমানটাই স্বাভাবিক এই কারণে যে এর আগে মিঃ কিউবিটের মুখে যা সব শুনেছি, তাতে মনে হয়, মিসেস কিউবিটের কোন চিঠির উত্তরে NEVER শব্দটা লিখে গেছে আততায়ী। ধরে নিলাম এইটাই ঠিক; তাহলে N, V আর R-এর প্রতীক দাঁড়াচ্ছে, যথাক্রমে :

"তখনও কিন্তু আমার মুশকিল আসান হয়নি, কাটেনি অন্ধকারের ঘোর। ঠিক এমনি সময়ে একটা কথা মাথায় আসতেই খানিকটা আলোর মুখ দেখলাম। হাতে তখন বেশ কয়েকটা চিঠি রয়েছে। ভাবলাম, আততায়ী যদি মিসেস কিউবিটের পূর্ব-পরিচিত হয় এবং অতীত-জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে, তাহলে যে যে পাঁচ অক্ষরওলা শব্দের মধ্যে দুটো অক্ষরই E, সেগুলো দিয়ে নিশ্চয় লেখা হয়েছে ELSIE নামটাকে। পরীক্ষা করে দেখলাম, তিন তিনবার খবরের উপসংহারে এমনি প্রতীক-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই, খবরগুলো যে ELSIE-র উদ্দেশ্যে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ না থাকাই ভাল। এমনি করে পেলাম L, S আর I-কে। কিন্তু এ কি ধরণের খবর? একি আকুতি, না শুধুই আদেশ? ELSIE-র ঠিক আগেই চার অক্ষরওলা শব্দটার শেষে দেখলাম E। মনে হল, শব্দটা COME হওয়াই উচিত। যতগুলো চার-অক্ষরওলা শব্দের শেষে E আছে, সবকটাতেই চোখ বুলোলাম, কিন্তু বিশেষ সুবিধে হল না। কাজেই, C, O, M হাতের মুঠোয় আসায় আবার পড়লাম প্রথম খবরটাকে নিয়ে? ছোট ছোট শব্দে ভাগ করে ফেললাম খবরটাকে, যে যে অক্ষর বুঝিনি, তাদের জায়গায় ফুটকি বসালাম। এইভাবে পেলাম :

. M . ERE . . E SL. NE.

"এখন প্রথম অক্ষরটা A না হয়ে যায় না, কেন না এইটুকু বাক্যের মধ্যেই তিন তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে একই প্রতীককে। দ্বিতীয় শব্দে H-কে অনুমান করে নেওয়া চলে। তাহলে বাক্যটা দাঁড়াল এই রকম :

AM HERE A.E SLANE,

নামের ফাঁকটায় Y বসাই স্বাভাবিক। তাহলে পাচ্ছি :

AM HERE A.E SLANEY

"হাতে অনেকগুলো অক্ষর এসে যাওয়ায় অকুতোভয়ে এবার পড়লাম দু'নম্বর খবরটাকে নিয়ে। প্রতীক-ছদ্মবেশ খসিয়ে দেখা গেল খবরটা দাঁড়াচ্ছে—এই রকম :

A. ELRI. ES.

ভেবেচিন্তে দেখলাম, ফাঁকগুলোয় যদি T আর G বসানো যায়, তাহলেই মোটামুটি একটা মানে পাওয়া যায় খবরটার। ELRIGES নামটা নিশ্চয় কোন বাড়ী বা সরাইখানার নাম—লোকটা আস্তানা গেড়েছে এইখানেই।"

প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম বন্ধুবর হোমসের হেঁয়ালী-উদ্ধারের

তাক-লাগানো গল্প। জলের মত পরিষ্কার করে এতবড় একটা কঠিন সমস্যাকে বুঝিয়ে দিলে হোমস। সামান্য কতকগুলো নাচুনে-মূর্তি, কিন্তু তাদের অংগভঙ্গিরও এত অর্থ।

"তারপর, স্যার, কি করলেন তাই বলুন।" বললেন ইন্সপেক্টর।

"ABE SLANEY যে আমেরিক্যান সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল না দুটি কারণে। প্রথমতঃ, ABE নামটার চলন আমেরিকাতেই আছে। দ্বিতীয়তঃ আমেরিকা থেকে আসা একটা চিঠি মিসেস কিউবিটের হাতে পড়তেই যত গোলমালের সূত্রপাত। তাছাড়া, এ ব্যাপারের গোপন-রহস্যটা যে আইনানুগ নয় এবং অপরাধ-সংক্রান্ত, আমার এমন বিশ্বাস হওয়ারও যথেষ্ট কারণ ছিল। অতীতের উল্লেখ এবং স্বামীর কাছে সব কথা চেপে যাওয়া—শুধু এইদুটো প্রমাণই কি এজন্যে যথেষ্ট নয়? কাজেই টেলিগ্রাম পাঠালাম উইলসন হারগ্রিভকে। উইলসন আমার বন্ধু। নিউইয়র্ক পুলিশ ব্যুরোর একজন হোমরাচোমরা। লণ্ডনের অপরাধ-জীবন সম্বন্ধে আমার সামান্য জ্ঞানকে বহুবার উইলসন কাজে লাগিয়েছে। উইলসনকে জিজ্ঞেস করলাম, অ্যাবি স্ল্যানি নামটা ওর চেনা কিনা। উত্তরে উইলসন লিখেছে: 'শিকাগোর সবচেয়ে বিপদজনক খুনে বদমাস।' এ খবর যেদিন পেলাম, সেদিনই সন্ধ্যায় হিল্টন কিউবিটের কাছ থেকে পেলাম তাঁর শেষ বার্তা। অক্ষর-পরিচয় আগেই ঘটেছে, তাই ধাঁধার জট ছাড়াতেই খবরটা দাঁড়াল এই রকম:

ELSIE RE ARE TO MEET THY GO.

P আর D বসাতেই সম্পূর্ণ হল খবরটা। খবর পড়ে আঁৎকে ওঠার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ, এইটুকু বুঝলাম যে কাকুতিমিনতি ছেড়ে ভয় দেখানো শুরু করেছে আমাদের নিশাচর আততায়ী। দ্বিতীয়তঃ শিকাগোর নীচুতলার জাঁহাবাজদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি একটু আধটু খবর রাখি। তাই, লোকটা যে আর অনর্থক দেরী না করে চটপট কথামত কাজ শুরু করে দেবে—তা বুঝলাম। তৎক্ষণাৎ সহকর্মী-বন্ধু ওয়াটসনকে নিয়ে চলে এলাম নরফোকে। কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা করতে পারলাম না—প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই শুনলাম যা হবার তা হয়ে গেছে গতরাত্তেই।"

ইন্সপেক্টর মার্টিনের গলায় যেন আবেগের ছোঁয়া লাগে। বলেন, "আপনার সঙ্গে একসাথে কাজ করা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার, মিঃ হোম্‌স্‌। আমার খোলাখুলি কথাবার্তার জন্যে কিছু মনে করবেন না, স্যার আপনি আপনার নিজের প্রশ্নের জবাবদিহি করেই সন্তুষ্ট। কিন্তু আমাকে জবাবদিহি করতে হবে আমার সুপিরিয়র অফিসারদের কাছে। এলরিজের এই অ্যাবি স্ল্যানি লোকটা যদি সত্যিই খুনে হয়, আর আমাদের এখানে বসে থাকার সুযোগ নিয়ে যদি প-য়ে আকার দেয় এ অঞ্চল থেকে, তাহলে আমার আর দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকবে না।"

"ঘাবড়াইয়ে মাৎ। পালাবার চেষ্টা করবে না সে।"

"কি করে তা জানছেন আপনি?"

"পালানো মানেই অপরাধ স্বীকার করা।"

"তাহলে চলুন এলরিজে গিয়ে গ্রেপ্তার করা যাক ওকে।"

"আমি তাকে যে কোন মুহূর্তে আশা করছি এখানে।"

"কিন্তু এখানে সে মরতে আসতে যাবে কেন?"

"কেন না, আমি তাকে লিখে দিয়েছি এখানে আসার জন্যে।"

"অসম্ভব, মিঃ হোম্‌স্‌! আপনি লিখেছেন বলেই আসতে হবে তাকে? আপনার চিঠির মধ্যেই তো বিপদের গন্ধ পেয়ে এতক্ষণে তার সরে পড়া উচিত?"

শার্লক হোম্‌স্‌ বললে—"আমার বিশ্বাস এ ধরণের চিঠির কাঠামো কি রকম হওয়া উচিত, সে জ্ঞান আমার হয়েছে। ইন্সপেক্টর মার্টিন, ভুল আমার নিশ্চয় হয়নি,—ঐ দেখুন, ভদ্রলোক নিজেই আসছেন এদিকে।"

জানলা দিয়ে দেখলাম, লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে আসছেন এক দীর্ঘকায় পুরুষ। গায়ের রঙ ময়লা হলেও ভদ্রলোক সুদর্শন, পরণে ধোঁয়াটে ফ্ল্যানেলের স্যুট, মাথায় পানামা হ্যাট। মস্তবড় উদ্ধত নাকটা সামনের দিকে একটু বেঁকানো, গালে-চিবুকে চাপদাড়ি, হাতে চকচকে ছড়ি। স্বচ্ছন্দভাবে ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে তার হাঁটার ভঙ্গিমা দেখে মনে হল যেন এ বাড়ীর মালিক সে-ই। তারপরেই শুনলাম জোর ঘন্টাধ্বনি—যেন এক মুহূর্তও আর তর সইছে না তার।

শান্তভাবে বলল হোম্‌স্‌—"এবার আমাদের দরজার পেছনে দাঁড়াবার সময় হয়েছে। এ ধরণের বিপদজনক লোককে বাগে আনতে হলে একটু সাবধান হওয়া ভাল। ইন্সপেক্টর, হাতকড়া বার করে রাখুন। কথা যা বলার আমিই বলব।"

পুরো একটা মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম তিনজনে—তুচ্ছ একটা মিনিট, কিন্তু তবুও তা কোনদিনই ভোলা যায় না। তারপরেই খুলে গেল দরজা—ঘরে ঢুকল ঢ্যাঙ্গা লোকটা। পলকের মধ্যে হোম্‌স পিস্তল ঠেকালে তার মাথায়। আর মার্টিন কব্জিতে এঁটে দিলেন হাতকড়া। সমস্ত জিনিসটা এত তাড়াতাড়ি, এত নিপুণভাবে শেষ হয়ে গেল যে, আক্রান্ত হয়েছে একথা বোঝবার আগেই অসহায় হয়ে পড়ল তার অবস্থা। জ্বলন্ত কালো চোখে একে একে আমাদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে সে। তারপরেই এক অট্টহাসি। তিক্ত হাসিতে ব্যর্থতার জ্বালা।

"সাবাস, জেণ্টেলমেন। এবার দেখছি আপনারাই একহাত নিলেন আমার ওপর। বড় কঠিন ঠাঁই মনে হচ্ছে। যাই হোক, মিসেস হিল্টন কিউবিটের একটা চিঠি পেয়ে আমি এসেছি। উনি বাড়ী নেই, একথা যেন আবার বলে বসবেন না। ফাঁদটা যে তারই পাতা, এ খবরও নিশ্চয় শুনতে হবে না আপনাদের কাছে।"

"মিসেস হিল্টন কিউবিট মারাত্মক ভাবে জখম হয়েছেন, বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই।"

ভাঙা গলায় বিকট চীৎকার করে উঠল লোকটা—সমস্ত বাড়ী গম্‌ গম্‌ করে উঠল সে চীৎকারে।

"কি আবোল তাবোল বকছেন আপনি।" তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সে। "ওর গায়ে কোন আঁচড়ই লাগেনি—লেগেছে ঐ লোকটার বুকে। এল্‌সিকে কেন জখম করতে যাব আমি? ভয় দেখাতে পারি। কিন্তু ওর ঐ রেশম-হাল্কা চুলের একটা গাছিও স্পর্শ করার দুঃসাহস আমার নেই। ফিরিয়ে নিন—ফিরিয়ে নিন এসব বাজে কথা! বলুন তার কোন আঘাত লাগেনি।"

"মৃত স্বামীর পাশে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় দেখা গেছে মিসেস কিউবিটকে।"

গুঙিয়ে উঠে হাতকড়া লাগানো দুহাতে মুখ ঢেকে সেট্টির ওপর এলিয়ে পড়ল সে। পুরো পাঁচ মিনিট সব চুপ। এতটুকু স্পন্দন শব্দ—শুনতে পেলাম না তার দিক থেকে। তারপর, মুখ থেকে হাত নামিয়ে চোখ তুললে সে। মুখ দেখে মনে হল যেন চকিতে কোন অমিতশক্তিশালী প্রভঞ্জনের বিপুল ফুৎকারে নিমেষে নিভে গেছে তার যত কিছু সাহস, শক্তি আর আত্মবিশ্বাসের দীপশিখা, হারিয়ে গেছে নিশ্ছিদ্র নিরাশার তমিস্রায়।

নিরুত্তাপস্বরে কথা বলল সে—"জেণ্টেলমেন, কিছুই আর লুকোবো না। আমি যদি তাকে গুলি করে থাকি, তবে সে-ও পাল্টা গুলি করেছিল আমাকে। সুতরাং, এতে খুন-টুন কিছু নেই। কিন্তু যদি ভেবে থাকেন এল্‌সিকেও জখম করেছি আমি, তাহলে বলব আমার সম্বন্ধে বা তার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না আপনারা। এ দুনিয়ায় আমার চাইতে তাকে বেশী ভালবেসেছে, এমন কোন পুরুষ কোনদিনই ছিল না, এখনও নেই। তার ওপর আমার দাবী অসীম। অনেক বছর আগে আমার বাগ-

দত্তা হয়েছিল সে। আপনারাই বলুন। আমাদের মধ্যে এই ইংলিশম্যানটার আসার কি অধিকার আছে? আবার বলছি, সে আমার। আমি এসেছিলাম আমার সে-ই দাবীকেই আবার চাগিয়ে তুলতে।"

"আপনার স্বরূপ প্রকাশ পেতেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন আপনার বাগ্‌দত্তা।" কঠিনকণ্ঠে বললে হোম্‌স্। "আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যেই আমেরিকা থেকে পালিয়ে ইংল্যাণ্ডে এসে একজন অনারেবল ভদ্রলোককে বিয়ে করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর শান্তি কেড়ে নিতে উঠে পড়ে লাগলেন আপনি। কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমেরিকা থেকে এলেন এখানে—সুখের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দুর্বিসহ করে তুললেন তাঁর জীবন। স্বামীকে উনি ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন—আর আপনাকে ঘৃণা করতেন, ভয় করতেন। কিন্তু আপনি চেয়েছিলেন এমন দেবতুল্য স্বামীকে ত্যাগ করে আবার সে নেমে পড়ুক আপনার পথে—অপরাধের অন্ধকারময় চোরাগলিতে। আপনার সঙ্গে উধাও হতে রাজী হননি তিনি—তাই শেষ পর্যন্ত হিলটন কিউবিটের মত অভিজাত পুরুষকে বিদায় নিতে হয়েছে এ দুনিয়া থেকে। আর তাঁর স্ত্রীকে করতে হয়েছে আত্মহত্যা। মিঃ অ্যাবি স্ল্যানি, আপনার হাত এ সবকিছুর পেছনেই আছে এবং এ রেকর্ডের উত্তর আপনাকে দিতে হবে আইনের কর্তাদের কাছে।"

"এল্‌সি যদি মারা যায়, আমি জাহান্নমে গেলেও আর পরোয়া করি না।" হাতের মুঠোয় দলা পাকানো একটা চিরকুটে চোখ পড়তেই বাঘের মত থাবালো চোখে সন্দেহের ঝিলিক হেনে বললে অ্যাবি স্ল্যানি—"মিস্টার, এ সম্পর্কেও গালগল্প ছাড়বেন নাকি? এদিকে তো বলছেন মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে এল্‌সি, তাই যদি হয় তবে এ চিরকুট কার লেখা শুনি?" কাগজের দলাটাকে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে সে।

"আপনাকে আনার জন্যে আমিই লিখেছি।"

"আপনি লিখেছেন? 'জয়েন্টে'র বাইরে তামাম আসমান দুনিয়ায় আর কারও পক্ষেই নাচিয়ে মূর্তিদের রহস্য জানা সম্ভব নয়। আপনি লিখলেন কি করে?"

হোম্‌স্ বললে, "আজকে যা প্রথম আবিষ্কার, কালকে তা পুনরাবিষ্কার—পৃথিবীর ইতিহাসে এ নজীরের তো অভাব নেই, মিঃ স্ল্যানি। যাই হোক আপনাকে নরউইচে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ী আসছে দেখছি। তার আগে টুকটাক কিছু কথা সেরে ফেলা দরকার। যে ক্ষতি আপনি করেছেন, তার আর চারা নেই। কিন্তু চেষ্টা করলে এখনও কিছুটা সামাল দেওয়া চলে। জানেন কিনা জানি না, মিসেস হিলটন কিউবিট সাংঘাতিক জখম হলেও মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'র মত মাথার ওপর ঝুলছে তাঁর স্বামীর হত্যাপরাধ। আমি এসে আমার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে তাঁকে এ জঘন্য দোষারোপ থেকে অব্যাহতি দিতে পেরেছি। আপনার এখন করণীয় শুধু একটি। সারা দুনিয়াকে আপনি জানিয়ে দেন যে কোন মতেই কোন দিক দিয়েই কিউবিট পরিবারের এই শোচনীয় পরিণতির জন্যে মিসেস হিলটন কিউবিটকে দায়ী করা চলে না।"

"খুব ভাল কথা বলেছেন। আমার এখন উচিত বিনা দ্বিধায় নগ্নসত্যকে স্বীকার করা এবং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিস্টার, আমি তা করব।"

"হুঁসিয়ার কিন্তু, আমি আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি আপনার প্রতিটি কথা আপনার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করব আমরা।" ঝটিতি চেঁচিয়ে ওঠেন ইন্সপেক্টর মার্টিন। বৃটিশ ক্রিমিন্যাল ল'র চমকদার সরলতার যেন একটি মূর্ত প্রতীক।

দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে স্ল্যানি—"সে টুকু ঝুঁকি না হয় নিলামই। জেন্টেলমেন, প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি, এল্‌সি যখন শিশু, তখন থেকেই আমি তাকে চিনি। শিকাগোর একটা দলে সবশুদ্ধ সাতজন ছিলাম আমরা। এল্‌সির বাবা ছিল 'জয়েন্টে'র মাথা। ধুরন্ধর লোক এই বুড়ো প্যাট্রিক। নাচিয়েদের বিদঘুটে মূর্তি দিয়ে চিঠি লেখার কায়দা আবিষ্কার করে সে-ই। হেঁয়ালীর চাবিকাঠিটি জানা না থাকলে ছেলেমানুষী আঁকিবুঁকি বলেই উড়িয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক এবং এতদিন তাই হয়েছেও। যাক, এল্‌সি আমাদের কাজকর্ম কিছু কিছু শিখে নিয়েছিল। কিন্তু এসব সহ্য না হওয়ায় নিজের সঞ্চিত কিছু টাকা নিয়ে একদিন সে আমাদের সবার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ল লণ্ডনে। এল্‌সি আমার বাগদত্তা; যদি এ পেশা ছেড়ে সৎপথে রোজগার করতাম, তাহলে নিশ্চয় সে বিয়ে করত আমায়। এই ইংলিশম্যানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার ঠিকানা পৌঁছোলো আমার হাতে। চিঠি লিখলাম—কিন্তু উত্তর এল না। বাধ্য হয়ে আসতে হল নিজেকে। চিঠি লিখে কোন ফল হত না—তাই যাতে তার চোখে পড়ে এমনি জায়গায় সাংকেতিক ভাষায় খবর পাঠাতে শুরু করলাম।

"প্রায় মাসখানেক হল এসেছি এখানে। এল্‌রিজির খামার-বাড়ীতে ডেরা নিয়েছিলাম প্রথম থেকেই। নিচের ঘরে থাকতাম, রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে যখন খুশি বেরোতাম—কাকপক্ষীও কোনদিন টের পায়নি। এল্‌সিকে বার করে আনার সব রকম চেষ্টাই করেছিলাম আমি। খবরগুলো যে তার নজর এড়োচ্ছে না তা বুঝলাম একদিন যেদিন আমার খবরের নিচেই দেখলাম তার হাতে লেখা একটা লাইন। তখনই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার—শুরু হল ভয় দেখানোর পালা। এবার একটা চিঠি পেলাম ওর কাছ থেকে। চিঠিতে এল্‌সি কাকুতি-মিনতি করে তার আশা ছেড়ে আমায় চলে যেতে বলেছে। কেননা স্বামীর মান-সম্মানের হানিকর এমন কেলেংকারী ঘটলে লজ্জায় দুঃখে আত্মঘাতী হতে হবে তাকে। আরও লিখলে, স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে রাত তিনটের সময়ে জানলার কাছে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে সে। কিন্তু সর্ত রইল—তারপর আর অশান্তি না করে এদেশ ছেড়ে চলে যাবো আমি। অনেক টাকা নিয়ে নেমে এল এল্‌সি—ঘুষ দিয়ে চেষ্টা করলে হটিয়ে দেওয়ার। এইতেই ক্ষেপে গেলাম আমি। খপ করে হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে জানলা দিয়ে বাইরে টেনে আনার চেষ্টা করতেই হাতে রিভলবার নিয়ে তীরবেগে ঘরে ঢুকল তার স্বামী। এল্‌সি মেঝেতে বসে পড়েছিল—মুখোমুখি দাঁড়ালাম দুজনে। আমার উদ্দেশ্য ছিল রিভালভার বার করে ভয় দেখিয়ে সরে পড়া। কিন্তু সেই মুহূর্তে গুলী চালালে লোকটা, আমিও পলকফেলার আগেই ঘোড়া টিপে পেড়ে ফেললাম তাকে মেঝেতে। বাগানের ওপর দিয়ে সরে পড়ার সময়ে পেছন থেকে জানলা বন্ধ করার শব্দ শুনলাম। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি জেন্টেলমেন, যা বললাম, তার প্রতিটি অক্ষর সত্য। ছোকরাটার হাতে চিরকুটটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত কিছুই শুনিনি আমি। চিঠি পেয়েই খুশীতে ডগমগ হয়ে এসেছিলাম এল্‌সির সাথে দেখা করতে।

কিন্তু বদলে পেলাম আপনাদের আর একজোড়া হাতকড়া।"

ইতিমধ্যে একটা গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরে। ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিশম্যান বসেছিল ভেতরে। ইন্সপেক্টর মার্টিন এবার উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাবি স্ল্যানির কাঁধ স্পর্শ করে বললে, "আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে।"

"এলসিকে একবার দেখতে পারি না?"

"না, এখনও বেহুঁশ উনি। মিঃ শার্লক হোমস্, যদি ভবিষ্যতে এরকম কোন গোলমেলে কেস হাতে আসে তখন আপনাকে আমার পাশে পেলে নিজেকে পরম সৌভাগ্যমান বলেই মনে করব।"

শুধু নেচে কুঁদে এগিয়ে যাওয়া এক সারি মূর্তি:

নরউইচের শীতকালীন আদালতে অ্যাবি স্ল্যানিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা

হোমস্ বললে, "এইমাত্র যে পদ্ধতি বোঝালাম, তাই দিয়ে চিঠিটার সাদা অর্থ দাঁড়ায় এই—'এখুনি চলে এস।' আমি জানতাম এ আমন্ত্রণ এড়ানোর সাধ্য তার নেই, কেননা এ সাংকেতিক লিপি যে মিসেস কিউবিট ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসতে পারে, তা সে কল্পনাতেও আনতে পারবে না। এতদিন ধরে যে নাচিয়েদের ছবি শুধু অশুভ বার্তাই বহন করে এনেছে, নতুন অপরাধ সৃষ্টি করেছে, নির্মম পরিণতির সূচনা

হয়। কিন্তু হিলটন কিউবিট প্রথমে গুলী করেছিলেন বলে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করার পর দণ্ডের কঠোরতা লাঘব করে শেষ পর্যন্ত ফাঁসীর বদলে হুকুম হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের।

জানালা দিয়ে বাইরে টেনে আনার চেষ্টা করতেই তার স্বামী.........

জানলায় দাঁড়িয়ে গাড়ীটাকে টগবগিয়ে চোখের আড়ালে উধাও হয়ে যেতে দেখলাম। তারপর, ফিরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল টেবিলে রাখা তালগোল পাকানো চিরকুটটাকে। সামান্য এই কাগজটা দিয়ে হোমস্ অতবড় দুর্ধর্ষ লোকটাকে ভুলিয়ে এনেছে নিজের খপ্পরে।

মুচকে হেসে হোমস্ বললে—"দেখ হে ওয়াটসন, যদি পঙ্কোপদ্ধার করতে পার লেখাটার।"

বিচিত্র চিঠি। অক্ষরের বালাই নেই, করেছে— এই প্রথম সেই নাচিয়েদের শুভ কাজে লাগালাম আমি, কল্যাণ এবং মঙ্গলময় পরিণতির মধ্য দিয়ে মহাকেলেংকারীর সম্ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে আনলাম পতিব্রতা মিসেস হিলটন কিউবিটের নামকে। আমি তোমায় কথা দিয়েছিলাম, নতুন লেখার চাঞ্চল্যকর উপকরণ দেব। সে প্রতিশ্রুতিও রইল। আমাদের ট্রেন তিনটে চল্লিশে, ডিনারের আগেই বেকার স্ট্রীটে ফিরতে পারব বলে মনে হয়।"

উপসংহারে শুধু একটি কথা।

মিসেস হিলটন কিউবিট সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানি যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর আর বিয়ে করেননি তিনি। গরীবের সেবায় এবং স্বামীর জমিদারী দেখাশুনা করায় সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি।

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন (সমাপ্ত)

গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডীস

সত্যভূষণ সেন *

ইংরেজিতে একটি প্রবচন আছে—In literature three years is boom, thirty years is fame, three hundred years is immortality, and three thousand years is Homer. পাশ্চাত্য জগতে সাহিত্য-প্রতিভার চূড়ান্ত আদর্শ হোমার। হোমারেরই দেশ গ্রীসে হোমারের যুগের পরবর্তীকালে এমন এক যুগের আবির্ভাব হয় যার অবদানফলে গ্রীস দেশ পৃথিবীর ইতিহাসে এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসেও বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। একদিকে রাজা পেরিক্লীসের (Pericles) যুগ; অপরদিকে কতকটা সেই যুগেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন কয়েকজন মণীষীর আবির্ভাব হয়, যাঁদের ব্যক্তিপ্রতিভার অবদানে সমগ্র গ্রীসের ইতিহাস সমুজ্জ্বল; দর্শন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সক্রেটীস, প্লাটো, অ্যারিস্টটল্ এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এস্কাইলাস্, সফোক্লীস্, ইউরিপিডীস ও অ্যারিস্টোফেনীস্। ১

প্রাচীন গ্রীসে প্রাচীন ভারতবর্ষের মত দেবদেবীর বন্দনা প্রথা প্রচলিত ছিল। কোনও কোনও উৎসবে দেবতার প্রশস্তিতে সঙ্গীত গীত হত, কোন কোন ক্ষেত্রে একজন অধিনায়ক—কোরিফীউস (Corypheus)—দাঁড়িয়ে কিছু আবৃত্তি করে যেতেন, তার পরে তারই প্রত্যুত্তরে গায়কদল (কোরাস্) সমবেত-কন্ঠে গান গাইতেন। পরবর্তীকালে এরই পরিণতিতে নাটকের সৃষ্টি; যতদূর জানা যায় এস্কাইলাসের হাতে এসেই গ্রীক নাটক সার্থক রূপ লাভ করে।

কালক্রম হিসাবে এস্কাইলাসের পরে সফোক্লীস্ তার পরে ইউরিপিডীস; এঁরা তিনজনেই ছিলেন করুণরসাত্মক (Tragedy) নাটক রচয়িতা; অ্যারিস্টোফেনীস ছিলেন হাস্যরসাত্মক নাটকের (কমিডী, Comedy) স্রষ্টা। এস্কাইলাসের মধ্যে দেখা যায় নাটকে দুঃখবেদনা-রসানুভূতির—গরিমার প্রথম অভ্যুদয়, সফোক্লীসে নাট্যশিল্পের চরম উৎকর্ষ, ইউরিপিডীসে দেখা যায় হৃদয়-বেদনায় সহানুভূতি এবং ভাবাবেগের বিকাশ।

অ্যারিস্টোফেনীস্ এই বলে এক-স্থলে ইউরিপিডীস্‌কে ধিক্কৃত করেছেন যে, ইউরিপিডীস্ তার নাটকে এস্কাইলাসের ভাবগরিমা রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু অনেকের মতে এস্কাইলাস থেকে এই পার্থক্য ইউরিপিডীসের পক্ষে

ইউরিপিডীস

অবক্ষয়ের পরিচায়ক না হয়ে বরং উৎকর্ষের পরিচয় বলেই গণ্য হতে পারে। এস্কাইলাসের জন্মের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে ইউরিপিডীসের জন্ম; এই সময়ের মধ্যে দেশের জীবনাদর্শে এবং জনসমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতেও কতকটা পরিবর্তন এসেছে, দেবতা এবং দেবকল্প বীরদের একান্ত প্রাধান্য অনেকটা খর্ব হয়েছে, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে সহানুভূতি অনেকটা পরিস্ফুট হয়েছে। সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে এস্কাইলাসের তুলনায় ইউরিপিডীস্ ছিলেন অপেক্ষাকৃত আধুনিক; হয়তো যুগের প্রভাবে ইউরিপিডীস্ কতকটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তার উপরে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথাও বিবেচনা করতে হয়। ফলে ইউরিপিডীসের ভাবনায় এস্কাইলাসের উচ্চস্তরের গরিমার পরিচয় নেই, কিন্তু তার মধ্যে আছে মানবীয় ভাবের সঞ্জীবন সুধা। একজন কবি-সমালোচক (Robert P. Downes) এই কথাই প্রকাশ করেছেন কবিকে উদ্দেশ করে তার প্রশস্তি-বাণীতে—তোমার মহান বাণীতে নেই বজ্রের নির্ঘোষ বা অগ্নির দীপ্তি কিন্তু তাতে আছে তপ্ত হৃদয়ের অশ্রুজল এবং আনন্দ-বেদনার হৃৎস্পন্দন। আর একজন (Kenelm Digby) বলেছেন—In all his pieces there is the sweet human Voice, the fluttering human soul. স্বনামখ্যাত ইংরেজ কবি ব্রাউনিং এই কথাই প্রকাশ করেছেন তার অনুপম ভাষায়—

> Down to the level of our common life
>
> Down to the beating of our human heart.

এই কথা বলে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, ইউরিপিডীস ট্র্যাজিডীতে যে আদর্শ এবং উৎকর্ষের সৃষ্টি করে গেছেন তাই হয়ে রয়েছে সমগ্র জগতের উত্তরাধিকার।

ইউরিপিডীসের জন্ম হয় সালামিস্ দ্বীপে; একটি নৌ-যুদ্ধের জন্য সালামিসের নাম ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে; যেদিন সেই যুদ্ধ সংঘটিত হয় ঠিক সেই দিনই ইউরিপিডীসের জন্ম হয়—খৃঃ পূঃ ৪৮০ সালে; এই জন্ম তারিখ সম্পর্কে কিছু মতভেদও দেখা যায়। তিনি বেরূপ ব্যয়বহুল এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষা

---

* গ্রীক নাট্যকার Euripides আমাদের বাঙলাদেশে আমাদের মত সাধারণ জনগণের নিকট "ইউরিপিডীস" নামে পরিচিত। ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি আমার নিকট লিখিত এক পত্রে এই নামটি "এউরীপিদেস্" বলে উল্লেখ করেছেন; তিনি যখন লিখেছেন তখন ধরে নিতে পারি যে, ওটি গ্রীক্ ভাষায় উচ্চারণ। আমাদের সুবিধার জন্য আমরা আমাদের দেশে সধারণতঃ পরিচিত রূপই গ্রহণ করলাম।

১। এই যুগটি পৃথিবীর ইতিহাসের পক্ষেই একটা বিশিষ্ট যুগ বলা চলে। কতকটা প্রায় এই যুগেই ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের যুগ, চীনদেশে কন্‌ফুসিয়াস্ এবং লাওৎজের যুগ এবং প্রায় সেই যুগেই বাবিলনে বাইবেলের পুরাতন পুঁথি Old Testament রচিত হতে থাকে।

লাভ করেছিলেন তাতে মনে হয় ইউরিপিডীস্ অভিজাত বংশের সন্তান ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তার কয়েকজন গুরুর নাম পাওয়া যায়; কাব্যালঙ্কার ও বাগ্মিতায় তার শিক্ষাগুরু ছিলেন প্রডিকাস, নীতিশাস্ত্রে তিনি শিক্ষা লাভ করেন সক্রেতীসের নিকট (সক্রেতীস্ ছিলেন একাধারে তার শিক্ষক এবং সহচর). দর্শন অধ্যয়নে তার গুরু ছিলেন আনাক্সা গোরাস্। যৌবন বয়সেই তাঁর নাটক রচনা আরম্ভ হয়; তাঁর বয়স যখন পঁচিশ বৎসর তখনই তিনি দেশের নাটক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন, কিন্তু চল্লিশ বৎসর বয়স হবার আগে তাঁর অদৃষ্টে পুরস্কার লাভ ঘটেনি।

ইউরিপিডীস দু'বার বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু অপরাপর কয়েকজন খ্যাতনামা কবির ন্যায় তাঁরও দাম্পত্য-জীবনে সুখলাভ ঘটেনি। তথাপি তাঁর পক্ষে এটা কৃতিত্বের বিষয়ই বলতে হবে যে, তাঁর নিজের দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও সমগ্র নারী জাতির প্রতি তাঁর চিত্ত বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েনি; প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তাঁর রচিত নাটকে চরিত্র-গৌরবে মহিমান্বিতা কয়েকটি নারীর চিত্রণ অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করেছে।
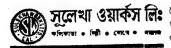
তাঁর আত্মপ্রত্যয় ছিল অত্যন্ত প্রখর; হয়তো তারই পরিণতিতে তাঁর প্রকৃতিতে কতকটা দাম্ভিকতাও এসে গিয়েছিল। তাঁর আত্মনিষ্ঠ এবং দাম্ভিক প্রকৃতির ফলে অনেকে তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন এমনও দেখা যায়। তাঁর এই প্রখর আত্মপ্রত্যয় এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ পেয়েছিল এমন একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—একদিন নাটক অভিনয়ের পরে সমগ্র দর্শকমন্ডলী দাঁড়িয়ে উঠে দাবী জানালেন—একটা অংশ তারা অনুমোদন করতে পারছেন না অতএব এই অংশটুকু নাটক থেকে বর্জন করা হোক। প্রত্যুত্তরে ইউরিপিডীস বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কর্তব্য এবং দায়িত্ব হচ্ছে আপনাদের শিক্ষা দেওয়া, আপনাদের নিকট থেকে শিক্ষালাভ করা নয়।

পূর্বতন গ্রীক নাট্যকারগণের ন্যায় ইউরিপিডীসও তাঁর নাটকের আখ্যান ভাগের জন্য প্রচলিত কিংবদন্তীর উপরেই নির্ভর করতেন—প্রধানত হোমারের প্রমুখাৎ প্রাপ্য আখ্যায়িকা; কিন্তু সেই সকল আখ্যায়িকা তাঁর হাতে এসে আরও ভাবাবেগে পরিপুষ্ট হয়েছে। কিন্তু অন্ততঃ দুটি ক্ষেত্রে "মীডীয়া" এবং "হিপ্পোলিটাস" নাটকে তিনি নূতন পথ অবলম্বন করে ট্র্যাজিডি রচনায়ও পরিণতি সাধনে চূড়ান্ত শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নিজ দেশে ইউরিপিডীসের প্রতিভা এবং খ্যাতি কতটা স্বীকৃতি লাভ করেছিল তার পরিচয় স্বরূপ তাঁরই একজন সহযোগী নাট্যকারের (ফিলেমন) উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে: "পৃথিবী থেকে তুমি লোকান্তরিত হয়েছ, তথাপি তোমার খ্যাতি হোমারের খ্যাতির ন্যায় মহাকালের বুকে চিরন্তন হয়ে থাকবে।"

ইউরিপিডীসের নাট্য-প্রতিভার পরিচয় স্বরূপ তাঁর কয়েকখানা নাটক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

আলসেস্টিস্

প্রথমে আলসেস্টিস্ (The Story of Alcestis)। নিয়তির বিধান হয়েছে যে থেসেলীর অন্তর্গত ফিরের রাজা অ্যাড্মেটাসের মৃত্যু ঘটবে; কিন্তু অ্যাপলো নিয়তি দেবীগণের সম্মতি আদায় করে নিয়ে এসেছেন যে, অ্যাড্মেটাসের পরিবর্তে একটি বিকল্প বলিদান তারা গ্রহণ করবেন। আড্মেটাসের পিতা বা মাতা কেউ সন্তানের জন্য নিজ জীবন বিসর্জনে সম্মত হলেন না; তখন অগ্রসর হয়ে এলেন তাঁর পত্নী আলসেস্টিস্; সতীত্বের গৌরবে এবং পতিপরায়ণতার আদর্শে তিনি সানন্দে পতির জীবন রক্ষার্থে আত্ম-বলিদানে প্রস্তুত হলেন। আত্মাহুতি দেবার আগে তিনি তার শিশু সন্তান দুটিকে তাদের পিতার হাতে সমর্পণ করে স্বামীর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করতে গিয়ে বললেন, "জীবনে আমি তোমাকে পতিরূপে গ্রহণ করেছিলাম এবং পতিত্বের উপযুক্ত সম্মানও আমি তোমাকে দিয়েছিলাম। নিয়তির বিধানে তোমার মৃত্যু ঘটলে আপাতদৃষ্টিতে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা বা পার্থিব সুখ-সম্পদ ভোগ করবার পক্ষে কোনও বাধা ছিল না, কিন্তু তোমাকে হারিয়েও বেঁচে থাকা আমার পক্ষে বিড়ম্বনা হত; সেজন্য আমি স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়েই তোমারই জন্য আমার প্রাণ বিসর্জন দিতে যাচ্ছি।"

আলসেস্টিসের মৃত্যুর পরে আড্মেটাস্ মর্মান্তিকভাবে বুঝতে পারলেন যে, জীবন থেকে পত্নীকে বিদায় দিলে পতির দুঃখ-বেদনা কত নিদারুণ হতে পারে। শ্মশান থেকে সকলেই একে একে ফিরে আসতে লাগলেন, কিন্তু এলেন না শুধু আলসেস্টিস্। তখন আড্মেটাস্ উপলব্ধি করতে লাগলেন, যারা মৃত্যুর রাজ্যে প্রয়াণ করে তারাই সর্বাপেক্ষা ভালবাসার উপযুক্ত, তাদের জন্য মৃত্যুও যেন কাম্য মনে হয়, এই সূর্যকরোজ্জ্বলা ধরণীও যেন তখন নিষ্প্রভ মনে হয়।

একজন সমালোচক (Robert P. Downes) মন্তব্য করেছেন—প্রতিভাবান কবির হৃদয়ও যেন এই দুঃখ-বেদনা সহ্য করতে না পেরে আলসেস্টিসের পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করলেন। হারকিউলিস্ অতিথি হয়ে এসেছিলেন আড্মেটাসের গৃহে; তিনি আড্মেটাসের দুঃখে বিগলিত হয়ে তাঁর দৈববলের প্রভাবে আলসেস্টিসকে মৃত্যু-রাজ্য থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। তাঁর এক হাতের বেষ্টনীতে দেখা যাচ্ছে বস্ত্রাচ্ছাদিত একটা কিছু, যেন জীবন্ত একটি নারী. মূর্তি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে স্পন্দিত। হারকিউলিসের মুখাবয়ব অপূর্ব জ্যোতিঃদীপ্তিতে উদ্ভাসিত, তিনি

উল্লাসে চীৎকার করে বললেন, দেখ, আড্‌মেটাস এর মধ্যে তোমার স্ত্রীর কোনও সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছ কিনা। আলসেস্‌টিস্‌কে সম্মুখে দেখেও আড্‌মেটাস যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—"একি সত্য? না কোনও পরিহাসপ্রিয় দেবতা আমার সঙ্গে পরিহাস করবার জন্য এই মায়াময় মূর্তির অবতারণা করেছেন।" হারকিউলিসের মুখে পরম পরিতৃপ্তির স্মিতহাসি।

মৃত্যু-রাজ্য থেকে আলসেস্‌টিসকে উদ্ধার করে আনার সার্থকতায় হারকিউলিসের মুখে যে জ্যোতি ফুটে উঠেছিল এবং আড্‌মেটাসকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে তাঁর মুখে যে তৃপ্তির হাসি দেখা গেল—তা যেন কবি ইউরীপিডীসেরই মনোভাবের প্রতিচ্ছায়া।

ইফিজীনিয়া

আর একটি বিখ্যাত নাটক ইফিজীনিয়া (Iphigenia in Aulis)। এই কাহিনীও হোমারের 'ইলিয়াড' থেকে গৃহীত। ট্রয় নগর অভিমুখে যাত্রায় গ্রীক নৌবহর অউলিস বন্দরে এসে আটকে গেল; আর কিছুতেই অগ্রসর হতে পারছে না। তখন দৈবাদেশে আগামেমননের নিকট প্রকাশ পেল যে একমাত্র তাঁর কন্যা ইফিজীনিয়াকে আহুতি দিলেই নৌবহরের মুক্তি ঘটবে। ঘটনার এরূপ সংঘটনে তার পিতৃহৃদয় মর্মাহত হল, তথাপি কর্তব্যবোধের তাড়নায় তিনি আরগসে কন্যার মাতা ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রার নিকট নির্দেশলিপি পাঠালেন কন্যাকে অবিলম্বে স্কন্ধাবারে তাঁর নিকট নিয়ে আসবার জন্য। এইখানেই নাটকের আরম্ভ।

যবনিকা উত্তোলিত হলে দেখা গেল সম্মুখেই শিবিরে আগামেমননের আবাস-তাঁবু, বাঁদিকে আরও অসংখ্য তাঁবুর সারি, পশ্চাতে দেখা যাচ্ছে নৌবহরের সারি, ডানদিকে একটি পথ চলে গেছে উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে। নক্ষত্রসমুজ্জ্বল রাত্রি। এই পথেই এসে উপস্থিত হলেন মাতা ও কন্যা। কন্যা ইফিজীনিয়ার বিয়ের প্রস্তাব ছিল থেটিসের পুত্রের সঙ্গে। ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা মনে করেছিলেন কন্যার বিয়ের জন্যেই এই আহ্বান, সেই অনুসারে প্রস্তুত হয়ে তিনি কন্যার সঙ্গে বিপুল সাজসজ্জা এবং উপকরণ-সম্ভার নিয়ে এসেছেন। ইফিজীনিয়া এই স্কন্ধাবারে এসে সব দেখে শুনে এই অভিনব অভিজ্ঞতায় যে বিস্ময়-পুলক অনুভব করেছিলেন কবি অত্যন্ত দরদের সঙ্গে তা প্রকাশ করেছেন। যখন ইফিজীনিয়া জানতে পেলেন যে নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানে তার জীবন, যৌবন এবং প্রেমের মোহময় আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে তখন তিনি দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তার সকল আবেদন ব্যর্থ হল। রাজন্যবর্গের হৃদয় গলল না, কারণ নৌবহর স্তব্ধ হয়ে আছে, সেনানীগণের মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দিল। যখন উপায়ান্তর রইল না তখন ইফিজীনিয়া নিয়তির বিধান মেনে নিয়ে আত্মস্থ হলেন। তাঁর আত্মাহুতিতে নৌবহর গতিলাভ করবে, ট্রয় নগরের পতন হবে, গ্রীসের জয় হবে। তখন তাঁর আত্মপ্রত্যয় ফিরে এল, সকলের কল্যাণার্থে তিনি জীবন, যৌবন এবং প্রেম-সম্ভোগের আশার পরিবর্তে জীবন বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হলেন।

এস্‌কাইলাস এবং সফোক্লীসও ইফিজীনিয়ার কাহিনী নিয়ে নাটক রচনা করেছেন; তাঁরা উভয়েই তাদের নাটকে ইফিজীনিয়ার বলিদান সংঘটন দেখিয়েছেন, কিন্তু ইউরীপিডীস তার কবি হৃদয়ে অতটা নিষ্ঠুরতার সমর্থন করতে পারলেন না, তিনি ঘটনা রূপান্তরিত করে দেখালেন, ইফিজীনিয়ার আত্মাহুতির সময়কালে একটি হরিণ শাবক এসে দেখা দিল এবং ইফিজীনিয়ার পরিবর্তে সেই হরিণ শাবকের বলিদানই গৃহীত হল।

হেকুবা

ঠিক এরই সমগোত্রীয় আর একটি ঘটনা দেখা যায় ইউরীপিডীসের হেকুবা নাটকে, যেখানে হেকুবার কন্যা পলিকেসনার জীবন আহুতি ঘটে। ট্রয় যুদ্ধের অবসানে যখন গ্রীক নৌবহর ফিরে আসছিল তখন থ্রেসের তীরে এসে সেই নৌবহর নিশ্চল হয়ে পড়ে। নিশীথ রাত্রিতে একিলিসের মূর্তি আবির্ভূত হয়ে হেকুবার নিকট দাবী করেন তার কন্যা পলিকেসনার বলিদান, যাতে দেবতাদের সন্তোষ বিধান হতে পারে এবং ফলে গ্রীক নৌবহরের মুক্তি-

লাভ ঘটতে পারে। হেকুবা কন্যার জীবন রক্ষার জন্য একিলিসের নিকট আবেদন জানালো, কিন্তু সে আবেদন ব্যর্থ হয়। তখন পলিকেসনা অগ্রসর হয়ে এসে একিলিসকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছেন, পাছে আমিও আমার জীবনের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা জানাই। না, না, আমি তা করব না; আমি ভীরু, স্বার্থপর অথবা জীবনে আসক্ত বলে পরিচিত হতে চাই না।

তারপরে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য, যেখানে একজন সংবাদদাতা এসে হেকুবাকে জানালো তার কন্যা কিভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন। পলিকেসনাকে হত্যা করবার জন্য নিয়োজিত হয় একজন দুর্ধর্ষ সৈনিক পীঢ়াস। পীঢ়াস তরবারি নিষ্কাসিত করে, অমনই তার সহায়ক কয়েকজন যুবক এগিয়ে আসে পলিকেসনাকে ধরে রাখবার জন্য। পলিকেসনা তাদের নিবৃত্ত করে বললেন, আমাকে কেউ স্পর্শ করো না; আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করছি। তোমার তরবারির আঘাতের জন্য আমি ঘাড় পেতে দিচ্ছি, তুমি আমাকে দেবতাদের নিকট আহুতি প্রদান কর। এই কথা শুনে উল্লাসধ্বনি জেগে উঠল। তখন আগামেমনন চীৎকার করে বললেন, কেউ ওকে স্পর্শ করো না। তখন পলিকেসনা তার বস্ত্রাবরণ ছিন্ন করে তার কুমারী বক্ষ উন্মুক্ত করে দিলেন। সে বক্ষস্থলের সৌন্দর্য ছিল শ্রেষ্ঠ-শিল্পীরও অনুকরণের অতীত। তারপরে ভূমিতে জানু পেতে বসে ঘাতককে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে যুবক, তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমার এই বক্ষে আঘাত করতে পার। অথবা আমার গ্রীবাও প্রসারিত রয়েছে তোমার তরবারির আঘাতের জন্য। পীঢ়াসের ন্যায় দুর্ধর্ষ সৈনিকও ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল, তার পরে যেন বাধ্য হয়েই পলিকেসনার বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করে দিল। তীব্র বেগে কুমারীর বক্ষ থেকে রক্তধারা উৎসারিত হল। মৃত্যুতেও পলিকেসনার শালীনতাবোধ জাগ্রত ছিল—তিনি তাঁর বস্ত্রাবরণে বক্ষঃস্থল আবৃত করে দিলেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কবি ইফিজেনিয়াকে বলিদান থেকে রক্ষা করলেন কিন্তু পলিকেসনার বেলায় তিনি বলিদান সংঘটনে আপত্তি করলেন না। কিন্তু এক্ষেত্রেও বলিদান প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সংঘটিত হতে দেখা যায় না। একজন সংবাদদাতা এসে মাতা হেকুবার নিকট বলিদানের ঘটনা বিবৃত করল। কিন্তু সেই ঘটনার মধ্যে পলিকেসনার চরিত্রে যে দৃঢ়তা ও বীর্যবত্তা এবং বিপদকালে ধৈর্যের যে পরিচয় দেখা যায় তা সত্যই অনবদ্য এবং মহনীয়। মৃত্যুর সময়ে শেষ মুহূর্তের চরম সন্ধিক্ষণেও পলিকেসনার চরিত্রে যে শালীনতাবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে তা ইউরিপিডীসের মত কবির সৃষ্টিরই উপযুক্ত বটে।

মীডীয়া

এই নাটকে ইউরিপিডীস্ যেন এক নূতন পথ অবলম্বন করেছেন; তার স্বভাবগত করুণা এবং সহানুভূতি বিসর্জন দিয়ে তিনি যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ এমনকি জিঘাংসা প্রবৃত্তিরও প্রশ্রয় দিয়েছেন। মীডীয়া, এক নির্যাতিতা নারীর প্রতিরোধ স্পৃহা যে কিরূপ জিঘাংসায় গিয়ে পরিণতি লাভ করতে পারে তারই ইতিহাস; এই চরিত্র উদ্ঘাটনে একাধারে মাতৃহৃদয়ের করুণা এবং জিঘাংসা প্রবৃত্তির যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তা বিস্মৃত হবার নয়।

মীডীয়া য্যাসনের স্ত্রী। য্যাসন তার এই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে করিন্থের রাজা ক্রেয়নের কন্যা গ্লচেকে বিয়ে করতে উদ্যোগী। রাজা ক্রেয়নের নির্দেশে মীডীয়াকে তার দুটি পুত্রসহ করিন্থের সীমানা ত্যাগ করে অবিলম্বে চলে যেতে হবে।

একজন পরিচারিকা সতর্কবাণী উচ্চারণ করল, "মীডীয়ার চোখে যে জিঘাংসার দৃষ্টি দেখেছি কারও উপরে প্রতিশোধ না নিয়ে তা শান্ত হবার নয়।" ভিতরে শোনা গেল মীডীয়ার তীব্র অভিসম্পাত বাণী —"ঘৃণ্য মায়ের অভিশপ্ত সন্তান, তোদের সঙ্গে সঙ্গে তোদের পিতারও মৃত্যু হোক, এবং এই বাড়ী ঘর সব জাহান্নামে যাক।" আবার শোনা গেল তার শপথ বাক্য—"আমাকে যারা নির্যাতন করবে তারা যে সুখে সম্ভোগে থাকবে তা কখনও হতে দেব না, আজ সন্ধ্যার মধ্যে পিতা কন্যা এবং যিনি ছিলেন আমার স্বামী তাদের সকলকে যে ভাবেই হোক মৃত্যুবরণ করতে হবে।

তার পরে মীডীয়া য্যাসনকে ডেকে পাঠালেন এবং তিনি যেন তার নির্বাসনের নিয়তি শান্তচিত্তে গ্রহণ করেছেন এই ভাবের অভিনয় করে দুটি উপহার-দ্রব্য উপস্থিত করলেন—নববধূ গ্লচের জন্য এক মহার্ঘ্য পরিচ্ছদ এবং রাজা ক্রেয়নের জন্য অপূর্ব শিল্পকৃতিত্বের নিদর্শন এক মহামূল্য মুকুট। উপহার দুটি যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছতে বিলম্ব হল না এবং গ্রহীতারা উপহার গ্রহণ করলেন এবং পরিধানও করলেন। কিন্তু উপহার দুটিই ছিল বিষপ্রযুক্ত; পিতা-পুত্রী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে প্রাণ হারালেন।

মীডীয়ার প্রতিশোধ স্পৃহা এতেও তৃপ্ত হয়নি। এবার য্যাসনের শাস্তি-বিধান বাকী; য্যাসনকে পত্নীহীন করা হয়েছে এবার তাকে সন্তানহীন করতে হবে। তার পরে মীডীয়ার নির্বাসনে অভিযান, তার আগে নয়। কিন্তু য্যাসনের সন্তান যে মীডীয়ারও সন্তান। একদিকে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি অপরদিকে সন্তানের জন্য স্নেহ—একদিকে বাৎসল্যের কোমল কাতরতা অপর দিকে জিঘাংসার ভয়াবহ মানকতা, ফলে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে, সমগ্র গ্রীক্ ট্রাজিডি সাহিত্যে তার তুলনা নেই।

মীডীয়া গ্লচে এবং রাজা ক্রেয়নকে হত্যা করেছে তাতে তার কিছুমাত্র অনুশোচনা হয়নি। কিন্তু এবার তার নিজের সন্তানদের হত্যার চিন্তা—এতে স্বভাবতঃই তার মাতৃহৃদয়ে মর্মন্তুদ বেদনা জেগে উঠল; কিন্তু এমনই তার দুর্দমনীয় ক্রোধ যে প্রতিহিংসার কথাও ভুলতে পারে না।

> এখন যে কাজ করতে যাচ্ছি তাতে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হচ্ছে। আমার সন্তানদের আমি হত্যা করব —আমারই সন্তান, আমার হাত থেকে কেউ তাদের কেড়ে নিতে পারবে না। আঃ, ওরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে; কি সুন্দর হাসি ওদের মুখে, ওদের চোখে মুখে কি আনন্দের দীপ্তি, আমার হৃদয় গলে যাচ্ছে। না, ওসব প্রতিহিংসার চিন্তা থাক, ওরা আমার সঙ্গেই যাবে। ওদের বাপকে দুঃখ দেবার জন্য ওদের হত্যা করলে তাতে আমার উপরেই যে দুঃখের বোঝা দশ গুণ হয়ে এসে পড়বে। না, না, তা আমি করব না।
>
> না, তা হতে পারে না, দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। যারা আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে তাদের

শান্তিবিধান করতেই হবে। আমি কি করব, তোদের বাপ তোদের উপর দুর্ভাগ্যের নিয়তি ডেকে এনেছে। আয়, এই শেষ বারের মত তোরা আমার বুকে আয়। না, না, আর নয়, এখন তোরা চলে যা।

য্যাসন এসে দেখতে পেলেন শিশু দুটি যেন রক্তস্নানে ভাসছে; মীডীয়াকে দেখলেন দানবীয় উন্মত্ততায় যেন এক উন্মাদিনী মূর্তি। য্যাসনকে দেখবামাত্র তাকে উদ্দেশ করে মীডীয়া বলে চলেছেন—আমাকে ঘৃণা করে নির্যাতিত করে তোমরা সকলে সুখে সম্ভোগে থাকবে, তা হবার নয়। গ্লচেকে শেষ করেছি, তার বাপকেও সেই পথেই পাঠিয়েছি, এবার তোমার উপরেও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হল। এখন তুমি আমাকে যা খুশি বলতে পার।

যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষে তেমনি প্রাচীন গ্রীস দেশেও জনগণের চিত্ত-বিনোদনই কাব্য-সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, জনগণের শিক্ষা-বিধানও অন্যতম উদ্দেশ্য এবং আদর্শ ছিল—শুধু কাব্য-সাহিত্য ব্যাকরণ শিক্ষা নয়, জীবনের ক্ষেত্রে ন্যায়, নীতি এবং ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাও। গ্রীস দেশের জনগণের চিত্তে কবি এবং নাট্যকারদের প্রভাব ছিল অসাধারণ, অলিখিতভাবে তাঁরাই যেন ছিলেন সমাজের গুরু-স্থানীয়। ঠিক ধর্মগুরু না হলেও তাঁদের কাব্য-সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁরাই ছিলেন সামাজিক জীবনে ন্যায়, নীতি এবং ধর্ম বিষয়ে গুরু বা পথপ্রদর্শক। জনগণ যেমন তাঁদের সেই দৃষ্টিতে দেখতেন, দেশের কবি সাহিত্যিকেরাও নিজেরা এবিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, জনগণের শিক্ষার দায়িত্বও তাঁদের উপরে ন্যস্ত আছে; কোনও ক্ষেত্রে যে ইউরিপিডীসের একটি মন্তব্যে তার ইঙ্গিত আছে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। হোমারের কাব্য ছিল জনগণের পরম সম্ভ্রমের বিষয়, যেন তাদের নিকট বাইবেল বা বেদবাক্য।

কিন্তু যখন ধর্মের আদর্শসচেতনতা এবং মানবতাবোধ প্রসার লাভ করতে লাগল, তখন ধীরে ধীরে জনগণের চিত্তে সংশয় দেখা দিতে লাগল। হোমারের দেবতাদের মধ্যে দেখা যায় অনেকস্থলে খামখেয়ালী ভাব, নিজেদের প্রবৃত্তির বশে তাঁরা ক্ষেত্রবিশেষে অন্যায় অবিচারও করে থাকেন, সুতরাং দেবতাদের প্রতি ভক্তি এবং সম্ভ্রমবোধে শিথিলতা এসে দেখা দিল। কিন্তু স্পষ্টভাবে এসব ভাববোধ প্রকাশ করবার মত বলিষ্ঠ জনমত গড়ে ওঠেনি। এমন সময়ে ইউরিপিডীসের আবির্ভাব। ইউরিপিডীসের অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তিনি সবই বুঝতে পারলেন, কিন্তু তথাপি তিনি প্রকাশ্যে দেবতাদের ধিক্কৃত করলেন না। মানুষের নিয়তি যে সকল বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তিনি সেই সকল উচ্চতর আদর্শের পথে জনগণের চিত্ত পরিচালিত করতে লাগলেন। তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে দুটি একটি উক্তিতে তিনি এসব দিকে ইঙ্গিত করেছেন—একজন নায়কের মুখে শুনতে পাই, দেবতারা যদি এমন কিছু করেন যা অন্যায় তা' হলে তারা আর দেবতা নন। ইউরিপিডীসের নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এক পরম সত্তার আদর্শ যিনি সর্বনিয়ন্তা এবং ন্যায় ও অপক্ষপাত বিচার যার মূলমন্ত্র।* কবির কাব্যে একজন শিক্ষাগুরুর আদর্শই দেখতে পাওয়া যায়।

ইউরিপিডীসের পার্থিব জীবন খুব সুখের ছিল বলে মনে হয় না। তিনি কি কারণে জানা যায় না—এথেন্স থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন। ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ছিলেন আর্কেলস্, তাঁর সভায় সকল বিষয়ে গুণী লোকদের তিনি আমন্ত্রণ করে আনতেন—এতে ছিল তাঁর পরম আনন্দ। ইউরিপিডীসও এখানে এসে স্থানলাভ করেছিলেন। ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে ম্যাসিডনিয়ার রাজধানী পেলাতে (Pella) তাঁর মৃত্যু হয়। কবির মৃত্যুর পরে গ্রীকদের চৈতন্য উদয় হল; কবির জীবিতকালে কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা তাঁরা ভাবেননি, মৃত্যুর পরে কবি ইউরিপিডীসের শবদেহ স্বদেশে আনবার জন্য তাঁরা দূত পাঠালেন; কিন্তু রাজা আর্কেলস্ সম্মতি দিলেন না। অগত্যা গ্রীকরা নগরের প্রেক্ষাগৃহে (Dionyside Theatre) কবির এক মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এথেন্স নগরের প্রবেশ পথে এক প্রতীক সমাধি-স্তম্ভে উৎকীর্ণ করিয়ে রাখলেন কবির প্রতি তাঁদের স্মৃতি-অর্ঘ্য:

> গ্রীসের কবির প্রতি সকল গ্রীকের
> এই সমাধি-স্মৃতিঅর্ঘ্য; দূরে ম্যাসি-
> ডন প্রান্তে নীরব-নিদ্রিত তাঁর
> দেহাবশেষ; গ্রীসের গৌরব এথেন্স,
> সেই এথেন্স ছিল তাঁর স্বদেশ;
> তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত সকলের
> শ্রদ্ধার অর্ঘ্য ও প্রীতির অশ্রুধারা।

* এই আদর্শই প্রকাশ পেয়েছে ইউরিপিডীস রচিত The Trojan Women নাটকে—ট্রয়ের বৃদ্ধ রাজা প্রিয়ামের (Priam) পত্নী হেকুবার (Hecuba) মুখে একটি বাণীতে—

> "O Thou that art the Sustainer
> of the Earth,
> and hast the Earth as Thy
> Throne,
> Whosoever Thou mayest be,
> Thou art difficult to know,
> Thou mayest be Zeus, or the
> Law of Nature,
> or the Reason of Man—
> But I invoke Thee; for, with
> silent steps,
> Thou leadest all living
> creatures to Justice."

সাতপাঁচ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

॥ কথা-বলার কথা ॥

কথায় বলে কথার কোনো ট্যাক্স নেই। এবং তেমন কথাশিল্পী হলে ট্যাক্স ত দূরের কথা ট্যাক্সী করে লোকে আপনার কথা শুনতে আসবে!

এমনি কথা বলিয়ে ছিলেন আমাদের বীরবল বা প্রমথ চৌধুরী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই বা কম কিসে! আর রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্যরসের কারবারী যাঁরা (হালের কথাশিল্পীরা কিন্তু সে মেজাজ বদলেছেন!) তাঁরাও কমবেশী এই কথার ভিয়েনের রসিক। কথা বলা নিঃসন্দেহে একটা আর্ট, বিশেষ করে আজকের দিনে আমাদের পরিবেশটা এমনই স্থূল হয়ে উঠেছে যে, তাতে সমাজে সুরসিক বলিয়ে-কইয়ে লোকের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী হয়ে উঠেছে।

ধরতে গেলে বিগত যুগের সব দেশের সব সাহিত্যিকরা এই রকম কথার বদলে মুক্তো ছড়াতেন কিনা তা জানা নেই। কিন্তু এমনি এক বিদেশী সাহিত্যিকের প্রাণ্ডটা হাতের কাছে এসে ভিড়ল বলেই এই উপক্রমণিকা। ইনি হলেন অস্কার ওয়াইল্ড। ছেলেবেলায় যাঁর স্বার্থপর দৈত্যের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় সেই গল্পের যাদুকর হলেন অস্কার ওয়াইল্ড। তাঁর লেখা গল্পের মতই তাঁর কথাবার্তাতেও যে যাদুমেশানো থাকত তারই কিছু সংগ্রহ করে পরিবেশন করছি তাঁর একটি জীবনীগ্রন্থ থেকে। অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর জীবনীকার

পিয়ার্সনের মতে কথা-বলার আর্টের অন্যতম সেরা আর্টিস্ট। ও'র এই কথা-শিল্প কোন চেষ্টাকৃত জিনিস ছিল না, যেন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ঠিক মুহূর্তে ও'র কথারসের সাগরে তুফান তোলবার জন্য বেরিয়ে আসত ও'র মুখ থেকে। ওয়াইল্ডের কতকগুলো বাণী পড়ুন।

'কর্তব্যবোধ' জিনিসটা হল সেই পদার্থ, যা শুধু আমরা অপরের কাছ থেকে প্রত্যাশা করি।' 'মেয়েরা আমাদের ত্রুটির জন্যেই ভালবাসে, যত আমাদের ত্রুটি, তত তাদের ভালবাসা। এমন কি আমাদের দোষ যদি বেশী হয়, গুণটার কথা তারা আমলই দেয় না।' বা, ক্ষমা করো, তোমাকে চিনতে পারিনি। আমিই অনেক পালটেছি কিনা!

তাই বলে অস্কার ওয়াইল্ড সেই রকম বাক্যবাগীশ ছিলেন না, যিনি নিজের কথা বলতেই ব্যস্ত সব সময়। কথা বলার আর্টিস্ট হতে গেলে এই গুণটা বেশী আয়ত্তে থাকা উচিত, ভালো শ্রোতা হওয়া। তারপর শোনার পালা শেষ হলে তাক বুঝে নিজের কথা ছাড়া, যে কথা সমস্ত কথাবার্তার কেন্দ্রটাই পালটে ফেলবে। দেখতে ভালো ছিলেন না ওয়াইল্ড। কিন্তু তাঁর কথায় ছিল উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য, যা সবাইকে অভিভূত করত, তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করত। সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই তাই তিনি ছিলেন সমাজের আকর্ষণীয় এক ব্যক্তি।

একদিনের একটা গল্প। ছোট্খাটো একটা মানুষ তাঁর দরজায় এসে হাজির, 'ট্যাক্সের জন্যে এসেছি স্যার?'

ওয়াইল্ড রাজোচিত ক্ষোভে বললেন, 'ট্যাক্স ট্যাক্স কেন?'

—'সে কি স্যার আপনি এই বাড়ীর মালিক। এখানে থাকেন আপনি, এখানে ঘুমোন আপনি!'

—'তা ত' ঠিক, তবে ঘুম ত' আমার ভাল হয় না এখানে!'

আরও একটা গল্প। ফুলের দোকানে গেছেন ওয়াইল্ড। আবেদন ও'র জানলা থেকে ফুলগুলো সরাবার।

—'নিশ্চয় স্যার, নিশ্চয়। কতগুলো আপনার চাই?'

—'ধন্যবাদ আমার চাই না ফুল। জানলা দিয়ে দেখে মনে হল নিজেদের দেখিয়ে দেখিয়ে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

লণ্ডনে খ্যাতি কুড়িয়েছেন অস্কার। আমেরিকা পর্যটন করবার সময়ও তাই। মার্কিন কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে তিনি যে সামান্য তিনটি কথা বলেছিলেন, তা আজও মুখরোচক প্রেস নিউজ হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি তাঁর একমাত্র সম্পত্তি নিজের কাছে আছে বলে ঘোষণা করেছিলেন, সে সম্পত্তি হল, 'শুধু আমার প্রতিভা!' আমেরিকা সফরে গিয়ে ওয়াইল্ড মার্কিন ব্যবসায়ী ধরনের জীবনযাত্রার ওপর সরস কটাক্ষপাত করতেও ছাড়েননি।

গল্পের যাদুকর ও নাট্যকার অস্কার ওয়াইল্ডের শেষজীবনে কিছুটা অস্বাভাবিকতা তাঁর খ্যাতিকে খণ্ডিত করেছে সত্য, তবু কথারসিক অস্কার ওয়াইল্ড জীবনের চল্লিশটা বছর তাঁর সাহিত্যে, তাঁর আচরণে যে সৃষ্টিশীল রসিক মানুষের ইতিহাস রেখে গেছেন, তা বিকৃতির লজ্জাকে নিঃশেষে ম্লান করে দিয়েছে।

আজকের দিনের সাহিত্যিকরা রাজনীতি-সচেতন হয়েছেন এও যেমন সত্য, তেমনি তাঁরা নিজেদের ও ভক্তদের পরিমণ্ডলেই আবদ্ধ থাকতে ততোধিক অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন, এও তেমনি সত্য।

আজকের কথাশিল্পীরা বিগত যুগের সেই বৈঠকী মেজাজ আবার ফিরিয়ে আনতে চাইবেন কিনা জানি না। কিন্তু এত বেশী বাজে কথায় আমরা নিজেদের জীর্ণ থেকে জীর্ণতর করে তুলছি, তাতে কথার মত কথা বলিয়েদের আমরা আবার আমাদের নাগালের মধ্যে পেতে চাই, যাতে আমাদের প্রাত্যহিক সাংস্কৃতিক জীবনে একটা সুরুচির প্রশান্তি এসে লাগে।

জানি না আমি যা বলতে চেয়েছি তা বোঝাতে পেরেছি কিনা, তবে এ বিষয়ে আশা করি সবাই একমত হবেন

রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ আমরা, সংস্কৃতি জিনিসটা যে সত্যিই আসলে এ দেশ থেকে বিদায় নিচ্ছে, তা আমাদের কথা বলার রকম-সকম দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়। যেটুকুও বা আছে, তাও জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই এ দিক থেকে উদ্যোগ আজ সবিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

আর এ উদ্যোগ নিতে হবে সংস্কৃতির নায়কদেরই!

বিচিত্র দেশ : বিচিত্র মানুষ

অতীন্দ্র মজুমদারের

॥ আদম-ইভের ভাষাভাষী ॥

নোহ্-র কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। সেই যে বৃদ্ধ ধার্মিক ঈশ্বরভক্ত অতি-অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ, যাঁকে অনেকটা আমাদের বশিষ্ঠ মুনির মত দেখতে, কেবল পরনের আলখাল্লাটা বাদ। হাজার হাজার বছর আগে মানুষের উচ্ছৃঙ্খলতা, ঈশ্বর-বিরোধিতা এবং আরো নানারকম কুকাজের বোঝায় পৃথিবীটা যখন পাপে পূর্ণ হয়ে গিয়ে সৎ, ভদ্র এবং ধার্মিক মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে দাঁড়ালো তখন ঈশ্বর মানুষের ওপর ভয়ানক চটে গিয়ে তাদের ধ্বংস করে ফেলবেন স্থির করলেন। কেবল একজন লোকের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি ধার্মিকপ্রবর এবং ঈশ্বরভক্ত নোহ্। ঈশ্বর নোহ্‌কে আদেশ দিলেন পৃথিবীর সমস্ত জীবিত প্রাণী কীট পতঙ্গ পাখি গাছ লতা গুল্মের পুরুষ এবং নারীর এক জোড়া করে বেছে নিয়ে একটি বিরাট জাহাজ বানিয়ে তাতে আশ্রয় নিতে। নোহ্ সেই অনুযায়ী এক বিরাট কাঠের জাহাজ বানিয়ে সমস্ত প্রাণীর এক জোড়া করে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ঈশ্বর আনলেন বৃষ্টি। এক নাগাড়ে সাত দিন ধরে মুষলধারায় বৃষ্টি চলল, নদী খাল বিল পুকুর পূর্ণ হয়ে গিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে প্রলয়নৃত্য শুরু করল—পৃথিবীর সমস্ত কীট পতঙ্গ প্রাণী জীব জন্তু মানুষ সেই জলে ডুবে মরে নিজেদের পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করল। কেবল সেই অকূল পাথারে ভাসতে ভাসতে চলল নোহ্-র 'আর্ক' এবং সেই আর্কের মধ্যে এক জোড়া করে প্রাণী।

সাতদিন পর বৃষ্টি থামল। তারও সাতদিন পরে নোহ্ তাঁর আর্ক থেকে একটি ঘুঘু পাখি ছেড়ে দিলেন, আকাশে ঘুরপাক খেয়ে উড়তে উড়তে একটা চলমান বিন্দুর মত সেই ঘুঘু অসীম দিগ্‌বলয়ে মিলিয়ে গেল। ভোর থেকে সকাল, তাপর দুপুর, দুপুর শেষ হয়ে বিকেল এবং বিকেল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যা হয় হয়, ঘুঘু তখন শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে আর্কের জানালায় এসে বসল। নোহ্ বুঝলেন, বৃষ্টি থামলেও ডাঙা এখনও দেখা দেয়নি। ঘুঘু তাই ফিরে এসেছে।

কিছুদিন পর আবার তাকে দিলেন উড়িয়ে। দিনান্তে সে ফিরে এল একটি কচি ডাল মুখে নিয়ে। বোঝা গেল জল থেমে গেলেও আশ্রয় নেবার মত স্থান এখনও ঘুঘুটা পায়নি। তারপর শেষবার যখন তাকে ছাড়লেন আরও কিছুদিন বাদে—সে আর ফিরে এল না। নোহ্ বুঝলেন এখন জল ছেড়ে মাটিতে নামা যেতে পারে।

আর্কের দরজা খুলে নোহ্ নেমে এলেন মাটিতে। জোড়া জোড়া প্রাণীদের মুক্তি দিলেন ঈশ্বরের আদেশ মত—তারা আবার বংশ বৃদ্ধি করতে লাগল। এই-ভাবে সৃষ্টি আবার নোহের কৃপায় জম-জমাট হয়ে উঠল। নোহ্ যদি এই সব মানুষ, প্রাণী, কীট-পতঙ্গের দম্পতিকে আর্কে না রাখতেন, তাহলে আমরা সবাই কবে শেষ হয়ে যেতুম, ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে আমাদের রক্ষা থাকতো না।

আপনারা সবাই হয়ত ভাবছেন এই মহাপ্রাণ নোহের বংশধরদের কোন পরিচয় পৃথিবীতে হয়ত নেই, অথবা থাকলেও তারা যে কারা, কোথায় থাকে, কি করে, তাদের নাম কি, তাদের বর্তমান হালচালই বা কি—এ সব খোঁজা বৃথা, কারণ তারা কবে মরেধরে শেষ হয়ে গেছে। এ রকম ভাবলে আপনি মহা ভুল করবেন। কারণ পৃথিবীতে, এই বিংশ শতাব্দীর স্পুতনিকের যুগেও, একদল মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের মহামতি নোহের সোজাসুজি বংশধর বলে মনে করেন। আফ্রিকার কোনো সুর্যহারা অরণ্যের অধিবাসী তাঁরা নন, বোর্ণিওর গাঢ় বাদামী বৃক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন মায়া-পুরীতেও তাঁরা বাস করেন না—করেন সুসভ্য য়ুরোপের একটি সুসভ্যতর এলাকায়, ফ্যাশানের জন্মভূমি ফ্রান্সের পীরেনাজ পর্বতমালার সানুদেশে ও উত্তর-মধ্য স্পেনের সীমান্তে।

এঁরা বলেন,—নোহ্-র পুত্র জ্যাফেথের পঞ্চম পুত্র তুবালের এঁরা সোজাসুজি বংশধর। 'ব্যারেলের স্তম্ভ' নির্মিত হবার আগেই তুবাল য়ুরোপে আসেন—এবং তিনিই তাঁর বংশ উৎপাদন করেন আমাদের এখানে—আমরা সেই তাঁর ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনিদের থেকে এসেছি। শুধু তাই নয়, তিনিই আমাদের স্বর্গোদ্যান ইডেনের খাঁটি ভাষা শিখিয়ে গেছেন; সেই ভাষা—যে ভাষায় আদম ইভকে প্রেম নিবেদন করতেন—একমাত্র আমাদের কাছেই সেই পবিত্র ভাষা সংরক্ষিত আছে এবং আমরা এখনও সেই ভাষাতেই কথা বলি।

আদম-ইভের ভাষাভাষী এই মানব-গোষ্ঠীর নাম বাস্ক জাতি। আগেই

সমুদ্রের ধারে বাস্ক মহিলা

বলেছি এ'রা দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের এবং মধ্য স্পেনের উত্তরভাগে রুক্ষ পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করেন। গাঢ় ধূসর বর্ণের পীরেনীজ পর্বতমালার নিম্নভাগে ছোট ছোট শ্যামল কার্পেটের মত বিস্তৃত তৃণভূমি, সেখানে এই বাস্কদের বসতি টুকরো টুকরো গ্রামে— শাদা দেওয়াল আর লাল টালির ছাদ দেওয়া বাড়িতে। স্পেনে যে সব বাস্ক বাস করেন তাঁদের বসতিও প্রায় একই রকম, অবশ্য তাঁদের ভাষা এবং গোষ্ঠীগত বিশেষত্ব এ'দের থেকে নিশ্চয় আলাদা।

এই বাস্কদের উৎপত্তি যে কবে এবং কোথায় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে সঠিকভাবে কিছুই এ পর্যন্ত জানতে পারা যায়নি। এ'দের ভাষাও য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর কারো সঙ্গে এক বিন্দু মেলে না। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন এ'রা য়ুরোপের প্রাচীনতম মানবগোষ্ঠী—প্রস্তর যুগ থেকে এ'রা নিজেদের বিশেষত্ব নিয়ে এখনও পর্যন্ত য়ুরোপের নানা বিবর্তনের মধ্যেও টিকে আছেন। এখানে অবশ্য বলে দেওয়া উচিত, এ'রা এখনও যে প্রস্তরযুগের মানবসভ্যতার স্তরে আছেন তা নয়—এর অর্থ প্রস্তরযুগের মানুষ থেকে এ'দের উৎপত্তি এবং তার প্রমাণ আছে এ'দের শারীর গঠনে, এবং ভাষাতেও।

বাস্করা নিজেদের বলেন, 'এসকুয়াল-ডুনাক' এবং নিজেদের দেশকে 'এসকুয়াল-হেরিয়া'। এই নামেই এ'রা নিজেদের এবং নিজেদের দেশের পরিচয় দিতে ভালোবাসেন। এ'দের শরীরের গঠন, সামাজিক রীতি-নীতি, ভাষা—সব কিছুতেই এ'দের গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য এবং গোঁড়ামী প্রকট।

য়ুরোপে মোট কত সংখ্যক বাস্ক আছেন তার সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও এটুকু জানা গেছে তাঁদের সংখ্যা এক লক্ষের কাছাকাছি। এ'দের মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বাস করেন স্পেনের গুইপুজকোয়া, আলাভা, নাভারা এবং ভিজকেৎ প্রদেশে আর বাকীরা বাস করেন ফ্রান্সের লাবুর্দ, বাসে নাভারে এবং শোল প্রদেশে—শেষ প্রদেশটি 'বাসে পীরেনীজ' এলাকার অন্তর্গত।

বাস্কদের উৎপত্তির সঙ্গে য়ুরোপের প্রস্তরযুগের মানুষের সম্বন্ধ খুঁজে বের করার ব্যাপারে তাঁদের ভাষা একটি প্রধান সূত্র। বাস্কদের ভাষায় এসকুয়ার কথাটির অর্থ পাথরের তৈরী ছেদনযন্ত্র। এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় তাদের মাথার খুলির গঠন এবং রক্তের ওপর যার সঙ্গে আদিম য়ুরোপীয় জনগোষ্ঠীর সাদৃশ্য বিস্ময়কর। এই রক্তধারার সঙ্গে য়ুরোপের কোন প্রান্তীয় অংশ—যেমন আয়ারল্যাণ্ডের কোন কোন অংশ, উত্তর ওয়েলস্‌, স্কটল্যাণ্ড এবং আইসল্যাণ্ডের মানুষের রক্তের মিল

বাস্ক ধীবর

আছে। এই সাদৃশ্য থেকে কোন কোন নৃবিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আদিকালে য়ুরোপে যে মানবগোষ্ঠী বসবাস করত, বাস্করা তাদের শেষ বংশধর। নিজেদের উৎপত্তি ব্যাপারে তাঁদের ধারণা যে কাহিনীতে আগে বিবৃত হয়েছে—এতেও পরোক্ষে তাঁদের প্রাচীনত্ব সমর্থিত হয়। অবশ্য 'তুবালের বংশধর' বলে নিজেদের চিহ্নিত করার পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই, আছে নিছক কাহিনী মাত্র। কিন্তু এই কাহিনীই বা নিজেদের সম্বন্ধে সগর্বে কজন বলতে পারে!

এবার চলুন আমরা ফরাসী বাস্ক্‌দের বসতি থেকে ঘুরে আসি। ডোভার থেকে স্টীমারে চড়ে আসবেন ফ্রান্সে, সেখান থেকে মোটরে ফ্রান্সের বালুময় 'ল্যাণ্ডেজ' অতিক্রম করে যেতে হবে 'বেয়নে'র দিকে—উত্তর দিক থেকে বাস্ক্‌ বসতিতে যেতে হলে সেটাই সব চেয়ে সোজা রাস্তা। শুকনো পোড়ো জমি, জলা জায়গা, শুকনো ঝোপ এবং দিগন্ত বিস্তৃত ফার্ণের ঝালর পার হতে হতে দেখবেন লম্বা লম্বা পাইন গাছ, তার শাখায় ঝোলানো পাত্র—তাতে পাইনের আঠা জমানো হচ্ছে, তা দিয়ে তারপেন-তাইন্ তৈরী হবে। বাস্ক্‌দের বসতিতে গিয়ে যে আড্ডা জমাবেন, সেটা ভাবতে ভালো, কিন্তু কাজে কঠিন—তার প্রধান প্রতিবন্ধক বাস্ক্‌দের ভাষা। আপনি যে ভাবছেন বাস্ক্‌দের ভাষা এস্‌কুয়ারা খুব চট্‌ করে শিখে যাবেন, সেটি হচ্ছে না, কারণ যে-কোন বিদেশীর পক্ষেই বাস্ক্‌দের এস্‌কুয়ারা বহুদিন চেষ্টা করেও সঠিকভাবে শিখে নেওয়া সম্ভব নয়। স্বয়ং রোড্‌নি গ্যালপ, যিনি বাস্ক্‌দের সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ, ১৯৩০ সালে যাঁর বিখ্যাত গবেষণা 'A Book on the Basques' য়ুরোপের নৃবিজ্ঞানী মহলে বিরাট চাঞ্চল্য এনেছিল—তিনিই বলেছেন, "To think in Basque requiries an entirely different attitude of mind." এস্‌কুয়ারা ভাষা কি রকম তার একটা সহজতম নিদর্শন দিই। ধরা যাক, আপনি ইংরেজিতে বলতে চান—I give the beret to the man এই সহজ সরল বাক্যটি এস্‌কুয়ারাতে দাঁড়াবে,—সেই ভাষার হুবহু ইংরেজি অনুবাদ করলে—

'Beret-the-man-the-to in-the-act-of-giving I-have-it-to-him!'

আদমের কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করতে হয় যখন আমরা বাস্ক্‌দের মারফৎ জানতে পারি এই রকম

বাস্ক লোকনর্তকের বাদক

হপ্‌-স্কিপ্‌ করা ভাষায় তিনি অবলীলাক্রমে তাঁর হৃদয়েশ্বরীর কাছে প্রেম নিবেদন করতেন!

আপনি আমি তো সাধারণ মানিষ্যি, স্বয়ং শয়তানকে পর্যন্ত বাস্ক্‌দের ভাষা শিখতে গিয়ে কী নাকাল হতে হয়েছিল—সে গল্প তো এখনও বলা বাকি আছে।

আপনি বেয়নের দিকে যেতে যেতে পথে পাবেন 'পবিত্র প্রেতের সেতু'—the Bridge of the Holy Ghost—আদুর নদীর ওপরে, নিভের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। এই সেতুর নামের সঙ্গেই শয়তানের নাকাল হওয়ার কাহিনী জড়িয়ে আছে।

জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়ে শয়তান তো আদম-ইভ্‌কে ইডেন উদ্যান থেকে তাড়িয়েছেন। হাতে অনেকদিন কোন কাজকর্ম নেই। শয়তানের খেয়াল হল, আচ্ছা দেখে আসি তো আদম-ইভের বংশধররা এখন কি করছে। ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পড়ল বাস্ক্‌দের রাজ্যে। কিন্তু মুশকিল, এদের মধ্যে ধার্মিক যাঁরা, তাঁদের প্রলোভিত করতে হলে তো এঁদের ভাষা শিখতে হবে। শয়তান তো কোমর বেঁধে লাগল এস্‌কুয়ারা শিখবার জন্য। কিন্তু আদম-ইভ্‌ যা পারেনি, তাদের বংশধররা তাই করল। বাস্ক্‌দের ভাষা শিখতে গিয়ে সাত সাতটি বছর শয়তান সেখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে কি হবে, তার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না। এই হপ্‌-স্কিপ্‌ করা ভাষার ধাক্কায় শয়তানকে একদিন এদেশ ছাড়তে

বাধ্য হতে হল। প্রাণভয়ে ভীত শয়তান এই সেতুর গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় —প্রাণে অবশ্য সে বাঁচলো, কিন্তু সাত বছরের দিবারাত্রি পরিশ্রমে সে-বেচারা যে দুটি বাস্ক কথা শিখেছিল 'বাই' এবং 'এজ্' (হ্যাঁ ও না) সে দুটি কথাও মাথার ফোকর থেকে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। স্বয়ং শয়তানের যখন এই হাল তখন আপনার কি অবস্থা হবে সহজেই বুঝতে পারছেন!

আদুরের নদীর নীল ঠাণ্ডা জলে আপনি দেখতে পাবেন সেণ্ট মেরীর ঘোরানো সিঁড়ির বিরাট গীর্জা—ত্রয়োদশ শতাব্দীর গথিক গঠন আপনাকে জানিয়ে দেবে একদিন এই অংশ বৃটেনের অধীনে ছিল। এখনও বেয়নের চেহারায় সেই ইংরেজি প্রসাধন আছে, ফরাসীদের অধীন হলেও তার প্রভাব এখানে কম। স্পেনীয় বাস্কদের মধ্যেও ইংরেজের প্রভাব লক্ষণীয়—আর তাদের কাছে ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন তো একজন রীতিমত 'হীরো'। ১৮১৩ সালে এই ডিউকই নেপোলিয়নের সৈন্যদের স্পেন থেকে হঠিয়ে দিতে স্পেনীয় সৈন্যদের আন্তরিক সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ডিউক অফ-ওয়েলিংটনের জনপ্রিয়তা সেই রাজনৈতিক কারণে নয়; আসল কারণ, ডিউকের নাকের গঠন নাকি স্পেনীয় বাস্কদের মত—সেজন্যেই they regard his aristocratic nose as first cousin to their own distinctive facial feature. স্পেনীয় এবং ফরাসী বাস্কদের চেহারার মধ্যে সত্যিই একটা বিশেষত্ব আছে। চওড়া কপাল, গোল মাথার খুলি এবং চিবুকের কাছে ছুঁচলো মুখ, প্রশস্ত কাঁধ এবং য়ুরোপীয়দের তুলনায় কিছু বেঁটে কিন্তু শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ চেহারা, খাড়া নাক—তাদেরকে সত্যি সত্যি একটা আশ্চর্য বন্য পৌরুষে উজ্জ্বল করেছে। গ্রীকরা ছাড়া শারীর-সৌন্দর্যে বাস্কদের পুরুষের কাছে আর কোন য়ুরোপীয় দাঁড়াতেই পারবেন না।

বাস্কদের পোষাক বেশির ভাগই সুতীর গলাবন্ধ কোট এবং পাতলুন—মাথায় গোল টুপি (beret)। বাস্করা কখনও এই টুপি সহজে খোলেন না, এই টুপি তাঁদের জাতীয় পোষাকের অঙ্গ—খাওয়ার সময়ও মাথায় তাঁদের টুপি থাকে। টুপি তাঁরা খোলেন গীর্জায়, বিছানায় শোবার সময় এবং তাঁদের জাতীয় খেলা 'পেলোটা' খেলার সময়। পেলোটা অনেকটা টেনিসের মত একটা খেলা—তফাৎটা হচ্ছে তার র‍্যাকেট, বল এবং খেলার পদ্ধতি নিয়ে। পেলোটার র‍্যাকেট তৈরী হয় চেস্‌নাট কাঠের ফালি, বেত এবং বাছুরের চামড়া দিয়ে, গোল হাতার মত দেখতে এই র‍্যাকেটের বাস্ক নাম 'চিস্‌তেরা'। চেসনাটের কাঠ দিয়ে হয় র‍্যাকেটের কাঠামো, বেত দিয়ে হয় র‍্যাকেটের স্ট্রিং এবং বাছুরের চামড়া দিয়ে হয় র‍্যাকেট ধরার দস্তানা, খেলোয়াড়ের হাতের মাপ অনুযায়ী। বল হচ্ছে কাঠের, ওপরের আবরণ ছাগলের চামড়া, অনেকটা ক্রিকেটের বলের মত, বড় ওজন সাত আউন্স মত—ক্রিকেট বলের চেয়ে অনেক ভারী। কোর্ট লম্বা এক ফালি জমি—তার প্রান্তে কংক্রিটের বা পাথরের দেওয়াল, মাটির থেকে এক গজ উপরে সেই দেওয়ালে আড়াআড়ি একটা দাগ। দু'জন দু'জন ক'রে ডাবল্‌স্ বা একজন ক'রে সিঙ্গল্‌স্ গেমের খেলোয়াড় সেই দাগের ওপর দেওয়ালে প্রচণ্ড জোরে চিস্‌তেরা দিয়ে বলটাকে মারেন, দেওয়ালে আঘাত খেয়ে ফিরে আসার পর প্রতিপক্ষ আবার তাকে দেওয়ালের দিকে মারেন—এইভাবে খেলা চলতে থাকে। মার্কার নীচে বল মারলে প্রতিপক্ষের পয়েণ্ট, আবার দেওয়াল থেকে আঘাত খেয়ে ফিরে আসার সময় বলটাকে আবার দেওয়ালের দিকে ফিরিয়ে না দিতে পারলেও প্রতিপক্ষের পয়েণ্ট। দারুণ উত্তেজনার এই পেলোটা খেলায় কেউ হেরে গেলে যেভাবে কোর্টে তার 'পতন ও মূর্চ্ছা'—এবং বিজয়ীর উল্লাস চিৎকার আকাশ বিদীর্ণ করে দেয় তাতে কারো সন্দেহ থাকে না এই পেলোটার মত প্রিয় বাস্কদের আর কিছু নেই।

বাস্কদের এই উল্লাসচিৎকার বা যুদ্ধনিনাদ একশ' বছর আগেও শত্রুর হৃৎকম্প জাগাতো। এই বিংশ শতাব্দীতেও সেই যুদ্ধনিনাদ তারা ভোলেনি। এই যুদ্ধনিনাদ শুনে একজন পর্যটকের কি মনে হয়েছিল সেটুকু তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারছি না—

—"beginning as a derisive laugh, it changed to a horse's shrill neigh' then to a wolf's howl, and ended like the expiring notes of a jack-ass's bray."

যুদ্ধনিনাদে ঘোড়া, নেকড়ে বাঘ এবং মদ্দা গাধার চিৎকারের একটা সম্মিলিত আওয়াজ থাকলেও এমনিতে বাস্করা কিন্তু অত্যন্ত সরল এবং সৎ লোক। পথের ধারে টাকা ভর্তি থলে রেখে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, সে টাকা আপনার ব্যাঙ্কে থাকার মতই নিরাপদে আছে—প্রাণ গেলেও সেই টাকা কেউ কোনদিন ভুলেও ছোঁবে না। সরল লোক এবং সুপুরি গাছে মিল হচ্ছে একবার দুমড়ালে আর সোজা হতে চায় না—বাস্করাও তেমনি একবার বিগড়ে গেলে সহজে শান্ত হয় না, কিন্তু অশান্ত হলেও খুনখারাপী সেখানে মুখের কথা নয়। কোনদিনই যে তারা মাথাগরম ছিল না তা নয়, বহুকাল আগে তাদেরকে য়ুরোপের সবচেয়ে হিংস্র গোষ্ঠী বলা হত। বাস্কদের দেশে সন্দেহজনক বিদেশীর সহজে পরিত্রাণ ছিল না, এমনকি তিনি তাদের স্বধর্মী খৃষ্টান পাদ্রী হলেও নয়। বিস্কে উপসাগর এবং পীরেনীজ পর্বতমালার মাঝখানে তারা শান্তিতেই বাস করত। কিন্তু য়ুরোপের শিল্প-বিপ্লবের পর, বিদেশীরা তাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না স্থির করল—ফ্রান্সের রাজশক্তি চায় বিস্কে উপসাগরের তীরে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি থাকবে তাদের অধীনে, ইংলণ্ডও চায় তাই; অন্যরা তো আছেই। এ অবস্থায় বাস্কদের হিংস্র না হয়ে উপায় কি ছিল? বিদেশীদের সম্বন্ধে সেই যে তাদের সন্দেহ ঢুকে গেছে এখনও তা নেই তা বলা যায় না। আবার একবার যদি কোন বিদেশী তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে, নিজেদের কথায় কাজে এবং ব্যবহারে যদি বাস্কদের মর্যাদা একটুও ক্ষুণ্ণ না করে তবে তাদের মত সারাজীবনের বিশ্বস্ত বন্ধু আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তাদের শপথ বেদবাক্যের মত অলঙ্ঘনীয়।

বাস্ক লোকনর্তক

পূর্বের সেই হিংস্রতা এখন আছে তাদের পেলোটা খেলায় এবং লোকনৃত্যে।

বাস্কদের এই লোকনৃত্য সত্যিই নয়নবিমোহন। যেমন সুন্দর তার পোষাক তেমনি তার নাচের পোষাক। টকটকে লাল জ্যাকেট, চিত্রিত বর্ণাঢ্য টুপি, শাদাকালোয় ভাগ-করা আটসাঁট পাজামা, ঢোল এবং বাঁশির সমবেত সংগীতে এমন প্রাণময় বলিষ্ঠ লোকনৃত্য য়ুরোপের স্লাভ অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ। এদের ঢোল এবং বাঁশি এক-জনই বাজায়—বাঁ হাতে আড়বাঁশি, ডান হাতে ঢোল, একই সঙ্গে দু'হাতে সুর এবং তাল রাখা অত্যন্ত কঠিন। নাচতে নাচতে শূন্যে লাফিয়ে ওঠা কুর্দিক লোকনৃত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিবাহে এবং পেলোটা খেলার পর বিজয়োৎসবে এই লোকনৃত্যানুষ্ঠান বাস্কদের করতেই হবে। স্পেনীয় বাস্ক-দের মধ্যে নৃত্য ছাড়াও একটা প্রাণান্তক আমোদ আছে। প্রতি বছর জুলাই মাসে একদিন তারা রাজপথে খ্যাপা ষাঁড়ের পাল ছেড়ে দেয়—ষাঁড়ের পাল উন্মত্ত হয়ে পথচারীদের তাড়া করে আর পথচারীরা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ায়—এতে শিশু মহিলা বৃদ্ধরা পর্যন্ত সোৎসাহে যোগ দেয় যদিও আহতদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি হয়!

বাস্কদের এখন জীবিকা পশু পালন এবং কৃষিকাজ। ভেড়ার লোম এরা এত সুন্দর বাছাই করতে পারেন যে, য়ুরোপের বাজারে বাস্কদের পালিত ভেড়ার লোমের সবচেয়ে বেশি কদর। বাস্করা তিন চারশো বছর আগে বিস্কে উপসাগরে তিমি শিকারও করেছেন—এখন মাছ শিকারেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। পাহাড়ের উপত্যকায় এ'দের গম চাষ আমাদের দেশের আলমোড়া অঞ্চলের চাষের পদ্ধতির (জুম চাষের) সমধর্মী। এ'দের চাষের সময় সবাই সারিবদ্ধ সৈনিকের মত ক্ষেতে যান—সার বেঁধে সবাই দাঁড়ান—তারপর দলনেতার হুকুম হলেই একসঙ্গে সবাই মাটিতে লাঙল দিয়ে আঘাত করেন। লাঙল বলতে কাঁটা চামচের মত দু'ফলা মুখ-ওয়ালা কাঠের ডাণ্ডা। তালে তালে সেই ডাণ্ডা-লাঙল দিয়ে এ'রা জমি চাষ করেন আনন্দে।

একটা জিনিস ভারি আশ্চর্য। বাস্ক-দের পরিচয় কিন্তু তাদের পরিবারের নামে নয়, বাড়ির নামে। ব্যক্তিগতভাবে কোন বাস্কের পরিচয় অমুকের ছেলে অমুক নয়, অমুক বাড়ির মালিকের বা মালু-কিনের ছেলে বা মেয়ে হিসাবে। ডোঙ্গেৎস্-এর ভাই সোর্জাবেল—এ বললে বাস্করা চিনবে না,—বলতে হবে উর্রুগ্নের ডোঙ্গেৎস্ বাড়ির ছেলে সোর্জাবেল! এর কারণ বাস্কদের কাছে নিজের বাড়ি, এক টুকরো চাষের জমি এবং জন্মভূমির চেয়ে প্রিয় কিছু নেই। সেজন্যে তাদের পরিবার সর্বদা যৌথ পরিবার—সবার সম্পত্তিতে সমান অধি-কার। বাড়ির কর্তা মারা গেলে একক-ভাবে কেউ উত্তরাধিকারী হতে পারেন না, সম্পত্তি বিক্রি করতেও কেউ পারেন না। কর্তার বড় ছেলেই যে উত্তরাধিকারী হবেন এমনও নিয়ম নয়—তিনি খুব জোর কে উত্তরাধিকারী হতে পারেন এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন, এই পর্যন্ত। অবশ্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ফরাসী ও স্পেনীয় বাস্করা এই আইন কিছুটা বদলাতে পেরেছেন—কিন্তু তাও খাস বাস্কভূমিতে খাটে না।

বাস্কদের বাড়ির গায়ে আবার তাদের নিজের ভাষায় ভারী সুন্দর সুন্দর কথা লেখা থাকে। যেমন—"অতীত আমাকে বঞ্চনা করেছে—বর্তমান আমাকে করছে পীড়িত—ভবিষ্যৎ আনছে আমার জন্যে শঙ্কা।" এটি ১৭০৭ সালে একটি বাড়ির গায়ে ক্ষোদিত হয়েছিল। আরেকটি—"ক্লান্ত লোকের বাড়িতে অপ্রত্যাশিত অতিথির মত আর কিছু বোঝা হতে পারে না।" অন্য একটি বাড়ির গায়ে লেখা কথাটি সবচেয়ে সুন্দর—"সারা-জীবন মানুষকে ঘুষি মারছে ঘণ্টাগুলো, সব শেষ ঘুষিটাই তাকে কবরের মধ্যে ঠেলে দেয়!"

বোধহয় এজন্যেই বাস্করা মৃত্যু সম্পর্কে দার্শনিক মনোভাব পোষণ করে। বাজে-পোড়া মৃত একটি পাইন গাছের সামনে দাঁড়িয়ে একজন যখন একটি বৃদ্ধ বাস্ককে প্রশ্ন করেছিল—'এই গাছটি কি আবার বাঁচবে? আবার এর সবুজ পাতার ছায়ায় আমরা কি বিশ্রাম নিতে পারব?'

বৃদ্ধ বাস্ক সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে-ছিল—জানি না। কিন্তু আমি অনেকদিন বেঁচেছি—অনেক, অনেক দিন!'

এবং সেজন্যেই বোধহয় এ'রা য়ুরোপের মলিন আকাশের নীচে এখনও শান্ত চিত্তে বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন।

সেকালের নগর সংকীর্তন

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানের খাতায় প্রায় সব অলি-গলির নামকরণ হয়ে তালিকাভুক্ত হয়েছিল অনেকদিন আগে। কিন্তু তাছাড়াও সেকালের কলকাতার বাসিন্দাদের কাছে অধিকাংশ পল্লীর আর একটি করে আটপৌরে নাম ছিল। যেমন আহিরীটোলা, কাঁসারীপাড়া, বেনেপাড়া, হাড়িপাড়া, যুগীপাড়া, ইত্যাদি, যদিও এই সব আটপৌরে নাম থেকে অমুক পাড়া লেন বা রোড প্রভৃতি হয়ে আজও সেইসব পুরাতন পল্লীর স্মৃতি বহন করছে। সেকালে আহিরীটোলা বলতে বোঝাত উত্তর কলকাতার বিরাট এলাকা। কাঁসারীপাড়া বলতে বোঝাত বর্তমান শ্রীমানি বাজারের কাছ থেকে সিমলা অঞ্চল নিয়ে চিৎপুর পর্যন্ত অলি-গলিবিস্তীর্ণ স্থান। ঠিক সেই-ভাবেই জেলেপাড়া বলতে বোঝাত বহুবাজারের এক পল্লীঅঞ্চলকে। এই সব অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময় নগর-সংকীর্তন বার হতো। যেমন ৫০।৬০ বছর আগে আহিরীটোলা থেকে মকর-সংক্রান্তির দিন বার হতো নগর-সংকীর্তনঃ

"বন্দে মাতা সুরধুনী
পুরাণে মহিমা শুনি
পতিতপাবনি পুরাতনী।"
—ইত্যাদি

প্রায় ৭০।৭৫ বছর পূর্বে সিমলা কাঁসারীপাড়ায় অনেকগুলি পাঠশালা ছিল। গুরুমহাশয়ের কাছে ছেলেরা লেখাপড়া শিখতো আর প্রতিবছর মকর-সংক্রান্তির দিন পাঠশালার ছাত্ররা দলবদ্ধ হয়ে বাদ্যযন্ত্র এবং নিশানাদি নিয়ে গঙ্গার স্তব গাইতে গাইতে গঙ্গাস্নানে যেত। ছাত্রদের সঙ্গে পল্লীর বয়স্করাও যোগ দিতেন। নগর-সংকীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠতো কাঁসারীপাড়া। নিম্নলিখিত গান তিনটি সেই উদ্দেশ্যে কাঁসারীপাড়ার বিভিন্ন পাঠশালার জন্য ১২৯৩ সালে রচিত হয়েছিল।

১

(রাগিণী বাহার—তাল দোলন)

"এ মা, জহ্নু-কন্যা জগৎ মান্যা,
তব গুণে ধরা ধন্যা, পতিত পাবনি!
ত্রিপুরারি-জটা হ'তে ত্রিধারা রূপে
ত্রিপথে, ত্রিপুর তারিণি!
করুণাময়ি মা। ত্রিতাপ হারিণি"
—ইত্যাদি

২

(তাল ঢিমা তেতালা)

"স্বয়ি গো মা কাল-ভয়-বারিণি-তারিণি!
শমন দমন, কারণ পাবন জীবন রূপিণি!
প্রবল বিমল জল চপল তরঙ্গে,
সরঙ্গে মিলিতাঙ্গ জলনিধি সঙ্গে,
সগর-সন্ততি উদ্ধার প্রসঙ্গে,
তারিলে ত্রিলোক হ'য়ে সুরধুনী!"
—ইত্যাদি

৩

(তেওট)

'তার মা তারিণি।
সুখদা, মোক্ষদা, জ্ঞানদা, ওং হ্রীঁ বরদা,
ভক্তিপ্রদা, মুক্তিপ্রদা সুরধুনী।"
—ইত্যাদি

সেকালে বহুবাজার থেকে বাগবাজার পর্যন্ত বহু স্থানে দোলযাত্রার দিন যে-সব নগর-সংকীর্তনে গান গাওয়া হতো সেই সব গানের মধ্যে এই গানটিও শোনা যেত। এই গানটি লিখেছিলেন প্রায় শতবর্ষ পূর্বেকার কাকওয়ালা "রূপচাঁদ পক্ষী"। গানটির কিয়দংশ উল্লেখ করলাম:—

"হোরি খেলিছে শ্রীহরি, সহ রাধা প্যারী,
কুঙ্কুম-ধুম, শ্যাম অঙ্গ ভরি॥
পুষ্পমালা, হিন্দোলা সাজায়ে ব্রজনারী,
রাইশ্যাম, অনুপম, দোলে তদুপরি॥
নব নব সখীগণ, আনি চুয়া চন্দন,
গোলাব সহিত আবিরী;
ঐ ঐ রসময়ী, শ্যামের বামেতে ঐ,
যুগলরূপ রস-কূপ, হের নয়ন ভরি॥
উড়ে আবির গোলাল, বৃন্দাবন লালে লাল,
লালে লাল কেশিঘাট, লালে লাল বংশীবট,
জাবট কালিন্দীতট, গোবর্ধন গিরি॥"
—ইত্যাদি

সেকালে কোন পল্লী থেকে দোল-যাত্রা উপলক্ষে, কোথাও রামনবমীর দিনে, কোথাও শারদীয় পূজার পূর্বে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রসহ নগর-সংকীর্তনের দল বার হতো। তাছাড়া সেকালের কলকাতায় বিভিন্ন পল্লীতে ছিল "হরিসভা"। হরিসভার আয়োজনে হতো অষ্টপ্রহর সংকীর্তন। তাছাড়া হরিসভা থেকে নগর-সংকীর্তন বার হতো।

এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করা দরকার যে, সেকালে কলকাতার পথের দুদিকেই ছিল খোলা নর্দমা। পানীয় জলের জন্য নির্ভর করতে হতো বাড়ীর কুয়া কিম্বা পল্লীর পুকুরের জলের ওপর। সেকালে কলকাতার চারিদিকে ছিল অসংখ্য পুকুর ও ডোবা। ঝোপ-ঝাড়ে ভরা। কলকাতার চারিদিকে তখন আধা-শহর আধা-গ্রামের পরিবেশ। গ্রীষ্মকালে বহু পুকুরের জল শুকিয়ে যেত। সেই কারণে জলের জন্য হাহাকার পড়তো। শুধু তাই নয়, জলও দূষিত হয়ে উঠত। এককালে লালদীঘির জল যাতে দূষিত না হয় সেই কারণে দীঘির পাড়ে পুলিশ মোতায়েন থাকতো। এবং লালদীঘির জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা হতো। সেকালে ভাল

ডাক্তার বা কবিরাজের যথেষ্ট অভাব ছিল। বিভিন্ন পল্লীতে বসন্ত, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি রোগ ব্যাপক আকারে দেখা দিলে হতাশায় ব্যাকুল হয়ে মানুষ যখন বাঁচার কোন পথ খুঁজে পেত না সেই সময় দেবতাকে স্মরণ করতো। সেই কারণেও বার হতো নগর-সংকীর্তন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে (১২৯৩ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) তারিখে কলকাতা শহরে মহাসমারোহে নগর-সংকীর্তন বার হয়েছিল। এই সংকীর্তন সেকালের একটি স্মরণীয় ঘটনা। সে কারণে প্রথমে এর গোড়ার কথা কিছু বলা দরকার।

একদা কলকাতা শহরে বহু 'কালীস্থান" ছিল। "কালীস্থান" অর্থাৎ যেখানে কালীমূর্তির সামনে ছাগ বলি দিয়ে সেই মাংস বিক্রি করা হ'তো। সেই স্থানকে বলা হ'তো "কালীস্থান"। যেহেতু উক্ত মাংস শুদ্ধ মাংসরূপে গণ্য হ'তো।

১৮৭৭ থেকে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতার পৌর-কর্তৃপক্ষের কাছে অনেকগুলি আবেদনপত্রে জানানো হয় যে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশহেতু এই সব কালীস্থানের মাংস বিক্রী করা অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হোক্। এর ফলে তৎকালীন পৌরসভা এই প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দেবার জন্য আইনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় যে, মাত্র সেইসব "কালীস্থান"গুলি যেখানে নিয়মিত কালী উপাসনা হয় সেইসব দেবালয় উক্ত আইনের এলাকার বাইরে। কিন্তু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতার মিউনিসি-প্যালিটির কমিশনারগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, যদি অখাদ্য মাংস বিক্রি করা বন্ধ করতে হয় তাহ'লে সব 'কালীস্থান' নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। এবং সব কালীস্থানেই যেন পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা থাকে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে উক্ত আইনের একটি উপধারা জারি করা হয়। যার ফলে কমিশনারগণের বিনা-অনুমতিতে কালীস্থানগুলিতে ছাগ বলি বন্ধ হয়। এবং তৎকালীন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা (Health Officer) এই বিষয়ের তদারক করার জন্য বহুলোককে নিযুক্ত করার খরচের ভয়ে অনুমতিপত্র দিতে একেবারেই রাজী হতেন না।

১৮৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, শহরের সব কালীস্থানগুলিকে দুইটি কেন্দ্রে একত্র করা হোক। একটি কেন্দ্র শহরের উত্তর-দিকে এবং অপরটি শহরের পূর্বদিকে স্থাপিত হোক। সেখানে প্রথানুযায়ী এবং পৌর-কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ছাগ বলি দেওয়া যেতে পারে। প্রস্তাব করা হয় যে, তার জন্যে ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে দুটি গৃহ নির্মিত হোক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ঐ পাড়ারই একটি অঞ্চলের বাসিন্দারা আবেদনে তীব্র আপত্তি জানান। বাড়ী তৈরির পরিকল্পনাটি বর্জিত হয়। প্রকৃত কালীমন্দির এবং তার বলিস্থানের সঙ্গে তথাকথিত 'কালীস্থান' যা নাকি কসাই-খানার নামান্তর মাত্র, এদের মধ্যে পার্থক্যই স্বীকার করা হয়। কিন্তু পরিদর্শকমণ্ডলীর পক্ষে কোনটি যে আসল দেবীস্থান এবং কোনটি যে আসলে কসাইখানা তা নির্ণয় করা বহুক্ষেত্রেই অসম্ভব ছিল। ফলে পৌরসভার আইনটি শেষপর্যন্ত খাটেনি।

"কালীস্থান" নিয়ে সেকালে সারা কলকাতা শহরে এক বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। তার পরিচয় আমরা সেকালের সংবাদপত্র থেকে জানতে পারি। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন ইংরাজী সংবাদপত্র "হিন্দু পেট্রিয়ট"-এর (The Hindu Patriot) ১০ই মে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ তারিখের সম্পাদকীয় কলমে লেখা হয়েছিল। উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখার কিয়দংশ মর্মানুবাদ প্রদত্ত হলো:—

"কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের কসাইখানার বিরোধিতা প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম যে, রক্ষণশীল হিন্দুগণ এই স্থানের মাংস খাইতে আপত্তি করিবেন। কারণ তাঁহারা মাত্র বলিদত্ত ছাগের মাংস আহার করেন। জনৈক কমিশনার অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই যুক্তি খাটে না। যেহেতু কর্পোরেশনের আইনে এই বিষয় সবিশেষ ব্যবস্থা আছে। তিনি বলেন যে, এই পরিকল্পিত কসাইখানায় কালীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং দৈনিক পূজার জন্য ব্রাহ্মণ পূজারী নিযুক্ত হবেন এবং একজন হিন্দু কামারকে ছাগ ও ভেড়া ঠিক কালীপ্রতিমার সম্মুখে যথাবিধি বলি দিবার জন্য নিযুক্ত করা হইবে। যদি এইরূপ বন্দোবস্ত করা ঠিক হয় তাহা হইলে আমাদের আপত্তি প্রত্যাহৃত করিব। কিন্তু আপত্তি করার হেতু যে ইহা হয়তো ঘটিয়া উঠিবে না।"

রক্ষণশীল হিন্দুগণের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, কালীমন্দির ও কসাই-খানাকে তালগোল পাকিয়ে এক করানো যেন না হয়। মাংস বিক্রি হবে এই উদ্দেশ্যেই কালীমন্দিরে বলি দেওয়া হয় না। বলি হয় পূজার এক বিশিষ্ট অঙ্গ রূপে। কসাইখানাকে কালীস্থান বললে কসাইখানা কালীমন্দিরে রূপা-ন্তরিত হয় না। এবং কসাইখানা সুষ্ঠু-রূপে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাতে চলতে পারে তার জন্যে নিয়ম প্রণয়ন ও প্রযোজ্য করা হোক।

অধিকাংশ হিন্দু এর বিরুদ্ধে সভা

ও দরখাস্ত প্রভৃতির দ্বারা আন্দোলন চালাতে থাকেন। পরে কর্পোরেশনের উক্ত প্রস্তাব রহিত করতে সমর্থ হন। সিমুলিয়া ভট্টাচার্যের বাগান যেখানে সেটি প্রতিষ্ঠিত হবার প্রস্তাব ছিল সেই স্থান থেকে ২৪শে মে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বার হয়েছিল নগর-সংকীর্তন। মহা সমারোহে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেকালের মানুষ গান গেয়েছিলেন:—

(বাউলের সুরে—তাল একতালা)

"আয়রে ভাই সবাই মিলে, বাহু তুলে,
হরি ব'লে নাচি চল!
সহরে কসাই-কালী-জবাই বলি-
ঢলা ঢলি যত ছিল;
শ্রীহরির কৃপা-বশে, এক বাতাসে, তুলার
মতন উড়ে গেল।
যত সব ষণ্ডামার্ক, ঘোর বিপক্ষ, কুতর্ক
জাল পেতেছিল;
তারা সেই কসাই-কালী-কলির চেলা -
চণ্ডকালী লাভ তাইতে হ'লো।"
ইত্যাদি

[উপন্যাস]

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

।। আঠারো ।।

চোখ ট্যারা, একটু তোতলা, হাসলে মাড়ি বেরিয়ে পড়ে; বাঁড়ুজ্জেমশাই কমাতে যত চেষ্টাই করুন, মাথার টাক আর চোখের কোণে ক্লান্ত রেখা দেখে এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে করুণাময়ের বয়েস পঁয়ত্রিশের নীচে নয়। তবু এর চাইতে সুপাত্র কোথায় প্রত্যাশা করতে পারেন গৌরাঙ্গবাবু? তৃপ্তির রূপ আছে এ-কথা ঠিক। কিন্তু গরীবের সুন্দরী মেয়েকে তার দুর্ভাগ্য থেকে উদ্ধার করবার জন্যে এখন আর রূপকথার রাজপুত্র এসে দেখা দেয় না—তার বদলে অমলের দল এসে ভিড় করে। লেখাপড়া জানা থাকলে হয়তো স্ত্রীকে দিয়ে চাকরি করানোর আশায় কোনো শিক্ষিত পাত্র এগিয়ে আসত, কিন্তু সেদিক থেকেও তৃপ্তির কোনো ভরসা নেই। কাজেই করুণাময়ের চোখ যেমনই হোক, টাকটা যতই চকচক করুক, বয়েসের ব্যবধানটা সতেরো-আঠারো যাই হোক—গৌরাঙ্গবাবুর প্রায় ধন্য হয়ে যাওয়ার কথা।

ধন্য হয়েছেন কিনা বোঝা যায়নি, কিন্তু ক্ষুন্ন যে হননি তাতে সন্দেহ নেই। বয়েস আর চোখের দিকটা বাদ দিলে করুণাময়কে খুব খারাপ লোক বলে মনে হয় না। সরল, শান্ত, বিনীত। করুণাময় স্ত্রীকে ভালোবাসবে, কোনো দিন এ-কথা ভাববে না যে তৃপ্তিকে সে দয়া করে উদ্ধার করে এনেছে—বরং নিজেই কৃতার্থ হয়ে যাবে। এই ধরণের চরিত্র প্রভাত আরো দেখেছে, করুণাময়কে চিনতে পেরেছে সে।

কিন্তু তার চাইতে বড়ো কথা আছে। করুণাময়ের নিজের একটি বাড়ী রয়েছে। হয়তো তা রাজপ্রাসাদ নয়—তা হলে নিশ্চয়ই সে ডাক্তার মজুমদারের ছোট ডিসপেন্সারিতে কম্পাউণ্ডারের চাকরি করত না। প্রভাত তার বাড়ীটি কল্পনা করতে পারে। দুখানি টিনের ঘর, সামনে একটি ছোট বাগান, তাতে কয়েকটি দোপাটি ফুটেছে আর একধারে মাচার ওপর ঘন সবুজ লাউয়ের ডগা হাওয়ায় কাঁপছে। তবু নারকেলডাঙার এই জীবন থেকে সেখানে তার মুক্তি—খাঁচা থেকে আকাশে মুক্তি। করুণাময় বড়লোক নয়—তৃপ্তিও তো গরীবেরই মেয়ে।

বাইরে দুপুর জ্বলছে—ঘরে গুমোট গরম। নিজের বিছানাটায় চিৎ হয়ে শুয়ে গলার নীচে দর দর করে ঘামতে ঘামতে আর প্রাণপণে হাত-পাখা চালাতে চালাতে এই সব তত্ত্বচিন্তাতেই মগ্ন ছিল প্রভাত। অভয় এই দুপুরেই কোথায় বেরিয়ে গেছে, বোধ হয় বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবার জন্যেই তাকে ডেকে নিয়ে গেছেন বাঁড়ুজ্জে। গৌরাঙ্গবাবুর ঘর থেকে কাকিমার গলার একটা গুন গুন আওয়াজ আসছে—স্বামী-স্ত্রীও নিশ্চয় বিয়ের কথাই ভাবছেন। তৃপ্তির কোনো সাড়া নেই— সে হয়তো দীপ্তির একফালি ঘরটুকুতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে কোথাও।

শুধু একটা জিনিশই বেসুরো ঠেকছে প্রভাতের। তৃপ্তির বিয়ের আয়োজন চলেছে, অথচ দীপ্তি পড়ে রয়েছে হাসপাতালে; তার কথা কেউ ভাবছে না, একটিবার তার নামও কেউ করেনি—সে যেন এই পরিবার থেকে চিরকালের মতো মুছে গেছে।

কিন্তু কী হবে তারই বা এ-সব নিয়ে দুশ্চিন্তা করে? হাতের পাখাটা অসতর্কভাবে একবার ঠক করে মুখে এসে লাগল, যন্ত্রণায় চমকে উঠল প্রভাত, জিভের গোড়ায় নোনতা স্বাদ লাগল একটু—কোথাও রক্ত পড়ছে দাঁত দিয়ে। কয়েক সেকেণ্ড নিজের রক্ত আর যন্ত্রণার স্বাদ নিলে সে, তারপর ভাবল, তারও সময় হয়ে গেছে—এখন এ বাড়ী ছেড়ে তাকেও চলে যেতে হবে। তৃপ্তির পরিত্রাণে তারও মুক্তি, যে বাঁধনটাকে কিছুতেই কাটাতে পারছিল না, আপনিই ছিঁড়ে যাচ্ছে সেটা। তৃপ্তির বিয়েটা পর্যন্ত হয়তো অপেক্ষা করতে হবে—তারপর যে-কোনো একটা মেসে, যেখানে হোক সে চলে যেতে পারে।

নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু বুকের ভেতরে এমনভাবে টনটন করে উঠবে এইটেই আগে তেমন করে বোঝা যায়নি। যে রাণীকে নিয়ে প্রথম চোখে স্বপ্ন জেগে-ছিল—তার পর যে রাণী তার কাছে সবচেয়ে বড়ো দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছিল—তারই করুণ কিশোরী রূপের একটি ঝলক এসে পড়েছিল তৃপ্তির মুখে। তবু সে ভালো করে কখনো তৃপ্তির কথা ভাবতে পারেনি—এক ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে একটা অন্ধকার গাছ যেন দৈত্যের মতো ডাল-

পালার হাজার হাত বাড়িয়ে তার পথ আগলে রাখত।

সেদিন রাণীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। কিংবা হঠাৎ দেখাও নয়—কলকাতার পথে এমনি কত চেনা-মানুষের ছবি পড়ে—কখনো পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া, কখনো দুটো একটা কথা বলা। আশ্চর্য হয়ে প্রভাত অনুভব করেছিল, রাণী তার পরণের শাদা থান আর ক্লান্ত চোখ নিয়ে কখন সেই চেনা-মানুষের ছবির ভিড়ে মিশে গেছে, আর তাকে আলাদা করে দেখবার দরকার নেই।

রিনি কাঞ্জিলাল—সেই অসহ্য পাগল মেয়েটা—তাকে ঠাট্টা করে চটাতে চেয়েছিল। কিন্তু রাণীর জন্যে বুকের ভেতরে তো আর দোলা লাগেনি। প্রভাত বুঝেছিল, চিরকালের মতো একটা ছেদ্ চিহ্ন পড়ে গেছে কোথাও—রাত্রির সেই অন্ধকার গাছটার বিভীষিকাকে রাণীই যেন সরিয়ে দিয়ে গেল।

পেছনের সীটে বসে সাপের মতো গর্জন করছিল রিনি : মিথ্যেবাদী—লায়ার। কাউকে ভালোবাসতে পারেন না আপনি। দরকার হলে দুম্ করে একটা বিয়ে করে ফেলতে পারেন এই পর্যন্ত। ভালোবাসার জন্যে একটা কাল্‌চার দরকার হয়—সে শিক্ষা কোথায় পাবেন আপনারা? বাবার মতো বিশ্ব-প্রেমিকেরাই আপনাদের লাই দিয়ে মাথায় তোলে, নইলে আপনারা যে মেণ্টালি কত ইন্‌ফিরিয়র—

মুখে ফেনা তুলে আরো কী কী বলেছিল রিনি। কিন্তু তার বাপের কথা যেমন সে কখনো সম্পূর্ণ শোনে না, তেমনি রিনির বক্তৃতাও তার ভালো করে কানে যায়নি। শুধু চোখের সামনে তৃপ্তি দেখা দিয়েছিল তখন। রিনির দেওয়া বাদামের প্যাকেট থেকে যে মিষ্টি গন্ধটা ছড়াচ্ছিল, সেটা তৃপ্তিকেই মনে করিয়ে দিচ্ছিল বার বার। একটা অসম্ভব কল্পনা রূপ নিচ্ছিল ধীরে ধীরে : কারখানার মজুর অভয়ের বোনকে চাইতে পারা একজন মোটর-ড্রাইভারের পক্ষে এমন কি একটা দুঃসাহসের কাজ?

কিন্তু স্বপ্নটা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। বুদ্বুদ ফাটল হাওয়ায়। এখন একেবারে নিশ্চিন্ত।

প্রথমে একটা হিংস্র ক্রোধ জেগে উঠেছিল করুণাময়ের ওপরে। ইচ্ছে হয়েছিল ওই বোকাটে টেকো লোকটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে রাস্তার ওধারে যে আবর্জনার স্তূপ জমে রয়েছে, তারই মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেয় সে। কিন্তু আস্তে আস্তে সেটা শান্ত হয়ে এসেছে। করুণাময়ের বাড়ী আছে—তার জীবনে একটা শান্তির ছোট আশ্রয় আছে। আর সে তো স্রোতের শ্যাওলা—আজ এখানে কাল সেখানে তার ভেসে বেড়ানো। তৃপ্তিকে নিয়ে সে কোথায় রাখবে? একবার মনে হয়েছিল তার প্রস্তাব শুনলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হবেন গৌরাঙ্গবাবু, এখন বুঝতে পারছে করুণাময়ের সামনে তার দাম কানাকড়ি।

না—করুণাময়ের ওপর তার রাগ নেই। তৃপ্তি সুখী হোক।

প্রভাত অনুভব করল, সারা শরীর দিয়ে ঘামের স্রোত নামছে তার—যেন কতগুলো কীট কিলবিল করে হেঁটে বেড়াচ্ছে তার গালে কপালে। একবার হাত-পাখাটাকে সে খুঁজল। সেটা মেজেয় পড়ে গেছে, কুড়িয়ে নিতে উৎসাহ আর খুঁজে পেলো না।

এইবারে এ বাড়ী তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। হয়তো কলকাতাও। এই ভিড়, এই কোলাহল আর তার ভালো লাগে না। কাঞ্জিলাল সাহেবের বাড়ীর চাকরিটাও আর যে বেশিদিন করা চলবে এমন মনে হচ্ছে না এখন। সাহেবের সম্পর্কে তার কিছু বলবার নেই—কিন্তু তাঁর মেয়েটিই তাকে তাড়িয়ে ছাড়বে।

আচ্ছা, রিনি সত্যি সত্যি কী চায়? কেন এমনভাবে বিরক্ত করে তাকে?

ঘরের ভেজানো দরজায় আওয়াজ হল একটা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল প্রভাত। আস্তে আস্তে দরজা খুলল, নিঃশব্দ পায়ে ঘরের ভেতরে পা দিলে তৃপ্তি।

প্রভাত নড়ে উঠল। এতক্ষণ যেন তৃপ্তির জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। মন বলছিল, তৃপ্তি আসবে।

তৃপ্তি এল। প্রভাতের বিছানার সামনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ডাকল : প্রভাতদা।

প্রভাত জবাব দিলে, বলো। জেগেই আছি।

তৃপ্তি তক্তপোষের একপাশে বসে পড়ল। প্রভাত দেখল তার চোখ দুটো লাল। কাঁদছিল মেয়েটা।

—আমাকে তোমরা জলে ভাসিয়ে দেবে প্রভাতদা?

প্রভাত চুপ করে রইল। তৃপ্তির করুণাময়কে পছন্দ হয়নি। না হওয়া অসম্ভব নয়—ওর বয়েস অল্প। অনেক দুঃখের ভেতরেও এখনো ওর আশা আছে, এখনো স্বপ্নের ভেতরে ওর মনে রাজপুত্রেরা আসে যায়।

—আমি ওই লোকটাকে কিছুতেই বিয়ে করব না—তৃপ্তির ধরা গলার প্রতিবাদ শোনা গেল।

কী সান্ত্বনা দেওয়া যায়? কিছুই মুখে জুগিয়ে উঠল না।

—বুড়ো, বিশ্রী দেখতে—বোকা! ওর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি গলায় দড়ি দেব, দেখে নিয়ো।

প্রভাত উঠে বসল। বিড়ি ধরালো একটা।

—কই, কিছু বলছ না যে প্রভাতদা?

প্রভাত একবার তাকিয়ে দেখল তৃপ্তির দিকে। লাল টক টক করছে চোখ—নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। এতক্ষণ একা একা কাঁদছিল। বাবা-মা-বড়দার সামনে একটা কথা বলবারও সাহস নেই—প্রভাতের কাছেই দাবিটা জানাতে এসেছে। কিন্তু অনেক দূরের একটা ছাড়া-ছাড়া সম্পর্ক থাকলেও প্রভাত যে এ বাড়ীতে পেয়িং গেস্ট্ ছাড়া আর কিছুই নয়, তৃপ্তি কি সে কথাটা জানে না?

তার বলবার কিছু নেই। তবু জবাব দিতে হল।

—দেখাই যাক্ না। একটা কথাই তো হয়েছে কেবল। কথা হলেই বিয়ে হয় না।

—তুমি বড়দাকে জানো না। ভীষণ গোঁ। যা ধরবে করে ছাড়বে।

—আচ্ছা, আমি বলে দেখব অভয়কে।

—আমার নাম করবে না তো?

—না—না—বিড়ির ধোঁয়া ছড়িয়ে প্রভাত ক্লান্তভাবে হাসল : আচ্ছা, কি রকম পাত্র তোমার পছন্দ? সুশ্রী, অল্প বয়েস, লেখাপড়া জানে, একটু ভালো রোজগার করে—এমনি একজন কেউ এলে খুশী হবে তো?

তৃপ্তির মুখের ঘন মেঘে আলো পড়ল একটুখানি, গালে রং ধরল একবার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিবে গেল সেটা।

—আমার কিছু দরকার নেই—তোমায় ফাজলামো করতে হবে না। দিদিরই বিয়ে হল না এখনো—

—দীপু বিয়ে করবে না এখন। চাকরি করছে কিনা।

—ছাই করছে!—তৃপ্তি জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে : আমায় তুমি ছেলেমানুষ ভাবছ—তাই না? কিছু বুঝতে পারি না আমি? অনেক রাতে বাড়ী ফেরে, মদ খেয়ে আসে, নোটের তাড়া থাকে ব্যাগের ভেতরে। দিদি গোল্লায় যাচ্ছে প্রভাতদা—একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আগে তো ওরই বিয়ে দেওয়া উচিত।

প্রভাত চুপ করে রইল। তৃপ্তির মনের অর্ধেকটা এখনো আশা রাখে, এখনো স্বপ্ন দেখে; কিন্তু বাকী আধখানা সংসারের ছোঁয়ায় এর মধ্যেই কঠিন, গম্ভীর আর সজাগ হয়ে গেছে।

—দিদির বিয়ে হোক, আমায় ছেড়ে দাও তোমরা।

তৃপ্তি বললে, দিদির বিয়ে হোক, আমায় ছেড়ে দাও তোমরা।—লাল চোখ দুটো আবার ভিজে এসেছিল, শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বললে, আমি যদি তোমাদের এতই ভার হয়ে থাকি, আমাকে বিদায় করে দিলেই তো মিটে যায়। শুনেছি মেয়েদের জন্যে সরকারী আশ্রম আছে। সেখানে থাকা-খাওয়া দেয়, সামান্য খরচা দেয়, নানারকম হাতের কাজ শেখায়। ওই রকম কোনো একটা জায়গায় আমায় ভর্তি করে দাও না। তোমার তো জানাশুনো অনেক আছে।

জানাশুনো প্রভাতের কিছুই নেই—সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত ডিউটি দিয়ে কিছুই জানবার মতো সুযোগ তার ঘটে না। কাঙ্গিলাল সাহেবের কথা মনে পড়ল একবার। সন্ধ্যাবেলায় 'বার' থেকে বেরিয়ে আসবার পর যখন তিনি দেশের মানুষের জন্যে অঝোরে কাঁদতে থাকেন, সেই সময় তাঁকে বললে একটা ব্যবস্থা হয়তো হয়েও যেতে পারে।

—আচ্ছা, খুঁজে দেখব।

—না, খোঁজা নয়।—তৃপ্তি প্রভাতের বাঁ হাতখানা চেপে ধরল এবার : উদয় ভিলায় কথা বলে সবাই। অনেক মেয়ে আছে ওখানে। আমাকে নিয়ে যাবে একবার?

—কাকাকে জিজ্ঞেস করে দেখব।

—না, বাবাকে নয়। বাবা যেতে দেবে না আমায়। বারান্দায় পর্যন্ত একটু দাঁড়াতে দেয় না—জানো? যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল করে। তুমি একবার খবর নিয়ে এসো। তারপর আমি লুকিয়ে—

—কিন্তু মা-বাপের মত না থাকলে ওরা ওখানে তোমায় ভর্তি করবে?

—পালিয়ে যাব।—আবার ঘন ঘন শ্বাস পড়তে লাগল তৃপ্তির : বলব, আমার মা-বাবা কেউ নেই।

প্রভাত চমকে উঠল। তৃপ্তিকে আর ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্ছে না এখন। চোখ দুটো জ্বলছে উত্তেজনাতে, সুন্দর মুখখানা কঠিন আর বিকৃত হয়ে এসেছে।

—ওসব পাগলামি করতে নেই তিপু। ভারী বিশ্রী হবে ওসব।

—বিশ্রী হবে!—তক্তপোষ ছেড়ে সোজা দাঁড়িয়ে উঠল তৃপ্তি, উত্তেজিত লাল চোখ দিয়ে তার আগুন ছুটল। তীক্ষ্ম গলায় বললে, বুঝেছি, তুমিও ওই দলে। তুমিও চাও, ওই বিশ্রী বুড়োটার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক। বেশ, তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না—নিজের রাস্তা আমি নিজেই খুঁজে নেব।

ধড়াস করে একটা আওয়াজ হল দরজায়। ঘরে ঢোকবার সময় তৃপ্তি সেটা ভেজিয়ে এসেছিল, এক আছাড়ে খুলে ফেলেছে অভয়।

তৃপ্তির মুখ ছাইয়ের মতো কালো হয়ে গেল। কী বলতে যাচ্ছিল প্রভাত—ভুলে গেল কথাটা। আর মুহূর্তের জন্যে, মাত্র মুহূর্তের জন্যেই একটা সন্দেহের ছায়া দুলে গেল অভয়ের মুখের ওপর দিয়ে, দুজনের দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি ফেলল সে। অভয় এখন আর পৃথিবীর কাউকেই বিশ্বাস করে না।

শুকনো গলায় প্রভাত বললে, এসো অভয়। আমি তিপুর সঙ্গে গল্প করছিলুম।

অভয় ঘরে ঢুকল। তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে কঠোর গলায় প্রভাতকে বললে, করুণাময়ের সঙ্গেই ওর বিয়ের কথাটা পাকা করে এলুম প্রভাতদা। আর বারো দিন পরেই—তেসরা আষাঢ়।

একটা অব্যক্ত আর্তরব বেরুল তৃপ্তির গলা দিয়ে। তারপরে আহত জন্তুর মতো সে ছুটে পালালো ঘর থেকে। অভয় কিছুক্ষণ স্থির হয়ে চেয়ে রইল সেদিকে।

প্রভাত আবার বিছানায় বসে পড়েছিল। অভয় কাছে এগিয়ে এল।

—তিপু কী বলছিল তোমাকে প্রভাতদা?

হাতের বিড়িটা নিবে গিয়েছিল, সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে প্রভাত। অভয়ের কোঁচকানো ভুরুতে সে সন্দেহটা থমকে রয়েছে, সেটাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। সত্যি কথাটাই বলা দরকার।

শুকনো গলায় প্রভাত জবাব দিলে, বলছিল করুণাময়কে ওর পছন্দ হয়নি।

—পছন্দ হয়নি!—দাঁতে দাঁতে ঘষল অভয় : ওই কটা চামড়ার পেত্নীর জন্যে

এখন লাটসায়েব বর ধরে আনতে হবে! একদম প্রশ্রয় দেবে না প্রভাতদা।

—প্রশ্রয় আমি দিইনি।

—তুমি দেবে না সে জানি।—অভয়ের একটা কিছু মনে পড়ে গেল ঃ ওই রাস্কেল আর তার পাঞ্জাবী ইয়ারটাই এর জন্যে দায়ী। নইলে ওর মুখে তো কোনোদিন কথা ছিল না।

এমনও সময় আসে—যখন বোবার মুখেও কথা ফোটে, পাথরও যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে—এইটেই প্রভাতের মনে এল। কিন্তু আপাতত তারও চাইতে বেশি করে জাগল কৌতূহল।

—কার কথা বলছ? অমিয়?

—আবার কে? সেই রাস্কেল আর তার বন্ধু চন্দন সিং।

—তাদের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

—সম্পর্ক আছে প্রভাতদা, সম্পর্ক আছে। সে অনেক কথা—আর একদিন বলব।—অভয় নিচের ঠোঁটটাকে প্রাণপণে কামড়ে ধরল একবার ঃ ওই দুটোকে খুন করতে পারলে তবেই আমার গায়ের জ্বালা মেটে। সে যাক। এখন বিড়ি দাও দিকি একটা। বাঁড়ুজ্জে বুড়োর বকবকানি দু ঘণ্টা ধরে শুনতে শুনতে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

অমিয়র মাথায় নেশা চড়ে গিয়েছিল। চোখের সামনে ঘরের আলোটা দুলছে, চন্দন সিংয়ের মুখটা একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেই আবার কতগুলো ভাঙাচুরো রেখায় মিলিয়ে যাচ্ছে। তবু সেই আচ্ছন্ন মস্তিষ্কের ভেতরেও কথাগুলো সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

—তা কী করে হয় চন্দন সিং?

—কেন হয় না দোস্ত?

—তিপুকে তুমি বিয়ে করবে?

—ক্ষতি কী! আজাদ-হিন্দুস্তানে বাঙালী-পাঞ্জাবী-মারাঠী-মাদ্রাজী সব এক। এখন তো হরদম হচ্ছে।

অমিয়র মাথাটা আস্তে আস্তে নুয়ে পড়ছিল টেবিলের ওপর ঃ কিন্তু আমার মা-বাপ, ভাই—

—কেন গররাজী হবে? তুমি বুঝিয়ে বলবে তাদের।

—বুঝিয়ে বলব?—এক ধাক্কায় নেশাটা কেটে গেল অমিয়র ঃ ওরে বাবা! মাথা ভেঙে ফেলবে যে আমার!

—মনে জোর করতে হবে দোস্ত।—চন্দন সিং হাসল ঃ তোমাকে এত ভালোবাসি বলেই তো তোমার সঙ্গে একটা পাকাপাকি সম্পর্ক করে নিতে চাইছি। তোমার ট্যাক্সির সব ব্যবস্থা করে দেব, তুমি যাতে পায়ের ওপর ভর দিয়ে মরদকা মাফিক মাথা তুলে দাঁড়াতে পারো, তার সব ভার আমি নেব। তোমার মা-বাপের কোনো কষ্ট থাকবে না। সবটা ভালো করে ভেবে দেখো।

অমিয় যেন একরাশ অতল অন্ধকারের মধ্যে পথ হাতড়াতে লাগল। সব ফাঁকা হয়ে এল চোখের সামনে।

—তুমি বাড়ী চাও, গাড়ী চাও, বড়লোক হতে চাও—সম্মোহনের ভঙ্গিতে চন্দন সিং বলে চলল ঃ সব হবে তোমার। আমি তোমার কুটুম হলে সব পাঞ্জাবী লোগ তোমার পাশে থাকবে। তুমি—

অমিয় আর শুনতে পাচ্ছিল না। ফাঁকা চোখের সামনে একটা ড্রেসিংরুম রূপ নিচ্ছে আস্তে আস্তে। নানক সিংয়ের সাজানো ঘরটার চাইতেও তা সুন্দর। নরম গদী আঁটা দামী শোফায় বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছে সে—চায়ের পেয়ালাটা ইতালি থেকে আনা। হাতের কাছেই একটা কেক-ট্রে রয়েছে, যেটি খুশি তুলে খেতে পারে অমিয়। ড্রয়িংরুমের সামনেই রাস্তার ওপরে একটা প্রকাণ্ড প্লিমাথ গাড়ী দাঁড়িয়ে—ইলেকট্রিকের আলোয় তার নীল বডি আর স্টিলের অংশগুলো ঝকঝক করে জ্বলছে—অমিয়র নতুন গাড়ী। হঠাৎ পাশের শাদা টেলিফোনটা গুঞ্জন করে উঠল।

টেলিফোন গুঞ্জন করল না, দরজার কড়া নড়ল সশব্দে। যেন বাজের মতো আওয়াজ হল সশব্দে। চৌকিতে বসে ছিল চন্দন সিং—উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলে।

প্রথমেই দেখা গেল চাচার মূর্তি। দরজা জুড়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে।

মেঘমন্দ্র গলায় চাচা বললে, একঠো বাঙ্গালী লড়কী আয়ী।

—বাঙ্গালী লড়কী?

চাচা বললে, হাঁ। অমিয়কো ঢুঁড় রহী।

অমিয়র নেশার শেষ অংশটুকুও মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। নিদারুণভাবে চমকে উঠল চন্দন সিং।

—কোন্ সা লড়কী চাচা?

—এহি তো।

দরজা থেকে নিজের আড়ালটা সরিয়ে নিলে চাচা। আর তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠল অমিয়। চিৎকার করে বললে, তিপু!

তৃপ্তিই বটে। পরণে কালো পাড়ের আধ ময়লা শাদা শাড়ী, কাঁধে একটা কাপড়ের ঝোলা। নিদারুণ ভয়ে চোখ দুটো প্রায় বুজে রয়েছে তার, কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে গালের ওপর। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না, দরজার চৌকাট ধরে কোনো মতে দাঁড়িয়ে আছে।

টলমল পায়ে সেদিকে ছুটে গেল অমিয়। তৃপ্তির কাঁধ ধরে ঝাঁকনি দিলে একটা।

—তিপু—তিপু, তুই। কেমন করে এলি এখানে?

—বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি ছোড়দা।—শোনা যায় না এমনি অস্পষ্ট গলায় বললে, সবাই মিলে জোর করে আমাকে একটা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিল যে!

শেষ কথাটা অমিয় শুনতেও পেলো না।

—কেমন করে তোর এত সাহস এল তিপু? ঠিকানা পেলি কোথায়? কার সঙ্গে এলি?

—একাই এসেছি ছোড়দা। তোমার সুটকেসে একটা চিঠিতে ঠিকানা ছিল।

নিদারুণ ভয়ে অমিয় চিৎকার করতে লাগল ঃ কেন এ কাজ করলি তিপু? কেন এমন সর্বনাশ করলি? চল্—এক্ষুণি পৌঁছে দিয়ে আসি তোকে।

—আমি আর ফিরে যাব না ছোড়দা, আমাকে আর কোথাও—

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই চৌকাঠ থেকে হাত সরে গেল। তারপরে পা ভেঙে বসে পড়ল, তারও পরে শুয়ে পড়ল দরজার ওপর।

অমিয় প্রাণপণে ঝাঁকুনি দিতে লাগল তাকে ঃ তিপু—তিপু—

চন্দন সিং পাথর হয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। আর প্রায় নেপথ্য থেকে গন্ধমাদন পর্বতের মতো এগিয়ে এল চাচা। বলিষ্ঠ বিশাল বাহুর এক ঝটকায় অমিয়কে সরিয়ে দিয়ে সেই মেঘের মতো গমগমে গলায় বললে, ঝুটমুট্ চিল্লাতা কেঁউ? মালুম নেহি, বেহোঁস হো গয়ী?

তারপর একটা ছোট্ট পাখির মতো তৃপ্তিকে দু হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে এল বিছানার দিকে। চন্দন সিংকে একটা ধমক দিয়ে বললে ঃ কেয়া দেখ্ রহে হো উল্লু? পাখা খোল্ দো। ফুল ফোর্স্‌সে।

(ক্রমশঃ)

।। কাজ আরও সহজ হবে ।।

"আধুনিক বিমানের কলকব্জা একটুখানি বিগড়ে গেলেই বিমান-চালকের কুঠরিতে ছোট একটি লাল আলো জ্বলে ওঠে। লাল আলো চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমানচালক সাবধান হন এবং তাকে কি করতে হবে তা তিনি পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারেন। অদূর ভবিষ্যতে জার্মাণীর বিভিন্ন হাসপাতালেও বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানকক্ষ স্থাপন করা হবে। হাস-পাতালের নার্সরা 'এই সব কক্ষে বসে এক-সঙ্গে হাসপাতালের একাধিক কঠিন রোগীর তত্ত্বাবধান করতে সক্ষম হবেন।

ডিউটিরত নার্স অথবা ডাক্তার একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানকক্ষে বসেই হাসপাতালের বিভিন্ন ঘরে অবস্থিত রোগীর দেহের উত্তাপ, রক্তের চাপ, নাড়ীর গতি প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট নার্স সম্মুখস্থ যন্ত্রের বোতাম-টিপে দেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট রোগীর ছবি টেলি-ভিশনের পর্দায় ভেসে উঠবে। নার্স তখন নিজের আসনে বসেই রোগীর সঠিক অবস্থা জানতে পারবেন এবং প্রয়োজন হলে ডাক্তারকে খবর পাঠাবেন।

সম্প্রতি কোলনের প্রসিদ্ধ প্রদর্শনী কক্ষে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হাস-পাতাল প্রদর্শনীতে একটি যন্ত্র সকলকে আকৃষ্ট করে। মানুষ এই জটিল যন্ত্রটির নাম দিয়েছে 'ইলেকট্রনিক নার্স'। অদূর ভবিষ্যতে জার্মানীর প্রায় সব হাস-পাতালেই এই যন্ত্রটি দেখতে পাওয়া যাবে। যন্ত্রটি প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, যন্ত্রটির সাহায্যে নার্সরা সদ্য অস্ত্রো-পচার করা হয়েছে, এই ধরণের রোগীর দিকে সব সময় নজর দিতে পারবেন। এইভাবে এক-সঙ্গে প্রায় আটজন রোগীর তত্ত্বাবধান করা সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, মিউনিখে আজ হতে দশ বছর পরে একটি সর্বাধুনিক ও সর্ববৃহৎ হাস-পাতাল দেখতে পাওয়া যাবে। হাস-পাতালে যে সব যন্ত্রপাতি ও আসবাব-পত্র থাকবে, তা হবে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের সর্বশেষ কথা। প্রিফ্যাব্রিকেটেড অংশ জুড়ে জুড়ে এই বিরাট হাসপাতালটি গড়ে উঠবে। দরকারের সময় ঐ একই কৌশলে হাস-পাতালটি চটপট বাড়িয়ে নেওয়া চলবে। ভবিষ্যতের এই হাসপাতালে সমস্ত রোগীকে ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা হবে। অর্থাৎ "ইলেক-ট্রনিক নার্স'রা সমস্ত কাজ করে চলবে। রোগীর দেহে লাগান ইলেকট্রোড থেকে অনবরত রোগীর তাপ, হৃৎ-পিন্ডের ক্রিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের হার ও অন্যান্য আচরণ ইলেকট্রনিক পরিমাপ-নিয়ন্ত্রিত ও মণিটারিং যন্ত্রে রেকর্ড হবে এবং একই সঙ্গে ম্যাগনেটিক টেপে রেকর্ড হয়ে যাবে। রোগীর অবস্থা অনুযায়ী স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার কোন-রকম হেরফের হলেই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ-কক্ষে ঘণ্টা বেজে উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যরত নার্স ডাক্তারকে খবর দেবে। এই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষে বসে বসে সুইচ টিপলেই চিকিৎসক ও নার্সরা টেলিভিশনের পর্দায় প্রত্যেক
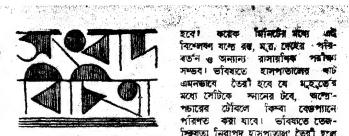
নতুন রঞ্জন-চিত্রগ্রহণ যন্ত্র

রোগীকে দেখতে পাবে এবং ইলেক-ট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্য পড়তে পারবে। ফলে ডাক্তারদের অনা-বশ্যক ব্যস্ত না থেকে গুরুতর পীড়িত রোগীদের তদারক করা সম্ভব হবে।

ভবিষ্যতে একটি ইলেকট্রনিক মস্তিষ্কের সাহায্যে রোগীর রোগ নির্ণয় হবে। এই মস্তিষ্কে পরিচিত বা জানা সব-রকম রোগের লক্ষণ মজুত আছে। রুগীর সামনে একটি পর্দায় প্রশ্ন ভেসে উঠবে। যেমন, "আপনার কি মাথা ধরে?" ঐ যন্ত্রে মাপা উত্তরের অনেক বোতাম আছে। যেমন 'হ্যাঁ', 'না', 'ভীষণ' 'সামান্য।' রোগী তার অবস্থানুযায়ী বোতাম টিপবে। নানা প্রশ্নের শেষে মুহূর্তের মধ্যে রোগ নির্ণয় সম্ভব হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে এই বিশ্লেষণ যন্ত্রে রক্ত, মূত্র, দেহের পরি-বর্তন ও অন্যান্য রাসায়নিক পরীক্ষা সম্ভব। ভবিষ্যতে হাসপাতালের খাট এমনভাবে তৈরী হবে যে মুহূর্তের মধ্যে সেটিকে স্নানের টবে, অস্ত্রো-পচারের টেবিলে কিম্বা বেডপ্যানে পরিণত করা যাবে। ভবিষ্যতে তেজ-স্ক্রিয়তা নিরাপদ হাসপাতাল' তৈরী হলে অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তার ফলে বায়ুমণ্ডল কলুষিত হলেও এই সব হাসপাতালে রোগীদের কোন ক্ষতি হবে না। বর্তমানে এই ধরণের একটি হাসপাতাল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মণ্টোগমারী শহরে তৈরী হচ্ছে।

দুনিয়ার বারোটি দেশের ৬৬১টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে। রোগীর চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করার ব্যাপারে কনরাড রন্টগেনের সময় থেকে জার্মাণী অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছে। কোলনের আন্তর্জাতিক হাসপাতাল প্রদর্শনীতেও জার্মানীকে এক অতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। প্রদর্শনীর 'ইলেকট্রমেডিসিন ও এক্সরে টেক-নিক' বিভাগে জার্মাণীর কোনো এক বিশ্ববিখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত রঞ্জন-যন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। এই যন্ত্রটির সাহায্যে রঞ্জন-চিত্রগ্রহণের জন্য কোনো অন্ধকারকক্ষের প্রয়োজন হয় না। দিনের আলোর মধ্যেও এই যন্ত্রটির সাহায্যে প্রয়োজনীয় চিত্রগ্রহণ সম্ভব। যে ভ্যাকিউয়াম ক্লিনারটি দেখতে পাওয়া যায়—তারও গুণ অনেক। যন্ত্রটির সাহায্যে শুধু যে ধুলো-বালি

পরিষ্কার করা, তাই নয়, যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরী যে, যন্ত্রটির অভ্যন্তরে সঞ্চিত ধূলো-বালির মধ্যস্থ জীবাণু অতি—বেগনি রশ্মির সাহায্যে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব। জার্মানীর কোনো এক বিখ্যাত শিল্প-কারখানা এই বিশেষধরণের ভ্যাকিউয়াম ক্লিনারটি প্রস্তুত করেছে। ডাক্তার এবং হাসপাতাল বিশেষজ্ঞগণ আশা করছেন যে, ভবিষ্যতে এই নয়া যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই হাসপাতালের আবহাওয়া জীবাণুমুক্ত করা সম্ভব হবে। ডাক্তার ও নার্সের পরিশ্রম এবং রোগীর জীবন বাঁচানোই এই সব আধুনিক যন্ত্রপাতির একমাত্র কাজ।

গত ২০ কুড়ি বৎসর ধরে চিকিৎসকরা খঞ্জকে হাঁটতে, পক্ষাঘাত-গ্রস্তদের অঙ্গ-সঞ্চালন করতে এবং মূককে কথা বলতে সাহায্য করে এসে-ছেন। এই চেষ্টা চলেছে নানাভাবে কখনও কখনও এ চেষ্টা আশ্চর্যজনক-ভাবে সফল হয়েছে।

ব্রিটিশ স্প্যাস্টিকস্ সোসাইটি এই ধরণের চিকিৎসায় সাফল্যের বহু দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে। রোগী প্রায় সম্পূর্ণভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কিন্তু সেই রোগী এইভাবে চিকিৎসার ফলে শিখতে পারে দাঁত দিয়ে বুরুশধরে বা পায়ের সংগে লাগান বুরুশ দিয়ে ছবি আঁকা, অথবা ওইভাবে সে শিখতে পরে কলম-ধরে মনের কথা সাজিয়ে লিখতে।

লণ্ডনের নিকটে লেটনের অধিবাসী শৌখিন বেহালাবাদক মিঃ হার্বার্ট লিওন এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে পরিচালনা করছেন একটি নতুন ধরণের চিকিৎসার স্কুল। এখানে তিনি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শারীরিক ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করছেন। তিনি অবশ্য বলেন এই কাজে সঙ্গীতের স্থান অপ্রধান, আত্ম-নিয়মানুবর্তিতা এবং একাগ্রতাই হ্যাণ্ডি-ক্যাপড্ বা স্বাভাবিক ক্ষমতাহীন ছেলেমেয়েদের প্রধান প্রধান সমস্যা পার হয়ে আসতে সাহায্য করে। সংগীত উপলক্ষ্যমাত্র। এই ধরণের চিকিৎসা

ইলেকট্রনিক নার্স

অকুপেশানাল থেরাপি বহু বৎসর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে রোগীর আগ্রহ এবং প্রবণতা বুঝে সেই বিষয়ের সাহায্যে তাদের অঙ্গের ত্রুটি দূর করার চেষ্টা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চেষ্টা বেশির-ভাগ সময়ই ব্যর্থ হয়েছে, তার ফলে রোগীর বিশেষ বিষয়ের ওপর আগ্রহও অনেক সময় হ্রাস পেয়েছে।

সম্প্রতি চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন একটি পরীক্ষার সাফল্য চিকিৎসকদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। 'ক্রিয়ে-টিভ থেরাপি' তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এই চিকিৎসা চালানো হচ্ছে—সৃজনী শক্তির প্রবাহভাণ্ডার থেকে গতিজনক শক্তি গ্রহণ করে। এই তত্ত্বের প্রয়োগ পূর্বেই হয়েছিল, কিন্তু এর ওপর ভিত্তি করে রোগ উপশমের চেষ্টা করা হয়, রোগ নিরাময়ের নয়।

ব্যবস্থা ব্রিটেনে মেডিকেল এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষগণের সমর্থন পেয়েছে। কেবল তাই নয় গুলবেনকিন ও কার্ণেগি ট্রাস্ট থেকে এই ধরণের চিকিৎসার জন্য এককালীন অর্থ সাহায্য পর্যন্ত এসেছে।

লণ্ডনের ওয়ালথামস্টো থেকে উইংফিল্ড ম্যাজিক ক্লাব অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড নর্দার্ন আয়ার্ল্যাণ্ড-এ মিঃ লিওন এবং তাঁর উৎসাহী-সহকর্মীরা প্রায় ৬০ জন স্বাভাবিক ক্ষমতাহীন শিক্ষার্থীর ওপর 'ক্রিয়েটিভ থেরাপি' বা সৃজনী-চিকিৎসা ব্যবস্থার এই আধুনিকতম পদ্ধতি প্রয়োগ কর-ছেন। এই সব শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেকে হল স্প্যাসটিক (স্বাভাবিকভাবে হাত বা পা চালাতে অক্ষম), পঙ্গু এবং হাঁপানিরোগগ্রস্ত। অন্যভাবে চিকিৎসায় সুফল না হওয়ার জন্য তারা এখানে চিকিৎসার জন্য আসে।

লণ্ডন, 'টাইমস' এই চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে একবার মন্তব্য করেন যে, 'এই নতুন পদ্ধতিতে কল্প-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, স্বেচ্ছাকর্মীরাও যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে এইদিকে কাজ করছেন।' এই কাজের সুফল বিস্ময়কর। অনেক অসাধ্য সাধিত হয়েছে এই চিকিৎসা ব্যবস্থাধীনে।

একটি হ্যাণ্ডিকাপ্ড শিশু, যে এই ক্লাবে একেবারে নতুন, তাকে প্রথম শেখানো হয় একটি বাদ্যযন্ত্র বাজানোর পদ্ধতি। তার ইচ্ছা অনুযায়ী এই বাদ্য যন্ত্র নির্বাচিত হয়ে থাকে; শিশুর যে সংগীত সম্পর্কে বিশেষ বা কোন রকম জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তার কোন মানে নেই। যে যন্ত্রটি সে ভাল করে বাজাতে পারে না বা যে যন্ত্র সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই সেই যন্ত্রই সাধারণত নির্বাচন করা হয়ে থাকে। মিঃ লিওন বলেন, শিশুর সমগ্র সৃজনীশক্তি শিশুকে অবশ বা শীর্ণ অঙ্গ বা কৃত্রিম অঙ্গকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

মিঃ লিওন বিশেষকরে একটি স্প্যাশটিক তরুণীর হাত-পা চালনার অক্ষমতা যেভাবে দূর করেন তাতে আশ্চর্যবোধ না করে উপায় নেই; মেয়েটি ঠিকমত কথা বলতেও পারত না, তার ওপর হাতে তার কোন জোর ছিল না। সংগীতের ছাত্রী হিসাবে তাকে গ্রহণ করা গেল না বটে, কিন্তু সে বেহালা বাজানোয় বিশেষ উৎসাহ দেখায়।

মিঃ লিওন বলেন, "কিছুদিন চিকিৎসা ব্যবস্থাধীনে থাকার পর মেয়েটি এসে কোনরকমে আমাকে জানায় যে সে বেহালা বাজানো শিখতে চায়। তার এ উৎসাহে আমিও উৎসাহিত হই। তাকে বেহালা বাজানো শেখাতে আরম্ভ করি।"

বছরখানেক পরে ক্লাবটি তার প্রথম কনসার্ট অনুষ্ঠান করে। মেয়েটি এই কনসার্টে মিঃ লিওনের সংগে বেহালা বাজায়। এখন সে পিয়ানো বাজানো শিখছে। তার কথাও অনেক স্পষ্ট হয়েছে। এমনকি সে ১৯৬১ সালের অগস্ট মাসে অন্য দশজনের সংগে প্রতিযোগিতা করে কমার্সিয়াল ক্লার্কের একটি চাকরিও যোগাড় করেছে।

মিঃ লিওন একবার নিজে এক দুর্ঘটনায় পড়ে তিনটি আঙগুল ব্যবহার করতে অসুবিধা বোধ করেন। এই অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংগীতে মনঃসংযোগ করে এই আঙগুল-গুলির স্বাভাবিক শক্তি তিনি ফিরিয়ে আনতে পারেন।

চার বেগম

আবদুল আজীজ আল্-আমান

বকুলপুরের গাছগাছালির গলা জড়িয়ে তখন বৈকালিক ধুলো-ধোঁয়ার একটা ঘন আস্তরণ কুয়াসার মত ঝুলতে শুরু করেছে। একটু পরেই ছায়া ছায়া অন্ধকার নামবে। গাছের ঘন পাতায় বিষণ্ণ সন্ধ্যা ঘনতর হ'য়ে উঠবে। তারপর দখিন পাড়ের বাঁশবন, তাল-দীঘির কালো পানী আর উত্তর পাড়ের বনশিউলীর ঘন ঝোপের ভেতর নতুন তৈরী কবরটার মধ্যে আর কোনই পার্থক্য রচনা করা যাবে না। দরকার হ'লে তখনো ঐ বনশিউলীর ঝোপের ভেতর টিস্ টিস্ করে দু'টি হারিকেন জ্বলবে। অসমাপ্ত কবরটা খুঁড়ে শেষ করা হ'বে, মরা লাশের খাটিয়া সামনে রেখে জানাজা পড়া হবে, কবরে শুইয়ে কেবলামুখী করা হ'বে লাশটাকে, তারপর মাটি চাপা দিয়ে বাড়ী চলে আসবে যে যার। কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না—কত বড় নৃশংস হত্যার সমাধি-পর্ব শেষ করে গেল তারা। তারা শুধু এইটুকু জানবে, মানুষ মরলে মাটি দিতে হয়। তাই দিয়ে গেল তারা। তারপর তালদীঘির বন-শিউলীর ঝোপ থেকে বেরিয়ে বাড়ীর পথ ধরবে। চরম নৈঃশব্দে ভরে উঠবে গোরস্থান। একটা ক্ষীণ কণ্ঠ—যা' খোদার দেওয়া এ পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় অনুচ্চারিত ছিল—চিরদিনের মত চাপা পড়ে যাবে মাটিতে। উপরে থাকবে বিপুল আকাশ আর নীচের অন্তহীন পৃথিবী—মাঝে অন্ধকারের একটানা ঘন প্রবাহ। তার তীব্র টানে এ ক্ষীণকণ্ঠের ইতিহাস রচনার পথ হয়তো অবলুপ্ত হ'য়ে যাবে চিরদিনের মত।

দামী হীরের মত চোখের তারা দু'টি সলাজ ভীরুতায় একাকার হ'য়ে গেল মেহেরুন্নেছার। ন' দিন পর এ বাড়ীতে তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ। বিয়ের দিনে ছিটান আতরের গন্ধ ফিকে হ'য়ে এলেও শাড়ীর ভাঁজ থেকে মিলিয়ে যায়নি এখনো। রোয়াকের ওপর বিছানা বিছিয়ে দিয়ে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মেহেরু বলল, বসুন।

একগাল উদ্দাম প্রাণের হাসি হাসল মাহমুদ। বলল, আমি যে আপনার থেকে অনেক ছোট হই ভাবী।

তেমনি ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল মেহেরু। হয়ত এক ঝলক সলাজ হাসি ঠোঁটের কারাগারে বন্দী করে চিবিয়ে চিবিয়ে হজম করে ফেলল। অথবা উদ্ভিন্ন যৌবনের মিঠেল সুবাসে মৃদু ঘেমে উঠল।

সেই হ'ল কাল। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে পালঙের ওপর বসে পান চিবুচ্ছিলেন আতাউর রহমান সাহেব। বিশের-মা আলবোলায় তামাক সেজে দিয়ে গেছে। পান চিবান বন্ধ করে মাঝে মাঝে তাই টানছেন। টানছেন আর ভাবছেন। উন্মুক্ত দরজার দিকে কানটাকে মেলে ধরে চুড়ির রিনিঝিনি শোনার চেষ্টা করছেন। কাল ঐ দরজার কোল থেকে পালঙ্ক পর্যন্ত আগ্রহ আর ব্যাকুলতাকে অভ্যর্থনার কার্পেটের মত বিছিয়ে রেখে-ছিলেন। কালকের সেই নরম মখমলের ভাঁজে ভাঁজে আজ বসিয়ে দিয়েছেন কাচের কুচি। ফনি মনসার কাঁটা। এ কার্পেটের ওপর দিয়ে যে আসবে রক্তাক্ত হ'য়ে যাক তার পা দু'টো। আলবোলার নল থেকে মুখ তুলে ঠোঁট দু'টোকে সরু করে আতাসাহেব বুকখানা তামাকের সুবাসিত নীলচে ধোঁয়া ছাড়বেন রাতের

আঁধারে আর আড়চোখে তাকাবেন একবার।

না—পা দুটো রক্তাক্ত হয়নি মেহেরুর। মনটাও না। চুড়ির রিনিঝিনি মৃদু আওয়াজটা অকস্মাৎ থম্‌কে ঝম্‌ঝম্‌ করে বেজে উঠেই থেমে গেল।* এক বিরাট ভয়ংকর দানবের কুৎসিত মূর্তি মনের আলোকোজ্জ্বল দিগন্ত কালো করে মাথা চাড়া দিয়ে ঠেলে উঠ্‌ছে। মেহেরু হীম-শীতল মৃত কানটাকে আবার মেলে ধরল।

হ্যাঁ—আমি ও-সব পছন্দ করি না। এইসব ঢলাঢলি। আলবোলার নল ছেড়ে চোখের তারাটা এক কোণে ঠেলে দিয়ে সাদা অংশ যতটা বার করা যায় বার করে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত চোখে তাকালেন আতা-সাহেব। ছিলে কুঁড়ে ঘরে—দু' তালায় উঠেছ। সে কথা মনে রাখতে হবে। আমার ঘরের মান-মর্যাদা নষ্ট হ'তে দেব না আমি। আলবোলায় ছোট্ট একটা টান দিয়ে খুক্‌ করে শয়তানী কাশি কেশে আবার মনের তপ্ত উত্তেজনায় ফোঁস্‌ করে আগুন ধরালেন আতাসাহেব, বে-আদব, বে-তমিজ আওরত।

ভয়ঙ্কর মূর্তি কুৎসিত দানবটা বুঝি টুঁটি চেপে ধরেছিল মেহেরুর। রক্ত-মাংসের কাঠামো থেকে প্রাণটাকে ছিঁড়ে নিয়ে মহাশূন্যের অসীম অন্ধকারে ছুঁড়ে দিয়েছিল। বিবশ বিবর্ণ দেহটা দাঁড়িয়ে ছিল আতাসাহেবের বিছিয়ে দেওয়া অভ্যর্থনা-কার্পেটের ওপর। তীক্ষ্ন একটা বিদ্যুতের চক্র চেতনাকে ছিট্‌কে বার করে দিয়েছিল দেহ থেকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পালঙের কাঠ ধরে ভাঙ-চোরা গুঁড়িয়ে যাওয়া দেহটার পতন রোধ করে-ছিল মেহেরু।

শায়ক-বেঁধা পাখীটা আবার দেহ-পিঞ্জরে ফিরে এসে বেদনা-ক্লান্ত ভয়াতুর ডানা ঝাপ্‌টোল ধীরে ধীরে, কি করেছি আমি? কি অন্যায়? কি অপরাধ? বে-হায়া আওরত হবার মত কি কাজ করলাম?

নত হ'য়ে যাওয়া মাথাটা কাপড়ের আড়ালে ঢাকা পড়েছে নইলে আতাসাহেব দেখ্‌তে পেতেন চোখে পানী নেই মেহরুর। মেহেরু কাঁদেনি। কেবল চাঁদ-গলা রাতে থম্‌কান বটের ডালে জড়িয়ে থাকা অন্ধকারের মত থোকা থোকা ঘন দুশ্চিন্তা যৌবন-মসৃণ পেলব মুখের চার পাশে দুল্‌ছে।

মাহ্‌মুদের সাথে মেশাটা অন্যায় হ'ল কিনা বুঝতে পারল না মেহেরু। কিন্তু মাহ্‌মুদের সাথেই বা সে মিশেছে কি এমন! রোয়াকে বিছানা পেতে দিয়ে একবার বস্‌তে বলেছে আর দুপুরে খাওয়ার সময় কাছে বসে পরিবেশনের দায়িত্বটা পালন করেছে। বিশেষ কোন কথা হয়নি। তবে?

তা' ছাড়া—অসংলগ্ন ভীরু চিন্তাটা এবার সাবলীল হ'তে চাইল—উনি তো ঘরে ছিলেন না সে সময়। ফিরেছেন তো সন্ধ্যার কিছু আগে। এ ঘটনা তো ও'র জানার কথা নয়।

মনের কোণে আবার সেই ভীত-বিহ্বল সন্দেহাকুল প্রশ্নটা উঁকি দিল, তবে?

চিন্তাটা বিরল শূন্যতায় দিক হারাল। কথাটা ও'র কানে তোলার মত কোন যোগ-সেতু নেই এ বাড়ীতে। না—কেউ নেই। স্থির বিশ্বাস সবেগে আন্দোলিত হ'তে হ'তে একটু থম্‌কে দাঁড়াল। বিশের-মা বলেছে কি? ওঁর সাথে এমন কথা বলার সাহস হবে বিশের-মার?

পুব পাড়ার মেয়ে বিশের-মা। গত বছর স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে তিন বছরের ছেলেকে কোলে নিয়ে এসে উঠেছে বাপের বাড়ী। কুঁড়ে স্বামীর ঘর করার থেকে আজরাইলের হাতে যাওয়াটা অনেক বেশী পছন্দ করে বিশের-মা। সেই থেকেই এ বাড়ীতে আছে। কোন ভোরে পুব পাড়ার জাফ্‌রী-ঘেরা ছোট্ট ঘরটা থেকে উঠে এসে কাজে যোগ দেয় আর নিমের বনে জোনাকীর মহোৎসবে পল্লীপথ যখন ঘন নীরবতায় উথাল-পাতাল হয় তখন ফিরে যায়। প্রথম দিনেই ওর দিকে তাকিয়ে কেমন হ'য়ে গিয়েছিল মেহেরু। শ্যাম-চিকন এক গলা উদ্দাম যৌবন নিয়ে বে-আবরু দেহে ছেলে-বুড়ো সমানে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবহেলায়।

তবুও জোর করে সবল হাতে চিন্তার টুঁটি চেপে নোংরা পর্বটার সমাপ্তি ঘোষণা করতে চাইল মেহেরু। হ'তে পারে না—বিশের-মার সে সাহস নেই। ঘরের নতুন বৌ-এর নামে এমন বিষাক্ত কালি ছিটিয়ে দিতে পারে না ও। তা' ছাড়া—মেহেরুর চিন্তাটা ধীরে ধীরে আতা-সাহেবকে কেন্দ্র করে কুটীল পথে পরি-ক্রমা শুরু করল—উনি কি বিশের-মার কথা বিশ্বাস করতে পারেন? কল্লুই বা বিশের-মা! কত বড় খান্‌দানী বংশের ছেলে। চৌহদ্দি এলাকা জুড়ে কত নাম। বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচক্ষণতার বলেই তো চৌরাশি মোল্লা হ'তে পেরেছেন। সুতরাং—

চিন্তাটা কুণ্ডলী পাকান সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আরো কুটিল, আরো বিষাক্ত হ'তে চাইল, কিন্তু পুরুষ মানুষের মন—বিশ্বাস কি? বিষ ছড়ালে তা' পচন ধরাবেই। পচিয়ে গলিয়ে দেহটাকে নষ্ট করবেই। কিন্তু উনি বিশ্বাস করলেন কি করে? বিশের-মা বল্‌তে পারে—ও সাত ঘাটের পানী খাওয়া মেয়েমানুষ। কিন্তু উনি!

অনেক রাতে, মনের শাখাকে আন্দো-লিত করে যখন আদিম প্রবৃত্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে, তপ্ত শিখা বিস্তার করে জৈবিক উত্তেজনা যখন বিপুল তরঙ্গ-ভঙ্গে ফেনিল হ'য়ে বুকের কাছে মাথা কুটছে তখনই ঘনিষ্ঠ হ'তে চাইল আতাসাহেব। বুকের মাঝে টেনে নিয়ে চোখ দুটো মুছিয়ে দিল। মৃদু কণ্ঠে বল্‌ল তারপর, সওহরের পায়ের তলায় বিবির বেহেস্ত। তুমি সে বেহেস্তের দরজা বন্ধ করে দিতে চাও?

বুঝি বুকের স্পন্দন থামিয়ে তাকিয়ে রইল মেহেরু।

আতাসাহেব মেহেরকে গোর-আজাব থেকে মুক্তি দিলেন। বললেন, ও বাড়ীর জয়নালের বাপ—তোমার শ্বশুর। চাচাত শ্বশুর। কিন্তু শ্বশুর হ'লেও সে তো পরপুরুষ।

মেহেরর সমগ্র হৃদয় প্রচণ্ডভাবে দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে দুলে উঠল। বুড়ো মানুষটা দরদভরা কণ্ঠে মা বলে এসে দাঁড়িয়েছিল উঠোনে। মেহেরু বসতে দিয়েছিল আর হামান দিস্তায় থেঁতো করে দিয়েছিল এক খিলি পান। আর কিছু না। একবার ইচ্ছে হ'ল ডুকরে কেঁদে উঠে পায়ে ধরে ক্ষমা চায়, কিন্তু পরক্ষণেই মনটা সন্দেহাকুল হ'য়ে উঠল মেহেরর, এ কি বলছেন উনি। শ্বশুর—তিনি তো আব্বার মত। তবু—

চিন্তাটা পূর্ণ অবয়ব নিয়ে বিস্তারিত হ'তে না হ'তেই মেহেরর চোখের সামনে শিথিল অন্ধকারকে ঘনতর জমাট করে দিয়ে আতাসাহেব উত্তর দিলেন, হাদিস শরীফে স্পষ্ট বলা আছে যৌবনবতী কন্যা যেন তার জন্মদাতা পিতা থেকেও দূরে থাকে।

ইঙ্গিতটা তরবারির চিকন ধারের চেয়েও তীক্ষ্ণ। ঘন অমাবস্যায় হঠাৎ-জ্বলা আলেয়ার মত স্পষ্ট। তবে কি উনি পিতা-কন্যার প্রীতির সম্পর্ককে অস্বীকার করতে চান? বোবা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সে কথাই ভাবল মেহেরু। ভাবল আর অজানা আশংকায় কেঁপে কেঁপে উঠল বার বার। কিন্তু এ কথাই বা উনি জানলেন কি করে? বিকেলের লাজ-রাঙা আলো চোখে মুখে মেখেই তো বুড়ো মানুষটা এসে দাঁড়িয়েছিল উঠোনে। বিশের-মা ছাড়া তো আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই এ বাড়ীতে। তা' হ'লে মাহমুদের কথা উঠল না কেন? না কি সব জেনে-শুনে ইচ্ছে করেই চেপে গেলেন উনি। অন্য সময়ে কঠিনতম আঘাতে ধরাশায়ী করার জন্যে ভাণ্ডারে জমা রেখেছেন মোক্ষম অস্ত্রটা?

তবুও পরদিন ভোরে যখন নি-রোদ আলোয় পথঘাট সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, মনটাকে অনেকখানি হালকা মনে হ'ল মেহেরর। মাহমুদের প্রসঙ্গটা উঠলে এতখানি ভার-হীন হ'তে পারত না। বুঝি কোথায় কোন গোপন গহনে একটা ব্যথার কাঁটা সযত্নে ফুটে থাকত। দিনের শত কাজের মাঝেও ব্যথাটা চিন্ চিন্ করে মাংসপেশীর ভিতর থেকে গজিয়ে উঠতে উঠতে মনটার গলা টিপে ধরত।

পুকুর-ঘাট থেকে মুখ-হাত ধুয়ে উঠানে এসেই থমকে দাঁড়াল মেহেরু। এসেছে—কালসাপিনী এসেছে। পাখী-পাকুলের ডাক মাথায় করেই এসে ঢুকেছে ঘরে এবং আলবোলা হাতে নিয়ে বুকের ঊর্ধ্বতো লোভাতুর কাঁপন জাগিয়ে বেরিয়ে আসছে হাসতে হাসতে। কাল সকালে যে ছিল বাড়ীর কাজকর্মে নিরত একজন সাধারণ ঝি—আজ সে হ'য়ে উঠেছে প্রতি-দ্বন্দ্বী। অন্ততঃ সকালের এই পর্যাপ্ত পবিত্র আলোয় সে-চোখেই তাকালে মেহেরু। তারপর হালকা-হাওয়া, ঋজু দেহমন চিন্তার বিষাক্ত পরিক্রমায় মুহূর্তে নুব্জ পাষাণের মত কঠিন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল।

মুখে হাসি? সংসারের হাজার বাসি কাজ পায়ের তলায় পিশে ঘরে ঢোকা? আলবোলা? উচ্ছ্বাস? কেন? কাতর মনে এক মুঠো ফাগ ছড়িয়ে বিষণ্ণ ঠোঁটে জোর করে হাসির ক্লান্ত রেখা ফোটাল মেহেরু। হয়ত এতখানি আবোল-তাবোল চিন্তা ভাল হ'চ্ছে না। জীবনের ঊষা-লগ্নে তপ্ত উত্তেজনার ভাঁপে অ-ফোটা মুকুল-গুলোকে নাই বা পুড়িয়ে দিল। দেউ-লিয়া রিক্ত বৃন্ত সম্বল করে বাঁচার সকল পথে আগল দিয়ে লাভ কি? এক অদ্ভুত আত্ম-প্রত্যয় ফিরে পেল মেহেরু। ভাবল, উনি অত নীচ হ'তে পারেন না। এবং আশ্চর্য, সাথে সাথেই সমগ্র দেহমন এক অপূর্ব আলোড়নে চেতনার ওপর চেপে-বসা নুব্জ পাষাণকে ছিটকে সরিয়ে দিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে ভারমুক্ত সহজ হ'য়ে দাঁড়াল।

থমকান চলাটা আবার গতি পেল। চলতে চলতেই মৃদু কণ্ঠে মেহেরু বলল, অ বিশের-মা—আগে থালাবাটি-গুলো মেজে নিয়ে আয়।

ভাঁজ-হীন নিটোল যৌবনকে দুলিয়ে একান্ত অনুগত দাসীর মত উত্তর দিল, যাই ভাবী।

কবর খোঁড়া ফেলে রেখে কোদাল সমেত বাপুরে বলে ঠেলে উঠতেই বন-শিউলীর ঘন ঝোপে ছায়া ছায়া অন্ধ-কারের মধ্যে একটা কোলাহল পড়ে গেল। কিছু দূরে তালদীঘির পাড়ের নীচের ঢালু জায়গায় বিচিত্রবর্ণ চেককাটা লুঙ্গি পরে যে লোকগুলো বিড়ি টানছিল তারা ছুটে এল। কি হ'ল?

হোসেন কোদাল হাতে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে অসমাপ্ত কবরটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল সবার। বুক সমান কবরটার নীচে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে দেখল সবাই, একটা মানুষ শুয়ে আছে। দু' হাত দু'দিকে ছড়ান, মাথাটা উপরের দিকে, পা দুটো লম্বা। কঙ্কাল। বিভৎস কঙ্কাল। বহু যুগ আগে আর একটা লাশকে বোধহয় মাটি দিয়েছিল কেউ।

কে একজন বললে, হ্যারে হোসেন, এত কবর খুঁড়ে শেষে এই সামান্য ব্যাপারে ভয় পেলি?

সবাই ভাবল, এখন উপায়?

চুরাশি খানা গ্রামের লোক যাঁর কথায় ওঠে বসে সেই চৌরাশি মোল্লাই শেষে ফতোয়া দিয়ে পাঠাল, নতুন কবর খোঁড়ার সময় নেই আর। সুতরাং—

কঙ্কাল সরিয়ে দিয়ে ঐ কবরেই মাটি দিতে হ'বে।

এ মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পায়নি মেহেরু। ডাইনীর মত চিন্তাটা আজ পুরো দেড় বছর তাকে তাড়া করে ফিরছে। ডাইনী বৈ কী। ঘাড় ভেঙে রক্ত পান করে তাকে জীর্ণ বিবশ কঙ্কাল করে তুলেছে।

পালঙ-এ শুয়েছিল মেহেরু। বহুদিন পর অকস্মাৎ অযাচিত আলো-হাওয়ার মত আতাসাহেবের আশীর্বাদ এসে পড়ল তার ওপর, শরীরটা কেমন মনে হচ্ছে?

কেবল একবার চোখ মেলে তাকাল মেহেরু—কোন কথা বল্‌ল না। ভীরু ভীরু মেয়েটা দাম্পত্য-জীবনের বহুতর প্রশ্ন-সংকুল চড়াই-উত্‌রাই পার হয়ে কথা বল্‌তে ভুলে গেছে যেন। ধীরে ধীরে মূক হ'য়ে গেছে।

আতাসাহেব আবার তাঁর প্রসঙ্গে এগিয়ে এলেন, তোমার শরীর তো দিন দিন খারাপ হ'য়ে পড়ছে। তা'ছাড়া এ সময়টা বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সুতরাং—

অকস্মাৎ চোখ দু'টো আরো তীক্ষ্ণ, আরো উজ্জ্বল হল মেহেরুর। কণ্ঠটা চিলের মত তীক্ষ্ণ হ'য়ে আবার খাদে নেমে গেল। বল্‌ল, না—কাকেও আন্‌তে হ'বে না। দিন এমনিই কেটে যাবে আমার।

তা' কি একটা কথা—আসন্নপ্রসবা মেহেরুর কষ্টের ওপর আতাসাহেবের দরদভরা প্রাণটা গলে মিশে একাকার হ'তে চায়—তোমার কষ্ট হ'বে আর আমি চোখ মেলে দেখব। এমন বেদিল পাষাণ—

কানটা চেপে ধরতে চাইল মেহেরু। কাঁকড়ার ঠ্যাং-এর মত লিকলিকে সরু হাতটা স্ফীত উদরের ওপর রেখে কান্নার একটা প্রবল বেগ কণ্ঠের বাঁধে আট্‌কে দিয়ে চোখের পানীকে রোধ করল। কি শরীর ছিল—কি হ'য়েছে। কর্মহীন বিরল মধ্যাহ্নে বিশের-মা যখন পাশের ঘরে আলবোলায় তামাক সেজে নিয়ে ঢোকে তখন জীর্ণ শরীরটার দিকে তাকিয়ে কেঁদে-কেটে চোখের পানীতে বুকের কাপড় ভেজায় মেহেরু। রৌদ্র-পিছল দ্রাক্ষার মত পুরুষ্ট গালের ওপর এখন যেন একটা শুক্‌নো চামড়া লেগে আছে। কোটরগুলো গভীর, চোখ দু'টো দীর্ঘ আর ম্লান হ'য়েছে। স্ফীত উদরের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলে সরু হাত পিছনে দিয়ে টাল সাম্‌লে বসে' দাঁতে ঠোঁট কামড়াতে হয়। চিপ্‌সান গালটা ফুলে ওঠে আর সেই শূন্য গালের মধ্যে জিবটা ঘুরপাক খেয়ে অকারণ শান্তি খোঁজে। তারপর উঠে দাঁড়ায় মেহেরু। কি শরীর কি হ'য়েছে!

তাই গত মাসে নিজেই আনিয়েছিল তার বিবাহযোগ্যা ছোট বোনকে। আলবোলায় তামাক আর পান সাজার ভারটা বিশের-মার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বোনের হাতেই দিয়েছিল মেহেরু। এ ব্যবস্থায় কোন আপত্তি তো করেননি—বরং খুশী হ'য়েছিলেন আতাসাহেব। তারপর মাত্র কুড়ি দিন। এই কুড়ি দিনে একটি মেয়ের খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, কথা-বার্তা কেমন অদ্ভুতভাবে পাল্টে যায় তা' দেখল মেহেরু। এই সামান্য সময়ে একটা কুমারী মেয়ে কেমনভাবে একটি লোকের পছন্দ-অপছন্দ, ভাল-লাগা-মন্দ-লাগার সাথে একাত্ম হ'য়ে সজাগ প্রহরীকে হার মানাতে পারে তাও দেখ্‌তে ভুল করল না মেহেরুর অপমানিত সজাগ দৃষ্টি। তাই সেদিন পড়ন্ত বেলায় শরতের সুনীল আকাশ ঘিরে যখন সোনা-রোদ গাছের সবুজ পাতায় একটানা ঝরে পড়ছিল তখন রোয়াকের কাছটায় এসে দাঁড়াল মেহেরু। বোনকেই উদ্দেশ্য করে কঠোরকণ্ঠে শুধাল, তুই কি মনে করেছিস্‌রে ছোট?

আলবোলার নল ধুতে ধুতে কেবল ঘাড়টা উঁচু করে তাকাল ও।

মেহেরু ভারী উদর নিয়ে হাঁফাচ্ছিল। উত্তেজনার তীব্র দাহ হাঁফটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বল্‌ল, কাঠ-কুটো সব জড়ো হ'য়েছে—এবার আগুন ধরালে হয়। বজি আমার সংসারে আগুন লাগাবার জন্যে তোকে এনেছি বুঝি?

পরদিনই তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিল।

মেহেরুর চেতনাটা আরো সতর্ক হ'ল। আবার কাকে আন্‌তে চান উনি? সে দরদী কে? এই জীর্ণ দেহে, পঙ্গু মনে—সে পাষাণের ভার বইবার মত শক্তি আছে তো? মেহেরু সবেগে ঘাড় আন্দোলিত করে আতাসাহেবের হাত ধরে বল্‌ল, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি। কাকেও আন্‌তে হ'বে না আর। মরি তোমার কোলে মাথা রেখে মরব। কেবল একটু শান্তিতে মরতে দিও।

তবুও সওহরের পত্নী-প্রেম তীব্র হ'য়েই দেখা দিল। দু' দিন আতাসাহেব পাগলের মত ঘুরে বেড়ালেন নিজের গ্রামে, অস্থির অবস্থা। মুরুব্বিস্থানীয় লোকেরা সহানুভূতিতে ভেঙে পড়ল, সাজেদাকেই নিয়ে এস না দিন কয়েকের জন্যে। কেউ কেউ আরো অন্তরঙ্গ হ'তে চাইল, তোমার যা সংসার—পরের মেয়ে ক'দিন এনে রাখবে, তার থেকে আর একটা বিয়ে কর।

চকিতে আকাশের দিকে চোখটা উল্টে বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বল্‌লেন আতাসাহেব, আল্লা হু। পরের দিন ছই-গাড়ী পাঠালেন সাধনপুরে। সন্ধ্যার আবছায়ায় তাঁর বাড়ীতে এসে নামল—শালেহা। শাজেদার ছোট বোন। শাজেদাকে আনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, ও বিধবা মানুষ হলেও কোলে দু'টো ছেলে-পিলে। সুতরাং অনূঢ়া শালেহাকে আনাটাই পছন্দ করলেন তিনি।

সেই কাল সন্ধ্যায় শালেহাবানু এ বাড়ীতে এসে উঠ্‌তেই আদর-আপ্যায়ন শতগুণে বেড়ে গেল মেহেরুর। শালেহা আর আতাসাহেব একযোগে অনুগত দাসানুদাসের মত মেহেরুর সুখ-সুবিধের দিকে সজাগ লক্ষ্য রাখলেন। এই অনায়াসলভ্য আপ্যায়ন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেহরুর বুকের সেই গোপন ব্যথাটাও সারা দেহে ছড়িয়ে গেল।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তিন মুখ এক জায়গায় হ'ল। মাঝখানে হারিকেন জ্বলছে। তার তিন পাশে তিনটি মুখ—আসন্ন জয়ের ফাগ মেখে একটি মুখ প্রসন্ন, মাঝখানের মুখটিতে ভয় ও ভবিষ্যৎ পেণ্ডুলামের মত দোদুল্যমান, শায়িত মুখটি ক্রোধ ও ঘৃণায় কঠোর। আতাসাহেব তন্ন তন্ন করে শালেহার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। তারপর তাক থেকে এক শিশি অলিভ ওয়েল নিয়ে শালেহার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, এটা তোমার আপার পেটে মালিশ করে দাও।

তারপর বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

এত রাতেও পাশের ঘরে বিশের-মা আলবোলায় তামাক সেজে ফু দিচ্ছে। এই শেষ দায়িত্বটুকু পালন করে তবে তার ছুটি।

একবার কেবল উন্মনা হ'ল মেহেরু। মালিশ বন্ধ করতে বলে উঠে বসল। শালেহা শুধাল, বাইরে যাবে নাকি আপা?

বাইরে নয়—ও ঘরে। কালসাপিনীটা ঢুকেছে—মনে মনে বল্‌ল মেহেরু। তারপর ক্লান্ত বিষণ্ণ দেহটা এলিয়ে দিল বিছানায়। কি হ'বে গিয়ে। সারা জীবনটাই তো জ্বলে জ্বলে শেষ হল।

কাকেও মুক্তি দেয়নি আতাসাহেব—কাকেও না। আদর-সোহাগের বেষ্টনে অক্টোপাসের শাখা-প্রশাখায় জড়ানোর মত

শালেহা যে জড়িয়ে পড়বে এ কথা জানতো মেহের্। কেবল সেই স্থির বিশ্বাসটা এই ক' দিনে দৃঢ়তর হ'ল এই মাত্র। এখন ভাত বাড়তে গেলে বিলম্বটা বিলম্বিত হ'য়ে ওঠে। পান সেজে দিতে গিয়ে দীর্ঘতর সময়টায় কতবারই না চাপা হাসির কাকলী ভেসে আসে। বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে সংযত করে সচেতন হ'য়ে ওঠে মেহের্। চিন্তাটা সূচাগ্র হ'য়ে অন্তঃস্থল বিদ্ধ করে। কি বলবে? কি বলা যায়?

দারুণ এক দুঃসহ গুমোট সেদিন প্রকৃতির বুকে বুঝি বিষ ঢাল্‌তে শুরু করেছে। মানুষ-প্রাণী সবাইকে বুঝি পাচিয়ে তুলবে। গাছের পাতা শঙ্কায় নিথর। বাতাস নেই। রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল মেহের্। অসীম আকাশের কূলে ছাপিয়ে অন্ধকারের পরিবর্তে যেন আগুনের ভাঁপ ঝরে পড়ছে। সে তাপে বুঝি প্রাণী-পাকুল ভাজা-ভাজা হ'য়ে যাবে। ছুটে এলেন আতাসাহেব। কড়া ধমক দিলেন শালেহাকে, করছ কি বোকার মত বসে! মানুষটা ছটফট করছে, আর বসে দেখছ তুমি। যাও কুঁজো থেকে ঠাণ্ডা পানী নিয়ে গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বাতাস কর। এই অবস্থায় না ঘুম হ'লে যে মরে যাবে মানুষটা।

হ্যাঁ পানী ছিটিয়ে বাতাস করেছিল শালেহা। বড় তৃপ্তি পেয়েছিল মেহের্। জ্বলন্ত চুল্লী থেকে বার করে মৃত্যুন্মুখী মানুষটাকে কে যেন বসন্তের ব্যাকুল হাওয়ায় উতলা এক নির্জন নদীর কূলে নির্বাসন দিয়েছে। আরামে চোখ বন্ধ করল মেহের্।

কতক রাতে রাত-জাগা পাখীর দল ডেকে উঠ্‌ল এক সাথে। বুঝি সেই ডাকেই তন্দ্রাটা ছিট্‌কে সরে যেতেই চেতনাটা ফিরে পেল মেহের্। কথা বল্‌ছে কারা? কোথায়?

—ইস্‌লাম কত মহান জান শালেহা। আমার প্রিয় নবীজী এ কারণেই স্বামীর জন্যে চার বিবি নির্দিষ্ট করে গেছেন। ধর আমার যে অবস্থা—আর কি পেতে পারি হাড্ডিসার ঐ কঙ্কালের কাছ থেকে। তোমার আব্বার কাছে আমি সত্তর পয়গাম দিয়ে লোক পাঠাব।

জানালা খোলাই ছিল। দেখ্‌ল, রোয়াকের ওপর শুয়ে আছে আতাসাহেব আর শিয়রে বসে মাথা টিপ্‌ছে শালেহা।

অসহ্য! কোন শব্দ না করেই বাইরে রোয়াকে এসে দাঁড়াল মেহের্। তারপর লোটা হাতে নিয়ে নেমে গেল উঠোনে। দুই সোহাগ-ঢালা প্রাণ আকস্মিকতায় নির্বাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল কেবল।

ফিরে আস্‌তেই হা হা করে উঠ্‌লেন আতাসাহেব। ছুটে ঘরের ভিতরে এল শালেহাও।

কি হল তোমার? উঠ্‌লে কেন? শরীরটা খারাপ লাগ্‌ছে বুঝি?

কোন কথা নয়, শব্দ নয়—কেবল পাশ ফিরে শুল মেহের্। ঘন অশ্রু গড়াল কিনা দেখার সাহস হ'ল না আতাসাহেবের।

পাখী-পাকুলের ডাক মাথায় নিয়ে পূব পাড়ার ছোট জাফরী-ঘেরা ঘর থেকে এ বাড়ীতে এসে ঢুক্‌ল কালসাপিনী। এই সাত সকালেই আতা সাহেব বেরিয়ে গেছে কোথায়। শরীরটা অত্যন্ত দুর্বল। হাত-পা কাঁপ্‌ছে। ভিতরের ব্যাথাটা বাড়ছে ক্রমেই। প্রাণের স্পন্দন বুক থেকে গলার জিরজিরে চামড়ায় এসে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তবু রোয়াকে এসে বস্‌লে মেহের্। এঁটো থালা-বাটি গুছিয়ে রাখ্‌ছিল বিশের-মা। তাকে কঠিন কণ্ঠে ডেকে কাছে আনল। বল্‌ল, আজ থেকে এ বাড়ীতে ঢুক্‌লে তোর জীবন শেষ করে দেব আমি। হাতের এই ঝাটায় মাথা ভাংব। তারপর হাঁফাতে লাগল ছিলায় টান দেওয়া ধনুকের মত।

কাছে এসে দাঁড়াল শালেহা। কঠিন কণ্ঠে কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিল মেহের্। কিন্তু সে অবকাশ না দিয়ে প্রায় নাটকীয় সুরেই শালেহা বল্‌ল, হ্যাঁ আমিও

তোর জীবন শেষ করে দেব আমি

বেরিয়ে যাচ্ছি। উনি গাড়ী আন্‌তে গেছেন।

বুকের ব্যথাটা বাড়ছে। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ছে। রোদ-মেঘের আলো-ছায়া খেলার মত এই দেখা দেয়, এই মিলায়। তবুও ব্যথা-বেদনায় বিমোথিত শরীর নিয়ে সব কাজ করল মেহের্। তারপর দুপুরের বিরল মধ্যাহ্নে যখন দুরন্ত গুমোটে ঝিম-মারা গাছের ডালে দুরন্ত কাকটাও নিঃঝুম তখন রোয়াকের ওপর এসে দাঁড়াল মেহের্। মৃত্যু কত দূর? তবুও এক অপূর্ব তৃপ্তি পেল ও। কেউ নেই—কেউ না। একটি কাটাও না। আহ্! এই তার সংসার!!

এক দুঃসহ ব্যথায় পালঙ্কের কাছটায় গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল মেহের্। নাড়ী ছিঁড়ে একটি ব্যথা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হৃদয় ভেদ করে ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে আস্‌তে চায়? লাফ মেরে নেমে এলেন আতাসাহেব, কি হ'ল মেহের্?

হাত বাড়িয়ে গ্লাস দেখাল, একটু পানী।

মাথায় হাত বুলিয়ে গালে পানী দিলেন আতাসাহেব। বল্‌লেন, কাকেও ডাক্‌ব?

ইঙ্গিতে নিষেধ করে তীব্র আবেগে আতাসাহেবকে জড়িয়ে ধরে নিদারুণ যন্ত্রণায় মোচড় খেল মেহের্। জীর্ণ শরীরকে বিমথিত করে এক উত্তেজিত অন্তহীন বেদনার আক্রোশ উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গে ছড়িয়ে গেল সারা দেহে। উদরটাকে তুলোর মত ফাঁসিয়ে দিয়ে এক দলা রক্ত বেরিয়ে এল। যন্ত্রণার শেষ আক্রোশটা সহ্য করার জন্যে মাতালের মত একবার খাড়া হ'তে গিয়েছিল—তারপরেই উল্টে পড়ে গিয়েছিল নিষ্প্রাণ চাপ-বাঁধা রক্তের দলাটার ওপর। শীর্ণ হাত-পা একবার ঘন তালে কেঁপে উঠ্‌ল, কোটর ছাপিয়ে চোখ দুটো বেরিয়ে এল বড় হ'য়ে; এলান চুলে ঢাকা মুখটার এক পাশ দিয়ে জিবটা বেরিয়ে ঝুলে লেগে রইল রক্ত-পিণ্ডের ওপর। রাক্ষসী যেন নিজের রক্ত পান করছে।

বনশিউলীর ঘন ঝোপটা শেষবারের মত দুলিয়ে এক মুঠো মাটি দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। অন্তহীন আকাশ ঘিরে ঘন অন্ধকার দুলছে। ঐ অসীম অন্ধকারের ওপারে যদি কোথাও তুমি থেকে থাক খোদা, তা' হলে আমার একটি মোনাজাত কবুল করো: এখনো অনেক মেহের্ তোমার দেওয়া পৃথিবীর আলো-হাওয়ার মুখ দেখেনি—ইস্‌লাম মহান হ'য়ে তাদের কাছে যেন এই চার বিবির

॥ প্রধানমন্ত্রী ॥

বেশ কিছুদিন বাদে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অল্পক্ষণের জন্য ঘুরে গেলেন কলকাতায়। আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পরলোকগত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও সুহৃদের অকস্মাৎ অন্তর্ধান গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল প্রধানমন্ত্রীকে, কিন্তু সেই দুঃখের দিনে তিনি নিজেও অসুস্থ ছিলেন। তাই চিকিৎসকদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আসতে পারেননি ডাঃ বিধানচন্দ্রের শেষ যাত্রায় যোগ দিতে। তারপর সময় ও সুযোগ হওয়া মাত্রই তিনি ছুটে এসেছিলেন বাঙলায়। বাঙলাদেশের মানুষও তাঁর অসুস্থতার সংবাদে দীর্ঘদিন ধরে উদ্বিগ্ন ছিল, কর্মচঞ্চল প্রধানমন্ত্রীকে নিজেদের মাঝে পেয়ে তাদের উদ্বিগ্নতা বহু পরিমানে দূর হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসবাণীও "এ সমস্যাবহুল রাজ্যের অধিবাসীদের নতুন করে আশান্বিত করে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র যে সকল কাজে হাত দিয়েছিলেন তা সবই অতি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পূর্ণ করা হবে, কারণ সেইটাই হবে লোকান্তরিত কর্মবীরের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন। কলকাতার আবর্জনা অপসারণের কাজ তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই বিশাল নগরীর পরিচ্ছন্নতা অক্ষুণ্ণ রাখা যায় কিনা সে কথা চিন্তা করে দেখার জন্য নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই শহরকে আবিলতামুক্ত সুস্থ সুন্দর নগরীতে পরিণত করার চিন্তায় বিভোর হয়েছিলেন কর্মবীর বিধানচন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন বলেছেন, বিধানচন্দ্রের 'মাষ্টার প্ল্যান'কে অবশ্যই সফল করে তুলবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীও আশ্বাস দিয়েছেন তাঁকে, এ ব্যাপারে কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাহায্য পাওয়া যাবে। পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে যে কর্মদক্ষ মানুষটির উপর বাঙলাদেশের মানুষ চোদ্দ বছর ধরে নির্ভর করেছিল হঠাৎ তাঁর তিরোধানে আশংকা হয়েছিল, হয়ত তাঁর আরব্ধ সব কাজই অর্ধপথে অসমাপ্ত হয়ে থেকে যাবে। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত নীতি ও কার্যক্রমে ও প্রধানমন্ত্রীর শুভাগমনে বাঙলাদেশের সে আশঙ্কা অপসৃত হতে আরম্ভ করেছে।

॥ শুভ সূচনা ॥

কর্মযোগী বিধানচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বাঙলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এক স্মৃতিরক্ষা কমিটি স্থির করেন, বিধানচন্দ্রের স্মৃতি যথাযথ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এই উদ্দেশ্যে দেশবাসীর কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদনও জানানো হয়। অতি আশা ও আনন্দের কথা যে, এই আবেদন প্রচারিত হওয়ার পর একমাস অতিক্রান্ত না হতেই দেশবাসীর আন্তরিক ও স্বতস্ফূর্ত দানে ২২ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। উদ্যোক্তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আগষ্ট মাসের গোড়াতেই ২৫ লক্ষ টাকার তহবিল পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই স্মৃতিসংরক্ষণ কমিটির উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হয়ে দেশবাসীর কাছে ৬০ লক্ষ টাকা প্রেরণের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, এ আবেদনও ব্যর্থ হবে না, অনতিবিলম্বেই ৬০ লক্ষ টাকার তহবিলও পূর্ণ হয়ে যাবে। আমাদের এই বিশ্বাসেরও মুখ্য অনুপ্রেরণা প্রধানমন্ত্রীর উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতা। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এক হাজার টাকা দান করেছেন, এবং সারা ভারতের অধিবাসীদের কাছে ভারতের মহান সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন। এ আবেদনের সাড়া যে বিপুল হবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা স্মৃতিসংরক্ষণ কমিটির উদ্যোক্তাদের এই কথাটি মনে রাখতে অনুরোধ জানাই যে বিধানচন্দ্র শুধু কলকাতারই ছিলেন না, তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সুতরাং তাঁর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শুধু কলকাতাতেই একটি বড় শিশু হাসপাতাল স্থাপন করলে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি সুবিচার করা হবে না। স্মৃতিরক্ষা তহবিলে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হবে তা থেকে বাঙলার ১৫টি জেলার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা মোটেই অসম্ভব হবে না। এই প্রসঙ্গে সকল জেলাতে একথা জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, জেলার যে অংশের লোকেরা এক লক্ষ টাকা দিতে পারবে, স্মৃতিরক্ষা তহবিল থেকেও তাদের একলক্ষ টাকা দেওয়া হবে। এইভাবে যদি দু'লক্ষ টাকা ব্যয় করা যায় প্রতি জেলার এক একটি স্থানে তবে তা দিয়ে সর্বক্ষেত্রেই অনেক বড় বড় কাজ করা সম্ভব হবে। বিধানচন্দ্রও চিরকাল বেঁচে থাকবেন বাঙলাদেশের সকল অঞ্চলের গুণমুগ্ধ দেশবাসীদের মনে। মফস্বলবাসীদের এটা চিরন্তন অভিযোগ, এবং এ অভিযোগ যুক্তিসঙ্গতও যে, বাঙলাদেশ বলতে কলকাতার মানুষেরা শুধু কলকাতাকেই বোঝে। এ অপবাদ অবশ্যই খণ্ডিত হওয়া দরকার। তাতে ভবিষ্যতে অন্যান্য মহত্তর প্রয়াসে মফস্বলবাসীদের কাছ থেকে অনেক বেশী আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

॥ সর্বদলীয় সম্মেলন ॥

অশান্ত উত্তর সীমান্তের ঘন ঘন অস্বস্তিকর সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে ভারতের বিভিন্ন দলের পক্ষ হতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর কাছে অবিলম্বে সংসদের অধিবেশন বা ন্যূনপক্ষে সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ তাঁদের অনুরোধপত্রে বলেন, সীমান্তে চীনা হামলা সম্পর্কে সরকার যে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তাঁদের ইতিকর্তব্য পালনেও তাঁরা যে স্থির-নিশ্চয় এ সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবশ্যই নিঃসন্দেহ করা দরকার। আভ্যন্তরীণ প্রশ্নে যতই মত-পার্থক্য থাকুক না কেন দেশরক্ষার প্রশ্নে সকল দল যে একজোট ও একমত এ সম্বন্ধেও দেশবাসীকে আশ্বস্ত করার প্রয়োজন আছে বলে দলীয় নেতৃবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁদের সেই মনোভাবের প্রতি সম্মান জানাতে ও সেইসঙ্গে সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে দেশের সকল মানুষকে নিশ্চিন্ত করতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বিগত ৩রা আগষ্ট নয়াদিল্লীতে সংসদের সকল দলের নেতৃবৃন্দের এক সভা আহ্বান করেছেন। এই সভায় ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে স্থির হয়েছিল। সংসদের অধিবেশন শুরু হয়েছে ৬ই আগষ্ট থেকে।

॥ পঃ ইরিয়ান ॥

ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক মহল হতে পঃ ইরিয়ান সম্পর্কে এক আশাব্যঞ্জক সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে পঃ ইরিয়ানের ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে যে আলোচনা

চলছিল তার সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অর্থাৎ পশ্চিম ইরিয়ানের উপর ইন্দোনেশীয়ার সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে হল্যান্ড, এবং পশ্চিম ইরিয়ানের শাসন দায়িত্ব ইন্দোনেশীয়ার হাতে শান্তিপূর্ণভাবে হস্তান্তরিত করতেও সম্মত হয়েছে সে। খবরটি যদি শেষ পর্যন্ত সত্যি থাকে তাহ সেটা সকলের পক্ষেই আনন্দের ও স্বস্তির কারণ হবে।

॥ অরণ্যরাজের সন্ধানে ॥

মালয়ের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতা "অরণ্যরাজ" চিন পেঙের সন্ধানে মালয় ও শ্যামের সৈন্যবাহিনী উভয়-রাজ্যের সীমান্তবর্তী গভীর অরণ্যে নতুন করে তল্লাসী শুরু করেছে। মালয় যখন জাপ কবলিত হয় তখন তার বিরুদ্ধে মালয়ের দেশপ্রেমীদের গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল চিন পেঙের নেতৃত্বে। মালয় আবার বৃটিশ কবলিত হলেও একই কারণে সে আন্দোলন বন্ধ হয়নি। চিন পেঙ ও তার অনুগামীদের দমন করতে দশ হাজার মানুষের প্রাণ-হানি হয়েছে এবং সরকারী তহবিল থেকে ব্যয় হয়েছে প্রায় দশ কোটি পাউন্ড। সম্মুখ সমরে পরাস্ত হয়ে চিন পেঙ শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আড়াই শ'সহচর নিয়ে শ্যাম সীমান্তে মালয়ের গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। তারপর মালয় স্বাধীন হয়েছে কিন্ত চিন পেঙের সংগ্রাম তাতে কমেনি। একচল্লিশ বছর বয়সের এই মানুষটির জীবনের একুশ বছর কেটে গেছে গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে বে-আইনী জীবনযাপনে। সম্প্রতি আবার চিন পেঙের কার্যকলাপ জোরালো হওয়াতে মালয় ও শ্যাম উভয়েই তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্যে সচেষ্ট হয়েছে। মালয়ের অরণ্যসমীপবর্তী গ্রামগুলিতে হঠাৎ চিন পেঙের অনুগামীদের লেখা পোস্টার দেখা যেতে আরম্ভ করেছে। তাতে লেখা আছে—'আমরা মাত্র ১৭ বছর সংগ্রাম করেছি, চীনের কমিউনিস্টরা ২১ বছর কঠোর সংগ্রাম করে তবে সফল হয়েছে।'

চিন পেঙ সম্বন্ধে যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে—তার প্রকৃত নাম উয়ং মান-ওয়া। লম্বা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। ফর্সা রঙ, একটু খুঁড়িয়ে চলে। বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি। বহুরকমের ছদ্মবেশ পরায় অভ্যস্ত। চীনের চাররকম কথ্য ভাষা, মালয়ী ও ইংরেজী বলার অভ্যাস আছে। অত্যন্ত বিপজ্জনক।

॥ মালয়েশিয়া ॥

মালয়, সিঙ্গাপুর ও তিনটি বৃটিশ উপনিবেশ উত্তর-বোর্ণিও, সারাওয়াক ও ব্রুনেই নিয়ে মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাব নিয়ে অনেকদিন ধরে আলোচনা চলছিল মালয়, সিঙ্গাপুর ও বৃটিশ সরকারের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে। এ ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের মৌলিক সমর্থন থাকলেও মালয় ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর তিনটি বৃটিশ উপনিবেশ এখনই সংযুক্ত করার সমীচীনতা সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ হতে পারছিলেন না। সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান ও সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ লণ্ডনে যান। লণ্ডনে অবস্থান-কালে সাংবাদিকদের কাছে বৃটিশ সর-কারের গড়িমসি নীতির সমালোচনা করে সিঙ্গাপুরের সমাজবাদী প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, 'মালয়েশিয়া গঠনের ব্যাপারে বৃটিশ সরকার যদি শেষ পর্যন্ত নারাজ হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমিউনিস্টদের দখলে চলে যাবে।'—শুধু মালয় ও সিঙ্গাপুর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করাকে তিনি বিপজ্জনক বলে মনে করেন। কারণ সে যুক্তরাষ্ট্রে চীনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হবে।

এ সম্পর্কে পয়লা আগস্টের সংবাদ-পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, মালয় ও সিঙ্গাপুরের প্রধান-মন্ত্রীর সঙ্গে বৃটিশ সরকারের আলোচনা সফল হয়েছে। সে সাফল্যের প্রকৃতরূপ কি তা ঐ সংবাদে জানা যায়নি।

॥ আলজিরিয়া ॥

দীর্ঘ সাত বছর ধরে কঠোর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর গত ১লা জুলাই আল-জিরিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার আনন্দে সেদিন সারা আল-জিরিয়া মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আলজিরিয়াবাসীদের দুর্ভাগ্য যে, তাদের সে আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। পক্ষকাল অতিক্রান্ত না হতেই আল-জিরিয়া এক সাংঘাতিক গৃহবিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। যেদিন আলজিরিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে সেদিন আল-জিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে লক্ষ লক্ষ জনতার স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন গ্রহণ করেন অস্থায়ী আলজিরিয়া সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেন খেদা। কিন্তু অনতি-বিলম্বেই আলজিরিয়াবাসীরা বুঝতে পারে যে, বেন খেদা সরকারের ক্ষমতা নিতান্তই সামান্য, ও আলজিরিয়ায় মুক্তি-ফৌজের উপর তার প্রভাব উপেক্ষনীয়। বেন খেদা যেসব নির্দেশ জারী করেন তার কোনটিই কার্যকরী হয়নি। আল-জিরিয়ার মুক্তিফৌজ আজ প্রকৃতপক্ষে দুই বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে, এবং তাদের এক পক্ষের নেতা অস্থায়ী আলজিরিয়া সরকারের পদত্যাগী উপ-প্রধানমন্ত্রী বেন বেলা ও অপর পক্ষের নেতা ঐ সরকারেরই প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলকাসেম ক্রিম। প্রথম পক্ষ সসৈন্যে ঘাঁটি স্থাপন করেছে আলজিরিয়ার অন্যতম প্রধান শহর ওরানে ও দ্বিতীয়-পক্ষের প্রধান ঘাঁটি কাবিলিয়া। এই বিরোধে বেন খেদা দ্বিতীয় পক্ষের সমর্থক হলেও বিরোধের নেতা তিনি নন। দুইপক্ষ হতেই বহু আদর্শের কথা প্রচারিত হলেও প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই এই কলহের প্রধান কারণ। একজন প্রগতিবাদী নেতা বলে প্রচারিত হলেও তাঁর অন্যতম প্রধান সমর্থক ফেরহাত আব্বাস, অস্থায়ী আলজিরিয়া সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যিনি এক সময়। এবং নরমপন্থী ও ধনতন্ত্রবাদী অপবাদে বেন বেলাই একদিন পরিত্যাগ করেছিলেন যাঁকে। সুতরাং এই বিরোধে বেন বেলা জয়ী হলে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতিবাদের জয় হবে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। তাছাড়া মুক্তি-ফৌজকেই রাজনৈতিক রূপ দিয়ে তাকে আলজিরিয়ার একমাত্র রাজনৈতিক দলে পরিণত করার যে পরিকল্পনা আছে বেন বেলার তাও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমর্থিত হতে পারে না। এখনই আলজিরিয়ার গৃহবিবাদ সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে যে খাতে বইছে ঘটনাপ্রবাহ তাতে আলজিরিয়া যদি শেষপর্যন্ত আর এক আলজিরিয়ায় পরিণত হয় তবে সেটা আশ্চর্যের কিছু হবে না। তবে এক্ষেত্রে জাতীয় বিপদের সম্ভাবনা আরও বেশী, কারণ এখন আলজিরিয়ায়, এভিয়ান চুক্তির ব্যবস্থামত তিন লক্ষ ফরাসী সৈন্য অবস্থান করছে। তা ছাড়াও আছে প্রায় দশ লক্ষ ফরাসী উপনিবেশী যাদের চেয়ে বড় শত্রু আলজিরিয়ার স্বাধীনতার আর কেউ নেই।

॥ ঘরে ॥

২৬শে জুলাই — ১০ই শ্রাবণ : তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় শিল্প-নগরী প্রতিষ্ঠা করা হইবে'—রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ কর্তৃক সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে বৈদেশিক মুদ্রার (২২ কোটি ডলার) ঘাটতি পূরণ—দিল্লীর সাংবাদিক বৈঠকে ইউরোপ সফরান্তে প্রত্যাগত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই'র আশা প্রকাশ।

২৭শে জুলাই — ১১ই শ্রাবণ : পশ্চিমবঙ্গের বাজারে জাল ও ভেজাল ঔষধের যথেচ্ছ কারবার—সরকারী ও বেসরকারী মহলে উদ্বেগ—তদন্তের জন্য রাজ্যসরকার কর্তৃক কমিশন নিয়োগ—কমিশনের চেয়ারম্যান : স্যার বীরেন মুখার্জি।

বিভিন্ন দাবীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার বিধানসভা (পশ্চিমবঙ্গ) অভিযান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন।

২৮শে জুলাই — ১২ই শ্রাবণ : পরলোকগত জননেতা ডাঃ বিধানচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর কলিকাতায় আগমন—রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ) মন্ত্রিসভার সদস্যদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়কের (মুখ্যমন্ত্রী) নেতৃত্বে পরিচালিত উড়িষ্যা মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ—বিভিন্ন বিভাগে নূতন সাতজন উপমন্ত্রী নিযুক্ত।

২৯শে জুলাই — ১৩ই শ্রাবণ : 'ডাঃ রায়ের (পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী) স্বপ্নবিজড়িত কলিকাতা মহানগরীর উন্নয়নসাধনই প্রধানতম দায়িত্ব'—কংগ্রেস ভবনে (কলিকাতা) অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সদস্যদের সভায় শ্রীনেহরুর ভাষণ—আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানের হিন্দুদের সমস্যা-সমাধানের আশা।

ডাঃ রায়ের বাসভবনে নির্বাক নেহরু—পরলোকগত মহান নেতার শূন্য-শয্যায় পুষ্পস্তবক ও প্রতিকৃতিতে মাল্য অর্পণ।

'অস্তিত্বরক্ষার জন্যই ভারতের জন্মহার শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করা প্রয়োজন'— পরিবার-পরিকল্পনা পর্ষদের (ভারত) বৈঠকে (কলিকাতা) কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ারের মন্তব্য।

পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর নারকীয় অত্যাচারের প্রতিকারের দাবী—প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) নিকট পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ কমিটির স্মারকলিপি।

৩০শে জুলাই — ১৪ই শ্রাবণ : মূল্যবৃদ্ধি ও নূতন করের প্রতিবাদে নানা স্থানে প্রচণ্ড বিক্ষোভ — আমেদাবাদ ও বরোদায় হরতাল ও হাঙ্গামা—ভূপালে ১৮ জন এম-এল-এ সহ ২০৬ জন গ্রেপ্তার।

মুর্শিদাবাদ-সীমান্তে পাক্ বাহিনী কর্তৃক ভারতীয় রক্ষী হরণ—পাক্ ফৌজের গুলীতে চারজন ভারতীয় ধীবর হতাহতের সংবাদ।

৩১শে জুলাই — ১৫ই শ্রাবণ : দিল্লীতে জাতীয় সংহতিসাধন কমিটির পাঁচ দিবসব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ।

কলিকাতা সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়নশীপের প্রশ্ন অমীমাংসিত—সব কয়টি খেলা শেষেও (২৮টি খেলা) ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সমান পয়েন্ট (প্রত্যেকেই ৪০ পয়েন্ট) অর্জন।

ভেজাল সন্দেহে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক আড়াই লক্ষ 'অ্যাম্পুল' ঔষধ বাজেয়াপ্ত—ছয়টি ভেষজ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের—বিধানসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবনরতন ধরের ঘোষণা।

১লা আগস্ট — ১৬ই শ্রাবণ : কলিকাতায় ট্রাম শ্রমিকদের আকস্মিক কর্মবিরতি—বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে দলবদ্ধ অভিযান—ট্রামের অভাবে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ।

'ভেজাল ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয় নরহত্যার সমতুল্য'—পাটনায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ারের ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

২৬শে জুলাই—১০ই শ্রাবণ : আলজিরিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ বেন বেল্লা দল কর্তৃক আলজিরীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা—ওরাণে বেন বেল্লার পরিচালিত পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদর কার্যালয় স্থাপন।

নোয়াখালির অন্তর্গত চৌমুহনীতে (পূর্ব পাকিস্তান) সংখ্যালঘুদের উপর নৃশংস আক্রমণ—১৫ জন নিহত ও ৩৭ জন আহত হওয়ার সংবাদ—রাজশাহীতে দুর্বৃত্ত দল কর্তৃক একটি হিন্দু পরিবারের সমস্ত লোককে হত্যা।

২৭শে জুলাই—১১ই শ্রাবণ : বৃটেনের ম্যাকমিলান সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা (অনাস্থা) প্রস্তাব (বিরোধী শ্রমিক দলের আনীত) ভোটাধিক্যে নাকচ।

২৮শে জুলাই—১২ই শ্রাবণ : ঢাকায় (পূর্ব পাকিস্তান) মর্ণিং নিউজ পত্রিকার অফিসে ছাত্রদের হামলা—আসবাবপত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ ও সংবাদপত্রের বাণ্ডিলে অগ্নি-সংযোগ—শেষ পর্যন্ত পত্রিকার অফিসে লৌহ শিরস্ত্রাণধারী পুলিশ মোতায়েন।

২৯শে জুলাই—১৩ই শ্রাবণ : ক্যান্সারের ঔষধ আবিষ্কারের জন্যে অব্যাহত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল—মস্কো-এ আন্তর্জাতিক ক্যান্সার সম্মেলনের সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনের নিবিড় আলোচনা।

স্ট্যালিনের (প্রাক্তন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী) বিরুদ্ধে রুশ প্রধানমন্ত্রী (বর্তমান) নিকিতা ক্রুশ্চেভের আর এক দফা বিষোদ্গার—সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কে স্ট্যালিনের জ্ঞান বিকৃত ছিল বলিয়া প্রকাশ্যে মন্তব্য।

৩০শে জুলাই—১৪ই শ্রাবণ : ওয়াশিংটনে 'এড ইণ্ডিয়া' ক্লাবের প্রতীক্ষিত বৈঠকের অনুষ্ঠান—তৃতীয় পরিকল্পনার (পঞ্চবার্ষিক) দ্বিতীয় বৎসরে ভারতকে আরও ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা। প্রতিশ্রুত মোট সাহায্যের পরিমাণ ১০৭ কোটি ডলার।

৩১শে জুলাই—১৫ই শ্রাবণ : সমগ্র কলাম্বিয়ায় প্রবল ভূমিকম্পে বহু নরনারীর প্রাণহানি—শত শত লোক আহত—তিন ঘণ্টা ধরিয়া মাঝে মাঝে ভূকম্পন।

ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ওলন্দাজ—ইন্দোনেশীয় বৈঠকে পশ্চিম ইরিয়ান বিরোধ সম্পর্কে বোঝাপড়া—মে মাসের (১৯৬৩) মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার হাতে পঃ ইরিয়ানের হস্তান্তর ব্যবস্থা।

কুমিল্লায় বিক্ষোভকারী ছাত্রদলের উপর পুলিশের লাঠি চালনা—কেন্দ্রীয় পাক্ মন্ত্রী (কৃষি) শ্রীফজলুল কাদের চৌধুরীর সভা পণ্ড—২৫ ব্যক্তি গ্রেপ্তার।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নূতন মালয়েশিয়া রাষ্ট্র (ফেডারেশন) গঠনের ব্যবস্থা—বৃটেন ও মালয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত।

১লা আগস্ট—১৬ই শ্রাবণ : নেপালী পুলিশ ও সৈন্যদলের সহিত বিদ্রোহীদের তিন ঘণ্টাব্যাপী লড়াই—রঘুনাথপুর থানা, ট্রেজারী ও রেভিনিউ অফিস দখল।

অভয়ঙ্কর

॥ বেলাশেষের গান ॥

প্রথম উপন্যাসেই অনেক লেখক খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বাংলাদেশেও এমন দু'চারজন লেখক আছেন। তবে এই খ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁদের চড়া মূল্য দিতে হয়, খ্যাতিকে লালন করার জন্য যে প্রিমিয়ম দিতে হয় অনেকের ভাণ্ডারে তার ফলে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। চড়া প্রিমিয়ম দান করেও শেষরক্ষা করা যায় না।

জিই সেপী লাম্পেদুজা'র কিন্তু এই আশঙ্কা নেই। কারণ লেখক এই প্রথম এবং শেষ উপন্যাস লিখেই পরপারে চলে গেছেন। খ্যাতির সুবর্ণ মুকুট মাথায় তুলে নিতে পারেননি। এদিকে সমালোচকরা তাঁর জয়গানে মুখর।

লেখক লাম্পেদুজা শয়নে, স্বপনে, জাগরণে পঁচিশ বছর ধরে এই উপন্যাসের কথা চিন্তা করেছেন। তিনি স্বয়ং এক সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের দুলাল, উচ্চশিক্ষিত, মার্জিতরুচিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল পুরুষ। সারা জীবন ধরে শুধু পড়েছেন, দেশে ও বিদেশে ঘুরেছেন, জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন অন্তরঙ্গভাবে।

এই উপন্যাসের নায়কের মত লাম্পেদুজা একদিন সহসা আবিষ্কার করলেন যে মৃত্যু সকলের কাছেই সমান। শুধু যারা আছে কাছাকাছি এবং পাশাপাশি, যারা আমাদের প্রিয়জন তাদেরই মৃত্যু ঘটে তা নয়, একদিন অকস্মাৎ নিজের জীবনেও শোনা যায় মৃত্যুর পদক্ষেপ। যে-পরমাশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশী উদাসীন সেই যখন মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তখন আমরা সবিস্ময়ে বলি—এরই মধ্যে সব হয়ে গেল, কত কি যে বাকী, কত কি এখনও না-বলা রয়ে গেল যে। তবু যেতে হয়। পঁচিশ বছর ধরে চিন্তা করলেও লাম্পেদুজা তাঁর 'Leopard' নামক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটি লিখেছেন মাত্র একবছরে এবং তারপরই ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে মারা গেছেন। মৃত্যু অনিবার্য এবং আসন্ন এই চিন্তা মনে উদিত হওয়ার পর তিনি দিবারাত্র খেটে উপন্যাস শেষ করেছেন। প্রিন্স অব ল্যাম্পেদুজা ডিউক অব পাল্‌মাকে প্রকাশকরা বল্লেন এই উপন্যাস মুদ্রণযোগ্য নয়। এর মধ্যে কিছু নেই। অখ্যাত লেখকের রচনা পাঠকের চিত্ত জয় করে না ইত্যাদি বাঁধাবুলি, কিন্তু আঠারো মাসের মধ্যেই ইতালীতে 'Leopard' অচিরেই বেস্ট সেলারের মর্যাদা লাভ করল। চতুর্দিকে প্রশংসা। ফরাসী এবং ইংরেজী অনুবাদও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করল। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দেই ইংরেজী সংস্করণ চৌদ্দবার মুদ্রণ হয়েছে।

এই উপন্যাসের পটভূমি উনবিংশ শতাব্দীর সিসিলি। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গারিবল্‌ডি বুরবনদের হাত থেকে উদ্ধারমানসে এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিসিলি দ্বীপে যাত্রা করেছিলেন, সেইখানেই এই উপন্যাসের সূচনা। এই উপন্যাসের নায়ক প্রিন্স ফার্বারিৎসিও অব সালিনা উদাসীনের ভঙ্গি নিয়ে নিশ্চল রইলেন। তাঁরই পারিবারিক নিশানা ছিল 'চিতাবাঘ'—সেই কারণে এই গ্রন্থের নাম The Leopard—, এদিকে 'রিসরজিমেণ্টো'র দল বা সমগ্র ইতালীকে একসূত্রে বাঁধার জন্য যাঁরা পণ করেছিলেন তাঁরা সিসিলিকে অধিকার করলেন। প্রিন্স কিন্তু গারিবল্‌ডিনিকে বাধা দিলেন না, বরং তাঁর প্রিয়তম ভাইপোকে বিদ্রোহী দলের এই আন্দোলনে যোগদানে উৎসাহিত করলেন। অক্‌টোবর মাস, ১৮৬০, গণভোট দ্বারা স্থির হবে যে সিসিলি ইতালীর সঙ্গে সংযুক্ত হবে কিনা, প্রিন্স স্বয়ং সংযুক্তির স্বপক্ষে ভোট দিলেন।

সংযুক্তিকরণ হয়ে গেল। তুরিণ সরকার যখন তাঁকে সিনেটের সদস্যপদ দান করলেন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এই যে মনোভঙ্গির মধ্যে একটা বৈপরীত্য রয়েছে এ হল তাঁর বৈশিষ্ট্য। সিসিলিয়ানদের সঙ্কট সম্পর্কে তিনি তাই বলছেন :

"Sleep, my dear Chevalley, sleep, that is what Sicilians want, and they will always hate any one who tries to wake them, even to bring them the most wonderful of gifts."

অনেকটা বাঙালীদের মত। আচ্ছন্ন হয়েই থাকতে আমরা ভালোবাসি। প্রসঙ্গতঃ একথা বলা প্রয়োজন যে সিসিলিয়ানদের চরিত্রের সঙ্গে বাঙালী চরিত্রের আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। প্রিন্স পরে বললেন—"নতুন যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হল তাদের ঝুলিতে যে আমাদের জন্য উপহারবস্তু নেই, তাই আমার ধারণা।"

প্রিন্সের এই সংশয় আজ সত্যে পরিণত। ঘটনার একশত বছর পরেও নিদারুণ সত্য। পাকিস্তানের পূর্ব অংশ এবং পশ্চিম অংশে যেমন আসমান জমিন ফারাক, তেমনই ইতালীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্তে অনেক ব্যবধান। অবশ্য ইতালীয় সরকার এই ব্যবধান দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর। এই গ্রন্থের বৈচিত্র্য পুরাতন মূল্যবোধের সঙ্গে নূতন মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব। এক দুর্ভাগা কালের মানুষ দিক্‌ভ্রান্তের মত পথহারা হয়ে ঘুরছে। ডন ফার্বারিৎসিও এই যুগের প্রতীক। প্যারীর এক বই-এর দোকানে নায়ক একদিন দেখেছিলেন,—সেই পদাংশ তাঁর মনে নাড়া দেয়—

".....donnez-moi la force et le courage de contempler mon coeur et mon corps sans degout...."

লেখকেরও এই মন্ত্রে মুক্ত। এই উপন্যাসে তিনি সব কিছুরই সন্নিবেশ করেছেন। এই উপন্যাসের নায়ক উপলব্ধি করেছেন যে পূর্ব সম্প্রদায়ের তিনি মানুষ, সেই সম্প্রদায় দ্রুত বিলীয়মান। কিন্তু স্বধর্মে নিধন শ্রেয় এই মন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী। তাই ভাইপোর মত অন্য দলে গিয়ে ভিড়তে পারলেন না। একদিন তিনি বলে ওঠেন—

"The whole lot us, leopards, jackals and sheep, we will all go on thinking ourselves the salt of the Earth."

সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যে নায়কের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলেও, নীল রক্তের ধারা তাঁর শিরায় শিরায় প্রবাহিত। তার হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের উপায় নেই। তাই যদিচ তিনি সচেতন যে বিজয়ীর বরমাল্য অপরপক্ষের গলায়; সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁদের ছেড়ে চলে গেছেন, তবু তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দিতে পারছেন না।

The Leopard উপন্যাসের প্রিন্স চরিত্রটির সঙ্গে আমাদের দেশের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার এবং রাজ্যহারা রাজন্যবর্গের আশ্চর্য মিল। বাংলা সাহিত্যে এক তারাশঙ্করের উপন্যাস ভিন্ন ঠিক এই অবক্ষয়িত সমাজের চিত্র আর কোথাও নেই। সামন্তবংশীয় লেখক প্রিন্স লাম্পেদুজার এই উপন্যাস তাই সামন্ততন্ত্রের 'এলিজি' হিসাবে গৃহীত হবে। চিরস্মরণীয় এক নিদারুণ শোকগাথা। *

---

* THE LEOPARD-II Giuseppe di Lampe dusa (Collins & Harvill)—Price—16 sh.

রবীন্দ্রনাথ—(প্রবন্ধ)—প্রমথ চৌধুরী ॥ রণজিৎকুমার সেন সম্পাদিত ।। বর্তিক ।। ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ ।। দাম দু' টাকা মাত্র।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় কথাপ্রসংগে বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ শুধু আমার আত্মীয় ছিলেন না, ছিলেন আমার অন্তরংগ সুহৃদ। তাঁর মহাপ্রয়াণ 'ক চোখে বসে দেখা যায়?" —প্রমথ চৌধুরীর ভক্তি ছিল যুক্তি দিয়ে গড়া, তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে সব প্রবন্ধাবলী রচনা করেছিলেন তার প্রয়োজন ছিল সাময়িক কিন্তু মূল্যে নিঃসন্দেহে চিরায়ত। 'রবীন্দ্রপরিচয়', 'রবীন্দ্রমনীষা লোকোত্তর' 'রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাগুরু', 'রবীন্দ্রপ্রসংগ', 'রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর', 'ছিটেফোঁটা', 'একটি আবিষ্কার', 'রবীন্দ্র-সন্দর্শন', 'বর্তমান বাংলাগদ্য', 'রবীন্দ্রজয়ন্তী', 'রবীন্দ্রনাথের তিরোধান,—এই কয়টি প্রসংগে প্রমথ চৌধুরীর মূল্যায়ন সাহিত্য-পাঠকের কাছে মূল্যবান সম্পদ। সম্পাদকের ভূমিকাটি তথ্যবহুল এবং সুলিখিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলন করে সম্পাদক এই অমূল্য সম্পদ প্রকাশের আয়োজন করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। ছাপা অতি পরিচ্ছন্ন তবে গ্রন্থটির আয়তনের অনুপাতে মূল্য বেশী।

রবীন্দ্রনাথ ।শতবর্ষ পরে—(প্রবন্ধ) ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ানা। ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ২-৫০ নয়া পয়সা।

ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মননশীল লেখক। তাঁর 'বঙ্কিমমানস', 'রবীন্দ্রমানস', 'ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক', 'শিল্পদৃষ্টি' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী বাংলা সাহিত্যের উল্লেখনীয় সৃষ্টি। আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের রবীন্দ্রনাথ—শতবর্ষ পরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা, মাটি আর মানুষের কবি, চৈত্রের শালবন, রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যে প্রয়োজনবোধ প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী সংকলিত। বিভিন্নকালে প্রবন্ধাবলী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত, তাই কোনোটির সঙ্গে সমসূত্র নেই, তবু রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা, মাটি আর মানুষের কবি এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা ও রবীন্দ্রনাথে মধ্যে একটি যোগসূত্র বর্তমান। এই গ্রন্থের এই তিনটি প্রবন্ধ বিশেষ মূল্যবান, লেখকের বক্তব্যের মধ্যে যে বলিষ্ঠ দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় তা প্রশংসনীয়। লেখকের রবীন্দ্র-বন্দনা সম্পর্কে বক্তব্যটুকুর মধ্যে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক আছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে বাৎসরিক পুতুল-পূজার আয়োজন, যেখানে জীবন-পর্যালোচনার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও নৃত্যনাট্যের প্রাধান্য সর্বাধিক সেই উৎসবের সার্থকতা কি। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার এই প্রবন্ধকটিতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনা ও ভূমাবোধ সম্পর্কে মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দান করেছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট —(রবীন্দ্রস্মারকগ্রন্থ)— ইংরেজী ও বাংলা দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। সম্পাদক —রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রকাশক—কলিকাতা করপোরেশন। দাম তিন টাকা।

কলিকাতা করপোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত যে "রবীন্দ্রস্মারকগ্রন্থ" ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয় আজো তা প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। আলোচ্য গ্রন্থটি কলিকাতা করপোরেশনের সেই প্রাচীন ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখেছে। প্রায় দুই শতাধিক সুমুদ্রিত চিত্র এবং দেশী

ও বিদেশী মনীষীবৃন্দের রচনায় এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, গোপাল রেড্ডী, ডঃ সম্পূর্ণানন্দ, হুমায়ুন কবির, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নরম্যান ক্যানিজনস, ডঃ মুলকরাজ আনন্দ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদার, ভবানী মুখোপাধ্যায়, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, ডঃ সরোজকুমার দাস, ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ হেলমুট ক্যালে, ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী, বিষ্ণু দে, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, সুনীলচন্দ্র সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রভৃতির ইংরেজী ও বাংলা রচনাগুলি মূল্যবান। এই সুবৃহৎ ও সুমুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য মাত্র তিন টাকা বেশ সস্তা বলা যায়। সুন্দর প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছেন বিশু গঙ্গোপাধ্যায়।

থোরো —মূল : উইলিয়ম কণ্ড্রি—অনুবাদ : মতিলাল দাশ। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : দুই টাকা।

আমেরিকার প্রকৃতিবাদী দার্শনিক হেনরি ডেভিড থোরোর সঙ্গে ভারতের পরিচয় দীর্ঘদিনের। গান্ধীজী থোরোর জীবনদর্শন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে থোরো বিবিধ বিষয়ে পড়াশুনো শুরু করেন। মনীষী এনাক্সনের বাড়ীতে কয়েকজন নবীন দার্শনিকের সান্নিধ্যে আসার ফলে তাঁর চিন্তাধারা ঐ সমস্ত তুরীয়বাদী দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হন। থোরো প্রায় সন্ন্যাসীর মত প্রকৃতির নির্জন কোলে বাস করেছেন। প্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মাঝখানে বাস করে থোরো আপন দর্শনচিন্তা গড়ে তোলেন। বই লেখা, প্রবন্ধ রচনা, জমির কাজ করে তাঁর দিন কেটেছে। হোয়াল্ট হুইটম্যানের বন্ধু থোরো দাসপ্রথার বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। ১৮৬২ সালের ৬ই মে থোরো মারা যান।

জীবিত অবস্থায় এই মহান প্রকৃতিবিজ্ঞানীর এ উইক অন দি কনকর্ড অ্যান্ড মেরিম্যাক রিভার্স' এবং 'ওয়ালডেন অর লাইফ ইন দি উডস' নামক দুখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর দেশে-বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমান বৎসরে থোরোর মৃত্যু-শতবার্ষিকী। কণ্ড্রি-রচিত জীবনীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই।

বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস—(২য় খণ্ড)— ধনঞ্জয় দাসমজুমদার। প্রকাশক—গ্রন্থকার। ৮২।১৬ নরসিংহ দত্ত রোড। প্রাপ্তিস্থান সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—পাঁচ টাকা।

এই গ্রন্থ দুটি খণ্ডে বিভক্ত, প্রথম খণ্ডে বাংলার ধর্ম, জাতি ও সমাজতত্ত্ব এবং আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডে বাঙালীর বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ যুগের অন্তভাগ পর্যন্ত আলোচিত। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দু-কেন্দ্রিক। ইতিহাস-সচেতন নয় তবে ইতিহাসনিষ্ঠ। গভীর বাঙালী প্রেম তাঁর গ্রন্থরচনার অনুপ্রেরণা। লেখকের সমস্ত মত গ্রহণযোগ্য নয়, তবে তাঁর ধ্যান-ধারণানুসারে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এ তারই ফল। তাঁর আলোচনায় ভাবাবেগ প্রধান হয়ে ওঠায় এবং যুক্তি স্থানে স্থানে দুর্বল হওয়ায় ভারসাম্য সর্বত্র সমানভাবে বজায় থাকেনি। লেখকমহাশয়ের গ্রন্থপাঠে তবু অনেক নতুন তথ্য জানা যায়। তাঁর আলোচনা চিন্তামূলক, তাঁর অনুসন্ধিৎসা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বৈদিক যুগে বাঙালী, রসায়ন ও মহাভারতের যুগে বাঙলা ও বাঙালী, প্রাচীন ভারতে বাঙালীর বল, রানাসাহি গঙ্গারাঢ়ি রাজবংশের পরিচয়, গঙ্গারাঢ়ির পতন ও পুনরভ্যুত্থান, গঙ্গারাঢ়ির পতনের কারণ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নায়েক বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ওয়াহবী বিদ্রোহ, নীলকর আন্দোলন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বিপ্লবী নারী—প্রভৃতি পরিচ্ছেদগুলি সুলিখিত এবং প্রশংসনীয়। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কিঞ্চিৎ সংস্কারমুক্ত হলে গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলা যেত। ছাপা ও বাঁধাই পরিষ্কার।

বাতাসী বিবি—(উপন্যাস) অজিতকৃষ্ণ বসু (অ, কৃ, ব) প্রণীত। প্রকাশক—রূপা এ্যান্ড কোং। কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ, কৃ, ব) গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত। এক বিশেষ ধরনের কবিতা রচনায় তাঁর কৃতিত্ব আছে। ইতিপূর্বে তিনি আরো তিনখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। বাতাসী বিবি স্বাধীনচেতা রমণী। যেমন তার দৈহিক বল, তেমনই রূপ এবং বুদ্ধি। সমাজবিরোধী আড্ডার সে নায়িকা। তার যৌনবুভুক্ষু মনে ছায়া পড়লো কোচোয়ান-তনয় কিশোরকুমার সুলতানের। অজিতকৃষ্ণ ম্যাজিক-রসিক, তিনি এই উপন্যাসে যাদুকরের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। পটভূমিকা সুবৃহৎ, কিন্তু সংক্ষেপে অনেক কথা বলতে হয়েছে। তার ফলে কাহিনী-অংশ সংহত হয়েছে, হয়ত উপন্যাসটিকে আরো কিঞ্চিৎ বড়ো করলে লেখকের সব বক্তব্য বলা যেত। অনেক ঘটনা একসঙ্গে ছোট এক প্রকোষ্ঠে এসে জমা হয়েছে সেই যা ত্রুটি। তবে বিষয়বৈচিত্র্যে এবং আঙ্গিকে অজিতকৃষ্ণের 'বাতাসী বিবি' জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। ছাপা, বাঁধাই এবং নিতাই দের প্রচ্ছদ সবই সুরুচিসঙ্গত।

তপতীর তৃষা— (উপন্যাস) রমাপতি বসু। প্রকাশক—রীডার্স কর্ণার। ৫ শংকর ঘোষ লেন। কলিকাতা-৬। দাম চার টাকা।

রমাপতি বসু খ্যাতিমান লেখক। ইতিপূর্বে তাঁর 'স্বৈরিণী', 'অনুশীলা', 'রোশন চৌকি' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'শিলাহার' নামক কবিতাগ্রন্থ বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে। তপতীর তৃষা তাঁর সর্বাধুনিক উপন্যাস। তপতী মজুমদার এক মিশনারী স্কুলের শিক্ষিকা। স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাকে ভালোবাসে। তপতী অতৃপ্ত। ত্রিশ বছরের পূর্ণযৌবনা নারী সে। সংসারবহির্ভূত শিক্ষার জৌলুসভরা নারী তপতী। কে বোঝে মেয়েদের প্রধান আকর্ষণ সংসার। জ্যোতিশংকরের সঙ্গে তার পরিচয় এক দুর্ঘটনার মাধ্যমে। জ্যোতিশংকরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। একদিন সে প্রশ্ন করে—আপনি কি শিক্ষিকার জীবনে খুসী!—এই ভাবেই চলে, একদিন গেল চন্দননগরে, সেখানেই রইল সেই রাত। দুজনের বিয়ে হবে, কিন্তু এদিকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের ফলে শিক্ষিকার চাকরি চলে যায়। জ্যোতিশংকরের প্রথমা স্ত্রী উন্মাদ হয়ে গেছে,—এদিকে জ্যোতিশংকর হঠাৎ বিদেশে যায় কি এক কনফারেন্সের ডেলিগেট হয়ে। যে প্লেনে তার ফেরার কথা সেই প্লেনটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনায় জ্যোতিশংকরের মৃত্যু হয়নি। তার আবির্ভাবে তৃষ্ণা মিটেছে তপতীর সে আজ মহিয়সী নারী। মিষ্টি মধুর কাহিনী, পরিবেশনের ভঙ্গিতে কৌতুহলোদ্দীপক এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছে। সবচেয়ে প্রশংসনীয় লেখকের সংযম এবং ঝরঝরে ভাষা। নিতাই দের আঁকা প্রচ্ছদটি চমৎকার।

রাশিয়ান শো— নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা - ৬, দাম ৪-৭৫ নঃ পঃ।

গল্প-সংকলন। মোট ২৩টি গল্প সংকলিত হয়েছে। একটি গল্পের নাম 'রাশিয়ান শো'।
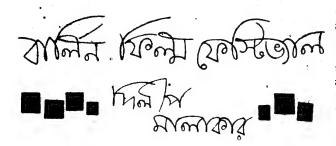
আজকাল ইউরোপের প্রায় সব দেশেই হয় বসন্তকালে নয় গ্রীষ্মকালে একটা না একটা উৎসব লেগেই আছে। নাটক ও সিনেমা উৎসব তাদের মধ্যে অন্যতম। প্যারিসে বসন্তকালে হয় নাটক উৎসব, আবার মে মাসে কান এ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ভেনিসে বছরে দু দুবার উৎসব। উৎসব উপলক্ষে আগমন হয় গুণী ব্যক্তি ছাড়াও ট্যুরিস্টদের।

বার্লিনের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালকে কেন্দ্র করে বার্লিনে প্রায় সপ্তাহ দুয়েক ধরে চলে মেলা। চারধারে হৈ চৈ ব্যাপার। রাস্তায় রাস্তায় দেখি দেশ বিদেশের রং-বেরংগের পতাকা উড়ছে। বিচিত্র বেশ পরে চিত্রতারকার দল এ হোটেল সে হোটেল থেকে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের দেখতে অগণিত দর্শকের দল তাদের পিছু নিয়েছে। তাও দেখেছি। তার মধ্যে বালখিল্যের দল খাতা-পেন্সিল নিয়ে তারকাদের পেছনে ছুটেছে। একটি সই চাই। চিত্রতারকাদের প্রতি আগ্রহ প্রতি দেশেই সমান। কোথাও কমবেশী দেখলাম না। এমনকি আকাশচ্যুত তারকাদের প্রতিও।

এবারকার বার্লিন ফিল্ম ফেস্টি-ভ্যালে অন্যান্য বছরের মতন অত ভিড় দেখিনি। তার প্রধান কারণ বার্লিনের দেয়াল। ওপাড়া থেকে যারা আগ্রহ করে আসত তারকাদের দেখতে, তারা এবার আসতে পারেনি বলেই ভিড় কম ছিল। তাছাড়া জার্মান ফিল্ম ব্যবসায়ে চলেছে মন্দা বাজার। এইসব মিলে এবারের উৎসব অন্যান্য বছরের তুলনায় কিছুটা ম্লান। তবে এত বাধা সত্ত্বেও বার্লিনের দ্বাদশ চলচ্চিত্র উৎসব সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। উৎসবের কর্মকর্তাদের তারিফ করতে হয়।

একালে সিনেমা আর বিদেশী বা অবাঞ্ছিত বলে পরিগণিত হয় না। বরং দৈনন্দিন জীবনে সব দেশেই আঙ্গিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারতীয় সমাজে, মায় ধর্মগ্রন্থে পর্যন্ত নাটকের সমাদর চিরকাল ছিল। সিনেমার সঙ্গে নাটকের তফাৎ হল এই। কাউকে দুটো কথা বলতে হলে হয় তার বাড়িতে গিয়ে তাকে ডেকে এনে কথা বলা। নয় সে বাড়িতে এসে কথা বলে যায়। এই কথা বলাটা আজকাল অত পরিশ্রম না করে অতি অল্প সময়ে টেলিফোনে সারা যায়। সিনেমার সঙ্গে থিয়েটারের পার্থক্য এইখানেই। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী বা উৎসবে একদল অভিনেতা পাঠানোর যে ঝকমারি, তার অনেক সংক্ষেপে পাঁচ কি ছটি বাক্সে পুরে সেলুলয়েডের ফিল্ম বিমানডাকে যে কোনো সময় এবং যে কোনো গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া অনেক সোজা। কম ঝঞ্ঝাটে আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টি-ভ্যালগুলো সমাধিত হয় বলেই তারা এত খ্যাতিলাভ করেছে। তাছাড়া সিনেমা-শিল্প অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্যের মতনই বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। সেকথা ভুলে গেলে চলবে না।

সমাজবিজ্ঞানীরা আজকাল সিনেমা-শিল্পকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছেন এই কারণে যে, সিনেমা-মাধ্যমে সমসাময়িক বা একালের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যা-বলী দেখা যায়। সমস্যাগুলি ভাল কি

ব্রাজিলিয়ান ছবি "ওস ফায়েসতেস"-র একটি দৃশ্য

'এ কাইণ্ড অব্ লাভিং' ছবির নায়ক ও নায়িকা

মন্দ তার বিচার সিনেমা-কর্ণধাররা করেন না। তাঁরা সাংবাদিকের মতন সমস্যাগুলো উত্থাপন করেন মাত্র। ভাল-মন্দের বিচার করবে সমাজ ও রাষ্ট্র।

বার্লিনের দ্বাদশ চলচ্চিত্র উৎসবে যে সব ছবি দেখানো হয়েছে তার অধিকাংশই ইউরোপ-আমেরিকার ইদানিংকালের সামাজিক সমস্যা নিয়ে তোলা। ইউরোপ-আমেরিকায় এখন চলেছে 'এ্যাংরি ইয়ংম্যান'দের যুগ। ইউরোপ-আমেরিকায় 'এ্যাংরি ইয়ং-ম্যানদের' দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা প্রায় সব যুবক-যুবতীদের প্রতিনিধিত্ব করে বললে মিথ্যে বলা হবে না। একালের অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর ইউরোপ-আমেরিকার তরুণ ও যুবকেরা সন্তুষ্ট নয়। কেন তারা সন্তুষ্ট নয়, কেন তারা সুখী নয় তার জবাব দেবেন সমাজবিজ্ঞানীরা। কিন্তু তাদের নিয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তারই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছে বিভিন্ন দেশের ছায়াচিত্রের প্রযোজক-পরিচালকরা। ইদানিংকালে ইউরোপ-আমেরিকায় আমরা যে সব সামাজিক সমস্যা দেখছি তা নিরীহ মানুষের সহজ সরল জীবন-যাত্রা নয়। এর মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে অন্ধকারময় দিন-গুলোর স্মৃতি, পরে অতি-স্বাধীনতা পাওয়ায় তরুণ-তরুণীদের পিচ্ছিল পথ, একালে আর্থিক উন্নতি চরমে ওঠায় যুবক-যুবতীদের মধ্যে নৃশংস মনোভাব, হিংসে-দ্বেষ ও খুনোখুনির চিত্র। যতগুলো ছবি দেখছি আজকাল তার মধ্যে অধিকাংশই নৃশংসতায় ভরা। তার ওপর রয়েছে নূতন 'ট্রেণ্ড'। সে হল নায়ক-নায়িকার মিলনের স্পষ্ট ছবি। অর্থাৎ ইদানিংকালে নগ্ন মূর্তি তুলে ধরাটা একটা হালফ্যাসান হয়েছে। যেমন এককালে চিত্রকলায় 'ন্যুড' বা নগ্ন চিত্র ছিল স্টাইল। তেমনি হয়েছে ইদানিং-কালের ইউরোপ-আমেরিকান সিনেমায়।

বার্লিন ফেস্টিভ্যালে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গোল্ডেন বিয়ার' লাভ করেছে ব্রিটেনের এ কাইণ্ড অব লাভিং'। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরস্কার 'সিলভার বিয়ার' দেওয়া হয়েছে ইতালিয়ান ছবি 'সালভাতোরে জিলিয়ানো'র পরিচালক সিনর ফ্রান্সোস্কো রোসিকে, মার্কিন ছবি 'এক্সিট' (জ' পল সার্ত্রর লেখা নাটক অবলম্বনে) এর নায়িকা রিতা গাম ও ভিভেসিয়া লিণ্ডাকোর্সকে, মার্কিন ছবি 'মিঃ হব্‌স টেক্‌স এ ভেকেশান' ছবির নায়ক মিঃ জেমস ট্যুয়ার্ট, কোরিয়ান ছবি 'টু দি লাস্ট ডেজ'-এর অভিনেতা জন উংহুল। লম্বা দৈর্ঘ্যের ডকুমেন্টারি ছবি 'গালাপাগোস' (পশ্চিম জার্মানী) পেয়েছে সিলভার বিয়ার পুরস্কার। ছোট দৈর্ঘ্যের ছবির মধ্যে 'গোল্ডেন বিয়ার' পুরস্কার পেয়েছে হল্যাণ্ডের 'আর্ট' অব কারেল আপেল'। সিলভার বিয়ার পেয়েছে কানাডার 'নাহানি', নাইজেরিয়ার 'দি এনসেসট্রস', অস্ট্রিয়ার 'ভেনেডিস', সেনেগালের 'গ্রাঁ মাগাল আ তুবা' ও পশ্চিম জার্মানীর 'টেস্ট ফর দি ওয়েস্ট : বার্লিন'। বার্লিনের সিনেট প্রদত্ত ছোটদের জন্যে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পেয়েছে ইস্রায়েলের 'দনেনু হোম দেজএসপারে', জার্মানীর 'গালাপাগোস', হল্যাণ্ডের 'দি জু', ফিন-ল্যাণ্ডের 'পিক্কু পিতারিন পিহা' ছবি। ক্যাথলিক পুরস্কার পেয়েছে সুয়েডেনের 'দি মিরর'। ফিল্ম সাংবাদিকদের পুরস্কার পেয়েছে হল্যাণ্ডের ছোট দৈর্ঘ্যের ছবি 'দি জু'।

গোল্ডেন বিয়ার পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি 'এ কাইণ্ড অব লাভিং' ছবির নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় মিঃ এলেন বেট্‌স ও শ্রীমতী জুন রিচির অভিনয় সার্থক হয়েছে। কিন্তু ছবির বিষয়বস্তু নতুন কিছুর নিদর্শন দেয়নি। ছবিটি এণ্টার-টেনমেণ্টের দিক দিয়ে সার্থক। ফটো-গ্রাফি ও অভিনয় চমৎকার। গল্পটি হচ্ছে এই : ইংলণ্ডের এক ছোট শহরের অফিসে ড্রাফট্‌সম্যানের কাজ করে ভিক্ ব্রাউন। সেই অফিসে টাইপিস্টের কাজ করে কুমারী ইংগ্রিড রথওয়েল। ভিক্-এর বোনের বিয়ের দিন ইংগ্রিডের সংগে তার হল আলাপ-পরিচয়। কিছুদিন পরে দেখা গেল দুইজনে প্রেমে পড়েছে। কিছুকাল পরে তাদের দৈহিক মিলনের পরেই ভিক্-এর মনে দেখা দেয় অন্যমনস্কতার ভাব। ভিক্ তার বান্ধবী ইংগ্রিডকে প্রায় ভুলতে বসেছে এমন সময় ইংগ্রিড তাকে জানায় যে সে সন্তান-সম্ভবা। এই ঘটনার পরেই ভিক্ তাকে বিয়ে করে। সে বিবাহ হয় অনাড়ম্বর-পূর্ণ। বিবাহের পরে ইংগ্রিডের বিধবা মায়ের সংগে ভিকের মনোমালিন্য উপলক্ষে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা দেয় বিরোধ। অবশেষে একদিন তাদের মধ্যে হয়ে যায় ছাড়াছাড়ি। ইতিমধ্যে ইংগ্রিডের সন্তানটি জন্মাবার আগেই মারা যায়। এ খবরে ভিক্-এর মনে নাড়া দেয়, কেন সে ইংগ্রিডকে অযথা বিয়ে করতে গেল। এই আপসোসে তার দিন কাটছিল। একদিন তার বাপ তাকে উপদেশ দেন যে, সে যেন অন্যত্র ছোটখাট বা ভাঙ্গা-চোরা ঘর পেলে যেন সেখানে তারা স্বামী-স্ত্রীতে কষ্টে বসবাস করে। যা তিনি নিজে করেছিলেন যৌবনকালে। ভিক তার বাপের উপদেশ মত উঠে গেল এক ভাঙ্গাচোরা ছোট ফ্ল্যাটে। সেখানেই আবার হল মিলন ভিক্ আর ইংগ্রিডে। মিলনান্তক নাটকটি হাসিকান্নায় ভরা একালের দৈনন্দিন জীবনের ছবি। একালের ইউরোপে এমনি ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন অহরহ। তাই এই ছবিটির সামাজিক মূল্য অনেকখানি। এবং এই কারণেই ছবিটি পেয়েছে প্রথম পুরস্কার।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরস্কার সিলভার

বিরাম লাভ করেছে যে কটা ছবি, তার মধ্যে ইতালিয়ান 'সালভাতোরে জিলিয়ানো' ছবিটি সিনেমা-টেক্‌নিকের দিক দিয়ে নতুনত্ব দেখিয়েছে। পুরো ছবিটাই সিসিলির গ্রামে গ্রামে তোলা। ছবিটা অনেকটা ডকুমেন্টারি ধরণের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সিসিলি দ্বীপে চলে অরাজকতা। সেই অরাজকতার রাজ্যে সালভাতোরে নামে এক দস্যুর আবির্ভাব হয়। সালভাতোরে দিনে-দুপুরে ডাকাতি করত। কিন্তু মাঝে মাঝে তার লুটের ভাগ গরীবদের মধ্যে বিলত। শেষ পর্যন্ত দস্যুর কি অবস্থা হল তাই দেখান হয়েছে এই ছিবে।

যে দুটো মার্কিন ছবির নায়ক-নায়িকা দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে, তাদের একটি, ফরাসী একজিসটেন-শিয়াল সাহিত্যিক জঁ পল সার্ত্র-এর নাটক 'এক্সিট'। এই ছবিতে মূলত দেখান হয়েছে তিনটি চরিত্র। দুই নারী একটি পুরুষ একটি ঘরে বন্দী। তারা তিনজনেই আত্মহত্যার পর সেখানে এসেছে নরক বাসে। প্রতিটি চরিত্র নিজে নিজের বিগত দিনের কাহিনী বলে চলেছে। সেই কাহিনী দেখান হয়েছে। এর মধ্যে অভিনয়ের কৌশল প্রশংসনীয়। দ্বিতীয় ছবি 'মিঃ হব্‌স টেক্‌সে এ ভেকেশান' অতি সাধারণ ছবি। গল্পের বিষয়বস্তুও নতুন কিছু নয়। এই ধরনের ছবি ফ্রান্স ও ইতালিতে অনেকগুলো হয়েছে ইতিপূর্বে।

এবারকার বার্লিন ফিল্ম ফেস্‌টিভ্যালের বৈশিষ্ট্য হল ছবিতে নগ্নতার প্রাচুর্য। এমনকি প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ইংরেজদের মতন গোঁড়া সমাজের ছবিতে নায়িকার সম্পূর্ণ নগ্ন চিত্র এই প্রথম দেখলাম। ইতালিয়ান, ফরাসী, ব্রাজিলিয়ান, আর্জেন্টিনিয়ান, স্পেনীয়, নরওয়ে, ডেনমার্ক-এর ছবিগুলোতে নারীর নগ্ন সৌন্দর্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এইসব নগ্ন ছবির মধ্যে ব্রাজিলের ছবিটি অতি সাহসের পরিচয় দিয়েছে। ব্রাজিলের পরিচালক ও নায়ক জিসে ভালাদাও-এর তোলা ছবি "ওস্‌ কাফায়েসতেস"-এর আখ্যানবস্তু একালের লাতিন আমেরিকার সামাজিক সমস্যা নিয়ে। জিসে ভালাদাও-এর সঙ্গে আলাপ হল বার্লিন উৎসবে। তিনি যেমন সিনেমা-ব্যবসায়ে নবাগত, তেমনি বয়সে এখনও তরুণ। তিনি তরুণ বলেই একালের 'এ্যাংরি ইয়ং মেন'দের সমস্যা নিয়ে ছবি তুলতে সাহস পেয়েছেন। ছবির বিষয়বস্তু হচ্ছে এই, রিওডি-জেনেরিও শহরের ধনী এবং অলস যুবকদ্বয়ের স্ফূর্তি বিনোদনে চাই অজস্র টাকা। কিন্তু সে অর্থ তারা উপার্জন করে রাহাজানি করে। তাদের এক ধনী কাকার রক্ষিতা বলে পরিচিত একটি মেয়েকে তারা ভুলিয়ে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে কৌশলে তার নগ্ন দেহের ছবি তোলে। সেই ছবি দেখিয়ে তারা তাদের কাকার কাছ থেকে টাকা আদায়ের ফন্দি আঁটে। এইভাবে তারা আরও কয়েকটি মেয়ের অনুরূপ অবস্থা আনে। পরে এই তরুণদের বন্ধুত্বের মধ্যে দেখা দেয় ফাটল। সেই নারীঘটিত ব্যাপার। তবে ছবিটিতে লাতিন আমেরিকার রাজনীতির প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ ও হাসিঠাট্টা এমন প্রচ্ছন্নভাবে কথিত হয়েছে যে, শেষকালে ছবিটি প্রহসনে পরিণত হয়। ছবিটি অনেকের কাছে দৃষ্টিকটু হতে পারে, কিন্তু অভিনয় ও ফটোগ্রাফি হয়েছে মনোরম।

ঠিক এমনি ধরনের না হলেও একালের ইউরোপের 'এ্যাংরি ইয়ং মেন'দের জীবনযাত্রা নিয়ে ছবি তুলেছে ডেনমার্কের 'ডুরেলা', নরওয়ের 'টুনি',

ফিনল্যান্ডের 'পুরস্কৃত' পিতামহ 'শিক্ষা' ছবির দৃশ্য

স্পেনের 'লস আত্রাকাদৌস্র', আর্জে-ন্টিনায় 'টু সিস্টারস', ইতালির 'লা বেলেজা দিপোলিতা'।

ডেনমার্কের 'ডুয়েল' ও নরওয়ের 'টনি' ছবিতে দুই নায়কই তরুণ। একজন ছাত্র অপরজন অনাথ। দুজনেই ভদ্র জীবন যাপন করতে চায়, কিন্তু বর্তমানের সামাজিক পরিস্থিতিতে তারা বিপথে যেতে বাধ্য হয়। আরও তারা নিষ্ঠুর হতে বাধ্য হয় কারণ তাদের প্রেমিকেরা তাদের ব্যর্থ করে বলে। এই দুই ছবিতে দৈহিক মিলনের আগে ও পরের দৃশ্যটি অতি সুষ্ঠুভাবে দেখান হয়েছে।

স্পেনের ছবিটা অনেকটা ব্রাজিলের ছবির মতন। স্পেনের উঁচু সমাজের ছেলেদের কীর্তিকলাপ দেখান হয়েছে। ইতালিয়ান ছবি 'লা বেলেজা দিবো-লিতা'তে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন খ্যাতনামা চিত্রতারকা জিনা লোলো-ব্রিজিডা। এবার ফরাসী পরিচালক জ' রনোয়ার তোলা ছবি 'ল্য কাপোরাল এপেংলে' নতুন কিছু নয়। দ্বিতীয় ছবি 'লাপুপে'তে অনেকক্ষণ ধরে নগ্ন ছবি দেখান হয়েছে এই যা। তবে তৃতীয় ছবি 'লামুর আ ভ্যাঁত' (বিশ বছর বয়সের প্রেম) ছবিটিতে ফ্রান্স, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও জাপানের তরুণ-তরুণীদের প্রেম-কাহিনী নিয়ে তোলা। ছবিটি মন্দ হয়নি। জার্মান ছবি 'দি রোটে' তেমন সুবিধের হয়নি। জার্মান সিনেমা-জগতে এখন দুর্দিন চলেছে। শুধু জার্মানী নয় সমগ্র ইউরোপ জুড়ে এখন চলেছে সিনেমা-ব্যবসার মন্দা বাজার।

ভারত থেকে এসেছিল দেবানন্দের 'হম দোনো' ছবিটি। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই ধরনের ছবি কখনো ধোপে টিঁকতে পারে না। ফিল্ম ডিভিশনের 'দি হিমালয়ান হেরিটেজ' মন্দ হয়নি। তবে ভারতের ওপর তোলা ইংরেজদের 'পিসফুল রিভল্যুসন' ছবিটি ভালই হয়েছে। ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রগতি নিয়ে ছবিটির বিষয়বস্তু। 'এ্যান ইনভিটেশান টু ইণ্ডিয়া' ছবিটি শ্রীমতী কেনেডির ভারত-ভ্রমণ নিয়ে তোলা। দুটোই রঙীন ছবি।

যে যে দেশে আজকাল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব পালিত হয়ে থাকে সে সব দেশে আজকাল পুরস্কার-বিতরণের বেলায় দেখা যায় আন্তর্জাতিক রাজ-নীতির খেলা। আগে আর্ট বিচারে এবং গুণানুসারে পুরস্কার বিতরিত হত। আজকাল তার বালাই নেই। বার্লিন উৎসব তার ব্যতিক্রম নয়। এবারকার উৎসব শুরু হয় ২২শে জুন, সমাপ্ত হয় ৩রা জুলাই। সবসুদ্ধ ৩৫টি দেশ বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ছবি প্রদর্শন করেছে।

জার্মান ডকুমেন্টারী ছবি 'গালাপাগোস' ছবির দৃশ্য

এবারকার ফেস্টিভ্যালে লম্বা দৈর্ঘ্যের ছবির বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন মার্কিন প্রযোজক মিঃ কিং ভিডর, ছোট দৈর্ঘ্যের ছবি বিচারক-মণ্ডলীর সভাপতিত্ব করেন ফিনল্যান্ডের ডাঃ ওলাভি লিনাস। এই বিচারক-মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন দক্ষিণ ভারতের ফিল্ম ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী এ এল শ্রীনিবাসন। ক্যাথলিক পুরস্কার ছাড়াও ফিল্ম সাংবাদিক পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রায় শ'খানেক ছবির মধ্যে পুরস্কার পেয়েছে মাত্র ছটা ছবি। তবে এ বছরে পুরস্কার-বিতরণে বিচারকমণ্ডলীকে বেশ বেগ পেতে হয়। কারণ এতগুলো ছবির মধ্যে একমাত্র সুয়েডেনের বিখ্যাত পরিচালক ইংগমার বার্গমান-এর ছবি 'দি মিরর' ছাড়া একটিও প্রথম শ্রেণীর ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ বার্গমান ছবিটি প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতার বাইরে দেখান হয় তাই ছবিটি ফেস্টিভ্যাল পুরস্কার লাভ না করে পেয়েছে ক্যাথলিক পুরস্কার। আরেকটি ছবি ফেস্টি-ভ্যালের পুরস্কার কেন পেল না বোঝা গেল না। সেটি হল ফিনল্যান্ডের 'পিক্কু পিতারিন পিহা' ছবিটি। ফিনল্যান্ডের ছবিটির নায়ক একটি আট-দশ বছরের বালক। ফিনল্যান্ডের এক অখ্যাত গ্রামের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ে তোলা ছবিটি হৃদয়স্পর্শী। এর মধ্যে করুণ ভাব থাকতে পারে কিন্তু অভিনয় ও নাটকের দিয়ে হয়েছে চরম সার্থক। একটি দরিদ্র পরিবারের কাহিনী এবং গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলো নিয়ে ছবিটি যে কোনো পুরস্কার পাবার যোগ্য। কিন্তু রাজনীতিই সব নষ্ট করেছে। বিচারকমণ্ডলীর রাজনীতি এর জন্য দায়ী।

অন্যান্য বছরের মতন এবারেও বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেলজনিক ইণ্টারন্যাশনাল পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ছবির মধ্যে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে ফরাসী ছবি 'ল্য পশাজ দু র‍্যাঁ' ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন স্যার আলেক গিনি। রৌপ্যপদক লাভ করেছে জার্মানীর 'দি ব্রুক', ইতালির 'ইল জেনেরা লে দেল্লা রোভেরা', 'লা চিউচিয়ারা', 'পোল্যান্ডের', 'এসেস অ্যান্ড ডায়মন্ড', রাশিয়ার 'ব্যালাড অব এ সোলজার' ও 'এ সামার টু রিমেমবার'।

নিরুদিষ্ট কিন্নরী ঃ মেরিলিন মনরো

কণাদ চৌধুরী

হলিউডের সেই অপরূপ "মিসফিট" নিজেকে 'মিসফিট' রূপে আবিষ্কার করে ইহলোক ত্যাগ করলেন। মরবার সময় হাতে তাঁর টেলিফোন রিসিভারটি ধরা ছিল। অন্তিম মুহূর্তে কি মনরো বাঁচতে চেয়েছিলেন? এর উত্তর আর পাওয়া যাবে না। মিসফিট ছবির বনজ্যোৎস্নায় যে কান্তিময়ী কিন্নরীকে নাচতে দেখা গিয়েছিল সেই জ্যোৎস্নার কথা ভেবেই বোধ হয় শেষবারের মত টেলিফোনটাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন মনরো।

সংবাদে প্রকাশ রাত্রি ৩-৪০ মিঃ ঘুমের ওষুধ খেয়ে তাঁর সহরতলীর বাড়িতে আত্মহত্যা করেছেন মেরিলীন মনরো। আত্মহত্যার কারণ কিছুই লিখে যান নি তিনি, তবে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের সঙ্গে একটি গোলমালকে অনেকে তাঁর আত্মহত্যার কারণ মনে করতে পারেন। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর "সামথিং হ্যাজ গট টু গিভ" ছবিতে ডীন মার্টিনের বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন মনরো। এই চিত্রে একটি নগ্ন স্নানের দৃশ্য তোলার খবর সাড়ম্বরে হলিউড থেকে প্রচার করা হয়। কিন্তু সুটিং-এ নিয়মিত হাজির না হওয়ায় প্রযোজক পক্ষের সঙ্গে মনরোর মনকষাকষি হয়। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী তাঁকে বাদ দিয়েই ছবি তোলা স্থির করেন। কিন্তু ছবির নির্বাচিত নায়ক ডীন মার্টিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, মেরিলীন না করলে তিনিও অভিনয় করবেন না। ফলে সমস্ত ছবির পরিকল্পনাটিই বাতিল করে দেন টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী। এবং মেরিলীনের নামে মামলা রুজু করা হয় প্রযোজক পক্ষ থেকে। কিন্তু শুধুমাত্র কি এই কারণেই পার্থিব সত্তাকে হিম-শীতল করে বিছানায় রেখে চলে গেলেন মেরিলীন। কিন্তু এই মামলা রুজু হবার পরও দেখা গেছে তিনি তাঁর নতুন বাড়ি সাজানোর জন্যে মেক্সিকো থেকে আসবাবপত্র কিনে আনিয়ে সাজিয়েছেন। আর তা ছাড়া "সামথিং হ্যাজ গট টু গিভ"-এর জন্যে ইটালীর বিখ্যাত চিত্রপ্রতিষ্ঠান 'টিটেনাস' ত প্রস্তাব দিয়েই ছিলেন যে সেঞ্চুরী যদি না করেন তা হলে তাঁরাই ছবিটির ভার নিতে রাজী আছেন। অবশ্য রোমে তা হলে যেতে হত মনরোকে। কিন্তু রোমের পথ মনরোর কাছে 'দূর-অস্ত' রয়ে গেল চিরকালের জন্যে।

মনরোর জীবন আরম্ভ হয়েছিল অশান্তিগ্রস্ত আবহাওয়ায়। মা-বাবার অবৈধ সন্তান ছিলেন তিনি। বাবা এডওয়ার্ড মরটেনসেন ছিলেন ডেন দেশের লোক। কিন্তু বাবাকে দেখেন নি মনরো। তিনি জন্মাবার আগেই এডওয়ার্ড নিরুদ্দেশ হয়ে যান। শোনা যায় একটি মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। মার শেষ জীবন কাটে উন্মাদাশ্রমে। মনরোর নিজের শৈশবও কেটেছে নিদারুণ গ্লানির মধ্যে। তাঁর বসন্তের দিনগুলোও শান্তির ছিল না। তিন-তিনবার তিনি ঘরণী হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় লস এঞ্জেলেস-এর জনৈক পুলিশ কর্মচারী জেমস ডগ্‌হার্টির সঙ্গে। দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তিনি বেসবল খেলোয়াড় জো ডিম্যাগোকে। কিন্তু সেই ঘরটিকেও টিকিয়ে রাখা গেল না। আবার ঘর বাঁধলেন প্রখ্যাত লেখক এবং চিত্রনাট্যকার আর্থার মিলারকে নিয়ে কিন্তু তৃতীয়বারও সংসারের পুতুলটা ভেঙে গেল।

আর্থার মিলারের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হবার পর হলিউডে আবার জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছিল মনরোর চতুর্থ পুরুষকে ঘিরে। অভিনেতা ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার সঙ্গে প্রায়ই পার্টিতে দেখা যেত মনরোকে। তাঁর ভূতপূর্ব দ্বিতীয় স্বামী জোকেও মনরোর সহচর হিসেবে অনেকবার দেখা গেছে। কিন্তু সিনাত্রা এবং জোকে মার্লীন শেষ জীবনে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। একবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থাকার সময়ে জো সর্বদা তাঁর রোগ-শয্যার পাশে ছিলেন মঙ্গল হৃদয় বন্ধুর মতই।

মেরিলীন মনরো যুদ্ধপরবর্তী হলিউডে প্রায় গ্রেটা গার্বোর মতই অনেক কিংবদন্তীর নায়িকা হয়ে উঠেছিলেন। অভিনয় প্রতিভাতেও তাঁর সঙ্গে নাম-করা যায় এমন নায়িকার সংখ্যা বর্তমান হলিউডে অঙ্গুলীমেয়। "সেভেন ইয়ার ইচ", "জেন্টেলম্যান প্রেফারস ব্লন্ডস", "হাউ টু ম্যারী এ মিলিওনিয়ার", "দি প্রিন্স এ্যান্ড দি শো গার্ল", "সাম লাইক ইট হট" এবং সর্বশেষ ছবি "দি মিসফিট" তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষী। —চিত্রকূট

রজত জয়ন্তী সপ্তাহ !

কাহিনী : শৈলেশ দে

পরিচালনা : ভূপেন রায়

সংগীত : মানবেন্দ্র মুখার্জী

পরিবেশনা : ন্যাশনাল মুভীজ প্রাঃ লিঃ

রাধা • পূর্ণ • প্রাচী

নবরূপম • চলচ্চিত্রম • ছায়াবাণী
কল্পনা • অরোরা • বিচিত্রা
রূপমায়া • করিম টকীজ • রূপমহল
চণ্ডীদাস চিত্রমন্দির • কল্যাণী
ছায়াবাণী (বারাসাত) ও অন্যত্র
(পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে)

নট সম্রাট ছবি বিশ্বাসের অবিস্মরণীয় অভিনয় সম্পর্কে

● সমালোচকদের অভিমত ●

"I do not know wheather it was Chhabi Biswas's acting alone that moved me so deeply. Anyway, his performance in "BADHU" seemed to me to be one of his finest."
—STATESMAN

"Chhabi Biswas gives one of his most lovable characterisation. The memory will be fondly cherished in the public mind."
—AMRITA BAZAR

"BADHU" is Chhabi Biswas's picture and it will be remembered and cherished for the great performance he has given in its pivotal role."
—HINDUSTHAN STANDARD

"Chhabi Biswas has given a performance which is simply unforgetable."
—CINE ADVANCE

"There is no exaggeration in the statement that, his sterling performance has been the biggest single factor of the popularity of the film."
—SCREEN (Bombay)

"As a matter of fact, I have seen the film thrice only for the performance of Chhabi Biswas."
—SPORTS AND PASTIMES

"Chhabi Biswas in the role of Bhuban Chowdhury will be remembered by the Picture Goers."
—NEWS & VIEWS

"ছবিটিকে সর্বদিক দিয়ে উপভোগ্য করে তুলেছেন ভুবন চৌধুরীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস একটি স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করে। তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের গুণে ছবিটি বার বার দেখবার ইচ্ছা জাগে দর্শকদের মনে।"
—আনন্দবাজার

"ছবিখানির আগাগোড়া জুড়ে আছেন ছবি বিশ্বাস। তাঁর অভিনয়ের আন্তরিকতায় অনেকেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করেছেন।"
—যুগান্তর

"অভিনয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই ছবি বিশ্বাস অতুলনীয়।"
—জনসেবক

"ছবি বিশ্বাস...কখনও কঠোর, কখনও কোমল, কখনও শিশুর মত সরল অভিব্যক্তিতে দর্শকমনকে অভিভূত করে তোলেন।"
—স্বাধীনতা

"ভুবন চৌধুরীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস অনবদ্য।"
—দৈনিক বসুমতী

"অবিস্মরণীয় প্রতিভাধর শিল্পী ছবি বিশ্বাস একটি অনুপম চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।"
—লোকসেবক

"ছবি বিশ্বাস অবিস্মরণীয় দক্ষতা দেখিয়েছেন।"
—নতুন খবর

"ছবি বিশ্বাসের অভিনয় এক অসামান্য চরিত্রসৃষ্টি।"
—মাসিক বসুমতী

"অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ছবি বিশ্বাস 'বধূ'কে তাঁর অতুলনীয় অভিনয় প্রতিভায় শেষবারের মত ভাস্বর করে রেখে গেলেন।"
—সচিত্র ভারত

"ছবির প্রধান সম্পদ ছবি বিশ্বাসের অসাধারণ অভিনয়। এই শিল্পীর অভিনয়ের জনাই ছবিটি অবশ্য দ্রষ্টব্য।"
—দেশ

"সুন্দর কাহিনী। ততোধিক সুন্দর অভিনয়। তার মধ্যে ছবি বিশ্বাসের অভিনয়টুকু অবিস্মরণীয়। সব মিলিয়ে 'বধূ' একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য ছবি।"
—সিনেমা জগৎ

"ছবি বিশ্বাসের অভিনয় দেখবার জন্যে ছবিখানিকে ফিরে ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে।"
—অমৃত

"পরলোকগত ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ের অপূর্ব হৃদয়গ্রাহিতার কথাই প্রথমে উল্লেখ করা উচিত। এ অভিনয়ের তুলনা নাই।"
—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য (এম-পি)

"বধূ' চিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় চিত্রখানিকে অবশ্য দ্রষ্টব্য বলে চিহ্নিত করে রাখার মত।"
—রূপমঞ্চ

"ছবি বিশ্বাস অসংখ্য মুহূর্তে নিজেকে নিঃশেষে বিলীন করে দিয়েছেন অভিনীত চরিত্রটির অন্তরালে।"
—পত্রগান

"ছবি বিশ্বাস চরিত্রটির মানস দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও নিরুদ্ধ বেদনার অভিনয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন।"
—জনতা

নান্দীকর

রূপালী পর্দার অপর পিঠ :
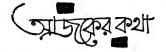
ভদ্রলোক কাজ করেন যদিও মেডিক্যাল কলেজে, তবু কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল ছবি দেখার অর্থাৎ চলচ্চিত্র দেখার অভ্যেস আছে। এবং তাঁর কৌতূহলী মন জনপ্রিয় তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন, বিশেষ করে তাঁদের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যেও বেশ উৎসুক। কিন্তু তিনিও যখন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, বাংলা ছবির অবস্থা কি রকম, তখন তাঁর দিকে সবিস্ময়ে না তাকিয়ে পারলুম না। তাঁর প্রশ্নটাকে আব একটু ব্যাখ্যা করে তিনি নিজেই বললেন, বাংলা ছবি ভালো কি মন্দ হচ্ছে, সে-কথা জিজ্ঞেস করছি না; বাংলা ছবির ব্যবসা কি রকম চলছে, তাই জানতে চাইছি। এ-রকম প্রশ্নের কারণ কি, জিজ্ঞেস করাতে তিনি যা জবাব দিলেন, তাতে তাঁর হিসাবী মনের পরিচয় পেলুম। তিনি বললেন, শুনেছি, দুটি মাত্র জনপ্রিয় তারকাকে একটি ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকা দিতে গেলে তাঁদের পারিশ্রমিক বাবদ লাখ দুয়েকের কাছাকাছি টাকা দিতে হয় এবং তারও মধ্যে বেশীর ভাগ টাকাটাই 'কালো'; তাহলে ছবিটা তুলতে ত' নিশ্চয়ই সাত-আট লাখ টাকা লেগে যায়। আমার প্রশ্ন, ছবিটা দেখিয়ে ঐ টাকাটা কি তার ন্যায্য সুদ সমেত ফেরত আসে? এবং একখানি ছবি তুলতে গিয়ে যে পরিমাণ 'কালো'-টাকার লেনদেন হয়, তার হিসেবই বা সামলানো হয় কি করে?

উত্তরে প্রথমেই বলে নিলুম, 'কালো' টাকা জীবনে কখনো চোখে দেখবার দুর্ভাগ্য হয়নি; তাই 'কালো' টাকার কালোবাজারের কালো কথা কোনো-কালেই আমি বলতে পারব না। ও-প্রশ্নের জবাবটা সম্ভব হলে সরকারের আয়কর বিভাগের কোনো ধুরন্ধরের কাছ থেকে জেনে নেবেন। তাঁর প্রথম প্রশ্নের জবাবে যা বলেছিলুম, তারই সূত্র ধরে সমস্যাটার বিস্তারিত আলোচনা করে তার সম্ভাব্য সমাধানের কথাটাও পাঠক সাধারণের সামনে উপস্থাপিত করতে চাই।

বাংলা ছবির জগৎ সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে, এখানে এমন প্রযোজক-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশী, যাঁরা একটি মাত্র ছবি তোলবার পরেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছে। সান্ত্বনা থাকত, যদি এ-বিদায় গ্রহণও সম্মানের সঙ্গে হ'ত। না, বহু লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, চোর-অপবাদ দেওয়া-নেওয়া এবং কটূক্তি-বর্ষণের পর এই বিদায়ের পালা সমাপ্ত হয়। কেন এমন হয়? জনপ্রিয় শিল্পীদের আকাশ-ছোঁওয়া দাবি মেটাতে গিয়ে প্রযোজকের পকেটে এমন টান ধরে যে, ছবি তোলার মাঝামাঝি সময় থেকেই যাদের কাছে ধার-বাকী রাখা চলে, যেমন কোনো কোনো পার্শ্বশিল্পী, এক্সট্রা-সাপ্লায়ার, খাবার-চা-সাজপোষাক-আসবাবপত্র সরবরাহকারীরা এবং ছোট-বড় কলাকুশলীবৃন্দ—এই রকম লোকেদের কাছে দেনা শুরু হয়ে যায়। এবং আজ দেব, কাল দেব, অমুক তারিখে নিশ্চয়ই পাবেন গোছের কথা দেওয়া ও কথার খেলাপ হওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। কলাকুশলীদের পাওনা মেটানো সম্বন্ধে আবার এমন রাখাঢাকার ব্যাপার চলতে থাকে যে, তারা জানতেও পারে না কে কতটুকু পাওনা আদায় করতে পেরেছে। ফলে, শুধু যে প্রযোজকের বিরুদ্ধে কর্মীদের মনে অসন্তোষ জমতে থাকে, তাই নয়, তাদের পরস্পরের মধ্যেও আস্থা ও প্রীতির সম্পর্ক ধীরে ধীরে চলে যেতে বাধ্য হয়। দুনিয়া শক্তের ভক্ত—এই কথাটা চিত্র প্রযোজকদের সম্বন্ধেও ষোলো আনা প্রযুজ্য। এই অবস্থায় ছবি যখন সত্যি-সত্যিই শেষ হয়, তখন প্রযোজকের নিজের টাকা তো শেষ হয়েই গেছে, ছবির পরিবেশকের যে-টাকাটা অগ্রিম দেবার কথা ছিল, তাও শেষ হয়েছে এবং প্রযোজক তাঁর চেনাশোনা যে-সব জায়গা থেকে ধার পাওয়া সম্ভব, সে-সব জায়গা থেকে বেশ হাজার কয়েক টাকা ধারও করে বসে আছেন। ছবির শেষের দিকেই খরচের মাত্রাটা বেশী হয়ে থাকে; বিশেষ করে সম্পাদনা, আবহসঙ্গীত গ্রহণ, শব্দ-পুনর্যোজনা প্রভৃতি ব্যাপারে প্রচুর পজিটিভ ফিল্মের প্রয়োজন। ছবিটিকে শেষ করবার তাড়ায় কোনো দিকে প্রযোজকের নজর দেবার অবস্থা থাকে না। নগদ খরচের জন্যে প্রযোজক যেখান থেকে পারেন, যে-কোনো শর্তে টাকা ধার

শিল্পী-ভারতী প্রযোজিত ও অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বর্ণচোরা'র একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায়, অনিল চ্যাটার্জি ও অনুপকুমার।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'কাজল' কথাচিত্রে অসীমকুমার ও জনৈকা জার্মাণ শিল্পী।

করেন। এরই মধ্যে আবার ছবির মুক্তির আগে একটি প্রকান্ড দেনা শোধ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়; সেটি হচ্ছে স্টুডিওর দেনা। কিন্তু এও শোধ হয়ে যায়; কারণ, স্টুডিওর দেনা শোধ না করলে ল্যাবরেটারী ছবির প্রিণ্ট ছাড়ে না এবং প্রিণ্ট ব্যতীত ছবির মুক্তি অসম্ভব। চিত্র পরিবেশককে ইতিমধ্যে চুক্তির চেয়েও বেশী টাকা অগ্রিম দিতে হয়েছে এবং তার পরিবর্তে তিনি তাঁর প্রাপ্য কমিশনের অঙ্ককে বেশ কিছুটা বাড়িয়েও নিয়েছেন। এদিকে প্রযোজকের পাওনাদারের সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য এবং দেনা হয়ে উঠেছে পর্বতপ্রমাণ।

যথাসময়ে বহু ঢক্কানিনাদ সহযোগে ছবিখানি মুক্তি পেল এবং জনপ্রিয় শিল্পীদ্বয় থাকার দরুণ প্রথম দু'হপ্তা প্রতিটি চিত্রগৃহে 'হাউস ফুল' বোর্ড ঝুলতে লাগল সগৌরবে। সৌভাগ্যক্রমে ছবিখানিকে যদি লোকের মনে ধরে, তাহলে আরও দু'হপ্তা লোকের ভিড় পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লোকে বলাবলি করে, উঃ, ছবিটা কি চলাই না চলছে। প্রযোজকও খুশী—যাক্, ছবিখানা লেগেছে (ইংরিজীতে বলে—ক্লিক্ করেছে) বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু?—কিন্তু টাকা? —সরকার নেবেন তাঁর আমোদ-কর; ছবিঘরগুলি নেবে তাদের শেয়ার, যেটা প্রায়ই আমোদ-করের টাকা বাদ দিয়ে বাকীটার অর্ধেক হয়ে থাকে; তারপর প্রযোজকের শেয়ার থেকে পরিবেশক নিজের কমিশন বাবদ টাকাটা কেটে নিয়ে বাকী টাকাটা অগ্রিম দেওয়া টাকা পরিশোধের খাতে জমা করতে থাকেন। পাওনাদাররা এদিকে প্রযোজককে ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছে—কি মশাই, ছবি তো বেরুলো, 'হাউস ফুলে'র ছড়াছড়ি, আর আমাদের টাকা দেবার বেলা মুখ শুকনো কেন? —কেউ বুঝবে না, পরিবেশকের কমিশন, অগ্রিম শোধ এবং উপরন্তু পাবলিসিটির টাকা দেবার পর একটা নয়া পয়সারও মুখ দেখতে পাচ্ছেন না প্রযোজক। কাজেই হপ্তা-চারেক পরে তিনি বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে গা-ঢাকা দেন এবং পাওনাদারেরা তাঁর উদ্দেশে অজস্র কটূক্তি করতে থাকে। একখানি ছবি করেই ভদ্রলোকের প্রযোজক সাজবার মোহ জন্মের মত কেটে যায়।

যদি প্রযোজকদের মধ্যে এমন কেউ থাকেন, যাঁর নিজের বেশ টাকার জোর আছে, তাঁর মোহ কাটতে একটু সময় লাগে—অর্থাৎ দু'তিনখানা ছবি করবার পর তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। আবার এও দেখা যায়, কেউ কেউ বেশী চালাক হয়ে পড়েন; তিনি একেবারে ছবির গোড়া থেকেই কাকে কতখানি ফাঁকি দেওয়া যায়, কত রকমে প্রবঞ্চনা করা যায়, তার পথ খুঁজে বার করতে থাকেন। ফলে, চলচ্চিত্র-প্রযোজনা ব্যবসা সারা ভারতে যে-মিষ্টি সুনাম অর্জন করেছে, সেটি সম্ভবতঃ পাঠকরাও জানেন:—এই ব্যবসাকে বলা হয়, চারশো বিশের (৪২০-এর) লাইন। ঘরের পয়সা খুইয়ে এই ৪২০-এর বদনাম বহু প্রযোজককেই নিতে হয়েছে। অথচ দেখুন, ছবিঘরের মালিকেরা এবং চিত্র-পরিবেশকেরা বেশ বাহাল-তবিয়তেই আছেন। কোনো একখানি ছবির প্রযোজক হয়ত সেই ছবিতে চল্লিশ হাজার টাকা লোকসান দিয়েছেন; কিন্তু সেই ছবির পরিবেশক তাঁর এক লক্ষ টাকা অগ্রিম তুলে নিয়ে কমিশন বাবদ হয়ত পেয়েছেন ষাট হাজার টাকা। তাঁর গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি। আর ছবিঘরের মালিকের ত' কথাই আলাদা। যে-সব ছবিঘরে ছবি মুক্তি পায়, তাদের মালিকের ব্যবসার খাতায় লোকসানের কোনো ঘরকাটা নেই; প্রতি সপ্তাহের হাউস প্রোটেক্শান তাঁকে দীর্ঘজীবী করে রেখেছে।

অর্থাৎ চলচ্চিত্র-প্রযোজনার ব্যবসা গোড়া থেকে শেষ অবধি একটি বেতালা, ভারসাম্যহীন ব্যবসায়। একটি উপন্যাসের প্রকাশনাস্বত্ব বড় জোর তিন কি চার হাজার টাকায় কিনতে পাওয়া যায়; কিন্তু তার চলচ্চিত্র-স্বত্ব কিনতে গেলেই লেগে যায় দশ হাজার টাকা। সেই উপন্যাসের চিত্রনাট্য করাতে লাগে আরও চার-পাঁচ হাজার। ছবিটিতে অন্ততঃ পাঁচখানি গান থাকা দরকার; প্রতিটি গান রচনার জন্যে দিতে হবে চার-পাঁচশো টাকা। এবং নামকরা সঙ্গীত-পরিচালক তাঁর ব্যক্তিগত পারিশ্রমিক নেবেন অন্ততঃ দশ হাজার টাকা। ছবির পরিচালক নেবেন তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা। জন-

প্রিয় শিল্পীদ্বয় নেবেন দু'লাখ, ক্যামেরাম্যান ছ'হাজার। শিল্পনির্দেশক, সম্পাদক, স্থিরচিত্রশিল্পী প্রভৃতিরও চাহিদা আছে। বহু সহকারী, কর্মী, পটশিল্পী, বয়, টাইটেল-লেখক প্রভৃতির প্রাপ্য মেটাতে হবে। স্টুডিও-কর্মীদের খুশী রাখবার জন্যেও অর্থ খরচের প্রয়োজন। আবার অপর দিকে যখন ছবি দেখিয়ে আয় করবার কথা, তখন প্রযোজককে দাঁড়াতে হবে সব শেষে; সকলের সব রকম প্রাপ্য মিটিয়ে যেটুকু ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট থাকবে—অবশ্য প্রায়ই অবশিষ্ট যা থাকে তা হচ্ছে দেনা—সেইটুকু নিয়েই প্রযোজককে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। —জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, ঘরের খেয়ে বনের মহিষ চরাবার জন্যে কার এমন মাথা ব্যথা? —তবুও দেখি, নিত্য নতুন নতুন প্রযোজক আসছেন এবং নিত্য ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে বিদায়ও নিচ্ছেন। বাংলার চলচ্চিত্র-জগতের যে-চিত্র এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে, সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতের ছবি তার থেকে কিছু ভিন্ন নয়।

এই অসহ অবস্থার সমাপ্তি ঘটাতে গেলে একটি মাত্র উপায়ের কথাই মনে আসে। সেটি হচ্ছে, ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্পের জাতীয়করণ। চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল ব্যবধান পারিশ্রমিকের অঙ্ক, 'কালো' টাকার লেনদেন, আধুনিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত স্টুডিওর অভাব, অদক্ষ শিল্পী ও কলাকুশলীর যথেচ্ছচার, পরিবেশক-প্রদর্শকের বেহিসাবী অংশ গ্রহণ ইত্যাদি হরেক রকমের অন্যায়ের অবসানকল্পে চাই শিল্পটির জাতীয়করণ। চলচ্চিত্র শুধু যে সংস্কৃতির বাহন, তাই নয়; এই বিরাট ব্যবসায় ঠিকমতভাবে চালাতে পারলে সরকারের আয়ের পথ হবে প্রশস্ততর; দেখতে পাওয়া যাবে, এই শিল্পটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সরকারের ধনভাণ্ডারকে পুষ্ট করে তুলছে অসামান্যরূপে। কাজেই, সকল বিরোধিতাকে নস্যাৎ করে সরকার এই শিল্পটির জাতীয়করণের জন্যে বিধিমত উপায়ে অগ্রসর হন।

বি এ পি প্রোডাকসন্স-এর "কাজল" :

আজ শুক্রবার, ১০ই আগস্ট থেকে শ্রী, ইন্দিরা, লোটাস, আলোছায়া প্রভৃতি চিত্রগৃহে বি এ পি প্রোডাকসন্স-এর "কাজল" ছবিখানি মুক্তি পাচ্ছে। ছবিখানিতে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী চক্রবর্তী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, শ্যাম লাহা, কুমার রায়, অসীম-

কুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কমলা মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা প্রভৃতি। পরিচালনা এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন চট্টোপাধ্যায়। ছবিখানির পরিবেশক হচ্ছেন নর্মদা চিত্র।

"বধূ"র রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ :

ছবি বিশ্বাসের অবিস্মরণীয় অভিনয়-সমৃদ্ধ ছবিখানি যে চিত্ররসিক জনসাধারণকে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে, তারই স্বাক্ষর হিসেবে বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্স-এর সাফল্যমণ্ডিত চিত্র "বধূ" আজ শুক্রবার ১০ই আগস্ট থেকে রজত জয়ন্তী সপ্তাহে পদার্পণ করল।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা প্রদর্শিত "ম্যান অব অ্যারান" :

তথ্যচিত্রের জন্মদাতা হিসেবে রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির নাম শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। তিনি আসলে ছিলেন একজন দেশ-আবিষ্কারক। কিন্তু যখন ১৯২০-২২ সালে তিনি সাব-আর্টিক অঞ্চলে যাত্রা করেছিলেন, তখন রেভিলিয়ন ফারস নামে একজন ব্যবসায়ী তাঁর জন্যে একখানি বিজ্ঞাপন-চিত্র তোলবার জন্যে ফ্ল্যাহার্টিকে যথেষ্ট অর্থ দেন। তারই ফলে জন্ম নিয়েছিল "নানুক অব দি নর্থ" নামে বিখ্যাত তথ্যচিত্র। সেই থেকে তাঁর জীবনযাত্রাও গেল বদলে। এর পর ১৯৩১ থেকে শুরু করে তিন বছর ধরে তিনি অ্যারান দ্বীপের জীবনযাত্রার ওপর যে-ছবি নিজে হাতে তুললেন, তারই নাম হচ্ছে "ম্যান অব অ্যারান"। বিচিত্র পরিবেশ, বিচিত্র রিক্ততার মধ্যে থেকে মানুষ উত্তাল সমুদ্র এবং কঠিন শৈলশ্রেণীর সংগে যুদ্ধ করে কিভাবে বেঁচে আছে, তারই আনন্দ-বেদনা-কৌতুকময় জীবন্ত চিত্র হচ্ছে "ম্যান অব অ্যারান"। কি সর্বনাশা জায়গায় কি দুঃসাহসের সংগে ছবিখানি তুলতে হয়েছে, তা যিনি ছবিখানি না দেখেছেন; তাঁকে বোঝানো যাবে না। গেল রবিবার, ৫ই আগস্ট ম্যাজেস্টিক সিনেমা হলে ছবিখানি দেখবার ব্যবস্থা করে সিনে ক্লাব ক্যালকাটা সভ্যবৃন্দের ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন।

শৌভনিক অভিনীত 'গোরা'র শততম অভিনয় স্মারক উৎসব :

গেল রবিবার, ৫ই আগস্ট, শৌভনিক নাট্য সংস্থা তাঁদের অভিনীত "গোরা" নাটকের শততম অভিনয় স্মারক উৎসব পালন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সংগীত নাটক অ্যাকাডেমীর ডীন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং সোভিয়েত কন্সালের প্রতিনিধি শৌভনিক সম্প্রদায়ের মঙ্গলকামনা করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সমবেত সুধীবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধ্যে সেদিন "গোরা" নাটকের যে-অভিনয় হয়, তাতে প্রত্যেকটি শিল্পীই প্রাণঢালা অভিনয় করেছিলেন। এবং ওরই মধ্যে বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন গোবিন্দ গাঙ্গুলী (মহিম), নিবেদিতা দাস (আনন্দময়ী) এবং মঞ্জুশ্রী চৌধুরী (ললিতা)।

লোকনাট্যম্-এর "সাইকোথেরাপি" :

গেল সোমবার, ৬ই আগস্ট, দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত-অঙ্গন রঙ্গমঞ্চে লোক-নাট্যম্ সম্প্রদায় বিমল গুপ্ত রচিত "সাইকোথেরাপী" নাটকখানি তাঁরই নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করেন। এ'রা আগস্ট মাসের প্রতি সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় এই নাটকের অভিনয় করবেন একই জায়গায়।

গন্ধর্বর নবতম নাটক "যক্ষ" :

বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা গন্ধর্ব আজ শুক্রবার ১০ই এবং আসচে শুক্রবার ১৭ই আগস্ট মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে তাঁদের নতুন নাট্য নিবেদন, অতনু সর্বাধিকারী রচিত "যজ্ঞ" নিয়ে দর্শকদের অভিবাদন করবেন সন্ধ্যা ৭টায়। প্রযোজনা, মঞ্চ-স্থাপন, আলোকসম্পাত এবং আবহ-সংগীতের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে শ্যামল ঘোষ, পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত মিত্র ও হৃদয় কুশারী। বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন রেবা দেবী, মমতা চট্টোপাধ্যায়, গিরিশঙ্কর, শ্যামল ঘোষ, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবকুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

সায়ম্-এর "মেকআপ" :

আসচে ১২ই আগস্ট রবিবার দক্ষিণ কলকাতার সায়ম্ সম্প্রদায় অমল বসু রচিত ও পরিচালিত "মেকআপ" নাটকখানিকে মঞ্চস্থ করবেন ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইড্স্ হলে সন্ধ্যা ৭টার সময়।

চক্রবৈঠকের "উম্বার্ষিকী" :

আসচে ১৪ই আগস্ট, মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় স্টার রঙ্গমঞ্চে দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র-সরোবরের অভিজাত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র "চক্রবৈঠক"-এর সভ্য-সভ্যাগণ অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় রচিত হাস্যমধুর নাটক "উম্বার্ষিকী"-কে মঞ্চস্থ করছেন।

শিবানী ফিল্মস্-এর 'মায়ার সংসার' :

জীবন নাটকের বিচিত্র অনুভূতির স্পন্দনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কনক মুখোপাধ্যায় রচিত প্রযোজিত ও পরিচালিত শিবানী ফিল্মস্-এর "মায়ার সংসার" আগস্ট মাসের মাঝামাঝি মুক্তি পাচ্ছে মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন সন্ধ্যারাণী, সুলতা, বিশ্বজিৎ, অসিতবরণ, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, ছবি বিশ্বাস, তরুণকুমার প্রভৃতি। প্রণব রায় রচিত সাতখানি গানে সুরারোপ করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। চণ্ডীমাতা ফিল্মস ছবিখানির পরিবেশনা করছেন।

দুঃস্থ শিল্পীদের সরকারী সাহায্য ব্যবস্থা :

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ সানন্দে ঘোষণা করেছেন যে, মঞ্চ, চলচ্চিত্র, বেতার ও রেকর্ডের দুঃস্থ অথচ বিশিষ্ট শিল্পী এবং নাট্যকারদের সাহায্য করবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় একটি

পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা পরলোকগত বিশিষ্ট শিল্পী ও নাট্যকারদের দুঃস্থা বিধবা এবং নাবালক সন্তানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এই সাহায্যের পরিমাণ হবে মাসিক পঞ্চাশ থেকে দেড়শো পর্যন্ত। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে পরিষদের যুগ্ম সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

"মানুষ চাই"

আগন্তুক প্রযোজিত শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'মানুষ চাই' নাটকটি আজ ১০ই আগষ্ট '৬২ রঙমহলে মঞ্চস্থ হচ্ছে। নাটকের পরিচালনায় ও সঙ্গীতে আছেন যথাক্রমে প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় ও অচিন্ত্য মজুমদার। প্রধান চরিত্রে আছেন —সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন রায়-চৌধুরী, সুনীল বসু, অনন্ত মুখোপাধ্যায়, বিমল সাহা, অজন্তা চৌধুরী, রমা চন্দ, শিখা ভট্টাচার্য, স্বাতী মুখোপাধ্যায় ও প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলকাতা

এ বছর শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ অগ্রদূতগোষ্ঠী পরিচালিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাসের চিত্ররূপ 'উত্তরায়ণ'। উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী অভিনীত এ ছবির অতিরিক্ত আকর্ষণ। মুখ্যচরিত্র ছাড়া আরো দুটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল।

আর ডি বনসল-এর প্রযোজনায় তিনটি ছবি—এক টুকরো আগুন, সাত পাকে বাঁধা ও ছায়াসূর্য। বিনু বর্ধন পরিচালিত 'এক টুকরো আগুন' সমাপ্তপ্রায়। দাম্পত্যকলহের পটভূমিতে এ কাহিনী। কয়েকটি প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন বিশ্বজিৎ, তন্দ্রা বর্মণ, কালী ব্যানার্জি, অনুভা গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল ও অপর্ণা দেবী। চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় ছবি 'সাত পাকে বাঁধা' পরিচালনা করছেন অজয় কর। সম্প্রতি কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বহির্দৃশ্যের কয়েকটি দৃশ্য সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে পরিচালক গ্রহণ করলেন। নিউ থিয়েটার্স দু-নম্বরে বর্তমানে ছবির দৃশ্যগ্রহণ চলেছে। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কাহিনী লিখেছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

তৃতীয় ছবি 'ছায়াসূর্য' পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী। আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করছেন শ্রী চৌধুরী। ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হবে এ মাসের শেষসপ্তাহে নিউ থিয়েটার্স দু-নম্বরে। চিত্রগ্রহণ করবেন অনিল গুপ্ত এবং সঙ্গীত-গ্রহণে ভি, বালসারা। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করছেন সন্ধ্যা রায়, নির্মলকুমার, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, সন্ধ্যারাণী, অনুভা গুপ্ত, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ।
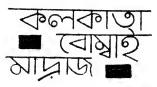
মৃণাল সেন পরিচালিত 'অবশেষে' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ চলেছে টেকনিসিয়ান স্টুডিওয়। অভিনয় করছেন অসিতবরণ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, উৎপল দত্ত, ছায়া দেবী, রবি ঘোষ, অনুপকুমার, বিধায়ক ভট্টাচার্য ও পাহাড়ী সান্যাল। সম্প্রতি ছবির কয়েকটি সঙ্গীত করলেন রবীন চ্যাটার্জী। শিল্পনির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত ও আলোক-চিত্রশিল্পী শৈলজা চট্টোপাধ্যায়ের শৈল্পিক নৈপুণ্য এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ।

বোম্বাই

প্রযোজক-পরিচালক এল, ভি, প্রসাদ সম্প্রতি রূপতারা স্টুডিওয় তাঁর ছবি 'বেটী বেটে'-র চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু করেছেন। প্রধান দুটি চরিত্রের নায়ক এবং নায়িকা হলেন সুনীল দত্ত ও যমুনা। সঙ্গীত-পরিচালক শঙ্কর-জয়কিশন।

কারদার স্টুডিওয় প্রযোজক ও পরিচালক বি, আর চোপরার 'গুমরা' একটানা ছবির কাজ শুরু হয়েছে। ছবিতে অভিনয় করছেন অশোককুমার, সুনীল দত্ত, মালা সিনহা, শশিকলা ও নানা পালশিকর মুখ্য চরিত্রে। সুরসৃষ্টি করেছেন রবি।

গুরু দত্ত ফিল্মস-র পরবর্তী ছবি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় 'আলিবাবা'। ছবিটি পরিচালনা করবেন গুরু দত্ত। নায়িকার চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন শিমি। দৃশ্যগ্রহণের কাজ এ মাস থেকে শুরু হবে।

তরুণ অভিনেতা জয় মুখার্জী বর্তমানে একজন ব্যস্ত শিল্পী। এঁর অভিনীত কয়েকটি ছবির নাম— 'জিদ্দি' (নায়িকা আশা পারেখ), 'আও পেয়ার কারে', 'দূর কি আওয়াজ' ও 'সাজ অর আওয়াজ' (নায়িকা সায়রা বাণু), 'রঙ্গে বহেন' (বৈজয়ন্তীমালা) ও 'উমীদ' (নন্দা ও লীলা নাইডু)।

পণ্ডিত ইন্দ্র-র একটি গল্প অবলম্বনে 'বিজয়গড়' ছবিটি পরিচালনা করছেন এস এন ত্রিপাঠী। প্রধান চরিত্রের কয়েকজন শিল্পী—বিশ্বজিৎ, অনিতা গুহ, হেলেন, বি এম ব্যাস, আনওয়ার হুসেন, মুকরী ও ওমপ্রকাশ। হামরাহী ফিল্মস্-এর প্রযোজক হলেন অরুণকুমার গুহ।

মণি ভট্টাচার্য পরিচালিত 'মুঝে জিনে দো' চিত্রের একটি মুখ্য ডাকাতি দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ শেষ হল মোহন স্টুডিওয়। সুনীল দত্ত, রাজেন্দ্রনাথ, ওয়াহিদা রেহমান ও নিরূপা রায় এ ছবির কয়েকটি প্রধান চরিত্র। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন জয়দেব।

সম্প্রতি দুটি ছবির সঙ্গীত-গ্রহণ শেষ হল। প্রথমটি—আর, কে, নায়ার পরিচালিত 'এ রাস্তে হ্যায় প্যায়ারকী'। ফেমাস সিনে ল্যাবরটারীতে সঙ্গীত-গ্রহণ করলেন সঙ্গীত-পরিচালক রবি। অশোককুমার, সুনীল দত্ত ও লীলা নাইডু এ ছবির তিনটি প্রধান চরিত্র।

শঙ্কর-জয়কিশনের সঙ্গীত পরিচালনায় 'হামরাহী' ছবির গান গৃহীত হল। টি, প্রকাশরাও-এর পরিচালনায় এ

ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজেন্দ্রকুমার ও যমুনা।

মাদ্রাজ

জনপ্রিয় তামিল ছবি 'কুঙ্কুম সান্ধ্যাই' এই প্রথম পোল্যাণ্ডে পোলিশ ভাষায় 'ডাব' করে ছবিটি প্রদর্শনের জন্য বিবেচিত হয়েছে।

পরিচালক বি. এন. রেড্ডি ভারতীয় শিশু চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে একটি অল্প দৈর্ঘ্যের শিশুচিত্র নির্মাণের ব্রতী হয়েছেন।

পদ্মিনী পিকচার্সের হিন্দী ছবি 'সাবাস মীনা' ছবির অতিরিক্ত আরও তিনটি গান গ্রহণ করলেন শঙ্কর-জয়কিশন। লতা মঙ্গেশকর ও মহম্মদ রফি এই ছবিতে কণ্ঠদান করেন। প্রযোজক-পরিচালক বি. আর. পান্থালু দৃশ্যগ্রহণের কাজ শুরু করেছেন। এ ছবিতে অভিনয় করেছেন শাম্মি কাপুর, মালা সিনহা, মামুদ, প্রাণ, মনমোহন-কৃষ্ণ, উল্লাস ও ওমপ্রকাশ।

সম্প্রতি গুরু দত্ত ও আশা পারেখ ম্যাজেস্টিক স্টুডিওয় বসু ফিল্মস-এর একটি হিন্দী ছবিতে (নামকরণ হয়নি) অভিনয় করে বম্বে ফিরেছেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন কে, শঙ্কর। সঙ্গীত পরিচালক রবি। —চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

ছবির পর ছবি। ছবি এখানে গল্প বলে। ছায়াছবির সিঁড়ি-পথ পেরিয়ে একদিন যে কাহিনী পরিচালক চিত্ররূপ দেন, তার সার্থক চলচ্চিত্র-রূপায়ণে সাহায্য করেন চিত্র-প্রযোজক। পরিকল্পনার পর শুভ মহরতে ছবির নাম ঘোষণা করা হয়। দৈনন্দিন কর্মনিয়ন্ত্রণে সে কাহিনীর চরিত্রামিছিলে অভিনয়ের দানা বাঁধে।

ছবির জীবনের শুরু সেখানেই। কিন্তু একদিনে নয়। তিলে তিলে তিলোত্তমা। স্টুডিওর চিত্রগ্রহণের পর ল্যাবরটারীতে পরিস্ফুটিত হলে সম্পাদক ছবিতে কথা সংযোজন করেন ক্ল্যাপ-স্টিকের নম্বর ও শব্দ মিলিয়ে। এমনি করে সম্পূর্ণ ছবিতে কাহিনী-অনুযায়ী গান, আবহ-সঙ্গীত ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ (শব্দের মাধ্যমে)-এর মিলন-সূত্রের মালা গাঁথেন সম্পাদক। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের সময় ও নাটকীয় মুহূর্তে বজায় ফেড ইন, ফেড আউট, মিক্সিইং, ডিসলভ আর মনটাজের সুপার ইম্পো-জিসন শেষ করে চলচ্চিত্রের ভাষারূপ কথনে সে ছবি পূর্ণ করেন সম্পাদক।

'সূর্যশিখার' দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে সুপ্রিয়া চৌধুরীকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক সলিল দত্ত।

সেন্সর সার্টিফিকেটের পর ছবি মুক্তি পেলে প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় তখন ছবি দেখি। চলচ্চিত্র-রূপায়ণের এই প্রাক্‌ধারা-পথ স্টুডিওর দৈনন্দিন জীবনের ঘূর্ণিপাক।

পর্বপ্রথমা শেষ করে এবার প্রাক্‌-কথন। টালিগঞ্জের টেক্‌নিসিয়ান স্টুডি-ওয় যে ছবি যন্ত্রস্থ তেমনি একটি ছবি, যার নাম—'সূর্যশিখা'। সূর্যের অসীম শক্তির কথা আমরা জানি। কিন্তু যারা ছায়াবৃত তারা ছায়া-সূর্যের স্বপ্ন দেখে। দূরে থেকে ভালবেসেও তাদের আশা মেটে না। বাঁধতে চায়। কিন্তু ভুল ভাঙে যখন ঐ সূর্যের অগ্নিবাণে তাদের অন্ধ কামনা-বাসনা ছাই হয়। শুধু প্রকৃতি নয়। এ সত্য আমাদের জীবনের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে। যেমন দীপ্ত রায়। বন্ধনহীন জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তাদেরই করুণা করেছিল, যারা অবহেলিত, নুব্জ ও অচল, যারা এই আধুনিক যুগের সব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এদেরই প্রতিনিধি দীপ্ত রায়।

পরিকল্পনায় সার্থক রূপায়ণে সহ-যোগী আর একজনকে সে পায়—তার নাম অচেনা।

দীপ্তর সহকর্মিনী হয় অচেনা। তার যোগ্যতায় মুগ্ধ হয় দীপ্ত। কিন্তু ভুল করলো অচেনা। সহকর্মিনী হল সহ-ধর্মিণী। সমস্যার শুরু তো এখানেই। অচেনার জীবন ছিল শুধু স্বপ্নে ভরা। আদর্শের লক্ষ্য ভুলে নারীর চিরন্তন সত্তা লক্ষভেদ হল। বাইরের জগতকে সে চাইনি। একান্ত করে পেতে চেয়েছিল ঘর-সংসার আর স্বামী-পুত্র। অন্তর্দ্বন্দ্বের জীবন ভিন্নমুখী হল। কারণ দীপ্ত রায় তা চাইনি। তার আদর্শ ছিল জীবনের মূলমন্ত্র। শুধু সেইপথের সঙ্গিনী

হিসেবে অচেনাকে মাত্র উপযুক্ত মনে হয়েছিল। তাই দীপ্ত রায়ের বৈরাগ্যে অচেনার সাধের সংসার চূর্ণ হল। হারিয়ে যায় অচেনা বিস্মৃতির অতলান্তে। এই সমস্যার ওপর কেন্দ্র করে কাহিনী, চিত্রনাট্য, প্রযোজনা ও পরিচালনার পথে অগ্রসর হয়েছেন নবীন পরিচালক সলিল দত্ত। চরিত্রলিপির দুটি মুখ্য চরিত্রে দীপ্ত রায়ের ভূমিকায় উত্তমকুমার ও অচেনার চরিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী অভিনয় করছেন। এছাড়া ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, তরুণকুমার ও পঞ্চানন উল্লেখযোগ্য। ডাইনিং রুমে সেদিনের দৃশ্যগ্রহণ শুরু করলেন আলোকচিত্রশিল্পী বিজয় ঘোষ। পরিচালক সলিল দত্তের নির্দেশে অভিনয় করলেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। অচেনা নিজের হাতেই রান্না করেছে। তবে জানাতে চাইনি দীপ্তকে। দীপ্ত ভেবেছে শম্ভু রান্না করেছে।

দীপ্ত—চমৎকার রেঁধেছিস তো। তুমি মিথ্যে বল, শম্ভুটা কাজের নয়।

শম্ভু পায়েস নিয়ে আসে।

দীপ্ত—এটা কি?

অচেনা—পায়েস।

দীপ্ত—আবার পায়েস কেন?

অচেনা—শম্ভু বললে আজ তোমার জন্মদিন।

দীপ্ত—শম্ভু আবার আমার কুষ্ঠি জানলো কি করে? তুমি খাবে না।

অচেনা—না, তুমি খাও আমি পরে খাবো।

দীপ্ত—কেন, একদিন সকাল সকাল খেয়ে নিলেই তো পারতে।

অচেনা—তুমি খাও না।

দৃশ্যটি শেষ হল দৃশ্যগ্রহণে। শিল্পনির্দেশক সত্যেন রায়চৌধুরী দৃশ্যপটের নিখুঁত রচনায় দর্শনীয় করেছিলেন। অন্যান্য বিভাগীয় কলাকুশলীদের মধ্যে ছিলেন শব্দধারক দেবেশ ঘোষ, সম্পাদক বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি, সঙ্গীত-পরিচালক রবীন চ্যাটার্জি ও কর্মাধ্যক্ষ সমর ঘোষ।

—চিত্রদূত

বার্লিনে নির্মীয়মান ইটালীয় ছবি—

'টু ডে ইন বার্লিন' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণকালে পরিচালক পিরো ভিভারেল্লি দারুণ বিপদে পড়েছিলেন। ছবির দৃশ্যগ্রহণ হচ্ছিল পূর্ব এবং পশ্চিম বার্লিনের সীমা-প্রাচীরের পশ্চিম পাশে। জনৈক পূর্ব জার্মান যুবকের পশ্চিম বার্লিনে পলায়নের ভিত্তিতে ছবির কাহিনী। পলায়নের দৃশ্য-গ্রহণকালে পূর্ব জার্মানীর সীমান্তরক্ষী পুলিশ এবং সৈন্যরা অভিনয় হচ্ছে জেনেও আত্মবিস্মৃত হয়ে টিয়ার গ্যাস এবং ইট-পাটকেল ছুঁড়ে নকল 'পলাতক'এর 'পলায়ন' বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিল। ব্যাপারটি শোচনীয় পরিণতিতে গড়াবার আগেই আমেরিকান পুলিশবাহিনীর উপস্থিতিতে শান্তি ফিরে আসে। পূর্ব দিক থেকে যখন টিয়ার গ্যাস ইত্যাদি ছোঁড়া হচ্ছিল, ক্যামেরাম্যান কিন্তু দৃশ্যগ্রহণ একেবারে বন্ধ করেননি। ফলে পলায়নের দৃশ্যটি নিদারুণ বাস্তব হয়েছে। বার্লিনের ওপর ইতিপূর্বে মাত্র একটি ইতালীয় ছবি তোলা হয়েছে। ছবিটির নাম "জার্মান ইন দি ইয়ার অফ জিরো", প্রযোজক ছিলেন স্বনামধন্য রবার্টো রোসেলিনী। "টু ডে ইন বার্লিন"এর নায়ক শেষ পর্যন্ত তার সতীর্থ পূর্ব জার্মানীর জনৈক পুলিশের গুলীতেই মারা যায়। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন হেলমুট গ্রীম, নায়িকার ভূমিকায় নানা অস্টেন।

আরেকটি ছবি তোলা হচ্ছে বার্লিনের পটভূমিকায়। "টো টো অ্যান্ড পেপিনো ইন ডিভাইডেড বার্লিন"—তুলেছেন সিনে-সিটা সংস্থা। ছবিটি খাঁটি স্ল্যাপস্টিক কমেডি। নেপলস থেকে টো টো এল বার্লিনে কাপড়ের দোকান খোলার জন্যে। নতুন দেশে ব্যবসা আরম্ভ করার আগে দেশী লোক পেপিনোর শরণাপন্ন হল টোটো। পেপিনোও বার্লিনে কাপড়ের ব্যবসা ফেঁদে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর টোটোর সঙ্গে পরিচয় হয় দুজন রহস্যজনক লোকের সঙ্গে। তারা টোটোকে বলে, সে যদি আমেরিকানদের কাছে বিখ্যাত জার্মান সেনানায়ক এ্যাডমিরাল ক্যানারিস'এর (এই সেনানায়কের জীবনী নিয়েও ছবি তোলা হয়েছে জার্মান ভাষায়) পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করে তাহলে এক কোটি মার্ক পাবে। চিত্রটি নিঃসন্দেহে একটি উত্তেজক হাসির ছবি হবে।

বৃটিশ ছবির টুকরো খবর

জুডি গারলেন্ড বিখ্যাত অভিনেতা ডার্ক বোগার্ড-এর বিপরীত-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করবেন। ছবির নাম "দি লোনলি স্টেজ"। ছবিটি তোলা হচ্ছে লন্ডনের নিকটবর্তী শেপারটন স্টুডিওতে।

• • •

কার্ল কোরম্যান তাঁর "দি ভিক্টরস" ছবিটির বহির্দৃশ্যের জন্যে সুইডেনে গেছেন। সোফিয়া লোরেন এবং 'রুম অ্যাট দি টপ'খ্যাত সাইমন সিনোরেৎ এই চিত্রের অন্যতম অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সোফিয়ার নামে আদালতে এক বহুগামিত্বার অভিযোগ আসার ফলে তিনি এই চিত্রে আপাততঃ অভিনয় করতে পারবেন না।

• • •

জে, বি, প্রিস্টলের চলচ্চিত্রায়িত "দি ওল্ড ডার্ক হাউস" আবার নতুন করে তোলা হচ্ছে। উইলিয়াম ক্যাসল ছবিটি পরিচালনা করবেন। নায়কের ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন টম পোস্টন।

ইংলণ্ড বনাম পাকিস্তানের চতুর্থ টেস্ট

ইংল্যাণ্ড : ৪২৮ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। টম গ্রেভনী ১১৪, পিটার পারফিট ১০১, টেড ডেক্সটার ৮৫ এবং ডেভিড শেফার্ড ৮৩। ফজল ১৩০ রানে ৩ উইকেট।)

পাকিস্তান : ২১৯ রান (মুস্তাক মহম্মদ ৫৫, সৈয়দ আমেদ ৪৩ এবং নাসিমুল গনি ৪১। ট্রুম্যান ৭১ রানে ৪, স্ট্যাথাম ৫৫ রানে ২, নাইট ৩৮ রানে ৪ উইকেট)।

ও ২১৬ রান (৬ উইকেটে। মুস্তাক নট আউট ১০০ এবং সৈয়দ ৬৪। স্ট্যাথাম ৪৭ রানে ২, ট্রুম্যান ৩৫ রানে ১, লক ২৭ রানে ১, ডেক্সটার ২৫ রানে ১ এবং টিটমাস ২৯ রানে ১ উইকেট)।

প্রথম দিন (২৬শে জুলাই) : বৃষ্টির দরুণ প্রথম দিন খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় দিন (২৭শে জুলাই) : ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট পড়ে ৩১০ রান। গ্রেভনী ৮৯ এবং পারফিট ৩৮ রান করে নটআউট থাকেন।

তৃতীয় দিন (২৮শে জুলাই) : ইংল্যাণ্ড ৪২৮ রানে (৫ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট পড়ে ১২৭ রান।

চতুর্থ দিন (৩০শে জুলাই) : পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ২১৯ রানে সমাপ্ত। ইংল্যাণ্ডের থেকে ২০৯ রানের ব্যবধানে পিছনে পড়ে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে ১ উইকেট খুইয়ে ১১ রান করে।

পঞ্চম দিন (৩১শে জুলাই) : শেষ দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে ২১৬ রান (৬ উইকেটে) ওঠে। মুস্তাক মহম্মদ ১০০ রান করে নটআউট থাকেন।

নটিংহামের ট্রেন্ট ব্রীজে ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তান দলের চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। আলোচ্য খেলা অমীমাংসিত হওয়ার কারণ বৃষ্টি। প্রথম দিন খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। সবশুদ্ধ সাড়ে দশ ঘন্টা সময় মাঠে মারা গেছে— বৃষ্টি এবং আলোর স্বল্পতার দরুণ। খেলাটি ড্র যাওয়াতে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি; কারণ ইংল্যাণ্ড পর পর তিনটে টেস্ট খেলায় জয়লাভ ক'রে আগেই 'রাবার' পেয়ে গেছে। তবে সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলায় জয়লাভের রেকর্ড করা থেকে ইংল্যাণ্ড বঞ্চিত হয়েছে। পাঁচটা খেলা নিয়ে টেস্ট সিরিজ সুরু হয়েছে ১৮৮৪-৮৫ সালে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। সেই থেকে ইংল্যাণ্ড মাত্র একবার টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলায় জয়লাভের রেকর্ড করেছে ১৯৫৯ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে।

এ পর্যন্ত মাত্র এই তিনটি দেশ সিরিজের পাঁচটা টেস্ট খেলাতেই জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে— অস্ট্রেলিয়া এই রেকর্ড করেছে দুবার ১৯২০—২১ সালে ইংল্যাণ্ড এবং ১৯৩১—৩২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাঁচটা টেস্ট খেলাতেই ইংল্যাণ্ড

পিটার পারফিট

জয়লাভ করে ১৯৫৯ সালে এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬২ সালে।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে আলোচ্য চতুর্থ টেস্ট খেলায় পাকিস্তানের অধিনায়ক জাবেদ বার্কি টসে জয়ী হয়ে ইংল্যাণ্ডকে প্রথম ব্যাট করতে দান ছেড়ে দেন। বৃষ্টির দরুণ প্রথম দিনের খেলা ভণ্ডুল হল। দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের ৩টে উইকেট গিয়ে ৩১০ রাণ ওঠে। ইংল্যাণ্ডের মাত্র ১১ রানের মাথায় পুলোর (৫ রান) আউট হ'ন। কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে শেফার্ড এবং ডেক্সটার দলের ১৬১ রান তুলে দেন। এরপর চতুর্থ উইকেটের জুটিতে গ্রেভনী এবং পারফিট দ্রুতগতিতে রান তুলতে থাকেন। ৯০ মিনিটের খেলায় এই জুটি ১০০ রান যোগ করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা যায় গ্রেভনী ৮৯ এবং পারফিট ৩৮ রান ক'রে নটআউট আছেন — উভয়ের জুটিতে ১২৫ রান। ইংল্যাণ্ডের ৩টে উইকেট পড়ে ৩১০ রান দাঁড়ায়।

খেলার তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড ৪২৮ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। গ্রেভনী এবং পারফিট উভয়েই সেঞ্চুরী করেন—গ্রেভনী ১১৪ এবং পারফিট নট-আউট ১০১ রান। ১৯৬২ সালের ইংল্যাণ্ড সফররত পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় পারফিটের এই তৃতীয় সেঞ্চুরী—এজবাস্টনের প্রথম টেস্টে নট-আউট ১০১, লিডসের ৩য় টেস্টে ১১৯ এবং নটিংহামের ৪র্থ টেস্টে নট আউট ১০১। গ্রেভনী এবং পারফিটের চতুর্থ উইকেটের জুটিতে দলের ১৮৪ রান ওঠে তিন ঘন্টার খেলায়। পিটার পারফিট ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামেন ভারতবর্ষের বিপক্ষে কলকাতার চতুর্থ টেস্টে (১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজ)। তিনি এ পর্যন্ত ৮টা টেস্ট ম্যাচ খেলে ৪টে সেঞ্চুরী করেছেন—সবই পাকিস্তানের বিপক্ষে। তিনি তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী (১১১ রান) করেন পাকিস্থানের বিপক্ষে করাচীর শেষ তৃতীয় টেস্টে। এ পর্যন্ত তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের ফলাফল দাঁড়িয়েছে : টেস্ট খেলা ৮, ইনিংস ১০, নটআউট ২বার, মোট রান ৫৮২ এবং সেঞ্চুরী সংখ্যা ৪। পিটার পারফিট ক্রমশঃ উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছেন। গ্রেভনী পাকিস্তানের বিপক্ষে আলোচ্য চতুর্থ টেস্টে ১১৪ রাণ করেছেন—পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৬২ সালের অসমাপ্ত টেস্ট সিরিজে তাঁর এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। প্রথম সেঞ্চুরী (১৫৩ রান) করেন লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলাতে এবং এজবাস্টনের প্রথম টেস্ট খেলায় মাত্র ৩ রানের জন্যে তিনি সেঞ্চুরী হাতছাড়া করেন। আলোচ্য চতুর্থ টেস্ট খেলার রান ধরে গ্রেভনীর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনের সাফল্য দাঁড়িয়েছে : টেস্ট খেলা ৫২, মোট রান ২,৯৯১, সর্বোচ্চ রান ২৫৮ এবং সেঞ্চুরী ৬। আর মাত্র ৯ রাণ করলেই টম গ্রেভনী টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে তিন হাজার রান করার দুর্লভ সম্মান লাভ করবেন। এই সম্মান দুর্লভ এই কারণে যে, টেস্ট ক্রিকেট খেলার সূচনা দিবস (১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ) থেকে ১৯৬২ সালের ১০ই আগস্টের মধ্যে মাত্র ২২ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় এই সম্মান অর্জন করেছেন —ইংল্যাণ্ডের ৯ জন, অস্ট্রেলিয়ার

পক্ষে ৭ জন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ৪ জন, ভারতবর্ষের পক্ষে ১ জন (পলি উমরীগড়) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে একজন।

পাকিস্তান তৃতীয় দিনের বাকি খেলায় ৬টা উইকেট খুইয়ে ১২৭ রান করলে ইংল্যাণ্ডের থেকে ৩০১ রানের পিছনে পড়ে যায়। আলোর অভাবে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে ৭০ মিনিট আগেই এইদিন খেলা বন্ধ হয়।

খেলার চতুর্থ দিনে প্যাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ২১৯ রানে শেষ হলে পাকিস্তান ইংল্যাণ্ডের থেকে ২০৯ রানের ব্যবধানে পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয় এবং খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১১ রান করে একটা উইকেট খুইয়ে।

খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে পাকিস্তান যখন অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে তখন দলের আর ৯টা উইকেট পড়তে বাকি এবং ইংল্যাণ্ডের থেকে ১৯৮ রানের পিছনে। অবস্থা খুবই শোচনীয়। দলের এই শোচনীয় অবস্থায় নির্ভীকভাবে খেলে দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন দলের ১৯ বছরের তরুণ খেলোয়াড় মুস্তাক মহম্মদ। তাঁর পরই সৈয়দ আমেদের খেলা উল্লেখযোগ্য। দলের ৭৮ রানে ৩য় উইকেট পড়ে। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে মুস্তাক মহম্মদ এবং সৈয়দ আমেদ দুঘণ্টায় দলের ১০৭ রান তুলে দেন। সৈয়দ আমেদ ৬৪ রান করে আউট হন; কিন্তু মুস্তাক সেঞ্চুরী (১০০ রান) ক'রে শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন। এই সেঞ্চুরী করতে তিনি ৩১৫ মিনিট সময় নেন; বাউণ্ডারী ছিল চারটে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল প্যাকিস্তানের ৬ উইকেট পড়ে ২১৬ রান উঠেছে।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ভূতপূর্ব অধিনায়ক ফজল মামুদ এবারের ইংল্যাণ্ড সফররত পাকিস্তান দলে প্রথমে স্থান পাননি। ফারুকের অসুস্থতায় তাঁর ডাক পড়ে এবং তিনি ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে চতুর্থ টেস্ট খেলায় প্রথম যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে ওভাল মাঠের টেস্টে তাঁরই মারাত্মক বোলিংয়ে পাকিস্তান জয়লাভ করে এবং এই জয়লাভের ফলে ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থাকে। আলোচ্য চতুর্থ টেস্টে ফজল ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে ১৩০ রানে ৩টে উইকেট পান।

পাকিস্তান দলের ১৯৬২ সালের ইংল্যাণ্ড সফর উপলক্ষ্য করে ইংল্যাণ্ডের খবরের কাগজগুলিতে ক্রিকেট খেলার বেশীরভাগ সমালোচকই পাকিস্তান ক্রিকেট দলের শক্তি এবং সাফল্য নিয়ে ইংল্যাণ্ডের আকাশে এক বিরাট রঙীন ফানুষ তুলেছিলেন। আজ রঙীন ফানুষের মহিমা ধরা পড়ে গেছে। ট্রেন্ট ব্রীজের চতুর্থ টেস্ট খেলায় মাত্র ১,৫০০ পাউণ্ডের অগ্রিম টিকিট বিক্রী হয়েছিল। নটিংহামের টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এত কম পরিমান অগ্রিম টিকিট বিক্রী কখনও হয়নি।

ভ্যালেরি ব্রুমেল (রাশিয়া)
সম্প্রতি হাইজাম্পে ৭ ফিট ৫ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করে নিজস্ব বিশ্ব-রেকর্ড ভংগ করেছেন।

॥ আন্তর্জাতিক লন টেনিস ॥

সুইডেনের আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস ফাইনালে রমানাথন কৃষ্ণান ৪—৬ ও ১—৬ গেমে ব্রেজিলের এডিসন ম্যাণ্ডারিনোর কাছে পরাজিত হন। সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণান ৬—২ ও ৬—২ গেমে আর্জেণ্টিনার সোরিয়ানোকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠেন; অপর দিকের সেমি-ফাইনালে ম্যাণ্ডারিনো ৬—২ ও ৭—৫ গেমে রয় এমারসনকে (অস্ট্রেলিয়া) অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করেন।

* * *

সুইডিস আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতবর্ষের কৃষ্ণান এবং অস্ট্রেলিয়ার রয় এমারসনের জুটি ৬—৩, ৩—৬, ৬—২ ও ৮—৬ গেমে ম্যানুয়েল শান্তানা (স্পেন) এবং রাফেল ওসুনাকে (মেক্সিকো) পরাজিত করেন।

॥ ডেভিস কাপ ॥

১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ইউরোপীয়ান জোন ফাইনালে সুইডেন ৪—১ খেলায় ইতালীকে পরাজিত করে মূল প্রতিযোগিতার ইন্টারজোন সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। সুইডেনের পরবর্তী খেলা পড়েছে আমেরিকান জোন বিজয়ী দেশের সঙ্গে। সুইডেনের কাছে এই পরাজয়ে ইউরোপীয়ান জোন ফাইনালে ইতালীর বিগত চার বার জয়লাভের প্রাধান্য খর্ব হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী খেলায় সুইডেন এবং ইতালী ৬ বার মিলিত হয়েছে এবং ইতালীর বিপক্ষে সুইডেনের এই প্রথম জয়লাভ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইতালী ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হয়ে রানার্স-আপ হয়েছিল।

এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতীয় ফুটবল দল

আগামী ২৫শে আগষ্ট থেকে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠান আরম্ভ হবে। এই অনুষ্ঠানের ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৬ জন খেলোয়াড়কে নিয়ে ভারতীয় ফুটবল দল গঠন করা হয়েছে। এই ষোলজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ১০ জন খেলোয়াড় বিগত ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। দলের বাকি ৬ জন খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক ফুটবল্ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলে এই প্রথম স্থান পেলেন। সুতরাং এই ভারতীয় ফুটবল দলটি একদিকে প্রবীণ এবং অপরদিকে তরুণ খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের

চুণী গোস্বামী

প্রতিনিধি চুণী গোস্বামী দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। পি কে ব্যানার্জি, পি সিংহ এবং পি বর্মন—রেলওয়ে দলের এই তিন 'পি' আদ্য-অক্ষরযুক্ত খেলোয়াড় কলকাতারই; কিন্তু তাঁরা বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেননি

মোহনবাগান বনাম এরিয়ান্সের লীগের খেলায় এরিয়ান্সের গোলের মুখে এক সংকটজনক পরিস্থিতির দৃশ্য।

—করেছেন নিজেদের কর্ম প্রতিষ্ঠান রেলওয়েজকে।

ভারতীয় দলে নির্বাচিত ষোলজন খেলোয়াড়ের নাম :

গোলরক্ষক : পি থঙ্গরাজ (বাংলা) এবং পি বর্মণ (রেলওয়ে)।

ফুলব্যাক : চন্দ্রশেখর (বোম্বাই), ত্রিলোক সিং (সেনাদল), অরুণ ঘোষ (বাংলা) এবং জার্ণেল সিং (বাংলা)।

হাফব্যাক : এফ এ ফ্রাঙ্কো (বোম্বাই), রামবাহাদুর (বাংলা) এবং পি সিংহ (রেলওয়ে)।

ফরোয়ার্ড : পি কে ব্যানার্জি (রেলওয়ে), ইউসুফ খাঁ (অন্ধ্র), ডি ই এথির (সেনাবাহিনী), আফজল (অন্ধ্র), চুণী গোস্বামী (বাংলা, অধিনায়ক), বলরাম (বাংলা) এবং অরুময়নঙ্গম (বাংলা)।

॥ ফুটবল লীগ ॥

গত সপ্তাহে (৩০শে জুলাই থেকে ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ১৪টা খেলা হয়েছে। খেলার ফলাফল : জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে ৭টা খেলায় এবং খেলা ড্র হয়েছে ৭টা।

মোহনবাগান বনাম এরিয়ান্স এবং ইস্টবেঙ্গল বনাম বালীপ্রতিভার খেলা ড্র হওয়াতে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। এরিয়ান্সের বিপক্ষে মোহনবাগান তার লীগের শেষ খেলাটি গোলশূন্য ড্র করে। অপর দিকে বালী প্রতিভার বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল তার শেষ খেলাটিও ১—১ গোলে ড্র রাখে। ফলে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলের সমান ২৮টা খেলায় সমান ৪০ পয়েন্ট দাঁড়ায়। এখন চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্ধারণের জন্যে উভয় দলের মধ্যে পুনরায় খেলা হবে। এই রকম অবস্থায় পূর্বে গোল এভারেজের উপর চ্যাম্পিয়ানশীপ নির্ধারণ করা হ'ত। এ নিয়ম ১৯২৬ সালে বদলে গিয়ে নতুন নিয়ম হয়—খেলার এ রকম ক্ষেত্রে দুই দলকে উভয়ের মধ্যে পুনরায় খেলতে হবে এবং সেই খেলার জয়-পরাজয়ের উপরই চ্যাম্পিয়ানশীপ নির্ধারণ করা হবে। সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে পূর্বে মাত্র একবার—১৯৩৮ সাল লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্ধারণের জন্যে এই আইন অনুসারে মহমেডান স্পোর্টিং এবং কাস্টমস দলকে উভয়ের মধ্যে পুনরায় খেলতে হয়েছিল। তারপর এই মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের খেলা।

প্রথম বিভাগ লীগ তালিকা

(৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত)

প্রথম চারটি দল

	খে	জি	ড্র	হা	স্ব	বি	প
ইস্টবেঙ্গল	২৮	১৪	১২	২	২৬	৭	৪০
মোহনবাগান	২৮	১৬	৮	৪	৪৭	১৮	৪০
ই আই আর	২৫	১১	৯	৭	২০	১৬	২৭
হাওড়া ইউ	২১	৯	৬	৬	২২	১১	২৪

আলোচ্য সপ্তাহে হাওড়া ইউনিয়ন ৫—০ গোলে ইস্টার্ন রেল দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ক'রে সকলকে তাক লাগিয়েছে। লীগের প্রথম খেলায় হাওড়া ইউনিয়ন ১—০ গোলে জয়লাভ করেছিল। লীগ তালিকায় বর্তমানে ইস্টার্ন রেলদল দ্বিতীয় স্থানে আছে, ২৫টা খেলায় ২৭ পয়েন্ট। আর হাওড়া ইউনিয়ন তৃতীয় স্থানে, ২১টা খেলায় ২৪ পয়েন্ট। তাদের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী জর্জ টেলিগ্রাফ এবং বাটা স্পোর্টস—দুই দলেরই ২২টা খেলায় ২৩ পয়েন্ট। লীগ তালিকার নীচের দিকে 'মরণ-বাঁচন' সমস্যায় পড়েছে খিদিরপুর (২১টা খেলায় ১৭), বালী প্রতিভা (২২টা, ১৫ পয়েন্ট) এবং পুলিশ (২১টায় ১৫ পয়েন্ট)।

॥ হকি টেস্ট ॥

মালয় সফরকারী ভারতীয় হকি দল প্রথম টেস্ট খেলায় ৩—০ গোলে মালয়ের জাতীয় হকি দলকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধে ভারতবর্ষ ৩—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথম গোল দেন আবদুল হামিদ, দ্বিতীয় গোল আরম্যান এবং তৃতীয় গোল যোগীন্দর সিং।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোনঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

অমৃত ॥ অমৃত ॥ **অমৃত** ॥ অমৃত ॥

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৫শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৩২শে শ্রাবণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 17th August, 1962.
40 Naya Paise.

স্বাধীনতা দিবস! পনেরো বৎসর পূর্বে কি আনন্দ কি উল্লাসের সহিত ভারতের জনসাধারণ, আবালবৃদ্ধবনিতা, এই দিবসের আগমন নন্দিত করিয়াছিল!

আজ অভাব-অনটনক্লিষ্ট অসংখ্য নরনারীর মনে সে আনন্দে বিষাদের ছায়া আনিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে বেকার সমস্যা, অর্থনীতির জটিল সমস্যা ও পক্ষপাত-দুষ্ট ও নীতিভ্রষ্ট অধিকারীদিগের যথেচ্ছাচার এই অভাব-অনটনকে এতই দুর্বহ করিয়াছে যে, সাধারণ-জনে ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে যে, স্বাধীনতা আমাদের কি দিয়াছে। দেশ অগ্রসর কতটা হইয়াছে বা হইতেছে সে সম্বন্ধে জনসাধারণ কোনও প্রত্যক্ষ এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি এখনও পাইতেছে না বলিয়া অনেকের মন আশাহত ও বিভ্রান্ত হইয়া আছে। স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা আমাদের এই পনেরো বৎসরে যাহা হইয়াছে তাহার মধ্যে তিক্ত-কটু-অম্ল-মধুর সকল রসই আছে, কিন্তু সেই মধুর রস ক্ষীণ ও তিক্ততা তীব্র বলিয়াই আমাদের মনে অনেক সময়ে হতাশা জাগে। স্বাধীনতা ও প্রগতির পথ কত দুর্গম সেই দেশ ও জাতির পক্ষে, যে দেশ ও জাতি স্বাধীনভাবে পথ চলিবার অধিকার হারাইয়াছিল বহু শতাব্দী পূর্বে, এবং বর্তমানে যাহাদের পথপ্রদর্শকগণের সকলেই অনভিজ্ঞ এবং অনেকেরই মন পক্ষপাতদুষ্ট বা বিচার-বুদ্ধিশূন্য ও অন্ধ-বিশ্বাস বা ধারণায় আচ্ছন্ন, সে কথা আমরা সকল সময় বুঝি না বলিয়া আমাদের মন এত ভারাক্রান্ত ও অবসন্ন হয়।

কিন্তু সে কারণে কি স্বাধীনতার মূল্য, তাহার প্রেরণা কিছু হ্রাস পাইয়াছে? যে স্বাধীনতার জন্য দেশের কত শত মহাচেতা মনীষী শতাধিক বর্ষ ধরিয়া সাধনা করিয়া গিয়াছেন, যে স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ এদেশের কত সহস্র সন্তান আত্মনিবেদন ও আত্ম-বলিদান করিয়া গিয়াছেন, সে মহামূল্য রত্নের আদর কি কখনও কমিতে পারে, যতদিন এদেশে দেশাত্মবোধের লেশমাত্র থাকিবে?

এই স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রথম চেতনা আসে বাঙালীর মনে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে রামমোহন রায়ের যুগে। স্বাধীনতার অভাব যে কি নিদারুণ সে সম্বন্ধে রঙ্গলাল ১৮৫৮ সালে গাহিয়াছিলেন :

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটীকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়॥"

রঙ্গলাল কোম্পানীর আমলের অনাচার-অত্যাচারের জ্বালায় জ্বলিয়াছিলেন বলিয়াই "দিনেকের" স্বাধীনতাও স্বর্গসুখসম বলিয়াছিলেন। আজ আমাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন ও আমরা মুক্ত সুতরাং সে জ্বালা আজ আমাদের নাই। তাই স্বাধীনতাকে অনেকে শুধু স্বার্থপূরণের পথ বলিয়া ভ্রম করিয়া বা স্বেচ্ছাচারের উপায় জানিয়া উহার ব্যবহারে বিফলকাম হইয়া বিক্ষুব্ধ হ'ন। অন্য অনেকের মনে অপূর্ণ আশা বা স্বাধীনতা-আগমনকালের দেশবিভাগ ও শান্তি-শৃঙ্খল ভঙ্গের কারণে সংগতিনাশের এবং অন্যভাবে ভাগ্য-বিপর্যয়ের দুঃখ-ক্লেশ আছে বলিয়া তাঁহাদেরও স্বাধীনতার সম্পর্কে বিকৃত ধারণা জন্মিয়াছে।

যদি আমরা স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর সমগ্র দেশের জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লাভ-লোকসানের হিসাব ধীরস্থিরভাবে বিচার করি, এবং বিচারকালে মনকে সকল গ্লানি সকল আবেশ হইতে মুক্ত রাখিতে পারি তবেই স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। স্বাধীন দেশ ও স্বাধীন মানবের সম্পর্কে ধারণাও স্পষ্ট হয়।

কবিগুরু এই শতাব্দীর আরম্ভের দিকে স্বাধীনতার পূর্ণরূপ বর্ণনা যেভাবে করিয়াছিলেন তাহার যথার্থতা এখন জগতে স্বীকৃত। সেই ধ্যানে ছিল :—

"চিত্ত যেথায় ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত॥"

সেই নির্দয় আঘাত স্বাধীনতার অবশ্য-দেয় মূল্য। ধৈর্যের সহিত সে আঘাত সহ্য করিলে ভারত ভূস্বর্গে পরিণত হইবে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ঐ ধ্যানের মর্ম। বাইশে শ্রাবণের সঙ্গে জড়িত সেই পুণ্যশ্লোক মহা-মানবের স্মৃতিকে প্রণাম জানাইয়া স্বাধীনতা-দিবসের আবাহন শেষ করি।

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠি

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

আমাকে হয় তো আর দিন-দশেকের মধ্যে কলকাতায় যেতে হবে। বন্যাপীড়িত বাংলার সাহায্যের জন্যে কিছু চেষ্টা না করে স্থির থাকা অসম্ভব। বন্যায় আমাদেরও উপজীবিকা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এর আগে যে বন্যা হয়েছিল তাতে ঋণ করে প্রজাদের সাহায্য ক'রেছি—দ্বিতীয়বার ঋণ বাড়াতে সাহস হয় না। তাই স্থির করেছি কলকাতায় বর্ষামঙ্গল দেখিয়ে বর্ষাজনিত অমঙ্গল কথঞ্চিৎ দূর করতে চেষ্টা করব। আট-দশদিনের পূর্বে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব হবে না—তার চেয়ে বিলম্ব করলে উৎসবের নামটাকে ব্যর্থ করা হবে। শরীর পীড়িত কিন্তু দেহের দোহাই মেনে কর্তব্য মুলতুবি রাখবার অবকাশ আমার আর নেই। ডাক্তার সরসীলাল সরকার আমার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দাবী করে পত্র লিখেছেন। প্রবন্ধ যদি কোমর বেঁধে লিখি পনেরো আনা লোক তার তাৎপর্য বুঝতে পারবে না অথবা ভুল বুঝবে। তোমার দিদিকে যে চিঠিগুলি লিখেছি তাতে আমার কথা যত সহজে ব্যক্ত হয়েছে কোনো প্রবন্ধে তা সম্ভব হবে না।......

এই ক্লান্ত জীর্ণ দেহে নতুন করে কিছু লিখতে উৎসাহ হয় না—অথচ আমার যা শেষ কথা তা আমাকে বলে যেতেই হবে। রচনাটি সংকলিত হলে পর ছাপবার পূর্বে তার এক কপি তোমাদের সম্মতির জন্যে পাঠিয়ে দিতে পারি। ইতি ৬ ভাদ্র, ১৩৩৮।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[চিঠিখানি শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে লিখিত এবং তাঁরই সৌজন্যে প্রাপ্ত]

প্রথমদ্বিতীয়

বিষ্ণু দে

বোঝে নি সে প্রথম যৌবনে, অন্তত সে আজকাল ভাবে তাই,—
এমনও তো হয়, কাক-জ্যোৎস্নাতেই কাক ডাকে ভুলের ভোরাই?

আজকেই যৌবন সত্য,—এমনও তো দেখা যায়, যখন কুয়াশা
এক আধ দিন বেলা আটটায় কাটে, তবে সূর্য ওঠে, তাহলে দুরাশা

মাত্র কেন তার পঁয়ত্রিশে যৌবন? অথচ মেলাও, দেখবে মিলবে লক্ষণ,
হৃদয়ে শরীরে সদ্য পুলকের ধরণটা বিশ-বাইশের মতো লাগে সর্বক্ষণ।

তুলনা? তা তুলনাও ওঠে বৈকি থেকে থেকে—মন বড় ভয়ানক—মনে, অগোচরে,
অবশ্য প্রথমই হারে, দ্বিতীয়ই জেতে, টানে রোমাঞ্চিত উত্তাল সাগরে।

ভেবেছে অনেক, কোনটি যে ভ্রান্তি? একি দিনগত অভ্যাসে ধিক্কার?
তাই কি স্নায়ুর উদ্দীপনা প্রয়োজন, তাই হৃদয়ের অভিজ্ঞ দীক্ষার?

সন্ধ্যায় জানলা ধ'রে একমনে ভাবে, অন্যমনা খোঁপাবাঁধা চুলে
আঙুল বুলিয়ে ফের লোহার গরাদ ধরে লতায়িত পাঁচটি আঙুলে।

ভাবে দ্বিতীয়ই আসলে প্রথম, ভাবে দ্বিতীয়ই এক অদ্বিতীয়,
ওর জীবনের সত্য। যোগ-বিয়োগের শূন্যে-বিভাজ্য নির্ভুল নয় কি ও?

ট্রেন

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

দূরে ট্রেন যায়, হায়, এ মাটিতে আমার শিকড়!
এই গাছপালা বাড়ি ঘর
একটানা সন্ধ্যা ভোর অচল করেছে দেহমন।
এখানের যতো আয়োজন
শুধু স্থির রেখে যেতে চায়।

বার্ধক্যের এই অবেলায়
তবু আমি চেয়ে থাকি যেন কোনো ট্রেন
ডাকবে আমাকে নিয়ে যেতে,
এ খামার-ক্ষেতে
ফুরোবে আমার লেন দেন।।

জৈমিনি

আমার আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, 'স্বাধীনতা ও সাহিত্য'। আমি তর্ক করে বুঝিয়ে দিতে চাই, স্বাধীনতার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক প্রায় ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের মতো মুখদর্শনবিহীন।

পাঠক! আমি জানি, এইটুকু শুনেই আপনি প্রতিবাদ করার জন্যে উসখুস করছেন। কিন্তু আগে ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন। তারপর আপনি যতো কিছু বলবেন সবই আমি নতশিরে শুনে যাব।

একথা কে না স্বীকার করবে যে, স্বাধীনতার সঙ্গে সাহিত্যের যোগ খুবই গভীর। কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে, সেই যোগাযোগটা ধনাত্মক নয়, ঋণাত্মক। অর্থাৎ আমার বিশ্বাস, সাহিত্য রচিত হয় তখনই যখন দেশে স্বাধীনতার অভাব ঘটে। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এলে সাহিত্যের স্রোতে চড়া দেখা দিতে শুরু করে।

অবশ্য চড়া-পড়া নদীর স্বভাবই এই যে, বুকের বোঝা এড়ানোর প্রয়াসে তার অগ্রগতির ধারা বহুধা-বিভক্ত হয়ে যায়। বাইরে থেকে দেখে আমরা এই বৈচিত্র্যের রূপে মুগ্ধ হই। কিন্তু নদীর অন্তরঙ্গ খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা বিচলিত বোধ করেন।

ধরা যাক আমাদের এই বাংলা-সাহিত্যের কথা। বিশ্ববন্দিত এই সাহিত্যের সাম্প্রতিক অবস্থা বিচার করলেই আমার উক্তির মর্ম হাড়ে হাড়ে টের পাবেন।

এগিয়েছি আমরা অনেক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। টেকনিকের উন্নতি হয়েছে, বিষয়-বৈচিত্র্য বেড়েছে। কিন্তু, বিশ্ব-সাহিত্যের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের এই বাংলা সাহিত্যের বিগত যুগের তুলনাতেও হাল আমলের বেশির ভাগ রচনা অন্তঃসারশূন্য মনে হয় নাকি?

অন্তত একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে, গত পনের বছরে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমরা যা পেয়েছি, তার থেকে উন্নততর ফসল পেয়েছিলাম তার আগের

পনের বছরে। এবং সময়টাকে যদি আরেকটু বাড়িয়ে দেওয়া যায়, ধরা যায় স্বাধীনতা পাওয়ার আগের গোটা আধুনিক পর্বটিকে, তাহলে তুলনা যে প্রায় অসম্ভবের কোঠায় গিয়ে পড়ে এ সত্য সবিনয়ে মেনে নেওয়াই ভাল।

সে পটভূমিতে সাম্প্রতিক পনের বছরের ফসলই শুধু নয়, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও যে কত অকিঞ্চিৎকর তা ভাবলে নির্বাক হ'তে হয়।

কাজেই, কোথাও একটা গোলযোগ ঘটেছে বলে সন্দেহ জাগছে। এমন কি হ'তে পারে যে, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই, সাহিত্যকর্ম এত নির্জীব হ'য়ে উঠছে? কিন্তু এ রকম ভয়ানক কথা তো মনে ভাবাও পাপ! মনুষ্যকুলে এমন কে নরাধম আছে যে, সাধ ক'রে পরাধীন হ'তে চায়? স্বাধীনতা এসে বাহিরের

এবং ভিতরের সব রকম বাধা সরিয়ে দিয়ে জাতির সর্বাঙ্গীণ আত্মবিকাশের অনুকূল অবস্থা এনে দেবে এইটেই তো স্বাভাবিক! আমাদের ক্ষেত্রে তার বিপরীত ফল দেখা দেবে কেন?

কেন দেবে, তার কারণ একটা অবশ্যই আছে। অমৃতবৃক্ষে অহেতুকভাবে বিষফল দেখা দিতে পারে না। আমার মনে হয়, স্বাধীনতা ব্যাপারটা যে ঠিক কী জিনিস তাই আমরা হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারিনি। বিপত্তি ঘটেছে সেইখানে।

আমরা যখন পরাধীন ছিলাম, তখন মনে মনে সেজন্যে একটা গ্লানি অনুভব করতাম। স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচতে চাওয়া যে মৃত্যু তুল্য অভিশাপ তা আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম। সেইজন্যে অন্তরের মধ্যে একটা তাগিদ ছিল, যাতে আমরা মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হই, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। গোটা ঊনিশ শতকের সাধনাই ছিল এই দিকে। তাই আমরা পেয়েছি একাধিক যুগন্ধর মহাপুরুষ, পেয়েছি আমাদের অপরূপ সম্পদ—আধুনিক বাংলা সাহিত্য।

বিশ শতকের অনেকদূর পর্যন্ত চলেছিল এই সোনার ফসল ঘরে তোলার পালা। তারপর ইতিহাসের বিচিত্র কার্যকারণে আমাদের ভাগ্যাকাশে দেখা দিল স্বাধীনতা। আর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে আসর জাঁকিয়ে বসল মরশুমী ফুলের রাজত্ব। এতে চোখের তৃষ্ণা যতো চরিতার্থ হয়, প্রাণের ক্ষুধা ততো সহজে মেটে না। সারা দেশের পাঠক-সমাজ আজ দুর্ভিক্ষকাতর।

স্বীকার করতেই হবে, স্বাধীনতাকে আমরা একটা কথার কথা বলে মনে করেছিলাম। নাহলে এমন অবস্থা হবে কেন? এই চিন্তাহীন গড্ডলস্রোতে গা-ভাসিয়ে আমরা নগদ পাওনা আদায় করতেই আজ ব্যস্ত, সেই বোঝাপড়ার অঙ্কে যে একটা গুরুতর রকম ফাঁকি জমে উঠছে, সেদিকে আমাদের লক্ষ্যই নেই।

সত্যি ভেবে দেখুন, বাংলা-সাহিত্যে আজ আপনি কী পাচ্ছেন? সৎ লেখক যে একেবারে নেই তা আমি বলি না। নিশ্চয়ই আছেন। জ্যেষ্ঠদের মধ্যে অনেকে এবং নবাগতদেরও কেউ কেউ দায়িত্বশীল সাহিত্য-সাধনায় নিয়োজিত রেখেছেন নিজেদের। কিন্তু বাকী যাঁরা আছেন, সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে তাঁরাই বেশি, পাঠকের মনোরঞ্জনের আশায় তাঁরা এমনই মত্ত হ'য়ে উঠেছেন যে, মনে হয় যেন স্বপ্নরাজ্যে বাস করছি। আজগবি কাহিনীর চটকদার নায়ক এবং ততোধিক অবিশ্বাস্য সব মন-দেওয়া-নেওয়ার সমস্যায় হাল আমলের বাংলা-সাহিত্য রূপকথার চেয়েও অবাস্তব।

বড় দুঃখের সঙ্গেই এঁদের মনে করিয়ে দিতে হয় 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছিলেন সেই কথা—

'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।...... অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহা পাপ।'

সত্যিই তাই। বক্তব্যহীন বাগাড়ম্বরে আজ বাজার ছেয়ে গেছে। সৌন্দর্য সৃষ্টির নামে নেমে এসেছে এক চরম বিশৃঙ্খলা। অথচ দায়িত্বশীল স্বাধীন জাতি হিসেবে কতই না আমাদের ভবিষ্যৎ ছিল!

সাহিত্যিকগণ এই দেশেরই মানুষ। স্বাধীনতা পাওয়ার পর সত্যিই তো আমরা মঙ্গলগ্রহে চলে যাইনি? বরং দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে অত্যন্ত কঠোর এক বাস্তব জীবনেরই সম্মুখীন হ'য়েছি। সে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, যন্ত্রণা ও আত্মত্যাগ কোথায় চিত্রিত হ'চ্ছে আমাদের সাহিত্যে? সাহিত্যিকরা কি তা'হলে মাটির পৃথিবীতে বাস করছেন না?

সব সাহিত্যিক নন, সেকথা আবার বলি। কোনো কোনো সাহিত্যিক বাস্তবকে ধরতে চাইছেন তাঁদের কঠিন মুঠিতে। কিন্তু তাঁরা সংখ্যালঘু। তাঁদের কৃতিত্বকেও কেউ তুলে ধরছেন না পাঠক সাধারণের সামনে। সমালোচকের রাজ্যেও আজ ঘাড় নেড়ে সায় দেওয়ার রাজত্ব।

এই সব দেখে-শুনে আমার কেমন যেন ধারণা হচ্ছে আজকাল, আমরা যে স্বাধীন হ'য়েছি, এই ব্যাপারটাই হয়তো যতো বিভ্রাটের মূল। কিংবা তা যদি না হয় তো দোষ আমাদের হাল আমলের সাহিত্যযশ-প্রার্থীদের। বোধকরি তাঁরা ভেবেছেন, ইংরেজ দেশছাড়া হ'য়েছে, অতএব আর কি, সুখ-নিদ্রায় কালাতিপাত করো। কিন্তু এটা যে আসলে জেগে ওঠবার পালা সেই কথাটাই তাঁদের প্রাণের মধ্যে সাড়া তোলেনি আজো।

অর্থাৎ স্বাধীনতা বাংলাসাহিত্যে এখনো স্বমহিমায় অনুপস্থিত!

পাঠক! এবার বলুন আপনার কথা শুনি।

স্বাধীনতার এপিঠ ওপিঠ

—প্রেমেন্দ্র মিত্র—

একটা বছর ঘুরে গেল।

সামনে আবার সেই অবিস্মরণীয় তারিখ রাত্রির-অন্ধকার বিদীর্ণ করে যা আশায় উৎসাহে উদ্দীপনায় দিকদিগন্ত দীপ্ত করে তুলবে।

পাঁজিকার পাতার যে-কোন একটি দিন এ তো নয়. এ তারিখ মানে অতীতের কত শতাব্দীর অপমান লাঞ্ছনা গ্লানি থেকে মুক্তি, বর্তমানের কি গভীর আত্মপ্রত্যয়, ভবিষ্যতের কি উজ্জ্বল আশ্বাস!

এ তারিখ সুতরাং আমাদের মনে উৎসবের উন্মাদনা যদি আনে তাহলে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাদের-ই প্রাণের উল্লাস ত্রিবর্ণ পতাকা হয়ে সমস্ত দেশের সৌধশীর্ষে আন্দোলিত হবে, রং-বেরং-এর শোভা ধরবে রাস্তার ঘাটে উদ্যানে, আকাশ মুখর করে তুলবে আনন্দ-গানে, তার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ দেখব অনুষ্ঠানে সভায় মিছিলে।

সামনের তারিখটির কথা ভেবে মনে এই উত্তেজনার সঞ্চার করতে গিয়েই কেমন একটু ভাবিত হয়ে পড়েছি। কোথায় যেন কি একটা তার আলগা হয়ে গেছে। উৎসাহের তাড়িত-প্রবাহ ঠিক বইছে না। কোন ফাঁক দিয়ে যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

এ কি হতাশার ফুটো! কি চেয়েছি আর কি পেলাম তার হিসেব করার তিক্ত অবসাদ?

না শুধু তাই নয়। হিসেব অবশ্য মনে মনে করিনি এমন নয়। সবাই করে। কিন্তু শুধু চাওয়া-পাওয়ার হিসাবে মিলছে না বলেই মনের এই নিরুৎসাহ শৈথিল্য নয়।

আশার সঙ্গে পাওনা জীবনেই মেলে না, তা রাষ্ট্রে! আমাদের কতদিন আর বোঁড় ভেঙেছে! তার মধ্যে মন্দ কি আমরা করতে পেরেছি! যে দিকে তাকাই চাক্ষুস প্রমাণের ত অভাব নেই। কলকাতা থেকে ট্রেনে আসানসোল যেতেই দু'পাশের নদী প্রান্তর জনপদ তার সাক্ষ্য দেবে। উদ্দাম দুরন্ত নদ বশ করবার বাঁধ, আকাশে উদ্ধতশির কলের চিমনি। ডি, ভি, সি, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন! এ ছাড়া আরো অনেক কিছু। না, আমাদের আকাঙ্ক্ষা সংকল্প উদ্যোগ দিগ্বিদিকে সহস্র বাহু বিস্তার করে সত্যিই কাজে লেগেছে।

তবে, মনের তারগুলো ঠিক বাজে না কেন? দোষ-ত্রুটি, ফাঁকি, গাফিলি? সে-সবও ধর্তব্য নিশ্চয়। খবরের কাগজের পাতা এই ধরনের খবরেই প্রতিদিন কণ্টকিত দেখতে হয় বটে, কিন্তু এরকম ব্যাপার কি অন্য কোথাও নেই? যুগ যুগ ধরে যারা স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে—তাদের খবরের কাগজের কালিও কালো। সেখানেও নানা দিকে গলতি, নানা অভিযোগ নিত্য লেগে আছে। দেহ থাকলে যেমন রোগ, রাষ্ট্র থাকলেও তেমনি গ্লানির ছিদ্র অল্পবিস্তর দেখা দেবেই। সেই রোগ আর গ্লানির বিরুদ্ধে নিত্য সংগ্রাম করে যাওয়াই স্বাস্থ্য কি স্বাধীনতার দাম ও দায়িত্ব।

এই সংগ্রামের উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞা যেখানে দুর্বল ভয় সেখানেই।

আমাদের ভয়ের মূলও এইখানে। নানা দিকে যত গলদই আমাদের থাক, তাতে হতাশ হবার কিছু নেই যদি জীবন্ত স্রোত আমাদের মধ্যে থাকে সমস্ত গ্লানি ধুয়ে নিয়ে যাবার মত। কিন্তু সেই স্রোতই যেন রুদ্ধ। আমাদের অভিযোগ আছে, অভিযান নেই। আমরা শুধু নালিশের ফিরিস্তি তৈরী করছি গুণে গুণে. নিজেদের নির্লিপ্ত বিচারকের আসনে বসিয়ে। বিচারক নয়, সমস্ত

নালিশের লক্ষ্যস্বরূপ আমরাও যে আসামী সেই কথাটা এখনও জানি না বা মানতে চাই না। রাষ্ট্র মানে আমি এবং আপনি, আজ পোনেরো বছর স্বাধীনতা পেয়েও এই শিক্ষাটাই আমাদের হয় নি। আমার এবং আপনার ছোট তুচ্ছ ফাঁকি সামান্য গাফিলতি যে জমে জমে রাষ্ট্রের ভিৎ ধ্বসিয়ে দেবার মত গহ্বর সৃষ্টি করে, এই অকাট্য সত্যের দিকে আমরা চোখ বুজে থাকতে চাই। কেরাণী হিসেবে আমরা দশটার জায়গায় এগারটায় এসে আজকের ডাক দুদিন দেরী করে পেলে রেগে আগুন হই। পোস্টাফিসে ডাক বিলির কাজে যিনি গাফিলি করেন তিনিই লাইফ ইনসিওর কর্পোরেশনে কিস্তি দেবার সারিতে দাঁড়িয়ে সেখানকার কর্মচারীদের তাচ্ছিল্যে ঔদ্ধত্যে হয়ত ক্ষেপে যান। এল আই সি-র সেই কর্মচারীদেরই শোধ-বোধ হয়ে যায় রেলের টিকিট কিনতে যাওয়ার হয়রানিতে। দপ্তরে দপ্তরে অক্ষমতা অকর্মণ্যতা ও আলস্য, অবহেলিত ফাইলের পাহাড় হয়ে জমে উঠছে। দক্ষিণ দিকে যিনি ফাঁকি দিচ্ছেন উত্তরে যে তিনিই ফাঁকি পড়ছেন এই হুঁস তাঁর নেই।

কাজে ফাঁকির বেলা যেমন, অন্যদিকের অসাধুতার বেলাও তেমনি। বাঁ হাতে যিনি উৎকোচ নেন, ডান হাতে তাঁকে তাই সুদ শুদ্ধ উজাড় করে দিতে হয় আরেক জায়গায়। অসৎ লাভের গুড় অনেক লোলুপ পিঁপড়েকে না খাইয়ে কেউ ভাঁড়ারে তুলতে পারেন বলে মনে হয় না।

এসব নীতিকথা নয়, নিছক বৈষয়িক লাভ-লোকসানের হিসাবের কথা। পাপ-চক্রে একবার জড়িয়ে পড়লে চুরির পাওনা যে বাটপাড়িতে হাত-সাফাই হয়ে যায় সেই নির্জলা সত্য। এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করে পাপচক্রের টান আমরা কতদিনে কাটিয়ে উঠব জানি না, কিন্তু ইতিমধ্যে এ চক্রে যাঁরা বাঁধা পড়েন নি তাঁরাই বা কি করছেন! প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাপ-চক্রের পরিধি নিত্য বাড়ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঠগ বাছতে দেশ এখনো উজাড় হবার অবস্থা নিশ্চয় হয়নি। অসাধু আমরা অল্পবিস্তর অধিকাংশই যদি হয়ে থাকি, সাধু দু'চারজন এখনো অবশ্যই আছেন। কিন্তু তাঁদের সাধুতা যদি নির্লিপ্ত নিষ্ক্রিয় অবজ্ঞায় তাঁদের শুধু দূরেই সরিয়ে রাখে, তা'হলে বলব তাঁরাও কম অপরাধী নন। উদার সহিষ্ণুতার ছলে তাঁরা যদি গুহাশ্রয়ী হ'তে চান তাহলে তা এক ধরনের স্বার্থপরতারই নামান্তর। সাধুতারও সত্যকার পরীক্ষা সংগ্রামে। নির্জীব নির্বিকার সাধুতা নয়, অসহিষ্ণু যুযুধান সাধুতাই আজ প্রয়োজন রাষ্ট্রদেহের ক্ষত ও ব্যাধি যাতে আপনা থেকে নিরাময় হয় সেই সুস্থ বলিষ্ঠ প্রাণস্রোত প্রবাহিত রাখবার জন্যে।

সাধুতা ও সততার সঙ্গে কেমন একটু মলিন দীনতার ছবিই আমাদের মনে জড়িত। সেই ছবি এবার বদলে আঁকবার সময় এসেছে।

বংশের আভিজাত্য, অর্থের আভিজাত্য, অনেক রকম আভিজাত্য নিয়েই ত পরীক্ষা মানুষের ইতিহাসে হয়ে গেল, তার বদলে বিদ্যা-বুদ্ধিও নয়, সাধুতা ও সততার আভিজাত্য একবার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে দেখলে দোষ কি? সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবর্তন অনেক মরুপথে হারিয়ে অনেক গোলকধাঁধায় ঘুরে কোন দেশেই আজও সার্থকতম পথ বোধহয় খুঁজে পায় নি। এই নূতন আভিজাত্যই তাকে সে পথ দেখাতে পারে আশা করা কি একান্ত বাতুলতা?

তাই যদি হয়, তাহলে আর এক বাতুল কল্পনার কথাও এই প্রসঙ্গে বলে ফেলা যেতে পারে। স্বাধীনতাই যখন সব সমস্যার মূল, তখন ওই বস্তুটিকে একটু উল্টো করে সাজালে কেমন হয়? এমনও ত হতে পারে যে, প্রাণী হিসেবে মানুষ স্বাধীনতার অযোগ্য, সে আর অনেক কিছুই পারে, পারে না শুধু স্বাধীনভাবে নিজেকে শাসন করতে। তা করতে গেলেই যত গলদ, যত গ্লানি, যত অক্ষমতা সব তার চরিত্রে প্রকট হয়ে ওঠে। এ সমস্যার সমাধান স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়ার ভেতরেই যদি খোঁজা যায়? সমস্ত দেশই স্বাধীন হবে এই আজ আমাদের আদর্শ। তার বদলে সবাই পরাধীন হবার সংকল্পই যদি করি! পরাধীন অবশ্য পরস্পরের। ইংলণ্ড আমাদের শাসন করুক ফিরে এসে, আর ভারতবর্ষ ভার নিতে যাক ইংলণ্ডের। ফ্রান্স আর জার্মানী, অ্যামেরিকা আর রাশিয়া—এরকম কত চমৎকার জুড়িই না তাহলে গড়ে উঠতে পারে। এরকম বদলা-বদলি শাসনের সুবিধে এই যে, শাসক ও শাসিত উভয়কেই সারাক্ষণ সজাগ থাকতে হবে পান থেকে চুণ খসবার ভয়ে। এক দিকের তিলমাত্র বিচ্যুতি অন্য দিকের তীব্রতম প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ তুলবে জাগিয়ে। শাসিত যেমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-বিশেষে অন্যায় প্রশ্রয় পাবে না, শাসকও তেমনি জানবে যে, বিদ্রোহের বারুদ শুধু একটি স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষাতেই মজুদ। পরের অধীনতার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতাই হবে বিশ্বময় সুশাসনের রক্ষাকবচ ও পাহারাদার!

স্বাধীনতায় শুরু করে হ য ব র ল-র রাজ্যেই কি শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেলাম!

স্বাধীনতার মূল্য না বুঝলে সব দেশকেই এই রকম নাকি যেতে হয়।

✿ স্বাধীনতা ✿

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিদেশী পণ্ডিতের দল আমাদের বুঝাইতে চাহেন যে, বিদেশী অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য, ভাষা ও জীবনদর্শন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান জন্মাইবার পূর্বে স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ ধারণা বা অভিজ্ঞতা ছিল না, এমন কি স্বাধীনতা শব্দের পূর্ণ সংজ্ঞার্থও আমাদের জানা ছিল না। এ বিষয়ে আমাদের দেশীয় জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনের মতামত খুব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না, তবে বাংলা ও বাঙালীর সামাজিক ও রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় লেখা-জোখা যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাতে বাঙালীর স্বাধীনতা সম্পর্কে চেতনার জাগরণ বিদেশীর ও বিদেশী ভাষার সংস্পর্শে আসিবার পরই হইয়াছিল মনে হয়—অন্ততঃপক্ষে সমষ্টিগতভাবে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বা বাংলাদেশেরও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যযুগের ইতিহাসে যে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ বা আত্মবলিদানের বহু প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা জাতিগত স্বাধীনতা-স্পৃহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু সেই স্পৃহার মধ্যে রাষ্ট্র-চেতনা বা দেশাত্মবোধ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সেই সুসংকীর্ণ ক্ষেত্রেও সমগ্র সাধারণ জনের স্বাধীনতা বা রাষ্ট্র-অধিকার সম্বন্ধে কোনও বিচার-বিবেচনার নির্দেশ ঐ স্বাধীনতাকামী যোদ্ধৃকুলের কার্যকলাপে পাওয়া যায় না। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফল-স্বরূপে যাহা কিছু অর্জিত হয় তাহা কেবল সেই বিজয়ী যোদ্ধৃশ্রেণীর বা তাঁহাদের নমস্য ব্যক্তিদের প্রাপ্য, ইতর-জনসাধারণের নির্ভর ছিল অধিকারী-বর্গের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর। সুতরাং এখানে স্বাধীনতা সম্পর্কিত চেতনা জাতি ও গোষ্ঠীগতই ছিল, তাহার বাহিরে স্বাধীনতার আলোক বা প্রেরণা যাইত না।

শত্রুকে যুদ্ধদান ছিল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুঞ্জয়ী শৌর্যবীর্যের মূলে ছিল তাহার শিক্ষাদীক্ষা এবং জাতি ও বংশগত কঠোর নিয়মানু-বর্তিতার ধারা ও যাহা লঙ্ঘন করিলে সে জাতিচ্যুত ধর্মভ্রষ্ট হইত। সেই শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যেও ছিল জীবন-মরণ-সম্পর্কিত বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত আমরা পাই নানা-ভাবে, যথা নিম্নস্থ শ্লোকে :—

যত্র তত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়ান লভতে লোকান্
যদি ক্লীবং ন ভাষতে॥
জিতেন লভ্যতে
লক্ষ্মীর্মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ।
ক্ষণবিধ্বংসিনি কায়ে কা
চিন্তা মরণে রণে॥

জয়ে লক্ষ্মীলাভ, অন্যথায় মরণে সুরাঙ্গনা প্রাপ্তি সম্পর্কে বিশ্বাস এবং ক্লীবত্বের ফলে অক্ষয়লোক হারাইবার ভয় যেখানে আছে সেখানে বিশ্বাসী যোদ্ধা যে মরণ উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধদান করিবে তাহাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু ঐ বিশ্বাসের মধ্যে দেশাত্মবোধের বা দেশ-মাতৃকার সকল সন্তানের—জাতি বর্ণ বা সামাজিক স্থান নির্বিশেষে—সাম্য বা স্বাধীনতায় পূর্ণ অধিকারের বিষয়ে কোনই প্রেরণা ছিল না। এখানে স্বাধীনতার রূপ একান্তই ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ছিল, জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনাই ছিল না, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যে প্রভেদ বিষয়েও কোনও চিন্তার অবকাশও ছিল না। এই কারণেই যে বিদেশী বিজেতা এত সহজে ভারতে বিজয় অভিযান চালাইতে সমর্থ হইয়াছিল তাহাই তো ইতিহাসের সাক্ষ্য।

রাজপুত মহারাষ্ট্রীয় বা শিখ, নিজ নিজ অধিকার-রক্ষায় যে শৌর্যবীর্য বা মরণবিজয়ী দৃঢ়সংকল্প দেখাইয়া গিয়াছে তাহা জগতের যে কোন জাতির উচ্চতম নিদর্শনের সমকক্ষ। কিন্তু ইহাদের স্বাধীনতা-স্পৃহার পরিসর ছিল সংকীর্ণ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ বা ধর্মভেদের কারণে বিকলাঙ্গ এবং সাম্যবাদের দূর-বিস্তৃত উদার প্রেরণা হইতে বঞ্চিত। নিজের, নিজ গোষ্ঠীর বা নিজ শাখা-জাতির অধিকার-রক্ষায় ইহারা যেরূপ পরাক্রম দেখাইয়াছে অন্যদিকে অন্যের অধিকার হরণে ও তাহার স্বাধীনতা খর্ব করার বিষয়েও ইহারা সমান উৎসাহ দেখাইয়াছে। মারহাটা বর্গীর লুণ্ঠন-ধর্ষণ ও অসহায় স্ত্রীলোকের উপর দলবদ্ধভাবে বলাৎকার

—ইহা তো ঐ স্বাধীনতা-জ্ঞানের বিকারেরই লক্ষণ। এবং এই সকল কারণেই বিদেশী পাণ্ডিতেরা বলেন যে, পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে।

কিন্তু বিদেশেও কি কোথায়ও উনবিংশ শতাব্দীর অর্ধেক পার হইবার পূর্বে স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পর্কে কোনও সমষ্টিগত জ্ঞান বা ধ্যানের পরিচয় পাওয়া যায়? যদি তাহা হইত তবে জগতের ইতিহাস তো অন্য পথে চালিত হইত এবং মনুষ্য সমাজ আরও অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছাইতে পারিত। স্বাধীনতা-জ্ঞানের সঙ্গে যদি মানবস্ব, দেশ-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সাম্যবাদ থাকিত এবং স্বাধীনতার বিশ্বজাগতিক সর্বজনীন রূপ সম্পর্কে শক্তিমান জাতি-সকলের জ্ঞান থাকিত তবে বর্ণ-বিদ্বেষ, ক্রীতদাস-প্রথা, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি সভ্যতা ও প্রগতির পরিপন্থী প্রথা-সকল বহু পূর্বেই জগৎ হইতে অপসৃত হইয়া মানব সমাজের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের আরম্ভ হইত।

ফরাসী বিপ্লবের আহ্বান পিতৃভূমির সকল সন্তানের উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হইয়াছিল বটে কিন্তু বিপ্লব-নেতা-

দিগের মনের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ ছিল এবং সেই কারণে "les aristo" (অভিজাতবর্গ) নিহত ও বিতাড়িত হইবার পরও ঐ ভেদবুদ্ধি সক্রীয় থাকে। উহাঁরই কারণে ফরাসী জাতির স্বাধীনতা-মন্ত্রে উচ্চারিত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী আজও বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় ফ্রান্সের সহিত অন্য জাতির বা দেশের আদান-প্রদানে।

মার্কিন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনায় যে সকল ঘোষণা উচ্চারিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে রিচমণ্ড নগরে কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের (Continental Congress Session at Richmond) তৃতীয় দিনের অধিবেশনে প্রদত্ত প্যাট্রিক হেনরীর (Patrick Henry) বক্তৃতা সর্বাপেক্ষা জ্বালাময়ী বিপ্লবের আহ্বান বলিয়া বিখ্যাত। তাহার শেষ অংশ ছিল :—

"Why stand we here idle? What is it that gentlemen wish? What would they have? Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it Almighty God! I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me death!"

"আমরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে কেন? ভদ্রজনের কি ইচ্ছা? তাঁহাদের কি চাই? প্রাণ কি এতই মহামূল্য বা শান্তি কি এতই মধুর যে তাহার মূল্য হিসাবে দাসত্ব-শৃংখল স্বীকার করিতে হইবে? সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাহা নিষেধ করুন! আমি জানি না অন্যে কি পথ লইবেন; আমার জন্য আমি বলিব, আমায় দাও স্বাধীনতা, অন্যথায় দাও আমায় মৃত্যু।" (২৩শে মার্চ, ১৭৭৫)।

এই বক্তৃতা বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় সমস্ত মার্কিন দেশ স্পন্দিত করে এবং ইহার পরই আরম্ভ হয় সেই স্বাধীনতার যুদ্ধ যাহাতে স্বাধীন মার্কিন জাতি জন্মলাভ করে। কিন্তু এই যে স্বাধীনতার যজ্ঞ আরম্ভ হয় তাহার যজ্ঞফলে কি সেই দেশের আদিম অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ান বা ক্রীতদাস নিগ্রোদের অধিকার ছিল? যদি থাকিত তবে রেড-ইণ্ডিয়ানকে ধ্বংস করা বা নিগ্রোর উপর নৃশংস অত্যাচার একি হইতে পারিত, না কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি বর্ণবিদ্বেষ আজও ঐ সুসভ্য দেশে থাকিত? ক্রীতদাস প্রথা তো ১৮৬২-৬৩ সালেও ঐ দেশে রাষ্ট্র-বিপ্লব আনিয়াছিল।

কার্ল মার্ক্সের লেখনীতেই প্রথম দেশ-জাতি বা বর্ণ নির্বিশেষ বিশ্বজাগতিক

আহবান ঘোষিত হয়—কিন্তু সেখানেও শ্রেণী-বিভাগ ও শ্রেণীবিদ্বেষ ছিল। ফরাসী বিপ্লবে অভিজাতবর্গকে নির্মূল করার নির্দেশ ছিল। মার্কসের ঘোষণায় সেই বিদ্বেষ আরও বৃহত্তর শ্রেণীর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় ও যাহার ফলে শ্রেণীযুদ্ধের সূত্রপাত সেইদিন হইতেই হয়। ইহাতেও মানুষ মাত্রেরই স্বাধীনতায় পূর্ণ অধিকারের স্বীকৃতি বিকারগ্রস্ত হইয়াছিল, যাহার প্রতিকারের চেষ্টা এখন সোভিয়েট দেশে চলিতেছে।

মানুষ মাত্রেরই—দেশ জাতি বর্ণ বা শ্রেণী নির্বিশেষে স্বাধীনতায় ও স্বাতন্ত্র্যে পূর্ণাঙ্গ অধিকার বোধহয় প্রথম স্বীকৃত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ সূত্র সংযুক্ত ঘোষণায়। ইহার মধ্যে চতুর্দশ সংখ্যক সূত্রে ছিল:—"জগতের সকল জাতির এক সংঘ স্থাপিত হইবে, যে সংঘ জগতের সকল জাতির স্বাধীনতা ও দেশের উপর অধিকার রক্ষা করিবে"।

"A general association of nations to guarantee independence and territorial integrity to all nations". (President Wilson's statement containing 14 points, January 8, 1919).

এই ঘোষণায় স্বাধীনতায় মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার সম্পর্কে প্রথম স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

কিন্তু এই স্বাধীনতার পূর্ণ রূপ ও আকৃতি কি? বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে চারি প্রকার স্বাধীনতার বিষয়ে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ:—বাক্যের ও বিবৃতি প্রকাশনে স্বাধীনতা, সারা জগতে। (Freedom of speech and expression—everywhere in the world)

দ্বিতীয়তঃ:—জগতের সর্বত্র প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের মত-অনুযায়ী (পূজা-অর্চনার পন্থায়) ঈশ্বরকে পূজনে স্বাধীনতা। (Freedom of every person to worship God in his own way—everywhere in the world).

তৃতীয়তঃ:—অভাব-অনটন হইতে স্বাধীনতা— যাহার অর্থ জগতের অর্থনীতিতে এমন বুঝাপড়া যাহাতে জগতের সকল জাতি শান্তিময় সুস্থ জীবনযাপনে সমর্থ হয়। (Freedom from want—which translated into world terms, means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants — everywhere in the world).

চতুর্থতঃ:—ভয় হইতে স্বাধীনতা— যাহার অর্থ সারা জগতে সমরশক্তির এতদূর সঙ্কোচন, যাহাতে কোন জাতিই তাহার প্রতিবেশী কোনও জাতিকে আক্রমণ করিবার সামর্থ না পায়। (Freedom from fear—which translated into world terms means a world-wide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in position to commit an act of aggression against any neighbour — anywhere in the world'

(F. D. Roosevelt Annual Message to Congress January 6, 1941).

সবশেষে আসে, এই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্বীকৃতিরও পর, দায়িত্বের কথা। স্বাধীনতা ও দায়িত্বজ্ঞান এই দুই বস্তু পরস্পরের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট। এই দায়িত্ব স্বাধীন দেশের প্রত্যেক লোকের উপর অর্পিত। আমাদের আজকার দিনে এই কথাটার উপর বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন দাঁড়াইয়াছে। যে ব্যক্তির দায়িত্বজ্ঞান নাই তাহার দাবী-দাওয়া পাওনা সবই তুচ্ছ। বিদেশী আমাদের আর কিছু শিখাইতে না পারুক "Eternal Vigilance in the price of Liberty" "অনন্ত ও সজাগ সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য"—এই মন্ত্র বুঝিতে শিখাইয়াছে তাহাদের নিজের দৃষ্টান্তে। এই সজাগ সতর্কতা প্রত্যেকের কাছেই দেশ চাহিতে পারে এবং এই সতর্ক দৃষ্টি শুধু নিজের স্বার্থের উপর নিবদ্ধ থাকিলে কি হয় তাহা আমাদের নিজেদের ইতিহাসই ৯০০ বৎসরের দাসত্বের মূল্যে শিক্ষা দিয়াছে। নিজের অধিকার—অর্থাৎ ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, সমাজগত, বা শ্রেণীগত স্বার্থ ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া অন্যের স্বাধীনতা বা অধিকার খর্ব করিতে চেষ্টিত হওয়ার ফলে এবং সমষ্টিগতভাবে সকলের স্বার্থ-সমন্বয়ের বিষয়ে অবহেলা করার ফলেই আমাদের দুর্দশা—অতীতে ও বর্তমানে —এরূপ কঠিন ও দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যের স্বার্থরক্ষাও আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্বের অঙ্গ এবং সে বিষয়ে সচেতন না হইলেই বিপদ।

কলকাতা, থেকে হলদিয়া, থেকে ফারাক্কা

সুধীর চন্দ্র সরকার

কলকাতার ডকে জাহাজ মেরামতের কাজ

জব চার্ণকের কলকাতা যেন আজ ওলটপালট হয়ে মুছে যাবার মত হয়েছে। এই বিরাট শহরের চারদিকে যেন 'চাই, চাই' রব উঠেছে। বাড়ী চাই, স্কুল-কলেজ চাই, আলোবাতাস চাই, জল চাই, ড্রেন চাই, হাসপাতাল চাই, খেলার মাঠ চাই, রাস্তা চাই—ইত্যাদি আরো অনেক কিছুই চাই। সব জিনিসই যেন একসংগে চাই এই কলকাতা শহরকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে।

কিন্তু সবচেয়ে কোন বড় জিনিস চাই এই কলকাতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে? ক'জন কলকাতাবাসী এ-কথা ভাবে? ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক যখন তাঁর জাহাজ নিয়ে সুতানটিতে উপস্থিত হলেন, তখন কি তিনি ভাবতে পেরেছিলেন—একদিন কলকাতা এত বড়, এত প্রকাণ্ড শহর হয়ে দাঁড়াবে? ক্রমে ক্রমে কলকাতা City of Palaces হোল, Second City of the British Empire হোল। ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হোল এই কলকাতা।

এই অভাবনীয় উন্নতির মূলে ছিল এই হুগলী নদী—গংগা বা ভাগীরথীর শাখা। ৩০০ বৎসর হোল এই হুগলী নদীই কলকাতাকে তিলে তিলে সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর সমস্ত রকম রত্ন-সম্ভার এই নদীই কলকাতার আমদানি

করেছে এবং অজস্র বস্ত্রসম্ভার বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই হুগলী নদীই কলকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। রাজধানীর গৌরব গিয়েছে বাংলাদেশ বিভক্ত হয়েছে দু'বার—কিন্তু কলকাতা দিনদিন বেড়েই চলেছে উন্নতির পথে। কলকাতার জনসংখ্যা বেড়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যও চতুর্গুণ হয়েছে; শহর নানা রকমে সমৃদ্ধশালী হয়েছে, এই হুগলী নদীর আনুকূল্যে। আমরা ক'জন জানি যে প্রায় চার লক্ষ লোক কলকাতার বন্দরকে প্রতিদিন রক্ষা করে এই শহরকে বাঁচিয়ে রেখেছে? এই চার লক্ষ লোকই কর্মরত থেকে নদীকে রক্ষা করছে আর ব্যবসা-বাণিজ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কলকাতার নদী ও বন্দর হচ্ছে এই শহরের প্রাণ। এই নদীর ভিতর দিয়েই তার প্রাণশক্তি বয়ে চলেছে। কিন্তু আজ অনেকগুলি সমস্যার মধ্যে এই নদীকে রক্ষা করাই সবচেয়ে বৃহৎ সমস্যা। কলকাতার নদী আজ রোগগ্রস্ত। তাকে রক্ষা করা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। কারণ কলকাতাই বাংলা, আর বাংলাই কলকাতা। একদিন পরে যেন আমরা কলকাতা নিশ্চিহ্ন হবার চিহ্ন চারদিকে দেখতে পাচ্ছি।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতাই শ্রেষ্ঠ বন্দর। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, সমগ্র দেশের শতকরা ৪৫ শতাংশ আমদানি কলকাতায় হয়, আর রপ্তানির পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ৪০ ভাগ। কলকাতার পশ্চাতে আছে প্রদেশের পর প্রদেশ। তাদের আমদানি রপ্তানি কলকাতা থেকেই হয়। যেমন, বিহার আসাম, উত্তরপ্রদেশ, সমস্ত বাংলাদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ইত্যাদির সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য কলকাতার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাছাড়া, নেপাল, ভুটান, সিকিম ইত্যাদি তো আছেই। কলকাতা বন্দর থেকেই লোহা, চা, পাট, কয়লা ইত্যাদি সব জিনিসই রপ্তানি হয়।

কলকাতার এই হুগলী নদী নানা দিক দিয়ে এখন বিপদগ্রস্ত। নদীর প্রাণশক্তি আবার সঞ্জীবিত না করতে পারলে কলকাতা নিশ্চিহ্ন হবার আশঙ্কা আছে—তা এখন সবাই বুঝতে পেরেছেন। আসন্ন বিপদের কথা এখানে খুলে বলা দরকার। হুগলী নদী গঙ্গার একটি শাখা মাত্র। কলকাতার ১৫০ মাইল উঁচুতে অর্থাৎ উত্তর থেকে হুগলী বা গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে কলকাতায় আসছে, আর কলকাতা থেকে আরও ১৫০ মাইল প্রবাহিত হয়ে এই হুগলী নদী সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে। কিন্তু প্রায় দশ বৎসর হোল এই হুগলী নদী গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আরম্ভ করেছে। দেখা গিয়েছে বৎসরের প্রায় সাত আট মাস হুগলী নদী গঙ্গা থেকে এক রকম বিচ্ছিন্নই থাকে। সেইজন্যে, জলপ্রবাহের গতি এই দুই নদীর মধ্যে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। এ ছাড়া প্রতিনিয়তই আছে জোয়ারের নির্মম ও

নিষ্ঠুর অত্যাচার। উপর থেকে নদীর স্রোতের সঙ্গে নীচের দিকে ক্রমাগত পলিমাটি ভেসে আসছে। এদিকে সমুদ্র থেকে যে প্রবল জোয়ারের ধাক্কা আসছে, তা উপরের দিকে ঠেলে এগিয়ে চলছে। এই দুই বিপরীত গতিতে পড়ে হুগলী নদীর গর্ভ ক্রমেই বুজে আসছে। উপর

কলকাতার বন্দরে ভাসমান বৃহৎ ক্রেন

থেকে আগত এই পলিমাটির স্রোত অবারিতভাবে সমুদ্রে প্রবাহিত না হলে হুগলী নদীকে রক্ষা করবার আর কোন উপায় নেই। উত্তর দিক থেকে নূতনভাবে জল-নিকাশের বা জলপ্রবাহের উপায় নির্ধারিত করতে হবে। এইজন্যেই ফরাক্কা বাঁধের বিশেষ প্রয়োজন। এই বাঁধ নির্মাণ করতে পারলে সমস্ত বৎসর ধরে গঙ্গার জলস্রোত হুগলী নদী দিয়ে অপ্রতিহতভাবে সমুদ্রে গিয়ে পড়বে—তখন আর পলিমাটির প্রশ্ন আসবে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ না করে কে কবে বা কোথায় জয়লাভ করতে পেরেছে। ফারাক্কা বাঁধ হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করবার একমাত্র অস্ত্র। কলকাতা বন্দরের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা যে কত নিকটে তা নিম্নলিখিত বিষয় থেকে বোঝা যাবে

(১) উপর বা উত্তরের জলধারার স্রোত সমুদ্র থেকে আগত জোয়ারের প্রবল স্রোতের ধাক্কায় নিরোধ হওয়ায় সমুদ্রগামী পলিমাটির স্রোতের স্বচ্ছন্দ গতি ক্রমেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

(২) এর ফলে হুগলী নদীর জলপ্রবাহের মধ্যে বালির প্রাচীরের (bars and crossings) সৃষ্টি হওয়ায় জাহাজের অবাধ গতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

(৩) নদীর এই অবরুদ্ধ স্রোতের ফলে কলকাতার পানীয় জল লবণাক্ত হয়ে দূষিত হয়ে পড়ছে।

(৪) কলকাতার জোয়ারের সংখ্যা এবং গতিবেগ ক্রমে এতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যে জাহাজ ও জেটিগুলো প্রবল জোয়ারের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

এই পলিমাটির সমস্যা পৃথিবীর কয়েকটি বড় বড় নদীতে আছে। আমেরিকার মিসিসিপি নদী বা চীনের ইয়াংসি নদী ক্রমাগত প্রচুর পলিমাটি নিয়ে সমুদ্রের দিকে এগুচ্ছে। কিন্তু এই সব নদীর গর্ভ প্রতিনিয়ত কেটে পলিমাটি পরিষ্কার করে দিয়ে নদী-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখা হচ্ছে। কিন্তু কলকাতার কথা স্বতন্ত্র। হুগলীকে এখন আর নদী বলা যায় না—সে এখন জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। আপাততঃ হুগলীকে বাঁচানোর জন্যে ড্রেজার (dredger) দিয়ে জাহাজ-যাতায়াতের নদীপথ ক্রমাগত পরিষ্কার ও গভীর করা হচ্ছে। এই সব ড্রেজারের কাজ চলেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

কলকাতার হুগলী নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্গম ও ভীষণ বন্দর। নদীপথে অসংখ্য বিপদ ও ভীতি জাহাজদের ঘিরে ধরে। পাইলটরা কোনরকমে প্রাণ হাতে করে জাহাজকে সমুদ্রের মুখে এগিয়ে দিয়ে আবার জাহাজ সঙ্গে করে হুগলী নদীতে ঢোকে। নদী-গর্ভে যেন অশরীরী

জলাঙ্গী নদীর ময়লা-নিষ্কাশনে একটি ড্রেজার

প্রেতাত্মা লুকিয়ে আছে—জাহাজগুলোকে গিলে খাবার জন্যে। ক্ষণে ক্ষণে নদীগর্ভে পলিমাটির খাঁড়ির সৃষ্টি হচ্ছে। নদীর দেহ বালির প্রাচীরে (bars and crossings) ও পাহাড়ে ভরা। আজ যেখানে অবাধ জলস্রোত, কাল সেখানে রুদ্ধ গতি। এতে খালি জাহাজের গতিপথ রুদ্ধ নয়, প্রাচীর, ঢিবি, খাঁড়ি ও বাঁক সৃষ্টি হওয়ায় নদী-গর্ভে পলিমাটি জমে নদীর গভীরতা একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র-পথে কলকাতায় আসতে হলে প্রায় ১২৬ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। এই নদীপথ তো সোজা বা সরল নয়—এটা একটা সর্পিল পথ। এই সর্পিল পথের দরুণ খুব বড় বড় জাহাজ নদীতে বাঁক নিতে পারে না। তাই খুব লম্বা জাহাজের আসা এখন আর সম্ভবপর নয়। আগে কলকাতা বন্দরে ৫৬০ ফিট লম্বা জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ করতে পারত। এখন ৫১০ ফিটের বেশী লম্বা জাহাজ কলকাতায় ঢুকতে পারে না। খালি নদীর বাঁক নয়, তা ছাড়া, আর দুটো বাধা, যেমন জোয়ার ও বালির বাঁধ সমুদ্রের মুখ থেকে কলকাতা বন্দর পর্যন্ত নদী-গর্ভে ছড়িয়ে আছে—যা নদীপথ রুদ্ধ করে রেখেছে। এই জিনিস কি ভীষণ আকার ধারণ করেছে তা এখনই বোঝা যাবে। ১১৪৮ পর্যন্ত কলকাতাগামী জাহাজ ২৮ ফিট পর্যন্ত জলের নীচে থাকতে পারতো। অর্থাৎ নদীর গভীরতা ছিল ২৮ ফিটের বেশ বেশী। এখন এমন জাহাজের এই গভীরতার মাপ দাঁড়িয়েছে ২১ ফিট, আবার গ্রীষ্মকালে এর চেয়েও কম মাপ—জাহাজ মাত্র ১৮ ফিট নীচু থাকতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ ভার নিয়ে কলকাতা থেকে জাহাজ আর যেতে পারে না—তাকে হাল্কা অবস্থাতেই কম মাল নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হয়।

ক্রমাগত নদীগর্ভের মাটি ড্রেজার দিয়ে কেটে কেটে নদী-পথ কোন রকমে চালু রাখা হয়েছে। নদীগর্ভের বালি ভেঙে রাস্তা করা হচ্ছে, গর্ভের গভীরতা সৃষ্টি করে জাহাজ ভাসিয়ে রাখা হচ্ছে, বড় বড় জাহাজের গতি সুগম করবার জন্য লম্বা বাঁকের সৃষ্টি করতে হচ্ছে। কিন্তু এ সবই তো সাময়িক ব্যবস্থা।

আপাততঃ এই সব বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কর্তৃপক্ষরা ডায়মণ্ড হারবারের কাছে কলকাতা থেকে ৫৬ মাইল দূরে একটা বন্দরের সৃষ্টি করেছেন। এর নাম হচ্ছে "হলদিয়া' বন্দর। শীতকালে বড় বড় বাণিজ্যবাহী জাহাজ কলকাতায় না এসে হলদিয়াতে আশ্রয় নেয়। এখান থেকেই আমদানী জিনিস খালাস হয় রপ্তানী জিনিস জাহাজে বোঝাই হয়। এই হলদিয়ার সমস্ত বৎসরের গভীরতা হচ্ছে ২৯ ফিট থেকে ৩২ ফিট। এই হলদিয়া থেকেই বড় জাহাজের আমদানি রপ্তানি পুরো মাত্রায় চলবে। ছোট ছোট ব্যাপারের জন্যে কলকাতা বন্দর তো আছেই। এই হলদিয়াকে পুরোভাবে চালু করতে ২৫ কোটি টাকা খরচ হবে। এর মধ্যে ৭ কোটি টাকা খরচ হবে তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনায়।

এতদিন কলকাতা বন্দরকে চালু রাখতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে, তা সকলের ধারণা করা অসম্ভব। ১০টি জাহাজ ক্রমাগত ১০০ মাইল নদী ও সমুদ্র-পথ তদারক করছে; এর সঙ্গে আছে খুব উচ্চ বেতনভোগী ৪২ জন 'পাইলট'। এর ফলে কলকাতায় আসতে ও যেতে জাহাজদের যা 'চার্জ' দিতে হয়, তা ক্রমেই অসম্ভব রকম বেড়ে চলেছে। তা-ছাড়া নদীর 'কবর'-গুলো চিহ্নিত করবার জন্যে আছে অসংখ্য 'বয়া' (buoys)। তাদের রক্ষা করবার জন্যে খরচ কত শুনতে বিস্ময় লাগে। গার্ডেনরিচের কাছে প্রায় ৬০০ ফিট লম্বা নদীর গভীরতা মাত্র দুই ফিট।

হলদিয়া বন্দরও সাময়িক। অনেকটা জোড়াতালি দেবার মত। দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপারের জন্য একটা নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল—

(১) ফারাক্কায় গঙ্গার উপর একটা বাঁধ নির্মাণ।

(২) মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর শহরের কাছে ভাগীরথীর উপর একটি খালের মোহনায় বাঁধ নির্মাণ।

(৩) জল-সরবরাহকারী ২৬½ মাইল লম্বা খাল নির্মাণ, এই খাল ফারাক্কা বাঁধ থেকে উৎপন্ন হয়ে জঙ্গীপুরের বাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

অবশ্য ফারাক্কা বাঁধ তৈরী হলেও ড্রেজারের কাজ পুরো মাত্রায় চলবে, আর নদী-রক্ষার অন্যান্য ব্যবস্থা যা আছে তা আরো ভাল ও আধুনিক সব প্রণালীতে চলবে।

গোয়া

আনন্দ কুমার মুখোপাধ্যায়

পূর্ণ স্বাধীন ভারতে এইবারই সর্ব-প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালিত হবে। আজ উপনিবেশের কোন কলঙ্ক-চিহ্ন নেই স্বাধীন ভারতের কোনখানে। সাড়ে চার শ' বছরেরও বেশী পরাধীন থাকার পর গোয়ার ছয় লক্ষ মানুষ এবার চুয়াল্লিশ কোটি স্বদেশবাসীর সংগে স্বাধীনতা উৎসবে অংশ গ্রহণ করবে।

গোয়া ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ। পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দা গামা ইউরোপ হতে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে, আর তার বারো বছর বাদে পর্তুগীজ অভিযাত্রী আলফান্সো দা আলবুকার্কের প্রয়াসে ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রোথিত হয় পর্তুগীজ অধিকারের নিশান। বৃটেন, ফ্রান্স প্রমুখ পরবর্তীকালের বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রাষ্ট্রগুলিরও তখন এক ইঞ্চি জমি ছিল না নিজ রাষ্ট্র-সীমানার বাইরে। এমনকি বাবর বাদ-শাহের ভারত অভিযান শুরু হয় তার পনের বছর পরে।

আলবুকার্ক প্রথম গোয়া দখল করেন ১৫১০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। গোয়ার তৎকালীন শাসক বিজাপুর-রাজ ইয়ুসুফ আদিল শাহ্ সেই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তদু-পরি আলবুকার্কের সুসজ্জিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর তুলনায় তাঁর তুর্কী-বাহিনী ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আবার ঠিক সেই সংকটময় মুহূর্তে এক ব্রাহ্মণ গণৎকার ভাগ্যবাদী আদিল শাহ্‌কে জানালেন, তাঁর সময় তখন শুভ নয়। সুতরাং বিনাবাধাতেই অবরুদ্ধ গোয়া আত্মসমর্পণ করল পর্তুগীজ সেনা-পতির উদ্ধত তরবারীর কাছে। বিজয়-দর্পে অধিকৃত নগরীতে প্রবেশ করলেন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক আলবুকার্ক।

কিন্তু আদিল শাহ্ সে পরাজয়কে স্বীকার করে নিলেন না। পুনরায় শুরু হল তাঁর সামরিক প্রস্তুতি, এবং তিন মাস বাদে ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন তিনি গোয়ার সীমান্তে। গোয়াকে অবরুদ্ধ করে রাখলেন মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত। তখন বর্ষাকাল; প্রবল বর্ষণে নিতান্ত নিরুপায়ের মত নগরীর অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হয়ে রইল কয়েক সহস্র পর্তুগীজ সৈন্য। তারপর বর্ষা থামতেই অরক্ষিত অবস্থায় গোয়াকে ফেলে রেখে সমুদ্রপথে পালিয়ে গেল তারা। এবার বিজয়দর্পে গোয়ায় পুনঃ-প্রবেশ করলেন বিজাপুর-রাজ আদিল শাহ্।

কিন্তু তাঁর সে জয়ের আনন্দ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হ'ল। নভেম্বর মাসে আবার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন আলবুকার্ক, এবং গোয়া পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আদিল শাহের সৈন্যবাহিনীর উপর। আদিল শাহের সর্বস্ব পণ করা প্রতিরোধ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হ'ল। রক্তের স্রোত বইয়ে গোয়ায় প্রবেশ করলেন আলবুকার্ক এবং নিশ্চিহ্ন করে দিলেন গোয়ার

আলবুকার্ক

আনুমানিক ১৫৮৩ খৃঃ ভারতগত পর্তুগীজ

মুশিলম জনতা। গোয়ার ত্রিশটি গ্রামের অসহায় অধিবাসীদের অনন্যোপায় হয়ে মেনে নিতে হ'ল পর্তুগীজ শাসন।

পরবর্তীকালে অঞ্জদ্বীপ, সাওজর্জ ও মার্সিজোম—মালাবার উপকূলে আরব সাগরের এই তিনটি ক্ষুদ্র দ্বীপকেও গোয়া উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এরপর পর্তুগীজরা ১৫৩৫ সালে গুজরাটের বাহাদুর শাহের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় দিউ নামে গুজরাটের উপকূলবর্তী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ১৫৩৮ ও ১৫৪৬ সালে গুজরাটী সৈনাবাহিনী দিউ পুনরুদ্ধারের আশায় পর্তুগীজ উপনিবেশীদের সঙ্গে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়, কিন্তু তাদের উদ্ধারপ্রয়াস কোনবারই সফল হতে পারেনি।

দমন অধিকার করে পর্তুগীজরা ১৫৫৯ সালে। বোম্বাইর এক শ' মাইল উত্তরে দমনের অবস্থিতি। নগর-আভেলি ও দাদরা নামে আরও দুটি ছিট তালুকের উপর পর্তুগালের অধিকার কায়েম হয় ১৭৮০ সালে। উপকূল অতিক্রম করে ভারতের মূল ভূখণ্ড একমাত্র এই ছিট তালুক দুটির উপরেই পর্তুগালের অধিকার দীর্ঘকাল কায়েম হতে পেরেছিল। জলদস্যুতার ক্ষতিপূরণস্বরূপ মারাঠীরা এই ছিট তালুকটি পর্তুগীজদের দেয়। শাসনগত ব্যাপারে এই ছিটতালুক দুটি দমনের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হত।

এই ছিল ভারতে মোট পর্তুগীজ অধিকার, এবং তার সামগ্রিক আয়তন ছিল ১৫৪০ বর্গমাইল।

১৯৫০ সালের লোকগণনা অনুসারে পর্তুগীজ অধিকৃত ভারতের ভূখণ্ডগুলির মোট লোকসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৯১। এর মধ্যে গোয়ার লোকসংখ্যাই প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ। ঐ লোক-গণনার হিসাবেই দেখা যায়, গোয়ার মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩,০৭,১২৭ জন, অর্থাৎ শতকরা ৫৬·২৮ জন হিন্দু ও ২,৩০,৯৮৪ জন অর্থাৎ ৪২·১০ শতাংশ খৃষ্টান। মুশিলম জনসংখ্যার হিসাব ৮,৪২০ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ১·৫০ শতাংশ। দমন, দিউ প্রভৃতি অন্যান্য উপনিবেশের জনসংখ্যার হিসাবে, হিন্দুর সংখ্যা আরও বেশী: শতকরা ৬০·৯, এবং খৃষ্টানের সংখ্যা শতকরা ৩৬·৮। এর কারণ সহজবোধ্য; গোয়ার তুলনায় দমন, দিউ প্রভৃতিতে খৃষ্টানদের সংখ্যা অনেক কম।

গোয়ার ক্যাথলিক খৃষ্টধর্মীদের উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব খুব বেশী বলে যে প্রচার করা হত সে কথাটিও সর্বৈব মিথ্যা। সারা পৃথিবীতে গোয়াই বোধহয় একমাত্র জায়গা যেখানে খৃষ্টধর্মীদের মধ্যে প্রবল জাতিভেদ আছে এবং সে ভেদেরও ভিত্তি হল হিন্দুধর্ম। ওখানকার খৃষ্টধর্মীদের একদল নিজেদের ব্রাহ্মণ ও অপরদল ক্ষত্রিয় বলে প্রচার করে এবং ঐ 'ব্রাহ্মণ' ও 'ক্ষত্রিয়'দের মধ্যে কোন রকম সামাজিক সংযোগ নেই।

তবে গোয়াবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদের উপর পাশ্চাত্য-প্রভাব খুব বেশী। ছেলেরা ত' কোট-প্যান্ট পরেই, মেয়েদেরও প্রায় সকলের পোষাক ফ্রক গাউন। একারণে গোয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে এদেশের এংলো-ইণ্ডিয়ানদের আপাতঃদৃষ্টিতে প্রায় কোনই পার্থক্য ধরা যায় না।

গোয়ায় মারাঠী ভাষার প্রচলন থাকলেও তাদের প্রধান ভাষা কংকনী। এই কংকনী ভাষা মারাঠী ভাষারই অপ-

গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনে যোগ দিয়ে জগন্নাথকে পর্তুগীজ বর্বরতার সম্মুখীন হতে হয়। তাতে সে পঙ্গু হয়।

প্রংশ। কঙ্কনীভাষার কোন হরফ নেই। স্বাধীনতা অর্জনের পর গোয়াবাসীরা কঙ্কনীকেই তাদের মাতৃভাষা বলে স্বীকৃতি দেবার দাবী জানিয়েছেন।

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিচয়

উত্তরে তেরাখল নদী, পূর্বে পশ্চিম-ঘাট পর্বতমালা, দক্ষিণে কানাড়া জেলা, পশ্চিমে আরব সাগর। দুটি নদী—মান্ডবী ও নুয়ারি গোয়াকে বিচ্ছিন্ন করেছে ভারতের মূল ভূখণ্ড হতে। গোয়া একটি ত্রিভুজ আকৃতির দ্বীপ। তার তট-রেখার দৈর্ঘ ৬২ মাইল। বোম্বাই থেকে গোয়া আড়াই শ' মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

দিউ একটি প্রাচীর-পরিবেষ্টিত চোদ্দ বর্গমাইল আয়তনের ক্ষুদ্র দ্বীপ। গুজরাটের কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপের সর্বদক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মত তার অবস্থিতি।

বোম্বাইর এক শ' মাইল উত্তরে অবস্থিত দমনের আয়তন ১৪৯ বর্গমাইল। দাদরা ও নগর-আর্ভেলি নামক ছিটতালুক দুটিও এই আয়তনের অন্তর্ভুক্ত। এই ছিট তালুক দুটিই সর্বপ্রথম পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতছাড়া হয়। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে ভারতের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত এই ছিটতালুক দুটি তাদের বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তারপর ১৯৬১ সালের ১১ই আগষ্ট দাদরা-নগর-আর্ভেলি আইনতঃ ভারতের সপ্তম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়।

গোয়ার প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ ম্যাঙ্গানীজ। বর্তমানে মার্মাগাওয়ে ছয়টি কোম্পানীর উদ্যোগে সাঁয়ত্রিশটি খনিতে ম্যাঙ্গানীজ উত্তোলনের কাজ চলেছে। ১৯৫৯ সালে গোয়া থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়েছে ৫৫,২৯৬ টন ম্যাঙ্গানীজ। গোয়ার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ হল লোহা। একারণে গোয়াতে একটি ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও রপ্তানি-যোগ্য কৃষিজ সম্পদ গোয়ায় আছে—নারকেল, নোনা ও টাটকা মাছ, মসলা, কাজু বাদাম, নুন, শুষ্ক শাঁস ইত্যাদি। কিন্তু গোয়ার সবচেয়ে বড় সম্পদ হল তার প্রাকৃতিক বন্দর। প্রধানত বন্দর হিসাবে গোয়ার উপযোগিতা লক্ষ্য করেই আলবুকার্ক গোয়া দখলের পর পর্তুগালের তৎকালীন সম্রাটকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন,—
"If you lose the whole of India, from Goa you could "conquer it."

১৯৫৯ সালে গোয়ার বন্দরে জাহাজ এসেছিল ১,০৮২টি, যাদের মোট ধারণ-ক্ষমতা ৩,০৯৯,৬৫৭ গ্রস টন।

গোয়ায় নির্মিত পথের দৈর্ঘ্য ১৬৩২ কিলোমিটার, অর্থাৎ হাজার মাইলের কিছু বেশী।

গোয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা

গোয়ার অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৫০·৫১। ১৯৫৯ সালে গোয়ায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩২১ এবং তাতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫,৫৫১। মাধ্যমিক স্কুল ছিল ৪টি, তাতে ছাত্র পড়ত ১৪২৩ জন; কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষার স্কুল ছিল ১২টি এবং সেগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫১৫; ১১৬ জন ছাত্র নিয়ে মেডিক্যাল স্কুল ছিল একটি, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে পড়তেন ৭৬ জন।

গোয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি

গোয়ার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। পুরাণেও গোয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে গোয়া গোভ, গোভাপুরি, গোমন্ত ইত্যাদি নামে পরিচিত। মধ্যযুগে আরবদের কাছে গোয়া পরিচিত ছিল সিন্দবার

নামে। পর্তুগীজরা গোয়াকে বলত গোয়া ভেল্লা।

দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ১৩১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গোয়া ছিল কদম্ব রাজবংশের শাসনাধীন। তারপর ১৩১২ থেকে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গোয়া ছিল দাক্ষিণাত্যের মুশ্লিম শাসকদের অধিকারে। এর পর আবার গোয়া হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

বিজয়নগর রাজ্যের হাতছাড়া হওয়ার পর গোয়া বাহমানি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে বাহমনি রাজ্য বিভক্ত হওয়ার পর গোয়ার শাসনাধিকার লাভ করেন ইয়ুসুফ আদিল শাহ্। এই আদিল শাহের হাত থেকেই ১৫১০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজরা গোয়া ছিনিয়ে নেয়।

ঐ সময় গোয়ার প্রধান গুরুত্ব ছিল দুইটি। প্রথমত, মক্কার হজ তীর্থযাত্রীরা তখন গোয়া থেকেই মক্কার উদ্দেশ্যে জাহাজ ভাসাতেন। আর, দ্বিতীয়ত, গোয়া ছিল ঘোড়া বিক্রির সবচেয়ে বড় বাজার। হরমুজ থেকে আরবী ঘোড়া এনে ঐ সময় গোয়ায় বিক্রি করা হ'ত। নৌ-শক্তিসম্পন্ন যে কোন জাতির পক্ষেই গোয়া সেদিন ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গ।

পুরাতন গোয়া নগরীর প্রতিষ্ঠা হয় ১৪৪০ সালে। সে নগরীর কোন অস্তিত্বই আজ প্রায় নেই। ১৫১১ সালে আলবুকার্ক গোয়া দখলের এক বছর পরে সেখানে যে গীর্জাটি নির্মাণ করেছিলেন, এবং ১৬২৩ সালে যার আর একবার আগাগোড়া সংস্কার হয়েছিল, সেই গীর্জাটি এখনও টি'কে আছে পুরাতন গোয়ায় ষোড়শ শতাব্দীর শিল্প ও স্থাপত্যের সাক্ষ্য হয়ে। এখনও ঐ গীর্জাটিই পুরাতন গোয়ার অধিবাসীদের প্রধান প্রার্থনা-ভবন। ষোড়শ শতাব্দীর ভবনগুলির মধ্যে আরও টি'কে আছে 'কনভেণ্ট অফ সেণ্ট ফ্রান্সিস' (১৫১৭), সেণ্ট ক্যাথারিনের গীর্জা (১৫৫১) ও চার্চ অব বম জেসাস (১৫৯৪-১৬০৩)। শেষোক্ত গীর্জাটিতে এখনও সুরক্ষিত আছে সেণ্ট জেভিয়ারের দেহ। এই গীর্জাটি প্রাচ্যের ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক খৃষ্টানদের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র।

পুরাতন গোয়া, পর্তুগীজদের ভাষায় ভেল্লা গোয়া প্রাচীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সম্পদশালী নগরী হলেও আজ জনবিরল জঙ্গলাকীর্ণ ও রোগজীর্ণ প্রান্তর। তার কারণ, আরও সমুদ্র সমীপবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৭৫৯ সালে পর্তুগীজরা পুরাতন গোয়া ত্যাগ করে আরও ছয়মাইল এগিয়ে এসে গড়ে তোলে নূতন গোয়া, পর্তুগীজদের ভাষায় নোভা গোয়া। এই শহরটিরই নাম পাঞ্জিম। ১৮৪৩ সালে পাঞ্জিম প্রাচ্যের সমগ্র পর্তুগীজ উপনিবেশের রাজধানী বলে ঘোষিত হয়। পাঞ্জিমের বর্তমান লোকসংখ্যা বত্রিশ হাজার।

গোয়ার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র মার্মাগাও, পাঞ্জিমেরও ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি আধুনিক বন্দর। আরও দুই মাইল দূরে আছে তেলের ডিপো, ভাস্কো দা গামার নামাঙ্কিত শহরে।

দমনের মাটি উর্বর। তার অরণ্য-সম্পদ বিশেষ মূল্যবান। এক সময় তাঁত শিল্প ওখানে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল, এখন মাদুর, ঝুড়ি ইত্যাদি প্রধান কুটির-শিল্প। গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার ও জাহাজ নির্মাণ দমনের প্রধান জীবিকা। ১৫৩১ সালে পর্তুগীজরা একবার দমন শহর পুড়িয়ে দিয়েছিল। পরে তারাই আবার নির্মাণ করে ১৫৩৮ সালে। এখনও দমনে বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্যসম্পন্ন কয়েকটি প্রাচীন প্রাসাদ আছে।

অর্থনৈতিক কারণে পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি বরাবরই ভারতের উপর নির্ভরশীল ছিল। ভারত থেকে বরাবরই বিপুল পরিমাণ চাল পাঠাতে হয়েছে গোয়ায়, গোয়াবাসীদের ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে। আবার গোয়ার সমগ্র রপ্তানির চল্লিশ শতাংশ বরাবর এসেছে ভারতে, এবং পর্তুগীজ শাসনকালে মাত্র ০.৫

পর্তুগীজ বোম্বেটেরা গোয়া ছেড়ে যাওয়ার আগে গোয়াকে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার চেষ্টা করে। চিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবনের অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

শতাংশ গেছে পর্তুগালে। গোয়ার অধিকাংশ ম্যাঙ্গানীজ ও লোহার খনির মালিক ভারতীয় এবং শ্রমিকদেরও বেশী ভাগ যেত ভারত থেকে। বাণিজ্যের ঘাটতি এতদিন পূরণ হত জাহাজী কারবার, বিদেশী ভ্রমণকারী ও প্রবাসী গোয়ানদের প্রেরিত অর্থে।

গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম

গোয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাচীনতম উপনিবেশ হলেও গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ নয়। তার কারণ, পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীরা গোয়ার সাধারণ মানুষকে কোনদিনই মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ দেয়নি। বাক্-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সংঘ গঠনের স্বাধীনতা প্রভৃতি মানুষের ন্যূনতম মৌল অধিকারগুলিও কোনদিন এতটুকু স্বীকৃতিলাভ করেনি গোয়ায়। সামান্যতম প্রতিবাদের প্রয়াসও গত কয়েক শতাব্দী ধরে নির্মমভাবে দমিত হয়েছে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের সকল প্রান্তে।

তবুও গোয়াবাসীরা বরাবর মুখ বুজে পর্তুগীজদের নির্মম অত্যাচার সয়ে গিয়েছে মনে করলে ভুল করা হবে। দেড় শ' দু'শ বছর আগেও গোয়াবাসীদের পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে দেখা যায়, এবং গোয়ার হিন্দু ও খৃষ্টানকে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় সে সকল বিদ্রোহে। ১৭৮৬ সালে গোয়ার ধর্মযাজকরা একবার বিদ্রোহী হন পর্তুগীজ শাসকদের বিরুদ্ধে, সে বিদ্রোহ Priests' Rebellion নামে পরিচিত। গোয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজপুত বংশজাত 'রানে' বা রানারাও কয়েকবার সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় পর্তুগীজ শাসকদের বিরুদ্ধে। ঐ বিদ্রোহগুলি অতি কঠোরভাবে দমন করা হয়। রানাদের শেষ বিদ্রোহ হয় ১৯১১-১২ সালে, সেবার দেশী সিপাহীরাও অংশ গ্রহণ করে রানা-বিদ্রোহে। কিন্তু সে বিদ্রোহ অসফল হয় এবং তারপর কয়েক হাজার রানা-যুবককে বন্দী করে নিষ্ঠুর পর্তুগীজ শাসকরা পূর্ব আফ্রিকার গভীর অরণ্যে তাদের নির্বাসিত করে। সেইখানে রোগে, অনাহারে নিরাশ্রিত অবস্থায় কয়েক বছরের মধ্যেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

গোয়ার মুক্তি আন্দোলন আবার জোরালো হয়ে ওঠে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত ত্যাগ করার পর ফরাসীরাও তাদের অনুগমন করে। পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকল প্রভৃতি যে কটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ ফরাসীদের ছিল ভারতে, তার শাসন-দায়িত্ব স্বেচ্ছায় ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়ে ফরাসীরা ১৯৫৪ সালে ভারত ত্যাগ করে। আশা করা গিয়েছিল যে, প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে পর্তুগীজরাও অনতিবিলম্বে তাদের ক্ষুদ্র অধিকার-কটির শাসন-দায়িত্ব অনুরূপভাবেই ভারতের হাতে তুলে দিয়ে স্বেচ্ছায় এদেশ ত্যাগ করবে। কিন্তু সে আশা যে ভুল তা কয়েক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভারতবাসী উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং আবার আন্দোলন শুরু হল পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে, এবং সে আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা হল ভারতে অবস্থানকারী কয়েক লক্ষ প্রবাসী গোয়ানীজ। ভারত সরকারেরও পূর্ণ সমর্থন রইল তাদের পিছনে। ভারতের সঙ্গে একে একে সব সংযোগ ছিন্ন হল গোয়ার, শেষ পর্যন্ত কূটনৈতিক সম্পর্কও।

১৯৫৫ সালে ১৫ই আগষ্টের পূর্বে গোয়াকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে সারা ভারত থেকে কয়েক সহস্র সত্যাগ্রহী সমবেত হ'ল গোয়া সীমান্তে। ১৫ই আগষ্ট প্রত্যূষে গোয়ায় প্রবেশ করল তারা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর পর্তুগীজ শাসকদের গুলীবর্ষণ শুরু হল। ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে বাইশজন সত্যাগ্রহীর দেহ নিষ্প্রাণ অবস্থায় লুটিয়ে পড়ল মাটিতে সে গুলীর আঘাতে। স্বাধীনতা দিবসে ভারতের মাটি রক্তরঞ্জিত হ'ল এক উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্মম গুলীবর্ষণে।

সুতরাং বোঝা গেল, শান্তিপূর্ণ উপায়ে গোয়ার মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। মানবিক আবেদনের কোন মূল্য নেই পর্তুগীজ বোম্বেটেদের কাছে। তাই ভারত সরকার অকারণ প্রাণ বিসর্জন বন্ধের উদ্দেশ্যে বন্ধ করলেন গোয়া সীমান্তে ভারতীয় সত্যাগ্রহ। তারপর থেকে সরকারই উদ্যোগী হলেন গোয়ার মুক্তির জন্যে। একাজ সহজসাধ্য ছিল না। শুধু পর্তুগালের শক্তিই এ সংকল্প সাধনের পথে বাধা ছিল না, তার উৎখাত যে-কোন মুহূর্তেই করা যেতে পারত। আসল বাধা ছিল পশ্চিমী শক্তিজোটের বিরোধিতা। পর্তুগাল উত্তর আতলান্তিক শক্তিজোটের সদস্য এবং ঐ সংস্থার সনদের ৪ ধারার সর্ত অনুসারে সংস্থাভুক্ত সকল রাষ্ট্র-সদস্য পরস্পরের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। সুতরাং গোয়াকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে অভিযান চালানোর অর্থ হ'ত আতলান্তিক শক্তিজোটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা। তাই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে ভারতের কয়েক বছর সময় লেগেছিল।

কিন্তু এই বছর জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে ভারত সরকার সত্যিই যখন গোয়ার মুক্তি-অভিযানে অবতীর্ণ হলেন, তখন দেখা গেল, অকারণ আশঙ্কায় তাঁরা শঙ্কিত ছিলেন এতদিন। বিজয়গর্বে গোয়ায় যখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করল এবং লক্ষ লক্ষ গোয়াবাসী সাদর অভিনন্দন জানাল সেই মুক্তি-ফৌজকে, তখন নিতান্ত নিরুপায়ের মতই পর্তুগীজ শাসকদের আত্মসমর্পণ করতে হ'ল। পর্তুগালের কোন বন্ধু এগিয়ে এল না তাকে উদ্ধার করতে। গণতন্ত্রী বিশাল ভারতের বন্ধুত্বের চেয়ে ক্ষুদ্র পর্তুগালের অতি ক্ষুদ্র কয়েকটি ঔপনিবেশিক অধিকারকে বড় বলে ভাবল না কেউ। তাই রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে ভারতের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা হলেও গোয়ার ভারতে অন্তর্ভুক্তি একটি স্থায়ী সত্য বলেই সকলের কাছে স্বীকৃতি লাভ করল।

ভারতের পেট্রোলিয়াম শিল্প

১৯৫৯ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখে খনি ও জ্বালানী মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্য লোকসভায় একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই বিবৃতিতেই প্রথম বলা হয়েছিল যে, ভারতে খনিজ তৈল অনুসন্ধানকার্যে সহযোগিতা করবার জন্য বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলিকে আহ্বান জানানো হবে।

এই বিবৃতিতে শ্রীমালব্য পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের যোগান ও চাহিদা

অয়স্কান্ত

সম্পর্কে কতগুলি তথ্যও উপস্থিত করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের চাহিদা ছিল ২০,০০,০০০ টন। বারো বছরের মধ্যেই এই চাহিদা তিনগুণে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬০,০০,০০০ টন। এবং দেশের দ্রুত শিল্পায়নের সংগে সংগে আগামী কয়েক বছরে এই চাহিদা স্বভাবতঃই আরো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। শ্রীমালব্যের হিসেব থেকে দেখা যায় ১৯৬৬ সালে এই চাহিদা হবে ১,৪০,০০,০০০ টন, অর্থাৎ প্রায় আড়াই গুণ। আর ১৯৭১ সালে ২,৫০,০০,০০০ টন। শ্রীমালব্য আরো বলেছিলেন যে, ইতিমধ্যেই পেট্রোলিয়াম আমদানীর জন্য ভারতকে বিদেশের বাজারে বছরে একশো কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে এই খরচ নিশ্চয়ই আরো বাড়বে। সুতরাং তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় তৈল উৎপাদন শিল্পের ওপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ইস্পাত শিল্পের ওপরে।

তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন

ইতিপূর্বে ১৯৫৬ সালের ১৯শে আগস্ট তারিখে একটি সরকারী ঘোষণায় 'তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন' গঠনের কথা বলা হয়েছিল। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ব্যাপক এলাকায় খনিজ তৈল অনুসন্ধান করা, উদ্ধার করা ও পরিশোধন করা। এই কমিশন নিষ্ক্রিয় থাকেনি। হিমালয়ের পাদদেশ, আসাম, গাঙ্গেয় উপত্যকা, পশ্চিম বাংলা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, কাম্বে, কচ্ছ এবং পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে এই কমিশনের উদ্যোগে পেট্রোলিয়ামের অনুসন্ধান-কার্য চলে এসেছে। উৎসাহিত হবার মতো ফলও পাওয়া গিয়েছে কোনো কোনো এলাকা থেকে। যেমন, বোম্বাইয়ের কাম্বে ও পাঞ্জাবের জ্বালামুখী। বিদেশের বিশেষজ্ঞ কোম্পানীরা কমিশনের কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করছেন এবং ড্রিলিং যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সমেত প্রচুর যন্ত্রপাতি কমিশনের হাতে এসেছে।

শ্রীমালব্যের বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছিল যে, ১৯৫৯ সালে ভারতে পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন পাঁচ লক্ষ টনের বেশি ছিল না। অর্থাৎ চাহিদাকে মেটাতে হলে বিদেশ থেকে আরো পঞ্চাশ লক্ষ টন পেট্রোলিয়াম আমদানীর প্রয়োজন ছিল।

আসামের নতুন তৈল খনিগুলিতে পুরোপুরি উৎপাদন শুরু হলে, আশা করা চলে, ১৯৬৫ সালে ভারতে পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন দাঁড়াবে ৪০,০০,০০০ টন। অথচ ১৯৬৬ সালের চাহিদা ১,৪০,০০,০০০ টন। অর্থাৎ দেশের মধ্যে যতোটুকু সংস্থান রয়েছে তার পূর্ণতম ব্যবহারের পরেও এক কোটি টনের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। তার মানে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, ১৯৬৫ সালের মধ্যে যদি পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরশীল হতে হয় তাহলে অন্তত আরো এক কোটি টন পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন-ব্যবস্থা দেশের মধ্যে অবশ্যই থাকা চাই। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারত সরকার বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলিকে ভারতে আমন্ত্রণ করেছেন।

শ্রীমালব্যের হিসেব থেকে আরো জানা যায় যে, ভারতে প্রায় ৪,০০,০০০ বর্গমাইল এলাকায় খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

অয়েল ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

১৯৫৮ সালের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে দিল্লীতে ভারত সরকার ও বর্মা তৈল কোম্পানীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং নতুন একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ঘোষণা শোনা যায়। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম অয়েল ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। চুক্তি অনুসারে এই প্রতিষ্ঠান উত্তর আসামে তৈল-অনুসন্ধানপর্ব চালাবে এবং বর্তমানের খনিগুলিকে পরিচালনা করবে। একই সংগে আরো একটি ঘোষণা করা হয় যে, এই প্রতিষ্ঠান বিহারের বারৌনি পর্যন্ত পাইপ-লাইন নির্মাণ করবে।

এই বর্মা তৈল কোম্পানি গত ষাট বছর ধরে আসাম তৈল কোম্পানীর মাধ্যমে আসামের তৈল-সম্পদকে নিজস্ব অধিকারভুক্ত করে রেখেছিল। এই কোম্পানির অধীনে ডিগবয়ের প্রথম তৈল-খনিটি খনন করা হয়েছিল ১৮৯০ সালে। আর তৈল পরিশোধন কারখানা

স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩০ সালে। এই পরিশোধন কারখানা থেকে বছরে ৪,০০,০০০ টন উচ্চমানের পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়ে থাকে।

নতুন তৈল খনি

১৯৫৪ সালে উত্তর আসামের নাহারকাটিয়া গ্রামে তৈলখনি আবিষ্কৃত হয়। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একই এলাকার আরো দুটি জায়গায়—হুগ্রীজান ও মোরানে। বিশেষজ্ঞরা মতপ্রকাশ করেন যে, এই নতুন আবিষ্কৃত খনিগুলোর আয়তন খুব সম্ভবত যতোটা হিসেব করা হয়েছে তার চেয়েও বেশি। পেট্রোলিয়ামের তীব্র অভাবের দেশে নাহারকাটিয়া সবদিক থেকেই একটি শুভসংবাদ।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য দিক থেকে। এই বিপুল তৈল পরিশোধনের কারখানা কোথায় স্থাপিত হবে তা স্থির করার জন্যে ভারত সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করলেন। এই কমিটিতে ছিলেন একজন ফরাসী ও একজন রুমানীয় বিশেষজ্ঞ। ১৯৫৬ সালের ২রা আগস্ট এই কমিটি সর্বসম্মত রিপোর্ট দিলেন যে, পরিশোধন কারখানা স্থাপনের সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে কলকাতা। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের এই সিদ্ধান্তে আসামে তীব্র বিক্ষোভের ঝড় জাগিয়ে তোলে। এই বিক্ষোভ প্রশমনের জন্যে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেন যে, দুটি তৈল পরিশোধন-কারখানা নির্মিত হবে। একটি বিহারের বারৌনিতে, অপরটি আসামে।

ইতিমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার কালে বেসরকারী উদ্যোগে তিনটি তৈল পরিশোধন-কারখানার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। দুটি বোম্বাইতে এবং একটি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তমে। এই শেষোক্ত কারখানাটি পনেরো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেছেন ক্যালটেক্স কোম্পানী। ভারতের পূর্ব উপকূলে এ-জাতীয় কারখানা এই প্রথম।

খনিজ তৈলের সন্ধান কার্য

১৯৬১ সালের মে মাসের মধ্যেই অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেডের উদ্যোগে নাহারকাটিয়া অঞ্চলে ৮৫টি এবং মোরান অঞ্চলে ১৩টি নতুন কূপ খনন করা হয়েছিল। নাহারকাটিয়ার ৬১টি কূপ থেকে এবং মোরানের ৭টি কূপ থেকে তৈল পাওয়া গিয়েছে। চলতি হিসেবে জানা যায়, এই এলাকায় সঞ্চিত তৈলের পরিমাণ চার কোটি টনেরও বেশি।

অন্যদিকে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের উদ্যোগে ভারতব্যাপী অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এই অভিযানের ফলে ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আসামের রুদ্রসাগর এলাকায় তৈল-খনি আবিষ্কৃত হয়। মোটামুটি হিসেব করা হয়েছে যে, এই খনিতে প্রায় পাঁচ কোটি টন তৈল মজুদ থাকার সম্ভাবনা।

অন্যদিকে প্রায় কাছাকাছি সময়ের মধ্যে কাম্বে অঞ্চলেও অনেকগুলি নতুন খনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যেমন, ১৯৬০ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে লুনেজ-এ, ১লা মার্চ তারিখে মালাসানাতে, ১৪ই মে তারিখে অঙ্কলেশ্বরে, ২৩ অক্টোবর তারিখে কাম্বেতে। তারিখগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কত অল্প সময়ের ব্যবধানে এক-একটি আবিষ্কারের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে!

এই কাম্বে অঞ্চলে একটি তৈল পরিশোধন-কারখানা স্থাপনের ঘোষণা সরকারীভাবে করা হয়েছে, যেখানে বছরে দশ থেকে কুড়ি লক্ষ টন তৈল পরিশোধিত হতে পারবে।

ভারত-রুমানিয়া চুক্তি

১৯৫৮ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে শ্রীমালব্য লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, ভারত ও রুমানিয়ার গভর্ণমেন্টের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে রুমানিয়ার সাহায্যে গৌহাটিতে একটি তৈল পরিশোধন-কারখানা নির্মিত হবে। নির্মাণকার্যের খরচ পড়বে ৫,২৩,৮০,১০০ টাকা। পুরো টাকাটি রুমানীয় গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে। এই কারখানায় বছরে তৈল পরিশোধিত হবে ৫,৭০,০০০ টন।

রুমানিয়ার আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যে নির্মিত এই তৈল পরিশোধন কারখানাটি নির্মিত হয়েছে গৌহাটির কাছে নুনমাটিতে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু গত ১লা জানুয়ারি তারিখে এই কারখানাটির উদ্বোধন করেছেন। নাহারকাটিয়া ও মোরানের খনিগুলো থেকে নিষ্কাশিত তৈল পরিশোধিত হবে এই কারখানায়। উৎপাদন-ক্ষমতা বছরে ৭,৫০,০০০ টন। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই এই কারখানায় উৎপাদিত হাল্কা ডিজেল তৈল ও পেট্রল বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে।

ভারত-সোভিয়েত চুক্তি

১৯৬০ সালের ১৬ই জুন তারিখে নয়াদিল্লীতে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। চুক্তিতে বলা হয় যে, ভারতে খনিজ তৈলের অনুসন্ধানকার্যে এবং তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের শিল্পস্থাপনে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বপ্রকার কারিগরী এবং প্রায় আড়াই কোটি রুবল আর্থিক সাহায্য করবে।

১৯৬০ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে সম্পাদিত অপর একটি চুক্তিতে বলা হয় যে, ১৯৬০-৬৪ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে দেড় কোটি টন পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করবে।

ইতিপূর্বে ১৯৫৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে নয়াদিল্লীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আরো একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এই চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত গভর্ণমেন্ট বিহারের বারৌনিতে একটি তৈল পরিশোধন-কারখানা নির্মাণের আর্থিক ও কারিগরী দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই নির্মাণকার্যের

নুনমাটি তৈল শোধনাগার

খরচ দশ কোটি রুবল বা ১১·৯ কোটি টাকা। এই টাকাটি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে ঋণস্বরূপে পাওয়া গিয়েছে। তবে সম্পূর্ণ প্রকল্পটির খরচ গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৪১ কোটি টাকা। ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এই নির্মাণকার্য শেষ হতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আরো একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ১৯৬২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। এই চুক্তি অনুসারে বরোদার দশ মাইল দূরে কোয়ালিতে একটি পরিশোধন-কারখানা নির্মিত হবে। কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা হবে বছরে কুড়ি লক্ষ টন এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের মধ্যে কারখানার প্রথম পর্বের নির্মাণকার্য শুরু করার পরিকল্পনা আছে।

ভারত-ফ্রান্স চুক্তি

গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের সঙ্গে ফ্রান্সের একটি প্রতিষ্ঠান এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, ফরাসী প্রতিষ্ঠানটি রাজস্থানের জয়সালমীরে ৬০০০ বর্গমাইল এলাকায় তৈল অনুসন্ধান-কার্যে সহযোগিতা করবে এবং প্রতি বছর দুজন ভারতীয়কে প্যারিসে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করবে। এই যুক্ত অভিযান সম্পূর্ণ হবে তিন বছরের মধ্যে।

ভারত-ইতালি চুক্তি

১৯৬১ সালের ২৯শে আগস্ট তারিখে ভারতের তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের সঙ্গে ইতালীয় স্টেট অয়েল কর্পোরেশনের একটি চুক্তি হয়েছে। চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, ইতালীয় প্রতিষ্ঠানটি বারৌনি থেকে কলকাতায় ও দিল্লীতে পাইপ-লাইন নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তাছাড়া, এই একই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নাহারকাটিয়াতে নির্মিত হবে কয়েকটি আনুষাঙ্গিক কারখানা।

এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গুজরাটের কচ্ছ এলাকায় তৈল-অনুসন্ধান অভিযান চালাবার অপর একটি প্রস্তাবও বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

গুজরাটের তৈল-খনি

গত বছর গুজরাটে একটি নতুন তৈল-খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই খনির অবস্থান সার্থ নামে একটি স্থানে—আমেদাবাদ থেকে পনেরো মাইল উত্তরে।

গুজরাটের অঙ্কলেশ্বর তৈল-খনিতে ১৯৬১ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন শুরু হয়েছিল। এ-বছরের ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে পুরোপুরি শিল্পগতভাবেই উৎপাদন চলেছে। তৈল পরিশোধিত হচ্ছে বোম্বাইয়ের কারখানায়।

ভবিষ্যতের ছবি

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শুরুতে ভারতের মতো বিরাট একটি দেশেও তৈল উৎপাদন কেন্দ্র ছিল মাত্র একটি—আসামের ডিগবয়। যে-পরিমাণ তৈল এখান থেকে পাওয়া যেত তা দেশের মোট চাহিদার তুলনায় ছিল অতি অকিঞ্চিৎকর। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে বিপুল এক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিম বাংলা ও আসাম এই কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান-ভূমি। বিশেষ করে আসামে নুনমাটি ও নাহারকাটিয়াকে কেন্দ্র করে অতি উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ রূপায়িত হতে চলেছে।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার আগে দেশে মাত্র একটি তৈল শোধনাগার ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় তৈরী হয়েছে আরো তিনটি—দুটি বোম্বাইয়ে ও একটি বিশাখাপত্তমে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে তৈল শোধনাগারের সংখ্যা অন্তত দ্বিগুণ হবে।

আবার এই তৈল-শোধনাগারগুলিকে কেন্দ্র করে অজস্র আনুষাঙ্গিক শিল্প গড়ে উঠবার সম্ভাবনা। ইতিমধ্যেই কয়েকটি পত্তনও হয়েছে। আরো অনেকগুলি এখনো পরিকল্পনার স্তরে।

পেট্রোলিয়ামকে বলা হয় কালো-সোনা। বর্তমানে যে-ভাবে সারা দেশ জুড়ে কালোসোনার হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চলেছে তার মধ্যে, ভবিষ্যতের বিপুল সমৃদ্ধির কিছুটা আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারে।

চলচ্চিত্র - ফলিত শিল্প

নির্মলকুমার ঘোষ (এন, কে, জি)

ফলিত বিজ্ঞানের কথা আমরা জানি। ইংরেজীতে যাকে ব'লে 'এপ্লায়েড্ সায়েন্স'। ফলিত শিল্প ব'লে কিছু আছে কি? প্রশ্নটা হয়তো অবান্তর। সব শিল্পই তো ফলিত। তবু প্রশ্ন থেকে যায়।

অলৌকিক আনন্দ এবং বেদনা থেকেই শিল্পের জন্ম। কিন্তু তার প্রকাশ? তার প্রয়োগ? এ যেন ভূমিষ্ঠ হবার পর নবজাতকের বড় হয়ে ওঠা। শিল্প তখন তার অপার্থিব উৎস থেকে বেরিয়ে এসে রূপ ও রীতির বৈচিত্র্যে বাঁধা পড়ে। যা ছিল একটি মুহূর্তের উদ্ভব তা যেন ব্যাপ্ত হল, বিকীর্ণ হল নানা রূপে, ছন্দে, বর্ণে, রেখায়। একটি আনন্দকণা অথবা বেদনার এক ক্ষণিক স্পর্শ বিচিত্র আত্মপ্রকাশে যেন ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠল। অণু থেকে যেন জন্ম নিল ভূমা। শিল্পের সৃষ্টি হল। শিল্প এল।

শিল্প তাই ফলিত। অর্থাৎ রূপ-রীতির ভেতর দিয়ে শিল্প যখন দৃষ্টি-নন্দন ও শ্রুতিমোহন হল, অশরীরী অনুভূতি যখন অবয়ব পেল তখনই ঘটল শিল্পসৃষ্টি।

শিল্পের প্রকাশ ও প্রয়োগ, ব্যাপ্তি ও বিকাশ তত্ত্বাশ্রয়ী নয়। শিল্পীর ধ্যান ও অনুভূতি রূপ নেয় শিল্পে। এই রূপায়ণের কোন নির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই। আছে শুধু প্রকাশধর্ম। শিল্পীর ভাবনা প্রকাশ পেল কিনা, অমূর্ত মূর্ত হয়ে উঠল কিনা, বেদনা বাঙ্ময় হল কিনা, তাই শিল্পীর সাধনার লক্ষ্য। কী বে তার অলৌকিক অনুভূতি লৌকিক রূপ পেল, কোন্ রীতি ও পদ্ধতি আশ্রয় করে অনুভূতির রূপান্তর ঘটল শিল্পী তা প্রত্যক্ষ করেন—পরে। নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তিনি দেখেন কোন্ ব্যাকরণের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কীর্তি, কোন্ পদ্ধতি, প্রয়োগ-রীতিতে গড়ে উঠেছে তাঁর শিল্পকলা। শিল্পী দেখেন, দেখেন সমালোচক। একটি বিশেষ পদ্ধতি বা প্রয়োগধারা, একটি বিশেষ ভাবদর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গিতে চিহ্নিত হয়ে ওঠে শিল্পীর কলাকর্ম। শিল্পীর সৃষ্টি থেকেই নতুন তত্ত্বের জন্ম হয়। তারপর সমালোচক বা কলারসিক নতুন নামকরণে অভিহিত করেন নতুন পদ্ধতি ও প্রয়োগ-রীতিকে, নতুন তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গিকে।

শিল্পে এমনিভাবেই বিশেষ মত বা পথ, বিশেষ রীতি বা নীতির উদ্ভব ঘটে। অতি আধুনিক কালের চলচ্চিত্র নিয়েও নতুন তত্ত্ব ও ভাবদর্শনের উদ্ভব ঘটেছে।

যুদ্ধোত্তর কালে পাশ্চাত্য দেশের চলচ্চিত্রে দেখা গেল এক নতুন শিল্প-রীতি, এক নতুন শিল্পদর্শন। সমালোচকরা তার নাম দিলেন "নিও-রিয়্যালিজ্ম"। একটি বিশেষ তত্ত্ব ও রীতি হিসাবে 'নিও-রিয়্যালিজ্ম্' অনুসৃত হতে লাগল ছায়াছবিতে। তারপর এল পালাবদলের পথ। 'নিও-রিয়্যালিজ্ম্' পুরোনো হয়ে গেল। দেখা দিল 'নিউ-ওয়েভ্'। এবং তার সঙ্গে দেখা দিল 'ডি-ড্রাম্যাটাইজেশন্'। অর্থাৎ ঘটল ছায়াছবি থেকে নাটকের নির্বাসন। স্থির হল যে চলচ্চিত্র চিত্রায়িত নাটক নয়। নাটক নাকি অলীক। জীবনানুগ নয়। জীবনের নগ্নসত্য রূপই শুধু ফুটিয়ে তুলতে হবে ছবিতে। এতোটুকু মিথ্যা আবেগে জীবন যেন বিকৃত না হয়ে ওঠে। এই হল নতুন যুগের চলচ্চিত্র-তত্ত্বজ্ঞদের নতুন দিগ্‌দর্শন, অভিনব সিদ্ধান্ত।

বলতে বাধ্য—এই তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত প্রমাদপূর্ণ। জীবনের বিশ্বরূপটিই যদি ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে হয় ফুলের মতো, তবে আবেগকে তো বিসর্জন দেওয়া যায় না চলচ্চিত্র থেকে। মানুষের জীবনে স্পন্দন আছে, সংঘাত আছে। বাসনার

সঙ্গে রয়েছে বিভ্রম, আশার সঙ্গে নৈরাশ্য। জীবনে রয়েছে সুখ ও দুঃখের, রাগ ও বিরাগের দ্বৈতলীলা। মানুষের মনের জটিল যন্ত্রণা, বিভ্রান্ত কামনা, সুখানুভূতি ও সংঘাতকে বিসর্জন দিয়ে জীবনের পূর্ণ রূপ আঁকবেন কোন্ শিল্পী কি করে?

আর জীবনের পূর্ণ রূপও যেখানে, আবেগও সেখানে। জীবন-বাসনা ও আবেগ অবিচ্ছেদ্য, জীবন-ভাবনা ও স্বপ্ন অভিন্ন। আর এই আবেগ ও স্বপ্নের লীলা নিয়েই গড়ে ওঠে নাটক। নাটক জীবনেরই ভাবকল্প। হতে পারে ক্ষেত্র-বিশেষে তা কিছুটা অতিপ্রকট, কিছুটা আতিশয্য-দোষে দুষ্ট। যা অন্তর্মুখী রুচিকে আহত করে। কিন্তু এরও উত্তরে বলা চলে, মানুষে-মানুষে যেমন অবশ্যই আছে প্রকারভেদ, চরিত্রে-চরিত্রেও তেমনি নিশ্চয় মেনে নিতে হবে ভাবনা ও আবেগের বিভিন্ন অন্তর-রূপ এবং তাদের বহিঃপ্রকাশের স্বতন্ত্র ধারা। কোথাও হয়তো সে ধারা ফল্গুর মত সংগুপ্ত গোপন, কোথাও আবার সে ধারা বর্ষার দুকূলপ্লাবী তরঙ্গের মতো উচ্ছল উন্মাদ। এ সত্যকে অস্বীকার করে মত্ত অহঙ্কারের স্তুতিগান করা যায়, জীবনের লীলাকল্প থেকে সেই সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাষাকারের দৃষ্টিকে অন্ধ বলেই অভি-হিত করতে হবে। এমন আবিল নয়ন এমন আত্মস্ফীত মন প্রকৃত রূপকারের নয়।

সুতরাং জীবনের সত্যরূপে ফুটিয়ে তুলতে গেলে ছায়াছবি থেকে নাটককে নির্বাসন দেওয়া চলে না, দেওয়া সম্ভব নয় তার প্রাণহরণ না করে। যে ছবি থেকে নাটক দ্বীপান্তরিত, সে ছবি বিশেষ এক জীবনের কোন একটি প্রামাণিক চলচ্চিত্র হতে পারে। কিন্তু শিল্প নয়। কেননা, সে-ছবিতে জীবনের অনুভূতি ও আবেগ-দল অনাদৃত, অস্বীকৃত।

তাই 'নিউ ওয়েভ' অথবা 'ডি-ড্রামাটাইজেশন' নামক তত্ত্ব-চিহ্নিত ছবি আদৌ শিল্প কিনা, সে প্রশ্ন এড়ানো সম্ভব নয়। কারণ, পূর্বেই বলেছি, শিল্পমাত্রই ফলিত। তত্ত্বকে অনুসরণ করে শিল্প চলে না। শিল্পসৃষ্টি থেকেই বরং নানা তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। চলচ্চিত্র যদি শিল্প হয় তবে তাও ফলিত শিল্প।

এই ফলিত শিল্পের, অর্থাৎ চল-চ্চিত্রের লক্ষ্য কী? লক্ষ্য জীবনের নিরন্তর বিকচমান, বিরাট ও বিচিত্র সত্তাকে তার পূর্ণ রূপকে শিল্পসৃষ্টির বাতনা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা, আলিম্পনের মতো, গানের মতো, ছন্দের মতো। এ যেন ক্ষণ-কালের মধ্যে অনন্তকালের, খণ্ডের ভিতর অখণ্ডের, রূপের মধ্যে অপরূপের অব-গুণ্ঠন খোলা। জীবনের গভীর, সমগ্র আভাসটিকে তুলে ধরা। চলচ্চিত্রের এই শিল্পশুচি জীবনজিজ্ঞাসার মূল কল্পনা-টিকে সার্থক রূপায়িত করে তোলার কোন রীতিবদ্ধ ব্যাকরণ থাকতে পারে না, নেই কোন প্রচলিত, গোড়জনস্বীকৃত তত্ত্ব। যদি চলচ্চিত্র-সৃষ্টিতে এমন কোন ব্যাকরণ ও তত্ত্বের বাঁধা-ধরা অনুশাসনের প্রশ্ন ওঠে তবে বুঝতে হবে,—চলচ্চিত্র আর শিল্প নেই। হয়েছে বিকারগ্রস্ত মতবাদীদের হাতে এক নতুন খেলা।

শিল্প নিত্যনতুন রূপে আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে, শিলাগাত্রে নির্ঝরের মতো। কোন নির্দিষ্ট রূপ-রীতির শৃঙ্খলে সে যখন বাঁধা পড়ে তখন সেই বন্দিনী রাজ-কন্যার ঘটে অপমৃত্যু। চলচ্চিত্র যদি শিল্প, তবে তার ক্ষেত্রেও তাই। বুলির বোলে ও রীতির চালে তাকে বদ্ধ ও বধির করা না।

ভারত ও চীন: অশান্ত সীমান্ত

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সীমান্ত-সমস্যার মীমাংসায় চীন আগ্রহী বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে।—সাম্প্রতিক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীনেহরু।

চীন কখনো অন্যায়ভাবে অপর দেশের এলাকা দখল করবে না—মস্কোয় সদ্য-সমাপ্ত নিরস্ত্রীকরণ কংগ্রেসে চীনা প্রতিনিধিদলের নেতা মাও তুন।

ভারত ও চীনের সীমান্ত-সমস্যা নিতান্তই স্থানীয় সমস্যা, এর ফলে যুদ্ধ বাধবে না।—জেনিভায় সাংবাদিক বৈঠকে চৈনিক পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্শাল চেন ঈ।

*

জনবিরল লাদাকের গালওয়ান উপত্যকায় চীনা সৈন্যদলের দ্বারা পরিবেষ্টিত মুষ্টিমেয় ভারতীয় সৈন্যের অমিত-সাহসের তিনদিনব্যাপী নাটক, দুই দেশের প্রতিবাদপত্রে ক্রমশঃ উত্তপ্ততর ভাষার ব্যবহার এবং শেষপর্যন্ত গত ২১শে জুলাই আবার লাদকেরই পার্বত্য-ভূমিতে চীনা বুলেটের আঘাতে ভারতীয় সৈন্যের রক্তপাতের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোদ্ধৃত ললিতবাণীর সমষ্টি অনেকের কাছেই কিছুটা ব্যর্থ পরিহাসের মতো শোনাবে।

কোন্ ঘটনার মধ্যে শ্রীনেহরু চীনের সদিচ্ছার প্রমাণ পেয়েছিলেন তা তিনি বিশদভাবে জানাননি। চীনের জাতীয় গণ-কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনের শেষে প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই যে বিবৃতি দিয়েছিলেন হয়ত শ্রীনেহরু তারই মধ্যে আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু চু এন লাইয়ের বিবৃতিতে নীতির ঈষৎ রদ-বদলের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা শুধু চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কেই প্রযোজ্য; বৈদেশিক ক্ষেত্র পর্যন্ত তা প্রসারিত হওয়ার আশা যে দুরাশা, সীমান্তের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই তার প্রমাণ। আভ্যন্তরীণ সংকটত্রাণে একান্তভাবে আত্মনিয়োগের জন্য চীন সীমান্তের সমস্যা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে—এমন ধারণা করার মতো অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয়নি।

ভারতীয় ও চীনা সৈন্যদের সাম্প্রতিক মুখোমুখি সংঘর্ষ ব্যতীত বিগত কয়েক মাসের মধ্যে সীমান্ত-সমস্যা প্রসঙ্গে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। প্রথমতঃ, তিব্বতে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ভারত-চীন চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর তার বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়নি। স্মরণ থাকতে পারে যে, ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে পিকিংয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষেই বিখ্যাত পঞ্চশীলের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু হিমালয়ের পার্বত্যভূমিতে সেই পঞ্চশীলের অপমৃত্যু ঘটেছে। সহাবস্থানের পঞ্চনীতির প্রথম দুটি নীতিই ছিল উভয় দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা ও অনাক্রমণ। ভারতের পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল এলাকার * ওপর দাবী জ্ঞাপন এবং কয়েক হাজার বর্গমাইল এলাকা জবরদখল সেই নীতি-পালনের চৈনিক রীতির উজ্জ্বল উদাহরণ!

ভারতভূমি থেকে চীনা সৈন্য অপসারিত না-হওয়া পর্যন্ত চুক্তির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিতে ভারত সরকার সঙ্গত কারণেই অস্বীকৃত হয়েছেন। চীনের সঙ্গে সম্প্রীতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌম অধিকার ভারত প্রায় নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিল কিন্তু চীন সে সদিচ্ছার মূল্য দেয়নি। তিব্বতে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যে-হয়রাণির সম্মুখীন হয়েছে তারপরেও আক্রমণকারী দেশের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে তার দ্বারা দেশের মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হত। এ-ক্ষেত্রে ভারত সরকার প্রশংসনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পেরেছেন।

---

* পূর্বে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে ('নেফা') ৩২৫০০ বর্গমাইল; মধ্যে উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশে ৫০০ বর্গমাইল; পশ্চিমে লাদকে (কারাকোরামের পূর্বে) ১২000 বর্গমাইল এবং কারা-কোরামের পশ্চিমে (পাক-অধিকৃত এলাকা) ৫000 বর্গমাইল।

বিচিত্র মিতালি

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কাশ্মীরের পাক-অধিকৃত এলাকা এবং তিব্বতের মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য পাক-চীন উদ্যোগ। এ-ক্ষেত্রে ভারতের ওপর চাপ দেবার জন্য দুটি দেশ যে সুবিধাবাদের পরিচয় দিয়েছে তা রীতিমতো বিস্ময়কর। অবশ্য যে-কম্যুনিষ্ট জুজুর ভয়ে পাকিস্তান নানা সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে সেই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গেই তাকে হাত মেলাতে দেখলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই কারণ কোনো আদর্শবাদের বালাই এই ঐশ্লামিক রাষ্ট্রের নেই। কিন্তু যে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের' বিরুদ্ধে চীন অনবরত প্রচারকার্য চালাচ্ছে তারই বিশ্বস্ত অনুচর জঙ্গীশাসক আয়ুব খাঁয়ের সঙ্গে চীনের এই মিতালি নিশ্চয় অনেকের কাছে দ্বান্দ্বিক জড়বাদের নতুন মহিমা বলে চিহ্নিত হবে।

কাশ্মীর সম্পর্কে চীনের এই নীতি-পরিবর্তন ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন জটিলতা সৃষ্টি করেছে। স্মরণ থাকতে পারে যে, ১৯৫৬ সালের ১৬ই মার্চ পিকিংয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে চু এন লাই বলেছিলেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে কাশ্মীরের জনগণ ইতিমধ্যেই তাদের রায় জানিয়ে দিয়েছে। আবার, মাত্র গত বছর ১৬ই জুলাই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেল শ্রীআর কে নেহরুকে চৈনিক প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেছিলেন: "কাশ্মীর ভারতের অংশ নয়, আমরা

কখনো এ-কথা বলেছি, এমন প্রমাণ কি দিতে পারেন?" কিন্তু সম্প্রতি এই নীতির পরিবর্তন ঘটেছে। চীন এখন প্রশ্ন করছে: "কাশ্মীর ভারতের অংশ, আমরা কখনো এ-কথা বলেছি, এমন প্রমাণ কি দিতে পারেন?" (চীনের পত্র, ৩১শে মে, ১৯৬২)।

একথা সত্য যে, চীন কখনোই কাশ্মীর সম্পর্কে সুস্পষ্ট বা সরকারী কোনো ঘোষণা করেনি। কিন্তু এ-কথাও সত্য যে, কাশ্মীরের প্রশ্নটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা মীমাংসিত হওয়া উচিত এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ এ-ক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয়, চু এন লাই বারবার এই কথা ঘোষণা করেছেন (প্রসংগতঃ, ১৯৫৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতায় সাংবাদিক বৈঠক, পরবৎসর ৫ই ফেব্রুয়ারী চু এন লাই-বন্দরনায়ক যুক্ত ইস্তাহার এবং ঐ বৎসরই ১১ই এপ্রিল চু এন লাই ও পোলিশ প্রধানমন্ত্রীর যুক্ত ইস্তাহারের কথা উল্লেখযোগ্য)। কিন্তু, এখন স্বয়ং চীনই পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের সংগে তিব্বতের সীমানা চিহ্নিতকরণের উদ্যোগ করে কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে বাধা সৃষ্টি করছে এবং কাশ্মীরের একাংশের ওপর পাকিস্তানের অধিকার স্বীকার করে নিচ্ছে।

কিন্তু সমগ্র কাশ্মীর যে ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, রাষ্ট্রসংঘে সাম্প্রতিক বিতর্ককালে সোভিয়েট ইউনিয়ন বিনা দ্বিধায় তা পুনরায় ঘোষণা করেছে। কাশ্মীর নিয়ে সোভিয়েট ও চীনের এই প্রকাশ্য মতবিরোধই হল তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যে-লাদকের বারো হাজার বর্গমাইল এলাকার ওপর চীন দাবী জানিয়েছে, অবৈধভাবে ঘাঁটি স্থাপন করেছে, এমন কি বিরাট সড়কও (আকসাই চীনে) নির্মাণ করেছে তা কাশ্মীরেরই অন্তর্গত।

ভারত ও চীনের সীমান্ত-বিরোধের প্রশ্নে সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বদাই অর্থময় নীরবতা পালন করে এসেছে। এই নীরবতা অর্থময় এই কারণে যে কোনো অ-কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের বিবাদের ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রকেই প্রকাশ্য সমর্থন জানানো সংগত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা তো ঘটেই নি, বরং সমগ্র কাশ্মীরকে ভারতের অংশ বলে ঘোষণা করে সোভিয়েট ইউনিয়ন পরোক্ষে চীনের দাবীকে অস্বীকারই করেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের এই মনোভাবের দ্বারা লাদক সম্পর্কে ভারতের দাবীর যৌক্তিকতাই আরো বেশি করে প্রতিপন্ন হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সংগে চীনের সিংকিয়াং ও তিব্বতের সীমানা প্রায় এগার শ' মাইল যাবৎ বিস্তৃত। এই সীমানার মধ্যে লাদক এলাকাই হল প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। তিব্বত ও লাদকের চিরাগত সীমান্তরেখা ১৮৪২ সালের একটি চুক্তি দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কাশ্মীর, দলাই লামা ও চীন সম্রাটের প্রতিনিধিদের দ্বারা এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চীন যে এই চুক্তিতে অন্যতম পক্ষ ছিল তা চুক্তিটির তিব্বতীয় বয়ান থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। ঐ চুক্তিতে অবশ্য সীমানার কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়নি, শুধু চিরাগত সীমান্তরেখার উল্লেখ করা হয়েছিল, কারণ এই সীমান্ত অত্যন্তই সুপরিচিত ছিল এবং আনুষ্ঠানিক চিহ্নিতকরণের কোনো প্রয়োজন ছিল না। ১৮৪৭ সালে চীন সরকারও ভারতের তদানীন্তন বৃটিশ সরকারকে এই কথাই জানিয়েছিলেন। পরে ভারতীয় কর্মচারীরা ঐ এলাকা জরীপ করেন এবং ভারতের সরকারী মানচিত্রে ঐ এলাকার সীমারেখা নির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত হয়। বর্তমানে ভারতের

সরকারী মানচিত্রে ঐ এলাকার যে সীমারেখা প্রদর্শিত হয় ১৮৯৩ সালে চীনের সরকারী মানচিত্রে সেই সীমারেখাই প্রদর্শিত হয়েছে।

ম্যাকমেহন লাইন

ভারত-চীন সীমান্তের এই পশ্চিমাংশের মতো উত্তর-পূর্বাংশ সম্পর্কেও ভারতের দাবী চুক্তি ও প্রথার উপর সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। ১৯১৩ সালের অক্টোবর থেকে পর বৎসর জুলাই পর্যন্ত সিমলায় অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনে এই অংশের সীমারেখা নির্দিষ্ট হয়। ভারত, তিব্বত ও চীন সরকারের সমমর্যাদাসম্পন্ন দূতেরা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯১৪ সালের ২৪ ও ২৫শে মার্চ ভারতীয় ও তিব্বতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে পত্র-বিনিময়ের দ্বারা ভুটানের পূর্বদিকে ভারত-তিব্বত সীমারেখাটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সিমলা চুক্তির খসড়ার সঙ্গে যে-মানচিত্রটি সংযুক্ত করা হয় তাতে এই ভারত-তিব্বত সীমারেখাটি অঙ্কিত হয় এবং চীনের প্রতিনিধি সেই সময়ে বা পরে এ-বিষয়ে কোনো আপত্তি জানাননি। তিব্বতের কর্তৃপক্ষ এতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না। এই ম্যাকমেহন (সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধির নামানুসারে) লাইনের দ্বারা ঐ এলাকার প্রাকৃতিক, চিরাগত, নৃতাত্ত্বিক ও প্রশাসনিক সীমারেখাটিই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সিমলা সম্মেলনের চুক্তি ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানচিত্র—দুটিতেই চৈনিক প্রতিনিধি ইভান শেন স্বাক্ষর করেছিলেন। বর্তমান সীমান্ত-বিরোধের আগে ভারত-তিব্বত সীমারেখার বিরুদ্ধে চীন কখনোই প্রতিবাদ জানায়নি বা তার পরিবর্তনও দাবী করেনি।

ইদানীংকালে চীনের সরকারী মানচিত্রে যখন সীমান্ত এলাকার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল এবং ভারতের কয়েক হাজার বর্গমাইল এলাকা চীনের অন্তর্গত বলে দাবী করা হল তখন শ্রীনেহরু লোকসভায় ঘোষণা করেছিলেন : "মানচিত্রে থাকুক আর না থাকুক, ম্যাকমেহন লাইনই আমাদের সীমারেখা। ঐ সীমারেখা অতিক্রম করে কাউকেই আমরা আসতে দেব না।" (২০শে নভেম্বর, ১৯৫০)। কিন্তু এই প্রকাশ্য ঘোষণা সত্ত্বেও চীন সরকার তখন এ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেননি। চীনের মানচিত্রের অসঙ্গতির প্রতি ঐ সময় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে চীন সরকার জানান যে, এই সব মানচিত্র কুয়োমিণ্টাং আমলের মানচিত্রের ভিত্তিতে রচিত এবং এই সব মানচিত্রের ভিত্তিতে তাঁরা কোনো দাবী উত্থাপন করবেন না। পরে, ১৯৫৩ সালে তিব্বতে বাণিজ্য সম্পর্কে যখন ভারত ও চীনের মধ্যে আলোচনা শুরু হয় তখনও ম্যাকমেহন লাইন নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি, অথচ তখন চীন সরকার অনায়াসেই সেই আপত্তি তুলতে পারতেন। এমন কি মাত্র ছ' বছর আগেও, ১৯৫৬ সালে দিল্লীতে শ্রীনেহরুর সঙ্গে আলোচনাকালে চু এন লাই জানিয়েছিলেন যে, তিনি ম্যাকমেহন লাইন মেনে নেবেন।

কিন্তু চু এন লাই এ-প্রতিশ্রুতি রাখেননি এবং পরবর্তীকালে ম্যাকমেহন লাইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। ১৯৬০ সালে দুই দেশের পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে আলোচনাকালে চীনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, তিব্বতের পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরের কোনো অধিকারই ছিল না। কিন্তু আলোচনাকালে নিজেদের দাবীর সমর্থনে চীন যে-সব নথিপত্র হাজির করেছিল তা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিব্বত ঐ সময়ে নানা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং চীন সরকার সেই সব চুক্তি মেনেও নিয়েছেন। এমন কি, ১৯৪৭ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখের চীনা সরকারের পত্রের উত্তরে ভারত সরকার যখন জানান যে, বৃটিশ-শাসিত ভারত ও তিব্বতের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী সকল দায়-দায়িত্ব ও অধিকারই স্বাধীনতা-লাভের পর বর্তমান ভারত সরকারের ওপর বর্তেছে, তখনও চীন সরকার কোনো আপত্তি জানাননি।

ভারতের এই বক্তব্য চীনকে বারম্বার পত্রযোগে জানানো হয় এবং পরে দুই দেশের পদস্থ কর্মচারীদের বৈঠকেও ভারতের বক্তব্যের সমর্থনে প্রচুর প্রমাণপত্র হাজির করা হয়। ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারী কর্মচারীদের দীর্ঘ রিপোর্ট ভারতীয় পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়। কিন্তু এই রিপোর্ট ১৯৬১ সালে চীনে তো প্রকাশ করাই হয়নি, পরেও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও প্রসঙ্গচ্যুত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। এ-থেকেই প্রমাণিত হয় যে, দুই দেশের কর্মচারীদের আলোচনায় ভারতের বক্তব্যের যৌক্তিকতাই প্রমাণিত হয়েছিল।

অসংগতি

এই আলোচনাকালে চীনা প্রতিনিধিরা তো নিজেদের দাবীর সমর্থনে যথেষ্ট তথ্যাদি হাজির করতে পারেনইনি, উপরন্তু তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে নানা অসংগতিও ধরা পড়ে। ১৯৫৯ সালের

ডিসেম্বরে শ্রীনেহরুর পত্রের উত্তরে চু এন লাই লিখেছিলেন : "১৯৫৬ সালে প্রকাশিত চীনের যে মানচিত্রের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন তাতেই দুই দেশের মধ্যে সঠিক সীমারেখাটি প্রদর্শিত হয়েছে।" কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে আলোচনাকালে চীনা প্রতিনিধিরা যে মানচিত্র পেশ করেন তার সঙ্গে ১৯৫৬ সালের পূর্বোল্লিখিত মানচিত্রের পার্থক্য (এতে লাদকের আরো দু' হাজার মাইল এলাকার ওপর দাবী জানানো হয়) দেখা যায়। চীনা প্রতিনিধিদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হলে তাঁরা কোনোরূপ অসঙ্গতির কথা সরাসরি অস্বীকার করেন এবং জানান যে, এ-সব অসঙ্গতি নিতান্তই তুচ্ছ!

চীনের নানা মানচিত্রে নানা রকম সীমারেখা প্রদর্শিত হয়েছে এবং ক্রমশঃই ভারতীয় এলাকার ওপর তাদের দাবী বেড়ে গেছে। একেবারে সম্প্রতি লাদকে যে সব স্থানে চীনারা ঘাঁটি স্থাপন করেছে সেগুলিকে কিন্তু ১৯৫৬ সালের মানচিত্রে চীনা এলাকা বলে দাবী করা হয়নি।

কিন্তু চীন এ-সব যুক্তি শুনবে বলে এখনও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মার্শাল চেন ঈ তো আশ্বাস দিয়েছেনই, শ্রীনেহরুও বলছেন যে, সীমান্তে বড় রকমের সংঘর্ষের আশংকা নেই। কিন্তু এদিকে আবার ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে, বিগত এক বছরে চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটেছে। সংঘর্ষের আশংকা থাকুক আর নাই থাকুক, বর্তমানের মতো বিপদগর্ভ অবস্থা সীমান্ত-এলাকায় জীইয়ে রেখে এবং পারস্পরিক অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগের দ্বারা ভারত ও চীন, কোনো দেশেরই মঙ্গল হতে পারে না।

ভারতীয় এলাকায় চীনের অবৈধ প্রবেশ শুরু হওয়ার পর (উত্তরপ্রদেশের বড়হোতি নামক স্থানে ১৯৫৪ সাল থেকে চীনা সৈন্যরা প্রায়ই যাতায়াত আরম্ভ করে) আট বছর অতিবাহিত হয়েছে। সীমান্ত-বিরোধের সূত্রপাতে ভারত সরকার নিতান্তই অপ্রস্তুত ছিলেন, ঘুমন্ত সীমান্ত যে জাগবে তা তাঁদের কল্পনাতীত ছিল। চীনের সদিচ্ছায় অত্যধিক আস্থাই এর কারণ। ১৯৫৬ সালে চু এন লাইয়ের সঙ্গে আলোচনার পর শ্রীনেহরু এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, সীমান্তে যে সামান্য রদ-বদল প্রয়োজন তা আলোচনার দ্বারাই সম্পন্ন হতে পারে। এমন কি চীনের সঙ্গে সম্প্রীতির খাতিরে তিনি যে ছোট-খাটো সংঘর্ষ উপেক্ষা করতেও সম্মত ছিলেন, ১৯৫৯ সালে বি বি সি থেকে প্রচারিত এক বক্তৃতায় তার প্রমাণ আছে। কিন্তু চীন ভারতকে জঙ্গী ও রণোন্মাদ বলে অভিহিত করে এই সদিচ্ছার উত্তর দিয়েছে।

এই আট বৎসরে চীনা হামলা অব্যাহতই আছে, সীমান্তে চীনা প্রস্তুতি জোরদার হয়েছে এবং অন্ততঃ এগারজন ভারতীয় সৈন্য চীনাদের গুলীতে নিহত হয়েছে। ইতিমধ্যে সীমান্তে ভারতের শক্তি যে প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে, শ্রীনেহরুর এই ঘোষণায় ভারতীয় মাত্রই আনন্দিত হবেন।

চীনের হামলা প্রতিরোধের জন্য সীমান্তে ভারতের শক্তিবৃদ্ধি নিতান্তই প্রয়োজন, কিন্তু যুদ্ধের দ্বারা যে এই সমস্যার মীমাংসা হবে না, এ-কথাও শ্রীনেহরুই বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

এ-ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে আলোচনাই একমাত্র পথ। আলোচনার ভিত্তি হিসেবে শ্রীনেহরু পারস্পরিক মানচিত্র অনুযায়ী বিবাদীয় এলাকা থেকে দুই দেশের সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব করেছেন। আক্রান্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের এই প্রস্তাব তার উদারতারই পরিচায়ক। কিন্তু চীনা নেতারা এই প্রস্তাবের কোনো সুস্পষ্ট জবাব দেননি। যুদ্ধ হবে না, এই আশ্বাস তাঁরা দিচ্ছেন; কিন্তু সৈন্য অপসারণ করে আলোচনার পথও তাঁরা উন্মুক্ত করছেন না। তবে কি চীনা নেতারা মনে করেন যে, সৈনিক বাহুবিদ্যার দ্বারা এই সমস্যার মীমাংসা হবে?

আলোকাভিসারী আফ্রিকা

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়
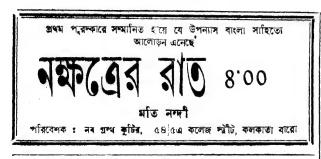
সারা আফ্রিকা ও প্রায় সম্পূর্ণ এসিয়া যখন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের পায়ের তলায় তখন সে ঔদ্ধত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করেছে শুধু ভারত। অন্ধকার কণ্টকময় পথে কেউ যখন চলার সাহস পায়নি তখন আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে একলা চলেছে ভারত।

ভারতের মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক গান্ধীজী শুধু ভারতেরই মুক্তিসংগ্রামের পুরোযাত্রী ছিলেন না, আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ-শাসনের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধেও জীবনপণ সংগ্রাম করেছেন তিনি। তাঁরই মহান নেতৃত্বের অনুপ্রেরণায় একাত্ম হয়েছে দুই লাঞ্ছিত মহাদেশের কোটি কোটি নরনারী, একদিন ন্যূনতম মানবিক অধিকার হতেও বঞ্চিত ছিল যারা।

প্রধানত এই কারণেই ১৯৪৭ সালে ভারত ও তার অংগোদ্ভূত পাকিস্তান, বর্মা, সিংহল প্রভৃতি দেশগুলি স্বাধীন হওয়া মাত্রই শৃংখলিত আফ্রিকার মুক্তির দাবী অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। এই আফ্রিকায় আজ যে বন্ধনমুক্তির জয়যাত্রা চলেছে তাকে ভারত অনুপ্রাণিত আফ্রো-এশিয়ার মুক্তি-আন্দোলনের শেষ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন এক কোটি পনেরো লক্ষ বর্গমাইল আয়তন-বিশিষ্ট বিশাল আফ্রিকায় স্বাধীন দেশ ছিল মাত্র দুটি—মুক্ত ক্রীতদাসদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে শ্বেতাঙ্গ-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র লাইবেরিয়া ও শ্বেতাঙ্গ-শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকা।

১৮২০ সালে পশ্চিম আফ্রিকায় সিয়েরা লিওন ও আইভরী কোস্টের মধ্যবর্তী তেতাল্লিশ হাজার বর্গমাইল স্থানে 'এমেরিকান কলোনাইজেশন সোসাইটির' উদ্যোগে লাইবেরিয়া রাষ্ট্রটি গঠিত হয় এবং ১৮৪৭ সালে লাইবেরিয়া স্বাধীন প্রজাতন্ত্ররূপে স্বীকৃতিলাভ করে। লাইবেরিয়ার বর্তমান লোকসংখ্যা ষোল লক্ষ। আমেরিকার শাসন-ব্যবস্থার অনুকরণে গঠিত এই রাষ্ট্রটির উপর যুক্ত-রাষ্ট্রের বরাবরই সীমাহীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব। অপর "স্বাধীন" রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ উপনি-

বেশীদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে মাত্র একুশ শতাংশ হলেও তারাই সে রাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীরা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা উনাশী ভাগ হয়েও নিজ বাসভূমে পরবাসী। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার ৮৯ শতাংশ ভূভাগ বর্তমানে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীদের করতলগত। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্র বলতে গেলে একটিও ছিল না।

১৮৮৪ সালে বার্লিন-কংগ্রেসে সমগ্র আফ্রিকাকে তরমুজের মত 'ফালা ফালা করে' কেটে ইউরোপের আটটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। ইংলণ্ড পায় প্রায় ৪৭ লক্ষ বর্গমাইল ভূমি, ফ্রান্স পায় ৪০ লক্ষ বর্গ-মাইল। বেলজিয়াম পায় কঙ্গো, যা তার নিজ আয়তনের চেয়ে বড় প্রায় বিরাশী গুণ। পর্তুগালের অধিকারে আসে কিঞ্চিদ-ধিক আট লক্ষ বর্গমাইল, যা গ্রেট ব্রটেনের চেয়ে আয়তনে বড় প্রায় আট গুণ। এছাড়াও এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকে ইতালী, স্পেন, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর অধিকার। এই সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মধ্যেও একটি দেশ কোনক্রমে তার স্বাধীনতা আরও কিছুকাল বজায় রাখতে সমর্থ হয়—সে আবিসিনিয়া কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার চার বছর আগে ভূমিলুব্ধ ইতালীর নির্লজ্জ আক্রমণে সেও পরাধীন হয়।

অথচ আজ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সতেরো বছর বাদে সমগ্র আফ্রিকায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংখ্যা বত্রিশটি। যে ফ্রান্স একদিন আফ্রিকার চল্লিশ লক্ষ বর্গমাইল স্থান অধিকার করে

দখল করেছিল, আজ তার দখলে একমাত্র সোমালিল্যাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নেই। জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও স্পেনের যে ক্ষুদ্র বৃহৎ অধিকার কায়েম হয়েছিল আফ্রিকার এখানে-ওখানে, তা সবই আজ অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। বৃটেনও প্রায় গুটিয়ে এনেছে তার সাম্রাজ্যিক স্বার্থ। কেনিয়া, উগাণ্ডা, নিয়াসাল্যাণ্ড প্রভৃতি যে কটি বৃটিশ উপনিবেশ এখনও স্বাধীন হয়নি তাদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আলোচনা হয় শেষ হয়েছে নয়ত অনতিবিলম্বেই শেষ হবে। আগামী অক্টোবরে উগাণ্ডার স্বাধীনতার দিন-স্থির হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালী পরাজিত হওয়ায় যুদ্ধশেষেই স্বাধীনতা অর্জন করে আবিসিনিয়া। আফ্রিকা তথা সমগ্র বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন এই রাজ্যটিকে মাত্র দশ বছর পরাধীন থাকতে হয়। এই দেশটির আয়তন সাড়ে তিন লক্ষ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটি।

আফ্রিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রথমে উত্তর আফ্রিকাস্থিত আরব দেশগুলিতেই জোরালো হয়ে ওঠে। সে সংগ্রামের অনুপ্রেরণা ছিল মিশর। মিশরের উপর ইংরেজের অধিকার কায়েম হয়েছিল ১৮৮২ সালে, যদিও মিশর তখন কাগজে-কলমে ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন। কিন্তু তুরস্ক প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যোগ দিতেই বৃটেনের পক্ষে মিশর কুক্ষিগত করার সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হয়, এবং সে সুযোগের সে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। ১৯১৪ সালে বৃটেন মিশরকে তার রক্ষণাধীন এলাকা বলে ঘোষণা করে এবং ১৯২২ সালে বৃটেন-অনুগৃহীত ফুয়াদ মিশরের রাজা হন। ঐ ফুয়াদের সঙ্গে ১৯৩৬ সালে বৃটেনের এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঐ চুক্তিতে মিশরকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তবুও বৃটেন ঐ চুক্তিবলেই সুয়েজে সৈন্য রাখার, আলেকজান্দ্রিয়া ও পোর্ট সৈয়দে নৌ-ঘাঁটি রাখার ও যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে মিশরের ভিতর দিয়ে সৈন্যবাহিনী পরিচালনার অধিকার লাভ করে। একটি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে এই অধিকারগুলি ছেড়ে দেওয়ার পর স্বাধীনতা বলতে যে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এটুকু বোঝার বুদ্ধি মিশরবাসীর ছিল। একারণে ঐ তথাকথিত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মিশরের প্রকৃত স্বাধীনচেতা মানুষদের আন্দোলন এতটুকুও স্তিমিত হয় না। এই আন্দোলনেরই ভয়ঙ্কর প্রকাশ হয় ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই, মিশরী সৈন্যবাহিনীর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। রাজা ফারুক রাজ্য হারিয়ে দ্বিতীয় ফুয়াদকে নিয়ে দেশত্যাগ করেন। এগারো মাস বাদে মিশর নিজেকে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। মিশরে বিপ্লবী শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকেই পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। তারপর ১৯৫৬ সালের ২৬শে জুলাই রাষ্ট্রপতি নাসের সুয়েজ খালের উপর বৃটিশ কর্তৃত্বের অবসান ঘোষণা করায় ক্ষিপ্ত বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা একজোট হয়ে মিশর আক্রমণ করে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের হুমকি ও রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপের ফলে অবিলম্বেই সে সংঘর্ষ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু মিশর বা সুয়েজের উপর বৃটেনের কর্তৃত্ব আর ফিরে আসে না। মিশর আজ শুধু সম্পূর্ণ স্বাধীনই নয়, সে আজ আফ্রিকা ও আরব জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী ও নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র।

মিশরে প্রজাতন্ত্র কায়েম হওয়ার পরেই উত্তর আফ্রিকার আরব রাষ্ট্রগুলিতে মুক্তিস্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠে এবং তারই ফলে একে একে স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে সুদান, মরক্কো, তিউনিসিয়া, লিবিয়া ও সর্বশেষে বিপুল সংগ্রামের পর আলজিরিয়া।

সুদান উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার একটি বিরাট আরব রাষ্ট্র। আয়তন কিঞ্চিদধিক সাড়ে নয় লক্ষ বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা এক কোটির কিছু বেশী। সাহারা মরুর বিস্তৃতিই জনবিরলতার মুখ্য কারণ। ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত ইংলণ্ড ও মিশরের যুগ্ম শাসনাধীনে ছিল সুদান, যে কারণে স্বাধীনতা-অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত সুদান পরিচিত ছিল এংলো-ইজিপসিয়ান সুদান নামে। ১৯৫৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী মিশর ও বৃটেন এক চুক্তি স্বাক্ষর করে সুদানের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার স্বীকার করে নেয়। ১৯৫৫ সালে সুদানের শাসন-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সুদানীদের হাতে চলে যায় এবং তখন হ'তেই সুদানের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী প্রবল হয়ে ওঠে। মিশরের ইচ্ছা ছিল সুদানের সম্মিলনে

একটি বৃহৎ আরব রাষ্ট্র গড়ে তোলা। কিন্তু সুদান সে প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী বৃটেন ও মিশর শান্তিপূর্ণভাবেই সুদান ত্যাগ করে চলে আসে।

আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত আরব-রাষ্ট্র মরক্কো। আয়তন ১,৭২,৬০৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা এক কোটি আট লক্ষ। কাগজে-কলমে মরক্কো মধ্যযুগ হতে স্বাধীন হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৯১২ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মরক্কো ছিল ফ্রান্স ও স্পেনের অধীন। ১৯১২ সালের ৩০শে মার্চ ফ্রান্সের সঙ্গে ও ১৯১২ সালের ২৭শে নভেম্বর স্পেনের সঙ্গে চুক্তি করে মরক্কোর সুলতান এ দুই দেশের রক্ষণ-কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঐ রক্ষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মরক্কোর আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধান্তে হীনবল ফ্রান্স ও স্পেনের পক্ষে সে আন্দোলন দমন করা

অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ১৯৫৬ সালের ২রা মার্চ ফ্রান্স ও ১৯৫৬ সালের ৭ই এপ্রিল স্পেন মরক্কোর স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়।

মরক্কোর স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরেই স্বাধীনতা অর্জন করে উত্তর আফ্রিকার অন্যতম রাষ্ট্র তিউনিসিয়া। আলজিরিয়া ও লিবিয়ার মধ্যবর্তী এই আরব রাষ্ট্রটির আয়তন ৪৮,৩১৩ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ। এর মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশী। ১৮৮১ সালে ফ্রান্স তিউনিসিয়া দখল করে। স্বাধীন তিউনিসিয়া ফরাসী উপনিবেশ আলজিরিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর, এই ছিল সেদিনের জবরদখলের পেছনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের যুক্তি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিউনিসিয়ার অধিবাসীদের স্বাধীনতার দাবী ফ্রান্সের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না এবং সেই দাবী-মত ১৯৫৬ সালের ২০শে মার্চ ফ্রান্স তিউনিসিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করে নেয়।

মিশর ও তিউনিসিয়ার মধ্যে অবস্থিত, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী মরুকল্প দেশ লিবিয়া। আয়তন ৬,৭৯,৩৫৮ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ, অর্থাৎ গড়ে প্রতি বর্গমাইলে দুইজনেরও কম। অধিকাংশই আরব, তবে বার্বার, ফেজ্জান অঞ্চলে নিগ্রো, কিছুসংখ্যক ইহুদী ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ইতালীয়দের বাস আছে সেখানে। ১৯১২ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত লিবিয়া ছিল ইতালীর অধীন। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালী পরাস্ত হলে লিবিয়া সাময়িকভাবে রাষ্ট্রসংঘের রক্ষণাধীন হয়। ১৯৪৯ সালের ২১শে নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘে লিবিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতার অনুকূলে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেই প্রস্তাবমত ১৯৫১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর লিবিয়া স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতিলাভ করে।

সাহারা মরুর উত্তরে অবস্থিত, আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র আলজিরিয়াকেই সাত বছর ধরে প্রবল সংগ্রাম করে ও কয়েক লক্ষ মুক্তিসেনার জীবন আহুতি দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। সারা পৃথিবীর সাম্রাজ্য বিসর্জন দিয়ে ফ্রান্স মরিয়া হয়ে আঁটকে রাখতে চেয়েছিল আলজিরিয়াকে, কিন্তু তার সে প্রয়াস শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হ'ল। ৮,৬০,৯৩৭ বর্গমাইল আয়তন-বিশিষ্ট আলজিরিয়ার বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি। তার এক-দশমাংশ শ্বেতাঙ্গ ফরাসী উপনিবেশী। ১৮৬৫ সালে তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকালে ফ্রান্স আলজিরিয়া অধিকার করে এবং সেই থেকেই ফ্রান্স আলজিরিয়াকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবী করতে থাকে। দলে দলে ফরাসীরা এসে আলজিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে এবং আলজিরিয়ার সমগ্র কর্ষণযোগ্য ভূমির এক-তৃতীয়াংশ তাদের কুক্ষিগত হয়। আলজিরিয়ার আদিম অধিবাসীদের উপর ফরাসী উপনিবেশীদের উৎপীড়ন অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং তারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা আলজিরিয়ায় স্বাধীনতার দাবী প্রবল আকার ধারণ করে। এই সংগ্রামেরই সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছে ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই। আলজিরিয়ার মুক্তি-অর্জনের পর আরব-আফ্রিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয়েছে।

আরব-আফ্রিকার মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সাহারা মরুর দক্ষিণভাগে কৃষ্ণাঙ্গ-আফ্রিকার মুক্তি-আন্দোলনও প্রবল আকার ধারণ করে। কৃষ্ণাঙ্গ-আফ্রিকার উপনিবেশগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা অর্জন করে গোল্ডকোষ্ট, স্বাধীনতার পর অতীত আফ্রিকার গৌরবমণ্ডিত রাজ্য ঘানার স্মরণে যার নতুন করে নামকরণ হয় ঘানা।

ঘানা স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৫৭ সালের ৬ই মার্চ। ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই ঘানা কমনওয়েলথের অভ্যন্তরে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এ ব্যাপারেও ভারত ঘানার অগ্রপথিক। পশ্চিম আফ্রিকায় গিনি উপসাগরের উপকূলবর্তী ঘানার আয়তন ৯১,৮৪৩ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৬৭ লক্ষ। কোন বর্ণ-সমস্যা নেই, কারণ সকলেই নিগ্রো।

ঘানার পরে স্বাধীনতা অর্জন করে পশ্চিম আফ্রিকার প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ গিনি। ফ্রান্সে শাসন-ক্ষমতা অধিকারের পর জেনারেল দ্যগল চতুর্থ রিপাবলিকের অবসান ঘোষণা করেন এবং পঞ্চম রিপাবলিকের নূতন সংবিধান প্রণয়ন ক'রে সমগ্র ফরাসী সাম্রাজ্যের কাছে তা অনুমোদনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত করেন। ১৯৫৮ সালের ২রা অক্টোবর এই উপলক্ষ্যে সমগ্র ফরাসী সাম্রাজ্যে গণভোট গৃহীত হয়। একমাত্র গিনি সেদিন সেকু তুরের নেতৃত্বে সেই সংবিধান প্রত্যাখ্যান করে এবং তার ফলে আপনা হতেই গিনি ফরাসী সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ঐ বছরে ডিসেম্বর মাসে গিনি রাষ্ট্রসংঘের পূর্ণ সদস্যরূপে স্বীকৃতিলাভ করে।

অতলান্তিকের উপকূলবর্তী সিয়েরা লিওন ও পর্তুগীজ গিনির মধ্যবর্তী গিনির আয়তন ৯৬,৮৬৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ।

পূর্ব ঘোষণা অনুসারে ১৯৬০ সালের ১লা অক্টোবর স্বাধীনতা অর্জন
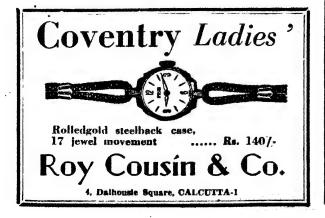
করে পশ্চিম আফ্রিকার বৃহত্তম ও সর্বাধিক জনবহুল দেশ নাইজেরিয়া। গিনি উপসাগরের উপকূলবর্তী এই দেশটির আয়তন ৩,৩৯,১৬৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি। কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত এই দেশটির আফ্রিকার বর্তমান রাজনীতিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

নাইজার নদীর উপকূলে নাইজেরিয়ারই নিকটবর্তী দেশ নাইজার প্রজাতন্ত্র একটি প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ। আয়তন ৪,৫৮,৯৭৬ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২৪ লক্ষ। সত্তর বছর দেশটি ফরাসী শাসনাধীন ছিল। নাইজার প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা-অর্জনের দিন ৩রা আগষ্ট, ১৯৬০।

পশ্চিম আফ্রিকার আরও তিনটি ফরাসী উপনিবেশ আপার ভোল্টা, আইভরি কোষ্ট ও দাহোমে প্রায় একই সঙ্গে স্বাধীনতা অর্জন করে। আপার ভোল্টার আয়তন এক লক্ষ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩২ লক্ষ ৬৬ হাজার। ১৯১৯ সালে সেনেগল ও নাইজারের কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করে ফরাসী উপনিবেশীরা এই দেশটি সৃষ্টি করে, আর ১৯৬০ সালের ৫ই আগষ্ট স্বীকার করে নেয় তার পূর্ণ স্বাধীনতা।

লাইবেরিয়া ও ঘানার মধ্যবর্তী দেশ আইভরি কোষ্ট ফরাসী অধিকৃত হয় ১৮৮২ সালে এবং স্বাধীনতা-অর্জন করে ১৯৬০ সালের ৭ই আগষ্ট। আয়তন ১,৮০,০২৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ।

দাহোমের উপর ফরাসী অধিকার কায়েম হয় ১৮৯৪ সালে, এবং দাহোমে স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬০ সালের ১লা আগষ্ট। দাহোমের আয়তন ৪৭,১,৪৪ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক সতের লক্ষ।

পশ্চিম আফ্রিকার অপর ফরাসী উপনিবেশ সুদান স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬০ সালের ২০শে জুন। স্বাধীনতা-অর্জনের পর সুদান ও অপর ফরাসী উপনিবেশ সেনেগালের সমন্বয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় এবং অতীত আফ্রিকার সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য মালির নামানুসারে ঐ যুক্তরাষ্ট্রের নাম হয় মালি। কিন্তু পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ঈর্ষার ফলে সে যুক্তরাষ্ট্র তিন মাসের বেশী স্থায়ী হতে পারে না। সেনেগল বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু সুদান মালি নামেই পরিচিত হতে থাকে। মালির আয়তন ৪,৬৩,৫০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা আটত্রিশ লক্ষ। মালি পরাধীন ছিল ছাপান্ন বছর।

সেনেগলের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্ক কিন্তু দীর্ঘদিনের। প্রায় ফরাসী বিপ্লবের দিন থেকে সেনেগলের নিগ্রো অধিবাসীরা ফ্রান্সের নাগরিক এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে সেনেগল ফরাসী পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকারী। ফরাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক দীর্ঘদিনের বলে সেনেগল অন্যান্য প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত। আয়তন ৭৬,০৮৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২৩ লক্ষ। স্বাধীনতা অর্জনের দিন ২০শে জুন, ১৯৬০।

ক্যামেরুন ও টোগোল্যাণ্ড ছিল ফ্রান্সের রক্ষণাধীন পশ্চিম আফ্রিকার দুটি প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশ। প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মানীকে উপনিবেশ দুটি হারাতে হয়। রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থানুসারে ক্যামেরুন স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৬০ সালের পয়লা জানু-

রারী, আর টোগোল্যান্ড ১৯৬০ সালের ২৭শে এপ্রিল। ক্যামেরুনের আয়তন এক লক্ষ তেষট্টি হাজার বর্গমাইল ও লোক-সংখ্যা বত্রিশ লক্ষ। টোগোল্যাণ্ডের আয়তন কুড়ি হাজার চার শ' বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা মাত্র বারো লক্ষ।

আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বর্গমাইল আয়তন-বিশিষ্ট অপর ফরাসী উপনিবেশ কঙ্গো। স্বাধীন হয় ১৯৬০ সালের ১৫ই আগষ্ট। দেশটি স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও তাকে এখনও নামের আগে ফরাসী কথাটি ব্যবহার করতে হচ্ছে, কারণ কঙ্গো নামেই বেলজিয়াম-অধিকৃত আর একটি বিশাল ও অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুপরিচিত দেশ তার আগেই স্বাধীনতা অর্জন করে ও রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশলাভের সুযোগ পায়। ফরাসী কঙ্গোর লোক-সংখ্যা মাত্র আট লক্ষ। রাজধানী ব্রাজাভিল, কঙ্গোকে তাই ব্রাজাভিল-কঙ্গোও বলা হয়।

আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে আতলান্তিক উপকূলে অবস্থিত আর একটি প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ মরিটানিয়া। যাযাবর আরব মুসলিম অধ্যুষিত মরুকল্প দেশ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ফরাসীরা মরিটানিয়ায় আসে এবং একটি স্বতন্ত্র উপ-নিবেশ হিসাবে তাকে গড়ে তোলে ১৯০৪ সালে। মরিটানিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৬০ সালের ২৫শে নভেম্বর। আয়তন ১৮,১২০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা মাত্র ৬ লক্ষ ২৫ হাজার।

পশ্চিম আফ্রিকার বৃটিশ উপনিবেশ সিয়েরা লিওন স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৬১ সালের ২৭শে এপ্রিল। ১৭৮৮ সালে এই উপনিবেশটির পত্তন হয় কয়েক হাজার মুক্ত ক্রীতদাসকে নিয়ে। সিয়েরা লিওনের বর্তমান লোকসংখ্যা ২৩ লক্ষ। সিয়েরা লিওনের প্রায় সকল অধিবাসীর কথাভাষা ইংরেজি।

পূর্ব আফ্রিকার অপর রাষ্ট্র সোমালিয়া গঠিত হয়েছে আফ্রিকার শৃঙ্গ অঞ্চলে, বৃটিশ ও ইতালীয় সোমালি-ল্যাণ্ডের সম্মিলনে। সোমালিয়া স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই। আয়তন দুই লক্ষ অষ্টাশী হাজার বর্গমাইল, কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র ২৬ লক্ষ। খুবই অনগ্রসর রাজ্য, অধি-কাংশ অধিবাসী এখনও যাযাবর।

ফরাসী বিষুব আফ্রিকা নামে পরি-চিত আতলান্তিক মহাসাগরের উপকূল-বর্তী মধ্য আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ডটি ত্রিধাবিভক্ত হয়ে তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাদের নাম সেণ্ট্রাফ্রিকান রিপাবলিক, চাদ ও গাবোঁ। প্রথম রাষ্ট্রটির আয়তন ২,৩৪,৪৬০ বর্গ-মাইল ও লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ ৭৫ হাজার। দ্বিতীয়টির আয়তন কিঞ্চিদধিক পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল, অর্থাৎ ফ্রান্সের দ্বিগুণেরও বেশী। কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র ২৭ লক্ষ ৩০ হাজার। দেশটির অধিকাংশই মরু বা মরুপ্রায় অঞ্চল। গাবোঁর আয়তন ১,০১,৪০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা মাত্র ৪ লক্ষ ৫ হাজার। তিনটি দেশই অনুন্নত।

ফরাসী শাসনমুক্ত আর একটি দেশ হল মাদাগাস্কার নামে পরিচিত পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম দ্বীপ মালাগাসি। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত এই দ্বীপটি আকৃতিতে জাপানের চেয়েও বড়। আয়তন ২,২৭-৮০০ বর্গমাইল, কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র ৫১ লক্ষ। দেশটি আফ্রিকার উপকূল-বর্তী হলেও মালাগাসির অধিবাসীরা নিজেদের আফ্রিকান বলে না।

উপরের হিসাব থেকে বোঝা যাবে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এক-মাত্র ফ্রান্সের হাত থেকেই মুক্তি পেয়েছে ১৮টি নিগ্রো ও আরব রাষ্ট্র।

বেলজিয়ামের হাতে আফ্রিকার একটিই মাত্র দেশ ছিল, কিন্তু আয়তনে, প্রাকৃতিক সম্পদে, শৈল্পিক অগ্রগতিতে সে দেশ কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার মধ্যমণি। বেলজিয়ামের চেয়ে আয়তনে বিরাশীগুণ বড় এই দেশটির নাম কঙ্গো। ১৯৬০ সালের ৩০শে জুন কঙ্গো স্বাধীনতা অর্জন করে। আয়তন ৯ লক্ষ ১০ হাজার বর্গ-মাইল, কিন্তু লোকসংখ্যা সে তুলনায় খুবই কম, মাত্র দেড় কোটির মত। স্বাধীনতা-অর্জনের পর কঙ্গোর যে বিপুল উন্নতির সম্ভাবনা ছিল তা ব্যর্থ হয়েছে কঙ্গোর সর্বনাশা আত্মকলহে।

বেলজিয়ামের রক্ষণাধীন প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশ রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডিও ১৯৬২ সালের পয়লা জুলাই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে রুয়াণ্ডা ও বুরুণ্ডি নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরি-নত হয়েছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘেও তারা সদস্যপদ লাভ করেছে।

জার্মানীর অপর প্রাক্তন উপনিবেশ বৃটিশ রক্ষণাধীন টাঙ্গানিকাও রাষ্ট্র-সংঘের ব্যবস্থাক্রমে সম্প্রতি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পূর্ব আফ্রিকার এই রাষ্ট্রটির আয়তন ৩,৬২,৬৮৮ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় পঁচাশী লক্ষ। উগাণ্ডা, কেনিয়া প্রভৃতি পূর্ব আফ্রিকার আরও কয়েকটি রাষ্ট্রের আসন্ন স্বাধীনতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। উগাণ্ডা ও কেনিয়া স্বাধীন হলে টাঙ্গানিকার সমন্বয়ে একটি বিশাল পূর্ব আফ্রিকা ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট সবকটি দেশের রাষ্ট্রনেতাদের বিবেচনাধীন।

আফ্রিকার এই বিরাট জাগরণ শুধু আফ্রিকার জীবনে নয়, সমগ্র বিশ্বের রাজনীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালে যখন নূতন বিশ্ব-সংগঠন রাষ্ট্রসংঘের সৃষ্টি হয়, তখন তার ৫২টি রাষ্ট্রসদস্যের মধ্যে আফ্রিকার রাষ্ট্র ছিল মাত্র চারটি, আর আজ সতের বছর বাদে সেই রাষ্ট্রসংঘের ১০৫টি রাষ্ট্র সদস্যের মধ্যে আফ্রিকার রাষ্ট্রের সংখ্যা ৩১। এর সঙ্গে এশিয়ার ১৯টি রাষ্ট্র সংযুক্ত হলে রাষ্ট্রসংঘে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রের সংখ্যা হবে ৫০টি। ১০৫ রাষ্ট্র-সদস্যের ৫০, অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক। শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রগুলির সবচেয়ে বড় অসু-বিধা এই যে, তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির আর কোন সুযোগ নেই, কারণ শ্বেতাঙ্গ দেশ পৃথিবীর কোথাও পরাধীন নেই। একমাত্র জার্মানী হয়ত আর কিছুকাল বাদে রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত হবে, আফ্রিকা থেকে অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ লাভ করবে আলজিরিয়া। তারপর তাকে অনু-সরণ করবে একে একে উগাণ্ডা, কেনিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, এঙ্গোলা, মোজাম্বিক, নিয়াসাল্যাণ্ড ও ছোট-বড় আরও কত ভবিষ্যতের রাষ্ট্র। এদিকে এশিয়া থেকেও রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ করবে কোরিয়া, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি।

সুতরাং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই হয়ত দেখা যাবে যে, এশিয়া ও আফ্রিকার অশ্বেতকায় রাষ্ট্রগুলি ইউরোপ ও আমেরিকার শ্বেতকায় রাষ্ট্রগুলিকে সংখ্যায় অতিক্রম করে গেছে। বিশ্ব-রাজনীতির ইতিহাসে সেদিন এক নতুন যুগের সূচনা হবে।

বর্ষায় বিরহিনী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গোপীনাথ সদরে নিজের আফিস-ঘরে টেবিলের সামনে এসে বসলেন। মনটা বেশ প্রসন্ন নয়।

প্রসন্ন না থাকার প্রধান কারণ সংক্ষেপে এই ঃ—

গোপীনাথ সামান্য একজন মুহুরি থেকে এখন কলকাতার বাইরে বেশ একটি মাঝারি গোছের লোহার কারখানার মালিক। যে সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর জোরে আজ তাঁর এই প্রতিষ্ঠা, তার মধ্যে আছে প্রবল কর্তব্যনিষ্ঠা, স্পষ্টভাষণ এবং আফিস সংক্রান্ত সব বিষয়ে লেফাফা-দুরস্ত থাকা। ছেলে অবিনাশকে কমার্সে বি-এ পাশ করিয়ে বছর পাঁচেক আফিসের নানা ডিপার্টমেণ্টে ঘুরিয়ে সম্প্রতি ম্যানেজারের চেয়ারে বসিয়েছেন। সেখানে নিজের কোয়ার্টার্সে থেকে কাজকর্ম চালায়। আর একটু গড়েপিটে নিয়ে নিজের পার্টনার বা অংশীদার করে নেবেন।

বেশ কাজ করছিল, সম্প্রতি বিবাহ দেওয়ার পর থেকে একটু যেন ঢিলে দিয়েছে। এবং সাম্প্রতিক শেষ ঘটনা,—অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে দিন-চারেকের ছুটি চেয়ে একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছে। গোপীনাথের লেফাফা-দুরস্ত আফিসে এটা করতে হয়। ছেলে যখন ম্যানেজার তখন সে ম্যানেজারই, ছেলে নয়।

বধূটি দিন সাতেক হোল বাপের বাড়ি থেকে এসেছে এবং এর সঙ্গে অসুস্থ হওয়াটার একটা গূঢ় সম্পর্ক আছে সন্দেহ করে গোপীনাথ ছুটি মঞ্জুর করেন নি। এই নিয়ে গৃহিণীর সঙ্গে ঘণ্টা দুই আগে বেশ একটু খিটিমিটি হয়ে গেল। এক নম্বর এই। এর ওপর কাল থেকে একটানা বৃষ্টি চলছে। নিজে কাজের মানুষ, এই কর্মনাশা জিনিসটাকে উনি একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না। কাজের মানুষের এমনি একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে, কেউই ঠিকমতো নিজের কর্তব্য করছে না। অন্য সময় নিজের কাজে থাকেন ডুবে, এদিকটায় তত দৃষ্টি যায় না; বৃষ্টি-বাদলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে মনটা অবসাদগ্রস্ত করে তোলে।

ও'র স্টেনোগ্রাফার অম্বিকা কাল থেকে আসছে না। ছোকরারও নূতন বিবাহ। আর ও'র সন্দেহ, একটু স্ত্রৈণও; কটা দিন যে নেবে এইরকম বর্ষা থাকলে কিছুই বলা যায় না। নিজে নিতান্ত জরুরী কিছু কিছু সামলে, বাড়ির মধ্যে গিয়েছিলেন, দ্যাখেন, কাজের দিক দিয়ে সবাই অম্বিকা। ঝরঝর করে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে, আর সবাই হাত-পা গুটিয়ে আছে বসে—কেউ ঘরে, কেউ বারান্দায়, কেউ সিঁড়িতে। কেউ কেউ আবার এখনও বিছানাই ছাড়ে

নি। চাকর-দাসী থেকে নিয়ে কেউই বাদ নয়। একা-একা কিংবা অলস জটলা। নূতন বৌমাটি বেশ হাসিখুশী, আর একটা কিছু-না-কিছু নিয়ে আছেন। তাঁকেও দেখলেন—জানলাটির ধারে একা চুপ করে বসে আছেন। অবশ্য করতেন আর কি? তবু ও'র নিষ্কর্মণ্যতার চিত্রটা যেন আরও মনটা দমিয়ে দেয়।...বাড়ির রোগে ধরেছে। ছেলেমানুষ, শেখবার, কাজ করবার এই তো বয়স। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, বেলা পাঁচটা। অন্য দিন বাড়ি এ সময় কাজে-কর্মে গমগম করতে থাকে।

একটু ধ'রে এসেছিল যেন বৃষ্টিটা, হাওয়াটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে যেমন গরম পড়েছে, আবার প্রবলতর বেগে নামবে। যেন আতঙ্ক ধরিয়ে দিয়েছে। উঠে সুইচ টিপে পাখাটা চালিয়ে দিলেন। একটু অকাজের কাজ গেল বেড়ে; পাখাটা চলতেই কতকগুলো আলগা কাগজ এলোমেলো ভাবে পড়ল ছড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে। ডাক দিতেই যাচ্ছিলেন কাউকে, কিন্তু যেমন বৃষ্টির আওয়াজ, আর যেমন দেখে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে যে এসে পড়বে কেউ সে ভরসা নেই। নিজের সঙ্গে যে আর্দালিটা থাকে সে আসেই নি।

কুড়ুতে কুড়ুতে একটা চটি খাতাও পাওয়া গেল। চিনু অর্থাৎ চিন্ময়ীর প্রবন্ধের খাতা। এ-ঘরে কেন, সে প্রশ্ন অবশ্য আসে না। ওর কোন্ জিনিসের কোন্খানে যে প্রবেশাধিকার নেই বলা যায় না। বাপের আফিস ঘরটি তো ওর প্রিয় আস্তানা, ও'র অবর্তমানে লেখা-পড়ার, বিশেষ ক'রে লেখার অর্ধেক কাজ ও'র টেবিলেই সারে। মানা ক'রে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। সরঞ্জামের দিক দিয়ে অনেক সুবিধা তো।

এইটিই সবছোট মেয়ে, স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ছে। নয় পেরিয়ে এবার দশে পড়বে মাস কয়েক পরে।

কতকটা কাজের অভাবেই খাতাখানা ওলটাতে লাগলেন গোপীনাথ, লেখাপড়া কাছে কি রকম চিনু? মাষ্টার তার কর্তব্য কেমন করছে?

হাওয়ায় আপনি পাতা উলটে গিয়ে একেবারে শেষ পাতায়ই দৃষ্টি পড়ল। প্রবন্ধের বিষয় "বর্ষা"।

অকারণেই একটু হাসি ফুটল মুখে। আজ যেন কানু ছাড়া আর গীতই নেই।

পড়ে যেতে লাগলেন—

"আমাদের দেশের ছয়টি ঋতুর মধ্যে বর্ষা একটি। আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাস লইয়াই এই ঋতু. তবে কোন কোন বৎসর ভাদ্র এমন কি আশ্বিন পর্যন্ত হইয়া থাকে। বর্ষায় রাস্তাঘাট জলমগ্ন থাকায় নানা প্রকার অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও এই ঋতুই যে আমাদের সবচেয়ে উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই..."

—একটু হাসি ফুটল মুখে। কথাটা সম্পূর্ণ মনের মতো না হওয়ায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে ছেড়েও দিলেন এখানে। তবে লেখাটা মন্দ হয়নি, মাষ্টার তার কাজ করছে; অবশ্য যদি এর মধ্যে ফাঁকি না থাকে। কাজের চাপে আর এদিকটা দেখতে পারেন না। আজ একটু জিজ্ঞাসা-বাদ করবেন ছোকরাকে। তবে আসবে কি এ বর্ষায়? শুনেছেন পদ্য লেখারও বাই আছে।

অন্যমনস্কভাবে প্রথম পাতাটা উল্টে দ্বিতীয়টায় এসে পড়লেন। ছোট প্রবন্ধ, ওদের ক্লাসের আর কতবড়ই বা হবে? এই পাতাতেই শেষ হয়ে যাবে। অন্যমনস্ক-ভাবেই চোখ বুলুতে বুলুতে শেষের কটা লাইনে এসে সচকিত হয়ে উঠলেন গোপীনাথ। একেবারে বিশ্বাসের অযোগ্য, স্বপ্ন দেখছেন না তো!

দু'বার, তিনবার, চারবার প'ড়ে গেলেন। যতই পড়ছেন যেন আরও গুলিয়ে যাচ্ছে মাথা। কালে কালে হোল কি? মাত্র ন'বছরের একটা মেয়ে—

উঠে পড়লেন খাতাটা একটা ফাইলের নীচে চাপা দিয়ে।

প্রথমটা মনে হোল গৃহিণীকে ডেকে এনে দেখান তাঁর আস্কারায় এবং

অবহেলায় আজ একটা দিকে কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে।...সেই দৃশ্য; ঝরঝর ক'রে একটানা বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে, আর বাড়ি যেন একটা ঘুমন্তপুরী। বৌমাটি জানলায় একইভাবে বসে বাইরের দিকে চেয়ে; একটা লোক বারান্দা দিয়ে চলে গেল, হুঁস নেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, দ্যাখেন চিনু হনহন করে নেমে আসছে, হাতে একটা বেশ পরিষ্কার করে বাঁধানো খাতা, স্বচ্ছ কাঁচ-কাগজে যত্ন ক'রে মোড়া।

বললেন—"থাম্, কোথায় চলেছিস?"

একটু থতমত খেয়ে গিয়ে উত্তর দেওয়ার আগেই দ্বিতীয় প্রশ্ন—"তোর হাতে ওটা কিসের খাতা? স্কুলের নয় তো দেখছি।"

"পদ্যর"—ভয়ে ভয়ে বলল চিনু স্কুলের বাইরের বলেই।

"কার পদ্যর খাতা?"

"মাষ্টারমশাইয়ের।"

সেকেন্ড কয়েক যে কিছু বললেন না, সে যেন কথা কিছু জোগালো না বলেই। চোখ দুটো আস্ত আস্তে ঘুরছে, কিসের সঙ্গে কি একটা যেন মেলাচ্ছেন মনে মনে।

প্রশ্ন করলেন—"মাষ্টারমশাই তোর পদ্য লেখেন?"

—চিনু মাথা দুলিয়ে জানাল—লেখেন।

"কিসের পদ্য সব?"

—উত্তর দেওয়ার আগেই বললেন—'থাক্, তুই নেমে আয় আমার সঙ্গে।"

হাওয়া দিয়ে আবার জোরে বৃষ্টি নামল। পাখাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যান নি, সুইচ তুলে দিয়ে চেয়ারে বসে খাতাটা ফাইলের নীচে থেকে বের ক'রে নিলেন। চিনু একটু জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দোষ করে ও। এইরকম সন্দিগ্ধ পরিস্থিতিতে থাকেই তাই। বাপের গায়ে-পিঠে পড়ে পুষিয়ে নেওয়ার সে আবার আলাদা পরিস্থিতি আছে।

প্রশ্ন করলেন—"তোর প্রবন্ধের খাতা এখানে কেন? মানা করেছি না কতবার?"

উত্তর দেওয়ার আগেই বললেন—"সরে আয়।"

শেষ পাতাটা খোলাই আছে, শেষের লাইন ক'টার নীচে আঙুল টিপে সামনে ধ'রে বললেন—"পড়্ তো কি লিখেছিস।"

একটু স্খলিত কণ্ঠে পড়ে চলল চিনু—"বর্ষায় বিরহিণীদের বড় জ্বালা। তাই তাহারা গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের জলে ডোবা-পুকুর সব ভাসাইয়া দেয়।"

"এসব ছাইভস্ম পেলি কোথা থেকে?"

—উত্তর দেওয়ার আগেই বললেন—"থাম্। বিরহিণী মানে কি?"

"কোলা-ব্যাঙ।"

"কোলা-ব্যাঙ!! বিরহিণী মানে!! কে তোকে বলেছে?"

"বৌদিদি।"

"বৌমা!! তোকে...মানে, তুই...মানে, তোকে হঠাৎ এসব কথা বলতেই বা গেলেন কেন?"

"জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

বিস্ময়ের আর সীমা পাচ্ছেন না গোপীনাথ। ঠিকমতো যেন কথাও জোগাচ্ছে না। প্রশ্ন করলেন—"তা তুই... তুই হঠাৎ ওঁকে 'বিরহিণী'র মানে জিজ্ঞেস করতে গেলি যে?"

"ওর মানে জিজ্ঞেস করতে যাই নি।"

"তবে?"

"বর্ষা নিয়ে আর কি লিখব জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম।"

"বেশ, তারপর?"

উত্তর দেওয়ার আগেই প্রশ্ন করলেন—"কি করছিলেন উনি?"

"জানালার ধারে ব'সে বৃষ্টি দেখছিলেন..."

"আচ্ছা...?"

"বললেন—তোমারও এইটে ঠাট্টা করবার সময় হোল ভাই? বর্ষার যে কী জ্বালা তা তুমি এখন কী বুঝবে? শুনতে পাচ্ছ না ঐ বিরহিণী দাদুরির দল মিলনের জন্যে চোখের জলে পুকুর-ডোবা সব ভাসিয়ে দিলে? ...আমি দাদুরি মানে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁ বৌদি, দাদুরি কাকে বলে? বললেন—হা পোড়া কপাল আমার। দাদুরি মানেও জানো না? তোমরা যাকে বলো কোলা-ব্যাঙ বোষ্টোম কবিরা তাকেই......"

"বুঝেছি।" —একটা চিন্তাস্রোত চলছিল ভেতরে ভেতরে, থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন—"আর কিছু বললেন তোকে?"

"আর জিজ্ঞেস করিনি। উনি আঁচল

দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলতে আমি পা টিপে টিপে চলে এলাম।"

"আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলতে—কাঁদছিলেন নাকি?"

—মাথা দোলাল চিনু।

একটু নীরব থেকে বললেন—"আচ্ছা তুই যা। তোর বই-খাতা এখানে রাখবিনি। খবরদার। দাঁড়া তো—মাষ্টারমশায়ের খাতায় কিসের পদ্য?"

"রবীন্দ্রনাথের ওপর। সেপ্টেম্বরে আবৃত্তি করব, মুখস্ত করতে দিয়েছেন।"

পরিস্থিতিটা নরমের দিকে লক্ষ্য করেই বোধ হয় নিজে হতেই জুড়ে দিল—"মুখস্থ হয়েও গেছে, বৌদিকে শোনাতে যাচ্ছিলাম। যাই?"

"যাও।"

চৌকাঠের ওদিকে পা দিলে ডেকে বললেন—"আর শোন্ চিনু, তোর মাকে একবার ডেকে দিয়ে যা।"

বৃষ্টি আরও জোর হয়েছে। আকাশ-পাতাল চিন্তা। একটা সামান্য কথা, সেটাও ভেতরে ভেতরে এত জটিল হ'য়ে দাঁড়ালে কাজকর্ম যে শিকেয় ওঠে। সব চেয়ে খারাপ লাগে যখন খুব বিরক্ত হওয়ার কথা, রাগে জ্বলে ওঠবার মতো অবস্থা তখন যদি বিরক্তি বা রাগ একেবারেই খুঁজে না পাওয়া যায়। ... কিসের কতকগুলো এলোমেলো কথা মনে এসে ভিড় করছে—নরম, ভিজে ভিজে—একটা যেন অসহ্য মানসিক স্পন্দনের মধ্যে প'ড়ে চেয়ার ছেড়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগলেন গোপীনাথ।

গৃহিণী নেমে এলেন, প্রশ্ন করলেন—"ডেকেছ আমায়?"

গৃহিণীকে দেখেই ফিরে পাওয়া গেল হারানো বিরক্তি আর রাগটুকু। একটু উগ্র দৃষ্টিতেই রইলেন চেয়ে, তার-পর উনি একটু বিমূঢ়ভাবে প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করতে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে উঠলেন—"কাজ নেই মুখ ভার করে, গোপালকে তোমার আনিয়ে দিচ্ছি। আমি নিজেই গিয়ে বসছি আফিসে, উনি ঐ মোটরেই ফিরে এসে..."

—থেমে গেলেন।

"তুমি নিজে যাবে, এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে!"—হঠাৎ পরিবর্তন, তাও আবার এই আকারে, গৃহিণীর বিস্ময়ের আর অন্ত নেই একেবারে, কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছেন না।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যেতে হবে আমায়!"—আরও ঝেঁঝে উঠলেন গোপীনাথ, হাত নেড়ে বললেন—"কাজকর্ম তো পরের হাতে ছেড়ে বসে থাকলে চলবে না। বৃষ্টি হোক, বাজ পড়ুক, থাকতে একজনকে হবেই..."

"তা বলে তোমায়!..."

"হ্যাঁ গো, আমায়ই! আর, আমি না থাকলে তুমি...কি যে বলে—তুমি তো চোখের জলে ডোবা-পুকুর ভাসাবে না!"

—স্পষ্টবক্তা মানুষ, জিভের লাগাম কষতে-কষতে ওটুকু গেলই বেরিয়ে মুখ দিয়ে।

"তুমি নিজে যাবে, এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে!"

মোটর অবশ্য খালিই গেল শেষ পর্যন্ত। তবে সবাই আশঙ্কা করছে বাপের ব্যবসায়ে অবিনাশের পার্টনার হওয়ার সময়টা বেশ দিনকয়েক পেছিয়ে গেল আপাততঃ।

খেলার মাঠের স্বাধীনতা

অজয় বসু

খেলার মাঠের স্বাধীনতা বলতে আমি শুধু সাংগঠনিক অধিকারই বুঝি না। আরও বুঝি মাঠে ময়দানে প্রাণময় ভঙ্গীতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ঘটানোয় খেলোয়াড়দের অধিকারও। সে অধিকার অর্জন করে নিতে হয়।

খেলাধুলোর আয়োজনের অধিকার পরাধীন ভারতবাসীর হাতে এসেছিল ক্রমপরিবর্তনশীল যুগধর্মের প্রভাবে, কিছুটা আন্দোলনের চাপে এবং বাকীটা আলাপ-আলোচনা ও বোঝাপড়ার সূত্রে। কিন্তু খেলোয়াড়দের আত্মপ্রকাশের ও প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা ভারতবাসী অর্জন করে নিয়েছিল নিজেদেরই যোগ্যতা ও ক্রীড়াকৃতির পরিচয়ে। সাংগঠনিক স্বাধীনতার অনুপাতে খেলোয়াড়দের স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত আত্মনির্ভর। সে স্বাধীনতা অর্জনের দৃষ্টান্তটিও অবিস্মরণীয়।

উচ্চমন্য ইংরেজ এক সময় ভাবতো, নিজের অপপ্রচারে অন্যদেরও ভাবাতে চেষ্টা করতো যে, জাতিগতভাবে ভারতের দৈন্যের বুঝি সীমা নেই! তাদের বিচারে ভারতবাসী ভুগছে অশিক্ষার অভিশাপে, কুশিক্ষার সংস্কারে এবং দেহগত সামর্থ্যের চিহ্নহীন বোঝার ভারে। ভারতবাসীর দেহ ও মনের পুঁজি একেবারেই শূন্য।

অতুল ঘোষের লাঠি আর পুলিন দাসের শ্যামবাগের আশ্রমকে ইংরেজ মনে মনে সমীহ করতো। কিন্তু মুখে স্বীকার করতো না। তাই মনের ভয় ভাঙাতে একদিন ক্ষমতাবান শাসককেই রাজ-শাসনের শাসানি দিয়ে বাংলাদেশের লাঠিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে হয়েছিল। লাঠিখেলা খেলাই তবু তার গলায় ঠাঁঠালাঠির ঘণ্টা ঝোলাতো বীর-পুঙ্গবের কুণ্ঠা জাগেনি।

কিন্তু হায়! এতো করেও ভারতকে সর্বস্বান্ত করে তোলা যায়নি। লাঠিখানি কেড়ে নিলেও 'কবচ-কুণ্ডলে' হাত পড়েনি। কে জানতো যে, নিরীহ আকৃতির 'কবচ-কুণ্ডলই' একদিন প্রকৃতিতে দুরন্ত হয়ে উঠে ইংরেজ মর্যাদায় ঘা বসাবে এবং অপপ্রচারের মূল দেবে নাড়িয়ে।

ভারতের অন্তরাত্মার সমগ্র বহিঃপ্রকাশকে অপবাদের ঢক্কানিনাদে অপরাধী করে তুলতে চাইলেও সব কিছু বুঝে ওঠা চতুর ইংরেজের পক্ষেও সেদিন সম্ভব হয়নি। তারা লাঠির আগায় ছোবল হেনেছিলেও আখড়ার মাটিতে বিষ ছড়াতে পারেনি। আর তা পারেনি বলেই স্বদেশী মাটি অঙ্গে লেপে ইংরেজ-আমলেই ভারতবাসী পেয়েছে খেলার মাঠে স্বাধীনতা অর্জন করতে।

যতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবরবাবু)

তখন ইংরেজী অপপ্রচারের আড়াল সত্ত্বেও ভারতবাসীর মনে সাহস ছিল, দেহে ছিল বল আর ভারতীয় উত্তরাধিকার সূত্রেই পাওয়া ক্রীড়াপ্রথাপ্রকরণ ছিল অধিগত। এ বিদ্যা আত্মস্থ করতে ভারতকে কারো কাছে পাঠ গ্রহণ করতে হয়নি। নিজের সাধনার সুফলেই পেরেছে নিজেকে সবার ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে।

আমাদের হকির বিশ্ববিজয়-কাহিনী আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের প্রতিষ্ঠার এক প্রামাণ্য দলিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগের কালে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এবং প্রশিক্ষণে অবহেলিত মোহনবাগানের পক্ষে গোরা শ্রেষ্ঠ দল ইষ্ট ইয়র্ককে হার মানানোও ফুটবলে ভারতীয় সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল প্রতীক। তবুও বলতে হয় যে, কি হকিতে কি ফুটবলে আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস ছিল ইংরেজেরই দৃষ্টান্ত। কিন্তু খেলাধুলোর আর এক বিভাগে নাম-মাত্র উৎসাহটুকু পেতেও আমাদের হাত পাততে হয়নি কারুরই কাছে। অথচ একেবারে নির্ভেজাল ভারতীয় হাতিয়ার হাতে নিয়েই আমরা পেরেছি অপপ্রচারে উচ্চারিত অক্ষমতার অপবাদকে পিটিয়ে শায়েস্তা করে দিতে।

সেই মূলধনেই ভারত পেয়েছে খেলার মাঠের স্বাধীনতা। আর আরও বড় কীর্তি রাখতে পেরেছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাবের সুযোগে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সে প্রতিষ্ঠা এমনই দৃঢ়মূলে যে, দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকালে তার একটি শিকড়ও নড়েনি। শিকড় স্থানচ্যুত হলো সেদিন যেদিন আমরা নিজেরা নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে ধ্রুপদী সাধনায় ক্ষান্তি দিলাম। এক মুহূর্তের ফাঁকি, কিন্তু তাতেই জাতিগতভাবে ভারত চিরকালের জন্যে ফাঁকিতে পড়ে গেল। আফশোষ এই যে, সেদিনের বাস্তব বৈভব আজ শুধু ইতিহাসের বিগত অধ্যায়েই রূপান্তরিত হয়ে রয়েছে!

কিসের কথা বলছি? কুস্তি মল্লক্রীড়া।

মুখোমুখি হতে পারলে ইতিহাসের দর্পণে আজও খুঁজে পাওয়া যাবে করিম বক্স, গোলাম, গামা, ইমাম বক্স, আহমেদ বক্স, মহিউদ্দিন, গোবর পালোয়ানের দীর্ঘচ্ছায়া। দীর্ঘদেহী মল্লদের খাঁটী ভারতীয় প্রতিকৃতি, সাফল্যের সার্থকতায় হেমকান্তি, কীর্তিচিহ্নে অম্লান, বিশ্বব্যাপী অভিনন্দনে অবিনশ্বর!

হকি স্টিক হাতে নিয়ে ভারত তখনও অলিম্পিক আসরে নামেনি, ঘরের কোণে ফুটবল মাঠেও নিজেদের ছড়াতে পারেনি। এমন সময়ে এই সব উন্নতশির ভারতীয়ের অগ্রপথিকেরা দেশীয় মূলধনের কড়ি ফেলে স্বদেশের ক্রীড়াঙ্গনের তো বটেই, সেই সঙ্গে বিদেশী তথা আন্তর্জাতিক ক্রীড়াকেন্দ্রের সিংহাসন নিজেদের দখলে এনে দিলেন। সেই প্রথম স্বদেশের এবং বিদেশের খেলার মাঠের স্বাধীনতা ভারত অর্জন করতে পারলো অবিমিশ্র ভারতীয় সৃষ্টি দেশী কুস্তিগীরদের কল্যাণে।

জাতীয় ইতিহাস-চারণের পুণ্য লগ্নে নিছকই কৃতজ্ঞতাবোধে আজ তাই ও'দের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। স্মরণ করা

সরকারও, কারণ, ওঁদের ভূমিকার যাথার্থ্য উপলব্ধি করায় আমাদের দেশেও সনিষ্ঠায় কর্তব্য সম্পাদিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

স্মরণধৃত একটি নাম করিম বক্স পেরলেওয়ালা। না, শুধু নাম নয়, আসলে করিম বক্স হলেন আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় ভারতীয় সাফল্যের নিকচিহ্ন! কালা-ধলার খেলায়, শাসক-শাসিতের মর্যাদার লড়াইয়ের উচ্চশির ভারতের জয়ধ্বজা।

আমাদের এই কলকাতা শহরেই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার ইতিহাসে ভারতীয় সাফল্যের সেই স্বর্ণস্বাক্ষর আঁকা হয়েছিল। ১৮৯২ সালের কথা। বিখ্যাত আইরিশ মল্ল টম ক্যানন এসেছিলেন কলকাতায় সেদিন। ক্যানন তখন গ্রেট-বৃটেনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী; ইউরোপেও তাঁর জুড়ি বেশী নেই। শুনেছিলেন তিনি যে, ভারতের রাজন্যবর্গ কুস্তির পরম পৃষ্ঠপোষক। ভারতে আসর মাৎ করতে পারলে ইনাম মিলবে প্রচুর।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীতে সেদিন তদানীন্তন প্রিন্স অব ওয়েলসের সফর উপলক্ষে মহাধুমধামের আয়োজন। এক বিরাট প্রদর্শনীর আসর পাতা হয়েছে কলকাতার গড় অঞ্চলে। সেই আসরেই একদিন মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ঘটে গেল গ্রেট বৃটেনের চ্যাম্পিয়ন মল্ল টম ক্যানন ও ভারতীয় করিম বক্সের মধ্যে।

এই দঙ্গলের উদ্যোক্তা ছিলেন কুচবিহারাধিপতি নৃপেন্দ্রনারায়ণ। সহযোগী দ্বারভাঙ্গার মহারাজা। ভারতভূমিতে কালা-ধলার সেই প্রথম প্রকাশ্য লড়াই। প্রবল প্রতাপ বৃটেনের সঙ্গে এক ভারতীয়ের মোকাবিলা। ব্যাপারটি যে আসলে কি তা জানতে, চক্ষুকর্ণের বিবাদ মেটাতে সারা শহরটাই সেদিন ভেঙ্গে পড়েছিল ময়দান-কিনারে।

সাহেবের সঙ্গে গায়ের জোর, ফলানোর চেষ্টা দেখে দর্শকদের মনে সংশয় ও শঙ্কাও কিছু কম ছিল না। তার ওপর গ্রেট বৃটেনের চ্যাম্পিয়ন টম ক্যানন আকৃতিতে ছিলেন তেমনি বিরাট পুরুষ। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, অঙ্গভঙ্গী বলদৃপ্ত। অনুপাতে করিম অনেক নরম, তবে আত্মবিশ্বাসে প্রকৃতস্থ।

প্রথম দর্শনে ভারতীয় দর্শকদের ভয় ভাঙ্গেনি, বরং বেড়েই ছিল। কিন্তু কুস্তি শুরু হতেই করিমই তাঁদের আশ্বাস দিলেন। জাত কুস্তি স্রেফ গায়ের জোরেই লড়া যায় না, শক্তির সঙ্গে মস্তিষ্কের সমন্বয় ঘটাতে হয়। মল্লবীর করিমের মস্তিষ্কে সে সমন্বয়ের সুসমঞ্জস প্রকাশ ঘটেছিল, তাই দেখতে দেখতে মিনিট কয়েকের মধ্যেই তিনি বিশালতর প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎ করে দিলেন।

ব্যাপারটা যেন অঘটনেরই সামিল! কান্ড দেখে সেই মুহূর্তেই শাসক ইংরেজের শক্তি সামর্থের অহমিকা যেমন ভাঙ্গলো তেমনি ভারতীয়রাও পারলো নিজেদের নতুন করে চিনতে। এই চেনাজানার সুস্থ ও স্বচ্ছ সচেতনার আশীর্বাদে ভারতবাসীও সেদিন বুঝতে শিখেছিল যে জীবনের অন্যক্ষেত্রেও ইংরেজকে হারমানানো তাহলে নিতান্তই স্বপন নয়। ভারতের এই আত্মোপলব্ধি উত্তরকালে, পরোক্ষে হলেও, রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামেও প্রসারিত হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

কিন্তু কথায় বলে, বাঁশঝাড় ভাঙ্গে তবু মচকায় না। টম ক্যাননের মর্যাদা গুঁড়িয়ে গেল তবু তিনি নিজে নতি-স্বীকার করতে চাইলেন না। দেশে ফিরে যে আত্মজীবনী রচনা করলেন তাতে রইল না ভারতীয়ের হাতে পরাজয়ের স্বীকারোক্তি। তবে সত্য কি কখনো চাপা থাকে? থাকেওনি। টম ক্যাননের স্বদেশেই 'ডেইলি নিউজ'এ প্রকাশিত কয়েকটি ছত্রে এই লড়াইয়ের বিবরণ ইতিহাসের মর্যাদায় জীবন্ত হয়ে রইলো। সে ইতিহাস আমাদের দেশেও অমৃত-বাজারে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে সমসাময়িক-কালে।

ভারতের আখড়ার মাটি মেখে, ভারতীয় ঐতিহ্যে আস্থা রেখে বুটা পালোয়ানের শিষ্য করিম বক্স পেরলে-ওয়ালা সেই ১৮৯২ সালে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন তা অক্ষুণ্ণ রাখায় আট বছর পরে যখন আবার ডাক পড়ে তখন মহামল্ল গোলাম যেন আরও প্রস্তুত।

এবারের পরীক্ষা কঠিনতর। পরীক্ষা-ভূমি সুদূর বিদেশ। এ ঘটনা বিংশ-শতাব্দীর জন্মলগ্নে। সেদিন (১৯০০) প্যারিসে আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী-আসরে উপস্থিত ছিলেন এক ভারতীয় প্রতিনিধিদল পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে। বিদগ্ধ ভারতীয়, শিল্পী-কলাকার এবং ক্রীড়াবিদে গঠিত সেই দল। সেই দলের বিশিষ্ট পুরুষ গোলাম পালোয়ান।

পণ্ডিত মতিলালেরই উৎসাহে প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী-কেন্দ্রেই দঙ্গল বসলো। এক পক্ষে গোলাম

অপরপক্ষে তুর্কী মহাবলী কোর দেরেলি। কোর দেরেলির তখন জগত-জোড়া নাম, বেসরকারী হিসেবে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ মল্লবীররূপে স্বীকৃত। দুরন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধলো দুপক্ষে। ঘণ্টা তিনেক টানাপোড়েন, জানমারি, কুস্তির পর বিচারকেরা গোলামের কপালেই জয়তিলক এ'কে দিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে এইভাবে ভারতের স্বাধীনতা আরও দৃঢ়মূল হয়ে উঠলো।

মহামল্ল গোলামের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে আরও কজন ভারতীয় মল্ল আন্তর্জাতিক ক্রীড়াভূমিতে মুক্ত বিচরণের সংকল্প বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। যথা ভুট্টান সিং, গঙ্গাব্রাহ্মান মহিউদ্দিন, গামা, ইমামবক্স, গোবর, আহমেদ বক্স, মিরাবক্স, গামু, বিদ্যোব্রাহ্মন। এ'দের মধ্যে লণ্ডনে ১৯১০—১১ সালে সহোদর গামা ও ইমাম বক্সের কীর্তি-কাহিনী সপ্রশংস স্বীকৃতিতে স্মরণীয়।

ঢিলে কুর্তা আর পায়জামার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ভারতীয় মল্লদের আসল পরিচয় চিনতে বৃটিশেরা প্রথম পর্ব আগ্রহ দেখাননি। কিন্তু ইমামবক্স খাস লণ্ডনে সুইস চ্যাম্পিয়ান জন লেম ও আয়ারল্যাণ্ডের প্যাট্ কানোলীকে এবং অগ্রজ গামা আমেরিকার ডাঃ রোলার এবং পোল্যাণ্ডের জিবিস্কোকে হারিয়ে দিতেই বৃটিশরা সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সেইসূত্রে সারা ইউরোপ, এমন কি আমেরিকাও কম্পিত শ্রদ্ধায় ভারতীয় মল্লদের মনে মনে সেলাম জানালেন।

সেকালে ডাঃ রোলার ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষপর্যায়ের মল্লবীর এবং জিবিস্কের আসন স্বীকৃতমতে বিশ্বের তৃতীয় শ্রেষ্ঠর স্থানে। গামার কাছে তাঁদের শোচনীয় পরাজয়ের দৃষ্টান্তে তখন থেকেই পশ্চিমী মল্লবীরেরা ভারতীয়দের সমীহ করে আসছেন এবং নানা ছলে তাঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করে চলেছেন।

রুশ চ্যাম্পিয়ান ও বিশ্বের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মল্ল জর্জ হেকেনস্মিথ ইউরোপে থেকেও লণ্ডনে গামার সঙ্গে লড়তে আসেননি। সারা ইউরোপ মান বাঁচাতে সেদিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মার্কিন মল্ল ফ্র্যাঙ্ক গচের দোরে ধর্না দিয়েছিল গামার সঙ্গে হাত মেলাতে। কিন্তু গচ রাজী হননি। উত্তরপর্বে গোলাম মহিউদ্দিন গাঁটের পয়সা ফেলেই ফ্র্যাঙ্ক গচের আস্তানা মার্কিনমুলুকে হানা দেন। তবুও গচ ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়িয়ে যান নানান অছিলায়। ব্যাপার বুঝে মার্কিনমুলুকে দাঁড়িয়েই মহিউদ্দিন বলে উঠেছিলেন, 'বামুন গেল ঘর; তো লাঙ্গল তুলে ধর!'—ইংরেজী প্রবাদে যার অর্থ বিড়ালের অন্তর্ধানেই মূষিকের দাপাদাপি শুরু হয়—অর্থাৎ না লড়েই ফ্র্যাঙ্ক গচ বিশ্বের চ্যাম্পিয়ন!

সেকালে এমনি অছিলায় ভারতেও অনেকক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মল্লক্রীড়ার অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হোতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯১১ সালে হারমস্টান সার্কাসের প্রস্তাবিত দঙ্গলের উল্লেখ করা যায়। তখনকার ভারতপ্রভু ইংরেজের করিম বক্স-টম ক্যাননের লড়াইয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ ছিল। তাই হারমস্টোন সার্কাসের দঙ্গলে অস্ট্রেলিয়া আগত চ্যাম্পিয়ন মল্লবীর পিটারের উদ্ধত চ্যালেঞ্জের জবাবে গোলাম-অনুজ রহমানি যেদিন আসরে নামতে চেয়েছিলেন সেদিন পুলিশ কমিশনারের ঘোষিত

নওরং সিং, হরনাম সিং, অমর সিং, গুর্তা সিং, মাজা, খোসলা চোবে প্রমুখ সেরা ভারতীয় মল্লবীরদের সঙ্গেও তাঁর মোকাবিলা হয়েছিল। এই অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার সম্পদ হাতে নিয়ে গোবর হাজির হন সুদূর সানফ্রান্সিস্কোতে এবং সেখানে ২৪শে আগষ্ট দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাড্ স্যানটেলকে চিৎ করে তিনি অর্জন করেন বিশ্বের লাইট-হেভী-ওয়েট-চ্যাম্পিয়ন মল্লের আনুষ্ঠানিক আখ্যা। এই কুস্তির উদ্যোক্তা ছিলেন মার্কিন মল্ল সমিতির পক্ষে বিখ্যাত প্রমোটার কফ্‌ম্যান।

গোবরের বিশ্বপ্রাধান্য প্রতিযোগিতায় আনুষ্ঠানিক সাফল্যের এই দৃষ্টান্ত পরশাসনের নির্মোক ভাঙ্গায় জাতিকে নতুন প্রেরণা জুগিয়েছিল। কারণ ১৯২১ সালে সানফ্রান্সিস্কোতে ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত গদর পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর। পার্টির কর্মীরা যেদিন সানফ্রান্সিস্কোর গুরুদ্বারে বিশ্ববিজয়ী গোবরকে সম্বর্ধনা জানান সেদিন তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে বলেছিলেন, 'একার সামর্থ্যে আপনি বিশ্বজয় করেছেন। আর আমরা সকলে মিলে মাতৃভূমির বন্দীদশা ঘোচাতে পারবো না! পারবো, নিশ্চয়ই পারবো!'

সে প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে সকলের সম্মিলিত সাধনায়।

ইমাম বক্স

করিমবক্স পেহালওয়ালা

জি মহম্মদ (বড় গামা)

আজ্ঞা প্রস্তাবিত অনুষ্ঠান বাতিল করে দেয়।

আফশোষের কথা এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে অথবা দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালে অনেক ভারতীয় মল্ল আনুষ্ঠানিক মতে স্বীকৃত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ গ্রহণে সুযোগ পাননি। পেলে, অসঙ্কোচে বলা যায় যে অনেকে, অন্ততঃপক্ষে গামা, ইমামবক্স, রহিম গুজরাঁওয়নদের নিশ্চয়ই বিশ্ববিজয়ে বিন্দুমাত্র অসুবিধে দেখা দিতো না। এই সুযোগ একমাত্র যে-ভারতীয়ের জীবনে এসেছিল ভারতীয় কুস্তির কৌলীন্য-গর্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনিও সফল হয়েছিলেন।

এই অনন্য ভারতীয় হলেন বাঙালী যতীন্দ্রচরণ গুহ ওরফে গোবর পালোয়ান। গোবরের বিশ্ববিজয়ের কাল ১৯২১ সাল। সুখ্যাত রহমানির সঙ্গে নৈমিত্তিক জোর করে গোবর পালোয়ান তৈরী হয়েছিলেন। সময় বিশেষে ঘরোয়া আখড়াতেও গুরুজবক্স কাল্লু, গামা, ইমাম বক্স এবং আলিসাই, গোরাপরতাপা,

মুক্তিপথের সন্ধানে অনেক জীবন বলি দিতে হয়েছে, তাজা রক্তের ধারায় চলার পথও পিছল হয়েছে তবুও সন্ধানী পরিক্রমণে ছেদ পড়েনি। অনেকের অনেক অবদানের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতার পাকা বনেদ গড়ে উঠেছে। সেখানে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের ভূমিকাও যে কিছুটা আছে, ক্রীড়ামোদী হিসেবে তাতেই আমাদের সান্ত্বনা।

সে ভূমিকা হয়তো তেমন প্রত্যক্ষ নয়। হঠাৎ নজর কাড়ার মতো নজীর নয়। কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে, সন্দেহ নেই। খেলার মাঠে ইংরেজকে হারিয়ে বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতার শানিত আক্রমণকে সংকুচিত করে দিয়ে পূর্বসূরী ক্রীড়াবিদেরা স্বাধীনতা-আন্দোলনের মর্মমূলে অপরিমিত শক্তির জোগান দিয়েছেন। জাতীয় চিত্তে এনেছেন দৃঢ়মূল আত্মবিশ্বাস। মাঠের খেলা জীবন খেলায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই কিছুটা নেপথ্যে থাকলেও এ ভূমিকা অস্বীকৃত থাকার নয়। এই ভূমিকা যে মহৎ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২ ।।

স্বামী অভয়পদের বিরুদ্ধে মহাশ্বেতার বিস্তর নালিশ। সে স্ত্রীর সঙ্গে কোনও দিন কোন বিষয় আলোচনা করে না; সে স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘকাল—প্রথম সন্তান হওয়ার পর থেকেই এক ঘরে বাস করে না; তারই পয়সায় শুধু নয়, বেশিরভাগ তারই গতরে এতবড় বাড়িটা উঠেছে অথচ তার বৌ শোয় সবচেয়ে পুরনো আর সবচেয়ে চাপা ঘরখানায় (তারই ব্যবস্থা) এবং সে নিজে শোয়, চলনে, তাও একখানা কাঠের বেঞ্চির ওপর; যুদ্ধের সময় চোরাই মাল সরিয়ে মোট মোট টাকা কামিয়েছিল, সেই সব টাকাটাই সে মেজ ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে, শুধু তাই নয় আজ পর্যন্ত মাইনের সমস্ত টাকাটা ধরে দেয় ভায়ের হাতে; খায় সে-ই সবচেয়ে খারাপ; কাপড় পরে সবচেয়ে মোটা আর খাটো; এক মোটা ময়লা জিনের কোট ছাড়া কোন জামা পরল না আজ পর্যন্ত; চিরকাল হেঁটে অফিস করেছে এখান থেকে—তিন ক্রোশ তিন ক্রোশ ছ' ক্রোশ পথ। এখন হাঁটতে পারে না ট্রেনে যায় কিন্তু ট্র্যামে কখনও চড়েনি—অথচ তারই পয়সায় বড়মানুষ হয়ে ভায়েরা কত কাপ্তেনি করছে; সংসারে খাটে মজুরের মত কিন্তু সে সংসার পরিচালনার ব্যাপারে একটা কথাও বলে না কোনদিন, এমন কি মেজকর্তার কুচক্করে-পানায় ছেলেগুলো যে একটাও লেখাপড়া শিখছে না—সে সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ উদাসীন; ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার পুরো নালিশের ফর্দ লিপিবদ্ধ করলে একটা বড় পুঁথি হয়ে যায়।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও, অভয়পদের এই সর্বশেষ কীর্তির জন্য মহাশ্বেতা সত্যিই প্রস্তুত ছিল না। সে যে ওর সঙ্গে এমন শত্রুতা করবে, এতবড় সাধে বাদ সাধবে তা কখনও কল্পনাও করে নি সে। যার সম্বন্ধে এই দীর্ঘকাল, প্রায় দু যুগ ধরে সে প্রচণ্ডতম অথচ অসহায় বিদ্বেষ বহন করে আসছে—তাকে এতদিন পরে আঘাত দেবার এমন অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রটি যে কেড়ে নেবে অভয়পদই—এ সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

আর কী কৌশলেই না মেজকর্তা অম্বিকাপদ এই কাজটি করিয়ে নিলে! উঃ সত্যি, বুদ্ধির কথা ধরলে নিত্য উঠে মেজকর্তার 'পাদোক জল' খাওয়া উচিত, এত বড় ধূর্ত, এমন ফন্দিবাজ বোধহয় আর দ্বিতীয় কেউ নেই। অন্তত মহাশ্বেতার জীবনে আর কারুর কথা মনে পড়ে না। তার চেয়েও এক কাঠি সরেশ হ'ল মেজগিন্নী। বিধাতা নির্জনে বসে এদের জোড় মিলিয়ে-ছিলেন।

না, একটা অনাথ বালক আশ্রয় পেল তাতে কোন ক্ষোভ নেই মহাশ্বেতার। প্রথম যখন খবরটা কানে গেল যে মেজ-বৌয়ের সদ্য বিধবা বোন সরমা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, একমাত্র অনাথ ছেলেটার মুখে জল দেবার কেউ নেই, পাড়ার লোকের দয়ার ওপর নির্ভর করে একা সেই ভূতুড়ে ভাঙা বাড়িতে পড়ে আছে—তখন কথাটা ঠোঁটের ডগায় এসেছিল মহাশ্বেতার, 'আহা ছেলেটাকে এখানে এনে রাখলে তো হয়।' আগেকার মতো বোকা থাকলে বলেই ফেলত হয়ত কিন্তু ইদানীং অনেক অগ্রপশ্চাৎ ভাবতে শিখেছে সে, ওর মুখ থেকে কথাটা বেরোলেই মেজবৌ লুফে নেবে, আর সেই সঙ্গে সে সম্পর্কে ভবিষ্যতে কোন কথা শোনাবার পথটিও চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। সেই ভেবেই অতিকষ্টে

সুখের কথা মুখে চেপে রেখেছিল মহাশ্বেতা।

অথচ ঠিক সেই কাণ্ডটিই তো হ'ল।

সরমা বেচারীর চিরকালই পোড়া কপাল। বিয়ে হয়েছিল যখন তখন ওর বর কোন্ সরকারী ইস্কুলে মাষ্টারী করে—তখনকার দিনের ঈপ্সিত পাত্র। কারণ বিদ্বান এবং সরকারী-চাকরে একাধারে। কিন্তু বিয়ের পরই দেখা গেল ওর স্বামী প্রভাস চিররুগ্ন; রোগ তার সর্বাঙ্গে, বলতে গেলে সর্ববিধ। বারোমাসই ভোগে এবং প্রায়ই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। ফলে মাসের পর মাস ইস্কুল কামাই হ'তে থাকে। নেহাৎ সরকারী ইস্কুল বলেই কাজটা অনেকদিন টিকে ছিল কিন্তু সমস্ত রকম নিয়মকানুন এবং কর্তৃপক্ষের ধৈর্যের সীমা যেদিন লঙ্ঘন করল সেদিন আর টিকল না।

সেও প্রায় দশ বছরের কথা। এর পর থেকেই প্রভাস বসে বসে খাচ্ছে। তবু তখনও মা ছিলেন, মার জন্য ছোট-ভাইকে কিছু কিছু করে দিতে হ'ত—এমনই বরাত ঐ সময় মাও মারা গেলেন। কোথাও থেকে কোন আয়ের পথ রইল না। কখনও এক আধটা মাষ্টারী যে না পেয়েছে তা নয়, কিন্তু কোনটাই রাখতে পারেনি। একমাস কি আঠারো দিন কাজ করার পরই যদি দু মাস কামাই হয় তো সে মাষ্টারকে রাখাই বা যায় কি করে? প্রাইভেট টিউশনিও মধ্যে মধ্যে পেয়েছে—দেশে ঘাটে সে টিউশ্যানির কীই বা মূল্য—তবু তাও তো থাকেনি। সর্বত্র একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অর্থাৎ এই দীর্ঘকাল বসে বসেই খেতে হয়েছে এবং কিছু কিছু চিকিৎসার খরচও যোগাতে হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার উপায় থাকত না প্রায়ই। চিকিৎসা করাতে গেলে ডাক্তার ডাকতে হয় ওষুধ কিনতে হয়। ইদানীং চোখ বুজেই থাকত প্রায় সরমা—পাড়াঘর থেকে শোনা টোটকাটুটকি ভরসা ক'রে। কিন্তু এক-এক সময় যখন খুব বাড়াবাড়ি হ'ত, তখন আর চুপ ক'রে থাকা যেত না। তার ফলে একে একে যথাসর্বস্ব—জমি জায়গা, গহনা, আসবাব, মায় বাসন-কোসন পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে। এছাড়া আত্মীয়স্বজনদের কাছে ভিক্ষা তো আছেই। কিন্তু ক্রমাগত সাহায্য করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়—সুতরাং তারা প্রায় সকলেই সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। একেবারে এমনি অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় এনে পৌঁছে দিয়ে প্রভাস যেদিন মারা গেল সেদিন সরমা আর কোনও পথই কোথাও দেখতে পায়নি—আত্মহত্যা ছাড়া। সেই পথই সে বেছে নিয়েছে, আসন্ন শ্রাদ্ধ ও ছেলের ভবিষ্যতের সমস্যা ভগবান ও পাড়ার লোকের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজে সে কড়িকাঠ ও পুরনো শাড়ির সাহায্যে সব জ্বালা থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

খবরটা পাওয়া গেল সন্ধ্যাবেলা ছোট দেওর দুর্গাপদর মুখে। সরমার গ্রামের একটি ছেলে ওদের অফিসে কাজ করে—তার মুখেই শুনেছে দুর্গাপদ। খবরটা শুনে মহাশ্বেতার চোখে জল এসে গিয়েছিল, ছেলেটাকে আনাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে—কিন্তু সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের এতবড় ব্রহ্মাস্ত্রটা নষ্ট করতেও মন ওঠেনি, দাঁতে দাঁত চেপে চুপ ক'রে ছিল।

সব মাটি করল অভয়পদ।

তিনভাই এক সঙ্গে খেতে বসেছিল। অম্বিকাপদই কথাটা তুললে 'আমার সেজশালীর কেলেঙ্কারীটা শুনলে দাদা?'

অভয়পদ মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল।

'কাল নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে সে!'

অভয়পদ মাথা নামিয়ে ধীরে সুস্থে ভাত মাখতে মাখতে শুধু প্রশ্ন করল, 'ছেলেটা?'

'ছেলেটা পাড়ার লোকের ওপর জিম্মে—আর কি! ঘরে নাকি একটা

কাঁথাকানিও আর নেই বেচবার মত। শ্রাদ্ধশান্তি করে শুদ্ধ হবারও একটা খরচ চাইতো, সেই জন্যেই বোধহয় কোনদিকে কোন কূলকিনারা না পেয়ে গলায় দড়ি দিলে ছুঁড়িটা। কীই বা করবে—এমন অবস্থা হয়েছিল ভিক্ষেও তো বোধহয় আর কেউ দিত না। নিত্যি নেই দেয় কে, নিত্যি রুগী দেখে কে! তা প্রভাসচন্দ্রের তো দুটোই ছিল কিনা।'

অভয়পদ কোন কথা কইল না, যেমন খাচ্ছিল তেমনি খেয়ে যেতে লাগল। রান্নাঘরের ভেতরেই ওরা খেতে বসেছে। বড় মেজ দুই বৌই সেখানে উপস্থিত। দেখা বা শোনা কোনটারই অসুবিধা নেই।

খানিকটা পরে অম্বিকাপদই আবার প্রসঙ্গটা তুলল, 'তাহ'লে কিছু তো সাহায্য করা দরকার—কী বল দাদা?'

'সাহায্য কী করতে চাও?' শান্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে অভয়পদ।

'যাহোক কিছু। আমার শ্বশুরবাড়ি থেকেও কিছু আসবে নিশ্চয়, কিন্তু খরচও তো কম হবে না, নমোনম করে করলেও বেশ কিছু খসবে। ছেলেটার তো শুনেছি লেখাপড়া বন্ধ হয়ে আছে। অথচ ওর নাকি মাথা খুব ভাল, পড়াশুনোয় চাড়ও খুব। পাড়ার লোকের কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে নিয়ে নিজে নিজেই পড়ে যা পারে।'

'ছেলেটাকে এখানে বরং আনিয়ে নাও, যা হয় ক'রে এখানেই শুদ্ধ হবে খন্।'

সংক্ষেপে এই কথা বলে একেবারে উঠে দাঁড়ায় অভয়পদ। রাত্রের খাওয়া তার খুবই কম, সেটুকু সারা হয়েই গেছে।

ঠিক এতটার জন্য বোধহয় অম্বিকাপদ তৈরি ছিল না, কিংবা সবটাই অভিনয় (মহাশ্বেতার বিশ্বাস তাই)—সে একটু অবাক হয়ে বললে, 'এখানে আনিয়ে নেব? মানে বরাবরের মতো? নইলে একবার নিয়ে এলে তো আর ঘাড় থেকে নামানো যাবে না!'

'সেইটেই যথার্থ উপকার করা হবে, নইলে দু দশ টাকা সাহায্য করলেই বা কি না করলেই বা কি? ওর শুদ্ধ হওয়া কি আর আটকে থাকবে? যেমন করে হোক হয়েই যাবে।'

'কিন্তু তাই বলে এতবড় একটা দায়িত্ব নেওয়া—। এখানে আনলে মানুষ করার সব দায়টাই তো চাপবে আমাদের ওপর!'

'তোমার এখানে এতগুলো লোক খাচ্ছে একটা ছেলে বাড়তি খেলে টেরও পাবে না। আর মানুষ করা? মানুষ যদি হয় তো সে আপনিই হবে—না হয় সেখানে থাকলেও যা করত এখানেও তাই করবে। জবাবদিহি তো কারুর কাছে করতে হবে না সে জন্যে!'

অভয়পদ আর দাঁড়াল না। তার পক্ষে এতগুলো কথা বলাই ঢের।

আর বলার দরকারই বা কি! অম্বিকাপদর মুখ স্মিত প্রসন্ন ভাব ধারণ করল। প্রমীলা স্বামীকে উপলক্ষ্য করে এবং সম্ভবত মহাশ্বেতাকে লক্ষ্য ক'রে বললে, 'সত্যি, অনেক তপস্যা ক'রে এমন দাদা পেয়েছিলে! মানুষ নয়—সাক্ষাৎ দেবতা। আমাদের সঙ্গে মিলোতে গিয়েই আমরা ভুল করি, দোষ দিই—কিন্তু আমাদের মাপে মেলবার লোকই নয় যে। ...ও'কে এখনও তোমরা কেউ চিনতে পারোনি—এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি!'

মহাশ্বেতা এতক্ষণ অসহ্য ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষছিল। এবার আর থাকতে

পারল না, বলে উঠল, 'কেমন করে চিনবে মেজবৌ, যাদের গোড়ে গোড় দেয় সদাসর্বদা তারাই চেনে! মনের মতো কথা বললেই দেবতা—নইলে যারা হক্ কথা বলে তারা সব জানোয়ার বই তো কিছু নয়!'

'পড়ল কথা সবার মাঝে যার কথা তার গায়ে বাজে! তোমারই বা অসৈরণ হয় কেন দিদি! তোমায় তো কেউ বলেনি। তাছাড়া কে হক্ কথা বলে আর কে মিছে কথা বলে তা তো ঠিক করে বোঝবার কোন উপায় নেই! তা তোমার মতে হক্ কথাটা কি শুনিই না?'

'আর শুনে দরকার কি ভাই! যার কথা শোনবার তা তো শোনা হয়েই গেছে। দেববাক্য বেদবাক্য তো বেরিয়েছে মুখ দিয়ে—আর কেন!'

'তবে কি তুমি বলতে চাও, এনে কাজ নেই ছেলেটাকে? পষ্ট করে খুলে বলই না মনের কথা! অনাথ আতুর একটা ছেলে তোমাদের বাড়ির দুটো পাত কুড়োনো ভাত খেয়ে মানুষ হ'ত—তা না হয় হবে না। কী করা যাবে, মনে করব সেও নেই, মরে গেছে। চোখে তো দেখতে যাচ্ছি না। তা ছাড়া—রাস্তা তো কেউ তার ঘোচায়নি, কত লোকই তো ভিক্ষে ক'রে জীবন কাটাচ্ছে! ...তার জন্যে এত রাগারাগির কী আছে? বটঠাকুর যাই বলুন, তোমার যদি মত না থাকে তো তাকে আনবে কে এখানে? আনব কি দুবেলা তোমার ঐ মধুর বাক্য আর খোঁটা শোনবার জন্যে? তারপর শোকাতাপা ছেলেটা রেলে গলা দিক কি পুকুরে ঝাঁপ দিক—আমাদের মুখটা আরও উজ্জ্বল হোক্ আর কি! চোখের বাইরে যা খুশি হোকগে, মরুক বাঁচুক আমরা তো আর দেখতে যাচ্ছি না। আমরা কেন এখানে এনে মাঝখান থেকে নিমিত্তের ভাগী হই?... না বাপু, ও বটঠাকুর যাই বলুন, বড়গিন্নীর যখন মত নেই, তখন তুমি ও ব্যাপারে আর যেও না, এই সাফ্ বলে দিলুম!'

মহাশ্বেতা এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল, মুগ্ধ হয়ে শুনছিলও বলা যায়—সে গালে হাত দিয়ে একদিকে মাথাটা হেলিয়ে বলল, 'বাব্বা কী বানাতেই পারিস তুই মেজবৌ! তাকে আনা আমার ইচ্ছে নয়—একথা আমি কখন বললুম লা, কার গলা জড়িয়ে বলতে গেলুম? বলে শুনে এস্তক চোখে জল রাখতে পারছি না, মনটা ছটফট্ করছে—একটা দুধের বালক বাপ-মা মরা অনাথ—তার যদি একটা গতি হয় আমি তাতে বাদ সাধব! না তাকে আমি কথা শোনাতে যাব?... আমি কি এমনই পিচেশ?... উঃ ধন্যি বাবা, ধন্যি! দিনকে রাত করতে পারিস তোরা। 'আমারই ঘাট হয়েছিল তোদের কাছে মুখ খুলতে যাওয়া। বলি না তো কখনও, মুখে তো কুলুপ এঁটেই থাকি! যে যা খুশি করুক, মরুক হাজুক—এই শিক্ষা হয়ে গেল, আর যদি কখনও দুটি ঠোঁট ফাঁক করি!'

বলতে বলতে রাগে দুঃখে অভিমানে অবিচারবোধে দু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে মহাশ্বেতার—সে ছুটে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আর যেতে যেতেই—সেই অবস্থাতেই নিজের নির্বুদ্ধিতার পূর্ণ অর্থটা হৃদয়ঙ্গম হয়। এ বিষয় নিয়ে অন্তত মেজবৌকে কোন কথা শোনাবার পথটা সেও বন্ধ করে দিয়ে এল চিরদিনের মতো। আর শুধু অভয়পদকে দিয়েই নয়, তাকে দিয়েও বলিয়ে নিলে মেজবৌ, ছেলেটাকে এখানে আনাবার কথা!

॥ ৩ ॥

অরুণ প্রথমে এসে কিছুটা বুঝতে পারেনি। প্রথমত দুটো প্রবল শোক, একান্ত নিঃসহায় এবং পরমুখাপেক্ষী হওয়ার দুর্ভাবনা, তারপর একেবারে অপরিচিত পরিবেশ সবটা মিলিয়ে সে একটু বিহ্বল হয়েও পড়েছিল। কোন জিনিস ভাল করে লক্ষ্য করার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। তাছাড়া, কোন ঘটা না থাক—শ্রাদ্ধশান্তির কিছুটা ঝঞ্ঝাটও আছে—সেজন্য নিজেকে নিয়ে যথেষ্ট বিব্রত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু সে সবগুলো মিটে গেলে থিতিয়ে বসার পর যখন চারিদিকে চাইবার মতো দৈহিক ও মানসিক অবস্থা হ'ল তখন সে বেশ একটু অবাকই হয়ে গেল। ছেলে তিন কর্তার মিলিয়ে যেটের আটটি তখনই—মেয়ে অবশ্য একটি। লেখাপড়ার বয়স এদের সকলেরই হয়েছে, প্রথম তিনজনের তো উৎরেই গেছে। মেজকর্তা ও ছোটকর্তার তিন ছেলে এবং বড়কর্তার ছোটটি তবু ইস্কুল পাঠশালায় যায় একবার ক'রে—বড়গুলো তাও যায় না। যারা যায় তারাও কেউ কখনও বাড়িতে বই নিয়ে বসে না। এরা তাহ'লে পড়ে কখন?

অরুণের পড়াশুনো হয়নি, হ'তে পারেনি ব'লে। কিন্তু ভদ্রলোক ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলেরা যে পড়াশুনোর একটা ঠাট্ বজায় রাখারও চেষ্টা করে না এবং সেজন্যে তাদের অভিভাবকরাও কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন নন, এটা তার সমস্ত

অভিজ্ঞতার অতীত। তাই সে প্রথমদিকে একদিন একটা বোকার মতো প্রশ্নও ক'রে ফেলেছিল মেজছেলে কেষ্টকে, 'ভাই তোমরা পড় কখন?'

কেষ্ট বা কৃষ্ণপদকে প্রশ্ন করার কারণ—এ বাড়ির মধ্যে তাকেই ওর সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও ভদ্র ব'লে মনে হয়েছিল। সে কথাও কয় এদের মধ্যে কম।

কেষ্ট এ প্রশ্নে কিছুটা বিব্রত বোধ করেছিল। সে একবার ঢোক গিলে, বাইরের দিকে চেয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'না, মানে পড়ি—এই কদিন গোলমালে সব ওলটপালট হয়ে গেছে আর কি! বসতে হবে—এবার বসতে হবে!'

কিন্তু তার এই আত্মসম্মান বজায় রাখার ক্ষীণ চেষ্টাটুকুকে একেবারে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠেছিল স্বর্ণ. 'তবেই হয়েছে! তুমি কাকে কি জিজ্ঞেস করছ অরুণদা! পড়া! মেজদাকে তুমি গাছে ওঠার কথা জিগ্যেস করো, ঘুড়ি ওড়াবার কথা বল—মাছ ধরতে বল, পোস্কার পোস্কার জবাব পাবে। এমন কি খুটির বাজারে কোন্ জিনিসের কি দর, তা পজ্জন্ত ওর মুখস্থ। ঐ লেখাপড়ার কথাটি বাপু জিগ্যেস করোনি। ওটা এ বাড়ির ধাতে সয় না!'

কেষ্ট আরও অপ্রতিভ হয়ে ওঠে। লজ্জাটা রাগে রূপান্তরিত হয়ে চোটটা গিয়ে পড়ে স্বর্ণর ওপর, দ্যাখ বুঁচি, মেলাই ফ্যাচ ফ্যাচ করিসনি বলে দিলুম। মারব টেনে গালে একটি চড়, ছোট মুখে বড় কথা বল। বার ক'রে দেব একেবারে!'

ঠোঁটের একটা অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গি ক'রে বিচিত্র সুর টেনে সমান তেজের সঙ্গে জবাব দেয় বুঁচি, 'ইঃ! টেনে চড় মারবে! তবেই তো আমি ভয়ে ইদুরের গর্ত খুঁজলুম আর কি! মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখ না একবার, মেজকাকী তোমার কি খোয়ারটা করে! ...অত তো তেজ দেখাচ্ছ, বেশ তো কই বার করো না, দেখাও না অরুণদাকে তোমার কখানা আর কী কী বই আছে! নিয়ে এসো না, দেখি!'

'যাঃ যাঃ! ওকে দেখাতে যাব কী জন্যে? ও কি আমাদের গার্জেন নাকি! যাকে দরকার বুঝব তাকে দেখাব!' কেষ্ট একটা অবজ্ঞার ভঙ্গি ক'রে চলে যায় সেখান থেকে।

আবারও খিল খিল করে হেসে ওঠে স্বর্ণ। বলে, 'মুখসাপেটটুক তবু রাখা চাই ছেলের! ওধারে মুখ শুকিয়ে আমসি।...সে যাকগে মরুক গে, মোদ্দা ওদের মুখ চাইলে তোমার পড়া হবে না। তুমি তোমার নিজের মতো নিজে পড়বে।'

দশ বারো বছরের মেয়ে, সে তুলনাতেও বরং কিছু বেঁটেই দেখায় স্বর্ণকে। অর্থাৎ সেদিক দিয়ে মায়ের ধাতে গেছে। যদিও গায়ের রংটা তার দেখবার মতো, মুখচোখও কাটাকাটা, অভয়পদর মেয়ে বলে চিনতে ভুল হয় না। কিন্তু স্বভাবটি পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে, এই বয়সেই গিন্নি গিন্নি ভাব, হাতপা ঘুরিয়ে মুখচোখ নেড়ে কথা বলে বয়স্কা ঠাকুমা দিদিমার মতো।

ঐটুকু মেয়ের অমনি পাকা কথা আর গিন্নিদের মতো চোখমুখ ঘুরিয়ে কথা বলা দেখলেই হাসি পেত অরুণের। আজও হাসি পেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখখানি ম্লান হয়ে উঠল তার। মাথা হেঁট করে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা ঘষতে ঘষতে বলল, 'আমি—মানে আমার তো বই পত্তর কিছুই নেই, ভেবেছিলুম এদের বই চেয়ে নিয়ে পড়ব। তেমন বই-ই তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।'

'আছে। তেমন খুঁজলে এক আধখানা বেরোবে বৈকি! মেজকাকার চেষ্টার তো কসুর নেই। বই সবাইকেই কিনে দিয়েছিল—একেবারেই বাজে খরচ দেখে এদানতে আর বড়গুলোকে দেয় না। তবে সে সব বই যে কোথায় আছে, কেমন আছে তা বলতে পারবনি। সে বই খুঁজে বার ক'রে তবে তুমি পড়বে—এই ভরসায় যদি থাকো তাহলে এহকালে আর তোমায় পড়তে হচ্ছে না, এ আমি পষ্টাপুষ্টি বলে দিচ্ছি! দাদার ভরসা বাঁয়ে ছার!...আর সে তুমি পড়বেই বা কি, ওরা তো সেই কোন্ কেলাস থেকে সব পড়া ছেড়েছে তার ঠিক নেই, সে বইতে তোমার কী হবে? তুমি তো আগে আগে ইস্কুলে পড়েছ শুনেছি।... না না, তোমার অন্য ব্যবস্থা করতে হবে! দাঁড়াও মেজকাকীকে বলিগে—'

ছুটেই চলে যাচ্ছিল, অরুণ খপ্ ক'রে ওর একটা হাত ধরে ফেললে। ধরে ফেলেছিল হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথায়, তারপরই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে, 'তা তোমার বই কই? তুমিও তো কিছু পড় না দেখি!'

স্বর্ণ ওর ধরণ দেখে আবারও হেসে উঠল। তারপরই কিন্তু মুখটা গম্ভীর করে পাকাগিন্নীর ভঙ্গিতে বললে, 'হ্যাঁ, মেয়েছেলের আবার পড়া! যাবো তো পরের বাড়ি, আজ না হোক দুদিন বাদে সেই যেতেই তো হবে। আর সেখানে গিয়ে তো সেই হাঁড়ি-বেড়ি ধরা আর গোবর নিকোনো! গোচ্ছার পড়ে হবেই বা কি! না, ওসব বাপু আমার ভাল লাগে না। ততক্ষণ মা কি মেজকাকীকে সংসারের যোগাড় দিলে ঢের কাজ হবে।'

এবার অরুণও না হেসে পারল না। বললে, 'কিন্তু পরের বাড়ি গিয়ে গয়লা-ধোপার হিসেবটাও তো রাখতে হবে। তাছাড়া বাপের বাড়িতে চিঠিও লিখতে ইচ্ছে করবে তো দু'চারখানা। আজকাল তো সব মেয়েই পড়ে কিছু কিছু। একটু লেখাপড়া জানা থাকলে নিজের ছেলে-মেয়েদেরও পড়াতে পারা যায়।'

'কে জানে বাপু! আমাদের তো হিসেব টিসেব সব মেজকাকাই রাখে।
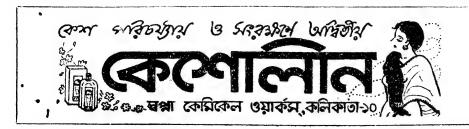
অবিশ্যি মেজকাকী ছোটকাকীও কিছু কিছু জানে। ছোটকাকী তো বইটই হাতে পেলে বেশ পড়ে দেখিছি।......তা বেশ তো, তুমি পড়াশুনো আরম্ভ কর—আমি বরং তোমার কাছে পড়া বলে নেব, য়্যাঁ? সেই বেশ হবে।'

অরুণ হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল কিন্তু সেটা দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করল না স্বর্ণ—এক দৌড়ে চলে গেল রান্নাঘরে মেজকাকীর কাছে।

'হ্যাঁ গা মেজকাকী, তোমাদের তো মুখ্খুর সংসার, কারুর কিছু হবে না। তা ঐ ছেলেটাকেও কি বসিয়ে বসিয়ে মুখ্খুর ডিম করবে?'

'কে লা, কার কথা বলছিস?' প্রমীলা একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে চায়।

বাড়ির মধ্যে এই একটিই মেয়ে বলে স্বর্ণলতার আদর বেশী, তার সর্বত্রই অবারিত দ্বার। আজকাল বড়দের কাছে কোন কিছু চাইতে হলে ছেলেরা ওকেই মুরুব্বি ধরে। বুঁচি সুপারিশ করলেই আর্জি মঞ্জুর হয়—এ তারা বার-বারই দেখেছে।

প্রমীলাও এই মেয়েটিকে ভালবাসে। এক মেয়ে বলে নয়—ওর মতো পরিষ্কার মন আর কারুর নেই বলে। ওর আপন-পর জ্ঞান কম, সবাইকেই আপন বলে মনে করে। তাছাড়া আজকাল মহাশ্বেতা কিছু কথা শোনাতে এলেই স্বর্ণ মেজ-কাকীর হয়ে ঝগড়া শুরু করে দেয়। সেটাও সম্ভবতঃ ওর প্রতি প্রমীলার প্রীতির একটা প্রধান কারণ।

আজও সে সস্নেহে স্বর্ণর একটা হাত ধরে বললে, 'বলি ব্যাওয়াটা কি? গিন্নিমা আজ আবার সাত সকালে কার ওপর সদয় হয়ে উঠলেন?'

অরুণ থপ্ ক'রে ওর একটা হাত ধরে ফেললো।

'এই তোমার বোনপোর কথাই বলছি!' হাতমুখ চোখ ঘুরিয়ে বলে স্বর্ণ, 'বলি ও তো এবাড়ির ছাঁচে নয়, ওর লেখা-পড়ায় চাড় আছে, ওর বিদ্যে হবেও। তা ওর বইপত্তরের কিছু ব্যবস্থা করে দাও!,

'বল্না গিয়ে তোর মেজকাকাকে। মেজকাকা তো তোর কথায় ওঠে বসে!' প্রমীলা ওর গাল দুটো টিপে দিয়ে বলে।

'হ্যাঁ, তা আর নয়! মেজকাকা যে কার কথায় ওঠে বসে তা এবাড়ির সব্বাই জানে। আমাকে আর ঘাঁটিও নি বাপু! এখন ওর কি করবে তাই বলো।'

'হবে গো গিন্নি হবে। এই তো আসছে মাস থেকে নতুন কেলাস শুরু হবে সব ইস্কুলে, তোমার মেজকাকা বলেছে ওকে একেবারে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে বইপত্তর কিনে দেবে!'

'বেশ বাপু বেশ। একটা সুরাহা হলেই ভাল।'

রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে বোধ-করি অরুণকেই খবরটা দিতে আসছিল, স্বর্ণ কিন্তু রোয়াক পেরিয়ে দালানে পড়তেই পড়ে গেল একেবারে মায়ের সামনে। মহাশ্বেতা এখান থেকে সবই শুনতে পেয়েছে, সে মুখের একটা বিশ্রী ভঙ্গি করে চাপাগলায় বলে উঠল, 'পরের ভেয়ের জন্যে তো মাথাব্যথার অন্ত নেই একেবারে! নিজের ভাইদের লেখা-পড়ার কী হচ্ছে তা তো কোনদিন ভাবতে দেখি না। কৈ, এত তো পিরীত, তাদের জন্যে একটা মাষ্টার রাখতে তো বলতে পারিস মহারাজা-মহারাণীকে!'

'হ্যাঁ—তা আর নয়। যা রত্ন এক-একখানি গব্ভে ধারণ করেছ সব! ওদের জন্যে মাষ্টার রাখবে! কত পড়ার চাড় ওদের দেখছ না! বলি মেজকাকা কী চেষ্টার কমতিটা করেছে শুনি? ওদের ইস্কুলে দেয় নি? না বই কিনে দেয় নি? সেসব কোথায় গেল? ছেলেদের ইস্কুলে পাঠাতে পেরেছিলে? মাস মাস একরাশ করে টাকা গুণগার দিয়ে এদানীতে না বন্ধ করেছে।......কত গুণের ছেলেরা তোমার তা দ্যাখো না—শুধু শুধু পরের ওপর রীষ করে জ্বলে পুড়ে মর!'

'মুয়ে আগুন! মুয়ে আগুন লাগুক তোমার! কথার ছিরি দ্যাখো না। ভায়েরা সব যেন শত্তুর ওর। পরঘরী এখন থেকে ঘর ভাঙছেন! মর্ মর্! একধার থেকে তোরা মরিস তো আমি শান্তি পাই, আমার হাড় জুড়োয়। ঘর জ্বালানে পর ভালানে কোথাকার! কবে মরবি তুই, কবে খালধারে যাবি তাই বলে যা আমায়!'

'দাঁড়াও আগে তোমাকে পাঠাই, তবে তো যাব!'

মুচকে হেসে আবার ছুটে চলে যায় স্বর্ণ। মার গালাগাল তার গা-সওয়া হয়ে গেছে।

ক্রমশঃ

মার্কিনী জীবন

বুদ্ধদেব বসু
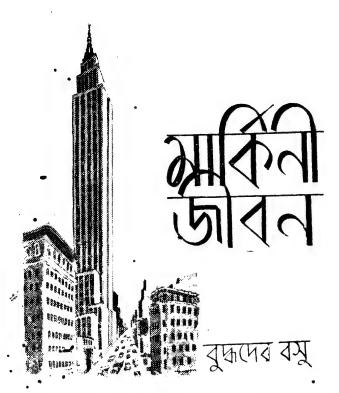
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি এ-বিষয়ে সচেতন যে আমেরিকায় এমন কিছু নেই, যার সঙ্গে লণ্ডনের স্মৃতিমেদুর গাম্ভীর্যের বা প্যারিসীয় শ্রী ও বিলাসের তুলনা হ'তে পারে,—বা যাতে পাওয়া যায় সেই বিশেষ ধরনের সুখ ও সৌষ্ঠবের স্পর্শ, যা রোম অথবা মুনিকে প্রাপণীয়। এবং আমি এ-কথাও ভুলে যাইনি যে মার্কিন দেশের য়োরোপীয় আত্মা দুই শতক ধ'রে এমনভাবে রূপান্তরিত হয়েছে যে আজ তাকে একাধিক অর্থে নতুন দেশ বলা যায়। একই মৌলিক সভ্যতার অন্তর্ভূত, ও পরস্পরের আত্মীয় হয়েও, বিভিন্ন দেশে (এমনকি প্রদেশে) যে-সব বৈশিষ্ট্য স্বতই দেখা দেয়, তাতেই প্রমাণ করে যে 'এক হওয়া মানে একাকার হওয়া নয়,' আর মনের ধর্মই অভিব্যক্তি। য়োরোপই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জননী, কিন্তু সন্তানের সতেজ ও স্রোতস্বল যৌবন প্রৌঢ়া মাতাকে বিস্মিত ক'রে দিয়েছে। জ্ঞাতিত্বে এত নিকট ব'লেই তফাৎগুলো এমন ঔৎসুক্যজনক। মনে হয়, য়োরোপে যার জন্ম তার পরিণতি যেন আমেরিকায়;—যে-সব যন্ত্র, বিজ্ঞান, ধারণা ও ভাবধারা পনেরো থেকে উনিশ শতকের মধ্যে য়োরোপে উদ্গত হয়েছিলো, যা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এই আধুনিক জগৎ, এবং যা সর্বমানবের জীবনে আজ স্বীকৃত, তার দূরতর সম্ভাবনার ঘটনাস্থল এই মহাদেশ। যন্ত্রের এমন ব্যাপক ও ক্ষমতাপন্ন ব্যবহার অন্য কোনো দেশে দেখা যায় না। ট্রেন, গাড়ি, লিফট, সাব-ওয়ে—সবই আকারে বড়ো, সংখ্যায় বেশি, ও অধিক বেগবান, দু-হাজার মাইল দূরস্থ বন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনে সংযুক্ত হ'তে তিন সেকেন্ড মাত্র সময় লাগে; যে-কোনো দুই বড়ো শহরের মধ্যে ট্রেন ও প্লেন যাতায়াত করছে ভোর থেকে নিশীথ পর্যন্ত ঘণ্টায়-ঘণ্টায়; আন্তঃরাজ্যিক বাসগুলি তট থেকে তটান্তর পর্যন্ত অহর্নিশ সঞ্চরণশীল। বিমানবন্দরে জেট-প্লেন থেকে নেমে, তারপর হেলিকপ্টারে চ'ড়ে হোটেলের ছাতে অবতরণ, রবিবাসরীয় দৈনিক একশো পৃষ্ঠা ও উপরন্তু দুটি বৃহৎ ক্রোড়পত্র; ট্রেনে বা প্লেনে চলতে-চলতে টেলিফোনে বাড়ির অথবা আপিশের সঙ্গে কথা বলা; আকাশের গায়ে ধূমাক্ষর আঁকা বিজ্ঞাপন;—এ-সব নূতনত্ব অন্য কোথাও দেখা যায় ব'লে আমি জানি না। এ-বিষয়ে বেশি বলা বাহুল্য, কেননা কে না জানে মার্কিনী জীবনে বস্তু যেমন বহুবিধ ও প্রচুর, তেমনি আছে অসংখ্য, ক্রমবর্ধমান ও অংশত নিষ্প্রয়োজনীয় 'গ্যাজেট' বা কলকব্জা।

কিন্তু এর একটা উল্টো দিকও আছে। 'এ-দেশে সুবিধে আছে অগুনতি, কিন্তু আরাম নেই।' কথাটা যে-মহিলার মুখে শুনেছিলাম, তিনি বাস করছেন প্রায় তিরিশ বছর ধ'রে আমেরিকায়, কিন্তু বাঙালির ঘরে জন্মে, জীবনের আদিপর্ব সেখানেই কাটিয়েছিলেন—নয়তো সুবিধে ও আরামের এই তুলনাটুকু তাঁর মনে আসতো না। কত সত্য এই কথা, তা বুঝতে আমার অল্পই সময় লেগেছিলো। যন্ত্র নামক মহাভৃত্য নিরন্তর উপস্থিত,

কিন্তু মনুষ্যদেহধারী এক-আধজন সাহায্যকারীর অভাবে জীবন কী-রকম শ্রমাক্ত ও শৃঙ্খল হ'য়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্ত যে-কোনোদিন যে-কোনো স্থলে দেখতে পাওয়া যায়। পিটসবার্গে বিপণি-পাড়ায় মহিলাদের দেখতাম : সপ্তাহের বাজার নিতে বেরিয়েছেন, চার-পাঁচ দোকান ঘুরতে হচ্ছে, আকটিকণ্ঠ পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে চলেছেন বাতাসে বরফে কুঁজো হ'য়ে বন্ধুর পথে, গাড়ি আছে আধ মাইল দূরে;—বাড়ি পৌঁছে আবার সিঁড়ি, চাবি ঘোরানো, 'এটা একটু ধরো' বলার কেউ নেই। স্যুটকেসের ভারে বেঁকে গিয়ে চলেছে রেল-স্টেশনে তরুণী ছাত্রী; অনেক সিঁড়ি, বিরাট লম্বা প্ল্যাটফর্ম; তার উপর যদি মিনিটে-এক-মাইল বেগে চলন্ত দোলায়মান ট্রেনে, কামরাগুলোর মধ্যবর্তী পাষাণপ্রতিম দরজা ঠেলে-ঠেলে, আসনের সন্ধান করতে হয়, তাহ'লে দাঁতে দাঁত চেপে নিশ্বাস নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। মফস্বলে প্রোফেসর এসেছেন আমাকে নিয়ে আমেরিকান এক্সপ্রেসের আপিশে, আমার কাজ সারতে একটু দেরি হচ্ছে দেখে তাঁর মুখ উদ্বিগ্ন, কেননা গাড়ি পার্ক করার জন্য মিনিট গুনে দাম দিতে হয়, দৈবাৎ ভুল হ'য়ে গেলে জরিমানা। এবং দশ হাজার যন্ত্র মিলে যে-একটি আদিশ্রমের লাঘব করতে পারেনি, বরং আমেরিকায় যা অনবরত অপরিহার্য, তা হ'লো পদচালনা। ন্যু ইয়র্কে পরিবহণ প্রচুর, তবু যদি একই দিনে থাকে নগরের বিভিন্ন অংশে একাধিক নিয়োগ, তাহ'লে—ট্যাক্সি নেবার সামর্থ্য বা ইচ্ছে না-থাকলে—সাব-ওয়ের সিঁড়ি, পেন্ স্টেশনে আরো দুই স্তর পাতালে নেমে অন্য গাড়ি ধরা, প্রকাণ্ড গোলধাঁধার মতো টাইমস স্কোয়ার স্টেশনের জটিল অলিগলি পেরিয়ে আবার গাড়ি বদল, অবশেষে আকাশের তলায় উঠে আসা, সেখান থেকে রাস্তার নম্বর গুনে-গুনে নিয়োগস্থলে পৌঁছনো আবার একইভাবে অন্যত্র—সব মিলিয়ে দশ-বারো মাইল হাঁটতে হ'লে এমন কী আর বেশি বলা যায়! অর্থাৎ, এত রকম সুবিধে সত্ত্বেও, এখানে জীবনযাপনের পরীক্ষাটি বড়ো সহজ নয়; তাতে সসম্মানে পাশ করতে হ'লে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই চাই প্রভূত পেশীবল, গতির ক্ষিপ্রতা, গৃহকর্মে নৈপুণ্য, পুঙ্খানুপুঙ্খে মনোযোগ; অন্যমনা বা উদাস ভাবটির প্রশ্রয় নেই এখানে, হস্তপদের ক্ষমতা কম হ'লে লজ্জা পেতে হয়;—যেন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড় চলছে, এমনি কাটে দিনের পর দিন।

এ-দেশে যে-পরিমাণ ধন উৎপন্ন ও সঞ্চিত হচ্ছে, এবং যে-ভাবে তা সর্বসাধারণে আবর্তমান, তার তুলনা বিশ্ব-ইতিহাসে কোথাও নেই; কিন্তু লোকেরা নয় ভোগেচ্ছু বা বিলাসী;—এদের ঐশ্বর্যের অন্য পিঠে আছে বিপুল শ্রম, কঠিন স্বাবলম্বিতা, আর এমন এক প্রকার নিয়মনিষ্ঠা যা কখনোই কিছু ফেলে রাখে না, মুহূর্তের দাবি প্রতি মুহূর্তে মিটিয়ে চলে। সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত আট-ন' ঘণ্টা ক'রে খাটুনি, দুপুরবেলা ডেস্কে ব'সেই কফি-স্যান্ডুইচ, আর সপ্তাহান্তে—যার যেমন রুচি—বিশ্রাম, বিনোদ বা উত্তেজনায় গা ঢেলে দেয়া : এই হ'লো সাধারণ লোকের সাধারণ জীবন। নিজের অথবা বন্ধুর 'পল্লী-কুটিরে' পলায়ন, বেলা এগারোটার আগে বিছানা ছেড়ে না-ওঠা, যামিনীর দ্বিতীয়ার্ধে বাড়িতে পার্টি জমানো, বিবিধ ক্রীড়া ও প্রমোদ—সাপ্তাহান্তিক কৃত্য বলতে এগুলোকেই বোঝায়; কিন্তু যে-বেচারা শুধু টেলিভিশন দেখে আর্তগ্রীব হয়েছে, এবং যে-বীর চর্মতুল্য রসনা ও প্রস্তরবৎ মস্তকের ভারে পীড়িত, সোমবারে তারা দু-জনেই যথাসময়ে কর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছবে—বৃষ্টি, বরফ, ঝড়-ঝাপটা যা-ই হোক না। স্বাস্থ্য, উদ্যম, কর্মিষ্ঠতা, দার্ঢ্য, ক্লান্তিহীনতা—অন্ততপক্ষে ক্লান্তি গোপন করার শক্তি—এ-সব গুণ উত্তর য়োরোপেও প্রকট, কিন্তু আমেরিকায় এগুলোর চর্চা যে-রকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধভাবে স্বীকৃত, তা, মানতে বাধা নেই, আমাদের অনেকের পক্ষেই অনুকরণের অগম্য। 'ক্লান্ত আছি', 'মন ভালো নেই', 'মাথা ধরেছে'—এ-রকম কথা মুখ ফুটে কেউ বলে না কখনো—সেটা প্রায় সামাজিক বেয়াদবি *; সকলেই সব সময়ে প্রস্তুত ও উপস্থিত, প্রসাধন ও বেশভূষার প্রতি অবিরাম মনোযোগও এইজন্যে যাতে চোখে-মুখে কোনো মালিন্য কখনো ধরা না পড়ে। যাদের সামাজিক জীবন বৃহৎ ও বিচিত্র, ও কর্মকাণ্ড বহুমুখী, ঘরের বাইরে, নিত্য-নব সংস্রবে ও বিনিময়ে যাদের অধিকাংশ জাগ্রত প্রহর কেটে যায়, তাদের পক্ষে এই ধরনের প্রস্তুতি যে অপরিহার্য তা একটু
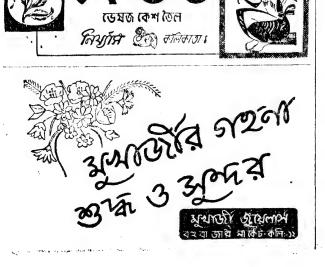
* সামাজিক জীবনে যা অনুমত নয়, সেই সব স্বীকারোক্তির জন্য আগে ছিলেন পুরোহিত বা কুলগুরু, এখন আছেন নানা-ধরনের ডাক্তার বা মনোবিজ্ঞানী। আমাদের ন্যু ইয়র্কীয় বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন ইয়ুং-এর শিষ্য; আমি একদিন তাঁকে জিগেস করলুম তাঁর পেশার ঠিক প্রকৃতি কী। তিনি বললেন, 'আমি সাইকিয়াট্রিস্ট—মনোরোগের চিকিৎসক নই; আমি মনোবিদ—সাইকলজিস্ট। আমার কাজ বাড়িতেই; নানা ধরনের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে লোকেরা আসে আমার কাছে, আমি তাদের সাহায্য করি।' 'তারা উপকৃত হয়?' 'হয় বইকি, নয়তো আসে কেন?' 'ধরুন একজন কবি কবিতা লিখতে পারছেন না—তিনি আপনার চর্যায় ফল পাবেন?' 'তা সম্ভব হ'তে পারে।' আমি অবাক হলাম।

চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। এদের কাছে জগৎটা সত্য; জগতের জন্যই নিজেদের এরা খাটিয়ে নিচ্ছে ও সাজিয়ে রাখছে; অন্যের বা নিজের প্রতি এতটুকু অবহেলাকে এরা প্রশ্রয় দেয় না। আট ঘণ্টা কাজ করার পর বর্ষাতি-জড়ানো গৃহস্বামী বাড়ি ফিরলেন—বাইরে বৃষ্টি, কাদা, শীত; কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে তাঁকে দেখা গেলো পরিষ্কৃত ও প্রফুল্ল, গাঢ় নীল সান্ধ্যবেশ ধারণ ক'রে অতিথিদের সঙ্গে যোগ দিলেন;—পানীয় ও উপাহার পরিবেষণ : সূক্ষ্ম সুচারু, ফালিতে কাটা কাঁচা গাজর, পেঁয়াজকলি, অরুণবর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি টোম্যাটো, পনির অথবা ক্যাভিয়ারলিপ্ত বিস্কুট, ধোঁয়ানো হ্যাম, সার্ডিন—এ-সব তিনিই সাজাচ্ছেন থালায়, এগিয়ে দিচ্ছেন সকলের দিকে, নিজেও খাচ্ছেন, সাংলাপিক আপ্যায়নেরও অভাব হচ্ছে না। এই প্রাথমিক আতিথেয়তা প্রধানত তাঁরই কৃত্য, শ্রীমতীর নয়। তারপর ডিনার : দু-জনে মিলে টেবিল সাজালেন, পরস্পর খাদ্য আনলেন টেবিলে; যথাসময়ে উঠে গিয়ে বদলে দিলেন থালা; তাঁরাই হোতা, তাঁরাই পরিবেষক, গল্প করতে-করতে খাচ্ছেন আর খেতে-খেতে কাজ ক'রে যাচ্ছেন—সুবেশ, সতেজ, সপ্রতিভ : হয়তো একই ঘরে বসার ও খাওয়ার ব্যবস্থা, আহার শেষ হওয়ামাত্র ছবির মতো পরিষ্কার হ'য়ে গেলো ঘর, এলো কফি, চা, লিকার; তারপর—যত রাত্রেই পার্টি ভাঙুক তাঁরাই বাসন ধুয়ে রেখে, মোজা কেচে (হয়তো স্নান ক'রে) তবে শুতে যাবেন। (অতিথিদের কাছে সাহায্য প্রত্যাশিত, কিন্তু সব সময় তা গৃহীত হয় না।) স্ত্রী-পুরুষের শ্রম-বিভাগে যে অসাম্য নেই, এটাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে অনুধাবনযোগ্য—বরং মাঝে-মাঝে পুরুষকেই দেখা যায় গৃহকর্মে অধিক সক্ষম ও উদ্যোগী। মায়ের অতিথিদের জন্য কিশোর পুত্র রেঁধে রাখছে, বা তরুণী পত্নীকে দীর্ঘতর বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে প্রবীণ অধ্যাপক নিজেই তৈরি করছেন প্রাতরাশ, বা অকৃতদার নিভৃত পুরুষ বাড়িতে বন্ধুবান্ধব ডেকে বাজার করা থেকে বাসন ধোয়া পর্যন্ত সব কাজ এক হাতে করছেন—এ-সব ঘটনায় এখানে কিছু অসাধারণত্ব নেই। পত্রিকাদির বিজ্ঞাপন ও রসিকতা প'ড়ে অনুমান হয় যে পত্নীদের হীনতর অর্ধেরা মাঝে-মাঝে বাসন ধোয়াটা এড়িয়ে যাবার অপচেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে তাঁরা উল্লেখযোগ্যরূপে সফল হন কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ রাখা বুদ্ধিসংগত। পুরুষ নামক অলস ও সুখলিপ্সু জন্তুকে মার্কিনী রমণীরা যে-ভাবে পোষ মানিয়ে, জোয়ালে ঠেলে, তাঁদেরই সেবায় নিযুক্ত রেখেছেন, এবং যে-রকম অম্লান ও অবিদ্রোহীভাবে পুরুষদের তাতে সম্মত দেখা যায়, তাতে যেন প্রায় সভ্যতার একটি নবপর্যায় সূচিত হচ্ছে, কেননা অবহমান ইতিহাসে এ-যাবৎ ছিলো পুরুষেরই কর্তৃত্ব।* ফলত হয়তো পুরুষের কিছু যোগ্যতা বেড়েছে—আমি অন্তত তাঁদের হাতের দক্ষতায় অনবরত মুগ্ধ না-হ'য়ে পারিনি; কিন্তু অভ্যাসদোষে মনে-মনে বরং কৃতজ্ঞ হয়েছি যে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বাংলাদেশেই নরজন্ম লাভ করেছিলাম।

গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা—যার উদ্ভব ইংলণ্ডে, আর বৈপ্লবিক বিজয়-ভূমি ফ্রান্স—এই ধারণাটিও আমেরিকায় যে-ভাবে ও যতদূর পর্যন্ত প্রযুক্ত, তা দেখে আমরা যারা পুরোনো পৃথিবীর অধিবাসী, আমাদের কখনো-কখনো চমক লাগে। মনে প'ড়ে যায়, অন্যান্য দেশ (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, ভারত ইত্যাদি) আদিতে এবং বহুকাল ছিলো অভিজাতপন্থী, তা থেকে ধীরে-ধীরে গণতান্ত্রিক হয়েছে বা হচ্ছে, কোথাও বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্র ও সমাজ-সংঘে আভিজাত্য সহজীবী। কিন্তু আমেরিকা প্রথম থেকেই রাজতন্ত্র ও পুরোহিত-পূজার বিরোধী : সাম্য, গণতন্ত্র, ধর্মীয় স্বাধীনতা—এই সব ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত এই যুক্তরাষ্ট্র; প্রথম যাঁরা পিতৃপুরুষের মাতৃভূমি ছেড়ে নতুন দেশে বাসা বেঁধেছিলেন, তাঁরা প্রটেস্টান্ট-বিপ্লবের সন্তান। 'কোনো রাজা বা পুরোহিত ভগবানের প্রতিভূ নন;' 'মানুষমাত্রেরই চিন্তার ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে;' 'কতগুলি মৌলিক মানবিক অধিকার সকলেরই প্রাপ্য'—এই আদর্শ, যা তর্কাতীতরূপে শ্রদ্ধেয়,

* নারী-প্রগতির সূত্রপাত হয় য়োরোপে, কিন্তু এ-বিষয়েও আমেরিকা আজ অগ্রণী। য়োরোপে ভ্রমণকালে শুনলাম, অধুনা সেখানে মেয়েদের চরম কাম্য হ'লো—মার্কিনী স্বামী; কেউ-কেউ এই উচ্চাশাপূরণের সংকল্প নিয়ে অটলান্টিকের ওপারে চ'লে যাচ্ছেন। এর কারণ নাকি বিত্ত নয়—তাঁরান্তরবর্তী পতিদের অতুলনীয় আনুগত্য ও বাধ্যতা। পক্ষান্তরে, লণ্ডনে একটি সদালাপী বাঙালি যুবকের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো; শনিবার হ'লেই, যখন তিনি বিশ্রাম বা বই পড়ার জন্য উৎসুক, তখন তাঁর ইংরেজ স্ত্রী তাঁকে বিবিধ গার্হস্থ্য ফরমাশে নিরন্তর না-খাটিয়ে ছাড়তেন না। অবশেষে বিবাহবিচ্ছেদ হ'লো।

তা থেকে এমন একটি সংস্কার গ'ড়ে উঠেছে যেন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিরও কোনো প্রভেদ নেই, আর সবচেয়ে সাধারণ হওয়াই সবচেয়ে ভালো। পরস্পরকে প্রথম নাম নিয়ে ডাকা, যা অন্যান্য দেশে হৃদ্যতাব্যঞ্জক ও সময়-সাপেক্ষ, তা এখানে প্রায় নিয়মের মধ্যে পড়ে; কলেজের দরোয়ানের পক্ষে প্রেসিডেণ্টকে 'টম' ব'লে সম্ভাষণ করা অসম্ভব নয়, আর যারা প্রথম পরিচয়ের অনতিপরেই 'মিস্টার'-এর আবরু সরিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক, তারাও অনেক*। দেশাচার সর্বত্রই মান্য, আর এতে এক ধরনের মসৃণতাও অনুভূত হ'তে পারে, কিন্তু পিটসবার্গে এক বালিকা যখন তার পিতামহপ্রতিম এক প্রবীণকে বার-বার 'প্রাফুলো' ('প্রফেসর') ব'লে সম্বোধন করছিলো, আমি তখন অপ্রকাশ্য অস্বস্তির চাপে পীড়িত না-হ'য়ে পারিনি। দৈনন্দিন ভাষার ব্যবহারে, ও উচ্চারণে, জনসাধারণ ও উচ্চশিক্ষিতে তফাৎটা তেমন স্পষ্ট নয়, কোনো বিষয়ে বৈশিষ্ট্য যেন সকলেরই অনভিপ্রেত. সকলেই অন্য সকলের মতো কাপড় পরতে, কথা বলতে, পানাহার করতে আগ্রহশীল। 'অ্যাস্ক', 'প্যান্ট', 'ম্যাস্টর' ইত্যাদি উচ্চারণ একেবারে সর্বজনীন, এর প্রভাবে 'ফ্র্যান্স' বা 'স্ট্যালিন' বলতে বস্টনীয় ব্রাহ্মণেরও বোধহয় আপত্তি হয় না; আর যদি বক্তব্য হয়, 'আপনি অমুকের কাছে যান, এ-বিষয়ে তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন—' তাহ'লে খুব সম্ভব ধূসরকেশ পণ্ডিতও, 'He is your guy', এই হ্রস্ব ও সরল বাক্যটির দ্বারাই তা প্রকাশ করবেন। সাধারণের প্রতি এই সম্মানবোধের ফলে অনেক নতুন নামকরণ হয়েছে : এ-দেশে যারা যন্ত্রপাতি মেরামত করে তাদেরও বলে 'এঞ্জিনিয়র'; কোনো গৌণ বিষয়ে তিনজনে ব'সে কিছুক্ষণ কথা বলতে হ'লে তারও নাম আক্ষরিকভাবে 'কনফারেন্স'; কোনো শিক্ষায়তনের প্রশাসন বিভাগে পদবিগুলি যত নিনাদী, সে-অনুপাতে কর্ম সব সময় উন্নত হয় না। পিটসবার্গে যে-কলেজে আমাকে পড়াতে হ'তো সেখানে একজন 'বিজনেস ম্যানেজার' ছিলেন; আমি প্রথমে ভেবে পাইনি কোনো বিদ্যালয়ে এই কর্মিকের কী প্রয়োজন হ'তে পারে; তাঁর সংস্পর্শে এসে যতদূর বুঝতে পারলাম, তাঁর কাজ হ'লো আসবাবপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ। কোনোরকম স্তরভেদ বা শ্রেণীভেদ যেন স্পষ্ট হ'য়ে না ওঠে, মার্কিনী সমাজের অচেতন চেষ্টা অনবরত সেইদিকে। এই অবস্থায় বর্ণিল জীবন সম্ভব হয় না (হয়তো সেইজন্যেই মার্কিনীদের দেশ-ভ্রমণে ও প্রবসনে আগ্রহ এত বেশি), কিন্তু এরই ফলে ট্যাক্সিওলাও অমার্জিত নয় এখানে; চেহারায়, পোশাকে ও ভাষায় সে আমার বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের চাইতে কতটুকু আলাদা, তা আমার পক্ষে ঠাহর করা শক্ত; —আর বস্তুত আমার বন্ধু যে কখনো ট্যাক্সি চালাতেন না, বা এই লোকটি ভবিষ্যতে হবে না সাহিত্যিক, তা কি কেউ বলতে পারে?

মার্কিনী সমীকরণের কথা বিদেশীরা প্রায়ই ব'লে থাকেন, দৈশিক মনীষীদের মধ্যেও অনেকে এর সমালোচনায় সোচ্চার। সত্য, এই মহাদেশে আপূর্বপশ্চিম যে-ধরনের সমতা দেখা যায় তা, আমাদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, য়োরোপীয়ের পক্ষেও আশাতীত। মানহাটানের যে-অংশটুকুতে স্কাই-স্ক্রেপারের পুঞ্জ উঠেছে তার মতো আর কোনোখানেই কিছু নেই, অন্য কয়েকটা বিষয়েও ন্যু ইয়র্ক তুলনাহীন; কিন্তু এ ছাড়া প্রায় অন্য সব স্থান পরস্পর-সদৃশ—কিংবা তাদের বৈশিষ্ট্য শুধু প্রাকৃতিক। তুলনা করলে হয়তো ধরা পড়বে যে এই দেশের ভূগোল ভারতের চেয়েও বিচিত্র : আছে বিশাল হ্রদ, দুই প্রান্তে বারিধি, অরণ্য, মরু ও পর্বত-মালা; আছে হিম, উষ্ণ, শুষ্ক ও সজল প্রদেশ; উৎপন্ন হচ্ছে অজস্র চাল, উত্তম খেজুর, অতুলনীয় তরমুজ, তৃপ্তিহীন-ভাবে সেবনীয় দ্রাক্ষা; যখন শিকাগো শীতার্ত তখন ফ্লরিডা রৌদ্রময় ও ক্যালিফর্নিয়া বাসন্তিক; —অর্থাৎ, প্রকৃতির নানাবিধ প্রকরণের একটি সংকলন যেন এই দেশ। এবং প্রকৃতির প্রভাবে বাহ্যিক পরিবর্তনও ঘটে; ভূমির পর্যাপ্তি ও ঋতুর মৃদুতা বুঝে কোথাও পাবেন বাগান উঠোন বারান্দা-সমেত হাত-পা-ছড়ানো বাংলো বাড়ি, কোথাও

* আট বছর পরে আমেরিকায় এসে লক্ষ করলাম, প্রথম নামের ব্যবহার তত ব্যাপক নেই. 'স্যর'ও মাঝে-মাঝে শোনা যায়, এবং যে-সাধারণ যানের স্থানীয় নাম আগে ছিলো 'ক্যাব' এখন সেটাকে প্রায় সকলেই 'ট্যাক্সি' বলছে। আর এক পরি-বর্তন : অনুরাগের আঙ্গিক উচ্ছ্বাসে পরস্পরে লিপ্ত হ'য়ে আছে, এমন যুগল প্রত্যক্ষ না ক'রে রাস্তায় বেরোনো বা ঘুরে বেড়ানো সম্ভব।
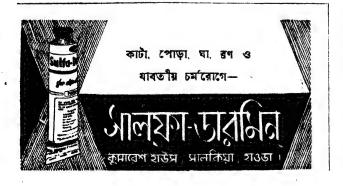
সকলেরই গারাজ আছে, আর কোথাও লোকেরা রাস্তাতেই ফেলে রাখে গাড়ি-গুলো; তাছাড়া, ধরুন, বিবাহবিচ্ছেদের আইন কোনো-কোনো রাজ্যে যতটা সহজ, সর্বত্র তা নয়। কিন্তু এই সব-কিছুই একই ব্যাপ্ত মার্কিনী মানসের অন্তর্ভূত। যেটা মৌলিক, যার দ্বারা মানুষ অচেতনভাবে চালিত হয়, যাকে বলে জীবনধারা বা লোকাচার, তাতে বিশেষ কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। বস্টন থেকে লস এঞ্জেলেস পর্যন্ত যেখানেই আপনি যান, সেখানেই দেখবেন একই রকম হোটেল, দোকান, আসবাবপত্র ও খবর-কাগজ, একই রকম খাদ্য পানীয় বেশবাস, একই দৈনন্দিন অভ্যাস ও সাধারণ ধ্যান-ধারণা; বাতাস তাপিত ও বাইরে রোদ উজ্জ্বল হ'লেও, নির্ভুলভাবে ছ-টার সময় ডিনার। রাতের ট্রেনে চলেছি পিটসবার্গ থেকে ন্যু ইয়র্ক; বাইরে তাকিয়ে অন্ধকার খুব কম দেখেছি; দু-তিন মিনিট কখনো হয়তো কালো হ'লো, কিন্তু তারপরেই আবার আলো, নিয়নচিহ্নিত বিপণি ও সিনেমা, জয়ধ্বজার মতো বিজ্ঞাপন। অর্থাৎ, নগরে ও গ্রামে ভেদ-রেখা অস্পষ্ট, কিংবা আসলে 'গ্রাম' কথাটাই ভুল (ঐ শব্দের ব্যবহারও প্রায় নেই): এখানে আছে, আমাদের ভাষায়, শুধু নগর আর মফস্বল, আর মফস্বল মানে শহরতলি, বা ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর শহর। এই সমীকরণের কারণগুলো অবশ্য স্পষ্ট : দেশের তারুণ্য, জনপদ-গুলির পরিকল্পিত গঠন, জীবনের অসামান্য জঙ্গমতা, পথ ও যানের প্রাচুর্য, অবিরলভাবে সম্প্রসারণশীল যন্ত্রশক্তি। তাছাড়া, মুষ্টিমেয় 'ইণ্ডিয়ান'-দের বাদ দিলে, এদের সমগ্র প্রজাবৃন্দ এসেছে বাইরে থেকে, ও নানা দেশ থেকে; কিন্তু এই বিপুল মিশ্রণ ও মন্থনের ফলে উদ্ভূত হয়েছে নতুন এক জীবনধারা, যার মধ্যে আইরিশ, হিস্পানি, ইহুদি, ওলন্দাজ, জাপানি প্রভৃতি সকলেই স্বচ্ছন্দে গৃহীত হ'য়ে যায়। এখনো অনবরত অভিবাসীরা আসছে; যত সহজে ও দ্রুতবেগে তারা মার্কিনী সত্তা লাভ করে, তা আমার পক্ষে বিস্ময়কর। এই যে আশ্চর্য শোষণ-ক্ষমতা, এটাই এদের সমীকরণের উৎস। মার্কিনী প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই এখানে।

কিন্তু যে-কারণে নানা দেশকে মিলিয়ে দেবার এই শক্তি, সেই একই ঐতিহাসিক কারণে মার্কিন দেশ বিদেশীর প্রতি সহমর্মী—শুধু তা-ই নয়, আমন্ত্রণকারীও উদার। বললে বোধহয় ভুল হয় না যে ভারতে যেমন বাঙালির, য়োরোপে তেমনি ফরাশি ও জর্মান চরিত্রে আত্মশ্লাঘা কিছু বেশি, আর ইংরেজরা, দূরস্পর্শী সাম্রাজ্য সত্ত্বেও, এক ধরনের চেতনাহীনতায় আবিষ্ট*; —অর্থাৎ, নানা দেশে অনেকেই ভাবেন যে তাঁদের পক্ষে যা অচলিত বা অচেনা, তা-ই সভ্যতার সীমানার বাইরে। কিন্তু মার্কিনীরা এ-দিক থেকে বিনয়ী, তা না-হ'লে চলে না তাদের, বা সেটাই তার সিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার পথ; যেহেতু বিদেশীরা অচিরে তাদের আত্মীয় হ'য়ে যায়, তাই তারা ব্যতিক্রমে অভ্যস্ত হ'তে শেখে। এমন অনেকের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা বা চেনাশোনা হ'লো, যাঁরা এক পুরুষের মার্কিনী, অর্থাৎ যৌবনে এ-দেশে এসে এখন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ হচ্ছেন; আমি চেষ্টা করতুম তাঁদের নাম ও উচ্চারণ থেকে আদিভূমি নির্ণয় ক'রে নিতে। সবচেয়ে নির্ভুলভাবে ধরা যেতো জর্মানভাষীদের। এঁরা মনে-প্রাণে মার্কিনী হ'য়ে গেছেন; কিন্তু কথা বলার ধরনটা এখনো পুরোপুরি স্থানীয় হয়নি—এমনকি কারো-কারো পক্ষে ইংরেজি এখনো পরভাষা, ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের টান অন্য-রকম—একজন বললেন, তিনি কবিতা লিখলে জর্মানেই লিখতেন, তাঁর মুখে হঠাৎ একবার 'ফুণ্ডামেণ্টল' উচ্চারণ শুনেছিলাম। অথচ এঁরা সকলেই কৃতী ও সম্মানিত; কেউ নামজাদা অধ্যাপক, কারো বা কেনেডির দরবারে যাতায়াত আছে এবং আইন ব্যবসায়ে উপার্জন বিপুল। (মনে-মনে বলেছি : 'হা ভগবান! আর আমরা ইংলণ্ডীয় উচ্চারণের অনুপুঙ্খ নিয়ে কত না উদ্বিগ্ন প্রহর যাপন করি!')

আসল কথা, আজকাল যাকে বলা হচ্ছে 'meritocracy' বা গুণতন্ত্র, এই দেশ তার এক পীঠস্থান। এ-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে দু-খানা হাতের ব্যবহারে রাজি থাকলে এখানে জীবিকার অভাব হয় না*; এবং এটা কিছু নতুন কথাও নয়, কেননা অন্যান্য দেশেও সার্বিক বিনিয়োগ সম্ভব হয়েছে, ইংলণ্ডে ও সাম্প্রতিক পশ্চিম জর্মানিতে বৈদেশিক শ্রমিকও কম নেই। তবে, আমার যতদূর ধারণা, ইংলণ্ডে কোনো জর্মান, বা ফ্রান্সে কোনো ইংরেজের

---

* কিছুকাল আগে লণ্ডনের 'হোরাইজন' পত্রিকায় এই ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছিলো। দু-জন ইংরেজ সামরিক পুরুষ ভারতবর্ষে ট্রেনে চলেছেন। এলাহাবাদ স্টেশনে গাড়ি থামলো। একজন জিগেস করলেন : 'এই শহরের লোকসংখ্যা কত হবে?' দ্বিতীয় ইংরেজের উত্তর : 'দশ লক্ষ—অবশ্য ভারতীয়দের ধ'রে বলছি।' 'ফরাশিরা কী অদ্ভুত—নিজেদের শহর-গুলোর নামের উচ্চারণ জানে না!' —বললেন ফ্রান্সে ভ্রমণকালে এক ইংরেজ মহিলা। দ্বিতীয় গল্পটা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, খুব সম্ভব এটা বানানো, কিন্তু ইংরেজ ভিন্ন অন্য কারো বিষয়ে এ-রকম ঠাট্টা রচিত হ'তে পারতো না।

* স্টেফান ৎসোয়াইখ-এর আত্মজীবনীতে এর একটি উদাহরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে, প্রথমবার আমেরিকায় গিয়ে, তিনি (শুধু যাচাই করার জন্য) বিজ্ঞাপন দেখে নিয়োগলাভের চেষ্টা করেন। একদিনের মধ্যে তিনটি আহ্বান তাঁর কাছে পৌঁছয়।

পক্ষে, অনন্য বা অসামান্য যোগ্যতা না-থাকলে, উচ্চপদলাভ দুঃসাধ্য; কিন্তু আমেরিকায় অনুরূপ ঘটনা নিত্যচালিত, এবং তার কারণ শুধু ধনবল নয়, ভিন্ন ইতিহাস ও মানসত্তা। একনায়কাধীন য়োরোপ ছেড়ে যাঁদের পালাতে হ'লো. সেই সব মনীষী ও তাঁদের সন্তানদের মধ্যে অনেকেই আজ আমেরিকার স্থায়ী ও চিন্ময় সম্পদ। প্রতিভা, এবং আরো সাধারণ অর্থে যা গুণ বা দক্ষতা, তার সমাদর এ-দেশে অবধারিত। এ-বিষয়ে শ্বেতাশ্বেতে ভেদ আছে ব'লে মনে হয় না, কেননা নৃত্যগীত দ্বারা যাঁরা বিত্ত ও খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে অনেক কৃষ্ণ ও মাঝে-মাঝে পীত ব্যক্তি পাওয়া যায়; এবং সত্যজিৎ রায় ও রবিশংকরের যশোকীর্তন আমি ভারতের বাইরে সবচেয়ে বেশি এখানেই

শুনেছি। ছোটোবড়ো অনেকগুলো শিক্ষায়তনে ঘুরে দেখেছি, সর্বত্রই কিছু ভারতীয় ছাত্রছাত্রী আছেন, তাঁরা সকলেই বৃত্তিলাভের ফলে স্বাবলম্বী, এবং কেউ-কেউ, সসম্মানে শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে, গবেষক বা সহকারীর পদে অধিষ্ঠিত। যাতে সমান যোগ্যতাসম্পন্ন মার্কিনী পাওয়া হয়তো শক্ত হ'তো না, এমন বিষয়ে ভারতীয় অধ্যাপকও দেখিনি তা নয়। এর ফলে, আমাদের পক্ষে, অন্য একটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে: ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে—বিশেষত বিজ্ঞানে যাঁরা তীক্ষ্ণধী, তাঁরা কেউ-কেউ দেশে ফেরা বিষয়ে দোমনা হয়ে পড়েন, বা সেটাকে অনির্দিষ্টভাবে পেছিয়ে দেন। তাঁদের যুক্তি—'অর্থের জন্য নয়, গবেষণার যে-সুযোগ আমরা এখানে পাচ্ছি, আমরা জানি দেশে তার শতাংশও পাবো না।' এই যুক্তি তুচ্ছ জ্ঞান তা বুঝি না, কেননা আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা বহু উপার্জন ও যন্ত্রসাপেক্ষ, এবং এ-মুহূর্তে ভারতে তা দুরধিগম্য হ'তেও পারে, কিন্তু আমাদের দ্বারা আহৃত যে-কোনো বিশেষ বিদ্যা যদি শেষ পর্যন্ত স্বদেশের সেবায় নিয়োজিত না হয়, সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। য়োরোপ সহস্রাধিক হারিয়েও দরিদ্র হ'য়ে পড়ে না, কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় প্রতিটি গুণী ও দক্ষ ব্যক্তি মূল্যবান। পার্থিব দিক থেকে তাঁদের কাছে কিছুদূর পর্যন্ত ত্যাগও আমরা দাবি করতে পারি, কিন্তু দেশের মধ্যে এমন ব্যবস্থার নিশ্চয়ই প্রয়োজন, যাতে কোনো গুণী ব্যক্তিকে স্বীয় কর্মকাণ্ডে ব্যাহত বা সংকুচিত হ'তে না হয়।

মোটের উপর মনে হয় যে আমেরিকায় চারদিক যেন খোলা, মানুষ তার জাতি বা ধর্মের দ্বারা ন্যূনতম চিহ্নিত। যখন সদ্য এ-দেশে এসেছিলাম, পিটস-বার্গের বৃহৎ বিভাগীয় বিপণির কর্মিণী আমাকে জিগেস করলে, 'Cash or charge?' মার্কিনী বাগ্-ধারার সঙ্গে তখনও পরিচিত হইনি ব'লে, এবং অন্য কারণেও, কথাটা বুঝতে আমার একটু দেরি হ'লো। বিদেশী এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও, আমি ইচ্ছে করলে ধারে কিনতে পারি, এটা আমার কল্পনার মধ্যে ছিলো না। অন্য এক দোকানে, কিস্তিতে কিনলুম টাইপরাইটার; ঠিকানা ও চেক লিখে দেয়ামাত্র জিনিশটি আমার হাতে এলো—আমি কোথায় এবং কী কর্ম করি, তা পর্যন্ত জানতে চাইলো না দোকানি। নিতান্ত কৌতূহলবশত, কী হয় তা দেখার জন্যই, ট্রেনের টিকিটের জন্য চেক দিতে চাইলুম; —লোকটি তা নিতে আপত্তি করলে না, শুধু জিগেস করলে আমার পকেটে কি গাড়ি চালাবার লাইসেন্স আছে, বা ঐ ধরনের অন্য যে-কোনো প্রমাণপত্র*? বিদেশীর প্রতি এই রকম নির্বাধ ব্যবহার অন্য কোনো দেশে প্রচলিত কিনা, আমি তা জানবার সুযোগ পাইনি, কিন্তু অন্ততপক্ষে একটা বিষয়ে আমেরিকার অনন্যতা আমাকে মানতে হয়েছে। য়োরোপে যখনই যেখানে গিয়েছি, হোটেলওলারা প্রথমেই চেয়ে নিয়েছে আমাদের পাসপোর্ট, তা থেকে সব তথ্যের প্রতিলিপি রেখে তবে ফেরৎ পাঠিয়েছে; —প্যারিসে, শুনেছি, বাড়িতে অতিথি এলে বা বাড়ি-বদল করলে, পুলিশের কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো কর্তব্য। এ-সব প্রথার ঔচিত্য বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু আমেরিকায় এগুলো অস্তিত্বহীন। আপনি এলেন কোনো হোটেলে, একটা কার্ডে নাম-ঠিকানা লিখলেন—এ ছাড়া আর-কিছুরই প্রয়োজন হয় না, কখনো কোনো অগ্রিম মূল্যের দাবি নেই: ব্যাপারটা এত সহজ যেন অসাধুতাকে সম্ভবপরতার বহির্ভূত ব'লে ধ'রে নেয়া হচ্ছে। সর্বত্র, সব হোটেলে, এই নিয়মই দেখেছি।

আমেরিকায় ব্যবসায়িক সাধুতা ইংলণ্ডের মতো নিষ্কলংক নয়, এমন কথা কারো-কারো মুখে শুনেছিলাম। আমি অবশ্য বাণিজ্যে অনভিজ্ঞ, কিন্তু সাধারণ জীবনে উল্টো প্রমাণই বার-বার পেয়েছি। চেক-সমেত চিঠি, বা পার্সেলে জিনিশপত্র, যদি না বিদেশে পাঠাতে হয়, কেউ কখনো রেজিস্ট্রি করে না; অনবরত সাধারণ ডাকে নির্ভুলভাবে পৌঁচচ্ছে সেগুলো। যে-কোনো চেক যে-কোনো ব্যাঙ্কে ভাঙানো যায়, কোনো চেক ফেরৎ আসতে পারে এটা যেন এদের ধারণায় নেই। একবার বাস্-এর বাক্সে ভ্রমক্রমে কিছু বেশি পয়সা ফেলে-ছিলাম, সেটা ডাকটিকিটের আকারে ফেরৎ এসেছিলো। 'মার্কিনী ডাক্তাররা অর্থগৃধ্নু'—এই জনরবের সমর্থন করাও আমার পক্ষে অসম্ভব; কেননা—আমাদেরই সৌভাগ্য কিনা কে জানে—তবে একাধিকবার দেখেছি, চিকিৎসক যথোচিত পরীক্ষার পর বলেছেন, 'এ-ব্যাপারে আমার কিছু করবার নেই, অতএব আমি দক্ষিণাও নেবো না। আপনি অমুকের কাছে যেতে পারেন।' উপরন্তু যা বিদেশীর পক্ষে প্রীতিকর তা এদের অগম্ভীর, অমলিন ও নিঃসংকোচ স্বভাব; এদের ব্যবসায়িক ব্যবহারেও কিছুটা ব্যক্তিগত স্পর্শ পাওয়া যায়;—চিকিৎসক, অধ্যাপক, হাসপাতালের নার্স, আয়করের অধিকর্তা, কঠিন মার্কিনী কর্মসূচি সত্ত্বেও কিছু ঘরোয়া আলাপে সকলেই প্রবৃত্ত হন, কোনোখানেই আঁট হ'য়ে থাকতে হয় না। প্র. ব. যখন দন্ত-শূলে পীড়িত, তখন ডাক্তারদের সৌজন্যে আমরা এমনকি মুগ্ধ না-হ'য়ে পারিনি। যন্ত্রণা দারুণ, সংবেশকেও উপশম হচ্ছে না, এই অবস্থায় ডাক্তার স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আমাকে টেলিফোনে বললেন, কিছুমাত্র প্রয়োজন হ'লে রাত্রির যে-কোনো সময়ে আমি যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি—আর, বস্তুত, যখন ভদ্রলোকেদের ঘুমের সময় বহুক্ষণ পেরিয়ে গেছে, তখনও তাঁর কণ্ঠে কোনো ক্লান্তি বা অনিচ্ছা আমি শুনিনি। পরবর্তী চিকিৎসার ব্যবস্থাও তিনি বন্ধুর মতো আগ্রহ নিয়ে করেছিলেন। —ক্রমশ

*এবার নু ইয়র্কে কিছুটা ভিন্ন ব্যবহার পেয়েছিলাম; সাধারণ একটা সামগ্রী বেচে দোকানি চেক নেবার আগে আমার কর্মস্থলের প্রমাণপত্র দেখতে চাইলে। এ-রকম অবশ্য একবারের বেশি ঘটেনি, তাই এ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না।

।। আণবিক নাটক ।।

তরুণ জার্মান সাহিত্যিক মিঃ বার্গেড ডবলিউ ওয়েজলিকের 'কোজেজো' একখানি বিতর্কমূলক নাটক। বিশ্বের প্রথম 'আণবিক' নাটক হিসাবে অভিহিত এই নাটকটির বিষয়বস্তু এইরকমঃ—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কাল্পনিক প্রবাল-দ্বীপ 'কোজেজো'য় স্থাপিত হয়েছে একটি আণবিক গবেষণা কেন্দ্র। যা আজ মানুষকে ধ্বংস করতে উদ্যত, গল্পের কাহিনী সেই প্রতীককে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীদল 'কোজেজো' দ্বীপে রয়েছে বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। একদিকে কর্তব্য, অন্যদিকে জীবনের হাতছানি, এই দোটানার মধ্যে তাদের দিন কাটছিল। এর মধ্যে প্রধান বিজ্ঞানী তাঁর সততা হারিয়ে দ্বীপের একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে মশগুল হয়ে উঠেছেন। এই প্রেমের হিংসায় জ্বলে উঠে দলের একজন মহিলা বিজ্ঞানী আণবিক কেন্দ্র সর্বনাশ ডেকে আনলো। বোমা রক্ষার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত, তাদের মেনে চলতে হয় এক অপরিবর্তনীয় আইন। আর সে আইন হল বিনা শর্তে সব কিছু মেনে চলা। যাদের কোন অনুভূতি নেই, মনোভাব নেই, আত্মতৃপ্তির আবেগ নেই, জাগতিক আচরণে উচ্ছ্বাস নেই। যারা সেই আণবিক শক্তিকে পোষ মানিয়ে সংগঠন করে তার শক্তিকে কাজে লাগাবে তাদের কাছে মনের আকুতির কোন দাম নেই। তাই এই নাটকে দেখানো হয়েছে দলের দুটি লোকের মানসিক ও আত্মিক অধঃপতনে দলের সকলের সর্বনাশ ঘনিয়ে এল, দু-জনের ভুলে সকলকেই আত্মাহুতি দিতে হল।

লেখকের মতে এই নাটক মানুষকে আজ দায়িত্বশীল হবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে, বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিকে সর্বনাশের পথে ব্যবহার না করে মানুষের কল্যাণে তাকে নিয়োজিত করতে আহ্বান জানাচ্ছে। সত্যিই এই 'আণবিক' নাটক মানুষকে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। দুটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান সমেত বহু নাট্য-প্রতিষ্ঠান এই নাটকটির মঞ্চাভিনয়ের স্বত্ব ক্রয় করতে চেয়েছেন। বর্তমানে জার্মাণীর সমসাময়িক ও প্রগতিশীল সঙ্গীত রচয়িতাদের অন্যতম ডিটার আইনফেল্টেন নাটকটির সংগীত রচনা করছেন। এই নাটকের উপস্থাপনায় জার্মাণী গর্ব করতে পারে। আর সেই স্মরণীয় নাটকের মহান সুরকার হিসাবে পৃথিবীর নাট্যজগতে ডিটার আইনফেল্টেনের নামও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।●

।। জন স্টাইনবেক ।।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই সৎশিল্পীর ধর্ম। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিল্পীরাও বার বার ক্রুদ্ধস্বরে কলম আঁকড়ে ধরেছেন। মস্তিষ্কের তীব্র যন্ত্রণার মাঝখান থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এসে অবিনশ্বর আত্মার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের মর্মস্পর্শী যে জীবন্ত আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে, তা জীবন-যুদ্ধে অপরাজিত মহান শিল্পীদের শাশ্বত শিল্পার্ঘ্য। এ কালের জনপ্রিয় মার্কিন ঔপন্যাসিক জন স্টাইনবেক ঐ গোত্রেরই একজন কথাশিল্পী।

ক্যালিফোর্নিয়ার 'স্যালিনাজ ভ্যালিতে জন্ম স্টাইনবেকের। খাজাঞ্চির ছেলে হয়েও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁকে মানুষ হতে হয়েছে। চরম দারিদ্র্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সমাজের অবহেলিত, দুঃস্থ, দুর্গত মানুষদের দুচোখ মেলে দেখেছেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল নিয়ে স্টাইনবেক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। সে অভিজ্ঞতা যাদের জীবন কেন্দ্র করে সাহিত্যের দরবারে আসর জমাল স্টাইনবেকের অন্তরাত্মা আর অন্তঃসলিল সৎ মানবপ্রেম তাদের এক মহান মর্যাদা দান করল।

১৯২৯ সালে স্টাইনবেকের প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় 'কাপ অব্ গোলড'। আর ১৯৬১-তে তাঁর উপন্যাস প্রকাশিত হয় 'দি উইন্টার অব্ আওয়ার ডিস্‌কন্টেন্ট'। এর মাঝখানে প্রকাশিত হয়েছে 'পাশচার্স অব্ হেভেন' (১৯৩২), দি আননোন গড্ (১৯৩৩), 'টোর্টিলা ফ্লাট' (১৯৩৫), 'ডিউবিয়াস ব্যাট্‌ল' (১৯৩৬), 'অব্ মাইস অ্যান্ড মেন' (১৯৩৭), 'গ্রেপস অব্ র‍্যাথ' (১৯৩৯), 'ক্যানারি রো' (১৯৪৫), 'সাইট থার্সডে' (১৯৫৪), 'ইস্ট অব্ ইডেন', 'রেড পনি' প্রভৃতি গ্রন্থ।

১৯৩৯ সালে প্রকাশিত 'গ্রেপস্ অব্ র‍্যাথ' উপন্যাস রচনার জন্য ১৯৪০ সালে পুলিৎসার পুরস্কার পান। 'কাপ অব্ গোলড', 'পাশ্‌চার্স অব্ হেভেন', দি আননোন গড' এই তিনখানি উপন্যাস-রচনার সময় পর্যন্ত স্টাইনবেক খ্যাতিলাভ করতে পারেননি। তখনও পর্যন্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যে অস্থির ও বিক্ষিপ্ত মানসিকতা নিয়ে সাহিত্যসাধনা করে যেতে হচ্ছে। ১৯৩৫-এ 'টোর্টিলা ফ্লাট' উপন্যাসে যখন দুঃসহ দারিদ্র্য, অবহেলিত জীবন, অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎকে তুলে ধরলেন তখন তাঁর মধ্যে একজন মহৎ অপরাজেয় দরদী শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া গেল। বইটির আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় স্টাইনবেকের আর্থিক স্বাচ্ছলতা আসায় গভীরতর সত্যান্বেষণে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন।

'ডিউবিয়াস ব্যাট্‌ল', 'অব মাইস অ্যান্ড মেন', 'গ্রেপস্ অব র‍্যাথ' তিনটি উপন্যাস রচিত হয়েছে একই দৃষ্টিকোণে। 'ডিউবিয়াস ব্যাটেলে' বর্ণিত হয়েছে শ্রমিক-সংঘর্ষের কথা, ঐ শ্রমিকদেরই গ্লানিময় দুঃসহ অসহায় জীবনকথায় ভাস্বর 'অব্ মাইস অ্যান্ড মেন'। 'গ্রেপস্ অব্ র‍্যাথ'-এ স্টাইনবেকের মানব-প্রেম আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। সত্যভাষী শিল্পীর অভিজ্ঞতা আর শিল্পসুষমার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে এখানে। তাঁর জন্মভূমি ক্যালিফোর্নিয়ার কথা বার বার মনে পড়বে এই উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে। সমাজের সংস্কারাবদ্ধ অমঙ্গলময় ব্যবস্থার চাপে পড়ে মানুষের জীবন যে কতদূর মর্মান্তিক হয়ে উঠতে পারে একটি কৃষক পরিবারের মধ্য দিয়ে তীব্র আঘাত ও বেদনার সঙ্গে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি সৎ পাঠকই উপন্যাস পাঠকালে দুঃখ আর দারিদ্র্যের মাঝখানে কুটিলতা অন্যায় অবিচারের খেলা চালিয়ে একদল মানুষের অন্তরাত্মা পাপী হয়েও মহান পুণ্য অর্জন করছে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবেন। এমন দরদী, অসহায় পীড়িত মানুষের বন্ধু কমই মেলে। শিল্প ও জীবনের প্রতি সততাবোধই স্টাইনবেকের সার্থক শিল্পসাধনার আদর্শ। তাই স্টাইনবেকের এই উপন্যাসটি সরকারী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সমগ্র আমেরিকাবাসীর মনে অভূতপূর্ব সমবেদনার ভাব জাগিয়ে দিল; তাঁকে দিল খ্যাতির চরম সম্মান।

'দি উইন্টার অব্ আওয়ার ডিসকন্টেন্ট আরও উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। সমাজের অন্যায় অত্যাচারের উৎস-কেন্দ্রে আঘাত হেনেছেন স্টাইনবেক। ধনী-দরিদ্রের অসম সমাজ-ব্যবস্থায় দারিদ্র্যের জীবনে যে পঙ্কিলতা, যে জটিল জীবন-যন্ত্রণায় সমাজ-জীবনে দুষ্ট দুরারোগ্য ব্যাধির উৎপত্তি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ সমাজ-ব্যবস্থা চলতে পারে না। সমাজে প্রত্যেকের বাঁচবার অধিকার আছে। সেখানে ধনী ও দরিদ্রের সীমারেখা নেই। তাই ধনিক সমাজের এই কুটিল চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্টাইনবেক। তাঁর মানব-প্রেম, চিরকালের নিপীড়িত মানুষের প্রতি সমবেদনায় অগ্নিবর্ষণ করেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[উপন্যাস]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

।। উনিশ ।।

প্লাসটারকরা পা নিয়ে বুড়ী একমনে লক্ষ্য করছিল দীপ্তিকে। একটা কুটিল সন্দেহে তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছে। একটু আগেই একটানা চেঁচিয়ে ছেলের বউদের গালাগাল দিচ্ছিল, এবার তার চোখ দীপ্তির ওপর।

—কিছুই তো খেলে না বাছা, সবই তো দেখছি পড়ে রইল।

—ভালো লাগছে না, খেতে ইচ্ছে করছে না কিছু।

বুড়ী তার কালো ফ্রেমের পুরু চশমার ভেতর দিয়ে আবার একভাবে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

—একটু আগেই তো দেখলুম বমি করলে।

দীপ্তি চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে শুয়ে পড়েছিল। ক্লান্তভাবে জবাব দিলে: আজ ক'দিন থেকেই শরীরটা খারাপ যাচ্ছে।

—হুঁ। ঘা তো সেরে গেছে দেখছি। ডাক্তারে কী বলে?

—বলে ও কিছু নয়।

বুড়ী আবার চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর:

—বাড়ীতে, তোমার কে আছেন বাছা?

কথা বলতে ভাল লাগছিল না দীপ্তির। তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিতে হল।

—সবাই আছেন। বাবা-মা, ভাই-বোন।

—সোয়ামী?

—দেখতেই পাচ্ছেন, আমি কুমারী।

—কে জানে বাপু!—বুড়ীর শাদা শাদা ভুরু দুটো কুঁচকে এল: একালের মেয়েদের দেখে তো আর কিছু বোঝবার জো নেই। তারা আজকাল খেস্টান আর বেম্মজ্ঞানীদেরও ছাড়িয়ে উঠেছে। সিঁদুর পরলে তাদের নাকি ফ্যাশন নষ্ট হয়। তা তোমার বিয়ে হয়নি বলছ?

—বললুম তো।—বিরক্ত হয়ে দীপ্তি বলালে, এক কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন বারবার?

—রাগ করো কেন বাছা? আমি তোমার ঠাকুরমার বয়েসী বলেই বলছি। কলেজে পড়ো বুঝি?

—না, চাকরি করি।

—বুঝেছি।—বুড়ীর কোটরে বসা চোখদুটো চক চক করে উঠল: আর বলতে হবে না। স্বাধীন জেনানা—আখেরের ভাবনা বলে তো কিছু নেই। আর তাইতেই তুমি মরেছ!

বুড়ীর কথা বলবার ভঙ্গিতে, চোখের চাউনিতে দীপ্তি চমকে উঠল এবার। উঠে বসল বিছানায়।

—কী বলতে চান আপনি?

—বয়েস অনেক হল বাছা—ঘরভরা নাতি-নাতনী। চোখে কম দেখি বটে, কিন্তু যত ভাবছ ততখানি কম এখনো দেখি না। বলি, এ দশা যে করেছে, সে কি বিয়ে করবে তোমায়? নাকি খাঁচা কেটে পালিয়েছে?

দীপ্তির মাথার ভেতরে রক্ত ছুটে গেল। ঝড় উঠল হৃৎপিণ্ডে। কাঁপা গলায়

দীপ্তি বললে, আপনার কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না।

—নেকী! পোয়াতী হয়েছ যে। পরশু থেকেই সন্দো হয়েছিল, দু'দিন ভালো করে দেখে সব বুঝতে পারলুম। মুখ পুড়িয়ে বসে আছ বাছা, এখন আর ঢেক গুড় গুড় করলে কী হবে!

বুড়ীর কথা সবটা শুনতে পেল না দীপ্তি। ওপর থেকে সমস্ত ছাদটা যেন বুকের ওপরে নেমে এল তার—মাথার ভেতরটা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল, তারপর একটা তীক্ষ্ন চিৎকার বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

ঘরের কোণে একটা চেয়ার টেবিলে বসে কী সব লিখছিল নার্স। ছুটে এল সঙ্গে সঙ্গে।

—কী হয়েছে—কী হয়েছে?

দীপ্তি জবাব দিল না। উবুড় হয়ে পড়ে মুখ গুঁজল বালিশে। কান্নায় থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল সারা শরীর। আর ফোকলা দাঁতে অপ্রতিভ হয়ে হাসল বুড়ী ঠাকুরমা। বললে, না— হয়নি কিছুই। শুধু বলেছিলুম, বলছ তোমার বিয়ে হয়নি, ইদিকে তো দেখছি তুমি পো—

ছেলেমানুষ নার্সের মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। ঝাঁঝালো গলায় বললে, কে বলেছে আপনাকে এ-সব বাজে কথা বলতে? কী জানেন আপনি? আপনি ডাক্তার?

—নাতি-পুতি নিয়ে সংসার করি বাপু—এটুকু বোঝবার বিদ্যে আছে। ওর জন্যে তোমার ডাক্তারীর দরকার হয় না। বলে আজ অবধি চোখের সামনে কত—

নার্সের চোখ থেকে আগুন ঝরে পড়ল। আর সেদিকে তাকিয়েই থমকে গেল বুড়ী।

নার্স বললে, আবার যদি একটা বাজে কথা আপনি বলেছেন তা হলে আপনার পা বেঁধে সেদিনের মতো বারো ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখব—বুঝতে পেরেছেন? নিজের চরকায় তেল দিন, অন্যের ব্যাপার নিয়ে মিথ্যে মাথা ঘামাবার দরকার নেই আপনার।

বুড়ী নিবে গেল সঙ্গে সঙ্গে, আইকে তালু পর্যন্ত শুকিয়ে গেল তার। বারো ঘন্টা পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখার ব্যাপারটা তার অজানা নেই, এর আগেই নিদারুণভাবে সে অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। বুড়ী খানিকক্ষণ হাঁ করে রইল, বিড় বিড় করে বললে, আমি কিছু জানিনে বাপু, আদার ব্যাপারী—

জাহাজের খবরে আমার কী দরকার।—তারপরেই ডুকরে কেঁদে উঠল: ওগো আমার কী হবে গো—ওই লক্ষ্মীছাড়ী বড় বৌটাই তো হাসপাতালে এই যমদূতের হাতে পাঠিয়ে আমায় মেরে ফেললে গো—এখন আমি মরে গেলেই তো ওদের হাড়ে বাতাস লাগে গো—

নার্স সেদিকে আর তাকালো না। দীপ্তির বিছানায় গিয়ে বসল, আস্তে আস্তে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার।

—কাঁদবেন না—কাঁদবেন না—শান্ত হোন। ওসব বাজে কথায় কান দিতে নেই—

"কাঁদবেন না—কাঁদবেন না—শান্ত হোন"

কিন্তু দীপ্তির কান্না থামল না। মনের ভেতরে একটা ছায়া তার ছিলই—বুড়ীর কথায় এক মুহূর্তে অনেকগুলো সন্দেহের জাল তার ছিঁড়ে গেছে। সেও তো মেয়ে।

দীপ্তির কান্না থামল না। আর নার্সের মনে হল যেন তার ফোঁপানিগুলো অতলের অন্ধকার থেকে উঠে আসছে—ধীরে ধীরে নিশ্চিত একটা পরিণামের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে সে—যেখান থেকে কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারবে না।

গৌরাঙ্গবাবুর স্ত্রী রান্নাঘরের একফালি বারান্দায় চুপ করে বসেছিলেন। রান্নাবান্নার কাজ এ বেলায় বিশেষ কিছু নেই, সকালের কিছু ডাল-তরকারী আছে, দুটি ভাত ফুটিয়ে নিলেই চলবে। বাজারে মাছের সের পাঁচ টাকায় উঠেছে, গরিবের সংসারে হপ্তায় একদিন মাছও আর আসে না। দীপ্তি আগে তার অফিস থেকে ফেরবার পথে মাঝে মাঝে মাছ মাংস নিয়ে আসত, সে হাসপাতালে যাওয়ার পর তা-ও বন্ধ হয়ে গেছে।

মা-র দু চোখ ভরে জল এল। সেই এক মাস আগে মেয়েটাকে একবার দেখে এসেছিলেন—তারপর থেকে আর যাওয়াই হয়ে উঠল না। স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়লেন, একদণ্ডের জন্যে নড়া যায় না তাঁর পাশ থেকে। যখন একটু ভালো হলেন—তখনও অমিয় তাকে নিয়ে গেল না। বললে, ট্রামে-বাসে চাপতে পারো না—উঠতে নামতে আছাড় খাও। তুমি গেলেই খামোকা রিক্সা ভাড়া দিতে হবে।

সে কথা ঠিক, একদিন উলটো দিকে মুখ করে ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে তিনি রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলেন। সে এক ভারী লজ্জার ব্যাপার। সেই থেকে কেউ আর তাঁকে সঙ্গে নেয় না। অভয়কে তো কোনো কথা বলবারই জো নেই, সব সময় তার মেজাজ

একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েছে। এক প্রভাত—

চারিদিকে মশার গুঞ্জন উঠছিল, একবার আঁচল ঘুরিয়ে সেগুলোকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। প্রভাতের কথা মনে পড়তেই সমস্ত অনুভূতিগুলো তাঁর কোমল হয়ে এল। বাপ মা মরা এই ছেলেটা ভারী ভালো। সাতে পাঁচে নেই—কোনো কথার ভেতরে থাকে না। মাসে মাসে ষাট-সত্তরটা টাকা সে দেয় বলেই দুবেলা তবু ভাত-ডালের সংস্থান হয়—নইলে হাঁড়ি চড়ত কিনা সন্দেহ। অ্যাপ্রেন্টিস্ খেটে, বাসের ভাড়া দিয়ে, অভয় সংসারে কী যে আনে তা চোখেও দেখতে পান না।

উনুনে ভাতটা ফুটে উঠেছে—গন্ধটা পেলেন। ডাকলেন, তিপু—তিপু কোথায় গেলি? ভাতটা নামিয়ে দে না মা।

তৃপ্তির সাড়া এল না।

—তিপু—তিপু—

কোনো জবাব নেই।

কলঘরে গেছে? না সেখানেও তো খোলা দরজার ভেতরে হাঁ-হাঁ করছে অন্ধকার। কেউ নেই।

তা হলে দীপ্তির ছোট ঘরটায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে হয়তো। তাই সম্ভব।

গৌরাঙ্গবাবু করুণাময়কে কতখানি পছন্দ করেছেন, তৃপ্তির মা তা জানেন না। সে কথা ভালো করে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পাননি তিনি। একবার শুধু বলেছিলেন, ছেলের বয়েস যেন একটু—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতের যন্ত্রণায় বিকৃত মুখটাকে আরো বিকৃত করে ধমক দিয়েছেন গৌরাঙ্গবাবু: 'বয়েস একটু বেশি হয়েছে তো কী! তোমার মেয়ের জন্যে এমন পাত্র যে যেচে এসেছে সেই তোমার সাতপুরুষের ভাগ্যি বলে মানো। নিজের বাড়ী রয়েছে—চাকরি রয়েছে, আর কী চাই! আমার যা অবস্থা এর চাইতে সুপাত্র কি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি!' আর অভয় পরম উৎসাহে বলেছে, 'চমৎকার ছেলে—এই-খানেই বিয়ে দিতে হবে। এই মাসেই।'

চমৎকার ছেলে! মা-র দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

কিন্তু ভাতটা টগবগ করে ফুটছে, উনুন থেকে উঠে আসছে পোড়া ফ্যানের গন্ধ। আর বসে থাকলে ওটা গলেই যাবে। তৃপ্তির মা উঠে রান্নাঘরে গেলেন, হাঁড়ি নামালেন, তারপর ফ্যান ঝরাবার জন্যে হাঁড়িটাকে উপুড় করে দিয়ে আবার নিজের জায়গাটিতে ফিরে এলেন।

তৃপ্তি এমন অসময়ে কোনোদিন শুয়ে পড়ে না। মেয়েকে মা ভালো করেই জানেন, অসুখ বিসুখে কোনোদিন তার বিশ্রাম নেই। ভোর পাঁচটায় ওঠে—শুতে শুতে রাত এগারোটা। আজ তার অসময়ে এমন করে ঘুমিয়ে পড়ার কারণটা মা অন্তত বুঝতে পেরেছেন।

মুখে কিছু বলবার জো নেই—কিন্তু মনে মনে তো বুঝতে পারেন। তাঁর অমন মেয়ের পাশে করুণাময়। বাড়ুজ্জে বুড়ো হাত-পা নেড়ে যত কথাই বলুক, ছেলের বয়েস মেয়ের দুগুণ ছাড়া কম নয়। মাথা ভর্তি টাক চকচক করছে, কথা বলতে বলতে তোৎলামো আসে, এদিকে ওই চেহারা! আজ ওর হাতেই মেয়েকে তুলে দেবার জন্যে বাপ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—অথচ একদিন তিনিই বলতেন: আমার ছোট মেয়ে সাক্ষাৎ সোনার প্রতিমা—সারা বাংলা দেশ খুঁজে ওর জন্যে আমি পাত্র যোগাড় করে আনব।

সেই পাত্র এই করুণাময়!

মেয়ে তাঁর ছোট—এখনো ভালো-মন্দ বোঝবার বয়েস তার আসেনি। কিন্তু করুণাময়কে তার যে এতটুকুও পছন্দ হয়নি, মা-র চোখে সে কথা লুকিয়ে থাকেনি। দেখেছেন দুপুরে এক মুঠো ভাত খায়নি মেয়েটা—ভালো করে কথা বলেনি, চোখ দুটো রাঙা হয়ে রয়েছে পাকা করমচার মতো। মায়ের বুকের ভেতরে শেল বিঁধেছে, কিন্তু কী করতে পারেন তিনি!

প্রভাত ফিরে এল বাইরে থেকে। ঘরে আলো জ্বলল। তৃপ্তির মা দেখলেন শার্ট খুলছে সে।

একটা অভিমানের উচ্ছ্বাস উঠে এল তাঁর মনে। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি বহুদিন ভেবেছেন, প্রভাতের হাতে তৃপ্তিকে তুলে দিলে কেমন হয়। ত্রি-সংসারে কেউ না-ই বা থাকল, সে তো এ বাড়ীরই আপনার জন হয়ে গেছে। খাসা ছেলে। দেখতে শুনতে ভালো, স্বভাব-চরিত্রে কোনো খুঁত নেই, সে তো নিজের চোখেই দেখতে পান। লেখাপড়া না-ই জানল, তবু ওর সঙ্গে বিয়ে হলে মেয়েটা সুখী হত।

ভেবেছিলেন, কথাটা প্রভাত নিজেই বলবে। এত ভক্তি শ্রদ্ধা করে, কাকিমা বলে ডাকে, সে-ই একদিন এসে জানাবে: 'কাকিমা যদি তিপুকে আপনারা আমায় দেন, তবে—'

কিন্তু সে-কথা সে তো বলল না। আজ যখন করুণাময় তৃপ্তিকে দেখতে এল, তখনও তো সে বলতে পারত: 'কেন বাইরে থেকে যাকে-তাকে ধরে আনছেন কাকাবাবু—আমিই তো আছি।'

স্বামী আপত্তি করতেন না—তিনি তা জানেন। অভয়ও নিশ্চয়ই খুশী হত, প্রভাতের সঙ্গে তো তার গলায় গলায় ভাব। কিন্তু প্রভাত তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল তারই চোখের সামনে মুক্তোর মালা বানরের গলায় পরাবার আয়োজন চলছে। কই—একটা কথাও তো তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল না।

প্রস্তাবটা তিনি নিজেই কি করতে পারতেন? কিন্তু তাও কি হয়? প্রভাত যদি তৃপ্তিকে পছন্দ না করে থাকে, তা হলে ভাববে, তাঁদের সংসারে আছে বলে

তাঁরা জোর করে মেয়েটাকে তার গলায় ঝুলিয়ে দিতে চাইছেন, সুযোগ নিচ্ছেন তার ওপর। ছি-ছি, সে হতেই পারে না। তৃপ্তিকে অমনভাবে যাচাই করবার প্রবৃত্তি তার নেই, এর চাইতে করুণাময়ও ভালো।

একটা লুঙ্গি পরে, গেঞ্জী গায়ে অভয় এল। মা-র পাশে বসল এসে।

—চুপ করে বসে আছো যে মা?

—এমনিই।

—উঃ কী মশা।—অভয় একসঙ্গে অনেকগুলো মারবার চেষ্টায় কয়েকবার তালি বাজালো দু-হাতে : কী করে বসে আছো এর ভেতরে? কামড়াচ্ছে না?

—কামড়ালে আর কী করছি?—মা ক্লান্তভাবে হাসলেন : মেয়ে তো আর শেষ করা যাবে না!

—কর্পোরেশন তো নয়—যত সব ইয়ের আড্ডা! কী সুখে যে মানুষ ট্যাক্সো দেয়!—অভয় বললে, মরুক গে, এখন একটু চা খাওয়াও দিকি।

—ভাত হয়ে গেছে যে। এখন আবার চা খাবি?

—রেখে দাও। এই সাত তাড়াতাড়ি ভাত খেতে বয়ে গেছে আমার। তিপু কই? স্টোভে এক পেয়ালা চা করে দিতে বলো।

—আবার তেল পোড়াবো কেন? উনুন তো জ্বলছে।

—যাতে হোক করে দাও—আমার চা পাওয়া নিয়ে কথা। কই তিপু কোথায়?

মা বললেন, আমিও তো ডেকে সাড়া পাইনি। দীপুর ঘরে ঘুমুচ্ছে বোধ হয়।

—এই সন্ধ্যেবেলায় ঘুমুচ্ছে কি রকম? টেনে তুলে আনছি আমি—

অভয় চটির আওয়াজ তুলে দীপ্তির ঘরের দিকে গেল। ভেজানো দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে ফেলে চড়া গলায় হাঁক পাড়ল : এই তিপু! এই হতচ্ছাড়ী, সন্ধ্যেবেলায় ঘুমুচ্ছিস কী বলে? উঠে আয়—

সাড়া পাওয়া গেল না।

বিরক্ত হয়ে অভয় ঘরের সুইচ টিপল। দীপ্তির শূন্য বিছানাটা জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তৃপ্তি নেই। তার বিছানার ওপর খাতার পাতা-ছেঁড়া একখানি কাগজ—বই দিয়ে সেটা চেপে রাখা হয়েছে।

লেখাটা দেখতে পেলো অভয়। এতখানি দূরে দাঁড়িয়ে থেকেও তৃপ্তির হাতের কাঁচা কাঁচা বড়ো বড়ো অক্ষর পরিষ্কার পড়তে পারল সে : 'আমি তোমাদের গলগ্রহ, তাই চলে যাচ্ছি। করুণাময়কে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।'

মিনিট দুই অভয় স্থির হয়ে রইল, নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারল না, মনে হল বিকারের ঘোরে একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন যেন দেখছে সে। তারপর ঘোলাটে মগজটা একটু একটু করে তার স্বাভাবিক হয়ে এল—থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চিঠিটা তুলে নিলে সে।

না, কোথাও কোনো ভুল নেই। তৃপ্তিই লিখেছে চিঠিটা।

তৃপ্তি! শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি! তার সেই পুতুলের মতো ছোট বোনটা যার মুখ দিয়ে একটা কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। এ সাহস সে পেলো কেমন করে—এমন ভয়ংকর বুদ্ধি তাকে জোগালো কে!

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা মনে উঠল। আজ দুপুরে প্রভাতদার সঙ্গে—

অভয় বেরিয়ে এল তৎক্ষণাৎ। আলোটা নেবাবার কথা তার মনে এল না, দীপ্তির শূন্য ছোট ঘরটায় সেটা যেন প্রেতের হাসির মতো জ্বলতে লাগল।

মা বললেন, কী হল? তিপু কোথায়?

অসীম সংযমে চিৎকারটাকে সামলে নিলে অভয়। মাথার মধ্যে যতই তুফান ছুটতে থাকুক, অভয় বুঝেছে পেরেছে, এ নিয়ে চেঁচামেচি করে কেলেংকারী বাড়িয়ে লাভ নেই। দাঁতে দাঁতে ঘষে করাতের মতো আওয়াজ তুলে অভয় বললে চুপ—একটি কথাও বোলো না—একটা কথাও না।

মা ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন।

—একটা কথাও বলব না কিরে? ব্যাপারখানা কী? তিপু কোথায়?

—নেই। বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে।

—কী বললি!—মা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে গেলেন, অভয় লোহার থাবার মতো হাত বাড়িয়ে মুখ চেপে ধরল তাঁর। তারপর আবার দাঁতে দাঁতে সেই নিষ্ঠুর করাতের আওয়াজ তুলে বললে, পালিয়েছে—করুণাময়কে বিয়ে করতে হবে বলে পালিয়েছে। বাস্তবিক মা—তুমি রত্নগর্ভাই বটে!—অভয়ের

গলায় নরকের গর্জন কথা কইতে লাগল : বুড়ো মেয়ের কল্যাণে দু দিন পরে নাতির মুখ দেখবে—ছোট মেয়ে বাড়ী থেকে উধাও হয়েছে। আঁতুড়ে একটু নুনও কি তোমার জোটেনি এদের জন্যে?

মা বাঁশপাতার মতো কাঁপতে লাগলেন, তারপর টলতে টলতে ছুটে গেলেন রান্নাঘরে। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ভাতের হাঁড়িটা নালায় উবুড় করে ধরলেন—খানিকটা গরম ভাত এসে পায়ে পড়ল। তারপর সেখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

কলতলায় হাত-পা ধুতে নেমে এল প্রভাত, ব্যাপারটার কিছুই তখনো জানা নেই তার। এক লাফে তার দিকে এগোল অভয়। বারান্দার পনেরো পাওয়ারের লালচে আলোতেও তার মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে প্রভাত স্তব্ধ হয়ে গেল।

অভয় অবরুদ্ধ স্বরে বললে, প্রভাত দা!

কী হয়েছে?

অভয় বললে, তৃপ্তি পালিয়েছে বাড়ী থেকে।

চৌবাচ্চা থেকে জল তুলতে যাচ্ছিল প্রভাত, হাতের মগটা ঠনাৎ করে আছড়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

—প্রভাত দা, কোথায় পালিয়েছে সে?

প্রভাত তখনো নির্বোধের মতো দাঁড়িয়েছিল। এবার শুধু বলতে পারল : কী বলছ তুমি!

বলছি, তৃপ্তি কোথায় গেছে? জানো তুমি?

প্রভাতের ঠোঁট দুটো যান্ত্রিকভাবে নড়তে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললে, জানি না।

—আজ দুপুরে সে তো তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করছিল!—রাগে অবিশ্বাসে খ্যাপা মোষের মতো হিংস্র শ্বাস ফেলতে লাগল অভয় : সে কোথায় গেছে তোমাকে সে কথা—

প্রভাতের শরীরে বিদ্যুৎ চমকালো। তাকেই তবে সন্দেহ করেছে অভয়। হাতের মুঠোটা তার শক্ত হয়ে উঠল, মনে হল এর পর সে অভয়কে আঘাত করে বসবে একটা।

—আমি জানি না।—এইবার প্রভাতের চোখেও আগুন ঝলকালো।

ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে অমলের গলার ডাক এল : অভয় বাবু—অভয় বাবু—

—ওই শালা! ওই জানে তা হলে!—তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল অভয়।

কলটা চেপে ধরে কতক্ষণ প্রভাত দাঁড়িয়েছিল তা সে জানে না। মনে হচ্ছিল বুকের ভেতর একটা অসহ্য চাপ উঠে আসছে কোথা থেকে, তার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তার ফাঁপা মস্তিষ্কটার মধ্যে শুধু ক্রমাগত অভয়ের কথাগুলো সাপের মতো ছোবল মারতে লাগল : তৃপ্তি পালিয়েছে—তৃপ্তি পালিয়েছে!

তারপর এক সময় অভয় ফিরে এল। আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেছে সে।

—আমায় মাপ করো, প্রভাত দা। এখুনি একবার তোমায় যেতে হবে আমার সঙ্গে।

নিরুত্তরে প্রভাত চোখ তুলে তাকালো তার দিকে। শান্ত হয়েই গেছে বটে অভয়। ভেতরে আগুনটা এমন করে জমেছে যে, মুখ দিয়ে কথা আর তার ফুটতে চাইছে না।

অভয় অদ্ভুত বিকৃত গলায় বললে, সন্ধ্যেবেলা একা বাড়ী থেকে বেরিয়ে কন্ডাকটারকে জিজ্ঞেস করে চোরের মতো বাসে উঠেছে তিপু। তাই দেখে রাস্কেল অমল তাকে ফলো করে। সে দেখেছে, এক পাঞ্জাবীর বাড়ীতে গিয়ে উঠেছে সে ভবানীপুরে। সেইখান থেকে সে সোজা এসেছে খবর নিয়ে।

—পাঞ্জাবী!—প্রভাতের মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এল : চন্দন সিং!

—হাঁ, চন্দন সিং। তোমাদের দোস্ত! আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। চলো প্রভাত দা, অমল দাঁড়িয়ে আছে—এখুনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে যেতে হবে আমাদের। আর—আর—খুন সম্ভব হলে খুন করে আসতে হবে!

প্রভাতের কাঁধে অভয়ের নখগুলো বিঁধে গেল একেবারের জন্যে।

কিন্তু চন্দন সিং তৈরী হয়েই ছিল।

ঘরের দরজা খুলে দিয়ে হাসলে, দেখিয়ে। কেউ এখানে নেই। অমিয় এসেছিল, সে চলে গেছে। তৃপ্তি এখানে আসেনি, তার কোনো খবরই জানা নেই আমার। —(ক্রমশঃ)

নীরোদ মজুমদারের চিত্র প্রদর্শনী

গত ৩১শে জুলাই থেকে ৯ই আগষ্ট পর্যন্ত ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে প্রখ্যাত শিল্পী নীরোদ মজুমদারের দশ বছরের সৃষ্টি-কর্মের এক সুন্দর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই প্রদর্শনীতে শিল্পীর ২১ খানি প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র-কর্মের নিদর্শন স্থান পেয়েছিল। এবং বলতে দ্বিধা নেই, এই নিদর্শনগুলি দেখে আমরা স্পষ্ট অনুভব করেছি নীরোদ বাবুর শিল্প-প্রতিভাকে।

অবশ্য প্রতিভাবান শিল্পীরূপে আজ আর নীরোদ মজুমদার অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা পরিচিত হবার অপেক্ষা রাখেন না। কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে যাঁরা বাঙলা তথা সর্বভারতের নব্য শিল্প-আন্দোলনের খবর রাখেন তাঁরা বোধহয় প্রত্যেকেই নীরোদবাবুর নামের সঙ্গে সুপরিচিত। তৎকালীন 'ক্যালকাটা গ্রুপের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শিল্পী নীরোদ মজুমদার। এই 'ক্যালকাটা গ্রুপ'-কে কেন্দ্র করেই শিল্পী প্রদোষ দাশগুপ্ত, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, শুভো ঠাকুর, পরিতোষ সেন, প্রভাস সেন প্রমুখ শিল্পীরা একদা বাঙলা দেশে সত্যিকার আধুনিক শিল্পরীতির

কলারসিক

প্রবর্তনে অগ্রসর হয়েছিলেন। এঁদের অধিকাংশই আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রায় নিশ্চুপ। নীরোদ মজুমদারই একমাত্র ব্যতিক্রম। এখনও তিনি যেমন জীবনে প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে নেননি, তেমনি প্যারিসে এগারো বছর কাটিয়েও ভারতীয় জীবন-দর্শনকে বিসর্জন না দিয়ে অথচ ইউরোপীয় শিল্প-রীতিকে গ্রহণ করে ভারতীয় পুরাণ ও লোক-কাহিনীকে ভিত্তি করে তাঁর অনলস সাধনায় শিল্প-জগতের নতুন পথ-পরিক্রমায় সদা উদ্যত। তাঁর সেই সাধনার উজ্জ্বল স্বাক্ষরে আলোচ্য প্রদর্শনীর প্রতিটি চিত্র-নিদর্শন দর্শক-মনকে অভিভূত করেছে। সুতরাং বলা যায়, শিল্পী নীরোদ মজুমদার বয়সেও যেমন প্রবীণ হতে চলেছেন, সৃষ্টি-কর্মেও তেমনি দিয়েছেন পরিণত শিল্পী-মনের পরিচয়।

আমার যতদূর জানা আছে তাতে মনে হয়েছে, নীরোদ মজুমদারই বোধহয় একমাত্র শিল্পী, যিনি তত্ত্ব ও দর্শন ছাড়া সৃষ্টির ক্ষেত্রে এখন এক পাও অগ্রসর হতে রাজী নন। আলোচ্য প্রদর্শনীর চিত্রগুলি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করলেই এ-কথা প্রমাণ করা যাবে।

এবারকার প্রদর্শনীর চিত্র-নিদর্শন-গুলি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে ছিল বেহুলা ও লখীন্দরের কাহিনী-ভিত্তিক ১২ খানি চিত্র (ইমেজেস এক্রোজেস)। দ্বিতীয় ভাগে ছিল গরুড়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত পাঁচ-খানি চিত্র (উইং অফ নো এণ্ড)। তৃতীয় ভাগে ছিল তাঁর সদ্যরচিত ৪ খানি চিত্র। আর এই চিত্রগুলি গড়ে উঠেছে ভারতীয় রসতত্ত্বের নবরস-তত্ত্বকে ভিত্তি করে (নাইন ভ্যারিয়েশনস অফ সিম্বলিক নাইন)। এই যে বিষয়বস্তু নির্বাচন, এ সুস্পষ্টভাবে শিল্পীর এক বিশেষ মানসিকতার পরিচায়ক। নীরোদবাবু এখানে তাঁর বিশেষ জীবন-দর্শন, প্রতীকী-চেতনা এবং রেখা ও বস্তু-নির্ভর ভারতীয় শিল্প-ধারার সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিমূর্ত-চেতনা, রঙ-প্রয়োগ-পদ্ধতি ও চিত্র-বিন্যাস-কৌশল এমন দক্ষতার সঙ্গে সংযোগ করেছেন যে দুইয়ের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে নতুন এক শিল্পভঙ্গি, যা নীরোদবাবুরই একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। তাঁর এই তত্ত্ব ও দার্শনিকতাকে হয়তো অনেকে গ্রহণ করতে পারবেন না, কিন্তু শিল্প-সৃষ্টির দিক থেকে কেউ তাঁকে যে অস্বীকার করবেন, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। এখানেই শিল্পী হিসাবে নীরোদ মজুমদারের জয়। এই মননশীলতা যেমন নীরোদবাবুর বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর, আমার কিন্তু মনে হয়েছে, তাঁর দুর্বলতারও। তত্ত্বকে ভিত্তি করে যে শিল্প রচিত হয় কিম্বা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এই সিদ্ধান্ত থেকে যদি কোন শিল্পী অগ্রসর হন, তবে তাঁর শিল্প সব কিছুই হয়তো বর্তমান থাকে কিন্তু সজীব জীবনের সৌন্দর্যময় অন্যতর দ্যুতি তাঁর শিল্প থেকে নিশ্চিত অন্তর্হিত হয়। নীরোদবাবুর অপূর্ব জমিন সৃষ্টি, রঙের টোন আর মেজাজ যেমন নিখুঁত পাশ্চাত্য শিল্প-ব্যাকরণের অনুসরণ করেছে, তেমনি ভারতীয় চিত্র-রীতির রৈখিক এবং লৌকিক ভঙ্গি গ্রহণেও তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। কিন্তু দুই মিলে শিল্প-ব্যাকরণ যত সুন্দরভাবেই মূর্ত হয়ে উঠুক না কেন, লৌকিক ও পৌরাণিক বক্তব্যে সেই জীবন-সত্যের উদ্ভাস নেই, যা মনকে নিয়ে যেতে পারে সজীব জীবনের অন্যতর সৌন্দর্যময় জগতে। এটাই শিল্পী নীরোদ মজুমদারের দুর্বলতা বলে আমার অন্ততঃ মনে হয়েছে।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও শিল্পীর 'স্বর্গ' (১১), 'বন্দী বিনতা ও গরুড়' (১৩), 'নবনারী কুঞ্জর' (১৮), 'নবপত্রিকা' (১৯) কিম্বা 'তাণ্ডব লাস্য' (২০) প্রভৃতি চিত্র তত্ত্ব ও দার্শনিকতার বাধা ভেদ করে অপূর্ব শিল্প-সুষমায় আমাদের মুগ্ধ করেছে।

'স্বর্গ' চিত্রখানির জমিনে রঙের আশ্চর্য দ্যুতি এবং রেখায়িত শিবের অনুপম অঙ্গ-সৌষ্ঠব সহ লাস্যময়ী পার্বতীর গীতি-ধর্মী রূপায়ণ, বেহুলা ও মনসাকে চিত্রে সংস্থাপন এমন পরিমিত শিল্প-চেতনার স্বাক্ষরদীপ্ত যে মনকে তা অনায়াসে অভিভূত করে। তেমনি 'নবনারী কুঞ্জর' চিত্রে নগ্ন-সৌন্দর্যের যে অভিব্যক্তি রঙে আর রেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে তাও ভুলবার নয়। আবার 'নবপত্রিকা' চিত্রের আশ্চর্য রঙ-প্রয়োগ-পদ্ধতি এবং প্রতীক-চেতনা প্রবীণ শিল্পীর প্রবীণতর উপলব্ধি এবং দক্ষতার কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমরা তাই সব দিক বিবেচনা করেই নীরোদ মজুমদারকে বর্তমান যুগের অন্যতম শক্তিশালী শিল্পীরূপে অভিহিত করতে চাই। তিনি যা দিতে পারেননি তা নিয়ে এই মুহূর্তে আপসোসের প্রয়োজন নেই, যা দিয়েছেন তা যে-কোনো শিল্পীকে ঈর্ষান্বিত করতে যথেষ্ট এটাই একমাত্র স্বীকার্য। শিল্পী নীরোদ মজুমদারকে আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

"বনের রাজা"

কণাদ চৌধুরী

সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ রাঁচীর জনৈক আদিবাসী হঠাৎ সরকার থেকে জমি বিক্রি বাবদ দু'লাখ টাকা পেয়ে আনন্দে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। খবরটি নিঃসন্দেহে অসাধারণ। অসাধারণ এই কারণে যে, আমরা যারা শহরের সমতলে থাকি, খবরের কাগজ পড়ি, কালোবাজারে টিকিট কিনে সিনেমা দেখি, মেরিলিন মনরোর মৃত্যুতে মূহ্যমান হই, বরং টাকা না পাওয়ার দুঃখেই মনে মনে হাজারবার, দৃশ্যতঃ কখনো-সখনো কুয়োতে লাফিয়ে আত্মহত্যা করতে পারি। কিন্তু টাকা পাওয়ার আনন্দে, যা-ইচ্ছে তাই করার রাজকীয় গুণাবলী আজো আমাদের অনায়ত্ব। 'রাজকীয়' বলা বোধহয় ত্রুটি-কথন হল, কারণ রাজারাও যে আজকাল খবরের কাগজ পড়েন, প্রত্যহ দাড়ি কামান, অর্থাৎ সভ্যতার আগুনে হাতের সবকটা আঙুলই সেঁকে নেন। লোভে হৃদয় যাদের কালো হয় না, পাওয়ার আনন্দকে তারাই হঠাৎ খুশীর ঝড়ে যেমন-তেমন করে ছড়িয়ে দিতে পারে—হ্যাঁ, এমনকি নিজের জীবনের বিনিময়েও। রাঁচীর সেই স্মরণীয় আদিবাসীটি নিঃসন্দেহে এক অলৌকিক, আনন্দ-বনের রাজা। কিন্তু শুধু রাঁচীতেই না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় তিন কোটি এমনি বনের রাজারা ছড়িয়ে আছে। কারখানার সিটিতে তারা ঘুম থেকে জাগে না, রেডিওতে অনুরোধের আসরে এরা চিঠি লেখে না। আণবিক বোমাও এদের মাথা ধরার বিষয় না। এদের আনন্দ বনজ্যোৎস্নায়, শালবনের পাতান্ধকারে, পলাশফুলের আগুনে, মাদলের পাগল শব্দে। একমাত্র এদেরই জীবন-গীতি হতে পারে :

> আমরা বনের রাজা
> বাঘের মত শাসন করি
> পাখীর মত গাই—
> নাচের তালেতে লুটি মজা
> মায়ের আশিস পাই।।
>
> (মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলার কর্কু-গীতি)

'আদিবাসী' শব্দটির অনেকগুলি ইংরেজী সমার্থক শব্দ আছে, যথা 'ট্রাইব', 'এ্যাবওরিজিনাল', 'প্রিমিটিভ' প্রভৃতি। সরকারী নথিপত্রে প্রথমোক্ত শব্দটিরই অধিক প্রামাণ্য দেখা যায়। সেনশাস রিপোর্টেও "ট্রাইবস" ও "ট্রাইবাল" বিশেষ্য-বিশেষণের উল্লেখ আছে। অথচ আশ্চর্য, এই শব্দটির কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ভারতের সংবিধানে নেই। 'ট্রাইব' কথাটি সকলের কাছে সমান অর্থবহ না। সাধারণ লোকের কাছে ট্রাইবের অর্থ হল যারা পাহাড়ে জঙ্গলে থাকে এবং দেশজ সুরাতে উন্মত্ত হয়ে নাচ-গান করে, অবশ্য তাদের সম্বন্ধে 'বাড়তি কিছু কিছু' খবরও কেউ কেউ রাখেন। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের চশমায় ট্রাইবরা হল সংবিধানের ৩৩৯ ধারায় সামগ্রী। এই ধারায় আদিবাসীরা হল এমন এক ধরণের গোষ্ঠী যাদের দায়িত্বভার সরাসরি রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে নিয়েছেন। নৃতত্ত্ববিদদের কাছে ট্রাইবরা শুধুমাত্র গবেষণার বিষয়। আবার এদেশের পুলিশীমহল ট্রাইবদের চিহ্নিত করেছেন "অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী" হিসেবে। এবং

টোডা রমণী

টোটো বালিকা (পঃ বাঙলা)

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা আবার 'ট্রাইব'এর নিগূঢ়ার্থ করেছেন "ইনডেজেনাস" বলে। কাজেই একটু সূক্ষ্মভাবে দেখলে 'ট্রাইব' শব্দটি আজো অন্যের দাবী হয়ে আছে!

আজকের আদিবাসীরা শুধুমাত্র 'বনের' রাজা হয়ে থাকলেও, একদা এরাও সভ্যতায় সমারূঢ় ছিল। আদিবাসীদের বংশ-পত্রিকার উৎসে অনেক প্রসিদ্ধ পৌরাণিক চরিত্রের সাক্ষাত মেলে। এমনকি শিব এবং কৃষ্ণকেও অনেক আদিবাসী গাথায় বংশপুরুষ হিসেবে দাবী করা হয়। বৈদিক মতে ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর শতপুত্রকে বনজাতিতে পরিণত হবার অভিশাপ দিয়েছিলেন। গুজরাটের কর্কুদের কিংবদন্তী অনুসারে, তারা হল মহাভারত-বর্ণিত বিরাটরাজার বংশধর। উড়িষ্যা এবং অন্ধ্র প্রদেশের সাতরাদের, আত্রেয়ীয় ব্রাহ্মণ এবং রামায়ণ-মহাভারতের শবরবংশ বলে বিশ্বাস করা হয়। কোর্ণি তাম্রফলক অনুসারে জানা যায় যে, কলিঙ্গ-গঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কামার্ণব, শ্রীকাকুলমের নৃপতি, শবরাদিত্যের হস্তে পরাজিত এবং নিহত হন। এই শবরাদিত্য সাতরাদেরই পরাক্রান্ত নৃপতি। আর শ্রীরামচন্দ্রের জন্যে প্রতীক্ষারত শবরী ও শবরকন্যাই। এইসব কিংবদন্তী সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, নৃতত্ত্ববিদরা বিশ্বাস করেন যে, অতীতে তথাকথিত উপজাতিদের সঙ্গে তৎকালীন সভ্য সমাজের যোগাযোগ নিগূঢ় ছিল। অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি নানা কারণেই প্রাচীন যুগের নগরবাসীরা বনে গিয়ে সময়ে সময়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতেন, এবং এই বন্য আশ্রয়স্থলটিই শেষ পর্যন্ত চিরস্থায়ী আবাস হয়ে যেত। রাজস্থানের গুজর এবং লোহারা এমনি দুটি উদ্বাস্তু বনবাসী সম্প্রদায়।

আদিবাসীদের জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে সম্ভবতঃ আফ্রিকার পরেই ভারতবর্ষের স্থান। ১৯৫১র আদমসুমারী অনুসারে ভারতবর্ষের শতকরা ৬·২৩ জন লোকই আদিবাসী। কয়েকটি প্রধান প্রধান আদিবাসী-অধ্যুষিত রাজ্যের সংখ্যাতত্ত্ব হল :

মধ্যপ্রদেশ	...	প্রায় ৫০ লক্ষ
বিহার	...	" ৩৯ "
উড়িষ্যা	...	" ৩২ "
গুজরাট	...	" ২১ "
রাজস্থান	...	" ১৪ "
আসাম	...	" ১৮ "
মহারাষ্ট্র	...	" ১৭ "
পশ্চিমবঙ্গ	...	" ১৩ "
অন্ধ্রপ্রদেশ	...	" ১২ "

এ ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর আদিবাসী অঞ্চল ছড়িয়ে ছিটিয়ে

টানসা বালিকা (আসাম)

আছে। ভৌগোলিক অঞ্চলানুযায়ী তিনটি আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের আদিবাসীরা—এরা পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সানুদেশের বাসিন্দা।

(২) আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণাপথের বিভাজক বিন্ধ্য অঞ্চলের আদিবাসীবৃন্দ।

(৩) উত্তর এবং উত্তর-পূর্বের পার্বত্য উপত্যকার উপজাতিরা।

পূর্ব সীমান্তের নাগারাও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী আজো বিভিন্ন স্তরে বিরাজমান আজো অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রাণধারণের উপায় আদিমকালের শিকার। আবার উত্তর-পূর্ব প্রত্যন্তের আদিবাসীরা (খাসিয়া প্রভৃতি) যথেষ্টই অগ্রসর। আজো কিছু কিছু 'বনের রাজা' বনেই সুন্দর হয়ে থাকে, আবার শহর এবং শহরতলীর সুখে আচ্ছন্ন আদিবাসীদের অভাবও নেই আমাদের দেশে। এইসব আদিবাসীদের শুধু সামাজিক রীতি-নীতিই না, ধর্মাচারও বিভিন্ন। কোনো কোনো আদিবাসী সম্প্রদায় বহু শতাব্দী ধরেই বৌদ্ধ, আবার মিশনারীদের প্রভাবে খৃষ্টান আদিবাসীর সংখ্যাও কম না। হিন্দু দেব-দেবীও অনেক সম্প্রদায়ের উপাস্য। আবার দেবতার প্রতীক হিসেবে প্রকৃতি-পূজার আদিম প্রথাটিও লুপ্ত হয়নি আজো। বিচিত্র রীতি-নীতির জন্যে আদিবাসী সম্প্রদায় সব সময়েই সরকারের কাছে সমস্যার কারণ হয়েছে।

বৃটিশ যুগে আদিবাসীদের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় সাধারণের মিশনারীদের কার্যাবলী-দ্বারা। কিন্তু তৎকালীন শাসকবর্গ বনের রাজাদের তাদের রাজত্বের বাইরে আসবার, বহির্বিশ্বের জানালায় চোখ রাখবার কোনো ব্যবস্থাই করেননি। আদিবাসীদের ওপর বৃটিশ শাসনের প্রভাব সম্বন্ধে তৎকালীন আই-সি-এস ডাঃ জে এইচ হাটন সখেদে বলেছেন:

Far from being of immediate benefit to the primitive tribes the establishment of British Rule in India did most of them much more harm than good......It may be said that the early days of British administration did very great detriment to the economic position of tribes through ignorance and neglect of their rights and customs .... many changes have been caused incidentally by the penetration of the tribal country, the opening up of communications, the protection of forests and the establishment of schools, to say nothing of the opening given in this way to Christian Missions. Many of the results of these changes have caused acute discomfort to the tribes.

বৃটিশ সরকার আদিবাসীদের সমতলবাসী নাগরিকদের সংস্পর্শে আসতে দেননি বটে, তবে কিছু কিছু "সভ্য মানুষ" যথা, জমিদার, ভূমিদার এবং মহাজনদের উপজাতি সাম্রাজ্যে যেতে বাধা দেননি। ফলে বৃটিশ যুগ, শোষণেরই যুগ ছিল অনগ্রসর পার্বত্য জাতিপুঞ্জের কাছে। এমন কি বনের রাজার রাজধানী তার বনটিকেও বনসংরক্ষণ বিভাগ গ্রাস করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছে। ফলে সিপাহী বিদ্রোহের দু বছর আগে থেকে আরম্ভ করে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বার বার বিদ্রোহী হয়েছে আদিবাসীরা।

১৮৫৫ সালে প্রথম বিদ্রোহী হয় সাঁওতালরা। ১৮৬৯ সালে ধানবাদের টুন্ডির জমিদারের বিরুদ্ধেও সাঁওতালরা রুখে দাঁড়িয়েছিল। সরদারী বিক্ষোভ হয় ১৮৮৭ সালে। হিন্দু জমিদার, কুসীদজীবী মহাজন এবং খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে মুণ্ডারা এবং ও'রাওরা বিদ্রোহ করে ১৮৯৫ সালে। শুধু সশস্ত্র বিদ্রোহই না, আইন অমান্য আন্দোলন করেও শাসক এবং

মারিয়া (মধ্যপ্রদেশ)

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর অবশ্য আদিবাসীদের সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতীয় সংবিধানে আদিবাসীদের সর্বাত্মক উন্নতির কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ৩৩৯ ধারার বলে রাষ্ট্রপতি ভারতের সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানের ভার নিজের হাতে নিয়েছেন। এই ধারায় প্রতি দশ বছর অন্তর একটি কমিশন দ্বারা আদিবাসীদের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে একটি সরেজমিন তদন্তেরও নির্দেশ আছে। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসের ধেবর কমিশনের তদন্তের ফল ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়েছে। ধেবর কমিশনের রিপোর্টে আদিবাসী সমেত সমগ্র অনগ্রসর গোষ্ঠীর উন্নতিবিধানের জন্যে অনেকগুলি সুপারিশ করা হয়েছে।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই আদিবাসীদের কথা বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় আদিবাসীদের জন্যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল ১৭·৩৬ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায়, বরাদ্দটি বেড়ে হয় ৪৮·৩৩ কোটি টাকা, এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬০ কোটি টাকা। সমবায় প্রথার মাধ্যমে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং সামাজিক প্রগতির চেষ্টা করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। বহুমুখী উন্নয়ন ব্লক প্রতিষ্ঠা

শোষকবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে উড়িষ্যার কোন্ড মালিয়া এবং বিহারের তানা ভগৎ সম্প্রদায়। ১৯২০ সালের সত্যাগ্রহীদের মধ্যে তানা ভগৎদের ভূমিকা অসীম আত্মত্যাগের। আদিবাসীদের সমস্ত বিদ্রোহই নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল তৎকালীন বৃটিশ সরকার কর্তৃক।

অবশ্য প্রাক-স্বাধীনতা যুগে আদিবাসীদের অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা যে একেবারে হয়নি তা নয়। ১৯৩৭ সালে বিহার, বোম্বাই, উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজের জনপ্রিয় সরকার গঠিত হবার পর উক্ত প্রদেশগুলিতে আদিবাসীদের উন্নতিকল্পে কমিটি গঠিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত এ ভি ঠক্কর এবং "সারভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি"র সভাবৃন্দ আদিবাসীদের মধ্যে প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলেন। ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের স্বাধীন অধিকার রক্ষার জন্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়ের কর্মপ্রচেষ্টাও বিস্মৃত হবার নয়।

মুরিয়াদের মুলাকি নৃত্য

ও'রাও স্কুল ছাত্রীদের নৃত্য

করা হয়েছে বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৩টি উন্নয়ন ব্লক স্থাপিত হয়েছে, তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রস্তাব নেয়া হয়েছে ৩০০টি ব্লক স্থাপনের। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গত ৭ই আগস্টের রাজ্যসভায় একটি বিতর্কের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, আদিবাসীদের আশানুযায়ী উন্নতি এখনো করা সম্ভব হয়নি।

বাস্তবিক, আদিবাসীদের সর্বাত্মক উন্নয়নের কাজটি একটু জটিলই। বিশেষতঃ শিক্ষার প্রসারে আশু উন্নতির পথে নানান অন্তরায়। যেমন প্রায় প্রতিটি আদিবাসী সম্প্রদায়েরই নিজস্ব কথ্য ভাষা আছে, লেখ্য বর্ণমালা নেই। অতএব তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সহজে সম্ভব না। আবার আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিও আদিবাসীদের অনুরাগের তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মহারাষ্ট্রীয় একটি আদিবাসীদের সতর্ক-প্রবাদ হল ঃ "যদি আদিবাসী হয়ে থাক, জঙ্গলের রাজা হয়ে থাকবে, যদি ব্রাহ্মণদের মত টেবিলে ধাঁও লিখতে, লিখতে একদিন শেষ হয়ে যাবে তুমি!"

কিন্তু তাই বলে এদের জোর করে যদি 'সভ্য' বানানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, তাদের শিল্পকলা, আদিম সংস্কৃতি প্রভৃতি কিছুই নগরগ্রাস থেকে রক্ষা পাবে না। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু বলেছেন ঃ

ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নতি নিশ্চয়ই করতে হবে; কেউই তাদের যাদুঘরের সামগ্রী করে রাখতে চায় না। কিন্তু এও সত্যি যে, তাদের নিজস্ব পথেই তাদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করতে হবে। কারণ কোনো ব্যক্তিত্বই ভিনদেশী আবহাওয়া, অভ্যেস এবং রীতিনীতির মধ্যে সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পারে না।

তাই বনের রাজাদের কথা ভাবতে গিয়ে 'বনে'র কথাটাও ভাবতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং সেই সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রকেও—বন্যেরা যিনি প্রথম, বনেই সুন্দর দেখেছিলেন।

পার্শ্ববর্তী

সুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

—দুটিতে কিন্তু মানিয়েছে বেশ! —বললেন পারুলবালা।

বঙ্কিমবাবু স্ত্রীর দিকে একবার তাকালেন, তারপর দই-মিষ্টির বকেয়া ফর্দর দিকে নজর দিয়ে শুধু একটা শব্দ করলেন,—হুঁ।

পারুলবালা নিজের খুশিতে নিজেই একগাল হেসে বাসনের তদারক করতে চললেন। স্বামীর কাছ থেকে হুঁ কথাটি ছাড়া আর বেশী কিছু তিনি আশাও করেননি।

বঙ্কিমবাবু এমনিতেই একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, তার ওপর মেয়ের বিয়ের ধকলের পরে আজ সকালে যে আরও গম্ভীর হয়ে উঠবেন এতে আর সন্দেহ কি?

কাল রাত্তিরে বিয়ে চুকেছে। আজ বিকেলে বরকনে চলে যাবে। ফিরে আসবে দিন সাতেক পরে। তারপর ওরা চলে যাবে দিল্লী। ছেলেটি দিল্লীতে বেশ ভাল একটি চাকরি করে, শুধু তাই নয়, দেখতে-শুনতে যাকে বলে সুপুরুষ। লম্বা দোহারা গড়ন। ফরসা রঙ। টিকোলো নাক। চোখদুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি।

খুকুও কিছু কম নয়। খুকুর সুপুষ্ট দেহটি যে-কোন পুরুষেরই কাম্য। তার ওপর খুকুর চোখ দুটি যেন মায়ায় ভরা, ভাসা-ভাসা। কে না বিমুগ্ধ হবে খুকুকে দেখলে?

খুকুর ফরসা ছোট্ট কপালে সিঁদুরের টিপটি থেকে আলগা সিঁদুরের গুঁড়ো পড়েছে নাকের ডগায়। বঙ্কিমবাবু তাকিয়ে দেখেন কিছুক্ষণ। এ মেয়ে তাঁরই।

শুধু মেয়ের রূপই নয়, খরচাও করেছেন বঙ্কিমবাবু। প্রায় সাত হাজার টাকা। সাধ্যমত যথেষ্ট খরচ করেছেন।

জামাই-মেয়ে দেখে কারো নিন্দে করবার জো নেই। এই টই বঙ্কিমবাবুর সবচেয়ে বড় তৃপ্তি। কিন্তু সত্যিই কি তৃপ্তি পেয়েছেন বঙ্কিমবাবু? কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধছে মনের অজ্ঞাতে। মনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে না এই বেদনার কারণ।

হয়তো এতকাল মানুষ করবার পর মেয়েকে পরের ঘরে পাঠিয়ে দিতে হবে, তাই এই অবসন্ন ভাবটা—হয়তো তাই!

বঙ্কিমবাবু দইয়ের ফর্দর দিকে চোখ মেলে ভাবতে থাকেন—দুটিতে বেশ মানিয়েছে।

এই মাত্র বলে গেল পারুল-বালা, দুটিতে বেশ মানিয়েছে।

শুনে তাঁর হাসবার কথা, খুশিতে চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠবার কথা, কিন্তু কেন তিনি তা পারলেন না? কথাটিকে খুশির মেজাজে তিনি নিতে পারলেন না কেন?

আজ বিকেলে মেয়ে চলে যাবে, সেই চিন্তায় কি তাঁর মন ভার? হয়তো তাই।

আলমারি থেকে আরও টাকা বার করে বাজারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন বঙ্কিমবাবু। পারুলবালা বার বার মনে করিয়ে দিলে—কলাগাছ আনতে ভুলো না যেন। আর দু গোছ পান। তোমার বরাবর পানটা আনতে ভুল হয়। খবরদার ভুলো না যেন। হ্যাঁ, শোন, কড়ি যদি পাও বেনের দোকানে চার গণ্ডা এনো বাপু। যে কটা আছে, ওতে বৌ-ঝিদের কড়ি খেলা হবে না।

বঙ্কিমবাবু কোঁচাটা ভাল করে গুঁজে নিয়ে একটা কথাও না বলে চাকরকে নিয়ে বেরিয়ে যান। বারান্দা দিয়ে যাবার সময় চোখে পড়ে খুকু রাঙা টুকটুকে দুটি আঙুলে একটি রসগোল্লা তুলে খাওয়াচ্ছে জামাইকে। মুখখানি অপরূপ খুশিতে রাঙা।

জামাই মাথার থোপা থোপা কোঁকড়া চুল কপাল থেকে সরিয়ে ছোট্ট হাঁ করে কামড়ে নিচ্ছে রসগোল্লা। রস পড়লো বেনারসীতে।

খিল খিল করে হাসি। হাসির রোল পড়ে গেল। যৌবনের নির্ঝর হঠাৎ পথ পেয়ে যেন কলকলিয়ে উঠেছে। খুশির মত্ততা।

উন্মত্ততা! —মনে মনে বিরক্ত হয়ে ভাবেন বঙ্কিমবাবু। ঠিক যেন খুশী হতে পারেন না, ব্যাপারটা দেখে।

কেন? বিয়েব পর থেকে জামাই-মেয়েকে পাশাপাশি নানাভাবে নানা রঙে

দেখে তিনি কোনমতেই খুশী হতে পারছেন না কেন?

মেয়ে পর হয়ে গেল এই বেদনায় নিশ্চয়ই। হয়তো হবে।

বাজার এলো। বাসী-বিয়ের কান্ড শুরু হোল। কত মেয়েলী আচার কি যে সব অনাছিষ্টি! বঙ্কিমবাবু জানলা দিয়ে মুখটা না বাড়িয়ে পারেন না।

নীচে শুধু শাড়ির বাহার। মেয়ে-মানুষের ভিড়।

জামাই পরিষ্কার বলিষ্ঠ দুখানা হাতে খুকুর নরম দেহটাকে তুলে ধরে ছোট একটি বানান জলাধার পার করিয়ে দিচ্ছে।

এঁটেল মাটি চারদিকে। মাঝে একটু জল ঢালা হয়েছে। সেইটি পার করাতে হবে জামাইকে। ছেলেটি শক্তিবান। হাতের পেশী ফুলে উঠেছে। সিল্কের পাঞ্জাবিটা কনুয়ের ওপর গোটান, তাই দেখতে অসুবিধে হয় না। হাতের গিপ্ আছে। খুকুকে চেপে ধরেছে।

মেয়েদের কি হাসি। মনের কোন্ এক অজ্ঞাত জায়গায় প্রতিটি মেয়েই যেন একটা কাতুকুতু অনুভব করছে। কি আশ্চর্য এই মেয়েগুলো!

খুকুও গা ছেড়ে দিয়েছে ওই বলিষ্ঠ হাতের গ্রিপে। কি যে সব কান্ড!

বঙ্কিমবাবু জানলা থেকে সরে আসতে চান। কেউ দেখে ফেললে কি মনে করবে? সরে আসতে কিন্তু পাচ্ছেন না। দেখেই চলেছেন।

ঠিক যা ভেবেছেন তাই। বঙ্কিমবাবুর মোটা শ্যালিকাটি ওপর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলছে—আপনি কি দেখছেন দাদাবাবু—আপনি সরে যান।

বলবার আগেই মুহূর্তে সরে এসেছেন বঙ্কিমবাবু।

পারুলবালা ঘরে ঢুকলেন—হ্যাঁগো, যা ভেবেছি তাই।

বঙ্কিমবাবু ভয়ে ভয়ে [illegible] পারুলবালার ঢাকার মত গোল [illegible] ঘামে ভেজা। প্রায় হাঁপাতে [illegible] বল্লেন—এত করে বলে দিলুম [illegible] দই এনো। ঠিক ভুলে ব[illegible]

বঙ্কিমবাবুর ইচ্ছে হে[illegible] বলেন—কই বলেছ?

কিন্তু বলতে ইচ্ছে হো[illegible] যে, এ কথা বললে প[illegible] স্মরণশক্তি সম্বন্ধে অব[illegible]

করবেন, এবং বলে বসবেন, যত বুড়ো হোচ্ছো, তত ভীমরতি ধরছে।

তিনি বুড়ো হচ্ছেন—কথাটা শুনতে তাঁর মোটেই ভাল লাগবে না।

বঙ্কিমবাবু ব্যাগ থেকে দশ টাকার একখানা নোট বার করে পারুলবালার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,—আনিয়ে নাও।

নোটখানা নিয়ে পারুলবালা ঘর থেকে চলে গেলেন।

দুপুরে স্নান করতে নামবার সময় বঙ্কিমবাবু ঘরের সামনে দাঁড়ালেন একবার। জামাই খেতে বসেছে। একটু সময় তাকিয়ে থাকেন বঙ্কিমবাবু। ঘরে ঢোকাটা তাঁকে মানায় না। তিনি ঘরে ঢুকলেই সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে। মেয়েরা গম্ভীর হয়ে উঠবে। মুখের হাসি-খুশি ছায়া মিলিয়ে যাবে। জামাই মুখ নীচু করে খেতে থাকবে।

তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে। ভয় করে।

ভয় আর শ্রদ্ধা! বঙ্কিমবাবুর মনটা তিক্ত হয়ে ওঠে। ওদের খুশির হাটে তাঁর স্থান নেই। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে তেইশ-চব্বিশ বছরের দলে মেশা বারণ। হাসতে বারণ। যৌবনের জোয়ারের তরঙ্গে ভাটার স্থান নেই। ভাটা যেখানে সেখানে জোয়ারের অফুরন্ত জলের কলরব নেই।

বঙ্কিমবাবু চশমাটা খুলে কোঁচার খুঁটে মুছতে থাকেন, যেন চশমাটা মুছতেই দাঁড়িয়েছেন। ওদের দেখবার জন্যে নয়।

জামাই গেঞ্জী পরে খেতে বসেছে। ধবধবে পরিষ্কার চওড়া বুকখানা ওপরের দিকে রাঙা, একটা কিছু যেন চাপা ছিল বুকের ওপর অনেকক্ষণ।

জামাই হাসছে। সাজান ঝকঝকে দাঁতগুলো সত্যিই সুন্দর।

নিজের অজ্ঞাতে বঙ্কিমবাবু নিজের দাঁতের ওপর জিভটা বুলিয়ে অনুভব করেন নীচের পাটির তিনটে দাঁত তাঁর নেই। চশমাটা আবার মোছেন।

অকস্মাৎ একটা হাসির কলরোল।

জামাই একটা রসগোল্লা কামড়ে [illegible] থু করে ফেলে দিচ্ছে। কি হোল? [illegible] রসগোল্লায় আবার হোল কি? মেয়েরা [illegible] প্রায় লুটিয়ে পড়েছে। এ ওর গায়ে [illegible] ঢলি।

[illegible] হোল গো? রসগোল্লায়

—এমন জামাই তো কখনো দেখিনি বাবা, রসগোল্লা খায় না!

—তা ভাই, একটা বাস্তা জানা গেল। রসগোল্লায় যখন অরুচি তখন জামাইয়ের রস কম। একবারে নীরস। কি বোল বলো তো ভাই?

জামাইয়ের মুখখানা টকটকে লাল। রাগে, না লজ্জায় কে জানে?

বলে, কি যে কারণ! নুনের জলে রসগোল্লা ভিজিয়েছেন।

মেয়েদের জবাব দেবার প্রতিযোগিতা পড়ে যায়।

—আমাদের দেশে ভাই মিষ্টি মেলে না। আমরা মুখের চিনিতে মিষ্টি করে নিই।

—তা কেন? ময়রা যখন চিনির বদলে নুন ভেজাল দিচ্ছে। তখন জামাইয়ের ভেতরেও যে কি ভেজাল আছে কে জানে! কিছুই বিচিত্তির নেই!

—তুই থাম তো বাপু। জামাই আমাদের গুলে মারছে কিনা কে জানে! আমরা ভাই মিষ্টি রসগোল্লাই দিইচি। আমাদেরও খুকুও নোনতা নয়, মিঠে। চেখে দেখো।

—চাখতে আবার বাকী আছে কিনা। আবার একটা হাসির রোল।

হঠাৎ হাসির শব্দ থেমে যায়। এই চুপ! চুপ!

—কি রে! কি হোল?

—জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে ওখানে।

একজন একটু উঁচু স্বরে শুনিয়ে বলে,—কি যে করিস তোরা, যা চারটে ভাল রসগোল্লা নিয়ে আয়। তোদের ঠাট্টার চোটে বেচারীর খাওয়াটা মাটি হোল।

—বেচারী! চাপা হাসির শব্দ ভেসে আসে।

বঙ্কিমবাবু ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছেন। গামছা কাঁধে দেখে পারুল-বালার চোখ দুটো কপালে ওঠে। খাবার-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পারুল-বালা। কপালের সিঁদুর ঘামে গলে ভুরুর ওপর গড়িয়ে পড়েছে। লাল পেড়ে শাড়ি পরণে। মোটা মানুষ, তার ওপর গরম। মোটা নাকের পাতা দুটো ফুলে উঠছে। হাঁপিয়ে উঠছেন যেন।

বঙ্কিমবাবুকে দেখে চোখ কপালে তুলে বলে ওঠেন,—ওমা গো! তুমি এখনো চান করনি?

বঙ্কিমবাবু কথা বলেন না।

—তোমাদের জ্বালায় আরও জ্বলে মলুম। জামাইয়ের খাওয়া হয়ে এলো, তোমাদের মিটিয়ে দিয়ে ভাবলুম জিনিস-

পত্তরগুলো গুছিয়ে দোব, তা তোমার এখনো চানই হয়নি। আশ্চর্য তোমাদের আক্কেল!

বঙ্কিমবাবু তাকিয়ে থাকেন পারুল-বালার দিকে। মোটা একটি বেমানান মাংসপিণ্ডর ভেতর থেকে যেন একটা বিরক্তি আর জ্বালা বেরিয়ে আসছে। হলুদ আর ময়লা-মাখা শাড়িখানা একদা এক বেনারসীর রঙচটা ময়লা জরির মত ম্লান আর বিরক্তিকর। তোরঙ্গের ভাপসা গন্ধ। বঙ্কিমবাবু এ সব কি আবোল-তাবোল ভাবছেন।

—হাঁ করে দেখছো কি, চান করে আর কিতাত্থ করো।

নীরবে কলঘরে চলে যান বঙ্কিম-বাবু। কথা বলতে পারেন না।

জামাই গেঞ্জী পরে খেতে বসেছে......জামাই হাসছে

শুধু, বঙ্কিমবাবু কমই বলেন।

দু'খানা ট্যাক্সি এসেছে। একটা লরী।

মালপত্তর তো আর কম নয়। তোরঙ্গ, বিছানা, খাট, সেলাইয়ের মেসিন, রেডিও, ড্রেসিং টেবিল কি নেই। খরচ তো বঙ্কিমবাবু কম করেননি। তবু তো বছর দুয়েক আগে আড়াই হাজার টাকার গয়না গড়িয়ে রেখেছিলেন। কিছু টাকা জমা ছিল, আর অপিস থেকে ধার করেছেন হাজার দুয়েক টাকা। মাসে একশ' টাকা করে কাটবে।

কে না প্রশংসা করেছে! কোন খুঁত রাখেননি বঙ্কিমবাবু।

যেমন মেয়ে তেমনি জামাই, দুটিতে মানিয়েছে বেশ! বারবার শুনছেন বঙ্কিমবাবু। চুপ করে বসে আছেন। কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

—জ্যাঠামশাই কেমন মনমরা হয়ে গেছে! তা আর হবে না। খুকুকে কি ভালইবাসত!

—দাদাবাবুর মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে! মেয়ে পরের ঘরে চলেছে! বাপের মন তো!

বঙ্কিমবাবুর কানে আসছে কথা-গুলো।

পারুলবালা কাঁদছেন। কেই বা কাঁদছে না! খুকু তো কেঁদে কেঁদে প্রায় চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। জামাইয়ের মুখখানা শুকনো। ভাব দেখে মনে হয়, ওই যেন অপরাধী। ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাপ-মায়ের বুক থেকে আদরের মেয়েকে।

—সকালে খুকুর চা খাওয়া অভ্যেস, তা ছাড়া খিদে একবারে সইতে পারে না। দেখো বাবা, তোমার হাতে তুলে দিলুম, তুমি দেখো বাবা!

পারুলবালা জামাইয়ের হাত ধরে কাঁদছেন। জামাই মুখখানা নীচু করে শুধু বললে, —কোন অসুবিধে হবে না।

পারুলবালার বোন বঙ্কিমবাবুর মোটা শ্যালিকা বলেন, —খুকু যে আমাদের কত আদরের, তা আর কি বলবো! এখন তোমার আদরের হয়, তবেই আমাদের আনন্দ।

জামাই মুখনীচু করেই রইলো।

—ক' দফা জিনিস উঠলো, গুনে ফেল। আঠারো দফা। সব উঠেছে তো!

ছেলে-ছোকরাদের চেঁচামেচি চলেছে। ওরই ভেতর দু-একটি বিয়ে-না করা ছেলে দু একটি বিয়ে-না-করা মেয়ের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। যেন চুম্বকের মত টানছে। চুম্বক যত সরছে, লোহাও তত সরে আসছে।

প্রণামের পালা শুরু হোল। কান্না ক্রমে সরব হয়ে উঠলো।

বঙ্কিমবাবুকে প্রণাম করল জামাই। লম্বা সমর্থ দেহ নুয়ে পড়লো। মস্ত পিঠখানায় হাত রাখলেন বঙ্কিমবাবু।

খুকু ফোঁপাতে ফোঁপাতে প্রণাম সেরে নিলো। বঙ্কিমবাবু আশীর্বাদ করলেন।

—যাই বলো দুটিতে মানিয়েছে যেন হর-পার্বতী।

কে একজন বললে।

সবাই বেরোল রাস্তার দিকে। উলু আর শাঁখের আওয়াজ।

শূন্য ঘরে বসে বঙ্কিমবাবু মাথাটা নীচু করলেন।

খুকুটা চলে গেল। সব যেন কেমন ফাঁকা হয়ে গেল! খুকুটা পর হয়ে গেল। এমনি করেই তো সব মেয়েই পর হয়ে যায়। খুকুর মা-ও একদিন পর হয়ে এ বাড়িতে এসেছিলো। তখন—তখন বঙ্কিমবাবুর যৌবন ছিল। খুশিতে ভরে উঠেছিলো মন।

দেহটা ছিল পাতলা, আরও শক্ত-সমর্থ!

যৌবন। যৌবন কেন চলে যায়? কেন যৌবন থাকে না, অনেক কাল থাকে না?

বঙ্কিমবাবুর চোখ জলে ভরে উঠেছে।

খুকুটার জন্যে কষ্ট হচ্ছে এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছেন বঙ্কিম-বাবু। চোখ উপচে জল পড়ছে।

দুটি যৌবন মিলেমিশে একাকার হবে। জোয়ারের উচ্ছলতা। যত হেসেছে তত [illegible] নছে। আবার হাসবে। হাসবেই [illegible]

বঙ্কি[illegible]র ভাঁটায় নিথর মন নিস্পে[illegible]ছ। এ কিসের জ্বালা। [illegible] মত্ততা।

[illegible] আগের গান-গাওয়া একটি [illegible] দিকে হাত বাড়িয়ে-ছিলে[illegible] ভাবেন [illegible] পাখী আর কোনো দিনই [illegible] হতে পারবে না তার পুরনো বাস[illegible] কেন?

মেয়েকে পাল্লা।

॥ মুক্তি ॥

এবারের স্বাধীনতা দিবসের এইটিই বোধ করি সবচেয়ে বড় সুসংবাদ। রাজ্য সরকারের বহুপ্রতীক্ষিত সিদ্ধান্তানুসারে এই স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি পেলেন প্রায় এক যুগ বা তারও আগে কারাগারে নিক্ষিপ্ত কুড়ি পঁচিশজন রাজনৈতিক কর্মী। স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরাতন ও পরীক্ষিত সৈনিক তাঁরা। যৌবনের প্রারম্ভেই দেশের ডাকে ঘর ছেড়েছিলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও ফিরে যেতে পারেননি। কারণ আজ থেকে পনের বছর আগে যে অভাবিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এদেশ স্বাধীন হয় তাকে অশংকচিত্তে তাঁরা ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতিরূপে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর স্বাধীনতা সংগ্রামের চিন্তাধারা ও কাজে যে পরিবর্তন ঘটা উচিত ছিল তাঁদের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। অবশ্য পরবর্তীকালে এশিয়া ও আফ্রিকার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইতিহাসই বুঝিয়ে দিয়েছে তাঁদের যে সেদিন কত বড় ভুল করেছিলেন তাঁরা। আর এতদিন নীরবে কারাযন্ত্রণা ভোগ করে প্রকৃত যোদ্ধার মতই সে ঐতিহাসিক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন তাঁরা।

দেশবাসীও তাই তাঁদের শুধু ভ্রান্ত বলেই জেনেছিলেন, কখনও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা হারাননি। এবং একারণে আবার তাঁরা মুক্ত হোন ও স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করুন—এ প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে কোন বিবেচনাবোধসম্পন্ন নাগরিক কখনোই দ্বিধা বোধ করেননি। পশ্চিমবঙ্গের নূতন মুখ্যমন্ত্রী শাসনদায়িত্ব গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ মাত্র পরেই যে স্বাধীনতা দিবসে তাঁদের মুক্তি দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তাতে তাঁর বিচক্ষণতা ও চিন্তাধারার দৃঢ়তায় দেশবাসীর আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে। দেশ গঠনের কাজে নূতন মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী-দলগুলির কাছেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমরা আশা করব, এ আহ্বানে অন্যান্য সকল দলের সঙ্গে সদ্যমুক্ত রাজনৈতিক কর্মীরাও আন্তরিকভাবে সাড়া দেবেন।

॥ জামাইকা ॥

বিশ্বের রাষ্ট্রসমাজে আর এক নবজাতকের আবির্ভাব হল। নবজাতকের মতই ক্ষুদ্র এই রাষ্ট্রটির নাম জামাইকা। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে [illegible]রিবিয়ান সাগরে পশ্চিম [illegible]রতীয় [illegible] নামে পরিচিত [illegible] বৃহত্তম এই দ্বীপটির আ[illegible] ৪,৪[illegible]১ বর্গমাইল। নিকটবর্তী [illegible] ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্র কিউবাও তার চেয়ে প্রায় এগার গুণ বড়। দ্বীপটির সর্বাধিক দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪৪ মাইল ও সর্বাধিক প্রস্থ প্রায় ৫০ মাইল। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার চেয়েও জামাইকা আয়তনে প্রায় এক হাজার বর্গমাইল কম। সর্বশেষ হিসাবে জামাইকার লোকসংখ্যা প্রায় সতের লক্ষ।

অচিরাতিবিলম্বেই জামাইকা রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ লাভ করবে এবং তখন তার রাজনৈতিক মর্যাদা হবে বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন রাষ্ট্রের সমতুল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটির অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত। মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান সাগরবর্তী অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মত জামাইকার অর্থনীতি যদিও নিছক কৃষি-নির্ভর নয় বা তার খনিজ সম্পদ বক্সাইট হতে বিদেশী মুদ্রা খুব কম আসে না তবুও তাতে জামাইকার প্রধান সমস্যার সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ। সে সমস্যাটি হল ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যাজনিত বেকার সমস্যা। ত্রিশ সালের অর্থনৈতিক মন্দার পূর্বে পর্যন্ত জামাইকার লোকেরা দলে দলে যেত পানামা, কোস্টারিকা, যুক্তরাষ্ট্র, গুয়াতেমালা, কিউবা, কানাডা প্রভৃতি দেশগুলিতে কাজের সন্ধানে। তারপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংকটের ফলে আমেরিকায় জামাইকা শ্রমিকদের দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় তারা আসতে আরম্ভ করে বৃটেনে এবং এই বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত সে স্রোত ছিল অব্যাহত। কিন্তু বহিরাগত আইন পাশ হওয়ার পর বৃটেনের দুয়ারও তাদের সম্মুখে বন্ধ হয়েছে। এ অবস্থায় জামাইকার পক্ষে জাতীয় অর্থনীতির সংকট দূর করা খুবই কঠিন হবে বলে মনে হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফেডারেশন অভগ্ন থাকলে জামাইকার সংকট হয়ত এতটা গুরুতর হত না। কিন্তু পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অসহিষ্ণুতার ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ দ্বিধাবিভক্ত। ওয়েস্ট ইন্ডিজত্যাগী অপর দ্বীপসমষ্টি ত্রিনিদাদ ও তোবাগোও আগামী ৩১শে আগস্ট স্বাধীন হবে। অবশিষ্ট বারবাডোজ ও লীওয়ার্ড-উইন্ডওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের নয়টি দ্বীপ নিয়ে পুনর্গঠিত হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফেডারেশন। বৃহৎ শক্তির প্রভাবে পড়ে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিতে যদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অশান্তি নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় তবে সেটা বিস্ময়কর কিছু হবে না।

আলজিরিয়া

বেন খেদা ও বেন বেলার বিরোধের ফলে আলজিরিয়ায় যে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল বেন খেদার নীতি-স্বীকারের ফলে আপাতত তার মীমাংসা হয়েছে বলে মনে হয়। স্বাধীনতার পরেই ফরাসী পক্ষপাতিত্বে বেন খেদা আলজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী হয়ে যে প্রাথমিক সুযোগটুকু লাভ করেছিলেন উপযুক্ত জনসমর্থন, বিশেষ করে সামরিক সমর্থনের অভাবে সে সুযোগ তিনি হারান। এক মাসের মধ্যেই আলজিরিয়ার তিন-চতুর্থাংশ বেন বেলার সমর্থকদের করায়ত্ত হওয়ায় সংগ্রাম

নিরর্থক বুঝে বেন খেদা বেন বেল্লার প্রত্যেকটি দাবীই মেনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, গত ৭ই আগষ্ট বেন বেল্লার হাতে সমস্ত শাসনদায়িত্ব তুলে দিয়ে তিনি অকস্মাৎ আলজিরিয়ার রাজনৈতিক রংগমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এক ঘোষণায় তিনি বলেছেন, আলজিরিয়ার অস্থায়ী সরকার কাগজে-কলমে বজায় থাকলেও তার যাবতীয় ক্ষমতা এখন থেকে বেন বেলা গঠিত রাজনৈতিক সংস্থাই (পলিট ব্যুরো) প্রয়োগ করবেন।

বেন খেদার এই আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে আলজিরিয়ায় একাধিক দলভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসনের সম্ভাবনাও লোপ পেল। ২৭শে আগষ্ট যে নির্বাচন হওয়ার কথা আছে আলজিরিয়ায় তাতে যাতে শুধু পলিট ব্যুরো অনুমোদিত ব্যক্তিরাই অংশ গ্রহণ করতে

ঘোষণা

• বর্তমান সংখ্যায় স্থানাভাববশতঃ 'মতামত' এবং 'জানাতে পারেন' প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে।

পারেন বেন বেলা তার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। ইতিমধ্যে মুক্তিফৌজকে (এফ. এল. এন) আলজিরিয়ার এক ও অদ্বিতীয় রাজনৈতিক দলে পরিণত করাই হবে তাঁর একমাত্র কাজ।

এই একদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে যে জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে তারই সদস্যরা আলজিরিয়ার নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। বেন বেলা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের নেতা নাসেরের সুহৃদ। সুতরাং, মনে হয়, তিনিও শেষ পর্যন্ত নাসেরের মত মূলত সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল একদলীয় শাসন আলজিরিয়ায় কায়েম করবেন।

॥ এডেন ॥

বৃটিশ উপনিবেশ এডেনের ভবিষ্যৎ নিয়েও বৃটিশ সরকারের সঙ্গে এডেনবাসীদের আলোচনা শুরু হয়েছে। এডেন ও 'ফেডারেশন অফ দি আরব আমিরেটস অফ দি সাউথ' নামক এগারোটি ক্ষুদ্র আরব রাজ্যের সম্মিলনে 'দক্ষিণ আরব যুক্তরাষ্ট্র' নামে একটি বৃহত্তর আরব রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা বর্তমানে বৃটিশ সরকার ও এডেন উপনিবেশের নেতৃবৃন্দের বিবেচনাধীন।

আজ্ঞে কাইণ্ডলি বলবেন আপনাকে যিনি এটা লিখতে দিয়ে গেছেন তাঁর ঠিকানাটা?

এডেন উপনিবেশের আয়তন ৭৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। প্রধানত বন্দরকে কেন্দ্র করেই এই উপনিবেশটি গড়ে উঠেছে এবং এখানকার অধিবাসীরা পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র আরব রাজ্যগুলির তুলনায় অনেক বেশী সুখী ও অগ্রসর। অপরপক্ষে যে বৃটিশ আশ্রিত ক্ষুদ্র আরব রাজ্যগুলির সম্মিলনে দক্ষিণ আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে তাদের সম্মিলিত আয়তন ১ লক্ষ ১২ হাজার বর্গমাইল, এবং লোকসংখ্যা এডেনের তুলনায় অনেক বেশী। একারণে স্বাভাবতই এই প্রস্তাবিত আরব রাজ্য গঠনের বিরুদ্ধে এডেনের শ্রমিক সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও রাজনৈতিক সংগঠন 'পিপলস সোস্যালিষ্ট পার্টি' ও 'পিপলস কংগ্রেস পার্টি' বলেছেন, এই সংযুক্তির অর্থ হবে এডেনের অধিবাসীদের ওপর কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল আমিরের শাসন চাপিয়ে দেওয়া। তাই তাঁরা দাবী করেছেন, সংযুক্তির প্রস্তাব কার্যকরী করার আগে এডেন ও ক্ষুদ্র আমিরশাহীগুলির সর্বত্র গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করতে হবে। এবং জনগণের সম্মতি অনুসারে গঠন করতে হবে নতুন রাষ্ট্রসংগঠন। প্রস্তাবটি এখন বৃটিশ সরকারের বিবেচনাধীন।

ঘটনা-প্রবাহ   # ঘটনাপ্রবাহ   ঘটনা-প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২রা আগষ্ট—১৭ই শ্রাবণ : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান সভায় তুমুল হট্টগোল ও উত্তেজনা—মুখ্যমন্ত্রীর (শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন) বক্তৃতাকালে বিরোধী পক্ষের প্রবল বাধাদান—বিভিন্ন সমালোচনার উত্তরে অবিচল দৃঢ়তার সহিত শ্রীসেন কর্তৃক সরকারী নীতি বিশ্লেষণ—সর্বদলীয় সদস্যসহ এস্টিমেটস্ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

উদ্বাস্তু ঋণ আদায়ের প্রশ্নে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ (কলিকাতা) মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার মধ্যে বৈঠক।

৩রা আগষ্ট—১৮ই শ্রাবণ : 'চীনের বর্তমান মনোভাবের পরিবর্তন না হইলে সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে আলোচনা চালানো অসম্ভব'—মার্শাল চেন ই'র (চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী) প্রস্তাব সম্পর্কে পার্লামেন্টে শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) ঘোষণা।

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন জাতীয়করণের দাবী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বেসরকারী প্রস্তাব ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য।

'গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাভার সরকারের হাতে লওয়া উচিত'—বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশনের সুপারিশ—পরীক্ষা-পদ্ধতি ও হিসাবাদির গলদ উল্লেখ করিয়া কঠোর মন্তব্য।

৪ঠা আগষ্ট—১৯শে শ্রাবণ : পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে পাক হানা ও অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্যে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন—রাজ্য বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত—চার সপ্তাহব্যাপী বাজেট অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা।

আসামে তিন লক্ষ পাকিস্তানীর অবৈধ বসবাস—রাজ্য বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার বিবৃতি।

'চীন বা পাকিস্তান আক্রমণ করিলে সমুচিত জবাব দেওয়া হইবে'—পুণার জনসভায় ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের ঘোষণা।

৫ই আগষ্ট—২০শে শ্রাবণ : বিধানচন্দ্র সপ্তাহের (৫ই—১২ই আগষ্ট) উদ্বোধনী দিবসে অভূতপূর্ব সাড়া—পরলোকগত জননেতার স্মৃতি তহবিলে রাজ্যপাল (শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু) ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন কর্তৃক অর্থ সংগ্রহ—প্রথম দিনেই কলিকাতায় লক্ষাধিক টাকা আদায়।

'লাডাকের অবস্থা গুরুতর : সংঘর্ষের আশংকা রহিয়াছে'—সীমান্তে চীনা ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে (দিল্লী) শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন কর্তৃক রাণাঘাটে ভারত-জাপানের যুক্ত উদ্যোগে গঠিত কৃষি খামারের উদ্বোধন।

৬ই আগষ্ট—২১শে শ্রাবণ : ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের অভিনব উদ্যম—বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট নির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ পত্র প্রেরণ।

'আঞ্চলিক অখণ্ডতায় আঘাত আসিলে দৃঢ়ভাবে বাধা দিব, প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগ করিব'—লাডাক পরিস্থিতি আলোচনা প্রসঙ্গে পার্লামেন্টে শ্রীনেহরুর ঘোষণা—চীনের সর্বশেষ নোট (ভারতের প্রস্তাবের জবাবে প্রেরিত) নৈরাশ্যজনক বলিয়া অভিমত প্রকাশ।

৭ই আগষ্ট—২২শে শ্রাবণ : ১৫ই আগষ্ট (স্বাধীনতা দিবস) পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দান—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন ও শিক্ষামন্ত্রীর (রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী) সহিত মাধ্যমিক শিক্ষক প্রতিনিধিমণ্ডলীর সাক্ষাৎকার — শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা।

৮ই আগষ্ট—২৩শে শ্রাবণ : কলিকাতা ও শহরতলীতে মাছের অগ্নিমূল্য (সের পাঁচ টাকা পর্যন্ত)—সরবরাহ শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস ও মূল্য ৪৩ ভাগ বৃদ্ধি—সাংবাদিকদের নিকট রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমানের বিবৃতি দান।

স্বীয় খনি হইতে কয়লা উত্তোলনে পশ্চিমবঙ্গের স্বাধিকার লাভ—সুপ্রীম কোর্টে মামলা বহাল থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রের সহিত রাজ্য সরকারের বিরোধ মীমাংসা—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন কর্তৃক তথ্য প্রকাশ।

॥ বাইরে ॥

২রা আগষ্ট—১৭ই শ্রাবণ : আলজিরিয়ায় মাসব্যাপী গৃহ-বিরোধের অবসান—বিবদমান বেন বেল্লা (উপ-প্রধানমন্ত্রী) ও বেন খেদার (অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী) দলের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা—বেল্লার পলিটিক্যাল ব্যুরো স্বীকৃত—২৭শে আগষ্ট গণ-পরিষদের নির্বাচন।

৩রা আগষ্ট—১৮ই শ্রাবণ : 'চীনা ফৌজ সীমান্তে নিজস্ব ভূমি ছাড়িয়া আসিবে না'—জেনেভায় চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ই'র সদম্ভ ঘোষণা—সীমানা নির্ধারণের প্রশ্নে ভারতের সহিত আপোস-আলোচনায় ইচ্ছা প্রকাশ।

পাকিস্তানের সহিত সীমানা নির্ধারণের কাজ ত্বরান্বিত করার উপায় বিবেচনা—পূর্ব পাকিস্তান, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের চীফ সেক্রেটারীদের বৈঠকান্তে যুক্ত ইস্তাহার প্রচার।

৪ঠা আগষ্ট—১৯শে শ্রাবণ : দক্ষিণ জর্জিয়ায় বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে অব্যাহত বিক্ষোভ অভিযান—এযাবৎ ৪ শতাধিক নিগ্রোর কারাবরণ।

৫ই আগষ্ট—২০শে শ্রাবণ : রাশিয়া কর্তৃক পুনরায় ৪০ মেগাটনী বিস্ফোরণ—বায়ুমণ্ডলে দ্বিতীয় বৃহত্তম আণবিক পরীক্ষা—সোভিয়েট নৌ, বিমান ও রকেট বাহিনীর ১১-সপ্তাহব্যাপী মহড়া আরম্ভ।

বৃটেনের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে প্রবেশের প্রশ্ন কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন (১০ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে আহূত) পর্যন্ত স্থগিত—ব্রাসেলসে সাধারণ বাজার সংশ্লিষ্ট ছয় জাতির মধ্যে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির কৃষি-পণ্য রপ্তানী ব্যাপারে ব্যর্থ আলোচনা।

তিনশত বৎসর বৃটিশ শাসনাধীনে থাকার পর জামাইকার স্বাধীনতা লাভ।

৬ই আগষ্ট—২১শে শ্রাবণ : ফরমোসায় টাইফুনের প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা—৮৭ জন নিহত, দেড় হাজার আহত ও ছয় হাজার গৃহ বিধ্বস্ত—জাপানেও টাইফুনে ১৮ জনের প্রাণহানি।

৭ই আগষ্ট—২২শে শ্রাবণ : বেন খেদার (প্রধানমন্ত্রী) নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী আলজিরীয় সরকারের সকল ক্ষমতার অবসান—উপ-প্রধানমন্ত্রী বেন বেল্লার 'পলিটিক্যাল ব্যুরোর' হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত।

৮ই আগষ্ট—২৩শে শ্রাবণ : কাটাঙ্গা ও বহির্বিশ্বের মধ্যে সরাসরি ডাক-তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন—রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক বিমানযোগে কাটাঙ্গা গমনের পারমিট দানও অগ্রাহ্য।

ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা আকাশ-পথে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংস সাধনে মার্কিন সাফল্যের ঘোষণা।

নেপালে রাজকীয় বাহিনীর সহিত বিদ্রোহীদের পুনরায় তুমুল সংঘর্ষের সংবাদ।

এসো নীপবনে— (উপন্যাস)— শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বুক সোসাইটি। ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা বার। দাম চার টাকা।

'এসো নীপবনে' শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাধুনিক উপন্যাস। নায়ক এক পঙ্গু তরুণ কবি, নিষ্ঠুর নিয়তির মত যে বউদির অবৈধ প্রেমলীলার পুতুল। এই অসহ্য অস্তিত্ববোধ একদিন কবিকে চরম হতাশায় নিমজ্জিত করে তুলল। কবি আত্মহত্যা করলেন। এই তরুণ প্রতিভাধর কবির মৃত্যুতে শ্মশানে সমাগত সাহিত্যিক ও প্রকাশকসমাজ। মৃত্যু উপলক্ষ্য ছাপিয়ে তারা আত্মপ্রচারে মুখর হয়ে ওঠে, সবশেষে অতিমাত্রায় উগ্র হয়েই লেখক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অপর চরিত্র সাংবাদিক হেমন্ত---বেহেড মাতাল এবং পত্নী-পরিত্যক্ত। লেখকের বর্ণনাগুণে চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মদে-মাতাল অন্য মানুষগুলির তুলনায় সে অপ্রকৃতিস্থ হয়েও ধাতস্থ। সমাজের ভণ্ডামি-নোঙরামির মূর্তিমান প্রতিবাদ এই চরিত্রটি।

আধুনিককালের কথাশিল্পী শান্তিরঞ্জনের জীবন-দর্শন অন্য সাহিত্যিক-নিরপেক্ষ—ব্যতিক্রমসৃষ্টিপ্রয়াসী। সামাজিক জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি তিনি মুক্ত চোখে দেখেন। রচনাশৈলী তির্যক, শাণিত এবং বক্র। তথাকথিত কাহিনী-চয়ননিপুণ শিল্পীদের মতো আজকের যুগেও একটি নিটোল গল্প বিস্তার করতে লেখক রাজি নন। ফলে, তাঁর উপন্যাসে গল্প-পড়ার সুখ নেই। আছে অপূর্ব চরিত্রশালা—সমাজের ভগ্ন খর্ব অসুস্থ মানুষের মানসিক চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এই চরিত্রগুলি নিশ্চয়ই নিত্য দেখা চোখের মানুষ নয়। লেখক তাঁদের সমাজের অন্ধকার মহল থেকে টেনে বের করে এনেছেন। চরম দুঃসাহসের সঙ্গে সেই রূপ তুলে ধরেছেন পাঠকদের সামনে। উপন্যাসের পরিশিষ্টে লেখক দিবাস্বপ্নের মত একটি প্রতীক ব্যবহার করেছেন। ঔপন্যাসিক যে এক্সপেরিমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তার সার্থকতার পরিণতি আশা করি।

মধ্যপঞ্চাশ— (উপন্যাস)—চাণক্য সেন। প্রকাশক ঃ নবভারতী। ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—২·৫০

শ্রীচাণক্য সেন সাম্প্রতিককালে কিছু রিপোর্টাজধর্মী রচনা লিখে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হয়েছেন। আলোচ্য রচনাটিকে লেখক ক্ষুদ্র উপন্যাস বলে দাবী করেছেন। এবং বিষয়বস্তু মধ্যবিংশ শতাব্দী-উত্তীর্ণ ভারতবর্ষের সমুদ্রো উদ্বেলিত মুখর-জীবনের চলচ্চিত্র। এই কাহিনীর চৌহদ্দি নয়াদিল্লির কেরাণী-পাড়া—উর্দীভয় অফিসের এবং দপ্তরী ক্লাশের কৌলীন্য-প্রতিষ্ঠার কাহিনী। গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ মানবপ্রবাহের চলমান মুহূর্তকে ধরবার চেষ্টা করেছেন লেখক। মধ্যপঞ্চাশের চাকুরীকেন্দ্রিক প্রাণীগুলির নির্মম আলেখ্য এখানে সমুপস্থিত। তথাপি সন্দেহ হয় উপন্যাসের ধর্মীয় অঙ্গীকার লেখক পালন করতে পেরেছেন কিনা। রিপোর্টাজ হিসেবে এ-কাহিনী অনবদ্য। কিন্তু উপন্যাসের মানদণ্ডে বিচার করতে হলে ধাঁধা লাগে। কারণ এখানে কাহিনী, চরিত্রায়ন এসেছে কলকাতার ঢঙে, নায়কের সাংবাদিকসুলভ প্রচারের মাধ্যমে। ফলে লেখকের ক্ষুরধার সাবলীল ভাষা (যা রিপোর্টাজের অন্যতম লক্ষণ) উপন্যাসের রস-রচনায় ব্যাহত হয়েছে। এবং সেটা বোধহয় লেখক কাহিনীর শেষে ধরতে পেরেছিলেন তাই নায়কের স্বগতভঙ্গিতে স্বতঃসিদ্ধের ঘোষণা-মতো দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। লেখকের বুদ্ধিগ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ এবং বর্ণনায় মননশীলতার স্বাক্ষর সুপরিস্ফুট কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত বিতর্কের আবহাওয়া তুলতে পারে। তথাপি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা পাঠক-মনে চিন্তার খোরাক যোগাবে।
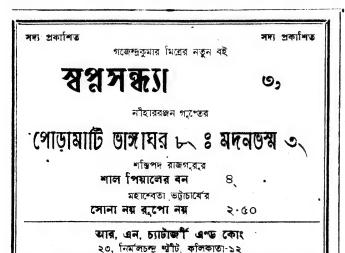
চেনামুখ— (উপন্যাস)— খগেন্দ্র দত্ত। পরিবেশক—বুকস এ্যান্ড বুকস। ৪০।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দাম তিন টাকা।

এই উপন্যাসটি লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস। তাঁর প্রথম উপন্যাসের মত এই উপন্যাসের পটভূমিতে আছে মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবার। নায়িকা, স্বপ্না প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আর পড়তে পারেনি দারিদ্র্যের জন্য, বিয়ের চেষ্টা চলছে। তার বাবা দরিদ্র, পাত্রপক্ষের দাবী মেটানো তার সাধ্যাতীত। স্বপ্নার বান্ধবী ইতুর কাছে আসে প্রেমপত্র, তার ভালোবাসার জন তাকে নিয়ে যায় সিনেমায়, রেস্তোরাঁয়, ইত্যাদি আধুনিক প্রেমাভিযানের ক্রীড়াভূমিতে, সেই-সব চটকদার কাহিনী স্বপ্না শোনে ইতুর মুখে। হয়ত নবেন্দু তাকে বাঁচাতে পারত, সে কিন্তু ধরা দেয় না। শেষ পর্যন্ত অসবর্ণ বিবাহ ঠিক, সেই বিয়েতে বাবা-মার আপত্তি, পালাতে গিয়ে উভয়েই ধরা পড়ে বিয়ে গেল ভেঙে। নবেন্দু একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে, রাত্রে মেয়ের চরিত্রে অপবাদ দিয়ে চলে যায়। নবেন্দু অবশ্য এইবার এসে বাঁচায়, তবে এ বিবাহ বিবাহ নয়, বিবাহের চেয়ে বড়ো, অর্থাৎ সখ্য বিবাহ, চুক্তি অনুসারে দুজনে বিবাহিত কিন্তু স্বামী-স্ত্রী নয়। খগেন্দ্র দত্ত চিন্তাশীল লেখক, সমাজের এক বিচিত্র সমস্যার দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আজ যে ধরনের আত্মহত্যা, গুম-খুন, রাহাজানি, বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার আধিক্য তাতে বর্তমান সমাজ কোথায় যে চলেছে তা ভাববার প্রয়োজন। ক্ষত যখন অল্প তখন হয়ত তা চাপা যায়, কিন্তু ক্ষত যখন সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত তাকে কি চাপা যায়? সেই নির্মম সত্যের প্রতি লেখক ইঙ্গিত করেছেন এবং পরিবেশনের গুণে তাঁর বক্তব্য সার্থক হয়েছে। তবে এত অল্প পরিসরে এত রকমের কথা বলার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় নয়। যেখানে প্রয়োজন সেইখানে উপন্যাসের আয়তন যদি বৃদ্ধি পায় স্বাভাবিকভাবে তাহলে ক্ষতি কি? ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

আমাদের জাতীয় শিক্ষা— (শিক্ষা ও নয়ী-তালিম প্রসঙ্গ)—শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী। প্রকাশক : সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি। কলিকাতা। দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

লেখক শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী সমাজসেবক এবং দেশসেবক হিসাবে প্রসিদ্ধ। তিনি শিক্ষানুরাগী এবং নয়ী-তালিমের উদ্ভব ও বিকাশ গোড়া থেকে লক্ষ্য করেছেন; নয়ী-তালিম গান্ধীজীর সর্বোত্তম ও সর্বশেষ দান। এই গ্রন্থটির হিন্দি অনুবাদ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতদিনে মূল গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হল। নয়ী-তালিমের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষা, উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা, নয়ী-তালিম ও নবসমাজ রচনা প্রভৃতি পরিচ্ছেদগুলি বিশেষ আকর্ষণীয়। নয়ী-তালিম সম্পর্কে বাংলা ভাষায় এমন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আর আছে মনে হয় না, সেই জন্য শ্রদ্ধেয় লেখক অভিনন্দনযোগ্য।

জলভ্রমি— (গল্প সংকলন)—সতীনাথ ভাদুড়ী। প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য। ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা—৬। দাম তিন টাকা।

একখানি বই লিখেই যে স্বল্প-সংখ্যক লেখক বাংলা সাহিত্যের সামনের সারিতে আসন লাভ করেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁদের অন্যতম। তিনি লেখেন অনেক কম, থাকেন বাংলার বাইরে। 'জলভ্রমি' তাঁর সর্বাধুনিক গ্রন্থ। এই সংকলনে তাঁর নটি গল্প আছে। গল্পগুলিতে লেখকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে। লঘু-রসের সস্তা প্যাঁচের কারবারী সতীনাথ ভাদুড়ী নন, তাই তাঁর 'মহিলা ইনচার্জ', 'দাম্পত্য সীমান্তে', 'দুই অপরাধী' 'জল ভ্রমি' প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠক-চিত্তকে আকুল করে তোলে। ছাপা ও বাঁধাই উত্তম।

লালশঙ্খ— (রহস্য উপন্যাস)— মণিলাল অধিকারী ॥ শ্রী প্রকাশ ভবন ॥ এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট— কলিকাতা—১২। দাম দু' টাকা ॥

মণিলাল অধিকারী রচিত রহস্য উপন্যাস 'লাল শঙ্খ' এক নিশ্বাসে পড়া যায়। তাপস চৌধুরী ক্রিমিনোলজিস্ট তার বন্ধু সুজিত গুপ্তধনের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। একটা হেঁয়ালির ভেতর লুকিয়ে আছে গুপ্তধনের সূত্র। বাক্সের মধ্যে আছে লাল শঙ্খ, যার মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা, অন্ততঃ কিংবদন্তী তাই বলে। সেই শঙ্খ গেল চুরি। তারপর রহস্য উপন্যাসের রীতি অনুসারে শেষ পাতায় পৌঁছে পাওয়া গেল সেই গুপ্তধন, ঝলমল করে উঠল শত শত হীরক। যাঁরা এই জাতীয় গ্রন্থ পড়তে ভালোবাসেন, তাঁদের ভালোই লাগবে।

পিয়াসী মন— (উপন্যাস)—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক— দি নিউ বুক এমপোরিয়াম। ২২।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট—কলিকাতা— ৬। দাম—৩·৫০ নঃ পঃ।

'নিশিভোর', 'হোমানল' প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাসের লেখক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসটি আঙ্গিক এবং রচনা-মনোহারিত্বে মনোরম। গম্ভীর প্রকৃতির আত্মসচেতন হেডমিসট্রেস বিপাশার মা আত্মহত্যা করে মারা যান, সেই ব্যথা ছিল তার বুকে। বাল্যে বাবা-ঠাকুরতলায় বর-বউ খেলা হত মনোরঞ্জনের সঙ্গে, সেই মনোরঞ্জনের সঙ্গেই তার বিবাহ হল যখন তার রূপ গেছে, যৌবন গেছে, দেহও অশুদ্ধ। বিপাশা সোমকে মনোরঞ্জন

আশ্বাস দেয় যে শুধু তাকেই চায়, আর নিপাশা ধরা দেয় তার বাহু-বন্ধনে। সুখ-পাঠ্য মনোরম উপন্যাস।

ছায়াময় অতীত— (গল্প সংগ্রহ)— **মহাদেবী বর্মা। অনুবাদ : মলিনা রায়। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম চার টাকা।**

হিন্দী সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখিকা মহাদেবী বর্মার 'অতীতকে চলচ্চিত্র' গ্রন্থের অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থখানি। সমকালীন হিন্দী-কাব্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য, গীতি-কবিতার বিচিত্র ভাবশৈলীতে যে অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে হিন্দী-সাহিত্যে সেরূপ তন্ময় ও মর্মস্পর্শী চেতনার প্রকাশ খুব কম শিল্পীর মাঝেই দেখা যায়।

গদ্য-শিল্পী হিসাবেও মহাদেবী খ্যাতিলাভ করেছেন। আলোচ্য সংকলনে যে এগারটি কাহিনী সংকলিত হয়েছে সে সম্পর্কে মহাদেবী বলেছেন যে, "যে সংকলনটি প্রস্তুত করা হয়েছে, তাতে এগারোটি স্মৃতি-চিত্র রয়েছে। সস্তায় পাঠকের মনোরঞ্জন করা যাবে, এই ইচ্ছে নিয়ে আমি এসব ক্ষত-বিক্ষত জীবন-গুলিকে খেলনার হাটে রাখতে চাই না। এ-সব অসম্পূর্ণ রেখা আর অস্পষ্ট রঙের সমষ্টির মধ্যে কেউ যদি নিজের ছায়ার একটি রেখাও দেখতে পান, তবে এগুলি সার্থক হয়েছে মনে করব।" মহাদেবীর এই শিল্প-চেতনার স্বাতন্ত্র্য সহজভাবেই উপলব্ধি করা যাবে আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলির মধ্যে। রামা, বৌদি, সারিয়া, মীনা, পঙ্কজা, অলোপী প্রভৃতির যে চরিত্র তুলে ধরেছেন তা সার্থক হয়েছে লেখিকার অন্তরঙ্গ অনুভূতি-গুণেই। সর্বত্র একটি পরিশীলিত শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি অধিকাংশ স্থানে মহাদেবীর কবি-মনটিকে খুঁজে নিতে অসুবিধা হবে না।

বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থখানি প্রকাশ করে প্রকাশক আমাদের হিন্দী-সাহিত্য সম্পর্কে আরও সচেতন করে তুলেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। অনুবাদিকার ভাষাভঙ্গি সুন্দর। মুদ্রণ ও বাঁধাই সুরুচিসম্মত।

শনিবারের সন্ধ্যায়—(গল্প সংকলন) : **শচীন্দ্রনাথ বসু। ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়। ৬।১এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন। কলকাতা বার। দাম ছয় টাকা।**

বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথ বসু একদা যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 'সব হারানোর দেশে' ও 'দেশান্তরী' নামক ভ্রমণমূলক দুখানি গ্রন্থ পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করে। তাছাড়া তাঁর রচিত ছয়খানি উপন্যাসও উল্লেখযোগ্য। 'মিহি ও মোটা' নামে একখানি রম্যরচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থখানিতে পনেরটি ছোট গল্প সংকলিত। গল্পগুলির অধিকাংশ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। কতকগুলো গল্পে কিছু পরিবর্তন সাধন করে নতুনতর সত্য উপলব্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। অধিকাংশ গল্পের কাহিনী আহৃত হয়েছে আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনযাত্রা থেকে। বিভিন্ন মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-বেদনার কথায় গল্পগুলি রূপায়িত। বিচিত্র চরিত্রের মানব মন ফুটে উঠেছে সুদক্ষ শিল্পীর লেখনীস্পর্শে।

পুরনো কালের এই গ্রন্থকারের সংকলনটি হাতে নিয়ে যথেষ্ট আনন্দ ও গর্বের বস্তু পাওয়া যায়। মুদ্রণ সুন্দর। প্রচ্ছদ অভিনব।

স্বর্ণমৃগ— **শ্রীমন্ত। গ্রন্থবিচিত্রা। পরিবেশক—অগ্রণী প্রকাশনী। ১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা চার। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।**

ইতিপূর্বে শ্রীমন্তের 'আমি মুসাফির' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেখানে গ্রন্থকারের রচনা-শক্তির দক্ষতা সহজেই উপলব্ধি করা গিয়েছিল। বর্তমান উপন্যাসখানিতে গ্রন্থকার সে শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছেন। চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থা আরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। গ্রন্থকারকে আরও সংযত ও সচেতন হতে হবে।

হার মানালে গো— (উপন্যাস)— **হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—সুন্দর প্রকাশন। ৮এ, কলেজ রো। কলিকাতা—৯। দাম তিন টাকা।**

অনেকের হয়ত জানা নেই যে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় একদা বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগেই আপন কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছিলেন। সরকারি কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে তিনি অবশ্য দীর্ঘদিন বিশেষ কিছু লেখেননি। 'হার মানালে গো' তাঁর প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসের পটভূমি এক বিলাতযাত্রী বিরাট জাহাজ পি এন্ড ও কোম্পানীর 'নারকুন্ডা', সে মার্সাই থেকে বোম্বাই আসছে। সমগ্র কাহিনীঅংশ তার ভিতর ঘটেছে। নায়ক দেবকুমারের মন নিয়ে দুটি নারীর মধ্যে প্রতিযোগিতা, একজন নিকটে আর একজন দূরে। শেষ পর্যন্ত বোম্বাই কাস্টম হাউসে কোথা থেকে এসে অজিতা বলে তোমার কাছে আমার অনুরোধ তোমার স্ত্রীকে আমার কথা নিশ্চয় বোলো। সে যেন চিরদিন অপরাজিতা থাকে। এই বলেই সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।—গল্পটি পরিচ্ছন্ন, পরিবেশ বিচিত্র এবং রচনাভঙ্গি সুন্দর। ছাপা এবং বাঁধাই ভালো।

অতসী— (উপন্যাস)— **প্রবোধবন্ধু অধিকারী। বসু চৌধুরী, ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম চার টাকা।**

ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে মণিশংকর এবং অতসী। উভয়ের ভালবাসা গড়ে ওঠে অজান্তে এবং প্রকাশ্যে। মণিশংকর অতসী-হারা হয়ে আশাকে নিয়ে বাঁচতে চাইল। আশা সকল বন্ধন ত্যাগ করে চলে গেলে

মণিশংকর পৃথিবীর মাঝে হারিয়ে গেল। তারপর ঘটল অতসীর মর্মান্তিক মৃত্যু। মণিশংকর যখন ফিরে এল তখন তার আপন জন কেউ নেই পৃথিবীতে।

চিরন্তন প্রেমের কাহিনী। বর্তমানে লেখকের বর্ণনার অভিনবত্বে কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায় একটি স্বতন্ত্র শিল্পী-মনকে যা সচরাচর খুব কমই দেখা যায়।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

আনন্দ—সম্পাদক : মিনাতি মুখোপাধ্যায়। ৭১।৯ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—১৪ হতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

বাঙলাদেশে 'পাচমিশেলী' পত্রিকার সংখ্যা একমাত্র গল্প-পত্রিকার থেকে অনেক বেশী। গল্প-পত্রিকাগুলি আঙুলে গোনা যায়। সে পরিস্থিতিতে 'আনন্দ'র আত্ম-প্রকাশকে আমরা অভিনন্দন জানাই। পত্রিকাটিতে নানা রসের গল্প ও উপন্যাস স্থান পেয়েছে। সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন রঞ্জিত সেন। কল্লোল যুগের লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'মুখোস খোলো' একটি অন্যতম আকর্ষণ। অন্যান্য গল্পকারদের মধ্যে আছেন—মিহির আচার্য, অজিত মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্র দত্ত, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, অনুপম বন্দোপাধ্যায়, শম্ভু গুপ্ত, মুনি মাণিকাম ও বীর পুরুষ। প্রচ্ছদের অলংকরণ উল্লেখ্য। পাঠক-সমাজে পত্রিকাটি সমাদৃত হবে আশা করি।

সম্প্রতি—সম্পাদক : অশোক চট্টোপাধ্যায়। ২৮ কিশনলাল বর্মণ রোড, হাওড়া থেকে প্রকাশিত। দাম ষাট নয়া পয়সা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সম্প্রতি'র বর্তমান তৃতীয় সংকলনটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন সুবীর রায়চৌধুরী ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন—মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, অশ্রু-কুমার সিকদার, বিনয় মজুমদার, আশিস সান্যাল, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, পুষ্কর দাশগুপ্ত, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। গল্প লিখেছেন—দেবেশ রায়, আশিস ঘোষ, অরূপ বসু।

জনান্তিক—সম্পাদক : সমীর রায়-চৌধুরী ও বিপ্লব দাশগুপ্ত। ১এ কৃত্তিবাস লেন, কলকাতা-২৬ হতে প্রকাশিত। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

জনান্তিকের বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন—বোম্মানা বিশ্বনাথম (দক্ষিণ ভারতীয় নাটক), বিজনকুমার ভট্টাচার্য (টেনেসি উইলিয়মস), বিমল গুপ্ত (বার্টার থিয়েটার), সরোজ ঘোষ (চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-কেন্দ্র)। বীরু মুখোপাধ্যায়ের নাটক 'প্রগতি' অনেককেই মুগ্ধ করবে। পিনাকী ভাদুড়ী ও শঙ্কর দাশগুপ্ত গল্প লিখেছেন। পুশকিনের একটি গল্পের অনুবাদ ছাপা হয়েছে। তাছাড়া আরও কয়েকটি বিবিধ আলোচনা রয়েছে।

মহিলামহল—সম্পাদিকা : অঞ্জলি বসু। কথা-সাহিত্য মন্দির, ৫৪বি আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা - ৯ হতে প্রকাশিত। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাঙলা দেশের পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'মহিলামহলে'র একটি স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। দীর্ঘ ষোল বছর ধরে মহিলাদের লেখায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি বাঙলা সাহিত্যের সেবা করে আসছে। বর্তমান বিশেষ সংখ্যাটি (১৬শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা : আষাঢ় '৬৯) বহু মূল্যবান প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পারমিতি-বোধে উজ্জ্বল স্বল্প সংক্ষিপ্ত এবং আশ্চর্য ভাবসমৃদ্ধ কর্মযোগী বিধান-চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধায় নিবেদিত কটি নিবন্ধ। মায়া বসুর ধারাবাহিক উপন্যাস, জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'সেকালিনীর স্মৃতি' এবং অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচার্য নন্দলাল-জায়া সুধীরা বসুর বিচিত্র জীবনী বিশেষভাবে উল্লেখ্য। গল্প-প্রবন্ধ-ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি লিখেছেন অলকা দেবী, শান্তি সেন, উৎপলা দেবী, কনকলতা ঘোষ প্রমুখেরা। একক প্রচেষ্টায় দীর্ঘ পঞ্চদশবর্ষের উত্তরণ কাহিনীর বিস্তৃত তথ্য পেশ করেছেন পরিচালিকা গীতা বসু। সমাজ-কল্যাণে নিবেদিত বাঙালী মেয়েদের এই পত্রিকার দীর্ঘজীবন আমরা কামনা করি।

আরোগ্যম—সম্পাদক : সুশীলকুমার বসু। ১৩৭নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা—১২ হতে নিতাইপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাঙলা ভাষায় স্বাস্থ্য-পত্রিকা হিসাবে আরোগ্যমের আবির্ভাবকে আমরা ইতিপূর্বে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। বর্তমান সংখ্যা এঁদের রচনায় সমৃদ্ধ—সুপ্ত মিত্র (রন্ধনে আহার্যের ভৌতিক পরিবর্তন), অমিয়কুমার মজুমদার (গলগণ্ড), অনামী (স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের আকিঞ্চনে মানুষ)। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের পরলোকগত মুখ্য-মন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের ওপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা আছে।

নান্দীকর

স্বাধীনতা ও বাঙলা চলচ্চিত্র :

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙলা রঙ্গমঞ্চ আন্দোলনের সূত্রপাত থেকেই যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, বাঙলাদেশের, তথা ভারতের চলচ্চিত্র-জগৎ সে-রকম কোনো ভূমিকা গ্রহণ করা দূরের কথা, বরং তা থেকে নিজেকে বরাবরই নিরাপদ দূরত্বে রেখে পথপরিক্রমা করেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রথম যুগে ভারতের যে-দু'টি কেন্দ্রে চলচ্চিত্র-প্রযোজনা শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই কলকাতা এবং বোম্বাইয়ে যাঁদের দখলে এই শিল্পটি ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো চিত্র নির্মাণ ক'রে সরকারী রোষে পতিত হওয়া এবং সাধারণ্যে প্রদর্শনের জন্য পুলিশী ছাড়-পত্র না পাওয়ার বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নেওয়ার চাইতে ব্যবসা মারফত অর্থোপার্জনের দিকেই তাঁরা বেশী তৎপর ছিলেন। বাঙলা ছবির নির্বাক যুগের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরাই জানেন, ছবি যতদিন পর্যন্ত কথা কইতে শেখেনি, ততদিন বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্পের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন ম্যাডান কোম্পানী।

মৃণাল সেন পরিচালিত 'অবশেষে' চিত্রে রবি ঘোষ ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

অরোরা, ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টস্, গ্রাফিক আর্টস্, ইস্টার্ন ফিল্ম সিণ্ডিকেট, ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান ফিল্ম কোম্পানী প্রভৃতি যে-দু'পাঁচটি সংস্থা এ-যুগের তৃতীয় দশকের শেষার্ধে অর্থাৎ ১৯২৫ থেকে শুরু ক'রে সবাক ছবির জন্মের আগে পর্যন্ত ছবি তৈরীর ব্যাপারে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা শক্তিশালী ম্যাডান কোম্পানীর সঙ্গে অসম প্রতি-যোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে হয় তাঁদের ছবির গল্পকে ধর্ম-মূলক, নয় প্রেমধর্মী ও কৌতুকরসজারিত করবার দিকেই দৃষ্টিকে নিবন্ধ রেখে-ছিলেন। এরই ভিতর একমাত্র উল্লেখ্য ব্যতিক্রম হচ্ছে, ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান ফিল্ম কোম্পানীর প্রথম ছবি "ফ্লেমস্ অব ফ্লেশ" বা সুন্দরী পদ্মিনী। এই ছবিতে আলাউদ্দীন ও পদ্মিনীর চিরপরিচিত কাহিনীটিকে চিত্রিত করতে গিয়ে কাহিনীকার দেববর্মণ নামে যে কাল্পনিক দেশভক্ত, সংগ্রামী, পতাকাবাহী জন-নায়কের চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁকেই বাঙলা চলচ্চিত্র-জগতে জাতীয়তাবাদ আমদানীর প্রথম স্মরণীয় নিদর্শন ব'লে চিহ্নিত করা যায়। আজকের দিনের বহু পাঠকই শুনে কৌতুক এবং বিস্ময় অনুভব করবেন যে, এই 'ফ্লেমস্ অব ফ্লেশ'এর দেববর্মণ চরিত্রটি যে-শিল্পী দ্বারা অভিনীত হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন বাঙলা, তথা ভারতের প্রবীণ পরিচালক দেবকীকুমার বসু।

নির্বাক যুগের আর কোনো বাঙলা ছবি মারফত জাতীয়তাবাদ বা স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হয়েছিল ব'লে মনে করতে পারছি না। সবাক যুগের সূত্র-পাতের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ছবির জগতে ম্যাডান কোম্পানীর প্রভাব ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে 'নিউ থিয়েটার্স' তার স্থান অধিকার ক'রে নিলেন। রাধা

ফিল্মস্, ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্, ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স, কালী ফিল্মস্, দেবদত্ত ফিল্মস্, ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান সবাক ছবি তোলবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন বটে, কিন্তু ভারতজোড়া খ্যাতির শিখরে বাঙলার একটি মাত্র চিত্র-প্রতিষ্ঠানই উঠতে পেরেছিলেন এবং তা হচ্ছে 'নীল হাতী'মার্কা নিউ থিয়েটার্স'। কিন্তু বৃটিশ ভারতের আইন-সচিব স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের পুত্র বীরেন্দ্রনাথ সরকার প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার ব'লে কিনা জানি না, কিম্বা মাত্র ঘটনাচক্রেই নিউ থিয়েটার্স তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে একখানিও জাতীয়তাবাদ বা স্বাধীনতার বাণী প্রচারক ছবি তৈরীর কাজে ব্রতী হয়নি। সে যুগের তিনজন বিশিষ্ট পরিচালক,—প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকীকুমার বসু এবং নীতীন বসুকে পেয়েও নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষ জাতীয়ভাবোদ্দীপক একখানিও ছবি জাতিকে উপহার দেননি, এটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত পরিতাপের কথা।

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী নির্মিত এবং ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'বিদ্রোহী' ছবিতে বিদ্রোহের কোনো গন্ধ ছিল কিনা, তা আজ আর স্মরণে আনতে পারছি না। স্বাদেশিকতার বাণীপূর্ণ 'পথের দাবী'র যে-চিত্রসংস্করণ পরলোকগত পরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত প্রস্তুত করেন, তাতে অবশ্য দেশের কথার চাইতে প্রেমের উপাখ্যানকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে বাঙলার বিপ্লববাদকে উপজীব্য ক'রে যে-ছবি প্রথম বাঙালী দর্শককে প্রেরণা জুগিয়েছিল, সেটি হচ্ছে হেমেন গুপ্ত পরিচালিত মনোজ বসু লিখিত "ভুলি নাই"। এবং এর পরে যে ছবির প্রকাশ্য মুক্তিকে উপলক্ষ্য ক'রে বাঙলা থেকে দিল্লী পর্যন্ত সরকারী মহলে ঝড় বয়ে গিয়েছিল, সেটিও হচ্ছে হেমেন গুপ্তের আর একটি সৃষ্টি ''৪২''—১৯৪২-এ মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অবলম্বন ক'রে রচিত স্বাধীনতার জয়গান। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় মনোজ বসু লিখিত 'সৈনিক' নামে আর একটি গল্পও চিত্রায়িত হ'তে শুরু ক'রে নানা কারণে শেষ হ'তে পায়নি। এ ছাড়া বাঙলার বিপ্লবযুগের অন্যতম শহীদ ক্ষুদিরামের জীবনী অবলম্বনে হিরন্ময় সেন পরিচালিত ছবি এবং নির্মল চৌধুরী পরিচালিত 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' ছবিখানিও জাতীয় ভাবোদ্দীপনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান ব'লে পরিগণিত হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত এবং যথাক্রমে প্রফুল্ল রায় ও সতীশ দাশগুপ্ত পরিচালিত 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারাম' ছবি হিসেবে অনবদ্য সৃষ্টি না হ'লেও জাতীয়তা ভাবসংবলিত হয়েছিল নিশ্চয়ই এবং সেই কারণেই জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। কিন্তু অমর দত্ত পরিচালিত 'সিরাজদৌলা' ও 'মীরকাশিম' নামে দু'খানি সর্ববিষয়ে অসার্থক সৃষ্টি সম্বন্ধে সমান কথা বলা যায় না।

আনুপূর্বিক পর্যালোচনা ক'রে এই কথাই বলতে ইচ্ছে করে যে, হেমেন গুপ্ত পরিচালিত "ভুলি নাই" এবং ''৪২'—ছবি দু'খানিই জাতীয়তাবাদের প্রতি বাঙলার চিত্রজগতের ভাস্বর এবং গৌরবময় অবদান।

চিত্র সমালোচনা

কাজল (বাঙলা) : বি. এ. পি. প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেডের নিবেদন; ১১,৫৫২ ফুট দীর্ঘ এবং ১২ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : তারক পাল; কাহিনী : সুরেন্দ্রনাথ মিত্র; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়; সংলাপ (পর্দায় চিত্রনাট্য ও সংলাপ) : বিধায়ক ভট্টাচার্য; সঙ্গীত-

সদ্যমুক্ত 'কাজল' চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী।

পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়; গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ, রামানন্দ সেনগুপ্ত ও বিশু চক্রবর্তী; শব্দধারণ : বাণী দত্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ ঘোষ ও জে. ডি. ইরাণী; শিল্প-নির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী; সম্পাদনা : কালী রাহা; রূপায়ণ : ছবি বিশ্বাস, অসীমকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, কুমার রায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অপর্ণা দেবী, কমলা মুখোপাধ্যায়, আরতি দাস, প্রতিমা দেবী, রমা দাস প্রভৃতি। নর্মদা চিত্রের পরিবেশনায় গেল ১০ই আগস্ট থেকে শ্রী, ইন্দিরা, লোটাস, আলোছায়া এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

শরৎচন্দ্র যখনই তাঁর কোনো উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন, তখনই সেই নাটকের নামকরণ করেছেন তাঁর উপন্যাসের নায়িকার নামে; দেনা-পাওনা থেকে হয়েছে ষোড়শী, পল্লীসমাজ থেকে রমা, দত্তা থেকে বিজয়া। জানিনা, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত মূল কাহিনীর কি নাম ছিল, কিন্তু আলোচ্য চিত্রের নামকরণ হয়েছে গল্পের নায়িকা 'কাজল'-এর নামে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত!—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকার বলিষ্ঠ চারিত্রিক দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা, একনিষ্ঠতা, এবং প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণাবলী যদি 'কাজল'-এর চরিত্রে খুঁজতে যাওয়া যায়, তাহলে অনেকাংশে নিরাশই হতে হবে। শুধু নায়িকাই নয়, এ গল্পের সব কটি চরিত্রই অবস্থার দাস অর্থাৎ কাহিনীকারের গোলাম। কোনো রকম যুক্তি-তর্কের বালাই না রেখে তিনি যখন যা ঘটাতে চেয়েছেন, তখনই তাই ঘটেছে। তাই কাহিনীকারের প্রয়োজনে নায়িকার পিতা অভয়বাবুকে হঠাৎ স্ট্রোক হওয়ার ফলে সারাক্ষণ নির্বাক হয়ে শুয়ে থাকতে হয়, কৃষ্ণবাবু ছেলেকে তাঁর অমতে চলবার জন্যে ত্যাজ্যপুত্র করবার ভয় দেখাবার পরও ছেলেরই জন্যে হাহুতাশ করেই নিজ চরিত্রের প্রকাশ করেন, একখানা উড়ো চিঠিই নায়ক-নায়িকার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট হয় এবং আরও কি যে হয় আর না-হয়, তা বর্ণনা করতে গেলে পাঠক ও লেখক—উভয়েরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা।

বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতে এমন নজীরের অভাব নেই, যেখানে একটি দুর্বল গল্পও অভিনয়গুণে এবং ঘটনা-উপস্থাপনের মুন্সিয়ানায় বেশ উপভোগ্য চিত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য চিত্রের চিত্রনাট্যটি এমনই আলগাছাড়া করে রচিত যে, কাহিনীর দুর্বলতা তাতে আরও বৃদ্ধিই পেয়েছে। তপনের দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ করবার জন্যে যেভাবে 'ঐ আকাশের চাঁদ বুঝি'—গানের ভিতর দিয়ে একটি নারীচরিত্রের আমদানী করা হয়েছে, তা রীতিমত চিত্রনাট্যরচনারীতি বহির্ভূত। ছবিতে মাত্র চারখানি গান আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, একখানি গানও ছবির গল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে

...শে যেতে পারেনি; প্রতিটি গানকেই ...র জন্যে 'গান' বলে মনে হয়েছে।

একটি মাত্র দুর্বল অভিনয় একখানি ...বির কতখানি ক্ষতি করতে পারে, তার ...জ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যাবে 'কাজল' ...বিতে। এই ছবির ভিলেন হচ্ছে তপন এবং সেই তপনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কুমার রায় নামে জনৈক অভিনেতা। তাঁকে এই চরিত্রে নির্বাচিত ক'রে প্রযোজক এবং পরিচালক সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের উপযোগী বাচনভঙ্গী আয়ত্তের জন্যে এঁর আরও অনেক অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। এবং এঁর চোখমুখ যে কোনো রকম ভাবপ্রকাশে সক্ষম, তারও কোনো পরিচয় পাওয়া গেল না। নায়ক এবং নায়িকার ভূমিকায় অসীমকুমার ও ...প্রিয়া চৌধুরী তাঁদের গৃহীত ভূমিকার সুবিচার করেছেন। সমান কথাই বলা যেতে পারে নায়ক-নায়িকার দুই পিতার ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল এবং ...তীশ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে। ছবিতে হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছেন জহর ..., শ্যাম লাহা এবং গঙ্গাপদ বসু। ...ার্জির ভূমিকায় দীপক মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় হয়েছে চরিত্রোচিত। এবং ধনী, মিলমালিক সুদর্শন রায়ের ভূমিকায় বাঙলার চেয়ে ইংরাজী কথা বেশী বলে ছবি বিশ্বাস তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়নৈপুণ্যের পরিচয় রেখে গেছেন। অপর্ণা দেবী গৃহস্থজননীর চরিত্রটিকে যথাসম্ভব রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছেন। শিবানীর ভূমিকায় কমলা মুখোপাধ্যায় অভিনয় মন্দ করেননি,

"নীল আঁখে" চিত্রের একটি দৃশ্যে শাকিলা ও জনি ওয়াকার।

কিন্তু যে-রূপসজ্জায় এবং ভঙ্গীতে তিনি আকস্মিকভাবে 'ঐ গুণ গুণ অলি গেয়ে যায়'—গানখানি গেয়েছেন, তা তাঁকে ঐ বিশেষ দৃশ্যটিতে পরিহাসের সামগ্রী ক'রে তুলেছে। একটিমাত্র দৃশ্যে দুঃখীর পিতার ভূমিকায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করেছেন। অপরাপর ভূমিকা অনুল্লেখ্য।

কয়েকজন চিত্রশিল্পী চিত্রগ্রহণ করলেও তাঁদের সকলের কাজই একটি নির্দিষ্ট মান রক্ষা করেছে। কৃষ্ণবাবুর বাড়ীঘর যা দেখানো হয়েছে, তাতে তাঁর মুখের 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখটাকার স্বপ্ন' কথাটি বেমানান হয়েছে। শিল্প-নির্দেশের এই ত্রুটিটুকু না থাকাই উচিত ছিল। ছবিতে আবহ-সঙ্গীতের কাজ উচ্চাঙ্গের।

দুর্বল কাহিনী, দুর্বলতর চিত্রনাট্য, গানের অপপ্রয়োগ এবং একটি প্রধান ভূমিকার শিল্পী নির্বাচনে মারাত্মক ত্রুটি "কাজল" ছবিকে সাধারণ পর্যায়ের থেকে উচ্চস্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করেনি।

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্প সংক্রান্ত আলোচনাসভা :

গেল শনিবার, ১১ই আগস্ট, বিকাল ৫টায় ফাইন আর্ট অ্যাকাডেমী হলে "পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্পের বর্তমান সংকট ও সমস্যাবলী"র এক বিশেষ আলোচনাসভা বসেছিল। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ এবং বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডঃ গোপাল রেড্ডী, পশ্চিমবঙ্গে প্রচারমন্ত্রী জগন্নাথ কোলে এবং লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়। এই সভার যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন খ্যাতনামা চলচ্চিত্রশিল্পী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়। সভার বিশেষ বিবরণ আসছে সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

শিবানী ফিল্মস্-এর "মায়ার সংসার"

আজ শুক্রবার, ১৭ই আগস্ট মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অপরাপর চিত্রগৃহে শিবানী ফিল্মস নির্মিত এবং চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত "মায়ার সংসার" নামে সংসারের হাসিকান্না, সুখদুঃখ দিয়ে গড়া সামাজিক চিত্রখানি মুক্তি পাচ্ছে। কনক মুখোপাধ্যায় একাই ছবিখানির প্রযোজক, কাহিনী রচয়িতা ও পরিচালক। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব বহন করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন সন্ধ্যারাণী, সুলতা, দীপ্তি রায়, শিখা বাগ, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, অসিতবরণ, বিশ্বজিৎ, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকুমার, মাস্টার তিলক প্রভৃতি।
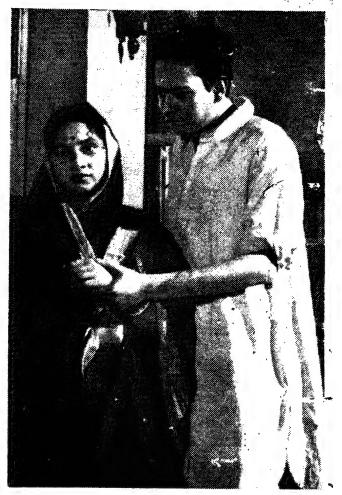
এস, সি, প্রোডাকসন্স নিবেদিত ও জনতা পরিবেশিত 'শুভদৃষ্টি' চিত্রের একটি দৃশ্যে সম্পা রায় ও অরুণ মুখার্জী।

আগন্তুক-এর "মানুষ চাই" :

গেল শুক্রবার, ১০ই আগস্ট, রঙমহল রঙ্গমঞ্চে আগন্তুক নাট্যসম্প্রদায় জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত "মানুষ চাই" নাটকখানি মঞ্চস্থ করেন।

কল্লোল-এর "যে আকাশে রঙ নেই" :

গেল ১৪ই আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার থিয়েটার সেণ্টার হলে কল্লোল সম্প্রদায়ের সভ্যরা 'অমল বেদজ্ঞ রচিত এবং সমরেশ চক্রবর্তী পরিচালিত "যে আকাশে রঙ নেই" নাটকখানি অভিনয় করেন।

এস, সি প্রোডাকসন্স-এর "শুভদৃষ্টি" :

পরিচালক চিত্ত বসু এস, সি, প্রোডাকসন্সের সুকুমার কুমার প্রযোজিত 'শুভদৃষ্টি' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করবার জন্যে সদলবলে বাঁকুড়া থেকে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী মুকুটমণিপুর-এ কংসবতী গ্রামে রওনা হয়ে গিয়েছেন। অনিল গুপ্ত, মানবেন্দ্র মুখার্জি,

দত্ত, সুধীর খান, মহাদেব সেন ও রমেশ যোশী যথাক্রমে চিত্রশিল্পে, সঙ্গীত-পরিচালনায়, শব্দযন্ত্রে, শিল্পনির্দেশে, ব্যবস্থাপনায় ও সম্পাদনায় আছেন। বিভিন্নাংশে আছেন কাঞ্চনজঙ্ঘাখ্যাত অরুণ মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তমাল লাহিড়ী, মমতাজ আমেদ, পার্থপ্রতিম, সন্ধ্যা রায়, সন্ধ্যারাণী, গীতা দে, দীপিকা দাস, নিভাননী, চিত্রা মণ্ডল প্রভৃতি। জনতা পিকচার্স-এর পরিবেশনায় ছবিটির মুক্তি আসন্ন।

রূপান্তর-এর "বিশ-পঞ্চাশ" ঃ

রূপান্তরের সভ্যবৃন্দ গেল ১৫ই আগস্ট বরাহনগরের স্বামী অভেদানন্দ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কিরণ মৈত্র রচিত "বিশ-পঞ্চাশ" নাটকটি অভিনয় করেছিলেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুধীর মুখোপাধ্যায়, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ মজুমদার, শিবব্রত মিত্র, অশ্রু মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় সুনীল দাশ, অরুণ সেন, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র গুহ প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীমানবেন্দ্র গুহ।

।। 'চেনা অচেনার' অনুষ্ঠান ।।

গত ২০শে জুলাই 'চেনা অচেনা' নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের বহু প্রশংসিত 'ভীমপলশ্রী' নাটকটি বিশ্বরূপায় পুনরাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। তাঁরা আয়োজনের কোন ত্রুটি না করা সত্ত্বেও পর্জন্যদেবের অপরিসীম করুণায় এ'দের আয়োজন প্রায় মাটি হবার উপক্রম হয়েছিল। যাই হোক, 'চেনা অচেনার' কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত অভিনয় করে সুবিবেচনারই পরিচয় দেন।

অভিনয়ে সর্বাগ্রেই এ'দের দলগত নৈপুণ্যের কথা মনে পড়ে। সেদিনকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দর্শকের অপ্রতুলতা ও অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে এ'রা যে টীম ওয়ার্ক দেখিয়েছেন সেটা সমবেত দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়। কিন্তু সংগীত, আলোক-সম্পাত ও দৃশ্যাদির বৈসাদৃশ্য রুচিবান দর্শকদের পীড়া দিয়েছে।

উপরিউক্ত দোষত্রুটিগুলি শুদ্ধ করে 'চেনা অচেনার' কর্তৃপক্ষ এই নাটকটির পুনরভিনয়ের আয়োজন করলে সুখী হব।
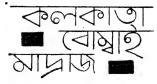
কলকাতা

বহির্দৃশ্যের পর সম্প্রতি মাণিক পিকচার্সের 'রক্ততিলক'-এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অজিত মুখোপাধ্যায়। 'সপ্তশিখা' নামক এক পরিচালক গোষ্ঠী এ ছবির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। কাহিনীর কয়েকটি মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

হিমালয় পিকচার্সের 'অগ্নিবন্যা' সমাপ্তপ্রায়। ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন পাঁচু বসাক। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। পার্শ্ব-চরিত্রে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অসিতবরণ, জহর রায়, অরুণকুমার, অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, অজিত চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, ভারতী দেবী, পদ্মা দেবী ও তপতী ঘোষ। পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন অঞ্জন ফিল্মস। সংগীত পরিচালনা করছেন গোপেন মল্লিক।

ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওয় 'হুগলী নদীর ধারে' ছবিটির চিত্রগ্রহণের কাজ চলছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন সুশীল ভট্টাচার্য ও রতন চট্টোপাধ্যায়। প্রধান নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন সুদক্ষ মঞ্চ-শিল্পী অরুণ রায়।

'অভ্যুদয়' গোষ্ঠীর নতুন ছবি--'আশা শুধু স্বপন'। সংগীত পরিচালক কালীপদ সেন। এ ছবির চরিত্র-শিল্পী--ছবি বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, রঞ্জলক্ষ্মী, নীতিশ মুখার্জি, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, তপতী ঘোষ ও নবাগতা সুমিতা বসু।

চিত্র-সংসারের 'শেষচিহ্ন' সমাপ্তির মুখে। চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা করছেন বিভূতি চক্রবর্তী। সুরসৃষ্টি করেছেন

অগ্রগামী পরিচালিত কবিগুরুর "নিশীথে" কাহিনীর চিত্ররূপের একটি মধুর মুহূর্তে উত্তমকুমার ও [illegible] বসু।

কীর্তন কলানিধি রথীন ঘোষ। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে আছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেছেন লিলি চক্রবর্তী, রেণুকা রায়, অনুপকুমার, কমল মিত্র, রাজলক্ষ্মী দেবী, রসরাজ চক্রবর্তী, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও তুলসী চক্রবর্তী।

অঞ্জলি পিকচার্সের প্রথম ছবি 'মধুরেণ'-র কাজ আরম্ভ হয়েছে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিনতা রায়। প্রধান নায়ক চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্বজিৎ।

বোম্বাই

সম্প্রতি হিমালয়ের বদরিনাথ অঞ্চলে কয়েকটি যাত্রার দৃশ্য চিত্রগ্রহণ করে পরিচালক, অভিনেতা ও প্রযোজক এন এ আনসারি বোম্বে ফিরেছেন। পরিচালক স্বয়ং এ ছবির একটি খল চরিত্রে অভিনয় করছেন। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে অভিনয় করেছেন—প্রদীপকুমার, শাকিলা, জনি ওয়াকর, মমতাজ বেগম, সাগর, চম্পল, শুক্লা ও নবাগত টনি-ওয়াকর। সাহিত্যিক রফি আজমেরি-র এই বিখ্যাত গল্পের চিত্রনাট্য করেছেন কে, বি, পাঠক। ছবির সংগীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন সুরকার রবি।

পরিচালক কে, এ, আব্বাসের একটি ছবি—'গায়রা হাজার লেড়কীয়াঁ'। একটি রোমাঞ্চকর দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মালা সিন্‌হা ও ভারতভূষণ। পার্শ্বচরিত্রে রূপদান করছেন নাদিরা, মুরাদ, মুকরী, অচলা সচদেব ও তরুণ কয়েকজন শিল্পী। ছবির সংগীত গ্রহণ শেষ হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এন দত্ত।

প্রযোজক বি, ডি, কাপুর ও প্রেম দত্ত-এর 'দুয়ে দিল কিসকো দুঁ' ছবির সঙ্গীত গ্রহণ করলেন সুরকার ইকবাল কোরেশি। কণ্ঠদান করেন আশা ভোঁসলে মুবারক বেগম, মহম্মদ রফি ও উষা খান্না। ছবিটি পরিচালনা করেছেন কে মিশ্র।

রঙিন একটি ছবি 'জিদ্দি'। সম্প্রতি একটানা ছবির দৃশ্য গ্রহণ করলেন পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী রূপতারা ও কমল স্টুডিওয়। শচীন ভৌমিক রচিত এ কাহিনীর চরিত্রলিপির মধ্যে অভিনয় করছেন জয় মুখার্জি, আশা পারেখ, রাজ মেহেরা, নাজিম, সুলতানা ও মদনপুরী। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক হলেন শচীন দেববর্মণ।

জি, পি, ফিল্মসের 'মেরী সুরৎ তেরি আঁখে' ছবির দৃশ্যগ্রহণ চলেছে শ্রী সাউণ্ড স্টুডিওয়। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন অশোককুমার, প্রদীপকুমার, অচলা সচদেব, ইফতিকর ও তরুণ বোস। এ ছবিটিরও সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শচীন দেববর্মণ।

মাদ্রাজ

এল. ভি. প্রসাদের নতুন হিন্দী ছবিতে সুনীল দত্ত নায়ক চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছেন। নায়িকা মনোনীত হয়েছে 'শ্বশুরাল'-খ্যাত সুন্দরী অভিনেত্রী বি সরোজা দেবী। অন্যান্য চরিত্রের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন শুভা খোটে, ললিতা দেবী, মামুদ, জয়ন্ত ও আগা।

'সাবাস মিনাদ'-এর পর মামুদ জেমিনীর পরবর্তী ছবিতে অভিনয় করার কথা পাকা করলেন। নায়িকা সম্ভবতঃ শান্তারাম-দুহিতা রাজশ্রী। এ-ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করবেন অশোককুমার, শোভা খোটে ও ললিতা পাওয়ার। ছবির পরিচালক হলেন কিশোর সাহু।

'সাঁইয়া' ছবির অসাধারণ সাফল্যের পর প্রযোজক এ. এল. নিরাসন তাঁর পরবর্তী ছবি আরম্ভ করছেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন কে. এস. গোপালকৃষ্ণ। চিত্রনাট্য ও হিন্দী সংলাপ রচনা করছেন রামানন্দ সাগর। প্রধান দুটি চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন প্রদীপকুমার ও মালা সিনহা।

দুই বাড়ীর দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে পাহাড়ী সান্যাল, সহকারী চিত্রশিল্পী মধু ভট্টাচার্য, পরিচালক অসীম পাল, কাহিনীকার শৈলেশ দে ও গীতা দে।

স্টুডিও থেকে বলছি

রাধা ফিল্মস স্টুডিওয় বর্তমানে দুটি ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি দুটি ফ্লোরে—একটি অগ্রদূত গোষ্ঠীর 'নবদিগন্ত' এবং আর একটি পরিচালক অসীম পাল-এর 'দুই বাড়ী'।

দুই বন্ধুর এ কাহিনী। কাহিনীকার শৈলেশ দে। পাশাপাশি দুই বাড়ীর এক বন্ধু হলেন জ্যোতিষ মহাদেব ভট্টাচার্য এবং আর একজন কবিরাজ কালিদাস চক্রবর্তী। এই দুই বন্ধুর যেমন ভাব আবার তেমনি কলহ। তিন-পুরুষ আগে এদের মামলা শুরু। সামান্য তেঁতুল গাছ নিয়ে। লোকে বলতো — মহাকালীন মামলা। দুই পরিবারের দূরত্ব মাত্র মাঝখানের একটি প্রাচীর। এই বন্ধুদ্বয়ের ভালবাসা আর মনোমালিন্য প্রাচীর-প্রান্তিক ইঁটের ভাঙাগড়ার মধ্যে বিদ্যমান। যখন ভাব তখন প্রাচীর ভাঙার শুরু। আবার কলহে প্রাচীর গড়ার পালা।

বেশ অবাক হলাম স্টুডিও-ফ্লোরের মধ্যে বড় বড় দুটি বাড়ী দেখে। শিল্প-নির্দেশক গৌর পোদ্দার জানালেন মাত্র দু'দিনের মধ্যে বাড়ী দুটি নির্মিত হয়েছে।

কাজলপুর গ্রামের এই দুই বন্ধুর, একজন কালিদাস চক্রবর্তীর মাত্র দুটি ছেলে—শংকর আর দেবু। কোন কন্যা নেই। আর মহাদেব ভট্টাচার্যের কোন পুত্র নেই মাত্র তিনটি মেয়ে—দীপু, রাণু ও নীপু। তবে পুত্র-কন্যার অভাব পূর্ণ হল এই দুই সংসারে। কারণ কালিদাসের বড় ছেলে শংকর ছিল মহাদেবের পুত্রসম

আর মহাদেবের কন্যা দীপু হল কালিদাসের প্রিয় পাত্রী।

সেদিনের দৃশ্যগ্রহণে কলহের সূত্রপাত। দুই বাড়ীর দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মুখোমুখি তুমুল আস্ফালন। একজন আর একজনকে যেন শেষবারের মত বলে নিচ্ছেন। বলছেন তাঁরা,

মহাদেব—আচ্ছা আমিও মহাদেব ভট্টাচার্য। আমি থানায় গিয়ে বলছি যে, আমার মেয়েকে ওরা জোর করে আটকে রেখেছে।

কালিদাস—আটকে রেখেছি বেশ করেছি। আমার মা-মণিকে আটকে রেখেছি তাতে কার কি?

মহাদেব — বটে, দাঁড়াও তোমার আটকে রাখাটা বার করছি। এখানে না হয় ওরা মেয়ে না দেখেই চলে গেল, কিন্তু এরপর আমি বাইরের লোকেদের কাছে মুখ দেখাবো কি করে?

কালিদাস—দেখিও না।

দুই বন্ধু হঠাৎ চুপ করলেন তাদের পুত্র-কন্যার কণ্ঠস্বর শুনে। ওদিকে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে নকল ঝগড়া শুরু করেছে শঙ্কর আর দীপু ওঁদের শুনিয়ে।

দীপু—আমি গান জানি না? জানো, আমার একখানা কীর্তন গানের দাম লক্ষ টাকা।

শঙ্কর—আরে যাও যাও! গত তিন দিনে আমার ডাক্তারী ভিজিট ৪ থেকে ৬৪ টাকা উঠেছে তা যেন ভুল না।

দীপু—ওঃ, ভারী তো ডাক্তার। কাকামণি ঠিকই বলে। তুমি হলে একটি—কি যেন,

শঙ্কর—ঘোড়ার ডাক্তার।

দীপু—তুমি হলে একটি আসল ঘোড়ার ডাক্তার।

শঙ্কর-দীপুর ঝগড়া শুনে দুই বন্ধু যেনে একটু লজ্জিত হন। দৃশ্য-শেষে বলে,

কালিদাস—হিস্টিরিয়া।

মহাদেব—শনির দশা।

পরিচালক অসীম পাল-এর নির্দেশে দৃশ্যটি গৃহীত হল। অভিনয় করলেন মহাদেব ভট্টাচার্য ও কালিদাস চক্রবর্তীর

'এক মুসাফির এক হাসিনা' ছবিতে সাধনা।

ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল এবং জহর গাঙ্গুলী। শঙ্কর ও দীপুর চরিত্রে অনিল চ্যাটার্জি এবং তন্দ্রা বর্মণ। এ ছাড়া দুই বাড়ীর অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন রেণুকা রায়, গীতা দে, অনুপকুমার, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জি, মিতা চ্যাটার্জি, তুলসী চক্রবর্তী, জীবেন বসু, সুদীপ্তা রায় ও মণি শ্রীমানি।

এ ছবির কাহিনীকার শৈলেশ দে গল্পটি বলছেন—কালিদাসের তেমন সচ্ছল অবস্থা নয়। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে শঙ্করের ডাক্তারী পড়ার সমস্ত খরচ বহন করছিলেন মহাদেব ভট্টাচার্য। পুত্রসম শঙ্কর ভবিষ্যতে একজন বড় ডাক্তার হবে এ তাঁর বদ্ধ ধারণা। ওদিকে কালিদাসের ঘুম নেই মা-মণি দীপুর বিবাহের জন্য। এর মধ্যে তিনি কত সম্বন্ধ দেখেছেন আবার নাকচ করেছে অপছন্দে। কিন্তু এই অনধিকার দাবী বিকল্পে আবার কলহের সূত্রপাত এবং শেষপর্যন্ত মামলা। পরাজিত হলেন মামলায় কালিদাস। ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ যোগাতে পৈতৃক বাড়ী বিক্রি করতে বাধ্য হলেন কালিদাস। অথচ আগেই ব্যাপারটা মীমাংসা হতে পারতো। কিন্তু কেউ কারো নতিস্বীকার করতে রাজী নয়। তবে শেষমুহূর্তে শঙ্কর-দীপুর স্নেহের আনুকূল্যে দুই বন্ধু নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। দুই বাড়ী সেই বাধার কারণ প্রাচীরটা দুই বন্ধু নিজের হাতেই ভেঙে ফেললেন।

হাসি-অশ্রুসমন্বিত এই দুই বন্ধুর জীবন-কাহিনী এ ছবির মূল চিত্রনাট্য। চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন অসীম পাল। সহযোগিতা করছেন মহেন্দ্র চক্রবর্তী। চিত্রগ্রহণে কানাই দে। সহচিত্রগ্রহণে ... ভট্টাচার্য। সম্পাদনায় অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী। সঙ্গীত-পরিচালনায় কালীপদ সেন।

—চিত্র...

॥ চলচ্চিত্রে সমগ্র বাইবেল ॥

ইতিপূর্বে বাইবেলের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে ব্যয়বহুল অনেক ছবিই তোলা হয়েছে। কিন্তু প্রযোজক ডিনো ডি লরেন্‌টিস সমগ্র বাইবেল-টিকেই চিত্রায়িত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। চিত্রটি নির্মাণে ব্যয় হবে এক কোটি পাউন্ড। চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা করবেন প্রখ্যাত নাট্যকার-কবি ক্রিস্টোফার

> **'মনরো-ডকট্রিন'**
> আগামী সংখ্যায়
> মেরিলীন মনরোর রোমাঞ্চকর জীবনের কয়েকটি সচিত্র উজ্জ্বল বিবরণ
> লিখছেন
> কুশাদ চৌধুরী

ফ্রাই। 'বেন-হার' এবং 'বারাব্বাস'এর চিত্রনাট্য রচনা করে চলচ্চিত্রমহলেও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন ফ্রাই।

।। যুগোশ্লাভ চলচ্চিত্রের প্রগতি ।।

গত ১৪ বছরে যুগোশ্লাভিয়ায় ১৭৭টি পূর্ণ দৈর্ঘ্য কাহিনী-চিত্র নির্মিত হয়েছে। স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র এবং তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে ৩১৫০টি। মোট ৫৭ লক্ষ ডলার মূল্যের ছবি বিদেশী ছবির বাজারে রপ্তানী হয়েছে। অন্যান্য বিদেশী চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুগ্ম প্রযোজনায় এ পর্যন্ত মোট ২১টি ছবি নির্মিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধের আগে যুগোশ্লাভিয়ায় প্রেক্ষাগৃহের মোট সংখ্যা ছিল ৫১৩টি, মোট আসন-সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩২ হাজার। বর্তমানে সেখানে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা হল ১৬৭২টি মোট আসন-সংখ্যা ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার।

ভেরা টেসেকোয়া জার্মানীর প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। "লিটল আন্ডার এজ" তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য ছবি। ভেরার ঠাকুমাও ছিলেন ত্রিশ দশকের চিত্রাভিনেত্রী। সম্প্রতি কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভেরা অভিনীত 'দি ব্রেড অফ দি আর্লি ইয়ারস' চিত্রটি দেখানো হয়েছে।

।। পশ্চিম জার্মানীর বাম্বি পুরস্কার ।।

কার্লসরুহে শহরে বাম্বি পুরস্কার বিতরণ উৎসব উপলক্ষে অসম্ভব ভিড় হয়েছিল। প্রায় চল্লিশ জন অভিনেতা অভিনেত্রীর সমাবেশে উৎসব অনুষ্ঠানটি সাফল্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ১৯৬২ সালের বাম্বি পুরস্কার পেলেন, সোফিয়া লোরেন, রক হাডসন এবং রুথ লয়ুভেরিক বর্তমান বছরের সর্বাধিক জনপ্রিয় নট-নটী হিসেবে। চিত্র-সমালোচকদের বাম্বি পুরস্কার পেয়েছেন পরিচালক বার্ণহাড ভিকি এবং ইটালীয় পরিচালক মাইকেল এঞ্জেলো তাঁর বিখ্যাত ছবি 'লা নতে' চিত্রের জন্যে।

—চিত্রকূট

॥ খেলাধুলা ॥ ॥ খেলাধুলা

দর্শক

॥ এশিয়ান গেমস ॥

জাকার্তায় আসন্ন চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ মোট এই ৮টি অনুষ্ঠানে যোগদান করবে—হকি, ফুটবল, এ্যাথলেটিকস, কুস্তি, ভলিবল, বক্সিং, ভারোত্তোলন এবং রাইফেল স্যুটিং। ৭১ জন প্রতিযোগী, একজন চীফ ডি মিশন, ৬ জন কর্মকর্তা এবং একজন পাচক মোট ৭৯ জন নিয়ে ভারতীয় দল গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দল এইভাবে গঠিত হয়েছে : এ্যাথলেটিক্স—১৭ জন এ্যাথলীট এবং ১ জন কোচ; হকি—১৬ জন খেলোয়াড়, একজন কোচ এবং একজন ম্যানেজার; ফুটবল—১৬ জন খেলোয়াড় এবং একজন কোচ; কুস্তি—৭ জন কুস্তিগীর এবং একজন কোচ; ভলিবল—১০ জন খেলোয়াড় এবং একজন কোচ; বক্সিং—২ জন মুষ্টিযোদ্ধা; ভারোত্তোলন—২ জন প্রতিযোগী এবং রাইফেল স্যুটিং—একজন প্রতিযোগী।

বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের দরুণ পূর্বঘোষিত অনুযায়ী দল গঠন করা সম্ভব হয়নি; বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দলের শক্তি হ্রাস করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানের সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে। ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেণীর টেনিস খেলোয়াড়—রমানাথন কৃষ্ণান, জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিৎ লাল এবং আখতার আলী বর্তমানে ইউরোপ এবং আমেরিকা সফর করছেন। তাঁদের যোগদানের কথা ছিল। টেনিস প্রতিযোগিতায় উইম্বলেডনের ৪নং খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান যোগদান করলে ভারতবর্ষ যে স্বর্ণপদক লাভ করতো এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। ডাবলসের খেলাতেও ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতা

জাকার্তায় আগামী চতুর্থ এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১২টি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে ২৫শে আগস্ট এবং ফাইনাল খেলা হবে ৪ঠা সেপ্টেম্বর। ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশগুলিকে প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি গ্রুপে ভাগ ক'রে খেলানো হবে। তৃতীয় এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দেশ জাতীয়তাবাদী চীন খেলবে এ গ্রুপে এবং চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্যোক্তা দেশ ইন্দোনেশিয়া খেলবে 'বি' গ্রুপে। লটারী ক'রে অন্যান্য দেশগুলির 'গ্রুপ' ঠিক করা হবে।

প্রত্যেক বিভাগের শীর্ষ এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমি-ফাইনাল খেলার তালিকা নিম্নরূপ তৈরী করা হয়েছে :

খেলা (ই) : 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশ খেলবে 'বি' গ্রুপের রানার্স-আপ দেশের সঙ্গে।

"কলকাতা থেকে হলদিয়া, থেকে ফারাক্কা" প্রবন্ধের ছবিগুলি 'যোজনা'র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

খেলা (এফ) : 'বি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশ খেলবে 'এ' গ্রুপের রানার্স-আপ দেশের সঙ্গে।

খেলা (জি) : 'সি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশ খেলবে 'ডি' গ্রুপের রানার্স-আপ দেশের সঙ্গে।

খেলা (এইচ) : 'ডি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশ খেলবে 'সি' গ্রুপের রানার্স-আপ দেশের সঙ্গে।

সেমি-ফাইনাল

উপরের 'ই' চিহ্নিত খেলায় বিজয়ী দেশ খেলবে 'এফ' খেলায় বিজয়ী দেশের সঙ্গে। 'জি' খেলায় বিজয়ী দেশ খেলবে 'এইচ' খেলায় বিজয়ী দেশের সঙ্গে।

প্রাথমিক পর্যায়ের খেলাগুলি ৩০শে আগস্টের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা।

পরবর্তী খেলাগুলির তারিখ : ৩১শে আগস্ট— কোয়ার্টার-ফাইনাল, ২রা সেপ্টেম্বর— সেমি-ফাইনাল; ৩রা সেপ্টেম্বর— তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান নির্ধারণের খেলা এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর-ফাইনাল খেলা।

ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

চুণী গোস্বামী (বাংলা) : বয়স ২৩। মোহনবাগান দলের ইনসাইড ফরোয়ার্ড। ১৯৫৫ সাল থেকে প্রতি বছর বাংলা রাজ্য দলে খেলেছেন। ১৯৬০ সালে বাংলা রাজ্য দলের অধিনায়কত্ব করেন। ১৯৫৮ সালে আফগানিস্থানে [illegible] সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলেরও নেতৃত্ব করেন। ইতিপূর্বে ভারতীয় ফুটবল দলে স্থান পেয়েছেন—১৯৫৮ সালে টোকিওর এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায়, ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় এবং ১৯৬১ সালে মালয়ের মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায়।

প্রদীপ ব্যানার্জি (রেলওয়েজ) : বয়স ২৬। ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলের রাইট আউট খেলোয়াড়। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়কত্ব করেন। ১৯৬১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 'অর্জুন' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৫ সাল থেকে ভারতীয় ফুটবল দলের পক্ষে খেলেছেন। [illegible] সাল থেকে [illegible] সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ফুটবল দলে নিয়মিতভাবে স্থান পান। পরবর্তী সময় থেকে তিনি ভারতীয় রেলওয়েজ দলের নেতৃত্বভার নিয়েছেন। ১৯৫৫ সালে এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতায়, ১৯৫৬ সালে দূরপ্রাচ্য সফর, ১৯৫৬ এবং ১৯৬০ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় তিনি ভারতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পি থঙ্গরাজ (বাংলা) : বয়স ২৭। বর্তমানে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং দলের গোলরক্ষক। পূর্বে তিনি ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে খেলেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ১৯৬০ সালে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় 'সন্তোষ ট্রফি' জয়লাভ করে। তিনি টোকিওর এশিয়ান গেমস এবং রোমের অলিম্পিক গেমসে ভারতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পি বর্মণ (রেলওয়েজ) : বয়স ২৪। ইস্টার্ণ রেল দলের গোলরক্ষক। ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালে পশ্চিম বাংলা রাজ্য দলের পক্ষে খেলেছিলেন। ১৯৬০ সাল থেকে রেলওয়েজ দলের পক্ষে যোগদান করছেন। ১৯৬৩ সালের ব্রহ্মদেশ সফরে ভারতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত হন।